



অমৃত

ত্রৈমাসিক সুচোপত্র

॥ ১ম বর্ষ ৪র্থ খণ্ড, ৩৯ সংখ্যা হতে ৫২ সংখ্যা ॥

১৯শে মার্চ ১৩৬৮-২১শে বৈশাখ ১৩৬৯ ॥ ২রা ফেব্রুয়ারী-৪ঠা মে ১৯৬২

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
॥ অ ॥		
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	নাচের পদতুল (গল্প)	৪১৭
শ্রীঅজিত সেন	আগুন! আগুন! (আলোচনা)	৬০৪
শ্রীঅতীন্দ্র মজুমদার	নির্বাচনের প্রচারকৌশল (আলোচনা)	৬৮৭
সমদাশঙ্কর রায়	আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	৭৩১
ঐঅভয়শঙ্কর	সমকালীন সাহিত্য (আলোচনা)	৬৯, ১৪৩, ২২৫, ৩০৯, ৩৮৭, ৪৭০, ৫৪৯, ৬২৯, ৭০৯, ৭৯০, ৮৬৬, ৯৪৮, ১০৩০, ১১০৮
শ্রীঅমরনাথ রায়	মতামত	২৬০
শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	পশ্চাৎপট (কবিতা)	৭২৮
শ্রীঅমরকান্ত	বিজ্ঞানের কথা (আলোচনা)	৩৭, ১১৪, ২৭৯, ৫২২, ৫৯৬, ৭৬৫, ৯০৮, ১১৭৬, বিজ্ঞানের গল্প ২০৭, ৩৫৭, ৪৪৩ ভবঘুরের খাতা ৬৭২, ৮৪২, ৯৮৮
শ্রীঅরুণকুমার গণ্ডোপাধ্যায়	আইনের দুনিয়ার চাক্ষুস চিত্র (আলোচনা)	১১
শ্রীঅরুণকুমার মৃধোপাধ্যায়	ধর্মপদ (প্রবন্ধ)	২১২
শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়	জানালা (কবিতা)	৮৮৮
শ্রীঅশোক গুহ	বই রাখা ও বই রক্ষা (রম্যরচনা)	৭০১
শ্রীঅসীম নন্দী	নিজের দিকে নজর রাখুন (রম্যরচনা)	৯৪১
শ্রীঅসীম রায়	শান্তিনিকেতন ১৯৬১ (কবিতা)	৮৮৮
॥ আ ॥		
আদিনাথ ভট্টাচার্য	কুয়াশার আকর্ষণের মূখ (কবিতা)	২৪৮
আনন্দভৈরব	সংগীতবীক্ষণ	৬৪
আব্দুল আজীজ আল আমান	বোবা মরশুম (গল্প)	১৩৫
আভা পাকড়াশী	মহীশূরে দশেরা (আলোচনা)	২০৪
আরাত দাস	দ্বিপদী (গল্প)	১০৫৭
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে	ঘাতক (বিদেশী গল্প)	৫৯৯
আলবেল কাম	অতিথি (বিদেশী গল্প)	২৮৫
আলেক্সান্ডার বরকার	নৌকো (কবিতা)	৯৬৮
আশাপুর্ণা দেবী	দিনান্তের রঙ (উপন্যাস)	৪৩, ১২৫, ২১৫, ২৯৩, ৩৭৩, ৪৫৫, ৫৪১, ৬০৭, ৬৯১, ৭৭৫, ৮৫৫
আশুতোষ মৃধোপাধ্যায়	ঠাকুরের ঝুলি (গল্প)	৪৯৭
আশিস সান্যাল	প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে (কবিতা)	৪০৮

অগ্রত

লেখক

বিষয়

পৃষ্ঠা

॥ ই ॥

শ্রীহান বানিন

... .. রোদের নেশা (বিদেশী গল্প)

॥ ক ॥

শ্রীকণাৎ চৌধুরী

... .. আগাধা ক্রিস্ট

... .. আতঙ্কের আতঙ্ক

... .. মেহেদী

... .. পরমায়ু

... .. ঘোবন সমীপে অকাল বসন্ত

... .. নিকট অতীত : দুই স্মৃতি

... .. দুই পৃথিবীর সেতু : পালি বাক

শ্রীকবিতা সিংহ

... .. সেই সবুজ পাহাড় পেরিয়ে (গল্প)

শ্রীকমল চৌধুরী

... .. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন (প্রবন্ধ)

শ্রীকরুণাসিন্ধু দে

... .. হাল ধরে বসে আছি (কবিতা)

শ্রীকলারসিক

... .. প্রদর্শনী (আলোচনা)

শ্রীকবি ঘা

... .. মকর্ট পুরাণ (কাটুন)

বিপদা ও পৃথিবী (কাটুন)

শ্রীকালিদাস দত্ত

... .. বসন্ত (গল্প)

শ্রীকিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য

... .. মতামত

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

... .. বীরগুণা কাব্য :

মধুসূদনের সামগ্রিক শিল্পপ্রত্যয় (প্রবন্ধ)

শ্রীকেশরনাথ চট্টোপাধ্যায়

... .. গুন্ডা হাতী (শিকার কাহিনী)

শ্রীকৃষ্ণ ধর

... .. রোদে খুঁজি সেই মূখ (কবিতা)

শ্রীকৃষ্ণ দাস

... .. আকৃতি (গল্প)

শ্রীকৃষ্ণ বসু

... .. যুক্তরাষ্ট্রে আর্ট মিউজিয়াম (আলোচনা)

শ্রীকুমকুম দে

... .. বসন্ত তোমার ডাকি (কবিতা)

॥ গ ॥

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য

... .. খুঁজিটিপ্রসাদ (আলোচনা)

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী

... .. বসন্তে (কবিতা)

॥ ঘ ॥

ঘটনাপ্রবাহ

... .. ৪৮, ৯৪২, ২২৪, ৩০৮, ৩৫৮

... .. ৪৬৯, ৫৪৮, ৬২৭, ৭০৮, ৭৫৮

... .. ৮৬৬, ৯৪৭, ১০২৮, ১০৭৮

॥ চ ॥

শ্রীচন্দ্রশেখর মল্লিক

... .. বিশেষ দ্রষ্টব্য (সাতপাঁচ)

শ্রীচন্দ্রশেখর মল্লিক

... .. ঘরে ফেরার বেলা (কবিতা)

অনুত

লেখক

বিষয়

পৃষ্ঠা

॥ জ ॥

শ্রীজ্ঞানসম্ম	 মসিরেখা (উপন্যাস)	 ৩৩, ১১৭, ১১৫, ২৭৩, ৩৫০, ৪৩৭, ৫২৫, ৫৮৯, ৬৭৫, ৭৬৯, ৮৪৫, ৯৩১, ১০১১, ১০৯৫
শ্রীজ্ঞান লাইস বরজেন	 তলোয়ারের আকৃতি (গল্প)	 ৭৬৭
শ্রীজৈমিনি	 পূর্বপক্ষ (আলোচনা)	 ৯, ৮৯, ১৬৯, ২৪৯, ৩২৯, ৪০৯, ৪৮৯, ৫৬৯, ৬৪৯, ৭২৯, ৮০৯, ৮৮৯, ৯৬৯, ১০৪৯
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)	 প্রেম ও পাদুকা (গল্প)	 ৮৯৫

॥ ত ॥

শ্রীকৃষ্ণ সান্যাল	 অথরা পাবর হাসি (কবিতা)	 ১৬৮
শ্রীতারাপদ রায়	 ভজগোবিন্দ ভোজনালয় (রসরচনা)	 ৩০৫
শ্রীভূদঙ্গীদাস বাগচী	 মতামত	 ৯৭৮
শ্রীভূষার চট্টোপাধ্যায়	 শিয়রে প্যাপের হাত (কবিতা)	 ৮
শ্রীবিদ্যবরপ্রদান মাল্যাকার	 শোক থেকে (কবিতা)	 ২৪৮
শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী	 প্রাচীন ভারতে মনের চিকিৎসার ধারা (প্রবন্ধ)	 ৮১৯

॥ দ ॥

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু	 পদাবলী (কবিতা)	 ৭২৮
শ্রীদর্শক	 খেলাধুলা	 ৭৮, ১৫২, ২৩৬, ৩৯৮, ৩৯৭, ৪৭৮, ৫৫৮, ৬৩৮, ৭১৮, ৭৯৮, ৯৫৮, ৮৭৭, ১০৩৮, ১১১৮
শ্রীদিনেশ দাস	 জীবন : কবিতা (কবিতা)	 ২৪৮
শ্রীদীপালী সেন	 মতামত	 ৫৮৮
শ্রীদিলীপ মাল্যাকার	 বালিন থেকে বলছি (আলোচনা)	 ৫৩০
শ্রীদিলীপ রায়	 হযতো (কবিতা)	 ৮৮
শ্রীদীপক চৌধুরী	 মতামত	 ৫০৪
শ্রীদীপক মজুমদার	 গোয়া (গল্প)	 ১৭৫
শ্রীদেবদাস ভট্ট	 মতামত	 ৮১৪
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ	 বহিরঙ্গ (গল্প)	 ৭৮১
শ্রীদেবব্রত মল্লোপাধ্যায়	 মতামত	 ১৭৪
শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী	 মতামত	 ৫৮৮
শ্রীদেববাংশু দত্ত	 সাহিত্যের সত্য (আলোচনা)	 ১০০৭
শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	 ভোটরঙ্গ (রম্যরচনা)	 ১৮৪
শ্রীদেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	 বাংলা বইয়ের সেকাল ও একাল (আলোচনা)	 ২৭৭
শ্রীদেবপ্রসাদ	 শেষ রাত্রে সনেট (কবিতা)	 ৮
শ্রীদেবপ্রসাদ	 (আলোচনা)	 ৬৬, ৮০, ২২২, ৩০৭, ৩৮৬, ৪৬৭, ৫৪৬, ৬২৬, ৭০৬, ৭৮৬, ৮৬৬, ৯৪৬, ১০২৮, ১১০৫

অনুভূতি

লেখক

বিষয়

পৃষ্ঠা

॥ ধ ॥

শ্রীমদ্র পাণ্ডা	...	বীরভূমের আলংকার (আলোচনা)	...	...	২
-----------------	-----	--------------------------	-----	-----	---

॥ ন ॥

শ্রীনিরেন্দ্র দেব	...	স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	...	...	৪১১
শ্রীললিতাকুমার ভট্ট	...	মতামত	...	...	৬৭০
শ্রীনাথদীকর	...	প্রেক্ষাগৃহ (আলোচনা)	...	৭২, ১৪৬, ২৩০, ৩১৩, ৩৯০, ৪৭৪, ৫৫৩, ৬৩২, ৭১৩, ৭৯৩, ৮৭০, ৯৫২, ১০৩৩, ১১১২	...
	...	মতামত	...	...	৯৭৮
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	আবরণ (গল্প)	...	...	৫৭৩
	...	মেঘের উপর প্রাসাদ (উপন্যাস)	...	৮২৩, ৯০১, ৯৮৬, ১০৭১	...
শ্রীনারায়ণ মথোপাধ্যায়	...	বাসাবাড়ী (কবিতা)	...	...	১০৪৮
শ্রীনিখিল সেন	...	‘হুতোম প্যাঁচার নক্সার’ শতবর্ষ (আলোচনা)	...	...	৫১৭
শ্রীদীনারায়ণ সেনগুপ্ত	...	হস্তকারিগরী সংস্থার নক্সাকেন্দ্র (আলোচনা)	...	...	৫৯৩

॥ প ॥

শ্রীশরৎচন্দ্র	...	সাতপাঁচ (আলোচনা)	...	...	২২০
শ্রীশিব মথোপাধ্যায়	...	শৈশবযাত্রা (কবিতা)	...	...	৩২৮
শ্রীশরৎচন্দ্র গোস্বামী	...	কনককুঞ্জের রহস্য (রোমাঞ্চ কাহিনী)	...	...	৬৫৩
শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী	...	অন্তর্জাল (কবিতা)	...	...	৪০৮
শ্রীশশীলা মিত্র	...	দুটি হাতের জাদুর প্রভাব (রম্যরচনা)	...	...	৮৪৯
শ্রীশরৎচন্দ্র লাগারকিডস্ট	...	যে লিফট নরকে গেল (বিদেশী গল্প)	...	...	২০৯
শ্রীশশীলা দাস	...	মতামত	...	...	৩৫৬
শ্রীশরৎচন্দ্র দাশগুপ্ত	...	রহস্যের দিকে (কবিতা)	...	...	৬৪৮
শ্রীপ্রতিমা বসু	...	মতামত	...	...	৭৪০
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী	...	মতামত	...	...	৯৪
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল	...	রাশিয়ার ডায়েরী (ভ্রমণ কাহিনী)	...	১৯, ৯৯, ১৮১, ২৬১, ৩৪১, ৪২৫, ৫০৭, ৫৭৭, ৬৫৯, ৭৪৭, ৮২৯, ৯১১, ৯৯৫, ১০৮৩	...
শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত	...	আর্নেস্ট লুইস (আলোচনা)	...	...	৩৫৯
শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার	...	মতামত	...	...	২৬০
শ্রীপ্রমোদ মিত্র	...	পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	...	...	৯১
শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মথোপাধ্যায়	...	ভলন্তায় সামিখো লিওনিড পাস্তেরনাক (প্রবন্ধ)	...	...	৮৯১
শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	মতামত	...	...	৮১৪

॥ ব ॥

শ্রীবল্লভ সেন	...	কলকাতার শিল্পমেলা (সংবাদ)	...	...	৫০৯
শ্রীবংশীধারী দাস	...	এই ঠান্ডা নিজের অধারে (কবিতা)	...	...	১৬৮
শ্রীবাণী দত্ত	...	মতামত	...	...	১০৫৬
শ্রীবারীন ঘোষ	...	মতামত	...	...	৩৫৬
শ্রীবিনয় মজুমদার	...	একটি উজ্জ্বল মাহ (কবিতা)	...	...	৮৮৮

অমৃত

লেখক

বিষয়

পৃষ্ঠা

॥ ব ॥

শ্রীনিভূতিভূষণ গদ্য	...	ভালবাসা (গল্প)	...	...	৮৫৯
শ্রীনিভূতিভূষণ মৃথোপাধ্যায়	...	তীর্থদ্রাড়া (গল্প)	...	...	২৫৫
শ্রীনিয়ন'স্টার্ন বিয়নসেন	...	বাবা (বিদেশী গল্প)	...	...	৯২৫
শ্রীনিবনাথ মৃথোপাধ্যায়	...	ব্রিটিশ নাট্যকলা প্রসঙ্গে (আলোচনা)	...	...	১১১
	...	সাকাস প্রসঙ্গে (আলোচনা)	...	...	৬১৬
	...	ওয়েস্টনার প্রসঙ্গে (আলোচনা)	...	...	৭৫৮
	...	জ্যাজ সংগীত প্রসঙ্গে (আলোচনা)	...	...	৮৯৫
শ্রীনিবনাথ রায়	...	মতামত	...	...	৯৪
শ্রীনিবনারা	...	বাইরে থেকে ঘরে (আলোচনা)	...	...	৯৪৩
শ্রীবিষ্ণু দে	...	যেমন জেনেছে চন্দ্রীদাস বা দান্বে (কবিতা)	...	...	৮
	...	চতুর্দশপদী (কবিতা)	...	...	৫৬৮
শ্রীবীর্য সরকার	...	মতামত	...	...	৩১
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	...	সুরের সুরধুনী, পাঁচ (আলোচনা)	...	...	১০৯৯
শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	মায়াবী নিকেতন (কবিতা)	...	...	৪০৮
	...	কবিতার্থ শান্তিনিকেতন (আলোচনা)	...	...	১৯২
শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	দোলযাত্রা ও সেকালের লেখক (প্রবন্ধ)	...	...	৫৯৫
	...	সেকালের কাঁসারীপাড়ার সং (প্রবন্ধ)	...	...	১০১৬
শ্রীবৃন্দেব ডাট্টাচার্য	...	উইলিয়ম কেরী ও বাংলার বিজ্ঞানচর্চা (আলোচনা)	...	...	৩৫১
শ্রীবেঙ্গা দে	...	সমস্যা ও সমাধান (আলোচনা)	...	...	৩৮৩
শ্রীবোম্মানা বিশ্বনাথ	...	যুগপদ্য গুরুজাড়া অম্পারাও (আলোচনা)	...	...	৪৮

॥ ড ॥

শ্রীভবশচন্দ্র চক্রবর্তী	...	অন্তঃসলিলা (গল্প)	...	...	৭০৩
-------------------------	-----	-------------------	-----	-----	-----

॥ ম ॥

শ্রীমজ্জলিকা দাস	...	প্রতিবেশী (কবিতা)	...	...	৮০৮
শ্রীমজ্জলিকা ডাট্টাচার্য	...	প্রতিভাসিক (কবিতা)	...	...	১৬৮
শ্রীমনন	...	শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব (সংবাদ)	...	...	৭১২
শ্রীমনোবীণা রায়	...	মিথ্যাচারিণী (গল্প)	...	...	৩৭৯
শ্রীমনোরঞ্জন বসু	...	শ্রীশ্রীগোরাঙ্গসুন্দর ও ভাবসাধনা (প্রবন্ধ)	...	...	৫৭১
শ্রীমণীশ ঘটক	...	অনেক পায়ের দাগ (কবিতা)	...	...	৩২৮
শ্রীমাধব রায়	...	বাংলা নাটকে যাত্রার প্রভাব (আলোচনা)	...	...	১২২
শ্রীমানস রায়চৌধুরী	...	ছিন্নভিন্ন গান (কবিতা)	...	...	৫৬৮
শ্রীমিহির আচার্য	...	পান্না হল সবুজ (গল্প)	...	...	৯৭১
শ্রীমৃগাঙ্ক রায়	...	স্বগত (কবিতা)	...	...	১০৪৮

॥ র ॥

শ্রীরতন সান্যাল	...	আর এক মৃত্যু (গল্প)	...	...	১১০১
শ্রীরবীন মজুমদার	...	নাটক : অভিনয় : আঙ্গিক (প্রবন্ধ)	...	...	৯৭৯
শ্রীরবীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ	...	ইউরোপীয় সভ্যতার সংকট ও শিল্পী (আলোচনা)	...	১৭১, ২৫১	
শ্রীরমানাথ রায়	...	অন্ধকার অপেক্ষা (গল্প)	...	...	৯৩৭
শ্রীরাম বসু	...	নারী তুমি উন্মোচিত হও (কবিতা)	...	...	৪৮৮
	...	বিদেশী গল্প (অনুবাদ)	...	২০৯, ২৮৫, ৩৬৬, ৪৪৯, ৫৩৩, ৫৯৯, ৬৮৩, ৭৬৭, ৮৫১, ৯২৫	

॥ ল ॥

শ্রীলুইজি পিরানদেল্লো	...	যুদ্ধ (বিদেশী গল্প)	...	...	৪৪৯
-----------------------	-----	---------------------	-----	-----	-----

অনুত

লেখক

বিষয়

পৃষ্ঠা

১১ শা

শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়	 অনন্তসাগরে ভেসে যায় আজি (কবিতা)	 ৬৪৮
শ্রীশঙ্করনারায়ণ সেন	 দীঘা (আলোচনা)	 ১০৭৯
শ্রীশঙ্করানন্দ মুনোপাধ্যায়	 লুপ্তিত বকুল (কবিতা)	 ৪৮৮
শ্রীশরদীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	 প্রজ্জ্বলিত কবী (রোমাঞ্চ কাহিনী)	 ১৩, ৯৫
শ্রীশশাঙ্ক সেনগুপ্ত	 ছুটির দিনের পড়া (আলোচনা)	 ৫০, ২০০
শ্রীশিবশঙ্কু পাল	 গৌড়লিক (কবিতা)	 ৮৮
শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি	 মতামত	 ১০৫৬

১২ শা

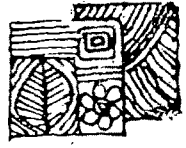
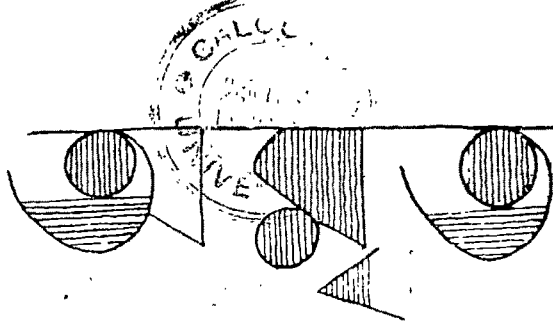
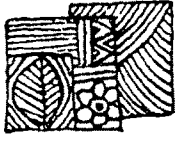
সংবাদ বিচিত্রা		১২১, ২৯২, ৪৫২, ৫৯৮, ৭৭৩, ৯১০
শ্রীসত্যভূষণ সেন	 জার্মান কবি গোটে (প্রবন্ধ)	 ৪৯১
শ্রীসমরজিৎ কর	 এটিকেট (রম্যরচনা)	 ৯৩৪
শ্রীনার্থবাহ	 ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা (আলোচনা)	১৩০, ৩০০, ৬১২, ৯২৭
শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেন	 বেলা পড়ে এলো (কবিতা)	 ৩২৮
সাহিত্য সমাচার		৩৯, ২২১, ৩৭২, ৫০৬ ৬৯৬, ৮৫৪, ৯৮৭, ১০৭০
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	 ব্রহ্মবান্ধবের সন্ধানে (প্রবন্ধ)	 ৬৫১
শ্রীসুভদ্রা ত্রিপাঠী	 প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা (আলোচনা)	 ৪০
শ্রীসুপ্রিয় মুনোপাধ্যায়	 মধ্যখানে তুমি আমি (কবিতা)	 ৮৮
শ্রীসুধোদ্রুম চক্রবর্তী	 মাতাহারি (গল্প)	 ৩৩৫
শ্রীসুভাষচন্দ্র পালিত	 মতামত	 ৯০৬
শ্রীসুধরঞ্জন মুনোপাধ্যায়	 কিস্বদন্তীর মাহ (আলোচনা)	 ৭৭০
শ্রীসুভোখা সান্যাল	 খোলা চিঠি (গল্প)	 ১০১৯
শ্রীসুশীল সিংহ	 ছেলে (গল্প)	 ৬৯৭
শ্রীসৈয়দ মুনতাহা সিরাজ	 মতামত	 ৫০৪
শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	 রবীন্দ্র-চিত্রের রূপ (প্রবন্ধ)	 ১০৫১
সম্পাদকীয়		৭, ৮৭, ১৬৭, ২৪৭, ৩২৭, ৪০৭, ৪৮৭, ৫৬৭, ৬৪৭, ৭২৭, ৮০৭, ৮৮৭, ৯৬৭, ১০৪৭
শ্রীস্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	 বৃষধর্মী (গল্প)	 ৭৪২

১৩ শা

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র	 কানামাছি—আন্তর্জাতিক (কবিতা)	 ৮০৮
শ্রীহরিন্দ্র রায়	 মতামত	 ৪১৬
শ্রীহারিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	 ফগু (গল্প)	 ৮১৫
শ্রীহরমান হেস	 বাহির ও অন্তর (বিদেশী গল্প)	 ৩৩৬
শ্রীহালডয় ল্যাকসনস	 লিলি (বিদেশী গল্প)	 ৫৩৩

১৪ শা

শ্রীয়োহানেস ভি য়েনসে	 হত অরণ্য (বিদেশী গল্প)	 ৮৫১
------------------------	-------------------------------	------------



১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯শং সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা,
শুক্রবার, ১৯শে মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 2nd February 1967
40 Naya Paise

নেহরুজী কর্তৃক কাশ্মীর সম্বন্ধে মার্কিং প্রেসিডেন্ট কেনেডি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান একদিকে যেমন দৃঢ়তা-বাজক, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় কূটনীতির পক্ষে একটি গুরুতর পরাজয়। মার্কিং প্রেসিডেন্ট কেনেডি কাশ্মীরের ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের সভাপতি মিঃ ইউজিন ব্ল্যাককে মধ্যস্থতার ভার দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রস্তাব কাশ্মীর প্রসঙ্গে একটি নতুন কূটনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা ঘটিয়েছিল। প্রস্তাবটি পত্রযোগে দিল্লী ও করাচীতে প্রেরিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্থান এতে সাগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। অন্যদিকে দিল্লী কিছু দিন নীরব থাকার পর, গত সোমবার নেহরুজী জানিয়েছেন যে, কোনো তৃতীয় পক্ষের দ্বারা মধ্যস্থতার প্রস্তাব ভারতবর্ষের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। এই ঘটনায় পাকিস্থান যে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক অবস্থার সম্মুখীন হবে, বিশ্বসভায় কাশ্মীর সম্বন্ধে অধিকতর সহানুভূতি আকর্ষণের সুযোগ লাভ করবে এবং পাকিস্থানী দাবীর যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে অনেকের মনে আশ্বাস সৃষ্টি করতে পারবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই সুযোগ পাকিস্থানকে কেন দেওয়া হল? ভারত সরকার যে সব কারণে এই মধ্যস্থতার প্রস্তাব বর্জন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। কারণ ভারতের পক্ষে সব চেয়ে মূল্যবান হচ্ছে দুইটি প্রশ্ন : (১) কাশ্মীর থেকে পাকিস্থানের আক্রমণাত্মক দখল হঠাতে হবে; এবং (২) ধর্মীয় ভিত্তিতে কাশ্মীরের কোনো বাঁটোয়ারা স্বীকৃত হবে না। অর্থাৎ শব্দ বিরোধ

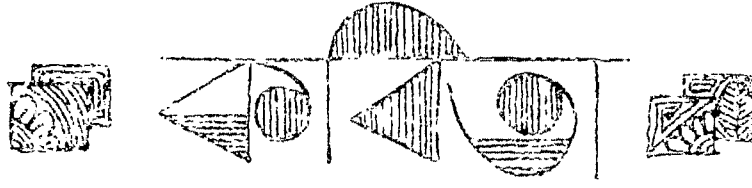
মীমাংসা নয়, মীমাংসার পদ্ধতি সম্বন্ধে নৈতিক ও আদর্শগত প্রশ্ন-গুলি আমাদের কাছে বেশী মূল্যবান। আমাদের মোট কথা এই যে, মীমাংসার পদ্ধতি যদি নীতিবিরোধী এবং আপত্তিকর হয় তাহলে মীমাংসার ফল যতই ভাল হোক না কেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে তা আমাদের গ্রহণীয় নয়।

কিন্তু ভারতের বক্তব্য আমরা বিশ্বসভাকে কতটুকু বোঝাতে পেরেছি? দুনিয়ার জনমতকে কতটুকু আমাদের অনুকূলে আনা সম্ভব হয়েছে? এই কাশ্মীরের ব্যাপারেই যেখানে প্রচার, আন্তর্জাতিক মন্তব্য ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র, সেখানে পর পর কয়েকটি গুরুতর কূটনৈতিক পরাজয় আমাদের স্বীকার করতে হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ মনে করে যে, কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য যথেষ্ট ন্যায়সংগত নয়। এই প্রান্ত ধারণা সব ক্ষেত্রেই স্বার্থপ্রসূত এবং পাকিস্থানের প্রতি প্রীতিজনিত—এই সান্দ্রনয়ন নিজেদের প্রতারণা করে কিছু লাভ নেই। একথা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা উচিত যে, অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রান্ত ধারণার জন্য আমরাই মূলতঃ দায়ী; কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য যথার্থভাবে এবং দক্ষতা সহকারে বিশ্বসভায় রাখা হয়নি।

কিন্তু পাকিস্থানের সঙ্গে কূটনৈতিক যুদ্ধে যতবার আমাদের পর-রাষ্ট্র দপ্তর পরাজিত হয়েছেন, তার মধ্যে এই কেনেডি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান সবচেয়ে মারাত্মক। এর প্রতিফল দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। অথচ এই প্রতিফল বা পরাজয় বহুলাংশে ভারতীয় দৃঢ়তাবাসের অকৃতকর্মের ফল। প্রস্তাবটি লিখিতভাবে জ্ঞাপন করার পূর্বে ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতকে আভাবে নিশ্চয়ই এর মর্ম জানানো হয়েছিল। কেনেডির চিঠি পাওয়ার

পূর্বে দিল্লী এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, একথা বিশ্বাস করা যায় না। আর, যদি একথা সত্যই হয় তাহলে এর থেকে ভারতীয় দূতের অপদার্থতা সুপ্রমাণিত। এতবড় একটি খবরের তিনি কোনো পূর্বাভাস পাননি! অপরপক্ষে, ভারত সরকারের কর্তব্য ছিল ওয়াশিংটনে উৎকর্ণ থাকা এবং লিখিতভাবে প্রস্তাবটি পেশ হওয়ার পূর্বেই মার্কিং প্রেসিডেন্টকে স্পষ্ট আভাষ পৌঁছে দেওয়া যে, মধ্যস্থতার প্রস্তাবে ভারত সম্মত হতে পারে না। তা যদি করা হত তাহলে কেনেডি নিশ্চয়ই প্রস্তাবটি আদৌ পেশ করতেন না এবং এইটি প্রত্যাখ্যানের বিরূপ প্রতিক্রিয়াও ভারতকে সহ্য করতে হত না।

প্রস্তাবটি যাতে আদৌ উত্থাপিত ও বিজ্ঞাপিত না হয় তার চেষ্টা ভারত করতে পারেনি। এই ঘটনায় দুইটি জিনিষ প্রমাণিত হয়েছে : প্রথমত, কাশ্মীর সম্বন্ধে ওয়াশিংটন ভারতের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে অবগত নয়—না থাকার দায়িত্ব ভারতের। দ্বিতীয়ত, ওয়াশিংটনের কার্যকলাপ বা মনোভাবের কোনো পূর্বাভাস ভারতীয় দূত বা পররাষ্ট্র দপ্তর রাখেন না। দুইটি অপরাধই ক্ষমাহীন। অপরপক্ষে যদি একথা সত্য হয় যে, এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পূর্ণ সম্ভাবনা জেনেও মার্কিং প্রেসিডেন্ট প্রস্তাবটি পেশ করেছেন তাহলে বৃদ্ধিতে হবে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতকে কোণঠাসা ও অপদস্থ করার চেষ্টা ওয়াশিংটনে আরম্ভ হয়েছে। সেক্ষেত্রে একথা স্বীকার করতে হয় যে, পণ্ডিত নেহরু তাঁর মার্কিং ভ্রমণ এবং কেনেডির সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও ভাব-বিনিময় সম্বন্ধে যেসব উচ্ছ্বাস কিছুকাল পূর্বেও প্রকাশ করেছেন, সেগুলি ভিত্তিহীন এবং কূটনৈতিক অজ্ঞতাপ্রসূত।



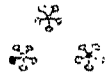
যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে

বিষ্ণু দে

উদাসীন চোখে দীর্ঘপক্ষ্য ভিড়ে
কর যাতায়াত? চিরকাল উদ্ভ্রান্ত!
চেনা-অচেনায় চেতনায় কোথা কান্দি?
উভবলী ঐ হৃদয়ে উক নীড়ে
সে কোন্ আকাশ বাসা বেঁধে পায় শান্তি?

ওগো মনসিজা, তুমি যে চাইলে ভিক্ষা
অতনুর আরু ত্রিকালের পদপ্রান্তে,
সে কি শূন্য ঘনপরাশর-গাণা শিক্ষা?
সে কি নিতান্ত প্রথা মতো? তুমি জানতে
প্রেমের তৃপ্ত-অতৃপ্ত একই দীক্ষা

চির-অস্থির উদাস এক শান্তি,
যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে?



শিয়রে সাপের হাত

তুষার চট্টোপাধ্যায়

শিয়রে সাপের হাত। পতনের সম্বদ ঘোষণা
পদতলে পহুৎলা। আত্মবৎ সক্ষম সমাধি
ধামন বয়েছে দীর্ঘ অন্তরাল প্রাঙ্গল ঘটনা।

নির্ভরতা তুমি নগ্ন ধরে ডাক। বাহির দুরারে
দুঃখের কত পরিচিত অবলম্বন অস্বাদিত স্মৃতি
বিদ্যাগে কলুষ হয়। বিপরীত হওয়ার প্রহারে
প্রসঙ্গের একময়। স্বরচিত বিষয় প্রকৃতি।
নিষ্ঠা বয়েছে করলে মৃত্তিকার নিষ্ঠ ব্যবহারে।

অন্ধুর ফুলের বসন্ত ওষ্ঠ রাখি। সমুদ্র সংবাদে
প্রবণের কুশলতা। কোলাহল অপেক্ষা ইত্যাদি
দৃষ্টিভঙ্গ। স্তব্ধ প্রাণিত বিশ্বাসের বিপুল আশ্বাদে।

শিয়রে সাপের হাত। পতনের অস্তিত্ব তোরগে
বুঝি অন্তরাল ভাঙে। বহুবিধ শব্দ প্রতিবাদী।
মৃতিভাষা নিষ্ঠা রাখি উন্মাদের সৈবৎ স্ববর্ণে।

শেষ ঘণ্টার সনেট

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাঁহ, আরও শূন্য রুদ্ধ জ্বালায় যন্ত্রণা পোড়ায়
স্বাধির আকাশ, শূন্য চতুর্দিকে তারা তীর তারা,
কুৎসিত বীভৎস ব্রণ ঝুলে আছে পীতাম্ব প্রভায়
রুদ্ধাঙ্গ রক্তের স্ফীতি। আহা স্মৃতি আমি তোর সাড়া
সহসা জেনেছি এই দৃঃসহ বিন্দু নভোতল
কারও চোখে তন্দ্রা নেই, কোনও খানে তন্দ্রা কারও চোখে
অতল সুস্বপ্ন নেই, স্নায়ুর প্রচণ্ড কোলাহল,
ওরে ও কিশোর, দেখ, আমাকেও টানে সে-নরকে!

জানলার সন্মোচে কাঁপে তোরই বয়সিনী অন্ধকার।
আহা স্মৃতি, দেখ সেই ছায়ার হাতছানি আমি তার
স্পর্কের তৃষ্ণার জ্বালা, আর দেখ আমার চারদিক
আমার সর্বগুণ এই রাগির আগুনে তপ্ত। ওরে
ও স্মৃতি আমাকে আগুনে রাখ সেই বিরতি বশিষ্ঠক
রহপার্বী স্বর্ষ যেন আমাকে খুঁজে না পায় ভোরে!

দুর্দশ

ইমিনি

আজকাল সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠলেই আমি ভয় পাই। না, পাওনাদার বা ভোটপ্রার্থী নয়। তাঁরাও আসেন মাঝে মাঝে। কিন্তু তাদের দেখলে চেনা যায়। এরা একেবারে অন্যজাতের আগন্তুক। অত্যন্ত হাসিখুশি, নিষ্পাপ চেহারা। দল বেঁধে ছ'সাত জনে আসে একসঙ্গে, এবং এসেই চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। যেন চক্রবাহে বাধা পড়েছে। লড়াই করা তখন অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। প্রাণের বদলে দিতে হয় পণ—অর্থ, মনুষ্যপণ। দিনের মধ্যে এ-রকম চার-পাঁচবার। ক্রমাগত এইভাবে অভিমুখের লড়াই চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। কড়া-নাড়ার ক্ষীণতম শব্দেই তাই বৃকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে থাকে।

বৃকতেই পারছেন, আমি সরস্বতী পুজোর চাঁদা-আদায়কারীদের কথা বলছি। আমাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্যে এদের যতো উৎসাহ তার একটা সামান্য ভঙ্গাংশও যদি মা-সরস্বতীর কাছে বিদ্যা-আদায়ের জন্যে নিয়োজিত হত, আমি হালপ করে বলতে পারি তাহলে এরা সকলেই এক একজন দিগ্গজ পণ্ডিত হয়ে উঠত।

কিন্তু, Nature abhors vacuum, সরস্বতীর শূন্য পীঠভূমিতে অনায়াসেই স্থান করে নিয়েছেন দুষ্ট সরস্বতী। দুষ্টবুদ্ধিতে এই সব কিশোরবাহিনী তাক লাগিয়ে দিতে পারে তাদের পিতৃপুরুষকেও।

এই তো সেদিন আমারই কী কাহিল অবস্থা হয়েছিল শুনুন।

কলকাতা বিরাট শহর। পাশের বাড়িতে বিশ্ববিখ্যাত মানুষ থাকলেও পাড়ার লোক তার খোঁজখবর রাখতে চায় না। এ-সবই আমার জানা কথা। তবু অহংবোধটা ভারি মজার জিনিস। সব জেনে-বুঝেও মাঝে মাঝে অবস্থা হয়ে যেতে হয়। কড়া-নাড়ার শব্দে সেদিনও যথারীতি হাতের মুঠোয় একটি আধূলি নিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। যা আশংকা করেছিলাম তা ঠিকই। চাঁদা-প্রার্থী। বয়স এদের ষষ্ঠ বৈশী, আঠার-উনিশ হবে।

বাক-সাহিত্যের বই

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

রবীন্দ্রায়ণ

মজবুত কাপড়ে বাঁধাই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রতি খণ্ডের দাম দশ টাকা

আশ্রয় ॥

জরাসন্ধ

৩.৫০

কয়লা খনির মালিক সোমনাথ প্রভুত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে প্রাসাদের পর প্রাসাদ বানিয়েছেন, কিন্তু বহু-আকাঙ্ক্ষিত একটি 'গৃহ' রচনা করতে পারেন নি। আর ভাগ্যের এমনি পরিহাস, ক্ষুধা পিতৃ-হৃদয়ের কালিমার মতো অবহেলিত সন্তানের জীবনেও প্রিয়-পরিজন-পরিবৃত্ত একটি শান্তিনিবিড় আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই বন্দী হয়ে রইল। জরাসন্ধের সার্থক লেখনী থেকে সার্থকতম নতুন উপন্যাস।

অগ্নিমিতা ॥

আশ্রুতোষ মুখোপাধ্যায়

৫.০০

চুনিগাঁয়ের মুকুন্দ গোস্বামীর আখড়ায় রসের বন্যা নিত্য প্রবাহিত। কীর্তনীয়া-কন্যা নন্দিনী, আর নন্দিনীর অন্তে তার দুই মেয়ে বাসনা ও স্বাধা জীবনের ছন্দ ও সুষমা বিসর্জন দিয়ে, লোভ ও লালসার সহচরী হয়ে কেন এই আখড়ার বেদীমূলে একের পর এক আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়েছিল তারই রস-বিধুর কাহিনী।

পকেটমার ॥

ডক্টর পণ্ডানন ঘোষাল

৪.৫০

দাগী পকেটমার করিম ও ছেদী। নিঃশব্দ নিপুণতায় পকেটকাটার কৌশলে যেমন সিদ্ধহস্ত, প্রণয় ও ভালোবাসার প্রতিবন্ধিতাভেও তেমন দৃঢ় ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। বাস্তববাসিনী আমিনা, চিত্রনটী চামেলী ও পকেটমার করিমকে কেন্দ্র করে অপরাধবিজ্ঞানী ডক্টর ঘোষাল যে বাস্তব আলেখ্য রচনা করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন।

ক্ষ্যাপা খুজে ফেরে ॥

নীলকণ্ঠ

৩.০০

একটি উপেক্ষিত জগৎ সম্পর্কে জগতকে সচেতন করার প্রথম সহানুভূতিমণ্ডিত মহৎ প্রয়াস। নীলকণ্ঠের নতুন বই।

আলো থেকে অন্ধকারে

জন হাওয়ার্ড গ্রিফিন ২.৫০

কৃষ্ণকায় মানুষের প্রতি সভ্য শ্রেণীসমাজের অমানুষিক আচরণের অবিশ্বাস্য তথ্য উন্মোচন করেছেন জন হাওয়ার্ড গ্রিফিন তাঁর 'আলো থেকে অন্ধকারে' গ্রন্থে। বিশ্ববিখ্যাত বইয়ের সক্ষম সাবলীল অনুবাদ করেছেন নিখিল সরকার।

বিনয় ঘোষের নতুন বই

বনফুলের নতুন বই

বিদ্রোহী ডিরোজিও ৫.০০

দুরবীণ

৪.০০

সমরেশ বসু

নারায়ণ সান্যালের

জোয়ার ভাটা

৩.০০

অন্তর্লীনা (উপন্যাস)

৫.০০

প্রাণতোষ ঘটকের উপন্যাস

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

রোজালিন্ডের প্রেম

৩.০০

আজ রাজা কাল ফকির

৩.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর

কন্যা-কলঙ্ক-কথা

৩.০০

আরও আলো (উপন্যাস)

৫.০০

বাক-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

একজন সন্নিহিত নিবেদন করল—
‘আমাদের কামের চাঁদটা—’

‘কেন কাম?’

‘চন্দ্রগতি সংঘ।’

সেকর খেলো যেন। প্রতিধ্বনি
করে বললো, ‘চন্দ্রগতি সংঘ?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ’, ছেলেটি একটু হাসি
ঠেনে বসে, ‘আগে নাম দিও অগ্রগতি
সংঘ। কিন্তু পাশের গাছিতে ঐ নামে
আরেকটি ক্লাব খোদো বসছে ওরা। আমরা
তাই নাম পালটে চন্দ্রগতি রেখেছি।’

তখন একটি ছেলে ব্যাখ্যান করে
যোগ দিল, ‘এর মাঝে এক বছর আমরা
নাম রেখেছিলাম চেয়েমতি সংঘ। কিন্তু
এটা ঠাড়া করতে চড়ুইভাতি সংঘ বলে।
তাই আমাদের প্রেসিডেন্ট ওরফে জব্দ
হাসিয়া এই নাম রেখে দিলেহন আমাদের
ক্লাবের।’

ডাক্তারবাবু কামের কথা ভালবার
সময় শুনল? একটু বিনয়ের সঙ্গেই
প্রশ্ন করে বললো।

‘হ্যাঁ না’, ছেলেটি আবার বলল,
‘তিনি নে ডাক্তার নন, ডি-ফিল। সভ্যন
দত্ত তাম রবীন্দ্রনাথ—কার কারিত্য
করেন। সাঁতার কাটার উল্লখ
করাই, সেই বিষয়ে গবেষণা করে—’

‘কেন, বেশ।’ আমি ডাড়াডাড়া কথা
শেষ করে জন্ম আধলিটি এবার তার
হাতের নিকটে এগিয়ে বললাম, ‘এই
নাও।’

নিবন্ধপত্রের মতো পিছিয়ে গিয়ে
সে চাপা আতনাদ করল, ‘সেকি স্যার?
মাত্র আট আনা?’

বস্তুতঃ আমার মন্থমই ছিল।
বললাম, ‘শুরু করলাম, ‘যে দিনকান
পড়েছে, বন্ধুত্বে ভো পারছ। তারপর
মাসের শেষ। আট আনা করে দিতে
দিতেই—’

সে বাধা নিয়ে অনায়িকভাবে হেসে
বলল, ‘সে তো ঠিকই। কিন্তু আপনার
মতো লোকের কাছ থেকে, দিলক্ষ্যবরে
সরস্বতী পুজোর ব্যাপার—’

অন্য চলে এসে উঠল। ‘আপনার
মতো লোকের এবং ‘সরস্বতী পুজো’ এই
দুটো কথা যার অর্থবোধক হয়ে উঠল
আমার কাছে। স্পষ্ট বাক্যে পাললাম,
এরা আমায় সাহিত্যিক সত্তা দিতে
ইচ্ছা করছে। এটা সাহিত্যিক হিসাবে
সরস্বতী পুজো উপলক্ষে আমান যে

কিছু বংশী দেওয়া ভীত সেই কথাই
বলতে চাইছে। ...তা বলতে যারে
বৈধি। আমার মতো সাহিত্যিক, বিশেষ
করে এইসব অপেক্ষা যুবক ও যখন
আমার নাম জানে। মনে মনে বিলক্ষণ
লজিত হয়ে তলের দাঁড়িয়ে বলে
তাড়াতাড়া ঘরে ফিরে এলাম, এবং
উৎসাহের প্রাথনো কড়কড়ে একখানি
দু টাকার নোট সংসার খরচ থেকে হাত
সফাই করে এনে তাদের একজনের
হাতে সম্প্রদান করলাম।

টাকাটা নিয়ে সবলে পকেটে রেখে
ছেলেটি এবার চাঁদার খাতা বের করল।
তারপর চাঁদার অঙ্ক, তারিখ-টারিখের
নয় ঘর ভরাট করে আয়িকভাবে হেসে
জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনার নামটা—?’

‘এ্যাঁ!’ নিজের কানকে বিশ্বাস
করতে পারলাম না।

‘ছেলেটি পুনরাবৃত্তি করল,
‘আপনার নামটা কি লিখব?’

মনে হল বলি ‘তোমার মন্থ’,
কিন্তু ততো আর সত্যিই বলা যায় না,
যে দুটাকার নোটখানা হাতছাড়া
হলে গেছে ডাও গাবা দিয়ে ওর পকেট
থেকে তুলে নেওয়া যায় না। শব্দ
নিজের জসীম মদুর্ভাগ্যকে নিজেই মনে
মনে ধিকায় দিয়ে চাপা গলার নিজের
নামটা উচ্চারণ করে দরজা থেকে ফিরে
এলাম।

এমন ঠাড়া জীবনে শব্দ কমই
ঠকোই।

এক বন্ধুর বাড়ীতে সেদিন এই
গল্প বললাম। বন্ধু-পত্নী হেসে
বললেন, ‘এ তো বড় ছেলোদের কথা।
ছোটগুলোও কম যায় না। সেদিন রাসা-
ঘরে বসে ভরকারি কুর্টাছ এক লগল
এসে বলল, মাসীমা চাঁদা দিন।
বাতারের ফিরতি গায়া পাশেই গড়ে-
ছিল, তাই থেকে চার আনা তুলে দিতে
গেছি, তা নেয়ে না। পুত্রো একটা
টাকা চাই। আমি কতো বলি, নেই,
ওদের সন ততোই দেব বেড়ে দার—
দিন, মাসীমা, ও মাসীমা দিন না।
আমি আর উত্তর দিলাম না। তাই
সেবে ওদের মধ্যে একটা বান কি
জানেন? সংগীটার মিছির্মিছি ঝগদ
দিয়ে বলল, মাসীমা মাসীমা কমিছ
কেন? দেখাছিনা ততো সুন্দর, বৌদি

বন্য, তাহলে দেবে। তাই না বৌদি!...
বন্ধু ততো কাম?’



বন্ধুর স্বগভীর করল, ‘কাম
আর কি? একটা টাকাই যে ওরা
পেরোছে, সে তো ঠিকই?’

‘নোটই না। আহা কি কথার স্বিধি,’
বন্ধু-পত্নী অত্যন্ত লজিত হয়ে বন্য
উঠলেন, ‘আট আনার বেশী এক
পয়সাও লিখিনি।’

‘ওই একই কথা হল। চান জানা
তো নয়।’

তিনজনেই এবার একসঙ্গে ছোটো
উল্কা।

এরপর বন্ধু বললেন ভায়
সাহিনী। তিনি তাঁর পাড়ার এক
পাঠাগরের সভাপতি। সেখানে সরস্বতী
পুজোও হয়ে থাকে প্রতি বছর। চাঁদা
ওঠে একশ কি সোয়া শ টাকা। এবার
উঠেছে মাত্র শ। অগতঃ এর জন্যে
চেষ্টাও করতে ছরান কিছ। প্রায়
আপনা থেকেই এনে গেছে টাকটা।
ওদের নির্বাচনী বৈঠকের এক নিগাত
ব্যতির তাই সেদিন কাম্য কথার পাঠা-
গারটির মদুর্ভাগ্য কথা ভুলে চাঁদা
দিলেন একশ টাকা। বান, পরদিন
সকালেই অন্য একজন জতোধিক
বিখ্যাত ব্যতির কাবা এনে দিলেন
দেড়শ। তারপর দুদিনের মধ্যেই অনেক
জ্যাঠা, মানা, পিনেব আনিকর্ষ ঘটতে
লাগল। ফলে ফাটের এখন টইটবুর
অবস্থা।

বন্ধু একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল,
‘দু-একদিনের মধ্যেই একটা নোটখ
দেব ভারি।’

‘কিসের নোটখ?’ বন্ধুত না
পেরে প্রশ্ন করে বললাম।

‘সিগারেট বন্ধুদের নির্মীতিত চক্ষে
বলল, ‘চাঁদা দিতে চাইয়া বন্ধু দিচ্চা
না।’

পুনরায় জিজ্ঞাসে উদহাস।



কুত

ডেইলি কোমিক্স

নির্মিতা ট্রাস্ট কলিকতা



আইনের হনিয়ার চাক্ষুষ চিত্র

অবিন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার জেলা কোর্টে উকীল-মোক্তারগণের নিম্ন ও মারাত্মক বড়বন্দে বিচার-প্রার্থী বাদী-প্রতিবাদীদের যে দারুণ দুর্দশা ও দুর্ভোগের ব্যবস্থা আছে তাহার করুণ কাহিনী কুশলী লেখক অচিন্ত্যকুমার সূর্যকুমার রসচন্দ্রে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার চাক্ষুষ চিত্র গগনেন্দ্রনাথের দুই একখানি ব্যঙ্গ-চিত্র বাদ দিলে, তাহার রস-চিত্র বাঙালী চিত্রকরদের চিত্রপটে ফুটিয়া ওঠে নাই। অথচ এদেশের 'জেলা-কোর্টে' ও 'হাই-কোর্টে' তাহার প্রচুর উপাদান ও রসের উপকরণ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আইনের জগতে তুলি চালাইলে যে কোনও চিত্রকর রসের জগতে সহজেই সোনা ফলাইতে পারেন, তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইল বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রকর ওনোরে দুমিয়ার রচিত পারী নগরের হাইকোর্টের আলেক্সামালা। এই আলেক্সামালায় আইনের দুনিয়াতে যে সকল ব্যবহার-জীবী বিচরণ করেন, এবং রাজস্ব করেন সেইসব ন্যায় ও অন্যায় বিচারের অবতারগণ জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও আদালতের "হুজুরগণ" এবং উকীল-মোক্তার ও ব্যারিস্টারের হৃদয়বিদারক ব্যাপারের করুণ নাট্যলীলার নায়কগণকে ওস্তাদ চিত্রকর দুমিয়ে অপূর্ব ব্যঙ্গচিত্রে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার প্রদর্শিত পথে এ দেশের কোনও চিত্রকর আমাদের আইনের দুনিয়াকে চিত্রপটে লিপিবদ্ধ করেন নাই। উল্লিখিত ফরাসী তুলি-বাজের অতুলনীয় তুলির তাজ্জবী সৃষ্টিতে অনেক কিছু দেখিবার, অনেক কিছু ভাবিবার, অনেক কিছু উপভোগের বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং তাহা আলোচনার যোগ্য।

দুমিয়ার চিত্রিত ফরাসী আদালতে বিচরণকারী নায়কের টাইপ-চিত্রে এ দেশের ব্যবহারজীবীগণের অনেকটা চাক্ষুষ সাদৃশ্য আছে। কালো রঙের দীর্ঘ গাউনে আবৃত তনু, গলদেশে 'বীব' নামক শাদা লম্বা যুগল জিহবার অলংকারে সজ্জিত অনেক মহাপুরুষদের চিত্রে এ দেশের উকীল ব্যারিস্টারদের অনুরূপ মূর্তি আমরা সহজেই চিনিতে পারি। পূর্বে লম্বাকৃতি গাউন পরিধান করা কেবল হাইকোর্টের মহাপুরুষদের

নিজস্ব অধিকার ছিল, এখন এই সম্মানের সজ্জা জেলাকোর্টে ও ম্যুন্সিফী আদালতেও প্রচলিত হইয়াছে। এদেশের ও বিদেশের আইনজীবীদের সাজ-সজ্জার প্রভেদ এই যে, বিদেশের মহাপুরুষরা মাথায় লম্বা কালো টুপী পরেন—বাহার রীতি এদেশে প্রচলিত নহে। এই প্রভেদের কারণ বোধ হয় এই যে, পুরাকালে মানী মানুষের নিকটে মাথা নীচু করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে হইলে মস্তকের শিরোপা নামাইতে হইত। মোগলাই দরবারে কিন্তু প্রার্থীদের পাগড়ী অবশ্যপরনায় সজ্জা ছিল এবং তাহারই ধারা অনুসরণে 'রাম-উকীলদের শির-সজ্জায় বহুদিন প্রচলিত মোহনী' পাগড়ী পরার প্রথা এ দেশের ছিল। ম্বারকানাথ ঠাকুর, টেকচাঁদ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বাংলার বিখ্যাত মনীষীদের মূর্তি-চিত্রে আমরা এই শালের পাগড়ীর ব্যবহার দেখিতে পাই।

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ব্যঙ্গ-চিত্রকর ওনোরে দুমিয়ার রচিত অসংখ্য চিত্রাবলী জীবনের নানা বিচিত্র দিক চাক্ষুষ করে লিপিবদ্ধ করিয়াছে, তাহার মধ্যে আইনের দুনিয়ার ব্যবহারিক জীবনের একাংশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশের অন্যান্য সুপরিচিত, ও অপরিচিত সমাজের ছবি

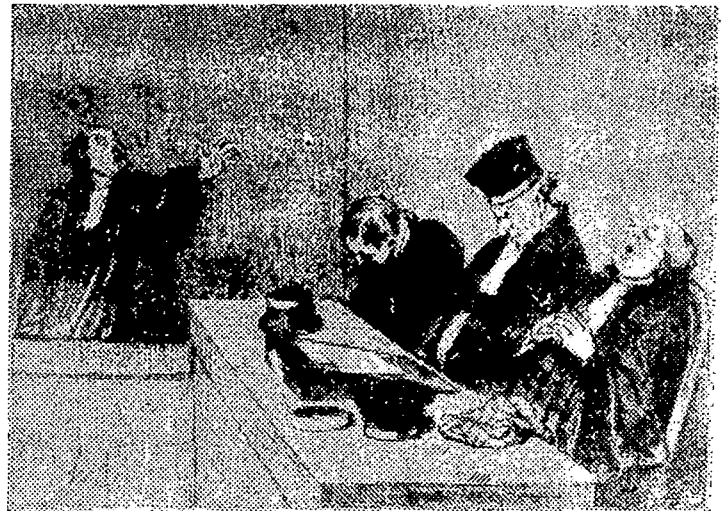
তাহার অসংখ্য চিত্রমালার নানা অধ্যায় বিভক্ত হইবে জীবন-আলেখ্যের সন্দ্বানী রসিক মানুষদের সমান ভাবেই আকর্ষণ ও আহ্বান করে, তাহার অলৌকিক রচনা-কুশল সরস ব্যাখ্যা-রীতির বাস্তবিক চাক্ষুষ পদ্ধতির অশ্রুত তুলি-সম্মিলনের যাদুকরী মোহে। অবশ্য তাহার বিশিষ্ট প্রতিভা সজীব হইয়া উঠিয়াছিল কেবল তৈলচিত্রে নহে, পরন্তু অসংখ্য রেখাচিত্রে এবং পাষণ-চিত্রের লিথোগ্রাফে।

তাঁহার আদালতের লিথোগ্রাফে লিখিত চিত্রমালা প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত "চারি ভারি" নামক পার্শ্বক পত্রিকায়। তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল "উকীল ও মজেল"। পরে এই চিত্রগুলি সংগৃহীত হইয়ে পুনঃ প্রকাশিত হয় নতুন শিরোনামায় 'আদালতের ভদ্র-মহাশয়গণ'।

তাঁহার সৃষ্টি-শক্তি ছিল বিপুল, অসংখ্য ব্যঙ্গচিত্রে তিনি সমাজের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করিয়া তাহার বস্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র তাঁহার লিথোগ্রাফের সংখ্যা প্রায় ৪০০০ ছবি। অন্যান্য চিত্র সংখ্যার অন্ততঃ দুই হাজার। এই সংখ্যা হইতে বুঝা যায় কি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি তাঁহার জীবন-দর্শন চাক্ষুষ চিত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার এই সব চিত্রে সামাজিক সমালোচনা সমসাময়িক সাহিত্যিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। এবং তাঁহার চিত্র-রীতি ও রেখাংকন পদ্ধতি তখনকার শিল্পীদের বিস্ময় ও হিংসার বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল।

আইন আদালতের ব্যঙ্গ চিত্রকলায় ভাবগম্ভীর এবং নিম্ন সমালোচকের



একদিকে উকীল বেচারী মজেলের কেস অবলম্বন করিয়া অবিরত গর্জন করিতেছেন। কিন্তু, হাকিম মহাশয় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সশব্দে নাসিকা গর্জন করিতেছেন।

ভূমিকা দিয়ে সমস্ত দৈনন্দিন জীবনের
বে দেহ, অঙ্গ ও মনকে চিত্রিত করে
গিয়েছেন। তাঁর মানবের চরিত্রে একটি
মুগ্ধতা ও গভীর-প্রধান বিশ্বকোষ।
তাঁর চরিত্র ও চরিত্রের আঁকা
চিত্রাবলীতে (নিম্নোক্ত) সজ আদা-
লতের এক প্রকারের (পোলে দ্য
জুস্টিস) অবস্থার বৈশিষ্ট্য
চিত্রিত করা গিয়েছে, তারা নিপুণ
কাঁচশক্তি, সূক্ষ্ম চিত্রশক্তি ও নিদা-
র্য নিষ্ঠুরিক ব্যক্তির পৃথিবীর চিত্র-
বিদ্যায় অধিকারী। সমসাময়িক সমাজের
মানব লোক-চরিত্র, ভাষা-ভাষা, পাপ ও
অন্যদের পৃষ্ঠে যে নির্ভর কলাধারা
ভিত্তি করিয়েছেন, তাহা সমাজের
নিষ্ঠুর চিত্রিতসঙ্গে এবং অন্যদের পৃষ্ঠে
প্রতিবাদরূপে চিত্রিত করিয়েছেন হইয়া
আছে। কিন্তু তাহার আদালতের
চিত্রাবলী ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনের
সম্পূর্ণ বিবরণচিত্র। সমাজের অন্যান্য
অংশ এক ব্যাপকভাবে চিত্রিত হয় নাই।

এই চিত্রকরের বাস্তবিক চিত্রপটে যে
ব্যবহারজীবী বচন-ব্যবসায়ী উকিলের
টাইপ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তিনি
হইলেন “শরতানের সমর্থক” (‘ডেভিডাস্
এডভোকেট’) আইনজগতের এক স্বকম
‘ছেঁড়া নেকড়া’ ও ‘জাঙ্গা হাড়ের
সংগ্রাহক’ ভিক্ষুক—বাহার বরদাশ্টি,
তোলা চুপ-চুপে দাড়ী ও মদ্যগানে রক্ত-
নাসিকা সহজে ঢাকণীয়, মিলি সমাজের
হাতে তুলে নেন—নোংরা, সন্ধান-বিরাগী
কেছা কাহিনীর মিলি নথিপত্র, যত্ন করে
তুলে রাখেন তাহার কাগজের ধামার—
তাঁহার স্বীকারে ওলিতে। ইনিই হইলেন—
দেওয়ানী আদালতের ব্যারিস্টার সাহেব,
চাতুরীর মহারাজা, আদালতের বিলম্বী
পুঙ্খ। তিনি কেবলমাত্র আইনের
মানুষ নন, তিনি হইলেন আইনের
মানবীয় ভ্রমরোক্ষ। ইনি কোজদারী
আদালতের বহুদেখীদের ঘণার ঢকে
কেছেন, তাঁহাদের নমস্কার ফিরাইয়া দেন
না। অন্যদের বন্দর আইনদাখনার পর
তিনি এমন একটি লোভনীয় স্থান
দেখান হইতে—যেখানে হইতে তিনি
তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি অস্তিত্ব বাৎসরিক
বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয়
করিতে পারেন। “আইনজীবীদের
সৌভাগ্য” অতি পরিচিত ভাষ্যমূলক
শব্দ। একজন ব্যবহারজীবী তাঁহার সহ-
যোগী “জাজের সমর্থক” করিতে
পারেন না, তিনি কেবল আপনাদের নিজের
মজলার বন্দু। এখানে হইলেন উকিলের
সম্পত্তি, বিষয়, টাকাদান ও জীবন্ত



এই চিত্র ব্যারিস্টারের দ্বারা গরিব মজলারকে বলিতেছেন “মাননীয় মহাশয়!
আপনার কেস নিয়ে দুইজন সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার! আপনার কেসে আসল
বন্দুই অভাব।” (অন্যভাবে) : “একশত টাকা দাঁড়ান—ই তা অভাব!”

দোমার খনি। দুইজন সহযোগী
উকিলের মধ্যে পণ্ডিত বোঝা-গড়া আছে
যে তাঁরা একটি মামলার পরস্পরের প্রতি-
দ্বন্দ্বিতা শত্রু। বাক-বাক্য আরম্ভ
হইলে শেষ পর্যন্ত প্রাণান্ত পরিচ্ছেদে
জড়িয়া বাইতে হইবে। কিন্তু শুনানীর
শেষে যার লাইভেরিতে বা গাউন রাখার
ঘরে, কিংবা টিফনের টেবিলে নিলিত
হইয়া পরস্পর সহস্রা পিট-
চাপড়ানিতে প্রাণবন্ধন-পর্ব আনন্দে
সম্পন্ন করিবেন।

পারী শহরের ব্যবহারজীবীদের
উপরে নির্দিষ্ট চিত্র ওনোরে
দৃষ্টিয়ের নিম্নোক্তকে উল্লেখ হইয়া
আছে। এ দেশের আদালতের অনেক
উকিলের ব্যবহারে অনেকটা তাহার
সদৃশ্য আছে।

এই ফরাসী ওস্তাদ-শিল্পীর চিত্র-
মালায় সরকারী উকীল (পাবলিক
প্রসিকিউটর), এজলাসের ন্যায়াধীশ
মহাশয়গণের, আদালতের কার্যণক,
পেন্ডার, নাজীফ, বেলিফ প্রভৃতি নানা
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁতভাবে চিত্রিত
হইয়াছে। কিন্তু, এই চিত্রকরের হাতে
আদালতের চাতুরী ও তথাকথিত তত্ত্ব-
কতার সাঙ্গ-পাঙ্গদের গণনায় এবং
আইনের দেবলোকে মোক্তার মহাশয়কে
(সলিসিটর) খাদ দেওয়া বার নাই—
কারণ আদালতের ব্যাপারে, “তাঁহার
অংশ টাকা হেন-দেবের ব্যবসারে
দাদালের অংশের অনুরূপ”।

এই যৎসামান্য ভূমিকার মধ্যে আমরা
ওনোরে দুর্মিয়ের আদালতের নির্মম
চিত্রবাদ্য কয়েকটি উদাহরণের পরিচয়
পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নীচে জীপের শব্দ হইল। বিরাজবাবু ফিরিয়াছেন। অরুণা উঠিয়া পড়িল। সুটকেশ হইতে কাপড়, জামা, সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি লইয়া স্নানঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বিরাজবাবু প্রবেশ করিলেন, তাহার হাতে এক মুঠি ধূপের কাঠি। উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—‘কি হে, কেমন অট্টালিকা? শ্যাল-বধু কোথায়?’

সুবীর বলিল,—‘বাথরুমে গেছে। চমৎকার অট্টালিকা। আপনি কোথায় শোবেন?’

বিরাজবাবু বলিলেন,—‘ভয় নেই, আড় পাতব না। আমার শয়ন-কক্ষ দোতলায়।—স্টেশনে এক আঁটি ধূপকাঠি কিনেছিলাম, জীপেই পড়ে ছিল।’ বলিয়া তিনি কয়েকটা ধূপ জ্বালিয়া দিয়া চেয়ারে বসিলেন—‘এ ঘরগুলোতে ধূপ-ধনো দেওয়া দরকার, অনেক দিন শূন্য পড়ে আছে।’

ধীরে ধীরে ঘরটি ধূপের গন্ধে ভরিয়া উঠিল।

সুবীর বলিল,—‘চা খাবেন না?’

বিরাজবাবু বলিলেন,—‘তাবু থেকে চা খেয়ে এসেছি। এখানে কেবল রাগে ভোজন এবং শয়ন। তারপর সুবোধদের আগেই প্রস্থান।’

সুবীর বলিল,—‘এখানকার জল-হাওয়া খুব ভাল—না?’

বিরাজবাবু সোৎসাহে বলিলেন,—‘ময়ূভূমির মত জায়গা আছে। রোগের বীজাণু এখানে টিকতে পারে না, জরসেপড়ে থাক হরে যায়। তাছাড়া এমন রাত্রি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ। এ দেশটা রাজস্থানের অন্তর্গত হলেও আসলে মালব দেশ। মুসলমানেরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসে ওরা লক্ষ্য করেছিল, অযোধ্যার সম্ভা, রাজোয়াড়ার সকাল আর মালবের রাত্রি জগতে অতুলনীয়। মুসলমানী ভাষায় বয়েছে।’

মালবের রাত্রি! বাক্যটির রোমান্টিক স্বাদ সুবীর মনে মনে গ্রহণ করিতেছে এমন সময় অরুণা শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে স্নিগ্ধ-শিখা মোমবাতি। সুবীরের মাথায় কর্ণাভা গুঞ্জরিয়া উঠিল—‘হেন কালে



প্রতিভ হাসিয়া বিরাজবাবুর পাশের চেয়ারে বসিল। তাহার মনের মধ্যে যেন বাস্তব ও অবাস্তবের ম্বন্দর চলিতেছে। সুবীরের মনে উদ্ভ্রমণ বিস্ময় পাক খাইতে লাগিল—অরুণা বারবার কেয়া ফুলের গন্ধ পাইতেছে! কী ব্যাপার?

বিরাজবাবু কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটু বেশী কথা বলেন, কিন্তু কথাগুলি নীরস নয়। নানা প্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা মিশাইয়া দুই ঘণ্টা-কাল কাটাইয়া দিলেন।

গিরধর ও রুক্মিণী রাত্রির আহার লইয়া আসিল। আহাৰ্য্য দ্রব্যগুলি টেবিলে রাখিয়া গিরধর আরও কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়া দিল। তিনজনে টেবিলের ধারে চেয়ার টানিয়া খাইতে বসিলেন।

খাদ্যবস্তু সংখ্যায় এবং পরিমাণে প্রচুর। শাক-সবজীই বেশী, তার সঙ্গে ঘৃতপক্ক অন্ন ও চাপাতি, অম্প মাংস, মালাই এবং বরফ।

খাইতে খাইতে সুবীর বলিল,—‘এই ময়ূভূমির মাঝখানে তাজা শাক-সবজি পান কোথেকে?’

স্বপ্নকেশবী
শরদিন্দু
বন্দ্যোপাধ্যায়

হাতে দীপশিখা, ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা!

প্রবেশ করিয়াই অরুণা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, চাকিত কটাক্ষে এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, ‘কেয়া ফুলের গন্ধ!’

বিরাজবাবু হাসিয়া উঠিলেন,—‘কেয়া ফুল নয়, অম্বুরী ধূপের গন্ধ। কেয়া ফুল এদেশে কোথায়। তাছাড়া এটা কেয়া ফুলের সময় নয়।—এস শ্যালবধু!’

স্বিধামন্ত্র পদে অরুণা আসিয়া টেবিলের উপর মোমবাতি রাখিল, একটু

বিরাজবাবু বলিলেন,—‘মাইল দুই দূরে আভীরদের একটা গ্রাম আছে, তারাই দুধ আর শাক-সবজি যোগায়। মাঝে মাঝে ভেড়ার মাংস পাওয়া যায়। কিন্তু মাছ পাওয়া যায় না। ময়ূভূমিতে জল কোথায় যে মাছ আসবে!’

সুবীর জলের গেলাসে চুমুক দিয়া বলিল,—‘ভারি সুস্বাদু জল। জল কোথায় পান?’

বিরাজবাবু বলিলেন,—‘নীচের তলায় একটা ঘরের মেঝেয় ইঁদুরা আছে। সেই দু’ হাজার বছরের পুরনো ইঁদুরা!

কিন্তু কী জল! বরফের মত ঠাণ্ডা, শর-বতের মত মিষ্টি।’

অরুণা পুরুষদের বাক্যলোপে যোগ দিল না, একটু নিঃশব্দে ভাবে আহা করিতে লাগিল। আহা! শেষ হইলে বিরাজবাবু বলিলেন,—‘শ্যালবো, তুমি ক্লান্ত হয়েছ, শূয়ে পড় গিয়ে, আমরা আরো খানিকক্ষণ গল্পগুজব করি। কাল ভোরেই আমি চলে যাব, হয়তো দুর্ভাগ্যবশত দিন আসতে পারব না।’

অরুণা একটু ঘাড় হেলাইয়া শয়ন-কক্ষে চলিয়া গেল। তারপর দুঃজনে ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া গল্প করিতে করিতে ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। বিরাজবাবু গলা খাটো করিয়া বলিলেন,—‘বোঁকে কিছু বোলো না, কিন্তু গিরগিরের মূখে শুনোছি এ বাড়িতে নাকি আছে।’

‘কী আছে—ভূত-প্রেত! আপনি বিশ্বাস করেন?’

বিরাজবাবু হাসিলেন,—‘আমি বিজ্ঞানী, যার প্রমাণ পেয়েছি তা বিশ্বাস না করে উপায় কি? বিজ্ঞানী আর অবিজ্ঞানীর মধ্যে ঐখানেই তফাৎ, বিজ্ঞানী প্রমাণ পেলে বিশ্বাস করে, অবিজ্ঞানী প্রমাণ পেলেও বিশ্বাস করে না, উল্টে নানা রকম কু-ব্যাখ্যা শুরুর করে দেয়।’

‘আপনি তাহলে প্রমাণ পেয়েছেন?’

‘দ্যাখো, ভূত-কাল নিয়েই আমার কারবার। ভূত-কালের সম্বন্ধে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ এমন কিছু পেয়েছি যাকে বাস্তব বলা যায় না। সে গল্প আর একদিন বলব। তবে এ বাড়িতে আমি নিজে কিছু প্রত্যক্ষ

করিনি। যা শুনোছি চাকর-বাকরের মুখে।’

‘ওরা কী বলে?’

‘ওরা বলে একটা আত্মা আছে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে বীণার ঝংকার শোনা যায়, তাজা ফুলের গন্ধ চারিদিকে ভর-ভর করতে থাকে—’

সুবীর চমকিয়া বলিল,—‘কোন ফুল! কেয়া?’

বিরাজবাবু কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন,—‘তা জানি না। আজ তোমার বোঁ কেয়ার গন্ধ পেয়েছিল..... তাই, তা, এটা আমার খেয়াল হয়নি—’

সুবীর বলিল,—‘অরুণার এই দুটোনা হবার পর থেকে সে তিনবার কেয়া ফুলের গন্ধ পেয়েছে: কোথাও কেয়া ফুল নেই, তবু গন্ধ পেয়েছে। এর মানে আপনি বলতে পারেন?’ বলিয়া সুবীর মোটর দুঃখটনার পর হইতে ব্যাপার বিবৃত করিল।

বিরাজবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—‘এখানে আসার আগে যদি গন্ধ পেয়ে থাকে তাহলে অলৌকিক কান্ড না হতেও পারে। হয়তো মাথার চোট লাগার ফলে olfactory nerves বিগড়ে গিয়েছে। স্নায়ু বড় বিচিত্র বস্তু। যা হোক ভাবনার কিছু নেই, আস্তে আস্তে normal হয়ে যাবে।’

তারপর, রাত্রি গভীর হইতেছে দেখিয়া তিনি শ্বিতলে শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন। সুবীর শয়নকক্ষে যাইবার আগে একবার বাহিন্দারের পর্দা সরাইয়া ছাদের দিকে উঁকি মারিল। বাহিরে মধুর শীতলতা; চাঁদ আকাশের

মাঝখানে উঠিয়াছে, বালু-ঢাকা প্রকাণ্ড ছাদ চন্দ্রাকিরণে কিংখাবের মত ঝিকমিক করিতেছে। তন্দ্রাজড়িত স্বপ্নসমাকুল দৃশ্য। মালবের রাত্রি। সুবীর একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। অরুণা যদি সুস্থ থাকিত, দুঃজনে মিলিয়া তাহার মালবের এই অপূর্ণ রাত্রি উপভোগ করিতে পারিত।

সুবীর শয়নকক্ষে গেল। বহুৎকক্ষের মাঝখানে বিস্তীর্ণ পালঙ্ক, অরুণা শয্যার এক পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুবীর পালঙ্কের পাশে বসিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিল,—‘অরুণা!’

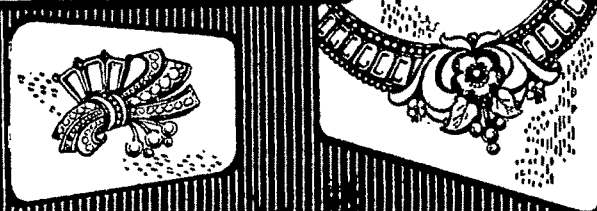
অরুণা জাগিল না। তাহার দেহ এমন শিথিল ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছে যে মনে হয়, শূন্য ঘুম নয়, ঘুমের চেয়েও দূরবর্গাহ অবচেতনতার মধ্যে তাহার সংজ্ঞা ভুবিয়া গিয়াছে। হঠাৎ শক্তিত হইয়া সুবীর তাহার বকের উপর করতল রাখিল। না, হৃৎস্পন্দন মন্থর বটে, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই সচল আছে। সুবীর সবুজ অরুণার গায়ের উপর চাদের টানিয়া দিল, অপলক চক্ষে তাহার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মাথার শিয়রে নিঃশেষিত মোমবাতিটা নিব-নিব হইয়া আসিয়াছিল, নির্বাণিত হইবার পূর্বে দগ্ধ করিয়া উঠিল। সুবীর তখন সন্তপণে শয্যায় অরুণার পাশে শয়ন করিল।

পরদিন সকাল হইতে তাহার প্রকৃত প্রবাস-জীবন আরম্ভ হইল। নির্জন প্রবাসে জীবনযাত্রার সুবিধা অসুবিধা দুই আছে। পরিচিত মানুষের অভাব কখনও সুবিধা কখনও অসুবিধা বলিয়া মনে হয়। কাজকর্ম নাই, খবরের কাগজ নাই, এরূপ অবস্থা কাহারও পক্ষে সুখ-কর, কাহারও পক্ষে অসুখকর। কিন্তু যেখানে দুটি স্বামী-পুরুষের মধ্যে প্রণয়ের বন্ধন আছে সেখানে প্রবাসের নির্জনতা মধুময় হইয়া ওঠে।

সুবীরের মন এই নিবিড় রসানুভূতির জন্য উৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু অরুণার দিক হইতে তাহার প্রতিফলন আসিল না। বরং মনে হইল অরুণা সুবীরকে এড়াইয়া চলিতেছে। একসঙ্গে ওঠা-বসা করিয়াও দুঃজন মানুষ মনে মনে পরস্পরকে এড়াইয়া চলিতে পারে। অরুণা স্বভাবত সরল ও সিঁধা প্রকৃতির মেয়ে; কিন্তু এখন দেখা গেল অরুণার চোখে গোপনতার কটাক্ষ, সে

মনের মতগহনার জন্য



ফোন: ৪৭-৩২৬৩

ভবানীপুর গিনি ম্যানসন

৩৯, আগুতোষ মুখার্জী রোড (যদু বাবুর বাড়ির) ভবানীপুর, কলিকাতা-২০

সুবীরের নিকট হইতে নিজের মানসিক অবস্থা প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহার মনের মধ্যে এমন কিছু ঘটিতেছে যাহা সে সুবীরকে জানিতে দিতে চায় না।

রুক্মিণী প্রথম দর্শনেই অরুণাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, সে নিজের কাজ হইতে ছুটি পাইলেই উপরে আসিয়া অরুণার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। অযাচিত ভাবে তাহার সেবা করে, চুলে তেল মাখাইয়া চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া চুল বাঁধিয়া দেয়, আর অনর্গল গল্প করে। অরুণাও তাহার সঙ্গে বেশ স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে। মেয়েদের ঐ একটা গুণ আছে, তাহারা উঁচু-নীচ নির্বিশেষে সকল জাতের মেয়ের সঙ্গে মিশিতে পারে। পুরুষের সে গুণ নাই, থাকিলে সুবীরের ভারি সুবিধা হইত, গিরধর সিংএর সঙ্গে গল্প জমাইয়া সময় কাটাইতে পারিত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে যেন একটু নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে যে-কয়টা বই আনিয়াছে তাহা মাঝে মাঝে খুলিয়া বসে। কিন্তু বই-এ মন বসে না। তখন সে উঠিয়া প্রাসাদের দ্বিতলে অগণিত কক্ষগুলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। যন্ত্রগুলি পরিষ্কৃত নয়; কোথাও দেওয়াল হইতে পাথর খসিয়া পড়িয়াছে, কোথাও ছাদের কোণে চাম-চিকা বাসা বাঁধিয়াছে। সব মিলিয়া পরি-ত্যক্ত লোকালয়ের প্রাণহীন কঙ্কালসার শৃঙ্খলতা।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর সুবীর দ্বিতলের খোলা ছাদে একাকী পরিত্রমণ করিতেছিল। আলিসার কিনারে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নানা অসংলগ্ন চিন্তার মধ্যে ভূত-প্রেতের চিন্তাও তাহার মনে আসিতোছিল। বিরাজাবাদ বৈজ্ঞানিক হইলেও অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করেন। এ বাড়ি-টাতে বাজনার শব্দ শোনা যায়, ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়; হয়তো কিছু আছে। হানা-বাড়ির কত গল্পই তো শোনা যায়, সবই কি মিথ্যা? এই বাড়ীটা দু'হাজার বছর ধরিয়া মরুভূমির মাঝখানে পড়িয়া আছে; হয়তো জীবিত অবস্থায় যাহারা এখানে বাস করিত তাহাদেরই কেহ বাড়ির মায়া ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে নাই, দু'হাজার বছর ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে কে জানে। এই রাজস্থানেই নাকি কোথায় একটা রাজপ্রাসাদ আছে, সেখানে রাহি-

কালে প্রেতাখ্যা 'মায় ভুখা হ'ব' বলিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।—

আজও আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। ঠাণ্ডা বাতাসে সুবীরের গা শীত-শীত করিয়া উঠিল। সে ঘরে ফিরিয়া গেল।

বসিবার ঘরে কেহ নাই, কিন্তু শয়ন-কক্ষ হইতে রুক্মিণীর কলকণ্ঠ আসিতেছে। সুবীর শয়নকক্ষের পর্দা সরাইয়া দেখিল সেখানে দু'টি মানুষের মজলিশ বসিয়া গিয়াছে। মেঝেয় পাটি পাতিয়া অরুণা ও রুক্মিণী মৃৎখোদনা বসিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে একটি

অরুণা একটু বিবর্ত হইয়া বলিল,— 'মেয়েলি গল্প কি তোমার ভাল লাগবে?'

সুবীর বলিল,— 'ভাল না লাগে উঠে যাব। অন্তত চীনেবাদাম ভাজা তো ভাল লাগবে।' সে কয়েক দানা চীনেবাদাম মুখে দিয়া বলিল,— 'আচ্ছা রুক্মিণী, তোমরা এ বাড়িতে ফুলের গন্ধ পেয়েছ?'

সুবীরের আগমনে রুক্মিণী একটু আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, এখন আবার স্বচ্ছন্দ হইয়া বলিল— 'জি মালিক, পেয়েছি। তাছাড়া গভীর রাত্রে বাঁশির আওয়াজ শোনা যায়, সিতারের আওয়াজ শোনা যায়।'



.....দু'টি মানুষের মজলিশ বসিয়া গিয়াছে।

আগনের ছোট আঁটা; রুক্মিণী খোসা-সুন্দর চীনেবাদাম আগুনে বল-সাইয়া খোসা ছাড়াইয়া অরুণাকে দিতেছে, অরুণা পরম সুখে নুন ও লঙ্কার গুঁড়া মাখাইয়া খাইতেছে।

সুবীরকে দ্বারের কাছে দেখিয়া রুক্মিণীর বাক্যস্রোত সংহত হইল, অরুণাও মুখ তুলিয়া চাহিল। সুবীর তাহাদের কাছে আসিয়া বসিল, হাসি-মুখে বলিল,— 'কি গল্প হচ্ছে? আমিও গল্প শুনতে এলাম।'

'কোন ফুলের গন্ধ পেয়েছ — আতর গুলাব ধূপ-ধূনার গন্ধ নয়?'

'জি না, তাজা ফুলের গন্ধ। জাই জু'হি চম্পা—এই সব।'

'কেয়া ফুলের গন্ধ কখনো পেয়েছ?'

অরুণা সুবীরের প্রতি একবার চকিত চক্ষুপ করিল। রুক্মিণী উৎসুক স্বরে বলিল,— 'কেওড়া ফুলের গন্ধ! না বাবাজি, কেওড়া ফুলের গন্ধ কেমন হয় আমি জানি না, কেওড়া ফুল কখনো

দেখিনি। তবে কেওড়া ফুলের গল্প জানি।

‘কেওড়া ফুলের গল্প!’

‘হ্যাঁ বাবুজি, ভারি চমৎকার গল্প। আমি আমার দাদির কাছে শুনেছিলাম, আমার দাদি আবার তার দাদির কাছে শুনেছিল। বহুকাল ধরে এ গল্প চলে আসছে। এই মহল নিয়েই গল্প।’

‘তাই নাকি! কী গল্প বল তো শুননি।’

তখন রুক্মিণী চীনাবাদাম পোড়াইতে পোড়াইতে গল্প আরম্ভ করিল—

‘অনেক অনেক দিন আগে এখানে একটি রাজ্য ছিল। মরুভূমির কিনারায় রাজ্য; ছোট রাজ্য হলেও বড় সুখের রাজ্য। শত্রুর উপপাত নেই, অন্নভাব নেই, মারী-মহামারী নেই; প্রজারা অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে মনের আনন্দে বাস করে।

‘রাজার নাম বিজয়কেতু। তরুণ রাজা, সম্প্রতি দক্ষিণ দেশের এক রাজ-কন্যাকে বিয়ে করেছেন। অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা; যেমন তাঁর রূপ, তেমন মধুর স্বভাব। নাম অরুণাবতী।’

সুবীর চমকিয়া প্রশ্ন করিল,—‘কি নাম বললে?’

রুক্মিণী বলিল,—‘অরুণাবতী। এ গল্পের নাম রাণী অরুণাবতীর গল্প।’

সুবীর ও অরুণা বিস্ফারিত চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিল, তারপর অরুণা চক্ষু সরাইয়া লইল। সুবীর বলিল,—‘আচ্ছা, তারপর বল—’

রুক্মিণী বলিতে লাগিল।—

রাজা আর রাণীর মধ্যে গভীর ভাল-বাসা; কেউ কাউকে একদণ্ড না দেখে থাকতে পারেন না। রাজা যখন সভায় বসে মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজকাৰ্য্য করেন, রাণী তখন অলিন্দ থেকে উঁকি মেরে দেখে যান। রাজাও রাজকাৰ্য্য করতে করতে হঠাৎ উঠে গিয়ে রাণীকে দেখে আসেন। রাজা আর রাণী যেন জোড়ের পায়রা।

রাণীর মনে কিন্তু একটি দুঃখ আছে। তাঁর বাপের বাড়ির দেশে যেমন ঋতুতে ঋতুতে নতুন ফুল ফোটে—বসন্তে অশোক নবমল্লিকা জাতী যুথী, গ্রীষ্মে চম্পক বকুল পিয়াল, বর্ষায় গোকর্ণ কদম্ব কেতকী—এদেশে তেমন ফুল ফোটে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা রাজা-রাণী চন্দ্র-শালিকার বিস্তীর্ণ ছাদে হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছিলেন, দেখলেন পশ্চিমের আকাশে মেঘ উঠেছে। দুজনের মনে খুব আহ্লাদ হল। এদেশে বৃষ্টি কম, মেঘ বেশী আসে না। রাণী কাজল-কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,—‘রাজা, অনেক দিন কেতকী ফুলের গন্ধ পাইনি। এ দেশে কি কেয়া ফুল পাওয়া যায় না?’

বিজয়কেতু বললেন,—‘না। পশ্চিমে লাট দেশ, সেখানে বনে-জঙ্গলে কেয়া ফুল ফুটে থাকে, গ্রামের লোকেরা কেয়ার ঝাড় দিয়ে ঘরের বেড়া বাঁধে।’

অরুণাবতী কুতূহলী হয়ে বললেন,—‘লাট দেশ! সে কত দূর?’

বিজয়কেতু বললেন,—‘ঘোড়ার পিঠে দুই তিন দিনের পথ।’

রাণী অরুণাবতী তখন রাজার বুকের ওপর দুহাত রেখে পরম আগ্রহভরে বললেন,—‘রাজা, লাট দেশ থেকে আমাকে কেয়া ফুল আনিয়ে দাও। কেয়া ফুলের জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।’

রাজা বিজয়কেতু বললেন,—‘এ আর বেশী কথা কি! আমি নিজে গিয়ে

রান্নাঘর আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব স্বকল্পের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উত্তন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলুও জমবে না।

- * বিনামূল্যে একসেট পলভে
- * যে কোন অংশ সহজলভ্য

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার



প্রস্তুতকারক :

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



PATENT NO. 62354 OF-'57

KALPANA, O. M. 17 B.

তোমার জন্যে কেয়া ফুল তুলে নিয়ে আসব।'

অরুণাবতী একটু শঙ্কিত হলেন,—
'তুমি নিজে যাবে?'

বিজয়কেতু বললেন,—'কাল সকালেই যাত্রা করব। তিন চার দিনের মধ্যে তোমার কেয়া ফুল নিয়ে ফিরে আসব।'

রাণী কিছুক্ষণ রাজার বৃকের ওপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন,—তারপর হাসি মুখে তুলে বললেন,—'বেশ, তুমি বর্তদিন না ফিরে আসবে আমি ততদিন রোজ পাঁচ ফোঁটা মধু খাব, আর কিছু খাব না।'

রাজা বললেন,—'আর কিছু খাবে না কেন?'

রাণী বললেন, তাহলে তুমি তাড়া-তাড়ি ফিরে আসবে।

পরদিন ভোরবেলা রাজা ঘোড়ায় চড়ে পশ্চিমমুখে যাত্রা করলেন। রাণী প্রাসাদের চুড়ায় উঠে যতক্ষণ দেখা যায় চেয়ে রইলেন।

তারপর একদিন গেল, দুদিন গেল। রাণী পাঁচ ফোঁটা মধু খেয়ে আছেন। তৃতীয় দিন থেকে রাণী আবার ছাদের উপর যাতায়াত আরম্ভ করলো। শরীর দুর্বল কিন্তু মন মানে না। ছাদের কিনারায় গিয়ে পশ্চিমদিকে চেয়ে থাকেন। চতুর্থ দিনও ওইভাবে কাটল। রাণীর শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, চোখের কোণে কালি। ছয়দিন কেটে গেল রাজার কিন্তু দেখা নেই। কোথায় গেলো রাজা। কী হল তার?'

রাজা বিজয়কেতু দ্বিতীয় দিন দুপুরবেলা লাট দেশে পৌঁছেছিলেন। সেখানে জঙ্গল থেকে কয়েকটি কেয়া-ফুল তুলেছিলেন। তারপর একটি কেয়া-ফুল বল্লমের ডগায় গেঁথে নিয়ে নিজ রাজ্যের দিকে ঘোড়ার মূখ ফিরিয়ে-ছিলেন। ঘোড়া পবনবেগে ঘরের পানে ছুটেছিল।

রাজ্যের সীমানায় ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, এই গিরি-সংকট পার হয়ে নিজের রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়। তৃতীয় দিন দুপুরবেলা রাজা গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে চলেছেন এমন সময় একদল সশস্ত্র লোক আশ-পাশের পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে ঘিরে ধরল।

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'একি! কে তোমরা?'

তারা বলল, 'আমরা যে হই, তুমি আমাদের বন্দী।'

রাজা ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে বললেন, 'কি তোমাদের এত স্পর্ধা! জানো, আমি এ রাজ্যের রাজা?'

তারা জয়ধ্বনি করে বলল,—'তবে তো ভালই হয়েছে। চল আমাদের সেনাপতির কাছে।'

পাহাড়ের মধ্যে বিদেশী শত্রু ছাউনি ফেলেছে, প্রায় বিশ হাজার সৈন্য। সেনাপতি তখন নিদ্রা যাচ্ছিলেন। সৈন্যরা বলল, 'তুমি আজ বন্দী থাকো, কাল সেনাপতির সঙ্গে দেখা হবে।'

সৈন্যরা রাজা বিজয়কেতুর কথায় বিশ্বাস করেনি, তারা ঠাট্টা তামাসা করতে করতে তাঁকে একটা শিবিরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখল। রাজা জানতেন উত্তর থেকে দুর্ধর্ষ শক জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, কিন্তু তারা যে এতদূর অগ্রসর হয়েছে তা তিনি জানতে পারেননি।

পরদিন সেনাপতির সঙ্গে দেখা হল না, সেনাপতি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তার পরদিন দুপুর বেলা

সৈন্যরা রাজাকে সেনাপতির কাছে নিয়ে গেল। সেনাপতির প্রকাণ্ড চেহারা, টকটকে রঙ, বড় বড় চোখ। তিনি রাজাকে আপাদমস্তক দেখে বললেন,—
'আপনি সত্যি এদেশের রাজা?'

বিজয়কেতু বললেন, 'হ্যাঁ, এই দেখুন আমার অঙ্গুরী, এই দেখুন কবচ।'

সেনাপতি বললেন, আপনি সত্যিই রাজা। আমরা আপনার রাজ্য জয় করতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনাকে যখন ধরেছি তখন আর আমাদের যুদ্ধ করতে হবে না। বিনা যুদ্ধে রাজ্য জয় হয়েছে।'

রাজা বললেন, 'আমার রাজ্য ক্ষুদ্র, দৈন্যবল সামান্য। এ-রাজ্য জয়ে আপনার গৌরব নেই। তবে কেন এ-রাজ্য জয় করতে চান?'

সেনাপতি বললেন, 'রাজস্থান বীরভূমি। মাটির গুণে মানুষ বীর হয়, মাটির দোষে কাপুরুষ হয়। তাই আমি রাজস্থান জয় করে নিজের রাজ্য স্থাপন করতে চাই।'

'কিন্তু আমাকে বন্দী করে লাভ কি? আপনি যদি আমার রাজ্য আক্রমণ করেন রাজ্যের লোক স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে।'

'না। তারা যখন জানতে পারবে



আপনি আমার হাতে বন্দী, তখন আর যুদ্ধ করবে না, আত্মসমর্পণ করবে।

রাজা চিন্তা করে বললেন, 'সেনাপতি আমাকে একবার আমার প্রাসাদে ফিরে যেতেই হবে। আপনি আমাকে দু'দিনের জন্য মুক্তি দিন, আমি আবার ফিরে এসে স্বেচ্ছায় ধরা দেব।'

সেনাপতি কিছুক্ষণ রাজার মুখের গানে চেয়ে থেকে বললেন, 'আপনি যে ফিরে আসবেন তার নিশ্চয়তা কি?'

রাজা সগর্বে বললেন, 'আমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় কখনো শপথ ভঙ্গ করে না।'

সেনাপতি প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু প্রাসাদে আপনার এত কী প্রয়োজন?'

রাজা বললেন, 'আমার পুত্রী কেবল কয়েকবিন্দু মধু খেয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন, তাঁকে দেখা দিইনি আমি ফিরে আসব।' রাজা কেতকী ফুল অঙ্কুরের কাহিনী সেনাপতিকে বললেন।

শনে সেনাপতি প্রীত হলেন, বললেন, 'ভাল। আমি আপনাকে মুক্তি দেব। কিন্তু আজ তো দিন শেষ হয়ে এল। আজ যদি যাত্রা করেন, দিন থাকতে প্রাসাদে পৌঁছাতে পারবেন না। তার চেয়ে কাল সকালে আপনি যাত্রা করবেন। শত হুঁস পাহারী সঙ্গে দেখা করেই আপনি ফিরে আসবেন।'

পরদিন প্রত্যবে রাজা শুলশীর্ষে

কেতকী ফুল গাথে নিয়ে অবপাতে যাত্রা করলেন।

ওদিকে রাণীর অবস্থা তখন শেচনীয়। দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়ে শরীর এত দুর্বল হয়েছে যে শয্যা ছেড়ে উঠতে কষ্ট হয়, মনের অবস্থা পাগলের মতন। এমন সময় বেলা তিন প্রহরে দাসীরা হাটে এসে খবর দিল—রাজা আসছেন!

রাণী পালঙ্ক থেকে নেমে ছাদের পানে ছটলেন। দাসীরা মনি করল, তিনি শুনলেন না। ছাদের কিনারায় গিয়ে পাশ্চম দিকে তাকালেন। চেখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না, তবু মনে হল অনেক দূরে মাঠের পরশুর থেকে একজন অশ্বারোহী হাটে আসছে।

কিছুক্ষণ পরে অশ্বারোহী আরো কাছে এলে রাণী চিনতে পারলেন, রাজা আসছেন। তার ভলের মাথায় একটি কেয়া ফুল উচু হয়ে আছে। রাজাও রাণীকে প্রাসাদ-শীর্ষে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি বল্লম-সুন্দর হাত তুললেন।

রাণী আর আত্ম-সংবরণ করতে পারলেন না, দু'হাত বাড়িয়ে সান্নিদের দিকে স্বদুকে পড়লেন। দাসীরা চীৎকার করে উঠল, কিন্তু রাণীকে ধরতে পারল না; তিনি আলিসা পেরিয়ে একেবারে নীচে পড়ে গেলেন।

রাজা এসে দেখলেন রাণী অরণ্য-বতীর মতদেহ প্রাসাদমূলে পড়ে আছে। তিনি দু'হাতে মতদেহ স্বীকে তুলে নিলেন।

তারপর রাণীকে চিতায় তুলে দিয়ে রাজা কেয়া ফুল দিয়ে চিতা সাজিয়ে দিলেন। চিতা জ্বলে উঠল। কেয়া ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরে গেল।

রাজা আর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন না, ঘোড়ায় চড়ে একলা শক সেনাপতির শিবিরে ফিরে গেলেন। সেনাপতিকে বললেন—'আমি ফিরে এসেছি। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে আমার রাজ্য আপনি পাবেন না। আসুন, যুদ্ধ করুন।'

শক সেনাপতির সঙ্গে রাজা বিজয়কর্তৃক স্বল্পযুদ্ধ হল। যুদ্ধে রাজা বিজয়কর্তৃক মৃত্যু পড়লেন। তারপর শক জাতি এসে রাজা দখল করল, সেনাপতি রাজপুত্রী দখল করলেন। অনেক বছর কেটে গেল; মরুভূমি এসে রাজ্য গ্রাস করে নিল। দেশ জনশূন্য হল। প্রাসাদ শূন্য পড়ে রইল।

এই ভাবে কত শতাব্দী কেটে গেছে তার ঠিকানা নেই। কিন্তু এখনো প্রাসাদের রাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়ায়, হঠাৎ নিশ্চিন্তি রাতে বাণীর ব্যঙ্গার শোনা যায়। যারা শনেছে তারা বলে, রাজার আর পুনর্জন্ম হয়নি, তার আত্মা এই প্রাসাদেই আছে। রাণীর জন্ম হয়েছে, তিনি ষাট-সত্তর বছর অন্তর দেহ ত্যাগ করে আসেন, রাজার সঙ্গে তার মিলন হয়। তারপর আবার তিনি চলে যান, রাজা প্রতীক্ষা করে থাকেন।

এই হচ্ছে রাজা বিজয়কর্তৃক আর রাণী অরণ্যবতীর গল্প।

(কুমার)



কাগজে প্রকৃত ঘটনার কিছুটা উহা রেখেছে।



বছর পনেরো হোল আমার বয়সের প্রায়ই গোলমাল হচ্ছে।

বাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধ কুমার মাস্তুল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৥ দশ ৥

বিমানযোগে তাসকন্দ থেকে মস্কোর দিকে যাচ্ছিলুম। অন্য যাত্রীও আছে এই জেটবিমানে। ভারতীয়রা হলেন মোট পনেরো জন। এটি প্যাসেঞ্জার জেট।

উত্তর পথে তাসকন্দ অতিক্রম করানার আগে পাওয়া যায় বিশাল একটা কৃষ্ণভূভাগ। এগুলা তুলা উৎপাদন অঞ্চল। তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টন তুলা এবার উঠেছে এই উজবেকিস্তান থেকে। এই কৃষ্ণভূভাগ ছড়িয়ে রয়েছে তুর্কমেনিস্তান, কিরগীজ ও তাজিকিস্তানে। তাজিকিস্তান পামীরের মধ্যে। এই রিপাবলিকটি হল ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে মস্কো থেকে প্রকাশিত “Facts and Figures” নামক একখানি বইতে বলা হয়েছে, “The Soviet Union has no common borders with Pakistan and India, though the Tajik S.S.R., one of its Union republics, is separated from the two by just a narrow strip of Afghani territory.”

ভারত গভর্নমেন্ট বা পাকিস্তান একথাটি মেনে নিচ্ছেন কিনা আমি জানিনে।

কৃষ্ণবর্ণ ভূভাগটি উত্তর পথে শেষ হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ডানদিকে কাজাখস্তানের দক্ষিণ মরু-জনপদ চিমকন্দ, এবং জহামবুল অতিক্রম করে মোটরপথ নির্মাণ করা হয়েছে মরুলোকের মধ্যেই। একটি পথ গিয়েছে কিরগীজিয়ার রাজধানী ফ্রুনজ (Frunze) এবং অন্যটি কাজাখস্তানের রাজধানী ‘আল্-মা-আতা’-র দিকে। ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী না হয়ে যদি ত্রিবাঙ্কুর হত, তাহলে বুঝানো যেত, সমস্ত কাজাখস্তান ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ পূর্বের শেষপ্রান্তে এসে রাজধানী বানাতে হল কোন যুক্তিতে। সমগ্র মধ্যএশিয়ার তুলনায় কাজাখস্তানের মরুভূমি অনেক ব্যাপক ও বিশাল। কিন্তু কাজাখস্তানের

মরুলোক—যেটি ভারতবর্ষের আরতন অপেক্ষা বড়—এত বড় এবং ব্যাপক ভূভাগ বৃষ্টিহীন হলেও নদীহীন নয়। পশ্চিম কাজাখ—যেটি সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ অঞ্চল—সেখানেও শিরদারিয়া, এম্বা, উরল, টোবল প্রভৃতি নদী ও অসংখ্য জলনালাপথ বর্তমান। পশ্চিম কাজাখে পৃথিবীর বৃহত্তম হৃদ কাস্পিয়ান সাী, এবং আরল সাী। উত্তর এবং পূর্ব কাজাখে অগণিত নদী, পর্বত, উপত্যকা এবং উপজাতীগণের জনপদ।

আমাদের বিমান উড়ে যাচ্ছিল কাজাখস্তানের আদিঅন্তহীন মরুভূমির উপর দিয়ে। এই মরুলোক, অনূর্বর প্রান্তর, প্রস্তর পরিকীর্ণ, অনূর্বর পাহাড় পর্বতের তুষারলোক,—এমন একটা পৃথক ‘পৃথিবীর’ প্রারম্ভ কোথায়, সন্নিহনে সেইটি ভাবছি। এই পৃথিবীটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ক্যাম্ব্রিয় ডিভিসনের উত্তর প্রান্তে—যেখানে হিমালয়ের দেওয়াল উঠেছে দাঁড়িয়ে সমুদ্র-সমতা থেকে কমবেশী ১৪,০০০ ফুট। তিব্বত থেকে এর আরম্ভ। তারপর সিন্‌কিয়াং, তাকলা মাকান, তারপর তিয়েন-সান পার হয়েছে কাজাখস্তান, মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া। অতঃপর সমগ্র সাইবেরিয়া পার হয়ে এই জনবিরল পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত গিয়ে মিলেছে উত্তরমেরু সাগরে।

পূর্ব কাজাখস্তানের মরুলোকে অগণিত জলনালাপথ সৃষ্টি করেছেন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ, এবং যে-ভূভাগের কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র সহসা চোখে পড়ে না, সেখানে দুটি নদীর সুযোগ লাভ করেছেন তারা। একটির নাম ‘ইলি’, এটি নেনে এসেছে তিয়েনসান পর্বত থেকে। এই পর্বত শ্রেণীর অধিত্যাকাপ্রদেশে যে প্যামলতার বিস্তার ঘটেছে, সেই কিরগীজিয়ার উত্তর প্রান্তে কোমল হরিৎক্ষেত্র কাজাখস্তানের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,—যার দক্ষিণে কিরগীজিয়ার সুবৃহৎ হৃদ ‘ইসিকুল’ অবস্থিত।

দক্ষিণের উর্বর মূল্লোক এবং সুশ্যাম বনানীর শোভা দুটি বৃহৎ নগরী ফ্রুনজ এবং আলমা-আতাকে সর্বপ্রকারে সম্পদশালী করে তুলেছে। ইলি নদীটি গিয়ে পড়েছে বলখাস হ্রদে—কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বলখাস হ্রদ লবণাক্ত। ভূ-তত্ত্ববিদরা বলেন, যে-কারণে তিব্বতের হৃদগর্ভলিতে লবণ পাওয়া যায়, সেই একই কারণে বলখাসের জল লোনা। আজ সেই সুপ্রাচীন কাজাখস্তানের আদিমকালাগত মাষাবর ও খন্ডজাতির মেধপালক দলকে সহসা সর্বহারার মরু-মানুষের দল বলে আর মনে হয় না। এরা সোভিয়েট ইউনিয়নের নতুনতর ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটি স্থায়ী ও নিরাপদ আশ্রয়লাভ করেছে। এটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যে-ভূভাগে বালু ও কাঁকর-পথের ছাড়া লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলের মধ্যে আর কিছু চোখে পড়ে না, সেই ভূভাগের নবাবিস্কৃত অগণিত খনিজ সামগ্রীর কুপায় একটির পর একটি সর্বাধুনিক ডিজাইনের নগর গড়ে উঠেছে। পূর্ব-কাজাখস্তানের বৃহৎ নদী ইরটিশ নদীর দুই পারে দাঁড়িয়েছে এক একটি বৃহৎ নগরী,—তেমিন সমগ্র মরুলোকের ভিতর দিয়ে উর্গানভের ভালের মতো রেলপথ ও মোটরপথ নির্মাণ করে এই বালু-জগৎকে আয়ত্ব আনা করেছে। কারাগান্ডা সেমিপালাটিনস্ক, পেট্রোপাভলোভস্ক প্রভৃতির মতো এক একটি সুবৃহৎ শিল্পনগর এই ভূভাগে গড়ে তোলা সম্ভব—এটি আজ প্রমাণিত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা দূরতর মরুলোক পশ্চিম কাজাখস্তানে দুটি বৃহৎ বন্দর কাস্পিয়ান সমুদ্রোপকূলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—যার একটির নাম পেট শেভচেনুকো, অন্যটি উরল নদীর মোহনায় অবস্থিত গ্যুরিয়েভ। মরুভূমির উপর এতবড় ব্যাপক নির্মাণকর্ম আর কোনও দেশে ঘটেনি।

উত্তর কাজাখস্তানের শহর কুস্তানাই পৌরসভায় আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম সাইবেরিয়ার আকাশে প্রবেশ করলুম।

এখানকার প্রথম দুটি জনপদের নাম কুগান ও চেলিয়াবিনস্ক। এই দুটি ছোট শহর ছাড়িয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যতম সুবৃহৎ নগরী 'সোয়েদলভস্ক' বিমানঘাটিতে আমরা এসে নামলুম। সাইবেরিয়ার আকাশ মেঘময়—ইস্পাতের মতো তার বর্ণ। এটি শীতাত 'অপরাজিত'। তিন-চারটি জামার নীচেও পিঠের দিকে তুহিন ঠান্ডার কাঁটা দিল। গরম কোটের উপর একটি ওভার-কোট থাকলে ভাল হত। আজ অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ শেষ হচ্ছে।

এই শহরটি তাতার দেশের অন্তর্গত। তাতাররা এককালে প্রবল প্রভুত্ব করেছিল রাশিয়ার ওপর। তারা মস্কোর সিংহাসনে বসে। এখন তাতার ও রুশ একাকার। তাতারদের গোলাকার পশমের টুপি রুশরাও পরে। ফিনল্যান্ডে পালাবার সময় লেনিনের মাথায় তাতারের ক্যাপ ছিল। রুশরক্তে তাতারের বহু রক্ত আজ প্রবাহিত হচ্ছে। প্রত্যেক রুশের মনে তাতার বাস করে। রুশ সৈন্য যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তখন সে তাতার হয়ে ওঠে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সেনাবাহিনীর মধ্যে তাতার ও কসাক বাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে যেমন গুর্খা ও ডোগরা সেনাদল।

ঠান্ডায় একটু জড়োসড়ো হয়ে বিমানঘাটির নিকটবর্তী এক হোটেলে এসে আমরা আশ্রয় নিলুম। খবর পাওয়া গেল, মস্কোর আকাশের চেহারা ভাল নয়। জেটবিমানের পক্ষে সেদিকে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ হবে না। আমরা হোটেলের বিছানায় ঢুকলুম। আহারাদির ব্যাপারটা উল্লেখ করছি না কেউ কোনদিক থেকে। সুতরাং ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে ক্ষুধাত 'মুখে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম মহাকাশভ্রমী কুকুর 'লাইকা' মার্ক' সিগারেট একটির পর একটি ওড়াতে লাগলেন। চেয়ে দেখছি, এতবড় সোসালিস্ট হোটেল, কিন্তু আগাগোড়া সব ধোঁয়া!

সাড়ে তিন বছর আগেকার দিল্লীর কথা মনে পড়ে গেল। বাঙালার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে ভারতের প্রথম 'ফিল্ম সেমিনারে' যোগদান করতে গিয়েছিলুম। দিল্লীর সরকারি অতিথি-স্বরূপ রাত সাড়ে নয়টা 'ওয়েস্টার্ন কোর্ট'র বিরাট হোটেল-প্রাসাদে আমার এবং আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বাণীর জন্য একটি অতি সুসজ্জিত আরামদায়ক

ঘর দেওয়া হয়েছিল। পিতাপুত্রী ক্ষুধাত ছিলুম। কিন্তু হোটেলের 'বয়টি' জানিয়ে দিল, আপনারা আজ নয়, আগামীকাল প্রভাত থেকে সরকারি 'অতিথি' হবেন! অতঃপর শ্রীমতী বাণী চাইল এক গেলাস জল! কিন্তু তৎক্ষণাৎ সবিনয় হাস্যে বয় জানাল, এত রাতে জলের ব্যবস্থা ত' করা যাবে না! অবশেষে আমার দিল্লীবাসী বন্ধু ডাঃ বিজয়প্রতাপ মিত্র মহাশয় উপস্থিত হাল-চাল বুঝে নিজের বাড়ি থেকে অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়ে পানীয় জলসহ যখন আমাদের ঘরে এসে পৌঁছলেন, রাত তখনও বারোটা বাজেনি! স্বাস্থ্যবান লোক,—কপাল বেয়ে তাঁর ঘাম নেমেছিল!

দক্ষিণ সাইবেরিয়ার এই সুন্দর হোটেলের কাঁচের জানলার বাইরে চেয়ে দেখাছিলুম, ঘর্মাক্ত কলেবর সেই বিজয়-প্রতাপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিনা!

মানুষের দৃষ্টি কুড়ি মাইলের বেশি বোধ হয় যায় না। কিন্তু আমাদের সামনে মেঘময় ধূসর ও একপ্রকার বিবর্ণ ও শীতাত সাইবেরিয়া দিগন্তবিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এই সোয়েদলভস্কেরই কোনও এক তাতার গ্রামের প্রান্তে দু'টি আমরিকান 'ইউ-২' প্লেনটিকে বিগত ১লা মে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে গুলী করে নামিয়ে আনা হয় এবং প্রায় ১৪ মাইল উঁচু থেকে উক্ত বিমানের পাইলট ফ্রান্সিস পাওয়ার্স প্যারাসুটের সাহায্যে নেমে আসেন। পাওয়ার্সকে দশ বছরের জন্য 'আটক' রাখা হয়েছে। কিন্তু ঠিক পঞ্চাশ বছর আগেকার অপর একটি 'সাইবেরীয়' ঘটনার কথা পৃথিবীবাসীরা অনেকেই মনে রেখেছে। তখন জারের আমল। বোধ হয় দ্বিতীয় নিকোলাস তখন রুশ সাম্রাজ্যের সম্রাট। দুর্গম সাইবেরিয়ায় তখন স্বভাব-দুবৃত্ত এবং রাজনীতিক বন্দীদেরকে নির্বাসন দেওয়া হত। কিন্তু দক্ষিণ সাইবেরিয়া চিরদিন গহন অরণ্যানীর দ্বারা পরিবেষ্টিত! পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ শেগুন বৃক্ষের অরণ্য সাইবেরিয়া ছাড়া অন্য কোথাও নেই! এ ছাড়া বার্চ, ওক, পাইন এবং অন্যান্য বহুমূল্যবান অরণ্যসম্পদে দক্ষিণ সাইবেরিয়ার লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল পরিপূর্ণ। এখানকার যে কোনও অঞ্চলে আড়াইশো থেকে তিনশো বছর বয়সের শেগুনের মহারণ্য দেখতে পাওয়া যায়। সে যাই হোক, বিগত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের কোনও এক সময়ে সৌরলোক থেকে

একটি বিরাট প্রজ্জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ড শব্দে এই অরণ্যের কোনও একখানে ছিটকে এসে পড়ে। সেই অনৈসর্গিক উল্কাপিণ্ডের প্রচণ্ড বিদারণশব্দে সাইবেরিয়ায় যে প্রকার ভূ-কম্পন ঘটে, জনৈক রুশ বৈজ্ঞানিক মিঃ জোলোটভ সেটিকে এক হাজার আনাবিক বোমার আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করেন! এই উল্কাপতনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশাল দাবানলের সৃষ্টি হয়, এবং এর ভস্মরাশির মধ্যে নানাপ্রকার অজ্ঞাত রাসায়নিক পদার্থ মৃত্তিকার উপরে ছড়িয়ে পড়ে। এই উল্কার বিদারণটি সম্ভবত ভূমিস্পর্শ করার আগেই ঘটে। সেই কারণে সাইবেরিয়ার বহু শত বর্গ-মাইলব্যাপী বিস্তৃত ভূভাগ ভস্মপরিাকীর্ণ হওয়ার ফলে সমগ্র মংলোকের উর্বরা-শক্তি সাত-আট গুণ বৃদ্ধি পায়! উক্ত বিজ্ঞানী বলেছেন, এই উল্কাটির প্রকৃতির সঙ্গে আনাবিক শক্তির যোগ ছিল।

জনবিবরল সেই হোটেল থেকে বেরিয়ে বিমানঘাটিতে এসে শোনা গেল, মস্কো অঞ্চলের আবহাওয়া যে প্রকার তাতে জেটবিমানের পক্ষে সেদিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, এবং ভারতীয় অতিথি-গণের জন্য কর্তৃপক্ষ সেই ঋতুিক নিতেও প্রস্তুত নন। অতএব একটি নবনির্মিত, ডাকোটা-প্লেন আমাদের জন্য বরাদ্দ হল। বিশেষ একটি 'ঘরপোড়া' জীব সি'দুরে মেঘ দেখলেই ডরায়! সেইজন্য 'ডাকোটার' নাম শুনাই আমি আঁতকে উঠেছিলুম! কিন্তু এ ডাকোটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে ব্যবহৃত 'সেকেন্ড হ্যান্ড' ব্রিটিশ ডাকোটা পূর্ণমূল্যে কেনা নয়, অথবা তার ওপর পালিশ চড়িয়ে নতুন বলে বুদ্ধিয়ে দেওয়াও নয়—এটি এখানকারই নবনির্মিত। তবে এই বিমানটিতে ওঠবার আগে একটি কথা মনে পড়ে গেল। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিমান দৃষ্টিনার সংবাদ কোথাও নাকি প্রকাশ করা হয় না, এবং সংবাদ-পত্রেও ছাপা হয় না, পাছে ক্যাপিটালিস্ট জগতে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্বেষের পাত্র হন, অথবা বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁদের অযোগ্যতা প্রকাশ পায়! মস্কো-পৌকিং বিমানটি ছিল চীনা বিমান, এটি শুনলুম। কিছুকাল আগে সোভিয়েট ইউনিয়নে অপর একটি বিমান দৃষ্টিনার অনেকগুলি পশ্চিম ইউরোপীয় লোক মারা যান। কাগজে পড়েছি সেটিও সোভিয়েট বিমান নয়। সে যাই হোক, এগুলি সবই আমার শোনা—জানা নয়।

মস্কোগামী ডাকোটার যখন উঠলুম, দিল্লীতে তখন প্রায় ছ'টা বাজে, এখানে প্রায় সাড়ে তিনটে। আমরা তাতার দেশের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি, এবং এটি যে হেতু 'ডাকোটা',—সেই কারণে সাত আট হাজার ফুট নীচে রুশভূমি দেখতে পাচ্ছিলুম। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটির পর একটি জনপদ, চাষাবাস, ছোট ও বড় শহর, নদী এবং রেলপথ। যেহেতু এটি মেঘচ্ছায়াচ্ছন্ন গোধূলিকাল—সেই কারণে নীচের দিকের আলোগুলি দেখতে পাচ্ছিলুম। বনময় ভূভাগ প্রায়ই চোখে পড়ছে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চিমনী এবং এঞ্জিনের ধোঁয়া।

বোধ হয় ঘণ্টা দুই, তারপরেই বিমানটি সাইবেরিয়ায়ই অপর একটি শহরে নেমে এল। এটির নাম কাজান, এখানেও তাতারের ক্যাপপরা বহুলোককে দেখতে পাওয়া গেল। এদের সঙ্গে যেমন পুরনো রুশইতিহাস প্রচুরভাবে জড়িত, তেমনি এই শহরটিও রুশবিপ্লবের সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লিখিত। রাশিয়াতে শীতকাল প্রায় এসে গেছে। সেই কারণে ওভারকোট ছাড়া মেয়ে-পুরুষ দেখা যাচ্ছে না। মেয়েদের মুখে চোখে যথেষ্ট ধারালো ভাবটি দেখাচ্ছিলে। একটু যেন ভোঁতা, একটু মোটা হাতের আহ্লাদী পুতুল, একটু বেশি যেন মোটামুটি। তবু লালিতা বিগলিতা দলের কা'রোকে বিশেষ চোখে পড়ছে না, দেখাচ্ছিলে তেমন কোথাও বাঁকা চোখের বিদ্রোহ, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না 'নিপুণিকা চতুরিকাদের'। সম্ভবত সোভিয়েট ইউনিয়নে তারা বাস করে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল জনৈক আমেরিকান লেখকের একটি মধুর পরিহাস : "....Since the Revolution in 1917 people do not kill themselves for romantic reasons."

আমরা মোট ঘণ্টা তিনেক পিচ্ছিয়ে পড়েছি। কাজান থেকে প্লেনটি ছাড়ল প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। এখন সম্ভ্রাম ছ'টা। এবার সোজা মস্কা—এই কথাটি জেনে গুঁছিয়ে বসলুম। ঠান্ডার কথা শুনে একটু ভয় পাচ্ছিলুম। ডিসেম্বর-জানুয়ারীর দিল্লীর উপযুক্ত গরম পোষাক সঙ্গে আছে, কিন্তু রাশিয়ার অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহের অন্তকাল একটু অন্য রকম। এবার অশ্বকার হয়েছে, নীচের দিকে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। এবার মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে পরদেশী আকাশের জ্যোৎস্না চোখে পড়ছিল। ভুলে গিয়েছিলুম, কলকাতায় আজ মহানবমী পূজা।

কাজান থেকে ডাকোটার তিন ঘণ্টা লাগল মস্কা বিমানঘাটি পৌঁছতে। এই বিমানঘাটির বিশালতা চট করে ঠা'হর করা যায় না। কিন্তু চারিদিকের দেব-দুরান্তর অবধি ফ্লাড-লাইটের অত্যাশ্রিতার সঙ্গে লাল-সবুজ আলোর যেমন ছড়া-ছড়ি, তেমনি অগণিত ও বিভিন্ন ডিজাইনের বিমান এক একদিকে শ্রেণী-বন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। আমাদের নামবার আগে প্রায় সকলেই যে-যার ওভার-কোট চাড়িয়ে নিল। আমার সঙ্গে ওটা নেই। প্লেন থেকে নামবার জন্য সেই একই ডিজাইনের হালকা নড়বড়ে অপদার্থ এবং অপসৃষ্টি এলুমিনিয়ামের সিঁড়িটি আমাদের জন্য এগিয়ে এসে প্লেনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। প্রতি যাত্রী ওইটির উপর পা দেবামাত্রই নিজেকে বিপন্ন বোধ বোধ করে,—এটি কতৃপক্ষের অবশ্যই অনুমান করা উচিত ছিল! এটির জন্য নিশ্চয়ই পার্টি মিটিং কিংবা কংগ্রেসের অধিবেশন দরকার হয় না! সে যাই হোক, আমরা পনেরো জন একে একে সভয়ে ও সতর্কতার সঙ্গে নেমে যে-ভূমিতে পদার্পণ করলুম, সেটি আমার নিকট রহস্যে আতঙ্কে সংশয়ে দৃষ্টিশক্তায় আবাল্য রোমাঞ্চকর! পৃথিবীর সকল রাজধানী অপেক্ষা মস্কা হল অস্বস্তি-দায়ক এবং সর্বাপেক্ষা ঔৎসুক্যজনক! ১৯১৭ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল সে ছিল একক, নির্বাস্তব,—জগতের মধ্যে এমন নিঃসঙ্গ এবং স্বজনহীন রাষ্ট্র ইতিহাসে কোনদিন ছিল না! ঘরের ভিতরে এবং সীমানার বাহিরে একটি 'নূতন সভ্যতা' বিস্তারের জন্য এমন

ক'রে পৃথিবীব্যাপী মনোমালিন্যও কেউ বাধ্যনি!

এক একটি 'সাহেব' এক একটি কলের গাড়ির হাতল ঠেলতে ঠেলতে বিমানঘাটির ময়দানের এদিক থেকে ওদিকে ছুটোছুটি করছিল। আমরা সাহেবী ইউরোপের মধ্যে ঢুকেছি! সামনের বৃহৎ অট্টালিকার কপালে রুশ-ভাষায় লেখা 'মস্কোয়া এইরোপোর্ট'। আমরা ভিতরের উষ্ণতার মধ্যে এসে জন-বহুল এবং কর্মব্যস্ত একটি লবীর আনা-গোনা পথে গদিআঁটা বেগ ও চেয়ারে আশ্রয় নিলুম। আমাদের সঙ্গেকার দু'জন রুশ গাইড ও দোভাষী এখানে-ওখানে-সেখানে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলেন। মস্কোর বড় ঘড়িতে রাত ন'টা বেজে গেছে। কলকাতার ঘড়িতে রাত এখন সাড়ে বারোটা।

স্ট্রীলোকের সর্বাঙ্গীণ আধিপত্য এর আগে এমন করে দেখিনি। যা কিছু প্রশ্নের জবাব স্ট্রীলোক দিচ্ছে। আমাদের দেশে ইদানীং মেয়েরা সরকারি অনেক আপিসে—বিশেষ করে রেল, ডাক-বিভাগে, টেলিফোন, টেটব্যাক, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদিতে ফোড়নের মতো ছাড়িয়ে থাকে। এখানে বাসে-কাজ-করা কোনও কাউন্টারে ফোড়নের মতোও কোনও পুরুষ ছাড়িয়ে নেই! এখানে সব মেয়ে। পুরুষ আছে দু'চারজন—তারা মেয়ের তাঁবেদার। ফাই-ফরমাস ছুটোছুটি মাল-টানার্টান—এইসব কাজে পুরুষ। কিন্তু সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ জবাব এবং সর্বপ্রকার নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনা মেয়ের

আরও মজবুত... আরও ভাল

পিতলের তৈরী
বাগার টিউব



'কিমান' লন্টনে
'স্পেশাল কোয়ালিটি'
গ্যাস দোঁষা নাইবেন।

সম্পূর্ণ লন্টন মোটা চাদরে
তৈরী ও লন্টনের ব্লু কেরোসিন
তৈলে লন্ট হয় না

কিমান
লন্টন
সর্বোৎকৃষ্ট



গেইস মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩, ৩নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৫৮০

হাতে। রসে বসে আগাগোড়া সব লক্ষ্য করছিলাম।

আমাদেরকে কেউ অভিযর্থনা করবার জন্য এগিয়ে আসছে না, এবং কেউ মালা গলায় পরাবার জন্য হুড়োহুড়ি করছে না—এটি নতুন। খাতির পাওয়া বাদের অভ্যাস হয়ে গেছে এবং গলায় মালা পাওয়া বাদের পক্ষে এক প্রকার নিত্য-নৈমিত্তিক—তাদের পক্ষে ওদুটো চট করে না-পাওয়া শব্দ যে গায়েই লাগে তা নয়,—নির্মিত হলেও—নিজেদেরকে তখন অব্যাহত মনে হয়। আমরা পনেরো জন মিলে এক ঘণ্টাকাল সম্পূর্ণ নিরুপায় এবং নিঃসহায় হয়ে বসে রইলাম। সেই সোভাষী দুজন রুশ ভদ্রলোকের চুলের টিকিও দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য উভয়ের একজনের মাথার পিছন দিকে টাকপড়া, এবং সোভিয়েট-ইউনিয়নে টিকি রাখার প্রচলন নেই—এটি বলাই বাহুল্য।

আমাদের দলের মধ্যে ১২ জন পুরুষ, এবং ৩ জন মহিলা। পুরুষের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার, কৃষ্ণকায়, বেপরোয়া, সূর্যাসিক এবং বাকপটু—তিনি জাত-মারাতা এবং বোম্বাইয়ের বিরোধী-দলের প্রধান নেতা আচার্য আত্রে। যিনি সর্বাপেক্ষা নীরব ও শান্ত—তিনি গুজরাটের নাট্যকার প্রাগজি দোস। মেয়েদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা খরকন্ঠী এবং বিদূষী—তিনি শ্রীমতী দুর্গা ভাগবৎ,—তিনিও মারাতী। তাঁর বয়স পঞ্চাশ শেরিয়েছে, রোগা পাংলা, তাম্র পয়সার মতো বর্ণ, এবং তিনি অবিবাহিত। নানা কারণে তিনি আচার্য আত্রে প্রিয় প্রসন্ন। বৈ-মহিলাটি সর্বাপেক্ষা শান্ত এবং প্রসন্নরূপিণী, তিনিও বেশ বয়স্ক।—তিনি রাণী লক্ষ্মীকুমারী চন্দাবৎ, রাণা প্রতাপাদিত্যের বংশের কে যেন!

আমাদের কারো কারো মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ দেখা দিল—যখন পেরিয়ে গেল দু'ঘণ্টা। অনেকে হিসাব করতে বসল, আমাদের প্রাতরাশের পর নাকি চৌদ্দ ঘণ্টা কেটে গেছে! সাইবেরিয়ান নির্বাসিত প্রাক্তন রুশ বিপ্লববাদীর মতো এক সময় আচার্য আত্রে নিজের মধ্যমী আত্মনাদ করে উঠলেন, না হয় উপোস করেই রইলাম মশাই, তাই বলে একটা 'পানীয়ও' কি পাবো না?

কি প্রকার পানীয় পেলেন তিনি এখনই তুণ হন, এ প্রশ্ন করবর প্রয়োজন আমরা কেউ মনে করিনি। দুর্গা ভাগবতের মূখের ভেতর বোর বিরতি

ফুটে উঠেছিল এবং লক্ষ্মীকুমারী শান্ত হাস্যে চুপ করে গিয়েছিলেন। বস্তুতঃ দু'ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পর আমরা সবাই যেমন তন্দ্রায় অবসন্ন এবং রাত্রি ঠাণ্ডায় জড়োসড়ো হচ্ছিলাম, তেমনি নিজেদেরকে এমন বিরক্ত, অসহায়, অব্যাহত, উপেক্ষিত এবং অনুকম্পাপ্রার্থীও আর কখনও মনে হয়নি। কেউ যদি তখন আমাদের কানে কানে এই কথাটি বলত, “মান থাকতে-থাকতে এখনই নিজেদের দেশে ফিরে চলো, বিমান তোমাদের রেডি, এবং দেশে ফিরে গিয়ে আত্মসম্মান রক্ষার দ্বায়ে এই অনাদরের ইতিবৃত্তটি ঢোক গিলে চেপে মেয়ো,”—তাহলে সেই শব্দ মূহুর্তে আমাদের মধ্যে অনেকেই তৎক্ষণাৎ বোধ হয় উঠে দাঁড়াত!

কলকাতার ঘড়িতে সম্ভবত রাত তিনটে বাজে। এমন সময় খবর পাওয়া গেল, সোভিয়েট লেখক-সম্মেলন প্রতি-নিধিরা আমাদেরকে অভিযর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য যথাসময়ে এসে এই বিমান-ঘাড়িতে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত অর্থাৎ বিকাল-পাঁচটা থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করেছিলেন, কিন্তু মস্কোর আকাশে দুর্ভাগ্যপূর্ণ আব-হাওয়ায় আমাদের জেটবিমানটি আজকে আর আসবে না,—এই খবরটি নিশ্চিত-ভাবে জেনে তাঁরা তাদের পনেরোটি ফুলের মালা এবং পনেরোটি ফুলের তোড়া নিয়ে যে-বার বাড়ি ফিরে গেছেন! আমাদের ডাকোটা-বিমানের খবর তাঁরা কিছুই জানেন না!

এবং প্রকার সন্দেহাবাক্য শুনেও কেউ কেউ তুড়ি দিয়ে হাই তুলেছিল। সিগারেটে অরুচি ধরেছে, জনবৈচিত্র্য পূরনো হয়ে গেছে, কবল একথানা সঙ্গে থাকলে বাকি রাতটুকু কোথাও গাড়িয়ে নেওয়া যেতো!

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছোটবেলাকার ভাদুড়ীদের বাড়ির প্রাশ্নভোজনের কথা ভাবছিলাম। উৎসাহ করে নেমন্তন্ন খেতে গৌঁ! কিন্তু রাত দশটা বাজবার পরেও ডাক পড়ে না, সুতরাং ছেলেমানুষ ক্ষিধে-ভেঙার ও ঘুমো মৌতয়ে পড়েছে! জামা-কাপড়ের ইস্তিহার সব নষ্ট, মাথার টেরি মুছে গেছে, একপাটি জুতো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মামা তাঁর স্বভাবসম্মত মূখ্যখিন্তি আরম্ভ করেছেন গৃহকর্তাদের উদ্দেশ্যে,—এমন সময় বদ্বি ডাক পড়ল, —“ব্রাহ্মণ আর কে অছ গো উঠে এসো, পড়া পড়েছে।”

ঠিক সেইরূপ ঘুমকাতর অবস্থায় এক সময়ে আমাদের ডাক এল, “ভারতীয় যারা আছেন আসুন, গাড়ি এসেছে আপনাদের জন্য।”

আচার্য আত্রে মূখ্যখিন্তি আরম্ভ করেছিলেন! চেয়ে দেখলাম, মস্কোর ঘড়িতে রাত বারোটা বাজে। কলকাতায় প্রায় সাড়ে তিনটে। আমরা গা ব্যাড়া দিয়ে উঠলাম। খান-পাঁচেক গাড়ি আমাদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে!

বংশগাড়ির বাইরে ঠাণ্ডা ছিল প্রচুর। বৃষ্টি পড়ছে সপসপিয়ে। কিন্তু মেঘমলিন রাতে দুই পাশের অন্ধকর প্রান্তর এবং পাইনের প্রেতচ্ছায়াদল ভিন্ন আর কিছু চোখে পড়ছিল না। গাড়ির মধ্যে কারো কারো নাক ডাকাছিল, এবং তাঁরা নিজদের নাকডাকার বহু বিচিত্র আওয়াজে নিজেরাই একসময়ে সচকিত হয়ে সলজভাবে সোজা হয়ে বসেছিলেন।

ঠিক মনে নেই, বোধ হয় মাইল কুড়ি-বাইশ পথ। কিন্তু দশ বারো মাইল পেরোবার পর দূরে-দূরে কয়েকটি রক্ত-ভারকার চিহ্ন বহু উচ্চ দেখতে পাওয়া গেল। এগুলি পৃথিবীর সকল দেশের ও সকলকালের সমস্ত বিপ্লববাদীগণের হৃৎপিণ্ডের প্রতীক কিনা, এটি আমার জানা নেই। কিন্তু অধুনা যেটি দিল্লীর রাষ্ট্রপতি-ভবন, সেটি এখন প্রাক্তন ইংরেজ আমলের ভাইসরয়ের প্যালেস ছিল, তখন সেখানে এবিস্বিধ একটি রক্ত-ভারকার আলোক ভারতব্যাপী রাজ-নীতিক অমানিশাম্বকারে দপ দপ করে জ্বলত! তবে এখানে এবার পথের দুই পাশে যে সুবিস্তৃত বিশালতা এবং সচ্ছল আলোকমালাসজ্জিত গগনরূপশী নব-নির্মিত অট্টালিকা শ্রেণী দেখতে পাচ্ছিলাম, এই দৃশ্য এখন পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্য কোথাও চোখে পড়েনি। মস্কোর প্রথম দৃশ্য পর্যটক মাগকেই অভিভূত করে।

তন্দ্রাগর্গী দৃষ্টির সম্মুখে সমস্তটাই কেমন যেন একটা অবাস্তব রূপকথার আকার নিয়েছিল এবং সেই অন্ধকারে কোন পথ দিয়ে ঘুরে কোন একটি নদী পার হয়ে কোথায় আমাদের গাড়িগুলি একে একে এসে থামল, সেদিকে আর ঠাহর করা গেল না। শব্দ এক বিশাল সোপানশ্রেণী বেয়ে উঠে দিল্লীর কুতব মিনারের মতো উচু যে অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করলাম সেটিকে ময়দানবের প্রাসাদ বলে

প্রথমেই মনে হল। ভিতরে প্রবেশকালে একটি উজ্জ্বল প্রভাসের প্রবাহ পেরিয়ে যেতে হয়। তারপর লবীর ভিতরে এসে দাঁড়াতেই বুঝতে পারা গেল, দিল্লীর জানুয়ারী মাস এই হোটেলের মধ্যে এসে কলকাতার মধুর চৈত্রসন্ধ্যায় পরিণত হয়েছে। আমরা আধুনিক মস্তকীর নবনির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেল 'উবাইনা'-তে এসে উঠেছি। দেখতে দেখতে আমাদের পনেরো জনের মালপত্র হুড়হুড় করে এসে পৌঁছল। যারা এগুলি তাঁবুর তদারক করছিল তাদের না বলতে পারি ভ্যালুট, না পোটরি, না খানসামা, না বয়। তারা ঘননালি পৌষিকের সঙ্গে সোনালি ব্যাজ লাগিয়ে নিজদের যে স্বতন্ত্র পরিচয়টি বহন করছে, সেটি হল হোটেলের 'উতা'। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে 'চাকর' কেউ নেই, সবাই হল ওয়াকার, 'বুবোচি'। তারা মাল নামায়, মাল তোলে, উপরে পৌঁছায়, এঘর থেকে ওঘরে নেন। তারাই আবার ওভার-কোট জমা রেখে টিকিট দেয়, পিছন থেকে ওভার-কোট গিয়ে চড়িয়ে দেয়, একটু নলটে আঁড়ল দিয়ে সিগারেট কান্ডে নেন, আবার ওরই মধ্যে দুটো কানেকানি ফিসফাস করে নিজদের মধ্যে। এদেরকে 'বকশিস' দেবার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, এবং অসন্তোষ মতো এরা কখনও হাত পেতে বকশিসও চায় না। সোভিয়েট ইউনিয়নে বকশিস দেওয়া এবং নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু লোকচক্ষুর একটু আঁড়লে দাঁড়িয়ে আমি যখন এক আধাবার আমার বদ অভ্যাস মতো এই বেকাইনী কাজ করছি, তারা প্রীতি ও খুশী হয়ে সেটি গ্রহণ করেছে।

আধুনিককালের হোটেল মাত্রই প্রত্যেক দেশের রুচি, প্রকৃতি, সম্পদ ও বৈভবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই হোটেলের ভিতরকার আগাগোড়া প্রথম শ্রেণীর শ্বেতপাথর এবং শেগুন কাঠের কাজ, তার গঠনের কারুকার্য, তার শিল্প-কলা, চারিদিকে চারশিল্পের বিবিধ চিত্রণ—এগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নের ধন ও ঐশ্ব্যের পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের সামনের সমস্ত ছবি বদলে গেছে। উজ্জ্বলবস্তান, তুকেমেনিস্তান, কাজখ, তাজিক, কিরগিজ, আজেরবাইজান, এমন কি জাজিয়া এবং সাইবেরিয়াও মনে পড়ে গেছে। আমরা এসেছি নতুন জগতে, যেখানে সব সাইব আর মৈম, যেখানকারি বর্ণ অত্যাশ্চর্য শ্বেতরক্তিম, লাল রেশমি চুল, অত্যন্ত বড়মানুষি পৌষিক পরিচ্ছদ—

যেখানে চারিদিকের পরিপাটের ফিটফাট টিপ-টাপ চোরা। নিজেদেরকে এবার যেন একটু বেশি কালো এবং একটু বেশি অকিঞ্চন মনে হতে লাগল।

মালপত্রের জটলার চারিদিকে ভারতীয়রা দাঁড়িয়ে যে-যার সুটকেস বা ব্যাগ মিলিয়ে নিচ্ছিলেন, এবং তাঁদেরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন অত্যাশ্চর্য রুশ মহিলা শমা চোখে দিয়ে আমাদের প্রত্যেকখানি পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে মানুষটিকে মিলিয়ে তার জন্য অমুক নম্বরের ঘরটি আবণ্টন করছিলেন। মহিলাটি বয়সসী, গোলগাল, নাদুস-নুদুস এবং হাসি-হাসি মুখ। আমাদের দেশের ভারি ক্লেশ গৃহণী! তিনি পাসপোর্টের ছবিগুলি মেলাতে গিয়ে কোনও একখানিকে পরীক্ষা করে বলছিলেন, আপনাদের মধ্যে এই মহিলাটিকে দেখাচ্ছে কেন? এই যে ববকরা ঘন কোঁকড়া চুল, চোখে চশমা, সুন্দর মুখ,— এই যে ইনি! এর জন্য মেয়েদের ঘরেই থাকার ব্যবস্থা করেছে।

ববকরা কোনও মেয়েকে আমরা সঙ্গে আনিনি, সেইজন্য ছবিটি পরীক্ষা করতে গিয়েই দেখি, তলায় নাম লেখা রয়েছে "সুভাচন্দ্র মুখার্জি"।

হাসির হটগোল পড়ে গেল, এবং সুভাচকে তার সামনে দাঁড় করানো হল।

মহিলা আপন ভ্রম শোধরতে গিয়ে একটি কলরব তুলে হাস্যমুখ হয়ে উঠলেন। তার আচরণের মধ্যে এবং কথা-বাতায় একটি গৃহস্থকন্যার আভাস

পাওয়া যাচ্ছিল। মনে হল, তিনি ঠিক সরকারি দপ্তরের কাঠখোটা মেয়ে নন। হাসিমুখে তিনি বললেন, আলো নিবিবে সুবে আমি শব্দে যাচ্ছিলুম, এমন সময় টেলিফোন বাজল—আপনারা সবাই আসছেন। শুনে অবাক, সারাতি আপনাদের খাওয়া হয়নি! কত কষ্ট হয়েছে আপনাদের। চলুন, আর নশ ওপরে আপনাদের জায়গা হয়েছে। এরা আপনাদের সব ভার নিলুম আমি। কাঁধ থেকে আপনাদের আর কোনও কণ্ট হবেনা, কথা দিচ্ছি। আসুন, আমি আগে বলে রেখেছি রান্নাঘরে। আপনাদের এ ছয়রানির জন্যে সবাই লজ্জিত। আসুন—

দোতলার একটি সরু লম্বা হয়ে ভারতীয় একটি দ্বিগুণরঞ্জিত পতাকা সামনে বসে সেদিনকার সেই শেষ রাতে কতটুকু কি কি মুখে দিয়েছিলুম মনে নেই। তারপর সমস্ত বজ্রটি কামেল এড়িয়ে একটি লিফট-এর সাহায্যে আটতলায় উঠে সুদীর্ঘ করিডর পেরিয়ে যে ঘরটিতে সুভাচ এবং আমাকে মালপত্রাদিসহ পৌঁছিয়ে দেওয়া হল, সেটি নম্বর ৭৮২। তখন মস্তকা টাইম রা সাড়ে তিনটে, কলকাতায় সকাল ৭টা।

সকাল আটটার আগে বিছানা ছাড়লেও চলে, সেইজন্য একটু ঘুমোতে পেরেছিলুম। বিছানা ছেড়ে উঠে চায়ে চেষ্টায় গিয়েছিলুম একবার সে দোতলাটার ওদিকে, কিন্তু এই বৃহ অটালিকার শাখা-প্রশাখা চারিদিকে এমন দুরবিস্তৃত এবং জটিল যে, নতুন মানুষের পক্ষে পথ হারাবার ভয় ছিল।

বনাম মী মাড়ি ব মেলা

মোহিনীমোহন

কাঙ্ক্ষিতাল

এও মন

কলেজ স্ট্রিট জংশন কলিঃ ২

ফোন: ৩৪-৪৫২০

ম্পদ এবং বৈভবের প্রাচুর্য প্রকাশ যদি হাটেলের পরিচয়পত্র হয় তবে কল-তার গ্র্যান্ড, গ্রেট ইন্টার্ণ থেকে আরম্ভ রে দিল্লীর মেডন, অশোক, জনপথ, স্টেটার্ণ, কোর্ট, ইম্পিরিয়াল এবং মাম্বাইয়ের ‘তাজমহলের’ অন্দরমহল রা দেখেছেন, তাঁরা চট করে ‘হোটেল ক্রাইনা’ দিয়ে অভিজ্ঞ হতে চাইবেন। ‘হোটেল উক্কাইনার’ নীচের তলায় যান। যে কর্ণটি দোকান আছে তাতে যেন্ডুলানো কয়েকটি বৃত্তোদ্ধাতুর অথবা ল্যোর অলংকার ছাড়া দু-তিনটি মূল্যী পদতুলের প্রদর্শনী দেখতে ওয়া যায়। বই এবং হাতঘড়ির দু-শতটি দোকান। খন্দেররা খুশী হয়ে যে খ্যে মাঝে এটা ওটা কেনে তা নয়, শতের কাছে অন্য কিছুই বৈচিত্র্য নেই। লেই কেনে। গ্র্যান্ড, গ্রেট ইন্টার্ণ, জমহলে পণ্যাবিপণি-বৈচিত্র্যের যে পরূপ শোভাসজ্জার প্রাচুর্য—মস্কোর প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ হাট্টেলে তার তাংশের এক অংশও নেই! আমাকে ভিজুত করেছিল এর বিহরাংশের গঠন-নিরপাট্য। যে সকল ইঞ্জিনিয়ার এটিকে মণি করেছিলেন, তাঁদের সামনে শতের ওয়েন্ট মিনিটের প্রাসাদটির বৈবোধ হয় ধরা ছিল। তবে এটি এখন মস্কোটের যুগ, ‘গোয়েথিক’ খিলান মণির কথা এখন আর ওঠে না।

প্রাতরাশের মতো ‘সকাল’ এখনও বিন, সুতরাং হোটেলের মধ্যেই চর্কির তো খানিকটা ঘুরে যখন নিজের ঘরে সে দাঁড়ালুম, দেখি ইতিমধ্যেই আমাদের ঘরটি ‘বাংলাদেশে’ পরিণত! স্ত্রীক কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর গালিকা, সমর সেন, সন্দীপ শত্ৰুঘ্ন রায়, এবং মস্কো রেডিয়ার বাঙলা প্রাণামের কর্তা, শ্রীযুক্ত বিনয় রায়। বলা হুদ্যা, আনন্দটা উৎসবে পরিণত হল। খনয়বাবু এই ঘরেই চা-কেক-বিস্কুটের আসর বসালেন। একটি ধবধবে সুবেশা দুশ মেয়ে এই ফ্লোরের ‘বুকে’ থেকে মামগ্রীসম্ভার এনে হাজির করল। মতোক তলায় এক একটি বৃক্ষেতে চা, কফি, রুটি, ডিম, মাংসর খাবার, আপেল, বাগদার, লজেন্স, চকোলেটাদি পাওয়া যায়। কিন্তু ‘ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন।’—এইটি অলিখিত থাকে! এখানে ফেলো কর্ণি মাথো তেল।” সর্বত্র যেমন প্রস্তুত হয়, এখানেও তেমন। এক গলাস হলুদেটে গরম জল, যার নাম ‘সান’—তার দাম এক রুবল! যদি দু’ ফাঁটা মোড়িয়ে পাতিলেবুর গন্ধ

ভাসে তবে আরও পনেরো কোপেক! আমাদের হিসেবে দাঁড়ায় মোট এক টাকা ছয় আনা! কফির দাম এক রুবল। একটি ভদ্র প্রতরাশ খেতে গেলে দশ থেকে পনেরো রুবল! মদ বাদ দিয়ে সভ্য সমাজের লাগু বা ডিনার পঁচিশ থেকে চল্লিশ রুবল! কামাক্ষীরা এখানে অনুবাদকের কাজ করেন। তাঁদের গড়-পড়তা আয় চার থেকে ছয় হাজার রুবল। কিন্তু তাঁদের ফ্ল্যাটভাড়া সামান্যই। এঁরা ছাড়াও এখানে আছেন ননী ভৌমিক এবং সন্দীপ প্রভাসচন্দ্র বসু। প্রাক্তন বঙ্গবাসীর অধ্যাপক এবং আকুমার রহুচাঁরী ও রুশ ভাষা জানা শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ও এখানে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক মাত্রই এখানে প্রচুর বেতন পান। এখানকার বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হলেন শ্রীযুক্ত কে-পি-এস মেনন। মস্কোতে কে-পি-এস মেনন এবং কৃষ্ণ মেনন, এঁরা দুজন খুবই জনপ্রিয়—এটি পরে শুনিয়েছিলাম।

সুভাষ তাঁর সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে চলে গেলেন এই হোটেল ছেড়ে। জলের মাছ ডাঙায় উঠে ছটফট করছিল, এবার জলে ডুবে বাঁচল! তিনি কলকাতা থেকে তাঁর বন্ধুদের জন্য এনেছিলেন মৃগ-মুসুরির ডাল, খাবার জন্য মসলাপাতি, এটা ওটা। এবার ‘দেশী’ আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে তিনি হাঁপ ছাড়লেন। সুভাষ আবার ওরই মধ্যে একটু অগোছালো, একটু বেসামাল, একটু বেশি ‘বাংগালী’। কিন্তু আমি ওর ভদ্র এবং মিষ্ট সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে একদম একা পড়ে গেলুম। এবার আমি রইলুম, আর আমার সামনে রইল মস্কো! এখন থেকে উভয়ের মধ্যে সোজা ও বাঁকা কটাক্ষ বিনিময় চলবে! যা কিছু শুনবে এসেছি, জেনে এসেছি, ভেবে এসেছি,—তা সম্পূর্ণভাবেই ভুলব! পূর্বসংস্কার বা প্রেজুডিস বিসর্জন দেবো! আমেরিকার চোখ নয়, ইংল্যান্ডের মন নয়, ফ্রান্সের অভিমত নয়, ভারতের সংশয় ও দূর্ভাবনা নয়, আমি দেখতে চাই মস্কোকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত চক্ষে! কেবল-মাত্র মস্কো নগরীর বিশেষ। বিশেষ অংশ গাড়ির ভিতর থেকে দেখে আমি একথা বলতে আসিনি “এখানে না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অপূর্ণ থেকে যেত।” আমি জানি এ-মস্কো ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মস্কো নয়। সেই মস্কো নিশ্চই হয়ে গেছে। আমি জানি রাষ্ট্রের বিশেষ আইডিয়া বিশেষ কাল থেকে অন্যকালে উদ্ভূত হয়ে তার

চেহারা বদলায়, ভিন্নতর আইডিয়ার মধ্যে সে এসে পৌঁছয়। আমি জানি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ‘চ’ডশোক’ ‘ধর্মশোক’ পরিণত হয়েছিলেন, এবং অহিংসবাদী গান্ধী ভারতের স্বাধীনতালভের পর ঠিক আজকের এই ২২শে অক্টোবর তারিখে একদা হিংসাত্মক সশস্ত্র প্রতি-রোধের জন্য কাম্মীরে-সংগ্রাম ঘোষণার অনুমতি দিয়েছিলেন।

বেলা দশটার সময়ে আমাদের সেই পরিচিত হল-এ প্রাতরাশের বৈঠক বসল। ভারতীয় মহিলা ও পুরুষ সকলেই উপস্থিত। মূল্যবান আনন্দ এলেন আমাদেরকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। তিনি আজই চ’লে যাবেন রাতে। সাজ্জাদ জহীরকে দেখে বড় খুশী হলুম। তিনি ইতিমধ্যে আসকাবাদ হয়ে এসেছেন। লেনিনের শবধারের উপর আমাদের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা উচিত, এবং সেই পুষ্পমাল্যের মূল্য কি পরিমাণ হওয়া সঙ্গত,—এই আলোচনাটি হচ্ছিল। অবশেষে স্থির হল, দুই-শত রুবল মূল্যের একটি ভাল মালা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার। আগামী কাল আমরা সেই ‘মসলিয়ম্’ দেখতে যাব।

কাল রাত্রে সেই রুশমহিলা আমাদেরকে খাওয়াতে বসেছেন। কোনও পরিচয় নেই, কিন্তু আড়ম্বর্তাও নেই। আজ তাঁর নাম শুনলুম ওই হাসি-হট্টগোলের মধ্যে। তাঁর নাম লিডিয়া। এই আসরেই রয়েছেন কয়েকজন রুশ পুরুষ এবং মহিলা,—এঁদের অনেককেই দেখেছি তাঁসকন্দে। মহিলাদের মধ্যে নাট্যা, কালোরিয়া, মেরিয়ম প্রভৃতি আমাদের বিশেষ পরিচিত। যাঁরা হাসি তামাশা কৌতুক পরিহাস বেশি করেন তাঁরা পরস্পর কিছু ঘনিষ্ঠ হন। সর্দার রাজেন্দ্র সিং বেদী কিন্তু প্রত্যেকের নিকট প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন তাঁর নির্মল ও মধুর পরিহাসপ্রিয়তার জন্য। তিনি বোম্বাই সিনেমা জগতে চিত্রনাট্যকাররূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সর্বাপেক্ষা প্রবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পাওয়া যাচ্ছিল আচার্য আগ্রের আচরণে। তিনি যখন বক্তৃনির্ঘোষ সহকারে কথা বলতে আরম্ভ করেন, আমরা তখন সভয় কৌতুহলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আড়ম্বর্তা বোধ করি—যদিও তিনি প্রচুর পরিহাসপ্রিয় এবং অনর্গল ইংরেজি বলেন। আমাদের সঙ্গে অধ্যাপক ‘অবশ্যম্ভাবী’ শেখান উপস্থিত আছেন। তিনি অনেকের কৌতুকের পাত্র।

নাট্যা আধুনিক রূপ মেয়ে। সাজ-সজ্জায় ও প্রসাধনে তিনি পরিপাটি। বয়স তাঁর বছর পঁয়ত্রিশ। নাচে গানে তিনি পটু। তাঁর সিপাসিপে চেহারাটি সুস্বী, ভঙ্গীটি সুঠাম—যেটি রাশিয়ান দুর্লভ। ওদেশে সিপাসিপে তন্বী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাট্যা ভারতে ছিলেন বছর তিনেক। হিন্দী এবং ইংরেজী ভালই জানেন। তিনি বিবাহিত এবং একটি সন্তানের জননী। তাঁর চোখে মধুর কটাক্ষ, এবং মনে রামধনুর খেলা। শ্রীমতী নাট্যার তাঁবে অন্যান্য দোভাষীরা আমাদের সঙ্গে 'কাজ' করছিলেন। আমাদের একমাত্র কাজ যখন তখন যেখানে খুশি হেঁটে করে বেড়ানো। আমাদের জন্য সকল সময় গাড়ি প্রস্তুত।

শ্রীমতী কালোরিয়া এবং লিডিয়ার পোষাকপত্র বিশেষ সংযত। এঁরা বিশেষ প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করেন না। কালোরিয়া ছুটি নেবে দু'একদিনের মধ্যে। ভারতীয়রা চলে গেলে লিডিয়ারও ছুটি। থাকবেন শুধু নাট্যা, কেননা তিনি সোভিয়েট রাইটাস ইউনিয়নে কাজ করেন। প্রকাশ থাকে, দোভাষী অপেক্ষা দোভাষীণীর সংখ্যা মস্কোতে অনেক বেশি। প্রথমত এগুলি হালকা কাজ, দ্বিতীয়ত পশটক এবং অভ্যাগতদের নিকট মহিলারা সহজে প্রিয় হন।

পুরুষের নিকট মেয়েরা আপন নিত্যকালীন ছলাকলার দ্বারা প্রিয় হতে জানে। মেয়েদের মুখ থেকে পুরুষ বক্তৃতা শুনতে চায় না, কিন্তু অনামনস্ক পুরুষের জামার একটি বোতাম সময়মতো শেলাই করে দিলে পুরুষ বড় খুশী। খাবার টেবলে মেয়ে যদি স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ দেয়, পুরুষ তার কথা কানে তোলে না। কিন্তু আর সকলকে লুকিয়ে মেয়ে যদি একখানি ডিম-দিয়ে-ভাজা ভেটকি মাছ কড়াই থেকে তুলে এনে পুরুষের পাতে দেয়, তবে পুরুষের চিত্তলোকে রসের সাজা পড়ে যায়।

লিডিয়া আমার মতোমুখি বসে-ছিলেন। চারিদিকের হাস্য কৌতুকের মাঝখানে আমার মুখে চোখে কিছু আড়ষ্ট গাম্ভীর্য ছিল। তিনি হঠাৎ বললেন, কই, আপনার কিছু খাওয়াই হচ্ছে না। হাত বাড়িয়ে কিছু নিচ্ছেন না? আমি দিচ্ছি—

এখন ওখান থেকে সুভোজ্য বস্তু তিনি আমার প্লেটে তুলে দিলেন। মেমসাহেবের শাদা রংয়ের দুখানা হাত সযত্নে আমার থালায় খাদ্যবস্তু গুছিয়ে দিচ্ছে—এটি আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা! বছর এগারো আগে আসামের অরুণবন্দ

পাহাড়ের একটি বাংলায় জনৈক ইংরে মহিলা এমনিভাবে খাইয়ে ছিলেন। সত্য ছিলেন 'যুগান্তর' সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এখানে এ মহিলাটি শেষের কথাটিতে টনক নড়ল। ইহা বললেন, বোধহয় বাড়ির জন্যে আপন মন-কেমন করছে?

স্বাভাবিকের সেই আদম চাকুর কতটুকু এই নারীর মুখে চোখে প্রকট সেটুকু নিরীক্ষণ করার জন্যই ম. তুললাম। হাসিমুখে বললাম, খ স্বাভাবিক!

আমাদের মুখ থেকে ভারত অবস্থার সংবাদ শুনে নেবার জন্য কোন ব্যক্তি আমাদের আশেপাশে নিযুক্ত আ কিনা অথবা আমাদের সম্বন্ধে কি প্রকৃত তথ্য অজ্ঞো, সংগৃহীত হচ্ছে, এটি সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম! আ কথা বলতুম কম, এবং শুনতুম বেশি। নিজের দৃষ্টিবিস্তারের দ্বারা সোভিয়ে ইউনিয়নে একটি পৃথক জগৎ রচনা ক নিয়েছিলাম, অথচ বাস্তবে যার কে অস্তিত্ব ছিল না। এই দ্রাস্তির উৎপাদন থেকে। ফোড়া দিয়ে পুজ-বোরিয়ে যাবার পরেও ফোড়ার জায়গায় বাথা এখনও মিলেয়নি! ভুলে গিয়েছিল চটালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়ে



এক মুহূর্তে ভেপোলিন স্বাভাবিক রাখুন

এই শীতে যে কোন সময় বাজাদের ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি হবার ভয় আছে। ফুস-ফুসে শ্বাস জমে, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট হয়। বুকে, পিঠে ও গলায় ভেপোলিন মালিশ করলে আপনার শিশুর সকল কষ্ট অবিলম্বে দূর হবে ও আপনিও দৃষ্টিস্তর হাত থেকে রেহাই পাবেন।

কোটা ও শিশিতে পাওয়া যায়

ভেপোলিন

মালিশের জগ

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস্ আইভেট লি: • ১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

উনিয়নের আকাশ কিছুর পরিষ্কার
হচ্ছে!

বেলা এগারোটার ঠান্ডাটাও গায়ে
শাণে বৈকি। সকালটা মেঘ ও রৌদ্র
মুগ্ধানো। মাঝে মাঝে হালকা বৃষ্টির
শলা হয়ে যাচ্ছে। পথে এই প্রথম
মলমল। হাটতে ভাল লাগছিল।
গামনেই মস্কো নদী, এবং নদীর দুই
পাশে শহর। অট্টালিকাশ্রেণী নবনির্মিত,
শুনাই রূপং তেমন। বিস্তৃত। একই
অট্টালিকার বিভিন্ন প্রবেশপথ, সুতরাং
ক একটি বন্দুপতিতে কত সংখ্যক
গ্রন্থীর বাসা বলা কঠিন। কিন্তু ভারতে
মেরা বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে বাস করি।
গামাদের দেশে যেমন প্রতি ইঞ্জিনিয়ার
শ্রম নিম্নাংশকালে স্বকীয় রসকল্পনার
প্রকাশ দেয়, যেমন একটি অট্টালিকার
ডিজাইন বা এলিভেশন অন্যটির সঙ্গে
মিলে না, এখানে তেমন নয়। এখানকার যে
কোনো রাজপথের দুইপাশে যে মনোরম
কৃষ্ণ নিম্নাংশপকলযুক্ত অট্টালিকাশ্রেণী
বিস্তৃত পাওয়া যায় সেগুলি যথেষ্ট
লোভনীয়, কিন্তু ছোট মোটামুটি এক।
রাশিয়া-বৈচিত্র্য এবং রীলিফ—বিশেষ
—হাওয়া নেই। পাছে সম্পূর্ণ নিরৈক্য
উপাধের সমূহ একটা স্তূপ হয়,
—জন্ম ছোট ছোট রাস্তা আছে বটে,
—কিন্তু সেগুলি হাতীর বিরাট দেহের
চলনায় ছোট ছোট চক্ষু। এই অঞ্চলের
বস্তার এবং পথের বিশালতা দেখে
—মিডভুত হয়েছিলুম। একা সোভিয়েট
উনিয়ন হল পৃথিবীর ছয় ভাগের এক
গণ, এবং ভারতখণ্ড অপেক্ষা সাত গণ
—বড়। জনসংখ্যা মনে-হেঁজো-দেশছাড়া
যেও মাত্র কড়ি কোটি। সুতরাং সোভি-
য়েট রাষ্ট্র তথা ক্রিমউনিয়ট প্রাচীর মতো
এত বড় জমিদার গোষ্ঠী, পৃথিবীর
—নব্য কোথাও যেমন নেই তেমন
—এত বড় জমিদারীর স্বপ্রকার সম্পদ-
ভাগ করতে গেলে প্রতি সোভিয়েট
গ্রন্থীর পক্ষে অন্তত দশটি সপ্তম স্তরান
প্রসব করা ছাড়া গতান্বর্ত নেই। বলা
—মাহুলা, অধিক স্তরান প্রসব করার জন্য
ওদেশে যথেষ্ট পরিমাণ পুরুষের যৌগণ
করা আছে, এবং সেই কারণে পারিবারিক
—জীবনের মধ্যে প্রতিযোগিতাও আছে।
এ-পরিবার গলা বাড়িয়ে দেখছে ওই
পরিবারের দিকে, —কার কটি হল।
—সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে শব্দ ফেড়া-
—রেটেড রাশিয়ার অংশে জনসংখ্যা প্রায়
বারো কোটি।

মস্কোর জনবহুল একটি পথের
এদিক-ওদিকে চেয়ে দেখি, ওভারকোট
উঠেছে প্রায় সকলেরই গায়ে। 'পুলে-
টেরিয়েট' কোথাও দেখা যাচ্ছে না।
গ্রন্থীর কেউ এখনও চোখে পড়ছে না।
পুরনো জুতো কারো পায়ে নেই, অল্পট
জুতোর দাম তিন-চারশ রুবল। তালি-
মারা জামা বা ওভারকোট একটিও
দেখাচ্ছে নে। সেই অসুতুচ্ছ, রুদ্ধচক্ষু, ছিন্ন-
ভিন্ন জীর্ণ বাস সর্বহারারা কোনদিকে?
কিন্তু ক্লিন, ক্লিয়ার এবং হৃৎভাগারা
কই? আমার মনে থেকে যাচ্ছে এই
অক্লান্ত প্রহ্ন। আমি যেন পথে পথে,
নগরে ও প্রান্তরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম
তাদেরকে, গোর্কির কাছে যাদের খোঁজ
পেয়েছিলুম, যাদের বিপুল কাহিনী
আরোলা শব্দে এসেছি টলস্টয়ের মুখে।
'বুজোয়া' শব্দটার বাঙলা জানিনে,
কিন্তু ব্যাখ্যাটা জানি। এরা সেই ভদ্র-
লোক, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়, এদের প্রতি
পদক্ষেপে দেখতে পাওয়া যায় অবস্থা
এদের সচ্ছল।

আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রুভময় ঘোষ।
রাজপথের মাঝখানেই একটির পর একটি
মাঝারি ধরনের বাড়ি দেখাচ্ছিলুম।
শহরের মধ্যে এমন রুখি আছে পঁচিশটি
বাড়ি। ছড়িয়ে আছে নানা অঞ্চলে।
প্রত্যেকটির রূপেই লেখা 'মেট্রো'। পথ-
চারী যেমন সহজে ফুটপাথে ওঠে, তেমন
এসে উঠলুম এমন একটি বাড়িতে। এটি
যে, রেলস্টেশন, এবং ভূগর্ভস্থ রেলপথ
এটি, হুঠাৎ বিশ্বাস করতে বাধে।
নিম্নেবের মধ্যে সমস্ত চেহারাটা বদলে
গেল। শত শত নরনারী একই স্তরে
পিলাপল করে, নামছে ভূগর্ভে এবং
সেখান থেকে উঠে আসছে। গভীরতায়
একশ ফুটেরও বেশি, কিন্তু নানা-ওঠার
পরিশ্রম নেই। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা
করে একটি বিদ্যুৎচালিত লোহ-পথের
উপরে দাঁড়ালে সেইটিই সিঁড়ি হয়ে নেমে
যায় তরতর গতিতে। এটি কোতুক ও
কৌশলের খেলা, —একটু আমোদ লাগে।
নীচের তলায় গিয়ে দাঁড়ালে রুদ্ধপূর্বীর
রূপকথার মতো! সামনে বিরাট প্লাটফর্ম,
—দু পাশ দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন প্রতি
পাঁচ মিনিট অন্তর আনাগোনা করছে।
সমগ্র প্লাটফর্ম আলোয় ঝলমল করছে।
মাথার উপরে মস্কো শহর। সূর্য্যপেক্ষা
স্বপ্নিত, ভূগর্ভের মধ্যে মধুর মলয়-
বাস্তব। সূর্য্য সময় ফুর ফুর করছে
মিষ্ট হাওয়া সকলের মুখে-চোখে।
ভিতরটা আগাগোড়া শ্বেতপাথরের
খিলান এবং পাথরের স্বর্ণালি বর্ণের

কার, কার্যকর সংখ্যাত্মক স্তম্ভ। প্রতি
স্তম্ভের গায়ে রুশ-বীর ও মনুষ্যীর
পরিচয় এবং চিত্র খোদিত। এই মেট্রোর
রেলপথের ভাড়া পঞ্চাশ কোপেক, ওদের
পঞ্চাশ নয়া পয়সা। 'নয়া পয়সা' শব্দে
যেন কেমন-কেমন! বছর পাঁচশেক
পুরেও যখন শুনবো 'নয়া পয়সা', —তখন
মনে হতে পারে আমরা যে-কোন পুর-
নোকেই বুঝি 'নয়া' বলে চালাই! এর
চেয়ে বরং পাকিস্তানের সংজ্ঞাটি শব্দে
ভাল—'পয়সা' এবং 'পুরনো পয়সা'। সে
যাই হোক, ওই পঞ্চাশ কোপেকের টিকিট
নিম্নে মাটির তলায়-তলায় সারাদিন
যেখানে খুঁশি এবং যতবার খুঁশি-যে-
কোনো ট্রেনে আনাগোনা করা যায়।
যতক্ষণ ডুব মেরেছ, উপরির খরচ নেই;
ভূইফোড় হলেই টিকিট বাতিল।

একখানা ট্রেন এসে আমাদের দুজনকে
নিম্নে প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে যেন কোনদিকের
অন্ধকার সুড়ঙ্গলোকে ঢলে গেল।
প্রত্যেকটি কামরাই অল্প-বিস্তর জন-
পূর্ণ। হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে যাবার
সুযোগ রয়েছে। কোনও কামরার বাথরুম
চোখে পড়ছে না। কিন্তু কামরাগুলি
আমাদের হাওড়া-বোম্বাই ইলেকট্রিক
ট্রেনের মতোই সুসজ্জবল।

অজানা উত্তর মের-বলয়ের দক্ষিণে
কোন সুড়ঙ্গগভীর ভিতর দিয়ে দ্রুত-
গতিতে অগ্রসর হচ্ছিলুম, ভাবলে গায়ে
কাঁটা দেয়। মাথার উপরে রয়েছে আধ-
ম্নিক পৃথিবীর ন্যূনতম সভ্যতার কেন্দ্র
মস্কো নগরী—ছাদ ভেঙে যদি হুড়-
মুড় করে পড়ে তবে ওদের সঙ্গে
আমরাও মরেছি। কিন্তু খিলান বড়
মজবুত। ওরা ওদের গুরুস্থানীয়
প্র্যারিস, লন্ডন এবং নিউইয়র্ক-এর অনু-
করণেই এই টিউব-রেলপথটি নির্মাণ
করেছে। এটি তাদের চেয়ে উন্নত কিনা
জানিনে।

মাইল পনেরোর মধ্যে একাধিক
স্টেশনে ট্রেন থামল। তারপর এক সময়
আমরা স্রাবার একই লোহ-কৌশলক্রমে
নগরের একটি অপেক্ষাকৃত নিরিবাল
অঞ্চলে এসে উঠলুম। এখান থেকে
কামাঙ্কীদের বাড়ি কাছাকাছি। কামাঙ্কী-
প্রসাদের দুটি ঘরমুণ্ড একটি পাঁচতলার
ফ্ল্যাটে আজ প্রথম দিন আমরা মধ্যাহ্ন
ভোজের সন্নিবিষ্ট। তারই উপর তলায়
থাকেন সময় সেন সপরিবারে। আজ বহু-

দিন পরে একটি উৎকৃষ্ট বাঙালী-ভোজ আমাদের কপালে জুটল।

কামাক্ষীপ্রসাদ ক্যামেরার ছবি তুলে থাকেন এবং এতে তাঁর নাম আছে। সম্প্রতি 'সমুদ্রবাজার পত্রিকার' মালিক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় মস্কোতে এসেছিলেন, কামাক্ষীপ্রসাদ তাঁর নানা অবস্থার ছবি তুলেছেন। কামাক্ষীপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য এই, তাঁর ছবিতে চিত্রিত ব্যক্তির বয়স কম দেখায়।

বাংগলা অনুবাদে কাজ নিয়ে কয়েকজন প্রীতিভাজন বন্ধুর পক্ষে এই ভাবে একান্তে পড়ে থাকাটা আমার কাছে খুব উৎসাহজনক মনে হয়নি। এঁরা বিশেষ শিক্ষিত এবং ভিন্নতর কর্মে যোগ্যতাসম্পন্ন। এ যেন এক প্রকার দিন-মজুরি,—কোনওমতে ক'রে খাওয়া! ওখানে ওঁদের প্রচুর বন্ধু-বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীকে দেখেছিলুম বটে। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, পরসী দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ওঁদের কাছ থেকে আপন খুশি ও রুচিমারফিক কাজ করিয়ে নিচ্ছেন!

বছর দুই পরে ওঁদের কেউ কেউ ভারতে ফিরে এসেছেন শুনে খুশী হয়েছিলুম।

আমার এক ভাণের বিয়েতে আমার ওপর পাত্রী পছন্দ করার ভার ছিল। আমি এই সর্তে রাজি হয়েছিলুম যে, কোনদিন এবং কোন সময়ে 'মেয়ে' দেখতে যাব সেটি আগে বলব না। মেয়েকে দেখব তার সাধারণ পোষাকে, বিনা সাজ-সজ্জায় ও বিনা প্রসাধনে। আসর পাতবে না, জানলার নতুন পর্দা ঝোলাবে না, মেয়েটার রাখায় কৃত্রিম চুল দিয়ে বড় খোঁপা দেখানো হবে না, এবং মূখে পাউডার দেবে না। আমি আসল মেয়েটাকে দেখব!

একথা যখন শুনলুম, আজই সন্ধ্যায় 'এশিয়া-আফ্রিকা' লেখক সমাজকে সোভিয়েট গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হবে, তখন একটু ভয় পেলুম। আমি দেখতে এসেছি, এবং অতর্কিতভাবে আগাগোড়া সবটা দেখে নিতে চাই! আদর অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে যে-দেখা, সে-দেখাটা সত্য নয়। সেটার মধ্যে আবরণ আছে, সেটা অকৃত্রিম নয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি আমার আন্তরিক ঔৎসুক্য এবং অনুদ্রোগের সামনে তাঁদের সকল দরজা খুলে দেন, যেমন জার্মানদের অধিবাসীরা দুই হাত বিস্তার

ক'রে আমাদেরকে আকর্ষিত ভালবাসায় আলিঙ্গনাবস্থ করেছিল,—তবে সেইটিই অভ্যর্থনা! আমরা গিয়ে হরত দেখব, নতুন পর্দা ঝুলছে, নতুন গালিচা এসেছে, ফুল দিয়ে ঘর সাজানো, বাড়ির দেওয়ালে পাউডার ঝুলানো। দাঁত দিয়ে কেউ হাসবে, ওজন ক'রে ভালবাসবে, সর্বনয়ন করযোড়ে স্বভাবের স্বরূপকে ঢাকবে, এবং বাছা বাছা মিষ্টবাক্য নিয়ে আসরে নামবে! সর্বাপেক্ষা বিপদ এই, 'এশিয়া-আফ্রিকা' লেখকস্বরূপ বাঁরা আজ মস্কোর উপস্থিত, তাঁদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের রচনা সোভিয়েট ইউনিয়নের অপর্যাপ্ত। সুতরাং অভ্যর্থনা দেওয়া হচ্ছে অন্ধকারে ঢিল ফেলার মতো! ব্যস্ত নয়, ব্যস্ত নয়, ব্যস্ত-স্বাভাব্য ও নয়, কোনও লেখককেও দেওয়া নয়,—দেওয়া হচ্ছে অমুক-অমুক দেশের এক-একটা দলকে! তার মধ্যে পড়ে 'ভারত' নামক একটা দেশ, একটা সংজ্ঞামাত্র। সে-দেশ থেকে যারা এসেছে তারা নাকি লেখক! কিন্তু ছাইপাশ কী লেখে জানা নেই!

আমাদের বেলাও তাই। এখানে এসে থেকে কথায়-কথায় যাঁদের নাম শুনছি,—টিকেনভ, সফ্রোনভ, ফাদিয়েভ, পোলেভয়, সুকভ, বরোডিন, আলোক্স, চেকভাঙ্ক, —কই, সাত জন্মে এঁদের নাম শুনিনি! কিন্তু ওরা শুনেছে বাল্মিকী, বেদব্যাস, কালিদাস, রবীন্দ্রকুর—আমরা শুনছি পুশকিন আর টলষ্টয়, ডসটয়েভস্কি আর গোর্কি! তারপর ওরাও এগোয়নি, আমরাও খোঁজ-খবর করিনি। সুতরাং সর্বাধুনিক ভারতের সঙ্গে সর্বাধুনিক সোভিয়েট দেশের মন-জানাজানির চেষ্টাটা হল কানামাছির খেলা!

বিকালের দিকে আমাদের হোটেলে চা খেয়ে সন্ধ্যার দিকে সবাই একত্র হয়ে ক্রেমলিনের দিকে অভিযান করব এইটি স্থির হয়েছে। রুশীয় লিপিতে অতি যত্নে এক-একখানি কার্ডে প্রত্যেকের নাম লিখে কতৃপক্ষ আমাদেরকে আমন্ত্রণ করেছেন। কার্ডখানির উপরে সরকারি প্রতীক চিহ্নে সোনালিবর্ণে হাতুড়ি এবং কান্টের ছবি আঁকা। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে ইরানীয় হাতুড়ি এবং কান্টের ব্যবহার প্রায় উঠেই গেছে। কেননা এখন মস্কো সর্বপ্রকার লোহা এবং ইস্পাতের কাজ হয়, এবং শস্যক্ষেত্রে ফসল কাটবার কাজে যন্ত্রচালিত গাড়ির ব্যবহারই চালু হয়েছে। আমার ধারণা, রুশ জাতি কিছু সংরক্ষণ-

শীল! ওদের মনে সেই, কান্টে-হাতুড়ি ফেলে ওরা এগিয়ে গেছে।

হোটেলের কাজ সেরে সন্ধ্যাকালে মাবার আগে পকেট হাতুড়িচ্ছিলুম, এটি বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে থাকবেন আমাদের দোভাষিনী শ্রীমতী লিডিয়া, যিনি আমাদের সকলের প্রতি নিত্যপ্রসন্ন। তিনি একবারটি কাছে এসে বললেন, 'একটু দাঁড়ান, যাবেন না,—এই ব'লে কোন দিকে যেন চলে গেলেন এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে দু' বাস্ত সিগারেট এবং একটি নতুন দেশলাই এনে হাতে দিয়ে বললেন, পকেটে রেখে দিন। এবার থেকে যখন সিগারেট দরকার হবে আমাকে বলবেন।—বলা বারুদ্য, আমার সিগারেট ফুরিয়েছিল।

কিন্তু আমি বলিনি। তিনি নিজেই প্রতিদিন দুটি দেশলাই এবং তিন চার বাস্ত সিগারেট এনে আমার কাছে গচ্ছিত করতেন। এই মহিলা আপন সৌজন্য ও আতিথেয়তার গুণে ভারতীয় মহিলার বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়েছিলেন। তার প্রধান কারণ, এ'র হাসি, কৌতুক, পরিস্ফুট এবং বাক-চাতুর্ষ্যের মধ্যে কোনও অসংযত চটলতা, বাঁকা কটাক্ষ এবং কটমীতিক চাপল্য প্রকাশ পেত না। এ'র চারিদিকে একটি শুচি ও স্বাস্থ্যদায়ক আবহাওয়া ছিল। বাঙালীর অভিজ্ঞাত মহলে এ ধরনের মেয়ে অচেনা নয়।

নতুনের বিস্ময়চমক আমার তখন ডাঙানি। আলোজ্জ্বলা দূরবিস্তৃত রাজপথ একটির পর একটি পেরিয়ে কে থ থেকে কোনদিকে যাচ্ছিলুম, কিছুই ঠাহর করার যো ছিল না। কিন্তু বাইরে বরফানি বাতাসের একটা তাড়না ছিল হু হু করছে পথ। সেই পথ পেরিয়ে আমাদের কয়েকখানি গাড়ি একটি প্রকাণ্ড দূর্গপ্রাকারের শ্রেতচ্ছায়ার নীচে দিয়ে ঢুকল। অনুমানে বুকলুম আমরা একটি অনুচ্চ উপত্যকার উপরে উঠে এসেছি। আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল একটি মস্ত তোরণস্বারের সামনে।

সোভিয়েটের বৈভব-প্রাচুর্যের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমাদের অনেকটা পরিচয় ঘটেছিল। ক্রেমলিনের গ্র্যান্ড প্যালেসের তোরণস্বারে চুকেই সামনে লাল মোটা মথমল বাঁধানো সোপান শ্রেণী দিয়ে উঠলুম প্রথম হলটিতে। শ্বেতকাম ইউরোপ গিজগিজ করছে চতুর্দিকে এবং হলের বিশালতার জন্য প্রত্যেক নর-নারীকে ক্ষুদ্রকায় মনে হচ্ছে। প্রথম

চোখে পড়ে, বর্ণবিশেষের বিন্দুমাত্র নেই কোনও সাহেব-মামের মূখে-চোখে। আমরা ইংরেজ আমলের লোক,—ওটা মর্মে মর্মে জানি। প্রথম আমলের ইংরেজ ভারত জয় করতে ব্যস্ত ছিল,—তখন আমরা অতটা ‘ঘৃণা’ হয়ে উঠিনি। দ্বিতীয় আমল আরম্ভ হয় ‘সিপাহী বিদ্রোহের’ পর থেকে। তখন ঘৃণা শুরুর হল! তৃতীয় আমল, দিল্লী দরবারের পর ঘৃণার সঙ্গে এল ঘন বিশ্বেষ! এখানে এই ক্রেমলিনের মধ্যে ঘৃণা কোথাও নেই—চোখে মূখে ভগ্নীতে আচরণের আভাসে প্রীতি ও শ্রদ্ধা উজ্জলিত! করমর্দন শূন্য, হাত ধরে টানা, কাছে নিয়ে কথা, গলা জড়িয়ে গলগলিয়ে আলাপ। এটা কি রাজনীতি? নিজেদেরকে লোকচক্ষে প্রিয় করে তোলার একি একটা নতুন আয়োজন? এটা কি লোক-দেখানো, মন-ডোলানো, বন্ধু-পাতানো? কমিউনিজম্ থাক্, ও আমি বুঝিনে! বিভিন্ন ‘সোস্যাল সিস্টেমের’ সহাবস্থান,—ওটাও থাক্ আন্তর্জাতিক কচকচির মধ্যে! আমি ক্ষুধিতে এসেছি মানুষ এখানে পুতুল ছাড়া আর কিছুর কিনা, এক ছাঁচে ফেলা কিনা, চলন্ত শব্দেহ কিনা!—আমি দেখতে এসেছি তাদেরকে যারা আধুনিক জগৎসভার ধিকৃত, নিন্দিত, লাঞ্চিত, ও অপমানিত—সেই সব তথাকথিত বাক্যহার, স্বাতন্ত্র্যহার, স্বাধীনতাহার। ‘মুঠ স্থান মুক্’ কুড়ি কোটি আবালবৃন্দবনিতাকে! কোথাও কেউ এখানে অভ্যর্থনা না জানালে আমার পক্ষে কোনও দুঃখের কারণ নেই,—আমার নিজের প্রাণসমস্যার তাড়নায় এখানকার জনসমুদ্রের তলায় আমি তালিয়ে যেতে চাই!

এশিয়া-আফ্রিকার মোটামুটি শতদুই লোক এসেছে। নিকট প্রাচ্য, মধ্য প্রাচ্য, দক্ষিণ ও সুদূর প্রাচ্য—কেউ বাকি নেই। কিছুর ইংরেজ-আমেরিকান-ফরাসী-গ্রীক ইতালিয়ান-জার্মান ইত্যাদি সাংবাদিকও উপস্থিত। এই কক্ষ থেকে ঘুরে আমরা ক্রেমলিন দরবারক্ষে উপস্থিত হলুম। সেটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শ্বেতপ্রস্তর সমাকীর্ণ—তার স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা, তার সম্পদ এবং বৈভব—যে কোনও জাতিতে অভিভূত করতে সমর্থ। আমি নিজে এসেছি হাজার হাজার মর্মর প্রাসাদের দেশ থেকে! আমি এসেছি গোয়ালীয়ার জয়পুর মেবার ষোড়শের দিল্লী আগ্রা লক্ষ্মী চিদাম্বরম, কাজি-ভরম, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম—সব নগরের পথ মাড়িয়ে। কিন্তু তবু এখানকার চারিদিকে

আশ্চর্য দৃশ্য। আমি দেখছি প্রায় সাত আটশ বছরের রাজন্যের ইতিহাস,—দেখছি তাদের আশ্চর্য ও অনবদ্য রূচি। দেখছি তাদের রসবোধ, শিল্পকলাবোধ, কারু ও চারুশিল্প সৃষ্টির মধ্যে অনন্য-সাধারণ মাত্রাবোধ! আমি দেখছি কিংবা মনে মনে গ্রাস করছি বলা কঠিন। আমি এখানে একক, নিঃসঙ্গ, নিরুদ্বেগ, নিশ্চেষ্ট,—বোধ হয় অনেকটাই নির্বিকার। আমি অজ্ঞাত, অখ্যাত,—আমার নাম ধাম পরিচয়,—সমস্তটাই অন্ধকারে ঢাকা।

পৃথিবীর নানান দেশের রাষ্ট্রদূতরা উপস্থিত। ভারতীয় দূতবাসের অধিনায়ক কে-পি-এস মেনন এসেছেন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে। অগণিত সংখ্যক সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান ঘিরে রয়েছেন চারিদিক থেকে। প্রাসাদের সেই বিরাট হুমকক্ষ জনপরিপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার মদের পাত্র শত শত লোকের হাতে ঘুরছে। ক্রেমলিনের প্রাসাদকক্ষ মদের গন্ধে যেন আতুর হয়ে উঠেছে!

এমন সময় ভিতরের একটি পথ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মিঃ খ্রুশ্চভ তাঁর এগারোজন সহকারী মন্ত্রী সঙ্গে নিয়ে শান্ত হাস্যে বেরিয়ে এলেন। ভিড়ের ভিতর দিয়ে খুবকায় মিঃ মিকোয়ানকে চিনলুম। অন্য কারো কারোর ছবি কাগজে দেখেছি মনে হচ্ছে। ওঁদের মধ্যে সংস্কৃতি-মন্ত্রী মিঃ মিখাইলভকে জানতুম—কলকাতায় লেডি রেগু মুখার্জীর বাড়িতে ওঁর সঙ্গে দোভাবীর সাহায্যে আলাপ হয়। ওঁদের মধ্যে বুলগানিন, মালেনকভ, কাগানোভ, মলোভ নেই—প্রথম তিনজন ‘নোংরা’ পলিটিক্সের অভিযোগে অপসৃত হয়েছেন। ওঁদের পোষাক যেমন-তেমন, কারো কারো নেকটাই নেই, কারো কোটের বোতাম খোলা, কারো পোষাক যথেষ্ট ধোপদস্ত নয়, দাড়ি আছে বুঝি দু’একজনের, অন্যরা প্রত্যেকে উপযুক্ত ভাবে ক্ষৌরি হয়ে এসেছেন কিনা লক্ষ্য করছিলাম। মিঃ খ্রুশ্চভ নেকটাই নেননি, কালো একটি কোট চড়িয়ে বেরিয়ে এসেছেন। উনি একটু মোটা, একটু বেঁটে, চোখ দুটি একটু ছোট, মাথায় প্রায় সমস্তই ঢাক, পিছন দিকে শাদা ধানের মতো ছাঁটা চুল। কিন্তু দুঃখ-রক্তিম বর্ণের জন্য শাদা চুল চেখে পড়ে না। মনে হচ্ছে ওঁরা যেন একটু আগে জটিল রাজকর্মের পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন। কৌতুকের বিষয় এই। ওঁদের মধ্যে একজনও বোধ করি ইংরেজি ভাষা জানেন না।

সভাস্থল কক্ষের সেকেন্ডের জন্য নিশ্চল এবং নিশ্চুপ। সেই আমাদের পরিচিত দোভাবীণী শ্রীমতী অকসানা রুশ পক্ষ থেকে এবার আহ্বান করলেন, ভারতীয়রা এবার এগিয়ে আসুন!

পলকের মধ্যে কী যেন ঘটল! কে যেন আমাকে ঠেলেছে পিছন থেকে এবং আমি যেন চাপের মধ্যে পড়েছি! তারপর সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে পাশ থেকে জনতিনেক ভারতীয় আমাকে সোজা ঠেলে দিলেন ‘রয়াল রাশিয়ান টাইগার’ মিঃ খ্রুশ্চভের সামনে। যন্ত্রচালিতবৎ আমার অর্ধচেতন দেহখানা পৃথিবীর অন্যতম ভাগ্যানিয়ন্তার ঈষৎ খর্বদেহের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, এবং আমার ঠাণ্ডা হাত যখন তাঁর উষ্ণ হাতের মধ্যে ঢুকল, তিনি মধুর হাস্যের সঙ্গে একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, “নমস্কে!” ভারতীয় শব্দটি শুনে আমি খুশী হলুম।

আমি কি কারণে ওইটুকু সময়ের জন্য ভারতীয় দলের মুখপাত্র হয়ে উঠলুম আজও জানিনে। কিন্তু মিঃ খ্রুশ্চভকে তখনই শ্রীমতী অকসানার সাহায্যে বললুম, আমি কলকাতা থেকে এসেছি এবং তিনি যখন কলকাতায় গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে মাঝপথ থেকে পলিশের গাড়িতে ‘বন্দী’ করে রাজভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মিঃ খ্রুশ্চভ কি যেন ভেবে সহসা মধুর হাস্য করে উঠলেন। পরে বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাহলে বাকিটা আমি বলি। অতবড় অভ্যর্থনা নেহরুর ভারত-বর্ষ ছাড়া আর কোথাও আমি পাইনি! হ্যাঁ, ঠিকই ত! কলকাতার লোকের কী ভালবাসা, কী আগ্রহ। আমরা অভিভূত হয়েছিলাম!

শ্রীমতী অকসানা মিঃ খ্রুশ্চভের বক্তব্যগুলি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে আমাদের নিকট ধরাছিলেন। সংখ্যাতীত ক্যামেরা দুই পাশ থেকে অপ্রাপ্তভাবে ক্লিক শব্দটি করছিল! আমি এবার পিছিয়ে এলুম। মিনিট তিনেকের জন্য একটি বিশেষ সম্মান লাভ করলাম বটে, কিন্তু নিজেকে কেমন যেন বেকুব এবং অকিঞ্চন মনে হতে লাগল! চক্ষু ঝাপসা এবং কানে যেন তাল লেগে গিয়েছিল! ভারতের পক্ষ থেকে মূল করাজ আনন্দ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানালেন।

পারিশেষে মিঃ খ্রুশ্চভ বহু ব্যক্তিকে স্বহস্তে মদের গেলাস ‘অফার’ করে আনন্দের সম্মেলনটিকে মুখর করে তুললেন এবং একটি টাইপকরা সংবর্ধনা পাতের পর সকলকে আমন্ত্রণ করলেন ভিন্ন একটি কক্ষে মণ্ডোপরি নৃত্যগীতের আসরে।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন কমন চৌধুরী

বাঙলা নাট্য সাহিত্যের উন্মেষযুগ ছিল বৈদেশিক সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবিত। এ প্রভাবই তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের শিল্পী স্বভাবের সার্থকতা লাভের পথে ছিল প্রতিবন্ধক। দীনবন্ধু রামনারায়ণ প্রভৃতির নাটকগুলি থেকে এ সত্য কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। এ প্রভাব অবশ্য কেবলমাত্র প্রথম যুগেই বর্তমান ছিল; পরবর্তী কালে নাট্য জগতে পাশ্চাত্য প্রভাবের দ্বারা এক অভূতপূর্ব যুগান্তর আসে। সেকালের অধিকাংশ নাটকের প্রসাধনকলার যথেষ্ট নৈপুণ্য থাকলেও ভাষার অস্বাভাবিকতা ও জড়ত্ব নাটকীয় রসসুন্দর্যে বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। এমনকি প্রাণহীন হয়ে পড়েছে কোথাও কোথাও। কিন্তু প্রহসনগুলির মধ্যে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সেখানে পরিচিত জগতের মানুষ তাদের ভাষা ও পরিবেশকে নিয়ে সমুপস্থিত। প্রহসনকারগণের বাস্তবধর্মী চেতনা সম্পূর্ণ জগতের লীলাবিহারে আর কষ্ট-কল্পিত ভাষাজালে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। প্রকৃত বাস্তবজীবনের হাস্যপরিহাসমুখর সংকট বিকৃতি অসামঞ্জস্যের জগৎ রূপে রসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাদের রসাবেদন একালেও কিছুটা অস্মান।

মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালেই বাঙলা নাট্য সাহিত্যের জন্ম। দেশের শিক্ষা জগতে পাশ্চাত্য জগতের ধারা যে নবজোয়ারের প্লাবন নিয়ে এল তার মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হল এক নব-জাগ্রত সম্প্রদায়। তারা চাইলেন সমাজকে নতুন করে সাজাতে, শিক্ষা বিস্তার, নারীর মুক্তি সাধন ও সমাজে প্রতিষ্ঠা দান, জীবন-প্রায় সমাজের সর্বোবধ পরিবর্তন। কিন্তু রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সংগে সূর্য হল পালাবদলের সংগ্রাম। সে সংগ্রামের ছাপ পড়ল সাহিত্যের বরণ ডালায়। প্রহসনকারগণ

অপূর্ব বিষয়বস্তু পেলেন সেই উত্তম সংগ্রামের মধ্য থেকে। তাই তাদের সৃষ্ট ফসল নিরপেক্ষ উদ্দেশ্যহীন না হলেও তার মধ্যে যে গুরুত্ব হাস্যরসধারা পরিষ্ফুট, তার উজ্জ্বলতা একালের মানুষের চোখে ধরা পড়ে। এই নাট্য-কারদের নাটকগুলির আবেদন যেখানে সর্বজনীনতা বা সর্বকালীনতা লাভ করতে পারেনি, সেখানে প্রহসনগুলি প্রয়োজনীয়তা আর উদ্দেশ্যসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কালসীমান্ন আবদ্ধ হয়ে থাকেনি।

রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র এবং মধুসূদন দত্ত এ তিন প্রতিভাধর নাট্যকার ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী। এ তিনজনের লেখনী সম-কালীন জীবনান্ধিত রুটি, বিচ্ছাতি, অসামঞ্জস্য, বিকৃতিকে ক্ষুদ্রধারে ব্যাংগ ও রহস্যপ্রিয়তার মধ্য দিয়ে ক্ষমাহীন ও নির্মমভাবে রূপায়িত করেছে। দীনবন্ধুর হাস্যরস গ্রাম্য জীবনের নানাবিধ কৌতুক ও হাস্যামুখ্যের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। অবশ্য “সধবার একাদশী”তে পাশ্চাত্য সভ্যতার অসার্থক অনুকারী, সমাজের বিকৃত রুচির পরিচয় মেলে। রামনারায়ণের হাস্যপ্রিয়তা বন্ধনসংকুল জীবনাবর্ত হতে উজ্জ্বল ধারায় উৎসারিত। প্রহসন রচনা ক্ষেত্রে মধুসূদন এলেন এঁদেরই স্মরণ করে। তবুও মধুসূদন পাশ্চাত্য ছাঁচে ফেলে ও বিষয়-বস্তুর অভিনব সাধন করে কৌতুকরস সৃষ্টিতে স্বীয় প্রতিভার সার্থকতা প্রমাণ করলেন। তাঁদের রচনামূল্যের যে পার্থক্য তা শিল্পীমাত্রেরই ঘটে থাকে।

এর পরেই আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)। “হিন্দুমেলা প্রবর্তিত নাগরিক বাংলায় যৌথ জীবনভাবনা প্রথম সার্থক নাটকীয় মুক্তি পেয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের রচনায়।” জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিণীলিত মন ও বাগ-

বেদন নাট্য রচনার ধারায় যে নতুন ইতিহাস সংযোজিত করল তার দ্বারা সম্ভব হল “দুর্লভ আঙ্গিক চেতনা এবং স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন স্ট” ও সার্থক সংলাপ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন একটি অভিজাত মন ও জগতের অধিবাসী। তাঁর চিন্তাজগত ছিল রুচিশীল, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্নশালীনতা বোধের অধিকারী। ফরাসী সাহিত্যের সংগে গভীর সংযোগের ফলেই তাঁর শৈল্পিক মনভূমিতে এই মার্জিত ও দুর্লভ প্রতিভার উন্মেষ সম্ভব হয়েছিল।

যুগপ্রভাবে বাতায়নির্ভৃত নবোদ্ভূত সমাজের রোমান্টিক কম্পজগতের প্রতিচ্ছবি মেলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন গুলির মধ্যে। তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক এ সমস্ত চরিত্র আমাদের জীবনান্ধিত সংস্কারবৃত্তি আর সমাজের পঙ্কিলতা থেকে উদ্ভূত হয়নি। কিন্তু এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাস্যরস পূর্ববর্তী প্রহসনকারগণ পরিবেশিত হাস্যরস অপেক্ষা বহু গুণে ভিন্ন। সাধারণ সরল জীবনযাত্রার মাঝখানে যে জটিলতা আর সেই জটিলতার অন্তরালে প্রবাহিত যে কৌতুকরসধারা তা তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি দ্বারা দিগোছিস নিখুঁত ভাবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রিয়তা চরিত্রের দোষত্রুটি অসামঞ্জস্য আর বিকৃতির স্বরূপ ব্যাংগের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেও কোন সম্প্রদায় বা চরিত্রের ওপর আঘাত সৃষ্টি করে না। এইখানেই তাঁর “হাস্যরসাত্মক চরিত্রের সর্বকালীনতা এবং সর্বমানবিকতা।”

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম প্রহসন ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’ প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রি। তাঁর চিন্তাজগৎ তখন ছিল রক্ষণশীল মনোভাবাচ্ছন্ন। কেশবচন্দ্র সম্প্রদায় নারী জাতির স্বাধীনতার স্বপক্ষে যে প্রচার শুরু করেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মন সেই স্বাধীনতা লাভের পরিপন্থী ছিল। সেই কারণে শ্রী স্বাধীনতার আতিশয্যকে ব্যাংগ করে রচিত হয় এ নাটক। পরে অবশ্য তাঁর চিন্তাজগতের পরিবর্তন হয় এবং এই নাটক রচনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এই প্রহসনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিদ্রূপাত্মক মনোভাব সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত। যে কাহিনী

অবলম্বনে হাস্যরস ও বিদ্রুপের প্রকাশ তার মধ্যে নিন্দনীয় কিছু পাওয়া দৃশ্যকর। এ ধরণের চরিত্র সকল যুগেই মেলে। এমনকি উদ্দেশ্যমূলক ও তাঁর বিদ্রূপাত্মক হওয়া সত্ত্বেও এর শিল্পরূপ ক্ষুদ্র হয়নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাস্যপ্রিয়তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবেই নয়, বাঙলা প্রহসনের মধ্যে অন্যতম হিসাবে “অলীক-বাবু” উল্লেখ্য। প্রতিটি টাইপ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যে নিগূঢ় হাস্যরস প্রবাহিত তত্ত্ব দ্বারা কোন ব্যক্তি বিশেষের ওপর ক্ষেত্র বা আঘাত সৃষ্টি করা হয়নি। এ রকম নির্মল হাস্যময় চরিত্রের মধ্যে অতিরঞ্জনের মাত্রাধীকা আমাদের মনে চরিত্রের আবাসত্বতা বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি করলেও আনন্দ ও হাস্যরস সৃষ্টিতে ব্যাঘাত করে না। কারণ অসামঞ্জস্য আর অতিরঞ্জনের মধ্যেই সার্থক হাস্যরস ধরা পড়ে। অলীকপ্রকাশ ও হেম্যাংগনী চরিত্র আজও সম্ভব। অলীক প্রকাশের মিথ্যা কথনের পরিমাণ যেমন অফুরন্ত, তেমনি জীবন্ত মানুষের প্রতিচ্ছায়া সম্পন্ন হওয়ায় অলীকপ্রকাশ সার্থক হয়ে উঠেছে অতিরঞ্জনের গুণে। হেম্যাংগনীর রোমান্টিক নায়িকারূপে নিজেকে কল্পনা করা বাঙলা সাহিত্যের দরবারে চির অস্মান হয়ে থাকবে সার্থক চরিত্র সৃষ্টির গুণে। প্রহসনটি প্রথমে “আর করবো না”

নামে ১৮৭৭ খৃঃ প্রকাশিত হয়। পরে নামকরণ হয় “অলীকবাবু”—এইটাই সঠিক নামকরণ। রবীন্দ্রনাথ বহুবার অভিনয় করেছেন নাম ভূমিকায়। সেকালে নাটকটি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৃতীয় মৌলিক প্রহসন “হিতে বিপরীত”। হিতে বিপরীতের কাহিনী চিরপুড়াতন হয়েও চির নতুন। বিশেষ পাগলা বুড়ো সে যুগে যেমন মিলত তেমনি এ যুগেও মেলে। রচনার সৌকুমার্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং পরিহাস উপযোগী পরিবেশ ও পরি-স্থিতি কাহিনীকে জীবন্ত করে তুলেছে। “বিয়ে পাগলা বুড়ো”র কাহিনীর সৃষ্টি এর মিল আছে। তবুও দুটি নাটকের নায়কের মূল পার্থক্য হচ্ছে “রাজীব সেকালের সমাজের প্রতিনিধি, ভজহারি সর্বকালীন বিয়ে পাগলা কুপণের অতিরঞ্জন সংস্করণ।” নাট্যকারের সুমার্জিত রুচি নাটকীয় পরিণতি সাধনে বিস্ময়কর ভাবে সার্থক।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিখ্যাত ফরাসী প্রহসনকার মলিয়েরের “লে বুর্জোয়া জাঁতিয়ম” ও “মারিয়াজ ফোসে” অবলম্বনে যথাক্রমে “হতাং নবাব” ও “দারে পড়ে দারগ্রহ” স্বাধীন অনুবাদ করেন। বিজাতীয় গন্ধ এর মধ্যে খুব কমই চোখে পড়ে। মৌলিক নাট্যসৃষ্টি এ দুটি নয়। কিন্তু এ সত্য অবিসংবাদীরূপে স্বীকার্য যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টিকর্ম প্রতিভা এখানেও পরিস্ফুট।

প্রহসন রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মলিয়েরের দ্বারা প্রভাবিত। ফরাসী সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম মোহ তাঁকে দিয়েছিল মলিয়েরের সাহিত্যকৃতির নিকট সংসর্গ। সেখানেই তাঁর সাহিত্যদর্শন গড়ে ওঠে। করুণরস আর হাস্য-রস সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে

শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক হওয়া সম্ভব নয়। মলিয়েরের এ দুয়ের সমাবেশ ঘটেছিল বলেই তাঁর সাহিত্যকৃতি চিরন্তনতা লাভ করেছে—আজও সে প্রতিভা সমাদৃত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথে এ দুয়ের সার্থক সমাবেশ না ঘটলেও কিছুটা পরিচয় মেলে। মলিয়েরের হাস্যরস সৃষ্টির অপর বিশেষ দৃষ্টি গুণ তাঁকে সর্বজনীনতা দিয়েছে। প্রথমটি স্বন্দরময় জীবনের অন্তরালে কোঁতুকরসের যে ধারা প্রবাহিত তার সীমান্ত রেখায় করুণরস সঞ্চার। দ্বিতীয়টি টাইপ চরিত্র সৃষ্টি—যার আবেদন সর্বযুগে স্বীকৃত। মলিয়ের সৃষ্ট চরিত্রগুলি দেশ কালের সীমায় আবদ্ধ নয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথে এ দুয়ের সমাবেশ ঘটেছিল। তাই তাঁর প্রহসন-গুলি এ যুগেও জনমানসে প্রভাব রাখতে সক্ষম। সুউপযুক্ত সংলাপ সৃষ্টির গুণে তাঁর প্রহসনগুলি সার্থক। আর পরিবেশ সংস্থাপনার মধ্য দিয়ে বে হাস্যময় জগতের সৃষ্টি করেছেন তা পরশুরামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু যখন দেখি একালের সমালোচক বলছেন, “তাঁহার রচিত প্রহসন কল্পখানি নিতান্তই প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইবে” তখন সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। নাটকের সংজ্ঞা, সার্থকতা কোথায় এ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

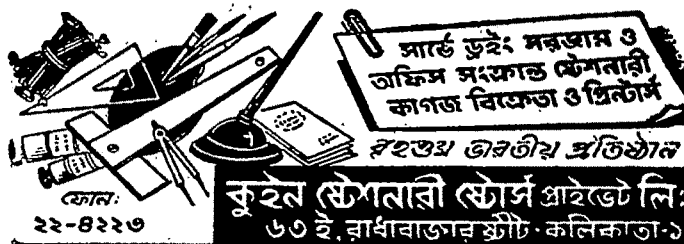
ঊনবিংশ শতাব্দীর কাল পরিধির মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির প্রয়োজনীয়তা আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। একালের নাট্যক্ষেত্রে যখন নাটকগুলির সার্থক প্রয়োগ দেখি তখন একমাত্র মনে হয় এ ধরণের টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করা একমাত্র শক্তিশালী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। আর সে ক্ষমতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছিল।

।। স্বপ্ন-স্বীকার ।।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস—অজিত দত্ত।
বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা—অজিত ঘোষ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ২য় পর্ব—
ভূদেব চৌধুরী।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—আশুতোষ ভট্টাচার্য।



মতামত

“লোক সংগীত ও শিল্পী-

সমাজ” প্রসঙ্গে

লোক-সমগ্রীপের
বেদন

১২ই জানুয়ারী সংখ্যার
পত্রিকায় “লোকসংগীত ও
সমাজ” শীর্ষক আলোচনায়
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহোদয় যে
সংগে উপস্থিত করেছেন তাঁর দৃষ্টির
মধ্যে নিঃসন্দেহে লোকসংগীত শিল্পী-
গায়কগণের প্রতি সহানুভূতি রয়েছে,
কিন্তু বিচারের দিক থেকে বড় রকমের
একটি ফাঁক রয়েছে। শহরের আলো ও
মাইকের আসরে পল্লীগানের শিল্পী
আর সদূর গ্রামের কোলে গ্রামবাসীদের
নিজস্ব গায়কশিল্পী—এ দুয়ের জাত
আলাদা। আলাদা বলছি এই কারণে,
শহরের মধ্যে লোকসংগীতের শিল্পীদের

লোক হা দিয়ে বিচার করেছেন, সে হল
ধীরেন্দ্রবাবুর কথায় “আলোকিত
মস্তিষ্কের মধ্যে সহস্র লোচনের সামনে
পল্লীরা গিয়ে আনন্দ পান পারিশ্রমিকও
না।” গ্রাম কিন্তু কোনদিনই
মহাদায় দিয়ে তাদের
বিচার করেনি বা
গণশীকে বিচার
গ্রামবাসীদের স্বরমে
চলেছে। এবং
সদৃশ বেঁচে
মুদ্রিত
“লোক-
হতা” রচনায়
আছে।

না। অথচ তাদের গানের আসরে
সারাদিন ও রাতি শ্রোতারা কোঁচড়ের
গিট থলে চিড়া খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ
করে গান শোনেন। এই যে গ্রামের গায়ক
এই যে পল্লীর শিল্পী এরা কিন্তু
কোনদিন শহরের আলোকিত মস্তিষ্কের
শিকলে বাঁধা পড়েননি, অথবা চাইবেনও
না—এদের জীবনে অর্থের কোন দায়
আছে বলে মনে হয় না—(পারিশ্রমিকের
উল্লেখ বাহুলা)। বাস্তবিকপক্ষে এরা
গানের ভিতর দিয়ে যে মজ্জা, যে
আনন্দের প্রভাব উপলব্ধি করেন তাকেই
মনোপ্রাণে গ্রহণ করে শহরের চোখে
ছন্দছাড়া ভবঘুরে জীবনযাপন করেন।
সুতরাং এই বনের পাখীদের শহরের
আলোকিত মস্তিষ্কের খাঁচায় বেঁধে রাখবার
প্রয়াস স্বার্থ নয়। এদের গানে যে
মৌলিকতা রয়েছে সেটা পল্লীর মাটিতে
বিশুদ্ধ খাঁটি। শহরে গেলেই সেটা স্রাব
বিশুদ্ধ থাকে না। কথা ও স্বর
কম্পনশীল ভিন্নে মেশাতে হয়। অর্থাৎ
আধুনিক, রম্যগীত ইত্যাদি স্রাব পাতি
গানের পাশে এই পল্লীগানেরও “লোক-
সংগীত” নামে একটা পোষাক পরে নিতে
হয়। গ্রামের খোলা মাঠে বা গহস্থের
উঠানে এর কোনো আবশ্যক থাকে না।
সেখানে শ্রোতা প্রাণের তত্বীতে গানের
ভাব গ্রহণ করে, দীর্ঘকাল সে গান
শ্রোতার স্মরণ থাকে, কাজের ভিতর
সামান্য অবসরে গুণ গুণ করে অথবা
কয়েকজন একত্রে বসে সেই গানে গলা
মেলায়। শহরের ক্ষেত্রে ঘটে এর
বিপরীত। ধীরেন্দ্রবাবু, ঠিকই বলেছেন,
“যেই আলো নিভে যায়, লোক চলে যায়,
অন্যদিক আশ্রয় হয়, তখন গায়কদের
পর্বে যাদের কণ্ঠে লোক-
সংগীতের মতো সবাই প্রশংসায়
ভরা (হলেন) কথা সবাই ভুলে

চক্রবর্তী মহোদয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু
সেটা শহরের শিল্পীদের ক্ষেত্রেই
পায়েজ্ঞ। সেখানে পল্লীর জীবন-
শিল্পীদের স্থান দেখছি না এবং
আবশ্যকও দেখছি না। ফাঁকির বাড়ল
এদের জীবন থেকেই এ কথা বলা চলে।
এদের জীবন হচ্ছে সাধারণ এবং এদের
অন্ন বাড়ী বাড়ী ঘরে সংগ্রহ করতে হয়,
নারায়ণ তাদের প্রতি ঘরে; রাজ্য-
জমিদারের দ্বার তারা কোনদিন ধারেনি
অথবা আজকের রাজ্য সরকারের দপ্তরে
ভরণপোষণের দরখাস্ত পেশ করেনি বা
আন্দোলনও তোলেনি। বাঙালী
সংস্কৃতির ধারক পল্লীর সাধক জীবন-
শিল্পী আর শহরের পেশাদার শিল্পী
দুই এক নয়। আজকাল যেভাবে লোক-
সংগীত যারা পরিবেশন করছেন অনেকেরই
দেখছি সকালে ভজন, সন্ধ্যায় আধুনিক
ও রাতে লোকসংগীত পরিবেশন
করছেন। শিল্পী হিসাবে এরা নিজেই
শ্রমকর। তথাপি এদের ওপরই যে
বাঙালী সংস্কৃতি পরিপূর্ণ নির্ভরশীল
তা বলা চলে না। বাঙালী ও বাঙালীর
সংস্কৃতির মূলকোষ বাঙালীর পল্লীগ্রাম।
সেখানে জীবনশিল্পী বহু যুগ ধরে যে
ট্র্যাডিশনের ওপর নির্ভর করে চলেছেন,
সেই ট্র্যাডিশনের ওপরই থাকবেন।
তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের পথ থেকে যেনে
এনে শহরের পেশাদার শিল্পীদের পাশে
বসিয়ে বিচার করা যাবেনা। কেননা
তাদের এই সংস্কৃতি “পারিশ্রমিক”
কাজাল নয়, সে প্রাণের কাজাল। এই
প্রাণের প্রশংসা সে পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের
মধ্যে। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁরা
নিজের ইন্দ্রজ্ঞান উন্মুক্ত করেছিলেন।
এর কবির সেই রবীন্দ্র-সংস্কৃতির স্থান
থেকে পেয়েছিলেন স্বদেশী গানের স্বর।
আর সেইজন্যই “স্বদেশী গান”

আগাথা-ক্রিস্টি

কণাদ চৌধুরী

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর উৎসবদীপ নিভতে না নিভতেই ভারতবর্ষে আরেকটি শতবার্ষিকী শেষ হল। গত ডিসেম্বর মাসে আমাদের দেশে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র শতবার্ষিকীর আয়োজন হয় এবং এই উপলক্ষ্যে এদেশে এসেছিলেন স্বনামধন্য প্রজাতান্ত্রিক ম্যার মালওয়ান স্বস্বামী। কিন্তু সাধারণ্যে মালওয়ানের স্বামী স্বামী অপেক্ষা অধিক পরিচিত। এমন কি বলা যায় শ্রীমতী আগাথা ক্রিস্টির সঙ্গেই যেন আসেন শ্রীযুক্ত মালওয়ান। বাস্তবিক গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠকদের কাছে আগাথা ক্রিস্টির পরিচয় জ্ঞাপন প্রায় বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এই লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনের খুব কম খবরই তাঁর পাঠকরা রাখেন।

ক্রিস্টির কুমারী নাম আগাথা ম্যারী ক্লারিসা মিলার। তিনি জন্মছেন ডিভন-শায়ারের চর্বেতে। ইংল্যান্ডের কার্টিং-গলোর মধ্যে ডিভন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম। আগাথার বাবা ফ্রেডারিক আলভা মিলার ছিলেন নিউইয়র্কের লোক। কিন্তু বাল্যকালেই বাবাকে হারিয়েছিলেন তিনি। মার স্নেহই ছিল তাঁর বাল্যকৈশোরের একমাত্র অবলম্বন। মা ছিলেন বুদ্ধিদীপ্তা মহিলা। মেয়েকে ছোটবেলা থেকেই তিনি গল্প কবিতা লিখতে প্ররোচিত করতেন। বাড়ির মধ্যে আগাথা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠা এবং নিঃসঙ্গ। নিজের চারদিকে একটি কেঁদে মল্ল কল্পনার জগত একে ভালবাসত ছোট মেয়েটি। কল্পনার অলীকসঙ্গীদের সঙ্গে সে খেলত এবং সেইসব ছায়া-হারিরের দল তার রক্ত মাংসের বান্ধবীদের চেয়েও একান্ত আপন ছিল।

প্রথম উপন্যাসটি লেখেন আগাথা। ইতি-মধ্যে এদিকে ওদিকে করেকটি গল্পও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের মধ্যে বিয়ে করেন আগাথা। যুদ্ধের কাজে স্বামীকে থাকতে হত ফ্রান্সে। সময় কাটাতে টবের একটা হাসপাতালে চাকরী নিয়েছিলেন আগাথা। এই সময়েই বোনের সঙ্গে একরকম বাজী রেখেই তিনি তাঁর প্রথম ডিটেক্টিভ উপন্যাস “দি মিষ্টিরিয়াস এ্যাফেয়ার এ্যাট স্টাইলস” লেখেন। কিন্তু উপন্যাসটি প্রকাশ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল তাঁকে। পরপর কয়েকজন প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর বডলে হেড প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে লেখাটা পাঠানো হয়। অনেকদিন পরেই কোনো খবর পাওয়া গেল না প্রকাশকপক্ষ থেকে। অবশেষে এক বছর পরে আগাথা মনোনয়নের আনন্দসংবাদটি পেলেন। এবং সেই থেকেই গোয়েন্দা কাহিনীর স্বর্গে আগাথা ক্রিস্টি ইন্দ্রাণী।

১৯২৮ সালে কর্ণেল আর্চিবোল্ড ক্রিস্টির সঙ্গে আগাথার বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং দু'বছর পরে পুনর্বিবাহ হয় তাঁর বিখ্যাত প্রজাতান্ত্রিক ম্যার মালওয়ানের সঙ্গে। প্রজাতন্ত্রের কাজে স্বামীর সঙ্গে বছরের কয়েকমাস তাঁকে সিরিয়া এবং ইরাকের মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে হত। ছবি তুলে স্বামীর গবেষণায় সাহায্যও করতে হত আগাথাকে সময়ে সময়ে। এবং কোনো কাজ না থাকলে লেখা নিয়ে বসতেন তিনি। মরুভূমিকে ভীষণ ভাল লেগেছিল তাঁর। সিনেমা, থিয়েটার এবং বাগানহীন নিরাভরণ মরুভূমি মনে প্রবল প্রভাব বিস্তার

বদলে ফেলতেন, সাজাতেন মনের মতন, বাস করতেন কিছুদিন, তারপর সমস্ত মায়া কাটিয়ে বিক্রী করে দিতেন। অবশ্য এই বিস্তৃষ্টক বাতিকের জন্যে বিশ্বের প্রয়োজন কম হত না। কিন্তু সৌভাগ্যের অকুপণ করে এই ধরনের “ছোট খাতি” সখ মেটানোর জন্যে কিছু কৈনোদিন ঘটেইনি তাঁর।

গোয়েন্দা কাহিনীর জগতে ক্রিস্টি প্রথম নাম। তাঁর জনপ্রিয়তায় একমেব। এ দিনের বাণিজ্যিক মল্য লেখিকাদের মধ্যে তাঁকে বললেও সম্ভবতঃ বাড়িয়ে বলা আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা হারিকউল পয়োরো অবিস্মরণীয় হোমসেরই উত্তরসূরী। ফিটফু দুরন্ত সেই ছোট বেলজিক তাঁর প্রবল ইংরেজী বিভূষণ। মোমঘষা গোঁফ নিয়েও ইংরেজী ভাষা-ভাষী অঞ্চলের একটি অপ্রতিহত-চরিত্র। গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠকগোষ্ঠীদের মতে ক্রিস্টির শ্রেষ্ঠ রহস্য গ্রন্থ “দি মার্ভার অব রোজার এ্যাঙ্কয়েড।” ক্রিস্টির কাহিনী অবলম্বনে চলচ্চিত্রায়িত “উইট-নেস ফর দি প্রসেকিউশন” জনপ্রিয় হবার মূলে কাহিনীর অবদান অসংখ্য। অনেক সমালোচক অবশ্য কাহিনী-গ্রন্থন পদ্ধতির সন্তুষ্টি নন। তাঁদের মতে অধিকাংশ কাহিনীর তারা যাদের সবচেয়ে পছন্দ হয়। গোয়েন্দা আগাথা সন্দেহ বোধী ব্যবহার পাঠকরা সহজে সহজেই সন্দেহ হারিকউল

অঙ্গি রেখা

৬৪১৮



[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্যাপারটা সাহেবের কানে তুলতে হল। তিনি ফাইল পড়াছিলেন, পড়েই চললেন। ডেপুটি জোর দিয়ে বললেন, এই ম্যাজিস্ট্রেটস অনেক দিন থেকে চলছে।

—জানি।

ডেপুটি সুপারের কিসমতের অবধি রইল না। জেনেশুনেও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত একজন দায়িত্বশীল অফিসার কি করে এতদিন চুপ করে আছেন, তাঁর বোধগম্য হল না। বললেন, এগুলো সার এখনই বন্ধ করা দরকার।

—‘সে চেষ্টাও করছি’, মাথা না তুলেই বললেন ঘোষসাহেব। ‘টেলার মাষ্টারকে গোটা কয়েক পানিশমেন্টও দিয়েছি। ওর সার্ভিস-বুক খুলে দেখবেন। তারপর কী হল, জানেন?’ (এবার তাকালেন তাঁর ডেপুটির দিকে) ‘সব স্টাফ একদিন সার দিয়ে দাঁড়াল এসে ঐ গেটের মাঝখানে। বলল, “সার দোষ আমাদের সকলেরই। ও বেচারার একা কেন শাস্তি পাবে? আমাদেরও পানিশমেন্ট দিন।” আমি চুপ করে রইলাম। একজনের হাতে ছিল পে-লিষ্ট-এর খাতা। এঁগিয়ে এসে খুলে ধরে বলল, “শাস্তি আমাদের প্রাপ্য। যা দেবেন মাথায় পেতে নেবো। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনাকে। এই দেখুন মাইনের স্কেল। বলুন, এ দু’দিনে একটি ভদ্র পরিবারের এ দিয়ে কেমন করে চলে।”

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন সুপার সাহেব। ক্ষণিক বিরতির পর যোগ করলেন, ‘ওদের প্রশ্নের উত্তর আমার যে গায়নি। শব্দ বলোছিলাম, তোমরা কাজে যাও।’

ডেপুটি সুপার খাটী এবং কড়া মানুষ। দারিদ্র্যের অজুহাতে অসাধু আচরণ সমর্থন করা যায় না, সেটা তিনি জানেন। বললেন, কিন্তু সার, এ রকম ডিজ-অনেস্ট স্টাফ নিয়ে—

‘ডিজ-অনেস্ট!’ মদু হেসে বাধা দিলেন সাহেব। ‘বুদ্ধদেবের সেই এক-মুঠো সর্বের গল্প জানেন? জানেন না তো? তবে শুনুন। সদ্য সদ্য একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে একটি স্ত্রীলোক এসে কেঁদে পড়ল তথাগতের পারের তলায়। মনে করেছিল করুণাময় মহাপুরুষ; তাঁর কাছে গেলেই এ মহাশোকের সান্নিধ্য মিলবে। বুদ্ধ বললেন, যে গৃহে মৃত্যুর প্রবেশ ঘটে, সেখান থেকে এক-মুঠো সর্ব নিয়ে এসো। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঘুরে বেড়াল মেয়েটি। মৃত্যু হানা দেয়নি তেমন ঘর পেল না। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে বলল, পেলাম না প্রভু। তবে একটা জ্ঞান লাভ হল—এ দুঃখ আমার একার নয়। সকলের।’

ডেপুটি সুপার এ গল্পের তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাঁর প্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চেয়ে সায়েব বললেন, আমি বুদ্ধদেব নই। আপনাকে সর্ব আনতে বলবো না। কিন্তু একটি মানুষ খুঁজে আনতে বলবো, যে ডিজ-অনেস্ট নয়—কাজে কিংবা চিন্তায়। যদি পারেন, সেরিদিন আমি এদের সবাইকে কঠিন শাস্তি দেবো।

ডেপুটি চুপ করে আছেন দেখে আবার বললেন, একবার উপরতলাটা ঘুরে আসুন, সন্তোষবাবু। দেখবেন, সেখানে গাদা গাদা রাখব বোয়ালের ছড়া-ছড়ি। তারা যদি অবাধে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে, গোটা কয়েক চুনো-পুঁটি মেরে আর কার কী উপকার হবে?

বর্ডালের শাসন-তন্ত্রে একজন ‘স্টার’ এবং ‘হাউস-ক্যাপ্টেনের’ ক্ষমতা কম নয়। চীফ, উপচীফ, ইনস্পেক্টরবাবু এবং অনেক সময় স্বয়ং ডেপুটি সুপার পর্যন্ত এদের কথা শুনে চলেন। কিন্তু সেও একটা দজী ছেলের পেছনে লাগা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল না। বিশেষ করে বিষয়টা যেখানে সামান্য একটা জাডিয়া। ওটা বাজেয়াপ্ত হলে, ওর জায়গায় আরেকটা সে যখন তখন তৈরি করে নেবে। মাঝখান থেকে সে-ই ওদের বিষ-নজরে পড়ে যাবে। ক্যাপ্টেন তাই উদ্যত শব্দ নিঃশব্দে গুটিয়ে নিয়ে অন্য দিকে মন দিল।

ঘুম থেকে উঠে ‘হাউস’ ছেড়ে বেরোবার আগে প্রত্যেককে তার বিছানাটি পাট করে গুঁছিয়ে এক লাইনে সাজিয়ে রাখতে হয়। সকলের দেখাদোঁখ দিলীপও তার দুটো কম্বল ভাঁজ করে রাখতে যাবে, ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল, ‘হয়নি, হয়নি।’ বলেই, পাশে দাঁড়ানো কেশবকে ধমকে উঠল, ‘কি দেখাছিস হাঁ করে? নতুন ছেলে, শিখিয়ে দিতে হবে না?’ কেশব তখন এঁগিয়ে এসে কম্বল দুটো ওর হাত থেকে নিয়ে, আলাদা আলাদা পাট করে একটার পর একটা পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখল। তার উপরে বাড়তি প্যান্ট, সার্ট, চাদর আর বালিশটা রেখে বলল, এমনি করে রাখবে। দ্যাখো না, ওরা সবাই কি করছে। ঠিকমত না রাখলে ডেপুটিবাবু বকা-বকি করে, রিপোর্ট করে দেয় সায়েবের কাছে।

‘রিপোর্ট’ বস্তুটির খানিকটা ধারণা আসামার হয়ে গেছে। কথাটা শুনেই দিলীপ মনে মনে সন্তুষ্ট হয়ে উঠল। ওর কবলে যেন পড়তে না হয়। ভয়ে

ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'রিপোর্ট' করলে কী শাস্তি হয়?

—তার কিছু ঠিক আছে? এই সব ছোটখাটো দোষ করলে বেশী করে ড্রিল করায়।

'ড্রিল' জিনিসটা দিলীপের অজানা নয়। তাদের বস্তির ইস্কুলেও করতে হত। ভালোই লাগত তার। তাকে এরা 'শাস্তি' বলছে কেন বুঝতে পারল না। বলল, ড্রিল তো ভালো। আমরা ক-তো করোছি।

একটা কাটা দাগ দেখাল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলল, পা মেলাতে না পারলেই ঠোঁকর। সববার পায়ে আছে, দু'চারজন ছাড়া।

ক্যাপ্টেনের হাঁক শোনা গেল, এই, কী করছিস তোরা ওখানে দাঁড়িয়ে?

ছেলেরা তখন এগিয়ে গেছে। পাশা-পাশি অন্য ঘর থেকেও বেরিয়ে পড়েছে কয়েক দল। এদের চেয়ে মাথায় বড়। কেশব দিলীপকে তাড়া দিয়ে বলল,

ছেলেটা জবাব দিল না। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আশে-পাশে যারা ছিল, সকলেরই চোখ-মুখে কৌতুক হাসি উপচে পড়ছে। একজন এগিয়ে এসে আলগোছে কম্বলটা একবার শূঁখে নাক মুখে বিকৃত করে বলল, উ! হাসির রোল উঠল চারদিকে। ক্যাপ্টেন নিজেও তাতে যোগ না দিয়ে পারল না। হাসতে হাসতেই বলল, মার মার, চাঁদা করে চাঁটি মার ওর মাথায়।

কে একজন বলে উঠল, না, না; মাথায় মারলে আরো বেশী করে করবে।

ক্যাপ্টেন বলল, তাহলে জোরে জোরে দুটো থাপড় মার ওর গালে। বুড়ো মন্দ, রোজ রোজ বিছানা ভাসাবে।

ছেলেটা জলভরা চোখ তুলে কাঁদো কাঁদো সুরে বলল, আমি ইচ্ছে করে করেছি নাকি? বলেই ভাঁ করে কেঁদে ফেলল।

মুখ ধোওয়া ইত্যাদি শেষ হতে না হতেই খাবার ঘণ্টা পড়ে গেল। আর্লি মর্নিং মীল—প্রাতরাশ। সাধারণতঃ খিচুড়ি;—চালের ভাগই বেশী, সঙ্গে সামান্য কিছু ডাল। চেহারাটা জেল-এ যেমন হয়, ততটা কালো নয় (সেখানে লোহার ডেক, এখানে পেতলের), খেতেও বিস্বাদ বলা যায় না। তবু কেউ পছন্দ করে না। তার কারণ বোধহয় ঐ পদার্থটির প্রচলিত নাম—লপসি। কথাটার মধ্যেই কেমন একটা 'জেল-জেল' গন্ধ জড়িয়ে আছে। শূঁধু গন্ধ নয়, লপসির পেছনে একটা ইতিহাসও আছে। এখানকার বাসিন্দারা সেটা পুরোপুরি না জানলেও, খেটুকু জানে বা শুনছে, এর বিরুদ্ধে একটা কঠোর মনোভাব গড়ে উঠবার পক্ষে যথেষ্ট। আজ লপসি ছিল না; তার বদলে চি'ড়ে-গুড়ের ব্যবস্থা। ছেলের দল প্রায় বাহু তুলে নৃত্য শুরু করল। বয়সটাই এমনি। কত সহজে খুশী করা যায়, আবার কত সহজে রুদ্র হয়ে ওঠে!

একটা টিনের শেডের মধ্যে খাবার জায়গা। "ডাইনিং হল।" আগে সব উবু হয়ে বসত। ছোটদের বড় কষ্ট হয়। সাহেব ব্যবস্থা করেছেন লম্বা লম্বা পিঁড়ি—চারজন করে বসবে একটাতে। তার আগে এক সারিতে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কিংবা ভজন গান। সহজ সুর। তাহলেও সকলের গলায় আসে না। কথাগুলোও জানা নেই অনেকের। অত্বে



আমরা ক-তো করোছি

—ও-ও, সেই ড্রিল বুঝি? বোকা ছেলেটার অজ্ঞতা দেখে অবাক হল কেশব। 'এর নাম বোটাল ইস্কুল। থাকো না দুদিন; ড্রিল মাষ্টারের জুতোয় ঠোঁকর খেলে বাপের নাম তুলে যাবে। এই দ্যাখ না? নীচু হয়ে ডান ঠোঁকর গোড়ালির ইণ্ডিয়ানেক উপরে

চল, চল। দেরি হলে চীফ আর আস্ত রাখবে না।

দরজার মুখে এসে থেমে যেতে হল। একটি বছর নয়কের রোগা টিনটিনে ছেলে অতি কষ্টে দুটো কম্বল বগল-দাবা করে বেরোবার আয়োজন করছিল। মিনিটর পেছন থেকে বাধা দিল, আরে, কম্বল নিয়ে যাচ্ছিস কোথায়?

কিছু আসে যায় না। বাহোক একটা তান তুললেই হল। নাইবা মিলল অন্য কারুর সঙ্গে। সে বিষয়ে চীফ অফিসার অত্যন্ত উদার। কিন্তু চুপ করে থাকতে পারবে না। ভগবানের নাম না করে পেট-পূজা—সেটা যে কত গর্হিত, এই বয়স থেকে না শিখলে শিখবে কবে?

সাহেবকে একদিন এই ভজন শোনাতে ডেকে এনেছিল চীফ। বিশেষভাবে নির্বাচিত গান। সাহেব মনোযোগ দিয়ে শুনছেন দেখে কী আনন্দ! শেষ হতেই লম্বা স্যালুট দিয়ে সর্বিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল, হুজুর? মনিব গম্ভীর গলায় বললেন, চমৎকার হয়েছে। এক কাজ করলে পার। এই কেষ্টের জীবগুলোকে মিছেমিছি কষ্ট না দিয়ে গঙ্গার ওপার থেকে কতগুলো শেয়াল এনে ছেড়ে দাও। তাতে করে একটা সুবিধে হল, সময় মত তারা নিজে থেকেই গান ধরবে। ধর-পাকড় হাঁক-ডাক কিছুই করতে হবে না।

দিলীপ জীবনে কোনোদিন গান করেনি। সতরাং চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কেশবের হঠাৎ নজর পড়তেই, সে ওর পিঠে চিমাটি কেটে বলল, 'ঠোট নাড়।' দিলীপ ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ঠোট নাড়াও যে শিখতে হয়, এলোপাতাড়ি নেড়ে গেলে চলবে না। কদিন পরেই অবশ্য এ বিদ্যা সে আয়ত্ত করে ফেলেছিল এবং দেখে অবাক হয়েছিল যে, তার মুরব্ব কেশবচন্দ্র তিন বছরেও এর বেশী অগ্রসর হয়নি। কেউ কেউ বোধহয় আগাগোড়াই ঠোট নাড়ার ক্লাশে থেকে যায়। চীফ ধরতে পারে না।

লপ্‌সি বা চি'ড়ে-মুড়ির পরেই ড্রিল ও ব্যান্ড প্রাক্‌টিস্‌। ব্যান্ড পার্টির দলটি আলাদা। বেশীর ভাগই বড় বড় ছেলে, বর্টাল আইনে যাদের সাজা। কিছু ইনডাস্ট্রিয়ালও আছে। শহরে এদের প্রচুর নাম। রুট্‌মার্চ বা ঐ জাতীয় রাষ্ট্রীয় উৎসবে পুলিশ ব্যান্ডের পেছনে "বর্টাল জেল"এর খুদে ব্যান্ডও যোগদান করে থাকে। দর্শকেরা আমোদ পায়, কেউ কেউ বড় বড় চোখ করে তারিফ করে, এটুকু টুকু ছেলে, কী চমৎকার শিখছে দেখছে? কেউ বলে না, ভেবেও দেখে না, ঐ অত বড় জয়ঢাকটা বৃকে করে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা ঐ বে'টে ছেলেটার কাছে আশা করা যায় কিনা, কিংবা প্রাণপণে গাল ফুলিয়ে প্রমাণ সাইজের ব্যাগপাইপগুলো যারা

বাজিয়ে চলেছে, তাদের ফুসফুসের জোর কতখানি।

বর্টালের মি'জিক্‌ ড্রিলের খ্যাতিও কম নয়। ব্যান্ড পার্টি বাঁশী বাজায়, তার তালে তালে পায়ের ও হাতের নানা রকম কসরৎ দেখায় ছোট ছোট ছেলেরা। কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, কখনো মাঠের উপর। কোনো কোনো দিন বাঁশীর সুরে এবং তার সঙ্গে ড্রামের উপর মৃদু গম্ভীর আওয়াজ তুলে ডি, এল, রায়; অভুলপ্রসাদ কিংবা কাজী নজরুলের গান বাজায়। 'ধন ধন্য পুষ্পে ভরা।' 'বল বল সব।' 'ঊষর' গগনে বাজে মাদল'।

বহুদিন ধরে বহু পরিগ্রহ করে শিখিয়েছে ব্যান্ডমাষ্টার বীর বাহাদুর। একসময়ে গোখাঁ রেজিমেন্টে ব্যান্ড বাজাত। এক বাঙালী বন্ধুর মূখে বাংলা শুনলে ভাল লেগেছিল। তারই কয়েকটা বাঁশীতে তুলে নিয়েছে। তখন জানত না, একদিন তাকে বর্টালে এসে মাষ্টারি করতে হবে। স্বাস্থ্যের দরুণ অকালে পেনসন নিয়ে কাজ খুঁজিছিল। পেয়ে গেল এই চাকরি। সৈনিকার বাড়তি বিদ্যাটাও কাজে লেগে গেল। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।

বর্টালের ভিজিটর বাবুরা, মাঝে মাঝে সন্ত্রাসী সরকারী উপরওয়ালারা এদের ড্রিল দেখে ও মিউজিক শুনলে মুগ্ধ হন। শতকণ্ঠে বীর বাহাদুরের তারিফ করেন। ব্যান্ডমাষ্টার বিনয়ে গলে গিয়ে হে' হে' করে, মাঝে মাঝে তার কাজটি যে কত কঠিন, তারও একটু আভাস দেয়, তার নিজের ভাষায় মোলায়েম করে বলে, আমি আর কী জানি, হুজুর? সব আপনাদের 'মেহের-বানী'। 'লেকিন' গাথা পিটিয়ে ঘোড়া বানানো—

সে কষ্টটা যে কত বড়, অবশ্যই অনুভব করেন অনুগ্রাহকের দল। কিন্তু কতখানি পিটুনি খেয়ে খেয়ে গাধাকে ঘোড়া হতে হয়, সে ইতিহাস থাকে অন্তরালে। সে কথা কেউ ভুলেও ভাবে না। এই 'মিউজিক'-এর পেছনে দীর্ঘদিন ধরে কত যে শিশুকণ্ঠের কান্নার সুর চাপা পড়ে আছে তাও কারো কানে এসে পৌঁছায় না।

ছেলেরা যে বাহাদুরি দেখাল তার 'সিংহভাগ' নিশ্চয়ই অধ্যক্ষের প্রাপ্য। বিশিষ্ট ভিজিটরদের মূখ থেকে তাঁকেও অনেক প্রশস্তি-বাণী শোনানো হয়।

উপরওয়ালারা যখন অভিনন্দন জানান, ঘোষসাহেব মুখে একটা গদগদ ধরনের মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলে কৃতার্থ হবার ভাব দেখান। তাছাড়া উপায় নেই। সেইটাই সরকারী দস্তুর। অন্যথায় তাঁরা রুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু বন্ধুরা যখন পিঠ চাপড়ে কিংবা হাতনাড়া দিয়ে বাহবা দেন, তাঁর পুরু পুরু ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে বাকী হাসির কুণ্ডল। মাঝে মাঝে এমন দৃ' একটা বেয়াড়া ধরনের মন্তব্য করে বসেন, এসব ক্ষেত্রে যেটা অত্যন্ত বেমানান। একবার একজনকে বলেছিলেন, তোমার সূখ্যাতি শুনে আমার সেই মামাবাড়ির গাড়োয়ানটাকে মনে পড়ল। আমার অবস্থাও অনেকটা তারই মত।

'কি রকম!' বন্ধু রীতিমত অবাক। —তবে শোনো। বছর কয়েক আগেকার কথা। মামাবাড়ি মাছলাম। সখ করে নয়, নিতান্ত বাধ্য হয়ে। মামা অনেক দিন থেকে ভুগছেন। একবার শেষ দেখা দেখে আসা। ছেলেবেলায় উনিই খাইয়ে পরিচয় মানদ্ব করেছিলেন। তা না হলে বর্ষার ঠিক পরে ও দেশে কেউ যায় না। স্টেশন থেকে পাক্সা পনের মাইল। আগাগোড়া পাক। বর্ষমানের সীতাবোগ মিহদানাই দেখেছ, তার পাক যে কী বস্তু নিশ্চয়ই পরখ করনি। ব্রীক্‌ফ্রের পাশ্ভার চেয়েও নাছোড়বান্দা আর ধরা মানেই গ্রাস করা।

প্লান্টফরম থেকে বেরিয়ে দাঁখি একখানিমাংস গোরুর গাড়ি পড়ে আছে। গাড়োয়ান পাশে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। মামার ভিটেবাড়ির প্রজা। তা নাহলে পনরশ' টাকাতেও এই পনের মাইল ঠৌঙয়ে কেউ আসত না। তাছাড়া তাকে বলা হয়েছিল, 'একজন' বাবু আসছেন, সঙ্গে মালপত্তর কিছু নেই। 'এক' য' 'বহু' হতে পারে উপনিষদের সে গভীর তত্ত্ব এ জানবে কোথেকে? আমার এই বিশাল বপুটার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন দিনদুপুরে ভূত দেখেছে। বিড়িটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল, জানতেও পারল না। আমার চোখ পড়ল গোরু দুটোর ওপর। হাড়ের ওপর শূন্য একটা চামড়ার ঢাকনা। তার ওপরে কেটে কেটে বসা লম্বা লম্বা দাগ।

কিন্তু বাহাদুর বটে লোকটা। হে-কান্ড করে, বেপরোয়া গালাগালি আর তার সঙ্গে বোধহয় পাচনবাড়ি ঢালিয়ে ছ' ঘণ্টার সেই পনের মাইল পথ ভেঙে সে আমাকে মামাবাড়ির দরজায় এনে

ফেলল, তা দেখে সেদিন শব্দ একটা কথাই মনে হয়েছিল—লোকটা গাড়ি না চালিয়ে সার্কাসের দলে গেল না কেন? এর চেয়ে আশ্চর্য কসরৎ কোন্ সার্কাসে দেখানো হয়?

তারপর, তোমরা যেমন আমাকে কংগ্রাচুলেট কর, আমিও তাকে তার বাহাদুরির জন্যে পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে বখসিস দিয়েছিলাম নগদ পাঁচ টাকা। গোরু-গলোর মূখ দিয়ে তখন ফেনা ঝরছে, পিঠময় রক্তের দাগ। সেদিকে আর তাকাইনি।

ছেলেদের চিৎড়ে-চব্বণ শেষ হতে না হতেই মাঠের দিক থেকে ভেসে এল একটা টানা বাঁশীর সুর। ঘরময় ঠেঠে পড়ে গেল। বাকী গ্রাসগুলো কেউ ফেলে রেখে, কেউ একসঙ্গে মূখে পুঁরে দিয়ে হু-ডম্‌ড করে বেরিয়ে পড়ল। ভীষণ কড়া মানুষ ড্রিলমাস্টার যদুনাথবাবু। এক মিনিট দেরি হলে আর রক্ষ নেই। ডবল মার্চ করিয়ে করিয়ে জান বের করে দেবে।

দিলীপও খাওয়া ফেলে অন্য সকলের সঙ্গে উঠে পড়েছিল। বেরোতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, কেশব নেই। আর কাউকে সে চেনে না। হঠাৎ বড় অসহায় মনে হল নিজেকে। খানিকটা অভিমানও হল নতুন জোড়ানো বস্ত্রের উপর, এইমাত্র ছিল তার পাশে; এর মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল! এক কোণে দাঁড়িয়ে অচেনা মূখগুলোর পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে দেখছে। হঠাৎ একটি ফসামত জোয়ান ছেলে যেতে যেতে থেমে গেল তার কাছে। চোখ দুটো ছোট ছোট, নাকটা চাপা, চাকার মত মূখ। হেসে বলল, তুমি বুদ্ধি নতুন এসেছ? কথಾಗুলোয় কেনম একটা অশ্রুত টান। দিলীপ মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। ছেলোট হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এসো। আমার নাম মনবাহাদুর। সবাই 'বাহাদুর' বলে ডাকে।

বাহাদুর তার হাত ধরে ড্রিল-মাস্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, নতুন ছেলে, স্যার। ভারী ঠান্ডা।—গোড়াতে সবাই অমন ঠান্ডা থাকে', ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন যদুনাথবাবু, 'দুদিন পরেই ন্যাজ গজায়। কি নাম রে তোর?'

দিলীপ পুরো নাম বলতেই ভেংচে উঠলেন ড্রিলমাস্টার, ভট্টা-চার্জ! সাধু-ভাষা বলছে ব্যাটা! ভট্টাচার্জ বাম্বুনের

ছেলে, জেলে এলি কি করে? কী চুরি করেছিল?

ধমকের চোটে দিলীপের পিলে চমকে গিয়েছিল। ভয়ে ভয়ে বলল, চুরি করিনি।

—কী করেছিস তবে? ডাকাতি?

দিলীপ কি বলবে ভেবে পেল না। তার হয়ে জবাব দিল মনবাহাদুর, কিছু না করেও এখানে আসা যায়, স্যার।

ড্রিলমাস্টার তার দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন, তাকে ফোঁপার দালাল করতে কে বললে? খুব লায়ক হয়ে গেছ, না?

মনবাহাদুর আর কিছু বলল না। বিরস মুখে ওদিকে চলে গেল। সে ব্যান্ড পার্টির লোক। তাদেরও প্রাকটিস শুরুর হবে এখনই।

ড্রিলমাস্টার দিলীপকে জিজ্ঞাসা করলেন, ড্রিল করেছিস কখনো?

—করেছি।

—কোথায়?

—আমাদের ইস্কুলে।

—ইস্কুলে! কোন্ ইস্কুলে?

—আমাদের বস্তিতে।

'বস্তিতে!' হা-হা করে হেসে উঠলেন যদুনাথবাবু। ব্যান্ডমাস্টার বীর-বাহাদুর তখন মাঠে ঢুকছে। বলল, কী হোল, যদুনাথবাবু? অতো হাসি কিসের?

—এই ছোকরা কি বলছে, জান? কোথাকার কোন্ বস্তিতে নাকি ড্রিল করতো! ব্যাস্ আর চাই কি? এবার আমার পোস্টটা ওকে দিয়ে দিলেই হয়।

বলেই আর এক দফা অটহাসি। বীরবাহাদুর কানো উত্তর না দিয়ে তার নিজের ছেলেদের দিকে এগিয়ে গেল। যদুনাথবাবু দূরত্ব থেকে দুটো দৃষ্টি দেখা দিল। এক কামটায় মূখখানা সরিয়ে নিয়ে দিলীপকে বললেন, এদিকে গিয়ে দাঁড়া। এর পরে দেখা যাবে কী ড্রিল শিখিয়েছিস, কতখানি তোর বিদ্যার দোড়।

আর একবার বাঁশীতে ফুঁ দিতেই ড্রিলের ছেলেরা সার বেঁধে দাঁড়াল। তাদের দিকে তাকানো দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই হেঁকে উঠলেন ড্রিলমাস্টার, সে কোথায় গেল? সেই কোলা ব্যান্ডটা?

উচ্চ হাসির রোল উঠল ছেলের দলে। কে একজন বলে উঠল, পালিয়েছে, স্যার।

—পালিয়ে যাবে কোন্ চুলোয়? তুই যা; চীফ অফিসরকে বলে অয়। নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে, নয়তো পাইখানায় ঢুকেছে।

প্রথম নম্বরে যে দাঁড়িয়েছিল, ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, তাকেই ইঙ্গিত করলেন। সে তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে গেল, এবং ফিরে এসে জানাল, চীফ অফিসার বললেন, আছে কোথাও। তোরা শুরুর কর। আমি ওকে খুঁজে বার করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যদুনাথবাবু বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'তার মানে, আজও ফাঁকি দিল ছোঁড়া। এমনি করেই বদমাসগুলো মাথায় ওঠে। গোসাই দিয়ে কি আর জেল চলে।

এদিকে সময় চলে যাচ্ছে। অগত্যা বাকী সবাইকে নিয়েই ড্রিলের কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

চীফ একজন পেটী অফিসারকে হুকুম করল কেশবকে খুঁজে নিয়ে আসতে। সে তামাম 'জেলটা' ঘুরে এল। তাকে পাওয়া গেল না। চীফ ঝাঁকিয়ে উঠল, পাওয়া গেল না মানে? উড়ে তো আর যেতে পারে না। বলে, নিজেই বেরোল খুঁজতে। সব জায়গা তন্ন তন্ন করে দেখা হল। কোথাও নেই। তবে কি পালাল? তাহলে তো পাগলা-ঘণ্ট দিতে হয়। তার আগে ডেপুটিবাবুকে রিপোর্ট করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই চলছিল অফিসের দিকে। মেইন ব্যারাকের সামনে দিয়ে পথ। তার পাশে এক সার পেয়ারা গাছ। হঠাৎ মনে হল, একটা উঁচু ডাল যেন একটু নড়ছে। ভাল করে তাকিয়েই চোঁচয়ে উঠল চীফ, এই বাদর, ওখানে গিয়ে উঠেছিস? দাঁড়া একবার তোর ঠাণ্ডা যদি-না ভাগি আজ—নেমে অয়.....।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

অল্পকাল

॥ কালি ও কলম ॥

দোয়াতে কলম ডুবিয়ে বা ফাউন্টেন পেন দিয়ে যখন আমরা লিখি তখন একবারও ভেবে দেখার প্রয়োজন হয় না যে এই কালি ও কলমেরও বিচিত্র এক ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসটি জানা দরকার।

এমন সময়ও ছিল যখন মানুষ খাগের কলমে বা পালকের কলমে লিখত। আর কালি বলতেই তখন বোঝাত শব্দ কালো কালি। লাল বা সবুজ রঙের কালির নামও তখন কেউ শোনেনি।

আর খাগের কলম বা পালকের কলম তৈরি করাটাও খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। কলম তৈরি করার জন্যে খাগের নল বা পালককে অতি নিপুণ হাতে চোখা করতে হত। আর এই কাজের জন্যে যে-অস্ত্রটিকে ব্যবহার করা হত তাকে আমরা বলি ছুরি। আজকাল আমরা অবশ্য ছুরি ব্যবহার করি পেনসিল কাটার জন্যে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, পেনসিল-কাটা-ছুরির ইংরেজি নাম পেন্‌ নাইফ। অর্থাৎ পেন বা কলম কাটা ছুরি। ছুরির এই বিশেষণটি যে-সময়ে যুক্ত হয়েছিল সে-সময়ে ছুরি দিয়ে সত্যিই শব্দ কলমই কাটা হত। এককাল পরেও পুরনো বিশেষণটি লোপ পায়নি।

খাগের নলকে বা পালকের গোড়ার দিককে তেরচাভাবে কেটে চোখা করলেই কিন্তু কলম তৈরি হয়ে যেত না। সেই চোখা মূখটাকে অতি সুক্ষ্মভাবে চিরে দু-ভাগ করতে হত। এমন কি আজকালও যে ফাউন্টেন পেন দিয়ে আমরা লিখি তার নিবের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব, নিবের মাথাটি দু-ভাগে চেরা। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, এই ভাগদুটি যতো বেশি ফাঁক হবে,

কালির প্রবাহ হবে ততো বেশি। এই ভাগ-দুটি যতো বেশি জুড়ে থাকবে, কালির প্রবাহ হবে ততো কম। এই কারণেই নিবে একটু বেশি চাপ দিয়ে লিখলে লেখা মোটা হয়। আবার যে-নিবে এমনিতেই মোটা লেখা বেরোয় তাকে উল্টিয়ে লিখলে সরু লেখা পাওয়া যেতে পারে।

নিব সম্পর্কে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। যে-ধরনের নিবই হোক না কেন, তা কখনো সমতল নয়, গোল করে বাঁকানো। খাগের নল বা হাঁসের পালক এমনিতেই গোল, কাজেই ছুঁচলো অংশটিও আধুনিক নিবের মতোই বাঁকানো হত। নিবকে বাঁকাবার প্রয়োজন হয় কালি ধরে রাখবার জন্যে।

এবারে তাহলে পুরো প্রক্রিয়াটি বোঝা যাচ্ছে। কালির ফোঁটাটি যাতে দোয়াত থেকে কলম তোলার সঙ্গে সঙ্গেই নিবের গা বেয়ে গড়িয়ে না পড়ে সেজন্যে নিবটিকে বাঁকানো হয়েছে। আবার কাগজে নিব ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গে কালির একটি প্রবাহ যাতে তৈরি হয় সেজন্যে নিবের মাথাটিকে দু-ভাগে চিরে সরু একটি রাস্তা খানানো হয়েছে। এই রাস্তাটি কতখানি প্রশস্ত বা কতখানি সংকীর্ণ তারই ওপরে নির্ভর করবে কালির প্রবাহ কতখানি বেশি বা কতখানি কম।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে, খাগের কলম তৈরি করতে হলেও রীতিমতো কারিগরী দক্ষতা থাকা চাই। যেমন তেমন ভাবে ছুরি চালালেই কলম তৈরি হয় না। সে-যুগের মানুষকে অনেক সময় নিয়ে অনেক

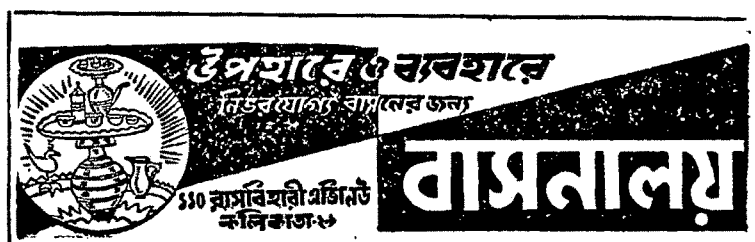
যত্ন ও পরিশ্রমে এক-একটি কলম তৈরি করতে হত। আবার একটি কলম তৈরি করতে পারলেই যে সারা জীবনের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া যেত তাও নয়। কিছ-দিনের মধ্যেই কলম হয়ে যেত ভোঁতা। তখন লিপিকরকে আবার নতুন আরেকটি কলম তৈরি করে নিতে হত। এবারে অনুমান করা যেতে পারে সে-যুগের মস্ত মস্ত পুঁথিগদুলো লেখার জন্যে কতগুলো করে কলমের প্রয়োজন হয়েছে। লিপিকরের দোয়াতদানির পাশে নিশ্চয়ই গন্ডাকয়েক খাগের নল বা হাঁসের পালক সব সময়েই মজুদ থাকত।

মজুদ থাকত আরো একটি পদার্থ। একরাশ বালি। কেন?

পৃষ্ঠাভর্তি লেখা হয়ে যাবার পরে লিপিকর লেখার কাঁচা কালির ওপরে বালি ছাড়িয়ে দিত। বৃষ্টিতে পারা যাচ্ছে, আমরা যে-উদ্দেশ্যে ব্লটিং-কাগজ ব্যবহার করি সেই উদ্দেশ্যেই বালির ব্যবহার। ছড়ানো বালির কণা মূহূর্তের মধ্যে কাঁচা কালিকে শুষে নিত। কতক্ষণে কালি শুকোবে সেজন্যে লিপিকরকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হত না।

এবারে কালির কথা। সে-যুগের কালিও ছিল অন্য ধরনের। এখনকার কালির মতো রঙ-বেরঙের তো নয়ই, বুঢ়কুচে কালোও নয়। সেই কালির রঙ হত গোড়ার দিকে কড়া চায়ের মতো, তারপরে আস্তে আস্তে কালো।

এই কালি তৈরি হত ফলের রস থেকে। অবশ্যই নির্ভেজাল ফলের রস



নয়, তার সঙ্গে কিছু কিছু খনিজ পদার্থও মেশানো হত। আর সব কাজই করা হত হাতে। সে-যুগে যারা কালি তৈরি করত তাদের হাত দুটো সব সময়েই কালি মাখামাখি হয়ে থাকত।

এ-যুগের কালি তৈরি হয় পুরো-দস্তুর একটি রাসায়নিক কারখানায়। এবং কালি তৈরি করার সমস্ত রকমের রঙ তৈরি হয় কয়লা থেকে।

নিবের আলোচনায় ফিরে আসা স্বাক। মাটির নিচে রয়েছে আকর পিণ্ড যা থেকে তৈরি হয় লোহা। লোহা থেকে ইস্পাত। এই ইস্পাত রৌপ্য মেশিন থেকে পাত হয়ে বেরিয়ে আসে। এই পাত থেকে টুকরো টুকরো অংশ কেটে নেওয়া হয়। এই টুকরোগুলোকে বাঁকায়েই নিবের চেহারা বেরিয়ে আসে। বাকি থাকে শুধু একটি কাজ। নিবের ছুঁচলো মাথাটাকে দু-ভাগে চিঁরে দেওয়া। অবশ্য তারপরও কিছু কাজ বাকি থাকে। প্রথমে নিবগুলোকে লাল করে গরম করা হয়, তারপরে চুবনো হয় ঠান্ডা জলে বা তেলে। এই প্রক্রিয়ায় নিবগুলো শক্ত ও মজবুত হয়ে ওঠে। আর নিবে যাতে মরচে না পড়ে সেজন্যে নিবের ওপরে নিকেল-পেইন্টিং করা হয়।

অবশ্যই ফাউন্টেন পেনের নিব তৈরি করার প্রক্রিয়া জটিলতর ও বিস্তৃততর। বলা বাহুল্য, প্রক্রিয়া সর্গক্ষপতই হোক বা বিস্তৃততই হোক, সরলই হোক বা জটিলই হোক, সবই করা হয় বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রের

সাহায্যে। আধুনিক একটি নিব-তৈরির কারখানায় ঘণ্টায় কয়েক হাজার করে নিব তৈরি হতে পারে।

কালি-কলমের প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ের আলোচনা তোলা যেতে পারে। তা হচ্ছে কালির দাগ তোলার রবার। আগে যেমন কালি তৈরি হত ফলের রস থেকে তেমনি রবার পাওয়া যেত রবার গাছের কষ থেকে। আজকাল কাঠের গুঁড়ো থেকে কৃত্রিম উপায়ে এই রবার তৈরি হচ্ছে।

॥ আসল থেকে নকল ॥

সামান্য একটা নিব বা সামান্য এক-দোহাত কালি বা সামান্য এক টুকরো রবার তৈরি করতে গিয়েও মানুষ ক্রমশ আসল থেকে নকলের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এক সময়ে মানুষ সামান্যতম উপকরণের জন্যেও প্রকৃতির মদ্যপেশী হয়ে থাকত। প্রকৃতির কারখানায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যা-কিছু তৈরি হত তাই দিয়েই মিটত তার চাহিদা। কিন্তু এ-যুগের মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরুর করেছে। মস্ত মস্ত কারখানায় কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হচ্ছে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ। শুধু কালি-কলম-রবারই নয়, এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত। উৎকর্ষের বিচারে হালের নাইলন বা রেয়নের সঙ্গে সূতীর বস্ত্রের তুলনাই হয় না। আর প্লাস্টিক তো মানুষের এক অন্যান্যসাধারণ সৃষ্টি। প্রকৃতির

কারখানায় আঁতপাঁতি করে খুঁজলেও এমন একটি উপকরণের সংধান পাওয়া যাবে না। এমন কি খাদ্যের ব্যাপারেও মানুষ প্রকৃতির ওপরে কারিগরি করতে শিখেছে। বরফ-ঢাকা জমিও এখন আর নিষ্ফল নয়। জমির আয়তনের ওপরে এখন আর ফলনের পরিমাণ নির্ভর করে না।

এখানেই শেষ নয়। আগামী দিনের মানুষ পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় নিজের সমস্ত চাহিদার যোগান দেবার ব্যবস্থা করবে। সজ্জনক্ষমতায় মানুষ হয়ে উঠবে প্রায় বিধাতাপুত্রদের মতোই। এক সময়ে যার জীবনধারণের উপায় ছিল শিকার ও সংগ্রহ, প্রকৃতির দাফিণ্যের ওপরে যাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হত, সে-ই হয়ে উঠবে নিজস্ব এক জগতের মহান সৃষ্টিকর্তা, যে জগৎ চালিত হবে তার ইচ্ছার দ্বারা। শারীরিক মেহনতের কোনো প্রয়োজন সেদিন আর থাকবে না। প্রকৃতি হবে মানুষের দাস।

এ-সব কথাই কথা নয়। সামান্য কালি-কলমের আলোচনাতেও এই ভবিষ্যতেরই আভাস রয়েছে। তবে সত্যিকারের ভবিষ্যত আরো অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। কারণ ইতিমধ্যেই এমন বস্তু তৈরি হয়েছে যা মানুষের মনের কথাকে সরাসরি লিখে যেতে পারবে। যন্ত্রের মতো লেখা নয়, লিখতে লিখতে ভাষাকে পর্যন্ত শূন্য করা। খাগের কলম থেকে প্রসূতি-লিখন যন্ত্র এককালে হয়তো কম্পনাতীত ছিল, কিন্তু এখন তা বাস্তব ঘটনা।



১। বিদেশে ভারতীয় সাহিত্যলোচনা ৷

রুক্মিণী পাবলিক লাইব্রেরীর মূল গ্রন্থাগারে গত ডিসেম্বর মাস হতে ভারতীয় ও পারস্যীক সাহিত্যলোচনার ব্যবস্থা হয়। গত ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত এই বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, নরেন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণমূর্তি এবং কুশবল্লভের রচনা হতে অংশ বিশেষ এবং পারস্যীয় সাহিত্যের ওয়র খৈয়াম সাদি, হাফিজ ও আওরের রচনাংশসমূহ পড়ে শোনান হয়। কেনেথ হুইটলক এবং মিস তাও স্ট্রং এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তাঁরা ভারতীয় ও পারস্যীক সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন যে ভারত ও পারস্য এই দুটি দেশের কাব্য ও নাটকে মানব মনের যে রকম সূক্ষ্ম অনুভূতি রূপায়িত হয়েছে এই রকম আর কোন সাহিত্যে হয়নি। কল্পনা-সৌন্দর্যের দিক থেকে এ রকম সমৃদ্ধ সাহিত্য আর কোথাও দেখা যায় না। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল মহান প্রাচ্য সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া। ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে এই বৈঠকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পড়ে শোনান হয়: রবীন্দ্রনাথের রচনা হতে ‘কর্ণকুন্তী সংবাদ’ ও আরও চারটি কবিতা, কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের অংশবিশেষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চোর নামক গল্প, জে. কৃষ্ণমূর্তির কয়েকটি কবিতা।

২। ভারতীয় লেখিকার জার্মান পুস্তককার লাভ ৷

আমেরিকার উইমেনস ইন্টারন্যাশন্যাল লীগ ফর পীস এ্যান্ড ফ্রিডম নামে একটি বেসরকারী সংস্থা বিশ্বের প্রমুখ শিশু-সাহিত্যের জন্য প্রতি বৎসর জন অ্যাডামসের নামে একটি পুস্তককার দিয়ে থাকেন। যে শিশু-সাহিত্যে বিশেষ মূল্যবান এবং জনগণের মধ্যে আস্থা প্রকাশ পায় তাদের বিচারে তাকেই পুস্তকৃত করা হয়। এ বছরের পুস্তককার লাভ করেছেন, হোয়াইট দেন রমন নামে পুস্তককার ভারতীয় লেখিকা শালি এল অরোরা।

৩। সোবিয়ত বিজ্ঞান পরিষদের সাহিত্য প্রকাশনা ৷

সোবিয়ত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান পরিষদের (অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস) প্রকাশনাভবন হতে কেবল বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদিই প্রকাশিত হয় না। এখান হতে রূশ সাহিত্যের ক্লাসিকস বা ধ্রুপদী গ্রন্থগুলিও প্রকাশিত হয়ে থাকে। শব্দে ভাই নয় গ্রিশ-চল্লিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশ করা একমাত্র সোবিয়ত বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষেই সম্ভব।

দ্যুস্তান্ত হিসাবে সম্প্রতি প্রকাশিত তুর্গেনেফের রচনাবলীর কথা উল্লেখ করা যায়। এই নতুন সংস্করণে তুর্গেনেফের বহু চিঠিপত্র, রেখাচিত্র, বহু গল্পের অংশবিশেষ বা খসড়া স্থান পেয়েছে।

সাহিত্য সমাচ ৷

সোবিয়তে বিজ্ঞান পরিষদের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন হচ্ছে “লিটারেতুর্নয়া না স লেদস্ স্ভো” (সাহিত্যিক ঐতিহ্য)। এই ঐতিহ্য-মালার খণ্ডগুলি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। এর ৬১তম খণ্ডটিতে সংকলিত হয়েছে রূশ সাহিত্যের অমর প্রতিভা টলস্টয়ের জীবন ও রচনা সম্পর্কে বিস্তার প্রামাণ্য নতুন তথ্য। ৭০তম খণ্ডটিতে থাকবে সোবিয়ত সাহিত্যিকদের কাছে লেখা ম্যাক্সিম গোর্কির বহু-সংখ্যক চিঠিপত্র।

এই প্রসঙ্গে “রূশ শিল্পকলার ইতিহাস” গ্রন্থখানিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪। পূর্ব জার্মানীর বই-র বাজার ৷

পুস্তক প্রকাশন ক্ষেত্রে পূর্ব জার্মানীর প্রকাশকগণ অন্যান্য দেশের তুলনায় কোন অংশে কম নন। ১৯৬০ সাল এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এ বছরে ১৩১৭ উপন্যাস, কবিতার বই, নাটক গল্প ও বিভিন্ন বইয়ের ১৮২৭১০০০ কপি প্রকাশকগণ প্রকাশ করেন। ৪৫৭ ধরনের শিশু-সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে। মোট কথা ১৯৬০ সালে প্রকাশকরা ৬১০০টি বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশ করেছেন। আর এর পরিমাণ হল নয় কোটি আঠারো লক্ষ কপি।

৫। নতুন রবীন্দ্র রচনাবলী ৷

বিদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমাদর বোধ হয় সোবিয়ত দেশেই সব থেকে বেশী। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের নানাবিধ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী স্তর থেকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে এই সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশের কয়েক-দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

বর্তমানে সোবিয়ত উপন্যাস ও কবিতা প্রকাশালয় বিশ্বভারতী প্রকাশিত ২৮ খণ্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর বারো খণ্ডের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করছেন। এর ফলে রূশ দেশের লোকেরা রবীন্দ্রনাথের অনেক নতুন কবিতা ও নাটক পড়বার সুযোগ পাবেন। সোজাসুজি বাঙলা থেকে অনুবাদ করা হবে। কবির সম্পূর্ণ রচনামূল্যে সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ মিলবে। পূর্ব প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীও আবার সম্পাদনা করা হচ্ছে। উপন্যাসগুলি সাজান হয়েছে সময়ের ভিত্তিতে। শেষ দুটি খণ্ডে থাকছে প্রবন্ধাবলী, পত্রাবলী, জীবন-স্মৃতি।

নতুন সংস্করণের প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দু-শ ভাষার অনূদিত “বৌঠাকুরাণীর হাট” ও “রাজহি” এই খণ্ডে আছে। “জীবিত ও মৃত”, “পোষ্টমাস্টার”, “কবুলিওয়ালার” প্রভৃতি ৩০টি গল্প আছে বা ১৮৪৪-৯৩ সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের যুবাবসরের ছবি এবং তাঁর আঁকিত কয়েকটি ছবিও এর মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া আছে সংকলিত রবীন্দ্র-জীবনকথা ও বিভিন্ন বিষয়ে টীকা-টিপ্পনী।

এই অনুবাদ কার্যে সাহায্য করছেন রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশেষজ্ঞগণ, সোবিয়ত ভারতভূতত্ত্ববিদগণ ও কবি-অনুবাদকগণ। এদের সঙ্গে আছেন পৃষ্ঠভর্য ঘোষ, ননী ভৌমিক, সমর সেন, অভিঞ্জ বন্দ্য প্রভৃতি বাঙালী লেখক ও সাহিত্যিকগণ।

৬। কাফ্কার গল্প সংকলন ৷

সম্প্রতি একখণ্ডে কাফ্কার গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে জার্মানিতে। কাফ্কা যে সমস্ত গল্প প্রকাশের অনুমতি দিয়ে গিয়েছিলেন শৃঙ্খমাত্র সেগুলিই প্রকাশিত হয়নি। এর মধ্যে আছে অপ্ৰকাশিত রচনা ও নানাবিধ রচন খসড়া। এগুলি প্রকাশিত হওয়ার কাফ্কার রচনাবলীর ক্রমানুক্রমিক ধারা-বাহিকতা রক্ষা পাবে বলে মনে হয়। পাণ্ডুলিপি, ডায়েরি, চিঠিপত্রাদি এবং অন্যান্য মূল্যবান বিষয় সম্পাদক-মণ্ডলী সংগ্রহ করেছেন। বড় গল্প, নীতিকথা, উপকথা এবং কাফ্কার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতির রচনা এতে সংকলিত হয়েছে। সমকালীন জার্মান সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি-লাভের পথে এ গ্রন্থের মূল্য অপরিসংখ্য।

৭। টমাস ম্যানের পত্রাবলী ৷

জার্মান কথাশিল্পী টমাস ম্যান পৃথিবীর সমস্ত দেশেই পরিচিত। দু-খণ্ডে তাঁর পত্রাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন ম্যানের কন্যা এরিক ম্যান। এর প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮৯-১৯৩৬ সালের মধ্যে লিখিত পত্রগুলি স্থান পেয়েছে এই খণ্ডে। কতকগুলি পত্র পূর্বেই প্রকাশিত হলেও অধিকাংশই এতদিন অপ্ৰকাশিত ছিল। পত্রগুলি ব্যক্তি ম্যান অপেক্ষা সাহিত্যিক ম্যানের শিল্প সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়গুলিকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। পত্রালাপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন আলবার্ট আইনস্টাইন, আর্নে জিড, স্টিফেন জর্জাইগ, ইডান পেমিলজভ, হেনরিখ মান (টমাস-ম্যানের ভাই) প্রভৃতি।



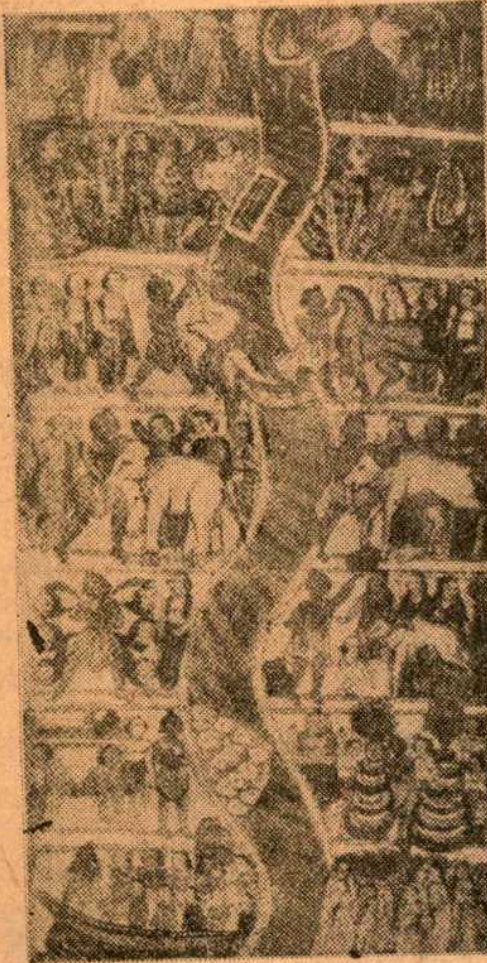
প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা

বাংলা দেশ ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ। বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভারতের যুক্ত সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি অঙ্গস্বরূপ; তথাপি একথা নিঃসংকোচে বলা যায় এই সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের থেকে পৃথক অথচ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট। বাংলার এই স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেকখানি নির্ভর করে তার প্রাচীন গৌরবময় শিল্পকলার উপর। এটি একটি বাংলার জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার উল্লেখযোগ্য দিক। এই বিশেষ দিকটির বিকাশ শুধু যে নাগরিক সভ্যতাকে কেন্দ্র করে হয়েছিল তা নয়; পরগী-বাংলার শ্যামল সুন্দর কুটীরে কুটীরেও এই শিল্পকলার সাধনা চলেছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ফলে আজ বাংলার বনিয়াদী লোক-শিল্পের প্রচুরতা ও তাঁদের অপূর্ণ শিল্প-নিপুণতা বাংলাদেশ হাতে দ্রুত বিলুপ্তির পথে।

বাংলার নিম্নত পল্লী-প্রান্তে সাধারণতঃ শিল্পকলার তিনটি বিভাগের চর্চা হত। প্রথমতঃ চিত্রপট, দ্বিতীয়তঃ আলপনা, তৃতীয়তঃ মাটির অথবা কাঠের খেলনা।

চিত্রপট বাংলাদেশের শিল্পকলার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সাধারণ পটুয়াদের অঙ্কিত এই সব লম্বা পট-চিত্রগুলি বর্তমানের শিল্প-রসিক মহলে একটি বিশেষ আলোচনার বস্তু। বীরভূম,

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কালীঘাট প্রভৃতি স্থানের পোড়োরা সাধারণতঃ এ ধরনের ছবি আঁকতেন। প্রতিমার চালচিহ্নের সাথেও আমরা এই পটচিত্রের কিছুটা মিল দেখি। এই সকল পটচিত্র আঁকার পদ্ধতিও অতি চমৎকার। অনেক দিনের



কুকলীলা পট (মেদিনীপুর)

—আশুতোষ মিত্রজয়ম

বাবহারগত অভিজ্ঞতার ফলে পটুয়াদের পরিবারের প্রায় সবাই এই পট আঁকার সাহায্য করতে সক্ষম হতেন। বাপ মা ছেলে-মেয়ে সবাই এক একটি কাজের ভার নিতেন। কেউ রং লাগাতেন। কেউ

চুল আঁকতেন আবার কেউবা তুলির টানে ছন্দময় চোখ, মূখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করতেন। এইভাবে রামলীলা-পট, কুকলীলা-পট, শক্তি-পট বা যম-পটের কাহিনী অঙ্কন করে পটুয়ারা স্মরণীয় গীতি-কবিতায় সুসজ্জিত ছন্দে আবৃত্তি ও গানের মাধ্যমে জনসাধারণকে দেখিয়ে যথেষ্ট অর্থো-পার্জন করতেন। কাহিনীর শেষে মৃত্যুর পর মানবাত্মার যমপটুরীতে নানাপ্রকার শাস্তিভোগের দৃশ্য থাকত বলে এগুলিকে সাধারণ ভাষায় যমপট বলা হত। হর্ষবর্ধনের সভাবদ বাণভট্টের লেখা হর্ষচরিতে এই পট দেখাবার পদ্ধতির উল্লেখ আছে। এর দ্বারা আমরা অনুমান করতে পারি যে প্রাচীনকালে বাংলাদেশের বাইরেও এই পটচিত্রের প্রচলন ছিল।

বাংলার পটচিত্রগুলি বর্ণবিন্যাস ও তুলির আঁচড়ের দিক থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য। কাগজের সঙ্গে কগজ জুড়ে একটা লম্বা পট তৈরী করে, তার উপর মাটি ও গোবরের একটা হালকা প্রলেপ দিয়ে আগে জমি তৈরী করে নিতেন পটুয়ারা। তারপর এক একটা বিশিষ্ট ঘটনার ছবি সাজিয়ে আখ্যানভাগ গড়ে তুলতেন। সাধারণতঃ পটচিত্রের ছবি-গুলিতে আমরা লাল, হলদে, সবুজ, নীল ও কালো রংয়ের বেশী ব্যবহার দেখি। বাংলার অতীত শিল্প-কীর্তির অতুলনীয় নিদর্শন এই পটচিত্রগুলি। পঁচিশ তিরিশ বছর আগেও বিক্রমপুরের মুসলমানেরা ছড়া কেটে কেটে এক প্রকার গাজীর পট দেখিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতেন। সেই সব ছড়ার কিছু কিছু আজও গ্রাম্যালোকের মধ্যে মধ্যে শোনা যায়—

রাবণ আইস্যা যোগীর বেশে সীতা

হরণ করে

সুপ্নখার নাক যেমন লক্ষণঠাকুর কাটে।
কামরতি বামন দেখেন ছিন্নমস্তা কালী।
তারপরেতে দেখেন কতী ময়ূরমণ্ডালী

নাও।

গাজীর ভাই কালু আইল নিশান ধরিল।
গাজীর কাছে একটা বাঘ নাম বে

খান্দিয়া। ইত্যাদি

এ ধরনের পটগুলি সাধারণতঃ প্রস্থে দু'হাত ও দৈর্ঘ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাত হত। বাঁশের লাঠির মাথায় পটের দুটো দিক বেঁধে দেওয়া হত। গান ও আবৃত্তির সাথে সাথে পটের ছবিগুলিকে



বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া গ্রামে তৈরী
পোড়ামাটির পুতুল

সবার চোখের সামনে তুলে ধরতেন
পটুয়ারা।

বাংলার এই নিজস্ব চিত্রপদ্ধতি
বিদেশী চিত্র-শিল্পকুশলীদের কণ্ঠ
থেকেও প্রশংসা অর্জন করেছে। বিদেশের
বহু আর্ট গ্যালারী বা মিউজিয়ামে
কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলের পটুয়ারদের
অঙ্কিত সুদৃশ্য পটের সংগ্রহ আছে।
সম্প্রতি বিদেশ থেকে এই ধরনের শিল্প-
কর্মের উপর সুন্দর বইও প্রকা-
শিত হচ্ছে। অথচ আমাদের দেশে এই
সুদৃশ্য পটঙ্কন পদ্ধতি প্রায় হারিয়ে
যাচ্ছে। এককালে যে সব পটুয়ারা বাংলা

দেশকে এই অমূল্য ও অতুলনীয় রস-
কলাসম্পদ দান করেছেন সেই সব
পটুয়ারদের দু-একজন বংশধর আজ
জীবিত থাকলেও শহুরে ও বিজাতীয়
আবহাওয়ায় পড়ে তাঁরা এই প্রাচীন
বিশুদ্ধ অঙ্কন-কৌশলটির ভুলতে
বসেছেন।

পটুশিপের ন্যায় আলপনাও এদেশের
একটি অতি মূল্যবান শিল্পকর্ম।
সাধারণতঃ হিন্দু মেয়েরা পূজা-পার্বণ
বা ব্রততে মাটির দেওয়ালে বা পিঁড়ির
উপর পিঠুলির (চালের গুঁড়ো) সাহায্যে
মাত্র কয়েকটা সহজ রেখার দ্বারা এক
একটি অপূর্ব নক্সার সৃষ্টি করতেন।
ভিন্ন ভিন্ন ব্রততে ভিন্ন ভিন্ন আলপনা
দেওয়ার প্রচলন ছিল। যেমন হরিরচরণের
ব্রততে শ্বেতচন্দনের দ্বারা প্রস্ফুটিত
পদ্মের নাকে সুন্দর করে হরির ছোট
ছোট 'যুগল চরণ' দুটি আঁকা হত। ভাদ্র
মাসে ভাদুলী ব্রততে পিঠুলির সাহায্যে
যে আলপনা দেওয়ার রীতি ছিল সে
আলপনাটি সত্যিই মনোরম। এই আল-
পনাটির বিষয়বস্তু—জোড়া ছত্র মাথায়
ভাদুলী ঠাকুরাণী জোড়া নৌকার উপর।
আর তার আশে-পাশে লতাপাতা ও
ফুলের সুন্দর একটি নক্সা। এইভাবে
লক্ষ্মীপূজা, বিবাহ উৎসব, রনে-এয়ো
ব্রত, বসুন্ধরা ব্রত, সেজুতি ব্রত, তুষ-
তুষলী ব্রত, তারা ব্রত, মাঘ-মণ্ডল ব্রত,
ত্রিভুবন-চতুর্থী ব্রত প্রভৃতিতে আলপনা
আঁকার প্রচলন দেখা যায়। ঘরে ঘরে
মেয়েদের হস্তাঙ্কিত এইসব চিত্রকলার
সৌন্দর্যের গৌরবে গ্রামগুণি ছিল
বাংলাদেশের গৌরবময় সম্পদ। কিন্তু
আজকাল গ্রাম-বাংলার মেয়েরা এ ধরনের
আলপনা আঁকার পদ্ধতি প্রায় ভুলতে
বসেছেন।



বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া গ্রামে তৈরী
পোড়ামাটির পুতুল

বাংলাদেশের মাটির পুতুল চিরকালই
বিখ্যাত। এ ধরনের পুতুল বেশীর ভাগ
কুষ্ণনগর, বীরভূম, বাঁকুড়াতে তৈরী হ'ত।
বাংলার কুষ্ণনগরের নাম বহুযুগ আগে
ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর ইউ-
রোপে পৌঁচেছিল। শোনা যায় এককালে
কুষ্ণনগরের পুতুলের আদর ইউরোপে
এত ছিল যে, তৃতীয় নেপোলিয়ান
সেকালের সেরা কুমার যদু পালকে ফ্রান্সে
আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলায়
এই নিজস্ব সম্পদ, অপূর্ব শিল্প-
নিপুণতা আজ বিলুপ্তির পথে। এই
সম্বন্ধে আমাদের সমাজের চিত্র-প্রেমীদের
এবং জাতীয় সরকারের অনেক কিছ-
কর্তব্য আছে।



যুগপুরুষ গুরুজাড়া আপ্পারাও বোম্বায়া বিশ্বনাথম্

রবীন্দ্রনাথের জন্মসালেই অশ্বের যুগপুরুষ গুরুজাড়া আপ্পারাওয়ের জন্ম। ১৮৬১ সালে ৩০শে নভেম্বর, বিশাখ জেলার এলামাণ্ডলি তালুকের রায়বরম পল্লীতে। পিতার নাম ভেঙ্কট রামদাস, মা কৌশল্যাম্মা।

বিগত ৩০শে নভেম্বর থেকে সমগ্র অশ্ব এবং ভারতের বিভিন্ন শহরে গুরুজাড়া আপ্পারাওয়ের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে।

আপ্পারাওয়ের জন্ম দরিদ্র পরিবারে। ১৭ বৎসর পর্যন্ত গ্রামে পড়াশুনা করে তারপর বিজয়নগরমে পদার্পণ করেন। এখানেই শুরুর হয় তাঁর কর্মজীবন ও সাহিত্য-জীবন।

বিখ্যাত কবি শ্রীশ্রীর মতে অশ্বের তিনজন মহান কবি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনজন, গুেমাম্মা এবং গুরুজাড়া আপ্পারাও।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মনসীয়ার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল। ১৯১২ সালে ২রা ডিসেম্বর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগেই তিনি কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। উভয়ের মাঝে তেলেগু এবং বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা হয়। আপ্পারাওয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পর-বর্তীকালে বহু পত্রের আদান-প্রদান হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত, শম্ভুপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। শম্ভুপ্রসাদ আপ্পারাওকে প্রতিভাবান বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভাকে রীভারাগী অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আপ্পারাও অদূরে থাকলে কিছু লিখবে না, দূর থেকে তোমার কলম সঞ্চালন দেখেই বলে দিতে পারবেন কি লিখছে।’ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস আপ্পারাওকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘এখন অশ্ব সাহিত্য-জগতে আপনি যেরূপে ধরনের বিপ্লব আনার প্রয়াস পাচ্ছেন সেই ধরনের কাজের জন্য টেকসাঁদ বাঙালীর কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।’ আরো তাঁর বহু বন্ধু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে

ছিলেন। দেশভ্রমণের নেশাও তাঁর কম ছিল না।

গুরুজাড়া আপ্পারাওয়ের জীবনকে ষাথেষ্ট প্রভাবিত করেছে মাইকেল মধু-সুদন দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের জীবন-সাধনা। অশ্বের সংস্কারবাদী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা কান্দু-কুরী বীরেশলিঙ্গমের পর সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুজাড়া আপ্পারাওয়ের ভূমিকা বলিষ্ঠ। বাংলার বিভিন্ন আন্দোলনের ডেউ অশ্বের বিপ্লবী-মনকে সতেজ করে



গুরুজাড়া আপ্পারাও

তুলেছে। আপ্পারাওয়ের বিখ্যাত কবিতা ‘দেশভক্তি’ বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময় লেখা। প্রত্যেক অশ্ববাসীর কাছে এই কবিতা সুপরিচিত। ‘দেশ’ শব্দের এক নতুন ব্যাখ্যা তিনি এই কবিতায় প্রদান করে-ছিলেন : দেশামাটে মাটি কাদোই, দেশা-মাটে মানুষলোই।

জাতীয় একা গঠনের উদ্দেশ্যে বহু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। দেশ-সেবার যারা সৌধীন মজদুরী করে, গালভরা ভাষণ দিয়ে বেড়ায় তাদের কটাক্ষ করেছেন একাধিক কবিতায়। ‘শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই নয়, পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্যও তাঁর বহু কবিতা রচিত হয়েছে।

গুরুজাড়া আপ্পারাওয়ের জীবনের উল্লেখযোগ্য মহত্তম অবদান কথা ভাষায় ‘কন্যাশুদ্ধকম’ নাটক রচনা। এই নাটক

১৮৯৬ সালে রচিত। প্রকাশিত হয় ১৮৯৭-এর ১লা জানুয়ারী। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ম্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালের জুন মাসে। সমসাময়িক কালের বিভিন্ন চরিত্র এই সম্প্রদায় নাটকে স্থান পেয়েছে। সামাজিক জীবন-যন্ত্রণাকে সুনিপুণভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। এই নাটক রচিত হওয়ার ফলে অশ্ব বা তেলুগু সাহিত্যে শুধু যে একটি উৎকৃষ্ট নাটকের অভাব দূর হয়েছে তাই নয়, সংস্কৃত সাহিত্যে মজ্জকটিকের মত তেলুগু সাহিত্যেও যে একটি বিখ্যাত নাটক রয়েছে তা অশ্ববাসী গর্ব করে বলতে পারে।

ছোট গল্পরচয়িতা হিসেবেও আপ্পারাও সিম্বহস্ত। খণ্ডকাব্য ‘পূর্ণাশ্মা’ প্রখ্যাত লাভ করেছে। ছোট গল্পের মধ্যে দ্বন্দ্ববাতু, মেটিম্ভা, মীপেরেমিটি, সংস্কৃত হৃদয়ম্ এবং পেশদামসীদু প্রভৃতি জনপ্রিয় অর্জন করেছে। এই সমগ্র-ব্যবস্থার নারী যে ভোগ্যপণ্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয় তা গভীর দরদ দিয়ে বিভিন্ন গল্পে ও কবিতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্যঅধ্যয়নকারীরা কিছুতেই ভুলতে পারবে না তাঁর চিত্রিত বিভিন্ন নারী-চরিত্র। মনে পড়ে বৃচ্চাম্মার কথা। পূর্ণাশ্মাকে ভুলতে পারি না,—অনন্যো-পায় হয়ে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। সমাজের অশ্বকার পিচ্ছিল পথে নেমে যেতে হয়েছে মীনাক্ষীকে। একজন বৃদ্ধকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে পিঞ্জরবন্ধ অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়েছে মেটিম্ভাকে। গৃহবতী হয়েও কন্যাশুদ্ধকম নাটকে দেখি মধুরবাণীকে পতিতাবৃত্তিকেই বেছে নিতে হয়েছে।

‘দ্বন্দ্ববাতু’ গল্পটা ভারি মজার। গোপাল রাও গভীর রত পর্যন্ত ঘুরে পতিতালয়ে কাটিয়ে আসে। আর চার-জনের মত ভাগ্যের উপর দোষ চাপিয়ে তার বউ হাত গুটিয়ে বসে থাকে না—সে একদিন উচিত শিক্ষা দিয়েছে। তার জন্য গোপাল রাওকে বিলাপ করতে হয়েছে। গল্পটি শুরুর হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই একটা মোচড় আছে। সেই মোচড়টাই গল্পের প্রাণ। গল্পের শুরুর থেকেই চাকর রামু হাসতে থাকে। তার হাসি গোপাল রাওয়ের নজরে পড়ে না। আর পাঠক ঐ হাসির তাৎপর্য বুঝতে পারে না। গল্প শেষ হলে সেই হাসিটি যে কত গভীর অর্থপূর্ণ তা বুঝতে পারা যায়।

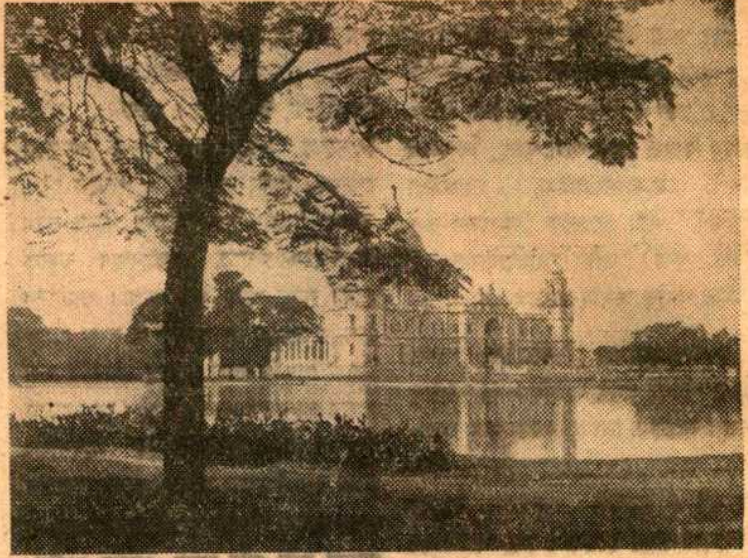
আপ্পারাওয়ের সৃষ্ট মধুরবাণী, পূর্ণাশ্মা, কন্যা, মেটিম্ভা প্রভৃতি

ছুটির দিনের

পড়া

শশাঙ্ক সেনগুপ্ত

শীতের উজ্জ্বল সকাল কিংবা শীতের দুপুরের মিষ্টি রোদ্দুর হাত-ছানি দিয়ে সকলকে বাইরে বেরিয়ে পড়তে আমন্ত্রণ জানায়। সেই আহবান কারো মনে সাড়া জাগে, কারো জাগে না। যাদের মনে প্রকৃতির এই আহবান পৌঁছে তারা বেরিয়ে পড়তে পারেন—সবখানেই শীতের রোদ্দুরের আঁচল পাতা। আলপুর চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মিউজিয়াম, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম—দর্শনীয় বস্তু অতীব নেই এই কলকাতায়। ছেলে, বড়ো, যুবা সকলেই দল বেঁধে এই দর্শনীয় স্থানে গিয়ে ভিড় করতে পারেন। এখানে বয়েসের কোনো প্রশ্ন নেই। আনন্দ ও শিক্ষা দুই এইগুলির মাধ্যমে পাওয়া ফেঁতে পারে। চিড়িয়াখানা কিংবা বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে অনায়াসেই উপলব্ধি হতে পারে যে, মানুষ ও প্রকৃতির সত্যকার সহাবস্থানেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করা যায়। নাহলে এই ইট-কাঠের শহরে হাফিয়ে-ওঠা মানুষ মাঝে মাঝে উদ্ভানের পরিকল্পনা করতো না। যাদুঘরে সংরক্ষিত অতীতের প্রেতের কাছ থেকেও আমাদের শিক্ষণীয় বহু বিষয় আছে। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের আদি ইতিহাস অনেক মজারান তথ্য আমাদের দেয়—সে তথ্য আধুনিককাল সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করে। বিশেষতঃ শিশুদের নিয়ে ইস্কুলের ছুটির বন্ধের সময়ে কিংবা কোনো ছুটির দিনে এইসব দর্শনীয় বস্তু দেখিয়ে আনা তাদের শিক্ষার পক্ষে খুবই উপযোগী। বিভিন্ন গ্রাছ-পালা চিন্তে শেখা, বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ, যাদুঘরের প্রস্তু ও অন্যান্য মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তাদের শিক্ষার



ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল।

অপরিস্রাব অংগ। বর্তমান পর্বায়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মিউজিয়াম ও বিড়লার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে অনেকেই দূর থেকে দেখে থাকেন। এর ভিতরে সংরক্ষিত মিউজিয়ামে বিভিন্ন বিষয় ও দর্শনীয় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অনেকেই ধারণা অত্যন্ত অল্প। আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষের একটি চূড়ান্ত উদাহরণ এই স্মৃতিসৌধ। এটা তৈরী করতে প্রায় এক কোড় ও পাঁচ লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। চারি জুগিয়েছিলেন ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা। ১৯০৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯২১ সাল অবধি লেগেছিল এই সৌধ নির্মাণ করতে। আরো বাকি টুকটাকি কাজ সারতে ১৯৩৫ সাল অবধি সময় গড়িয়ে গিয়েছিল। সার উইলিয়াম এমার্সনের নৈপুণ্যে এবং মার্টিন বার্ন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে এই সৌধ নির্মিত হয়। রাজপুতানার যোধপুর শেটের সেই মার্বেল পাথর কেটে এই সৌধের নির্মাণ কার্যে ব্যবহার করা হয়—যে পাথরে তৈরি হয়েছিল আগ্রার তাজমহল। এর মধ্যে সংরক্ষিত শূদ্র মর্মরের মূর্তির অনেকগুলিই ইতালির নিপুণ ভাস্করদের হাতের সৃষ্টি।

১৮৪ ফুট উচ্চ এই মর্মর প্রাসাদের স্থাপত্য ইতালীয় রেনেসাঁসের স্থাপত্যের অনুরূপ। ভিক্টোরিয়ার সুন্দর স্ফুটিত মর্মর মূর্তিই ১৬ ফুট উচ্চ। এই স্মৃতিসৌধে উত্তরের প্রবেশ পথ দিয়ে

প্রথমে ঢুকলে ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে পঞ্চম জর্জের আমল অবধি বিভিন্ন রাজপরিবারের চিত্র ও বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে। এখানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পুরানো আমলের বিরাট একটি ঘড়ি—যার নাম 'গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক'।

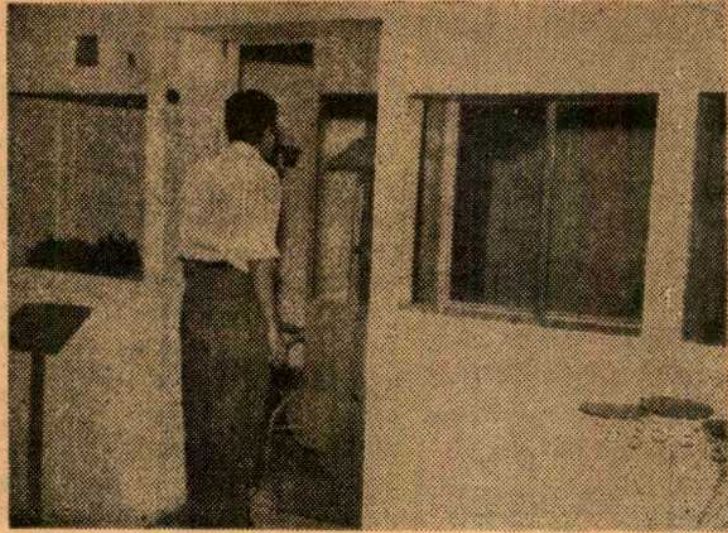
ডানদিকের হলের সামনে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ব্রোঞ্জ মূর্তি ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলে রয়্যাল গ্যালারিতে সারি সারি পোঁত রয়েছে, তার মধ্যে 'জয়পুর্বে সপ্তম এডওয়ার্ডের ভ্রমণ' রশিয়ান শিল্পীর আঁকা এবং 'মহারাজা ভিক্টোরিয়ার বিয়ে', 'সপ্তম এডওয়ার্ডের বিয়ে' প্রভৃতির পারিবারিক ছবি এবং ভিক্টোরিয়ার পিয়ানো ও লেখা-পড়ার টেবিল হলের মধ্যে সাজানো রয়েছে দেখা যাবে।

হলের বাদিকে একটি ঘরের মধ্যে বিখ্যাত ডাচ শিল্পীর আঁকা তদানীন্তন-কালের ভারতবর্ষের ছবি রয়েছে, যা দেখে তখনকার সময় ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে। এই ধরণের ছবির মধ্যে একটি 'সতীদাহের' ছবি খুবই মর্মস্পর্শী। তাছাড়াও স্মারকানুষ্ঠান ঠাকুর, কেশব সেন এই দু'জন ভারতীয় যুগপুরুষ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ গবর্নরের ছবি রয়েছে। এই ঘরের মধ্যে কাঁচের সুরক্ষিত শো-কেসে পারস্যের ফেরদৌসী প্রমুখ মহাকাব্যের শাহ-নামা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সাক্ষাৎ মেলে যা সুদৃশ্য হস্তলিপিতে নকল ও অলঙ্করণ করা। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে পারস্য সাহিত্যের স্নাত ভল্লাম বই সম্রাট জাহাঙ্গীর মীর

এমদাদ-কে দিয়ে নকল করিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি পাতা কপি করার মূল্য এক মোহর। পোর্টের গ্যালারির লাগোয়া ছোট ঘরের শো-কেসে কোম্পানীর আমল থেকে ভারতবর্ষের রাজা-রাজাদের বর্ম ও অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে—বেগুলি উপহার দেওয়া হয়েছিল।

এর পরে উল্লেখযোগ্য প্রিন্স হলের মধ্যে লর্ড ক্লাইভের স্ট্যাচুর সামনে সংরক্ষিত দুটি পিস্তল নির্মিত ফরাসী কামান। সিরাজদ্দৌলার কাছ থেকে ব্রিটিশেরা যা দখল করে নিয়েছিল বলে শোনা যায়। প্রিন্স হলের পূর্বদিকে দরবার হল। দরবার হলের সাজানো মঞ্চ ও রাজপুত পেণ্টিং দর্শনীয়। এই দরবার হলে বাংলার নবাব নাজিমের সিংহাসনের পাথরের পাদপাঠ সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া দুটি ইতিহাসবিখ্যাত রিভলবার সংরক্ষিত রয়েছে—যে দুটি নিয়ে কোম্পানীর আমলে হেষ্টিংস ও ফিলিপ ফ্রান্সিসের মধ্যে ক্ষমতার সন্ধ-বন্দ্ব হয়েছিল। খিদিরপুরের নিজান রাস্তায় এই ঐতিহাসিক ডুয়েল লড়ে-ছিলেন দুই ব্রিটিশ মহারথী। টিপু সুলতান ও হায়দর আলির দুটি তরবারির উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাতে দশক ভুলবেন না। কেননা, এই দুই তরবারি একদিন ব্রিটিশ সিংহের উদ্দেশে আশ্ফালিত হয়েছিল।

প্রিন্স হল পেরিয়ে একটি বারান্দা দিয়ে দর্শক পেঁছবেন ড্যানিয়েল-এর হলে। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী টমাস ড্যানিয়েল (১৭৪১-১৮৪০) ও তাঁর প্রাতুষ্পুত্র উইলিয়াম ড্যানিয়েল (১৭৬১-



আসন্ন অটোমেশন যুগ।

১৮৩৭) ভারত ও ভারতের জীবন-যাত্রা বিষয়ক বহু ছবি একেইছিলেন। সেই ছবি থেকে তখনকার সময় সম্বন্ধে বহু ধারণা লাভ করা যায়।

কুইন মেরী হলে রাজা রবি বর্মা, রাডিক্সার্ড কিপলিং, ইলাইজা ইম্পের ছবি এবং চিত্রশিল্পী জোফানীর আঁকা বহু চিত্রাবলী আছে। কুইন মেরী হলের লাগোয়া ছোট ঘরে 'পলাশির যুদ্ধের' মডেল থেকে পলাশি যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে, যদিও তা ইংরেজের চোখে দেখা। এছাড়া ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজের মডেল ও প্রথম আবিষ্কৃত তারবার্তা-প্রেরক যন্ত্রের নিদর্শনসমূহও দেখতে পাওয়া যাবে। এর পরে উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বিষয়-বস্তু উপরের হেষ্টিংস হলে

“কর্ণওয়ালিশ সকাশে টিপু সুলতানের বন্দী পুস্তকসমূহ”—এর ছবি এবং জোফানীর ঐ বিষয়ে আঁকা চৈত্রচিত্র এবং ১৮০০ সালের শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গের মডেল রক্ষিত আছে। এছাড়া পরবর্তী শতাব্দীর ঘরে পুরনো কলকাতার রাস্তাঘাট ও দৃশ্যাবলীর বহু চিত্র ও ঐতিহাসিক সনদ, চিঠিপত্র, সন্ধিপত্র ও মহারাজা নন্দকুমারের জাল দলিল সমূহ সংরক্ষিত আছে—যা দেখে বিগত যুগের প্রাচীন ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এইতো গেল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কথা। এর পর চলুন বিড়লা মিউজিয়ামে। বিজ্ঞান নিরন্তরিত আধুনিক যুগের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাবে এই বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম পরিদর্শন করে এনে। যে শিশুরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসুক বা যাদের মধ্যে বিজ্ঞানের ঔৎসুক্য জাগ্রত করার প্রয়োজন; যে কিশোররা বিজ্ঞানের ছাত্র এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিরাও বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করে আসতে পারেন এই মিউজিয়ামে গিয়ে। এই মিউজিয়াম গৃহের ন্বিতলে ও গ্রিতলেই দ্রষ্টব্য বিষয়-সমূহকে বিষয়ানুযায়ী নানা ভাগে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে। ধাতু নিষ্কাশনের বিভাগটি এখনো সম্পূর্ণ খোলেনি। মিউজিয়ামের অন্যান্য অংশেও এখনও নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়নি। তবুও ন্বিতলে ও গ্রিতলে দ্রষ্টব্য জিনিস প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষিত। ন্বিতলে ইলেকট্রনিকস্ বিভাগ। প্রথম ঘরে একটি যন্ত্রের মডেলের সাহায্যে তৈল নিষ্কাশন ও তৈল কীভাবে পরিশ্রুত করে মানুষের ব্যবহারে লাগানো হয় তা দেখানো



টেলিভিশন সেট।

হয়েছে। সিসমোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে দেখানো হয় পৃথিবীর ভূত্বিকাত্বের কোনখানে খনিজ তৈল আছে। ভূকম্পন নির্ণয় ছাড়াও সিসমোগ্রাফ যন্ত্রকে ভৌতানুসন্ধানের কাজে লাগানো হয়। এ ব্যতীত পৃথিবীর ভূত্বিকার কোন স্তরে ইউরেনিয়ামের প্রভূতি বাতু প্রাপ্তব্য তাও একটি যন্ত্রের মডেলের সাহায্যে রশ্মি দ্বারা নির্ণয় করা যায়। যন্ত্রপ্রেরিত রশ্মি ইউরেনিয়ামের সংস্পর্শে এলেই গ্যাসপূর্ণ টিউবে একপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয় যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখানেই ঐ প্রকার বাতু আছে।

পেটের পীড়ায়

“এন্টাফোনা” একটি বিশ্বকর গ্রন্থ। ইহা ব্যবহারে পাকায়িক রোগ, জ্বর, অসুখ, পুষ্টিজন্য অসুস্থতা, তরল পিত্ত, পেট কষ্ট, নিদ্রার বিকট প্রভৃতি রোগ দূরীভূত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩ টাকা। মণ্ডল পুথক।

হাশিয়া (অস্ত্র বুদ্ধি)

বিশিষ্ট গ্রন্থ বাস্তব ও অসম্ভব হাশিয়া অস্ত্রবুদ্ধি ও কোমল হাশিয়া জারোগ্য হয় ও আর পুষ্টিজন্য হয় না। রোগের বিবরণ সহ সহজ ভাষায় বিরলাবলী লেখ।

ফ্রিস্ক রিসার্চ হোম

১৪, বীলকমল দুধাখী রোড, শিবপুর
লাগড়া। ফোন: ৬১-২৭৫৫

সুখা স্বিস্ততা ত্রানে

বোল্ডার

ফেস পাউডার

১০০% ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্টস - কলিকাতা

ফোন: ৫৫ ৪০২২

বেঙ্গল ডেকরেটর

২২০ চিরন্তন এডমিড - কলিকাতা ৬



একমিনি জীন্স জোয়ার তালকার বৈচিত্র্য

আর.সি.দে.সহ

১১১-মহম্মদপুর স্ট্রীট - কলিকাতা

এর পরে উল্লেখযোগ্য দ্রুততা শব্দ-ধ্বনি তরঙ্গ পরিমাপক যন্ত্র। মাইক সংলগ্ন ক্যাথড রে-এর সাহায্যে 'pure tone' ও 'complex tone' নির্ণয়। শব্দধ্বনিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে কীভাবে জানা যায় গৃহস্থময়ী বাড়ীতে আছে কি নেই (In or Out) তাও দেখা যায়। আসন্ন অটোমেশনের যুগে আগন্তুককে সাড়া পেয়ে গৃহস্থ ব্যক্তি বৈদ্যুতিক বোতাম টিপতেই দরজা খুলে গেল, ফ্যান আপনা থেকেই চলতে লাগলো, আগন্তুক এসে চেয়ারে বসতেই চোরা বোতামে চাপ লেগে আলো জ্বলল উঠলো আপনা থেকেই—শব্দ আপনা থেকে এক কাপ চা আসার অপেক্ষা। আগামীকালে বোধ হয় তাও অসম্ভব থাকবে না। এরপর রোডওচালিত এরিয়ালবিশিষ্ট মোটর-জপও দেখা যাবে। বৈজ্ঞানিক যুগে কী সম্ভব হয়েছে তার আভাস পাওয়া যাবে এক পলকেই। এ ছাড়া আরো কী কী সম্ভব হতে পারে তা ভেবে দর্শকের কম্পনাশক্তি আপনা থেকেই সজীব ও প্রখর হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও মার্কানি উদ্ভাবিত বোতারের প্রাথমিক যন্ত্রাদি এবং ভোল্টাস্ উদ্ভাবিত যন্ত্রসমূহ দেখা যেতে পারে।

মিউজিয়ামের টোলিডিসন সেট সম্বন্ধে উৎসূকা প্রবলতর হওয়া স্বাভাবিক। এখানে প্রতিদিন দু'ঘণ্টা প্রোগ্রাম হয়। অনেক ইস্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে আসতে পারে। টোলিডিসনে প্রোগ্রাম করতে হলে লটারীতে যোগদান করতে হবে। যারা 'ল্যাক নাম্বার' পাবে গেটে সেই নম্বর দেখিয়ে তারা প্রোগ্রাম করার সুযোগ পায়। এই সেট দেখে টোলিডিসন সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা অনেকাংশে স্পষ্টতর করা যেতে পারে। যদিও সেটটি সম্পূর্ণ হাল-আমলের নয়। তাই জোর আলোর সামনে বসে দু'একটি শিশু দেখা গেল

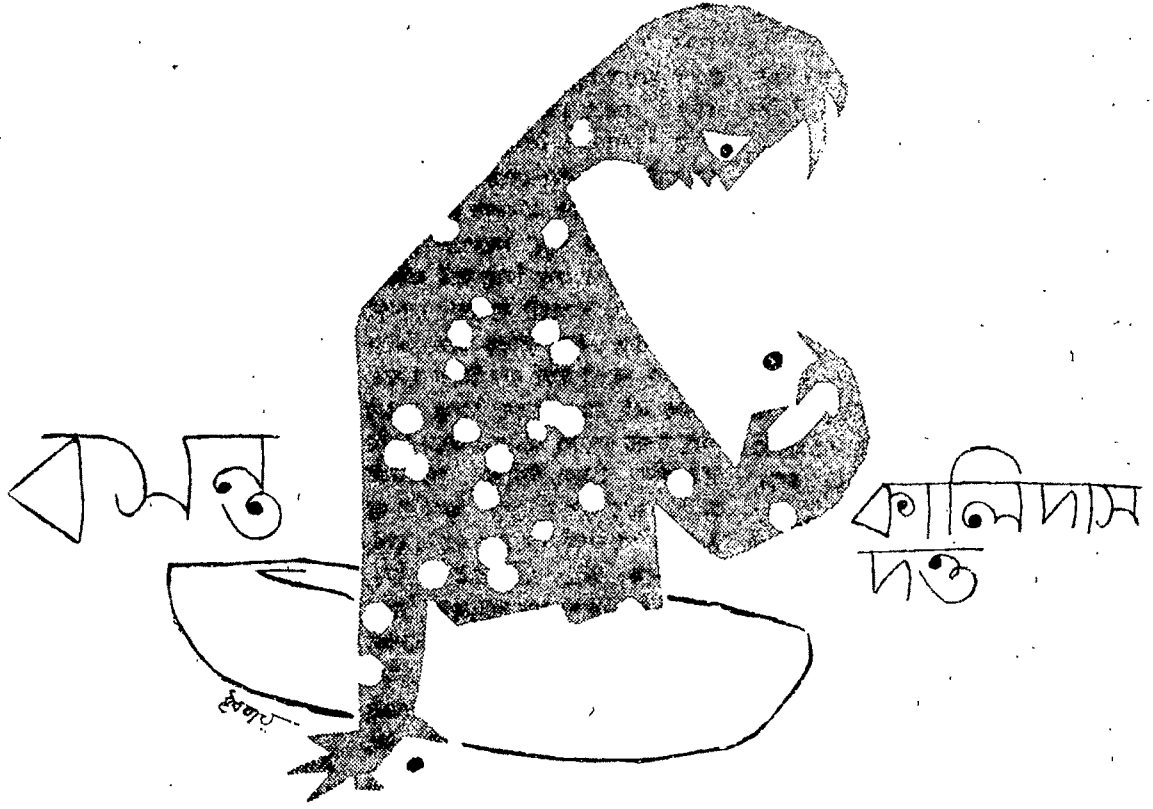
চোখ বন্ধ করে গান গেয়ে যাচ্ছে। তবুও এরই দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। তিন লাখ টাকা খরচ করতে পারলে সম্পূর্ণ আধুনিক টোলিডিসন আনা যাবে। তখন অল্প আলোতেই প্রোগ্রাম চালু করা যাবে সুসুভাবে। টেপ রেকর্ডারে গান রেকর্ড করার সুযোগও শিশুরা পায়।

দ্বিতলে 'Motive Power' বিভাগে বাষ্পীয় শক্তির উদ্ভাবন থেকে শুরু করে কিভাবে সেই শক্তি কাজে লাগিয়ে ক্রমে ক্রমে স্টীম ইঞ্জিন আবিস্কৃত হলো এবং কারখানার প্রচণ্ড শক্তিশালী আধুনিকতম বয়লার থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা কল-কারখানা চালু করা গেল নানা মডেলের উদাহরণের সাহায্যে তারই ভূমিক ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতলের 'Electricity' বিভাগে চুম্বক ও তার ব্যবহার কি করে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যায়—বিজ্ঞানের এইসব প্রাথমিক পাঠ নানা যন্ত্রের পরীক্ষার সাহায্যে শিশুদের দেখানো হয়। প্রতি ঘরেই 'ডিমেনস্ট্রেশনারী' অনগল বস্তুতার সাহায্যে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করে থাকেন। বিজ্ঞানের ছাত্ররা এই ল্যাবরেটরির পরীক্ষা থেকেও যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে। একটি ন্যূনতম 'X-ray plant'ও স্থাপন করা হয়েছে—জনসাধারণকে এর উপ-যোগিতা সম্বন্ধে ওরাকিবহাল করার জন্যে।

মিউজিয়ামের আর একটি বিভাগ শীর্ষগির খোলা হচ্ছে। সেখানে খনিজ তামা ও লোহার ধাতুনিষ্কাশন ও শোধনের পদ্ধতি দেখানো হবে। সর্ব-সাধারণের জন্যে এখনো তা খোলা হয়নি। কিন্তু ধাতুনিষ্কাশন ও পরি-শোধনের ছোট 'Model plant' বসানো হয়েছে। এছাড়াও নিম্নায়মান অংশে আরো অনেক কিছু দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে।

আধুনিক পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের দিগন্তকে আরো প্রসারিত করে দিতে এই ধরণের মিউজিয়ামের উপ-যোগিতা সীমাহীন। আমরা যে আণবিক যুগে বাস করছি, তার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছুই শিশুদের অজানা। বিজ্ঞানের অবদান আমাদের জীবনে কত অসামান্য সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ ধ্যান-ধারণা এ সব না দেখলে শিশুমনে বন্ধমূল হওয়া সম্ভব নয়। অথচ অভ্য-ভাবকদের সঙ্গে ছুটির কয়েক ঘণ্টা এ সব জায়গায় খেলাচ্লে কাটিয়ে এসে লাভ বই লোকসান হয় না।



নিশির ট্র্যামে উঠতে ইচ্ছে করল, কিন্তু ভাড়ার কথা মনে পড়ায় ফুটপাথ ধরল। ইচ্ছে হলেই কিছু করতে যারা পারে তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান, নিশি নয়। অবশ্য ভাড়া না দিয়ে কিছু দূর যাওয়া যায় এবং সে কোন কোন দিন গেছেও, তবু আজ যেতে ইচ্ছে করল না। ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাসটাকে সে রপ্ত করতে চায় না, সে সং থাকতে চায়, তাই সেই ইচ্ছেটাকে সে নিয়ত প্রাণপণে দমন করে। তার আই-এ পরীক্ষাটা দেবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু টাইফয়েডে তিন মাস ভুগে, পাঁচ মাসের মাইনে কলেজে বাকি ফেলে, সেকেন্ড ইয়ারে উঠেই তাকে পড়ায় ইস্তফা দিতে হয়েছিল। চেষ্টা করলে দু-এক মাসের মাইনে মকুব হয়তো হত, কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হত না, তা ছাড়া প্রার্থী হতে অর্থাৎ কিছু বিনিময় না করেই দান গ্রহণে তার ইচ্ছে হয় না। ভিক্ষে করার ইচ্ছেটাও তাই সে দমন করেছে। হাত পেতে ভিক্ষে করতে, তা সে যার কাছেই হোক না কেন, সে পারবে না, পারে না। মাধবী তার কোন এক জন্মদিনে (মাধবীরও জন্মদিন হয়, মানে হয়েছিল!) বড়লোক মাসির কাছ থেকে পাওয়া তিন আনি সোনার আংটিটা

নিশিকে দিতে চেয়েছিল, সরাসরি নয়, মাত্র একটা ইঙ্গিত করেছিল। নিশি সেই ঘটনার পর দেড় মাস মাধবীর সঙ্গে দেখা করেনি।

মাধবীর কথা মনে পড়ায় নিশির ইচ্ছে হল একদিন মাধবীর সঙ্গে সে দেখা করে। দিন সাতেক হয়ে গেল মাধবীর সঙ্গে তার দেখা হয়নি, মাধবীদের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। কিন্তু ইচ্ছে হলেই একদিন সে ইচ্ছেটা পূরণ করা যায় না। এখান থেকে, শহরের এই হৃদয়স্থল থেকে শহরতলীর পাদনথের দূরত্ব অন্ততঃ সাত মাইল। পেঁছতে পেঁছতে হয়তো ইচ্ছেটা আর থাকবেই না। এই ইচ্ছে না থাকার, গত সাত দিন যাবৎ সময় না পাওয়ার আরও একটি কারণ অবশ্য আছে। মাধবীর চোখে সহানুভূতির ছায়া বড়োই বেশি। স্বাগত ভাষণটা বিরক্তজনক। কারণ দুটি চোখ তুলে মাধবী বলবে, “কিছু হল?” আর মাধবীর মা অসহ্য আরও। তাঁর চোখের প্রত্যাশাটা প্রায় হ্যাংল্যামির মত। নিশিকে তিনি খুব স্নেহ করেন, ঘরে যা থাকে তাই “নিশি তো আমার ছেলের মত” বলে খেতে দেন, কিন্তু কেন তিনি বলবেন, “অ মাধব, শুবু, শুবু বসে রয়োঁহিস,

নিশিদাকে একটা গান শোনা না?” আর তাই শুবু মূখ আরও গোঁজ করে মাথাটা ঝুঁকিয়ে মাধবী ঠায় বসে থাকবে অবশ্য ঘোড়ার মত। গায়ের ওপর বিতৃষ্ণায় ওর মনটা ভরে উঠবে।

শুবু কি এই জন্যই নিশি এই সাত দিন মাধবীদের বাড়ি যায়নি, মাধবীর সঙ্গে দেখা করেনি? না, তা নয়। আরও একটা কারণ অবশ্য আছে। মূখে তা মাধবীর কাছে কিংবা কারুর কাছেই স্বীকার করবে না। নিজের কাছেও স্বীকার করতে চায় না। তবু হঠাৎই মনে পড়ে যায়। এবং তখন নিজেকে ভীরু কাপুরুষ অপদার্থ মনে হয়। হঠাৎ নিশি বিড়বিড় করে উঠল, “না, আমি ভীরু নই, আমি কাপুরুষ নই।”

এসপ্লানেডের মোড়ে এসে ভাবল, “এবার আমি কি করব।” অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করল, “ভয়ংকর খিদে পেয়েছে, আমি খাব।” সত্যি সত্যি খিদে পেয়েছে কিনা পেটে হাত বুলিয়ে দেখতে গিয়ে দেখল হাতে কার্ডটা এখনও ধরে আছে। হাতের ডেলোর ঘামে ভিজ়ে কার্ডটা প্রায় রেঁদে-পোড়া টয়লেট সাবানের মত নবম হয়ে গেছে। এই কার্ডটা রিনটে করাও

সকাল সাঁটায় সে রওনা দিয়েছে। এখন বারোটা বাজে। কাডের মত জীবনটাও যদি মাঝে মাঝে রিনিউ করা যেত, দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে নিশি ভাবল। সেই বিরক্ত কেরানী ভদ্রলোককে নিশি আত্মীয়তার সুরেই জিজ্ঞেস করেছিল, “আশা প্রায় হারিয়েই ফেলাছি স্যার। এই নিয়ে ছ’বার রিনিউ হল। একটা ডাকও কি আমাদের আসতে নেই? অনেকেই তো পায়-টার শুন।” একটু ঠাট্টা করেই শেষের কথাটা নিশি বলোচ্ছিল অবশ্য।

ভদ্রলোক (আসলে ভদ্রলোক কিনা এখন নিশির সন্দেহ হচ্ছে) মর্ম্মান্তিক রকমের নিম্ন। উত্তর (উত্তরটা কি বলব না) শুনে নিশি বোকার মত একটু হেসে বলেছিল, “ও, তাই বটে। মানে, ম্যাট্রিকুলেটও তো পায় শুন, আমি তবু তো সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছি। পাশ করিনি, শিথি করব, মানে করার ইচ্ছে আছে।”

অনেকটা চুরি করে ধরা পড়ে যাওয়ার পর, মার খেয়ে পালিয়ে আসার মত, সে মুখে হাসির ভাবটা বজায় রেখেই (যেন একটা মজা করছিল) রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। এবং রাস্তায় বেরিয়ে এসে, রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সামনে পেছনে মোটরের তীব্র হনের মধ্যে নিবিষ্ট থেকে একটি কথাই ভেবেছিল। কেরানীর প্রমোশিস্ মানে কি? সেটা একমাত্র বিশেষ এক প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কেন? এক্ষণি, এই মুহূর্তে, আমারও কেন প্রমোশিস্ হবে না? অনেক ইচ্ছের মত এই ইচ্ছেটাও যখন নিশির পূরণ হল না, তখন নিশি হাঁটতে আরম্ভ করেছে।

কাডটা নিশি পকেটে রাখল পেটে হাত বুলোবার জন্যে। এইবার সে পেটে হাত রাখল।

ফের্দুআরির শেষ, অথচ এরই মধ্যে রোদ্দুরের তেজ আগুনে পুড়িয়ে তোলা ক্ষুরের মত। বেশ কেটে কেটে বসছে। অনেকক্ষণ রোদ্দুরে হাঁটার প্রতিক্রিয়া অথবা নিজের ভিতরের দাহের উত্তাপ ঠিক করতে পারার আগে নিশি সিঁদুলত করল, কাল রাত্তিরে আলুভাজা দিয়ে রুটি খাবার পর আজ সকালে কিছু না খেয়ে বেরিয়ে পড়া এবং এখন পর্যন্ত অর্থাৎ এই মোট পনেরো ঘণ্টা না খেয়ে থাকলে খিদে পাওয়া উচিত। সে ঠিক এই মুহূর্তে বুঝতে যদিও পারছে না, কারণ অনেকক্ষণ আগেই তার খিদেটা সরে গেছে, তবু খিদে তার পেয়েছে।

“এবার আমি কিছু খাই” এই ভেবে সে সামনের সাজানো খাবারের সোকানে গিয়ে ভরে-রাখা এক গ্লাস জল তুলে খেয়ে, জামার হাতায় মুখ মুছে রাস্তায় নেমে পড়ল। চলতে চলতে হঠাৎ তার মনে পড়ল, বদের আর কিছুই খাবার অধিকার নেই, তারা জল খেতে পারে, যেমন কোন কিছুই করার অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত, তারাই শূদ্র শিল্পের সাধনায় অধিকারী। তার বন্ধু হিমু তাই কবিতা লেখে এবং অনেকেই বলেছেন, সে-সব স্থায়ী কবিতা হবে, যদিও হিমু নিজেকে বেশিদিন স্থায়ী হবে না। নিশি ভাবল, আমিও এই পথে যেতুম, কিন্তু আমার কিছু করার এখনও অধিকার আছে আমি মনে করি, যেমন, আই-এ পরীক্ষাটা আমার দিতে হবে, এবং মাধবীর মা আমার ওপর একটা প্রত্যাশা রাখেন যেটা আমি পূরণ করতে পারি চাই না-পারি, তাতে একথা মিথ্যা হয়ে যায় না যে, আমি মাধবীকে ভালোবাসি। ভালোবাসা একটা কাজ, কিছু একটা করা। হিমু সেদিন বলছিল, যারা শিল্পী তারা যদি নিজেরা ভালোবাসা-বাসিতে জড়িয়ে থাকে, মানে, জড়ানো অবস্থায় থেকে চলে, তা হলে তারা আর শিল্পী থাকে না, শিল্পীর দরকারী চরিত্রের ‘র মোটরিয়াল’ হয়ে যায়। হিমু অবশ্য খানিকটা পাগল, কারণ কেউ আদর করেও কিছু খেতে দিলে সে “আমার খাওয়ার যোগ্যতা নেই” বলে খায় না, যদিও আমার কাছে সে স্বীকার করেছে, “না খেয়ে থাকলে অনর্ভূতির তীব্র উপলব্ধি জন্মে। তাই শিল্পীদের বেশি খেয়ে ভোঁতা হয়ে যাওয়া উচিত নয়।” খাওয়ার মর্ম্মটা বোধ হয় কোনদিনই বেচারী টের পেল না। তাই ওই ভেবেই নিজেকে সন্তুষ্ট দেয়।

এই খাওয়া অবশ্য একটা কারণ যার জন্য এই মুহূর্তে নিশির ইচ্ছে করল মাধবীদের বাড়ি যেতে, কারণ, দুপুর-বেলা গেলেই মাধবীর মা জোর করে ভাত খাইয়ে দেন, তাতে আমিষের মধুরোচক গন্ধ কখনো-সখনো থাকে, কিন্তু বাড়িতে বিধবা মায়ের সঙ্গে আলুসিঁদুল ভাত খেয়ে খেয়ে নিশি নিজেকে নাকি বিধবা হয়ে গেছে। তবু ভাগ্যিস মা বড়ীটা ছিল এবং ভাগ্যিদার অন্য ভাইবোন নেই তাই এখনও যা গেলেই জুটছে তা ঠিকই জোটে। মা টীকে বানিয়ে, ঠোঙা গড়ে এখনও ভাত আর আলুসিঁদুল ব্যবস্থাটা চালু রেখেছে; নিশিও মাঝে মধ্যে সিকি আধালি টাকা মায়ের হাতে দিতে পারে,

তাইতে শূদ্র সিঁদুল নয় মাঝে মাঝে আলু-ভাজাও হয়। টীকের বাজার খারাপ, কল-কাতার লোক এখন সন্ধ্যায় ধুনো দেওয়ার পাট তুলে দিয়েছে, গড়গড়ার চলটাও পড়তির মুখে। বরানগর থেকে বেলেঘাটা অনেক দূর, নইলে টীকে-বড়ীর ছেলে নিশিকে মাধবীরা কোনদিনই মাস্টার রাখত না এবং মাধবী ক্লাস-নাইনে উঠে পড়ায় ইস্তফা দেবার পরও নিশিকে বাড়ি ঢুকতে দিত না। অবশ্য মাধবীরাও লাট-বেলাট নয়, তার বাবাও পুরুতগিরি করে, তবু নিশিকে তারা কেউ-কেউই ভাবে। মাধবীর মা একদিন বলেছিলেন, আমার মাধুর খুব ইচ্ছে, তোমার মাকে গিয়ে একদিন দেখে আসে। যার ছেলে এমন হীরের টুকরো তিনি না জানি—

নিশি মনে মনে চমকে উঠলেও মুখে বলেছিল, সে তো ভালোই। যাবে না হয় একদিন। শুনে তিনি বলেছিলেন, যা না মাধু, যাবি যাবি করছিলি যে। বা, দেখে আয় গিয়ে, একটু বেড়ানোও হবে। ঘর থেকে তো বেরুস না, যা।

নিশি বুঝল মাধবীর মা সুযোগ দিচ্ছে। হঁ, খুবই চলাক। না হলে উপায় কি?

রাস্তায় বেরিয়ে মাধবী বলেছিল, আমার ভয় করছে, উনি যদি কিছু ভাবেন।

নিশি বলেছিল, ভাবেন মানে? আমাকে একেবারে কেটেই ফেলবেন। তোমার মার মত আমার মা অত উদার নন। ভয়ংকর কনজারভেটিব। মা মোটে পছন্দ করেন না মেয়েদের সঙ্গে মিথ্যে আমি গোলায় যাই। ধাড়ী মেয়েরা কামাখ্যার মন্ড্র জানে, জানো?

: আমি ধাড়ী বুঝি?

: অই আর কি কথার কথা, তিনি তাই বলবেন। ছেলের বিয়ে দিয়ে হাজার টাকা পণের স্বপ্ন দ্যাখে বড়ী। তোমার মার সামনে তো আর সব খুলে বলতে পারি না। বললেন নিয়ে যাও, নিয়ে এলাম। এই ফাঁকে একটু বেড়ানো হবে।

: তা হলে এখন কী করব?

সমস্যা। নিশি মেয়েদের নিয়ে এর আগে কখনও রাস্তায় বেরোয়নি, তার কেমন লজ্জা এবং গর্ব হচ্ছিল। পকেটে যথেষ্ট পয়সা থাকলে ট্যাক্স করে একটু বেড়ানো, কিংবা সিনেমায় গিয়ে বসে যেত। সে সব কিছুই হল না। শিয়ালদা স্টেশনে একটু বেড়াল, চোরা বাজারে

টুকে ফ্যানিচার দেখল, দায় করল, তার-
পর বাস্তবায়ন দাঁড়িয়ে শালপাতার ঠোঙায়
মুখনি খেয়ে বেলেঘাটা ফিরে গেল।

বেলেঘাটার পৌছে সুদিন নিশি
নিজেকে খুব দুর্বল, জ্বকম, ভীরু,
অসুস্থ ইত্যাদি ভেবেছিল, কারণ সে
ইচ্ছে করলেই ট্যাক্সি করে হাওয়া খেতে
পারে না, সিনেমা যেতে পারে না, কাজেই
মাধবীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া তার উচিত
হবে না যতদিন না সে—। ঠিক এই সময়
মাধবীর মা এসে বলেছিলেন, হয়ে গেল?
কেমন দেখাল, মাধব? যেও না, বাবা।
তালুর বড়া ভেজেছি, গরুর গরুর দুটো
মুখে দিজে যাবে।

হ্যাঁ, এই খাওয়া। খাওয়ার জন্যেই সে
এই মহাজেঁ বৈতে চাইছে মাধবীদের
বাড়ি। তা হলে এই সাত দিন সে যার্নি
কেন মাধবীদের বাড়ি? তার গড়ে কার্গটা
কী? কারণ আছে। কিন্তু এতদিনে
মাধবীও নিশ্চয়ই সেরে উঠেছে।

প্রায় দশ-বারোদিন পর, দিন
সাতকে আগে, নিশি মাধবীদের
বাড়ি গিয়েছিল। নিশি ইচ্ছে হলেই
যখন তখন মাধবীদের বাড়ি যেতে পারে
না তার কারণ প্রচুর হাটতে হয়, পা
বাধা হয়ে যায়। যৌদন বাসের পয়সা
পকেটে থাকে সেদিন অবশ্য আর হাটে
না। দ্বিতীয় কারণ, তার জামা কাপড়
ইদানিং সব সময় মাধবীদের বাড়ি
যাবার মত থাকে না, শব্দ, ময়লা নয়,
যায়ে ডিক্কে কেমন একটা ট্রাকটর গন্ধ
হয়ে যায়, কারণ তাকে চাকরির জন্যে,
না শব্দ, চাকরির জন্যে নয়, যে কোন সং
উপায়ে উপার্জন করছে সে সব সময় রোদে
জলে হাটহাটি করতে হয়। তৃতীয়
কারণ, এই বয়সেই তার দ্বিটিটা এখন
খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হয় যা নিয়মিত সে
কুমারের প্রাণে না। এক মনঃ দ্বিটি নিয়ে
কেন যেন তার মাধবীদের বাড়ি যেতে
মন চান না। এটার কোন সম্ভাব্যজনক
কারণ অবশ্য সে খুঁজে পায় না। চতুর্থ
কারণ এবং এটাও সব চাইতে বড়ো
কারণ, সে ভাবে, গিয়ে কী হবে? ওর
মায়ের সেই অতি প্রত্যাশার হ্যাংলানি,
মাধবীর মনঃ গোল্ড করে বসা, কিছু হল
কিনা জিজ্ঞাসা করে মাঝে মাঝে উত্তাপ
করা—তার চাইতে না গিয়ে একটি মেরে
এবং তার মা জামার সুপারকে ভাবছে
একথা ভাবতে ভালো লাগে এবং এই
পরিপূর্ণ সুপারকে পরিপূর্ণের ভাবাবাধি,
কাছাকাছি হওয়ার ইচ্ছা অথচ না হওয়া

অথবা না হতে পারা ইত্যাদি মানসিক
বিশৃঙ্খলিকেই বোধহয় ভালোবাসা বলে।
এঃ, নিশি ভাবল, অনেকটা হিমুর মত
চিন্তা হয়ে গেল। হিমুর সঙ্গে মিশে
হিমুর অনেক ইনফ্লুয়েন্স আমার ওপর
পড়েছে। বহুদিন হিমুর সঙ্গ দেখা
নেই, বোঁচে আছে কিনা কে জানে।

এই সমস্ত কারণেই মাধবীদের
বাড়ি যাওয়া আজকাল তাকে অনেক
কমিয়ে দিতে হয়েছে। টাকার জন্যে
তাকে হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।
এ বছরটা নষ্টই হল, সামনের বছর
তাকে পরীক্ষাটা দিতেই হবে, মাধবী-
কেও ম্যাট্রিকটা দিতে বলবে, আসলে
টাকার জন্যেই ওরও পড়া খতম হল
সেটা মাধবীর মা অত টাকার চেষ্টা
করলেও নিশি ঠিকই বোঝে, মার
টরকে-বেচা সম্বল থেকে তিন টাকা ধার
নিয়োছিল হিমুকে ধার দেবার জন্যে,
সেটা শোধ দিতে হবে, পাইকপাড়ায়
মাসিক জ্যাট টাকা মাইনের ক্রাশ থ্রির
যে ছাত্রটিকে পড়াতো এবং যার বাবার
কাছ থেকে অনেক চেয়ে চিন্তে এক
মাসের অগ্রিম টাকা নিয়োছিল, তার এই
দাদিনের বাজারের সেই একমাত্র ছাত্রটি

দিন তিনেক হল কলেরায় মারা গেছে,
কাজেই অ্যাডভান্স নেওয়া টাকার কতটা
ফেরৎ দেওয়া উচিত, অথবা আদৌ সে
টাকাটা হাতে করে ফেরৎ দেওয়া চলে
কিনা, যদি চলে তবে সেই টাকা
কোথেকে আসবে—এই সব সমস্যার
সমাধানের জন্যেই তাকে আজকাল ছুটো-
ছুটিটা বেশি করতে হচ্ছে। এই ছুটো-
ছুটির মধ্যেই মাধবীর চেহারাটা হঠাৎ
মনে ভেসে ওঠে। ওর কারণ অসুস্থ
চোখ, আবার পরকণ্ঠেই নিশির জন্যে
ওর সহানুভূতির গাঢ় ছায়াময় চোখ,
কেমন যেন কাজে কর্মে অবসাদ এনে
দেয়, তখন মাঝে মাঝে এক বেলেঘাটার
যেতে হয়, দু-চারটে কথাবার্তা বলে
অবসর ভারটা যখন কাটে, একটা
দুর্দান্ত আশার ছবি সামনে ভেসে ওঠে
তখন আবার ও ঠিক হয়ে যায়। মনে
মনে ঠিক করে একটা কিছু ওলাট-
পালাট না হওয়া তক সে আর বেলে-
ঘাটা আসবে না। কিন্তু সব ইচ্ছের মত
শেষ পর্যন্ত এই ইচ্ছাটাও সে ঠিক
রাখতে পারে না। সে তখন মনকে এই
বল্লে বোঝায় যে, ইচ্ছাটাই বড়ো কথা
এবং সেই ইচ্ছাটা পূরণের সং চেষ্টা
আরও বড়ো কথা, কিন্তু তারপরও

প্রকাশিত হল
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বপ্ন সঞ্চার

দাম—৩.৫০

রবীন্দ্রনাথ

প্রথম চৌধুরী দাম—২.০০

রজবুলি

রূপদর্শী দাম—৩.৫০

যখন যেখানে

দাম—২.৭৫

আর্ট পেপার জ্যাকেট সমৃদ্ধ



বর্তমান গোড় বঙ্গের বঙ্গের জগৎপের
পুস্তকভিত্তি লেখা উপন্যাস একটি
ভাষাবিজ্ঞান বঙ্গিনী নারীর
জীবন-সংগ্রাম এবং এক শিক্ষিত ও
সমাজ সচেতন কার্যকরী নিষিদ্ধ
স্বপ্নের বিচিত্র ক্রমসংগঠনের কাহিনী।

এই দেহ অন্য মুখ

বিমল কল দাম—৩.০০

পরম লগনে

দাম—৪.৫০

ডাঃ আনন্দকিশোর মাস্তী

আনন্দবাজার, দেশ, স্বাধীনতা প্রভৃতি
পত্রিকার, প্রশংসাধন্য পুস্তকটি
বাংলার জনাত্ম শ্রেষ্ঠ কবি শ্রেষ্ঠ
তম গদ্য-রচনা, বিদগ্ধ পাঠক
মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান

গ্রন্থ ভারত :

৪১বি, রাসবিহারী এডেন,

কলি-২৬, ফোন : ৪৬-৭৫২৯

কথা শিল্প :

১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলি-১২

১৩ই এফ, প্রিন্স গোলাম মহঃ রোড কলি-২৬

ফোন : ৪৬-৮৪৭৫

পুরণ যদি না হয় তখন মানুষের পরবর্তী ইচ্ছের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া উপায় নেই। কাজেই পুনরায় না যাবার সিদ্ধান্ত নেবার আগে সে একবার মাধবীর সঙ্গে দেখা করে আসে।

সেদিন তাই মাধবীদের বাড়ি গিয়েছিল নিশি। দরজার গলি পার হয়ে ওদের ঘরের দিকে যেতে যেতে মনে হয়েছিল বাড়িটা কেমন বিমিয়ে আছে, মনে হচ্ছে শূন্যে ঘুমুচ্ছে ক্লান্ত হয়ে। অরুণা তখন সম্পূর্ণরূপে আগের বিকেল রিকেল ভাড়াটে বাড়ির কুতারা কেউ বাড়ি ফেরেননি, ছেলেরা বোধ হয় খেলাতে বেরিয়ে গেছে কিংবা ওই রকম কিছু একটা হবে। মাধবী বোধ হয় নিশির পায়ের শব্দ চেনে, কিংবা কুকুরের মত একটা বিশেষ ঘ্রাণশক্তি আছে যার ফলে নিশি দরজার ঢোকর সঙ্গে সঙ্গাই সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আজ এল না। নিশি ওদের বড়ো ঘরে ঢুকে কাউকে না দেখে ফিরবে কিংবা ডাক দেবে ভাবছে এমন সময় মাধবীর মা ঘরে ঢুকে “ওমা, নিশি যে” বলে একটু হেসে মাথার কাপড় ঠিক করে টলটো এগিয়ে দিলেন বসতে। নিশি বসল। যেন মাধুর মার কাছেই সে বেড়াতে এসেছে!

মাধবীর মা বললেন, এতদিন আসেননি, আমরা ভাবলুম তুমি বোধ হয় চাকরি পেয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেছ। মাধবী তো সেই রকমই বলছিল, তোমার নাকি কলকাতার বাইরে যাবার কথা।

নিশির মনে পড়ল। মাধবীর প্রশ্নে উত্তর দিয়ে একদিন সে অবশ্য বলেছিল, চাকরি একটা পেয়েছে কলকাতার বাইরে, যাবে কিনা ভাবছে, মাকে ফেলে যাওয়া অবশ্য শক্ত, তবু ভাবছে। শূন্যে মাধবীর মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কারণ নিশি প্রথমেই মাকে ছেড়ে যাবার প্রশ্নে চিন্তিত, অন্য কারুর কথা ভেবে নয়।

নিশি বললে, যাবার কথা ছিল, গেলুম না। মানে, কলকাতা ছেড়ে গেলে অনেক অসুবিধে এখন। পরীক্ষাটা দেব ভাবছি। এর মধ্যে এদিকেও একটা কাজ হয়ে যাবে যাবে মনে হচ্ছে। তারপর, আপনারা কেমন আছেন? মোশামশাই, সিস্টার, মিস্টার, মাধু ওদের দেখছি না। বেরিয়েছে বাবা?

মাধুর নামটা করে নিজেকে কেমন

ছোট মনে হল। ওর কথা জিজ্ঞেস করে মাকে প্রফুল্ল না করলেই ভালো ছিল।

: মাধুর তো অসুখ।

শূন্যে নিশির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মাধুর নাকি আরার অসুখ হয়? একথা তো সে কোনদিন ভাবেনি। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে অথচ না পেরে সে বললে, অসুখ? কি অসুখ?

: কিছই বুঝি না বাবা। দিন চার-পাঁচ হল গায়ে কেমন সব গোটা গোটা বেরিয়েছে। উনি তো বলছেন হাম।

তারপর কপালে খাঁড়ার মত জোড় হাত ঠেকিয়ে বললেন, আমার কিন্তু ভয় হয় হাম নয়, মায়ের দয়া, আসলই হবে। কী যে ভয়ে আছি, তুমি একটু এসে দ্যাখো তো বাবা!

নিশির গায়ের রক্ত প্রায় জল হবার উপক্রম। গা-টা তার কেমন শিরশির করে উঠল। ইচ্ছে হল, ওই মূহুর্তে সে ছুটে পালায় এখান থেকে। পরক্ষণেই মনে হল, সে কি, মাধুকে না সে ভালোবাসে? মাধুকে সে নিশ্চয়ই ভালোবাসে, কিন্তু অসুস্থ মাধুকে কি সে ভালোবাসে? তার ওপর, এতক্ষণে তার মনে পড়ল, সে নিজেকে নেয়নি, আর এ বছর এমন বিচ্ছিরি বসন্ত হচ্ছে। নিশি বললে, ভয়ের কি? এ বছর খুবই বসন্ত হচ্ছে চারদিকে। টিকে-ফিকে নেয়নি, নিশ্চয়ই?

: হ্যাঁ, নির্যোছিল তো।

: তবে ভয়ের কিছ নেই। চিকেন পক্ক হতে পারে। বেশ গোটা গোটা, ভেতরে জল জল মনে হয়?

: মূখটা খুব ফুলেছে, বুক পিঠ ভর্তি হয়ে গেছে, মেয়ে আমার কাৎ হয়ে ছাড়া শূন্যে পারে না, ব্যথা! ঘায়ের মত, জল, এ সব তো মনে হল না। এসো না, বাবা, একটু দেখবে।

“চলুন”—নিশি ভয়ে ভয়ে উঠল, বললে, এ বছর খুব হাম বসন্ত হচ্ছে। অন্য ছেলেমেয়েদের একটা সাবধানে রাখবেন। বলে হাত দুটো সে পকেটে রাখল যেন হাতেই ছোঁয়াচের ভয় বেশি।

পাশের ঘরে মাধবীকে রাখা হয়েছে। ঘরের জিনিসপত্র যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলা হয়েছে। ধূপ-ধূনো দেওয়ায় অনেকটা পুরনো মন্দিরের

ভেতর যেমন গন্ধ বেরোয় তেমন মনে হচ্ছে ঘরটা। মেজের ওপর বিছানা পাতা, ঘন মশারির মধ্যে মাধবী শূন্যে আছে। অনেকটা শ্বেত পাথরের কবরের মত দেখাচ্ছে মশারিটা। এখনও হারিকেন জ্বালানো হয়নি, বিকেলের আবছা স্নান আলোয় মশারির ভেতর কিছু ঝিঝি ঝাচ্ছে না।

মাধবীর মা বললেন, অ মাধু, দ্যাখ কে এসেছে। মশারিটা তুলে মুখটা একটু দেখা তো, নিশি দেখুক।

মশারির ভেতরে কেমন একটা অনুমানসিক কাতর গোঙানির শব্দ বেরুল। মাধবী, এত বড়ো মেয়ে, কাঁদছে : না, আমি এ মুখ কাউকে দেখাবো না, ফুলে রাক্ষুসীর মত হয়েছে। বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি। আমি কাউকে দেখাবো না। তুমি যেতে বলো মা।

বলল, কিন্তু মশারির একটা কোণ তুলে মুখ বের করে নিশিকে দেখল। চোখদুটো জলে টলটল করছে, ফুলেছে। এক দৃষ্টি তাকিয়ে আছে। মা ‘আসছি’ বলে বেরিয়ে গেলেন, নিশি কাছে এসে মাধুর হাত ধরল, আহা বেচারী।

মাধবী বললে, নিশির হাতটা মঠের চৈপে ধরেই বললে, ছুঁয়ো না, ছুঁতে নেই। বসন্ত।

শূন্যে মমতায় নিশির মনটা ভরে গেল। বললে, ভয় কি মাধু, শিগগির সেরে যাবে। মাধবী শূন্যে কাঁদছে। মশারির কোণ গুঞ্জে ভিতরে কাঁদছে।

মা এলেন। নিশি বললে, ভাববেন না, মাসিমা, ভয়ের কিছ নেই।

: তাই বলো, বাবা। ভয়ের যাতে কিছু না থাকে সেই কথাই বলো। আমি তো ভেবে অস্থির। মেয়ের আমার বারো বছরে অসুখ করে না, এত ভালো মন, তারই কি না এই শাস্তি। বসো তুমি, বাবা, চা খেয়ে যাবে।

রাস্তায় বেরিয়ে নিশির প্রথমেই মনে হল মাধবীর মা শূন্যে নির্যো নয়, মহা-নির্যো। আমাকে ওঘরে নিয়ে গেল। চা-জলখাবার খাইয়ে দিল। অথচ এদিকে আমি আবার টিকে নিইনি। আজই টিকেটা নেওয়া দরকার। কর্পোরেশন অফিসের চাকরুলো

বিচ্ছিন্ন ভেঁতা, কোন হসপিটালে গেলে হয়।

তারপর থেকে বেলেঘাটা সে আর যায়নি, মানে যেতে হচ্ছে হয়নি, ভয় হয়েছে। যদিও এটা-সে কারুর কাছে স্বীকার করবে না, নিজের মনের কাছেও নয়, তবু এখন মনে হচ্ছে এ-ও বোধ হয় একটা কারণ। কিছুক্ষণ আগেই তার মাধবীকে দেখতে খুব হচ্ছে হচ্ছিল, এবং আজই একবার মাধবীদের বাড়ি যাবে ভাবছিল, এখন মনে হল, আজ অনেকগুলো কাজের চাপে সে জড়িয়ে পড়বে, কিছু টাকা জোগাড় না করলেই নয়, কাজেই হয়তো বেলেঘাটা যাবার সময় আর পাওয়া যাবে না। এই তো সাত দিন আগে গিয়েছিল, এখন আবার যাওয়া কি। আর দিনকতক শাক, মাধবী সেরে উঠুক, তারপর যাবে। মাধবীকে সে ভালোবাসে, কিন্তু তাই বলে ফুলো-মুখো বসন্তওয়ালা মাধবী--নাঃ, সেদিন ওর ঘরে যাওয়া, চা-পেরোটা খাওয়া উচিত হয়নি।

নিশি ভেবে দেখবার চেষ্টা করল, ভালোবাসা কতগুলো শতের সমষ্টি, সেখানে প্রয়োজনের “মার্জিনাল ইউটিলিটি” মনের মধ্যে কাজ চালায় এবং পোষালে মন সায় দেয়, নইলে কেটে পড়ে। যুক্ত-বসন্ত মাধবী এবং বি-যুক্তবসন্ত মাধবী ইউটিলিটি বোধে অবশ্যই হের-ফের ঘটায়। হিমুর বাড়ি যতই কাছে এগিয়ে আসছে, নিশির মনে হল, ততই সে হিমু হয়ে যাচ্ছে। হিমুটা বসে বসে কী সব কবিতা লেখে আর ভেবে ভেবে এমন অশুভ সব থিয়োরী বের করেছে যার আধেক বৈজ্ঞানিক, আধেক ষাট না। কালে নিশিই ও একটা কেউকেটা হবে।

বন্ধু ওস্তাগার লেনের খুঁপিরিতে যখন সে মাথা গলাল তখন মাথাটা ঘেঁষে গেছে। পানের দোকানে দেখেছে একটা বাজে। ভয় ছিল কবি আছে কিনা কে জানে। মাথা গলিয়ে দেখল কবি উবুড় হয়ে বসে হাতের দুই তেলোয় খুঁতান রেখে দুলে দুলে কী মন্থত করছে। দেখে শুনে নিশি ডাকল, হিমি আছিস? টাকা কটা দে। দুলে দুলে কী মন্থত করছিস? কবিতা?

ঘাড় ফিরিয়ে হিমানীশ দেখল নিশিকে। তারপর এক গাল হেসে বললে, নিশিচন্দ্র যে। এসে বাবা ভেতরে এস, চটি জোড়া নিয়েই এসে, মন্দির

নয়। তারপর, বাবা নিশিচন্দ্র, হঠাৎ দুপুরে উদয়?

নিশি ঘরে ঢুকে আড়মোড়া ভেঙ্গে বসে মুখ চোখ কুঁচকে বললে, তার মানে হল, বাবা হৈমরাণী, কবিকুল-তিলক, আমার টাকা কটা দাও? এক মাস হতে চলল, এমন তো কথা ছিল না? কবিতা লিখে তুমি এখন টাকা পাচ্ছে, সলভেন্ট পার্টি। খবর রাখ।

বিড়ি খা। আদার ব্যাপারী, এ সব জাহাজের খবরে মাথা গলানো কেন? গত তিন মাসে দেখেচিস কেসথাও একটা লেখা?

“হুম্”। নিশি বিড়ির ঠোঁটে ফুঁ মেরে ল্যাঙ্গটা দাঁতে চেপে ধরল। দেশলাইয়ের আগুনের দিকে টারায় চোখে তাকিয়ে শেষ করলে, “স্লাম পিরিয়ড?” লেখা ছেড়ে তাই বন্ধি এখন মন্থত ধরেছ” বলে আড় চোখে বইটা দেখে বললে, “নোট” মন্থত করছিস, ব্যাপার কিরে হৈমবতী, তুইও শেষে—অ্যা নোট—?

কথাটা শেষ হল না। হিমানীশ হাসল। “স্লাম পিরিয়ড। তাই পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলছি, দু মাস থেটে যা হয় আর কি। ব্যাটা নিশিকান্ত, তুমি কি জানো, কবি হিমানীশ কবিতা ছেড়ে কালোয়ারপটির সখারাম দাসের সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লিখে পণ্ডাশ টাকা উপার্জন করেছে?”

আমার টাকাটা দে। তুই তবু আত্মজীবনী লিখে দিতে পারিস, আমার অবস্থাটা বোঝ, শব্দ টাইটান আর কুলি—যাগগে, শব্দ ওই ভরসা। তাও ছাত্তরটি শব্দ রে, অকালেই সেদিন মারা গেল। টাকা তিনটে দে। ওর সঙ্গে

আরও পাঁচটা টাকা দিস, পরে দেব। পরীক্ষা কবে?

সতেরই বৃদ্ধবার, আর ষোলটা দিন। লোক হাসাবো।

টাকাটা দে। চালি।

হঠাৎ গম্ভীর যে? ফিরাসির সঙ্গে বগড়া বন্ধি?

বাজে বকসিনি টাকা ছাড়, আবার দৌড়তে হবে। বিনা ক্যাপিটালে ব্যাটা কবিতা লেখো, আত্মজীবনের আত্ম-জীবনী বানাও, কত ধানে কত চাল, তুমি তার বন্ধবে কি? ওঠ, টাকাটা দে। পরীক্ষার পরে আসবো, অনেক কথা আছে। দেবী করিসনি হিমি, ওঠ ভাই।

মাধুর খবর কি?

জানি না, তুই টাকা দে।

তুমি একটি আস্ত বন্দু। আমিই তোর কাছে টাকা চাইতে যাবো ভাব-ছিলাম। অ্যান্ডিন ও টাকা থাকে? কবিতার বই বেরুতে এখনো ছ’ মাস। প্রেসে দিয়ে এলুম কুড়ি টাকা, পরীক্ষার ফি দিয়েছি। তারপর থেকে তো গোঁরী পেনের টাকায় চলছে। তোর কাছ থেকে তিন টাকা নিলুম, ধীরেনের কাছ থেকে সাত, নীতার কাছ থেকে পাঁচ, আখতারের কাছ থেকে—

খাম হয়েছে। তোর বন্ধুভাগ্য ভাল। আর আমার ভাগটা তোকে দিয়েই বন্ধুতে পারছি। সত্যি হিমি, টাকার খুব দরকার রে। সেদিন প্রফেসর চৌধুরীও ঠকালো। কেবল ঠকছি।

প্রফেসর চৌধুরী? হিতেন চৌধুরী? তোকে ঠকালো? মানে?

পরে একদিন বলব। পারিস তো

অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের জন্য
আমাদের আর একটা নতুন কেন্দ্র

৭নং পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা—১

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এর্ভিনিউ, কলিকাতা—১২

টাকাটা জোগাড় করে রাখিস। পরীক্ষা কবে থেকে বললি?

সতেরই। নে, বিড়ি খা। এই রোদে এখনি বেরাচ্ছিস? আনা কয়েক দেব?

না।

নিশি বেরিয়ে এল। সতেরই থেকে পরীক্ষা। কথাটা মাথার মধ্যে চরিকর মত পাক খেয়ে গেল। ফিরে এসে বললে, আচ্ছা, আনা চারেক পরিসা দে তো, হৈমবতী।

উঃ জদালালি।

ড্রামে উঠতে গিয়ে এবারও ড্রামে উঠল না নিশি। থাক, এইটুকু তো রাস্তা। হেঁটেই মেরে দেব। পরিসা কটা জমুক। সতেরই পরীক্ষা শব্দ। বৃদ্ধবার। ষোল দিন। নাঃ আজই যাওয়া দরকার। “বিলম্বে হতাশ হইবেন” বিজ্ঞাপনের ভাষা মনে পড়ল নিশির। আজই যাওয়া দরকার।

নিশি পা চালালো। হিমোটাও শেষে পরীক্ষা দিচ্ছে। হিমে টাকা জোগাড় করতে পেরেছে। ওর বন্ধবান্ধব আছে, কলম আছে। আমার শব্দ মাধু আছে। মাধুকে নিয়ে আমি কী করব? অসহায়, করণ মাধু। আমি নিজেকে অসহায়, মাধু আবার সেই আমাকে সহায় চায়। মাধুর মা তাঁর মেয়েকে গছাতে চায় আমার কাঁধে যে কাঁধ দুর্বল, নিস্বেজ, নিজেকে ঠেকা চায়। সব মানুষই অসহায় একা একা। দুটো অসহায় মানব একত্রে কিছটা সহায় পরস্পরের। হায় রে! ভালোবাসার মানে? ভালোবাসার মানে পরস্পরের কাছে নীরব সহায়তা প্রার্থনা। যেখানে তাঁর প্রতিশ্রুতি নেই সেখানে ভালোবাসা উবে

যায়, অধিকতর সহায়তার প্রতিশ্রুতি যেখানে বিকাশের আর প্রতিষ্ঠার, ভালোবাসা সেনিকেই এগিয়ে যায়, যাবেই। মাধু আমার কাছে সহায়তা চায় আমি মাধুর কাছে। তাই আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি কারণ এই সহায়তা এতটা সহায়তা, এখনো ভিন্নতর কেউ দিতে পারে না। এই সহায়তার প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করতে হবে, দুর্বল কাঁধকে শক্ত করতে হবে, চাকরি চাই, পরীক্ষা দিতে হবে, টাকা চাই, সং উপার্জনের টাকা, টাইশনের বাজার কড়া। গ্র্যাজুয়েট, এম-এ-র আমার প্রতিশ্রুতি হায়রে। আমি দালালি করেছি, বর্ণা হয়েছে, কুলিগিরি, হ্যাঁ কুলিগিরি করতে চেয়েছি, পারিনি। পারা যায় না। আমি চেষ্টা করছি পারিনি। পারা যায় না।

দ্রোণাচাঁপ বলেছিলেন, কী দেখছো। একটা পাখি। ব্যর্থ। সরে যাও। তুমি কী দেখছো। পাখির মাথা। ব্যর্থ। সরে যাও। অজুন, তুমি কি দেখছো। একটা চোখ, গুরুদেব। হ্যাঁ, তুমিই পারবে।

আমি তেমনি যাত্রীদের বুক দেখিনি, মুখ দেখিনি। পেটে ফাস লাগানো বোঁড় জল কাদা গিয়েছে চম, খেতে খেতে এসোচ্ছে। গলিয়ার দাঁড়-লোটা, হোল্ডিউল, বালতি সাটকেস কুলিদের কাঁধে পিঠে কব্জিতে মাথার। আমি পারিনি। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। দুঃখটা। পারিনি।

দামা ট্রাউজারের পাশে ছোট হোল্ড-অলটি অসহায়ভাবে দুলছে। কুলি নেই। আমি এক পা পৌছিয়ে এসে ছুট লাগিয়েছি। আমার দিন সার, ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে। একটা পা চালিয়ে সার। ছুট, ছুট।

ফাস্ট ক্লাস কীমরা। গুলো গুলি নেই। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল নিশি।

থ্যাক য়, মাই বয়। ভাগ্যিস তুমি ছিলে। আদারওয়াইজ, আউট্রাভ মিসড্ দ্য ট্রেন।

ট্রেনের হুইসল দিয়েছে। চোখ তুলে তাকাল নিশি। প্রফেসর চৌধুরী। ভাড়া নেবার জন্য প্রসারিত ডান হাতটা মড়ার খুলির মত চকচকে বুটের উঁগায় চলে এলো। ধুলো নেই। আঙুলের ডগা মাথার দিকে তুলল, ঠেকাল না। বাইরে বেরিয়ে সাবান দিয়ে ধুতে হবে।

কাজকে সি-অফ করতে এসেছিলে? — প্রফেসর সিগারেট ধরালেন।

মুখে-চোখে বিষমতা এবং তৃপ্তি। ইকনমিস্টের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট— তৃপ্ত। ডক্টরেট পাননি—বিষমতা।

মিথো কথা বলব না, বলব না, বলব না। তবু নিশির ঠোট দিয়ে বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ, সার, দাদাকে।

খুব রুপ্ন মনে হচ্ছে, অসুখ নাকি?

চাকরির চেষ্টা। চাকরির চেষ্টায় ছোটাইটি করছি, তাই।

আনএম প্লয়মেন্ট? সেইটেই তো সব-চাইতে বড়ো অসুখ হে। নাউ গেট ডাউন, গেট ডাউন, মাই বয়, দি ট্রেন মুভ্‌স।

চলন্ত ট্রেন থেকে, খালি হাতে, লাফিয়ে নেমে পড়ল নিশি। পরের দিন একজন পোটার জিজ্ঞেস করেছিল, ক্যা বাবু, কালকা লাইসেন্স বা?

বিনা লাইসেন্সে সব কাজই অপরাধ। সবাই লাইসেন্স, অধিকার-ভেদ। মতুর জন্যও একদিন লাইসেন্স লাগবে। জন্মের জন্যও।

তারপর আর যায়নি নিশি। একটা লাইসেন্সের চেষ্টা করলে হয় ভেবেছিল। কাকে পাকড়াবো?

প্রফেসর চৌধুরী আমাকে ছ' আনা ঠকিয়েছিলেন। তিনি একবারও আমার নাম বলেননি, নাম জানেন না। মুখটা এখনও চিনে রেখেছেন, কারণ একদিন আমাকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছিলেন। আমি কোন দিনই তাকে ক্লাস থেকে বের করে দিতে পারব না।

কলেজের গেটে এসে নিশি একটা দাঁড়াল। দরজা জানলা বন্ধ। অফিস খোলা। প্রফেসর ব্যানার্জিই একমাত্র চেনেন তাকে।

প্রফেসর ব্যানার্জি আছেন, পারি-তোষ ব্যানার্জি?

হোস্টেলে।

ঐ। ধনীবাড়ি।

পারিতোষবাণ, সবে দুপরের ঘুম থেকে উঠছেন তখন। বাংলার অধ্যাপক। সোম্য, ঋষিতুল্য চেহারা। নয়নাভিরাম রূপ, বোধ হয় প্রাণায়াম করেন। এত ব্যয়স এখনও রয়সের ছাপ নেই চেহারায়। কথা বলেন মিষ্টি ভরপুর, যেন নানিমূল থেকে শব্দ উঠে আসে, রেক কুন্ডক করার অভ্যাস আছে মনে হয়।

কি গো, কি খবর? গতবার তো

জানতকি? নানিহোনের অন্যতম কারণ ধোয়া কিন্তু রান্নাঘরের বিরক্তি কই ধোয়া থেকে আঁতড়াইজেই আপনাকে রেখাই দিতে পারে একমাত্র বাজারের দেয়া...

থুইথু

সব রকম রান্নার জন্য

—কেবোসিন-সুকার—

জিফিবিউটিস

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং

১৩৩, ১৩৬ চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকতা

• দি ইণ্ডিয়ান ট্রেডার্স •

পরীক্ষা দিয়েছিলে? কোন কলেজে
আর্ডমিনশন নিয়েছো?

প্রশ্ন করে নিশি বললে, পরীক্ষা
দিইনি স্যার।

: এবার দিচ্ছ?

: না।

: তবে?

: পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছি স্যার।

: ছেড়ে দিয়েছ? চাকরি করছ?

: খুঁজছি, স্যার।

পরিতোষবাবুর মুখটা বিষম হল,
একটু গম্ভীর দেখাল। চূপচাপ।
নিশি ভাবল, এখানেও প্রার্থী হওয়া যায়
না। যেখানে আমি শুধুমাত্র বিদ্যার
প্রার্থী হতে পারি, অর্থের প্রার্থী হতে
সেখানে বাঁধে, সম্পর্ক কেটে যায়। লেট
মি গো ব্যাক।

: কি গো, কি দরকারে এসেছো
বললে না? বলো।

: স্যার, পরীক্ষা তো সতেরই আরম্ভ
হচ্ছে। আমার একটা উপকার করে
দিতে হবে।

: বলো।

: আমি গার্ড হতে চাই। আপনি
একটু বলে দিলেই হয়ে যায়। এটা
করে দিতেই হবে। দিনে তিন টাকা
করে পাব, আমার অনেক উপকার হবে।

: তুমি এক কাজ করো। নিবারণদার
কাছে যাও। একটু দুমুখ, কিন্তু
লোক ভালোই। আমার কথা বোলো,
তা হলেই হবে।

: আচ্ছা, স্যার।

তাহলে হবে। নিবারণবাবুকে
গিয়ে ধরল নিশি লাইব্রেরী রুমে।
পরীক্ষার রুটিন-ওয়াক ঠিক করছেন।
হেড ক্লার্ক। বছর পঞ্চাশ বয়স। সুতোয়
বাঁধা চশমার ফ্রেমের পাঁচিল ডিঙিয়ে
তাকালেন নিশির দিকে : তুমি পরি-
তোষের লোক? পরিতোষকে গিয়ে
বলো লোক নেওয়া হয়ে গেছে। ফের
যেন সে কাউকে আমার কাছে না পাঠায়।
বুঝেছ?

শুনে মাথা গরম হয়ে গেল নিশির।
ষোল দিন আগেই সব লোক নেওয়া
হয়ে গেছে? আশ্চর্য। কিন্তু মাথা
গরম করলে লাভ নেই। পদে অধি-
ষ্ঠিত নিবারণবাবু। তাঁর হাতেই সব
ক্ষমতা। ক্ষমতাবলের সঙ্গে সমকক্ষ না
হলে লাড়াই করে কি লাভ? সবিনয়ে
তাই সে বললে, পরিতোষবাবু বললেন
তাঁর নাম করলেই হয়ে যাবে।

: কেন বাজে বকাছো? পরি-
তোষটা জানে কি? পরীক্ষা কন্ডাক্ট
করছে কোন দিন? এ দু'পাতা
বই পড়ানো নয়। কুড়ি দিন
আগেই নাম সব এনালিস্ট হয়ে যায়,

আপয়েন্টেড ভিজিলেটরদের নামে কার্ড
চলে গেছে। পঁচিশ তিরিশজনকে
এরনিই বাদ দিতে হয়েছে। তার মধ্যে
এম-এ, বি-এ-ও অনেক আছে, তুমি
তো-যাও এখন। বিরক্ত কোরো না,
বাপদা।

নিশি ভাবল, এটা আমার একটা
অভিজ্ঞতা। আমার দারিদ্র্যের বেতন।
কিন্তু এখানেও এমন ভিড় জানতুম না।
আমি পরীক্ষা দিতে চেয়েছি। পারিনি।
পরীক্ষার দরোয়ান হতে চেয়েছি,
পারিনি। বাঁচতে চাইছি, পারব না।
পারব না? আমাকে পারতেই হবে যে,
স্যার। এই আমি। পরীক্ষা। মাধবী।

পরিতোষবাবু সব শুনে বললেন,
আজকাল ভয়ঙ্কর রাশি হয়। ভেরি
স্যাড। তুমি সিক্ বেডে গার্ড দিতে
পারবে? মানে, ভয় করবে না তো?
এবার ভয়ঙ্কর পঞ্জ হয়েছ, সিক সেন্টার
থাকবে কলেজে। দ্যাখো, ভেবে দ্যাখো।
রিস্ক আছে অবশ্য। না, না, তাড়া-
হুড়ো করার দরকার নেই। যদি মন-
স্থির করতে পারো নিবারণদার কাছে
নামটা লিখিয়ে যেও। কেমন?

নিশি রাস্তায় নামল।

সিক্ বেড। বসন্ত। টাকা চাই।
ভয়। আমি ভয় পাচ্ছি? আমি কি
ভয় পাচ্ছি? আমি বাঁচতে কি ভয়
পাই? না, আমি ভীরা নই, আমি
ভীরা নই। ভীরা হলে আমার চলে
না, স্যার।

দ্রুত পায়ে আবার গেল সে নিবারণ-
বাবুর কাছে। এবার যোগ্যতা নিয়েই।

: সিক সেন্টারে গার্ড দেবো, আমার
নামটা লিখে নিন, স্যার।

: পঞ্জ হয়েছিল?

: না।

: এটা কি ইয়ার্কির জায়গা?

: পরিতোষবাবু যে বললেন।

: পরিতোষ তের বছর দু'পাতা
পিড়িয়ে বাংলা ডিপার্টের হেড হয়েছে এই
সেদিন, আমি তেরিশ বছর পরীক্ষা
কন্ডাক্ট করছি, আমার চাইতে বেশি
জানবে সে? আঁ? সে বেশি
জানবে? পঞ্জ হলে এসো। যেমন গুরু,
তেমনি তার চালা। অমানুষ।

নিশি শুনে খুব খুশী হল।
তা হলে কাজটা আমার হচ্ছে। আমি
টিকে নিইনি। পঞ্জ হলে এসো।
কিন্তু মাধবী কি রাজী হবে? আমি
ভীরা নই। ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে
গো। মাধু, আমার খুব খিদে
পেয়েছে। মাধু এখন কি করছে?
মাধু কি রাজী হবে? টাকার খুব
দরকার। আঃ চাকরিটা হচ্ছে। চাকরি।

শিয়ালদা পেঁছে বেলস্বাটার বস
ধরল নিশি। মাধবীদের বাড়ি যখন
পেঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যা। আঃ, একটা

কাজ হচ্ছে দেখে কী আরাম লাগে।
কাজটা তা হলে হচ্ছে আমার।

মাধবীর বোধ হয় কুকুরের মত ঘ্রাণ-
শক্তি আছে। দরজায় দেখা দিল। ফর্সা
মুখে ছাকনির ফুটোর মত বসন্তের
শুকনো কালো চিমাড়ি ভর্তি।

নিশির মনে হল, তারায় ভরা
আকাশ। চোখ দুটো ম্লান, রুদ্ধ চুল,
শুকনো ঠোঁট।

: এতদিনে বুদ্ধি সময় হল?

: হুঁ।

মাধবীর চোখে টলটলে জল। অভি-
মান হয়েছে। ঘাড় গুঁজে নিশির পিছ-
পিছ ও ঘরে এল।

: একটা লোক মরল কি বাঁচল সে
খবরে বুদ্ধি কারুর দরকার নেই?

: মাধু, একটা কাজ বোধ হয় হচ্ছে।
তোমার কাছে একটা জিনিস চাইবো,
দেবে? কোনদিন চাইনি।

মাধবী তাকাল নিশির দিকে। তার-
পর নিজের আঙুলের আঙটির দিকে।
নিশি মাধুর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে
চাপ দিল। সেই চাপে মাধবীর হাতের
পিঠে বসন্তের কালো চিমাড়ি একটা
চিড় খেল। মাধবী কাঁপছে থেকে
থেকে। যদি রাজী না হয়, তা হলে?
তা হলে জোর করেই—

মাধবীর মা ঘরের চৌকাটে পা
দিলেন। নিশি মাধুর হাতটা ছেড়ে
দিল। মাসিমা সরে গেলেন। সুযোগ
দিতে চান। নিশি বোঝে। তবু সে-ই
সুযোগ নেয় না। কারণ সে সং থাকতে
চায়। এবং সুযোগ দিচ্ছে শুকলে
আগ্রহ ফরোয়, বুঁচি থাকে না।

: মাসিমা, চা খাবো।

মাসিমা ফিরলেন : পরোটা ভাজছি।

: চমৎকার।

: আহা, মেয়ে যেন সঙু। নিশিদা
ঘামছে, পাখা দিয়ে একটু হাওয়া করতে
পারিস তো। কত শেখাবে? দাঁড়িয়ে
আছে যেন ছবি। বসে বাতাস কর।

মাধবীর মা চলে গেলেন।

নিশির খরাপ ধাগল। মনে হল
ছুটে পালায়। এই জন্যেই মাধবীদের
বাড়ি সে আসে না। মাধবীর মার
হ্যাংল্যাম এত প্রকাশ্য এবং নিচু যে
মাঝে মাঝে তার ঘোরা করে। কিন্তু
মাধবী আর মাধবীর মা এক নয়। মার
কথা শুনে মাধবী আরও সরে গেল এক
হাত। কঠিন চোখে, মাটির দিকে
তাকিয়ে রইল। পাখা ছল না।

: আপনি আর আমাদের বাড়ি
আসবেন না।

: বেশ, আসবো না। আমি যে
একটা জিনিস চাইলাম।

: বলুন?

বলে উত্তরের আগেই আঙুল থেকে
আঙটিটা খোলার চেষ্টা করল মাধবী।

ঃ না, আংটি নয়। আগে বলো দেবে?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তোমায় একটা চুমু খাব?

চোখ তুলে তাকাল মাধবী। গভীর দৃষ্টি চোখ, শান্ত, নিজনি।

ঃ বলো?

ঃ না। হঠাৎ? এমন ইচ্ছে?

ঃ এমনি।

চুপচাপ। মাধবীর মা পরোটা চা নিয়ে এলেন। নিশি খেল। তারপর

উঠল : চল, মাসিমা।

ঃ আবার এসো।

মাসিমা কাপ প্লেট নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

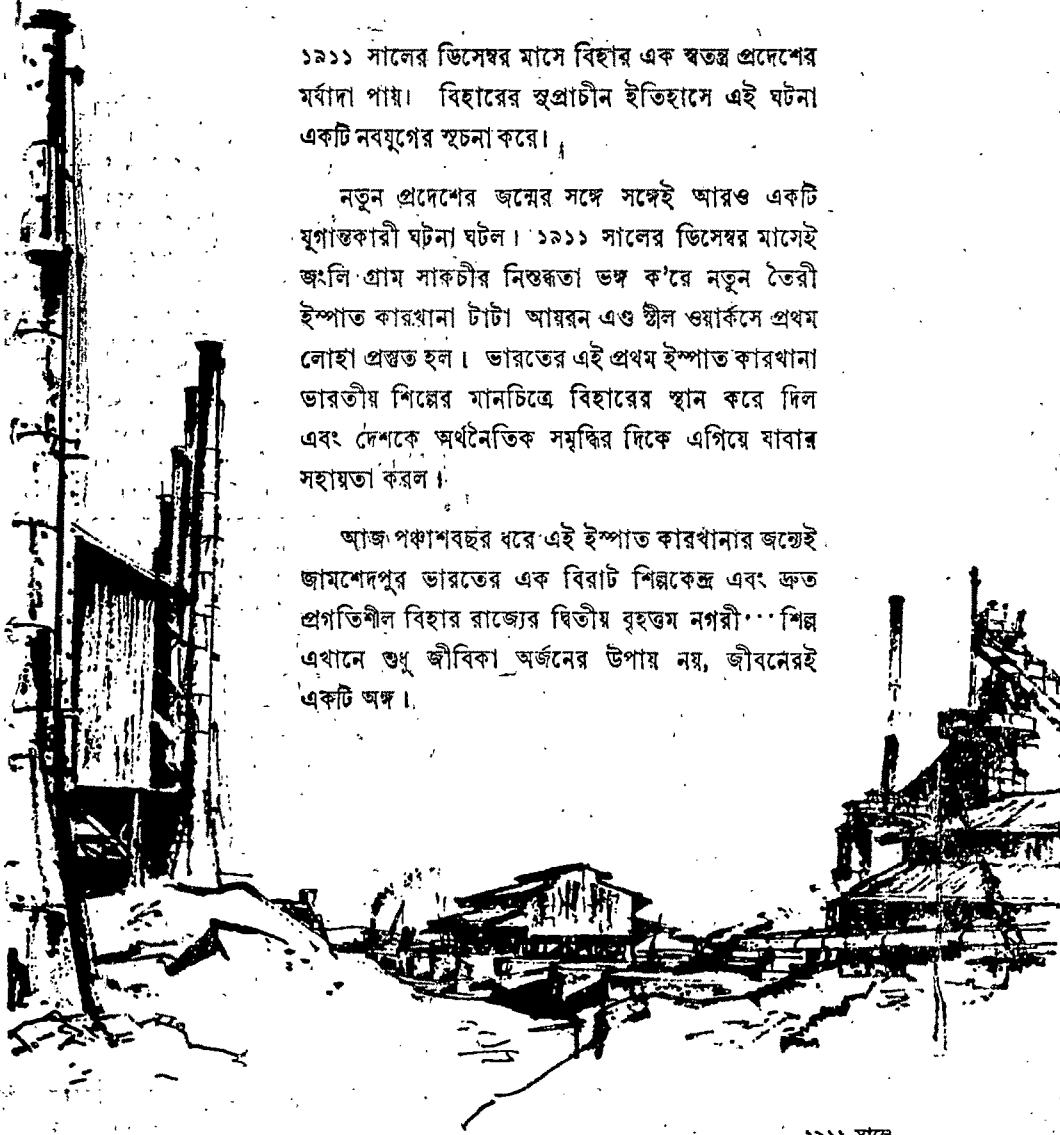
নিশি মাধবীর দিকে চাইল। মনে মনে ভাবল, আমি জানতুম আমি জানতুম, মাধবী এই কথা বলবে। কিন্তু আমার যে উপায় নেই। চুমু আমি

শুভ সূচনা

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিহার এক স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা পায়। বিহারের সুপ্রাচীন ইতিহাসে এই ঘটনা একটি নবযুগের সূচনা করে।

নতুন প্রদেশের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসেই জংলি গ্রাম সার্কটীর নিশ্চিন্ততা ভঙ্গ করে নতুন তৈরী ইস্পাত কারখানা টাটা। আয়রন এণ্ড স্টীল ওয়ার্কসে প্রথম লোহা প্রস্তুত হল। ভারতের এই প্রথম ইস্পাত কারখানা ভারতীয় শিল্পের মানচিত্রে বিহারের স্থান করে দিল এবং দেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে বাবার সহায়তা করল।

আজ পঞ্চাশবছর ধরে এই ইস্পাত কারখানার জেতেই জামশেদপুর ভারতের এক বিরাট শিল্পকেন্দ্র এবং দ্রুত প্রগতিশীল বিহার রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী... শিল্প এখানে শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, জীবনেরই একটি অঙ্গ।



জামশেদপুর ইস্পাত নগরী

১৯১১ সালে
টাটা স্টীল ওয়ার্কসের
একটি দৃশ্য

খাবই মাধু, তুমি বাধা দিলেও খাব।
খেতে আমাকে হবেই।

নিশি তাকাল মাধবীর দিকে।
বললে, সদর পর্যন্ত এগিয়ে দেবে না,
মাধু?

ঃ চলুন। আবার কবে আসবেন?

ঃ এই যে তুমি বললে, আমাদের
বাড়ি আর আসবেন না?

ঃ আপনার ইচ্ছে। মাধবীর মুখ
শুকলো, বললে, আমি এ বাড়িতে থাকব
না, একদিন কোথাও পালিয়ে যাব।
ঠিক। মার কাছে আর থাকব না।
চাকরি করব।

ঃ ছিঃ, মার ওপর এমন রাগ করে?
অতিষ্ঠ হয়ে বলেন ও-সব। দোষ তো
আমারই। আমিই তো হ্যাঁ-না কোন
আম্বাস দিইনি, দিতে পারিনি। তাই।

মাধবীর চোখের জল মুছিয়ে দিল
নিশি রুমালের খুঁট দিয়ে। ওর হাতটা
ধরল। বসন্তের চিমাড়িগুলো কেমন
খরখর করছে মাছের শৃকনো আঁশের
মত। আর পারল না মাধু, নিশির
গলা দু' বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল, বুকে
মাথা রেখে কণ্ঠায় নাকটা ঘষল। চামড়াটা
খরখর করছে। নিশি মাধবীর
অমাবস্যা-তার-ভরা-মুখটা দু' হাতে
তুলে ধরে চুমু নয়, ওর জিভটিকে একে-
বারে লেহন করে এক দলি থুতুই গিলে
ফেলল চোখ বুজে। জীবনে কারুর
ঠোঁটে এই প্রথম চুমু খেল নিশি। মুখটা
বিস্বাদ লাগছে। বড়ো বিস্বাদ।
জীবনের প্রথম চুম্বন।

বাইরে এসে থুতু ফেলল। ডাবল
আর পনেরো দিন, না মোল। কদিন
পরে বেরবে? জানি না। একজন
ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করব। সাত দিনের
মাঝে সারবে কি? দশ দিন? জিজ্ঞেস
করব। চাকরিটা হচ্ছে তা হলে?
টেম্পোরারি। হোক টেম্পোরারি। অনেক-
গুলো আছে—আই-এ, বি-এ, বি-কম,
—তর্দানে একটা কিছু হবেই। আর
একটা ভালো কিছু।

ঃ সাবধানে থাকবেন। শত্রুদ্বার
সময় ভয় নেই, ঘা-পুজ চাটলেও কিছু
হয় না। শত্রুদ্বার সময় ওই চিমাড়ি
ওতে বীজ থাকে, নিশ্বাসের সংগে
টোকে, সংক্রমণ হয়। সেই সময়টা
সাবধান।

ঃ সংক্রমণ হলে কতদিনে বেরোয়—
মানে, গুটি?

ঃ একশ দিনের মধ্যে। তবে সাত-
দিনের আগে নয়। ঘরে লোশন
ছটিয়ে দেবেন, ধূপ-ধনো দেবেন। খুব
খুশী হয়েছি, আপনি জানতে এসেছেন।
এই তো চাই, কেননা অজ্ঞতার জন্যই
বিস্মৃত বেশি-ছড়ায়। আমরা কর্পো-
রেশনের লোকেরা এই চাই, এই
অনুসন্ধান—

ঃ চলি, ডাক্তারবাড়ি, দরকার হলে
আসব—আবার আসব।

আঃ! তাহলে চাটলেও কিছু হয়
না। বাটলুন। আমি কি পাগল হয়ে
গিয়েছি, নতুবা এভাবে—ইস্! কিন্তু
চাকরিটা? চাকরিটা তো হত!

বিস্বাদে মনটা ভরে গেল।

বসন্তা, জীবনে বসন্তা। বিছানাতা
চিতা। জ্বলছে। পিঠ রাখা যায় না।
কি করে হল? আমার? এবং মাধু?
মাধুকে কে ছোঁয়া দিল?

নিশি তার যৌবনে বসন্তের পলক
নিম্নে আছে অঙ্গে, তার জীবনে। আর



মাধবী কাঁপছে থেকে থেকে। যদি রাজী না হয়.....

ছাঁদনের মাথায় ওরা বেরুল—তপ্ত
বাতির খোলায় ফোটা খইয়ের মত, সারা
গা মুখ ছেয়ে। সারা আকাশ জুড়ে
নক্ষত্রের মত।

দু'দিনেই মনে হল, কে যেন নখ
দিয়ে আঁচড়ে কামড়ে তাকে রক্তাক্ত করে
দিয়েছে। আমার যৌবনের বসন্ত। বুকে
পিঠে মাথায় বসন্তা। এই শরীরে

টীকে-দিউনী মায়ের বিছানায় শুয়ে
ভাবছে এতক্ষণে এত সব যার জন্যে সেই
পরীক্ষা শেষ হয়ে এল। মাধু এবার
ফুল নিয়ে আসবে। জুই ফুল।
অঙ্গেও তার জুই ফুল আঁকা। এখন
তখন সব সময়। কোমল এবং থর
এই আল ওই—দুই বসন্ত।

।। চারটি চিত্র-প্রদর্শনী ।।

জানুয়ারী মাসের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে কলকাতার চারটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। পাক' স্ট্রীটের আর্টিস্ট হাউসে শ্রীমতী মাধুরী গুপ্ত ও শিল্পাঞ্জলী নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ক্যাথেড্রাল রোডের আকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে শিল্পী রবীন মন্ডল-ও পাক' ম্যানসনের আর্টস এন্ড প্রিন্ট গ্যালারীতে শিল্পী প্রকাশ কর্মকার তাঁদের চিত্রকলার নিদর্শন নিয়ে কলারিসকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত দুটি ছিল একক চিত্রকলার প্রদর্শনী, দ্বিতীয়টিতে ঘটেছিল সাতজন শিল্পীর বিচিত্র সমাবেশ। এবার একে একে আমরা চারটি প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাঠকদের কাছে পরিবেশন করছি।

।। শিল্পী শ্রীমতী মাধুরী গুপ্তের একক প্রদর্শনী ।।

আর্টিস্ট হাউসে শ্রীমতী মাধুরী গুপ্তের প্রদর্শনীটি ১৭ই জানুয়ারী থেকে ২৪শে জানুয়ারী পর্যন্ত চলেছে। এটিই শ্রীমতী গুপ্তের প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী। ইতঃপূর্বে এই শিল্পী করেকটি সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে পড়ছে। সেই অনেকের ভিড়ে হারিয়ে-যাওয়া শ্রীমতী গুপ্তের ৫০টি চিত্রকলার নিদর্শন এক সঙ্গে দেখার সুযোগ পেয়ে আমরা খুঁশি হয়েছি।

প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে ৩০ খানি তৈল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত এবং ২০ খানি প্যাস্টেলের কাজ। শ্রীমতী গুপ্ত সম্প্রতি শিল্পী দিলীপ দাশগুপ্তের 'স্টুডিও' গ্রুপের সঙ্গে কাজ করছেন। প্যাস্টেলে অঙ্কিত চিত্রগুলি 'স্টুডিও' গ্রুপে শিল্পচর্চার ফল বলে মনে হল। এর সবগুলিই প্রতিকৃতি চিত্র। শিল্পী প্যাস্টেলের মাধ্যমে সুন্দর ড্রয়িং ও বর্ণ-বিন্যাসের পরিচয় দিয়েছেন। 'গায়ক' (৩১ নং) ও 'খ্যাত পিস' (৫০ নং) প্যাস্টেলে অঙ্কিত প্রতিকৃতি-চিত্রের দুটি চমৎকার নিদর্শন।

তৈল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে তথাকথিত আধুনিকতার কোনো চিহ্ন নেই। বরং তাঁর রচনায় আমাদের পরিচিত পরিবেশ প্রথাগত ভঙ্গীতে অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে বিধৃত করতে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। শিল্পীর চিত্র-সংস্থাপন সত্যি চমৎকার। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে হলুদ আর নীল রঙের প্রাধান্য একটু দৃষ্টিকটু লেগেছে। তাঁর 'টিফিন আওয়ার' (৮ নং), 'সুইমিং পুল' (২৭ নং) 'আল-

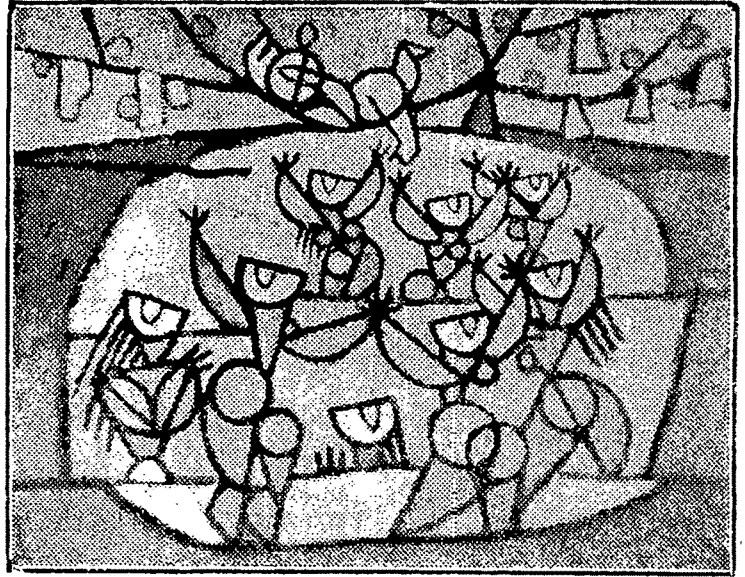
প্রদর্শনী

কলারিসক

কুঞ্জ' (১৪ নং) প্রভৃতি চিত্র এরই দৃষ্টান্ত। শিল্পী যেখানে অনুচ্চ মিশ্র রঙের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন কিংবা কালো আর হলুদের বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেখানে তাঁর চিত্র অনেক বেশি রমণীয় হয়ে উঠেছে। শিল্পীর 'বোঝাই নৌকা' (৬ নং), 'টিউবয়েল' (১৭ নং), 'স্নানের ঘাট' (২০নং), 'উইনডো শীপ' (১ নং), 'শীতের রাত' (২৩ নং), 'কুয়াশাবৃত সকাল' (২৪ নং) প্রভৃতি রচনাগুলি এ-জন্যই সকলের ভাল লাগবে বোধ হয়। এখানে চিত্র-সংস্থাপন ও বর্ণ-বিন্যাস—

শ্রীমতী রমা ঘোষ, ঝর্ণা গৌধুরী, রমা বসু (কর), সুরেন সিংহ, প্রভাংশু আইচভৌমিক, সুহাস রায়, বেণু ভট্টাচার্য—এই সাতজন শিল্পীর মোট ৩৮টি চিত্র স্থান পেয়েছিল। এখানে যেমন ছিল তৈল-রঙ, জল-রঙ ও গ্রাফিক চিত্রকলার নানা নিদর্শন, তেমনি ছিল প্রথাগত ও বিমূর্ত শিল্প-শৈলীর ভিন্নধর্মী রচনা।

শিল্পী রমা ঘোষের তৈল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত 'সমুদ্র নৈকতে' (১নং) ও জালের ঢাকনার মধ্যে 'বিক্রয়ের জন্য' (২নং) রক্ষিত মোরগগুলি সত্যি সুন্দর। ঝর্ণা গৌধুরীর চিত্রগুলিও আমার বেশ ভাল লেগেছে। বিশেষ করে তাঁর 'দুপুর' (৭নং) চমৎকার কম্পোজিশন ও রঙ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে। ৬নং নিংসগ চিত্রটিও দর্শকদের ভাল



মহাভারত থেকে—বশুহরণ

শিল্পী : প্রকাশ কর্মকার

দুই মিলে সত্যিকার শিল্প-জগৎ সৃষ্টি করতে শ্রীমতী গুপ্ত অনেকখানি সফল হয়েছেন।

আমরা আশা করবো শিল্পী শ্রীমতী মাধুরী গুপ্ত চিত্রে রং-প্রয়োগ সম্বন্ধে আরো সজাগ হয়ে ভবিষ্যতে আমাদের নতুনতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে বিধানবিত্ত হবেন না। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

।। শিল্পাঞ্জলীর চিত্র-প্রদর্শনী ।।

নবগঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'শিল্পাঞ্জলী' তার অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে চারুকলাচর্চাকেও স্থান দিয়েছেন। এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। 'শিল্পাঞ্জলী' আরোজিত এই চিত্র-প্রদর্শনীটি গত ১৮ই জানুয়ারী শুরুর হয়ে ২৪শে জানুয়ারী শেষ হয়েছে। আলোচ্য প্রদর্শনীতে

লেগেছে বলে আমার বিশ্বাস। রমা বসু (কর)-র কাঠখোদাই ও লিনোকট মন্দ নয়।

শিল্পী সুরেন সিংহের চারটি চিত্রই প্রতিকৃতি-চিত্র। প্রতিকৃতি রচনায় প্রভাংশু আইচভৌমিকের 'পাখী-বিক্রেতা'ও একটি সুন্দর রচনা। শিল্পী সুহাস রায় বিমূর্ত শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট বলে মনে হয়। জ্যামিতিক প্যাটার্নের এই চিত্রকলার দিকে অধুনা অনেক তরুণ শিল্পীর যৌক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্পী সুহাস রায়ের নিষ্ঠুর আছে কিন্তু তাঁর রচনার চড়া রঙ আমার কাছে নয়নসুখকর মনে হয়নি। শিল্পীর 'গল্প-গুজব' (২৬নং), 'লেডি উইথ সেতার' প্রশংসার যোগ্য। শিল্পী বেণু ভট্টাচার্য তাঁর সমস্ত রচনার মাধ্যমরূপে জল-রঙকে বেছে নিয়েছেন। সবগুলিই ক্ষুদ্রাকৃতির কাজ। তবে শিল্পী

ভট্টাচার্যের কাজের মধ্যে সত্যিকার শিল্পীমনের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর 'সবুজ ভূমি' (৩৪নং) 'নীল টালি' (৩৬নং) ছোট হলেও জল-রঙের কাজ হিসাবে আমাদের আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে।

শিল্পাঞ্জলীর এই প্রথম প্রচেষ্টা সাধক হয়েছে। অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যদি চিত্র-শিল্পীদের প্রতি এদের মত সদয় হন তবে অনেক নতুন সম্ভাবনাময় শিল্পী-জীবন অকাল বিনষ্টের হাত থেকে হয়তো বা রক্ষা পেতে পারে। আমরা এদিকে অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শিল্পী রবীন মন্ডলের চিত্র-প্রদর্শনী।

আকাদেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে শিল্পী রবীন মন্ডলের চিত্র-প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। গত ২৩শে জানুয়ারী। এটিই শিল্পীর প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী। শিল্পী রবীন মন্ডল ব্যক্তিগত জীবনে সরকারী অফিসের একজন কেরানী। কিন্তু কেরানী জীবনের অন্তরালে তাঁর যে শিল্পী-মন ঘামিয়েছিল নিজের নিষ্ঠা ও সাধনায় তাকে তিনি জাগ্রত করেছেন। শিল্প-মহাবিদ্যালয়ে নৈশ বিভাগে ক্লাস করে তিনি স-সম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন কলা-বিভাগের পরীক্ষায়। আর, এবার ৩৪খানি চিত্র নিয়ে কলকাতার কলারিসিকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন নতুন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। আমরা মানুসে স্বীকার করছি শিল্পী রবীন মন্ডল এ-পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণতার ছাড়পত্র পাবেন।

রবীনবাবুর ৩৪খানি চিত্র যাদে আর সবুই তৈল-রঙে আঁকিত। চিত্রের বিষয় হিসাবে তিনি কোনো বিশেষ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেননি। মানুষের বিচিত্র জগতের দিকেই তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত। কিন্তু আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি এক বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট। অন্যান্য তরুণ আধুনিক শিল্পীর মত জ্যামিতিক প্যাটার্ন সৃষ্টির দিকেই তাঁর প্রবণতা। এটা এখন এক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে প্রায়। আশাকার রবীনবাবু আঁচিরে এই এক্ষেত্রে মনুষ্য হয়ে অন্যতর শিল্প-আঙ্গিক গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবেন।

রবীনবাবুর অনেকগুলি রচনা আমরা ভালি লেগেছে। তাঁর কম্পোজিশন নিম্নসঙ্গে প্রশংসার যোগ্য। বিশেষকরে 'দ মিউজিয়ান' (১নং), 'মিউজ নেটস' (৫নং), 'আমিউজড' (১৮নং), 'ফ্যান্টাসি মেন্ডারস' (২১নং), 'ট্যালি' (২৪নং) ও 'আরিসবড' (৩৩নং)

রচনাগুলিতে তাঁর শিল্প-দক্ষতার সুপ্ত পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। এগুলি সবুই তৈল-রঙের মাধ্যমে রচিত। জল-রঙের মাধ্যমে রচিত 'পেজাট লাইফ' (১১নং) ও 'বাথ অফ ক্রাইস্ট' (৮) মন্দ লাগলো না। গণিকাদের জীবন নিয়ে শিল্পী কয়েকখানি চিত্র সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাতে সমাজের অবক্ষয়ের রূপ হয়তো শিল্পী তুলে ধরতে চেয়েছিলেন কিন্তু একমাত্র ১৫নং চিত্রটি ভিন্ন অন্য কোনো চিত্রের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়াই যায়। বিমূর্ত সৃষ্টির এও বোধহয় এক কন্ট-কন্টপত শিল্প-প্রচেষ্টা।

রবীনবাবুর রঙ প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা বক্তব্য আছে। যিনি নানারঙের সমাবেশে চমৎকার জমিন সৃষ্টি করতে পারেন, (অন্ততঃ এমন তিনটি চমৎকার রচনা তাঁর এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে), তিনি কেন মাঝে মাঝে অত চড়া নীল রঙের প্রতি আকৃষ্ট হলেন তা ঠিক বোধগম্য হ'ল না। যাহোক, আমরা এই প্রদর্শনী উপভোগ্য করছি। শিল্পী রবীন মন্ডলকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

শিল্পী প্রকাশ কর্মকারের চিত্র-প্রদর্শনী।

আলোচ্য প্রদর্শনীগুলির মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন শ্রীপ্রকাশ কর্মকার। কিছুকাল আগে স্টুডিও গ্রুপে যাকে আমরা দেখেছিলাম বাস্তবধর্মী চিত্র-রচনায় উদ্যত, বছর-খানেক আগে ফটোপাতকে যিনি চিত্র-প্রদর্শনীর স্থান নির্বাচন করে কলকাতার কলারিসিকদের চমকে দিয়েছিলেন, এবার আর্টস এড প্রিন্টস গ্যালারীতে তাঁর চিত্রকলা দেখতে যেয়ে তাঁকে এবার নতুনভাবে আবিষ্কার করে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। শিল্পী প্রকাশ কর্মকার তাঁর সমস্ত অতীতকে প্রায় অস্বীকার করে নতুনভাবে, নতুন বিষয়বস্তু, নতুন আঙ্গিক নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। শিল্পী হিসাবে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি অভিযান মাগেই লক্ষ্য করার মত।

এবারকার প্রদর্শনীতে প্রকাশবাবুর ২০টি চিত্র স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীটি গত ২৩শে জানুয়ারী কলকাতাস্থ সোভিয়েৎ কমালি জেনারেল শ্রীএস, আই, রাগব উন্বের্দান করেন।

প্রকাশবাবুর এই চিত্রগুলির আধিকাংশ পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত। কিন্তু তিনি ভারতীয় চিত্রকলার তথাকথিত আঙ্গিক গ্রহণ করতে উৎসাহবোধ করেননি। মূলতঃ তিনি হিন্দু-শিল্পশৈলীর লৌকিক-ভঙ্গী বিশেষ করে আলপনার বস্তুকৃতি ভেঙ্গে আধুনিক চিত্রকলার জ্যামিতিক

প্যাটার্নকে এমন কৌশল ব্যবহার করেছেন যার মধ্যে আদিম শিল্পকলার সারলাই ফটে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে শিল্পী নীরোদ মজুমদারের একটি প্রদর্শনীতে এই ধরণের কাজ লক্ষ্য করেছিলাম। শুনোঁছ প্রকাশবাবু বর্তমানে নীরোদবাবুর কাছে শিল্প-শিক্ষার দীক্ষা নিচ্ছেন। এই দীক্ষার ফসল বেশ ভালভাবেই ফলেছে। কিন্তু আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যা-কিছু নতুন তাকেই মানসে গ্রহণ করতে হবে, এমন কোনো একরোখা মনোভাব না থাকাই বোধহয় শিল্পীর পক্ষে কাম্য।

প্রকাশবাবুর এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখে আমরা যেমন বিস্মিত হয়েছি তেমন একটি মৌলিক প্রশ্ন না উত্থাপন করেও পারছি না। এই যুগে বাস করে আজ এই পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে আগ্রহগ্রহণ কি পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় নয়? আর এই পৌরাণিক কাহিনী যদি অন্যতর মূল্যবোধে শিল্পী নতুনভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরতেন তাহলেও তাঁর উদ্দেশ্য বৃথাতাম। কিন্তু শুধুমাত্র আঙ্গিকের প্রয়োজনে যদি প্রকাশবাবুর এই রূপান্তর ঘটে থাকে তবে নিঃসন্দেহে তা হবে দৃষ্টিবদ্ধ কথা। অবশ্য প্রকাশবাবু সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া বর্তমানে স্থির কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ একেবারে অসম্ভব।

যাহোক, তাঁর এই প্রদর্শনীর 'মহিষ-মর্দিনী' (১৬নং), 'নুনী-চোরা' (১৭নং), 'মহাভারতের একটি দৃশ্য' (১৯নং), 'রাসলীলা' (২০নং) পৌরাণিক বিষয়বস্তু নব আঙ্গিকে রচিত উল্লেখ-যোগ্য নিদর্শন। এই সব চিত্রের সংস্থাপন, সরলরেখা, অলঙ্কৃত রূপ এবং অনূচ্চ জল-রঙ প্রয়োগের দক্ষতা সত্যিকার পরিণত শিল্পী-মনের পরিচয়ই বহন করছে। অবশ্য বিভাজনে সূক্ষ্ম, জামিতিক চেতনা এবং জুগ্ম সম্বন্ধে এমন নিখুঁত ধারণা অন্য কোনো প্রদর্শনীতে কোনো তরুণ শিল্পী প্রদর্শন করেছেন বলে আমার অন্ততঃ মনে পড়ছে না। এদিক দিয়ে তাঁর 'ইন্টারিয়র' (৫নং), 'ট্যালি' (১১নং), 'ফিশার উয়েমান' (১৪নং), 'লেডি উইথ ফাওয়ার' (১৫নং) মনে রাখার মত কাজ। 'অন দি সি বীজ' (৬নং) ও 'বোটস এ্যাট রেস্ট' (৮নং)ও আমার খুব ভাল লেগেছে।

শিল্পী প্রকাশ কর্মকার সম্পর্কে আমরা উচ্চ ধরণা পোষণ করি। আশা করি এই নতুন পথ-পরিভ্রমায় তিনি আমাদের আরও সুন্দরতম শিল্পের ফসল উপহার দেবেন। তাকে আমাদের অকণ্ঠ অভিনন্দন।

সংগীত বিপ্লব

আনন্দভৈরব

॥ নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলন ॥

সংগীতের যা মূখ্য উদ্দেশ্য—সুন্দর ছন্দ ও লয়ের মিলিত আনন্দলোকের সন্ধান পাওয়া ও দেওয়া—এই সত্যটিকে যিনি নিজের জীবনে নিবিড়ভাবে গ্রহণ ও প্রমাণ করেছিলেন কলামারশ্রেষ্ঠ সেই তানসেনের নামে নামাঙ্কিত চতুর্দশ বার্ষিক নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলন গত ১৭ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ছয় দিনের ছয়টি অধিবেশনে নেতাজীর পূণ্যস্মৃতিস্থাপিত মহাজাতি সড়নে অনুষ্ঠিত হল। তার মধ্যে বর্তমান আলোচ্যের ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা কয়েকটি অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

এই সম্মেলনের এবারকার অনুষ্ঠান-সূচী সুপরিষ্কৃতিপত ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে। উন্মোচন-অনুষ্ঠানে সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কলকাতায় একই সময়ে অথবা নিকটবর্তী বিভিন্ন সময়ে নানা সংগীত সম্মেলনের আয়োজন হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট শিল্পীগণ অর্থকরী প্রয়াস ব্যতীত তাঁদের শিল্প-কর্মের মান প্রদর্শনে সুযোগ পান না বা মনোযোগ দেন না। এ বিষয়টি একদিকে যেমন সত্য, অন্যদিকে বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনের উদ্যোগগণের গঠনমূলক চিন্তাধারা ও সহযোগিতার মনোভাব আছে কিনা, সমঝদার শ্রোতৃগণের আগ্রহ ও উপস্থিতির বৃদ্ধি হচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয়গুলিতেও ভাববার কথা আছে। কেমনা উদ্যোগ, শিল্পী ও শ্রোতা এই তিনের উপরেই সম্মেলনের সফলতা অনেকখানি নির্ভর করে।

প্রথম অধিবেশনে পূর্বকল্যাণ রাগে চোতালে ও আড়ানা রাগে ধামার তালে ধ্রুপদ পরিবেশন করেন তানসেনবংশাব-তংস ওস্তাদ দরবার খাঁ। তাঁর সঙ্গে পাখোয়াজ সংগত করেন শ্রীপ্রতাপনারায়ণ

মিত্র। সম্মেলনের সূচনায় ধ্রুপদানুষ্ঠানের পরিকল্পনাটি উত্তম। বাগেশ্রী রাগে প্রথমে বিলম্বিত একতালে ও পরে ত্রিতালে গীটার বাদ্য (আলাপ ও গং) পরিবেশন করেন শ্রীদেবব্রত রায়। তাঁর এই অনুষ্ঠানের বিশেষ মূল্য আছে মনে করি এইজন্যে যে, যারা গীটারকে মূল্যহীন হুন্দাঘাতের যন্ত্র মনে করেন তাঁদের ভ্রম দূরীকরণের জন্য শ্রীদেবব্রত রায়ের অনুষ্ঠানটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। অ-হিন্দুস্থানী সংগীতের যন্ত্রকে হিন্দু-স্থানী সংগীতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হলে তার বাদন-পদ্ধতিও তদনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীবিষন্বনাথ বসুর পরিচালনায় তানসেন সংগীত কলেজের ছাত্র-গণের 'তবলা মেলডি' পরিবেশন প্রশংসনীয়। ত্রিতালে চন্দ্রকোষ রাগের গড়ের এক-ফেরত অংশ নিয়ে তাঁরা নানা ছন্দ ও লয়কারি প্রদর্শন করেন। নতুন স্ব ও প্রস্তুতির দিক থেকে পরিচালক ও তরুণ শিক্ষার্থীগণ সাধুবাদ পাবার যোগ্যতা দেখিয়েছেন। প্রথমে 'শুদ্ধ কল্যাণ' রাগে খেয়াল এবং পরে ঠুংরি ও ভজন পরিবেশন করেন পন্ডিত ভীম-সেন ঘোষী। স্বরপ্রয়োগের কৃতিত্ব, রাগ-রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য ও মেজাজের গুণে তাঁর গায়ন উপভোগ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্যামকল্যাণ রাগে খেয়াল তারানা এবং পরে বিষ্ণু-দিগম্বর ঘরানার বিখ্যাত 'জোগী ম্যায় তো' ভজন পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুনন্দা পটনায়ক। এই শিল্পী নিষ্ঠার সহিত স্বরপ্রয়োগ ও রাগ-রূপায়ণ করেন। বিচিত্র আলাপ, সরগম, বোলতান ও তান সহযোগে তাঁর খেয়াল-গায়ন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। অবশ্য আলোচ্য অনুষ্ঠানে তিনি সরগম তেমন প্রয়োগ করেননি। ত্রিতালে তবলার লহরা বাজান বারানসীর পন্ডিত কণ্ঠে মহারাজের শিষ্য শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর বাজনাতে

শৈলী-কৃতিত্ব আছে, সন্দেহ নেই। থুন্দ না, ধেরেধেরেকিটাতাক বাণীগুণি আরও বেশি আশা করা গিয়েছিল। চন্দ্রকোষ ও কলাবতী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন শ্রীমতী গঙ্গাবাই হাঙ্গল। সুকণ্ঠে সুন্দর মেজাজে তিনি রস-সৃষ্টি করেন। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ সহকারিতা করেন তাঁর কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণা হাঙ্গল। শ্রীমতী কৃষ্ণার কণ্ঠ-স্বরটি উত্তম—তার-ষড়জ স্থিতি মনোগ্রাহী। শ্রীমতী গঙ্গাবাই হাঙ্গলের অনুষ্ঠানে তবলা সহযোগিতা করেন তাঁর ভ্রাতা শ্রীশেষগিরি হাঙ্গল। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে যে পরি-প্রেক্ষিতে শ্রীমতী সুনন্দা পটনায়ককে প্রশংসা করা হয়েছে ঠিক সেই সেই পরি-প্রেক্ষিতে শ্রীমতী গঙ্গাবাই হাঙ্গলকে প্রশংসা করলে ভুল করা হবে। কারণ ঘরানাভেদে গায়ন রীতি ও পদ্ধতিতে পার্থক্য বিদ্যমান। সেতারে শ্রীহিন্দুনীল ভট্টাচার্যের কৌশিক কানাড়া রাগে আলাপ-অংশ সুপ্রাভা ও পরিচ্ছন্ন, গং-অংশ কিছুটা সংক্ষিপ্ত মনে হয়েছে।

তৃতীয় অধিবেশনে আভোগী কানাড়া রাগে বেহালা বাজিয়ে শোনান শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী। তাঁর সঙ্গে তবলা-সহযোগিতা করেন ওস্তাদ আল্লা রাখা। শ্রীমতী ধরচৌধুরীর বেহালা-বাদনে আলাপ-অংশ উপভোগ্য করা গেছে। কিন্তু গং-অংশের সঙ্গে তবলা-বাদনে পড়নের এত আধিক্য হয়েছিল যে মাঝে মাঝে এই অনুষ্ঠানটিকে তবলা লহরার অনুষ্ঠান বলে ভ্রম হচ্ছিল। সাথ-সংগতের সময় তবলা-বাদকের সংযম ও সহ-যোগিতার ভাবনা থাকলে রসভগ হয়। সেতারে শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় হেম-বেহাগ রাগে আলাপ, জোড় ও ঝালা পরিবেশন করেন। তার পরের গং-এর সঙ্গে তবলা-সংগত করেন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। এ অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছে। কল্যাণ রাগে খেয়াল ও পরে ভজন পরিবেশন করেন পন্ডিত কুমার গন্ধর্ব। এই শিল্পীর রাগের পরিবেশ-সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। তবে মাঝে মাঝে সুদের রেশ ধরে রাখার (বিশেষ বিশেষ স্বরে স্থিতির) অভাব অনুভূত হয়েছে। আর এক-একটি গানের সমাপ্তি বেন-হুতা এই হয়ে যায়, মনে হয়েছে।

চতুর্থ অধিবেশনে—তানসেন সংগীত সম্মেলনের পরিচালকগণ তাঁদের

অনুষ্ঠানসূচীতে সংগীত সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করে সুবিবেচনার কাজ করেছেন। পূর্বেও তাঁরা এরূপ আয়োজন করেছিলেন। বর্তমানে এই সম্মেলন ছাড়া অন্য কোনো সম্মেলনে এবিষয় আলোচনার ব্যবস্থা হয় বলে আমাদের জানা নেই। এবারকার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ধ্রুপদ ও খেয়াল। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ওস্তাদ দবীর খাঁ, পন্ডিত কুমার গন্ধর্ব, প্রোফেসর লক্ষ্মণপ্রসাদ জয়পুরওয়াল, শ্রীমতী গঙ্গুবাই হাঙ্গল, ওস্তাদ নাজাকত আলি খাঁ, সালামত আলি খাঁ, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীগণ। আমরা আশা করব ভবিষ্যতেও এই সম্মেলনে শ্রুতি-তত্ত্ব, রাগের উৎপত্তি, প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগ, ঠাট-পাশ্চাত্য যৌক্তিকতা, রাগ-মিশ্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হবে। এই অধিবেশনের সংগীতানুষ্ঠানের সূচনায় পূর্বরী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন কিশোরী শিল্পী কুমারী সূচিস্মিতা মিত্র। তাঁর ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা আছে। শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি ও সম্প্রদায় কর্তৃক পরিবেশিত ভারতনাট্যম আমাদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। নৃত্যশৈলীর সঙ্গে যখন দেহবল্লরীর সূক্ষ্মা ও নৃত্যভঙ্গীর সৌন্দর্যতা মিলিত হয় তখনই নৃত্য উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আলারিপদ, জাতি-শব্দ, কীর্তন প্রভৃতি নৃত্যে শ্রীমতী যামিনী কৃষ্ণমূর্তির ক্লাসিক্যাল নৃত্য-ভঙ্গী ভারতের প্রাচীন মন্দিরগায়ে খোদিত মূর্তিগুলির নৃত্যভঙ্গিমা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। তাঁর নবরসের অভিব্যক্তিও যথার্থ হয়েছে—তাঁর মধ্যে বীর, করুণ, ভয় ও শান্ত রসের অভিব্যক্তি চমৎকার। এই নৃত্যানুষ্ঠানে আনন্দ-বাংগক কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীত উত্তম। মৃদঙ্গের বোলগুলি পর্যন্ত প্রায়শঃ সুরে উচ্চারিত হয়েছে। এরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সংগীত শব্দটির অর্থ অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্যের মিলিত রস পরিষ্ফুট হয়ে উঠতে পারে।

পঞ্চম অধিবেশনে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর স্বরোদ-বাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে পূর্বরী-কল্যাণ রাগে আলাপ, জোড় ও ঝালা এবং পরে মধুবন্তী রাগে গং ও গারা রাগে ঠুংরি পরিবেশন করেন। তাঁর সঙ্গে স্বরোদে সাফল্যের সহিত সহকারিতা করেন তৎপদ তরুণ-শিল্পী আশীষকুমার।—তবলা সহযোগিতা করেন ওস্তাদ অজিয়া রাখা। শিল্পী

আশীষকুমারের হাত বেশ তৈরি। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে যথার্থ বাজিয়ে নিজের গৃণপনার পরিচয় দিয়েছেন। পিতা-পুত্রের এই সৈবত অনুষ্ঠানটি আমরা উপভোগ করেছি।

ষষ্ঠ ও শেষ অধিবেশনটি ছিল সারারাত্রিব্যাপী। সূচনায় ধ্রুপদ পরিবেশন করেন ওস্তাদ নাসির মৈনুদ্দিন ও নাসির আমিনুদ্দিন ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়—প্রথমে কাম্বোজী রাগে চৌতালে এবং পরে অনুরোধক্রমে বাহার রাগে ধামার তালে। সাধারণত স্থায়ী অন্তরা সম্ভারী ও আভোগ এই চার কলিযুক্ত ধ্রুপদ গান ও স্থায়ী অন্তরায়ুক্ত হোরী গান সম্পূর্ণরূপে গীত ও বিভিন্ন লয়কারির সহিত পরিবেশিত হলে যে গীতি-রীতি পরিষ্ফুট হয়ে ওঠে, এ ক্ষেত্রে তার অভাব অনুভূত হয়েছে। সম্ভবত, সময়ের সংকীর্ণতাই তার কারণ। ডাগর ভ্রাতৃদ্বয় আর-একটু বেশি সময় নিজে বেশ গুছিয়ে তাঁদের ধ্রুপদানুষ্ঠান সম্পূর্ণ করতে পারলে আমরা আরও খুশি হতাম। দরবারী কানাড়া রাগে যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন কিশোর-শিল্পী কুনওয়ার রাজেন্দ্র সিং। তাঁর যন্ত্রটি অনেকটা বেহালার মতো দেখতে হলেও ঠিক বেহালা নয়। ইতোপূর্বে যন্ত্রটি সুরমাধুরী নামে প্রচারিত হয়েছে। এই শিল্পীর হাত বেশ তৈরি। রাগ-রূপায়ণে আর-একটু স্থৈর্যের প্রয়োজন—সেটা বয়সের পরিণতির সঙ্গে আস্তে আস্তে আশা করা যায়। গৎ-অংশে তিনি অনেক তেহাই যোজনা করেছেন। তেহাইয়ে মাত্রাসংখ্যার সাম্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিলে ভালো হয়। সেতারে মারুবোহাগ রাগ পরিবেশন করেন শ্রীমণিলাল নাগ। তাঁর সঙ্গে তবলা-সংগত করেন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। দ্রুত তানের কাজে শ্রীনাগের হাত ভালো তৈরি। কিন্তু আলাপের

যথার্থ পরিবেশন দ্বারা রাগের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা তেমন সমৃদ্ধ মনে হয়নি। অন্যদিকে, দ্রুত লয়ের গং যখন দ্রুততর থেকে দ্রুততম অবস্থায় পৌঁছায়, সেই অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলে তার চমক কমে যায় ও একঘেয়ে মনে হয়। এই অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে শ্রীভট্টাচার্যের তবলা-সংগতে আধিক্য অনুভূত হয়েছে। গোরখ-কল্যাণ রাগে খেয়াল এবং কাফি ও ভৈরবী রাগে ঠুংরি গীত হয় ওস্তাদ নাজাকত আলি খাঁ ও সালামত আলি খাঁ কর্তৃক। রাগ-লাপের পূর্বাহ্নে কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি বোধ হয়েছে। খেয়াল গায়নে তাঁরা হাল্কা তান ও গমকী তান উভয় প্রকারই প্রয়োগ করেছেন। গোরখ-কল্যাণ রাগে, কল্যাণ রাগের একমাত্র বিকৃত স্বর তীরি মধ্যম বর্জিত। রাগ-নামের দিক থেকে সৈজন্য কতক বিশিষ্টা লক্ষিত হয়। আলোচ্য শিল্পী-দ্বয়ের ঠুংরি-গায়ন ভালো হয়েছে।

মিঞা বিসমিল্লা ও সম্প্রদায় কর্তৃক সানাই-বাদনের দ্বারা এই সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। তাঁরা ললিত রাগ পরিবেশন করেন। ললিত রাগে দুই মধ্যমের প্রয়োগ ও শূন্য মাধ্যমে স্থিতি শ্রুতিমধুর। মিঞা বিসমিল্লা সুষ্ঠুভাবে রাগের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের পরিবেশন মনোগ্রাহী হয়েছে।

চতুর্দশ বার্ষিক নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলনে উল্লিখিত ও আলোচিত শিল্পীগণ ছাড়াও অনেক স্থানীয় ও বিহারগত, পূর্বাগত ও নবাগত শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন। বর্তমান আলোচ্য সূচনায় যে প্রসংগটি উপস্থাপিত করা হয়েছিল, অর্থাৎ সংগীতের আনন্দলোকের সম্ভান পাওয়া ও দেওয়া, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে অনুষ্ঠানবল্লীর আরো বিস্তারিত ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা হয়ত করা যায়। কিন্তু সে সমালোচনাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়। আনন্দলোকের সম্ভান পাওয়া ও দেওয়ার বিষয়টি মনে জাগ্রত রেখে সংগীত-কর্মে লিপ্ত থাকা ও অগ্রসর হওয়াই বড়ো কথা।

SINGAPURI HAND WOVEN

G.G. LUNGI COY.

Ganamukala

NO. A 1

গণমুকলা

ভূদায়াম গণমুকলা লুঙ্গি কোম্পানী

185/8, MAHATMA GANDHI ROAD, CALCUTTA-1

সকল সম্ভাদায়ের ব্যবহার

উপযোগী প্লেট ও চেক

ডিজাইনের

গণমুকলা

লুঙ্গি

রং পাকা ও টেকসই

সকল লুঙ্গির দোকানেই পাইবেন

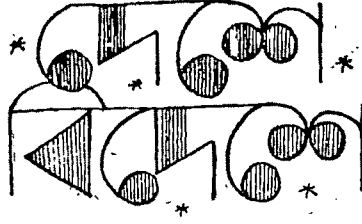
॥ রাষ্ট্রীয় সম্মান ॥

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসে যারা রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, অর্থনীতিবিদ ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় নৃত্য ট্রাস্টের সভাপতি শ্রীজ্ঞানেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নয়াদিল্লীর শল্য চিকিৎসক ডঃ সন্তোষকুমার সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ভারতের জ্ঞান ও সংস্কৃতির রাজ্যে তাঁরা সুপরিচিত এবং বলা বাহুল্য এ সম্মান তাঁদের দীর্ঘজীবনের সকল সাধনারই স্বীকৃতি মাত্র। বহু-সম্মানিত ব্যক্তিদের এই নতুন সম্মানে আমরা আনন্দিত।

॥ জাতীয় স্বাস্থ্য ॥

জাতীয় স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মাদ্রাসার কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে সান্ত্বনার কোন অবকাশ নেই। হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, শয্যা, সেবিকা ও ডাক্তারের সংখ্যা অবশ্য যথেষ্টই বেড়েছে এবং জন-সংখ্যানুপাতিক হারও পূর্বের চেয়ে উন্নত। বসন্ত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগগুলি এখন যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত, বিশেষ করে, ম্যালেরিয়া দেশে নেই বললেই হয়। কুষ্ঠ, ট্রাকোমা, যৌনব্যাধি প্রভৃতির বিরুদ্ধেও সরকারী অভিযান উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কাজ শহরে অন্তত যথেষ্ট সন্তোষজনক এবং স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছেন জাতীয় স্বাস্থ্যের অধিকর্তারা। তবুও অভাব আজো এমনই সর্বগ্রাসী ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এমনই অবিস্বাস্য যে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জাতির গত পনের বছরের উন্নয়ন প্রায় প্রায় তেলা বাঁশ আঁকড়ে ওঠার মতই দুঃসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৪০ সালে ভারতে হাসপাতালের সংখ্যা ছিল ৭,৪০০, সে জায়গায় '৬০ সালে' এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২,০০০। কিন্তু এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও এ ব্যাপারে সতের বছর আগের জন-সংখ্যানুপাতিক হার ১:৪০,০০০ থেকে কমে-ইয়েছে ১:৩৫,৮০০। '৪৬ সালে



প্রতি হাজার পিছদ শয্যাসংখ্যা ছিল ০.২৪; গত চৌদ্দ বছরে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ঐ আনুপাতিক হার হয়েছে ০.৪০। '৪৬ সালে প্রতি ৬,৩০০ লোকের জন্যে ডাক্তার ছিলেন একজন। আজ ডাক্তার আছেন প্রতি ৪,৮৫০ লোকের জন্যে একজন। এর ওপর আছে শহর ও গ্রামের মধ্যে ডাক্তারের অসম বন্টনের সমস্যা। অথচ গত চৌদ্দ বছরে এদেশে পাশ করা ডাক্তারের সংখ্যা ৪৭,৫২৪ থেকে বেড়ে ৮৮,০০০, প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু জাতীয় স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বোধহয় সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল নাসের অপ্ৰতুলতা। '৬০ সালে এদেশে নাসের সংখ্যা ছিল ৩০,০০০ (যেখানে '৪৬ সালে ছিল মাত্র ৭,০০০), কিন্তু জন-সংখ্যানুপাতে এ হার হ'ল ১:১৪,০০০।

জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির শতরূপে কমিশনের সুপারিশ হল—ভাল বাসস্থান, যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য, পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানীয় জল, উপযুক্ত শৌচ ব্যবস্থা, মৃত্ত বায়ু, অনুপ্রবেশের উপযুক্ত ব্যবস্থা, নগরে জনবাহুল্য নিয়ন্ত্রণ ও বস্ত্রী সংস্কার; ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে শিশুদের জন্যে, খাঁটি দুধের ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি দেশবাসীর সামাজিক শৌচ চেতনা। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই অবস্থা সৃষ্টি যে কতখানি অসম্ভব তা উল্লিখিত কয়েকটি সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই অনুমান করা যায়।

॥ শিক্ষারতীর অবমাননা ॥

বহু আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হওয়ার পর গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে সারা পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষকরা নিরুপায় হয়ে বিদ্যালয় ছেড়ে পথে নেমোছিলেন বাঁচার দাবী জানাতে। ধর্মঘট শুরুর হওয়ার দু'দিন পরে সরকারের পক্ষ থেকে মধ্যমস্তরী প্রতিশ্রুতি দিলেন, অবিলম্বে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হবে এবং পদলিখের হাতে প্রায়ই যে তাঁদের নিগৃহীত হতে হয় তারও প্রতিকার করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে শিক্ষকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন,

কিন্তু সরকারও বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলেন তাঁদের আশ্বাসের কথা। কারণ তারপর পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। বেতন বৃদ্ধির আশায় শিক্ষকের নিরানন্দ গৃহে ক'মাস আগে যে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলছিল, সরকারের হৃদয়হীন নীরবতায় ইতিমধ্যেই তা নিভে গেছে আর সে জায়গায় ভয়াবহ হয়ে উঠছে পদলিখী সন্দ্রাস। ক'দিন আগের সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে নাকি বিভিন্ন স্কুলের কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলা হয়েছে, গত সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন কারা। এ যদি সত্য হয় তবে একথা বলতেই হবে যে, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর প্রবণতা আর কল্পনা করা যেতে পারেনা।

কিন্তু গরজ, বড় বালাই, অভাবের দাবী অপ্রতিরোধ্য। তাই চোখের সম্মুখে অনুজ সহকর্মীদের এই প্রবণতা ও নিগ্রহ প্রত্যক্ষ যক্ষ্মাও একই পথে পা বাড়িয়েছেন কল্যাণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষারতীরা। আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ হওয়ার পর ক'দিন আগে এক মৌন মিছিল বেরিয়েছিল অধ্যাপকদের। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁদের, দুর্ভাগ্য বাঙলা দেশেরও, তাঁদের আবেদনে ফেট কর্পাসত করা প্রয়োজন মনে করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল সৌদীন বাসভবনে উপস্থিত থেকেও শিক্ষারতীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রত্যাখ্যান করেছেন; রাইটাস' বিল্ডিংয়ে মধ্যমস্তরীও সৌদীন তাঁদের কথা শোনার জন্য উপস্থিত থাকা প্রয়োজন মনে করেননি। পরন্তু গত ২৪শে জানুয়ারী সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অধ্যাপকদের দাবী তাঁরা পূরণে অক্ষম। সুতরাং এরপর হয় অধ্যাপকদের নিজেদের দুর্ভাগ্য মনে নিয়ে ক্ষান্ত হতে হবে, না হয় নিতান্ত নিরুপায়ের মত বেপরোয়া হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। যতদূর সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, শিক্ষারতীরা শেষের পথই বেছে নেবেন। ওদিকে আশাহত বিদ্যালয় শিক্ষকরাও হয়ত তাঁদের সঙ্গে একই পথের অনুগামী হবেন। আর তার ফলে আনবার্য ভাবে সারা রাজ্য জুড়ে এক বিরাট বিপর্যয় ঘনিয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, যেদেশে শান্তিকামী শিক্ষারতীদেরও বাঁচার প্রয়োজনে নিরুপায় হয়ে চরম অশান্তির পথে নামতে হয়, সেদেশ অভিশপ্ত।

সকল কল্যাণের পথ সেখানে রুদ্ধ। আমরা শেষ পর্যন্ত আশা করব, এবতবড় দুর্গতির মধ্যে বাঙলা দেশকে বাঙলার ভাগ্যবিধাতারা ঠেলে দেবেন না।

॥ লাওসে জাতীয় সরকার ॥

দীর্ঘ আলোচনা ও বারংবার ব্যর্থতার পর লাওসের তিন প্রিন্স একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবে একমত হতে পেরেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। নিরপেক্ষ প্রিন্স সুভানা ফুমার নেতৃত্বে এই জাতীয় সরকার গঠিত হবে এবং তাতে মন্ত্রী থাকবেন সাতজন ও উপমন্ত্রী দুইজন। তবে স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তর কোন পক্ষীয় মন্ত্রীর হাতে থাকবে সে প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয়নি। বলাবাহুল্য, প্রশ্নটি একটিমাত্র হলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং শৃঙ্খমাত্র এরই মীমাংসার অভাবে যদি শেষ পর্যন্ত লাওস রাজনীতিতে আবার সংকট ঘনিয়ে ওঠে তবে সেটা আশ্চর্যের কিছু হবে না। তবুও জাতীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে লাওসের শ্রমদ্বীপ রাজকীয় নেতৃত্ব যে একমত হতে পেরেছে, সেইটাই স্বল্প-দীর্ঘ লাওসের পক্ষে সবচেয়ে বড় আশার কথা।

॥ মীমাংসা প্রয়াস ॥

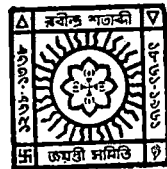
পশ্চিম ইরিয়ানের অধিকার নিয়ে হল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে বিরোধ চরম পর্যায়ে ওঠার পর রাষ্ট্রসংঘ তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। ১৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার সংগে বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট হল্যান্ডের কাছে যে আবেদন জানিয়েছিলেন হল্যান্ড তাতে সাড়া দিয়েছে। অপরপক্ষে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকেও প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ উ থান্টকে জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রয়াসে সাড়া দিতে ইন্দোনেশিয়া সব সময় প্রস্তুত। তবে সেইসঙ্গে একথাও উঃ সুকর্ণ জানিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিম ইরিয়ানের মন্ডি এই বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হবে এবং জাতির প্রতিরক্ষা-বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে সৈন্য-বাহিনীকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, জাতির ঐক্য ও মর্যাদা রক্ষার জন্য তারা যেন সবসময় প্রস্তুত ও সতর্ক থাকেন। ইন্দোনেশিয়ার এই অনমনীয় মনোভাব হল্যান্ডের ওপরেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয়। হল্যান্ডের নিউগিনি বিখ্যক পররাষ্ট্র-

মন্ত্রী মিঃ থিও বট সম্প্রতি পশ্চিম ইরিয়ানের হল্যান্ডিয়া শহর পরিদর্শন-কালে বলেছেন—আমরা নিউগিনিতে থাকার চেষ্টা করছি না, ইন্দোনেশিয়ার সংগে হল্যান্ড সব সময়েই আলোচনায় প্রস্তুত।—এইসব উক্তি ও ঘটনাপ্রবাহ থেকে মনে হয়, পশ্চিম ইরিয়ানের মন্ডি শেষপর্যন্ত হয়ত বিনা যুদ্ধেই সম্ভব হবে।

॥ ফিজোর দম্ভ ॥

বিরোধী নাগা নেতা ফিজো বৎসরা-ধিককাল ইংলন্ডে অবস্থান করছেন। তিনি নাগা অঞ্চল ত্যাগ করার আগেই নাগা বৈরীদের অন্তর্ঘাতী আন্দোলন স্টিমিত হয়ে এসেছিল। তারপর তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে ও নাগাভূমির অধিবাসীদের সমর্থন ও সহযোগিতার অভাবে স্বতন্ত্র নাগারাজ্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রায় সম্পূর্ণই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ দীর্ঘ নীরবতা ভংগ করে ফিজো লন্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে হুঙ্কার ছেড়েছেন। তিনি বলেছেন, যুদ্ধ করার ইচ্ছা তাঁর নেই, কিন্তু ভারত সরকার যদি তিন সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে সম্মত না হন তবে আন্তর্জাতিক আইন পরিষদের কাছে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে পঁচাত্তর হাজার নাগাকে পাই-কারীভাবে হত্যার অভিযোগ আনবেন। সেখানে যদি তিনি ব্যর্থ হন তবে আন্তর্জাতিক শান্তি ব্রীগেডের শরণাপন্ন

হবেন। তাতেও যদি কোন সুরাহা না হয় তবে, তিনি বলেছেন, চীন ও পাকিস্থানের সহযোগিতায় ভারতকে নাগা-ভূমি ত্যাগে বাধ্য করবেন। ফিজোর এই-সব কথা অবশ্য নিছক প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দুটির নাম করেছেন তাদের কোন দেশের ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন দায়িত্ব নেই, এবং ভারতও কোন অবস্থাতেই তাদের কাছে নিজ কাজের জবাবদিহী করবে না। এমনকি চীন পাকিস্থানের সহায়তার হুমকিও ভারতের কাছে অর্থহীন। যদিও পাকিস্থানের কাছে এবং হয়ত বা চীনের কাছেও ইতিমধ্যে কিছু কিছু সাহায্য ফিজো পেয়ে থাকবেন। তবে গোয়া সমস্যার সমাধানে ভারত শেষপর্যন্ত যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তাতে পাকিস্থান বা চীন অবশ্যই আর ফিজোকে কোনভাবে সাহায্য করতে সাহসী হবে না। কিন্তু এই সকল উত্তির মধ্য দিয়ে ফিজোর যে ভয়ংকর মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তাতে তার সম্পর্কে কোন রকম দুর্বলতা প্রকাশ করা ভারতের পক্ষে উচিত হবে না। ঐ ব্যক্তিটিকে গ্রেপ্তার করার ও তাঁর দেশদ্রোহিতার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের অবশ্যই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রস্বার্থ-বিরোধী প্রচার সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব দৃঢ় হলে আরও অনেক রাষ্ট্রস্বার্থ-বিরোধী সংঘত হবে।



• পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি •

১। রবীন্দ্র-চরিত

শ্রীবিজয়বিহারী ভট্টাচার্য রচিত

সরল, সুখপাঠ্য, প্রামাণিক রবীন্দ্র জীবনালেখ্য

২। শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যধারার অনবদ্য আলোচনা
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

—লেখক—

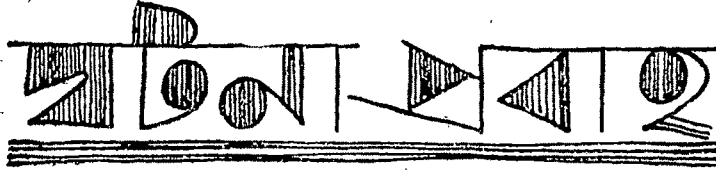
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
রমেশচন্দ্র মজুমদার
সুকুমার সেন
প্রমথনাথ বিশী
শশিভূষণ দাশগুপ্ত
বিজয়বিহারী ভট্টাচার্য
কাজী আব্দুল ওদুদ
শালতা দেবী
মৈত্রেয়ী দেবী
ক্ষিতীশ রায়
শচীন সেন

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
সোমনাথ মৈত্র
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
রথীন্দ্রনাথ রায়
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
আশুতোষ ভট্টাচার্য
ভবতোষ দত্ত
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হরপ্রসাদ মিত্র
অহীন্দ্র চৌধুরী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রবোধচন্দ্র সেন

—মূল্য পাঁচ টাকা—

বংগীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা

১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭



॥ ঘরে ॥

১৮ই জানুয়ারী—৪ঠা মাঘ :
‘কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ :
ভারতের জনগণই কাশ্মীরের প্রকৃত
‘স্বস্তি পরিষদ’ ও ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা’—
জনসভায় কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বজ্রী
গোলাম মহম্মদের ঘোষণা।

১৯শে জানুয়ারী—৫ই মাঘ :
‘দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা শান্তি-
পূর্ণ সহযোগিতার অন্যতম দৃষ্টান্ত’—
কারখানার ‘মার্চেন্ট মিল’-এর উদ্‌ঘাটন
উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী (পশ্চিমবঙ্গ) ডাঃ
বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ।

‘গোয়া অভিযানের ফলে ভারতের
নীতির কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই’—
প্রেসিডেন্ট কেনেডি (মার্কিন) নিকট
প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর পত্র।

২০শে জানুয়ারী—৬ই মাঘ : কলি-
কাতায় অধ্যাপকদের (পশ্চিমবঙ্গ) মৌন
শোভাযাত্রা—বেতন বৃদ্ধি, কলেজ কোড
প্রবর্তন, ছাঁটাই বন্ধ প্রভৃতির দাবী।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে মোট
১৪ শতাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র
দাখল—কলিকাতায় ২৬টি বিধানসভায়
আসনের জন্য ১১১ জন প্রার্থীর প্রতি-
দ্বন্দ্বিতার আগ্রহ।

পাঁজরে ২০ হাজার প্রাক্তন পত্নী-
গীজ কর্মচারীর ভারতের রাষ্ট্রপতি
ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ
গ্রহণ।

২১শে—জানুয়ারী ৭ই মাঘ :
‘ভারতের চীনা আক্রমণ প্রত্যাহারের
জন্য প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগ করা
হইবে।’ নয়াদিল্লীর জনসভায় প্রধান-
মন্ত্রী শ্রীনেহরু দৃঢ় ঘোষণা।

শতকরা মাত্র ১৫ জনের হাতে অর্থ
পঞ্জীভূত : শহরাঞ্চলে শতকরা ৮৫টি
পরিবার সমুদ্রে অক্ষম—জাতীয় বৈষয়িক
গবেষণা পরিষদের রিপোর্টে তথ্য
প্রকাশ।

গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে
তদন্তকল্পে সরকারী কমিশন নিয়োগ।
চেন্নায়মান : বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস্-
কমিশন সদস্য শ্রী ডি সি পাভেট।

২২শে জানুয়ারী—৮ই মাঘ : বাঙ্গা
ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি-
দানের দাবী—কলিকাতায় অনুষ্ঠিত
সারা ভারত বাংলাভাষী সম্মেলনে গুরুত্ব-
পূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত।

২৩শে জানুয়ারী—৯ই মাঘ : পশ্চিম-
বঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে বিপুল
উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে নেতাজী
সুভাষচন্দ্র বসুর ৬৬তম জন্ম-জয়ন্তী
উদ্‌যাপন।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু ও কেনে-
ডির মধ্যে পত্র বিনিময়ের সংবাদ—
মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাকিস্থানী দাবী
অনুযায়ী স্বাস্থ্য-পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্ন
উত্থাপনে বিরোধী বলিয়া ইংগিত।

‘পাঞ্জাবী সুবার দাবী কখনই
স্বীকার করা হইবে না’—লুধিয়ানায়
প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২৪শে জানুয়ারী—১০ই মাঘ :
ভারত কখনও পাকিস্থানের সহিত
যুদ্ধ বাধাইবে না : পাকিস্থান যুদ্ধ
বাধাইলে ভারত উপযুক্ত জবাব দিবে—
ফিরোজপুরে জনসভায় শ্রীনেহরুর
ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

১৮ই জানুয়ারী—৪ঠা মাঘ : মার্কিন
কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট কেনেডির ৯২৫০
কোটি ডলারের বাজেট পেশ—সামরিক
খাতে প্রচুর ব্যয়-বৃদ্ধির দাবী।

১৯শে জানুয়ারী—৫ই মাঘ :
ডোমিনিকান রিপাবলিকে পুনরায়
সামরিক অভ্যুত্থান—বিমান বাহিনীর
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা দখল।

লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠন
বিষয়ে প্রিন্সগরের মধ্যে মতৈক্য হওয়ার
সংবাদ।

বৈমানিকের ভুলের জনই হ্যামার-
শীল্ডের (রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন সেক্রেটারী
জেনারেল) মৃত্যু ঘটে—সুইডিশ পাইলট
সমিতির পত্রিকায় বিমান দুর্ঘটনার
কারণ সম্পর্কে মন্তব্য।

বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে কেনেডি-
উ থল্ট দুই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক।

২০শে জানুয়ারী—৬ই মাঘ :
কংগ্রেস পদচ্যুত সহকারী প্রধানমন্ত্রী
গিজেন্গার সিওপোন্ডিলে প্রত্যাবর্তন
ও রাষ্ট্রসংঘে আশ্রয় গ্রহণ। ভারতীয়
জেট বিমানের উপর বিদ্রোহী কংগ্রেসী
সৈন্যদের গুলীবর্ষণের সংবাদ।

‘জরুরী অবস্থায় পাকিস্থান
মজুত সকল অস্ত্রই ব্যবহার করিবে’—
পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সদৃশ
ঘোষণা।

২১শে জানুয়ারী—৭ই মাঘ :
নেপালে কংগ্রেস কমিউনিস্ট
তিনটি পুলিশ ফাঁড়ি দখল—সৈন্যদের
সহিত ছয় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে দশজন
হতাহত।

২২শে জানুয়ারী—৮ই মাঘ : নাগা-
ভূমির প্রশ্নে আপোষ-আলোচনার ভারত
অসম্মত হইলে ব্যাপক আক্রমণ—
লন্ডনে সাংবাদিক বৈঠকে বিদ্রোহী
নাগা নেতা ফিজোর হুমকী—নাগাভূমির
স্বাধীনতাভির্ষিতে আলোচনা সমুদ্র
করার জন্য ভারত সরকারকে তিন
সপ্তাহ সময় দান।

নেপালের রাজা মহেন্দ্রের প্রাণ-
নাশের চেষ্টা—জনকপুরের পথে গাড়ীতে
বোমা নিক্ষেপ।

আংগোলার মুক্তির জন্য পর্তুগালের
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী—
রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে সৌভিক্ষেট
ইউনিয়নের বক্তব্য পেশ।

২৩শে জানুয়ারী—৯ই মাঘ :
ইরানে রাষ্ট্রসংঘের তদন্ত কমিশন
প্রেরণের অনুরোধ—পশ্চিম নিউ গিনি
জাতীয় পরিষদের প্রস্তাব।

কাশ্মীর সমস্যা মীমাংসার জন্য
কেনেডির পক্ষ হইতে মধ্যস্থতার
প্রস্তাব—নেহরু ও আয়ুবের নিকট
মার্কিন প্রেসিডেন্টের পত্র—মধ্যস্থ
হিসাবে প্রেসিডেন্ট ইউজিন ব্যাকের
নাম সুপারিশ।

উপনিবেশবাদের অবসানের জন্য
রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ভারত সম্মত
সত্তেরটি রাষ্ট্র লইয়া তদারকী কমিটি
গঠন।

২৪শে জানুয়ারী—১০ই মাঘ :
রাশিয়া একটি পারমাণবিক রকেটের
আঘাতে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটাইতে
সক্ষম—সৌভিক্ষেট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী
মার্শাল ম্যালিনোভস্কির ঘোষণা।

সামবলান সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

১১ মানবিক রহস্য ১১

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বেনজামিন ডিস্ট্রেলস্‌ প্রশ্ন করেন—“What is the question now placed before society with a glib assurance the most outstanding?”—এই প্রশ্নের উত্তরের আশায় তাকে না দাঁড়িয়ে সেদিন ডিস্ট্রেলস্‌ নিজেই জবাব দিরাইছিলেন—“The question is this—Is man an ape or an angel? by Lord I am on the side of angels.”

ডিস্ট্রেলস্‌ স্বয়ং ছিলেন দেবদূত-দের দলে, ডারউইনের প্রতি কটাক্ষপাত করলেও তিনি নিঃসন্দেহে এনজেল, যেমন আরো অনেক সরল এবং সাধারণ প্রাণী—এমন কি বৈজ্ঞানিকরাও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। বিবর্তনবাদের সমস্যা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যে যার ব্যক্তিগত সমস্যায় মাথা ঘামিয়েছেন অনেক বেশী।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে The Descent of Man প্রকাশিত হওয়ার পর ডারউইনের সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়। ডারউইনীয় মতবাদের একজন উৎসাহী প্রচারক ছিলেন টি. এইচ. হাক্সলী। এক হিসাবে ‘ডাউন হাউসের’ বাইরের জগতে ডারউইনের মতবাদ তিনিই অসীম উৎসাহে প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন—“অজ্ঞতা এবং ঔষ্ধতোর সংমিশ্রণেই ডারউইনীয় মতের বিরোধিতা হত গোড়ার দিকে, অধিকাংশ আক্রমণ এই অজ্ঞতাপ্রসূত, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশের এর এই ডারউইন-বিরূপতার অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা হ্রাস পেল।

ভিক্টোরীয় যুগের সাহসিক প্রতি-রোধ সত্ত্বেও বিবর্তনবাদ প্রয়োজনীয় প্রগতিবাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মানুষকে দেবদূতের উচ্চ সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে একেবারে মাটির বৃকে পশুদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মানুষ পশুদের আত্মীয়, একই বংশ এবং গোত্র-সম্ভূত, শুধু মাত্র জীবনযুদ্ধের প্রচণ্ড সংঘর্ষে মানুষ বেঁচে আছে তার সেই বিরামবিহীন জীবন-ধারণের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য। এমনই বোঁচ থাকবে যতক্ষণ না থার্মো-ডাইনামিকসের (উত্তাপের প্রভাবে বিভিন্ন পদার্থে গতি-শক্তি) নীতি অনুসারে ক্রান্ত ধরণীকে সর্বশ্রমেরই জীবিত প্রাণীর ভার বহনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া না হয়। থার্মো-ডাইনামিকস্‌ একদিন নাকি এই বিশ্বজগতকে তার গুরুদায়িত্ব থেকে

নিষ্কৃতি দেবে, তখন আর পৃথিবীতে প্রাণের এতটুকু স্পর্শ পাওয়া যাবে না।

বিবর্তন সম্পর্কে আজো কুসংস্কার আছে, আমরা যে বিবর্তনের ফসল এ কথা মনে করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রশ্নেরও প্রয়োজন আছে আমরা এ ছাড়া অন্য আর কিছুরও হতে পারি। এই প্রশ্নের দ্বারা জীব-বিদ্যাগত সিদ্ধান্তানুসারে প্রায় এই প্রশ্নই ওঠে যে বিবর্তনবাদই কি মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে শেষ কথা? সব প্রশ্নের কি একটিই উত্তর? অপরপক্ষে এই প্রশ্নও মনে জাগে যে মানবিক প্রকৃতির এমন সব দিক আছে যে বিষয়ে বিবর্তন-বাদের আলোকে কিছুই পাওয়া যায় না।

দার্শনিক প্রজ্ঞার আরম্ভ এ যুগের মনীষীরা দু’পুরুষ আগেও জীবতাত্ত্বিক বিবর্তনবাদের প্রতি যে মূল্য আরোপ করতেন বর্তমানে আর তা করেন না একথা ঠিক, তবে তার অর্থ এই নয় যে মানবিক চরম পরিণতিতে বিবর্তনবাদের গুরুত্ব কতটুকু তা তাঁরা পরিমাপ করেন না, কিংবা তাঁরা আর বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী নন। জন ল্যাংডন-ডেভিসের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ “On The Nature Of Man” এই বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছে, (গ্রন্থটির প্রকাশক নিউ আমেরিকান লাইব্রেরী, দাম পঞ্চাশ সেন্ট),—। যুক্তির যুগে (age of reason) এই বিষয়ে লব্ধজ্ঞানকে একালের প্রজ্ঞার যুগ (age of sanity) একেবারে নস্যাত করে দিতে চায় না, একথা ল্যাংডন-ডেভিস বলেছেন, তবে এ যুগের মানদণ্ড যা গ্রহণ করেন তার থেকে অনেক অবাস্তব ও অবজ্ঞনীয় অংশ বর্জন করেন, অজ্ঞ, অল্প-শিক্ষিত, সহজ-বিশ্বাসী মানুষ যা নির্বিচারে গ্রহণ করেছে তার থেকে সারটুকুই নিতে হবে।

যুক্তির যুগের যে সব ভ্রান্ত ধারণার জঞ্জাল স্তব্ধীকৃত হয়ে উঠেছে তা যদি পরিষ্কার করে অগ্রসর হওয়া যায় এবং প্রশ্নের প্রত্যক্ষ দিকটা নিয়ে বিচার করা যায় তাহলে হয়ত সেই চিরন্তন প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। মানুষ কি? এই বিচার কালে প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে সৃজনধর্মী শিল্পী বন্দী হয়ে আছে তাকে উপেক্ষা করলে চলবে না।

মানব-প্রকৃতির গোপন সৃজনশীলতা থেকেই ল্যাংডন-ডেভিসের মতে নতুন সম্ভাবন-সূত্র পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে নতুন জ্ঞান। সেকেলে এবং গোঁড়া

প্রবৃত্তির রক্ষণশীল বৈজ্ঞানিকরা এই সব দিক এককাল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন, মানব-প্রবৃত্তির মধ্যে যে তথাকথিত প্যারা-নরম্যাল বা অ-প্রাকৃত শক্তি বা গুণ আছে তার কোনও বিশ্লেষণ করা হয়নি। ল্যাংডন-ডেভিস বলেছেন :

“Let me say at once that in so far as these faculties exists—telepathy, clairvoyance, precognition, and other stranger things still—they are not abnormal, super-normal or super-natural. Anything that exists is natural and, until it has been seen to fit into the pattern of nature, it is not safe to think that we understand it—or the rest of nature either. And of course we may find that some pieces of the puzzle, wrongly ‘‘tied hitherto, must be differently arranged to make room for the new facts.”

পুরাতন ধাঁধার নতুন উত্তর খুঁজতে হবে, তবেই সব কিছুর একটা অর্থ পাওয়া যাবে।

এই গ্রন্থের এই হল মূলকথা এবং প্রধান বক্তব্য। নিঃসন্দেহে একটি অত্যাবশ্যক গ্রন্থ ল্যাংডন-ডেভিসের এই “On The Nature Of Man”। শিক্ষিত অথচ এই বিষয়ে জ্ঞানহীন মানুষের কাছে একালের এই চিন্তা-নায়কের অসীম শক্তিমত্তা এবং মানসিকতার আভাস এই গ্রন্থপাঠে পাওয়া যায়। মিঃ জন ল্যাংডন-ডেভিস বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দান করেছেন, সেই সঙ্গে তাঁর সাহসিকতা ও মননশীলতার দ্বারা তিনি সর্বোত্তম রহস্যময় হেয়ালির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, সেই হেয়ালির নাম—মানুষ। মানুষকে ঘিরে যে অপরূপ রহস্যময় দুর্জয়ের জগৎ আছে ল্যাংডন-ডেভিস অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতার সঙ্গে তার পরিচয় দিয়েছেন। তবে লেখকের অহংমত্যতার পরিচয়ও কিছু আছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের গোঁড়া মতবাদানুসারে সূর্যের বিনাশের সঙ্গেই পৃথিবীর বৃক থেকে মানবজাতি বিলুপ্ত হবে। সেই মতবাদকে এই গ্রন্থে খণ্ডন করার প্রচেষ্টা হয়েছে, এবং সেই প্রচেষ্টার মধ্যে আছে যুক্তি, তীক্ষ্ণতা এবং উপলব্ধি। ল্যাংডন-ডেভিসের মতবাদ এবং সিদ্ধান্ত তাঁর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত, তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্র বিচিত্র এবং পাশ্চাত্য জগতের মনের চাইতে প্রাচ্য দেশের মনের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য বিষয়ের সমমর্মিতা অনেক বেশী।

লেখক বিশদভাবে “extra-sensory perception” বা “জ্ঞেয় উপলব্ধি বহির্ভূত প্রবৃত্তি, তার উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে” আলোচনা করেছেন এবং এক কথায় বলেছেন—“The fact of ‘Telepathy’ cannot be explained in accordance with known laws of energy, motion and matter, any more than it would be possible to explain a flower suddenly appearing in a hermetically sealed, hitherto

empty glass jar, in accordance with the known properties of matter, one of which is that solid matter can not pass through solid matter."

বর্তমান জগতে অনেক বিস্ময়কর কিছু ঘটনা সম্ভাবনা আছে বলেই telepathy বা 'পরীচিন্তা' সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানার্জন করার প্রয়োজন মানবজাতিরই আছে। বর্তমান কালে হয়ত দৈনন্দিন জীবনের কাজেও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব হবে না, কিন্তু কোনো দিন যে সেই প্রয়োজন ঘটবে না এ কথা চিন্তা করা হঠকারিতার সামিল। পদার্থ (matter) এবং তেজ (energy) সম্পর্কিত আইনস্টাইনের মতবাদ সব-প্রথম ঘোষিত হওয়ার পর তেমন প্রয়োজনীয় বস্তু বলে কারো মনে হয়নি, কিন্তু অতি শীঘ্রই তার ফলে 'হিরোসিমা'-র ধ্বংস ঘটেছে এবং 'থার্মোনিউক্লিয়ার' পারমাণবিক অস্ত্রাদি নির্মাণের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

এই "অধিকতর বিস্ময়কর" বস্তুটি কি, এবং পরমাণু কি কান্ড ঘটা সম্ভব? লেখক তার জবাবে বলেছেন: "I do not know. Nobody knows. We have as yet nothing but awkward facts; but they are sufficiently well authenticated for us to realise that our knowledge of human nature may at any moment be revolutionised in the same way as Einstein revolutionised our knowledge of time and space."

প্রচলিত কয়েকটি ধর্মমতের অনুজ্ঞানুসারে আত্মার বিনাশ নাও ঘটতে পারে, আত্মা অবিনাশী। এই প্রশ্ন সম্পর্কে মানুষের মনোভঙ্গী কিন্তু তার ভাবগত মনোভঙ্গীর সঙ্গে অনেকটা পৃথক। এই মূল্যবান প্রশ্ন সম্পর্কে সকলেই হয়ত আগ্রহান্বিত হয়ে উত্তর খুঁজতে ব্যাকুল হতে পারেন; কিন্তু প্রকৃতির কাছে থেকে সেই গোপন তথ্য আদায়ের জন্য খুব কম সংখ্যক লোকেরই কোনোরকম আগ্রহ থাকতে পারে।

মৃতের সঙ্গে কথাপকথন বা সংযোগ-সাধনের দ্বারা কি অবিনাশী আত্মার প্রমাণ পাওয়া যায়? মিডিয়ম মারফত প্রাপ্ত কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। তাঁর সত্যতা বিশ্বাসযোগ্য। তবে তাঁরও বিশ্বাস যে পরলোকভাষিকদের দ্বারা আসল তথ্য অনেক সময় জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এবং তাঁদের মতবাদও অনেক সময় তেমন জোরালো নয়।

যে যা বলে বলুক, বা ভাবুক ভৌতিক বা পারলৌকিক এই সব ঘটনা প্রতিবারে গ্রহণ করাও যেমন উচিত নয় তেমনই লেখকের মতে যে কোনো মনীষী এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে পারেন উন্মুক্ত মন নিয়ে। যাঁদের মনে সংশয় আছে—'we need not wait for the orthodox ostriches to take their heads out of the sand'—তাঁরা তাঁদের

গোঁড়া মন নিয়ে অস্ট্রিচের মত বালিতে মূখ লুকিয়ে বসে থাকুন। তাঁদের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

নতুন বই

The Great Wanderer — Maitraye Devi. Grantham. — 221, Cornwallis Street, Calcutta-6, India. Price — Rs. 7.50 nP. (with 4 photographs by Sambhu Saha)

সুর্কাবি মৈত্রেয়ী দেবী বঙ্গ সাহিত্যের অগ্ণেয় সুপরিচিত। তাঁর রবীন্দ্রভক্তি সর্বজনবিদিত, মংগু বাসকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁকে 'মংগাবী' এই নামে অভিহিত করেছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবীর "মংগুতে রবীন্দ্রনাথ" রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষপর্বের এক অনুপম আলিখ্য। ১৯৬০-এ তিনি 'বিশ্ব-সভায় রবীন্দ্রনাথ' নামক যে সুন্দর গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, বর্তমান গ্রন্থটি তার ইংরাজী অনুবাদ। এই গ্রন্থে লেখিকা রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-ভ্রমণের বহু প্রামাণ্য তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন। গ্রন্থটির ডকুমেন্টারি মূল্য অসীম। তবে মাঝে মাঝে কিছু দুটি দেখা যায়, যেমন ৮৯ পৃষ্ঠায় যে গ্রন্থটি থেকে উইলিয়াম রথেনস্টাইনের চিঠিখানি উদ্ধৃত করা হয়েছে তার নাম "Testing Apostle", "Testing Prophets" নয়। পরবর্তী সংস্করণে এই দুটিগুলি সংশোধন করলে গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠিক এই জাতীয় গ্রন্থ সংখ্যার বেশী নেই, সেই কারণে The Great wanderer রবীন্দ্রজীবনী-সংগ্রাহকদের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই।

চলচিত্র—(স্মৃতিকথা) ১। কালিদাস রায় ১। প্রকাশক—'অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স', ১১, পদ্মনান ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। দাম চার টাকা।

প্রবীণ কবি ও শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের গদ্যরচনার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের বিশেষ পরিচয় নেই। আজীবন তিনি কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা করেছেন। পরিণত বয়সে জীবনসাহায়ে সূদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সমসাময়িক কালের বিচিত্র জীবনধারা সম্পর্কে কিছু কিছু রসরচনা সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেছেন। চিন্তাশীল লেখকের দৃষ্টিকোণে আধুনিক লোকচারণের যে অপূর্ব রেখাচিত্র এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র নিবন্ধগুলিতে পরিবেশিত হয়েছে তার তুলনা নেই। প্রবীণ লেখক যেমন একধারে কৃত্রিম সামাজিকতার আধুনিক রীতির প্রতি ভীত কষাঘাত করেছেন তেমনি তাঁর করুণা ও মমতাভরা মনের ব্যথার আভাসও তাঁর

এই রচনার মধ্যে পরিস্ফুট। নিঃস্পন্দনশন পিতা ইদানীং কালের একটি বহুলা আলোচিত রচনা। পাঁচশ টাকার হিসাব, দুই পুরুষ আগে, পণপ্রথা, আত্মীয়তা, মাসীমা, অবাধ্যতা, কালচার, মোক, ভাত-গোরব, নারীপ্রগতি প্রভৃতি নিবন্ধগুলি শব্দ যে তথ্যমূলক তা নয়, একালের সমাজচিত্র হিসাবে একটা দীর্ঘস্থায়ী মর্ষাদা লাভ করবে একথা বলা যায়। প্রায়-গল্পের আভিগকে লেখক অনেক গুরুতর সমস্যার উল্লেখ করেছেন এবং তার সমাধানের ইঙ্গিতও দান করেছেন। বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় বিপদ এই যে, সত্য কথা বলার সাহস খুব কমসংখ্যক ব্যক্তির আছে, লেখক অকুতোভয়ে সেই অপ্রিয় সত্য কথাই তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বলেছেন এবং সেই কারণেই তিনি অভিনন্দন-যোগ্য। গ্রন্থটির ছাপা এবং প্রচ্ছদ অতিশয় মনোরম এবং সুবিন্যস্ত।

মনোনীতা—(গল্প সংগ্রহ) ব্রজেন-কুমার ভট্টাচার্য। মৃকুন্দ পাবলিশার্স, ৮৮, কলিকাতা-৮। পাবলিশিং স্ট্রীট, কলিকাতা-৮। পরিবেশক মিহালয়, ১২, বঙ্গবন্ধু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

শ্রীব্রজেনকুমার ভট্টাচার্য বাঙলা সাহিত্যে অপরিচিত নন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প প্রকাশকালে তিনি অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সে সমস্ত গল্পের কতকগুলি নিয়েই এ গ্রন্থের প্রকাশ। সমসাময়িক জনজীবনকে ভিত্তি করেই তাঁর গল্প রচিত হয়েছে। সমরেশের সাংবাদিক জীবনের প্রজেক্ট, প্রবীর ও নীতার সাংসারিক জীবন, শহর-জীবনের নানাবিধ বিড়ম্বনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষের ছবিও ফুটে উঠেছে। মোট কথা লেখক শহর ও গ্রাম্য জীবনের বিশেষ রূপকে উপলব্ধি করেছেন বলে তাঁর কোন কোন গল্প সার্থক হয়ে উঠেছে। 'মনোনীতা', 'হীরামানিক', 'পলাতক', 'মহাল', 'স্নেহ-নীড়' গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গল্পে বস্তুর অভাব না থাকলেও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মাত্রাতিরিক্ত প্রবেশে গল্পগুলির সার্থকতা নষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ গল্পেরই বর্ণনা-ভঙ্গী খুবই পুরনো।

নওগাঁর প্রাসাদ—(উপন্যাস) সুশীল-কুমার মল্লোপাধ্যায়। সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়; ৪৪, কালীকুমার মল্লার্জি লেন; শিবপুর, হাওড়া। দাম ৭-৫০ টাকা।

অত্যাচারী জমিদার বংশের কাহিনী। জমিদার নিখিলেশের ষড়যন্ত্রে নিহত হল তারই ছোট ভাই সমরেশ। নাবালক পুরুষে নিয়ে সমরেশের বিধবা পত্নী যখন সম্পত্তির দাবীতে মামলা দায়ের করল তখন তাদের পাশে এসে

দাঁড়াল সং মানুষ রমানাথ ডট্টাচার্য ও শচী সামন্ত। নিখিলেশের মৃত্যু হল। সমরেশের বিধবা স্ত্রী মামলা জিতল। কিন্তু নিখিলেশ পুত্রের হাতে সুমিত্রা হারিতা হল আর শচী সামন্তের মরণ গেল। অবশেষে এক চরম বেদনা-দায়ক অবস্থার মধ্য দিয়ে জমিদার বংশের পতন হল।

লেখকের বর্ণিত বিষয় খুবই জটিল। মোটামুটিভাবে জমিদারদের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু পরিণতির দৃশ্যটি কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। ভাবা সুন্দর হলেও কাহিনী পরিবেশনার ভাষার ছটাক-মোটাতির কারণে ব্যবহার করা হয়েছে। সৈদিকে লক্ষ্য রাখলে তার ভবিষ্যৎ রচনা আরও সাধক হবে বলে আশা করি।

পিরামিডের মাথার মানুষ—
(কিশোর সাহিত্য) জ্যোতিষ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। নিউকম্পট। এ-১৪, কলকাতা-১২। দাম ২-৫০ টাকা।

মিলক গ্রহে মানুষ— (কিশোর সাহিত্য) অশ্বিনী বর্ধন। আলকা বিটা পাবলিকেশনস। পোস্ট বক্স ২৫০৯, কলিঃ—১। দাম ৩-০০ টাকা।

বেশ কিছুকাল হল বাঙলা ভাষার ছোটদের জন্য নানাবিধ বই প্রকাশিত হয়েছে। তা আমাদের গর্বের বস্তু, তবে তার মধ্যে প্রকৃত কিশোর উপযোগী গ্রন্থ কতদূর আছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সে বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। জ্যোতিষ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'পিরামিডের মাথার মানুষ' গ্রন্থখানি বাঙলা দেশের কিশোরদের উপযোগী একটি সাম্প্রতিকতম প্রকাশন। বাঙলা দেশের একটি কিশোর পিরামিডের মাথার ওপরকার সাড়ে সাত ইঞ্চি একটি লোককে (যে শ' পাঁচেক ফুটকা, আড়াই মন হজমি, আর সাড়ে তিরিশ সের কড়া চিনে-বাদাম ভাজা খায়) কি করে নিয়ে এল বাঙলা দেশে তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী। 'প্রফুল্লবিকাশবাব', 'প্রজ্ঞানারামবাব', 'বোকাদা', 'ঈশ্বরভক্ত-বাব', 'প্রপন্নপালবাব' প্রভৃতি নাম-দাঁড়াল ছোটদের মনোপযোগী করে দেওয়া হয়েছে। শঙ্করের অভিযানে প্রাচীনমন্দির থেকে শব্দ করে বিভিন্ন মন্দির ব্যতির সহযোগিতায় চিত্রাঙ্কনে লেখকের অপরিমিত পারদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে। বর্ণনাভঙ্গী এবং ভাষার স্বাভাবিকতা গ্রন্থটিকে সাধক করে তুলেছে। বাঙলা ভাষায় এ ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির বহুদূর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক কিশোর উপন্যাস। মহাকাশের বৃক্কে আছে 'মিলক' নামে একটি গ্রহ। সেখানে যে চারজনের এক অভিযাত্রী দল গেল তারা নানাবিধ বিপদের মধ্য দিয়ে অবশেষে মৃত্তি লাভ করেছে। বিজ্ঞানের এক রহস্য ও চাঞ্চল্য-কর জীবনধারাকে লেখক তুলে ধরেছেন। লেখকের রচনারীতি স্বচ্ছ। বর্ণনাভঙ্গীর অভিনব রয়েছে। গল্প সৃষ্টি করবার জন্য তার উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থান রচনায় গ্রীষ্মক বর্ধন নিপুণ শিল্পী। তার ভাষা ভঙ্গীমা সুন্দর। এ ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক কিশোর উপন্যাস আরও রচনা করা উচিত বলে মনে করি।

বঙ্গ-রঙ্গমণ্ড— (প্রবন্ধ) শ্রীবিহার চৌধুরী, সাহিত্য চর্চাকা, কলি-কাতা। দাম—২-০০।

বাংলা নাটক ও রঙ্গমণ্ডের ইতিহাস দীর্ঘ এবং সংঘাতপূর্ণ। ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে একজন বিদেশী গেরাসিম লেবেদিয়েফ কলকাতার বৃক্কে প্রথম যে নাট্যশালা স্থাপন করেন তারই অনুপ্রেরণায় প্রায় চল্লিশ বছর পরে বাঙালী কতৃক বেলেঘাটার হিন্দু থিয়েটারের স্বেচ্ছাচিন্তা হ'ল। নাট্যরঙ্গ আন্দোলন করবার জন্য এর পর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য সখের থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথম পেশাদারী রঙ্গমণ্ড (ন্যাশনাল থিয়েটার) ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানেই দীন-বন্দ্যের নাটক 'লীলাবতী'র প্রথম অভিনয়। 'লীলাবতী', 'মেবার পতন' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে চিত্তবিনোদনের সঙ্গে পরাধীন ভারতবাসীর চিন্তা-জাগরণের দায়িত্ব গিরিশচন্দ্র, শ্রীজেন্দ্রলাল প্রমুখ নাট্যকাররা কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন লেখক তা সর্বিস্তারে জানিয়েছেন।

আধুনিক নাটকের আলোচনার রবীন্দ্রনাথ এক বিস্তৃত অধ্যায় জুড়ে বিবাজিত। দৃশ্যগত, মণ্ড-উপস্থাপনা ও আঙ্গিক বাহুল্যবর্জন করে বাংলার রঙ্গ-মণ্ডকে সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলে-ছিলেন।

১৯২১ সাল থেকে বঙ্গ-রঙ্গমণ্ডের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই যুগ থেকে রঙমহল, স্টার, শ্রীরঙ্গম বা বিশ্বরূপা, মিনার্ভা, থিয়েটার সেন্টার ও মৃত্ত অঙ্গনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও নাট্যশৈলী সম্পর্কে লেখকের মতামত প্রাধান্যযোগ্য।

কলকাতার নাট্যশৈলীর সঙ্গে মফস্বলের নাটক-অভিনয়ের একটা ধারা-বাহিক স্রোত প্রবাহমান। সে সম্পর্কে কোন আলোচনা 'বঙ্গ-রঙ্গমণ্ডে' নেই। এই অভাবটি এই গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি।

সম্পূর্ণ দোষমুক্ত না হলেও বাংলা নাট্যমণ্ডের দেড়শতাব্দীকালের ইতিহাসকে অল্প পৃষ্ঠায় তুলে দেবার যে দূরত্ব প্রয়াস

নিয়ে লেখক অগ্রসর হয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি সাধক।

কালীঘাটের পট— (কাব্য)। শান্তি লাহিড়ী। মূল্য : দুটাকা। ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন। কলিকাতা—এক।

প্রকরণ এবং মননের একটি পরিণত-রূপ অঙ্গীকার করে কবি শান্তি লাহিড়ীর এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। চরিত কবিতাগুলির মধ্যে একটি বিধুর রোমান্টিকতা সূরের মতন বর্ধনিত, যা সঞ্চারিত হতে সক্ষম কবিতা-পাঠকের মনে। এই কবিতাগুলে কবিত্বের উজ্জ্বল অভিজ্ঞানরূপে দীপ্ত-ময় কিছু পংক্তি রয়েছে যা আমাদের আকর্ষণ করে।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, কিছু যান্ত্রিকতা মাঝে মাঝে যেন এই কবিতা-পুস্তকের শরীরে সংক্রমিত হয়েছে। এবং প্রত্যেক সং কবির যান্ত্রিকতা পরিহারে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

একটি উপন্যাস
উমানাথ ডট্টাচার্য
নব্বক ০-৭৬
কথকতা
৩০টি, নেপাল ডট্টাচার্য লেন, কলি-২৬

সমাজবিজ্ঞান-মনোবিজ্ঞান
জীববিজ্ঞানের
তৈমাসিক পত্র
মানব মন
জানয়ারী সংখ্যার বিশিষ্ট রচনা।
* পাভলভ পরিচিতি
* আমেরিকার মৃত্তরস্তে শিক্ষা-
ক্রমেবদ্য ও প্রয়োজন
* জনাত্মক বা নব্যম্যলম্যন জড়
* জীব ও জীবদ্য
* মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে
প্রতি সংখ্যা ১ টাকা
সডাক বার্ষিক ৪-৮০
পাভলভ ইনস্টিটিউট
১৩২/১এ, কলিওয়ালা শ্রীট,
কলিকাতা—৪।

স্বপ্না যুগ

নান্দীকর

আজকের কথা

বহির্ভারতে ভারতীয় ছবির বাজার:

স্টেটসম্যানের লেখিকা শ্রীমতী অমিতা মল্লিককে ধন্যবাদ। তিনি ভারতীয় ছবির বহির্ভারতীয় বাজার সম্পর্কে একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন সম্প্রতি। তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি, যে-পাঁচটি দেশে ভারতীয় ছবির সবচেয়ে বেশী চাহিদা, সেগুলি হচ্ছে যথাক্রমে ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকা, মালয়, সিংহল, বর্মা এবং ইন্দোনেশিয়া। এর পর দ্বিতীয় পর্যায়ের চাহিদায় পড়ে ছ'টি অঞ্চল—পারস্য উপসাগরীয় বন্দরগুলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, ইউনাইটেড কিংডম বা যুক্তরাজ্য (অবশ্য ইংলণ্ডে দেখানোর জন্যে নয়; ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের জন্যে), ত্রিনিদাদ ও কাম্বোডিয়া। আর যে-সব দেশেও অল্প-বিস্তর ভারতীয় ছবি দেখানো হয়ে থাকে, সেগুলি হচ্ছে ইরান, লেবানন, ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মরিসাস, ঘানা ও পাকিস্তান।

এই সব দেশে ভারতীয় ছবি রপ্তানী হওয়ার প্রধান কারণ, ও-সব জায়গায় বহু ভারতীয়ের বাণিজ্য বা অপর কোনো কর্মব্যাপদেশে বসবাস। এ ছাড়া ঐ সব অঞ্চলের অপরাপর বাসিন্দারাও সাধারণ ভারতীয় দর্শকদের মতোই অনগ্রসর ও অল্পশিক্ষিত। ১৯৬০ সালে বিদেশে রপ্তানীর ফলে ভারতীয় ছবি বিদেশের বাজার থেকে ১,৭৫,৮৯,০০০ (প্রায় এক কোটি ছিয়ান্ডর লক্ষ) টাকা উপার্জন করলেও পাশ্চাত্য জগতে এর চাহিদা অত্যন্ত সামান্যই; এমন কি নেই বললেও চলে। রাশিয়া, পোলাণ্ড, চীন প্রভৃতি কয়েকটি দেশে খুব অল্প কয়েকখানি ভারতীয় ছবি বিক্রী হলেও ও-সব দেশে ভারতীয় ছবির একটা নিয়মিত বাজার আজও সৃষ্টি হয়নি। আর ছবির রাজ্য আমেরিকা ও ইংলণ্ডের তো কথাই নেই। খ্রীসত্যজ্ঞ রায়ের ছবি ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় ছবির নাম ওখানে শুনতে পাওয়া যায় না। খ্রীয়ায় ভারতকে এনে দিয়েছেন জাতীয় সম্মান, ব্যবসায়িক সাফল্য ও বিদগ্ধজনের প্রশংসা। কিন্তু তাঁর পর?

অথচ ভারত সম্প্রতি আগ্রহে আজ পৃথিবীর সর্বত্রই। সকল দেশের লোকই ভারতবাসীর চিন্তাধারা, দৈনন্দিন রীতিনীতি, কার্যকলাপ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে চায়। যে-ভারতের হয়ে পণ্ডিত নেহরু, পৃথিবীর দেশে দেশে শান্তির বাণী বহন করে নিজে গেছেন, সেই ভারত কেমন, সেখানকার গ্রাম, শহর, পাহাড় পর্বত, নদী, পথ, ক্ষেত, বন, বাড়ীঘর সব কেমন, সেখানকার



“সাহেব বিবি গোলাম” চিত্রে মীনা কুমারী

লোকজন সমেত সমস্ত দেশটাকেই এসব দেশের লোকেরা জানতে বুঝতে চায়। এবং এ-পরিচীতি ভারতীয় চলচ্চিত্র যে-রকম প্রত্যক্ষভাবে দিতে পারবে, সে-রকমটি আর কোনো কিছুর মাধ্যমেই সম্ভব নয়। তবুও পৃথিবীর সকল দেশে ভারতীয় ছবির চাহিদা নেই কেন?

প্রথম কারণ, বেশীর ভাগ ভারতীয় ছবিরই বিষয়বস্তু স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; সর্বজনীনতা তার মধ্যে অত্যন্ত অল্প। গল্পগুলির মধ্যে এমন সব চরিত্রসৃষ্টি করা হয়, যাদের কাহিন্য কলাপ স্থানীয় দর্শক ছাড়া অন্য সকলের কাছেই দুর্বোধ্য। অথচ ইতালীয় ছবি ‘বাইসিক্ল থিফ’ বা জাপানী ছবি ‘ইউকিওয়ারিগু’ বা ‘হ্যাপিনেস ফর আস অ্যালোন’ প্রভৃতি ছবির গল্প বা চরিত্রগুলি—পৃথিবীর সব দেশের, সব কালের, সব শ্রেণীর লোকেরই সহজবোধ্য। দ্বিতীয় কারণ,

ভারতীয় ছবিতে সংলাপ অত্যন্ত বেশী। ভাবাবেগ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও যেমন, হাস্য হাস্যরস সৃষ্টির বেলাতেও তেমন—সংলাপের সাহায্য ছাড়া ভারতীয় ছবি যেন চলতেই চায় না। তাই যারা ভাষা জানেন না, তাঁদের কাছে ছবিগুলিকে গতিহীন বলেই মনে হয়; যেখানে কথার প্রস্রবণে ভারতীয় দর্শকের হৃদয় বিগলিত হয়ে ভেসে যায়, সেখানে ভাষানিডঙ্ক অভারতীয় দর্শক কোনো রকমে মনোযোগী হবার কারণই খুঁজে পান না। তৃতীয় কারণ, ভারতীয় ছবিতে নাচগানের অত্যধিক ছড়াছড়ি। আমাদের ছবির পাত্রপাত্রীরা আনন্দেও গান গায়, দুঃখেও গান গায়; তাদের প্রেম করার উপকরণ গান, ব্যঙ্গ করার উপকরণও গান। এর ওপর আছে নাচ; একক,

দ্বৈত এবং বহুজনের সম্মিলিত। কেন নাচ হচ্ছে, অনেক সময় আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না। এবং ভারতীয় গানের সুর বা নাচের বিভিন্ন ভঙ্গী আমাদের কাছে যতই উপভোগ্য হোক না কেন, সকল বিদেশীর কাছে তাদের আবেদন কতখানি, সেটা যথেষ্ট অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। চতুর্থ কারণ, ভারতীয় ছবির বৈদেশিক বাজার সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের জাতীয় সরকারের নিষ্সহতা এবং কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করা। আমাদের সরকারের একটি সংস্কৃতি বিভাগ আছে; কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্রকে সংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যম হিসেবে তারা আদৌ স্বীকার করেন কিনা, সে-বিষয়েই ঘোরতর সন্দেহ আছে। এবং আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ চলচ্চিত্র মারফত বৈদেশিক মদ্রা অর্জনের ব্যাপারে কতখানি যত্নশীল, তার বাহা নিদর্শন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

ভারতীয় কাহিনী-চিত্রকে বিদেশে বিস্তৃত বাজার করে নিতে হলে শ্রীমতী মল্লিকের এবং ঐ সংগে আমাদেরও মতে এই কণ্ঠ জিনিষের প্রয়োজন : (১) আমাদের প্রযোজকদের বিদেশের বাজারের দিকে তাকিয়ে ছবির দৈর্ঘ্য, বিষয়বস্তু এবং বিন্যাসপ্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; এ-ব্যাপারে জাপানের প্রচেষ্টা আদর্শস্থল। (২) এই সব ছবির প্রস্তুতির জন্যে যে অর্থ প্রয়োজন, তার দিকে সরকার প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পোরেশনের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। (৩) ভারতে বৈদেশিক ছবি (হোলিউডের তৃতীয় শ্রেণীর চিত্র সমেত) দেখিয়ে যে প্রভূত লাভ হয়, তার বেশীর ভাগ অংশই ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্যে যাতে ব্যয়িত হয়, তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার এবং বিদেশের যে-সব অঞ্চলের ছবি ভারতে দেখানো হয়, বিশেষ চুক্তিবলে সেই সব অঞ্চলে ভারতীয় ছবির প্রদর্শন ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন আছে। অবশ্য আমরা তখনই এই ধরনের ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কথা কইতে পারব, যখন আমরা আমাদের ছবির মানকে যথেষ্ট উন্নত করে তুলব। (৪) ভারতীয় ছবিকে বিদেশের বাজারের উপযোগী জনপ্রিয় করবার জন্যে জাতীয় সরকারের উচিত, ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন বৈদেশিক প্রতিনিধিদের এবং কন্ট্রীটিজ্ঞদের নিয়মিতভাবে ভারতীয় চিত্র দেখানো। এর ফলে বৈদেশিক চাহিদা ও রুচি সম্পর্কে আমাদের প্রযোজকদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র প্রযোজনা

বিপাশা : চিত্র-প্রযোজকের নিবেদন; ১২,০০০ হাজার ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : তারা-



তারাশঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে অগ্রদূত পরিচালিত "বিপাশা" চিত্রে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন।

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; পরিচালনা : অগ্রদূত; চিত্রনাট্য ও গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; সংগীত পরিচালনা : রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; চিত্র গ্রহণ : বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ; শব্দধারণ : যতীন দত্ত; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; শিল্প নির্দেশনা : সত্যেন্দ্র নাথ চৌধুরী; নৃত্য পরিচালনা : অতীন্দ্র নারায়ণ গাঙ্গুলী; রূপায়ণ : সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জীবন বসু, তুলসী চক্রবর্তী, লিলি চক্রবর্তী, কেতকী দত্ত, ছায়া দেবী, গেলারিয়া ডাউনিংটন প্রভৃতি। চাডীমাতা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের

পরিবেশনায় গেল ২৬শে জানুয়ারী থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

আজকাল বাঙলা ভাষায় এমন অনেক দুঃসাহসের পরিচয়বহনকারী গল্প লেখা হচ্ছে, যা সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনবিশিষ্ট পাঠক-পাঠিকাকে মৃগধ এবং আকৃষ্ট করে। কিন্তু সেই সমস্ত গল্প অবলম্বন করে যদি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়, তাহলে সেগুলি লেখকের প্রসাদগুণবিশিষ্ট ভাষার আবরণমুক্ত হয়ে দর্শক মনে বিরূপতারই সৃষ্টি করে। তারাশঙ্কর রচিত "বিপাশা" উপন্যাস একটি উচ্চাঙ্গের রচনা হিসেবে পাঠকদের প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু ছবির পর্দায় তার যে-রূপ প্রকাশিত হয়েছে, তাকে সমভাবে প্রশংসা করা যায় কি? ছবির নায়ক দিব্যেন্দ্রের পিতা শরবিদ্যুর চরিত্রকে কোনো রকম যুক্তি স্বারাই গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সহ্য পর্যন্ত করতে পারা যায় না এবং যখন দেখা যায় যে, ঐ কামান্দ্য লোকটাই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত 'স্বামিজী'-রূপে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এসেছে, তখন ঐ ন্যাকারজনক চরিত্রটির সংগে সারা গল্পটির প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করবার সময় মনে হয়, যেন মুখে একটি তিক্তস্বাদ লেগে রয়েছে। 'বিপাশা' গল্পকে ছবির জন্যে নিবর্তিত করে প্রযোজক এবং পরিচালক—কেউই সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি এবং যদিই বা বিপাশা ও দিব্যেন্দ্র—



"কাণ্ডনজম্বা" চিত্রে অনিল চ্যাটার্জি ও বিদ্যা সিং



মার্কিন-এর পরিচালনায় চিত্রযুগ-এর চিত্রোপহার 'কাঁচের স্বপ্ন'র একটি দৃশ্যে দিলীপ মুখোপাধ্যায়

এই দুই চরিত্রে সুচিহ্না এবং উত্তম-কুমারকে দিয়ে অনবদ্য অভিনয় করাবার লোভে গল্পটিকে নির্বাচিত করেই থাকেন, তাহলে শরৎচন্দ্র চরিত্রকে তার বিবাহব্যাপারে এমনভাবে পরিবর্তিত করা উচিত ছিল, যা ছবির দর্শকের কাছে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে উপস্থাপিত করা যায়। কিন্তু তা হয়নি।

বাঙালী-বাপ এবং পাজাবী মায়ের মেয়ে বিপাশা (বিয়াস্ যার ডাক নাম) বাঙালী যুবক দিবোন্দ্রকে যে-বিচিত্র পরিবেশে প্রথমে অপমান এবং পরে অপমানের অন্যায় শোধরাতে গিয়ে ক্রমেই ভালোবেসে ফেলোছিল; তার মধ্যে খুব বেশী নতুন না থাকলেও সাধারণ দর্শককে আনন্দ দেবার উপাদান যথেষ্টই ছিল। দিবোন্দ্রের কাছে বিপাশার নিজের অতীত জীবন বর্ণনা বহুলাংশে চিত্ররীতি বিরোধী। দ্যাশ-বাকের সাহায্যে পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থান উত্তরণের ঘটনাটি একান্ত অবিবাস্য-রূপে উপস্থাপিত হলেও অভিনয়গুণে মনোহর। এর পর পাণ্ডুতে বিবাহরাত্রি পর্যন্ত ঘটনাগুলি পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হলেও সুন্দর উপস্থাপনা, অভিনয় এবং নয়নসুখকর দৃশ্যগ্রহণের গুণে

বহুলাংশে উপভোগ্য। কনিষ্ঠ মাতুলের পুত্রপ্রাপ্তির পর দিবোন্দ্র তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, এলাহাবাদে সঠিক জন্ম-রহস্য জানবার জন্যে মাতৃ-অশ্রুবর্ণ, দিবোন্দ্রের সম্মানে বিপাশার এলাহাবাদে আগমন, জীবনের প্রতি বাঁতশ্রম হওয়ায় দিবোন্দ্রের আত্মহত্যার চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর সাহায্যে প্রাণরক্ষা ও তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হাসপাতালে তার সঙ্গে বিপাশার কথোপকথন—এ পর্যন্ত দর্শক বেশ ভালো ভাবেই গ্রহণ করে এবং কেমন করে ছবির পরিসমাপ্তি ঘটে, তার জন্যে একটি কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করে। অবশ্য ছবির গোড়ার দিকে “উপনয়ন” নামে যে সুদীর্ঘ নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান আছে, তা তার দৈর্ঘ্যের জন্যেই দর্শকের ক্লান্তি ও বিরক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু পরে দিবোন্দ্রের জন্মরহস্য উন্মোচনের যে-তথ্য যেমনভাবে স্বামীজীরূপি ছবি কিশ্বাসের মূখ দিয়ে বলানো হয়, তা চোখ এবং মন, উভয়কেই পীড়িত করে। এবং পুরুর বাড়ীতে দিবোন্দ্রের মা-রূপিনী ছায়া দেবী যখন দিবোন্দ্র ও বিপাশাকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরেন, তখন সে-দৃশ্যকে

অন্তর দিয়ে অনুমোদন করতে পারা যায় না।

আজও পর্যন্ত রোমাটিক নায়ক-নায়িকারূপে যে সুচিহ্না সেন ও উত্তম-কুমার অশ্বিত্য, তা এই “বিপাশা” চিত্রেও আর একবার প্রমাণিত হল। বিরাগ, অনুরাগ, আকৃতি, প্রণয়, বিরহ, বিলাপ—সমস্তই অপরূপভাবে অভিব্যক্ত হয় সুচিহ্না সেন দ্বারা এবং উত্তমকুমার তাঁর গৃহীত চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলেন স্বচ্ছন্দ সাবলীল অভিনয়ে দ্বারা। ছবি বিশ্বাস গৃহীত স্বামীজী সংযত অভিনয়ে উজ্জ্বল। পরিচালনা শিখের ভূমিকায় কমল মিত্রের রূপসজ্জা ও বাচন দর্শকচিহ্নে মূখ্য বিষ্ময়ের সৃষ্টি করে। অপরাপর ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল (ব্যারিস্টার গুহ), জীবেন বসু (মিত্র), তুলসী চক্রবর্তী (পানওয়াল), ললি চক্রবর্তী (যশোদা), নীতিশ মুখোপাধ্যায় (ছোট মামা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

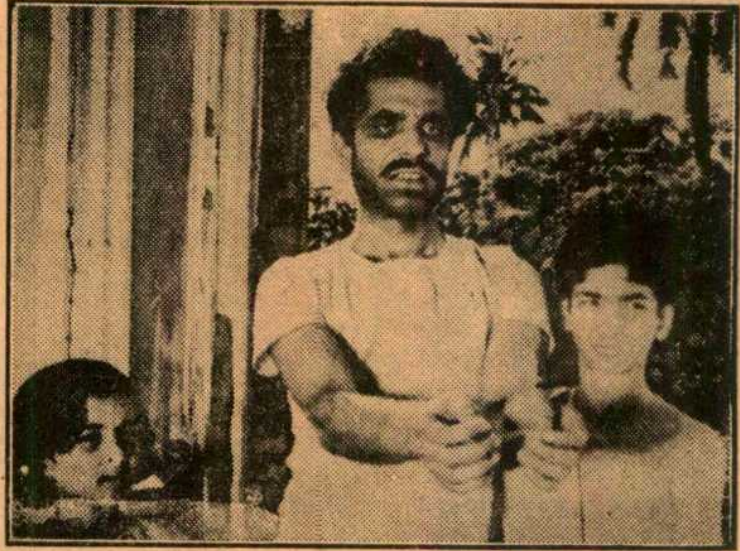
চিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ, শিল্পনির্মাণে প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগীয় কলাকৌশল কাজ অত্যন্ত উচ্চ স্তরের। সুপ্রযোজনায় বিশেষ অভিনব না থাকলেও সুগীত ও সুপ্রযুক্তি আবহসংগীত দৃশ্যানুযায়ী ভাবসৃষ্টির সহায়ক। “বিপাশা” চিত্র অভিনয়, কলাকৌশল এবং অপরাপর অঙ্গকে সুসমৃদ্ধ।

ডাকাতের হাতে : লিটল সিনেমার নিবেদন; ১০,১১২ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ রিলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত; চিত্রনাট্য ও সংলাপ : কমল কুমার মজুমদার ও শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী পরিচালনা : শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী সংগীত-পরিচালনা : নির্মল চৌধুরী চিত্রগ্রহণ : গোপাল সান্যাল; শব্দধারণ : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা : নানু বসু; রূপায়ন : শেখর চট্টোপাধ্যায়, রাভা সেনগুপ্ত, পল্লব বল্লোপাধ্যায়, রাণু গুপ্ত, অনুরাধা গুহ, নির্মল চৌধুরী, কালিদাস চক্রবর্তী, শম্ভু ভট্টাচার্য, শৈলেন গাঙ্গুলী প্রভৃতি। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পরিবেশনায় গেল ২৬-এ জানুয়ারী থেকে রাধা, পূর্ববী মেনকা এবং অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি (শিশুচিত্রম) একটি সরকারী প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংশাসিত সমিতি। এর উদ্দেশ্য, বিশেষ করে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের জন্যে পূর্ণদীর্ঘ ও অনূদীর্ঘ কাহিনীচিত্র ও শিক্ষামূলক চিত্র নির্মাণ। এই সমিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধি, সংগে বাঙালার চলচ্চিত্র শিল্পের কয়েকজন আস্থাবান প্রযোজকও আছেন বলে শুনছি। এঁদেরই প্রযোজনায় প্রথম ছবি

হচ্ছে “ডাকাতের হাতে”। বিজ্ঞাপিত হয়েছে যে, ছবিটি লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ঐ নামের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। ছবিটির পরিচালনা করেছেন বিজ্ঞাপনচিত্র-নির্মাতা লিটল সিনেমার কর্ণধার শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী, যিনি এই সেদিন রবীন্দ্র-শতবর্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে দলিলচিত্র “রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন” নির্মাণ করে আমাদের অকুণ্ঠ প্রশংসাজনন করেছেন। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন কমলকুমার মজুমদার (ইনিই কি কিশোরকুমার প্রযোজিত “সুকোচুরির পরিচালক?” ও শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী। এঁরা দু’জনে অচিন্ত্যকুমারের মূল গল্পটিকে চলচ্চিত্রের উপযোগী—অনুপযোগীও বলতে পারা যায়—করবার জন্যে এমনভাবে খোল-নল্চে বদলে খাড়া করেছেন বা শাইয়ে দিয়েছেন। একমাত্র মূল ডাকাতের নাম গণেশ, ডাকাতের হাতে-পড়া ছেলেমেয়ে দু’টির নাম অনিল ও বৃন্দা, বৃন্দার বাবার নাম অমরেশবাবু এবং বইয়ের নাম “ডাকাতের হাতে” রাখা ছাড়া ওঁরা আর কিছুই মিল রাখেননি। নৌকোর ডাকাতকে তারা ডাঙায় এনে তুলেছেন, ডাকাতদের বাসস্থানকে বনের মধ্যে দু’খানিমাত্র খড়ের ঘরের পরিবর্তে বিরাট ভাঙা জরাজীর্ণ বাড়ীতে পরিণত করেছেন, ডাকাতের কালী এবং তার পুজারীকে পর্যন্ত ডাকাতদের থেকে আলাদা এক-তান্ত্রিকের প্রতীকিত মূর্তিরূপে দেখিয়েছেন। মাত্র বাকুপটুতায় ছবির বৃন্দা মূল গল্পের বৃন্দাকে অল্প অনুসরণ করেছে, যদিও মূল গল্পের বৃন্দা তার সারল্য ও নির্ভরতাময় কথাবার্তার দ্বারা যে-ভাবে সর্দার গণেশকে অভিভূত করেছিল, ছবির বৃন্দা তার ধারে কাছেও যায়নি।

জিজ্ঞাসা জাগে, এতখানি স্বাধীনতা নেওয়ার আবশ্যকতাই বা কি ছিল এবং চিত্রনাট্যকারের এই স্বাধীনতাকে কত-পক্ষ বরদাস্ত করলেন কি কারণে? ব্যয়-



শিশু-চিত্র ‘ডাকাতের হাত’এর একটি দৃশ্যে শেখর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান পল্লব ও কুমারী রিতা।

ভার লাঘব করবার জন্যে যদি এই কাজ করা হয়ে থাকে, তাহলে অচিন্ত্যকুমারের বই গ্রহণ করা হ’ল কেন? এবং অচিন্ত্যকুমারের রচনার যদি কিছুই না রাখা হবে, তাহলে অনর্থক অচিন্ত্যকুমারের নাম বিজ্ঞাপিত হ’লই বা কেন? আমরা পশ্চিমবঙ্গ শিশুচিত্রমের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আশা করছি।

বিজ্ঞাপন-চিত্র বা দলিল-চিত্র নির্মাণ করার মধ্যে যথেষ্টই মনস্কায়না আছে; কিন্তু সেই মনস্কায়না যে একটি পূর্ণ-দীর্ঘ কাহিনীচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আদৌ সহায়তা করে না, তা দেখা গেল এই “ডাকাতের হাতে” চিত্রে, যার পরিচালক হচ্ছেন শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী। “ডাকাতের হাতে”র মধ্যে যে অ্যাডভেঞ্চার-চিত্রসুলভ রোমাঞ্চ ও নিশ্বাস-রোধী কৌতুহল জাগানো একান্ত প্রয়োজন, এই ছবিটিতে তার একান্তই অভাব। শিশুচিত্রও বিশ্বাস করতে পারবে না, এমনই আজগুবিভাবে এর গল্পের অবতারণা এবং প্রসার। কেন যে কি ঘটছে, তা দেবতার বুদ্ধিরও অগম্য। এমন একখানি নিরর্থক চিত্র আজকের দিনে নির্মাণ করা রীতিমত বাহাদুরীর পরিচায়ক।

চিত্রনাট্য, পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ, শব্দ-ধারণ, অভিনয় প্রভৃতি সকল দিকেই এমন অসামান্য ব্যর্থতা সম্প্রতি আমরা কাঁচিৎ দেখেছি। এই সমূহ ব্যর্থতার মাঝেই বৃন্দা ও অনিলের ভূমিকায় রীতা সেনগুপ্ত ও পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় মরুভূমিতে ওয়েসিস্ট সদৃশ।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীবিষ্ণুর “অগ্নিশিখা”

রাজেন তরফদারের পরিচালনায় শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন “অগ্নিশিখা” কাজ টেক্‌নিসিয়ান্স স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এই ভাবসমৃদ্ধ ছবিটির নায়ক-নায়িকা-রূপে দেখতে পাওয়া যাবে বসন্ত চৌধুরী ও কণিকা মজুমদারকে। এবং এঁদের সঙ্গে আছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, অনুপ-কুমার, বিজয় ভাওয়াল, ছায়া দেবী, মঞ্জুলা, জয়শ্রী সেন এবং নবাগত শর্মিষ্ঠা। ছবিটিতে সুরারোপ করছেন রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রূপভাস্বর-এর “ভারপর”

রূপভাস্বর সংস্থা গেল ২৬শে জানুয়ারী দক্ষিণ কলিকাতায় “মুক্ত

দক্ষিণ কলিকাতায় একটি প্রখ্যাত মণ্ডালয় কি চলে না? কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রমবর্ষমান

জনপ্রিয়তাই এ-প্রশ্নের ২৫শে জবাব। জানুয়ারী : ৭টা ও প্রতি বৃহস্পতি সন্ধ্যা ৭টা

কৃষ্ণচন্দ্র

• মহারাজ নিবাস

১৬, হাজরা রোড।

৫৭-৫১১৬



রূপকার

প্রযোজিত

রবীন্দ্রনাথের

কান্ডের হস্ত

পরিচালনা—সবিহারত দত্ত
মণ্ড—খালেদ চৌধুরী

মুক্ত অঙ্গন

ফেব্রু প্রডি সোন, বৃহ সন্ধ্যা ৬টা১৫

অঙ্গন" রঙ্গমঞ্চে তাঁদের নতুন নাটক "তারপর" রঙ্গস্থ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিনোদ পাল, জে-পি।

রূপকার-এর "কালের যাত্রা"

সুখ্যাত নাট্যসংস্থা রূপকার আস্ট্রে ফেরুয়ারী মাস থেকে প্রতি সোম ও বুধবার সন্ধ্যা ৬টা১৫ দক্ষিণ কলকাতার "মুক্ত-অঙ্গনে" নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথের "কালের যাত্রা" নাটকটি রঙ্গস্থ করবেন। নির্দেশনা ও মঞ্চপরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে সবিতারত দত্ত এবং খালেদ চৌধুরী।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার সৌজন্যে আমরা গেল ২৩শে জানুয়ারী জনতা সিনেমা গৃহে "গোল্ডেন ফিশ" নামে একখানি ফরাসী রঙীন ছোট ছবি দেখেছি। টেবিলের ওপর রাখা বোতলের ভেতর সোনালী মাছ, খাঁচার পাখী এবং কালো বিড়লের চমকপ্রদ দৃশ্যগুলি অবিস্মরণীয়। কি অসামান্য কৌশলে, কত ধৈর্যের সঙ্গে এই দৃশ্যগুলি তোলা হয়েছে, তা চিন্তা করেও হৃদিশ পাওয়া যায় না। এরই সঙ্গে দেখানো হয়েছিল ভেঁড়ি নীল পরিচালিত ব্রিটিশ ছবি "হবসন্স চয়েস"।

চলচ্চিত্র শিল্পীদের ক্রিকেট খেলা :

আস্ট্রে রবিবার ৪টা ফেরুয়ারী তারিখে সর্বজনপ্রিয় শিল্পী শ্রীছবি বিশ্বাসের একাদশ বনাম প্রখ্যাত পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়ের একাদশের রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এক মনোজ্ঞ চ্যারিটি ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই খেলার সংগৃহীত সমুদয় অর্থ সিনে টেকনিসিয়ান্স এ্যান্ড ওয়াকার্স ইউনিয়নের সাহায্য তহবিলে জমা হবে।

ছবি বিশ্বাস ও সত্যজিৎ রায় ছাড়াও এই খেলায় উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, বসন্ত চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপকুমার, তরুণকুমার, তপন সিংহ, অজয় কর, অসিত সেন, বিভূতি জাহা, সুধীর মথোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, রাজেন তরুণদার, স্বর্ষিক ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীরা অংশ গ্রহণ করবেন। তা ছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কানন দেবী, সন্ধ্যারাণী, ছায়া দেবী, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কণিকা মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, শর্মিলা ঠাকুর, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, অনুভা গুপ্তা, মঞ্জু দে, রুমা গুহঠাকুরতা, নিমিতা সিংহ, তপতী ঘোষ,

মঞ্জুলা সরকার প্রমুখ সর্বজনপ্রিয় মহিলা শিল্পীরা। বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে এ জাতীয় বিরাট সমাবেশ ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটেনি।

সাহিত্যিকদের অভিনয়

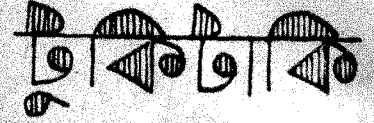
গত ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে যুগান্তর ছোটদের পাত্তাতিড়ির ব্যবস্থাপনায় সর্বপেয়েছির আসরের ষোড়শ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে বাঙলা দেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিকবৃন্দ কতক সুকবি সুকমল দাশগুপ্ত রচিত "কি বিচিত্র এই দেশ" সাফল্যের সহিত রঙ্গস্থ হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন—সর্বশ্রী কেশব গুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, মন্মথ রায়, কুমারেশ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, হিমালয়নিবাসী সিংহ, কিরণ মৈত্র, বিমল রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, রণজিৎকুমার সেন, সুদীপ দত্ত, রাগা বসু, দিগন্তচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ দাশগুপ্ত, সুকমল দাশগুপ্ত, ধীরেন বল, ক্ষিতীশ বসু, রমেন মল্লিক, অরুণ ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, রেবতীভূষণ ঘোষ, হরেন ঘটক ও স্বপনবড়ো।। স্ত্রী-ভূমিকায় ছিলেন শবরী দেবী, বেলা দেবী ও উমা দে শীল।। অভিনয় পরিচালনা করেন প্রথিতযশা নাট্যকার মন্মথ রায় এবং উপদেষ্টা রূপে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বৈশাখী নাট্যাংগণ :

গেল ১৫ই, ২২-এ এবং ২৪-এ জানুয়ারী মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে বৈশাখী সম্প্রদায় তাঁদের নাট্যাংগণের অনুষ্ঠান করলেন। ওরা ১৫ই রঙ্গস্থ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা', ২২-এ পৃথ্বীশ সরকারের 'লবণাক্ত' এবং ২৪-এ দৃষ্টি একাধিকক—কমল চট্টোপাধ্যায়ের 'শাস্বতিক' এবং পরশুরাম বিরাচিত বটেশ্বরের অবদান অবলম্বনে 'কে থাকে কে যায়'। আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন এঁদের উৎসবে উপস্থিত ছিলাম।

বহুদিন ধরে আমরা উদ্দেশ্যমূলক (purposeful) নাটকের কথা শুনে আসছি। কিন্তু নাগরিক জীবনের মধ্যবিত্ত সমাজের রকবাজ ছেলেদের নিয়ে পৃথ্বীশ সরকার 'লবণাক্ত' নামে যে উদ্দেশ্যমূলক নাটকখানি রচনা করেছেন, এমন সাধক নাটক আমরা আগে দেখিনি বললেও অত্যুক্তি হয় না। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোট ছেলে অরুণ (শান্তি দে অভিনীত) এই রকবাজ ছেলেদের প্রতীক। আমরা ওদের দূর-ছাই করি, কিন্তু ওদের ওই অবস্থার জন্যে আমরাই দায়ী, এই পরম সত্যটি নাট্যকার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কমল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনয়ও হয়েছে মোটের

ওপর হৃদয়গ্রাহী। "কে থাকে কে যায়"—নাট্যিক উপন্যাসিকের বিড়ম্বনা অপূর্ব ভাবে প্রকাশিত হয়েছে বটেশ্বরের ভূমিকায় বর্ণরঙ্গমঞ্জের কৃতী চরিত্রাভিনেতা তরুণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা। এবং তাঁর উপযুক্ত চাকর কেটে চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে চাঁদ্যদাস চক্রবর্তীর অভিনয়-গুণে। "শাস্বতিক" রচনা এবং অভিনয় উভয় দিক দিয়েই বার্থ।



দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলচ্চিত্রের বিষয়রূপে চিত্রনির্মাতাদের কাছে আজো পুরোনো হয়নি। তবে যুদ্ধকে ইদানীং পটভূমি হিসেবেই ব্যবহার করা হয় বেশী। বিশেষ জোর দেয়া হয় মানবিক আবেদনের ওপর। ঠিক এই জাতের একটি ছবি সম্প্রতি ব্রুটেনে তোলা হয়েছে। "দি বেণ্ট অফ এনিমিজ" ছবির কাহিনী যেমনি চিত্তাকর্ষক, তেমনি মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। ১৯৪১ সালে ইথিওপিয়ার মরুভূমিতে ছোট্ট একটি ইটালিয় প্রহরী-দলের সঙ্গে শত্রুপক্ষীয় দুজন ইংরেজ সৈনিকের বিরোধ-মধুর কাহিনী নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে এই চিত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। মেজর রিচার্ডসন এবং ফ্রাউট লেফটেনেন্ট বাকে' কমান দু'ঘটনা হয়ে ইথিওপিয়ার মরুভূমিতে গিয়ে পড়েন এবং ইটালিয় প্রহরী সৈন্যের ক্যাপ্টেন ব্রাসির হাতে বন্দী হন। রিচার্ডসন এবং ব্রাসি কেউই ঠিক পেশাদার সৈনিক ছিলেন না। কিন্তু যুদ্ধকে তাঁরা দুজন দুই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। রিচার্ডসন যুদ্ধকে খাঁটি মিলিটারী অফিসারের মতই গ্রহণ করতে চান এবং ব্রাসির মন বিদেশ বিভূষে থাকতে থাকতে যথেষ্ট কোমল এবং ঠিক সৈনিকের মতন না। কিন্তু ব্রাসিকে ফাঁপরে পড়তে হল যখন তাঁর কমান্ডারের মৃত্যুতে তাঁরই ওপর ছোট্ট সৈন্যবাহিনীর ভার পড়ল। এদিকে শত্রুপক্ষের আক্রমণের তীব্রতাও অসম্ভব ব্যুধি পেল। যুদ্ধবন্দী রিচার্ডসন অসীম কৌতুকে ব্রাসির অসহায় অবস্থাকে উপভোগ করতে লাগলেন। অবশেষে ব্রাসি ঠিক করলেন যুদ্ধবন্দীদের তিনি পালাবার সুযোগ দেবেন, যাতে তারা তাদের শিবিরে ফিরে খবর দেয় যে, ব্রাসির সৈন্যবাহিনী এতই অকিঞ্চিৎকর যে তার পেছনে গোলাগুলি খরচ করে লাভ নেই। বন্দীরা যথারীতি পালালেন এবং ঘটনাচক্রে কয়েকদিন পর ব্রাসির সৈন্যদলটিই বন্দী হল রিচার্ডসনের হাতে। এরপর স্থানীয় আদিবাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বিজিত এবং বিজেতা উভয় দলই একত্রে যুদ্ধ করলো। এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে



সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অভিযান' চিত্রের একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

রাসি এবং রিচার্ডসন অকৃত্রিম বন্ধু হলেন।

ছবির শেষটি পরিচালক বন্ধুদের মধুর রসে সিংহত করেছেন। "দি বেণ্ট অফ এনিমিজ" এর অভিনয়ংশ তারকা-শোভায় চিত্রিত। রিচার্ডসনের ভূমিকায় ডেভিড নিভেন, রাসির ভূমিকায় আলবার্টো সর্ডি অভিনয় করেছেন। গাই হ্যামিলটন হচ্ছেন পরিচালক। ছবিটি তোলা হয়েছে ইজরেইলে।

ওয়ারউইক ফিল্মসের পনেরো লক্ষ পাউন্ড ব্যয়ে নির্মিত "ক্রময়েল" ছবিটির নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে পিটার ফিণ্ড নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৬২ সালের মাক্সামাক্স নাগাদ স্পেনে

ঐতিহ্যপূর্ণ

মির্জা থিয়েটারে

ঐতিহ্যময় আর একটি
সংযোজন

ফেরারা ফৌজ

বহুপতি ও শনিবার-৬টা
রাবিবার ও ছুটির দিন-৩ ও ৬টার

বহির্দৃশ্য তোলার কাজ আরম্ভ হবে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কেন হিউজেস।

ডেবোরা কারের মতে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় হল "দি ইনোসেন্টেস" চিত্রে গভরনেস-এর ভূমিকায় অভিনয়টি। চিত্রের কাহিনীকার হেনরি জেমস। পরিচালক হলেন জ্যাক ক্রেটন। ক্রেটনের সঙ্গে ডেবোরা কাজ করে বিশেষ আনন্দের কারণ ডেবোরার প্রথম ছবি শ'র "মেজর বারবারা"র দ্বিতীয় পরিচালক ছিলেন ক্রেটন।

'ইনভেশন কোর্সেট' বটেনের একটি অনন্য যুদ্ধের ছবি। গত বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূল প্রায়ই জার্মান কামানের গোলায় বিপর্যস্ত হত। জার্মানরা অধিকৃত ফরাসী উপকূল থেকে কামান দেগে দেগে ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলস্থ একটি সামরিক হাসপাতালের তিনজন রুগীর বিকেলটিকে বিষময় করে তুলেছিল। কারণ ঠিক বিকেল হলেও হাসপাতালের চারপাশে গোলাগুলো এসে পড়ত। শেষে একেবারে তিত্তিবিরক্ত হয়ে তিনজন রুগী ঠিক করল তারা ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে কামানগুলোকে স্তম্ভ করে দেবে। একটা নৌকা জোগাড় করে একরায়ে তারা পাড়ি দিল ফ্রান্সের দিকে। অসম সাহসী এই তিনজন রুগী এবং তাদের জনৈক বোমাবিশারদ বন্ধু কিভাবে ফরাসী উপকূলে অভিযান চালিয়ে সফল হয়ে ফিরে এল তারই চিত্তাকর্ষক ছবি "ইনভেশন কোর্সেট"। ভূমিকালিপিতে আছেন বিল ট্রেভার্স, গ্রিগর আসলাস, জন লে মেসুরিয়ে,

স্পাইক মিলগ্যান, মরিস ডেনহাম প্রভৃতি।

"অন ফ্রাইডে এ্যাট ইলভেন" একটি অপরাধ-চিত্র। চিত্রের কাহিনীকার জেমস হেডলে চেজ গোয়েন্দা গল্পের জন্যে ওদেশে বিখ্যাত। এই ছবিতে যড়যন্ত্রকারীরা পটভূমিকা। চারটি পুরুষ এবং অপরাধের একটি তরুণী। দশ লক্ষ ডলারের একটি মিলিটারী ভ্যান লুট করবার প্রস্তাব অনায়াসে তারা বাস্তবে কার্যকরী করে। কিন্তু নিজেদের মথোকার দুর্বলতাই তাদের আইনের হাতে তুলে দেয়।

চিত্রটিকে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ বললে অন্যায় হয় না। ছবিটির চিত্র-নাট্যকারম্বয় চেজ এবং ফ্রাংক হারভে হলেন ইংরেজ। ছবি তোলা হয়েছে দক্ষিণ ফ্রান্স এবং মিউনিকের একটি গুটিওতে। শ্রেষ্ঠাংশের পটভূমিকা অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে রড টিগার হলেন আমেরিকান, অ্যারাস হলেন স্কট-ল্যান্ডের লোক, পিটার ভ্যান আইক হচ্ছেন ডাচ, জাঁ সারভে ফরাসী এবং নাজা টিলার হলেন জার্মান। চিত্রের প্রযোজক আলেকজেন্ডার ব্রুটার জার্মান-দেশীয় এবং পরিচালক আলভিন রেকফ নাম দেখেই চেনা যাচ্ছে রাশিয়ান।

টনি রিচার্ডসন বাস্তববাদী 'আধুনিক চিত্রের প্রযোজক হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছেন ইদানীং। তার 'লুক ব্যাক ইন্' এ্যাংগার' এবং 'এ টেবু অফ হানি' চিত্র-জগতের দুটি বিশিষ্ট প্রযোজনা। এবার রিচার্ডসন তুলেছেন হেনরি ফিল্ডিং-এর চিরকালের উপন্যাস "টম জোনস"। ছবিটি তোলা হবে টেকনিকলারে।

ওয়ার্ট ডিসনের নবতম ছবি "আই ক্যাপচার দি ক্যাসেল" তোলা হবে ইংল্যান্ডে। বাড়ি স্মিথের উপন্যাস অবলম্বনে চিত্রটি তোলা হবে। নামকের ভূমিকায় অভিনয় করছে ১৫ বছরের একটি বালক, হেলে মিলস।

সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা চিত্র ও গল্প সাপ্তাহিক

নতুন খবর

দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে প্রতি

শনিবার প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রতি সংখ্যা : ১৬ নং পরস

বাহ্যিক : ৭৫০ নং পরস

১৬/১৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

- এজেন্সীর জন্য লিখুন -

খেেলা খেলা

৬ম

খেেলায়াদের রাষ্ট্রীয় সম্মানলাভ

ভারতবর্ষের ত্রয়োদশ সাধারণতন্ত্র দিবসে দেশের যে সকল গুণীজন তাঁদের কর্মজীবনের সাধনা এবং সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এই চারজন খেলোয়াড় ‘পদ্মশ্রী’



গোষ্ঠ পাল

খেতাৰ লাভ করেছেন—প্রখ্যাত প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল, টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরিগড় ও নরী কন্ট্রোল্টর এবং ভারতের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান। এই চারজনের মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল বয়োজ্যেষ্ঠ এবং খেলাধুলা থেকে বহুকাল পূর্বে অবসর গ্রহণ করেছেন।

(সর্বভারতীয় ভাষায় বাংলার অবদান বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বই)

“আধুনিক কন্ট্রোল্ট ব্রীজ টেকনিক নিজে নিজে শেখা”

প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত, ধাকার স্পংক ডি. এম. লাইব্রেরী।

এ, সি আর-১০

এক মাইল দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড

নিউজিল্যান্ডের অলিম্পিক দৌড়-বীর পিটার স্নেল এক মাইল দূরত্ব পথ ৩ মিনিট ৫৪.৪ সেকেন্ডে অতিক্রম করে নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্বে রেকর্ড : ৩ মিনিট ৫৪.৫ সেকেন্ড—হার্ব ইলিয়ট (অস্ট্রেলিয়া)।



পলি উমরিগড়



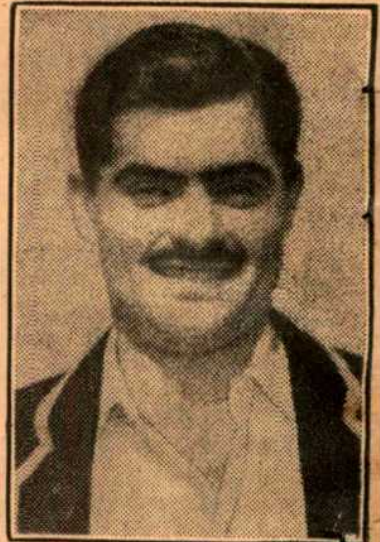
রমানাথন কৃষ্ণান

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান—২য় টেস্ট

পাকিস্তান : ৩৯৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)। হানিফ মহম্মদ ১১১, জাভেদ বার্কি ১৪০, সয়িদ আমেদ ৬৯। লক ১৫৫ রানে ৪ এবং এ্যালেন ৯৪ রানে ২ উইকেটে।

৩ ২১৬ রান (হানিফ মহম্মদ ১০৪, আলিমুদ্দিন ৫০। লক ৬৯ রানে ৪ এবং এ্যালেন ৩০ রানে ৫ উইকেটে)।

ইংল্যান্ড : ৪০৯ রান (জিওফ পুলার ১৬৫, বারবার ৮৬ এবং ব্যারিংটন ৮৪ রান। ডি'সুজা ৯৪ রানে ৪, সুজাউদ্দিন ৭৩ রানে ৩ এবং



নারি কন্ট্রোল্টর

নাশিমুলগনি ১১৯ রানে ২ উইকেটে)।

৩ ৩৫ রান (কোন উইকেট না পড়ে। পুলার ৭ রান এবং রিচার্ডসন ২১ রান করে নট আউট)।

১ম দিন (১৯শে জানুয়ারী) : পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস—১৭৫ রান (২ উইকেটে)। হানিফ মহম্মদ ৬৪ রান এবং জাভেদ বার্কি ৩০ রান করে নট আউট থাকেন।

২য় দিন (২০শে জানুয়ারী) : পাকিস্তান ৩৯৩ রানে (৭ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে কোন উইকেট না পড়ে ৫৭ রান ওঠে। পুলার ৩১ রান এবং বারবার ২৩ রান করে নট আউট থাকেন।

৩য় দিন (২১শে জানুয়ারী) : ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস—৩৩৩ রান (১ উইকেটে)। পুলার ১৬০ রান এবং



জিওফ পুলার

ব্যারিংটন ৬৯ রান করে নট আউট থাকেন।

৪র্থ দিন (২০শে জানুয়ারী) : ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪৩৯ রানে সমাপ্ত হয়। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে কোন উইকেট না পড়ে ২৮ রান ওঠে। হানিফ ১৮ রান এবং আলিমুদ্দিন ৮ রান করে নট আউট থাকেন।

৫ম দিন (২৪শে জানুয়ারী) : পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৬ রানে সমাপ্ত। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ রান (কোন উইকেট না পড়ে)।

ঢাকার ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলে পাকিস্তানের বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের এখন আর 'রাবার' হারানোর কোন ভয় রইলো না। খড়্জের টেস্ট সিরিজ জুড়ে যাবে যদি পাকিস্তান করাচীর তৃতীয় অর্ধাংশ শেষ টেস্ট খেলায় জয়লাভ করে। তৃতীয় টেস্টে পাকিস্তানের হার হলে ইংল্যান্ড ২-০ খেলায় অথবা খেলাটি ড্র গেলে সেক্ষেত্রে ১-০ খেলায় 'রাবার' লাভ করবে।

ঢাকার দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি সম্পূর্ণ নিষ্ফল্য বলা যায়। খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা তো হয়নি এমন কি অমীমাংসিত খেলার মধ্যেও কোন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি। প্রথম দিন থেকেই খেলার গতি অমীমাংসিত ফলাফলের পথে চলেছিল এবং কোন সময়েই মোড় ফেরারনি। একমাত্র কয়েকজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত সাফল্য ছাড়া দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় উল্লেখ করার মত বিশেষ কিছু নেই। পাকিস্তানের পক্ষে হানিফ মহম্মদ টেস্টের উত্তম ইনিংসে সেগুরী (১১১ ও ১০৪) করার প্রথম গৌরব লাভ করেছেন। আরও দু'জন সেগুরী করেছেন, পাকিস্তানের জাভেদ বাকি (১৪০) এবং ইংল্যান্ডের জিওফ

পুলার (১৬৫)। ইংল্যান্ডের টনি লক তার টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ১৫০টি উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলার দ্বিতীয় দিনে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় লকের বলে ইনিতিখাব আলাম ব্যারিংটনের হাতে ধরা পড়লে লকের ১৫০ উইকেট পূর্ণ হয়। তাকে নিয়ে ইংল্যান্ডের এই সাতজন খেলোয়াড় টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ১৫০ অথবা তার বেশী উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন : বেডসার (৫৯টা টেস্টে ২৩৬ উইকেট), স্ট্যাথাম (৫৯টা টেস্টে ২১৩ উইকেট), ট্রুমান (৪৫টা টেস্টে ১৯৪ উইকেট), লেকার (৪৬টা টেস্টে ১৯৩ উইকেট), এস এফ বার্গেস (২৭টা টেস্টে ১৮৯ উইকেট), টেট (৩৯টা টেস্টে ১৫৫ উইকেট) এবং লক (৪০টা টেস্টে ১৫৬ উইকেট)। এই সাতজন খেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬১ সালের টেস্ট সিরিজে স্ট্যাথাম ৪টে, ট্রুমান ৪টে এবং লক ৩টে টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন।



হানিফ মহম্মদ

পাকিস্তানের বিপক্ষে এবারের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় লক খেলেননি। ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলায় যোগদানের আগে লক ৩৪টা টেস্ট খেলেছিলেন এবং উইকেট পেয়েছিলেন ১২৬। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৫টা টেস্ট খেলে তিনি ২২টা উইকেট পান। তখন তার মোট উইকেট দাঁড়ায় ১৪৮, ৩৯টা টেস্ট খেলে।

ইংল্যান্ডের আধিনায়ক ডেক্সটার টেসে পরাজিত হন। এবারের ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফরের টেস্ট সিরিজের টেসে এই তার ৬ষ্ঠ পরাজয়, ৭টা টেস্টে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলার টেসে তিনি জয়লাভ করেছিলেন।

প্রথম দিন ৫ই ঘণ্টার খেলায় পাকিস্তান ২টা উইকেট পাইয়ে মাত্র ১৭৫ রান করে। লাগের আগের দু' ঘণ্টার



বব বারবার

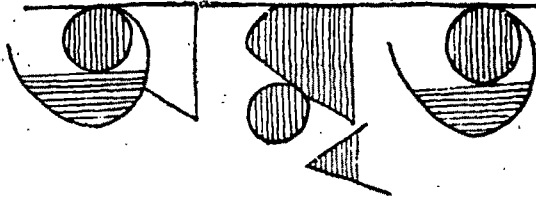
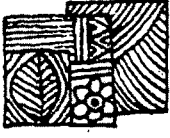
খেলায় মাত্র ৪৩ রান উঠেছিল। দলের ৫০ রান ওঠে ১৩২ মিনিটের খেলায়।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তান ৩৯৩ রানের (৭ উইকেটে) মাধ্যম প্রথম ইনিংসের সমাপ্ত ঘোষণা করে। হানিফ মহম্মদ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তার প্রথম সেগুরী করেন। তার ১১১ তুলতে ৮ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় লেগেছিল।

হানিফ ৪৫৫ মিনিট খেলে তার সেগুরী রান পূর্ণ করেন। জাভেদ বাকি ১৪০ রান করে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দু'টি টেস্ট খেলায় উপস্থাপি দু'টি সেগুরী করার কৃতিত্ব লাভ করেন। হানিফ এবং বাকি ৩য় উইকেটের জুটিতে ২৮৫ মিনিট খেলে দলের ১৫৬ রান তুলে দেন। হানিফের ৯৮ রানের মাধ্যম একবার আউট হওয়ার আবেদন ওঠে এবং একবার তিনি লকের বলে লকেরই হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে খুব জোর বেঁচে যান। এই দিনের খেলায় কোন উইকেট না পড়ে ইংল্যান্ডের ৫৭ রান ওঠে।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের এক উইকেট পড়ে ৩৩৩ রান দাঁড়ায়। পুলার এবং বারবার প্রথম উইকেটের জুটিতে দলের ১৯৮ রান তুলেন। বারবার ৮৬ রান করে আউট হন। টেস্ট ক্রিকেটে এই ৮৬ রানই তার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪৩৯ রানের মাধ্যম শেষ হলে ইংল্যান্ড মাত্র ৪৬ রানে অগ্রগামী হয়। চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের বাকি উইকেট খুব অল্প রানের মধ্যে পড়ে যায়। দ্বিতীয় উইকেট পড়ে দলের ৩৪৫ রানের মাধ্যম। তারপর বাকি ৮টা উইকেট পড়ে যায় ৯৪ রানে। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে পুলার এবং ব্যারিংটন দলের ১৪৭ রান তুলে দেন ২০০ মিনিট খেলে। পুলার ১৬৫ রান



১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪০শ সংখ্যা—৪০ নম্বর পয়সা
শুক্রবার, ২৬শে মাঘ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 9th February, 1962.
40 Naya Paise.

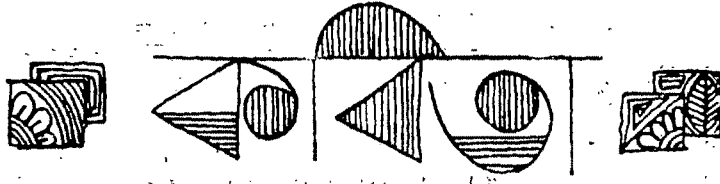
সোহরাবর্দি গত সপ্তাহে নাটকীয়ভাবে গ্রেপ্তার হওয়ার পর, পূর্ব পাকিস্তানে আরও কতকগুলি ঘটনা নাটকীয় গতিতে এবং দৃশ্যসাহসিক আবেগে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্রেরা একদা বাংলাভাষার জন্য যে রক্তদান করেছিলেন, সেই স্মৃতির আগুন অকস্মাৎ আবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। এবং প্রজ্জ্বলিত হয়েছে এমন সময়ে যখন পাকিস্তানের ডিক্টেটর স্বয়ং আয়ুব খাঁ সুপারিশদ ঢাকায় উপস্থিত।

ফৌজী ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদের পরিণতি যাই হোক, যদি আপাতদৃষ্টিতে তা ক্ষণস্থায়ীও হয়, তথাপি ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বপক্ষে বুদ্ধিজীবী মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে এই কাহিনী উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। ঢাকায় এই ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালের মাতৃভাষার শহীদদের রণক্ষেত্রের পাশেই। এই সভায় সৈরতুল্লের বিরুদ্ধে এমন একটি নির্ভীক ও প্রকাশ্য প্রতিবাদ ছিল যে, সামরিক কর্তারা এর সম্মুখীন হতে সাহস করেননি। সংবাদপত্রে এই সভার বিবরণী প্রকাশ, কিংবা সোহরাবর্দির গ্রেপ্তার সম্পর্কিত যে কোনো মন্তব্য প্রকাশই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাকিস্তানের বাইরে মর্দিত যে একটি মাত্র পত্রিকার এখনও পাকিস্তানে প্রবেশাধিকার আছে, সেই স্টেটসম্যান স্বভাবতই যথেষ্ট সন্তপণে সংবাদটিকে তাঁদের পাতায় স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ফলে স্টেটসম্যানের পর পর ৩ দিনের মধ্যে ২ দিনের সার্কুলেশন ঢাকায় বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঢাকার সংবাদ-পত্রগুলিও বলাই বাহুল্য আয়ুবশাহীর দ্বারা নিরুদ্ধ-কণ্ঠ। ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভানুষ্ঠানের পরের দিন প্রেস ক্লাব ভবনের সম্মুখে সংবাদপত্রের বহিঃউৎসবের দ্বারা এই মৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতার চিত্তাঙ্গ প্রজ্জ্বলিত করেছিল।

স্মরণ রাখতে হবে যে, এই ঘটনাগুলি কোনো গণ-তন্ত্রের দেশে অনুষ্ঠিত হয়নি। ফৌজী শাসনের সীমাহীন অত্যাচার-ক্ষমতা যেখানে বলবৎ, যে দেশে ইমারজেন্সি আইন অনুযায়ী যে-কোনো লোকের নির্বিচারে শাস্তি ও কারাদণ্ড যে কোনো মর্দুত্ব ঘটতে পারে এবং যে দেশ

বর্তমানে গোয়েন্দা ও গুপ্তচরবৃত্তির দ্বারা অষ্টোপাশের বন্ধনে আবদ্ধ, সেই দেশে এই নিরস্ত্র, প্রকাশ্য প্রতিবাদ একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। নূরুল আমিনের গভর্ণমেন্টের আমলে ঢাকার ছাত্রেরা যে গুলীবর্ষণ ও রক্তপাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার চেয়েও এই সাহস আরও দৃঢ়তর সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, এর পরের দিন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঞ্জুর কাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রসভায় তিরস্কৃত হয়ে দেহরক্ষীদের পাহারায় সভাস্থল ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু এই প্রতিবাদ কি শুধু সোহরাবর্দির প্রতি যুবসম্প্রদায়ের প্রীতি ও আনুগত্যই প্রতিফলিত করছে? আসলে তা নয়। কোনো বৃহৎ আদর্শ এবং প্রচণ্ড কোনো জাতীয় আবেগের তাড়না ছাড়া এই সাহস ও সঙ্কল্প কখনো কোনো তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। সোহরাবর্দির ন্যায় একটি রাজনৈতিক চরিত্রের জন্য পূর্ব বাংলায় ছেলেরা ফাঁসীর বাঁধন গলায় ঝোলাতে চাইছে, একথা অবিশ্বাস্য। যে সঙ্কল্প মৃত্যুকে অস্বীকার করে এবং যে প্রতিজ্ঞা নিরস্ত্র মানুষকে মিলিটারী শাসনের উদাত্ত বেয়নেটের সম্মুখে নির্ভীক মনো দাঁড় করিয়ে দেয়, তার পিছনে আছে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার তীব্র অগ্নিদাহন। আয়ুব গভর্ণমেন্ট যে গণতান্ত্রিক শক্তিকে পিষ্ট করতে চেয়েছিলেন, সেই শক্তি আজ তাকে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, এর মধ্যে দীর্ঘ সিভিলিয়ান শাসনের বদভ্যাসজনিত দুর্নীতি ও অক্ষমতা মিলিটারী শাসক-বর্গের ভিতরেও দেখা দিয়েছে। তাঁদের প্রাথমিক মোহ ও ভীতি কতকাংশে দূরীভূত হয়েছে। কাজেই পূর্ব বাংলার ছেলেরা আজ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অবকাশ খুঁজে নিয়েছে। এই বিরুদ্ধতার মূল কথা হচ্ছে, তারা পাকিস্তানের কৃত্রিম জাতীয়তাকে অস্বীকার করতে চায় এবং তারা চায় অস্বীকার করতে পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিকতাকে, যে ঔপনিবেশিকতা ইসলামিক জাতীয়তার ছদ্মবেশে মিলিটারী রুদ্রমূর্তি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের উপরে আবির্ভূত।



হয়তো

দিলীপ রায়

এই ব্যাকুল বাদল হাওয়ায় হাওয়ায়
ডাকছে আমাকে কে? তার
অদৃশ্য অস্ফুট কথার শব্দ
আমি শুনতে পাচ্ছি যেন এই
শহরের ট্রামের শব্দ, এঞ্জিনের শব্দ
অমনিবাসের শব্দ সব অতিক্রম করে তার
কান্নার আওয়াজ এলো ভেসে।

হায়, এই অন্ধুত বাদলের দৃপ্তরে
এখন, এখন আমি কী করি!

অন্ধকার অবতীর্ণ এর পরে;
চকিত বিকালের হাতছানি অনুসরণ করে
দীর্ঘ থমথমে রাগি, বিদীর্ণ করে দেবে
মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দন্ডে যন্ত্র।

তখন, রাগিবাস প'রে
সে এসে হয়তো দাঁড়াবে নিঃশব্দে জানালার ধারে
যে বাতাস স্পর্শ করবে তার দেহকে
ঈষৎ চুম্বন করে, তা এসে লাগবে হয়তো
আমার চুলে, কপালে; চেউ যেমন
মৃদু ধীর ধাক্কা আছড়ে পড়ে তটপ্রান্তে॥



মধ্যখানে তুমি আমি

সদাপ্রিয় মৃদুপাধ্যায়

পৌত্তলিক

শিবশম্ভু পাল

অগ্নুপরিমাণ জানে নিরবধি কালের স্বরূপ।
আলোকের মৃদু প্রাণ পান করে পৃথিবীর রূপ।
তোমার সম্পদ স্রোতে বহমান নগর-সভ্যতা,
মধ্যখানে তুমি আমি কথা আর কথানীরবতা।

সূর্যের প্রথম স্পর্শে ওই দেহ রোদ্দরের কণা।
অমৃত বালুকাদপ্ত মধ্যাহ্নই প্রকৃষ্ট সৌরভ;
জলরাশি স্বভাবের, মনে ফোঁসে চৈতন্যের ফণা!
মধ্যখানে তুমি আমি নিম্পলক কথাই নীরব।

বর্ণে নয় অর্থে নয় অন্ধঘোরে আশ্চর্য জীবন;
অহর্নিশি রোদ্দোরে, পরিণতি উত্তাপে স্পন্দন।
এ মৃদু ফেরালে দেখি উন্মেষিত সায়াহ্ন-সাগর!
মধ্যখানে তুমি আমি চরাচর শূন্যতার ঘর।

তোমার সম্পদ স্রোতে সময়ের বগুনীর রূপ।
অগ্নুপরিমাণ জানে তুমি আমি কালের স্বরূপ।

ভেঙে গেল বর্মখানি। ক্ষরিত রক্তের শতধারা
বক্ষ বেয়ে ক্রমে ক্রমে সিক্ত করে মর্মতল। ভাঙে
চোয়ালে চোখের কোণে অধরের প্রান্তে যত প্রচ্ছন্ন ছুরির
শাণিত দ্যুতির কণা। বদলে পেলব নয় কুসুমনির্দিত
কোমলতা অধিকার করে নিল সারা অঙ্গ, আর
অগম আত্মার দুর্গ।

তুমি সেই কোমলতা, তুমি
বাধ্য কর পরাজয়; কাছে আসি বিনত পাহাড়।
তুমি স্থির। দম্ভ তব জয়যুক্ত এই যুদ্ধে, জানি!

তুমি সেই কোমলতা, কিম্বা প্রেম, রমণী অথবা;
যদিচ প্রতাপ কিছুর অল্প নয়, বিশাল বাহিনী
পরভূত কর শব্দ চোখের তিমির মণি জেদলে
শুদ্ধমাত্র বিদ্যুতের চকিত বস্কিমা অধরের
প্রজ্ঞারে বিনষ্ট করে। অন্যথায় মূর্তিপূজা কেন
অধুনা আমার রত! রূপান্তর, দেখ, রূপান্তর।

দুর্ঘটনা

ভূমিকা

ঠিকই অনুমান করেছেন, আমি
অষ্টগ্রহ সম্মেলনের কথাই আবার বলছি।

আজ রবিবার। এখন পর্যন্তও
মারামারি কিছু ঘটেছে বলে জানিনে। সূর্য
যথারীতি পূর্বাকাশে উদিত হয়েছেন,
সকালে ঘুম ভেঙে নিতাকার মতো
আজও জমাদানের কর্মদক্ষতার বিষয়ে
গৃহপরিচারকের উচ্চকণ্ঠ সমালোচনা
শুনতে পেয়েছি, এবং নিয়ম-মতো
বাজারের থলি-হাতে প্রোটিন কার্বে-
হাইড্রেট ইত্যাদি শরীর-পোষণের উপাদান
সংগ্রহের জন্যে আমাকে ধাবিত হতে
হয়েছে। অন্যদিনের সঙ্গে আজকের
কোনো পার্থক্য আমার নজরে পড়েনি।
জীবন সেই একই চালে চলতে শুরুর
করল আজও। এত বড় একটা সন্ধ্যোগ
মাঠে মারা গেল।

সত্যিই বলছি, আমি হতাশ হয়েছি।
একবারে মহাপ্রলয় না হোক, ছোটখাট
একটা খণ্ড-প্রলয় ঘটলে কারই বা এমন
কি অসুবিধে ঘটত?

সব থেকে বড় দুর্ঘটনা হল প্রাণ-
হানি। তা কি এমনিতেই আর ঘটছে না?
অ্যাকসিডেন্ট তো জীবনে লেগেই আছে।
তা-ছাড়া চাল-ডাল-ওষুধের সমস্যায়
পড়ে কতো লোকের প্রাণ রাখতেই যে
প্রাণান্ত হচ্ছে তাও তো চোখের উপরই
দেখতে পাচ্ছি। এমতাবস্থায় বিপদগুলো
একটু সাজিয়ে-গুঁড়িয়ে যদি একসঙ্গে
তুলে ধরা হতো, তাতে কার কি মহাভারত
অশ্রুধ হতো জানিনে। এই অত্যন্ত
অগোছালোভাবে ম্লান হয়ে নিভে
যাওয়ার চেয়ে বেশ একটা লাগভাট
হৃদয়কারের সঙ্গে যদি দুর্ঘটনা আমাদের
উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, মৃত্যুর মধ্যেও
তাহলে হয়ত মহত্ত্ব থাকত। কিন্তু কিচ্ছুই
ঘটল না সে রকম। আবার সেই খোড় বড়
খাড়া এবং বাকীটা বলতে হাই উঠছে!

আয়োজনের মধ্যে কিন্তু কোনো ফাঁক
ছিল না।

মধ্য-ইউরোপে তুয়ার-ঝড়, আমেরিকায়
হিমাঙ্কের ১২ ডিগ্রী নিচে উত্তাপ নেমে
যাওয়া, আলজিরিয়া এবং মিশরে
প্রভুজনের তান্ডব, এইভাবে আসরটা জমে
উঠছিল বেশ। কিন্তু টোলক-ক্ল্যারিওনেট
সবই বাজল, দ্রোপদীও আতকণ্ঠে
'প্রাণনাথ' বলে ডাক ছাড়ল, অথচ ঠিক
যে-মুহুর্তে গদা হস্তে ভীমের প্রবেশ

ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার

ষোড়শ শতাব্দীর গদ্যাবলী সাহিত্য

১৫.০০

গাঁচশত বৎসরের গদ্যাবলী

৬.০০

অজিত দত্ত	॥	বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস	১২.০০
ডাঃ মদনমোহন গোস্বামী	॥	ভারতচন্দ্র	৩.০০
অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত	॥	চিন্তনাময়ক বঙ্গকমচন্দ্র	৬.০০
ডাঃ রথীন্দ্রনাথ রায়	॥	সাহিত্য-বীচিরা	৮.৫০
নারায়ণ চৌধুরী	॥	আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন	৩.৫০
ডাঃ অরুণ মুনোপাধ্যায়	॥	ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য	৮.০০
অধ্যাপক শিবজেন্দ্রলাল নাথ	॥	আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য	৮.০০
ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য	॥	রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা নাটক ও নাটকীয়ত্ব	৬.০০ ২.৫০
অধ্যাপক সত্যরত্ন দে	॥	নাটক লেখার মূলসূত্র	৫.০০
অরুণ ভট্টাচার্য	॥	চর্যাগীতি পরিচয়	৫.০০
অধ্যাপক প্রশান্ত রায়	॥	কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল	৮.০০ ৮.০০
অধ্যাপিকা কল্যাণী কালেকর	॥	সাহিত্য দৃষ্টি	৮.০০
ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী	॥	ভারতের শিক্ষা (১ম খণ্ড)	২.৫০
ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ	॥	ভারতের শিক্ষা (২য় খণ্ড)	৫.০০
শ্রীতারাপ্রসন্ন দেবশর্মা	॥	ভারত-জিজ্ঞাসা	৩.০০
গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী	॥	মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন	২.৫০
	॥	হিন্দু-সাধনা	৩.০০
	॥	রামায়ণভিত্তিক	৮.৫০
	॥	ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিশ্ববদ	৫.০০
	॥	শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে	৫.০০
শ্রীবলাই দেবশর্মা	॥	মহাবিশ্ব উপাধ্যায়	৫.০০
মণি বাগচি	॥	শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার	১০.০০
	॥	রামমোহন	৮.০০
	॥	মাইকেল	৮.০০
	॥	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	৮.৫০
	॥	কেশবচন্দ্র	৮.৫০
	॥	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৮.৫০
প্রফুল্লকুমার দাস	॥	রবীন্দ্র-সংগীত প্রসঙ্গ (১ম খণ্ড)	৩.৫০
প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত	॥	রবীন্দ্র	৬.০০

৩৩, কলেজ রো,
কলিং-৯

॥ জিজ্ঞাসা ॥

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-২৯

করার কথা, তখন সব চূপচাপ। এ 'টেম্পো' কি আর বেশীক্ষণ ধরে রাখা যায়? সবই যে বরবাদ হয়ে গেল!

অথচ আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম। ভেবেছিলাম, পার্কে পার্কে যেমন স্টোর-পাঠ আর যন্ত্র চলছে তা চলতেই থাকবে। আপিস-আদালতে লোক কম পড়তে পড়তে একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে। ট্রেনের কামরাগুলো ফাঁকা হ'তে হ'তে ট্রেন চলাই শেষে বন্ধ হয়ে যাবে। বাজারে মাল আসবে না, কয়লার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে, কল থেকে জল পড়বে না, ঘরে আলো জ্বলবে না, এবং তখন অন্য কিছু, ঘটক আর না ঘটক আপনা থেকেই শূন্য হবে। যদুবংশ ধ্বংসের মতো এক আত্মঘাতী মহাসংঘর্ষ।

অথবা, আমি ভেবেছিলাম, এ সব কিছু না ঘটলেও কলকাতার সমস্ত লোক হাজির হবে গড়ের মাঠে। ঢালা তুলবে, তাঁবু খাটাবে—দিব্য একটা হরিহরছত্রের মেলা ব'সে যাবে। আমরা সব স্বেচ্ছাসেবক হয়ে সেখানে টহল দেব। আরো অনেকে যাবে, যারা ঠিক স্বেচ্ছাসেবক নয়, স্বয়ং সেবক। তারা সেবা করতে চাইবে নিজেদের। আমরা তাদের হাতে-নাতে ধরে গৃহস্থ ও গৃহকন্যাদের বাহবা অর্জন করব। তারপর এখানে-সেখানে লিখে দেব 'সাবধান! জুয়াচোর, চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।'



এদিকে লোক-সমাগমের ফলে রীতি-মত দোকানপাট বসবে চারপাশে।

সকলেরই মনে মৃত্যুভয়, কে বাঁচে কে মরে স্থিরতা নেই। দোকানের গায়ে লেখা থাকবে 'হরি হে তুমিই-ভরসা।' এবং ঠিক তার নিচেই 'আজ নগদ, কাল ধার।'

নামাবলী-ধারী জ্যোতিষী এবং বেটনধারী পুলিশের কাজ বেড়ে যাবে। কিন্তু সময় পেলেই সকলে জিজ্ঞাসা করবে, কটা বাজে?

তারপর আসবে সেই চরম ক্ষণ। ইঠাৎ কী হবে বুঝতে পারব না—অষ্টগ্রহের টান, প্রচণ্ড শব্দ এবং বিস্ফোরণে সন্নিহিত হারিয়ে শতধা-বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর একটা বড় অংশের সঙ্গে আমি ছিটকে পড়ব মৃগল গ্রহে; আমার পরিচিত মানুষের কেউবা যাবে চাঁদে, কেউ বুধে। তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমি আকাশবাণীর ঘোষণাকারীর মতো মোলায়েম কন্ঠে দিগ্বিদিকে বেতার-ভাষণ পাঠাব—'হ্যালো, জৈমিনি কলিং। দিস ইজ মাস! হ্যালো—!' কী ভয়ানক সেই উদ্বেজনা, কি থ্রিল!

কিন্তু কিছু হল না।

দেখে শূন্য মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা। জীবনমূর্তির এক জায়গায় তিনি তাঁর প্রথম টেন-চড়ার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লেখেছেন—

'সত্য (কবি'র সময়সী ভাগিনেয়।—লেখক) বলিয়াছিল, বিশেষ দক্ষতা না থাকলে রেলগাড়িতে চড়া এক ভয়ংকর সংকট, পা ফনকাইয়া গেলেই আর রক্ষা নাই। তারপর, গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া কসা-চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে, মানুষ কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্টেশানে পৌঁছিয়া মনের মধ্যে বেশ একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। কিন্তু, গাড়িতে এত সহজেই উঠিলাম যে মনে সন্দেহ হইল, এখনো হয়ত গাড়ি-ওঠার আসল অঙ্গটাই বাকি আছে। তাহার পরে যখন অত্যন্ত সহজে গাড়ি ছাড়িয়া দিল তখন কোথাও বিপদের একটুও আভাষ না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।'.....

আমারও ঠিক সেই অবস্থা। তবে আগেই বলোছি, আজ মাত্র রবিবার। সোমবার এখনো আসেনি। কাজেই কবি'র মতো আমারও মনে হচ্ছে 'এখনো হয়ত ...আসল অঙ্গটাই বাকি আছে!'

বলা যায় না, তেমন সময় হয়তো সত্যিই এসে যাবে, যখন জৈমিনি ধরাধাম তাগ করে চলে যাবে মৃগল গ্রহে, এবং কবি'র অমিয় চক্রবর্তী'র অনুকরণে বলবে—

আছি এখন মাসে

এখানে কই

রৌদ্রজেরটারে দই!.....

আহা, তেমন দিন কি আর আসবে!

তিন মাসে অমিতাভ চৌধুরীর মুখের ভাষা বুকের রুধির (৩৫০)

প্রথম মূদ্রণ প্রায়-নিঃশেষিত।

চব্বিশখানা ছবি সহ দ্বিতীয় মূদ্রণ ছাপা হচ্ছে।

চার মাসে সঞ্জয় লিখিত আইখম্যান (৩০০)

প্রথম মূদ্রণ প্রায়-নিঃশেষিত।

কিছু নতুন লেখা সংযুক্ত হয়ে বর্ধিত আয়তনে দ্বিতীয় মূদ্রণ বের হচ্ছে।

পাঁচ মাসে জরাসন্ধ লিখিত একুশ বছর (৩৭৫)

প্রথম মূদ্রণ শেষ হয়ে গেছে।

দুটি সর্বাধুনিক কাহিনী সংযুক্ত হয়ে দ্বিতীয় মূদ্রণ বেরুল

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
সর্বাধুনিক বিচিত্র উপন্যাস

অপরূপ প্রচ্ছদপটে
৪ ফেরায়ার বেরিয়েছে
৥ ৩-২৫ ৥

কলিকতা-১

৫১-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকতা-১

সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ প্রিয়দর্শিনী

উদ্ভিদ জগতে ফণিমনসার গাত ক্যাষ্টাস জাতীয় গাছ যেমন আছে তেমনি আছে অশখ বট শাল শিমূল। এক জাতের গাছ নিজেকে নিজের মধ্যে মূড়ি দিয়ে সংগোপন করে রাখে, বাইরে নিজেকে যতটুকু কম প্রকাশ করে রাখা যায় তারই চেষ্টায়। আর অন্য জাতের গাছ ডাল-পালার বিস্তারে ফুল আর পাতার অজস্রতার নিজেকে শূন্য মেলে ধরবার জন্যেই উন্মুখ, সেই আনন্দে বিভোর। আকাশ বাতাস রোদ বৃষ্টিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে সাড়া দেয় প্রতি পলে পলে। জমিয়ে রাখার কোন গরজ তার নেই। প্রতিক্ষণের পাওনা প্রতিক্ষণেই সে অসত্যাচে ফেলে ছড়িয়ে দিয়ে যায় ডাল-পালা দুলিয়ে পাতা গজিয়ে কাঁপিয়ে ঝরিয়ে।

গাছপালার জগতে যেমন মানুষের মধ্যেও তেমনি এই দুই জাতই আছে, এমন কি সাহিত্যের রাজ্যেও।

প্রকাশ করাই সাহিত্য। তবু এমন সাহিত্যিকও অনেক আছেন ক্যাষ্টাসের মত যাঁরা প্রকাশ-স্বপণ। তাঁরা অনেক সমুদ্রের পর কদাচিৎ কিছু দুলভ ফল ফোটান হয়ত, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে সব-কিছুতেই সাড়া দেবার শক্তি বা উৎসাহ তাঁদের নেই।

সাহিত্যের রাজ্যে সৃষ্টি ও জীবনের সর্বকিছুতে অনায়াস সাড়া দেবার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত আমরা পেরোছি রবীন্দ্রনাথে। মানুষের চেতনার যা প্রতিফলিত হয়, তার মধ্যে মূল্যবান এমন কিছু নেই বললেই হয়, যা তাঁর লেখনীমুখে রূপান্তরিত হয়ে বিচ্ছুরিত হয়নি।

সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই উর্বর করে তুলে তিনি বিস্ময়কর নতুন ফসল ফলিয়েছেন তবু তাতেও তাঁর সম্পূর্ণ পরিচর ধরা পড়ে না বলে মনে হয়। পরমাশ্রম এক বাদ্যযন্ত্রের মত এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পর্শচেতন তাঁর মন

যে ছুঁতে না ছুঁতেই বেজে ওঠে। তাঁর সেই মনের রণন, আমরা কবিতা গান গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ ছবি ইত্যাদি সব কিছুরেই পেরোছি কিন্তু সবচেয়ে তা স্বতঃস্ফূর্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈচিত্র্যে তাঁর পত্রাবলিতে পেরোছি যদি বলি খুব অত্যাশ্চর্য কি?

চিঠি ত আমরা সবাই লিখি, সাহিত্যিকেরা ত বটেই। নানা দেশের নানা যুগের প্রতিভাবরদের চিঠি সাহিত্যের একটি বিশেষ বিভাগই সৃষ্টি করেছে। অনেক সাহিত্যিকের রচনার চাবিকাঠি তাঁর চিঠির মধ্যে পাওয়া যায়, চিঠির ইতিহাসে ও আলোচনায় কোন কোন লেখককে আমরা নতুন করে চিনি।

শুধু সাহিত্য কি সাহিত্যিককে বোঝানো চেনানো কিংবা সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্যে তাঁর চিন্তা ভাবনার পরিচয় দেওয়া ছাড়াও চিঠিপত্রের আর একটি বিশেষ মূল্য ও আকর্ষণ আছে। সে মূল্য ও আকর্ষণ একদিক দিয়ে সার্থক সাহিত্যের চেয়ে বেশী বই কম নয়।

চিঠিপত্র যেখানে স্বতঃউৎসারিত সেখানে তার মধ্যে এমন একটা অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা থাকে যা মার্কসার সাহিত্যের পক্ষে শূন্য দূরায়ত্ত নয় কিছুটা প্রকৃতি বিরুদ্ধও বটে। সাহিত্য যত সহজই হোক তাঁর একটু পোষাকী ভাব যাবার নয়, তাকে সচেতনভাবে সভায় গিয়ে বসতে না হোক পাঁচজনের সামনে বার হতে হয়। চুলের পাট কি পোষাকের ভাঁজটা তাই সে অবজ্ঞা করবার কোথাও চেষ্টা করলেও ভুলে থাকতে পারে না একেবারে। অশ্রুতনের ভীষণতার মধ্যেও সযত্ন প্রয়াস তাই নিজেরও অগোচরে লুকিয়ে থাকে।

স্বতঃস্ফূর্ত চিঠিপত্রের জাত ও চেহারাও কিন্তু একেবারে আলাদা। বাইরে যিনি বিশিষ্ট, এ যেন তাঁকে ঘরের মানুষ হিসেবে অসতর্ক অনামনস্কতার সন্ধ্যোগে পাওয়া।

অসামান্যদের সব চিঠিপত্র অবশ্য এমন নয়। বাঁধা ধরা প্রসঙ্গ-সীমার শাসন একটু আধটু শিথিল করে নিলেও অনেকের অনেক চিঠি ধারালো ও ভারালো পোষাকী সাহিত্যেরই মহলা। যেমন গোটেই চিঠির কথা বলা যায়। গোটে জীবনে প্রায় দশ হাজার নাকি চিঠি লিখেছেন, তাঁর শিলার শ্লেগেল ও তখনকার দার্শনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তানায়কদের কাছে লেখা বিখ্যাত চিঠিগুলি, বিষয় বৈচিত্র্যে অপূর্ব ও বাক্যবৈদগ্ধ্য উপাদেয় হলেও বিশুদ্ধ চিঠির চেয়ে ভাষণেরই নিকটাত্মীয়।

রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের চিঠিপত্র লেখেন নি এমন নয়। শাসালো ধারালো গুরু-গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা অনেকের সঙ্গে অনেক চিঠিতে তিনি করেছেন। কখনো উপদেশটা কখনো ব্যাখ্যাতার আসনে বসে ভাষণ জাতীয় চিঠিও তাঁকে লিখতে হয়েছে কিন্তু তাঁর যে চিঠির জন্যে আজ ও সুদূর কালের পাঠকসমাজ চিরকৃতজ্ঞ থাকবে, তার উৎস প্রেরণা ও প্রকৃতি সবই ভিন্ন। সে চিঠি আকাশ-বাতাসের আমন্ত্রণে ও স্পর্শে অরণ্যের পাতা, ধরা ও বরষার মত অনায়াস স্বতঃস্ফূর্ত। এসব চিঠি যাদের লেখা হয়েছে তারা উপলক্ষ্য মাত্র। অন্তরের অদম্য আনন্দোচ্ছলতায় এসব চিঠি লেখা হয়েছে কোনখানে কোন লাভের আশা না রেখে বাইরের কোন তাগিদ ছাড়া-ই।

এসব চিঠির গুরু রহস্যের কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যেতে পারে।

তিনি বলছেন.....সৃষ্টির একটা দিক আছে যেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বিশুদ্ধ বকুনি। সৈদিক থেকে এমনও বলা যেতে পারে—তিনি আমাদের চিঠি লিখছেন। আমার কোনো চিঠির জরব নয়, তাঁর আপনার বলতে ইচ্ছে হয়েছে বলে। কাউকে ত বলা চাই। অনেকে বলে, এ তো সারবান নয়। এ তো বন্ধুর আলাপ, এ তো সম্পত্তির দলিল নয়।... আমি একটা গর্ব করে থাকি, এই চিঠি লিখার চিঠি পড়তে পারতুমি কখনো ভুলি নে। বিশ্ববকুনি যখন তখন আমি শুনে থাকি।

রবীন্দ্রনাথ বিধাতার সেই বিশ্ব-বকুনি শুধু শোনে নি, তাই আবদর আমাদের শুনিয়েছেন। তিনি শুনিয়েছেন দেখেছেন আর দেখিয়েছেন শুনিয়েছেন তাঁর সেই অপূর্ণ মূক-স্বচ্ছ ভাষায়।

কোনো ক্যামেরা কি রেকর্ডার যার নাগাল পায় না।

তিনি যা দেখেছেন শুনেছেন তাও সাধারণ শ্রাব্য দ্রুতবোর কোঠায় পড়ে না। সে দেখা শোনা তথাকথিত বিজ্ঞ বিম্বান-বিচক্ষণের দেখাশোনা নয়। এ যেন এক আশ্চর্য চিরশিশুর তীক্ষ্ণ সজাগ চেতনা যা এই বিশ্বলীলার সব কিছুর মুখে বিস্ময়ে প্রতিফলিত করে।

এই দেখা সম্বন্ধেই তিনি বলেছেন, —মোহের কুরাশায় অভ্যাসের আবরণে সমস্ত মন দিয়ে জগৎটাকে ‘আছে’ বলে অভিযর্থনা করবার আমরা না পাই অবকাশ না পাই শক্তি। সেইজন্যে জীবনের অধিকাংশ সময় আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়েই চলেছি। সত্তার বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েই মারা গেলাম।

তিনি আবার বলেছেন,—আমি বলি দেখো—তবেই দেখাতে পারবে। সত্তার

প্রবাহিণী ঝরে পড়ছে। তারই স্রোতের জলে মনের অভিক্ষেপ হোক। ছোটো বড় সুন্দর অসুন্দর সব কিছুর নিয়ে তার নৃত্য। সেই প্রকাশ ধারার বেগ চিন্তকে স্পর্শ করলে চিন্তের মধ্যেও প্রকাশের বেগ প্রবল হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের অগণন চিঠিপত্রের মধ্যে প্রবাহিণী সত্তার এই নিরন্তর বিচ্ছুরণই আমরা সব চেয়ে বেশী করে পাই।

সতেরো আঠারো বছর বয়সে লেখা য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের তার স্পষ্ট আভাস।

লিখছেন,—মেঘ বৃষ্টি বাদল অন্ধকার শীত—এ আর একদণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয় তখন মৃদলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ ঝড়—তাতে কেমন একটা উল্লাসের ভাব আছে। এখানে এ তা নয়, এটিপ টিপ

করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতি নিঃশব্দ পদসম্মারে চলেছে ত চলেছে। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তম্ভ-ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জানলার ওপর টিপ টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে স্তরের স্তরে মেঘ করে। এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে। মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জগৎমের একটা অবসর মুখশ্রী। লোকের মুখে সময়ে সময়ে শুনেতে পাই বটে যে কাল বজ্র ডেকেছিল কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে তার মুখ থেকেই সে খবরটা পাই। সূর্য ত এখানে গৃজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের লেখা চিঠিপত্র থেকে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি এই জন্যেই করলাম যে পরবর্তী সারা জীবনে তাঁর পত্র সাহিত্য যে অভিনব রসলোক সৃষ্টি করবে তার সূচনা এইখানেই দেখা যায়।

ইউরোপ প্রবাসীর পত্র ওই বয়সের এক যুবকের পক্ষে প্রায় অবিম্বাস্য বিচারবোধ ও পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় যেমন পাই সেই সঙ্গে পাই সেই দুর্লভ প্রকৃতি-চেতনার প্রথম উন্মেষ যা তাঁকে পৃথিবীর সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে মহিমা-ময় স্বাভাব্য দিয়েছে।

সত্যি কথা বলতে গেলে য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র একটু অবহিত হলে ভাবী রবীন্দ্রনাথের বিরাট বিচিত্র প্রতিভার অনেক অঙ্কুরই বোধহয় পাওয়া যায়। তাঁর পত্রালাপের সমস্ত সূরের খেলার ত বটেই। স্নিগ্ধ, শান্ত মধুর করুণ থেকে কৌতুকোজ্জ্বল শ্লেষভীক্ষ্য প্রায় সমস্ত রসই তার মধ্যে উপস্থিত।

য়ুরোপ তাঁর আগেও অনেকে গেছেন, তাঁর পরেও। সে যুগের সে য়ুরোপও আর নেই। কিন্তু সেই য়ুরোপের যে ছবি তিনি সেই বয়সে একে গেছেন তার তুলনা আমাদের ভাষায় অন্তত এখনো আর কোথাও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। এ রচনার বিশেষত্ব এইখানে যে সত্যিই আগাগোড়া তা চিঠির মেজাজে লেখা,—সেই স্বচ্ছ স্বাভাবিক স্রোত যা অবলীলা-ক্রমে বয়ে যায় আর তরল লঘু ভাষাতেই একটু ছুঁয়ে অনেক কিছুর প্রকাশ করে।

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র যা সূর্য পত্রা-লাপের সেই আশ্চর্য অভিনব রসমাধুর্য ও বৈচিত্র্য আরো পরিণতভাবে তাঁর সারা জীবনের অজস্র চিঠিতে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তবু নমুনা হিসেবে তাঁর ভাবী পত্রসাহিত্যের বিভিন্ন ভাব ও ভঙ্গীর কয়েকটি অঙ্কুর সেখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন, হালকা কৌতুকরসের সাক্ষ্য ত প্রথম পত্রের সূর্য থেকেই পাই। সমগ্র প্রথম পত্র দিয়েই সমগ্র পীড়ার হৃদয় শয্যাশায়ী থাকার পর প্রথম

রান্নার স্বাচছন্দ্য

রান্নায় আপনি তখনই
উৎসাহ বোধ করবেন যখন
কয়লা ভেঙে উঠুন ধরাবার
ঝামেলায় ও অস্বাস্থ্যকর
ধোঁয়ায় আপনাকে বিব্রত
হতে হবে না।

- * বিনামূল্যে একসেট পলতে
- * যে কোন অংশ সহজলভ্য



PATENT NO. 62354 OF-57

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক :

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

KALPANA, Q. M. 188

এডেনের কাছাকাছি এসে বিছানা ছেড়ে উঠে লিখছেন,—বিছানা থেকে ত উঠলাম। উঠে দেখি যে সত্যিই ইন্দুরের মত দুর্বল হয়ে গেছি। মাথা যেন ধার করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালো করে বনে না। চুরি করা কাপড়ের মত শরীরটা যেন আমার গায়ে ঠিক লাগছে না।

টনিব্রিজ ওয়েলসের স্বাস্থ্যকর জলের উৎস সম্বন্ধে লিখছেন,—উৎস শুনেই কল্পনা করেছিলাম না জানি কী সুন্দর দৃশ্য হবে। চারিদিকে পাহাড়-পর্বত গাছ-পালা সারস ময়ালকুল কজিত কমল কুমুদ কহ্লার বিকশিত সরোবর, কোকিল কুজল মলয় বীজল ভ্রমর গুঞ্জন ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে পশুশরের প্রহার ও এক ঘটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসা। গিয়ে দেখি একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো।

পরে সেই জায়গা সম্বন্ধে আবার লিখছেন,—যখন টনিব্রিজ ওয়েলসে ছিলাম তখন ভাবতুম এখানে যদি মদন থাকে, তবে অনেক বনবাদাড় বোপঝাপ কাটা-গাছ হাতড়ে দু'চারটে বুনো ফুল নিয়েই তাকে কোনমতে ফুলশর বানাতে হয়—

মুরোপ ও বিলেতের মানুষজন আচার-ব্যবহার সামাজিক রাষ্ট্রিক রীতিনীতির অম্লমধুর সরস বিবরণের মাঝে সেই যুগেও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি তন্ময়তার পরিচয় নানা জায়গায় ছড়ানো। একটি উদ্ভৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। আর একটিও এই সূত্রে দিলে বোধহয় বাহুল্য হবে না।

ডেভেনশায়ারের সমুদ্রতীর সম্বন্ধে লিখছেন,—এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড় ভালো লাগে। যখন জোয়ার আসে তখন সমুদ্রতীরের খুব প্রকাণ্ড পাথরগুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বোঁরয়ে থাকে। ছোটো ছোটো স্বীপের মত দেখায়।...এক একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের ওপর খুব ঝুঁকু পড়েছে, আমরা প্রাণ পণ করে এক এক দিন সেই অতিদুর্গম পাহাড়গুলোর ওপর উঠে বসে নিচে সমুদ্রের ডেউ-এর ওঠা-পড়া দেখি। শব্দ উঠছে, ছোট ছোট নৌকো পাল তুলে চলে যাচ্ছে, চারিদিকে রোদ্দুর, মাথার ওপর ছাতা খোলা...আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা কোথায় পাব?

এই বর্ণনা আমাদের মনকে আপনা থেকেই সুন্দর ইংল্যান্ডের সমুদ্রতীর থেকে বাংলার প্রান্তে অপরিপূর্ণ একটি নদীর রাজ্যে নিয়ে যায় না কি? ডেভন-শায়ারের টর্কির সমুদ্রকূল থেকে শিলাহিঁদহের পশ্চিম ভৌগোলিক দূরত্ব যতই হোক মুরোপ প্রবাসীর পত্রই ছিন্নপত্রে পৌঁছোবার প্রথম সেতু।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে কত চিঠি লিখেছেন তা পাণ্ডিতদের কাছে জানবার অপেক্ষার রইলাম। আমাদের তা গণনার বাইরে। তাঁর চিঠিপত্রের সন্ধান আজও

শেষ হয় নি, এখনও তা প্রায় অফুরন্ত-ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। মহারণের পত্র-পুঞ্জের মতই তাঁর চিঠির রাশি তিনি দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সে সমস্ত চিঠি সংগৃহীত হবার পরও কিন্তু ছিন্নপত্রের মর্মরই তার মধ্যে প্রধান বলে জানা যাবে বলে মনে হয়।

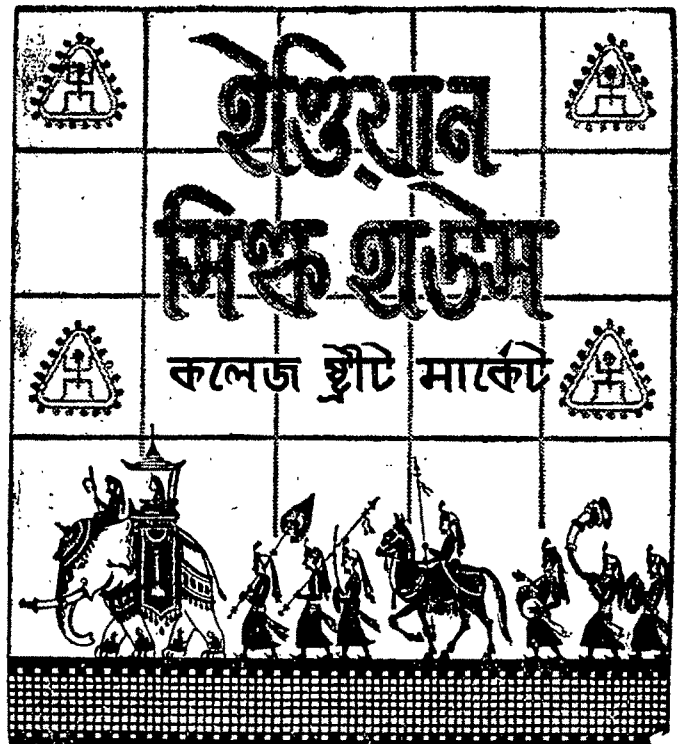
ছিন্নপত্র শব্দ রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের মধ্যেই নয় পৃথিবীর সমস্ত পত্র-সাহিত্যের মধ্যেও অনন্যপূর্ব বললে বোধ হয় বেশী বলা হয় না। বাংলা সাহিত্যে শব্দ নয় বাংলা ভাষার বিবর্তনে; ছিন্নপত্র এবং তাঁর সেই প্রথম যৌবনের মুরোপ প্রবাসীর পত্রের দান ত অবিস্মরণীয়। তা এখনো আমাদের যথোচিত সন্তুষ্টি স্বীকৃতি পায়নি বলেই সন্দেহ হয়। বাংলা গদ্যে কথা-ভাষার সাবলীল বেগ প্রথম সঞ্চারিত করবার দঃসাহসী সার্থক পরীক্ষা সবুজ পত্রের ঘোষণামুখর আন্দোলনের বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন।

কিন্তু ছিন্নপত্রের কাছে ভাষার এই মূর্ত্তি-প্রেরণা আমাদের উপরি পাওনা মাত্র। ছিন্নপত্রে আমরা এমন কিছু পাই, যে কোন দেশের সাহিত্যে যা দুর্লভ। তুলনা হিসেবে অ্যামিয়েলস জার্মান বা সেই জাতীয় কিছু যদি মনেও আসে, একটু বিচার করলেই রবীন্দ্রনাথের চিঠির সঙ্গে তার পার্থক্য বুঝতে কষ্ট হবে না। রবীন্দ্রনাথের পত্র রোজনাট্য নয়, এমন কি সচেতন চিন্তা বিলাসও নয়, তা যেন আশ্চর্য এক আনন্দঘন চেতনার গুঞ্জন যা অন্তরংগভাবে

উপভোগ করবার আশাতীত সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। সাহিত্যের অন্য যে সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সচেতন স্রষ্টা সেখানে অসামান্য সব কীর্তি তিনি রেখে গেছেন আমাদের মূগ্ধ বিস্ময় জাগাতে, কিন্তু তাঁর চিঠিপত্রে আমরা যা পাই, তা যেন তাঁর সেই প্রবাহিণী সত্তারই আবির্ভাব আত্মবিভোরতার কলতান, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যেও সচেতন যে কৃতিমতটুকু প্রায় অপরিহার্য বলা যায় তাও যার মধ্যে অনুপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক আত্ম-জীবনী লিখে যান নি এবং তাঁর বিস্তারিত জীবনী লেখার উপকরণ দুঃপ্রাপ্য বলে অনেককে দুঃখ করতে শুনি। এমন কি তাঁর পঠিত পুস্তকের তালিকা না পাওয়ার জন্যেও নাকি আক্ষেপ শোনা যায়। আমার ত' মনে হয় এ যেন তীর্থ দর্শন সেরে এসে ছাপানো টাইম টেবল না পাওয়ার আক্ষেপ। তীর্থ মানে ত' স্টেশনের খবর, গাড়ী বদলের হিঁদশ আর পাণ্ডার নাম-ঠিকানা নয়। রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের জীবনও তেমনি নয় শব্দ কটা বাইরের ঘটনা আর তারিখের ফাঁসি। স্থলে কৌতুহল মেটাবার ঘটনানির্ভর বিবরণ নয়, রবীন্দ্রনাথের কাছে আরো গভীর কিছু দুর্লভ কিছু আমরা পেয়েছি—পরমাশ্চর্য এক চেতনা প্রবাহের প্রায় নিত্যকার দিনলিপি।

তাঁর সারা জীবনের অপরিপূর্ণ অপরিপূর্ণ পত্রধারাই সাহিত্য লোকের অনন্যপূর্ব সার্থকতম আত্মজীবনী নয় কি?



॥ প্রেক্ষাগৃহের 'সরি ম্যাডাম' ॥

সম্পাদক সমীপেবু,

অমৃত

সবিনয় নিবেদন,

আমি অমৃত পরিচয় অনেক অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে অন্যতম। অল্প কয়েকমাসের মধ্যে অমৃত পত্র-পত্রিকার জগতে যে বিশিষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন করেছে তা রাস্তাবিকই একটি বিশ্ময়ের বিষয়, আপনাদের নিরামিত বিভাগগুলির মধ্যে 'পূর্বপক্ষ' ও 'ইউরোপীয় সাহিত্য' পরিচয় আরও অনুরক্ত পাঠক। কিন্তু আপনাদের ছায়াচিত্র বিভাগটির চিত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে আমার কিছু আপত্তি আছে। কয়েক সংখ্যা আগে 'সরি ম্যাডাম' ছায়াচিত্রটির দেখলাম প্রায় উচ্ছ্বাসিত প্রশংসাই করা হয়েছে। অথচ আমি নিজে ছবিটি দেখেছি। বিশ্লেষণ করুন উক্ত চিত্রটি দেখতে দেখতে আমি একটি দড়ির অভাব প্রবলভাবে অনুভব করছি। কারণ দড়ি দিয়ে নিজেকে সিনেটর সঙ্গে না বেঁধে রাখলে একনাগাড়ে ছবিটি বসে দেখা প্রায় অসম্ভবই। আপনারা বলতে পারেন বাংলা ছবি যাতে একেবারে মার না খায় তাই সমালোচককে রূঢ় সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। কিন্তু অন্য কোনো কাগজেই 'সরি ম্যাডাম' এর এতটুকু প্রশংসা দেখলাম না। আবার 'ডাকাতের হাতে' ছবির প্রায় রূঢ় সমালোচনাই কোরেছেন সমালোচক। অথচ 'সরি ম্যাডাম' এর তুলনায় 'ডাকাতের হাতে' অনেক ভাল ছবি ত বটেই—অন্ততঃ প্রচেষ্টা হিসাবেও মহৎ।

অন্তে নিবেদন করি, সমালোচনা যদি গোষ্ঠীতোষণে অথবা চাটুকারিতার পক্ষে অবস্থা নির্মিত হয়, তাহলে 'সমালোচনা' এবং 'বিশ্লেষণ' শব্দদ্বয়ের কোন মৌলিক পার্থক্যই আর থাকেনা এবং সেক্ষেত্রে এই ধরনের চিত্র-সমালোচনার নিচে 'A' অর্থাৎ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লিখে দেওয়াই বিধেয়।

নিজগুণে প্রগলভতা ক্ষমা করবেন।

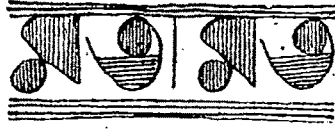
বিনীতি

বিশ্বনাথ রায়, কলিকাতা-৩৭।

(২)

প্রমথের সম্পাদক মহোদয় সমীপেবু :—
মহাশয়,

সাম্প্রতিক অমৃতের নিয়মিত পাঠক হিসেবে চিত্রসমালোচক 'নান্দীকর' মহাশয়ের কাছে আমার গুটিকয়েক কথা বলার আছে। গত ১৯শে জানুয়ারী ও ২৬শে জানুয়ারীতে প্রকাশিত পর পর দু'খানা 'অমৃত'ে 'সরি ম্যাডাম' ও 'কাবুলীওয়ালার' অপভূত চিত্র-সমালোচনা পড়ে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়েছে। 'সরি ম্যাডাম' বাংলা চলচ্চিত্রাকাশে এক বিভী-



ষিকাময় দৃষ্টান্ত—যার অবাস্তব কাহিনী, অভব্য উপকরণ, সাদৃশ্যহীন বিন্যাস-ধারা, নির্লজ্জ অশ্লীলতা বাংলার মহান খ্যাতিকে স্মান করে দিয়েছে। দুর্বল পরিচালকের হাস্যকর অপচেষ্টাকে নান্দীকর কেন যে স্বাগত জানিয়েছেন ভেবে পাইনি। 'বাংলা দেশের গতানুগতিক ছবি থেকে 'সরি ম্যাডাম' একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম'..... বাংলা দেশের ছবি গতানুগতিক!! আর তাদের বিশিষ্ট ব্যতিক্রম 'সরি ম্যাডাম'!! ".....এবং যে প্রাণোচ্ছলতার গুণে বোম্বাই দেশের ছবি সাধারণ বাঙালী দর্শককে ক্রমেই হিন্দী ছবির দিকে আকৃষ্ট করছিল....." কে খবর দিয়েছে তাঁকে যে বাঙালী দর্শক ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছেন? আর "প্রাণোচ্ছলতার" অর্থে তিনি কি বলতে চেয়েছেন? এমন অনেক কথা লিখেছেন যা নাকি প্রকৃত সমালোচক হিসেবে তাঁর লেখা উচিত হয়নি—অন্যায় হয়েছে তাঁর, যেহেতু তিনি তাঁর মন্তব্যে বলেছেন 'সরি ম্যাডাম' একটি চমৎকার উপভোগ্য চিত্র।"

কাবুলীওয়ালার চিত্রের সমালোচনারও নান্দীকর তাঁর বক্তব্য পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। হিন্দী চিত্র রূপ অনাবশ্যকভাবে বর্ধিত হয়েছে সত্য কিন্তু সেই অনাবশ্যকতারও প্রয়োজন ছিল, কেননা স্থলে দর্শকসমাজের কাছে স্নেহবৃদ্ধি কাবুলীওয়ালার অন্তর্লীন মানবিকতার সুক্কর রসবোধটুকুকে উপস্থাপিত করার আর কি পথ ছিল? অনাবশ্যক হয়েছে বিদগ্ধ-দর্শকের কাছে কিন্তু তাই বলে 'অবাস্তব' হয়নি মোটেও।

স্বপ্নদৃশ্য ছোট হলেই কি আতিশয্য-দৃষ্টতা দূর হোত? কাবুলীওয়ালার পরিপ্রেক্ষিতে কতকংশ অনাবশ্যক হলেও পরম-উপভোগ্যতার গুণে কি ক্ষমাহঁ হয়নি? হিন্দী চিত্র কাবুলীওয়ালার কাহিনীর অন্তর্লীন সুক্কর শিল্পরূপ ও বাগ্যনা ফুটে উঠেন আর মিনি-কাবুলীওয়ালার সম্পর্কটুকু যেন কেমন একটা উচ্ছ্বাসোদ্দীপক মিলনান্ত নাটকীয়তার মথিত হয়েছে—ছোট্ট এ দুটো কথা বলা কি সত্যিই কঠিন? মিনির কাবুলীওয়ালাকে দেখে প্রথমে থমকে দাঁড়িয়ে পড়া, ও পরে ছুটে পালিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কয়েকটা বিষয় নিয়ে যে ব্যক্তিগত শৈশবের অপ্রাসংগিক অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে শিশুমনস্তত্ত্বের উপর কটাক্ষ করেছেন—এটাও কি যুক্তি-যুক্ত হয়েছে? 'সরি ম্যাডাম' যা করে শেষ করেছেন এটাতেও যদি তার আভাস মাত্র থাকতো তবে হয়তো কিছু লেখার

প্রয়োজনীয়তা থাকতো না, কিন্তু তিনি তা করেননি। প্রকৃতপক্ষে 'প্রাণোচ্ছলতা'-পিয়াসী নান্দীকর এতে হয়তো হতাশ হয়েছেন, কিন্তু হিন্দী চিত্রজগতে 'কাবুলীওয়ালার' চিত্রটি এক পরম সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে।

আমার এ চিঠির জবাব পেলে খুশী হবো। নমস্কারান্তে—

প্রীত্য়দুর্গাকুমার চক্রবর্তী

ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩৯।

॥ উত্তর ॥

প্রথমেই প্রথম পত্র সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করছি।

"সরি ম্যাডাম" একখানি হালকা ছবি। আমাদের ধারণা, হাসির ছবিকে হালকাভাবেই নেওয়া উচিত। তাতে কার্য-কারণ বোঝবার চেষ্টা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাংলা দেশে হালকা রোমান্সের ছবি হয়না বললেই চলে। অথচ এই ধরনের ছবি করে বোম্বাই আমাদেরই কাছ থেকে দু'হাতে টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই নাচে-গানে-হাসিতে ভরপুর "সরি ম্যাডাম" একটা নূতন আমদানীর চেষ্টা করেছে বলে আমাদের প্রশংসা পেয়েছে। আবার "ডাকাতের হাতে" ছোটদের জন্যে ছবি হয়েও কারুরই জন্যেই ছবি হয়নি। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র ফিল্ম সোসাইটি ছবিখানির প্রয়োজক। ছোটদের জন্যে প্রথমেই এমন একটি morbid জিনিস উপহার দেবার অর্থ হয়না। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিত কাহিনীর সঙ্গে যার পরিচয় আছে, তিনি ছবিখানি দেখে ব্যথিতই হবেন। রস-গোন্ধার সঙ্গে সিংগাডার যেমন তুলনা চলে না, তেমনি চলে না 'সরি ম্যাডাম'ের সঙ্গে 'ডাকাতের হাতে'র তুলনা। সব-শেষে জানিয়ে দি, আমি কোনো গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত নই।

এইবার দ্বিতীয় চিঠিতে আসা যাক। "সরি ম্যাডাম" সম্পর্কে কিছুটা বক্তব্য ওপরেই রয়েছে। ভব্যতা, শালীনতা, শ্লীলতা জ্ঞান সকলের সমান নয়। মহাত্মা গান্ধীর পরিচ্ছদ দেখে চাচিল তাঁকে 'অর্থ নন্দন' বলেছিলেন। যোমটো-টোনা পল্লীবিধ এবং জিন্স-পরা আধুনিক তরুণী—দু'জনেই দু'জনের কাছে অভব্য।

হিন্দী "কাবুলীওয়ালার"তে স্নেহ-বৃদ্ধি কাবুলীওয়ালার মাত্র স্নেহবৃদ্ধি থাকলে তা কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু এখানে কাবুলীওয়ালার পরোপকার করে বেড়াচ্ছে—নানা রকম মহানুভবতার পরিচয় দিচ্ছে। মিনি হারিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ না দিলে কি কাবুলীওয়ালার চরিত্র বিকশিত হত না। আমি হিন্দী "কাবুলীওয়ালার"তে সুক্কর শিল্পরূপের অভাবই দেখেছি। —নান্দীকর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গল্প শেষ করিয়া রুদ্রিণী তাড়া-
তাড়ি চলিয়া গেল। তাহার এখনও অর্ধেক
রান্না বাকি।

সুবীর দেখিল, অরুণা আচ্ছন্ন অভি-
ভূতের মত বসিয়া আছে। তারপরই
অরুণা চমকিয়া সুবীরের পানে চোখ
তুলিল, মুখে ছন্দ হাসি টানিয়া আনিয়া
বলিল,—‘আষাঢ়ে গল্প—না?’

সুবীর বলিল,—‘একেবারে আষাঢ়ে
গল্প নাও হতে পারে। মূলে হয়তো
একটু সত্য আছে।’

অরুণা আর কিছু বলিল না। তাহার
মুখের উপর রহস্যের পর্দা নামিয়া
আসিল। তাহার মনের মধ্যে কী হইতেছে
সুবীর তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে
না পারিলেও তাহার মনও অশান্ত হইয়া
উঠিল। এ কোন্ অদৃশ্য কুহক জালে
তাহারা জড়াইয়া পড়িতেছে! যে সন্দেহটা
সুবীর জোর করিয়া মন হইতে সরাইয়া
দিবার চেষ্টা করিল তাহা এইঃ অরুণা
কি নিজেকে জন্মান্তরের রাণী অরুণাবতী
মনে করিতেছে এবং মনে মনে বিদেহাছা
রাজা বিজয়কর্তুর উদ্দেশ্যে অভিসার
যাত্রার জন্য উৎসুক হইয়াছে। অসুস্থ
শরীরে মনও অসুস্থ হয়। ইহা কি সেই
অসুস্থতার লক্ষণ? /

কিন্তু যাহাই হোক, গল্পের রাণীর
অরুণাবতী নাম আশ্চর্য রকমের সমা-
পতন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সে রাতে অরুণা ‘ক্ষিদে নেই’ বলিয়া
শয়ন করিতে চলিয়া গেল। সুবীর যথা-
সময় আহালাদি সম্পন্ন করিয়া শয়ন কক্ষে
গিয়া দেখিল অরুণা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।
সুবীর তাহাকে জাগাইল না, অস্বচ্ছন্দ
মন লইয়া কিছুক্ষণ খাটের চারি পাশে
পায়চারি করিল, তারপর শয়ন করিল।

গভীর রাতে সুবীরের ঘুম ভাঙিয়া
গেল। দূর হইতে যেন বীণা শব্দের
অস্বচ্ছন্দ মূর্ছনা আসিতেছে। সুবীরের
সর্বাগে কাঁটা দিল। ঘরে আলো নাই,
মোমবাতি নিভিয়া গিয়াছে।

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া সুবীর
পাশের দিকে অনুভব করিল, অরুণা
শয্যায় নাই।

বালিশের পাশে সুবীর একটা
বৈদ্যুতিক টর্চ রাখে, সেটা জ্বালিয়া
দেখিল শয্যা শূন্য। ঘরের চারি পাশে
আলো ফেলিয়া দেখিল ঘরেও অরুণা

নাই। দূরগত বীণা ধ্বনি দূরে মিলাইয়া
গেল।

সুবীর স্নায়ুপেশী শক্ত করিয়া
কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিল, কিন্তু
অরুণা ফিরিয়া আসিল না। তখন সে
উঠিয়া গায়ে চাদর জড়াইয়া লইল, টর্চ
জ্বালিতে জ্বালিতে অন্য ঘর দুটা
দেখিল। সেখানেও অরুণা নাই।

দৃঢ়ভাবে নিজেকে সংযত করিয়া
সুবীর ঘরের বাহিরে ছাদে আসিয়া

দাঁড়াইল। পশ্চিম আকাশে প্রায়-পূর্ণাঙ্গ
চাঁদ চলিয়া পড়িয়াছে, আকাশ এবং মরু-
ভূমিতে চাঁদের কিরণ যেন উল্লসিত
হইয়া পড়িতেছে। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া
বরফের কাঁটার মত সুবীরের গায়ে
বিস্থল।

বিশাল ছাদ চন্দ্রকুহেলিতে ঝিমঝিম
করিতেছে; সুবীর চারিদিকে দৃষ্টি
ফিরাইল, কিন্তু অরুণাকে দেখিতে পাইল
না। কিছুক্ষণ সে হতবুদ্ধি হইয়া
দাঁড়াইয়া রহিল। কোথায় গেল অরুণা?
এই নির্জন পুরীতে গভীর রাত্রে
একাকিনী কোথায় গেল? তবে কি নীচে
গিয়াছে! কেন? তাহাকে না জাগাইয়া
একাকিনী নীচের তলায় যাইবে কেন?...
নিশির ডাক?...না, না, এ সব কী
অবিশ্বাস্য কথা সে ভাবিতেছে! আজ
সন্ধ্যাবেলা যে গল্প তাহার শুনিয়াছে,
এ সব তাহারই অনুরণ। অরুণা নিশ্চয়
কাছেই কোথাও আছে—

সে গলা চড়াইয়া ডাকিল—‘অরুণা!’

সাদা নাই। কেবল ঠান্ডা বাতাস
তাহার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ কথা
বলিয়া চলিয়া গেল।

এতক্ষণ সুবীর নিজের মনকে দৃঢ়
শাসনে রাখিয়াছিল। এইবার তাহার
সংযমের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সে
ছুটিয়া আলিসার কাছে গিয়া নীচে
দৃষ্টিপাত করিল, তারপর নীচের দিকে
দৃষ্টি রাখিয়া সারা ছাদ পরিভ্রমণ
করিল। না, অরুণা ছাদ হইতে নীচে
পড়িয়া যায় নাই। তবে সে কোথায়?

সুবীর ক্ষণকাল মাথায় হাত দিয়া
দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আবার শয়ন-
কক্ষের দিকে ছুটিল। শয়নকক্ষটা ভাল
করিয়া দেখা হয় নাই, হয়তো অরুণা



স্বপ্নকথক
শরদিন্দু
বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুমের ঘোরে খাটের পাশে পড়িয়া গিয়াছে।

অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে কেয়া ফুলের গন্ধ ভরপুর করিতেছে। স্থানদূর মত দাঁড়াইয়া সুবীর ভাবিল—কেয়াফুলের গন্ধ তবে মিথ্যা নয়, রেণু-বিকৃত মস্তিস্কের কল্পনা নয়। অতি-প্রাকৃত যতদূর প্রাকৃত হইতে পারে কেয়া ফুলের গন্ধ তাই। বীণাধ্বনিও তাই। এক সুক্ষ্ম জগতের অলৌকিক পরিবেশের মধ্যে তাহারা বাস করিতেছে।

সুবীর টর্চ জ্বালিল। বিছানার এক পাশে অরুণা শুইয়া আছে। তাহার বেশবাস, বিশ্রুত, চুল এলোমেলো; সে গভীর ক্রান্তির ঘুম ঘুমাইতেছে। সুবীরের সংশয় জাগিল, তবে কি অরুণা সারাক্ষণ বিছানায় শুইয়া ছিল! কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব!

একটা মোমবাতি জ্বালিয়া সুবীর শয্যাশিরে রাখিল, তারপর শয্যা উঠিয়া অরুণার পাশে বসিল। তাহার নিদ্রাশিথিল মূখের পানে চাহিয়া সুবীরের হৃদয়ে একটি বাৎপীড়িত স্নেহের উচ্ছ্বাস কণ্ঠ পর্যন্ত উদ্গত হইয়া উঠিল। সে দুই বাহু দিয়া নিবিড়ভাবে তাহাকে জড়াইয়া লইয়া রুদ্ধশ্বরে ডাকিল,—‘অরুণা! অরুণা!’

অরুণার কিন্তু ঘুম ভাঙিল না; তাহার শল্য অঙ্গে কোনও প্রতিক্রিয়া নাই। ক্রান্ত শিশুর মত সে ঘুমাইয়া রহিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া সুবীর তাহাকে ছাড়িয়া দিল, তারপর আলো নিভাইয়া তাহার গায়ে হাত রাখিয়া শয়ন করিল। সে লক্ষ্য করিল, কেতকীর গন্ধ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বিলীন হইয়া গেল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিলে সুবীর অরুণাকে জিজ্ঞাসা করিল,—‘কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে?’

অরুণার চোখে সদ্য ঘুম ভাঙার জড়মা; সে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—‘কোথায় গিয়েছিলুম! যাইনি তো কোথাও!’

সুবীর বলিল,—‘গিয়েছিলে। দৃপ্তর রাতে ঘুম ভেঙে দেখি তুমি বিছানায় নেই।’

অন্তলীন কণ্ঠে অরুণা বলিল,—‘কি জানি—মনে পড়ে না—’ সুবীর দেখিল অরুণার স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেছে। সে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

অরুণা নত নেত্র তুলিয়া সুবীরের পানে চাহিল; চোখে শঙ্কা ও গোপন উত্তেজনা। সে জড়ানো গলায় বলিল,—‘ঘুমের ঘোরে কি করেছি মনে পড়েছে না!’ তাহার মুখের উপর অদৃশ্য মূখশ্যের আবরণ পড়িয়া গেল।

বাঁহরের ঘর হইতে চাবের সরঞ্জামের ঠুং ঠাং শব্দ আসিল, গিরধর প্রাণে

কালীন চা আনিয়াছে। সুবীর উঠিয়া পড়িল। তাহার বস্তিতে বাকি রহিল না যে কাল রাত্রির কথা অরুণার মনে পড়িয়াছে কিন্তু সে তাহা সুবীরের কাছে গোপন করিতে চায়। কী কথা গোপন করিতে চায়? স্বপ্নাভিসার?

দিনটা অবসন্ন আলস্যে কাটিয়া গেল। দু’জনেই শামুকের মত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইয়াছে। সুবীর এইরূপ বিচিন্ন পরিস্থিতিতে কী করবে ভাবিয়া পাইতেছে না। অরুণা একটা অন্তর্গত মাদকতায় নিমজ্জিত হইয়া আছে। তাহারা যেন দু’টি সচল যন্ত্র, পরস্পরের সহিত কোনও সচেতন সংযোগ নাই, নিত্যন্ত আকস্মিকভাবেই একত্র বিন্যস্ত হইয়াছে।

সূর্যাস্তের পর রুক্মিণী ছাদের উপর পাঠি পাতিয়া অরুণার চুল বাঁধিতে বসিল। চুল বাঁধার সঙ্গে মৃদুস্বরে জল্পনা চলিতেছে। সুবীর দূর হইতে দেখিল অরুণার মুখ উৎসুক ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; তন্দ্রাচ্ছন্ন মাদকবিমূঢ় ভাব আর নাই। সে একটু আশ্বস্ত হইয়া নীচে নামিয়া গেল। সামন্তন জ্যোৎস্নার স্নান বিজনতায় বালুর উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

জামাইবাবু আজ যদি আসেন ভাল হয়.....এ স্থানটা বিজনবাসের পক্ষে খুবই চমৎকার, কিন্তু.....প্রাসাদে কোনও বুদ্ধিমান আত্মা অদৃশ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে.....কেয়া ফুলের গন্ধ, বাজনার আওয়াজ, এসব মিথ্যা নয়..... অরুণার মানসিক অবস্থা এখানে আসার পর আরও অবোধা রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে.....তাহার মনের মধ্যে কী হইতেছে তাহা যদি দেখা যাইত..... জামাইবাবু আসিয়া পড়িলে ভাল হয়...

ঘণ্টাখানেক পরে সুবীর বালির বাঁধ বাহিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিল। বসিবার ঘরে চার-পাঁচটা মোমবাতি জ্বলিতেছে; অরুণা একটি আয়না হাতে লইয়া নিজের মুখ দেখিতেছে। সুবীর চমৎকৃত হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল। অরুণার চুলে নূতন ধরণের কবরীবন্ধ, মুখে অলকা-তিলকা, সীমন্তে একগুচ্ছ মৃত্তার বৃদ্ধকা; তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে একটি অজন্মের ছবি। রুক্মিণী তাহাকে সেকালের ভাঙতে সাজাইয়া দিয়াছে।

সুবীর কিছুক্ষণ মুগ্ধমুখে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল,—‘বাঃ! কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে!’

অরুণা সুবীরকে দেখিতে পায় নাই, ধরা পড়িয়া গিয়া দু’হাতে মুখ ঢাকিল, তারপর ছুটিয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।

অরুণার লজ্জা যেন অস্বাভাবিক। সুবীর ক্ষণকাল অবাধ থাকিয়া শয়নকক্ষে অরুণাকে অনুসরণ করিল। দেখিল অরুণা শয্যা বালিশে মুখ গুঁজিয়া

শুইয়া আছে। খাটের পাশে দাঁড়াইয়া সুবীর হালকা সুদে বলিল,—‘এতে লজ্জার কী আছে? ওঠো, আর একবার ভাল করে দেখি!’

অরুণা কিন্তু মুগ্ধ তুলিল না। কিছুক্ষণ সাধাসাধনা করিয়া সুবীর বসিবার ঘরে ফিরিয়া গেল, চেয়ারে বসিয়া চোখের সামনে একটা বই খুলিয়া ধরিল। জীবনটা হঠাৎ অত্যন্ত শূন্য এবং জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

রাত্রির আহ্বারের পর অরুণা একটা বই লইয়া পড়িতে বসিল। তাহার নূতন সাজসজ্জার লজ্জা কাটিয়া গিয়াছে।

সুবীর বলিল,—‘শুতে যাবে না?’

অরুণা বলিল,—‘না, দৃপ্তরবেলা ঘুমিয়েছি, এখন শুলে ঘুম আসবে না।’

তিষ্ঠ মনে সুবীর একাকী শয়ন করিতে চলিয়া গেল।—

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সুবীরের ঘুম ভাঙিল। এবার বীণাধ্বনি নয়, কেয়া ফুলের হিম-গদগদ গন্ধ। সুবীরের ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া উঠিয়াছে।

শয্যা অরুণা নাই; সে যে শয়ন করিয়াছিল তাহার চিহ্নও শয্যায় নাই। টর্চ হাতে লইয়া সুবীর খাট হইতে নামিল। পাশের ঘরও নিঃপ্রদীপ, সেখানে অরুণা নাই। সুবীর ছাদে গেল।

আজও চাঁদ অস্ত যাইতেছে, পশ্চিম আকাশে আলোর বন্যা। কিন্তু অরুণা এখানে নাই। ছাদে কেয়া ফুলের গন্ধও কম।

সুবীর ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইল। এখানে কেয়ার গন্ধ বেশী, মনে হয় নীচের তলা হইতে গন্ধটা আসিতেছে। সুবীর ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিল।

যে ঘরটাতে প্রজ্বলন্ত রাখা ছিল সেই ঘর হইতে গন্ধ আসিতেছে। সুবীর টর্চ জ্বালিল না, দ্বারের সম্মুখে কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল। প্রকাশ্য ঘর অন্ধকার, কেবল দূরে ঘরের অন্য প্রান্তে মিট-মিট করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের আলোয় ঘরের ইতস্তত-বিন্যস্ত টেবিল প্রভৃতি আসবাব-গুলি অস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।

সুবীর নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, সন্তপণে টেবিলগুলি বাঁচাইয়া ওই আলোকবিন্দুর দিকে আগ্রসর হইল।

অর্ধপথে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। মৃদু বিগলিত হাসির শব্দ। যেন দুইটি প্রণয়ী বাসক শয্যা শুইয়া চুপচুপ কথা বলিতেছে। গভীর রসালুতার গদগদ হাসি হাসিতেছে। দীপের ক্ষীণ আলোকে কিন্তু মানুষ দেখা যাইতেছে না।

সুবীরের মস্তিস্কের ক্রিয়া স্বাধিকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, একটা অন্ধ আবেগ

তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিল। সে আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দপ করিয়া টচ্ জ্বলিল।

দেয়াল ঘেঁষিয়া পাটি পাতা, তাহার উপর অরুণা একাকিনী শুইয়া আছে। টচের তীর আলোয় তাহার অঙ্গের অলংকারগুলি ঝলমল করিয়া উঠিল। সে তাড়িবেগে উঠিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল।

‘অরুণা!’

ব্যাধের সাড়া পাইয়া হস্ত হরিণী যেমন পলায়ন করে, অরুণাও তেমনি ছুটিয়া পালাইল। সুবীর ক্ষণকাল হত-বৃদ্ধির মত দাড়াইয়া রহিল, ঘরের এদিকে ওদিকে টচের আলো ফেলিল। কেহ কোথাও নাই। কেবল পাটির শিখরে পীতভ দীপশিখা জ্বলিতেছে। সুবীর দৈহিক এবং মানসিক জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত উপরে ফিরিয়া গেল।

শয়নঘরে অরুণা খাটের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল। সুবীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল—‘অরুণা!’

অরুণা উঠিয়া বসিল, গলদপ্রু চক্ষে চাহিয়া বলিল,—‘কেন তুমি আমাকে নির্যাতন করছ?’

স্তম্ভিত হইয়া সুবীর বলিল,—‘আমি তোমাকে নির্যাতন করছি!’

অরুণা মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিল,—‘আমাকে ছেড়ে দাও। মৃদু দাও।’

সুবীর খাটের পাশে বসিল, অরুণার হাত ধরিয়া স্নেহাস্বরে বলিল,—‘অরুণা চল আমরা এখান থেকে চলে যাই, এই অভিশপ্ত বাড়ী ছেড়ে দেশে ফিরে যাই!’

অরুণা সন্মানে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল,—‘আঁ! না না না—’

সুবীর বলিল,—‘এখানে তোমার মনের রোগ সারবে না। আমি তোমাকে আর এখানে থাকতে দেব না। জামাইবাবু আসুন, কালই আমরা চলে যাব।’

‘না না না—আমি যাব না—’

‘হ্যাঁ, যাবে। তোমাকে আমি জোরে করে নিয়ে যাব। এ বাড়িতে আর নয়।’

‘না না না—’ অরুণা খড়মড় করিয়া খাট হইতে নামিয়া পড়িল, তারপর তীর বেগে ছাদের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

‘অরুণা-অরুণা—’ ডাকিতে ডাকিতে সুবীর তাহার পিছনে ছুটিল।

চাঁদ অস্ত যাইতেছে, আকাশে বাঁধ-ভাঙা জ্যোৎস্নার প্লাবন। সুবীর দেখিল অরুণা ছুটিতে ছুটিতে ছাদের পশ্চিম কিনারার দিকে যাইতেছে। সেও উচ্চ-কণ্ঠে অরুণার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিল।

ছাদের আলিসার কাছে আসিয়া অরুণা একবার পিছন দিকে চাহিল। দেখিল সুবীর ছুটিয়া আসিতেছে।

অনৈসর্গিক চীৎকার করিয়া অরুণা ছাদ হইতে নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সুবীর আলিসার উপর ঝুঁকিয়া দেখিল, জ্যোৎস্নালোকে অরুণা বিশ হাত নীচে বালুর উপর পড়িয়া আছে। সুবীর দীর্ঘ শিহরিত নিশ্বাস টানিয়া অন্ধের মত সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আলুগা নরম বালুর উপর অরুণার দেহ বিস্রস্তভাবে লুপ্তিত রহিয়াছে। সুবীর দেখিল তাহার জ্ঞান নাই কিন্তু প্রাণ আছে। আলুগা বালুর উপর পড়িয়াছিল বলিয়া দেহে আঘাত লাগে নাই। তখন সুবীর নিজের অজ্ঞাতসারে ‘অরুণা, অরুণা’ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাকে দুই বাহু দিয়া তুলিয়া লইল, অসীম কষ্টে বালুর বাঁধ পার হইয়া উপরে উঠিয়া আসিল; অরুণার বালু-ধূসর দেহ বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

সকাল হইতে এখনও দুই-তিন ঘন্টা বাকি। সুবীর ভিজা তোয়ালে দিয়া অরুণার মূখ ও দেহ মৃদু হইয়া দিল। অরুণার কিন্তু জ্ঞান হইল না।

নিবন্ধু রাহি! ঝি চাকরদের জাগাইবার কথা সুবীরের মনে আসে



...জ্ঞান নাই, কিন্তু প্রাণ আছে।

নাই। সে অরুণার পাশে বসিয়া একদৃষ্টে তাহার মূখের পানে চাহিয়া রাত কাটাইয়া দিল।

সকাল সাড়ে সাতটার সময় জীপে চড়িয়া বিরাজবাবু আসিলেন। সুবীরের মূখে সমাচার শুনিয়া তিনি বলিলেন,—‘এখনি হাসপাতালে নিয়ে চল।’

রেল স্টেশনের কাছে হাসপাতাল। অরুণাকে জীপে তুলিয়া সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। প্রবীণ ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, শরীরে কোনও আঘাত নাই, কেবল কংকশন হইয়াছে, শীঘ্রই জ্ঞান হইবে।

অপরাত্নে তিনটার সময় অরুণার জ্ঞান হইল। ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া সে কিছুক্ষণ শূন্যপানে চাহিয়া রহিল, তারপর তাহার চোখের কোণ দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সুবীর পাশে বসিয়া ছিল, সে অরুণার মূখের উপর ঝুঁকিয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল—‘অরুণা!’

অরুণার ঠোঁট দু’টি একটু নড়িল,—‘আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।’

‘বাড়ি!’

‘হ্যাঁ। কলকাতায় আমাদের নিজের বাড়িতে ফিরে যাব।’

বিহ্বল উল্লাস দমন করিয়া সুবীর বলিল,—‘আজই আমরা কলকাতায় ফিরে যাব।’—

মেল ট্রেন সুবীর পথ অতিক্রম করিয়া বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়াছে। সর্বাঙ্গ প্রকম্পিত করিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়াছে। এখানে মরুভূমি নাই, যতদূর দৃষ্টি যায় হিমচর্চিত শ্যামলতা।

কুপে কামরার মধ্যে সুবীর অরুণার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইল, আস্তে

আস্তে বলিল,—‘অরুণা, মরুভূমির মাঝখানে সেই পাথরের বাড়িটির কথা তোমার মনে আছে?’

অরুণা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল,—‘ও কথা আর কোনো দিন আমাকে মনে করিয়ে দিও না। আমি ভুলে যেতে চাই।’

সুবীর তাহার মূখখানা গাঢ়ভাবে নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—‘আমি তোমাকে ভুলিয়ে দেব। তুমিও একটা কথা মনে রেখো, ইহজন্মে তুমি আমার।’

॥ সমাপ্ত ॥



মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন!

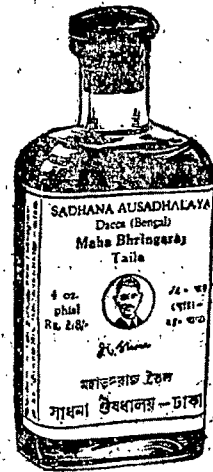
দ্বিহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভূঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল, সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্বদা প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনার মহা ভূঙ্গরাজ তৈল



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় বোড, কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র বোষ,
(এম. বি. বি. এস. (কলি:) আয়ুর্বেদাচার্য)

অধ্যক্ষ ত্রীযোগেশচন্দ্র বোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এক, সি, এস, (লওন) এম, সি, এস (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

বাংলায় ডায়েরী

প্রবোধী কুমার মাতাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

II এগার II

মস্কোর বয়স আটশ বছরের কিছু বেশি। একদা সেই প্রাচীনকালে এই অঞ্চলটির নাম ছিল মস্কোভি, এটি পাহাড় উপত্যকা, এবং তলা দিয়ে যে অপ্রশস্ত নদীটি বইছে তার নাম মস্কোয়া। 'মস্কো'—এই নামটি প্রথম উচ্চারিত হয় ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে। সেইকালে জনৈক রাজপুত্র এই উপত্যকার উপরে এসে প্রাকৃতিক শোভার মূগ্ধ হয়ে এর উচ্চ-শীর্ষে করেকটি মোটা মোটা কাঠের ঘর নির্মাণ করেন। এই রাজকুমারের নাম ছিল 'দৌলগোরদিক'। পরবর্তীকালে অপর একজন শক্তিশালী ব্যক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। তিনি মস্কোভি অঞ্চলকে সমন্বয় করে তোলেন এবং দেখতে দেখতে যেন জনপদটি গড়ে ওঠে। সেটি তৎকালীন রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ জনপদ, তার নাম 'মস্কো'। দ্বাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি ক্রেমলিন শব্দটিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রিন্স দৌলগোরদিক যে দারুপ্রাসাদটি নির্মাণ করেন সেটিকে প্রথম কালে ক্রেমলিন বলা হত। দুশো বছর পরে এটি আইভান কালিতার আমলে মস্কো পাকা-পাকিভাবে রাজধানী হয়ে ওঠে এবং আরেকটি দারুপ্রাসাদ ওই পাড়াতেই নির্মিত হয়। ক্রমে ক্রমে একটির পর একটি শ্বেতপাথরের 'মন্দির' মাথা তুলতে থাকে। তৃতীয় আইভানের রাজত্বকালে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে আবার নতুন ক্রেমলিনের জন্ম হয়। বিশাল রাক্ষস প্রাকারের দ্বারা সেই ক্রেমলিন চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত হয়। তখন থেকে একদিকে যেমন রুশরাষ্ট্র সংহত হতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি একটির পর একটি প্রাসাদ, গির্জা ও অট্টালিকা মাথা তুলে উঠে দাঁড়ায়। মস্কো নগরীর মূল প্রতিষ্ঠাতা রাজকুমার দৌলগোরদিকের অশ্বারূঢ় প্রস্তরমূর্তি আজও মস্কোর রাজপথে সর্বোচ্চ বিদ্যমান।

ভারতীয় দলকে আনন্দিত করে জোলবার এবং নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে অভ্যর্থনা জানানোর একটি আন্তরিক আগ্রহ প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করছিলাম। এটি লোক-দেখানো, আমি মনে করিনে। এও মনে করতে ইচ্ছা করে না, যেহেতু ক্রেমলিনের ছাপ আমাদের কপালে জুটেছে, সেই হেতু একে একে সবাই এসেছে এগিয়ে। মানুষ শূণ্যল নয় যে, একটি ডাক দিলে একশতটি ডাক ছাড়বে! আমার ধারণা, ভারতের প্রতি ওদের একটি স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।

সেই পক্ষপাতিত্বটি কেমন, সেটি লক্ষ্য করলাম সেদিন সকালে ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সংহতি সম্মেলনে। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ শান্ত ও ভদ্রমূর্তি মিঃ বালাবরুশভিচ এবং তাঁর সহকারী ও আমার বিশেষ পরিচিত মিঃ চেলিগেভ। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশেষ প্রেরণাদায়ক এটি তাঁদের প্রায় সকল কথা-বার্তায় প্রকাশ পাচ্ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষপ্রান্ত থেকে ভারতীয় সাহিত্য ও কাব্যের সঙ্গে রুশজাতির কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ওরা ভারত সম্পর্কে যেখানে যা কিছু খুলকুড়ো পেয়েছেন এবং তিন চারশত বছরের মধ্যে যে সকল রুশ পয়টিক কখনো-সখন ভারত থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন, সেগুলি এখানে সহজে গচ্ছিত আছে। ওরা বিশ্বাস করেন, ভারতভূমির সংস্কৃতির মূল স্বভাব হল কবুলা, অসীম ক্ষমা, পৃথিবীর সকল জাতির প্রতি তার নিতাপ্রসন্ন আশীর্বাদ;—এবং এইগুলিই তার বৈশিষ্ট্য। হিংস্র দুর্জনের প্রতি ভারতের ঘণা নেই, কোনও জাতির প্রতি তার বিদ্বেষ নেই, এমন কি যারা বৈরী তাদের প্রতিও আকোশ নেই! ভারতের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সহজাত প্রীতি ও প্রীতি বর্তমান। শান্তিকামী ভারতের আদর্শে পৃথিবীর সকল জাতি আজ অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথ হলেন সেই

সুপ্রাচীন এবং আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

সভাপতি এবং তাঁর সহকর্মীগণের ভাষণে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করেছিলাম। আমাদের মধ্যে গ্রীষ্মক শিউদান সিং চৌহান তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।

ডিস্টেন্ট স্টালিন মারা গিয়েছেন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তারিখে। কিন্তু তিনি তাঁর প্রায় ত্রিশ বৎসর শাসনকালের মধ্যে একটিবারের জন্যও ভারতবাসীর প্রতি একছত্রও প্রীতিবাক্য প্রকাশ করেনি। কিনা, সেকালের বিলেতী রয়টারের গোপন কাগজপত্রে হয়ত তার চিহ্ন কিছু জমা থাকতে পারে,—কিন্তু কোনও ভারতবাসী সেটির খোঁজ পায়নি! ভারতবর্ষে স্টালিনের পরিচয় থেকে গেছে দুটি। প্রথম, তিনি অনন্যসাধারণ কর্মীবীর, ইতিহাসের কঠোরতম শাসনকর্তা, এবং তাঁর আমলেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বপ্রকার বস্তুতান্ত্রিক ও বৈষায়িক উন্নতি ঘটে। তাঁরই কালে পনেরো কোটি রিপাবলিক ঐক্য ও পরস্পর সংহতিলাভ করে। তিনি তাঁর আশ্চর্য শক্তির দ্বারা সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে দুর্দশা, দারিদ্র্য, অপমান, অন্তর্মন্দ, প্রভৃতির থেকে তুলে তাকে সম্পদে ও ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল করে তোলেন। তাঁর দ্বিতীয় পরিচয় তিনি ইত্যাকারী এবং বিশ্বাসহীনতা, তিনি অগণিত সহস্র অহেতুক হত্যা, অপমৃত্যু, লক্ষ লক্ষ নিরপরাধের লাঞ্ছনা, তাদের উপর কায়িক ও মানসিক উৎপীড়ন, তাদের প্রতি শক্তির বীভৎস অনাচার, প্রতিকারহীন অপমান,—এবং তিনি নাকি দেশের চারিদিকের দরজা-জানলা বন্ধ করে কুড়ি কোটি মানুষকে পোষা কুকুরে পরিণত করেছিলেন,—এই-গুলির জন্য তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী! তাঁর এই ইতিহাসকথ্যাত বর্বরতা বরদাস্ত করেছিল সব চেয়ে বেশি তারাই, যারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট, তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী, কমিউনিস্ট সন্ন্যাসের

নির্ভাতা, পার্টির প্রাণপ্রতিম এবং জাতির সুযোগ্য প্রতিনিধি। তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো অনগ্রসর এবং চাষী-প্রধান জনসাধারণকে শিল্পপ্রধান এবং বিজ্ঞানোন্নত জাতিতে পরিণত করে তোলার জন্য স্টালিনের এই আরণ্যক বর্ষবর্তার প্রয়োজন ছিল কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে যে কয়জন স্টালিনের প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং হয়ত বা এখনও কয়জন আছে—তারা আজও ভারতের শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে সম্মানজনক আসন পায়নি! তারা বিগত বিশ্ব-যুদ্ধের কালে যখন স্টালিনের ছবি কাঁধে তুলে এপাড়া ওপাড়ায় হুজুগ বাধিয়ে তুলত, তখন ভারতের মন তাদের এই বিজাতীয় বিশ্বমায়ী এবং অশ্রদ্ধেয় আচরণ লক্ষ্য করে কঁটুক, এবং ঘণায় ভরে উঠত! কিন্তু দোল-পূর্ণিমার রাতে হোলির রংয়ের বদলে এক শ্রেণীর মাতাল যেমন নদমার কাদা ছোড়াছাড়ি করে এবং পরদিন নেশা কাটবার পর আপন আপন দেহের দুর্গন্ধে নিজেরাই অপমানিত বোধ করে, এদের সেই দুর্দশা দেখে ভারতবাসী অসীম বেদনা ও করুণায় চুপ করে স্নেহের হাসি হাসত।

মস্কোর রাজপথে আমোদ-প্রমোদ বা কোলাহল কলরবের উচ্চগ্রাম নেই। মেলা নেই, মিছিল নেই, রসোচ্ছলতা নেই, হৈ-চৈ, রৈ-রৈ কিছু নেই। আমি আসছি 'গিঞ্জিল শহর' কলকাতা থেকে। সেখানে রাজপথে সাপ খেলায়, পায়ে ঘণ্ডুর চোঙ্গা ফুঁকে সাড়ে-বিশ্রি ভাজা বিক্রি করে, নয়া পয়সা নিয়ে স্টেট বাসে মারামারি বাধায়, গরু বাঁচাতে গিয়ে বড়ির ওপর দিয়ে মোটরের চাকা চলে যায়, পথে পথে নিলাম হাঁকে, ফুটবল-ক্রিকেটের মরশুমে উন্মত্ত অসভ্যতায় গগন-পবন ঘূর্ণিত হয়,—আমি আসছি সেই আজব শহর থেকে। এখানে দেখছি সমস্তটা সচল, কিন্তু গম্ভীর। প্রতি পদক্ষেপ বালিস্ত, কিন্তু আত্মগত। হাজার হাজার স্রনারী পেরিয়ে যাচ্ছে এদিকওদিকে যেমন যেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ লক্ষ্যের দিকে। কেউ কোথায় হেসে গলে পড়ছে না, কেউ তর্ক বাধিয়ে তুলছে না, পথ আটক করে কেউ গল্প করছে না। অতিশয় ভদ্র সবাই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী যেন নিয়মতান্ত্রিক। বিদ্যুৎমাত্র অশান্তি দেখাচ্ছে কোথাও, ঈষৎমাত্র অভাব্যতা চোখে পড়ছে না। এমন কঠিন, বালিস্ত, গম্ভীর এবং স্বাস্থ্যময় জনসাধারণকে দেখার অভ্যাস নিয়ে আমি ফেরিনি।

ঠান্ডা প্রচুর। রোদে ও বৃষ্টিতে আকাশ মেলানো। শব্দময় ঘোষ ও সুভাষের সংগে এপাড়া ওপাড়া ঘুরছিলুম। হাটছি অনেক দূর। মস্কো শহর নতুন এবং পুরনোয়-মেশানো। পুরনো অংশগুলি আমাদের ধর্মতলা বোবাজার এলিয়েট রোডের চেয়ে উন্নত নয়, এবং পুরনো মস্কোই রুশজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস বহন করে। ওরই মধ্যে বাস, ট্রলবাস, মোটরকার বা ট্যাক্সি। ওরই মধ্যে ছুটোছুটি করে রাস্তার এপার ওপার হওয়া, জলকাদার ছোপ মাড়ানো, এষড়ো-থেবড়ো সঙ্কীর্ণ ফুটপাথে হোঁচট খাওয়া জনতার ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া। এখানে ওখানে প্রায় প্রত্যেক বাড়ির ছাদ থেকে বৃষ্টির জলের পাইপটি নেমে এসেছে ফুটপাথের ওপর, পথচারীর পায়ের তলা দিয়ে সে জল ফুটপাথের ওপর দিয়েই গড়াচ্ছে, এটি অতিশয় বিরক্তিকর এবং অশোভন। পুরনো শহর, বাজার নিতান্তই ঘিঞ্জি, বহুস্থলে আমাদের বড়বাজারের অলি-গলি, বহু পুরনো অতি সাধারণ বাড়ির দেওয়ালের চাপড়া খসে গিয়ে ভিতরের কাঠের জালি এবং বদ রং বেরিয়ে পড়েছে। ভিখারীর ছেঁড়া কাঁথায় যেমন ভিন্ন কাপড়ের তালি পড়ে এখানে ওখানে! কিন্তু আনন্দের কথা এই, পথে রিক্সা গরুর গাড়ি নেই, নৌড় কুকুরের দল জঞ্জাল শব্দকে বেড়ায় না, ধর্মের বাড়ি পথ অবরোধ করে না, নোংরার রাশির মধ্যে কোনও ভিখারী খাদ্যবস্তু খোঁজে না, উন্নদের ছাই ফেলার মধ্যে বসে খালক বালিকা পোড়া করলা বাছে না, কাঁধে চটের খলি ঝুলিয়ে কেউ পচা নদমা থেকে ময়লা কাগজ কুড়ায় না! পুরনো মস্কোর 'সর্বত্র বহু জরাজীর্ণ' এবং ঘন-সন্নিবিষ্ট গৃহস্থপল্লী থাকা সত্ত্বেও পথ-ঘাট মোটামুটি যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন।

মস্কো দাঁড়িয়ে আছে ইউরোপের মধ্যে। কিন্তু সমস্ত ইউরোপ আজ যেমন ঢুকেছে হোটেলের মধ্যে, পারিবারিক জীবন ভেঙ্গে দিয়ে যেমন সে একক ইউনিট নিয়ে এক হোটেল থেকে অন্য হোটেলের ঘরে বেড়ায়, যেমন সে শৃঙ্খল-হীন এবং শিকড়বিহীন,—সোভিয়েট ইউনিয়নে এবং মস্কোয় সেটি নেই, হোটেলের বসবাস রুশজাতি পছন্দ করে না। রুশরা পছন্দ করে ঘর, গৃহস্থালী, কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা, পাড়া-প্রতিবেশীর সমাজ, সুখ-দুঃখের সংগী, মেয়ের জন্য জামাই পছন্দ করা, পুত্রবধূকে নিয়ে

আমোদ আহ্লাদ—ইত্যাদি সামাজিক জীবন। রাশিয়ার প্রকৃতি অত্যন্ত সংরক্ষণশীল,—এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি নৈতিক শাসনের সীমা নেই। হাজার হাজার পরিবার আমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে রয়েছে যারা ঠাকুমা, দিদিমা, মাসি পিসি,—এদের সবাইকে নিয়ে পারিবারিক জীবন যাপন করছে। বড়ো বাপ সামান্য পেন্সন পায়, বৌদিদি মাষ্টার করে, ভগ্নি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। বড়ো কাজ করে অমলক আপিসে, মা রান্না করেন, ঠাকুমা মাঝে মাঝে খলি ঝুলিয়ে বাজার যান, বিধবা পিসি আমাদের এখানে থাকেন,—এমন পরিবার প্রতিপদক্ষেপেই মিলবে! আমাদের দোভাষী শ্রীমতী অকসানা বিধবা, একটিমাত্র তার কন্যা,—তিনি কন্যা-জামাতাকে নিয়ে একটি সরকারি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন। জামাই চাকরি করে, মেয়েটি শব্দ ঘরকন্না দেখে। শ্রীমতী মীরা—যার জপর একটি নাম মেরিয়ম তিনি এবং তার স্বামী জর্জ,—যে-ছোকরা আমাদের সঙ্গে তাসকন্দ-বিলিসিতে দোভাষী ছিল,—দুজনেই চাকরি করে। কালেরিয়া অতিশয় স্বামীগতপ্রাণা,—স্বামীনিন্দা শুনলে দক্ষিণে 'সতী' দেহত্যাগ করতে পারেন, এই ছিল আমাদের ভয়।

মস্কোর উপর দিয়ে তুহিনকণাবৃষ্টি বায়ুতরঙ্গ বইছে। বাইরের চেহারা দেখলে ভয় করে। কিন্তু মস্কোবাসীরা হাটতে বেশি ভালবাসে। মেয়ে-পুরুষ-বালক-বালিকা বাইরের দুর্যোগের পরোয়া করে না। প্রত্যেকের গায়ে ওভারকোট। পুরষের মাথায় টুপি, মেয়ের মাথায় গরম ওড়না বাঁধা। ওরা চওড়ায় যতটা লম্বায় ততটা নয়। মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে পুরুষমাত্রেরই দুর্ভাবনা আসে, এবং চর্বি দেখলে মন শঙ্কিত হয়। প্রতিদিন তিনটে করে সম্পূর্ণ খোরাক, কারো কারো চারটে,—কেউ বা পাঁচবার পেট ভরায়। ওরা খায় বড় বড় ফালার চমৎকার রুটি, কুচিমাংস মেলানো আনাজের ঝোল,—তার উপরে ক্রীম, তার সঙ্গে উপাদেয় শর্কর-মাংসের চাকলা, এবং তার সঙ্গে শাক, শশা, টমাটো, আপেল, মাখন বা চাঁজ। সর্বাপেক্ষা সুলাভ, শর্করের মাংস। ওদের ধারণা, শর্করের মাংসের যে বড় তৈরি হয় তার মতো উপাদেয় এবং খাদ্যপ্রাণ আর কিছু নয়। এ মাংস সর্বসাধারণের পাতে পড়ে। অনেক মেয়ের স্বাস্থ্যলাভের উপর শ্বেতশুকরের দেহপেলবতার ছায়া

দেখোঁছ! কিন্তু প্রতিদিন কুড়ি কোটি নরনারী প্রতিদিন তিনবার মাংস বা মাংসমিশ্রিত ভোজ্যসামগ্রী খাচ্ছে,—এবং এত মাংসের জন্য কত সংখ্যক জন্তু বধ করা হচ্ছে, এটি ভেবে যেন কুলকিনারা পাইনে।

হোটেলের মধ্যে এসে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, নাট্যশা যেমন ভারতীয় গোষ্ঠীকে বাচ্চাকুর্ষের দ্বারা আনন্দদানের কাজে ব্যস্ত, শ্রীমতী লিডিয়া তেমনি আমাদের তন্ত্রের তদারকে হস্তদস্ত। কে কি খাবে, কে কোথায় যাবে, কার কোন সামগ্রী দরকার, কেউ ওভারকোট তুলে গেল কিনা, কেউ চায়ের বদলে কফি চায়, কারো ধোবা-নাগিত-মুচির দরকার, কেউ চাইছে অম্লক ঠিকানার নির্দেশ, কেউ সিনেমা-থিয়েটারের টিকিট খোঁজ করছে, কেউ ভারতীয় টাকার বদলে রুবল চায়, কার কার বাড়িতে চিঠি পাঠানো দরকার,—আমি দেখাছিলাম শ্রীমতীর রুদ্ধশ্বাস কম-ব্যস্ততা! চারিদিকের অবস্থার হারবারির মধ্যে তাঁর নিরলস কর্মপটুতা আমার পক্ষে লক্ষ্য করার বিষয় ছিল। তিনি যেন আমাদের সকলের ঝগাট-ঝামেলাটা সেন্নেহ হাসি-পরিহাসের সঙ্গে সাদরে গ্রহণ করছিলেন। অনুমানে রুদ্ধভাবের পারা যায়, লেখকসংঘের দোভাষীগণের কাজটি তাঁর পক্ষে নতুন। পরে জেনে-ছিলাম, অনুমান আমার মিথ্যা নয়। তিনি বাইরের লোক।

এক সময় এগিয়ে এসে তিনি বললেন, ফরেন্-লিটারেচার ম্যাগাজিন থেকে আপনার খোঁজ করছিলাম। আপনার লেখার জন্য সেখানে আপনার টাকাও পাওয়া আছে। আপনি প্রস্তুত থাকলে আমি নিয়ে যেতে পারি।

চলুন, যাবো।

গহনার গন্ধে মেয়েমানুষ এবং টাকার গন্ধে মানুষ চপ্পল হয়। কিন্তু আমি ইতি-মধ্যেই কিছু 'টাকা' অর্থাৎ রুবল পেয়েছিলাম। তাসকন্দে থাকতে তারশঙ্করের জবানীতে ছোট ছোট দু'একটি লেখা লিখতে হয়েছিল। সেগুলি এখনকার ইংরেজি "সোভিয়েট লিটারেচারে" এবং তাদের রুশ অনুবাদ বন্ধি অন্যত্র ছাপা হয়েছে। সে-টাকা তারশঙ্কর আমার নামে 'উইল' করে যাবার ফলে আমার বর্তমান অবস্থা সচ্ছল!

শ্রীমতী লিডিয়ার কল্যাণে একটি মাসিক পত্রের আপিসে এসে ঢুকলাম। এখনকার কতী হলেন সেই আমাদের

চেঞ্চলিস্কি,—সেই পাতলাহনো বুদ্ধিমান মানুসটি,—যাঁর সঙ্গে তাসকন্দে আলাপ। তাঁর আপিস-বাড়িটি পুরনো আমলের এক গৃহস্থের। সেই গৃহস্থের কাছ থেকে এটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে কিনা জানিনে। তবে মস্কোতে এমন বহু শত বাড়ি আছে যেগুলি গভর্ণমেন্ট দখল করেছেন। যাই হোক, সঙ্কীর্ণ কাঠের সিঁড়ি পেরিয়ে উপরতলার একটি কক্ষে এসে দেখি, মস্ত আপিস, এবং সেখানে প্রায় সবই মেয়ে। সবাই যে-যার নিজের টেবিলে বড় বড় ফাইলের গোছা সামনে নিয়ে কাজে ব্যস্ত। সকাল নাটায় আসে, একটার 'ডিনার', পাঁচটার ছুটি। এই কক্ষে ব'সে অন্তত ১৫টি মেয়ে কাজ করছে। শ্রীমতী লিডিয়ার আলোপের পর একটি স্বাস্থ্য-বতী মেয়ে ফাইল থেকে একটি কাগজ বার করে দিল। সেই কাগজটি উনি এসে ক্যাশ-কাউন্টারে দিলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কাউন্টারের গর্তটি দিয়ে আমার জন্য একটি রসিদ বেরিয়ে এল। আমি তার ওপর একটি সই করে দিলাম। অতঃপর আধ মিনিটের মধ্যে গর্তের ভিতর থেকে একখানি নথর ও সুকোমল হাতের সঙ্গে এক গোছা 'লেলিন মার্কা' বড় ও ছোট নোট এবং

কয়েকটি ছোট বড় কোপেক মূদ্রা বেরিয়ে এল। শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, আপনাকে চারশ' একানন্দই রুবল এবং ভেতালিশ কোপেক দেওয়া হয়েছে! আট রুবল এবং সাতার কোপেক ইন্কমট্যাক্স দিলেন!

আমি গুণে নেবার চেষ্টা পাচ্ছি দেখে তিনি পুনরায় হেসে বললেন, না গুণসেও পারেন! এখানে ওটার দরকার নেই!

যিনি টাকা দিচ্ছেন তাঁর সামনে গুণে নেওয়াটা যে উভয় পক্ষেই অসম্মানজনক এটি আমার আগে জানার দরকার ছিল! এরপর অনেকবার অনেক রুবল রোয়গার করছি,—এবং তার পরিমাণ বহু সহস্র, অনুরোধ ছাড়া কিন্তু আর কখনও গুণে নিইনি। পরে হিসাব মিলিয়ে দেখেছি নিভুল। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে কারোকে গুণতে দেখিনি, কিন্তু টাকা গচ্ছিত রাখার সময় ব্যাংকের মেয়েরা সব সময় গুণে নেয়! চেক-এর ব্যবহার নেই। সবচেঁ নগদ কারবার। যারা টাকা তোলে, তারা একটি ছোট ছাপা কাগজ ব্যাংক থেকে পায়,—সেইটিতে টাকার অংকটি লিখে সই করে দিতে হয়। তার সঙ্গে পাসবইটি। সই মিলেই টাকা! একই দিনে যখন-তখন টাকা তোলা যায়। এক একজনের নামে হাজার হাজার বা লক্ষাধিক রুবল ব্যাংক খাটছে। বহু শত লোক বাড়িভাড়া পায়,

—ঃ পরিচয়ের বইঃ—

নির্বাচনের ভোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। রাজনীতিক, অর্থনীতিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক—নানা প্রশ্ন এসে আপনার মনে জড় জমিয়েছে। কিন্তু আপনি নিজেই এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন। পড়ুনঃ—

হিউ স্টোন ওয়াটমেনের	হাওয়ার্ড ফাটের	
আধুনিক কালের বিপ্লব—	২৫	নগ্ন দেবতা— ৭৫
লিওনার্ড সোপারোর		সাহিত্যিকের জবানবন্দী
রাশিয়ার ভবিষ্যৎ—	২৫	পরাজিত দেবতা ১০০
আলফ্রেড জুবাবরম্যানের		অ্যান্ডার হেলারের
আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ—	২৫	আর কমরেড নই— ১০০
বি জে পি উডসের		অশোক মেহতার
অর্থনৈতিক সহযোগিতা—	২৫	পরিকল্পিত অর্থনীতির
রকফেলার রিপোর্ট		রাজনীতি— ১১২
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্রমতা—	৩৭	বাট্রাম ডি উলফের
জুলে ম্যানকেনের		সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা— ১৫০
প্রতিরক্ষার অর্থনীতি—	৩৭	মোশেফ কোরবলের
পিটার হালজের		টেকোসোভাক গণতন্ত্রে
আন্তর্জাতিক যুব উৎসব—	৩৭	কমিউনিষ্ট স্বপ্নমন্ড— ১৫০
অমলেন্দু দাশগুপ্তের		ফাদার রিগনের
দেশোন্নয়নে গণতন্ত্র—	৩৭	নয়া চীনের কারাগারে— ১৫০
লেন্টার বি, পিয়ারসনের		ডেভিড কাশম্যান কয়েলের
বিশ্ব রাজনীতিতে গণতন্ত্র—	৫০	যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক পদ্ধতি
		স্লেভ ২০০ শোভন ৩০০

পরিচয় পাবলিশার্সঃ

২১, হাসং খাঁ লেন, কলি-৯।

সর্বপ্রকার পুস্তক সরবরাহ
প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৩৫-২৪১৪

তাদের টাকাও ব্যাংক খাটে। মস্কোতে জমিন হাজার হাজার বাড়িওয়ালা আছে যারা বিশেষ কমিটির নির্দেশক্রমে নির্দিষ্ট টাকার অঙ্কে ভাড়াটে বসায়। বাড়ি-ওয়ার অন্যায় আমি শুনিনি, এবং ভাড়ারের কথায় কথায় বাড়িওয়ার বিরুদ্ধে নামলা করতে ছোট্ট না। কমিটি আছে মাঝখানে দাঁড়িয়ে। জনসাধারণের প্রত্যাশিক জীবনযাত্রার সঙ্গে হয় একটি কমিটি, আর নয়ত একটি ইউনিয়ন জড়ানো। এরা পার্টাই অঙ্গ। মস্কোর জনসংখ্যা মোট পঞ্চাশ লক্ষ এবং শহর-তলী ও শিল্পাঞ্চল যোগ করলে নব্বই লক্ষ হয়। এর মধ্যে শতকরা চল্লিশজন পার্টির সভ্য। বাকিরা জন-সাধারণ। সোভিয়েট ইউনিয়নে মৃত্যুসংখ্যা কম নয়। হৃদরোগ, ক্ষয়রোগ, বক্ষ্মা, টাইফয়েড, কলেরা বসন্ত—এগুলি এখন নেই বললেই হয়। থোস-পাঁচড়া ইত্যাদি কাঁকে বলে ওরা জানে না, কিন্তু ক্যান্সার অসুখ এখনও যথেষ্ট। ওটার ভয়ে বহু-লোকেরই ভীত। মানুষের মৃত্যু ঘটলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব দাহ করা হয়—আমি শ্মশানে গিয়ে দেখছি! কবরের তলার পথে ফেলাটা ইচ্ছাধীন। ওখানে এখন ফাঁসী বা ইলেকট্রিক চেয়ার নেই। অপরাধীকে গুলী করে মারা হয়। লেনিনকে যে-মেরেট ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে গুলী করে আহত করেছিল, তার নাম শ্রীমতী কাপলান। তাকে গুলী করে মারা হয়। সব সময়েই পিছন থেকে গুলী করার নিয়ম! এখানকার সংবাদপত্রে সামাজিক অপরাধের খবর ছাপা হয় না। কুরচিপুর্গ, রুচিবিগহিত, অশ্লীল বা নোংরা উত্তেজনা আনে—এমন কোনও খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সোভিয়েট ইউনিয়নে নিষিদ্ধ।

আজ সন্ধ্যায় ভারতীয় দূতাবাসে মাননীয় শ্রীযুক্ত কে-পি-এস মেনন ভারতীয় লেখকগণকে একটি সংবর্ধনা দেন। আমি বেরিয়ে গিয়েছিলুম পথে-ঘাটে। আমার উদ্দেশ্য ছিল ফুটপাথের কোনও রোয়াকে বসে থাকব, টমাটো জুস কিনে খাব কোথাও, খবরের কাগজের ঠলে দাঁড়াব, পথে-পথে মেয়েপুরুষ হৈ-হুল্লা বা বেহায়াপনা করে কিনা দেখব, পুলিশের কাজ লক্ষ্য করব, হোটেলের কার্ফ ও 'শামুসা' ওরফে 'শিগুগাডা' কিনে খাব।

অর্থাৎ 'রথ দেখব' এবং 'কলা বেচব'! কিন্তু সবাপেক্ষা অসুবিধা—ঠান্ডা। এমন ঠান্ডা যে, বাইরে বেশীক্ষণ থাকা যায় না! শরীর সচল না রেখে উপায় নেই।

যখন ফিরলুম, দেখি ভারতীয়রা কেউ নেই। আমার খোঁজ পড়তে পারে সেটি ভেবে আড়চোখ বোধ করলুম। তা ছাড়া আমাদের দূতাবাসের খাতায় এখনও নাম সই করিনি, এটি অন্যায়। লিডিয়া বললেন, বেশত, আপনি সেখানে যান। আমি ট্যান্ডিতে তুলে দিচ্ছি।

একা কেমন করে যাব? আপনি সঙ্গে চলুন?

আমার মস্তকের দিকে চেয়ে উনি আমার সরলতা অথবা অজ্ঞতা—ঠিক কোনটি লক্ষ্য করলেন বুঝলুম না। শব্দ বললেন, অন্যের দূতাবাসে আগা-দের যেতে নেই! চলুন, আপনার জন্যে ট্যান্ডি ডেকে দিই—।

ওভারকোট কাউন্টারের কাছে এসে তিনি বললেন, ওভারকোট না নিয়ে বাইরে যাবেন না। আমারটা নিয়ে যান—।

ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু লক্ষ্য করলুম, তিনি নিজেও তাঁর ওভারকোটটি গায়ে চড়ালেন না। আমার সঙ্গে সেই ভরসন্ধ্যায় কঠিন ঠান্ডায় বেরিয়ে এলেন। অদূরে সবুজ আলো-জ্বালা একটি ট্যান্ডি আমাদের দেখে এগিয়ে এল, এবং তিনি যথোচিতভাবে সেই ড্রাইভারকে বহুবিধ নির্দেশ দিলেন। গাড়ি বেরিয়ে গেল। ট্যান্ডিভাড়া মোটামুটি এক কিলোমিটারে এক রুবল পড়ে। ট্যান্ডিওয়ালকে বকশিস নিতে দেখেছি অনেকবার, কিন্তু কখনও বকশিস চেয়ে নেয়নি। ট্যান্ডিওয়ার কাছে রুবল ভাগিয়ে কোপেকগুলি অনেকেরই ফিরে চায় না। আরোহীর সঙ্গে ড্রাইভারের এমন একটি সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ঘটে যায়, যেটি লক্ষ্য করে অনেক সময় আনন্দ পেতুম। শতকরা ৩০ ভাগ ট্যান্ডিচালক হল মেয়ে। বাস-কন্ডাকটর মাঝে মেয়ে। মেয়ে ছাড়া কোনও দোকান নেই!

মস্কোর প্রশস্ততর রাজপথ হল 'রুয়ে গোল্ড', অর্থাৎ 'গোল্ড স্ট্রীট'। এটি পরলোকগত ম্যাক্সিম গোল্ডক'র নামে উৎসর্গীকৃত। প্রায় সকল সময়েই এই রাস্তা দিয়ে আমাদের আসতে যেতে হয়। এত চওড়া যে, এপার থেকে ওপারের লোককে একটু ছোট দেখায়। যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য পথের মাঝখানে বহু উঁচু শূন্য লাল নিশানা দেওয়া হয়,—দূরের থেকে সবগ্রে যেটি চোখে পড়ে। মোটরের প্রত্যেক ড্রাইভার অতি সাবধানী ও সতর্ক। যদি কখনো কোথাও দুর্ঘটনা

ঘটে তবে ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে অথবা গাড়ি নিয়ে পালায় না! দুর্ঘটনা ঘটলে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও শহরে জনতা উত্তেজিত হয়ে ড্রাইভারকে ধরে ঠাণ্ডায় না, কিংবা গাড়িখানাকে ভেঙ্গে নিক্ষেপ করে না। ড্রাইভার আহত অথবা মৃত ব্যক্তিকে গাড়িতেই তুলে নেয় এবং পথচারীরা সর্বপ্রকারে সাহায্য করে! ড্রাইভারের অপরাধ প্রমাণিত হলে তাঁর সশ্রম কারাবাস ও জরিমানা হয়। কোনও ড্রাইভার মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে এটি প্রমাণিত হলে তাঁর লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। আমি প্রথম দফায় তিন সপ্তাহকাল মস্কোয় ছিলাম, কিন্তু একটিও মোটর দুর্ঘটনার খবর পাইনি।

কোন পথ দিয়ে কোথায় এসে থাম-লুম, কিছুর বুঝতে পারলুম না। আন্দাজে পাওয়া গেল আট থেকে দশ মাইল পথ। এটি পুরনো মস্কো, এবং ভারতীয় দূতাবাসের বাড়িটি পুরনো কালের হলেও মস্ত বাগানবাড়ি। ফটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন সশস্ত্র রুশ পাহারা। আমার ট্যান্ডিভাড়া হয়েছে আঠারো রুবল। দুখান দশ রুবলের নোট দিয়ে দুটি রুবল তাকে বকশিস দিতে গেলুম, লোকটা হাসিমুখে প্রত্যা-খ্যান করে চলে গেল।

রুশ প্রহরী আমাকে ভিতর দিকের পথটি সহাস্য দেখিয়ে দিল। আমি ভিতরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে স্বর্ণ-উঠছি, তখন এক ভদ্রলোক দ্রুতপদে নেমে আসছিলেন। তিনিই মিঃ মেনন। মঞ্চ-খানি সুস্থী নয়, কিন্তু ব্যবহার অতি শোভন ও ভদ্র। তিনি প্রসন্নহাস্যে আমার হাতখানা ধরে আবার ওপরে উঠে এলেন এবং বৃন্দ সর্দার গুরুবাক সিংয়ের কাছে আমাকে গচ্ছিত করে দিয়ে গেলেন। তাঁকে বিশেষ কাজে এখনই বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। এখানে আমাদের জলযোগের আলোজ্ঞ ছিল।

যেখানে বসেছিলুম, সেই ভারতীয় দূতাবাসটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন স্বর্ণ মস্কো অধিকার করেন, তখন এই বাড়িটি তাঁর বাসস্থান ছিল! এই বাড়িটি একটি অনুচ্চ উপত্যকার উপর প্রতি-ষ্ঠিত, এবং ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ঠিক যেমনটি ছিল, আজও তেমনি আছে। অদল-বদল কিছুই হয়নি। আমাদের সামনের এই জানলাটির ধারে দাঁড়িয়ে এই উপত্যকার উপর থেকে নেপোলিয়ন সৈনিকের সেই প্রাচীন মস্কো নগরীর

চেহারা দেখতেন, এবং এই বাড়ি থেকেই তার হুকুমনামা নিয়ে ফরাসি সৈন্যরা সমগ্র মস্কো নগরীতে আগুন জ্বালায়, ক্রেমলিনের একটা অংশ পোড়ায়, এবং তাদের সেই অগ্নিকাণ্ডে মোট আড়াই হাজার প্রস্তর-প্রাসাদ জ্বলে পুড়ে ছার-খার হয়। সেই জানলার দাঁড়িয়ে আজ আমি দেখলুম, সমগ্র বিরাট মস্কো নগরীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি লক্ষ লক্ষ প্রদীপের মালায় চন্দ্রা-লোকিত সন্ধ্যাকেও উদ্ভাসিত করেছে। আজ শুক্রা একাদশী, রাত্রি বড় সুন্দর।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সদলবলে আমরা গিয়ে পৌঁছলুম মস্কো আর্ট থিয়েটারের নীলাভ অট্টালিকার সামনে। এটি পুরনো কালের এবং সবাই বলে এটির খ্যাতি পৃথিবীজোড়া। পৃথিবীর কোনও দেশে রুশ থিয়েটারের জড়ি নেই, এটি নাকি সর্বজনজাত। রুশ থিয়েটার হল রুশজাতির অপরাঞ্জের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মন্দির। এই থিয়েটারের আদি নাম 'মস্কো একাডেমিক আর্ট থিয়েটার', এবং এর বর্তমান পরিবর্তিত নাম 'মোর্স্কি থিয়েটার'।

পুরনো মস্কোর পথঘাট মাত্রই অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ এবং যানবাহন ও জনতায় পরিপূর্ণ। এই পথের উপরেই পৃথিবীপ্রসিদ্ধ আর্ট থিয়েটার—এক কালে যেটির থেকে কলকাতার 'গার থিয়েটারের' নামের হেরফের করা হয়। কিন্তু বাইরে থেকে এর প্রকৃত চেহারাটি বুঝবার উপায় নেই। না আছে তেমন আলোক-সজ্জা, না বা বিজ্ঞাপনের 'চিং-কার'। সিনেমাতেও এই কোথাও পথের দেওয়ালে বিজ্ঞাপন নেই! সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও শহরের কোথাও নারীর আনন্দ দেহ-সৌন্দর্যকে কোনও বিজ্ঞাপন বা প্রচারণায় দেখানো হয় না। এটি নাকি সোভিয়েট নীতিবিরুদ্ধ। ওদের বিশ্বাস, যৌন আবেদন সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আবেদন! মেয়েদের যৌবনপ্রী উপার্জনের মূলধন নয়।

ভিতরটি জনতা পরিপূর্ণ। সমগ্র অফিসমহলটি পুরনো কালের, এটি প্রথমেই বুঝতে পারা যায়। বাঁ-হাতি ওভারকোট কাউন্টার। প্রতি জায়গায় প্রতি প্রতিষ্ঠানে প্রতি আপিসে প্রতি রংগালয়ে—কোট খোলো, টোকেন নিয়ে কোট জুমা দাও, আবার পরে সেই কোট ফিরিয়ে দিয়ে গিয়ে চড়াও! বহুস্থলে কাউন্টারের লোক কোটটি গায়ে চাড়িয়ে নিতে স্যাহায্য

করে। এই সামান্য কাজে সর্বত্র হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ প্রতিপালিত হচ্ছে।

আমার ওভারকোট নেই। কিন্তু আমার সামনে ছিলেন কেবলার সেই কমিউনিষ্ট প্রফেসর মিঃ দামোদরন, যিনি কারোকে বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়েই তাসকন্দ থেকে হঠাৎ একদিন মস্কো এসে একক ও বিচ্ছিন্নভাবে থাকেন। তাঁর জন্য একজন পৃথক দোভাষিণী। দামোদরন পৃথক টেবলে বসে থান। আমাদের কাছ থেকে দূরে। আমাদের সঙ্গে তিনি তেমন বাক্যলাপও করেন না। তিনি কখন আসেন, কখন এবং কোথায় যান, কোন কাজে ঘরে বেড়ান, কত পক্ষের সঙ্গে তাঁর কি প্রকার যোগাযোগ, —এ আমরা কিছুই জানিনে। প্রথম দিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শ্রুতময় ঘোষের নামে আমার চিঠিখানা কি তাঁকে দিয়েছিলেন?—তিনি মৃদু ফিরিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করে বললেন, মনে ছিল না!

তাহলে ওখানা আমাকে ফেরৎ দিন? খুঁজে দেখব!

আমি আজ সেই দামোদরনের ঠিক পিছনে পড়েছিলাম। তিনি যখন ওভারকোট কাউন্টারের সামনে তাঁর জামাটি খুলতে গেলেন, তার ঝাপটায় হঠাৎ আমার চশমা জোড়াটা নাকের উপর থেকে ছিটকে গেল। অপরাধ তাঁর নয়, এ রকম দৈবাৎ ঘটনা ঘটেই থাকে। চশমা তুলে আমি দেখলুম, দুখানা কাঁচই ফেটে চোঁচির হয়ে গেছে। ঈষৎ হাস্যে আমি যখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, তিনি বললেন, আমি কি করব? আমার কি দোষ?

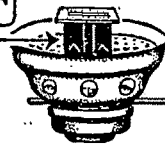
দামোদরন এগিয়ে গেলেন। ভাণ্ডা চশমা তুলে নিয়ে আমিও ভিতরে ঢুকলাম। ঘটনাটা সামান্য। অপরাধ আমারই—আমিই ছিলুম কমিউনিষ্ট কেবলার ঠিক পিছনে। কিন্তু দামোদরন একটুকু দৃষ্টি প্রকাশ বা বিন্দুমাত্র সৌজন্য প্রকাশ করে গেলেন না, এইটুকু আমার কাছে বিস্ময়।

'মস্কো ব্যালে' মস্কো আর্ট থিয়েটারে হবার কথা নয়। বলশয় থিয়েটারের বাড়িটি সম্প্রতি মেতায়িত করা হচ্ছে, এবং সেখানকার দলবল এখন বাইরে-বাইরে ঘুরছে। এই কারণেই এই থিয়েটারে 'ব্যালি' অভিনীত হচ্ছে। ভিতরে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ। প্রতি সিনেমা, থিয়েটার, অপেরা হাউস, সার্কাস গৃহ, —প্রতিদিন সন্ধ্যায় যেমন সর্বত্র জনপরিপূর্ণ থাকে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও নগরে বা গ্রামে কোনও প্রমোদ-ভবন জনস্বল্পতায় অর্ধশূন্য থাকে না। টিকিট কাটতে হয় দুদিন, তিনদিন, সাতদিন বা পনেরোদিন আগেও। স্পোর্টস স্টাডিয়াম, সুইমিং পুল, বাদ্যঘর, চিত্রশালা, চিড়িয়াখানা, গ্রন্থাগার, প্রতি দোকান বাজার, ইউনিয়নগুলির ক্লাব, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি রেস্টোরা—সব সময় লোকারণ্য। সর্বাপেক্ষা জনবিরল হল পার্ক এবং বন-বাগান। ঠান্ডার ভয়ে সেদিকে বিশেষ কেউ এগোয় না!

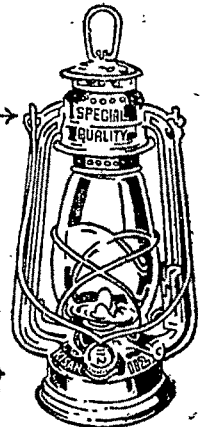
আমাদের সামনে মস্ত রংগমণ্ডে অভিনীত হচ্ছে "হংস সরোবরের" নৃত্য। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'সোয়ান' লেক

আরও মজবুত... আরও ভাল

প্রিতলের তৈরী
বার্গার টিউব



কিবাণ লন্টনে
'স্পেশাল কোয়ালিটি'
ছাপ দেখিয়া লইবেন।



সম্পূর্ণ লন্টন মোটা চাদরে
তৈরী ও লন্টনের লুং কেব্রোপিত
তৈলে নষ্ট হয় না

কিবাণ
লন্টন
সর্বোৎকৃষ্ট



সেইসময় ২২ন দাঙ্গ এও কোং

২৩৬, ৩৬২ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন-২২-৬৫৮০

ডান্স'। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া এটি নানিক পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। মণ্ডের উপর চতুর্দিক অরণ্যসমাকীর্ণ, প্রাকৃতিক শোভায় সমৃদ্ধ। সেখানকার নির্জন একটি সরোবরের সলিলে একটি কিংবা দুটি হংস এবং প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি বনহংসী রমণীয় নৃত্যে আত্ম-হারা। এটি পরিকল্পনা করেছেন রাশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ গীতি-নাট্যকার চেকভস্কি। এর মধ্যে একটি কাহিনী লক্ষ্যীয়, সেটি ক্রীড় কলকাকলীর মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। সেই কাহিনীটি কি,— পাশ ফিরে দোভাষী অথবা দোভাষিণীকে আমি প্রশ্ন করিনি। দোভাষীরা পাশ থেকে যখন কানে-কানে চুপি-চুপি কথা কয়, আমি ভয় পাই। ওরা অনেক সময় উত্তমরূপে দাঁত মাজে না বা জিভ ছোলে না! কিন্তু মেয়ে-দোভাষীরা অতি সতর্ক এবং সজাগ। রুশ মেয়ের ভিতর-বাহির অতি পরিচ্ছন্ন। আমাদের কয়েকজনের কাছাকাছি শ্রীমতী কালেরিয়া ও মীরা বসেছিল।

আমার চশমার কাঁচ ফুটিকাটা। কিন্তু লং-সাইট বলেই ভাল দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, “চল্লিশের পর দুইয়ের দৃষ্টি স্পষ্ট ও ভীষণ হয়, কাছের দৃশ্য ঝাপসা হয়ে যায়!” হঠাৎ মনে পড়ে গেল মহাকাব্যের কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন,—তবে ষষ্ঠ মহাদেশ অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলেন কিনা এখনই মনে পড়ছে না। তিনি অল্প কয়েকদিনের জন্য মস্কোতেও ঘুরে গেছেন। কিন্তু তিনি পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও নৃত্য-গীত, বল্ ডান্স, অপেরা ইত্যাদির যথেষ্ট সূখ্যাতি এবং যথোচিত উল্লেখ তাঁর কোনও রচনায় করেছেন কিনা, এটিও তেমন আমার মনে পড়ছে না। বরং দক্ষিণ প্রাচ্যের নৃত্য-গীতাদির সম্বন্ধে তাঁর প্রশস্তির কথা শুনেছি। কেন এমনটি ঘটল, এটি ভাবছিলাম ‘হংস সরোবরের’ দিকে তাকিয়ে। রুশনৃত্যের আঙ্গিক বা শৈলী আমার জানা নেই। চোখের সামনে যেটি দেখছি, সেটি দৃশ্যতঃ পরম রমণীয় এবং উপদেশ, কিন্তু কাব্যতঃ সেটি কলাকৌশলপূর্ণ দূর্বল ব্যায়ামক্রীড়া বা জিম্-নাস্টিক্। প্রত্যেকটি হংসীর পাখা উঁচু হয়ে চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে, সে-পাখা বন্ধ হয় না। হংসীদের অধোমাণ্ড সম্পূর্ণ নগ্ন কিনা এটি দূরের থেকে নিরীক্ষণ করার জন্য অনেকে তিন রুবল ভাড়া দিয়ে ক্রাউন্টার থেকে এক একটি বায়নোকুলার

সঙ্গে এনেছেন। সেই সকল হংসীর এক একটিকে উঁচিয়ে এবং ঘুরপাক খাইয়ে কোলে, পিঠে, পায়ের মাথায় এবং দেহের নানা আঁকে-বাঁকে যেভাবে মোচড়ানো, দোলানো, মচ্কানো এবং ঘোরানো হচ্ছে সেটি দ্রষ্টব্য। এই সকল কর্ম যিনি সূচু-ভাবে সম্পন্ন করছেন, তিনি পুরুষ-হংস। হংসীগণের লজ্জাঙ্গ নিয়ে এমন ছিন-মিনি খেলা আমার দেখতে বাকি ছিল! কিন্তু দর্শক সাধারণ যে প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত (warmed up) হয়ে উঠেছেন, তাঁদের মৃদু-মৃদু করতালি-ধ্বনিতে সেটি বন্ধ হতে পারা যায়। শূদ্ধ হংসীনৃত্য হলে হয়ত মেয়ে-দর্শকের পক্ষে হাততালি দিতে বাধবে; শূদ্ধ হংস পুরুষদর্শকের দৃষ্টিচোখের বিষ। সুতরাং মণ্ডের উপরে পরম পুরুষ এবং পরমা প্রকৃতিকে এনে উভয়ের শৃংগার-কৌতুক দেখা দরকার বৈকি। এই ‘হংস-সরোবর’-এর স্বপ্নিল এবং অপ-রূপ নিসর্গশোভার মধ্যে সর্বপ্রধান যে-ব্যঙ্গনাটি প্রকাশ পায়, সেটি হল দর্শক-সাধারণের মধ্যে বোঁদ-চৈতন্যের একটি মনোরম উত্তাপ সৃষ্টি করা। আমার বিশ্বাস, শীতপ্রধান দেশগুলিতে এদের প্রয়োজন আছে।

ঠিক মনে পড়ছে না, আর্ট থিয়েটারের টিকিটের দাম বোধ হয় সাত থেকে পঁয়ত্রিশ রুবল পর্যন্ত। টিকিট এবং দর্শকের শ্রেণীবিভাগ আছে বৈকি, কেন না শ্রেণীবিভাগ সর্বত্রই। দর্শক সাধারণের পোষাক ও পরিচ্ছদ যথেষ্ট মূল্যবান,—এ বিষয়ে মধ্যাশিয়া ও মস্কোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এটি রাজধানী,—ভদ্র, গম্ভীর, সংযত, স্বরূপবাক এবং সচ্ছল—এটি ভুললে চলবে না। সমগ্র মধ্যাশিয়াকে এই রাজধানীই টেনে তুলেছে তার ধূলো-বালি ঝেড়ে—এটিও মনে রাখা দরকার। দেশভেদ, আবহভেদ, রুচি ও প্রকৃতিভেদ, অবস্থা-ভেদ—এগুলি স্মরণীয়। কিন্তু আমি নিজে মধ্যাশিয়ার নৃত্যগীত দেখে অনেক বেশি অভিভূত হয়েছিলাম। তাদের মধ্যে ছিল প্রকৃত প্রাণসত্তা, গভীরতর একটি ব্যঙ্গনা, একটি অতি মধুর শরমজড়িত ভাব, সংযত এবং সুশোভন পরিচ্ছদ ও প্রকাশভঙ্গী। হয়ত ‘শান্তি নিকেতনের’ নাচগান ও গীতি-নাট্যাদির অনুর্ত্তান সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক পক্ষপাতব্ধের দরুণ আমি এই সৌন্দর্যময় মস্কো বালেকে-ঝাপসা চোখে দেখেছিলাম। চশমা আমার ভাঙা ছিল।

মস্কো রেডিয়ার বিশাল অট্টালিকাটি নতুন আমলের নয়। এটি পুরনো মস্কোর একটি অংশ। সেদিন ডঃ রাধাকৃষ্ণ বলেছেন, “কি ভাগ্য চৌগঙ্গা খানের আমলে টেলিফোন ছিল না! থাকলে সর্বনাশ হয়ে যেত!” মস্কো রেডিয়ার বাড়িতে এসে ভাবছিলাম, কি ভাগ্য জারের আমলে ‘আকাশ বাণী’ ছিল না! থাকলে শত শত ‘সোভিয়েট ক্লাবের’ সৌদীন সর্বনাশ হয়ে যেত! ইংরেজ আমলে ভারতে মোটর, রেলপথ, টেলিফোন, বিমান, রেডিও, রেডিোগ্রাম, সামুদ্রিক কেবুল—প্রভৃতি বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের হাতে থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসী ভারত লড়াই করেছে তাদের বিরুদ্ধে। জারের আমলে বৃহত্তর রাশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা অতিশয় আদম এবং অকিঞ্চিৎকর থাকার জন্য বিপ্লববাদীরা আত্মগোপনের সুবিধা পেয়েছিল প্রচুর। তাদের পক্ষে প্রচারের সুযোগ ছিল যথেষ্ট পরিমাণ। ধরা পড়ে মার খেয়েছে এবং উৎপীড়িত হয়েছে যত, তার চেয়ে অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র তাদের পক্ষে ছিল দেশজোড়া। ভারতের কংগ্রেসকে লড়াই করতে হয়েছে অনেক বেশি বিজাতীয় এবং বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে।

শ্রীযুক্ত বিনয় রায় মস্কো রেডিয়ার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ভারত-বর্ষ থেকে পাকিস্তানে স’রে গিয়ে বোধ করি মুসলমান নামাঙ্কিত ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নয় বৎসর আগে মস্কোয় আসেন। আমি তাঁর অমায়িক মিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলাম। তাঁর কণ্ঠের রবীন্দ্রসংগীত চট করে যেখানে-সেখানে শোনা যায় না। তিনি অতি পরিচ্ছন্ন রুশ ভাষায় কথা বলতে এবং লিখতে পারেন। সম্ভবতঃ কোনও এককালে তিনি কমিউনিস্টপন্থী ছিলেন, এবং ইন্ডিয়ান-পীপল্-থিয়েটারের একজন সুদক্ষ শিল্পী বলে পরিচিত। তিনি বহু সরকারি মহলে এবং ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিবাস্তির নিকট প্রিয়। মস্কো রেডিয়ার বাঙলা বিভাগ তাঁর হাতে। এখান থেকে তিনি কবিতা, নাটক, গান, গল্প, কথকতা—ইত্যাদি প্রচার করেন। কিন্তু সোভিয়েট কমিউনিজম-এর কোনও প্রকার প্রচার তাঁর হাতে নেই। তাঁর সকল কাজ রাজনীতির বাইরে। রুশমহলে বিনয়বাবু বিশেষ জনপ্রিয়।

আমি এসেছিলাম শ্রীমতী লিডিয়ার সঙ্গে একটি বাঙালী কথিকা টেপ-

রেকর্ড করার জন্য। সেটি নিজের বিদ্যো-
বুদ্ধি অনুযায়ী লিখে এনেছিলুম।
মিনিট পাঁচেকের কাজ। এখানে বোধকারি
শব্দ গুণে ঢাকা দেওয়া হয়। আমি এই
কথিকাটির জন্য ইন্কম্যাট্রাক্স বাদ দিয়ে
দুইশত একান্তর রুবল এবং ছত্রিশ
কোপেক পেয়েছিলুম। সোস্যালিস্ট দেশে
বিনামূল্যে কারো পারিশ্রম নেওয়া হয় না।
আমি বোধ হয় মোট সাতবার মস্কো
রেডিওর 'কথা' বলেছিলাম এবং তার জন্য
প্রায় তিন হাজার রুবল আমাকে দেয়া
হয়েছিল। কেবলমাত্র একদিন আমাকে
পনেরো মিনিটের জন্য রবীন্দ্রনাথের
কবিতা আবৃত্তি রেকর্ড করবার অনুরোধ
করা হয়। সেদিন প্রায় পনেরো মাইল
মোটরে গিয়ে শ্রীমতী অকসানা শ্রুতময়
ঘোষের কাছ থেকে আমার জন্য মহাকাব্য
'সমুদ্রত' গ্রন্থখানি চেয়ে আনেন।
অকসানার ভারত প্রীতি আমাদের জানা
ছিল। রেডিও থেকে ফিরবার সময়
একজন রুশ কর্মচারী আমার দিকে হাসি
মুখে এগিয়ে এলেন এবং একখানি মোটা
রুশভাষা ও শব্দতত্ত্বের বই আমার হাতে
দিয়ে পরিচ্ছন্ন বাঙলা ভাষায় অনুরোধ
জ্ঞানালেন, বইখানি আমি যেন ডাঃ
দুর্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে
পৌঁছে দিই। আমি তাঁর অনুরোধ
পালন করেছিলাম।

তরুণ বয়সে আমি একদা আন্তর
চেকভের অতিশয় অনুরাগী ছিলাম এবং
তাঁর যে কোনও লেখা, গল্পপট্ট অধিকাংশ,
—অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে পাঠ কর-
তুম। তাঁরই নাটক 'চেরী অর্চাড' অভিনীত
হ'চ্ছিল মস্কো আর্ট থিয়েটারে। শ্রীমতী
লিডিয়া আমাকে আজ সঙ্গে নিয়ে থিয়ে-
টার কচুপক্ষকে টিকিটের ফরমাস করে
সন্ধ্যার সময় গিয়ে সেখানে ঢুকলেন।
দুটি মঞ্চের বাঁধানো সীট নিলেন পাশা-
পাশি। 'মেয়েকে এতকাল মেয়েছেলে
বলেই জানতুম! কিন্তু সোভিয়েট ইউ-
নিয়নে গিয়ে প্রথম জানলাম, বাইরে তাদের
যত লাভ্য এবং পেলবতাই থাকুক, এখানে
মেয়েমানুষই মেয়ে নয়, —শক্তিময় 'পুরুষ'
আছে ওদের অনেকের মধ্যে। দরকার যদি
হয়, অধ্যাপক ভূষার ঝটিকার মধ্যে মেয়ে-
মানুষ একা ছুটল বিশ তিরিশ মাইল,
ডোলগেশনের সর্বপ্রকার দায়িত্ব নিয়ে সে
ঘুরিয়ে আনল একটির পর একটি
রিপাবলিকে, কমিটির পর কমিটির জটিল
ঘণ্ডবর্তে বিভিন্ন ও বিচিত্র মানব
চরিত্রকে চরিত্রে মেয়েমানুষ কাজ হাসিল

কর এল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে একশটি
টেলিফোন করে সে আপন কর্মজাল
বিস্তার করল, এবং একই সঙ্গে ও একই
কালে এই হোটেলের সর্বপ্রকার বিল-
ব্যবস্থা, বিমানের মধ্যে সীটের রফা,
সিনেমা ও সার্কাসের টিকিট অমুক
মিউজিয়ামের সঙ্গে বন্দোবস্ত, ডেলি-
গেশনের প্রতি সভ্যের কৌতুহল মেটানো
প্রতিজ্ঞার পৃথক পৃথক অভিযানের জন্য
ধানবাহনের ব্যবস্থা, প্রত্যেকের রুচি ও
ফরমাস মেটানো,—এবং তারই ফাঁকে
ফাঁকে হাসি পরিহাস গল্পগাউর তর্ক-
বিতর্ক! বলা বাহুল্য, অকসানা, লিডিয়া,
নাট্যা, কালোরিয়া, মেরিয়ম, লোলা, মায়
ইত্যাদি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
ভাবতুম, ওরাই পুরুষ, আমরাই মেয়ে!
নিজেদেরকে অত্যন্ত অসহায়, নিরুপায়,
পরমরূপেক্ষী, পরনিভরশীল এবং
অন্যের কাঁধের বোঝা বলে মনে হতো।
ওদের সহায়তা ছাড়া এক পা কোথাও
নড়বার উপায় নেই, ভাষা না জানার জন্য
এক ব্যক্তির সঙ্গেও কথা বলতে পারিনে,
দোকান বাজারে গিয়ে দাঁড়বার মুখ নেই,
পথ চিনি নে, কোথায় কি আছে জানিনে,
হোটলে দশবার চেষ্টা করে একটি বিশেষ
কোনও খাদ্য চেয়ে নিতেও পারিনে।
মাঝ থেকে উভয় পক্ষে একটা দুরভিধা
হাসাহাসি পড়ে যায় মাত্র!

মণ্ডের উপর অভিনয় আরম্ভ হয়েছে।
'চেরী অর্চাড' আমার পরিচিত বই। পাঁচ
মিনিটের মধ্যেই গল্পপট্ট বুঝে নিলাম।
'সুখের' আলো এমনভাবে ফেলা হয়েছে,
—দেখতে পাচ্ছি বেলা নটা! বেলা একটা
পৰ্বন্ত একটি নাটকীয় পরিণতি হল, এটি
বুঝিয়ে দিতে হয় না। চরিত্র অভিনয়,
চাইনি, ভগ্নী, প্রকাশ, বৈশিষ্ট্য, মেক-আপ
চলারফেরা,—নিখুঁত শব্দ নয়, আশ্চর্য
নিখুঁত! মণ্ডের উপরকার যে সমস্ত
বুটিনাটি আয়োজন এবং সাজসজ্জা,
ষেগুলি প্রতি চরিত্রকে বিশদভাবে প্রকাশ
করার কাজে লাগে,—তার আগাগোড়া
পুঙ্খানুপুঙ্খ চেহারা দেখে আমি বিস্ময়-
বিমূঢ়। আমাদের কলকাতায় শিশির
ভাদুড়ীর সর্বশ্রেষ্ঠ যুগেও এগুলি ছিল
স্বপ্নবৎ। তার কারণ, আমাদের নাট্যশালা
কোনও কালেই সরকারী সহযোগিতা
পায়নি! আজ যখন সেই সুযোগ ঘটবার
সম্ভাবনা এল তখন না আছে নাট্যকার,
না অভিনয়-প্রতিভা, না বা প্রয়োগশিল্পী!
কিন্তু সে দুঃখ এখন থাক। উৎকৃষ্ট
নাটকে গানের জায়গা নেই, এটি আবার

এখানে এসে বিশ্বাস করলাম! মণ্ডকলা,
ইংরেজিতে যাকে বল্য হয় স্টেজ-ক্যাফেট,
—সেটির প্রথম শিক্ষা এখানে হওয়া
উচিত। শ্রীমতী লিডিয়ার কুপায় দিনের
পর দিন আমি এই থিয়েটারে বসে টলন্টের
চেকভ, শেক্সপীয়র প্রভৃতি গ্রন্থকারের
বিভিন্ন নাটক অভিনয় একটির পর একটি
দেখছি এবং সর্বপ্রকার পারিপাট্য ও
শ্রেষ্ঠতার সম্মুখে বিস্ময়াভূত হয়ে বসে
থেকেছি। 'আনা কারেনিনা' দেখতে
দেখতে শ্রীমতীকে যখন সেই অশ্বকারে
বসে বরবারিয়ে শেষ দৃশ্যগুলিতে চোখের
জল ফেলতে দেখছি, তখন আমাকে পাশ
থেকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছে, এটি
প্রেক্ষাগৃহ এবং গ্রন্থকর্তার পরিবর্তিত
গ্রন্থের এটি নাটকীয় অভিনয় মাত্র!
শ্রীমতী লিডিয়া এবার নিয়ে বোধ করি
বুড়ি বাইশবার এই নাটকটি দেখলেন।
তিনি নাকি যখন আসেন একাই আসেন।
আমি প্রশ্ন করেছিলাম, এই নাটকে কোন
অঙ্ক বা কোন দৃশ্যটি সবারিপেক্ষ
আপনাকে অভিভূত করে?

লিডিয়া বললেন, আগাগোড়া! একটি
নারীর জীবনে সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও
পরম ব্যর্থতাবোধের জন্য সে আত্মনশের
দিকে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বেদনা
এইখানে!

পরে আমি জেনেছিলাম, টলন্টয়ের
প্রতি লেনিন অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন,
এবং টলন্টয়ের উপরে তিনি পর পর
সুদীর্ঘ সার্ভাট প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।
সোভিয়েট দেশের পরাশ্রিত ও পরপদ-
দলিত নারী-জাতি ও চাষী সমাজ
সম্পর্কে যতগুলি আইন-কানুন লেনিন
প্রবর্তন করেন, সেগুলির মধ্যে টলন্টয়ের
অনুপ্রেরণা ছিল প্রচুর। সাহিত্য-কর্মী
ও কবিগণ সম্বন্ধে লেনিনের যথার্থ
অনুরাগ কি প্রকার ছিল, সমগ্র
সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ না করলে
সেটি সম্যকভাবে বোঝা যায় না। আমার
বিশ্বাস, পৃথিবীর কোনও দেশে সাহিত্য
প্রতিভাকে অকুপণ ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা
জানাবার এমন ব্যাপক আয়োজন অন্য
কোথাও নেই। কিছু দিন আগে জনৈক
ইংরেজ নাট্যমণ্ডকার দুঃখ প্রকাশ করে
বলেছিলেন, 'শেক্সপীয়রের নাটকের সর্ব-
শ্রেষ্ঠ অভিনয় এবং প্রয়োগ কৌশল
একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেই হয়ে
থাকে, এটি আক্ষেপের বিষয়।'

ওদের দেশের শিশির ভাদুড়ি
হলেন পরলোকগত শ্রী চরিত্রসুলভ শিল্পী!

বিগত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন তারিখে একটি “প্লাভবিস্তর” হাটের পাশে একটি হোটেলের তিন তীর সতীর্থ দানুচেনকোর সঙ্গে আত্ম দিতে-দিতে মস্কোর ‘আর্ট থিয়েটারের’ পরিকল্পনা করেন। হাটের কাছে তখন ছিলেন অন্যসাধারণ গম্পলেখক মিঃ চেকভ। তাঁকে ডাকা হল। তিনি তাঁর “সবী গাল” বইটি হাজির করলেন। সেই নাটক দিয়ে ‘আর্ট থিয়েটারের’ প্রথম যাত্রারম্ভ। তারপর একে একে সবাই এসে হাজির হলেন, টলষ্টয় ও গোর্কি পর্যন্ত। থিয়েটার জমজম করে উঠল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্ট্যানিস্লাভস্কি মারা যান। সোনালি-বর্ণের একটি সমুদ্র-পাখীর ছবি মণ্ডের যবনিকার ওপর আজও আঁকা। ওইটি হল ‘আর্ট থিয়েটারের’ জন্ম-ইতিহাসের সূচনা-নাট্য। সাগরপক্ষীটি ডানা বিস্তার করে উড়াও শব্দে উড়েছে অনন্ত নীলিমায়। যবনিকাটির বর্ণ নীলাভ, এবং ‘আর্ট থিয়েটারের’ ওইটিই প্রতীক-চিহ্ন!

“চেরী অর্চার্ড” অভিনয়ের শেষে আমি গিয়েছিলুম যবনিকার অন্তরালে নাটকের পাত্রপাত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাবার জন্য। তাঁদের পক্ষে এটি বোধ হয় একটু নতুন। সেজন্য প্রথমটা তাঁরা একটু যেন হকচকিয়ে যান। লিডিয়া তাঁদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেই “মার্চেন্ট” দু-হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে আলিঙ্গনাবন্ধ হন।

যন মেঘময় দিন, বৃষ্টি পড়ছে সপ-সপিয়ে। বাইরের প্রবল হাওয়ায় তুহিন কঠিন ঠাণ্ডা। সমগ্র উল্কাইনা হোটেলের কৃত্রিম উপায়ে উষ্ণতার সৃষ্টি করাই আছে। ভিতরে, ফাঙ্গুন মাস। প্রাতঃরাশ শেষ হল এগারোটায়। এমন সময় পতিগতপ্রাণা শ্রীমতী কালেরিয়া এসে উপস্থিত। আজ আমাদের ঘরিরে এনে তিনি এযাত্রা ছুটি নেন। তাঁর বাড়িতে নাকি নানাবিধ অসুবিধা ঘটছে। কখন রান্না, কখন বা বাজার দেখা-শোনা,—তার ওপর ‘ওদের’ আবার মান-অভিমানের পালা। চলুন—উঠুন—

আমরা চার-পাঁচজন সেই দুর্ভোগের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে ছিলেন বন্ধুবৎসল চোহান এবং বৃন্দ ও অমায়িক সর্দার গুর্বাক সিং। তিনি বর্তমানে ভারতীয় ‘শান্তি’ কমিটির সভাপতি। সব ক’থানা গাড়ি বেরিয়ে গেছে একে একে। বন্ধুগোষ্ঠিকে নিয়ে

আমাদের কপালে আজ মোটর-বাস। তাই সই। গত বছর কৈলাস-মানস সরোবরের পথে আঠারো-উনিশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে বহু তুষার ও তুহিন ঝাপটার অভিজ্ঞতা আমার ছিল। সুতরাং অতটা ঠাণ্ডা আমার গায়ে লাগে না। তবু বা হোক করে সবাই আমরা বাসে উঠলুম, এবং দরজাগুলি আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল। টিকিট-কন্ডাকটর মেয়ে,—সবাইগ তার গরম পোষাকে ঢাকা। এই বাসেই এক পাঞ্জাবী হিন্দুকে পাওয়া গেল। তিনি আঠারো বছর আগে এখানে অন্ন-সংস্থানের জন্য নানা কৌশলক্রমে চলে আসেন। এখানে মাট্টারী করেন। বেশ আছেন। তবে বিগত বৃন্দের কালে সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট মনে করেন, এ ব্যক্তি বোধ হয় ইংরেজদের গুস্তর! সুতরাং অনেক দিন অবধি তিনি নজর-বন্দী থাকতে বাধ্য হন। এখন তিনি আছেন পরমানন্দে।

বৃষ্টিবাদল সত্ত্বেও পথঘাট জনাকীর্ণ। নানা পথ ঘুরে মোটর বাস এসে এক স্থলে আমাদের নামিয়ে দিল। এটি ‘রেড স্কোয়ারের’ প্রান্ত। অদূরে সেন্ট বেসিলের সেই মোট নমিট মিনারবৃত্ত জগৎপ্রসিদ্ধ গিজ্যা (Vasily Blazhenny) যেটি ‘পটভাস্ক’ গিজ্যা নামেও বিদিত। এটি ষোড়শ শতাব্দিতে নির্মিত হয়। তদনন্তর রাশিয়ার এইটি স্থাপত্যশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল। এটি ল্যান্ডমার্ক। অন্য দিকে ক্রেমলিনের সুবিশাল প্রাকার—দিল্লী-আগ্রা দুর্গের মতো তার গঠনভঙ্গী, যেটি আমার কাছে নতুন নয়।

‘রেড স্কোয়ার’ নামটি শুনলে একটু চমক লাগে, একটু ভয় করে। কলকাতার ‘রেড রোড’ এবং ‘লাল পাগড়ি’ এককালে আতঙ্কের বস্তু ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের বহু শহরে আছে এক একটি রেড স্কোয়ার। মস্কোর রেড স্কোয়ারের নাম দুনিয়ার লোক জানে। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যকাল অবধি এই রেড স্কোয়ারের নাম ছিল, ‘পোজার’ অর্থাৎ আগুন। এই অঞ্চলে কবে যেন একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। সেই রক্তিম চেহারার থেকে আসে এই নাম, রেড স্কোয়ার! রক্ত ভাষায় রেড শব্দটির তিনটি অর্থ পাওয়া যায়, যেমন আগুন, ফুল এবং সুন্দর। এই রেড স্কোয়ারে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বসমক্ষে সকল শ্রেণীর অপরাধীর ফাঁসি হত। জারের

আমলে রাজনীতিক বন্দী এবং সাধারণ অপরাধের কয়েদীরা একই শ্রেণীভুক্ত ছিল। মস্কোভাইটরা বলে, রেড স্কোয়ার রক্ত জাতি তথা ক্রেমলিনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কিত। এই স্কোয়ারের একটি মণ্ডের নাম ‘লবনয় মেটো’—যেখানে ফাঁস দেওয়া হত, যেখানে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের শাসননামা জারি করা হত, এবং যেখানে দাঁড়িয়ে বৃন্দ ঘোষণা করে জাতিকে অস্ত্রধারণ করতে বলা হত। একালে এই রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়েই জারের অনাচারের বিরুদ্ধে জাতিকে প্রবলতম আন্দোলনে আহ্বান করা হত।

সেই রেড স্কোয়ারে পেঁছে দেখি, এদিক ওদিক মিলিয়ে কম-বেশী আধ মাইল লম্বা সারবন্দী পিপিলিকা শ্রেণীর মতো নরনারী ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে ‘লেনিন-স্টালিন মসোলিয়ম’-এর প্রস্তর-সমাধি গৃহের দিকে। খবর পাওয়া গেল, এই জনশ্রেণী প্রাত্যহিক। প্রতিদিন সকাল থেকে অপরাহ্নকাল পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সমগ্র পৃথিবী থেকে প্রায় দেড় লাখ লোক সারবন্দী হয়ে নিঃশব্দে ধীর গতিতে এবং অসীম ধৈর্যসহকারে এই সম্মাননিবাসের মধ্যে ঢুকে একে একে লেনিন-স্টালিনের দুটি সুরক্ষিত শবদেহ দেখে যায়। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-তুষার-ঝড়—কোনও আবহ-দুর্যোগেই এই শ্রদ্ধামিশ্রিত কোতুহল ও ঐশ্বর্য্য-বাধ্য পায় না। আমরা যদি সেই সারবন্দীর মধ্যে দাঁড়িতে চাই, তাহলে প্রায় তিন ফালং দূরে সব শেষের দিকে যেতে হবে। এমন সময় একজন কালো-সোনালি পোষাকপরা ‘মিলিচ-ম্যান’ (পুলিশ) এসে শ্রীমতী কালেরিয়ার সঙ্গে কি যেন কথা বলল, এবং বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে বরং আমাদেরকে কতকটা এগিয়ে দিয়ে সারবন্দীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। অনেকের মাথায় ছাড়া, অনেকের হাতে মালা, প্রত্যেকের গায়ে ওভার-কোট কিংবা রেন-কোট,—এবং ডিডের চেহারাটা, যাকে বলে, আবালবৃন্দবনিতা ওর মধ্যে ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান,—কে নেই? কোন জাতি বাকি আছে সোভিয়েট ইউনিয়নের? কিন্তু বিশেষ দৃষ্টব্য এই, কারও মুখে কথা নেই, না তামাশা, না অন্যকে শোনার জন্য খেলো রসিকতা! এমন একটি নিঃশব্দ, নিয়মানুগতাসীল, স্বেচ্ছা, গম্ভীর—সুনিয়ন্ত্রিত জন

সাধারণের সমাবেশ দেখতে আমার বাকি ছিল।

মিনিট পনেরো অবধি এক এক পা করে সেই ঝুপঝুপে বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে আমরা অবশেষে একটি মিশিবর্ণ প্রস্তর-দৃঢ় সূদৃশ্য পাথর-সম্মানিবাসের মধ্যে ঢুকলাম। সশস্ত্র মিলিটারী পাহারা প্রতি ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু কিছু দাঁড়িয়ে দেখার সময় নেই। একধার দিয়ে দেখতে দেখতে অগ্রসর হও, দেখতে দেখতে পারে-পারে চলে যাও, দাঁড়িয়ে না কোথাও! পিছনে লোক আছে, দাঁড়ালেই ভিড়! ভিতরটা ঈষৎ ছমছমে অন্ধকার, যেন ছায়াছন্ন। চারিদিকে কালো আর মিশি পাথরের পালিশ ঝলমল করছে। নীরেট, শ্বাসরোধী, আতঙ্কপ্রাপ্ত, যেন কঠিন শীতল মৃত্যুলোক, যেন একটা গৃহাগর্ভ! প্রথমেই পাওয়া যায় 'লেনিনকে' একটি কাঁচের আধারের মধ্যে। ভিতরে আলো দেওয়া হয়েছে! দীর্ঘ বিশাল নয়, ক্ষুদ্রকায়, যেমনটি দেখেছি ছবিতে। সেই দেহ, সেই টাক, সেই ছোট দাড়ি—অর্ধজাগ্রত চক্ষু, শরীরের খানিকটা অংশ ঢাকা, শাদা-হলদে মেশানো রং। কিন্তু তাজা দেহ যেন ঘুমিয়ে! ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী নয়—যেন গত পরশু সকালে মৃত্যু ঘটেছে! দেহ যেন দেহ নয়—বারুদ, যে-বারুদের ফরমুলা নতুন সভ্যতার পত্তন করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সোসালিস্ট রাষ্ট্র গঠন করেছে। এক পা এগোলেই স্টালিন! জেনারালিসিমো স্টালিন। খাঁকি পোষাক, সামরিক ব্যাজ ও তারকা, সেই গোর্কি, সেই ওলটানো চুল—অবিকল যা ছবিতে। চেয়ে থাকতে ভয় করে, মৃত কিনা নেড়ে দেখতে ইচ্ছা যায়! ও'র যেন মৃত্যু হয়নি, দেহ এত তাজা! শরীরে রোমাণ্ট শিহরণ আসে, গলা শুকিয়ে ওঠে। বার বার দেখে মন যেন নিশ্চিত হতে চায় যে, মৃত্যু হয়েছে! স্টালিনের মৃত্যু হয়েছে বলেই ত' আমরা লেনিনকে দেখতে পেলুম! নৈলে কে আমাদের যোঁজ় নিত, কে এদেশে ঢুকতে দিত, কার হুকুমে এমন স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুযোগ পেতুম?

বৌরিয়ে এলাম। সম্মানিবাসের পাশেই ক্রেমলিনের উচ্চ প্রাকার এবং তারই নীচে নীচে রয়েছে অগণ্য বিপ্লববাদী, যোদ্ধা, এবং জাতীয় নেতা-শরণে সমাধিফলক। এদের মধ্যে আছে আমেরিকান, বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান,

সুইডিস, ইতালিয়ান প্রভৃতি বহু জাতির প্রতিনিধি—যারা সোভিয়েটের শিশু-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকালে সোভিয়েট ভূমিতে অস্বাৎসর্গ করেছিলেন। ওদের মধ্যে আমেরিকার সাংবাদিক জন রীড—যিনি লেনিনের একজন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং যার সামনে তড়িৎগতিতে পেট্রোগ্রাডে রুশ বিপ্লবটি ঘটে—তার সমাধিটি বিশেষ আকর্ষণীয়। জন রীড এই ঘটনাবলী নিয়ে "Ten days that shook the world" নামক একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীমতী কালেরিয়া আমাদের নিয়ে এলেন, 'শিশুস্বর্গে'। সেই অতি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে যে বিপুল খেলনার জগৎটি দেখলাম সেটি বিস্ময়কর এবং তার মধ্যে ক্রেতারদের যে নিরবচ্ছিন্ন জনতা, সেটি আমাকে অভিভূত করেছিল। শিশু ও বালক-বালিকার মন-ভোলাবার জন্য একটা খেলনা-জগৎ করা হয়েছে যার অন্তহীন বৈচিত্র্যের শেষ খোঁজা কঠিন।

হোটেল ফিরে মধ্যাহ্নভোজন সারতে বেলা গেল। খাদ্যের প্রাচুর্যের মধ্যে প্রচারকার্য আছে কিনা আমি

জানিনে। কিন্তু বহু সময়ে এমন অজস্র খাদ্যসম্ভারের নির্বিকার অপচয় দেখে দৃষ্টবোধ করতুম। আমার প্রশ্ন শুনে এক দিন শ্রীমতী লিডিয়া বলেছিলেন, হোটেলের খাদ্যের সমস্ত উচ্ছিষ্ট চজে যায় মস্কোর বাইরে 'পোলিট্রি ফার্মে'। শূকরদের ঘরেও যায়। আমাদের দেশের এক একটি শূকর পাঁচ-ছয়শ' কিলোগ্রাম ওজনেরও হয়। অনেক ক্ষেত্রে তারও বেশী। একটি মেয়ে-শূকর বারো-চৌদ্দটি বাচ্চা প্রসব করে। শূকরের মাংস রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা সস্তা এবং জনপ্রিয়।

গত কয়েক দিন আমার 'ফুটিফার্ট' চশমায় কাজ চালাচ্ছিলাম। এটি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, এবং এর জন্য আমার দুই চোখে একটি ব্রুর বক্রতা প্রকাশ পাচ্ছিল! থেয়ে-দেয়ে উঠে এক সময় লিডিয়া বললেন, চলুন আমার সঙ্গে, এখন বৃষ্টি-বাদল নেই। কিন্তু সময় কম, চলুন ট্যাক্সি ধরি একখানা। একটি চশমা আপনার দরকার।

মস্কো তাঁর নখদর্পণে। আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি নিয়ে এলেন একটি জনবহুল পথের এক চশমার দোকানে। দোকান মানেই মেয়ে। বিক্রেতা মেয়ে। হিসাব-

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত বিশিষ্ট প্রামাণ্য-গ্রন্থ

রবিচ্ছবি ॥

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

৬-০০

"আপনার 'রবিচ্ছবি' আমি ইতিমধ্যে বারদ্বয়েক পড়েছি। খুব ভাল লাগল। রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন এবং তাঁর সান্নিধ্যের সূক্ষ্ম কেমন বইত তার বেশ একটুখানি পরিচয় আপনার লেখায় পেলুম।"

—অধ্যাপক ডক্টর সূর্যশার সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গীতবিতান পত্রিকা

৮-০০

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা

সম্পাদক ॥ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

"প্রায় সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার এই জয়ন্তী সংকলনটিতে বিশ্বকবি সম্পর্কে শ্রদ্ধা নূতন তথ্যই পরিবোধিত হয়নি, পরন্তু বহুমুখী রবীন্দ্রপ্রতিভার একাধিক সৃষ্টিধারার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত ব্যাপক আলোচনা এতে রয়েছে.....প্রথম ভাগে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সংগীত, নৃত্য, নাট্য সম্পর্কিত আলোচনা আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্পর্কে তথ্যমূলক স্মৃতিকথা। কবিগুরুর অপ্রকাশিত চিঠি, পাণ্ডুলিপি, ছবি ও আলোকচিত্র—সমস্ত ধরনের সম্পদই সংখ্যাটিকে বেশ অলংকৃত করেছে।.....রবীন্দ্রশতাব্দী পূর্তিতে এমন একটি সার্থক স্মারকগ্রন্থ জাতিকে উপহার দেওয়া.....আমরা অভিনন্দন জানাবো। যবে বাইরের যে কোন শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেবল এম যথোচিত সমাদর না হয়ে পারে না।"

—দৈনিক বঙ্গমতী

॥ প্রকাশক ॥

গীতবিতান ২৫বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫

নবিশ মেয়ে। ডাক্তারবাঁদী মানেই মেয়ে। সোভিয়েট ইউনিয়নে ডাক্তারদের মধ্যে শতকরা ৭৬ জন মেয়ে। একটি মেয়ে-ছেলে এগিয়ে এসে ফুটসহযোগে আমার চক্ষু পরীক্ষা করলেন। আমি প্রশ্ন করলুম, পনেরো মিনিটের মধ্যে আমার জমা অতি উৎকৃষ্ট একজোড়া বাইফোকাল চশমা কত দিতে পারবেন? কত দাম চান?

মাইলা বললেন, সেটা সম্ভব নয়। অন্তত চার-পাঁচ দিন লাগে। আপনার কাজ চলাগোছে একটি চশমা এখনই করে দিতে পারি। সূক্ষ্ম কাজে সময় লাগে।

বলা বাহুল্য, লিডিয়ার দ্বারফৎ কথা হচ্ছিল। আমি বললুম, চশমা আমার এখনই পেলে ভাল হয়।

পনেরো মিনিট পরে যেমন-তেমন একটি চশমা পরে বোরিয়ে এলুম। কাঁচের নিচের দিকটা চন্দ্রাকার, উপর ও নিচের মাঝখানে সীমারেখাটা বেশ মোটা। এমন চশমা পরে কলকাতার কাঠগোঁলার বাবু, আদালতের মুহুরি, ইন্সপেক্টর করোনী, ছাপাখানার প্রুফ রীডার, স্যাকরার দোকানের খাতা-লিখিয়ে! কিন্তু এবার থেকে আমার চোখে রুশ-চশমা, যা দেখব তা হয়ত সোভিয়েট-রঙে ঈষৎ রঙীন। এ চশমা ফিট করেনি আমার চোখে। রাস্তায়-রাস্তায় দেখছি ঈষৎ বাকা, ঈষৎ ঝাপসা, ঈষৎ এসোমেলো! কাঁচের উপরটা যেন ভারতীয় নিচের অংশটা সোভিয়েট! আগের চশমায় দুই কাঁচের মাঝখানের দাগ ছিল বেমানান, এবার সেটি স্পষ্ট সীমারেখা টানা। দুইয়ে মিলে এক হচ্ছে না, স্পষ্টভাবেই দুটো পৃথক। দূরের দৃষ্টিতে ভারত, কাছে দৃষ্টিতে মস্কো। চশমাটির দাম আমাকে দিতে হল বত্রিশ রুবল। দামোদরনের প্রায়শ্চিন্ত!

কেমন লাগছে এবার?—লিডিয়া প্রশ্ন করলেন।

একটু লাগছে!—বললুম, তবে দেশে ফিরে আবার নতুন চশমা নেবো।

প্রীমতী লিডিয়ার মধ্যে সোভিয়েট মূল্য অতি প্রবল ভৈরবিতায় ভরা। বাঁহিরে হাস্য পরিস্রব, ভিতরে অভ্যন্তর স্বদেশপ্রাণ রাশিয়ান। সোভিয়েট ব্যবস্থা বা কমিউনিস্ট সমাজের বিন্দুমাত্র নিন্দা বা সমালোচনা তাঁর পক্ষে অসহনীয়। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগ নেই বটে কিন্তু পার্টির এমন অম্প্রতাবক অঙ্গ কোমণ্ড বাস্তি আমার চোখে পড়ে নি।

তাঁর প্রতি-শ্বাসপ্রশ্বাসে সোভিয়েট নীতির প্রশস্তি প্রকাশ পায়। এমন মেয়েকে আমার জানা দরকার বৈকি।

আবার উঠলুম ট্যাক্সিতে। গাড়িভাড়া তিনিই দিচ্ছেন হাসি-মুখে এবং অকাতরে। প্রশ্ন করলুম, এ সব টাকা-পয়সা কার? কে দিচ্ছে?

জবাব পেলুম যার কাছে, সে-মেয়ে অন্য লিডিয়া। মিষ্টকণ্ঠে তিনি বললেন, আপনি কেমন বার বার ব্যস্ত হচ্ছেন? এ আমার নিজের খরচ নয়। আপনারা সবাই সোভিয়েট লেখক সংঘের অতিথি!

কিন্তু এখন যে নেমতন্ন খেতে যাচ্ছি ভারতীয় বন্ধুর বাড়িতে?

হোক না কেন? এ আপনাদের সম্মান! আপনাদের সব রকমের খরচ ওঁরা বহন করবেন।

প্রশ্ন করলুম, আপনি যদি টাকা তছরূপ করেন, কে দেখছে?

লিডিয়া কঠিন হেসে বললেন, আমিই দেখছি আমাকে! শুনে রাখুন, কোনও 'ওয়াকার' কখনও মিছে কথা বলে না! সবাই সবাইকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে, সেজন্য প্রতারণা কোথাও পাবেন না!

কিন্তু খুচরো খরচ যদি ভুলে যান?

হাসিমুখে লিডিয়া বললেন, আপনি লক্ষ্য করেননি, প্রতি বেলায় আমরা প্রত্যেকটি খরচ লিখি, এবং এক সময় সেটি পেশ করে দিই। গাড়ি ছুটছিল গোফিক স্ট্রীট দিয়ে। বাইরে প্রায় লম্বা হয়ে এসেছে। আমি বললুম, ক্ষমা করবেন, এ কাজে আপনি কত পাবেন?

তিনি বললেন, আমার কাজ সাময়িক, তাই সকলের চেয়ে কম মাইনে। আমি এক হাজার রুবল পাব। এর আগে আমি 'পীস' কমিটিতে কাজ করছিলাম।

আসলে আপনার প্রধান কাজ কোনটি?

আসলে মাফটার কারি।—লিডিয়া হাসলেন।

কিরঞ্জন চুপ করে থেকে আবার অব্যাহা প্রশ্ন করলুম, আরেকবার ক্ষমা করবেন যদি অর্বাচীনের মতন আরেকটি কথা জানতে চাই। আপনার নিজের জন্য মাসে ঠিক কত খরচ পড়ে?

লিডিয়া আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আমার নিজের ফ্ল্যাটে আমি একা থাকি। ছেলে বাইরে পড়ে। আমার

সর্বসাকুল্যে খরচ হয় পাঁচশ রুবল। বেশি বড়মানুষী করলে আরও দুশো পড়ে। একটি ঘরে আমি থাকি। নিজে রান্নাবান্না করি। এবার খুশী ত?

আমি চুপ করে গেলুম। লিডিয়া ঠিকানা মিলিয়ে আমাকে শূভময় ঘোষের ফ্ল্যাটে তুলে নিয়ে এলেন। এখানে শূভময়ের নবজাত শিশুপুত্রের অন্তপ্রাশনের আনন্দোৎসব। ধূপ ধূনা চন্দন নৈবেদ্য শীথ এবং পুজা! একটি ভারতীয় পারি-বেশ রচনা করা হয়েছে। রুশ বন্ধুরা এসেছেন অনেকে। অংপা পিরিসর ফ্ল্যাটটিতে সকলের জন্য ভূরিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। আমি লিডিয়াকে সকলের মধ্যে পরিচিত করে দেবার পর নির্মমতাদের জন্য পাতা পড়ল এবং সেইখানে বসিয়ে লিডিয়াকে আমি বাঙালী ঘরের লুচি ভরকারি বেগুন-ডাজা ডাল মাংস চাটনি ইত্যাদি সব অপরিচিত এবং 'অস্বাভাবিক' খাদ্য গিলতে বাধ্য করলুম। তিনি সহ্যসা ক্রুদ্ধ এবং চাপা কণ্ঠে আমাকে শূনিয়ে বলছিলেন, 'টোরবল, আনিথংকেবল, আই কামট ইম্যাজিন—'

এর পর আরেক দিন তাঁকে বাগে পেয়ে কামাক্সীপ্রসাদের ঘরে তাঁকে খিচুড়ি এবং মাছভাজা খাইয়ে নেমে আসবার সময় তিনি করুণ কণ্ঠে বলেছিলেন, আমার যদি বর্মী হয়, কিংবা অসুখ করে, আপনি দায়ী!

অন্তপ্রাশনের ভিড়ের মধ্যে এক সময় তিনি আমাকে ধরে বসলেন, ওই শিশু-ছেলটিকে কোলে নিয়ে আমি আসনে বসব, আপনার বন্ধুকে বলুন ছবি তুলতে!

বললুম, গাউন পরে মেঝেতে বসা বৈমানি!

তা হোক, আপনি বলুন। বাচ্চাটি তাঁর চমৎকার।

কামাক্সীপ্রসাদ হাসিমুখে তখনই সেই ছবিটি তুলে নিলেন। ছবিখানা বৈমানি হয়নি, কেননা শূভময়ের শিশু পুত্রটি ছিল প্রকৃতই শূভ্রতনু!

ফিরবার পথে ট্যাক্সিতে বসে তিনি বললেন, আপনার কথাবার্তা একটু রুঢ়। এতে কি মনে হয় জেনেন? আপনি বাড়ি ফিরবার জন্য ব্যস্ত—

বললুম, আপনি ঠিকই ধরেছেন। শূধু যাদুঘর চিত্রশালা আর এট-ওটা দেখে চলে যেতে আসিনি। এর চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল।

লিডিয়া আমার দিকে তাকালেন। পরে বললেন বেশ, আমি আজ থেকে আপনার 'কাজ' করব। আপনি খুশী হয়ে এক দিন বাড়ি ফিরবেন, তার সব দায়িত্ব আজ থেকে আমি নিলুম।

(—ক্রমশঃ)

ভোট রত্ন

দেবানন্দ দত্ত

‘এত ভগ্ন বগ্ন দেশ কত রংগ ভরা’।
সর্বোচ্চ বড় রংগ বোধ হয় ভোটরংগ।
রংগ জন্মে উঠলে মাঝে মাঝে রংগ অবশিষ্ট
হয়। সেই ভোটরংগ আজ আসন্ন।

দিন দিন আসন্ন জন্মে উঠছে। পাড়ায়
পাড়ায় পোষ্টার পড়ছে। প্রার্থীরা ক্লাবের
দরজায়, সম্ভ্রান্ত বাড়ির বৈঠকখানায়,
দাতব্য হাসপাতালের অফিসে প্রকাশ্যে
ঘোরাঘুরি করতে আরম্ভ করেছেন। আর
অপ্রকাশ্যে যা চলেছে এবং চলবে তার
বিবরণ অপ্রকাশিত থাকাই ভাল।

প্রচার ও অপপ্রচার, কুৎসা ও প্রশংসা,
নিন্দা ও সাধুবাদ এক সঙ্গে ধনিত হতে
হতে কান কালাপালা হয়ে যাবে, মাথা
ঝিমঝিম করবে, গা টলে উঠবে। তবু
সমর্থকদের হাত থেকে নিকৃতি নেই।
শুনতেই হবে। আবার বেশিক্ষণ শোনাও
বিপদের। হয়ত দেখা যাবে পাশ দিয়ে
একবার আড়চোখে চেয়ে চলে যাচ্ছেন
প্রতিপক্ষের দলপতি, পাড়ার মাননীয়
‘দাদা’। সাংসারিক জ্ঞান আপনার ঘটে যত
কমই থাক, মানুষ বলেই, আশ্রয়কার
প্রবৃত্তি টনটনে। তাই আপনার অজ্ঞাত-
সারেই আপনি একবার পাড়ার দাদার
আড়চোখের দিকে আড়চোখে চাইবেন
এবং সেই সঙ্গে সমর্থকদের দিকে বিনীত
হাসি ছুড়ে দেবেন। দাদা বঝে গেলেন
যতই বোঝাক ছোকরা ওখানে ফুট কাটতে
হবে না। সমর্থকরা বুঝলেন যাক ভোটটা
পাওয়া গেল। আপনিও বুঝলেন যাক
কৌশল করে প্রাণটা ত এ যাত্রার মত
বাঁচান গেল।

হরেক রকমের বিপদ আছে; অনিন্দ্য
আছে। তাই সব চেয়ে বড় রংগ ভোট-
রংগ। এই রংগে শূন্যমাত্র রাজনৈতিক
দল, সমাজহিতৈষী সংগঠন কিংবা পাড়ার
ক্লাব জড়িয়ে পড়ে না। জড়িয়ে পড়ে ছাঁ-
পোষা সাধারণ মানুষ। এদের সঙ্গে কোন
সংগঠনের কোন যোগ নেই, পরিচয় নেই।
বা বা যার ছেলের বিরুদ্ধে; ছেলে যায়
বাবার বিরুদ্ধে। মা ও মেয়ে গাছ-কোমর
বেঁধে লেগে পড়ে দু’জনের বিরুদ্ধে। কত
মন ভাঙে, আবার মন মেলাবার পালাও
চলে কারো কারো।

দলের কথা বাদ দেওয়া ভাল। ওটা
ক্ষমতার কথা, রাজনীতির কথা। ওটা
ওদের জীবন-মরণের সমস্যা। সহজে তাই
নিস্তার নেই। অ-করণীয় কিছু নেই।
নাচতে এসে ঘোমটার সংস্কার যাদের
থাকে তাদের এসব ব্যাপারে জড়িয়ে না
পড়াই ভাল। তাই উত্তেজনা বাড়তে থাকে

যত, ততই নায়-নায়িতর সাবেকী প্রশ্ন-
গুলো বাপসা হয়ে যায়। আপনি বাঁচলে
বাপের নাম। আগে জয় হোক, তারপর
প্রায়শ্চিত্ত করে পাপক্ষালন করা যাবে।

কিন্তু আমাদের দেশে নির্বাচনটা
এখনও নেহাৎ উত্তেজনার স্তরে রয়ে
গেছে। কয়েক মাস জ্বর ও বিকারের
ঘোরে গোটা সমাজটাই কাহিল হয়ে পড়ে।
রাজনীতির কথা, দলের কথা বাদ দিয়ে
সমাজ-বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে ভোটরংগকে
দেখলে কিন্তু কোথাও রংগ খুঁজে পাওয়া
যাবে না। বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও
মানসিক শক্তির অপচয়ে ব্যথিত হতে হয়।
অথচ নির্বাচনটা শূন্যমাত্র দলের ব্যাপার,
ক্ষমতার ব্যাপার নয়। তার চেয়েও গুরুতর
প্রশ্ন এর-সঙ্গে জড়িত। সে প্রশ্নটি
সামাজিক ব্যক্তির প্রশ্ন, ব্যক্তির প্রশ্ন।
ব্যালট কাগজে কোন দাগ কাটতে পারলেই
কোন বিশেষ দল হয়ত ক্ষমতা পেতে
পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে বোঝা যায়
ভোটদানের ব্যক্তির বিকাশের ধারা ও
প্রকৃতি, রুচি ও বিবেক। তাই ভোটের
সময় রাজনৈতিক পাশ্চাত্য মতে মনুষ্য-
মোচন খেলায় আর সমাজ-বিজ্ঞানী ও
মনোবিজ্ঞানীরা মাতেন বিশেষণের অঙ্কে।

ইরোরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষ
করে আমেরিকায় সমাজ-বিজ্ঞান বিশেষ
উন্নত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, রিসার্চ
গ্রুপ ও সংগঠন রীতিমত গবেষণা করে
থাকে। নানা রকমের চার্ট ও প্রশ্ন তৈরী
হয়; বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান তৈরী
হয়। তাদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নয়,
সামাজিক। তারা জানতে চায় কি ভাবে
জনমত গঠিত হচ্ছে, ব্যক্তির সঙ্গে
সমাজের মিলন ও সংঘর্ষ হচ্ছে কিভাবে।
এক কথায়, ব্যাপক অর্থে ভোটদানের
ব্যক্তির কি ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। খুবই
দৃষ্টিভঙ্গির কথা, আমাদের দেশে এমন
ধরনের গবেষণা হয় না। হলেও,
সাধারণতঃ তার প্রচার নিতান্তই সামান্য।

আমরা সকলেই ভাবি ভোটের সময়
মানুষ ভেবে-চিন্তে বিচার-বিবেচনা করে
ভোট দেয়। রাজনৈতিক দলের নেতাদের
কেউ কেউ সাধারণ মানুষের এই সহজ
বিশ্বাসের অংশীদার। তাই পাড়ায়
পাড়ায় চলে সভা ও বৈঠক। বাড়িবাড়ি
যায় ছাপানো প্রচারপত্র। দোরদোরে
বকে যায় অনলস, কানডাসার। কথার
পিঠে কথা গেঁথে, হেসে কেঁদে অভিনয়
করে ভোটদানের মন জয় করার চেষ্টার
অন্ত থাকে না।

কিন্তু চেষ্টার কি ফল? মিচিগান
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা গ্রুপ এই বিষয়ে
ব্যাপক পরিসংখ্যান তৈরী করে এই
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রাজ-
নৈতিক দলগুলির এই প্রচার একেবারে
ভ্রম ষি ঢালার মতই ব্যর্থ ও নিরর্থক।
ভোটদার সাধারণভাবে নতুন দল নির্বাচন
করে না। বরং তারা পুরুষানুক্রমিক
ধারাকেই অক্ষুণ্ণ রাখতে ভালবাসে। রীতি
ও প্রথা বলা মানুষের চরিত্রে বশমূল
সংরক্ষণশীলতা আছে। মানুষ স্বভাবত
রীতি ও প্রথাকে মান্য করে, মেনে চলে।
এমন কি দেখা যায় যে রীতি ও প্রথা
মানুষের ব্যক্তির বিকাশের প্রতিবন্ধকতা
সৃষ্টি করলেও আমরা রীতি ও প্রথাকে
সহজে আঘাত করতে চাই না। বরং
প্রশ্নহীন আনুগত্যই আমাদের রুচি ও
বিবেকের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। তাই মিচিগান
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা গ্রুপের মতে
ভোট দেবার প্রশ্নটি একটি পারিবারিক
প্রথার অনুরূপ। অর্থাৎ বাপ ঠাকুঁদা যে
দলকে সমর্থন করে এসেছে সেই পরি-
বারের নতুন ভোটদারও বিশেষ গুরুতর
কিছু না ঘটলে পুরাতন ও পরিচিত
দলের পক্ষে ভোট দিয়ে থাকেন।

প্রার্থী নির্বাচনের সঙ্গে ভোটদানের
ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিবিড়ভাবে জড়িত। যে
পার্টিতে আমি সমর্থন করি, আমার বন্ধু-
বান্ধবও সেই পার্টিরই সমর্থক। আত্মীয়-
স্বজন যদি আমার অবাস্থিত দলকে
সমর্থন করে তবে আমি অপ্রসন্ন হই।
যুক্তিতর্কের বাণ ব্যর্থ হলে ব্যক্তিগত মান
অভিমান করে সেই আত্মীয়কে রাইনুস্ত
করতে পিছ-পা হই না। আমি এক
প্রেমিকবৃন্দকে জানতাম। প্রেমের
গভীরতা ছিল নাকি তাদের অতুলম্পর্শী।
অন্ততঃ এ কথা বহুবার তারা আমার
কাছে হাঁপ করে বলেছে। কিন্তু গতি
নির্বাচন তাদের কালজয়ী প্রেমেও চিড়
ধরিয়ে দিয়েছে। প্রেমিকটি এমন একটি
দলের সমর্থক হয়ে উঠল যা প্রেমিকের
কাছে অসহ্য। দু’জনের মধ্যে বিভেদ এল।
ভোটের উত্তেজনা থেমে যাওয়ার পরও
তারা অমিল থেকে মিলে ফিরে আসতে
পারেন।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা
লক্ষ্য করেছেন যে, পারিবারিক জীবন
ভোটের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার
করে। ভোটের আগে যদি স্বামী-স্ত্রীর
মধ্যে সাংসারিক কারণে বিবাদ-বিসম্বাদ
হয়, তবে জানতেই হবে যে সেই দম্পতির
দু’ই ভোটই সরকারের বিরোধীদল
পেয়েছেন। পারিবারিক জীবনে যতই
হতাশা আসবে, বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে,
পারিবারিক বন্ধন যতই শিথিল হতে
থাকবে ততই সরকারের বিরোধী দলগুলি
লাভবান হবে। পারিবারিক জীবন যতই
সুস্থ ও অটুট থাকবে, পারিবারিক
বন্ধনগুলি যত দৃঢ় ও স্বচ্ছ হবে, ততই

প্রতিষ্ঠিত সরকারের সুবিধা এবং সরকারের বিরোধী দলের অসুবিধা।

এই যুগটা নারী-পুরুষের সমান অধিকারের যুগ। এই অধিকার আইনত স্বীকৃত। অফিসে কাছারিতে এর প্রমাণ আছে। ট্রামে বাসে এই অধিকারের ঘোষণা অহরহ নন্দিত। কিন্তু ভোট দেবার ব্যাপারে নারী-পুরুষের বিরাট পার্থক্য ফুটে ওঠে। যে ভদ্রমহিলা দর্শনের কূট প্রশ্নে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে পারেন, অতি সাম্প্রতিক সাহিত্যের ওপর নিভর্যে মতামত দিতে পারেন, সেই তুহিন ইন্টেলেকচুয়াল ভদ্রমহিলা কিন্তু ভোট দেবার সময় ঘোর এ্যান্টি-ইন্টেলেকচুয়াল কাজ করে বসেন।

কথাটা একটু খুলে বলা দরকার। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজত্ব। সুতরাং প্রার্থী ব্যক্তি-নিসারে খুব একটা কিছুর করতে পারেন না। তাই দলকে বিচার করতে হয়, বিচার করতে হয় সেই দলের কার্যক্রম, অভীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি। কারণ শেষ বিচারে গণতন্ত্রে শাসনকাজ চালায় দল, ব্যক্তি নয়। ভোট দেবার সময় মহিলারা কিন্তু অন্যভাবে চিন্তা করে থাকেন।

হাবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বিরাট সার্ভে করার পর জানিয়েছেন যে, মহিলারা ভোট দেবার সময় দল কিংবা দলের কার্যক্রম মোটেই চিন্তা করেন না। তারা বিচার করেন একমাত্র প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব। প্রার্থী যদি কয়েকটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার পরও আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বহীন হন তবে বামাকুল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হবেনই।

এ শব্দ হাবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মত নয়। আমেরিকার গত নির্বাচনে শুধুমাত্র মহিলা ভোটারদের মনোভাঙ্গ লক্ষ্য করার জন্য একটি সার্ভে করা হয়। এইসব গবেষকদের প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল কি কি প্রশ্ন ও কথা মাথায় রেখে মার্কিন মহিলারা ভোটে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

বিষয়টি আমেরিকায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আগে আমেরিকায় মহিলা ভোটার ছিলেন না। মাত্র চল্লিশ বছর আগে মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছেন। আমেরিকায় মেয়েদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। পুরুষের জন্মের হার কম। সুতরাং বর্তমানে ভোটারদের একটি বিরাট অংশ মহিলা।

অনুসন্ধান দেখা গিয়েছে, রাজনীতির হালচাল ও খবরাখবর মেয়েরা খুব কম রাখেন। বেশ বিরাট অংশ অতি সামান্য ও সাধারণ খবরটিও জেনে রাখা প্রয়োজন মনে করেন না। ১৯৫২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে শতকরা প্রায় ষাটটি মহিলা ভোটার জানিয়েছিলেন যে, সামনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে এ খবর তাঁরা রাখেন না।

রাজনীতি ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে এতদূর অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, ভোটে মহিলারা অংশ গ্রহণ করছেন ক্রমাগত বেশী পরিমাণে। ঘটনাটি মজার। রাজনীতিতে উৎসাহ নেই অথচ ভোট দিতে আগ্রহ প্রচণ্ড! এই বৈপরীত্যকে বুঝতে গিয়ে গবেষকরা মার্কিন মহিলাদের একটি চারিত্রিক বিশেষত্ব আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, আমেরিকান মেয়েরা সংগঠিত রাজনৈতিক দল, তাঁদের কার্যক্রম ইত্যাদির চেয়ে স্বয়ং প্রার্থীকে ব্যক্তি হিসাবে বুঝতে চান। তাঁরা একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান : নির্বাচন-প্রার্থী নির্ভরযোগ্য হবে কি না। তাই কোন গিম্বীকে কোন প্রশ্ন করলেই তিনি সোজা উত্তর দিয়ে বলেন : আমি কিছুর জানি না। আমার ধারণা আইজেন-হাওয়ার সব ঠিক করে দেবে।

মহিলারা প্রথমেই প্রার্থীর ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নেন। সাধারণত তাঁরা প্রার্থীর বয়স (৫০ বছরের কম হলে ভাল), কলেজের ডিগ্রি, পরিবারিক জীবন (বিবাহিত কি অবিবাহিত), ধর্মমত জানতে চাইবেন। যদি প্রশ্ন করা যায়, রাজনীতিতে এই ব্যক্তিগত ব্যাপার আসছে কি করে? উত্তর বাঁধা। এক বাক্যে অধিকাংশ মহিলা ভোটার জানান : প্রেসিডেন্টের চাই ব্যক্তি আর চারি। প্রেসিডেন্ট এমন লোক হওয়া দরকার যিনি মানুষের মনে বিশ্বাস আনতে পারবেন, চটপট সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। মহিলা ভোটার মনে করেন যে, প্রার্থীটি সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি না হলে চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেন না।

আন্তর্জাতিক সমস্যার চেয়ে ঘরোয়া সমস্যা মেয়েদের কাছে প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য বিষয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মেয়েরা ঘরমুখী হতে আরম্ভ করেছে আরো বেশীভাবে। মার্শাল প্ল্যানের মাধ্যমে বাইরের দেশগুলোকে সাহায্য করা উচিত কিনা, অন্য দেশগুলোতে অধিকতর অস্ত্র সাহায্য দেওয়া উচিত কিনা—এই বিষয়ে একটি প্রশ্নোত্তর আদান করা হয়েছিল। বেশব মহিলা এই প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়েছিলেন তাঁদের ভিন ভাগের মত এই যে, আমেরিকাকে এইসব ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলা উচিত নয়। এই উত্তর থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বৃদ্ধ সম্পর্কে ভয় ও উদ্বেগ ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশী। অধিকাংশ মেয়েরা জানেনই না যে আমেরিকা মহাজগতে রকেট পাঠাবার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। যারা জানেন তাঁরা আবার এই ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁদের ধারণা এ বিষয়ে খরচা করা নির্বাসিত।

সংগঠিত রাজনৈতিক দলের প্রতি আমেরিকান মহিলাদের সংশয় প্রচুর।

দলের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস তাঁদের কাছে অপরাধ। তাঁরা চান প্রার্থী যেন দলের নির্দেশ না মেনে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে কাজ করেন।

রাজনৈতিক জ্ঞানের অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও মহিলা ভোটার কিন্তু স্বামী কিংবা বৃদ্ধদের নির্দেশ মত ভোট দেন না। তাঁরা নিজেরাই বিচার করতে ভালবাসেন। বরং মহিলারা জানতেই দেন না তাঁরা কাকে ভোট দেবেন। যদি কখনও স্বামী কিংবা বৃদ্ধদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন, তার বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। কারণ ওটা কথার কথা। এই বিষয়ে স্বামী কিংবা বৃদ্ধরা খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না।

মহিলা ভোটার যত সংরক্ষণশীল হোন না কেন, এ কথা প্রমাণ হয়েছে যে, তাঁরা মোটেই পুরুষদের কার্যব কপি নন। আজকের রাজনৈতিক জীবনে তাঁদের অংশগ্রহণ যত সামান্যই হোক আগামী দিনে তাঁরা প্রচুর প্রভাব বিস্তার করবেন। সমাজ-বিজ্ঞানীদের এই অনুসন্ধান লোভনীয় হবেন দলপতিরা।

ভোটের অধিকার পেয়েও আমরা ভোট দিতে বিরত থাকি। স্বদেশে বিদেশে এই একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করা যায়। অথচ ভোট দেবার অধিকার অর্জন করার জন্যে ইতিহাসে কত সংগ্রামের কথা পড়া যায়। এইসব ভোটারদের মানসিকতা বিশ্লেষণ করা হয় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে। ফাউন্ডেশনের অধীনে যে গবেষকরা কাজ করেছিলেন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভোটের অধিকার পেয়েও ভোট দিতে বিরত থাকেন সাধারণত কুনা ও সংকীর্ণচেতা ব্যক্তিরা। তাঁদের কম্পনশীল কম, জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তাঁদের নেই। বরং দেখা যাবে যে, এরা অধিকাংশই জীবনে বীতশ্রু। এইসব ব্যক্তিরা অধিকাংশই দারিদ্র পরিবারের লোক। যে কাজে তাঁরা নিযুক্ত আছেন সেই কাজের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ও উৎসাহ নেই। দিনগত পাপক্ষয় করে যান কোনমতে। এক কথায় গবেষকদের ধারণা এই যে, এই সব ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত এবং সমাজজীবনে ব্যর্থ। তাই জীবনের প্রতি এত অনিচ্ছা।

অবশ্য সমস্ত সার্ভেগুলি আমেরিকার। আমাদের দেশে এমন সার্ভে হয় না। তাই আমাদের দেশের ভোটারদের মতিগতি ও রুচি নির্ধারণ করতে হয় আন্দাজের ওপর। বলাবাহুল্য, এটা আদৌ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়। এই সব সার্ভে থেকে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের বহু বিশেষত্ব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এইসব বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হয়ে থাকে। মনে হয় সমস্ত বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগঠিত করতে পারলে ভোট শব্দ রং ও রণ হবে না। তার চেয়েও আরও গভীর ফল আশা করা যেতে পারে।

ব্রিটিশ নাট্যকলা প্রসঙ্গে

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ইতালী যদি ইউরোপের চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের তীর্থ হয়, তবে জার্মানী হচ্ছে সংগীতের, রাশিয়া ব্যালে নৃত্যের, ফ্রান্স ফ্যানশান ও সুন্দরচিত্র এবং বৃটেন নাট্যকলার তীর্থ।

নাট্যকলায় ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, একদিকে যেমন তার দীর্ঘ নাট্য-সাহিত্যের ঐতিহ্যে সেক্সপীয়ার-ইবসেন-বার্ণড শ থেকে আরম্ভ করে আজকের দিনের জন অসবর্ন, হিউ মিলস ও পল গ্রীন প্রভৃতি অনেক জগদবিখ্যাত ও শক্তিশালী নাট্যকারেরা জন্মেছেন, তেমনি অন্যদিকে মিসেস সিডান, ও স্যার হেনরী আর্ভিং থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত স্যার জন গিলগুড, স্যার লরেন্স অলিভিয়ে, হ্যারী এনড্রুজ, ডেম সিডিল থন্ডাইক, এডিথ ইভানস ও ভিভিয়ান লে প্রভৃতি স্মরণীয় নট ও নটীর প্রতিভা বৃটেনের নাট্যমণ্ডল ব্যাবহার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

তবু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গত শতাব্দীতে অপেরার সঙ্গে প্রতিযোগিতার মতই বর্তমানে ব্রিটিশ নাট্যশালাগুলি সিনেমা ও টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।

গত ১০ বছরের মধ্যে বৃটেনে প্রায় ১০০টি নাট্যশালা বন্ধ হয়ে গেছে। তার মধ্যে দুটি হচ্ছে মধ্য লন্ডনে, ১২টি তার সহরতলীতে, বাকিগুলি লেণ্টার নিউক্যাসেল প্রভৃতি মধ্যস্থল শহরে।

কিন্তু নাট্যশালাগুলির সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে আলোচনায় আসবার আগে তাদের সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলা প্রয়োজন।

বৃটেনের নাট্যশালাগুলি সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক, কমাশিয়াল, অর্থাৎ যেগুলিকে নিছক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মত চালানো হয়। এখানে সব কিছুই মোশুম্ভী। কতৃপক্ষ বাজার বুকে কোন বিশেষ ধরনের বাছাই-

করা নট-নটীদের দিয়ে একটি নাটক মণ্ডস্থ করেন।

দ্বিতীয় ধরনের নাট্যশালা হচ্ছে রিপারটরি, (Repertory)। এগুলি হচ্ছে এক-একটি বিশেষ নাট্য-সম্প্রদায়ের স্থায়ী অভিনয় কেন্দ্র। যেমন লন্ডনের বিখ্যাত ওল্ড ডিক নাট্যাগার ও ওয়ট-ফোর্ড আপন-এ্যাডনে সেক্সপীয়ার মেমরিয়াল থিয়েটার।

বৃটেনে কমাশিয়াল নাট্যশালাগুলির বর্তমান সংখ্যা প্রায় দশ। তার মধ্যে একশ কুড়িটি সারা বছর ধরে চলে। লন্ডনে তাদের সংখ্যা ৩৮টি, যুদ্ধের আগে ছিল ৫১টি। লন্ডনের প্রাচীনতম নাট্যশালা হচ্ছে ডুরি লেনের থিয়েটার রয়াল। এটি স্থাপিত হয় ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে। কয়েকবার ভাঙা-গড়া হলেও সাবেকী কাঠামোটি প্রায় অপরিবর্তিতই আছে। লন্ডনের কয়েকটি নাট্যশালা আবার বিশেষ ধরনের নাটকের জন্যে নির্দিষ্ট যেমন ওল্ডভিক সেক্সপীয়ারের নাটকের এবং ইন্ডিয়া হাউসের প্রায় বিপরীত দিকে অলউইচ থিয়েটার প্রহ-সনের জন্যে।

কমাশিয়াল নাট্যশালাগুলির প্রায় সমগ্র মালিকানা 'থটল থিয়েটার কর্পোরেশন' ও 'মাস এম্পায়ার' নামে দুটি ব্যাবসা-জোটের হাতে। কেবল লন্ডনের কয়েকটি নাট্যশালার মালিক ক্ষুদ্রতর সংগঠন কিম্বা ব্যক্তি বিশেষ।

উপরোক্ত নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি চলে নাট্যশালাগুলির মালিক ও প্রিডিউসিং কম্পানীর সহযোগিতায়। নাট্যশালার মালিকদের আভ্য, প্রবেশমূল্যের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ, তা ছাড়া বার-রেজেন্ট, প্রোগ্রাম বিক্রী এবং ছাতি-বর্ষাতি-ওভার কোট জন্ম রাখার টিকিট প্রভৃতি থেকে। আর ব্যয়,—আলো, উত্তাপ, রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মচারীদের মাইনে প্রভৃতিতে।

প্রিডিউসিং কম্পানীর দায়িত্ব হচ্ছে

নাটকটিকে মণ্ডস্থ করা। তার প্রধান ব্যয়, নট-নটী, পরিচালক ও নাট্যকারদের পারিশ্রমিক। ১০ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী সমেত একটি সাধারণ নাটককে মহড়া প্রভৃতি দিয়ে মোটামুটি খরচ হয় ৫ হাজার পাউন্ড। কিন্তু তা গণিত কি নতানাটা হলে খরচ গিয়ে দাঁড়ায় ২৫ থেকে ৫০ হাজার পাউন্ড। বক্স অফিস থেকে যদি সন্তোষে গড়পড়তা অন্তত ১৫০০০ পাউন্ড আয় না হয় তা হলে নাটকটি লোকসান দিতে থাকে। ১৯৫৯ সালের নভেম্বর থেকে '৬০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৬৩টি নতুন প্রডাকশানের মধ্যে ৪২টির লোকসান হয়েছে।

বলাবাহুল্য কমাশিয়াল নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলিরই যখন এই অবস্থা তখন রিপারটরিগুলির অবস্থা আরো সংগীণ। এদের সংখ্যা সমগ্র দেশে ৫১টি। তাদের মধ্যে ১৭।১৮টি মাত্র কিছুটা লাভ করে। বাকিগুলি সরকারী আর্ট কাউন্সিল ও বিভিন্ন স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পায়।—এই আর্থিক সংকটের জন্যে রিপারটরি নাট্যশালাগুলি বেশির ভাগ সময়েই নতুন নাটক নিয়ে পরীক্ষা না করে পরোনো ও সফল নাটকই মণ্ডস্থ করে। সময়-সময় অবশ্য কমাশিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন নাটক পরীক্ষার জন্যে এদের সাহায্য করে এবং সে-চেহটা সফল হলে নাটকগুলি নিজেরা মণ্ডস্থ করে।

ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশগুলিতে সরকার নাট্যশালা, অপেরা, সংগীত ভবন ও ব্যালে প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে আর্থিক সাহায্য করে। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যের পরিমাণই সবচেয়ে কম। ব্রিটিশ সরকারের ললিত-কলায় সাহায্যের পরিমাণ হচ্ছে ১৫ লক্ষ পাউন্ড, ফ্রান্সের ২০ লক্ষ পাউন্ড, পঃ জার্মানীর ২৮ লক্ষ পাউন্ড আর ইতালী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশ হলেও তার সাহায্যের পরিমাণ হচ্ছে ৩৭ লক্ষ পাউন্ড।

আর্ট কাউন্সিল মারফৎ ব্রিটিশ সরকারের এই সাহায্যের বিশ্লেষণ করলে যা দেখা যায় তা হচ্ছে প্রতি নাগরিক পিছ ৭ পেন্স। এই সাত পেন্সের মধ্যে মাত্র ৪ পেন্স অর্থাৎ আমাদের দেশের এক পয়সার কিছু কম পায় নাট্যশালাগুলি। বাকি ৩ পেন্স পায় সংগীত-ভবন, অপেরা ও ব্যালে প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

আর্ট কাউন্সিলের সাহায্যের ওপরে আছে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য। কিন্তু সেখানেও, তারা যেখানে ৫ শিলিং ৯ পেন্স খরচ করতে পারে, সেখানে তারা খরচ করে মাত্র ১ শিলিং ১ পেন্স।

—অথচ প্রয়োজনীয় আর্থিক সমর্থন না পেলে নাট্য-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে নতুন নতুন নাটক কিম্বা অভিনয় কিম্বা মণ্ড-কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

হজসাধা নয়। আর তা যতক্ষণ পর্যন্ত শব্দ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নাট্যালাপুলিতে দর্শকদের ভীড় বাড়ানো হবে না। আজ বুটেনে শতকরা মাত্র দুজন লোক নিয়মিত নাটক দেখতে যায়।

নতুন-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মারেকটি উপায় হচ্ছে ফরাসী দেশের ত সরকারী সাহায্যে একটি জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন করা। সেখানে নতুন-নতুন নাটক, অভিনয় আঙ্গিক ও মঞ্চ-কাশলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। যথেষ্ট ব্যয়িতলাভ করে পেশাদার নাট্যশালায় যাবার আগে পর্যন্ত তরুণ নট-নটরীরা তাঁদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ও শিক্ষা পাবেন।

বুটেনে ঐ জাতীয় একটি নাট্যশালা গঠনের পরিকল্পনা বহুদিনের। ঐ উদ্দেশ্যে লন্ডনের কার্ডিফ কাউন্সিল বা কর্পোরেশন ১০ লক্ষ পাউন্ড মঞ্জুর করেছে এবং সরকার করেছে ১০ লক্ষ পাউন্ড। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে পরি-কল্পনা বাস্তবে রূপ নেয়নি, এমনকি সংস্কৃতির ঐভাবে জাতীয়করণ আদৌ বাস্তবীয় কিনা সে বিষয়েরও মীমাংসা হয়নি।

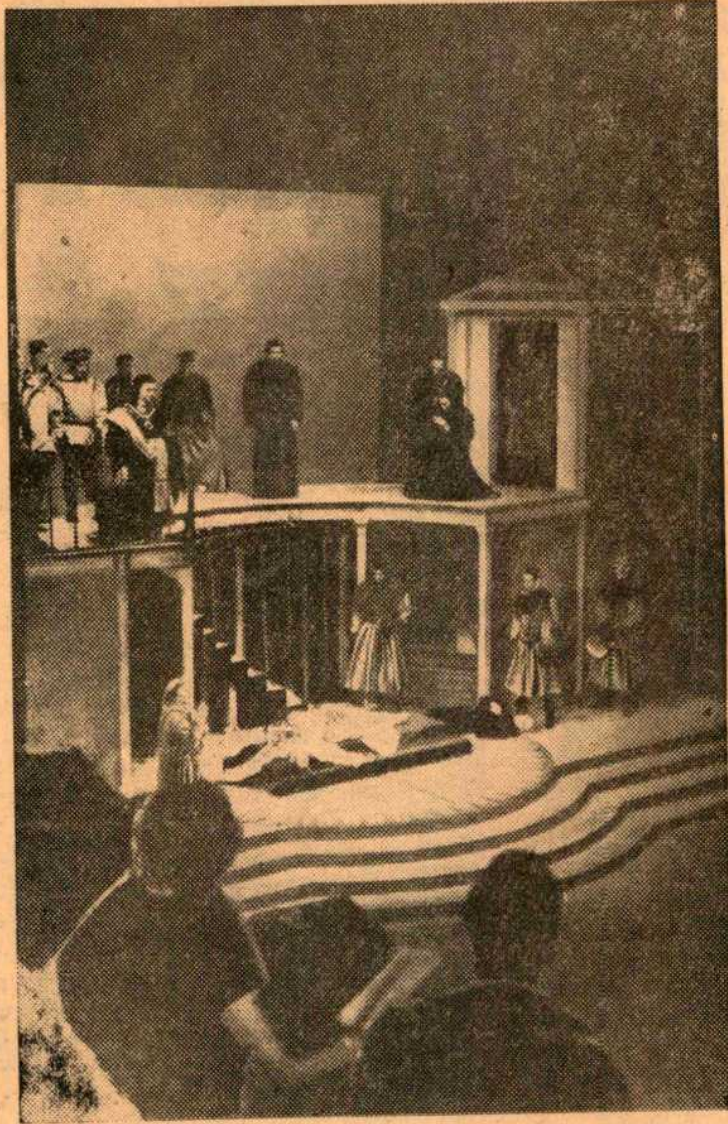
তবে সরকারী কিম্বা বেসরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী না থেকেও যে কোথাও কোথাও নাট্যনুরাগীরা নাট্যা-লেন্দালনে নবপ্রাণ সৃষ্টির চেষ্টা করেননি এমন নয়। যেমন লন্ডনের 'থিয়েটার ওয়াকসপ' ও 'ইউনিটি থিয়েটার।' কিন্তু দুঃখের বিষয় দুটি প্রতিষ্ঠানই জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করবার পরও প্রথমটি এ বছর অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়টির অবস্থা মূর্খমূর্খ।

নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট

অবশ্যই একথা অনস্বীকার্য যে, কোন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন যদি স্বকীয় প্রাণশক্তি বৈগবান হয়, অর্থাৎ যুগের মানসিক প্রয়োজন পরিপূর্ণ করতে সমর্থ হয় তা হলে একমাত্র আর্থিক অনটনই তাকে স্তিমমান করে তুলতে পারে না।

নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে ইংরাজ নাট্যকার জন ওয়েন বলেছেন, "এ হচ্ছে একটা মিলন ক্ষেত্র। এখানে লোকে দল বেধে আসে, কে টগলিকে যথাস্থানে রাখে, পরস্পরের দিকে তাকায়, তারপর সমবেতভাবে নাটকটি দেখবার জন্যে তৈরী হয়।.....

বিখ্যাত মনীষী জাঁ ক'কতো সিনেমা সম্পর্কে বলেছেন যে তা এমন স্বপ্ন যে বহু লোক এক সঙ্গে দেখতে পারে। সিনেমায় বহু দর্শকের সম্মিলনের মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়ে গিয়ে স্বপ্নাত্মক মত ছবিই ছায়ায়, সংগীতে



দেখুপায়ের স্মৃতি নাট্যশালায় অভিনীত 'রোমিও জুলিয়েটের' একটি দৃশ্য।

ও অনুভূতির পরিবর্তনে গভীরভাবে সাড়া দেয়।

কিন্তু নাটকের দর্শকমণ্ডলী ভিন্ন প্রকৃতির। তারা স্বপ্ন দেখে না, ফরাসীরা যাকে বলে 'সহযোগিতা করা'—তাই করে। তার নিকটমত বিকল্প হচ্ছে রাজনৈতিক সভা।

জাঁ পল সঁতর বলেছেন, "নাটকের দর্শকমণ্ডলী হচ্ছে একটি সভার মত।—যার মানে দর্শকেরা শুধু নাটকটি সম্পর্কে নিজেদের মতামতের চিন্তা করে না, তার পাশের লোকের চিন্তা করে। আমি যখন কোন নাটক দেখতে গিয়ে কোন সংলাপ শুনিনি, তখন ভাবি আমার সঙ্গে একমত নয় এমন বহু লোক এই নাট্যশালায় আছে যারা এই সংলাপ শুনে মর্মাহত হচ্ছে। সেই কথা ভেবে আমার সমালোচনা শক্তি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। আমি তাদের জন্যে বিব্রত বোধ করি।"

মনে হয় নাট্যশালায় সংকটের গভীরে আছে বর্তমানের পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশ। আজকের শিথিল-বিশ্বাস, স্নায়ুযুদ্ধ শঙ্কিত পৃথিবীতে মানুষ নাট্যশালায় পরিবেশে বসে সামাজিকভাবে মন-দেওয়া করতে যেন অপারক।

অবশ্য আজ যদি এমন নাট্যকারদের আবির্ভাব ঘটতো মানুষকে যারা যুগ-সংকট গ্রাণের বাণী শোনাতে পারতেন, মূর্খতার পথনির্দেশ করতে পারতেন তা হলে হয়তো অবস্থা অন্য রকম হতো। কিন্তু তার বদলে বর্তমানে পাশ্চাত্যের নাট্যকারদের প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে পারিবারিক সংকট—যেখানে একই পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের শত্রুর মত সম্মুখীন হয়। সেই বিরামবিহীন বিদ্বেষ ও বিরোধ দেখতে দেখতে সাধারণ মানুষের মন হাঁপিয়ে ওঠে। বাইরের মূর্ত

আলো বাতাসে বেরিয়ে আসতে পারলে বাঁচে।

কয়েক বছর আগে মস্কো আর্ট থিয়েটারের ডিরেক্টর প্রীঅলেকজেন্ডার সোলডোভনিকভ বটেনের নাট্যশালা-গুলিতে অনেকগুলি নাটক দেখবার পর লেখেন যে ব্রিটিশ নাট্যকারদের সবচেয়ে বড় অভাব হচ্ছে 'বিশ্বাসের অভাব।'

কারণ নাটক রচনার আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, "কার জন্যে, কোন উদ্দেশ্যে, কার নামে সেই নাটক উৎসর্গীত হবে? আজকের সমাজে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে এই নাটকের স্থান কোথায়? কোন-কোন জরুরী প্রশ্নের তা উত্তর দেবে? থিয়েটারকে শুধু আমাদের ক্ষেত্র,—যবানিকা পতনের এক ঘণ্টা পরেই যা ভুলে যেতে হবে,—মনে করাটা দুঃখের বিষয়।

প্রীসোলডোভনিকভ ব্রিটিশ নটীদের মধ্যে আরেকটি অবাঞ্ছিত প্রবণতাও লক্ষ্য করেছিলেন। যাকে তিনি বলেছিলেন 'Standardisation of stage characters' অর্থাৎ কয়েক প্রতিভাধর নট-নটী যখন বিশেষ কোন অভিনয়নৈপুণ্যে ও কৌশলে দর্শকচিত্ত জয় করেন তখন স্বল্প প্রতিভাধরেরা কিম্বা তরুণ নট-নটীরা তাঁদের একঘেয়ে অনুসরণ করতে সুরু করেন।

ব্রিটিশ নাটককার বৈশিষ্ট্য

এতক্ষণ যা বললাম তা শুনে মনে হতে পারে বটেনের নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি

বুঝি একেবারে মূমূষু এবং মানব সংস্কৃতির এই স্বর্ণ-নিখরটি বুঝি বা শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। চলার পথে বাঁক ও বাধার সম্মুখীন হলেও ব্রিটিশ নাট্যশালার ধারা আজো প্রাণবন্ত ও বহু সম্ভাবনাময়। নাটক উপভোগ্য হলে তার দর্শকের অভাব হয় না। আগাথা ক্রিষ্টিয় 'মাউস ট্রাপ' আজ একই নাট্যগৃহে একটানা নয় বছর ধরে চলছে।

বার্ণার্ড শয়ের 'পিপগমিলিয়নের' সংগীত ভাষা 'মাই ফেয়ার লেডি' চলছে পাঁচ বছরের ওপর।

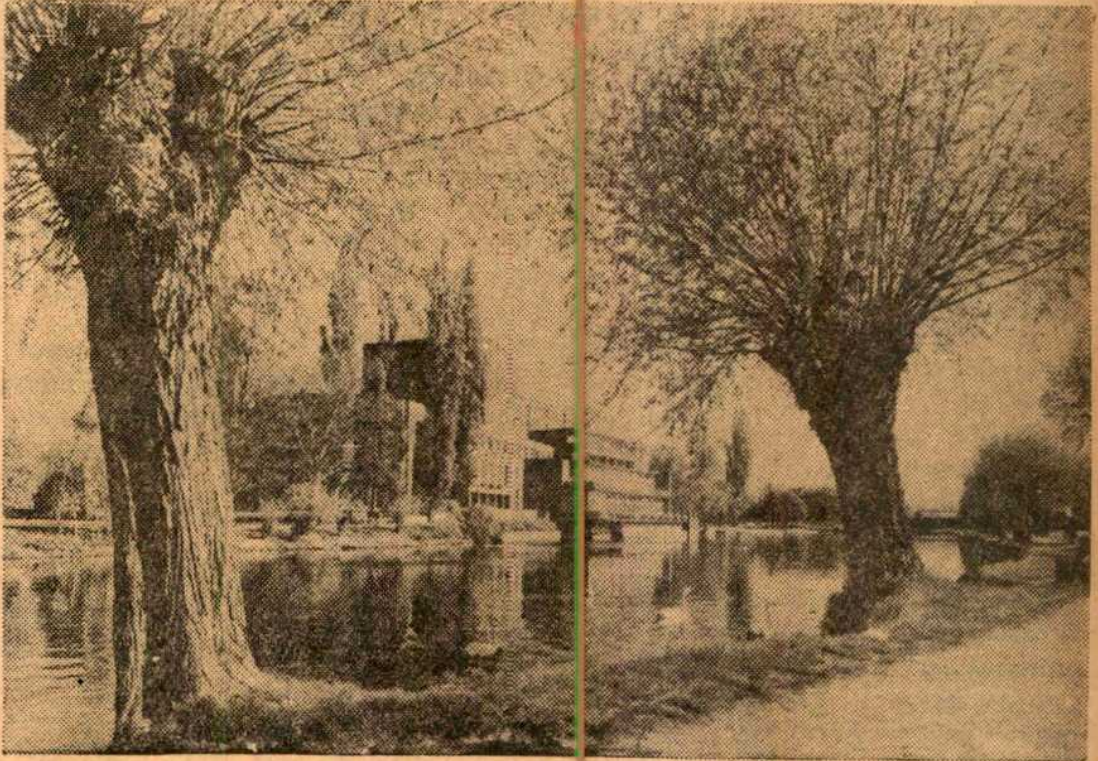
খুব সংক্ষেপে যদি ব্রিটিশ অভিনয় কৌশলের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের পার্থক্য বর্ণনা করতে হয় তা হলে বলতে হয় তা হচ্ছে প্রসাধন ও রূপ-সজ্জার পরিমিত বা বাহ্যিক বর্জন। এ সম্পর্কে সোলডোভনিকভের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "লন্ডনের অভিনেতার রূপসজ্জা পরিহার করেন। তাতে তাঁদের মুখকে জীবন্ত ও অভিব্যক্তির করে তোলা সহজ হয়। ফলে তাঁরা মঞ্চচারিত্র সৃষ্টির এই শক্তিশালী হাতিয়ারটির চরম ব্যবহার করতে পারেন। অভিনেতার নিঃসন্দেহে রূপসজ্জার বর্জনের জন্যেই দর্শকচিত্তের কল্পনাকে উন্মুখ করে তোলাবার এই সনাতনী কৌশলটিতে সবশক্তি প্রয়োগ করতে পারেন।

তবে রূপ-সজ্জা বর্জনের একটা অসুবিধার দিকও আছে। আমি লক্ষ্য

করেছি যে লন্ডনে নাটক বর্ণিত কোন চরিত্রের অভিনয়ের জন্যে অভিনেতার দৈহিক গঠনও সাদৃশ্য এবং মেজাজের ওপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু অভিনেতার সৃজনীশক্তির সম্প্রসারণের জন্যে তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির বাইরেও নতুন কোন চরিত্রের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভের চেষ্টা করা উচিত। এমন তো প্রায়ই ঘটে যে দর্শকরা কে অভিনয় করছেন সে কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যান এবং মধ্যে আবির্ভূত ব্যক্তিকে নতুন ও অজ্ঞাতপূর্ব ব্যক্তি হিসাবে আবিষ্কার করেন।—এই নতুন আবির্ভাবকেই আমি পুনর্জন্ম বলছি। এ রকম ক্ষেত্রে প্রসাধন ও রূপসজ্জা নির্ভরযোগ্য সহায়।"

ব্রিটিশ অভিনেতাদের সম্পর্কে সোলডোভনিকভ আরেকটি মহাপ্রশংসিত করে গেছেন, "এমন কি ভাষা না জানলেও দর্শক (তিনি নিজে ইংরাজ ভাষা খুব ভাল জানেন) গভীর কৌতূহলের সঙ্গে নায়কের হৃদয় সংঘাত ও মেজাজের সূক্ষ্মমাত্রা সূক্ষ্ম পরিবর্তন অনুধাবন করতে পারেন। সব কিছুই তাঁর মুখে ও কণ্ঠে প্রতিফলিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। মনে হয় যেন তাঁর আঘাত সমগ্র রূপটি তুলে ধরা হচ্ছে।"

আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে বটেনের মঞ্চকৌশল সম্পর্কেও অনেক কথা বলার থাকে। কিন্তু তা দীর্ঘতর স্থান সাপেক্ষ।



স্টার্টফোর্ড-আপন-এভেনে সেলুপার্স স্মৃতি নাট্যশালা।

বিজ্ঞানের কথা

অশ্বকান্ত

॥ অশ্বজনের দৃষ্টি ॥

আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসা-সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য প্রকরণ ছিল— সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়রা বহু কাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যায় কেন সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল এক্ষণে জোপ পাইয়াছে কেবল দুই একজন সন্ন্যাসী উনাসীন প্রভৃতির কাছে সে সকল লুপ্ত বিদ্যার কিয়দংশ অতি গৃহভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন, আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, ‘শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে? কন্যা যে অশ্ব’ আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, ‘আপনি অশ্ব আরোগ্য করুন’ তিনি বলিলেন, ‘করিব—এক মাসে’। ঔষধ দিয়া, তিনি এক মাসে রজনীর চক্ষের দৃষ্টি সৃজন করিলেন।”

বাল্মীকিস্তম্ভের কলমের জোরে রজনী অনায়াসেই চোখের দৃষ্টি পেয়েছিল। আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা কিন্তু এখনো এতখানি ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁরা মহাকাশকে জয় করতে চলেছেন, অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে নানা আশ্চর্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন, কিন্তু এখনো পর্বন্ত কোনো জন্মান্থকে চোখের দৃষ্টি দিতে পারেননি।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অশ্বকে নিরাময় করার জন্যে চিকিৎসাসম্বন্ধে কোনো আশ্চর্য প্রকরণ ছিল কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু সৌভাগ্যে বিজ্ঞানী ফিলাতভ পরবর্তী জীবনের অশ্বকে বহু ক্ষেত্রে যে-পদ্ধতিতে নিরাময় করেছেন তা আধুনিক বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য কৃতিত্ব। ফিলাতভের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়েছে। আশা করা চলে, এমন দিন শীঘ্রই আসবে যেদিন রজনীর মতো জন্মান্থরা আধুনিক বিজ্ঞানের চিকিৎসাতেই চোখের দৃষ্টি লাভ করবে।

তবে এই মহতেই অশ্বকে চক্ষু-জ্ঞান করা না গেলেও পরোক্ষ উপায়ে অশ্বকে কিছুটা দৃষ্টি দেবার আয়োজন চলেছে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, অশ্বের জন্যে নতুন ধরনের এক যষ্টি, যার সাহায্যে পরিবেশের হাদিশ পাওয়া যাবে এবং প্রতিবন্ধক সম্পর্কে আগে থেকেই সাবধান হওয়া চলবে।

বোঝাই যাচ্ছে, এই যষ্টি এক যন্ত্র-বিশেষ। আলো বা শব্দতরঙ্গের সাহায্যে এই যন্ত্র পথের হাদিশ সংগ্রহ করবে।

শব্দতরঙ্গের সাহায্য নিয়ে যে সব যন্ত্র তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে তার মূলনীতির প্রয়োগ অন্যত্র আগে থেকেই ছিল। যন্ত্রের সময়ে জলের নিচের অদৃশ্য ভুবোজাহাজের হাদিশ পাবার জন্যে শব্দতরঙ্গ পাঠানো হত। ভুবোজাহাজের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সেই শব্দতরঙ্গ ফিরে এলেই বোঝা যেত যে শব্দতরঙ্গের গতিপথে প্রতিবন্ধক রয়েছে। তারপরে নানা ধরনের হিসেব ও মাপ-জোখের মধ্যে দিয়ে প্রতিবন্ধকটির অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেওয়াও অসম্ভব নয়। সাম্প্রতিক কালে জলের নিচে মাছের ঝাঁকের অস্তিত্ব টের পাবার জন্যেও এই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগের একটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে প্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের আরো অনেক সব আশ্চর্য প্রয়োগ সম্ভব হবে।

এ-প্রসঙ্গে আগের আলোচনায় আমরা বাদুড়ের কথা তুলেছিলাম। সকলেই জানেন যে বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তি প্রায় না-থাকার মতো। অনেকের ধারণা, বাদুড় একেবারেই অন্ধ। কিন্তু তবুও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে নিশ্চয় অন্ধকারে হাজার রকমের বাধা ও প্রতিবন্ধকের মধ্যে দিয়ে বাদুড় অতি অনায়াসেই পথ করে নিতে পারে। এমন কি বাদুড়ের চোখ পুরোপুরি অন্ধ করে দিয়েও দেখা গিয়েছে যে বাদুড় পুরোপুরি চক্ষু-জ্ঞানের মতোই উড়ে বেড়ায় ও পোকা-

মাকড় ধরে। বাদুড়ের এই আশ্চর্য ক্ষমতা লক্ষ্য করার পরেই বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছিলেন, যে-পদ্ধতিতে বাদুড় পথের হাদিশ পায় সেই একই পদ্ধতিতে অশ্ব মানুষের পক্ষেও পথের হাদিশ পাওয়া সম্ভব কিনা। এই উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞানীরা বাদুড়ের চালচলন খুঁটিয়ে পৰ্যবেক্ষণ করেছেন।

আগের আলোচনায় আমরা বলেছি, বাদুড় অতি-উচ্চমাত্রার ফ্রিকোয়েন্সির প্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের ডাক ছেড়ে পথের হাদিশ নিয়ে থাকে। কাজেই গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল যে প্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের যন্ত্র সম্বলিত একটি যষ্টি অশ্বের হাতে তুলে দিতে পারলেই আর কোনো চিন্তা নেই। ঘোর অন্ধকারেও বাদুড় যেমন অনায়াসে উড়তে পারে তেমনি প্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের যন্ত্র হাতে নিয়ে অশ্বরও ট্র্যাফিক-সমাকীর্ণ শহরের রাজপথে নিশ্চিন্ত হয়ে হাটিতে পারবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যাপারটা তেমন সরল নয়। কারণ, দেখা গেল, শব্দ প্রবণাতীত শব্দতরঙ্গই যদি বাদুড়ের একমাত্র সম্বল হয়ে থাকে, তাহলে তার পক্ষে এতখানি ক্ষিপ্ততা ও নিখুঁত লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা আরও করা সম্ভব নয়। কারণ, দেখা গেল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিবন্ধক, যা শব্দতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়েও ছোট, তাও বাদুড়ের কাছে গোপন থাকে না। আস্তো একটি ভুবোজাহাজ বা কোনো বহুৎ বস্তুকে খুঁজে পাওয়া শব্দতরঙ্গের পক্ষে কিছুই শক্ত কাজ নয়। কিন্তু একটি আণুবীক্ষণিক বিন্দুসদৃশ পোকের হাদিশ পেতেও যখন কিছুমাত্র ভুলচুক হয় না—তখন নিশ্চয়ই ধরে নিতে হয় যে ব্যাপারটি জটিলতা-বর্জিত নয়।

তাছাড়াও কথা আছে। বাদুড় যখন প্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের ডাক ছাড়ে তখন তার স্থায়ী হয় এক মিলি-সেকেন্ড (এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ) থেকে দশ মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত। শব্দতরঙ্গের বেগ যদি ধরা যায় সেকেন্ডে হাজার ফুট তাহলেও এই স্থায়ীকালের মধ্যেই শব্দতরঙ্গ এক ফুট থেকে দশ ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে, বাদুড় যতোকণ ধরে ডাক ছাড়ছে ততক্ষণের মধ্যেই—অর্থাৎ তার ডাক শেষ হবার আগেই—অন্তত পাঁচ ফুট পর্যন্ত দূরত্বের প্রতি-

বন্ধক থেকে শব্দতরঙ্গ বাদুড়ের কাছে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাদুড় একই স্বেগ ডাকও ছাড়ে আবার প্রতিধ্বনিও শোনে। এ অবস্থায় খুব কাছের জিনিসের হৃদিশ নেবার ব্যাপারে বাদুড়ের মধ্যে খানিকটা দিশেহারা ভাব আসা উচিত ছিল। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, এক মিলিমিটার ব্যাসের তারও যদি প্রতিবন্ধক হিসেবে সামনে খাড়া থাকে, আর বাদুড় যে ফ্রিকোয়েন্সিতে শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের ডাক ছাড়ে সেই একই ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রচণ্ড একটা সোরগোলও যদি বাদুড়ের কানের পর্দার ওপরে আছড়ে ফেলা হয়, তাহলেও বাদুড় অতি অনায়াসেই প্রতিবন্ধক এড়িয়ে যেতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রতিধ্বনি থেকে হৃদিশ নেবার ব্যাপারটা বিজ্ঞানীরা যান্ত্রিক উপায়ে যেভাবে সম্পন্ন করতে পারেন, আর সত্যিকারের একটি বাদুড় যেভাবে সম্পন্ন করে—এ দুয়ের মধ্যে খুবই পার্থক্য।

তবে অন্যদিক থেকেও বলার কথা থেকে যায়। ধরে নেওয়া গেল যে বাদুড় যতখানি দক্ষতার স্বেগ শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের প্রতিধ্বনিকে যাচাই করতে পারে, একটি যন্ত্রের সাহায্যেও তা করা যাচ্ছে। তাহলেই কি একজন অন্ধের সমস্ত প্রয়োজন মিটেবে? বিজ্ঞানীরা তা মনে করেন না।

বাদুড়ের একটি কান যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বাদুড় পথের হৃদিশ নিতে গিয়ে খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রতিধ্বনি যাচাই করতে গিয়ে বাদুড় তার দুটি কানকেই ব্যবহার করে থাকে। উড়বার সময়ে বাদুড়ের ডানাদুটি থাকে শ্রবণপথের একই সমতলে। তাছাড়া লক্ষ্য করা গিয়েছে যে ডান বা বাঁ দিক দিয়ে উড়ে যাওয়া পোকা ধরবার জন্যে বাদুড় অনেক সময়ে ডানা ব্যবহার করে থাকে। এ থেকে বোঝা যায় বাদুড়ের দিগ্‌নির্ণয় ও লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা কতখানি নির্ভুল।

কিন্তু বাদুড়ের পক্ষে একটি স্দুবিধের ব্যাপার হচ্ছে এই যে তার শরীরটি খুবই ছোট। কাজেই বাদুড়ের পক্ষে শরীরকে খুঁশিমতো নাড়াচাড়া করা এবং শরীরের যে-কোনো প্রত্যঙ্গকে খুঁশিমতো অবস্থানে নিয়ে আসা খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়।

মানুষের বেলায় তার মস্ত শরীরটাই দারুন একটা অস্দুবিধের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমতঃ মানুষ বাদুড়ের মতো ডানা মেলে আকাশে ওড়ে না। তাকে এই অসমান মাটির ওপরেই পা রেখে চলাফেরা করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ মানুষ বাদুড়ের মতো তার শরীরটাকে সটান মেলে দিতে পারে না, তাকে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বাদুড় যদি ফুট ছরেক দূর পর্যন্ত হৃদিশ রাখতে পারে তাহলেই বাদুড়ের আর উড়ে বেড়াতে বিশেষ কোনো অস্দুবিধ হয় না। কিন্তু মানুষের কাছে ছ'ফুট মানে বড়ো জোর তিনটি পদক্ষেপ। তাকে চলাফেরা করতে হয় আরো অনেক বিস্তৃত সীমানার হৃদিশ রেখে। আর শেষ কথাটা এই যে বাদুড় হচ্ছে বাদুড়। সে তার পরিবেশ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। কিন্তু মানুষের মনে তার পরিবেশ সম্পর্কে তীব্র একটা কৌতুহল। অন্ধকে পথের হৃদিশ দিতে হলেও এই কৌতুহলের কিছুটা নিবৃত্তি হওয়া দরকার। এই কারণেই শব্দ প্রতিবন্ধককে এড়িয়ে চলতে পারলেই অন্ধদের প্রয়োজন মেটে না। মানুষ বলেই তাদের জন্যে আরো কিছু চাই।

যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, অন্ধব্যক্তি যখন রাস্তা দিয়ে চলবেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই জানতে দিতে হবে যে রাস্তার দু-পাশে কী আছে—নদী না রেলিং না ঘোপবাড় না মাঠ-ময়দান? অন্তত এইটুকু খবর যদি অন্ধের কাছে পৌঁছতে পারা না যায় তবে যান্ত্রিক সহায়তার কোনো অর্থই হয় না। বলা-বাহুল্য, অন্ধের কাছে সমস্ত খবরই পৌঁছে দিতে হবে কানের মাধ্যমে। অর্থাৎ জগতের প্রত্যেকটি জিনিসের একটা শব্দগত ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হবে। কথাটা শুনতে যতোটা অসম্ভব মনে হচ্ছে আসলে তা নয়। ক্লাসিক গানের কান যাদের আছে তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে গানের সুরও নানা ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে। এমন কি অনেক সময়ে এই গানের সুরের ছবি মনকে এমনভাবে নাড়া দেয় যা চোখের দেখা ছবি পারে না।

প্রাণীজগতে, যতোদূর জানা গিয়েছে, শব্দের সাহায্যে ছবি গ্রহণ করার ক্ষমতা

বাদুড়েরই সবচেয়ে বেশি। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা এই স্তন্যপায়ী জীবটিকে এত খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, বাদুড় যখন শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের ডাক ছাড়ে তখন তার মধ্যে অনেকগুলো ফ্রিকোয়েন্সির মিশ্রণ থেকে যায়। সংখ্যার হিসেব দিয়ে বললে কথাটা আরো স্পষ্ট হবে। আমরা মনে করতে পারি, বাদুড় যখন ডাক ছাড়ে তখন সেই ডাকের শব্দতরঙ্গের মাপ বরাবরই ৫০ কিলোসাইক্লস্। এক্ষেত্রে শব্দতরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি অপরিবর্তিত। কিন্তু এমনও হতে পারে, শব্দতরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি ৮০ কিলোসাইক্লস্-এ শব্দ হয়ে ৪০ কিলোসাইক্লস্-এ নেমে আসছে। এক্ষেত্রে পুরো একটি ডাকের মধ্যে অনেকগুলো ফ্রিকোয়েন্সি এসে গেল। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এ-ধরনের মিশ্র শব্দতরঙ্গের সাহায্যে পরিবেশ সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা হওয়া সম্ভব।

এই ধারণা থেকে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞানীরা কয়েকটি যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে এসব যন্ত্রের কার্যকারিতা এতকালের নির্মিত অন্য সমস্ত যন্ত্রের চেয়ে উন্নততর ও ব্যাপকতর। কারণ এসব যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ প্রতিবন্ধকের অস্তিত্ব সম্পর্কেই ধারণা হয় না, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের মধ্যে পার্থক্যও টের পাওয়া যায়। অবশ্য এজন্যে যন্ত্র-ব্যবহারকারীর কিছুটা ট্রেনিং থাকা দরকার। অন্ধদের এমনিতেই শ্রবণশ্রুটি খুবই প্রখর। জন্মান্ধরা এমনিতেই শব্দের ভাষায় জগৎ সম্পর্কে একটি ছবি তৈরি করে নেয়। কাজেই এ-ধরনের একটি যন্ত্রের ট্রেনিং নেওয়া তাদের পক্ষে কিছু-মাত্র শক্ত ব্যাপার নয়। তারপরে এই যন্ত্রটির সাহায্যে তারা নিম্নে বৃদ্ধি নিতে পারবে, কোনটি দেওয়াল, কোনটি সিঁড়ি, কোনটি গাছ, কোনটি রেলিং, ইত্যাদি। তারপরে যন্ত্রটির আকার যদি ছোট হয় আর যন্ত্রটি দেখতে যদি সুন্দর হয়— তাহলে এই যন্ত্রটিকে নিয়ে অন্ধ শিশুরাও ছুটোছুটি খেলার মেতে উঠতে পারবে।

পৃথিবীর সব দেশেই কিছু সংখ্যক জন্মান্ধ আছে। তারপরে মহাযন্ত্রের সময়ে বেশ কিছু লোককে দৃষ্টিশক্তি হারাতে হয়েছে। অন্ধদের চক্ষুস্থান করা হবে এমন দাবি বিজ্ঞানীরা করছেন না।

কিন্তু অনেকখানি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন যে করে তোলা বাবে তার বাস্তব প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে।

৥ অদৃশ্য চশমা ॥

চোখের সামনে নাকের ওপরে একটা চশমা থাকারটা সব সময়েই একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। বিশেষ করে আমাদের দেশে গরমের সময়ে চশমা প্রায় একটা শারীরিক যন্ত্রণার সামিল। খেলোয়াড় বা পাইলটদের ক্ষেত্রে চশমার মতো অভিযাপ আর কিছু নেই।

চশমাধারীদের পক্ষে একটি আনন্দের সংবাদ এই যে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় অদৃশ্য চশমার প্রচলন হয়েছে। এই অদৃশ্য চশমাকে বলা হয় কর্নিয়াল লেন্স। এই লেন্স কর্নিয়া বা চক্ষুতরকার ওপরে পাতলা একটি পর্দার মতো লেগে থাকে। খুব অভিজ্ঞ চোখ না হলে এই লেন্সের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না, মনে হয় যেন স্বাভাবিক চোখ। এই

কারণেই এই লেন্সকে খবরের কাগজের ভাষায় বলা হয় অদৃশ্য চশমা।

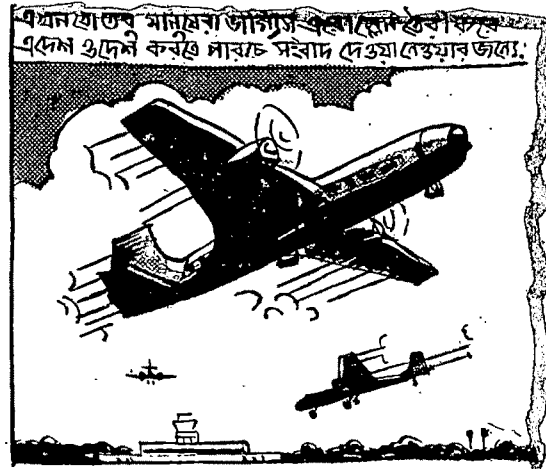
আমরা সাধারণত যে ফ্রেম-লাগানো চশমা ব্যবহার করি তার লেন্সের ব্যাস হয় প্রায় ২২ মিলিমিটার। আর এই কর্নিয়াল লেন্সের ব্যাস হয়ে থাকে ৯ থেকে ১১ মিলিমিটার। আর ওজনও হয় খুবই সামান্য—এক গ্রামের দশভাগের এক বা দুই ভাগ। এই সামান্য ওজনের জন্যেই অদৃশ্য চশমায় পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে খুব বেশি সময় লাগে না।

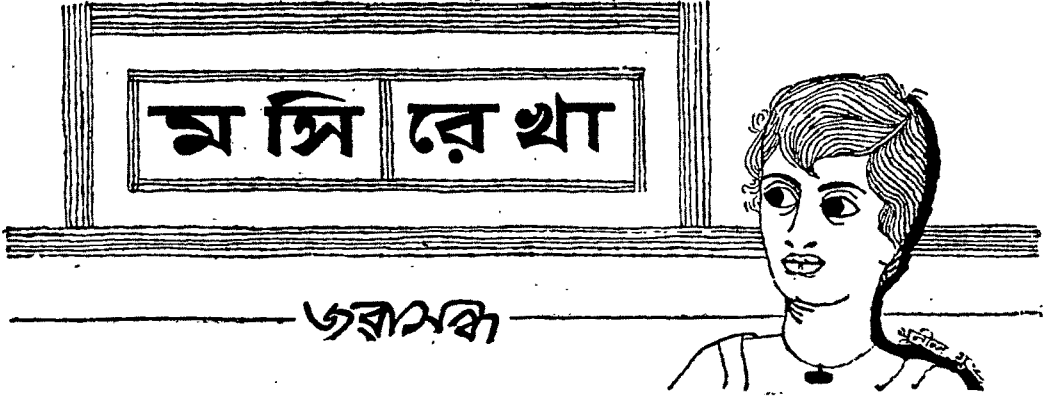
ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই অদৃশ্য চশমার প্রচলন খুবই বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ চশমার চেয়ে এই অদৃশ্য চশমা দৃষ্টিশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

দামের দিক থেকেও খুব একটা অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয়। সাধারণ চশমার যা খরচ তার ছ-গুণ বেশি খরচ করতে পারলেই এই অদৃশ্য চশমা নেওয়া

চলে। আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমলেই এই চশমার রোয়াজ শুরু হয়েছিল, তবে এখনো পর্যন্ত তেমন ব্যাপক হতে পারেনি। জার্মানির একটি প্রতিষ্ঠানের হিসেব থেকে দেখা যায় যে ১৯৫৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানে যতো লেন্স তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ মাত্র ছিল সাধারণ লেন্স, বাকি ৯৬ ভাগ কর্নিয়াল লেন্স।

তবে এই লেখাটি পড়ে অদৃশ্য চশমা সম্পর্কে যদি কেউ আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে একটি বিষয়ে সাবধান করার আছে। অদৃশ্য চশমায় চোখের ভাষা খানিকটা বেন চাপা পড়ে যায়, চোখের ঝিলিক ঠিকমতো যেন ফুটে বেরোয় না। কাজেই আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ এই যে চোখে ছানি পড়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত অদৃশ্য চশমা না পরাই ভালো। বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে, কারণ অদৃশ্য চশমায় চোখের কটাক্ষ ভোঁতা হয়ে যাবার সম্ভাবনা।





[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কেশবের নামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চীফ্ এবং দু-একজন পেটী অফিসার কিছুক্ষণ লাঠি আফালন করল। যাকে লক্ষ্য করে করল, সে একেবারে নির্বিকার, যেন কানেই শব্দই কী বলছে এরা। দু'ডালের ফাঁকে আর একটু ঘন হয়ে বসল। বাধ্য হয়ে অন্য পথ ধরল চীফ্। নরম সুরে বলল, এখনো যদি নামিস, কিছু বলবো না। দৌর করলে আর রক্ষা নেই।

এবারে গুটি গুটি নামতে শব্দ করল কেশব। মাটিতে পা দিতেই চীফ্ গর্জে উঠল, গাছে উঠেছিল কেন?

কোনো উত্তর নেই।

—বল, কি করছিল ওখানে?

কেশবের মাথাটা আরো খানিকটা নুয়ে পড়ল মাটির দিকে। পেটী অফিসারদের মধ্যে কে একজন বলল, পেয়ারা খাচ্ছিল, আর করবে কী?

—কোথায় পেয়ারা? এটা কি পেয়ারার সময় নাকি?

তাইতো। সকলেরই নজর পড়ল গাছ-গুলোর দিকে। নতুন পাতা গজিয়েছে। ফলের নাম-গন্ধও নেই।

চীফ্ আর একবার তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেও যখন জবাব পেল না, এগিয়ে এসে ঠাস করে চড় কসিয়ে দিল ওর গালের উপর। সঙ্গে সঙ্গে মূখের ভিতর থেকে সুড়ং করে বেরিয়ে এল একটা গোলগাল ভাঁশা পেয়ারা। ততক্ষণে আরো লোক, এসে জড়ো হয়েছে চারদিকে। সকলেই অবাক! এ সময়ে পেয়ারা খল কোথেকে!

—এ একটাই ছিল, ধুলোজড়ানো পেয়ারার দিকে করণ চোখ রেখে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল কেশব।

চীফ্ কোনো রকমে হাসি চেপে বলল, তা তো ছিল বুঝলাম। কিন্তু তোর এই রান্ধুসে খিদে মিটেবে কিসে. বলতে পারিস? এই না একবাটি চিড়ে গিলে এলি?

এর প্রায় বছর খানেক পরে চীফ্ অফিসারের এই প্রশ্নটা কেশব নিজেই একটু অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল তার বন্ধু দিলীপের কাছে—এত খাচ্ছি, তবু পেট ভরে না। কেন, বলতে পারিস? তখন দু'জনের খুব ভাব হয়ে গেছে। সৌদীন বর্ডসল স্কুলে একটা ছোটখাটো উৎসব লেগে গিয়েছিল। ছোট বড় সকলের চোখেই উত্তেজনা। কী ব্যাপার? না, বেগুনি হচ্ছে। জেলবাগানের বেগুন,—পালং শাক, শালগম আর মুলোর সঙ্গে ঘেঁটে যা দিয়ে রোজই একটা একই ধরণের কুম্বর্ণ রসায়ন তৈরী হয়ে থাকে, এবং যার চেহারা দেখেই অত-গুলো নাক একসঙ্গে কুঁচকে ওঠে,—তাকে আজ আলাদা করে বেসনে ভুবিয়ে ভাজা হবে। বেনলটাও বাড়তি নয়। যে ছোলার ডাল ওদের সপ্তাহে তিনদিন গলাধঃকরণ করতে হয়, এবং বহু কসরৎ করেও জলের সঙ্গে তার মিলন ঘটানো কিছুতেই সম্ভব হয় না, তারই খানিকটা করে কেটে রেখে জমিয়ে জমিয়ে আজ হামান দিস্তায় গুঁড়িয়ে বেসনে রূপ দেওয়া হয়েছে। তেলটাও রোজকার রেশন থেকে একটু একটু করে জমানো। অর্থাৎ সরকারের অতিরিক্ত খরচ কিছু নেই। তবু সমস্ত ব্যাপারটাই বে-আইনী। মাথা প্রতি চাল, ডাল তেল, নুন, মায় হলুদ-লঙ্কার বরাদ্দ সব রীধা আছে স্কুল-কোড-এ, এবং তার এক চুল এদিক ওদিক করবার ক্ষমতা সুপারকে দেওয়া হয়নি। প্রাত্যহিক রেশন সেইদিনই খরচ করতে হবে, তার

কোনো অংশ জমিয়ে রাখা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। খাদ্যবস্তুর স্কেল যারা তৈরী করেছিলেন, তাঁরা তো আর খেয়াল খুঁশি মত যা হোক একটা দাঁড় করাননি, প্রতিটি জিনিসের খাদ্যমূল্য কষে, ক্যালরি হিসাব করে তবে তার পরিমাণ স্থির করেছেন। তারপর তাকে কোডিফাই অর্থাৎ আইনবদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে এদিক ওদিক করা শব্দ আইনভঙ্গ নয়, ক্যালরির তারতম্যের দরুণ ছেলেদের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটানো।

কিন্তু মিলিটারী সুপার মাঝে মাঝে আইন ও ক্যালরি—দুটোকেই অগ্রাহ্য করে চলে। কথা নেই বাতাল নেই হঠাৎ একদিন চীফ্ অফিসারকে ডেকে বললেন, আসছে রবিবার দিন নিম্নিক খাবে ছেলো-গুলো, প্রত্যেকে চারখানা করে।

‘যে আজ্ঞে, হুজুর’ বলে সেলাম করে চলে যায় চীফ্। হুকুমটা জানিয়ে দেয় ‘রেশন-স্টোর’এর কেরাণীবাবুকে। তার মুখে অন্ধকার নেমে আসে, এক-গাদা কাজ বেড়ে গেল। তার সঙ্গে একঝুড়ি হিসাব। অতটা করে আটা আর তেল কেটে রাখো রোজকার রেশন থেকে, আটার বদলে ইস, কর চাল, সেই পরিমাণ ‘বিহার ডায়েট’ অর্থাৎ যারা একবেলা ভাত, আরেকবেলা রুটি খায়, তাদের সংখ্যা কমিয়ে ‘বেংগল ডায়েট’ অর্থাৎ দু'বেলা অন্ত্রভাজীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দাও। বাড়তি চাল যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, আলাদা একজায়গায় নোট করে রাখো, চ’মাস পরে ‘রাইট অফফ’ করবেন সুপার। তেলের বেলাতেও খাতাপত্রে অমনি সব জটিল ডান দিক বাঁ দিকের ব্যাপার! এসব নির্দেশ আগে থেকেই দেওয়া আছে। পালন না করে উপায় নেই। ‘কাগজপত্র ঠিক রেখো’—সাবধান করে দিয়েছেন সাহেব। ‘অডিট যেন কিছু

ধরতে না পারে। আর যদি ধরে আমি তো আছি, তোমার কোনো ভয় নেই।’ তবু হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হয়। খেলালী হলেও প্রাণ আছে লোকটার, বৃকের পাটা আছে—নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে কেরাণীবাবুরা। এরকম ‘বস’ যাতে বিরত না হন, অবশ্যই দেখতে হবে।

খেলালী ‘বস’এর অত্যাচার যে কর্মীরাই ভোগ করে তাই নয়, কনষ্ট্রাক্টর-বাবুরাও বাদ যায় না।

ছেলেদের খারার ‘ফাইলে’ উপস্থিত থাকা সূপারের অবশ্য কর্তব্য নয়। কালে ভদ্রে এলেই চলে। কিন্তু ঘোষসাহেবের আলাদা নিয়ম। বিকাল বেলা আফিস নেই; তবু প্রায়ই এসে হাজির হন এবং সোজা চলে যান ‘ডাইনিং সের’এ। দুপুরে থাকেন তার চেয়েও বেশী। একদিন কিডিং প্যারেড থেকে ট্রিকের ডেপুটিকে ডেকে বললেন, বাঁধাকপিটা বস্ত্র একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটা খদলান।

—এ সময়ে বাগানে তো আর কিছু নেই, গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন সন্তোষ-বাবু।

এ ব্যাপারেও সরকারী বিধিনিষেধ রয়েছে। বাগানের তরকারী হান্দন না শেষ হচ্ছে, কিংবা ঘাঁটিত পড়ছে। ততদিন উপরওয়ালারা বাইরে থেকে এক ছটাকও কিনবার অনুমতি দেবেন না। এ নিয়ে হেড অফিসের সঙ্গে অনেক অপ্রিয় চিঠি চলাচল হয়ে গেছে, সুপার বোকাবার চেষ্টা করেছেন, অনেক সময় জেল-বাগানে কেবল এক কি দু রকমের সবজি পড়ে থাকে, যদিও পরিমাণের দিক দিয়ে প্রচুর। কিন্তু তাকে খাদ্যবস্তুর রূপ দিতে হলে তার সঙ্গে অন্য দু’চারটা তরকারী মেশাতে হয়। মানুষের বিশেষ করে এইসব ছোট মানুষের, রসনা বৈচিত্র্য-পিয়াসী। বলা বাহুল্য এসব হাস্যকর যুক্তি উপর মহলে পাত্তা পায়নি। সরকারী অর্থের অবস্থা অপব্যয়ে তাঁরা রাজী হননি।

ডেপুটির জবাব শুনে ঘোষসাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে বললেন, বিষ্টকে দেখলাম যেন গেটে। ডাকুন তো।

বিষ্ট সরকার একজন কনষ্ট্রাক্টর। ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়াল সাহেবের সামনে। কী একটা লিখছিলেন। লিখতে লিখতেই বললেন, কাল এক মণ আলু দিও তো বিষ্টকে।

বিষ্ট আকাশ থেকে পড়ল। চুপ, আলকাতরা আর নারকেল দাঁড়র ঠিকাদার সে। আলুর কনট্রাক্ট অন্য লোকের। জোড়হাত করে বলল, আজ্ঞে, হুজুর, আলু তো আমার নয়। ওটা বোধহয় ভুবন শা পেয়েছে।

—জানি। তোমাকে দুমণ চুণের অর্ডার দিচ্ছি। তার বদলে এক মণ আলু দেবে।

বিষ্ট প্রমাদ গণল। চুক্তি অনুসারে সে বাধ্য নয়। কিন্তু এ ব্যক্তিটির সামনে সেকথা বলবার সাহস কারো নেই। আমতা আমতা করে, মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, দুমণ চুণের দামে কি একমণ আলু হয়, হুজুর?

—খুব হয়। কিছু না হয় খসালে ট্যাক থেকে। কতগুলো বাপ-তাড়ানো, মা-খেদানো ছেলের জন্যে। ওদের কল্যাণেই তো করে খাচ্ছে।

বিষ্ট নমস্কার করে চলে গেল। ডেপুটি ব্যাপারটা বুঝলেন না। সাহেব বুঝিয়ে দিলেন, অর্ডার যাবে চুণের, গেট বই এবং স্টক বৃকে লেখা হবে চুণ, তারই দাম পাবে কনট্রাক্টর। আসলে আসবে একমণ আলু, তা দিয়ে তৈরী হবে আলুর দম।

—কিন্তু এটা কি রীতিমত ইররেগুলার নয়, সার? বিস্ময়ের সুরে কিঞ্চিৎ উম্মার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন ডেপুটি সুপার।

—হ্যাঁ, ইররেগুলার বৈকি? অত্যন্ত সহজভাবে, লেখা থেকে চোখ না সরিয়েই তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন ঘোষ-সাহেব।

ডেপুটি কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, তা ছাড়া আমার মনে হয়, এইসব স্পেশাল ফুড খাইয়ে ছেলেগুলোকে আমরা বিগড়ে দিচ্ছি।

এবার মুখ তুললেন সুপার। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন তার ডেপুটির মুখের দিকে। তারপর বললেন, আপনার কটি ছেলে-মেয়ে, সন্তোষবাবু?

—তিনটি?

—কত বয়স তাদের?

—বড়টির বোল, ছোট ছেলেটা সাত বছরের।

—তাদের কি রোজ রোজ একই জিনিস খেতে দেন?

সন্তোষবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে সাহেব বললেন, আপনি হয়তো জানেন না। আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, দেন না। আপনার এই সামান্য আয়ের মধ্যেই তাঁকে ওদের জন্যে আজ এটা কাল ওটার ব্যবস্থা করতে হয়। তা না হলে ওরা খায় না, ফেলে ছাড়িয়ে উঠে যায়। মনে রাখবেন, আমরা যাদের নিয়ে আছি, তারাও ঐ বয়সী ছেলে। ভাগ্যদোষে জেলে এসেছে বলে স্বভাবটা পালটে যায়নি, যেতে পারে না।

চীফ্‌ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বেগুনি ভাজাচ্ছে। কিচেনের ছেলেরা তো আছেই, আরো কতগুলো ফালতু ছেলেও ভিড় করেছে চারপাশে। কিচেন-এলাকার পেটী অফিসার মাঝে মাঝে বেটন উঁচু করে তাড়া করতেই পালিয়ে যাচ্ছে, আবার এক-পা দু-পা করে এগিয়ে এসে জড়ো হচ্ছে উনুনের ধারে। ভাজা বেগুনির পাহারায় রয়েছে জনকয়েক “স্টার বয়”। হঠাৎ তাদের একজন চিৎকার করে উঠল, “এই, নিল, নিল! ঐ যে যাচ্ছে।” এক পাল ছেলে ধর ধর করতে করতে ছুটে গিয়ে বমাল চেপে ধরল চোরকে। কেশব সিকদার। গোটা একটা বেগুনি তার মুখের মধ্যে, আর একটা হাতে। চারদিক থেকে শব্দ হল চড় চাপড়, কীল ঘুঘু, তার সঙ্গে মুঠি খুলে চোরাই মাল ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা। সে কি সহজে ছাড়তে চায়? দু’তিনজনে মিলে অতিকণ্টে যখন উদ্ধার করা হল, সেটা আর খাবার মত নেই, খেঁতলে চেপে টুকরো হয়ে গেছে। মুখের খানা অবশ্য সে নষ্ট হতে দেয়নি। ধন্দাধন্দিতর মধ্যেই কোঁচ করে গিলে ফেলেছে।

চীফ্‌-এর হুকুম মত একজন পেটী অফিসার কেশবের কান ধরে সেল্‌-এ নিয়ে বন্দ করল। সে বেলার মত খাওয়াও বন্দ। ‘যেমন নোলা হতভাগার; থাক খানিকটা উপোস করে’—রায় দিল চীফ্‌ অফিসার। ছেলেরাও অনেকে সম্মত করল, ঠিক হয়েছে। খেয়ে খেয়ে কুমড়া হয়েছে, তবু লোভ দ্যাখ না?

জনাপ্রতি দুখানা করে বেগুনি। দিল্লীপের পাতে পড়তেই সে এদিক ওদিক তাকিয়ে চট করে তুলে নিয়ে কোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। আশে-পাশে যারা বসেছিল, তাদের ঝুপ ঝুপ দৃষ্টি তখন পড়ে আছে পরিবেশনের বড়ির দিকে। কে জানে যদি

বেঁচে যায়, আরেকখানা করে জুটে যেতে পারে।

খাওয়া শেষ করে উঠবার সময় হৈটে হল্পার মধ্যে বেগুনি দুখানা কোল থেকে পকেটে চালান করাটাও বিশেষ কঠিন হল না। শীতের দিন। খাবার পরে বেশীর ভাগ ছেলে যখন মাঠের দিকে রোদ পোহাতে গেল, সকলের অলক্ষ্যে দিলীপ চলল সেল-এর দিকে। সেখানে

উঠান, চুকবার মুখে কাঠের দরজা। সেটা খোলা ছিল। তারই ভিতর দিয়ে দিলীপ নিঃসাড় পা টিপে টিপে গরাদে দেওয়া গেটের ফাঁক দিয়ে ফিস ফিস করে ডাকল কেশো.....! হাতদুটো জড়ো করে তার উপর মাথা রেখে ঠান্ডা মেঝেতে উপড় হয়ে শুয়ে ছিল কেশব। ডাক শুনে খড়মড় করে উঠে বসল। চোখের কোল বেয়ে নেমে আসা দুটো জলের

হাতটা তুলতে গিয়ে হঠাৎ সামলে নিয়ে বলল, না, ভাই, ওটা তোর; তুই খা।

—যাঃ, আমার কেন হবে? সে তো আমি তখনি খেয়ে নিয়েছি। এ দুটো তোর জন্যে এনেছি।

—সত্যি বলছিস?

—বা রে! মিথ্যে বলতে যাবো কেন?

—কি করে আনলি?

—সে সব তোকে ভাবতে হবে না। নে ধর। চট করে খেয়ে ফ্যাল। আবার কে এসে পড়বে।

কেশব আর আপত্তি করল না। বেগুনি দুটো নিয়েই মুখে পুরে দিল। চিবোতে চিবোতে বলল, খুব ভালো হয়েছে, না রে?

দিলীপ জবাব দিল না; অবাধ হয়ে ওর মুখের পানে তাকিয়ে রইল। অমৃতও বোধহয় এমন করে কেউ খায় না। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে অনুযোগের সুরে বলল, আচ্ছা, তুই হঠাৎ ঝড়িতে হাত দিতে গেলি কেন বল ত? খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, বাহাদুরকে বললেই হত। সে তো তোকে কত জিনিস এনে দেয়।

—ও সব কি আর তখন মনে ছিল? গরম গরম বেগুনি! দেখে এমন লোভ লেগে গেল—! কি জানিস ভাই, প্রাণটা আমার সব সময় খালি খাই খাই করে। কি জানি কেন?

বলে খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে কেমন একটা উদাস করুণ সুরে বলল, কতদিন যে পেট ভরে খেতে পাইনি। কিছুর খেতে দিত না লোকটা।

—কোন লোকটা? কার কথা বলছিস?

—সেই আমার বাবাটা। আবার কে?

দিলীপ চমকে উঠল। বাবা সম্বন্ধে এভাবে কেউ কথা বলতে পারে, সে স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারে না। নিজের বাপকে সে দেখিনি বললেই হয়, মার মুখে যতটুকু শুনেছে, তার থেকেই একটা গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জড়িয়ে আছে তার মনের মধ্যে। কখনো তাঁর উল্লেখ করতে গেলে সেই সুরটাই বোরিয়ে আসে। বাবার স্মৃতি জেগে উঠতেই হঠাৎ মাকে মনে পড়ে গেল। হয়তো সেই থেকেই বোরিয়ে এল প্রশ্নটা, তোর মা? তিনি কিছুর বলতেন না?

—থাকলে তো বলবে। সে তো সেই কবে মরে ভূত হয়ে গেছে।



“এই, নিল নিল। ঐ যে যাচ্ছে।”

একজন পেটী অফিসারের পাহারায় থাকবার কথা। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। সেল-রকের সামনেই কতগুলো কাঁঠাল গাছের জটলা। দুপুরবেলাতেও অন্ধকার মত। শীতের দিনে ভীষণ ঠান্ডা। হয়তো সেইজন্যই সিপাই সেখানে নেই, ওদিকের মাঠের ধারে খোলা জায়গায় রোদে বসে আরাম করছে। সেল-এর সামনে একটুখানি পাঁচিল-ঘেরা

ধারা তখনো ভাল করে শুকায়নি। তার উপরে ফুটে উঠল এক ঝলক হাসি। ছুটে এসে বন্ধ গরাদের ওপাশে দাঁড়িয়ে বলল, তোদের খাওয়া হয়ে গ্যাছে?

দিলীপ পকেট থেকে বেগুনি দুটো তুলে নিয়ে শিকের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, এই নে।

কেশবের চোখ দুটো চকচক করে উঠল, মুখেও জল এসে গেল। ডান

আরেকবার হেসে উঠল কেশব। কিন্তু দিলীপের কানে সেটা শোনাল ঠিক কান্নার মত।

এর কিছুদিন পরে, একদিন বিকাল-বেলা খেলার ঘণ্টা পড়তেই অন্য ছেলেরা যখন 'ভলিবল' নিয়ে বাস্তু, ওরা দুজন সকলের অলঙ্কো সরে গিয়ে উত্তর দিকের পাঁচিলের ধারে একটা নিরালা কোণ বেছে নিয়ে বসে পড়ল। কেশব সেদিন কি কারণে বকুনি খেয়েছিল 'লোহা-মাগটারের' কাছে। মনটা ভাল ছিল না। হয়তো তার থেকেই বর্জ্যে ঢুকবার আগের দিনগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল। সমবাসী বন্ধুর কাছে আপনা হতেই বেরিয়ে পড়েছিল সব কথা, যা সে কোন-দিন কাউকে বলেনি। এ যেন তার স্বগতোক্তি, এমনিভাবে ধীরে ধীরে বলেছিল, "মা কবে মরে গেছে আমার কিছু মনে নেই। বাবা নাকি রাত্তিরবেলা মদ খেয়ে এসে লাথি মেরেছিল পেটের ওপর। সে সব আমি কিছু জানি না; পটলার মার কাছে শুনছি। তাকে আমি মাসি বলতাম। তার কাছে খেতাম, শুতাম। তারপর একটু বড় হতেই বাবা এসে নিয়ে গেল। দুজনে সে কী ঝগড়া! মাসি আমাকে যেতে দেবে না, বাবাও ছাড়বে না। তারপর কারা সব এসে পড়ল এদিক ওদিক থেকে। আরো অনেকক্ষণ চেঁচামিচি হল। শেষটায় দেখলাম মাসি বসে বসে কাঁদছে, আর বাবা আমার নড়া ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। আমার একটুও যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাবার যা রাগ, আর যে রকম গম্ভীর মত দেখতে; ভয়ে কিছু বলতে পারিনি।"

তারপর থেকেই শূন্য হল তার জীবনের দুঃখের ইতিহাস। একটি একটি করে কেশব তার সব অধ্যায়গুলো খুলে বলেছিল বন্ধুর কাছে। প্রথম থেকেই না খেতে দেবার পালা। অথচ, বাবার অবস্থা খারাপ ছিল না, বেশ সচ্ছলই বলা চলে। কোন একটা বসন্ততে একটা খোলার ঘরে তারা থাকত। সকালে উঠেই একটা করে পয়সা পেত কেশব, মর্দি খাবার জন্যে। এক পয়সার মর্দিতে তার পেট ভরত না। একদিন বলেছিল, আর একটা পয়সা দাও না বাবা? বাবা এমন তেড়ে উঠেছিল যে আর কোনোদিন আর কিছু চাইতে সাহস করেনি। বজার করে এসে নিজেই রাখত বাবা। রান্না হলে একটা কলাই-করা থালায় দশমুণ্ড ভাত, একটু ডাল কোনোদিন বা এতটুকু তরকারী দিয়ে বসিয়ে দিত তাকে। আধ-

পেটাও নয়। চোঁছে মূছে শেষ কণাটুকু পর্যন্ত খেয়ে বসে থাকত, যদি আর দুটো ভাত দেয়। বাবা ধমক দিয়ে উঠিয়ে দিত। তারপর মস্ত বড় এক থালা ভাত আর বাটি ভর্তি ডাল তরকারী নিয়ে এক ঘণ্টা ধরে বসে বসে খেত। খেয়েই শূন্যে পড়ত। উঠত সেই সন্ধ্যার মুখে। রাতে রান্নার পাট ছিল না। নটার সময় ছেলের হাতে চারটা পয়সা ধরিয়ে দিবে বেরিয়ে যেত। এই ছিল রোজকার রুটিন। কোথায় যেত, কেশব তখনো জানত না। বেরোবার আগে কোমরে একখানা ছোরা গজে নিত, আর গায়ে একটা চাদর। অনেক রাত পর্যন্ত খিদের জ্বালায় ছটকট করতে করতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ত কেশব। তার বাবা যখন ফিরত, তখন ভোর হয়ে গেছে।

তারপর একদিন এই নৈশ অভ্যাসের রহস্য আর তার কাছে গোপন রইল না। শূন্য যে জানল তা নয়, যোগও দিতে হল বাবার সঙ্গে। তখন সে আরো খানিকটা বড় হয়েছে, কিন্তু সে শূন্য মাথায়। রোগা পাকাটে চেহারা; পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট গোনা যায়। তার উপরে বেশ খানিকটা তেল মেখে ছোট্ট একটা জ্যাঙিয়া পরে প্রায় রাতেই বেরোতে হত। হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে যেত কোনো কোনো দিন। তারপর, রাত যখন গভীর, কোনো একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত তার বাবা। শূন্য বাড়িটা নয়, তার আশপাশ, সামনে পিছনের রাস্তা সব ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে দেখে ফিস ফিস করে বলত, জ্যাঙিয়া খুলে আমার কাঁধে ওঠ। কাঁধে চড়ে পাঁচিলের উপর উঠে বন্ধ দরজার চৌকাঠ রেখে নেমে গিয়ে ওপাশ থেকে খিল খুলে দিত। বাবা ঢুকত পা টিপে টিপে। খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঘরে দেখত ঘরের ভিতরটা। কখনো উঠে যেত দোতলায়। তারপর যে ঘরে ঢুকতে হবে তার জানলার শিক ধরে বেরিয়ে দেবার চেষ্টা করত। কোনোদিন শূন্য হাতে, কিন্তু বেশীর ভাগ দিন একটা মোটা কাঠির সঙ্গে দাঁড় বেঁধে আস্তে আস্তে চাড়া দিতে থাকত। দুটো শিকের মাঝখানের ফাঁকটা একটু বেড়ে যেতেই ভালোকে বলত ঢুকে পড়। কেশব সত্যি ঢুকতে পারত না। পিঠের চামড়া উঠে যেত, কখনো বা মাথাটা গলত না। ঠেলাঠেলি কবে সেই শীর্ণ দেহটাকে ভিতরে ঢালিয়ে দিতে দিতে চাপা গলার দাঁত ক্রমাগত করে বলত তার বাবা, দিন দিন খাসী হচ্ছে হারামজাদা। কাস থেকে কিল্প খেতে দেবো না; শূন্য জল খেয়ে থাকবি।

ঘরে ঢুকেই কেশবের প্রথম কাজ ছিল দরজাটা খুলে দেওয়া। এতটুকু শব্দ না হয়, ঘরে বারা ঘুমিয়ে আছে, তারা না টের পায়। তাহলেই মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে বাবা। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বাপ ঢুকে পড়ত, আর ছেলের উপর নির্দেশ ছিল সদর দরজার কপাটের আড়ালে লুকিয়ে থাকা, যতক্ষণ সে কাজ সেরে না ফেরে।

সবদিন সুবিধা হত না। আয়োজন-পর্বের মাঝখানেই কোনো এক সময়ে জেগে উঠত কেউ না কেউ। তখন প্রাণ-পণে পালাতে হত। আবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে বিনা বাধায় মনের মত কাজ হাঁসিল হয়ে যেত। হাতের কাজে যা পেত হাতিয়ে নিয়ে আসত ওর বাপ—ঘড়ি, কলম, সোনার বোতামসমেত সিলেকের জামা, দামী শাড়ি, টাকা ভর্তি মানিব্যাগ এবং ঐ জাতীয় খুচরো মাল। বাক্স-পাটরা বা অন্য কোনো ভারী জিনিসে হাত দিত না। একবার একটা স্টেকেস সমেত রাস্তায় বেরিয়ে প্রায় ধরা পড়েছিল পুলিশের হাতে। তাড়াতাড়ি ফেলে রেখে বাপ-বেটায় দে ছুট।

গৃহস্থের হাতেও একবার ধরা পড়েছিল কেশব। পাঁচিল ডিঙিয়ে সদর দরজা খুলতেই একজন ঘণ্ডায়তন হিন্দুস্থানী ছুটে এসে তার একটা হাত চেপে ধরেছিল। রাখতে পারেনি। পিছলে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেদিন বর্ষাভিল, তেল মাখা নিয়ে বাবা এত খিট খিট করত কেন। ঐ তেলই সেবার বাঁচিয়েছিল তাকে। কিন্তু এর পরের বার আর কাজে লাগল না।

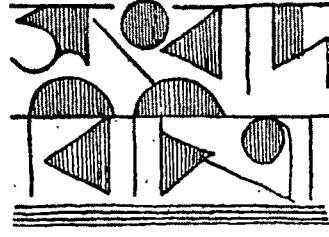
একতলার ঘর। গরাদেগুলো মোটা মোটা। অনেক চেপ্টা করেও বাঁকানো যাচ্ছিল না। কাঠির সঙ্গে লেগে বোধহয় একটু শব্দ হয়ে থাকবে। একজন মেয়ে-ছেলে হঠাৎ চোঁচিয়ে উঠল—চোর। চোর! কাঠি আর দড়ি ফেলে বাবা এক লাফে উঠোন পেরিয়ে উধাও হয়ে গেল কেশব পারল না। সে-ও ছুটেছিল উদ্ভ্রম্বাসে। কিন্তু গেট পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই মাথাটা ঘুরে উঠল। সে রাতে প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি। 'মোটা' হয়ে যাচ্ছে বলে রোজকার সেই সামান্য বরাদ্দ থেকেও খানিকটা কমিয়ে দিয়েছিল তার বাপ। ছুটেতে গিয়ে পা দুটো বেন জড়িয়ে গেল। বসে পড়ল দরজার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে শূন্য হল এলো-পাতলা চাদ চাপড়। সে পর্বটা কতক্ষণ বলেছিল, কেশব ঠিক জানতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। যখন জ্ঞান হল, দেখল একটা কান্না অচেনা জারগায় বোঁপের উপর শূন্য আছে। পনে জেনেছিল, সেটা থানা।

(ক্রমশঃ)

॥ একটি অতিকায় বাজার ॥

যে সমস্ত বাজারের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেগুলি খুবই পুরনো ধরনের। ইউরোপের অতিকায় বাজারগুলি আমাদের চোখে এখনও বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। আমাদের দেশের আধুনিক ধরনের বাজার তৈরীর আগে এ সমস্ত বিদেশী বাজারগুলি থেকে অনেক কিছু শিখার আছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের বাইরে দু'লক্ষ বর্গমিটার জায়গার ওপর নির্মিত হচ্ছে ইউরোপের সব্ববৃহৎ অতিকায় বাজার। এটি নির্মাণে জমির জন্য মোট ব্যয় হবে এক কোটি মার্ক এবং নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ মার্ক। সম্প্রতি বুলডোজারগুলি তার জন্য জমি নির্মাণের কাজ শুরু করেছে এবং ১৯৬৩ সালে এর নির্মাণকর্ম শেষ হবে। অবশ্য কতৃপক্ষকে প্রাথমিক অবস্থায় অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এমন কি সাধারণতন্ত্রী জার্মানীর পালার্মেন্টে পর্যন্ত পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা হয়। এরকম একটি বৃহৎ বাজার নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগেই পরিচালকগণ দু'বছর ধরে পশ্চিম জার্মানীর বাজারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। যে কোম্পানী বাজারটি তৈরী করছেন তাঁরা পরিচালনাগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে এই দোকান ভাড়া দেওয়া হবে। দোকান ভাড়া দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে বত অনুরোধ এসেছে তার সংখ্যা বাজারের দোকান সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে থাকবে ১২০০০ বর্গমিটার জায়গার ওপর একটা নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দোকান। দুটি বড় কাপড়ের দোকান (৪০০০ ব. মী.), একটি ছোট ধরনের বাজার (১০০০ ব. মী.), বিপুল আকারের মদ্যখানা (৩০০০০ ব. মী.), একটি ছোট ডিপার্টমেন্ট স্টোর (২০০০ ব. মী.)। পোস্ট অফিস, খেলার জায়গা, চুল কাটার ও হেয়ার ড্রেসারের দোকান, ক্রীনারের দোকান, বেস্তেরা, পেট্রল পাম্প এবং বিবিধ বিষয়ের ৫০টি খুচরা দোকান। মোটরগাড়ী থেকে চুলের কাটা পর্যন্ত টুকটাকি জিনিস পাওয়া যাবে। শিশুদের জন্য একটি কিন্ডার গার্টেন থাকবে—যাতে শিশুদের রেখে বাবা-মায়েরা নিশ্চিন্ত মনে বাজার করতে পারেন। বেশীর ভাগ খরিশদারগণের মোটরকে করে আসবার সম্ভাবনা থাকায় একটি পার্কিংগের জায়গা করা হয়েছে, যেখানে একসঙ্গে ১৫০০ মোটরগাড়ী রাখা চলেবে। নির্মাণকর্ম শেষ হওয়ার পর এই অতিকায় বাজারে ২৫০০ থেকে ৩০০০ লোক নিযুক্ত হবে। আমেরিকার মতো এখানকার ডিপার্টমেন্ট স্টোর ও অন্যান্য দোকানের পাশের ফুটপাথগুলিরও ছাদ থাকবে। ফলে ভবিষ্যতে

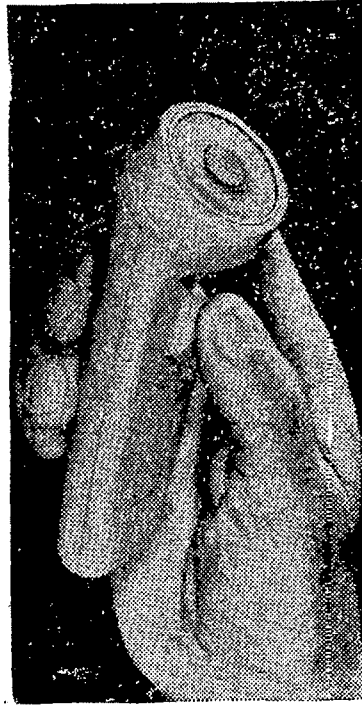


ক্রেতাগণ বর্ষাকালেও নিশ্চিন্তমনে কেনাকাটা করতে পারবেন।

॥ কৃত্রিম কণ্টনালী ॥

বেল সিস্টেম অব দি আমেরিকান টেলিফোন এন্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানী নামক একটি বৃহত্তম যৌথ প্রাক্টিসান ট্রানজিস্টার চালিত কৃত্রিম ইলেকট্রনিক কণ্টনালী তৈরী করেছেন। এর ফলে পৃথিবীর হাজার হাজার বাকশব্দহীন মানুষ আবার কথা বলতে পারবে। এই মহৎ মানবিক কাজে নিউইয়র্কের বাকশব্দ ব্যাধি চিকিৎসালয়ের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

এ প্রচেষ্টার শব্দ সূচনা হয় ১৯২৫ সালে—বেল টেলিফোন কোম্পানীর



কৃত্রিম কণ্টনালীর নমুনা

কর্তৃত্বাধীনে। ১৮৫৯ সালে ভিয়েনার ডাক্তার জোহান নেপোস্টক জার্মান কৃত্রিম কণ্টনালী তৈরির যে পদ্ধতি বর্ণনা করে গিয়েছিলেন তার দ্বারা কয়েক রকম কণ্টনালী তৈরী করা হয়। কিন্তু সেগুলি উপযুক্ত বলে বিবেচিত না হওয়ায় শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসকগণ দীর্ঘ পরিশ্রমের পর মাত্র ৪৫ ডব্লুমার মূল্যের এই কণ্টনালীটি আবিষ্কার করেছেন। যন্ত্রটির

ওজন ৭ আউন্স। ব্যাটারি দিয়ে চালাতে হয়।

নারী ও পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। কথা বলবার প্রয়োজন হলে যন্ত্রটিকে কণ্টনালীর সঙ্গে চেপে ধরতে হবে। কণ্টনালীর মাধ্যমে উদ্ভূত কম্পন কথারূপে প্রকাশ পাবে। শব্দ জোর এবং কম করারও ব্যবস্থা আছে। আমেরিকায় কণ্টনালীশীল লোকের সংখ্যা ২৫ হাজার কণ্টনালী ক্রয়িতগণ জোরের সংখ্যাও প্রচুর। তারা এবার কথা বলবার সাযোগ্য পাবেন। বেল কোম্পানী যন্ত্রটি সমগ্র মানব সমাজের উপকারের জন্য ব্যবহারে উদগ্রীব। তাই তাঁরা কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যয় নিয়ে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে যন্ত্রটি বিক্রি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

॥ পুরনো প্রেম ॥

পঞ্চাশ বছর আগের কথা। শ্রীমতী ল্যাভিনিয়া বেয়ার্ড তাঁর স্বামী টম বেয়ার্ডের সঙ্গে যখন বিবাহ বন্ধন করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল ৪৩ এবং টমের ছিল ৪৯।

এতদিন বাদে শ্রীমতী বেয়ার্ডের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে ছেলোক দেখবার জন্য। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রান্তর স্বামী-গৃহে ছেলেকে দেখতে গিয়ে পুরনো দিনের কথা তার মনে পড়ল। সেই সঙ্গে টমেরও। স্মৃতিচর্চায় তাদের মন ভরে গেল। দুজন যেন ফিরে গেলেন তাদের অতীত জীবনে। সেখান থেকে ফেটেই ফিরতে চাইলেন না। 'পারিতল করা' বিষয়ে এতদিন পর আবার জোড়া লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীমতী বেয়ার্ড থাকেন ইংল্যান্ডের ইমকসায়ারে তাঁর নিজের বাড়ীতে। কিছুকালের মধ্যেই কালসবাদে তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠান উদযাপিত হওয়ার পর তাঁরা সকলে ইংল্যান্ড ছিটক সামলান। স্বামীর বয়স নিরানব্বই আর স্ত্রীর তিরানব্বই।

॥ নতুন ক্যামেরা ॥

গত ১৫ই জানুয়ারী থেকে ১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত লন্ডনে ফিজিক্যাল সোসাইটির বিশেষ প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ব্রিটিশ এটমিক এনার্জি অথরিটি প্রতি সেকেন্ডে ৮,০০০,০০০ চিত্র গ্রহণক্ষম একটি নতুন ধরনের ক্যামেরা প্রদর্শন করেন। এই অতি-উচ্চ-গতি-সম্পন্ন ক্যামেরাটি বাকশায়ারের অন্তর্গত অল্ডারম্যানস্টন-এর বিজ্ঞানগণ কর্তৃক যে অশ্রুততা থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্ট রপ্তরসের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটায় তার চিত্র গ্রহণের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে।

বাংলা নাটকে * * যাত্রার প্রভাব মহিষ রায় * *

বাংলা নাটকের ইতিহাসে দেখা যায় বাংলা নাটকের অনেকাংশ জুড়ে যাত্রার অপ্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। কেউ কেউ বলেন, ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বর্তমান বাংলা নাটকের সৃষ্টি হয়েছে; আবার অন্য দলের মতে বর্তমান নাটকের স্বরূপ নাট্যসাহিত্যেরই ক্রমবিকর্তনের ফলে সম্ভব হয়েছে। একজনের অভিমত অন্যজনের অভিমত দিয়ে ধামাচাপা দিলে কটুস্তির আর শেষ থাকবে না। তবে সম-কালীন রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রভাব এবং যুগচেতনার উপযোগী প্রকাশের মাধ্যমে যে নাটক সে সম্বন্ধে বিমত নেই।

আমাদের জাতীয় ধর্মোৎসব উপলক্ষ্যে নাট্যকান্ডিনয় হত এবং তার উদ্দেশ্যও ছিল দেবতার লীলা-মাহাত্ম্যের রূপায়ণ ও মূল্যায়ণ। সেই প্রাচীনতম উৎস থেকে প্রথম নাটকের সৃষ্টি ও পরবর্তীকালে এর কাহিনী, আঙ্গিক, কলাকৌশলের উন্নতি বর্তমান নাট্যসাহিত্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। সকল দেশেই এইরূপ ক্রমানুসারে উন্নতি ঘটে। কিন্তু বাংলা নাটকে এর আগমন পালাগান বা কীর্তনের মাধ্যমে। এইসব পালাগানের মূল গায়ক গান করবার সময় লীলাকাহিনীর মধ্য-চরিত্রগুলোর কথা ও ভাব আমাদের কথক-ঠাকুরদের মত উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী ও স্বর পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশ করতেন। প্রয়োজনবোধে আবার অনেক সময় চরিত্রোপযোগী মন্থোস ধারণও করতেন।

নাটকের তিনটি পর্যায়—নৃত্য, নৃত্য ও নাট্য। নৃত্য অর্থাৎ তাল-লয়প্রাপ্ত অঙ্গবিক্ষেপ মাত্র; নৃত্য অর্থাৎ হাবভাব-যুক্ত বিবিধ মূদ্রা সহযোগে মূক অভিনয়-করণ; পরিশেষে নাট্য অর্থাৎ নৃত্যগীত-সহ বাচিক ও সাঙ্গিক অভিনয়। প্রত্যেকটি পর্যায়ের ব্যক্তির সশরীরে অবস্থান ও প্রকাশকলায় নিয়োজিত থাকতে হয়।

হয়তো বা মানুষের অনুকরণপ্রবৃত্তি থেকে অভিনয়শিল্পের উৎপত্তি।

প্রাচীন বাংলার সকল সাহিত্যই যে অভিনয়ে সে প্রমাণ প্রাচীন রামায়ণ-গান, বৃন্দ-নাটক দানখন্ড নৃত্য, মনসার গান, ভাসান গান, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি। এই সকল গান শ্রুতমাত্র সুদূর-তাল-লয় সহ-যোগে গাওয়া হত না। জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে বহু পাত্র-পাত্রীর বিচিত্র ভূমিকা, ভূমিকার উপযোগী মন্থোস-ধারণ, নৃত্যগীত ইত্যাদির ব্যবহারও থাকতো।

কিন্তু এর দ্বারা কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না যে, সুসংবদ্ধ নাট্য-শৈলীর প্রেরণা এই সকল সাহিত্যের উৎস। পৌরাণিক কাহিনীকার ও রামায়ণ-মহাভারতের খন্ড-আখ্যান মধ্য-যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও রাম-সীতার ভাগ্যবিড়ম্বনা বা সত্যী বেহুলার মত স্বামীীর জন্যে শ্রুতমাত্র মর্মচ্ছেদী আত্ননাদ নাট্যকল্পনাকে উদ্ভূত করতে পারেনি। এখানে ভাবঘন মূহূর্ত-গুলোকে তুলে ধরা হয়, রস-রূপের ব্যাখ্যার প্রাবল্য দেখা যায়। এই মূহূর্তে পাত্র-পাত্রীর মন্থ দিয়ে দার্শনিকতা, মানসিক ব্যাখ্যা ও চিন্তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই যাত্রার নাটকে চরিত্র-বিকাশের কোনো অবকাশ প্রায় থাকে না। আপন গতিপথে যাত্রার নাটকের নায়ক-নায়িকার প্রকাশ। এদের জীবনের অভিজ্ঞতা বা ঘটনা-উদ্বেগ চরিত্রের উত্থান-পতন দিয়ে সংলাপ তৈরি হয় না। একটা নিরবচ্ছিন্ন ঘটনার দৃশ্যরূপ দেওয়াই যাত্রা-নাটকের প্রকৃতি। যাত্রা ঘটনার গতিতে আন পাত্র-পাত্রীর প্রকৃতির প্রতিবিম্ব, নাটক তখন পাত্র-পাত্রীর সংঘাতের মাঝখানে চরিত্র-আত্মপ্রকাশের রূপটা তুলে ধরে। স্বভাবতই সেখানে পরিণতির কোতুহল

ও ক্রমটান থাকে। যেখানে এসে বাস্তব বিশেষ চরিত্রের ওপর আঘাত—বিরুদ্ধ আঘাত হানছে সেখানে অন্তর্মন্দ, 'ক্রাইমেজ' সৃষ্টির কারণ ঘটছে। কিন্তু যাত্রার নাটকে একটা আবাহনকালের পরিণতি থাকে এবং যদিবা সংঘাত সৃষ্টির উপকরণ থাকে তথাপি তার মধ্যে 'যথা ধর্ম তথা জয়' ভাবের আত্মপ্রকাশই বেশী। একটা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যে যে আবিলতার সৃষ্টি হয়েছিল তার দূরীকরণই যেন এর প্রধান লক্ষ্য।

যাত্রার ভাব-ব্যাকুলতা ও দার্শনিকতা নাট্য-চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতি নয়। কৃষ্ণ, রাধা বা সখীদের ভাব-ব্যাকুলতা প্রকাশের মাঝখানে চরিত্রের ক্রমগতি লক্ষ্য করা যায় না। এখানে যাত্রাওয়ালার মানসিক সংস্কার ও মনোভাবের প্রকাশ পাত্র-পাত্রীর অন্তরে যতখানি কাজ করে পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব ভাবনা প্রকাশের অবকাশ ততখানি থাকে না। পাশ্চাত্যের নাটকের সঙ্গে আমাদের দেশীয় নাটকের পার্থক্য এখানে। পাশ্চাত্যের নাটকে চরিত্রের অন্তর্মন্দ ও চরিত্র-সৃষ্ট ঘটনার রূপটি প্রথম ও প্রধান।

যাত্রার প্রথম যুগে যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয়—পৌরাণিক ও অলৌকিক ঘটনার পরিবেশন। পরবর্তীকালে তাও বন্ধ হয়ে মহাকাব্যের দেবতুল্য চরিত্র বা ইতিহাস-প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ রাজা ও বীরগণের জীবনচরিত্র নিয়েই নাটক-রচনা আরম্ভ হয়। এই সমস্ত বিষয়বস্তুর লক্ষ্য ছিল নীতিশিক্ষা, উপদেশ, ধর্মভাবের উন্মোচন, দার্শনিকতা ও কাব্যগুণের প্রকাশ। তাই বহু পুরাতন ও জানা ঘটনার আত্মপ্রকাশে হয়তো নাটকের কোতুহল, ঘটনার চমৎকারিত্ব, চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা ইত্যাদি থাকে না। তথাপি সেই বহুজন পরিচিত কাহিনী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতো; আনন্দ, দৃষ্টি-বেদনায় সমবাসী, উপভোগ্য এবং একই দার্শনিকতার চর্চিতচর্চণ ভাবনা ও জ্ঞানের উন্মোচন। নিয়োজিত করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হত না। "The play was the thing" ছিল যাত্রার নাটকের আসল বস্তু। যাত্রার দৃশ্যকূল নাটকের রসে বার বার আকৃষ্ট

হয়ে যেতো। পুরাতন ভাবনার রোমন্থনে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। ভগবৎলীলা-মাহাত্ম্যে হয়তো তারা নতুন মানসিক খোরাক পাচ্ছে না, কিন্তু ঐ লীলারসের আবেগটুকু বিশ্বাসে ও অনুভবে বার বার দৃশ্যকাব্যের রূপায়ণে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতো। যাত্রার নাটকে সংগীতে বা সংগীতের গদ্য ব্যাখ্যা, বিবেকের প্রবেশ-প্রস্থান, পাপাত্মার পতন ও পুণ্যাত্মার জয়, জন্মান্তরবাদ, পরলোকের সুকল ইত্যাদিতে মানব নিজের বিশ্বাসের জগৎ-সংসার দেখতে পায়। আবার তাদের যে-জিনিষে বিশ্বাস করানো হয়েছে তার সমর্থনের সাড়া পাওয়াও কোনো কম কৌতূহল নয়। এমনি করে যাত্রার নাটক নাট্যসাহিত্যের জটিলতা, কৌতূহল ও ঘটনার চমৎকারিত্ব ছাড়াও জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ছিল।

যাত্রা-সাহিত্যে সমাপ্তির মধ্যে নাট্যবস্তুর এক অশুভ শৈলী চোখে পড়ে। সে হচ্ছে, যাত্রা-নাটকের পরিণতি বিরোগান্ত হোলেও, তার মধ্যে কোথায় এক অভূতপূর্ব ও মহান অর্থের আন্বাদ দর্শকমাত্রই অনুভব করে থাকেন। এখানে নাটকের স্ববিন্যাসপাতের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের শেষ নয়। পরিণতিতে মনের এমন এক জয়গা নাড়া দেওয়ার রীতি যাত্রা-নাটকে আছে, যার পরেও জীবনের এক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। অভিমন্ত্র্যবধ, রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ বা নিমাই-সন্ন্যাস ইত্যাদি যাত্রা-নাটকে দেখি—অভিমন্ত্র্য জয়দ্রথের ম্বারা নিহত হোলেও অভিমন্ত্র্যের সে-মৃত্যু মৃত্যু নয়, জীবনের লীলা যাত্রা; বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের বিচ্ছেদের কারণ অবতার-গ্রহণের জন্যে মর্তে নারায়ণের আবির্ভাব বা নিমাই-সন্ন্যাসে নিমাই-এর সন্ন্যাস গ্রহণের মাঝে বৃহত্তর জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাঁর সংসার ত্যাগ। বিচ্ছেদের মাঝে মিলনের এই সুরটি সত্যিই বড় অপূর্ব। বিচ্ছেদে মিলনের ইঙ্গিত বোধ হয় ভারতীয় চিন্তাধারার সংস্কার, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতির পরিচয়। অবশ্য এই আঙ্গিক সংস্কৃত নাটক থেকেই যাত্রাওয়ালারা গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে-যাত্রা, খুব বেশী দিনের কথা নয়, গণশিক্ষার বাহন ও ভগবৎপ্রেমের পরিবেশকরূপে আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় মুখপাত্র ছিল, তার পতনোদ্ভূত বা পতন ঘটল কেমন করে! আপাতদৃষ্টিতে যা মনে

হয়, তার মধ্যে রুচির পরিবর্তন অন্যতম। এই রুচির কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে যাত্রা-শৈলী যুগোপযোগী হতো নয়ই, উপরন্তু পদাবলীর যে উন্নত ভাবধারা ও দার্শনিকতা যাত্রা-নাটকের প্রাণস্বরূপ, পরবর্তীকালে সে ভাবপ্রেরণার অনুপস্থিতি এবং বৈষ্ণবের বিষয়ে যাত্রা-সাহিত্যে কুরূচি, ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতার প্রবেশ যাত্রা-নাটককে শিক্ষিত সমাজে হয়ে প্রতিপন্ন করে। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা-নাটকের নিদর্শন।

যদিও তৎকালীন শিক্ষিতশ্রেণী যাত্রার নাট্য-প্রয়োগরীতি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেনি বা কোনো সমর্থন জানায়নি, তবু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত থিয়েটারের নাটক খুব বেশী প্রসার লাভ করতে পারেনি। তাদের মনে তখন পাশ্চাত্য নাট্যরীতি এবং মঞ্চের ভাবধারা ও প্রভাব প্রকট। সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে থিয়েটারী নাটক অভিনয়াদি হোত। যাত্রা-নাটকের কুশ্রীতা চাকতে ও নাট্যবস্তুর আমদানীর জন্যে অবশ্য এই প্রচেষ্টা। থিয়েটারের জন্যে লেখা নাটক ‘রত্নাবলী’, ‘শর্মিস্তা’, ‘কৃষ্ণ-কুমারী’ প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের অভাবের দরুন তৎকালীন শিক্ষিত নাট্যানুরাগীগণ যাত্রা-নাটক অভিনয় করতে থাকে। যাত্রার নাটকে প্রধানতঃ সংগীতাংশের পরিমাণ বেশী থাকে। সেই সংগীতাংশ কমিয়ে সংলাপ ও নাট্যক্রিয়া বাড়িয়ে দিয়ে থিয়েটারী-নাটকে পরিবর্তন এমন কিছু শক্ত নয়।

এমনি করে বহুদিন পর্যন্ত আমাদের রঙ্গমঞ্চে যাত্রা ও থিয়েটারী নাটক পাশাপাশি অভিনয় হতে থাকে। যাত্রার নাটকে সংস্কার করতে গিয়ে হয়তো পাশ্চাত্যধারায় নাটকে মনো-বিশ্লেষণ ও মানসিক জটিলতার প্রবেশ ঘটান হল, কিন্তু আমাদের দর্শকগণ আজও পর্যন্ত নাটকে নাচ-গান, কৌতুকদৃশ্য, ভাঁড়-চারিত্রের উপস্থিতি, অদৃশ্য বিধাতার হস্তস্পর্শ কম-বেশী পছন্দ করেন। বস্তুতঃ আমাদের থিয়েটারের নাটক যে যাত্রারই পরিমার্জিত সংস্করণ, আজ পর্যন্ত গান, কৌতুকদৃশ্য ও দার্শনিক ভাবধারা বর্জন করতে না পারা তার অন্যতম কারণ।

পণ্ডিত-প্রবর ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা নাটকের আলোচনা

প্রসঙ্গে একবার বলেছেন—“অশ্বৈতবাদ-পুষ্টি, প্রীতি ও শান্ত রসে অভিযুক্ত বাঙালীর মনে মানবিক দ্বন্দ্ব ও চিন্ত-বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত কখনই চরম সত্যরূপে অনুভূত হয় নাই। এমন কি নাটকীয় ভাব-স্ফূরণ ও সংঘাত-তীব্রতার যে লীলাভূমি যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানেও নাটকীয়তার পরিপূর্ণ বিকাশ রসান্তর-পরিণতি লাভ করিতেছে। রাম-রাবণের যুদ্ধের মধ্যে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্শ ও নাটকীয় উত্তেজনা বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে তখন হঠাৎ কোথা হইতে ভক্তি-প্লাবন বাহিয়া নায়ক-প্রতিনায়কের মধ্যে উত্তপ্ত সম্পর্কটিকে ভক্ত-ভগবানের মধ্যবর্তী স্নেহ-প্রীতির উদ্বেলতার অভিযুক্ত করিয়াছে।”

বাংলা নাটকের অনেকাংশ জুড়ে যাত্রার অপত্যক্য প্রভাব যে আছে বাঙালীর জাতীয় চরিত্র ও মানসগঠন বিশ্লেষণে সে সত্য স্বতঃই প্রমাণ করে।

১৮৭৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে নাট্যকার মনোমোহনবাবু বলেছিলেন—“গান ছাড়া এদেশে নাট্য-ভিনয় হইতে পারে না। কথায় কথায় গান না দিয়া পরিমিত গান থাকা উচিত। কেননা দর্শকগণ গান ও ‘সং-রং-ঢং’ প্রদর্শন ভালবাসে।”

পরিপূর্ণ যাত্রা থেকে আংশিক পাশ্চাত্য নাট্যধারাটি তৎকালীন ‘বঙ্গ-দর্শন’ও সাদরচিত্তে গ্রহণ করেনি। পাশ্চাত্যের থিয়েটারী-নাটক প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ বলা হয়েছিল—“ইহাতে শামলা আছে, পেন্টলুন আছে, বস্তুতা আছে, চীৎকার আছে, পতন আছে, উত্থান আছে। ইহাতে দৌখবার জিনিস যথেষ্ট। পূর্বে লোকে যাত্রা শুনিত, এখন লোকে যাত্রা দেখে। তাহাতেই এই নূতন যাত্রাতে বেশভূষার এত জাঁক। সংগীত ও কাব্যরসের এত অভাব।”

বাংলা নাটকে যাত্রার এই যে প্রভাব, বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত পাশ্চাত্য নাটক ও নাট্যরসিকদের শত-চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারেনি ভাবতেও আনন্দ লাগে। অবশ্য এর ওঁচিয়া নিয়ে অন্য কথা তোলা যেতে পারে।

হিমালী

হিমসার

আয়ুর্বেদিক কেশতৈল ও

হিমসারিন সাবান

দিনের শুরুতেই হোক কি শেষেই হোক
হিমালী হিমসারিন সাবান দিয়ে স্নান করে
দেখুন—কি চমৎকার লাগে ! এতে গাত
চর্ম সজাগ হয়, গাত্রবর্ণ সতেজ হয় এবং
মনের তৃপ্তিবোধ ফিরে আসে ।
আর স্নানের শেষে—শীতল সুবাসিত
হিমালী হিমসার কেশতৈলে কেশের
জৌলুস আনে ।



পূর্ণাঙ্গ স্নানের সামগ্রী

হিমালী আইসেট লিঃ • কলিকাতা-২



(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নীতার চিঠি!

চিঠিখানা সামনের টেবিলে রাখে নিরুপম। যে টেবিলের দু'দিকে মৃদু-মৃদু বসে আছেন সূশোভন আর সূচিন্তা। সূচিন্তার সামনে একখানা খোলা বই। সূশোভনকে পড়ে শোনা-জ্বিলেন নাকি? তীব্র হয়ে ওঠে কি সূচিন্তার বড় ছেলের শান্ত দৃষ্টি!

নীতার চিঠি।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন সূচিন্তা, তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন। কিন্তু ততক্ষণে বন্ধুকে পড়েছেন সূশোভন। তুলে নিয়েছেন চিঠিটা। 'নীতার চিঠি! আমার কথা লিখেছে নীতা!'

চিঠি-ধরা হাতটা সূশোভনের কাঁপতে থাকে, বার কয়েক দ্রুতভঙ্গীতে চোখ বুলিয়ে হতাশভাবে মৃদু তুলে বলেন, 'এত সব কি লিখেছে নীতা! বুদ্ধিতে পারছি না।'

বুদ্ধিতে পারবেন এ আশা অবশ্য করেও নি কেউ।

সকাল বেলা খবরের কাগজখানা দেখতে পেলেই একবার চোখের সামনে মেলে ধরেন তিনি রোজই, কিন্তু একটু পরেই ফেলে রেখে কপালে হাত বুলোতে থাকেন আর বলেন, 'এত কথা কেন যে লেখে? মানে বোঝা যায় না!'

সূচিন্তা হেসে বলেন, 'কেন তোমার বুঝি মনে হয় সব বাজে কথা লেখা আছে?'

'বাজে কথা নয়?' উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন সূশোভন, 'পড়তে গেলে মাথার মধ্যে হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না?'

সূচিন্তা এক পলক তাকিয়ে দেখেন, দেখে বলেন, 'মাথার মধ্যে কী হচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়?'

'দেখতে পাওয়া যায় না? বাঃ বেশ বলেছ? দেখতে পাওয়া যায় না!'

'কই আমি তো দেখতে পাই না। তুমি পাও? দেখতে পাচ্ছ আমার মাথার মধ্যে এখন কী হচ্ছে?'

সূশোভন সহসা হাঁহা করে হেসে ওঠেন, হাসতে হাসতে মৃদু লাল করে বলেন, 'তোমার কথাগুলো ঠিক-পাগলের মত সূচিন্তা!'

ঘরের মধ্যে সূচিন্তার বড় ছেলের মৃদু লাল হয়ে ওঠে। তারপর ভুরু কুঁচকে ভাবতে থাকে—'হাঁহা করে হাসবার মত কী কথা লেখা আছে নীতার চিঠিতে? এই মাত্র তো নিরুপমও নীতার চিঠি পেয়েছে! সে চিঠি কি উল্লাসজনক?'

পড়া চিঠিটা আবার চোখের সামনে মেলে ধরে নিরুপম।

নীতা জানিয়েছে সাগরময়ের জ্ঞান ফিরিয়ে বটে, মৃত্যুর আশংকাও আর বোধ হয় নেই। কিন্তু ডাক্তাররা আশংকা করছেন পৃথিবী তার কাছে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ভরসা রাখছে না সাগরময়ের দৃষ্টিশক্তিকে

ফিরিয়ে আনতে পারবে। সবচেয়ে আশ্বাত লেগেছিল চোখে কপালে মাথায়।

একথাও জানিয়েছে নীতা, সাগরকে নাড়াচাড়া করার মত অবস্থা হলেই হয়তো তারা তাকে নিয়ে সাগরে ভাসবে। 'তারা' মানে নীতা আর সাগরের বন্ধু শিশির। যে বন্ধু এই দুর্ঘটনার সময় কেবলমাত্র বিহরণ থেকে একেবারে অন্তরঙ্গতায় এসে পৌঁছেছে। সাগর-ময়ের অবস্থার জন্যে সে কন্টিনেন্টাল টুরের প্রোগ্রাম-বর্জন করে নীতার সাহায্যকারী হয়ে সাগরকে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনবার সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছে। পড়ার মেয়াদ হয়ে গিয়েছিল শিশিরের, সেইটুকুই ভাগ্যের কথা।

এরপর সূশোভন সম্পর্কে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে নীতা, কী বলছেন ডাক্তার, কেমন হয়েছে অবস্থা, নীতার অনুপস্থিতিতে নতুন কোন বৈলক্ষণ দেখা গিয়েছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

নীতার অনুপস্থিতিতে!

নিরুপম ভাবলো, লক্ষণ যদি কারো বদল হয়ে থাকে তো সে ওই পাগল মানুষটার নয়, সুস্থ মানুষটার। সূচিন্তাই যেন বেপরোয়া হয়ে উঠছেন। নইলে রাত বারোটা পর্যন্ত রোগীকে ঘুম পাড়ান তিনি তার ঘরে মৃদু নীল জেরলে! ঘরে কেউ না থাকলে নাকি ঘুম আসে না সূশোভনের!

আগে বরং বিসদৃশ কোন ব্যাপার ঘটলে কিছুটা কৈফিয়তের মত দেবার চেষ্টা ছিল সূচিন্তার, ছেলেরা কান না

দিলেও সে চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখন?.....চিন্তার মাঝখানে আর একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল।

আবার হাহা করে হেসে উঠেছেন স্দশোভন। হাতুড়ির ঘায়ের মত সেই শব্দ! আর তার সঙ্গে মস্তিস্কের কোষে কোষে পিন্ ফোটান মত একটা যন্ত্রণা ঘটিয়ে মৃদু তীক্ষ্ণ আরও একটা হাসির ধ্বনি।

কিন্তু স্দশোভনের চিঠিতে কি স্টিফাই নীতা উল্লাসজনক কিছ্ লিখেছে? নইলে এত হাসবার কী হল?

না, নতুন কোন বাতী পাঠাননি নীতা, নিরুপমকে যা লিখেছে তাই। শুধু স্দশোভনকে জানিয়েছে 'আলাদা চিঠিতে বড়দাকে ডাক্তার পালিত সম্পর্কে' যা কিছ্ ব্যবস্থা, জানালাম। স্দশোভন চিঠিতেও তো সাগরময়ের দুর্ভাগ্যের বাতী!

কিন্তু সে চিঠি স্দশোভন পড়তে গেলে তো?

এক লাইন পড়তে না পড়তে অসহিষ্ণু স্দশোভন স্দশোভনের চিঠি পড়া হাতটা ধরে নাড়া দেন, কী হচ্ছে স্দশোভন? মনে মনে পড়ছ কেন? চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে পড়তে পার না? নীতার চিঠি তুমি মনে মনে পড়বে?

স্দশোভন মুখ তুলে বলেন, 'রোসো আমি আগে পড়ে নিই, তারপরে চোঁচিয়ে পড়বো।'

স্দশোভন ধৈর্য ধরার ভান করেছেন। অপেক্ষা করার ভঙ্গীতে দু'-চার পা পায়চারি করেছেন, কিন্তু সে তো মৃদুত মাত্র। পরক্ষণেই আবার স্দশোভনকে নাড়া দিয়েছেন, 'কী হল স্দশোভন! নীতার চিঠি তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়বে? মতলবটা কি তোমার?'

স্দশোভন আর একবার মিনতি জানিয়ে আর দু'-এক লাইন পড়েন কিন্তু হঠাৎ ফস্ করে চিঠিটা তাঁর হাত থেকে টেনে নেন স্দশোভন, নিয়ে মৃদোর মধ্যে পিষতে থাকেন।

'কী করছো! কী করছো!'

স্দশোভন ব্যস্ত হয়ে কেড়ে নিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পাগলের সঙ্গে কে পারে কাড়াকাড়ি করে জিততে?

স্দশোভন সহসা চেয়ার ডিঙিয়ে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে চিঠি ধরা

হাতটা উঁচু করে হা হা করে হেসে ওঠেন, 'কী? পারবে আমার সঙ্গে জোরে?'

'দোহাই স্দশোভন মূচড়ে ফেলো না, দাও আমাকে। পড়তে দাও। খবরের জন্যে হাঁ করে রয়েছে। পড়বো, চোঁচিয়ে পড়বো, দিয়ে দাও।'

মুখ উঁচু করে মাটিতে দাঁড়িয়ে মিনতি করতে থাকেন স্দশোভন। আর বোধ করি সেইটাই হয়ে ওঠে পাগলের কাছে পরম কৌতুককর। কৌতুকে উজ্জল পড়া মুখে হাতটা আরও উঁচু করেন স্দশোভন, পায়ের ভরটা সম্পূর্ণ বৃদ্ধো-আঙুলের ডগার ওপর রেখে, আর স্দশোভন চিঠির ভাবনা ছেড়ে স্দশোভনের জন্যই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। পড়ে যাবে স্দশোভন পড়ে যাবে। লক্ষ্মীটি নেমে

সহসা স্দশোভন অন্য চাল ধরেন। উদাস কণ্ঠে বলেন, 'বেশতো দিও না চিঠি। কী দরকার আমার নীতার চিঠি নিয়ে, না হয় পড়বোই না।'

চাল ব্যর্থ হয় না।

'পড়বোনা নেবনা' বলার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিখানা হাত থেকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে জোরে হেসে উঠে বলেন স্দশোভন, 'ঈস্ কী দরকার আমার! এতক্ষণ তবে চোঁচাচ্ছিলে যে? স্দশোভন তোমায় কী রকম দেখাচ্ছিল জানো? সেই কথামালার শৃংখলার ছবির মত। মুখ উঁচু করে বসে থেকে থেকে শেষটা কি না দ্রাক্ষাকল অতিশয় অম্ল! নেমে আসেন স্দশোভন বিপজ্জনক ঠাই থেকে।



স্দশোভন ব্যস্ত হয়ে কেড়ে নিতে চেষ্টা করেন।

এসো দোহাই তোমার। স্দশোভন তোমার পায়ে পড়ছি,' টেবিলের দুটো কোন্ চেপে ধরে উধ্বমুখে প্রায় কাণ্ডাতে থাকেন, আর তাতেই যেন আরও উল্লসিত হন স্দশোভন।

'কেমন আর নিয়ে নেবে নীতার চিঠি? মনে মনে পড়বে?'

চিঠিটা ততক্ষণে হাতে পেয়ে গেছেন স্দশোভন, তাই বোধ করি এ উপমায় হেসে ওঠেন, 'কথামালার গল্প-ছবি এখনো মনে আছে তোমার?'

'মনে থাকবে না? কথামালার গল্প আবার ভোলে নাকি কেউ? একদা এক

বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল—তোমার মনে নেই এ কথা?’

সুচিন্তা একটা গভীর অনামনস্ক দৃষ্টিতে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘আছে বৈকি! খুব মনে আছে।’ তারপর নিশ্বাস ফেলে বলেন, ‘আচ্ছা চিঠিটা একবার পড়তে দাও সুশোভন। তারপর তোমাকে বলছি কি লিখেছে নীতা। নীতার জন্যে তোমার ভাবনা হচ্ছে তো?’

‘ভাবনা হচ্ছেনা? আলবৎ ভাবনা হচ্ছে। নীতাকে আমি ভালবাসি জানো না।’

খানিকটা হেঁটে বেড়ান সুশোভন, তারপর সুচিন্তার কাছে এসে বলে ওঠেন, ‘সবটা আমাকে শোনাতে হবে বুঝলে সুচিন্তা। বাদ দিয়ে দিয়ে ফাঁকি দেবে না।’

সুচিন্তা কেমন একটু হেসে বলেন, ‘আমি তোমায় ফাঁকি দিই?’

সুশোভন সজোরে বলেন, ‘দাও বৈকি! খবরের কাগজ পড়ার সময় খালি তুমি বাদ দাও, ধরতে পারি না ভেবেছ?’

‘কি করে পারো?’

‘কি করে পারি মানে? পড়ার সময় আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকি না? তোমার চোখ কোথা থেকে কোথায় যায় দেখতে পাই না?’

সুচিন্তার কি ক্রমশঃই আগুন নিয়ে খেলার সাধ বাড়ছে? তাই বলেন, ফাঁকি দিই, সে কথা যদি ধরতে পারো তো বক না কেন?’

‘বকবো? তোমাকে বকবো? কী যে তুমি বল সুচিন্তা। তোমাকে বকলে আমার কান্না পাবে না?’

‘আমাকে বকলে তোমার কান্না পাবে?’

‘নিশ্চয় পাবে। কিন্তু ওই তো তুমি ফাঁকি দিচ্ছ সুচিন্তা। নীতার চিঠিটা পড়ছ না। পড়ে সবটা বল শীগুগির।’

কিন্তু সবটা কোথা থেকে বলবেন সুচিন্তা?

সবটা পড়তে পেলো তো?

কোন লাইনটাই কি ভাল করে পড়তে পারেন?

পড়া সম্ভব? যদি ভারী একটা মানদ্র চোয়ালের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বন্ধুকে পড়ে ওই একই চিঠি পড়তে চেষ্টা

করে গালে গলায় কানে তার উত্তপ্ত নিশ্বাসের তাপ লাগিয়ে লাগিয়ে।

পাগলের নিশ্বাস এত উত্তপ্ত হয় বুঝি? যার তাপে গালের চামড়া গলার চামড়া যেন পড়ে যেতে থাকে, কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে?

সুচিন্তার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া রক্ত এখনো এমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠবার মত উপাদান বহন করে তার ধারার মধ্যে?

আরও পিছনে নিঃশব্দে কখন ইন্দ্রনীল এসে দাঁড়িয়েছে টের পাননি সুচিন্তা, টের পেলেন সে যখন ঘুরে এসে সামনে দাঁড়াল।

পরিবেশের থেকে যেন হচ্ছে করেই চোখ ফিরিয়ে রেখে ইন্দ্রনীল কাটাকাপড়ের টুকরোর মত একটুকরো কথা ফেলে দিল, ‘একটা কথা বলার ছিল।’

সুচিন্তা মূখ্য তুললেন। বোধকারী শঙ্কিত হলেন।

কি না জানি কথা।

শঙ্কতেই বোধ করি আমল দিতে চাইলেন না সে কথাকে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ‘নীতার চিঠি এসেছে—’

চিঠিটা যে নীতার সে তো ইন্দ্রনীল দেখেই বুঝেছিল, কিন্তু ‘কি লিখেছে নীতা, কখন এল নীতার চিঠি? কী খবর তার ভাবী স্বামীর?’ এসব কথা রলবে কখন? বলবার সাধটাই বা থাকবে কি করে? যদি ইন্দ্রনীল এসে দেখে— অতএব ইন্দ্রনীল নীতার খবরের মত ব্যাপারটাকেও অবহেলা দেখিয়ে বলে, ‘তা তো দেখতেই পাচ্ছি।’

‘অবস্থাতো আর এক অদ্ভুত পরিণত হল। লিখেছে প্রাণের আশঙ্কা আর নেই মনে হয়, কিন্তু—’

‘সুচিন্তা!’ সুশোভন বিরক্ত স্বরে বলেন ‘চিঠিটা তুমি আমায় না বলে ওকে বলছ কেন?’

‘বাঃ ও শুনবে না নীতার খবর?’

‘না শুনবে না!’ সুশোভন সহসা সরে এসে একেবারে ইন্দ্রনীলের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, ‘ইয়ংম্যান! সুচিন্তার ছোট ছেলে। নীতার খবরে তোমার দরকার কি? বল বলতে হবে তোমায় কী দরকার?’

‘আমার কোন দরকার নেই। উদ্ভত-ভাবে বলে ইন্দ্রনীল।

‘দরকার নেই! তোমার—কোন দরকার নেই?’ প্রায় ধমকে ওঠেন সুশোভন, ‘নীতা একটা যে সে বাজে লোক? তাই তার খবরে কিছ্ এসে যায় না তোমার? জানো এতে নীতার অপমান হয়?’

ইন্দ্রনীল তীর সরে বলে ‘হোকনা একটু!’

‘হোকনা? হোকনা একটু? সুচিন্তা তোমার ছেলেদের বুদ্ধিতো ভাল নয়? তুমি শাসন কর না কেন বলতো?’

সুচিন্তা সহসা বলেন, ‘তুমি ঘরে চল সুশোভন।’

‘ঘরে যাব?’

‘হ্যাঁ। তোমাকে নীতার চিঠি পড়ে শোনাইগে চল।’

সুশোভনের পিঠে আলতো একটা হাত রেখে ইন্দ্রনীলের সামনে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন সুচিন্তা।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে ঠিকরে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রনীল।

কৃষ্ণার বাবার প্রস্তাবের কথা বলতে এসেছিল সে। বলতে এসেছিল আজ বিকেলে কৃষ্ণার বাবা-মা সুচিন্তার সঙ্গে দেখা করতে চান। বলা হ’ল না।

ভাবল এখন গিয়ে কী বলা যায় কৃষ্ণার বাবাকে?

অনেক নিষেধ তো করছিল সে আগেই। বলেছিল ‘মার কাছে গিয়ে তাঁর পুত্রের বিয়ের জন্যে আবেদন করতে যাওয়াটা একটা অর্থহীন বাহুলা কাঙ্ক্ষ হবে, ইন্দ্রনীলের মা এত বেশী উদার-পন্থী যে, ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে একথা শুনলেও বিস্মিত হবেন না, ক্ষুব্ধ হবেন না।’

তবু কৃষ্ণার বাবা গম্ভীর কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, ‘আবেদনের প্রশ্ন ওঠে না, তবে সাধারণ সৌজন্য বলে একটা কথা আছে।’

‘আমার মা সাধারণ নিয়মমাফিক সৌজন্য-সামাজিকতার ধার ধারেন না।’

কৃষ্ণার মা ফোড়ন কেটে উঠেছিলেন, ‘বুঝতে পারছি তোমার মা অসাধারণ, কিন্তু আমরা তো তা’ নই? আমাদের কাছে ‘লোকদৃশ্য’ বলে একটা কথা আছে। আমাদের কর্তব্য আমরা করে আসবো ব্যস।’

আর কি বলবে ইন্দ্রনীল?

তাই মাঝেই বলতে এসেছিল তাঁদের আগমনের অগ্রিম খবর। মনে করেছিল একটু অবহিত করিয়ে রাখবে মাকে।

কিন্তু তার ছিঁড়ল।

সুচিন্তার ওই চলে যাওয়ার ভঙ্গীর মধ্যে যেন এক দুঃসাহসিক সংকল্পের উদ্ভাস।

ইন্দ্রনীল কি ভাবী শ্বশুরকে গিয়ে বলবে, তার মাকে না জানিয়ে যদি বিয়ে দিতে রাজী থাকেন তাঁরা, তবেই বিয়ে হওয়া সম্ভব।

কিন্তু যে অহংকারী ভদ্রলোক! হয়তো বলে বসবেন, 'ঠিক আছে এমন একটা অদ্ভুত শর্ত' ভিন্ন যখন বিয়ে সম্ভব নয়, তখন বিয়েটাই বন্ধ থাক।'

অথচ সেকথা 'শুনলে কৃষ্ণা রুমালে চোখ ঘষবে, আর আড়াল পেলেই ইন্দ্রনীলের কাঁধে মুখ ঘষবে।

সুহসা মনে হয় ইন্দ্রনীলের কৃষ্ণার সঙ্গে যদি তার আলাপ না হতো।

কেন কে জানে, আলাপের শুরুর থেকেই কৃষ্ণা যেন ধরে নিয়েছিল ইন্দ্রনীল তার প্রেমে পড়ে বসে আছে। এই ধরনের বোকামীটা তরুণ পুরুষের কাছে কৌতুকপ্রদ। প্রথম প্রথম সে কৌতুক উপভোগ করতো তারপর এমনি করে নিজেকে যেন সে কথা বিশ্বাস করতে শুরুর করল।

কবে থেকে?

কখন থেকে?

সে কথা কে মনে রাখে? একটি সুন্দরী তরুণীর অবিরাম প্রেম নিবেদনের আকর্ষণ তরুণ বয়সের একটা ছেলেকে বিচলিত করে তোলে বৈ কি। আর এক্ষেত্রে তো আরোই। কারণ ইন্দ্রনীলের সাদা উন্মাদিত মন তখন যেন একটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নীতা সম্বন্ধে প্রেমের কথা সে ভাবেনি সত্যি, শূদ্র মণ্ড-হৃদয় নিয়ে তাকিয়ে দেখাছিল, তখনই একদিন টের পেল নীতার মন অনেক আগে থেকেই বন্ধক দেওয়া। বন্ধুর বিশ্বস্ততা নিয়ে নীতা সোজাসজিই এ গল্প করেছে ইন্দ্রনীলের কাছে। মাত্র ইন্দ্রনীলই দেখেছে সাগর পার থেকে চিঠি আসে নীতার।

মেয়েদের প্রতি যে মোহবোধ, সে জিনিসটা উঠল জেগে, অথচ নীতা সম্বন্ধে মনকে যে আর অগ্রসর হতে দেওয়া চলবে না, এমন একটা চেতনাও রইল সজাগ হয়ে। এমনি সময়ে এল কৃষ্ণা। ইন্দ্রনীল দেখল—নীতা যেন উঁচু আকাশের তারা! ওর হাসি, কথা,

উজ্জ্বলতা, উজ্জ্বলতা সেটাই ওর সবটা নয়। সেটা যেন ওর আচরণ মাত্র। ওকে বুঝি ঠিক বোঝা যাবে না কোনদিন। ইন্দ্রনীলের এত ক্ষমতা নেই। চিরকাল একটা 'না বোঝার' বোঝা বইতে পারে। ইন্দ্রনীলের পক্ষে কৃষ্ণার মত মেয়েই হয়তো ঠিক। যাকে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়, পড়ে আর পাঠ্যবস্তু নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয় না। সোজা সহজ কৃষ্ণার মধ্যেই আশ্রয় নিল ইন্দ্রনীলের সদ্যজাগ্রত আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু আজ।

আজ ইন্দ্রনীল ভাবছে যদি কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা না হতো! ভাবছে, যদি মেজদার মত পালাতে পারতাম।

হয়তো এমনিই হয়।

যে মেয়ে নিজে থেকে আত্মসমর্পণ করে বসে' সকল রহস্য হারায়, সে মেয়ে পুরুষের কাছে দুর্বল ভাব হয়ে দাঁড়ায়।

ভিক্ষা ভিক্ষা সব ঠাই—

তবে আর কোথা বাই? ভিখারিণী হ'ল যদি কমল-আসনা।'

পুরুষ কমল-আসনাকে পূজা করতে চায়, ভিখারিণীর আকৃতি বেশীদিন নয় না তার।

তার মন হতাশ হয়ে বলে, 'কুতর্থা' হইব আশে, গেলাম তোমার পাশে, তুমি এসে বসে আছ আমারই দুয়ারে।'

সহজে আয়ত্ত করতে পারার প্রথম দিকটা উন্মাদনাময়। পরিত্যক্ত হয় পৌরুষ। আত্ম অহমিকায় নিজেকে বিজয়ী ভেবে উল্লসিত হয় পুরুষ মন। কিন্তু সেই নিতান্ত সহজে জর করে ফেলা আয়ত্তাধীনকে অসহনীয় মনে করতে বেশী দিন লাগে না। কিন্তু উপায় নেই, উপায় নেই। যদি ধরা পড়ে যায় জয়লম্ব সম্পত্তি ধনের আঁটি নয়, ঘাসের বোঝা; তবুও মাথায় করে বইতে হবে। নইলে যে অপরের কাছে ধরা পড়ে যাবে নিজের অকিঞ্চিৎকরতা। হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই 'প্রেমে পড়ে বিয়ের' ভিতরের ইতিহাস এই।

পূর্বরাগ মধুর মদিরাময়! কারণ সে ভারহীন।

পূর্বরাগ বিভ্রান্তিকর, কারণ সেখানে একে অপরের কাছে মনোহর হবার সাধনায় সজাগ হয়ে থাকে।

কিন্তু সে মাদুর বিবাহের বন্ধনে বাঁধা পড়লেই মোহ হারাতে শুরুর করে। শূদ্র তো এদেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই সমাজ-কোলিনা আর অর্থ-কোলিনা ভিন্নতর চেহারায় সর্বত্র বিদ্যমান, কাজেই সেই 'কুলশীল' মনে প্রেমে না পড়তে পারলেই অভিভাবকের সহানুভূতি হতে বাঞ্ছিত হতেই হবে। আর

দাম্পত্যজীবনের ভারটা সম্পূর্ণ তুলে নিতে হবে নিজের কাঁধে।

এ ভার বোঝা না হয়ে ফুলের মত হালকা হয়ে উঠতে পারে এমন জীবন-সঙ্গিনী ক'জন নেই বা জেটে? কৃষ্ণার মত মেয়েই তো বেশী। তাই প্রেমের বিবাহেই বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা-ধিক্য।

তবু ইন্দ্রনীল হয়তো এখন থেকেই এমন কথা ভাবতে শুরুর করত না 'যদি কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা না হতো! শুরুর করত না যদি সে আজ বাড়ীর ছোট ছেলের সন্নিবিধে সুযোগটা পেতে পারত। মায়ের সাথে আর দাদাদের ব্যবস্থাপনার আহ্বাদে গোপালের মত শূদ্র টেপার পরে বেরিয়ে পড়াটাই যদি ওর আপাততের কর্তব্য হতো, তাহলে কৃষ্ণাকে পাওয়াটাই বেশ বড় পাওয়া বলে মনে হতো ইন্দ্রনীলের।

কিন্তু তাতো হচ্ছেনা ইন্দ্রনীলের ভাগ্য। এ পাওয়া ওর অনেকখানির বদলে। তাই ক্ষণে ক্ষণে মন অগ্রসর হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে কৃষ্ণার বাবা লোকটা সন্নিবিধের নয়, কৃষ্ণার মানেহাৎ সন্নিবিধাবাদী আর কৃষ্ণা ইন্দ্রনীলের পক্ষে মস্ত অসন্নিবিধের।

তবু এখন আর পিছিয়ে আসা চলে না।

আর পিছিয়ে 'আসবেই' বা কোথায়? মৃত বিবৃণ এক শবসাধনার শ্মশানে? অনুপম! কুটিরে জীবনের উত্তাপ কোথায়? স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সুললিত ছন্দ কোথায়? এই ছন্দহীন স্তব্ধ জীবন থেকে পালাতে চেয়েছে বলেই বুঝি ইন্দ্রনীল এত সহজে কৃষ্ণার কাছে ধরা দিয়েছে।

কিন্তু তার অন্তরালবর্তী মন গভীর নিশ্বাস ফেলে বলছে—'যদি কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা না হতো!' বলছে—'যদি মেজদার মত পালাতে পারতাম।'

অনেকদিন পরে আজ বাপকে মনে পড়ল ইন্দ্রনীলের। হয়তো অনুপম মিত্রের বেঁচে থাকলে তার ছোট ছেলের জীবন এত সমস্যাযুক্ত হতো না! না কি তিনিই আর এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে? কে জানে। তবু এখন এক সমস্যা তাকে বিব্রত করছে। এ সমস্যার কাছ থেকে পালাবার পথ নেই। কৃষ্ণার মা বাপ সুচিন্তার কাছে আসবেনই।

আর এলেই তো এ প্রশ্ন উঠবে সুশোভন কে? সুশোভন কেন?

কি করে ওঁদের এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করা যায় সে চিন্তা করতে করতেই ওঁরা এ বাড়ীতে এসে গেলেন। আর ইন্দ্রনীল কিছু ভেবে ঠিক করতে না পেরে 'বসুন আপনারা আমার একটু দর-

কার আছে—বলে চটপট পালালো, মার দিকে না তাকিয়ে। সুচিন্তা তাকিয়ে দেখলেন ছেলের গমন পথের দিকে।

ওরা বললেন, ‘আরো আগেই আপনার কাছে আসা উচিত ছিল। যাই হোক না হওয়ার চাইতে দেবীতে হওয়া ভাল, কি বলেন? কথাটা এই—আপনার ছোট ছেলোটিকে আমরা জামাই করে নিচ্ছি।’

সুচিন্তা কি চমকে উঠলেন?

আকস্মিকতার আঘাতে স্তম্ভ হয়ে গেলেন?

ঠিক বোঝা গেল না। সুচিন্তার সব কথা বোঝা যায় না। সুচিন্তা আপাত-দৃষ্টিতে অন্তত চমকালেন না, বরং একটুকরো হেসে বললেন, ‘করেই যখন নিচ্ছেন, তখন তো সব কথা মিটেই গেছে।’

কৃষ্ণার বাবা বোধ করি এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ইন্দ্রনীল যতই অবহিত করিয়ে রাখুক—ভেবেছিলেন ভদ্রমহিলা জ্বলে উঠবেন, ফোস্ করে উঠবেন। অথবা আহত হয়ে স্তম্ভ হয়ে যাবেন। সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেই তিনি ‘জামাই করতে চাই’, না বলে বলেছিলেন ‘জামাই করে নিচ্ছি।’

মানুষের হৃদয়-রহস্য বোঝা ভার।

কেন সুচিন্তাকে আহত করে আমোদ পাবার ইচ্ছে ভদ্রলোকের? সুচিন্তা কী তাঁর ক্ষতি করেছেন?

হয়তো তিনি নিজেকে সুস্কায় অপমানের জ্বালায় ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হচ্ছিলেন, সে জ্বালা কোথাও ছোবল হানবার জন্য ফুঁসে বেড়াচ্ছিল। আর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল ছোবল হানবার উপযুক্ত ক্ষেত্র অবশ্যই ইন্দ্রনীলের মা। যে নাকি তার অভিভাবক। ইন্দ্রনীলের মত একটা বেকার ছোকরার হাতে তাঁর মহামূল্যবান একমাত্র কন্যাকে তুলে দিতে হচ্ছে এ নিরুপায়তার জ্বালাতো কম নয়।

এ নিরুপায়তার মূল যে তাঁর নিজের ঘরেই, সে কথা বিস্মৃত হয়েছেন ভদ্রলোক, দায়ী করছেন লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটাকে। অতএব তার সঙ্গে তার মাকে।

সুচিন্তার কথায় ভদ্রলোক গম্ভীর হলেন।

গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘মিটে অবশ্য গেছেই তবে সৌজন্য হিসেবে একবার আপনাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করলাম বলেই—’

সুচিন্তা আবার হাসলেন, ‘শুনে খুশি হলাম।’

রূপসী কন্যার গরবে গুরবানী কৃষ্ণার মা খলে উঠলেন ‘আমার মেয়েকে অবশ্যই আপনি দেখেছেন! আপনার বাড়ীতেও এসেছে।’

সুচিন্তা বললেন, ‘দু’-তিনটি মেয়ে

তো আসতো মাঝে মাঝে, তেমন ভাল করে তাকিয়ে কোনদিন দেখিনি। ঠিক বুদ্ধিতে পারছিলাম কোনটি আপনার মেয়ে।’

কৃষ্ণার মা আরম্ভ মুখে বললেন ‘আপনার বাড়ীতে যদি কেউ আসে, আপনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন না?’

সুচিন্তা বিস্ময় প্রকাশ করলেন, ‘কী মুশ্কিল! দেখব না কেন, আমার কাছাকাছি এলে তো দেখতেই পেতাম। ছেলে-মেয়েদের বন্ধুরা কে কখন আসে যায়, সব সময় লক্ষ্য রাখি এত সময় কোথা? আর দরকারই বা কি?’

‘কী ধরনের বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আপনার ছেলেরা মিশছে, এ আপনি লক্ষ্য করা দরকার মনে করেন না?’

‘লাভ কি?’ সুচিন্তা বললেন, ‘ওদের সমস্ত গতিবিধির ওপর খবরদারি করে বেড়াই এমন সাধ্য তো নেই। আমার এই ছোট্ট বাড়ীর ছোট ঘর দু’খানা ওদের জীবনের কতটুকু?’

‘চমৎকার!’ কৃষ্ণার বাবা বলে ওঠেন বিদ্রুপে মুখ কুঁচকে, ‘আপনার মত এত উদার মা ঘরে ঘরে সৃষ্টি হলে দেশটা বিলেত হয়ে উঠতে বেশী দিন লাগবে না।

এই সরাসরি আক্রমণে সুচিন্তা বোধ করি সহসা বিমূঢ় হলেন, কিন্তু সে মূহুর্তের জন্যই। পরক্ষণেই হেসে উঠে বললেন, ‘ক্ষমপেছেন! তাই কখনও হয়? আপনারা নেই? বাঁধ দেবেন না?’

ভদ্রলোক তিস্ত স্বরে বলেন, ‘বাঁধ দিতে আর পারছি কোথা? সে ক্ষমতা থাকলে কি আর আমার একমাত্র মেয়েকে এইভাবে অপচয় হতে দিই? জাফিস্ ঘোষের ছেলের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করতে পারতাম আমি তা জানেন? অথচ—’

থেমে গেলেন ভদ্রলোক। আর থামলেন বলেই সুচিন্তা অমায়িক মুখে উত্তর দিলেন, ‘তা সত্যি! আমিও ভেবে একটু আশ্চর্য হচ্ছি, ‘অথচ’—আপনি কেন আমার ওই বাউন্ডুলে বেকার ছোট ছেলেটাকে জামাই করছেন!’

কৃষ্ণার মা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠেন, ‘কেন করছি, সেটুকু বোকবার মত ক্ষমতা অবশ্যই আপনার আছে?’

সুচিন্তা এবার গম্ভীর হলেন।

আর সেটা চাকবার চেষ্টাও করলেন না। গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, ‘তা হয়তো আছে। কিন্তু এটা বোকবার ক্ষমতা সত্যিই নেই, আপনার মেয়ে আপনার আয়ত্তের বাইরে, এ খবরটা ঘটা করে আমার কাছে এসে শোনাচ্ছেন কেন! সত্যিই ব্যাপারটায় বিস্ময় বোধ করছি।’

‘বোকামী হয়েছিল!’ কৃষ্ণার বাবা উঠে দাঁড়ান, রক্তস্বরে বলেন, ‘ভেবেছিলাম বিয়ের আগে একবার আপনাকে জানানো

একটা সাধারণ ভদ্রতা। দেখছি সেটা ভুল ভেবেছিলাম। আচ্ছা উঠি!’ হাত তুলে নমস্কারের একটা ভঙ্গী করেন ভদ্রলোক।

সুচিন্তাও তাই করেন সঙ্গে সঙ্গে।

এইবার কতী গিন্নীর চলে যাবারই কথা। কিন্তু কৃষ্ণার মায়ের বোধকরি এত তাড়াতাড়ি নাটকের যবনিকা পতনে মন ওঠে না। তাই তিনি উঠে দাঁড়িয়েও বলে বসেন, ‘আপনার বাড়ীতে অতিথি এলে একটু চায়ের অফার করার অভ্যাসও বোধকরি আপনার নেই?’

সুচিন্তা বোধকরি বর্মাবৃত হ’য়েই ছিলেন, তাই এ প্রশ্নেও বিচলিত হলেন না, শুধু প্রায় হাসিমুখে বললেন, ‘অতিথির আবির্ভাব আমার বাড়ী এত কম যে, কী অভ্যাস আছে কি নেই, মনে করতে পারছি না?’

‘যাবে তুমি?’

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক রুদ্ধ প্রশ্ন করেন। স্ত্রীও অবশ্য সন্মোহিত ভ্রূ-ভঙ্গীতে উত্তর দেন, ‘যাব না তো কি থাকতে এসেছি? যাচ্ছি!..... আচ্ছা আপনার একটি ছেলে হঠাৎ কোথায় যেন চলে গেছে শুনলাম!’

সুচিন্তা এ প্রশ্নের আঘাতও পরিপাক করে সহজভাবে বলেন, ‘বিদেশে চাকরী করতে যাওয়াটা খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা বলে মনে হয়েছে আপনার?’

চাকরী! শুনলাম তো না বলা কওয়া হঠাৎ—

সুচিন্তা হঠাৎ হেসে উঠে বলেন, ‘বাড়ীর ঝি চাকরের কাছে শুনে থাকবেন বোধ হয়? ওরা অমন মুখরোচক গল্প করে বেড়ায়।’

‘ঝি-চাকর’ শব্দটার মধ্যে যে অবহেলা নিহিত ছিল তাতে কৃষ্ণার মার ফর্সা মুখ লাল হয়ে ওঠে। ঝি-চাকরের সঙ্গে গল্প করা যে তাঁর পেশা নয়, সেই কথাটাই বোধকরি বলতে যান কিন্তু অকস্মাৎ এক বিপর্যয় ঘটে যায়।

ভিতর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সুশোভন বলে ওঠে, ‘এতক্ষণ ধরে ওই সব বাজে বাজে লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কী হচ্ছে তোমার সুচিন্তা! তাড়িয়ে দাও না ওদের।’

মূহুর্তকাল যেন ঘরের তিনটে মানুষই বিদ্যুতাহত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর সুচিন্তা শান্ত সুরে বলেন, ‘তুমি নেমে এলে কেন সুশোভন! ওপরে যাও।’

সুশোভনের এই নীচে নেমে আসাটা সত্যিই অভাবনীয়। নীচের তলার এই সাজানো-গোছানো বসবার ঘরটায় বোধকরি কোনদিনই পা পড়েনি সুশোভনের। রাস্তার দরজার সামনে থেকেই সিঁড়ি, সেইটাই শুধু পরিচিত হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

(ক্রমশঃ)

জার্মান নাটক :

অনুদ্রুতি ও অধ্যয়ন

নাটকের সঙ্গে কবিতার কোথায়, কতখানি যোগাযোগ এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনার সূত্রেপাত না-করেই বোধ হয় বলা যায় যে, নাটকের প্রতি কবিদের সহজাত আকর্ষণ। অনেক নাট্যকার যদি-বা কবিদের-কোনও সংগ্রহে থাকেননি, কম-কবিই নাটকের সংস্পর্শ একেবারে এড়িয়ে গেছেন। এমনকি ইংরাজ রোমান্টিক কবিদের অনেককেই নাটক-রচনার আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছিল। যদিও তাদের কবিতা-লেখার পূর্ণাঙ্গ রূপে ফাঁকির অবসর ছিল সামান্যই। তবে, নাটকের ভাষা উক্ত কবিদের কাছে যেহেতু কদাচই গদ্য হ'ত, নাটক-রচনা তাদের কাছে কাব্যচর্চারই নামান্তর ছিল, বললে ভুল হয় না। আর, ঠিক এই কারণেই বোধ হয় ইংরাজ রোমান্টিক কবিদের রচিত নাটকগুলিতে কাব্যের উপাদান সজোর ও উদার হয়ে অনেক ক্ষেত্রে নাটকে তার ভাবেদার বানিয়ে-ছিল। এমনভাবে যে, সেগুলি সার্থক রচনা হয়ে ওঠেনি। ওল্ডসওয়ার্থের 'দি বর্ডারস', কিংবা কীটসের 'ওথো দি গ্রেট' কিংবা এমনকি শেলির 'চিও' উল্লিখিত কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত হয় না। তাদের সাহিত্য-জীবনে মূল সম্পাদক কবিদের সাময়িক চিন্তা-বিচিন্তার সাক্ষ্য যেন এ নাটকগুলি। কিন্তু এই হিসাবে সমসাময়িক জার্মান কবিদের নাট্যপ্রেরণা স্পষ্টতঃ ইংরাজ কবিবর্গকে পরাস্ত করেছিল আন্তরিকতায় ও সম্পদে। অন্ততঃ দুইজন কবি তখন জার্মানিতে ছিলেন যাদের

ইউরোপীয় সাহিত্য সারিক্রম

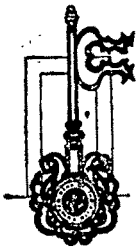
স্বার্থবাহ

মস্তিষ্ক ও কল্পনা, কাব্য-লক্ষ্যের কাছে বাঁধা থাকলেও, যথাযথ অভিনিবেশে নটরাজের ভজনা করতে দ্বিধা করেনি। যে অচ্ছেদ্য স্বরসাধনায় রতী ছিলেন গোয়তে ও শিলর তাতে কাব্য ও নাটক যেন সমান উচ্চারণে পরস্পরের সহকারিতায় পুষ্ট হয়েছিল। ঐ দুই মহাকাব্যের রচনার কোনওরূপ গোঁথতা না-লাভ করে নাটক যে-সরাসরি অগ্রগতির পথে পরিচালিত হয় তার মধ্যে নিঃসংশয়ে নিহিত ছিল উনিবিংশ তথা বিংশ শতাব্দীর জার্মান নাটকের অভ্যুত্থান।

গোয়তের মহাকাব্য 'ফাউস্ট' তাঁর মতেই 'একটি বিয়োগান্ত নাটক।' 'ফাউস্টের' নাট্য-কেন্দ্রিকতা সম্বন্ধে যদি কারও সন্দেহ জাগে তবে তাঁকে দেখতে বলি গোয়তের আঁকা 'ফাউস্ট'-বিষয়ক চিত্র : 'প্রলক ইম হিমেল' বা 'স্বর্গ-লোকে নান্দীপাঠ'। এই চিত্রে মেফিস্টোফেলস ও ঈশ্বরের দাঁড়ানর ভঙ্গীটিতে কী নিঃসম্বন্ধ মগ্ন-নির্দেশনার বৃদ্ধি প্রকাশিত। মগ্নের সম্মুখ ভাগে, পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, হাত-তুলে বস্ত্র

মেফিস্টোফেলস,—দূরে ব্যাকড্রপের লাগোয়া, মাঝখানে আবির্ভূত ঈশ্বর। অভিনয় রজনীর গন্ধ যেন চিত্রটিতে মাখানো! আর, এই 'ফাউস্টের' নাট্য-স্বরূপ নির্ধারণ করতেই বা নাট্যকার গোয়তের কতো দৃষ্টিচলতা ছিল। সে দৃষ্টিচলতা লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যায় নাটক নিয়ে কতোখানি মাথা ঘামাতেন গোয়তে। শুরুর দিকে 'ফাউস্ট' বিয়োগান্ত ও মিলনান্তের জগাখড়ির স্বাদ পেয়ে গোয়তে তাঁর বন্ধুবর মিলরের কাছে লেখা পত্রে নাটকটিকে বিদ্রোহী সংজ্ঞায় অভিহিত করেন 'গ্রাগেলাফ' বলে, যেন উক্ত রচনার গ্রীক 'ট্রাজেডির' ব্যুৎপত্তিগত 'গ্রাগস' বা 'ছাগলের' সঙ্গে অশোভন মিলন ঘটে-ছিল 'এলাফস' বা 'মূগের'!

গোয়তে-শিলর মারফত নাটকের এই উন্নতিসাধন যে যথেষ্ট শ্রী ও সামর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিল তার কারণ অবশ্যই কবিবর্গের ব্যক্তিগত প্রতিভা। তবে, এ প্রসঙ্গে অনুস্মেয় বোমানান যে, এই দুই কবিই যুরোপীয় নাট্য-বিদ্যার ঐতিহ্যে নিজেদের চিনে-নিতে পূর্ব-পুরুষদের স্মরণ করেছিলেন সচেতনভাবে। গোয়তে ও শিলর নাট্যকলার ব্যাকরণে গ্রীক আরিস্তোতিলিস ও নাট্য-সাহিত্যের বিকাশধারায় সেক্সপীয়র ও গ্রীক নাট্যকারদের অনুধাবন করে-ছিলেন। ফলে, যেমন গোয়তের পক্ষে 'গ্রাগোয়দিয়া' বা 'বিয়োগান্ত'র শৃঙ্খল রূপ সম্মানে 'ফাউস্টের' জন্য বছরের পর বছর পরিশ্রম করতে হয়, তেমন শিলরের নাটকে ব্যক্তি-চরিত্রের অনু-শীলনের পরিকল্পনা স্বার্থ নাটকের দাবীতে 'চরিত্র' ছেড়ে 'কর্ম' ও 'ঘটনার' মাধ্যমকে গ্রাহ্য করে। উপযুক্ত ক্ষমতা ও সাহসের পরিচয় দিয়ে গোয়তে স্মার্টরিপ-দেশের বিখ্যাত নাটক 'ইফিগেনেইয়া' ই এন তাউরয়স'-এর অষ্টাদশশতকী ভাষা 'ইফিগেনিয়া আউফ তাউরিস' রচনা করেন একই আখ্যান অবলম্বন করে এবং যেখানে গ্রীক নাট্যকার দ্রোণপ্রাণ-রক্ষায় ইফিগেনিয়া-কে চাতুরী ও মিথ্যা-ভাষণে উপনীত করেন, সেখানে গোয়তে তাঁর নায়িকাকে সত্যসন্ধ, মানবিক পথে কার্যসিদ্ধি করান ক্রাসিকল নাট্যবস্তুর এক সদৃশদেশ রূপান্তর ঘটিয়ে। স্বীকার করতে হয় যে, গ্রীক নাটকের পূর্জারিণী ইফিগেনিয়া ও রাজা থায়স উভয়েই গোয়তের ভাষায় তাদের মানবিকতা থেকে মুক্তি পেয়ে মহত্তর আয়তন লাভ করেন।



পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধির

সোনার কাঠি

বাক্তির কলাগ ও জাতীয় সমৃদ্ধি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এই কলাগ বা সমৃদ্ধি-সাধন একমাত্র পরিকল্পনাহীন প্রযত্নের দ্বারা স্বল্পকালে সম্ভবপর। এবং পরিকল্পনার সাক্ষ্য বহুলাংশে নির্ভর করে জাতীয় তথা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর। সুসংগঠিত ব্যাক্তির মারফত সঞ্চয় যেমন ব্যক্তিগত হৃদিত্তা দূর করে, তেমনি জাতীয় পরিকল্পনারও রসদ যোগায়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং ক্লাইভ হাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র গ্রাফ অফিস এবং পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে ক্রেসেন্ট মারফত

আপনার ব্যক্তিগত সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার গ্রহণে প্রস্তুত



নাট্য-শিল্পে সমাহৃত গায়তে ও শিল্প, স্বাভাবিকভাবেই, আঙ্গিক অপেক্ষা বস্তুর প্রতি অধিকতর উৎসাহ পোষণ করেছিলেন। বিশেষতঃ গায়তে। 'ফাউন্ট' যে অনেকাংশেই কবিতা, ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতা, দার্শনিক ভাষণ, আলাপ ও প্রলাপ এবং গায়তের আরেকটি নাটক 'তরকুয়াতো তাস্সা'-যে অনুদূরপ উদ্ভিবহুলতায় দৃষ্ট, একথা 'ইফিগেনিয়া আউক তাউরিস'-এর সার্থকতার পরও স্মর্তব্য। শিল্পের অবশ্য অপেক্ষাকৃত বেশী আঙ্গিক-সচেতন। নাট্যবস্তুর সম্বন্ধে শিল্পকে যেমন সচল মনে হয়, তেমন আঙ্গিক সম্বন্ধে বহুলাংশে অবহিত ও উৎসাহী। বিচিত্র বিকাশ শিল্পের নাট্য-প্রতিভার। তাঁর প্রথম নাটক 'কাবালে উলত লিবে' ('রহস্য ও প্রেম') সামাজিক-নাটকের এক নব্য প্রচেষ্টা। দস্তুরমতো কাব্য-নাট্য রচনা করেন শিল্পের তাঁর 'দোন কালোস'-এ। উক্ত নাটকের উপযোগী বস্তু যদিবা হিম্পানী উচ্ছলতা ও স্থান-কালের জন্যে শিল্পের দেশান্তরী। তাঁর তিন খণ্ডের প্রকাশ্য নাটক, 'ভালেস্তাইন'-এ খাঁটি স্বদেশী বিষয়বস্তুর দিকে পূর্ণ অবধান শিল্পের। সমানে ঐতিহাসিক, মন-স্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভাবনার পরিবেশে সৃষ্ট শিল্পের এই নাটক অনায়াসেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিবেচিত হতে পারে, যদিও তাঁর শেষ নাটক, 'ভিল-হেলম তেল'-কে সমালোচকেরা আরো সম্পন্ন ও নির্দোষ রচনা বলেছেন।

'ভিলহেলম তেল' একাধিক কারণে বিশিষ্ট। বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্যে নাটকটি ফরাসী বিপ্লবোত্তর মানবতাবাদের আদর্শে পরিপুষ্ট। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জন-জাগরণ ও বিপ্লবী নেতা, বীর ভিলহেলম তেল-এর শর-সম্বন্ধে প্রবল প্রতাপ গেসলরের জীবনাবসান এই নাটকের মূল বর্ণিত বিষয়। ঘটনা-বিন্যাসে ও সংলাপ-রচনায় শিল্পের নাট্যপ্রতিভা প্রকৃষ্ট প্রয়োগ এই নাটকে। দৃশ্য-পরিচ্ছন্নায়, পাত্রপাত্রী-সমাবেশে, নাট্য-গতিনিয়ন্ত্রণে শিল্পের স্বাচ্ছন্দ্য ও সংযমের এক বিরল সংযোগ ঘটিয়েছেন এই নাটকে। ভিনদেশী আবহাওয়া ধাতস্থ করতে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞান উত্তীর্ণ হয়ে শিল্পের সুইস জীবনের কোনও অন্তর্গত স্তরে দ্রুত-রূপে হাজির হয়েছিলেন তাঁর নাটকের রসদ জোগাড় করতে। নতুবা, কাব্যে যে অভিজাত তন্ময়তা শিল্পকে আগ্রহিত রেখেছিল, তার হেঁপাজত ডিঙিয়ে তাঁর

পক্ষে সম্ভব ছিল না সুইস গ্রামীণদের অমন মর্মস্পর্শী জীবনলেখ্য রচনা করা।

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যবাদী কুশাসনের কবল থেকে সুইস জনগণের গ্রাণকর্তা এই ভিলহেলম তেল সম্বন্ধে যদিও ইতিহাস অপেক্ষা জনশ্রুতির সাক্ষ্যই বেশী, তবু এক সময়ে তেল-এর চরিত্র অবলম্বনে মহাকাব্য লেখার জোর তাগিদ অনুভব করেছিলেন স্বয়ং গায়তে। অর্ধসভ্য তবু, মুক্তিকামী, বীর ভিলহেলম তেল গায়তেকে ব্যক্তি-চরিত্রের মহত্ব যে কতখানি বিচলিত করেছিল তা তিনি একেরমানের কাছে ব্যক্ত করেন এবং একাধিক পক্ষে শিল্পকেও জানান। বস্তুতঃ, অন্য কাজের তাড়ায় গায়তে যখন তেল-বৃত্তান্ত বিসর্জন দিতে বাধ্য হ'ন তখন শিল্পকে 'ভিলহেলম তেল' রচনার দায়িত্ব নিতে হয়। হাত বদল করে তেল-বৃত্তান্ত যে ভাষা লাভ করল, তাতে ধরা পড়ল প্রত্যক্ষভাবে শিল্পরীয় নাট্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য। শিল্প যে পশ্চাত্য নাটক লিখলেন তাতে 'ভিলহেলম তেল' নায়ক হ'লেও, নাটকটি গড়ে উঠল আরো অনেককে নিয়ে এবং তেল-এর ব্যক্তি-স্বরূপ অনুধাবনের গায়তীয় পন্থা ত্যাগ করে শিল্পের ঐ একক বীরকে ঘটনার বিচ্ছিন্নতা, ঘরোয়া তুচ্ছতা ও পাশ্চাত্যের মাঝখানে টেনে এনে তার নাট্যরূপ অনুসন্ধান করলেন। তেল-এর আশে-পাশে মুক্তিসংগ্রামের

সমর্থক হিসেবে অভিজাত শ্রেণীর আতিথ্যহাউসেন ও স্টাউফার এবং নিম্নশ্রেণীর কুয়োনি, রুয়োদি, ভেরানি, উলরিখ ইত্যাদি বেশ কতিপয় চরিত্র সৃষ্টি করে শিল্পের নাটকের কেন্দ্রস্থ ব্যক্তি থেকে বহুতে,—বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, এমন সাবলীলভাবে আরোপ করলেন যে গায়তে-কৃত 'তাস্সা' অপেক্ষা অনেক ফলপ্রসূ নাটকীয় ও সার্থক রূপায়ণ লাভ হ'ল 'ভিলহেলম তেল-এর। চরিত্র ও ঘটনার যে বাহুল্য শিল্পের এই নাটকে প্রথমতঃ অনাবশ্যক, এমনকি অপ্রিয়, ঠেকে, তা-ই শেষ পর্যন্ত নাটকটির সাফল্যের প্রধান উপাদানরূপে প্রতীয়মান হয়। নাটকটি ভিলহেলম তেল-এরই কাহিনী যদিও, তবু সে কাহিনীর নাট্যরূপ যে জীবন ও ঘটনা মারফতই সম্ভব, ব্যক্তিস্বরূপ উদ্ঘাটনের কোনও পৃথক বনোদী পথ নেই,—এ সত্য শিল্পের সম্ভবতঃ আরিস্ত-ভালিসের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। *

*ট্রাজেডি প্রসঙ্গে আরিস্তভালিসের বক্তব্য সাধারণভাবে নাটকের সত্ত্ব ও বিশেষিত করে : ব্যক্তি নাটকে প্রধান উপলক্ষ্য হলেও, নাটক কখনও ব্যক্তির অনুভূতিতে উদ্ভূত হয় না, অনুভূতি সदैব ঘটনার ও জীবনের (পঁহ গার হাগোয়দিয়া মিমোসিস এস্তিন উক আনথোপোন আলা প্রাক্সেসওস কাই বিরু।' —প্যারোটিক্সম, ৬, ৯)। প্রগোদনার আভিষ্যে এই সহজ সত্য অনেক নাট্যকারই বিস্মৃত হ'ন।

বাংলা কথাসাহিত্যে তিনটি বিশিষ্ট সংযোজন

গতিনছন্দ

আশাপূর্ণা দেবী ৪:০০

মরসুমী

পত্রবিলাস

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ২:৫০ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৩:০০
লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখকের বলিষ্ঠ উপন্যাস
দুরের মালতী ৪:০০ হেডমাস্টার ২:৫০

অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাস ও বহু প্রশংসিত গল্প সংগ্রহ

সাহসিকা

সিন্ধুর স্বাদ

প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩:৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ৭:০০

মায়ামারীচ

শুদ্ধকণ

সুনীলকুমার ঘোষ ৩:৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩:০০

রাতের ঢেউ

ছায়া-হরিণ

সত্যপ্রিয় ঘোষ ৩:০০

সন্তোষকুমার ঘোষ ৩:০০

রায়মঞ্জল

পাহাড়ী চল

শক্তিপদ রাজগুরু ৩:০০

সমরেশ বসু ৩:০০

অচেনা

শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ২:৫০

বিদ্যোদয় পালিত ২:৫০

সুর্ভাষ প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

শিল্পের 'ভিলহেল্ম তেল' নাট্য-সাহিত্যে এমন নিশ্চিত মূল্যবান এক অবদান যে, নাটকটির বিস্তারিত আলোচনা একমাত্র স্থানাভাবেই বর্জিত হ'ল বর্তমান প্রবন্ধে। তবু, বাচন ও পরিবেশ-নিম্নে নাট্যকারের আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্য কাঁড়াবে এই নাটকটিকে গতি ও তীব্রতা দিয়েছে তার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শনস্বরূপ : নাটকের চতুর্থ অঙ্কে ভিলহেল্ম তেল-এর বন্দী হওয়ার সংবাদ যখন পেঁছিল ধীবর রুয়োদির কানে, তখন ঐ অশিক্ষিত ধীবরের মুখে শিল্প যে বচন দেন তাতে যেমন নেতার বিনাশে জাতীয় জীবনে প্রলয়ের সংবাদ, তেমন স্বাধীনতা অর্জনে সাধারণ মানুষের দুঃস্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা সূচিত হয় সমান প্রাবল্যে। এই নিদারুণ বিপর্যয়ের বাচনিক অনুকার খুঁজতে শিল্পের সেক্সপীয়রের 'কিং লিয়র'—অধঃশ্রমাদ, পরাভূত লিয়রকেই মনে করেন : ধীবর! প্রভঞ্জন, হও প্রবাহিত!

বিদায় শিখারা, জর্জালিয়ে দাও এ অঞ্চল। মেঘবল, হও বিদারিত।

স্বর্গের নদীরা, ঢালো নীচে! নিমজ্জিত করে দেশটাকে! * *

মিদর করগ্রাহী গেসলর, তাকে তেল-এর বাণে মরতে হবে। কিন্তু মৃত্যুর ক্ষণটিতে পর্যন্ত নাট্যসুবিচারের যোজনা চাই শিল্পের নাট্যমীমাংসার

**Wilhelm Tell : Schauspiel von Friedrich Schiller (ed. Karl Bretl) ৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য, লাইন ২১২৯-৩১

সুখে স্বিগ্ৰতা আনে
বোল্যাক্স
ফেস পাউডার
ওগরন কসমেটিক প্রোডাক্টস • কলিকাতা

ছকে। ভাই চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে শরবিধ হওয়ার ঠিক পূর্বে 'মহুর্তে' আমরা শুনিন মিনতিময়ী আম'গার্তকে বিদ্রূপ করে অত্যাচারী গেসলর আবাহন দাওঁ উঠেছে : 'ভাগ্যবো আমি এই মৃত্তিলাভের বজ্রাত ইচ্ছেটা, এ দেশে নতুন একটা আইন জারি করবো!'

শিল্পের পর জার্মান নাট্যসাহিত্যে রীতিমতো চাঞ্চল্য ও কলরব অমৃত হ'ল কয়েক দশক বাদ দিয়ে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। উত্তর যুরোপীয় দুইজন নাট্যকার, ইবলেন ও স্ট্রিন্ডবেগ তখন নাটকে 'যুগের হাওয়া' নিরূপিত করে দিয়েছেন বাস্তববাদের নামে। এই পর্যায়ে জার্মানীতে অন্ততঃ চারজন শক্তিশালী নাট্যকার বাস্তববাদী নাট্য-আন্দোলনের পুরোধার ছিলেন : হেরমান সুদেরমান, ফ্রাংক ভেদেকিন্ড, গেরহাট হাউস্টমান ও আর্নস্ট শনিংসলর। পারিবারিক নৈতিকের নাগপাশে আটক একটি মেয়ের বিক্ষোভে ও প্রতিবাদে-ভরা সুদেরমানের 'দি হাইমাং' (গৃহ)। বাস্তবের আরো তীক্ষ্ণ অধ্যয়ন সুদেরমানের 'জুদামস এন্ডে' (সেউমের শেষ) নাটকে। ব্যাভিচারী ধর্মিক সম্প্রদায়কে বে-আরু করতে নির্মম লেখনী ধরে-ছিলেন বাস্তববাদী সুদেরমান। ফ্রাংক ভেদেকিন্ড নাট্যাটিকীয়ায় দৃঃসাহসিক নতুনত্বের নিদেশ দেন যেন বিষয়ক কাহিনীর রূপায়ণে। ভেদেকিন্ড বাস্তববাদ শপথ করে মামুষকে অবদমিত যৌনতার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কতকটা জিদ ধরেই নাট্যজগতে কিছু পরিমাণ শিহরণ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি করেন। ভেদেকিন্ড আসলে ছিলেন উনবিংশ শতকী গেষক ব্যায়খনরের ভক্ত (যে ব্যায়খনরের বিখ্যাত নাটক 'দাঁতির মৃত্যু' সাম্প্রতিক কালে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে), এবং ব্যায়খনরের নাটকে ভাষা

ও কম্পনার দৌরাণ্য যে অসাধারণত্বের প্রসব করেছিল তার সহজাত সন্ধান ভেদেকিন্ড পেয়েছিলেন যৌনমূলকের পরিবেশন করায়। শনিংসলরের নাটকে সংলাপ লক্ষণীয়ভাবে প্রাধান্য পায়, এ্যাকশন বা সংঘটনের আয়োজন ও বুননে তদনুপাতে শৈথিল্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। যৌনতা বা সমাজনৈতিক চিন্তা, এ-দুয়ের কোনওটিতেই তাঁর নাট্য-প্রচেষ্টা ধাতস্থ হতে পারেনি, কারণ প্রেমকাহিনী মনস্তত্ত্ব ও সৌন্দর্যবোধ তাঁর মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে জটিলতা ও রক্ষুতার থেকে দূরে রেখেছিল। শনিংসলরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'লিবেল্লাই' (ছেনালী) বিয়োগান্ত নাটক হিসাবে বেশী বর্ণনাময় মনে হলেও, সংলাপে ও আবহাওয়ায় মৃদুধর। সংলাপের ক্ষমতা আরো সম্প্রকাশ শনিংসলরের 'দেই আইম-সামে ভেক' (নিজের পথ) নাটকে, যেখানে সংঘটনের ঝড়িক নাট্যকার প্রায় নেননি বললেই হয়।

গেরহাট হাউস্টমান, যার প্রথম নাটক, 'ফর জেনেবুন্ডেরগাউ' (সুখো-দয়ের পূর্বে) কিছু দিন আগেও হামবুর্ক শহরে সগৌরবে অভিনীত হয়েছে 'দুয়সেলদফ' নাট্যভবনের অভিনেতৃবর্গের দ্বারা, অর্ধশতাব্দীরও বেশী ব্যয়ধানে যে দর্শকচিন্তে যথার্থ আবেদন করতে পারেন, তার কারণ অবশ্যই তাঁর নাট্যকলায় কয়েকটি অনস্বীকার্য সদগুণের উপস্থিতি। নাট্যকারের প্রধানতম আর্থিক পর্যবেক্ষণ—বা জীবন-দেখার চোখ, হাউস্টমানের অন্ততঃ গোড়ার দিকে ছিল। সংলাপ-রচনায় শৈলী ও বুদ্ধিমত্তা (আণ্ডলিক ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা) তাঁর আরেকটি গুণ। আর, বাস্তবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টাও তিনি কদাচই ত্যাগ করে-ছেন (বিদবা থেকে থেকে রূপক-নাট্য, রসতী ও মেতর্লিঙ্ক মারফত, তাঁকে আকৃষ্ট করেছে)। অপরিমিত ক্ষমতা ও সিস্কা হাউস্টমানের সহধারাত্ম নাট্য-সৃষ্টিতে সপ্ৰমাণ। প্রথম দিকের একটি নাটক 'দি ভেবর' (তন্তুজীবীরা)—এ হাউস্টমান তাক লাগিয়েছিলেন একের বদলে একটি দৃংলকে নায়কত্ব বরণ করে; পরবর্তী নাটকগুলিতেও চমক-প্রদের অভাব ঘটাননি তিনি, যদিও সে চমক এনেছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর নাট্যজগতের গভীরতর উপপাস্তিগুলি। স্ট্রিন্ডবেগের মতো বাস্তব-অধ্যয়নে হাউস্টমানকে জটিল, প্রবল, অধিকার, রিপূঃপরবশ—ভীষণতাকামী মনে হয়,

অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের জন্য
আমাদের আর একটি নতুন কেন্দ্র
৭নং পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এঁভিনিউ, কলিকাতা-১২

এবং তাঁর নাটকের কাহিনীগুলি প্রায়ই বেনে সুপরিচীত আবেগে দারণ কোনও বিষয়গতকে আদৃত করে। তবু, কদাচই হাউস্‌তম্যান অতি-নাটকীয় বা অবাস্তব এবং সেই কারণেই তাঁর নাটক কখনও বিস্বাদ বা ধিক্কার আনে না। 'দি ফেরসুন্ডেনে স্ট্রোকে' (ডুবন্ত ঘণ্টা) নাটকে রূপকথার মাধ্যমে হাউস্‌তম্যান যে প্রতীকী-নাট্য রচনা করেন তা যথেষ্ট কাব্যময় হলেও বিষয়গত। এই বিষয়গতেরই সাধনা হাউস্‌তম্যানের সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনকে চালিত করে। আত্মহত্যাকে একমাত্র পথ হিসাবে বেছে নিতে হয় তাঁর একাধিক নাটকের নায়ক-দের। বৃদ্ধ বয়সে নাৎসীবাদে বিশ্বাসী হওয়াও হয়ত বা হাউস্‌তম্যানের জীবন-নাট্যে অনুরূপ পথ নির্দেশ (যা, বলা বাহুল্য, এক অশোভন, দুর্বল পর্য-বেক্ষণলব্ধ)।

গেয়ক কাইসার, কুর্ট হিলর ও এনস্ট তোমার : হাউস্‌তম্যানের পরবর্তী জার্মান নাটকে এই তিনজনের ক্ষমতাবান শিল্পী একপ্রশ্ননিজমের আওতায় নাটক লেখেন। বাস্তববাদের যে ভাবসমৃদ্ধ অনসৃত দাবী করেছিল উক্ত সাহিত্যিক পন্থা তাতে ঘটনাবিন্যাসের দায় ছাড়াও শিল্পীকে পোহাতে হ'ত তাঁর আপন মনোজগতের প্রতিক্রিয়া ও তাঁর ধ্যান-ধারণা বিজ্ঞাপিত করার আন্তরিকতাকে। এবং সেইসঙ্গে বাস্তবের অধ্যয়নে কোনও তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিক কারচুপি করে শিল্পীর পক্ষে দূরে সরে থাকা কণ্ঠকর হয়েছিল। বর্ণনার চেয়ে গভীর-তার বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব পড়েছিল উপ-ন্যাসিক ও নাট্যকারদের উপর। তাঁর সৃষ্টি মারফত শিল্পী সচেতনভাবে বাস্তবের ভাষা-নির্মাণে অভিযুক্ত কর-ছিলেন নিজেকে। এই একপ্রশ্ননিজম বাস্তব অথবা স্বভাব-কেন্দ্রিক প্রকাশ-রীতিকে স্পষ্টতর গুরুত্ব ও নিষ্ঠায় ঘনীভূত করেছিল। তাই, নাটকে হাউস্‌তম্যানের প্রতিভাও উন্নাসিক প্রমাণিত হ'তে পারল। প্রয়োজন হ'ল আরো দায়িত্বপূর্ণ কম্পনার, আরো জীবননিষ্ঠ সংলাপের, এবং স্বচ্ছতর পথপ্রদর্শনের। এই নব নাট্য-প্রচেষ্টায় কাইসারের 'গাস' (গ্যাস) ও 'ফন মাতগেনস বিস মিতেরনাথ' (প্রভাত থেকে মধ্য রাত্রি) শিল্পযোজিত বিংশশতকী জীবনে ঘটনা ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব এবং তাঁর সমাধানের ইচ্ছাত। সমকালীন সভ্যতার গোপন গলদ, তাঁর ভিত্তিতে সঞ্চিত অপলোপ, সভ্য মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা কাইসারকে এবং আরো

সরাসরি, তোমার-কে নাটকের মাধ্যমে জীবনের সমালোচনা ও বিচার করায়। সমাজ ও সভ্যতার এক প্রখর বিশ্লেষণ তোমারের বিখ্যাত নাটক, 'হপলা, ভির-লেবেন' (কী মজা, আমরা বাঁচছি)-এ আঙ্গিক ও বস্তুর বিস্ময়কর উৎকর্ষে সাধিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পট-ভূমিকায়, ঘরে-ফেরা এক বিজয়ী সৈনিকের আত্মজ্ঞান কিভাবে তাকে বাস্তববাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামে ব্রতী করে তাঁর কাহিনী তেলরের আরেকটি সুপরিচিত নাটক 'দি ভান্ডলুন্ড' (পরিবর্তন)এ। তোমার বলেন : যন্ত্রযুগের ব্যাধি নিরাময়-করতে যন্ত্রের নিপাত চাই না (যদিও কাইসারের কাছে ঐ নিপাতই প্রের), চাই যান্ত্রিকতা থেকে মানবিক মূল্য, দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ধার।

শিল্প থেকে এনস্ট তোমার পর্যন্ত রীতি ও বাস্তবের নানান অভিধায় পরিভ্রমণ করে জার্মান নাটক আদর্শ, বাস্তব, স্বভাব ও চিন্তার সংজ্ঞায় যে সকল শ্রান্তি ও ক্ষতির জেরে চেনে তার আধুনিকতম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তাদের ইতিবাঞ্চে অন্ততঃ মৌখিক এক ব্যীতরাগ দেখিয়ে শব্দ করেন এ যুগের অন্যতম প্রধান জার্মান নাট্যকার, বের-তোমার প্রেথত। রাজনীতির পাকচক্রে

প'ড়ে রেথতের বরাতে যে উপযুক্ত পরি-চিতি ও সুখ্যাতি আদপেই অবির্ভবে আসেনি, তা স্বীকার করতেই হয়। ভাবনা ও বাচনের যে-অবিসংবাদী মন্থে রেথত আলোকসামান্যের কিছু কম নন, তার সমাদর রাজনৈতিক বিঘ্নে বাহত ও বিলম্বিত না-হলে, রেথত প্রসঙ্গে অবশ্যই অনেক রক্ষণশীল পশ্চিমী নাট্য-সমালোচকদের কম আড়ষ্ট দেখা যেত। কম্মানিষ্ট হিসাবে সুপরিচিত রেথত দলমাত্র ছাপেই নিস্তার পান না। এক চপল উৎকণ্ঠা নিয়ে দক্ষিণপশ্চিমীও রেথতের ভোগ-দখল দাবী করতে যে পিছপা নন তার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত দেখা দিয়েছে একটি বহু-প্রচারিত ইংরেজী মাসিকের পাতায়। রেথতের একটি নিষিদ্ধ কবিতা, 'গেসাণ্ড দেস জলদাতেন দেস রোতেন আরমে' (রেড আমির সৈনিকের স্তব), উদ্ধৃত করে উক্ত পত্রিকা রেথতের রূপ-বিশ্লেষণ প্রচার করেন! (এ জাতীয় বাম-দক্ষিণ টানাপোড়নে এক সময়ে কাহিল হ'তে হয়েছিল ফরাসী সাতকে)।

অবশ্য যে কোনও প্রকার নাকান-চুবানি সহ্য করেও জলজ্যান্ত উঠবার সামর্থ্য রেথতের রচনাগুলির আছে। সৃষ্টিশীলতার যে অখণ্ড প্রতাপ ও নির্বিরোধ প্রেরণায় রেথতের অজস্র

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

মনোরঞ্জন রায়

আদিম সমাজের ইতিহাস

... রোমাঞ্চকর গল্পকাহিনী থেকেও চিন্তাকর্ষক মানুষের এই জয়-যাত্রার বাস্তব ইতিহাস। সেই ইতিহাসই লেখক এখানে উপস্থিত রেছেন স্বচ্ছন্দ ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে। দাম ৫-০০

প্রাপ্তিস্থান

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

মাচন রোড, বেনারীচাঁতি, দুর্গাপুর ৪

সাহিত্যিক কতব্য সম্পাদিত হয়েছিল, তাতে কল্পনার সমারোহ ও শিল্পের শূন্যতা অনায়াসে রাজনীতিপ্রসূত প্রতিভা বা দিশা অভিক্রম করতে পারত। কারণ, রেখত রাজনীতি থেকে সাহিত্যে প্রবেশাধিকার সুগম করেননি; সরাসরি, প্রায় বৈশ্ববিক জোর নিয়ে, সাহিত্যক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হন তিনি। তাঁর এই জোর একপ্রশ্ননিজমের আব-হাওয়ায় তাঁকে বেমানান, এমনকি রোমান্টিক প্রমাণ করতে পারত। মর্ত্য-মন্ডের দিক থেকেও রোমান্টিকতা রেখতের প্রথম জীবনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যেমন বায়ুখনর ও ভেদেকিস্তের প্রতি তাঁর অনুরাগে। তাঁর তরুণ বয়সের রচনা 'দ্রোমেলন ইন দের নাখত' (স্মিগিতে দামামাধর্মনি) নাটকের কাহিনীতে, কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন উপলক্ষ্য করে লেখা 'ফন আরমেন বে-বে'র মতন কবিতায় রেখত নিশ্চিতভাবে অরাজ-নৈতিক, আত্মভাবে মানবিক বলে ধরা দেন। উক্ত কবিতায় যে-আশ্চর্য নিরাবেগে রেখত তাঁর আত্মপরিচিতিতে জানান তিনি 'সন্দেহঠাসা, আর পচা, আর পরিবেশে, ভুট্ট মানব' (মিসরাউইশ উক্ত ফাউল উক্ত সন্দেহদে আম এলে) তা কেবল তাঁর মানবিক চেতনাকেই প্রাজল করে।

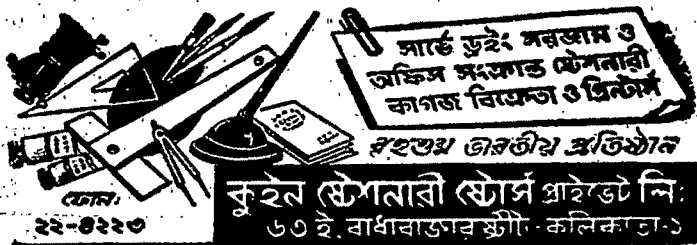
নাট্য-সাহিত্যে রেখতের অবদান সর্বাঙ্গীণ। পর্যবেক্ষণ, অনুভব, সংলাপ, আঙ্গিক ও সর্বোপরি ভাব-সংগ্রহ বা আইডিয়েশন; তাঁর নাটকে দর্শক বা পাঠককে অভিভূত করে। উক্ত লক্ষণ-গুলির পর্বর আলোচনা বিশেষজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব। তবু, মোদ্দাভাবে এটুকু বলা যায় যে, নাট্য-ভেত্রে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধি-লাভ হয়েছিল রেখতের। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলিতে কোনও একটি জগকে দুর্বল-বা দুর্দ-বলে নির্ধারিত করা ছিদ্রান্বেষীর পক্ষেও শক্ত। ভাব-সংগ্রহ ও বাচনের অভিনবরুই রেখতের নাটক পাঠকচিহ্ন এভাবে আলোড়িত করে যে, তাঁর গুণাগুণের আপেক্ষিক বিচার গোণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া, প্রশংসনীয়

নতনর রেখতের আঙ্গিক ও নাট্য-সামগ্রী আহরণে। মন্ডের আয়ত্তে ও নাট্য-পরিচালনার অধিকারে তিনি এমন সব কলাকৌশল ন্যস্ত করেন যা অনেক ক্ষেত্রেই আবিষ্কারের পর্যায়ভুক্ত। উদাহরণ হিসাবে মধ্যবয়সী রেখতের রচনা, 'লেবেন দেস গালিলাই' (গালিলেও-জীবনী) নাটকটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করুন।—প্রথমতঃ একাঙ্গিকার ধারে-কাছে না-এসেও রেখতের এই নাটক অঙ্কে-বিভক্ত হয়নি। পনেরটি অনতি-বিচিত্র দৃশ্যে বৈজ্ঞানিক গালিলেওর ঘটনাবলি জীবন নাট্যরূপ পেয়েছে। দৃশ্য-সংস্থাপনার গুণে এমতো ব্যবস্থায়ও রেখত ষোড়শ শতাব্দীর ঐ চিন্তা-নায়কের যে-অনুকৃতি সৃষ্টি করেছেন, তাতে প্রত্যয় ও সমৃদ্ধির অভাব ঘটেনি। দ্বিতীয়তঃ, এই নাটকে দৃশ্যের শিরো-নামা ও দৃশ্য-ফলক ব্যবহার। নাটকের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নীত হওয়ার সুবহার-শোভন ঐ শিরোনামগুলি বাহ্যতঃ যারা অষ্টাদশ শতকী উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রতি অধ্যায়ের মূলে কার্যক্রম-নির্দেশক শীর্ষাঙ্গিক কথা স্মরণ করায়, এবং বোধ হয়,—এখানে নাটককলা বিষয়ে রেখতের প্রস্তুতি ও অনুসৃত পথ্য, 'পার্বকা-ভোগ' বা 'ফেরফ্রেমদুগুসএকুজ'-এর কথা চিন্তনীয়,—স্থানকাল-পাত্রের দুরূহটি নির্বিবাদে-খরিয়ে দেয়। দৃশ্য-ফলকের আমদানি আরো বিচিত্রঃ ছড়ার ঢঙে, রচিত, ছোট ছোট কবিতায় প্রতি দৃশ্যের শুরুরতে রেখত হালকাভাবে ব্যস্ত করেন গালিলেও-সংক্রান্ত এমন দু-একটি সত্য যাতে উচ্চকিত হয়ে কান খাড়া করতে হয় দর্শককে, এবং শুনে তাঁর যেমন মজা লাগে, জ্ঞানও তেমন বাড়ে। কবি ও রসিক রেখত দৃষ্টা-প্রোত্যাকে শিল্পের সীমানার মধ্যে ডেকে এনে বিনোদনের পাত্র যেন উজাড় করে দেন। 'বোলিনর অ'সারল' নামক নাট্য-সম্প্রদায় কতৃক 'গালিলেও-জীবনী' অভিনয়ের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে-রচিত এই

° Leben des Galilei: Bertolt Brecht (Heinemann German Texts), 1938.

দৃশ্য-ফলকগুলিতে রেখতের বাচনিক ঋজুতা ও সংঘমের কী চমৎকার সাক্ষ্যঃ মহামানব যা করেন সব কীর্তি নয়, খেতেন জ্বর গালিলেও মহাশয়। এখন শুধুনা ঠান্ডা রেখে মাথা-টেলিস্কোপে-সত্য কয় কথা। (দৃশ্য ২)

গালিলেওকে তাঁর মথার্থ লাভন-চারি দান করার জন্য রেখত যথেষ্ট উদ্যোগী। জ্ঞান-তপস্যায় আটক না রেখে রক্তমাংসের মানব করেই গালিলেওকে তাঁর সাধনা ও পদস্থলনের ইতিবৃত্তে লজ্জিত মহামানবরূপে দেখিয়েছেন রেখত। ভোজনবিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরবণ, বিজ্ঞানভিক্ত তবু ধর্মভীরু, নিশ্চিত তবু ভগ্নুর রেখতের গালিলেও গালিলাই। পৃথিবী স্থির, সূর্য তাকে প্রাবক্ষণ করে—এই মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের ব্যতীর যদিও তাঁর গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্রাণ করেছিল, তবু গালিলেও ধর্মীয় প্রজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। চার্চের সঙ্গে আপস করলেন তিনি তাঁর বিশ্ববীক্ষা উঠে দিয়ে। চার্চের পুনরুদ্ধারের লাভ করলেন তিনি—চাক-পিটিয়ে সারা রাজ্যে জানান হ'ল তাঁর 'ভিন্নপন্থা-গ্রহণের' ('ভিডেরদু'ক) বাতী। গুরুত্ব এই পরাজয়ের ঘোষণা কানে-যেতেই শিরো-আন্দ্রেয়া গালিলেওকে বিচার দিয়ে বললঃ 'দুর্ভাগ্য সেই দেশ, যাতে বীর নেই একটি।' পরাক্রম গালিলেওর জবাবে শব্দে আঙ্গানির পদ্ম চাঁককারঃ 'না, দুর্ভাগ্য সেই দেশ, যাতে বীরের দরকার নেই।' কিন্তু গালিলেও শান্তি পান না। তিনি আন্দ্রেয়ার কাছে পরে স্বীকার করেন যে, তাঁর পথ-মান্তর পথ ('বাহন দেস ইরুতমস')। যদি বা একবার অবমাননার অসহ্য যন্ত্রণার হেঁকে ওঠেন গালিলেও যে হাত 'না-খাকার' চেয়ে নোহো হাত ভাল' (বেসের বৈজ্ঞানিক আলস লের), তবু পরক্ষণেই তাঁর যুক্তির পাহা অনুভূতাপের অবসাদে হারিয়ে যায়। রেখতের চরম কৃতিত্ব এই-যে, মহাজ্ঞানী গালিলেওকে, কি চেতনো, কি নরদেহে, অতি-মানবিক ঐশ্বর্য না-দিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক স্বরূপটি তিনি উন্মার করেছেন। টেলিস্কোপ, গ্রহভারা ও গণিতের জগতে নির্বাসিত না-করে গালিলেওকে রেখত মানবিক আকাঙ্ক্ষা দিয়ে পাখি জগতের বাসিন্দা করেছেন। তাঁর গালিলেও হোরাতিয়সের অটম বাগ-কবিতা আবৃত্তি করেন, 'নাচঘরে-সিঁরে আপন কন্যার কাছে কবিতার কৌদে বলেন যে, তিনি বড়ো হয়ে গেছেন।



সার্ভে ডুইং: সরজাম ও
ত্রফিস সংস্কৃত খেতনারী
কাগজ বিক্রয় ও প্রিন্টার্স
কুহন ষ্টেশনারী স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড
৬৩ ই বাধাবাডগার স্ট্রীট-কলিকাতা-১



বোঝা মরশুম আব্দুল আজীড আল-আমান

শীত শীত পৌষের হাওয়াতেও যেমে উঠল শাহানা। শাহানা বেগম। কপালে-চুটে কুরাশার মত কুচি জমছে। পাতলা নীল কাচের টুকরোগুলো চারদিকে ছড়ান। চোখের দৃষ্টিটা ওদিকে ছাড়িয়ে স্তম্ভ হয়ে গেছে। শাহানা যেন তার অনুভূতি হারিয়ে ফেলছে। চেতনা অবলম্বিত হয়ে দেহটা পাথর হয়ে উঠছে।

এইমাত্র হাত থেকে পড়ে আহসানের প্রিয় গ্লাসটা ভেঙে গিয়েছে। ধীরে অতি ধীরে অনুভূতিহীন দেহে যেন আবার চেতনা ফিরে আসছে একটু একটু করে। গাছের পাতার বুক থেকে সকালের সোনা-সুঁই ফেন মার্টি ছুইছুই করে। দূর্বলতার জঞ্জাল মনের কানাচে ফেলে দিতে চায় শাহানা। কি হবে চিন্তা করে। যা হবার হয়েছে। জল খেতে চাইলে মৃদু গ্লাসে নিয়ে সামনে ধরবে, তারপর কিছু বলার আগেই অপরাধ স্বীকার করবে, লক্ষ্মীটি কিছু মনে করো না—

তোমার সেই বেলজিয়াম-তৈরী পাতলা নীল গ্লাসটা.....

লক্ষ্মীটি! অতিকটে হাসল শাহানা। আজ পর্যন্ত অমন কোন কথাই বলতে পারল কী! সোহাগের বিশেষণগুলিতে আহসানকে সম্বোধন করতে মনটা কতবারই না কি গভীর আবেগে আন্দোলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিরাট দেহী লোকটা গম্ভীরমুখে কাছে এসে

দাঁড়ালেই সব ভুলে যায় শাহানা। কিছু মনে থাকে না। রাতদিনের পার্থক্য অবলম্বিত হয়। আলোআঁধার মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তখন সংস্কৃতভাষে চিন্তা করে' কথা বলার খেই হারিয়ে ফেলে শাহানা।

তীক্ষ্ণাগ্র কাচের কুচিগুলো সরিয়ে একপাশে রাখতে যাবে এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। কান পেতে আর একবার শব্দটা শুনল। আশ্চর্য—দরজায় কড়া নাড়ার শব্দটাও কি নিম্নমভাবে সংযত আর গম্ভীর। মনের মাটিতে আর কোন নতুন চিন্তার উঁকি বাকি নেই। নিজের চিন্তাভাবনা বলে আর কোন কিছুই অবশিষ্ট রইল না তার। এসে এখন অপরের ইংগিতের দাস। নবীল কুচিগুলো নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পড়ে রইল রোয়াকের ওপর, শাহানা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

প্রায় সপ্তে সপ্তেই ভিতরে এল দীর্ঘদেহী লোকটা। দরজাটা বন্ধ করতে যাবে, শাহানা বন্ধ—আমি খিল দিয়ে দিচ্ছি—তুমি.....

ঐ পর্যন্তই। শান্তভাবে কপাটদুটো লাগিয়ে খিল ভুলে দিল আহসান। তারপর ধীর সংযত পর্দাবিক্ষেপে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। রোয়াকে ছড়ান নীল টুকরোগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে জুতোর শব্দটা আরো মৃদু হয়ে এল, গতি শলথ হ'ল, আর পিছনে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মৃত্যু-বশ্ণরায় ছটফট করতে লাগল শাহানা।

কিছু বলল না আহসান। একবার ফিরেও তাকাল না। শলথ গতিটা আরো কিছু দ্রুত হল। তারপর ঘরের ভিতর গিয়ে শাটের বোতাম খুলতে লাগল একমনে। দরদর বকে প্রায় সপ্তে সপ্তেই ঘরের মধ্যে এসে সুইচ টিপে পাখা খুলে দিল শাহানা। লুৎগী তোয়ালে রাখল যথাস্থানে। জামা-কাপড় খুলে মুখ ধোয়ার জন্যে বাথরুমের দিকে যাবে, শাহানা বলল—একটু বিশ্রাম করে তারপর মুখ ধুয়ো'খন।

বাথরুম থেকে তখন জল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল আহসান। তারপর আমচোরে গা এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। টেবিলের ওপর

খবরের কাগজের পাতাটা পাথার হাওয়ায় উঁকি দিচ্ছে। আহসান ওঁদিকে হাত পাতল। শাহানা তৎক্ষণাৎ কাগজটা এনে দিল হাতে। সিগারেট টানতে টানতে কাগজের মধ্যে ডুবে গেল ও।

দৃষ্টিশ্রুত শাহানার মনটা একেবারে কানায় কানায় ভরে ওঠে। কি জানি, গ্লাস ভাঙাটা আহসান কোন্ আলোকে নিল। একটুখানি ইতিউতি করে শেষকালে বলেই ফেলল কথটা। যতখানি হাসার দরকার, তার থেকে অনেক বেশী হেসে বলল—জান, তোমার সেই গ্লাসটা আমি ভেঙে ফেলেছি।

পাথার শব্দটা ঠিক আগের মতই শোনা গেল, আর কিছ্ না। এই গুমোট দাহন সহ্য করতে পারে না শাহানা। অন্যায় করেছে—চীৎকার করুক আহসান। তাকে ধমক দিক। কিন্তু একি! উদ্গলিত ব্যথার একটা প্রথম ঢেউ মনের উপলে এসে আছাড় খেল। কিছ্ বিরতির পর বলল—ও বাড়ীর সেই মেয়েটাকে আজ দুপুরে ধরে বেঁধে

শব্দরবাড়ী পাঠালে সবাই। মাগো—যাওয়ার সময় সে কি কান্না আর গালিগালাজ।

কথা বলার সময় শাহানাকে অনেক বেশী খুশীখুশী দেখাল।

তেমনি নীরবতা। কেবল খবরের কাগজটা একটু নড়ে উঠল খশ্-খশ্ করে। আর সিগারেট টান দিয়ে একটু কাশল আহসান। নীলচে ধোঁয়াটা পাথার বাতাসে স-জোরে ঘুরপাক খেয়ে মিলিয়ে গেল কোথায়।

মনের খালি অংশগুলো ব্যথার আমেজে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আশায় বুক বাঁধার মত আর কোন কিছ্ই অবশিষ্ট নেই। শিরা-উপশিরা ভরা ব্যথার ম্লান বিষমতাকে আপন মনেই হজম করতে হবে শাহানাকে। ইচ্ছা করেও আর হাসা যায় না এখন। বুকটা ছম্-ছম্ করে। পাথরের মত ভারী। লোকটা তেমনিই নির্বিকার চিন্তে গম্ভীরমুখে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেছে।

কুণ্ডাভরা স্বরে শাহানা শুধায়—চা করে আনব?

খবরের কাগজটা নীচু করে সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে কেবল ঘাড়ের দিকে তাকাল আহসান। দেওয়াল-ঘাড়ের টিক্-টিক্ আর হাওয়ার সমুদ্রে পাথার আলোড়ন ছাড়া আর কিছ্ শোনা গেল না।

খানিকটা চুপচাপ বসে থেকে উঠে পড়ল শাহানা। যেতে যেতে কতকটা নিজের মনেই বলল—মাই কলতলায় হয়ত বাল্যিটা বোকাই হয়ে গেছে এতক্ষণ।

চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে যাবে, আহসান ডাকল—শোনো।

একসাগর আশা নিয়ে মূহুর্তে ফিরে দাঁড়াল শাহানা।—আমাকে ডাকছে?

কাগজের দিকেই দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে নিরন্তর স্বরে আহসান বলল—ডুয়ারে আইডিন আছে—পায়ে দিয়ে নাও।

এই প্রথম নিজের পায়ের দিকে তাকাল শাহানা। পা-টা অনেকখানি কেটে গেছে। নীল কুচির একটা কখন ছিটকে এসে পড়েছিল।

ছিটকে এসে পড়েছিল পায়ে? না মনে? কার্টল পা, না মন?

বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দু' বছর ধরে সেই চিন্তাই করে আসছে শাহানা। তব্বী শাহানা। হাস্যে লাস্যে যে জীবনটাকে কাটাতে চেয়েছিল সুন্দরতর করে। শিক্ষিত, বিত্তবান, রচিসম্পন্ন স্বামী চেয়েছিল—তা' সে পেয়েছে। অর্থে, শিক্ষায়, পদমর্যাদায় আহসান অনেকেই হিংসার পাত্র। তবু জীবনের মৃকুলগুলো ফুল হয়ে ফুটল না শাহানার। একটা দারুণ দুঃসহ গুমোটের মধ্যে তার সুকুমার বস্তুগুলি যেন ঝলসে গেল। এই তপ্ত গুমোটের মধ্যে মনের আলিঙ্গন বেয়ে এক বলক হিমশীতল দখিনার মত আবিদের স্মৃতি কে'পে কে'পে স্থির হয়। দুপুরের ধূসর নিস্তত্বতায় আবিদ এসে দাঁড়ায়। কানে কানে কথা বলে। হাসায়, হাসে। ছিম-ছাম একহারা চেহারা। শিক্ষা তার যথেষ্ট কম। অর্থও। তবুও জীবনটা কি অপূর্বই না হতে পারত। অথচ কী হয়ে গেল!

দুপুরে ঘুম আসে না। এমনি সাত-পাঁচ চিন্তা করেই কাটে। হঠাৎ দরজায়

মাঘ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

জলসা

এই সংখ্যা থেকে বিশেষ আকর্ষণ

অচিন্ত্যবিশ্বের স্নেহপুত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধারাবাহিক রচনা

সমরেশ বসু

এখানে সেখানে

নিয়মিত দ্বিভাষী রচনা

এছন্দ গল্প | জীবনী | সাপ্তাহিক |
পরিচিতি এবং ফিক্টের উপর রসরচনা |
নিখোঁজ অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় | শৈলেন্দ্র দে
শর্মা বর | শ্যামপ্রসাদ সরকার প্রভৃতি।

উপন্যাস নিখোঁজ | যশোদাজীবন ভ্রমচার্য

২২ পৃষ্ঠার বই। দাম এক টাকা চার আনা।

কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চোখটা মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াল শাহানা। তবে? শব্দটা আর একবার কান পেতে শুনল শাহানা, না, এ শব্দে সে গাম্ভীর্য নেই।

দরজা খুলতেই এগিয়ে এল অফিসের বেয়ারা। একটা বড় প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল—সাহেব পাঠিয়ে দিলেন।

—আচ্ছা।

বিদেশী লেবেল আঁটা এক কোটো স্নো, তিনটে সাবান আর শাড়ী। ফিরোজা রংএর এই ধরনের একটা শাড়ীর কথাই হিচ্ছিল কাল। সব দেখেশুনে কান্নাটা যেন আরো চেপে এল শাহানার। টেবিলের ওপর ওগুলো ছাড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেমন করে তাকিয়েছিল সেদিন নীল কুচিগুলোর দিকে।

আজকাল অফিস থেকে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসে আহসানের। গাছ-গাছালির ছায়াগুলো লম্বা হ'তে হ'তে যখন অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, সূর্যের কমলা রং-এর ছোপ খেয়ে বিচিগ্রবর্ণ মেঘগুলো যখন স্তম্ভ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন দরজায় সেই কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। আজও পড়িমরি করে ছুটে গেল শাহানা। এবং দীর্ঘ দু'বছরের জীবন-যাত্রায় যেন একটা নতুন সুর বেজে উঠল।

দরজায় খিল তুলে দিয়ে এই দু'বছরের মধ্যে আজই প্রথম কথা বলল আহসান—হাতে কোন কাজ আছে এখন?

প্রায় রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিল শাহানা—না—কেন?

কাপড় ছেড়ে খাটের ওপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বলল,—বস্তু মাথা ধরেছে।

কপালে হাত দিয়ে আছাড় খেল শাহানা। তারপর ব্যাকুলকণ্ঠে বলল—এত জ্বর নিয়ে কেন অফিসে ছিলে এতক্ষণ?

নিজের হাত দিয়ে শাহানার হাতটা কপালে চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে বলল—অফিসে যে বড় কাজ শান্দ।

একেবারে নতুন সুর, নতুন স্বর। সকালের সেই নিরন্তর মানুষের গাম্ভীর্য গলে গিয়ে যেন নতুন রূপ নিয়েছে। প্রথম থেকে এ স্বরের স্পর্শ পেলে মাটির পৃথিবীকে বেহেশত করে দিতে পারত শাহানা। একেবারে বিগলিত কণ্ঠে বলল

—থাক কাজ। তা' বলে জীবনটা শেষ করে দিতে হবে?

শাহানাকে একেবারে বৃকের কাছে এনে বলল আহসান—আরো কাছে সরে এসো। উঃ, বড় শীত করছে।—কিছু একটা চাপা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধর। একটু বিরতির পর বলল আবার—বহুদিন কোন অসুখ-বিসুখ হয় না,—কি যে হবে লক্ষ্মীটি।

একেবারে পাগলের মত ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল শাহানা। বৃকের ওপর মৃদু লড়কিয়ে বলল—কি সব আবোল-তাবোল বকছ। কিছু হবে না—দেখো, তুমি কালই ভাল হয়ে উঠবে।

রাত একটু গভীর হলে নিথর হয়ে গেল আহসান। ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বামীর বাহু থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল কেবল, খাওয়া-দাওয়া সব পড়ে রইল। আবার এসে শুয়ে পড়ল স্বামীর পাশে। একটি-বারের জন্য কেবল দূর অসীমের কাছে মনে মনে প্রার্থনা জানাল—এত জ্বর, তুমি ভাল করে দাও!

কিন্তু ঠিক তার পরের মূহুর্তেই ব্যাকুল মনে বলল—না, তুমি ভাল করে দিও না। এক মাস, দু'মাস, আহসান অনেকদিন ভুগুক এ জ্বর।

হঠাৎ পাশ ফিরে শাহানাকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘসূরে আহসান বলল—‘শান্দ গো—!’

এই দীর্ঘ দু' বছর বিবাহিত জীবনের পুঞ্জীভূত সকল অভিযোগ

হঠাৎ যেন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল শাহানার। একটা পরিপূর্ণ প্রাপ্তির উল্লাসে জীবনের অ-ফোটা মৃদুল আবার রং ছড়াতে চাইছে।

ডাঃ সামন্ত বোধহয় ধন্বন্তরী। মাত্র এক সপ্তাহ মধোই ভাল হয়ে উঠল আহসান। আগামীকাল পথ্য ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন।

রাত্রে শুয়ে কি যেন একটা কথা জিগ্যেস করছিল শাহানা। প্রায় ধমক দিয়ে উঠেছিল আহসান। বড় দুর্বল মনে হচ্ছে—আমাকে বকিও না। তারপর আর কোন কথা হয়নি সারারাত্রে।

সকালে চা দিয়ে শাহানা জিজ্ঞেস করেছিল—কই মাছ আনতে দেবো, না সিঙি?

আহসান চায়ে চুমুক দিয়ে কেবল একবার তাকিয়েছিল। আর কিছু না।

চা খাওয়া হয়ে গেলে লেটগুলো নিয়ে যেতে যেতে শাহানা বলেছিল—তাহলে কই মাছ আর কাঁচাকলার ব্যবস্থা করি?

চোখের কোণে কালবৈশাখীর ঘন-ছায়া। গম্ভীরকণ্ঠে আহসান উত্তর দিল—সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে নাকি?

সাতদিন সাতরাত যে গাম্ভীর্য দেখা যায়নি, আজ অষ্টম দিনের সোনালী সকালে তার ছায়া পড়েছে ওমুখে।

প্রতি পাঠাগারের যোগ্য পুস্তক

জাতিস্মর কথা

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু প্রণীত।

এরূপ পুস্তক বাংলাভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

বিদগ্ধ সমালোচকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

‘দেশ’ পত্রিকা—যে বিষয়বস্তু নিয়ে লেখক অবতীর্ণ হয়েছেন, তা একেবারে অভিনব বলা চলে।

‘অমৃত’ পত্রিকা—কাহিনীগুলি চমকপ্রদ, রহস্য উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর। ভূমিকাটি সুদীর্ঘ। এই জাতীয় গ্রন্থ এক হিসাবে এই প্রথম, সেই কারণে লেখককে অভিনন্দন জানাই।

আনন্দবাজার পত্রিকা—বইটি পাঠকদের খুবই ভাল লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান : প্রকাশক ঘাটশীলা কোম্পানী। ৩, ম্যাসো লেন, কলিঃ—১

ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২নং কণ্ঠওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিঃ—৬

দাশগুপ্ত, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি প্রভৃতি প্রধান পুস্তকালয়ে।

আতঙ্কের আতঙ্ক

কগাদ চৌধুরী

অল্প-বিস্তার আমরা প্রায় সকলেই আতঙ্কের হাতে খেলনা। কিছু না কিছু ভয় আমাদের আছে। ভূতের ভয়ে ত প্রায় গৃহপালিতই বলা যেতে পারে। তবে বিপদসমীমা অতিক্রমিত না হলে আমরা অহেতুক আতঙ্কে বিশেষ আমল দিই না। আতঙ্কের ইংরেজী প্রতিশব্দ “ফোবিয়া”। সম্প্রতি জনৈক আমেরিকান মনোসমীক্ষক আতঙ্ক সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন যে, একজন সাধারণ লোক ২-২১টি আতঙ্কে মহামান। মহিলারা অপেক্ষাকৃত বেশি ফোবিরয়কবলিত। প্রতিটি মহিলাই প্রায় ৩-৫টি আতঙ্কের আক্রমণে অস্থির। যে ১৭০১টি লোককে উক্ত মনোচিকিৎসক পরীক্ষা করেছেন তারা মোট ৬,৪৫৬টি ভয়ের কথা স্বীকার করেছেন। তাদের ফোবিয়াগুলি বিভিন্ন এবং বিচিত্র ধরনের।

Gynophobia

—মহিলাতঙ্ক।

Cynophobia

—কুকুর ভীতি

Ailurophobia

—মার্জার ভীতি

Mysophobia

—সংক্রমণ ভীতি

Tapophobia

—জীবন্ত সমাধির ভয়

Pyrophobia

—অগ্নিভয়

Keraunophobia

—বজ্রাতঙ্ক

Astraphobia

—বিদ্যুতাতঙ্ক

Klopsophobia

—তস্করাতঙ্ক

Triskaidekaphobia

—১৩ সংখ্যার

ভীতি (আনলাকি থার্টন!)

Gephyrophobia

—সেতু অতিক্রম

ভীতি

Nyctophobia

—অন্ধকার ভয়

Claustrophobia

—আবদ্ধ ভীতি

Acrophobia

—উচ্চতা ভীতি

Agoraphobia

—মুণ্ডাঙ্গন ভীতি

Ophidiophobia

সর্পাতঙ্ক

Ochlophobia

—জনতা ভীতি

Panophobia

—সর্ব ভূতে ভয়

Androphobia

—মন্দুষ্য ভীতি
ইত্যাদি।

উল্লিখিত আতঙ্কগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ হল বজ্র-বিদ্যুৎ, সর্পসং, অন্ধকার, উচ্চতা, আগুন, ভূত, জন্তু, জানোয়ার, পোকামাকড় (আরশোলা, টিকিটিকি ত আমাদের প্রত্যাহের চেনা ভয়!) এবং বন্যা-ঘণীবাভ্যা। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল ফ্যাশনের মত আতঙ্কও পরিবর্তনশীল। আজকের আতঙ্কে কালকের লোক অকুতোভয়ও হতে পারে। আমেরিকাতে কয়েক বছর আগে জীবন্ত কবরের ভীতি ব্যাপক ছিল। গত শতাব্দীর অনেক বিখ্যাত লোকেরই এই আতঙ্ক ছিল। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসন, হারবার্ট স্পেন্সার, বেঞ্জামিন ডিসরেলী প্রত্যেকেই স্নিয়মাণ ছিলেন এই সমাধির ভীতিতে। ডীন সুইফট ভূগতেন মন্দুষ্যভীতিতে। ‘গ্যালিভাস ট্রাভেল’ তাঁর মন্দুষ্য বিতৃষ্ণার গরলে তাঁর। ফরাসী প্রতীক কবি (হাল আমলেও যার প্রভাব এতটুকু কমেনি, এমন কি বাঙ্গালী কবিদের মধ্যেও) শার্ল বোদলেয়ার কেবল ভাবতেন তাঁকে বৃষ্টি একা ফেলে রেখে যারা যাবার তারা কখন গেছে চলে। চিত্রাভিনেত্রী নর্মী শিয়ারার, এবং ডাচেস অফ উইন্ডসর ছিলেন আবদ্ধ ভয়ে সন্তুষ্ট। ডাচেস যখন প্যারিসে ছিলেন গত মহাযুদ্ধে বিমানাক্রমণের সংকেত হবার পর কিছুতেই তাঁকে ভূগর্ভ ঘরে আশ্রয় নিতে রাজী করানো যায়নি।

যে কোনো রকমেই আতঙ্কের উৎস-কাল হচ্ছে শৈশব। মার ভয় প্রায়ই সন্তানে সংক্রামিত হয়। অন্ধকারের ভয় “জুজু” বাহিত হয়ে অনেক সময় উত্তর

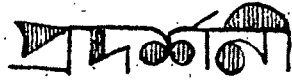
জীবনের সাহসকেও পঙ্খ করে দিতে পারে। আটকে-পড়ার ভয়ে যারা সদাই ভীত, খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তাঁদের অধিকাংশই ছোটবেলায় ঘরে আটক থাকার শাস্তি পেয়েছেন। ভিক্টোরীয় যুগে এই আবদ্ধ ভীতি প্রসারের একমাত্র কারণ ছিল ভিক্টোরীয় জননীরা ছেলে দৃষ্টমুখী করলে আলমারীতে বন্ধ করে শাস্তি দিতেন।

আতঙ্কের আতঙ্কে জয় করার উপায় হল এই অহেতুক ভয়ের উৎসের দিকে চোখ ফেরানো। একবার যদি শৈশবের কুয়াশার মধ্যে শায়িত এই ভয়ের ভূতটাকে ধরতে পারেন, ভয় আর ভয়ঙ্কর থাকবে না আপনার কাছে। এ সম্বন্ধে জনৈক মনোসমীক্ষক একটি চিত্তাকর্ষক গল্প বলেছেন। বাইশ বৎসরের জনৈক মহিলা, ছোটবেলা থেকেই জল শব্দে নিদারুণ ভীতি ছিল। এমন কি কল থেকে জল পড়ার শব্দও তিনি আতঙ্কিত হতেন থেকে থেকে। ছোটবেলায় তাঁকে স্নান করানো ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। একবার মহিলাটির বাড়ীতে তাঁর এক মাসী এলেন বেড়াতে। সন্ধ্যা ১৩ বছর বোনটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। মহিলাটির এই আতঙ্কের কথা যখন শুনলেন মাসী, অনেক দিন আগের একটি ঘটনা মনে পড়ল তাঁর। যখন বোনটির বয়স সাত তখন তিনি তাঁর বোন আর বোনির একবার পিকনিকে যান। মা বোনের কাছে মেয়েকে রেখে একটা সকাল সকাল চলে যান। হঠাৎ মাসীর হাত ছাড়িয়ে সাত বছরের মেয়েটি ছুটোছুটি করতে করতে চোখের আড়ালে চলে যায়। খোঁজাখোঁজের পর তাকে পাওয়া গেল একটা ঝর্ণার ধারের কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাই-এর ফাঁকে। এবং তখন তাঁর মাথার ওপরে এসে পড়ছিল ঝর্ণাটার ফাঁকি এক ধারা। মেয়েটি আতঙ্কে ভীষণ চীৎকার করছিল। বাড়ী ফিরে বোনকে এই দুর্ঘটনার কথা ভয়ে বলেননি মাসী এবং পরেও বলার অবকাশ পাননি তিনি। পরের দিনই তিনি চলে গিয়েছিলেন। এবং এই ঘটনার কিছু দিন পর থেকেই মেয়েটি জলধারাতঙ্কে (জলাতঙ্ক নয়!) ভুগতে থাকে।

মাসীর কাছ থেকে ছোটবেলায় ঘটনাটি শোনার পর থেকে মহিলাটি ক্রমশঃ সাহসী হয়ে ওঠেন এবং আতঙ্কটিকে জয় করতে সক্ষম হন।

আতঙ্ক-লঙ্কার স্নিয়মাণ লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে। কিন্তু তাঁরা যদি জানতেন যে আমরা প্রত্যেকেই প্রায় অল্পবিস্তার আতঙ্ক-ভীরু তাহলে লঙ্কার ঘাটে আর পা ধুতেন না।

একটি একক অনাটি সমবেত প্রদর্শনী



কলারসিক

আনুসারীর শেক্ষসংস্থাহে ক্যাথেড্রাল
রোডের আকাডেমী অফ ফাইন আর্টস
তুবনে শিল্পী অভয় খাটাউ এবং পার্ক
স্ট্রীটের আর্টিস্ট হাউসে পাঁচজন মহিলা
শিল্পী দুটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন
করে কলকাতার কলারসিকদের প্রশংসা-
ভাজন হয়েছেন। প্রদর্শনী দুটি ফেব্রু-
য়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রত্যহ বেলা
৪টা থেকে রাত ৮টা অবধি সর্বসাধারণের
জন্য খোলা ছিল।

॥ শিল্পী অভয় খাটাউ-এর চিত্র-প্রদর্শনী ॥

শিল্পী অভয় খাটাউ বোম্বাইয়ের
শিল্পী: ১৯৪৬ সালে মাত্র ১৯ বছর
বয়সে বোম্বাই শহরে বসন এই শিল্পীর
প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়
তখন অনেক প্রখ্যাত কলা-সমালোচক
তার শিল্প-প্রতিভাকে স্বাগত অভিনন্দনে
অভিষিক্ত করেন। তারপর অনেক কাল
কটে গেছে। সেই তরুণ শিল্পী পৃথিবী
বীর বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন, প্রদর্শনীর
আয়োজন করেছেন এবং বিদেশী কলা-
সমালোচকেরও অনেক প্রশংসার বাণী
কড়িয়ে আবার ফিরে এসেছেন স্বদেশে।
শিল্পী হিসাবে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত।
আমরা খ্যাতি-এর এই নিষ্ঠা ও
সততাকে নিশ্চয়ই প্রশংসা করতে পারি।

কলকাতার মানব এই সর্বপ্রথম
শিল্পী খাটাউ-এর প্রত্যগালি চিত্র-কলার
সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলেন।
১৯৪৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬১
সাল পর্যন্ত রচিত প্রায় ৭০টি চিত্রকলা
এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। নানা
রীতি, নানা মাধ্যমে রচিত হয়েছে চিত্র-
গুলি। বিষয়বস্তু নির্বাচনেরও কোনো
নির্দিষ্ট সীমারেখা গ্রহণ করা হয়নি।
যখন শিল্পীর মা ভাল লেগেছে, মন
টেনেছে, তখন তাকেই তিনি কখনো
প্যাঁটেনো কখনো জল-রঙে আবার
কখনো তেল-রঙের মাধ্যমে কাগজে কিংবা
ক্যানভাসের উপর ধরে রাখবার চেষ্টা
করেছেন। শিল্পী অভয় খাটাউ যেন এক
রপমূর্তি মস্ত শিল্পী। ফলে, তাঁর চিত্র-
কলাও কোনো নির্দিষ্ট মান রক্ষা করতে
পারেনি। তবে সামগ্রিক বিচারে এই
প্রদর্শনী দেখে যে-কোনো দর্শক শিল্পী
খাটাউ-এর সজীব শিল্পী-সত্তাকে
নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন বলে
আমাদের বিশ্বাস।

এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন মাধ্যমে
রচিত কাজের মধ্যে যেমন কিছু সাধারণ-
স্তরের কাজ আছে তেমন কিছু কাজ
আছে বা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। তবে
একটি ব্যাপারে তিনি প্রায় সর্বদাই
নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। সেটি হলো
তার ড্রয়িং সম্বন্ধে চেতনা। অনেক চিত্রের
সংস্থাপন কিংবা রঙ প্রয়োগ-পদ্ধতি
হয়তো ভাল নাও লাগতে পারে কিন্তু
তার বলিষ্ঠ রেখার টান চোখ না টেনে
পারবে না। যাহোক তাঁর প্রতিকৃতি চিত্র
'কারমেন' (৬), 'কর্মকার' (১০),
'কাথিওয়াড়ের কৃষক' (১৫), 'গ্রামের
আসর' (১৭), বালি, জাপান, স্পেন ও
আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানের নৃত্য, বিশেষ
করে মাসাই উপজাতিদের বিভিন্ন বলিষ্ঠ-
রূপ তাঁর চিত্রের মাধ্যমে যেভাবে প্রকা-
শিত হয়েছে তা দেখে আমরা মুগ্ধ
হয়েছি।

১৯৪৯ সালের শিল্পী খাটাউ ১৯৬১
সালে যে নতুন শিল্প-জিজ্ঞাসায় উদ্বে-
লিত তা এই প্রদর্শনী দেখে স্পষ্ট অনু-
ভব করা যায়। উপেক্ষিতা ছায়াবৃত্তা
আফ্রিকার জন্য তিনি তাঁর শিল্পী-মনের
ঘেটুকু দরদ ঢেলে দিয়েছেন তার জন্য
তাকে আমরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।
আশা করি শিল্পী খাটাউ এইভাবে তাঁর
শিল্পী-জীবনের ক্রমবিকাশমান জয়যাত্রা
অব্যাহত রাখবেন। এই কলকাতার অদূর
ভবিষ্যতে আমরা তাঁর নতুন প্রদর্শনী
দেখার প্রতীক্ষায় রইলাম।

॥ পঞ্চ মহিলাশিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনী ॥

পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট হাউসে
আয়োজিত পঞ্চ মহিলাশিল্পীর চিত্র-
প্রদর্শনীটি একটু নতুন আশ্বাদ পরি-
বেশন করেছে। কলকাতায় ইদানীং সম-
বেতভাবে চিত্র-প্রদর্শনী করার রেওয়াজ
চালু হয়েছে। তবে তার প্রায় সবগুলিরই
উদ্যোক্তা হলেন পুরুষশিল্পী। নারী-
শিল্পীরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এদিকে এখনো
লক্ষণীয়ভাবে অগ্রসর হননি। সব দিক
দেখে-শুনে মনে হচ্ছে তাঁরাও আর
পিছিয়ে থাকবেন না। এই পঞ্চ মহিলা-
শিল্পী সৈদিক দিয়ে পঞ্চ-প্রদর্শকের কাজ
করলেন বোধহয়। পঞ্চ মহিলাশিল্পীর
এই প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় আর-একটি
বিষয় লক্ষ্য করলাম। পঞ্চজনের একজন

মাত্র বাঙালী মহিলা অন্য চারজনই
বিদেশিনী। চারজন বিদেশিনীর সঙ্গে
একজন বঙ্গ-ললনার এই সংযোগ নিশ্চয়ই
অনেকের কৌতুহলের কারণ হবে।

আমরা সেই কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত
না হয়ে প্রদর্শনীর চিত্রকলা সম্বন্ধে
আলোচনা করাই প্রায়ঃ মনে করছি।
বস্তুতঃ, শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে আলো-
চনা করাই আমাদের লক্ষ্য, তাঁদের জাত-
গোত্র নির্ণয়ের প্রশ্ন অব্যাহত।

পঞ্চ মহিলার এই প্রদর্শনীতে শ্রীমতী
মীনাঙ্কী গুস্তার ১৪ খানি, জাঁ
লোংগেলীনের ১০ খানি, গুলু ম্যাকার্থির
১৯ খানি, লোলী পারোথের ১৭ খানি ও
হেটি রোগের ২৪ খানি চিত্রকলার নিদ-
র্শন স্থান পেয়েছে। সর্বমোট এই ৮৪
খানি চিত্রের মধ্যে দু'খানি বাদে আর
সবই রচিত হয়েছে তৈল-রঙের মাধ্যমে।
আলোচ্য শিল্পীদের কাজ এখনও পরি-
ণতির অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এই পরীক্ষা-
নিরীক্ষার স্তরেও এই পাঁচজনই একটি
বিষয়ে খুবই সাফল্য অর্জন করেছেন
বলে আমাদের বিশ্বাস। এরা প্রায়
প্রত্যেকেই ফুলের স্থিরচিত্র রচনার
চমৎকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ফুলের
এমন নিখুঁত জীবন্ত স্ট্যাড সম্প্রতি-
কালের খুব কম প্রদর্শনীতেই লক্ষ্য করা
গেছে। ফুলের স্ট্যাডের মধ্যে ৭, ২২, ৩০,
৪০, ৪১, ৭৯ নং চিত্রগুলি নিঃসন্দেহে
সকলের ভাল লাগবে। আর, এই ব্যাপারে
শ্রীমতী গুলু ম্যাকার্থি সবচেয়ে দক্ষতা
প্রদর্শন করেছেন।

নিসর্গ চিত্র রচনাতেও শ্রীমতী
মীনাঙ্কী গুস্তার 'সুইস লেক' (২),
জাঁ লোংগেলীনের 'দি লিডো' (২৪),
গুলু ম্যাকার্থির 'ট্রিজ' (৩৬), দার্জিলিং
(৩৭), হেটি রোগের 'হেমন্ত' (৬৬),
'প্রতিবিশ্ব' (৬৯), 'দি ব্লক' (৭৭)
যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এর মধ্যে
শেষোক্ত দুইজন শিল্পীর কাজ সবচেয়ে
ভাল হয়েছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে
'দি রিভার' (৪), 'দি ডকস' (১৯),
'স্টীম লাইফ উইথ ফিশ' (২৯), 'স্পেনিশ
ম্যুরাল' (৫৬), 'দি পিপস' (৬২),
'ড্রিফট উড' (৭৫) প্রভৃতি চিত্রগুলিও
অনেকের ভাল লাগবে।

পঞ্চ মহিলাশিল্পীরা যদি সবসম-
বিনোদনরূপে শিল্পের এই জগৎকে গ্রহণ
না করে থাকেন এবং যদি প্রকৃত শিল্প-
নিষ্ঠা ও সততার ভবিষ্যতে এদিকে অগ্র-
সর হন, তবে তাঁরা তার পুরুষকার
পাবেন বলে আমরা আশা পোষণ করি।
আমরা এই পঞ্চ মহিলাশিল্পীর
উদ্দেশ্যে আজ তাই অভিনন্দন জানিয়ে
আলোচনা শেষ করছি।

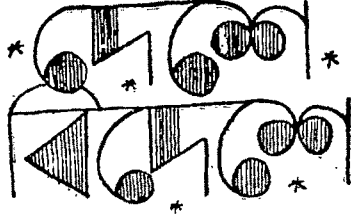
॥ সিংহলে সামরিক ষড়যন্ত্র ॥

গত ২৭শে জানুয়ারী মধ্যরাত্রে সিংহলের মহিলা প্রধানমন্ত্রীর অন্যান্য মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী রাষ্ট্রক্ষমতা দেখলের উচ্চপদস্থ করেছিলেন তা সরকারী তৎপরতায় অন্ধুরেই বিনষ্ট হয়েছে। যারা ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাদেরও প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হয়েছেন।

কিন্তু সিংহলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এখন মোটেই শান্ত বা নিরাপদ নয়। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে জোরালো বিরোধ ত আছেই সেখানে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাষা-বিরোধ, ধর্ম-বিরোধ, সিংহলী-ভারতীয় বিরোধ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক সংকট। সিংহলের জাতীয় সম্পদ বলতে আছে শুধু কফি, রবার ও নারকেল। কিন্তু তিনটি পণ্যেরই আন্তর্জাতিক বাজার এখন ভাল নয় বলে সিংহলের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বের সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে সিংহলের বন্দর-শ্রমিকদের ধর্মঘট চলেছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাগিচা, শ্রমিকদের ধর্মঘট, ব্যাংক ধর্মঘট ইত্যাদি বহুতর শ্রমিক অসন্তোষ। গত ৫ই জানুয়ারী শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে সারা দেশ জুড়ে একটি সাধারণ ধর্মঘটেরও আহ্বান জানানো হয়েছিল, যদিও তা সফল হয়নি। সুতরাং সামরিক অভ্যুত্থান জাতীয় বৈপর্যায় ঘটনাবলীর উপযুক্ত পরিবেশই সৃষ্টি হয়েছে সারা সিংহলে। এ অবস্থায় আপাতত ক্ষমতালব্ধদের অভ্যুত্থান প্রয়াস ব্যর্থ হলেও তার সমূহ সম্ভাবনা লোপ পেয়েছে একথা ভাবলে ভুল করা হবে। যতদিন সিংহলের অর্থনৈতিক সংকটের প্রকৃত সমাধান না হচ্ছে ততদিন ষড়যন্ত্র ও সামরিক অভ্যুত্থানের আশংকা অপরিবর্তিতই থাকবে। সুতরাং ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে শ্রীমতী বন্দরনায়কের মন্ত্রিসভা যে কৃতিত্ব ও তৎপরতা দেখিয়েছেন জাতীয় সমস্যাগুলিরও তাঁরা সেইভাবে সমাধান করুন, সিংহলের শত্রুতর্কিমাত্রেরই আজ এই কামনা।

॥ নেপালে অভ্যুত্থান ॥

স্বৈরতন্ত্রী রাজশাসনের বিরুদ্ধে নেপালের প্রজাপুঞ্জের অভ্যুত্থান ক্রমেই শক্তিশালী ও দূর্নিবার হয়ে উঠছে। শাসকপক্ষ থেকে গোড়ার দিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভগুলিকে অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই তা সংঘবদ্ধ ও সুপরিচালিত রূপ পরিগ্রহ করাতে সরকারী পীড়নযন্ত্রণ ও উত্তরোত্তর সক্রিয় ও নিয়মিত হয়ে উঠছে। বিক্ষোভ অবশ্য তাতে থামেনি। সম্প্রতি রাজা মহেন্দ্রের বক্তৃতার উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি বক্তৃতা-মঞ্চ বিক্ষুব্ধ দেশকর্মীদের বোমার



আঘাতে ভূমিসং হয়েছিল। তার পরদিন স্বয়ং রাজা মহেন্দ্রকেই লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ করে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে। নেপালের অধিকাংশ নেতা আজ কারাগারে বন্দী, অল্প কয়েকজন গ্রেপ্তারী এড়িয়ে পালিয়ে এসেছেন প্রতিবেশী রাজ্য ভারতে। অপর প্রতিবেশী রাজ্য কমিউনিস্ট চীন আজ রাজতন্ত্রী নেপালের বিশেষ বন্ধু, সে কারণে সেখানে আশ্রয়-প্রার্থী নেতাদের যাওয়া সম্ভব ছিল না। গণসমর্থনহীন নেপালের বর্তমান শাসকবর্গের সব আক্রোশ, এখন তাই ভারতের ওপর ফেটে পড়েছে। নেপালের বর্তমান বিক্ষোভগুলির পরিচালনা কয়েকজন পলাতক দেশদ্রোহীকে ভারত আশ্রয় দিয়ে অনায়াস করেছে এই হল ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ। নেপালে অবস্থিত ভারতের কয়েকটি বাণিজ্য ও রাষ্ট্র দূতাবাসও বিক্ষোভ দেখিয়ে নেপালের পক্ষ থেকে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী নেপালী নেতৃবৃন্দের প্রতাপণ দাবী করা হয়েছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত কয়েকবার নেপালের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে কিন্তু নেপাল সরকার তাতে কণপাত করেননি।

তবে নেপাল সরকারের বক্তব্য যাই হোক না কেন, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী নেপালী নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আজ নেপালকে একথা জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রাজনৈতিক অপরাধীকে আশ্রয় দিতে ভারত সরকার বাধ্য। নেপালের অনুন্নতভাবে রাজনৈতিক কারণে দেশত্যাগী কোন ব্যক্তির প্রতাপণের দাবী জানানোর অধিকার নেই। তাছাড়া প্রতিবেশী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা চলেছে সেটাও ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

॥ সুরাবদী গ্রেপ্তার ॥

ষড়যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে পাক সরকার পাকিস্থানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব সুরাবদীকে গ্রেপ্তার করেছেন। তিরিশে জানুয়ারী সকাল পাঁচটায় পুলিশ তাঁর বাসভবন ঘেরাও করে এবং বেলা সাড়ে সাতটায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে অজ্ঞাত স্থানে চালান দেওয়া হয়। সুরাবদীর অন্তরঙ্গ মহলের সংবাদে প্রকাশ, তাঁকে নিবর্তনমূলক আটক আইনে এক বছরের জন্যে আটক

রাখা হবে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, জনাব সুরাবদী যে আইনে বন্দী হয়েছেন, সে আইন তাঁরই মন্ত্রিকালে দুই-বার সংশোধিত হয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে। সুরাবদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয়েছে—“দুঃখের বিষয়, তাঁহার মত বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিকের মত দেশসেবায় লিপ্ত না হইয়া ধনসমুলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।... এমতাবস্থায় সরকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিঃ সুরাবদীকে আটকের আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছেন।”

তাঁর গ্রেপ্তারের প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি, সুতরাং এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা উচিত হবে না। তবে সত্যিই দুঃখ হয় এইসব অতি-বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্যে। আজ যদি ভারত অবিভক্ত থাকত তবে জনাব সুরাবদী, খুরো, ফিরোজ খাঁ নূন প্রমুখ ব্যক্তির শত্রু নিজ নিজ প্রদেশের অবিসংবাদিত শাসকই হতেন না, দশ কোটি মুসলিমের নেতারূপে ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতেও তাঁদের ভূমিকা হত অপ্রতিহত। কিন্তু আরও প্রভাব চাইতে গিয়ে আজ এক উদ্ভত বেশী বচাবকের নীচে সাক্ষীর বাঘের মৈনিকের নিতান্ত নিরুপায়ের মত ওর্দমত তাঁদের হচ্ছে। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে বস করতে হচ্ছে। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে আজ পাকিস্থানের প্রজাদের, তাতে মনে হয়, কয়েদে আজম জিন্দা বা জনাব লিয়াকৎ আলী বোখ হয় মরে বেঁচেছেন।

॥ অবলুপ্তি ॥

সুপ্রীম সৌভিয়েটের অনুমোদনক্রমে সৌভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র মলোটোভ, ভেরাশিলভ, কাগানোভিচ ও মালেনকোভের নাম মুছে ফেলার কাজ আরম্ভ হয়েছে। সুপ্রীম সৌভিয়েটের অনুমোদনক্রমেই একদিন রাশিয়ার এই চারজন হুতগোরব নেতার নামে ৮৪টি শহর, গ্রাম, রাস্তা, খামার, কারখানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছিল। আজ আবার সেই সুপ্রীম সৌভিয়েটেই তাঁদের নাম মুছে ফেলার প্রস্তাব অনুমোদন করল, এবং বলা বাহুল্য, সুপ্রীম সৌভিয়েটের পরস্পর-বিরোধী এই দুটি সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছে সর্বসম্মতি-ক্রমেই। এ চারজন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল যে তাঁরা পার্টি-বিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে সৌভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে প্রাক্তন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মলোটোভের নামে মোট ৩৫টি শহর, গ্রাম, খামার, কারখানা প্রভৃতির নামকরণ করা হয়েছিল। আর গত ৩০শে জানুয়ারী সৌভিয়েট ইউনিয়ন থেকে এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে রাশিয়ার রাষ্ট্র-জীবনে মলোটোভের আর কোন অস্তিত্ব

নেই। সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটেছে তার। তিনি যে কোথায় আছেন এখন তাও কেউ জানে না। গত মাসে মঃ স্ট্যালিনকেও ঠিক এমন ভাবেই নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে সমগ্র রাশিয়া থেকে।

॥ আফ্রিকার শীর্ষ সম্মেলন ॥

নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগোসে আফ্রিকার কুড়িটি রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল। 'কাসায়াঙ্কা জোট' নামে পরিচিত আফ্রিকার পাঁচটি রাষ্ট্র ঘানা, গিনি, মালি, মরক্কো ও মিশর এই সম্মেলনে যোগদেয়। কারণ তাদের দাবী মত আলজিরিয়ার অস্থায়ী সরকারকে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আমন্ত্রণ জানাননি। বলা বাহুল্য, আফ্রিকার এই কুড়িটি রাষ্ট্র মোটামুটিভাবে পশ্চিমী জোটের সমর্থক বলেই তারা আজাদ আলজিরিয়া সরকারকে সম্মেলনে ডেকে ফ্রান্সকে অসন্তুষ্ট করতে চাননি। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বহু আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র গঠন অসম্ভব ধরে নিয়েই আলোচনা শুরু করেছিলেন এবং নিজেদের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর করার ওপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কণ্ঠা সমস্যাকে স্বাস্থ্য পরিষদে উত্থাপনের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে সম্মেলনে তার নিন্দা করে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের সহযোগিতায় কণ্ঠার কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংকট ও সমস্যাগুলির সমাধান করছেন। এ অবস্থায় কণ্ঠা প্রসঙ্গ আবার স্বাস্থ্য পরিষদে উত্থাপিত হ'লে কণ্ঠার সমস্যা ক্ষতি হবে।

অপর এক প্রস্তাবে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এংগোলায় পতঙ্গীজদের বর্বর নির্যাতন ও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বর্ণ-বিশেষী নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এ দুটি রাষ্ট্রকেই অর্থনৈতিক একঘরে করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

॥ নিষ্ফল বৈঠক ॥

পারমাণবিক পরীক্ষা স্থগিত সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ জারাপকিন গত ২৯শে জানুয়ারী সম্মেলনের শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন, সম্মেলন সফল হওয়ার আশাতত আর কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং তিনি মস্কো ফিরে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ৩৫টি বৈঠক হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের পক্ষ থেকে

একটা যুক্তি বিবৃতি প্রচার করাও সম্ভব হয়নি।

দু'পক্ষই যখন নতুন করে আবার বেপরোয়াভাবে পারমাণবিক পরীক্ষা শুরু করেছেন তখন পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের আলোচনা সত্যি অর্থহীন, সুতরাং অসম্ভবের পেছনে অর্থহীনভাবে ছুটে অকারণে সময় অপচয় না করে সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত কাজই করেছেন। কিন্তু এই ধরনের একটা সম্মেলনে বসে পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসা যে বিশেষ জরুরী ছিল তাই বা ভোলা যায় কি করে?

॥ কিউবার বিদায় ॥

আমেরিকা মহাদেশের একশটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের জেদই বজায় রইল। 'অর্গানিজেশন অফ দি আমেরিকান স্টেটস' নামক আন্তঃ আমেরিকা রাষ্ট্র-সংস্থায় কিউবা এতদিন পর্যন্ত অন্যতম সদস্য ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবীর কাছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলি শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। কিউবাকে সে সদস্যপদ ত্যাগ করতে হ'ল। কিউবা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্র, অতএব আমেরিকার কোন রাষ্ট্রসংস্থায় তার থাকার অধিকার নেই—এই অর্থহীন যুক্তি দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বহিস্কার দাবী করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবটি নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে পাঁচদিন ধরে আলোচনা চলে। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে ১৪টি ভোট সংগ্রহ করে যুক্তরাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয় স্প্রিং কিউবা, এবং ছয়টি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকে। বলা বাহুল্য, কিউবার এতে কোন ক্ষতি হবে না, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেদিন তার বিরোধ শুরু হয়েছে, আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গেও কার্যত সেই দিন থেকেই তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। এখন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্যের বিরুদ্ধে যথেষ্ট দাঁড়াতে পারে এমন নেতৃস্থানীয় আজ আমেরিকার কোন রাষ্ট্রেই নেই। আন্তঃমার্কিন সংস্থার ওপর চাপ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আজ যা করল তার ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাকেই হতে হবে সবচেয়ে বেশী। সারা আমেরিকার সাধারণ মানুষের কাছে আজ এইটাই আরও একবার যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ করল যে, তাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নাম-

মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা বা স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করার স্বাধীনতা তাদের নেই। সুতরাং এর পরে যদি লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিকোড প্রবলতর হয়ে ওঠে তবে সেটা আশ্চর্যের কিছু হবে না।

॥ অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ॥

সাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ কয়েকদিন আগেই পরলোক গমন করেছেন। "চরকাগেম" খ্যাত এই কথাসিঁপীর জন্মস্থান পূর্ববঙ্গ; অধুনা পূর্ব পাকিস্থান। সাহিত্যিক খ্যাতি তিনি লাভ করেন এই উপন্যাসখানি রচনার পর। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে চরকাগেম, ভাঙছে শব্দ ভাঙছে, একটি সংগীতের জন্মকাহিনী, দক্ষিণের বিল, পদ্যাদিঘীর বেদেনী উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদালাপী ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেরই প্রিয় অর্জন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা তাঁর আত্মীয়বর্গের সঙ্গে প্রিয়-বিয়েগের বেদনা অনুভব করছি।

‘রূপার বই

বাঙলা সাহিত্যে জাগ্রত ও
অগ্রগ লেখক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

নতুন গল্পগ্রন্থ

বরবর্ণিনী

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

বঙ্গী

১৫ বঙ্গিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

সবিন্যাস

॥ ঘরে ॥

২৫শে জানুয়ারী—১১ই মাঘ :
শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু (পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল) ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের পদ্ম-বিভূষণ রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ—সাধারণতন্ত্র দিবসে বড়ে গোলাম আলি খান, ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পদ্মভূষণে সম্মানিত—সাহিত্যিক ভরদ্বাজের বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ২৫ জনের পদ্মশ্রী সম্মান লাভ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রথম 'ভারতরত্ন' বলিয়া ঘোষণা।

দেশবাসীকে সম্প্রদায় ও জাতিগত ভেদবিশিষ্ট বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আহ্বান—ভারতের ব্রাহ্মদেশ সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণের ভাষণ।

কাশ্মীর ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ আবদুল্লাসহ ২৪ জন আসামী দায়রায় সোপর্দ।

২৬শে জানুয়ারী—১২ই মাঘ :
ভারতের সর্বত্র সাড়ম্বরে সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত—নয়াদিল্লীর কুচ-কাওয়াজে উপরাষ্ট্রপতির অভিযান গ্রহণ—সদ্যমুক্ত গোয়ায় সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান—কলিকাতার ময়দানে কুচ-কাওয়াজ ও বিরাট জনসভা।

২৭শে জানুয়ারী—১৩ই মাঘ :
গোয়া অভিযানকালে ধৃত পতুগীজ বন্দীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন—পতুগাল সরকারের নিকট ভারত সরকারের নূতন লিপি প্রেরণ।

অণ্টগ্রহ সম্মেলনের (৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী, '৬২) ব্যাপারে বিভিন্ন মহলে আলোড়ন সৃষ্টি—দেশের নানা স্থানে সমারোহসহকারে শান্তি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সংবাদ।

২৮শে জানুয়ারী—১৪ই মাঘ :
যুগোশ্লাব স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মোৎসবের উদ্দেশ্যে—কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন স্থানে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠান—স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত লইয়া দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও প্রদর্শনী।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া পূরণের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দাবী—অন্যথা ডঃ রায়ের (মুখ্য-মন্ত্রী) নির্বাচন-কেন্দ্রে (চৌরঙ্গী) বিরুদ্ধ প্রচার কার্যের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

২৯শে জানুয়ারী—১৫ই মাঘ :
'কাশ্মীরের ব্যাপারে কোন তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ চলিবে না'—প্রেসিডেন্ট কেনেডির (মার্কিন) নিকট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর পত্র—বিরোধ মীমাংসার সালিশের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান।

চীন ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ভঙ্গের কাজ করিয়াছে—কানপুরে সাংবাদিক বৈঠকে কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রী এস এ ডাঙের স্বীকৃতি।

গোয়ায় বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অবসান দাবী—দায়িত্বশীল সরকার গঠনে সারা গোয়া রাজনৈতিক সম্মেলনে (পাঞ্জিম) প্রস্তাব গৃহীত।

৩০শে জানুয়ারী—১৬ই মাঘ :
স্বাধীনতা যজ্ঞের শহীদদের স্মরণে সমগ্র দেশে দুই মিনিট (বেলা ১১টার) নীরবতা পালন—গান্ধীজীর তিরোধান দিবসে কলিকাতা ও দিল্লীসহ ভারতের সর্বত্র শহীদ তপণ অনুষ্ঠান।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ১১ হাজার কর্মীর দুই ঘণ্টা কর্মবিরতি—অতিরিক্ত মাংগী ভাতা নামঞ্জুরের প্রতিবাদ।

৩১শে জানুয়ারী—১১ই মাঘ :
'পাক দাবী অনুযায়ী স্বস্বিত্ত পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্নের আলোচনায় অবস্থার প্রতিকার হইবে না'—জম্মুর জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

২৫শে জানুয়ারী—১১ই মাঘ :
ইন্দোনেশীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক সাধারণ সমাবেশ বিল অনুমোদিত—১৮ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিককে লইয়া বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা।

২৬শে জানুয়ারী—১২ই মাঘ :
কাঠমন্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ—ভারতস্বত্ব নেপালী রাজ-নৈতিক নেতৃবৃন্দের আত্মসমর্পণ দাবী।

নেপালী সীমান্তে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ—গ্যাংটকে সাংবাদিক বৈঠকে সিকিমের মহারাজকুমারের ঘোষণা।

২৭শে জানুয়ারী—১৩ই মাঘ :
মলোটভ, ভরোশিলভ, কাগানোভিচ ও ম্যালেনকভ—এই চারজন শীর্ষস্থানীয় সোভিয়েট নেতার নাম সমগ্র রাশিয়া

হইতে বিলুপ্ত—সুপ্রীম সোভিয়েটের নির্দেশে অভাবনীয় কার্য-ব্যবস্থা।

২৮শে জানুয়ারী—১৪ই মাঘ :
সিংহলে সামরিক অভ্যুত্থানের বিরাট ষড়যন্ত্র বানচাল—সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন পদস্থ অফিসার গ্রেপ্তার।

স্বস্বিত্ত পরিষদে (রাষ্ট্রসংঘ) কণ্ঠে প্রসঙ্গ উত্থাপনে সোভিয়েট ইউনিয়নের উদ্যম—কণ্ঠের প্রধানমন্ত্রী মিঃ সিরিল আদুলা কর্তৃক তাঁর প্রতিবাদ।

২৯শে জানুয়ারী—১৫ই মাঘ :
জেনেভা ট্রিশক্তি আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ বৈঠক ব্যর্থ—ইংগ-মার্কিন পক্ষের সহিত সোভিয়েট পক্ষের মত-বিরোধ।

কাশ্মীর প্রশ্নে স্বস্বিত্ত পরিষদের বৈঠকের জন্য পাকিস্থানের অব্যাহত পীড়াপীড়ি—পরিষদ সভাপতি স্যার প্যাট্রিক ডিনের নিকট স্যার জাফরুল্লাহ (পাক প্রতিনিধি) শ্বিতীয় দফা পত্র—পাক দাবীতে ভারতের পুনরায় আপত্তি।

৩০শে জানুয়ারী—১৬ই মাঘ :
রাশিয়ার দাবী অনুযায়ী কণ্ঠে প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য স্বস্বিত্ত পরিষদের বৈঠক সুরু।

পাক নিরাপত্তা আইনে পাকিস্থানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী করাচীতে গ্রেপ্তার—দেশদ্রোহ ধরনের কার্যকলাপের অভিযোগ।

আন্তঃ আমেরিকান রাষ্ট্রসংস্থা হইতে কিউবা (কাস্ট্রোর নেতৃত্বাধীন) বহিস্কৃত।

আগোলায় দ্রুত শাসন সংস্কার প্রবর্তনকল্পে পতুগালের প্রতি আহ্বান—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে ভোটধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত।

৩১শে জানুয়ারী—১৭ই মাঘ :
সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে পাকিস্থানের শত্রু-দের সহিত সহযোগিতার অভিযোগ—ঢাকায় পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের ঘোষণা।

প্রচণ্ড ঝড়, তুষারপাত ও হিম-প্রবাহে ইউরোপে ব্যাপক ধ্বংসলীলা—মার্কিন ষড়যন্ত্রেও প্রবল হিমপ্রবাহ ও বহু লোকের মৃত্যু।

স্বস্বিত্ত পরিষদে পাক দাবী অনুসারে কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পর্কে বিতর্ক সুরু।

সমকালীন সাহিত্য

অভ্যুত্থান

১১ পাস্তেরনাকের পুনর্বাসন ১১

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রুশ কবি ও ঔপন্যাসিক স্বর্গতঃ বোরিস পাস্তেরনাকের “ডঃ জিভাগো” উপন্যাসের খ্যাতি এবং তাঁর জীবনের নিদারুণ ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা আজ সর্বজন-বিদিত। রবীন্দ্রনাথের কার্দাম্বিনীর মতো বোরিস পাস্তেরনাকেরও “মিরয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছে যে তিনি মরেন নাই”। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ও তজ্জনিত প্রাপ্ত শীতল শান্তি বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। সেই পাস্তেরনাকের এখন পুনর্বাসনের চেষ্টা চলেছে তাঁরই স্বদেশে। এই সংবাদ অবশ্য শ্রুত। কিন্তু সেই সূত্রে বোরিস পাস্তেরনাকের বান্ধবী এবং “ডঃ জিভাগোর” বিখ্যাত নায়িকা লারিসা গুলসার চরিত্রের যিনি আদর্শ, সেই মাদাম ওলগা আইভিনস্কয়ার যে শাসিত হয়েছে তা রহস্য উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর। তাঁর উনিশ বছরের মেরেটিও দাঁড়িত হয়েছে। আন্ত-জাতিক পি-ই-এন সংস্থার ইংরাজী শাখার সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডেভিড কারভার মাদাম আইভিনস্কয়ার এই শাস্তি সম্পর্কে সোভিয়েট লেখক সংঘের সেক্রেটারি মিঃ আলেক্সান্দ্র সুরকোভকে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তর সুরকোভ ইংরাজীতেই দিয়েছেন। তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি : “Who is Ivinskaya? Ivinskaya is a forty eight year old woman, who since 1946, was known as the private secretary of Pasternak and the last mistress of this elderly man who lived until his very last day with his family. In literary circles Ivinskaya was known as an unscrupulous adventuress who advertised her intimacy with Pasternak. Despite her advanced age she did not stop to have many parallel and frequent intimate relations with other men”

মিঃ ডেভিড কারভার আন্তর্জাতিক পি-ই-এনের ইংরাজী শাখার তরফ থেকে এবং “সোসাইটি অব অথরস”র তরফ থেকে মিঃ সুরকোভকে চিঠি লিখেছিলেন, তারবাতী পাঠিয়েছিলেন—মার্জনা-প্রার্থনার অনুরোধ জানিয়ে। পরে এই বিচারের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রার্থনা করেছিলেন। (মাদাম ওলগা আইভিনস্কয়ার আট বছরের কারাদণ্ড হয়েছে মদ্রা সংক্রান্ত অপরাধ এবং জালিয়াতির জন্য রীতিমত

বিচারের পর।) সোসাইটি অব অথরস এবং পি-ই-এনের এই প্রচেষ্টা সুরকোভ একরকম উপেক্ষা করে উড়িয়েই দিতে চেয়েছিলেন। পি-ই-এন কিন্তু সুরকোভের উত্তর মেনে নেননি। সুরকোভের যে-চিঠিখানি পি-ই-এন আজ সাধারণ্যে প্রকাশ করেছেন সেটি অনেক বিলম্বিত জ্বাবে। লিখিত হয়েছে ৩রা এপ্রিল ১৯৬১-তে মিঃ কারভারের তৃতীয় অনুরোধ সম্বলিত ৩০শে জানুয়ারী ১৯৬১-র চিঠির জ্বাবে। মিঃ কারভার শেষপর্যন্ত বিচারের একটি বিবরণ, কিংবা মস্কোস্থ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিচারের রিপোর্টের কপি প্রার্থনা করেছিলেন। কারণ সুরকোভ বলেছিলেন এ একটা মামলার ধরনের বিচারমাত্র। তথাপি এর বিবরণ কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। বিচারের বিবরণও মিঃ কারভার পাননি।

পাস্তেরনাকের বন্ধুরা অবশ্য মাদাম ওলগা আইভিনস্কয়ার এই কারাদণ্ডে বিস্মিত হননি। আইভিনস্কয়ার এবং তাঁর উনিশ বছরের মেয়ে আইরিনাকে ১৯৬০-এর শেষের দিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জননীর আট বছর এবং কন্যার তিন বছর কারাদণ্ড। পাস্তেরনাক ন্যাক ওদের সতর্ক করে বলেছিলেন এমনটি ঘটতে পারে। তাঁর জীবদ্দশায় এমনটা হতে পারে এই সংশয়ও তাঁর মনে ছিল। পাস্তেরনাকের ধারণা হয়েছিল যে সোভিয়েট সরকার তাকে স্পর্শ না করলেও ওলগাকে শাস্তি দিয়ে তাঁর মারফত ওর প্রতি আঘাত হানবেন। জুলাই ১৯৬০-এ পাস্তেরনাকের মৃত্যুকাল পর্যন্ত কিছুই অবশ্য হয়নি। তারপর শব্দ হল এই বিচার।

আইভিনস্কয়ার এই দণ্ডের কথা যখন ১৯৬০-এর শেষার্শ্বে পশ্চিমা-গুপ্ত পৌছায় তখন পাছে ওলগার শাস্তির পরিমাণ বেড়ে যায় তাই তার সাহায্যের জন্য প্রকাশ্যে কোনও চেষ্টা না হলেও গোপনে কিছু কিছু ভাবের তদারক করা হয়। তারপর যখন সমগ্র ঘটনা প্রকাশিত হয় তখনই মিঃ কারভার পি-ই-এন এবং “সোসাইটি অব অথরস”র তরফ থেকে সাহায্যের যে

প্রকাশিত হ'ল
বিমল কর
এই দেহ অন্য মুখ
দাম ৩.০০

রবীন্দ্রনাথ

প্রথম চৌধুরী ১২.০০

রাজবুলি

রূপদর্শী দাম ৩.৫০

সুভাষ মদ্যোপাধ্যায়

যখন যেখানে

দাম—২.৭৫

আর্ট পেপার জ্যাকেট সমৃদ্ধ



গ্রন্থ ভারত :

৪১বি, রাসবিহারী এডেন,
কলি-২৬, ফোন : ৪৬-৭৫২৯

১।০২।এফ, প্রিন্স গোলাম মহঃ রোড, কলি-২৬
ফোন : ৪৬-৮৪৭৫

যে কয়জন আধুনিক লেখক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছেন “বিমল কর” তাদের মধ্যে বিশিষ্ট, অন্যতম এবং মননশীল রচনা ও চরিত্রের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে গভীরতম বিশ্লেষণের ক্ষমতায় নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্য।

স্বপ্ন সঞ্চার দাম ৩.৫০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম লগনে দাম ৪.৫০

ডাঃ আনন্দকিশোর মন্সী

দেশ, আনন্দবাজার, স্বাধীনতা প্রভৃতি পত্রিকার প্রশংসানু গ্রন্থটি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ, আধুনিক কবির শ্রেষ্ঠতম গদ্য রচনা। প্রখ্যাত শিল্পি চিত্রপ্রসাদের অঙ্গসজ্জা, খালেদ চৌধুরীর রেখাঙ্কন ও নিতাই দেব জ্যাকেট ডিজাইন চমকপ্রদ।

প্রাপ্তিস্থান

কথা শিল্প :

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলি-১২

নিষ্ফল প্রচেষ্টা করেন তার ফলেই আজ সমগ্র ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছে। সুরকোভ মিঃ কারভারের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মাদাম ওলগা আইভিনস্কয়ার সম্পর্কে চরিত্র-বিবরণসহ এক সুদীর্ঘ বিবৃতি দান করেছেন। তিনি অবশ্য বলেছেন যে—

"It is very unpleasant to write all this about a woman, but those who take her under their protection must know what sort of a person Ivinskaya is."

পি-ই-এন কিন্তু মাদাম আইভিনস্কয়ার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে এতটুকু অনুসন্ধানও করেনি না। তাঁর অপরাধ এবং তার গুরুত্বটুকু উপলব্ধি করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সুরকোভ যদিচ বলেছেন যে তিনি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ বিচারকাহিনী স্বয়ং পাঠ করেছেন, তথাপি সেই বিষয়ে কোনো তথ্যই তিনি তাঁর এই পত্রে পরিবেশন করেননি।

মাদাম ওলগা আইভিনস্কয়া নাকি নিয়মিতভাবে 'ডঃ জিভাগো'-র বিদেশী সংস্করণ বাবদ পাস্তেরনাকের প্রাপ্য রয়্যালটি আদায় করেছেন। এই অর্থ বে-আইনীভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার আনা হত সিনর দ্য' এঞ্জেলো নামক জনৈক ব্যক্তি মারফত। সেই সমস্ত অর্থ ওলগা ব্যক্তিগত ব্যবহারে ব্যয় করতেন। এই লেন-দেন সম্পর্কে পাস্তেরনাক ও তাঁর পরিবার কিছুই জানতেন না। সুরকোভ বলেছেন—এই জালিয়াতির প্রমাণ হিসাবে জানা গেছে যে প্রথম দফায় পাস্তেরনাকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ওলগা মোটা টাকা পেয়েছেন, এবং পাস্তেরনাকের স্ত্রী এবং পরিজন-বর্গ তাঁকে বলেছেন যে পাস্তেরনাক কখনই এই অর্থ নিতেন না। তিনি তাঁর ন্যায়সংগত সোভিয়েট উপার্জনেই দিন কাটিয়েছেন। এই উপার্জনের পরিমাণ সুরকোভের মতে পাস্তেরনাকের জীবনের শেষ আড়াই বছরে প্রায় ৪৯৬,০০০ রুবলের মত।

পি-ই-এন মিঃ সুরকোভের এই-সব উক্তি তেমন আগ্রহ প্রকাশ না করে মাদাম ওলগার প্রতি মার্জনা-ভিক্ষার জন্য বিচারের একটা প্রকৃত বিবরণ প্রার্থনা করেছিলেন। তাই মিঃ কারভার আবার ২৬শে এপ্রিল ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে লিখলেনঃ—

"মাদাম আইভিনস্কয়ার ব্যক্তিগত চরিত্র পাস্তেরনাকের মৃত্যুর ঠিক পূর্বে যাই থাকুক না কেন, কবির জীবনে যে বিগত চৌদ্দ বছরকাল ধরে তিনি এককভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে গেছেন, এবং তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে যাই কিছু প্রমাণিত হোক বিচারের দ্বারা তদ্বারা নিশ্চয়ই প্রভাবিত হবে না আশা করা যায়।

আপনার চিঠিতে মাদাম ওলগার কন্যা সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। তার দণ্ডের সংবাদ পশ্চিম জগতের মানুষকে বিশেষভাবে আহত করেছে। আমি এই আশা করি যে আপনি আপনার ইংলণ্ডে অবস্থানকালে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মাদাম আইভিনস্কয়া কয়েক মাসের মধ্যেই মৃত্যুলাভ করবেন। আশা করি আপনার চিঠিতে যে সব কথা উল্লেখ করেছেন তজ্জন্ম তাঁর মৃত্যুর পথ রোধ হবে না।"

মার্চ ১৯৬১-তে যখন সুরকোভ ইংলণ্ডে এসেছিলেন তখন পাস্তেরনাকের জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে এইসব কথা হয়। সেইকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ক্রুশ্চেভ জামাতা "প্রাভদা" সম্পাদক মিঃ এডজুবেই। "প্রাভদা" সম্পাদকের কাছে কিছু প্রামাণিক তথ্যাদিও ছিল। পি-ই-এনের কতৃপক্ষদের মতে তার মূল্য অতি তুচ্ছ। আর ছিল একটি স্বীকৃতির ফটোকপি,—স্বীকৃতির তলায় মাদামের স্বাক্ষর ছিল। তাঁর এই স্বীকৃতির সঙ্গে অন্য অসংখ্য স্বীকৃতির কোনো প্রভেদ নেই।

এডজুবেই এবং সুরকোভ যখন দেখলেন যে তাঁদের দলিল দস্তাবেজের প্রতি কেউ তেমন গুরুত্ব দান করছেন না, তখন তাঁরা মাদাম ওলগার বৈ-জীবন সম্পর্কিত কুৎসা প্রচার শুরু করলেন। যা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।

সুরকোভ সেইসঙ্গে ইংলণ্ডে বলেন যে সোভিয়েট সরকার পাস্তেরনাকের প্রাপ্য অর্থাদির আইনসংগত হস্তান্তরের জন্য সহায়তা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পাস্তেরনাক সেই ব্যবস্থায় সম্মতি দান করেননি। এই কথার অর্থ এই যে তিনি এই অর্থ স্পর্শ করতেও চাননি। আইভিনস্কয়া পাস্তেরনাকের ইতালীয় প্রকাশককেও প্রতারণা করেছেন।

পি-ই-এনের মতে পাস্তেরনাকের বন্ধুবান্ধবদের কাছে লিখিত পত্রাদি এই কথার সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য দান করে। পাস্তেরনাক-ই আইভিনস্কয়ার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিষয়ে সংবাদ প্রচার করেছেন, আইভিনস্কয়া নয়। বিশেষতঃ ১৯৪৬-এ আইভিনস্কয়ার প্রথমবার রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তারের পর পাস্তেরনাকই তাঁর এই বান্ধবীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার কথা প্রচার করেন। দুর্দিনের দুঃসহ মুহূর্তে আইভিনস্কয়াই পাস্তেরনাককে নিজের বিপদ তুচ্ছ করেও অনেকভাবে সাহায্য করেছেন। পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে দেশ-দ্রোহিতামূলক সকল প্রকার অভিযোগের বিরুদ্ধে আইভিনস্কয়া সৈদন্য বর্মের মত ব্যবহৃত হয়েছিল। কতৃপক্ষদের সঙ্গে পাস্তেরনাকের পক্ষ থেকে পত্রাদি লিখতেন আইভিনস্কয়া, তাদের রোষ-

বহির্ভূত শান্তির জল সিঞ্জন করতেন, এবং অন্তিমকাল পর্যন্ত পাস্তেরনাকের সঙ্গে তিনি পত্রালাপ করেছেন। সুরকোভের ইংগিত যে পাস্তেরনাক কপদকহীন ছিলেন না একটা ঠিক নয়, সিনর দ্য' এঞ্জেলোর সাহায্যে তাঁকে অর্থসংগ্রহ করতে হয়েছে, অন্য কেন্দ্রে পল্টা না থাকায়।

৬ই মে তারিখের Sunday Telegraph নামক পত্রিকায় সিনর দ্য'এঞ্জেলোর এক বৃহৎ খোলা চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে সোভিয়েট নিরাপত্তা বিভাগের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই অর্থাদি হস্তান্তরিত হত। পাস্তেরনাকের মৃত্যুর পর মাদাম আইভিনস্কয়া এবং তাঁর কন্যাকে বিলুপ্ত করার জন্যই এই সব অভিযোগের উদ্ভাবনা। সুরকোভ দ্য'এঞ্জেলোকে বলেছেন, "International swindler" এবং মাদাম আইভিনস্কয়া হলেন "dirty cynics, profiteers and evil spirits in the life of the outstanding and subjectively profoundly honest poet Boris Pasternak"...

দ্য'এঞ্জেলোর খোলা চিঠি প্রকাশের পরই পি-ই-এনের তরফ থেকে মিঃ কারভারকে সুরকোভ-লিখিত পত্র প্রকাশ করতে হয়েছে। দ্য'এঞ্জেলো বলেছেন—
—".this is utterly false, as was demonstrated last May when I caused to be published some letters written in Pasternak's own hand in which the writer, whom you persecuted during his life and pretend to admire him after his death, said that he was in a precarious economic state and asked that a part of the income from "Dr. Zivago" should be sent to him directly, that is in the only way he considered possible...."

সিনর দ্য'এঞ্জেলো মাদাম আইভিনস্কয়াকে তছরূপের বা জালিয়াতির দায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সে সম্পর্কিত দলিলপত্র তাঁর কাছে আছে। পাস্তেরনাক ও তাঁর পরিজনবর্গ প্রভৃতি সকলের জ্ঞাতসারেই এই অর্থাদি হস্তান্তরিত হয় তার প্রমাণ আছে। সিনর ফাটিনেলী (ইতালীয় প্রকাশক) বা সিনর দ্য'এঞ্জেলো গোপনে কিছু করেননি। এ সব কথা পাস্তেরনাকের চিঠিতেই সমর্থিত।

পরিশেষে সিনর দ্য' এঞ্জেলো বলেছেন যে সোভিয়েট অপরাধ আইনের যে-ধারানুসারে মাদাম আইভিনস্কয়া ও তাঁর কন্যা অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছেন তাঁর চূড়ান্ত শাস্তি দশ বছরের কারাবাস, কিন্তু সেই দ্বারা "Concerns only the case of professional smugglers who personally carries across explosives,

drugs, poisons, arms and munitions."

বর্তমান রাশিয়ায় সাহিত্য সমাজের সমাজপতি কবি সুরকোভ কেন এই রমণীর প্রতি প্রদত্ত নিষ্ঠুর দণ্ডের সমর্থন করলেন, কেন তাঁর কন্যার অপরাধ সম্পর্কে নীরব রইলেন এবং অবান্তরভাবে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন তা আজ আন্তর্জাতিক সাহিত্য জগতের বিস্ময়। মিঃ ভিসিনিস্কির বিচার ও তাঁর সঙ্গে ঘোঁরাপরাধের সংযোগ এই মামলার সঙ্গে তুলনীয়। তাই পি-ই-এনের মিঃ কারভারের মনে হয় যে রাশিয়ায় আজ বোরিস পাস্তেরনাকের পুনর্বাসনের আয়োজন চলেছে। কবির মৃত্যুর পর তাঁকে স্বীকৃত কবিতা আর বাধা কি! শুধু তার মহৎ সৃষ্টি Dr. Zivago কাণ্ডে পীড়াদায়ক, সেই উপন্যাসের প্রেরণা ছিলেন মাদাম ওলগা আইভিনস্কয়া, তাই তাঁকেও মৃদু দেওয়া এই পুনর্বাসনের অঙ্গ। মিঃ কারভার বলেছেন মাদাম ও তাঁর কন্যার এই শাস্তিতে বিশ্ববাসী আজ স্তম্ভিত। বোরিস পাস্তেরনাকের বিয়োগান্ত জীবনোত্তরালের এই পর্বটিই কি একমাত্র পরিণতি না আরও এক অঙ্ক এখনও অপ্ৰকাশিত, সাহিত্য সমাজে সেই সংশয় জেগেছে।

নতুন বই

আর্চবিশপের মৃত্যু— উইলা ক্যাথার।

অনুবাদ—ভবানী মৃথোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪ বাক্স চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম : চার টাকা।

মার্কিন ঔপন্যাসিক উইলা ক্যাথার রচিত 'ডেথ কামস ফর দি আর্চবিশপের' অনুবাদ করেছেন শ্রীভবানী মৃথোপাধ্যায়। সাম্প্রতিক কালের সার্থক অনুবাদকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বিশপ লাতুর জাতিতে ফরাসী হলেও যুক্তরাষ্ট্রের একজন ধর্মযাজক। প্রকৃত ধর্মীয় জীবনযাপন তিনি করেছেন। নানাবিধ ধর্মকাণ্ডে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটেছেন। মানুষকে ভালবাসা আর স্নেহের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেছেন। অনুবর্তন অগম্য স্থানে গমন করেছেন ধর্ম এবং মানবিক আবেদন নিয়ে। সত্যের মর্যাদা কখনও তাঁর কাছে ব্যর্থ আবেদন সৃষ্টি করেনি। দিনের পর দিন বিপদকে তুচ্ছ করে ঈশ্বরের আস্থা রেখে উদ্দেশ্য সাধনের দিকে এগিয়ে গেছেন। তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। শেষদিনের বর্ণনা—এমনকি তাঁর জীবনের শেষ মৃত্যু

আগত ক্ষণকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা সত্যিই ক্যাথারের সার্থক শিল্পী-ক্ষমতার পরিচায়ক। অনুবাদের মাধ্যমেও এ চিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটেছে। প্রকৃত ধর্মযাজকের জীবন কত সুন্দর এবং পবিত্র তা এ গ্রন্থ পাঠে জানা যাবে। বিচিত্র চরিত্রের উপস্থিতি গ্রন্থখানির রসাস্বাদনে পাঠককে আকৃষ্ট করে। ঘটনার জটিলতা কোথায়ও অস্বাভাবিক না হয়ে স্বচ্ছ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ক্যাথারের এই রচনা নিতান্ত ধর্মভিত্তিক নয়। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উপযোগী করে লেখার জন্য গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা সংস্করণটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মূদ্রণ, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ। এ ধরনের গ্রন্থ-প্রকাশ বাংলাদেশে খুব কমই দেখা যায়।

ফাউস্ট—(অনুবাদ) [১ম খণ্ড] বোহান ভোল্ফগাঙ গোয়াতে। অনুবাদ : কানাইলাল গাঙ্গুলী। প্রকাশক : জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স (প্রা) লিমিটেড। কলিকাতা—১৩। দাম—দুই টাকা।

বোহান ভোল্ফগাঙ গোয়াতে (১৭৪৯-১৮৩২) জার্মান ভাষার একজন মহান কবি ও বিশ্বের এক স্মরণীয় চিন্তা-

নায়ক। তাঁর 'ফাউস্ট' নামক দার্শনিক নাটকের নাম শোনেই এমন শিক্ষিত মানুষ এই যুগে বিরল। কুড়ি বছর বয়সে গোয়াতে এই নাটক-রচনার কর্মে নিযুক্ত হন এবং ষাট বছর বয়সেও এই রচনার পরিবর্ধন ও পরিবর্জন কর্মে লিপ্ত ছিলেন। এই গ্রন্থটি বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় গ্রন্থ। 'ফাউস্ট' নাট্যকারের এক রূপকান্তিত দার্শনিক মহাকাব্য। ডকটর ফাউস্ট জার্মানিতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ছিলেন, তিনি কিছু অলৌকিক কর্মে পটু ছিলেন। তাঁর জন্য সাধারণের ধারণা ছিল তিনি শয়-তানান্দুগহীত ব্যক্তি। সাধারণের বিশ্বাস যে, ডঃ ফাউস্ট শয়তানের কাছে আত্ম-বিক্রয় করে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হন। ফাউস্ট অবশেষে কুখ্যাত জীবন-যাপনের পর নিহত হন। জনসাধারণও তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত গুজবাবাদ বিশ্বাস করতে শুরু করে। গোয়াতে এই লোক-কাহিনীকেই অবলম্বন করে এক আশ্চর্য সুন্দর মহাকাব্য রচনা করেন। ফাউস্ট চরিত্র মানবাত্মার বৈচিত্র্যময় জীবনের লীলা। 'ফাউস্ট' মহানাটক সামান্য বস্তু নয়, এর তত্ত্ব অতি গভীর। ডঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী দীর্ঘকাল জার্মানিতে বস

সদ্য প্রকাশিত

বাংলা কথাসাহিত্যে পরম বিস্ময়

ধনঞ্জয় বৈরাগীর অসামান্য উপন্যাস

মঞ্চকন্যা

জাতীয় জীবনের দর্পণ যে রংগমণ্ড, তারই মায়ালোকের স্বপ্নময় কাহিনী দরদী প্রাণের অনুভূতিতে, বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অবদ্য রূপ-রেখায় সার্থকরূপে প্রতিফলিত।

বাংলার নাট্যপ্রয়াসের স্বমুখী ধারার একদিকে পেশাদার নাট্যশালায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিছক বাষ্যিক মনোবৃত্তি, অন্যদিকে নাট্যলক্ষ্যীর সাধনায় সৌখিন নাট্যসংস্থাসমূহের নিষ্ঠাপূর্ণ ও অনলস পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নাট্য-আন্দোলনের এই স্বমুখী ধারায় জোয়ারভাটা, আবর্তন-অগ্রগমনের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র ভূমিকার মধ্য দিয়ে অভিনব ভঙ্গীতে উপস্থাপিত হয়েছে। দাম ৭, টাকা।

॥ এই লেখকের অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থ ॥

একমুঠো আকাশ (উপন্যাস) ৫.০০ মধুরাই (উপন্যাস) ২.৫০
(৫ম সংস্করণ) (৩য়, সংস্করণ প্রকাশের পথে)
আর হবে না দেবী (নাটক) ২.৫০ এক পেয়লা কফি (নাটক) ২.৫০
একমুঠো আকাশ (নাটক) ২.০০



এফএম

২২ ১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

করেছেন এবং স্বয়ং জার্মান ভাষায় সুপরিচিত। তাই মূল জার্মানি থেকে অনূদিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। অনুবাদ সুন্দর ও সহজবোধ্য হয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাটি গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। সত্যি এই গ্রন্থের অনুবাদকে অশেষ সাধুবাদ দান করা উচিত।

যুগ পরিভ্রম— (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (প্রবন্ধ) ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। প্রকাশক : ফার্মা কে, এল, মধ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-১২। মূল্য প্রতি খণ্ড আট টাকা।

ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। তাঁর উপন্যাসাবলী একদা পাঠক মহলে অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে, শরৎচন্দ্রের পর পাঠক ও সমালোচক সমাজ তাঁকেই সন্মানের সর্বোচ্চ আসন দান করেছিলেন। অনলস সাহিত্যসেবায় বাংলার কথাসাহিত্য বিভাগে নরেশচন্দ্র যে স্থান লাভ করেছিলেন একালের সাহিত্যিকের কাছে তা ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু আজ নরেশচন্দ্র প্রায় বিস্মৃত লেখকের পর্যায়ে পড়েছেন, সে কথা তিনিও জানেন, তাই “আমি ছিলাম” নামক গ্রন্থে তাঁর জীবন-দর্শনের পরিচয় দান করেছেন অননুকরণীয় ভঙ্গীতে। যেদিন জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের ‘সাহিত্যধর্ম’ প্রবন্ধ পাঠের পর আধুনিক সাহিত্যিকদের কাঠগড়ায় হাজির করা হয় সেইদিন নরেশচন্দ্র অপরাধে কথাসাহিত্য শরৎচন্দ্রের পাশে বসে তরুন সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে কবির কাছে আধুনিকের বক্তব্য পেশ করেছিলেন। আজ তিনি জীবনসাম্যে উপনীত।

তাঁর পুত্র শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত নরেশচন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধাবলী দুই খণ্ডে সংকলিত করে প্রকাশ করেছেন তাঁর আশীতম জন্ম-দিবস উপলক্ষে। প্রথম খণ্ডে আছে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ এবং এই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে নবযুগের কথা-সাহিত্য, সাহিত্যে জাতীয়তা, সাহিত্য-ধর্মের সীমানা, সাহিত্য সংগ্রাম প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির সাহিত্যিক মূল্য ব্যতীত ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। রবীন্দ্র-জয়ন্তী, কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র, আশু-তোষ এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধগুলিতে সমকালীনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও গুরুগ্রাহিতার প্রমাণ আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে ‘ধর্ম ও দর্শন’, ‘সমাজনীতি’, ‘রাষ্ট্রনীতি’ এই তিন বিভাগে বিভক্ত প্রবন্ধাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। এই খণ্ডের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ‘সাংখ্যের মূল-কথা’, ‘সমাজসংগতি’, ‘মৌখ্যপরিবার’ এবং ‘ভাত-কাপড়ের কথা’ এবং ‘পরিয়ালিস বেদ’ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি, প্রকাশ কালে বিশেষ আলোচিত হয়েছিল একথা আমাদের স্মরণে আছে। ডঃ নরেশচন্দ্র ভূমি-সংক্রান্ত আইনেও যে কি গভীর জ্ঞানের অধিকারী তাঁর প্রমাণ তাঁর শেষোক্ত প্রবন্ধাবলী। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় নরেশচন্দ্র অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে সরসতার সঙ্গে আছে তীক্ষ্ণ যুক্তি-জাল, সেখানে তাঁর ব্যবহারজীবী সত্তা অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করেছে। এ যুগের পাঠক নরেশচন্দ্র-জীবন-সাধনার ফসল ‘যুগপরিভ্রম’ পাঠে নিঃসন্দেহে

উপকৃত হবেন। এমন মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশককে অভিনন্দন জানাই। তবে গ্রন্থটিতে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সাহিত্য-কর্মের একটা বিশদ আলোচনা থাকা উচিত ছিল। এই জাতীয় গ্রন্থের পক্ষে সেই আলোচনা অপরিহার্য। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

মহানির্বাণতন্ত্রম্— (প্রবন্ধ) ১ম খণ্ড —শ্রীমদ হরিরহরানন্দ ভারতী। বিরচিত। ১৭৪৬। ১১, নেতাজী সুভাষ বসু রোড, পোঃ রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-৪০। দাম ৬ টাকা।

তন্ত্র কি এবং বিশেষ করে মহানির্বাণ তন্ত্র যে কি, হিন্দুর নিকট তা অপরিচিত নয়। মহানির্বাণ তন্ত্রে কলি-যুগে করণীয় কার্যের সদুপদেশ পদে পদে পূর্ণ। এ পর্যন্ত যতগুলি মহানির্বাণতন্ত্র মুদ্রিত হয়েছে, তন্মধ্যে ‘বৃন্দ জগন্মোহন তর্কালংকার মহাশয়ের অনুবাদ ও টিপ্পনীসমিত মহানির্বাণতন্ত্রই যে শ্রেষ্ঠতম তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এতে শ্রীমদ হরিরহরানন্দ ভারতী বিরচিত টীকা এবং স্বর্গত তর্কালংকারকৃত অনুবাদ ও টিপ্পনী সন্নিবেশিত হওয়ায় অনেক গুরুত্বের সুন্দররূপে মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে। ‘তর্কালংকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক মহানির্বাণতন্ত্র পরিবর্ধিতাকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে তদীয় পুত্র শ্রীপরমানন্দ তীর্থনাথ, মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনায় এর পঞ্চম সংস্করণ ইতিপূর্বে নিঃশেষিত হওয়ায় এই নতুন ষষ্ঠ সংস্করণ ১ম হতে ৯ম উল্লেখ্য প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। শাস্ত্রভিজ্ঞাসু সাধকদিগের পক্ষে এ যে একখানি অমূল্য পুস্তক তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

আলোর পরিধি— (কবিতা)। সলিল মিত্র। মূল্য : দেড় টাকা। পরিবেশনায়—কারেন্ট বুক সপ্লি। ৫৭, কলেজ স্ট্রীট। কলিকাতা-১২।

গদ্য এবং ছন্দে লেখা মোটামুটি আধুনিক রীতির কিছু কবিতা রয়েছে এই পুস্তিকায়। প্রথম কবিতাটি এবং অন্য দু-এক জায়গায় ভালো লাগল। স্থানে স্থানে ছন্দ এবং মিলের দৃষ্টি লক্ষিত হোল। পরিভ্রম ও একাগ্র প্রবৃত্তির বিনিয়োগ করলে কবি ভবিষ্যতে কিছু সাধক কবিতা রচনা করতে পারবেন বলে আশা করি।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-অনুসারী সুধীবৃন্দ কর্তৃক অভিনন্দিত

অজস্র

‘রবীন্দ্র-শতবর্ষ’ প্রতি স্মারক সংকলন

রবীন্দ্রনাথের অজস্র সৃষ্টিবৈচিত্র্যের বর্ণচ্ছটায় আমাদের মন যেমন আনন্দিত ও পুলকিত তেমন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব আমরা অভিভূত। গত অর্ধশতকে তিনিই ছিলেন মানব সভ্যতার প্রতীক। এই মহামানবের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মারক সংকলনে তাঁর রূপকল্পনা ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। লেখায়, রেখায়, ছাপায় ও অঙ্গসজ্জায় অম্বিতীয়।

আট টাকা

পরিবেশক

বিত্তিম

৬ বঙ্কিম চ্যাটজ্জি স্ট্রিট, কলকাতা-১২

শ্রেষ্ঠা যুগ

মানসিক

চিহ্ন সমালোচনা

কাঁচের স্বর্গ : চিত্রযুগের নিবেদন; ১২.৯০৪ ফুট দীর্ঘ এবং ১৪.০০ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : যান্ত্রিক; সঙ্গীত পরিচালনা : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র; চিত্রগ্রহণ : অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা; শব্দধারণ : মৃণাল গুহঠাকুরতা; শিল্পনির্দেশ : সুবোধ দাস; সম্পাদনা : দুলাল দত্ত; রূপায়ণ : দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, জীবন বসু, সবিতারত দত্ত, ছবি বিশ্বাস, উৎপল দত্ত, অমর মল্লিক, সোমনাথ, মঞ্জুলা, কাজল গুপ্ত, মঞ্জু দে, গীতা দে, ছায়া দেবী, আরতি দাস এবং আরো অনেকে। মিতালী ফিল্মস-এর পরিবেশনায় আজ শুক্রবার ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী ও অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত কাহিনী “কাঁচের স্বর্গ”—এ যে-প্রশ্নটি সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে এই : কোনো মানুষ যদি বিশেষ কোনো বস্তুতে চরম পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়, তাহলে তার পিছনে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তক্কা না থাকলেই কি সে জীবিকার্জনে বঞ্চিত হবে? তার জন্যে কি দেশের প্রচলিত আইনকে অতিক্রম করে কোনো বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব? বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধা রাস্তা ধরে যে অগ্রসর হয়নি, লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে চিরদিন বঞ্চিত রেখে সমাজ কি নিজেই তার প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পদক্ষেপ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না?

“কাঁচের স্বর্গ”—এর নায়ক সঞ্জীব চৌধুরী এই রকমই এক লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী শল্য-চিকিৎসক। মেডিক্যাল কলেজের কৃতি ছেলে হয়েও কোনো অজ্ঞাত কারণে সে শেষ পরীক্ষায় ঐপস্থিত হতে পারেনি এবং সেই কারণে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ডাক্তার নয়। অথচ রণক্ষেত্রে তারই শল্য-চিকিৎসার ফলে সুশোভন সেন নামে একজন যুবক তার প্রাণ ফিরে পায়। বৃন্দ-দামামা থেমে যাবার পর সে যখন কলকাতার পথে-পথে সামান্য কোনো চাকরীর সন্ধানে বাধ্য-মনোরম হয়ে জীবনে বীতশ্রম, তখন একান্ত অকস্মাৎ তার দেখা হয় সেই

লব্ধপ্রাণ যুবকের সঙ্গে। যুবক তখন বাতাসপুরে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। বহু মানসিক স্বপ্নের পর সঞ্জীব বাতাসপুরে মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের পদ গ্রহণ করে। সেখানকার চীফ সার্জেন ডাঃ ব্যানার্জি প্রথমে তাকে নেওয়ার বিরোধিতা করলেও পরে তার কৃতিত্বপূর্ণ শল্য-চিকিৎসার পরিচয় পাবার পর তাকে



অগ্রগামী পরিচালিত প্রযোজিত “নিশীথে” চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তমকুমার।

আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে কার্পণ্য করেন না। কিন্তু মফঃস্বল হাসপাতালের শল্য-চিকিৎসক সঞ্জীব তার নামের প্রচার পছন্দ করতে পারে না; কারণ তার মনে সর্বক্ষণই ভীতি রয়েছে, ডাক্তারী তকমা-ধারী না হয়েও সে হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের পদে কাজ করছে। তাই যখন তার বন্ধু যক্ষ্মাচিকিৎসক ডাঃ অসীম মৈত্র তার প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে চায় তাকেই প্রধান সাক্ষী হিসেবে

দাঁড় করিয়ে, সঞ্জীব তার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারে না। যক্ষ্মাচিকিৎসক সঞ্জীবকে ভুল বুঝে নিমিষে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং যখন তার অসামান্য শল্য-চিকিৎসার স্বীকৃতি স্বরূপ সঞ্জীব সংবর্ধনা পায়, তখন তার প্রশান্তিসূচক করতালি ধনিকের ডুবিয়ে সে তার বিচিত্র করতালি দ্বারা সঞ্জীবকে উপহাসিত করে। এই উপহাস বিদ্রূপ সঞ্জীব আর সহ্য করতে পারে না, সে মত্তকণ্ঠে স্বীকার করে, সে শল্য-চিকিৎসক বটে, কিন্তু কোন ডিগ্রীধারী নয়। এই স্বীকারোক্তি সঞ্জীবের জীবনে আনে চরম বিপর্যয়। দেশের প্রচলিত আইন

অনুসারে সে আদালতে অভিযুক্ত হয় এবং তার কৌশলীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে দু'বছরের সশ্রম কারাবাসের দণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। সকলের সঙ্গে দণ্ডদাতা বিচারকের মনেও জিজ্ঞাসা জাগে—প্রতিভার এমন অপমান্য দেশ আর কতদিন সহ্য করবে?

“কাঁচের স্বর্গ”—এর চিত্রনাট্য অত্যন্ত ভাবসমৃদ্ধ এবং নিপুণতার সঙ্গে গ্রথিত। কোথাও কোথাও কিছু অসংগতি এবং উচ্ছ্বাসের কিছুটা বাড়াবাড়ি

থাকলেও মোটের উপর এমন সুগঠিত চিত্রনাট্য সহসা নজরে পড়েনা। যে-দুর্ভাগিনীট অসম্পূর্ণ মনকে পীড়িত করে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে : কাউকে আসিস্ট্যান্ট সার্জেন পদ দেবার সময় কর্তৃপক্ষ তার উপযুক্ততা বিবেচনার জন্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পরীক্ষা করেন না, এটা যদি বাস্তব ঘটনাও হয়, আর্টের জগতে একান্তভাবেই অসম্ভবতাপূর্ণ (improbable); : বাতাসপুর মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে ও-রকম একটি দুর্ভাগ্য-চিকিৎসা হওয়া সম্ভবপর বলে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন; দু'আড়াইশো লোকের জনতার পক্ষে এমন বৈপর্য্য হয়ে একজন লম্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের গৃহ আক্রমণ করা যতটা সহজ বলে দেখানো হয়েছে, সত্যি কি ততটা সহজ? কিন্তু এ ধরনের ছোটখাট অনেক প্রশ্নকেও ছাপিয়ে যে-মহত্তর প্রশ্ন নিয়ে কাহিনীটির সৃষ্টি, তাই শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনকে আধিকার করে থাকে এবং এমন রসোত্তীর্ণভাবে এই প্রশ্নটিকে কাহিনীর সঙ্গে অগাধভাবে বিধৃত করা হয়েছে, যার অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে পারা যায় না।

‘কাঁচের স্বর্ণ’কে ষাটক-গোষ্ঠী যে অপূর্ণ রূপসজ্জায় সজ্জিত করে দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন, যার তুলনা কদাচিৎ মেলে। এবং এ-ব্যাপারে যে-দু'জন কুশলীর কৃতিত্ব সমাধিক, তারা হচ্ছেন চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত ও শিল্পনির্দেশক সুবোধ দাস। ছবিখানি দেখতে দেখতে মনে হয়, যেন কোনো উচ্চাঙ্গের আমেরিকান চিত্র দেখছি। শট এবং দৃশ্যকে এমন সার্থকভাবে ক্যামেরার মাধ্যমে গ্রহণ করা বিশিষ্ট শিল্পবোধের পরিচায়ক। বাস্তব এবং কাব্যের এমন সুস্বমিলন ও চিত্রাঙ্গ সহসা নজরে পড়ে না। এদের সঙ্গে বিভিন্ন দৃশ্যের ভাবপ্রকাশক আবহ-সঙ্গীত চিত্রটিকে রসোত্তীর্ণ হ'তে প্রভূত সাহায্য করেছে; এক একটি বিশেষ মুহূর্তে উচ্চাঙ্গের আবহ-সঙ্গীত চিত্রকে সচকিত করে তোলে। ছবিখানির সুরকার হিসেবে



সত্যজিৎ রায়ের ‘অভিযান’ চিত্রে সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও রুমা দেবী।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

‘কাঁচের স্বর্ণ’-এ অভিনয় ব্যাপারে প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রী অল্প-বিস্তর প্রশংসা দাবী করতে পারেন। দিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়—দু'জনেই তাঁদের স্বাভাবিক অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়ে তাঁদের গৃহীত চরিত্র দু'টির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন। এঁদের পরেই নাম করতে হয় পাহাড়ী সান্যাল, জীবন বসু, তরুণকুমার, মঞ্জুলা, কাজল, মঞ্জু দে, গীতা দে, সোমনাথ, অমর মল্লিক, ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ প্রভৃতি বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। এমন কি, কলী-সর্দার, ভূতা প্রভৃতি ছোটখাট ভূমিকাও অত্যন্ত সুঅভিনীত।

‘ষাটক-গোষ্ঠী’কৃত ‘কাঁচের স্বর্ণ’ বাঙলার চিত্রজগতে একটি স্মরণীয় যোজনা।

বিবিধ সংবাদ

মার্ক রবসনের “ডে অব ডার্কনেস” :

মার্কিন প্রযোজক-পরিচালক মার্ক রবসন ভারতবর্ষে এসেছিলেন “ডে অব ডার্কনেস” বা “নাইন আওয়ার্স টু রাম” নামে ছবির কিছু বিহীন তুলতে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, ভারতীয় কাহিনী নিয়ে নির্মিত এই ছবির নায়ক হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী এবং ভারত সরকার কর্তৃক প্রাণদণ্ড দণ্ডিত নাথুরাম গডসে। এই কাহিনীর মধ্যে মহাত্মা গান্ধীকেও দেখতে পাওয়া যাবে। গান্ধী এবং তাঁর হত্যাকারী নায়কের ভূমিকায় যথাক্রমে অবতীর্ণ হচ্ছেন জে, এস, কাশ্যপ এবং সুখ্যাত

জার্মান অভিনেতা হর্স্ট বুকহোলৎস। আজকের দিনের পাঠকেরা জানেন কিনা বলতে পারিনা, জে, এস, কাশ্যপ হচ্ছেন অভীতের সেই খ্যাতিমান হিন্দী সংলাপ-লেখক, যার লেখনীনিঃসৃত সংলাপের গুণে বোম্বে টকীজ নির্মিত ‘অছুৎকন্যা’, ‘বন্দন’, ‘কংকন’ প্রভৃতি চিত্র এবং জেমিনীর ‘চন্দ্রলেখা’, ‘নিশান’ প্রভৃতি চিত্র সর্বভারতীয় সমাদর লাভ করেছিল। একদা উত্তর-প্রদেশের গ্র্যাজুয়েট-শিক্ষক, শ্রীকাশ্যপ হিন্দী এবং উর্দু—উভয় ভাষায় বিশেষ পারদর্শী বলে সারা ভারতের উপযোগী এমন এক সহজ হিন্দুস্থানী ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন চলচ্চিত্রের পাণ্ড-পাত্রীদের সংলাপের জন্যে যে, হিন্দী চিত্রের প্রসারের পথে তা অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। এবং হিন্দী ছবি যে হিন্দী ভাষার প্রচারে অপরিমিত সাহায্য করে, এ-কথা আমরা না জানলেও ভারত সরকারের অকুৎসাহী হিন্দীপ্রচারক সদস্যরা বিলক্ষণ জানেন।

কিন্তু এদিকে রেড লায়ন ফিল্মস্ লিমিটেডের প্রযোজক-পরিচালক মার্ক রবসন ছবিখানির বিহীন তুলতে ভারতে এসে বেশ যে কয়েকটা বড় রকম গোলযোগের সৃষ্টি করেছেন, তা বিভিন্ন সংবাদপত্র মারফত ক্রমশঃই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথম গোলযোগ তাঁর ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য নিয়ে। ডঃ স্ট্যানলি উলপার্ট লিখিত মূল উপন্যাস অবলম্বনে রচিত যে-চিত্রনাট্যখানি (মূল এবং সংশোধিত) কেন্দ্রীয় সরকারের বতায় ও তথ্য মন্ত্রণালয় পড়ে দেখেছেন, তাতে নাকি নাথুরাম গডসের জীবন-নাট্য রচনার প্রচুর কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এবং তাই দেখে সরকারের তরফ থেকে প্রযোজক-সংস্থাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সাধারণো মুক্তির আগে ছবিখানিকে ভারত সরকার বা লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনারকে

দীক্ষণ কলিকাতায় গত ৩ মাস ধারণ
প্রতি বৃহস্পতি
সংখ্যা ৭০৪
সাপ্তা
জাগিয়েছে
খিটোর
ইউনিট-এর

কুস্তিগার

৪৭-৬১৯৫

মহারাজ নিবাস
১৫, হাজরা রোড
সি-৬২

দেখাতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিবর্তন বা পরিবর্তন করতে হবে। এ ছাড়া ভারতে মজির আগে সাধারণ প্রথমত ভারতীয় সেন্সার বোর্ডের ছাড়পত্র নেওয়া দরকার হবে। চিত্রনাট্যখানিতে নাকি এমন ইংগিত আছে যে, যে-হেতু গড্‌সে সেনা-বাহিনীতে ভর্তি হতে চেয়েও বিফল-মনোরথ হয়েছে, সেই হেতুটিও গান্ধী-হত্যার অন্যতম কারণ। অথচ সাধারণ বান্ধিতে বলে, নাথুরাম গড্‌সের জীবনীতহাস সংগ্রহ করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়; বিশেষ যখন হত্যা-পর্যায়ে গড্‌সের বিরুদ্ধে আদালতে যথারীতি মামলা চলেছিল। আমাদের আশংকা হচ্ছে, হয়ত জুলিয়াস সীজারের হত্যাকারী ব্রুটাসের মতো মহাশয় হত্যাকারী গড্‌সেও রবসন-চিত্রে গোরবের আসন লাভ করবেন। দ্বিতীয় গোল বোধে, এ ছবিতে যে-সব ভারতীয় কলা-কুশলী ও শিল্পী কাজ করছেন, তাঁদের নিয়ে। কথা ছিল, দিল্লী এবং বোম্বাইয়ে বাহিদর্শ্য তোলায় পর ছবির অন্তর্দর্শ্যগুলি বোম্বাইয়ের মেহবুব স্টুডিওতে তোলা হবে। কিন্তু ফেডারেশন অব ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে-এম্প্লয়িজ এ ছবিতে যে-সব বিদেশী কলাকুশলী কাজ করছিলেন, নির্দিষ্ট চাঁদা জমা দিয়ে তাঁদের এখানকার কুশলী-সংঘের অস্থায়ী সভ্য হবার জন্যে দাবি জানানোয় প্রযোজক-পরিচালক রবসন পূর্বমত পরিবর্তন করে সদলবলে লন্ডনের এল্‌স্ট্রি স্টুডিওতে অন্তর্দর্শ্যগুলি তোলায় জন্যে রওনা হয়ে গিয়েছেন। কাজেই ফেডারেশনের দাবি এইভাবে উপেক্ষিত হওয়ায় ফেডারেশন তার সভাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে, যাতে তারা এই ছবিতে কাজ না করে। বোম্বাইয়ের যে-সব শিল্পী ছবিখানিতে অভিনয় করবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদেরও ওপর এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবে বলে প্রকাশ। দেখা যাচ্ছে, রবসন তার এই চিত্র মারফত ভারতে ইতিমধ্যেই রীতিমত সোরগোল তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

“কথাকালি”র নবম বার্ষিক সম্মেলন :

গেল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকালে “কথাকালি” সম্প্রদায় তাঁদের নবম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে নিউ এম্পায়ার রংমঞ্চে পরশুরাম বিরাচিত যে-তিনটি গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করলেন, সেগুলি হচ্ছে : (১) সরলাক্ষ হোম, (২) বটেশবরের অবদান এবং (৩) রাতারাতি। নাট্যরূপগুলিকে একাঙ্ককা আখ্যা দিলেও আমরা ওগুলিকে ঠিক একাঙ্ককা বলে মনে নিতে পারছি না। বাদানুবাদ এড়িয়ে ওদের মত প্রহসন আখ্যা দেওয়াই ভালো। বটেশবরের অবদান ও রাতারাতি—এই গল্প দুটিকে অপর করেকটি

সম্প্রদায়ও নাট্যরূপান্তরিত করে অভিনয় করেছেন। “কথাকালি”র অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও অভ্যস্ত কৃতিত্বের সঙ্গে নাট্যরূপগুলিতে অভিনয় করেছেন। এরই মধ্যে নাট্যরূপদাতা ও যুগ্ম-পরিচালক প্রকাশ পাল, যুগ্ম-পরিচালক সুনীল বসু, ভূপেন মিত্র, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ রাহা, মীনাক্ষি রায়, উমা দাশ-গুপ্তা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মার্কিনী পুতুলনাচ :

নিউ এম্পায়ারে বিল বেরার্ড এবং কোরা বেরার্ড প্রদর্শিত মার্কিনী পুতুল-

নাচ যাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, তারা স্বীকার করবেন, তাঁদের নতুনতর অভিজ্ঞতার কথা। চেকোস্লোভাকিয়া বা রাশিয়ার পুতুলনাচ থেকে এই মার্কিনী পুতুলনাচ নানা দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। “ডেভিড জোস লকার” নামে একটি পুরো রূপকথাকে বাঙালী পুতুল ভাষ্যকারের সাহায্যে বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে এঁরা যেভাবে রূপদান করেছেন, তা আমরা আগে দেখিনি। তা ছাড়া মণ্ডের ওপর এঁদের দলের বেশ কয়েকজন মিলে যে-ভাবে “ক্যান ক্যান” নাচ দেখালেন পুতুলগুলিকে সূতোর সাহায্যে নেড়ে-

পালিয়ে বাঁচবে তুমি
কার হাত থেকে?
সত্যের হাত থেকে
পালাতে পারবে কী?

কালের সঙ্গ

অভিনয়: দিলীপ-অমল-কাজল-মঞ্জলা-মঞ্জু দে
রিকশা-গীতা দে-অমিতকর্ণ-ছবি-জীবন-পাশেরী
রূপকুমার-ছাত্রা-দেবী-উৎপল দত্ত
অমর মল্লিক ও সোমনাথ

প্রিন্সিপাল গৃহীতকণ্ঠ টিগ্রু-রু নিবেদন। গৃহীতকণ্ঠ: যাদবিক-সু:জ্যোতিষিক টেম

আজ শুভমুক্তি !

রূপবাণী : ভারতী : অরুণা

৥ ও সহরতলীর অন্যান্য চিত্রগ্রহ ৥

চেড়ে, তাতে মনে হ'ল, বেরাড-দম্পতি দর্শকদের পুতুলনাচের কায়াদা-কানুন সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ রাখা পছন্দ করেন না। সমস্ত ব্যাপারটা trade Secret না রেখে দর্শকের সঙ্গে এই যে খোলাখুলি ভাব, এটি আমাদের অত্যন্ত ভালো লেগেছে।

চলচ্চিত্র-জগতে ক্রিকেট খেলা :

দি সিনে টেকনিসিয়ান্স অ্যান্ড ওরাকাস ইউনিয়নের উদ্যোগে রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়ামে গেল রবিবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাঙালার চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীরা “ছবি বিশ্বাস একাদশ” বনাম “সত্যজিৎ রায় একাদশ” নাম দিয়ে একটি উপভোগ্য প্রদর্শনীর ক্রিকেট ম্যাচ খেলোছিলেন দৃশ্যকলাকুশলী সাহায্য-ভাণ্ডারের জন্যে। দিলীপ মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি কয়েকজন শিল্পী ও কলাকুশলী নিপুণ হাতে ব্যাট ও বল করে সমবেত দর্শকদের দেখিয়ে দিলেন, শিল্পী ও কুশলী হলেও তাঁরা মানুষ এবং মানুষের মতোই এককালে খেলা-ব্লাও করেছেন।

বিবেকানন্দ উৎসবে শিল্পীমহলের

“যুগসূচ্য” :

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে উত্তর কলকাতার শ্যাম স্কোয়ারে সাড়ম্বরে যে-উৎসব চলছে, তারই প্রাঙ্গণে গেলকাল বৃহস্পতিবার, ৮ই ফেব্রুয়ারী শিল্পীমহল সম্প্রদায় স্বামিজীর জীবনী নিয়ে রচিত “যুগসূচ্য” নাটকখানিকে মণ্ডস্থ করেছিলেন।

অশ্বেষা কর্তৃক “কাণ্ডনরংগ” :

উত্তর কলকাতার নাট্যসংস্থা “অশ্বেষা” আজ শুক্রবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী,



চলচ্চিত্র প্রয়াসের ‘সূর্যস্নান’ চিত্রে তৃপ্তি মিত্র।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রাজাবাজারস্থ প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র বিরচিত রংগনাটক “কাণ্ডনরংগ”-এর পুনরাভিনয় করবেন। “টাকা থাকলেই মানুষ, নইলে মানুষ নয়,”-আধুনিক যুগের এই বিচিত্র মনোভাবকে কশাঘাত করে লেখা এই নাটকখানির পরিচালনা করবেন স্বদেশ বসু এবং এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবেন শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেকা নিয়োগী, কমলা দাস, প্রশান্ত সেন, স্বপন বসু, সুদর্শন দাস, শ্যামল দত্ত, সুনীল-বরণ চৌধুরী, নিমল ঘোষাল, ফজলুর রহমান ও পরিচালক স্বয়ং।

চিত্রম্ আশার “মেঘলা আকাশ” :

গ্রাম্য কুসংস্কার অপসারণের বাণী নিয়ে ‘প্রি-না-দ’ রচিত “মেঘলা আকাশ”-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক অমল দত্ত। সম্প্রতি তিনি সোনারপুরের পল্লীঅঞ্চলে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ

মুখোপাধ্যায়, সোমা সরকার, মনীষা রায়, আরতি দাস এবং নবাগত নায়ক অশোক চক্রবর্তী ও নায়িকা শম্পাকে নিয়ে পূর্ণোদ্যমে চিত্রগ্রহণের কাজ চালিয়েছেন। ছবিটির চিত্রগ্রহণ করছেন বিজয় দে ও শান্তি দত্ত, সম্পাদনা করছেন অনিত মুখোপাধ্যায় এবং সুরযোজনা করছেন ননী মুখোপাধ্যায়। “মেঘলা আকাশ”-এর প্রযোজনা করছেন “অমল দত্ত” ইউনিট।

দিশারীর উদ্যোগে “যাত্রা উৎসব” :

মধ্য কলকাতার “দিশারী” সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে আসন্ন মাসের আটই থেকে পনেরো দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা উৎসবের আসর বসবে। উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, প্রাচীন প্রথায় এই আসর তৈরী হবে, যাতে দর্শক আর শিল্পীদের মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকবে না এবং সকলেই যাতে এই উৎসবে বোগ দিতে পারেন, তাম্রজ্যে খুব অল্পমূল্যের প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রা



বিবাহের

শয্যাপ্রব্য

এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

অনন্তচরণ মল্লিক এণ্ড কোং
১৬৭/৪, ৫ম ফ্লোয়িং স্ট্রিট কলিকাতা-১৩
ফোন-২৪-৪৩২৮

স্বাভাবিক সুবিধার জন্য অনুষ্ঠানগুলিকে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাতি ১০টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার ব্যবস্থাও হচ্ছে। যোগা-যোগের জন্যে দিশারী কার্যালয় ১৪এ, ডাঃ সুরেশ সরকার রোডে বৈকাল ৪টা থেকে রাতি ৮টার মধ্যে অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছে।

॥ ভিনদেশী ছবি ॥

চার্ট বনাম চলচ্চিত্র :

বাইবেলের টেন কম্যান্ডমেন্টস-এর একটি অনুশাসন হল 'দাউ শ্যাল নট কিল'। এই অনুশাসনবাণীকে ভিত্তি করে জনৈক ফরাসী চিত্র-পরিচালক রুদ্ লারা একটি ছবি তুলেছেন। কিন্তু এই ছবিটিকে উপলক্ষ্য করে ইতালী-ফ্রান্স-ভাটিকানের মধ্যে কূটনৈতিক সংঘর্ষের বাড়ি বয়ে গেছে। যদিও এই চিত্রের পরিচালক জনৈক ফরাসী, তবুও ফ্রান্সে এই ছবি তোলার অনুমতি পাওয়া যায়নি এবং এই চিত্রের প্রদর্শনীও ফরাসী দেশে নিষিদ্ধ। 'দাউ শ্যাল নট কিল' ছবিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ হল যে, চিত্রটি নাকি মূলতঃ ক্যাথলিক চার্চ বিরোধী। ছবির নায়ক একজন ফরাসী ক্যাথলিক যুবক। সে যুগ্মের সময় সামরিক শিক্ষা নিতে রাজী নয়, কারণ তার আদর্শগত বিশ্বাস যে, ক্যাথলিক হিসেবে, টেন কম্যান্ডমেন্টস-এর অষ্টম অনুশাসনবাণী 'দাউ শ্যাল নট কিল' মানতে সে ধর্মতঃ বাধ্য। কিন্তু সে অপরিণীত দৃষ্টিতে জানলো যে তার এই আদর্শের পেছনে তার চার্চের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন নেই। লারা পরিচালিত, লিখিত, অভিনীত এই ছবিটি যে কোনো-দিন মুক্তির স্বর্গে পৌঁছতে পারবে প্রয়োজক সে আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, এখন সময় গত আগস্ট মাসে ভেনিস ফেস্টিভ্যাল থেকে ফ্রান্সের কাছে এই চিত্রের জন্যে সরকারীভাবে আমন্ত্রণ এল। ফরাসী সংস্কৃতি-মন্ত্রী আন্দ্রে মালরো ছবিটি পাঠাতে অস্বীকার ত করলেনই, উপরন্তু ভেনিস ফেস্টিভ্যাল কমিটিতে জানানলেন যে, ছবিটি যদি চিত্র-উৎসবে প্রদর্শিত হয়, তিনি সমস্ত ফরাসী ছবি প্রত্যাহার করে নেবেন ভেনিস থেকে। প্রয়োজক উপায়ান্তর না দেখে সুইজার-ল্যান্ডের শরণাগত হলেন—তারা যদি তাদের দেশের চিত্র-প্রতিনিধি করে 'দাউ শ্যাল নট কিল'-কে পাঠান ভেনিসে। সুইস কর্তৃপক্ষও সরাসরি অস্বীকার করলেন এই ছবিকে পাঠাতে। অবশেষে ভেনিসে ছবিটি প্রদর্শিত হয় যুগোশ্লাভ দেশীয় চিত্র হিসেবে। ফরাসী মন্ত্রী

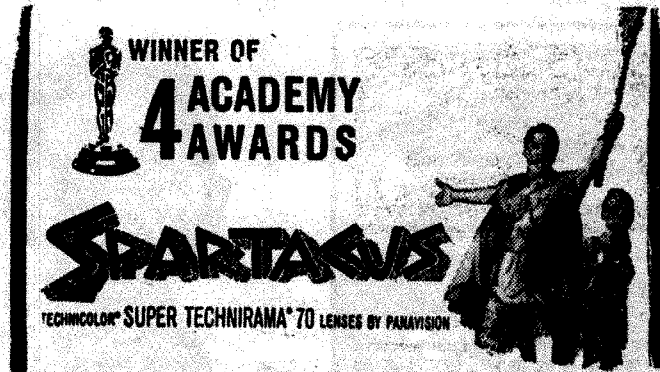
মালরোকে সন্তুষ্ট করা হয় তাঁর প্রিয় একটি ছবি 'লি'য় মারিন, প্রিন্স'-এর বিশেষ প্রদর্শনী মারফৎ। সেই মাসেই মিলানের এক চিত্র-সপ্তাহে এই ছবিটিকে দেখানোর চেষ্টা চলতে থাকে। অবশেষে ঠিক হয় 'দাউ শ্যাল নট কিল' মিলানে দেখানো হবে। কিন্তু প্রদর্শনী আরম্ভ হওয়ার ঠিক আধ ঘণ্টা আগে পুলিশ প্রেক্ষাগৃহে এসে জানায় যে, সেন্সারের অনুমতি ছাড়া চিত্রের প্রদর্শনে তারা অনুমতি দিতে পারবে না। পরে সেন্সারকে যখন দেখানো হয় ছবিটি, সেন্সার সমিতি সরাসরি ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করেন। সেন্সারের এই অস্বী-কৃতির ফলে ইটালীর প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী গুইলো আল্দ্রোন্তির হাত আছে বলে অনেকে সন্দেহ করেন। কারণ আল্দ্রোন্তি এর কিছুদিন আগেই ফ্রান্স থেকে 'লিজিয়ন অফ অনার' উপাধি পেয়েছেন। অনেকের বিশ্বাস ফরাসী সেনাপতিদের চাপে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইটালীতে ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ করিয়েছেন।

ছবিটি নিয়ে প্রচুর হৈ-চৈ হবার ফলে ইটালীতে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। চিত্রটির সম্বন্ধে ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক জর্জিয়ো লা পিরা ঠিক করলেন, ইটালীর সরকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পুলিশ কর্তৃপক্ষ, ভ্যাটিকানের পোপ, দাগল প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি

একাই দাঁড়াবেন। লা পিরা নিজেকে অবশ্য ছবি দ্যাখেন না বিশেষ। কিন্তু বিরোধী-পক্ষের নেতা হবার-উৎসাহ-ভার অনেক কালের অভ্যাস। অতীতেও এরকম কোনো গোলমালে ব্যাপার উপস্থিত হলেই পিরা প্রথম এগিয়ে যেতেন। কাজেই এই ব্যাপারেও যথারীতি নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন তিনি। ঠিক করলেন সাতশো লোককে তিনি ফ্লোরেন্সে নিমন্ত্রণ করে একটি ঘরোয়া প্রদর্শনীতে 'দাউ শ্যাল নট কিল' দেখাবেন। এবং বলতে গেলে কর্তৃপক্ষের নাকের ওপরেই চিত্রটি প্রদর্শিত হল। এবং এইটাই এখন পর্যন্ত এই চিত্রের শেষ প্রদর্শনী। কারণ এই প্রদর্শনীর পরেই স্বরাষ্ট্র বিভাগ সাকুলার দিলেন যে, বাইরের লোক নিমন্ত্রিত হলেই কোনো প্রদর্শনী আর 'ঘরোয়া' থাকবে না এবং সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র একান্তই আবশ্যিক।

ভাটিকানের 'ল' অসরভেভর রোমানো ছবিটি সম্বন্ধে পরে লিখলেন—চিত্র-নির্মাতা সুকৌশলে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস, পুরোহিত গোষ্ঠী এবং চার্চের বিরুদ্ধে অপ-প্রচার করেছেন। চিত্রের নায়কের সামারিক মনোভাব কখনই সমর্থনীয় নয়, কারণ অন্যায় এবং অবিচার যতদিন থাকবে পৃথিবীতে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবার অধিকারও থাকবে ততদিন। (প্রতিনিধি)

কেবল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম প্রদর্শনী
শুক্রবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী মেট্রো প্রতাহ ২টি প্রদর্শনী ২৪টা ও ৭টা
আরম্ভ অতিরিক্ত প্রদর্শনী রবিবার ও ছুটির দিনে
সকাল ১০টার



একটি ইউনিভার্সাল ইন্টারন্যাশনাল রিলিজ — কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
টিকিট বিক্রয় চলিতেছে। সকল আসন সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

টিকিটঃ—৪.৫০, ৩.৭০, ২.৬৫ ২.২০ এবং ১.০৫ নং পঃ

সাপ্তম্বর, শ.ভারম্ভ—১৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টা

ইংরাজীভাষী ইউনিয়নের উপযোগে। প্রবেশমূল্য : ১০, ৫, ও ২ টাকা।

প্রথোলা শ্রীনাথ

দশক

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ক্রিকেট

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমানায় অবিস্তৃত বিশাল জলরাশি—একদিকে ক্যারিবিয়ান সাগর এবং তারই সংলগ্ন অপর দিকে আটলান্টিক মহাসাগর। ক্যারিবিয়ান সাগরের জলে মাথা তুলে আছে শত শত ছোট-বড় দ্বীপ এবং কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সুসজ্জিত হয়ে এই অঞ্চলের দ্বীপগুলি দেশ-বিদেশের সৌন্দর্য-পিপাসু পর্যটকদের ঘরছাড়া করে নিয়ে আসে এখানে। বেশীর ভাগ ভ্রমণকারী আসেন আমেরিকা এবং কানাডা থেকে। সভ্যজগত থেকে আকর্ষিতভাবে এই অঞ্চলে প্রথম এসে পড়েছিলেন দুঃসাহসিক দেশ-আবিষ্কারক এবং ভূপটিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস। তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কারের সংকল্প নিয়ে দুর্গম সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়ে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের কোন একদিন ক্যারিবিয়ান সাগরের এই অজ্ঞাত এবং অখ্যাত দ্বীপময় অঞ্চলে পথ হারিয়ে উপস্থিত হন এবং ভারতবর্ষের কোন অংশ মনে করে তিনি এই অঞ্চলের নাম দেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেই থেকেই এই অঞ্চল ঐ নামেই পরিচিত। অবশ্য আরও একটা নাম আছে—ক্যারিবিয়ান। এই অঞ্চলের আদিবাসী ক্যারিব জাতির নাম থেকেই ক্যারিবিয়ান শব্দের উৎপত্তি। যে সময়ে কলম্বাস এই অঞ্চলটি আবিষ্কার করেন তখন এই অঞ্চলে দু'রকম জাতির লোক বাস

করতো। তারা—আরাওয়াকস এবং ক্যারিব। এরাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের আদিবাসী। এই দুই জাতির লোকের স্বভাব-চরিত্র এবং দৈহিক আকৃতির মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ ছিল। উত্তরাঞ্চল দ্বীপগুলির আদিবাসী আরাওয়াকসরা ছিল খুব ভদ্র



শ্রী কনস্টানটাইন

এবং শান্তিপূর্ণ। কিন্তু ক্যারিব আদিবাসীরা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। এদের দৈহিক আকৃতি এবং স্বভাব-প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। রণালিসু স্বভাবের কারণে ইউরোপীয় ঐতি-



জর্জ হেডলি

হাসিকদের কলমে ক্যারিব জাতি কুখ্যাত হয়ে আছে। সভ্যদেশের লোলুপ দৃষ্টি থেকে স্বদেশ রক্ষার জন্যে এই ক্যারিব জাতি দু'শত বছর ধরে যুদ্ধ করেছে স্পেনীয়, ফরাসী, ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের সঙ্গে। এই যুদ্ধে শেবত জাতির অনেক অর্থ, সময় এবং রক্ত ক্ষয় হয়েছে। ইংরেজরা ক্যারিব জাতির বর্বরতা এবং ধৃষ্টতা ক্ষমা করতে পারেনি। ইংরেজি ভাষায় 'ক্যানিবাল' শব্দের প্রচলন দেখা গেল। এই শব্দের অর্থ 'স্বগোত্র-ভোজী' বা 'নরখাদক'। ক্যারিব জাতি থেকেই এই কথাটার উৎপত্তি।

ইউরোপের আশ্রয়শ্রমের কাছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আদিবাসীরা শেষে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। শূন্য তাই নয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের আদিবাসীরা আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে চলেছে।

আদিবাসীদের বিপক্ষে যুদ্ধ-জয়-



এডার্টন উইকস



ফ্রাঙ্ক ওয়েল



ফ্রাইড ওয়ালকট



আলফ্‌ ভ্যালেন্টাইন

জাতির পর সেখানে শূন্য হয় উপনিবেশ স্থাপনের কাজ। আফ্রিকা থেকে জাহাজ ভর্তি হয়ে আসতে থাকে হাজারে হাজারে নিগ্রো ক্রীতদাস। তাদেরই রক্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বাধীনতা ইউরোপের ধন-ভাণ্ডারে সোনার ফসল তুলে দেয়। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন দেখা দেয় এবং একদিন ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হয়। তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাজারে ভারতীয় শ্রমিকদের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। জাহাজ ভর্তি হয়ে দলে দলে ভারতীয় শ্রমিকদের ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাত্রার ধুম পড়ে যায়। বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তার বেশীর ভাগই ওয়েস্ট ইন্ডজে আগত পূর্বকালের ভারতীয় শ্রমিকদের বংশধর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভারতীয়দের মধ্যে ধনী ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যথেষ্ট। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বহু জাতির মিলনক্ষেত্র বলা যায়। এখানে বসবাস করছে ভারতীয়, নিগ্রো, স্পেনীস, ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, চীনা এবং উত্তর আমেরিকার বহু লোক। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিগ্রোরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও বিশ্বস্ত এবং তাদের রস-জ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভারতীয় এবং নিগ্রোদের আত্মপ্রিয়তার খ্যাতি আজ প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডজে বৈদেশিক শাসন কর্তৃত্ব আছে ইউরোপের তিনটি জাতির—ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজের। তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ফ্রেন্স ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ডাচ এ্যান্টিলিজ।

কারিবিয়ান সাগর অঞ্চলে ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজই আকারে অনেক বড়।

লোকসংখ্যা তিন মিলিয়ন; এই অঞ্চলটি দশটি স্থানীয় সরকার দ্বারা শাসিত। ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডজে জামাইকা সব থেকে বড় স্বাধীন এবং কারিবিয়ান অঞ্চলের 'রাণী'। ত্রিনিদাদ সব থেকে সমৃদ্ধিশালী স্বাধীন।

ভারতীয় ক্রিকেট দল এই ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ অঞ্চলেই খেলতে গেছে। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের জাতীয় খেলা। শূন্য ছোট-বড় সহরে নয়, অতি নগণ্য গ্রামাঞ্চলেও ক্রিকেট খুবই জনপ্রিয়। ওয়েস্ট ইন্ডজে আনন্দোৎসবের প্রধান উৎসব এই ক্রিকেট। রবিবারের ক্রিকেট খেলার আকর্ষণ অন্য রকম। রবিবার ছুটির দিন, তাই বিশ্রামের দিন এবং ফুটির দিন। বিশ্রাম ও ফুটি ঘরে বসে নয়। দলে দলে ছেলে-মেয়েরা এবং বড়রা সাজ পোষাকে

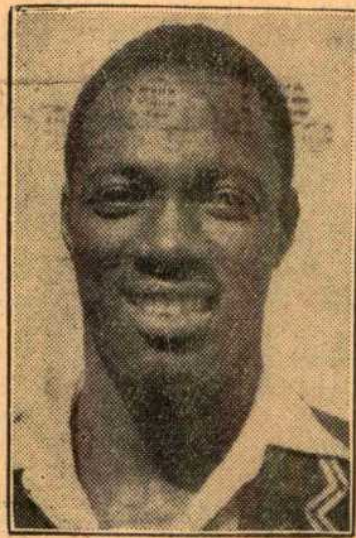


সনি রামাধীন

খোপদুর্সত হয়ে ক্রিকেট খেলা দেখতে যায়। আমাদের দেশে বিশেষ পালা-পার্বণে যেমন জনসমাগম, তেমনি ওয়েস্ট ইন্ডজে রবিবারের ক্রিকেট



রোহান কানহাই



ওয়েসলী হল

খেলায়। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান মেয়েরা ঘর-কুনো নয়। তারাও বর্ণাভা পোষাকে সাজগোজ করে দলে দলে উড়ে আসে ক্রিকেট মাঠে। ক্রিকেট মাঠ রঙীন প্রজাপতিতে ভরে যায়। মেয়েদের সাজ-পোষাকের এমন জটিলত্ব আমাদের দেশে বিশেষ উৎসবের দিনেই চোখে পড়ে। শূন্য নির্দিষ্ট ক্রিকেট মাঠেই খেলা হয় না, খেলা হয় যত্রতত্র—কেবল নদনদী, খাল-বিল প্রভৃতির জল বাদ দিয়ে। আর সে খেলার উত্তেজনা একমাত্র চোখে দেখে উপলব্ধি করা যায়। ক্রিকেট খেলাছে দলে দলে—নিগ্রো, ভারতীয়, চীনা এবং সময়ে সময়ে শ্বেতাঙ্গরাও খেলায় ভিড়ে যায়। প্রতি দলেই থাকবে দু'তিনজন ফাস্ট বোলার এবং শক্তিশালী 'হিটার'। ছয়ের মারে ছয়-ছয়াকার—দু'রের তাল-নারকেল গাছের মাথার ওপর দিয়ে ছয়ের বল আনন্দ করতে করতে উড়ে যায়। সে আনন্দের শিহরণ লাগে গেছো দর্শকদের। চওড়া ঠোঁটে গিশ দিতে গিয়ে কিংবা আনন্দের আতিশয্যে হাততালি দিতে গিয়ে দু'চারজন ছেলে-ছোকরা মাটিতে পড়ে যায়। সে দিকে কোন জুক্ষেপ নেই, না কোন আক্ষেপ। এ রকম ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক। ওরা বলে, নারকেল গাছের পাকা ফল পড়লো। চুয়াল-ভর্তি শ্বেত-পদ্ম ফুটে উঠলো—একটা-আধটা নয়, সারি সারি, সাদা দাঁতের সে হাসি গুণে শেষ হয় না। খেলার শেষে পেটপূরে খাওয়া, পানোৎসব, মেয়ে-পুরুষ মিলে নাচ-গান। এই পরিবেশ থেকেই একাধিক বিশ্ববিখ্যাত ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়ের আবির্ভাব।

জনপ্রিয়তার তুলনায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট খেলা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে দু'ত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়নি, তাছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট



এফ আলেকজান্ডার

খেলার আসল রূপও প্রকাশ পায়নি। নানা কারণের মধ্যে প্রধান কারণ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট খেলার উপর শ্বেতাঙ্গ প্রভাব। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের উৎকট বর্ণবৈষম্য নীতি ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট খেলার অগ্রগতির পথে এতদিন প্রধান বাধা হয়ে ছিল। প্রতিনিধিত্বমূলক ক্রিকেট খেলার বহু ক্ষেত্রে অশ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়দের যোগ্যতা উপেক্ষিত হয়েছে এবং সেই জায়গায় নিষ্কৃতি শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়দের সম্মানে দলভুক্ত করা হয়েছে। বিদেশের ক্রিকেট সফরে এবং স্বদেশের টেস্ট খেলায় অধিনায়কের পদ লাভ করেছে শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়রা। মাত্র দু'একটি ক্ষেত্রে অশ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড় দল পরিচালনার ভার পেয়েছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেছে অতি সম্প্রতি। সে পরিচয় দিয়েছে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১৯৬০-৬১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে। এই সফরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১-২ খেলায় হেরেছে। তবুও অস্ট্রেলিয়ার জনগণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ধ্বনি করেছে। মেলবোর্নে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড়দের জন্যে বিরাট নাগরিক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। রাস্তার দু'পাশে অগণিত জনগণ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়দের দর্শন-প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের সংখ্যা ৫ লক্ষের মত। এ রকম জনসমাগম একমাত্র ১৯৫৪ সালে রাণীর আগমনে হয়েছিল।

চারদিক থেকেই জয়ধ্বনি উঠেছে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নামে। ওরেলের নামে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের টেস্ট সিরিজে বিজয়ী দলের পুরস্কার 'ওরেল কাপ'। এই পুরস্কারের প্রবর্তকও অস্ট্রেলিয়া। এ জয়গান শুধু ওরেল বা



গারফিল্ড সোবার্স

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের নয়, ক্রিকেট খেলার নতুন জীবনের। সেই নতুন জীবনের সম্মান দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট খেলার সূচনা ভারতবর্ষের অনেক পরে। সেখানেও ক্রিকেট খেলার পথপ্রদর্শক ইংরেজ জাতি। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আর এস লুকাসের নেতৃত্বে প্রথম ইংলিশ ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যায়। পাঁচ বছর পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল ইংল্যান্ডে খেলতে যায়। এই সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১৭টা খেলায় যোগদান করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়ায়—জয় ৫, হার ৮ এবং খেলা ড্র ৪। ইংল্যান্ড সফরের অনেক আগে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল কানাডা এবং আমেরিকায় ক্রিকেট খেলে এসেছিল। আমেরিকা থেকেও প্রথম ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে এসেছিল, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলার যোগ্যতা লাভ করে। ভারতবর্ষকে এই যোগ্যতা পেতে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ প্রথম সরকারী টেস্ট খেলতে নামে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সরকারী টেস্ট খেলা আরম্ভ হয় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে, অস্ট্রেলিয়ার রিসবেনে। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল গডার্ডের নেতৃত্বে ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত সফরে এসে ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলতে নামে নিউডিল্লীতে ১০ই নভেম্বর।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ইংল্যান্ড সফরে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংল্যান্ডের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে



কনার্ড হার্ট

যায়—তিনটে টেস্টেই ইংল্যান্ডের ইনিংস জয়। এর পর ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ইংল্যান্ড দলকে বেশ বেগ পেতে হয়। মোট ৪টে খেলায় দুই দলেরই একটা করে খেলায় জয় এবং দুটো খেলা ড্র। 'রাবার' অমীমাংসিত থেকে যায়। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম 'রাবার' পায় ১৯৩৪-৩৫ সালের টেস্ট সিরিজে, স্বদেশের মাটিতে। ইংল্যান্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম 'রাবার' লাভ করেছে ১৯৫০ সালে জে ডি গডার্ডের নেতৃত্বে। এই সময়ের মধ্যে দুই দেশ ৭টা টেস্ট সিরিজ খেলেছে। টেস্ট সিরিজের ফলাফল সমান, দুই দেশই তিনটে করে 'রাবার' লাভ করেছে এবং একটা টেস্ট সিরিজ (১৯২৯-৩০) অমীমাংসিত।

১৯৫০ সালের পর ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের মধ্যে আরও তিনটে টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের টেস্ট সিরিজ ড্র যায়। ইংল্যান্ড পরবর্তী দু'টো টেস্ট সিরিজে (১৯৫৭ ও ১৯৫৯-৬০) 'রাবার' পায়। ১৯৫৯-৬০ সালের টেস্ট খেলা হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ইংল্যান্ড প্রথম 'রাবার' লাভ করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে ৫টি টেস্ট সিরিজ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪ এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১) খেলা হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোন সিরিজেই হার স্বীকার করেন—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রয় ২ (১৯৩৪-৩৫ ও ১৯৪৭-৪৮) এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১ (১৯৫০)। উপর্যুপরি তিনটি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'রাবার' পায়। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২টি টেস্ট সিরিজ (১৯২৯-৩০ ও ১৯৫৩-৫৪) ড্র যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে বৈদেশিক ক্রিকেট দল হিসাবে

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষের পক্ষে :

ভারতবর্ষ : ১০৪* বিজয় হাজারে,
বোম্বাই, ১৯৪৮-৪৯

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ১৬০* মাধব
আশ্বেত, ট্রিনিদাদ, ১৯৫০

(এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের
ভারতীয় রেকর্ড : ২৩১ রাণ-ভি
মানকড়, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, মাদ্রাজ,
১৯৫৫-৫৬। ভারতবর্ষের বিপক্ষে :

বিপক্ষে, কিংস্টোন, ১৯৫৭-৫৮ (বিশ্ব
রেকর্ড)। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে
রেকর্ড : ৩৩৭ হানিফ মহম্মদ
(পাকিস্তান), বার্বাদোজ, ১৯৫৭-৫৮)

ডাবল সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষের পক্ষে : শূন্য

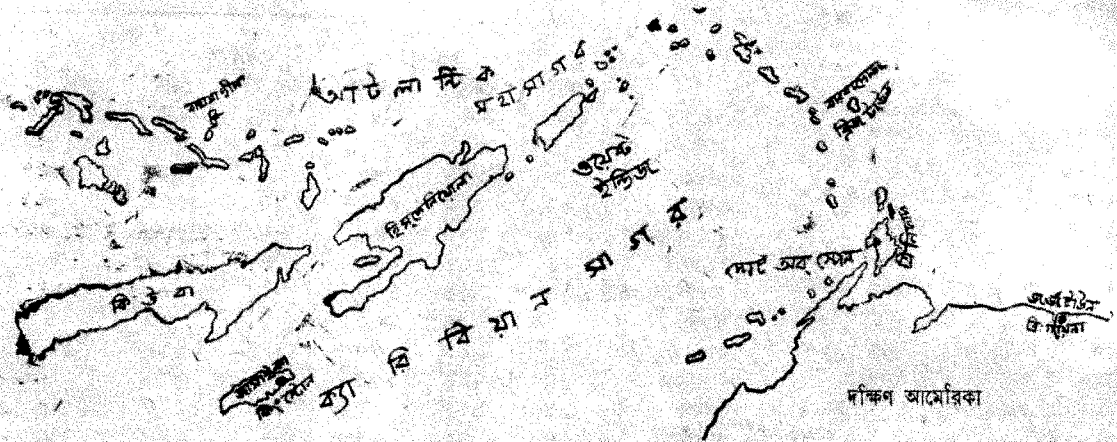
ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ৩টি—২৫৬
রোহন কানহাই, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯;
২৩৭ ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, কিংস্টোন, ১৯৫০
এবং ২০৭ এডার্টন উইকস, পোর্ট অব
স্পেন, ১৯৫০।

৫০ রানে—হল, কানপুর,
১৯৫৮-৫৯ এবং ৬ উইকেট
৫৫ রানে—গিলক্রিস্ট, কল-
কাতা, ১৯৫৮-৫৯

একটি টেস্টে সর্বাধিক উইকেট :

ভারতবর্ষের পক্ষে : ১০ উইকেট
(২২০ রানে)—সুভাষ গুপ্তে,
কানপুর, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ১১
উইকেট (১২৬ রানে)—হল,
কানপুর, ১৯৫৮-৫৯



১৯৬২ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের টেস্ট ক্রিকেট খেলার তারিখ : ১ম টেস্ট
(ট্রিনিদাদ) : ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১। ২য় টেস্ট (জামাইকা) : মার্চ ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১২। ৩য় টেস্ট
(বার্বাদোজ) : মার্চ ২০, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮। ৪র্থ টেস্ট (বাটিশ গায়ানা) : এপ্রিল ৭, ৯, ১০, ১১ ও ১২। ৫ম টেস্ট
(ট্রিনিদাদ) : এপ্রিল ১৮, ২১, ২১, ২৩ ও ২৪।

২৫৬ রান—কানহাই (ওয়েস্ট ইন্ডিজ),
কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯)

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে :

ভারতবর্ষ : ২৫৬ আর কানহাই,
কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৩৭ ফ্র্যাঙ্ক
ওরেল, কিংস্টোন, ১৯৫০

(এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের
ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান রেকর্ড : ৩৬৫ নট
আউট—গারফিল্ড সোবার্স, পাকিস্তানের

টেস্টের এক সিরিজে

সর্বাধিক মোট ব্যক্তিগত রান

ভারতবর্ষের পক্ষে : ৫৬০ (এভারেজ
৫৬.০০)—রুসী মোদী, ১৯৪৮-৪৯
(ভারতবর্ষ)। ৫৬০ (এভারেজ ৬২.২২)
—পলি উমরীগড়, ১৯৫০ (ওয়েস্ট
ইন্ডিজ)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ৭৭৯
(এভারেজ ১১১.২৮)—এডার্টন উইকস,
১৯৪৮-৪৯ (ভারতবর্ষ) এবং ৭১৬
(এভারেজ ১০২.২৮)—এডার্টন উইকস,
১৯৫০ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)।

টেস্টের উভয় ইনিংসে
সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষের পক্ষে : শূন্য

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ১৬২ ও ১০১
—এডার্টন উইকস, কলকাতা, ১৯৪৮-
৪৯।

বোলিং রেকর্ড

টেস্টের এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট :

ভারতবর্ষের পক্ষে : ৯ উইকেট
১০২ রানে—সুভাষ গুপ্তে,
কানপুর, ১৯৫৮-৫৯
ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ৬ উইকেট

টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট :

ভারতবর্ষের পক্ষে : ২২ উইকেট
(এভারেজ ৪২.১০)—সুভাষ
গুপ্তে, ১৯৫৮-৫৯ (ভারত-
বর্ষ) এবং ২৭ উইকেট
(এভারেজ ২১.২২)—সুভাষ
গুপ্তে, ১৯৫০ (ওয়েস্ট
ইন্ডিজ)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ৩০

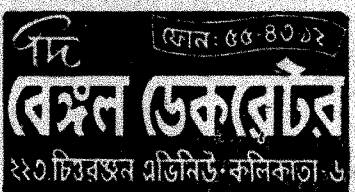
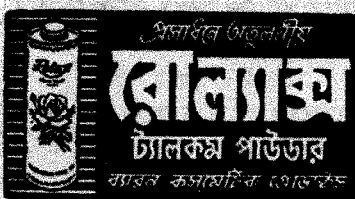
উইকেট (এভারেজ ১৭.৬৬)
—হল, ১৯৫৮-৫৯ (ভারত-
বর্ষ) এবং ২৮ উইকেট
(এভারেজ ২৯.৫৭)—
ভ্যালেন্টাইন, ১৯৫০ (ওয়েস্ট
ইন্ডিজ)।

উইকেট-কিং

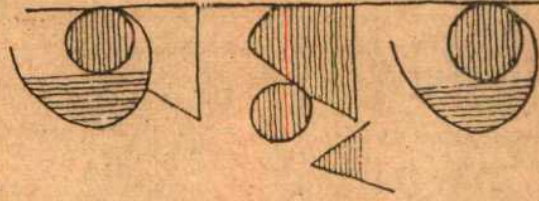
টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট :

ভারতবর্ষের পক্ষে : ৭—এন ডাম-
হানে, ১৯৫৮-৫৯ (৪টি
টেস্টে)

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ১৮—
আলেকজান্ডার, ১৯৫৮-৫৯
(৫টি টেস্টে)



অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে প্রীতীপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা-৩ হইতে মদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১টি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।



১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪১শ সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 16th February, 1962
40 Naya Paise.

সজনীকান্ত দাস

সুপরিচিত সাহিত্যিক এবং ‘শনিবারের চিঠি’র শান্ত হ’য়ে আসার পর একথা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের জীবনাবসান হ’য়েছে, গেছে যে, সজনীকান্তের সেই আবির্ভাব ছিল ইতিহাস-নির্দিষ্ট। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যেমন শাসকদের মূখোমুখী থাকে বিরোধীপক্ষ, সাহিত্যের অগ্রগতির জন্যেও তেমনি দরকার শক্তিশালী প্রতিবাদের কণ্ঠ। সজনীকান্ত বাংলাসাহিত্যের আসরে সেই বিরোধীপক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছেন তাঁর দায়িত্ব।

সজনীকান্ত কবি, গল্পকার এবং উপন্যাস-লেখক হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলেও তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল সমালোচক হিসাবে। একদা তিরিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই বাংলা-সাহিত্যে একবার হাওয়াবদল ঘটে। গল্প-উপন্যাস-কবিতায় তখন দেখা দেয় সেই সব যুগলক্ষণ যাকে আমরা বলি আধুনিকতা। ফ্রেড এবং মার্জের যুগান্তকারী মতবাদের প্রভাবে সেই যুগের তরুণ কবি-সাহিত্যিকগণ জীবনকে এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। তাঁরা প্রচলিত ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করে মানবিক সম্পর্ক এবং মানব মনের দুর্জয়ের রহস্যকে উদ্ঘাটিত করার রত গ্রহণ করেন—তাঁদের বিষয়বস্তু-নির্বাচন এবং ভাষা-ব্যবহারের মধ্যে দেখা দেয় বেপরোয়া বিদ্রোহের আভাস।



সাহিত্যের ক্ষেত্রে সজনীকান্ত কবিতা, বিশেষ করে ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন যথেষ্ট, নক্সাজাতীয় ছোট গল্পেও ছিল তাঁর গদ্য রচনার মন্তব্যগুলি একাধারে সরস ও তীক্ষ্ণ। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাসের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল যেমন ব্যাপক, সে বিষয়ে তাঁর মনোনিবেশ ছিল তেমনি গভীর। বস্তুত তাঁর মতো মনেপ্রাণে সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমিক মানুষ সমস্ত যুগেই দুর্লভ।

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলা যায়, এই বিদ্রোহের প্রয়োজন ছিল। ‘কল্লোল-যুগ’ নামে পরিচিত সেইকালের তিরিশ বছর পরে আজ আমরা নিঃসংশয়েই দেখতে পাচ্ছি, সেদিনের তরুণ লেখকদের ঐ পরিবর্তনপ্রয়াস বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সুফলপ্রসূ হ’য়েছে। কিন্তু যে-সময়ে ঐ আন্দোলন বাংলার স্তিমিতবেগ সাহিত্য-ধারায় ‘পাহাড়ী ঢল’ এনেছিল তখন তার মধ্যে গতির প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে তলানি-গুলিয়ে-ওঠা আবির্ভাবও দেখা গিয়েছিল প্রচুর পরিমাণেই।

সজনীকান্ত ঐ আবির্ভাবের বিরুদ্ধে কঠিন সমালোচক হিসাবে আবির্ভূত হন বাংলা-সাহিত্যে। আজ তিরিশ বছরের ব্যবধানে সে যুগের উত্তেজনা ও উদ্বেগ

শ্যাকেই আঘাত করেননি, নতুন একদল সাহিত্যিককেও নবপ্রেরণায় উৎসাহিত করে তুলেছিলেন। অত্যন্ত সুখের বিষয়, তাঁরা আজ অনেকেই বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সজনীকান্তের বন্ধুকণ্ঠের বিষয়ে

রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর বৎসরে হারিয়েছি আমরা অনেক সুসাহিত্যিককেই। সেই শোকাত্ত তালিকায় সজনীকান্তের নামও যুক্ত হল, কিন্তু সে নাম মহাকালের বিচারে ভাস্বর হ’য়ে থাকবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

দুবদুহা

উদ্ভাস

ভদ্র মহোদয়গণ! আমি কালাপাহাড় নই। নির্বিচারে সৌন্দর্য-ধ্বংস করাই আমার জীবনের পরম ব্রত নয়। পরন্তু আমি বর্তমান কালের মানুষ, এবং একালে রচিত শিল্প-সাহিত্যের প্রভাবে একজন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর যে-পরিমাণে চিত্তোৎকর্ষ ঘটা সম্ভব তাও আমার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আধুনিক যুগের কথাসাহিত্য অনন্দের সঙ্গে পাঠ করি, আধুনিক কাব্যতাও কিছু পরিমাণে আমাকে নাড়া দেয়। একালের সিনেমার আমি একজন উৎসাহী ভক্ত, আধুনিক রংগমঞ্চও আমাকে অনেকখানি আশান্বিত করে তোলে। কিন্তু শব্দ, আধুনিক গান এবং আধুনিক চিত্রশিল্প আমাকে কিছুতেই আনন্দিত করতে পারে না—এতে আমি উদ্ভ্রান্ত বোধ করি।

গানের কথা আগে একবার নিবেদন করেছি, পরে না হয় আবার বলা যাবে। এবার চিত্রশিল্পের বিষয়ে আমার চিত্ত-বিস্ফোভের কারণ নিবেদন করি।

চিত্রশিল্প অর্থাৎ সাদা কথায় স্বাক্ষর বলে ছবি, সেটা নেহাৎই চোখে দেখার ব্যাপার। একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাগজ বা ক্যানভাসের উপর রঙ আর রেখার সাহায্যে রূপের আভাস ফুটিয়ে তোলাই বোধহয় ছবির স্বধর্ম। রূপ-বস্তুটির এমনি মহিমা যে দেখা মাত্রই মানুষকে তা আকৃষ্ট করে। অবশ্য 'মানুষ' বলে কোনো সাধারণ গণ্ডি টানা আজকের দিনে ভুল তা আমি স্বীকার করি। যে অর্থে সব মানুষই আজকের দিনে ভোটের অধিকারী সেই অর্থে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই যে শিল্প-সচেতন হবে এমন কোনো কথা নেই। সভ্যতার বিস্তীর্ণ ইতিহাস অতিক্রম করে শিক্ষিত মানুষ আজ এমন ধরনের সুক্ষ্ম রসবোধের অধিকারী হয়েছে যা আমাদের আদিম যুগের পূর্বপুরুষ কিংবা বর্তমান যুগের অ-সংস্কৃতচিত্ত মানুষের অনিধিগম্য। কাজেই একালের ছবিও একালের শিক্ষিত মানুষেরই প্রত্যাশী—যে মানুষ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়িক অর্থেই শিক্ষিত নয়, যার চোখজোড়াও চিত্রদর্শনে শিক্ষিত।

এ সবই আমি সবিনয়ে মেনে নেব। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমি নিবেদন করব, ছবি দেখার প্রাথমিক সতর্ক ফেল হ'য়ে যাই এমন দর্শক হয়ত আমি নই। অন্তত,

আমার মতো দর্শকেও যদি অস্পষ্ট জ্ঞানে সরিয়ে রাখতে হয় তাহলে কল-কাতার মতো শহরে ছবির এগজিবিশন খোলার যে কোনো মানেনই হয় না, সেটা আমি সরবেই ঘোষণা করব। কারণ, অপ্রিয় সত্য হলেও আমি বলতে বাধ্য, ও-সব প্রদর্শনীতে ষাঁরা নয়ন সার্থক করতে (এবং করতে) যান তাঁরা শতকরা নিরানন্দ্বই জনই আমার মতো দর্শক।

তাঁদের যদি বাদ দিতে হয় তাহলে প্রদর্শনী ঘরের চারদিকে ছবি টাঙানোর পর সদর দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে উদ্যোক্তাদেরই পরস্পরকে বাহবা দেওয়া ছাড়া কোনো গতান্তর থাকবে না। হয়তো সদর দরজা খোলা রেখেও পরিণামে ব্যাপারটা ঐ রকমই দাঁড়ায়। প্রদর্শনীটির উদ্ঘাটনের জন্যে যদি কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন,

বা ক - সা হি ত্যে র ব ই

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

রবীন্দ্রায়ণ

মজবুত কাপড়ে বাঁধাই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রতি খণ্ডের দাম দশ টাকা

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

নিশিপদ্ম

কাগুন কীর্তনওয়ালীর মেয়ে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মুক্তি দাস, সংগীতেও যার সুখ্যাতি সর্বত্র। বাপের 'বোস' উপাধি ত্যাগ করে, আত্মপরিচয়ের শ্লানিময় উৎসকে মুছে ফেলে সে বিমুক্ত হতে চেয়েছে নিজের জীবনে। জন্মের জন্য কোন দোষ নেই তার, তবে সমাজ তার ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা দিতে নারাজ কেন?—উপন্যাসিকশ্রেষ্ঠ তারাক্ষরের গভীর মানবিকআবেদনসম্পন্ন শিল্প-রস-সমৃদ্ধ নতুন কাহিনী।

দাম—৪.০০

বিকর্ণ-র সুবৃহৎ বাস্তবধর্মী উপন্যাস

নৈমিষারণ্য

উদ্ভাস্তু সমস্যা বাঙালীর জাতীয় সমস্যা। আশ্চর্য, বাংলা কথাসাহিত্যে এই বিষয়টি এতদিন উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। বৎসরাধিককাল ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে কাটিয়ে সংবেদনশীল লেখক হাজার হাজার উদ্ভাস্তুর জীবন-সংগ্রামের বাস্তব চিত্র এঁকেছেন এই সুবৃহৎ উপন্যাসে। 'নৈমিষারণ্য' কলির নব-রামায়ণ, নতুন জীবন সাধনার অভিনব কাহিনী। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

আশ্রয় ॥

জরাসন্ধ

৩.৫০

জরাসন্ধের সার্থক লেখনী থেকে সার্থকতম নতুন উপন্যাস। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়।

স্ত্রী ॥

বিমল মিত্র

৪.০০

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিকের উপন্যাসোপম তিনটি অনবদ্য বড়ো গল্পের সুশোভন সংকলন। দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল।

বাক-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

তিনি অনিবার্যভাবেই ছবির বিষয়ে কতগুলি মামুলি কথা বলে কতব্যসাধনা করেন। কিংবা, শিল্পী যদি প্রভাবশালী ব্যক্তি হন, তাঁর বরাতে জোটে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা, যার এক বর্ণও যদি সত্যি হত তাহলে অনায়াসে তিনি স্থান পেতেন পিকাসোর পাশে!

কিন্তু এসব কথা না হয় বাদ দিলাম। প্রশংসা না করলে শিল্পীরা তাঁদের আদর করে ডেকে আনবেন কেন? সে কথা থাক। ছবি দেখার পর শিল্প-সমালোচকেরা যা বলেন এবং লেখেন সেইটাই হল সবচেয়ে মজার ব্যাপার। 'ধরি মাছ না-ছুই পানি' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে বাংলা দেশে, ছবির সমালোচনাও যেন সেই ধরনেরই একটি উচ্ছ্বাসের আর্ট! জল রং, তেল রং, প্যাস্টেল, জ্যামিতিক প্যাটার্ন এবং সর্বশেষে কিন্তু সর্বোপরি সেই অ্যাবস্ট্রাকট ফর্ম—এই কথ্যগুলিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রয়োগ করাই হল চিত্র-সমালোচনার পরম কৌশল! অবশ্য তার মানে এ নয় যে, সমালোচকেরা ছবির বিষয় কিছু বোঝেন

না। অনেকেই সম্ভবতঃ বোঝেন। কিন্তু তাঁরা তো ভ্যাকুয়ামের মধ্যে কাজ করেন না, কাজ করতে হয় একটা পরিবেশের মধ্যে। সেই পরিবেশের আচরণবিধিই সর্বপ্রথমে মেনে চলেন তাঁরা। ফলে যেমন করে সমালোচনার কথা বলা রেওয়াজ তেমনি করেই বলেন তাঁরা। এবং পরিণামে একটি ছবির প্রদর্শনী থেকে অন্য প্রদর্শনীর বিন্দুমাত্র গুণগত পার্থক্যও তাতে ধরা পড়ে না।

এ এক অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। মূড়ি আর মিছরি এখানে প্রায় সমান দরে বিক্রয়। ফলে একদিকে যেমন এখানে প্রকৃত গুণগ্রাহিতার অভাবে ক্ষমতাবান শিল্পী মাঝারীর ভিড়ে হারিয়ে যান, অন্যদিকে তেমনি সহজে বাহবা কুড়ানোর প্রলোভনে অজস্র অপটু ভাগ্যান্বেষীর সমাগম ঘটতে থাকে। বস্তুত কিছুকাল যাবৎ এঁদের ভিড়ই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে যেন!

যে-কোনো ব্যক্তি তুলি-ধরা শিখেই দেখছি আজকাল ছবির এগজিবিশানের

জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে উঠছেন। দর্শনার্থী হাত থাকলেই যে ছবি আঁকা যায় না, অনেক প্রদর্শনী দেখেই সেটা বিশ্বাস হয় না। অ্যাবস্ট্রাকশানের নামে অজস্র বিকৃতি পণ্যপালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে চারিদিক থেকে। বিমূঢ় সমালোচক ও দর্শক তাঁদের ব্যাখ্যা করার জন্যে গলদঘর্ম হচ্ছেন।

কিন্তু আসল কথাটা কেউই স্পষ্ট করে বলছেন না। সেটা হল এই যে, অধিকাংশ ছবিই ছবি নয়। চিত্রকরেরাও বেশীর ভাগই শিল্পী নন। তাঁরা হলেন নকলনবীশ, বিদেশী ছবির নিকৃষ্ট প্রতি-লিপিগর অক্ষম অনুকারী মাত্র। তাই বেশীর ভাগ আঁককেরই নিজের কোনো অঙ্কনশৈলী নেই, চারিত্র্য নেই, এবং বস্তু তো নেই-ই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, যে কয়খানি ছবি এঁরা এগজিবিশানে হাজির করেন তার বেশী ছবি এঁরা আঁকেননি অনেকেই। সাধনার কথা দূরে থাক, যে-কোনো শিল্পরূপের মতোই ছবিও যে একটি নিয়ত চর্চার যোগ্য বস্তু তাও এঁরা জানেন কিনা সন্দেহ। হুজুরগের টানে দু'দশ টুকরো ক্যানভাসের উপর রঙ বুলিয়েই এঁরা ছোটেন এগজিবিশান করতে, এবং সেই সব এগজিবিশানেই আমরা চোখ গেল করে চোক গিলতে গিলতে বাহবা দিতে থাকি। আত্মহলনারও একটা সীমা থাকা দরকার!

আমরা ছবি চাই, ভালো ছবি। আমরা এমন সব প্রদর্শনীতে গিয়ে দাঁড়াতে চাই যেখানে উপস্থিত হলেই শিল্পীর ব্যক্তিগত আমাদের সচেতন করে তুলবে। আমরা পরিচিত জীবন ও জগৎকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করে নিজেদের অস্তিত্বের অন্য ব্যাখ্যা খুঁজে পাব। আমাদের অভিজ্ঞতার দিগন্ত আরো একটু প্রসারিত হয়ে মানুষ হিসাবে আমরা কিছুটা পরিবর্তিত হব—সংস্কৃতির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হব।

তৈমন ছবি যদি শয়ে শয়ে না পাই, ক্ষতি নেই, দু'দশখানা পেলেই খুশি আমরা। কিন্তু আগাছাকেই মনোরম উদ্যান বলার প্রান্তিবলাস থেকে মুক্তি চাই। সমালোচকেরা কঠিন হাতে নিড়ানি ধরুন। জাত ফুলের গাছ যদি একটি কি দুটিও থাকে তো সেগুলি নিশ্বাস ফেলে বাঁচুক—কুসন্মিত হয়ে উঠুক। এই আযোগের ভিড় অসহ্য!



একটি বিশিষ্ট আসন

এবারেও (১৯৬১) সর্বভারতীয় মূদ্রণ ও প্রকাশন-সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় শিশু সাহিত্য সংসদ পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া ভারত সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছে।

রচনার জন্য : ছবিতে পৃথিবী (প্রস্তর যুগ)-এর লেখক শ্রীমদো-মোহন চক্রবর্তী এক হাজার টাকা পুরস্কারে ভূষিত।

মুদ্রণ ও প্রকাশন-সৌষ্ঠবের জন্য : ছবিতে পৃথিবী (প্রস্তর যুগ) প্রথম পুরস্কার। নবীন রবির আলো—দ্বিতীয় পুরস্কার। খেলার পড়া—প্রশংসাপত্র।

বিগত সাত বৎসরে প্রাপ্ত পুরস্কার

রচনার জন্য : নিজে পড়—শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও। ছবিতে মহা-ভারত—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। নাকাল নেংটী (চেঙাবেঙা ২)—শ্রীবিমল ঘোষ (মোমাছি)। চিরোঁ মে' পশুরোঁ কি লোরিয়া—শ্রীশ্যামসুন্দর ফেরী। আমরা ফসল ফলাই—শ্রীহরিনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। যুবকল্যাণ—শ্রীবিনয় ঘোষ।

মুদ্রণ ও প্রকাশন-সৌষ্ঠবের জন্য : প্রথম—ছড়ার ছবি (৩) ('৫৫); নিজে পড় ('৫৬); ছবি আঁকা—খ ('৫৭)। দ্বিতীয়—ছড়ার দিনে মেঘের গল্প ('৫৫); ছোটদের বাঙ্গালীক রামায়ণ ('৫৮); * জীবনের ঝরাপাতা ('৫৮); প্রশংসাপত্র—ছবিতে রামায়ণ ('৫৫); আমরা বাঙ্গালী ('৫৬) চেঙাবেঙা ১ ('৫৬); * রামায়ণ কৃতিবাসি বিরচিত ('৫৭)।

* সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত।

গত সাত বৎসরে মোট বিশটি পুরস্কারের অধিকারী

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড

৩২এ আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-১

ইউরোপীয় সভ্যতার মঙ্কট ও শিল্পী

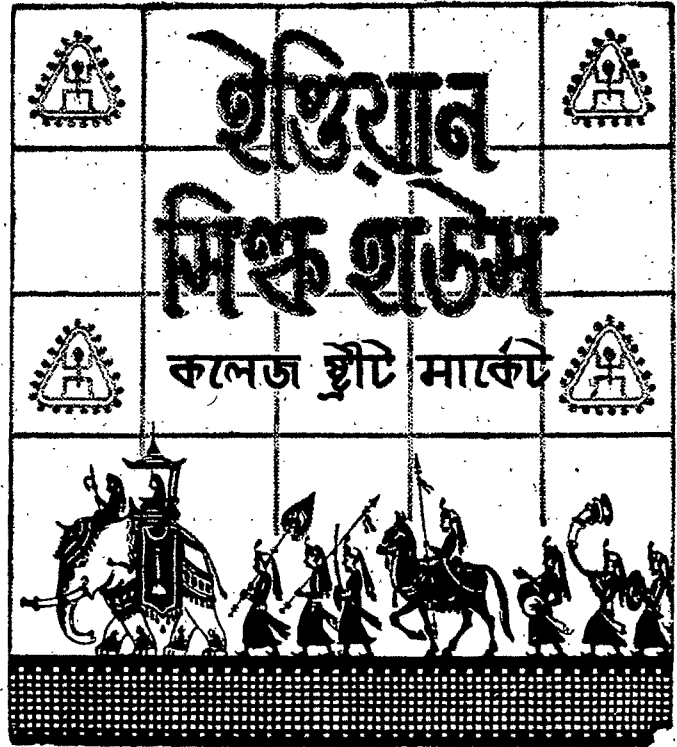
রবীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ

ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পর থেকে যুগে যুগে, পুরুষানুক্রমে ইউরোপ আমাদের শিক্ষার, সভ্যতার, সংস্কৃতিতে ও চিন্তাশীলতায় অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে ও প্রভাবান্বিত করে এসেছে। আমাদের জাতীয়তাবোধের সূচনা থেকে শুরু করে উগ্র ইউরোপ-প্রীতি এবং তার বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়ায় উগ্র জাতীয়তাবাদ, উভয়ই সেই অনুপ্রেরণা ও প্রভাবের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। মধ্যযুগ শতাব্দীতে তাই যখন স্বভাব ও অভাব-বশে ইউরোপের দিকে তাকাই তখন দেখি ইউরোপীয় সভ্যতা, সংস্কৃতিতে, চিন্তায়, সাহিত্যে ও শিল্পে নিদারুণ রিক্ত এবং ইউরোপের মানুষেরও নতুন কেন জীবনাদর্শ নেই বরং গভীর আত্মিক অসুস্থতায় সে মূহ্যমান।

মধ্যযুগ শতাব্দীর মানুষের এই যে ‘অসুস্থতা’ সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় মহাদুঃস্বপ্নের ইউরোপীয় চিন্তা-শীল শিল্পী-সাহিত্যিক গোষ্ঠীরা সচেতন হয়েছেন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই সমস্যার সমাধান খুঁজছেন। Colin Wilson-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে (G. P. O’Rourke-এর ছুটিতে কাজ করার সময়) তিনি যখন জানালেন যে, মধ্যযুগ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকট-মোচনের জন্যে ‘Visionary’ হওয়া চাই যেমন ভারতবর্ষের ‘রামকৃষ্ণদেব’ ইত্যাদি, তখন স্বভাবতই ধর্মপ্রসারী ভারতবর্ষের মানুষ হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম যে, যে দেশ গীতা, বৃন্দ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের জন্মদাত্রী সে দেশের মানুষের ‘অসুস্থতা’ ও সংস্কৃতির যে সংকট তার সমাধান কি বা কে করবে? এর জবাব পেলাম না; তার পরিবর্তে Colin জানালেন যে, এই ‘সংকট’ ইউরোপের এবং তিনি ভারতবর্ষের দেশ, সমাজ, অর্থনৈতিক অবস্থা, মানুষজনকে জানতে উৎসুক নন, তিনি শুধু চান ভারতের বৃন্দ, রামকৃষ্ণের মত ‘Visionary’দের। Colin ও তাকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্যিক ও সমালোচক বন্ধু Stuart, শিল্পী David এবং কয়েকজন বোহেমিয়ান ‘ইনটেলেকচুয়াল’-এর সঙ্গে আলাপে বিশেষ করে Colin-এর “Emergence From Chaos” ও “Outsider”-এর পাণ্ডুলিপি পাঠের আলোচনায় জানলাম যে খ্রীষ্টধর্ম ইউরোপকে বিফল করেছে এবং ধর্মহীন ইউরোপের অসুস্থতার একমাত্র সমাধান

একটা ‘Scientific Religion’-এর প্রবর্তন এবং শিল্পীরা বাঁরা ‘Vision’ দিয়ে অজানায় যাত্রা করেন, ‘জানা’র সীমাকে বিস্তৃততর করেন তাঁদেরই এ দায়িত্ব। কিন্তু অসুস্থ, রুগ্ন সমাজ ও মানুষের মধ্যে শিল্পীরা থাকতে পারেন না। তাই Colin জানালেন যে তিনি সমাজবিরোধী—একজন “Outsider”। ইউরোপীয় সভ্যতার সংকট সমাধানের এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে যে, সভ্যতার এই সংকট ও মানুষের আত্মিক অসুস্থতা কি কেবলমাত্র ইউরোপের এবং তার সমাধান কি বৈজ্ঞানিক যুগে “Scientific Religion”এ? এবং ইউরোপ কি কোনও “Religion”এর জন্ম দিয়েছে বা জন্ম দিতে পারবে? মানুষ, সমাজ, ধর্ম ও প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য ও ঐক্যাত্ম্য সম্পর্কের যে অভাব তা কেবলমাত্র ইউরোপীয় জীবনেই সীমিত নয়; বর্তমান সভ্যতার এ সংকট সর্বমানবীয়। ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও মননশীলতায় বিশ্ব-

রহস্যের “এক হতে বহু” ও বহু হতে এক” বোধের দারিদ্র্য ইউরোপের বৈশিষ্ট্য এবং এর ফলে ইউরোপ ক্রমাগত নতুন নতুন “মূল্য” সৃষ্টি করে আসছে এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়ে চলিত মূল্যকে বর্জন করে নতুন মূল্য স্থাপন করছে। ইউরোপের চিন্তাধারার বিবর্তন ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অর্থনৈতিক কাঠামোর ভাঙ্গাগাড়ার সঙ্গে পা ফেলে ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক যে অদলবদল, ভাঙ্গাগড়া হয়ে আসছে, তাদের সমর্থনে নতুন নতুন জীবন মূল্যায়নেরও উদ্ভব হয়েছে। কখনও ভাঙ্গার প্রয়োজনে, কখনও পরিপোষণের জন্যে এবং সর্বদাই চলিত অবস্থা ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে—তাই ইউরোপের বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক ছবি হচ্ছে চলিত্তার—এবং সেই চলার পথে সর্বদাই একটা পরিবর্তনের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। ছোট ছোট বিপ্লব আর বিবর্তনের সম্ভাবনায় ইউরোপ স্পন্দিত হচ্ছে—এবং তার প্রথম ও স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় ইউরোপের মনন-শীলতায়, শিল্পে সাহিত্যে। শিল্পীরা সব সমাজেই সবচেয়ে বেশী অনুভূতিশীল। ইউরোপে আবার সমাজ ও শিল্পীর মধ্যে সমতার অভাবটা প্রায়ই বেশী। এই নিত্য অস্থির প্রবাহের মধ্যে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিপ্লবগুলো সাপ্তিক প্রতিক্রিয়ার



বিস্ফোরণ এবং অব্যাহিত ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অন্তরবর্তীনে ছেদ।

(২)

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব এবং নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রাক-বিপ্লব, চলিত অবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া মাত্র। বুদ্ধি ও যুক্তি হল হাতিয়ার; ধর্ম, রেনেসাঁ ও সিংহাসনকে গিলোটিনের তলায় বালি দেওয়া হল। ফরাসী বিপ্লবের আদি চেহারাটা হারিয়ে গেল। নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবকে সমগ্র ইউরোপের বিপ্লব করে তার পুরোহিত হলেন নিজের অজ্ঞাতেই।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিপ্লব ও যুদ্ধের ভেতর দিয়ে নতুন শ্রেণী তার অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একত্রীভূত করে সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারক হল। ইউরোপের শিল্পী-সাহিত্যিক মননশীলরা ফরাসী বিপ্লবকে উচ্ছ্বাসভরা আহ্বান জানিয়েছিলেন গোড়াতে। বিপ্লবোত্তর উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের চেহারা দেখে ইউরোপীয় চিন্তায় আবার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ততদিনে নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নব মূল্যায়নে সমাজ গড়ে তুলছে পাকাপাকিভাবে অনুভূতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকেরা বুদ্ধিজীবী অর্থনৈতিক সমাজের পরগাছা হয়ে Outsider গোষ্ঠী গড়ে তুললেন সংগীহীন অসন্তোষ ও ক্ষোভে।

ইউরোপীয় চিন্তাসূত্রে ধনীভিত্তিক বুদ্ধিজীবী সমাজব্যবস্থার যুগান্তকারী প্রতিক্রিয়া মাত্রাণী সমাজতত্ত্ববাদ। চিরাচরিত আদর্শবাদের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ও বিচ্ছিন্নতার ওপর জোর দেওয়ার জন্যে নতুন “বাদের” ভিত্তির নাম দেওয়া হল “বৈজ্ঞানিক বস্তুতত্ত্ববাদ”। খৃষ্টীয় ধর্ম ও বিশ্বাসের যে শৃঙ্খলাস্থান বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ পূরণ করেছে তার ওপর একমাত্র বিজ্ঞানেরই বেদী হওয়া স্বাভাবিক ছিল—এবং মার্ক্সবাদ একান্তই ইউরোপীয় চিন্তা প্রবাহোদ্ভূত আর একটা দশা। পশ্চিম ইউরোপে নতুন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় নতুন শোষণ নীতি পুরোদমে চালু থাকলেও এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে শোষিত সম্পদবান্ধব ফলে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির ভেতরের ব্যবস্থা অবস্থানদ্বারী সংশোধিত ও সহনীয় হতে লাগল, ফলে চলিত ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক বিপ্লব দিয়ে ভেঙে ফেলার মত চরম অবস্থায় পৌঁছল না। নতুন ধনীক-শ্রেণী ও কৃষকের শোষণের প্রতিক্রিয়ায় ধর্মাবিস্তার-শ্রেণীর প্রভাবে শিল্পী-সাহিত্যিক গোষ্ঠী মনন সমাজ ব্যবস্থার নতুন শোষণ নীতির তত্ত্ব হলেন। “Outsider” গোষ্ঠী ধন-

তান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশের শহর ও নগরগুলি ছাড়া থাকতে পারেন না অথচ নতুন নগরজীবনের অসহনীয় নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার পরিবেশই তাদের নব নব প্রতিক্রিয়ার চেতনা যোগায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে (১৯১৪ খৃঃ পর্যন্ত) পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি যখন দেশের ভেতরের অবস্থা উন্নততর করেও এশিয়া আফ্রিকা ও নতুন মহাদেশ-গুলিতে পূর্ণমাত্রার শোষণযন্ত্র চালিয়ে একটা স্থিতিস্থাপকতা ও সমৃদ্ধির পাকা বন্দোবস্ত করে এনেছে, সেই সময়ে পশ্চিম ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক জগত নতুন নতুন প্রতিক্রিয়া, বৈপ্লবিক বুদ্ধিদ ও সামগ্রিক লুপ্তি-বিলাসের বিভিন্ন প্রকাশে ভরা। এই যুগের ইউরোপীয় শিল্পী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা-ধারার ইতিহাস পড়লে দেখতে পাওয়া যায় যে প্রায় সবাই Isolate আর Outsider।

Cezanne ইউরোপীয় শিল্প-বিবর্তনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। সমাজের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার সীমা ছিল না। মানুষ ও সমাজ থেকে নিজেকে একান্তে সরিয়ে এনে উন্মুক্ত প্রকৃতির Idyllic পরিবেশে Cezanne তাঁর Promised land ও Absolute কে খুঁজে বেড়ালেন। সমসাময়িক শিল্পী Van Gogh, Ganguin, Matisse, Zola, এবং Rilke সবাই Isolate,—উন্মাদ ও মূম্বুদ্ধ।—সমসাময়িক পরিবেশ ও সমাজের কাছে তাঁরা সম্পূর্ণ অপরিচিত, সমাজ, মানুষ ও ইউরোপীয় নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিজদের খাপ খাওয়াতে না পেরে তাঁরা একান্তই সমাজবিরোধী।—হয়ত তাই Ganguin পারিপার্শ্বিক ইউরোপীয় সভ্যতার বার্ষক্যকে “rejuvenation through barbarism” করতে তাহিতি দ্বীপে বৃথা আশ্রয় খুঁজলেন। Van Gogh-এর প্রায়-আত্মহত্যার জন্যে তাঁর নিজের কোন আক্ষেপ ছিল না। সমসাময়িক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বরবাদ করতে ইউরোপের শিল্পীগোষ্ঠী অজানা নতনের খোঁজে হাতড়ে বেড়ালেন নানান সূত্র ধরে—barbaric simplicity থেকে solidity এবং Cubism থেকে Russeae-র Naivty: শিল্প-শিল্পের নতুন অর্থ আবিষ্কৃত হল। ষষ্ঠশিঃকোন্দ্রক ইউরোপীয় সমাজ ও

সভ্যতার করম্ব অনুভূতি শিল্পী ও চিন্তাশীলদের ঘাড়ে জরার মত বসে আলো ও বাতাস কেড়ে নিল। ইউরোপীয় শিল্পীরা ছুটলেন আফ্রিকা ও Pacific Islands-এর বর্বর আদিমদের কাছে নতুন জীবনের দীক্ষা নিতে।—Picasso ইউরোপীয় শিল্পের পৌরহিত্য নিয়ে নতুন নতুন গবেষণা শুরু করলেন। Guilanue Apollinaire, Max Jacob, Gertrude Stein, Alfred Jarry সকলেই প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া ও ধ্বংসের জয়গান গাইলেন। ইউরোপীয় শিল্পসাহিত্যজগতে যখন Isolate ও Outsider শিল্পী-সাহিত্যিক গোষ্ঠীরা absolute-এর খোঁজে বৈপ্লবিক ভাঙ্গাঘড়ার গবেষণায় ব্যস্ত, তখন বিজ্ঞান ও আধিবিদ্যা (metaphysics) জগতে নতুন নতুন আবিষ্কার আর এক বিপ্লবের সূচনা করল। Einstein-এর Space ও time-এর ওপর নতুন আলোকপাত জগৎ সম্বন্ধে মানুষের চিরাচরিত ধারণাকে তাঁর ঝাঁকুনি দিল। শিল্পীরা যেমন আদিম বর্বর মানুষের কাছে ছুটলেন মূলসূত্র খুঁজতে তেমনি Freud তাঁর Interpretation of Dreams ও Psychopathology of Everyday life-এ মানুষের মনের নানান আবেগের অন্তর্নিহিত সূত্র খুঁজলেন। ইউরোপীয় চিন্তাজগত থেকে ধর্ম ও বিশ্বাসকে উৎখাত করার ফলে প্রকৃতি ও জগৎ যেমন বস্তুময় ও অপরিচিত হল, তেমনি তাকে বোধগম্য করার জন্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বিশ্লেষণ এগিয়ে এল। বিশ্বাসহীনদের কাছে বিজ্ঞান তখন নতুন ও একমাত্র ভরসা। যৌন বিকারের ভিত্তিতে মানুষের মনের ও চেতনার যে নানা প্রকাশ—Freud-এর এই বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী ভত্ত্বের প্রভাব হল সুদূরপ্রসারী। Sexকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেওয়ার তার নবজন্ম লাভ ঘটল। Hedonism নবজন্ম লাভ করে দুর্দম হল।

ইতালীর অতীত শিল্পউৎসবের ভগ্নস্তুপের লজ্জাকে ঢাকতে Futurist দল তৈরী হল।—শিল্পী Vincis চেয়ে যন্ত্র আবিষ্কারক Vinci বড়—রণ-তরী নারী দেহের চেয়ে সুন্দরতর এবং প্রেম,—যোষিত হল উনবিংশ শতাব্দীর নজারজনক মিথ্যাচাররূপে। Mussolinis কন্ঠস্বর খুব কাছাকাছি শানা গেল। Futurist-দের সাহিত্যে ভাঙ্গাপুরোণ চিরাচরিত নিয়মকে তলা, সংগীত হল শব্দ (noise) সমন্বয়, তাতে চিত্তকার, আত্মবাদ, নিদাদ রেগ-

গাড়ীর বাঁশী, যন্ত্রের গর্জন, যোজিত হ'ল। নিগ্রোসংগীতের আদিম ও বর্বর বন্ধনহীন স্পন্দন ইউরোপের সুসভ্য সংগীতকে নতুন দীক্ষা দিল। অংকন-শিল্পে একমাত্র স্থান পেলে উদ্দাম বেগ-মত্ততা ও বন্ধনহীন আত্মপ্রকাশ—মাধ্যমের কেন বিচার রইল না।—অংকনশিল্পে নিয়মভংগই হ'ল উৎকর্ষের মাপকাঠি। ইতালীর Futurism, সুইজারল্যান্ডে Tristan Tzara-র নেতৃত্বে আর এক রূপ নিয়ে Dadaism, আন্দোলনে পরিণত হল।

ইতালীতে যেমন Futurism, অতীত গোরবের ভগ্নস্তুপের নপুং-সতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, জার্মানীতে তেমনি, ধর্ম, জাতি ও স্বপ্নবাদ থেকে মুক্তির সন্ধানে সেখানকার শিল্পী সাহিত্যিকরা Expressionism নাম দিয়ে নতুন আন্দোলন গড়ে তুললেন। মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যে মানুষকে যে নতুন করে আবিষ্কারের দরকার হ'ল, ইউরোপের এই বৈপ্লবিক যুগের শিল্পী সাহিত্যিক ও মননশীলরা তার জন্যে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে নগ্ন করে মূলে-সূত্রে সন্ধানে উঠেপড়ে লাগলেন। ব্যাখ্যাহীন জটিলতম মানুষের মন ধরা-ছোঁয়ার সব চেষ্টাকে বরাবর ফাঁকি দিয়ে এসেছে এতদিন, Freud-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে তাই, ইউরোপের শিল্পী সাহিত্যিকরা নির্বিচারে গ্রহণ করলেন।

ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যিক ঐশ্বর্যে সবচেয়ে ঐশ্বর্যবান বৃটেনের সম্পদ ও সুখের আদ্যমী নিরাপত্তাকে ভেদ করে কল্টনেন্টের বৈপ্লবিক ঘূর্ণাবর্ত যখন পৌঁছিল, তখন তার তাপ ও উগ্রতা ইংলিশ চ্যানেলে হারিয়ে গিয়েছে। তবু Cambridge, Oxford, Bloomsbury-র Intellectual-রা Roger Fry, Russell, Virginia Woolf, W. B. Yeats, Lytton Strachy আর Aldous Huxley-র দল পুঞ্জীভূত ইউরোপীয় সভ্যতার জড়বোধ ও মহাদেশের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে মুক্তি সমস্যা, নিজ নিজ সমাধানের জন্যে হাতড়ে বেড়ানর তাগিদ অনুভব করলেন। কিন্তু বৃটেনের Cambridge-Oxford-Bloomsbury-র অভিজাত বুর্জোয়া Intellectual গোষ্ঠী ইউরোপের নতুন নতুন বৈপ্লবিক গবেষণাকে পরিচিতের মত গ্রহণ করতে পারলেন না। বৃটেনে Futurism-এরও স্থান হল না। আমেরিকার সাংস্কৃতিক উৎসের সন্ধানে, ভৌগোলিক সংকীর্ণতার

বাধা ভেঙ্গে, Ezra Pound, Eliot, Henry James এ'রা ইউরোপ ঘুরে লন্ডনে এসে নতুন দল করলেন। Pound তাঁর বিরাট প্রতিভার পক্ষপটে বিস্তার করলেন। London-এ Vorticist গোষ্ঠী তৈরী হ'ল। যারা ইউরোপের চরমপন্থী Futurist-দের এবং Bloomsbury Intellectual-দের অতি মানবীয় আকাঙ্ক্ষাকে গ্রহণ করতে পারলেন না, তারা Wyndham Lewis-এর নেতৃত্বে Vorticist হয়ে উনিবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া সমাজ ও সভ্যতাকে অস্বীকার করে ও সীমিত মানুষের একান্ত দুর্বলতাকে স্বীকার করে, "Higher Authority"-র দরবারে শক্তি প্রার্থনায় বশ্যতা স্বীকারের আহ্বান জানালেন—বিশ্বাস তার একমাত্র মন্ত্র। 'Rebel Art Centre' চলিত পরিবেশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানাল। একান্ত স্বতন্ত্রবাদী Lawrence, অভিজাত Bloomsbury intellectuals, Vorticist এবং ইংলন্ডের মধ্যবিত্ত সমাজ চেতনার মধ্যে একান্তই Rebel ও Outsider। এঁদের চেতনার সঙ্গে তিনি নিজের কোনও সহানুভূতির সূত্র খুঁজে পেলেন না।—তাঁর মতে মানুষকে খুঁজতে মানুষের আদিম ভিত্তিকে জানতে হবে; আর তা জানতে হলে, মানুষের চেতনাকে সংস্কার, সভ্যতা ও মানবীয়তা থেকে মুক্তি দিয়ে তার আদিম আবেগের বন্ধনমুক্ত প্রকাশের আশ্রয় নিতে হবে।—রক্ত মাংস ও দেহ, মানুষের মননশীলতা এবং বুদ্ধির চেয়ে বেশী জ্ঞানী;—তাই Lawrence-এ যৌনবোধের অভিব্যক্তি সংস্কারমুক্ত।—Lady Chatterley's Lover-এর অশ্লীলতার বিরুদ্ধে ইংলন্ডে ঝড় উঠল। James Joyce-এর স্বাতন্ত্র্যবাদী আত্মচেতনা অন্তর্মুখীন প্রতিভাও দেশে ও কালে "Outsider"।—Lawrence মুক্তির খোঁজে দেহ ও ইন্দ্রিয়গত আদিম-তম প্রবৃত্তি ও চেতনার বন্ধন ও সংস্কার মুক্তির দাবী করছিলেন—Joyce চেতনামনের ওপর বাহ্যিক জগতের প্রতিক্রিয়া, জৈব প্রবৃত্তির ও আহরিত জ্ঞানের সংঘাত ও সংমিশ্রণে অচেতন মনের দ্বন্দ্ব ও সংলব্ধের জগতের মধ্যে অতিপ্রাকৃত একচ্ছ ও নিয়মানুবর্তিতার সম্মান করলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত চেতন ও অচেতন জগতের সকল দ্বন্দ্ব ও সংলব্ধের মধ্যে বিরাট নিয়মানুবর্তিতার সূত্র সম্মানে তিনি মানুষের সম্মান করলেন।—Joyce এর এ Catholic চিন্তা বাহ্যিক কোন শক্তির কাছ বশ্যতা স্বীকার করে না। সে আত্মবিশ্বাস।

ইটালীতে Futurism যখন এক পা এগিয়ে গিয়ে Facism হ'ল, ফ্রান্সে যখন Cubist Apollinaire-এর সাহিত্য ও Picasso-র শিল্প-পৌরহিত্যে এবং জার্মানীতে Expressionist Klee, Kandinsky-র পৌরহিত্যে নতুন নতুন গবেষণা চলছে তখন লন্ডনে Pound ও Eliot-এর পৌরহিত্যে সাহিত্যের চিরচরিত প্রথার বন্ধনমুক্তির গবেষণা চলল। পশ্চিম ইউরোপের এই মূমুক্ষু চেতনার বৈপ্লবিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে Diaghilev, Stravinsky, Nijinsky-র দল একই তাগিদে উদ্বুদ্ধ হয়ে Russian Ballet যা একান্তই Slavonic ছিল তাকে প্যারিসে এনে নগ্ন বর্বর আদিম জীবন-সম্মানের সঙ্গে গ্রথিত করে সর্ব ইউরোপীয় করে দিলেন। Nijinskyর অনুপ্রেরণা কবলিত উন্মত্ত নৃত্য আর Stravinsky-র লালিত্য বিবর্জিত সংগীতের বর্বর আদিম ইন্দ্রিয়ভেদী শব্দে সুসভ্য ইউরোপে আফ্রিকার অরণ্যের স্পন্দন শোনা গেল।

প্রাক প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপের সাংস্কৃতিক চিন্তা শিল্প ও সাহিত্য জগতের এই যে নানামুখীন প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন,—প্রাক Cezanne Impressionist-দের অবচেতন বৈজ্ঞানিকতা, Cezanne-এর Impressionism-এর সঙ্গে জ্যামিতিক Solidity যুক্ত করে Promised Land-এর সন্ধান, Van Gogh-এর বলিষ্ঠ মহাজীবন পিপাসার বিকার, Ganguin-এর ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কার হতে পালিয়ে গিয়ে আদিম নগ্নে মুক্তির অনুসন্ধান থেকে শুরু করে Futurism, Expressionism, Vorticism, Dadaism, Freudism, Imagism, Surrealism, Absolutism ইত্যাদি আন্দোলনের সংশয়সৃষ্টিকারী বিপরীতমুখী আপাত পার্থক্য সত্ত্বেও ইউরোপীয় সভ্যতার সামগ্রিক অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াসজাত চেতনার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এই যে প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রথম মহাযুদ্ধানতিপূর্বে তীব্র-তর হয়ে পুঞ্জীভূত প্রতিক্রিয়ার যুগান্ত-কারী বিস্ফোরণ—প্রথম মহাযুদ্ধে হারিয়ে গেল। ইউরোপীয় জগতে সত্যি সত্যি 'বিসম্ব' হবার নিষ্ফল সুযোগ এল। "ইউরোপের ব্যাতি নিবে গেল—" আতনাদে বতমান ও ভবিষ্যতের অনেক ইতিগত শোনা গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

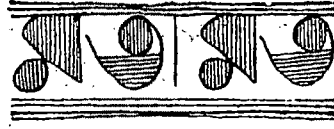
চায়ের ধোঁয়া প্রসঙ্গে

সম্পাদক সমীপে,

নাটকের মূল্যায়নে আগিকের স্থান কোথায় হবে, এই বিতর্কমূলক প্রশ্নটি খ্রীউৎপল দত্তের আলোচনায় নতুন করে দেখা দিয়েছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, বেশ কিছু দিন আগে কোন এক খ্যাত-নামা বাংলা দৈনিকে এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট মতামত প্রকাশিত হয়েছিল।

বৃন্দোত্তর কালে নব নাট্য আন্দোলনের যে ঢেউ আজ ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে অসংখ্য করেকটি সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় গোষ্ঠী একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যে কণ্ঠি সৌখীন গোষ্ঠী বা ভরদূণ পরিচালক—যাদের মধ্যে আছেন শম্ভু মিত্র, সলিল সেন, উৎপল দত্ত প্রমুখ—যারা মানুষকে নতুন করে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করলেন—মনে পড়ে যায় তাঁদের প্রথম দিনের সেই নাটকগুলির কথা। রক্তকরবী বা নতুন ইহুদী বা পথিক সমানভাবেই আমাদের মত সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল তার অভিনয়, ব্যঙ্গনায়, প্রকাশনায় এবং তার সুন্দর টিম-ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে। এই নাটক আমাদের ভালো লাগল, আমরা নতুন করে নাটককে ভাল বললাম—কলকাতার স্থায়ী মণ্ডলি উঠে যেতে যেতে আবার জাঁকিয়ে বসলো।

কিন্তু সেই সাথে আমরা লক্ষ্য করলাম—নাটক বেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো—তার সুবোগ ব্যবসাগত ভিত্তিতে কাজে লাগানো হল। ঠিক যে কারণে 'তিন কন্যার' জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও অনেক ছাত্র ও সস্তা হিন্দী ছবি বক্স অফিসের দিক থেকে সাফল্য আনে—নাটককে পাঁচশতাধিক রজনী অতিক্রম করানোর পেছনে এই মানসিকতা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অভিনয়ের সূক্ষ্ম মার-প্যাঁচ বা চড়া পর্দায় বাঁধা নাটকের সূর্য বিস্ময় ব্যস্তির সপ্রশংস দৃষ্টি হয়তো আকর্ষণ করবে; কিন্তু সিনেমার ২।১ জন নাম-করা অভিনেতা-অভিনেত্রী ও আগিকের ডেংকী বক্স অফিসকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখবে একথা কে না জানে? স্টেজের মধ্যে থেকে চোখ ধাঁধানো আলো দিয়ে রেলগাড়ী যাওয়ার দৃশ্যের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে আলোক সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা যায় নিঃসন্দেহে, কিন্তু নাটককে যে হত্যা করা হ'ল তা' অস্বীকার করি কি করে?



আমি নিজে বহু লোককে উক্ত দৃশ্যটি দেখার জন্যেই প্রধানতঃ সেই নাটকটি দেখতে যেতে দেখেছি বা প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়ের শেষে দরজার কান পাতলেই দেখা যাবে নাটকের পাত্র-পাত্রী-অভিনয়ের চাইতে উক্ত দ্রুত যাওয়ার দৃশ্যটি মুখ্য হয়ে উঠেছে। সে কথা “অগারের” ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

পেশাদারী মণ্ডে ব্যবসায়-ভিত্তিক নাটকে আগিকের এই বাহ্যিক বদলে পারি, কিন্তু অবাধ হয়ে যাই নব নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পরিচালক উৎপল দত্তকে অভিনয়ের চাইতে আগিকের গুরুত্ব বেশী দিতে দেখে। মনে হচ্ছে, কোথায় যেন সৌখীন নাট্য পরিচালক উৎপল দত্ত মিনার্ভা থিয়েটারের পেশাদার পরিচালকের ব্যবসাদার দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাথে একাকার হয়ে গেছেন। অগার দেখে যে কথা মনে হয়েছিল—উৎপলবাবুর লেখা পড়ে সে ধারণা দৃঢ় হ'ল।

ইতি—

দেবব্রত ঘোষ, কলিঃ—২৭

॥ মন্দিরে-মন্দিরে ॥

সম্পাদক মহাশয় সমীপে,

‘অমৃত’ পত্রিকায় ‘মন্দিরে মন্দিরে’ এই বিভাগে বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সাধনার ইতিহাস বর্ণনা করবার যে প্রচেষ্টা আপনারা করেছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। লেখার সঙ্গো মন্দিরের ছবি থাকলে আরও উপভোগ্য হত এই বিভাগটি।

বিগত ২২-১২-৬১ তারিখে প্রকাশিত ‘জটেশ্বর নাথের মন্দির’ ওই জাতীয় একটি সুখপাঠ্য রচনা। লেখক জটেশ্বর নাথের মন্দির সম্পর্কে সংক্ষেপে প্রায় সকল তথ্যই পরিবেশন করেছেন। তবে মহানাদ গ্রামটির ঐতিহাসিক ও প্রাচীনত্বের সম্পর্কে তিনি কিছুই লেখেননি। মহানাদ গ্রামের প্রাচীনত্ব ও অতীত ইতিহাসের সঙ্গো জটেশ্বর নাথের মন্দিরের পুরাতত্ত্বের একটি নিকট-সম্পর্ক আছে।

মহানাদ এই গ্রামটি একটি প্রাচীন জনপদ। গুপ্তযুগে এই স্থানে গুপ্ত-বংশীয়দের বসবাস ছিল। মহারাজ চন্দ্র-কেতু গুপ্তবংশীয় কোন সামন্তরাজ

ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। গুপ্ত-যুগে বাংলা দেশে ‘রাঢ়াপুরী’ বলে যে সমৃদ্ধিশালী নগরের কথা শোনা যায়, তা ছিল বর্তমানের মহানাদ ও পাশ্চ-বর্তী গ্রাম ম্বারবাসিনীকে কেন্দ্র করে।

মহানাদ গ্রামে গুপ্তযুগের সুবর্ণ-মুদ্রা পাওয়া গেছে,—পাওয়া গেছে গুপ্তযুগের প্রস্তর-নির্মিত নানা মূর্তি। গুপ্ত রাজারা ছিলেন শৈব,—জটেশ্বর নাথের মন্দির তাই গুপ্তযুগেই নির্মিত বলে অনুমানিত হয়।

১৯৫৬ সালে মহানাদ ভ্রমণের সময়, মন্দিরের নিকটেই একটি উঁচু টিপি খনন করে গুপ্তযুগের তৈজস-পত্রাদি ও অট্টালিকার ভস্মাবশেষ পাওয়া গেছে, তা আমি দেখেছি। আমার মনে হয়—প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষায় ও গবেষণায় মহানাদের অনেক গুপ্ত সম্পদ আবিষ্কার হতে পারে।

জটেশ্বর নাথের মন্দিরের প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে মন্দিরের ভিত্তিগার লক্ষ্য করলে মন্দিরটিকে গুপ্তযুগের সমকালীন বলে মনে হয়। গুপ্ত-পরবর্তী কালের বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাবও আছে মন্দিরের আশে-পাশে ছড়ানো নানা বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তির মধ্যে।

তীর্থঙ্কর পান্ডুরার ‘গরুকাটা যুদ্ধের’ সন-তারিখে মন্ত ভুল করেছেন। তিনি লিখেছেন—“...মুসলমান আক্রমণ হয় প্রায় তিন শ’ বছর আগে। দিল্লীর বাদশা তখন ফিরোজ শাহ”।...” হিসাবটি কিন্তু ভুল। পান্ডুরার গরুকাটা যুদ্ধ হয় তুঘলক বংশীয় ফিরোজ শাহ রাজত্বকালে—তিনি মহম্মদ বিন-তুঘলকের মৃত্যুর পর ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান হ'ল। সুলতান হবার কয়েক বছর পরেই বাংলার ইলিয়ান শাহর বিরুদ্ধে সূর্য হয় তাঁর বাংলা অভিযান। আরও একটি কথা। ফিরোজ শাহকে সুলতান বলা হত, বাদশা নয়। মুঘল বাবর-পূর্ববর্তী দিল্লীর মুসলমান রাজত্বকালে ইতিহাসে বলা হয় দিল্লীর ‘সুলতান’ আমল। মুঘল সম্রাটদেরই বাদশাহ বলা হত, দিল্লীর সুলতানদের নয়। নমস্কার ইতি—

শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রিষড়ী

গোয়া

দীপক চৌধুরী



বেড-সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন বিভাসবাবু, বিভাস চৌধুরী। দুইতলার ছাদের ওপর মস্ত বড় হল-ঘর। এক কোণায় ডবল খাট। তারই উল্টো দিকে বসবার জায়গা। কাপেটের ওপর গদি-আঁটা তিন খন্ডের সোফা। দুটো ছোট আকারের, অন্যটা স্প্রিং-বসানো বোঁগ-বিশেষ। দু'দিকের দেওয়াল ঘেঁষে সেগুন কাঠের শেলফ্‌। বুক-শেলফ্‌। এক ইঞ্চিও খালি জায়গা নেই। মরক্কো চামড়া আর রেক্সিনে বাঁধানো পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডারটিকে সাজিয়ে রেখেছেন বিভাস চৌধুরী। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্যের অতি উত্তম সংগ্রহ। উত্তর পশ্চাশের হুজুগ থেকে নিষ্কৃতি পাননি তিনি। বিজ্ঞানের মুগমদ পান করেছেন প্রচুর পরিমাণে। তাঁর মাতলামীর চিহ্নগুলো সুস্পষ্ট। সদ্য-কেনা বিজ্ঞানের বইগুলো তৃতীয় দেয়ালের গা ঘেঁষে উঁচু হয়ে রয়েছে। হাত দেননি তিনি, হাত দেয়নি কেউ। যেন করেক শত আজীবনের কুমারী সত্যীর জয় ঘোষণা করছে। দেহের চাকচিক্য স্থান হয়নি এখানে।

যরের দক্ষিণ কোণায় তাঁর খাট। দেহে মেদবাহুল্য নেই, তবু ডবল

খাটের ব্যবস্থা। সহধর্মিণী বর্তমান, তবু একলাই তিনি শয্যা গ্রহণ করেন। নিদ্রার মধ্যেও একা—আগেও একা, পরেও একা। ব্রিটিশ আমলের রায়-বাহাদুর, এই আমলের দেশ-প্রেমিক। গোয়ার মুক্তি সংগ্রামে মনে মনে অংশ নিয়েছেন। মুক্তির পরে চাঁদা পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ডে। মস্ত ধনী লোক। ষাট বছর বয়স। পায়ে বাত, বুকু গ্রন্থাসিসের আসন্নতা।

ডবল খাট। তারই ওপর রেডিও। অল-ওয়েভ। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খবর আসে। বালিশের এক দিকে স্তূপীকৃত খবরের কাগজ। ইংরেজী আর বাংলা। অন্য দিকে ফিল্মসাহিত্যের ম্যাগাজিন। ছবি দেখে আর স্বাদ মেটে না। দশ আঙুলের ময়লা লেগে ছবি-গুলো কলঙ্কিত। ধর্ষিতা, কিন্তু পথের ধারে বিবর্জিত নয়। বালিশের পাশে উঁচু হয়ে আছে। পুরনো বঁলে ম্যাগাজিনগুলো ফেলে দেননি বিভাসবাবু। শব্দা দরে ফিরওয়ালাদের কাছে বেচেও দেননি তিনি। সবসঙ্গে রক্ষিত। আজীবনের রক্ষিতার মতো প্রতিটি ম্যাগাজিনই নতুনত্বের স্বাদ স্পষ্ট করে। তিন দেয়ালের শেলফে-আবস্থা কুমারী-

দের চোখে ঈর্ষার আগুন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গায়ে তবু হাত দেন না বিভাস চৌধুরী। ভুবে থাকেন শব্দ-ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে। ভুবে থাকেন; তলিয়ে যান—আবার ভেসেও ওঠেন। মস্ত খাট, বিস্তৃত পরিসর। স্ত্রী বর্তমান, খাটের পরিসরে আবদ্ধ নন। তিনি থাকেন দোতলায়। আর থাকে সন্নি, সন্নিমিতা চৌধুরী। এঁদের একমাত্র সন্তান। বয়স উনিশ।

মধ্যবয়সের সন্তান। আদুরে, সাত-রাজার ধন এক মানিকের মতো সর্বোচ্চ মূল্যের কুমারী। পাণিপ্রার্থীর সংখ্যা সমুদ্রতটের বালুকাবৎ, গোনো যায় না। রায়বাহাদুর চোখ বুলুজলেই তাঁর সাম্রাজ্যের মালিক হবে সন্নি চৌধুরীর স্বামী। এখন সাম্রাজ্য বলতে কয়েকটি শব্দ ব্যাংক একাউন্ট, আর ভল্ট। ব্রিটিশ আমল শেষ হওয়ার আগেই জমিদারিটা সর্বোচ্চ মূল্যে বেচে দিয়েছিলেন। প্রচুর নগদ তার চেয়েও বেশি ছিল তাঁর প্রতিপত্তি। রাশভারি লোক, গোঁফ রাখতেন। দৈখতে অনেকটা টুথ ব্রাসের মতো। চাকর, দরওয়ান আর কর্মচারীরা বলত, “কর্তাবাবুর যখন গোঁফ ছিল না তখন তাঁকে ভয় পেতুম”

না আমরা। খুবই মাইডিয়ার লোক ছিলেন।" তারপর তিনি গৌফ রাখলেন, রায়বাহাদুর খেতাব পেলেন। তাঁর ভয়ে সম্রাজ্যের সবাই হুকুম তামিল করবার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মদ চলত। মডার্ণ বাদ্জীর আসা-যাওয়া করত হাইহিল পরে। কলকাতার পুরনো কালচার তাঁকে স্পর্শ করেনি। একটু বেশি বয়সে বিয়ে করলেন বিভাস চৌধুরী। বিয়ে করতে বাইরে গেলেন না। নিজের বাড়িতেই ছাঁদনাতলা তৈরি হ'ল। মধ্যবিত্তের ঘর থেকে তুলে নিয়ে এলেন সন্মিতার মাকে। সামাজিক প্রথা না মানলে চলে না। ঘরে একজন স্ত্রী না থাকলে নানা রকমের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। সময় নষ্ট হয় তাঁর। বিয়ের বছর দুই পর মনে পড়ল স্ত্রীর কথা। যথা সময়ে সন্মিতার জন্ম হ'ল। তাতেও বিভাস-বাবুর মধ্যে পরিবর্তন কিছু দেখা গেল না। ভেতরে দোদাঁড় প্রতাপশালী, বাইরে শিথিল। নানা ধরনের স্ত্রীলোক নিয়ে মেতে থাকেন। বাড়ি ফেরেন ঘুমবার জন্য। তারপর হঠাৎ একদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'য়ে গেল। টুং-হ্রাশের মতো গৌফটা চে'ছে ফেললেন। মাথায় গান্ধী টুপি পরে এদিক ওদিকে ঘোরাঘুরি করলেন। লেগে থাকলে

হয়তো হিসেবে একটা হ'য়ে যেত। লীডার হ'য়ে বসতে পারতেন। কিন্তু স্বাস্থ্য-শিবিরের খুঁটি পড়ল ভেঙে। নানা রকমের ব্যাধি, নানা রকমের দুর্ভাবনা। শয্যা গ্রহণ করলেন। পঞ্চমতে আশি বছরের ভ্রমতা। স্ত্রী এবং কন্যার ওপর নির্ভর করতে চাইলেন। তাঁরা ও'কে তুলে দিলেন দু'তলার ছাদে। ক্রমে ক্রমে ও'রা আলগা হ'য়ে যেতে লাগলেন। তার আগে অবিশ্য গুটিকয়েক ব্যাংক একাউন্ট চলে এল মিসেস চৌধুরীর নামে। চেক সহ করতে আজকাল হাত কাঁপে বিভাসবাবুর। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, রায়বাহাদুরের অসহায়তা যতো বাড়ল মিসেস চৌধুরীর স্বাস্থ্য ভাল হ'ল ততো বেশি। কলকাতার সামাজিক জীবন তাঁকে ছাড়া চলে না—তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে সজীব অঙ্গ। সন্মিতা চৌধুরী সজীবতর। এ'দের দেখলে মা আর মেয়ে বলে চেনা যায় না। দুই বোনের মতো মনে হয়।

শয্যার পারিসর কম নয়। গোটা তিন গরম জলের ব্যাগ সব সময় তৈরি করে রাখতে হয়। কোমর থেকে পায়ের পাতা অবধি বাতের ব্যথা। নিজেই টেনেটুনে পায়ের ওপর ফেলে রাখেন। পুরনো আমলের চাকর একটা আছে। নাম শশী জানা। সে তার খেয়াল-খুশী মতো

ডিউটি দেয়। আগের দিনের মতো মাঝে মাঝে রেগে ওঠেন বিভাসবাবু। হুমকি দেন, "তোকে কাজ থেকে বরখাস্ত করব রে শশী।" জবাব দেয় না পুরনো ভৃত্য। টিনের একটা সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে চলে আসে দোতলার ছাদের ওপর। মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে ঘোষণা করে, "পেনাম কর্তাবাবু। দেশে চললাম।" চোখ দুটো উঁচু করে তুলে ধরেন রায়বাহাদুর। ডুবন্ত মানুষের মতো অসহায়তার ভঙ্গীতে প্রশ্ন করেন, "আমার মতো একটা কচি শিশুকে ডুবে যেতে দিবি? তুই হিচ্চিস গিয়ে অন্দের হাতের লাঠি। তোকে দিয়ে যাব রে শশী, অন্তত লাখ খানিক টাকা তোর হাতে দেব। ভাবিছিস গিল্লীমায়ের হাতে সব কিছু দিয়ে দিয়েছি? পাগল! লাখ পাঁচেকের বেশি নিভে পারিনি ওরা। মালিশটা নিয়ে আস তো, উরুর মাংসেও ব্যথা শুরুর হয়েছে।" টিনের সুটকেসটা পাশে সরিয়ে রেখে শশী জানা মালিশ করতে বসে। গোটা পাঁচেক টাকা নগদ চেয়ে নেয় আগে। রায়বাহাদুর জানেন, নগদ না চাললে সেবা পাওয়া যায় না। সন্মিতা মা তো পাঁচ লাখ সরিয়ে নেয়ার পরেও সেবা করতে আসে না। সেবা তো দরের কথা, আজকাল মাসের মধ্যে একবারও দেখতে আসে না তাঁকে।



এক কোঁটা ভেপোলিন বাড়িতে রাখুন

এই জীতে যে কোন সময় বাচ্চাদের ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি হবার ভয় আছে। ফুস-ফুসে শ্লেষ্মা জমে, জ্বর ও খাসকষ্ট হয়। বৃকে, পিঠে ও গলায় ভেপোলিন মালিশ করলে আপনার শিশুর সকল কষ্ট অবিলম্বে দূর হবে ও আপনিও হৃচ্ছিত্তার হাত থেকে রেহাই পাবেন।

কোঁটা ও শিশিতে পাওয়া যায়

ভেপোলিন

মা লি শের জন্ম

জি, ডি, কার্শাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লি: • ১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩।

দোতলা থেকে মাঝে মাঝে শব্দ শুধু টেলিফোন করে খবর নেয়, স্বামীটি তার বেঁচে আছেন কি না। খাটের কিনারে পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে মানব জীবনের অসহ্যতার কথাই ভাবছিলেন তিনি। টেলিফোন করে খবর নেয় সুমির মা। মরে গেলে ডেথ-ডিউটি কতো লাগবে তার হিসেব জানতে চায়। এদের চেয়ে বরং শশী জানান ব্যবহারটা ভাল। দেশে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে মাত্র পাঁচটা টাকা চায়। সঙ্গে সঙ্গে মালিশ করতে বসে। মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে পৃথিবীর কোন্ মানুষটা উরুর মাংসে মলম লেপে দিত? রায়বাহাদুর জানেন, দিনকাল বদলে গিয়েছে। পাঁচ টাকা দিয়ে মানুষের কাছ থেকে সেবা পাওয়া অসম্ভব। আজকাল এক কিলো পাচা পোনার দামই সাড়ে চার টাকা। তাঁর উরুর মাংস পাচা পোনার চেয়েও বেশি পাচা। শশী তাতে হাত লাগাবে, মলম ঘসবে। তারপর গরম কাপড়ের টুকরো দিয়ে পটি বাঁধবে। এ সব হচ্ছে শশীর বাড়তি কাজ। না করলেও পারত। পূরনো আমলের লোক বলেই করে। আজকালকার ছোকরা চাকরদের দিয়ে এ সব কাজ করানো যায় না। হুমকি দিলে পাঁচটা হুমকি দিয়ে কাজ ছেড়ে দেয় ওরা। রায়বাহাদুর শুনছেন, দিন পাশ্চটে গিয়েছে। মাইনের সঙ্গে মর্যাদা থাকা চাই। আগে মর্যাদা, পরে মাইনে। উরুর মাংসে মর্যাদা কই? শশীর কথা আলাদা। পূরনো লোক। মাসের মধ্যে মাত্র বার পাঁচেক টিনের সন্টকেসটা হাতে নিয়ে উপস্থিত হয় ছাদের ঘরে। ওকে ধরে রাখবার জন্য পাঁচশটা টাকা মাত্র বাড়তি খরচ করেন রায়বাহাদুর। সুমির মাকে পাঁচ লাখ দিয়েছেন। সেই টাকা থেকে ডেথ-ডিউটি দিতে চায় না সে। দেবেও না। সুমি বলে, “ঐ টাকাটা তুমি আলাদা করে রেখে যেও বাবা।”

ডবল খাট। বিছানার ওপরেই টেলিফোনের রিসিভার। হাতের নাগালের বাইরে রাখতে ভয় পান। বাতের ব্যথায় হঠাৎ তিনি মরে যাবেন না। প্রস্বাসের ভয়টাই বেশি। গাটিকয়েক ডান্ডারকে বলা আছে, টেলিফোন পেলেই তাঁরা যেন চলে আসেন। মধ্যরাত্রির অসুবিধা থাকলেও চলে আসতে হবে তাঁদের। রায়বাহাদুরের বিশ্বাস, ক্রাইসিস আসবে মধ্যরাত্রেই। ভিজিটের নগদ টাকা আলাদা করে রেখেছেন। আলাদা আলাদা খাম, তার ওপরে আলাদা আলাদা নাম। প্রতিটি খামে নগদ টাকা।

ব্রিটিশ, চৌধুরি নয়, একেবারে একশো অটোশ। খামগুলো যে কোথায় আছে তাও তাঁরা জানেন। জায়গায়টা দেখিয়ে দিয়েছেন বিভাসবাবু নিজেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর নেই। সেই সঙ্গে নিজের সাম্রাজ্যটাও ভেঙে পড়েছে। সব গিয়ে যা আছে তার আয়তন খুব কম। চেক-বই আর ভন্টের চাবিও তাঁর বালিশের তলায়। ডবল খাটের বাইরে আর কিছু নেই। যা আছে তার সবটুকুই অসহায়তা। খানিকটা হাহাকারও থাকতে পারে। কিংবা সাম্রাজ্যশাসনের অনুতাপ। একটা লোকও সুখী নয়, একটা প্রাণও আনন্দোজ্জ্বল নয়—কৃতজ্ঞ নয় কেউ। এমন কি স্ত্রী এবং কন্যা পর্যন্ত বিরূপ। একনায়কত্বের ফল ভাল হয়নি।

তিনি ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। পারা সম্ভবও নয়। স্ত্রী এবং কন্যাও তাঁর বিরুদ্ধে। বেঁচে থাকলেই শত্রু বাড়বে, কষ্ট বাড়বে, হাহাকার বাড়বে। অসহায় গোয়ার মতো বেঁচে থেকে লাভ কি? অসহায়তা চরিত্রের গুণ নয়। অসহায় গোয়াও যা, দমনও তাই। দিউই বা আলাদা হবে কি করে?

বেড-সুইচ টিপে আলো জ্বালানেন রায়বাহাদুর। রাত দুটো। বাতের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছে। কলকাতায় ঠান্ডা পড়েছে খুব। সারা উত্তর ভারতের গা দিয়ে বরফ গলে পড়ছে। তারই স্পর্শ লেগেছে কলকাতার বুকে। ঠান্ডার তীব্রতা উঠে আসছে দোতলার ছাদে। মস্ত বড় হল-ঘরটার দিকে এগিয়ে



শুক্র-বিগাট

“ঐ টাকাটা তুমি আলাদা করে রেখে যেও বাবা।”

তাই কি রায়বাহাদুর একা পড়লেন আজ? মানুষ যদি না রইল তা হলে সাম্রাজ্যশাসনে লাভ কি? সুখ কোথায়? ঐশ্বর্যের ভরা-নৌকা কোন্ ঘাটে ভেড়াবেন তিনি? আগ্রহের হাত যদি না রইল তবে উত্তরণস্থান স্পর্শ করার অর্থ কি? তাই আজ তিনি দোতলার ছাদে একা পড়েছেন। সবাই বিরুদ্ধে, স্বপক্ষে কেউ নেই। গোয়ার মতো অসহায়, আর দুর্বলও। দ্বিশ হাজার সৈন্যের আক্রমণ

আসছে বরফের ঢেউ। বালিশের তলায় হাত ঢোকালেন বিভাস চৌধুরী। ভন্টের চাবিতে উত্তাপ নেই। চেক-বইটাও হিমশীতল। বরফের কুচি জমল নাকি? নিজের বুকে হাত রাখলেন। আসল ক্রাইসিস ওখানেই। রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে নিশ্চয়ই। নিঃশ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। প্রস্বাস? শেষ পর্যন্ত এল না কি? সীমান্ত অতিক্রম করল না কি ভারতীয় সেনাবাহিনী? এখনো জ্ঞান

আছে। রিসিভারটা টেনে নিলেন হাতে। কাৎ হয়ে ডায়ালদের টেলিফোন করতে লাগলেন। বার বার নম্বর ঘোরাচ্ছেন। কেউ জবাব দিচ্ছে না। ঐ প্রান্তে নিঃশব্দ। কয়েক শতাব্দীর ঘন নৈশব্দ। ঐ প্রান্ত আলোড়িত, ঐ প্রান্ত শীতল। মাঝখানটায় তবে কি? কিছুই না। ফাঁকা। শূন্যতার বৃক্কে অশ্রুকারের টান। পোড়েন। শয্যার সান্নাধ্যাত্য অসহায়তার বরফ ছাড়া আর কিছু নেই। রিসিভারটা হাত থেকে পড়ে গেল তার। মেঝে থেকে ভোলবার সামর্থ্য পূর্বস্ত নেই। হাতের আঙুল অবশ। যোগাযোগের তারটা ফসকে গেল হাত থেকে। বাইরের পৃথিবীর সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক শূন্য হয়ে গেলেন রায়বাহাদুর। ঘামতে লাগলেন তিনি। চিং হয়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে রইলেন। হাতের অস্তিত্ব অনুভব করছেন না! বোধ হয় অসাড় হয়ে গেল! এই অশ্বলে মশা নেই। হঠাৎ একটা মশা কোথা থেকে উড়ে এল। বড়ুক্ক মশা, রক্তের স্বাদ খুঁজছে। রায়বাহাদুরের নাকের ডগায় হুল্লিঁরিছিয়ে বসল। হয়তো হুল ফোটছে মশা। ভয়ে রায়বাহাদুর হাত তুলতে পারলেন না। ঘাড় দেলাতেও ভয় পাচ্ছেন তিনি। ঈষৎ আন্দোলনই হঠাৎ-মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। গোয়া অসহায়, কিন্তু রক্তের বিন্দুগুলো শূন্য করে যারনি এলো। শূন্য দিয়ে রক্ত টানছে মশা। রাক্ষসহৃদয়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লগল। অক্ষমতা চরমে উঠেছে। একটা মশার সংগেও যুদ্ধ করতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। সশব্দে কেঁদে উঠলেন বিভাঙ্গবাবু।

জানলার বাইরে থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে? কাঁদছেন কেন?”

মানুষ? হ্যাঁ মানুষের কণ্ঠস্বরই তো! রায়বাহাদুর বললেন, “শিগগীর ভেতরে এসো। বোধ হয় প্রেস্বাসিস—”

“কি করে আসব? দরজা সব বন্ধ।”
“জানলার শিক ভেঙে ঢুকতে পারবে না?”

“তা পারব। বোধ হয় পারব। দেখি চেষ্টা করে।”

সিলিং-এর দিকে চেয়ে রইলেন রায়বাহাদুর। অপেক্ষা করতে লাগলেন। জানলা দিয়ে প্রবেশ করল একটি যুবক। তার দিকে না চেয়েই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কি নাম তোমার?”

জগন্নাথ ঘোষ। সবাই জগদু বলে ডাকে।”

নামটা এই অঞ্চলের ভীতি। এ-পাড়ার সবচেয়ে বড় গুন্ডা। ভন-কুস্তীতে জগদু এক সময়ে নাম কিনেছিল খুব। বৃক্কে দিয়ে মোটরগাড়ি আটকাত। রায়বাহাদুর একে চেনেন। বার কয়েক পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কি যে তার অপরাধ ছিল জগদু তা জানিত না। হয়তো সুমির দিকে দৃষ্টি একবার দৃষ্টি দিয়েছিল সে। সুমিতা সুন্দরী। তার দিকে তো সুস্থ মানুষেরা লোভের দৃষ্টি দেবেই। প্রমাণের অভাবে পুলিশ ওকে ধরে রাখতে পারেনি।

রায়বাহাদুর বললেন, “ইলেকট্রিক হিটারে জল গরম করো। তারপর ওখান থেকে ঐ শিশিটা আনো। একটা ট্যাবলেট বার করে দাও।”

কাজ দ্রুত চটপট শেষ করে ফেলল জগদু। মিনিট পাঁচেক পর একটু সুস্থ বোধ করলেন বিভাঙ্গ চৌধুরী। খাটের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন। বসিয়ে দিল জগন্নাথ ঘোষ।

“এবার মালিশের টিউবটা নিয়ে এসো। কোমর থেকে পা-এর পাতা অবধি বাখা। মনে হচ্ছে যেন সুড় ফুটছে.....একটা দ্রুত নয় কয়েক হাজার।” লেপের তলা দিয়ে পা দ্রুত বার করে দিলেন রায়বাহাদুর। তারপর তিনি বললেন, “আগে পায়ে মালিশ লাগাও.....গুন্ডারের চামড়ার মতো হাতের চামড়া তোমার খসখসে নয় তো? আমার স্কিন খুব ডেলিকেট, পেঁজা তুলোর মতো মসৃণ.....শোনো, আগে পা দ্রুত শেষ করো, তারপর উরুর চামড়ায় হাত দেবে। এখানে বাথরুম। হাতে তোমার ময়লা নেই তো? সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এসো.....দেবাজ থেকে একটা তোয়ালে বার করে নাও—”

রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে বৃটিশ আমলের পুরনো ঔষধ্য প্রকট হয়ে উঠল। শশী জানার সংগেও আজকাল তিনি ভেবেচিন্তে কথা বলেন। কিন্তু জগন্নাথ ঘোষকে তিনি মানুষ বলেই বিবেচনা করছেন না। বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে এল জগদু। হাতের চেটোর টিউব থেকে মালিশ বার করতে বাচ্ছিল, এমন সময় রায়বাহাদুর বললেন, “একটু দাঁড়াও। বাথরুমের তাকে দেখবে একটা বোতল আছে.....ডিসইনফেক্ট্যান্ট। তা থেকে কয়েক ফোটা হাতের চেটোয় ঢেলে নাও। তারপর জল দিয়ে আরেক-বার হাত দ্রুত ধুয়ে নিয়ে মালিশ করতে বসো। এত বড় একজন ধনী এবং মানী লোকের উরুতে হাত দেওয়ার সৌভাগ্য কখনের হয় বোলা?”

তার আদেশ মতো আরও একবার হাত ধুয়ে এল জগদু। তারপর খাটের পাশে মেঝের ওপর নতজানু হয়ে বসে পায়ের গাটে মালিশ লাগাতে লাগল। আরাম বোধ করছেন রায়বাহাদুর। বকের কণ্ঠবোধও কমে এসেছে। অসহায় গোয়ার চোখে-মুখে পুনর্জীবন লাভের সাময়িক ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠতে বিলম্ব হ'ল না।

মিনিট পনরো নিঃশব্দে কাটল। তারপর রায়বাহাদুর বললেন, “গরম জলের ব্যাগটা এবার নিয়ে এসো। দাঁড়াও। ক্যানালের টুকরো দ্রুত দিয়ে পায়ে পটি বাঁধো আগে। বেশ এঁটে বাঁধবে। গায়ে তো দেখছি উসূরী বাঘের মতো শক্তি রাখো.....এতো প্রোটিন পাছ কোথায়? আজকাল কি গৃহস্থ-বাড়ির জানলা-দরজা ভেঙে উপার্জনের পথ খুলেছে? শোনো—পুরো কেটলীর জল ব্যাগে লাগবে না। বাকী যা থাকবে

সুখে স্বিচ্ছতা জানে
বোল্যান্ড
ফেজ পাউডার
ব্যারন ক্যাপিটাল প্রোডাক্টস • কলিকাতা



সার্ভ ডই: সরস্বতী ও
অফিস সংস্কৃত সেশনারী
কাজ বিক্রয় ও প্রিন্টার্স
২২তম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান
কুইন সেশনারী স্টোর্স প্রাইভেট লি:
৬৩ ই. রাধাবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১

তাই দিয়ে বেশ ভাল করে দু' বাটি কফি তৈরি করো। হট্ কফি.....পাইপিং হট্—” জিব দিয়ে তলার ঠোঁটটা চেটে নিয়ে রায়বাহাদুরই বললেন, “কফিতে কি তোমার তেষ্টা মিটবে? আজকাল তো শুনতে পাই, বারোদুয়ারীতে বসছে তুমি.....”

কথাগুলোতে কান দিল না ঈগদু। মনোযোগ দিয়ে কফি তৈরি করতে বসল। ঘরের উত্তর কোণায় প্যানট্রি। শৌখিন পার্টিশন দিয়ে কোনাটা আড়াল করা। খাটে বসে প্যানট্রিটা দেখতে পাওয়া যায় না।

মস্ত বড় হল-ঘর। সাম্রাজ্য হিসেবে ক্ষুদ্র, কিন্তু ঘর হিসেবে বিরাট। অথাক হাঙ্কিল জগন্নাথ ঘোষ। বিভাসবাবু কেন এখানে একা একা থাকেন? দোতলায় তাঁর জায়গা হ'ল না কেন? কফি তৈরি করবার আগে নানা স্বকন্মের প্রশ্ন উঠতে লাগল। ওর মনে। মা আর মেয়ে তো প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ায় কলকাতার ক্লাব-হোটেলে। দোতলার ছাদ পর্যন্ত উঠতে পারে না কেন?

খাটের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছেন রায়বাহাদুর। হাতে কফির পেয়ালা। কফি থেকে ধোঁয়া উঠছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কফি খাবে না?”

“না। এবার উরুর কাপড় আলগা করুন।” ঈগদুকে বসল জগদু।

“আগেই কেন উরুতে হাত লাগাতে চাইছ? কফি খেয়ে নাও—”

“কফি আমি খাই না।”

“কি খাও তবে সারাটা দিন?”

“ভাত—তার সঙ্গে ডাল, তরকারি, মাছ।”

“সন্ধ্যার পর? কালী-মার্কা চলে বন্ধি?” পেয়ালায় চুমুক দিলেন বিভাসবাবু।

“না। মদ-গাঁজা আমি খাই নে। নেশাটেশা কিছু নেই।”

“তবে এখানে এসেছিল কেন?”

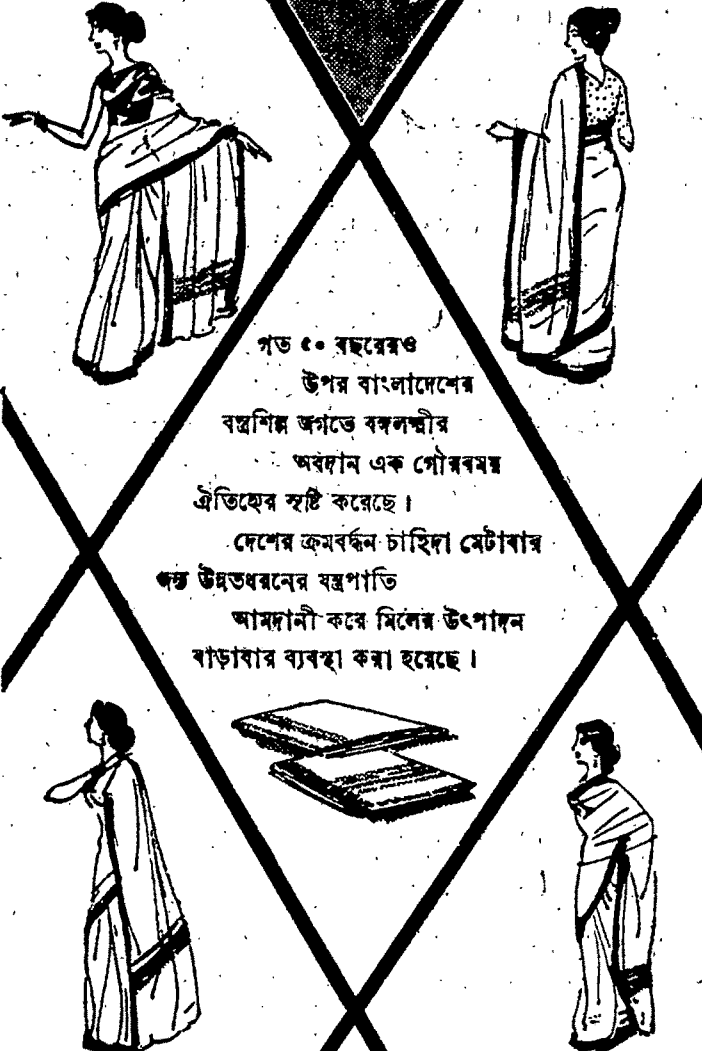
“এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল—”

“আমার এখানে? ছাদে উঠলে কি করে তুমি? দারোয়ান ব্যাটা ফটকটা কি বন্ধ করেনি?”

“আপনার ফটকের সংখ্যা তো একটা নয়, অনেকগুলো। বড় বড় তালো বন্ধে দেখানে,” রায়বাহাদুরের উরুর দিকে হাত

বাড়াল জগদু, “মিসেস চৌধুরী আজকাল না হয়, তা হ'লে বারোদুয়ারী আর রাত একটার আগে বাড়ী ফেরেন না..... ক্যালকেটা ক্লাবের মধ্যে তফাৎটা কি? দারোয়ানটা বসে বসে বিষয়—সিঁপিড়ি এবার ডান দিকের উরুটা ধরিয়ে দিয়ে উঠতে গিয়ে দুটো পা-ই তাঁর টল-টল করে ওঠে। মদ-খাওয়া যদি অপরাধ “দিচ্ছি—” দৃষ্টিচ্যুত হায়া পড়ল

গৌরবময়্য ঐতিহ্য



গত ৫০ বছরেরও
উপর বাংলাদেশের
বস্ত্রশিল্প জগতে বঙ্গলক্ষ্মীর
অবদান এক গৌরবময়
ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে।
দেশের ক্রমবর্ধন চাহিদা মেটাবার
জন্য উন্নতধরনের বস্ত্রপাতি
আমদানী করে মিলের উৎপাদন
বাড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।



বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

KALPANA B.L.S.

বিশ্বাসবাহুর চোখে, “দিচ্ছি। কিন্তু তুমি তা হ’লে ছাদে উঠলে কি করে?”

“পাইপ বেয়ে।”

“কেন?”

“এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।”

মুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠল। খেলা দরকার দিকে চোখ ঘুরিয়ে বিশ্বাসবাহু জিজ্ঞাসা করলেন, “ছাদের উপর কেউ হাটাইটি করছে না কি? পায়ের শব্দ পেলাম যেন। কটার সময় এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তোমার?”

“আড়াইটায়।”

“রাত আড়াইটায়।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন প্রায় তিনটে থাকে।”

“পুলিশের ডেপুটি কমিশনারকে একবার টেলিফোন করি—” কাৎ হ’য়ে রিসিভারটা ধরতে গেলেন রায়বাহাদুর। খুঁজে পেলেন না। মেঝের ওপরে সেটা পড়ে গিয়েছিল। নাগালের বাইরে। তিনি বললেন, “নড়াচড়া করতে ভয় পাচ্ছি। ছোটখাটো একটা আক্রমণ ঘটে গিয়েছে আজ হাটের ব্যাপারে ঝড়ুকি নেয়া ঠিক নয়। রিসিভারটা আমার হাতে তুলে দাও।”

“কেন?” আরও খানিকটা মালিশ টিউব টিপে বার করল জগদ।

“তোমার এ্যাপয়েন্টমেন্টের বারোটা বাজতে চাই। হাতনাতে ধরিয়ে দিতে চাই তোমাকে।”

“কেন?” মনোযোগ দিয়ে মালিশ শব্দে জগদ।

“সমাজ-বিরুদ্ধ লোক তুমি। এ্যান্টি-সোসাল এলিমেন্ট—”

“তা হ’লে তো পুরো কলকাতাকেই গ্রেপ্তার করতে হয়। যারা গ্রেপ্তার করতে আসবে তাদের হাতেও হাতকড়া লাগাতে হবে—”

“কে লাগাবে হাতকড়া?”

“আমি।” জবাবের যথাযথতার উদ্দেশ্যে হ’ল জগন্নাথের মদ্য।

কফির পেয়লাটা জগদ হাতে তুলে দিয়ে রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, “সুদূর তা হ’লে রাত একটা পর্যন্ত করে কি?”

“দোতলার কারাকক্ষে আবদ্ধ হ’য়ে থাকে। শৃঙ্খলিতা.....মিসেস চৌধুরী দোতলার ফটকে তালা লাগিয়ে যান। ফ্লিপকেট চাবিটাও সঙ্গে রাখেন তিনি। হোটেল-ক্লাবে সুদূরকে যেতে দেন না।”

“কেন?” বিস্ময়ে ভুরু কুণ্ঠিত হয়ে এল।

“সুদূর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠেন না মিসেস চৌধুরী। ওকে দেখলে কেউ আর মিসেস চৌধুরীর প্রতি আকৃষ্ট হয় না।”

“দোতলার সাম্রাজ্যে তা হ’লে ভীষণ অরাজকতা চলেছে বলো? ও কি, উরুতে বাধা দিচ্ছ কেন?”

“দোতলার বাধা চরমে উঠেছে। এক সময়ে আপনিও মিসেস চৌধুরীকে শাসন করতেন—”

বাধা দিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, “কিন্তু তাঁর চলাফেরার স্বাধীনতায় হাত দিইনি আমি। এখন তো দেখছি আমার একনায়কত্ব মানুষের আরাম ছিল অনেক বেশি। সুদূর কেন তা হ’লে আমার কাছে আসে না? মিসেস চৌধুরীর বিরুদ্ধে আমরা তো দল গড়তে পারি?”

“শাসনের মধ্যে ঔদার্য না থাকলে সব শাসনই এক। তা ছাড়া, আপনার মতো একজন বেতো রোগীর সঙ্গে সুদূর কেন যাবে দল গড়তে? এখান থেকে পালিয়ে না গেলে সুদূর দল গড়তে পারবে না। আপনার সাম্রাজ্যে বলিষ্ঠতা নেই—”

“তাই বলে কোমরে আমার গুতো মারবে না কি?” আত্নানাদ করে উঠলেন রায়বাহাদুর।

হেসে উঠল জগদ। বলল সে, “সামর্থ্য নিঃশেষ বলে আমার ছোঁয়া লাগলে বাধা পান আপনি।”

অসন্তুষ্টির সুরে মন্তব্য করলেন বিশ্বাস চৌধুরী, “জানলার শিক ভাঙলেই মানুষ বলিষ্ঠ হয় না। আবার যেন পায়ের শব্দ পেলাম ছাদে। সুদূর সঙ্গে কি তোমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল? টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে দাও তো—”

“কাকে ফোন করবেন?”

“পুলিশের ডেপুটি কমিশনারকে। আমি এখনো মরিনি। না ডাকতেই লক্ষ হাত এগিয়ে আসবে আমার সাহায্য করতে।”

মদ্য হাসি ভেসে উঠল জগন্নাথের ঠোঁটে। বললে সে, “আপনি অতীত, আমি ভবিষ্যৎ। আপনি পরাজিত গোয়া, আমি জাগ্রত ভারত। আপনার ডেপুটি কমিশনার এখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। কেউ তাঁকে ঘুম থেকে তুলবে না। আপনার আহবান কেউ শুনবে না। হয়তো রিসিভারটা তাঁর যোগাযোগ চ্যুত-টোবিলের ওপর নামানো রয়েছে।”

“আমি ইমারজেন্সি কল পাঠাব।” রুখে উঠলেন রায়বাহাদুর।

“কেউ শুনবে না। পৃথিবী ব্যস্ত। আপনার ইমারজেন্সিতে কান দেবে না ওরা। আপনার আত্নানাদ শুধু আমিই শুনতে পেয়েছিলাম। এ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকলে পাইপ বেয়ে ছাদে উঠতাম না আমি। আপনি নিবে যাওয়ার আগেও দপ করে জ্বলে উঠলেন। আপনি ভাগ্যবান। আর এক পেয়লা কফি দিই?”

“দাও। কফি তৈরির কয়দা জানো তুমি। শোনো—” আগ্রহের টানে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে বললেন, “তাই বলে তুমি ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে মাঝ-রাতে পালিয়ে যাবে? ইলোপ করবে? জগদ—”

‘রায়বাহাদুর—’ ঘুরে দাঁড়াল জগন্নাথ ঘোষ।

বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে চেক-বই বার করলেন বিশ্বাস চৌধুরী। জগন্নাথের দিকে চেয়ে বললেন, “কলমটা দাও। হাজার পঞ্চাশ দিয়ে দিচ্ছি। গুন্ডামী করবার দরকার হবে না। সারা জীবন বসে খেতে পারবে।”

ফিক করে হেসে উঠল জগদ। বলল, “আমি তো এখন কাজ করছি।

“কোথায়?”

“শ্যামনগরে।”

“কি কাজ?”

“পাওয়ার হাউসের মিস্ত্রী।”

“বাঙালীরা মিস্ত্রীর কাজ করে বলে জানতাম না। ও কি কোথায় চললে?”

“বাড়ি যাচ্ছি।”

“কোন পথ দিয়ে?”

“ষে-পথ দিয়ে এসেছিলাম।”

“এ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখবে না?”

“না।”

“কেন?”

“দিনের বেলায় আসব। আর আসব আপনার সামনের দরজা দিয়ে—” থোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেল জগদ।

রায়বাহাদুর ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। বৃকের কণ্ঠ আপাতত আর নেই। খাটের কিনারে পা দট্টো ঝুলিয়ে দিলেন। হেঁটে গেলেন দরজার কাছে। কাণিশের ওপাশে নেমে পড়ল জগদ। তারপর ডান দিকে চোখ ঘেঁরালেন তিনি। ঐ দিকেই দোতলার নামবার সিঁড়ি। মনে হল কে যেন ছুটে পালিয়ে গেল সিঁড়ির মূখে। সুদূর নয়তো?

পায়ে পটি বাঁধা অসহায় গোয়া শুধু ক্রান্ত নয়, জীর্ণ এবং বিধ্বস্তও। অতীতের দৃষ্টিপট আবার গিয়ে ঢুকে পড়ল লেপের তলায়।

রাসিয়ার ডায়েরী

প্রবোধী কুমার-মান্যম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১১ বাহরো ১১

বিংশ শতাব্দীর ঠিক প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় চাষীর সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল 'সমবায় পদ্ধতির' চাষ, যেটিকে একালে কনগ্রেসের পক্ষে বলা হচ্ছে, 'কো-অপারেটিভ ফার্মিং'। কবির বক্তব্য ছিল, জমির বণ্টন-ব্যবস্থাপনার মধ্যে চাষীর জমি চাষীর মালিকানাতেই থাকবে এবং রাষ্ট্র তাঁর সহায়তা করবে জনকল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। চাষীকে মাঠের মজুরে যদি পরিণত করা না হয়, এবং সে যদি এটি জানে, এ জমি তার নিজের, তবে তাকে দিয়ে অনেক কাজ পাওয়া যাবে। কবির সঠিক বাক্যাঙ্গুলি আমার হাতের কাছে নেই, কিন্তু মানবতার দিক থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত অনেকটা এই প্রকারই ছিল।

জনকল্যাণের আদর্শ পৃথিবীর প্রতি র'ষ্ট্রেরই মন্তব্য—সেখানে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ভারত আজ একই চিন্তায় চিন্তিত। চাষীসাধারণের হাত থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোথাও জন্ম কেড়ে নেয়নি, কেননা সবাই জানে জমির আদি মালিক তারাই যারা জমি স্বহস্তে কৃষক করে। কিছুকাল আগে মিঃ খুশ্‌চভের সহকারী মন্ত্রী মিঃ মিকোয়ান গিয়েছিলেন আমেরিকায়। তিনি মাঠের চাষী এবং কল-কারখানার মজুরদের সম্পদ-সম্পদ অবস্থাটির দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে যান। আমেরিকান চাষী ও মজুর সোভিয়েট দেশের চাষী-মজুর অপেক্ষা অনেক বেশি উন্নত এবং বৈভবশালী—এটি মিকোয়ান সাহেব স্বচক্ষে দেখে আসেন। ভারত গভর্নমেন্ট সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কো-অপারেটিভ ফার্মিংয়ের কাজে হাত দিয়েছেন, যেটিতে চাষীর মূল মালিকানা ক্ষমতা না কাটাও 'যৌথ' চাষের কাজ করা যাবে। যৌথ-চাষ যে উন্নতির পথ তাতে সন্দেহ নেই। অধিকতর ফসল ফলাবার জন্য যৌথ-চাষের প্রণালী সর্বজনগ্রাহ্য, কিন্তু তর্ক

বাধে শব্দে তাঁর প্রয়োগ-পন্থা নিয়ে। সোভিয়েট ইউনিয়ন জনগণের রাষ্ট্র, এবং সোভিয়েট ভূমির নিয়ন্ত্রা হলেন রাষ্ট্র,—কিন্তু ভূমির মালিক চাষী নয়! সবাই সবাইয়ের জন্য চাষ করছে, কিন্তু কে কা'র জন্য করছে সেটি অস্পষ্ট! সবাইগে আমি দেখব, যে-জমিতে চাষ করা হচ্ছে সেটি একান্তভাবে আমার নিজস্ব কিনা,—তবেই ত তাকে 'সাজাব যতনে কুসুম রতনে—!' জননীর কোলে মানুষ হওয়া এক জিনিস, ধাত্রীর হাতে পালিত হওয়া অন্য বস্তু!

মস্কো থেকে মাইল কয়েক দূরে গিয়ে সেদিন সকালে ছোটখাট একটি কলেক্টিভ ফার্ম, যাকে বলে, 'কল্‌খোজ'—দেখাছিলুম। আশেপাশে দেখতে পাচ্ছিলুম একটি দারিদ্র্যদাশা, একটু যেন অনড়তা এবং ক্রান্তির আবহাওয়া। বিদেশীরা গিয়ে যদি পাঁচ রকমের প্রশ্ন করে, তাদের জবাবগুলি গুছিয়ে না বললে চলবে কেন? আমাদের ঘরে নবাগত এবং অপরিচিত কেউ এলে আমরা আমাদের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তাই দেখাতে চাই! এটা নিয়ম। সে যাই হোক, এই 'কলেক্টিভ ফার্ম'টির এখনও যথেষ্ট উন্নতি করা সম্ভব হয়নি, এখনও সর্বপ্রকার সুবিধা পাওয়া যায়নি, তবে এই লাইনে কাজ চলছে, ইত্যাদি। আগাগোড়া সব আমাদেরকে ব্যস্ত করে বলা হল। এখানে একটি পুরনো নীচ বাড়িতে হেড আপিস, দেওয়ালগুলিকে যথাসম্ভব সুদৃশ্য করার জন্য কাঁচা রং লেপা,—আনুপূর্বিক চেহারাটা বিশেষ উৎসাহজনক নয়। মস্কোর এত কাছে এমন একটি দৈন্যদাশা ঠিক আশা করিনি। বোধ হয় প্রদীপের নীচেই সর্বাপেক্ষা জম্‌কার। আপিসের সামনে বড় রাস্তায় উঠে আসবার পথটা জল-কাদায় ব্যাড়াব্যাদ করছিল, আমরা জুতো এবং পোষাক বাঁচিয়ে কোনওমতে পেরিয়ে এলুম।

বস্তুত, মস্কো অঞ্চল থেকে পল্লীগ্রামের দিকে বেরিয়ে এলে দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের জীবনযাত্রা এখনও যথেষ্টই অন্তর্ভুক্ত। বহু ক্ষেত্রেই পথঘাট এখনও

ঠেঁরি হয়নি, নালা-নদীর সুবিধা নেই, টিউব-ওয়েলের দ্বারা দূর-বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা, সম্ভার পরে আলোর ব্যবস্থা যথোচিত নয়, আহা! সামগ্রী সংগ্রহ করার বিবিধ অসুবিধা, সচ্ছন্দ বসবাসের পক্ষে যথেষ্ট সংখ্যক ঘরদোর কম, বড় বড় দোকান হাতের কাছে না থাকার জন্য দূর-দূরান্তের পেরিয়ে শহর-বাজারের দিকে ছুটোছুটি,—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবনধারণের পক্ষে এখনও কষ্টকর অবস্থার শেষ যেন হয়নি! গ্রামের ধার দিয়ে মাঠের পাশ দিয়ে ধূলা বা কাদা, জল বা ডোবার ধার পেরিয়ে খানা-খোদল ডিঙিয়ে যখন মেয়ে-পুরুষকে বহুদূর পর্যন্ত পেরিয়ে অন্য গ্রামের দিকে যেতে দেখতুম,—তখন আমাদের চেয়ে ওদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা দৃশ্যকরী যে খুব বেশি উন্নত, এমন কথা মনে হত না। অনেক সময় আমি ব্যথিত চক্ষে চেয়ে থাকেছি।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পাজারের পার্টিশানের পর পাজারীদের অবস্থা আমি স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে দেখেছি! পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা চলে এসেছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ সর্বস্বান্ত, কিন্তু তারা পথে ব'সে নৈরাশ্যপীড়িত হয়ে হাহুতোশ করেনি, ভিক্ষের বদলি নিয়ে পথে পথে ঘোরেনি, মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যবাদের উদ্দেশ্য করেনি,—তারা কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়িয়ে কাজ করেছে, নিজের হাতে ঘর বেঁধেছে, বন-জঙ্গল সাফ করে একটি উপনগর বসিয়েছে, জমিদারের বউ হয়ে খাবারের দোকানে বসেছে, এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা, কষ্ট এবং দুর্গতির একেবারেই আমল দেয়নি। তারা দুঃখ ভুলেছে, চোখের জল মুছেছে, নিজের চারিদিকে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তারা পূর্ব পাজাব থেকে রেফারজ সমস্যা সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছে। অতঃপর নিজের হাতে আজ তারা একটি সম্পূর্ণ নতুন রাজধানী নির্মাণ করেছে। পূর্ব পাজাব সম্পদে এবং ঐশ্বর্যে আজ সমৃদ্ধ হল।

এ ব্যাপারে আধুনিক পৃথিবীর আর মাত্র তিনটি জাতি পাজ্রাবের সমকক্ষ—একটি পশ্চিম জার্মানী, আরেকটি ইসরায়েল, এবং তৃতীয়টি সোভিয়েট উক্রাইন।

সেই পাজ্রাবীপ্রকৃতি রুশপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এরা কষ্ট এবং দুর্গতিকের স্বীকার করে না, সুকঠিন আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা দুঃস্বপ্নকে সহজ করে। জলে, কাদায়, বরফে হি হি করছে, দুর্ঘোষে অন্ধকার চারিদিক, বাসস্থানের ও স্বাচ্ছন্দ্যের একান্ত অভাব, তুহিন ঠান্ডার মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি করতে অসমর্থ হচ্ছে, —কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। অবস্থাকে উন্নত করার জন্য সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রাম সুকঠিন, —কিন্তু মূখে সচ্ছল হাসি। নিয়মিত স্নানাদির অভাব, পায়-খানার অব্যবস্থা, একই রান্নাঘরে পাঁচটা পরিবার, একই শোবার ঘরে সাতজন, গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না, উত্তাপের অভাবে হুত কাঁপছে, আলোবামুহীন ঘরটিতে, মন টিকছে না, —কিন্তু তারা জানে, এ অসুবিধা থাকবে না, তারা রাষ্ট্রের কল্যাণ আদর্শে বিশ্বাসী, এবং তারা কোনও

দুঃখ-যন্ত্রণায় ভর পায় না! মস্কো নগরীর ভিতরে ও বাহিরে শত শত 'ক্রেম' প্রতিদিনের বিরাট নির্মাণ তালিকার নিয়ত সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। গ্রান্ডের এই অদম্য প্রাণশক্তির দিকে প্রস্থার সঙ্গে কত দিন চেয়ে থেকেছি।

সেদিন সন্ধ্যায় উক্রাইন হোটেলের নীচের তলাকার মস্ত হল-এ ভারতীয় লেখক ও কবি-সম্মেলন বসল। বাঙালী-দের মধ্যে ছিলেন বিনয় রায়, ননী ভৌমিক, সমর সেন, প্রভাস বসু, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীরেন রায়, শূভময় ঘোষ, সুভাষ মৃধা-পাধ্যায়—এরা। ওদিকে আছেন প্রিয়-দর্শী সাজ্জাদ জহীর, চোহান, ভাবান, শেখোন, আরে, দুর্গা ভগবৎ, লক্ষ্মী-কুমারী, প্রদোষ কাউর, ষশপাল, দোসা, সত্যানন্দ, পট্টনায়ক, মালসুখানি, হরচরণ সিং, প্রীতম সিং ইত্যাদি। পাকিস্তান থেকে আছেন ফৈয়াজ আহমেদ ফয়েজ এবং হাফিজ জলিলুরী। রুশ লেখক আছেন অনেকেই, তাঁদের কয়েকজনকে

আজকাল বেশ চিনতে পারি। আহারাতি এবং পানাদি আরম্ভ হয়ে গেল। প্রচুর খাচ্ছে সবাই। এমন ব্যয়বহুল পানাহার কে দিচ্ছে, আমার জানা নেই। কিন্তু এটি জানি, সব ভারতীয়গুলিকে একসঙ্গে ধরে মস্কোর হাটতলায় গিয়ে বেচলেও আজকের খাই-খরচের সিকি ভাগও হবে না! হলের শেষ দিকে আজ একটি গল্প দেখা যাচ্ছে, সেখানে সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ কয়েকজন শোভা পাচ্ছেন। এদিকে সমগ্র হল-এ সেই বিপুল পরিমাণ পানাহারের আসরে পরস্পর হাসি-তামাসা ও গল্প-গুজব চলছিল। এ যেন একটা রুশ-ভারত লেখক সম্মেলনের মতো—যেটি একদা তাসকণ্ডে রবীন্দ্র-সভায় দেখে এসেছি।

ভারতীয় কবি-সম্মেলনের উদ্বেগধন-কালে শ্রীযুক্ত সাজ্জাদ জহীর প্রস্তাব করলেন, মহাকাবি রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রপাঠ করে এই সম্মেলনের উদ্বেগধন করা উচিত! তাঁর এবান্বধ প্রস্তাবটি শোনামাত্র সমগ্র সভায় করতালিধ্বনি উঠল। কিন্তু তিনি এই সূত্রেই হঠাৎ এক সময়ে আমার নামটা উচ্চারণ করে আমাকে একটি আবৃত্তি করার জন্য অনুরোধ জানানেন। আমি একান্তে বসেছিলাম এতক্ষণ, সহসা আমার নাম প্রস্তাবিত শুনে প্রথমটা একটু হকচকিয়েই গিয়েছিলুম। আমার ডানপাশে বসেছিলেন শ্রীমতী লিডিয়া এবং বাঁদিকে সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্তা হেলেন রমানোভা। শ্রীমতী লিডিয়ার সানন্দ হাত-তালির দিকে চেয়ে মনে হল, এ যেন তাঁরই জন্মোৎসব! তিনি প্রায় আমাকে ঠেলে তুলে এগিয়ে দিলেন। আমি কাঁচু-মাচু মূখে অগ্রসর হয়ে সোজা গিয়ে মঞ্চের উপরে উঠলুম এবং অতঃপর মহাকাবির একটি কবিতা আবৃত্তি করার আগে ছোট একটি ভাষণ দিয়ে সকলকে এইটি জানালুম, মহাসমুদ্রের থেকে এক চামচ জল তুলে এনে অন্তহীন এবং অগাধ জলধির পরিচয় দেওয়া চলে না! তা ছাড়া তাঁর মূল বাঙলা ভাষা আপনাদের প্রায় সকলেরই নিকট অজ্ঞাত। আমার আবৃত্তির মধ্যে কেবলমাত্র ধ্বনি, ছন্দ এবং প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা যদি আপনাদের মনে কিছু রেখাপাত ঘটে, আমার সেইটিই আনন্দ।

কবিতা আবৃত্তির পর শ্রোতাসাধারণ আন্তরিকভাবে করতালিধ্বনির দ্বারা কবির উদ্দেশ্যেই তাঁদের নৈবেদ্য নিবেদন করেছিলেন। অতঃপর পাকিস্তানের দুই

আপনাকে ঠিক যা মানায়

সাজসজ্জাই বলুন আর গহসজ্জাই বলুন, মানানসই হ'লে তবেই বাহার খোলে। মনের মত অথচ সুলভে পেতে হ'লে—রুটি ও খাঁইল মেলাতে হ'লে—আমাদের একান্ত নিজস্ব কারুশিল্প সমৃদ্ধ

হাতের তাঁতের

রেশম ও সুতীর বস্ত্রসম্ভার
রঙ ও ডিজাইনের বৈচিত্র্যে
সত্যই অতুলনীয়।

ভারতের সকল প্রদেশ থেকে সংগ্রহ করা শাড়ি,
ব্লাউজপীস, ধুতি, সার্ট ও সুটের কাপড়, টাই,
তোয়ালে, পর্দা প্রভৃতি নিজে এসে পছন্দ করুন.....

হ্যাণ্ডলুম হাউস

২, লিডলে স্ট্রীট, কলিকাতা

॥ পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র : ৩, গার্লটন লেন, কলিকাতা ॥

জন কবি ফয়েজ আহমেদ এবং হাফিজ জলশরী সেই রাতে গান গেয়ে-গেয়ে তাঁদের কবিতা শোভাবে শুনিয়ে সকলকে নির্মল আনন্দ দান করেছিলেন। সেটি আমাদের অনেকের পক্ষেই স্মরণীয়। তাঁদের উভয়ের সেই কবিতাগুলির মধ্যে পাকিস্তানের প্রতীকিত আত্মার বন্ধন-জরতা ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠেছিল। অনেকে অশ্রুসংবরণ করতে পারেননি। পরিশেষে রুশ-লেখক এবং 'অগনিয়োক' (আগুন) সামতাহিকের সম্পাদক সৌম্যদর্শন এবং দীর্ঘ-স্থলেকার মিঃ সফোনভ তার নৃত্য ও কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন। এ-আমোদ উপভোগ করার মতো ছিল।

আসন্ন শেষ হবার আগেই আমি বেরিয়ে আসছিলাম। দরজার বাইরে পা দিতেই ওদিক থেকে জনৈক শ্যামবর্ণ ব্যক্তি আমার জন্য এসে সামনে দাঁড়ালেন। মনে হল, তিনি বাইরে এতক্ষণ কোথাও অপেক্ষা করছিলেন। আমি থমকিয়ে গেলুম। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি ভারতীয়। ভদ্রলোক এবার সহাস্য পরিচ্ছন্ন বাগলায় বললেন, ক্ষমা করবেন, আপনার জন্যই এখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমাকে এখানে 'লিটন জ্যাক' বলে সবাই জানে।

এবার মুখ তুললুম ভাল করে,— আপনি বাগলায়?

আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমার পূর্বনাম ছিল হরেন্দ্রলাল দত্ত। ১৯৩০-এ আমি রাজনীতিক কারণে বোম্বাই থেকে ছদ্মবেশে জাহাজে পালিয়ে আসি। আমি বিপ্লবী-দলে ছিলাম। ইউরোপে কোথাও আমার ঠাই হয়নি। এখানে এসে জায়গা পাই। সে অনেক কাহিনী। দেশে আমার বৃদ্ধা মা আছেন জানতুম। আমি নানা দৃষ্টান্তে মানুষ হয়েছিলাম। আমি একই সন্তান। ছোটবেলায় পিতৃহীন হই।

প্রশ্ন করলুম, ভারত স্বাধীন হবার পর দেশে ফেরেননি কেন?

লিটন জ্যাক জবাব দিলেন, আমি এখন সোভিয়েট নাগরিক। এখানে আমি রুশ মহিলাকে বিবাহ করেছি, আমার ছেলেপুলে আছে। এখানে খবরের কাগজে আমি কাজ করি। আমার ভালই উপার্জন।

এবার আমি পান্ডববর্তিনী লিডিয়াকে শুনিয়ে ইংরেজীতে তাঁকে প্রশ্ন করলুম, ভারতীয় 'ক্যাপিটালিস্টদের' বিরুদ্ধে কি আপনাকে নিষিদ্ধ গালমন্দ লিখতে হয়?

ভদ্রলোক এবার খুব হেসে উঠলেন, এবং লিডিয়া ছটফট করে উঠে বললেন, আপনার কেবল কথার কথায় খোঁটা! আমাদের কি খেয়ে-দেয়ে আর কোনও কাজ নেই? বেশ, ও'কে যা খুশি আপনি জিজ্ঞেস করুন, আমি স'রে যাচ্ছি।

লিডিয়া রাগ করে ঠরঠরিয়ে হাত পাঁচশেক দূরে গিয়ে একখানা মখমলের কুশন-কেদারায় বসে রইলেন।

হরেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয় হাসিমুখে বললেন, আমি রুশভাষায় লেখাপড়া করি। আরও তিন-চারটে ভাষা ভালই জানি। মস্কো বা অন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন রিপাবলিকের কোনও ভাষার কাগজে ভারত-বিরোধী একটি বাক্যও প্রকাশ পায় না! বরং এর উল্টো। ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, এ'রা সেগুনি নিয়মিত প্রকাশ করেন। এইটাই এ'দের নীতি। আপনি যখন এসেছেন, এদেশ ভাল করে দেখে যান, ভারতের প্রতি এ'দের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

বললুম, গান্ধীজির সম্বন্ধে এ'রা একবার খুব মন্দ কথা ছেপেছিলেন, মনে আছে আপনার?

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, সেটি ষ্টালিন আমলের কুকীর্তি। সে-সব লেখা বাজার থেকে একদম তুলে নেওয়া হয়েছে। ভারত স্বাধীনতার পর গান্ধীজি রাতারাতি কমিউনিষ্ট হননি কেন, এইটি ছিল ষ্টালিনের আক্রোশ!

আপনি কি কমিউনিষ্ট?

আমি পার্টির সভ্য নই, কিন্তু আমি সোভিয়েট নাগরিক। ভারতে যেমন কন-গ্রেসের 'ওয়ার্কার' না হয়েও ভারতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়, এখানেও তাই!

আবার একটি বোয়াদা প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা হরেনবাবু, ভারতবর্ষে যদি কখনও কমিউনিষ্ট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়— আপনি সুখী হবেন?

লিটন জ্যাক জবাব দিলেন, আমি সোভিয়েট নাগরিক! ভারতবর্ষে সুখে থাক, তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হোক,— দূরের থেকে এই আমার কামনা। তার পথ সে জানে, আমার কিছু বলবার এস্তিয়ার নেই।

বললুম, ভারত গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে আপনার ধারণা কেমন?

অত্যন্ত ভালো!—ভদ্রলোক জবাব দিলেন, আমার গর্ব, আমার আনন্দ! আমি কাঠখোটা মানুষ, দৃষ্ট পেয়েছি, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতালাভে আমার সব দৃষ্ট মুছে গেছে!

হাসিমুখে বললুম, কিন্তু আপনি ড° এখন সোভিয়েট নাগরিক!

হরেনবাবু বললেন, আমার জীবন যে দুই দেশে গড়া। দুই আমার আপন। আপনি বিশ্বাস করুন, দশ এগারো বছরের মধ্যে ভারতের এই উন্নতি দেখে এরা অবাক হয়ে গেছে। তা ছাড়া ভারত এদের বড় প্রিয়।

আমি প্রশ্ন করলুম, আপনি কি আমাকে এই কথাগুলি বলবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন?

আরও মজবুত...আরও ভাল

পিতলের তৈরী
বাণীর টিউব



‘কিমান’ লাইট
‘স্পেশাল কোয়ালিটি’
হাপ দেখিয়া লইবেন।



সম্পূর্ণ লাইট মোটা চাদরে
তৈরী ও লাইটের নং কেরোসিন
তৈলে নষ্ট হয় না

কিমান
লাইট
সর্বোৎকৃষ্ট



সেইসময়েই দাম ৭৩ কোঃ

২৩৩, ৩২৬ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন-২২-৬৬৮০

না,—হরেনবাবু জবাব দিলেন, আপ-
নার দৃষ্ট একখানি বই আমি রুশভাষায়
অনুবাদ করব, আপনি অনুমতি দিন।

এঁরা কি অনুমতির অপেক্ষা রাখেন?
শুনোছি পৃথিবীর সব বই এঁরা যখন
খুশি অনুবাদ করিয়ে নেন?

ভদ্রলোক একটু থতিয়ে গেলেন। পরে
বললেন, এঁদেরও ক্লাসিক গ্রন্থ পৃথিবীর
সবাই নিজের ভাষায় নিয়ে নিয়েছে, কেউ
অনুমতির অপেক্ষা রাখেনি। আপনি যদি
দেশে ফিরে আমাকে একখানা অনুমতি-
পত্র পাঠান আমি খুশী হই। আপনার
খান পাঁচেক বই আমার কাছে আছে।

ভদ্রলোককে আজও আমার চিঠি
দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে বছর খানেক
আগে রুশভাষায় Dolls নামে আমার
একখানি গল্পের বই ছাপা হয়। সেখানি
প্রকাশ করেন মস্কোর 'ফরেন লিটারেচার
পাবলিশিং হাউস'।

ভদ্রলোকের বিদায় নেবার আগে হঠাৎ
তাকে প্রশ্ন করলুম, দেশে ফিরতে আর
আপনার ইচ্ছা করে না?

লিটন জ্যাক-এর বাড়ি ছিল পূর্ব-
বঙ্গের কোন সুন্দর অশ্বকার পল্লীগামে।
প্রশ্ন শুনে তিনি ক্ষণকাল আমার দিকে
তাকালেন। পরে একপ্রকার অশ্রুত
গভীরকণ্ঠে বললেন, সেখানে আর ঠাই
নেই আমার।

ওভারকোটটা কাউন্টার থেকে চেয়ে
নিয়ে নমস্কার জানিয়ে তিনি চলে
গেলেন। বাইরে তখন দুর্যোগ, তুষার-
মেলানো দুরন্ত ঝাপটা চলছে। ওপাশে
চেয়ে দেখলুম, কবি-সম্মেলনে পানা-
হারের প্রবল আনন্দের আসর। এপাশে
অদূরে কে এক নবাগতা নারীর সঙ্গে
শ্রীমতী লিডিয়া উচ্ছ্বাসিত আলাপের
মধ্যেও আমার দিকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য
করছিলেন।

আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম,
কিংবা ওই তুষার-দুর্যোগের ভিতর দিয়ে
লিটন জ্যাকের পিছু নিয়েছিলুম, আজ
আমার সঠিক মনে নেই! বোধ হয় আমার
সৌন্দর্যকার লিখিত সাহেবী পোষাকের
ভিতর থেকে বৎসহারা এক দরিদ্রা
বাঙালী জননী হঠাৎ শাসন-বাধন ছিঁড়ে
অশ্বকার পল্লীগামের ভিতর দিয়ে বিপ্লব-
বাদী সন্তানের পিছু পিছু ছুটোছিল
কাঁদতে কাঁদতে। সেই জননীর কান্না
ওইখানে দাঁড়িয়ে নিজের কানেই শুন-
ছিলুম।

শ্রীমতী লিডিয়া ইশারায় আমাকে
ডেকে নিয়ে গেলেন দোভলার একটা
নিরীবিাল লবীতে। এখানে সর্বত্র ঘন
সবুজ মখমলের আসবাব। আলোটা
সবুজ বর্ণচ্ছটা বিস্তার করছে। মেঝের
কাপেটটিও সবুজ। রাত্রের দিকে সর্বত্র
যেন এক মায়ালোক সৃষ্টি করেছে।
সম্পদের প্রাচুর্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে চারি-
পাশে। রাতি অনেক।

সেখানে ঘন কালো আঁটসাঁট পোষাক-
পরা একজন দুর্যোগ-সুদ্রী যুবতী-
মহিলা একাকিনী বসেছিলেন। আমাকে
আসতে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।
মুখশ্রী তাঁর অতি কমনীয় এবং শান্ত-
মধুর। কিন্তু তাঁর ঘনকৃষ্ণ পরিচ্ছদের
আঁটসাঁট পেরিয়ে ভরা যৌবনসমৃদ্ধ দেহের
প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন সুপরিষ্কৃত
যে, তাঁর সুন্দর মুখখানির উপর ছাড়া
আর কোনটার দিকে চোখ রাখা যায় না।
পরিচ্ছদ পরিধানের সুকৌশল পারি-
পাটের দ্বারা পৃথিবীর সব দেশে, এবং
ভারতেও—যৌন-আবেদন প্রচারের একটি
রীতি নারীসমাজে প্রচলিত আছে। সেই
আবেদনের দ্বারা মেয়েমানুষ যদি তার
চক্ষু ও ভঙ্গীর ইশারায় নিজের দিকে
পুরুষকে আকর্ষণ করতে থাকে, তবে
সেটি নারী-প্রকৃতির দৈন্য, সেখানে
পুরুষের বলিদান ঘটে, এবং মেয়েরা
জয়ের উল্লাসে মদমত্ত হয়ে ওঠে। এখানে
এই নম্রমুখী নারীর সেই অভিসম্পদী নেই
লক্ষ্য করে কতকটা যেন স্বেচ্ছিত পাওয়া
গেল। আমি তাঁকে বসবার জন্য অনুরোধ
জানালুম। কৃষ্ণবসনঢাকা অগ্নিকুণ্ড যেন
সামনে বসল।

মহিলাটি উক্লাইনের মেয়ে। বাড়ি
রাজধানী 'কিয়েভ' শহরে। তিনি
'সেসউইথ' নামক একখানি মাসিকপত্রের
সম্পাদিকা। তাঁর নাম শ্রীমতী অলোসিয়া
ক্রাভেজ। "সেসউইথ" শব্দটির ইংরেজি
অর্থ হল, 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড'—পৃথিবী
এক। অলোসিয়া নিজে একজন ঔপ-
ন্যাসিক, এবং একখানি উক্লাইন ভাষায় ও
রুশলিপিতে লেখা, বই আমার জন্য
এনেছেন। বইখানি বিশেষ মোটা এবং
গেরদুয়াবর্ণের মলাট। সোনালি অক্ষরে
মলাট ছাপা। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারা
গেল, তাঁর এই আসার মধ্যে লিডিয়া
হাত আছে। অলোসিয়া একবর্ণ ও ইংরেজি
বোঝেন না, সেইজন্য লিডিয়া আমাদের
মধ্যে দোভাষীর কাজ করছিলেন। ওঁরা
দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

আমি বললুম, আপনি আমাদের
কবি সম্মেলনের আসরে কেন গেলেন না?

অলোসিয়া কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হয়ে
জবাব দিলেন, ওখানে ঢুকতে ভারী লজ্জা
করছিল।

তার অবিস্মৃত লজ্জা তাঁর এই আঁট-
সাঁট পোষাকটির সঙ্গে জড়িয়েছিল কিনা
সেটি যখন ভাবছিলাম, তখন লিডিয়া
বললেন, আপনার সঙ্গে উনি আলাপ
করার জন্য এসেছেন। এখানে ওঁর কোনও
কাজ ছিল না।

অলোসিয়া বললেন, আপনাকে আমি
কফি খাওয়াতে চাই।

হাসিমুখে বললুম, রাত একটা বেজে
গেছে। কফি খেলে ঘুম হয় না শুনোছি?

তা হলে বার দুই কফি খান!

আমরা তিনজনেই হেসে উঠলুম।
লিডিয়া একবার উঠে গিয়ে কফির ব্যবস্থা
করে এলেন। আজ না ঘুমোলেও চলবে!
অতঃপর আমরা দেশ-কাল-পাত্র এবং
পরস্পরের পারিবারিক গল্পে মেতে উঠ-
লুম।

এক সময় আমি ধরে বসলুম, পশ্চিম
সোভিয়েট ইউনিয়ন হিটলারের হাতে
ছিল বছর তিনেক। কিন্তু জার্মানরা যখন
উক্লাইন আক্রমণ করে, তখন আপনার
বয়স কত?

অলোসিয়া হাসিমুখে বললেন, তখনও
আমি সতেরো বছরে পৌঁছাইনি।

লিডিয়াকে প্রশ্ন করলুম, আমার
কথায় অলোসিয়া হাসছেন কেন? দাঁত-
গদূলি ওঁর মুস্তোর মতন, দেখতেই পাচ্ছি।
তাহলে—?

না মশাই, সেজন্য নয়। আপনাকে
বলতে ও লজ্জা পাচ্ছে,—অলোসিয়া তখন
স্বামী নিয়ে ঘর করছিল!—লিডিয়া
আমাকে সহাস্যে ধমক দিলেন।

বেশ ত, তারপর?

এবারে আর হাসির অবকাশ
রইল না। দেখতে দেখতে অলোসিয়ার
সেই চুলটেনে-বাঁধা মুখখানি কতকটা
গম্ভীর ও ছিলছিল হয়ে উঠল।
তিনি বললেন, আজ আমার মনে
পড়ছে না সৌন্দর্য কেমন করে
বাঁচলুম, কী খেললুম, কোথায় গেলুম!
জার্মানী আক্রমণ করবে আমরা কেউ
জানতুম না! আমার শব্দরবাবড়ির ওপর
যখন বোমা পড়ল, তখন হুটতে হুটতে
গিয়েছিলুম বাপের বাড়িতে। সেখানে
মা-বাবা-ভাই-বোন কারোকে দেখলুম না।
স্বামী কাজে বেরিয়েছিলেন, আর ফির-

লেন না,—এবং আর কোনওদিন তাঁর দেখাও পেলুম না। শহরের সব জায়গায় বেমার বৃষ্টি হচ্ছে, বড় বড় বাড়ি ছিটকে যাচ্ছে একদিক থেকে অন্যদিকে—! চারদিকে কত লোক মরছে! কিন্তু আমি কেমন করে বেঁচে যাচ্ছি বুঝতে পারছি নে—আমি আবার সেই ভাঙ্গা শব্দ—বাড়িতে ফিরে এলুম। কোনমতে সেখান থেকে একটা পুঁটলি কোমরে নিয়ে ছুটে দিয়েছিলুম একদিকে—। চোখের ওপরে আমাদের সাজানো বাগানের সর্বনাশ হতে লাগল—!

বললুম, ভবিষ্যৎ কালের ঔপন্যাসিক এই অবস্থাতেই বেঁচে যায়! হ্যাঁ, তারপর—গেলেন কোথায়?

অলিসিয়া বললেন, কোথা গেলুম! তা জানব কেমন করে? আমি কি বাড়ির বাইরে বেরিয়েছি কোনদিন? চারদিকে তখন মিলিটারি, পশ্চিম থেকে জার্মানরা আসছে, মাথার ওপর স্লেনের যুদ্ধ, দেশের লোকেরা সব ছেড়ে পূর্বদিকে পালাচ্ছে,—আমার মনে নেই কোথায় গেলুম। তবে ওই বোধ হয় পূর্ব-দক্ষিণের পথ দিয়ে' ছুটোছিলুম একদিকে..... রাস্তায় রাস্তায় কোথাও কলের জলও ছিল না—। আমার মতন হাজার হাজার ছুটোছিল—কত লোক মরছে না খেয়ে—কত লোক পাগল হয়ে গেছে..... ওলাওঠায় কত মরছে.....

লিডিয়া শান্ত গম্ভীরভাবে বসে-ছিলেন। এবার মৃদুকণ্ঠে বললেন, আমাদের সৈদিনের দুঃখ আপনাদের কম্পনারও অতীত!

অলিসিয়া বললেন, প্রায় সাত মাস। একে একে জামা-জুতো-মোজা—সব ছিঁড়তে লাগল। কখনও মাঠে ঘুমোচ্ছি... মাথার ওপর স্লেজ দেখে গাছতলায় লুকোচ্ছি! গ্রামাঞ্চল অন্ধকার, সেখানে আশ্রয় নিয়ে হয়ত বা দুদিন কাটল! আবার পিছন থেকে তাড়া এল.....আবার পাতত্যাড় গাটিলে ছুটতে লাগলুম। হিসেব করে দেখলুম, প্রায় এক হাজার মাইল হেঁটে শেষ করেছি! ভয় ছিল পাছে জার্মানদের হাতে পড়ি—!

ভয় কেন! ওদের খাকি পোষাকের আড়ালে অনেক সত্যিকার মানুষ হয়ত চাপা ছিল!

না, একজনও না!—অলিসিয়ার সেই নখর সুন্দর চক্ষু এবার দপ করে জ্বলে উঠল,—একজনও মানুষ ছিল না! ওরা ছিল পাগলা কুকুর! আপনি কি জানেন,

শেষের দিকে ওরা এদেশের মানুষের মাসেও আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে গেছে? আমাদের যুদ্ধ ছিল মানুষের সঙ্গে বন-মানুষের! তারা না পারে হেন কাজ ছিল না।

আমাদের কফির আসর বেদনার আসরে পরিণত হয়ে উঠল। ওধারে হোটেলের সেই অপর প্রান্তে টেবলের ওপর মাথা রেখে একটি 'ফ্লোর মেড' ঘুমিয়ে। টেবলজ্যাম্পটি জ্বলছে তার মাথার কাছে। এদিকটা নিশ্চুতি। নিচের তলায় কচিং এক একবার জুতোর মসমস শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

এবার বললুম, আপনারা কি পথে পথে ভিক্ষা করে খাচ্ছিলেন?

না, ভিক্ষা কেন করব?—অলিসিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, চেয়ে খেতে হয়নি! উপবাস করতে হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু গ্রামে যখন পেঁপেছোঁচ, দু'হাত বাড়িয়ে সবাই ডেকে নিয়েছে। খেতে দিয়েছে যার যা কিছু ছিল! ছেঁড়া জামা ছাড়িয়ে আস্ত জামা পরিয়ে দিয়েছে, জুতো মোজা যেমন করে হোক যুগিয়ে দিয়েছে,—কেউ কখনো কৃপণতা করেনি! এমনি করে প্রায় সাত মাস পরে যেখানে গিয়ে পেঁপেছোঁচ, জার্মানরা সেখানে কোনদিন নাগাল পায়নি। তারপরে এক কারখানায় কাজ পাই। সে-অঞ্চলে মস্তু বড় এক 'চীনা-বস্তু' ছিল। সেখানে পশ্চিম তিরিশ হাজার চীনা বাস করে বহুকাল থেকে। সেটা ছোট্ট একটি শহর। সেখানে আমি চীনাভাষা শিখি!

অলিসিয়া স্তান হাসো বললেন, আমার প্রথম জীবনে সেই যে যর জার্মানরা ভেঙ্গে দিয়েছিল, সে-যর আর জোড়া লাগেনি!

আপনার কি সন্তানাদি ছিল?

লিডিয়া দপ করে বললেন, নন-সেন্স, ওর তখন সব বিয়ে হয়েছে! ওর বাবা ভাল পাত্র খুঁজে ঘটা করে বিয়ে দিয়ে-ছিলেন।

আপনাদের কি চার্চে গিয়ে বিয়ে হয়?

না—অলিসিয়া জবাব দিলেন, আগে-কার কালে অবশ্য চার্চের সম্মতি ছাড়া বিয়ে হত না এবং চার্চের সম্মতি ছাড়া ডাইভোর্সও হত না। এখন সব কিছু রেজিস্ট্রি করে হয়। অনেকে এখনও বিয়ের পরে আশীর্বাদ নিতে চার্চে যায়। যার যেমন খুশি।

প্রশ্ন করলুম, আপনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন কবে? আপনার ছেলেপুত্রে কি?

লিডিয়া আবার আমাকে ধমক দিলেন,—বস্তু বেমরুর প্রশ্ন করেন আপনি! বিয়ে আর উনি করেননি! নিন, কক্ষ যে আপনার ঠাণ্ডা হয়ে এল!

অলিসিয়া তখন মধুর হাসি হাস-ছিলেন। রাত তখন শেষ হয়েছিল।

পরবর্তী কয়েক মাস অবধি কল-কাতায় বসে এই মহিলার কয়েকখানি চিঠি পাই। সব চিঠিগুলি একে একে প্রীমতী লিডিয়া অনুবাদ করে মূল পত্র

বেনারসী মাড়ি ব মেলা

মোহিনীমোহন

কাঙ্ক্ষিত

এও মন্ড

*
কলেজ স্ট্রিট জংশন-কলিঃ-১
ফোন: ৩৪-৪৫২০

সহ পাঠিয়ে দেন। একুশখনি চিঠি বেশ কৌতূহলজনক ছিল। শ্রীমতী অলেনিয়া চীন ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। ইয়াংসি নদী পার হবার সময় তিনি 'মহুরা' গাছের একটি ছোট্ট ডাল আমার জন্য সংগ্রহ করেন! তারপর পেকিং থেকে ফিরবার সময় তিনটি কফির পেয়ালা আমাদের তিনজনের জন্যে, এবং ছোট একটি কাঁচের বাস্কে ডালে-বসা দুটি পুতুল-পাখী আমার জন্য আনেন! কিন্তু ওখানেই শেষ হয়নি। তিনি মগোলিয়া হয়ে তাঁর নিজের কাজে—তাসকন্দ—যান, এবং সেখানে আমার 'কন্যা' শ্রীমতী সোয়েথ-লানা যে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে এই খবরটি নিয়ে মস্কো ফেরেন।—“আপনি আরার যখন মস্কোয় আসবেন তখন ওই পেয়ালায় আমরা তিনজনে কফি খাব এবং পাখী-পুতুলের বাস্কেটি আপনার হাতে দেবো। সেই প্রথম রাতে আলাপ-কালে আপনার কথাগুলি আমার কানে ও স্মৃতিতে আজও রয়েছে। আপনার সেই মহৎ বাক্যগুলি থেকে আমি জীবনের শক্তি, গর্ব এবং বিশ্বাসকে যেন আবার খুঁজে পাই। বাঁচতে হয় অন্যের সেবায়—এই অবিস্মরণীয় শিক্ষা আপনার কাছেই পেয়েছিলাম। আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি আপনার অলেনিয়া।”

নয় মাস পরে পুনরায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণে গিয়েছিলাম। কিন্তু অলেনিয়াকে আর কখনও দেখিনি। তিনি বুদ্ধি তখন দক্ষিণ সাইবেরিয়ার দিকে একাকিনী ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কবে ফিরবেন কেউ জানে না।

ঠিক মনে নেই, লেনিনই বোধ হয় প্রথম ক্রম্বকস্টে বলেছিলেন, “খমটা হল আফিগের মতো। ওটা নেশা। ওটার প্রভাবে মানুষ বদ হয়ে থাকে, এবং ওর বাইরে জীবনের আর কোনও রূপ চোখে পড়ে না।

লেনিনের এই মন্তব্যটি নিয়ে আমরা তরুণ বয়সে লোফালাফি করতাম। কলকাতার কালিঘাটে যাওয়া বন্ধ করলাম, কাশী গিয়ে বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকতুম না, কেউ কেউ বাপ-ঠাকুরদার পিণ্ডদান বন্ধ করল, কেউ গির্জার দিকে চেয়ে হাসল, মসজিদ দেখে কেউ কোঁতক বোধ করল। গান্ধীজির সব ব্যাপী অভ্যুত্থানের আগে রাজনীতিক চেতনার মধ্যে আমরা মনে মনে লেনিন এবং তাঁর বিশ্লববাদকে ব্রহ্মণ করেছিলাম।

মানুষের চরিত্রের মধ্যে একটি-ভিন্ন প্রকার ধর্ম বর্তমান—সৈদিকে নব-সভ্যতার উদ্‌গাতা মহামতি লেনিনের চোখ পড়েছিল কিনা আমার জানা নেই। সেটি হল ‘ভূতের’ ভয়। পাশ্চাত্য দেশে এই ‘ভূত’ যেমন প্রচুর, প্রাচ্যেও তেমনি। সোভিয়েট ইউনিয়নের সংস্কার হল প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের একটি মিশ্রিত রূপ—পাঁচ রকম ঔষধ মিলিয়ে এক শিশি ‘মিস্কটার’! বাইরে কেউ খৃষ্টধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। যাকে জিজ্ঞাসা করছি সেই বলেছে, “am not a believer”,—যেন বিশ্বাস করতে গেলে ছোট হয়ে যাবে, যেন অবিশ্বাস করলেই সুখে থাকবে! কিন্তু ভিতরে গিয়ে যখন ঢুকলাম, দেখি সামান্য একটা কালো রংয়ের বিড়াল দেখলেই আঁৎকে ওঠে গৃহস্থরা,—কেননা ওটা ‘অলক্ষণে!’ হরিৎবর্ণ একটি গাছের ডাল যারা ঘরে পড়ে রাখে বছরে আট মাস—শব্দ চোখের তৃপ্তির জন্য, তারা সবুজ রংয়ের কোনও সামগ্রী পেলে বলে, ও রঙটা আমাদের পক্ষে অশুভ! গ্রামের মধ্যে সাপ বেরোলে আঁৎকে ওঠে সবাই,—কি জানি, এ বোধ হয় কোনও অজানা বিপদের সংকেত! ভারতীয়রা ‘হাত’ দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে, এজন্য গৃহস্থ মেয়েরা হাত বাড়িয়ে ছোটোছোটো করে। আমি নিজে গণকর কিংবা ভবিষ্যৎবেত্তা নই, কিন্তু ডামাশা করে হাত দেখার ফলে আমার বন্ধু জাইৎজেন্ড এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক বিপ্লব বেধে ওঠে আর কি! যারা বিপ্লবের এত বড় পূজারী, তারা যখন খৃষ্টিয় তিথি ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে “খৃষ্টমাস ফাদারের” সেই পরমশ্রদ্ধা বৃক্ষের ছবিটি লক্ষ লক্ষ কাডে ছেপে বিলি করে, এবং সমগ্র রাশিয়ার প্রত্যেক গৃহস্থঘরে উৎসব-আমোদ-আহারের সাড়া পড়ে যায়, তখন বৃক্ষের পানি “নন-বিলিভার” হল ওদের বাহবাফোট, অন্তরে-অন্তরে ওরা সেই আদিকালেরই স্বাভাবিক মানুষ! বিপ্লবের দ্বারা ওরা সমাজ-ব্যবস্থা বদলেছে, কিন্তু সামাজিক মনকে কোথাও ওরা ‘অধার্মিক’ করে তোলায় চেষ্টা পায়নি। ‘বৈশ্বপতিবারের বারবেলা, হাঁচি-টিকটিং’ ধোবার মুখ দেখলে অশুভযাত্রা, ভোরবেলা উঠেই অমৃকের মুখ দেখা, অমৃক বস্তুটি আজ খেতে নেই, অমৃক লোকের মুখ দেখলে আজকের দিনটা ভাল যাবে না—এই ধরনের চিন্তাভাবনা নিয়ে ওদের দেশের বহু গৃহস্থ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ওদের দেশের অতি দরিদ্ররা হয়ে উঠেছে

অবস্থাপন্ন এবং অবস্থাপন্নরা হয়ে উঠেছে ধনাঢ্য। আমি যাদের সঙ্গে দিবারাত্র মেলামেশা করছি তারা যথেষ্ট ধনবান, এবং যথেষ্ট প্রকারে সুবিধাভোগী,—তাদের ব্যয়-বহুলতা দেখে অনেক সময় চমৎকৃত হয়েছি। যাদের সঙ্গে কোনমতেই ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাচ্চিনে তারা হল ওই বৃদ্ধা ব্যাডুদারিনি—আপাদমস্তক গরম পোষাক বেঁধে যে ‘ঠাকুমা’ রাজপথের দুদিকের নদ্রমায় বরফ কাটি দিচ্ছে। আমি হাতের কাছে পাচ্চিনে ধোবা, নাপিত, মূচি, জেলে, চাষী, সাধারণ জীর্ণ পোষাকপরা মজুর,—ওই যাদের দেখছি ট্রাকে চড়ে ছুটছে কারখানার দিকে, মস্ত ঘোড়ার গাড়ি-চালিয়ে ঘাস-পাতা নিয়ে যাচ্ছে। আর পাচ্চিনে ওই হাজার হাজার রাজমিস্ত্রি মজুর মেয়ে-পুরুষকে—যারা হাত-কনকনানো কঠিন তুহিন ঠান্ডায় খোলা জায়গায় বসে অমানুষিক পরিশ্রম করছে মুখ বুজে। কী কঠিন সব মেয়ে-মজুর! কে বলেছে ওদেরকে অবলার জাতি? পাথরের মতো নীরেট স্বাস্থ্য, কালোবর্ণ ও ধূলিসমাকর্ষণ পাজিমা পরা, লোহার-তালের মতো বৃক আর পাছা, সাংঘাতিক বলিষ্ঠ দুই নিরাভরণ হাত, ধুলোবালি-মাখা ‘পাথরের’ চোয়াল,—কী খাম ওরা? ওদের কি অসুখ নেই? ওরা কি ছেলে-পুলের মা হয় না?—ওদের কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে দাঁড়ালে নিজেকে মনে হয়, আমি দুর্বল, স্বল্পপোভাজী, শ্রমভীরু, সুখান্বেষী, মেরদুন্ডহীন, খর্বকায়—শব্দ বাঙ্গালী। আমি যেন চিরকাল ‘ভদ্রলোক’ হয়ে রইলাম, কিন্তু মানুষ হলুম না! বাঁচার মতো আমি বাঁচলাম না, মরার মতো মরতে পারলাম না,—শব্দ-যক্ষ্মায় শেষ হয়ে গেলুম! চারিদিকে সৌভাগ্য-রচনার অপ্রান্ত আড়ম্বর দেখে ঘরের মধ্যে যখন ফিরে একা বসে থাকি, তখন নিজের মধ্যেই যেন একটা অশিক্ষিত, গ্রাম্য, বিবেচনাপরায়ণ, অলংকারলোভী এবং ঈর্ষাতুর মেয়ের কান্না শুনতে পাই!

বছরে চার পাঁচ লক্ষ রুবল নিয়মিত উপার্জন করেন এমন কয়েকজন লেখক ও সাহিত্যিকমণীর কথা যখন ডাবছিলাম, তখন একজন অপেক্ষাকৃত স্বল্পপোভাত লেখকের বাড়িতে গিয়ে একদিন অপরাহ্নকালে উঠলাম। একে তাসকন্দে দেখেছিলাম এবং এর নাম ‘মালগেজভ’। ইনি অতিশয় শান্তপ্রকৃতি এবং মিষ্টভাষী ব্যক্তি। বয়স পঞ্চাশ হয়েছে কিনা সন্দেহ। দুচারখানি বই ইনি লিখেছেন

এবং 'প্টালিন পদ্রুস্কার' পেয়েছেন। মস্কা থেকে মাইল কুড়ি দূরে একটি 'লেখক-উপনিবেশ' আছে,—যেমন প্রায় প্রত্যেক শহরেই আছে,—সেই উপনিবেশটির নাম 'পেরেডেল'কিনো', এবং সেখানে মালংজেভের একটি বাগানবাড়ি অর্থাৎ 'দাচা' আছে। তিনি মস্কায়ে একটি ফ্ল্যাটে থাকেন, এবং তাঁর নিজের একখানি দামী বড় মোটরগাড়ি আছে। গাড়ির যারা মালিক তারা নিজেরাই গাড়ি চালান। আঁচে বসতে পারি ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য গাড়ির ড্রাইভার নিযুক্ত করা বেআইনী। এটি ব্রিট ইউনিয়নের দেশ। যদি ইউনিয়ন থেকে ডেকে এনে ড্রাইভার নিযুক্ত করা যায়, তবে সে-ব্যক্তি টাকা নেবে অনেক বেশি, এবং দিনের একটা বিশেষ সময়ে 'কাজ' করতে আসবে,—মোটরের মালিকের সঙ্গে সেটি হয়ত মিলবে না। অতএব গাড়ি কেনবার আগে গাড়ি ড্রাইভ করতে শেখা অনেকটা অত্যাশংক্য। আমরা বরাবর বেসব গাড়িতে চড়ে আসছি সেগুদিল অমুক ইউনিয়ন বা কমিটির গাড়ি। সেখানে ড্রাইভার বহুসংখ্যক এবং তাদের 'কাজ' ভাগ করা আছে। 'সোভিয়েট লেখক-সংঘের' মস্কা আশিসে বোধ করি ছরখানা দামী, বড় এবং নতুন গাড়ি সকল সময়ে মোতামেন রয়েছে। লেখকদের উপার্জনের একটি বিশেষ ভাগ লেখক-সংঘের তহবিলে দিতে হয়। উপার্জনের পরিমাণ বিবেচনা করলে সেটি গায়ে লাগে না। লেখক-সংঘের নিজস্ব শাসনতন্ত্র বর্তমান।

মালংজেভের ফ্ল্যাটটির পরিসর খুব কম। দুটি মাঝারি শোবার ঘর, সামান্য চলাফেরার জায়গা, খুব ছোট ছোট দুটি রান্না-ভাড়ার ঘর, একটি বাথরুম, এটা-ওটা রাখার জন্য একটু আধটু খোঁজ-খাঁজ,—কোনও মতে মাথা গোঁজা। প্রবেশপথের দরজাটি সিঁড়ির পাশে বন্ধ করে এলে একেবারে কৌটোর মধ্যে ঢোকা। আমরা দোতলায় এসেছি। ফ্ল্যাটের জানলা ও দরজাগুলি ভাল, আলো হাওয়া আছে। পাশের সরুগলির গায়ে-গায়ে পদ্রুনো মস্কা, সেখানে বহু বাড়িওলা—তাদের বহু ভাড়াটে। জারের আমলে তাদের ঠাকার ছিল অনেক বেশি, ১৫ টাকার ঘরের ভাড়া নিত ৪৫ টাকা। এখন তারা জন্ম, কমিটি ভাড়ার রেট নির্দেশ করে দেয়। সেকালের পেন্সনভোগীদের রাগ সেজন্য কম নয়। গোয়ালঘরের মতন এদোপড়া পদ্রুনো ঘর ভাড়া দিয়ে আয়েকার মতন আর মোটা মোটা টাকা

পিঠবার উপায় নেই। সেইজন্য আয়েকার-কালের বড়ি দিদিমা আর বড়োকর্তারা এখানে ওখানে বলাবালি করে, দেশটাকে উজ্জ্বল দিলে গা? মানবী মান নেই? পারের জুতো সব মাথায় উঠল? ঘর ভাড়া দিয়ে দুটো পরসা পেতুম, হিংসের ওদের বুক ফেটে গেল? জারের আমলে দু'খানা ঘর ভাড়া দিলে বড়োবড়ির বেশ চলে যেত, আর এখন? মরণ দশা! পাঁচশ' রুবলে থে নেই!

নাতিরা ক্লেপায়,—বটে, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নটা চোখে পড়ছে না?

থাম, মস্কা করিসনে! নিজের জ্বালায় মরি! দাঁতের ব্যামোয় ভুগছি আজ দু'বছর! 'আনতেকায়' ওষুধ কিনতে গেলুম, দাম শুনলে চোখ কপালে উঠল! বললে, বড়ো মানুষের আবার দাঁত কি হবে? কী দেশের ছিঁরি! দুটো দাঁত বাঁধাতে গেলে ঘটি-বাটি বেচতে হয়!

বটে!—নাতিরা খোঁটা দেয়,—ওসব জারের আমলের বিষদাত, বুকলে ঠাকুমা? দাঁতের ব্যথা! নতুন ওভারকোট পেলে কোথায়? কাঁধামুড়ি দিয়ে গোয়াল ঘরে একদিন পড়ে থাকতে না? কেরোসিন তেল সোদিন জুটত? বোতাম টিপে গরম জল পেতে? গ্যাসে রান্না করতে? মনের মতন কাজ পেতে? মেয়েমানুষ ইস্কুলে যেত, না লেখাপড়া শিখে কাজ পেতে? বাড়ি-বাড়ি ভাঙুর আসত কখনো? পাড়ার গুন্ডা ছেলেরা মেয়েদের মান রেখে কথা কহিত? বলো, জবাব দাও?

থাম, ছোট মুখে বড় কথা ক'সনে! ভেড়ার পাল তৈরি হচ্ছে! যা শেখাচ্ছে তাই শিখছে!—বড়ো বীরয়ে এসে চোখ রাগায়,—ভারি তর্ক করতে শিখেছি। কথায় কথায় কালোকে শাদা বলতে হচ্ছে, শাদাকে বলতে হচ্ছে কালো! তুই কি বুঝিস? পাখীপড়া বুলি মুখস্থ করে এসেছি! দেশের ধর্ম গেল, মান-হিজত গেল, গেরস্থদের পদ্রুনো আমলের ঘর-কন্না ভেঙে গেল! কুমারী মেয়ের কলঙ্কে কান পাতবার জো নেই, ঘরের বউ পাঁচটা পদ্রুবের হাত-ফেরতাই হয়ে ঘুরছে, গিজের গিরে দুটো ভগবানের নাম করলে নিন্দে বটে,—তুই এসেছি! ওকালতি করতে! যা-বেরো—

নাতি চোখ টিপে হেসে চলে যায়। বড়োরা না মরলে বদনাম ঘুচবে না!

সোভিয়েট ইউনিয়নে সাধারণ বন্ধ বা বন্ধার কোনও প্রকাশ্য সমাদর আমার চোখে পড়েনি! বহু বন্ধ ব্যক্তির অঙ্গ এবং 'প্রাণহীন' চেহারা অতি ধীরগতিতে ফুটপাথ ধরে

নিজের মনে চলেছে অসীম বৈরাগ্য নিয়ে,—এটি বখন তখন দেখতে পেতুম। অনেক সময় লক্ষ্য করছি তারা মদ খেয়ে চুরচুর হয়ে রয়েছে। মদ খা চাওয়াচায়ি ক'রে দেখছি, তারা যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু ভাষার অভাবে পারে না! তাদের অনেক সময়কার বিষম ও ক্রান্ত মূর্তি দেখে আমার মনে এসেছে অনেক প্রকারের দুর্ভাবনা। কিন্তু সেগুলি আমার নিজের অনুমান মনে ক'রে নিজেকেই সংযত করছি! আমি ত' এই সুন্দর দেশে সামাজিক গোয়েন্দা হয়ে আসিনি! আমার মনে ত' বিন্দুমাত্র বৈরাগ্য নেই! আমার মন ত 'মক্ষিকা রণমিচ্ছন্তি' নয়! আমি যে আমার দেশের চিরকালীন সংস্কৃতির ধারা বহন করে এদেশে এসেছি! বলা বাহুল্য, আমার নোংরা কৌতুহলের জন্য অনেকবার নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি!

মালংজেভ অতি সজ্জন এবং ভদ্র। বারম্বার দেখছি, সোভিয়েট ইউনিয়নের লোক হ্যাণ্ডসেক করবার আগেই আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। ওরা বখন মস্কায়ে বলে ইউরোপ, আমি তখন দেখি, এর পাড়ার-পাড়ায় 'ঠনঠনে-কালিতলা!' এক একজন মেয়ে বা প্রবীণ পদ্রুষ বাজারের সেই জালি-থলেটি বুলিয়ে ফিরছে। বাঁ হাতে পাঁচ বছরের ছেলোটোর নড়া ধরেছে,—সেই অবিকল মধ্যবিস্তার ঘর! বেগুন, পটোল, ঝিঙে, চিচিঙা বা কুমড়া ওদেশে ফলে না তাই! বেলে-গুলে-পাসে ট্যাংরা মাছ ওদের দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে জন্মায় না! ওরা এক প্রকার কন্যাপাতা চিবোয় স্যালাডের সঙ্গে বড় দুঃখে, আমাদের দেশের মতো অগ্রহায়ণের নধর পালং, চৈত্রের নটে শাক, কাঁচা আম, ক্রান্তিক মাসের চাঁড়শ, বারুইপরের লিচু, বেনারসী ল্যাংড়া, চন্দননগরের মতমান, দক্ষিণের ন্যাওরা-পতি ডাব, জয়নগরের মোয়া—এসব ওদের কম্পনাতীত! সর্জিত কোথায় ওদেশে? খাদ্যের প্রাচুর্য দেখছি, কিন্তু ভোজ্যের বৈচিত্র্য কোথা? হাঁস, না হয় মর্গি; গরু, না হয় শূর্য্যোর,—কিন্তু মাংস ছাড়া আর কিছু নয় ত? তারপর ওই আদি ও অক্লিম আল, খাও যত পার! শূরু চিবোও ভিনিগরে-পচা শশা, নয়ত আপেল-আঙুর-কাঁচা পিয়াজ তার সেই রাগা রাগা জাম। কাকডার শাঁস খাও, আর নয়ত টমাটো! তার সঙ্গে অধমতারগ পেরাজ,—আর কিছু চেয়ো না।

এ নিন্দে নয়, গালি নয়,—এটি বৈচিত্র্যহীনতাসঙ্গাত বিরক্তি। একই ভোজ্য

জিহ্বাকে আড়ষ্ট করে, প্রতিদিন প্রতিবেলা একই খাদ্যের দিকে চেয়ে দেখলে জিহ্বায় লালারস আসে না! যত্ন তাকে গ্রহণ করতে নারাজ। রুচি পাঁড়িত হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে অগ্নিমন্দ্য আসে। এ যেন দেশব্যাপী এক মস্ত ছাঁচ। একই খাদ্য, একই পানীয়, একই নীতি, একই দশা! কোথাও দুই নেই, শ্বিধা নেই, ভিন্ন অভিমত নেই, বিরোধ নেই, আক্রোশ নেই, অনৈক্য নেই। ওদের দেশে পাঁচটি সামগ্রী শতকরা একশ জনেরই চাই। মদ, মাংস, আশ্রয়, জুতো এবং ওভারকোট। আমাদের দেশে শতকরা পাঁচজন মদ এবং শতকরা পনেরো জন মাংস খায় কিনা সন্দেহ। শ্রীমতপ্রধান ভারতে শীতকালেও বহু লোক গাছতলায় শুতে ভালবাসে। ওভারকোট চড়ায় লাখে একজন। জুতো পায়ে দিতে চায় না কোটি কোটি লোক। ওদের দেশে দশজনের কাজ একজনে করে মৌসিনের সাহায্যে—কারণ ওদের মানুষ কম, দেশটা বড়। আমাদের দেশে মৌসিন ভেমন নেই, তাই দুজনের কাজ দশজনে করে। কেননা লোক আমাদের বেশি, সেই তুলনায় দেশ ছোট। মৌসিনের সংখ্যা বেশি হলে বেকার সমস্যা বাড়বে, এই আমাদের ভয়।

মালংজেভের ঘরটি সুসজ্জিত। ঘরে তাঁর বৃদ্ধা জননী, বছর আটেকের একটি ছেলে এবং স্ত্রী। ঠিকে কি আছে, কিন্তু সে ইউনিয়নের মেয়ে। বিশেষ সময় আসে, কাজ সেরে আবার বিশেষ সময়টিতে চলে যায়। মা রান্না করেন, আর নতুনো হাতখালি থাকলে স্ত্রী! আর রান্নাই বা কি? ভিন্ন যদি বা থাকে ডালনা নেই! মাছ যদি কাঁচ থাকে, কালিয়া নেই! তাঁর মাংস বাজারেই কেনা যায়,—সেটি শুকনো, নুন-দোওয়া সিদ্ধ! স্নাট বাজারের। রান্নার মধ্যে একটা ঝোল! তাতে মাংসের কুচি, আলুর কুচি, গোটা আশ্বেক চাউলের দানা, দুটো শুনো শাকের পাতা,—তাতে নুন, হলুদ, জল আর খানিকটা 'বাটার অয়েল' অর্থাৎ ভেলের বর্ণ ঘি ছেড়ে দাও,—সেইটিই ঝোল। রান্নার মধ্যে ওই একটি। লঙ্কার বালাই নেই, জিরে-ধনে-পাঁচ-কোড়ন, গরম মসলা,—এদের কেউ চোখেও দেখেনি, নামও শোনেনি! মনে পড়ে, তাসকদের হোটেলের সিঁড়ির জানলাগাুলি নানা বর্ণের ফুলগাছ দিয়ে সাজানো হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল একটি পূর্ণিপাক চারাগাছ বহু শফে রাখা। সেইটি দেখে সন্দেহক্রমে আমি এক সুশব্দকে প্রশ্ন করি। তিনি ইংরেজিতেই

জবাব দেন, "Haven't you seen before? It is called chilli-plant! Beautiful" অর্থাৎ লংকাগাছ! মস্কোর কোনও বাদুঘরে পান-সুপারি-লবঙ্গ ইত্যাদি রাখলে অন্তত দশ হাজার লোকের ভিড় জমে যেত! একটি মহিলা একদিন আমার কাছে 'আম' ফলটির ইংরেজি জানতে চেয়েছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় ওটার প্রকৃত উচ্চারণ জানতে চান।—ওটা 'ম্যান-গো' না 'ম্যাং-গো'!

আমার দ্বিতীয় দফার মস্কা যাত্রাকালে আমি পাঁচটি আম, কয়েকটি পান এবং চুন-খয়ের-সুপারি - মসলা-লবঙ্গ-এলাচ নিয়ে গিয়েছিলুম। আমার জন্য আমার ঘরটিতে একটি আনন্দের আসর বসেছিল, এবং আমি নিজের হাতে তাঁদেরকে পান সেজে খাওয়াবার ফলে বেচারীদের যে-অবস্থা ঘটল, সেটাকে রক্তারক্তি কান্ড বলা চলে। কোট-প্যান্ট-শার্ট-গাউন-ঘাঘরা - রুমাল ইত্যাদির অবস্থা করুণ হয়ে উঠল। কারো মাথা-গা ঘোরা, কারো বম্বনেছা, কেউ বা ভাবল ভারতীয় সাংঘাতিক বিষ এনে খাইয়ে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছি। পান খেতে গেলে যে ওষ্ঠাধর, তালু ও জিহ্বার একটি বিশেষ সংযম-কৌশলের দরকার হয়, সেটি ওদের জানা ছিল না। অবশেষে বাথরুমে গিয়ে মাথার ও মূখে ঠান্ডা জলের ছাট এবং ক্লকচো! শেষ পর্যন্ত হেসে গড়াগড়ি। আমার পান খাওয়া দেখে ওরা বোধহয় আমাকে ভারতীয় কোনও 'যোগী' ঠাউরেছিলেন! রাশিয়ায় ভারতীয় যোগী এবং যৌগিক ব্যায়াম আজকাল খুব প্রিয়। ওদের চর্বি-প্রধান স্বাস্থ্যের পক্ষে এটির প্রয়োজন আছে।

মালংজেভ আপন মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষা জানেন না। সুতরাং শ্রীমতী লিডিয়া সংগেই ছিলেন। আর ছিলেন সর্দার সন্তাসিং সেখোন! এটি বৈঠকখানা, কিন্তু রাত্রের দিকে এটি সম্ভবত শয়নকক্ষ হয়ে ওঠে! ঘরে আস-বাবপত্রের সুসজ্জার মধ্যে লেখককে বেশ চিনতে পারা যায়। আমি যখনই কোনও গৃহস্থঘরে ঢুকেছি, দুই একটি বইটাসা কাঁচের আলমারি ঠিকই চোখে পড়েছে। যে-মেয়ে লিফটের বোতাম টিপে ওপর-নীচে করে, তাকেও দেখেছি ওইটুকু অরকাকশের মধ্যে বই পড়ে নিচ্ছে। 'ফ্লোর-মেডার' রাত জেগে বই পড়ে। রে-বাস্তি হোটেলের বাথরুমে সাবান-চিরুনী-

তোয়ালে হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে কিছু পরস্যা নেয়, সেও তার অরকাকশ মতো বই পড়ে। বই নিয়ে লোকে গেলেন ওঠে এবং মেট্রো-স্টেশনে নান্নে। লেনিন লাইব্রেরীর হলগাুলিতে প্রতিদিন সাত হাজার মেয়ে পদুর পড়াশুনো করে।

মালংজেভ আমাদেরকে বিশেষভাবে যখন আপ্যায়িত করছিলেন বাইরে তখন ভুলোর গুড়ির মতো ভুবারপাত হাছিল। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ। আকাশ পাংশুবর্ণে ঘোরালো। মালংজেভ আমাদের কয়েকজন ভারতীয় লেখককে কি প্রকার দৃষ্টিতে দেখেছেন—তাই নিয়ে তিনি সম্প্রতি একখানি গ্রন্থরচনায় বাস্ত। আমার সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধটি লিখেছেন সেটি তিনি আমাকে শোনাতে চান, কিন্তু আমি প্রস্তুত নই। বইখানি নাকি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

মালংজেভ আমাকে অশেষরীতি প্রদান করেন। কিন্তু আমার একেকটি জবাব শুনে শ্রীমতী লিডিয়া হয় রেগে আগুন হন, আর নয়ত হেসে ফেটে পড়েন। অবশেষে এইটি দাঁড়াল, আমি নিজের সম্বন্ধে যা বলি তা আগাগোড়া ভুল, যা ভাবি তা সম্পূর্ণ উদ্ভট, এবং যা জানি তার আদ্যোপান্ত অলীক! মিঃ মালংজেভ আমার সম্বন্ধে প্রথম থেকেই সন্দেহাধ। ফলে, এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হলেন, আমি নাকি "মোস্ট ল্যভেরল" এবং "ইন্টরেষ্টিং!"

মালংজেভের বাড়িতে গিয়ে এই প্রকার বর্কিশ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু রাতে খাবার টেবলে বসে লিডিয়ার কাছে আমার মস্ত লাঞ্ছনা ঘটল।

বলা বাহুল্য, যে আধুনিক রুশীয় রাজপ্রাসাদটিতে সম্প্রতি পোর্টলা-পোর্টলা নিয়ে একটি আশ্রয় বানিয়ে বসেছি, সেটি 'হোটেল উক্লাইনা'। সেদিন ভোরবেলা অর্থাৎ সাড়ে সাতটার সময় উঠে ডবল কাঁচের জানলার বাইরে হঠাৎ দূরের দিকে চেয়ে দেখলুম, মস্কা মহানগরী নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে! বারোয়ারীতলার খুঁটি নড়ে গিয়ে খেমটা নাচের আসরের - উপর সহসা যেমন পাল চাপা পড়ে, এও ঠিক তেমনি। মস্কোর যতদূর দেখা যায়, কঠিন শাদা ভুবার-আবরণে আগাগোড়া সব চাপা পড়েছে। তিন চার দিন আগে থেকে এটি অনমনা করছিলুম। গত-কাল আমাদের বহু মালংজেভের গাড়িটির তলায় কলকজার মধ্যে বরফ

টুকে গাড়ি অচল হয়েছিল, আজ সকালে আটতলার উপরের জানলা দিয়ে নীচের দিকে দেখি, চার পাঁচখানা মোটরগাড়ি কাল রাত থেকে বরফের তলায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে। বরফ না কাটলে গাড়ি বেরোবে না। 'হিম্মন দেশে যদাচারঃ'—বরফ কাটবার জন্য সরকারি লোকও মোতায়েন আছে। ঝাপটা হাওয়ায় মস্কোর পথে পথে তুলোর মতো বরফ উড়তে থাকে। পথ শিখল হয়।

এ বছরে আজ প্রথম মস্কা বরফ চাপা পড়ল,—এই খবরটি লোফান্‌স্‌কি চলছে টেলিফোনে এঘরে ওঘরে। এটি একটি খবর,—‘প্রাবদায়’ কাল বেরোবে। আমাদের দেশে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যেমন এক পশলা বৃষ্টির সংবাদ কাগজে ছাপা হয়!

ননী ভৌমিক এবং বিনয় রায় এরা দুজন আমাদের একটি ওভারকোট এবং একটি ফুলহাতা মোটা সোয়েটার ধার দিয়েছেন। ও দুটি সঙ্গে নিয়ে উত্তর মেরু বলয়ের মধ্যেও যাওয়া চলে। কিন্তু আজ আমরা লেনিনগ্রাড রওনা হচ্ছি। মস্কা থেকে লেনিনগ্রাড সোজা উত্তরে আন্দাজ ডিনশ মাইল রেলপথ। মস্কা স্টেশন থেকে এই গাড়িটি ছাড়ে রাত বারোটায়। লেনিনগ্রাডে পৌঁছান সকাল সাড়ে আটটার কিছু পরে।

ভারতীয় দলের অধিকাংশই ভারতে ফিরে গেছেন। মহিলাদের মধ্যে আর কেউ নেই। আমাদের মধ্যে যিনি সর্ব-শ্রেষ্ঠা বয়ঃকনিষ্ঠ, উড়িষ্যার সেই তরুণ কন্যাসী এম-এল-এ সত্যানন্দ চম্পত-রায়,—তাকে ছাড়তে আমি যেন একটু দুঃখই শেয়েছিলুম। ছোকরা অতি মধুর প্রকৃতি। পশুরাজ আচার্য আগ্রের সেই প্রবল হৃৎকার আর শুনিয়ে, এ যেন জ্বলন্তদায়ক শান্তি। শ্রীমতী প্রদ্যোৎ কাউরের নিন্ত্য নব প্রসাধন সজ্জা আর চোখে পড়ছে না,—আমরা যেন কোঁড়কের লক্ষ্য হারিয়েছি! প্রদ্যোৎ কাউরের বিদায় নেবার পর আমরা প্রায়ই সদাঁর অধ্যাপক শেখোনকে সান্ধনা দিচ্ছিলুম। ভদ্রলোক যেন কিছু বিমর্ষ। আমার নিজের মেয়াদ এখনও ফুরোয়নি কেন আমি জানিনে।

আমরা যথারীতি শ্রীমতী নাটাশা ও লিডিয়ার তত্ত্বাবধানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি। ওরা দুজন ছাড়া সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে আমাদের আপন বলতে আর কেউ নেই। কা'র কা'র ভাগে

কোন্ কোন্ নারী পড়েছে সেটি স্পষ্ট। শ্রীমতী সাজ্জাদ জহীরের দলে গেছেন মেরিয়ম তথ্য মীরা, ফয়েজ আহমেদের সঙ্গে আছেন লোলা, মায়ী যেন কা'র ভাগে। শ্রীমতী অকসানা—যিনি দোভামিশী মহলে বিশেষ বিদূষী বলে পরিচিত, তিনি পড়েছেন জনচারেক অস্ট্রেলিয়ানের ভাগে। আমার নিজের অনস্থা যেন অনেকটা দলে ভিড়ে থাকে। আমার কপাল মন্দ, আশেপাশে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

রাত্রির আহারাদির পর সেই তুষার-ঝাপটের ভিতর দিয়ে দুখানি গাড়িতে করে যখন স্টেশনে এলুম, তখন এগারোটা বেজে গেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই প্রথম স্টেশনের চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, মালবহনের জন্য 'কুলি' নেই! লোহার টেলিগাড়ি প্ল্যাটফরমে আসে বটে মধ্যে-মাঝে, নৈলে নিজের সমগ্রী নিজেই বহন করতে হয়। এটি প্রায় সকল সময়েই পীড়াদায়ক এবং কান্ডজানহীনতার পরিচয়। শ্রীমতী নাটাশা ও লিডিয়াকে বাদ দিলে আমরা মোট ছয়জন,—চৌহান, শেখোন, যশপাল, বন্দী, তাবান ও এই অধম। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে দুজন পাগড়িপরা শিখ, একজন উত্তরপ্রদেশী, একজন পাঠান কবি, একজন পাজাবী রাজপুত এবং একজন 'বংগালি'। আমরা প্ল্যাটফরম পেরিয়ে এসে একখানা 'বোগি' দখল করলুম। এখানি লেনিনগ্রাড-মস্কা ট্রেন, অন্য কোথাও যায় না। গাড়িখানার নাম 'রেড অ্যারো এক্সপ্রেস'। এখানি সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গাড়ি। সমগ্র স্টেশনের চেহারা হাবড়া স্টেশন অপেক্ষা উন্নত নয়, বরং আকারে কিছু ছোট। গাড়ি ছাড়তে বিলম্ব নেই। বোগির মধ্যে আমাদের জন্য মোট চারটি ডবল-সীটের ঘর নির্দিষ্ট রয়েছে। তার মধ্যে একটি ঘরে থাকবেন দুটি মহিলা। রাতে এবার কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে।

এই বৃহৎ বোগিটি আমাদের। দুই প্রান্তে দুটি বাথরুম, এক কোনে একটি ছোট হোটেল, অন্য কোনে একটি খিৎমদগারের ছোট শোবার ঘর। হোটেলে একটি প্রবীণ স্ত্রীলোক মোতায়েন রয়েছে। সেখানে মদ, মাংস, কাটলেট, কেক-বিস্কুট, কফি ও চা, আপেল আঙুর, দুটি চীজ-মাখন—মোটামুটি সবই পাওয়া যায়। লক্ষ্য করে দেখলুম, রাত্রির আহারাদির পর একমাত্র 'বংগালি'

ছাড়া প্রায় আর সকলেরই-শেটে ক্ষুধা ও কষ্টে তুষা রয়েছে। অন্তঃপ্রাণ গাড়ি ছাড়তে না ছাড়তেই ক্ষুধাতৃষ্ণায় রৈ রৈ করে উঠল পাঁচজনে, এবং শ্রীমতী নাটাশা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন! একটির পর একটি খাদ্য ও পানীয়ের অর্ডার পড়তে লাগল সেই হোটেলে। কেন জানি, আমি একটু আড়ম্বলি বোধ করলুম। বোধ হয় আমার মধ্যে কি যেন একটা প্রতিবাদ কদিন থেকে ধুমায়িত হচ্ছিল। নিছক আনন্দ এবং হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে প্রকৃতিই কোনও তফাৎ আছে কিনা এটি আমি তোলাপাড়া করছিলাম। বিদেশ-বিশ্বের এসে প্রথম থেকেই নানা বিষয়ে আমি সতর্ক ছিলাম। সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাধীনতা থাকলেই যে সেগুলিকে ব্যবহার করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। পৃথিবীর সব দেশেই লোভ এবং অসংযমের ফাঁদ পাতা আছে। ভারতও আছে এবং বলা বাহুল্য, দিল্লিও, আমেরিকা বা সোভিয়েট ইউনিয়নেও আছে। কিন্তু এটি আজ পর্যন্ত আমার কানে ওঠেনি, কোনও সোভিয়েট নাগরিক ভারতে এসে কোনও অসংযত বন্য জীবনের ফাঁদে পা দিয়েছে। বরং এটি লক্ষ্য করেছি তারা আমাদের দেশের বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে মোলামোশা করতে চায় না, অকারণে পথেঘাটে ঘোরেনা, আমাদের দেশের পারিবারিক জীবনকে খোঁজখবর রাখে না,—কেমন যেন একটা নিরুৎসুক গাম্ভীর্য তারা বহন করে। একালের ইংরেজ আমেরিকান জার্মান ফরাসী ইত্যাদিরা ঢালাও মিশে যায় আমাদের বন্ধুসমাজে, তারা পেটে কথা রেখে কেউ বাইরে সৌজন্য প্রকাশ করে না, এবং শুধু নিজেদের মধ্যেই ঘোরা-ফেরা করে দিন কাটাতে চায় না। ভারতে এসে সোভিয়েট নাগরিকরা যেন আশ্রিত-আপন জাত-গণ-গোত্র-সম্প্রদায়-অভিমত—এগুলিকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে চলে। ওরা এখনও বুদ্ধিতে শেখেন, ভারতের উদার আতিথ্যের চেহারা কি প্রকার! ভারতের দিকটিছাইল নীলকান্ত আকাশে রংগীন বর্ণসমারোহ খেলা করেছে অনাদ্যন্ত কাল থেকে। সম্রাট আলেকজান্দার থেকে আরম্ভ করে এই সেদিনের ফরাসী ইংরেজ,—কোনও রং-বাদ বার্মান। কিন্তু একে একে সব রং ধুয়ে-মুছে গেছে সেই উদার নীলিমায়! ভারত কোনদিন কোনও মতবাদে ভয় পায়নি। কত জাত এসে, কত স্বাধীন এসে, কত জনতা এল-গেল! 'পিতামহ' কস

রয়েছেন শান্ত স্নেহের হাস্য মুখ নিয়ে। শব্দে তাঁর হাতে রয়েছে একটি কণ্ঠ-পাথর। এই পাথরে ঘষাঘষি চলছে পৃথিবীর সকল মতবাদ, সকল রাষ্ট্রধর্ম, সকল সমাজনীতি। এই কণ্ঠপাথরে ধরা পড়বে, সেগুলি আসল, কি ঝুটো; সোনা কিংবা সোনালী; চোখধাঁধানো, বা মনমাতানো; শব্দ প্রচার, না কিছু সদাচার। কমিউনিজমের সেই 'নবসভ্যতা' আজ ভারতের সামনে এসে কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার চোহারা নিয়ে কাঁপছে। এর মধ্যে কতখানি হিংসা, কতটুকু নিরীশ্বরবাদ, কতখানি মানবতা, কতখানি সত্যের বীজ, কি প্রকার কল্যাণ-বোধ, তার প্রথর জড়বাদের তলার সুদূর ভবিষ্যৎ মনুষ্যবাদের কোনও স্বপ্ন নিহিত আছে কিনা, পরবর্তী শতাব্দি-মুন্ডলির জন্য তার ভাড়া করে কোনও উজ্জীবনী মন্ত্র খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা, নতুন সমাজ বিজ্ঞান বা বস্তু ও মারণ বিজ্ঞানের দ্বারা এই 'জাতিগোত্র-হীন' জাতিরা আরেকটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চায় কিনা,—ভারত তার আপন কণ্ঠপাথরে এগুলি ঘষতে বসেছে! চেয়ে দেখছি ভারতের স্বাধীনতা-লাভের দশ বছরের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে স্টালিন পন্থা নিশ্চয় হয়ে গেল, যুগোস্লাভিয়া-হাঙ্গেরী-পোল্যান্ড প্রভৃতি 'জাতীয়তাবাদী' হয়ে উঠল, এবং চীনের ভিতর থেকে প্রাচীন চাংগিস খাঁর তরবারির ফলক দেখা দিল! এই সৌদিন মস্কোর দাঁড়িয়ে গ্রীষ্মে চো-এন-লাই বলে গেলেন, "আশা করি চীনের তরবারি কোষমুক্ত হবার আগেই ভারতের সুবৃদ্ধির উদয় হবে!"

মস্কো চুপ। 'প্রাধদ্য'—যার বংগাথ হুজ 'সত্য'—সেও চুপ। শব্দে হিমালয়ের তপোবন আশ্রমে বসে পরম তপস্বী পিতামহ তাঁর ধ্যাননির্মীলিত নেত্র তুলে পরিব্রাজক হয়েই সানের সর্বশেষ উত্তরাধিকারীর দিকে চেয়ে স্নেহের হাসি হাসলেন!

জ্যোৎস্নালোকের ভিতর দিয়ে আমাদের ট্রেন চলেছে লৌনিনগ্রাডের দিকে। মাঝে মাঝে দূর প্রান্ততরের থেকে এক-একবার আলো দেখাছিলুম। দিবাভাগের বন্ধা নয়, এবং পররাত্রে থেকে অভাগত ব্যক্তিদেরকে দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রকৃত চোহারাটা দেখাবার ইচ্ছা আছে

কিনা, তাও জানা নেই। সুতরাং অস্পষ্ট ও ধূসর প্রান্ততরের দিকে চেয়ে নানা কথা অনুমান করছিলাম। কিন্তু সামনের দিকটার আগাছার ঝোপঝাড় পেরিয়ে দূরের দিকে কোনও জনবসতির চিহ্ন কোথায় পড়ছিল না। গাড়িখানা চলেছে আমাদের দেশের 'ফার্স্ট' প্যাসেঞ্জারের মতো। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, দৈবদর্শিপাকের ভয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনও যানবাহনের অতিশয় দ্রুতগতি নিষিদ্ধ। সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম-প্রান্ত থেকে দূর পূর্ব-প্রান্তে ট্রেনে যেতে গেলে নাকি পনেরো দিনেরও বেশি লাগে। রুশীয় প্রকৃতির মধ্যেও স্পীড কম! অত্যন্ত জরুরী চিঠির জবাব দিতে তাঁরা মাস দুই টাইম নেন কেননা ওটা প্রকৃত জরুরী কিনা সেটি দলবল ডেকে গোপনীয় শলা-পরামর্শ করে ভাবতে বসলে কিছুকাল সময় লাগে বৈকি। অতঃপর জবাব যখন পাওয়া গেল,—তখন দেখা গেল, সর্বাপেক্ষা জরুরী প্রশ্নের জবাবটি সর্বাপেক্ষা অস্পষ্ট! সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে পৃথিবীর সকল জাতিকে ভালবাসেন, অন্তরে অন্তরে গ্রন্থা করেন বহু জাতিকে, কিন্তু তাদেরকে বিশ্বাস করতে কিছু সময় নেন। সেইজন্য আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি, ভারতীয় কমিউনিষ্ট কেউ ওদের দেশে গেলে ওরা বাইরের বৈঠক-থানায় হয়ত নানাবিধ চাকচিক্যের মধ্যে তাঁকে বসতে দেন, পার্টি আপিসে ঘুরিয়ে দেন, কিন্তু অন্তরমহলে প্রবেশ করতে দেন না! ভারতের কোনও কমিউনিষ্ট ওদের দেশে গিয়ে অগণ্য-নগণ্য জীবনের মধ্যে ঢুকে তাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা-দুর্গতি-সংগ্রাম, কপালের ঘাম, তাদের পারিবারিক জীবনের সমস্যা, তাদের জটিল এবং রক্তক্ষয়ী কর্মসম্পাদন, তাদের ব্যথিত বেদনহস্ত ও সমস্যাসঙ্কুল প্রতিটি দিন,—এগুলি লক্ষ্য করে আসেন না। ভারতীয় কমিউনিষ্টরা ওখানে গিয়ে এটি আজও দেখে আসেননি, ওদের দেশের শত-সহস্র গ্রামাঞ্চলে আজও স্বচ্ছলভাবে পরিধেয় বস্ত্র জোটেনি, আজও হাজার হাজার পরিবারের লোকের স্নান করবার সুবিধা নেই, মেয়েদেরকে রান্না ও খাবার জল আনতে হয় বহুদূর থেকে এবং শূকনো রুটি ঝোলের মধ্যে ভিজিয়ে নরম করে চিবোতে হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এখনও সংখ্যাভীতি

গ্রাম-রয়েছে যাদের দুর্গম, দুর্গতি ও সঙ্করূপ মূর্তির দিকে তাকালে যে কোনও ভারতবাসীর হৃদয় আত্মীয়তা-বোধের মমতা ও সহানুভূতিতে অভিভূত হবে। এ সব খবর আমরা জানিনে, কিন্তু ওরা নিজেরাই জানে। যে-কোনও 'কলেকটিভ ফার্ম' গিয়ে সব দেখে-শুনে ওদের মূখের উপরে যদি স্তাবকতা করে, ওরা নিজেরাই সলজ্ঞ নতমুখে বলবে, "আমরা যেন আপনাদের সুখ্যাতির যোগ্য হতে পারি। আমাদের কাজ এখনও অনেক বাকি। দেশের লোকের সুখ-সুবিধার এখনও অনেক অভাব।"

ট্রেনের মধ্যে আমাদের ঘরগুলি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত। শুনলাম এ গাড়িখানা গত যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণ-স্বরূপ জার্মানীর কাছ থেকে পাওয়া! এখানকার নাম 'রেড স্যারো', কিন্তু বর্ণ হল নীল! যাই হোক, চা ও জলখাবার প্রথম দিনে গেছে এই গাড়িরই একজন সেবিকা। বাইরের বারান্দাটা সর, কিন্তু সেখানে বসে জানলা দিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখা বা প্রলাপজড়িত মৃদু গলায় কানে কানে কথা বলার জন্য পাশাপাশি দুটি করে চেয়ার। ছোট ঘরটি একটি প্রথম শ্রেণীর শয়নকক্ষ। মেঝেতে কার্পেট নৈলে শীতের দেশে চলবে কেন? দুখানি চেয়ার চাই বৈকি। জানলাটিতে রেশমের কুচি দেওয়া পর্দা, সুন্দর দুটি আরনা, টেবল-ফ্যান, গ্যাস-স্ট্র, রেডিও যন্ত্র, কোট-প্যাণ্ট ইত্যাদি বোলাবার হ্যাঙ্গার, টেবলের ওপর কভার, জুতো-মোজা ছাড়ার সুব্যবস্থা, এই ইত্যাদি রাখার শেগুপ। শোবার ব্যবস্থা মনোজ্ঞ। গদি, তোষক, নধর দুটি বালিশ, ধবধবে চাদর, কোমল কব্জল,—কি নেই? সীটের পাশে বোতামটি টেপো-মেয়ে-গ্যাটেনডাণ্ট তখনই ছুটে আসবে। একটি রাতির আরাম বিলাসের পক্ষে যথেষ্ট।

শ্রীমতী নাট্যা ও লিডিয়ার ঘরটিতে উকরোলের উল্লাসধ্বনিতে আমার চমক ভাঙলো। তাঁদের সেই ছোট ঘরটিতে বসেছেন সাতজন এবং আমাকে দেখামাত্রই তিন চারজন সোচ্ছাদ্য অভিনন্দনের দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি বসালেন। বিশুদ্ধচারিত্র বেদী এবং চোহানকে আমি বিশেষ পছন্দ করতুম। যশপাল সর্বপ্রকার আমোদে যোগ দেন, কিন্তু সংযত। তিনি পুরুষের। বাকি আর সবাই কাঁচা-পাকা। নাট্যাশার বিলাস হল

শ্রীমতী লিডিয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন। অন্য সবাই লিডিয়াকে পরিহাস করছেন। লিডিয়া জাত-কমিউনিষ্ট, প্রবল হাস্য এবং বাক-পটুতার দ্বারা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। তিনি ভারতীয়গণের নিকট প্রিয়। মনে হচ্ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁর পক্ষে শত্রু হয়নি। আমরা সবাই হাসিছিলাম।

শ্রীমতী নাট্যশার, গান্ধীজী এবং সত্যজিতের কিছু অভাব আমি লক্ষ্য করছিলাম। আমি ভারতীয়, এসব দৃশ্য দেখার অভ্যাস আমার কম। তিনি সন্তানের জননী, গৃহস্থ নারী, শিক্ষিতা এবং স্বামীসহবাসিনী। তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ ব্যবহার, মধুর প্রকৃতি এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আমার বিশেষ প্রিয় ছিল। শ্রীমতী লিডিয়া হলেন প্রথমা, মধুর-হাসিনী, কিন্তু কঠিনভাষিণী, পরোনো ইংরেজ আমলের মেয়ের মতো আপাদ-মস্তক বসনাবৃত্তা, এবং সেটি যেন আগাগোড়া ইস্পাতের বর্ম ঢাকা। পুরুষের পক্ষে প্রিয় নাট্যশা, কিন্তু টারিগেটের পক্ষে প্রয়োজন লিডিয়াকে। সৌভাগ্যে ইউনিয়নের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে লিডিয়ার জন্মান্বিত অনুরাগ আমাদের পক্ষে কৌতুকের বস্তু ছিল। এদেশের বিন্দুমাত্র সমালোচনা তিনি ধরদাস্ত করতে পারতেন না।

ঘরের ভিতরকার এই হাস্য-রসোৎসর্গটি আমার পক্ষে একটু মাত্রাধিক বোধ হচ্ছিল। কিছু একটা অছিলায় আমার নিজের ঘরটিতে এসে একাই বসে রইলাম। রাত আড়াইটে বেজে গেছে। মেয়েরা বিশ্রাম নিন, এইটি আমার ইচ্ছা। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি, লিডিয়া আমার ঘরটিতে এলেন। দেখতে পাচ্ছি তাঁর শ্রান্ত রাগা চোখ ঘুমের জন্য কাতর। কিন্তু তিনি গান্ধীর মুখে বললেন, আপনি 'আসি' বলে এলেন না কেন, আমি জানি। ওখানে আপনি অভ্যন্তর অস্বস্তিবোধ করছিলেন।

আমি হাসিমুখে বললাম, আপনি রাগ করছেন কেন? আমার বয়স হয়েছে

যথেষ্ট, ওঁদের মধ্যে আমি একটু অসুবিধায় পড়ি।

লিডিয়া বললেন, আপনার চেয়ে বেশি বয়সের লোক ওখানে আরও আছেন। কিন্তু আমি বলতে এসেছি আমিও সোভিয়েট মেয়ে, অপমান আমার ভয়ানক গায়ে লাগে! আমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমি না এলেই পারতুম.....বলতে বলতে তাঁর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল।

তাঁর কথা শেষ হয়নি, এমন সময় আমার এক ভারতীয় বন্ধু—যাঁকে লিডিয়া সম্মান করেন—তিনি একটু টলটলে অবস্থায় ঘরে এসে ঢুকলেন। আমি একটু ভয় পেলাম। তিনি বললেন, লিডিয়া, তুমি কি আমার ওপর রাগ করে চলে এলে ওঘর থেকে?

লিডিয়া ভৎক্ষণাৎ তাঁর মুখের কঠিন চেহারা পালটিয়ে শান্ত হাসো বললেন, কই না? আমার গলা স্বভাবতই একটু চড়া—রাগ আমি করিনি।

হাসি মুখে আমি বলতে গেলুম, ভারতীয়দের প্রতি উনি রাগ করেন না।

এটি আপনার মতো কথা—লিডিয়ার কণ্ঠ স্বয়ং কঠিন হয়ে উঠল আমার প্রতি। বললেন, রাগের কারণ ঘটেনি।

ভারতীয় বন্ধুটি তাঁর একটু কাছ ঘেঁষে বসবার চেষ্টা করতেই লিডিয়া আবার বললেন, একটু সরে বসুন, মিষ্টার—। এটা আমার পছন্দ নয়।—এই বলে তিনি নিজেই সরে বসলেন।

মিষ্টার অমুক কিন্তু একটু বেশ স্নেহশীল। তিনি বোধ করি, হাতখানা ঘুরিয়ে শ্রীমতী লিডিয়ার কাঁধে রেখে মিষ্ট শ্রম্ভাই জানাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যেই মেয়ে রক্তচক্ষু এবার চাপা গর্জন করে উঠলেন, আপনাকে আবার সতর্ক করছি মিষ্টার—মেয়েদের সঙ্গে শোভন ব্যবহার করুন।

মিষ্টার অমুক এবার স্বয়ং জড়িত কণ্ঠে বললেন, কিন্তু কই, নাট্যশা তো তোমার মতন উগ্রমূর্তি হন না?

নাট্যশা আমার 'চীফ',—তাঁর কাজের সমালোচনা করার কোনও অধিকার আমার নেই। আমরা সোভিয়েট নাগরিক, মনে রাখবেন মিষ্টার—

এবার আমি বলতে বাধ্য হলুম, আপনি একটু বেশি রক্ত হচ্ছেন, ম্যাডাম!

মোটেরী না, লিডিয়া হঠাৎ যেন ফেটে পড়লেন,—পুরুষ পাশে এসে বসলে মেয়েমানুষ মাত্রই বুদ্ধিতে গারে তার মনোভাব। মিষ্টার, আপনি যদি শান্ত হয়ে এখানে বসতে চান বসুন, নৈলে একজনের আচরণের জন্য ভারতের সুনাম এইভাবে কলঙ্কিত (blemished) হবে, এ আমি কোন-মতেই বরদাস্ত করব না।

বিষধর সপ্ন যেন বেরিয়ে এল। চক-চক করছে তার চোখ। ফণাটা উদাত। ভারতীয় বন্ধুটি পুনরায় টলটলে অবস্থায় উঠে দাঁড়ালেন। হাসবার চেষ্টা করে শব্দ বললেন, তোমার মন-মেজাজ আজ ভাল নেই, ম্যাডাম!

তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমিও তাঁর পিছ পিছ ওঘরের সামনে গিয়ে অনুরোধ জানালুম, এবার আপনারা মেয়েদের ছুটি দিন। চোঁহান, বেদী, যশপাল, আপনারা শূন্যে পড়ুনগে। গাড়ি চলছিল। ওঁরা একটু লজ্জা পেয়ে যে-যার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

পরবর্তীকালে কোনও এক রাতে যখন মস্কোর ক্রেমলিনের প্রাচীর-সংলগ্ন একটি বাগানের ভিতর দিয়ে ফিরছিলাম, তখন জনৈক প্রবীণ মদ্যপ টলতে টলতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন। আমি তাঁকে হাসিমুখে একটি সিগারেট ধরিয়ে দিই। ওটা তাঁর প্রয়োজন ছিল ওই ঠান্ডা রাতে। কিন্তু তাকে কাছে আসতে দেখে শ্রীমতী লিডিয়া স্বয়ং দর্ভাবনার জড়োসড়ো হয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, একজন মাত্র রক্ত মাতাল সৌভাগ্যেই ইউনিয়নের সুনামকে কলঙ্কিত করতে সমর্থ—আমি কিন্তু এটি বিশ্বাস করিনে।

লিডিয়া তাঁর আচরণের জন্য দৃঢ় প্রকাশ করেছিলেন।

(জন্মভূমি)



কেশুত

ডেয়াজ কেশ তৈল

নিখার্স কলিকাতা



কবিতার্থ

শান্তিনিকেতন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

॥ এক : মুখবন্দ ॥

গত ২৪শে থেকে ২৬শে জানুয়ারী শান্তিনিকেতনের বিচিত্রা প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এক সাহিত্যসম্মেলন হ'য়ে গেল। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য উভয় বাঙলা থেকে প্রায় শতাধিক কবি, সাহিত্যিক ও অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রায় অর্ধশত রবীন্দ্রানুরাগী অমন্ত্রণ গ্রহণ করে অন্য সমস্ত কাজ ফেলে এখানে ছুটে এসেছিলেন। তিনদিনের আলোচনার মূল বিষয় ছিল : 'রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার সাহিত্য ও জাতীয় জীবন'। মোট পাঁচটি সভায় আলোচনাগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছিল, তার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ছিলো সংগীতের জন্য। সভায় যারা যোগ দিয়েছিলেন, সেই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কবির সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। তাঁরা অনেকেই কোন লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন নি এবং আলোচনার কোনরূপ অংশগ্রহণেই তাঁদের মনে সন্দেহ ছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং সজনীকান্ত দাস অবশ্য লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেছেন এবং অরুণ ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস ও দক্ষিণারঞ্জন বসু আলোচনায় সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মণীশ ঘটক, সুশীল রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাণী রায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষ—এঁরা সকলেই শান্তিনিকেতনের সভায় এসেছিলেন শুনেতে এবং বলা বাহুল্য, আমিও ছিলাম এঁদের দলে। আলোচনা-সভায় যখনই এঁদের নাম ধরে আহ্বান করা হয়েছে, এঁরা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তথ্যটি বিশ্বভারতীর আহ্বানে এঁরা অন্য সমস্ত কাজ ফেলে শান্তিনিকেতনে ছুটে গিয়েছিলেন কেন? আমার মনে হয়, শান্তিনিকেতন এঁদের তীর্থক্ষেত্র বলেই, রবীন্দ্রনাথকে এঁরা কবি-সমাজের মধ্যমণি বলে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন বলেই বিশ্বভারতীর আহ্বানে এভাবে সাড়া

দিয়েছিলেন। তাছাড়া এই সম্মেলনের আহ্বায়ক অশোকবিজয় রাহা একজন কবি, পাঁচটি সভার তিনটিতে পৌরোহিত্য করেছিলেন কবি; এবং একমাত্র কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানটিই, তিনদিনের আলোচনা-সভার যা অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলে বিশ্বভারতীর প্রোত্বেশ অনেকে অনুভব করেছিলেন, অনুষ্ঠানসূচীতে না থেকেও হাতে পেরেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের পরিচিতি আমার কাছে তাই কবিতার্থ বলেই। কবি রবীন্দ্রনাথই কি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা নন? পাঁচটি সভায় যে চৌদ্দটি প্রবন্ধ পঠিত হয় (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দেন নি এবং শেষ পর্যন্ত সভায় উপস্থিত হন নি) তার শ্রেষ্ঠ তিনটি রচনার দুটিই কবির লেখা। অন্য যা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বলে আমার মনে হয়েছে তা গানের ওপর এবং ছবির ওপর, যাঁরা গান করেন এবং ছবি আঁকেন তাঁদের লেখা।

তিনদিনের আলোচনার ধারা-বিবরণী আমি এখানে দেবো না। কবিতার্থে গিয়েছিলাম একটি গভীর প্রত্যাশা নিয়ে। সে প্রত্যাশা আমার পূর্ণ হয়েছে। শূদ্রই বিশ্বভারতীর শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধ সকলের সহৃদয়তার নয়। আমরা, যাঁরা কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চল থেকে সাহিত্য-সম্মেলনে গিয়েছিলাম, যেন সেখানে গিয়ে পরিবর্তিত মানব হয়েছিলাম। কাজি আবদুল ওদুদ, মণীশ ঘটক, গোপাল হালদার থেকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু ও শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত সকলেই যেন এই তিনদিন একসঙ্গে বাঁধা হয়ে গিয়েছিলাম। কোনরূপ কৃত্রিমতাই এই তিনদিনের শান্তিনিকেতনে আমাদের মধ্যে ছিল না। রাত বরোটা পর্যন্ত ছোটদের মধ্যে বসে গোপাল হালদার ভূতের গল্প শুনলেন। সভায় বসে হাসকা মদহতগুলিতে মণীশ ঘটক ও

প্রেমেন্দ্র মিত্র পরস্পরকে নিয়ে ছুঁড়া কবিতা লিখলেন। এই তিনদিন আমরা যেন এক নতুন পৃথিবীতে বসবাস করছিলাম। একটি ভয় অবশ্য কবি-সাহিত্যিকদের মনে ছিল, যা নীরেন্দ্র চক্রবর্তী সভায় ব্যক্ত করেছিলেন; তা হ'লো, সভায় কিছুর বলতে হবে এমন অহ্বান আসবার ভয়। এ যন্ত্রণা আহ্বায়ক অশোকবিজয় রাহা আমাদের দিচ্ছিলেন সত্য; তবু তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা আমাদের অন্য সকল রকমেই আনন্দ দিয়েছিলেন।

॥ দুই ॥

ঠিক এক সপ্তাহ হ'ল শান্তিনিকেতন ছেড়ে এসেছি। তার আগে কণ্ঠদন ছিলাম সেখানে? দিনের হিসেব নিলে তিনদিন, অথবা তিন রাত; আর ঘণ্টার হিসেব নিলে ৬২ থেকে ৬৩ ঘণ্টা, তার বেশী নয়। অথচ এক সপ্তাহ হ'য়ে গেল ঐ কয়েক ঘণ্টার স্মৃতি এক মদহত ভুলতে পারছি না কেন?

কি দেখেছি শান্তিনিকেতনে, কি শুনছি, যা ভুলবার নয়? আমলকী আর আম্রকুঞ্জ, শাল ও তালবাঁথি, রামকিস্করের ভাস্কর্য, তিন ঠাকুরের হাতে আঁকা কিছুর ছবি; তিনদিনের সভায় গুরুদেবের আলোচনা, কিছুর গান আর চেনা ও অচেনা অনেক মানুষের মুখ। এমন দেখা, এমন শোনার সুযোগ শান্তিনিকেতনে আরো হয়েছে এবং সে দিনগুলির স্মৃতিও আনন্দের। কিন্তু এমন বৃক্করা আনন্দ, তারপর সপ্তাহ-ব্যাপী বিচ্ছেদের এই যন্ত্রণা—আমার কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

আর, এই আনন্দ ও যন্ত্রণা কি শূদ্রই আমার? আজ ওরা ফেরুয়ারী। ঠিক দুদিন আগে গিয়েছিলাম কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে, তারপর দেখা হয়েছে অরুণ ভট্টাচার্য এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এঁরা তিনজনই কবি। জিজ্ঞাসা করছি, কেমন লাগলো এবারকার শান্তিনিকেতন? কেউ ভুলতে পারছেন না শান্তিনিকেতনকে। কামাক্ষীপ্রসাদ স্পষ্টই বলে ফেললেন, এবারকার অভিজ্ঞতার কোন তুলনা হয় না। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসেই তিনি নতুন কবিতা লিখেছেন, সে কবিতা পড়ে শোনালেন। যেন অনেক দিনের রন্ধ নিরুত্তর স্বপ্নভোগ হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের সভায় আমরা কেউ বস্তু ছিলাম না। অরুণ তবু গান সম্পর্কে

দু'চার কথা বলেছেন; কিন্তু আর সবাই কিছু বলতে হবে ভেবে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য মনে দিন কাটাতাম। কামাক্ষী-প্রসাদ তো নামঘোষণার সময় পলাতক থাকারই চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে এবং সমরেশ বসুকে অনেক বুদ্ধিরে ডায়াসের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন; বলেছিলেন, নিমন্ত্রিত অতিথিরা সভায় উপস্থিত নেই, এতে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে অবহেলা করাই হয়। সভায় দাঁড়িয়ে তাঁরা প্রায় কিছুই বলতে পারেন নি। আমরা এবং মঙ্গলাচরণের অবস্থাও তাঁদের তুলনায় ভাল ছিল না! তিনদিনের সভাই ছিল প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনার সভা। মণীশ ঘটক, আমি ও মঙ্গলাচরণ শেষ পর্যন্ত নিয়ম ভেঙে কবিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানালাম; কেননা, সভায় নাম ধরে ডাকলে চুপ করে থাকা যায় না। অথচ তিনদিনের সভায় উপস্থিত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কবির সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। কেন সভায় বক্তৃতা দেবার কোনরূপ দক্ষতা নেই জেনেও, মণীশদা থেকে শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের কবিরা, সবাই অমল্লগ পাওয়া মাত্র শান্তিনিকেতনে ছুটে এসেছিলেন? এ-ও এক প্রশ্ন।

আমার মনে হয়, ওপরের সব প্রশ্নের একটিই উত্তর। তা হল, শান্তিনিকেতন কবিমাত্রেয়ই তীর্থস্থান; এই তীর্থস্থানে আমরা কয়েকজন কবি তিনদিন একত্র হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে, তাঁর কীর্তিকে সামনে রেখে। আমরা অনেকেই তিনদিনের সভায় শূদ্ধ প্রোতা ছিলাম। সভার বাইরে আমরা যখন আমলকী ফুড়িয়েছি, অনেক দূর থেকে সাঁওতাল-কন্ঠের কোন গুণ-গুণ গান শুনছি, অথবা ধূমপানের জন্য সভাস্থলের একটু বাইরে গিয়ে প্রকারান্তরে বিশ্বভারতীর নিয়ম রক্ষা করেছি, তখনো আমাদের ভূমিকা একই—দর্শকের, শ্রোতার, বাইরের লোকের। তথাপি, ২৪শে থেকে ২৬শে জানুয়ারী, তিনদিনের একটি মহত্বও আমরা এ অনুভব থেকে দূরে ছিলাম না যে, আমরা এখন যেখানে আছি তা তীর্থক্ষেত্র—এখানকার মাটিতে শূদ্ধ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নম্র, অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালেরও স্নেহ মেশানো; এখানকার বাতাসে শূদ্ধ গান ও কবিতাই নয়, বিংশ শতাব্দীর যা কিছু মানবীয় ও শ্রেষ্ঠ চিন্তা, যেন আমাদের স্পর্শ করছে।

।। তিন ।।

কাল লেখা শুরুর করার সময়ে স্পষ্ট সংকল্প নিয়েই বসেছিলাম,

‘অমৃত’ পত্রিকার পাঠকদের কাছে বিশ্বভারতীর সাম্প্রতিক সাহিত্য-সম্মেলন সম্পর্কে কিছু তথ্য নিবেদন করবো। গতকাল কিন্তু লিখতে শুরুর করে দিলাম, নতুন তথ্য দেবার মত আর কি আছে? মোটামুটি খবর তো ‘যুগান্তর’ পত্রিকাই পরিবেশন করেছেন। অন্য একটি পত্রিকাতে একটি সমালোচনা বেরিয়েছে দেখলাম। ও ধরনের সমালোচনায় আমার মন সায় দেয় না, কেননা এতে করে বাইরের ঘটনাবলীকেই বেশী প্রশ্ন দেওয়া হয়, সমগ্র পরিবেশটাকে ঠিক ধরাছোঁয়া যায় না। ২৪শে থেকে ২৬শে জানুয়ারীর সভায় বক্তারা যে কি লিখিত ভাষণ পড়েছেন, সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা তিনদিনের অনুষ্ঠান কি ভাবে পরিচালিত হয়েছে, শ্রোতারা কি ভাবে এই সাহিত্য-সম্মেলনকে নিয়েছেন এবং নিমন্ত্রিত অতিথিরাই বা কি অভিজ্ঞতা নিয়ে এলেন? এ তিনটি প্রশ্নের উত্তরে আমি একটি কথাই বলতে পারি—আনন্দ। তিনদিনের সভা পরিচালিত হয়েছে আনন্দের মধ্য দিয়ে, যদিও কোনো একজন সাহিত্যসেবীর একটি দিনের ভাষণ, অন্য একজন সম্মানিত অধ্যাপকের প্রতি অকারণে তাঁর তীব্র শ্লেষ এই আনন্দকে কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে। শ্রোতারা তিন দিনের

পাঁচটি সভায় সমবেত হয়েছিলেন মনে আনন্দ নিয়ে। কেননা এ সভা তাঁদের অতি শ্রদ্ধা ও মমতার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। আর আমরা, যাঁরা কেউ কেউ বস্তা এবং অধিকাংশই শ্রোতা ছিলাম, আমরাও শান্তিনিকেতন থেকে আনন্দের অভিজ্ঞতাই নিয়ে এসেছি। যুগান্তরের তিন কলাম খবরের মধ্যে এ সভাটাই কিছুটা প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু অন্য পত্রিকার খবরে তেমন নেই। এই সভাটুকু সামনে রেখে যদি আমরা বিশ্বভারতীর আহুত সভার সমালোচনা করি, তাহলেই বোধহয় সংগত ও শোভন হয়।

অনুষ্ঠানের যে ঘন্টার কথা কোনো কোনো পত্রিকা উল্লেখ করেছেন; অর্থাৎ এ যেন অনেকটা অধ্যাপকদের সভা, তা তো একেবারে মিথ্যে নয়। সভায় অধ্যাপকরা কথা বললেন, কবি এবং সাহিত্যিকরা শুনলেন। অথচ যে কটি ভাল প্রবন্ধ তিনদিনের সভায় পাঠিত হয়েছে তা কবি-সাহিত্যিকদের দ্বারাই রচিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং রাজেশ্বর মিত্রের প্রবন্ধ তিনটিই সম্ভবতঃ তিনদিনের সভায় শ্রেষ্ঠ রচনা। তুলনায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খ্যাতনামা অধ্যাপক যাঁরা এসেছিলেন, অনুল্লেকযোগ্য প্রবন্ধই পড়েছেন। গানের ওপর আলোচনাচক্রটি কিন্তু খুবই মনোরম হয়েছিল। রাজেশ্বর



• পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি •

১। রবীন্দ্র-চরিত

ব্রীবিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য রচিত
সরল, সুখপাঠ্য, প্রামাণিক রবীন্দ্র জীবনালেখ্য
মূল্য ১.৫০

২। শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যধারার অনবদ্য আলোচনা
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

—লেখক—

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভারতশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
রমেশচন্দ্র মজুমদার
সুকুমার সেন
প্রমথনাথ বিশী
শশিভূষণ দাশগুপ্ত
বিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য
কাকী আশুদল ওদুদ
শান্তা দেবী
মৈত্রেয়ী দেবী
ক্ষিতীশ রায়
শচীন সেন

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
সোমনাথ মৈত্র
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
রবীন্দ্রনাথ রায়
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
আশুতোষ ভট্টাচার্য
ভবতোষ দত্ত
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হরপ্রসাদ মিত্র
অহিন্দ্র চৌধুরী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রবোধচন্দ্র সেন

— মূল্য পাঁচ টাকা —

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা
১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

মিষ্টক বাদ দিয়েও বলা যায়, শান্তিদেব ঘোষ এবং স্বামী প্রজ্ঞানন্দ যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন তাতে নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম দুইই লক্ষ্য করা গেছে। অরুণ ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্তর আলোচনাও এদিন ভাল হয়েছিল। এমনি আরেকটি শোভনীয় এবং সাধক সভা হতে পারতো যদি নিমন্ত্রিত কবিদের নিয়ে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা ও কবিতা-পাঠের একটি সভা ডাকতেন। তিনিদিনের সভায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার ওপর জোর দিয়ে একটি প্রবন্ধও পাঠিত হয়নি; এবং কবিদের কবিতাপাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রায় প্রস্তুত হবার কোন সময় না দিয়েই। এই কবিতাপাঠের ব্যবস্থাও, আমরা যতটুকু জানি, ২৬শে তারিখ অম্মদাশঙ্কর রায়ের উৎসাহে হয়; আলোচনা-সূচীতে কোথাও তা ছিল না।

কিন্তু এসব দুটি সত্ত্বেও যে নিরাভরণ ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ্বভারতীর সভা-গদলি একের পর এক অনুষ্ঠিত হয়েছে তা দেখবার, জানবার এবং অনুভব করবার মতো। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তো কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে কম সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হয়নি। সর্বত্র না হোক, অনেক জায়গাতেই অস্বাভাবিক প্রহসন, এবং এই প্রহসার অভাব দেখেছি চিংকার দিয়ে ঢাকা হয়। বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানগুলিতে এই নাটকেপনা ছিল না। যেটুকু নাটক মধ্যে দাঁড়িয়ে সেখানে অভিনয় করা হয়েছে, তা কলকাতার কোনো একজন তরুণ সাহিত্যিকের 'সোজানোই' হয়েছে। তাঁর জন্য আমরা লজ্জিত বোধ করেছি। বিশ্বভারতীর আয়োজনে আর যা দুটিই থাক, তাঁরা যে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে জানেন এবং আগন্তুক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শৃঙ্খল আনন্দিত করাই নয়, তাঁদের সর্বপ্রকার ধূর্ততা ক্ষমার চক্ষে দেখার মনোবল তাঁদের আছে; এ আমাদের মেনে নিতেই হবে।

II চার II

রবীন্দ্রশতবর্ষের শান্তিনিকেতনকে জানতে হলে শৃঙ্খল সভায় যোগ দেওয়া ছাড়াও অন্য কাজ থাকে। এমন দুচারটি টুকরো কাজ অনেকে মিলে একত্রে করতে হয়েছে। এমন একটি কাজ হলো ২৫শে তারিখে বিকেলের দিকে বি এম সেন-এর বাড়ি বসে পাঁচ থেকে বারো-তেরো বছরের শিশু এবং বালক-বালিকাদের গান শোনা। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো এদের সমবেত

সংগীতগদলি। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এক-সঙ্গে গাইছে যারা কেউই গানের স্কুলের ছাত্র বা ছাত্রী নয়। অথচ কোথাও একটি কণ্ঠস্বর আগে-পরে শোনা যাচ্ছে না, কেউ গানের তালভঙ্গি করছে না। কলকাতার কোন আসরে এ ধরনের ঘটনা ঘটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সবশৃঙ্খল প্রায় দশ-এগারো জনের গান শুনলাম; এরা নাকি বি এম সেন-এর জিপ-বাহিনী একটি লরীতে ২০।২৫ জন মিলে শান্তিনিকেতন তথা বোলপুরের বাইরেও এরা আহবান পেলে গান গেয়ে আসে। হিরণকুমার সান্যাল, মণীশ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, সম্প্রদায়িক কাজ মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, দিনেশ দাস প্রভৃতিও আসরে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী তো উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলেন! শান্তিনিকেতনের আকাশে-বাতাসে গান, কাজেই আমরা আর 'আশ্চর্য' হ'লাম না।

এদিনই মন্দিরের উপাসনায় যোগ দেবার পর আমরা কয়েকজন রওনা হ'লাম যামিনী চক্রবর্তীর বাড়ি। তিনি বিশ্বভারতীর রাগসংগীতের অধ্যাপক। যামিনীবাবুর তিন কন্যা ও দুই পুত্র। একে একে তারা প্রত্যেকেই গান গেয়ে শোনালো, এবং একটি মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হ'লো। অরুণ ভট্টাচার্য, আমি, মণিলাচরণ ও স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বোধহয় এই চারজন বাইরের প্রোতা ছিলাম। যামিনীবাবুর বাড়ি আমরা আগেও গান শুনিয়েছি; অপর বন্ধুরা মন্ত্রণ হ'লেন এই ভেবে যে বাড়ির পাঁচটি ছেলে-মেয়েই ভালভাবে গাইতে ভালবাসে।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে এ ধরনের উদাহরণের কোন অভাব আছে কি? আমাদের তো তেমন মনে হয় না। ঘটনা দুটি শৃঙ্খল তাঁদের জন্যই লিপিবদ্ধ করলাম, যারা শান্তিনিকেতন সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছুই জানেন না। যেখানে রবীন্দ্র-শতবর্ষ ঘরে ঘরে এবং সারা বছর ধরেই। অন্ততঃ গানের ব্যাপারে তো বটেই!

২৬শে শান্তিদেব ঘোষের ঘরে বসে টেপ রেকর্ডে তাঁর নিজের গান প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে শুনলাম। আরো গান ছিল এবং শুনবার মনও আমাদেরও ছিল। কিন্তু সময় ছিলো না। তখন রাত প্রায় গভীর হয়ে এসেছে, আমাদের গেস্ট-হাউস-এ ফিরে যেতে হবে। সুতরাং ফিরতে হ'লো।

এদিন দুপুরেই অম্মদাশঙ্কর রায়ের বাড়ি গোলাম আমি, অরুণ ভট্টাচার্য এবং মণিলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এবং

শ্রীযুক্তা লীলা রায় দুজনেই অপেক্ষা করছিলেন। বাংলা কবিতায় ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করা গেল। অম্মদাশঙ্করের ছড়া কবিতা নিয়েও কিছু কথা হ'লো। কথায় কথায় তিনি এমন প্রস্তাব দিলেন যে বিকেলে কবি-সম্মেলন করলে কেমন হয়। অবিশ্য কোন পৃথক সম্মেলন নয়। শেষদিনের সভায় তিনিই সভাপতি; ঐ সভাপতির ভাষণ না দিয়ে যদি অতিথি কবিদের কবিতাপাঠের জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানান কেমন হয়?

আমরা জানালাম, খুবই ভাল হয়। এসময় শান্তিনিকেতনে একটি কবি-সম্মেলন হওয়া খুবই উচিত ছিল। দেখলাম শ্রীযুক্তা রায়েরও অসমী উৎসাহ। অম্মদাশঙ্কর অনুরোধ জানালেন, সাধ্যমত কবিদের খবর দিতে। আমরাও তাকে পাঁচটা অনুরোধ জানালাম, তাঁর নির্দেশ আমরা মান্য করবো; কিন্তু তিনি যেন সভায় কিছু ঘোষণা করার আগে আহবায়কের সঙ্গে একবার আলাপ করেন।

বিকেলের সভায় আহবায়ক অশোক-বিজয় রাহা কবি-সম্মেলনের কথাটি ঘোষণা করলেন। কবিরা কেউই প্রস্তুত ছিলেন না, তবে সাধ্যমত সহযোগিতা করে উপস্থিত প্রায় সকল কবিই তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছেন।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে এখনো আমার একথাটাই বারে বারে মনে হয়, কবিতাখের রবীন্দ্র-শতবর্ষ অনুষ্ঠানে এই একটি অভাব রয়েছে। বিশ্বভারতী কবি ও সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ ও আদর দুই-ই করেছেন; কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করার তা-তো তাঁরা নেন নি। এতে অবশ্য কবি-সাহিত্যিকদের কোন ক্ষতিবান্ধ হয় নি; কেননা, আমরা যে প্রত্যাশায় গিয়েছিলাম, তা পেরেছি। শান্তিনিকেতনকে চিরদিনই প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছি, এবার সেই প্রীতি ও শ্রদ্ধা গভীরতর হ'লো।

এবং এজন্য শৃঙ্খল রবীন্দ্রশতবর্ষের অনুষ্ঠানসূচীর উদ্যোক্তারা নন, বিশ্বভারতীর প্রতিটি মানুষ, অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ প্রভাতকুমার মল্লিকোপাধ্যায় থেকে শৃঙ্খল করে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী সবাইকেই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাবার আছে। একজন বা কয়েকজনের চেষ্টার কোন পরিবেশই আনন্দের হয়ে ওঠে না; এ আনন্দের যেখানেই সম্মান পাওয়া যায় সেখানে সমগ্র সংসারটাই সরল এবং সুন্দর।

বিশ্বভারতী, এখন আমার মনে হয়, এমন একটি সুন্দর সংসারের ছবিই বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে উপহার দিতে পারে।

অঙ্গি রেখা

৬২২২২



[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছয়

মানুষের জীবন নিয়ে কত লোক কত গবেষণা করে গেছেন, এখনো করছেন। কবি, দার্শনিক এবং কর্মবীর প্রত্যেকে একে আলাদা দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন এবং নানা বিভিন্ন বস্তুসমূহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ বলেছেন নদীস্রোত, কেউ বলেছেন রংগামণি; কারো মতে এ জীবন শুদ্ধ স্বপ্ন, কারো মতে মরীচিকা। তাদের উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছেন আর এক দল, বলেছেন, জীবন একটা বিরামহীন সংগ্রাম; গোলাপ-কুঞ্জ নয়, কঠিন কঠোর রাজপথ।

বর্টাল স্কুল পরিচালনার পিছনে যে নীতি, তার মধ্যে ঘোঁড়ায় এই শেষ উক্তিটির সমর্থন পাওয়া যাবে। যে-কারিগর রাজপথ তৈরী করে, তার প্রধান লক্ষ্য হল, পাঁচু চেলে কিংবা সিমেন্ট এ'টে নিশ্চিত করে তোলা, কোথাও যেন কোনো ফাঁক না থাকে। এখানকার 'ইন্সপেক্টর'দের দৈনন্দিন জীবনটাও তেমনি একটানা রুটিনের শক্ত সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো, উদয়ান্ত ডিসি'প্লিনের শিকল দিয়ে গাঁথা। উদয়ান্ত কথাটা বোধহয় যথার্থ হল না। উদয়ের খানিকটা আগে থেকে অস্তের অনেকখানি পর পর্যন্ত, অর্থাৎ একটা ঘুমের ঘোর থেকে উঠে আরেকটা ঘুমের কবলে নোঁতয়ে পড়বার নির্দিষ্ট ক্ষণ যতক্ষণ না আসে, তার প্রতিটি মুহূর্ত কতৃপক্ষের করায়ত্ত। সমস্ত সময়টাকে ঘণ্টা মিনিটে ভাগ করে, তারা নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, কখন সে কী করবে এবং কী করবে না। আহা! বিহার, শ্রম ও বিশ্রামের কোনো ফাঁকে একটি মিনিটও তার নিজের নয়, যার আশ্রয়ে বসে সে বলতে পারে—'করব আমার যা মনে লয়।'

তার মানে এ নয় যে, ওরা শুদ্ধ কাজ করে, খেলাধুলা ফুর্তি আমোদ করে না। তারও ব্যবস্থা আছে, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যতটা আশা করা যায় তার চেয়ে বেশী বই কম নয়, কিন্তু সব কোডিফায়েড, বিধিবদ্ধ রুটিন মাসিক, খেলার ঘন্টার খেলতেই হবে। যদি বল, আজ আমার খেলতে ইচ্ছে করছে না, ইউ আর লায়বল? টু বি পানিশড। তোমাকে শান্তি দিতে পারেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। 'ইচ্ছা বলে তোমার হাতে কিছ্র নেই; তোমার কল্যাণের জন্যে ওটা এখন সরকারী হেফাজতে গচ্ছিত। খাটনির মত খেলাটাও তোমার 'কমপালসারি', অবশ্য করণীয়। তোমার চিন্তাবিনোদনের দিকেও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন সরকার। রেডিও আছে, নিয়মিত গান, বাজনা, নাটক, আবৃত্তি, সরস্বতী পূজার হৈ হুগুগু আছে। যখন তোমার দলবদ্ধ রিক্রিয়েশনের পালা, তখন যদি বলে বস, আমার ভালো লাগছে না, আমি একটু একা থাকতে চাই, সেটা হবে দৃষ্টান্তীয় অপরাধ—পানিশেবল অফেন্স। তোমার জন্যে চিন্তিত হবেন কতৃপক্ষ। তাঁরা জানেন, কিছ্র না করে, নিজের মনে একা থাকা বিপজ্জনক। এম্পটী রোগ ইজ্-এ ডেভিল্‌স্ ওয়াকসপ্।

এতগুলো বিপথগামী বালকের জীবনভরীটাকে নিস্তরঙ্গ কাটা খালের ভিতর দিয়ে সমান তালে চালিয়ে নেবার দায়িত্ব যার হাতে, তিনি নিজেই এসে মাঝে মাঝে সেখানে তুফান সৃষ্টি করে বসেন। সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ এসে হয়তো দেখলেন গল্পের ক্লাশ নেবার আয়োজন করছেন হেড-মাষ্টার। ছেলেগুলোর মুখে নেমে এসেছে অমাবস্যা। গল্পের নামে

নীতিবচন তাদের কাছে কুইনাইনের মত ভেতো হয়ে গেছে। সাহেব বলে বসলেন, গল্প নয়, এখন তোদের 'যা খুশির ক্লাস'। যা খুশির ক্লাস মানে? মানে, যার যা খুশি কর—ছবি আঁকা, খোঁরা-ফেরা, লুকোচুরি, আড্ডা, কিংবা যদি ইচ্ছে হয়, আপন মনে চুপচাপ বসে থাকা। চোখের নিমেষে ঠিক এক ঝাঁক পাখির মত কোথায় যে উড়ে গেল ছেলেগুলো, তারাই শুদ্ধ জানে।

বাঁকা চোখে হেডমাষ্টারের ক্ষুদ্র গম্ভীর মুখের দিকে এক পলক তাকালেন অধ্যক্ষসাহেব। গোঁফের কোণে ফুটে উঠল একটি সরু মৃদু হাসির রেখা। তারপর বিশাল দেহ এবং ক্ষুদ্র ছাঁড়খানা নিয়ে সদলবলে বোঁড়িয়ে চলে গেলেন।

আরেক দিন। অফিসে বসে কাজ করছিলেন। হঠাৎ কি খেয়াল হল। চললেন ভিতরে। হল ঘরে ক্লাস নিচ্ছেন মাষ্টারমশাইরা। চার পাঁচটি শ্রেণী। মাঝখানে মাঝখানে কঠোর পাটিশন। সাহেবকে দেখে টিচারদের গলার জোর উচ্চতর হল সেই সঙ্গে চড়ে গেল ছাত্রদের গুঞ্জন। এখানে যারা পড়ছে, মোট সংখ্যার তিনভাগের এক ভাগ। বাকী সব ওয়াকসপে—তাঁত, দজ্জিলালা, কামার-খানা, কাঠকামান, বুক বাইন্ডিং, প্রেস ইত্যাদি। চীফ অফিসারকে হুকুম করলেন অধ্যক্ষ ঘণ্টা দে দেও। টনটন করে অসময়ে ছাত্রের ঘন্টা বেজে উঠল। ছেলেরা বোররে আসতেই, সুপারের নির্দেশে তাদের দাঁড় করানো হল মাঠের পাশে দেবদারু-বাঁথির ছায়ায়। পেছনে আরদালীর হাতে একটা বড় গোছের হাত-ব্যাগ। ভিতরে কী আছে কেউ জানে না। নানা রকম আন্দাজ চলছে নানাঙ্গনের মনে। সব গবেষণা মিথ্যা করে দিয়ে

সবাইকে অবাক বানিয়ে বেরিয়ে এল কতগুলো ছোট রঙিন নোট বৃক্, তার সঙ্গে একটি করে পেমিসল। নিজের হাতে ছোট বড় প্রতিটি ছেলেকে এক খানা করে বিলিয়ে দিয়ে বললেন, এগুলো ইস্কুলের নয়, তোদের। যার যা খুশি লিখি। সাপ, বাঘ আঁকতে হয়, আঁকি। কাউকে দেখাতে হবে না।

লেকটেন্যান্ট ঘোষের নিতানতুন পাগলানি নিয়ে শহরের সরকারী মহলে সরস আলোচনা প্রায়ই লেগে থাকত। এই ব্যাপারটা যখন রাষ্ট্র হল, শাসন বিভাগের উচ্চস্থানীয় জর্নেল কর্তাব্যক্তি বিদ্রুপ করে বলছিলেন, বর্ডারের বাছাধনদের বুঝি এখন থেকেই লেখক বানাতে চান?

—বানাতে হবে কেন? অন্য সকলের মত ওরাও জন্ম-লেখক, বর্ণ রাইটার।

—কি রকম!

—লেখক নয় কে? আমি আপনি টম, ডিক্, হ্যারি, মানুস বলতে যে স্বপদ প্রাণীক বোঝার প্রত্যেকেই কিছ্ না কিছ্ লিখছে, মানে সৃষ্টি করছে। কেউ মনে মনে, কেউ মুখে মুখে, কেউবা কাগজের পাতায় কিংবা ক্যানভাসের পিঠে। আপনাদের কেতবেই তো আছে, মানুস বিধাতার প্রতিচ্ছায়া,—ইমেজ্ অব্ গড্। তাই যদি হয়, তাহলে সেও স্রষ্টা, এক একটি খুদে রাইটাকুর।

ভদ্রলোক বাঙালী খুঁটোন। লক্ষ্য করেছিলেন আশে-পাশে যারা উপস্থিত সকলেই একটি বিশেষ কোঁচুক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর পদ-মর্যাদার কথা মনে করেই বোধহয় প্রাণ খুলে হাসতে পারছেন না। আর কথা না বাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গ পেড়েছিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এ ‘পাগলটাকে’ আর ঘটিবেন না।

এই ‘নোটবৃক্’ নিয়েই আর একদিন কথা হচ্ছিল স্কুল-সেকশনের সেকেন্ড মাস্টার আশুতোষবাবুর সঙ্গে। এখানকার কর্মীদের মধ্যে, দুচারজন সিপাই সান্ত্বী বাদ দিলে, ইনিই ছিলেন সাহেবের বয়োজ্যেষ্ঠ। শৃধ্ সে জন্যে নয়, আরো কিছ্ ছিল বাইরে বৃধ্, অন্তরে শিশু, নাদা-সংস্কৃতিত, দরিদ্র লোকটির মধ্যে, অধ্যক্ষ বাকে মনে মনে সম্ভ্রম করে চলতেন। মুখে অবশ্য ঠাট্টা তামাসার বাছ-বিচার ছিল না। একটি মাত্র জামা ছিল। আশুতোষবাবুর—মান্দাতার, অমলের টুইলের সার্ট।

সপ্তাহে একবার নিজের হাতে সাবান-কাচা করে নিতেন। একবার কাচতে গিয়ে পিঠের দিকে ছেঁড়াটা অনেকখানি বেড়ে গেল। তাই পরেই এসেছেন পরের দিন। গেট পেরোবার মুখে হঠাৎ সাহেবের নজরে পড়ে গেল। ঠুঁকে কিছ্ বললেন না, পাশে দাঁড়ানো ডেপুটিকে বললেন, ‘স্যার আশুতোষের সবই উল্টো। আমরা ঘরের দরজা করি সামনের দিকে, উনি লাগিয়েছেন পেছনে।’ কথাটা কানে যেতেই তখনকার মত কোনো রকমে মাথা নীচু করে পালিয়ে বেঁচেছিলেন আশুবাবু। কিন্তু পরদিন পার পাননি। কী একটা কাল্পনিক রত উপলক্ষে ‘মেমসাহেবের’ কাছ থেকে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ এসে উপস্থিত। না গিয়ে উপায় নেই। আহারান্তে যখন বাড়ি ফিরবার আরোজন করছেন, মনিব-গৃহিণী দু’হাতে এগিয়ে ধরলেন ভোজন-দক্ষিণা—ধবধবে থান কাপড়, তার সঙ্গে একটি টুইলের সার্ট। আশুবাবু অসহায় ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকালেন সাহেবের পানে। তিনি যেন ধমক দিয়ে উঠলেন, আমার দিকে তাকিয়ে কী হবে? আমি কী করবো! দক্ষিণা না দিলে ব্রাহ্মণ-ভোজনে পুণ্য নেই—এ-সব বিধান তো আপনারাই দিয়েছেন একদিন। গিন্নীর পামে শেষটায় আমি সন্ধ্য নরকে পচবো?

আশুবাবু বিবাহ করেননি। দু’-একটি দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারা দু’রই থাকত এবং মাসান্তে কিছ্ কিছ্ মাসোহারা পেত। আর ছিলেন এক গদুর্। আত্মীয়দের দাবী মিটিয়ে সামান্য মাইনে থেকে যা বাঁচত, প্রায় সবটাই চলে যেত তাঁর আগ্রামে। নিজের জন্যে ভাতে-ভাত কিংবা এক তরকারীর ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে, অর্থাৎ মাসের শেষ কদিন তা-ও রোজ জুটত না। সহকর্মীরা সবকিছ্ জানতেন। সুতরাং ‘ব্রাহ্মণ-ভোজন’ প্রায়ই লেগে থাকত। তাছাড়া, এ-বাড়ি-ও-বাড়ি থেকে কখনো একটু কুমড়ো-শাক দিয়ে রাখা মটর ডল, কখনো এক বাটি বাড়ি দিয়ে শুকতো। প্রায়ই এসে যেতো খাবার সময়। রান্না জিনিস যারা পাঠাতে পারত না, তারা দিত সিধে—পাঁচপো খানেক চাল, তার সঙ্গে খানিকটা করে তেল-নুন, ডাল-মশলা। আশুবাবু আজন্ম নিরামিষভোজী, কিন্তু খেতে পারতেন। তাঁকে নিমন্ত্রণ করা মানে অন্ততঃ

দু’জনের মত আয়োজন। সহকর্মীরা জনতেন এবং সেই ব্যবস্থাই করতেন। উপলক্ষ কিছ্ থাক বা না থাক, খেতে বললে, আশুবাবু কোনো দিন ‘না’ বলতেন না। বাড়ির ছেলোপলোরাই প্রায় আসত নিমন্ত্রণ করতে। জিজ্ঞাসা করতেন—লাউঘণ্ট হবে তো রে?

—হবে।

—বেশী করে করতে বলিস মাকে।

ফোকলা-মুখে এক গাল হেসে ‘জয় গদুর্’ বলে ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হতেন। জাত সম্বন্ধে কোনো বাছবিচার ছিল না। ভোজ্যবস্তু সম্পর্কেও তাই। লাউঘণ্টের উপরে কিঞ্চৎ পক্ষপাত ছিল। আর একটি প্রিয় খাদ্য ছিল আশুবাবুর—পায়েস। সেটা প্রায়ই জুটতো না। বর্ডারে চাকরি করে পায়েস খাওয়াবে কে? কালেভদ্রে বিয়ে-থা উপলক্ষে হয়তো কখনো মিলত এক-আধটু। কিন্তু বছরে একটি দিন প্রাণভরে পায়েস খেতেন আশুমাষ্টার—স্কুলে। ষোদিন সর্বস্বতী পূজো করত ছেলেরা। সেদিন স্পেশাল রান্না হত ছেলের চাঁদায়। একেক বার একেক রকম ‘মেনু’, কিন্তু পায়েস ছিল কমন ফ্যাক্টর। আশুবাবু একটা গামলা নিয়ে বসতেন, ছেলেরা ঘিরে বসে খাওয়াত। ‘সেকেন্ড স্যার’-কে সবাই ভালবাসত।

নোটবৃক-বিতরণের ব্যাপারটাকে আশুবাবু অন্য সকলের মত হাস্কা করে দেখেননি। এ শৃধ্ তাঁর অর্থহীন খেলা নয়, এই সামান্য বস্তুটির ভিতর দিয়ে সংহেব হয়তো শিশু-মনের একটা চিরন্তন চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করেছেন। আত্মবিকাশের চাহিদা। ফুলের মত সে মনও নিজেকে মেলে ধরতে চায়। সে-ই তার প্রকৃতি। অন্যের ইচ্ছা নয়, বিধানবন্ধ প্রয়োজনের তড়ায় নয়, নিত্য-প্রয়োজনের বাইরে তার যে খেলা, খুশি, অনিয়মের রাজ্য তারই তাগিদে। সেখানে প্রত্যেকে স্বরাট, প্রত্যেকের আলাদা পথ, আলাদা রীতি।

প্রতিটি ছেলের কাছে আরেকটা গভীর তাৎপর্য ছিল খাতাগুলোর। এখানে তার যাকিছ্, সব সরকারের, ঐ একটি মাত্র ক্ষুদ্র জিনিস তার নিজস্ব। ঐটিকে নিয়ে সে যা মনু চায় করতে পারে। তার জন্যে কারো কাছে কোনো জবাবদিহির দায় নেই।

নোটবৃকগুলোর কী দশা হল, জানবার জন্যে সাহেবের মনে প্রচুর

কৌতূহল ছিল। আশুবাবুর সঙ্গে সড় করে সেই খবরটা গোপনে সংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন। ছেলেবয়সের যা নিয়ম, দু'চার দিন চাপাচাপির পর খাতা সম্বন্ধে তার মালিকদের হুঁসিয়ারি অনেকটা শিখিল হয়ে পড়ল। এখানে-সেখানে ফেলে রাখতেও দেখা গেল কাউকে কাউকে। তারই গোটাকরেক সকলের আড়ালে পকেটস্থ করে আশুবাবু একটা ফাঁক খুঁজে সাহেবের ঘরে গিয়ে উঠেছিলেন।

প্রতিটিতেই কিছু-না-কিছু লেখা হয়েছে। একজন শব্দ ছবি একেছে। প্রথম ছবিটা বেশ কিছুক্ষণ তাকালে মনে হবে মানুষের চেহারা। মাথাটা একদম গোল, সরু গলা, তার পর থেকে সবটাই পেট, নীচে দু'খানা ছোট ছোট পা ঝুলছে। তলায় পরিচয় দেওয়া আছে—'সারেব'। পরের পাতায় একটি পাখি আঁকবার চেষ্টা হয়েছে। কী পাখি একমাত্র চিত্রকরই বলতে পারেন। আর একটা খাতায় পাওয়া গেল চার লাইন কবিতা। বোধ হয় কবির কোনো বন্ধুর উদ্দেশ্যে রচিত—

এমন চাঁট মারবো Head-এ
ফট্ ফটাস্ ফট্।
Teeth কিলিয়ে থাকবি পড়ে,
বাঁচতে হবে Not

পাতা ওলটাতেই আর একটা, তার সুর আরো গভীর।

Mango গাছের ফাঁকে
মোমাছরা ডাকে।

চাক বানাতে হবে,
অনেক Honey হবে।

'এতো দেখছি সব্যসাচী অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গেছে', গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন অধ্যক্ষ। 'তিনি দু'হাতে বান চালাতেন, আর ইনি একই কবিতায় দু'দুটো ভাষা চালাচ্ছেন।'

আর একখানা বই খুলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন সূপারসাহেব। কাঁচা অক্ষরে ভুল বানানে লেখা—সত্যবাদী অমিয়কে ঘোড় করে চুমু খেয়েচে। অমিয় কানাইল। ভয়ে নালিশ করে না।

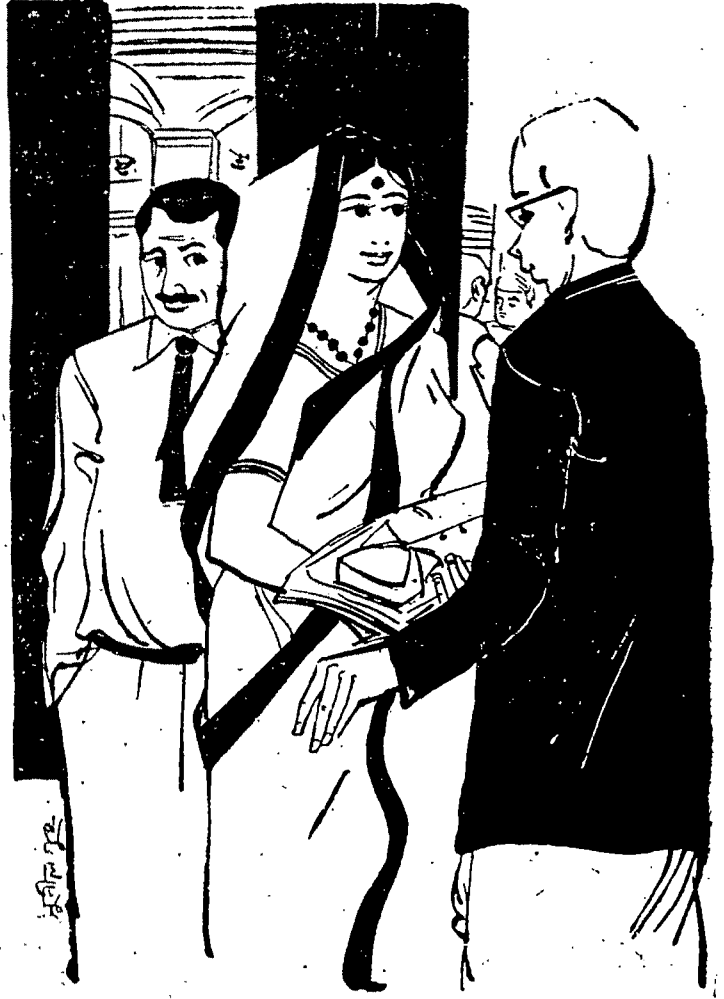
লেখাটা আশুবাবুর দিকে বাড়িয়ে ধরতে, তিনি বললেন, দেখছি সার। সত্যীশ ছেলেটাকে নিয়ে একটু অসুবিধা হচ্ছে। শব্দ সত্যীশ নয়। এরকম আরো কয়েকজন আছে। ছোটগুলোকে, বিশেষ করে অমিয়, মকবুল, দিলীপ, বিজয়—এদের রীতিমত আগলে রাখতে হয়।

—'জানি', তেমনি গম্ভীরকণ্ঠে বললেন যোষসাহেব, 'সত্যীশ বা সিরাজুলের দোষ নেই, দোষ ঐ বয়সটার। আর্লি পিরিয়ড অব অ্যাডোলেসেন্স। বড় গোলমালে সময়। কিন্তু কী করবো! কস্তাদের এত করে বোঝালাম, এক টিলে দু'পাখি মারাটা সব জয়গায় চলে না। এই দুটো গ্রুপকে একসঙ্গে রেখে দুটোরই সর্বনাশ হচ্ছে। বর্ডাল আর

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলেন। তারপর খানিকটা ম্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে বললেন, একটা কথা ভাবছিলাম; কিন্তু আমার পক্ষে বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

—খুব হবে। বলুন না?

—রাস্তার বেলা তো আলাদাই রাখা হয়। স্কুলে যতক্ষণ থাকে, নজর রাখায়



ভোজন-দক্ষিণা—খুব খান কাপড়, তার সঙ্গে একটি টুইলের সার্ট।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল সব দিক দিয়েই আলাদা। দুটো আলাদা স্কুল চাই। কেউ কানেই তুললো না। এক কস্তা বলে বসলেন, 'ঐ কস্তা' ছেলে নিয়ে দুটো ইনস্টিটিউশন!' আর, সংখ্যাটাই কি সব? এক লক্ষ ছেলেকে হেলায় ফেলায় মানুষ করার চেয়ে একটা ছেলেকে ঠিক মত দাঁড় করাবার দাম অনেক বেশী। তা কে বোঝে? মরুকগে, আমার কী!

মনিবের মুখে নৈরাশ্য ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে, আশুবাবু

বিশেষ অসুবিধে নেই, যদিও অনেক সময় ছোট-বড় মিলিয়ে ক্লাস করতে হয়—(কতগুলো বড় ছেলে তো 'ক' 'খ' ও জানে না)। কিন্তু মনস্কিল হচ্ছে, যখন ওয়াকশপে যায়। অতটা সময়। তার ওপরে—

—ইনস্ট্রাক্টরবাবু কিছই দেখে না।

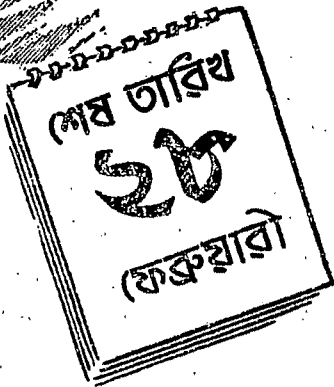
—আজ্ঞে, সে-কথা আমি বলছি না।
—আপনাকে বলতে হবে কেন? আমি সবই জানি। ভেবেওছি অনেক।

কিন্তু—থাক, আপনি এবার আসুন।
আবার যখন দরকার হবে, ডাকবো।

—আর একটা কথা, স্যার।
দিলীপের মার কোনো খবর পাওয়া
গেল না?

—আর বলবেন না, মধুখে একটা
হতাশাসূচক শব্দ করে মাথা নাড়লেন
সুপার এবং 'এই দেখুন না?'—বলে,
ডান দিকে রাখা একটা মোটা ফাইল
দেখিয়ে দিলেন। বললেন, ক্যালকাটা
পুলিশ তো প্রথমটা কোনো পান্ডাই

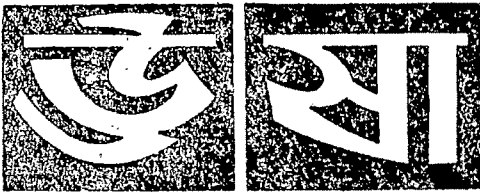
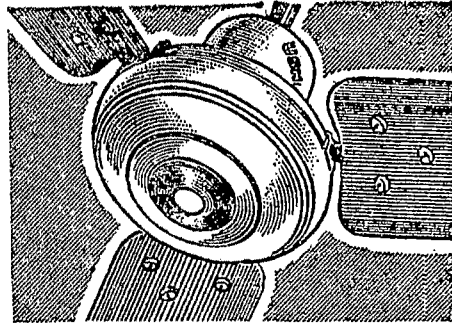
দিতে চায়নি। 'ওরকম মীনার ইন-
ফরমেশনের ওপরে প্রসীড করা যায় না,
আরো পারিটিকুলারস্ দাও'। আরে,
থাকলে তো দেবো? ছেলেটা যে মায়ের
নামটাও বলতে পারে না। কেউ শেখায়নি
তো, পাড়ার লোকে 'থাকার মা' বলে



সহজ
কিষ্টির সুযোগ
কোনও বাড়তি
খরচ নেই।

দেখেন এখনি কিনুন
শেষ দিনের অপেক্ষায়
থাকবেন না

JE-6-BEN



বিভিন্ন রাঙের এবং বিভিন্ন মাপের
সকল প্রকার সিলিং ফ্যান
এবং টেবিল ফ্যান
এখন পাওয়া যাচ্ছে।

নিকটতম উবা বিক্রেতার কাছে কিষ্টির বিবরণ ঘেঁষে নিন।

সিটি সেলস্ অফিস : পি-১০, মিশন রো এন্ড্রুটেশন, কলিকাতা-১

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড

ডাকে, সেইটুকুই জেনে রেখেছে। ওর কথা ছেড়ে দিন, আমিও ঐ বয়সে আমার মায়ের নাম জানতাম না, কিন্তু বৃন্দ প্র-পিতামহের নাম গড়গড় করে মুখস্থ বলেছি।.....

বলে হেসে উঠলেন লেফটেন্যান্ট ঘোষ। হাসি ধামিয়ে বললেন, যাই হোক, এখনো হাল ছাড়িনি। ডি, সি, কে একটা ডি, ও, লিখেছি। আজ ভাবছি রিমাইন্ডার দেবো। কেন, মায়ের কথা কিছু বলছিল নাকি আপনাকে?

—আজ্ঞে না। ওর খাতাটা দেখছিলাম, বলে আশুবাবু দিলীপের নোটবুকটা এগিয়ে দিলেন।

প্রথম পাতার শব্দ নাম। ঠিক মাঝখানে, দু'পাশে সমান ফাঁক রেখে গোটা গোটা অক্ষর—শ্রীদিলীপকুমার ভট্টাচার্য। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুপার। তারপর পাতা ওলটতেই চোখে পড়ল কাঁচা কিন্তু পরিষ্কার হাতে লেখা কয়েকটি লাইন—মাগো, কাল রাত্রেও আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি। তুমি বারান্দায় বসে কাঁদিছিলে। সেই যে ঘুম ভেঙ্গে গেলে, আর ঘুমুতে পারিনি। আমার জন্যে কেঁদো না। আমি খুব ভাল আছি। এঁরা সবক'লে আমাকে ভালবাসেন।

তোমার থোকা।

কিছুই নয়; অত্যন্ত সাধারণ একখানা চিঠি, সব ছেলেই যা মায়ের কাছে লিখে থাকে। তফাত শুধু এই, সে চিঠি পাঠানো যায়, তার জবাব আসে; কিন্তু এ চিঠি কেবল লেখা রইল এ খাতার পাতায়। যার উদ্দেশ্যে লেখা তার কাছে কখনো পৌঁছবে না, সামান্য একটা উত্তরও আসবে না কোনোদিন।

নোটবুকেরানা আস্তে আস্তে বন্ধ করে জানালার বাইরে লক্ষাহীন দৃষ্টি মেলে শব্দ হয়ে বসে রইলেন ঘোষ-সাহেব। আশুবাবুও আর কোনো কথা বললেন না। নিঃশব্দে নোটবুকগুলো, কুড়িয়ে নিয়ে নত হয়ে নমস্কার করলেন এবং অনেকটা অজস্রের মত ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

ডেপুটি সুপারের প্রথমটা মনে হল, কুল শব্দেই। তার পরেই জেগে উঠল।

থেকে পড়লেন,—বলেন কি সন্ত! এত-গুলো ছেলে, ওয়াকশপে না গিয়ে করবে কী?

সাহেব হালকাভাবেই বললেন, ওখানে গিয়েই বা করছেটা কী? কাঠ-মাষ্টারের পাকা চুল তোলা, নয় তো লোহা-মাষ্টারের পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়া? এই ভয়ানক ভয়ানক দরকারী কাজগুলো না-ই বা করল।

সন্তোষবাবু 'সিরিয়াস' মানুষ। কাজের কথায় মধ্যে ঠাট্টা-তামাসার আমদানী পছন্দ করেন না। বললেন, রুল-এ তো ওদের বেলায় কোনো এক-সেপশন্' নেই। বড়, ছোট সব এজ-গ্রুপ-এর জন্যেই এক ব্যবস্থা তিনচুটা স্কুল আর পাঁচ ঘন্টা 'ওয়াকশপ'। সে রুটিন আমরা বদলাই কেনন করে?

সাহেবও সে কথা জানেন। জানেন বলেই, দশ-বারো বছরের অপজন্ড ছেলে-গুলোর এই পাঁচঘন্টা ওয়াকশপ-ট্রেনিং-এর হাস্যকর প্রহসন প্রতিদিন চোখের উপর দেখেও নিঃশব্দে সহ্য করে গেছেন। ঠিক নিঃশব্দে নয়, নিজের মনে গজগজ করেছেন, মাঝে মাঝে মেজাজ চেপে রাখতে না পেরে নিজের ঘটাফ-এর উপর অস্বাভাবিক ঝেড়েছেন, তার বেশী আর কিছু করতে পারেননি। কতৃপক্ষের সঙ্গে লেখালোখি চালাতে পারতেন। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন, তার থেকে কাগজ কলম ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কোনো বস্তুই লাভ হয় না। যে পদার্থ অনড়, তাকে নড়ানো যায় না। তাই লেখালোখিতে আর উৎসাহ পান না। অথচ, ছেলেগুলোকে এখনই দেখেন, ছটফট না করেও পারেন না। সেক্রেটারিয়েটের দূর পাল্লায় বসে যারা লেখনী চালান, তাদের সুবিধা হল ঐ দরজা। সেই লেখনীর প্রতিটি খোঁচায় যারা উঠছে পড়ছে, তারা থাকে চোখের আড়ালে। দেখতে হয় না খেঁচাটা কোথায় গিয়ে লাগল, অথবা ঠিকমত লাগল কিনা।

ডেপুটি যে আপাত্তি ডুললেন, তার উত্তরে ঐ ধরনের প্রসঙ্গই শোনা গেল ঘোষসাহেবের মুখে। বললেন, মুন্সিফ কি বলেন? 'রুল' বারা তৈরী করেছেন,

তাদের হাতে ছিল শব্দ, দিস্তা করেক কাগজ আর একটা করে কলম; আর আমাদের হাতে এসে পড়েছে কতগুলো জল-জ্যান্ত মানুষ, তাও পুরো মানুষ নয়, কোনোটা আধখানা, কোনোটা সিকি। প্রত্যেকের জাত, গোষ্ঠ আলাদা, মন, মেজাজ আলাদা, রুচি, প্রকৃতি, মেধা বৃদ্ধি সব আলাদা। অথচ একই রুল-এর রোলার চালিয়ে সবগুলোকে লেভেল করতে হবে। কেন? এরা কি কতগুলো গাছ না ইঁট পাথর?

এই জাতীয় 'বড় বড়' কথার মূল্য যে কী, সন্তোষবাবু কোনোদিন বুঝে উঠতে পারেন না। অথচ উপরওয়ালার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করাও যায় না। অফিস ডিসিপ্লিনের খাতিরে এগুলো অনেক সময় শব্দেই হয়; তাই শব্দেই গেলেন। ঘোষ আবার বললেন, কর্তাদের মাথায় ঢুকেছে ভোকেশনাল ট্রেনিং। কি করতে হবে? না; কতগুলো দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলেকে ধরে রোল পাঁচ-ঘন্টা ওয়াকশপে কাজ করানো হবে। ইজ্, ইট্, নট্, রিডিকুলাস্? হাতে-কলমে কোনো কাজ শেখবার মত বয়স হয়েছে এদের না বৃদ্ধি হয়েছে? তাছাড়া কী অধিকার আছে আমাদের—এই কচি ছেলেগুলোকে এখন থেকে মিস্ত্রী তৈরী করবার। সব সভা দেশের ছেলেমেয়েরা অন্ততঃ চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ইস্কুলে যায়। এদের সে সুযোগ কেন দেওয়া হবে না? না, মশাই; রুল-এ যাই থাক, ওয়াকশপের নামে এই বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করতে পারি না। কাল থেকে চৌদ্দ বছরের নীচে বাদের বয়স, সব কচিকে আপনার ঐ 'কামান'এর মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসুন। আপনিও জানেন, আমিও জানি, ওদের দিয়ে ওখানে কোনো কাজ হয় না, শুধু গোয়ালর যাবার রাস্তা তৈরী হয়।

—'ঐ সময়টা কী করবে তাহলে?' বিরতিপূর্ণ শব্দ মুখে জানতে চাইলেন ডেপুটি।

—পড়বে। হেডমাষ্টারকে বলে দিন, ওরা যেন ভালোমত পড়াশুনা করে। সেদিকে দৃষ্টি হতে হবে।

সন্তোষবাবু, চলে যাচ্ছিলেন। সাহেব ঐ সঙ্গে আর একটা নতুন নির্দেশ যোগ করলেন, 'ওদের মধ্যে যারা কিছুটা লেখাপড়া জানে, যেমন দিলীপ বা মকবুল, তাদের কয়েকঘন্টা করে প্রেস-এ কাজ লিখতে দিন। মেশিনে নয়, কম্পোজ লেখাতে বলুন।'

(কমলাঃ)

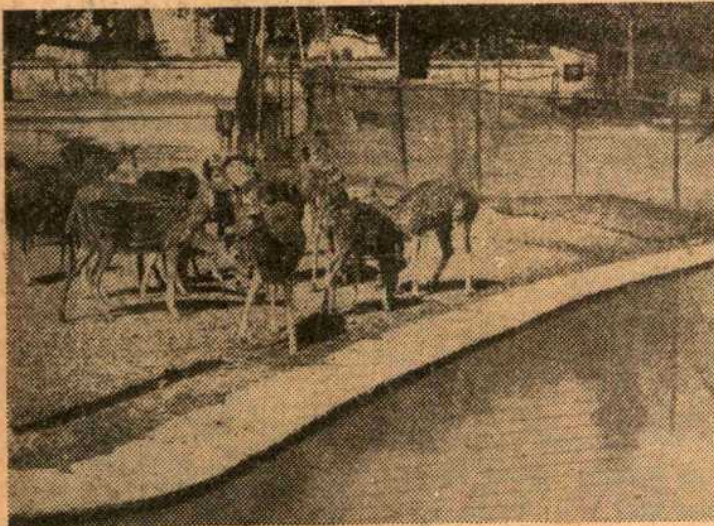
ছুটির দিনের

পড়া

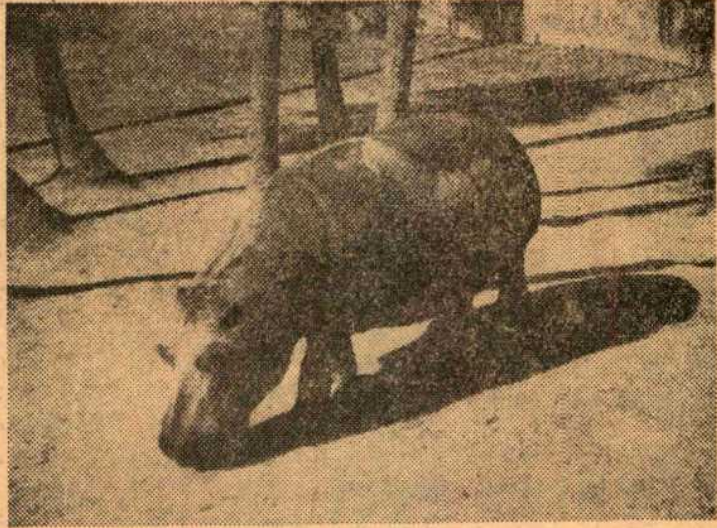
শশাঙ্ক সেনগুপ্ত

(২)

শিক্ষামূলক ভ্রমণ অনেকের মতে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। বহু দেশ-দেশান্তর পর্যটন করে প্রকৃতি ও বিভিন্ন মানুষের ঠিক-ঠিকানা সংগ্রহ করতে হয়—এ ধারণা অনেকেই মনে মনে পোষণ করেন। চোখ আমাদের সদৃশের তারার দিকেই নিবদ্ধ এবং তার ফলে হাতের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে বহু অপরিপূর্ণ জিনিসই আমাদের হাতের মৃদুতায় এসেও আসতে চায় না—নাগাল এড়িয়ে যায়, সে কথা কি আমরা একবারও ভেবে দেখি? ‘স্ফুলিঙ্গে’ রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ জানিয়েছেন যে, বহু দেশ ঘুরে বহু জিনিস তিনি অন্বেষণ করে বোড়িয়েছেন, কিন্তু তৃণফলকে একটি শিশিরবিন্দুর সহজ সৌন্দর্য তাঁর দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে গিয়েছে। এতদিন দেখেও দেখেননি। আমাদের জীবনেও এই কথা কত মর্মান্তিকভাবে



আলিপুর চিড়িয়াখানায় হরিণের পাল



আলিপুর চিড়িয়াখানায় জলহস্তী

সত্য হয়ে উঠছে বিশ্লেষণ করলেই তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবে।

শিশুরা পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন দেশের জন্তু-জানোয়ারের কথা পড়ে। কিন্তু আমরা কি একবারও তাদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন দেশের জন্তু-জানোয়ার পাখি সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ ও কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলি। অনেক সময় হয়তো সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু চোখের সামনে যা দেখা যায় তার সম্বন্ধে যথেষ্ট খবরা-খবর তাদের জানানো হয় না।

প্রকৃতিবিজ্ঞানে তারা গাছ-পালা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রবন্ধ পড়ে থাকে, কিন্তু সেখানেও কি বট্যানিক্সে নিয়ে গিয়ে ঐ সব বিষয়ের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ

পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না?

এমনি করে যাদুঘর থেকেও তারা অতীতের লুপ্তপ্রায় অতিকায় জন্তু, মানুষের সভ্যতা এবং তাদের জাতব্য আরো বহু বিষয় সম্বন্ধে যাতে ওয়াকি-বহাল হতে পারে সে সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করছি।

প্রাণীজগত সম্বন্ধে শিশুমনে কৌতূহল অসীম। তাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, তাদের শোভা-সৌন্দর্য সহজ প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুরা যাতে উপভোগ করতে পারে সেজন্যে গত অক্টোবর মাসে গভর্ণ-মেন্ট হাউসে একটি ‘মিনিয়েচার জ্যু’ খোলা হয়েছিল। শিশুরা বড় হয়ে এই প্রাণীজগত সম্বন্ধে যাতে গভীর জ্ঞান-লাভ করতে পারে এবং তার সুদ্রপাত যাতে বর্তমানেই করা সম্ভব হয় এজন্যে চিড়িয়াখানার মধ্যেই ছোট ছোট ‘চিলড্রেনস জ্যু’ তৈরী করা হচ্ছে। এই ‘মিনিয়েচার জ্যু’ দেখে শিশুরা প্রচুর রোমাঞ্চ ও আনন্দলাভ করবে। খাঁচার মধ্যে জন্তু-জানোয়ারকে না রেখে উন্মুক্ত পরিবেশে তাদের ছেড়ে রাখা হবে। অবশ্য দূরে সতর্কতামূলক জাল ও পরিখা দিয়ে ঘিরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে, যাতে এর ফলে কোনো বিপদ না আসতে পারে। এখানে অনেক জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চাকে শিশু অবস্থায় মাড়কোড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে

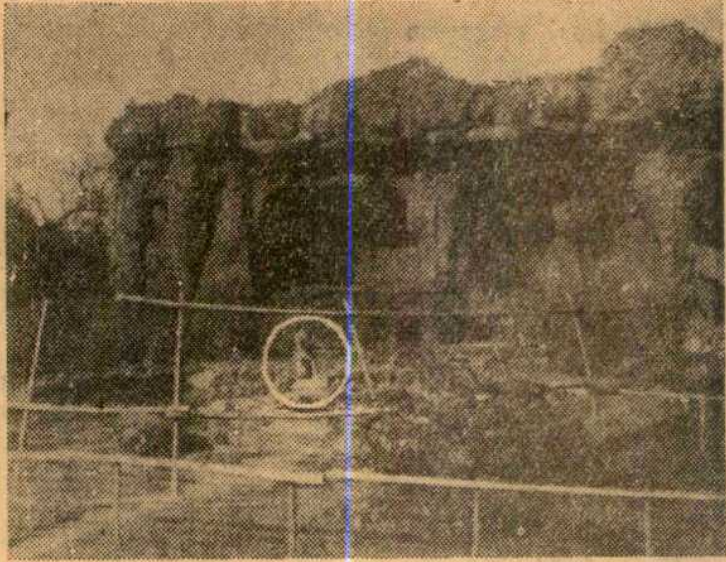
রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই অবস্থা মেনে নিয়ে তাদের অনেকেই পোষ মেনে যাচ্ছে। এই উপলক্ষে সর্বপ্রথম গাঁর-জঙ্গলের সিংহশাবকদের কথা উল্লেখযোগ্য। তৈরী-করা কালো পাহাড়ের কোলে তিন-চারটি সিংহশিশুকে ছেড়ে রাখা হয়েছে। এই নকল পাহাড়ে গুহাও আছে। সেখানে তারা নিজেদের প্রয়োজনমত ঢুকে পড়ে বিশ্রাম করতে পারে। দূরে জাল ও পরিখা দিয়ে ঘিরে দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিত্র থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে। সহজ প্রাকৃতিক পরিবেশে সিংহের সৌন্দর্য আরো নয়নাভিরাম লাগে।

শিশুদের মনোরঞ্জনার্থে মৃত্ত-অঙ্গনে আরো যা যা রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে তার মধ্যে 'লজ্জাবতী বানর' অতি মজার জিনিস। এরা দিনের বেলা ধুমোয় এবং রাত্তির হলে খুঁজে বেড়ায় ফলমূল, পোকা, পাখির ছানা আর পাখির ডিম।

পিঠে তারকা-চিহ্নিত কচ্ছপ আর একটি কৌতুককর দৃষ্টব্য। পিঠের শক্ত



প্রসাধনরতা নারী-মূর্তি
(কলকাতার যাদুঘর)



আলিপুরে চিড়িয়াখানায় নকল পাহাড় এলাকায় সিংহ-শাবক (সাদা বৃত্তের মধ্যে) স্তম্ভের সিংহের প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে তাদের কিছু বলা যেতে পারে। তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে বৌদ্ধযুগের অন্যান্য স্মারকের সঙ্গে। সাঁচীস্তুপের ভাস্কর্যের নমুনা দেখেও তাদের মনে অতীতকালের স্বদেশের ছবি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। মাঝের হলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তাদের দেখানো যেতে পারে খ্রী পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে ধীরে ধীরে কী ভাবে বুদ্ধমূর্তি ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। কী ভাবে গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে গান্ধার শৈলীর বুদ্ধ-

কলকাতার যাদুঘর আরো একটি অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার। ছুটির দিনে সহজেই এখানে আনন্দময় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লেখাপড়ার চর্চা করা যেতে পারে। এখানে সংরক্ষিত প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে খুঁটি-নাটি তথ্য দিয়ে শিশু-মনকে ভারাক্রান্ত না করে প্রাগৈতিহাসিক ও অতীত সভ্যতার মোটামুটি একটি ছবি তাদের চোখের সামনে তুলে ধরা যায়। যাদুঘরে ঢুকেই অশোক-



মূর্তি তৈরী হয়েছে। তারপরে ধীরে ধীরে মোঘলযুগে বুদ্ধমূর্তি মোটা-মুটি একটি স্থির লাভ করেছে। বৌদ্ধসত্ত্ব মূর্তিও গাংখার শৈলী অতিক্রম করে ধীরে ধীরে বুদ্ধমূর্তির মত ভারতীয় ঢঙে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পার্শ্বনাথের মূর্তিও চোখে পড়বে—বুদ্ধমূর্তির আদর্শে তা রচিত হলেও তার বুদ্ধের জৈনদের একটি বিশেষ স্মারকচিহ্ন দেখে আলাদা করে চেনা যায়। এ-ছাড়াও মোঘলযুগের বহু মূর্তি, ভুবনেশ্বরের 'পটলেশ্বর', পুরী মন্দিরের 'শালভজিকা', মোগল ও পারস্যিক স্থাপত্য শিল্পের প্রচুর নিদর্শন দেখা যেতে পারে। আকবরের নকল-করা বিচিত্রিত 'লায়লা-মজনু'র কপিও সেখানে সংরক্ষিত আছে।

মাঝের হল থেকে ডানদিকের হলে ঢুকে মানব সভ্যতার শৈশবকাল থেকে ক্রমবিকাশের ইতিহাস ক্রমে ক্রমে পর্যবেক্ষণ করা যায়। প্যালিওলিথিক যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, তীরের ফলা, নিতা-

ব্যবহার্য পাট্যাদার, নিওলিথিক যুগের প্রচুর নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হবে। মাঝখানে কাঁচের শব্দাধারে রক্ষিত মিশরের মমি বিশেষ দৃষ্টব্য। মহেঞ্জদাড়ার কলস, পাট্যাদার, আভরণ, অলংকার এবং শিল্প-সামগ্রী ও বহু স্মারকচিহ্ন থেকে ঐ যুগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করা সহজ হবে। মাকরান (বালুচিস্তান) থেকে প্রাপ্ত অনুরূপ নিদর্শনাদি থেকেও মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বহু তথ্য লাভ করা যাবে। সিন্ধুসভ্যতার অস্ত্রশস্ত্র, বাসন-পত্র স্বচক্রে দেখলে ইতিহাসে বর্ণিত পাঠ-বিষয়াদি সকলের কাছেই আরো মনোরম হয়ে ওঠা সম্ভব।

বাদিকের হলে ঢুকে আদিম যুগের অতিকায় হাতী, বিশালকায় কচ্ছপ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা করা সম্ভব। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভূ-স্তরের কার্যকারিতা ও প্রকৃতি, বিভিন্ন খনিজ পাথর এবং খনিজ লৌহ ও অন্যান্য খাত সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদ

ও জ্ঞাতব্য বহু দুর্লভ তথ্য পাওয়া যাবে। যাদুঘরের উপরতলে প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় ম্যামথের কঙ্কাল, অধুনালুপ্ত অতিকায় স্তন্যপায়ী ম্যামালিস্, সমুদ্র-গভীরে প্রবাসম্বীপ ও সমুদ্রতলদেশের অন্যান্য রহস্যময় বস্তু রক্ষিত আছে—যে জিনিস বারবার দেখলেও কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না।

ছুটির দিনে বেড়াবার আর একটি সুন্দর উপভোগ্য স্থান বেলগাছিয়ার পার্শ্বনাথের মন্দির। এই মন্দিরের চতুষ্পাশ্বে ছায়াশীতল বাগান, নকল পাহাড়, মৎস্যাকীর্ণ ঝিল দিয়ে সাজিয়ে জায়গাটি সুন্দর করে তোলা হয়েছে। জৈনদের মতে চম্বিশজন তীর্থংকর মহাপুরুষ জৈনধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। এদের মধ্যে শেষ দুজনের নাম পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। পার্শ্বনাথ বারাণসীর এক রাজপুত্র ছিলেন। এক কথায় রাজবেশ ত্যাগ করে শিষ্যদের মধ্যে চারটি বিষয়ে সংযত হবার রীতি প্রচার করলেন। অহিংসা, সত্যভাষণ, চৌব্রহ্মচর্য হতে বিরতি এবং অনাসক্তি। এই চারটি নিয়ম—যা জৈনরা সযত্নে মেনে চলেছিলেন, পরবর্তীকালে মহাবীর তার সঙ্গে জিতেন্দ্রিয়তার সঙ্কলন যোগ করেন। পার্শ্বনাথের এই বাগানে যে পাহাড়টির উপরে একটি মঠ তৈরী করা হয়েছে, অনুরূপ একটি পর্বতে পার্শ্বনাথ সিঁধ্যলাভ করেছিলেন বলে কথিত আছে।

ছুটির দিনে চড়াইভাতি উপলক্ষ্যে বট্যানিকস-এ অনেকেই যেতে পারে। এখানের হাবেরিয়ামে রক্ষিত বিভিন্ন গাছ-পালা সম্বন্ধে জ্ঞান অতি সহজেই লাভ করা যায়। অর্কিড, বিভিন্ন রকমের ম্যাসেনালিয়া ও দুপ্রাপ্য বহু গাছের চারা এখানে দেখতে পাওয়া যাবে। এখানের নাশারিতে বহু গাছ ও ফুলের চারা সযত্নে লালন করা হয়—যার সম্বন্ধে অতি সহজেই জ্ঞান আহরণ করা যায়।

কলকাতা অতি রহস্যময়ী নগরী। বহু মনোরম দৃষ্টব্য বিষয় তার বুকের মধ্যে লুকিয়ে আছে—কাছে থেকেও তা বহু দূরে। ছুটির দিনে ঘুরে ঘুরে সময়মত যদি আমরা সে রহস্যের অনুসন্ধান করি তাহলে খনির তলার লুকানো হীরের মত একেকটি উজ্জ্বল মুহূর্তকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি—যা আমাদের মনে স্থায়ী আলোক বিজ্জ্বল করবে।

কেশের স্বাস্থ্য

কেশের স্বাস্থ্য রক্ষায় ভূঙ্গল অতুলনীয়। ইহা শুধু স্বাস্থ্যমতেজ ও স্নিগ্ধ রাখে না, মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও সুন্দর কাল কেশোদগমে সহায়তা করে।

ভূঙ্গল

সুসঙ্গি মহাত্মা বেন্জৈ টেল
আমুর্বেদীয় মতে প্রস্তুত



BHINGOL 1/61-62

বি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ
কলিকাতা-২২



মেহেদী



কল্যাণ
চৌধুরী

রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের শ্রাবণ মাসটি হল বিবাহিতা মেয়েদের কাছে পরম প্রত্যাশার মাস। আকাশে যখন ধূসর মেঘের ভেলা, ভিজে মাটির গন্ধ বাতাস যখন মস্তুর প্রায় তখনই শ্রাবণ মাসের অষ্টাদশ দিনে, উত্তর ভারতে তীজ পর্ব আসে। এই দিন স্বামীর ঘর থেকে বাপের বাড়ি ফেরে মেয়েরা। শ্রাবণ-সংগীতে মেয়েরা মিনতি জানায় তাদের স্বামীকে:

এতদিন পরে তীজ পার্বনে ফিরে এল
ছোটবেলা
মেহেদী রঙের কুমারী দিনের হাত
রাঙানোর খেলা
হে প্রিয় আমার বাড়ি যাবো আমি,
ডাক দিয়ে গেছে সই
এতদিন পরে তীজের পর্ব আবার
ফিরেছে ওই॥

তীজ পর্বে সুখী গৃহকোণ আরো
সুখী হয়। সকালবেলার পাখী হয়ে
ছোটবেলাটা যেন ফিরে আসে হঠাৎ।

গাছে গাছে দোলনা খাটানো হয়। “ঝুলা” গানে বনস্থলীর হরিৎ পত্র যেন নতুন প্রাণস্পন্দনে কাঁপতে থাকে। “রাজা-শাহী”, “কাজলি লহরীরা” শাড়ির হঠাৎ রঙের ঝলকানিতে সমস্ত গ্রামটাই যেন রামধনুর দেশে ফেরারী হয়ে যায়। শাড়ির সব মেয়েরা রঙীন কাপড়ে, নতুন সাজে তীজ পর্বকে স্বাগত জানায়। অলঙ্কারে প্রসাধনে পুরোনো মূখে নতুন

আলো ফোটে। কিন্তু এই তীজ পর্বের প্রধান প্রসাধন হল মেহেদী। উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানের ১৮ই শ্রাবণ মেহেদীর রঙে লাল।

প্রাক-ঐতিহাসিক কাল থেকেই ভারতবর্ষে মেহেদী সৌন্দর্য চর্চার একটি রমণীয় উপকরণ। হেনা গাছের পাতাই হল সমস্ত রক্তিমতার উৎস। গাছটির বিদেশী উপাধি “লসোনিয়া আলবা”। মেহেদী পাতাকে খেঁতলে মশ্ড তৈরী করে হাত, পায়ের পাতা চিহ্নিত করা হয়।



শুকিয়ে গেলে মেহেদীর রঙ সাধারণতঃ অনেকদিন পর্যন্ত থাকে। অজ্ঞতা গৃহ-চিত্রের অবিনশ্বর নভ'কীরা মেহেদীর লালে প্রসাধিত। পরবর্তী সময়ের রাজস্থানী চিত্রকলায়ও মেয়েদের মেহেদী-প্রসাধনের দৃশ্য বহুরূপে চিত্রিত। তীজ পর্বের দিনটিতে গায়ের সব মেয়েরা মেহেদীপাতার মশ্ড তৈরী করে প্রথমে। মিহি মশ্ডে নজ্রা আঁকার বেশী সন্নিবেশ।

মশ্ডের সঙ্গে সাধারণতঃ লেবুর রস অথবা তেঁতুলের জল মেশানো হয়। কখনো কখনো জাম কিংবা ওক'রার রসও দেয়া হয় রঙটাকে গাঢ় করবার জন্য। জংলা এবং জামিতিক নানান ধরনের নজ্রা আঁকে মেয়েরা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও মেহেদীর রঙ দিয়ে হাতে নম্র লেখে উল্লিকর মত। নজ্রার ওপর নারকোলের তেলের প্রলেপ দিয়ে অনেক সময় উজ্জ্বলতাও বাড়ানো হয়।

উত্তর ভারতের অনেক স্থানে গয়না এবং ফুলের মতই মেহেদী কনে-সাজানোর একটি দেশজ উপাচার। বরের বাড়ি থেকে কনেকে শুকনো মেহেদী পাতার গুঁড়ো তত্ত্ব দেয়া হয়। এই তত্ত্ব-লব্ধ মেহেদীতে প্রসাধিত হয়ে কনে যার বিবাহ-বাসরে :

মেহেদী রাঙানো দুটি হাতে
গান গেয়ে সখীদের সাথে
ভীরু পায়ের চলে ধীরে বালা
গলে তার দিতে বর-মালা॥

বরকেও মেহেদীতে লাল হতে হয়। মারওয়ার দেশের মেয়েরা মেহেদী-শিঙেপ অম্বিতায়। কোনো তুলির সাহায্য না নিয়ে শুধুমাত্র আগুলের সাহায্যেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নজ্রা ফুটিয়ে তোলে তারা হাতের এপিঠে ওপিঠে।



মুসলমানদের মধ্যেও মেহেদী ধর্ম-চারের পবিত্র উপকরণ। মক্কা এবং মদিনায় হজযাত্রার শেষে মুসলমানরা তাঁদের চুল ও দাড়ি মেহেদীতে লাল করেন। শুধু প্রসাধন বা ধর্মার্থেই না, মেহেদী ওষুধ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। অতিরিক্ত গরমে পা ঘায়ে হেজে গেলে মেহেদীর প্রলেপে ভাল হয়ে যায়।

মহীশূরে দশেরা

আজ পাকড়ানী

সবাই চলেছে মহীশূরে। শহরটিই একটি দ্রষ্টব্য বিশেষ। তবে এখানকার আকর্ষণ হল ভারত-বিখ্যাত সেই মহীশূরের মহারাজার দশেরা প্রশেসান। দূর-দুরান্তের থেকে লোক চলেছে এখন এই প্রশেসানের আকর্ষণে। আমরাও চলেছি এই একই কারণে। যেনে অসম্ভব ভীড়। কানপুর থেকে বেরিয়েছি প্রায় তিন-চার দিন হল। চলেছি তো চলেইছি। পথে পড়েছে হায়দ্রাবাদ ব্যাংগালোর। ওখানকার যা দ্রষ্টব্য তাও অল্প সময়ের মধ্যেই যতটুকু সম্ভব দেখে এসেছি। তবে আমার আজকের বক্তব্য তা নয়। বিজয়া দশমীর দিন বেরোবে এই প্রশেসান। তাই অষ্টমীতেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেলাম।

এখানে পৌঁছেই মহীশূরের বন্দাবন গার্ডেন্স দেখতে এসেছি। অশ্রুত এর আকর্ষণী শক্তি। এই বাগানটিকে নিছক বাগান বলে মনে হয় না। এর নৈসর্গিক মনোহারিতার, রঙিন ফোয়ারায় সত্যিই শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলাভূমি বন্দাবনেরই সমতুল্য বলে মনে হয় এটিকে। এখানে সন্ধ্যা হয়নি। ডায়ের ওপর বন্দাবন গার্ডেন্স দেখছি। এত বড় বাগান এক দিনে সবটা ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। তাই ওপরে দাঁড়িয়ে এই বাগানের ছকটির কিছুটা আন্দাজ নেবার চেষ্টা করছি। মহারাজা কৃষ্ণরাজাওয়াড়িয়র এখানে কাবেরী নদীতে একটি বাঁধ তৈরী করেন। তারই জল দিয়ে এই অপূর্ব নয়নাভিরাম উদ্যান বন্দাবন গার্ডেন্স-এর সৃষ্টি। এর বিশেষত্ব ফুলে নয় ফোয়ারায়।

এবার ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছি। বাগানটিও ফোয়ারা বাগিচা সমেত ধাপে ধাপে নীচে চলেছে। প্রথমেই রাধাকৃষ্ণের আলিঙ্গনাবস্থ মধুর যুগলমূর্তির পদপ্রক্ষালন করে শূর, হয়েছে রঙিন ফোয়ারা। এক একটি স্টেপে এক এক রকম ফোয়ারার ডিজাইন। কোনখানে এই উৎকীর্ণ জলধারা একত্র হয়ে ছাতার আকার ধারণ করেছে কোথাও বা একটি ধারা অন্যটির গ্রাম লীলাভরে হেলে পড়ে রামধনুর

সৃষ্টি করেছে। কোনটি বা উদ্ভূত ভঙ্গীতে সোজা উঠেছে ওপরে। কি অপরূপ! প্রত্যেকটি ধাপের আলাদা বৈশিষ্ট্য। কোনটির সঙ্গে কোনটির ভঙ্গীর মিল নেই। নীচু সেডে আলো দেওয়া ফ্লাওয়ার বেড, আর তারই সঙ্গে রং মিলিয়ে ফোয়ারার ধারা উঠেছে। মাঝখান দিয়ে রক্তা। ফোয়ারাগুলির নীচে রঙিন আলো দেওয়ায় অমনি লাল, নীল, হলদে, বেগুনী, সবুজ রং ধরে সেই উৎকীর্ণ জলধারা মরকত মণির মত দৃষ্টি বিকিরণ করছে। এখানকার ঝাউগুলি বড় বড় ডেমের আকারে ছাটা। অমনি একটি ঝাউ-এর নীচে বসে চোখ ভরে এই অপরূপ দৃশ্য ও অগণিত মানুষের মিছিল দেখছি। এই বাগানের এই অপরূপ শোভার কিছুটা আভাস পেরেছিলাম ভি শান্তারাম-এর 'বনক বনক পায়ের বাজে' ছবিতে। তবে সেই রঙিন ছবিতে রঙিন ফোয়ারা বড় যেন আর্টিফিসিয়াল মনে হয়েছিল।

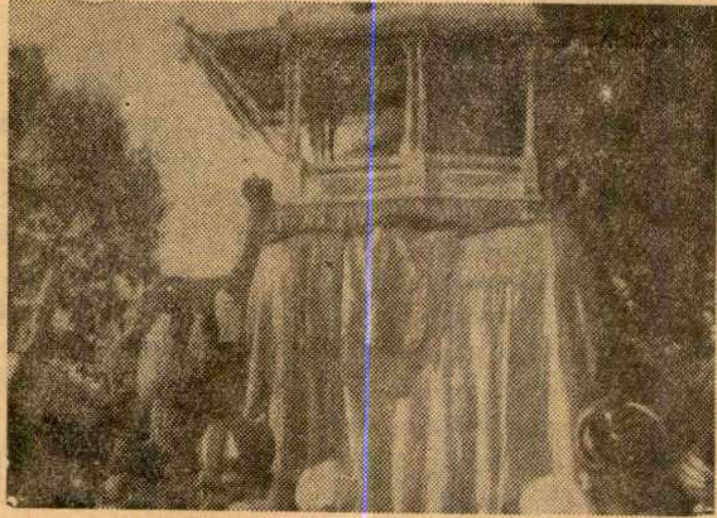
আজ নবমী। এখানকার চিড়িয়াখানা আর মিউজিয়াম দেখতে এসেছি। ছোটর মধ্যে বেশ ভরা চিড়িয়াখানাটি, সিংহ আছে অনেকগুলি। হাতীও রয়েছে দিশী আর অ্যাফ্রিকান। তিন-চার রকম ভাঙ্গুর। আর নানান বরণী পাখী রয়েছে। এখানে গেটে ঢুকতেই একটি নুস্জদেহ, ফেজপরা, বামন মুসলমান পরিষ্কার ইংরেজীতে আমাদের ক্যামেরা নিয়ে যেতে বারণ করল।

এবার গেলাম মিউজিয়াম দেখতে। জগমোহন প্যালেসেই মিউজিয়াম। কৃষ্ণরাজাওয়াড়িয়রের ও অতীতের অন্য রাজাদেরও ব্যবহৃত জিনিসে ভরা এই মিউজিয়াম। বর্তমান রাজার ঠাকুরদা ছিলেন ইনি। ওর সংগ্রহ দেখেই বোঝা যায় উনি কি রকম গুণগ্রাহী রাজা ছিলেন। কত দেশের কত রকমারী বাজনা রয়েছে। এক বাঁগা তাই কত রকমের। সরস্বতী বাঁগা, বিচিত্র বাঁগা, মোহন বাঁগা। কত রকমের বাঁশ। রবাব, বেহালা, সেতার, সরোদ এই সব বাজনা নাকি তিনি নিজে বাজাতে পারতেন। এ ছাড়া ছবির কালেকসনও চমৎকার।

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ আরও কত বড় বড় আর্টিস্টের যে ছবি আছে তার ইয়ত্তা নেই। রবীন্দ্রনাথের আঁকা অহল্যা ও রামচন্দ্রের বিরাট দেয়াল-জোড়া একখানি তৈলচিত্র রয়েছে। ছবিখানিতে বহু যুগ আগের অহল্যার সেই দিনের সেই সদ্যমুক্তি-প্রাপ্তির আনন্দ ও লজ্জা যেন মেঘ রৌদ্রের খেলার মত মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে এবার চললাম চামুন্ডা মন্দির দেখতে। বাসে করে উঠছি পাহাড়ের উপরে। মনে হচ্ছে যেন আবার চলেছি সেই তুহিনতীর্থ কেন্দ্র-বন্দী দর্শনে। বাস একে-বেঁকে ওপরে উঠছে। দূরে মহারাজার সামার প্যালেস 'ললিতা মহল' একটি বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। এই চামুন্ডা পাহাড় থেকে মাইশোরের দৃশ্য ভারী সুন্দর। মন্দিরটি বহু পুরাতন। অপূর্ব কারুকার্য এই মন্দিরের। অবশ্য দক্ষিণের মন্দিরের বৈশিষ্ট্যই এই। মনে পড়েছে হ্যালিবিড্ ও বেলুড্ মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ অশ্রুত জীবন্ত সেই নৃত্যপরা মূর্তি-গুলি ও মহাভারতের পুরো কাহিনীর সেই মূর্তির মাধ্যমে প্রকাশের কথা। বহু দূর থেকে চোখে পড়ে বিশাল মহিষাসুর মূর্তি ও বিরাট নন্দীর দেহ। কালো কণ্ঠপাথরে গড়া মহাদেবের এই বাহনটির উচ্চতা প্রায় দোতলা সমান। মহিষাসুরটি উচ্চতর। মন্দির-ভিত্তরে মা দুর্গার মহিষমর্দিনী মূর্তি। এরা বলে চামুন্ডী বেটো। বেটো মানে অস্ত্র ভাষার পাহাড়। ছোট ছোট ডালায় পূজার উপকরণ নিয়ে বসেছে দক্ষিণী মেয়েরা। পূজা অন্তে ডালিটি ফেরৎ দেওয়া নিয়ম। আস্ত নারকোল, কলা, ধূপ, রোলি, সামান্য ফুল এই হল পূজার উপকরণ। কিনে নিলাম। নবমী পূজা শেষ পর্যন্ত মা দুর্গার চরণেই অর্পণ করতে পারব এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চলেছি পূজো দিতে। দেখি বিরাট লাইন লেগেছে। নিয়মানুবর্তিতার দেশ, তবে পূজো দেবার বেলাই বা তার ব্যতিক্রম হয় কেন? অধৈর্য হয়ে দেখি এখানে আবার পূজো দেবার টিকিট কিনতে হয়। এত বাঁধাবাধি নিয়মের প্রবর্তন সত্ত্বেও দাঁখি ভেতরে অসম্ভব ভীড়। অত রোদ্দুরের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিলাম তাই প্রথমটা ভেতরে ঢুকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, পরে দেখলাম মন্দিরটি বেশ বড়। মূর্তিটিও সুন্দর। মায়ের মূখে যেন মাড়ভবের অভিবাতি ফুটে রয়েছে। বেশীক্ষণ

দাঁড়িয়ে দেখার অবকাশ কই? লাইন এগুচ্ছে। বেরিয়ে এসে সঙ্গীদের—মানে স্বামী-পুত্রকে আর খুঁজে পাই না। ওরাই আমাকে খুঁজে বার করল। কি করে আমাকে এত লোকের মাঝে খুঁজে পেলে? জিজ্ঞেস করায় বলল এই অল্প দেশের মেয়েরা নিজের গায়ের ঘোর রংয়ের সঙ্গে রং মিলিয়ে বিকট ঘোর রংয়ের শাড়ী পরেছে, এর মধ্যে তোমার সাদা শাড়ী ব্যতিক্রম বৈকি। প্রচুর ডাব বিক্রি হচ্ছে এখানে। প্রাণ ভরে ডব খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। উত্তর প্রদেশে এই বস্তুটি মিলে না। ব্যাঙ্গালোরের আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ। এখনে এই অক্টোবরেও বেশ গরম লাগছে।



হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণনির্মিত হাওদায় মহীশূরের মহারাজা

আজই বিজয়া দশমী। এদেশের চিরকালের প্রধানুযয়ী মহারাজ অজকের দিনে রাজবেশে সজ্জিত হয়ে হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণনির্মিত হাওদায় সমাসীন হয়ে সাধারণ দর্শন দেবেন। শুধু তাই নয়, আজ হবে বিজয় অভিযান। হ.তি. ঘোড়া, সৈন্য, সামন্ত নিয়ে পুরোদস্তুর যুদ্ধ-যাত্রা করে যাবেন সাত মাইল দূরবর্তী তারা দেবীর মন্দিরে। সেখানে সমস্ত দিন আরাধনার পর সন্ধ্যায় আবার ঐ সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন। অতীতে এই দিনে রাজারা দিগ্বিজয়ে বেরুতেন। এই যাত্রা তারাই প্রতীক। বিরাট দর্শনীয় প্রেশসন বেরোয় প্রাসাদ থেকে। কত দূর-দুরান্তর, দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক সমাগম হয় এই অতীতের যুদ্ধযাত্রার বিপুল সমারোহ দেখতে। এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে তারা পায় দূর অতীতের বিগত দিনের বীরত্বের ও বাহুবলের স্বাদ। সমস্ত মহীশূর শহর আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে অপরূপ শোভা ধারণ করে। রাজ-প্রাসাদটি মনে হয় ইন্দ্রপুত্রী।

এমনিতে শহরটিই বড় সুন্দর। ফোয়ারা আর ফুলের দেশ। শুধু যে বন্দাবন গার্ডেনস্—এই ফোয়ারা আর ফুলের বৈচিত্র্য আছে তা নয়। প্রত্যেক চৌরাস্তায় আছে বড় বড় ফোয়ারা আর সব রাস্তার ধারে ধারেই আছে ফুলের কেয়ারি। রাস্তাগুলি পরিচ্ছন্ন। আজ শহর লোকে লোকারণা। তবু হৈ-ঠে মারামারি নেই। ঝগড়া ঠেলঠেল নেই। সবাই পদলিখের নির্দেশমত চলেছে।

রাস্তার দু'ধারে সামিয়ানা টাঙ্গান, চোরার পাতা, এখনই লোকে ভরে উঠেছে। অথচ সেই বেলা তিনটের প্রেশসন বেরবে। কত লোক ফুটপাথের ওপর ঐ রোন্দের মাথায় করে বসে রয়েছে। অতি দীন-দরিদ্র যারা তারাও এসেছে রাজদর্শনে—কিন্তু তাদের চীর-বাসখানিও কত পরিচ্ছন্ন। এই পরিচ্ছন্নতাবোধই দক্ষিণের বৈশিষ্ট্য। কত অ্যামেরিকান সাহেব-মেম এসেছে তাঁদের মুভি-ক্যামেরা নিয়ে—বর্তমানের এই অভিনয়ের মাধ্যমে ভারতের পুরাতন ঐতিহ্যের কিছু আভাস পাবার আশায়। আমারও এই বিষয়ে পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা নেই। আজই দেখে চক্ৰ সার্থক করব।

ঐ আসছে শোভাযাত্রা। প্রথমে আশা-সৌটাধারী পদাতিক সৈন্য সমস্ত রাস্তা

কাঁপিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ওদের পেছনে এলো গুর্খা শাস্ত্রীর দল। তারপর চলল ঢাল-তরোয়াল হাতে দক্ষিণী সৈন্য। মাঝে মাঝে এক একদল বাজনাদার চলেছে। গোয়ার বাজনা, দিশী বাজনা সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করা। এরপর মেয়ে-পল্টন। তাদের পেছনে এল বিরাট এক রণ-হস্তীর মিছিল। বড় থেকে ছোট সুন্দর সাজে সাজে সাজান। যেমন সুন্দর এদের দেহের আলপনা, আর তেমনি বৈচিত্র্য এদের অলঙ্কারে। বহুক্ষণ ধরে চলেছে হস্তীযুগ্ম। এই অশ্রুত রণসজ্জা দেখছি অভিভূত হয়ে। এর পর এলো নানারকম ট্যাবলো। বড় বড় লরিতে সাজান। কিটুরের রানী বিনামা তলোয়ার উঁচিয়ে ঘোড়ার উপর বীরাগ্না সাজে বসে আছেন। এই মহীরসী মহিলা ঝাঁসীর



বিবাহে ও উপহারে
এস, সি, সরকারের
গহনা
অভিলানী
ফোন-৩৪-২৫০৩

এস.সি.সরকার ৩৩ কোং
ভুয়েলোস

১২৫-বি, বহুবাজার স্ট্রীট-কলি-১২
১৭৭-১৬৭-বি, বহুবাজার স্ট্রীট-কলি-১

রানীর মতই নিজের দেশ কিটুরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসিহস্তে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পরেরটিতে সিম্ধকুলতলে জ্যোতির্ময় শ্রীগৌরাঙ্গা ধ্যানে বসেছেন। তারপর দশ-প্রহরণধারিণী চামুণ্ডামূর্তি। টাবলো শেষ হতেই দেখলাম আমাদের সেই রূপ-কথার গণ্ডে শোনা সন্তানবাহিত স্বর্ণ-রথ। সূর্যালোকে ঝলমল করছে। ভিতরে অসূর্যস্পন্দা কেউ থাকায় চারিদিক কিংখাবের পর্দায় মোড়া। এবার এক কালো পাহাড়ের মত উঁচু মেঘবর্ণের রাজহস্তীর পৃষ্ঠে ঝলমল করে উঠলো সোনার হাওদা। মহারাজা বসে আছেন। পরিধানে ব্রোকেটের আচকান, চুড়িদার পায়জামা। কণ্ঠে মস্তুর সাতনরী—প্রকোণ্টে হীরকবলয়, মস্তকে উষ্ণীষ, তার মধ্যমাণি একটি মস্ত হীরে ঝকঝক করছে সূর্যের আলো পড়ে। ক্ষণকালের জন্য পারিপার্শ্বিক ভূলে মূর্খাবিস্ময়ে অধাক হয়ে চেয়ে রইলাম। মনে হল বহু পতাস্ফী পেরিয়ে কোন অভীতের গৌরবময় রাজ্যে উপনীত হয়েছি। শব্দ আমিই আত্মবিস্মৃত হইনি, দেখলাম আপামর জনসাধারণ দূহাত দিয়ে রাজার চলে-যাওয়া পথের ধুলো ভূলে মাথায় রাখছে, ফেলে-যাওয়া ফুল আঁচলে বাঁধছে। এখনো রাজার প্রতি এত শ্রদ্ধা! আড়ম্বরের প্রতি গ্র্যাজারের প্রতি এত মোহ! তাহলে জমীদার শ্রেণী শব্দ শোষণই করেনি, সূশাসনও করেছে, প্রজাদের দুঃখ-দরদও বুঝেছে। দান-ধ্যানও করেছে।

হায়দ্রাবাদ-এর শালারজঙ্গ মিউজিয়াম দেখার পর গিরেছিলাম নিজাম বাহাদুরের

ফালাকনুমা পালেস দেখতে। ঐ ছোট ফালাকনুমা স্টেশনের স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যেটুকু বুঝেছিলাম তাই বলি। ঐ বৃক্ষ স্টেশন-মাস্টার আলা হজরৎ নিজাম বাহাদুরকে শত কোটি ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'বড় সুখে ছিলাম ঐ সময়ে, কারণ তখন কোয়ার্টার, কয়লা, ইলেকট্রিক ও চিকিৎসা ছিল ফ্রি। আর রেশনও পেতাম কম দামে। তাছাড়া রিটারার করার পর সমগ্র ভারত ভ্রমণের জন্য ফ্রি ফ্যামিলি পাশ পাওয়া যেত। আর এখন তো কোনটিই ফ্রি নয়। জিনিসপত্রও আগের তুলনায় অগ্নিমূল্য, কিন্তু মাইনে বাড়িনি। সেই একই অঙ্কে আটকে আছে বেতন।

দিনের দেখা মাইশোর রাতে যেন আর চেনা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন কোন অলকাপুরী দেব-ভবনে বিবাহ-বাসর বসেছে। প্রাসাদের ভোরণে বসেছে রোশনচৌকি। নহবতে তান ধরেছে পুরবীতে। আলোয় আলোয় সমস্ত শহর ঝলমল করছে। প্রতিটি ফোয়ারা, গাছ সবচেয়েই আলোর ঝিকিমিকি। প্রাসাদটি তো, কি আর বলব—আগেই বলেছি যেন ইন্দুপুরী। এবার প্রশেসন ফিরবে।

উৎসুক হয়ে উঠেছে জনতা। ঐ এসে পড়ল প্রশেসন। এর নাম টর্চলাইট প্রশেসন। প্রত্যেকের হাতে একটা করে জ্বলন্ত মশাল থাকায় দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন একরাশ জোনাকি জ্বলছে। এবার কাছে এসে পড়লো সেই আলোকোজ্জ্বল বিরাট শোভাযাত্রা। এই মশালবহন জয়ের পরিচায়ক। প্রাসাদে মংগল-শব্দ বাজছে, বিজয়ী সেনানীকে

অভিনন্দন করছেন পুরনারীরা। আরও তিন-চারটে ব্যান্ডপার্টি মিলে থাকবে পরে। বাজনার তালে তালে পা ফেলে চলেছে ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা। যেমন সুন্দর তেজী ঘোড়া, তেমনি জমকালো জরীর পোষাকে সজ্জিত তাদের নও-জওয়ান সওয়াররা। খাপ-খোলা তলোয়ার হাতে বীরবিক্রমে চলেছে শোভাযাত্রার পুরোভাগে। ঘোড়ার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ ও সওয়ারের হাতের তরোয়ালে মশালের আলো যেন পিছলে পিছলে যাচ্ছে। যাবার সময় এরা ছিল সবচেয়ে পেছনে। মহারাজ এখন ক্রান্ত তাই রোলস রয়েসে ফিরলেন। মূর্তি ক্যামেরা হাতে সাহেব-মেমদের ছুটোছুটির অন্ত নেই। শোভা-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলতে তুলতে তারাও প্রাসাদের ভেতর চলে গেল।

এই প্রশেসন গভর্ণমেন্ট থেকে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কারণ মহারাজা তো আর এখন সত্যি মহারাজা নন। মহারাজা সজেছেন। তিনি তো এখন এই মহাশয়ের গভর্নর, সুতরাং তাঁর কি এজিয়ার আছে এই শোভাযাত্রা করার? কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের বিপুল আন্দোলন আর দাবী এই শোভাযাত্রা বার করিয়ে ছেড়েছে, তারা অন্ততঃ একদিনের জন্যও তাদের রাজাকে সত্যিকারের রাজ-বেশে দেখতে চায়।

উৎসবান্তে এবার ভারক্লান্ত মনে ফিরে এলাম 'দশপ্রকাশ' হোটেলে। বিরাট পাঁচতলা হোটেল-বাড়ী। যেন রাজভবন। তবে রাজকীয় খরচ লাগে না এই রকম। দক্ষিণের খাবার স্বাদে ও দামে ভালই। উৎসব-শেষে এবার যাবার তাড়া পড়েছে সকলের। অতবড় হোটেলে সকাল থেকে তিল ধারণের স্থান ছিল না। অথচ এই রাতেই তার অধিক খালি হয়ে গেল। আশ-পাশের গ্রাম বা শহর থেকে যারা এসেছিল চলে গেল তারা। আমরাও কাল রওনা হব। আবার ফিরে যাব সেই বৈচিত্র্যহীন অভ্যস্ত জীবনযাত্রায়। শব্দ মনের মণিকোঠায় চিরজাগরুদ হয়ে থাকবে এই দক্ষিণ ভ্রমণের অপূর্ণ স্মৃতি। আর কখন কখন স্বপ্নঘোরে দেখব এই বিরাট শোভাযাত্রার অপূর্ণ শোভা।



॥ সর্বকালের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক ॥

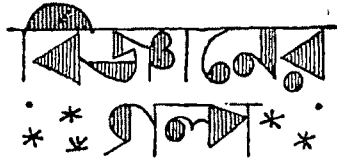
রবীন্দ্রনাথের 'সে' এক গেছো বাবার গল্প বলেছিল। "বাবা সেদিন ডুমুর গাছে চড়ে বসে পা দোলাচ্ছিল; ভেঁকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চিটেগুড়, তামাক তৈরি করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তাঁর হাঁড়ি গেল টলে—চিটেগুড় তার মুখ চোখ গেল বঁজো। বাবার দরার শরীর। বললে, ভেঁকু, তোর মনের কামনা কী খুঁলে বল। ভেঁকুটা বোকা, বললে, বাবা, একখানা টানা দাও, মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল এক-খানা গামছা। মুখ চোখ মুছে উপরে বখন তাকালো তখন আর কারও দেখা নেই।" শাল নয়, দোশালা নয়, শুধু একখানা গামছা! কিন্তু এই গামছার দোলাতেই ভেঁকুর কপাল ফিরে গিয়েছিল।

এমনি আর এক গেছোবাবার গল্প বলেছেন বিখ্যাত লেখক ভ্যান লুন। এই গেছোবাবা সারা পৃথিবীর মানুষকে জীবজগতের শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভেঁকু একহাঁড়ি চিটে-গুড় নিয়ে যাচ্ছিল। আর ভ্যান লুনের গল্পের 'আমি' ও তার বন্ধু কল্পনার ডানা মেলে এমন এক জগতে হাজির হয়েছিলেন যেখানে সময়কে খুঁশিমতো পিঁছিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে। এই দুই বন্ধু এমনিভাবে অতীতের বিখ্যাত সব ব্যক্তিদের ডিনারে আমন্ত্রণ করতেন। প্রতি শনিবার সন্ধ্যে সাতটার সময় এই ভোজের আসর বসত।

একবার দুই বন্ধুর কী খেয়াল হল, ভোজের আমন্ত্রণ পাঠালেন সর্বকালের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের উদ্দেশ্যে। বিশেষ কারও নাম করা হল না, অনির্দিষ্ট একটি আমন্ত্রণ। কাজেই দুই বন্ধুর আগে থেকে কোনো ধারণাই ছিল না—ভোজের টেবিলে, সেদিন কার শুভাগমন হবে।

দু'জনে অনেক জল্পনাকল্পনা করলেন। এডিসন আসবেন কি? কিংবা শ্বেয়ার্স? মধ্যযুগে যারা বারুদ আবিষ্কার করে মানুষকে স্ব-প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? মার্কিনী বা নয় কেন? এই বেতার যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটি তো তাঁরই। রাইট ভাইদুটিও তো আসতে পারেন। এই রকেট-যুগের মানুষকে তাঁরাই তো প্রথম উড়বার কায়দা শিখিয়ে-ছিলেন। এমনি ভাবে অজস্র নাম তাঁরা ভাবতে লাগলেন। যে-নামই ভাবছেন মনে হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের সম্মান একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। আবার অন্য নাম মনে পড়তেই সেই নামটি বাতিল হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে অন্য সমস্ত নাম বাতিল করে দিয়ে ধরে থাকলেন শুধু



॥ অল্পস্কান্ত ॥

একটি নাম। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। যিনি বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে নির্দিষ্ট দিন ও ক্ষণটি হাজির হল। শনিবারের সন্ধ্যে সাতটা।



দুই বন্ধু আমন্ত্রিত অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সদরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। সাতটা বাজল। দুই বন্ধু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, এমন সময়ে শুনতে পেলেন বাড়ির ভেতরে প্রচণ্ড একটা সোরগোল ও লুটোপাটি। শব্দটা যেন খাবার-ঘর থেকেই। দুই বন্ধু ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলেন খাবার-ঘরে।

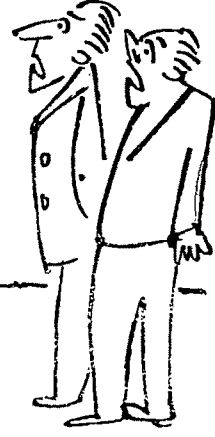
তারপরে বে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে দু'জনেরই চক্ষুস্থির। সবকিছু চেয়ার ওলোট-পালোট, টেবিলের ওপরে মদের বোতল সাজানো ছিল, সেগলোরও একই অবস্থা। পেয়লা ও পিরীচ ভাঙা-চোরা। মদের বোতল থেকে মদ গড়িয়ে পড়ে মেঝে ধৈ-ধৈ। জ্বলন্ত মোমবাতি উলটিয়ে পড়েছে ফুলদানির ওপরে আর ফুলগুলো পড়ে পড়ে অগ্ন্যার। দুই বন্ধু একনজরেই বুঝতে পারলেন যে খাবার-ঘরে একটা তাণ্ডব ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

কিন্তু কোনো মনুষ্যমূর্তি দুই বন্ধুর চোখে পড়ল না।

শেষকালে একজনের চোখে পড়ল। তিনি অপর জনকে ইসারা করে দেখিয়ে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছ! ওটা কী?'

"ওটা"-ই বটে! রবীন্দ্রনাথ যে গেছোবাবার কথা লিখে গিয়েছেন তিনিও বোধহয় এই রকমটিই দেখতে ছিলেন। দুই বন্ধুর মনে হল, ঘরের ভেতরে যে জীবটির আবির্ভাব হয়েছে সে মানুষও নয়, বানরও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা। শিপাজী বা ওরাংওটাং জাতীয় বনমানুষ বললেই যেন ঠিক বোঝানো যায়। কিন্তু তাও নয়। বনমানুষ বটে কিন্তু চেহারাও ও চালচলনে মানুষের লক্ষণটাই যেন বেশি প্রকট।

লম্বায় ফুট পাঁচেক হবে। সর্বাঙ্গ ঘন লোমে ঢাকা, এমন কি মুখমণ্ডলও। হাতদুটো খাবার মতো। কপালটা ছোট আর চালু। সটান খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না, মাথাটা ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে আর হাঁটুদুটো ঝুঁকে যায়।



দুই বন্ধুর মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাঁরা তাকিয়ে রইলেন। মানুষ অথচ পুরো-পুরি মানুষ নয় এই জীবটিকে দেখে তাঁরা স্বভাবতই সন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে কৌতুহলীও কম হননি। জীবটি না ওরাং-ওটাং, না মানুষ। অথচ দুই-ই।

অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে দুই বন্ধুর একজন গলা খাঁকারি দিয়ে উঠলেন। জবাবে উৎকট রকমের ঘড়-ড়-ঘড়-ড়-ঘড় একটা আওয়াজ পাওয়া গেল মাত্র। এই আওয়াজের কোনো অর্থ দুই বন্ধুর বোধগম্য হল না।

দুই বন্ধুর চোখের সামনেই জীবটি টেবিলের ওপর থেকে মস্ত একটা মুরগির ঠ্যাণ্ড তুলে নিয়ে পরমানন্দ চিবোতে লাগল। চিবোবার ধরন দেখে বোঝা গেল, খাদ্যবস্তুটির স্বাদ সে খুবই তারিফ করছে। দুই বন্ধু তাকিয়ে দেখলেন, টেবিলের ওপরে যতো খাবার সাজানো হয়েছিল সবই প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

ঘরের এককোণে একটা লাঠি ছিল। দুই বন্ধুর একজন সেই লাঠিটা হাতে নিয়ে জীবটিকে তাড়া দিতে চেষ্টা করলেন। চকিতে দৈত্যের মতো হিংস্র চেহারার সেই জীবটি প্রচণ্ড রক্তমের একটা ছুঁকার ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল। আর তখন দেখা গেল, তার হাতে রয়েছে ঘষা পাথরের চকচকে একটা টুকরো। এই পাথরের টুকরোটা নিশ্চয়ই সে সংগে করে এনেছিল এবং পাশে নিয়ে বসেছিল। তারপরে সে খাবার মতো হাত বাড়িয়ে আর ছুরির ফলার মতো ধারালো পাথরের টুকরো-টাকে উঁচিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হল।

কিন্তু বন্ধুটির ভাগ্য বলতে হবে, হঠাৎ এই মারমুখী দৈত্যের নজর গিয়ে পড়ল একখণ্ড চকোলেটের ওপরে। আর সম্ভবত মদের নেশাটাও পুরো মাত্রাতেই ধরেছিল। কাজেই খুব সহজেই সে ভুলতে পারল কেন সে অস্ত্র উঁচিয়েছিল। তার সমস্ত মনোযোগ নিবন্ধ হল চকোলেটের খণ্ডটির ওপরে। এবং চকোলেটের খণ্ডটি উদরসাত করার পরে তার কাছে

ঘুমের প্রয়োজনটাই বড়ো হয়ে উঠল। বন্ধুটি বেঁচে গেলেন।

দুই বন্ধু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন একু পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনিই ছিলেন দুই বন্ধুর ভোজের আসরে প্রথম আমন্ত্রিত অতিথি এবং পরবর্তী কালের ভোজ্ঞেও তিনি প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন।

প্রসন্নমুখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন, 'বাপু হে, এতে তেমাদের শিক্ষা হবে কি? এর পরের বার যখন কাউকে নেমন্তন্ন করবে, তখন তার নাম-ধাম স্পষ্টভাবে জানাতে ভুলো না।'

দুইবন্ধু বললেন, 'কিন্তু আমরা তো নিমন্ত্রণ করেছিলাম সর্বকালের সর্ব-দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে!'

পণ্ডিত বললেন, 'তিনিই তো এসেছেন।'

'কী বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলাছি।'

দুই বন্ধু অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস

করলেন, 'তা ইনি কী আবিষ্কার করেছিলেন শূন্য?'

পণ্ডিত বললেন, 'খুবই সামান্য একটি জিনিস। কিন্তু এই সামান্য জিনিসটিই মানুষকে মানুষ করে তুলেছে আর জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

দুই বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, 'জিনিসটা কী?'

পণ্ডিত বললেন, 'একটুকরো ঘষা পাথর যা তোমরা ওর হাতে দেখেছ। পাথর ঘষে ঘষে কি-ভাবে অস্ত্র ও হাতিয়ার বানাতে হয় তা ওরই আবিষ্কার।'

অনেকক্ষণ পরে সর্বকালের সর্ব-দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকটির ঘুম ভাঙল। আড়মোড়া ভেঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ঘন ভুরুতে ঢাকা কুতরুতে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন দুই বন্ধুকে এবং হৃদয় করে একটি ডাক ছেড়ে খোলা জানলা দিয়ে গাছের ডালে বুলে পড়লেন।



বিদেশী গল্প

যদিও নরম গাল সব নাগাবক্রান্ত

বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ স্মিথ সোঁখিন
হোটেলের লিফটের দরজা খুলে স-প্রেম
অভ্যস্ততার সঙ্গে ফারকোট ও পাউ-
ডারের গন্ধ-বহু শ্রীময়ী এক নারীকে
নিয়ন্ত্রিত হাজির। লিফটের নরম আসনে
জড়াজড় করে বসল তারা এবং লিফট
নিচের দিকে যেতে আরম্ভ করল। মেয়েটি
মদে-ভিজা আধ-খোলা গাল বাড়িয়ে দিল
এবং তারা চুমু খেল। নক্ষত্রের নিচে
বারান্দায় বসে এখনি তাদের ভোজন
সমাপ্ত হয়েছে। এখন একটু আমোদ
করার জন্য বাইরে যাচ্ছে।

মেয়েটি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে,
“হোটলে কি সুন্দর কেটেছে, লক্ষ্মীটি।
তোমার কাছে বসলে যেন কবিতার বাদ
নেমে আসে। মনে হয় আমি যেন নক্ষত্রের
দলে মিশে আছি। সেই সময় আমি ভাবি
তুমি সত্যিই জানো প্রেম কাকে বলে।
তুমি আমার ভালবাস। বাস না?”

একটা দীর্ঘস্থায়ী চুমু দিয়ে উত্তর
দিল মিঃ স্মিথ; লিফট নিম্নগামী হল।

মিঃ স্মিথ বললে, “তুমি এসেছ এ
আমার সৌভাগ্য। তা না হলে আজ
আমার অবস্থা কত ভয়াবহ হত।”

“সত্যিই। কিন্তু তুমি কল্পনা করতে
পার ওর সঙ্গে বাস করা আরও কত
ভয়াবহ। যে মুহূর্তে আমি আসবার জন্য
তৈরি হচ্ছি, ঠিক সেই মুহূর্তেই ও
জিজ্ঞাসা করে বসল আমি যাচ্ছি কোথায়।
আমি উত্তর দিলাম, “যেখানে খুঁসি
সেখানে যাবো। আমি তোমার কেনা বাঁদী
নই।” তারপর সে জোর করে বসে আমার
দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকল। আমি জামা
ছাড়ছি, তবু সে তাকিয়ে। নোতুন পাথর
পরছি, সে তাকিয়ে রয়েছে। পাথরটা
মানিয়েছে? বল ত কোন রঙের পাথরে



সব চেয়ে বেশী মানায়? তোমার কি মত?
পাটল রঙের, না?”

“যে কোন সাজে তোমাকে মানায়।

কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তোমাকে এমন
রূপসী দেখাচ্ছে; তোমার এত
রূপ আমি কখন দেখিনি।”

পরিভূত হাসিমুখে মেয়েটি
তার ফারকোট খুললে। তারা
অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল আর
লিফট নিম্নগামী হল।

“তারপর আমি যেই বাড়ির
বাইরে আসতে যাব ঠিক সেই
সময় সে আমার হাতটা নিয়ে
কোন কথা না বলেই চাপ
দিতে লাগল। এত জোরে চাপ

দিয়েছে যে হাতে আমার এখনও ব্যথা লাগছে। সে যে কত বড় পশু, তোমার কোন ধারণা নেই। আমি বললাম, “তা হলে চলি” সে কোন কথা বললে না। সে যে কত ভীষণ অব্যবস্থা। আমি ওকে সহ্য করতে পারি না।”

মিঃ স্মিথ বললে, “সত্যি কত কষ্ট তোমার।”

“আমি যেন এক নিমেষের জন্য বাইরে যেতে পারবো না, একটুও আনন্দ করতে পারবো না। তার ওপর ও এত গুরু-গম্ভীর। তোমার কোন ধারণা নেই। ও কোন কিছুই সহজভাবে, স্বাভাবিকভাবে, মেনে নিতে পারে না। সব সময় সব সমস্যাই এত গুরুতর, যেন তার ওপর ওর জীবন নির্ভর করছে।”

“সত্যি, তুমি কত কষ্ট পেয়েছ।”

“সত্যি, আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। ভীষণ। এত কষ্ট কেউ কখনও পায়নি। কিন্তু তুমি আমার জীবনে আসবার আগে আমি বৃহত্তম ওনা প্রেম কাকে বলে।”

স্মিথ তাকে বৃকের কাছে টেনে বললে, “লক্ষ্মী আমার”, আর লিফট নিম্নগামী হল।

আলিঙ্গনের পর হাঁক ছেড়ে মেয়েটি বললে, “তোমার সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকা, তোমার সঙ্গে স্বপ্ন-দ্যাখা, সে যে কি রোমাঞ্চকর। এ আমি কখন ভুলবো না। সত্যি কথা কি জানো? আর্যভট্টকে নিয়ে বাস করা অসম্ভব। ও সব সময় এত গুরুগম্ভীর। ওর ভিতর কবিতার নাম-গন্ধ নেই। কবিতার জন্য ওর বিশদ-মাত্র ব্যাকুলতা নেই।”

“সত্যিই এ অসহ্য।”

“অসহ্য না? সত্যিই অসহ্য। কিন্তু,” মেয়েটি হেসে স্মিথের হাত ধরে বলে উঠল, “আর ও সব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো চলবে না। আমরা আনন্দ করতে বার হয়েছি। তুমি সত্যিই আমাকে ভাল-বাস?”

“বাসি না।” এই বলে স্মিথ এত জোরে মেয়েটিকে কাছে টানল যে সে হাঁফিয়ে উঠল; লিফট নিম্নগামী হল। মেয়েটির ওপর ঝুঁক পড়ে স্মিথ আদর করতে থাকল; মেয়েটি লজ্জা পেল।

স্মিথ ওর কানে কানে বললে, “আজ রাতে আমরা ভালবাসব—এমন ভালবাসা যা আমরা কখন বাসিনি।”

মেয়েটি স্মিথকে বৃকের কাছে টেনে নিয়ে চোখ বোজাল। লিফট নিম্নগামী হল।

লিফট নামছে ত নামছেই।

শেষ কালে স্মিথ লাফিয়ে উঠল। তার মূখ্য জ্বলছে।

“লিফটের কি হল? থামছে না কেন? আমরা যেন কত যুগ ধরে এই লিফটের মধ্যে বসে গল্প করছি, তাই না?”

“তাই হবে বোধ হয়। আমারও তাই মনে হয়। সময় এত তাড়াতাড়ি যায়।”

“কিন্তু কি ব্যাপার? আমরা কত যুগ ধরে বসে আছি। কি হল?”

লোহার কাঁকরির ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল স্মিথ। গাঢ় গভীর অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। সমান দূত-বেগে লিফট নীচের দিকে নামছে, নামছে; ক্রমাগত নীচের দিকে নামছে।

“কি অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু কেন? মনে হয় আমরা যেন এক অতল গহবরের দিকে যাচ্ছি।”

সে একবার পাতালের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চেষ্টা করল। সেখানেও গাঢ়তম অন্ধকার। তারা ক্রমাগত সেই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

স্মিথ বললে, “আমরা যেন নরকে যাচ্ছি।”

মেয়েটি আতঁনাদ করে বললে, “আমার ভীষণ ভয় লাগছে। তুমি তাড়াতাড়ি ব্রেক চেপে ধর।”

স্মিথ প্রাণপণ শক্তিতে ব্রেক চাপল। কিন্তু তাও নিষ্ফল। লিফট ক্রমাগত নীচের দিকে যাচ্ছে।

মেয়েটি কেঁদে পড়ল, “কি ভয়ংকর! আমরা কি করব?”

“সত্যিই আমাদের কিইবা করার আছে? এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।”

হতাশ মেয়েটি অঝোরে কাঁদতে লাগল।

কেঁদো না, কেঁদো না, লক্ষ্মীটি আমার। অব্যবস্থা হয়ো না। আমাদের আর কিছু করার নেই। এস, আমরা বাসি। আমরা দুজনে এখানে চূপ করে বসে থাকব। খুব কাছাকাছি বসব। দেখব কপালে কি ঘটে। লিফটটা থামবে, কোথাও না কোথাও গিয়ে থামবেই।”

তারা বসে প্রতীক্ষা করতে থাকল।

মেয়েটি বললে, “ভেবে দ্যাখো কি কপাল আমাদের। আমরা যাচ্ছিলাম একটু আনন্দ করতে। আর কি হল।”

“এ যেন শয়তানের কারসাজি,” স্মিথ বলে উঠল।

“তুমি এখনও আমাকে ভালবাস; বাস না?”

“মগি আমার,” স্মিথ হাত দিয়ে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরল এবং লিফট নিম্নগামী হল।

শেষ কালে লিফট আচমকা এক জায়গায় থেমে গেল। চারপাশে অতি প্রখর আলো; চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওরা নরকে নেমেছে। এক ছায়ামূর্তি এক পাশে সরে গিয়ে বিনীতভাবে লোহার কাঁকরির ফাঁক করে দিল।

চোখ-বলসানো আলোর হেঁচট খোঁতে খেতে স্মিথ ও মেয়েটি নামল। চার পাশে

ভূতুড়ে অপছায়া দেখে ওরা দুজনেই চিৎকার করে উঠল, “আমরা কোথায় এলাম?” একটু লজ্জিত হয়ে ছায়ামূর্তি জায়গাটার বিবরণ দিল।

শেষে বললে, “যতটা খারাপ শুনতে আসলে জায়গাটা কিন্তু অত খারাপ নয়। আপনারা এখানে বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্য থাকবেন। কোন অসুবিধা আপনারদের হবে না। আমি শূন্যেই এক রাত্রির জন্য আপনারদের এখানে বাস।”

খুব তাড়াতাড়ি স্মিথ বলে উঠল, “ঠিক, ঠিক, মাত্র এক রাত্রির জন্য। তার বেশী আমরা আর এখানে থাকতেও চাই না।”

মেয়েটি স্মিথের হাতের ওপর ভর দিয়ে কাঁপছে। আলো বড় চোখে লাগে। কেমন যেন হলদেটে-সবুজ। কিছুই ভাল করে দেখা যায় না। ওদের মনে হল চার পাশে ভাপসা গন্ধ উঠছে। আলোর চোখ একটু সরে গেছে। চেয়ে দেখল ওরা একটা পাকের মধ্যে দাঁড়িয়ে। চারপাশে ঘর-বাড়ি। দরজাগুলো জ্বলন্ত। বাড়ির মাথায় চাপ চাপ অন্ধকার। পর্দা ফেলা; তবু পাশ দিয়ে দেখা যায় যে বাড়ির ভিতরে কি যেন পুড়ছে।

ছায়ামূর্তি জিজ্ঞাসা করল, “আপনারা দুজন কি দুজনকে ভালবাসেন?”

মেয়েটি তার সুন্দর চোখ সুন্দরতর-ভাবে ছায়ার চোখের ওপর রেখে উত্তর দিল, “খুব।”

“তা হলে এ পথে আসুন,” এই বলে পিছনে আসার জন্য ইংগিত করল। পাকের বাইরে এক অন্ধকার রাস্তায় গিয়ে তারা পড়ল। চারি মাথান দরজার ওপর পুরানো ভাঙা লণ্ঠন দুলছে।

“এখানে আসুন।” সে দরজা খুলে দিয়েই মিলিয়ে গেল।

ওরা ভিতরে গেল। ওদের এবার অভ্যর্থনা জানাল এক নারী মূর্তি। মূর্তিটা বেশ মোটা-সোটা, কপালে থাক থাক রেখার ভাঁজ পড়েছে, বিপুল স্তন, গোঁফের গোড়ায় পাউডারের ছোপ। এই অদ্ভুত নারীমূর্তি যখন হাসে তখন সঁসা করে শব্দ হয়। একে দেখে খুব সদাশয় মনে হয়। পুঁতির মত খুঁদে খুঁদে চোখে সর্বত্র ভাব লেগে আছে। কপালের দুই শিঙের ফাঁকে সবুজ সিলেকের ফিতে দিয়ে বাঁধা দু গাছা বিনুনী দুলছে।

নারী মূর্তি বললে, “মিঃ স্মিথ ও তার বান্ধবী? আট নম্বর ঘরে যান।” ওদের দিকে বিরাট চারি বাড়িয়ে দিল সে।

অস্পষ্ট আঁধারে চারিমাথান সিঁড়ি ভেঙে উঠতে থাকল ওরা দুজন। সিঁড়িটা চারিতে তেল-ভেলে; মাঝে মাঝে পা পিছলে যায়। তিনতলার ওপর মিঃ স্মিথ তার আট নম্বর ঘর খুঁজে পেল। ঘরটি

বেশ বড়, কিন্তু বড়ই সাবেক। পুরানো-গন্ধ ভর-ভর করছে। মাঝখানে টেবল, চারটা বড় টেবল। কিন্তু টেবল-খরচের ওপর পোকা-মাকড়সি দাঁড়াইল করছে। দেওয়ালের কাছে সিঁদুর-মোড়া বিছানা। ঘরটা ওদের বেশ মনে ধরে গেল। ওরা কোটের সঙ্গে আবার চুমু দিল। অনেকক্ষণ ধরে।

কোন সাড়া না দিয়ে অন্য ঘর থেকে আর একটা লোক এল। সাজ-গোছ দেখে তাকে ওয়েটার বলে মনে হয়। তার জ্যাকেটের কাটিং খুব অভিজ্ঞ। বড়ের কাছে ঝোলানো তোয়ালে ধপ-ধপে সাদা। সব মিলিয়ে তাকেও দেখতে ভুতের মতন। হাঁটলে তার পায়ের কোন শব্দ হয়না। তার অংগভাঙ্গা যান্ত্রিক; মনে হয় ঘোরের ভেতর চলাফেরা করে। তার শরীরে কঠোরতা, দৃষ্টি সব সময় সামনের দিকে দৃঢ়-নিবন্ধ। তাকে ভীষণ পাশুর দেখায়; এক দিকের রগে বুলেটের দাগ। টেবল মুখে ঘরটা গোছ-গাছ করে রাখল সে। ওয়েটারের দিকে খুব একটা নজর দেরনি ওরা। ওয়েটারকে চলে যেতে দেখে স্মিথ বললে, “আমাদের জন্য মদ দাও। এক বোতল ম্যাডেইরা।” ওয়েটার মাথা নীচু করে অভিবাদন করে চলে গেল।

স্মিথ জামা-কাপড় খুলতে আরম্ভ করল। মেয়েটি স্তব্ধ পড়ল।

মেয়েটি বললে, “ওয়েটার, এখনি ফিরবে।”

“দূর, এই সব জায়গায় ও রকম সংকোচের কোন মানে হয়? ও দিকে চাইতে হবে না। নাও, তুমিও পোষাকের বোঝা নামাও।” মেয়েটি ছলাকলার বাণ ছুঁড়তে ছুঁড়তে জামা-কাপড় খুলে স্মিথের হাঁটুর ওপর বসল। ওদের সুন্দর মানায়।

মেয়েটি মৃদু কণ্ঠে বললে, “এই বিচিত্র জায়গায় ভেবে দ্যাখো আমরা দু’জন। কি রোম্যান্টিক; কবিতার মত। আমি কখন ভুলব না।”

নিঃসাড় ওয়েটার আবার ঘরের ভিতর এল। অতি ধীর ও যান্ত্রিক নিপুণতায় টেবলের ওপর প্লাশগল্লো নামিয়ে মদ ঢালতে আরম্ভ করল। টেবল-ল্যাম্পের আলো ওয় মৃদু পড়েছে। বৈশিষ্ট্যহীন মৃদু; কিন্তু ভীষণ পাশুর। রগের এক দিকে বুলেটের দাগ।

মেয়েটি অকস্মাৎ লাফিয়ে চিৎকার করে উঠল।

“সর্বনাশ, আরাভিড তুমি! তুমি? আরাভিড? সর্বনাশ, ও মারা গেছে। গুলি করেছে নিজেকে! আত্মহত্যা করেছে।”

ওয়েটার স্থির ও অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার মুখে বন্দুগের লেশ-মাত্র নেই। মুখটি কেবল কঠোর এবং ভীষণ গম্ভীর।

“কি করেছ আরাভিড! এ কি সর্বনাশ করলে! এ কাজ তুমি কি করে করতে পারলে! যদি জানতাম, আগে যদি বুঝতাম আমি কিছুতেই বাড়ির বাইরে পা বাড়াইতাম না। তুমিও আমায় কিছুই বলনি। এ বিষয়ে একটা কথাও আমার সঙ্গে হয়নি। আমায় যদি কিছু না বল আমি কি করে বুঝব? সর্বনাশ, ভগবান.....”

মেয়েটির সর্বাঙ্গ কাঁপছে। ওয়েটার অপরিচিতের মত মেয়েটির দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি শীতল ও নিঃশব্দ। তবু তার নজর সমস্ত ভেদ করে সামনের দিকে পড়েছে। ঈষৎ পীতবর্ণ মৃদু যেন একবার জ্বলে উঠল, ক্ষতস্থান থেকে একবিন্দুও রক্ত ঝরল না; কেবল রগের কাছে একটা গর্ত দেখা গেল।

মেয়েটি ডুকরে উঠে বললে, “সাংঘাতিক, কি ভয়ানক! আমি কিছুতেই এখানে থাকবো না। চল, এখনি নিয়ে চল এখান থেকে। আমি সহ্য করতে পারছি না।”

জামা-কাপড়-টুপি ও ফারকোট কোন-ক্রমে মূঠো করে ধরে দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। তার পিছনে পিছনে ছুটলো স্মিথ। দৌড়ে যেতে যেতে সিঁড়ির ওপর পা পিছলে পড়ে গেল ওরা। মেয়েটি বসে পড়ল সিঁড়ির ওপর। পিছনে খুঁখু আর সিগারেটের ছাই লেগে গেল। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে গোঁফ-ওয়ালা নারী মূর্তি। সে যেন সব জানে, সব বোঝে। তাই মৃদু হেসে শিং দোলাতে থাকল মূর্তিটি।

রাস্তায় পড়ে ওরা প্রকৃতিস্থ হল একটু। মেয়েটি জামা-কাপড় পরে, মৃদু পাউডার বুলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠল। দ্রাণ-কর্তার ভাণ্ডারে স্মিথ মেয়েটির কোমরে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। চোখ থেকে পড়-পড় অশ্রু ঠোঁট দিয়ে মৃদু দিল। স্মিথ বড় সদাশয়। ওরা পার্ক অবধি হেঁটে গেল।

ছায়ামূর্তিদের বড় কড়া পায়চারি করছিল। ওদের দেখতে পেয়েই দৌড়ে এসে বললে, “আপনারা বড় তাড়াতাড়ি ফিরলেন দেখছি। ওখানে কোন অসুবিধে হয়নি তো আপনাদের!”

মেয়েটি বললে, “কি ভয়ংকর! সাংঘাতিক!”

“না, না, এসব অভিযোগ এখন আর করতে পারেন না। একথা মনেও ঠাঁই দেবেন না। আগে যদি আসতেন তবু এ-কথার কোন মানে থাকত। আজকাল অবস্থা একেবারে বদলে গিয়েছে। এ-নরক আর আগেকার নরক নয়। আজকাল এখানে অভিযোগ করার মত কিছু নেই। আমরা অবশ্য এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে ঢাক পেটাই না। আমরা চাই জায়গাটা সকলের ভাল লাগুক।”

উত্তর দিল স্মিথ, “ঠিক, ঠিক কথাই। ব্যবস্থা ভালই, খুব উদার বলতেই হবে।”

ছায়ামূর্তি বললে, “যাবতীয় আর্থ-নিক ব্যবস্থা আমরা এখানে চালু করেছি। সব কিছুই নোতুন করে সাজিয়েছি।

“নিশ্চয়ই, যুগের হাওয়ার সঙ্গে তাল রাখতে হবে বৈকি।”

“ঠিক কথা, দেখবেন আজকাল মানুষের একমাত্র আত্মাই কষ্ট পায়।”

মেয়েটি বললে, “ঈশ্বরের করুণা তাই।”

ছায়ামূর্তি ওদের লিফটের কাছে নিয়ে গেল। খুবই বিনীতভাবে মাথা নিচু করে বললে, “নমস্কার। আবার আসবেন।” লোহার ঝাঁঝের বশ্ব করে দিল ছায়ামূর্তি এবং লিফট উধামুখী হল।

সিটে দু’জন দু’জনকে জড়িয়ে ধরে একসঙ্গে বললে, “যাক বাঁচা গেল।”

মেয়েটি ফিস ফিস করে বললে, “তুমি আমার সঙ্গে ছিলে তাই কোনক্রমে এ-যাত্রা পার পেলাম।” স্মিথ মেয়েটিকে কাছে টেনে অনেকক্ষণ ধরে চুমু দিল। আলিঙ্গনের পর নিঃশ্বাস নিয়ে মেয়েটি বললে, “দেখলে আরাভিডের কাণ্ডটা দেখলে! চিরকালই ও বড় অশুভ। ও জীবনে কখন কোন কিছু সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারেনি। অথচ, তাই ত নেওয়া দরকার। যে কোন ব্যাপারই হোক না; সবটাই যেন ওর জীবন মরণ সমস্যা।”

স্মিথ বললে, “অশুভ।”

“আমাকে বললেই পারতো। আমি না হয় বাড়িতেই থাকতাম। তুমি আর আমি না হয় আর একদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে যেতাম। কি ক্ষতি হত বল!”

“সত্যিই ত। আর একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা যেতাম।”

মেয়েটি স্মিথের গলা ধরে বলল, “ও প্রসঙ্গ ত চুকে গেল। এখানে বসে এখনও কি আমরা ওই সব ছাই-পাঁশ ভাববো?”

“না, ও প্রসঙ্গ চুকে গেছে। এখন আর ওই কথা নয়।” স্মিথ মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরল আর লিফট উধামুখী হল।

অনুবাদ : রাম বসু

ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং কবি হিসাবে সুইডিশ সাহিত্যে বড় আসন অধিকার করে জাছেন লাগারকবিষ্ট। ১৮৯৯ সালে এ’র জন্ম হয়। প্রথমে ইনি কবিতা লিখতেন। ১৯১২ সালে এ’র প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ফরাসী দেশে যান এবং কিছুকাল আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হন। সুইডিশ কবিতায় এ’র দান ইংরাজী কবিতায় এলিয়টের অনুরূপ। ১৯৫১ সালে এ’কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুবাদক :

ধর্মপদ

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাত্‌কালিক পৃথিবী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,

“পৃথিবীতে আজ সকল দেশই বাসনার অগ্নিকে প্রবল ও ক্রোধের, দৌরাণ্যকে উৎকট করিয়া তুলিতেছে, আজ ভারতবর্ষ যদি, জড়ভাবে নহে, মূঢ়ভাবে নহে, জাগ্রত সচেতনভাবে বাসনাবদ্ধ-মুগ্ধের আদর্শকে, শান্তির জয়পতাকাকে, এই পৃথিবীব্যাপী রক্তাক্ত বিক্ষোভের উদ্দেশ্যে অবিচলিত দৃঢ় হস্তে ধারণ করিয়া মরিতে পারিত, তবে অন্য সকলে তাহাকে যতই দিক্কার দিক, মৃত্যু তাহাকে অপমানিত করিত না।”

আশ্চর্য মনে হয়, এই উক্তি পারমাণবিক বোমার আঘাতে মহতী বিনষ্টির আশংকার ক্রমপূর্ণ আজকের পৃথিবী সম্পর্কেই বিশেষ প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করেছিলেন ১৩১২ বঙ্গাব্দে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। সোদিন উপলক্ষ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ধর্মপদের চারুচন্দ্র বসু-কৃত রংগানুবাদের আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের মূলে বক্তব্য ছিল, ভারত ও ইয়োরোপের ভিন্নতর জীবন-সাধনা।

ধর্মপদের আলোচনা বাংলা দেশে একদিন বিস্তারিত হয়েছিল। কিন্তু সংপ্রতিকালে ঐ বিষয়ে কোনো আলোচনাই হয় না। হিন্দু ধর্মে গ্রীসভগবদ-গীতার যে স্থান, বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মপদের সেই স্থান। ভগবান বুদ্ধের সাধু-শ্রমসহস্রাধিক জয়ন্তী উৎসব দূরে ভারতে মহাসমারোহে উদযাপিত হলো ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ধর্মপদের আলোচনার আমরা হৃদয় সমর্পণ করিনি।

যে একসময়ে ভারতের অতীত ভবিষ্যৎ বিধৃত, সে একসময়ের বহুতর উপকরণ বৌদ্ধশাস্ত্রে ছড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ‘ধর্মপদ’ প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছেন, “আমাদের দেশে রহুদিন-অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র যুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—আমরা তাহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, ইহাই

আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম নাজার কারণ।.....এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে, একথা মনে করিয়াও কি দেশের জন-কয়েক তরুণ যুবরাজ উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না?”

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সামনে একমাত্র চারুচন্দ্র বসু অনুদিত ‘ধর্মপদ’ ছিল। এরিষয়ে আলোচনাকারী বাঙালীদের নাম : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বসু, সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন শ্রীমৎধর্মাদার মহাস্থাবির।

আধুনিক ভারতীয়দের পূর্বেই ইয়োরোপীয় মনীষীরা ধর্মপদ উদ্ধার অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। এ, জে, এডমান্ডস, ডঃ ফস্বেলে, বান্‌ফ, গগার্লি, উফম, ওয়েবর, ম্যাকসমুলার লাতিন, ফরাসী, ইংরেজী, জার্মান ভাষায় ধর্মপদের অনুবাদ করেন। গত শতাব্দির ষষ্ঠ থেকে নবম দশকের মধ্যেই এই কাজ হয়েছে।

ভারতীয় ভাষায় ধর্মপদের প্রথম অনুবাদ বাংলায়। অনুবাদক চারুচন্দ্র বসু (১৯০৪) : একথা পূর্বেই বলেছি। সে-সময়েই কপিলাশ্রম থেকে স্বামী হরিহরানন্দ সংস্কৃত পদ্যানুবাদ ও বাংলা গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ হিন্দীতে ধর্মপদ অনুবাদ করেন (১৯২১)। শ্রীমৎ ধর্মাদার মহাস্থাবির বাংলায় গদ্যানুবাদ করেন (১৯৫৪)।

ইয়োরোপ ও এশিয়ার সকল প্রধান ভাষায় ধর্মপদের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অধুনা বাংলাদেশে ধর্মপদের চর্চা নিতান্ত ক্ষীণ।

একদা এশিয়ার চিত্তবিজয়ে ধর্মপদ গ্রীসভগবদ-গীতার অপেক্ষা অধিক প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষে গীতার জনপ্রিয়তার কাছে ধর্মপদ ক্ষীণপ্রভ। বোধকরি আচার্য শংকরের হিন্দুধর্ম পুনের-

ভাষ্যের অভিমানে ফলে যখন বৌদ্ধধর্ম তার উৎপত্তি-ভূমিতে মর্যাদা-প্রাপ্ত হয়েছিল, তখনই ধর্মপদ ভারতের মন থেকে অপসৃত হয়েছিল। ধর্মপদ ও ভগবান বুদ্ধের অমৃত-জীবন-কাহিনী আধুনিক পৃথিবীতে ভারতের মর্যাদাবৃন্দের বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সে-কারণে ধর্মপদের পুনঃপ্রচলন ও চর্চা আমাদের দেশে একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত—এই তিন ভারতীয় ভাষাতেই ধর্মপদ এদেশে সুপ্রচলিত ছিল। কালক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধর্মপদ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র পালি ভাষাতেই ধর্মপদ সুরক্ষিত ছিল।

বোধিলাভের পর থেকে মহাপরি-নির্বাণ পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধ জগদ্বিশ্বাস মন্মদ্বন্ধের মধ্যে যে অমৃতবাণী বিতরণ করেন, তারই সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ এই ধর্মপদ গ্রন্থ। এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থটি খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দি প্রথম সংকলিত হয়।

ধর্মপদ বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ত্রিপিটকের অঙ্গবিভাগ। পালি সুত্তপিটকের পাঁচটি নিকায় (অংশ)। তার পঞ্চমটির নাম খুন্দক নিকায় (ক্ষুদ্র অংশ)। এই নিকায় ষোলটি পুস্তকের সমষ্টি; তার দ্বিতীয় পুস্তকটিই ‘ধর্মপদ’। ধর্মপদ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ধর্মগ্রন্থ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বিশ্বমানবের চিত্তে দু-হাজার বছর ধরে শান্তি সঞ্চার করেছে।

ধর্মপদের রহস্য বা তত্ত্ব-বিচারের স্থান নেই। প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ উপাদান থেকেই এর উপমাগুলি সংগৃহীত হয়েছে। ধর্মপদের উপদেশ সহজেই প্রকৃতিপুঞ্জের চিত্ত স্পর্শ করে। শান্তিসম্পাদনী মানুষের কাছে ধর্মপদের মূল্য অপরিমিত।

ভদ্রত আনন্দ কৌশল্যায়ণ ধর্মপদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, “যদি একটিমাত্র পুস্তককে কেহ সারা জীবনের সাথী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বিবেকর গ্রন্থাগারে ধর্মপদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম পুস্তক পাওয়া অসম্ভব।”

অধ্যাপক এ, জে, এডমান্ডস ধর্মপদ অনুবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, “এশিয়া মহাদেশে যদি কোনো অমর মহাকাব্য কখনও রচিত হয়ে থাকে তবে, তা হলো ধর্মপদ। ভারতের ঋষি-মনীষীরা যুগ যুগ ধরে যে অতীন্দ্রিয় মহাজীবন গড়ে তুলেছিলেন সেই জীবনের এই চিরন্তন বাণীসমূহ কত হৃদয়ে যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। দু-হাজার বছরের রোমক ও খ্রীষ্টান সংস্কৃতির পরে আজও সেই বাণী

কোপেনহাগেন থেকে ক্রিস্টিয়ান এবং শিকাগো থেকে সেন্ট পটার্গ'বার্গ পর্যন্ত প্রতি শিক্ষাসম্মেলন ইয়েরোপীয় ও আমেরিকানদের প্রাধিকার অর্জন করেছে।"

প্রাচ্য-প্রতীচ্য জগতের শ্রেষ্ঠ মনোবিদদের দ্বারা পরিচালিত এই ধর্মপদ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা লজ্জাকর। কেবল এই অজ্ঞান ও লজ্জা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই নয়, ধর্মপদের গুরুত্ব আকর্ষণেও আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বাসনার দাপট থেকে মুক্তিলাভের ও কর্মের ভাঙন বৈরিতাহীন প্রয়াসের অম্বিতা থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষ যে সাধনা করেছে, সে-সাধনা আদ্যাবধি আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনকে এবং ইহলৌকিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আমরা কর্মকে জয়ী করতে চাই না, কর্মের উপরেই জয়ী হতে চাই : আমাদের জীবনে এই ভাবেরই আধিপত্য।

রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনায় তাই বলেছেন, "আমাদের গৃহধর্ম, আমাদের সম্মানধর্ম, আমাদের আহা-বিহারের সমস্ত নিয়ম-সংযম, আমাদের বৈরাগ্য-ভিক্ষকের গান হইতে তত্ত্বজ্ঞানীদের শাস্ত্রব্যাখ্যা পর্যন্ত সবই এই ভাবের আধিপত্য। চাষা হইতে পণ্ডিত পর্যন্ত সকলেই বলিতেছে, আমরা দলভ মানব-জন্ম লাভ করিয়াছি, বর্ধিতপূর্বক মর্ত্যের পথ গ্রহণ করিবার জন্য, সংসারের অন্তর্হীন আবর্তের আকর্ষণ হইতে বাহগত হইয়া পাড়িবার জন্য।"

রামপ্রসাদের শাস্ত্র গানে এই মূর্ত্তিপথের ইংগিত আছে, আবার উপনিষদের অশেষানুভূতি-মস্তেও আছে। সরল থেকে কঠিন, সহজ থেকে দুর্গম—সকল চিন্তাপথের পাথেয় ও লক্ষ্য একই। ধর্মপদ এই মূর্ত্তি-সাধনার অন্যতম প্রধান সুরাণ।

ধর্মপদের জনপ্রিয়তার রহস্য রামপ্রসাদী গানের জনপ্রিয়তার মতই জীবন-নিহিত, অর্থাৎ দুর্গম দর্শনচিন্তা-বর্জিত প্রত্যক্ষ সংসারোদ্ভূততা ও সরল হৃদয়ানুভূতি। ভগবান বৃন্দের মত-নিঃসৃত এই বাণী পালি ভাষার মাধ্যমে শতাব্দীর সিঁড়ি বেয়ে আমাদের হৃদয়-দ্বারে এসে পৌঁছেছে। আমরা কি এর প্রতি উদাসীন থাকব?

ধর্মপদ ছাব্বিশটি বর্গ (বর্গ)-এ বিভক্ত। প্রতি বর্গে বিশ-তিরিশটি শ্লোক সংকলিত হয়েছে। বর্গসমূহের নাম : যমক, অস্পন্দ, চিত্ত, পদ্য, বাল, পণ্ডিত, অহরন্ত, সহস্র, পাপ, দণ্ড, জরা, অস্ত, লোক, বৃন্দ, সুখ, পিয়, ক্রোধ, মল, ধর্মট, মগ্গ, পাক্ষিক, নিরয়, নাগ, তগ্হা, ভিকখ, রাজগ বর্গ।

বাঙালীমাত্রের কিছুটা সংস্কৃত ভাষা জানা আছে, অন্ততঃ জানা উচিত। সংস্কৃতের সাথে পালিভাষার সম্বন্ধ

ঘনিষ্ঠ। তাই একটু ধৈর্য ও সাহসভরে অগ্রসর হলে আমরা সহজেই ধর্মপদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারব।

উদাহরণে বক্তব্য পরিচ্ছন্ন হবে।
মূল শ্লোক : পালি ভাষায়—
ন হি বেরেন বেরানি সম্মত্তীধ
কুদাচনং।

অবেরেন চ সম্মত্তি এস ধম্মো সম্মত্তনো
[যমক-বর্গ-গো]

সংস্কৃত রূপান্তর—
ন হি বেরেন বেরানি শাম্যন্তীধে
কদাচন।
অবেরেন চ শাম্যন্তি এস ধর্মঃ সনাতন॥
বাংলা পদ্যানুবাদ (বীরেন্দ্রলাল রায়-সম্পাদিত)—
বৈরিতা বৈরিতা শান্ত নাই
করে কদাচন ;
অবৈরিতা শান্ত করে :
এই ধর্ম সনাতন।

শ্রীমৎ ধর্মধার মহাস্থাবির-কৃত বাংলা
পদ্যানুবাদ—

জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও
শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারা
শত্রুতার উপশম হয় ; ইহাই সনাতন
ধর্ম।

ধর্মপদের ছাব্বিশটি বর্গের শ্লোক-রাজ্যে বাঙালী পাঠক ব্রহ্মদেব রচয়িতার সুযোগ পাবেন, এই আশ্বাস দিতে পারি। ধর্মজিজ্ঞাসু না হয়েও ধর্মপদ পাঠে আনন্দ লাভ করা যায়, তা নির্দিষ্ট নয় বলা যায়। উপমার নৈকট্য, প্রকাশের স্বজন্মতা অননুভূতির সারল্য সংশয়ী পাঠক-হৃদয়কেও প্লগ করবে। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আশাকার ধর্মপদের প্রতি পাঠকের আনন্দাঙ্গ জন্মাবে।

(ক) উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা
উসুকারা নময়ন্তি তেজসং।
দারু নময়ন্তি তচ্ছকা অন্তানং
দময়ন্তি পণ্ডিতা॥
[পণ্ডিতবর্গ-গো]

সেচকগণ জলকে (যেহেতু) পরিচালিত করে, শরনির্মিতা শরকে ইচ্ছানুরূপ গঠন করে, সুদ্রেরেরা কাষ্ঠখণ্ডকে আয়ত্ত করে ; আর পণ্ডিতগণ দমন করেন নিজেকে।

[ধর্মধার মহাস্থাবিরের অনুবাদ]
(খ) অক্লোচ্ছ মং অবধি মং অজ্জানি
মং অহাসি মে।
যে তং ন উপনয় হন্তি বেরং
তেসুপ সম্মতি॥
[যমকবর্গ-গো]

আমাকে গালি দিল, আমাকে মারিল, আমাকে জিভাল, আমার (ধন) হরণ করিল, ইহা যাহারা (মনে) বাঁধিয়া না রাখে তাহাদের বৈর শান্ত হয়।
[রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ]

(গ) যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো
পাচোতি গোচরং
এবং জরা চ মচ্চু চ আয়ুঃ পাচোতি
পাণিনং।
[দণ্ডবর্গ-গো]

গোপাল যেমন দণ্ডাঘাতে গোরু ভাড়াইয়া গোচারণে লইয়া যায়, সেইরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীদের আয়ুকে ভাঙনা করিতেছে। [ধর্মধার মহাস্থাবিরের অনুবাদ]

(ঘ) চত্তারি ঠানানি নরো পন্নত্তো
আপজ্জন্তি পরদারুপসেবী।
অপদুংগু এলাভং ন নিকামসেয়ং
মিলদং তত্তিয়ং নিরয়ং চতুথং।।
অপদুংগু এলাভো চ গত্তী
চ পাপিকা
ভীতসুস ভীতায় রতী
চ থোয়িকা।
রাজা চ দণ্ডং গরুদং পণেতি—
তস্মা নরো পরদারং ন সেবে।।
[নিরয়বর্গ-গো]

পরদারসেবী প্রমত্ত মানুষ্য দুঃখের চারি অরম্ভা প্রাপ্ত হয়—অপদুংগুলাভ, নিদ্রাহীন শয়ন, ভৃতীয় লোকনিন্দা ও চতুর্থ নরক। তাহার অপদুংগুলাভ এবং (নরকাদি) পাপগতি হয়। ভীত নরনারীর রতিও ক্ষণস্থায়ী হয়। রাজা ইহাতে গুরুতর দণ্ড বিধান করেন, সুতরাং কেহ পরদার (কিংবা পরপুরুষ) সংসর্গ করিবে না। [অনুবাদ : তদেব]

(ঙ) তং বো বদামি ভদ্রং বো
যাবন্তেত্থ সমাগতা
তগ্হায় মূলং খগথ
উসীরথো'ব বীরগং,
মা বো নলং'ব সোতো'ব
মারো ভজি পদুপ্পদুং।।
[তগ্হাবর্গ-গো]

এখানে যাহারা সমাগত হইয়াছে, তোমাদের মণ্ডলের নিমিত্ত বলিতেছি, উষীরার্থীর বেণাভূতের মূল খননের ন্যায় তোমরা তৃষ্ণার মূল খনন করো, স্রোতের দ্বারা বিনষ্ট নলের মতো মার যেন তোমাদিগকে বারবার বিধ্বস্ত না করে। [অনুবাদ : তদেব]

(চ) তিগদোসানি থেত্তানি,
রাগদোসা অয়ং পজ্জা।
তস্মা হি বীতরাগেসু দিমং
হোতি মহপ্পফলং।।
[তগ্হাবর্গ-গো]

ভৃগদূষিত ক্ষেত্রে ফসল ভাল জন্মে না, ভোগানুরাগবশতঃ এই জন্মসমাজে কলুষিত হয় ; সুতরাং বীতরাগীদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয়।
[অনুবাদ : তদেব]

ধর্মপদের আলোচনায় লাভ বই জোকসান নেই, এই আশ্বাসে বতস্মান আলোচনার সমাপ্ত।



মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজনে !

বাহ্যিক অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম
করেন, মহাত্মজরাজ তাঁহাদের পরম
কল্যাণকর। এই শিথিলকর ও আরাম-
দায়ক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও
অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে
সর্বদা প্রকৃত ও কর্মক্ষম রাখে

সাধনার মহা ভৃঙ্গুরাজ তৈল



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদচর্চা

অধ্যক্ষ ত্রিবোপেনচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এক, সি, এণ্ড, (সত্ত্ব) এম, সি, এম (আমেরিকান)
ভারতীয় কলেজের মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।



(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু সূচিন্তাই বা ক'দিন এসে
বসেন এখানে?

সুশোভন আসার পর একদিনও কি?
আজ এসে বসেছেন।

সুশোভন তখন ঘুমোচ্ছিলেন।
কিছুদিন থেকে মাঝে মাঝে দুপদরে
ঘুমিয়ে পড়ছেন সুশোভন। যেটা আগে
আদৌ ছিল না। কে জানে এ লক্ষণ ভাল
কি মন্দ। চিকিৎসকরা তো বলেন
মানসিক রোগীর ঘুম সলক্ষণ।

আশ্চর্য, তবু সূচিন্তা সুশোভনকে
হঠাৎ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়তে দেখলে
শঙ্কিত হন। বিকেলের খাওয়ার সময়
পার হয়ে যাচ্ছে ছুতো করে ঘুম
ভাঙান। ঘুম না ভাঙলে নিজে নিজে
সহজে ভাঙতে চায়ও না।

সূচিন্তা তাই নিশ্চিন্ত ছিলেন।
কারণ অতিথির আগমন সংবাদে নীচে
নেমে আসার সময় দেখে এসেছিলেন
সুশোভন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কে জানে
কখন উঠেছে মানুষটা। হয়তো এঘর
ওঘর ঘুরে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভয়
পেয়ে নেমে এসেছে।

সূচিন্তা বললেন, 'তুমি নীচে এলে
কেন? ওপরে যাও।'

সুশোভন যাবার জন্যে পা বাড়ালেন,
কিন্তু অসন্তোষ প্রকাশ না করে ছাড়লেন
না। 'তুমিই বা নীচে কি করবে? চলে
এস।' বলে ভারী ভারী পা ফেলে
নির্দিষ্ট দিকে উঠতে লাগলেন।

এডফ্রণে বাক্ স্ফুর্তি হ'ল কুষ্কার
মার। কুণ্ডিত চু আর সন্দেহাকুল কণ্ঠে
বলেন, 'উনি কে? আপনার ভাই?'

'না।'

'তা হলে?'

সূচিন্তা মুখ তুলে স্থিরস্বরে
বললেন, 'আমার বাল্যবন্ধু।'

'বাল্যবন্ধু!'

এমন সুরে কথাটা বলেন কুষ্কার মা,
মনে করা চলে বাল্যবন্ধু শব্দটা বদ্বি
জীবনে এই প্রথম শুনলেন।

সূচিন্তা আর কোন কথা বললেন
না শুধু বিদায়দানের ভঙ্গীতে আর
একবার হাত তুলে নমস্কার করলেন।

তথাপি কুষ্কার মা না বলে পারলেন
না—'শুনোছিলাম আপনার বাড়ীতে কে
একজন পাগল এসেছে, উনিই তিনি
বদ্বি?'

সূচিন্তা সহসা দম্তুরমত খোলা
গলায় হেসে ওঠেন, আর হাসতে হাসতেই
বলেন, 'পাগলকে একনজর দেখেই পাগল
বলে চিনতে পারেন! আশ্চর্য ক্ষমতা তো
আপনার! আচ্ছা নমস্কার যাই। ওই
পাগল নিয়ে তো জরালার শেষ নেই
আমার।'

বলেন বটে, কিন্তু মুখ দেখে কে
এ'রা বিশ্বাস করলেন পাগল নিয়ে
সূচিন্তার জরাল।

'আমাকে না বলে চলে যাও কেন
সূচিন্তা?' বিকৃত অসন্তুষ্ট স্বর

ধনিত হয়ে ওঠে, 'আমি তোমায় খুঁজে
খুঁজে পাইনা।'

'তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে।'

'বাঃ বেশ! চিরকাল ধরে ঘুমোব
বদ্বি?'

'তা আমি বদ্বি লোকজন এলে কথা
বলব না?'

'না না ওদের সঙ্গে কথা বলতে
হবে না'—সুশোভন প্রবলভাবে বলে
ওঠেন, 'ওরা তো ভাল লোক নয়।'

সূচিন্তা হেসে ফেলে, বলেন, 'কে
বলল ভাল লোক নয়। ভাল তো।'

'না না! দেখলে না কী রকম করে
যেন তাকচ্ছিল তোমার দিকে।'

'কী রকম করে আবার?'

'রাগ রাগ করে। দেখতে পাচ্ছিলে
না?'

'কই না তো। তুমি দেখতে পেলে
বদ্বি?'

'পাবনা?' সুশোভন বিরক্ত স্বরে
বলেন, 'তোমার দিকে, রাগ করে তাকালে
দেখতে পাব না? ওদের বকে দিতে ইচ্ছে
করাছিল আমার।'

সূচিন্তা কাছে সরে এসে বলেন
'তা সবাইকি তোমার মত করে
তাকাবে?'

সুশোভন সহসা যেন ভারী বিপন্ন
বোধ করেন। চঞ্চলভাবে বলেন, 'আমার
মত? আমি কী করে তাকাই সূচিন্তা?
কই আমি তো বদ্বিতে পারি না!'

‘থাক তোমায় বরুতে হবে না। কিন্তু ওরা যদি আবার আসে তুমি ওদের সামনে যেও না বরুনে? ওরা তো তোমাকে ভালবাসে না।’

‘আমাকে ভালবাসে না! কিন্তু কেন বলতো সুচিন্তা। আমাকে তো সবাই ভালবাসে।’

‘তুমিই তো বললে ওরা লোক ভাল নয়।’

‘ওঃ ঠিক ঠিক। কিন্তু সুচিন্তা ওরা কে?’

‘ওরা কে?’

সুচিন্তা কৌতূহলের স্বরে বলেন, ‘ওরা আমার ছোটছেলের শ্বশুর আর শ্বশুড়ী।’

শ্বশুর শ্বশুড়ী! ছোট ছেলের শ্বশুর শ্বশুড়ী! এ কথার মানে কি সুচিন্তা?’

‘বাঃ বেশ! মানে জানো না? ওদের মেয়ের সঙ্গে আমার ছোট ছেলের বিয়ে হবে।’

‘না না কিছতেই বিয়ে হবে না—’ বীরবিক্রমে বাধা দেবার ভঙ্গীতে হাত তোলেন সুশোভন, ‘ওরা ভাল লোক নয়।’

‘কিন্তু ওদের মেয়ের সঙ্গে যে আমার ছোট ছেলে ভাব করেছে, সুচিন্তা আশেত আশেত বদ্বিষয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলেন, ‘আমার ছোট ছেলেকে ওদের মেয়ে পছন্দ করেছে, ভালবেসেছে। বিয়ে না হলে ওদের মেয়ের মনে কষ্ট হবে।’

ঠান্ডা হয়ে যান সুশোভন, একেবারে নরম হয়ে যান। সহানুভূতির কোমল গলায় বলেন, ‘মানে কষ্ট হবে? ওদের মেয়ের মনে কষ্ট হবে?’

‘হ্যাঁ, আর আমার ছেলেরও কষ্ট হবে।’

‘ওদের মেয়ে ওদের মত নয়তো সুচিন্তা?’ সুশোভন যেন আর এক দৃষ্টিতে কাতর হইলেন, ‘তোমার দিকে রাগ রাগ করে তাকাবে না তো?’

‘না না সে ভাল মেয়ে।’

‘ভাল মেয়ে!’ সুশোভন পছন্দর ভঙ্গীতে বার দুই মাথা হেলিয়ে হঠাৎ আর এক চিন্তায় চলে যান, ‘কিন্তু সুচিন্তা ওরা তো মদুখুসো ওদের সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে?’

সুচিন্তা অপলক দৃষ্টিতে কিছক্ষণ এই পাগলের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘কে বললে ওরা মদুখুসো! মদুখুসো তো নয়।’

‘নয়? ঠিক বলছ সুচিন্তা?’ সুশোভন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন ‘ভাগ্যিস নয়।’

সুচিন্তা তেমনিভাবেই বলেন, ‘মদুখুসো হলে কি হয়?’



‘পাগলকে একনজর দেখেই পাগল বলে চিনতে পারেন। আশ্চর্য ক্ষমতা তো আপনার...’

‘কী হয়! অমনি বোকার মত বলে দিলে কী হয়। বিয়ে হয় না তা জানো?’

সমস্ত পথটুকু অর্থাৎ পথের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত এইটুকু কর্তা-গিন্নী নিস্তব্ধ, বাড়ী ঢুকে বসে পড়ে প্রথম স্তব্ধতা ভাঙলেন গিন্নী, ‘খুকুর কপালে শেষে এই ছিল।’

‘থাকবেই তো!’ কর্তার স্বর ভীষণ হয়ে ওঠে, ‘এখনি কপালের হয়েছে কি! আরও কত হবে।’

‘হিঁ ছি, একেবারে যা তা!’ আজ আর কর্তার কথার ফৌস করে ওঠেন না গিন্নী, বরং কাঁদো কাঁদোই হল, ‘মা টা

তো দেখছি ভাল নয়। এতদিন পড়ায় আছি, এসব তো জানি না। হতভাগা মেয়ে বেছে বেছে শেষে কিনা—’

‘বেছে বেছে?’

ভয়ংকর শব্দে ধমকে ওঠেন কৃষ্ণার বাবা, ‘হতচ্ছাড়া মেয়ে ছেলেদের বাহ-বিচার কিছ থাকে? থাকে সামনে পায় তাকেই— হিঁ ছি। কী বলবো, তোমার ওই আদুরে মেয়ে আবার সুইসাইড

করবো বলে ভয় দেখিয়ে রেখেছেন। নইলে ওই মেয়েকে ঘরে চাঁবি দিয়ে রেখে, দেখিয়ে দিতাম ছোঁড়াটাকে কী করে শাস্ত করাতে হয়। জলবিছাটি মেয়ে ছাল চামড়া তুললেই দেখতে ‘বাপ বাপ’ করে পালাতে পথ পেতেন না বাত্বাধন। ভদ্রঘরের মেয়ের সঙ্গে প্রণয় করতে আসার বাসনা জন্মের শোধ মিটে যেত।’

কৃষ্ণার মা চোখ মুছে বলেন, ‘কী করবো, মেয়েই তোমার বাদী। যেমন আহ্বাদ দিয়ে মানুষ করেছে। আজ আমায় দুঃখো, তুমি আশ্চর্য দাওনি ছেলেবেলা থেকে? একটা মেয়ে বলে, যা বলেছে তাই করনি? যা চেয়েছে তাই এনে দাওনি?’

‘দিয়েছি!’ ভদ্রলোক ভীষণতর স্বরে বলেন, ‘ভাল ভাল জিনিস চেয়েছে, দিয়েছি। রাস্তার পাঁক নিয়ে খেলতে চাইলে, তুলে এনে দিতাম না নিশ্চয়!’

কৃষ্ণার মা আরও কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন, ‘তা বয়েসকালে কি আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে? কিন্তু ইন্দ্রনীল ছেলে খারাপ নয়। পাকের সঙ্গে তুলনা কোর না তুমি ওকে। খুকুর কানে গেলে দারুণ শক্ পাবে!’

‘শক্ পাবে! ওঃ! কিন্তু শক্ পেলে কী হয় বলতে পারো? কিছু যদি হতো, তা’হলে তোমার মেয়ে যেদিন সুই-সাইডের ভর দেখিয়েছিল, আমার সেই-দিনই হার্টফেল হতো। বড়বলে? কীল খেয়ে কীল চুরি করলাম কেন জানো? মেয়ের মায়াম নয়, পাছে মেয়ে লেকের জলে ডুবে মরে আমার মুখ হাসায় এই ভয়ে। উঃ এখন ভাবছি একেবারে গোড়াতে কেন গোড়ায় কোপ মারিনি।

কৃষ্ণার মা সভয়ে বলেন, ‘দোহাই তোমার চুপ করো। খুকু শুনতে পাবে। খুকুকে তো আর ওই শ্বাশুড়ীর কাছে ঘর করতে পাঠাচ্ছি না। মেয়ে জামাই আমার কাছেই থাকবে।

পারো তো তাই রেখো। সুখে সংসার কোরো মেয়ে জামাই নিয়ে। কত গম্ভীরভাবে বলেন, ‘আমার থাকার ব্যবস্থা অন্যত্র কোরবো।’

কৃষ্ণার মা এ গর্জনে অবশ্য ভয় পান না।

কতী তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র থাকতে পারবেন, এ আশংকাকে নস্যাত করেন তিনি।

সংসারের চক্র এইভাবেই আবর্তিত হয়। নিজের নিজের সমস্যার ক্ষেত্রে যখন পড়ে মানুষ, তখন কেবলমাত্র তার দিকটা বিবেচনা করলে কিছুতেই তার কোন আচরণকে দোষ দেওয়া চলে না। দোষ দেওয়া চলনা তার অসহিষ্ণুতাকে।

অথচ সকলের সমস্যার মীমাংসা কোন কিছুতেই হবে না কোন দিন।

একই ঘটনা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। যে বর্ষাকে গ্রামের চাষীরা দু’হাত তুলে অভিনন্দন জানায়, সেই বর্ষাকেই শহরবাসীরা ভ্রুকুটি করে অভিসম্পাত দেয়। যে আইনকে ভাড়াটিয়া নিত্য প্রণয় করে, সেই আইনকেই বাড়ীওয়ালারা নিত্য দাঁত খিঁচায়।

বড়লোকের কাছে গরীবের অসন্তোষ বিরক্তিকর, গরীবের কাছে বড়লোকের ব্যবস্থানা চক্ষুশূল। বড়দের চোখে ছোটদের ব্যবহার আপত্তিকর, ছোটদের চোখে বড়দের ব্যবহার নিষ্ঠুরতাপূর্ণ।

অথচ দোষ দেওয়া যায় কাকে?

কৃষ্ণা প্রেমে পড়েছে সেটা কি তার দোষ?

কৃষ্ণার অভিভাবক তার ভুল নির্বাচনে ক্ষেপে উঠেছেন, এটাও কি তাঁদের পক্ষে অসঙ্গত?

সূচিন্তা তাঁর উদ্ভূত প্রতিবেশীকে অবহেলা করলেন, এটা যেমন সূচিন্তার অবস্থায় স্বাভাবিক, ঠিক তেমনিই স্বাভাবিক সূচিন্তার প্রতিবেশী যদি সূচিন্তাকে অপবাদ দিয়ে বলেন ‘খারাপ’।

ঈশ্বর জানেন সত্য মিথ্যার মাপকাঠি কার হাতে।

পরস্পরবিরোধী সত্য সমস্ত সংসারটাকে এমন এক অশুভ কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যে তার থেকে সূর্যের সত্যকে আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। গুরুভক্ত শিষ্য যখন তার গুরুর মৃত্যুরোগে ডাক্তার না ডেকে গুরুর চরণামৃত খাওয়ায়, তখন তার নিবুদ্ধিতাকে নিন্দাবাদ দেব না তার গুরুভক্তিকে তারিফ করব? দূর্চারিণ স্বামীর অবমানিতা স্ত্রী যখন তার শিশু সন্তানকে পর্যন্ত ভাসিয়ে দিয়ে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে, তখন সে স্ত্রীর আত্ম-মর্যাদাবোধকে সাধুবাদ দেব, না তার নির্মমতাকে নিন্দাবাদ করবো?

মানুষকে বিচার করা বড় কঠিন।

মানুষকে বিচার করা কঠিন, কতব্য বিচার করে ওঠাই কি সহজ?

অন্ততঃ আপাততঃ বুদ্ধিমান উকিল সূবিমল মৃদুব্যো পারছেন না কতব্য নির্ধারণ করতে। ব্যাপারটা সুশোভনকে নিয়েই। ইতিপূর্বে নিজেই সূবিমল মায়ালতাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করে। কিন্তু নীতা চলে গিয়ে পর্যন্ত অবিরতই ভাবছেন সূবিমল, নীতির ওপর রাগ করে ভাই সম্পর্কে একেবারে নির্বিকার থাকা তাঁর পক্ষে সঙ্গত কি না।

একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে মেরের অকর্তব্য সূবিমলকে কি কতব্যচ্যুত করবে? অসুস্থ ভাইকে একবার দেখতেও যাবেন না? অথবা শুধুই দেখতে যাওয়া কেন, তাঁর ভৃত্যবধানই বা নয় কেন। সূচিন্তা

নিয়ে নিতে চাইছে বলে, তিনি একেবারে দিয়ে দেবেন তাঁর ভাইকে?

সত্য বটে এখানে দেওয়া নেওয়া কথাটা অর্থহীন, সেদিন সেই বন্ধু-পাগলের যে বাধ্যতা দেখেছেন তিনি সেটা এক পরম বিস্ময়ের অনুভূতি। সেই অনুভূতির কাছে স্বীকার করেছেন সূবিমল সম্পর্কের দাবীই সব নয়।

তবু সূবিমলেরও লোক সমাজ আছে।

আত্মীয়জন মাঝে মাঝেই সুশোভন সম্পর্কে প্রশ্ন করছে, এবং সূচিন্তা কোন অধিকারে সুশোভনকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে, তা’ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছে। একদিন তো সূবিমলদের ছোট পিসি এসে এ কথাও বলে গেলেন, ‘আমাকে একবার নিয়ে চল দিকি সেই সূচিন্তার বাড়ী। দেখে আসি কেমন সে দজ্জাল মেয়ে! দেখে আসি কী গৃহতুক করেছে সে। আর ছেলেটাকেও দেখে আসি।’

সূবিমল ‘ক্ষেপেছ’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রশ্ন। কিন্তু সেই অবধি-নিজে ভাবছেন একবার যাওয়া উচিত। তা’ ছাড়া অন্য কারণও তো একটা রয়েছে। নীতার খবর জানতে যাওয়ার মত বড়সড় একটা কারণ।

একটা রবিবারের সকাল ধাঁধ করলেন তিনি যাবার জন্যে। আর মনে মনে ঠিক করলেন সুমোহনের ছেলে দুটোকে নিয়ে যাবেন। দেখবেন কী প্রতিক্রিয়া হয়।

ছেলে দুটোকে সুশোভন বেজায় ভালবাসতেন।

কখন যে সূবিমল অশোককে বলেছেন ছেলেদের সাজিয়ে দিতে, আর কখন যে অশোকা সে আদেশ পালন করেছে, মায়ালতা তার কিছুই টের পাননি। দেখতে পেলেন একেবারে যখন বেরোচ্ছেন।

রবিবার সকালে প্রায়শই ভাইপো-দের নিয়ে বেড়াতে বেরোন সূবিমল, তবে মায়ালতা সেটা কোনদিনই ‘স্বাভাবিক’ বলে মেনে নিতে পারেন না। প্রত্যেক সন্তাহেই দেয়ালকে শুনিয়ে বলেন, ‘আদিখ্যেতা! চঃ! অমনি ছেলে-দের লৌলয়ে দেওয়া হল। মানুষের যেন আর কাষকর্ম নেই। একে তো রাতদিন কোর্ট আর মক্কেল, মামলা আর নথি, যদি বা একটা ছাড়ান হল তো ভাইপো

নিজে সোহাগ করতে হবে। নিজের ছেলের নিয়ে তো কখনো এক পা বেড়াতে যেতে দেখিনি! তা' কেন, পাছে, একটা কাজের কথা বলি, তাই পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো।'

বলাবাহুল্য মায়ালতার এত অভিযোগেও দেয়াল যথারীতি নীরব থাকে, এবং সুবিমল যথারীতি 'কইরে তোদের হল?' বলে তাড়া দিয়ে বার করে নিয়ে যান।

আজ কিন্তু এ তাড়াটুকুও দেননি সুবিমল, এমনিই বেরোতে উদ্যত হয়েছিলেন, চোখ পড়ে গেল মায়ালতার। এবং যথারীতি তিনি ঠিকরে এসে প্রশ্ন করলেন, 'অতি সকালে আবার ভাইপো ঘাড়ে করে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

একটা বছর 'চার এবং একটা ছয়, দুটো ছেলেই দু'দিক থেকে জ্যাঠারবার আঙুল ধরে অধিকার কয়েম রেখেছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করে সুবিমল মৃদু হেসে বলেন, 'ঘাড়ে কই? বরং হাতে করে বলতে পারো।'

'আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাকরণের ভুল হয়েছে আমার। তা' এত সাজগোজ করে যাওয়াটা হচ্ছে কোথায়?'

সুবিমল বলেন, 'আন্দাজ করতে পারছ না?'

'গণকর তো নই।'

'ওদের মেজজ্যাঠার কাছে নিয়ে যাচ্ছি ওদের।'

'মেজজ্যাঠার কাছে! অ!' মায়ালতা একটি কুটিল দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে বলেন, 'তা' ওদের ছুতোটা আর করা কেন! নিজের কথাটাই বললে পারতে। যেটা সত্যি। তা' সেই প্রেমের তাজমহলটিকে নিজে দেখতে যাচ্ছা যাও ছেলে-দুটোকে আবার টানা কেন?'

'তাজমহল তো দেখাবারই জিনিস।' বলে বেরিয়ে যান সুবিমল। আর মায়ালতা ছেলের কাছে গিয়ে হাপসে পড়েন, 'দেখালি? দেখালি তো তোরা? আমাকে একবার বলা পর্যন্ত নয়। তলে তলে ভান্ডরবোঁকে বলা হয়েছে, তলে তলে ছেলের সাজানো হয়েছে, বাড়ীর দাসীবাদী-হুদাংশও-টের পারানি।'

'ভূমি যাই নিল'জ্জ' তপোধন হাতের সিগারেটটা পিছন দিকে আড়াল করে সত্যিছিলো বলে, 'তাই এখনও ধাবান নগ্নে কথাবার্তা কও। কোন

প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন মহিলা হলে, কখনই এরকম অপমানে কোন রকম কো অপারেশন রাখে না।

মায়ালতা এবার ছেলের উপরই আক্রমণের অস্ত্র ধরেন। কারণ ছেলের অভিযোগটা মর্মান্তিক। সেই মর্মান্তিকের জ্বালায় ছটফটিয়ে ওঠেন মায়ালতা, 'তা' সে নীচুতা স্বীকার, না করে আমার উপায়? তোমরা আমার একটা কাজ করে দেবে? একটি আঙুল নাড়বে সংসারের জন্যে? কাজগুলো করিয়ে নিতে হবেনা আমাকে? কথা বন্ধ করলে আমার চলবে?'

অদূরে 'দেয়াল' বসে চা ঢালছিল। বড় একটা কাঁচের গ্লাশের এক গ্লাশ চা এনে বড়জায়ের হাতে দিয়ে সে সহাস্য বলে, 'কী যে বলেন দিদি! বলে রাজ্য নইলে রাজ্য চলে—'

'কী! কী বললে ছোটবোঁ?' মায়ালতা 'ধেই ধেই' করে ওঠেন, 'মরণ কামনা করলে ভূমি আমার?'

'কী আশ্চর্য! কী যে বলেন দিদি। চাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে, আগে খেয়ে নিল।' বলে আর একটা চটাওটা এনামেলের গ্লাশে চা ঢালতে থাকে অশোকা।

এ চাটা বাড়ীর বড়ো ঝিয়ের।

সহসা বর্তমান রাগ ভুলে মায়ালতা আর একটা প্রসঙ্গে এসে পড়েন, 'ও চা কার শুনি?'

'এ গোলাশে আবার কার চা হবে দিদি—'

'তা' বুঝেছি! কিন্তু এও তোমাকে বলছি ছোটবোঁ, পরের জিনিস বলে অত বেদরদ হওয়া ভাল নয়। এই দামী চা, তাই থেকেই বিকে দেওয়া হচ্ছে আখসারি গোলাশ ভর্তি করে! সাথে কি আর কথায় বলেছে কোম্পানীকা মাল, দরিয় মে ডাল!' কেন একটু সস্তা চা ঝিয়ের জন্যে, আনানো যায় না? একটু হাত রেখে কম করে দেওয়া যায় না?'

অশোকা গরম চাটা সমস্তে আঁচল দিয়ে ধরে নিয়ে যেতে বলে যায়, 'আমি তো ও দুটোর একটাও বোধহয় পেয়ে উঠব না দিদি, কাল থেকে বরং গোপালের মার চাটা আপনিই করবেন।

'হল তো!' তপোধন মৃদু বাক্সে বলে, 'গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া হলতো!

সাথে বলি, ভূমি না হয়ে কোন প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন মহিলা হলে এদের সঙ্গে কথা বলতো?'

মায়ালতা ব্রহ্মকণ্ঠে বলেন, 'মান-মর্যাদা কেউ দিলে তবে তো থাকবে? দিয়েছে আমার কেউ কোনদিন? সংসারের দাসী-বাদী হয়েই রইলাম চিরদিন। এখনই বা হয়েছে কী! এর পর ছেলের বোঁরা এসে উঠতে বসতে অপমান করবে।'

মুহূর্তে মুহূর্তেই রাগের কারণ আর পাঠ বদলায় মায়ালতার।

ঠিক পর মুহূর্তেই দ্রুত পাশের ঘরে চলে যান তিনি সুমোহনের সঙ্গে লড়তে। কারণ শুনতে পেলেন সুমোহন ব্যঙ্গ-মিশ্রিত একটি মন্তব্য করছেন বোধকরি স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করেই। 'এই তোমাদের রবিবার সকালের জলখাবার? বাঃ বাঃ! বেড়ে। অতি দীন-দরিদ্র বাড়ীতেও রবিবারের সকালটায় একটু ভাল-মন্দ খায় জানি।'

এ মন্তব্য কানে যাওয়ার পর আর ধৈর্য ধরতে পারেন না মায়ালতা, স্বামী-স্ত্রীর আলোপের মাঝখানেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, 'বলি ছোট ঠাকুরপো, বার তারিখ তোমার মনেও বা থাকে! ধন্য স্মরণ-শক্তি তো! নইলে কাকে বলে রবিবার আর কাকে বলে বৃধবার, তোমার তো মন থাকার কথা নয়।'

মায়ালতা এমনিই।

কেবলমাত্র বাক্য সংযমের অভাবেই সংসারের গৃহিণীর মর্যাদা হারিয়েছেন। অনেক কৃপণ, অনেক স্বার্থপর, অনেক নীচমনা গৃহিণীও দিবা তরে যায়। কেবলমাত্র স্বল্পভাবের বর্মে। কিন্তু মায়ালতা যত বলেন, সত্যিই হয়তো তত খারাপ তিনি নয়।

'উচিত কথা' শুনিয়ে দেবার লোভই মায়ালতার সমস্ত সন্দ্রম কেড়ে নিয়েছে।

কারো সঙ্গে 'কথা বন্ধ' করে প্রতিজ্ঞা বজায় রাখবেন, এ সাধ্য মায়ালতার কোথায়? 'কথা'ই যে তাঁর অসীম অফুরন্ত। নিরন্তর তাঁর বাইরে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে।

ছোট দ্যাওরের সঙ্গে কিছুক্ষণ বাক-
বন্দ করি উত্তমত মায়ালতা বড় ছেলের
কাছে গিয়ে পড়েন। বলেন, 'তোপাটাতে
কোন কর্মের নয়, এদিকে তুইও কিছুতে
গা লাগাবিনা। বলি তোদের মেজকাকার
বুয়াপারটা এমনিই চলতে থাকবে?'

'তা' ছাড়া?'

'তুই তো ওরকম বেড়ে জবাব দিবি
তা' জানা কথা। বলি পুলিশের সাহায্য
নেওয়া যায় না? বলা যায় না পাগল
পেয়ে মানুষটাকে আটকে রেখেছে?
এ কথাও তো বলা যায় ওষুধ-বিসুধ
খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে সূচিন্তা!'

সাধন হেসে ফেলে বলে, 'তাতে
তোমার ওই সূচিন্তাকে কিছু ভোগানো
যায় হয়তো! কিন্তু লাভ কি?'

'না কিছুতেই কিছু লাভ নেই! যত
ব্রাতি রাতদিন ভাল ভাল পোষাক পরায়,
আর হস্তায় তিন দিন সিনেমা দেখায়!
ঠিক আছে, তোদের কাউকে কিছু করতে
হবেনা, আমি একবার রাধুর কাছে
'খাছি!'

রাধু বা রাধানাথ মায়ালতার বোনিক-
জামাই, লালবাজারে কাজ করে।
মায়ালতার ধারণায় রাধুই লালবাজার
অফিসের সর্বময় কর্তা। কাজেই যে কোন
মুদ্রিকলের সময়ই মায়ালতা অহঙ্কার
প্রকাশ করেন, 'রোস আমি রাধুকে
'বলছি!'

বদিও রেকাবী-ভর্তি খাবার ও
কাপ কাপ চা ধংসানো ছাড়া আর কোন
কাজ আজ পর্যন্ত মায়ালতার বোনিক-
জামাইকে দিয়ে হয়নি।

তবু অহঙ্কার করতে ছাড়েন না এবং
রাধুকে বলতে যাওয়ার উপলক্ষে ঘট-
করে সন্দেশের বাস্তু হাতে নিয়ে বোনিকের
বাড়ী বেড়াতে যাওয়াটা তাঁর মাঝে মাঝেই
ঘটে। কারণ রাধুর বাড়ী মায়ালতার
বাড়ীর কাছেই। একাই যেতে পারেন
রিকশ করে। আজও গেলেন।

সন্দেশের বাস্তুটা হাত থেকে নামিয়ে
এক গাল হেসে বললেন, 'এই এলাম
বাবা তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ
করতে।'

পরামর্শ করতে লোকে এ বাড়ী
ও বাড়ী ছোট্টে। অথচ নিজের সংসারে

সূচিন্তা কারো সঙ্গে পরামর্শ করেন না।
পরামর্শ করে না সূচিন্তার ছেলেরাও।

হয়তো বা অনভ্যস্ত কাজটা নতুন
করে করতে ওদের লজ্জা করে। নইলে
ইন্দুনীল? কিন্তু তারই বা আর কি উপায়
ছিল?

কৃষ্ণার মা বলেছিলেন, 'বিয়ের পর
তোমরা দু'জনে কিছুদিন কোথাও
বোড়িয়ে এসো। 'হনিমুন' করাও হবে,
আর এই পাড়ার লোকের চোখের সামনে
থেকেও দু'দিন সরে যাওয়া হবে। বিয়ে
হয়ে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যেতে পাবে না
এর চাইতে লজ্জার আর কি আছে?'

ইন্দুনীল বলেছিল, 'শ্বশুরের টাকায়
'হনিমুন' করতে যাবো এর চাইতে
লজ্জারই বা আর কি আছে?'

কৃষ্ণার মা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন,
'শ্বশুরের টাকাতেই যখন তোমাকে
এখনও বেশ কিছুদিন চালাতে হবে, তখন

সে টাকাকে সর্বদা অশ্লীল অপবিত্র ভেবে
কষ্ট পাবার কোন দরকার নেই; সেটা
বোকামী। আমি তো তোমায় 'বারবার'
বলেছি আমাদের যা কিছু 'সর্বস্বই'
খুকুর।'

ইন্দুনীল তবু বলেছিল, 'তা' হতে
পারে। কিন্তু আমার পক্ষে তো অধি-
কারের কোন প্রশ্ন নেই।'

কৃষ্ণার মা ধমকে উঠেছিলেন, 'খামো
তুমি বাবা! ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের
মতন থাকো, হাসো খেলো, খাও মাখো,
পাকামী করে করে আর আমার হাড়
জ্বালিও না। ঘরে বাইরে জ্বলছি আমি।
এই বিয়ের আগে থেকেই দার্জিলিংয়ের
কোনও ভাল হোটেলে সীট বুক করিয়ে
রাখাছি, ফুলশয্যের পরদিনই রওনা
দেবে। তারপর ফিরে এসে দেখা যাক
কি ব্যবস্থা হয়।'

(ক্রমশঃ)

জয় যৌধেয়

"রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ"

জয় যৌধেয়—একখানি গবেষণামূলক উপন্যাস। চতুর্থ
শতকের (খৃঃঅ ৩৫০—৪০০) সালের ভারতবর্ষের
রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের একখানি প্রামাণ্য
আলেখ্য। রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ অগাধ পণ্ডিত ও গবেষক।
এ ধরণের ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত উপন্যাস বাঙলা
সাহিত্যে বিরল। তাই বাঙলা পাঠকদের মনোরঞ্জননের জন্য
পরিবেশন করলাম এই বলশালী গগনান্তিক বিস্মৃত
যৌধেয় জাতির রোমাঞ্চকর কাহিনী। দাম ৭.০০

বাবা রঙে বোনা

॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥

জীবনেরই বৈচিত্র্য বিস্ময় মাধুর্য ও উদ্বেজনা। এ যুগের
এক নিপুণতম লেখনীর তুলনাহীন শিল্পসৃষ্টি।
দাম ৪.০০

বিশ্ববাণী

১১এ বারাগসী ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

আপনি যদি রূপসী তরুণী অথবা ধনী-ভনয়া হয়ে থাকেন, তাহলে নিজের সম্পর্কে আপনার বিশেষ সাবধান থাকা প্রয়োজন। অপরিচিত অথবা অধ-পরিচিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে আকস্মিক ঘনিষ্ঠতা করে আপনি যদি তার সঙ্গে বেড়াতে যান অথবা গোপন স্থানে মিলিত হন, তাহলে দয়া করে ড্যানিটি ব্যাগের মধ্যে আপনার নামধাম লিখে রাখতে ভুল করবেন না। কেননা, অন্তরংগতার ফাঁদে পড়ে আপনার যদি জীবনশঙ্কা ঘটে, তাহলে অন্তত পুলিশ অথবা পথচারী আপনার মৃত বা অর্ধমৃত দেহকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আপনার আত্মীয়-পরিজনকে নিদেন খবরটা জানাতে পারবে।

অবশ্য জানি, আমার এই হিতো-পদেশটা কোন কাজেই লাগবে না, যদি হফম্যানের মত পদুর্দর্শন সৌজন্যসূজ্ঞ কোন ধনী-তরুণীর প্রেমের ফাঁদে আপনি পড়ে যান। তখন হয়ত মনে হবে, জীবনের পরম সাধকতা এই ধরনের একটি অগুণীল-সংকেতের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু আপনি তো জানেন না—

তাহলে স্পষ্ট করই বলি! হফ-ম্যানকে আপনি চেনেন না, তেনে বেল-গ্রেডের পুলিশ দস্তর এবং জনসাধারণ। জ্ঞাত হ্যাঁ, সেই বেলগ্রেড শহর, যেখানে নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে মেরু নাসের সুকর্ণ শ্রীমতী বন্দরনায়ক প্রভৃতি টিটোর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সেই বেলগ্রেড শহরের একটি প্রেক্ষা-গৃহের প্রতীক্ষায় হফম্যানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রূপসী লুইজের।

লুইজ সুন্দরী, বয়স কুড়ি-একুশের বেশি নয়। স্থানীয় এক অফিসে কাজ করে। অনেক তরুণের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে তার, কিন্তু এমন কোন মানুষের সম্মান পায়নি যাকে সব কিছু দিয়ে ভালবাসা যায়। মেজাজেও সে অত্যন্ত স্পর্শকাতর সংবেদনশীল। তাই দেহে মনে সে যখন ফুলের মত ফটে উঠেছে তখনও প্রেমের স্পর্শ না পেয়ে মন তার আকারণ বেদনায় বিহবল। এমনি এক আত্ম মনের বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলে ভাল লাগবে ভেবে না পেয়ে অনামনস্কভাবে এসে দাঁড়াল এক প্রেক্ষাগৃহের সামনে। তখনও মাধ্য প্রদর্শনী শুরুর হতে এক ঘণ্টা বাকি। টিকিট কেটে সে প্রতীক্ষায়ের সোফায় বসে। সংবাদপত্রটা খুলে ধরল।

প্রথম পৃষ্ঠায় একটা তাজব খবর বড় বড় হেডিং দিয়ে ছাপা। রোমহর্ষক নারী হত্যার কাহিনী রিপোর্টারের সরস ভাষায় আরো বীভৎস হয়ে উঠেছে। একটি অজাতকুলশীলা তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে এক নির্জন

হাত পাট

॥ পরকীট ॥

রাস্তার উপর, তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে ডাক্তার অনুমান করেন। এ নিয়ে পুলিশ দস্তর বিশেষ বিবৃত, কেননা গত ছয় মাসের মধ্যে বেলগ্রেড শহরে চারটি তরুণী এমনভাবে নিহত হয়েছে, অথচ হত্যার কুল-কিনারা করা পুলিশ দস্তরের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পুরো খবরটা পড়ে লুইজের কেমন আতঙ্ক দেখা দিল। হৃৎপিণ্ড ঝড়ঝড় করে উঠল, শিরা-প্রবাহে একটা হিম-বিদ্যুৎ শিরশির করে ছড়িয়ে গেল। তার হাত থেকে দস্তানাটা খলে পড়ে গেল মাটিতে। সে হাত বাড়িয়ে দস্তানাটা তুলতে যাবে কিন্তু তার আগেই, এক সুবেশ সুগোন্ধ ভদ্রলোক নিচু হয়ে দস্তানাটা কুড়িয়ে হাতে তুলে দিলেন। কৃতজ্ঞতার ভান করে ভদ্রতার হাসি হেসে লুইজ বলল, ধন্যবাদ।

ভদ্রলোক বললেন, ধন্যবাদ জানিয়ে লজ্জা দেবেন না।

লুইজ আরেকটু বিনয়ের হাসি ঠোঁটের ফাঁকে ছড়িয়ে দিয়ে খবরের কাগজটায় মনোনিবেশ করল। কিন্তু আর মনোনিবেশ করা সম্ভব হল না। অপরিচিত ভদ্রলোকটির উজ্জ্বল দাঁটি চোখ তার মনের মধ্যে বারে বারে ছায়া ফেলতে লাগল। মাঝে মাঝে অনামনস্কভাবে চোখ তুলে দেখতে লাগল ভদ্র-লোককে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চোখ নামাতে হল। কেননা যতবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়েছে, চোখে চোখ মিলে গেছে। ভদ্রলোকও সবক্ষণ তার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন।

কিন্তু লুইজকে আরো অবাক হতে হল যখন প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখতে ঢুকে তার পাশের সীটে ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখল। লুইজ খুশী হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনের আলাপ জমে উঠল। ভদ্রলোক বললেন, তাঁর নাম হফম্যান, পেশায় ব্যবসায়ী, ব্যাংক মজুত অর্থের পরিমাণ খুব সামান্য নয়, কিন্তু অসামান্য নিঃসঙ্গতায় মন তার ভরপুর।

শুনে লুইজ রোমাঞ্চিত হল। সেও একা, নিঃসঙ্গতার নির্জনতায় তারও মন বিষম বিবর্ণ। ছবি শেষ হবার আগেই দুজনের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠল। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে গেল রেস্টুরায়। বাড়ি গিয়ে অনেকক্ষণ লুইজ গুণগুণ করে গান গাইল।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে দুজনে গেল পিকনিকে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এক নাচের আসরে। চতুর্থ দিন বিকেলে এক পার্কে মিলিত হয়ে দুজনে স্থির করল বিবাহের পবিত্রতা দিয়ে দুজনের মিলনকে চিরস্থায়ী ও সাধক করে তুলতে হবে। সেদিনই হফম্যান বলল, চলো না আমার বাড়িতে। বিয়ের পর তুমি কেমন করে বাড়িটা সাজাবে সে কথা শুনবে।

সানন্দে রাজি হল লুইজ। তখন রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে শহরের বুকে। টাঙ্কি চেপে দুজনে শহরতলীর এক নির্জন রাস্তায় হফ-ম্যানের বাড়ি গেল। বড় ডালা খুলে হফম্যান ঘরে ঢুকল তারপর লুইজকে নিয়ে ড্রইংরুম পেরিয়ে শোবার ঘরে এল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আতঙ্কে শিউরে উঠল লুইজ, তারপর এক দৌড়ে ঘর ছেড়ে পালাল সে। এক পলকের জন্য হফম্যান তাকে ধরতে পারলেন না।

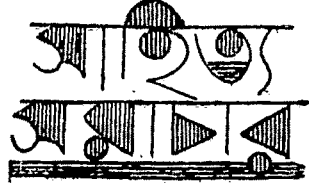
লুইজের ভয় পাবার কারণ, ঘরের মধ্যে একটি নারীর উলঙ্গ মৃতদেহ রয়েছে দেখেছিল। লুইজ সোজা দৌড়ে গেল থানায় কিন্তু বাড়িটা খুঁজে বার করে পুলিশকে দেখাতে পারল না। খবরের কাগজে লুইজের ছবি ছাপা হল, ফলাও হয়ে বেরোল তার অভিজ্ঞতার কাহিনী।

কিন্তু এক মাস না পেরোতেই আরেকটি হতভাগ্য তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেল এক ফেলে যাওয়া মোটর-গাড়ির মধ্যে। তিন সপ্তাহ পরে আরো একটি তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া গেল স্ট্রীল ট্রাঙ্কের মধ্যে। দাঁটি ভরুশীকেই শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ দস্তর অনুমান করলেন।

এই হত্যার রহস্য অনেকদিন পর্যন্ত উন্মোচন করা সম্ভব হয়নি। ছয় মাস পর একটি মার্কায় বয়সের ক্ষয়তাপর ব্যক্তির আত্মহত্যা সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ সাক্ষ্যে আবিষ্কার করল তাঁর শোবার ঘরে ছানিমা জন সুন্দরী তরুণীর মৃতদেহ। মৃতদেহগুলিকে রসায়ন দ্রব্যের সাহায্যে অবিকৃত রাখা হয়েছিল।

যে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে শুরুর বেলগ্রেড নয় রুরোপের আন্ত-জাতিক পুলিশ কর্তৃপক্ষ নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল, সেই ভয়ঙ্কর লোকটি দকলের চোখের সামনে শিক্ষা, প্রতিপত্তি ও দৈহিক সৌন্দর্যের আলো জ্বালিয়ে ধরে বেড়াচ্ছিল।

অতএব, আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যায় তাতেই মন ভুললে পরে কখনো কখনো তার প্রায়শ্চিত্ত করতেও হতে পারে!



প্রাচীন বিশ্বসাহিত্যের নানাবিধ গবেষণার খ্যাতি সুপ্রসিদ্ধ। বর্তমানে জার্মানিতে বৌদ্ধসাহিত্যের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। এটি নিঃসন্দেহে বিদেশী ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি জার্মানদের উদ্বেগের পরিচায়ক। জার্মানদের মনোভাবের বিশেষত্ব তারা বিশ্বকে জানতে চায়। তারা যা জানে না সে সম্বন্ধে অবগত হতে চায়। তাই বৌদ্ধ ধর্মের ভিন্ন পথ ও মত সম্বন্ধে তারা আজ জানতে উৎসুক। সাম্প্রতিককালে মিউনিখ থেকে প্রকাশিত বৌদ্ধ সাহিত্যের দুটি নবযোজনা একাধারে বিদেশ ও সাধারণ লোকের কাছে কাল-জয়ী বৌদ্ধধর্মের মহিমা ও তার সমস্ত মাহাত্ম্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

মিউনিখ শহরের একটি প্রকাশালয় “দি স্মল অ্যান্ড দি গ্রেট ক্রসিং” নামে সম্প্রতি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, তার গ্রন্থকার মিঃ রাইনহাট র্যাফেল্ট প্রস্তাবনায় বলেছেন, “বুদ্ধের ভক্ত নর-নারীদের প্রতি প্রণতি”। কাব্যময় রূপ-কথা ও চিত্রে বুদ্ধের জীবনী ব্যাখ্যা করায় তার গ্রন্থটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। হীনযান ও মহাযান সম্বন্ধে তার বিশদ আলোচনা সম্পর্কে একজন জার্মান সমালোচক বলেছেন, “বৌদ্ধ-ধর্মের জাগতিক দৃষ্ট কণ্ঠের মূল-নীতিকে গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক ও পার্শ্বভিত্তিপূর্ণ ধারায় ব্যাখ্যা না করে রূপকথায় ও চিত্রে কাগজের ওপর ইতিহাস রচনা করেছেন। ধর্মীয় আচার উৎসব, দশভুজা দূর্গার বর্ণনা, সুবিখ্যাত কান্দ মন্দিরের ঢাকের বাজনা ও শানাইয়ের সুর লেখকের বর্ণনা গুণে মূর্ত হয়ে উঠেছে।” সবশেষে সমালোচক বলেছেন “পুস্তকটি শুধু যে বিশ্বস্ততা সহকারে লিখিত, তাই নয় উপরন্তু পরম যত্নের সংগে অঙ্কিত এক বিচিত্র জগতের চিত্রসমূহ দ্বারা আশ্চর্যরূপে শোভিত। পুস্তকটি যেন পাশ্চাত্যের সমগোষ্ঠীয় মানসের স্মারকচিহ্ন।”

একই ভাবের কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়বস্তুপূর্ণ “বিশিষ্ট টেলস্ ফ্রম অ্যানিসিয়াট ইন্ডিয়া” নামে বৌদ্ধ অধ্যক্ষ জগতের তথ্যপূর্ণ দ্বিতীয় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছে পশ্চিম জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরের একটি গ্রন্থালয়। এটি সাধারণ পাঠকের জন্য রূপকথার ধরণে বুদ্ধের জীবনের কাহিনীগুলো নিয়ে লিখিত। বিখ্যাত ভারতবিদ মিঃ এইচ লুয়ে-ডাসের সহধর্মিনী পালি ভাষা থেকে গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন। পুস্তকটির সমালোচনার বিখ্যাত একটি জার্মান সংবাদপত্র লিখেছেন, “এই রূপ-কথাকল্পের মূল নীতি মধ্যযুগীয় খৃষ্টান প্রচারকদের স্মারক।”

প্রকাশিত পুস্তক দুখানি বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি পশ্চিম জার্মানীর জন-সাধারণের প্রগাঢ় ভক্তিপূর্ণ আগ্রহ ও উপলব্ধির নিদর্শন।

।। বাঙলায় নোবেল সাহিত্য ।।

ইংরিজি না-জানা বাঙালীর পক্ষে বিশিষ্ট বিদেশী লেখকদের রচনা সব-সময়ে পড়া সম্ভব নয়। বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্য যথেষ্ট পুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও একথা বলতে হয়। কারণ বাঙলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ-তম সাহিত্য স্বীকৃতি নোবেল পুরস্কার পাওয়া লেখকদের বইয়ের অনুবাদ হয়েছে খুব কমই। কিছুদিন আগে অনূদিত ‘ডক্টর জিভাগো’ এবং অন্যান্য কয়েকটি বই ছাড়া বিশেষ কিছুই হয়নি।

সম্প্রতি এ ব্যাপারে একটি আশাপ্রদ সংবাদ পাওয়া গেছে। কটকের নোবেল সাহিত্য প্রকাশক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাস নোবেল পুরস্কার পাওয়া সাহিত্যিকদের রচনার বাঙলা তর্জমা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এর দ্বারা বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ‘বুড়ো ও সাগর’, স্যার জন প্যাসের ‘বৃত্তান্ত’, হ্যাল্ডর ল্যাঙ্গেনসের ‘স্বাধীন যারা’, হিমেনথের ‘আমি আর প্লাভেরো’, আলবার ক্যামুর ‘অগ্নে, ভুল, পতন’, ইভান বুনিনের ‘ছায়া বীথি গ্রাম’, এমিল সিল্লানপার ‘সিলজা’ এবং সালাভতোর কোয়ারিসমো-দোর কবিতা। এতগুলি নোবেল পুরস্কার পাওয়া লেখকের বই ইংরিজি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় একসঙ্গে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

।। পুস্তক প্রতিষ্ঠানের পনের বছর ।।

গত পনের বছরে পোলিশ গ্রন্থ প্রকাশালয় থেকে তিন হাজার রকমের বই প্রকাশিত হয়েছে। এর পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ কপিও বেশী। গত যুদ্ধে পোল্যান্ডের নষ্টপ্রায় গ্রন্থগুলির পুনরা-বিস্কার প্রকাশালয় প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে দ্রুততার সঙ্গে পালন করা হলেও বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে তার যোগাযোগ হ্রাস হয়ে যায়নি। সমকালীন পোলিশ ও বিশ্বসাহিত্যের নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ব সাহিত্যের অমর গ্রন্থ-রাজির যে সমস্ত পোলিশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন বাল্লরন, কনরাড, ডিকেন্স, গলসওয়ার্ড, হার্ডি, সেক্সপিয়র, থাকারে, দিদত,

ফলার্ট, হুগো, স্টেন্ডহল, সাভেন্টিস, গ্যোটে, শিলার, চেখভ, গোর্কি, ডল্টয়েভস্কি, লেরমেনটভ, পুশকিন, টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, ইবসেন, শেভচেভেঙ্কো, গগচেরভ, হাইনে প্রভৃতি। এস্কিলিস, এরিস্টেফিনিস, হোমার, ওভিড, সফোক্লিস ও থিয়োক্রিটাসের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া সমকালীন সাহিত্য-কারদের উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহও প্রকাশিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের কেবলমাত্র বিবিধ বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্য সর্গিতগুলির সংগে সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করে কাজ করে না লেখক ও অনুবাদকদেরও সাহায্য করে থাকে। গত বছর প্রতিষ্ঠানটির ১৬ বৎসর পূর্ণ হয়েছে।

।। অন্য ভাষায় বাঙলা সাহিত্য ।।

বিদেশে বাঙলা সাহিত্যের সমাদর খুব বেশি না হলেও মস্কো, লন্ডন আর ফ্রান্সে বইয়ের বাজারে বাঙলা বইয়ের অনুবাদ পাওয়া যায়। বিশেষ করে সোবিয়েৎ দেশের বিভিন্ন ভাষায় আধুনিক বাঙালী কবি ও গল্পকারদের রচনা অনূদিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ বাঙলা ভাষাকে কতদূর সমাদর করছে তা নিশ্চয়ই জানবার অপেক্ষা রাখে।

আধুনিক বাঙালী কথাসিল্পীদের মধ্যে রিমল মিত্র অন্যতম। তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা কম নয়। বৃহদায়তনের গ্রন্থ রচনায় তাঁর সমকক্ষ লেখক বাঙলা দেশে বর্তমানে খুব কমই আছেন। ‘সাহেব বিবি গোলাম’ রচনার পর তিনি লিখেছেন ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’। ক্লাসিকধর্মী এ-উপন্যাসটি পাঠক সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। খবরে প্রকাশ গ্রন্থটি হিন্দীতে অনুবাদ হবে। দিল্লীর বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক আজহারাম এই গ্রন্থটি প্রকাশ করছেন কয়েকটি খণ্ডে।

রমাপদ চৌধুরীর নামও হিন্দী সাহিত্য জগতে অপরিচিত নয়। তাঁর ‘ললবাই’ উপন্যাসটি খুব শীঘ্রই হিন্দীতে অনুবাদ করে একটি পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে। ভৈরবপ্রসাদ সম্পাদিত ‘নৈ কহনীরী’ মাসিক পত্রিকাটির সংগে অনেকেই পরিচিত। এই পত্রিকায় রমাপদ চৌধুরীর ‘লেখালিখ’ গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হবে।

এছাড়া রিমল মিত্র ও রমাপদ চৌধুরীর গল্প বিভিন্ন ইংরিজি সংকলনে প্রকাশিত হচ্ছে।

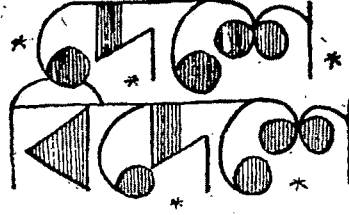
॥ অসুস্থ যৌবন ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ বোর্ড ৩,৬৮৬ জন কলেজের ছাত্র ও ১৫৯৯ জন ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সে রিপোর্ট দাখিল করেছেন, তা এককথায় ভরাসহ। ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৭০.৫৪ জনের আছে চক্ষুরোগ, ৪৫.৫৩ জনের আছে কণ্ঠব্যাদি ৩৫.৪০ জন ভুগছেন দন্তরোগ আর ২০.০১ জনের আছে পাকাসয় প্রদাহ ও আন্ত্রিক ব্যাদি। ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ১৬.৪৭ জন ভুগছেন চর্মরোগে (ছাত্রীদের মধ্যে এ রোগের লক্ষণ বেশ কম, মাত্র ০.৬৯ জন ছাত্রীর আছে চর্মরোগ)। শতকরা ২৪.৬১ জন ছাত্রের আছে কণ্ঠব্যাদি, ২৩.৩০ জনের আছে চক্ষুরোগ এবং ২০.৬৭ জন ভুগছেন পদাতিহীনতা রোগে।

॥ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ॥

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের অনু-রোধে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার জন সার্জেণ্ট পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের কাছে এক রিপোর্ট দাখিল করেছেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, অবস্নাতক ও উত্তরস্নাতক এই চার পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন এবং সকল ক্ষেত্রে যে সকল সংস্কারের সুপারিশ করেছেন তাতেই বোঝা গেছে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর বিবেচনায় কতখানি ত্রুটিপূর্ণ। তিনি ১৪ বছর বয়স এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছেন এবং সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বুনিয়েদী শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে বুনিয়েদী শিক্ষকদের শিক্ষণ-কালও এক বছর থেকে বাড়িয়ে দু' বছর করার জন্যে তিনি সুপারিশ করেছেন।

কর্তমানে যে ক্লাস টেন স্কুলগুলিকে ক্লাস ইলভেন স্কুলে পরিণত করা হচ্ছে তা সার্জেণ্ট সমর্থন করেছেন কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলির বর্তমান শিক্ষকদের যোগ্যতার মান অত্যন্ত অসন্তোষজনক বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।



কথাটি অপ্রিয় হলেও সত্য। এতদিন পর্যন্ত ফিজিক্স, কোমিষ্ট্রি, লজিক, সিভিল প্রভৃতি যে সকল বিষয়-গুলি ছাত্ররা কলেজে অধ্যাপকদের কাছে পড়ার সুযোগ পেত, নতুন ব্যবস্থায় সেগুলি পড়ানোর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে স্কুল-শিক্ষকদের উপর। যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিশ্চয়ই অধ্যাপকের চেয়ে কম। এ ব্যবস্থার এক-মাত্র প্রতিকার হল উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল-গুলিতেও কলেজের অধ্যাপকদের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা। কিন্তু ১৪০ টাকা বেতনে (তাও শুধুমাত্র সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে) দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম-এ, এম-এস-সি পাস শিক্ষক পাওয়া কল্পনাতীতরূপে অসম্ভব ঘটনা। কলকাতা শহরে মাঝে মাঝে কোন স্কুলের ভাগ্যে অস্থায়ীভাবে এক-আধজন জুটলেও মফস্বলে এ বেতনে অধ্যাপকের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক কোনদিনই পাওয়া যাবে না। সুতরাং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়ন আপাতত অসম্ভব বলেই মনে হয়, শিক্ষকদের ধর্মঘটের প্রাকমুহূর্তে গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্য সরকার শিক্ষক-দের কিছু কিছু বেতনবৃদ্ধির কথা বলেছিলেন, কিন্তু এতদিনে সে কথা বোধ হয় তাঁরা ভুলে গেছেন।

কোন কলেজে এক হাজারের বেশী ছাত্র থাকা উচিত নয় বলে সার্জেণ্ট অভি-মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বড় কলেজগুলিতে ছাত্ররা সব সময় বসার সুযোগও পায় না। কলেজে বথেষ্ট ছাত্র-ভর্তি বন্ধ করার সুপারিশ করে সার্জেণ্ট বলেছেন কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে ছাত্রদের আর একবার পরীক্ষা নেওয়া উচিত। সাধারণ মেধার ছাত্রদের জন্যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাই যথেষ্ট বলে সার্জেণ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যাও ছয় হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে সার্জেণ্ট

সুপারিশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে 'বিশেষ' শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত বলেও সার্জেণ্ট জানিয়েছেন।

সার্জেণ্ট সাহেবের এই মূল্যবান সুপারিশগুলির জন্যে বাঙলা সরকার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু এই সুপারিশগুলি নিতান্তই অর্থহীন কথা-র বোঝা হয়ে থাকবে যদি না তাকে কার্যকর করার উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়। বাঙলা সরকার কি করবেন জানি না।

॥ ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ ॥

ঢাকার তরুণ-প্রাণ আবার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আয়ুবশাহীর নিষ্ঠুর পীড়নযন্ত্র উপেক্ষা করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলির হাজার হাজার যুবক বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, অবিলম্বে সমগ্র পাকিস্থানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মানুষক-নিভয়ে মুক্তকণ্ঠে তার অভিযোগ জানাবার সুযোগ দিতে হবে। ছাত্রদের এই হঠাৎ বিক্ষোভের প্রত্যক্ষ কারণ পূর্ব পাকিস্থানের জনপ্রিয় নেতা জনাব সুবাবদীর গ্রেপ্তার হলেও পরোক্ষ কারণ অন্তর্হীন। জগন্দল পাথরের মত সারা পাকিস্থানের বৃকগত চার বছর ধরে চেপে আছে এক জবরদস্ত সৈন্যশাসন। সংঘাতীত সমস্যাক্রিস্ট পাকিস্থানের একটি সমস্যারও এই সৈন্যশাসনের দীর্ঘ মেয়াদে সমাধান হয়নি। কিন্তু তার বিরুদ্ধে একটি কথা বলার অধিকারও সেনেশের মানুষের নেই। যাঁদের কাছ থেকে এতটুকুও প্রতিবাদের আশঙ্কা পাকিস্থানের জঙ্গী শাসকরা করেছেন তাঁদেরই তাঁরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেছেন। তাই বছরে পর বছর বন্দী হয়ে আছেন ভাসানীর মৌলানা, সীমান্ত গান্ধী গফুর খান। এই জঘন্য পীড়ন ও সৈন্য-শাসনের ঔন্ধ্যভোর বিরুদ্ধে পাকিস্থানের তরুণ-প্রাণ যে একদিন গর্জন করে উঠবে তা একরকম জানাই ছিল। ইতিপূর্বেও দশ বছর আগে ঢাকার দুঃসাহসী ছাত্রদল এক গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছিলেন মাতৃভাষার মর্যাদারক্ষার্থে অকাতরে প্রাণ

বিসর্জন করে। যা আমরা পারিনি, তাঁরা তা করেছেন। গৌরবময়ী বঙ্গভাষা আজ পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা। তাঁদের এবারের অভ্যুত্থানও পূর্ণ সাফল্যে। গৌরবান্বিত হ'ক—এই আমাদের একান্ত কামনা।

॥ কিউবা একা নয় ॥

লাতিন আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে জোট পাকিয়ে কিউবাকে আন্তঃআমেরিকা রাষ্ট্রসংস্থা থেকে বহিস্কৃত করে যুক্তরাষ্ট্র যে কোন ভাবেই লাভবান হবে না এবং কিউবারও হবে না কোন ক্ষতি একথা গত সন্তাহেই বলা হয়েছিল। পরবর্তী ঘটনাবলীতে যুক্তরাষ্ট্র বোধহয় তা ভাল-ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। আন্তঃ-আমেরিকা রাষ্ট্রসংস্থার সিদ্ধান্ত নস্যাৎ করেই কিউবার রাষ্ট্রপতি গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হাভানার এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করেছেন, কিউবা আগের মতই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকবে এবং সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনদিনই কিউবার বিপ্লবকে ধ্বংস করতে পারবে না। অপর দিকে সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভও কিউবার রাষ্ট্রনায়কদের কাছে এক বাণী প্রেরণ করে জানিয়েছেন, কিউবা একা নয়। সোভিয়েট জনগণ সব সময়েই তাদের পাশে থাকবে। সাম্রাজ্যবাদী অট্টোপাস ও দাসত্ব-হতে মুক্তিলাভের জন্য জনগণের সংগ্রাম স্তব্ধ করা অসম্ভব। কিউবার বিপ্লব ভারি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

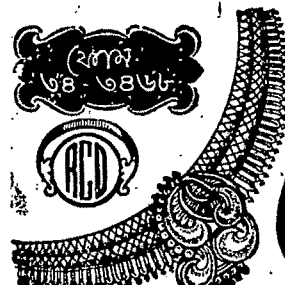
॥ আলজিরিয়া ॥

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্যগল গত ৫ই ফেব্রুয়ারী আলজিরিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে বৈতরণ্য দিয়েছেন তা যদি সত্য হয় তবে এটা অবশ্যই আশা করা যেতে পারে যে, আলজিরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের দিন আর খুব বেশী দূরে নয়। হয়ত এ বছর শেষ হওয়ার আগেই আলজিরিয়ার সন্তম বর্ষব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের সফল পরিসমাপ্তি ঘটবে। অতীতেও অবশ্য প্রেসিডেন্ট দ্যগলের আন্তরিক প্রয়াসের ফলে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে মনে হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভাবিতপূর্ব সম্পর্কের ফলে সে সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এবারও সমস্যার অভাব নেই। সুতরাং আলজিরিয়া সত্যিই স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এ

অভিশপ্ত আরব দেশটি সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করাই নিরাপদ নয়। আলজিরিয়ার অবস্থানকারী শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা ইতিমধ্যেই সতর্ক হয়ে উঠছে এবং তাদের ইতিমত আক্রমণের ফলে ইতোমধ্যেই কয়েকজন আরব আলজিরিয়কে প্রাণ হারাতে হয়েছে। ফ্রান্সও এই দক্ষিণপশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থকের অভাব নেই। পরপর কয়েকবার তারা প্রেসিডেন্ট দ্যগলের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছে। এবং যতই আলজিরিয়ার স্বাধীনতার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে ততই তাদের বেপরোয়া কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে। অন্যান্য মন্ত্রীদের প্রাণনাশের চেষ্টাও ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আলজিরিয়াবাসীদের পক্ষে এটা বিশেষ আশার কথা যে জেনারেল দ্যগলের মত একজন শক্ত মানুষের হাড়ে ফ্রান্সের শাসনদায়িত্ব অর্পিত আছে। নইলে এই আলজিরিয়ার প্রশ্নেই যুদ্ধোত্তর ফ্রান্স যে প্রায় দুই ডজন মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে এবারও তার ব্যতিক্রম হ'ত না। জেনারেল দ্যগলের পক্ষে বিলম্ব নীতি গ্রহণের ব্যাপারে সব চেয়ে বড় অসুবিধা হল আলজিরিয়ার বে-আইনী শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী সংগঠন ও-এ-এস-এর প্রতি খোদ ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীর এক অংশের প্রচ্ছন্ন সমর্থন, আর এই সৈন্যবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া জেনারেল দ্যগলের পক্ষে সাফল্যের আশা সুদূর-পর্যন্ত। সৈন্যবাহিনীর খুব বেশী বিরোধিতা করতে গেলে ফ্রান্স একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং আলজিরিয়ার স্বাধীনতা জেনারেল দ্যগলের যতই কাম্য হোক না কেন, ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী যদি তাঁর প্রতি বিরূপ হয় তবে তাঁকে শেষ পর্যন্ত পৌছিয়ে আসতেই হবে, নয়ত পদত্যাগ করতে হবে।

॥ কোন মধ্যস্থতা নয় ॥

কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত যে কথা রাষ্ট্রসংঘকে জানিয়েছে, ইন্দো-নেশিয়াও ঠিক সেই কথাই বলেছে পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে। উভয়েরই বক্তব্য হ'ল, তাঁদের দাবার প্রশ্নে মধ্যস্থতার মীমাংসার কোন অবকাশ নেই! কারণ সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোন সালিশী চলে না। রাষ্ট্রসংঘ শব্দে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তির জন্যে উভয় পক্ষকে অনুরোধ জানাতে পারে। কিন্তু অন্যায় জেনেও যে পক্ষ অন্যায় করে তার কাছে শান্তির আবেদন ব্যর্থ পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। চোদ্দ বছর ধরে ভারত পতু'গালের কাছে আবেদন জানিয়েছিল গোয়া ছেড়ে চলে যেতে, কিন্তু সে আবেদনকে পতু'গাল কর্ণপাত করার যোগ্য বলেও মনে করেনি। কিন্তু এখনই ভারত যথেষ্ট দাঁড়াল প্রাণভয়ে ভয়াত' পশুর মত পতু'গাল পালিয়ে গেল গোয়া ছেড়ে। পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কেও ঠিক সেই একই কথা প্রযোজ্য। যতদিন না হল্যান্ডকে বাধ্য করা হবে ঐ স্বীপাংশটুকু ত্যাগ করতে, ততদিন সে কিছুতেই যাবে না। সুতরাং বন্দ্য আলোচনার অকারণ কালক্ষেপ না করে ইন্দোনেশিয়া পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তির উদ্দেশ্যে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইন্দো-নেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ সুকর্ণো রাষ্ট্রসংঘের কর্মপ্রধান উ থাল্টকে জানিয়ে দিয়েছেন, ওলন্দাজদের বর্তমান মনো-ভাবে আলোচনা অর্থহীন, সুতরাং উ থাল্ট যেন আর মধ্যস্থতার চেষ্টা না করেন। বলা বাহুল্য, ইন্দোনেশিয়ার এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের শঙ্কিতই করে তুলবে। কারণ এর প্রকৃত তাৎপর্য কি পতু'গালের সাম্প্রতিক ভাণ্ডার-বিপর্যয় থেকে তার বুঝতে পারি নেই।



২৪শ
৬৪ ৬৪৬৮

আর.প্রি.দে.সঙ্ক

১১১-মহম্মদজার স্ট্রীট • কলিকাতা

সত্যবাহু

২২ ঘরে ২২

১লা ফেব্রুয়ারী—১৮ই মাঘ : সাম্প্রদায়িক দলগুলিই দেশ-বিভাগের জন্য দায়ী—জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য—জনসংঘ, হিন্দু-মহা-সভা, আর এস, এস, স্বতন্ত্র পার্টি ও আকালী দল দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে বলিয়া অভিভূত প্রকাশ।

বেতারের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার চালানোর পরিকল্পনা বাতিল—প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতানৈক্যের জের।

প্রায় তিনশত কংগ্রেসকর্মী সাময়িক-ভাবে বরখাস্ত—নির্বাচনে সরকারী কংগ্রেসপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি।

২রা ফেব্রুয়ারী—১৯শে মাঘ : শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে দেশকে সমৃদ্ধ করিতে বাংলার যুবকদের প্রতি আহ্বান—বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-এর (কলিকাতা) ৭৫ বৎসর পূর্তি উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ।

‘ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তৃতীয় পক্ষের সালিশী মানিব না’—লক্ষ্মী-এর জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা—কাশ্মীর সম্পর্কে কেনোডির (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) প্রস্তাব অগ্রাহ্যের কারণ ব্যাখ্যা।

৩রা ফেব্রুয়ারী—২০শে মাঘ : অষ্টগ্রহ সম্মেলনের প্রথম দিবস (শনিবার) নির্বিঘ্নে অতিবাহিত—কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা—গ্রহ-শান্তির জন্য সর্বত্র যথারীতি কাগযজ্ঞ, হোম ও নামকীর্তন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সহ-যোগিতা চুক্তি সম্পাদিত—কলিকাতার রুশ প্রতিনিধি মঃ জুকভ ও ভারত সরকারের প্রতিনিধি মিঃ হুমায়ুন কবীরের মধ্যে স্বাক্ষরিত দলিল বিনিময়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—২১শে মাঘ : ক্ষুধিত দেশবাসীর মধ্যে অন্নদান করাই কংগ্রেসের রত—‘হারদ্রাবাদে নির্বাচনী জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা—সমাজ-তান্ত্রিক নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় আহ্বান।

অষ্টগ্রহ সমাবেশের দ্বিতীয় দিনেও (রবিবার) ভারতের কোথাও প্রলয় কিংবা অভাবনীয় কিছু ঘটে নাই—বিশ্বশান্তির জন্য পূজা-অর্চনা ও বাগযজ্ঞ অব্যাহত।

৫ই ফেব্রুয়ারী—২২শে মাঘ : কংগ্রেসের আদেশেই দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সম্ভব—কলিকাতায় নির্বাচনী সমাবেশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা।

অষ্টগ্রহ সম্মেলন শেষ অবধি নির্বিঘ্নে অতিবাহিত—গ্রহ-সমাবেশের তৃতীয় দিনে (সোমবার) সন্ধ্যায় চন্দ্রের মকর-রাশি ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র জনসাধারণের স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ।

৬ই ফেব্রুয়ারী—২৩শে মাঘ : দুর্গাপূজার নতুন এ, ভি বি শিল্প-সংস্থার (বাংলা ও বৃটেনের সহ-যোগিতার নিদর্শনবাহী) উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান ডাঃ রায় (মুখ্যমন্ত্রী) কর্তৃক সম্পন্ন।

‘সমাজতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ ভিন্ন ভারত খণ্ড-বিখণ্ড হইবে’—মাদ্রাজের জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

৭ই ফেব্রুয়ারী—২৪শে মাঘ : আসামের বিভিন্ন সহরে ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট-দাবী পূরণে সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : ডিব্রুগড়ে ১১ হাজার ছাত্রের শিক্ষায়তন বর্জন।

‘একমাত্র কংগ্রেসই জাতিকে অগ্র-গতির পথে পরিচালনা করিতে সক্ষম’—আসানসোলে নির্বাচনী সভায় মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ রায়ের ঘোষণা।

২২ বাইরে ২২

১লা ফেব্রুয়ারী—১৮ই মাঘ : মিঃ সুরাবদী (প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী) গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্র-বিক্ষোভ ও ধর্মঘট-অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বন্দীর মুক্তি দাবী।

পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে ইন্দো-নেশিয়াল-নেদরল্যান্ড বিরোধের মধ্যস্থতায় উ থান্টকে (রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল) বিরত থাকিতে

ইন্দোনেশীয় সরকারের অনুরোধ—পশ্চিম ইরিয়ানে সৈন্য প্রেরণে ওলন্দাজ সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া।

২রা ফেব্রুয়ারী—১৯শে মাঘ : স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর বিতর্ক—মার্চ মাস পর্যন্ত স্থগিত—রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সি এস ক্যার যুক্তিপূর্ণ ভাষণের পর কার্য-ব্যবস্থা। ভূগর্ভে রাশিয়ার পারমাণবিক বিস্ফোরণ (পরীক্ষামূলক) ঘটানোর সংবাদ।

প্রচণ্ড মরু-ঝঞ্জায় সমগ্র সুরেজ অঞ্চল প্রায়ান্ধকার—সুরেজ খালে জাহাজ চলাচল বন্ধ।

৩রা ফেব্রুয়ারী—২০শে মাঘ : ঢাকায় ছাত্রদের সভায় পাক পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ মনজুর কাদির নাজেহাল—প্রশ্নবাণে জর্জরিত হইয়া শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠ-প্রদর্শন।

কিউবা হইতে আমেরিকার সর্ব-প্রকার আমদানী নিষিদ্ধ—কাস্ট্রো সর-কারকে (কিউবান) শাস্তেস্তা করার জ-কেনোডির ব্যবস্থা অবলম্বন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—২১শে মাঘ : পশ্চিম ইরিয়ানে ওলন্দাজদের সৈন্য ও যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণ।

পূর্ব পাকিস্তানের স্থানে স্থানে মিঃ সুরাবদীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল।

৫ই ফেব্রুয়ারী—২২শে মাঘ : সরকারের ‘মজুরী বন্ধি স্বাগিত’ নীতির প্রতিবাদে বৃটেনে ৩০ লক্ষ শ্রমিকের (জাহাজ নির্মাণ ও ইঞ্জিনারীবিং বিভাগীয়) ধর্মঘট।

শান্তিপূর্ণ আলোচনা মারফৎ আলজিরিয়ায় শীঘ্র যুদ্ধাবসানের সম্ভা-বনা—ফরসানী প্রেসিডেন্ট দ্য গলের বেতারভাষণ।

৬ই ফেব্রুয়ারী—২৩শে মাঘ : ঢাকায় পুলিশ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ—লাঠি-চালনায় ৭জন ছাত্র আহত : সমস্তদিন ব্যাপী প্রবল বিক্ষোভ।

টোকিও-এ প্রচণ্ড ভূকম্পনের সংবাদ।

৭ই ফেব্রুয়ারী—২৪শে মাঘ : কাঁদুনে গ্যাস উপেক্ষা করিয়া নারায়ণ-গঞ্জ হইতে ঢাকা অভিমুখে বিরাট মিছিল—ছাত্র-বিক্ষোভের মুখে দিশেহারা পাক-প্রেসিডেন্টের (আয়ুব খান) ঢাকা হইতে বিদায় গ্রহণ।

আলজিরাসে অব্যাহত সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা।

পশ্চিম জার্মানীর খনিগর্ভে প্রবল বিস্ফোরণ—প্রায় তিনশত শ্রমিক নিহত।

সমকালীন সাহিত্য

অভ্যুত্থান

৥ সাহিত্য ও শিল্পে রাষ্ট্রীয় বদান্যতা ॥

সম্প্রতি জনৈক কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে চারুশিল্প সম্পর্কে সরকারের যে দায়িত্ব আছে সেই বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অবহিত, চারুশিল্প উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতির পথে। রাষ্ট্রীয় আগ্রহ এক বস্তু, উন্নয়নের প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নামক বস্তুটি বিস্ময়কর, এই গুরুদায়িত্ব তাঁরা কাঁধে তুলে নিতে চান এবং সেইখানেই সমগ্র বিষয়টি বিশেষভাবে বিচারের প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের যারা কর্ণধার তাঁরা সহস্র কললক্ষ্মীর প্রতি এত আকৃষ্ট হলেন কেন, রাজনৈতিক মগ্ন ত্যাগ করে মুকুট-হীন রাষ্ট্রপ্রধানগণ কি অতীতের মুকুট-ধারী রাজন্যবর্গের সকল দোষগুণ অধিকার প্রয়াসী। আগে রাজাদের সভাকবি, সভাশিল্পী, সভাগায়ক প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বহু বাংলা গ্রন্থ মহারাজা মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী, লালগোলা মহারাজা, বর্ধমানের মহারাজা, বগুড়ার নবাব নবাব আলি চৌধুরী প্রভৃতি সাহিত্য-প্রেমিক মনীষীদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়েছে। পাতিয়ালার মহারাজা প্রভৃতির মত শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক একালে আর দেখা যায় না। বাংলা দেশের ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান শাসকবর্গ ছিলেন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। মথুরেশ্বরের অভিধান “শব্দ রত্নাবলী”তে তাঁর পৃষ্ঠপোষক মুসা খানের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

“যল্লক্ষ্মীরবৈরিগাং কুলবধু সিন্দুর
বিধংসিনী—
যদ্বাণী ললিতা সত্যং
গুণবতামানন্দকল্লোলিনী।
বরষ্মোত্তরকল্পনা বিজয়িনী কর্ণাদি
পৃথবীভূজাং
সোহংগ শ্রীমশনন্দ এল্লিন্দুতি
জীয়াচ চিরং ভূতলে।”

অর্থাৎ যার সৌভাগ্যে প্রধান শত্রুবর্গের কুলবধুদের সিন্দুর মুছে যায়, যার ললিতবাণী সং ও গুণবান লোকের

অন্তরে আনন্দকল্লোল প্রবাহিত করে। যার দানশীলতা কর্ণাদি রাজাদেরও গৌরব স্থান করেছে, এই সেই মশনদ আলি ভূতলে চিরজীবী হোন।। (মধ্য-যুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডঃ সুকুমার সেন)

পরে এইভাবে মধ্যযুগ-সূর্যের মত প্রবল প্রতাপাবলি মশনদ আলির অনুজ শ্রীমহম্মদ খান এবং কন্দর্প সহোদর অতিরাসিক আবদুল্লা খানের প্রশস্তিও আছে।

এই জাতীয় প্রচুর উদ্ভূতিদান করা যায়, এবং ঊনবিংশ শতকের গোড়ার যুগের মহাজন আনু কল্যা-পুষ্ট গ্রন্থাদির উৎসর্গ পৃষ্ঠটি একটি দর্শনীয় বস্তু। কিন্তু এই পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে একটি জিনিস ছিল যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ধনী এবং প্রতাপশালীদের যে তোষামোদ করা হত তা কিংবা প্রাণ্ডির আশায়— তাঁদের নির্দেশে নয়। দানের পট্টালির সঙ্গে আর কোনো অদৃশ্য তার বাঁধা থাকতো না। সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, স্বতোৎসারিত গতিতেই অগ্রসর হয়েছে, কোনোরকম প্রতিযোগিতা, বাধা বা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়নি।

সরকারি আনুকূল্যের উল্লেখ কিন্তু একটা সাধারণ ঘোষণা মাত্র নয়। অনেক সময় সভার মধ্যে অনেক কথা ভাবাবেগে অনেকেই বলেন, উপস্থিত জনগণের কর-তালির দ্বারা তার তাৎক্ষণিক প্রশস্তিও পাওয়া যায়, তারপর মহারাজ দৃষ্টান্তের মত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গেই সব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃতির অভলে নিমজ্জিত হয়। এই ঘোষণাও সেই জাতীয় কি না কে জানে। যদি তাই হয়, তাহলে মঙ্গল নতুবা সরকারি কর্মচারীরা চারুশিল্প, সাহিত্য, প্রভৃতির যদি কর্ণধার হন, এবং প্রতিটি আঞ্চলিক রাজ্যে কড়া পাহারায় তার উন্নয়ন ব্যবস্থা করেন তাহলে কিন্তু দেশের পক্ষে, চারুকলা বা সাহিত্যের পক্ষে, কোনো দিক থেকেই তার ফল শুভ হবে না। রাজপুরুষরা অতিশয় কর্মবাস্ত, তাঁদের সর্বদাই কাজের ভিড়ে নিঃস্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তারপর নিরন্তর সফর আছে, আজ এখানে কাল ওখানে, তাছাড়া নিজস্ব জ্ঞান, ধ্যান, ধারণা দিয়ে

তাঁরা যদি শিল্প ও সাহিত্যের মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হন তাহলে শিল্প ও সাহিত্যের পক্ষে দুর্দিন ঘনিজে আসবে। টেকস্ট বুক কমিটির আনুকূল্যে পাঠ্যপুস্তকের যে দুর্দশা সাহিত্যেরও সেই দুর্দশা ঘটা অসম্ভব নয়। আধুনিক যুগের যেসব সরকারি কর্মচারী উচ্চপদাধিকারী তাঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, এবং সুদৃঢ়চিস্তাশালী। কদাচিত্ত যে এর মধ্যে উল্লাসিক, বিকৃত রুচির মানুষ পাওয়া যায় না তা নয়, তবে সেই জাতীয় মানুষ শুধু সরকারি দপ্তরে নয়, সর্বশ্রেণী এবং সমাজেই আছে। মোটামুটিভাবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে সরকারী কর্মীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সহানুভূতিতে সমৃদ্ধ মানুষ অসংখ্য আছেন, কিন্তু সেই সত্ত্বেও একথাও স্মরণ রাখা কতব্য যে ঠিক মানুষটি ঠিক জায়গায় বসে নেই। যিনি শিল্প সম্পর্কে বিচারের অধিকারী, তিনি হয়ত কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা যিনি সাহিত্য বিচারের অধিকারী তিনি পূর্ত বিভাগের কাজে ব্যস্ত, সুতরাং সাহিত্য ও শিল্পের রাষ্ট্রীয় বিচার, উন্নয়ন, পুরস্কার বা তিরস্কার কিভাবে যে হবে তা অনুমেয়। যদি উন্নয়নের দ্বারা অক্ষম ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহ লাভ করে তাহলে তার ফলে যে গভীর হতাশা ও ক্ষোভের উৎপত্তি হয় তা নয়, সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা বিষয়ে সাধারণের অন্তরে একটা নিদারুণ বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়, এবং অনেক সময় দেখা যায় প্রশংসনীয় রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাও সাধারণের কাছে যথোচিত সমাদর লাভ করে না।

সাহিত্য ও চারুশিল্প শুধুমাত্র বাধাবন্ধহীন মুক্ত পরিবেশেই বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রচুর অবসর এবং অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও শিল্প গড়ে উঠেছে। স্বজন-শীল মানুষ চায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, এতটুকু বাধা বা বিপত্তি তার স্বাধীন চিন্তাকে ক্ষুণ্ণ করে। আনুকূল্য পরিবেশ-টাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, সমান একটা শব্দ, একটা সাময়িক উজ্জ্বল বা প্রতিকূল পরিবেশ অনেক মহৎ সৃষ্টির সর্বনাশ সাধন করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ একবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আ মা দে র বলেছিলেন— “লোকলক্ষ্মী গর্ভিণী, গর্ভিণীকে যেমন পরিচর্যা করতে হয়, তবে তিনি সুপ্রসব করেন, লোকলক্ষ্মীকেও তেমনি সন্তপনে পরিচর্যা করতে হয়, তবে সৃষ্টি হয় মহৎ সাহিত্যের, মহৎ শিল্পের।” রবীন্দ্রনাথের সেই আবিষ্কারগণী উজ্জ্বল সৌন্দর্য

ছিলাম তা আজো আমাদের মনের মাঝে দাগ কেটে আছে। কারখানায় বসে ফোরম্যানের নির্দেশে সাহিত্য সৃষ্টি বা শিল্প সৃষ্টি করা কোনোকালেই সম্ভবপর নয়। স্বাধীনতা ও অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য আজকের দিনে কোথায়, যেতারা-শিল্পীদের দুর্দশা সংবাদপত্র-পাঠকের অজানা নেই, ফিল্মের জন্য উপযুক্ত কাঁচা মালের অভাব, তার ওপর আছে সেনসরের কাঁচি, সবরকম সাহিত্য-গ্রন্থ আমদানি করার অবাধ অধিকার নেই, চিত্র সম্পর্কেও সেই কথাই বলা যায়। ডাক্তার যে জাতীয় মৃত্তিকায় মূর্তি-গঠনপ্রয়াসী সেই মৃত্তিকা হয়ত সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন। বাজারে পাওয়া যায় না। শিল্পীর রঙ আমদানী নীতি অনুসারে বিদেশ থেকে আনা যাবে না, যদিও যায় তার মূল্য অনেক বেশী, কর্তার প্রচণ্ড। স্থপতি দেশলাই বাজের মত বাড়ি করবেন কিন্তু সিমেন্টের অভাব। সংগীতকার কিংবা কবি যে নিভূতে বসে সংগীত বা কবিতা রচনা করবেন তার উপায় নেই, চারপাশে কলকারখানা, ট্রাম বাস, মোটরের বীড়ৎস চীৎকার, ছন্দ যাত মিল-সব সেই আসুরিক-উৎপাতে দেশ ছেড়ে পালানোর উপক্রম করে।

সরকারি ব্যবস্থায় যদি পাবলিক ওয়াকস ডিপার্টমেন্টের মত একটা চার-শিল্প ও সাহিত্যের কারখানা খোলা হয় তাহলে সেটা হয়ত সাহিত্য ও শিল্পের আড়াল হইবে। সৎ এবং মহৎ সাহিত্য বা শিল্পকর্ম সরকারি আওতায় গড়ে উঠতে পারে না। গণতান্ত্রিক দেশে তাই নয়। এদেশে এখনও ইংরাজ আমলের “প্যারিটি” ব্যবস্থা বজায় আছে। জন-সংখ্যা অনুপাতে যেমন করের বণ্টন হয়, সাহিত্য বা শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়োজন আঞ্চলিক অবস্থা বিবেচনা করেই স্থিরীকৃত হয়, নিছক গুণানুসারে নয়।

তাই মনে হয়, সরকারি আনুকূল্যে সবরকম বাধা-বিপত্তি দূর হোক, মহৎ সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির মতো অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠুক। কিন্তু প্রদেশে প্রদেশে অহেতুক অশোভন প্রতিযোগিতা দূর হোক, আনুকূল্য আর অনুগ্রহ এই দুটি বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা যদি বিচার করা যায়, তাহলেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার একটা সুন্দর ফললাভ করা যায়। যোগ্য ছাত্রদের যেভাবে বৃত্তি দান করা হয় ঠিক সেই মনোভঙ্গীতে এবং মাপকাঠিতে সাহিত্য বা শিল্পের বিচার করা অসংগত, অশোভন এবং অযথা দারুণ—এই কথা স্মরণ করা সকলের কর্তব্য। শিল্প ও সাহিত্যের উন্নয়নের চরম দায়িত্ব শিল্পী ও লেখকের, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নয়। শিল্পী ও সাহিত্যিকদেরও রাষ্ট্রীয় বদান্যতার মোহমুগ্ধ হতে হবে।

নতুন বাই

প্রতিধ্বনি ফেরে— (উপন্যাস) :
প্রেমেন্দ্র মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড। ৫, চিত্তামণি
দাস লেন, কলি-১। দাম—৪-০০।

কবি এবং গল্পকার হিসাবে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র এক অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠার অধিকারী। উপন্যাস রচনায় ইতিপূর্বে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ দেখা না গেলেও সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কথাসাহিত্যের সে বিভাগেও যাতায়াত



করেছেন তিনি একাধিকবার। এবং তার মধ্যেও প্রেমেন্দ্রবাবুর ব্যক্তিগত ছাপ লক্ষ্য করা গেছে।

আলোচ্য উপন্যাসখানি কিন্তু সৈদিক দিয়ে অন্য জাতের সৃষ্টি। এর মধ্যে কেবল প্রতিভার হঠাৎ আলোর বলকানি নয়, এমন একটি সাধনার স্বাক্ষর দেখা যায়, যার ফলে নির্ভুলভাবেই একে লেখকের সমগ্র জীবনের অন্যতম প্রধান সৃষ্টি বলে সনাক্ত করা সম্ভব। বাস্তবিক, একদিকে অত্যন্ত স্বচ্ছ বাস্তবনিষ্ঠা এবং অন্যদিকে কাহিনীর বহিরগতির আড়ালে একটি স্বতীয় বস্ত্য উপস্থাপনার দক্ষতায় এই উপন্যাস কেবল প্রেমেন্দ্রবাবুরই নয়, সাম্প্রতিককালে রচিত সমস্ত কথা-সাহিত্যের মধ্যেই অবিস্মরণীয়।

কাহিনীর নায়ক উমাপতি ঘোষাল অগ্নিবয়স্কর দেশকর্মী, বর্তমানকালের সাংগঠনিক নেতা, কিন্তু উপন্যাস যখন শুরু হয়েছে তখন তিনি মৃত। তাঁরই প্রতিধ্বনি ফেরে পরিচিত নারীপুরুষের স্মৃতির দেয়ালে, প্রত্যেকের কাছেই তিনি

বিভিন্ন—একটি দ্রিশির পরকলায় বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মির মতো তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্যুতি ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণে ছড়িয়ে পড়ে সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, কেউই তাঁকে সম্পূর্ণ করে পায়নি, বোঝেনি। ব্যতিক্রম বোধহয় শুধু অশীতিপর বৃদ্ধ নিশীথবাবু এবং যৌবনমত্তা তরুণী মলয়া। একজন সস্নেহ অভিজ্ঞতা আর অন্যজন সপ্রেম অভিজ্ঞানে উমাপতিকে বুঝতে পেরেছিলেন কিছুটা। অন্য সকলে তাঁর ব্যক্তিত্বের ভূশাংশকেই পৃথকতর মর্যাদা দিতে গিয়ে বিভ্রান্ত হ’য়েছেন।

কিন্তু নিশীথবাবু আর মলয়ার দৃষ্টিকোণ একেবারে পরস্পর-বিরোধী। উমাপতির স্মৃতিসভায় নিশীথবাবু বলেন, ‘.....এক আশ্চর্য মিছিলের মশাল সে জ্বালাতে চেয়েছিল, তা পারেনি বলে নিজের শিখায় নিজেকেই সে ভস্মীভূত করে গেছে।.....’ আর মলয়া তার মায়ী নীরজাদেবীকে (যিনি সে সময়ে উমাপতির অন্যতম ভক্ত ছিলেন, তাঁকে) ধমক দিয়ে বলেছে, ‘তুমি থামো তো মা। ওর ভেতরেও যে একটা মানুষ আছে আমাদের মত, সেইটে সবাই মিলে তোমরা ভক্তি আর ভয় দিয়ে চাপা দিয়ে রাখতে চাও।’

আর এ দুই মেরুর মধ্যবর্তী অংশের অভিজ্ঞতা হল জয়ার। তার উদ্দীপ্ত দেশপ্রেম, যুক্তিবাদের প্রতি নিষ্ঠা এবং কল্যাণময়ী আত্মসংযম তাকে দিয়ে মনে মনে উমাপতির উদ্দেশ্যে বলিয়েছে, ‘তুমিও বাঁধা পড়বার জন্যে তৈরী হওনি, আমিও বাঁধবার জন্যে নয়। ঘর আমাদের জন্যে নয়, আলো-আধারী এই নির্জন শহরের একটা নিরুদ্দেশ রাতই আমাদের সম্বল হ’য়ে থাক।’

একশ পচাত্তর পৃষ্ঠার এই অনতি-বৃহৎ উপন্যাসখানির সুনিপুণ রচনা-কৌশলে বৃহদায়তন একটি মহাকাব্য পড়ার অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল। এ জগতে কিছুক্ষণ বাস করার পর আমাদের নিজেদের অস্তিত্বও অন্যতর ব্যক্তির সম্মুখ হইবে ওঠে। এতে কেবল বিভিন্ন নারীপুরুষের স্মৃতিচারণে উমাপতিকেই স্পষ্টতর করে চেনা গেল তা নয়, উমাপতির সঙ্গো তাদের বিচিত্র আচরণের টানাপোড়েনে একটা সম্পূর্ণ যুগকেও গভীরভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হল। বর্ণনার তীক্ষ্ণতায়, প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের বৈদগ্ধ্য, এবং সর্বোপরি চরিত্রসৃষ্টির অপারিসীম

মুমতায়: 'প্রতিধ্বনি ফেরে' আমাদের কালের মতোই অনাগত ভবিষ্যতের পাঠকদের মনেও যে প্রতিধ্বনি তুলবে তাতে সন্দেহ নেই।

বইখানির প্রচ্ছদ-পরিষ্কারণা অভিনব।

বেগু ও বাঁগা— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। মিত্র ও শোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে এস, এন, রায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪-০০।

রবীন্দ্র-সমসাময়িককালে যে দু'চারজন কবি স্বাতন্ত্র্যের জন্য স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের পুরোভাগে। মৌলিক ভাব-ভাবনার প্রকাশ তাঁর কবি-মানসকে বিহ্বল না করলেও, বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্য-মাধ্যম তাঁর কাব্যসৃষ্টির আনন্দেরূপে অনাম্বাদিতপূর্ব আন্বাদন দান করেছে আমাদের। শব্দের চয়ন-বয়ন ও প্রয়োগ-কৌশলের অশ্রুত যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ। অপরিসীম অনস্বিৎসা ছিল তাঁর মধ্যে। বিভিন্ন ছন্দের উপর ছিল তাঁর অপারাজিত প্রত্যয়। নানা ছন্দের বেসাতীকার ছন্দ-সরস্বতী সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যলক্ষ্মীর যে অফুরান ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে গিয়েছেন, আজও তা যেমন রসিকজনের বিলক্ষণ উপভোগের সামগ্রী হয়ে আছে, নিরবধিকালও তেমনি থাকবে।

'বেগু ও বাঁগা' সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-মাধুর্যের প্রাথমিক প্রকাশ। ম্বাদশ ও ত্রয়োদশ বয়ঃক্রমকালেই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-রচনার প্রতি অনুরাগ দেখা দেয়। এই গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩১৩ সালের আশ্বিনে, এবং এই কাব্যগ্রন্থের সমূহ কবিতাগুলিই তাঁর ম্বাদশ বর্ষ থেকে পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যে রচিত। সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১২৮৮ সালের ২৯শে মাঘ। কবিতা-রচনার এই কাল ও কবির জন্মকাল নিগণিত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ লিখিত প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ও কবিরব্দ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সত্যেন্দ্র-পরিচয়'-এর মধ্যে। আলোচিত বর্তমান সংস্করণে এই বিবিধ বিষয়ই পদনর্দ্রিত হয়েছে।

সর্বসমেত বিবিধ বিষয়ের পঁচাশিটি কবিতায় 'বেগু ও বাঁগা' সমৃদ্ধ। অধিকাংশ কবিতা আকারে দীর্ঘ হলেও, নগ্নদীর্ঘ কবিতাও আছে বহুসংখ্যক। দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থাকার পর, প্রকাশক মিত্র ও শোষ এরূপ একখানি সমৃদ্ধিত ও উল্লেখযোগ্য কাব্যরসসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ

করে কাব্যরসিক মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা—(প্রবন্ধ) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। দাম—পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ—(প্রবন্ধ) শ্রীনিলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ পাঠশালার। কলিকাতা-১২। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন প্রবন্ধকার হিসাবে বাঙলা দেশে সুপরিচিত। বিশ্ব-ভারতীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও দীর্ঘদিনের। তিনি দীর্ঘকাল রবীন্দ্র-সাহিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অতিবাহিত করে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আহরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তার সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। 'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়', 'বিশ্বভারতী প্রসঙ্গ', 'শিক্ষার লক্ষ্য', 'শিক্ষাসমস্যা', 'শিক্ষার মূল্য', 'ভাষার মূল্য', 'সাহিত্যের মূল্য' প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে যে অভিমতসমূহ ব্যক্ত করা হয়েছে তার দ্বারা বিদগ্ধ পাঠক অনেক কিছু জানতে পারবেন। এমন কি শিক্ষা-ব্রতী মানুষকে শিক্ষাব্যাপারে অনেক কিছু জানবার প্রেরণা দেবে এ প্রবন্ধ-গুলি। কেবলমাত্র রবীন্দ্রচর্চা নয় বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনার আলোকপাত করবে আলোচিত বিষয়-

সমূহ। শিক্ষা সম্পর্কিত গ্রন্থ পূর্বারে আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

দ্বিতীয় গ্রন্থটির রবীন্দ্রশতবর্ষ-পাঠ-সংস্করণ। পূর্ববর্তী সংস্করণে

RUPA PAPER-BACKS

SUFFERINGS OF YOUNG WERTHER

by Goethe Rs. 2-50

"It is a masterpiece in which devastating feeling and precocious artistic understanding achieve an almost unique combination. Youth and genius are its subject and out of youth and genius it was created". Thomas Mann.

ALL OR NOTHING

by John C. Powys Rs. 3-00

A novel of humour and sadness and mystery of life on this earth.

THE PRODIGY, a novel by Hermann Hesse Rs. 3-00

Nobel prize winner 1946

SOMEONE WILL DIE TONIGHT IN THE CARIBBEAN

by Rene Puisseuseau Rs. 2-50

An adventurous voyage to the underside of paradise—the wind ravaged, backwater islands of the caribbean.

(a list of other titles on application)

RUPA & CO.

15 Bankim Chatt. St. Cal-12

94 South Malaka, Allahabad-1

11 Oak Lane, Fort, Bombay-1

গাঠকবর্গের প্রতি সর্বনয় নিবেদন

বিগত ১৯৩৪ (ইং) সাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ, M.A. (Cal.), Ph.D. (Edin.) Fellow of the National Institute of Sciences, India মহাশয় নিজ নামে এবং "ভাস্কর" এই ছদ্মনামে (শ্রীভাস্কর নহে) বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প, কবিতা, রসরচনা প্রভৃতি লিখিয়া আসিতেছেন।

সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক বা অন্য কোন প্রকার গ্রন্থফল নক্ষত্রফল, তিথিফল, জন্মফল, মৃত্যুফল, ভবিষ্যদ-গণনা, অদৃষ্ট-গণনা প্রভৃতি বিষয়ে ডঃ ঘোষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। জনসাধারণের নিকট ইংহা বিনীত অনুরোধ এই যে কেহ উপরোক্ত বিবিধ ফলাফল বিষয়ে কোন প্রকার প্রশ্ন বা মন্তব্য করিয়া ডঃ ঘোষকে অবগত করিবেন না।

গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের রচনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিজস্ব দৃষ্টির আলোকে সত্যকে ধরবার চেষ্টা করেছেন তার দ্বারা রবীন্দ্রশিল্প ও সাহিত্যজগতের প্রবর্তন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রকাব্যের রসাবেদন কেবলমাত্র বৃন্দার কাছে নয় তার জন্য স্বতন্ত্র রসঘন জগতে উত্তরণের প্রয়োজন আছে। সেকথা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই দরদী রবীন্দ্র-পাঠকের কাছে গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ‘শিশুপী রবীন্দ্রনাথ’, ‘রবীন্দ্রনাথ ও দর্শনবাদ’, ‘রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা’, ‘রবীন্দ্রনাথের ভাষা’, ‘রবীন্দ্রনাথের তমি ও আমি’ আলোচনাগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। রবীন্দ্র-সাহিত্য-জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে গ্রন্থটির মূল্য অপরিহার্য।

প্রাচীর— (উপন্যাস), শ্রী রমজেন্দ্রনাথ প্রকাশকঃ নবমুগ সাহিত্য মন্দির।
৩নং বেলিয়াঘাটা মেইন রোড,
কলিকাতা-১০। প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা-৬।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীটি, কলিকাতা-৬। মূল্য—তিন
টাকা।

একটি বিশেষ আদর্শ মনে রেখে এই উপন্যাসখানি রচিত। এবং সে আদর্শ সাধারণ গল্পের মনস্তাত্ত্বিক কসরৎ দেখানোর কৃতিত্বে শেষ নয়। এর মানস-পরিধি আরও ব্যাপক এবং গভীর। একটি নারী তার অভ্যস্ত পরিবেশের বাইরে মাথা তুলতে যে আত্মত্যাগ করেছে, তার সঙ্গে দেশের সকল ‘এক চাকাতাই বাঁধ’ নারীর চিত্তের যোগ স্থাপন করাই লেখিকার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে লেখিকা ঘরের এবং বাইরের পরিবেশ চিত্র যা এঁকেছেন তা যেমন বাস্তব, তেমনি সুন্দর। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকারের কথা শুনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লেখিকা ঠিক সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার কথাই মনে রেখেছেন কাহিনী রচনার সময়। এ বইতে স্বভাবতই সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে অনেক মতামত প্রকাশ করতে হয়েছে লেখিকার। সে সব মতামত যেমন জোরালো তেমনি স্পষ্ট। লেখিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরূপে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এবং লেখিকারূপে আশাপ্রদ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছেন এ বইতে। ভাষা স্থানে স্থানে কাব্যধর্মী

হয়ে উঠেছে, মনকে নন্দিত করে। শক্তির পরিচয় এর প্রতি পৃষ্ঠায়।

শান্তির পাখিরা এবং তুমি—
(কবিতা)। সুবোধু ভূগ। দিশারী।
৫২ পৃষ্ঠা। কলিকাতা—৬।
মূল্য : দুটাকা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করলে কবির সত্যতা এবং কবিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। প্রেম এবং নিঃসঙ্গের পরিমন্ডলে আশ্রিত একটি অনুভূতিশীল কবিত্বের প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতানিচয়ে। কিছু আবেদনকর্ম চিত্র-রূপ এবং পংক্তিও রয়েছে কবিতা-গুলিতে। কিন্তু, এই কাব্যের ভাবনায় এবং কবিতার ভাষারীর-নির্মাণে ভীষণানন্দের প্রভাব এতই অধিক এবং সুস্পষ্ট যে, প্রায়শই তা আলোচ্য কবিত্বের আবেদনের স্বাভাব্য এবং নিজস্বতাকে ক্ষয় করে। কবির সিঁধের পক্ষে তা একটি প্রধান অন্তরায়। তবু, কাব্যগ্রন্থটি কবির পরবর্তী সৃষ্টি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করে।

পৃথিবী গগোপাধ্যায় অধিকতর প্রচ্ছদচিত্র কবিতাপুস্তকটির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

প্রথম তারার আলো— (কবিতা)।
অনুগ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য : দুই
টাকা। নব নীপম। ১৪, ভুবন
ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা—৭।

আধুনিক ভাষায় লিখিত চার্লিটি কবিতা সমির্বেশিত হয়েছে এই পুস্তকে। অবশ্য আধুনিকতার অনিবার্য কিছু প্রভাব রয়েছে কাব্যভাষায়। বিষয়-বৈচিত্র্য থাকলেও রচনা হিসাবে সার্থক, নতুন এবং নিপুণ কোন কবিতা দৃষ্ট হয় না। প্রায় অধিকাংশ কবিতাই গতানুগতিক এবং অনুজ্জ্বল। কদাচিৎ দু-একটি চকিত প্রতিশ্রুতিময় পংক্তি চোখে পড়ে।

পল্লী পুনর্গঠন—(গমজ - বিজ্ঞান)
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। অনু-
বাদক—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
গান্ধী স্মারকনিধি (বাংলা শাখা)—
পরিবেশক— সর্বোদয় প্রকাশন
সমিতি। সি ৫২০, কলকাতা-১২। দাম তিন
টাকা।

মহাত্মা গান্ধী পল্লী সংগঠন এবং
সংস্কার সম্পর্কে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা

করেছিলেন এবং সেই সব রচনা তাঁর
সম্পাদিত Young India এবং ‘Harijan’
পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এই সব প্রবন্ধ
এবং অন্যান্য প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী সংকলন
করে স্বর্গীয় ভরতন কুমারাপ্পা মহাশয়
নবজীবন ট্রাস্টের পক্ষে “Rebuilding
our Villages” নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ
করেন আলোচ্য গ্রন্থটি সেই ইংরাজী
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। গান্ধীজী ভারতের
গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং গ্রামীণ উন্নতির
উপর সর্বাপেক্ষা অধিক জোর দিতেন।
তিনি বলতেন—ভারত আসলে বাস করে
গ্রামে। গ্রামবাসীদের শারীরিক, আর্থিক,
সামাজিক এবং নৈতিক উন্নয়নের প্রতি
তাঁর লক্ষ্য ছিল, তাদের সঙ্গে তিনি
একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সেই মহা-
মানবের কি আদর্শ ছিল, কি তিনি
চেষ্টাছিলেন তা এই গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া
যাবে। শ্রদ্ধা গ্রামবাসীদের আর্থিক
উন্নতি নয় তাদের আর্থিক উন্নতির
প্রতিও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। বর্তমান
সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা আর্থিক দিকটায়
দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়ে আর্থিক দিক-
টির অবহেলা করছি একথা বলা বাহুল্য।
আজ গান্ধীজীর শারীরিক উপস্থিতি
আমাদের মধ্যে নেই, এই জাতীয় রচনার
মাধ্যমে সেই মহাপুরুষকে স্পর্শ করার
সৌভাগ্য আমাদের সহজ হয়ে উঠেছে।
গ্রন্থটির অনুবাদ সুন্দর, স্বচ্ছ এবং
সাবলীল। পরিশেষে লেখক ভূদান
আন্দোলনের লক্ষ্য এবং তাৎপর্য নামক
প্রবন্ধটি মহাত্মাজীর রচনাবলীর লেজুড়
হিসাবে না জড়ুলেই হয়ত ভালো
করতেন। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত।

রক্তবান্ধবের ত্রিকথা— (প্রবন্ধ)
রক্তবান্ধব উপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান
অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং
প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী
রোড, কলিকাতা-৭। হইতে
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত। মূল্য—২-৫০।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি-
উৎসবের সঙ্গে আজ বাংলা তথা ভারতের
অন্যতম মনীষী রক্তবান্ধব উপাধ্যায় জন্ম-
শতবর্ষপূর্তি-উৎসবও জড়িত। বিপ্লবী
‘সম্মুখ’ সম্পাদক রক্তবান্ধব কবিগুরু
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই বৎসর ১৮৬১
সালে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানতপস্বী
রক্তবান্ধব যেমন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী
ছিলেন এবং বোলপুর রক্তচর্যাগ্রামে
শিক্ষকতাও করেছিলেন, তেমনি রবীন্দ্র-
নাথও তাঁকে সুহৃদ হিসাবে গ্রহণ করে,

তার সম্বন্ধে বহু মূল্যবান উক্তি করে গিয়েছেন। একস্থানে তিনি ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে বলেছেন, "তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সম্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক, —তেজস্বী, নিভীক, ভাগ্যী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাপকবিশিষ্ট তার অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।"

'Sophia' পত্রিকায় 'The World-Poet of Bengal' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথের ভূমিসী প্রশংসা করেন এবং 'The Twentieth Century' পত্রিকায় কবির 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের দীর্ঘ সমালোচনা করেন। এতদ্-বাতীত অন্যান্য নানা বিষয়ে বহু জ্ঞান-গর্ভ রচনায় সমৃদ্ধ ছিল উপাধ্যায় মহাশয়ের লেখনী। এই রচনা-সম্ভারের মধ্যে পুস্তকাকারে 'বিলাত-যাত্রী' সম্যাসীর চিঠি অন্যতম। বাংলার ১৩১০ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'ব্রহ্মবান্ধবের চিকিৎসা'র মধ্যে এই গ্রন্থ-খানি ব্যতীত 'বাংলার পাল-পার্বণ' ও 'আমার ভারত উদ্ধার' একত্রে স্থানগ্রহণ করেছে।

'বাংলার পাল-পার্বণ'-এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, জামাইষষ্ঠী, স্নান-যাত্রা, রথ-যাত্রা, 'কোজাগর লক্ষ্মী পূজা', শিব-চতুর্দশী, দোল-লীলা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে নিরপেক্ষ শ্রদ্ধায়। 'আমার ভারত উদ্ধার' প্রবন্ধটির মধ্যে ব্রহ্মবান্ধবের ব্যক্তিগত জীবনে স্বদেশিক-তার প্রভাব কিভাবে সূচিত হয় তারই রসগর্ভ চিত্র চিত্রিত হয়েছে। দার্শনিক ও সাংবাদিক হয়েও তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে বক্তব্যপদ্ধতি ও সাবলীল ভঙ্গী বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। বিস্মৃতপ্রায় এই সকল রচনাসমূহের একত্র প্রকাশ অত্যন্ত যুগোপযোগী ও সংসাহিত্যপ্রকাশ-চিকিৎসার নিদর্শন।

স্বরকল্লোল (গান ও স্বরলিপি)—
নরীণগোপাল আইচ। প্রকাশক :
প্রশান্তকুমার মূখোপাধ্যায়। শত-
দল। ৪১১, ডায়মন্ডহারবার রোড।
কলিকাতা-৩৪। দাম—২-৭৫ নয়া
পয়সা।

এই গ্রন্থে চাব্বিশটি গান ও সংগীত-লিপি মুদ্রিত হয়েছে। সব গানেরই কথা ও সুর গ্রন্থকার শ্রীনরীণগোপাল আইচ-কৃত। উক্ত গানগুলিতে যে-সব রাগ প্রয়োগ করা হয়েছে তার অধিকাংশই প্রচলিত। তা ছাড়া, হংস, সখল খাম্বাজ ও নাটিকা রাগের গানও গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থারম্ভে বাবসুত রাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাল-নির্দেশ দেওয়া আছে। দ-একটি রাগ-পরিচিতির ক্ষেত্রে 'কিছু কিছু' মন্তব্যের অবকাশ আছে।

আলোচ্য গ্রন্থ যে স্বরলিপি-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, বহুল পরিচিত বাংলা 'আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি'র

সঙ্গে তার অনেকাংশে সামঞ্জস্য থাকলেও হুবহু এক নয়; আবার উত্তর ভারতীয় ক্লাসিক্যাল রাগসংগীতের ক্ষেত্রে যে স্বরলিপি পদ্ধতিগুলি বর্তমানে অধিক প্রচলিত তা থেকেও ভিন্ন।

কবিতা ও গানের ছন্দে প্রায়শঃ পার্থক্য থাকে। গানের উদ্দেশ্যে যে-কবিতা রচিত তাতে যদি কাব্যগত ছন্দের সাবলীলতার অভাব ঘটে, নিরামিতভাবে

সুর-তালবন্ধ হয়ে সে-কবিতা গানের রূপ নিলে ওই অভাব ঘটে যায়। পূর্বে আলোচিত 'সুর ও বাণী' গ্রন্থে এবং আলোচ্য গ্রন্থে তার কতক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

'স্বর কল্লোল' গ্রন্থে শ্রীনরীণগোপাল আইচ রাগসংগীতের ভিত্তিতে স্বীয় রচনাকে সুর-তালবন্ধ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির সহায়তার সংকলিত স্মারক গ্রন্থ

যে মহামানব হলেন সমগ্র বিশ্বের
প্রতিজ্ঞাবি, তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন দিক
অবলম্বন করে আলোচনা করেছেন বাংলার
প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমালোচক ও অধ্যাপক-
বৃন্দ। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে
প্রাজ্ঞাধীমানদের লেখা অথচ জ্ঞান সমুদ্রের
মত এরকম গ্রন্থ আজও সংকলিত হয়নি।
রোহিনী বামাই, দুঃপ্রাণা আলোকচিত্র সহ
অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথ

॥ এই গ্রন্থে বাঁদের লেখা আছে ॥

ডঃ সুনারীতকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, ডঃ শশিভূষণ দালগুপ্ত,
ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রমথনাথ বিদ্যাপী,
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী, শ্রীআমরকুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীপংকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমলাপ্রসাদ মূখোপাধ্যায়,
শ্রীঅশোকবিজয় রাহা, ডঃ অমলেন্দু বসু, ডঃ বিকপদ ভট্টাচার্য, শ্রীসুমন্ত
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সরোজকুমার দাস, শ্রীঅলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত, ডঃ উমা রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মূখোপাধ্যায়, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য,
শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্রয়, শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্তী, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। দাম ১০০

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন গ্রন্থ

এই গ্রন্থে

৪৫৬ পৃষ্ঠার এই সংকলন গ্রন্থে ৫০জন শ্রেষ্ঠ রস-সাহিত্যিকের রসগ্রন্থার
সমৃদ্ধ, ঘনোটেইশে ছাপা রমনীয় পাঁচ রঙা প্রচ্ছদ, সিন্ধু কাপড়ে বাঁধাই।
গরিমল গোম্বারীর মূল্যবান ডুম্বিকা সংকলিত। দাম ৭-৫০
বিশীর্ষার সংসার—আশাপাণী দেবী ৪-০০ • নীল নিধি—সচিন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় ০-২৫ • জলন্তালের শিশিরকুমার-তারাকুমার মূখোপাধ্যায়
৪-০০ • এই লহরে—বেদুইন ২-৫০ • বামশা-বেগম-নজর—বেদুইন ০-৫০
গৌড় কন্যা—বেদুইন ০-৫০ • চোরকাটা—নীহার গুপ্ত ০-৫০ • এক
রাজার ছয় রাণী—বিমল মিত্র ৪-৫০ • প্রথম পুরুষ—বিমল মিত্র ০-০০
পিন্না-মুখ-চন্দা—নীহার গুপ্ত ৪-৫০ • বাঁহাশিখা—নীহার গুপ্ত ৬-৫০

ইন্টেলাইট বুক হাউস



২০, স্ট্যান্ড রোড কলিকাতা।

ফোন : ২২-৬৩৮৯

শ্রেষ্ঠম সূত্র

নান্দীকর

আজকের কথা

ঐতিহাসিক ও জীবনী-চিত্র :

“রাজসিংহ” ব্যতিক্রমচন্দ্রের একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন, “ঐতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাস-লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে সকল স্থানে উপন্যাস ঐতিহাসের আসনে বসিতে পারে না।.....উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাশ্রুত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমাধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।.....উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।”.....অর্থাৎ ঐতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে যদি উপন্যাস বা নাটক কিংবা কাহিনী-চিত্র রচনা করা যায়, তাহলে তাদের ষোল আনাই যে ঐতিহাস হতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। উপন্যাস বা নাটকের একটা ধর্ম আছে। তার ভিতর দিয়ে যে-কাহিনী বলা হয়, তাকে হৃদয়গ্রাহী, রসঘন, রোমাঞ্চকর বা নাটকীয় করবার জন্যে কাহিনীকারকে ঐতিহাসের সঙ্গে কল্পনার সূত্রে সংমিশ্রণ করতে হয়। নইলে ঐতিহাসের ঘটনাকে উপন্যাস বা নাটকের উপজীব্য করে তোলা যায় না। ঠিক সমানই কথা বলা যায় জীবনী-নাটক বা জীবনী-চিত্র সম্বন্ধে। আত্মজীবনীর ওপর রং চাড়িয়ে উপন্যাস লেখা

বহু হয়েছে, যেমন আমাদের শরৎচন্দ্র-লিখিত ‘শ্রীকান্ত’; কিন্তু অপরের জীবনী নিয়ে—যেমন, লুই পাস্তুর এমিল জোলা, ইজাডোরা ডানকান, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ



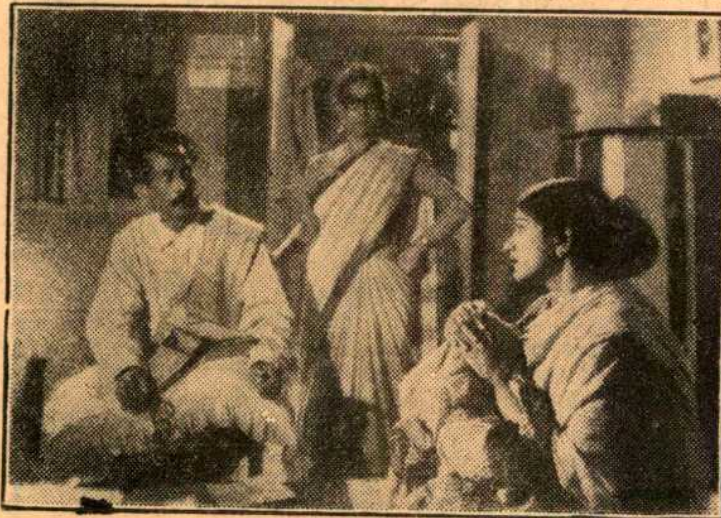
তারাসংকরের কাহিনী অবলম্বনে, অগ্রগামীর ‘কাম্মা’ চিত্রের একটি দৃশ্যে নান্দীকর।
বসু ও উত্তমকুমার।

প্রভৃতি নিয়ে—জীবনচিত্রই লেখা হয়েছে, উপন্যাস লেখা হয়েছে বলে জানা নেই। কিন্তু জীবনী নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বহু নাটক এবং সাম্প্রতিক কালে কাহিনী-চিত্র রচিত হয়েছে। এই জীবনী-নাটক রচনার ব্যাপারে ‘এব লিঙ্কন ইন ইলিনয়েস’-এর নাট্যকার রবার্ট এমের্ট শেরউড বলেছেন, “The playwrights’ chief stock in trade is feelings, not facts. When

he writes of a subject out of history, or out of today’s news, he cannot be a scholarly recorder or a good reporter; he is, at best, an interpreter, with a certain facility for translating all that he has heard in a manner sufficiently dramatic to attract a crowd. He has been granted, by a tradition that goes back to the kings of Thebes, considerable poetic license to distort and embellish the truth; and

he generally takes advantage of far more license than he has been granted.”

(নাট্যকারের প্রধান উপজীব্য হচ্ছে তার অনুভূতি, ঘটনার স্বার্থ নয়। ঐতিহাসের কোনো বিষয়, বা আজকের দিনের কোনো সংবাদকে অবলম্বন করে যখন সে রচনা করে, তখন সে একজন বিদগ্ধ দলিল-লেখক বা উৎকৃষ্ট সংবাদদাতা নয়; সে বড় জোর একজন ব্যাখ্যাতার কাজ করে এবং তাও সে যাকিছু শুনছে, তাকে তার সুযোগের সম্ভাবনার করে এমন নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করে, যাতে বহুজন আকৃষ্ট হয়। থিব্‌সের রাজার যুগ থেকে লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত ঐতিহাসে এতখানি কবিসুলভ স্বাধীনতার সে অধিকারী যে, সে সত্যকেও বিকৃত এবং সুসজ্জিত করতে পারে। এবং সাধারণতঃ তাকে যতখানি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার থেকেও বেশী স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করে।) উদাহরণস্বরূপে তিনি বলেছেন, যিনি আসল ক্রিওপেট্রা ছিলেন, সেসকল-পীরারের সূচী ক্রিওপেট্রার সঙ্গে তাঁর হয়ত কিছুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না এবং বাগার্ড শ’ কর্তৃক সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে অঙ্কিত ক্রিওপেট্রা থেকেও তিনি নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র ছিলেন। অথচ এ নিয়ে



চলচ্চিত্র প্রদর্শন সংস্থার মূল্যবোধবিশিষ্ট ‘সুধাঙ্গিনী’ চিত্রের একটি দৃশ্যে তৃপ্তি মিত্র, আরতি মিত্র ও বেহু সিং।

মিশরবাসীদে মধ্যেও কেউ আজ মাথা ঘামায় না।

নাট্যকার বা চলচ্চিত্র-কাহিনীকারের প্রধান লক্ষ্য, কাহিনী বা নাটক হিসেবে তার রচনা সাধক কিনা। তিনি ইতিহাসও লিখতে বসেন না বা জীবন-চরিত্রও লিখতে বসেন না। তাই ঐতিহাসিক পারস্পর্য বা খুঁটিনাটির দিকেও যেমন তাঁর নজর দেবার সুযোগ নেই, তেমনই কোনো জীবনীর সকল ঘটনা যথাযথ লিপিবদ্ধ হ'ল কিনা, তাও তাঁর লক্ষ্যের বাইরে। মাত্র তাঁকে মনে রাখতে হয় ইতিহাস বা জীবনী যেন 'অযথা' বিকৃত না হয়। অর্থাৎ 'যথা' বিকৃত করবার অধিকার তাঁর আছে। নাটক বা কাহিনীর গুরুতর প্রয়োজনে তিনি ঐতিহাসিক বা জীবনী সংক্রান্ত তথ্যকেও বিকৃত করতে পারেন। ইতিহাসে কোনও দুটি ঘটনা হয়ত কিছুদিন—সে দুদিন বা দু'বছরও হতে পারে—বাদে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু নাট্যকার বা কাহিনীকার তাঁর রচনার সৌকর্য্যার্থে সেই দুটি ঘটনাকে একই সপ্তকে বা আগে-পিছে করেও ঘটতে পারেন। আর ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে ত' কথাই নেই। লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করেন। যেমন সেন্সপীয়র এবং শ'র ক্রিওপেট্রা, তেমনই আমাদের বিবেকানন্দলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ অধিকতর ওরংজীব চরিত্র। বিভিন্ন লেখক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই ঐতিহাসিক চরিত্রকে দেখতে পারেন। 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর প্রতাপাদিত্য, আর ক্ষীরোদপ্রসাদ অধিকতর প্রতাপাদিত্য এক নয়। তবে লেখককে কোনও ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে সাধারণ ধারণার প্রতি অবহিত থাকতে হয়। ভগবানকে শয়তান এবং শয়তানকে ভগবান রূপে অধিকতর করায় বিপদ আছে বহুতর।

কোনও প্রসিদ্ধ জীবনী অবলম্বন করে নাটক বা চলচ্চিত্রের কাহিনী রচনা করতে বসে লেখক সেই জীবনের মধ্যে নাট্যবস্তু কোথায়, তারই সম্ভান করেন প্রথমে। এবং সেই জীবনের কোন কোন ঘটনাকে নাটকীয়তা দেওয়া যেতে পারে, তাও তিনি তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। তাই দেখি, এমিল জোলা'র জীবনী নিয়ে চলচ্চিত্র করতে গিয়ে কাহিনীকার 'ড্রাইফাস' মামলা'র ঘটনাটিকেই বিশেষভাবে প্রধান্য দিয়েছেন। সাব্বাটের জীবনীতে দেখি, বেথোফেন কর্তৃক সাব্বাটের সুরসৃষ্টির অপরাধ আবিষ্কারের ঘটনাই সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। শ্রীমধুসূদনের জীবনের সবচেয়ে বড়ো নাটক হচ্ছে, তাঁর অশান্ত প্রমত্ত মনের আকাঙ্ক্ষার অভ্যস্ত। যশের শিখরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অগাধ অর্থোপার্জনের জন্যে দণ্ড-কুলোত্তর কবি কি না করেছেন?

জীবনী-নাট্যকার বা কাহিনীকারদের একটি বিষয়ে সদাই সতর্ক থাকতে হয়। প্রথমে চরিত্রকে যেন কোনক্রমে অশ্রদ্ধার সঙ্গে অধিকতর করার মারাত্মক ভুল না ঘটে। জনমানসে এক একটি চরিত্র সম্পর্কে এক একটি বিশেষ চিত্র মূর্তিত থাকে। সেই চরিত্রের সঙ্গে লেখক-অধিকতর চরিত্রের কিছু গরমিল হলেই সাধারণের মধ্যে জিজ্ঞাসা জাগে; এমন কি, সময় সময় আন্দোলন গুরুতর আকার ধারণ করে। তাই জনবরেণ্য জীবনী নিয়ে রচনার সময় শেরউডের

উপদেশ স্মরণ রাখা উচিত : "A strict regard for the plain truth is more than obligatory; it is obviously desirable" (সরল সত্যের প্রতি অবিস্মিত শ্রদ্ধা একান্ত বাধ্যতামূলক; এটা সুস্পষ্ট-ভাবেই কাম্য।)

ডি, বালসারার নবদৃষ্টি :

গেল রবিবার, ১১ই ফেব্রুয়ারী সকালে নিউ এম্পায়ারের প্রেক্ষাগৃহে বাঁদের উপস্থিত হবার সুযোগ হয়েছিল, তারা নিশ্চয়ই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের

শুভমুক্তি
১৬
ফেব্রুয়ারী



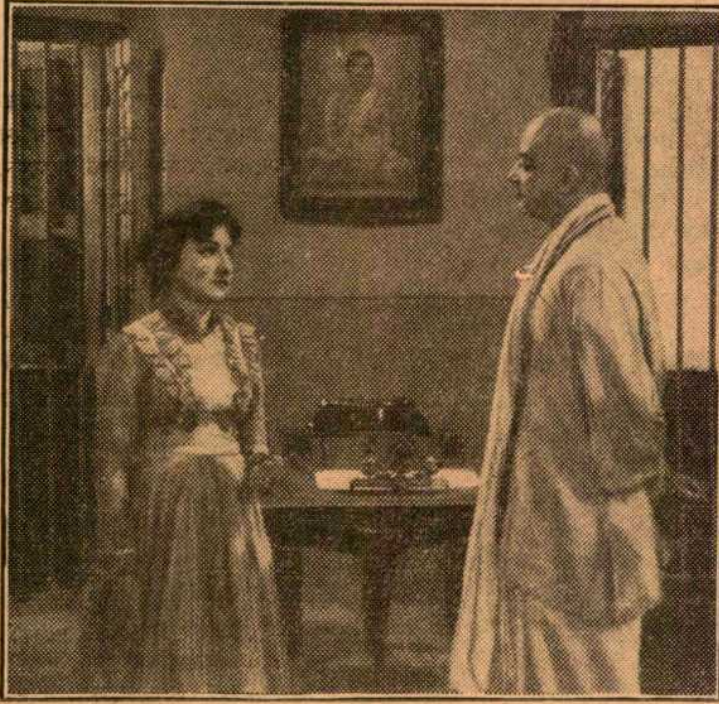
বিবেকানন্দ মতবার্তিকীর সূচনা
আবারও অধ্যাপনা
স্বানিকীর মানসকল্প
ভগিনী

নিবেদিতা

চিত্রনাট্য • নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সঙ্গীত • অনিলা বাগচী
পরিচালক • বিজয় বোজ

শ্রেণী—অরুণধরী * শোভা সেন * সুনন্দা * সাধনা
অসিতরবণ * রবীন ও অমরেশ দাস

রাধা-পূর্ণ ও অব্যাহত চিত্রগ্রহ



‘ভাগিনী নিবেদিতা’ চিত্রের একটি দৃশ্যে অরুণ্ডতী মথোপাধ্যায় (নিবেদিতা) ও অমরেশকুমার (বিবেকানন্দ)।

অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হয়ে বলবেন, ভারতীয় সংগীত-জগতে এক নবযুগের সূচনা করলেন সুখ্যাত যন্ত্র-শিল্পী ডি. বালসারা। এদিন তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের “দেবতার গ্রাস” কবিতাটির সংগীত-রূপ পরিবেশন করলেন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সকাশে। আমরা পাশ্চাত্যসংগীত জগতের বীথোফেন, চোকোয়েস্কি, স্যুবাট’ প্রভৃতি বরেণ্য সংগীতশ্রমচার ‘মুনলাইট সোনেটা’, ‘সোয়ান লেক’, ‘আর্নাফিনিস্ট সিম্ফনি’, ‘ব্রাদারনয়’ প্রভৃতি সংগীত-আলেখ্য শুনলে মৃদু-বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। কিন্তু কোনো দিনই ভাবতে পারিনি, বিভিন্ন যন্ত্রসংগীতের সমন্বয়ে গঠিত

ভারতীয় সংগীত-জগতে ঐ ধরনের সংগীত-আলেখ্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। ভারতীয় সংগীত চিরদিনই সুর-মাধুর্য (melody) সৃষ্টি করে এসেছে; তার লক্ষ্য একটি সুরকে আশ্রয় করে ছোট ছোট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মুচ্ছনার সৃষ্টি করা—বিন্দুর মধ্যে সিন্দুর রূপায়িত করা, একের মধ্যে বহুর প্রকাশ করা। পাশ্চাত্য-সংগীতই আমাদের কাছে বহু যন্ত্রের সমন্বয়ে একতান সৃষ্টির বার্তা বহন করে আনে; ইউরোপ করেছে বহুর মধ্যে এককে খোঁজবার সাধনা, যেমন আমরা করেছি একের মধ্যে বহুকে প্রকাশের। আমরা ঋজুই variety in unity, আর ওরা চেয়েছে unity in variety. কিন্তু ইউরোপীয় রীতির অনুকরণে আমরাও ধীরে ধীরে বিভিন্ন যন্ত্র-সংগীতের সমন্বয় সাধন করে অকেশ্ট্রা বা একতান বাদন সুরু করে দিয়েছি। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই। দক্ষিণাচরণ সেন প্রতিষ্ঠিত ব্রাদারনয় অকেশ্ট্রা আমাদের প্রথম শোনার যন্ত্র-সংগীতে ‘বন্দেমাতরম’ গান। তবে বলতে বাধা নেই, এই একতান যন্ত্র-সংগীতে সুরমুচ্ছনা বা মেলডি সৃষ্টির দিকে যতটা ঝোঁক ছিল, যন্ত্রগুলিকে বিভিন্ন পদ্য বিবিধভাবে বিভিন্ন লয়ে বাজিয়ে একতান বা হার্মনি সৃষ্টির দিকে ততটা ঝোঁক ছিল না। আমরা সে যুগে যত ব্যান্ড-মিউজিক এবং

অকেশ্ট্রার মাধ্যমে হার্মনিক মিউজিক শুনিয়ে, সমস্তই পাশ্চাত্য; কিন্তু যখনই যন্ত্রের মাধ্যমে ভারতীয় কোনো রাগ-রাগিনী বা পরিচিত কোনও গান বাজানো হয়েছে, তখনই হার্মনি অন্তর্হিত হয়ে মেলডি বেজে উঠেছে। যতদূর মনে পড়ে, বিখ্যাত অকেশ্ট্রা-পরিচালক ফ্র্যাংগোপোলোই প্রথম ভারতীয় রাগ-রাগিনী বা গানের মধ্যে কিছু কিছু হার্মনি সৃষ্টির চেষ্টা করেন যন্ত্রের একতানবাদনের মাধ্যমে। খাঁটি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে হার্মনি-মিউজিক সৃষ্টির প্রয়াস করেছিলেন তিমিরবরণ উদয়শঙ্কর-নৃত্যসম্প্রদায়ের সংগীত-পরিচালক রুপে। ভারতীয় নৃত্যসংগীতের জগতে তিমিরবরণের দান অবিস্মরণীয়। গ্রামোফন রেকর্ডে তাঁর ‘সাকী’ ও ‘রাধাকৃষ্ণ’ যন্ত্রসংগীত তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। এর পর যৌদিন থেকে ভারতীয় সবাক চলচ্চিত্রে আবহ-সংগীতের প্রবর্তনা হল, সেদিন থেকে ভারতের বিভিন্ন সুরকার পাশ্চাত্য-সংগীতের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য বা ভারতীয় সংগীতকেও চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দৃশ্যের ভাবপ্রকাশক আবহ-সংগীত রূপে ব্যবহার করবার চেষ্টায় অপ্রবিস্তর সাফল্য লাভ করেছেন। এ-ছাড়া পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের দেশেও আবৃত্তির সঙ্গে হার্মনিক মিউজিকের ব্যবহার কোনো কোনো ক্ষেত্রে করা হয়েছে। প্রতি বছর মহালয়ার প্রত্যয়ে কলকাতা রডকাস্টিং অনুষ্ঠিত ‘মহিমাদিনী’ পালার কথা নিশ্চয়ই কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। রবীন্দ্রনাথের রেকর্ড-আবৃত্তি ‘আমি চণ্ডল হে, আমি সূদূরের পিয়াসী’-র সঙ্গে শুনতে পাওয়া যায় আবহ-সংগীত। কিছুকাল আগে জোসেফ নস্কর ‘ফিলহার্মনিক অকেশ্ট্রা’ নাম দিয়ে কিছু ভারতীয় রাগ-রাগিনীকে সিম্ফনি অকেশ্ট্রার রূপদান করেছিলেন।

কিন্তু গেল রবিবার প্রায় আশিজন যন্ত্রীর সহযোগে ডি. বালসারা যে সংগীত-আলেখ্য পরিবেশন করলেন, তা ভারতীয় সংগীত-জগতে একান্তই অভূত নব এবং অভূতপূর্ব। ‘মুনলাইট সোনেটা’, ‘সোয়ান লেক’ প্রভৃতি বিখ্যাত সংগীত-আলেখ্য এবং ‘ক্যালকাতা স্কুল অব মিউজিক’ পরিবেশিত বহু পাশ্চাত্য একতান-যন্ত্রসংগীত দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ডি. বালসারা এই ‘নিউ ইন্ডিয়ান সিম্ফনি’ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ

দক্ষিণ কলিকাতায় গত ৩ মাস যাবৎ
প্রতি বৃহস্পতি
সংখ্যা ৭টার
সাতা
জাগিয়েছে
ধিয়েটার
ইউনিট-এর

কলকাতা

৪৭-৫১২৫

মহারাজ নিবাস
১৫, হাজরা রোড
সি-৬২



‘নিশীথে’ চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্তে উত্তমকুমার।

করেছেন। প্রায় মাস তিনেক আগে তার মূখে প্রথম শুনিয়ে, তিনি ‘দেবতার গ্রাস’-এর সংগীত-রূপ দিতে মনস্থ করেছেন, তখন ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে, তা ধারণা করতে না পেরে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘আপনি এটাকে ব্যালে হিসেবে উপস্থাপিত করবেন?’ তিনি হেসে বলেছিলেন, ‘ওসব কিছুই নয়; খালি যন্ত্র-সংগীত শুনবেন।’ তখনও আমি আবার বলি, ‘কবিতাটা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র বাজবে?’ উনি আবার হেসে বলেন, ‘না, তাও নয়। এই কবিতার বিভিন্ন পংক্তির বা বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ভাবে আমি সংগীতের রূপ দেব—আমিরা খালি সমবেত যন্ত্র-সংগীত শুনবেন, আর কিছু নয়।’ স্বীকার করি, ঠিক একথার পর আমি যদিও আর কোনও প্রশ্ন করিনি, তবুও আমি ঠিক পানে বেশ বোকার মত, তাকিয়ে-ছিলাম। মনে প্রশ্ন জেগেছিল, ‘দেবতার গ্রাস’-এর বিভিন্ন ভাবধারাকে সমবেত যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে সুরের রূপে প্রকাশ করলে শ্রোতারা তা’ অনুভব করতে পারবে কি? মনে হয়, আমার এই মনোগত প্রশ্ন আমার ঐ বোকা-বোকা চাহনির মধ্যে ফুটে উঠে-ছিল। তাই দেখলাম, যখন তিনি ঐ সংগীত-আলেখ্য পরিবেশন করলেন, তখন পটে প্রতিফলিত হচ্ছিল দেবতার সুরের পংক্তিগুলি, যাতে শ্রোতৃবৃন্দ ঝরে পড়েন, কখন কোন ভাবটি সুরের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। পুরো ঐশ মিনিট স্থায়ী এই সংগীত-আলেখ্য সেদিনের শ্রোতৃমণ্ডলকে যেন সুরলোকে উন্নীত করেছিল, তা

বিচিত্র মাধুর্যমণ্ডিত। বেহালা, বাঁশী, ভায়োলা, চেলো, ক্ল্যারিনেট, স্যাক্সোফোন, ট্রাম্পেট, ট্রম্বোন, ভাইব্রোফোন, স্প্যানিশ গীটার, ইলেকট্রিক গীটার, সেতার, স্বরোদ, ম্যান্ডোলিন, জলতরঙ্গ, জাইলোফোন, তবলা, সুরমণ্ডল এবং

পিয়ানোর সহযোগিতায় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সুরের মাধ্যমে মেলডি ও হার্মনির সংমিশ্রণে প্রকাশ করেও একটি সামগ্রিক অখণ্ডতা বজায় রেখে যে সংগীত-আলেখ্য তিনি সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে তিনি তা দেখে শ্রীবালসারাকে ভারতীয় সংগীতের নব-পথিকৃৎ বলে অভিনন্দিত করতেন। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, শ্রীবালসারা তাঁর এই নবাবিস্কৃত পথে দৃঢ়পদবিক্ষেপে অগ্রসর হয়ে ভারতীয় সংগীত-সিদ্ধান্তকে জগদসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

‘দেবতার গ্রাস’-এর সংগীত-রূপ পরিবেশনের আগে শম্ভু মিত্র প্রথমে কবিতাটির ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার শোনান এবং পরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট কবিতাটি শ্রোতৃবৃন্দের সামনে অত্যন্ত প্রাণস্পর্শীভাবে আবৃত্তি করেন। কিন্তু এ সমস্তই হয় সেদিনের অনুষ্ঠানসূচীর শেষের দিকে। অনুষ্ঠানের সুরতে ভি. বালসারা একক পিয়ানোর মাধ্যমে ‘আহির ভৈরবী’ রাগিনী বাজিয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে সম্মোহিত করেন। এবং



সুসঙ্গীত

চলচ্চিত্রায়ণ : দেওজী ভাই ॥ সংগীত পরিচালনা : ভি. বালসারা
 শব্দানুলেখ : অতুল চট্টোপাধ্যায় ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
 শিল্প-নির্দেশ : কান্তিক বসু ॥ সম্পাদনা : মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরা ॥ পূর্ববী ॥ উজ্জ্বলা

শ্যামাঙ্গী ॥ নিউ তরুণ ॥ নৈর
 পুষ্পাঙ্গী ॥ শ্রীরামপুর টীকজ

• পরিবেশনায় : শ্রীবিজিত পিকচার্স •

শুভ মুক্তি
 শুক্রবার
 ১৬ই
 ফেব্রুয়ারী

রূপায়ণে : কৃষ্ণ মিত্র
 ছবি : পাহাড়ী
 লিলি চক্রবর্তী - অমর
 গাঙ্গুলী - শম্ভু মিত্র



চন্দ্র ফিল্মসের হিন্দীচিত্র "সোহাগ সিন্দুরে" মালা সিনহা

তার সঙ্গে কিছুটা অকর্মে ও প্রধানতঃ তবলা ও মৃদঙ্গ সংগত চলে। প্রায় পনেরো মিনিটব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শ্রীবাসসারা যে অপরূপ ভঙ্গীতে যৎ, বিস্তার, ঝালা প্রভৃতি শুনিয়েছেন, তা এতকাল আমরা সেতার বা স্বরোদের মাধ্যমেই শুনছি। পিয়ানোতেও যে ভারতীয় রাগরাগিনীর অত সুক্ষ্ম কাজ করা সম্ভব, তা আমাদের অবিদিত ছিল।

'সাজ ও আওয়াজ' (যার অর্থ যন্ত্র ও শব্দ) প্রযোজিত সেদিনের এই অভিনব অনুষ্ঠান শ্রোতৃবৃন্দকে অপার আনন্দ দিতে সমর্থ হয়েছে।

বিবিধ সংবাদ

'অশ্বেষা'র 'কাণ্ডনরংগ' :

গেল শুক্রবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় রাজাবাজার প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে 'অশ্বেষা'-গোষ্ঠী শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র বিরচিত 'কাণ্ডনরংগ' কোতুক-নাট্যখানিকে মণ্ডস্থ করেন। 'বর্তমান সমাজে রংগময়ী কাণ্ডনের প্রভাবে মানুষে মানুষে সম্পর্ক' যে কী রকম বদলে যায়, তাই বলা হয়েছে' এই নাটকটিতে প্রধানতঃ কোতুকের মাধ্যমে। আজ আর মানুষের মূল্যায়ন তার

নিজস্ব গুণপনার ওপর নির্ভর করে না, করে তার টাকার অঙ্কের ওপর—এই পরমে সত্যটিকে প্রকাশিত করবার জন্যে যে লটারীর টাকা পাওয়া, না-পাওয়ার ওপর নির্ভর করা হয়েছে, সেটি অত্যন্ত অবাস্তব ভিত্তি (false promise); কারণ লটারীর টিকিটের টাকা পাওয়া বা না-পাওয়া এমনই হৈ-হৈ ব্যাপার যে, মাত্র একজন বন্দুর মূখের খবরের ওপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করে না। কিন্তু এই বৃহৎ ট্রাটি সত্ত্বেও নাটকের নায়ক পাঁচু এমনই জীবন্ত গোটা চরিত্ররূপে চিত্রিত হয়েছে যে, দর্শক তার মধ্যে একটি পরিপূর্ণ রসাস্বাদনের সুযোগ পায়। এবং 'অশ্বেষা'র নাট্যনির্দেশক ও প্রধান চরিত্রাভিনেতা স্বদেশ বসু, পাঁচু চরিত্রটির সঙ্গে নিজেকে এমন অবলীলাক্রমে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন যে, আমরা ঐ জীবন্ত চরিত্রটিকে অত্যন্ত উপভোগ করেছি। এ ছাড়া তরলা রূপে শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বরকতা ও ফিল্ম ডাইরেক্টররূপে সুনীলবরণ চৌধুরী, কর্তারূপে স্বপন বসু, নটী ও ভদ্র-মহিলারূপে কেকা নিয়োগী এবং সীমারূপে কমলা দাস প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন।

প্রতাপ মেমোরিয়াল হলের মণ্ডটি কিন্তু অত্যন্ত অপরিসর হওয়ায় সৃষ্ট, অভিনয়ের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

শিল্পীমহলের 'যুগসূচ' :

বিবেকানন্দ শততম জন্মোৎসব লক্ষে গেল ৮ই ফেব্রুয়ারী সাহাওয়ার শিল্পীমহল কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'যুগসূচ' নাটকটি মণ্ডস্থ করে যুগাবতার পরমহংস রামকৃষ্ণ দাক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ী সংশ্লিষ্ট অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। ভূমিকায় অমিয়কান্ত অত্যন্ত হৃদয় আভিনয়কুশলতার পরিচয় দেন। এ মীনা বসু (রাসমণি), আচিন গুহ (কুমার), দিব্যেন্দু গাঙ্গুলী (মধুরব), শ্যামল বসু (পাগল) প্রভৃতি অনেকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। নাট্য প্রথমে মহাজীবন বন্দনার দৃশ্য সুপরিচালিত।

বিচিত্রা-গোষ্ঠীর 'সাজাহান' :

গেল ২রা ফেব্রুয়ারী বিশ্বরূপা বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা বিচিত্রা গোষ্ঠী উদ্যোগে ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের পতিত্ব প্রজেক্টলালের "সাজাহান" অভিনীত হয়। সাজাহানের ভূমিকা কুরদাস মিত্র এবং ঔরংজীর ভূমিকায় সুধীর মুস্তাফীর আত্মজীবনী প্রাশংসনীয় হয়। এ মোরাদ, দারা, সুজা, সোলে, যশোবন্ত সিংহ, জিহান আলী, সিজাহানারা, পিয়ারা এবং নাদি ভূমিকায় যথাক্রমে শিবনাথ ভট্টাচার্য, নলিনী ভদ্র, বিমল চট্টোপাধ্যায়, অর্থাৎ ঘোষ, বিশ্বনাথ দে, বিভাস মুখোপাধ্যায়, বেবী মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী (ছে) শেফালী দে এবং শাম্ভবতী রায়ের অভিনয় হয়েছে হৃদয়গ্রাহী। সুধীর মুস্তাফীর নাটকখানি পরিচালনা করেছিলেন।

পেটেন্ট অফিস ক্লাবের বোডিশ বারী উৎসব :

ভারত সরকারের অধীনস্থ "পেটেন্ট অফিস" ক্লাবের সভ্যবৃন্দ গেল মঙ্গল ১৩ই ফেব্রুয়ারী বোডিশ বার্ষিক উৎসবলক্ষ্যে বিশ্বরূপা মণ্ডে একটি বিনামূলীয়া সম্মেলন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র র "উলপাশ নম্বর মেস" নাটকটি মণ্ড করেছিলেন। নাটকটির পরিচালনা করেছিলেন ক্লাব ইউনিট এবং পরিচালনা করেন নলিনীকান্ত করণ।

শৌণিক মিত্র গোষ্ঠীর নাট্যানুষ্ঠান :

গেল ১৩ই ফেব্রুয়ারী শিলাল ক্রেম ব্রাউন ইনস্টিটিউটে শৌণিক গোষ্ঠী অমর গণ্যোপাধ্যায় রচিত "অধ্যায়" এবং "পকেটমার" না

দু'খানিকে মণ্ডস্থ করেন। এই অনুষ্ঠানে গোরোহিত্য করেন মৃণাল সেন।

স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ কর্তৃক "উদ্‌যাপিকা" :

গেল ৫ই ফেব্রুয়ারী রঙমহল রঙ্গ-মঞ্চে স্কটিশ চার্চ কলেজ-প্রাক্তনছাত্র-পরিষদের সভাপণ অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় রচিত নতুন নাটক "উদ্‌যাপিকা"র অভিনয় করেন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। বর্তমান বাঙালী জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিক হাল্কা ব্যংগচিত্রের মাধ্যমে এই নাটকটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। অভিনয়ে ইটখোলার মালিক জগৎ চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী স্বর্ণময়ীর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন নাট্যকার-পরিচালক সুশীল মুখোপাধ্যায় ও কেয়া চক্রবর্তী। গুরুদেব ও তাঁর ভক্ত অবসর-প্রাপ্ত সরকারী চাকুরে সদনন্দের ভূমিকায় রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়-এর অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরাপর ভূমিকায় উজ্জ্বল অভিনয় করেন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভোম্বল), বিমান গুপ্ত (ঝংকারপ্রিয়), ধীরেন বসু (নেপালবাবু), কুমুদিকা বাগচী (মিসেস চাকলাদার), কাজল ঘোষ (শান্তি) ও পূরবী মুখোপাধ্যায় (মণিকা)। এইসঙ্গে গীতভারতী মীরা মিত্রের কীর্তনগান অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল।

"রূপকার"-গোষ্ঠীর "কালের বাগা" :

গেল সোমবার, ১২ই ফেব্রুয়ারী রূপকার গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ বিরচিত "কালের বাগা" নাটকটি মঙ্গু-অঙ্গন-এ মণ্ডস্থ করেন। এই অভিনয়ের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আস-চেবারে পাঠকদের জানাব।

বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্স-এর পরবর্তী চিত্র :

প্রথম প্রচেষ্টা "বধু"র কাজ শেষ করবার পর বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্স এবার যে-দু'খানি ছবিতে হাত দেবেন, তার প্রথমটি হবে শৈলেশ দে রচিত "অসম্মানিত" সামাজিক কাহিনী "অস্মান-স্বাক্ষর" এবং দ্বিতীয়টি হবে পৌরাণিক কাহিনী "বামনাবতার"।

নবচিত্রের "স্বপ্নসমুদ্র" :

"মাণিক"-চিত্রের অসামান্য সাফল্যের পর পরিচালক বিজয়ীবরণ সেন নবচিত্র-এর হয়ে শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত

এক বিধায়ক ভট্টাচার্য কর্তৃক চিত্রনাট্য-কারে গ্রন্থিত "স্বপ্ন-সমুদ্র"-এর চিত্ররূপ দেবেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ভি. বালসারা। সুভাষচন্দ্র চন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ছবিখানির প্রযোজনা করবেন বেনু দাস।

প্রসাদ প্রোডাকসন্স-এর "হামরাহী" :

প্রসাদ প্রোডাকসন্স-এর নতুন ছবি "পতিপত্নী"র নব নামকরণ হয়েছে "হামরাহী"। এঁদের "শব্দশূরাল" ছবির মত এ-ছবিখানিরও বিশ্ব পরিবেশনসত্ত্ব নিয়েছেন রাজগু প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড। টি. প্রকাশরাওয়ের পরিচালনায় ছবিখানির একটি সেটের কাজ সম্প্রতি হয়ে গেল কারদার স্টুডিওতে। এর হিন্দী সংলাপ লিখেছেন ইন্দুরাজ আনন্দ এবং গীত রচনা করেছেন হসরৎ ও শৈলেন্দ্র। সুরযোজনা করছেন শঙ্কর জয়কিষণ। ছবিটির চিত্রগ্রহণ, শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে ম্বারকা ডিভেচা, শান্তি দাস ও শিবাজী অবধুত।

ভগিনী নির্বেদিতা ও সূচস্মান :

এ হস্তায় দু'খানি বাঙলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। আরোরার শ্রম্বাজলি "ভগিনী নির্বেদিতা" দেখানো শুরু হচ্ছে রাধা, পূর্ণ এবং অপরাপর চিত্রগৃহে। বিজয় বসু পরিচালিত ছবিখানিতে অভিনয় করেছেন অরুণ্ডতী মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায় চৌধুরী, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার এবং অমরেশ দাশ। ছবিটিতে সুরযোজনা করেছেন অনিল বাগচী।

চলচ্চিত্র প্রসাস সংস্থার নবতম চিত্র "সূচস্মান" রঞ্জিত পিকচার্সের পরিবেশনায় আজ থেকে দেখানো হচ্ছে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অপরাপর ছবিঘরে। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র ছবিখানির যুগ্মপরিচালক। চিত্রগ্রহণ করেছেন দেওজীভাই। প্রধান স্ত্রী ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে তৃপ্তি মিত্রকে।

জ্যতির অপেক্ষায় বাঙলা ছবি :

যে-কটি বাঙলা ছবি আসন্নমুক্তির অপেক্ষায় দিন গুণছে, তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় এন-সি-এ প্রোডাকসন্স-এর সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ইস্টম্যানকালারে তোলা ছবি "কাশ্যনজঙ্ঘা"। এরপরেই নাম করতে হয় মূলচাঁদ জৈন নির্বেদিত ও বিভূতি

চক্রবর্তী পরিচালিত "শেষচিহ্ন", শিবানী ফিল্মসের কনক মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "মায়ার সংসার", মৃণ্ডটক লিমিটেডের গীষ-বসু পরিচালিত "শিউলীবাড়ী", শব্দকল্প চিত্রমের সুনীলবরণ পরিচালিত "রূপ-সনাতন", ফিল্ম ক্র্যাফট প্রাইভেট লিমিটেডের হয়ে অরূপ গুহঠাকুরতার পরিচালনায় তোলা "বেনারসী" প্রভৃতি ছবি।

শক্তিপদ রাজগুরু নীল পাহাড় অত্র রোড

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভূমি তৃণের জল ০.০০
ভূমি নারী

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

নিশি ভোর ০.০০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাদান ৫.০০

শ্রীমন্ত সওদাগর

সাম্বলসন ২.৫০

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গাইট টু স্ট্রীম

লোকোমোটিভ ৫.০০

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

আকাশ বনানী জাগে ০.০০

ধরণীর ধূলিকণা ০.৫০

পথের ধূলা ৪.০০ ৥ ধূলা-

রাঙ পথ ০.৫০ ৥ ওপার-কন্যা

০.০০ ৥ প্রজাপৎ ছবি ০.০০

রাহু ও রবি ০.৫০

বিশ্বনাথ পার্লিশিং হাউস

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

নিবাহের

শয্যাপ্রব

এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

অনন্তচরণ মল্লিক এও কোং
১৬৭/৪, ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা-১৩
ফোন-২৪-৪৩২৮

খেলাঘর

৫ম

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান—৩য় টেস্ট

পাকিস্তান : ২৫৩ রান (আলিমুদ্দিন ১০৯ এবং হানিফ মহম্মদ ৬৭। নাইট ৬৬ রানে ৪ এবং ডেক্সটার ৪৮ রানে ২ উইকেট) ও ৪০৪ রান (৮ উইকেটে। হানিফ ৮৯, ইমতিয়াজ ৮৬, আলিমুদ্দিন ৫৩। ডেক্সটার ৮৬ রানে ৩, বারবার ১১৭ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যান্ড : ৫০৭ রান (টেড ডেক্সটার ২০৫, পিটার পারফিট ১১১, জিওফ পুলার ৬০ এবং মাইক স্মিথ ৫৬। ডিসুজা ১১২ রানে ৫, নাশিমুল গণি ১২৫ রানে ৩ এবং হাসিব আসান ৬৮ রানে ২ উইকেট)।

তৃতীয় টেস্টেও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তান টেসে জয়ী হয়—উপর্যুক্ত তিনটে টেস্টের টেসে জয়।

প্রথমদিনেই পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২৫৩ রানে শেষ হয়, খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের দু'মিনিট আগে। ৪র্থ উইকেট পড়ে যায় দলের ৫৬ রানের মাথায়। শেষ পর্যন্ত ৫ম উইকেটের জুটিতে হানিফ মহম্মদ এবং আলিমুদ্দিন ১১২ মিনিটের খেলায় দলের ৯২ রান তুলে শোচনীয় অবস্থা থেকে দলকে উদ্ধার করেন। ইংল্যান্ডের ফিল্ডিংয়ের দোষে দু'জনই কয়েকবার আউট হওয়ার থেকে ছাড়ান পান। আলিমুদ্দিন ২০৭ মিনিটে খেলে তার দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরী করেন। হানিফ তিন ঘণ্টা পনের মিনিট খেলে তার ৬৭ রান করেন, বাউন্ডারী ১০টা। আলিমুদ্দিনের ১০৯ রানে ১৭টা বাউন্ডারী ছিল।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে সাড়ে পাঁচ ঘটায় খেলায় ২১৯ রান তুলে, উইকেট পড়ে দুটো। ডেক্সটার ৮৭ রান এবং স্মিথ ৪২ রান করে নটআউট থাকেন। নাশিমুল গণি ৭১ রানে এইদিনের খেলায় দুটো উইকেট পান।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের রাণ দাঁড়ায় ৪৫৩, মোট ৪টে উইকেট পড়ে। অর্থাৎ এইদিনের খেলায় আরও দুটো উইকেট খুঁইয়ে পূর্বদিনের ২১৯ রানের সংগে ২০৪ রান যোগ করে। লাগু পর্যন্ত ইংল্যান্ড মন্থরগতিতে রান করে। ২ ঘণ্টার খেলায় মাত্র ৫৯ রান। লাগের পর ইংল্যান্ডের হাত খুলে দ্রুত রান ওঠে। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ডেক্সটার ডবল সেঞ্চুরী (২০৫) করেন—টেস্টের এক

ইনিংসের খেলায় ডেক্সটারের সর্বোচ্চ রান। এই ২০৫ রান তুলতে তিনি ৪৯৫ মিনিট সময় নেন এবং ২২টা বাউন্ডারী মারেন। অনেককাল পর বিদেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় ডবল সেঞ্চুরী করলেন টেস্ট খেলায়। ১৯৫৩-৫৪ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে স্যার লিওনার্ড হাটন শেষ ডবল সেঞ্চুরী (২০৫ রান) করেছিলেন কিংস্টোনে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। আলোচ্য তৃতীয় টেস্ট খেলায় তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ডেক্সটার এবং মাইক স্মিথ (৫৬ রান) ২৩০ মিনিটে দলের ১৪৩ রান এবং চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ডেক্সটার এবং পিটার পারফিট ২২২ মিনিটে



টেড ডেক্সটার

দলের ১৮৮ রান তুলে দেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বর্তমানে টেড ডেক্সটারের মোট রান দাঁড়িয়েছে ২,১২৭, পাকিস্তানের বিপক্ষে আলোচ্য তৃতীয় টেস্ট খেলায় তিনি ২০০০ রান পূর্ণ করেন। তৃতীয় দিনের খেলায় পারফিট ৮৮ রান এবং বারবার ৪ রান করে নটআউট থাকেন।

চতুর্থ দিন ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৫০৭ রানে শেষ হয়। পারফিট তার প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী (১১১ রান) করেন। ডিসুজা ১১২ রানে মোট ৫টা উইকেট পান। পাকিস্তানের এই দিনটা খুব ভাল ছিল। ৯০ মিনিটের খেলায় তারা ইংল্যান্ডের বাকি ৬টা উইকেট ফেলে দেয় ৫৪ রানে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার আরম্ভও খুব ভাল হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আশ্চর্যকর মূলক খেলায় বেশী জোর দেয়। ২টো উইকেট পড়ে এইদিন ১৪৭ রান দাঁড়ায়। হানিফ ৫৮ এবং বাকি ১০ রান করে নটআউট থাকেন। ইংল্যান্ডের থেকে পাকিস্তান তখনও ১০৭ রানের পিছনে থাকে।

খেলার শেষদিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল ৮টা উইকেট পড়ে পাকিস্তানের ৪০৪ রান দাঁড়িয়েছে। দলের অধিনায়ক ইমতিয়াজ আমেদ এর আগে উপর্যুক্ত তিনটে 'গেজা' করে এবার ৮৬ রান করেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ইমতিয়াজ আমেদ এবং স্মিথাক মহম্মদ ১০৩ মিনিটের খেলায় দলের ৮১ রান তুলে দিলে খেলার মোড় অমীমাংসিত ফলাফলের পথে ঘুরে যায়।

লাগের সময় পাকিস্তানের স্কোর ছিল ২২৮, ৪ উইকেট পড়ে। অর্থাৎ তখনও ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ২৬ রান কম। খেলা ভাঙতে যখন আর ৯৫ মিনিট বাকি এবং পাকিস্তানের ৫টা উইকেট পড়ে ৩১০ রান অর্থাৎ পাকিস্তান ৫৬ রানে অগ্রগামী, তখন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক খেলায় জয়লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে পিটার রিচার্ডসনকে বল করতে দিলেন। চা-পানের বিরতির সময় পাকিস্তানের স্কোর দাঁড়ায় ৩২১, ৫টা উইকেট পড়ে।

নাশিমুল গণি ৪১ এবং ডিসুজা ১০ রান করে নটআউট থাকেন। প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড জয়লাভ করে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্ট খেলা জু যায়। ফলে ইংল্যান্ড ১-০ খেলায় 'রাবার' লাভ করে।

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফরে ইংল্যান্ডের এই তিনজন খেলোয়াড় তাঁদের টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে দুই সহস্র রান পূর্ণ করেছেন—ব্যারিংটন, ডেক্সটার এবং রিচার্ডসন। পাকিস্তান সফরের শেষ টেস্ট খেলা ধরে তাঁদের মোট টেস্ট খেলা এবং মোট রান দাঁড়িয়েছে : ব্যারিংটন—২৮টা টেস্টে ২২৪৩ রান, ডেক্সটার—৩০টা টেস্টে ২১২৭ রান এবং রিচার্ডসন—৩৩টা টেস্টে ২০৪৫ রান। বোলিংয়ে টনি লক ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফরে তার টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১৫০টা উইকেট পাওয়ার রান-স্কামনা পূর্ণ করেছেন। ৪১টা টেস্টে তিনি ৩৭৬৯ রানে ১৫৮টা উইকেট পেয়েছেন।

ডেলী মেল পত্রিকার বিখ্যাত ক্রিকেট খেলার সমালোচক এলেক্স ব্যানিস্টার ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ খেলা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ভারতবর্ষের কাছে ইংল্যান্ডের দুটি টেস্টে পন্থাজয় বরণের একমাত্র সাক্ষ্যনা হয়েছে, পাকিস্তানের বিপক্ষে

প্রথম টেস্টে ৫ উইকেটে জয়লাভ করে 'রাবার' লাভ।

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফরের মোট ৮টি টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের ২টি খেলায় হার, মাত্র ১টি জয় এবং ৫টি খেলা ড্র করা প্রসঙ্গে ব্যানিটোর এই ৩টি করণ উপস্থাপিত করেছেন, (১) ইংল্যান্ড দলে দক্ষ স্পিন-ফল্ডসম্মানের অভাব, (২) আটটি টেস্ট খেলার ৭টিতে ইংল্যান্ডের টেসে পরাজয় এবং (৩) ফাস্ট বোলার হিসাবে ব্রাউন এবং হোয়াইটের ব্যর্থতা।

টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের খেলার ধারা লক্ষ্য করে লন্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্রের ক্রিকেট সমালোচকেরা বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। 'ডেলী মীরার' পত্রিকায় ব্রায়ন চ্যাপম্যান মন্তব্য করেছেন, এ ধরনের খেলায় ইংল্যান্ডের দর্শকদের পক্ষ থেকে বিদ্রূপ করার প্রয়োজন হবে না কারণ তারা মঠেই উপস্থিত হবেন না। ডেলী এক্সপ্রেস মন্তব্য করেছে, শক্তিশালী দলের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে তাদের অতিরিক্ত কিছু থাকে দরকার।

॥ কূচবিহার কাপ ॥

অল-ইন্ডিয়া স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে ইস্ট জেন দল ৯ উইকেটে ওয়েস্ট জেন দলকে পরাজিত করে 'কূচবিহার কাপ' জয়লাভ করেছে। ইস্ট জেন দলের এই প্রথম কূচবিহার কাপ জয়। চারদিনের ফাইনাল খেলা তৃতীয় দিনেই শেষ হয়। ভারতবর্ষের প্রখ্যাত চোকস প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভিন্দু মানকড়ের পুত্র শ্রীমান অশোক মানকড় পশ্চিমাঞ্চল দলের পক্ষে খেলে ব্যাটিংয়ে বিশেষ ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দেয়। সেমি-ফাইনালে সেন্ট্রাল জেন দলের বিপক্ষে অশোক ৯০ রান করে। ফাইনালে ইস্ট জেন দলের বিপক্ষে তার দুই ইনিংসের রান ৩৩ ও ৪৯। ব্যাটিংয়ে এই সাফল্যের দরুণ তাকে জে সি মুখার্জি পুরস্কার দেওয়া হয়।

ওয়েস্ট জেন : ১৩৬ ও ১৯৭

ইস্ট জেন : ২৩২ ও ১০৭ ...

(১ উইকেটে)

জাতীয় স্নুকার ও বিলিয়ার্ডস

অল-ইন্ডিয়া স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার এ্যামেচার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ান এবং ভূতপূর্বে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান বব মার্শাল ৬-১ স্কেমে বিভি কোমটিকে পরাজিত করেন।

বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানসীপের ফাইনালে বব মার্শাল গত বছরের বিজয়ী উইলসন জোসকে পরাজিত করে একই বছরে স্নুকার এবং বিলিয়ার্ডস খেতাব লাভ করেন।



এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন (বামে সর্বশেষে) এবং ফ্রেড স্টোডি (দক্ষিণে সর্বশেষে) দু'জনের মধ্যে বিজিত নরেশকুমার এবং রমানাথন কৃষ্ণন

এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা

ভারতবর্ষের বিখ্যাত ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের লানে এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা সাফল্যের সঙ্গেই শেষ হয়েছে। প্রথম এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতার শ্রুত উন্মোচন হয় এই মাসেরই ঘাসের ওপর ১৯৪৯ সালে। আলোচ্য বছরে অস্ট্রেলিয়া সরকারীভাবে প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় প্রতিযোগিতার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ লন টেনিস খেলায় অস্ট্রেলিয়ার পদমর্যাদা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের সমান। পৃথিবীর বিখ্যাত লন টেনিস প্রতিযোগিতা—ডেভিস কাপ, উইম্বলডন, আমেরিকান লন টেনিস, অস্ট্রেলিয়ান লন টেনিস প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার গত কয়েক বছরের সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় আমেরিকার কোন খেলোয়াড় যোগদান করেন নি। ভারতবর্ষের খেলোয়াড় ছাড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করে অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, জাপান, যুগোস্লাভিয়া, ডেনমার্ক, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়রা।

প্রতিযোগিতা আরম্ভের আগে যোগদানকারী খেলোয়াড়দের যোগ্যতা অনুযায়ী খেলোয়াড়দের নামের একটি ক্রম-পর্যায় তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই তালিকায় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা স্থান পান :

পুরুষ সিংগলস :—(১) রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া); (২) রমানাথন কৃষ্ণন (ভারতবর্ষ); (৩) ফ্রেড স্টোডি (অস্ট্রেলিয়া); (৪) ডরিউ এ নাইট (গ্রেট ব্রিটেন); (৫) জয়দীপ মুখার্জি (ভারতবর্ষ); (৬) ডবলিউ জেকস (অস্ট্রেলিয়া); (৭) প্রেমজিৎ লাল (ভারতবর্ষ); (৮) নরেশকুমার (ভারতবর্ষ)।

পুরুষ ডাবলস :—(১) রয় এমার্সন ও ফ্রেড স্টোডি (অস্ট্রেলিয়া); (২) প্রেমজিৎ লাল ও জয়দীপ মুখার্জি; (৩) রমানাথন কৃষ্ণন ও নরেশকুমার; (৪) ডবলিউ নাইট এবং জে এ পিকার্ড (গ্রেট ব্রিটেন)।

মহিলা সিংগলস :—(১) লেসলি টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া); (২) এম সাক্ট (অস্ট্রেলিয়া); (৩) পি বোলিং (ডেনমার্ক); (৪) মিস আর্পিপা (ভারতবর্ষ)।

পুরুষদের সিংগলস খেলার শেষ বোলজন খেলোয়াড়দের মধ্যে এই ৬ জন ভারতীয় খেলোয়াড় ছিলেন—রমানাথন কৃষ্ণন, নরেশকুমার, জয়দীপ মুখার্জি, সুমন্ত মিশ্র, প্রেমজিৎ লাল এবং আখতার আলী। এঁদের মধ্যে সুমন্ত মিশ্র এবং আখতার আলী কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেন নি এবং সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন কৃষ্ণন এবং জয়দীপ মুখার্জি। সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণন অস্ট্রেলিয়ার

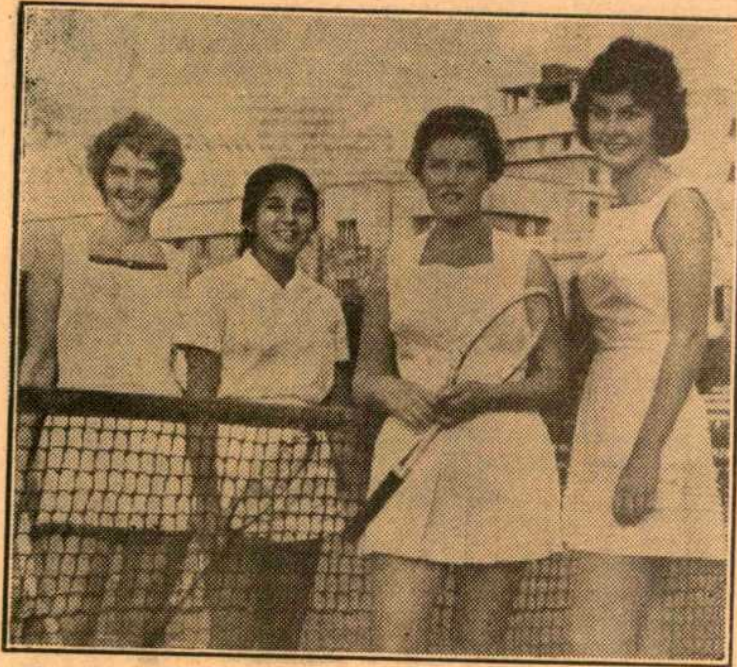
পুরুষদের সিংগলস খেলার শেষ বোলজন খেলোয়াড়দের মধ্যে এই ৬ জন ভারতীয় খেলোয়াড় ছিলেন—রমানাথন কৃষ্ণন, নরেশকুমার, জয়দীপ মুখার্জি, সুমন্ত মিশ্র, প্রেমজিৎ লাল এবং আখতার আলী। এঁদের মধ্যে সুমন্ত মিশ্র এবং আখতার আলী কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেন নি এবং সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন কৃষ্ণন এবং জয়দীপ মুখার্জি। সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণন অস্ট্রেলিয়ার

(সর্বভারতীয় ভাষায় বাংলার অবদান বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম বই)

“আধুনিক কণ্ঠাঙ্ক রীজ টেকনিক নিজে নিজে শেখা”

প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত, ধাকার পিঙ্গক ডি. এম. লাইব্রেরী।

এ, সি আর-১০



এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ডাবলস ফাইনালে বিজিত মিস পি বেলিং ও ডি আর্পিয়ার (বাম দিক থেকে) এবং মিস এল টার্ণার ও মিস এম সোকাট (বিজয়ী)

লিয়ার ফ্রেডী স্টোলাকে পরাজিত করে ফাইনালে যান এবং অপর দিকে জয়দীপ মুখার্জি প্রতিযোগিতায় ১নং বাছাই খেলোয়াড় রয় এমার্সনের কাছে পরাজিত হ'ন।

পুরুষদের সিঙ্গেলস ফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান রমানাথ কৃষ্ণন (ভারতবর্ষ) স্ট্রেট সেটে বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রয় এমার্সনের (অস্ট্রেলিয়া) কাছে পরাজিত হ'ন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার-ফাইনালে কৃষ্ণন স্ট্রেট সেটে এমার্সনকে পরাজিত করেছিলেন। তারপর উভয় খেলোয়াড়ের মধ্যে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। ফাইনালে কৃষ্ণন নিজের সুনাম অনুযায়ী মোটেই খেলতে পারেননি। এমার্সন সমস্ত মাঠ জুড়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে খেলেন। তাঁর সুতীর সার্ভিস, ভলি এবং স্পেসিংয়ের কাছে রমানাথ দাঁড়াতে পারেননি।

প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার মিস্ লেসলি টার্ণার তিনটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে জয়লাভ করে 'ত্রি-মুকুট' সম্মান লাভ করেন। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন 'স্বি-মুকুট' লাভ করেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গেলস : রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) ৭-৫, ৬-৪, ৬-৩ সেটে রমানাথন কৃষ্ণনকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গেলস : প্রতিযোগিতায় ১নং বাছাই খেলোয়াড় মিস লেসলি



এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপে পুরুষদের সিঙ্গেলস বিজয়ী রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া)।

টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-২ সেটে ২নং বাছাই খেলোয়াড় মিস ম্যাডোনা সাকটকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : মিস টার্ণার এবং মিস সাকট (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-১ সেটে মিস পি বেলিং (ডেনমার্ক) এবং

মিস আর্পিয়ারকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : ১নং বাছাই জর্জি রয় এমার্সন এবং ফ্রেড স্টোলা (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-২, ৯-৭ সেটে ৩নং জুটি রমানাথন কৃষ্ণন এবং নরেশ-কুমারকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মিডল ডাবলস : ফ্রেড স্টোলা ও মিস্ লেসলি টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৬-৩, ৬-১ সেটে রয় এমার্সন ও মিস্ ম্যাডোনা সাকটকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর

ত্রিনিদাদ কোল্টস : ২৩৭ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)। এলিয়িং ৪৭, ডোর ৪২, রবিনসন ৩৭ এবং আসগর আলী ৩৬। সূতি ৪৫ রানে ৩ উইকেট, দুরানী ৬০ রানে ২, প্রসন্ন ৬১ রানে ২ উইকেট ও ১৪৩ রান (৫ উইকেটে)। রবিনসন ৪৪।

ভারতীয় একাদশ : ৩১৭ রান (সার-দেশাই ১১৮, উমরীগড় ৭৩, সূতি নটআউট ৫২ এবং জয়সীমা ৪৫)

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রথম খেলাটি ড্র গেছে। ভারতীয় দল পূর্ণ শক্তি নিয়ে নামতে পারেনি। দীর্ঘ ভ্রমণের পর ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা মাত্র একরাতির বিশ্রাম নিয়ে দুদিনের খেলায় যোগদান করে। দলের কয়েকজন খেলোয়াড় এই দীর্ঘ বিমান ভ্রমণে বেশ কান্দু হয়ে পড়েন।

ত্রিনিদাদ কোল্টস দল প্রথম ব্যাট করে ৯ উইকেটে ২৩৭ রান তুলে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতীয় দল এইদিন ২০টা উইকেট খুইয়ে ৬২ রান তুলে। জয়সীমা ৪৫ রান এবং কন্সট্রাক্টর ৬ করে আউট হ'ন। তৃতীয় উইকেটের জুটি সারদেশাই এবং উমরীগড় যথাক্রমে ৩ ও ৪ রান করে নটআউট থাকেন।

খেলার দ্বিতীয় অর্ধাংশ শেষদিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩১৭ রানে শেষ হয়। সারদেশাই উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১১৮ রান করেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে সারদেশাই এবং উমরীগড় পিটিয়ে খেলে ৮০ মিনিটে দলের ১০২ রান তুলে দেন। উমরীগড় এইদিন প্রথম আউট হ'ন। তাঁর ৭৩ রানে ছিল ১২টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউন্ডারী। সারদেশাই তাঁর ১১৮ রাগে ২০টা বাউন্ডারী করেন। লাগুর সময় ভারতীয় দলের স্কোর ছিল ২১১ রান, ৪ উইকেট পড়ে। উইকেটে ছিলেন সারদেশাই (৭৪)

এবং সূর্য। সূর্য শেষ পর্যন্ত ৫২ রান করে নটআউট থেকে যান। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস মোট ২০৫ মিনিট খেলার পর ৩১৭ রানে শেষ হলে তারা ৮০ রানে অগ্রগামী হয়।

ত্রিনিদাদ কোল্টস দল খেলার ১৩০ মিনিট সময় হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং ৫ উইকেটে ১৪৩ রান তুলে দিলে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

বছরের শ্রেষ্ঠ হকি দল—ভারতবর্ষ

বছরের শ্রেষ্ঠ হকি দল হিসাবে ভারতবর্ষ ১৯৬২ সালে প্রখ্যাত 'লিউটি কাপ' লাভ করেছে। ইন্টার-ন্যাশনাল হকি ফেডারেশনের প্রথম সভাপতির স্মৃতিরক্ষার্থে এই পুরস্কার। প্রতি বছর হকি খেলার শ্রেষ্ঠ দলকে এই পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ১৯৬০ সালে ইটালী এবং ১৯৬১ সালে স্পেন এই পুরস্কার লাভ করেছে। ১৯৬২ সালে ভারতবর্ষে ইন্টারন্যাশনাল হকি ফেডারেশনের অধিবেশন, সাফল্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা পরিচালনা এবং এই প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের চ্যাম্পিয়ান-সীপ লাভ—এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভের পক্ষে ভারতবর্ষের যোগ্যতাই পরিচয়।

৥ ভারতীয় মহিলা হকি দল ॥

সিংহল সফরে ভারতীয় মহিলা হকি দল অপরাজের সম্মান লাভ করেছে। এই সফরে তারা মোট সাতটি খেলায় (তিনটি টেস্ট ম্যাচ সহ) যোগদান করে এবং কোন গোল না খেয়ে ৫৯টি গোল দেয়।

টেস্ট খেলা : ভারতীয় মহিলা হকি দল ১ম টেস্টে ২-০ গোলে, ২য় টেস্টে ৩-০ গোলে এবং ৩য় টেস্টে ৫-০ গোলে জয়লাভ করে।

ফোন: ৫৫-৪৩১২
বেঙ্গল ডকরেটর
১১৩, চিত্ররঞ্জন এডিটর-কলিকাতা-৬



ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটার প্রাজালে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট

তারিখ : ১৬, ১৭, ১৯, ২০ ও
২১শে ফেব্রুয়ারী

কুইন্স পার্ক ওভাল

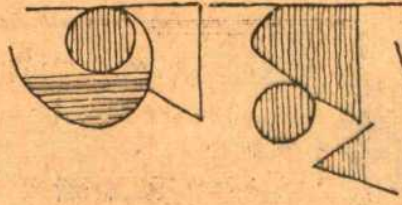
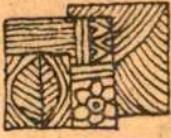
ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ভারত-বর্ষ ১ম ও ৫ম টেস্ট ম্যাচ খেলবে পোর্ট-অব-স্পেন শহরের 'কুইন্স পার্ক ওভাল' মাঠে। প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হবে ১৬ই ফেব্রুয়ারী। ত্রিনিদাদ দ্বীপের রাজধানী এবং প্রধান বন্দর এই পোর্ট-অব-স্পেন। ত্রিনিদাদ দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে পেরিয়া উপসাগরের উপরে পোর্ট-অব-স্পেন বন্দরটি অবস্থিত। এই পেরিয়া উপসাগর উত্তর আমেরিকার ভেনিজুয়েলা থেকে ত্রিনিদাদ দ্বীপকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কিন্তু এই সব উপ-সাগর, সাগর, মহাসাগর ত্রিনিদাদ দ্বীপকে পৃথিবীর স্থলভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করেও এই দ্বীপের আদিবাসী এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করতে পারেনি। ত্রিনিদাদ

দ্বীপের আদিবাসী আরওয়ারাক এবং কারিব জাতির বংশে বাতি দেওয়ার মত আজ একজনও জীবিত নেই। বহু জাতির সমাবেশে আজ ত্রিনিদাদ দ্বীপের জীবন আধুনিক সভ্যতার গড়ে উঠেছে। জনসংখ্যার প্রধান অংশ অধিকার করে আছে আফ্রিকা থেকে আগত নিগ্রো জাতির বংশধরেরা। তারপরই ভারতীয়। ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের থেকে বেশী। শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে আছে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ

কিংকো'র *
আর্গিকা
হেয়ার অয়েল

প্রতি বারক-কিংকো কোং কোং-১





১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪২শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 23rd, February, 1962
40 Naya Paise

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

নিম্নতলার শ্মশান থেকে বেরোবার সময় যুগান্তর সম্পাদক একটি দীর্ঘশ্বাস সহকারে প্রথম এই কথাটি বলেছিলেন : বাংলা সংবাদপত্রের পিতামহের মৃত্যু হল।

১৮৯৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত একাদিক্রমে ৬৩ বৎসর যিনি বাংলা সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং যার লেখনীর স্মৃতি বহন করছে স্বদেশী যুগের প্রত্যেকটি স্মরণীয় সংবাদপত্র—বন্দেমাতরম, যুগান্তর, সন্ধ্যা ইত্যাদি, বাংলাদেশের সেই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মৃত্যুতে এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কোনো শোকোক্তি হতে পারে কিনা সন্দেহ।

তার মৃত্যু আকস্মিকও নয়, মর্মান্তিকও বলা চলে না। ৮৬ বৎসর বয়সে এবং সুদীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন কর্মজীবনের অত্যন্ত সুমিত পরিণতিতেই মৃত্যু এসে তার দরজায় দাঁড়িয়েছিল—কোনো কাজ ফেলে রেখে তাকে হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে হয়নি। তিনি অবকাশ পেয়েছিলেন সাহিত্য, সমালোচনা ও সাংবাদিকতায় তার কর্মজীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে প্রত্যাশিত পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার।

বিংশ শতাব্দীর গোটা প্রথমার্ধ তার এই সম্ভাবনা সাংবাদিক জগতে শাখা-প্রশাখায় বিচিত্র এবং অত্যন্ত গম্ভীর, মহনীয় সম্ভার নিয়ে আত্মবিকাশ করেছিল, যার পরিণতি আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে দেখেছি একটি বিরাট মহীরুহের ন্যায়।

তিনি উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রের মধ্যে ৬৩ বৎসরব্যাপী এমন একটি কর্মজীবন বিস্তার করেছিলেন, যা এই দুই যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে একটি সহজ সৈতুবন্ধের মতো! এই সৈতুবন্ধ দিয়ে সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম এবং যুগান্তর ইত্যাদি আগ্নেয় সংবাদপত্রের যুগ পেরিয়ে আমরা বর্তমানের সংবাদপত্রে এসে পৌঁছেছি। প্রকৃতপক্ষে বিগত ৬৩ বৎসরের বাংলা সংবাদপত্রের বিরাট বিবর্তনের ইতিহাস একটি মানুষের জীবনের মধ্যেই প্রতিফলিত হতে পেরেছে, একথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, যিনি বিপিন পাল, শ্রীঅরবিন্দ এবং রুক্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহ-কর্মীরূপে নিজেকে দাবী করতে পারতেন, মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বেও তার রচনা আমাদের এই নবজাত পত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সংবাদপত্রের একাল ও সেকালের মধ্যে এই জীবন্ত যোগসূত্রটি তার মৃত্যুতে ছিন্ন হয়ে গেছে।



কিন্তু শুধু সক্রিয় সাংবাদিকতার সুদীর্ঘ ৬৩ বৎসরব্যাপী এই রেকর্ডের জন্য নয়, তার ভূমিকা বাংলা সংবাদপত্রে একটি অম্লিতীয় অধ্যায়রূপে লিখিত থাকবে অন্য কারণেও। বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় তার সমান ওজস্বিতা যে-কোনো ম্ভিভাষিক সাংবাদিকের পক্ষে দ্বিবার বস্তু। তার সম্বন্ধরক্ষিত সংগ্রহশালায় সংবাদ ও ঘটনার যে বিপুল রেফারেন্স বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে সঞ্চিত হয়েছিল, তা যে-কোনো গবেষণামন্দিরের সমকক্ষ। প্রকৃতপক্ষে বাংলার জীবন্ত বিশ্বকোষরূপে তার যে পরিচিতি, সে ধরনের পরিচিতি অদ্যকার দিনে আর কোনো প্রতিভাবান সাংবাদিকের পক্ষেও লাভ করা সম্ভব নয়।

বর্তমান স্পেশলাইজেশনের যুগে ঐ শ্রেণীর সামগ্রিক জ্ঞান, ঔৎসুক্য এবং বহু বিদ্যায় সমান পারদর্শিতা ও অধিকার ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে আসছে। তথ্যনির্ভর, যুক্তিশীল এবং ওজস্বী—একাধারে এই তিনটি গুণই তার লেখনীর মধ্যে ছিল। তদুপরি, বাংলা রচনায় তার আর

একটি দান এবং বিশেষত্ব—দেশজ প্রবচন এবং উপমা ব্যবহার, যার ফলে তার সম্পাদকীয় রচনাগুলি সাধারণ মানুষের মর্মের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে।

বাংলা সংবাদপত্রে তিনিই প্রথম সাংবাদিক যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্র পরিদর্শন এবং রিপোর্ট করেছিলেন। পরিহাসজলে তার সম্বন্ধে অনেকে বলতেন, এই সেই সাংবাদিক—সম্রাটের সঙ্গে করমর্দনের চাকতুল্যাবস্থায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (বাকিংহাম প্রাসাদে ১৯১৯ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের সঙ্গে করমর্দনের তার একটি ছবি অনুরূপ শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল)! কিন্তু পরিহাস বাদ দিয়ে একথা স্বীকার করতে হবে যে, বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় যে বহুমুখী, দূরবিস্তৃত বিপুল অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চার করেছিলেন এবং অবিরত অক্লান্ত লেখনীর ম্বারা সেই অভিজ্ঞতাকে যেমন শেষদিন পর্যন্ত সংবাদপত্রের পাতায় উৎসর্গ করে গেছেন, তার ম্ভিতীয় একটি দৃষ্টান্ত দুর্লভ। এমন একটি পরিণত জীবন সম্বন্ধে শোকোচ্ছ্বাসের হয়ত কোনো কারণ নেই। কিন্তু ইতিহাসের একটি জীবন্ত পৃষ্ঠা বন্ধ হল, একথা শ্রদ্ধামিপ্রিত বেদনায় আমরা স্মরণ না করে পারছি না।

দূরদৃষ্টি

ভেটমিন

আমরা, বাঙালীরা, খুবই সংস্কৃতি-অনুরাগী জাত। আর বাংলা দেশ বলতে বোঝে আমাদের চে'থের সামনে ভেসে ওঠে কেবল কলকাতা শহর, সেইহেতু আমাদের সংস্কৃতি-প্রীতির পরাকাষ্ঠা যে দেখা যাবে এই শহরেরই চৌহিন্দীর ভিতরে তাতে আর আশ্চর্যের কি!

বাংলার মেলা নাকি এক অতি উত্তম সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের উপায়। যে যুগে, যে প্রয়োজনে এই মেলাগুলির উদ্ভব ঘটেছিল সেই যোগাযোগের ব্যবস্থাহীন যুগের সর্বপ্রকার প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ আজ বহুদূরে অপগত হলেও আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহের সঙ্গে কলকাতার বড় বড় বজারের পর বজর ধরে নানা উপলক্ষ্যে মেলা বসিয়ে আসছি। অথচ এ শহরে তো প্রতিদিনই মেলা বসে আছে। বড়বাজার বাদ দিলেও, কলেজ স্ট্রীট, শিয়ালদা, শ্যামবাজারের মোড়ে, বা জগদ্বাজার বা গড়িয়াহাটের মোড়ে বিকেল এবং সন্ধ্যার দিকে যে রকম নর-নারীর সমাগম হয়, প্রকৃত মেলাতেও তেমন হয় কিনা সন্দেহ।

তবু আনুষ্ঠানিকভাবে মেলা বসে এবং লোকও আসে। এসব জায়গায় ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং/দ্রব্যের প্রদর্শনীর পাশে পাজাবী চট্টের দোকান, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সমাবেশের কাছে নাগরদোলার ব্যবস্থা এবং কৃষি-যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টরের সমিহিত কৃষ্ণলীলার তাঁবু সত্যিই এক বিচিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করে দর্শকের সামনে। কিন্তু সেটা বোধহয় বড় কথা নয়, অন্তত উদ্যোক্তাদের কাছে তো বটেই। বড় কথা হল সংস্কৃতি। তাই মেলা-প্রাঙ্গণের গাছগুলিতে লাগানো হয় লাল-নীল বৈদ্যুতিক বাল্ব, উচ্চকিত অ্যাম্প্লিফায়ারে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানো হয়, 'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি...' এবং চায়ের স্টলে চায়ের খালি পাওয়াই দুস্কর হয়ে ওঠে।

হীতমধ্যে অবশ্য নির্ধারিত মণ্ডে বক্তৃতা আছে, লোকসঙ্গীত আছে এবং আছে ফিল্ম শো।

আমি শুনছি, ববণীয়া শিক্ষানেত্রী গ্রীষ্মকান্ত মন্ডেসরীর শিক্ষা প্রণালী, বাকে

‘নাভানা’র বই

এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে একটি অপরিমেয়তা আছে যা তাঁকে একই অনুভবের বিন্দুতে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। বারে বারে তিনি নিজেকে অতিক্রম করেছেন। তাঁর বিস্তৃত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা জীবনের অভ্যন্তর পৃষ্ঠা থেকে বারে বারে উদ্ভার করেছেন অপরূপকে। এত বিভিন্ন রসে ও পরিবেশে এত সার্থক নিখুঁত আঙ্গিকে এত আশ্চর্য প্রেমের গল্প আর কে লিখেছে? প্রতিদিনের সত্যকে চিরদিনের সৌন্দর্যের মধ্যে আর কে দিয়েছে অজমা করে? অন্তরে প্রেম নিয়ে সৃষ্টি করেছেন বলেই তাঁর রচনাকে তিনি এত সুন্দর করতে পেরেছেন। ‘এক অঙ্গে এত রূপ’ আদ্যোপান্ত এক কুসুমলহরী লাবণ্যের বন্যা ॥ তিন টাকা ॥

ফরিয়াদ ॥ দীপক চৌধুরী

‘ফরিয়াদ’ উপন্যাসের ব্যারিস্টার নিমাই চ্যাটার্জি ধর্ম্মাধিকরণের দরবারে এক মর্ম্মান্তিক নালিশ নিয়ে উপস্থিত। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী, তাঁর সন্তানের জননী এনাক্ষী শয়তান সিতাংশুর মিত্রের শিকার হয়ে পালিয়ে গেছে মাতৃমৃত্যু দেশ-বিদেশের নাইটক্লাবে ভূমিকা নিয়েছে মোহিনী নৃত্য-শিল্পী। সুন্দরী এনাক্ষী আর দুঃখিনী প্রমীলাদের পণ্য বানিয়ে সিতাংশুর লেনদেন চলছে পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে। টাকা চাই, ডলার পাউন্ড পিসেটা চাই। অটেল টাকা ছাড়া ধমনীতে রক্ত আসে না, মাতৃহের নাড়ী শক্ত হয় না। টাকার জাদুতেই গারদের মজবুত লোহার গরাদে অঙ্গগা হয়ে যায়, আসামী সিতাংশুরা পালিয়ে গিয়ে আরও প্রবল প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। এই টাকাই আজকের পৃথিবীতে পয়সা আসামী ॥ চার টাকা ॥

চিররূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ

‘চিররূপা’র গল্পগুলিতে রূপকে ছাড়িয়েও শিল্পীমানসের যে-জিজ্ঞাসা সরবে উচ্চারিত সে-জিজ্ঞাসা প্রেমের জিজ্ঞাসা। যে-মানুষটি আজীবন একটি না-পাওয়া মেয়ের স্মৃতিকে আঁকড়ে রইলো, জীবনের গোড়ালিতে তার কাছে সে-মেয়েটির মূল্য কী! অতসী ঘরে নেই জেনেও নয়নমোহন আর মল্লিকার কাছে সে-ঘর কোনদিনই নিরালা হয় না কেন? ‘চিররূপা’র আটটি গল্পে আছে এমন বহু বিচিত্র প্রেমের দিকদর্শন। আর আছে উপন্যাস-প্রায় বড়ো ‘জীবন-কাঠি’র মণিকা, প্রীতি ও রত্নীকে ঘিরে নিষ্ঠুর প্রেমের এক জটিল আবর্ত, যে-আবর্তের প্রতিটি রেখাবলয় সন্তোষকুমারের শিল্পীসত্তার স্পর্শ পেয়ে অনিন্দ্য হয়ে উঠেছে ॥ তিন টাকা ॥

মীরার দুপুর ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

দেবদারুর মতো সক্ষম স্বামী এখন অসুস্থ। অচল সংসারকে চালানু রাখার তাগিদে প্রসাধনের আড়ালে ক্লান্ত ও বিকৃতিকে ঢেকে নিয়ে মীরাকেই বেরতে হচ্ছে টাকার ধান্দায়। শহরের বিচিত্র সংসর্গে শুচিচারি ছিটেফোঁটা খোয়া গেলেও সভ্যসমাজ তো আর অসতী বলছে না তাকে। জীবিকার হিজিবিজি থেকেই হয়তো একদিন জীবনশিল্পের অমৃত উদ্ভার নয়তো ঠাট্টমক বজায় রেখেও মীরা চক্রবর্তীরা শেষ পর্যন্ত শূন্যে শূন্যে এসেন্সের শিশি।... ‘মীরার দুপুর’ সমস্যা-পীড়িত প্রেমের প্রসঙ্গে বলিষ্ঠ আধুনিক উপন্যাস ॥ তিন টাকা ॥

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

বলে 'মন্তেসরী পম্ধতি' তার মূলকথা হল—আনন্দের ভিতর দিয়ে শিক্ষাদান। মেলার ভিতর দিয়ে আমরা যা সংস্কৃতি-অনুভূতি সঞ্চার করি তারও মূলকথা হল আনন্দ। সৈদিক থেকে আমাদের এই 'মন্তেসরী পম্ধতি'র সাংস্কৃতিক শিক্ষা যে অত্যন্তই উপযোগী তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু ঈশ্ব-সচ্ছল বাঙালী মধ্যবিত্তের ঘরে পৌঁছে এই সংস্কৃতি-অনুভূতির যে চেহারা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাতে অবশ্য একটু হোঁচট খেতে হয়।

সূচনাটা হয়েছিল বেশ কিছুকাল আগে থাকতেই। শান্তিনিকেতনী মোড়া, নিচু তক্তাপোষ, আধুনিক চিত্রকরের দৃষ্টি একটি ছবি দেখা যাচ্ছিল পনের-বিশ বছর আগে থেকেই। ইদানীং বছর কয়েকের মধ্যে এই গৃহসজ্জার ব্যাপারে উপকরণ-বৈচিত্র্য ঘটেছে অসম্ভব রকম।

সত্যিই তো, মৃত্যু যেমন মানুষের মনের দর্পণ, তেমনি বাড়ির বসবার ঘরটির রূপসজ্জা সমস্ত পরিবারটির সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে বহির্কি। তাছাড়া নিছক বসবার ঘরটির বৈশিষ্ট্যই যদি সংস্কৃতিবান বলে ছাড়পত্র পাওয়া

যায় তো, সৈদিকে যে সকলেরই নজর পড়বে সেটাও বিচিন নয়। ফলত, হয়েছেও ঠিক তাই। পরশুরামের গল্পে যে গৃহিণীটি ফাস্ট বুকের ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত বিদ্যাভাস করে স্বামীকে 'হোয়াট' 'হোয়াট', 'হোয়াট' বলে চমকিত এবং পদূলিকৃত করে তুলেছিলেন, তেমন গৃহিণী হয়তো আজ অনেক পরিবারেই নেই। কিংবা যে গৃহিণী যুদ্ধের সময় শাদা উল বাজারে দুর্লভ হওয়ায় নীল রঙের উল দিয়ে কাপেটের উপর নীল বিড়াল বসে সাধারণের অবগতির জন্যে তার নিচে ইংরাজীতে লিখে দিয়েছিলেন 'দি ক্যাট', তেমন গৃহিণীও বোধকরি আজকাল সংসার-আলো রুবে নেই। কিন্তু যারা আছেন তারা সকলেই যে খুব একটা সূর্যচির পরিচয় দিচ্ছেন এমনও বলা যায় না। বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণে এমন সব জিনিস বৈঠকখানায় জড়ো করছেন তারা যার মাথামুসু খুঁজে পাওয়া কঠিন।

কাঠের পদতুল খুবই সুন্দর জিনিস; পুরোনো পোড়া-মাটির পদতুলও অতি অপূর্ব। স্থান পেল ঘর সাজানোর কাজে। ভালো কথা। কিন্তু তার পাশেই দেখা যাবে দেয়ালের উপর ঝুলছে এক টুকরো মাদুর, দুটি সোলায় মালা এবং তিনটি পাখা-মেলা কাঠের হাঁস-থাকে থাকে উড়ছে! অন্য দেয়ালে একটি চিত্রিত চ্যাটাই, তার দুপাশে রঙকরা বাঁশের আধারে দুটি নখরকান্তি সবুজপত্র লতা—যার পয়মন্ত নাম হল 'ম্যানি প্ল্যান্ট'। ফলে দাঁড়াল এই যে, প্রমাণিত হল, আপনি একজন রুচিবান, বিদগ্ধ মানুষ। পদতুল, মাদুর, সোলা, চ্যাটাই, এসব দেখাল আপনি মনেপ্রাণে বাঙালী, বাংলার দেশজ ঐতিহ্য এবং লোকশিল্পের প্রতি অত্যন্ত প্রস্ধাবান। আরার সেই স্বেগেই 'ম্যানি প্ল্যান্ট' অভিমানে দেহিহিলেলে বাকিয়ে দিল আপন 'আন্তর্জাতিক চিন্তা-ভাবনারও অংশীদার'।

এরপরে সে ঘরে যদি কেউ নাইলন শাড়ীতে সুসজ্জিতা হয়ে চড়া রঙের পম্পাফুল-আঁকা বরণডালার উপরে চরের সরঞ্জাম নিয়ে আবির্ভূত হন তো সোনায় সোহাগা। একই লগ্নে আপন শ্রাবস্তী এবং প্যারিসের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পেরে ধন্য হবেন।



এমনই ধরণের এক বাড়িতে আমি মঙ্গল নারকেলের মালায় ফ্রিজে-রাখা ঠান্ডাজল পরিবেশিত হতে দেখেছি; অন্যর আতঙ্কিত হয়েছি দেয়ালের গায়ে দুখানি কুলো ঝোলানো দেখে। সে বাড়িতে ভদ্রমহিলারা কেউ কুলো দিয়ে চাল-ডাল ঝাড়তে উৎসাহী বলে অনুমান করতে পারিনি বলেই সন্দেহ হয়েছে, ওদুটির ব্যবহার হয়তো অব্যবহৃত অতিথিদের বাতাস দিয়ে বিদেয় করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমস্ত সময়টা বেশ আড়ম্বরভাবে কাটাতে হয়েছিল আমাকে।

রুচি বস্তুটি বড়ই অমূল্য। যার নেই সে ব্যবহারেই পারে না, কোথায় তার ঘাটতি। সস্তা অনুকরণে চোখ-ধাঁধানোর দিকেই তখন বোঁক পড়ে যায় বেশী, কী করছি বা কেন করছি, সৈদিকে আর খেয়াল থাকে না। কিন্তু ঘর সাজানোর ব্যাপারটা তো শুধু আজব কিছু করার বাহাদুর নয়, নিজের সমস্ত শিক্ষাদায়ীকার প্রশ্নই যে ওর সঙ্গে জড়িত। তাই সে ব্যাপারে একটু চিন্তা করতে হয়। নকল ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নকলস্য নকল উপকরণের যত্নতর ব্যবহারে কেবল রুচি-দৈন্যই প্রকটিত হয়, পরিবারের বিষয়ে কোনো সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা তাতে মেলে না।

আমাদের সংস্কৃতি-পিপাসা হ্রদ-অভিজাত নরনারীকে এ বিষয়ে সচেতন হতে অনুরোধ করি।

কিংকো'র *
আগিকা
হেয়ার অয়েল

প্রথম বার-কিংকো'র কলি-১



প্রতি পাঠাগারের যোগ্য পুস্তক

জাতিস্মর কথা

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু, প্রণীত।

এরূপ পুস্তক বাংলাভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

বিদগ্ধ সমালোচকগণ কড়ক উচ্চ প্রশংসিত।

'দেশ' পত্রিকা—যে বিষয়বস্তু নিয়ে লেখক অবতীর্ণ হয়েছেন, তা একেবারে অভিনব বলা চলে।

অমৃত পত্রিকা—কাহিনীগৌল চমকপ্রদ, রহস্য উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর ভূমিকাটি সুলিখিত। এই জাতীয় গ্রন্থ এক হিসাবে এই প্রথম, সেই কারণে লেখককে অভিনন্দন জানাই।

আনন্দবাজার পত্রিকা—বইটি পাঠকদের খুবই ভাল লাগবে।

প্রাপ্তিস্থান : প্রকাশক ঘাটশীলা কোম্পানী। ৩, ম্যাক্সো লেন, কলিকতা-১

ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২নং রূপওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকতা-৬

দাশগুপ্ত, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি প্রভৃতি প্রধান পুস্তকালয়।

ইউরোপীয় মতভাব মঞ্চ ও শিল্পী

রবীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাচীনতার বিরুদ্ধে যখন শিল্পী ও সাহিত্যিকরা অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাচ্ছেন—ঠিক এমনি সময়ে ঐতিহাস্যহীন আমেরিকার শিল্পী ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীরা মার্কিনী সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ জানালেন। অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্যে ইউরোপের মত—আদিম ও প্রাচীন আফ্রিকা আর প্রশান্ত মহাসাগরে ছুটলেন না তাঁরা। তাঁরা আগ্রয় নিলেন আমেরিকান সভ্যতার আদি ও প্রাচীন ইউরোপে। অতীতনীতিবাদী ঔপনিবেশিক পূর্বপুরুষরা মানবীয় আবেগের কণ্ঠ কঠোর সংযম দিয়ে রুদ্ধ করে, ধর্মোন্মাদের অভ্যুৎসাহ দিয়ে, যে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, তাতে ভারসাম্যের একান্ত অভাব ঘটল। “নতুন” মহাদেশের নতুন সভ্যতা, একদিকে যেমন মানুষের সৃজনশীলতার বিস্ময়কর ঐশ্বর্যদানব, অন্যদিকে তেমনি আত্মিক দারিদ্র্য ও অপরিপূর্ণতার বিকলোগে শিশু হল। অন্তঃসারশূন্য অর্থহীন মত ধর্মচার, অতিঐশ্বর্যলিপ্সা, এবং জীবনমূল্যের বিকৃতি ও অসংগতিতে, অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা প্রতিবাদ জানালেন। দার্শনিক তত্ত্বের আপোষী চেষ্টা সত্ত্বেও বিজ্ঞানগত সমাজ ও সভ্যতার মানুষের আত্মিক সমস্যা সমাধানের উপায় হল প্রকৃতি। একদিকে এই ভগবৎচেতনাহীন বস্তুময় জড়প্রকৃতির কাছে মানুষের শক্তি ও স্বকীয়তার ক্ষুদ্রত্ব, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক তত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যার অপব্যবহারে ঐশ্বর্যকামনা-সম্বল সমাজের কবন্ধতা ও অশ্লীলতার সম্মুখীন হয়ে চিন্তাশীল শিল্পী ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীরা প্রকৃতিবাদী হলেন, তাঁদের চেতনার প্রকাশ হ’ল নিরাশা-বাজক। এই নৈরাশ্য ইউরোপীয় নবচেতনায় উদ্ভূত মানুষের বৃহত্তর ও পূর্ণতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও আশাভঙ্গের। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে Balzac, Zola Flaubert-এর সাহিত্যে এবং Impressionist ও তার পরবর্তী শিল্পপ্রচেষ্টায় যে প্রকৃতিবাদ, আমেরিকার সমসাময়িক Mark Twain, Herman Melville, Stephen Crane, Henry Adams, Frank Norris ও Theodore Dreiser

প্রভৃতির সাহিত্যেও তার অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। আটলান্টিকের উভয় পারেই ইউরোপীয় সভ্যতা ও চিন্তাধারার শিল্প-সাহিত্যগত প্রকাশ সমধর্মী। এই যুগের শিল্প ও সাহিত্য প্রচেষ্টা হ’ল পচনোন্মুখ সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তাকে বাতিল করে দেবার আকাঙ্ক্ষা। বর্তমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার নৈরাশ্যের ভেতরেও নতুন ও সুস্থ ভাবী সমাজের সম্ভাবনার আশা শিল্পী ও সাহিত্যিকরা হারায়নি, কিন্তু ভাবী সমাজের কোন ছবি বা সংস্কারের ইঙ্গিতও নেই। Ezra Pound, Upton Sinclair-এর মত অনেকেই একটা নব-যুগ ও নব চেতনার আশায় উদ্ভূত হ’লেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক চেতনার এই আশাভঙ্গ, ভবিষ্যতের প্রতিক্রিয়াময় পঞ্জীভূত সংকটের মধ্যে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের ঐতিহাসিক গুরুত্বের আরও একটি বিশেষ কারণ হ’ল রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। জটিল অর্থনৈতিক সংকট, অথবা আত্মিক সংকট, অথবা এই দুয়ের পারস্পরিক

আন্তর্কিয়া বা-ই এই ঐতিহাসিক বিস্ফোরণের কারণ হোক না কেন, এর প্রভাব ও প্রতিফলন যেমন পৃথিবীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক চিন্তা ও ব্যবস্থার বৈশ্বিক পরিবর্তনের সূত্রপাত করল, তেমনি ইউরোপীয় চিন্তাধারায় এক বিশেষ ছেদ টানল। যুদ্ধের আরম্ভে ইউরোপের শিল্পী-সাহিত্যিকরা যুদ্ধকে নানাভাবে গ্রহণ করেছিলেন। Futuristরা তাঁদের বহু-মোচিত মতবাদের বাস্তবরূপ দেখালেন: Cubistরা যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চিত্রের Cubism-এর ফলিতরূপে উৎফুল্ল হলেন। অনেকের চোখে যুদ্ধ, প্রাচীনতার বিরুদ্ধে নতুন, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম এবং এর ভেতর দিয়েই আকাঙ্ক্ষিত সংজ্ঞাহীন ভবিষ্যতের খোঁজ চলাছিল। অনেকে দার্শনিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শান্তি ও যুদ্ধ দুয়েরই ভেতর বাস্তবকে দেখলেন। পলায়নী বৃত্তি দিয়ে মানুষের মনকে এই সীমিত বাস্তব থেকে মুক্ত করে, এক অতিবাস্তবের খোঁজ কেউ কেউ করলেন যেখানে মানুষের সঙ্গে জগতের নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এই নবসম্পর্ক ভিত্তিগত অতিবাস্তব-বাদের নাম দেয়া হল “Surrealism”। প্রাক-যুদ্ধ সমাজের শান্তি ও স্বাধীনতার বিক্ষুব্ধ হয়ে যুদ্ধের আরম্ভে যারা যুদ্ধের ভেতর আদর্শ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেখেছিলেন, তাঁরা যুদ্ধোত্তর অবস্থায় যুদ্ধের নারকীয়তায় বিহবল ও সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হলেন।



Russel, T. S. Eliot প্রভৃতি যুদ্ধের কারণ হিসেবে মানুষের বুদ্ধি-প্রগতি ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে মানুষের অক্ষমতাকে দোষারোপ করলেন। Shaw, H. G. Wells, Bennett-এর মত যারা প্রাক-যুদ্ধকাল থেকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ পোষণ করতেন তারা সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শ্রেণীবৈষম্যগত সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে, যুদ্ধের কারণ হিসেবে দেখলেন। Hemingway, Barabuse, Remarque-এর মত সৈনিক-সাহিত্যিকরা তাঁদের যুদ্ধবিরোধী সাহিত্যে এবং Bloomsbury-র বুদ্ধি-প্রবণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা সকলেই মহাযুদ্ধে মানুষের অসহনীয় দুর্দশার জন্যে শ্রেণীগত সমাজের মালিক শ্রেণীর নিদারুণ লোভ ও তাদের হাতে সাধারণ মানুষকে কামানের রসদ হিসেবে ব্যবহারকে দায়ী করলেন। তবু Hemingway-এর Farewell to Arms Barabuse-এর Under Fire এবং Remarque-এর All Quiet on the Western Front-এ মানুষের স্বাধীনতার ওপর একান্ত আস্থা রাখা হয়েছিল। তারা বললেন, ব্যক্তিগত মানুষ তার স্বাধীনতা প্রয়োগ করে যুদ্ধকে অস্বীকার করতে পারে, সমাজকে যুদ্ধমুক্ত করতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধকে শিল্প ও সাহিত্য-ধারার আধুনিক ইতিহাসের একটা সুস্পষ্ট ছেদরেখা বলে ধরা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের ওপারে ইউরোপীয় মূমুক্ষু অনুভূতিপ্রবণ মন, সমসাময়িক সমাজ ও জীবনমূল্যের বিকৃতিতে প্রতিবাদ করলেও এবং ইউরোপীয় সভ্যতায় নিরাশ হলেও, “ব্যস্তির” শাস্বত স্বাধীনতার ওপর আস্থা রেখে, একটি সংজ্ঞাহীন আদর্শ ভবিষ্যতের আশা পোষণ করছিল। সভ্যতাবিবর্জিত আদিম মানুষ ও আত্মমানুষের নানান গবেষণার বহুমুখী প্রকাশ ও প্রতিফলন সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক চেতনার প্রকাশ থাকলেও সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্য, রাজনৈতিক চেতনা ও মতবাদ বিবর্জিত। প্রথম মহাযুদ্ধের এপারে ইউরোপীয় শিল্প, সাহিত্য ও চিন্তায় যে এক নতুন ধারার সূত্রপাত হ’ল, তা রাজনৈতিক চেতনা ও মতবাদ-মুখীনতা। ক্রমশঃ তাকে কেন্দ্র করে ইউরোপের শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক-জগতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদগত গোষ্ঠী তৈরী হ’ল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাস্ত্রীয় মতবাদের পরিচয় ও গ্রহণের যে সময়ক্ষেপের প্রয়োজন, তা শেষ হল প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে। বিশেষ করে যুদ্ধের ভেতর দিয়ে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক গোষ্ঠীর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শও বহু পরিকল্পনার

রূপগ্রহণ ইউরোপের তথা বিশ্বের চিন্তাজগতে যে প্রচণ্ড নাড়া দিল, তাতে বিশ্বের মূমুক্ষু মানুষের কল্পনা ও অনুভূতিপ্রবণতা রাজনীতিতে চেন হ’ল। ইউরোপের শিল্পী ও সাহিত্যিক মন নতুন আশা ও আলোকের সন্ধান পেল। “খ্রীষ্টধর্ম” এতদিন ইউরোপকে নিরাশ করেছে ও নিজে নিষ্ফল হয়েছে। রিলিজিয়ন-হীন ইউরোপ নতুন অবলম্বনের সন্ধানে নানান গবেষণা ও ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে দিয়ে এসে প্রথম মহা-যুদ্ধকাল পর্যন্ত নিরবলম্ব হয়েছিল। তাত্ত্বিক মাস্ত্রবাদ, বলশেভিক পার্টি ও রুশ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রাদর্শের যে ইগিত দিল তাতে অবলম্বনহীন ইউরোপের মন অবলম্বন পেল। আন্তর্যুদ্ধকালীন ইউরোপে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দ্রুত পরিবর্তন ঘটলেও এবং রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী হবার চেষ্টা করলেও, একমাত্র রাশিয়া ছাড়া ইউরোপীয় সংজ্ঞায় মানুষের স্বাধীনতা নষ্ট হয়নি এবং ইউরোপের শিল্পী-সাহিত্যিক ও চিন্তা-শীলদের রাষ্ট্রের বিশেষ আদর্শ প্রচারের জন্য পীড়ন করা অথবা নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তবু সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্যের রাজনীতিমুখীনতা এবং শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মাস্ত্রীয় মতবাদকে কেন্দ্র করে সমগোষ্ঠীয় ও সহযাত্রী হবার যে নানান রূপ তা ইউরোপের সর্বদ্রষ্ট্যর ও আত্মবিশ্বাস-লুপ্তির প্রকাশ মাত্র। Spengler-এর দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী আতিশয়োক্তি ও মিথ্যা হলেও নিরর্থক হয়নি। ইংলণ্ডের ধর্মবাদী James Joyce, Aldous Huxley, T. S. Eliot অথবা H. G. Wells, Ezra Pound, H. D. Lawrence-এর মত অনেকে Communism ও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি বিমুখ ও প্রতিরীক্ষাশীল হলেও, আন্তর্যুদ্ধকালীন ইউরোপের শিল্পী ও সাহিত্যিকরা মুক্ত মানুষের মহৎ সমাজ ও জীবনের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার একমাত্র ও নতুন ভরসা সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানালেন। কম্যুনিজম ও মার্কসবাদ পরবর্তী অধ্যায়ে পৃথিকৃ হ’ল। Spender, Koestler, Sartre Picasso, Wright, Silone প্রমুখদের মত Andre Gide, Malraux, Fischer-এরা “পার্টি মেম্বর” না হলেও, সকলেই মাস্ত্রবাদে আর্বাতিত হলেন সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন হ’ল এই যুগের ইউরোপীয় অনুভূতিপ্রবণ মনের পীঠস্থান। ধর্ম-চেতন Silone এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী Gide, Koestler-এর মত যারা মার্কসিজমে দীক্ষা নিলেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে তীর্থপীঠ জ্ঞানে, সেখানে ছুটলেন, তারা মার্কসিজমের আকর্ষণের

চেয়ে পশ্চিমী গণতন্ত্রবাদের অন্তঃ-সারশূন্যতার ধর্মলুপ্ত সমাজের নিরবলম্বতার মধ্যে নরদেবতাকে সন্ধান করলেন। এই সর্ব ইউরোপীয় নৈরাশ্য ও চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থায় যুদ্ধোত্তর জার্মানীর বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা ও শ্বাসরোধকারী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যকার নৈরাশ্য সর্বাত্মক হ’ল। দারিদ্র, অবিশ্বাস, নৈরাশ্য থেকে বিস্বেষ, ঘৃণা, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় গৌরববাদ ও রাষ্ট্র সর্বস্বতার মধ্যে Nazism-এর জন্ম হল। একদিকে জার্মানীর Nazism ও ইতালীর Facism, অন্যদিকে পশ্চিমী Democracy-র সমাজ ও জীবন-মূল্যের বিকৃতি ও অন্তঃসারশূন্যতা ও Facism তুষ্টি প্রচেষ্টা। এই উভয় সংকটের মধ্যে সর্বমূল্যচ্যুত ইউরোপীয় অনুভূতিপ্রবণ মনের শূন্যতা Communism ও সোভিয়েট সমাজ-তন্ত্রবাদকে নানা পন্থা হিসাবে সাগ্রহে গ্রহণ করল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাকৃতিক মানুষ প্রথম যুদ্ধোত্তর বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক-সামাজিক-রাজ-নৈতিক মানুষে পরিণত হ’ল। Gide, Camus, Malraux, Sartre, Spender, Hemingway, Steinbech, Remarque, Picasso, W. Lewis-দের মত ইউরোপীয় শিল্পীগোষ্ঠীরা সমসাময়িক ইউরোপীয় মনের প্রতিনিধি। T. S. Eliot, Aldous Huxley-দের ইউরোপীয় খৃষ্টীয় ঔপনিবেশিকতা একান্তই বিদ্যাসব্ব। H. G. Wells প্রমুখদের বৈজ্ঞানিক সমাজব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা নগর্যক। যারা নান্যপন্থী হয়ে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রে মানবহানকর্তা নরদেবতাকে খুঁজতে গেলেন তারা ঐতিহাসিক Stalin-Hitler চুক্তিতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও “disillusioned” হলেন। অবশেষে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও শূন্য ইউরোপ রাষ্ট্রনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদদের হাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হ’ল।

আন্তর্যুদ্ধকালীন আমেরিকার ঐতিহাসিক ও সামাজিক পার্থক্য সত্ত্বেও ইউরোপীয় জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শন-সম্ভূত সমসাময়িক আমেরিকার সাহিত্যে একই সংশয় বিভ্রান্তি ও নৈরাশ্যবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। ধর্মভিত্তিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ জীবনের সংকট ও নৈরাশ্য প্রকাশ পেল। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার অনিবার্য ধ্বংস আশঙ্কায় যারা নতুন বিশ্বাস ও আশ্বাসের সন্ধানে Marxism-এ আশ্রয় নিলেন তারা প্রাক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালের সোভিয়েট নীতিতে নিরাশ হয়ে ইউরোপের শিল্পী সাহিত্যিকদের মতই নিরাশ্রয় হলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধকালীন শিল্প ও সাহিত্যে যদিও নিরাশা ও স্বপ্নভঙ্গের

প্রকাশ ছিল, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা ভবিষ্যতে আস্থা হারাননি। সেই নিরাশার প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া ছিল চলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ও নায়কগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। নতুন ব্যবস্থা ভিত্তিতে নতুন ভবিষ্যতের সম্ভাবনার প্রতি সেই প্রতিবাদ কখনো আস্থাহীন হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিল্প-সাহিত্যে প্রথম মহাযুদ্ধের শিল্প-সাহিত্যের মত যুদ্ধ-বিরোধিতা ও শান্তির বাণী নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিল্পী-সাহিত্যিকরা যুদ্ধ, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনায়কদের বিচার করেননি, যুদ্ধের কার্য-কারণ নিয়ে প্রশ্নও করেননি, শান্তির মতই যুদ্ধ ও বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিল্প ও সাহিত্যে। প্রাক-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত চলিত সমাজ ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া শক্তি সঞ্চার করে নানান ভাষাগাড়া ও গবেষণার মধ্যে দিয়ে এসে আদর্শ ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, Marxist দর্শন এবং Bolshevic রাষ্ট্রব্যবস্থা তাকে আশ্রয় দিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেই সিদ্ধান্ত ও দর্শন সম্বন্ধে বিরাট প্রশ্ন উঠল ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এ অবস্থায় অতীতের ঐতিহ্যে ও ভবিষ্যতের আদর্শে সম্পূর্ণ-রূপে আস্থাহীন হয়ে ইউরোপীয় “মন” “কম” ছেড়ে “কর্তা”কে সন্ধান করল—“I am that I am”—“I am my own justification” এই হল নতুন দর্শন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে তাই অতীতের নানান “বাদ” ও “তত্ত্বের” জন্ম হয়নি। এ যুগের নবদর্শন হল “Existentialism”.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মানব ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী ছেদ। মানব-ইতিহাস-প্রবাহে মধ্যবংশ শতাব্দী একটা বাক। খন্ড খন্ড ঘটনা সম্বলিত ও খণ্ডিত সময় দ্বারা পরিমিত ইতিহাস, মহাযুদ্ধকালে সম্মুখের পথহারা হয়ে অতল অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক সর্বস্বান্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইউরোপ তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সামগ্রিক লুপ্তি আশংকায় যখন অবসন্ন, তখন আটলাণ্টিকের ওপারের ভাঙারের দ্বারা খুলে দেওয়া হল হতবল ইউরোপকে পুনর্জীবিত করার জন্যে এবং অর্থ-ইউরোপ-কবলিত সোভিয়েট ইউনিয়নের কবল থেকে বাকী ইউরোপকে রক্ষা করার জন্যে। এর ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্জীবন ঘটলেও আর্থিক শূন্যতা অপূর্ণ রয়ে গেল। পশ্চিমী বুর্জোয়া ডেমোক্রেসী নববলীয়ান বলশেভিক কম্যুনিজমের সামান্যসামান্য দাঁড়িয়ে আর্থিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে লাগল। এবং

ইউরোপীয় সভ্যতার এই সংকট সমাধানের ভার বর্তেছে A. Toynbee'র মত সৃজনশীল মুদ্রিত-মেয়ের ওপর। এবং Colin Wilson-দের মত যারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন তাঁরাও সমাজের নেতৃত্ব দাবী করছেন আজকে।

প্রাক-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইউরোপে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ভাল-মন্দের দায়িত্ব ব্যক্তিগত ছিল না এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষ সে দায়িত্ব স্বীকার করেনি। রাষ্ট্রগত, শ্রেণীগত ও স্বার্থের আন্তর্বিষয়-প্রসূত বিভিন্ন জটিল শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক যে Leviathan, তার পাপপুণ্য, ভালমন্দের দায়িত্ব ব্যক্তিগত নয়নি বা তার ছিল না। রাষ্ট্রবিশ্বের বিভিন্ন স্বার্থ-সংঘাতের মিশ্রণের ফলে স্বতঃস্ফূর্ত প্রগতির যে আশা, তার সর্বধ্বংসী পরিণতিতে যুদ্ধোত্তর ইউরোপ নতুন মূল্যায়নে সজাগ হল। এতদিন নৈতিক চেতনা ব্যক্তিগত জীবনের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল; সমগ্র সামাজিক জীবনের নৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন বোধ ছিল না। যুদ্ধোত্তর মধ্য-বিশ্ব শতাব্দীর চিন্তাশীল মানুষ সর্বধ্বংসী অথবা সর্বশুদ্ধিকারী এই দুই বিপুল সম্ভাবনার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে নতুন সমাজ, রাষ্ট্র ও জগৎ-ব্যবস্থায় তার সক্রিয় দায়িত্ব সচেতন

হল। মানুষের বিশেষ করে ইউরোপের মানুষের এই যে নবচেতনা—“that the inner forces of existence are suddenly revealed as the supreme forces on which the external future of civilization will depend, just at a moment when men were consoling themselves for the decadence of the inner life by the systematic development of Science”, যার ফলে যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় শিল্পে সাহিত্যে চিন্তার দাবী হল—“on being rather than on making” এবং সে “being” হবে “moral being”। যুদ্ধোত্তর মৃদু, ইউরোপের “Angry young men”রা ইউরোপের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতি যা কিছু চলিত ও স্বীকৃত এবং যা কিছু একান্তই ইউরোপীয় তাকে বরবাদ করে দিয়ে নতুন জীবন-পদ্ধতি ও জীবনমূল্যের সন্ধানী হলেন। একদিকে বর্তমান ইউরোপ যেমন মাস্তুরীয় দর্শনের গবেষণাগার সোভিয়েট ইউনিয়নে যেমন আস্থাহীন, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপের ধনভিত্তিক সভ্যতা ও জীবনবোধ যার ভিত্তি হল “Culture”, তাকে বাতিল করে নতুন সমাজ ও জীবনের সন্ধান করছে, যার ভিত্তি হল নৈতিকতা ও ধর্ম।

ইউরোপের এই ঐতিহাসিক নব-চেতনার পটভূমিকায় ফরাসী সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যের ইন্দ্রিয়গত ও আত্মিক সংমিশ্রণের একান্ত রূপকে বর্ণন করে

অবধূতের ক্লাসিক উপন্যাস

ফল্গুনতত্ত্ব

২-৩ পর্ব একত্রে বেরুল ॥ ৩-৭৫ ॥

১ম পর্ব—২-৭৫

তিন-প্রহর (উপন্যাস)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৩-২৫ ॥

মায়াকন্যা

মনোজ বসু ॥ ৩-৫০ ॥

সমাজ সমীক্ষা :

অপরাধ ও অনাচার

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ ৭-০০ ॥

একশ বছর (২য় সং)

জরাসন্ধ ॥ ৩-৭৫ ॥

ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়

জসীমউদ্দীন ॥ ৩-৭৫ ॥

রূপং দেহি ধনং দেহি

শৈলজানন্দের উপন্যাস ॥ ৩-২৫ ॥

তিন কাহিনী

বনফুল ॥ ৫-৫০ ॥

মুখের ভাষা

বুকের রুধির

অমিতাভ চৌধুরী ॥ ৩-৫০ ॥

আইখম্যান (২য় সং)

সঞ্জয় ॥ ৩-০০ ॥

ডম্বর ডাক্তার

মনোজ বসুর কৌতুকনাট্য ॥ ১-৭৫ ॥

আসন্ন

প্রকাশ : বিভূতিভূষণ মৃধোপাধ্যায়ের কন্যা সঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী এবং...

কলিকাতা

৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট.

কলিকাতা—৯

“engaged” সাহিত্যে উৎসাহী হইল এবং শিল্পী ও সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্বের দাবী শোনা গেল সমসাময়িক Camus, Sartre-দের সাহিত্যে। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর ধ্বংস সম্পূর্ণ হইল,—জৈব ও আত্মিক বিনাশে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত আত্মপাপ-সচেতন জার্মানী তার নিজস্ব সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন তুলিল। শ্রেষ্ঠ জার্মান শিল্প, সাহিত্য ও জার্মান সংস্কৃতির বিমূর্ত-প্রকৃতিকে বরবাদ ও অস্বীকার করে নতুন সংস্কৃতি, শিল্প ও জীবন মূল্যায়নের যে দাবী হইল, তার ভিত্তি “moral realism”। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর এই দাবীকে Thomas Mann সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও জাতীয় নৈতিক গুরু হিসেবে অস্বীকার করলেন। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধোত্তর জার্মানীর বুদ্ধিজীবী ও আত্মিক প্রতিভা এবং মূর্খতার প্রকাশ দেখা যায় এই উক্তিতে; “There are no such alternatives as good and evil. There are truths and untruths. Truth is a diabolic and energetic and destructive. What is called good is only a facade of untruths. All social aims of democracy and progress and reconstruction and re-education—seek to establish a kind of routine on the false assumption that there is something concrete and enduring in nations, parties business and machinery which can absorb peoples lives and make them think of themselves as parts of the structure which has nothing to do with the innermost reality of their existence. All talks of rights and wrong is an attempt to make one loyal to something outside the truth about oneself—which is that one is alive and is going to die and that one has no loyalty to anyone except one self..... The Third World War which will complete the unfinished task of this war.....Destroy the whole of this unnatural decadent civilization of great cities and false values”.

প্রাক-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বটেনের সাম্রাজ্যপন্থী বুর্জোয়া সমাজের অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে জটিলতা সৃষ্টি করেছিল সে অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে Keynesian অর্থনীতি তত্ত্ব ও Neo Fabian রাজ-নৈতিক চিন্তা সাহায্য করল। এবং পুরোন শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীস্বার্থের সংস্কারের যে অবশ্যম্ভাবী ও আশা প্রয়োজন ছিল, তা সম্ভব হইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মারফত। নব শ্রেণীবিন্যাস ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে মানুষের যে আর্থিক উন্নতি ও জৈব স্বাচ্ছন্দ্য ঘটল, তাতে সমাজ, সংস্কৃতি ও আত্মিক সমস্যার সমাধান হইল না, বরং সেখানকার চিন্তাশীল শিল্পী-সাহিত্যিকরা ইউরোপীয় “Culture” গত সভ্যতার সংকট গভীরভাবে অনুভব করলেন। প্রজাতিতত্ত্বমী রাষ্ট্রের জৈব নিরাপত্তা ও

অভ্যুতপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও যুদ্ধোত্তর বুর্জোয়া সমাজে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিভিরা ও সংকটের প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৪০-৫০ দশকের সাহিত্য ও সাহিত্য প্রচেষ্টায়। Angus Wilson, Osborne, Braine, Elizabeth Sitwell, W. Cooper, Iris Murdoch, Beckett, Denis-দের মত “Angry young men”-দের সাহিত্য সমাজের অন্তঃসারশূন্য পচনশীল সভ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও ব্যঙ্গের ভরা। প্রাক-মহাযুদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধোত্তর শিল্প ও সাহিত্যের তফাত হইল যে, উভয়েরই ধর্ম বাস্তববাদ। চিরায়ত ও চলিত যা কিছু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি, কিন্তু যুদ্ধোত্তর সাহিত্যে ভবিষ্যতের কোনও ইঙ্গিত বা আদর্শ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নাই। Beckett-এর “Waiting for Godot”-তে নিরলস্য জড় ও অসুস্থ মানুষের যে নিজীবন “অপেক্ষা” তা একান্তই মধ্যবংশ শতাব্দীর ইউরোপের প্রতিচ্ছবি;—সে “অপেক্ষা” কিসের জন্যে তার সংজ্ঞা নাই। যুদ্ধোত্তর ইংল্যান্ডের সাহিত্যের এই নগ্নত্বক মূর্খতা-অবস্থার মধ্যে Colin Wilson-এর “An enquiry into the Sickness of the Mid-Twentieth Century Man” আটলান্টিকের উভয় পারেই সানিনাদ সাড়ম্বরে গৃহীত হইল নব আলোক ও নবজীবন দর্শনের প্রকাশ্যায়। “Outsider” এবং “Religion and the Rebel”, প্রাক Colin Wilson চিন্তাশীল ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টিচলিত ও নিরাশাবাদের প্রতিধ্বনি। Eliot-এর ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা, Spengler-এর ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনিবার্য পতন প্রভৃতি নিরাশাবাদের সঙ্গে Shaw, Eliot-এর “ধর্ম”কে জুড়ে Colin Wilson-এর যে নব “Existentialist” দর্শন ও সমাজ তার কারুণ্য হবে Nietzschean Superman-রা, যারা Colin Wilson-এর মত “Inside”—Outsider, কিন্তু এই আদর্শ, ভাবী সমাজ ও জীবনের অন্তরায়। Colin Wilson - এর মতে “No man can become a superman in a world of apes, it is impossible to be a genius among pygmies.... Vast mass of people are so stupid they fight as well as be dead, they are lepers—morally and spiritually.” Colin Wilson আশা-বাদী, —তাই ইউরোপীয় সভ্যতার

সংকট ও সমস্যার প্রতিবিধানের জন্যে তিনি একটা “Scientific” ও “Community Religion” এবং নব Church-এর প্রয়োজন জানালেন কারণ—Christian Church ও “Christianity has failed Europe”! তাঁর এই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে “One can only hope that he has failed.”

যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গর্ব, দম্ভ ও বৈশিষ্ট্য প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ থেকে ইউরোপ, নিজেকে সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়েছিল সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ ও ধর্ম হইল দ্বন্দ্ব-কেন্দ্রিক। ইউরোপ তার অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট ও অন্তঃসারশূন্যের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও আত্মিক সংকট ও অন্তঃসারশূন্যের সমাধান যুগে যুগে করেছে নতুন নতুন “মূল্য” সৃষ্টি করে এবং ইউরোপের গতি ও প্রকৃতি হয়েছে এই অন্তঃসারশূন্যের অনুসরণে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর দ্বিধা-বিভক্ত ইউরোপের ঐতিহাসিক সভ্যতা, সংস্কৃতি-চেতনা ও মূল্যবোধের ধারক পশ্চিম ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রগুলি একাদিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক অন্তঃসারশূন্যতা ও অনাদিকে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতির কাছে আত্মলুপ্তির আশঙ্কা, এই উভয় সংকটের মধ্যে নতুন দর্শন ও মূল্য সৃষ্টির জন্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এবং সেই সন্ধানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ওপর যারা নগর-কেন্দ্রিক বুর্জোয়া সমাজের পরগাছা ও জীবন-যোগসূত্রহীনতার ফলে Outsiders। বুর্জোয়া শিল্প সাহিত্যগত সাংস্কৃতিক যে বিশেষ জগৎ, তা সমাজ ও রাষ্ট্রের দৈনন্দিন জীবনে বিগত সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন,—পরিচিত জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রহীন—তাই অপরিচিত। শিল্পীর বাস্তব সাধারণের বাস্তব নয়। শিল্পী সাহিত্যিকেরা পোষা, পরগাছা এবং ভারসাম্যহীন। খুঁটী ধর্মের চার্চগত যে রূপ তা বুর্জোয়া চেতনার পরিপন্থী তাই বিজ্ঞানও যান্ত্রিক শিল্প। কিন্তু মধ্যবংশ শতাব্দীর আত্মিক এ সংকট শৃঙ্খলায় পশ্চিম ইউরোপীয় কিনা এ সুদেহ দেখা দিল Dudinstev ও Pasternac -এর চাঞ্চল্যকর “Not by Bread Alone” ও “Dr. Zivago”-তে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির এ সংকট সর্বমানবীয়। আশা করা যায় এই শতাব্দীতেই মানুষ “Grand Synthesis”-এর সন্ধান পাবে।



তীর্থ-হাত

শ্রীমদ্বিষ্ণু
মুদ্রাপাশ্রয়



গোড়াতেই বলে রাখি আমি দেব-
ব্রজ এবং সাধু-সম্মাসীতে বিশ্বাসী।
আপনারা বলবেন ওসব বোগাস্, এ যুগে
অচল। আমি, তা কি করে মেনে নোব?
বিশ্বাস আছে বলেই তো সম্মাসীর
আশ্রয় নিতে পেরেছিলাম, আর তাইতেই
তো অভাব একটা সংকট থেকে পরিচালিত
পেয়ে গেলাম।

তীর্থে যাওয়ার আরোজন করছিলাম।
গোবর্ধন এসে প্রশ্ন করল—“যা সব
শুনছি সে কি সত্যি দাদা?”

বললাম—“বয়েস হয়েছে তো গোবর্ধন।”

“ওটা আমাদের দেশে চল্লিশের আগে
থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু সে-কথা
থাক। আমি ভেবেছিলাম আপনি অন্তত
একথা মানতে চাইবেন না যে যাক ঘরে,
এত কাছে থেকে পাওয়া গেল না—তাকে
অত দূরে গিয়ে পাওয়া যাবে।”

বললাম—“আমি তো বলি, যখন সারা
জীবনটা এত কাছে থেকে পাওয়া গেল
না, তখন ‘কাছে’ ব্যাপারটার মধ্যেই
হয়তো কোনও গলি আছে। তাই মনে
করাছি একবার দূরটাও দেখে নেওয়া
ভালো। সময় আর কোথায়?”

একটু চুপ করেই রইল গোবর্ধন,
ঘাড় হেঁট করে, আয়ুর কথা তুললে
একটু পীড়িতই হয়। একটু পরে মুখ
তুলে বলল—“তা একাই যাবেন?”

“একরই পথ নয় কি ওটা?”—আমি
উত্তর করলাম।

বলল—“তীর্থের পথ অনেকটা
সংশরীরে স্বর্গে যাওয়ার পথ, এটা
স্বীকার করতেই হবে দাদা। স্থায়ী নয়,
অস্থায়ী স্বর্গ, এইটুকুই মেনে নিতে
পারি। সে-মজার ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের

কথা ধরে বলা যায়, মহাপ্রস্থানের পথে
তিনি সঙ্গী নিয়েছিলেন।”

বললাম—“ধর্মরাজ বলে তিনি
তাদেরও অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে
যেতে পারবেন, সে-সাহসটা ছিল তাঁর।
আমি উলটে তাদের বোঝাই হব না
গোবর্ধন?”

একটু ঠোঁট মূচকে হাসল গোবর্ধন,
মনে হোল যেন বুধবার চেষ্টা সত্ত্বেও
হাসিটুকু ফুটে উঠল। প্রশ্ন করলাম—
“হাসলে যে?”

বলল—“আপনার সঙ্গে তর্ক চালিয়ে
যাব সে আম্পর্দা নেই আমার দাদা। আমি
যে-কথাটা বলতে চাইছিলাম সেটা বেশ
আপনার মুখ দিয়েই বেরিয়ে গেল।
ঐ ‘বোঝা’। যুধিষ্ঠির ফাঁকা মহাপ্রস্থানের
পথ ধরেছিলেন দাদা। আপনার পথে চাপ
ভিড়, আর তার মধ্যে এমন রহস্য লোক
আছে যারা মনে করেন যাত্রীদের বোঝা
হালকা করা স্বর্গলাভের আরও সোজা
পথ। তাদের পক্ষে সে বিশ্বাসটা নিভুল,
এটা অস্বীকার করবেন? এমন কি
যুধিষ্ঠিরও এ বিষয়ে হুঁসিয়ার ছিলেন
দাদা; অত ফাঁকা পথ, তবু রক্ষী হিসাবে
যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তাকে আগা-
গোড়া সঙ্গে রেখেছিলেন।”

ওর বলবার যা চাই তাতে না হেসে-
উপায় থাকে না; বললাম—“তুমি গাট
কাটা-পকেটমারদের কথা বলছ নিশ্চয়,
কিন্তু আমি অত ভালো রক্ষী পাবই বা
কোথায় গোবর্ধন?”

“আছে একটা দাদা। হয়তো অতটা
ভালো নয়—যুগটাও তো বদলেছে.....”

“তালিম-দেওয়া এ্যাল-সেশিয়ান?—
স্পেনিয়েল?”—কুকুরের প্রসঙ্গ চলছিল

বলেই আমি কতকটা উৎসুক হয়েই
প্রশ্নটা করলাম, বললাম—“তাহলে না
হয় নেওয়া যেত একটা সগে।”

মুখ নীচু করে ঠোঁট চেপে হাসছিল
গোবর্ধন; তুলে, মুখের দিকে চেয়ে বলল
—“অত ভালো বলেও গুমর করতে
পারি না, তবে.....”

বললাম—“গিঃ, তুমি নিজেকে
কুকুরের সামিল করছ গোবর্ধন?” বাধা
দিয়ে অন্তত কণ্ঠে বললাম আমি।
তিরস্কারটা বাড়তেই যাচ্ছিলাম, সেটা
আন্দাজ করেই পাশ কাটিয়ে আরম্ভ করে
দিল—“ওসব তীর্থ-ধর্মের দিকে মতি-
গতি তো দিলেন না ভগবান; দাদা,
কখনও যে দেবেন এমন লক্ষণও দেখছি
না। তাই বলছিলাম যদি সঙ্গে নিতেন,
ও-কাজটুকু হয়ে থাকত। বলবেন—
বিশ্বাস তো করো না। তা সাপের বিষ
আছে বিশ্বাস না করলেও যমে তো ছাড়ে
না।”

এই রকম উন্মত্ত উপময় ছাড়ে মাঝে-
মাঝে, হাসিয়ে যুক্তি-তর্কের বোঁকটা
কাটিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করার চেষ্টা
করে। তবুও বললাম, কতকটা ভকের
খাতিরেই বললাম—“থাকই না এখন
গোবর্ধন। সাপের বিষের কথা যাই হোক,

ধর্মের ব্যাপারে বিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে কাজ
করতেই বেশি ফল তো। তোমার তো
এখনও সময় আছে তার জন্যে অটেল।”

“এ একটা জিনিস দাদা, যখন মনে
হয় অটেল রয়েছে হাতে, হঠাৎ দেখা

যায় এক লহমাও নেই আর। আর এমনই
ভালো নয়—যুগটাও তো বদলেছে.....”

সওয়ায়ে, কারুর কাছে হাত পাতলে
সব বুঝে-সুঝেই যারা বৃদ্ধিমান, অন্য

উপায় না থাকলে নিজের শ্রাম্ভটাও আগে-
ভাগে করিয়ে রাখে। তাই.....”

আর বাড়ানো চলে না। বললাম—
“চলোই তাহলে।”

সঙ্গে থাকলে কোনও কাজই তো
করতে দেয় না নিজের। কোন
ঝুঁকিই তো নিতে দেয় না; স্নান, আহা-
র আর ঘুরে ঘুরে দেব-দর্শন, খুঁজে
খুঁজে সাধু-সঙ্গ—দীর্ঘ আরামে প্রায়
মাসখানেক ধরে কয়েকটা তীর্থ সেরে
বাড়ি-মুখে হয়েছি, হঠাৎ একটা লোভে
পড়ে যেতে হোল।

তখন আমরা উত্তরাখণ্ডের পাহাড়-
অঞ্চল থেকে সমতলে অনেকখানি নেমে
এসেছি। গাড়িতেই খবর পাওয়া গেল,
স্টেশন থেকে মাইল কুড়ি দূরে হঠাৎ
পাথর ফেটে এক দেবতার আবির্ভাব
হয়েছে, এতই জাগ্রত যে, দেশ-বিদেশ
থেকে দলে দলে লোক জড়ো হয়েছে,
কাউকে খালি হাতে ফিরে আসতে হচ্ছে
না। একটা রীতিমতো শহর বসে গেছে।

তখন আমরা ক্লান্ত, তার ওপর
পরস-কাড়ির ব্যাপারেও প্রায় রিক্ত হয়ে
এসেছি। কিন্তু মাসখানেক ধরে এই
করে করে তীর্থ-তীর্থ আর সাধু-
সম্মাসী বাইটা হাড়ে-হাড়ে গেছে ঢুকে।
মনে করলাম এমন প্রত্যক্ষ মাহাত্ম্য, এটাও
সেরেই নিই তাহলে।

বাই অবশ্য আমারই। গোবর্ধনকে
বলতে সে আর একটা তার উল্লেখ উপমা
বের করে বলল—“ইংরাজীতে শুনোছ
Last straw on the camel's back
(লাস্ট-স্ট্র অন্ দ্য ক্যামেল'স ব্যাক)
বলে একটা কথা আছে। মানেটা নাকি এই
যে, উটের পিঠে বোঝার পর বোঝা
চাপিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, শেষে
একগাছা খড় চাপাতেই পিঠটা মচাৎ করে
ভেঙে পড়ল। আমার কথা বাদ দিন,
আপনার আর বরদাস্ত হবে কি? পুণ্যের
সবই গুণ, শব্দ একটা দোষ, মেদ-মাংস-
রক্ত—এই সব বাজে জিনিস কমাতে
কমাতে শরীরটাকে এমন শুকিয়ে আনে
যে.....”

“কৈ, তেমন কিছু তো মনে হচ্ছে না
তোমায়! ভেতরে ভেতরে অসুস্থ বোধ
কর কি কোনরকম?”—একটু ভীত হয়েই
প্রশ্ন করলাম আমি।

পরের ছেলে সঙ্গে এনেছি, সব
ঝুঁকিটাও বেচারার ওপর দিয়েই গেছে
তো।

বলল—“ভুল করছেন দাদা। আমি
তো পুণ্য সঞ্চয় করতে আসিই-নি,
পশ্চিমের রাবিড়ি-মালাই সঞ্চয় করতে
এসেছিলাম। সেদিন হরিম্ভার স্টেশনে
মাল ওজন করবার যন্ত্রটার ওপর
শরীরটাকে তুলে দিয়ে দেখলাম কুড়ি
পাউন্ড অর্থাৎ এই এক মাসে তার সের
দশেক পুরে ফেলোছি ভেতরে।.....আমি
বলছি আপনার কথা.....”

“রোগা হয়ে গেছি খুব?”

“বললে তো বিশ্বাস করবেন না।
ঘর থেকে কোন পুণ্যার্থী গোড়াতেই
সেই যে আরিসিটা লোপাট করলে, আর
একটা কিনতেও তো দিলেন না, নৈলে
দেখিয়ে দিতে পারতাম সামনে ধরে.....”

“একবার হয়েই আসি চলো গোবর।”
—পিঠে হাত দিয়ে একটু হেসেই বললাম
আমি। বললাম—“বেশ তো, দেবতার
কাছে না হয় এগুলোই আবার চেয়ে
নোব, শুনছি কেউ-ই খালি হাতে ফিরছে
না। বলব—আমার সেই মেদ-মাংস-রক্ত,
যেমনকার তেমনি ফিরিয়ে দাও প্রভু।
কথাটা কি জান, এত দূর-দেশ থেকে এত
কষ্ট করে আসছে সবাই, আর আমরা
সামনে দিয়েই বোরিয়ে যাব, নেমে দু'পা
গিয়ে একটু দেখে আসব না, এর আপ-
শেষ জীবনে হয়তো কখনও যাবে না।
বিশেষ করে তুমি রয়েছ সঙ্গে, আমার
একটা মন্ত বড় সুবিধে। এমনটা আর
কবে হবে?”

তবু খানিকটা চেষ্টা করল। শেষে
বোধ হয় এই আশংকা করেই রাজি হোল
যে, আমি মনে করতে পারি ওকে সঙ্গে
এনেছিলাম বলেই আমার এত বড়
সুযোগটা হাত-ছাড়া হয়ে গেল।

সকাল আটটার সময় আমাদের
গাড়িটা স্টেশন থেকে যাত্রা সেখানে
এসে পৌঁছাল। আমরা নেমে পড়লাম।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ওর উপমাটাই
যেন হাতে-হাতে ফলে গেল।

স্টেশনেই একটা দোকানে কোন রকমে
স্নানাহার সেরে আমরা একটা শেরারের
টাঙ্গা করে যখন পৌঁছলাম, তখন
দিনের আর মাত্র ঘণ্টাখানেক অবশেষ
আছে। পাহাড়ের গোড়ায় একটা উঁচু-নীচু
মেঠো জায়গায় বোধ হয় হাজার পঞ্চাশেক
লোক জড়ো হয়েছে। বিশৃঙ্খল, অবি-
ন্যস্ত। যেন অকূল সাগরে পড়া গেল।
কোথায় পাথর ফাটিয়ে-ওঠা ঠাকুর, দোকান
পাট বা থাকবার জায়গা কোথাও থাকে

তো ভাই বা কোথায়, কিছুই বোঝা যায়
না; তার ওপর সামনে রাস্তা। এর ওপর,
আমার দিক থেকে এত লজ্জিত হয়ে
পড়েছি গোবর্ধনের কাছে যে, তাকে যে
একটা প্রশ্ন করব, একটা সলা-পরামর্শ
করব তার সঙ্গে, সেটুকুও পারছি না।
সঙ্গে একটা স্ট্রেকেস, দু'জনের সংক্ষিপ্ত
বোডিং, আর একটা বেতের ব্যাসকেট,
টুকিটাকিতে ভরা। টাঙা থেকে নামিয়ে
দিয়েছে, পায়ের কাছে রেখে চারিদিকে
কলোচ্ছ্বাসময় জনসমুদ্রের দিকে মাথা
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাঁ করে দেখছি।

গোবর্ধন অবশ্য মনোবলটা পুরো-
মাত্রায় রেখেছে। বলল—“দাদা, দাঁটি
দিয়ে সমুদ্র মেপে কোন ফল নেই এখন।
ভয়ই বেড়ে যাবে। আগনি চোখ দাঁটিকে
এই তিনটি মালের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে
থাকুন। বিছানাটার ওপর বসেই থাকুন
বরং, আরও কাছে কাছে থাকবে। আমি
একটু বোরিয়ে দেখি, সন্ধান নিই একটু।”

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এল।
বলল—“অবিশ্বাসীকেও বিশ্বাস করিয়ে
ছাড়লেন ঠাকুর, দাদা।”—নিশ্চয় আমার
ভরসা দেওয়ার জন্যই বলল গোবর্ধন—
“খালি হাতে ফেরালেন না। একটু শব্দ
রাগির কাটাবার জায়গা—আপাতত এই
হালকা প্রার্থনাটুকুই ঠোঁটে করে
বোরিয়েছিলাম—সদ্য ঘুম থেকে উঠেছেন,
মেলা চাপ দেওয়া ঠিক নয়তো—তা পাপ-
মুখে বলতে নেই—পথেই দেখা। আজ্ঞে
হ্যাঁ, দেবতাই বলব না তো অন্য কে?
নিতান্ত সাধারণ বেশেই আসছিলেন।
প্রশ্ন করলেন—রাত কাটাবার আশ্রয় চাই?
বললাম—সেই সন্ধানই বেড়াচ্ছি, দু'জন
আছি, তিনটে মাল। সঙ্গে নিয়ে গেলেন।
টানা ফুসের চালা, দু'দিক খোলা, মাঝে
মাঝে ফুসের বেড়ারই পার্টিশন দিয়ে
কয়েকটা খুবড়িতে ভাগ করা। খালি
একটি। বললেন আমাদের জন্যে আদেশ
পেয়েই ধরে রেখেছেন। এই ছোঁড়াটাকে
দিলেন মাল বয়ে-নিয়ে যেতে।”

প্রশ্ন করলাম—“ভাড়া?”

“বললেন—যেমন আদেশ হর
জানাবেন পরে।”

বললাম—“আগে ঠিক করেই ঢুকলে
যেন ভালো হতো।”

আমি মনোবলটা বেশ ধরে রাখতে
পারছি না। বললাম—“বেশ চলো তো
এখন। দেখা যাবে।”

চিড়ে-গুড়ে কিনে নিয়েছিল স্টেশনের

দোকানে। চিবিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে দেখলাম শুধু আমরাই দুজনে রয়েছি, স্ট্রাকেস আর বেতের ব্যাসেকটটা নিশিচ্ছ হয়ে অন্তর্ধান হয়েছে। আমাদের দুজনের মধ্যেও

গোবর্ধন তখন ঘুমিয়েই। কিছু শূঁকিয়ে দিয়েই থাকতে পারে, যার এই অপকর্ম, কিংবা হয়তো ভেতরে ভেতরে হারিয়েই ফেলেছে মনোবল গোবর্ধন, আজকের ব্যাপারের পর একেবারেই এলিয়ে অসাড়া হয়ে পড়েছিল।

উঠে দেখে-শুনে বলল—“ও ব্যাটার নিশ্চয় আরও জোর প্রার্থনা ছিল দাদা, যাতে শুদ্য হাতে না ফিরতে হয়। ঠাকুর দেবতাদেরও গেরো দেখুন না, কাকে মেরে কাকে রাখেন? যাক, আমি একটু সম্ভান নিই দাদা, আপনি এখানেই চুপ

সুপ্রিয়া চৌধুরীর সৌন্দর্যের গোপন কথা...

‘লাক্সের মধুর পরশ আত্মায় সুন্দর রাখে’

কীপসী সুপ্রিয়া চৌধুরীর স্নিগ্ধ রমণীয় রূপ, সবার মুগ্ধ দৃষ্টির জিজ্ঞাসা! আর বিস্ময়, কোমল লাক্সের মধুর পরশে তাঁর বিশ্বাস। লাক্স আপনার রূপেরও গোপন কথা হোক! লাক্স মাথুন... লাক্সের কুসুম কোমল ফেনার পরশে চেহারায় নতুন লাবণ্য আনবে! সুবাসভরা লাক্সের মধুর গন্ধ আপনার চমৎকার লাগবে! লাক্সের রামধনু রঙের বিচিত্র মেলা থেকে মনের মতো রঙ বেছে নিন। আপনার প্রিয় সাদাটিও পাবেন। লাবণ্যত্রীর জন্য লাক্স ব্যবহার করুন।

চিত্রতারকাদের বিস্ময়, কোমল
সৌন্দর্য-সাবান



সুপ্রিয়া চৌধুরী বলেন—‘সাবানটিও চমৎকার, আর রঙগুলোও কত সুন্দর!’

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী

করে বসে থাকুন ততক্ষণ; যেটা অন্ততঃ একটা উপকার করেছে, আর জিনিস-গুলোর দিকে একঠায় চেয়ে বসে থাকতে হবে না।”

মিনিট দশেক পরে ফিরে এল। বলল—“বেশি ঘোরাঘুরি করতে হোল না দাদা। এই চালারই ওদিককার একটা খুঁদারিতে পাওয়া গেল সম্ভান।”

“নিম্নে এলে না-বে?”—আশান্বিত হয়েই প্রশ্নটা করলাম, গোবর্ধন বলল—“বামালের নয় দাদা; এ গভীর সমুদ্রের অতল থেকে তাদের টেনে তুলবে এমন ডুবুরি তো আজও জন্মানি। আমি সম্ভান পেলাম—একদল লোক আছে যারা এই রকম সদ্য পুণ্য-লোটার ব্যাপারে লাগিয়ে দিয়েছে—নিজেদের—সেই গোড়াতেই আপনাকে বলেছিলাম না? এ-চালা সে ব্যাটার মোটেই নয়, কোন এক শেঠ বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, খালি পাও, থাকো। ও ব্যাটার, একটা খালি হলেই দৈবদেশ বলে আমাদের মতন শাসালো পুণ্যার্থীদের পুরে ফেলছে, তার পরের ইতিহাস এই দেখতেই পাচ্ছি।”

“আর আমি এর ওপর জোর করে ব্যাটাকে দুটো টাকা আগাম ভাড়া হিসেবে গাছিয়ে দিলাম-হে।”—নিতান্ত অনুরূপে কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল আমার।

গোবর্ধন বলল—“শাস্ত্রকারেরা এ সবেবও ব্যবস্থা করে গেছে দাদা; ব্যা মন খারাপ না করে আমি তো সেই পথই ধরি...”

“কী সেটা?”—প্রশ্ন করলাম আমি।

“বিধানটা হচ্ছে—উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। খইগুলো হাওয়ায় যখন উড়িয়েই নিয়ে যাচ্ছে তখন ঐ মন্ত্রটুকু বলে পুণ্যটা হাতিয়ে নিই না কেন? কথাটা হচ্ছে, এখন পুণ্যক্ষেত্রে আমার যা গেল সেটাকে দান করলাম ধরে নিলেই তো ক্ষতির জায়গায় লাভই থেকে যাচ্ছে হাতে। ও দুটো টাকা? নিকণে, দানের দক্ষিণে বলে ধরে নিলে আর খেদ থাকে না। দক্ষিণে না হলে পুরো ফল তো পাওয়া যায় না। ঠাকুরই বা সে খুঁদটুকু থাকতে দেবেন কেন?”

কথায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেও অবস্থা দ্রুত একেবারে সঙ্গীন হয়ে উঠল। পরস্য কাড়ি যৎসামান্য যা ছিল তা পকেটমারের ভয়ে সূটকেসেই। সদ্য খরচের জন্য গোটা দশ টাকা আর কিছু খুঁচরা গোবর্ধনের কাছে ছিল, তা থেকে টাঙা ভাড়ার আর আগাম বাড়ি ভাড়ার আট টাকা বেরিয়ে গেছে, বাকি পড়ে আছে দুটো টাকা আর ঐ খুঁচরা কটা। খাওয়ার জিনিস, অর্থাৎ খাওয়ার যোগ্য জিনিস একেবারেই নেই বাজারে। চিড়ি, চালভাজার মতো মড়ি, ছাতু আর মড়ি কিংবা চিড়ির মোয়া, ধূলা-বালির সঙ্গে মেশানো; তাও অশ্লীলমূল্য। আর এখানে একদমুও থাকার কথা আসে না, পাথর-

কাটা ঠাকুর দেখার শখ মাথায় উঠে গেছে, কিন্তু ফিরে যাওয়া যায়ই বা কি করে?

শেষে গোবর্ধনই এক বুদ্ধি বের করল। বলল—“ধূলা-পায়েই ফিরে যেতে হবে দাদা। আমাদের দর্শন দেওয়া ঠাকুরের ভাগ্যে নেই, কি করব? এখন উপায় তো এক পা-গাড়ি। তার চেয়ে আমি বলছিলাম—বিছানাগুলো বেচে দিই। যা ছিল ভরা-পেটের আরাম তা এখন খালি-পেটের বোকা বৈতো নয়। বিক্রমপুরে চলান করে দিলে হাতে কিছু আসবে। তাই থেকেই টাঙা-ভাড়া দিয়ে চেষ্টান পর্যন্ত তো পেঁছানো যাবেই, বাকি পথটাও এক রকম করে কাটিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়াও যাবে। কি বলেন?”

বিছানা—দুজনের দুটো রাগ (Rug), ওর পাতার জন্য একটা কম্বল আর চাদর, আমার একটা পাংলা তোষক আর সুজানী। আমারগুলো ছেড়ে দিতেই চাইছিল, আমি জিদ করতে আমার রাগ আর ওর চাদরটা ছেড়ে সব-গুলো জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল গোবর্ধন।

সেই ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

তার পর দুটো দিন যে ছিলাম, যেন একটা দৃশ্যবর্ণনের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। মনি-ব্যাগটা আমার কাছেই রেখে গিয়েছিল—সেই দুটো টাকা, খুঁচরা আর আর দুজনের টিকিট—এটে পকেটে করে, কাঁধে সুজানী আর রাগটা নিয়ে সমস্ত দিন-রাত্র খুঁজে বেরিয়েছি ওকে। একটা পুলিশের আঙা হয়েছে। খবর দিয়েছি, কোন সম্ভান পাইনি। ওরই ওপর নির্ভর করে করে ওর অবর্তমানে যেন হাল-ভাঙা নৌকার মতো অসহায় হয়ে পড়েছি। ওকে। ছেড়ে বাড়িই বা ফিরে যাব কোন-মুখে?

শুকনো চিড়ে সম্বল করছি। তাতেও শ্বিতীয় দিনে মাত্র সেই খুঁচরা কটা সম্বল রইল। বুদ্ধিতে কিছুই কুলুচ্ছে না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পরিণাম বিঘোরে মৃত্যু। কিংবা তার চেয়েও বেশি কিছু অদৃষ্টে আছে নাকি—ভিক্ষা?

যাই থাক, গোবর্ধনকে ছেড়ে যাওয়া যাবে না—জিদ ধরে গেছে একটা। এক দিক দিয়ে নিরুপায়ও; শ্বিতীয় দিন মাঝরাত্রে টিকিটের মোয়াদও যাচ্ছে ফুরিয়ে।

একেবারে চরম অবস্থার মধ্যে সম্ভান সময় একটা কথা মনে হোল—হাতে তখনও একটা টাকা আর গন্ডা পাঁচেক পরস্য আছে। স্থির করলাম—চেষ্টানে চলে যাব, অবশ্য হেঁটেই, যে অবস্থায় যখন পেঁছাই। দুটো চেষ্টান পরেই শহর: বাঙালী আছে, তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ি। বিদেশে বিপন্ন স্বজাতি, একটা

কিছু উপায় হবেই। গোবর্ধনকে ওপর করা পর্যন্ত।

আর শ্বিত্য না করে বেরিয়ে পড়লাম।

তারপর, গোড়াতেই যেমন বলছি, কাজ দিল দেব-শ্বিজ-সন্ন্যাসীতে সেই অটুট-বিশ্বাস, যা, হয়তো মোচড় খেয়ে আসছিল খানিকটা, কিন্তু একেবারেই ভেঙে পড়েনি।

মেলা ছেড়ে বেশ খানিকটা বেরিয়ে এসেছি; ভিড় পাংলা হয়ে এসেছে, পেছন থেকেই একটি লোক পাশে এসে সঙ্গ নিল। একটু চাপা গলাতেই প্রশ্ন—“আপনি ফিরেই যাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত?”

চকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম প্রশ্নের ধরনে। লোকটা কালো, মাঝ বয়সী, বড় বড় কটসে দাড়ি-চুল। কোনও সন্ন্যাসীর চেলা-টেলা বকোই মনে হয়।

নিরুত্তরই রয়েছি। বলল—“বাবা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।”

“বাবাটা কে?—প্রশ্ন করলাম আমি। কথাবার্তা চলছে ওর ভাঙা বাংলায়, আমার ভাঙা হিন্দীতে।

“দর্শী বাবা।”

“ঐ নতুন ঠাকুরের নাম হয়েছে?”

“না, সন্ন্যাসী। ওর হয়েছে কাজ করছেন বলতে পারেন। এই মেলায় প্রত্যেকটি লোককে দেখতে পাচ্ছেন বলে ‘দর্শী বাবা’ নাম পড়েছে, আমায় পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে।”

“জানেন আমার কথা সব?”

“প্রত্যেকটি ব্যাপার তাঁর নখ-দর্পণে। এখনও এখানে পুলিশের ব্যবস্থা ঠিক মতো হয়নি, ভুলশিষ্টারও তেমন এসে পড়েনি, সামলে দিচ্ছেন। ওদের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেলেই হিমালয়ে উঠে যাবেন।”

বিস্ময়ে কুল পাচ্ছি না, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। প্রশ্ন করলাম—“কি জানেন আমার সম্বন্ধে?”

“তা আমায় বিশেষ কিছু বলেননি। সব কথা বলেন নাও তো। তবে পাছে আপনি বিশ্বাস না করেন, তাই আপনার নামটা শুধু আমায় বলে দিয়েছেন, আর কোথায় বাড়ি।”

নাম আর শহরের নাম দুটিই বলল।

আর দু’একটা প্রশ্ন করা যেত। কিন্তু সন্ন্যাসী নিয়ে ব্যাপার, অবিশ্বাসের আঁচ পেলে চলে যেতে পারেন ভেবে আর ইতস্ততঃ করলাম না, বললাম—বেশ চলুন; কতদূর?”

মেলা থেকে খানিকটা সরে একটা পাথরের টিলা, তার এক পাশে একটা অগভীর গুহার মতো। সন্ন্যাসী পদ্মসনে বসে আছেন তার মধ্যে। সতাই দেখলে আপনিই কোথা হতে যেন ভক্তি আর ভরসা এসে পড়ে। পিণ্ডাল জটা-কেশ-

দাড়িতে সমস্ত মুখমণ্ডল আর দেহ প্রায় অবলুপ্ত, পরগে একটি সংক্ষিপ্ত কৌপীন। জায়গাটা পরিষ্কার, বনবাদাড় নেই। স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গিয়ে আরও যেন আশ্চর্য মনে হচ্ছে। বাইরের চাতাল ঘিরে কিছু দর্শনাথী বসে রয়েছে। একটি ধূনি জ্বলছে। পাশে একটা রেকাবিতে বেশ কিছু দর্শনী পড়েছে। একটা আস্ত কলাগাতে ফলমূল।

সঙ্গী আমার আগেই বলে দিয়েছিল প্রণাম করে অপেক্ষা করতে। পৌঁছালে ভেতরে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করে এসে আমার জানকল-বসতে আদেশ হয়েছে। আমার ব্যবস্থাটা একটু জটীল, সব শেষে হবে।

বেশ রাত হয়ে গেল। যার জন্য যা বিধান, একে একে নিয়ে সবাই উঠে যেতে লাগল। ঐ পন্ডিত; লোকটি যায়, শূনে এসে বলে, কপালে একটা ধূনির ছাইয়ের টিপ দেয়, জয় দর্শী বাবা!—বলে চলে যায় সবাই। সত্য কথা বলতে কি, যতই পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল, গাটা ছমছম করতে লাগল। বুদ্ধলাম সেটা জায়গাটার গাম্ভীর্য এবং নিজস্বতার জন্যই কেন না ওরই সঙ্গে সেই বিশ্বাসটি কিভাবে জানি না আরও দৃঢ় হয়ে আসছে যে সব ঠিক হয়ে যাবেই।

যখন আর কেউই বাকি নেই, রাত প্রায় দশটা হবে, গোবর্ধন গোঁফ-দাড়ি-জুটা সব এক এক টানে খুলে ফেলে পেছন থেকে কাপড়টা টেনে নিয়ে জড়াতে জড়াতে বেরিয়ে এল। বলল—“দাদা, সব বলাছি, আগে এগুলো সব বদলে নিই একটু।”

অবাক হয়ে গেল। প্রণামী গুলো তুলে নিল গোবর্ধন। ফলমূলের কিছু ঐ লোকটাই একটা গামছা বেঁধে দিল, বাকি গুলো নিজেই সংগ্রহ করে নিলে, গোবর্ধন তাকে প্রণামী থেকে একমুঠা নোট দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বলল—“যাও বেটা, মস্ত রহো।”

লোকটা পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল।

গোবর্ধন বলল—“একটা খালি টাঙ্গাই খরি দাদা; ভ্যাজাল বড়ো না। দুদিনে প্রায় তিনপায় টাকা কয়েক আনা হয়েছে, চলে যাবে।”

স্টেশনের পথে যেতে যেতে ব্যাপারটা সব বলল। কন্বল চাদর বেচতে গিয়ে একেবারে পুন্ডিসের হাতে। চোরাই মাল বেচার ধুম পড়ে গেছে, ওরাও তর্কে তর্কে রয়েছে। রাগ, কন্বল, সুজনী তিনটে পুন্ডিসকে ঘুষ দিয়ে কি করবে ভাবছে, এই লোকটার সঙ্গে দেখা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, পুন্ডিসের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে ওই একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে মতলবটা দিলে। ওস্তাদ লোক—মেলাতে মেলাতে ঘুরে বেড়ানই পেশা,

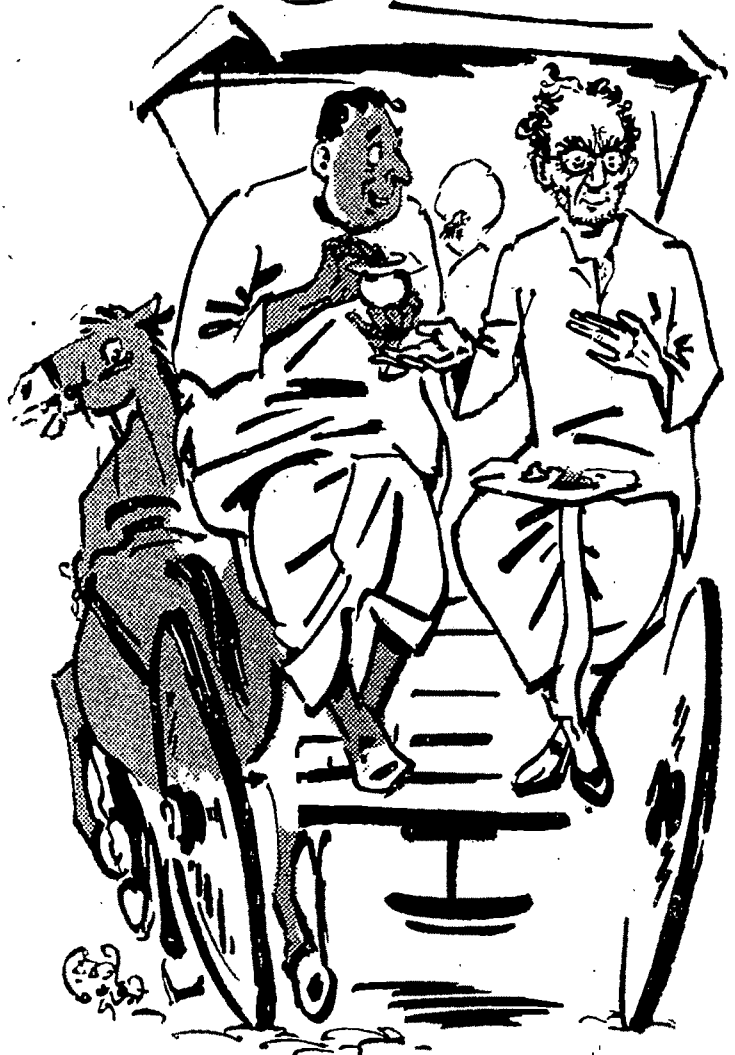
ঘাঁৎ-ঘোঁৎ সব জানে। ঠিক লোককে ধরে, টেনে আনে। অধাআধি বখরা। সবিস্তারেই সব বলে যাচ্ছে গোবর্ধন। আমার কতকগুলো ফল বের করে দিয়েছে, খেয়ে যাচ্ছে। একটা ছোট-রাবাড়ির ভাঁড়ও ছিল, এগিয়ে দিয়ে বলল—“ধরুন দাদা। এই রাবাড়ি মালাইয়েরই জয় জয়কার। চেহারাটা দেখেই পছন্দ হয়েছে তো ব্যাটার।”

ক্ষুধার জ্বালা, তার ওপর সদ্য চোখের সামনে যা ঘটল তাতে মনটাও অসাড় হয়ে গেছে, অনামনস্ক হয়েই ফলগুলো চিবিয়ে যাচ্ছিলাম, রাবাড়ির কথাটার যেন একটা

হতভগা গোবরার বিশ্বাস না থাকলেও প্রায়শ্চিত্তে আছে বলেই তো কাটিয়ে যাচ্ছে কোন রকমে। নয়তো শাস্তকে যে মিথ্যা বলা হয়, সে অপরাধের তো আবার প্রায়শ্চিত্তও নেই!... আরও একটা কথা দাদা।”

বলল,ম—“কি বলো।”

“বাড়ি থেকে একান্তই সাধুভাবে অর্জন করা টাকাকাড়ি, জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে এসে তীর্থে বিলিয়ে এই রকম অকূল পাথারে পড়ার চেয়ে, অসাধু উপায়ে সেখানে কিছু, হাতিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া ভালো নয় কি?”



“দাদা তোমার রাবাড়ির ভাঁড় গোবর্ধন.....”

ধাক্কা খেয়ে সাড়াটা ফিরে এল। হাতটা টেনে নিয়ে অনুতপ্ত কণ্ঠেই বললাম—“শেষে আমাদের এই প্রতারণার আশ্রয় নিতে হোল গোবর...তীর্থক্ষেত্রে?”

একটু চুপ করেই রইল। তারপর বলল—“আপনার সঙ্গে তর্ক করব সে আপ্পর্খি নেই। তবে দেবতা-সন্ন্যাসীতে

—অবিশ্য শখ করে নয়, আপ্পর্খম হিসেবেই—এই রকম অবস্থায় পড়ে...”

—আপেলটা বড় মিষ্ট। কোথা থেকে একটা হাসিও এসে গুড়গুড়িয়ে উঠছে পেটে। হাতটা বাড়িয়ে বললাম—“দাদা তোমার রাবাড়ির ভাঁড় গোবর্ধন, দেখি না হয় কি রকম।”

॥ চায়ের ধোঁয়া প্রসঙ্গে ॥

মাননীয় সম্পাদক, অমৃত

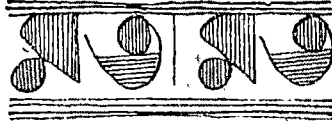
সমীপেষু,

আপনার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত উৎপল দত্তের 'চায়ের ধোঁয়া' নামক ধারাবাহিক রম্য-রচনা (না প্রবন্ধ?) পাঠ করছি এবং এ বিষয়ে আমার বক্তব্য সবিনয়ে নিবেদন করছি।

প্রথমেই শ্রীযুক্ত দত্তের লেখার রীতির কথা বলতে হয়। কারণ আমি বন্ধুত্বই পার্যছি না চায়ের ধোঁয়াকে গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ না লঘু রম্য-রচনা হিসাবে গ্রহণ করব। প্রবন্ধ সাধারণত প্রবন্ধকার উপস্থাপিত বক্তব্য বা মতামতের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যুক্তিসহ সেই মতামত পেশ করে থাকেন। রম্য-রচনায় 'সে দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম। কারণ রম্য রচনা, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, পাঠককে পূর্বাহে সাবধান করে দেয়। রচনার বিষয়বস্তুও হয় হালকা। কিন্তু চায়ের ধোঁয়াতে শ্রীযুক্ত দত্ত গুরুতর বিষয় নিয়ে যেমন হালকাভাবে আলোচনা করছেন তাতে বিষয়বস্তু গুরুতরভাবেই জখম হচ্ছে বলে আমার ধারণা। শ্রীযুক্ত দত্ত তাঁর পরিচালক বা নাট্যকার ইত্যাদি পাত্রের মুখে বহু তর্ক-সংকুল মতামত বিনা প্রমাণ-প্রয়োগ সহ জুগিয়ে দিচ্ছেন। অথচ সেই উক্তির দায়িত্ব কার? রচনার পাত্রের না লেখকের? বোঝা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত দত্ত মনের আড়ালে থেকে বাণ ছোঁড়ার সুচতুর পদ্ধতিই বেছে নিয়েছেন। অথচ সেই বাণের জন্য শ্রীযুক্ত দত্তকে প্রত্যক্ষ-ভাবে দায়ী করা মুসকিল।

বহু উক্তির মধ্যে আমি একটিকে বিচারের জন্য বেছে নিচ্ছি। ৩৭ সংখ্যা অমৃত চায়ের ধোঁয়ার নাট্যকার পাঠকদের জানাচ্ছেন, বাংলা সাহিত্যে তৃতীয় শ্রেণীর গল্প-কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং অধিকাংশ নাটকও হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর। সুতরাং আফশেষের কারণ নেই। নাট্যকার আরও জানালেন বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস কবিতা যদি কেউ লিখে থাকেন তবে তাঁরা হলেন বনফুল ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই হোক আমার বিশ্বাস এই যে, নাট্যকার এবং পরোক্ষে শ্রীযুক্ত দত্ত কোন বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, অধুনা বাংলা সাহিত্যের গল্প, কবিতা তৃতীয় শ্রেণীর? আমরা ত জানি বাংলার সাম্প্রতিক গল্প, কবিতা শিক্ষণ হিসেবে উন্নত। আমাদের এই ধারণা, শ্রীযুক্ত দত্তের মতে ভ্রান্ত ধারণা, নিরসন করার মত কোন যুক্তি নাট্যকার, তথা শ্রীযুক্ত দত্ত দিলেন না। শ্রীযুক্ত দত্ত কি আশা করেন তাঁর নাট্যকারের এই উক্তিকে আন্তবাক্য হিসাবে পাঠক সমাজ গ্রহণ করবে? শ্রীযুক্ত দত্ত আধুনিক সমাজের বাসিন্দা বলে এ কথা অন্তত তর্কের খাতিরে স্বীকার করবেন



যে, ব্যক্তিগত রুচি থাকা ভাল এবং তা ব্যক্তির লক্ষণ। কিন্তু ব্যক্তিগত রুচির স্বেচ্ছাচার অকল্যাণকর এবং দায়িত্বজ্ঞান-হীনতা।

আমি বিশ্বাস করি যে, বনফুল এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যে কীর্তিমান লেখক। আমার এই বিশ্বাসকে যুক্তিবদ্ধ ভাবে উপস্থাপিত করতেও প্রস্তুত। কিন্তু সাহিত্য বিচারের কোন নিরীখে প্রবীণ সাহিত্যিক যথা তারাসংস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বদাশংকর রায় বা তরুণ সাহিত্যিক সমরেশ বসু ইত্যাদির নাম উল্লেখের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে? আমি কেন বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে নাট্যকার তথা শ্রীযুক্ত দত্তের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে পারি যে, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ কবিদের কোন দান নেই? যে কোন মতাবলম্বী সাহিত্যের সং পাঠকমাত্রই নাট্যকার তথা শ্রীযুক্ত দত্তের এই চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি লজ্জা বোধ করবেন এবং হয়ত এ কথাও ভারতে পারেন যে, চায়ের মত নিরাপদ ধোঁয়ায় ঘোরে এত বড় বিপজ্জনক উক্তি করা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত দত্ত আধুনিক প্রয়োগকর্তা হিসাবে খ্যাত। তাঁর নাটকে যন্ত্রের দৌরাণ্য দর্শকদের বিহ্বল করে। বিশ শতকের একটি উদ্ভাবনকে অন্তত শ্রীযুক্ত দত্ত মধ্যে বিরাট স্থান দিয়ে থাকেন। তাই আশা করা গিয়েছিল যে, শ্রীযুক্ত দত্ত আধুনিকতাকে সামগ্রিক হিসাবে এবং জীবনের প্রতি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে স্বীকার করেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আমার ধারণা ভুল। তিনি শুধু প্রয়োগকর্তা হিসাবে আধুনিক। কিন্তু সাহিত্য-রসিক হিসাবে গ্রিশের যুগের ভাবনা-রীতির কাছে বিকৃত। তাই যে যুগে তিনি মানুষ হয়েছেন সংস্কারবশে সেই যুগকেই তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু সেই যুগকে অতিক্রম করে সাহিত্যের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে, এবং যা শ্রীযুক্ত দত্তের বিরূপতা সত্ত্বেও হতে থাকবে, তার প্রতি তিনি উদাসীন। আমার এই উক্তির প্রমাণ তাঁর রচিত নাটক-নাট্যকার লিখন-ভাণ্ড ও চরিত্র-সৃষ্টি থেকে উদ্ভূত করতে পারি। কিন্তু সে পরিসর হয়ত আমার নেই এবং বর্তমান পত্রটির পটভূমিতে তা অপ্রাসঙ্গিক।

আমি শ্রীযুক্ত দত্তকে এই অনুরোধ জানাবো যে, নাট্য-সাহিত্যের নিম্নমানের সাফাই গইতে গিয়ে সাহিত্যের অপরাপর উন্নত শাখা ও তার কীর্তিমান

সাহিত্যিকদের হেয় করা রুচি-বিরুদ্ধ। তিনি যে সব মতামত উপস্থাপ্ত করছেন তার পিছনে কোন যুক্তির অবতারণা তিনি করছেন না এবং এই কলাপাহাড়ী রচনা পদ্ধতি বিরক্তিকর। বিনীত

অমরনাথ কর
রাউরকেলা

মাননীয় 'অমৃত' সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু,

মহাশয়,

উৎপল দত্ত মহাশয় 'চায়ের ধোঁয়া'র মাধ্যমে অঙ্গারের 'জল', সেতুর 'ট্রেন', ফেরারী ফোজের 'আগুন' প্রভৃতির পক্ষে অত্যন্ত কৌশল সহকারে তাঁর জোরালো যুক্তি উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু স্বয়ং তাপস সেন মহাশয় এক কথায় তাঁর সকল যুক্তি নস্যাক্ত করে 'হাটে হাট্ট ভেঙে' দিয়েছেন। গত ৩৪শ সংখ্যা (২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬১) 'অমৃত'-তে তাপস সেন লিখিত 'অভিনয়ে—আঙ্গুর' থেকে—“কিন্তু সমগ্র অভিনয় যার দ্বারা নির্দেশিত, নিয়ন্ত্রিত..... তিনি সত্যিই যখন বলেন, এইখানটায় একটা খুব বড়ো রকম চমক না দিলে আমি নাটককে ধরে রেখে দিতে পারব না, তখন আমাদের মাথায় হাতুড়ী মেরে চমকের বস্তু আবিষ্কার করা ছাড়া গতান্বর্ত থাকে না।” তাপসবাবুর এই সহজ সরল স্বীকারোক্তির মধ্যে 'ট্রেন', 'আগুন', 'জল' প্রভৃতির যেন একটা সুন্দর মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ফেরারী ফোজ বেশ কিছুদিন ধরে নাট্যকর্মীদের পরে শেষ দৃশ্যে উক্ত 'আগুন'—দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'কলাবিদ্যা' থেকে হুবহু কয়েকটি লাইন : “যেখানে পণ্যের হাট সেখানে বাণিজ্য-লক্ষ্যীর হাতে সৌন্দর্য-লক্ষ্যীর, কলের হাতে কলার অপমান বর্তমান 'যুগের ললাটে লেখা আছে।”

'নবনাট্য আন্দোলন' কথাটি ইদানিং প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। উৎপলবাবুর 'চায়ের ধোঁয়া'তেও প্রচুর ব্যবহৃত। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে যুগের প্রভাবে তার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সর্বকালে সর্ববিষয়েই উন্নতির চেষ্টা চলছে। কোথাও উন্নতি হচ্ছে না, কে'থা-ও হচ্ছে। যেখানে উন্নতি হচ্ছে না সেখানে আজ না হলেও আগামী কালে তা হবেই। আবার আজ যা নতুন বলে মনে হচ্ছে, আগামীকাল তা অবশ্যম্ভাবী ভাবেই পুরনো হতে বাধ্য। আর এই সহজ-সরল চিরন্তন সত্যটি যদি সর্বজন স্বীকৃত হয়, তাহলে 'নবনাট্য আন্দোলন' এই কথাটির প্রকৃত কোনো অর্থই বোধ হয় থাকে না।

নমস্কারান্তে,
ইতি

শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার
কলিকাতা-৪।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধ কুমার মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ১৩ ॥

ছোটবেলায় আমরা আলোচনা করতুম, কোনটা কোন দেশের জন্তু! রুশ হল শ্বেতভল্লুক, ইংরেজ হল সিংহ, জার্মানী ইগল, কিন্তু চীনের ওই জন্তু ড্রাগন—ওটাকে চিনতে পারতুম না! ওটা না সিংহ, না বাঘ, না ভালুক। কিন্তু ওটার দংষ্ট্রা, ওটার থাবা, ওটার স্বাস্থ্য এবং সাংঘাতিক চক্ষু দেখে আমিই আবালা। জাপানের প্রতীক ছিল বোধ হয় ‘সুৰ্যোদয়’। এই ‘সুৰ্যোদয়’ দেখে একদা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুশভল্লুক পালিয়েছিল ‘রুশ-জাপান রণ-ক্ষেত্র’ থেকে। খরগোসের ভয়ে হিংস্র ভালুক পালল! ক্ষুদ্র জাপানের কাছে রুশ সম্রাট নিকোলাসের এত বড় পরাজয় এবং অপমান বর্তমান শতাব্দীতে আর ঘটেনি। ‘রুশ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস’ নামক বইটি বড় আনন্দে বাল্যকালে পড়ে-ছিলুম।

কিন্তু তারপর রাশিয়ার কি কি ঘটনা ঘটল, আর জানিনে। আমরা তখন ব্রিটিশ সিংহের থাবার তলায়, এবং তার কেশরজালে আবদ্ধ। তার গর্জনে ধরাতল কম্পমান। মানচিত্র খুললেই দেখা যায়, পৃথিবীর বহু দেশ ছোপ-ছোপ লাল রঙে রঙীন, এবং ইস্কুলে আমাদের শেখানো হতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না! সেই ‘ব্রিটিশ’ ছিলেন রুশ-সম্রাট জার নিকোলাসের বন্ধু; এবং কি একটা বৈবাহিক সূত্রেও আবদ্ধ। ফলে, আমাদের বাল্যকালে পাঠ্যপুস্তকে এক সময়ে নিকোলাসের স্তবগান পাঠ করে পরীক্ষা দিতে হত। আমাদের মিশনারী স্কুলের খৃষ্টান হেডমাস্টার লিখিত ‘ভারতে ইংরেজ শাসন’ নামক একটি বাংলা চিঠি বই এবং এন-এন-মোষের “England's work in India”—এ দুখানি বই মুখস্থ না করলে কেউ প্রমোশন পেতনা। কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসের ফটকের দুই পারে দুটি ক’রে ‘সিংহমূর্তি’ একদা দাঁড়িয়ে থাকত। সেই সিংহমূর্তি যে লোহার তৈরী, এতকাল ধরে জানতুম না। তাদের ভাংগা টুকরো-

গুলি এই সৈদিনও ফটকের পাশে পড়ে-ছিল। সেই লোহা বোধ হয় দুর্গাপুরের ‘ব্রাশ্চ ফারনেসে’ গলে গেছে।

ওদিকে জার নিকোলাসের রুশ সাম্রাজ্যে ‘পরাজিত’ দেশবাসীর খবর আর পাওয়া যায়নি। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-জাতি জারের বিরুদ্ধে যে দেশজোড়া বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল, এর আনুপূর্বিক সংবাদ ইংরেজ আমাদের কাছে চেপে গিয়েছে সম্বন্ধে। বলা বাহুল্য, সেইটিই বর্তমান শতাব্দীর প্রথম রুশ-বিপ্লব। সেটি সাফল্য লাভ করেনি, কিন্তু সাধক হয়েছিল! রুশসম্রাট নিকলসের নির্যাতন এবং প্রচণ্ড উৎপীড়নের দ্বারা সেই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। এই সময়ে বাংলায় এবং মহারাষ্ট্রে বিপ্লব-বাদের অভ্যুত্থান ঘটে। এখন দেখতে পাচ্ছি বাঙালীর সেই বোমার আওয়াজে প্রাচ্যের বহু দেশের টনক নড়ে যায়, আফ্রিকা কেঁপে ওঠে, এবং ‘অহিফেন-সেবী’ চীনেরও তন্দ্রা ছোটে। ওদিকে রাশিয়ায় জগৎপ্রসিদ্ধ সাহিত্যস্রষ্টা ম্যাক্সিম গোর্কি প্রমুখ বহু বিপ্লববাদী নেতা কারাগারে অবরুদ্ধ হন। কিন্তু রুশবিপ্লববাদের সেইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেনি। আমাদের দেশের কংগ্রেসের ছোট ছোট ‘মণ্ডল’ কর্মীদের মতো অসংখ্য ক্লাব এবং কমিটি রাশিয়ার বহু অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এদের বাইরের পরিচয় ছিল সমাজ-সেবা ও গ্রামোন্নয়ন, ভিতরের কাজ ছিল বিপ্লববাদের প্রচার এবং রিভলভার ও পিস্তল সংগ্রহ। এই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল, “সোভিয়েট”, অর্থাৎ ক্লাব। বাংলায় যাকে বলা হয় ‘আড্ডা’। লেনিন ট্রটস্কি, কালিনিন প্রভৃতিরা ছিলেন সেই ‘আড্ডাবাজ’, এবং এঁদের সাক্ষরিত গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন বোধ হয় মলেটভ, কাগানোভিচ, ভেরোসিলভ, স্টালিন ইত্যাদি কর্মীরা। তফাৎ আমাদের সঙ্গে শুধু এই, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের পর গান্ধীজীর শিষ্যদের মধ্যে গুলী মারামারি হয়নি এবং ক্ষমতা লাভের জন্য দেশজোড়া গৃহযুদ্ধও চলেনি। আমাদের উপরতলায় ক’রো ক’রো মধ্যে মনোমালিন্য যে

ঘটেনি তা নয়, কিন্তু সেটি এত সংঘত, শান্ত এবং ভদ্র যে, দু’নিয়ার কোথাও আমরা ধিকৃত বা হাস্যাস্পদ হয়ে উঠিনি।

লেনিনগ্রাডে এসে পেঁছে চারিদিক তাকাচ্ছিলাম। আমরা পৃথিবীর উত্তরতম প্রান্তের কাছাকাছি এসে পেঁছেছি। অক্টোবরের শেষ। কেন জানিনে মস্কোর মতো এখানে আজও বরফ পড়েনি। দু’র অতীতের এক অক্টোবরের ঠিক এই সপ্তাহে এবং ঠিক এইখানে রুশবিপ্লব সংঘটিত হয়! ইংরেজি পাঁজি উলটিয়ে সেই তারিখটি দেওয়া হয় ‘এই নভেম্বর!’ তখন এই নগরটি ছিল রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানী, নাম ছিল পেট্রোগ্রাড। পেট্রোগ্রাড নামটি দেওয়া হয়েছিল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র দশ বছরের জন্য। সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে শুনলাম, ‘পিটার দি গ্রেটের’ নামানুসারে এর নাম হয়নি। একজন প্রসিদ্ধ ধর্মযাজকের নামানুসারে এই নগরের নাম ছিল ‘সেন্ট পিটার্সবার্গ!’ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর এই মহানগরের নামটি পুনরায় বদল করে নাম রাখা হয়, ‘লেনিনগ্রাড’।

উত্তর মেরু লোকের যে গোলক, তার ধারেই পড়ে লেনিনগ্রাড। ‘নেভা’ নদীর দুই পারে এই শহর। কিন্তু এই খাঁটি ইউরোপীয় এবং শান্তিময় বিরাট শহরটির সর্বত্র জলাশয়মণ্ডিত। সেই কারণে ভ্রমণকালে প্রায় প্রতি পথেই একটি ক’রে সুন্দর সাঁকো অতিক্রম করতে হয়। সমগ্র নগরীর চারিদিকে একটি সুস্পষ্ট আভিজাত্যিক প্রকাশ পাওয়া যায়, যেটি উদার গান্ধীর্ষ এবং প্রশান্তিতে সমাসীন। জার আমলের প্রবল উৎপীড়ন এবং অকথ্য অনাচারের কাহিনী কানে শুনছি এবং বইতে পড়ছি, কিন্তু চোখে দেখিনি। চোখে যা দেখছি তা হল জার আমলের আশ্চর্য উন্নত রুচি, একেকটি কীর্তি-রচনায় সেই যুগের কালজয়ী প্রতিভা, সৌন্দর্যসৃষ্টির বিস্ময়কর শিক্ষকলা বোধ। রাশিয়ার যা কিছু শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, শ্রেষ্ঠ কীর্তি, শ্রেষ্ঠ চারুশিল্প, শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য

ও কাব্য,—একটি জাতির পক্ষে যা কিছুর শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তার আগাগোড়া জারের আমলের। সোভিয়েট আমলে এসেছে জাতীয় শিল্প-বিজ্ঞান এবং তার উন্নতি। দেশের সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে সোভিয়েট আমলে। জারের আমলে এই দেশব্যাপী বিপুল সমৃদ্ধি ছিলনা, কিন্তু রুচিবোধ এবং রসবোধ যেটি ছিল, ঠিক সেটি একালে নেই। আমি সর্বাপেক্ষা আনন্দ বোধ করছিলাম এইটি লক্ষ্য করে যে, জারের প্রতি অসীম যুগা সঙ্গেও জার আমলের প্রত্যেকটি কীর্তি অপরিণামী যন্ত্রে অশেষ গৌরবের সঙ্গে সোভিয়েট কতৃপক্ষ রক্ষা করে আসছেন। জনৈক রুশবন্ধু বলেছিলেন, “আমাদের বিপ্লবে প্রকৃতপক্ষে পঁচিশ জনের বেশি লোকের মৃত্যু হয়নি; একটি-মাত্র গোলা ছোঁড়া হয়েছিল রাজপ্রাসাদের ওপর; এবং সারাদেশের তুচ্ছতম সামগ্রীটিও বিনষ্ট হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সোসালিস্ট গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শান্তিপূর্ণভাবে।”

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর শেষ পাদে রাশিয়ায় শ্বিতীয়বার গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু সেটি পুনরায় দলিত ও মথিত হয়। তবে তার ফলাফল এই দাঁড়ায়, জার সিংহাসন ত্যাগ করে ‘একটারিনবার্গ’ দুর্গে আশ্রয় নেন এবং ‘জাতীয়তাবাদী নেতা’ কেরেনস্কি রুশ-সাম্রাজ্যের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। আমাদের বাঙ্গলা দেশে সেই বছরে ‘হোম রুল’ আন্দোলনের কালে যেমন সহস্র প্রকার বিরোধের মধ্যে জাতীয়তাবাদী স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজ চক্রান্তে পড়ে বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করেন, ঠিক তেমনি কেরেনস্কির অবস্থা ঘটে। বলশেভিক, মেন্শেভিক, সোস্যাল রিভল্যুশনারিজ প্রভৃতি কোনও দলকে বাগ মানাতে তিনি অসমর্থ হন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ প্রান্ত। রুশসম্রাট তখন মিত্রশক্তির দলে। কিন্তু সেই অর্থ-হীন সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য রুশ সৈন্যদেরকে ডাক দেন রুশ-বিপ্লবের মন্ত্রগুরু, লেনিন।—তখন কেরেনস্কির তাঁবে ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সর্বাপেক্ষা নির্মম বৃহৎ কসাক সৈন্যদল। তারা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বের বেরে বসে। এই বিপর্যয় ও দুর্ভোগের দিনগুলিতে লেনিনের রাজনীতিজ্ঞান, তাঁর নেতৃত্ব-প্রতিভা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আত্মপ্রত্যয়, এবং অবিচল ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। তিনি আকস্মিকভাবে সম্রাটের প্রাসাদ আক্রমণ করেন, এবং সেখান থেকে

মিঃ কেরেনস্কি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হন, বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি! তাঁর এই বিনা নোটিশে পলায়নের পরে কসাক সৈন্যরা অতিশয় রুদ্ধ হয় এবং লেনিনের নজাটি সাফল্যলাভ করে। অতঃপর সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার পরে সপরিবারে জারকে হত্যা করা হয় একটি পরোয়ানাবলে। তাঁদেরকে একে একে গুলী করে একটারিনবার্গ দুর্গের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে তাঁদের শবগুলিকে দাহ করা হয়। জারতন্ত্রের উচ্ছেদ, সম্রাট-গোষ্ঠির এই ভয়াবহ মৃত্যু, রুশসাম্রাজ্যের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিগণের একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারলোপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য এবং নব-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর চৌদ্দটি জাতি আপন-আপন দলবল, সৈন্য, স্বেচ্ছাসেবক, অস্ত্রশস্ত্র এবং পুর্লিখ ও গোয়েন্দা-বাহিনী নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এদের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘হোয়াইট গার্ডস’, এবং জাতীয়তাবাদীদের নাম দেওয়া হয়েছিল, ‘রেড গার্ডস’। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে প্রথম তিন বৎসরকাল সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে মহাপ্রলয়ের ঝড় বইতে থাকে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, গৃহ-শত্রুর সর্বব্যাপী তান্ডব, অরজকতা, অনিশ্চয়তা, মহামারি, অম্মাভাব, দুর্ভিক্ষ, জনসাধারণের পাশব প্রবৃত্তি, শৃঙ্খলমূলক উদ্দামতা—এগুলি অব্যাহত চলতে থাকে। এই মহাপ্রলয়ের ফলে ৭০ লক্ষ নরনারী ও বালক-বালিকা প্রাণ হারায় এবং কোটি কোটি নরনারী ভিখারী ও সর্বহারাদলে পরিণত হয়। পরবর্তী আরও ৭ বছর অবাধ সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষতবিক্ষত ছিল, কেননা ঘরের শত্রু বিভীষণ ছিল লক্ষ লক্ষ! এই অবস্থার অনেকটা সূরাহা যখন হয় সেই সময় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে লেনিন মারা যান। মৃত্যুর ছয় বছর আগে কাপলান নামক একটি মেয়ের অতর্কিত গুলীতে তিনি আহত হয়েছিলেন। কাপলানের ফাঁসী হয়। গাম্বীজীর অপমৃত্যুতে সমগ্র ভারতে যেমন দিশেহারা হয়ে যায়, তেমনি লেনিনের মৃত্যুতে তৎকালীন সোভিয়েট দেশগুলি শোকে মূহমান হয়ে পড়ে!

আমরা ‘হোটেল অ্যাসটারিয়া’ নামক একটি বৃহৎ অট্টালিকার দোতলার আশ্রয় নিয়েছিলাম। এ হোটেলটি বৈভবের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। জার্মান-শাসক

হিটলার নাকি এই হোটেলের কতৃপক্ষের নিকট এই প্রকার সংবাদ পাঠান যে, লেনিনগ্রাড বিজয়ের পর এই হোটেলের তিনি এসে উঠবেন এবং সেই কারণে তাঁর জন্য যেন উপযুক্ত ব্যবস্থাদি প্রস্তুত রাখা হয়!—এই সংবাদটি হিটলারের পরিহাসস্বরূপ ছিল না, কেননা তিনি আপন বিজয়যাত্রার সম্বন্ধে অনেকটা নেপোলিয়নের মতোই আস্থাবান ছিলেন! হিটলারের সৈন্যদল এই লেনিনগ্রাডকে তিরিশ মাস অর্থাৎ মোট নয়শত দিন প্রায় চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে রেখেছিল। সমুদ্রপথে উত্তরদিকে একটি সংকীর্ণ পথ বিপদমুক্ত ছিল মাত্র। সেই পথটিই শূন্য ছিল লেনিনগ্রাডের ‘প্রাণসূত্র’। নগরের নাভিকেন্দ্র থেকে হিটলারের সৈন্যদল মাত্র পাঁচ মাইল দূরে বেড়াঝাল বিন্ধার করে বসেছিল। তিরিশ মাস ধরে এই নগরকে রক্ষা করার জন্য মোট ছয় লক্ষ সোভিয়েট নাগরিকের জীবনের বলিদান ঘটে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ তিরিশ মাস কালের মধ্যে হিটলার বাহিনীর মেরুদণ্ডও ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে আসে। তুষারে, বরফে, অর্ধাহারে, অনাশ্রয়ে, রোগে, যন্ত্রণায় এবং নৈরাশ্যে তারা ক্রমে ক্রমে ছত্রভঙ্গ হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে হিটলারের মৃত্যুর পরোয়ানা লেখা হয় লেনিনগ্রাড ও স্টালিনগ্রাডে! মস্কো নগরীর উপান্তে পেঁছেও নাৎসীবাহিনী অবরোধ করে, কিন্তু এখানেও তাদের শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়। রুশ লেখক লুকনিংস্কি আমাকে সেই রণক্ষেত্রগুলি দেখিয়ে নানাবিধ ঘটনার সঙ্গো পরিচয় করিয়ে দেন।

আমরা রুশ সম্রাটের রাজপ্রাসাদ ‘উইনটার প্যালেসে’ এসে উপস্থিত হলাম। এই রাজপ্রাসাদ ‘হার্মিটেজ’ নামেও প্রসিদ্ধ। এই বিশাল এবং প্রায় আদি-অন্তহীন প্রাসাদটি অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে রুশ সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের কালে নির্মাণ করা হয়। কিন্তু যিনি নির্মাণ করেন তিনি একজন ইতালীয় স্থাপত্যশিল্পী, নাম মিঃ রাসট্রেলি। লেনিনগ্রাডের বহু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-কীর্তি এবং মস্কোর অনেকগুলি—ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্মান, ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির শিল্পীগণের সার্থক সৃষ্টি। মস্কো এবং লেনিনগ্রাডের অগণিত সংখ্যক শ্বেত পাথরের কাজে এবং বিভিন্ন চিত্রশালায় ফরাসী এবং ইতালিয়ানের হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁদের স্ফুর্জিতস্ফুর্জ শিল্পকলার সৌন্দর্যমন্ডিত স্ত্রীর কাছে সোভিয়েট আমলের মোটা হাতের আঙুল,—আমার

ধারণা—আজও এসে পৌঁছয়নি। আমাদের সামনে এই বৃহৎ 'উইন্টার প্যালেসের' সঙ্গে সেই সেকালের পিটার-দি-গ্রেট—যিনি নিজের হাতে নিজের জন্য মস্কো এক জোড়া চামড়ার জুতো প্রস্তুত করেছিলেন—এবং ক্যাথরিন-দি-গ্রেট ও রুশসম্রাট আলেকজান্ডারের নাম সংযুক্ত। সোভিয়েট আমলের আগে বিগত ২০০ শত বছর অবধি 'লেনিনগ্রাড' রাশিয়ার রাজধানী ছিল।

উইন্টার প্যালেসের ঠিক সামনে নেভা নদীটির ধারে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রুশ-জাহাজ 'অরোরা' স্মৃতিস্তম্ভ চোরাহা নিয়ে দাঁড়িয়ে। এই জাহাজটি এখন প্রদর্শনী-রূপে ব্যবহার করা হয়। এইটির থেকে একটিমাত্র গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছিল প্রাসাদের অভ্যন্তরে, এবং তাতেই কাজ চলে যায়! উভয়ের দ্বন্দ্ব হয়ত পঞ্চাশ-গজের সামান্য কিছু বেশি। সকল দেশেরই সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তর থেকে মানদণ্ডের দারিদ্র্য ও দুর্গতিজনিত ঘৃণা ও অসন্তোষ যদি নিভুল সত্যরূপ না নেয়, সেখানে বিপ্লব সার্থক হয় না। রাশিয়ায় এটি সত্য ছিল, ফ্রান্সে এটি একদা নিভুলভাবে ছিল। ইউরোপের নানা দেশে গভর্নমেন্টের ভাঙ্গাগড়া হয়ত যখন তখন চলতে পারে, কিন্তু প্রাক্তন রুশসাম্রাজ্যের মতো সর্বদেশে সর্বব্যাপী দুর্গতি নেই বলেই দেশজোড়া বিপ্লব সম্ভব নয়। ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় কোনও কালে কমিউনিষ্ট বিপ্লব সম্ভব নয়—কেননা সেখানে প্রায় প্রতি নরনারী সচ্ছল অর্থ-নীতিক জীবনযাপন করে। শূন্যই সেখানে সাধারণভাবে যে-ব্যক্তি 'বেকার',—সে ঠিক বাঙালী বেকার নয়, কারণ সোশ্যাল এবং লেবার ইনস্যুরেন্স থেকে সে-ব্যক্তি যে পরিমাণ ভাতা পায়, সেটি বাঙালী ডেপুটি মিনিষ্টার অপেক্ষা কম নয়! পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে আমেরিকার জীবনযাত্রার মানরূপ সর্বাপেক্ষা প্রোজ্ঞদল, এবং বিগত বিশ্ব-যুদ্ধের প্রবল অম্মাভাবের কালে ইংল্যান্ডে যখন খাদ্য-সংকট দেখা দিয়েছিল, তখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল আপন দেশের অন্ন সংস্থানের জন্য একবার প্রেসি-ডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমেরিকান শহরের হোটেলের মাত্র আড়াই টাকায় যে শ্রেষ্ঠ মধ্যাহ্নভোজন করা যায়, এটি লক্ষ্য করে তাঁর জিভে জল এসেছিল। "His mouth watered when he looked through the eating houses." (Reuter) অর্থাৎ আমেরিকার জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন যত সমৃদ্ধই হোক,

সেখানে আহার্য সামগ্রী কোথাও উচ্চমূল্য বা দুঃপ্রাপ্য হয়নি, কিংবা ব্যবসায়িক চক্রান্তের দ্বারা উৎকৃষ্ট ঘিয়ের বাজার বন্ধ করে বন্ধপতি ঘি-এর ওপর উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন প্রচার করেনি! আমেরিকায় বেকার আছে অনেক, কিন্তু অর্থনীতিক দুর্দশা কোথাও নেই। মাঝে মাঝে যে ধর্মোন্মত্ত অসন্তোষের কথা কানে আসে, সেটির উৎপত্তি হল অতিরিক্ত বিলাস-বৈভবের সাময়িক অভাব থেকে। লক্ষ লক্ষ আমেরিকান 'বেকার' নিজ নিজ মোটর গাড়ি নিয়ে এ-হোটেল থেকে ও-হোটলে আমোদ করে বেড়ায়, এই সংবাদগুলি সোভিয়েট সংবাদপত্রে ছাপা হয় কিনা, আমি জানিনে। রুশীয় ভাষা আমার জানা নেই।

'উইন্টার প্যালেসের' মধ্যে বিশালতার যে-মহিমা, যে-ব্যাপকতা, এবং সুশ্বেত-প্রস্তরলোকের চারিদিকে ডাস্কবের যে অপূর্ণ অভিব্যক্তি, সেটি যে কোনও পর্যটককে কিছুকালের জন্য অভিভূত করে। ঠিক বুঝতে পারা যায় না, কেন দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকব! এই প্রাসাদেরই একটি অংশের নাম 'হার-মিটেজ'।

উইন্টার প্যালেসের মধ্যে মোট ২৫ কিলোমিটার অর্থাৎ কমবেশি প্রায় ১৫ মাইল হাটতে পারলে তবে আগাগোড়া এই বৃহৎ চিত্রশালা দেখা যায়। আমাদেরকে বলা হল, এই প্রাসাদের ভিতরকার লাউঞ্জ, করিডর, লবী, সিঁড়িপথ ইত্যাদি বাদ দিলে মোট দেড় হাজারেরও বেশি এক-একটি সূপারিসর কক্ষ, এবং তাদের মধ্যে চারশত কক্ষের প্রত্যেকটিতে এক-একটি বৃহৎ চিত্রশালা, এবং রাজবৈভবে পরিপূর্ণ। আমাদের অনেকের এই বিশ্বাস দাঁড়াল, প্রতিদিন এই চিত্রশালায় অন্তত আট ঘণ্টা সময় কাটালে তবে মোটামুটি বছরখানেক লাগে প্রতিটি চিত্র ও লক্ষ্যবস্তুর খুঁটিয়ে দেখার জন্য। আমাদের হাতে সময় মাত্র চার ঘণ্টা! অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিমলকুমার বসু—যিনি এখন কলিকাতা মিউজিয়ামের স্থাপত্য-বিভাগের ডায়রেক্টর—তার মুখে শুনিয়েছিলাম, তিনি ডিউয়ার কনাকের সূর্য-মন্দিরটির বিষয়ে গবেষণা করার জন্য সেখানে চার মাস একাদিক্রমে বাস করেছিলেন। চার ঘণ্টায় আমরা এই 'হার-মিটেজের' চিত্রশালা দেখে নেবো, এটি হাস্যকর। ফলে, এই দাঁড়াল—ওই চার ঘণ্টা কেমন একটা উদ্ভ্রাঙ্কন এবং আত্ম-বিমূর্ত অবস্থায় শ্রীমতী নাট্যাশা এবং

চিত্রা পরিচয়

নির্বাচনের তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। রাজনীতিক, অর্থ-নীতিক এবং জাতীয় ও আন্ত-জাতিক—নানা প্রশ্ন এসে আপনার মনে ভিড় জমিয়েছে। কিন্তু আপনি নিজেই এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন।

পড়ুন :-

অমলেন্দু দাশগুপ্তের	
দেশোন্নয়নে সমাজতন্ত্র	২৫
হিউ সেটন ওয়াটসনের	
আধুনিক কালের বিপ্লব—	২৫
লিওনার্ড সের্পোরের	
রাশিয়ার ভবিষ্যৎ—	২৫
আলফ্রেড জুবায়ারম্যানের	
আর্থিক স্বাভাবিকবাদ—	২৫
বি জে পি উডসের	
অর্থনৈতিক সহযোগিতা—	২৫
রকফেলার রিপোর্ট	
গণতান্ত্রিক আদর্শের ক্ষমতা—	৩৭
জুলে ম্যানকেনের	
প্রতিরক্ষার অর্থনীতি—	৩৭
পিটার হালাজের	
আন্তর্জাতিক যুব উৎসব—	৩৭
অমলেন্দু দাশগুপ্তের	
দেশোন্নয়নে গণতন্ত্র—	৩৭
লেফ্টার বি. পিয়ারসনের	
বিশ্ব রাজনীতিতে গণতন্ত্র—	৫০
হাওয়ার্ড ফাটের	
নগ্ন দেহতা—	৭৫
কোরেশ্বার আর্দ্রেজিদ প্রমুখ	
পরাক্রান্ত দেহতা	১০০
অ্যান্ডার হেলারের	
আর কমরেড নই—	১০০
অশোক মেহতার	
পারিকল্পিত অর্থনীতির	
রাজনীতি—	১১২
বাট্রাম ডি উলফের	
সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা—	১৫০
বোশোফ কোরবেলের	
চেকোস্লোভাক গণতন্ত্রে	
কমিউনিষ্ট যুগ্মফ্রন্ট—	১৫০
ফাদার রিগনের	
নয়া চীনের কারাগারে—	১৫০
ডেভিড কাশম্যান কয়েলের	
যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক পন্থা	
সুলভ ২.০০ শোভন ৩.০০	

পরিচয় পাবলিশার্স

২১, হায়াৎ খাঁ লেন, কালি-৯।

সর্বপ্রকার পুস্তক সরবরাহ
প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৩৫-২৪১৪

লিভিয়ার সঙ্গে এক স্বপ্নলোক থেকে অন্য রূপলোকে নিবেদন 'নিশি-পাওয়া' ব্যক্তির মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে সবগুলো যেন দ্রুত সরে যেতে লাগল। আমি এই প্রথম লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির দু'খানি মূর্তি চিহ্ন, পিকাসোর খান পঞ্চাশেক, রুবেন্সের কুড়ি বাইশখানা এবং রেমব্রাণ্টেরও খান পঁচিশেক দেখলুম। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে পারি, এই হারমিটেজে না এলে 'আমার এ জন্মের তীর্থদর্শন নাকি থেকে যেতো!'

এখানে আমার সেদিনকার ডায়েরী থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করে দিই :

"But here are, they say, the biggest collections of paintings and portraits, and other art-objects. We go from one hall of marbles to another, as if, from one fairly land to the other, and visit the dreamlands of the artists of all ages....Hall after hall full of rare paintings, portraits, statues and art-collections from Italy, Greece, France, England, Germany, Rumania and other countries, in thousands and thousands, — and we sweepingly look at them, a very small part of the whole. We do not remember how we spent the 4 hours inside some of the halls. We cannot recollect what really we have seen, or which way we proceeded through and how we crossed from one floor to another....How many crores of rupees worth of art-collections there are, we cannot imagine....Ultimately when we were all exhausted, tired and became hungry, we were asked to enter a specially protected inner chamber which has its door of iron, guarded by armed sentries."

শোনা যায় ইউরোপের 'লুভার'-চিহ্নশালার পর হারমিটেজ হ'ল পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ।

আজ সকাল থেকে পারের আঙ্গুলের কড়ার জন্য বিশেষভাবে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাটছিলাম। গত এক মাস ধরে জুতোটা কষ্ট দিচ্ছে! তাসকন্দ রওনা হবার আগের দিন এই নতুন জুতো জোড়া কেনবার সময় একথা মনে ছিল না, শীতপ্রধান দেশে মোটা মোজা পরতে আমি বাধ্য, — না পরলে ঠাণ্ডায় কষ্ট এবং ভদ্রসমাজে নিন্দা! বলা বাহুল্য, এই নিন্দাটা কি প্রকার, সেটি জানার জন্য আমি মস্কাতে অনেকবার বিনা মোজায় নাগরা জুতো পরেছি! একমাত্র শ্রীমতী লিভিয়া ছাড়া আর কেউ এর সমালোচনা করেননি! তাঁর

কেবলই ভয়, পাছে কোনও ভারতীয় সামাজিক বিদ্বেষের পাত্র হয়ে ওঠেন!

আমার ক্লান্ত এবং খুঁজগতি বোধ হয় শ্রীমতী প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলেন। এবার কাছে এসে একবার পারের দিকে চেয়ে বললেন, কষ্ট হচ্ছে খুব? ওটা নাই পরে আসতেন? একটু আস্তে চলুন— আমি সঙ্গেই আছি—

হাসিমুখে বললুম, তা'তে কষ্ট কমবে না, বরং কুঠাই বাড়বে—!

কী দরকার ছিল ওই ছাই জুতোয়... এত কষ্ট হত না!

জুতো এবং ফোস্কা সতাই বিশেষ কষ্ট দিচ্ছিল এবং অনেক সময়ে অশোভন-ভাবে আমাকে থমকিয়ে যেতে হিচ্ছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকের সহানুভূতিশীল কণ্ঠস্বর সম্পর্কে পুরুষের কান বড় সচেতন। এই নারী বিদেশিনী, খাস ইউরোপীয়, আপাদমস্তক কমিউনিষ্ট ছাঁচে গড়া, সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে বিশ্ব-পৃথিবীর সমস্ত দেশ এর নিকট অনু-কম্পার বস্তু এবং আপন অভিমত সম্বন্ধে ইনি তিলমাত্র আপোষরফা করতে কখনও প্রস্তুত নন। কিন্তু হঠাৎ এর কণ্ঠস্বরে কেমন যেন খটকা লাগল। এই নারীর ছাঁচ যেন ভিন্নপ্রকার। আমার পা দু'খানার অপারিসমী যন্ত্রণা এবং ক্রেশ-বিকৃত চেহারাটার প্রতি এই প্রকার বিষয় ও ব্যথিত কণ্ঠের সমবেদনা হয়ত তখন দরকার ছিল।

মুখে বললুম, আপনি এগোন, আমি আস্তে আস্তে হাঁটি।

শ্রীমতী আমার কথা শুনলেন না। আমি খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাটছিলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গেই রইলেন। পি'য়াজের খোসা একটির পর একটি ছাড়ালে তার ভিতরে শাঁস-বিল্ডু পাওয়া যায় কিনা ভাবছিলাম!

সশস্ত্র প্রহরী একটি ছাড়পত্র নিয়ে যখন আমাদেরকে একটি গোপন কক্ষের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিল, আমরা তখন একটি আশ্চর্য পৃথিবীর মধ্যে ঢুকলাম। বিশাল এক কক্ষ, কিন্তু তার চারিদিকে শত শত বৎসরের সঞ্চিত হীরা মুস্তা স্বর্ণ রত্ন মণিমাণিক্যের দ্যুতি-ঝলসিত যক্ষপুত্রীর দিকে চেয়ে আমরা কয়েকজন ভারতীয় যেন অনেকটা দিশাহারা হয়ে গেলুম।

পৃথিবী কত বড় এখনও ভালো করে জানিনে, কিন্তু এখানে শুনলাম, এত বড় রত্নাগার নাকি পৃথিবীতে আর

কোথাও বর্তমানে নেই। বিগত তিন হাজার বছর ধরে এই রত্নভান্ডার, এক-কাল থেকে অন্য কালে পরিপূর্ণ হইছে। অগণিত সংখ্যক সিন্দুক ও বাস্ক হীরা-জহরতে বোঝাই, রাজ-পোষাক আগাগোড়া সোনা ও হীরায় মোড়া। আসা-সোঁটা, মুরুট, রাজদণ্ড, পরিধেয়াদি—সব জহরাদিতে পরিপূর্ণ। বড় বড় হীরা ও আসল মুক্তার মালা সর্বত্র শোভা পাচ্ছে। যতগুলি জার ও জারিনা এতাবৎ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের সমস্ত অলংকারাদি। তুরস্কের কবেকার এক সুলতান জারকে উপহার দিয়েছিলেন একখানা শাল, সেটিতে প্রায় একশটি হীরা বসানো,—এবং তাদের প্রত্যেকটির আকার প্রায় আমাদের 'নয়া পয়সার' মতো। সম্রাজ্ঞীর সাজ, রাজার বহির্বাস, ঘোড়ার পিঠের সাজ, অন্যান্য আসবাবসজ্জা, ব্যবহার্য নানা সামগ্রী—সমস্তগুলি থেকে সংখ্যাভীত হীরকের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চারিদিকে শত-সহস্রবিধ লক্ষ্যবস্তু—প্রত্যেকটিই আপন আপন হীরকের কাহিনী বলবার জন্য ঝলমল করছে।

গজনির মাহমুদ বুরি সতেরোবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ধনরত্নভান্ডার লুট করেছিলেন! ভারতের বাজারে তখন নাকি মোহর ছাড়া মুদ্রা ছিল না! তিনি একবার সোমনাথের মন্দির লুট করে যখন ধীরে সুস্থে চলে যান, তখন সেই লুণ্ঠিত রত্নসম্ভার বহন করার জন্য ৪০০০ সংখ্যক উট দরকার হয়েছিল! সেটি বোধ হয় দশম শতাব্দির শেষ দিকে। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ দিকে ক্লাইভের লুট-পাটের পর ইংরেজ জাতির একটা বড় অংশ ধনবান হয়ে উঠল, তখন থেকে 'হাউস অফ লর্ডস'-এর জন্ম হল কিনা, অতটা ইতিহাস আমি জানিনে। তবে ক্লাইভ সাহেব হয়ে উঠলেন 'লর্ড', এবং এক শ্রেণীর ইংরেজ ধনীর নাম দেওয়া হয়েছিল 'ন্যাবব'।

'হারমিটেজ' থেকে ফিরবার সময় আমার এক বন্ধু কানে কানে শুধু বললেন, "একমাত্র এই রত্নাগারে যে-পরিমাণ টাকার সামগ্রী যথের ধনের মতো সংরক্ষিত রয়েছে, তাতে ভারতের মোট ২৪টি 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক' যোজনার খরচ উঠে যায়!"

কথাটার মধ্যে বোধ হয় সূক্ষ্ম একটা দৈন্যের ইঙ্গিত ছিল, সেই জন্য ওটায় কান দিইনি। তবে পরবর্তীকালে

এই সংবাদটি সংগ্রহ করেছিলুম, সমগ্র প্রাচ্যলোকে সর্বাধিক সংখ্যক হীরকের খনি একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেই নাকি বর্তমান, যেমন বর্তমান তার সর্বাধিক পরিমাণ অরণ্য ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ! সোভিয়েট ইউনিয়নের মেয়েদের বিশেষ প্রিয় হল, বড় হীরের আংটি! কেউ কেউ একই আংটিতে দু'টি হীরা বসায়। কেউ বা তিনটি। গলায় ঝোলায় আসল মুক্তোর মালা। হাতে চুড়ি বা বালা। বিশেষ কেউ পরেনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “মেয়েরা হাতে বালা দিয়ে জানিয়ে দেয়, আমরা কাজ করিনে, সেবা করি।” সোভিয়েট মেয়েরা দুই হাত শূন্য করে জানিয়ে দিচ্ছে, আমরা কেউ সেবা করিনে, কাজ করি! আমাদের প্রকৃতির মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ পুরুষ বর্তমান।

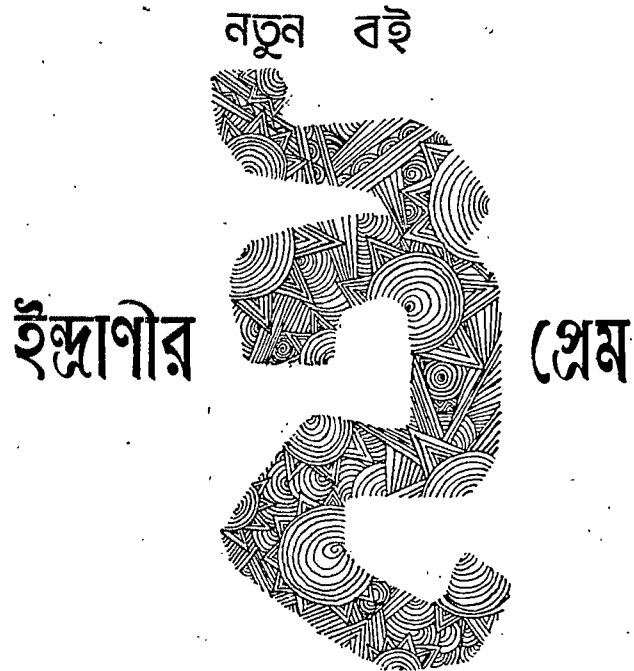
সোভিয়েট ইউনিয়নে সোনার অলংকারের ব্যবহার একেবারেই কম।

লেনিনগ্রাডকে বিশেষজ্ঞরা বলেন, পৃথিবীর একাদশ শ্রেষ্ঠ শহর। এখানে কমিউনিষ্ট সমাজের উগ্র প্রচারের চক্কা-নির্নাদিত রূপটি নেই। চারিদিকের সৌন্দর্যে যেন একটি সুকুমার পেলবতা, অনাহত শান্তি। নদীর ওপারে পিটার ও পল দু'গ,—ওটি একদা বিপ্লববাদীগণের মৃত্যুলোক ছিল। আমাদের চোখ ছাড়া পেয়েছে বনে, বাগানে, গির্জা ও অট্টালিকার অলিন্দে, শ্বেত পারাবত-দলের চব্বতরে। চোখের অপারিসীম তৃপ্তি ঘটছে বড় বড় যোম্বা এবং বড় বড় মনীষীর প্রস্তরমূর্তিগুলি দেখে। আমরা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, আমরা এসেছি এমন একটি সুন্দর জগতে, যেটি রসবোধ, সুসুচি, শালীনতা, আভিজাত্য এবং উচ্চ সংস্কৃতির একটি মনোমুগ্ধকর পরিচয় বহন করে। আমার নিজের চোখের পক্ষে সর্বাপেক্ষা স্বস্তি এই গট্যালিনের কোনও মূর্তি, ছবি, বিজ্ঞাপনী—এগুলি কথায় কথায় খামোকা চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে না! দিল্লী-কলকাতার পথ-ঘাটের প্রতি বাঁকে যদি কথায়-কথায় দেখতুম গান্ধী-নেহরুর পাথরের মূর্তি একের পর এক এখানে-ওখানে বসানো, এবং বশব্দ হয়ে নেহরু বসে রয়েছেন গান্ধীজির কোলের কাছে,—তাহলে আমি স্থায়ীভাবেই মণি-কর্ণিকার ঘাটের ধারে গিয়ে আশ্রয় নিতুম। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই রুচিবিকারের অতিশয়তাই পাইয়া দেয় সব-চেয়ে বেশি! এত বেশি ‘পুতুল-পুজো’

একটু গায়ে লাগে। এত বেশি লোক-দেখানো, অনুরাগের মধ্যে জনসম্মতি আছে কিনা বা ফাঁকি আছে কিনা, এটি যে কোনও পর্যটকের মনে আসে। আরেকটি লোক-দেখানো প্রচার-কাণ্ড অত্যন্ত স্থূলভাবে দেখা যায় সোভিয়েট ইউনিয়নে। সেটি হল, চীন সম্পর্কে। বোধ হয় মস্কোর প্রতি সংবাদপত্রেই কথায়-কথায় প্রকাশিত হয়, চীনের সঙ্গে তাঁদের ‘চিরন্তন ও চিরস্থায়ী’ বন্ধুত্ব! সোভিয়েট ইউনিয়নের বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর কয় মাস! কিন্তু আমাদের বয়স তিন হাজারেরও বেশি। আমরা যখন একদা মধ্যএশিয়ার ভিতর দিয়ে মঙ্গোলিয়ার দিকে ‘ভিক্ষু’ পাঠিয়ে-ছিলাম, ইন্দো-চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্যে ধর্মসমাজ স্থাপন করে ফিরে

এলাম—তখন আমরাও ভেবেছিলাম, তাদের সঙ্গে এই বন্ধুত্ব বৃদ্ধি নিত্য-স্থায়ী। কিন্তু দেখা গেল, দু'হাজার বছরের বেশির বন্ধুত্বেও ফাটল ধরে! সোভিয়েট ইউনিয়নের এই ছেলে-মানুষী বিজ্ঞাপন-প্রচার লক্ষ্য করে মনে হত, যখন এত চিংকার, তখন এর মধ্যে-কার ফাঁকিও একদিন ধরা পড়তে পারে। আজ চীন-ভারত বন্ধুত্ব বিপন্ন, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি বিপন্ন চীন-সোভিয়েটের ‘চিরন্তনকালের’ বন্ধুত্ব! সেটি কি প্রকার চেহারা নিচ্ছে ধীরে ধীরে,—সে-আলোচনা পরে করব। রাজ-নীতিক বন্ধুত্বের চিরস্থায়ীত্বে আজ পৃথিবীর কেউ আর বিশ্বাস করে না!

কতকাল আগে জানিনে, কিন্তু কোনও এককালে লেনিনগ্রাড বৃষ্টি ছিল



নীলিমা দাশগুপ্ত দাম—তিন টাকা
‘বসুমতী’ পত্রিকার ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত মিষ্টি-মধুর এক প্রেমের উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের ধারায় এ এক অপূর্ব সংযোজন।



পুস্তক প্রকাশক

১১ টা/১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা-১২ ৥

একটা য়সত জলাভূমি। একদিকে বালুটিক সমুদ্র ফিনল্যান্ড উপসাগরের খাঁড়ি দিয়ে এই জলাভূমিতে জল ঢুকিয়ে দিত, এবং অন্যদিকে 'লেক লাডোগা' সেই জল ধরে নিয়ে ছোট-খাটো সমুদ্র ব'নে যেত। এই জল ও স্থল-ভূ-ভাগ মিলিয়ে যে আদিঅন্তহীন তুষারলোক উত্তর মেরুবলয়ের সঙ্গে মিলে থাকত, সেটি বিগলিত হত না নবেম্বর থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত। আমরা ফিনল্যান্ড উপসাগরের তীরে সন্ধ্যার সময় কঠিন ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, সমুদ্র জমে গিয়ে কঠিন বরফে পরিণত এবং একখানি জাহাজ মাইল দুই দূরে বরফে আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে! সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের অসাধ্যসাধক বিজ্ঞানীরা একখানি আণবিক শক্তিশেলযুক্ত জাহাজ নির্মাণ করেছেন। সেটির দ্বারা কঠিন নিরেট বরফ-সমুদ্রে যথাযোগ্য ফাটল ধরিয়ে জাহাজ চলাচলের কাজ চলবে। পৃথিবীর এই প্রথম 'এটমিক আইস-ব্রেকার' জাহাজটির নাম দেওয়া হয়েছে 'লেনিন।' নামটি মানানসই হয়েছে।

লেনিনগ্রাডে আমাদের মাত্র তিন-দিনের জন্য থাকার ব্যবস্থা কেন করা হল, এর কারণ খুঁজে পাইনি। শ্রীমতী নাটশার কাছে এর সদুত্তর ছিল না। শ্রীমতী লিডিয়াকে জিজ্ঞাসা করা ব্যথা। লেনিনগ্রাডের স্বভাব একটু ভিন্ন রকমের। এখানকার অধিবাসীদের চাপা কৌতুক-পরিহাসবোধ কিছু বেশি। রাজধানী মস্কো যেন একটা বিরাট বাজার, কিন্তু লেনিনগ্রাড হল গৃহস্থ-শ্রম, অভিজাতপন্থী! মস্কোতে সকল কাজ সারো, লেনিনগ্রাডে এসে বিশ্রাম নাও! মাথার ঘাম পায়ে ফেলো মস্কোতে, লেনিনগ্রাডে এসে কপালের ঘাম মোছ! লেনিনগ্রাডের হাওয়া মস্কোর আব-হাওয়ার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই মেলেনি।

সেই এককালের বন-বাঁদাড় আর জলাভূমি একদা যখন নগরে পরিণত হল তখন প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক পিটারের নামে এটি 'সেন্ট পিটার্সবার্গ' নামাঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু নামটি দেন পিটার-দি-গ্রেট,—ধর্মি এই নগরটি সেই জলাভূমির উপরে নির্মাণ করেন! পিটারের একটি অশ্বারোহী ব্রোঞ্জমূর্তি—যেটি সাপে জড়ানো,—সেটি বিশেষ আকর্ষণীয়। এটি নির্মাণ করেন দু'জন ফরাসী ভাস্কর। যে কয়টি মনোজ্ঞ গির্জা চোখে পড়ে তাদের মধ্যে 'সেন্ট অ'ইজাক' এবং 'কাজান' গির্জা সর্বা-

পেক্ষা প্রসিদ্ধ। এটির চেহারা অনেকটা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো। এটি নির্মাণ করা হয় উনিশ শতাব্দির প্রারম্ভে। এটি এখন ঐতিহাসিক যাদুঘরে পরিণত। বস্তুত, সোভিয়েট ইউনিয়নের ধর্মমন্দিরের সংখ্যা অগণিত। গির্জা, সিনাগগ, মসজিদ, বৌদ্ধবিহার এবং অধুনাতন-কালে আবিষ্কৃত হিন্দুর পূজামন্ডপ ও অগ্নিমন্দির—এগুলি সর্বত্র সন্নিবেশিত আছে বটে, তবে এদের অনেকগুলি এখন ধর্মসম্বন্ধীয় যাদুঘরে পরিণত হয়ে রয়েছে। কাজান ক্যাথ-ড্রালও তাই।

প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘরটিও অবাক বিস্ময় আনে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি অতিকায় এরাবতের কংকাল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে আরল সমুদ্রতীরে—সেটি রয়েছে। এককালের অতিকায় জন্তু, অদ্ভুত ধরণের প্রাণী ও মানুষ, ভয়াবহ সরীসৃপ,—এদের খুঁজে পাওয়া যেত মধ্য-এশিয়ায়, এবং ককেশাস, প্রাচীন আর্মেনিয়া ও বৈকাল হ্রদের আনাচে-কানাচে, অথবা মঙ্গোলিয়া ও তাকলামাকানের ওদিকে। একদা পিটার-দি-গ্রেট এগুলি দেখে আকৃষ্ট হন। পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ এই 'প্রাকৃতিক' যাদুঘরটি তাঁরই সৃষ্টি। বিংশ শতাব্দির প্রথম বছরে, তুষার-সমাকীর্ণ সাইবেরিয়ার 'তাইগা' অঞ্চলে একটি অতিকায় দানবাকৃতি জন্তুর অক্ষত ও তুষার সমাধিস্থ সম্পূর্ণ দেহটাকে খুঁজে পায় এক ভল্লুক-শিকারী। সেই ব্যক্তি এই জন্তুর একটি দাঁত কেটে নিয়ে দূরে এক গ্রামের হাটে যখন বিনিময়-মূল্যে তামাক কিনতে আসে, তখন লোক-জানাজানি হয়। ফলে 'যক্ষতোষক' বা 'যোকুটস্ক' রাজ্যের তাতার বংশীয় আমীর মহাশয় এটির খবর পেয়ে 'ছোটোছোটো' করেন। অতঃপর বরফ কেটে যে বিরাট দেহটি টেনে বার করা হয়,—দশ হাজার বছর পরেও সেই শব্দদেহটির ওজন দাঁড়ায় প্রায় একশ' চল্লিশ মণের মতো। এই যাদুঘরে সেই বিশাল জন্তুটি জোড়া-তাড়া অবস্থায় রয়েছে।

আমরা লেনিনগ্রাডে আপাতত কোন কর্মটি বা ইউনিয়নের অতিথি, সেটি সঠিক আমার জানা ছিল না। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরাট মাকড়সার জালের শত-শত সূত্রের অন্যতম সূতো হল, সোভিয়েট লেখক-সংঘ! এই লেখক-সংঘের

আতিথেয়তা অকুপর্ণ সৌজন্যে-ডরা। সন্ধ্যার পরে ভোজনের আসরে বসে এই প্রথম জানলাম, আমরা লেনিনগ্রাড লেখক-সংঘের অতিথি।

ঐশ্বর্যসম্পদ পরিপূর্ণ প্রসিদ্ধ 'আসটারিয়া' হোটেলের নীচের উল্লম্বকার ডাইনিং হলের একধারে আমাদের ছয়জন ভারতীয়ের মধ্যে বসলেন হাস্যরসিকা এবং বয়োধর্মিণী শ্রীমতী নাটশা এবং সোভিয়েট-প্রাণা তেজস্বিনী শ্রীমতী লিডিয়া। লিডিয়া বসেছেন আমার ডান দিকে। কারণ তাঁর ধারণা খাদ্যসামগ্রী সম্বন্ধে আমি ঈষৎ উদাসীন,—তিনি সেগুলি গুছিয়ে দেবার চেষ্টা পান। তাঁর সর্বদা ভয় পাচ্ছে আমার জামায় আহাৰ্য সামগ্রীর দাগ লেগে পোষাক নষ্ট হয়। তাঁর আশংকা অমূলক নয়। এই টেবল থেকে কিছু দূরে অন্য একটি টেবলে বসেছেন জনচারেক ভারতীয়,—বোধ হয় কমিউনিস্ট—তাঁদের এক ব্যক্তির স্ত্রী মস্কোতেই আমার আলাপ হয়েছে। তাঁর নাম শ্রীমতী ভবানী সেন। শুনছিলাম তিনি ভাল অঙ্ক জানেন! সেই অঙ্ক সোভিয়েট ইউনিয়নে এসে মিলছে কি না, সে খবর আমি পাইনি। কিন্তু তাঁর বাইরের চেহারাটি বিশেষ শান্ত এবং অমায়িক সৌজন্যে পরিপূর্ণ। আমার বিশ্বাস, তাঁর ভিতরে কিছু পদার্থ আছে বলেই বাইরের পালিশটি একটু মেটে। তাঁরা বোধ করি কোনও কৃষি ও শিল্প-সংস্থার প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন। তা হবে।

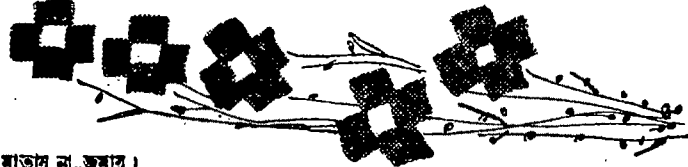
আমাদের টেবলে এসে বসেছেন লেখক-সংঘের পক্ষ থেকে একজন সুশ্রী যুবক-কবি, একজন তরুণী কবি এবং তৃতীয়জনও একজন নব্য বয়সের লেখক। লেনিনগ্রাডে প্রবীণ লেখক-লেখিকা আর কে কে আছেন, অথবা তাঁরা সকলে রাজধানী মস্কোতে গিয়ে স্পন্দিত কারণে ডেরা নিয়েছেন কিনা—সেটি সঠিক নির্ণয় করতে এখনও পারিছিনে। তবে হয়ত এই ধরণের লেখকরা আমাদের দেশের মতন এখানেও মধ্যবয়সের মানসিক বা সাম্যাত্মিকের কারখানায় কেউ কেউ তৈরি হয়! তারপর একদিন তারা আসে শহরে। সকলের আগে তারা চায় একটু বিশ্রাম,—এবং সেই যশের দু' একটি তরুণ যদি স্বগ্রামের ঘাটে এসে লাগে, তবেই কিছু তৃপ্তি! যশের পর কিছু অর্থ। তারপর কিছু প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পর কিছু প্রতিপত্তি। এমনি করেই বোধ হয়

একদিন এঁদেরও 'আত্মল ফুলে কলা-
পাছ' হয়,—কে জানে!

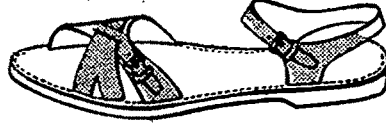
মেয়েমহলে কোন কোনও ভারতীয়
বন্দুর ব্যবহারিক দৈন্য লক্ষ্য করে আমি
মধ্যে মাঝে একটু-আধটু বিরক্ত বোধ
করতুম এটি তাঁরা জানতেন এবং সেজন্য

আমাদের মধ্যে অতিশয় সংযত ও ভদ্র
কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত সাম্ভাদ
জহীরের উপস্থিতি কামনা করেছিলাম।
তাঁর ন্যায় সদাচারী, সংস্কৃতিবান, মিষ্ট-
ভাষী ও মধুর প্রকৃতি ব্যক্তি ভারতীয়
কমিউনিষ্ট দলে আর কতজন আছেন,

আমার খুঁজে দেখতে ইচ্ছা করে! তিনি
স্যার ওয়াজির হাসানের পুত্র,
বংশানুক্রমিক ধনী, উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী
আলী জহীরের ভ্রাতা, প্রাক্তন জমিদার,
সুপরিচিত এবং আভিজাত্যের ঐতিহ্য-
বাহক। একবার জহীর আমাকে হাসি-

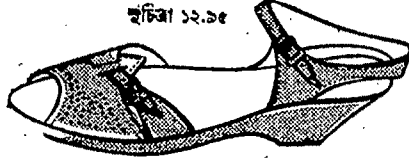


শীতের হাওয়া কেমন মাতাল না, জমাল।



ইটন ৪.৯৫-৫.৯৫

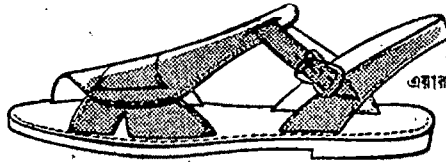
হুটিয়া ১২.৯৫



শীত বলে না দোর খোলো, বলে সব বন্ধ করো।

সেই শুকনো শীতের দিন ফুরিয়েছে।

হাওয়া ঘুরেছে, শিশুল কুলের মেজাজ দেখে বুঝি এখন বসন্ত।



এয়ারলিক্ট ১৭.৯৫

চলো হাটেবাটে...চলো নিখোজ বন্ধুর সন্ধানে...

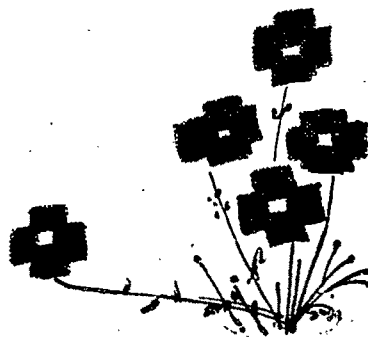
...চলো নদীকে ঘেঁষে আসি।

লিফার ২০.৯৫



কারামে চলতে আসে ঘুরে আসি বাটার দোকানে।

Bata



মুখে বলেছিলেন, হ্যাঁ, পাঁচ 'সাইয়ের মধ্যে আমিই একমাত্র লক্ষ্মীছাড়া, নৈলে পার্শ্বতানের জেলে পাঁচ বছর ধরে নিজের 'সেল'-এ কেন থাকতে যাব বলুন?' হাসিমুখে তিনি বলতেন, "সবাই জানে আমি উচ্ছিন্নে গেছি!"

জহীর আমাদের সঙ্গে নেই সেজন্য অসুবিধা বোধ করছিলাম।

তিনজন নবাগত লেখক-লেখিকার সান্নিধ্য লাভ করে আমরা আনন্দিত হয়ে পোভারীদের সাহায্যে গল্পগল্প করছিলাম। যুবকটির প্রদীপ্ত শ্রী, স্বাস্থ্য এবং আলাপের মধ্যে বিনয়-নম্রতা আমাদের পক্ষে আকর্ষণের বস্তু ছিল। তরুণী কবি-মেয়েটিও ভারি সুন্দরী এবং সংযতপ্রকৃতি। তৃতীয় যুবকটি নাট্যশার কাছাকাছি বসেছেন এবং সর্দার শেখোনের হাসি-পরিহাসে এরই মধ্যে তিনি মশগুল হয়েছেন। শুনোঁছ লেনিনগ্রাদের ছেলে-মেয়েরা রসবোধ কাকে বলে জানে। লোকমুখে শোনা ছিল, তারা নাকি কমিউনিজমকে ঠাট্টাবিদ্যুৎ বা তামাশায় অনেক সময় নাজেহাল করে। ঠিক বলতে পারিনে, মস্কাকে রাজধানী করার জন্য লেনিনগ্রাদের মনে চাপা অসন্তোষ আছে কি না! শোনা কথার মধ্যে মিছে কথা থাকে প্রচুর।

আহারাদির মাঝখানে নবাগত সেই লাজনন্দী তরুণী কবি একখানি সাময়িক পত্রিকা বার করলেন। তাঁর একটি কবিতা কিছুকাল আগে ছাপা হয়েছে উক্ত সাময়িক কাগজটিতে। কাগজটির সাইজ 'অমৃত'র মতো। উক্ত কবিতাটি বোধ করি গদ্য কবিতা,—জায়গা নিয়েছে পাঁচ ছয় পৃষ্ঠার মতো। বোধ হয় আরও বেশি। কবিতাটি পাঠ করে তিনি বিশেষভাবে আমাকে এবং আমার বৃদ্ধপার্শ্ববর্তী পাঠান-কবি শ্রীযুক্ত ভাবানকে আনন্দ দিতে চান। আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালুম।

কবিতা অতি দীর্ঘ হলে শ্রোতা এবং পাঠকের পক্ষে অসুবিধাজনক হয় কিনা স্পষ্ট জানিনে। কিন্তু যখন শুনলাম, এ কবিতাটির বিষয়বস্তু হল 'ভারতবর্ষ' তখন একটু সজাগ হলুম। লেনিনগ্রাদের একটি মেয়ে লিখেছে ভারতবর্ষের উপর কবিতা? সন্দেহ নেই, এটি আমাদের সকলের পক্ষেই আনন্দের কারণ। ভাস্করের মহিলা কবি শ্রীমতী জুলিফিয়া ভারতের উপর যে কয়টি সুন্দর কবিতা তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করেছেন, সেগুলিতে প্রম্ভা, ভালবাসা, সম্মান এবং হৃদয়ের আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। এ কবিতাটি একটু অনারকম। এর বিষয়বস্তু হল, 'ভারতের শোচনীয় দুর্ভিক্ষ'!

দুর্ভিক্ষ! ভারতের?—প্রশ্ন করলাম, আপনি কি ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের বাঙলা

দেশের সম্বন্ধে লিখেছেন? আপনি কি ভারতে কখনও গিয়েছিলেন?

লাজুককণ্ঠে তরুণী কবি জবাব দিলেন, না, আমি লিখেছি ১৯৪৭-এর কাহিনীটি, এই কবিতায়!—এই বলে তিনি কবিতাটি পাঠ আরম্ভ করলেন এবং আমার পার্শ্ববর্তী লিডিয়া মুখে মুখে প্রতি ছত্র অনুবাদ করে দিতে লাগলেন। ওপাশে নাট্যশালা হাসি-পরিহাসে মশগুল ছিলেন।

কবিতাটির বিষয়বস্তু বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটা! ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত অম্মের জন্য হাহাকার করছে! কেউ দিচ্ছে না তাঁকে খাদ্যশস্য। দয়া, স্নেহ বা মমতা কোথাও নেই। এমন দিনে পরিপূর্ণ এক জাহাজ খাদ্যশস্য নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের এক নাবিক বোম্বাইয়ের ঘাটে গিয়ে অবতীর্ণ হলেন! চারিদিকের নিরস্ত্র, উপবাসী, ছিন্নজীবী, ক্ষুধার্ত জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সোভিয়েট খাদ্য-জাহাজের সেই দয়াদ্র নাবিক। দুর্ভিক্ষপীড়িত এবং ক্ষীণতপ্রায় ভারতীয় সেই ভিখারীদলের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষা নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল! গ্রাণ-বর্জ্য এসেছেন আমাদের জীবনদান করার জন্য! দুই হাত ভুলে সেই বিরাট ক্ষুধিত জনসাধারণ আশীর্বাদ করতে লাগল!

কমিউনিষ্ট পাঠান-কবি যিনি দিল্লীর 'দল্লবা জামিয়ার' ম্যানেজার এবং সুপরিচিত, সেই মিঃ ভাবান মদের গেলার্সটি নামিয়ে আমাকে বললেন, দেখেছেন, কী চমৎকার রচনাশৈলী, কেমন নতুন ধরণের আঙ্গিক?

কবিতা পাঠের মাঝখানে আমি প্রশ্ন করলাম, সোভিয়েট ইউনিয়ন ওই গম্ব কি দান করেছিল, না ধার দিয়েছিল?

হঠাৎ ওঁরা চুপ করে গেলেন। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, আপনারা কি জানেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে নিঃস্বার্থভাবে ভারতের কোনও উপকার করেননি? আপনারা কি জানেন স্টালিনের জীবিতকালে ভারতবর্ষ তাঁর হাত থেকে কোনও 'দান' নেয়নি? তা হলে শুনুন, ১৯৪৭ সালে আমি বোম্বাইতে 'প্রবাসী বংগ সাহিত্য সম্মেলনে' উপস্থিত ছিলাম এবং আপনার ওই কাব্যবর্ণনার সঙ্গে বোম্বাইয়ের তৎকালীন জীবনযাত্রার এতটুকুও মিল নেই! ক্ষমা করবেন, কবিতাটির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাচ্ছিনে।

ভাবান একটু খিঁচিয়ে বললেন, আগে সব কবিতাটা শুনুন—?

আমি হাসলাম, কবিতার মূল ভিত্তি যেখানে সত্য নয়, সেখানে অন্যান্য 'সেস্টিমেণ্টও' হাস্যকর। এ কবিতাটি সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষেও সম্মানজনক হয়নি, কারণ তাঁদের পররাষ্ট্রনীতিতে কোথাও দাতা ও গ্রাহিতার সম্পর্ক

প্রতিষ্ঠিত নয়! খোঁজ নিয়ে দেখুন, ভারতবর্ষ কি প্রকারে সেই সোভিয়েট গম্বের দেনা শোধ করেছিল!

তরুণী কবির সুন্দর ও রসিষ্ঠ মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে ভাবান আমাকে বললেন, দেখুন, আপনি নিজে কবিতা লেখেন না, কিন্তু আমি লিখি! এ কবিতাটির জন্ম হয়েছে একটি মহৎ অনুপ্রেরণা এবং বিশ্ববন্ধুত্বের পরি-কল্পনা থেকে—আপনি একটু ধৈর্য ধরে শুনুন—!

আমি আবার হাসলাম। বললাম, দেখুন, আমি বয়সে বোধ হয় আপনারদের সকলের চেয়ে একটু বড়ই হবো। আমি রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি কলকাতা থেকে আসছি। কবিতা কাকে বলে একটু বুঝি। সে যাক, তাহলে ঐতিহাসিক সত্য শুনুন! বাঙলার লক্ষ লক্ষ লোক যখন না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় মরছিল, সেই ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববন্ধুত্ব মিত্রশক্তির অন্যতম সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিবাসীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পাশ্চাত্য উপ-সাগরের ভিতর দিয়ে, বতদূর মনে পড়ে, হাজার হাজার টন ভারতীয় খাদ্যশস্য এবং কানপূর থেকে লক্ষ লক্ষ জোড়া জুতো আপনারদের এখানে এসে পৌঁছিত কিনা, আপনারা একটু খোঁজ নিলে খুশী হতুম!

শ্রীমতী লিডিয়া পাশ থেকে বললেন, জুতো এখনও আসে!

আমি বললাম,—হেসেই বললাম, কিন্তু এসব নিয়ে কোনও ভারতীয় কমিউনিষ্ট-কবিও একছত্র কবিতা লিখে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি এই প্রকার অসম্মানজনক সমবেদনা প্রকাশ করেননি! ভারতের রুচি একটু অনারকম!

তর্কবিতর্কের মধ্যে কবিতাটা আর পড়া হয়ে উঠল না। মনে মনে তবু আমার একটি প্রতিজ্ঞা ছিল, নিজের দেশ সম্বন্ধে কোথাও কোনও প্রকার গর্ব প্রকাশ করব না! আমি শূন্য দেখতে ও জানতে এসেছি। যদি কিছু শিক্ষালাভ করে যাই, বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু এই ভোজনের আসরে সেই প্রতিজ্ঞাটা হঠাৎ ভেঙে গেল। ঈশৎ উত্তেজনার সত্ত্বেই সেই যুবক কবিতাকে বলে ফেললাম, দেখুন, হাতী পাঁকে পড়লে অন্যান্য জন্তুরা মনে করে, এবার ওটার সংশ্লিষ্ট হোক! কিন্তু সেই হাতী সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রতীক! এটি মনে রাখা দরকার, ভারত চিরদিন সম্পদ ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ,—কোনও যুগে তার অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটেনি, অথবা কোনও দিন তাঁর দারিদ্র্য বা অভাব নেই! শূন্য এক এক যুগে বাইরের থেকে দস্যু-দানব-তস্করের দল ভারতে এসে লুটপাট করে, মুখের অন্ন কেড়ে নেয়, গায়ের জোরে ভোগদখল করতে থাকে। মাঝে মাঝে সেই কারণে ভারতের দুর্গতি

[illegible]

দাঁড়াবে এই গোরব? এ যে বড় অর্থহীন!

লেনিনগ্রাডের পথ পেরিয়ে বাচ্ছিলুম। ডানদিকে প'ড়ে রইল সেই নীলাভ সবুজ ঘন নিরেট সম্রাটের প্রাসাদ 'উইন্টার প্যালেস' তথা 'হার্মিটেজ'। গাড়ি চলল দূর থেকে দূরে একটি পর একটি সাকো পেরিয়ে। সমগ্র লেনিনগ্রাড অগণিত জলপ্রণালী ও নদীর শাখাপ্রশাখার উপরে মোট ৪০০ সাকো আছে। এতদিন ধরে এত শহর পেরিয়ে এলাম, কিন্তু কোথাও দেখতে পাইনে নরনারীর বেহায়াপনা, দেখতে পাইনে কোথাও যৌনসংকেত। সমস্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে কোথাও একটি প্রকাশ্য চুস্বন-আলিঙ্গন নেই, অশ্লীল সিনেমা বিজ্ঞাপন, অশ্লীল বাক্য বা আচরণ, প্রকাশ্য পথে কোথাও ইতর আলাপ, কোনও দুরন্ত জনতার নোরা উল্লাস বা গালিগালাজ, কোথাও কদম্বের সমাবেশ, কোথাও প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাসের অশোভন প্রকাশ, কোথাও গদগদভঙ্গীর বিগলিত রূপ,—না, কোনটাই কোথাও নেই! অনেক সময় মনে হয়েছে এরা পাথর, বরফ, এরা যেন সদ্য আবিষ্কৃত কঠিন একটা বিচিত্র ধাতু,—নতুন সভ্যতার গবেষণাগারে যেন এই ধাতুকে নিয়ে ভরানক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে! ভবিষ্যৎ কালে এই ধাতুর দ্বারা কোন অসাধ্য সাধন করা হবে, সেটি অনিশ্চিত। এই ধাতু দিয়ে গড়া 'স্পোর্টানক' আর 'লুটনিক' চলে গেছে কোন মহাবিশ্বের শূন্যলোকে। এই ধাতু ছুটেবে চাঁদে, মঙ্গলে, শুরে, ধ্রুবে, চন্দ্রে এবং সূর্যলোকে। জানি নে দূর কালের মানব সভ্যতার বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এই ধাতু কাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে! সোভিয়েট ইউনিয়নের কীর্তিকলাপের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তাই পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজের পক্ষে অন্যতম সন্তোষের কারণ। এদের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সকল আনন্দের মধ্যেও কেমন যেন ভয় পাই!

বিশ্ববিদ্যালয়টি জার আমলের পুরনো বৃহৎ একটি বাড়ি। তার নানা সিঁড়ি, নানা অলিগলি। ভিতরে শত শত ছাত্রছাত্রীর আনাগোনা,—একপক্ষ অন্যপক্ষ সম্বন্ধে সচেতন নয়। মেয়ে বলে বিশেষ দৃষ্টব্য বস্তু—এমন ভাষা কারও চোখে দেখাচ্ছিলে! পুরুষ বলে সম্মতি নেই মেয়ে পক্ষে। উভয়পক্ষই সহজ।

আমরা নানান বিভাগ মাড়িয়ে যে কক্ষটিতে এলাম, সেখানে সকল বয়সের ছাত্রছাত্রীরা একত্র জড়ো হয়েছে। একজন তামিল মহিলা এখানে শিক্ষকতা করেন। হিন্দীর সুবিধা আছে। বাঙলা পড়বার নানা অসুবিধা,—শিক্ষক নেই। পাঁচ ছয়টি ছাত্রছাত্রী বাঙলা পড়ে। বহুকমারী সাধু বাঙ্গলার সঙ্গে এখনকার বাঙ্গলার মিল ঘটে না। চলতি ভাষার বাঙ্গলা

এখানে অপরিচিত,—পড়াটা কঠিন! কারণ এর ব্যাকরণ, গঠন, শব্দ, প্রয়োগ, রচনারীতি—কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। ওরা সাধু বা চলতি—কোন ভাষাটা পড়বে ওরা জানে না, যেটা পড়ছে সেটার চলন নেই! দেখতে দেখতে চার পাঁচটি ছাত্রছাত্রী আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। একটি মেয়ের নাম, ইরা সোয়েতোভিনোভা, আরেকটি মেয়ের নাম, লেনা স্মিরনোভা। ওদের সকল প্রশ্নের জবাব আমার কাছে ছিল না। ওরা দু'একজন উপযুক্ত বাঙ্গলা শিক্ষক চায়। আমি যেন তেমন শিক্ষকের দূর একটি নাম কতৃপক্ষের কাছে বলে যাই! পরবর্তীকালে এই দু'টি ছাত্রী আমার কাছে বসে ঘণ্টা দুই বক্ষম-চন্দ্রের 'কমলাকান্তে'র পাঠ নিরোঁছিল। কলিকাতার ফিরে এদেরই একজনের বাঙলা ভাষার চিঠি পাই। সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের বাঙলা হস্তাক্ষরের বিস্ময়কর অনুকরণ লক্ষ্য করি।

এই কক্ষের দেওয়ালে তিনখানি ছবি বসুন্ধরে,—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও নেহরু! এই তিনজনের ছবি আরও কয়েকটি শহরের কোন কোনও প্রতিষ্ঠান-কক্ষে দেখে এসেছি। কোনও প্রসিদ্ধ ভারতীয় কমিউনিষ্ট নেতার ছবি কোথাও দেখিনি! ডাঃ মল্লিকরাজ আনন্দের একটি ছবি দেখেছিলুম মস্কোর গোর্কি মিউজিয়মে। তিনি সেখানে এটি উপহার দিয়েছেন।

বাঙলা ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে আমাকে বাঙলায় কয়েকটি কথা বলতে হল। ওদের মধ্যে কেউ কেউ বোধ হয় সুদূর তাসকন্দের থেকে কোনও প্রকারে শূন্য থাকবে, আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করি,—সুতরাং সকলের পক্ষ থেকেই এবার অনুরোধ এল, একটি আবৃত্তি শোনাবার। আমি রাজি হলুম। অতঃপর সভাস্থ সকলের বোধগম্য ভাষায় রবীন্দ্রনাথের "প্রশ্ন" কবিতাটি রচনার কালে বাঙলাদেশের রাজনীতিক জীবন কি প্রকার উৎপীড়িত ছিল, বাঙলার বিপ্লববাদের তদানীন্তন অবস্থায় ইংরেজ শাসকদের অনাচারের চেহারা কিরূপ ছিল, এবং অন্ধকার রাতে হিজলীর বন্দীশালায় আবদ্ধ অবস্থায় বাঙালী রাজবন্দীগণের উপর কি প্রকারে অতর্কিতভাবে গুলীচালনা করা হয়েছিল,—এইসব নিয়ে আগে একটি বিষয় বস্তুত করলুম! কিন্তু আমার মনে ছিল, অদূরে নেভা নদীর অপর পারে 'পট্টার ও পল' নামক অতি কুখ্যাত দুর্গ—যেখানকার কঠিন ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার মৃত্যুপুরীর মধ্যে জার আমলে শত শত বিপ্লবী একটি মহৎ আদর্শরক্ষার জন্য ভরাবহ অনাচার এবং উৎপীড়নের মধ্যে নিঃশব্দে মৃত্যুবরণ করেছে! বোধ হয় আমার কণ্ঠে নৌদনের কিছু উত্তাপ এবং

কিছু বেদনা-বল্লভার স্পর্শ লেগে থাকবে, তাই মহাকাবির শেষ কয়েক ছত্র বাণী যেন ব্রহ্ম কান্নার মতো বিদীর্ণ হল :

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে,
বাঁশী সঙ্গীত হারা,
আমাবস্যার কারা
ঢেকেছে আমার ভুবন

দুঃস্বপনের তলে।

তাইত তোমায় শোঁদাই অশ্রুজলে,
"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়,

নিভাইছে তব আলো,

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,

তুমি কি বেসেছে ভালো?"

কবিতাটি আবৃত্তি করার কালে সোভিয়েট কতৃপক্ষের নাস্তিকবাদের কথা আমার মনে ছিল না! কিন্তু 'পট্টার ও পল' দুর্গের গৃহান্ধকারের মধ্যে যে হিমাবিকৃত মৃত্যুপথবাণী বিপ্লবী ওই গৃহাছিন্নপথ দিয়ে মাঝে মাঝে বক্রদৃষ্টিতে তাকাত তাদের মাতৃভূমির "চিরসারথীর রথচক্রের" দিকে, আমার চোখেও হয়ত তাদের কিছু আভা পড়েছিল! সেইজন্য, কবিতাটি পাঠ করার পর সহসা যখন ওই নিস্তব্ধ জনতার মধ্যে প্রথমেই চোখ পড়ল নাট্যাঙ্গার দিকে,—সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলুম, নাট্যাঙ্গার দুই চক্ষু দিয়ে দরদরিয়া অশ্রু নেমে এসেছে!

সামনের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবিটির দিকে আরেকবার তাকালুম! সমস্ত কক্ষটি বেদনার আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে মহাকাবির বাণীতে। বেরিয়ে আসবার সময় শ্রীমতী নাট্যাঙ্গা যখন আমার হাত ধরলেন, দেখি তখনও তাঁর দুই চোখে জল! সেই অশ্রুর অর্ঘ্য মহাকাবির উদ্দেশে নিবেদিত!

পৃথিবীর ইতিহাসে তিনটি দেশের বিপ্লব বোধ করি সর্বপ্রধান। কিন্তু আমেরিকার 'ওরার অফ ইনডিপেনডেন্স' অপেক্ষা ফরাসী বিপ্লব রাশিয়ার পক্ষে কাজে লেগেছিল বেশি। একটা যেন অন্যটার পরিপূরক। লেনিনের প্রিয় ছিল তিনটি দেশ। ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইংল্যান্ড। প্রথমটির মন্ত্র, দ্বিতীয়টির পান্ডিত্য এবং তৃতীয়টির সংস্কৃতি,—এ তিন হজম করেছিলেন। কার্ল মার্ক'স সম্ভবত ছিলেন জার্মান ইহুদী, কিন্তু তিনি আগ্রয় পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডে। ইংরেজ তার ইতিহাসে দুইজন মনোবীকে আমল দেয়নি। একজন কার্ল মার্ক'স, অন্যজন হ্যাভেলক এলিস। হ্যাভেলক এলিস মারা যাবার পর ইংরেজ জাতি শুনল, তিনি ৪০ বছর ধরে ইংল্যান্ডেই বাস করছিলেন! কার্ল মার্ক'সের 'ক্যাপিটাল' প্রথম ইংল্যান্ডে ছাপা হয় কিনা আমি জানি নে। কিন্তু তাঁর এই 'অজগদুবী' থিয়োরী নিয়ে পরবর্তীকালে কেউ প্র্যাকটিস করবে,—এটি আগেভাগে জানলে ইংরেজ হয়ত অন্য ব্যবস্থা করত! রুশবিপ্লবের কেন্দ্র হল লেনিনগ্রাড।

কিন্তু রুশবিশ্ববের সংখ্যা একটি নয়। কোনটির নাম 'ডিসেম্ব্রিস্ট' কোনটির নাম ১৯০৫, কোনটির 'ফেব্রুয়ারী' এবং সর্বশেষটির নাম 'এই নবেম্বর'। এই শেষবারের বিশ্ববকালে যথাসময়ে লেনিন সশরীরে উপস্থিত ছিলেন কিনা, আমি সম্পূর্ণ ও নির্দিষ্টভাবে আজও জানতে পারিনি। তিনি এর আগে পলাতক অবস্থায় ফিনল্যান্ডে আশ্রয়গোপন করেছিলেন, এবং তাঁর 'মুন্ডের' উপর কেরেনস্কি গভর্ণমেন্ট পুরস্কার ঘোষণা করে রেখে ছিলেন। প্রসঙ্গত বলা চলে, লেনিন এবং কেরেনস্কি একই তাতার গ্রামের ছেলে, এবং কেরেনস্কির পিতা লেনিনের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। কেউ বলে, তিনি বিশ্ববের কিছুদিন আগে লেনিনগ্রাদের এক বসতিতে একটি স্ত্রী-লোকের আশ্রয়ে এসে উঠেছিলেন; কেউ বলে বিশ্ববের আগের দিন তিনি এসে উপস্থিত হন, কেউ বলে তিনি ছদ্মবেশে সকল কর্মের মধ্যেই ছিলেন দাড়িগোঁফ কামিয়ে, এবং তার একটি ছবিও আছে; আবার কেউ বা বলে, তিনি বিশ্ববের একমাস পরে বাড়ি-বাপটা শেষ হয়ে গেলে রুগ্মপথে অবতীর্ণ হন!

আমরা 'স্মল্‌নি'র বহু প্রাসাদ-শ্রেণীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। এই স্মল্‌নিই ছিল 'এই নবেম্বরের' সাফল্য-মণ্ডিত রুশবিশ্ববের সর্বপ্রধান কেন্দ্র।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এসে লক্ষ্য করছি, যে-ব্যক্তি এক যুগে পূজ্য, অন্য যুগে সে ত্যজ্য। কাল যে ব্যক্তি ছিল যুগ্য, আজ সে বরণ্য। নতুনতর ইতিহাসে যে-ব্যক্তিকে মাত্র সেদিন বলা হয়েছে, জাতির পৌরব, আজ তাকে বলা হচ্ছে মানব জাতির শত্রু! কাল যে-ব্যক্তি সবসমক্ষে দাঁড়িয়ে জাতির হাত থেকে সংবধনা লাভ করেছিল, আজ সে অন্ধকারে তলিয়ে গেল—খোঁজ নিচ্ছে না কেউ। যার জীবনী পাঠ করে লক্ষ লক্ষ বালক বালিকা শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাল, যে-ইতিহাস পাঠ করে তাঁরা মানুষ হল, যে-পররাষ্ট্রকে পরমাশ্রয়ী জেনে তাঁরা ভালবাসল—আজ সকালে উঠে সেই সব নিরীহ সোভিয়েট বালক বালিকার দল এইটি দেখে শিউরে উঠল যে সব আগাগোড়া মিথ্যা! সেই প্রদেশের নেতা দেশের ঘোর শত্রু ছাড়া আর কিছু নয়। সেই ইতিহাস আগাগোড়া অসত্য কাহিনী দিয়ে লেখা; এবং সেই বিশেষ-বিশেষ পররাষ্ট্র তাদের বন্ধু নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে কথায়-কথায় এক একখানা গ্রন্থ কোটি কোটি সংখ্যায় ছাপা হয়, যে কোনও ব্যক্তির নামে এক একটি নগর নামাঙ্কিত হয়, একই ব্যক্তির নামে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, বিশেষ একটি চিন্তাধারায় কোটি কোটি নর-নারীর জীবনকাল নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা একদিন দেখা গেল, কোনও এক

বিশেষ গ্রন্থের কোটি কোটি সংখ্যক কপি রাস্তার বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং এক ইতিহাসকে চাপা দিয়ে ভিন্ন ধরনের ইতিহাসে বাজার-ছাওয়া দেখা গেল, জীবনী ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা এক রাস্তা গিয়েছে বদলে, এবং লক্ষ লক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যতালিকা থেকে এক রাস্তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ বই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে! দেখা গেল, নগরের বা জনপদের নাম, সেনাপতির নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম—সমস্তগুলো মূছে অন্যান্য নাম বসাবার জন্য দেশব্যাপী একটা তোড়জোড় পড়ে গেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ৪৫ বৎসরের নিতুল ইতিহাস আমি কোথাও খুঁজে পাইনি। লেনিনের জীবনীর টুকরো পেয়েছি অনেকগুলি, কিন্তু সেগুলি সোভিয়েট রঙে রঙীন! বিশ্ববের পূর্ব-বর্তী সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি রিপাবলিকের প্রাচীন ইতিহাস নেই। ইংরেজ লেখক 'সিডনি ওয়েব' ছাড়া অপর কোনও সোভিয়েট লেখক রুশবিশ্বব এবং বিশ্ববোত্তরকালের প্রকৃত ও নির্ভর-যোগ্য ইতিহাস রচনা করেননি। লিয়ো ট্রটস্কীর "History of the Russian Revolution" সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্টালিন, তাঁর জীবনী রচনা করিয়েছিলেন অন্য এক লেখককে দিয়ে। সেটি আগাগোড়া মিথ্যা কাহিনীতে ভরা বলে বাজার থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে! সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রকাশিত যতগুলি গ্রন্থ আমি সংগ্রহ করেছি তার প্রত্যেকখানি স্টালিনের মৃত্যুর পর ছাপা। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের আগে প্রকাশিত কোনও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ এখন আর সোভিয়েট বাজারে নেই। স্টালিনের আমলে প্রকাশিত বিশেষ শ্রেণীর কাব্য, উপন্যাস, জীবনী, ইতিহাস, সমাজবিষয়ক গ্রন্থ, রাজনীতিক প্রবন্ধ সংকলন, পাঠ্য দৈনন্দিন কাহিনী, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি বা হত্যা হানা-হানির রেকর্ড, পাগলা গাঙ্গু বা লেবার ক্যাম্পের তথ্য, রাজনীতিক বন্দীদের বিবরণ, ইত্যাদি, অনেক চেষ্টা করেও পাইনি। সোভিয়েট ইউনিয়নে গোপনীয়তারক্ষার চেষ্টা বড় বেশী। সেই জন্য ভয় করে, এ সমাজ হয়ত জীর্ণ হতে থাকবে কালক্রমে। পচন ধরলেই গ্যাস জন্মায় ভিতরে ভিতরে। সেই গ্যাস একদিন বিদারণশক্তি লাভ করে। বর্তমান স্টালিনোচ্ছেদের (de-Stalinisation) যুগ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে ভারতের মনে একটি ভীতি বর্তমান। যেদিন রুশসাম্রাজ্য ভাঙলো, সেদিন ভারতের মন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। যেদিন জার-সম্রাটকে সপরিবারে রাষ্ট্র অন্ধকারে হত্যা করা হল, সেইদিন প্রথম দেখা গেল ভারতীয় মনের আড়ম্বল। পরবর্তী পৃষ্ঠ বছর সোভিয়েট ইউ-

নিয়নে অরাজকতা, প্রসন্ন-তান্ডব, মহা-মারী, দুর্ভিক্ষ, কোটি কোটি নরনারী ও বালক-বালিকার বীভৎস এবং উদ্দাম পাশব প্রবৃত্তির শৃঙ্খলবিহীন প্রকাশ দেখে ভারত শিউরে উঠল। তার উপরে স্টালিন এসে নামিয়ে দিলেন লৌহ-যবনিকা এবং ট্রটস্কী পিছলে বেরিয়ে এসে প্রায় বারো বছর ধরে স্টালিন সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রকাশ করতে লাগলেন। এর মধ্যেই উল্লেখ্য ভারতবর্ষ স্টালিনের সৈবরাচারী শাসন এবং নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের কাহিনী যখন কান পেতে শুনছে, তখন 'রয়টার' আপন সুযোগ মতো স্টালিনের আচরণের সংগে সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থার 'সাংঘাতিক' চেহারাটা জুড়ে দিয়ে আমাদেরকে ভয় দেখাতে লাগল। এর উপরে এসে দাঁড়াল কমিউনিজমের অন্তর্গত নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিক্যবাদ এবং সেই গালভরা শব্দটি—'ডায়ালেকটিক মোটরিয়ালিজম'। কিন্তু ভারতবর্ষের মনকে প্রভাবিত করতে লাগল 'রয়টার', বিভিন্ন ইউরোপীয় ও আমেরিকান কাগজ-পত্র, ভারতের ইংরেজ গভর্ণমেন্ট এবং রোমান ক্যাথলিক জগতের পুরোহিত গোষ্ঠি। সবাই মিলে ভারতের কানে কানে বলতে লাগল, সোভিয়েট ইউনিয়নে ধর্ম নেই—যেখানে যত ধর্ম-মন্দির ছিল তারা সব ধূলিসাৎ করেছে। ঈশ্বর নেই এবং কেউ ঈশ্বরের নাম করলে শাস্তি পায়! সে দেশে সমাজ নেই, নারীর সত্য নেই, সন্তানদের পিতৃ-পরিচয় নেই। সেখানে সব প্রলৈটেরিয়েট, সবহারা চাষী-মজুর, তাদের গৃহ-সংসার নেই,—পথে পথে মেরে-পুঁদুৰ খেয়ে বেড়ায়, জন্তুর মতো জীবন-যাপন করে, যৌনজীবনে কোনও সম্পর্ক স্বীকার করে না—এবং রাষ্ট্রকালে যেখানে সেখানে দল বেঁধে ঘুরে। ভারতবর্ষের কান যখন ভারী হয়ে উঠেছে তখন একদিকে দেখা গেল, স্টালিন আমলের লৌহ-যবনিকা,—অন্য দিকে ইংরেজ আমলের ছাড়পত্রের নিষিদ্ধকরণ। রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক—সর্বপ্রকার যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভক্তিবাদী জ্ঞানবাদী আস্তিক্যবাদী এবং সমাজধর্মবাদী ভারতের চোখের উপরে দাঁড়িয়ে রহল সোভিয়েট ইউনিয়ন বিরটকার এক সর্বনাশা বিভীষিকার মতো!

আমার মতো যারা অর্বাচীন পর্যটক, যাদের চোখে রং নেই, যারা রাজনীতির ধার ধারে না, যারা দলগত অভিমত নিয়ে কোথাও যার না, যাদের কাছে সর্বপ্রকার সুবিধাবাদ বিবর্তিকর, যারা সরকারী আনুকূল্যের তোয়াক্কা রাখে না, তারা আসে এখানে শাদা চোখ নিয়ে! তারা এসে দেখে, যা শুনেন এসেছে এতকাল তার অনেক মিথ্যে। আমি এসে দেখছি সেই সুপ্রাচীন

সমাজমন্ড তেমনি রক্ষণশীল,—‘দেব-বিজ্ঞ-ব্রাহ্মণের’ প্রতি সেই আঁচল অনুসরণ, একটি ধর্ম-মন্দির কোথাও বিনষ্ট হয়নি—সেই একই জনসাধারণ চলেছে গির্জায় আর মসজিদের সান্নিধ্য, সেই একই ‘হাঁচি-কাসি-টিকটি’কি যষ্ঠি-শেতলা-মনসার’ আদিম কুসংস্কার, ঈশ্বরের প্রতি সেই মানন, ‘খ্রীষ্ট-মাস ফাদারের’ সেই আরাধনা, প্রতি মসজিদে সেই আজান, প্রতি সিনাগগে সেই আরতি। বিপ্লব-পূজারীর দেশে এসে দেখছি বিপ্লবকে ওরা পরম প্রীতির সঙ্গে আঁকড়ে ধরে আছে ‘বুড়ি’ ছোঁওয়ার মতো! ওরা থেমে গেছে ওইখানে, আর দৌড়তে চায় না। বিপ্লব ছাড়িয়ে আর কোনও বড় চিন্তায় দিকে ওদের মন এগোয়নি। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ আপন সাধনার জোরে জাগ্রতা দক্ষিণেশ্বরীকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ওরা সেই একই দিশাহারা দুর্ভাগ্যের সাধনায় জড়িয়ে ধরেছে লেনিনকে—সেই জ্ঞান তার মৃতদেহটাকেও নষ্ট হতে দেয়নি ৩৮ বছরে। ওরা কিছু ভাগ্যে, কোনটাকে অশ্রদ্ধা বা অস্বীকার করেনি। ঘর, সংসার, সমাজ, পিতৃপরিচয়, সম্পত্তির মালিকানা, বিবাহ, বাৎসল্য, নারীর সেই সম্ভ্রম, বৈবাহিক আনুগত্য এবং সত্যতা, সাংস্কৃতিক সৌজন্য ও শালীনতা—যেমন ভারতে, তেমন সোভিয়েট ইউনিয়নে! ঘর ভাঙলে তেমনি করে মেয়েরা কাঁদে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট হলে তেমনি দিশাহারা হতে হয়, বিধবার একমাত্র সন্তানের মৃত্যু ঘটলে পাগলনি তেমনিই হাহাকার করে। কিন্তু ওদের সাথ’ক বিপ্লবের পর নতুন কথা আর ওরা শুনতে চায় না কারো মুখে, নতুন দর্শন ওদের দৃষ্টিতে বিষ, মানুষের উদ্ভীন কণ্ঠনায় আর ওদের বিশ্বাস নেই, কারও ব্যক্তিগত স্বাধীন সন্ত্যর অভিব্যক্তিতে ওরা আর তৃপ্ত হয় না! ওরা একই কাঠামোয় বেঁধেছে একমুখী চিন্তা,—সেই ওদের প্রাণপণ তপস্যা!

‘স্মল্নির’ গেষ্টের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ে কয়েকটি চক্রাকার প্রাসাদ এবং তার কেন্দ্রে লেনিনের এক বিরাট জোরালো প্রস্তরমূর্তি। এটি এখন পার্টির কর্ম-কেন্দ্র। জার আমলে এটি ছিল রাজপুরুষ-পরিবারের কন্যা বিদ্যালয়। এই অট্টালিকার মধ্যে ১৯৩৪-এর ৬ই ডিসেম্বর লেনিনগ্রাড সোভিয়েটের কর্তা কিরভকে হত্যা করে জনৈক ছাত্র। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাশিয়াব্যাপী ধরপাকড় আরম্ভ হয়। অনেকে বলে এটি স্টালিনের পূর্ব-পরিকল্পিত। এই উপলক্ষটি নাকি তাঁরই সৃষ্টি। তিনি তাঁর কোনও সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে জীবিত ও সক্রিয় রাখতে চান না! এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার নিরপরাধ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে স্টালিন ‘লিকুইডেট’ করেন। এর পর

৩৬ বছর অর্ধ রাশিয়ার অন্ধকার যুগ, যেটার নাম বলিদানের যুগ! ললাটে রক্তাভিলেকের চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভীষণচক্ৰ এক কাপালিক, হাতে তার রক্তমাখা খুঁজ, সামনে যুগান্ত। সেই অমান্বধকারে মশাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরেক জন—সে হল কোতোয়াল।

প্রাসাদের মধ্যে মিলিটারি দু-এক জনের আনাগোনা দেখছি। কিন্তু প্রতি কক্ষই লোহার সিঁদুরের মতো নিরেট-ভাবে বন্ধ। শুনলুম প্রতি কক্ষই জন-পূর্ণ। কিন্তু বাহির থেকে সব নিঃসাড়। সোভিয়েট ইউনিয়নের রেওয়াজ হল এই, কর্মরত কোনও উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীর আপিসে প্রবেশ নিষেধ। দেখাশোনা করতে হলে তিনি বাইরে এসে লাউজে বসবেন—সেখানে তাঁর সহ-কর্মী হয়ত থাকবেন দু-একজন।

লেনিনের ঘরটি অত্যন্তই শাদাসিঁধ এবং গরীব। এই ঘরটির থেকেই তিনি প্রথম বাণী প্রচার করেন বিশ্বের উদ্দেশে,—রাশিয়া যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। রাশিয়া সকলের বন্ধু হয়ে থাকতে চায়। আমরা দেশ গঠন করতে চাই। কোনও দেশ বা জাতির সঙ্গে আমরা মনোমালিন্য চাইনে।—সোভিয়েট ইউনিয়ন তার জন্মকাল থেকে যেমন একদিকে শান্তি, মৈত্রী এবং নিরস্ত্রীকরণের বাণী প্রচার করছে অন্য দিকে তেমনি ‘ক্যাপিটালিস্ট’ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিন্দা, ঘৃণা ও বিশেষ প্রচার করে আসছে। তাদের চোখে আজও সোভিয়েট ইউনিয়ন শ্রমের হয়ে ওঠেনি।

লেনিনের ঘরটি দু-ভাগে ভাগ করা। পুরনো ছোট আলমারি আর টেবল, অল্প-স্বল্প সামগ্রী, স্বামী-স্ত্রীর দুটি সামান্য দরিদ্র বিছানা, এটা ওটা—মানুষের জীবন-যাত্রার পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজনের আসবাবপত্র। এখানে পুরনো দলিলপত্রাদি, কয়েকটি সেকালের বিশেষ বিশেষ ঘটনার ফটো, সংবাদপত্রের কাটিং এবং অন্যান্য টুকটাকি বস্তু সম্ভারিত। টেবলের উপর দোয়াত-কলম, লেখার সরঞ্জাম এবং তাঁর সেই টেলিফোন যন্ত্রটি। আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তু হল লেনিনের একটি মূল্যবান ঘোষণাপত্র! এই ঘোষণাপত্রটি বিপ্লববাস্যল্যের অব্যবহিত পরে ভারত-বাসীগণের উদ্দেশে প্রচার করা হয়। ঔপনিবেশিক শক্তি ইংরাজের বিরুদ্ধে আপন শক্তিবলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতালাভ করার জন্য ভারতবাসীগণকে তিনি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে চান। ভারতের সেই পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় তিনি রাশিয়ার পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। ভারতের মুসলমানদের উদ্দেশে তিনি একটি অভিনন্দনসূচক বিশেষ ঘোষণাবাণীও প্রচার করেন।

পরবর্তীকালে ছোট এক টুকরো

ইতিহাস আমি সংগ্রহ করেছিলুম। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে উত্তর আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে একটি বিচ্ছিন্ন ভারতীয় সৈন্যদল ১৯১৭ অথবা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে গোপনে আমুদরিয়া নদী পেরিয়ে মধ্য-এশিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে। সেনা-নাথক ছিলেন জাতিতে মুসলমান। তিনি বহু দুর্ভোগ এবং দুর্গতির মধ্যে অসীম সাহস এবং পৌরুষের সঙ্গে সদলবলে ‘রেডগার্ড’দের পক্ষ নিয়ে ‘হোয়াইট’ গার্ডসদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হন। বোধহয় জনতিরিশেক সশস্ত্র সৈন্য তাঁর সঙ্গে ছিল। তাঁদের পরিণাম কি হয়েছিল জানিনে, কিন্তু তাঁদের সেই গৌরবের ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে এখনও এখানে স্মরণ করা হয়। রুশ-বিপ্লবের পর ইউরোপ এবং আমেরিকার মোট চৌদ্দটি জাতি যেমন ‘হোয়াইট গার্ডস’ নাম নিয়ে নাবালক সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিপক্ষে সোভিয়েট ভূমিতে দাঁড়িয়েই সশস্ত্র শত্রুতা আরম্ভ করে, তেমনি পৃথিবীর বহু জাতির স্বৈচ্ছাসেবকরাও চারিদিক থেকে এসে ওই সোভিয়েট ভূমিতে দাঁড়িয়েই ‘নাবালকটিকে’ আপন আপন বুদ্ধির মধ্যে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক শত্রু ছিল তার আপন ঘরে। তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষ লক্ষ। রুশ-বিপ্লবে রক্তপাত ঘটেনি, কিন্তু বিপ্লবোত্তর কালে সোভিয়েট ইউনিয়নের মাটি রক্তে ভিজ়ে উঠেছিল! যেমন ভারত বিভাগের কালে পূর্ব ও পশ্চিম পাক্ষাবে রক্ত পড়ছিল অনেক। আজ পূর্ব পাক্ষাব শস্য ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ! রক্ত বোধ হয় মাটির উর্বর-শক্তি আনে!

ফিনল্যান্ড উপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আলোকোজ্জ্বল খাস ইউরোপীয় মহানগর লেনিনগ্রাডের দিকে চেয়েছিলুম। লেনিনগ্রাডের অধিকাংশই প্রতীচ্য, মস্কোর অনেকাংশই প্রাচ্য। লেনিনগ্রাড প্রচুর মার খেয়েছে হিটলারের হাতে, কিন্তু জার-সম্রাটদের কৌতুলোদ্দীপক রসালোপে তার অরুচি বা নিরানন্দ নেই। মস্কো মার খেয়েছে কম, উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে অনেক বেশি—কিন্তু জার-সম্রাটের কাহিনী তার কাছে অরুচিকর! পনেরোটি জাতির স্বাধীন রিপাবলিককে মস্কো বেঁধে রেখেছে একই অবিচ্ছেদ্য এবং কঠিন যোগসূত্রে, কিন্তু যে-ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী এবং ঔপনিবেশিক জার-সম্রাটদেরকে সে গালি দেয়, সেই প্রকার ভাষায় আমরা ইংরেজকেও কোন দিন কটাক্ষ করিনি! রুশ-বিপ্লব হল ফরাসী বিপ্লবের সন্তান! কিন্তু ফরাসীরা তাদের বিপ্লবের থেকে শৃঙ্খল পেয়েছিল স্লোগান, রাশিয়া তার বিপ্লবের আগে পেয়েছিল ফরাসীদের মন্ত্র! মস্কোর ‘ডেলী ওয়াকার’ অপেক্ষা ‘লা হিউম্যানাইট’ বিক্রি বেশি। (ক্রমশঃ)

অঙ্গি রেখা

৬২১৮



[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দিলীপ এসে অবধি 'কাঠ-কামানে' কাজ করছিল। একখণ্ড তক্তার উপর রাঁধা চালাতে দিয়েছিলেন কাঠ-মাষ্টার। প্রথম দিন চালিয়েই হাতে ফোসকা পড়ে গেল। কিন্তু ভয়ে কাউকে জানাল না। খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু তাই নিয়েই কেন রকমে কদিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ফোসকাগুগো গলে যখন ঘা হয়ে গেল, তখন আর পারল না। ওখানে যে 'স্টার' বসে 'ছিল' সে দেখতে পেয়ে কাঠ-মাষ্টারের নজরে আনতেই তিনি মুখ ভেঙে উঠলেন, 'নানীর পুতুল! বলিসনি কেন, ফোসকা পড়েছে? যা, হাসপাতালে যা'।

'হাসপাতাল' শব্দে চমকে উঠল দিলীপ। তার ধারণা, সেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না। তার বাবাও আসেননি। তাদের বন্দির লোকেরাও ভীষণ ভয় করত হাসপাতালকে। কারো কলের বা বসন্ত হলে বাড়ির লোকেরা চেপে যেত, পাছে হাসপাতালে যেতে হয়। মাঝে মাঝে যখন খুব রোগ ব্যামো দেখা দিত, কোথা থেকে একটা অশুভ চেহারার মোটরগাড়ি এসে লাগত সামনের কার সেই বাঁকড়া আমগাছটার নীচে। জনকয়েক লোক নেমে গিয়ে গলির ভিতর এ-ঘর ও-ঘর থেকে জোর করে বগীচা লোকে বের করে গাড়িতে পুরে নিয়ে যেত। পাড়া মাথায় করে ভেঙে পড়ত মেয়েদের কান্নার রোল। এসব দৃশ্য সে খুব ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। তাকেও সেই হাসপাতালে যেতে হবে শব্দে অন্তরাখ্যা শূন্য হয়ে উঠল। মাথা নেড়ে ভরে ভরে বলল, আমি যাবো না। আমার বাথা সেয়ে গ্যাছে।

—দূর বোকা! সব্বাই সেখানে যেতে পারলে বেঁচে যায়, আর তুই

বলিছস 'যাবো না'! ভয়টা কী? 'চল' বলে 'স্টার' তার হাত ধরে নিয়ে চলল।

ডাক্তার তখনো আসেননি। কম্পাউন্ডার বসে কি লিখছিলেন। দিলীপকে তারই সামনে হাজির করা হল। তিনি সেই মোটা খাতার পাতা থেকে চোখ না ভুলেই বললেন, 'কী হয়েছে?' জবাব দিল 'স্টার', 'ফোসকা গলে ঘা হয়েছে।' 'কাঠকামান?' লিখতে লিখতেই জিজ্ঞাসা করলেন কম্পাউন্ডার। 'হ্যাঁ'। সঙ্গে সঙ্গে একটা কি নাম ধরে হাঁক দিলেন এবং একজন বড় গোছের ছেলে এসে দাঁড়াতেই বিড় বিড় করে কি সব নির্দেশ দিলেন। মনে হল ইংরেজি কথা, বোধহয় কোনো ওষুধের নাম। ছেলেটা দিলীপের হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল এবং ঘায়ের দিকে চেয়ে বলল, 'অ্যান্ডিন কোথায় ছিল?' দিলীপ কী বলবে ভেবে পেল না। সে তার জন্যে অপেক্ষাও করল না। খানিকটা মলম লাগিয়ে তার উপর তুলো দিয়ে চটপট ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। দিলীপ তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'কী দেখিছস হাঁ করে? বাথা আছে?' দিলীপের মনে হল, তার অর্ধেক যন্ত্রণা তখনই চলে গেছে। মাথা নেড়ে জানাল, না। ছেলেটি বলল, কাল ঠিক এই সময়ে আসবি। ব্যান্ডেজ বদলে দেবো।

কম্পাউন্ডার যেখানে কাজ করছিলেন, তার নাম 'ডিসপেনসারী'। ঘর ভর্তি ভাক, তার উপরে ঠাসা নানা আকারের শিশি-বোতল। কিসের একটা কড়া গন্ধ আসছিল সেই ছোট্ট গুদাম মত কামরাটার ভিতর থেকে। তার পাশের ঘরখানা অনেক বড়। সেটা হল 'ওয়ার্ড'—এ স্টার ছেলেটিই সব বুদ্ধি দিয়ে দিচ্ছিল। 'চল না?' দেখাবি' বলে সেখানেও নিয়ে গেল। পাশাপাশি কয়েকখানা লোহার খাট, তার উপরে লাল কম্বল মোড়া

বিছানা। বেশীর ভাগ খালি। দু'তিনটিতে কারা সব শুয়ে আছে। ওদের অসুখ। তিন চারটা ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারই একজনকে ধমকে উঠল 'স্টার', এই জগা, তুই এখানে কী করিছস? দাঁড়া এখনই চীফ অফিসারকে বলে দিচ্ছি।

—বারে, আমি খালি খালি এসেছি নাকি? নাকী সূরে প্রতিবাদ জানাল জগমোহন।

—না, না; কে বললে খালি খালি! ভয়ানক পেট কামড়াচ্ছে, কি বলিস?

—'কামড়াচ্ছে তো'—রীতিমত দুট উত্তর। মৃগুও গাম্ভীৰ্যের অভাব নেই। শব্দ ঠোঁটের কোণে লেগে রইল এক টুকরা দুর্দৃষ্টি জড়ানো হাসির আভাস, যার অর্থ—সুস্পষ্ট।

—তুই কেন এসেছিস? তোর আবার কী হল?—এ প্রশ্নের লক্ষ্য আরেকজন। উত্তরে সে গলটাকে যন্দুর সম্ভব মিহি ও করুণ করে বলল, বস্তু মাথা ধরেছে।

এতবড় একটা কঠিন অসুখের খবর পেয়েও 'স্টার' কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখাল না, বরং হো হো করে হেসে উঠল।

মাথাধরা ও পেট কামড়ানো—এ দুটোই এখানকার ক্রনিক ব্যাধি। রোগীর পক্ষে মস্ত বড় সুবিধা—বাইরে কোনো লক্ষণ নেই, রোগ পরীক্ষার সাধারণ যন্ত্র দিয়ে ধরা যাবে না, 'সুতরাং 'নেই' বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। এর জন্যে দুটি বাঁধা মৃদুচোষা ঠিক করে রেখেছেন ডাক্তারবাবু, প্রচলিত নিদান শাস্ত্রে যার উল্লেখ নেই। দুটোই ও'র পেটেন্ট। পেট কামড়ানো—কেস-এ ব্যবস্থা হল স্নেফ জল সাব, আর মাথা ধরার ক্যাস্টর অয়েল। ওষুধ প্রয়োগ করার আগেই

বেশীর ভাগ রুগী চম্পট দেয়। তবু একটা রাত, (কখনো কখনো তার চেয়েও বেশী) ‘অবজারভেশনে’ থাকা যায়। এটুকুই লাভ।

হাসপাতাল সম্বন্ধে দিল্লীপের পুরনো ধারণা বদলে গেল। ভয় পাবার মত তেমন কিছু তো নেই এখানে। বৃদ্ধিতে পারল না, তবে বিন্ধিত লোক-গুলো অত ভয় করত কেন। কেমন করে বৃদ্ধবে? অ্যাম্বুলেন্সে বন্ধ করে তাদের যেখানে নিয়ে ফেলা হত, সেই সব বহুং বহুং ‘আরোগ্য নিকতনের’ আসল রূপ তো সে কখনো দেখেনি। বড় হয়ে হয়তো দেখে থাকবে।

হাতের ঘা-কাঁদনেই সেরে গেল। তার পরেও সে কাঠ কামানেই রইল, কিন্তু ছুতোয়ার হাতিয়ার ছেড়ে বদলি হল রংপালিসের ঘষামাজার। তাও নামে মাত্র। শূদ্ধ সে নয়, সকলেই প্রায় তাই। সাহেব যতক্ষণ না ঘুরে যান, ততক্ষণ টুকটাক, খুটখুট। কেউ দূটো পেরেক ঠুকছে, কেউ একটু করাত চালাচ্ছে। সেই কোন মাঝাতার আমল থেকে তৈরী হয়ে পড়ে আছে খানকয়েক গাম্ভী আসবাব—একখানা ক্যাম্প চেয়ার, দুটো টুল, একটি আলনা, আর গুটি-কয়েক খেলনা। সেইগুলো রোজ বেড়ে-বুড়ে লাইন করে সাজিয়ে রাখে ‘গ্টার’। সাহেব চলে গেলেই আবার এলোমেলো করে সারিয়ে রেখে দেয়, বস্ত্রপাতি গুণে গুণে বাজ্ঞে তোলে, তাতে তালা লাগিয়ে চাবিটা দিয়ে দেয় মাষ্টারের হাতে। তিনি বাড়ি চলে যান। ছেলেরাও যে-যার বোরিয়ে পড়ে ওয়াক-শপ ছেড়ে।

এই হল গণিং শিফট, অর্থাৎ প্রাতঃকালীন কর্মসূচী। পরের পর্ব শূদ্ধ হবে দেড়টার পর। মাষ্টার আবার আসেন, এবং আসতেই ‘গ্টার বয়’ কার-খানার কোণে গুটিয়ে রাখা কবলটা মেঝের উপর বিছিয়ে দেয়। তিনি শূয়ে পড়েন, এবং যতক্ষণ তাঁর নাসিকাগর্জন স্পষ্ট না হয়ে ওঠে, ছেলেরা এদিক ওদিক একটু নড়াচড়া করে। তার পরেই ওয়াক-শপ ফাঁকা। কে কোণায় যায়, কেউ খোঁজ রাখে না। কেউ কেউ চলে যায় একদম গেটের বাইরে, কোনো মাষ্টার বা কেরাণীবাবুর বাসায়। সেখানে জল তোলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, ছেলেরা পিলে রাখে, রাত্রের রান্নাবান্নার যোগাড়-বন্দ করে রেখে দেয়। ঐ সময়টা উপরওয়ালাদের মাধ্যমিক বিরাতি। গেট-

কীপারের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, চীফ অফিসারের দ্বিতীয় দফা ডিউটি কিংবা ডেপুটি সুপারের বৈকালিক অফিস শুরুর হবার আগেই সব আবার যথাস্থানে ফিরে আসে।

এই নিষিদ্ধ গোপন কাজগুলোর জাত ও প্রকৃতি যাই হোক, বেশীর ভাগ ছেলের এতে আপত্তি নেই, বরং আকর্ষণ আছে। এই সময়টির জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে। মা, বাপ, ভাই, বোন নিয়ে যে-জীবন, তার স্বাদ অনেকেই পায়নি। অথচ এই সেই বয়স, যখন তার জন্যে সকলেরই মনে মনে তৃষ্ণা জাগে। তাই যতটুকু পায়, তারই লোভ এদের প্রতিদিন বাইরে টেনে নিয়ে আসে—ছক-কাটা রুটিনের মতাহীন ঘূর্ণী থেকে গাছ-পাখী-জীবনের স্নিগ্ধ ছায়ায়। হয়তো সেখানে আসলের চেয়ে মেকীর ভাগ বেশী; স্নেহের সঙ্গে স্বার্থ-বৃদ্ধির খাদ, অনুগ্রহের মধ্যে অবজ্ঞার গন্ধ। তবু, এখানে আসবার আগে তা-ই বা ক’জন পেয়েছে? খুঁজলে দেখা যাবে, দু’চারজন বাদ দিলে সবাই হয়তো কেশব সিকদার কিংবা তার জ্যোতি-গোষ্ঠীর দল।

ওয়াক-শপ থেকে সকলে চলে গেলেও দিল্লীপ একা বসে থাকত। অন্য ছেলেগুলো টানাটানি করলেও যেত না। স্কুল লাইব্রেরী থেকে একটা করে বই নিয়ে আসত। আশুবাবু বেছে দিতেন। নানা ধরনের বই—গল্প ভ্রমণ যথা-পুরুষদের জীবনীচর, দেশ-বিদেশের ইতিকথা, নতুন নতুন আবিষ্কারের কাহিনী। পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেত। জানতেও পারত না কখন চলে গেছেন কাঠমাষ্টার। ওয়াক-শপ বন্ধ করতে এসে পেটি অফিসার ডেকে তুলে দিত। তখন হয়তো জোর ফুটবল চলছে বস্টালের মাঠে। খেলছে চৌন্দ জন, দু’দিক থেকে গলা ফাটাচ্ছে চার-চৌন্দং ছাপ্পান।

কাঙ্ক্ষামান থেকে বোরিয়ে দেবদারু গাছের লাইন বাঁয়ে রেখে পশ্চিমদিকে এগোলেই প্রথমে পড়ে স্কুলবাড়ি। তার পরেই খান-দুই কামরা নিয়ে দিল্লীপের রহস্য জগৎ। জানালার ঠিক ধারেই একটা অস্ফুট যন্ত্র। সামনে দাঁড়িয়ে একটা বড় ছেলে পা দিয়ে নীচের দিকে কোথায় দোলা দেয় অমনি ঘূটর ঘূটর করে চলতে থাকে লোহার ডাম্‌ডাগুলো, একটা ছোটখাটো দৈত্য যেন হাড়গোড় নেড়ে জেগে ওঠে। ছেলেরা পা চালাতে থাকে আর ডান হাত দিয়ে ক্ষীপ-

গতিতে টেনে নেয় বড় বড় কাগজের সীট। সেগুলো এক সেকেন্ড আগে ছিল সাদা যখন বোরিয়ে আসে আগাগোড়া লেখায় ভর্তি!

আসতে যেতে জানালার ধারে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে দেখতে দিল্লীপ। নিশ্চয়ই কোনো যাদু আছে ঐ ঘূর্ণমান যন্ত্রটা আর তার ঐ একটানা ঘট ঘট আওয়াজের মধ্যে। দেখতে আর ভাবতে কবে সে ঐ ছেলেটার মত বড় হবে, এখানে দাঁড়িয়ে অমনি কবে অনায়াসে চালাবে ঐ অস্ফুট কলটাকে। শূদ্ধ কি ঐ একটা? ওর চেয়েও কিস্তুত কিমাকার কালো কালো আরো কত-গুলো যন্ত্র সারি সারি সাজান ছিল দেয়ালের ধারে। তাছাড়া ছিল এক সার বড় বড় কাঠের ডালা, তার মধ্যে এক-রাশ ছোট ছোট লোহার টুকরো। বাহাদুর বলোছিল, লোহা নয়, সীসা; ওগুলো সব অক্ষর যার নাম টাইপ। দু’তিনটি ছেলে খড়ম পায়ে ঐ ডালার সামনে দাঁড়িয়ে একটি একটি করে তুলে তুলে ঐ টাইপগুলো পর পর সাজিয়ে ফেলত ছোট এক খণ্ড পেতলের তক্তার উপর।

ওরা খড়ম পরে আছে কেন? জানতে চেয়েছিল দিল্লীপ। বাহাদুর বলোছিল, সীসাতে একরকম বিষ আছে। পায়ে ঘা হতে পারে কিনা তাই।

—হাত দিয়ে ঘাঁটছে যে?

—হাতেও একটা কিছু পরা উচিত। এখানে সে সব নেই। কী করবে, খালি হাতেই কাজ করতে হয়।

বাহাদুরের কাছেই শোনা। এর নাম প্রেস—ছাপাখানা। কোন কোন অফিসের কি সব কাগজপত্র ছাপা হয়। সেই এখানকার গ্টার। সব কিছুর তদারক করে, নতুন ছেলেদের শেখায়, আবার দরকার মত কলও চালায়। প্রেস এর সব কাজ সে শিখে নিয়েছে। প্রেসমাষ্টার খুব ভালবাসেন তাকে। দু’চোখে গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে দিল্লীপ চেয়ে দেখত এই ছোট-চোখ চ্যাণ্টা-নাক হাসি-হাসি মধু শান্ত ছেলেরা দিকে। তাকে সবাই কেমন তাচ্ছিল্য করে বলত বাহাদুর, দিল্লীপ বলত বাহাদুর-দা। বাহাদুর ভরসা দিয়েছিল আর একটু বড় হলেই সে সাহেবকে বলে দিল্লীপকে প্রেসেও নিয়ে আসবে এবং নিজের হাতে বস্ত্র করে সব কাজ শিখিয়ে দেবে। সেই

শুভদিনের অপেক্ষায় সে বসে বসে দিন গড়ছিল।

সেদিনটিও যে তার জন্যে এত কাছে এসে অপেক্ষা করছে, দিলীপ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ডেপুটিবাবু যখন ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিলেন, কাল থেকে তিন ঘণ্টা করে তাকে প্রেস-এর কাজ শিখতে হবে, সে যেন হাতে স্বর্ণ পেয়ে গেল। তার সঙ্গে আর একটি ছেলে এল দজিকামান থেকে। তার নাম মকবুল, থোকার চেয়ে কয়েক বছরের বড়, ফর্সা রং, স্বাস্থ্যও বেশ ভাল। প্রেসমাস্টার বাহাদুরকে ডেকে ওদের কম্পোজ শেখাতে বলে দিলেন আর বললেন মন দিয়ে পড়াশুনা করতে। তা না হলে কাজ শিখতে পারবে না, শিখেও কোন লাভ হবে না। এটা শুধু হাতের কাজ নয়, তার সঙ্গে মাথাও।

মকবুল খানিকটা উপরের দিকে পড়ে, মোটামুটি ইংরাজী জানে। তাকে দেওয়া হল ইংরাজী হরফ, আর থোকাকে বাংলা। থোকার বোঁক মৌসিনের দিকে। বাহাদুরকে একান্তে পেয়ে চুপিচুপি বলল, ওখানে কবে যাবো বাহাদুর দা?

সে হেসে ফেলল, দাঁড়াও, ট্যাংদুটো আরেকটু লম্বা হোক, তবে তো।

মকবুলের সঙ্গে দিলীপের জ্ঞান-শুনো ছিল, মিশবার সুযোগ হয়নি। তবে প্রথম থেকেই ভালো লেগেছিল ছেলোটিকে। এবারে আরো ভালো লাগল এবং দু'দিনেই ভাব জমে উঠল। মকবুল ওকে বলত, বড় ছেলেগুলোয় সঙ্গে কথখনো মিশাও না।

—কেন? জানতে চাইত দিলীপ।

—ওরা ভালো না।

দিলীপ ঠিক ধরতে না পেয়ে তাকিয়ে আছে দেখে বলত, আর একটু বড় হ, তখন ধুকবি।

বুঝতে অবশ্য বেশী দেরি হয়নি। কয়েকজন বড় ছেলে—বিশেষ করে সতীশ এবং সিরাজুল যেসব বিদ্রী কথা বলত, গায়ে পড়ে যেভাবে ভাব করতে আসত, দুপুরবেলা কিংবা সন্ধ্যার পর ফাঁক পেলেই আড়ালে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করত, তার থেকে সমস্ত দলটার উপরেই তার কেমন বিতৃষ্ণা গড়ে উঠেছিল। মকবুলের মত সেও ওদের এড়িয়ে লেতে শুরুর করল। কিন্তু, দেখে অবাক

হয়ে গেল, একদল ছোট ছেলে, তার মধ্যে কেশোণ ছিল, ঐ ছেলেগুলোর ভীষণ নেওতা। ওদের সঙ্গে ঘোরে, দুপুরের দিকে যখন অফিসাররা কেউ থাকেন না, ওয়াকশপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওদের হাত ধরে কোথায় কোথায় চলে যায়। বড়দের মধ্যে অনেকে ছিল 'গটার বয়'। তারা যে বাড়তি খাবার পেত ডিম, মাছ, মাংস, তার খানিকটা করে ভাগ এই পেটোয়া ছোট ছেলে-গুলোকেও খেতে দেখেছে দিলীপ। তাকেও কোনো কোনো 'গটার' সাধাসাধি করত, কিন্তু সে রাজী হয়নি।

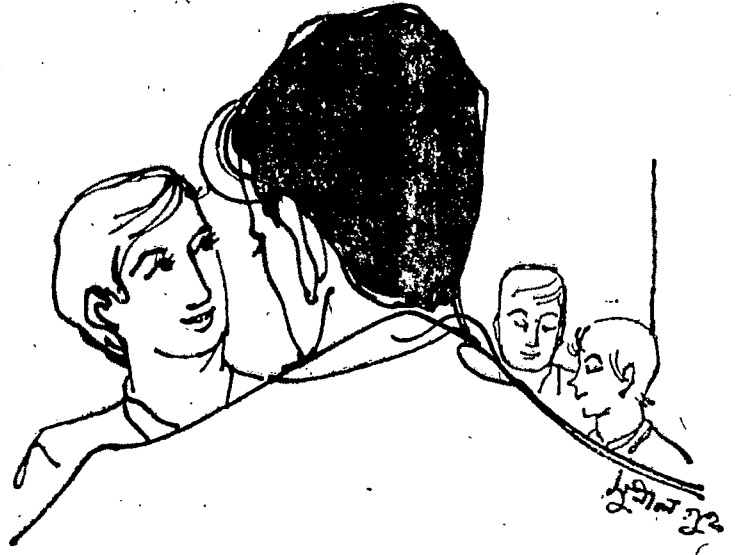
বড়দের মধ্যে একজন ছিল সবদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। সে বাহাদুর। ছোটদের, বিশেষ করে দিলীপকে সে খুব ভাল-বাসত, কাছে বসিয়ে কত কথা বলত, কিন্তু কোনোদিন অন্যায়ভাবে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেনি। তারও একটা জিনিস দিলীপ পছন্দ করত না—দুপুরবেলা গেটের বাইরে চলে যাওয়া।

আজাদা এবং একা। মাঝে মাঝে লুকিয়ে নিয়ে যেত একটা সেন্স ডিম, কিংবা দু-টুকরো মাংস—গটার হিসেবে তার যে খাবার, কিংবা হাসপাতাল থেকে চেয়ে আনা একটু চিনি, চা বা দু-এক স্লাইস পাউরুটি। কখনো কখনো ওর হাতে থাকত ছোটদের পড়বার মত কোনো বই, একটা খাতা বা পেনসিল। সবটাই হত গোপনে; শুধু দিলীপের কাছে লুকো-বার চেষ্টা করত না। কিন্তু কোথায় যায়, কার জন্য নিয়ে যায় ঐ জিনিসগুলো, সেটা কোনোদিন বলেনি, দিলীপও করবো করবো করে জিজ্ঞেস করেনি। একদিন বলে ফেলল, দুপুর বেলা তুমি কোথায় যাও, বাহাদুর-দা?

—যাই এক জায়গায়। একজনকে দেখতে।

—কে সে?

বাহাদুরের মুখে একটা স্লান ছায়া ভেসে উঠল। দু'রে মটির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, তোকে একদিন



...আর বললেন মন দিয়ে পড়াশুনা করতে...

আর যারা যেত, তারা যে এ-বাসার ও-বাসায় কাজ করতে যায়, সেকথা কারো অজানা ছিল না। দিলীপও জানত। খাবার সময় তাদের কারো হাতে থাকত নতুন বাঁধা খাটা, কারো হাতে লোহা-কামানে তৈরী একটা আলুমিনিয়ামের মগ, কিংবা গুদাম থেকে খানিকটা ফিনাইল বা ঐ জাতীয় ঘর-সংসারের টুকটাকি দরকারী জিনিস। তারা যখন বেরোত, প্রায়ই দল বেঁধে। এবং সঙ্গে থাকত পেটী অফিসার। বাহাদুর যেত

বলবো। কিন্তু দেখিস, আর কেউ যেন জানতে না পারে।

—আমি কাউকে বলবো না।

—আমি জানি। সেই জন্যেই তো তোকে আমি সব বলতে পারি। কদিন যাক; তার পরে। কেন?

দিলীপ মাথা নেড়ে জানাল, আচ্ছা।

মকবুলের সঙ্গে যখন আরো ভাব হল, একদিন নিজের কথা—নিজের কথা মানেই মায়ের কথা—বলতে বলতে

দিলীপ হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, তোমার মা আছেন?

—আছে।

—চিঠি লেখেন তোমাকে?

—মা লিখতে জানে না।

—বাড়ির কোনো চিঠি পাও না?

—বাবা লেখে মাঝে মাঝে। আমি তার একটারও জবাব দিইনি।

—কেন? বিস্মিত হল দিলীপ।

—কী হবে চিঠি লিখে? এই বেশ আছি।

দিলীপ বুঝতে পারল না কী বলতে চায় মকবুল, তবু চুপ করে রইল। তার বাবাকে সে দেখেনি বললেই হয়। তবু কেমন করে যেন মনে হয়, তিনি যদি থাকতেন, আজ তাকে এখানে আসতে হত না। মার বাপ আছে তার আর ভাবনা কি? কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তবে কি এও কেশবের মত? বাবা থাকতেও নেই?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি মনে করে আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ভাই তুমি জেলে এলে কেমন করে?

মকবুলের চোখ দুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। সেই মূহুর্তে এরই সঙ্গে জড়িত কোনো প্রসঙ্গ বোধ হয় ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল তার মনের মধ্যে, ঐ প্রশ্নটা তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। দিলীপ মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু বুঝতে পারল না এতে রেগে যাবার কী আছে। একথা তো তাকেও কতজনে জিজ্ঞাসা

করেছে, অনেকে আবার নিজেকে থেকে বলে গেছে তার কাছে।

মকবুল ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, মনে মনে লজ্জিত হয়েছে বন্ধুর কাছে এই আকস্মিক ভাবান্তর প্রকাশ হয়ে পড়ায়। মৃদু হেসে ওর কাঁধে হাত দিয়ে অন্তরঙ্গ সুদূর বলাল, চল, খেলতে যাই।

দিলীপ নিঃশব্দে পাশে পাশে চলল। কিছুক্ষণ পরে তেমনি কাঁধে হাত রেখেই বলাল মকবুল, কেমন করে জেলে এলাম জানতে চাইছিল? সে সব কথা তোকে বলা যায় না ভাই।

—কেন?

—তুই বুঝবি না।

—বুঝবোনা কেন?

—তুই যে বন্ড ছেলে মানুষ।

কথাটা দিলীপের পছন্দ হল না। এমন কি ছেলেমানুষ সে? আর মকবুলই বা এমন কি বড়! খানিকটা অভিমান হল বন্ধুর উপর। তাই অপ্রসন্ন মুখে চুপ করে রইল।

দিন কয়েক পরে প্রেসে ছুটি হবার পর মকবুল তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে চুপিচুপি বলাল, জানিস, বাহাদুরের নামে 'রিপোর্ট' হবে।

দিলীপ যেন আকাশ থেকে পড়ল বাহাদুর এমন কী করতে পারে মার জন্যে 'রিপোর্ট' হবে! বলাল, কেন?

—ব্যান্ড মাষ্টারের বাড়িতে কী সব মেয়েছেলে নিয়ে ব্যাপার। ওখানে ও

যায়তো প্রায়ই। মাষ্টারের বৌ গিয়ে বলে দিয়েছে চীফ অফিসারের কাছে। তাতে আর মাষ্টারে কথা হচ্ছিল; আমি হঠাৎ গিয়ে শুনতে ফেলেছি। এখনো কেউ কিছু জানে না।

দিলীপ কিছু বুঝতে না পেরে বলাল, কী করেছিল বাহাদুর?

—মাষ্টারের একটা মেয়ে আছে না? তার সঙ্গে নাকি,—থাক, ওসব কথা তোকে শুনতে নেই।

দিলীপের মাথার ভিতরটা যেন ওলটপালট হয়ে গেল। বাহাদুর তো তেমন ছেলে নয়। কোনো রকম মন্দ কাজ সে করতে পারে, এ যে একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না। মকবুল একমনে কী ভাবছিল। খানিকক্ষণ পরে আবার শোনা গেল তার কথা। আর কাউকে নয়, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে, এমনি ভাবে বলাল, বাহাদুরের কোন দোষ নেই; নিশ্চয়ই ঐ মেয়েটা মিথ্যা করে লাগিয়েছে ওর নামে। ওরা সব পারে।

বলতে বলতে যেন কতদূরে চলে গেল মকবুল, তারপর হঠাৎ কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল। চোখদুটো থেকে একরশ আগুন ঠিকরে এল। দিলীপের দিকে ফিরে বলাল, জানিস? আমার নামে সে-ও এমনি বদনাম দিয়েছিল। আমি নাকি জোর করে অত্যাচার করেছি। মিথ্যা কথা। সে-ই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মটর ক্ষেতের মধ্যে। আমার চেয়ে সে দু বছরের বড়। আমি তো ইচ্ছে করে যাইনি বাপজান আমার কথা বিশ্বাস করল না, জুতো দিয়ে মারল আমাকে। তারপর সেই অতো রাত্তিরে ঘাড় ধরে বের করে দিল বাড়ি থেকে।

মকবুলের দু চোখ জলে ভরে উঠল, আর সেই দিকে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল দিলীপ। স্পষ্ট কিছুই বুঝল না, কিন্তু কিছু না জেনেও একটা দৃঢ় প্রত্যয় হল তার মনে—মকবুল কোনো দোষ করেনি। কে একটা মেয়ে তার নামে মিথ্যা দোষারোপ করেছিল, আর তার বাবা তাকে জুতো মেরে রাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। সব বাপই বোধহয় এমনি। কে জানে, হয়তো তার বাবাও ঠিক এই করতেন। ছোট হলেও, সেই মূহুর্তে সমস্ত পৃথিবীর উপর কেমন একটা অস্পষ্ট ক্ষোভ আর অভিমানে তার সমস্ত মনটা ভরে উঠল। সংসারে সবাই নিষ্ঠুর; কোথাও যেন দয়াময়ী ভালবাসা এ সব কিছু নেই। (ক্রমশঃ)

আরও মজবুত... আরও ভাল

প্রিতলের তৈরি
বার্নার টিউব



'কিম্বা' লন্ডনে
'স্পেশাল কোমার্শি'লি
গ্রাপ দেখিয়া লইবেন।

কিম্বা
লন্ডন
সর্বোৎকৃষ্ট



সম্পূর্ণ লন্ডন মোটা চাদরে
তৈরি ও লন্ডনের লুং কেব্রাসিন
তৈলে নষ্ট হয় না



গোবিন্দ চন্দ্র দাস এণ্ড কোং

২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন-২২-৬৫৮০

বাংলা বইয়ের মেকান ও একান

দেবীশ্রম ভট্টাচার্য

বাংলা বইয়ের ইতিহাস গল্পের মতই রোমাঞ্চকর। অথচ বাংলা বইয়ের পূর্বে সংবাদ বোধহয় এখনো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। প্রাগৈতিহাসিক কাল পর্যন্ত বাংলা বই ছিল হাতে-লেখা পুঁথি। পুঁথির মধ্যে অনেক সম্পদ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যিক ঐশ্বর্য ছাড়া পুঁথির নিজস্ব আর কোন বিশেষ ইতিহাস নেই। থাকলেও আমাদের আজ তা জানবার সুযোগ কোথায়। কত পুঁথি অক্ষয় অবহেলার নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরকালের কোন কবিশপ্রার্থী লিপিকারের অসাধুতায় মূল লেখক গেছেন হারিয়ে। পুঁথিশালায় বিগত যুগের মৃত সাক্ষী হয়ে শব্দ পড়ে আছে পুঁথিগলি।

কিন্তু একদিন দুজন মানুষের মিলিত চেষ্টার ফলে নিজস্ব ইতিহাসের সম্পদে বিশিষ্ট হয়ে উঠল বাংলা বই। স্বরগীর ১৭৭৮ সালে স্যার চার্লস উইলকিন্স এবং প্রীরামপুরের পণ্ডানন কর্মকার বাংলা হরফে মদ্রাস প্রবর্তন করলেন। একটা নতুন যুগের সৃষ্টি হলো। আজ আমরা কল্পনাও করতে পারব না যে, সৈদিন বাংলা দেশের মানুষের মনস্কী বিপুল আনন্দে মেতে উঠেছিল বেদিন তারা প্রথম হাতে পেল ছাপান বাংলা বই। আজ কোন কোতু-হলী পাঠক প্রীরামপুর মিশন থেকে পাত্রী সাহেবদের উদ্যোগে ছাপা প্রথম মদ্রিত বাংলা বই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' হাতে নিয়ে ছাপা এবং গ্রন্থনের সৌন্দর্যের অভাবে আদৌ তৃপ্ত পাবেন না। তথাপি বিদেশীর সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং উদ্যোগে মদ্রিত এই বই চিরদিন আমাদের কাছে গৌরবের সামগ্রী হয়ে থাকবে।

ছাপাখানা প্রবর্তিত হওয়ার পর অতি দ্রুত বাঙালী সমাজ গ্রন্থ-সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। এর আগে বাঙালীর জীবনে কাব্য-সাহিত্যের কোন সমাদর যে ছিল না তা নয়। কিন্তু তার প্রসার ছিল সীমিত। নিজের জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত সঙ্গী করে বই পাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও পূর্বে নিশ্চয়ই তার সুযোগ ছিল না। হাতে-লেখা পুঁথির প্রচার আর কি এমন বেশী হতে পারে! উনিশ শতকে ব্যক্তি-স্বাভাব্যবোধ যখন আমাদের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দিতে শুরু করল তখন প্রতিটি মানুষ নিজের মনের স্ফিদি মিটাতে তৎপর হয়ে উঠে। দেশজুড়ে চলেছে তখন শিক্ষাপ্রসারের

অক্লান্ত চেষ্টা। মানুষ আপনা থেকেই উন্মুখ হয়ে থাকবে তার নিজস্ব অবসরের নিটোল মনোতীর্থে বইয়ের জন্য। ছাপাখানা চালু হওয়ার পর বাঙালী পাঠক যে কি অদম্য আগ্রহে ছাপা বইকে স্বাগত জানাচ্ছে তার জীবন্ত এক সাক্ষ্য সে-কালের প্রখ্যাত পত্রিকা "সমাচার দর্পণ"-এর একটি উদ্ধৃতিঃ—“গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক এক জায়গায় নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এইরূপে এদেশে বিদ্যা প্রচলিত হইতেছে।”—২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮১৯।

গত শতাব্দীর এই পাঠকদের মধ্যে সমাজের পিছনের সারির মানুষের সংখ্যা অনেক। একদিকে ইংরেজ আমলে ইঠাৎ-বড়লোক বাঙালীদের যেমন বইয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করা একটা বনেদীপনার স্মারক হিসাবে আদৃত হত, অপরদিকে তেমন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী মনের আকাঙ্ক্ষায় সে-যুগে বাংলা বইয়ের উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুল্ক প্রতিষ্ঠার মত বইয়ের গৃহগ্রাহিতা এবং অর্থানুক্রমে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা উনিশ শতকের বাঙালী ধনীরা অনেকেই বিশেষ একটা কৃতব্য বলে মনে করতেন। শোভা-বাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর “সংক্ষিপ্ত সান্ধ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসঙ্গী” নামক বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। সে সময়ের ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ নানা কারণে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী হয়ে বই লিখেছিলেন। তাঁদের লেখা কোন কোন বইয়ের দাম আজকের দিনের টাকার হিসাবেও এত বেশী যে আজো সে-সবের ক্রেতার সম্ভাবনা পাওয়া মুশকিল। ১৮৩৪ সালে লন্ডন সহরে স্যার গ্রেবস হোটন বাংলা ও ইংরেজীতে নতুন এক অভিধান ছাপলেন। তার মূল্য ৮০ টাকারও বেশী। ডক্টর উইলসন ‘এক দিকে সংস্কৃত ও অপর দিকে ইংরেজী’ অভিধান লিখলেন। এগারশ’ ঘোল পৃষ্ঠা। মূল্য ইংরেজী কাগজে একশত টাকা ও পাটনাই কাগজে আশী টাকা। সন ১৮১৯ খৃঃ। ডক্টর উইলিয়াম কেরীর

বাংলা-ইংরেজী অভিধান ২০৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১১০ টাকা। সন ১৮২৫ খৃঃ। একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে জাগে যে সফীত অঙ্কের এইসব বইয়ের গ্রাহক কারা ছিলেন। সাধারণ অথবা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পক্ষে সৈদিনও যেমন আজো তেমন বইয়ের এই দাম ভয়াবহ। তথাপি বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় গ্রাহকের অভাব হয়ত ছিল না। এবং অনুমান করি ধনী বাঙালীর লাই-ব্রেরীর শোভাবর্ধনের জন্য হলেও এসব চড়া দামের বই কেনা হত। ১৮ই জুন, ১৮২৫ তারিখের সমাচার দর্পণে ডক্টর কেরীর বাংলা-ইংরেজী অভিধানের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—“গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে।”

ধনী-নিধন বাঙালী পাঠকের সাগ্রহ পৃষ্ঠপোষকতার বইয়ের বিক্রী এমনভাবে যখন বেড়ে চলল তখন বইয়ের ব্যবসার দিকে কারুর কারুর নজর পড়ল। ক্রমে সৃষ্টি হল পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের। গণ্যাকিশোর ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করে বাংলা পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হন। ছাপা, বইয়ের সমাদর বেশি। অথচ উল্লেখযোগ্য লেখক কে? তার উপর অর্থের প্রলোভনে কোন কোন নীতিহীন ব্যবসায়ী কুরূচি-দম্পন বই ছেপে প্রকাশ করতে থাকে। এতে দুর্ভাগ্য হয়ে কোন এক অজ্ঞাত-নামা পাঠক ছদ্মনামের আড়ালে থেকে ১৮২৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী সমাচার দর্পণের পৃষ্ঠায় তাঁর মর্মবেদনা লিখে রেখে গেছেন। তিনি লিখেছেন যে সহরে ব্যবসার দল আদরসাম্রাজ্য বই পছন্দ করে। তাই এইসব ইতর রুচির বইয়ের এত বিক্রী। অথচ পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থ অবিক্রীত হয়ে পড়ে থাকছে। পত্র-কারের খেদোস্তির মধ্যে সনাতনী দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় থাকলেও সে-সময়ের বাংলা বইয়ের বাজার সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

সে-যুগে অন্যান্য সব জিনিষেরই দাম যখন আজকের তুলনায় এত কম তখন বইয়ের দাম এমন অস্বাভাবিক সফীত কেন? এর সম্ভাব্য উত্তর মনে হয় ছাপাখানার উন্নতি না হওয়ার ছাপা খরচ অনেক পড়ে যেত। ধনী অথবা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়া স্বল্পবিত্ত মানুষের পক্ষে ছাপা খরচ বহন করা সম্ভব ছিল না। তাই গমাজের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মানুষও যখন বই প্রকাশ করতেন তখন তাঁদের অনেককেই বইয়ের ছাপা খরচের কথা ভাবতে হত। ডক্টর উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিকস কেরী এবং রামকমল সেনের ‘কমবেশি হাজার পৃষ্ঠার ইংরেজী-বাংলা অভিধান’ প্রীরামপুর

প্রেসে ছাপা হওয়ার সময় ঘোষণা করতে হয়েছিল—“যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তাম্রমুদ্র লোকের লইতে সস্তুর টাকা ল্যাগিবেক” (১৮২৯, সমাচার দর্পণ)। ধর্মপুত্র দেশে টাকার অভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছাপাতে না পেরে ১৮২৭ সনে ১৭ই মার্চ সমাচার দর্পণের মাধ্যমে কলকাতার আমড়া-তলার শ্রীবেণীমাধব দত্ত “পূর্তাচিন্তা” ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা” করছেন।

ছাপাখানা প্রবর্তিত হওয়ার পর অতি দ্রুত আমাদের দেশে মদ্রণব্যবস্থার উন্নতি হতে থাকে। বইয়ের মধ্যে ছবি ছাপান শুরুর হয় ১৮২১ নাগাদ। রামরত্ন ন্যায়পণ্ডানন ‘মহাভাগবতোক্ত শিবনারদ সংবাদযুক্ত ভগবদগীতা’ বাংলায় অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থে ‘স্বয়মুক্ত নারদ গোস্বামিকে যোগ কহিতেছেন এবং মেনকার ক্রোড়েশ্বারবিশ্বতা ভগবতী রাজা হিমালয়কে যোগ কহিতেছেন’—এই দুখানি ছবি ছাপা আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম যুগের ছাপা বাংলা বই মোটামুটি এই কয় শ্রেণীর—(ক) ধর্ম-গ্রন্থ, (খ) ধর্মীয় আচার-আচরণমূলক গ্রন্থ, (গ) প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণের অনুবাদ অথবা ছায়াবলম্বনে রচিত গ্রন্থ, (ঘ) শিক্ষামূলক—ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যই তখন আধুনিক যুগের নতুন প্রভাবে সবেমাত্র পা-পা করে এগিয়ে চলেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে কোন যুগন্ধর প্রাতিভার তখনো আবির্ভাব হয় নাই। কাজেই সাহিত্যে অর্থক সৃষ্টির বই তখন কোথায় পাওয়া যাবে? তবু ছাপাখানাকে কেন্দ্র করে ভুলপ্রান্তি, আত্মপ্রচার আর অর্থলোভ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কল্লোঁলিত হয়ে উঠেছে বাঙালী পাঠক সমাজ। অনুমতি না নিয়ে একের বই অপরে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হচ্ছে। বইয়ের মধ্যে অপরের লেখা চুরি করে নিজের নামে প্রকাশ করবার কৌশল আয়ত্ত্ব হচ্ছে; আর তার বিরুদ্ধে যথায় যোগ্য প্রতিবাদ এবং আইনের ভয় দেখানো শুরুর হয়েছে। ১৮২৯ সালের ১৫ই আগস্ট দেবীচরণ পরামণিক তাঁর “চন্দ্রকান্ত” নামক পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা করবার জন্য মথুরামোহন মিত্রকে ‘সমাচার দর্পণ’ মারফৎ হুমকি দিচ্ছেন—“যদ্যপি তিনি ঐ.....পুস্তক পুনর্বীর ছাপা করেন তবে আমার-দিগের ঐ প্রস্তুত পুস্তকের ক্ষতির নিশা তাঁহাকে করিতে হইবে এবং একের রচিত গ্রন্থ অন্য ব্যক্তি তাহার অনাভিমতে ছাপা করিলে তাঁবশ্যে যে আইন নিরূপণ আছে তদনুসারে উচিত ফলপ্রাপ্ত হইবেন.....” লেখাচুরির জন্য সে-যুগের স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উপদেশ কোমুদী অথবা প্রদানপুরঃসর

নামক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থের লেখক কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে ‘দর্পণ’মারফৎ এক চিঠি লেখেন—“আমি স্বল্পপাধ্যা দ্বারা বিশেষ পরিশ্রমে গণপাতি দিনপাতি পশুপাতি এবং ভগবদ্গুণবর্ণনা পূর্বক যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলাম তাহা তেঁহ প্রচ্ছন্নভাবে হরণকরত আমার অনাভিমতে নিজে বিরিচিত বলিয়া স্থানে ২ দুই একটা শব্দান্তর করিয়া উক্ত পুস্তকের প্রথমার্ধেই প্রকাশ করিয়াছেন সুধীবীর মহাশয়েরা কালীমোহনের আশ্চর্য বিদ্যা পাণ্ডিত্য ও ব্যবহার এবং সাহসের ব্যাপার বিবেচনা করুন.....আমি অন্যান্য কবিতার সহিত সেই কবিতা সমুদয় যোগ করিয়া অবিলম্বে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব এবং কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় নতুন গ্রন্থ প্রকাশে যে চৌর্য-বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্ম অবশ্যই কোন উপায় করা যাইবেক।” ‘সংবাদ-প্রভাকর’ সম্পাদকের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সে-সময়ের কোন লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। লেখকের বিনা অনুমতিতে বইয়ের পুনর্মদ্রণ অথবা লেখা চুরি করা ঘৃণিত কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই হীন কাজ এবং তার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বাঙালীর পুস্তক-সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায় না কি?

সে-সময়ের বাঙালী পাঠকের (সংখ্যা সীমাবদ্ধ হলেও) ভালো বইয়ের জন্য কী উদগ্র আগ্রহ! কী বিপুল উচ্ছ্বাসে ভালো বই প্রকাশ হওয়া মাত্র তাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে! সে-সময়ের পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। অসামান্য পুস্তক ব্যবসায়ীর অত্যধিক অর্থলোলুপতার নিন্দা করে লেখাকে ‘মিশন’-এর পর্ষায়ে উন্নীত করে যত প্রশংসাই করা হক না কেন পাঠকের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে বইয়ের ব্যবসায়ও তত পুষ্ট হয়ে উঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মিত্রবিশ্বকর্মে শুরুর থেকেই বাংলা সাহিত্য যখন সৃষ্টি-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল তখন বাঙালী সমাজে পাঠকের সংখ্যা অনেক। যদিও শ্রীমধুসূদনের প্রথম নাটক ‘শর্মিস্টা’ মৃদু হইয়াছিল পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থসাহায্যে তবু বাংলা উপন্যাসের বিক্রী সে-যুগে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে শ্রীমধুসূদনের মেঘনাদবধ ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। রাজা দিগম্বর মিত্র মেঘনাদবধের ১ম সংস্করণের প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। মদ্রক সংস্থার নাম উল্লিখিত থাকলেও মূল্যের উল্লেখ নেই। কাব্য-সাহিত্যের ব্যবসায়িক মূল্য সেদিন ছিল না। গল্প-কথার চাহিদা কিন্তু বিপুল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বেতাল পঞ্চ-বিংশতি”র ২য় সংস্করণের ডুমিকার বলা হয়েছে—“ফলতঃ, দুই বৎসরের

অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মৃদুত সমস্ত পুস্তক নিঃশেষরূপে পর্যবসিত হয়।” বঙ্গমচন্দ্রের বইয়ের বিক্রী আজকের দিনেও নিশ্চিতরূপে লোভনীয়। শচীশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তালিকা হতে জানা যায় বঙ্গমচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় দুর্গেশনন্দিনী ১২৫০০, কপালকুন্ডলা ও বিষবৃক্ষ প্রত্যেকটি ৭০০০, আনন্দ-মঠ, মৃণালিনী প্রত্যেকটি ৬০০০, দেবী-চৌধুরাণী, রজনী প্রত্যেকটি ৫০০০, কৃষ্ণকান্তের উইল ৪০০০ খণ্ড বিক্রী হয়। তাঁর দুর্গেশনন্দিনীর স্বাগত সম্বর্ধনা যে কী বিপুল হয়েছিল তা বোঝা যায় এই বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ ও অনুবাদগুলি লক্ষ্য করলে। তাঁর জীবিতকালেই দুর্গেশনন্দিনীর ১৩টি সংস্করণ হয় ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জে, এফ, রাউন, বি, সি, এস, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক এই বই রোমান অক্ষরে রূপান্তরিত হয় এবং থ্যাকার্স স্পিৎক এন্ড কোং তা প্রকাশ করে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চারুচন্দ্র মূখার্জি ‘দী চিফটেনস্ ডটার’ নামে এর ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মী থেকে কে কৃষ্ণ দুর্গেশনন্দিনীর হিন্দুস্থানী, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বেনারস থেকে জি সিংহ হিন্দী এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর থেকে অন্য কেউ কানাড়ী অনুবাদ করেন।

সব চাইতে আনন্দের বিষয় এই যে, ঊনবিংশ শতকের ধনিক-প্রধান কলকাতার সমাজেও বাঙালী সাহিত্যিক পেয়েছেন সম্রাট স্বীকৃতি। ১৮৩৯ সালে গ্রান্ট সাহেব “পূর্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ সংখ্যক” যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাতে সমাজের অন্যান্য কার্তি-মানদের সঙ্গে স্থান লাভ করেছেন ‘বঙ্গ ভাষার গ্রন্থকর্তা শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ চরবতী’।

অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা বই আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে তাতে আর্থিক দিক থেকে আশার লক্ষণ দেখা যায়। বাংলা বইয়ের ব্যবসায় জগতে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চপল শোখীনতার পর ক্রমে আজ সংঘ-বদ্ধ হতে চলেছে। মদ্রণ-সৌষ্ঠব, প্রচ্ছদ-পারিপাট্য এবং বিজ্ঞাপনের নিপুণ ব্যবস্থা বাংলা বইয়ের আকর্ষণ আশাতীতভাবে বৃদ্ধি করেছে। কিছুকাল আগেও বাংলা বইয়ের এ-সব দিকে প্রকাশক বা পাঠক আদৌ নজর দিতেন না। আজ বাংলা বইয়ের অঙ্গ-সজ্জা এবং বিক্রীর পরিমাণ অবশ্যই লোভনীয়। কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বাড়ছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অন্তত আজকের জগতে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান-আহরণ এবং জ্ঞান-বিতরণের যতো সুযোগ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তার যে যথেষ্ট সন্দেহবহর হচ্ছে না এটা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

বিজ্ঞানের কথা

অস্পষ্টতা

॥ জীবজগতের লড়াই ॥

কলকাতা রাস্তায় ষাঁড়ের লড়াই নিশ্চই অনেকে দেখেছেন। পর্বতপ্রমাণ দেহ নিয়ে দুই বলদপণী জীব ঠোকাঠুকি করছে, ট্রাম-বাস বন্ধ, চারদিক থেকে উৎসাহী দর্শকদের হাততালি—এ দৃশ্য কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে প্রায় সোজাই দেখতে পাওয়া যায়। এই ষাঁড়ের লড়াইতেও একটি বিষয়ে লক্ষ্য করবার মতো। যে ষাঁড় অনায়াসেই একটি শিঙ-এর গর্তোয় বাঘকে পর্যন্ত কাবু করতে পারে সে কিন্তু নিজের স্বজাতির সঙ্গে লড়াই করবার সময়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে শিঙ ব্যবহার করে থাকে। ষাঁড়ের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কোনো ষাঁড় আহত হয়েছে এমন আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। তারা শুধু শিঙে শিঙ বাজায় আর শিঙে শিঙ ঠেকিয়ে পরস্পরকে ঠেলা-ঠেলি করে। শেষ পর্যন্ত যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে তার হার। এ-ব্যাপারেও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে হার স্বীকার করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার পরে বিজয়ী ষাঁড় কখনো তাড়া করে না। এই ষাঁড়ের লড়াই দেখে নিশ্চই মনে হতে পারে ভারতীয় কুস্তিতে যেমন কতকগুলো নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়, এক্ষেত্রেও যেন তাই। কিন্তু স্পেনে এখনো যারা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করে তাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু একেবারেই ভিন্ন। মানুষের সঙ্গে লড়াইয়ে ষাঁড় সুযোগ পেলেই শিঙের গর্তোয় মানুষকে এফোড়ি ওফোড়ি করে দেয়।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন, একই প্রজাতির মেরুদণ্ডী জীবরা যখন পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে তখন তা যেন অনেকটা টুর্নামেন্টের মতো হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ পরস্পরকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কখনো লড়াই করে না। তাদের এই লড়াই পরস্পরের শক্তি-পরীক্ষা মাত্র। যে কোনো একজন হার স্বীকার করা মাত্রই লড়াই শেষ।

অথচ লড়াই না করেও এই মেরুদণ্ডী জীবরা থাকতে পারে না। দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে কি শুরুর হয়ে গেল গুঁতোগুঁতি আর ঠেলাঠেলি। মাছ থেকে মানুষ পর্যন্ত সকল মেরুদণ্ডী জীবের মধ্যেই এটি একটি সাধারণ লক্ষণ। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে, মেরুদণ্ডী জীব মাত্রই মারমুখী।

এরিনতে মনে হতে পারে, মারামারি হওয়াটাই স্বাভাবিক। একই প্রজাতির জীব একই ধরনের খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে

বেড়ায়, একই ধরনের উপকরণ দিয়ে বাসা তৈরি করে, একই ধরনের পরিবেশ পছন্দ করে। কাজেই, জোর যার মূলত্ব তার—এই নীতির জয়জয়কার অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ, মনে হতে পারে, বেঁচে থাকার তাগিদ থেকেই মেরুদণ্ডী জীবরা মারমুখী হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই হচ্ছে রীতি।

কিন্তু এই যুক্তি পুরোপুরি প্রয়োগ করতে বাধা আছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের রীতিই যদি হবে পরস্পরকে ঘায়েল করে চলা তাহলে মারামারির ফল সর্বক্ষেত্রেই চূড়ান্ত হতে দেখা যেত। একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত অপরজন কিছুতেই থামত না।

কিন্তু বাস্তব সাক্ষ্য এই সিদ্ধান্তের বিপরীত। একই প্রজাতির জীবরা পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করে বটে, কিন্তু এই মারামারির শেষ ফল একজনের প্রাণসংহার নয়। যদি তাই হত তাহলে জীবজগতের অস্তিত্বই হয়তো এতদিনে নিশ্চই হয়ে যেত। জীবজগত রয়েছে, আমরা রয়েছি (যদিও আমরা মানুষরা এমন পরমাণু বোমা তৈরি করেছি যা কোটি কোটি বছরের মারামারির পরেও টিকে থাকা জীবজগতকে এক লহমার মধ্যে ধ্বংস করতে পারে), এ থেকেই প্রমাণ হয় যে জীবজগতের মারামারিটা অনেকটা যেন নিয়মপালনের ব্যাপার। এই মারামারিতে বিজিত পক্ষই যে দুর্বল পক্ষ তা সব সময়ে নাও হতে পারে। কিন্তু বিজিতকে বিজয়ীর জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। তার মানে, বোঝা যাচ্ছে, একই প্রজাতির জীবরা মারামারি করে বলেই আরো বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের পক্ষে এটি নিশ্চই জরুরি প্রয়োজন।

তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে একই প্রজাতির জীবদের মধ্যে লড়াই বা মারামারি হওয়াটা অনেকটা যেন নিয়ম-রক্ষার ব্যাপার, যাকে বলা যেতে পারে রিচুয়াল। জীবজগতের লড়াইয়ের কায়দাকানুন খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার পরেই বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

‘কায়দাকানুন’ কথাটার আপাত্তি উঠতে পারে। বলা যেতে পারে মানুষ কায়দাকানুন শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, অতএব মানুষের লড়াইয়ে কায়দাকানুন থাকতে পারে।

কিন্তু দুটি হিংস্র সাপ যখন লড়াই শুরু করে তখন তাদের লড়াইয়ে কায়দা যদিও

থাকে, কানুন থাকতেই পারে না। হিংস্র সাপ একে অপরকে যেমনভাবে পারবে ঘায়েল করতে চেষ্টা করবে।

কিন্তু বাস্তব সাক্ষ্য এর বিপরীত। বিশেষ করে হিংস্র জীবদের লড়াই দেখলে সত্যি সত্যিই মনে হয়, তারা যেন অনেকখানি বাঁচিয়ে চলেছে। তাদের লড়াইয়ের যেন কতকগুলো অলিখিত ধর্মতানীতি ও বিধিবিধান আছে। এমন কি বাধানিষেধও আছে। মুষ্টিযোদ্ধারা এমন কখনো কোমরবন্ধনীর নিচে আঘাত করে না, তেমনি এরাও কতকগুলি আইন মেনে চলে।

তাই বলে যেন মনে না করা হয় যে জীবজগতের লড়াইটা সার্কাস-পাটির মণ্ডের লড়াইয়ের মতো লোকদখনো। দুটি সাপ যখন লড়াই করে তখন মরীয়া হয়েই লড়াই করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে লড়াই করবার সময়ে কেউ কাউকে কামড়ায় না। আবার হার স্বীকার করার বা জয় ঘোষণা করারও বিশেষ বিশেষ ভাঙ্গিমা আছে। এই ভাঙ্গিমা প্রদর্শিত হবার পরেই লড়াই শেষ।

সাধারণত দেখা যায় যে-সব জীবের শরীরে মারাত্মক রকমের অস্ত্রসজ্জা নেই তারাই সবচেয়ে মরীয়া হয়ে লড়াই করে। যে-সব জীবের শরীরে অস্ত্রসজ্জা এমনই যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনায়াসে খুন বা মারাত্মক রকমের জখম করতে পারে—সেইসব জীব পলায়নেও খুবই সক্ষম। ফলে বিজিত পক্ষ ঠিক সময়টিতে শরীর বাঁচিয়ে পলায়ন করতে পারে। আর বিজয়ী সাধারণত বীরের ধর্ম মেনে চলে এবং পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বিরত থাকে।

অনেক সময়ে পলায়নের প্রয়োজন হয় না, শুধু একটি ভাঙ্গিমাই যথেষ্ট। কুকুর ও লেকডেগেরা সাধারণত লড়াই শুরু করে কামড়াকামড়ি করে। কিন্তু কোনো একপক্ষ যেই মূহুর্তে তার নরম গলাটা প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে বাড়িয়ে দেয় বা চিত হয়ে শুরুর নরম পেটটা মেলে ধরে তখন প্রতিদ্বন্দ্বী এই ভাঙ্গিমাকেই হার-স্বীকার বলে ধরে নেয় এবং গলায় বা পেটে কামড় দেবার জন্যে কাঁপিয়ে পড়ে না। অনেক সময়ে মানবের কড়া ধমকে পোষা কুকুরকেও এই একই ভাঙ্গিমা আশ্রয় নিতে দেখা যায়। আগেকার কালে মানুষ যখন যুদ্ধ করতে গিয়ে হাতাহাতি লড়াই করত তখনো পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী পদতলে আশ্রয় নিয়ে তাকে বধ করা বীরের ধর্ম বিবেচিত হত না। আজকালকার মানুষ দূরসম্প্রদায়ী অস্ত্র নিয়ে লড়াই করে। কাজেই পদতলে আশ্রয় নিয়ে করুণা ভিক্ষা করার ভাঙ্গিমা করা এখন আর পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে হার-স্বীকারের ভাঙ্গিমা করা বা পলায়ন করার প্রয়োজন জীবজগতের

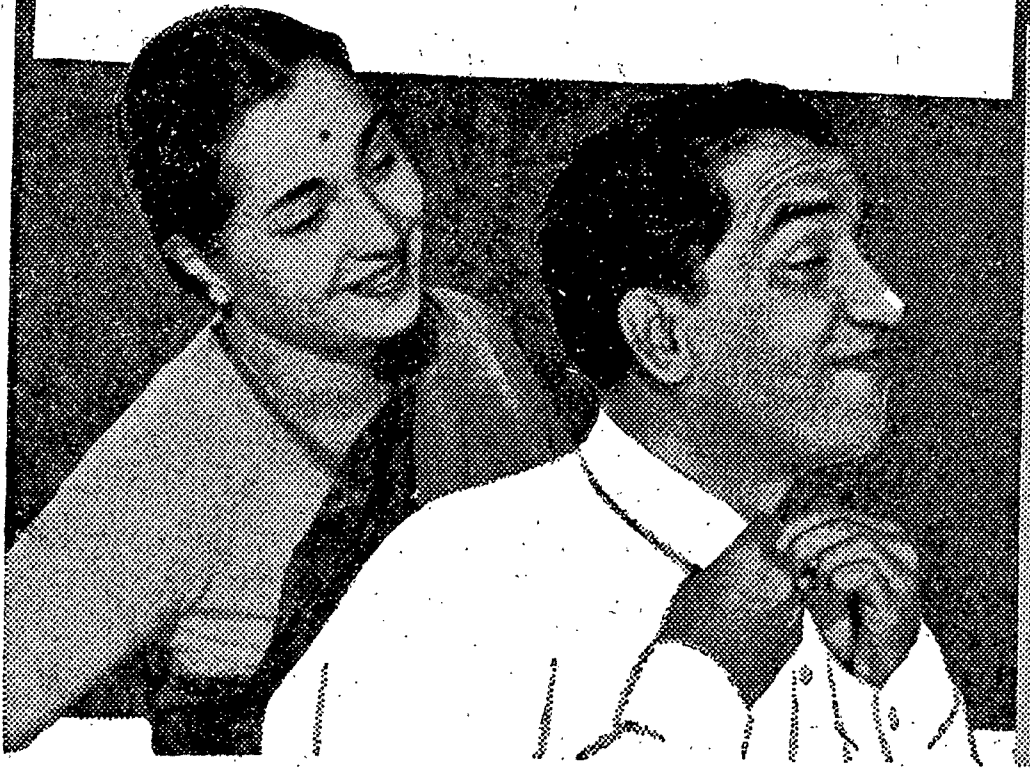
বৃহত্তর অংশের ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।
এরা লড়াই করে অনেকটা যেন আপোসে।
শিঙে শিঙে ঠেকিয়ে পরস্পরকে ঠেলাঠেলি
করা বা এমন ধরনের খুবই নিরীহ
গোছের পক্ষাভাতে পরস্পরের শক্তি
পরিমাপ করাটাই এদের কাছে লড়াই।
কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার গায়ে গা

ঠেকাবারও প্রয়োজন হয় না। দূর
থেকে ভাল ঠুকে বা হুংকার ছেড়েই
লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়া যায়। অবশ্য,
প্রায় সব লড়াইয়েরই প্রাথমিক পর্বে
এই তালচোকা বা হুংকার ছাড়ার
ব্যাপারটা থাকে।

জীব-জগতের টিপকাল লড়াইয়ের

দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে একজন বিজ্ঞানী
গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জের ইগুয়ানার
(গোসাপ জাতীয় সরীসৃপ বিশেষ)
লড়াইয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। ইগুয়ানা
দেখতে অনেকটা বড়ো আকারের, টিক-
টিকির মতো, পিঠের ওপরে এক সার
কাঁটা আর চারটি পায়ে বড়ো বড়ো নখ।

‘যদি ভাবেন ঠুকে খুশী করা সহজ...’



‘...তবে নিশ্চয়ই আপনি ভুল করবেন’—বোধের স্রীমতী আর. আর
প্রভু বলেন। ‘কাপড় জামার বেলাতেও কি উনি কম খুঁতখুঁতে...!’
‘এখন অবশ্য আমি ওঁর জামা কাপড় সবই সানলাইটে কাচি—
প্রচুর ফেনা হয় বলে এতে কাচাও সহজ আর কাপড়ও ধ্বংস
করসা হয়!... উনিও খুশী!’
‘কাপড় জামা যা-ই কাচি সবই ধ্বংস আর আলমলে করসা—
সানলাইট ছাড়া অন্য কোন সাবানই আমার চাই না’

গৃহিণীদের অভিজ্ঞতায় বাঁচি, কোমল
সানলাইটের মতো কাপড়ের এত
ভাল যত আর কোন সাবানেই নিতে
পারে না। আপনিও তাই বলবেন।

সানলাইট

কাপড়জামার সঠিক যত্ন নেয়!

S. 30-232 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী



এদের লড়াইয়ের প্রাথমিক পর্বে অবশ্যই থাকে পরস্পরের প্রাতি আশ্ফালন। কিন্তু তারপরে সত্যিকারের লড়াইয়ের সময়ে এরা পিঠের কাঁটাও ব্যবহার করে না, পায়ের নখও নয়। এদের কপাল থাকে পুরু আর শক্ত আঁশে ঢাকা; সেই কপালে কপাল ঠেকিয়ে এরা পরস্পরকে ঠেলাতে শুরু করে। যে-পক্ষ বৃদ্ধিতে পারে যে তার আর জেতার আশা নেই, সে অমনি পেট খেঁবড়িয়ে মাটিতে গা এলিয়ে দেয়। অন্যপক্ষ এই ভাগ্যমাকেই পরাজয়ের নিদর্শন হিসেবে মনে নিতে কিছুমাত্র আপত্তি করে না।

র্যাটল সাপ লড়াই করে বড়ো বিচিহ্ন ধরণে। কেউ কাউকে কামড়ায় না। মাথার দিকে শরীরের এক-তৃতীয়াংশ শূন্যে উঁচিয়ে এরা পাশা-পাশি চলতে শুরু করে আর মাথা দিয়ে মাথা ঠেলাতে থাকে। যে অপরের মাথাটাকে মাটিতে শূঁইয়ে দিতে পারবে তারই জিত।

হরিণের লড়াইও কম বিচিহ্ন নয়।

গোড়ার দিকে তারা শিঙে উঁচিয়ে পাশা-পাশি মাচ করে চলে আর একে অপরকে আড়চোখে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। তারপরে আচমকা তারা মূর্খোমূর্খি দাঁড়িয়ে পড়ে আর মাথা নাবিয়ে একে অপরের দিকে ভেড়ে যায়। শিঙের সঙ্গে শিঙের হয় ঠোকাঠুকি। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যতোকক্ষণ দুজনে পাশা-পাশি মাচ করে চলে ততোকক্ষণ কেউ কাউকে আক্রমণ করে না।

ছাগলের ও ভেড়ার লড়াইয়েও এমনি শিঙে শিঙে ঠোকাঠুকি। এবিষয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাঁদের ধারণা, শিঙের ব্যবহার শূঁই কপালের সঙ্গে কপাল ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। আসল লড়াইটা হচ্ছে ঠেলাঠেলি।

ইঁদুরে লড়াইয়ে প্রথম পর্বে হয় ঠেলাঠেলি। তারপরে কামড়া-কামড়ি। সাধারণত যে পক্ষ প্রথম চিত হয় তারই হার।

হাল আমলে একমাত্র মানুষের বেলাতেই এসে দেখা যাচ্ছে, একই

প্রজাতির জীব হওয়া সত্ত্বেও মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ে রীতিনীতি বা নিয়ম-কানুন নেই। মানুষের লড়াইটা কোনো ক্রমেই নিয়মরক্ষার ব্যাপার নয়, টুর্নামেন্ট তো নয়-ই। কারণ দেখা যাচ্ছে, মানুষ লড়াই করে মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, কে প্রতিদ্বন্দ্বী বা কে প্রতিদ্বন্দ্বী নয় সে-বাছবিচার তার নেই, দূর থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে সে যে বাণ বর্ষণ করে তা সরাসরি মৃত্যুবাণ। মানুষের কান্ডকারখানা দেখে মনে হতে পারে, জীবজগতে মানুষ একটি ব্যতিক্রম হতে চলেছে।

তবে আশার কথা এই যে, জীব-জগতে মানুষই একমাত্র জীব যে নিজেকে বদলাতে পারে ও পরিবেশকে বদলাতে পারে। কাজেই ভরসা রাখা চলে যে, মানুষই একদিন এমন ইতিহাস সৃষ্টি করবে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াইটা হয়ে উঠবে একেবারেই অতীতের ব্যাপার। গোটা পৃথিবীর মানুষই হয়ে উঠবে একই পরিবারবন্ধ।

প্রকাশিত হইল !

প্রকাশিত হইল !

গৌরিকিশোর ঘোষের
বলিষ্ঠ মননের উপন্যাস

এই দাহ

॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

এই বছরের নতুন বই!

গ্রন্থাগারে রাখার মতো বই!!

উপহার দেবার মতো বই!!!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অহিংসা ৬.০০

উপন্যাসটির বিষয় প্রকরণ ও ভাষা
একান্তভাবে মানিকবাবুরই।
লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

সাবিত্রী রায়ের

ত্রিস্রোতা ৬.০০

পাকা ধানের গান

১ম পর্ব ৩.৫০

২য় পর্ব ৪.০০

৩য় পর্ব ৫.০০

উপন্যাসটিকে মহৎ ও সাংগঠনিক সৃষ্টি
বলা যায়। —স্বাধীনতা

বিনোদচন্দ্র সেনের

আইনের দুনিয়া ৪.৫০

এখানে রাজনৈতিক আসামীর বেশে
দাঁড়িয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র
মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু।

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের

ব্যঞ্জন বর্ণ ৪.০০

এমন সুন্দর উপন্যাস আপনি আগে
কখনও পড়েন নি। একথা জোর করে
বলা যায়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমুদ্র মানুষ ৫.০০

মাণিক স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত
উপন্যাস।লেখক যে আশ্চর্য জীবন ও জগতের
সন্ধান দিয়েছেন, তা আমাদের
সবিস্ময় অনুমোদন দাবী করে।
—আনন্দবাজার

মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তীর্থ নয় কাণাগালি ৫.০০

বীরভূমের জল মাটি মানুষ দিয়ে
গড়া একখানি নিটোল উপন্যাস।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চর্যাপদের হরিণী ৩.০০

তৃতীয় ভূরন ৪.৫০

উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ ভাষায় দীপেন্দ্রনাথ
উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়েছেন।
—পরিচয়

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের

বিদেশীনী ৪.৫০

বিখ্যাত গ্রন্থ 'সুশান্ত সা' যার
অকুণ্ঠ প্রশংসা বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-
পাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির করেছিলেন।
তারই পরবর্তী খণ্ড।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

পরিচয় ৪.০০

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে হাসি
ফোটানো সামান্য কথা নয়। এটি
অসাধারণ রসের কান্ডারীর নবতম
সৃষ্টি।

মি হা ল য় : ১২ বস্কিম চাটুয্যো স্ট্রীট : কলিকাতা ১২ : ফোন ৩৪-২৫৬৩

বীরভূমের স্বপ্ন পাণ্ডা আলকাপ

আমাদের লোকউৎসব, লোকগাথা, গ্রাম্য ছেলেভুলানো ছড়া, সামাজিক রীত-প্রথা ও পার্বণ-পালাগানের মূল্য দেশবাসীর কাছে আদৌ তুচ্ছ নয়। এই লোকসংস্কৃতি থেকে মানুষের জাতি ধর্ম ও সমাজের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক ও স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। এবং সংস্কৃতির রূপবিবর্তনে বর্তমান সভ্যতা ও কৃষ্টিধারার গতি-নির্ধারণ খুবই চিত্তাকর্ষক। সন্দেহ নেই। এজন্য এগুনি Ethnology বা নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নৃতাত্ত্বিক-গণের সিদ্ধান্ত এই যে, লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত নৃত্য, উৎসব, গাথা বা লোকচিত্র কেবলমাত্র আনন্দবিধানের জন্য নয়, জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে আদিম মানুষের আদিম মনের উদ্ভাবিত কর্মের বিচিত্র প্রচেষ্টা ও প্রকাশ। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে জেগে উঠেছে ব্যাঙের বদলে গোষ্ঠীচেতনা, আধুনিক-কালের Community life বা সামুদায়িক জীবন। এই গোষ্ঠীচেতনার সহায়তায় আদিম সমাজে উদ্ভূত হয়েছে তুচ্ছতাক, মন্ত্রতন্ত্র, লৌকিক পূজাআর্চা, আউল-বাউল-কর্তাভজার দল, সমবেত নাচ-গান এবং তার মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবার প্রেরণা।

পল্লী বাংলার এমনি একটি স্বভাবঃ-উৎসারিত লোকউৎসব 'নবান্ন'। রোদে পড়ে, জলে ভিজ়ে কিশাণ-কিশাণীরা কঠোর শ্রমের ফসল ফলানোর পর, 'ধান কাটার গান'

“আগনেতে আঁটি ধান
ঝাড়বা যখন দিনমান
কুলার বাতাস দিয়া হামি
ধান ঝাড়ু না।”

গাইতে গাইতে সোনার ধানে গোলা ভরে তুলে। মনেপ্রাণে আনন্দের পরিসীমা থাকে না। ‘তুষ-তুষলী’ রূতে আছে যেন ওদের হৃৎ মনের কথাঃ—

“তুষ-তুষলী তুমি কে
তোমার পূজা করে যে,
ধনে ধানে বাড়ন্ত
সুখে থাকে আদি অন্ত।”

মনের গভীর আনন্দ প্রকাশের জন্য উদ্ভাবন করল অদ্ভুত বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্ম-পদ্ধতি যা পরবর্তীকালে নব নব

লোকউৎসবরূপে পরিচিত হল। ‘নবান্ন’ উৎসব উপলক্ষে এইভাবে সৃষ্ট হয়েছে ‘আলকাপ’।

বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের লৌকিক উৎসবের প্রচলন আছে। বীরভূমে সাধারণ ‘যাত্রা’ ছাড়া নানা রকমের ছোট ছোট পালাগান নানা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন তরঙ্গা, পাঁচালী, ভাদুগান, চুসুগান, লুটো বা লোটো, মনসামঙ্গল, রামায়ণগান, সত্য-পীর, আলকাপ, কবিগান, বাউলগান ইত্যাদি। মুর্শিদাবাদেও আলকাপ প্রচলিত আছে। আলকাপ কতকটা লুটো ধরনের পালাগান—কর্মিক ও ছড়াপ্রধান। ‘আলকাপ’ কথাটি প্রাদেশিক। মনে হয় মূল শব্দ এটি নয় বা কি ছিল জানা যায়নি। আবার ‘শব্দ’ ‘আওল’ মানে সর্বোৎকৃষ্ট, প্রথম শ্রেণীর। প্রাদেশিক শব্দ ‘আওল’-এর অর্থ এলোমেলো এবং ‘কাপ’ (‘কপট’ শব্দজ)—কৌতুকজনক বিষয়। সম্ভবত ‘আউলকাপ’-এর অপভ্রংশ ‘আলকাপ’ শব্দ গ্রাম্য কথায় প্রবেশ করেছে, যার অর্থ দাঁড়ায় ‘এলোমেলো কৌতুক, সপ্ত, রঙ্গ’ ইত্যাদি। আলকাপ আবার ‘শব্দানুযায়ী’ ‘আওলকাপ’ হলে সর্বোৎকৃষ্ট কৌতুকনাট্য বলেও একে বলা যায় না। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যদিও এর মূল্য যথেষ্ট।

এই পালাগানে দটো দল থাকে। সপক্ষ দল ও বিপক্ষ দল। উভয় দলে প্রায় দশ বারোজন লোক থাকে। কৌতুক অভিনয় ও নাচ-গানের দ্বারা যে দল ভাল করবে তাদের জিত হয়। সাধারণ উৎসব ছাড়া ‘নবান্ন’ উপলক্ষে বেশি অনুষ্ঠিত হয়। ডোম, হাড়ি, মূচি, মূসলমান, বাগদি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জাতে এই পালাগান গেয়ে থাকে। পালা আরম্ভের আগে সবাই বিশেষভাবে যারা অভিনয় করবে, এসে গোল হয়ে আসরে বসে সেজেগুজেই। গানের বা বাজনার দল তো আসরে অন্যান্য যাত্রাদলের মত আগে থেকে থাকেই। তারপর পালা আরম্ভ হবার ঠিক পূর্বে যাত্রাতে কনসার্ট বাজনার মত এদের একজন মেয়ে-বেশী নাচিয়ে নাচ আরম্ভ করে বাজনার তালে তালে। গান তখন হয় না। বাজনার দলে যন্ত্রের মধ্যে থাকে,

তবলা বাঁয়া, বড় খঞ্জনী, হারমোনিয়াম ও ঢোল। সাধারণত দুই কাহারবা ও দাদুৱা তালে পালার নাচগান হয়। পূর্বোক্ত মেয়েটি নাচ শেষ করে বসলে পালা আরম্ভ হয়। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একক নৃত্য মাঝে মাঝে থাকে; ছড়াও থাকে পাঁচালীর সুরে। পালাতে বাই বা নাচিয়ে থাকে ২।৩ জন। অভিনয়শ্রেণী কেউ শাশুড়ী সাজে, কেউ সাজে বউ, ছেলে, মোড়ল, ইত্যাদি। দলে মেয়ে থাকে না, ছেলেরা মেয়ের ভূমিকা করে। নাচিয়েরা প্রথমত গান গেয়ে চিমে লয়ে নাচের ভঙ্গীতে গানের ভাব প্রকাশ করে। তারপর দুয়ারীরা (যারা একসঙ্গে জোরে একই গানের কলি পুনরাবৃত্তি করে) দ্রুত লয়ে গানটা যখন ধরে তখন নাচিয়ে সেই গানের ছন্দে ছন্দে নাচতে আরম্ভ করে। পালায় যে ‘মোড়ল’ সাজে তার স্ত্রীকে বলে ‘মোল্লান’। যাকে কেন্দ্র করে পালাগান অগ্রসর হয় সেই কর্মিক ভূমিকাটি দলের বিশেষ একজন রচনা করে। তার সঙ্গী সাথীরা যথা বাবা মা শাশুড়ী বৌ ইত্যাদি তার কর্মিকের ভাবটাকে বাড়ানোর জন্য কথাবার্তা চালিয়ে যায়। আলকাপ পালা-অভিনয় কর্মিক ও হাস্যরসের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। সাধারণ গ্রাম্য লোকেরা এই আনন্দে সারা রাত মেতে থাকতে পারে। এই অভিনয়ে কথাবার্তা সাধারণত দুই অর্থে ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই কথাবার্তার ভিতর দিয়ে সহজ পল্লীবাসীদের উপস্থিত বুদ্ধি, নিজস্ব রচিত গান ও সুর এবং দর্শক-শ্রোতার মনে আনন্দ দেবার কায়দা-কৌশল বুঝতে পারা যায়। এখন সিনেমা-রেকর্ডিং গান শুনে শুনে অনেকে এই সকল সুর নিজেদের রচিত গানে বসিয়ে এক অদ্ভুত খিচুড়ি তৈরি করে। আর একটি আনন্দের বিষয় যে, প্রধানত মূসলমানেরা মিলে অভিনয় করলেও উভয় দল (হিন্দু ও মূসলমান) অতি খুশি মনে শোনে। যখন আসর সরগরম হয়ে উঠে গানে নৃত্যে কর্মিকে, তখন শ্রোতাদের কেউ একজন “আল্লা হো” বললেই সবাই ঐ বলে সোজাসে হাঁকে। আবার মাঝে মাঝে সমস্বরে “হরিবোল” ধনিও শোনা যায়। এই জগতের চিরন্তন আনন্দটুকু সুখ-দুঃখের মধ্যেও পল্লীর লোকে নানাভাবে নানা রকমে আহরণ করে।

‘আলকাপ’ পালাগানের কিছুটা নমুনা এখানে দেখানো হচ্ছে। তার থেকে মোটামুটি এই পালাগানের ধরণ বোঝা যাবে।

প্রথম, মোড়ল উঠলো। নাচতে লাগলো। নাচার পর মাগিককে ডাকলো বার বার। মোড়ল মাগিকের বাবা। মোড়লের কথায় মাগিক উঠলো না।

পরে তার মা ডাকতে লাগলো। ডাকার সঙ্গেই মাণিক উঠলো।

মোড়ল বলছে (শ্রীকে)—ছেলেটা তুমিই নষ্ট করলে। লেখাপড়া শিখলো না, কিছুর না।

মা—আমি মেয়েমানুষ, তা আমি কেমন করে জানবো? আমি খাওয়াবার-দাওয়াবার মালিক। তারপর,—ছেলে কি করে না করে, আমি জানি না।
মোড়ল—দ্যাখ মাণিক, পড়তে যাব কি না বল?

মাণিক—আমি যে একদিন পড়েছিলাম, সেই যে মা আমাকে তেঁতুল পাড়তে পাঠিয়েছিল। আমি তেঁতুল গাছ থেকে দূর করে পড়লাম। বাবা, তখন তো আমি পড়েছিলাম। পড়া আমার শেষ হয়েছে।

মোড়ল—না বাবা সে পড়া লয়, পাঠ-শালায় যেতে হবে।

মাণিক—(গান ধরল) বেশ মধুভাঙ্গি করে কামার সুরে বিনীতভাবে :

বাবা গো,—

‘তোমার পায়ে ধরি পড়তে যাব না,
ঘরের কড়ি পরকে দিয়ে

কাঁচা-কাঁধের মার খাব না।

আঁচলেতে দে মা মূড়ি

কাঁকে দে গোবরের বুড়ি

মাঠে খেলব কড়ি কড়ি

পোরাব মনের বাসনা।’

বাবা—পড়বি না তো চাকরী করগে—তা না হলে আমাদের সংসার চলবে কি করে?

মাণিক—এ সংসার আমি যদি চালিয়ে দিতে পারি? (এই বলে মাণিক ঘরের মা-বাবা ইত্যাদি সকলকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলে।)

বাবা—একি রে! একি রে! এ তুই কি করছিস।

মাণিক—দাঁড়াও আমি সংসার “চালিয়ে” দিচ্ছি। (অর্থাৎ সংসার ঘর থেকে অন্যত্র “চালিত” হয়ে গেল)।

বাবা—ওরে তা নয়, তুই খাবি কোথা থেকে?

মাণিক—আমাদের তো জমি আছে, আমি এক কোণে বসবো, তুমি এককোণে বসবে, মা আর এক কোণে বসবে। সবাই মিলে একধার থেকে খেতে লাগবো।

বাবা—না রে, এমন করে খাওয়া হয় না। তোকে চাকরী করতে যেতে হবে।

মাণিক—তাহলে যদি ‘নিত্যান্তপার’ আমাকে যেতেই হয়, তবে আমি ঘরের লোক গুনবো।

মা—আমি আছি, তোর বাবা আছে, আর তুই আছিস—মাত্র তিনজন লোক আছে, তার তুই কি গুনবি।

মাণিক—না, আমি গুনবো। ব’লে,—বাবা আছে, মা আছে, আমি আছি, আর আমার বেলায় ফাঁকি? আমার আর একটা কই? আমি একা কেন একটা পেটে খাটতে যাব?

মা—আচ্ছা, তুই কি চাস বল দেখি।

মাণিক—না গো, এই,—এত বড়!

(এখানে একটু বলে রাখা ভাল যে, কামিক অভিনয়ে হাবভাব, আকার-ইঙ্গিত এত বেশী থাকে যে কথার সাহায্য অল্প নিলেও কামিক অভিনেতার আসল বক্তব্যের অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। মাণিক তার বাবা-মাকে বোঝাতে পারছে না যে সে একটি সুন্দর বোঁ চায়। কিন্তু ঐ একটু কথা আকার-ইসারা ও অঙ্গ-ভঙ্গীর আশ্রয়ে ঠিক ভিতরের কথাটি বলে দেয়। দর্শক শ্রোতা-হেসে হেসে লুটোপুটি খায়)।

মাণিক—আমি এত বড় হলাম, তোমাদের কি আন্দাজ নাই?

মা—হ্যাঁ, হ্যাঁ ব’কোছি। বলেই মাণিকের বাবাকে বললো,—ওগো, মাণিকের একটি বিয়ে দেওয়া দরকার। বিয়ে দিলে ও সব কাজ করবে।

বাবা—না, না, ফেপী, বিয়ে দিলে ও কোন কাজই করবে না।

মা—হ্যাঁ, ও ঠিকই করবে।

বাবা—দ্যাখো, বিয়ে আমি দিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে ওকে কাজে পাঠাতে হবে।

মা—তাহলে তুমি বউ আনতে যাও।

বাবা—বেশ তাহলে আমি যাচ্ছি।

(কউ আনতে মোড়ল চলে গেল হবু বেয়াই-এর বাড়ী)।

বাবা—(গান ধরল)—

আমি এলাম তাড়াতাড়ি

বেহাই তোমার বাড়ী

বেহাই আছ কিনা বাড়ীতে।

হবু বেয়াই (গান ধরে)—

এস বেহাই কস খাটে

পা খেও গড়ের ঘাটে,

বাড়ীতে কে কেমন আছে?

কউ—চললাম শব্দের ঘরে

ভগবান যা করে

হয় বিধির ঘটনা।

বরের উদ্দেশ্যে নুতন বউকে লক্ষ্য করে গান গাইতে লাগল নাচিয়ে। নাচিয়ে এক এক কাল গাইবার পর দুয়ারীরা উৎসাহের সঙ্গে সজ্জার গান ধরে। ক্রমশ তাল মধ্য থেকে দ্রুতগতি হয় নাচিয়ের গান—

দাদরা—

পরশ বন্ধু, একবার আসিয়া

সোনার চাঁদমুখ যাও দেখিয়া হে।

কাঁপতাল—

দেশের লোকে ময়না পোষে

পিজরায় ভারিয়া রাখে

তেমনি বধুর সোনার যৌবন

দাদরা—

যাও হে বাঁধিয়া। সোনার চাঁদমুখ...হে।

কাঁপতাল—

কোন রমণীর ফাঁদে পড়ে

গেলে বন্ধু আমায় ভুলে

দেশ-বিদেশে ঘুরে মরি

দাদরা—তোমার লাগিয়া। সোনার চাঁদ-মুখ...হে।

নিম্নোক্ত আর একটি গানের ভাষা উপরের গানের থেকে পৃথক ও আধুনিক। সরেও আধুনিকতা আছে। কাহারবা।

মোর স্বপনে কার বাজল বাঁশ গো—
মন-প্রাণ আমারে চায়,

আলোতে বলমল শিশিরে টলমল

আনন্দে কেবা নেচে যায়

মন-প্রাণ আমারে চায়।

মাতা-পিতা জড়সড়

অঙ্গ তার ভয়ে মর

মন-প্রাণ আমারে চায়।

অভিনয়ের মাঝে মাঝে থাকে ছড়া।

পাঁচালীতে বা কবিকানে যেমন ছোল,
কাঁশি নিলে টাক ডুমাড়ম করতে করতে
ছড়া কাটা হয়, এ তা নয়। তবলিচি
আসরে বসে তবলা বাজায়। আর যে
ছড়া কাটবে সে আসরের মাঝে উঠে
দাঁড়ায় ও তালি দিয়ে দিয়ে ছড়া গায়।
কবিকান বা পাঁচালীর এক ধরনের সুরের
মত এ সকল ছড়ায়ও তেমনি সুর
থাকে।

ছড়া

ওহে ভোলা, ভুল তুমি করেছ মূলে
ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি জানে সকলে
এক, এসো এসো একবার ধর্মকথা বলি
দুই বলে ধর্মেরে তুই উল্টে যাবে কলি
তিন বলে তিনটি লয়ে কি করবি এখন?
চার বলে চতুর্ভেদী কি কি নাম ধরে
পাঁচ বলে পঞ্চনারী শূয়ে ছিল ঘরে।
ছয় বলে ছয়টি রিপু আসা-যাওয়া করে
সাত বলে সাতটি লয়ে লাগাইলরে লাটা
আট বলে অষ্টবসু জন্ম হল কোথা
নয় বলে নবগ্রহ কি কি নাম ধরে

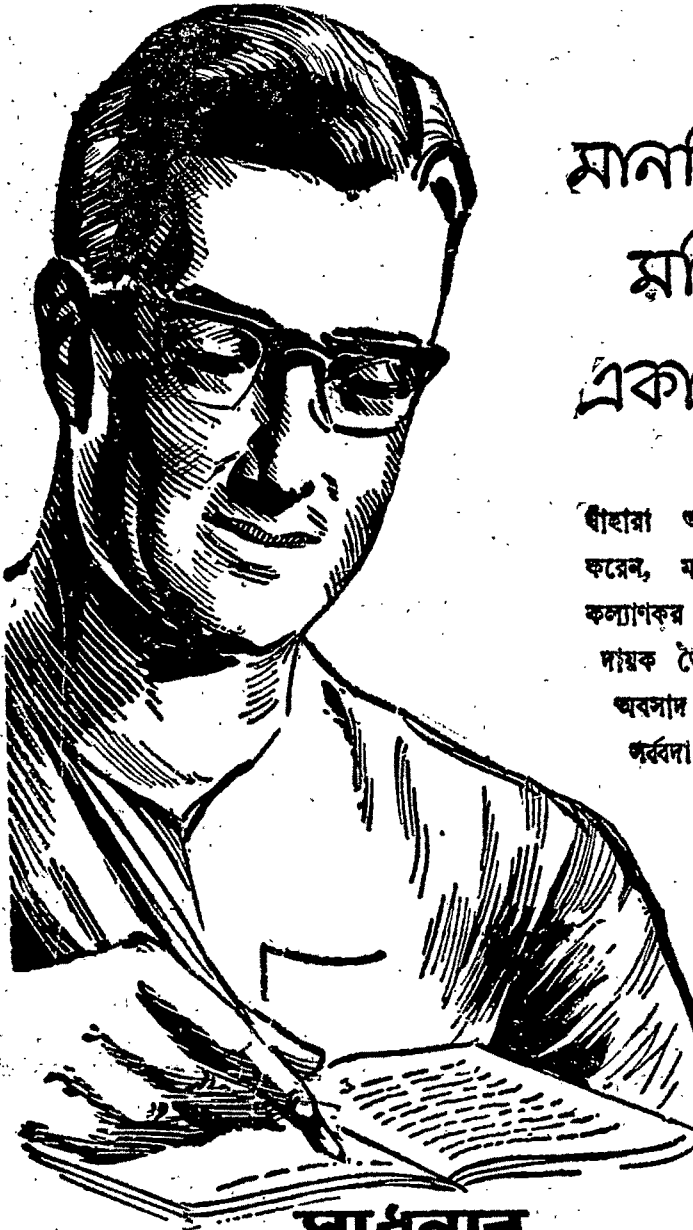
দশ বলে দশের মাঝে বলে জানাও আমারে
এগার বলে এসব কথা বলো না রে আর
তেরো বলে তাই নায়ে করতে এলি গান
চৌদ্দ বলে চারদিকেতে পেতে ছিল ফাঁদ
পনেরো বলে দাখ ভাই ভোলা পরাগে

খালে দাখ

ওহে ভোলা ভুল তুমি করেছ মূলে।

ইত্যাদি *

* আলকাপের সংলাপ ও গান সংগ্রহের
জন্য বীরভূমবাসী শান্তিনিকেতন
সংগীত ভবনের প্রাপ্তন ছাত্র শ্রীঅভিরাম
দাসের নিকট কৃতজ্ঞতা আবস্থ।



মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

ধীহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভুঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরামদায়ক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে জর্বদা প্রকৃত ও কর্মকম রাখে

সাধনার মহা ভুঙ্গরাজ তৈল



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা ৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদচর্চা

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লন্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

বিদেশী গল্প

অতি আলবের কাম্বু

স্কুলমাস্টার দেখল দুটো লোক তারই দিকে আসছে। একজন ঘোড়ায় চড়ে, তার পিছনে একজন আসছে হেঁটে হেঁটে। স্কুলটা পাহাড়ের গায়। স্কুল-বাড়িতে আসতে গেলে চড়াইটা পার হতে হয়। চড়াইটা উঠেছে অকস্মাৎ খুব সোজা হয়ে। ওরা কিছতেই সেই সোজা চড়াইটা ডিগ্গাতে পারছে না। উঠতে গিয়ে দম বেরিয়ে আসছে তাদের। পাথর, তুষার আর অধিকার বিপুল জনহীনতা ঠেলে তারা খুব সামান্য পথ

পার হতে পেরেছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ার হোঁচট খাবার শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না। তবু স্কুলমাস্টার ভাবল ঘোড়ার ফোঁস ফোঁস করা নিঃশ্বাস তার গানের খুব কাছেই। ওই দুজনের মধ্যে একজন অন্ততঃ এই অঞ্চলের বিশেষ পরিচিত। আজ কাঁদিন ধরে তুষার পড়েছে। ময়লা সাদাটে তুষারের মধ্যে পথরেখা ডুবে গেছে। তবু লোকটা যেন শিকারীর মত পথের গন্ধ শব্দকে শব্দে আসছে। স্কুলমাস্টার ভাবল এই গতিতে ওরা যদি হাঁটে তবে এখানে পৌঁছতে ঘন্টাখানেক লাগবে। বাইরে বড় ঠান্ডা। সোয়েটার আনতে ঘরে গেল সে।

শীতে জমাট বেঁধে আছে ফাঁকা স্কুল-ঘর। তিনদিন আগে বোর্ডে আঁকা হয়েছিল ফ্রান্সের মোহনামুখী চারটে নদী চার রংয়ের চকখড়িতে। আজো সেই নদীগুলি মোহানার দিকে প্রবাহিত। এখন অক্টোবরের মাঝামাঝি। মাস কয়েক থরা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির কোন পূর্বাভাস না দিয়ে তুষার

পড়তে শুরু করেছে। স্কুলের ছাত্র মাত্র কুড়িজন। অধিকার্য ছড়ানো ছিটানো গ্রামের বাসিন্দা তারা সবাই। তুষার মাথায় করে ছাত্ররা কাঁদিন স্কুলে আসছে না। আকাশ পরিষ্কার হলে তারা আবার আসবে। ক্রাশ-ঘরের পাশের ঘরে থাকে ডারু। জানালা খুললেই পূর্বের দিক চোখে পড়ে। ঘরটাকে একটু গরম করার জন্য ডারু চুলো জ্বাললো। দক্ষিণমুখী জানালা খুললে দেখা যায় ঢালু মালভূমি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে নজরে পড়ে সার সার টুকটুকে লাল পাহাড়। ওখান থেকে মরুভূমি পর্যন্ত শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই।

গা একটু গরম হয়েছে। যে জানালা থেকে লোক দুটোকে আসতে দেখেছিল ডারু আবার সেই জানালার কাছে গেল। ওদের আর দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় তারা এতক্ষণ চড়াই পার হয়েছে। আকাশও খুব অন্ধকার নয়। কাল রাত থেকে তুষারপাত বন্ধ। মেঘ কেটে গেছে। তবু ভোরের ময়লা আলো এখনও অনদ্ভবল।

বেলা প্রায় দুটো বাজে। তবু মনে হয় এই সব মাত্র সকাল হয়েছে। গত তিন দিন ধরে ছেদহীন অন্ধকারের মধ্যে পূর্ব তুষার পড়েছে ত পড়েছেই। আর মাঝে মাঝে এসেছে হাওয়ার ঝাপটা, ক্রাশঘরের দরজার পাল্লা কাতরে উঠেছে বারবার। তার চেয়ে আজকের আকাশ তবু অনেক ভাল। এ কাঁদিন ডারু তার ঘরেই সমস্ত সময় কাটিয়েছে।



মাঝে মাঝে গিয়েছে ভাঁড়ারে, মুরগীর
বাচ্চাকে খাবার দিতে হয়ত, হয়ত বা
নিজের জন্য কয়লা আনতে। ভাগ্য ভাল
বলতে হবে। তুষারপাত আরম্ভ হবার
মাত্র দুদিন আগে উত্তর দিকের নিকটতম
গ্রাম তাদাজিদ থেকে রেশনের গাড়ী
এসে তাকে খাবার পৌঁছে দিয়ে
গেছে। আবার দুদিন পরে আসবে
রেশনের গাড়ী। কিন্তু গাড়ী
যদি নাও পৌঁছায়, ক্ষতি নেই।
অবরোধ থেকে আত্মরক্ষার জন্য
রসদ আছে তার। স্কুলবাড়িতে মজুত
করা আছে বস্তা বস্তা গম। কর্তৃপক্ষ
গমের বস্তা এখানে গাদা করে রেখেছে।
অনাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের পরিবার-
বর্গকে এই গম দিয়ে সাহায্য করা
হবে। সব পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
তাদের ভীষণ দারিদ্র্য। ডারু প্রতিদিন
ছাত্রদের রেশন দিয়েছে। তুষারপাতের
দিনকটা তারা কেউ আসতে পারেনি।
ডারু জানে একটা দিন তাদের দানাও
জ্বাটেনি। অজ্ঞ হয়ত ছাত্রের বাবা কিংবা
বড় ভাই রেশনের জন্য এখানে আসবে।
ডারু তাদের রেশন দেবে। নতুন ফসল না
ওঠা পর্যন্ত চাল থাকবে এই ব্যবস্থা।
এখন ফ্রান্স থেকে জাহাজ জাহাজ গম
আসছে। দশময়ের দিন শেষ হয়ে
এলো। তা হোক। কিন্তু সেই দশমহ
দিন মনে জেগে থাকবে। সেই অনাহার-
রিক্ত দরিদ্র মুখগুলি সর্ব্বের আলোর
মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাসের পর মাস
অধিত্যাকা পড়ে পড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে,
মাটি বলসে বলসে কুকড়ে আসছে একটু
একটু করে, পায়ের চাপে পাথরগুলো
বাঁলির মত ধরে যাচ্ছে। এই দৃশ্য
ভোলা অসম্ভব। হাজার হাজার ভেড়া মারা
গেছে। এখানে ওখানে হয়ত মারা গেছে
মানুষও।

এই দারিদ্র্যের মাঝখানে সে যেন
প্রাচুর্যের মধ্যে বেঁচেছে। এই পান্ডব-
বর্জিত দেশের একটা স্কুলবাড়িতে
সম্রাসীর মতন জীবনযাত্রাও বিলাসিতা
বলে মনে হয়। কলিটানা ঘরের দেওয়াল,
ছোট কোঁচ, রং না করা তাক, কুয়া আর
সাপ্তাহিক রেশন ও জল এই সামান্য
উপকরণ পেয়ে নিজেকে বিরাট বিত্তবান
বলে মনে হয়েছে। কোন ইংগিত বা
বাক্তির পূর্বাভাস না দিয়েই এল এই
তুষারপাত। এ অঞ্চলের ধারাই বেরাড়া,

এখানে বাঁচা বড় কষ্টকর। জীবন বড়ই
নিঃসঙ্গ, লোকজন যা আছে, তারাও
উদাসীন, তবু ডারুর জন্ম হয়েছে
এখানে। এই অঞ্চল ছাড়া সর্বত্র ডারু
নিজেকে নির্বাসিত মনে করে।

স্কুলের বারান্দার উপর দাঁড়াল
ডারু। লোকদুটো এতক্ষণে ঢালুর
মাকামারি এসেছে। তাদের চেনা যায়।
ঘোড়ায় চড়ে আসছে বালদুচি। বাল-
দুচি পুরানো সেপাই। বহুকালের
পরিচিত। সে একজন আরব দেশের
অধিবাসীর হাত দুটো দড়ি দিয়ে
পিচমোড়া করে বেঁধে নিয়ে আসছে।
দড়ির একদিক বালদুচির হাতে আর
তার পিছনে মাথা নিচু করে করে
আসছে লোকটি। তার গায়ে ফিকে
রংয়ের বিরাট জোঁবা, পায়ে পুরুর ও
ককর্শ পশমের মোজা ও চটি। মাথায়
ছোট একটা টুপি। বালদুচি নমস্কার
করল ডারুকে। ডারু যেন তা লক্ষ্যই
করল না। সে যেন ওই আরবটির বেশ-
ভূষা দেখতেই মসগল। তারা এগিয়ে
আসছে। ঘোড়াটাকে সামলাতে হচ্ছে
বারবার। কারণ, বালদুচি চায় না
লোকটার আঘাত লাগুক।

নিকটে আসতেই চিংকার করে উঠল
বালদুচি, “এল আমার থেকে মাত্র তিন
কিলোমিটার পথ আসতেই লাগলো
পাকা একটা ঘন্টা।” উত্তর দিল না
ডারু। মোটা সোয়েটার পরে স্বেচ্ছাবান
দেখাচ্ছে তাকে। ওরা এগিয়ে আসছে।
ডারু চুপ করে ওদের দেখছে। আরবটি
একটি বারের জন্য মাথা তোলেনি।
বারান্দার উপর উঠে আসতেই ডারু বলে,
“ব্যাপার কি। ঘরে এসে হাত তৈতে
নাও।” হাতের দড়িটা হাতে রেখে
ঘোড়া থেকে নামতে খুব কসরত করতে
হল বালদুচিকে। খাড়া খাড়া গৌফের
নিচে ঝিলকি উঠল বালদুচির হাঁসি।
রোদে-পোড়া কপালের তলায় গর্তে-
ডোবা দুটি চোখ আর বলিরেখাময় মুখ
নিয়ে খুব দৃঢ় ও মনোযোগী দেখাচ্ছে
তাকে। ঘোড়ার রাশ ধরে টেনে গোল্লালে
রাখতে গেল ডারু। ফিরে এসে দেখল
যে লোকদুটো ততক্ষণ তার জন্যে
অপেক্ষা করছে স্কুলে। ডারু তাদের
নিজের ঘরে ডেকে এনে বলে, “ক্লাশ-
ঘরে উন্নত আঙুলের ব্যবস্থা করছি।
তা হলে আর কষ্ট হবে না।” সে ক্লাশ-
ঘরের উন্নত ধরাবার জন্য চলে গেল।
নিজের ঘরে ফিরে এসে লেখল হাতের
দড়ি ছেড়ে দিয়ে বালদুচি তার কোঁচের

উপর বসে। আরবটি উন্নতের পাশে বসে
আছে। দড়িবাঁধা হাত, মাথার টুপিটা
একটু পিছনের দিকে ঠেলে দেওয়া।
আরবটি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে
চোখে আছে। হঠাৎ ডারুর খেয়াল হল
আরবটির ঠোঁট দুটি পুরুর, মসগল
অনেকটা নিগ্রোদের মত। তবু খাড়া
তার নাক, কালো চোখ দুটো জ্বলছে।
টুপিটা পিছনের দিকে ঠেলে দেওয়া
বলেই আরবের উদ্ভট কপালটা নজরে
পড়ল। ঠান্ডার ভেতর দিয়ে এসেছে বলে
তার মুখটা খুব বিবর্ণ ও বড়োটে
দেখাচ্ছে। কিন্তু বন্দী আরবটি সেই জানালা
থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সোজাসজি
ডারুর মুখের দিকে তাকাল। মনে হল
তার মুখের মধ্যে রয়েছে চণ্ডলতা এবং
বিশ্রোহের ভীষণ আবেগ। স্কুলমাষ্টার
বলে, “ও ঘরে যাও। তোমার জন্য একটু
চা তৈরি করি।” বালদুচি বলে, “চমৎকার,
কি আমার চাকরি! ছাড়তে পারলেই বাঁচি।”
আরবী ভাষায় বন্দীকে বলে, “এস।”
বন্দী বাঁধা কব্জিদুটো সামনের দিকে
এগিয়ে দিয়ে ক্লাশ-ঘরের দিকে চলে গেল।

চায়ের সঙ্গে একটা চৈয়ার নিয়ে ক্লাশ-
ঘরে ফিরে এলো ডারু। বালদুচি কিন্তু
বসে আছে ছাত্রদের ডেস্কের উপর আর
মন্টারিশায়ের পড়াবার জায়গায় বসে
উন্নতের দিকে মুখ করে আছে বন্দী।
বন্দীর দিকে চায়ের প্লাস এগিয়ে দিতে
গিয়ে সজ্জুচিত হল ডারু। ওর হাত দুটি
বাঁধা। “দড়ি বোধহয় এখন খুলে দেওয়া
যেতে পারে।”

বালদুচি বলে, “নিশ্চয়ই। আনবার-
সময় হাতে দড়ি বাঁধতে হয়েছিল।” এই
বলে উঠে দাঁড়াল সে। কিন্তু ডারু চায়ের
প্লাশটা নিচে নামিয়ে বন্দীর পাশে হাঁটু-
গেড়ে বসে দড়ি খুলতে আরম্ভ করলো।
নির্বাক বন্দী তার জ্বলন্ত দুটি চোখ
দিয়ে দেখতে থাকল। দড়ি খোলার পর
কব্জির ফেলা অংশ একটু ঘসে নিয়ে সে
চায়ের প্লাশটা হাতে করে তন্ত পানীয়ের
মধ্যে দুটি ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়ে চুমুক দিল।

ডারু বলে, “ভাল, কোথায় যাবে?”
চায়ের প্লাশ থেকে মুখ সরিয়ে বালদুচি
বলে, “এখানে আসার জন্যই এসেছি।”

“অনুভূত লোক। এখানেই কি রাত
কাটাবে?”

“না, আমি এল আমারে এখানি ফিরে
যাবো। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে
হবে। এই লোকটিকে নিয়ে যেতে হবে

তিনগুইট-এর থানায়। এর তলব পড়েছে সেখানে। তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে।”

ডারুর মন্ডের দিকে চেয়ে বন্ধুর মত হেসে কথাগুলি বলে বালদুচি। স্কুল-মাস্টার বলে, “কি ব্যাপার! আমাকে ঠাকাবে নাকি?”

“না, বাছা। এই-ই হুকুম।”

“হুকুম? আমি.....” ঢোক গিললো ডারু। বুড়ো কাস্কান সেপাইকে আঘাত দিতে তার মমতা হল। “মানে, এত আমার কাজ নয়।”

“কি? কি বলে? যুদ্ধের সময় মানুষকে সব রকম কাজই করতে হয়।”

“তা হলে আগে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক তারপর করব।”

মাথা নাড়ল বালদুচি।

“ভাল কথা। কিন্তু হুকুম দেওয়া হয়েছে। অবস্থা ক্রমশই পাকিয়ে উঠছে। দেখে অন্ততঃ তাই-ই মনে হয়। শোনা যাচ্ছে কয়েক দিনের মধ্যেই এরা বিদ্রোহ করবে। সৈন্য তলব করাও হয়ে গেছে।”
কিন্তু ডারু অবিচল।

বালদুচি বলে, “কথা শোন বাপু। জানই ত তোমাকে আমার ভাল লাগে। তুমি আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। এল আমরা আমরা মাত্র বারোজন আছি। বিরাট অশ্লল পাহারা দেবার জন্য মাত্র বারোজন সেপাই। তাই বুঝতেই পারছ আমাকে এখনি ফিরতে হবে। এই লোকটাকে তোমার জিম্মায় রেখে আমার এখনি ফিরে যাবার কথা, কিন্তু এখানে ত আর একে রাখা যাবে না। ওর গ্রামের লোক এর মধ্যেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ওকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। তাই তোমাকে কাল বেলাবেলির মধ্যে তিনগুইটে রেখে আসতে হবে। তোমার মত গাটো-গোটা লোক কুড়ি কিলোমিটার পথ যেতে গলে যাবে না। তারপর তোমার সব কাজ চুক যাবে। তুমি আবার ছাত্রদের নিয়ে মাস্টারি করো।”

দেওয়ালের অন্য দিকে ঘোড়া ডাকছে, মাটিতে পা দাপছে। শব্দ আসছে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে ডারু। এবার সত্যি সত্যিই আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল। তুষার-ঢাকা অধিকার ওপর ঝিকিয়ে উঠছে আলো। সব তুষার গলে গেলে সূর্য আবার অধিকার করবে এই পাথরে প্রান্তর; আবার পড়িয়ে দেবে তাকে। তাই এখন কয়েক দিন ধরে অপরিবর্তনীয় আকাশ উজাড়

করে ঢেলে দেবে মানুষের সব চিহ্ন-মোছা এই বিস্তীর্ণ বিশালতার ওপর শূন্যকন্যা আলো।

বালদুচির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ডারু বলে, “কিন্তু লোকটা আদর্শে কি করেছিল?” বালদুচির উত্তর দেবার আগেই সে জিজ্ঞাসা করলে, “ও কি ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারে?”

“না; একবর্ণও না। আমরা কয়েক মাস ওকে খুঁজে বেড়াছি। কিন্তু গ্রামের লোকজন ওকে লুকিয়ে রেখেছিল। ও ভাইপোকে খুন করেছে।”

“ও কি আমাদের বিরুদ্ধে?”

“আমার মনে হয় না, কিন্তু কিছুই জোর করে বলা যায় না।”

“ও কেন খুন করল?”

“পারিবারিক বিবাদ। আমার ত তাই-ই মনে হয়। একজন বোধহয় গম ধার করেছিল। তাই-ই হবে বোধহয়। ব্যাপারটা মোটেই স্পষ্ট নয়। যাই হোক লোকটা খাঁড়া দিয়ে তার ভাইপোকে জবাই করেছে ভেড়া জবাই করার মত।”

বালদুচি জবাই করার ভীষণে হাতটা তার নিজের গলার কাছে নিয়ে আসতেই খুবই উদ্ভ্রাণ হয়ে উঠল বন্দী। আরব-টির ওপর অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ডারু;—ক্ষিপ্ত হল জঘন্য হিংসার পরিপূর্ণ সমস্ত মানুষের উপর আর মানুষের ক্রান্তিহীন ঘৃণা এবং রক্তলোলুপতার ওপর।

উনুনের ওপর কেটলিতে চা ফুটছে। ডারু আর একবার চা ঢেলে দিল বালদুচিকে। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বন্দীকেও আর একবার চা ঢেলে দিল।। ব্যগ্র ভাবে চায়ে চুমুক দিল বন্দী। চা খেতে হাত তুলেছিল সে। জোন্সবাটা ফাঁক হয়ে গেল। ডারুর নজরে পড়ল বন্দীর পেশী-বহুল বুক। বালদুচি বলে, “ধন্যবাদ। আমি চলাম।”

পকেট থেকে ছোট দাড়ি বার করে আরবটির দিকে এগিয়ে গেল সে। রক্ষ্য গলায় ডারু জিজ্ঞেস করল, “কি করছ?”

হকচকিয়ে গিয়ে বালদুচি দড়িটা দেখাল। “দরকার নেই।”

সংসকোচে সেপাইটি বলে, “এটা অবশ্য তোমার ব্যাপার। যা বোঝ কর। অস্ত্রপাতি আছে ত?”

“আমার শটগান আছে।”

“কোথায়?”

“বাল্লে।”

“বিছানার কাছে রাখা দরকার।”

“কেন! আমি কিসের জন্য ভয় করব?”

“তোমার মাথা খারাপ। সত্যি যদি বিদ্রোহ হয়, কেউ নিরাপদে থাকবে না। আমাদের সকলেরই এক দশা হবে।”

“আমি আত্মরক্ষা করব। এখানে আসতে দেবী লাগবে ওদের। ওরা আমার নজর এড়িয়ে আসবে কি করে?”

কথা শুনে হেসে উঠল বালদুচি। তার সাদা দাঁতের পাঁচি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ হাসি বন্ধ করে বলে,

“আসতে দেবী হবে না? বেশ, ভামারও তাই মনে হয়েছিল। তোমার মাথা খারাপ। আমার ছেলের মত তুমিও পাগল। তাই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে।”

কথা বলতে বলতে রিভলবারটা খুলে ডেস্কের ওপর রেখে দিল বালদুচি।

“এটা রেখে দাও। এখান থেকে এল আমরা যাবার জন্য দুটো অস্ত্রের দরকার হবে না।”

টেবিলের কালো পালিসের ওপর রিভলবারটা ঝকঝক করে উঠল। বালদুচি নিকটে আসতেই চামড়া আর ঘোড়ার গন্ধ নাকে এল ডারুর।

হঠাৎ বলে উঠল ডারু, “শোন বালদুচি, আমার বন্ধু বিরক্তি লাগছে। তুমি এই লোকটাকে কেন এখানে আনলে? আমি কিছুতেই ওকে পদলিশের হাতে তুলে দিয়ে আসব না। ও কাজ আমার স্ভারা কিছুতেই হবে না। দরকার হলে বরং লুডাই করব।”

মুখোমুখি দাঁড়াল বালদুচি, খুব কঠিনভাবে তাকিয়ে থাকল।

“তুমি একটা আহাম্মুক। এ সব আমারও ভাল লাগে না। এত কাল পরেও তুমি একটা লোকের হাতে দাড়ি পরাতে গিয়ে আংকে ওঠ। সবচেয়ে বড় কথা লজ্জা পাও। হ্যাঃ, লজ্জাই পাও, কিন্তু তাই বলে তুমি চাও ওরা যা ইচ্ছে তাই করবে?”

“আমি কিছুতেই ওকে পদলিশের হাতে তুলে দেবো না,” ডারু আবার বলে উঠল।

“এ হুকুম, বাছা। আমি হুকুমটাকে আর একবার বললাম।”

“ভাল কথা, আমার কথাও ওদের

শুনিয়ে দিও। আমি কিছতেই লোকটাকে পদলিসের হাতে তুলে দিতে পারবো না।”

বালদাচি খুব চিন্তা করছে। একবার আরবটির দিকে আর ডারুর দিকে তাকাল সে। তারপর স্থির কণ্ঠে বলল—

“না, আমি ওদের কাছে গিয়ে কিছতেই বলব না। তুমি যদি আমাদের ত্যাগ করতে চাও, কর। আমি তোমাকে কড়া কথা শোনাতে পারব না। বন্দীকে তোমার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য হুকুম পেয়েছি আমি। হুকুম তামিল করছি। তুমি এই কাগজে দয়া করে সই করে দাও।”

“কোন দরকার নেই। তুমি ওকে আমার হেফাজতে রেখে গেছ—একথা আমি কিছতেই অস্বীকার করব না।”

“আমার সঙ্গে খিটমিটি করো না। আমি জানি তুমি সত্যি কথা বলবে। তুমি এই অঞ্চলের লোক; মানুষের মত

মানুষ। কিন্তু যা আইন তাই তো করতে হবে। তুমি সই কর।”

ডেস্ক খুলে ডারু ছোট্ট চৌকো লাল কালির দোয়াত আর “সার্জেন্ট মেজর” মার্কা কলম বার করল। স্কুলের কাজ করার সময় ডারু এই কলম ব্যবহার করে থাকে। ডারু সই করল। খুব যত্ন করে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেল বালদাচি।

ডারু বলল, “চল, তোমাকে কিছদূর এগিয়ে দিয়ে আসি।”

“না”, উত্তর দিল বালদাচি। “থাক, আর ভদ্রতার দরকার নেই। অপমান যা হবার তাই হচ্ছে।”

উঠে দাঁড়াল বালদাচি। আরবটির দিকে একবার, আর একবার দরজার দিকে তাকিয়ে বললে, “তা হলে যাই।” হঠাৎ বেরিয়ে গেল সে। পায়ে পায়ে তুষার জড়িয়ে যাচ্ছে। দেওয়ালের অন্য

পায়ে ঘোড়ার চাপল্য ভেসে এল। ভয় পেয়ে পাখা সাপটে ডাকল মোরগ। একটু পরে ঘোড়ার রাশ হাতে করে জানালার কাছে বালদাচিকে আবার দেখা গেল। একবারও ফিরে না তাকিয়ে ঘোড়া টানতে টানতে চড়াই-এর দিকে এগিয়ে গেল সে। তারপর তাকে আর দেখা গেল না। বড় বড় পাথর গাড়িয়ে পড়ার শব্দ ভেসে এল। ডারু এগিয়ে গেল বন্দীর দিকে। কিন্তু ওরও কোন উত্তেজনা নেই। তবু ডারুর দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি নামাল না একবারও। আরবী ভাষায় ডারু বলল, “বস, আসছি।” শোবার ঘরে এল ডারু। দরজা পার হতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ভাবল একটু, তারপর বিভ্রল-বারটি তুলে পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল। পিছন দিকে না তাকিয়ে সোজা শোবার ঘরে এল সে।

কোঁচের ওপর শূন্যে শূন্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। আকাশটা ক্রমশই



গোম্বা! মানুষের জন্ম
আল্লাহ কত উপকার
সমালো ক'রে যাচ্ছি। শুধু
তুমিই বুঝবে, কত বড়ো
ফদায়বান আমিরা!



আমেরিকা থেকে সাহেবরা এলে আমাদেবকে কারো
বুদাবন থেকে -



সাহিবসহী হালে বাসে আমেরিকার নিজে যাচ্ছে ওরই তেরী
কলার জালে! কেন জামো? এয়ে MONKEY ISLAND, সেই ওরই!



এ ওরই দিয়েই মানুষ শান্তিহুদ্ধিকরে নিচ্ছে!
বুঝালেনা গিন্দা, ওরা আবার আমাদেবের মত হতে চায়!

তার উপর ঝুঁকে পড়ছে। স্তম্ভতার দিকে কান পাতল। যুদ্ধের পর সে যখন এখানে এল, তখন এই স্তম্ভতাই তাকে পীড়িত করেছে। পাহাড়ের তলার, যেখানে মরুভূমি আর উঁচু মালভূমি ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে একটা ছোট শহরে বদলী হতে চেয়েছিল সে। শহরের পাথরে প্রাচীর, উত্তর দিকটা কালো ও সবুজ, দক্ষিণ দিকটা লালচে, গাছ গাছ ফুলের গাছ। সেই প্রাচীর যেন শেষহীন গ্রীষ্মের সীমান্ত। কিন্তু সেখানে বদলী হতে পারেনি সে। বরং তাকে আরও উত্তরে খাস মালভূমির দিকে পাঠানোর প্রস্তাব করা হল। প্রথম প্রথম এই নিঃসাড় স্তম্ভতা আর রাশ রাশ পাথরের মধ্যে খুবই কষ্ট হয়েছিল তার। মাঝে মাঝে পোড়া মাটি নজরে পড়ে। মনে হয় হাল চালানো হয়েছে বুঝি। চাষ আবাদ হবে। কিন্তু তা না। মাটি খোঁড়া হয়েছে সত্যি। তবে চাষ-আবাদের জন্য নয়। মাটি খুঁড়ে পাথর বার করা হয়েছে। এই পাথরে মজবুত বাড়ী তৈরী করা যায়। তাই হাল দেওয়া হয়েছে শুধু পাথর আবাদ করার জন্য। এখানে ওখানে খানায় খোদলে পাতলা মাটির আস্তরণ কেঁকে নিয়ে গ্রামের লোক তাদের ছোট সীজ-বাগান লাগায়। এই হল এই অঞ্চলের চেহারা। নগ্ন পাহাড় আর পাথর দিয়ে এর চার-ভাগের তিন ভাগ গড়া। শহর গড়ে উঠেছে, বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে, তারপর ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষ এসেছে, পর-পরকে ভালবেসেছে অথবা টুন্টি টিপে ধরেছে পরস্পরের। তারপর মারা গেছে। কিন্তু এই মরুভূমিতে সে কিংবা তার অর্থাৎ কেউ-ই কিছু নয়। কিছুতেই কিছু আসে যায় না। তবু একথাও ঠিক যে, এই মরুভূমির অন্য পারে তারা কেউ-ই বাঁচতে পারে না। ডারু একথা মর্মে মর্মে বোঝে।

কোঁচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডারু। পাশের ক্রাশ-ঘরে কোন সাড়া শব্দ নেই। পালিয়ে গেছে বন্দী—আরব। শুধু এই কথা ভেবেই বিশুদ্ধ আনন্দে তার বুকের ভরে উঠল। এবার সে এক। আর তাকে কোন সিঁধ্যান্ত নিতে হবে না। কিন্তু পালিয়ে যায়নি বন্দী। সে শুধু উনুন আর ডেস্কের মাঝখানে চিং হয়ে শুয়ে আছে। খোলা চোখ ছাদের দিকে নিবদ্ধ। এই অবস্থায় তার পুরনু ঠোঁটটা সবচেয়ে বিশিষ্ট দেখাচ্ছে। মনে হয় সে যেন ঠোঁট উলটে আছে। ডারু বলে, “এস।” উঠে দাঁড়াল আরব।

ডারুর পিছনে এল। শোবার ঘরে জানলার ধারে একটা টেবলের কাছের চেয়ারে বসতে ইংগিত করল স্কুল-মাষ্টার। ডারুর ওপর থেকে চোখ না তুলেই চেয়ারে বসে পড়ল বন্দী।

“খিদে পেয়েছে?”

“হ্যাঁ”, উত্তর দিল বন্দী।

দু-জনের মত খাবারের ব্যবস্থা করল ডারু। ময়দা আর তেল দিয়ে তৈরী হবে কেক। ছোট্ট গোটোটি জ্বালানো। কেকটাকে গোটোভের ওপর চাড়িয়ে ভাঁড়ারে গেল মাখন, ডিম, খেজুর আর জম্বাট দুধ আনতে। কেক তৈরী হল। জানলার ওপর ঠান্ডা করার জন্য রেখে দিল কেক। জম্বাট দুধে কিছুটা জল ঢেলে ফুটিয়ে নিল। কয়েকটা ডিম ভেঙ্গে অমলেট করতে থাকল ডারু। খাবার, তৈরী করার সময় নড়া-চড়া করতেই ডানদিকের পকেটে রাখা রিভলবারটা বার বার ধাক্কা খাচ্ছিল শরীরে। গোটো-থেকে পাত্রটা নামিয়ে রেখে ক্রাশ-ঘরের ভিতরে গিয়ে রিভলবারটা ড্রয়ারে রেখে এল ডারু। রাগি নেমে আসছে। আলো জ্বালিয়ে, বন্দীকে খেতে দিল ডারু। “খাও”, সে বলে। এক টুকরো কেক তাড়াতাড়ি মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে থমকে গেল আরব।

“আপনি খাবেন না?” সে জিজ্ঞাসা করল।

“খেয়ে নাও। তারপর আমি খাব।”

পুরু ঠোঁটটা আবার একটু ফাঁক হল। একটু ইতস্ততঃ করে খুব দৃঢ় ভাবে কেকে কামড় বসিয়ে দিল।

খাওয়া শেষ হবার পর বন্দী জিজ্ঞাসা করল, “আপনিই আমার বিচার করবেন বুঝি?”

“না। তুমি শুধু কাল অবধি আমার কাছে থাকবে।”

“আপনি আমার সঙ্গে খেলেন কেন?”

“আমার খিদে পেয়েছে।”

আর কথা বলে না বন্দী। ডারু বাইরে গেল। ভাঁড়ার থেকে একটি আরামপ্রদ চেয়ার এনে টেবল আর গোটোভের মাঝখানে, ঠিক বিছানার কাছে রাখল। স্যুটকেসের ওপর স্তূপ করা কাগজপত্র নামিয়ে দুটো কম্বল বার করে চেয়ারের ওপর ভাল

করে বিছিয়ে দিল। তারপর হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। বিছানার ওপর বসে পড়ল সে। মনে হল সবই ব্যর্থ। আর ত করণীয় কিছু নেই। হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। কোন কিছু নেই যা আবার গুঁছিয়ে রাখা যায়। লোকটার দিকে আর একবার তাকাতেই হয়। সুতরাং আর একবার তাকাল ডারু। কম্পনা করে নেবে যে বন্দীর মুখটা রাগে ফেটে পড়ছে। কিন্তু তাও করা গেল না। নজরে পড়ল বন্দীর কালো উজ্জ্বল চোখ আর পশুদের মূখ। আর ত কিছু নেই সেখানে।

“তুমি কেন খুন করলে?” নিজের বিরূপ কণ্ঠস্বরে নিজেই অবাক হল।

চোখ ফিরিয়ে নিল বন্দী।

“সে পালিয়ে গেল। আমিও তার পিছন পিছন ধাওয়া করলাম।”

বন্দী ডারুর দিকে আবার ফিরে তাকাল। তার চোখে বেদনার গাঢ় স্ফীয়া। “আমাকে নিয়ে কি করবে ওরা?”

“ভয় লাগছে?”

কাঠ হয়ে চোখ সন্ধিয়ে নিল আরব।

“দুঃখ হচ্ছে?”

হ্যাঁ করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বন্দী। বোঝাই যাচ্ছে কথাটার মানে ঠিক ধরতে পারিনি আরব। বিরক্তি বাড়তে থাকল ডারুর। সঙ্গে সঙ্গে খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকল সে। দুটো বিছানার ফাঁকে তার বিরাট দেহ সম্পর্কে অকস্মাৎ সে খুব বেশী সচেতন হয়ে উঠল।

অধৈর্য হয়ে বলে, “ওটা তোমার বিছানা। শুয়ে পড়।”

এক চুল নড়ল না আরব। ডারুকে ডেকে আবার বলে, “বলুন, না, ওরা আমার কি করবে?”

স্কুলমাষ্টার ওর দিকে ফিরে তাকাল।

“কালকেও কি সিপাই আসবে?”

“জানি না।”

“আপনিও কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?”

“জানি না। কেন?”

বিছানার ওপর উঠে বসল বন্দী। জানলার দিকে পা করে কম্বলের ওপর চিং হয়ে শুয়ে পড়ল। ইলেকট্রিক বাল্ব

থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে তার চোখে।
তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করল সে।

বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে আবার
জিজ্ঞাসা করলে ডারু, “কেন?”

ধাঁধানো আলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে
চেয়ে থাকল বন্দী। চেষ্টা করল যেন
চোখ দুটো পিট পিট না করে।

“আমাদের সঙ্গে আসুন”, সে বললে।

মাঝরাত অবধিও ডারুর চোখে ঘুম
এল না। সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে শব্দে
গিয়েছে ডারু; এই-ই তার অভ্যাস।
কিন্তু যখনই তার মনে পড়ল যে তার
গায়ে কিছু নেই, তখন অস্বস্তি হতে
থাকলো। মনে হল বন্দী এখন তাকে
আঘাত করতে পারে। মনে হল উঠে
জামা কাপড় পরে তৈরী হয়ে থাকা ভাল।
তারপরই মনে হল এসব ছেলেমানুষী।
সে বালক নয়। যদি আরব তাকে সত্যিই
অক্রমণ করে তবে দুই হাতে পিষে
ফেলার মত শক্তি আছে তার। বিছানা
থেকেই আরবকে লক্ষ্য করতে থাকল
ডারু। লোকটি ঠিক আগের মতই চিং
হয়ে শব্দে আছে। আলোর জন্য চোখ
দুটো বন্ধ। আলো নিভিয়ে দিল ডারু।
মনে হল অকস্মাৎ অন্ধকার দলা পাকিয়ে
উঠেছে। আস্তে আস্তে জানালার কাছে
রাতি প্রাণ পেতে আরম্ভ করেছে। নড়ে
চড়ে উঠছে নক্ষত্রহীন আকাশ। লোকটি
অসাড় হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তার
চোখ দুটি খোলা। স্কুলের ওপর দিয়ে
মৃদু বাতাস বইছে। বোধ হয় এই
বাতাসে মেঘ কেটে যাবে। কাল সূর্য
উঠবে।

রাতের দিকে বাতাসের গতি বাড়ল।
মোরগ-মুরগীরা বিচলিত হয়ে পাখা
ঝাপটিয়েছিল কিছুক্ষণ। আরব ডারুর
দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকল। ডারুর মনে
হল আরবটি গোঙাচ্ছে। তাই অতিথির
নিঃশ্বাস পতন শোনার জন্য কান খাড়া
করে থাকল সে। না, ভারী ও স্বাভাবিক-
ভাবেই বন্দীর নিঃশ্বাস বইছে। খুব
কাছে প্রবাহিত এই নিঃশ্বাসের ওঠা
নামার শব্দ শুনতে শুনতে ভাবনায়
জড়িয়ে পড়ল ডারু। ঘুম এল না মোটে।
এই ঘরে সে প্রায় একটা বছর একলা
কাটিয়েছে। একলা থাকা এখন তার
অভ্যাস। হঠাৎ অন্য একটি লোকের
উপস্থিতি তাকে বিব্রত করে তুলেছে।
এই উপস্থিতি তার ওপর প্রত্যক্ষ বন্ধন
চাপিয়ে দিয়েছে, আত্মত্বের প্রতি

সচেতন করে তুলেছে। ডারু জানে এই
বন্ধনগুলি, স্বীকারও করে নিতে পারে।
কিন্তু আজকের এই বিশেষ অবস্থায় সে
এই সব বন্ধন স্বীকার করতে চায় না।
যে লোকগুলো একই ঘরের মধ্যে দিন
কাটায়, বন্দী হোক অথবা হোক সৈনিক,
তাদের মধ্যে এক ধরনের মৈত্রী গড়ে
ওঠে। প্রতি রাতে জামা কাপড়ের সঙ্গে
তারা নিজদের ধমটাকে খুলে দূরে
ছুড়ে ফেলে দেয়। আর বিরোধ ও
বিবাদের ওপারে গিয়ে ক্রান্তি ও
স্বপ্নের প্রাচীন সাত্ত্বাজ্যে পরস্পরকে তারা
বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে। গা ঝাড়া
দিয়ে উঠল ডারু। না, এই সব ভাবনা
আর নয়। এবার ঘুম, ঘুমের খুব
দরকার।

একটু পরে এপাশ ওপাশ করল
বন্দী। ডারু তখনও জেগে। বন্দী যখন
আর একবার নড়ল, সতর্ক হয়ে উঠল
ডারু। দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে
বিছানায় উঠে বসল বন্দী। নিশি
পাওয়ারা ঠিক এই ভাবেই ওঠে।
বিছানায় সোজা হয়ে বসে থাকল
কিছুক্ষণ। ডারুর দিকে একবারও ঘাড়
ফেরাল না। ও যেন বসে বসেই বুঝতে
চায় ডারু জেগে আছে কি না। ডারু
কোন সাড়া দিল না। একবার মনে হল
রিভলবারটা ড্রয়ারের মধ্যে আছে। মনে
হল এই বারই বন্দীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া
দরকার। কিন্তু সে তা করল না। বরং
শব্দে শব্দে বন্দীকে লক্ষ্য করতে থাকল।
আগের মত অতি সতর্ক হয়ে মাটিতে
পা রাখল আরব। একটু থামল। তারপর
মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আর একটু
হলেই ডারু চিংকার করে উঠত। কিন্তু
বন্দী ততক্ষণে পা টিপেটপে হাঁটতে
আরম্ভ করেছে। ঘরের শেষ প্রান্তে
ভাড়ারের দিকে যাবার দরজার কাছে
এগিয়ে যাচ্ছে। কোন শব্দ না করে
দরজার খিল খুলে বেরিয়ে গেল সে।
হাট-আলগা হয়ে থাকল দরজা। বিছানা
না ছেড়ে ডারু ভাবল, “ও পালিয়ে
যাচ্ছে। ভালই হল।” মুরগীগুলো পাখা
ঝাড়ছে। বন্দী এতক্ষণে নিচয়ই মাল-
ভূমি অধিগিয়েছে। একটু পরে জলের
শব্দ হল। ডারু বুঝতেই পারল না
কোথা থেকে আসছে এই জলের শব্দ।
তার কিছুক্ষণ পরেই বন্দীকে আবার
দরজার কাছে দেখা গেল। ঘরের মধ্যে
এসে অতি সাবধানে দরজা বন্ধ করে দিয়ে
বিছানায় উঠে বসল সে। তারপর ডারু

পিঠ ফিরিয়ে শব্দেই ঘুম ধরে এল।
তবুও ঘুমের অতল থেকে তার কানে
বাজতে থাকল অতি-সতর্ক পদধ্বনি।
ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে উঠল ডারু,
“স্বপ্ন দেখছি, এ স্বপ্ন।” কিন্তু ঘুম
ভাঙল না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন আকাশ
পরিষ্কার। খোলা জানালা দিয়ে ঠান্ডা
বাতাস আসছে। কম্বলের মধ্যে কুঁকড়ে
শুয়ে বন্দী তখনও ঘুমাচ্ছে হাঁ করে।
সে যেন ঘুমের মধ্যে নিজেকে একেবারে
ছেড়ে দিয়েছে। গায়ে ঠেলা দিতেই
ধড়মড় করে উঠে বসল বন্দী।
বিস্ফারিত চোখ দুটো ডারুর ওপর
নিবন্ধ। সে যেন ইতিপূর্বে কখনও
ডারুকে দেখেনি। তার চোখে ওপছানো
ভয় দেখে কয়েক পা পিছিয়ে এসে স্কুল-
মাষ্টার বলে, “ভয় কি! এই ত আমি।
তোমার খিদে পেয়েছে।” মাথা নেড়ে
বন্দী বলে, হ্যাঁ। তার মুখ ততক্ষণ
স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু দৃষ্টি
তখনও ফাঁকা ও নিঃপ্রাণ।

দুজনে বিছানায় বসে কফির সঙ্গে
কেক খেয়ে নিল। তারপর ডারু বন্দীকে
বাথরুম দেখিয়ে দিল। ঘরে ফিরে এসে
ডারু বিছানা পরিপাটি করে তুলে ঘর
পরিষ্কার করল। ক্রাশ ঘরের ভিতর দিয়ে
বারান্দার দিকে একবার গেল। নীল
আকাশে সূর্য উঠেছে। উজ্জ্বল কোমল
আলোয় উন্মাদিত জনহীন অধিত্যকা।
পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় কোথাও কোথাও
বরফ গলছে। এখনি হয়ত সব তুষার
গলে যাবে। পাথর দেখা যাবে আবার।
অধিত্যকার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ডারু
তাকিয়ে থাকলো বিপুল প্রসারিত
শূন্যতার দিকে। বালদুচির কথা মনে
পড়তেই মন খারাপ হয়ে গেল। সে
বালদুচিকে এমনভাবে বিদায় দিয়েছে
যেন সে কোনক্রমে ওদের সঙ্গে জড়িত
হতে চায় না। যাবার সময় বালদুচি যে
কথাগুলো বলেছিল এখনও কানে
বাজছে সে কথার রেশ। আর তখনই
ডারুর মনে হল সে বড় একা, এখনি সে
অজান্ত হতে পারে। অন্যদিক থেকে
বন্দীর কাশির শব্দ কানে এসে। অনিচ্ছা
সত্ত্বেও ডারু সেই কাশির শব্দ শুনতে
বাধ্য হল। আর তাই নিজের ওপর রাগ
বেড়ে গেল। একটা পাথর কুড়িয়ে সজোরে
ছুড়ে মারল। পাথরটা সাঁই সাঁই শব্দ
করে তুষারের মধ্যে ডুবে গেল। ওই

লোকটার নির্বোধ অপরাধ তার কাছে জঘন্য লাগছে সত্যি; কিন্তু তাই বলে তাকে পুর্লিশের হাতে তুলে দেওয়া ভীষণ অপমানের কথা। শব্দ এই সম্ভাবনার কথা ভাবতেই লজ্জায় মিলিয়ে গিলে ডারু। সে অভিশাপ দিল তার স্বজাতিকে। কারণ তারাই এই লোকটাকে তার কাছে পাঠিয়েছে। সে অভিশাপ দিল বন্দী আরবকে। কারণ সে নির্বোধ খুন করতে পারে কিন্তু পালিয়ে যাবার মত তার ক্ষমতা নেই। বারান্দাটা ঘুরে ঘুরে পায়চারি করতে-করতে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়াল ডারু। তারপর ঘরে চলে এল।

নিমেষের মেঝের ওপর বসে দুই আঙুল দিয়ে দাঁত মাজছে আরব। তার দিকে তাকিয়ে ডারু বলে, “এস।” বন্দীর আগে আগে ঘরের মধ্যে এসে সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট চাপিয়ে বাইরে যাবার জুতো পরে নিল ডারু। বন্দীও টুপি আর চটি পরে নিল। ওর জন্য দাঁড়িয়ে থাকল ডারু। তারা এল ক্রাশ-ঘর। বাইরে যাবার পথের দিকে আঙুল দেখিয়ে ডারু বলে, “যাও।” বন্দী নড়ল না। ডারু বলে, “আমি যাচ্ছি।” বন্দী বাইরে এল। ঘরে ফিরে ডারু খাবারের একটা প্যাকেট তৈরী করে নিল। ক্রাশ-ঘরে পার হবার সময় ডেস্কের কাছে এসে একটু দুর্বল হয়ে পড়ল ডারু। কিন্তু সে কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপর চোকাঠ পার হয়ে দরজায় তালা দিল। “এই দিকে”, বলে ডারু। ওরা পূর্বের দিকে এগুতে থাকল। অল্প একটু যেতেই ডারু যেন শুনতে পেল তার পিছনে তস্পত পদশব্দ। থামল ডারু। স্কুল-বাড়ি একবার ভাল করে পরীক্ষা করে নিল। না, কোথাও কেউ নেই। চেয়ে থাকল আরব। কিন্তু সে কিছু বুঝেছে বলে মনে হল না। ডারু বলে, “এস।”

এক ঘণ্টা হাঁটার পর চুনো-পাহাড়ের খাড়া চূড়ার ধারে তারা জিরিয়ে নিল। খুব তাড়াতাড়ি তুষার গলে যাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন অধিত্যাকা শূন্যে আসছে। বাতাসের মত অনুরাগিত হচ্ছে যেন। আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। পায়ের তলায় মাটি বেজে উঠছে। মাঝে মাঝে

এক একটা পাখির আনন্দিত চিৎকার সামনের দিগন্ত ফাল ফাল করছে। সকালের হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিল। এই অতি পরিচিত বিস্তীর্ণতায় বিপুল আনন্দে অভিভূত হল ডারু। এখন গাঢ় নীল আকাশের নিচে সমস্ত পরিসর সম্পূর্ণ হলো। আরও এক ঘণ্টা হাঁটার পর তারা দক্ষিণের দিকে মোড় নিল। এই অতি পরিচিত বিস্তীর্ণতায় তারা এসে দাঁড়াল সমতল পথের ওপর। এখান থেকে অধিত্যাকা পূর্ব দিকে আরও ঢালু হয়ে সমতলের সঙ্গে মিশেছে। দক্ষিণ দিকে দেখা যায় কিছু পাহাড়, তাই এখনকার নিঃসর্গ কেমন অবাধ্য বেয়াড়া বলে মনে হয়।

দুই দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল ডারু। দিগন্তের আকাশ ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না। কোথাও মানুষের চিহ্ন মাত্র নেই। বন্দীর দিকে তাকিয়ে দেখলে ডারু। তার চোখে অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি। খাবারের প্যাকেটটা বন্দীর দিকে বাড়িয়ে দিলে ডারু বলে, “ধর। রুটি, খেজুর, চিনি আছে। দিন দুয়েক চলে যাবে। আর এই নাও এক হাজার ফ্রাঙ্ক।” বন্দী আরব খাবারের প্যাকেট আর টাকা বুকের কাছে ধরে রাখল। ও যেন বুঝতেই পারছে না এসব দিয়ে সে কি করবে। পূর্বের দিকে হাত বাড়িয়ে স্কুলমাষ্টার বলে, “ওই দিকে তিনগুইট। ওখানে পুর্লিশ-ফাঁড়ি। তারা তোমাকে ধরতে চায়।” খাবারের প্যাকেট আর টাকা বুকের কাছে ধরে পূর্বের দিকে তাকাল বন্দী। ডারু যেন জোর করে তার হাত ধরে দক্ষিণের দিকে ঠেলে দিল। ঠিক তাদের পায়ের নিচেই পায়ে চলা পথ। ডারু বলে, “ওই পায়ে পায়ে চলে চলে পথ পড়ে গেছে। এই পথ ধরে দিনভর হেঁটে গেলে সমতল ভূমির মাষাবরদের দেখা যাবে। তারা তাদের আইনকানুন অনুসারে তোমাকে আশ্রয় দেবে।” বন্দী আরব ডারুর দিকে ভীত চোখে তাকাল। ডারু বলে, “কথা শোন। ভয় কিসের? আমি চললাম।” এই বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে স্কুলের দিকে কিছুদূর এগিয়ে আবার পিছনে ফিরে তাকাল। আবার ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আবার এগিয়ে গেল ডারু স্কুলের দিকে।

ঠাণ্ডা মাটির ওপর নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। কয়েক মিনিট পরে আবার পিছনে তাকাল ডারু। আরবটি তখনও পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ডারুর গলায় কান্না যেন দলা পাকিয়ে উঠছে। অর্থ-হীনভাবে সে একবার আরবটির দিকে হাত নেড়ে হেঁটে গেল বেশ দ্রুতভাবেই। আর একবার পিছনে তাকিয়ে দেখল পাহাড়ের ওপর আর কেউ নেই।

ডারু বেশ স্বিধাদীর্ণ। সূর্য এখন আকাশের মাঝামাঝি। সামনের দিকে হাঁটতে থাকল স্কুলমাষ্টার। প্রথমে বেশ স্বিধার সঙ্গে। পরে আর স্বিধা থাকল না। দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেল সে। ছোট পাহাড়ের কাছে আসতেই দেখল ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভিজে জবজব করছে। খুব তাড়াতাড়ি পাহাড়ে চড়তে থাকল। চূড়ার কাছে এসে হাঁফিয়ে পড়ল ডারু। দক্ষিণ দিকের পাহাড়াটা নীল আকাশের গায় ঝলু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বদিক থেকে ভেসে আসছে বাষ্পাশ্র উষ্ণতা। ওই আচ্ছন্নতার মধ্যে ডারু তার বন্দীকে নিয়ে পুর্লিশ ফাঁড়ির দিকে যাচ্ছিল।

একটু পরে ক্রাশ-ঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডারু দেখাচ্ছিল সমস্ত উপত্যাকা পরিচ্ছন্ন রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু মন তার অন্য কোথাও। তার পিছনে র্যাক বোর্ডে আঁকা ফরাসী দেশের নদীর বাঁকের মধ্যে বেচপ অক্ষরে লেখা : “তুমি আমাদের একজনকে পুর্লিশের হাতে তুলে দিয়েছ। এই অপরাধের দাম দিতে হবে।” ডারু লেখাগুলো এইমাত্র পড়েছে। একবার আকাশের দিকে একবার উপত্যকার দিকে সে তাকাল। আর তারও ওপারে অদৃশ্য প্রান্তর সমুদ্রের কিনার অবধি এগিয়ে গেছে। এই বিরাট নিঃসর্গ বড় ভাল লাগে ডারুর। কিন্তু এই নিঃসর্গও সে কত নিঃসঙ্গ। অনুবাদ : রাম বসু

কামু ইতিমধ্যে এই দেশে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছেন। ১৯১৬ সালে আলজেরিয়ার কামুর জন্ম হয়। ইনিও জীবনে নানা প্রকার বৃত্তি গ্রহণ করেন। স্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রতিরোধ আন্দোলনে ইনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। একেও অস্তিত্ববাদী দর্শনের একজন প্রধান প্রবক্তা হিসাবে স্বীকার করা হয়। ১৯৫৭ সালে একে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় এবং ১৯৬০ সালে একটি মোটর দুর্ঘটনায় এর মৃত্যু হয়।

অনুবাদক।

II ইউরোপের সব চাইতে উঁচু বুরুজ II

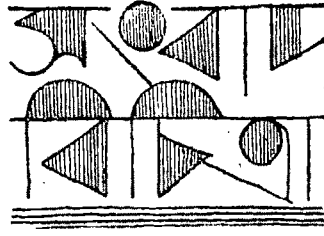
প্যারিসের আইফেল বুরুজ দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে যুরোপের সবচাইতে উঁচু বুরুজ বলে পরিচিত ছিলো। কিন্তু মাত্র বছরখানেক আগে শটকলনের ৩২০ মিটার উঁচু সুইডিশ টেলিভিশন বুরুজ আইফেল বুরুজকে উচ্চতার পরাস্ত করে। তবে সুইডিশ টেলিভিশন বুরুজের গৌরবও বেশী দিন টিকবে না। দক্ষিণ জার্মানির মিউনিকে শীর্গগির ইয়ুরোপের সব চাইতে উঁচু বুরুজ নির্মাণ করা হবে। এ বুরুজটি সুইডিশ টেলিভিশন বুরুজের চাইতে পাঁচ মিটার অধিক উঁচু করে নির্মাণ করা হবে। বুরুজের ভেতর ছয় তলার একটা কার্টানিমিত মণ্ড থাকবে এবং মণ্ডের রেস্টোরা ও অন্যান্য জায়গা থেকে চার পাশের অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করা সম্ভব হবে। মিউনিকের পদ্রলিশ কতৃপক্ষ বুরুজের সবচাইতে উঁচু মণ্ড থেকে মিউনিকের সমস্ত ট্রাফিক অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। তিনটি আধুনিক লিফট দর্শকগণকে মাটি থেকে মণ্ডে নিয়ে যাবে এবং এই মণ্ডে সবসময়ে পাঁচশো দর্শকের জায়গা থাকবে। জানা গেছে যে, মিউনিকের এই টেলিভিশন বুরুজ নির্মাণ করতে প্রায় এক কোটি মার্ক শয় হবে। অনেকেই এই বুরুজ নির্মাণের কাজে অর্থ নিয়োগ করতে রাজী হয়েছেন। কারণ এই ধরনের পদ্রজ নিয়োগ একটা মস্তবড়ো লাভজনক ব্যাপার। শটটগার্টের টেলিভিশন বুরুজ মাত্র ২১১ মিটার উঁচু এবং এখানে মাত্র ১৩০ জন দর্শকের স্থান সংকুলান হয়। কিন্তু এই বুরুজ নির্মাণ করতে যে টাকা খরচ হয়েছে বছর দুয়েকের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ উঠে গেছে। নির্মাণ-কতৃপক্ষের বিশ্বাস যে, মিউনিকের টেলিভিশন বুরুজের রেলায় এটা আরও অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হবে।

II বিদেশিনী II

১৭ বৎসর বয়স্কা একজন পোলিশ মহিলা বহুবৎসর যাবৎ ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। ইংল্যান্ডে তিনিই সর্বাধিক বয়স্ক পোলিশ। তাঁর স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভালই আছে। কানে শুনতে বা চোখে দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। এ-উৎসাহী মহিলা জীবনে কোন দিন জেলে হাতায়াক করেন নি। দৈনন্দিনজীবনে যেখানে ইংরাজিভাষীদের সংগে চলাফেরা করতে হয় সেখানে দীর্ঘকাল বাস করেও আজ পর্যন্ত তিনি একটি ইংরাজি শব্দ শেখেন নি।

II টেলিফোনের সাহায্যে মানসিক ব্যাধির উপশম II

দু'বছর হলো হামবুর্গে একটা বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। টেলিফোনের সাহায্যে মানুষের



মানসিক ব্যাধি আরোগ্য করাই হলো, এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কাজ। শব্দ হামবুর্গেই নয়। জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরেও এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১৯৬০-৬১ সালে সমবেত ৭০০০ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নারী-পুরুষ টেলিফোনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চেয়েছিলো। এদের সকলেই নানা রকম মানসিক স্বন্দ, দাম্পত্য কলহ অথবা সাধারণ হতাশায় ভুগছে। হামবুর্গের এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রায় ৪০ জন নারী-পুরুষ বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত আছেন। এদের আধিকাংশই হলেন চিকিৎসক, আইন বিশেষজ্ঞ আর ধর্মশাস্ত্রবিদ।

II যুরোপের বৃহত্তম ঝুলন্ত সেতু II

বুটেনের ফোর্থ নদীর ওপর যে নতুন ঝুলন্ত ফোর্থ রোড ব্রিজ নির্মিত হচ্ছে তার জন্য ইঞ্জিনীয়ারগণ ৪০,০০০ মাইল দীর্ঘ তার দ্বারা বয়ন কার্য আরম্ভ করে দিয়েছেন।

সেতুটি নির্মাণ করতে ব্যয় হবে ১৬,০০০,০০০ পাউন্ড হতে ১৭,০০০,০০০ পাউন্ড। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মতে এটি ব্রিটেনের বৃহত্তম ইঞ্জিনীয়ারিং পরিকল্পনা। সেতুটি নির্মিত হলে এডিনবরা ও উত্তর স্কটল্যান্ডের মধ্যে স্থলপথে প্রথম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব হবে।

বয়নকার্য সম্পূর্ণ হতে ইঞ্জিনীয়ারগণের প্রায় দুইমাস সময় লাগবে, অবশ্য যদি আবহাওয়া ভাল থাকে। এই পথ-সেতুটি হবে যুরোপের এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিশ্বের বৃহত্তম ঝুলন্ত সেতু। ১৯৫৮ সালের শরৎকালে এসম্পর্কে কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেতুটি ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সাধারণের ব্যবহারের জন্য খোলা সম্ভব হবে।

II বিনা পেট্রোলে আগামী দিনের গাড়ী II

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মিউনিকের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় যুরোপের একটি সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ক্ষুদ্র গবেষণাগারে এমন একটি জিনিস আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে যা আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে সম্ভবত আনবিক শক্তি অপেক্ষা অধিক বিপ্লব আনবে।

এই দুটি গবেষণাগারে যে অভিনব শক্তি সম্পর্কে গবেষণা করা হচ্ছে তার নাম জুন্টি গ্রাস পদার্থ এবং তার উৎসের

নীতি খুবই সরল। এটি মধ্যবর্তী তাপশক্তিতে পরিবর্তিত না করে রাসায়নিক বিক্রিয়াজনিত উৎপন্ন বিদ্যুৎ শক্তির সরাসরি ব্যবহার। রাসায়নিক কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুন্টি বিশেষরূপে নির্মিত সচ্ছিন্ন ইলেকট্রোডের মাধ্যমে সংমিশ্রিত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থেকে প্রাপ্ত বিন্যস্ত শক্তি সঞ্চার এই “পরশ পাথর” আবিষ্কার করেছেন। তরল পটেশিয়াম দ্রবকে ইলেকট্রোলাইটরূপে ব্যবহার করা হয়; হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়নগুলি মিলনে সৃষ্ট জলে একটি ধনাত্মক ও অপর একটি ঋণাত্মক অর্থাৎ বিপরীত-ধর্মী দুটি ইলেকট্রডকে তড়িৎ সঞ্চারিত করা হয়; ফলে কোন শক্তি অপচয় না করে এদুটি ব্যাটারীর মত কাজ করে চলে। যতক্ষণ দুটি সচ্ছিন্ন ইলেকট্রোডের একটিতে হাইড্রোজেন ও অপরটিতে অক্সিজেন সরবরাহ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া চলার সবসময় এই ব্যাটারী কাজ করবে ও তড়িৎশক্তি সরবরাহ করতে থাকবে।

পর পর অনেকগুলি এ ধরনের ব্যাটারী সাজিয়ে, যাকে জ্বালানী পদার্থ বলা হয়, উৎপন্ন বিরাট শক্তিশালী তড়িৎ-প্রবাহের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে ইলেকট্রিক মোটর চালানো হয়। বর্তমানের ইন্টিনাল কম্বাশন ইঞ্জিনের ৩০ শতাংশ শক্তি ব্যবহার করা যায়, সেই তুলনায় নতুন শক্তির ৮০ ভাগ ব্যবহার করা যায়। এটিই এই নতুন শক্তির সুবিধা এবং এই শক্তির উৎস হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস সর্বত্র সীমিত পরিমাণে পাওয়া যায়; তাই এই ‘বাস্তব জ্বালানী’ পেট্রোল ও ডিজেল অপেক্ষা অনেক সস্তা।

ভবিষ্যতের এই নতুন পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক মাত্রেই জানেন। এখন পৃথিবীর সর্বত্র টেকনিক্যাল উন্নতির সাহায্যে এই শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। মিউনিকের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রোলাইট রূপে জোরালো সক্রিয় জ্বালানী মেথেনল ও ইথার ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ এই দুটি থেকে অসংখ্য হাইড্রোজেন অণু নির্গত হয়ে বিক্রিয়াজনিত শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। স্থান সংকুলান ও হাঙ্গা শক্তির উৎস হিসাবে জুন্টি গ্যাস পদার্থ মহাজাগতিক রকেটযান, জাহাজ ও স্থলযানে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে যখন এই শক্তি দিয়ে মোটর গাড়ী চলবে তখন, মোটর গাড়ীর পেট্রল ট্যাঙ্কের জায়গায় থাকবে জ্বালানী পদার্থ ভর্তি হাঙ্গা ধাতুতে মোড়া দুটি গ্যাস সিলিন্ডার। বাজ যন্ত্র, ক্রাচ, গীয়ার, একজন্ট, শব্দ, দোঁয়া সেদিন থাকবে না। গাড়ী হাঙ্গা হবে, কম খরচে চলবে। তবে বিজ্ঞানের সাফল্যের পূর্বে আরও কয়েক বছর ধৈর্য ধরতে হবে বৈকি।



(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতঃপর ঘটনার স্রোত দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকলো সেই পথেই। কৃষ্ণার বাবা প্রচুর সমারোহে মেয়ের বিয়ে দিলেন জামাইকে আগে থেকে বাড়ীতে এনে, বলতে গেলে আটকে রেখে। এবং ফুল-শয্যার পরদিনই নিজে সংগে করে দমদমে নিয়ে গিয়ে পেলেন তুলে দিয়ে এলেন দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে।

আদরে আর আবেষ্টনে, ঘটনার স্রোতে আর উৎসবের স্রোতে নিরুপায় ইন্দ্রনীল যেন বন্যাতাড়িতের মতই ভেসে গেল। তার বিয়েয় তার মা-ভাইয়ের কোন ভূমিকা রইল না।

কিন্তু একেবারেই কি ভূমিকা রইল না?

ভূমিকা রইল শ্রোতার, ভূমিকা রইল দর্শকের। পাড়ার মধ্যে সানাই বাজল তিন দিন ধরে। তার সুর ভেসে বেড়াতে লাগল বাতাসে বাতাসে। শুনলেন সূচিন্তা, শুনল নিরুপম।

প্যান্ডেল বাঁধা থাকল পাঁচ দিন ধরে, পাড়ার মাঝখানে। জানলা থেকেই চোখে পড়ে, না দেখে উপায় নেই, দেখলেন সূচিন্তা, দেখল নিরুপম।

অবশ্য বিয়ের আরও একটা জিনিস দেখল নিরুপম। হয়তো বা দেখেছিলেন সূচিন্তাও, তবে জিনিসটার দাবীদার বলতে নিরুপমের নামটাই ধরা যায়।

প্রতিবেশী হিসেবে কৃষ্ণার বাবা অনুপম কুটিরের বড় ছেলের নামে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছিলেন। নিরুপম

দেখল টেবিলে পড়ে আছে। সেই মদ্য-বান কাগজে ছাপা সুদৃশ্য পরখানার দিকে নিরুপম তাকিয়ে থেকেছিল অনেকক্ষণ, হাতে করে তুলে নিতে ভুলে গিয়ে।

মায়ে-ছেলের বাড়ীর আর একটা ছেলের এই আশ্চর্য বিয়েকে কেন্দ্র করে কুশাগ্র আলোচনাও হয়নি। নিরুপমের অপসরণে তবুও সামান্যতম সোরগোল উঠেছিল; ইন্দ্রনীল যেন নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল অনুপম কুটিরের আওতা থেকে।

শুধু সানাইয়ের শব্দে সুশোভন ব্যাকুল হয়ে বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'বিয়ে-বাড়ীর সুর কোথা থেকে আসছে সূচিন্তা?'

সূচিন্তা আস্তে বললেন, 'পাড়ায় বিয়ে হচ্ছে সুশোভন।'

'কোথায়? কোন্ বাড়ীতে? চল না সূচিন্তা সেই বিয়ের বরকনেকে দেখে আসি।'

'বাঃ আমরা কি করে যাবো সুশোভন, আমরা কি ওদের চিনি?'

'চেন না? পাড়ার লোককে চেন না তোমরা?'

'তা' সবাইকে চিনে রাখা যায়?'

'কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় তো এমন ছিল না সূচিন্তা। পাড়ার সকলকে আমরা চিনতাম।'

'আমাদের ছেলেবেলাটা অনেকদিন চলে গেছে সুশোভন,' একটা আবেদন পাগলকে উপলব্ধ করে বুঝি নিজেকেই বলেন সূচিন্তা, 'আমাদের সব বেলাই চলে গেছে। এদের এখানে আমরা অচেনা। আমরাও কাউকে চিনি না।'

সুশোভন এ কথার উত্তরে যান না, বলেন, 'বিয়ে-বাড়ীর এই সুর শুনলে আমার বড় কষ্ট হয় সূচিন্তা! মনে হয় কে যেন কাকে ছেড়ে চিরকালের মত চলে যাচ্ছে। তোমার এ রকম মনে হয় না সূচিন্তা? তোমার মনে কষ্ট হয় না?'

সূচিন্তা সহসা খুব জোর গলায় বলে ওঠেন, 'কেন, কষ্ট হবে কেন? বিয়ে তো আহ্লাদের জিনিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব আহ্লাদের জিনিস।'

দিন-রাত্রির লুকোচুরি খেলার মাঝ-খান দিয়ে কেটে গেল কটা দিন। অনুপম কুটিরের বাতাসে স্তিমিত নিস্তরঙ্গতা। এ বাড়ীতেই যে মাঝখানে কিছদিন বাতাস উতরোল হয়েছিল, গানের সুর ছড়িয়ে পড়েছিল তার স্তরে স্তরে, দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে উঠেছিল অনেক কথা আর অনেক হাসি, সে আর এখন মনে পড়ে না।

অনুপম কুটিরের ছেলেগুলোকে চুরি করে নিয়ে পালাবার জন্যে যেন কোন মায়াবিনী যাদুকরী একটা ঝড় তুলেছিল, থেমে গেছে সে ঝড়।

কিন্তু একেবারেই কি থেমে গেছে?

মাঝে মাঝে কোথাও কোনখানে কি ওঠে না?

নির্বোধ এক পাগলের অদ্ভুত খাম-খেয়ালে! হয়তো ওঠে। আবার আপনিই ঠান্ডা হয়ে যায়।

সংসারের বহির্দৃশ্যটা নিশ্চুপ।

হঠাৎ সুশোভন তুললেন কথাটা।

'সূচিন্তা তোমার সেই অনেকগুলো

ছেলেকে আর দেখতে পাই না কেন? কোথায় তারা গেল বল তো?’

সুচিন্তা এক মৃদুত সেই উত্তর-প্রত্যাশী মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তারা বিদেশে চলে গেছে।’

‘কেন?’ সুশোভন বিরক্ত হলেন, ‘সববাই মিলে বিলেত যাবার কী দরকার হল? এই নীতাই সববাইকে—’

‘বিলেতে নয় সুশোভন, বিদেশে। ছেলেরা বিদেশে যায় না? তুমিও তো গিয়েছিলে দিল্লীতে।’

‘হ্যাঁ আমিও তো গিয়েছিলাম দিল্লীতে। কিন্তু কেন গিয়েছিলাম বল তো?’

‘বাঃ কেন আবার? চাকরী করতে।’

‘চাকরী!’ ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবতে থাকেন সুশোভন।

সুচিন্তা জোর দিয়ে বলেন, ‘হ্যাঁ চাকরী! মস্ত মোটা মাইনের চাকরী। চমৎকার সুন্দর। সেই অফিস-বাড়ীতে চকচকে টেবিল নিয়ে বসে কাজ করতে তুমি, কম্পনাকে বিস্মৃত করতে থাকেন সুচিন্তা, ‘ভাল ভাল পোষাক পরতে। লোকে তোমায় বলতো, মৃদুখাঁজ সাহেব—’

সুশোভন মাথা নেড়ে বলেন, ‘মনে পড়েছে না সুচিন্তা। তুমি আমায় দেখিয়ে দেবে?’

‘দেখিয়ে দেব? কী দেখিয়ে দেব?’

‘ওই যে চকচকে টেবিল, সুন্দর বাড়ী আর মৃদুখাঁজ সাহেবটাকে।’

বিবাহের

শ্যাব্য

এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

অনন্তচরণ মল্লিক এও কো

১৬৭/৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩

ফোন-২৪-৪৩২৮



ফোন ২২-৪২২৩

সুচিন্তা হেসে ফেলে বলেন, ‘কি করে দেখিয়ে দেব? আমি কি দিল্লী যেতে পারি?’

সুশোভন চঞ্চল আবেগের ভঙ্গীতে বলে ওঠেন, ‘কেন পারে না সুচিন্তা? তুমি তো জানো তুমি দিল্লীতে গেলে কত ভাল লাগে আমার?’

‘ভাল লাগে! কই এ কথা তো কোন-দিন বলনি সুশোভন। কখনো তো ডাকনি ‘সুচিন্তা তুমি দিল্লী এস। তুমি এলে আমার দিল্লী ভাল লাগে।’

সুশোভন হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে যান। ভয়াবহ ভঙ্গীতে বলেন, ‘ও রকম করে কথা বোলো না সুচিন্তা, আমার ভয় করছে।’

‘ভয় করছে। কেন ভয় করছে কেন?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, করে।’ সহসা পদুনো ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে ওঠেন সুশোভন, ‘বুঝতে পার না কালো কালো মেয়ের মতন কী যেন মাথার মধ্যে ছুটোছুটি করে।’

‘আচ্ছা আচ্ছা বলব না।’

‘বলবে না কেন? দিল্লীর কথা বলবে। ভাল দিল্লীর কথা বলবে। যে দিল্লীতে সেই আমরা কুতুবের নীচে বসে থাকি।’

‘আমরা কারা সুশোভন?’

সুশোভন যেন চলতে চলতে হঠাৎ বাধা পেয়ে যান। থমকে থেমে থাকেন একটু, তারপর ঈষৎ বিরক্তভাবে বলেন, ‘আমরা আবার কারা? আমরা। তুমিও সব ভুলে যাচ্ছ আজকাল সুচিন্তা।’

সুচিন্তা অকারণে খানিকটা হেসে ওঠে বলেন, ‘কে বললে ভুলে যাই? এই তো মনে রয়েছে—তোমার ওষুধ খাবার সময় হলো।’

‘আবার ওষুধ? ওই তোমার বড় দোষ সুচিন্তা। ওষুধ খেতে আমার বিদ্রী

লাগে। ওষুধগুলো কেন যে নীতা সেই বিলেতে নিয়ে গেল না।’

‘নীতা যখন নিরেই যারনি তখন খেয়ে ফেল।’ বলে ওষুধের শিশি আর জলের পাহটা হাতে করে এসে দাঁড়ালেন সুচিন্তা।

সুশোভন সেটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলেন, ‘তোমার খালি ওষুধ আর ওষুধ! ছেলেগুলো কোথায় চলে গেল খুঁজবে তো আগে।’

সুচিন্তা খুব একটা ঠান্ডা গলার বলেন, ‘কেন, খোঁজবার কি দরকার? তুমি তো ওদের ভালবাস না।’

‘ভালবাসি না? কে বললে ভালবাসি না? নিশ্চয় ভালবাসি। সুশোভন পর্দার পর্দায় চড়ে ওঠেন, ‘ওরা বুঝি তোমার তাই লাগিয়েছে?’

‘ওরা কেন লাগাবে। তুমিই তো ওদের দেখে ভয় পাও। ওরা যখন থাকে না স্বর্গততে থাকে—’

সুশোভন কেমন বেন চঞ্চল হয়ে ওঠেন। ব্যস্ত হয়ে বলেন, ‘না না ওরা থাকবে। ওরা না থাকলে যে তোমার কান্না পাবে।’

‘কে বলছে কান্না পাবে? কই, কোন-দিন কি কাঁদতে দেখেছ আমার?’

সুশোভন কয়েক গজ পায়চারি করে নিয়ে কাছে এসে বলেন, ‘কি করে দেখব? তুমি তো রাগিত্তে কাঁদো। আমি কি তোমার রাগিত্তে দেখতে পাই?’

সুচিন্তার অবিচলিত থাকার চেষ্টা বুঝি ব্যর্থ হয়। কণ্ঠে বিচলিত সুরের আভাস। ‘দেখতে পাও না তো—রাগিত্তে আমি কাঁদি, এ কথা তবে কি করে জানলে?’

সুশোভন আবার সেই রকম দ্রুত খানিকটা পায়চারি করে এসে বলেন, ‘জানবো না? তুমি কাঁদবে আর আমি জানবো না? সেই যখন তুমি কোথায় যেন থাকতে, আমি দিল্লীতে। দেখতাম নীতা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে জানলার দাঁড়াতাম, আর দেখতে পেতাম তুমি কাঁদছ।’

সুচিন্তা আরও আস্তে বলেন, ‘কোথায় বসে কাঁদতাম আমি?’

‘বসে? বসে তো নয়। দাঁড়িয়ে যে। অনেক দূরে কোনখানে যেন একটা জানলার তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে, আকাশ

সার্ভ ডুইং সরঞ্জাম ও অফিস সংক্রান্ত ফোনকারী কাগজ বিক্রয় ও প্রিন্টার্স

সহায় ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

কুইন ফোনকারী ফোর্স প্রাইভেট লি: ৬৩ ই, রাধাকৃষ্ণন ষ্ট্রীট কলিকাতা-১

মনের জোর? সেটা বোধকারি গায়ের জোরের বিপরীতেই চলে। সকলের ক্ষেত্রে কি না কে জানে, কিন্তু সূচিন্তার ক্ষেত্রে সেটা সত্য। অপারিসীম মনের জোর না থাকলে পাগলের বেদম হাসির শব্দে চমকে ঘুম ভেঙে উঠে আসা 'বড়ছেলের' বিস্ময়াহত দাঁড়ির সামনে অত সহজ হয়ে বসে থাকতে পারলেন কি করে সূচিন্তা।

আর শুধুই তো বসে থাকা নয়, মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়েও দিতে হয়েছে একগুঁয়ে পাগল মানুষটার।

না, নিরুপম কিছুর বলান।

শুধু উঠে এসে একবার দরজার বাইরে বারান্দার সামনে দাঁড়িয়েছিল। একবার বললেও হয়তো ঠিক বলা হয় না, বলা চলে একমুহূর্ত। পরক্ষণেই নিশেধে সরে গেল সেই ছায়া। সূচিন্তা চোখ তুলে দেখেছিলেন, চোখের পলক না ফেলাতে ছায়ার মিলিয়ে যাওয়াও দেখলেন।

কিন্তু নিরুপম কি এতটুকু প্রশ্ন করতে পারত না? সামান্যতম একটু বিস্ময় প্রশ্ন। মায়ের উপর এটুকু দয়া করা কি একেবারেই অসম্ভব ছিল?

সূচিন্তার বড়ছেলে তো উদার মহৎ মার্জিত। তাদের বাড়ীতে এসে পড়া, ঘাড়েপড়া পাগলটার জন্যে তো অনেক করে সে। নিরুপমের উপর বাপের ভার দিয়ে রেখে নাকি নীতার মত বৃদ্ধিমতী মেয়েও নিশ্চিন্ত। জানে পাগলটার উপর করুণা আছে সূচিন্তার বড়ছেলের।

আশ্চর্য এককণাও করুণা নেই তার শুধু নিজের মার উপর।

নিশ্বাস ফেলে ভেবেছিলেন সূচিন্তা, তুচ্ছতম একটু প্রশ্নের মধ্য দিয়েই তো মহৎ হয়ে উঠতে পারতো নিরুপম, পারতো সুন্দর হয়ে উঠতে। 'কি হল, ব্যাপার কি?' শুধু এইটুকু।

কিন্তু মানুষের মন বড় দীন, বড় কুপণ।

ঔষধের চাবিকাঠি মৃত্যুর মধ্যে থাকতেও দৈন্যটাই পরম আদরে বেছে নেয় সে।

স্বপ্ন হয়ে বসে বাকী রাতটা শুধু মানুষের এই ইচ্ছাকৃত দৈন্যের রহস্যটাই ভাবতে থাকলেন সূচিন্তা।

রাত্রের ঘুমের বিঘার প্রতিক্রিয়ার অনেক বেলা অবধি ঘুমোলেই সুশোভন। আলো জ্বলোছিল সেই বাকী সারারাত। ভোরবেলা নিভিয়ে দিয়ে চলে এলেন সূচিন্তা। চলে এলেন একেবারে স্নানের ঘরে। অনেক অনেকক্ষণ ধরে স্নান করতে লাগলেন। সূচিন্তাব ঘরের দরজার আধসরান পদটি যেমন ছিল তেমনই থাকল।

বি লক্ষ্মীর মা যথারীতি ন্যাভা-বালাতি নিয়ে ঘর বারান্দা মুছেতে এসে সেই আধসরানো পদার পাশ দিয়ে ছোট্ট ঘরটার সরু খাটের বিছানায় একটা ওজনে ভারী বড়সড় মানুষকে পড়ে ঘুমতে দেখে 'খতিয়ে' গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বেশ খানিকক্ষণ। তারপর তার মুখে ছুরির আগায় মত বিকটবাক্যে আর সূক্ষ্ম একচিলতে হাসি ফুটে উঠল। আর তারপর যথারীতি হাত চলতে লাগল ঘসঘস শব্দে।

সুবল চায়ের জল নিয়ে দোতলায় উঠল, ট্রেটা টেবিলে নামাল, কাঁধের ঝাউন দিয়ে টেবিলটা মুছল, তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই পাথর হয়ে গেল।

পাথর হবারই কথা।

কোন পরিকল্পিত ঘর বদলাবদলি নয়, রায়ে পাগলাবাবুর শোবার পরও সুবল সে ঘরে খাবার-জল রেখে গেছে, মশারী গুঁজে দিয়ে গিয়েছে।

না সুবলের মুখে হাসির বিলিক খেলল না। কালো মুখটা তার আরও কালো হয়ে উঠল আর মুখের পেশী-গুলো কোন এক কল্পিত সংকল্পে কঠোর হয়ে উঠল।

অনুপম কুটির ছাড়াও অনেক বাড়ী আছে কলকাতা শহরে। তা যদি না থাকে

দেশ' বলে একটা জায়গা আছে সুবলের।

ইন্দ্রনীলের চা করতে হয় না আর। করতে হয় না নিরঞ্জনেরও। শুধু নিরুপম। এ সময় সে তো রোজই খবরের কাগজখানা হাতে করে বারান্দার কোণে পাতা ওই একক চেয়ারটার বসে থাকে। কিন্তু আজ সে চেয়ার শূন্য পড়ে।

সুবল কালো কয়লার মত কঠিন-মুখে ইন্দ্রনীল আর নিরঞ্জনের খালি ঘর দুটো পার হয়ে নিরুপমের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়েই থাকল কিছুক্ষণ।

দেখল সে ঘরটাও খালি।

অবাক হয়ে দেখল বিছানার চাদর-খানা কুঁচকে বাকী হয়ে বিছানা থেকে বুলে মাটিতে লুটোচ্ছে। ইন্দ্রনীল থাকতে তার ঘরের দুশাটা সাধারণতঃ এই রকমই ছিল, কিন্তু নিরুপমের ঘরে এমন কুদৃশ্য সুবল অন্ততঃ দেখেই নকখনো। ঘুম থেকে উঠে বিছানা ঝেড়ে, ঘরের সামান্যতম অগোছালো অবস্থা-টুকুও গুঁছিয়ে তবে ঘর থেকে বেরোয় নিরুপম।

তাহলে নিরুপমও চলে গেল।

অন্ততঃ সুবল তাই ভাবল।

হঠাৎ রুর একটা ভগ্নাী ফুটে উঠল সুবলের মুখে। সে পর পর তিনটে ঘরের সব জানলা দরজাগুলো খুলে দিল আর তাদের সামনের দরজার পর্দা সরিয়ে দুটো কপাটই দু-হাট করে রেখে নীচে নেমে গেল দ্রুতপায়ে।

পাশাপাশি তিনখানা শূন্য ঘর একটা দৃশ্যের মত হাঁ হাঁ করতে লাগল, আর প্রথম সকালের লাজুক রোদ যেন জানলা দিয়ে সস্তপ্পনে ঢুকে এসে দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল সেই দৃশ্য। (ক্রমশঃ)

প্রকাশিত হ'ল নতুন উপন্যাস
বিখলিপথ্যাত বিজয় গুপ্তের
কলে চন্দন ২.৭৫

ডেল কার্ণেগী গ্রন্থের আদর্শে
বাংলায় লিখিত বহু প্রশংসিত
আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের
কাজের কথা ২.৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
আগুস্তাঙ্ক ৩.০০

আশাপূর্ণা দেবীর
সোনালী সন্ধ্যা (যন্ত্রস্থ)

বনফুলের নতুন উপন্যাস: সীমারেখা (যন্ত্রস্থ)

ব্যাশবাল বুক হাউস

৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিং-১২
১৬, শিবপুর রোড, হাওড়া

॥ মৃৎচল মিনিয়চার চিত্রকলা ॥

মৃৎচল চিত্রকলার কিছু কিছু নিদর্শন ভারতের বিভিন্ন যাদুঘরে হয়তো অনেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু সংগ্রহশালার বাইরে কোনো কোনো খনাঢ্য ব্যক্তির পারিবারিক সংগ্রহে মৃৎচল চিত্রকলার যে-সব সম্পদ সংরক্ষিত হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছে খুব কম লোকের। কলকাতার অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে মৃৎচল চিত্রকলার অনেকগুলি দুর্লভ সম্পদ দর্শনের সেই সুযোগ করে দিয়েছেন সম্প্রতি। এর জন্য তাঁদের উদ্দেশ্যে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে যে ৮০ খানি চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে সেগুলি মৃৎচল মিনিয়চার চিত্রের অন্তর্গত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মৃৎচল সন্নাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই চিত্রকলার জন্ম এবং বিকাশের ধারা অব্যাহত ছিল।

মহানুভব সন্নাট আকবর ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির দরদী বন্ধু। তিনি ভারতের তৎকালীন প্রায় সকল শিল্পকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর দরবারে। গুজরাট ও রাজপুতনার শিল্পীরাও ছিলেন আমন্ত্রিতের দলে। আকবরের এই দরবারে রাজস্থানী ও পারস্যশৈলীর সংমিশ্রনে গড়ে ওঠে মৃৎচল চিত্রের বৈশিষ্ট্যময় ধারা। মিনিয়চার চিত্রগুলি ছিল সেই যুগের মৃৎচল সন্নাট, মৃৎচল দরবার ও অন্তর্পুত্রের অন্তরংগ পরিচয় বহনকারী সুক্ক রেখা আর রংয়ের সমন্বয়ে গঠিত এমন এক শিল্পরূপ, যা গুজরাট বা রাজস্থানী শৈলী থেকে সত্যিই পৃথক। রাজস্থানী চিত্র-শৈলীর মৃৎচলবয়বের অহিডিয়ালাইজড টাইপ-এর একঘেঁয়ে পুনরাবৃত্তির জায়গায় মৃৎচল চিত্র-শৈলী আমাদের স্বাতন্ত্র্যধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্ত মৃৎচলবয়বের সম্ভান দিতে সক্ষম হল। মৃৎচল মিনিয়চার চিত্রেও এই শিল্প-দৃষ্টি ও নিপুণ

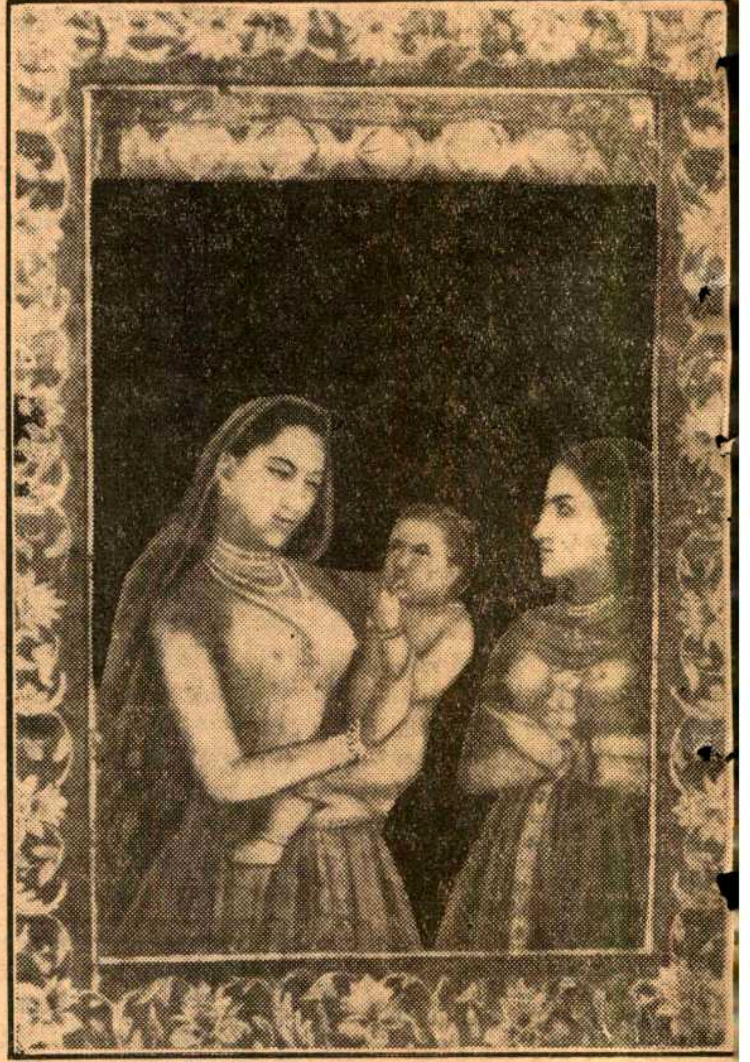
প্রদর্শনী

কলারসিক

কলা-কৌশল নিষ্ঠা ও সততা সহকারে ব্যবহৃত হয়েছে।

সন্নাট আকবরের পর জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালকে মৃৎচল চিত্রকলার গৌরব-

শাহজাহানের সময় আমরা স্থাপন শিল্পের যে উন্নত রূপ দেখেছি, চিত্রকলায় কিন্তু তেমন উন্নততর রূপে সম্ভান পাইনি। যদিও ঐ সময়কালে মৃৎচল চিত্রের রং, রেখা, অলঙ্কৃত-রূপ সব দিকেই শিল্পীদের প্রথর দৃষ্টি পরিচয় মিলবে,—তবু চিত্রের সামগ্রিক বিন্যাসে একটু অনমনীয় ককর্ষতা পরিলক্ষিত হবে। শাহজাহানের সম



মা ও ছেলে

ময় যুগ রূপে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর সময়েই রেখার সৌন্দর্যে, কমনীয় বর্ণ-প্রলেপনে মৃৎচল চিত্রকলা আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত জীবন, পশুপক্ষী প্রীতি, শিকার-প্রীতি সব কিছুকে ভিত্তি করেই শিল্পীরা সৃষ্টি করেন অসংখ্য মিনিয়চার চিত্র। তাঁর সময় সবচেয়ে বড় শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ মনসুর।

প্রতিকৃতি, দরবার-দৃশ্য ও অজস্র দরবেশের চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল।

ঔরঙ্গজেবের আমলে তাঁর অনুদা দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য মৃৎচল চিত্রের ঐতিহ্য ম্লান হয়ে গেল। দরবার আর চিত্র শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রসর হইল না। ফলে বিভিন্ন শিল্পী পাটনা লক্ষ্যে বিজাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অভিজ্ঞ

সম্প্রদায়ের নিরাপদ আশ্রয়ে নিজেদের সারিয়ে নিয়ে গেলেন। দিল্লীতে শুধু শিল্প-চর্চা অব্যাহত রইল হারেমের মধ্যে। অন্ততঃ হারেমের দৃশ্যাবলীই শিল্পীরা মুখ্য বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। মুঘল চিত্রকলায় এইভাবে ধর্নিত হল অবক্ষয়ের সুর। পরে এই ধারাকে আর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়নি।

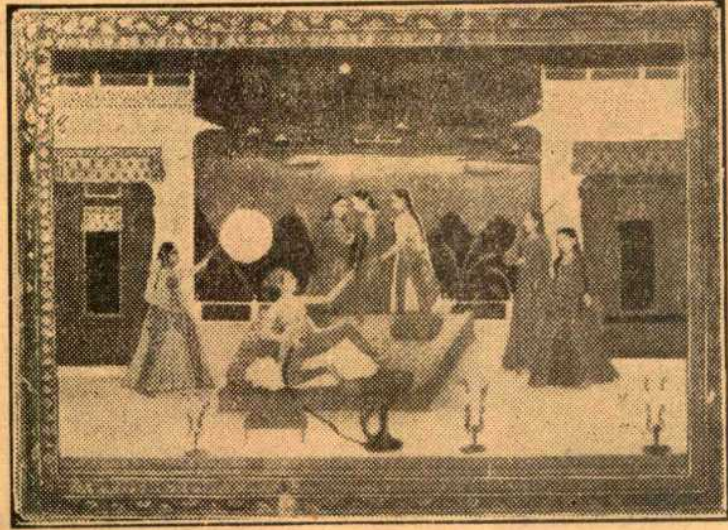
এই ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটে আমরা অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে প্রদর্শিত মুঘল চিত্রকলা বিচার করে দেখতে পারি। বারাণসীর বিখ্যাত শাহ পরিবারের শ্রীসীতারাম শাহ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্রাট-পরিবারের পলাতক যুবরাজ জাহাঙ্গীর শাহের নিকট থেকে যে বিপুল সংখ্যক মুঘল চিত্রকলা হস্তগত করেন তার থেকে লেডি রাগু মুখার্জি বাছাই করে এই মিনিয়চার চিত্রগুলি প্রদর্শনের জন্য নিয়ে এসেছেন কলকাতায়।

আয়োজ্য প্রদর্শনীতে দুই শতাব্দী ব্যাপী অঙ্কিত মুঘল চিত্রের নিদর্শন স্থান পেয়েছে। সবগুলি যে প্রতিনিধিত্বমূলক এমন কথা বলা যায় না। আকবরের আমলের চিত্রের মধ্যে 'হস্তীর অশ্ব আক্রমণ' (২৫), 'ম্যাডোনা ও শিশু' (৪০), 'সিংহ শিকার' (৪৫), 'হস্তী-শিকার' (৫৮) প্রভৃতি চিত্রগুলি নিঃসন্দেহে সুন্দর। এইসব চিত্রে পারস্য ও চৈনিক চিত্র-রীতির স্পষ্ট প্রভাব আছে। একটিতে ইউরোপীয় প্রভাবও লক্ষ্য করা গেল (৪০)। পারস্য প্রভাব ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ২৮, ৩৭, ৪১, ৭০ নম্বর চিত্রেও পরিস্ফুট।

জাহাঙ্গীরের আমলের যে চিত্রগুলি এখানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলির কয়েকখানি সত্যি প্রতিনিধিত্বমূলক। এর মধ্যে 'জাহাঙ্গীরের দরবার' (১১), 'একজন নারী' (৩৪), 'কবীর সাহেব' (৩৭), 'রাজা মান সিং' (৩৯), 'জাহাঙ্গীরের শিকার-তাবু' (৪৭) ও 'রথ' (৭২) খুবই উল্লেখযোগ্য রচনা।

শাহজাহানের সময়কার 'নৌকা-বিহার' (৫০), 'ইউরোপীয় দূতাবাস' (৫১), 'দরবার-দৃশ্য' (৫৯), 'দারা-শিকোর বিবাহ-শোভাযাত্রা' (৬৩) প্রভৃতি চিত্রগুলিতে জাঁকজমকপূর্ণ মুঘল জীবনধারা অপূর্ব সুসমায় বিধৃত করেছেন দরবারের শিল্পীদল।

ঔরঙ্গজেবের পরবর্তীকালে পাটনা, লক্ষৌ, দিল্লীতে মুঘল চিত্রের যে



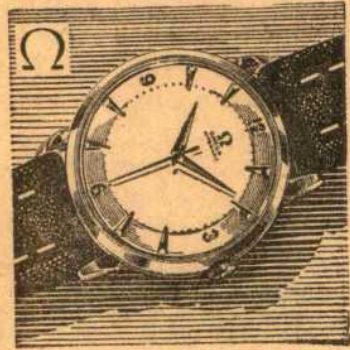
জোছনারাতের প্রেম

অবক্ষয় রূপে ফটে ওঠে তার অনেক-গুলি নিদর্শন আছে এই প্রদর্শনীতে। পাটনা কলমের 'মীর কাশিম' (৫), লক্ষৌ কলমের 'হিন্দু রাজা' (৬), 'নবাব এনারাতুল্লাহর দরবার' (৮) ও দিল্লী কলমের 'প্রসাধনরতা রাণী চন্দ্রাবতী' (১৩) প্রভৃতি চিত্রগুলি এর জবলন্ত দৃষ্টান্ত।

প্রদর্শিত ৮০ খানি চিত্রের মধ্যে মাত্র ২২ জন শিল্পীর নাম উল্লেখ করা গেছে। এছাড়া কতকগুলি চিত্র কখন কোন সম্রাট-পরিবার বা ব্যক্তির কাছে ছিল তারও সীলমোহর অঙ্কিত আছে চিত্রের গায়। সব দিক বিচার করেই বলা যায়, এই প্রদর্শনীর আয়োজন ইদানীংকালের স্মরণীয় ঘটনা। ঐতিহাসিক মুঘল যুগের কলা-নৈপুণ্য আর তার অন্তরঙ্গ পরিচয় এমন করে আর কোথায় পাবো আমরা?

প্রদর্শনীটি গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে সকলের

জন্য খোলা ছিল। আমরা এই প্রদর্শনীটি দেখে খুশি হয়েছি।



OMEGA
SEAMASTER

Steel Automatic—Rs. 520/-

ROY COUSIN & CO.

4, Dalhousie Sq. Calcutta-1.

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত বিশিষ্ট গ্রন্থ

রবিচ্ছবি ॥ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

৬.০০

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা

গীতাবিতান পত্রিকা

৮.০০

সম্পাদক ॥ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

গীতাবিতান

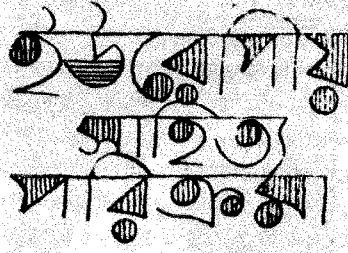
২৫বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫

জার্মান কবিতা :

।। তত্ত্বমতা ও প্রাচুর্য্য : ।।

যদিও এ-যুগের একজন মনস্ববী, সর্বজনস্বীকৃত কবি-সমালোচক জগৎ-রাজা বন্টন করে দিয়েছেন তাঁর মাত্র দুই ন্যায্য অংশীদার, ইংরাজ সেক্সপীয়র ও ইতালীয় দান্তের মধ্যে এবং জানিয়েছেন যে উক্ত সম্পত্তির কোনও তৃতীয় ভাগীদার নেই, তবু এ মীমাংসাকে সন্তোষজনক করতে তৃতীয় একজনের দাবী পেশ করার প্রলোভন অনতিবিদগ্ধের পক্ষে নিশ্চয়ই অশোভন নয়। জার্মান গোয়তের পক্ষে ওকালতি করার জন্য উদগ্রীব হওয়া এক্ষেত্রে অনেক প্রত্যায়ী কাছেও অপ্রেয় বিবেচিত হবে না বোধহয়। রুরোপীয় কৃষ্টির শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও কদাচ অবিবেচক, এনস্ট রোরের কৃতি-রুস যখন গোয়তে প্রসঙ্গে বলেন যে যে-রুরোপীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা বীরবান হোমর, তাঁর শেষ বিস্বজনীন সেবক গোয়তে, তখন মনে হয় খৃষ্টীয় জগৎ-সম্পত্তির তৃতীয় দাবিদার সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন একটি বক্তব্য উচ্চারিত হ'ল। আরও আশ্বস্ত বোধ করা যায় প্রখ্যাত 'ফা উ স্ত'-অনুবাদক, উনিশশতকী মার্কিণ, বের্ড টেলরের 'আন গোয়তে' শীর্ষক প্রশস্তিতেও অনুরূপ বক্তব্যের আওয়াজ পেয়ে : 'তুমি (গোয়তে) সেই সহস্রাব্দ বীণায় নতুন ঝংকার তুলেছিলে যা একদা সেক্সপীয়রের, একদা হোমারের আয়ত্তে ছিল।' দান্তে, সেক্সপীয়র ও গোয়তে : রুরোপীয় চৈতন্যের রাজ্য ভোগদখলের বাটোয়ারায় এই তিনটি নামের সমাবেশ শুধু ন্যায্য নয়, ঐতিহাসিক অর্থেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মধ্যযুগ ও তারপর রেনেসাঁস-পর্যায় পার হয়ে এসে মানসিকতার যে-উদ্ভব, সেই 'আধুনিকের' পত্তনিত গোয়তের বীতানন্দ সাধনা তাঁকে 'তৃতীয়' এক অনন্যতায় ভাস্বর করে নিঃসন্দেহে। এবং সেই সাধনা ছিল এতো গভীর, তীব্র ও উচ্চাঙ্গ যে এখন, শতাব্দিক বৎসরের ব্যবধানে, আধুনিক জার্মান কবিতার রূপরেখা নিরূপণে গোয়তের ও তার সমকালীন জার্মান কাব্যের কীর্তিকলাপ নিরতগ্রাহ্য, মূল্যবান এক অবতরণিকা হিসাবে উপস্থিত হয়। জার্মান রোমান্টিকতার ফলপ্রসূ আদ্যন্ত যেমন এই অবতরণিকার অন্তর্ভুক্ত, তেমন রোমান্টিকতার পরবর্তী বৃহত্তর ও জটিলতর জার্মান কাব্যচর্চার আধুনিককালীন পরি-



স্বার্থবাহ

প্রেক্ষিতও এর কাছে অব্যয় যাত্রা করে। গের্গে, রিলকে, হফমানস্টাল, বেন ও ব্রেখতের অবদানে যে-আধুনিক জার্মান কাব্যের সমৃদ্ধি, তাঁর বিকাশের কার্যকরী উপকরণ ও ধর্ম এ গোয়তীয় যুগ থেকে এতো স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হয়েছে, এমন দীর্ঘায়ু এক পথনির্দেশে ও সংগত আবেগে সে-যুগ এ যুগকে চিহ্নিত করেছে, যে রোমান্টিকতার উক্ত মূখবন্ধ বাদ দিয়ে জার্মান কাব্যের বর্তমান অধ্যায়ে প্রবেশ দ্রাব্যতর, যদি-না দুঃসাধ্য। অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল ধরে বারিত গোয়তের একার সৃষ্টি-শীলতা, এবং তাঁর সমকালীনদের ও উত্তরপুরুষদের কার্যকরিতায় অতিক্রান্ত আরও এক অর্ধ-শতাব্দী, এই দুইয়ে মিলে যে-সফলতম কবিতার শতাব্দী, তা' আধুনিক জার্মান কবিতার প্রত্যক্ষ ভিত্তিভূমি ত' বটেই, কাঠামোরও অব্যর্থ' কিছটা।

যে-দেশে ত্রয়োদশ শতকে প্রেমের-গায়ন (মিনেসিঙ্গার) কবিদের একজন, রাইনমার ফন হাগেনাউ, ঈগল ও বাজ-পাখীর মতো সাহসিক নভচর রূপে দেখেন কবিকে এবং আরেকজন, ভালতর, স্পষ্টতঃ তাঁর মোক্ষের সম্মান পান 'ঈশ্বরের কৃপা আর আমার রমনীর প্রেমে', সে-দেশে কবি ও কবিদের মর্যাদা নিশ্চয়ই গুরু ও নির্বিরোধ। প্রেম, প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের অনুসন্ধান ও আরাধনায় গোড়া থেকেই জার্মান কবির যে-ভাবে সচেতন তাতে তাঁদের উপজীবী-কার গুরুত্ব যেমন জাতীয় জীবনে সমর্থিত, তেমন আরাধার নিশ্চিত মহত্ত্বও তাঁদের সাধনাকে মহান পরিচালনা ও অগ্রগতি শেখায়।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে গোয়তে যখন আবির্ভূত হলেন, তখন তাই জার্মান কবিতার কোনও দুর্দশা বা অধোগতি তাঁকে চিরাচারিত 'উন্নয়ন-কার্য' নিষ্পত্ত করল না, বরং এক অলোকসাধারণ পথিককে তাঁর যাত্রা-

পথের অশেষ ঈশ্বর্য্য সম্বন্ধে সুস্থভাবে অবহিত করে দিল। 'আউফক্লের' রুঙ বা 'নবজাগরণের' ছোঁয়াতে ইতিমধ্যে জার্মানীতে কবিতার বিবিধ অভ্যুত্থান সূচিত হয়েছে প্রতিভাধর রূপস্বত্বের ঔদার্য্যকামী কাব্যচর্চার, ব্যয়গর ও হেদ'রের সংকলনে লোকগাথার নব-জীবনলাভে। নিছক ঈশ্বরপ্রীতির ও গ্রীক কবি আনক্রেয়নের আদর্শে রচিত সুরা-সাকীর কাব্যে জার্মান কবিদের যে-কণ্ট-দারক, সাময়িক আকর্ষণ কিছুকাল ধরে উর্গিক মেরেছিল, তাঁর আবহাওয়া রূপস্বত্ব ও লোকগাথার পর আর টিকে ছিল না। তাই গোয়তে কবিতাকে বন্দী বা ক্ষিপ্ত দেখে উদ্যোগী কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ না-হয়ে, অপেক্ষাকৃত মৃদু ও স্বচ্ছন্দ প্রেরণা নিয়েই জার্মান কবিদের দায়ভাগ গ্রহণ করেছিলেন। একাই একশ' যদি বা গোয়তে নিঃসন্দেহে ছিলেন, তবু গোয়তীয় সাধনায় রবাহ'তেরাও প্রত্যক্ষ যোগ্যতায় দাবী করলেন গোয়তের সহচারিত্ব। গের্মানীয় কাব্যের ষোলকলা পূর্ণ হ'ল উনিবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে, যখন গোয়তের আশেপাশ এসে দাঁড়িয়েছেন ক্রমান্বয়ে হোয়দেবলিন আইথেনদর্ফ, হাইনে, মোয়রিকে, লেনাউ, ব্রেনতানো ও অন্যান্যেরা। আর এঁদের মতোই এক সময়ে ছিলেন বধু ও উজ্জলতম সহচর, শিলর, যাঁকে যাত্রার মধ্যপথে হারিয়েছিলেন গোয়তে।

উনিবিংশ শতকে গোয়তীয় বিশ্ব জার্মান কবিতার পরিচরণ সুসম্পন্ন। রীতি, নীতি, সামর্থ্য ও উৎসাহের বিচিত্র প্রয়োগে অভূতপূর্ব এই সুফলা যাত্রা রুরোপীয় কাব্যোত্থাসে একটি বিরল ঘটনা। বিশেষভাবে প্রাধান্যযোগ্য এই যে এ-যাত্রার অভিজ্ঞাতায় ও ফলে যে-সকল তত্ত্ব ও উপকরণের সম্মান সুলভ হয়েছিল, তাঁদের অনেক কিছুই নানা-ভাবে বিংশ শতাব্দীর জার্মান কাব্য-চিকীষায়, জ্ঞাতার্থে ও অজ্ঞাতে, ব্যবহৃত হয়েছে। বিস্তৃত রোমান্টিকতার কাব্যের যে প্রাথমিক মূর্তি তাঁর বৃত্তান্ত স্বকীয় গৌরবেই মূন্ধকর। পরন্তু এই মূর্তির ইতিবৃত্তে জার্মান কবিদের বিশিষ্ট অবদান এভাবে ঘনীভূত হয়েছে থেকে-থেকে যে বাচনিক প্রক্রিয়ায় একজন হোয়দেবলিন, ক্রাসিকল চিন্তাবোধে একজন শিলর, গীতিময়তায় একজন আইথেনদর্ফ, হৃদয়ভাঙানিতে একজন হাইনে, মনস্তাত্ত্বিক প্রয়াসে একজন মোয়রিকে 'যুগের হাওয়ার' বাহিরে এসে পৃথক অনুধাবন দাবী করেন অনায়াসে। আর

'ফাউস্টের' কবি তাঁর ভাবনার ধারে ও ভারে পশ্চিম যুরোপের বর্ষা-অনুভবের সমগ্র চিরকালই দাগ কাটেন।

'ফাউস্ট' বহুধা-সমন্বিত গোয়'তীয় উপনিষদ ও বিশ্ববীক্ষার নিঃশঙ্ক অভিব্যক্তিতে পৌঁছান গোয়'তের চিত্তস্থৈর্য্যেও সময়সাপেক্ষ ছিল। চিন্তার জগতে যে-অস্থিরতা ও আবেগ নিয়ে ডাম্যান্ট গোয়'তে প্রথম যৌবনে ক্লাসিকল ধ্বংসাবশেষ দেখতে-দেখতে হা-ঘরে, উন্মন, তাতে সম্ভাগের শান্তি নেই এতে টুকু। শান্তি নেই সন্ধ্যা সেই ঘরণীর আহবানে যে বলে,—

আমার সোয়ামী এখন
ক্ষেত থেকে ঘরে ফিরবে।
পাখি ওগো, থাকো থাকো।
আমাদের ঘরে রাত্তিরে খাও।

(‘দেব ভাস্কর’ : পথিক)

শান্তি দেয় না স্বর্গ-নিষ্কান্ত সেই
বরদাতা ‘ভূমি’—

ভূমি, দুর্লোক দিয়েছে বাস্তু যা'রে,
যে করে শমিত সর্ব দুঃখ ও যাতনা,
দ্বিগুণ দুর্ভাগ্য যা'র, তা'রে
এনে দাও দ্বিগুণ সান্ধ্বনা—

(‘ভাস্কর’ নাথালিড’ : পথিকের
নৈশগীত)

এই অশান্তিকে সম্বল করে বাঁচার শপথও যেমন গোয়'তের ছিল না, তেমনি এর থেকে মুক্তি পাবার জন্য নান্দনিক, ঐশ্বরিক বা প্রাকৃতিক সত্যের হৃদিশ পেয়ে, কোনও কয়েমী স্বস্তি লাভ করার জন্য ব্যতিব্যস্তও হয়ে ওঠেননি গোয়'তে। হা-ঘরে হলেও পথিক উদভ্রান্ত হয় না, চষা বউ-এর নিমন্ত্রণ করণভাবে ফিরিয়ে দিয়ে সে কুমা-র পথে চলে যায়, যদিও ঘর-ফেরার এক ক্লাসিকর স্বপ্ন হৃদয়ে ধারণ করে। ঐ পথিকের সঙ্গে গোয়'তেও যেন ভিনদেশী হলেন, শান্তির সন্ধানে ক্লাসিকল রোমক রাজ্যে। হোরাতিয়ুস ও প্রোপেরতিয়ুসের দেশে বীরত্ব, নিসর্গ, প্রেম ও রত্নের অনুধ্যানে তীর ও সমুদ্র গোয়'তে যে-কালত সুখের দিশা পেলেন, তা তাঁর ‘রোয়মিশে এলগিন’ (রোমীয় বিশ্বদগাথা)-এর কুড়িটি দীর্ঘ কবিতায় বাস্তব হয়েছে। প্রাণবন্ত তবু অচপল লাতিন কাব্যের জলবায়ুতে স্বাস্থ্য উদ্ভারের এক অনলস প্রয়াস ‘রোয়মিশে এলগিন’-এর ছত্রে ছত্রে। রোমান্টিক উৎকণ্ঠায় ছেদ টানল গোয়'তের স্মৃতি-পথে উদ্ভিত সেই আদি বীর-যুগ (heroischen Zeit), যখন দেবদেবীরও রত্নলীলায় লিপ্ত হতেন। রোমক

‘অস্তিত্বের ধ্বংসস্তুপ থেকে রক্তের মতো উৎখাটিত করলেন গোয়'তে সেই হুগো-দীনী ‘আমর’ বা ‘রতিক’, আর তাকে বিজয়িনী দেখলেন মানবিক জীবনের সামগ্রিক বিস্তারে। চিত্ত-প্রশান্তির এমতো আহরণে যদিবা গোয়'তে প্রথমতঃ রোমান্টিক ও অপসারী, তবু যে-বিশ্লেষণ ও সাযুজ্য তাঁর এই নান্দনিক প্রবাসযাত্রারও কবিতাকে বলিষ্ঠ রাখে, তার সুর আধুনিক ও সরাসরি জিজ্ঞাসায় স্তম্ভিত করেন গোয়'তে :

বাস্তব হও, শিলাদল!
আমাতে সবাক্ হও সোমত প্রাসাদ!
পথঘাট, বোলা একাটি কথা!
প্রকাশিত নও তুমি পরমপুরুষ?
(‘রোয়মিশে এলগিন ১’)

মনন ও আবেগের অপূর্ব সংশ্লেষ ঘটিয়ে গোয়'তে উপলব্ধ করেন যে অতীত আর বর্তমান উভয়েই তাঁর সঙ্গে চমৎকার আলাপ করে বতক্ষণ তিনি এই ক্লাসিকল জমির ওপর দাঁড়িয়ে। রোমান্টিক উদভ্রান্তির অবিস্মৃত ভূমি ত্যাগ করে গোয়'তে এইভাবে ক্লাসিকল খাসমহলে ভদ্রাসন পাতলেন, আর তা শূন্য, পরিশেষে, প্রেমেরই জরগান করতে! একমাত্র প্রতিভার নিয়মবশেই সম্ভব হ'ল রোমান্টিক-ক্লাসিকের দ্বন্দ্ব

গা-সওয়া ক'রে গোয়'তের পক্ষে অজস্র প্রেমের, নিছক প্রেমের, কবিতা রচনা করা যার অধিকাংশ এখন শূন্যে ও হুগো ভোলফ মারফত, গানে রূপান্তরিত।

কিন্তু মানসিকের যে চাপ একজন সিস্কু গোয়'তে সহ্য করেন তাতে ছোটোখাটো আত্মিক মীমাংসাগুলি দ্বন্দ্ব পুনরাবৃত্ত হয়, পরিচিত জগতের সংজ্ঞা ওলট-পালট চেনে, জীবনরহস্যের সমাধান গাণিতিক সমাপ্তি কখনই পায় না। উন্মেষ ও ব্যথার টান অনন্ত থাকে কবিব সত্তায়। রোমক ‘রতিক’ মন্থপাঠে তাই গোয়'তের চিত্তগৃহে যে-স্বস্তায়ন সংঘটিত হ'ল, তাও পূর্ণ শান্তির প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। গোয়'তের মর-অস্তিত্ব বৃষ্টি-বিশেক ও শিশুপীর বিহীনতায় সমানে সেই অশান্তির জের টানতে থাকল, যা'র প্রশমন সম্ভব কেবল শিশু-সৃষ্টির মাধ্যমেই। ‘ভিলহেলম মাইস্টারের শিক্ষানবিস’ নামক উপন্যাসের একটি গানে যে অপর্যব ব্যথার উল্লেখ :

কামনা জেনেছে যে শূন্য সেই
জানে কী আমি সই!

সেই কবিজনোচিত বেদনাবোধ মানবিক গোয়'তে যেন কখনই অনু-

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

মনোরঞ্জন রায়

আদিম সমাজের ইতিহাস

... রোমান্টিক গল্পকাহিনী থেকেও চিত্তাকর্ষক মানবের এই জয়-যাত্রার বাস্তব ইতিহাস। সেই ইতিহাসই লেখক এখানে উপস্থিত করেছেন স্বচ্ছন্দ ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে। দাম ৫.০০

প্রাপ্তিস্থান

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বার্কম চাটাজী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১০

নাচন রোড, বেনারচাঁত, দুর্গাপুর ৪

পাশ্চাত্য থাকেনি ও বৈমান্য হয়নি। এই কামনা থেকে বর্ণিত হলে, গায়ত্রে দেখান, মানুষ কতো যান্ত্রিক ও অলৌকিক হয়ে ফাউস্টের প্রমাদে ধরা পড়ে।

এই কামনার বোধই শুধু নয়, সংজ্ঞাও মহাজ্ঞানী গায়ত্রে কান্না ছিল। কবি ও দৃষ্টান্তে তিনি যুগপৎ এই কামনার শিকার ও ব্যাখ্যাতা। মানুষের এই কামনার স্বয়ংক্রিয় বিশ্ব-যে ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে অপরিভাজ্য নিয়ামক-রূপে হাজির রেখেছে, মরতা ও চৈতন্যের নিয়ন্ত্রণে সর্ববিধ মানবিক উৎপত্তি ও বিপত্তিকে ন্যস্ত করে গায়ত্রে অরফির প্রজ্ঞার পদনালিখনে তাই বলেন:

তোমাকে হতেই হবে এই মতো,
নিজেকে পালাবে কোন ছলে!

এই মতো বলেছিল সিবিলা ও

দৈবজ্ঞের দল পুরাকালে।

(‘উরভোতে’ অরফিন’ : দাইমন

অরফির কথাসমূহ : নিয়তি)

প্রকৃষ্ট অর্থে জ্ঞান গায়ত্রে কবিতায় এইভাবে মূর্ত হ’য়ে উঠতে থাকে। মনন-শীল জীবনচর্যা, বিদ্যাবৃত্তা ও অবিশ্রাম শিপকর্মের সন্তান গায়ত্রে ভাব-সমৃদ্ধ কাব্য। বাচনে গায়ত্রে, কতকটা লোকগাথার দৃষ্টান্তে, যে অতিথক স্বচ্ছতা অবলম্বন করেছিলেন, তাতে তাঁর ছান্দসিক স্বচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সেই অকপট আত্মিক স্বর যার জার্মান নাম ‘জেলেনশিতমুড’। এই স্বর

কাব্যের নন্দনলোকে হয়ত নৈতিকের অপছন্দ আওয়ার কদাচ বা তুলেছে, তবু এই স্বরেই সম্ভব ছিল গায়ত্রে মহাকাব্য, ‘ফাউস্ট’ রচনা করা। কাব্যমোদীকে তুচ্ছ রাখার মতো বিবিধ বৈচিত্র্য ‘ফাউস্টের’ ছন্দে, আখ্যান ও দৃশ্য পরি-কল্পনায় অবশ্যই আছে, তবু ভাবনার যে গুরুত্ব ফাউস্টের কাব্যরূপে স্থিত, তাঁর ভাষায় সেই আত্মিক স্বর, যাতে অভ্যন্তরীণ এক প্রচণ্ডতার কথা মতোই অভিব্যক্তি, শব্দ মতোই কোনও বাচনিক বিস্তৃতি। সচেতনতা, বুদ্ধি, অন্তঃকরণের গাঢ়-সর্বোপরি, বোধ, ফাউস্টের ভাষণে। প্রকৃতিকে পরাস্ত করার ব্যর্থ যাদু যখন ফাউস্টের করায়ত্ত, তখন উপলব্ধির সপ্তারে শিহরিত সেই উন্মাদগামী বলে:

হায়, মানুষ যে নেহে কিছু নির্দেশ,
এখন বুঝেছি আমি! তুমি দাও

এই বিহবলতা,

যা আমার নিরত নিকটে নেয়

দেবতার—

আর ঐ সহকর্মী, যাঁর বিনা

এখন পারি না আর,

যদি বা সে ঘৃণায়, নিঃসন্তজ, আমার
আমারই সমক্ষে করে কলঙ্কিত,

করে নস্যং,

একটি ফৎকার দিয়ে, তোমার

সকল আশীর্বাদ।*

গায়তরী চরিত্র সর্বতোভাবে জার্মান রোমান্টিকতার নয় এবং স্বাভাবিক-ভাবেই। ঐ রোমান্টিকতার স্বরূপ যে কী তা বেশ কিছুটা ধরা পড়েছে উনিবিশ শতাব্দীর একটি জার্মান উপন্যাসে বর্ণিত নায়ক-চরিত্রে। কবি এদুয়ার্দ মোয়রিকে রচিত ‘মালের নলতেন’ নামক উপন্যাসে নায়ক হেনরি শোকাত ও

*Faust I. Teil, Wald und Höhle.

বিশুদ্ধ মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করতে দিয়েছিলেন সে তাঁর কেশরাশি অবিন্যস্ত দিয়েছিল সে তাঁর কেশরাশি অবিন্যস্ত করে দিতে, আর বাসনা-বিমোহিত হয়ে শুনিয়েছিল সেই শতস্বর ঝড় (lauschtemit Willust dem hundestimmigen winde) অনুরূপ কোনও ঝড়ে মাথা পেতে আলোড়ন কুড়ানো এবং সেই অভিজ্ঞতার কামদের স্বাদ পাওয়া (প্রসঙ্গতঃ, এই রোমান্টিকতা ‘ঝড়-ঝাপটা’ আখ্যায় অভিহিত হয়েছিল কোনও এক পর্যায়), এক হিসাবে উনিবিশ শতাব্দীর বেশ ক’জন জার্মান কবির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। স্বয়ং গায়ত্রেও এই ঝড়-ঝাপটায় কতকটা অস্থির, এলোমেলো। মোয়রিকে নিজে ব্যক্তিগত জীবনে ও তাঁর কাব্যে ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ আবহাওয়ার শিহরণে বেপথু না হলেও অনাহত থাকেননি। আর, হাইনে ভূ প্রায় অলঙ্ঘ্যভাবেই অন্ধকার সেই ঝড়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন যা যৌবনের একটি তুলনাও।

এই ঝোড়ে হাওয়ার শিরশির— (ফরাসী সমালোচনায় ফ্রিজ) সর্বকোষেই রোমান্টিক কাব্যের একটি লক্ষণ। কারণ, রোমান্টিকের মৌলিক একটি রোগ নিশ্চয়ই ব্যাকুলতা। জার্মান রোমান্টিক কবিরা সেই ব্যাকুলতায়-আকুলতায় ও চঞ্চলতায় অন্য রোমান্টিকদের মতো ভুলেও, যে-একটি মহা সঙ্গুর্গের ধারক থেকেছিলেন এবং ঠিক যে-কারণে তাঁরা অনেকদূর পর্যন্ত প্রভাবশীল, সেই সঙ্গুর্গের নাম ‘বোধ ভার্মা’। উনিবিশ শতকের ইংরাজ বা ফরাসী কবিদের জার্মান সমকালীনরা এই ব্যাপারে অপরিপক্ব ও বেসামাল প্রমাণিত করে রোমান্টিকতার প্রতিশ্রুতিকে অনেক দূরপ্রসারী ও স্থায়ী এক কাব্যিক আদেশরূপে প্রতীয়মান করেন। বিস্ময় সামান্যই হয় যখন দেখা যায় পঞ্চদশ শতকী এক গের্মানীয় কবিচিত্ত এই অপরায়ে ‘বোধভার্মার’ দাবীতে তাঁর জীবনের সার্থকতা খুঁজছেন : ‘আমি বোধভার্মা নিয়ে (বুদ্ধিশুদ্ধি? (‘mit Sinnen’) বেঁচেছি, বলেছিলেন উলরিখ ফন হুতেন। এই অনাবিল ও প্রভূ বোধের অঙ্গীকার জার্মান রোমান্টিকদের কাব্যকে স্থানকালের গণ্ডির বাইরে আনে।

গায়ত্রে চেয়ে আরো জটিল ও জোয়ালাভাবে ক্লাসিকল পন্থায় আকৃষ্ট শিল্প রোমান্টিক উদ্বেগে আটক

প্রসারিত অতুলনীয়

রোল্যান্ড

চালকস পাউডার

ব্যারন কসমটিক থোডাইস

অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের জন্য

আমাদের আর একটি নতুন কেন্দ্র

৭নং পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা—১

২, মালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

নিঃসংশয়ে, তবু উপলব্ধিতে সংগতির
অভাব নেই কখনও। তাঁর বন্ধুদের
গোয়েতের 'জ্ঞান' শিল্পে কী সুডৌল
আবেগে প্রবাহিত :

কামনা উদ্ভীন হয়,
প্রেম রাখে সুনিশ্চিত স্থিতি;
কুসুমের ধ্রুব লয়,
ফল পাবে অব্যর্থ আকৃতি।

(‘দাস লীদ ফন দের শ্লেসকে’ :
ঘণ্টার গান)

ক্লাসিকল নিসর্গে কোনও ‘আমর’
বা ‘রত্ন’ লালনে শিল্পের অবশ্য নিজেকে
কখনও ব্যস্ত করতে চাননি, তাঁর লক্ষ্য
ছিল সেই শান্ত, অতীত নিসর্গের
বোধটুকু বিচ্ছিন্ন বর্তমানে চারিত করে
দেওয়া। তাই দেখি শিল্পের পড়ে থাকেন
জ্ঞাতসারেই সেই টলেমীয় বিশ্বে, যেখানে
পৃথিবীর চক্রবাল বেয়ে সূর্যের রথ ওঠে,
ডুবে যায় :

ডুবে যাক, রক্তিম ঈশ্বর,—

তুষা পায় প্রান্তরের
শান্তিময় শিশিরের লগ্নি;

দুর্বলতা ধরে মানবেরে;
ঘোটকেরা ক্রান্ত দৃষ্ট হয়,—
রথখানি এবে ডুবে যাক!

রোমান্টিক আবেশে শিল্পের সূর্য-
দেবতা, প্রেমিক আপোহো ফইবুসকও
প্রান্ত হতে হয়। ক্লাসিকল অন্তর্মুখিতা
শিল্পরীতি রসায়নে বোধহয় সবচেয়ে অটুট
রোমান্টিকতায় দানা বাঁধে। ‘দি ক্রানিখে
দেস ইবিকুস’ নামক কবিতায় গ্রীক কবি
ইবিকুসের হত্যাকাণ্ডের কাহিনীতে
শিল্পের আকর্ষণ প্রথমতঃ অবশ্যই তার
রূপকথাশোভন অভিনবত্বের কারণেই,
তবু এরই মাধ্যমে ক্লাসিকল ‘নেমিসিস’
বা ‘প্রতিশোধ’ তত্ত্বও তাঁর কাব্যে অনুসৃত
হয়। অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে নিহত
হ’ন পৃথক ইবিকুস, কিন্তু তবু এ
নরহত্যা কারও দৃষ্টিগোচর অবশ্যই :

তা’রা কি দস্যুর দলে

ওকে ছিঁড়ল যারা?

হলো পূর্ণমন্সকাম

লুক্কায়িত রৈরীর অসুয়া?

সেই সূর্যে স্ফুট এই

দুর্ধর পাপের কিনারা

তমসার বিশ্বে যার

আজো ছোট্ট আলোর সাজোয়া।

(‘দি ক্রানিখে দেস ইবিকুস’ :
ইবিকুসের বকগুনি)

সূর্য, সৌরদেবতা হেলিঅস,
রোমান্টিক শিল্পের অনাত্মীয় ন’ন!

এইভাবে জার্মান রোমান্টিকতা
অ’গাগোড়া যে-একটি অনুগ্রহ স্বভাবে
লগ্ন থেকোছে, তা-ই-যা অবশ্য
রোমান্টিকই, এবং ক্লাসিকল নয়—
আমাদের কাছে উনিবিংশ শতাব্দীর
জার্মান কবিতার অন্যতম প্রধান আবেদন
এবং তা-ই তাঁর সৃষ্টি-মূল্যকে সময়ের
কারাক্ষে না-রেখে যুগান্তরে গ্রাহ্য
ক’রে তোলে। কাব্য, বোধ ও সৃষ্টির এই
স্বাভাবিকে, যা প্রশংসা তন্ময়তা লাভ
করেছিল, তাঁর পরিণতি কবিতার
প্রাচুর্যে, বিচিত্রতায়, প্রাণে ও সারবত্তায়।
—মরমী হোয়দেবরলিন নিজের অজান্তে
সওয়ার হয়েছেন ‘গানের উন্নত, উদ্ভীন
প্রভাতী মেঘের’ ওপর, সন্দেহ শূন্য :

পুত পন্থা সে কি এষংবিধ?

হে ঐশ্বর্যময়ী দিশা,

করো না’ক প্রবণিত গোরে!

আত্ম-নির্ণয়ে ব্যাকুল হোয়দেবরলিন
টের পান জ্ঞানের সৈবরাচার, যা ঈশ্বরকে
লোপাট করে কেবল সত্তার সর্বনাশ
সাধনে—তাঁর এম্পিরিক্লিস ফাউন্টের
মতো এক অতি-মানবিক তাড়নায়
হেঁকে ওঠে :

দাসীয়ে পেয়েছি আমি

প্রভু-খুঁজে-ফেরা প্রকৃতিকে,

তা’র যদি থাকে গোরব, তা আমারই।

হোয়দেবরলিনের বিবেকে এই
দুর্বিনীতের শাস্তি সুচিহ্নিত :
উদভ্রান্ত, বিম্বান এম্পিরিক্লিস নির্বা-
সিতের যন্ত্রনায় অবশেষে জানে :

একা হওয়া, দেবগণের বিহনে,

সে-ই মৃত্যু।

গোয়েতে ও শিল্পের মতো
হোয়দেবরলিনের কবিতায়ও সেই সকল
জিজ্ঞাসা, যাদের অপলাপ নেই মানবের
বিষ্ময়-বোধ যতদিন আছে; সেই সকল
সত্যের-ঢাকা-খোলার জন্য বাঁপ, যা’রা
কালের ধাক্কায় পণ্ডু হয় না, আর,
সেই অতীত-উদ্ভারের হৃদয়-বিদারক
আতি।—

তবু, বন্ধু! আমরা এসেছি বড় পরে।

সত্য, আছেন দেবতারা,

কিন্তু তা’ মাথার উপরে

কোনও অপর জগতে।

তথায় অপ্রান্ত কর্মে রত তাঁরা

এবং আমরা বাঁচছি

কি-না এই নিয়ে স্বপ্নই চিন্তিত

মনে হয়;

স্বর্গস্থেরা এমনি রেহাই দেন

আমাদের।

দুর্বল আধারে তবে অসম্ভব

তাঁদের ধারণ সর্বদা,

কখনও কখনও শূন্য

মানুষে বিধৃত হয়, ঐশ্বরিক ভূমি।

অতঃপর তাঁদের স্বপ্নে জীবনের সার।

কতো পরে হোয়দেবরলিনের কথারা
আবার, শূন্য ভগ্নী আর ঝংকারের
ভিন্নতায়, বিশশতকী রিলকেতে ফিরে
আসবে আরেক বাস্ময় ধ্রুবতায়
পৌঁছতে।



জেনারেল প্রিন্টার্স য্যান্ড পারিশাস
প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত
মূল জার্মান হইতে উত্তর কানাইলাল
গাঙ্গুলী অনূদিত

গোয়েতের ফাউন্ট

কয়েকটি অভিমত :

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর : “...আপনি
বাঙালী পাঠকে ফাউন্টের রসাম্বাদ করবার
সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য সমস্ত বাঙালী
আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।”

Weekly German News :

“...A very competent
piece of work, the transla-
tion breathes the spirit of
the original”.

Amrita Bazar Patrika :

“...This should be considered
not only as another gem in
the store of Bengali litera-
ture, but may be considered
by the posterity as an im-
portant event in the Indo-
German cultural ties in the
twentieth century”.

বিখ্যাত সাস্তাহিক “অমৃত” : “...মূল
জার্মানী থেকে অনূদিত এই গ্রন্থের প্রথম
খণ্ড বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক
স্মরণীয় ঘটনা।”

যুগান্তর : “...বিশ্ব-সাহিত্যের এমন একটি
বই এতদিন যে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত
হয়নি তা সত্যই দুঃখের কথা।...উত্তর
গাঙ্গুলীকৃত ফাউন্টের অনুবাদ বাংলা
সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করল।”

:: মূল্য দুই টাকা ::

জেনারেল বুকস

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

হিমালী

হিমসার

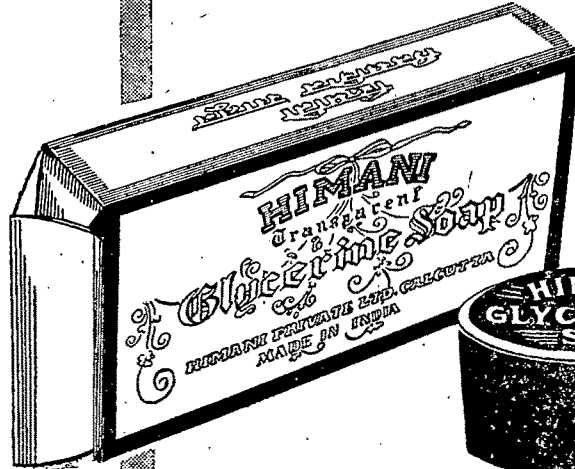
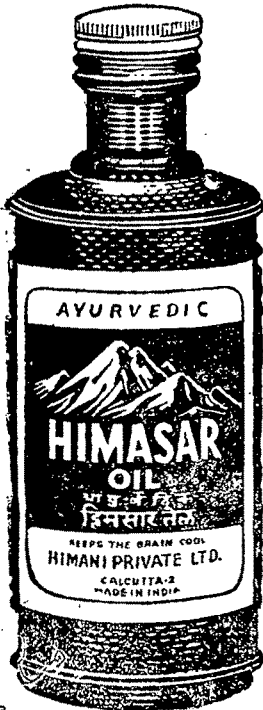
আয়ুর্বেদিক কেশতৈল ও

গ্লিসারিন সাবান

দিনের সূর্যতেই হোক কি শেষেই হোক
হিমালী গ্লিসারিন সাবান দিয়ে স্নান করে
দেখুন—কি চমৎকার লাগে ! এতে গাত্র
চর্ম সজ্জাগ হয়, গাত্রবর্ণ সতেজ হয় এবং
মনের তৃপ্তিবোধ ফিরে আসে ।
আর স্নানের শেষে—শীতল সুবাসিত
হিমালী হিমসার কেশতৈলে কেশের
জোলুস আনে ।



পূর্ণাঙ্গ স্নানের সামগ্রী



হিমালী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২



ভজগোবিন্দ ভোজনালয়

তারাপদ বায়



ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের আমি একজন বাঁধা খন্দের। অবশ্য এতে আমার আপত্তি বা অসম্মানের কিছুই নেই। এই ভোজনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভজগোবিন্দ জীবিত থাকলে যে কোনো উৎসাহী তাঁর কাছ থেকে এই হোটেলের প্রাক্তন গ্রাহকদের একটি বিস্তৃত তালিকা শুনতে পারতেন। যাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বীকৃত খ্যাতনামা এখন। একসঙ্গে রাজভবনের কোনো ভোজসভাতেই বোধ হয় এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তির দর্শন অসম্ভব। ভজগোবিন্দবাবুর তালিকায় পূর্ণ আস্থা নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যেতো অমৃততঃ দুজন পদ্মশ্রী, এক ডজন এম-এল-এ; এম-পি-এ এবং ততোধিক সাহিত্যিক, অধ্যাপক এবং চিত্রতরকা

চেয়ারটায় বসতেন ভুতোবাবু—আহা চিংড়ি মাছ দিয়ে নটে চর্কাড়ি তিনি কি যে ভালোবাসতেন। অনুসন্ধান করলেই জানা যেতো ভুতোবাবু কোনো কেউ কেটা নন, বর্তমানে যাঁর ছবি ঘরে-ঘরে পর্দায়-পর্দায় সেই বিখ্যাত চিত্রতরকার পরিত্যক্ত নাম ওটা।

যা হোক, ভজগোবিন্দ ভোজনালয় আপনিও নিশ্চয় দেখেছেন। হাজারার মোড়ে সেই বিস্তৃত সাইন-বোর্ড—হলুদ পটভূমিকায় নীল কালিতে লেখা গোটা গোটা বাংলা হরফে হোটেলের নাম। নামের দু'পাশে দু'টি ছবি—একদিকে ব্যালুচর্মপরিহিত ত্রিশূল হাতে মহাদেব এবং অপরদিকে চেয়ারে আসীন খালি গায়ে হোটেলের মালিক ভজগোবিন্দবাবুর আনুমানিক প্রতিকৃতি। অবশ্য এসবই বছর পনেরো আগের কথা। যখন সাইনবোর্ডটি প্রথম আঁকা হয়েছিলো সেই সময়কার। সাইনবোর্ডটির একটি ইতিহাস আছে; জনশ্রুতি কোনো এক সাইনবোর্ড লিখিয়াকে দিয়ে একমাস বিনামূল্যে খেতে দেওয়ার চুক্তিতে এই সাইনবোর্ডটি আঁকানো হয়। কিন্তু ভজগোবিন্দবাবু দিন পনেরো পরে অনুভব করেন যে, হিসেবের তৌলে তিনি কিছু ঠকেছেন এবং ফলত আর্টিস্টের ডালে ভাতের ফ্যান এবং ঝোলের মাছটি ক্রমাগৎ সংকুচিত হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিন্তু ভজগোবিন্দবাবু হিসাবে ভুল করেছিলেন, কেন না তাঁর দুর্ভাগ্যবশত সেই সময়ে শুধুমাত্র তাঁর প্রতিকৃতিটি ব্যতীত আর সবই আঁকা প্রায় শেষ হয়েছিলো।

সুতরাং খাদ্যাভাবে শিকপীর স্নায়বিক এবং শারীরিক দৌর্বল্যের প্রকোপ ভজগোবিন্দবাবুর প্রতিকৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছিলো। তদুপরি পরবর্তীকালে রৌদ্র-বৃষ্টি ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণে সাইনবোর্ডের লালরঙটুকু সর্বাগ্রে মূছে যাওয়ায় (ভজগোবিন্দবাবুর চেয়ার লালরঙে আঁকা ছিলো) একটি বিচিহ্ন দৈহিক ভঙ্গি উক্ত প্রতিকৃতিকে জনসাধারণের অবশ্যদ্রষ্টব্যে পরিণত করেছিলো। এবং স্বীকার করতে স্বেচ্ছা নেই একদা উক্ত প্রতিকৃতিই আমাকে



জীবনের কোনো না কোনো সময়ে এখানে বসে কিছু না কিছু গলাধঃকরণ করেছেন। ভজগোবিন্দবাবু মধ্যে মধ্যে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে দেখাতেন, 'ঐ



ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ে আকৃষ্ট করে এনেছিলো। তদবধি এর বন্ধনে আমি বদ্ধ, বিপরীত ফুটপাথের নিউ গ্র্যান্ড হোটেলের তাঁর প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যে

কিটি চিরস্থায়ী গ্রাহক ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের আওতায় রয়েছে আমি তাদের অন্যতম।

ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের সেই সাইন-বোর্ড আজ আর নেই। নয়া পয়সা হওয়ার পরে ভজগোবিন্দবাবু ভেবেছিলেন যে, 'সাইন-বোর্ডের নীচে যেখানে "পাইস হোটেল" লেখা আছে সেখানে 'নয়া পয়সা হোটেল' লিখে দেবেন এই ভেবে সাইন-বোর্ডটা নামিয়ে আনেন। কিন্তু শ্রদ্ধাভাষ্যীদের পরামর্শে অবশেষে তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং নয়া পয়সার মতো তুচ্ছ ব্যাপারে পাইস হোটেলের ঐতিহ্য নষ্ট না করাই স্থির করেন।

মধ্যে কয়েকদিন আমি কলকাতায় ছিলাম না। অনেক রাগিতে বাসায় ফিরে এসেছি। এমন সময় দরজায় ধাক্কাধাক্কি এবং কান্নার চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে দরজা খুলে বেরোলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে ভজগোবিন্দবাবুর বড়ছেলে নবলাল দাঁড়িয়ে, সঙ্গে আর দু'একজন। আমি বেরুনো-মাত্র নবলাল বললে, 'বাবু, সর্বনাশ হয়েছে। বাবা, আমার বাবা আজ তিনদিন...' এই বলে ফোঁপাতে লাগলো। আমি কিছুটা অনুমান করলাম, ভজগোবিন্দবাবুর বয়স হয়েছিলো। আমি সঙ্গের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হলো? লোকটি যা জানালো তার সারাংশ ভজগোবিন্দবাবু আজ তিনদিন হলো মরে গেছেন। আমি বেশ অবাক ছিলাম। আমি ভজগোবিন্দবাবুর হোটেলের গ্রাহক, 'কিন্তু শ্রদ্ধামাত্র সেই সূত্রেই ভজগোবিন্দবাবুর মৃত্যুর তিনদিন পরে তাঁর ছেলে মধ্যরাত্রে আমার উপর হামলা করে শোকপ্রকাশ করবে, এটা বিশেষ সর্বাধিকার মনে হলো না। তবু

ভদ্রতার খাতিরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি, 'তা বাবার বয়স হয়েছিল, মানুষ কি চিরকাল বাঁচে?' ইত্যাদি নানা ধরণের কথা বলতে লাগলাম। নবলালবাবুর কান্না থামলো না, 'কিন্তু বাবা তো আরো একমাস আগেও মরতে পারতেন, এখন আমরা একেবারে ডুবে গেলাম। আর, আর ঐ শয়তান, ঐ বলাই দাস.....!'

বলাই দাস—ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের সনাতন প্রতিদ্বন্দ্বী নিউগ্র্যান্ডের মালিকের নাম। ভজগোবিন্দবাবু একমাস আগে মারা গেলেই বা কি সর্বাধিকার আর বলাই দাসই বা এই শোকের মধ্যে আসে কেন; সমস্ত বিষয়টি বিশেষ জটিল হয়ে উঠলো আমার কাছে। সারাদিন ক্রান্তির পর বর্ষগম্বুধর এক প্রাণের মধ্যরজনীতে হোটেলমালিকের তিনদিন পূর্বে মৃত্যুর জন্যে যেটুকু দৃষ্টিতে হওয়া উচিত; যে টুকু শোকান্বিত হওয়া উচিত—তার চেয়ে অনেক বেশী শোক এবং দুঃখ পেতে হলো। অনেক পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে নির্বিকার থেকেছি, এটাকে তার প্রায়শ্চিত্ত বলে ধরে নিলাম।

এইবার নবলাল আমাকে পায়ে জড়িয়ে ধরলো, 'বাবু বাঁচান।' আমি প্রায় পড়ে যেতে যেতে আচমকা এই ধাক্কা সামলে নিলাম। নবলাল তখন বলছে, 'আমাদের হোটেলের আপনাকে খেতে হবে।' তা তো খাই, সে তো নবলাল না বললেও খাই, কিন্তু ব্যাপারটা কি? প্রাণের নিমন্ত্রণ করছে। অসেছে নাকি। তিনদিনে প্রাণ, কি জানি—আর এভাবে নিমন্ত্রণ আমার জ্ঞাতসারে কোথাও কখনো দেখিনি।

খটকাটা লেগেই রয়েছে। অবশেষে যা বোঝা গেলো—এখন চারদিকে ভীষণ

কলেরা। কর্পোরেশন বলছে মহামারী। এর মধ্যে ভজগোবিন্দবাবু মারা গেছেন। বলাই দাস চারদিকে রটিয়ে দিয়েছে যে ভজগোবিন্দবাবুর কলেরায় মৃত্যু হয়েছে। হোটেলের মালিক যে সবচেয়ে ভালো খাদ্যদ্রব্যগুলি নিজে খায় সেই যদি কলেরায় মরে, তাহলে অন্য লোকে আসবে কোন্ ভরসায়। বাঁধা খন্ডের আজ দু'দিন একজনও আসছে না, উটকো ছুটকো এক আধটা আসে আর সব সময় হোটেল ফাঁকা।

নবলাল আবার আমার পা জড়িয়ে ধরলো, 'বাবু আপনার পা ছুঁয়ে বলাই, বাবা এমনি এখনি মরে গেছে, তার কিছু হয়নি,' ফোঁপাতে লাগলো, 'আপনি আমাদের হোটেলের খাবেন, এক পয়সা দিতে লাগবে না। যা খেতে চান তাই রান্না করবো। শ্রদ্ধা দু'বেলা রাস্তার ধারের ঐ জানালার পাশের সিটটার বসে থাকবেন।' এ পাড়ায় আমি পুরোনো লোক। স্মৃতির আমি যদি ভোজনালয়ে নিয়মিত খেতে থাকি, তাহলে আস্তে আস্তে অনেকেই আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে, নবলাল কেঁদে কেঁদে জানালো।

—জানি না, ভজগোবিন্দ সত্যি কলেরায় মরেছেন কিনা, সেটা তো বলাই দাসের অপপ্রচার নাও হতে পারে, হয়তো সত্যিই তাই; কিছু আশ্চর্য নয়।

কিন্তু তাতে আমার কি? জীবনে এই প্রথমবার মরাল কারেজ, সংসারের অভাব হলো না আমার। কোনো ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েই এই অভূতপূর্ব আত্মবিসর্জনের কাহিনীর কোনো স্থান নেই, কোনো তুলনাও নেই—একথা জেনেও আমি নবলালকে কথা দিলাম। সেই কথা এখনো রেখেছি। আর সংসার থাকলে যে কোনো কাজেই কোনো ক্ষতি হয় না তার প্রমাণ আমি এখনো জীবিত। এবং ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের কোনো আসনই কোনো মৃত্যুতে ফাঁকা যাচ্ছে না। হাজার মোড়ে নতুন সাইন-বোর্ড লাগানো হয়েছে, তাতে কব্জিতে ঘড়ি-আঁকা একটি হাতের তর্জনী নির্দেশ রয়েছে, 'আসন পাইস হোটেল ভিতরে'।

যে কোনোদিন সময় করে চলে আসবেন।

এম, আর, পি,
ট্রানজিষ্টর রেডিও

মণি রেডিও প্রোডাক্টস
১৫৭বি, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-১০

॥ সাধারণ নির্বাচন ॥

প্রজাতন্ত্রী ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন শুরু হয়েছে। এই নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার ২৮৫৫টি আসনের জন্যে প্রতিনিধিত্বতা করছেন মোট ১২,৬২৫ জন প্রার্থী। এই নির্বাচনের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ছাড়া হয়নি তার নির্বাচন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তির জন্যে। ঐ রাজ্যের বিধানসভার আসন সংখ্যা ৭৫। উড়িষ্যা ও কেরালার নির্বাচন সংখ্যাও বাদ গেছে। এই হিসাব অনুযায়ী কারণ কিছুকাল আগে ঐ দুটি রাজ্যের বিধানসভায় অন্তর্ভুক্তিকারী নির্বাচন হয়ে গেছে। জম্মু ও কাশ্মীর, উড়িষ্যা ও কেরালা সমেত ভারতের সব ক'টি রাজ্যে বিধানসভার মোট আসন ৩১৯৬।

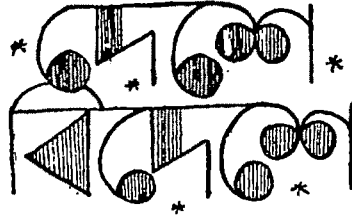
২৮৫৫টি বিধানসভার আসনের জন্য কংগ্রেসের প্রার্থী সংখ্যা হল ২৮৩৬, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের ১,০৭০, জন-সংঘের ১,০৬৫, স্বতন্ত্র দলের ১,০৩১, কমিউনিস্ট দলের ৮৩০, সমাজতন্ত্রী দলের ৫৭৯, রিপাবলিকান দলের ১৮২, হিন্দু মহাসভার ১৮২, ডি-এম-কে দলের ১৪২, কৃষক শ্রমিক দলের ৭৯, অকালী দলের ৪৬, ফরোয়ার্ড ব্লকের ৪০ ও নির্দলীয় ৪,১৬৯। বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় এ পর্যন্ত ১৩ জন কংগ্রেস প্রার্থী বিনা প্রতিনিধিত্বতায় নির্বাচিত হতে পেরেছেন।

লোকসভার ৪৯৮টি আসনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিধিত্বতায় নেমেছেন প্রায় ১৯০০ জন প্রার্থী। এর মধ্যে কংগ্রেসের প্রার্থী সংখ্যা ৪৭৩, জন-সংঘের ১৭৯, স্বতন্ত্র দলের ১৬৪, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের ১৫৭, কমিউনিস্ট দলের ১২৬, সমাজতন্ত্রী দলের ১০২, রিপাবলিকান দলের ৬৫, হিন্দু মহাসভার ৪১, রামরাজ্য পরিষদের ৩৮, নির্দলীয় ও অন্যান্য দলের ৪১৩। মুসলিম লীগ কেরালা থেকে তিনজন ও মাদ্রাজ থেকে দুইজন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। লোক-সভাতেও এ পর্যন্ত কংগ্রেসের তিনজন প্রার্থী বিনা প্রতিনিধিত্বতায় নির্বাচিত হতে পেরেছেন।

সারাভারতে নির্বাচনের জন্য লাগবে ৪০ কোটি ব্যালটপত্র, ৭০০ টন কাগজ, ৪ লক্ষ শিশি কালি। নির্বাচনের জন্য সরকারের মোট ব্যয় হবে কিশিদিখ গড়ে পাঁচ কোটি টাকা।

॥ ঢাকায় খণ্ড বিপ্লব ॥

পূর্ব পাকিস্থানের জনপ্রিয় নেতা জনাব সুরাবদীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আত্মবিশ্বাসের জবরদস্তির বিরুদ্ধে সারা



পূর্ব পাকিস্থান জুড়ে যে গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এখানে তার উল্লেখ নিঃপ্রয়োজন। সংক্ষেপে এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে শুধু এই কথাই বলা যায় যে এমন ঘটনা পাকিস্থানের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ভারতের আগন্তু আন্দোলনের সঙ্গেই শুধু তার তুলনা চলে। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সোদিন এমনি করেই সারা ভারতের মানুষ বিদেশী সরকারের নিষ্ঠুর নির্বাতনকে উপেক্ষা করে গর্জন করে উঠেছিল। তবুও, জনাব সুরাবদীর বিপুল জন-প্রিয়তার প্রতি পূর্ণ স্বীকৃতি জানিয়েই একথা বলা যায় যে, এই বিক্ষোভের কারণ শুধু এক শক্তিশালী জনপ্রিয় নেতার আকস্মিক গ্রেপ্তারই নয়। বহুদিন ধরে পূর্ব পাকিস্থানে যে বিক্ষোভের বারুদ জমে উঠেছিল, এই গ্রেপ্তার তাতে শুধু স্ফুলিঙ্গ সংযোগ করেছে মাত্র।

পূর্ব পাকিস্থান আজ পশ্চিম পাকিস্থানের উপনিবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সমগ্র পাকিস্থানে অজিত বৈদেশিক মদ্রার শতকরা ৮০ ভাগ উপার্জন করে পূর্ব পাকিস্থান কিন্তু তার সিংহভাগ পায় পশ্চিম পাকিস্থান। কলকারখানার অধিকাংশই গড়ে উঠছে পশ্চিম পাকিস্থানে। একারণে পশ্চিম পাকিস্থানে যেখানে মাথাপিছু আয় বছরে ৩২০ টাকা সেখানে পূর্ব পাকিস্থানের বছরে মাথাপিছু আয় মাত্র ২১৫ টাকা। পাকিস্থানের প্রথম শ্রেণীর ৮০০ জন সরকারী কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ৫০ জন পূর্ব পাকিস্থানী। পাকিস্থানের ৮ই ডিভিসন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্থানীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে মাত্র ২টি ব্যাটেলিয়ন এবং তাও হয়েছে পূর্ব পাকিস্থানীদের দীর্ঘ আলোচনের ফলে।

এ অবস্থায় বিপ্লবের দেশ পূর্ব-বঙ্গে শেষ পর্যন্ত যে এমনি করে বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে উঠবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এতদিন যে জর্জেনি সেইটাই ছিল আশ্চর্যের কথা। এ সম্পর্কে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বিলাতের প্রখ্যাত পত্রিকা 'ম্যাগেট্রার গার্ডিয়ানে' যে মন্তব্য লিখিত হয়েছিল তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'গার্ডিয়ানে' বলা হয়— Bengalees are famous for being politically minded to the point of turbulence, and for a long time one of the wonders of the martial law regime was that East Pakistan took it so quietly.

॥ নেপালে বিদ্রোহ ॥

নেপালের দেশভুক্ত বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ ক্রমেই সাংঘাতিক ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। ১০ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ নেপালের ভরত-পূর্ব এলাকায় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করেছে। বহু স্থানেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে এবং বিদ্রোহীদের গেরিলা তৎপরতার ফলে নেপাল সরকারের পক্ষে ঘটনাস্থলে সব সময় সৈন্য উপস্থিত করাও সম্ভব হচ্ছে না। নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ তুলসী গিরি অবশ্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, বিদ্রোহী নেপালীদের তৎপরতা সম্পূর্ণরূপে দমন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি অবশ্য একথাও স্বীকার করেছেন যে, বিদ্রোহীরা দুর্দিনের জন্যে মারি ও একাদিনের জন্যে ভরতপূর্ব দখলে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও পুলিশ মোতায়েন করে তাদের হাত থেকে একে ঐ স্থান দুটি আবার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আগে আগে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে নেপালের বর্তমান শাসকবর্গ যেভাবে তাচ্ছিল্যের উক্তি করতেন ডঃ গিরির কণ্ঠে এবার আর সে সুর শোনা যায়নি। অপর পক্ষে নেপালী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়েছে যে, প্রবল পীড়ন ও বাধা সত্ত্বেও স্বৈরতন্ত্রী রাজশাসনের বিরুদ্ধে নেপালী দেশভক্তদের অভ্যুত্থান ক্রমেই দুর্নিবার হয়ে উঠছে।

॥ পাওয়ারের মৃত্তি ॥

দশ বছরের জন্য কারা-রুদ্ধ কথ্যত মার্কিং গোয়েন্দা বিমান ইউ-টু-১১০০ পরিচালক ফ্রান্সিস পাওয়ার্স আকস্মিকভাবে সোভিয়েট কারাগার থেকে মৃত্তি পেয়েছেন। ১৯৬০ সালে ১লা মে তারিখে রাশিয়ার আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় পাওয়ার্সের বিমানকে ভূপাতিত করা হয় এবং তারপর গুলুচরবস্তির অভিযোগে তাঁকে দশ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ঘটনাক্রমে সোদিন এমনই আন্তর্জাতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে, সেই সময় প্যারী নগরীতে আহুত শীর্ষ সম্মেলনও তার ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়।

মার্কিং সোভিয়েট সম্পর্ক বর্তমানে খুব ভাল নয়। এ অবস্থায় পাওয়ার্সের হঠাৎ মৃত্তি খুবই আশার কথা। বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার একজন রুশ গোয়েন্দাকেও মৃত্তি দিয়েছেন এবং বার্লিনে উভয়পক্ষের সীমান্তবর্তী এক সেতুর উপর গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টা ৫২ মিনিটে উভয়পক্ষের মধ্যে বন্দী বিনিময় হয়েছে। ক্রীমীয়াতক মহলের ধারণা, এই বন্দী বিনিময় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির শুরুর লক্ষণ।

সীমা

॥ ঘরে ॥

৮ই ফেব্রুয়ারী—২৫শে মাঘ : মণি-পুন্ডের তামেনলং মহকুমায় দুইমাস-ব্যাপী কারফিউ জারী—সশস্ত্র নাগা বিদ্রোহীদের অব্যাহত উপদ্রবের জের।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে নির্ধিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে মাধ্যমিক শিক্ষকদের (পশ্চিম-বঙ্গ) সন্তাহব্যাপী প্রচার অভিযান সূর্য—শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ।

৯ই ফেব্রুয়ারী—২৬শে মাঘ : শিশুদের (পাঞ্জাব) বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রমাণ নাই—ভারত সরকার কর্তৃক দাশ কমিশনের রিপোর্ট গৃহীত।

দ্বিশতাব্দী সীমান্ত বরাবর পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর চলাচল বৃদ্ধির সংবাদ।

১০ই ফেব্রুয়ারী—২৭শে মাঘ : ভারতের প্রথম জৈব-রসায়ন ও এক্সপেরি-মেন্টাল মৈডিসিন ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন—যানবপুর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর কর্তৃক অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে জন্মলগ্নপুর্বে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনু-ষ্ঠানিক উদ্বোধন।

সৌলমারী আশ্রমে (শিলিগুড়ির প্রায় ১ শত মাইল দূরত্ব) আশ্র-গোপনকারী সন্ন্যাসী নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র বসিয়া গৃহস্থ রটনা।

১১ই ফেব্রুয়ারী—২৮শে মাঘ : প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক শনি-বারের চিঠি সম্পাদক প্রীসজ্ঞানীকান্ত দাসের (৬২) তিরোধান।

নির্বাচনী উত্তেজনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে ছোটখাট সংঘর্ষ—প্রবল উত্তেজনার দরুণ মজঃফরপুর জেলায় ১৪৪ ধারা জারী—সর্বত্র সশস্ত্র পুলিশের টহল।

১২ই ফেব্রুয়ারী—১লা ফাল্গুন : ৪০ কোটি মানুষের দারিদ্র ও মৃত্যুর জন্য কঠোর শ্রম ও সমবায়মূলক উদ্যমের

আহ্বান—নান্দেদ-এর (মহারাষ্ট্র) জন-সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বক্তৃতা।

বেগমপুর টেঞ্চে (হুগলী জেলা-স্থিত) বিক্ষুব্ধ ষাট্রীদল কর্তৃক লোকাল ট্রেন আটক—হাওড়া-বর্ধমান রুট লাইনে প্রায় ১২ ঘণ্টাকাল ট্রেন চলাচল ব্যাহত।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—২রা ফাল্গুন : নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে ১৮-জাতি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাবসহ শ্রীনেহরুর (প্রধান মন্ত্রী) নিকট ক্রুশ্চেভের লিপি।

কংগ্রেস হইতে এ যাবত ৫৬৭ জন কর্মী বহিস্কৃত—নির্বাচনে সরকারী কংগ্রেস প্রার্থীর বিরোধিতার জের।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—৩রা ফাল্গুন : শ্বিতীয় ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের যাত্রা সূর্য—ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী জয়নগরে বিদ্যায় সম্বর্ধনা : দলীয় নেতা—মেজর জন ডায়াস।

॥ বাইরে ॥

৮ই ফেব্রুয়ারী—২৫শে মাঘ : ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পুলিশের স্থলে সৈন্য মোতায়েন—মোসিনগান ও স্টেনগান লইয়া রাস্তায় রাস্তায় টহল—ঢাকার বিক্ষোভ অভিযান পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সম্প্রসারিত।

আগবিক পরীক্ষা বন্ধ সম্পর্কে জেনেভায় ১৮ জাতি পররাষ্ট্র সচিব বৈঠকের প্রস্তাব—রাশিয়ার নিকট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিপি।

৯ই ফেব্রুয়ারী—২৬শে মাঘ : ঢাকায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (পূর্ববঙ্গ) মিঃ আতাউর রহমান গ্রেফতার—সমগ্র পূর্ব-বঙ্গে গোয়েন্দা ও সামরিক গৃহতলচরদের তৎপরতা—উত্তরবঙ্গে ছাত্র বিক্ষোভ দমনে সৈন্য প্রেরণ।

প্যারিসে পুলিশের সহিত বিক্ষোভ-কারীদের সংঘর্ষে ৮ জন নিহত—সন্ত্রাসবাদী 'নেপাল সৈন্য সংস্থা'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সহস্র সহস্র নর-নারীর যোগদান।

১০ই ফেব্রুয়ারী—২৭শে মাঘ : রাশিয়ায় আটক মার্কিন ইউ-২ বিমানের

চালক ফ্রান্সিস পাওয়ার্স-এর মৃত্যুলাভ—বার্লিনে সোভিয়েট-মার্কিন বন্দী বিনিময়।

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ—পুলিশ অঞ্চলে বিক্ষোভের প্রসার—ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী নানা-স্থানে সামরিক ছাউনি স্থাপন।

১১ই ফেব্রুয়ারী—২৮শে মাঘ : কুমিল্লা ও সূর্যদুর গ্রীষ্ম পর্বত ঢাকার ছাত্র বিক্ষোভের বিস্তৃতি—খুলনাতেও বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের স্ফোটাভাব—নোয়া-খালিতে প্যাসেজার ট্রেনের উপর আক্রমণ।

১২ই ফেব্রুয়ারী—১লা ফাল্গুন : নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে জেনেভায় ভারত সমেত ১৮টি রাষ্ট্রের শীর্ষ বৈঠকে নতুন প্রস্তাব—ইং-মার্কিন প্রস্তাবের উত্তরে ক্রুশ্চেভ (রুশ প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক মার্কিমিলান ও কেনোডির নিকট লিপি প্রেরণ।

উত্তর ইউরোপে তুষারপাত ও প্রবল ঝড়ের তাণ্ডব—বিভিন্ন স্থানে রেল, বিমান ও জাহাজ চলাচল বিপর্যস্ত।

নিরাপত্তা আইনে করাচীতে আটক মিঃ সুরাবদীর 'হেবিয়াস কর্পাস'-এর আবেদনের শুনানী ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থগিত।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—২রা ফাল্গুন : লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য প্রিন্সগরের সম্মেলন (শীর্ষ) অনু-ষ্ঠানের অনুরোধ—ভিয়েটনামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সোভান্না ফোমার (নিরপেক্ষ নেতা) তারবার্তা।

পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর মন্ত্রি-সভা গদরুতর সপ্তকটের সম্মুখীন—নয়া শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে অন্তর্ভুক্তদের সংবাদ।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—৩রা ফাল্গুন : নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে অষ্টাদশ রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সোভিয়েট প্রস্তাব কেনোডি (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) কর্তৃক অগ্রাহ্য—বৃটেন কর্তৃক সোভিয়েট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

কুমিল্লা ও নোয়াখালিতে (পূর্ববঙ্গ) আবার হাঙ্গামা—বিভিন্ন স্থানে প্রবল ছাত্র-বিক্ষোভ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ জনগণেশের কৌতুক ॥

অনেকে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, ১৯৬২-র নির্বাচন শেষ পর্যন্ত কেঁচে যাবে। এই কেঁচে যাওয়ার জন্য ভরসা ছিল অষ্টগ্রহ সম্মেলন। শেষ পর্যন্ত অষ্টগ্রহের আকর্ষণে ভারতবর্ষের নির্বাচন দ্বন্দ্ব বন্ধ করা সম্ভব হল না। বাঁধা কার্যক্রম অনুসারেই সর্বত্র ভোটোভূতি শূন্য হয়ে গেছে।

ভোটেরও সাহিত্য আছে। “ভোট-রংগ” নামে একখানি পত্রিকা একদা বাংলা দেশে বেশ খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করেছিল। তাতে থাকত ছড়া, টিপ্পনি, গালি-গালাজ ইত্যাদি। ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং বিভিন্ন প্রার্থীর জীবনের গোপন সংবাদ পরিবেশিত হত। তখনকার কালের ‘পরিসা সাপ্তাহিক’গুলি এই রকম চান্দাচুরের মত মন্থরোচক সংবাদাদিতে পরিপূর্ণ থাকায় বেশ কার্যকর হত। এই সব ছোঁয়াচ দায়িত্বশীল পত্র-পত্রিকাতেও যে লাগত না তা নয়, ‘নন্দী-ভূগণী’ রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত রংগকাব্য সাহিত্যরস সমৃদ্ধ হওয়ায় সর্বজনের কাছে আকর্ষণীয় হত। নাট্যকার অমৃতলাল বসু একটি প্রহসন নাটক ‘দ্বন্দ্ব মাতনম’ (১৯২৬) রচনা করেন। হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় রচিত নাটকে ভোট ভণ্ডুলের কথা আছে। সম্ভবতঃ M L C কথাটিকে তিনিই ‘মালসী’ করেছিলেন।

তখনকার কালে যে সব পত্রিকা কোন বিশেষ প্রার্থীকে সমর্থন করতেন তাঁরা সহযোগী অপরাপর বিরোধী পত্রিকার সঙ্গে লড়াই-এ অবতীর্ণ হতেন। এর একটি চমৎকার চিত্র এঁকেছেন পরশুরাম। ধূমকেতু-পত্রিকাকে আক্রমণ করে অপর পক্ষ বলছে—‘তৎসমসি ধূমকেতো!’

আধুনিক যুগে সেই সব কাঁচা খেউড় অন্তর্হিত। শালীনতার সঙ্গে সেই কালের অমার্জিত রসিকতা লুপ্ত হয়েছে বটে, তবে এখন যে নীতি চালু হয়েছে তা প্রায় পিছন থেকে ছোঁরা মারার সামিল। এই ধরণের আক্রমণ সর্বপ্রথম শুরুর হয় দেশবন্ধুর Forward দৈনিক পত্রে। সেই কালে ফজলুল হকের একখানি পত্রের ফটো-স্টাট প্রতিলিপি প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল—“Bluff, Bait,

Bribery—Which?” ফলে সেদিনই ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার পতন হয়।

ভোটের সাহিত্য অন্য জিনিস, রঙদার, জ্বালাময় এবং অস্ত্রমধুর। বর্তমান কালে এই ভোটরংগের অনেকখানি দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন কার্টুন-শিল্পীরা। যোগ্য আযোগ্য উভয় শ্রেণীর কার্টুনে শহর বোঝাই। পোষ্টার লেখার অনশীলনের ফলে নানিক অনেক নিকর্মী বালকের হাতের লেখা পরিষ্কার হয়েছে এবং বানান জ্ঞান নির্ভুল হয়েছে। আমাদের দেশে নির্বাচনী সাহিত্য বর্তমানে শুধু সংবাদপত্রেই সীমাবদ্ধ, কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে তার এখনও যথাযোগ্য আসন লাভ সম্ভব হয়নি।

ইংলন্ডের নির্বাচনে গতবার মোট ভোটের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন কোটির মত, ভারতবর্ষের প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার নীতি অনুসারে ভোটদাতার সংখ্যা একুশ কোটি। এদের ভাষা বিভিন্ন, ধর্ম বিভিন্ন এবং অনেক অঞ্চল দুর্গম এবং স্বাপদসঙ্কুল। অধিকাংশ মানুষ জীবনের উপযুক্তভাবে শিক্ষা লাভ করেনি। এই বিরাট অঞ্চলের অসংখ্য মানুষকে গণতন্ত্রের পথে চালিত হওয়ার যে সুবিধা দান করা হয়েছে, এশিয়ার ভূখণ্ডে তার আর কোন তুলনা নেই। পাশাপাশি রাষ্ট্র আজ পর্যন্ত নির্বাচন ব্যবস্থা করতে পারেননি। ব্যক্তি স্বাধীনতার কোনও বালাই সেখানে নেই। নিরাপত্তা আইনে বন্দীর পক্ষে ‘হেব্রিয়াস কর্পাস’ দাবী করা পর্যন্ত চলবে না, হাইকোর্ট সেখানে সাক্ষীগোপাল মাত্র। লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিকপত্র Times এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছেন—
“It might be argued that the five year festival of garland giving, factional manoeuvring and petition writing can only last so long as ‘Panditji’ lasts at the top. Yet those who spurn democracy as unsuited to Asian conditions will point to the time it took to mature in Europe.”

গণতন্ত্রের ইতিহাসে ভারতবর্ষের ভূমিকা তাই বিস্ময়কর এবং এশিয়া ভূখণ্ডের মানুষের কাছে আদর্শস্থল। দারিদ্র্য, বেকারী, হাশাকার দূর হয়নি সত্য কথা। কিন্তু সেই কারণে রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষমতা থেকে জনগণকে বঞ্চিত

করে রাখার কোন অজুহাত নেই। ভারত-বর্ষ সে কথা বুঝেছে, এবং সেই মহৎ দায়িত্বপালনে ভারতের এই সাহসিক প্রচেষ্টা সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে। তাই ভারতের এই নির্বাচন মহাযজ্ঞে সমগ্র বিশ্বের মানুষের আগ্রহ।

তাই বলে সাধারণ নির্বাচন নিছক গদ্যময় গুরুগম্ভীর ঘটনামাত্র নয়। ১৯৬২-র নির্বাচনের ঘণ্টাবর্তে যারা মেতে আছেন তাঁরা তাঁদের সম্ভাব্য জয়-পরাজয়ের চিন্তায় ব্যস্ত থাকুন। ১৯৫৭-র নির্বাচনের কথা স্মরণ করা যাক। শুধু যে ভারতীয় নরনারীই এই নির্বাচনকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছিলেন তা নয়, বন্য জন্তুরাও তাঁদের নৈশবিহার কালে নির্বাচন কেন্দ্রে এসে হানা দিয়েছিলেন এমন কি প্রকাশ্য দিবালোকেও।

মধ্যপ্রদেশের এক নির্বাচন কেন্দ্রে এক শাদুল পুণ্ডগব এসে গজ্ঞান শূন্য করেছিলেন, কার পক্ষে যে তিনি আবেদন করছিলেন কে জানে, ভোটদাতারা কিন্তু বিশেষ বিরত বোধ করেছিলেন। পরে জানা গেল সেই চিতা-বাঘটির জন্য অন্ততঃ অর্ধেক ভোটদাতা নির্বাচন কেন্দ্রে হাজির হতে পারেননি।

এই মধ্যপ্রদেশেই আর একটি কেন্দ্রে দিন-দুপুরে এই ব্যাঘ্র নির্বাচনের পূর্ব-রজনীতেই এসে হাজির এবং একজন কর্মীকে কাঁধে নিয়ে পলায়নের উপক্রম করে। স্পষ্টতঃই নির্বাচন ভণ্ডুল করাই তার উদ্দেশ্য ছিল।

বন্য জন্তুর অন্য ভূমিকাও আছে। উত্তরপ্রদেশের জনৈক প্রার্থীর প্রতীক ছিল ‘উদ্যত সিংহ’। তাঁর নির্বাচনী প্রতিনিধিরা একটি গ্রামে গিয়েছেন নির্বাচনী প্রচারে, কাঁধে সেই ‘সিংহের’ প্রতীক। এমনই কান্ড, সেই রাতেই নেকড়ে বাঘের আক্রমণে এক দল গ্রাম্য ছাগল বিপর্যস্ত হয়। ফলে গ্রামবাসীরা স্থির করল এই ‘সিংহ’ চিহ্ন অত্যন্ত অশুভ এবং বলাবাহুল্য ভোট পাওয়া গেল না।

এইবারের নির্বাচন সংগ্রাম যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তিতে লড়াই হচ্ছে গত নির্বাচনও প্রায় সেই পটভূমিকাতেই লড়াই হয়েছে। আগে আগে যে সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস নির্বাচনী রংগমঞ্চে প্রকাশিত হয়েছে এই যাত্রায় যে তার পুরাবৃত্তি ঘটবে না, তা বলা যায় না। ১৯৫৭-এ একজন ভোটের ব্যালট বক্সে ভোটদানের পূর্বে তার সামনে আসন করে বসে রীতিমত প্রার্থনা করেছিলেন। কোন কোন জায়গায় ব্যালট বক্সে সিঁদুর কুমকুম, পত্র-পুষ্প ইত্যাদি দান করা হয়।

অনেক ব্যালট বাক্স উন্মোচন করে পাওয়া গেছে, (১) কোন প্রার্থী-বিশেষের সাফল্য সম্পর্কে শুভেচ্ছা,

কিংবা যথেষ্ট গালাগাল, (২) ফটোচিত্র এমন কি হলিউডের জনৈক তারকার ছবি, (৩) রোপ্যমুদ্রা এবং (৪) কারোন্সি নোট।

ইলেকসন কমিশন বলেছেন কোন রকমের টাকাকড়ি পেলে তা সরকারী ধনভান্ডারে জমা পড়বে।

কোন কোন ভোটদাতা আবার সদাশয়। মহাশূর, মাদ্রাজ এবং উড়িষ্যার ভোটদাতারা সবকটি প্রার্থীর নামেই চিহ্ন দিয়ে ভোট দিয়েছেন। কাউকেই তাঁরা চর্চাতে চান না। ব্যালটপত্র ছিঁড়ে কটি বাজতে একটু একটু অংশ দান করে কতব্য পালন করেন।

এক বৃন্দা নির্বাচন কেন্দ্রে এসে বলে যে, নেহরুজীকে দেখতে চাই, তবেই ভোট দেব। অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে ঠাণ্ডা করতে হয়।

ইলেকসন কমিশন আর একটি মজার কথা জানিয়েছেন। একজন ভোটদাতা তদানীন্তন ইলেকসন কমিশনার শ্রীযুক্ত সফুমার সেন ছাড়া আর কাউকে ভোট দিতে নারাজ।

প্রতীকেরও আবার একটা ভূমিকা আছে। একজন ভোটার এসে মহাশূরের এক কেন্দ্রের নির্বাচন অধিকর্তাকে বললেন যে, তাঁর জীবনে 'মই' এক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। জীবিকা অর্জনের সহায়ক, অতএব সে 'মই' মার্কা বাজিয়ে ভোট দেবে। সে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। এদিকে ভোট দিতে হবে লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে, 'মই' ছিল বিধানসভার প্রার্থীর প্রতীক। অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়।

উত্তরপ্রদেশের কিছুসংখ্যক মাঝি ভোটকেন্দ্রে এসে দেখে ভোটদানকেন্দ্রের ব্যালট বাজ্রে একটিও 'নৌকা' প্রতীক চিহ্ন নেই, তারা বিরক্ত হয়ে ভোট না দিয়েই চলে গেল।

রাজস্থানে একজন হাজির হয়ে নির্বাচন-অধিকর্তাকে বলে যে, তার স্ত্রী ভোটের নয়, তবু তার জননীর ভোটটি তিনিই ব্যবহার করবেন। কেন না জননী অসুস্থ এবং স্ত্রী সংসার চালায়। অতএব ভোটদানের অধিকার তার। অনেক করেও তাঁকে সোঁদীন বোঝানো যায়নি।

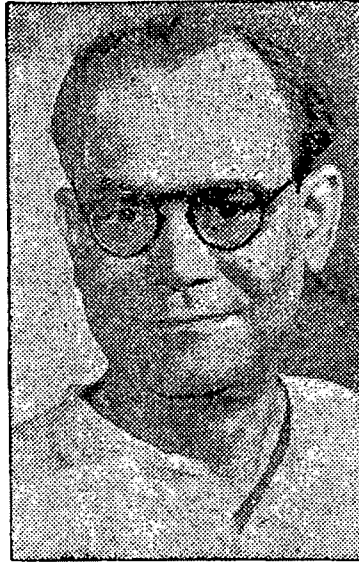
সর্বশেষ আর একটি কৌতুককর কথার উল্লেখ করা যাক। অনেকেই জানেন যে, তাঁর জেতবার আশা নেই, তবু তিনি একজন প্রবল প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়েন। সাধারণত তাঁর নির্বাসিতার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন। কিন্তু লোকটি হেরে গেলেও লাভবান হন। উত্তরপ্রদেশের একজন আবেদন-লেখক ২৫০ টাকা মাত্র ব্যয় করে যে প্রচার লাভ করলেন তার মূল্য অনেক বেশী।

জনগণেশের জয় হোক।

নতুন বাই

লগ্ন-শুভ— (উপন্যাস) প্রবোধকুমার সান্যাল। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। ২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা—৬। দাম—৩.৫০

ভুলটা হয়েছিল গোড়াতেই। দাম্পত্য-জীবনে চিড় খাওয়ার ফলে স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করে সরমা দেবী ও নরেশচন্দ্র যে ভুল করে ভেবোঁছিলেন এখানেই এর শেষ—কার্যত তা' হোল না। ভবিষ্যৎ বংশধরকেও তিলে তিলে সেই ভুলের মাসুল শোধ করতে হলো। বাপের আওতায় লালিত হয়ে সোমেন্দ্র শত দারিদ্র্যের মধ্যেও মেধা, বিদ্যাবস্তু এবং এমনি ব্যক্তিগত নিয়ে মানুষ হয়ে উঠলো যে, সরমা



দেবী তার কাছে নাম মাত্র জননী হয়ে রইলেন।

ছেলেকে নিজের কাছে কাড়বার জন্যে মিলিকে সরমাদেবী ব্যবহার করেছিলেন দাবার ঘড়িটার মত। তাঁর হিসেবমতই সোমেন্দ্র মিলির প্রণয়াসক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু নরেশচন্দ্র সরমাদেবীর ওপরে টেকা দিয়ে হিন্দু শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ-ঘরের মেয়ে চারুলতার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। নরেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে লড়াই করার মত প্রতিপক্ষবিহীন হয়ে সরমাদেবীও চারুলতার দিকেই ঝুঁকলেন। সোমেন্দ্র বিবাহিতা স্ত্রী চারুলতাকে ত্যাগ করে মিলির দিকেই ধাবিত হলো। ফলশ্রুতির রাতে সোমেনের মৃত্যুে সর্বকিছু শূন্যে ঝঞ্ঝাটস্থলসম্পন্ন চারুবালা হাসিমুখেই সরে দাঁড়ালো। ভাঙা হৃদয় নিয়ে সে বসে রইলো না, সংসারে তার অনেক কাজ। লগ্ন-শুভ উপন্যাসে নৈরাশ্য-বেদনা

ও মহান আত্মত্যাগের মাধুর্য্যে এই দ্বিভূজ প্রণয় কাহিনী গড়ে উঠেছে।

চারুবালার জন্যেই যদিও সোমেন ও মিলির গোপন বিবাহ সম্ভব হলো, কিন্তু সরমাদেবীর ক্রুর চক্রান্তে তাদের জীবনে আবার ট্রাজেডি খনিজে এলো। বিয়ের সময় পিতার মতের বিরুদ্ধে যেতে হ্যাঁ পারার জন্যে সোমেন যে পাপ করোঁছ সন্তান প্রসবাস্তে ও হাসপাতালে মিলির মৃত্যুতেও তার প্রায়শ্চিত্ত হলো না। সম্পূর্ণ আত্মশুদ্ধির জন্য সোমেনের কারাবরণের প্রয়োজন ছিল। শেষে মিলির ছেলেকে নিয়ে চারুবালা ও সোমেনের মিলনে উপন্যাসের শুভ-সমাপ্তি ঘটেছে।

বর্ণনাচাতুর্য্যে ও লিপিকৌশলে প্রবোধ-কুমারের অন্যান্য উপন্যাসের মত এখানেও উপভোগ্য। আসর জাঁকিয়ে সুদক্ষ শিল্পীর মত মিহি ও মোটা সূতোয় তিনি মনোজ্ঞ কাহিনীর জাল বুনেছেন। এই দিক থেকে দেখলে শরৎচন্দ্রের আমলের তিনিই শেষ প্রতিনিধি, যিনি কাহিনী দিয়ে পাঠককে অভিভূত করে টেনে রাখতে পারেন। তাঁর চরিত্রেরা সদা সপ্তরশ্মীল, হয়ত একটু কম ভাবে এবং তাই ভাবায়ও কম। জীবনের জটিলতা-মুহুর্ত কাহিনী সহজ ছন্দে এগিয়ে চলে।

এই গ্রন্থের দাদু-র স্মিত উজ্জ্বল চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। ঘটনা-অঘটন সবই তাঁর স্ফারাই সম্ভব হয়েছে।

সরমা ও চারুবালা এই কাহিনীর দুই কোটিতে দীপ্যমান দুটি নারী চরিত্র। সরমা যৌবনের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্য-পীড়নে প্রতিহিংসাপরায়ণা, ধূমায়িত শিখা আর মর্ষাদাময়ী চারুবালা যেন শ্রাবণের বিদ্যুৎবতী মেঘ। যদিও চারুবালা চরিত্রে যে-নৃতনত্ব আভাসিত, উপন্যাসের সহজ পরিণতিতে সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়নি। তবু লগ্ন-শুভ উপন্যাসের সমস্যার বৈচিত্র্যের আশ্বাদ আছে।

প্রচ্ছদ ও মৃদুগ সূর্যচিহ্নপূর্ণ।

কীর্তিদাস-কীর্তিদাসী— (গল্প)

শ্রীসন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। এ্যান্ডো-সিয়েটেড পাবলিশার্স। এ।১৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম ২-৫০ নং পঃ।

চারিটি স্বতন্ত্র গল্পের সংকলন হলেও তাদের নায়ক বিজন। নায়ক বিজন এ যুগের মানুষ। জীবনের বিবিধ ছন্দ চারিটি গল্পের মধ্যদিয়ে বিজন চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জীবনটা হঠাৎ গড়ে ওঠে না। কৈশোর আর যৌবনের ছাপ থেকে যায় তার ওপর। অভিজ্ঞতার পরতে পরতে অনুভূতির সচেতনতায় গড়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ জীবন। কিন্তু এ জীবনে 'জ্ঞান নেই বলে প্রেম নেই, বন্ধুতা নেই... পরস্পরকে যৌনপ্রহার করে বেঁচে থাকতে

ই...মারা যাব অতীর্কিতে আততায়ী
তার হাতে"। বিজনের জীবনের মধ্য
বয়ে এই যে কথা বলবার চেষ্টা
রা হয়েছে আধুনিক সভ্য আর
নৃশীল জীবনের যুবসম্প্রদায়ের
ক্ষে তা একান্ত সত্য। বিজনের
ইসিহা নিরালম্ব অন্মুতপ্রবণ
বীণ থেকে এ সত্যও ফুটে ওঠে,
বঁচে থাকতে হলে যে সুস্থতার প্রয়ো-
জন সে সুস্থতা একালের শ্রম্য ভক্তি
বিশ্বাসহীনতার মাঝখানে হারিয়ে গেছে,
এ সংগ্রামের প্রয়োজন তার জন্য শক্তি
ারিয়ে গেছে নিঃশেষে। কিন্তু মানুষ
এই বঁচিতে চায় আর সে জন্য তার
কুলতার অন্ত নেই।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের এ কাহিনী
র্ণিত হয়েছে, আধুনিক বর্ণনাভঙ্গীমার
ধামে। কাহিনী গ্রন্থনার এ অভিনব
বঁচন সমভাবে বর্তমান হলেও 'মীরাবাদী'
লপটি কিছুটা পুরনো বলেই মনে
য়েছে। এ গল্পটির কাহিনী অন্যগুলির
কৃষ্ণ সমভাবে ভাল রাখতে পারেন।
বজনের রক্তমাংস, 'দশ বছর পরে
একদিন', 'কীতদাস কীতদাসী' গল্প
তনটি উল্লেখযোগ্য। শেষ গল্পটি
এ যুগের একটি অন্যতম ছোট
লপ। এ ধরনের গল্পসৃষ্টিতে যে
শীলক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়
হা লেখকের আছে। শ্রীযুক্ত চট্টো-
পাধ্যায় যে একজন সুদক্ষ কথাসিঁপী
ওয়ার সম্ভাবনা রাখেন তার প্রতিশ্রুতি
র্তন দিয়েছেন। এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা কুর-
বার দায়িত্ব তাঁর। গদ্যের ভাষা অতি-
রিক্ত মাত্রায় কাব্যধর্মী হলে তার মাধুর্য-
গুণ নষ্ট হয়ে যায়, এদিকে দৃষ্টি
দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এ প্রসঙ্গে
তাকে স্মরণ করিয়ে দিই যে, বড়
শ্রীমতী হতে গেলে শিল্পিক সংযমের
প্রয়োজন। আর সে সংযমের অভাব এ
গ্রন্থের কোথাও কোথাও রয়েছে।

এইসব আলো প্রেম—(উ প ন্যা স)
শ্রীঅসিত গুপ্ত। এম, সি, সরকার
এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; কলি-
কাতা—১২। দাম ৪.০০ ন, প।

সুদের আগুন—(উপন্যাস) শ্রীগোলাম
কুদ্দুস। মুকুন্দ পারলিশার্স; ৮৮নং,
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৪।
দাম ৪.৭৫ ন, প।

এই সব আলো প্রেমের লেখক
না সাহিত্য ক্ষেত্রে একেবারে নতুন
ক। ইতিপূর্বে তাঁর উপন্যাস ও কিছু
প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে
তাঁর রচনায় যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর
পাওয়া গিয়েছিল এখানে তার পরি-
পূর্ণ সাধকতা না ঘটলেও মোটামুটি
স্বাভাবিক রূপটি পাওয়া যাবে।

মানুষটি সংগীতকে ভালবাসে, সে

জীবনকে ভালবাসে। কিন্তু এ কথা সে
জানে জীবনটা 'প্লেটোনিক লাভের
ব্যাপার নয়। এখানে সংগ্রাম আছে—নানা-
বিধ পরিবেশের মধ্য থেকে সংগ্রাম করে
গড়ে উঠতে হয়। ভালবাসা নাম করে
অনেক ব্যাভিচারের সম্ভাবনা রয়েছে।
যুক্তি আর বিচারের মানদণ্ডে সব
কিছুকে যাচাই করে নিতে হয়। কিন্তু
সে অসুস্থ নয়। সে স্বাভাবিক। একটি
যুবকের চিন্তাজগতে অনেক কিছু বস্তুর
আবির্ভাব ঘটতে পারে যাকে অস্বাভাবিক
মনে হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সত্য।
নায়ক 'আমি'। তার জীবনের এক একটি
মহুতের বহু মানুষ এসেছে মধুর
স্রাস্ত্রের মধ্য দিয়ে। তাই চলে
গেছে মা, বাবা, ললিতা বউ,
মীনাফণী। কিন্তু ঐ তো স্বাভাবিক
ছিল। ঐ ভুলটাই স্বাভাবিক। এ-ই
জীবন। তা না হলে মহুতের আবেশকে

আঁকড়ে ধরতে গিয়ে একদিন 'আমি'
হারিয়ে যেত। শেষ মহুতের সরস্বতীকে
পেয়েও কিন্তু তার মনে হয় এও হারিয়ে
যেতে পারে।

উপন্যাসটিতে একজন আধুনিক
শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।
রচনার অভিনব ও নায়কের সুক্ষ্ম মন-
বিশ্লেষণ উপন্যাসিকের দুলভ ক্ষমতার
পরিচায়ক। বিশেষ করে নায়কের মনের
বিশ্লেষণের অপূর্বতা সহজেই মনকে
আকৃষ্ট করে। তাই ঘটনাপ্রবাহে যে বিচিত্র
জীবন ঘুরে-ফিরে এসেছে বারে বারে
তার মধ্যে লেখকের মনসীমানার পরিচয়
সুস্পষ্ট। তারা ক্রটিমতার আড়ালে পড়ে
অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। সর্বাপেক্ষা
উল্লেখযোগ্য উপন্যাসিকের কার্যধর্মী
চেতনা। রচনাকে তা মধুর করে তুলেছে।
ভাষা স্বাভাবিক হওয়ায় কাহিনী এতটা
সাধক হতে পেরেছে। প্রতিশ্রুতিবান এই

বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি বরণীয় গ্রন্থ

৥ সাহিত্য-বিষয়ক ৥

বিমানবিহারী মজুমদার : ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫.০০;
পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ৬.০০ ৥ অজিত দত্ত : বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস
১২.০০ ৥ মদনমোহন গোস্বামী : ভারতচন্দ্র ৩.০০ ৥ ভবভ্যে দত্ত :
চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ৬.০০ ৥ রথীন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্য-বিচিত্রা ৮.৫০ ৥
নারায়ণ চৌধুরী : আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন ৩.০০ ৥ অরুণ মুখো-
পাধ্যায় : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য ৮.০০ ৥ শিবজেন্দ্রলাল নাথ :
আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য ৮.০০ ৥ সত্যরত্ন দে :
চণ্ডীগীতি-পরিচয় ৫.০০ ৥ অরুণ ভট্টাচার্য : কবিতার ধর্ম ও বাংলা
কবিতার ঋতুবদল ৪.০০ ৥ প্রশান্ত রায় : সাহিত্য দৃষ্টি ৪.০০ ৥ সাধন-
কুমার ভট্টাচার্য : রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ৬.০০; নাটক ও নাটকীয়
২.৫০; নাটক লেখার মূলসূত্র ৫.০০ ৥ আজহারউদ্দিন খান : বাংলা
সাহিত্যে মোহিতলাল ৫.০০

৥ জীবনী সাহিত্য ৥

চারচন্দ্র ভট্টাচার্য : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী ১.৫০ ৥ যোগেন্দ্রনাথ
গুপ্ত : বঙ্গের প্রাচীন কবি ১.০০ ৥ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : ভগিনী
নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ ৫.০০; শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন
মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫.০০ ৥ বলি দেবশর্ম্মা : ব্রহ্মবান্ধব উপাখ্যান ৫.০০ ৥
প্রভাত গুপ্ত : রবিচ্ছবি ৬.০০ ৥ খাজা আহমদ আব্বাস : ফেরে নাই শব্দে
একজন ৪.০০ ৥ মণি বাগচি : শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১০.০০;
রামমোহন ৪.০০; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৪.৫০; মাইকেল ৪.০০; কেশবচন্দ্র
৪.৫০; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৪.৫০

৥ বিবিধ গ্রন্থাবলী ৥

রাধাকৃষ্ণ : হিন্দু সাধনা ৩.০০ ৥ তারাপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা : রামায়ণতত্ত্ব
৪.৫০ ৥ দীনেশচন্দ্র সেন : রামায়ণী কথা ৪.০০ ৥ হিপ্পোশঙ্কর সেন
শাস্ত্রী : রামায়ণের কথা ১.২৫; ভারত জিজ্ঞাসা ৩.০০; মনোবিদ্যা ও
দৈনন্দিন জীবন ২.৫০ ৥ শিশিরকুমার নিয়োগী : সহজ কৃত্তিবাসী রামায়ণ
৩.৫০ ৥ বিশ্বেশ্বর মিত্র : পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গ ৩.৫০ ৥ কলাগণী
কালেকর : ভারতের শিক্ষা ১ম খণ্ড ২.৫০; ২য় খণ্ড ৫.০০ ৥ প্রফুল্লকুমার
দাস : রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গ ১ম খণ্ড ৩.৫০ ৥ সন্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় :
আফ্রিকার চিত্র ১.৫০ ৥ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় : লাইবেরিয়ার উপকথা
১.৫০ ৥ সুনীলকুমার গহ : স্বাধীনতার আবেল তাবেল ৫.০০

জিজ্ঞাসা ৥ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ : ১৩৩এ, রাসবিহারী
অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

লেখকের কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়া যাবে বলে আশা করি।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি একটি উপন্যাস। কে মাল্লিক সুরসাদক। সুরকেই সে জীবন দিয়ে ভালবেসেছে। কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার এই জীবন গড়ে ওঠে। ভারতীয় সংগীতের তীর্থ-ক্ষেত্রে সে ছুটে গেছে আরাধনার জন্য। বহু সাধনার পর এসেছে সার্থকতা। নামের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে অর্থ আর আনন্দাশুভক। বিষয়-সম্পর্কিত গড়তে গেছে। সেখানে তার সংগীত-প্রেমিক মন সংগীতের মধ্যেই শান্তি খুঁজে পেয়েছে।

মোটামুটিভাবে গ্রন্থটি সুখপাঠ্য। ভাষা সহজ ও সুন্দর। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে চরিত্রগুলি চিত্রিত। কাহিনীর মধ্যে বাঙলার চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন তেমন একটি বাঙালী শিল্পীমুনকে পাওয়া যায় রচনার মধ্যে। উপন্যাসিকের এ বৈশিষ্ট্যটিই গ্রন্থটির আকর্ষণ।

মিস বোসের কাহিনী—(উপন্যাস)

—বাণী রায়। প্রকাশক গ্রন্থম, ২২।১, কণ্ঠশালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—তিন টাকা।

বাণী রায় প্রবন্ধ, কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। এক নেতার জীবনের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে মিস বোসকে অপমরণের কালিমা মাখতে হয়। ফলে তিনি তাঁর জীবনের শূন্য সিংহাসনের উপর দৃষ্টি পড়বে আর খুঁজে পেলেন না। উচ্চ পর্যায়ের প্রথম প্রেমিকের শূন্য আসনে নিশ্চেষ্টের প্রেমিককে বসাতে মন চায় না। প্রথম যৌবনের মাদক স্মৃতি-প্রাপ্তে হোঁচট খেয়ে রইলেন মিস বোস। শ্লিষমানা, ভান আশার প্রতিমা—মিস বোস। কাঙালের মতো যৌবনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, দীর্ঘ করেন সুন্দরী তরুণীদের। জগৎকে অকৃতজ্ঞ মনে হয়। তারপর একদিন অনঙ্গ এল মিস বোসের জীবনে নতুন স্বপ্ন নিয়ে, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। একজন পণ্ডিত, অপরে আটম। কিন্তু দুজনেই একা, দুজনের শূন্য হৃদয় ভরে ওঠে। অনঙ্গ তাই তরুণের মত দৃষ্ট হয়ে ওঠে আর মিস বোস আহ্বাদে খুঁকিপনা সুর করলেন, এই হোল মিস বোসের কাহিনী। পাইকা অক্ষরে ছাপা একশ সাড়ে তিন পৃষ্ঠার উপন্যাস। মৃদুগ-পরিপাঠ্য প্রশংসনীয়।

চণক-সংহিতা—(সরস প্রবন্ধ)—

কালিদাস রায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা—৯। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের সদ্য প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ 'চালচিত্রের' সমালোচনা আমরা

ইতিপূর্বে করেছি। 'চণক-সংহিতা' তাঁর দ্বিতীয় সরস প্রবন্ধ সংকলন। মধুর ভঙ্গীতে প্রবীর্ণ কবি করেকটি লঘু প্রবন্ধের মধ্যে অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রাপ্ত কিছু বিচিত্র তথ্য পরিবেশন করেছেন। জীবনের ভিত্তি, তীক্ষ্ণ, রুঢ়, রুদ্ধ রূপ তাঁর মনে যেভাবে দাগ কেটেছে এই সব রচনায় তা প্রতিফলিত। সামাজিক পট-পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন মূল্যবোধের সঙ্গে নবীনাদর্শের যে মৌল পার্থক্য আছে পুরাতনের পক্ষে তা সর্বদা নির্বিচারে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, তার ফলে দুটি বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে একটা সংঘাত বাধে। বহুদর্শী লেখকের রচনায় সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রাণরসে উজ্জ্বল সজীব রেখাচিত্রে রূপায়িত কথোপকথনের আঙ্গিকে রচিত সতেরটি রচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। রচনাগুলির মধ্যে 'বইয়ের আদর', 'ছাপার ভুল', 'সাহিত্যিকের বিভ্রম', 'কবির বিবাহ', 'মোটর', 'অবসরের বিভ্রম', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'গানের ভুল' প্রবন্ধটি সম্পর্কে লেখককে সেকস-পীয়রের সেই অতি প্রচলিত উক্তি 'নামে কি আসে যায়, গোলাপকে যে নামেই ডাকো'—ইত্যাদি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার লোভ সংবরণ করা গেল না। গ্রন্থটির ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি মনোরম, তবে প্রচ্ছদটি তেমন মনোরম নয়।

সাহিত্যচিন্তা—(প্রবন্ধ)—আমিরতন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—শান্তি লাইব্রেরী, কলিকাতা—৯। দাম তিন টাকা।

বিভিন্ন মাসিক ও হৈমাসিক পত্রের সম্পাদকদের তাগিদে রচিত পনেরটি প্রবন্ধের সংকলন-গ্রন্থ। লেখক কৃতী অধ্যাপক এবং সাহিত্য সমালোচক। তাঁর আলোচনা-গ্রন্থ সোনার তরী, বলাকা, পূর্ববী এবং মৃদুয়া সমালোচকদের প্রশংসান্য। এই প্রবন্ধগুলি অবশ্য সংক্ষিপ্ত আকারের। লেখকের বিচিত্র চিন্তার প্রতিফলন। এই গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে কবিতার শব্দশিল্প, কবিতার সমর্থনে, কবিতার আঙ্গিকের মূল্য। আধুনিক কবিতা, কবিতার পাঠ্যগার এবং তরুণ কবিদের আসরে প্রবন্ধাবলীর মধ্যে যে বক্তব্য আছে তার মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্যে সহাবস্থান নীতি ও সাহিত্য ও স্বাধীনতা প্রবন্ধ দুটি বিশেষ মূল্যবান। ছাপা পরিষ্কার।

৯ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা-৯

প্রবন্ধ-পত্রিকা—সম্পাদক শ্রীরামেন্দ্র দত্ত ও শ্রীচিন্তরঞ্জন ঘোষ; ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলি—৫ ইহতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

বাঙলা ভাষায় কেবলমাত্র প্রবন্ধ-পত্রিকার সংখ্যা খুবই কম। আলোচ্য পত্রিকাটি

সেক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজক গভীর মননশীল রচনা প্রকাশে এর এ ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান ২য় ব ৯ম সংখ্যায় তাঁদের সে ঐতিহ্য অক্ষ রয়েছে। এ সংখ্যায় লিখেছেন শ্রীরাখী নাথ রায় (ঘরে বাইরে), শ্রীঅনিলা গগোপাধ্যায় (আদিবাসী সমাজ-জীবন স্বরূপ), শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (ভক্তির রাজ্য ভ্যাগরাজ), শ্রীসুভাষ সরকার (ক নাট্য ও 'চার চোখ'), শ্রীচিন্তরঞ্জন ঘোষ (রবীন্দ্রোত্তর নাটক : ভূমিকা), শ্রীগির্গা শংকর (রক্তকরবীর শিল্পরূপ), শ্রীঅশে মস্তাফি (একজন বিস্মৃত চিন্তানায়ক শ্রী স্বাধীনতা), শ্রীবিমলপ্রিয় মন্ডল পাধ্যায় (বিজ্ঞান শিক্ষক ও রবীন্দ্রনা এবং শ্রীগোতম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদেবী ভট্টাচার্য)।

পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি রূপ ভারতী—সম্পাদক শ্রীমহাদেবপ্রসাদ সাহা। ৭৭ ধর্মতলা স্ট্রীট; কলি কাতা—১৩ ইহতে প্রকাশিত। ৭৫ ন, প,

ভারত সোবিয়ত সংস্কৃতি সমিতি পশ্চিমবঙ্গ শাখা কর্তৃক প্রকাশিত হৈমাসিক পত্রিকা। সোবিয়ৎ প্রেসিডে ব্রেজনেফ সংবন্ধনা, বেজনেফের ভ ব্রেজনেফ : সংক্ষিপ্ত জীবনী, চে য়ারি গাগারিন সংবন্ধনা, মেজর গাগারিনে ভাষণ, মহাশয়ন্যাভিয়ানের রোজনা সংকলিত হয়েছে। ভান্দা ভাসিলেভস্ সহযাত্রী নামক একটি গল্প অনু করেছেন শ্রীসুধাংশু অধিকারী। তা ছা লিখেছেন ডি, ওয়াই মার্তিনভ; কবি রাজ, দিলীপ সেনগুপ্ত, নিকো তিখোনভ, পরিমলচন্দ্র ঘোষ, আদি প্রসাদ সিংহ, চিত্তসুন্দর ভট্টাচার্য প্রভৃ পত্রিকাটির অঙ্গসজ্জা ও সম্পাদ দিকে নজর দেওয়া উচিত।

দ্রুম সংশোধন—২৭শে পৌষ তারিখে 'অমৃত' পত্রিকায় অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য একটি উপন্যাসের সমালোচনা প্রস লিখিত হয়েছিল "সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ তেই কথা-সাহিত্যে তাঁর হাতেখড়ি ইত্যাদি। অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য পত্রযে প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন যে, ঐ সাতখানি উপন্যাস ইতিপূর্বে প্রকাশ হয়েছিল, এবং প্রায় সবগুলির প্র সংস্করণ নিঃশেষিত। এই তথ্যট আমাদের সম্যক জানা না থাকে অজ্ঞানতারশতঃ যে দুটিপূর্ণ দ্রুম মস্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তজ্জন্য আ দর্শিত এবং লজ্জিত।

শ্রেষ্ঠা যুগ

নান্দীকর

আভ্যন্তরীণ কথ্যা

সংগীতভিত্তিকতা ও দর্শক :

একদা কোনো চলচ্চিত্র-পরিচালক গুরুগম্ভীরে কোনো খ্যাতিমান নায়ক অবসর-প্ৰাপ্ত অভিনেত্রীকে একটি বর্ষীয়সী প্রচারিত্রে আত্মপ্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উত্তরে অভিনেত্রীটি পরিচালকের এই অনুরোধ রক্ষায় তার অক্ষমতা জানিয়ে কারণস্বরূপ বলেছিলেন, “বার্ধক্যের আক্রমণে কাবু হয়ে পড়বার আগেই সুনাম থাকতে থাকতেই সাধারণ মণ্ড থেকে অবসর গ্রহণ করেছি। আজ ঐ সুনামের স্মৃতিটুকু অবলম্বন করেই বেঁচে আছি। আপনার হৃদিতে নেমে আমার সেই সুনামটুকু হারাবার সম্ভাবনার সামনে দাঁড়াতে রাজী নই।” পরিচালক যখন উৎসাহভরে বলেছিলেন, “জানেন তো, মেরী ড্রেসলার তুমি রকম বেশী বয়সে ফিল্মে নেমে কি শ্রবণ নাম করেছেন; আপনিও এই ফিল্মের মাধ্যমে এই সুন্দর ভূমিকাটিতে অবতীর্ণ হয়ে নিশ্চয়ই খুব নাম করবেন”, তখনও অভিনেত্রীটি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, “ভূমিকাটি সত্যিই লোভনীয় এবং এর জন্যে যে-পারিশ্রমিক দেবেন বলছেন, সে তো আরও বেশী লোভনীয়। তবুও মেরী ড্রেসলার যা করেছেন, আমিও যে তা পারব, এমন কথা কে বলবে? তা ছাড়া মেরী ড্রেসলারের মণ্ডখ্যাতি ছিল কিনা জানি না; যদি বলেন ছিল, তাহলে বলব, সুনাম হারাবার ঝুঁকি নিয়েই তিনি ফিল্মে গিয়েছেন। মাপ করবেন, আমি ও-রকম কি কিছুতেই নিতে পারব না।” একটু পরে তিনি বললেন, “শুনিয়েছি, আমাদের দেশের বিখ্যাত অভিনেত্রী, সর্বজন-স্নেহজন্য অমূল্য ফিল্ম নায়িকা কামিক পাট করে নাম করেছেন? বন্ধন তো অবস্থা! মণ্ডে উনি কি করতেন, আর ফিল্মে কি করতেন? আমি ত’ এ জিনিস ভাবতেই পারি না।” কাজেই পরিচালককে তার কাছ থেকে বার্ষিকনোরথ হয়েই ত্যাগ হয়েছিল।

ওপরের ঘটনা থেকে যে-জিনিসটা সবচেয়ে বেশী প্রাধান্যযোগ্য, তা হচ্ছে, বার্ধক্যপীড়িত হবার আগেই অভিনেত্রীটির সাধারণ মণ্ড থেকে অবসর গ্রহণ। অমৃতলাল লিখেছেন, “দেহপট সনে নট সর্কাল হারায়।” কিন্তু আমরা দেখেছি, দেহপট হারাবার আগেই বহু নট তাঁদের জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। দেহ

থেকে ঘোবনের দীপ্ত যেমনই চলে যায়, জরা যেমনই ধীরে ধীরে দেহকে আক্রমণ করতে থাকে, অমনি মণ্ডনটের নাট-নৈপুণ্যের জলস ও কমেতে থাকে একটু একটু করে। আমরা দেখেছি, গিরিশপুর, পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) যুবা বয়সে যে অমিতবিক্রমে

নাটকে প্রবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিন ত’ প্রায় উপহাসিত হয়েছিলেন। তৎকালীন সাপ্তাহিক “নাচঘরে”র কার্টুন চিত্রের পরিচয়লাপি “ওগো মোর স্বর্ধবীর প্রবীর, আমি তব কায়িকা নায়িকা” আজও আমাদের স্মরণে আছে। ঠিক সমানভাবেই শিশিরকুমারের নটজীবনে জনপ্রিয়তা হ্রাসের বিষয় উল্লেখ করা যায়। মনোমোহন নাট্যমন্দির বা কণ্ঠ-ওয়ালিস রংগমণ্ডে (বর্তমানে “শ্রী”) ‘সীতা’, ‘আলমগীর’, ‘রঘুবীর’, ‘ঘোড়শী’, ‘শেষরক্ষা’, ‘দীর্ঘজয়ী’, ‘নরনারায়ণ’ প্রভৃতি অভিনয়ে তাঁর নাটনৈপুণ্যে যে



সুশীল মজুমদার পরিচালিত দে প্রোডাকশন্স-এর মৃষ্টি-প্রতীকিত ‘সংগীতগী’ চিত্রে কণিকা মজুমদার

সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশেম, শিবাজী প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করে প্রেক্ষাগৃহকে মাতিয়ে কাঁপিয়ে তুলতেন, বার্ধক্যে আট থিয়েটারে অভিনয় করবার সময় মন্তব্য বা পোষ্যপুত্র নাটকে রমাবল্লভ বা শ্যামাকান্তের ভূমিকায় প্রতিভার দৃষ্টিভর সম্যক পরিচয় দিলেও ঘোবনের সেই উদ্ভাসনা লক্ষিত হয়নি। “জনা”

অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, জীবনের অপরাহ্নবেলায় গ্রীষ্মকালে ‘জীবনরঙ্গ’, ‘মহাপ্রস্থান’, ‘তথ্যে তাউস’ প্রভৃতি নাটকে তাকে কি ধীরে ধীরে নিম্নগামী হতে দেখা যায়নি? যে-শিশিরকুমারের অভিনয় দর্শককে একদিন মৃধাবিশ্ময়ে হতবাক করে রাখত, সেই শিশিরকুমারকেই কি মণ্ড থেকে সমা-



মার্ক রবসনের গান্ধী-চিত্রে ('নাইন আওয়ারস টু রাম') গডসে ও মহাত্মা গান্ধীরূপে (বাম থেকে দক্ষিণে) জার্মান শিল্পী হুস্ট বুলোজ ও জে এস কাশ্যাপ।

লোচক দর্শকের সঙ্গে বাক্যবন্ধে প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়নি? কি অভিনেতা, কি অভিনেত্রী, কুশলী নটনটী খ্যাতির শিখরে ততদিনই সমাসীন থাকেন, যতদিন জরার আক্রমণে তাদের স্বাভাবিক নাটনৈপুণ্য ব্যাহত না হয়। আর মণ্ড থেকে অবসর গ্রহণ করলে ত' কথাই নেই। মানুষের স্মৃতিপটে তাদের ছবি মলিন থেকে মলিনতর হ'তে হ'তে একদিন একেবারেই মুছে যায়। আমরা দেখছি, যে-বিনোদিনী চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করে রামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হয়েছিলেন, সেই বিনোদিনী মণ্ড থেকে অবসর গ্রহণের কয়েক বছর পরে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, কেউ তাঁর দিকে তাকিয়েও দেখছে না। মনোমোহন থিয়েটারের প্রখ্যাত নট হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, আর্ট থিয়েটারের নটকলিশরোমণি তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতি নটকে মণ্ডভাগের পর শহরের গ্রামে বাসে, হাটে বাজারে জনতার মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেছি; কেউ তাঁদের চিনতে পেরে সম্মানের সঙ্গে পথ ছেড়ে

দিয়েছে, এমন ঘটনা নজরে পড়েনি। এবং পরবর্তী জীবনে কর্মহীন ও অর্থহীন হওয়ার দরুণ কোন শক্তিমান নটকে যেমন দেখেছি, সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতে, তেমনই দেখেছি একদা জনপ্রিয় নটীকে উত্তর কলকাতায় গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাটের নিকটে ভিক্ষাবৃত্তি করতে। মনে হয়েছে, মানুষ কি অকৃতজ্ঞ! একদিন যারা তাদের অভিনয়ের দ্বারা হাজার হাজার মানুষকে আনন্দ দিয়েছিল, তাদেরই তারা পরবর্তীকালে এমন অনায়াসে ভুলে যেতে পারল যে, সমাজের আবর্জনা জানে তাদের দূরে ঠেলে দিতেও তাদের বাধলনা? জানি, 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সূদানি চ দুদানি চ', কিন্তু কালের অমোঘ প্রভাবে এমন নিষ্ঠুর পটপরিবর্তন মানুষের সভ্যতাকে উপহাসিতই করে। যখন দোষ, বঙ্গরঙ্গমণ্ডের ইতিহাসের পাতায় যাদের নাম অজস্র প্রশংসাসূচক বিশেষণে বিশেষিত হয়ে গৌরবের আসনলাভ করেছে, তারাই কৃধাঘের জন্যে সভ্য মানুষের দরজায় নতমস্তকে হাত পেতে নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে, তখন আমাদের সভ্যতাভিমানকে শত ধিক্ দিতেই ইচ্ছা করে।

রূপকারের "কালের যাত্রা" :

শরৎচন্দ্রের ৫৭ বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে "কালের যাত্রা" নাটিকাটি তাঁর নামে উৎসর্গ করা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নাটিকাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে এই কয়টি কথা লেখেন, "রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হতাৎ দেখতে পেল, মহাকালের রথ অচল। মানব-সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত,

সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসম্মান হয়ে গেছে তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছে। তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘূচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।" প্রশ্ন জাগে, কার শক্তিতে এই সাংসারিক রথ চলছে, কে চালায় এই রথ? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন রাজশক্তি বা দৈবশক্তি যখন অচল, রথ সচল করতে পারে না, তখন প্রয়োজন শত্রুশক্তি; শত্রুশক্তির দ্বারা ই কলের রথ আবার সচল হয়ে উঠবে।

এই ইঙ্গিতধর্মী রূপক নাটিকাকে অত্যন্ত সার্থকভাবে মণ্ডে উপস্থাপিত করেছেন রূপকার নাট্য-সম্প্রদায়। খালুদ চৌধুরী পরিকল্পিত প্রতীক নির্মাণ এবং অদৃশ্য রথের বৃহদাকার রঞ্জ এই রূপক নাটিকা অভিনয়ের অত্যন্ত সুস্থ আঙ্গিক রূপে মণ্ডে উপস্থাপিত হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সবিতারত দত্তের সুস্থ নির্দেশনা। তিনি রবীন্দ্র-নাট্যের একটি পংক্তিও অদল-বদল না করে মাত্র কিছু সংযোজনের দ্বারা নাটিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। আরম্ভেরও আগে আরম্ভ আছে। তাই দেখে মূল-রচনার কথা আরম্ভের আগে মন্দিরের পুরোহিত আপ্রাণ চেষ্টাতেও অনড় রথ-রঞ্জকে বিন্দুমাত্র সরাতে ব্যর্থ হয়ে এলিয়ে পড়লেন এবং তাঁর এই ব্যর্থতার কাহিনী গোপনে জানা হয়ে রইল এক গ্রামবাসীর। এ-ছাড়া তিনি তাঁর নিজের দ্বারা অভিনীত কবির মুখে কয়েকটি অত্যন্ত সুনির্বাচিত গান যোজনা করেছেন। এর ফলে দর্শক-মন আরও নড়া পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সোজা করে তার মনে এসে পৌঁছেছে। এই অভিনয় এমন একটি সুন্দর বাধা হয়েছে যে, কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে দলচ্যুত করে বিশেষ প্রশংসা করার উপায় নেই। নাগরিক, সৈনিক, ধনপতি মন্ত্রী, পুরোহিত, কবি, সন্ন্যাসী, চর, রথের মেলার মেয়েরা-সকলেই নিজ

দক্ষিণ কলিকাতায় গত ৩ মাস যাবৎ

প্রতি বৃহস্পতি

সন্ধ্যা ৫টায়

সাদা

জাগিয়েছে

থিয়েটার

ইউনিট-এর

কৃষ্ণচূড়া

মহারাজ নিবাস

১৫, হাজারা রোড

সি-৬২

৪৭-৫১১৫

গান্ধী

নব নাট্যমেলার একমাত্র ত্রিমাসিক।
৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।
দাম : ১-২০- গ্রাহকমূল্য ৫-০০
১৮, সুবর্ণ সেন স্ট্রীট, কলকাতা ১২।

নিজ অংশে ছন্দ বজায় রেখে অভিনয় করে একটি সমগ্র রসমূর্তিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। অবশ্য কবিকণ্ঠনিসূত গানগুলি তাদের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় এই রসমূর্তিকে দর্শকপ্রাণে সুপ্রতিষ্ঠিত করায় অত্যন্ত সাহায্য করেছে।

ইণ্ডিগোবর্মী রূপক নাটিকার এমন সার্থক অভিনয় কচিৎ দেখা যায়।

“কালের যাত্রা” বা “রথের রশ্মি”র অভিনয়সূচীসম্বলিত যে নাতিবহু পত্রিকাটি রূপকার গোষ্ঠীর হয়ে দিলীপ চৌধুরী প্রকাশ করেছেন, বিভিন্ন সার্থক রচনা-সমৃদ্ধ হয়ে তা নাট্যরস-পিপাসুর কাছে একটি মূল্যবান সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে।

চিত্র সমালোচনা

সূর্যস্নান : চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার নিবেদন : ১২,৭৫৫ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : অজয়-কুমার; চিত্রগ্রহণ : দেওজীভাই; সংগীত-পরিচালনা : ভি বালসারা; শব্দধারণ : অতুল চট্টোপাধ্যায় ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা : রঘুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশ : কার্তিক বসু; রূপায়ণ : তৃপ্তি মিত্র, লিলি চক্রবর্তী, মিতা চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা, সীতা মুখোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, সবিতারত দত্ত, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, খগেন পাঠক প্রভৃতি।

শ্রীরঞ্জিত পিকচার্সের পরিবেশনায় গেল ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে উত্তরা, পূর্ববী, উজ্জ্বলা ও অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।



‘সূর্য’ চিত্রে অনুভা গুপ্তা, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় ও বিশ্ববিজয়।



অসিত সেন পরিচালিত বাদল পিকচার্সের ‘আগুন’ চিত্রে সন্ধ্যা রায়, অনিল চ্যাটার্জি ও নিমলকুমার।

“সূর্যস্নান” নামটির মধ্যে একটি মহৎ কাহিনীর প্রতিধ্বনি আছে। টলস্টয় লিখিত অবিনশ্বর উপন্যাস “রেজারেক-সান”—এ একটি কালজয়ী শিল্প-সৃষ্টির অমোঘ স্বাক্ষর প্রধানতঃ অনুপ্রাণিত হয়ে যে-আত্মগোপনকারী লেখক চলচ্চিত্রের প্রয়োজন মেটাতে “সূর্যস্নান” গল্পটি লিখেছেন, তিনি মাত্র বার্থতারই স্বাক্ষর রেখেছেন এর পথে পথে। কবি লিখেছেন, “অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে। তব রোষ তারে যেন তুগসম দহে।” কলকাতা হাইকোর্টের সূচ্যাত বিচার-পতির সূযোগ্য ব্যারিস্টার-পুত্র জয়ন্ত সেন তার নিজের জন্যে রাখা ব্যাচিলার্স ফ্লাটে তার বন্ধু প্রকাশের বস্তির গরীব ভাড়াটে হাবুদল সরকারের সং-মেয়ে

বাসন্তীকে নিয়ে এসে ‘এলোমেলো ঝড় আর মূষলধারে বৃষ্টির মধ্যে’ মৃহুতের আবেগে প্রকৃতি-তাড়িত হয়ে যে-অন্যায়টি ঘটিয়ে বসল, সেটি পর দিন সকালে তার একমাত্র বন্ধু প্রকাশের কাছেও প্রকাশ না করার কোন সাধু যুক্তি থাকতে পারে? ধনী কন্যা সুরূপা শকুন্তলাকে যখন সে কোন দিন মৃধ ফুটে ভাল-বাসার কথা বলেনি, তখন তাকে অস্বাভাবিক দলে উপেক্ষা করে বাসন্তীকে বধু-বে বরণ করার পথে বাধা ছিল কোথায়? যদি বলা হয়, বাধা ছিল তার নিজেরই দুর্বল মনে, যে-দুর্বল মন তাকে নারী-দেহ-সম্ভোগের প্রলোভন থেকে দূরে রাখতে পারেনি, যে-দুর্বল মন বাসন্তী থেকে রূপে-ঐশ্বর্যে শকুন্তলা তার কাছে ঢের বেশী কাম্য বলে জানিয়ে দিয়ে-ছিল, তাহ’লে বলব, এমন দুর্বলমন-বিশিষ্ট জয়ন্তকে গল্পের নায়করূপে উপস্থাপিত না করে একটি ভিলেন বা শয়তানরূপে চিত্রিত করলে লেখক অন্ততঃ নিজের প্রতি ঢের বেশী সুবিচার করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত সেনকে বিচারক সাজবার প্রহসন থেকে মুক্তি দিতে পারতেন। গল্পের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে, জয়ন্ত একটি অত্যন্ত দুর্বল চরিত্রের লোক। এবং প্রকাশ যখন তাকে বলে, পরস্পরকে ভালোবাসার জোরে সে আর বাসন্তী বিবাহিত হ’তে চায়, তখন জয়ন্তের স্বস্তির নিশ্বাস-ফেলা ব্যবহার দেখে লোকের সন্দেহ থাকে না যে, জয়ন্ত একটি খাঁটি শয়তান, যাকে ইংরেজীতে বলতে পারা যায়, a smiling damned villain. অন্যায়কারী জয়ন্ত, আর অন্যায় সহ্য-



ইউনিভার্সাল ইন্টারন্যাশনালের 'পার্টীগাস' চিত্রে কার্ক ডগলাস ও লরেন্স অলিভার।

কারিগী বাসন্তী—দু'টি চরিত্রই অত্যন্ত ব্যর্থভাবে চিত্রিত হয়েছে লেখকের দ্বারা।

এর পরেও কথা আছে। “সরকার বনাম বাসন্তী” মামলার বিচার্য বিষয় ছিল, বাসন্তী তার সদ্যোজাত অবৈধ সন্তানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করেছে কিনা? সন্তানটির নিতান্ত আকস্মিকভাবে অপঘাত-মৃত্যু ঘটেছে, এ-সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সে-সব প্রমাণকে আদালতে উপস্থিত করা হয়নি এবং সেই কারণে জুরীদের রায়ে বাসন্তী সন্তান-হত্যার অপরাধে অপরাধী। বিচারকের পদে ইস্তফা দেবার পর বাসন্তীর অবৈধ সন্তানের পিতৃ স্বপক্ষে জয়ন্তের স্বীকারোক্তির স্বেচ্ছা হত্যার প্রশ্নঘটিত মামলার সম্বন্ধ কি? প্রকৃত তথ্য গোপনের অপরাধে জয়ন্তের শাস্তির জন্যে অন্য মামলা হওয়া সম্ভব, কিন্তু হত্যাপরাধ স্থলন হয়ে বাসন্তীর মুক্তি পায় কোন আইন বলে? গল্পের প্রতি স্তরে অসংখ্য দুর্বলতার আরও ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু তা আমাদের আলোচনাকে অনাবশ্যক-ভাবে দীর্ঘায়িত করবে।

ছবিতে কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য লক্ষ্য করা গেছে। চিত্রগ্রহণে আলোছায়ার সূক্ষ্ম সমন্বয়বিধানে চিত্রশিল্পী দেওজীভাই যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সন্তান-হত্যা মামলার রায় মূলভূমী রেখে জয়ন্ত যেখানে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে অকম্পনীয় হয়ে অব্যবস্থিতিচক্রে গাড়ী চালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে বাক্যভাবে রাস্তা-বাড়ীঘরের দৃশ্য জয়ন্তের অস্থিরতাকে প্রকাশ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অবশ্য কলকাতা হাইকোর্টের কোন বিচারপতি নিজেই

মোটর চালান কিনা, তা আমাদের জানা নেই। শব্দধারণের কাজও প্রায় নিখুঁত; যদিও গগ্গাবকে ধনি-প্রতিধনি সৃষ্টির চেষ্টা যেমন অকারণ, তেমনই ব্যর্থ। কাস্টিক বসু, শিল্পনির্দেশের দায়িত্ব পালনে কিছুমাত্র ঘৃণি রাখেননি। গল্পের মেজাজ অনুযায়ী আবহ-সঙ্গীত রচনায় অত্যন্ত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন ভি বালসারা।

অভিনয়ে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বাসন্তীর ভূমিকায় তৃপ্ত মিত্র। ঝড়ের রাতে অপরাধ সংঘটনের পর থেকে তার মানসিক অন্তর্জালকে তিনি বিচিত্রভাবে রূপায়িত করেছেন তার চলনে, বলনে, চাউনিতে, ঠোঁট-মুখের অভিব্যক্তিতে। এত সহজ অভি-

যান্ত্রিক অভিনয় কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এর পরেই নাম করতে হয় প্রকাশের ভূমিকাভিনয়কারী সবিতারত দত্তর। অত্যন্ত আন্তরিকতার স্বেচ্ছা তিনি তার গৃহীত চরিত্রটি রূপদান করেছেন। বাসন্তী ও প্রকাশের মধ্যে প্রেম সজ্জাত হবার তেমন কোন দৃষ্টবা নিদর্শন না দেখিয়েই তার মুখ দিয়ে যে-ভাবে জয়ন্তের কাছে বাসন্তীকে বিবাহের প্রস্তাব করানো হয়েছে, তা অত্যন্ত হাস্যকর। এবং এই হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে সবিতারত কিছুমাত্র দায়ী নন। হোটেলের ফ্লাট-গালের ছোট ভূমিকায় মিতা চট্টো-পাধ্যায়ের রূপসজ্জা ও অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসনীয়। নায়ক জয়ন্তের ব্যর্থ-চরিত্রে শম্ভু মিত্র অত্যন্ত কৃপিম ভঙ্গীতে অভিনয় করে চরিত্রটির ব্যর্থতাকে আরও পরিস্ফুট করে তুলেছেন। পাহাড়ী সান্যালের মিঃ সেন, ডবি বিশ্বাসের জগদীশবাবু, লিলি চক্রবর্তীর শকুন্তলা, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের হাবুল, অপর্ণার হাবুলের স্ত্রী, অমর গাঙ্গুলীর সরকারী কৌসলী—প্রভৃতি ভূমিকা চরিত্রানুগ হয়েছে।

ছবির একটিমাত্র গান, রবীন্দ্রনাথ-রচিত “সব খবরতাকে দহে তব ক্রোধদাহ” এককভাবে গেয়েছেন রিগি চৌধুরী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গ্যে।

বিবিসি সত্বেবাদ

শৌণিক-মিত্র গোল্টার নাট্যানুষ্ঠান :

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা শৌণিক-মিত্র গোল্টা গেল ১৩ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় শিয়ালদহ ক্রেম ব্রাউন ইনস্টিটিউটে দু'টি একাঙ্ককার অভিনয় করেছিলেন—“এক অধ্যায়” এবং “পকেট-মার”। দু'খানি বই-ই অমর গঙ্গো-



‘স্বপ্নান’ চিত্রে শম্ভু মিত্র, আরতি দাস ও লিলি চক্রবর্তী।

পাধ্যায়ের রচনা। প্রথমখানিতে কল্যাণখনির খণ্ডে বিপদের আশংকা জেনেও কয়েকজন কল্যাণ নামের ফলে তাদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে খনির ম্যানেজার প্রাণীরা লোকদের সঙ্গে শ্রমিকদের অবশ্যম্ভাবী বিরোধ দেখানো হয়েছে। এবং দ্বিতীয়খানিতে দেখানো হয়েছে, কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ধর্মচর্চা চলবার সময়ে কয়েকজন শ্রমিকের ক্ষুধার তাড়নায় মালিক পক্ষের কাছ থেকে গোপনে টাকা নিয়ে আন্দোলনকে বামচল করে দেবার চেষ্টা এবং ওরই মধ্যে একজন শ্রমিকের পকেটমার প্রতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও বিপন্ন শ্রমিক-ভাইদের উদ্ধার করার মহৎ প্রচেষ্টা। একাঙ্গিক হিসেবে নিশ্চয়ই 'পকেটমার' 'এক অধ্যায়' থেকে বলিষ্ঠতা ও সম্পূর্ণতা দাবী করে। উভয় নাটকটিতেই গোষ্ঠীর অভিনেতারা অসামান্য নাট্য-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংস্থা :

একদা বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংস্থা (Bengal Film Journalist Association) প্রতি বছর প্রেস্ট চলচ্চিত্রগুলিকে পুরস্কৃত করে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বেশ কিছু দিন যাবৎ এই সংস্থাটি একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি আবার যেন এই সংস্থাটিতে নতুন করে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। অমৃতবাজার পত্রিকার সিটি আপসে গেল ১০ই এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত দু'টি অধিবেশন মারফৎ জানা গেছে যে, এ'রা ১৯৬১ সালে কলকাতায় প্রদর্শিত হিন্দী, বাঙলা ও ইংরেজী চলচ্চিত্রগুলিকে প্রেস্টের বিচারে পুরস্কৃত করবেন। সংখ্যক সাধারণ অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে একটি আড-ডাক কমিটিও গঠিত হয়েছে।

জীবন্ত পুতুলটির :

সম্প্রতি লাইটহাউস মিনিয়চার থিয়েটারে পরীক্ষামূলকভাবে একটি জীবন্ত পুতুলটির প্রদর্শিত হয়েছে। আজ চক্রবর্তী দ্বারা ১৬ মিলিমিটার ক্যামেরায় তোলা এই কুড়িমিনিটস্থায়ী ছবিটির মাধ্যমে মানুষের হাসিকান্না, আনন্দউদ্বেগ পুতুলকে আশ্রয় করে রূপায়িত হয়েছে। ছবিটির নাম— 'নামে মনে সিঁতারে'। প্রচেষ্টা সাধ সফল নেই।

স্টারে নতুন নাটক 'শেষাঙ্গিনী' :

'শ্রেয়সী'র সাফল্যময় প্রদর্শনের পর স্টার থিয়েটারে যে নতুন নাটকটিকে নাট্যরসিক দর্শকদের মনোরঞ্জননের জন্যে মনোস্থ করছেন, তার নামকরণ হয়েছে— 'শেষাঙ্গিনী'। শঙ্কিপদ রাজগুরু রচিত 'শেষাঙ্গিনী' উপন্যাস অবলম্বনে দেব-

নারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাটকটি রচিত হয়েছে। নাটকের কাহিনী প্রধানতঃ বর্তমান যুগকে আশ্রয় করেছে গ'ড়ে উঠেছে। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্টারের খ্যাতিনামা অভিনেতা সংঘের যে-সব নতুন শিল্পী যোগ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে বাসবী নন্দী, আশীষকুমার, বীরেশ্বর সেন ও সাধনা রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

নাটকটি পরিচালনা করবেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত স্বয়ং এবং এর কলা-

কৌশল ও আঙ্গিকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন অনিল বসু। আশা করা যায়, 'শেষাঙ্গিনী' মার্চ মাসের প্রথমেরই মনোস্থ হবে।

উত্তর কলিকাতা সংগীত সম্মেলন

উত্তর কলিকাতা সংগীত সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক সংগীত অধিবেশন ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৩রা মার্চ ১৯৬২ পর্যন্ত মহাজিতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা শিল্পীদ্বন্দ্ব তংশ গ্রহণ করবেন।

শু ত যু ক্তি

শুক্রবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী !

বিদ্যমান দে "এমোজিক্স"

সুশীল মজুমদার
পরিচালিত
দে মোজাকসদের ডিউজি নিবেদন



প্রকারিকা



কি পায়ে
কপিতা-বস্ত্র-বিশেষ
সাহিত্য-মিষ্টি-লভন
হুগো-কি-জিগ-বুধি
অমিষ্টি
ব্যায়াম-গাঙ্গা-গাঙ্গা
কি-লো-লো
মিথাক-ভট্টাচার্য
কালী-কালী
কালী-কালী
কালী-কালী

শ্রী : প্রাচী : ইন্দিরা

ও অন্যান্য চিত্রগৃহ

খেলাধুলা

দশক

॥ জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

জুবলপুরে বিংশতম জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল অধিক সংখ্যক অনুষ্ঠানে জয়লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। সার্ভিসেস দল গত দশ বছর ধরে তাদের অটুট প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

আলোচ্য বছরে সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগের এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় মোট ২৩টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ১৬টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে ১৬টি স্বর্ণপদক পেয়েছে। রৌপ্য-পদক পেয়েছে ১৩টি এবং ব্রোঞ্জ ৮টি। যোগদানকারী কোন দল এত অধিক সংখ্যক স্বর্ণ, রৌপ্য বা ব্রোঞ্জ পদক লাভ করতে সক্ষম হয়নি। ২য় স্থান অধিকারী মহারাষ্ট্রের পদক সংখ্যা মোট ৯ (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ২)।

বালক বিভাগেও সার্ভিসেস দল প্রথম স্থান লাভ করেছে মোট ১১টা পদক পেয়ে (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৫)। তবে স্বিতীয় স্থান অধিকারী বাংলা থেকে ঋব উচুতে উঠতে পারেনি। বাংলার মোট পদক সংখ্যা ১০ (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ৫ এবং ব্রোঞ্জ ৩)। মহীশূর ৩টে স্বর্ণপদক পেয়েছে, অন্য কোন পদক পায়নি।

মহিলা এবং বালিকা বিভাগের পদক প্রাপ্তির তালিকায় সর্বাধিক স্বর্ণপদক লাভ করেছে মহারাষ্ট্র-মহিলা বিভাগে ৪টি এবং বালিকা বিভাগে ৬টি। মহিলা বিভাগে সর্বাধিক পদক লাভ করেছে বাংলা ৭টি (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ৩) এবং মহীশূর ৭টি (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৪)। মহারাষ্ট্রের মোট পদক ৬ (স্বর্ণ ৪ ও ব্রোঞ্জ ২)।

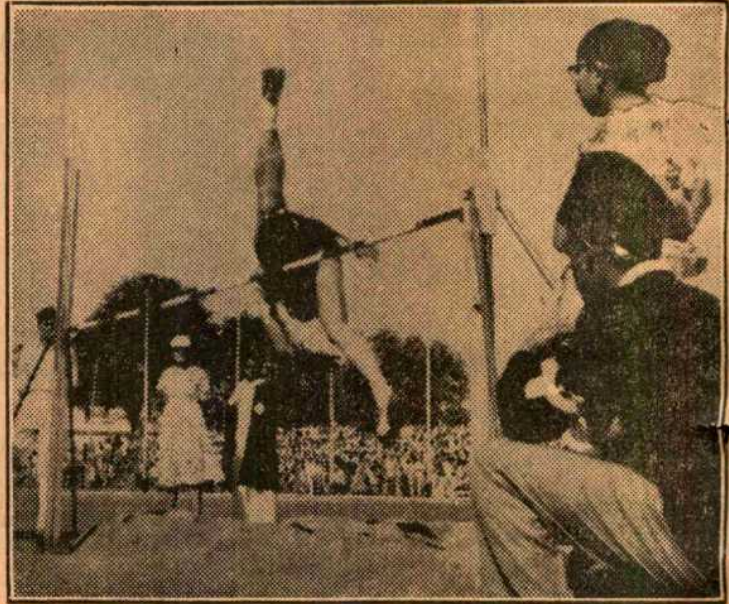
বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্র মোট পদক পেয়েছে ৯ (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ১)। বালিকা বিভাগের মোট ১০টি স্বর্ণপদক পেয়েছে-মহারাষ্ট্র ৬ এবং মহীশূর ৪।

পুরুষ বিভাগে পদ্মশ্রী মিলখা সিং এবার পাঞ্জাব দলের পক্ষ থেকে ৪০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন; কিন্তু পায়ের মাংসপেশীর টান ধরায় তিনি প্রতিযোগিতা থেকে শেষ পর্যন্ত অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ন।

এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্রের ক্রিস্টিন ফোরেজ এবং বালক বিভাগে মহীশূরের কৃষ্ণপ্রতাপ সিং লাম্বা।

ক্রিস্টিন ফোরেজ বালিকা বিভাগের ১০টি অনুষ্ঠানেই যোগদান করে ৫টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান, ২টি অনুষ্ঠানে স্বিতীয় স্থান এবং ১টি অনুষ্ঠানে তৃতীয় স্থান লাভ করে। ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে তার সহযোগিতায় মহারাষ্ট্র প্রথম স্থান পায়। তাছাড়া ফোরেজ সটপুটে নতুন জাতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছে।

বালক বিভাগে কৃষ্ণপ্রতাপ সিং লাম্বা তিনটি অনুষ্ঠানে-হাইজাম্প, লং জাম্প এবং হপ-স্টেপ-জাম্প প্রথম স্থান লাভ করে প্রতিটি অনুষ্ঠানে নতুন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করে।



বালিকাদের হাইজাম্প ফাইনালে ক্রিস্টিন ফোরেজ (মহারাষ্ট্র) : ক্রিস্টিন প্রথম স্থান লাভ করেন।

বালিকা বিভাগে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয় দু'জন-মহারাষ্ট্রের ক্রিস্টিন ফোরেজ এবং মহীশূরের শীলা পল। মোট ১০টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ফোরেজ ৬ এবং শীলা পল ৪টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে। ফোরেজ ৯টি অনুষ্ঠানে যোগদান করে এই ৫টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে-৮০ মিটার হাডলস, হাইজাম্প, সটপুট, ডিসকাস এবং জ্যাভেলিন থ্রো বিভাগে। তাছাড়া স্বিতীয় স্থান পায় ৫০ মিটার দৌড়ে এবং লংজাম্পে এবং তৃতীয় স্থান ১০০ মিটার দৌড়ে।

মহীশূরের শীলা পল প্রথম স্থান লাভ করে এই ৪টি অনুষ্ঠানে-

৫০ মিটার, ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে এবং লংজাম্পে। ৮০ মিটার হাডলসে স্বিতীয় স্থান পায়। প্রধানত এই দু'জনের সাফল্যের দরুনই বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্র প্রথম এবং মহীশূর স্বিতীয় স্থান লাভ করে।

এ্যাথলেটিকসে বাংলা দেশ পুর বিভাগে কোন পদকই অর্জন করতে পারেনি। মহিলা বিভাগে বাংলা স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য এবং ৩টি ব্রোঞ্জ পদক; বালক বিভাগে ২টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য এবং ৩টি ব্রোঞ্জ পদক এবং বালিকা বিভাগে ১টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

মহিলা বিভাগে বাংলার মৌরিন হকিন্স ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় স্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এ্যান রিচসন সটপুটে ২য় এবং জ্যাভেলিন থ্রোতে ৩য় স্থান পান।

হাইজাম্পে গিলিনায় ব্রাউটন প্রথম স্থান লাভ করেন। বাঙ্গালী মহিলা কৃষ্ণি মুনাজি ৮০০ মিটার দৌড়ে ৩য় স্থান পান।

বালক বিভাগের ১০০ মিটার দৌড়ে বি ফোর্ড এবং ২০০ মিটার দৌড়ে সমীর চ্যাটার্জি প্রথম স্থান লাভ করে। বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে পোলভাস্ট আর বসু স্বিতীয় স্থান, ১০০ মিটার দৌড়ে এস সরকার তৃতীয় স্থান, ১১০ মিটার হাডলসে এস দাসিত্য স্বিতীয় স্থান, লংজাম্পে এস ধর স্বিতীয় এবং হপ-স্টেপ জাম্পে তপন ঘোষ ৩য় স্থান পায়। বালিকা বিভাগে বাংলার একমাত্র সাফল্য

৮০ মিটার হাউলসে জয়া ভাটচায়ে'র
৩য় স্থান লাভ।

॥ ভারতবর্ষ বনাম ট্রিনিদাদ ॥

ভারতবর্ষ : ৩৬৬ রান (মঞ্জরেকার ৬৬, উমরীগড় ৬৪, কণ্ট্রাস্টর ৬২, সরদেশাই ৫০ এবং দুরানী ৪৬। রডারিগস ৬৭ রানে ৪, সি সিং ৭৫ রানে ৩ এবং রবার্টসন ৭৮ রানে ২ উইকেট) ও ১৬৩ রান (৫ উইকেটে ডিক্রেয়াড)। সরদেশাই ৭৩ নট-আউট)

ট্রিনিদাদ : ২৪৬ রান (রডারিগস ৭৭, ডেভিস ৫৭ এবং ফোরলোজ ৫৫ রান। বোরদে ৮৩ রানে ৪, উমরীগড় ৩৫ রানে ৩ উইকেট) ও ১৪৭ রান (৪ উইকেটে। রবিনসন ৮০। দুরানী ৫৩ রানে ৪ উইকেট)

ট্রিনিদাদ স্পীপের রাজধানী পোর্ট-অব-স্পেন শহরের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ট্রিনিদাদ দলের চারদিনের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

প্রথম দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি। ব্যাটের জলে ৫২ মিনিট সময় ধুয়ে যায়। ৪ ঘণ্টা ৮ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষ ৪ উইকেট খুইয়ে ২০৪ রান করে।

ভারতবর্ষ টেসে জয়লাভ করে কিন্তু খেলার সূচনা শুভ হয়নি। কোন রান হওয়ার আগেই জয়সীমা আউট হ'ন। লাগের সময় স্কার দাঁড়ায় ৫০ (১ উইকেটে)। কণ্ট্রাস্টর ২৭ এবং মঞ্জরেকার ২২ রান করে নট-আউট থাকেন। দলের ১০৭ রানের মাথায় অধিনায়ক কণ্ট্রাস্টর নিজস্ব ৬২ রান করে রান-আউট হ'ন। তিনি প্রায় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্কুল-ছাত্র চার্লি ডেভিসের হাডের টিপে তার উইকেট ভেঙে যায়। কণ্ট্রাস্টর তার ৬২ রানে ৮টা বাউন্ডারী করেন। কণ্ট্রাস্টর এবং মঞ্জরেকারের ২য় উইকেটের জুটিতে দলের ১০৭ রান ওঠে। দলের ১৪৬ রানের মাথায় মঞ্জরেকার এবং ১৪৯ রানের মাথায় পর্তোদির নবাব আউট হ'ন। মঞ্জরেকার তিন ঘণ্টা খেলে ৬৬ রান করেন, বাউন্ডারী করেন ৫টা।

খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে রান দাঁড়ায় ২০৪, ৪টে উইকেট পড়ে। বোরদে ৩৪ এবং উমরীগড় ২২ রান করে নট-আউট থাকেন। এই দিন ৫ম উইকেটের জুটিতে বোরদে এবং উমরীগড় ৫৯ মিনিটের খেলায় ৫৫ রান করেন।

দ্বিতীয় দিনেও খেলা আরম্ভের সময় আকাশ মেঘে আবুল করে ছিল। আগের দিন রাতে এক পশলা বৃষ্টি পড়ায় মাঠ বেশ ভিজে ছিল। দলের ২০৬ রানে বোরদে আউট হ'ন। লাগের সময় রান

দাঁড়ায় ২৮৭ (৫ উইকেটে)। উইকেটে ছিলেন উমরীগড় (৬২ রান) এবং সরদেশাই (৪৩ রান)। লাগের পর দলের ভাঙ্গান সূর্য হয়। সরদেশাই ৮৭ মিনিট খেলে আউট হ'ন নিজস্ব ৫০ রানে, বাউন্ডারী ৭টা। উমরীগড় ৬৬ রান করে আউট হ'ন ১৭০ মিনিট খেলে। ৮টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউন্ডারী করেন। উমরীগড় এবং সরদেশাইয়ের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৮৯ রান ওঠে। দুরানী অসুস্থ অবস্থায় ৪৬ রান করেন। ৮ম উইকেটের জুটিতে দুরানী এবং নাদকানী ৫০ মিনিটের খেলায় ৬৫ রান তুলে দেন। লাগের পর রডারিগস ২টা এবং চরণ সিং দলের শেষ তিনজন খেলোয়াড়—দুরানী, নাদকানী এবং রজনেকে আউট করেন ২৩ ওভার বল করে মাত্র ৩ রান দিয়ে।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৬৪ মিনিট স্থায়ী ছিল। এই সময়ে পূর্ব দিনের ২০৪ রানের সঙ্গে (৪ উইকেটে) ১৬২ রান যোগ হয়, ৬টা উইকেটের বিনিময়ে। ৩৬৬ রানে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। এই দিন ট্রিনিদাদ ২টা উইকেট খুইয়ে ৬৬ রান করে। মাত্র ৩ রানের মধ্যে ২টা উইকেট পড়ে যায়।

তৃতীয় দিনে লাগের সময় ট্রিনিদাদ দলের রান দাঁড়ায় ১২২ (৩ উইকেটে)। চা-পানের পর তারা ৫২ মিনিট খেলে; প্রথম ইনিংস ২৪৬ রানে শেষ হয়। তরুণ খেলোয়াড় ডেভিস এবং কারু দলের ৩ রানের মধ্যে ২টা উইকেট পড়া সত্ত্বেও দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেন; তৃতীয় উইকেটের জুটিতে তারা দলের ১০৭ রান তুলে দেন। ভারতবর্ষের ফিল্ডিং খুব উন্নত পর্যায়েন্ন হয়নি।

ভারতবর্ষ ১২০ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং এই দিনের খেলায় ১ উইকেট খুইয়ে ২৮ রান করে।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষ ১৬৩ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় সমাপ্ত ঘোষণা করে। ভারতবর্ষ লাগের পরও ৪০ মিনিট খেলেছিল। দলের সর্বোচ্চ ৭৩ রান করেন সারদেশাই। তাড়াহাড়ি রান তুলতে গিয়ে দুরানী (৩), উমরীগড় (৪) এবং বোরদে (৪) অল্প রানের মধ্যে আউট হয়ে যান। সরদেশাই ৭৩ এবং মঞ্জরেকার ২৭ রান করে নট আউট থাকেন।

ট্রিনিদাদ দল ১৫৮ মিনিট খেলার সময় হাতে নিয়ে এবং ভারতবর্ষের থেকে ২৮৩ রান পিছনে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এই সময়ের মধ্যে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৮৪ রান করা একেবারে অসম্ভব ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রিনিদাদ দলের ৪

উইকেট পড়ে ১৪৭ রান ওঠে। দলের সর্বোচ্চ ৮০ রান করেন রবিনসন—তার এই ৮০ রানই দুই দলের সর্বোচ্চ রান। ট্রিনিদাদ দলের প্রথম উইকেটের জুটি রবিনসন এবং ডেভিস ১০০ মিনিটের খেলায় ১২০ রান করেন।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম টেস্ট

ভারতবর্ষ : ২০৩ রান (রুসী স্মিথ ৫৭, সেলিম দুরানী ৫৬। সোবার্স ২৮ রানে ৩, স্টেয়ার্স ৬৫ রানে ৩, হল ৩৮ রানে ২ এবং ওয়াটসন ২০ রানে ১ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ১৪৮ (৬ উইকেটে)। হাট ৫৮ এবং সোবার্স ৪০। দুরানী ৩৪ রানে ৩, উমরীগড় ৩৫ রানে ১, দেশাই ৩০ রানে ১, বোরদে ৪৩ রানে ১)।

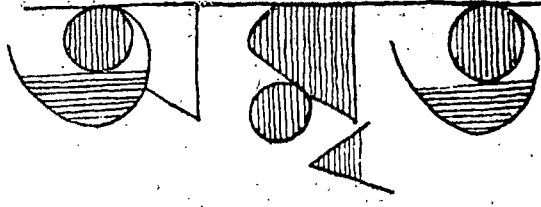
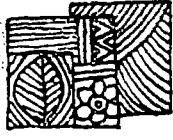
১ম দিন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস—১১৩ (৬ উইকেটে)। সেলিম দুরানী ২২ এবং রুসী স্মিথ ১০ রান করে নট আউট থাকেন।

২য় দিন (১৭ই ফেব্রুয়ারী) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২০৩ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস—১৪৮ রান (৬ উইকেটে)। সেলোমন ৪ রান করে নট আউট আছেন।

ট্রিনিদাদ স্পীপের রাজধানী পোর্ট অব স্পেন শহরের বিখ্যাত কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলা গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে সূর্য হয়েছে। খেলা আরম্ভের আগের দু' দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। খেলার আগের দিন রাতে কয়েক পশলা বৃষ্টিও পড়ে। এমন কি খেলার দিন খেলা আরম্ভের নির্দিষ্ট সময় থেকে ৪৫ মিনিট আগেও এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যায়। ব্যাটের দরুণ সকালের খেলার ২৫ মিনিট সময় নষ্ট হয়।

টস করার সময় মাঠে ৭০০০ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাস্টর ভাগ্যবান পুরুষ—টসে জয়লাভ করলেন। উপর্যুপরি পাঁচটি টেস্ট খেলায় তিনি টসে জয়লাভ করলেন। এর মধ্যে ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে উপর্যুপরি চারটি টেস্টের খেলায় আহত থাকায় জয়সীমা এবং পর্তোদির নবাব দলভুক্ত হননি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দল গঠন করতে কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। শেষ পর্যন্ত গারাকিন্ড সোবার্স ও দলভুক্ত হয়েছেন। তার সম্বন্ধে দলের যথেষ্ট



২ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৩শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 2nd March, 1962.
40 Naya Paise.

বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো পাহাড়ী ধ্বংস নামেনি। কিংবা, যারা “উঠুক তুফান ছুটুক বাতাস” বলে চিৎকার তুলেছিলেন, তারা হতাশ হয়েছেন যে, ব্যালটের বাস্তব থেকে চৈতন্য ঘূর্ণি হাওয়া বেরোয়নি। এই মুহূর্তে অমৃতের সম্পাদকীয় ছাপতে দেওয়ার সময় পর্যন্ত ঘোষিত ১০৭টি আসনে কংগ্রেস ৬৫টি লাভ করেছেন এবং সমর্থিত স্বতন্ত্রসহ সংযুক্ত বামপন্থীরা ৩০টি। অর্থাৎ বিধানসভার মোট আসনের এই আড়াই ভাগ ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৭ সালের আনুপাতিক হারের একটুও পরিবর্তন ঘটেনি।

কিন্তু ফলাফলের চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ, রাজনীতির কতকগুলি লক্ষণ ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে। কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন এবং একটি সুসংবদ্ধ সর্বভারতীয় দলের শৃঙ্খলাপরায়ণ শাসন থেকে পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত হবে না, এগুলি যেমন প্রভূত আশার লক্ষণ, তেমনি অন্যদিকে এই নির্বাচনের ফলাফল থেকেই কংগ্রেসের সম্মুখে চিন্তনীয় সমস্যাও উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই সমস্যাগুলি বিজয়ের আনন্দে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

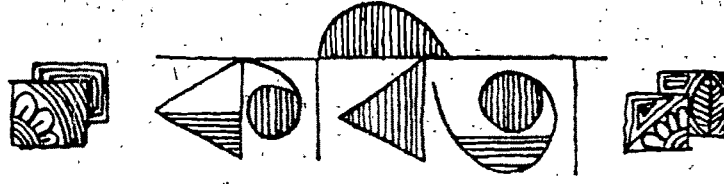
প্রথমত লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কংগ্রেসের নিজস্ব আসন বহু ক্ষেত্রে হস্তচ্যুত হয়েছে, এখন পর্যন্ত সেরূপ আসনের সংখ্যা ১৬টি। অন্যদিকে ভোটের গতি বা প্রবাহ কংগ্রেসের অনুকূলে সর্বোচ্চ কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ সাধারণভাবে জনমত কংগ্রেসের অনুকূলে হওয়া সত্ত্বেও ১৬টি আসন তারা হারিয়েছেন। এই পরাজয়ের কারণ কোথায়? পরাজিত কংগ্রেসপ্রার্থীরা নিজেদের এলাকার প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেননি, অথবা বিগত ৫ বৎসরে তারা স্বীয় আচরণের দ্বারা জনসাধারণকে সন্দ্বিষ্ট বা বিস্বস্ত করেছেন যার ফলে কংগ্রেসী আসন বিরুদ্ধদলের হাতে গেছে। অথবা আরও একটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যায়—কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জন্য নিজেদের ঘাঁটি পরহস্তগত হয়েছে। পৃথক পৃথক ভাবে এই দুইটি উপসর্গের যে কোনো একটি, অথবা দুইটি উপসর্গই একত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে কংগ্রেসের হস্তচ্যুত এলাকাগুলিতে—নদীয়ায়, মুর্শিদাবাদে, উত্তরবঙ্গে এবং বাঁকুড়ায়। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই এলাকাগুলিই ১৯৫৭ সালে কংগ্রেসের সবচেয়ে নিরাপদ ঘাঁটি ছিল। এই সব এলাকায় আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে

জিলা-কংগ্রেসের সভাপতিরা পরাজিত হয়েছেন—বীরভূমে, মুর্শিদাবাদে এবং ২৪-পরগণায়। অথচ পরাজিত জিলা-সভাপতিরা প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতির একান্ত অনুগ্রহ ও প্রীতিভাজন।

সুতরাং কংগ্রেসকে যেমন প্রত্যেকটি হস্তচ্যুত আসনের প্রার্থী এবং তাঁর নির্বাচন সম্বন্ধে নির্বাচনোত্তর সমীক্ষা বা তদন্ত করে দেখতে হবে যে, পরাজয়ের আসল কারণ কোথায়, তেমনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে অতঃপর সতর্ক হতে হবে তাঁর সেনাপতি নির্বাচনে। কংগ্রেসের জিলা স্তরে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বা বিরোধিতার একমাত্র কারণ মনোনয়নপত্রলাভের লোভ এবং না পাওয়ার ক্ষোভ, এই সহজ সালস্বনা যেন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ লাভ না করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসন্তোষের কারণ আরও গভীর এবং সেই কারণগুলির মূলোচ্ছেদ শক্ত হাতে করা দরকার। কারণ কংগ্রেস দলের পক্ষে একথা গভীর পরিতাপের যে, সামগ্রিকভাবে নির্বাচনী হাওয়া কংগ্রেস গভর্নমেন্টের অনুকূলে হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এর ষোল আনা ফসল ঘরে তুলতে পারেননি।

একথাও যে কোনো চিন্তাশীল পর্যবেক্ষকের চোখে পড়তে বাধ্য যে, গভর্নমেন্ট হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নিজেকে যতটা জনপ্রিয় বলে প্রমাণ করতে পেরেছেন, ততটা হিসাবে প্রদেশ কংগ্রেস ততটা জনপ্রিয় প্রমাণিত হননি। প্রেসিটজ ফাইট বা মর্ষাদার যুদ্ধে মন্ত্রীরা নিরাপদে জয়ী হয়েছেন, কিন্তু জিলা-কংগ্রেসের সভাপতিরা অনেকেই ধরাশায়ী, অন্যেরা কায়ক্লেশে উত্তীর্ণ।

কিন্তু একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৯৫৭-৬২ সালের মধ্যে কংগ্রেস-অনুসৃত নীতি জনসাধারণ সমর্থন করেছে। শত্রু নিষ্পৃহ সমর্থন নয়, বিকল্প সরকারের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার জন্য বিপুলতর সংখ্যায় এসে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। অন্যদিকে, প্রশাসনিক ঘৃণা-বিচ্ছাদিত, বুদ্ধিজীবীদের স্বাভাবিক অসন্তোষ ও বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট স্বীয় অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেননি, তার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি জনসাধারণের সংশয়গ্রস্ততা, যা গত ৫ বৎসরে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখা যাচ্ছে, কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই সুযোগ নিয়েছেন, নিজেদের জনপ্রিয়তা বা শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি।



অনেক পায়ের দাগ

মনীশ ঘটক

মনের মধ্যে গড়েছি দেউল গভীর সঙ্গোপনে
শুঁচি স্নান করে পবিত্র হয়ে সদৃশ সযতনে।
ধ্যানের নেত্রে পরমায়াণে কল্পনা বেদী পুরে
বসিয়েছি পূজা হোমোয়গ্নি জেরলে অটুট নিষ্ঠাভরে।
দেবতার কারাগারের দরবারে অদৃশ্য মসীলেখে
‘প্রবেশ নিষেধ অনধিকারীর’ দর্পে দিয়েছি একে।

সচকিতচিত সদাশিক্ষিত কলুষপরশ ভীত,
কোন ফাঁকে হয় প্রমত্ত বায় পশেছে অতর্কিত।
ভেঙেছে দেয়াল করিনি খেয়াল—বিশ্বের ধূলারাশি
সেবা নির্মল মর্মরতল দেখি যে ফেলেছে গ্রাসি।
উদ্বেগভীর বুক দরু দরু অশুচি স্পর্শ ঘাসে,
রুদ্ধনয়নে স্বস্তিবচন উচ্চারি দ্রাণ আশে।
দেবতা আমার নহেন একাকী কে জানিত তাহা আগে
ধূলাময় বেদী ভরে গেছে দেখি অনেক পায়ের দাগে॥



বেলা প’ড়ে এলো

সিন্ধেশ্বর সেন

চারদিক থেকে কারা হিমকুয়াশার স্বর
গলায় জড়িয়ে নিয়ে আসে
কম্বাটার ও স্কার্ফের ভেতরের গলনালী বেয়ে
অবিশ্বাস্য কাশে

নগরীর দেওয়ালে লাগে ছিটে, নগরীর
দেওয়াল নোংরা, ছিটে

বিপন্ন স্মৃতির কুশ কার্তিকের শিশিরের ঘাস—
ট্রামের লাইনের রিপটে

চারদিকে কারা চাপা হিমকুয়াশার স্বর
অবদমনের ঝোঁকে, হাসে

ওদের মাথার মধ্যে বাঁচবার ভয়ানক পোকা

একটা ফুস্‌ফুস, জল ভাসে

কেউ টাইপিস্ট বা কে মনোনীতা করণিক সেজে, ভাবে, বাঁচা
ক্যান্সার হাসপাতালের আশপাশে

জীবনের মানে তারা নক্ষত্র উঠলে, অন্ধকারে

বুকে ফেলে ভীষণ একলা

এক নির্বীচিত নয়, পালা বদলিয়ে তারা বাঁচবার কীট
হ’য়ে বাঁচে, হারিশ—

পাকের দুইবেলা॥

শৈশবযাত্রা

পবিত্র মৃত্যুপাধ্যায়

অবিরত তোকে স্মরি যাত্রা মোর প্রতিকূল দ্রোতে

শৈশব দূরের স্বপ্ন! বহু পথ হয়ে যাই পার—

সুন্দর তরণী ভাসে, মাস্তুলের ভিড় জমে পোতে

রাত্রির উন্মাদ টানে মনে হয়, আমার উদ্ধার

অনায়াস লভ্য বৃষ্টি। পণ্যা নারী, মাতাল, লম্পট

স্বর্ণীয় আঁধারে জ্বলে, শ্বেতরম্য প্রাসাদের সারি

জলে প্রতিকৃতি দেখে, কারা যেন-মৃত্যুর শকট

বাহিয়া উদ্ভিষ্ট লক্ষ্যে ক্রমাগত.....প্রচ্ছায়া আমারই!

অবিরত জলরাশি ধেয়ে আসে, কাঁপায় তরণী.....

মুহূর্তের আলিঙ্গনে আত্ননাদ জানায় সহস্রাংগে :

কোথায় স্বপ্ন স্বপ্ন? অপেক্ষিত শব্দপ্রাবরণী

মুহূর্ত বিলম্ব হলে ছিঁড়ে যাবে সমুদ্র-বাতাসে

সময়ে খাটানো পাল। আবর্তের অসহ দুর্বার

আক্রমণে পণ্ড হবে আয়োজন শৈশবযাত্রার।

দূরদৃষ্টি

উদ্দেশ্য

‘আপ উঠিয়ে’, ‘আপ উঠিয়ে’ ব্যাপারটা যতো কৌতুকজনকই হোক, ভদ্রতা জিনিসটা যে একেবারেই উপহাসের বিষয় নয়, আমাদের আচার-আচরণ দেখলে তা বিশ্বাস হয় না। আতিশয্য সমস্ত ব্যাপারেই বজ্রনীর। কিন্তু তা করতে গিয়ে আমরা যদি বেগীর সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিও কেটে দিতে চাই তবে সেটা একটু বেশী দেওয়া হবে না কি? অন্তত, ভদ্রতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বাদ দিতে গিয়ে আমাদের বোঁকটা যে পড়ে সেইদিকেই তাতে আর স্বমতের অবকাশ নেই।

আমি জানি, বর্তমান নাগরিক জীবন আমাদের সর্বব্যাপারে এমন তটস্থ করে রেখেছে যে, আমরা সকলেই এক-একটি স্নায়ু-ষিকারের রোগী হ’য়ে উঠেছি। তবে, ‘স্নায়ু’ জিনিসটার স্বভাবই এই যে, যতো রাশ আলগা করা যায়, ততোই যায় বেড়ে। ‘নিউরসিস’কে কাটিয়ে ওঠার একটা প্রধান উপায় হল, সে বিষয়ে সচেতন হ’য়ে ওঠা।

সচেতন প্রয়াসে আমরা অনেক সময়েই ছোটোখাটো ‘নিউরসিস’কে কাটিয়ে উঠতে পারি। এ প্রায় পরীক্ষিত সত্য। বাস্-এ বা ট্রামে আমরা কতো সহজে মেজাজ খারাপ করে বাসি তা ভাবলে অবাক হ’তে হয়। কন্ডাকটর ভাড়া চাইল। আপনি একটি সিকি এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ডালহোসী’। বাস তখন চৌরঙ্গী দিয়ে ছুটেছে। কন্ডাকটর আবার জিজ্ঞাসা করল, ‘কোথা থেকে উঠেছেন?’ বাস, আপনার মেজাজ খারাপ হ’য়ে গেল, তখিক দৃষ্টিতে চেয়ে আপনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, ‘আপনার সামনেই তো উঠলাম, দেখতে পান নি?’ সেও পিছ-পা হবে কেন? তৈরী জবাব দিল, ‘কি জানি, কতো লোক উঠছে, মনে থাকে না!’ ইতিমধ্যে দু’চারজন যাত্রী এদিকে কৌতুহলী হ’য়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে শুরু করেছেন। হয়তো তার মধ্যে একজন মহিলাও আছেন। কাজেই আপনি কন্ডাকটরের বাক-বৈভবে ঈষৎ কোণঠাসা এবং অপমানিত বোধ করলেন, চাপা গর্জনে তরপে উঠলেন, ‘তা মনে থাকবে কেন? ঈডিয়ট কোথাকার!’ ছিটকে তার প্রত্যুত্তর এল, ‘মুখ সামলে কথা বলবেন!’ বাস্-এর সবগুলি মুখ এদিকে ঘুরে পেল। নাটকের ক্লাইমাক্স, এবং সামনে আয়না থাকলে সকলে দেখতে পেতেন আপনার মুখখানি ভিলেনের মতো বাঁধুংস!

এমান প্রায় সর্বত্র। অথচ এর কোনো মানে হয় না। সামান্য একটু ভদ্রতাবোধ

থাকলে এর প্রায় শতকরা নিরানব্বই ভাগই এড়ানো যায় অতি সহজে।

আসল কথা তাহলে ঐ ভদ্রতাবোধ। ‘স্নায়ু’র ব্যাপার ছেড়ে দিলেও, কিংবা ‘স্নায়ু’র ব্যাপারটা বাদ না দিয়েও বলা যায়, সৌজন্য যাঁর চরিত্রগত স্বভাব তাঁর পক্ষে চটপট মেজাজ খারাপ করা তো বটেই, অন্য মানুষের মনে কোনোরকম কারণেই আঘাত দেওয়া প্রায় অসম্ভব

হ’য়ে ওঠে। কারণ সৌজন্যের মূলকথা হল, আত্মসম্মানবোধ। নিজের সম্মানের বিষয়ে যিনি সচেতন, অন্যের আত্মসম্মানেও তিনি সহসা হস্তক্ষেপ করেন না। এবং আমরা যারা অতি সহজেই অন্যের প্রতি অসৌজন্য দেখাই, বৃদ্ধিতে হবে তাদের নিজেরও কোনো আত্মসম্মান-বোধ নেই।

এই আত্মসম্মান-বোধের অভাবে

বাক্-সাহিত্যের বই
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

নিশিপদ্ম

কাণ্ডন কীর্তনওয়ালীর মেয়ে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মুন্সি দাস, সংগীতেও যার সুখ্যাতি সর্বত্র। বাপের ‘বাস’ উপাধি ত্যাগ করে, আত্মপরিচয়ের প্লানিময় উৎসকে মুছে ফেলে সে বিমুক্ত হতে চেয়েছে নিজের জীবনে। জন্মের জন্য কোন দোষ, কোন অপরাধ নেই তার, তবে সমাজ ও প্রার্থিত পুরুষ তার ব্যস্তিতার মর্যাদা দিতে নারাজ কেন—এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন উপন্যাসিকশ্রেষ্ঠ তারাশঙ্কর তাঁর গভীর মানবিক আবেদনসম্পন্ন ও শিল্প-রস-সমৃদ্ধ উপন্যাস ‘নিশিপদ্ম’র নতুন কাহিনীতে।

দাম—৪.০০

আশ্রয় ॥

জরাসন্ধ

৩.৫০

জরাসন্ধের সার্থক লেখনী থেকে সার্থকতম নতুন উপন্যাস। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়।

শ্রেষ্ঠ গম্প ॥

সৈয়দ মুজতবা আলী

৪.০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর বিভিন্ন বই থেকে নির্বাচিত বিচিত্র মেজাজের বিশিষ্ট গম্পগুলি এই সংকলনগ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

চিত্তচকোর ॥

সুবোধ ঘোষ

৩.০০

স্বনামধন্য লেখকের সাম্প্রতিক গম্পসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন। দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হ’ল।

স্ত্রী ॥

বিমল মিত্র

৪.০০

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিকের উপন্যাসোপম তিনটি অনবদ্য বড় গম্পের সুশোভন সংকলন। দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হ’ল।

অগ্নিমিতা ॥

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫.০০

হৃদয়-রাগের রস-বিধুর কাহিনী। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অভিনন্দন-যোগ্য গ্রন্থ।

আরও আলো ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

৫.০০

শৈল-নগরী সিমলার মোহময় পটভূমিতে অতি আধুনিক প্রণয়রংগের অতিবাস্তব কাহিনী। বিশিষ্ট লেখকের বলিষ্ঠ উপন্যাস।

জরাসন্ধের বিখ্যাত উপন্যাস

শংকরের অনন্যসাধারণ বই

পাড়ি (৫ম মুদ্রণ)

৩.০০

এক দুই তিন (৪র্থ মুদ্রণ)

নীলকণ্ঠের নতুন বই

প্রাগতোষ ঘটকের উপন্যাস

ক্যাপা খুঁজে ফেরে

৩.০০

রোজলিভের প্রেম

৩.০০

বাক্-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মানুষকে কি রকম স্বার্থপর করে তোলে তার নমুনা পথে-ঘাটে ছড়ানো দেখতে পাবেন। একটু আগে বাস-এর কথা হচ্ছিল। সেই প্রসঙ্গে আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। তখন আপিসের সময় নয়, কিন্তু বাস-এ ভিড় ছিল। লেডীজ সীট সবগুণিই ভর্তি। দুজন তরুণীর সঙ্গে তিন-চারজন যুবক উঠল। তাদের বয়স সকলেরই কলেজে পড়ার মতো, অন্তত উচ্চল হাসি ও উচ্চকিত বাক্য-বিনিময়ে মনে হ'ল সহ-পাঠী-পাঠিনী হওয়া বিচিত্র নয়। তরুণীস্বরকে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমার পাশে-বসা উদ্ভলোক্তিটির নামবার জায়গা এসে গিয়েছিল, তিনি নেমে গেলেন। ঠেলাঠেলি করে মেয়ে দুটির কাছে এগিয়ে এসে যুবকেরা গম্প-গম্প করে দিল। বাস চলতে আরম্ভ করল। কয়েক স্টপ পরে মেয়ে দুটি নামবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই সংগী ছেলেদের মধ্যে দুজন ঝুপ ঝুপ করে বসে পড়ল খালি সীটে। আমি পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার হাতে ছিল বেশ

বড় আকারের একটি বইয়ের প্যাকেট। চলন্ত বাস-এ প্যাকেট নিয়ে তাল সামলাতে না পেরে সীটে-বসা একটি যুবকের মাথার উপর বোধকারি জামার হাতা লেগে থাকবে, তৎক্ষণাৎ সে বিদ্রোহপুষ্টের মতো মাথার উপর হাত তুলে টোঁটর সামলাতে সামলাতে তীক্ষ্ণকন্ঠে বলে উঠল, 'ঠিক করে দাঁড়ান দাদা!'

মনে করেছিলাম উত্তর দেব না। কিন্তু তার পাশের সংগীটি টিপ্পনী কাটল, 'দাদার বোধহয় পায়ের ওপর কন্ট্রোল নেই!'

ইঞ্জিনটা খুবই স্পষ্ট। ফলে জবাব দিতে হল। বললাম, 'দেখুন, আপনারা যেখানে বসে আছেন সেখানে আমিই বসেছিলাম। আপনাদের সঙ্গে যে মেয়েরা উঠেছিলেন তাঁদেরই জন্যে সীট ছেড়ে দিয়েছিলাম। তাঁরা উঠে যেতে আপনারা হুড়মুড় করে বসে পড়লেন, আমার কথা আপনাদের মনে পড়ল না। এখন আবার এইসব বলছেন?'

কিন্তু তারা কেউ লজ্জিত হল না। বরং আমাকেই নিবোধ প্রতীপন্ন করে একজন বলল, 'রিসার্ভ সীট নাকি আপনার? উদ্ভতা শেখাতে এসেছেন?'

না, আসিনি, মনে মনে বললাম, ভদ্রতা যার নেই তাকে শেখানো যায় না। এবং যায় না-বলেই ভদ্রস্বভাবের মানুষদের আমরা মিন্‌মিনে, ভীরু, বোকা এবং অপদার্থ জ্ঞানে উপহাস করি। কিন্তু সকলেই যদি দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ নিতে উদ্যোগী হতেন তাতেই কি সংসারটা খুব সুখের জায়গা হ'য়ে উঠত!

পরস্পরের প্রতি সৌজন্য, নারীর প্রতি সম্মান, বয়সের প্রতি শ্রদ্ধা, বৃদ্ধের প্রতি বিনয় এগুলি অবশ্যই উপহাসের বিষয় নয়—উপহাস যখন করি তখন বুঝতে হবে আমাদের আত্মিক দীনতা একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে।

বিশেষ করে ধিক্কার জগে যখন দেখি বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রতি উদাসীনতা। সংসারে শিশু যেমন আমাদের অপরিণীম মমতা দাবী করে, বৃদ্ধরাও তেমনি আমাদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতার অধিকারী। যে জগৎ-টিকে আমরা আমাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করছি, সেই জগতের যাবতীয় বন্দোবস্তই করে গেছেন আমাদের পূর্ববর্তী পুরুষের মানুষেরা। আজ তাঁরা অক্ষম, অশক্ত, কিন্তু তাঁরা না থাকলে সংসারটাকে ঠিক যেমনভাবে আমরা পেয়েছি তেমন করে তো পেতাম না! এজন্যে তাঁরা অবশ্যই আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পারেন। তাছাড়া তাঁদের বর্তমান অবস্থা তো আমাদেরও চর্চাব্যক্তের দিশারী। এজন্যেও মহাকাালের দ্বারা আমাদের বিনীত হওয়া উচিত।

কিন্তু তা হই কি! হই না! ট্রামে-বাসে এবং ট্রেনে অজস্র বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কাতরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, যুবক-যুবতীরা আসন ছেড়ে দিয়েছেন এমন ঘটনা বিরল।

যুবকের সঙ্গে 'যুবতী' কথাটা সচেতনভাবেই প্রয়োগ করছি। আমি অনেক বাড়ীতে প্রত্যক্ষ করছি। একজন বৃদ্ধ অতিথি এলে গৃহস্বামী উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু তাঁর তরুণী স্ত্রী পায়ের উপর পা তুলে যেমন সোফার বসেছিলেন তেমন বসে থেকেই নমস্কার জানালেন।



নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এটা ঠিক ভদ্রতা নয়। 'লেডীজ ফাস্ট' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে, তা আমি জানি। সেটা পুরুষের আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ পুরুষেরা আগে মেয়েদের পথ করে দেবেন। কিন্তু মেয়েদেরও নিশ্চয়ই কিছু করণীয় আছে, অন্তত বৃদ্ধদের বেলায় তো বটেই। সে কর্তব্য পালন না করলে মেয়ে বা পুরুষ এ সংজ্ঞা বাদ দিয়ে নিছক মানুষ হিসাবেই তো তাঁরা ছোট হয়ে যান!

সত্যি কথা বলতে গেলে বলা যায়, আমাদের জীবনে সৌজন্যের স্থান এত সংকুচিত যে অসৌজন্যকেই আমরা যেন মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করছি। এবং নিজেরাও যেমন সারাজীবন কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে সামনে এগোতে চেয়ে হাস্য-স্পদ হচ্ছি তেমনি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও অনবরত স্মার্ট হ'তে উপদেশ দিয়ে সেই কনুইবাজির দিকেই লোলেয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু একটু চোখ মেললেই আমরা দেখতে পেতাম, যে-জাত সত্যিই বড় হ'য়ে ওঠে তার প্রতিটি ব্যক্তিরই চরিত্রগত স্বভাব হ'য়ে দাঁড়ায়—ভদ্রতা। এবং ঠিক ঐ সামান্য একটা জায়গাতেই মানুষের সঙ্গে ইতরপ্রাণীর পার্থক্য!

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

লিবে কালি। শুকায় না।
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রাগের মতই গভীরতা। চিত্র
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা গুরু-সুস্থ যায় না।
প্রশস্ত কলম পরিষ্কার রাখ।

সুলেখা কালি

যদি কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা কাগজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের দোরদার করবে।



সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাস

বীরাঙ্গনা কাব্য

মধুসূদনের গ্রামগ্রিক শিল্প প্রত্যয়
কিরীটশঙ্কর যেনগুপ্ত

॥ এক ॥

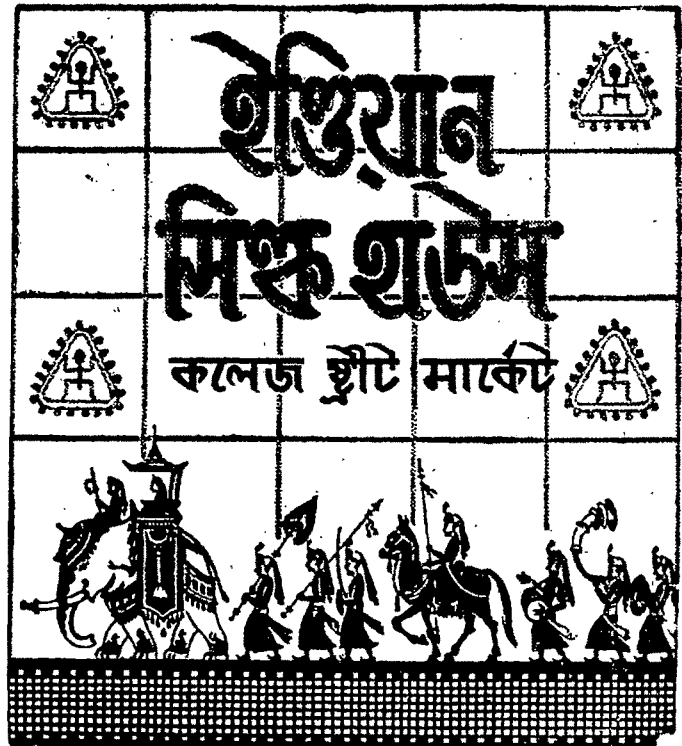
মধুসূদনের সামগ্রিক শিল্পপ্রত্যয়ের অকৃত্রিম সাক্ষ্য বীরাঙ্গনা কাব্য; অন্ততঃ তাঁর সুপরিণত কবি-মানসের সূক্ষ্মবোধ ও সমৃদ্ধ বিস্তারে এই কাব্যগ্রন্থ নানা দিক থেকেই তাৎপর্যময় একথা উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থ রচনার পূর্বেই প্রায় একই সময়ে মেঘনাদবধ এবং রজাঙ্গনা কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হওয়ার মধুসূদনের কাব্যপ্রবাহের দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পাঠক-সমাজের সচেতন স্পষ্টতর উপলব্ধিতে ইতিমধ্যেই পরিণত হয়েছিল। একথা যেমন সত্য যে মেঘনাদবধ রচনা হওয়ার আগে বাংলা সাহিত্যে বীররসের অস্তিত্ব কল্পনাতীত ব্যাপার বলেই পরিগণিত হতো অন্যদিকে তেমনি মেঘনাদবধের বিরূপ সাক্ষ্য সত্ত্বেও বীররসের জের টেনে কাব্য রচনার মোহ যে মধুসূদনের মতো অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান কবি প্রায় সপ্তে সপ্তেই বজ্রনে সচেতন হয়েছিলেন রজাঙ্গনা কাব্যই তার প্রমাণ। মেঘনাদবধের পাশাপাশি বীররস বিষয়ে অভিনব উদ্যম পুনরাবৃত্তি হবে এই ধারণা থেকেই রজাঙ্গনায় গীতিকাব্যের গভীর উৎসকে উন্মোচিত করার জন্যে মধুসূদন তৎপর হয়েছিলেন * *। কিন্তু রজাঙ্গনায় তাঁর আকাঙ্ক্ষিত গীতিকাব্যনির্ভর আশানুরূপ অন্তরঙ্গতায় উৎসারিত হতে পারেনি। বীররস থেকে শান্তরসের দিকে যাত্রা তাঁর পক্ষে খুব সহজসাধ্য হয়নি। মেঘনাদবধের রণদামামার গম্ভীর আওয়াজ রজাঙ্গনা কাব্যের শ্রুতিমধুর বংশীধ্বনির মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ, অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে মধুসূদনের পক্ষে কাব্য রচনা সম্ভব হলেও উল্লিখিত কবিদের মতো গীতিকাব্যের কোমল রসের গভীরে ডুবে যাওয়া তাঁর মতো পাশ্চাত্য ভাবধারায় গভীরতর ভাবে অনুপ্রাণিত সচেতন কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভাষাগত দুর্বলতা এবং ভাবগত অসম্পূর্ণতা দৃষ্টব্য। অর্থাৎ, বিষয়োচিত ভাষাবিন্যাস

কার দিনেও মধুসূদন-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপেই পরিগণিত তথাপি বীরাঙ্গনা কাব্য লিখিত না হলে মধুসূদনের সামগ্রিক শিল্পপ্রত্যয় সম্পর্কে বিবেচক পাঠকসমাজের যথোচিত ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হতে পারতো কিনা সন্দেহ।

॥ দুই ॥

তখন পর্যন্ত যেন অধিকতর এবং গভীরতর পরীক্ষার মধ্যপেক্ষী এবং বৈষ্ণব কবিতার অনুরূপ ভাব-বৈচিত্র্য রজাঙ্গনায় শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘনাদবধের অপ্রত্যাশিত সাক্ষ্য সত্ত্বেও এই ধরনের আরও রচনা পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হতে পারে এই আশঙ্কায় রোমাণ্টিকতা ও গীতিকাব্যের অবাক প্রান্তরে প্রায় একই সময়ে বিচরণ করবার অধীরতা থেকেই রজাঙ্গনা কাব্য লেখা সম্ভব হলেও এবং শূন্য বৃন্দাবনে উন্মাদিনী রাধিকার বিরহ বর্ণনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধুসূদনের অভাব না ঘটলেও সমগ্রভাবে এই আদরসম্প্রদায় কাব্যের সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এইরূপ অবস্থায় বীরাঙ্গনা কাব্যই বরং মধুসূদনের বহুদুর্খ প্রতিভার অনন্য নিদর্শন এবং যদিও মেঘনাদবধের অভূতপূর্ব সাক্ষ্যই এখন-

সুতরাং বীরাঙ্গনা কাব্যের যথোচিত আলোচনা সচেতন পাঠকসমাজেরই অভিপ্রেত এবং সেকালের এই একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থে নবজাগরণের যুগের মননসাধনার যে-অভিযান্ত্রিক প্রস্ফুটিত তার তুলনা রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অনুসন্ধানের চেষ্টাই বোধহয় বাতুলতা। বস্তুতঃ বীরাঙ্গনা কাব্যের সার্থকতা তার সামগ্রিক ব্যঙ্গনায়, তার অন্তর্নিহিত শিল্প-সম্ভাবনায়। এবং এই গ্রন্থের বহিঃসং-পরিষ্কল্পনা যদিও ইউরোপীয় ধ্রুব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের অনুগামী তথাপি ভাবনায় ও চরিত্র-চিত্রণে এই পত্রকাব্যগুচ্ছের অধিকাংশই ভারতীয় বিচারবোধ, সংস্কার ও সংস্বয়ের অধিকতর সন্নিবিষ্ট। সুতরাং যাদের ধারণা মধুসূদন চিন্তায় ও আচরণে ইউরোপীয় অনুকরণপ্রিয়তার বলিমাধ তাদের চোখের সামনে বীরাঙ্গনা পত্রকাব্যের প্রায় সব-গুলি সগই ভিন্নতর ব্যাপক অভিজ্ঞতার



স্বাদ বহন করে আনবে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ে (১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন সেই বছরেই মধুসূদন বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করেছিলেন এবং এই পত্রগুচ্ছ প্রাচীন স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত। 'বীরাঙ্গনা'য় মধুসূদন পত্রকাব্যের ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেন এবং তারা, দ্রৌপদী, জাহ্নবী, জনা, উর্বশী চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে নারীহৃদয়ের যে দুঃস্বয় রহস্যজাত বিচিত্র ভাবাবেগকে উন্মোচিত করেন তার সাধক উত্তরাধিকার অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের দেবযানী, গান্ধারী, চিত্রাঙ্গদা এবং অনুরূপ চরিত্র-চিত্রণের মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভের সুযোগ পেয়েছে এরূপ সিদ্ধান্ত অর্থাত্তিক নয়। বীরাঙ্গনা পত্রকাব্য নির্মাণের ক্ষেত্রে মধুসূদন যে প্রাচীন রোমক কবি ওভিদের বীরপত্রাবলীর (Heroic Epistles) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মধুসূদনের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু যথাস্থানে তার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত অনুরাগী হয়েও যোগীন্দ্রনাথ মধুসূদনের নৈতিক আদর্শের সমালোচনার পক্ষপাতী এবং সহোদরের প্রতি অনুরাগিনী ক্যানেস কিংবা সপত্নী-পুত্রের প্রেমে নিমজ্জিত ফিড্রা চরিত্র-সৃষ্টির অনুসরণে 'সোমের প্রতি তারা' পত্রকাব্য রচনার জন্যে যোগীন্দ্রনাথের মতো সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জীবনীকারও যখন গভীর অতীত অনুভব করেন তখন এ ব্যাপারে মধুসূদনের স্বপক্ষে কিছু বলার থাকতে পারে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। অন্ততঃ এখনকার দিনে অনুরূপ কবি-কল্পনায় সুরচিত্র বিকৃতি কিংবা গান্ধীজীর অবমাননার ভক্ বোধ হয় অব্যবহৃত। মধুসূদন গোড়া থেকেই মহাকাব্য কিংবা পত্রকাব্য রচনার ক্ষেত্রে রামায়ণ মহাভারত কিংবা পুরাণের চরিত্র-গুলিকে আপন কবিস্বভাব ও কবিকল্পনার জারকরসে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির করে গড়েছিলেন। ছন্দ মিল গুণে কবিতারচনা যে কারণে তাঁর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল ঠিক সেই কারণেই এদেশের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত চরিত্রসৃষ্টিতে কোনো গতানুগতিক সংজ্ঞা আরোপ খুব সম্ভব তাঁর একেবারেই অনাভিপ্রেত ছিল। এবং এই কারণেই রাবণ, মেঘনাদ বা শূরপন্থা সম্পর্কে মধুসূদনের আরোপিত গুণাবলীর ব্যাখ্যায় দীর্ঘকালের সংস্কার ও অভ্যাসজর্জরিত পাঠকসমাজ চমৎকৃত ও বিস্মিত এবং রাম-লক্ষ্মণ-অজ্ঞান

প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নরূপ ব্যাখ্যায় অপ্রীতিকর কিন্তু অভিনব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

॥ তিন ॥

ওভিদের পত্রাবলীর সঙ্গে বীরাঙ্গনার রূপকল্পের সাদৃশ্য যতোটা, স্বাভাব্য সম্ভবতঃ তার চেয়েও বেশী। চরিত্র-চিত্রণে ভাষা-বিন্যাসে, ঘটনা সংস্থাপনে মধুসূদনের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। ওভিদের বীরপত্রাবলী পাঠে পত্রকাব্যে কবি-কল্পনার সাধক বিস্তৃত যে সম্ভব একথা মধুসূদনের মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে বীরাঙ্গনা পত্রগুচ্ছকে সম্ভবতঃ সম্পূর্ণরূপেই মৌলিক বলা যেতে পারে। যদিও ওভিদের আদর্শে পরিকল্পিত একুশটি পত্রকাব্যের স্থলে প্রস্তাবিত গ্রন্থের মাত্র এগারোটি পত্রকাব্যই শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের অবি-স্মরণীয় প্রতিভার সাক্ষ্য তথাপি এই এগারোটি পত্রকাব্যেই নবজাগৃতির যুগের বাঙালীর মননসাধনার অমূল্য সম্পদ সংগৃহীত।

বীরাঙ্গনা কাব্যে বর্ণিত নায়িকারা পৌরাণিক কালের নারী। কিন্তু অনুভবে, উন্মোচনে, অভিজ্ঞান ও অভিব্যক্তিতে এই চরিত্রগুলো নবজাগৃতি যুগের প্রাণোন্মাদনার প্রতীক। এই দিক থেকে মধুসূদনের স্বকালের প্রতি পক্ষপাত যতটা সেকালের প্রতি আনুগত্য ততটা নয়। বীরাঙ্গনার নায়িকারা মধুসূদনের মনোজগতের দুর্মর আলোকধারায় সম্পূর্ণরূপেই নতুন করে জন্মেছে। মধুসূদন রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক আখ্যায়িকার সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় ভাবেই পরিচিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁর নিজের কবিস্বভাব অনুরাগী তিনি নায়িকা নির্বাচনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল যুগোপযোগী কাব্যসৃষ্টি, পৌরাণিক ঘটনাবলীর পদ্যানুবাদ নয়। ফলে, 'সোমের প্রতি তারা' পত্রকাব্যে একদিকে যেমন অমৃতাক্ষ হৃদয়ের প্রেত কলা-কৌশলের দৃষ্টান্ত অন্যদিকে তেমনি মূল থেকে (সোমদেব ও তারাদেবীর কাহিনীর) বিচ্যুতিরও সাধক উদাহরণ। মধুসূদনের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ব্যতিক্রম, স্থলন নয়। বীরাঙ্গনা পত্রকাব্যে বর্ণিত চরিত্রসৃষ্টিতে—পটভূমিকার ব্যাপ্তিতে, দৃশ্যের রম্যতা এবং নাটকীয় আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত

সঞ্চারে—মধুসূদন অনন্যাতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শকুন্তলা, তারা, ভানুমতী, উর্বশী এবং জনা—এই চরিত্রগুলো স্পষ্টতঃই পরস্পরের থেকে বহুল পরিমাণে স্বতন্ত্র এবং জনা বা ভানুমতী যে-অর্থে বীরাঙ্গনা শকুন্তলা কিংবা তারাদেবী যে অনুরূপ অর্থে বীরাঙ্গনা নয় তা বলাই বাহুল্য। জনা পুত্রহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে বন্ধপারিকর; ভানুমতী স্বামীর অধঃপতনে অমঙ্গল আশংকার পীড়িত। পক্ষান্তরে শকুন্তলার আচরণে তপোবন-সুলভ নির্মল ভাবাবেগ লক্ষণীয় এবং তারাদেবী স্পষ্টতঃই নিজের নিবন্ধ প্রেমের গভীর আর্তিতে স্পন্দিত। সুতরাং প্রচলিত অর্থে বীরাঙ্গনা নয়, বিশিষ্ট নায়িকার অর্থেই এই ধরনের চরিত্রগুলোকে বীরাঙ্গনা বলা যেতে পারে। পত্রাকার কাব্যে বর্ণিত নারী-হৃদয়ের আলেখ্য একদিকে যেমন পৌরাণিক কালের ঘটনাসংস্থানের নৈপুণ্যে, দৃশ্যসংজ্ঞার নিখুঁত প্রতি-চিত্রণে, পরিবেশ এবং পরিমন্ডলের প্রতি-ভাসে পাঠকমনকে বিস্ময়াবিষ্ট করে থাকে অন্যদিকে তেমনি পুরুষের প্রভাব থেকে মুক্ত স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনে সাধক। প্রকৃত প্রস্তাবে, পৌরাণিক যুগের নারীসমাজের অভিজাত, শিক্ষিত অংশের ধ্যানধারণা, চিন্তা ও কল্পনা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একালের পাঠক-সমাজ অনুমান করতে পারেন মাত্র যেহেতু ইতিহাসের তথ্যসমৃদ্ধকালের সঙ্গে একালের ব্যবধান বিস্তর। পক্ষান্তরে মধুসূদনের কবিকল্পনায় যে চরিত্রগুলোর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তাদের প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই উনিবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের নবজাগৃতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব। 'সোমের প্রতি তারা' এবং 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। মধুসূদন এরূপক্ষেত্রে স্বকালের চিন্তা ও ভাবনার প্রভাবেই জনা কিংবা তারার চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর করে তুলতে পেরেছেন বলা যেতে পারে। নীচের শ্লোকগুলো থেকে—

গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে
সুধানিধি, মৃদু আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে।
আশীর্বাদ-ছলে মনে নিমিত্ত আমি!

কলংকী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব জনে।
কর আসি কলংকণী কিকরী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ ব্যা কুশমানে।

এসো, হে তারার বাহু! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!

(সোমের প্রতি তারা)

হায় রে কি পাঠপ,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধর আজ
নর্তাশর-হে বিধাতা!—পাথের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চাঁড়ালের পদধূলি রাম্রাণের ভালে?
কুরঙ্গীর অশ্রুবীর নিবায় কি প্রভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্নে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?

কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজ
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছাবে

তোরে?

কেন বা জ্বলিস, মনঃ? কে জুড়াবে

আজ

বাক্য-সুধারসে তেরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর, অরে মণিহারী ফণি:—

(নীলধরজের প্রতি জনা)

অন্তত দুটি বিষয় সুস্পষ্ট।
প্রথমতঃ, তারাদেবীর নারীহৃদয়ে প্রেমের
যে আলোড়ন প্রত্যক্ষ করা যায় নারীর
ব্যক্তিব্যক্তির উন্মেষের সঙ্গেই কোথায়
যেন তার গভীরতর মিল অনুভূত হবে।
দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক অর্থে তারাদেবীর
প্রণয়কাঙ্ক্ষাকে ঠিক বৈধ বলা না গেলেও
এই শ্বিচারিণী যে গভীর মানসিক
অন্তঃসন্দেহের মধ্যে প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়েছেন
তার জন্যেই সর্বকালের কাব্যপাঠকের
সমবেদনা ও শূভেচ্ছায় সে-চরিত্র অন্বেষিত।
এই দিক থেকে মধুসূদনের পত্র-
কাব্যের কোনো কোনো চরিত্র নিঃসন্দেহেই
সেক্সপীয়রের ট্রাজিক চরিত্রের অনু-
গামী এবং সে-কারণেই নবজাগৃতির
(the renaissance) গভীরতর মানসিক
আবেদনে বিকীর্ণ। আনন্ড বেনেট
একদা যে হৃদয়াবেগের ব্যাখ্যা করেছেন
('Literature does not begin till
emotion has begun') তার

স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আধুনিক বাংলা
সাহিত্যে বলা যায় মধুসূদন থেকেই
শুরু। রেনেসাঁ বা নবজাগৃতির সারাৎ-
সার (essence) মধুসূদনের কবি-
কল্পনার যে সর্বদাই গভীর ব্যাপ্তি এনে-
ছিল মিলটনের প্রতি প্রবল পক্ষপাতই
তার প্রমাণ। অর্থাৎ, আদর্শের দিক
থেকে হোমার, ডারজাল, দান্তে, ওভিদ্
তার ধ্রুবসাহিত্যজ্ঞানিত চেতনাকে অনু-

রঞ্জিত করলেও চরিত্রচিত্রণে সেক্সপীয়র
এবং মিলটনের অনুসরণই তাঁর পক্ষে
স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ব্যাপার হয়ে
দাঁড়িয়েছিল। মেঘনাদবধেই মধুসূদনের
চরিত্রচিত্রণ স্পষ্টতা এবং ব্যঙ্গনা লাভ
করেছে। পাত্রপাত্রীর উক্তি এবং পরিবেশ
বর্ণনার মধ্যে কবিকল্পনার সাংক
ব্যাপ্তি কাব্যপাঠকে আকর্ষণ করে।
এই মহাকাব্যের প্রধান অবলম্বন যদিও
সমগ্রভাবে বীররস, তবু, বিভিন্ন সময়ে,
বিভিন্ন সর্গে কোমল ও শান্তরসের অনু-
রণনও দৃষ্টিগোচর হবে। বীররাগনা
কাব্যে মাইকেল মধুসূদনের রসবোধ
অধিকতর পূর্ণতা লাভ করেছে,
অমিতাক্ষর ছন্দের ওপর দখলও বিস্ময়-
কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যেমন
চরিত্রচিত্রণে অধিকতর উৎকর্ষতা
লক্ষ্যণীয় এবং নারীচরিত্রের বিভিন্নমুখী
বৈচিত্র্য আশ্চর্য্য সূচক উন্মোচিত অন্য
দিকে তেমনি রোমান্টিক চিত্তবৃত্তির
অনুগামী রসের ক্ষেত্রও বহুবিস্তৃত।
পত্রকাব্যের স্বল্প পরিসরে এক-একটি
নারীচরিত্র এক-একটি মানসিক আবেদনে
স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উন্মোচিত। প্রেম,
শপথ, অঙ্গীকার, ঘৃণা, আত্মত্যাগ,
উদ্বেগ, পূর্ণতায় বীররাগনা কাব্যের
চরিত্রগুলো শেষ পর্যন্ত পাঠকমনে
গভীরভাবেই রেখাপাত করে।

৥ চার ॥

মধুসূদনের কবিতায় গোড়া থেকেই
নাটকীয় উপাদানের আধিক্য এবং প্রকৃত
প্রস্তাবে অনেক ক্ষেত্রেই এই নাটকীয়
উপাদান তাঁর কাব্যরচনার আঁতরিষ্ট
আম্বাদ বহন করে এনেছে। মেঘনাদবধে

বীররসের ব্যাপ্তির সঙ্গে নাটকীয়
উপাদানেরও প্রচুর সমাবেশ ঘটলেও
বীররাগনা কাব্যে পৌঁছে এই নাটকীয়
লিপিকুশলতা যেন অধিকতর সম্পূর্ণতা
লাভ করেছে। 'সোমের প্রতি তারা'
'লক্ষ্মণের প্রতি শূপনাথ' 'পুরুষবীর
প্রতি উবশী' ইত্যাদি পত্রকাব্য প্রসঙ্গে
উল্লেখ্য। নিম্নলিখিত পংক্তিবিন্যাসে
নাটকীয় উপাদান এবং অমিতাক্ষর ছন্দের
অনুসরণ যে-কোনো সজাগ পাঠকমকে
নাড়া দিয়ে থাকে:

কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্বজন।
কর আসি কলঙ্কী কিস্করী তারের,
তান্নাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাহু! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!

(সোমের প্রতি তারা)

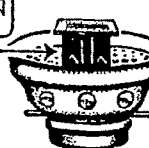
ভূজ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে;
নহে কহ প্রাণেশ্বর। অঙ্গানবদনে,
এ বেশ ভূষণ তাজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পুজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব।
রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবার বাকলে স্তন; ঘুচাইয়া বেগী,
মাড়ি জটাজুটে শিরঃ, তুলি রক্তরাজী,
বিপিন-জিনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী!
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভঙ্গ্য কলেবরে।
পরি রক্তাক্ষের মালা, মৃণ্মালা ছিঁড়ি
গলদেশে!

(লক্ষ্মণের প্রতি শূপনাথ)

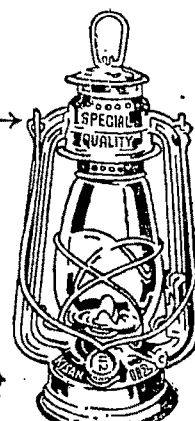
শূদ্র প্রণয়কাঙ্ক্ষণী নারীর প্রণয়-
নিবেদনের মধ্যেই নয়, অন্যত্র বিদ্রুপে,
ক্ষোভে, উদ্বেগেও এই নাটকীয়তা
বিদ্যুত। নীলধরজের প্রতি জনার উক্তি,

আরও মজবুত... আরও ভাল

পিতলের তৈরী
বার্ণার টিউব



'কিমান' ল্যাম্পে
'স্পেশাল কোয়ালিটি'
হাশ দেখিয়া নইবেন।



সম্পূর্ণ লক্কন মোটা চাদরে
তৈরী ও লক্কনের লুং কেব্রোসিত
তৈলে নষ্ট হয় না

কিমান
লক্কন
সর্বোৎকৃষ্ট



গোবিন্দচন্দ্র দাস এণ্ড কোং

২৩৩, ৩নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন-২২-৬৫৮০

দুর্বোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দেবের প্রতি দংশলা এবং দশরথের প্রতি কৈকেয়ীর আবেদনে এই ক্ষোভ, উদ্বেগ ও বিদ্বেষের বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষ্যণীয়। মধুসূদন তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনায় নাটক রচনায় যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তার ফলেই সম্ভবত পরকাব্যরচনার ক্ষেত্রেও এই নাটকীয় সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। জীবন এবং জীবনের অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ হলেই নাটকীয় আবেগ সার্থকতা লাভ করে। কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের ভাষা মূলত সংস্কৃত সাহিত্যের মূখ্যোপেক্ষী এবং তৎকালীন প্রাকৃত ভাষার অবস্থা সম্ভবত এরূপ ছিল, না যার থেকে সংসাহিত্য-রচনার অনুপ্রেরণা পাওয়া যেতো। সুতরাং সাহিত্যের ভাষাগঠন ও ভাষা-বিন্যাসের প্রাথমিক কৃতিত্বও মধুসূদনের প্রাপ্য এবং যদিও বর্তমান কালের কবিতার ভাষার সঙ্গে মধুসূদনের সৃষ্ট ভাষার ব্যবধান দুস্তর তথাপি বাংলা সাহিত্যের সেই নব-উন্মেষের যুগে বাংলা ভাষায় মহাকাব্যের প্রবর্তন এবং নাটকীয় আবেগ সৃষ্টির ব্যাপকতার সাফল্য লাভের জন্যেই মধুসূদন একালের নমস্।

ভাষা সংগঠনে মধুসূদনের কবিতা পুথিগত অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশই সমকালীন জীবনের বোধ ও ব্যাপ্তির মধ্যে, গভীরতর অনুভূতিগুলোর মধ্যে, সঞ্চারিত হয়েছিল। মেঘনাদবধ থেকে বীরঙ্গনাকাব্যে উত্তরণের মধ্যেই তার নিভৃত প্রমাণ উপস্থিত। মেঘনাদবধের বিরট সাফল্য এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সে-কাব্যের ভাষায় কোনো কোনো অংশে ভাষাবিন্যাসের দুর্বলতা লক্ষ্যণীয়। ঘটনাসংস্থাপনের বৈচিত্র্যে, বীরঙ্গনের আধিক্যে এবং সর্বোপরি অভূতপূর্ব নাটকীয় আবেগ সৃষ্টিতে ভাষাগত এই দুর্বলতা অনেক পরিমাণেই প্রচ্ছন্ন। কিন্তু বীরঙ্গনায় মধুসূদন এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করেছেন। তাঁর অবচেনন মনে সম্ভবত এই বোধ জেগেছিল যে ভাষাকে ক্রমশই জীবনমুখী করে সংগঠিত করার প্রয়োজন এবং বীরঙ্গনার ভাষায় সম্ভবত সে-কারণেই প্রাকৃত ভাষার উপকরণ সঞ্চারিত হতে শুরু করেছিল। বলা বাহুল্য, মধুসূদন প্রবর্তিত কাব্যে ভাষা একান্তভাবেই তাঁর অননুকরণীয় প্রতিভাসৃষ্টি এবং সে-ভাষার প্রকৃতি এরূপ স্বতন্ত্র ছিল যে পরবর্তী কালে সে-ভাষায় কাব্য রচনার উদ্যোগ আর সফল হয়নি। হেমচন্দ্র এবং

নবীনচন্দ্র ভাষাকে পরবর্তী কালে অধিক-তর জীবনানুগ করলেও মধুসূদনের ব্যাপক সাফল্য শেষ পর্যন্ত তাঁদের আয়ত্তাধীন হয়নি। সুতরাং বলা যেতে পারে ভাষায় ও ভাবানুসঙ্গে মধুসূদন সেকালের সংশয়াচ্ছন্ন আকাশে বজ্রের মতোই অকুপণ এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও বিস্ময়কররূপে একক। ছন্দোমুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের অরদান সর্বাধিক; কিন্তু মধুসূদন এই পথে অগ্রণীর সম্মানের অধিকারী।

মধুসূদনের সামগ্রিক শিল্পপ্রত্যয় সুদৃঢ় কবিকল্পনার উপরে সংস্থাপিত ও বদ্ধমূল ছিল বলেই মধ্যযুগীয় কবিতার কলাকৌশলকে সম্পূর্ণ বর্জন করেও তিনি অতুলনীয় সাফল্যের অধিকারী। সুবীন্দ্রনাথ দত্ত এক জায়গায় বলেছেন : “মাইকেল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর করেছে থামলেন, বুঝলেন না যে ভাষা প্রাকৃত না হ’লে, প্রাকৃত কাব্যরচনা অসম্ভব। তবু মাইকেলের সমর্থনে একথা নিশ্চয় স্বীকার্য যে ভাষা সম্বন্ধে তিনি কোনো কালেই ওদাসীন্য দেখাননি। তৎকালীন পুথিগত বাংলা তার চোখে অচল ঠেকেছিলো, এবং সজীব ভাষার সম্মানে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দকোষেরই শরণ নিয়ে থাকেন, তাহলে শব্দে তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চমকে না, অসংস্কৃত বাংলার ঐকান্তিক দৈন্যও মানতে হবে।...” সুবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অংশত সত্য যেহেতু মধুসূদনের কাব্যের ভাষা তৎকালীন সমাজের মানুষের মুখের ভাষার নিকটবর্তী হতে পারেনি। কিন্তু মধুসূদন আপন প্রতিভা-বলেই নতুন যে কাব্যভাষার সৃষ্টি করে-ছিলেন এবং যে-ভাষায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম মেঘনাদবধ এবং বীরঙ্গনা কাব্যের মত সংসাহিত্য সম্ভব হয়েছিল তার সাহিত্যিক গুরুত্ব এরূপ উজ্জ্বল হ্রাস পায় না। “...মাইকেল শব্দে, শ্লিষমাণ বাংলা কাব্যকে জাগিয়ে তুলেই, বিমিশ্রে পড়েনি, বাঙালী কবিকে তরঙ্গাওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই।...” সুবীন্দ্রনাথের একই নিবন্ধের (“ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ”) এই পরবর্তী উক্তি বরং সংপাঠকের বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এরূপ অবস্থায় মধুসূদন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক মূল্য-বিচার (“সাহিত্যচর্চা”) সর্বাংশে গ্রাহ্য কিনা সন্দেহ। “মাইকেলের যতি স্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের ভূত-ঝাড়ানো যাদুমন্ত্র।” এছাড়া অন্য গুণাবলী তিনি

মধুসূদনের সাহিত্যে খুঁজে পাননি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বীরঙ্গনা কাব্যগ্রন্থের সমগ্রতার অনুধাবন যদিও সহজসাধ্য নয় তবু সাধারণ কার্যপাঠক সে-গ্রন্থের চিত্তহারী পদবিন্যাস ও ভাষালাবণ্য সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পান। এবং যে-পাঠক সতর্কতার সঙ্গে বীরঙ্গনার চরিত্রগুলো বিশ্লেষণের পক্ষপাতী মধুসূদনের কবিকল্পনার প্রতি শ্রদ্ধাশ্রিত হবার মতো প্রচুর উপাদান তিনি আবিষ্কার করবেন। এখনকার দিনে, রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ পূর্তির পর মাইকেল প্রবর্তিত ভাষা ও ছন্দে নানা বিচ্যুতি আবিষ্কার সম্ভব; কিন্তু মধুসূদন যে-কালে প্রথম মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করলেন তখনকার বাংলা সাহিত্যের গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট অবস্থার কথা মনে রাখলে মধুসূদনের অবদান সম্পর্কে সংশয় থাকে না।*

* “ ‘ভিলোভমা’র সঙ্গে ‘রজাঙ্গনা’র আরম্ভ। তারপরে ‘মেঘনাদবধ’ আর ‘কৃষ্ণ-কুমারী’ প্রায় একসঙ্গে লেখা চলিল। ‘মেঘনাদবধ’ শেষ না হইতেই ‘বীরঙ্গনা’।”

(মাইকেল মধুসূদন : প্রথমনাথ বিশ্বাস।

পৃঃ ৫০, ২য় সংস্করণ।)

“মেঘনাদবধের সঙ্গে আমরা মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশকালে উপস্থিত হই। শর্মিস্তা ও তিলোত্তমাসম্ভব রচনা করিয়া, তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার জীবনের এই অংশে আমরা তাহার ফল দর্শন করি। ভাষার লালিত্য, ভাবের উৎকর্ষ ও গাম্ভীর্য এবং গ্রন্থোদ্ধারিত চরিত্রসমূহের পূর্ণতা প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে, তাহার এই সময়কার রচিত গ্রন্থগুলিই তাহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। মেঘনাদবধ, কৃষ্ণকুমারী, রজাঙ্গনা এবং বীরঙ্গনা এই চারিখানি গ্রন্থ এই সময়ের অন্তর্গত।... রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী এবং মেঘনাদবধ এই তিনখানি গ্রন্থ মধুসূদন প্রায় একই সঙ্গে আরম্ভ এবং প্রায় একই সঙ্গে সম্পূর্ণ করিয়া-ছিলেন।”

(মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত।
যোগীন্দ্রনাথ বসু। প্রথম সংস্করণ।)

“মধুসূদন তাহার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে ‘মেঘনাদ বধের পর বীরঙ্গন বিষয়ে অভিনব উদ্যম কেবল পুনরাবৃত্তি মাত্র হইবে; গীতি-কবিতারও দিকে আমার প্রবণতা আছে, আমি সেই দিকে চেষ্টা করিব।’ মধুসূদনের সেই প্রবণতার ফল তাহার রজাঙ্গনা কাব্য।”

(ঐ পৃঃ ৩৯৫)

সুতরাং বলা যেতে পারে একই সময়ে আরম্ভ করলেও ‘মেঘনাদ বধ রচনার কাজই তুলনায় অধিকতর অগ্রসর হয়েছিল। বিষয়-বস্তু ও ভাবের দিক থেকে সমস্ত কাব্যই যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে-কারণেই গোড়া থেকেই মধুসূদন ‘রজাঙ্গনা’ কাব্যকে গীতি-কাব্যের আদর্শে রচনা করতে শুরু করেন।



মাতাহরি

সুবোধকুমার চক্রবর্তী



নির্মলের হাতে হাতকড়া পড়ল হেমন্তের এক সোনালি সন্ধ্যায়। নিছক প্রেম করতে গিয়েই এই বিপদ সে ডেকে আনল।

নির্মলের বয়স তখন বছর ত্রিশেক। মহাবুদ্ধি শেখ হবার দু-চারদিন আগেই জন্মেছিল, তাই বয়সের কথা উঠলে সগর্বে মন্তব্য করে : আমি কি আর আজকের লোক হে, বিছানায় পড়ে না থাকলে ভিক্টোরিয়া ক্রশ নিতুম। বৃদ্ধের পরে পাওয়া পীস মেডেলটা এখনও আলমারিতে তোলা আছে।

এটা বয়সের ধর্ম। এ বয়সে সব বৃদ্ধই বয়স বাড়িয়ে আনন্দ পায়। সত্যিই যখন বয়স বাড়বে, তখন আর এ কাজ করবে না।

নির্মলের পিতার পরিস্থিতি আছে। বাগিজে নেমে লক্ষ্মীকে তিনি সিঁদুকে আটকেছেন। নির্মলের শৈশবেই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, কিন্তু স্মিত্য-বাবু দারপরিগ্রহ করেননি। বিবাহে নির্মলেরও রুচি নেই। এটা বোধহয় যুগের হাওয়ায়। সারা জীবনের সঙ্গী হিসেবে যাকে গ্রহণ করতে হবে, তাকে ভাল করে দেখে শূনে বাজিয়ে নেওয়া দরকার। এই বাজিয়ে নেবার নামে যথেষ্টচারও হয়তো চলে। শূভানুধ্যায়ী বৃদ্ধরা যখন ঘরে লক্ষ্মী আনবার পরামর্শ দেন, নির্মলের বাবা বলেন : তাঁকে তো সিঁদুকে বন্দী করেছি।

লেখাপড়া শিখে নির্মল চাকরিতে ঢোকেন, বাপের ইচ্ছায় বাপের ব্যবসারেই কতকটা দায়িত্বহীনভাবে কিছু দেখাশোনা করছিল। আরও সব কর্মচারীর মতো মোটা মাইনে পায়, ছুটি নেয় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে। ঘোড়দৌড়ের মাঠে জাঁকিয়ে বসে, ক্লাব ও জুয়োর আড্ডায় তার জুড়ি মেলে না। বৃদ্ধরা হিরো বলে, আর তবু শ্যামারা তাকে অতিরিক্ত সঙ্গ দিয়ে দলের আর দশটা তরুণকে ঈর্ষায় কাতর করে।

কলকাতার এই নির্মলকে সেদিন দার্জিলিংয়ের বাচ হিলে দেখা গেল। গম্ভীর মুখ, পাইপের ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার, একটা বোম্বটে একা বসে বোধহয় আকাশ পাতাল ভাবছে। সামনে ছেলেমেয়েদের খেলায় বিম্রাম নেই। কেউ সি-সর উপর চেপে ঢেঁকি-ঢেঁকি খেলছে, কেউ দোলনার দুলছে বিপর্যস্তভাবে, কেউবা মই বেয়ে উপরে উঠে সড় সড় করে নেমে আসছে বিপুল বেগে। নির্মলের মনে ছিল এই খেলার দিকে, কিন্তু দৃষ্টিটা আত্মস্থ, বেশ চিন্তাগ্রস্ত। নির্মল জানত না যে এখানে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। টের পেলে নিশ্চয়ই সে উঠে যেত।

ওধারের বেগে বসে যে বৃদ্ধো ভদ্রলোক নির্মলকে লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর দৃষ্টি ঠিক শ্যেনের মতো তীক্ষ্ণ। মাথার চুল ও দাড়ি

অকালপক না হলে বয়স তাঁর ষাটের কম বলা উচিত হবে না। পাশের মেয়েটি কিন্তু সুদর্শনা। বৃদ্ধের নাৎনি বলে সন্দেহ হলেও মেয়ে বলেই মানতে হয়েছে। দশজনের শ্রবণ বাঁচিয়ে মাঝে মাঝেই তাঁরা গভীর আলোচনা করছিলেন।

বৃদ্ধ এক সময় নির্মলের কাছে উঠে এলেন। বেগের একটা ধারে বসে একটুখানি কাশলেন।

তাঁর উদ্দেশ্য সাধন হল। নির্মল চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল। চিন্তার জগৎ থেকে সে বাস্তবে ফিরে এসেছে।

বৃদ্ধ বললেন : আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো।

বিরক্ত।

বিরক্তই তো, একা বসে আপনি হয়তো কত কি ভাবছিলেন—

নির্মলের দৃষ্টি হঠাৎ কঠিন হল, বলল : কে বলল আমি কত কি ভাবছি?

বৃদ্ধ হেসে বললেন : আমরা যে রোজ আপনাকে লক্ষ্য করছি।

রোজ?

কোন অপরিচিত লোকের এই অহেতুক কৌতূহল নির্মল সোজানাহীন অভদ্রতা মনে করে। একটা কঠিন উত্তর দিতে গিয়েই সে থেমে গেল।

বৃদ্ধ বললেন : মায়ার ধারণা আপনি বাঙালী নন। আর আমি

বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বলেই তাঁর মেয়েকে ডাকলেন।

মায়া এই আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। শাড়ির আঁচলখানা সামনের দিকে টেনে এগিয়ে এল। বড়ো বললেন : কার কথা ঠিক হল এইবারে দেখ। ভদ্রলোক একেবারে খাঁটি বাঙালী। গায়ে পড়ে কথা কইছি বলে রাগ করছেন।

দু-হাত জুড়ে মায়া নমস্কার করল :
রাগ করবার কথাই যে।

কেন?

আপনি হয়তো কোন গুরুতর সমস্যার কথা ভাবছেন—

সেই এক কথা। নির্মল বাধা দিয়ে বলল : একা বসে হাসতে শুরু করলে কি আপনারা পাগল ভাববেন না?

মায়া নির্মলের পাশেই বসেছিল। পুন্সকে উচ্ছাসিত হয়ে হেসে উঠল। বলল : সে আরও কোতুকর হত।

এই হাসিতে নির্মলের উন্মাদ অনেকটা নেমে গেছে। তা লক্ষ্য করে বড়ো বললেন : আপনার চোখে মূখে দার্শনিকের মতো গাম্ভীর্য, তাই দেখেই আমরা আলাপে ভয় পেয়েছি।

মায়া বলল : বাবাকে আমিই সাহস দিয়েছি। বাবার চেহারাই বা দার্শনিকের মতো নয় কিসে!

এবারে নির্মলও হাসল।

বেলাশেষের এই সোনালি রোদে বৃষ্টি একটু নেশা আছে। মেঘে যেটুকু জল ছিল, তা ঝরে গেছে। এখন শুধু নির্জলা রোদ। পাহাড়ি পরিবেশে এই উত্তাপেই তো নেশা ঘনায়।

মায়ার বাবা বললেন : এত মানুষ থাকতে বসে বসে আপনাকে কেন লক্ষ্য করেছি তার কারণ বলি। আপনি আমাদের পাশের হোটেলেরই আছেন, আর বেরোন প্রায় আমাদের সঙ্গেই। কোন দিন আগে, কোন দিন পেছনে। কোন সংগী নেই, কথাও বলেন না কারও সঙ্গে।

মায়া বলে উঠল : কথা না বলে আমরা এক মুহূর্ত থাকতে পারিনে।

গভীর বিস্ময়ে নির্মল বলল : আমি আপনাদের একদিনও লক্ষ্য করিনি।

করেছি আমি।

হাসতে হাসতে বড়ো বললেন : মেয়ে আমার—

নির্মল কথাটা শেষ করল : ভাল গোয়েন্দা হতে পারতেন।

মায়া যেন চমকে উঠল, তারপরেই সহজ হয়ে বলল : কোন কাজ আছে কি আপনার খোঁজে, কোন ডাকাতি বা খুনের তদন্ত?

এবারে নির্মল চমকাল, একান্ত অন্যমনস্কভাবে বলল : না না, এ আমার ঠাট্টার কথা।

বৃন্দের দৃষ্টিটা যে শ্যোনের মতো, নির্মল তা লক্ষ্য করেনি।

বাড়ি ফেরার পথে তাদের পরিচয় হল। মায়ার বাবা বিপিনবাবু উত্তর-বঙ্গের এক আদালতে ওকালতি করেন। সরকার উকিলদের অবসর নিতে বাধ্য করেন না, তাই তিনি এখনও কাজ করছেন। বক্তৃতার ক্ষমতা ফুরিয়েছে বলে এখন শুধু পরামর্শ দেন। চারিদিকের চা-বাগানগুলো চলছে বলে তিনিও চলছেন, নইলে বিপদে পড়তে হত।

নির্মল আশ্চর্য হিচ্ছিল। সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছে কি নিজের অসচ্ছলতার কথা এমন অকপটে বলা যায়! অপরিচিতের কাছেই বড়ি যায়।

বিপিনবাবু তাঁর মেয়ের কথাও বললেন। মায়া তাঁর একমাত্র সন্তান নয়, তাঁর শেষ সন্তান। আর সব ছেলে-মেয়েরা বিয়ে-থা করে ঘোরতর সংসারী হয়েছে। বাপের শেষজীবনে এ মেয়ে ছাড়ছে না, ছায়ার মতো সর্বত্র ঘুরছে। মৃত্যুর আগে কি মায়াকে পান্থস্থ করতে পারবেন না?

বিপিনবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ ছলছল করে উঠল।

নির্মল অভিভূত হল। আত্মদানে যে নারী মহিমাময়ী, নির্মল বৃষ্টি তারই একজনকে নিজের নিকটে দেখছে। পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে মায়ার দিকে তাকাল। কৃত্রিম সম্ভ্রম এই মেয়েটি নিজেকে উৎকৃষ্ট করে তোলেনি। সায়াহের সুন্দর আকাশের মতোই রূপে রঙে রঞ্জিত হয়ে আছে। মায়াকে নির্মল শ্রদ্ধা করতে শিখল।

দুপুরের আহ্বানের পর নির্মল তার নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল। উত্তরের জানালা খুলে দিয়ে গভীর মনোযোগে পড়েছে দৈনিক সংবাদপত্র। কাগজখানা কখন তার হাত থেকে পড়ে গেছে

থেয়াল করেনি, দূরন্ত ভাবনায় সে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। চোখের সামনে ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল কাগজজঙ্ঘার উদার বিস্তার। কিন্তু এখন তার চোখের সামনে সংবাদপত্রের শিরোনামাই জ্বল-জ্বল করছে। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু মনোজ মিত্রের হত্যার তদন্ত। তাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল শৈশব থেকে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কলকাতায় ফিরে আর তাকে দেখতে পাবে না।

এই সম্পর্কে পুন্স তাদের ‘অপদার্থ’ সংঘের জনককে ‘অপদার্থ’কে গ্রেপ্তার করেছে। মনোজের সঙ্গে তাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ ছিল। এবং তাদের তর্ক এক একদিন খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হত। সম্মে ইদানীং মদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছিল। মেয়ে সভ্যও এসেছিল। তাঁর হয়নি কেবল কড়াকাড়ি বা বাঁধাবাঁধি আইন। এই সংঘকে তাই যথেষ্টাচারের আবাধ প্রশয় দিতে হয়েছে।

মনোজের মৃতদেহ একদিন সকালে সংঘের একটা ঘরে আবিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু এটা বিশ্বাস করা সম্ভব হয়নি যে, রাতের এই ঘটনাটা সকল সভ্যেরই অজ্ঞাত ছিল। সন্দেহ হয়েছে যে, রাতে যারা এসেছে ও এ দৃশ্য দেখেছে, তারা অন্ধকারেই গা-ঢাকা দিয়েছে, প্রথম দর্শক হিসেবে পুন্সে সংবাদ দিতে কেউই সাহসী হয়নি।

পুন্স নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, খুনটা প্রথম রাতে হয়নি। কেননা, সম্ম্যাবেলায় ‘অপদার্থ’রা যে আসা-যাওয়া পান-বিন্যাস সবই করেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেকের ধারণা যে মনোজ গভীর রাতে এসে আত্মহত্যা করেছে। করে থাকলে পুন্স তা বিশ্বাস করতে পারেনি। মনোজ মরছে কপালে আঘাত পেয়ে। একটা খালি বোতল মেঝের পাওয়া গেছে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বোতলের আঘাতেই যে মৃত্যুটা হয়েছে, পুন্সের তাই অনুমান। কিন্তু আঘাতটা করেছে কে?

পুন্স নাকি নির্মলের বাড়িও চড়াও করে। কিন্তু এই, ঘটনার দিন সম্ম্যাবেলাতেই সে দার্জিলিং বেড়াতে গেছে জেনে পুন্স কতকটা আশ্বস্ত হয়েছে।

মামলা এখন পুরোদমে চলছে। ‘অপদার্থ’ সংঘের ‘অপদার্থ’রা একে

এসে সকলেই জীবনবন্দী দিয়ে যাচ্ছে, আর পদলিশের হাজতে বন্দী হয়ে সংঘের দারোয়ান ও বারের বেয়ারারা অবিশ্রাম মার খাচ্ছে। নির্মলের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না বলে সে দার্জিলিঙে পড়ে আছে, আর প্রচুর কৌতুহল নিয়ে মামলার বিবরণ পড়ছে।

এই নির্বাসন একঘেয়ে জীবনে নির্মল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যে রঙীন ছবি সন্ধ্যাগুলি তাকে এতদিন মাতাল করেছে, তার নেশা এখনও তার রক্তে লেগে আছে, এখানেও তাকে চুম্বকের মতো টানছে। তারপরেই হচ্ছে একটা মর্মন্তিক বন্দনা, নানা আশঙ্কায় তার সবল স্নায়ুগুলো জড়ের মতো অসাড় হয়ে যাচ্ছে। দেহটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে না উঠতেই—একটা পুঞ্জিত প্লানির ভারে মনটা মিইয়ে যাচ্ছে। নির্মল ডাক্তার দেখাচ্ছে, টানক খাচ্ছে, আর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কত অসম্ভব আজ-গুণি কথা ভাবছে।

খেলা জানালা দিয়ে নির্মল বাইরে চেয়ে ছিল। হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ এসে রৌদ্রকে ঢেকে দিল, একটা গাঢ় নীল ছায়া এল সামনের দিকে এগিয়ে। নির্মল চমকে উঠল, অত্যন্ত দ্রুত দেহটা উঠল খরখর করে কেঁপে।

এক সময় মায়ী এসে যে তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল, নির্মল তা লক্ষ্য করেনি। তার কথা শুনে আর একবার চমকে উঠল। মায়ী প্রশ্ন করেছিল : কী হল, অমন চমকে উঠলেন যে?

নির্মলকে বড় অসহায় দেখাল। যেন তার একটা গভীর অপরাধ হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে। মুখে তার কথা যোগাল না।

মায়ী বলল : স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি?

নির্মল হয়তো স্বপ্নই দেখাছিল, তার প্রিয়তম বন্ধু মনোজের হত্যার দৃশ্যস্বপ্ন। মানুষ খুন হতে সে কখনও দেখেনি। খুন হবার পরেও না। শুধু কাগজে পড়েছে, আর গল্প শুনেছে। কিন্তু এখন সে চোখ বুজলেই রক্ত দেখতে পায়। দেখে, তাদের সংঘের একটা ঘরে মনোজ লুটিয়ে পড়ে আছে, মাথার খুলিটা ভেঙে মগজ গড়িয়ে পড়ছে সাদা আর গোলাপী রঙের। আর রক্ত। অনামনস্ক হলেই নির্মল চমকে ওঠে।

মায়ী তখনও তার উত্তরের অপেক্ষা করছে। কিন্তু নির্মলের কথা সব এলো-মেলো হয়ে গেল : স্বপ্ন। হ্যাঁ, না, স্বপ্ন কেন দেখব।

মায়ী নাছোড়বান্দা, 'বলল : বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিয়ে, ডেকে আপনার সাড়া পেলাম না। ভাবলাম অবেলায় ঘুমোচ্ছেন, জাগিয়ে দেব।

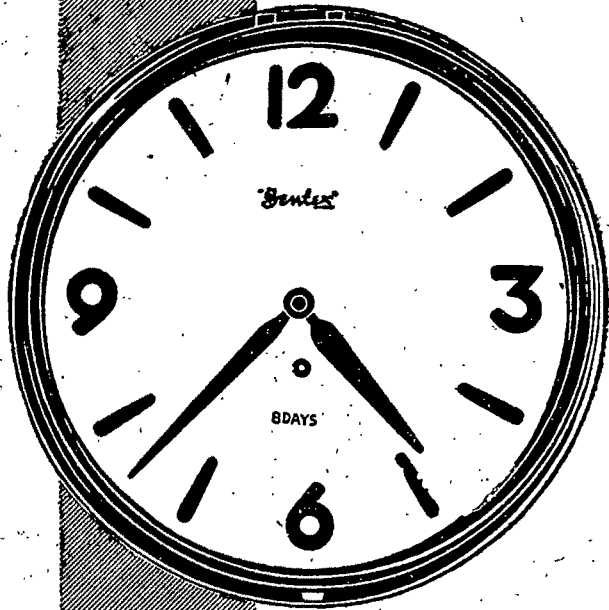
কিন্তু আপনি জেগেই ছিলেন। খুব অনামনস্ক।

নির্মলকে এ কথা স্বীকার করতে হল, কিন্তু কথা না বলে সে শুধু মাথা নাড়ল।

মায়ী এগিয়ে এসে একখানা চেয়ারে বসল, হাসতে হাসতে বলল : আমার

বেনটেক্স ঘড়ি

উপহারে আদর্শ



পছন্দ করার মত
কয়েকটি মডেল।
সবকয়টি মডেলই আমদানী করা
অংশাদি সমিতিবিশিষ্ট।
চারি অথবা বিদ্যুৎ চালিত
ব্যবস্থা সহ পওয়া যায়।

"Benetex" CLOCKS

নির্মল ও দীর্ঘস্থায়ী কাজ

সকল প্রতিষ্ঠিত ডীলারের কাছে পাওয়া যায়।

মেসার্স ডি. গুলাব,	এ-৪৬/৪৭, নিউ মার্কেট
" ইউনিভার্সাল ওয়াচ এম্পোরিয়াম,	এ-৩৩/৩৪, নিউ মার্কেট
" ইন্ডিয়ানা ওয়াচ কোং	
" নোবল ওয়াচ কোং	রাধাবাজার স্ট্রীট
" স্টেটা টাইম কোং	
" এ্যালিয়েড ওয়াচ কোং	
" ব্যালার্জি ব্রাদার্স,	১১৩/১১ বি, রাসবিহারী এ্যান্ডন।

বাংলা, বিহার, আসাম ও নেপালের একমাত্র এজেন্ট :—

মেসার্স নরিন্দর নাথ এ্যান্ড কোং

পি-৩৬, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

ফোন : ২২-২৮২৬

চেহারাটাই বোধহয় পেজার মতো, তাই ছায়া দেখেই চমকে উঠেছিলেন।

মায়ার হাসিটা নিম্নের ভাল লেগেছিল। ইচ্ছে হল বলে প্রশংসা শোনার বাসনা মেয়েদের স্নাতন।

কিন্তু এখনও সে সহজ হতে পারেনি, এখনও তার মনে চলেছে দুরন্ত চিন্তার প্রতিভ্রিয়া। সুযোগ পেয়েও সে সহজ হতে পারল না। নিঃশব্দে সে হাসল, প্রাণহীন শূন্য হাসি।

মায়ার মেঝের দিকে চেয়ে, খবরের কাগজটা দেখে নিয়েছিল। খোলা পাতার উপরেই মনোজ মিত্রের হত্যার মামলা। নিম্নলিখিত দেখল মনস্তাত্ত্বিকের অন্তর্ভেদী গভীর দৃষ্টি দিয়ে। লোকটার আচরণ সত্যিই অদ্ভুত, তা না হলে এমন গম্ভীর হয়ে থাকতে কেন ভাল বাসবে!

মায়ার মেঝের কাগজখানা তুলে পাট করে রাখল। তারপর ছেলোমানুষের মতো প্রশ্ন করল : এবারে বেড়াতে বেরবেন তো, না এমন করে ঘরে বসেই বিকেলটা কাটাবেন?

নিম্নল তখন উঠে দাঁড়িয়েছে, বলল : সত্যিই খুব দেরি হয়ে গেছে। দেরি এমন আর কী হয়েছে! কিন্তু আপনি তো এখনও চা খাননি।

চা।

মায়ার হেসে বলল : বৈয়ারা চা নিয়ে ফিরে গেছে। আমার মতো বেহায়া নয় তো, সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢোকবার সাহস পায়নি।

মায়ার বোধহয় বৈয়ারাকে ডাকতে যাচ্ছিল। তার দরকার হল না। বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে সে নিজেই ভিতরে এল।

চা খেয়ে পথে বেরতে তাদের বেশি দেরি হল না। নিম্নল বলল : আজকাল আপনার বাবা আসেন না তো?

মায়ার হেসে বলল : তাঁকে তাসে পেয়েছে ভূতে পাবার মতন। হোটেলের ঘরেই দিনরাত জাঁকিয়ে আছেন। তাসের সঙ্গে যত পরস্পা পড়ছে, নেশাও তত ঘনিয়ে উঠছে।

নিম্নল যেন আঁৎকে উঠল। তারারও যখন 'অপদার্থ' 'সংঘ' খুলেছিল, তখন চা আর তাস দিয়ে সংঘের উদ্বেগধন হয়। তারপর এল পাশা আর লেমনেড। সকলের শেষে মদ আর মেয়ে। জুয়ার

আড়া সরগরম হল। মাতুলামি খিতিয়ে উঠল ভিতরে ও বাইরে। সুযোগ বুঝে বাজে মেয়েরা এল রোজগারের লোভে। এই অতীতটাকে নিম্নল ভয় পায়। ও সব বাদ দিতে পারলে মনোজ মিত্রকে নিশ্চয়ই হারাতে হত না।

নিম্নলের এই চমকানিটা মায়ার লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু এই নির্বিকার লোকটাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে আর লাভ কি। শূন্য সময় নষ্ট করা বইতো নয়।

চলতে চলতে মায়ার অন্য কথা জিজ্ঞাসা করল : কী ভাবছেন?

অন্যমনস্কভাবে নিম্নল বলল : স্বাস্থ্য যে মানুষের কত বড় সম্পদ।

মায়ার এ কথার সূত্র খুঁজে পেল না। বলল : হঠাৎ এ কথা কেন?

এই কথাই যে এখন বার বার মনে হয়। আয়নার আমার নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠি। এত খারাপ স্বাস্থ্য আমার কোন দিন ছিল না। এখন যেন একখানা কঙ্কাল বয়ে বেড়াচ্ছি।

মায়ার এ সবই লক্ষ্য করেছে। কারণও জানতে চেয়েছে অনেকবার অনেক ভাবে। কিন্তু উত্তর পায়নি। এবারে আর প্রশ্ন করে নিম্নলকে বাধা দিল না। বরং নীরব থেকে তাকে বলবার সুযোগ দিল।

নিম্নল আজ প্রগলভ হল, বলল : আমি এমন ছিলুম না মায়ার দেবী। 'অপদার্থ' 'সংঘ' আমার চেয়ে বড় অপদার্থ আর ছিল না। কতগুলো অলস বিলাসী ধনী 'অপদার্থকে' নিয়ে যখন এই সংঘটা গড়ে তুলি, তখন এর ভবিষ্যৎটা দেখতে পাইনি। পরিণতিটা যে এমন ভয়াবহ হবে, তারও দৃঃস্বপ্ন দেখিনি। সেদিন উচ্ছৃঙ্খল যথেষ্টাচারকে নিভীক পৌরুষ বলে প্রশংসা করেছি, সামাজিক নীতি ও চারিত্রিক দৃঢ়তাকে কুসংস্কার বলে বেপরোয়া নিন্দা করেছি। পিতা পরোক্ষে প্রশ্রয় দিয়েছেন, নির্বিকার চিন্তে অর্থ জুগিয়েছেন অকুণ্ঠ হাতে।

একটু থেমে বলল : ঘরে আর কেউ ছিল না যে বাধা দিতে পারত। মাকে হারিয়েছিলুম জ্ঞান হবার আগেই। জননীর শাসনে স্নেহে প্রহারে ও প্রশ্রয়ে আর দশটা শিশুর চরিত্র যেভাবে গড়ে ওঠে, আমার বেলায় তা হল না। যে আদর্শ অলক্ষ্যে থেকে অন্যতরকে একটা আতঙ্ক দিয়ে ঘিরে রাখে, সে

আদর্শ আমার জীবনে প্রতিফলিত হল না। বাবা যখন বিয়ে করতে বললেন, আমি তখন নারীর বাইরের রূপ দেখে চিনে ফেলেছি। জীবনের সংগী করে নেবার মতো কোন প্রলোভন তার মধ্যে খুঁজে পাইনি।

আজ তারার জলা পাহাড়ের পথ ধরেছিল। সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু অন্ধকার গভীর হইনি। বাড়ি ফেরার সময় হয়ে থাকলেও মায়ার আজ বসবার প্রয়োজন বোধ করল। রাস্তার ধারে একটা টিনের ঢালা দেখে বলল : আসুন না, বৌগুতে একটু বসার যাক।

নিম্নল দাঁড়িয়ে পড়ল, তার ধ্যান যেন ভেঙে গেছে। বলল : আমি অত্যন্ত দুঃখিত মায়ার দেবী—

মায়ার দেবী নয়, শূন্য মায়ার।

নিম্নল হাসল, বলল : অন্যমনস্কভাবে অনেক দূর চলে এসেছি, অন্ধকারে আর এগোন উচিত হবে না।

কিন্তু মায়ার ডুকুনি ফিরতে রাজী হল না। বলল : একটু জিরিয়ে নিই, তারপর ফিরব।

মায়াকে অনুসরণ করে নিম্নল এসে বৌগুতে বসল, কিন্তু কথা কইল না।

কিন্তু মায়ার আজ সব কথা শুনতে চায়, বলল : তারপর?

নিম্নল তার গলপের সূত্র হারিয়ে ফেলেছে, বলল : কী তারপর?

আপনি বিয়ে করতে রাজী হলেন না।

নিম্নল ভাবল 'খানিকক্ষণ', তারপর বলল : আমার অত্যাচারের জীবন আজ শেষ হয়ে গেছে। আজ ভাবি, আমিও তো খুন হতে পারতুম মনোজের হাতে! অপ্রকৃতিস্থের—

সমস্ত স্মার একরু করে মায়ার গন্ত হয়ে বসল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই নিম্নল থেমে গেল।

মায়ার বলল : অপ্রকৃতিস্থের—

কথাটা নিম্নল শেষ করল না। তবু মায়াকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল : মনোজের প্রতিভা ছিল, পাল্লা দিয়ে মদ গিলে আমি কোন দিন তাকে হারাতে পারিনি। তার চেয়ে কম মদ খেয়ে আমি তার চেয়ে অনেক বেশি মাড়াল হয়েছি।

নিম্নল উঠে দাঁড়াল, বলল : চলুন, এবারে ফেরা যাক।

দিন কয়েক পরের কথা।

আকাশে আজ মেঘের আড়ম্বর। দুপুরের রোদ নিবে যেতেই শিরশির করে উঠল মায়ার সারা দেহ। পাহাড়ের নিচে থেকে মেঘ উঠছে অবিরত। বৃষ্ণরা জানালা বন্ধ করে দিলেন, মাফলার দিয়ে ঢাকলেন কানদুটো। লাল নীল ছাড়া হাতে মেমসাহেবরা বোরিয়ে এলেন নিজের রাস্তার উপরে। মায়ার মনটাও দূলে উঠল। কেন সেই জানে। শ্যাওলা রঙের একখানা শাড়ির উপর তার পশুদে ক্লোক চাড়িয়ে সেও বোরিয়ে পড়ল। তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঠেলে উঠল পাশের হোটেলটায়।

দরজার সারিসতে টোকা দিয়ে নির্মলের সাড়া পাওয়া গেল না। পর্দা সরিয়ে মায়া ঘরে ঢুকে পড়ল। নির্মল ঘুমোচ্ছিল। তার বুকের উপর খবরের কাগজটা ছড়িয়ে পড়ে আছে। মায়া নির্মলকে জাগাল না, কেমন একটা অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকাল ঘুমন্ত মানুষটার দিকে। ক্রুর ও হিংস্র দৃষ্টি। বাকি এবারে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়বে। নির্মলের ডান হাত দিয়ে কাগজখানা চাপা ছিল, মায়া তা মৃদু করে নিল।

সেই মামলা। মায়ার কী মনে এল, বোঝা শক্ত। ঘরের কোণের আরাম-চৌকিটায় বসে কাগজখানা পড়তে লাগল। কে এক গণেশ হালদার তার জবানবন্দীতে নির্মলের নামেরও উল্লেখ করেছে। বলেছে, ঝড় জল উপেক্ষা করেও যারা প্রতি সম্মান্য নিয়মিত আসত, তারা দুজনেই সৌদীন অনুপস্থিত ছিল। নির্মল বসু আর মনোজ মিত্র। নির্মল বসুর দার্জিলিং যাবার প্রয়োজনের কথা কারও জানা ছিল না। মনোজ মিত্র হয়তো তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে এ খবর রাখত ও সন্দেহবোলায় তাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

কাগজখানা সরিয়ে রেখে মায়া ভাবতে লাগল। এইবার হয়তো নির্মলের ডাক পড়বে। অসুস্থ শরীর নিয়েও তাকে পদলিখ ও আদালতের সামনে দাঁড়াতে হবে। খেলের মামলার সামান্য খবর বলে সাধারণে যা উপেক্ষা করে, পদলিখের তদন্তের জন্য সেইটেই হয়তো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ।

এক সময় মেঘের আড়াল থেকে একটা শব্দ ভেসে এল—উড়োজাহাজের পাখার শব্দ। এই বাদলার দিনে কার

শব্দ হল ওড়বার, এই ভেবে মায়া আশ্চর্য হল। জগতে পয়সাওয়ালা পাগলের তো অভাব নেই!

মায়া জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেঘে মেঘে কাগুনজংঘার চুড়াগুলো আজ আড়াল হয়ে গেছে। উড়োজাহাজও দেখা যাচ্ছে না। কাচের জানালা খুলে দিতেই অনেকক্ষণের অবরুদ্ধ মেঘ দূরন্তভাবে ঘরে ঢুকে পড়ল। শিরশিরে ঠান্ডা ধোঁয়ার মতো ভিজে মেঘ। মায়া তাড়াতাড়ি আবার জানালাটা বন্ধ করে নিজের জায়গায় ফিরে এল।

উদ্দেশ্যহীনভাবে মায়া বসে নেই, হয়তো কিছু ভাবছে। একসময় ব্যস্তভাবে উঠে-গেল ঘরের আর একটা কোণায়। সেখানে নির্মলের সুটকেশ আর হোল্ডল গোটাটো আছে—। তৎপর হাতে মায়া সেই সুটকেশের লেবেল পরীক্ষা করল। তারপর হোল্ডলটা নেড়ে-চেড়ে সেটার লেবেলও বার করল। আনন্দে ও গর্বে মায়ার দুচোখ উঠল জ্বলে। তারপরেই চমকে উঠল নির্মলের চীৎকারে।

নির্মল ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠেছে। আতঙ্কে আতঁনাদ করে উঠবার মতো। তার দেহটাও কেঁপে উঠেছিল থরথর করে। মায়া ছুটে এসে দেখল, বিন্দু বিন্দু ঘামে তার কপাল ভিজে গেছে, উত্তেজনার শ্রান্তিতে সে তখনও বেশ হাঁপাচ্ছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে মায়া বোরিয়ে গেল, একটা বেয়ারাকে কফির ফরমাসেস করে নির্মলের কাছে এসে বসল। কম্বলে তার পাদুটো ঢেকে দিয়ে নিজের ডান হাতটা রাখল তার কোলের উপর।

বাহিরে তখন শিপশিপ করে বৃষ্টি নেমেছে, তার ছিটে এসে পড়ছে কাচের জানালার উপর। নির্মল শূন্যে শূন্যে তাই দেখতে লাগল।

এক সময় মায়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল : তোমার ঘরের দরজাটাই শূন্য খুলে রেখেছ নির্মলবাবু, মনেরটা কি কোনদিন খুলবে না?

নির্মলের গভীর দৃষ্টি স্থির হল মায়ার ম্লান মুখের উপর। মেয়েদের মন নিয়ে নির্মল ছিনিমিনি খেলেছে, কিন্তু এ কথা কোনদিন ভাবেনি। এ রকম প্রশ্নের জবাব তাকে কারও কাছে দিতে হয়নি। নির্মল বিচলিত হল।

হোটেলের বেয়ারা এই সময় কফির ট্রে না আনলে নির্মলকে আরও বেশ

পীড়িত হতে হত। মায়া তাকে অধ্যবসায়িত দিল। এক পেয়লা কফি ঢেলে বলল : এই নাও।

অনেকক্ষণ পরে মায়া আবার কফি কইল, বলল : আর বোধ হয় তোমার স্নেহ দেখা হবে না।

কেন?

কলকাতা থেকে জরুরি তার এসেছে। দিদি ডেকে পাঠিয়েছে।

দিদি কেন ডেকে পাঠিয়েছে, মায়া তা বলল না। নির্মলও জানতে চাইল না। দিদি আর একবার মায়াকে ডেকে-ছিলেন। ভাল পাঠ আছে, তারা দেখবে। এবারেও বোধ হয় তাই। কিংবা অন্য কিছু।

মায়া বলল : পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে যেতে আমার আজকাল ভয় করে। শকরিগলি ঘাট হয়ে ঘুরে যেতে কন্সট্রাকশন নেই।

নির্মল বলল : শ্লেপে যাব না কেন?

মায়া খুশিতে কলসে উঠল : ঠিক বলেছ, শ্লেপের কথা আমার মনেই ছিল না।

ভারত বিতর্ক হবার পর নতুন বিমানঘাটি খোলা হয়েছে বাগডোগরার। পাকিস্তানের ভিতর দিয়েও যাতায়াত তখনও নিষিদ্ধ হয়নি। কিন্তু যারা ভয় পান, তারা বিমানে উড়ে আসছেন। তারপর মোটরে উঠছেন দার্জিলিং।

কিন্তু টিকিট পেতে অসুবিধা নেই তো?

নির্মল বলল : কলকাতার শুনিয়ে অসুবিধে হয় না।

তবে হয়তো ফিরেও আসতে পারবে।

বলে আর এক পেয়লা কফি ঢালল। নিজে নিল, নির্মলকেও দিল। তারপর বলল : আজ তুমি নিশ্চয়ই কোন দৃশ্য দেখবে, কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না।

নির্মল এবারে স্বীকার করল। বলল : হ্যাঁ।

মায়া তার চোখের দিকে চোরে আছে। তাই দেখে নির্মল বলল : সত্যিই দৃশ্য দেখাচ্ছিলুম।

মায়া আরও বেশি জানতে চায়, বলল : তুমি বড়ই চাপা ম্ভাবের।

নির্মল হেসে বলল : অসুস্থ কিনা, কথা কইতে ভয় পাই।

কেন?

কী বলতে কী বলে ফেলব—শেষে হয়তো অসুখটাই বেড়ে যাবে।

মায়া হাসল।

লজ্জা পেয়ে নির্মল বলল : স্বপ্নে আজ মনোজকে দেখিছিলুম। সে আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর বলছে, একা মদ খেতে আর ভাল লাগছে না। আমাকে কাছে পেতে চায়, যেমন আগে ছিলুম।

মায়া নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে। আর নির্মলের চোখদুটো হঠাৎ ঘোলাটে হয়ে গেল, পাথরের চোখের মতন দৃষ্টিহীন স্থির। তবু মায়া কথা কইল না।

নির্মল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বলল : আমি পাগল হয়ে যাব মায়া, আমি আর সইতে পাচ্ছি না। চোখ বজলেই আমি একটা কাঠের খুঁটি দেখতে পাই, সাদা আর কালোয় ডোরা-কাটা তার রঙ, একটা বালির বস্তা ঝুলিয়ে দড়িটা মজবুত কিনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ একটা বিভীষিকা মায়া, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি না, পেলো আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব।

এর কিছুক্ষণ পরেই নির্মলের হাতে হাতকড়া পড়ল।

দিন কয়েক বিশ্রাম নেবার জন্য দার্জিলিং এসেছিলুম। হোটেলের ম্যানেজার তাঁর মোটা খাতায় নাম ঠিকানা লিখেই সন্তুষ্ট হলেন না। নানা অশুভ অহেতুক প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। শেষ পর্যন্ত আমার সর্টকেশ হোল্ডল ও তার লেবেলগুলো পর্যন্ত পরীক্ষা করে বোয়ারাকে ভিতরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন।

বিকলে যখন বের হচ্ছি, ভদ্রলোক নমস্কার করে এগিয়ে এলেন, বললেন : আমাকে তখন নিশ্চয়ই অভদ্র ভাব-ছিলেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এ সব ঠেকে শিখেছি। এই তো সেদিন নির্মল-রাবু নামে এক ভালমানুষ ভদ্রলোক এসে এই হোটলেই উঠেছিলেন। কে জানত, লোকটা খুনের আসামী। যে ঘরে আপনি উঠলেন, সেই ঘর থেকেই

তো কাল বিকেলবেলায় গ্রেপ্তার হয়ে করেনি। খুন্দো মাতালের কারবার, রক্ত দেখে নেশা ছুটে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। প্রশ্ন করলুম : খরা পড়ল কী করে?

উৎসাহিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন : ভদ্রলোক বলতেই চাইছিলেন, বললেন : মনোজ মিত্রের হত্যার মামলা মেয়ে-গোয়েন্দার কথা শুনেছিলুম, কাগজে পড়েননি কি? এবারে নিজের দেশেই প্রত্যক্ষ করলুম।

পড়েছি বৈকি।

বাগানে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে



স্বপ্ন! হ্যাঁ, না, স্বপ্ন কেন দেখব।

ভদ্রলোক বললেন : যে রাতে খুন্দো হয়েছিল, সেদিন সন্ধ্যা থেকেই নির্মল-রাবু অনুপস্থিত। খবর রটেছিল যে, ভদ্রলোক খুনের আগেই দার্জিলিং মেলে চেপে এখানে চলে এসেছে। কিন্তু আসলে তা আসেনি। এসেছিল পল্লেনে পরিদর্শন ভোরবেলায়। খুন্দোটা অবশ্য করব বলে

বললেন : বসুন না, গল্পটা গোড়া থেকেই শুরু করি। ওরে, ও মহাবীর, চা আন, আর কিছ—

উপরের সমস্ত গল্পটা তাঁর কাছেই শোনা। সবটাই বিশ্বাস করতে বললেন। খবরের কাগজে না পড়া পর্যন্ত বলতে পারিনে, কতটা রঙ ফলিয়েছিল।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধ কুমার মাস্তুল

১১ চোন্দ্র ১১

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উত্তর মেরুবলয়ের কাছাকাছি থাকার জন্য লেনিনগ্রাড অঞ্চলে সূর্যের উদয়াস্ত একটু বিচিত্র। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে ১৯২০ ঘণ্টা দিবালোক থাকে। এখান থেকে বিমান আনাগোনা করে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু লেনিনগ্রাড থেকে 'মার্মানস্ক' হল উত্তরমুখী গতি। বিমান অনেক উচ্চতায় উঠলে অনেক সময় মেরুকেন্দ্রের বিচিত্রবর্ণ অরোরার কম্পন চোখে পড়ে। মেঘ আছে দূরে দূরে, কিন্তু আমরা সেই মেঘখণ্ডের বিস্তৃত আকার দেখছি, দেখতে পাচ্ছি লম্বা একটি সূতো। শাদা গান কাপড়খানা হাওয়ায় ভাসছে, আমরা দেখছি তার পাড়টুকু। পৃথিবীর উত্তর গোলাধারের উত্তর ধারে এলে চোখের মর্নিতে বোধকরি একটা গোলযোগ ঘটে। এই দৃষ্টিবিভ্রম নাকি স্বাভাবিক।

উত্তর মেরুর অনাবিস্কৃত এবং অগম্য-লোকের দিকে সোভিয়েট কতৃপক্ষ উদাসীন থাকেননি। সেইজন্য লেনিনগ্রাড থেকে উত্তর-পশ্চিমে একটি রেলপথ যেমন গেছে 'ফিনল্যান্ডে', তেমনি পূর্বোত্তরপথে একটি গেছে মেরুবলয় ভেদ করে 'কারোলিন' হয়ে তুষারলোক 'কোলা' উপস্বীপে। এই বৃহৎ তুষারসমাকীর্ণ ভূভাগের প্রধান নগরী হল 'মার্মানস্ক'। এই মার্মানস্ক 'বেরগটস' নামক বরফ সমুদ্রের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। উত্তর মেরুমহাসাগরের দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকটি সাগরের উপর সোভিয়েট কতৃপক্ষের একচেটিয়া অধিকার। যেমন বেরগটস, হোয়াইট, কারা, লাপটেভ এবং মাইবেরিয় সমুদ্র। এই সকল সমুদ্রগুলি স্বীপ, উপস্বীপ, স্বীপপুঞ্জ ইত্যাদিতে ভরা। এই সমস্ত স্থল ও জলভাগে কোটি কোটি বর্গমাইলের মধ্যে সোভিয়েট কতৃপক্ষের বিজ্ঞান-গবেষণা এক একটি বিস্তারিত ও ব্যাপক গবেষণাগার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, যার ফলে পৃথিবীর বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে এক একটি চমক এক একটি

ভরগের মতো ছুটে আসছে। 'ফ্রাঞ্জ জোসেফ' স্বীপপুঞ্জে, 'নভায়া জেমলিয়া' স্বীপে, 'সেভারনয়া জেমলিয়ায়', 'ফাদিয়েভ', 'নভায়া শিবিরে' কিংবা যমল, তৈমির, চুচকা, কামস্কাট্টা, বা শাখালিন প্রভৃতি স্বীপ এবং উপস্বীপে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বসে বসে শূদ্ধ তুষারের হাওয়া খাচ্ছেন না—এটি আজ স্পষ্ট। একশ মেগাটন বোমা কোথায় ফাটানো হচ্ছে, 'স্পুটনিক-লুনিক-ভস্টক' প্রভৃতি কাজাখস্তান থেকে ওড়ানো হচ্ছে কিনা, এটির সন্ধান করা আমার কাজ নয়। কিন্তু আজকের উত্তর মেরুসাগর-লোক আর সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার মতো অনাধিগম্য নেই—এটি স্পষ্ট। এই ভয়াবহ বরফসমাক্ষর প্রাণীচেতনাচিহ্ন-হীন মেরুলোকে যে-সোভিয়েট সমাজ এসে বসেছে, তার অতিমানবিক বিজ্ঞান-গবেষণার প্রয়াস মানব ইতিহাসের কোন নতুন পরিচ্ছেদটির উদ্বোধন করবে, সেটি অভাবনীয়। আণবিক ও পরমাণবিক বা অম্পলজান শক্তির কথাই আমরা শুনছি। কিন্তু সেই শক্তির চরম পরিণতির কীর্তি-টিক কেমন এবং কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটি আজ কারও কাছেই স্পষ্ট নয়। শূদ্ধ বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মেরুলোকের সেই তোরণস্বর হল এই লেনিনগ্রাড। আমেরিকার বিজ্ঞানোন্ময়ন বিগত দেড়শ বছর ধরে যেমন পৃথিবী-বাসীর কাছে এনেছে আনন্দ, সোভিয়েটের বিজ্ঞানোন্ময়ন তেমনি এনেছে কেমন একটা অনিশ্চিত আতঙ্ক। এই আতঙ্ক বৃহত্তর মানবসংসারের উপর ফেলেছে একটা বিশাল ছায়া। আমেরিকা কখনও হৃদয় করেনি, যত্নে মরেনি! কিন্তু রাশিয়া গিয়েছে বার বার মৃত্যুর মধ্যে। কখনও রক্তে ভেসেছে, কখনও উপোসে মরেছে, কখনও সর্বহারা হয়েছে, কখনও বা দৃথ-দৃশ্যের কঠিন আঘাতে মূখ-থুবেড়ে পড়েছে। আপন প্রাণের মধ্যে তার কান্না জমা আছে বহুকালের। সেইজন্য সে যখন শান্তি চায়, নিরস্ত্রীকরণ চায়,—সেটি একান্ত আতর্জিক। কিন্তু যুদ্ধে সে যদি নামতে বাধ্য হয়, তবে সেটি

পৃথিবীর ইতিহাসে হবে শেষ মরণরণ! উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর তুষার সমুদ্র শূদ্ধ সৈন্য থেকে হয়ত একাকার হয়ে থাকবে! বোধহয় তারই নাম মহা-প্রলয়! সোভিয়েট বিজ্ঞান একদিকে যেমন বসেছে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র-সাধনায়, অন্যদিকে সেই সাধনার বিষয় ঘটর ভয়ে তেমনি বসেছে সর্বনাশা মারণাস্ত্র রচনায়। সে এখন আত্মরক্ষার সমস্যায় নিরত, আক্রমণের সন্ধানে রত নয়! সমস্ত পূর্ব ইউরোপে সে বেড়াবাধার চেষ্টা পেয়েছে আত্মরক্ষার বহিঃসীমাকে নিরাপদ রাখার জন্য—আমরা যেমন বাড়ির বাইরে বাগানের ওপারে পাঁচিল গেঁথে তুলি! ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে অসম্ভব হাঙ্গারী ওই পাঁচিল টপকে বোর্সে পড়তে চেয়েছিল সোভিয়েট কতৃপক্ষ সেই 'নির্বোধ নাবালককে' ধরে গলা টিপে ধাপড় কসিয়ে আবার ফিরিয়ে এনেছেন! ছেলেটার মনে রাগ থাকলেও এখন শান্ত হয়ে আছে! বাইরের পৃথিবীর ভয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন মেগাটন বোমা তৈরিতে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু নিজের ঘরের জন্য সামান্য একটি লিফট তৈরিতে সে এখনও সিম্ধহস্ত হয়নি! ভাল একটি আলমারি, ভাল একটি তালচাচি বা রান্না-ভাড়ারের ভাল আসবাবসজ্জা চট করে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোথাও চোখে পড়ে না। জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ওদের নেই।

লেনিনগ্রাডে আমরা এক মধ্যাহ্ন ঘরে নৈমন্ত্যর খেতে গিয়েছিলাম। এই বিশাল নগরের মনোরম পটভূমিতে এবাড়ির চেহারাটা বাইরে থেকে যেমনমান। নতুন দিল্লীর রাষ্ট্রপতিভবনের কাছে সেক্রেটারিরাটের প্রাসাদ কিংবা লোক-সভার চিত্তাকর্ষক গোল-প্রাসাদটি মানায়, —কিন্তু তাদের গায়ে-গায়ে বিনয়নগরের ছাটবাড়ি অশোভন! এটি শোভনরচিত্র গম্ব। কিন্তু সেই রুচি সোভিয়েট ইউনিয়নে মার খেয়েছে অনেকবার। এ বাড়িটি তেমনি সুবৃহৎ একটা যেন ইমারতের স্তূপ,—যেমন নিরেট, তেমনি অবকাশ-

বিহীন। বোম্বাই শহরে এককালে খ্রিস্ট উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই ধরনের কতকগুলি বৃহৎ ইমারত তৈরি হয়েছিল,—তার একেকটি ধোপে একেকটি স্বাক্ষরকার-পরিবার। সেগুলো যেন কাজসামান্য দায়-সারার জনকল্যাণকর, তারা যেন ধনীরা বোম্বাইয়ের উজ্জ্বলভাষ্যে জন্য দামান্দ-দান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! এখানেও অনেকটা তাই। হয়ত কিছু উন্নত, কিন্তু এরাও যেন পেয়ে গেছে পৃথিবীর শ্রিত্যের ধনী-শ্রেণীর উজ্জ্বলভাষ্য। সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা সম্প-বিস্তৃত যে কর্মী, তার ঠাই জের্মান প্রাসাদে কেন হরনি—এ প্রশ্ন রেখে এসেছি।

একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে এক গৃহস্থের মধ্যে এসে দাঁড়ানুম। তিনটি মাঝারি ঘর পাশাপাশি। এপাশে দুটি ছোট রান্না-ভাড়ার, ওপাশে বাথরুম। সমস্তটাই নক্ষত্র-পরিসরের মধ্যে। গৃহনির্মাতা ইঞ্জিনিয়ারের ভাবায় থাকে বলা হয়, ইয়াকিং স্পেস, রিলিফ, রিসেপশন—সুগন্ধিলর পরিমাণ স্বাক্ষর। বিনি গৃহস্থের কর্তা, তাঁর স্বাস্থ্য যে পরিমাণ ভাল, মাথায় সেই পরিমাণ টাক। বরন ছিন্ন পণ্ডাশ। অতি অমায়িক এবং হাসিখুশী। তাঁর স্ত্রী অতটা স্যাস্পারবতী ন, কিন্তু মিষ্টভাষিনী। ঘরে একটি মাত্র বছর পনেরো বয়সের ফুটফুটে মেয়ে, একটি তার পিসতুতো ভাই, এবং মেয়েটির দুটি দিদিমা। এরা জাতিতে রুশ, অর্থাৎ ঠিকি গওয়া যি,—তলার দিকে বনস্পতির ভজাল নেই! আমি সর্বাপেক্ষা কিস্তিত লুম এদের অভ্যর্থনার চেহারা দেখে। বাসী নিকটায়ীয়া যেন আপন ঘরে ফরে এল! আজ তোমরা এসে পৌঁছবে এই ঘরদোর সাজিয়ে গুঁছিয়ে রেখেছি! নি বাজার করে দিয়েছেন ঠিক সময়, আমি নিজে রান্না করেছি তোমাদের হৃদয়মতন। মেয়েকে ইঙ্কুল বেতে ইনি! ওর ভাণ্ডারের আবার সারনে কজামিন্। মা কোথা গেলে? এসো দিকে,—দেখোসে কা'রা এসেছে! উনি আবার একটি সেকেন্ডে মানুষ, লোক খলে আজও একটি আড়ালে সরে যান। ক আশ্চর্য, বসো তোমরা, সেই কন্দুর ক এলে? হাত ধুয়ে একেবারে বসবে? শ ত, এসো—আমি হাতে জল দিচ্ছি! র নেই, এখানে গরম জলের পাইপ আছে। আমরা গ্যাসে রান্না করি। কই, রেকজনকে যে দেখেছিলেন। বশপাল বৃষ্টি রে আসছেন? মিটার শেখান, দেখুনত পেরিখানা। হ্যাঁ, ওখান পাসিয়ান।

আপনারা আসবেন আজ, তাই ঘরের দেওয়ালে সব কাপেট টাঙ্কিয়েছি। আসুন, একেবারে টেবিলে বসি সবাই মিলে। না, এসো। মিলি, বোস না ভুই-ও'র পাশে?

অবশ্য মেয়েটির নাম 'মিলি' নয়। কিন্তু অনেকটা এই প্রকার। ভদ্রলোক আমাদের সবাইকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর বলিষ্ঠ দুই বাহুতে। আমরা তাঁর ঘরের লোক। বললেন, হ্যাঁ, ফ্রাটো একটু ছোট। ওঘরে থাকেন আমার শাশুড়ী আর মেয়ে, এই ঘরে থাকি আমরা দুজন। আর ওই যে ছোট ঘরটি, ওটিতে আমার ভাস্পন। চলুন না একদিন আমাদের বাগানবাড়িতে, —থাকবেন দিন দুই আমার 'দাচার'।

আমি দু'পা এগিয়ে তাঁর শাশুড়ীকে সসন্মানে ডেকে নিয়ে এলাম এবং সেই লজ্জাশীলা বৃদ্ধাকে বাঁদিকে বসিয়ে তাঁর বিনীত আড়চোখে ওরই মধ্যে একটু সহজ করে দেবার চেষ্টা পেলুম। এমন নম্রস্বভাবা বৃদ্ধাও সচরাচর কম চোখে পড়ে। খ্রীমতী গিডিয়া হাসিমুখে বসলেন আমার ডান-দিকে। মিলি বিশেষ কুণ্ঠিত লজ্জায় একটু সময়ের জন্য তাঁর পাশে বসে আবার যেন কোথায় গা-ঢাকা দিল। তাঁর লজ্জুক মেয়ে। এটি সব সময়েই লজ্জা করে এসেছি, বয়স্ক ব্যক্তিদের ভিনারের টেবিলে যখন মদ্যের ব্যবহার চলতে থাকে, তবুও এবং কিশোর বয়স্ক ছেলেমেয়েরা আড়ালে আশেপাশে সরে যায়। মদ্য এবং মদ্যপ সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রাচ্য কম, অথচ এ দেশের কঠিন-ঠান্ডার মধ্যে দু-তিন মিনিটে শরীরে কিছু উত্তাপ সঞ্চার করার জন্য নাগরিকদের অধিকাংশই অলপবিস্তার 'ভোদকা' পান করে থাকেন। এটির প্রভাবে নাকি বাক্যালাপগুণি প্রাপবন্ত হয়। হ্যাঁ 'ভদ্র-শ্রেণীর' সোভিয়েট নাগরিক, তাঁদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তরটি সিগারেট খান কিনা সন্দেহ। আমার ধারণা, ক্যান্সার রোগের আশঙ্কার থেকে এবাশ্বব সংস্কার উৎ-পত্তি। সুস্থ থাকা এবং সুস্থ রাখার আশ্রয় আয়োজন এদেশে সর্বত্র। জীবন-বৈরাগ্য, স্বাস্থ্যরক্ষার বিবিধাঙ্গ, অসময়ে স্নানাহার, যেমন তেমন খেয়ে পেট ভরানো, পেটে কিল মেয়ে টাকা জমানো, —এগুলি ওদের কাছে স্বাভাবিক। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার খরচ লাগে না, মেয়ের বিয়ের আর্থিক দায়িত্ব নেই, ভবিষ্যতের জন্য কোনও প্রকার সংস্থানের কথা ভেবে না, বৃদ্ধ বয়সের পেন্সন

সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, ছেলেমেয়েদের বেকার বসে থাকার চিন্তাই নেই! এই সব 'অবশ্যস্বভাবী' সুবিধার ফলে আর এবং ব্যয়ের প্রণালী সমান হয়ে থাকে। সামান্য অসুখের জন্য কেউ হাসপাতালে গেছে, এবং দিন পনেরো পরে দেহের ওজন বাড়িয়ে হাসিমুখে সে ঘরে ফিরেছে এমন বহুলোক আমার চোখে পড়ত। এমন কোন কোনও মেয়ে-পুরুষ চোখে পড়েছে যারা বিশেষ বিশেষ অসুখের অহিলার হাসপাতালের সুখ-সাজুলোর মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। আমার ঈষৎ হজমের গোল-বোসের জন্য বার বার আমাকে হাস-পাতালে রাখার জন্য প্রস্তাব এসেছে। অন্যদিকে সোঁদন আরেকটি বস্তু প্রতি আমার চোখ পড়েছিল। কুপ কুপ করে বর্ষি হাচ্ছিল, আমরা ফিরাচ্ছিলাম। পথের পাশে একটি নোটিস বোর্ডে কাগজমালা। তাতে কর্মীদেরকে আহবান করা হচ্ছে। 'দেড়শ' ইঞ্জিনিয়ার, একশ' কেরানী, আড়াইশ' লোহাকাটা মিস্ত্রি, পঞ্চাশজন জাহাজের কারিগর ইত্যাদি দরকার। কিন্তু একজনও সেই নোটিস পড়ে না দেখে আমি প্রশ্ন করলাম, এবং জবাব পেলুম, লেনিনগ্রেডে কেউ বেকার নেই! এমন লজ্জা করোঁছ, মাসে দু'তিনবার করে সোভিয়েটের অনেক লোক চাকরি বদলে বেড়ায়—যখন যেটা খুশি! একজনে দু'টো চাকরি করে, এমন অনেক আছে। চাকরি পড়ে রয়েছে চারদিকে, অথচ মানুষের সংখ্যা কম—সোভিয়েট ইউ-নিয়নে এই সমস্যাটি আসন্ন। চাকরি মানুষকে খুঁজছে! লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা এখন রাষ্ট্রের প্রধান কাজ।

স্বামী ও স্ত্রী। এ'রা দুজন একই লোহাগাল-ই-পিটাইয়ের কারখানার কাজ করেন। স্বামী পান ১৬০০ রুবল, স্ত্রী পান ১৩০০। স্ত্রীর চাকরি তাঁর স্বামী অপেক্ষা অল্পকালের, তাই বেতন কিছু কম। বৃদ্ধা পেন্সন পান ৬০০ রুবল। পেনসনের টাকা তাঁর হাতে এসে পৌঁছার প্রতি মাসের ১লা তারিখে। কথায় কথায় তাঁর বেঁচে থাকার সার্টিফিকেটের জন্য ওপাড়ার সেই বৃদ্ধমেজাজী গেজেটেড অফিসারের কাছে উমোদার করতে হয় না! পেনসনের টাকার একটি মানুষের সর্ব-প্রকার খরচ বাতে চলে, সেই পরিমাণ 'টাকা' দেওয়া হয়। পেন্সনভোগীর মৃত্যু ঘটলে ডাক্তার, হাসপাতাল, সন্ধান এবং পেন্সন বিভাগ দ্বারা এক ঘটীর মধ্যে যোগসুত্রবদ্ধ হয়ে যান। মৃতদেহ সন্ধান দ্বারা সরকারি ব্যবস্থায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোটারের তালিকা, পরি-

সংখ্যান ও আদমসুমারী সেটি টুকে নেন। আজকাল সোভিয়েট দেশে মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের হার বেশি। সন্তর বছরের এদিকে কেউ মারা গেলে সেটি অকাল মৃত্যু। অকালমৃত্যুর সংখ্যা বড়ই কম। আমি দিন দুই মস্কোর শ্মশানে গিয়েছি, একটির বেশি শবদেহ দেখিনি। ওদের শ্মশানটি শহরের মাঝখানে। পাঁচিলেরা যেন মলত আপিসবাড়ি। মড়ার কাঁথা কাড়াকাড়ির জন্য কোথাও 'মুদোফরাস' বসে নেই। শবদাহ হয় গ্যাস-চেম্বারে বা ইলেকট্রিকে। রিক্সা কেউ সেখানে বসে কপাল লাগড়ে কাঁদে না। আমি বহু বিধবা দেখেছি যারা সংযতপ্রকৃতি এবং স্বভাবগাল্ভ, বয়স তাঁদের কম। কিন্তু তারা আর দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা ভাবেন না। বহু পুরুষ এবং নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছেন দেখতে পেয়েছি, কিন্তু তারা আপন-আপন যৌনজীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে রয়েছেন। সংখ্যাভীড় কুমারী মেয়ে রয়েছে, বয়স পেরিয়ে গেছে পাঁচিশ-তেরিশ-পঁয়ত্রিশ, — তাঁদের বিবাহ হয়নি। যৌন-চরিত্রের স্থলন বহু আছে বহু মেয়ে-পুরুষের জীবনে; এবং এগুলি জনবার জন্য আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু এটি লম্পট করে দেখেছি, স্থলিত-চরিত্র মেয়ে বা পুরুষ 'রক্ষণশীল' সোভিয়েট সমাজে অভিশপ্ত অনাদৃত। কেউ তাদের ছায়া মাড়াতে চায় না। ওদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় হল নিরাপদ সচ্ছল পারিবারিক জীবন। অসচ্ছর বা লম্পট মেয়ে বা পুরুষ যে 'অভিশপ্ত' এবং 'একঘরে' হয়ে থাকে—সোভিয়েট দেশে না এলে আমি বিশ্বাস করতুম না। মেয়েদের পক্ষে বেশ্যা-পতি এখানে শুধু আইনের দ্বারাই নিষিদ্ধ নয়, স্থলিতচরিত্রা নারী এদেশে অভিশপ্ত ঘৃণ্য, এবং তার পক্ষে সামাজিক জীবন বড়ই কটকাকীর্ণ। মেয়েদের পক্ষে দুটি গালগালি, সোভিয়েট ইউনিয়নে মারাত্মক। সর্বাপেক্ষা সে-মেয়ে অপমানিত বোধ করে, যদি কেউ তাকে বলে মিথ্যা-বাদী বা বেগম। মস্কোর সরকারী মহলের জনৈক উচ্চপদস্থ রুশ কর্মচারী একটি রুশ মেয়েকে কোনও একটি কটুক্তি করার ফলে তার কী দশা হয়েছিল সেটি আড়াল থেকে শুনেছিলুম। দোভাবীর সাহায্যে সে মেয়েটিকে যখন প্রশ্ন করলুম, তোমার এত বেশি চন্দ্র উত্তেজনার কারণ কি?—মেয়েটি নীপিনীর মতো রুদ্ধ আক্কেশে জবাব দিল, লোকটা আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না, এমন পাষাণ!—আমি যখন বললুম, কিন্তু উনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি! ওর মতের ওপর এমন—

মেয়েটি তাক্সিভারে আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, আমি একজন সোভিয়েট নাগরিক! অপমান বরদাহত করিনে!

তার দর্শিত পদক্ষেপের দিকে চেয়ে রইলুম। মেয়েটি প্রশ্নের কারখানায় কাজ করে।

আহার্যাদির আয়োজনে কিছু বাড়ি বাড়ি ছিল। যেখানেই ভোজের আমন্ত্রণ, সেখানেই দুই প্রস্ত খাওয়া। আইস-ক্রিম এক প্রকার সর্বত্রই। আহার্যাদি সমাপ্ত হবার পর আসে বিস্কুট, চকোলেট, বাদাম, আপেল, কফি ইত্যাদি। ওরই এক ফাঁকে বৃন্দার বয়সটি জানলুম, চূয়াস্তর! প্রশ্ন করলুম, যত্থের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?—এবার তিনি সহজ কণ্ঠে বললেন, আর কোথায় যাব, এই আমার দেশ!

আপনার স্বামী কতদিন মারা গেছেন?

বৃন্দা একটু বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন, লেনিনগ্রাডের যত্থেই তিনি মারা যান।

এবার আমি শ্রীমতী লিডিয়াকে অনু-রোধ করলুম, দোভাবগটি নিভুল হলে ভারি খুশী হব।

ওধারে শ্রীমতী নাটশার দলে আহা-র্যাদির মধ্যে আমোদ-আহ্লাদের হুজুগ চলছিল। এধারে শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে চাপা ক্রোধে ধমক দিলেন, আপনার সন্দেহবাতিক রাখুন। আমি সোভিয়েট মেয়ে! নিম্ন, ওঁকে যা খুশি জিজ্ঞেসা করুন! সব কথাই আপনার খোঁচা!

বৃন্দা বলতে লাগলেন, ওই মেয়েটি ছাড়া আমার আর সব ছেলেমেয়ে যত্থের সময় মারা গেছে। আমার স্বামী মৃত্যু পর্যন্ত খেতে পাননি। তেরিশ মাস আমাদের অন্ন জোটেনি। জার্মানরা আমাদের ঘিরেছিল।

বললুম, তেরিশ মাস কেউ না খেয়ে থাকতে পারে না। আপনারা কি করতেন?

বৃন্দা তাঁর নয় দৃষ্টিতে লিডিয়ার দিকে তাকিয়ে কি যেন মৃদুস্বরে বললেন। শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, আপনি এসব শুনতে চান, কিন্তু উনি সেই ভয়ানক দিনের কথা বলতে গিয়ে হয়ত কেঁদেই ফেলবেন। ওর স্বামীকে উনি কোনমতেই বাঁচাতে পারেননি!

বৃন্দা বললেন, তেরিশ মাস অব-রোধের প্রথম কয়েকদিন কোনরকমে চালানো গিয়েছিল। ঘরে কেউ খাবার জিনিস পুড়িয়ে রেখে না। কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের স্বভাবও যায় বদলে। বোমা-যত পড়ে, লোক মত মরে, মানুষও তত জলত-বনে যায়। যারা পারল তারা রাজার থেকে সব খাবার জিনিস কিনে ঘরে জমালো। কিন্তু সে আর কদিন? তারপর আরম্ভ হল এক-বেলা পেট ভরানো! তারপর ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে খাইয়ে নিজেদের না খাওয়া! তারপর থেকে ভেগে গেল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। যে যেমন পায় খায়, শুধু প্রাণধারণের জন্য যত্থ! তখন জার্মান বোমা মাথায় পড়লে বোধ হয় দুঃখ পেতুম না। আমরা সন্নিবে পেলোই হামাগুড়ি দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তুম—!

বেনার মী মাড়ির মেলা

মোহিনী মোহন

কাঙ্ক্ষিত্য

এও মন

কালজ স্ট্রিট জংশন-কলিঃ-৩

ফোন: ৩৪-৪৫২০

হামাগুড়ি? মানে?

দাঁড়াতে পারতুম না যে! অমনি ক'রে যেতুম কোথাও যদি ঘাস দেখতে পেতুম! আমরা একা নই—দলে দলে, যে যেমন পারে। না খেয়ে মরে গেল একে একে, কিন্তু কামা আর আসে না চোখে! ঘরে কোথাও একটি কাগজের টুকরো রইল না, সব পেটে গেল! তারপর সবাই কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর—এসব ধরতে লাগল কেন, বুঝতেই পারছেন।

কিয়ৎক্ষণ বৃন্দা চুপ ক'রে গেলেন। ফিরে দেখি লিডিয়ার হাতে রুমাল। এবার তিনি গাঢ়স্বরে বললেন, আমি আর অনুবাদ করতে পারব না, ক্ষমা করুন।

অনেকক্ষণ পরে বৃন্দা পুনরায় বললেন, বোধ হয় এই সময়টায় আমার স্বামীর অন্তিম এসে উপস্থিত হয়। রাস্তায় রাস্তায় তখন উপবাসী, পাগলের দল মরা জন্তুর পচা হাড়-চামড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে। খেতে না পেলে মানুষ কী না করে? হাজার হাজার ছোট ছেলেমেয়ে মরছে যেখানে সেখানে—কিন্তু কেউ তাদের ফেলবার নেই। একটা বাড়িতে চার হাজার শিশুকে রেখে বাঁচাবার চেষ্টা হাছিল, একটা বোমায় সেই বাড়ি ধূলি-সাং হয়।

প্রশ্ন করলুম, ছেলেমেয়েরা?

বৃন্দা বললেন, না, একটিও বাঁচেনি!

আপনার স্বামীর কি অবস্থা ঘটল?

তখন শীতকাল, বরফে সব ডোবা।—বৃন্দা বললেন, ও'র মাথার বোধ হয় একটু দোষ হয়েছিল। আমরা দুজনেই আর উঠতে পারতুম না। উনি মাঝে মাঝে এক পাটি জুতোয় চামড়া চিবাবার চেষ্টা করতেন। জুতো অনেকেই খেয়ে ফেলত। আমাকে উনি নাড়া দিয়ে ডেকে বললেন, শুনছি গভর্ণমেন্ট খাবার এনে বিলি করছে! তুমি একটু জল আনতে পার, গলাটা আগে থেকে ভিজিয়ে রাখ? উনি খাবারের স্বপ্ন দেখছিলেন এ আমি জনতুম, কিন্তু ও'র তেষ্টাটুকু সত্যি ছিল!

আমি তখন আর হামাগুড়ি দিতে পারতুম না। মাটিতে উপড় হয়ে পড়ে বুকে হাঁটতুম।—বৃন্দা বললেন, যেমন সরাসরি এগোয়।

আমি লিডিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালুম। তিনি ভিজা চোখে বললেন,

“yes, it was so, moving on the belly like a reptile!” সাপ যেমন এগোয়! কিন্তু মনে রাখবেন, উনি একা নন... শত শত ...

বৃন্দা বললেন, দাঁতে একটা বাটি কামড়ে ধ'রে গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে—হ্যাঁ, শূন্যে শূন্যেই নামলুম নেভা নদীতে! ভাবলুম ও'কে নাদিয়ে আমি জল খাব না। কিন্তু জলটুকু আনতে আমার একটু দেরিই হয়েছিল। এসে দেখি উনি বেঁচে নেই!.....মানুষ খেতে পেলে কামার শক্তিও পায়! সেদিন আমি কাঁদতে পারিনি! বরং স্বস্তি পেয়েছিলুম।

এতক্ষণ পরে বৃন্দার চোখ দিয়ে দরদরিয়ে জল গড়িয়ে এল। শ্রীমতী লিডিয়ার ঘন রক্তিম এবং আবেগপ্রবণ চোখ দুটোর চেহারাও আগে আমার জানা ছিল না।

আহারাদির মাঝপথে সেদিন আসন ছেড়ে উঠে শ্রীমতী নাট্যাশা এবং ওই ভদ্রলোকের স্ত্রী সকলকে আনন্দ দেবার জন্য মনোরম ভঙ্গীতে যখন নৃত্য আরম্ভ করলেন, অধ্যাপক শেখোন তখন মহা-রংগে বিশেষ ভঙ্গীতে করতালি দিতে লাগলেন। কিন্তু আমার চোখ দুটো ঘুরছিল এই ফ্ল্যাটের আনাচে-কানাচে। চারিদিকে সুন্দর ছবি, কারপেট ও মূল্যবান সব গহসজ্জা। এ'দের অবস্থা ভাল। শীঘ্রই একখানা গাড়ি কিনতে পারেন। এ'দের ফ্ল্যাটটিতে রয়েছে রেডিয়ো, একটি টেলিভিশন, টেলিফোন, গ্যাস, ইলেকট্রিক এবং তিনটি ঘরের যাবতীয় কাঠের আসবাবসজ্জা,—সমস্ত-সমস্ত এই ফ্ল্যাটের ভাড়া মোট ৯৭ রুবল পড়ে।

প্রশ্ন করলুম, রেডিয়ো-টেলিভিশন দুটি কি ভাড়া করা?

না, ও দুটি আমাদের কেনা। রেডিয়োর দাম খুব সামান্য। টেলিভিশন যন্ত্রটি প্রায় আড়াই হাজার রুবল পড়ে।

আপনাদের সংসার-খরচ কত?

বউটি হেসেই অস্থির। শ্রীমতী লিডিয়া আমার অভব্য প্রশ্নগুলির জন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। আমাকে কথায়-কথায় তাঁর শাসন শুনতে হয়। এবার তিনি সত্যিই চটে গেলেন। তাঁর ধারণা, শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের মূখের ওপর এ-সব প্রশ্ন করা সংস্কৃতিবান ব্যক্তির পক্ষে অনুচিত। মখে শূন্য বললেন, “You're very obstinate!”

বউটি অতি ভদ্র। হাসিমুখে বললেন, কি জানি, আমাদের খরচ বোধ হয় একটু বেশিই হয়ে যায়। ওই ধরুন না, মাথাপিছু গড়পড়তা দৈনিক ১০ রুবল ক'রে পড়ে। তবে কি জানেন, সবাই একসঙ্গে থাকলে একটু সুরাহাও হয়। আমার মা ‘মুন্সের পেনসন’ পান মাসে ৬০০ রুবল। উনি আসছে এপ্রিল মাসে নিজের জন্য একটি ফ্ল্যাট পাবেন। তার ভাড়া সবসম্মত দিতে হবে ১০।১২ রুবল।

আপনাদের কি-চাকর আছে?

হ্যাঁ, ঠিকে ঠিক। তার মাইনে দেড়শ' রুবল আর জলখাবার। ঘণ্টা দুই কাজ ক'রে চলে যায়। যখন কামাই করে, তখন অন্য লোক দেয়।

আপনারা টাকা জমান?

হ্যাঁ,—সবাই ব্যাংক টাকা রাখে। সুদও পাই।—বউটি হাসলেন।

এবার আমি সাহস ক'রে বললুম, আপনার একটি চোখে ক্ষত দেখছি কেন? স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন রামাবান্না নিয়ে?

সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠল এটিকে পরিহাস মনে করে। শ্রীমতী লিডিয়া আত্নানাদ ক'রে উঠলেন, “Ah, terrible! Terrible man you are!”

নাট্যাশা বললেন, ও'র কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। উনি ত' সন্দেহ করতেই পারেন। অন্যায় কিসের?

চারিদিকের হাস্যোল্লাসের মাঝখানে লিডিয়া বললেন, না, এ ভয়ানক অন্যায়। এ-সব কথা ভীষণ আপত্তিজনক। উনি আমাদের বাদির বানাতে চান! মনে রাখবেন, আমরা সোভিয়েট নাগরিক। আমরা হয়ত ঝগড়া করি বাড়ির মধ্যে কখনো কখনো, কিন্তু খামচা-খামচি করিনে!

শান্তভাবে প্রশ্ন করলুম, আপনাদের দেশে কি বাদির আছে? কই, দেখানি ত?

গর্বিতা ও তেজোদ্দীপ্তা শ্রীমতী লিডিয়া এবার উঠে দাঁড়িয়ে আপন দেশের বনজংগল স্মরণ ক'রে সদম্ভে সভাভাষণ করলেন, “yes, there are!”

সবাই আবার কলরোলে হেসে উঠল। অতঃপর হৈ-ঠে ধামবার পর বউটি বললেন, আজ সকালে কারখানায় একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। হঠাৎ লোহা-

গলাইয়ের একটা ফিন্টিক ছিটকে
চোখে লাগে। ডাক্তার এবং ওষুধ
আমাদের হাতের কাছেই থাকে।

সৈদন ফিরবার পথে আমাকে
একটু আড়ালে পেয়ে শ্রীমতী
লিডিয়া খোঁটা দিয়ে বললেন,
terrible person! I can't imagine.
আপনার সকল সম্ভেদ ঘটিয়ে তবে
আমি ছাড়ব।

নাট্যশার কান খাড়া থাকে লিডিয়ার
দিকে। নাট্যশা সহাস্যে আমাকে বললেন,
এবার শক্ত পাল্লায় পড়েছেন আপনি।
সাবধান, লিডিয়া আপনাকে না কমিউ-
নিষ্ট বানিয়ে ছাড়বে!

শ্রীমতী লিডিয়ার মনে অবস্প্রকার
কোনও দূরভিসন্ধি নেই বলেই বোধ
হয় তিনি আবার দম্ভে ফেটে উঠলেন।
জোর দিয়ে দিয়ে তিনি বললেন,
"No, n-never! He belongs to a
capitalist country! We'll co-exist
together!"

আজ রাতেই আমরা লেনিনগ্রাড
থেকে চলে যাব।

সোভিয়েট ইউনিয়ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার
প্রারম্ভে ইংরেজপ্রমুখ কয়েকটি নৌ-
শক্তির আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফলে
এইটি স্থির হয়েছিল। সোভিয়েট রাষ্ট্র
যেন কোনওকালে আন্তর্জাতিক নৌ-
বাণিজ্য করার সুবিধা না পায়। সেই
কারণ, প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাল্টিক
সমুদ্রের পথ এবং কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ-
পশ্চিমে 'বসফোরাস' ও দাদানেলিস
প্রণালী দুটি রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ
ছিল। বাল্টিক সাগরের দায়িত্ব নিয়েছিল
ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক
এবং তিনটি বাল্টিক রাজ্য—এস্টোনিয়া,
ল্যাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়া। এদিকে
তুরস্কের সাহায্যে বসফোরাস ও দাদানেলিসের
পথও ইংরেজ কর্তৃক বহুলাংশে
নিয়ন্ত্রিত। সুদূর প্রাচ্যের সমুদ্র প্রশাসন
করা ছিল জাপান এবং ইংরেজ। সেকালের
মানচিত্র খুললেই দেখতে পাওয়া যাবে—
এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ জোড়া
ইংরেজের 'লাইফ-লাইন' অর্থাৎ প্রাণ-
সূত্র। সেই প্রাণসূত্র-পথের কয়েকটি নাম
শুধু এখানে উল্লেখ করে রাখি। যেমন,
জিব্রাল্টার, মালটা, সুয়েজ, এডেন,
বাহেরিন, করাচী, বোম্বাই, কলম্বো,
কলিকাতা, রেঙ্গুন, সিংগাপুর, হংকং ও
সাংহাই। এগুলি সম্পূর্ণ তার নিজের
সম্পত্তি—এগুলি তার প্রাণ। আজ এদের
চার-পাঁচটি ছাড়া আর সব বেহাত হয়ে

গেছে। সে যাই হোক, এককালে তিনটি
বাল্টিক রাজ্য, অর্থাৎ এস্টোনিয়া, ল্যাট-
ভিয়া ও লিথুয়ানিয়া—এরা ছিল জারের
আমলে রুশ সাম্রাজ্যের অধীনে।
বিলুপ্তির পর এরা রুশ সাম্রাজ্য থেকে
বিচ্ছিন্ন হয়ে 'স্বাধীন' জীবনযাপন
করে। এরা কতকটা মিশ্রিতবর্ণ, কিন্তু
অধিকাংশ রুশ। বিগত বিশ্বযুদ্ধের
প্রাক্কালে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগস্ট
মাসে হিটলার ও স্টালিনের মধ্যে যে
'ইতিহাস-কথ্যাত' এবং 'অদূরদর্শী' অনা-
ক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়, তার একমাত্র
'শব্দ' ফল হল এই, সেই চুক্তির অব-
কাশের মধ্যে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে একটি
'রেফারেন্ডামের' সাহায্যে তিনটি বাল্টিক
রাজ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত
হয়ে যায়। এই 'রেফারেন্ডামের' চেহারাটি
আসামের অন্তর্গত 'সিলেটের রেফা-
রেন্ডামের' মতো অসাধু এবং মূখ্যমন্ত্রী
বরদোলাই-কৃত অদূরদর্শিতার মতো
চেহারা নিয়েছিল কিনা আমি জানিনে।
কিন্তু ভারতের কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের
ঔদাসীন্য এবং বিশেষ কয়েকজন নেতার
স্বার্থপরতার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে
যেমন মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, ভাগল-
পুর এবং পূর্ণিয়া নামক জেলাগুলি
আসতে পারেনি, তেমনি ঘটতে দেওয়া
হয়নি সোভিয়েট ইউনিয়নে। সেখানে
যদি কোনও প্রশাসনিক কারচুপি করা
হয়ে থাকে, তাহলে সেটি স্বীকার। কেন
না, ঘরের লোক ঘরেই ফিরেছে। এই
'রেফারেন্ডাম' হিটলারের উন্মত্ত ক্রোধের
অন্যতম কারণ।

সে যাই হোক, এই তিনটি বাল্টিক
রাজ্য সোভিয়েট ইউনিয়নে আসবার
পর থেকে তারা বাল্টিক সমুদ্র, ডেনমার্ক
পেরিয়ে উত্তর সমুদ্র, এবং ইংলিশ চ্যানেল
পেরিয়ে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের উপর
অধিকারলাভ করেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন
তাদের 'এলোমেলো' ঘরকন্না গুছিয়ে
তোলবার আগে জলপথ নিয়ে তেমন
বিবাদ-বিতর্ক করেননি। আত্মশক্তি
আহরণ করা ছিল তাদের প্রধান কাজ।
হিটলারের পরাজয়ের পর বাল্টিক সম্ভ্র-
লনের বিশেষ চুক্তির ফলে সোভিয়েট
ইউনিয়ন আরেকটি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের
মালিক হল। সেইটির নাম অধুনা কালি-
নিগ্রাড, প্রাজন রুদেনিয়া—এই অঞ্চলটি
পোল্যান্ড এবং লিথুয়ানিয়ার সংযোগস্থলে
অবস্থিত। এই চারটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত
অতি নিরাপদ ও নিভৃতিস্থ বন্দরগুলি
পাওয়ার ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্র ইদানীং
নৌশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। এই

বন্দরপ্রদেশগুলি শীতকালে তুষার-
সমাকীর্ণ হয় না এবং এরা শীতাতপের
অতিশয়তাবিজ্ঞিত। প্রসঙ্গক্রমে এখানে
বলা চলে, আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন ইউ-
রোপ ও এশিয়ার ১৮১৯টি দেশের
রাষ্ট্রসীমানার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এত-
কাল ধরে শুনে এসেছি, গিলাগিট অঞ্চলে
ভারতের সঙ্গে তার সীমানা হল প্রায়
দুশ মাইলের মতো। এটি এখন
তাজিকিস্তান তথা দক্ষিণ পাকিস্তানের
অন্তর্গত। ভারতের এই অনধাৰিত
অঞ্চলটি এখন পাকিস্তানের জবর-
দখলের মধ্যে। সম্প্রতি এই অঞ্চলের
কোনও এক স্থলে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান
গলা উচু করে চীনকে ইশারায় কাছে
ডাকছেন। চীন একটু বাড় তুলে দেখছেন,
পাকিস্তানের বাঁ-হাতে লুকানো আমে-
রিকান অস্ত্র মরচে ধরেছে কিনা!
সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি বইতে
দেখছি, ভারতের সঙ্গে তার সীমানা
কোথাও নেই।

বাল্টিক রাষ্ট্র তিনটির প্রধান নগর-
গুলি হল তালিন, রিগা ও ভিল্‌নিয়াস।
এ তিনটি রাষ্ট্রে মানবের খাদ্যশস্যের উৎ-
পাদন কম বলেই এর জনবিরলতা প্রথম
চোখে পড়ে। অনন্ত আগাছার প্রান্তর,
বালুর ঢিবি, মাঝে মাঝে ওক, বার্চ ও
পাইনের অরণ্য, প্রস্তরাকীর্ণ পার্বত্যভূমি,
অন্তহীন নাবাল জলাভূমি এবং
গোচারণের অবারিত ক্ষেত্র। এই তিনটি
রাজ্যে পশুপালনের অপারিসীম সুবিধা
থাকার জন্য এখানে দুগ্ধ, মাখন, মাংস
এবং অন্যান্য সামগ্রীসহ নানা শিল্প-
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব অঞ্চলে
নানা স্থানে মেরিনের জন্য নানাবিধ কল-
কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন এরা
উন্নতিশীল রাষ্ট্র।

লিথুয়ানিয়া কিন্তু অন্য দুটি রাজ্যের
বার্তিক্রম। এখানে অপেক্ষাকৃত খাদ্যশস্যের
প্রচুর। এখানে এবং বিশেষ করে ল্যাট-
ভিয়ায় মাছ ধরার বৃহৎ কর্মবাস্ততা
দেখতে পাওয়া যায়। এ তিনটি রাজ্যের
জনসাধারণ পরস্পর মিশ্রিত। এস্টোনিয়ার
অধিবাসীগণকে বলা হয় 'এস্ট' এবং
ল্যাটভিয়াকে 'লেটস'—কিন্তু আসলে
এরা পোল, ইহুদি, রুশ—ইত্যাদি
মেলানো। সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও
রিপাবলিকে জাতি বা জাতীয়তা বা
জাতি-স্বাভাব্যতার উপর কোনও জোর
দেওয়া হয় না। সব নদী যেমন সাগরে
মিলে গিয়ে জলের স্রাব হয় সোনা,
তেমনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের সব জাতি

মিলেছে এক জনসম্মুখে—যেটার স্বাদ হল কমিউনিজম! পৃথিবীর কোনও দেশ এমন ‘একঘরে’ নয়, এমনভাবে কোনও রাষ্ট্রের ভাগ্যে এমন সর্বব্যাপী ‘জাতি-চ্যুতি’ ঘটেনি। সোভিয়েট শিশুর সামনে ইতিহাসের যে পাঠ্যতালিকাটি ধরা হয়, সেটি কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দির সোভিয়েট ইতিহাস! লেনিনের অভ্যুত্থান হল তার প্রথম পাঠ। রুশ সাম্রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস সোভিয়েট শিশুর কাছে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ওটা যাদের দরকার তারা গিয়ে বসুক লেনিন লাইব্রেরীর ঐতিহাসিক গবেষণাগারে। সোভিয়েট ছাত্রর কাছে কমিউনিস্ট সমাজের জন্ম-বৃত্তান্তই বড়, পুরনো কালের দিকে তার চোখ না পড়লেও চলবে। ইতিহাসের ছাত্র ছাত্রী সোভিয়েট ইউনিয়নে কম। আমি নিজে ওদেশে স্লাভ-তাত্ত্বিকের আদি ইতিহাস খুঁজে পাইনি। আধুনিক, বর্তমান, নতুন এবং বৈপ্লবিক—এই কয়েকটি শব্দের অতিশয় ব্যবহার অনেক সময়ে মনকে পীড়িত করে। বাপের পরিচয় নিতে গেলে ছেলের কীর্তি—সর্বগ্রাে শূন্যে হবে, এটি যেন কৈমন-কৈমনি। ওরা জন্মস্থানত অপেক্ষা কর্মবৃত্তান্তের বেশি : অনুরক্ত, জ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞান শূন্যে চায় বেশি, এবং জ্ঞানবৃত্ত প্রবীণের মনীষা অপেক্ষা যৌবনের জড়-কীর্তি ওদের কাছে বেশি প্রিয়। ওরা কেবল ‘কাঁচা মাটির’ তাল চায়, তাতে ছাঁচে পুতুলগড়ার সুবিধা। বোরিস প্যাটেরনাককে ওরা বরদাস্ত করল না, কিন্তু তরুণ অস্ট্রেলিয়াকে মাথায় তুলে নাচল। ‘ডাঃ জিভাগো’ ছাপা হল না, কিন্তু ‘হাউ দি গ্টল ওয়াজ’ টেমপাড’ এক-কোটি কুড়ি লাখ বিক্রি হয়ে গেল।

উরল পর্বতের পশ্চিম পার্শ্ব হল হোয়াইট রাশিয়া এবং তার পূর্বদিক সাইবেরিয়া। উরলের দক্ষিণ প্রান্তভূমিতে যেখানে হোয়াইট রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার সংযোগ-স্থল সেটি আমাদের ভ্রমণকালে কিছু দেখে এসেছি। উরল পর্বতশ্রেণী যথেষ্ট উচ্চ নয়। একদিকে যেমন এটি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে প্রাচীরের কাজ করে এসেছে, তেমনি এই পর্বতশ্রেণীর গর্ভস্থিত অন্তহীন বিভিন্ন খনিজ সম্পদ চিরদিন ধরে রাশিয়াকে বিশৃঙ্খলী করে রেখেছে। উরলের পশ্চিমে যে অংশটা হোয়াইট রাশিয়ার উত্তর পূর্বপ্রান্ত—সেখানকার হাজার হাজার বগমাইলের মধ্যে মানুষের বসতি নেই বললেই হয়। উরলের পূর্বপারে যেমন ‘অব’-নদী চলে গিয়েছে দক্ষিণ থেকে

উত্তরে মেরুসাগরের দিকে, তেমনি উরলের পশ্চিম পর্বতের থেকে উদ্ভূত হয়ে ‘পেচোরা’ নামক এক বিশাল নদী অগণিত শাখা-প্রশাখা নিয়ে আদি-অন্ত-হীন মহারণের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ওই একই উত্তর মেরু-সাগরে। এই বিরাট ভূভাগের নিবিড় অরণ্যভূমিতে কোনও প্রকার চাষ-আবাদ নেই, এবং ‘তুন্দ্রা বলয়ের’ নীচে এটি আগাগোড়া অধিকাংশকাল তুষারাকীর্ণ থাকে। সম্রাটের আমলে এই ভূভাগে স্বভাব-দুর্ভাগ্য এবং রাজনীতিক অপরাধীদেরকে সাইবেরিয়ার বন্দনে পঠানো হতো। এই অঞ্চলে ‘পেচোরা’ নদীর একটি শাখার নাম ‘উসসা’। এটি পার্বত্য এবং বন্য নদী। এই বৃহৎ বনাভূমি চিরদিন ব্যাঘ্র, শেভ-ভল্লুক ও অন্যান্য অতি হিংস্র জানোয়ারের অবাধ লীলাক্ষেত্র এবং শিকারীগণের পক্ষে দুঃসাহসিক অভিযানভূমি। ‘উসসা’ নদীর আশেপাশে যে ব্যাঘ্রগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়, তাদের নাম ‘উসসার’ বা ‘উসসার’। কিছুকাল পূর্বে মিঃ খ্রুশ্চভ এই নামাঙ্কিত দুটি বাঘ উপহার দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুকে। শ্রীযুক্ত নেহরু খ্রুশ্চভকে উপহার দিয়েছিলেন একটি ভারতীয় হস্তী। ব্যাঘ্র হল হিংসার প্রতীক, হাতী ঐশ্বর্য ও সম্পদের বাহন। আমরা অনেককেই হস্তীদান করি এই শ্রুভেজ্ঞা নিয়ে—“তোমাদের দেশ সম্পদে পূর্ণ থাক।”

অপর জাতির সম্পদের চেহারা দেখে যতখানি খুশী হওয়া উচিত আমি ততখানিই হচ্ছি। কিন্তু সেই সম্পদের বর্ণনা আমার ভায়েরীতে নেই। আমি রিপোর্টার নই। এ রচনা সোভিয়েট সম্পদের পরিচয়পত্র নয়। আমি ভারতীয় কোনও রাজনীতিক দলের কেউ নই, কিন্তু বামে-দক্ষিণে বহু ব্যক্তি আমার প্রীতিভাজন। ভারতীয় কংগ্রেসের ছিটে-ফোঁটা প্রসাদ পাবার লোভে যারা পোষা মেন-বিড়ালের মতো পায়-পায়ে ঘোরেন, আমি তাঁদের কেউ নই। কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেসের সর্বমানবিক লোক-কল্যাণের আদেশ আমি চিরদিন অনুপ্রাণিত। সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণকালে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি, বিনা রক্তপাতে বিনা বিপ্লবে, বিনা হিংসা ও হানাহানিতে বিগত পনেরো বৎসর কালের মধ্যে ভারতে যে বিপুল পরিমাণ সংগঠনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসে এক পশ্চিম জার্মানী ছাড়া সেটি

অন্য দুলভ। জনৈক রুশ বন্ধুর সঙ্গে মস্কোতে এই নিয়ে আলোচনা চলছিল। উদ্বেলক বললেন, “ভেবে দেখুন, আমরা সময় পেলাম কোথায়? ১৯১৭ থেকে ১৯২৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিহিংস্র, অন্তর্-বৃন্দ, গৃহবিদ্বেষ, দুর্ভিক্ষ-মহামারী, এবং জাতীয় পরিকল্পনার অভাব। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত মাত্র ১১ বছর একটু অবকাশ। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত স্বদেশরক্ষার যুদ্ধে আমরা সর্ব-বলান্ত। যা গড়েছিলুম, তার অধিকাংশ চুরমার হয়ে গেল। ৮ কোটি ফ্লোর্ক হিটলারের হাতে বন্দী ছিল তিন বছর। তার পর থেকে আবার ভাঙা-যার জোড়া দেওয়া চলছে। আমাদের এই ‘মহাদেশ’ গড়ে তোলাবার জন্য মোট ২২ বছর নিশ্চিন্ত সময় হাতে পেরেছি।”

উদ্বেলক পুনরায় বললেন, “এমন ইতিহাস কোথাও শুনেননি, আমরা যখন আমাদের রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা করার সময় পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছিলুম, তখন পাশ্চাত্য পৃথিবীর চৌদ্দটি রাষ্ট্র গায়ের জোরে আমাদের ঘরে ঢুকে সব তচনত করছিল? এমন দেশ আজ পৃথিবীতে কোথাও আছে শুনেননি, যে দেশ মোটে আঠারো-উনিশটি পররাষ্ট্রের স্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নন? শত্রু ভাবেন উ, আমাদের রাষ্ট্রসীমানারক্ষার কী বৃহৎ দায়িত্ব? আজ আমাদের সর্ব-পেক্ষা প্রধান দুটি কাজ সামনে দাঁড়িয়ে। প্রথমটি হল, কায়মনোবাক্যে সর্ববৃত্ত-করণে একাত্ম আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা চাই অনাহত শান্তি বিরাজ করুক সমস্ত পৃথিবীতে। সেই কারণে শান্তিপ্রচারের সর্ববৃহৎ প্রচারণাস্থ প্রতিষ্ঠা করছি আমাদের দেশে। দ্বিতীয়টি হল, আমরা আমাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক শক্তি এবং প্রতিভা প্রয়োগ করে এমন ধারণাস্থ প্রস্তুত করতে চাই যেটির ধ্বংসশক্তি মানব ইতিহাসের কোনও পৃথক শোনা যায়নি এবং যাবেও না।”

আপনারা কি ক্যাপিটালিস্ট দেশ-গুলিকে ওই ধারণাস্থের দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে চান?

“একেবারেই না।”—উদ্বেলক বললেন, “আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে এবার ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাই। আপনাকে বলে রাখি, কখনও আমরা বৃহৎ বাধা না,—যদি আমাদের কাছে

সর্বাপেক্ষা যুগ্ম, সর্বাপেক্ষা আতঙ্কজনক, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শত্রু,—কিন্তু সেই যুদ্ধ আবার এসে যদি আমাদের টুটি টিপে ধরতে চায়, আমরা এমন সর্বনাশা আঘাত হানব যার জন্য বিংশ শতকের মানবসভ্যতা ভরে কেঁপে উঠবে। সেই হবে আমাদের আত্মরক্ষার সর্বশেষ সংগ্রাম।”

তারপর?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, “তারপর? তারপর দেখবেন, আমাদের এই সোস্যালিস্ট গভর্নমেন্টের অনুকরণে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে নতুন মানব-বংশের অভ্যুত্থান। প্রত্যেকটি তাদের ঘর ভেঙ্গে পড়েছে সর্বত্র। তার বদলে একটির পর একটি সোস্যালিস্ট সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।”

পূরনো উপকথার সেই দানবের সামনে ক্ষুদ্র ‘হারিকউলিসের’ মতো আমি মূৰ তুলে দাঁড়িয়েছিলুম। এবার একটি সাহস করে প্রশ্ন করলুম, আপনি কি আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী—এদেরকে ধ্বংস করার নজ্জা আঁকছেন?

মিসেস রুডভেল্ট সম্প্রতি সোভিয়েট দেশ পরিভ্রমণ করে গিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন, রুশরা নাকি প্রাণ খুলে হাসে না! ওরা কেমন যেন একটু গোমড়া মতো। কিন্তু আমার প্রশ্নে এই ইংরেজি-জানা রুশ ভদ্রলোক ম্বল্ল সুন্দর হাসি হাসলেন। বললেন, “আপনি আমাদের দেশের যে কোনও গ্রামে ও শহরে যে-কোনও ব্যক্তির কাছে যান, যে-কোনও ঘরে গিয়ে ঢুকে এই প্রশ্নটি করুন—দেখবেন—আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মান জাতির প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আমাদের! তাদের নাম করলেন তাঁরা কেউ আমাদের বন্দাগুর, কেউ মন্দাগুর, কেউ শিক্ষাগুর, কেউ বা কর্মগুর।”

আমি এবার যেন ভয়ে ভয়ে কেঁদে উঠলুম। বললুম, ওঁদের নিকেশ করার পর আমাদের রাখবেন ত?

ভদ্রলোক আমার দিকে একবার তাকাল। তারপর উচ্ছ্বাসিত হাসি হেসে—কিন্তু বলিষ্ঠ বাহুতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “আমরা চিরদিন আপনাদের বন্ধু এবং শত্রুভাব্যম্বী থাকতে চাই।”

আমি বললুম, তবে কেন আপনাদের পাড়ার সোক আমাদের হিমালয়ের উপর

উঠে ছুঁতে বাজি খেলে ভয় দেখাবে? আমাদের ঘর-দোরে জামা-কাপড়ে যদি আগুন লেগে যায়? কিছ, বলতে পারেন না আপনারা?

আমার করুণ কণ্ঠ শুলে ভদ্রলোক মনে করলেন, আমি যাকি ভয়ানক পরিহাস করছি। তিনি ওই কঠিন আলিঙ্গনের মতোই আবার মধুর হাসি হেসে উঠলেন।

আমি নোহুড়ীম নই! কিন্তু ধূতরাঙে সতাই অন্ধ ছিলেন!

উত্তর মেরু-বলয়ের মধ্যে পেচোরার তুষার নদী ও জনশূন্য প্রান্তরের পশ্চিমে দেখতে পাওয়া যায় ‘মেনজেন’ ও ‘দিভিনা’ নদীর দিগন্তজোড়া সমভূমি। এই দুটি বৃহৎ নদী উত্তরে প্রবাহিত হয়ে শেভের্সাগরে পড়েছে। ‘দিভিনা’র মোহানায় রাশিয়ার প্রসিদ্ধ ‘কান্ট-শহর আর্কাংজেলস্ক’। এখানে প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের প্রধান কাজ হল, রাশিয়ার সুবৃহৎ বন-সম্পদকে কাজে লাগানো। লেগুন, ওক, বার্চ ইত্যাদি কাঠের বড় বড় কল-কারখানা এই মেরু-নগরকে চিরদিন বিস্তারিত করে রেখেছে। সম্প্রতি ‘আর্কাংজেল’ নগরী হয়ে উঠেছে মেরুলোকের একটি প্রধান ভোরশ্বেয়ার এবং মেরু-বিজ্ঞানের একটি প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু সোভিয়েট দেশের অরণ্য-ভূমি ওখানেই শেষ হয়নি। পূর্ব-পশ্চ চলে গিয়েছে উরল পেরিয়ে ‘তুন্দ্রা’ ও ‘তাইগা’ রেখা নিয়ে সুদূর সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্য। পশ্চিমে সেই বিশাল অরণ্য-লোক ‘কোলা’, ‘কারেলিয়া’ ও ‘লেনিন-গ্রাড’ হয়ে বালটিক ইউনিয়ন এবং বেলো-রাশিয়া পেরিয়ে উক্রাইনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই অরণ্যসীমানার দৈর্ঘ্য চার থেকে পাঁচ হাজার মাইল। সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভের সম্পদের সঠিক পরিমাণ কি প্রকার, সেটি সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্তব্যারগণ এখনও জানতে পারেনি। ওরা ‘কাস্ট’ আর ‘হাউজি’ দিয়ে বিশেষ শতাঙ্গীটা চালিয়ে নেবে। একবিংশ শতাব্দীতে ওঁদের ফ্যাগে হয়ত আর দুটো হাতিয়ার-আঁকা হবে। একটি হবে গাঁথিত, অন্যটি কেদাজ। সোভিয়েট রাষ্ট্রের ডানদিককার মহাদেশাংশ এখনও খুঁড়ে দেখা হয়নি। সেই বিশাল ভূখণ্ডের মাটির নীচে ‘সোহরের ঘড়ার’ সংখ্যা কত কেউ জানে না! বিভীষণ আপন ভাগ্যের জোরে পেলে পেছে ফ্রান্স একটা মাছ,—সেটা সে

নিরীবিালিতে বসে ‘উপভোগ’ করতে চান,—অশান্তি চায় না!

বালটিক রাজ্যগুলির পশ্চিমে এবং পোল্যান্ডের উত্তর-পূর্বে একটি ক্ষুদ্রকণ্ঠ সোভিয়েট রিপাবলিক একপ্রকার গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ওটা যেন আপন মনে নিরীবিালিতে বসে বালটিক সমুদ্রের ঢেউ গুনছে। ওটির নাম ক্যালিনিগ্রাড। এটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। যেমন আমাদের দেশে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হল মণিপুর বা আগরতলা। লেনিন, ক্যালিনি, ভর-শিলভ, জালিন এবং হয়ত বা আরও দু-একজনের নামের সঙ্গে ‘গ্রাড’ শব্দটি যুক্ত করে এক-একটি সুবৃহৎ নগর পুন-নির্মাণ করা হয়েছে। তফাৎ এই শব্দ লেনিনের মৃত্যুর পর দেশবাসীর ম্বতঃ-উৎসারিত অনুরাগ পেট্রোগ্রাডের নামটি বদলিয়ে লেনিনের নামাঙ্কিত করেছিল। কিন্তু বাকি তিনজন বোধ করি নিজেদের সম্বন্ধে দেশবাসীর ভবিষ্যৎ অনুরাগের উপর আস্থা রাখতে পারেননি। সেই কারণে সম্ভবত ইতিহাস থেকে হচ্ছে যাবার অশঙ্কায় আপন আপন জীবনীকালের মধ্যেই একেকটি শহরের সঙ্গে নিজ নিজ নাম যুক্ত করেছেন। তাঁরা যে আশঙ্কা করেছিলেন, সম্প্রতি সেইটিই আরম্ভ করেছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে যে-নগরটি আত্ম-রক্ষার জন্য যুদ্ধের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গ্রন্থা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, সেই ‘জালিনিগ্রাড’ নামটি কেটে দিয়ে তার বদলে ‘জলগা-তীরবর্তী’ নগরটির নতুন নাম করা হয়েছে, ‘ভলোগারড’। এটি ভাল কি মন্দ হয়েছে সেটি আমার বলবার অধিকার নেই। কিন্তু বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল ধরে সমগ্র পৃথিবীতে জালিনের ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ধনিত হয়ে এসেছে, আধুনিক সোভিয়েট কৃৎপক্ষ সেই আগাগোড়া প্রমাণসিদ্ধ বিদ্রোহ নিঃশব্দে স্বীকার করে নিয়ে জালিনের নামটিকে এবার নিশ্চিহ্ন করে দিলেন! আজ বৃহত্তে পারা যাচ্ছে, ইউরোপ, ইংল্যান্ড বা আমেরিকা জালিন সম্বন্ধে কোনওদিন ভুল করেননি; এবং এটিও বৃহত্তে পারি, সোভিয়েট ইউনিয়নের নিরীহ ও ভদ্রজীবন কি প্রকার বেদনা ও যন্ত্রণার মধ্যে পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল অতিবাহিত করেছে! সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রথম প্রবেশকালে জালিন-রাজত্ব সম্বন্ধে যে ভয় ও ভাবনা নিয়ে গিয়েছিলুম, সেটি যে ভীতিহীন নয়, সোভিয়েট পার্টি কংগ্রেসের ২২তম

অধিবেশন তার প্রমাণ। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে রাজনীতির ক্ষেত্রে এত বড় ডিগবাজির উদাহরণ আর কে-থোও নেই। ইউরোপের সর্বশেষ দানব হিটলারের অপমৃত্যুতে গণতন্ত্রী জগৎ স্বাধীনতার নিঃশ্বাস ফেলোছিল। কিন্তু সেখানে তিনি মৃত্যুর পর আপন জাতির নিকট অপমানিত হননি! অথচ 'হিটলার-বিজয়ী' জেনারালিসিমো যোসেফ স্টালিন সোভিয়েট জাতিগুলির হাত থেকে যে অপমান এবং কলঙ্কের বোঝা নিয়ে গেলেন,—সভ্যতার ইতিহাসে এর উদাহরণ বিরল।

উত্তরাপথের ভ্রমণ শেষ করে আবার মস্কোয় ফিরে এলুম। সোভিয়েট ইউনিয়নে আমার থাকার মেয়াদ শেষ হয়েছে। বোধকারী চক্ষু লজ্জার খাতারে আর এক সপ্তাহকাল বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু পাসপোর্টে লিখিত সেই তারিখও শেষ হয়ে এল। আর মাত্র তিনদিন বাকি। ভারতীয়রা পাঁচ-সাতজন ছাড়া আর সবাই এক এক দলে চলে গেছেন। শেষ দলটির সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে। আমরা প্রথম এসে 'লেখক-সংঘের' অতিথি ছিলাম। গত সপ্তাহটা ছিলুম 'অ্যাফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটি কমিটির' অতিথি। এখন আমি কার নিমক খাচ্ছি, আমি জানিনে। সম্ভবত আবার লেখক-সংঘই আমাদের দায়িত্ব নিয়েছেন। যাঁদের নুন খাচ্ছি, তাঁদের গুণগান করতে আমি বাধ্য কিনা, সেটি শোনবার জন্য এখানে-ওখানে কান পেতে ছিলাম। একটা সন্দেশ এখনও এড়াতে পারিনি—এখানে এসে অনেকে নাকি 'ইনজেকশন' নিয়ে যায়! কিন্তু আমি উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ তনয়,—পাঁচ হাজার বছর ধরে আমার শিরার রক্ত বিশেষ জরো-জরো! বাইরের বিষ আর ধরবে না।

হঠাৎ সেদিন প্রাতঃরাশের টেবলের সামনে এক বাঙালী ভদ্রলোককে দেখে উৎসাহিত হলাম। তিনি ভারত গভর্ণ-মেন্টের পক্ষ থেকে টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের ব্যাপার নিয়ে সোভিয়েট কন্ট্রোলের সঙ্গে আলোচনার জন্য এসেছেন। তাঁর নাম শিশিরকুমার বসু। আমার নামটির সঙ্গে তিনি পরিচিত থাকার জন্য কাছে এসে বসলেন। কমিউনিষ্ট দেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় একেবারেই নেই। তাঁর নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আলাপ ঘনিষ্ঠ হল। কিন্তু শ্রীমতী লিডিয়ার সামনে বসে তাঁর বোধগম্য ভাষাই ব্যবহার করি ছিলাম।

অতঃপর শেষের দিকে শ্রীমতী খুশী হয়ে বললেন, ভারতীয়ের মধ্যে এমন বর্ণনা এর আগে শুনিনি! সোভিয়েট ইউনিয়নের নতুন পরিচয় আপনার মুখে শুনলাম।

এই দিনটির দু' বছর পরে বোম্বাই সাহিত্য সম্মেলনে একদিন বসেছিলাম, হঠাৎ পিছন থেকে এসে শিশির বসু মহাশয় আমাকে তুলে নিয়ে বোম্বাই শহর থেকে একুশ মাইল দূরবর্তী 'ভিক্টোরিয়া' নামক একটি ছোট শহরে যান। সেখানে গিয়ে দেখি এই অমায়িক ভদ্র-লোকটির আপ্রাণ পরিগ্রহের ফলে এক বিশাল পার্বত্য জলাশয়ের চারিপাশে অধুনা-প্রসিদ্ধ সুবিশাল 'বোম্বাই টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট' গড়ে উঠেছে। এটি খলপূর প্রমুখ ভারতের চারটি ইনস্টিটিউটের অন্যতম। এর জন্য তখন পর্যন্ত খরচ পড়েছে প্রায় দশ কোটি টাকার মতো। কিন্তু তার মধ্যে সড়ে আট কোটি টাকারও বেশী দিয়েছেন সোভিয়েট ইউনিয়ন। শ্রীযুক্ত শিশির বসু মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, অর্থাৎ ডাইরেক্টর। সেদিন শিশিরবাবু তাঁর ছেঁড়া জামা ও ছেঁড়া জুতো-মোজা নিয়ে আমাকে আগাগোড়া সব ঘুরিয়ে দেখা-ছিলাম। বলা বাহুল্য, এই প্রতিভাবান ও করিৎকর্মী বাঙালীর গৌরবময় কীর্তিকলাপ দেখে আমি সেদিন মুগ্ধ মনে ফিরে এসেছিলাম।

শিশিরবাবুর সঙ্গে গল্প-গুজব করার পর প্রাতঃরাশের টেবিল ছেড়ে যখন উঠলাম, তখন শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, চলুন আর দেরি নয়।

আমি সেদিন সকালে জগৎপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক আন্তন চেকভের বৃন্দা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম।

বাইরে শীতাত দিন। আকাশ মেঘলা। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। আমি গিয়ে চড়িয়ে নিলাম শ্রীমান ননী ভোমিকের কাছে ধারকরা ওভারকোটটি। এটির নীচে আমার গরম কোট, তার নীচে বন্ধুবর বিনয় রায়ের ফুলহাতা সেরেটার, তার নীচে আমার সূতি শার্ট, তার নীচে ফুলহাতা গেঞ্জি! গেঞ্জির নীচে বেটির নাম গারচম, সেটিতে শীতের কাঁটা দিচ্ছিলাম ক্ষণে ক্ষণে। আমার মাথায় ছিল একটি টপি। সেটি মাথায় দেওয়া এবং মাথা থেকে নামানোর মাঝখানে বহুবার হারাতে বসেছিলাম। কিন্তু

সদাসতক দোভাষীর খরদৃষ্টির জন্য তেমন ঘটনা ঘটেনি।

ট্যাঞ্জির মধ্যে বসে এক সময় লিডিয়া বললেন, ওরা তাঁরই আপনায় যাওয়া হতে পারে না।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম কেন?

আপনাকে বেঁচে দেওয়া হবে না!—লিডিয়া চুপ করে গেলেন।

ভয়ে আমার গায়ের মধ্যে আবার যেন শীত করে উঠল। কণীকণ্ঠে আমি বললাম, দেখুন, আমার খুব ছোটবেলায় আমার বন্ধু বড়লোক সুবোধ যখন ইংকল থেকে ফিরে লুচি আর হালুয়া ছড়াছড়ি করে খেত, আমি সেদিন সময় মতো চারটি মন্ডি-মন্ডিকিও পেতুম না! সেটা অবশ্য রুশ বিশ্লেষকের কয়েক বছর আগে! আমার বিশ্বাস, আমি তখন থেকেই 'কমিউনিষ্ট'। এটা শুনলে কি আপনারা আমাকে ছেড়ে দেবেন?

লিডিয়া বললেন, না।

অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে এক সময় প্রশ্ন করলাম, এখানে প্রত্যেক দোভাষীই কি পুলিশের লোক?

শ্রীমতী জবাব দিলেন, আপনার কথার বাকগুলি অতিশয় আপত্তিকর। আপনাদের সবাইকে নিয়ে আমরা যখন আনন্দ করছি, আপনি তখন কথায় কথায় আমাদের খোঁচা দিচ্ছেন! আমরা কমিউনিষ্ট মনে রাখবেন। আমরা পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল। আমরা কায়মনোবাক্যে অতিথিদের সেবা করি। আপনি শুনলে খুশী হবেন, এ বছর মোট ছয় লক্ষ বিদেশী সোভিয়েট ইউনিয়নে এসেছেন! তার মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ হলেন আমেরিকান। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান অর্গণ্ড। আপনি বোধ হয় এখনও খোঁজ করেননি, মিঃ খুদুচভের আমল আমাদের পক্ষ বিশেষভাবে গৌরবের আমল! গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় ঘরে জিজ্ঞেস করুন যে, এদেশে কী গভীর শ্রদ্ধা ভারতের প্রতি এবং আপনাদের প্রধান-মন্ত্রীর প্রতি!

মিষ্টকণ্ঠে বললাম, কিন্তু মিঃ নেহরু ত কমিউনিষ্ট নন?

শ্রদ্ধারস্তম্ভবর্ণা মেমসাহেব এবার অনুগ্রহপূর্বক হাসলেন। বললেন, এই কথাটি আপনার চাতুরিতে ভরা! মিঃ নেহরু আমাদের পরম বন্ধু, কেন না

উনি শান্তির অগ্রদূত! আপুনি বোধহয় খবর রাখেননি, ১৯৫৫ সালে ছয়-লক্ষ সোভিয়েট নর-নারী ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে নেহরুকে দেখবার জন্য ছুটে এসেছিল!

এবার যেন একটু সাহস পেয়ে বললুম, সৌদীন কে কে ফুলের তোড়া কেননি, আপনারা কি তাদের নাম টুকে রেখেছিলেন?

শ্রীমতী লিডিয়া চলন্ত গাড়ির মধ্যে একবার আমার দিকে তাকালেন। তারপর হেসে উঠে বললেন, "ah, what a naughty friend you are." কথাটা শুনে রাখুন। অনেকেই আসে, হৈ-ঠে আমোদ আহ্লাদ করে বাড়ি ফিরে যায়। আপুনি একটু অন্যরকম,—সকলেই আপনাকে ভিন্ন চক্ষে দেখেন! আপুনি বিশেষ শ্রদ্ধা পেয়েছেন এখানে। আপনাকে এখন আমরা যেতে দেবো না! আপনার যাবার আলোচনাই ওঠেনি!

মস্কোর একটি রাজপথের এক কোণে একটি গিলির কোণে এসে গাড়ি থামল। যেমন বহুক্ষেত্রেই দেখেছি, আধুনিক রাজপথের চাকচিক্যময় ও শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকার ঠিক পাশে অথবা পিছনে—প্রাচীন মস্কোর পুরনো বিস্তৃত বাসিন্দা চোখে পড়ে। পুরাকালের বাড়ির অশিষ্টাংশে নানা জঞ্জাল, নানা নদমা চাপা দেওয়া। অনেক ক্ষেত্রে নীচের তলাটা পরিত্যক্ত, নড়বড়ে পুরনো কাঠের সিঁড়ি কোথাও, কোথাও বা গৃহস্থের বাস সামনের দিককার বড়পিসি ঘরদোর ছাড়িয়ে দূর অন্দরমহলের দিকে। এমনি একটি সাবেক কালের বড় বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে দৈত্যলায় আমরা উঠে গেলুম। ইলেকট্রিকের বোতাম টিপবার পর এক বৃন্দা বেরিয়ে এলেন, এবং শ্রীমতী লিডিয়া তাঁর সঙ্গে রুশ ভাষায় মিনিটখানেকের জন্য যে আলাপ-টুকু করলেন, তার মধ্যে মাত্র তিনটি শব্দ বহুব্যবহার নানা জায়গায় শোনার ফলে আমার বোধগম্য হল। সেগুলি হচ্ছে, "ইন্দিজ্কা পিসাটিয়েল্" "সানিয়াল।" অর্থাৎ ভারতীয় লেখক সান্যাল! অনেক সময় "পিসাটিয়েল্" উচ্চারণটির মধ্যে "পিশাচ" শব্দটি কানে এসে ঠেকত এবং নিজের সম্বন্ধে ধারণাটা একটু গুলিয়ে যেত।

একটি অতি সুসজ্জিত ঘরে এসে আমরা বসলুম। এটি পরলোকগত পরম রসপ্রসূতা আন্তন চেকভের মস্কো বাস-

কালীন বৈঠকখানা ছিল। আমার তরুণ বয়সের সাহিত্যধর্মের মধ্যে চেকভকে অন্যতম গুরুস্থানীয় বলে মনে করতুম, এবং 'কণ্টিনেন্টাল' সাহিত্যে রুশ সাহিত্যের দিকপালগণকে সর্বাপেক্ষা বলে বিশ্বাস করতুম। আন্তন চেকভ এবং ফরাসী প্রতিভা মোপাসাঁর মধ্যে কে বড় এবং আঙ্গিক বিবেচনার দিক থেকে কে প্রধান—সেটি আজও বিচার করি।

ঘরের মধ্যে একটি বড় জানলা রাসতার দিকে খোলা। তারই পাশের দেওয়ালে একখানি নাতিবৃহৎ চেকভের ছবি টাঙানো। চেকভ মারা গিয়েছেন যক্ষ্মারোগে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে। কিন্তু তাঁর দাড়ি দেখে মনে হয় বয়স যেন কিছু বেশি। ঘরের ভিতরটিতে মেহগনি কাঠের আসবাব সর্বত্র, মেঝের উপর মূল্যবান একখানি কাপেট। উঁচু দেবাজের উপর সোনালি বর্ণের একটি ঘড়ি, পিছনে একটি প্রশস্ত আয়না। চীনা কাঁচের পতুল এবং অন্যান্য 'কিউরিয়ো'গুলি পরিপাটি করে সাজানো। প্রত্যেকটি কেদারা মোটা কালো গদিতে আঁটা। এখানে ওখানে বই কাগজের বাঁশল সুবিন্যস্ত করে রাখা। অন্য দেওয়ালগুলিতে বড় বড় দেশ কবি, ঔপন্যাসিক এবং মনীষী'র ছবি ঝুলছে। আসবাবপত্র বেড়ির মধ্যে সোভিয়েট ডিজাইনের কে ও সুন্দর সামগ্রী নেই। প্রত্যেকটিই দেশ সুপ্রাচীন রুশীয় আভিজাত্যের পরিচয় দিচ্ছে। জানলা-দরজার সুন্দর লেসযুক্ত পর্দা-গুলিও যেন একালের নয়। চেকভের নিজ হস্তের সংগৃহীত এইসব মূল্যবান গৃহসজ্জাগুলির দিকে আত্মবিস্মৃতভাবে চেয়েছিলুম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার চোখের সামনে থেকে কে যেন 'সাম্প্রতের আবরণটি' সরিয়ে নিয়েছিল। আমি স্তম্ভ, মূগ্ধ এবং সমাধিস্থভাবে বসেছিলুম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার পিছনের দরজাটি খুলল, এবং সঙ্গে

সঙ্গে যে পল্লকেশিনী বৃন্দা শান্ত ও সংযত হাস্যে ভিতরে এসে প্রবেশ করলেন, তাঁকে দেখামাত্রই আমি চমকিত হয়ে গেলুম। অদ্যাবধি সোভিয়েট ইউনিয়নে এমন প্রশস্ত, বলিষ্ঠ এবং রাজকীয় আভিজাত্যপূর্ণ বৃন্দা মহিলাকে আমি দেখিনি! চওড়া চোয়াল, আকর্ষণবিশ্রান্ত শান্ত চক্ষু, বিস্তৃত বক্ষ, লেসযুক্ত কালো মখমলের গাউন, সুন্দর শাদা চুলের রাশি, পাকা হাত দুখানার বড় বড় আঙ্গুল,—তাঁর সেই রাজ-মহিমাম্বিত আবির্ভাবের দিকে তাকিয়ে আমার চোখের সামনে দিয়ে যেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি এবং শিশির-কুমার ভাদুড়ীর জননীর দেহচ্ছায়া সরে যেতে লাগল! আমি সহসা ভারতীয় ভঙ্গীতে নতজানু হয়ে তাঁর জানু স্পর্শ করে অভিবাদন জানালুম। তিনি হাসিমুখে আমার চিবুক ধরে তুলে সামনে বসালেন।

মাদাম চেকভ ওরফে শ্রীযুক্তা আল্‌গা কেনিপার রুশ ছাড়া অপর কোনও ভাষা জানেন না। সুতরাং শ্রীমতী লিডিয়া রইলেন মাঝখানে। আমি বললুম, আজ আমি পরম গৌরব বোধ করছি আপনার দর্শনলাভ করে। আজকের এই দিনটি আমার স্বপ্নের অতীত ছিল! ভারতের আন্তরিক শ্রদ্ধা আপনাকে জানাতে এসেছি!

মাদাম বললেন, সুন্দর ভারত আমাদের কাছেও আনন্দ-কম্পনার জগৎ। তুমি এসেছ সেই দেশ থেকে তার মধুর আচরণ সঙ্গে নিয়ে। তোমাকে আশীর্বাদ করি!

'আমি বললুম, আপনার নম্রই বছর পরস হয়েছে এটি মনেই হয় না।

মাদাম হাসিমুখে আমাকে শূধরে দিয়ে বললেন, ওর পরে আরও দর্শনীয় যোগ কর। আমি আর লেনিন মোটাগুটি এক বয়সী। এখন দিন গুনছি!

প্রশ্ন করলুম, বর্তমান কাল আপনার কেমন লাগছে?

তিনি আমার দিকে একবার



আরজিত মিত্র

১৯১-নতুনমার্গ স্ট্রীট • কলিকাতা

তাকালেন। পরে বললেন, এই ভাষা, হাসিমুখেই বিদায় নিয়ে যেতে পারব।

লিডিয়া এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনি আর একটু গলা তুলে কথা বলুন। উনি কানে একটু কম শোনেন। আপনার গলার আওয়াজটি শুনে ওর ভালো লেগেছে।

আমি যেন মহাপ্রাচীরের আশ্রয়ের নীচে জারগা পেয়েছিলাম। পুরাকালের রুশীয় সভ্যতা, স্নাভজাতিক অতীত ঐতিহ্য, স্নাভদের আমলের সেই বর্ণাঢ্য আভিজাত্য, একে একে আমি যেন এই হৃদয়ের মধ্যস্থিতে সেকালের স্পষ্ট ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার জীবনে কোনও বৃদ্ধার কাছে বসে এমন আত্ম-বিলুপ্তি ঘটেনি। এক সময় একটি প্রশ্ন করে বললাম, আপনার সামনে বসে যদি আপনারদের অতীত জীবন সম্পর্কে কিছু জানবার জন্য উৎসুক হই, সে কি অন্যায় হবে?

বৃদ্ধা হাসলেন। বললেন, কী সন্দেহ ছবি তোমানের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। বড় হয়ে পড়েছিলাম তাঁর বই। কী মহৎ কবি! কী বিরাট লেখক! তিনি এখানে এসেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমি তাঁকে দেখিনি। সেই মহাকবির দেশ থেকে তুমি আজ এসেছ এক তরুণ বাসক!—হ্যাঁ, এই প্রথম, প্রথম বৈকি—একজন ভারতীয়কে দেখলাম। সেকালে আমেরিকার কোনও ভারতীয়কে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বড় আনন্দ, তোমাকে দেখতে পেলাম।

আপনি আমেরিকার গিরেছিলেন কবে?

কবে?—মাদাম হাসলেন,—সে অনেক কাল আগে। বোধ হয়, সত্তর বছরের কাছাকাছি। তখন আমার বয়স বড় অল্প। ওদের টেক্সে-নাচতে গিয়েছিলাম। আমাকে যখন তখন গান গাইতেও বলা হত। একালে যাদের এখানে দেখছি, তারা তখন অনেকেই জন্মায়নি।

একটু থেমে মাদাম আবার বললেন, আমার স্বামী আমার নাচগান খুব পছন্দ করতেন। ওর জন্যেই ত আমি এসব করতুম। ওর বত তামাশা আর পরিহাস ছিল আমার সঙ্গে। আমি আমেরিকার গিরে অনেকগুলি নাটকের হিরোরিন সেজে অভিনয় করেছি, কিছু হাত-তালিও পেয়েছিলাম। তারপর চেকভ আর আমি নামলুম এক মস্ত কাজ নিয়ে। তুমি আর্ট থিয়েটারে গিরেছ ত? আজ্ঞে হ্যাঁ—

ওইটি আমরা গড়েছিলাম এককালে। আমাদের পরম বন্ধু, বিখ্যাত অভিনেতা ফ্যানিসলাভস্কি আর আমরা দুজন লেগে গেলুম কোমর বেঁধে। সবাইকে নেমতন্ন করলুম, জার স্নাভদের দলবলকেও বাদ দিইনি। বড় বড় মনীষী তখনও সবাই বেঁচে। সেই বছর চেকভ লিখলেন 'সী-গাল',—সেই নাটক নিয়ে আর্ট থিয়েটারের যাত্রা শুরু। ষাট বছর আগে আমি নেমেছিলাম সোদিন তার প্রধান অভিনেত্রীরূপে। চেকভ যখন হাততালি দিলেন, আমি বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। তুমি সেই 'সী-গাল'-এর ছবিটি কার্টোনে দেখেছ ত?

হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি। আপনার স্বামীর 'চেরী অর্চাড' নাটকটি দেখে সকলের মতন আমিও অভিভূত হয়েছিলাম।

মাদাম এবার উজ্জ্বল মুখে হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, রাশিয়ানরা অভিনয়কলা ভালই বোঝে। কি জানো, প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিভার সঙ্গে চেকভও রাশিয়ান খুব প্রিয়। তুমি রুশ ভাষার আমাদের 'ক্লাসিকস'-গুলি পড়তে পারনি, সেটি দুঃখের কথা। তাঁদের সকলের বই আগের চেয়ে এখন অনেক বিক্রি বেড়েছে। আমার ঠিক মনে পড়েছে না, আমাদের রুশভাষা বাদ দিয়ে চেকভের বই বোধ হয় পৃথিবীর ৭০।৮০টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

আমি তাঁকে সংবাদ দিলাম, ভারতের প্রায় পনেরোটি ভাষায় চেকভের গল্পের বই বেরিয়েছে, এবং লেনিনের মৃত্যুর পরের বছরে আমি নিজে চেকভের দুটি গল্প ইংরেজি থেকে অনুবাদ করি।

বৃদ্ধা সানন্দে বললেন, এসব আমি জানতুম না।

আমি পনেরো মিনিটের জন্য গিরে-ছিলাম, কিন্তু নানা কথায় আধ ঘণ্টারও বেশি হয়ে গেছে। মাদাম কি যেন বললেন, লিডিয়া সেটি অনুবাদ করে দিয়ে জানলেন, ওর ইচ্ছে আপনি এখানে আহারাতি করে যান। উনি বলছেন, আপনি খুব 'ইন্টারেস্টিং' মানুষ।

হাসিমুখে বললাম, ওঁকে বলুন, এখানে অভিজ্ঞানের ফলে আজ একাদশী করতে বাধ্য হয়েছি।

মাদামও হাসলেন। আমি এক সময় পনেরায় নমস্কার জানিয়ে সোদিনের মতো উঠে দাঁড়ালাম। কালো টুপিটি মাথার তুলে মাদাম চেকভ হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

এই দিনটির সাড়ে তিনমাস পরে শ্রীমতী অল্গা কেনিপারের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি যে ছোট প্রবন্ধটি লিখি, তার মধ্যে দুটি ছয় এই প্রকার ছিল : “খররোদ্রের তাপে চারিদিকের বিশুদ্ধ প্রান্তর যখন তুষার ধু ধু করছে, সেই সময় পরিশ্রান্ত এক পথিক খুঁজে পেয়েছিল একটি প্রাচীন অশ্বখ বৃক্ষের সুস্বাদু ছায়াতল। পথিক সেই সুশীতল ছায়ার নীচে বসে কপালের ঘাম মুছেছিল।”

এই প্রবন্ধটি “মস্কা নিউজ” নামক সাপ্তাহিক কাগজে প্রকাশিত হয়।

পথে আসতে আসতে শ্রীমতী লিডিয়া প্রশ্ন করলেন, অলোসিয়াকে সেই সোদিন আপনার কেমন লেগেছিল?

হাসিমুখে জবাব দিলাম, মাত্র একটি রাতে মেয়েকে লেগে কি চেনা সহজ? অলোসিয়া বড় বেশি সুখী, তাই ভয় করে।

লিডিয়া আমার দিকে তাকালেন এবং রাগ করে বললেন, মনে রাখবেন এ জীবনে অন্য কারও কাছে অলোসিয়া এমন করে নিজের কাহিনী বলেন—যেমন বলেছে আপনাকে! এবার আপনি তার অনুরোধ রাখুন।

কি অনুরোধ?

জানিটি ব্যাপ থেকে লিডিয়া একটি চিঠি বার করে পড়লেন। সেটি লিডিয়াকে লেখা একটি অনুরোধপত্র। ‘শান্তি’ বিষয়ে আমি যেন অলোসিয়ার সম্পাদিত ‘হোল্ড ওয়ার্ল্ড’ কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখি। আমার পরিশ্রম বিনামূল্যে নয়! কাগজটি প্রকাশিত হয় ‘কিয়েভ শহর’ থেকে।

শ্রীমতী অলোসিয়া হলেন উল্লেইন শান্তি কর্মিটির ভাইস চেয়ারম্যান, এবং সেখানকার রাইটার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট।

এক সময় হাসিমুখে শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, অলোসিয়াকে খুব ভাল লাগে আমার। সমস্ত রাত জেগে অলোসিয়া আপনাকে চেখের জল নিয়ে অগাগোডা আত্মকাহিনী বলে গেল বটে,—কিন্তু একটি ছোট বিষয় আপনার কাছে মুখ খুলে বলতে পারল না! সোভিয়েট মেয়ে কেমন বুদ্ধিমতী, দেখলেন ত?

আমি বললাম, মেয়ে আর সোভিয়েট মেয়ের মধ্যে তফাৎটা কি?

সোভিয়েট মেয়ে শৃঙ্খল মেয়ে নয়, জেনে রাখুন। চলুন, পরে বলব।

(কমলা)

উইলিয়াম কেরী ও বাংলার বিজ্ঞান-চর্চা

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

উইলিয়াম কেরীর শ্বশুরতম জন্ম-বার্ষিকী উৎসব শেষ হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে স্বদেশের ও বিদেশের অনেকেই এই অসাধারণ কর্মী ও মহৎ সাহিত্যসেবকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান নিয়েও অনেক আলোচনা ইতিমধ্যেই হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে এই প্রতিভাবান পুরুষ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তার যথার্থ মূল্যায়ন আজও হয়নি। অথচ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার গোড়াপত্তন হয়েছিল মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন ইউরোপীয়কে কেন্দ্র করে, উইলিয়াম কেরী তাঁদেরই একজন।

আজ থেকে দেড় শতাধিক বৎসর আগেকার কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে কয়েকজন ইউরোপীয় ধর্মযাজকের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার গোড়াপত্তন হ'ল। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪), ফেলিকস কেরী (১৭৮৬-১৮২২), জন লোসন (১৭৮৭-১৮২০), রবার্ট মে (১৭৮৯-১৮১৮), জন পিয়াসন (১৭৯০-১৮৩১), উইলিয়াম ইয়েটস (১৭৯২-১৮৪৫) উইলিয়াম হপকিন্স পিয়াস (১৭৯৪-১৮৭৭) ও জন ম্যাকের (১৭৯৭-১৮৪৫) নাম। উল্লিখিত লেখকদের মধ্যে একমাত্র উইলিয়াম কেরী ছাড়া অপরাপর সকলেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলায় উইলিয়াম কেরীর কোনো বিজ্ঞানের বই নেই, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস প্রসঙ্গে কেরীর কথা বিস্মৃত হবার এটা হয়তো একটা কারণ। কিন্তু এই কারণকে বড় করে দেখলে সাহিত্যের ইতিহাস থেকে অনেকের নামই তো বাদ দিতে হয়। এমন কি শ্রীচৈতন্যও ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে যান। কারণ, চৈতন্য নিজে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য রচনা করেননি। অথচ আজ থেকে তিন শতাধিক বৎসর পূর্বে

তাঁর লোকোত্তর জীবনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে অভূতপূর্ব প্রাণবন্ত্য এসেছিল, সে কাহিনী সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মাঝেই অবগত আছেন। বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এমন তিনজন মনীষী আছেন যারা নিজেরা বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা না করেও এদেশের বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এঁরা হলেন উইলিয়াম কেরী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। পরিচয়, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি পত্রিকায় কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখা ছাড়া অধ্যাপক বসু বিজ্ঞানের কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি সত্য; কিন্তু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে তিনি যে আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছেন সেজন্য তিনি সমগ্র জাতির নমস্কার। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠিত করে তিনি এদেশীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চার যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন, বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার চেয়ে তার মূল্য বেশী ছাড়া কম নয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে উইলিয়াম কেরীও একই পথের পাথক। বাংলায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করলেও তিনি কোনো বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেননি। অথচ এগ্রিহাট কালচারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে ও বহু লেখককে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় উৎসাহ করে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে তিনি প্রভুত কল্যাণ সাধন করেছেন। তাই বলছিলাম, কেরী বিজ্ঞানের কোনো বই লেখেননি—এই বাহ্যিক কারণকে বড় করে দেখলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে তাঁর অবদানের কথা কোনোদিনই নিগূহিত হবে না। বস্তুতঃ নিজে কোনো বিজ্ঞানের বই না লিখলেও বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি যেরূপ সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন তা তখনকার যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অতুলনীয়। তা' ছাড়া এদেশে

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসারেও কেরীর বিরাট অবদান রয়েছে। সেই অবদানের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিচার করে তাঁর কর্ম-জীবনের সঙ্গে বাংলার বিজ্ঞান-চর্চার যোগসূত্রের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করলেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে কেরীর অবদান নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে।

কেরী ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম কর্ণধার। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এদেশে আসেন। মিশনের কাজে তাঁর দু'জন প্রধান সহযোগী ছিলেন মার্শম্যান ও ওয়ার্ড। তাঁরা এদেশে এলেন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। বাংলা দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই ত্রয়ীর নাম অবিস্মরণীয়। এঁদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উইলিয়াম কেরীর আকর্ষণই ছিল সবচেয়ে বেশী। জ্ঞাননি-শীল ও সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি নিজেই শ্রদ্ধা অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন না, তাঁর সংস্পর্শে যারা আসতেন তাঁদেরও নানাভাবে অনুপ্রাণিত করতেন।

বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-গ্রন্থ 'বিদ্যাহারাবলী' রচনার পশ্চাতে উইলিয়াম কেরীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। গ্রন্থটি রচনার কৃতিত্ব উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিকস কেরীর। ফেলিকস কেরীর 'বিদ্যাহারাবলী' কলিকাতা কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভাষা দুরূহ ও দুর্বোধ প্রকৃতির হলেও এখানে অস্থিবিজ্ঞান ও শারীর-বৃত্ত নিয়ে যা বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে তা একব্যাক্যে অভি-নন্দনের যোগ্য। 'বিদ্যাহারাবলী'—ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'র বিষয়বস্তু পণ্ডিত সংস্করণ 'এনসাইক্লোপিডিয়া রিট্রিনিকা' থেকে বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। এই অনুবাদে উইলিয়াম কেরী ফেলিকসকে অশেষ সাহায্য করেন। বস্তুতঃ কেরীর সদাঙ্গত দৃষ্টি ও সন্মত অনুমোদন না থাকলে ফেলিকসের মতো খামখেয়ালী প্রকৃতির ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিরাট গ্রন্থ রচনা করা হয়তো সম্ভবপর হ'ত না।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার আদি পর্বের দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'পদার্থ-বিদ্যাসার' (১৮২৪) এবং 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩০) রচনার পশ্চাতেও উইলিয়াম কেরীর যথেষ্ট অবদান ছিল। এই দু'টি গ্রন্থের লেখক উইলিয়াম ইয়েটস বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার অনুপ্রেরণা কেরীর কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। এ দু'টা বাংলায় প্রথম রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ

‘কিমিয়াবিদ্যার সার’ (১৮৩৪) রচনায়ও কেরী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ‘কিমিয়াবিদ্যার সার’ ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুর প্রেসে। দু’ভাগে বিভক্ত এই গ্রন্থে রাসায়নিক শক্তি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির রচয়িতা শ্রীরামপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক জন ম্যাক। ‘কিমিয়াবিদ্যার সার’ রচনার সময়ে বাংলায় রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষার অভাবে লেখককে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই সময়ে কেরী ও মার্শম্যানের সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে গ্রন্থটি পরিসমাপ্ত করা হয়তো ম্যাকের পক্ষে সম্ভবপর হত না। গ্রন্থটির ভূমিকায় জন ম্যাক উইলিয়ম কেরীর কাছে তাঁর ঋণের কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়ে লিখেছেন,

“In issuing this little work there are two persons whom I cannot refrain from associating with its production. The first is my venerable friend Dr. Carey, from whom I derived the greatest assistance and encouragement in my earlier attempts at Chemical translation, and whose ardent sympathy I have always enjoyed in every liberal and useful pursuit.”

অর্থাৎ “এই সামান্য গ্রন্থটি প্রকাশকালে গ্রন্থটি রচনার সঙ্গে জড়িত দু’জন

ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে পারছি না। এঁদের প্রথম জন হলেন আমার গ্রন্থের বন্ধু ডঃ কেরী। তাঁর কাছ থেকে আমি আমার রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রাথমিক অনুবাদের প্রচেষ্টায় সর্বাধিক সাহায্য ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি, এবং সব সময়েই প্রতিটি প্রগতিধর্মী ও প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টায় আমি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি পেয়েছি।”

বাংলা দেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে কেরীর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এগ্রিকালচারাল ও হার্টিকালচারাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। কেরী ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি। শৈশবকাল থেকে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের প্রতি কেরীর যে কৌতুহল ছিল পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সেই কৌতুহলই যে আরও পল্লবিত হয়ে উঠল, এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তার সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। এগ্রিহাটিকালচারাল সোসাইটি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করলেন ‘মসীনাবাদ’ নামক গ্রন্থটি। এ গ্রন্থটি তিসি বা মসীনার চাষ

সম্বন্ধে লেখা। এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেই প্রকাশিত হ’ল জে. মার্শম্যানের ‘কেন্দ্র বাগান-বিবরণ’—১ম (১৮৩১) ও ২য় (১৮৩৬) খণ্ড। এছাড়া সোসাইটির মুখপত্র ‘ট্রানসাকসানস্ ও জার্নাল’ থেকে ইংরেজী প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদের জন্যে একটি অনুবাদ-সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন উইলিয়ম কেরী। ভারতবর্ষীয় কৃষি বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ নামক সাময়িক-গ্রন্থটির বিভিন্ন সংখ্যা (১৮৫৩-১৮৫৬) এই সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। এতে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে সহজ ও জনপ্রিয় আলোচনা স্থান পেত। পুস্তক প্রকাশ করা ছাড়াও এদেশে কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য এগ্রিহাটিকালচারাল সোসাইটি নানাপ্রকার চেষ্টা করে। কৃষি-প্রদর্শনী, বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রবর্তন, কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার কাজে এই সোসাইটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

অতএব, সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, বাংলা দেশে বিজ্ঞানের প্রসারে এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই সংকলন, অনুবাদ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে উইলিয়ম কেরী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।



এক ছোট্টো ভেপোলীন বাড়ীতে রাখুন

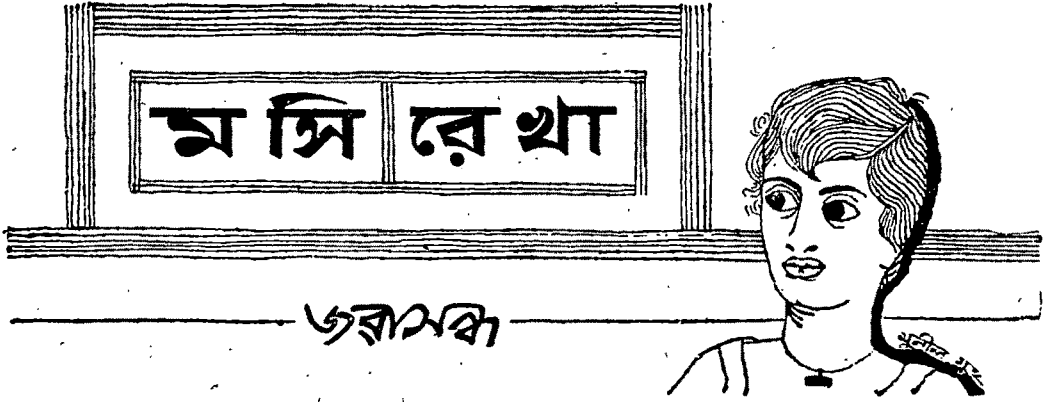
এই শীতে যে কোন সময় বাচ্চাদের ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি হবার ভয় আছে। ফুস-ফুসে শ্বাস নেমে, জ্বর ও খাসকষ্ট হয়। বুক, পিঠে ও গলায় ভেপোলীন মালিশ করলে আপনার শিশুর সকল কষ্ট অবিলম্বে দূর হবে ও আপনিও দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবেন।

কোঁটা ও শিশিতে পাওয়া যায়

ভেপোলীন

মালিশের জন্ম

জি. ডি. কানাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিঃ • ১১/১, নিবেদিতা সেন, কলিকাতা-৩



[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বড় হবার পর যখন সব কিছুর
বুদ্ধিতে শিখেছে, জীবনের এই দিন-
গুলোর কথা ভাবতে গিয়ে দিল্লীপের
অনেক বার মনে হয়েছে, এই যে এক
একটি ছোট ছেলে সংসারের সহজ ও
সাধারণ পথ ছেড়ে বিপথে নেমে পড়ে,
সৎ, ন্যায় ও সুন্দরের উপর আস্থা হারিয়ে
ফেলে, খুঁজলে বেরিয়ে পড়বে, তার মূলে
রয়েছে এমন কোনো অপ্রত্যাশিত আঘাত;
যাকে সে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, কিংবা
বিশ্বাস করে, তার কাছ থেকে কোনো
নিম্নম আচরণ। দীর্ঘ ছ বছর কাল এই
বর্টার স্কুলে তাকে কাটাতে হয়েছিল।
সম এবং অসমবয়সী অনেক ছেলের সঙ্গে
সে মিশেছে। কত বিচিত্র তাদের কাহিনী।
কত জটিল ও বিস্ময়কর অবস্থা-
বিপর্জয়ের ভিতর দিয়ে এখানে এসে
তারা দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু একটি জায়গায়
প্রায় সকলেই এক। সেখানে রয়েছে আপন-
জনের কোনো অবহেলা, অন্যদের কিংবা
অবিচার, কারো কারো বেলায় তার চেয়ে
কঠোরতর কোনো লাঞ্ছনা বা অত্যাচার।

ছোটখাটো 'অপরাধ' করবার প্রবণতা
শিশুমানের স্বাভাবিক ধর্ম। তাদের
দৈনন্দিন কর্মতালিকায় এমন কতক-
গুলো বিষয় থাকে, যাকে বলা
যেতে পারে 'অন্যায়' বা 'অনুচিত'।
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো
তাদের কাছে নিছক আমোদ বা 'স্পোর্ট'।
কোথাও কোথাও তার শিখনে থাকে লোভ,
বাহাদুরি, কিংবা বন্ধু মহলে নেতৃত্ব
প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি। একে যদি 'অপরাধ'
বলা যায়, তাকে রোধ করবার একমাত্র
অস্ত্র ক্ষমা ও স্নেহের শাসন। সে শাসন
যখন মাত্রা হারিয়ে ফেলে, অথবা নির্ধাতন
কিংবা প্রতিহিংসার রূপ নেয়, তখন ঐ

শিশুসুলভ 'অপরাধ'গুলোই সত্যিকার
অপরাধের পথ ধরে, যার নাম 'ক্রাইম'।
ফুলের বৃকে যদি কীট এসে বাসা বাঁধে,
বুদ্ধিতে হবে সে দোষ ফুলের নয়, দোষ
রয়েছে, যে গাছে সে ফুটল তারই
কোনোখানে। একটি নির্মল শিশু কিংবা
একটি নিষ্পাপ কিশোর যে পাপের ছাপ
কপালে নিয়ে বর্টারে এসে দাঁড়ায়, সে
পাপ তার নয়, তার বাপমায়ের কিংবা
কোনো নিকট আত্মীয় বা অভিভাবকের।
অভিভাবক যেখানে অনুপস্থিত,
সেখানেও খুঁজলে দেখা যাবে, সে পাপ
আপনা থেকে জন্মানি, তার শিকড়
রয়েছে, যে পারিবে তার জন্ম, যেখানে
সে বেড়ে উঠেছে, তারই পাকের তলায়।

বর্টার 'খুঁজে ক্রিমিন্যাল'গুলোই
এই পরম সত্যের জীবন্ত সাক্ষী।

ষোড়শাব্দের একটা দিনের গুটি-
কয়েক কথা দিল্লীপ কোনোদিন ভুলতে
পারেনি। সেদিন তার পনের বছরের
কিশোর মন নিয়ে তার সবটুকু মানে
হয়তো বুদ্ধিতে শেখেনি। বুদ্ধি ছিল
অনেক পরে।

সাহেবই ডেকে পাঠিয়েছিলেন কী
কাজে। খুব সম্ভব প্রেস-সংক্রান্ত কোনো
জরুরী নির্দেশ বা ঐ জাতীয় কিছুর।
তখন সে প্রেস-মাস্টারের ডান হাত এবং
অনেক ব্যাপারে ডেপুটিবাবু কিংবা
সাহেবের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ
রাখতে হয়। সুপার একটি ভদ্রলোক এবং
ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন বলে
আফিসের দরজার পাশে অপেক্ষা করছিল।
হঠাৎ কানে গেল, তিনি বলছেন, দেখুন,
কিছু মনে করবেন না, আমি স্পষ্ট কথার
লোক। ছেলে আপনাদের নিজে থেকে
বিগড়ে যাননি। আপনারাই পথ দেখিয়ে-
ছেন।

—আমরা পথ দেখিয়েছি! আপনি
বলছেন কি! প্রায় চোঁচিয়ে উঠেছিলেন
ভদ্রলোক।

—হ্যা, আপনারা।

ভদ্রলোকের মুখে আর কথা সরেনি;
বোধহয় অতি বিস্ময়ে মুক হয়ে গিয়ে-
ছিলেন। সাহেব বলেছিলেন, আপনাদের
সন্দেহবেলার প্রোগ্রামটা একবার মনে
করুন। প্রায় প্রত্যাহ দুজনে মিলে, মাপ
করবেন, একটু বিশেষ সাজগোজ করে
বেরিয়ে যাওয়া। কোনোদিন সিনেমায়,
কোনোদিন বা পার্টি, ক্লাব কিংবা হোটেলে।
ওকে বলতেন, আমরা একটু ঘুরে
আসছি। তুই বসে বসে পড়। মাঝে মাঝে
ও জানতে চাইত, কোথায় যাচ্ছে তোমরা,
আপনারা ধমকে উঠতেন, তা দিয়ে তোর
কাজ কী? দরকারে বেরুছি। ও কিন্তু
জানত সে দরকারটা হচ্ছে গান, বাজনা,
স্বহৃদী, আমোদ, পান, ভোজন। আপনি
যখন থাকতেন না আপনার পকেট হাতড়ে
দেখত, পেয়ে যেত হোটেলের বিল, কিংবা
সিনেমার টিকিটের আধখানা। ফিরে এসে,
কী দেখলেন কোথায় গিয়েছিলেন তা
নিয়ে খোসগল্প জুড়ে দিতেন দুজনে
মিলে। পাশের ঘরে শুয়ে মাঝখানের
খোলা দরজা দিয়ে সব শুনত।
আপনারা মনে করতেন থোকা ঘুমিয়ে
পড়েছে। ভুল। ঘুমোয়নি; ঘুম
আসত না ওর। অনেক রাত পর্যন্ত
ছটফট করত, আর শুনলে অবাক হবেন,
মনে মনে প্ল্যান করত কী করে এর শোধ
নেবে।

—শোধ নেবে মানে? কিসের
শোধ? রীতিমত উষ্মার সুরে বলে
উঠেছিলেন ভদ্রলোক।

—আপনাদের অবহেলার। ভুলে
যাচ্ছেন ও আপনাদের একমাত্র সন্তান।

—আপনি ভুল করছেন। আমরা তো ওকে একদিনের তরেও অবহেলা বা অনাদর করিনি।

সাহেব হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন, সে কথার কোনো জবাব দেননি। তারপর বলেছিলেন, আপনার পকেট থেকে যখন দু'একটা টাকা চুরি যেতে শব্দ হল, আপনারা প্রথমে সন্দেহ করলেন চাকরটাকে। মারধোরও করলেন খানিকটা, কিন্তু চুরি বেড়ে চলল এবং ছাড়িয়ে পড়ল মানি ব্যাগ থেকে অ্যানিটি ব্যাগে। তারপর একদিন চাকরটাই বলে দিল, চোর কে। খোকা অস্বীকার করতে পারত, বেশীরভাগ ছেলে তাই করে। কিন্তু ও করেনি। কভে ভাল ছেলে আপনাদের। তবু আপনি তাকে না খেতে দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখলেন।

—কী করবো! আমার ছেলে চোর, এটা কিছতেই বরদাস্ত করতে পারিনি।

—জানি। কিন্তু কেন চুরি করছে, জ্ঞানতে চাননি, ভেবেও দেখেননি। শব্দ টাকা পরমা সম্বন্ধে সাবধান হয়েছিলেন। কিন্তু তখন সে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। নতুন ছবি আসা মাত্র না দেখলে ভাত হজম হয় না, যেমন আপনাদেরও হত না। মাঝেমাঝে দু'একজন বন্ধু-বান্ধব মিলে চীনে হোটেল জাঁকিয়ে না বসলেই বা চলে কেমন করে? তাই নিজের বাড়ির বাগ্নে যখন তালা পড়ল, পরের বাড়ির তালা ভেঙে সাইকেল নিয়ে সরে পড়া ছাড়া আর কী উপায় ছিল; বলুন?

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ওবুদ্ধি এ সব কথাই বলেছে আপনাকে?

—আজ্ঞে না। ও কিছই বলেনি। দুটো একটা প্রশ্ন করে, বাকীটুকু ওর মস্তের দিকে চেয়ে আমি নিজেই অনুমান করে নিয়েছি। এতো শব্দ আপনার ঘরের কথা নয়, এখানে যারা আছে তাদের অনেকের পেছনেই রয়েছে ঐ এক

ইতিহাস। একটু এদিক আর ওদিক। দেখে দেখে আমার মস্তক হয়ে গেছে। হয়তো কিছ বাড়িয়ে বলেছি, কিংবা—

—না, কিছ বাড়িয়ে বলেননি আপনি, বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা, 'এর কোনোটাই মিথ্যা নয়। কিন্তু তার থেকে এতবড় সর্বনাশ হবে, একবারও কি ভাবতে পেরেছিলাম?'

ভারী করুণ শোনালো ভদ্রমহিলার কথাগুলো। ঘরের আবহাওয়াটাই যেন বদলে গেল। কিছক্ষণ কারো কোনো কথা শোনা গেল না।

তারপর ভদ্রলোক বললেন, যা হয়ে গেছে তার তো আর প্রতিকার নেই। এখন কি করে ছেলেকে আমরা ফিরে পেতে পারি, সেইটুকু আপনাকে করে দিতে হবে, মিষ্টার ঘোষ। আমি একাই আসছিলাম, কিন্তু ওঁকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না।...বলে, স্ট্রীকে দেখিয়ে দিলেন।

মিষ্টার ঘোষ ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললেন, মনে হচ্ছে এর আগেও যেন আপনি এসেছিলেন একবার।

—একবার নয়, দু'দুবার এসে ফিরে গেছি। উনি জনেন না। কিন্তু একটুবার চোখের দেখাও দেয়নি হতভাগা।

বলতে বলতে মুখ নিচু করে আঁচলে চোখ মুছলেন। ভদ্রলোক অনুন্য়ের সুরে বললেন, আপনি চেষ্টা করলে দু'মিনিটের জন্যে হয়তো একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন। আপনার কথা সে নিশ্চয়ই অমান্য করবে না।

—তা করবে না। তবে, সেটা আমি চাই না মিষ্টার ব্যানার্জি। এদের মনের ওপর কোনো জোর খাটানো বা চাপ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। নিজে থেকে হৃদয় না আসে, আপনাদেরও অপেক্ষা করতে বলবো।

মুদ্র হেসে যোগ করলেন, বয়সটাই যে অসুভূত। প্রথমে উগ্র অভিমান,

তারপরে আসে লজ্জা।...খ্রীমানের বোধ-হয় সেই স্টেজ চলছে।...থাক। কিছুদিন নিজের মনে। লজ্জাবতী লতা যেমন ছুঁলেই কুঁকড়ে যায়, এরা আবার তার ওপরেও এককাঠি।

বলে আর একদফা ছাদ ফাটানো হাসি হেসে উঠলেন লেফটেন্যান্ট ঘোষ।

ওদের কথাবার্তায় ছেলোটর নামের উল্লেখ না থাকলেও দিলীপ আলদাজ করতে পেরেছিল। শচীন ব্যানার্জি, ইনডাস্ট্রিয়াল বয়। মাস দু'এক আগের আমদানী।

সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এসে শচীন এবং আরো অনেকের সঙ্গো নিজেকে সোঁদিন সে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সহজে কোনো মিল খুঁজে পায়নি। সে যেন সবার থেকে আলাদা। সাহেবের কথাগুলোও একটি একটি করে ভেবে দেখেছিল। তার জীবনের সঙ্গো তার সঙ্গতি কোথায়? বাবাকে সে পায়নি। তার সমস্ত শৈশব জুড়ে আছে শব্দ মা। কিন্তু তার প্রতিদিনের প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ তন্ন তন্ন করেও তো কণামাত্র অবহেলা বা অনাদর খুঁজে পাওয়া যায় না। সবটুকু ভরে আছে অপারিসমী স্নেহ। শব্দ একটি দিনের সেই একটি মাত্র রক্ত কথা, একটি মাত্র আঘাত। কিন্তু কত দুঃখ, কত বড় লাঞ্ছনায় মা সোঁদিন হাত তুলেছিল তার গায়ে, মুখ ফুটে বলেছিল সেই দুটি মর্মান্তক কথা, 'দিলীপের চেয়ে কে বেশী জানে?' সোঁদিন সে জ্ঞান তার ছিল না। হয়তো তার জন্যে দায়ী মায়ের সেই নিরবচ্ছিন্ন স্নেহ-বন্ধন কোমলরূপে, চোখ ফুটবার পর থেকে অত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও মনুষ্যত্বের তরে যার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মাঝেমাঝে একটু যদি কঠোর হত মা, কিংবা একটু কম ভালবাসত তাকে, সোঁদিনকার আঘাতটা বোধহয় অতখানি তীব্র হয়ে বাজত না। ভালবাসা যেখানে যত গভীর, অভিমানটাও সেখানে তত বেশী উগ্র।

পরবর্তীকালে দু'নিয়াটকে যখন সে আরো স্পষ্ট করে চিনতে শিখেছে, যখন বুঝতে পেরেছে, জীবন-প্রত্যয়ে যে মসিরেখা তার ললাটে আঁকিত হয়ে গিয়েছিল, সংসারের কাছে সেইটাই তার পরিচয়, তখনো মাঝে মাঝে ঘোষ-সাহেবের নানাদিনের নানা কথা তার মনে আন্দোলিত হত। নিজেই নিজে প্রশ্ন করত, তার কপালের উপর এই যে পাপাচিহ্ন তার জন্যে তার শিশুমন যদি দায়ী হয়ে না থাকে, তবে কে দায়ী? এ কার পাপ? উত্তর পায়নি।

এই প্রসঙ্গে একদিন, সেই ছেলে-



উপহারে ও ব্যবহারে

নিউসপ্যাপার ব্যানার জন্য

১১০ রাসবিহারী এন্ড সন্স

বাম্পনালয়

বেলায় মায়ের মূখে শোনা কয়েকটি কথা, তার মনে পড়েছিল।

যা মা বলেছিলেন, সেদিন তার পুরো-পুরি অর্থবোধ হয়নি। কিন্তু কথা গুলোর একটা হীন রেশ বোধহয় লুকিয়ে ছিল মনের কোনো কোণে। অনেকদিন পরে সেইটুকুই হঠাৎ ভেসে উঠেছিল চেতনার মধ্যে। মা বলে-ছিলেন, থোকা ভুই যখন বড় হবি, একটা কথা কোনোদিন ভুলিস না। লোভের চেয়ে বড় শত্রু আর কিছু নেই। লোভই মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়, অন্যায়ের দিকে টানে। যেটুকু তোর পাওনা, তাই নিয়ে খুশী থাকিস, তার বাইরে কখনো হাত বাড়াতে যাসনে। আর্মি যখন থাকবে না, আমার এই কথাটা মনে রাখিস, বাবা।

যে কোনো কারণেই হোক, মায়ের মনটা সেদিন ভাল ছিল না। সন্ধ্যার পর একা একা অন্ধকার বারান্দায় থামে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। ঘরের মধ্যে রৌদ্রের তেলের প্রদীপের নীচে দিলীপ বসে পড়েছিল, কিন্তু বই-এর পাতায় মন দিতে পারছিল না। মায়ের স্থান মন্থখানা বার খার ভেসে উঠেছিল থেকে থেকে কাপসা হাল্লা যাওয়া অক্ষর-গুলোর উপর। তারপর আর থাকতে না পেরে তার পাশটিতে এসে বসে পড়েছিল। মা তার দিকে তাকায়নি, বাইরের অন্ধকারের পানে চেয়ে ধীরে ধীরে থেমে থেমে ঐ কটি কথা বলে গিয়েছিল। দিলীপের ইচ্ছা হয়েছিল জিজ্ঞাসা করে, তোমার কী হয়েছে, মা? পারেনি। কেমন একটা ভয়-জড়িত-সংশোধিত যেন তার গলাটা আটকে ধরেছিল। মায়ের আঁচলের একটা ধার চেপে ধরে নিঃশব্দে বসে ছিল তার গা ঘেঁসে।

সেইখানে বসেই মা আরো কত কী সব বলে গিয়েছিল সেদিন। তার সব-খানি তার মনে নেই। যেটুকু আছে ভাও অস্পষ্ট। তার বেশীরভাগই যেন মায়ের নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া। সে ছিল শূন্য উপলক্ষ্য। অনেক কথার মধ্যে মা বলেছিল, তিনি তো চাননি। বারবার বলেছিলেন, 'এটা অন্যায়, এ আর্মি পারবে না। আমারই জিদ্দ তাকে টেনে নামিয়েছিল। জিদ্দ নয়, পাপ। শেষ পর্যন্ত আমার সেই পাপের ছোয়া তিনিও এড়াতে পারলেন না। সারাজীবনে যার এতটুকু হলো কোথায় লাগেনি, শূন্য নিষ্পাপ মানুষ যাবার সময় একটা কালো দাগ নিয়ে গেলেন। কিন্তু সে কালি আমি তোর গায়ে লাগতে দিইনি, থোকা। সে নোট আর্মি হুইনি। হাস-পাতালের চিঠিটাও তখনই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

—কোন নোট, মা?

—বড় হ; তারপর একদিন বলবো।

সে বলা আর হয়নি। সেই নোট এবং রহস্যময় ইতিহাস দিলীপের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। মায়ের মূখে সেদিন যা দেখেছিল, যা শুনেছিল, বড় হবার পর তার থেকে একটা ধারণাই শূন্য গড়ে উঠেছিল তার মনে—ঐ নোট তাদের জন্যে কেবল অকল্যাণ হয়ে আনেনি, ওর মধ্যে জড়িয়ে আছে তার বাবার জীবনের

করেনি মা। তার নিজের জীবনের কোনো-খানেও সে-টাকার ছোঁয়াচ লাগেনি। তবে? এ প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। হতে পারে, পাপ অবিনশ্বর, তাকে মুছে ফেলা যায় না। নোট ছিঁড়ে ফেলা যায়। কিন্তু তার মধ্যে অলক্ষ্যে জড়িয়ে আছে যে অন্যায় লিপ্সা, তার কখনো ধ্বংস নেই। তার সংরক্ষণ এড়ানো যায় না। অকস্মাৎ একদিন কোনো অনুকূল আবহাওয়ার স্পর্শ লেগে একটি শিশুমনের মধ্যে যখন সে ফুটে বেরোয়, সং এবং সত্য



“তোমার কী হয়েছে মা?”

কোনো মিসিচিহ্ন। তবে কি ঐখানেই রয়েছে তার প্রশ্নের উত্তর? জ্ঞান হবার আগেই যে কালো রেখা কপালে নিয়ে সে যাত্রা শুরু করেছিল, সেটা কি তার পিতৃদত্ত উত্তরাধিকার? জন্মার্জিত অভিশাপ? তাই বা কেমন করে হবে? যিনি অজন্ম-শূন্য, অজীবন শূন্যচারী, তাঁর এই মূহূর্ত-লম্বা কালিমা-স্পর্শ কি এত গভীর যে সন্তানের ললাটেও তার ছাপ থেকে যাবে? সেই অভিশপ্ত অর্থ তো তারা ভোগ করেনি। স্পর্শ পর্যন্ত

জগৎ সেই আবোধ ও অপোগন্ড মানুষটার উপরেই চাপিয়ে দেয় সকল দায়। সারা-জীবন ধরে তাকেই তার দণ্ড দিতে হয়। কেউ জানতে চায় না, তার মধ্যে কোথা থেকে এল এই কালব্যাদি, প্রভাতের অক্ষয় কলিকায় একটা বিঘাত কীট হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসল কেমন করে?

বর্জাল স্কুল থেকে মুক্তি পাবার অনেক দিন পরেও পেছনের দিকে তাকিয়ে দিলীপের মন মাঝেমাঝে এই সমাধানহীন প্রশ্নজালে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত।

(জয়শ)

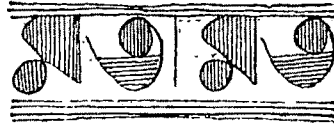
॥ আধুনিক চিত্রকলা ও পূর্বপক্ষ ॥

(১)

অমৃত সম্পাদক সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

গত সংখ্যা অমৃতে জৈমিনির আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কীয় বস্তুটি দৃঃসাহসিক হলেও সমর্থনীয়। গত ছমাসে আমি সম্ভবতঃ কুড়িটি চিত্র-প্রদর্শনী দেখেছি এবং আধুনিক চিত্রধারার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি। আধুনিক তরঙ্গ চিত্রকরদের সম্বন্ধে আমার যাবতীয় ঔৎসুক্য, চিত্র-প্রদর্শনীগুলো দেখবার পর একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি প্রদর্শনীতে একই ধরনের অঙ্কন-বিকৃতি (distortion-এর বাংলা প্রতিশব্দ ঠিক পেলাম না) রঙের ব্যবহার এবং দৃশ্যনির্বাচন চোখে পড়ল। আমি সন্দেহ করি যে, distortion ছাড়া আজকের তরঙ্গ শিল্পীরা ছবি আঁকতে পারেন না। Drawing-এর শিক্ষা শিল্পীর প্রাথমিক গুণ। এবং এই Drawing-এর যথাযথ শিক্ষা থাকলেই distortion-এর দিকে শিল্পী যেতে পারেন। ব্যাকরণগত শব্দের ওপরেই যার দখল নেই, তিনি স্বভাবতঃই ব্যাকরণ-বহির্ভূত শব্দনির্মাণের অধিকারী নন। জেমস জয়েসের অনেক অদ্ভুত নতুন শব্দকে আমরা মেনে না নিলেও সম্মান করতে পারি, কিন্তু শিশুর স্বকল্পিত শব্দমালাগুলো নিছক মা-মাসী ছাড়া আর কারো মনে ছাড়পত্র পাবে না নিশ্চয়ই। Drawing-এ আধুনিক তরঙ্গ চিত্রকরদের প্রাথমিক শিক্ষার অভাবের ফলে distortion-এরও নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চোখে পড়ে না প্রদর্শনীগুলোতে। যে আঙ্গিক ইয়ো-রোপের শিল্পীরা অনেকদিন হল পরিত্যাগ করেছেন, আমাদের শিল্পীরা আজো সেই আঙ্গিকের রঙেই ভুলি ভুলিয়ে আছেন! ফলে তাঁদের ছবি না হচ্ছে কালান্ত্রিত না হচ্ছে দেশান্ত্রিত। বাংলা সাহিত্যে, বাংলা লোকশিল্পে, এমনকি বাংলার বস্ত্রশিল্পেও দেশকে চেনা যায়, কিন্তু আধুনিক চিত্রে যেন শিল্পীরা সমবেতভাবে দেশকে নির্বাসিত করেছেন। আজকের শিল্পীরা রঙের ব্যবহারেও বিদেশ-বর্ণে বন্দী। রঙের ব্যবহারে সূর্যের অর্থাৎ আলোর ভূমিকাকে এঁরা প্রায় অনেকেই অস্বীকার করে ছবি আঁকেন। ইয়োরোপের আকাশের আলো আর আমাদের প্রকৃতি-কিরণ এক না। ইংল্যান্ডের ল্যান্ডস্কেপ-এর রঙ যে-আলোর নিয়ন্ত্রিত হবে, আমাদের সূর্যকরোজ্জ্বল দিন সেই রঙে উজ্জ্বল হবে না। তাছাড়া আলোর ভাঙ্গনও দূরদেশের পৃথিবীতে দূর্বাক্য। কিন্তু এদেশের শিল্পীরা এ-



সমস্ত তথ্যের ওপর কখনই নির্ভর করে-রঙ ব্যবহার করেন না। “যদৃচ্চং তং আকিতং” এই হচ্ছে আধুনিক অনু-কারী শিল্পীগোষ্ঠীর মূলমন্ত্র।

শিল্পীর সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য তার কল্পনাশক্তি। সৈদিক দিয়ে যে আমাদের শিল্পীরা কি নিদারুণ দরিদ্র তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এঁদের দৃশ্য-নির্বাচন দেখলে। আমি গত প্রদর্শনী-গুলিতে সব মিলিয়ে অন্ততঃ কুড়িটা স্টিল দেখেছি যার বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি টেবিলে কয়েকটি আপেল, এক-থোকা আঙুর আর পেছনে একটা বিশেষ ধরনের বোতল (সম্ভবতঃ মদের!)। রঙের ব্যবহারে অঙ্কনরীতিতে সবকটা স্টিলই যেন একটি অন্যগুলির ফোটোগ্রাফ। জানি না এই এক দৃশ্য শিল্পীরা কোন ভাগ্যবানের বাড়িতে দেখেন প্রত্যহ যে তাঁদের এই বিষয়বস্তুটি এত প্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া জাহাজঘাটার একই দৃশ্য, সেই ছাদের ওপর থেকে ধোঁয়াটে শহর দেখা (ধোঁয়াটে হবেই কারণ লন্ডন ধোঁয়াটে!) নাডের নামে অবয়বহীন মাংসপিণ্ডের “ম্যাসিভ” চিত্র-প্রকাশ হাল আমলের প্রদর্শনীগুলির ব্যাধিবিশেষ।

এবং সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হল এই প্রদর্শনীগুলির যথাযথ সমালোচনা হয় না। অবশ্য না হওয়ার কারণও হয়ত আছে। যে দেশে তরঙ্গ শিল্পীদেরই উপযুক্ত চিত্রশিক্ষা নেই, সে দেশের চিত্রসমালোচকদের কাছ থেকে উপযুক্ত সমালোচনা আশা করা অনায়াস। এবং চিত্রসমালোচকবৃন্দ যেহেতু প্রায়শঃই ব্যক্তিগত পরিচয়কে মানদণ্ড করে সমালোচনা করেন, খাঁটি সমালোচনা তাঁদের কাছে প্রায় বিষয়বৎ পরিত্যজ্য।

চিত্রপ্রদর্শনীগুলির একটি হাস্যকর দৃষ্টব্য হল ক্যাটালগে লিখিত ছবির দাম! প্রমাণ সাইজের যে কোনো ছবির দামই একশ টাকার ওপরে। বেশী দাম লেখাটা যেন চিত্রের উৎকর্ষের সঙ্গে জড়িত! ছবিগুলির দাম বেশী হওয়ার ফলে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী চিত্ররসিক বাঙালী কখনো ছবি কিনতে পারেন না। যাঁরা দৃঢ়চরিত্র কেনেন তাঁদের চিত্র-ধারণা সাগরপার থেকে আমদানী করা। ফলে তাঁদের সন্তোষার্থে আজকের চিত্রকলা ও কখনই ছবি হয় না, প্রতিচ্ছবি হয়ে প্রদর্শনীর দেয়ালে ঝোলে।

ইতি—

—বারীন ঘোষ, যতীন দাস রোড।

(২)

সম্পাদক, ‘অমৃত’

সমীপেষু—

‘অমৃত’ পত্রিকার ‘পূর্বপক্ষ’-র প্রখ্যাত লেখক শ্রীজৈমিনী-বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কলা-সমালোচকদের বেশ এক হাত নিয়েছেন। তাঁর অভিযোগের অনেকখানিই স্বীকার করে নিতে আমার কোনো বিধা নেই। সম্প্রতিকালে অনুষ্ঠিত অজস্র চিত্র-প্রদর্শনী সম্বন্ধে কলা-সমালোচকেরা যে-সব অভিমত প্রকাশ করেছেন তাতে এক শিল্পী থেকে অন্য শিল্পীর গুণগত পার্থক্য বুঝে নেওয়া সত্যি কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে, শিল্পীর সৃষ্টিকলা সম্পর্কে এমন একটি ধারণা গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয় যে, আলোচ্য শিল্পীরা সবাই বুদ্ধি এক দরের। শ্রীজৈমিনী এই ধরনের সমালোচনার বিপক্ষে তাঁর মতামত প্রকাশ করে সংগত কাজই করেছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে শ্রীজৈমিনীর জ্ঞাতার্থে কয়েকটি বস্তুবা আছে। সম্প্রতি কি সাহিত্যে, কি শিল্পে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কোনো সাহিত্যিক বা শিল্পীর দর্শন কি তিনি পেয়েছেন? বোধহয় না। এই যখন অবস্থা তখন মাঝারি বা তার থেকে কম প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিকেরাই তো আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের প্রবহমানতাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এ-কথা আশা করি তিনি স্বীকার করবেন। এই মাঝারিদের যখন মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করে সমালোচকদের অগ্রসর হতে হয়, তখন তৃতীয় সারির শিল্পী-সাহিত্যিককেও তাঁরা আর উপেক্ষা করতে পারেন না। আর, বাংলার উপেক্ষিত শিল্পী-সমাজকে কলা-সমালোচকেরা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করার চেষ্টা করেন। প্রধানতঃ এই দুটি কারণেই মাঝারি এবং তৃতীয় সারির শিল্পীদের তাঁরা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সারিতে বসিয়ে যে সমালোচনা লেখেন তাতে পার্থক্যটি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বাংলার শিল্পী-সমাজ ও দর্শকের বর্তমান চেতনা-স্তরে সমালোচকের পক্ষে এর বেশি বাড়াবাড়ি না করাই ভাল।

একটা কথা অবশ্য ঠিক। আধুনিকতা বা বিমূর্ত শিল্পকলার নামে তরঙ্গ শিল্পীরা যা-খুশি-তাই যখন সৃষ্টি করেন তখন সমালোচনার খজা সেই অসুস্থতাকে বিবর্তিত করে যদি সত্যিকার পথের সম্মান না দিতে পারে তবে কি হবে ধীরে মাছ না-ছুই পানি-র সমালোচনা? এ-দিকে জৈমিনী কলা-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

ইতি—পীযুষ দাশ, কলিকাতা।

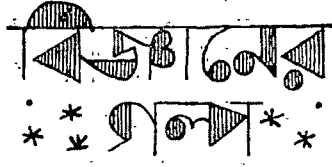
॥ প্রকৃতির বর্ণালিপি ॥

আপনাকে যদি চুল কাটবার জন্যে কোনো সেলুনে যেতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই আপনি কোনো ওষুধের দোকানে ঢুকবেন না। কেন? না, দোকানের বাইরে সাইনবোর্ডের লেখা দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন, এই দোকানটি ওষুধ বিক্রি করবার জন্যে চুল কাটবার জন্যে নয়। তেমনি আপনার পকেটে যদি রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বরটি থাকে তাহলে সেই বিশেষ বাড়িটি আপনি অনায়াসেই খুঁজে বার করতে পারেন। কলকাতাতে অবশ্য কোনো কোনো রাস্তায় বাড়ির নম্বর এখনো খুবই ওলোট-পালোট—তাহলেও খুব একটা অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু বিষ্ণুচন্দ্রের 'ইন্দিরা' উপন্যাসে ইন্দিরা শূদ্র এইটুকু জানত যে, তার জাতিখুড়ো কলকাতায় থাকেন। এই জানাটুকু যথেষ্ট ছিল না। মহেশপুর গ্রাম হলে হয়তো ব্যাপারটা অসম্ভব হত না, কিন্তু কলকাতায় ইন্দিরার জাতিখুড়োকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাঠক হিসেবে আমরা অবশ্য তাতে লাভবানই হয়েছি, কারণ ইন্দিরার জাতিখুড়োকে খুঁজে পাওয়া গেলে ইন্দিরা উপন্যাসটি মাঠে মারা যেত।

যাই হোক, আসল কথাটা এই যে, আমাদের চলাফেরাটা কখনো ঠিকানা বিহীন নয়। আর এই ঠিকানা আসলে কী? বিশেষ একটি বর্ণালিপি মাত্র—কয়েকটি স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিশেষ অর্ধসূচক একটি সমাবেশ। এই বর্ণালিপি যদি আয়ত্ত থাকে তাহলে আস্তে একাটি মহাভারতও অনায়াসে পড়ে ফেলা যায় এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রই অর্নিধগম্য থাকে না। আজকের দিনে যারা পৃথিবীর দিগ্গজ পন্ডিত, তাঁদেরও একেবারে গোড়ার ধাপে বর্ণপরিচয় নিয়ে বসতে হয়েছে।

কিন্তু সাদা কাগজের ওপরে কালো কালির আঁচে যে বর্ণালিপি ফুটে ওঠে, তা ছাড়াও আরো এক ধরনের বর্ণালিপি আছে যা প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষের জানা দরকার। এটি হচ্ছে প্রকৃতির বর্ণালিপি। এই বর্ণালিপিতে অক্ষরের সংখ্যা একা-দুটি নয়, হাজার হাজার। আকাশের প্রত্যেকটি তারা হচ্ছে একটি অক্ষর। রাস্তার প্রত্যেকটি নুড়ি। অরণ্যের প্রত্যেকটি গাছ।

প্রকৃতির বর্ণমালায় যার হাতেখড়ি হয়নি তার কাছে আকাশের প্রত্যেকটি



অয়স্কান্ত

তারা এই একই রকম মনে হবে। কিন্তু জ্যোতির্বিদকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, প্রত্যেকটি তারার আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। প্রত্যেকটি তারার আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আর বর্ণমালার বিশেষ বিশেষ অক্ষরের সমাবেশে যেমন বর্ণালিপি, তেমনি আকাশের বিশেষ বিশেষ তারা মিলে তারামন্ডল।

সমুদ্রে পাড়ি দেবার সময়ে নাবিকরা এই আকাশের বর্ণালিপি থেকে দিগ্-নির্ণয় করে। শূদ্র আজকের দিনে নয়, বরাবরই। অবশ্যই নাবিকরা কম্পাস-বহু ও ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কম্পাস না থাকলে আকাশের এই বর্ণালিপিই একমাত্র পথের হিদ্দিশ।

আকাশের মেঘও এমনি আরেক ধরনের বর্ণমালা। এই বর্ণমালার অক্ষরেও আকাশে বিচিত্র সব লিপি ফুটে ওঠে। এই লিপি যাঁরা পাঠ করতে পারেন তাঁদের পক্ষে আবহাওয়ার হিদ্দিশ বাতলানো কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নয়।

আকাশের মেঘ কখনো পেঁজা তুলোর মতো কখনো জমাট অন্ধকারের মতো, কখনো ছোপ ছোপ রঙের মতো। এই মেঘের দিকে তাকিয়েই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে দিতে পারেন, ঝড় হবে, না, বৃষ্টি। কখনো কখনো দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখা যায়, একরাশ মেঘ কামারশালের নেহাইয়ের মতো ছুঁচলো হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞ বৈদ্যনিকরা এই মেঘ থেকে দূরে সরে থাকেন। কারণ তাঁরা

জানেন যে, প্রচন্ড একটা ঝড়ের তাড়নাতেই মেঘের এমনি চেহারা হতে পারে।

আকাশের বর্ণালিপি আরো অনেক আছে। পাখির ঝাঁক যখন বিশেষ একা-টি জ্যামিতিক বিন্যাস বজায় রেখে এক দেশ থেকে আরেক দেশে উড়ে যায় তখন তার মধ্যে থাকে একদেশের শীত ও অপ-দেশের বসন্তের খবর। এই উড়ন্ত পাখির ঝাঁককে পর্যবেক্ষণ করেই কত বিজ্ঞানী সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

প্রকৃতির বর্ণালিপি শূদ্র আকাশেই নয়, পায়ের তলায় মাটিতেও। কিন্তু এই বর্ণালিপি আয়ত্ত করতে হলেও অনেক অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন চাই।

মনে করা যাক, কোনো এক জায়গায় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে চূনাপাথরের একটা স্তর পাওয়া গেল। অনভিজ্ঞের কাছে ব্যাপারটার কোনো তাৎপর্য নেই। কিন্তু যিনি এই বর্ণালিপি পাঠ করতে জানেন তাঁর কাছে এই চূনাপাথর আশ্চর্য এক ইতিহাস মেলে ধরবে। এই চূনাপাথর তাঁর হয়েছো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্যিক বিন্দুক থেকে। তার মানে যেখানে এখন এই চূনাপাথরের স্তরটি পাওয়া যাচ্ছে সেখানে লক্ষ লক্ষ বছর আগে নিশ্চয়ই সমুদ্র ছিল।

কোনো গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল মস্ত একটি গ্রানাইট পাথরের চাঁই। হয়তো গ্রানাইট বলে আর চেনা যাচ্ছে না। শ্যাওলায় সবুজ হয়ে রয়েছে। এই গভীর অরণ্যের মধ্যে গ্রানাইট পাথরের চাঁই কোথেকে এল? প্রকৃতির বর্ণালিপি যাঁরা পাঠ করতে জানেন তাঁরা এ প্রশ্নের জবাব বলতে পারবেন। এই গ্রানাইট পাথর এসেছে হিমবাহের সঙ্গে যখন এই অরণ্যের চিহ্ন-মাত্র ছিল না আর একটা হিমযুগ চার-

আসল গ্রহরত্ন

রবির জন্যে—পদ্মরাগমণি (চুনি), চন্দ্রের জন্যে—শ্বেতমন্ডা বা চন্দ্রকান্তমণি, মঙ্গলের জন্যে—প্রবালরত্ন বা অনুরাগমণি, বুধের জন্যে—মরকতমণি (পাশা), বৃহস্পতির জন্যে—পীতপদ্মরাগমণি, শুক্রের জন্যে—হীরক বা বরুণমণি, শনির জন্যে—নীলকান্তমণি বা সন্ধ্যামণি, রাহুর জন্যে—গোমেদকমণি, কেতুর জন্যে—বৈদ্যমণি বা রাজপট।

আমাদের গ্রহরত্ন জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া অফিসের পরীক্ষার অধীনে প্রমাণিত হইলে ১০ হাজার টাকা প্রতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।

আসল গ্রহরত্ন ব্যবসায়ী

এম, পি, জুয়েলার্স

১, বিবেকানন্দ রোড (চিৎপুর জং), কলিঃ-৭, ফোনঃ ৩৩-৫৫৬৫

দিকে সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়ে জাঁকিয়ে বসছিল।

এমনি ধরণের বর্ণলিপি পৃথিবীর মাটির প্রত্যেকটি স্তরে লেখা হয়ে আছে। লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি বছরের ইতিহাস পাঠ করা যেতে পারে এই বর্ণলিপিতে। বিজ্ঞানীরা এই বর্ণলিপি থেকেই প্রাগৈতিহাসিক কালের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন।

॥ বেড়ালের প্রাণ ॥

বেড়ালের নাকি নটি প্রাণ। কথাটার মানে একটা মানে এই করা যায় যে, বেড়ালের শরীরে ন' রকমের বিভিন্ন আয়োজন আছে যা বেড়ালকে বিপদ-আপদ থেকে বাঁচাতে পারে। আমাদের দেশে বেড়ালকে আমরা বলি বাঘের মাসী। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেড়ালকে আমরা খুব যে সম্মিহ করে চলি তা নয়। আর বাঘের মাসীটিও ইন্দুর বা পাখির ছানা শিকারে যেতাই পট হোক অস্ত্রত মানুষের ওপরে কখনো বিরক্ত দেখাতে আসে না। অবশ্যই যদি না নিতান্তই কোণঠাসা হয়। তবে সরাসরি বিরক্ত না দেখালেও মানুষের সামান্যতম অনামনস্কতার সুযোগে পাতের মূড়ো বা বাটির দৃশ্য অনায়াসে উদরসাৎ করতে পারে। কমলাকান্তের বেড়ালটি আবার আরো এক কাঠি ওপরে। লাঠির ভাড়া খেয়েও বিজ্ঞের মতো হুস্তিজাল

বিস্তার করে উদাত লাঠিকে নিরস্ত করছিল।

যাই হোক, বেড়ালের নটি প্রাণের কথায় আসা যাক।

প্রথম কথা এই যে, বেড়ালকে যেতো উঁচু থেকে যেভাবেই ফেলা যাক না কেন, বেড়াল সবসময়ে তার পায়ের ওপর পড়ে। গাছের মগডাল থেকে মাটিতে পড়লে একজন মানুষের হাড়গোড় ভেঙে যাবে, হয়তো প্রাণের আশংকাও দেখা দিতে পারে, কিন্তু বেড়াল সম্ভবত বেঁচে যাবে। মাটিতে পড়বার সময় সবচেয়ে আগে মাটি ছোঁবে তার পা চারটি আর মনে হবে যেন চারটি তুলো-লাগানো স্প্রিং সেই প্রচণ্ড পতনের বেগকে আলগোছে থামিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য, বেড়ালের মতো পা মাটির দিকে রেখে পড়তে পারার ক্ষমতা সব মেরুদণ্ডী জীবেরই অঙ্গবিস্তার আছে, তবে বেড়ালের মতো এমন নির্ভুল অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়। শৃঙ্গ চোখের নয়, ক্যামেরার সাক্ষ্যও দেখা গিয়েছে যে, মাটিতে পড়বার সময়ে শরীরকে ঠিকমতো

ব্যালান্স করার ব্যাপারে বেড়ালের কোনো সময়েই কোনো ভুলচুক হয় না। এই হচ্ছে বেড়ালের এক নম্বর প্রাণ।

বেড়ালের দ্ব' নম্বর প্রাণটি রয়েছে তার গোঁফে। এই গোঁফও বেড়ালের এক-চেটিয়া নয়। মানুষের তো আছেই, অন্য প্রায় সমস্ত জীবেরই আছে। এমন কি যে তিনিমাছের গায়ে এমনিতে লোমের কোনো বালাই নেই সেই তিনিমাছেরও ওপরের ঠোঁটে কয়েক গাছি গোঁফ রয়েছে। কিন্তু বেড়ালের গোঁফের মতো এমন স্পর্শপ্রবণ গোঁফ অন্য কোনো জীবের মৃদুমন্ডলে নেই। মানুষের গোঁফ তো নিতান্তই একটা বাহারের ব্যাপার, অধিকাংশ মানুষই বাজে জিনিসের মতো তার মূলোৎপাটন করে—কিন্তু এমন কি বাঘের গোঁফকেও বেড়ালের গোঁফের কাছে হার মানতে হবে। অন্ধকারে চলাফেরা করবার সময়েও বেড়ালের গোঁফের সঙ্গে যদি কোনো জিনিসের সামান্যতম ছোঁয়াও লাগে, বেড়াল সঙ্গে সঙ্গে তা টের পায় এবং সাবধান হয়ে যেতে পারে।

বেড়ালের তিন নম্বর প্রাণ হচ্ছে তার দ্রাণশক্তি। আর চার নম্বর তার শ্রবণশক্তি। এই দুটি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করার কিছু নেই। কুকুর ও অন্যান্য অনেক জীবের দ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি বেড়ালের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয়।

পাঁচ নম্বর—বেড়ালের দৃষ্টি। কথায় বলে, বেড়াল অন্ধকারেও দেখতে পায়। কথাটা এভাবে বলা ঠিক নয়। অন্ধকারে কোনো জীবই দেখতে পায় না। কিন্তু বেড়াল যতোখানি দেখতে পায় এমন আর অন্য কোনো জীব নয়। সকলেই জানেন যে, বেড়ালের চোখের মণি ছোট-বড়ো হতে পারে। ভরা দুপুরে মণি দৃটো হয়ে ওঠে পিনের মাথার মতো দৃটি বিন্দু আর সন্ধ্যার পরেই হয়ে ওঠে প্রায় একটা নয়া-পরসার মতো গোল ও বড়ো। চোখের মণি এভাবে বড়ো হয়ে যাবার দরুন খুব আবছা আলোতেও বেড়াল দেখতে পায়।

ছ' নম্বর—আস্তানা চিনে ফিরে আসার ক্ষমতা। বাড়ির পোষা বেড়ালের পক্ষে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু বুনো বেড়ালও বনেবাঁদাড়ে ঘুরতে ঘুরতে কখনো হারিয়ে যায় না। এমন কি বেড়ালকে ট্রেনে চাপিয়ে অনেক দূরের এলাকায় এনে ছেড়ে দিয়েও দেখা গিয়েছে যে রাস্তা চিনে ফিরে যেতে বেড়ালের খুব বেশী অসুবিধে হয় না।

এ ছাড়াও আরো তিনটি প্রাণ আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে কোণঠাসা হলে বেড়াল গায়ের লোম খাড়া করে শরীরটাকে অনেকখানি ফুলোতে পারে। বেড়ালের এই রাগের মূর্তি দেখে অনেক পরাক্রমশালী জানোয়ারও পালিয়ে যায়। এমন কি অনেক মানুষও বেড়ালের এই মূর্তিকে ভয় পায়।

তাহলেও বেড়ালের আরো দুটো প্রাণ থেকে যায়। বেড়ালের ক্ষিপ্ৰতা, বেড়ালের বাৎসল্য ইত্যাদি অনেক কিছুর উল্লেখ করে এই শূন্য স্থান দুটিকে পূরণ করা চলে। কিন্তু তার আর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এতক্ষণের আলোচনায় এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা গিয়েছে যে, বেড়ালের নটি প্রাণের কম্পনা নিতান্তই একটা কুসংস্কার। অন্যান্য জীবের মতো বেড়ালের শরীরেও কতকগুলি স্বাভাবিক অসুস্থসজ্জা আছে কিন্তু তার মানে এই নয় বেড়াল বার বার আটবার মরবার পরেও বেঁচে ওঠে। বেড়াল সম্পর্কে কুসংস্কার আমাদের দেশের চেয়ে পাশ্চাত্য দেশে বেশী। বেড়াল নাকি ঘুমন্ত মানুষের বুকের ওপরে চেপে বসে ফুসফুস থেকে 'বাতাস' টেনে নেয়, কালো বেড়াল নাকি অমঙ্গলের লক্ষণ, ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঁচি বেড়ালকে ভালোবাসে না এমন মানুষ সম্ভবত নেই।

বিনা চশমায় দেখুন

পুনর্জ্যোতি

অভ্যুত্থান বনোঁষি পুনর্নবা ও উজ্জ্বল জ্যোতি হইতে প্রসূত আইদ্রপ। সকল বয়সে অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির জন্য ব্যবহার করুন। মূল্য ৪ টকা। প্যাকিং ও ডি পি—১.৫০ নং পঃ।

নিও হারবল প্রোডাক্টস

২০/০২, গাড়িয়াহাট রোড,
কলিকাতা-১৯

স্টকিস্ট : মেজ মেডিকেল স্টোর
৬/২বি, লিডসে স্ট্রীট, কলিকাতা।

জুথো-স্বিপ্রতা জ্বায়ে

বোল্যান্ড

ফেস পাউডার

কার্বন কসমেটিক প্রোডাক্টস • কলিকাতা

আর্নেস্ট লুব্চিন্স

প্রভাতকুমার দত্ত

ফিল্ম কমিডির স্রষ্টা হিসাবে চার্লি চ্যাপলিনের খ্যাতির সমপর্যায়-ভুক্ত আরেকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হচ্ছেন জার্মান চিত্রপরিচালক আর্নেস্ট লুব্চিন্স। বর্তমান শতকের তিরিশের যুগে ফিল্ম মহলে 'Lubitch Touch' কথাটির খুব প্রচলন ছিল। এই কথাটির মধ্যে লুব্চিন্সের বিস্ময়কর প্রতিভার আসল তাৎপৰ্য নিহিত। লুব্চিন্সের প্রতিভা তিরিশের যুগের ফিল্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করলেও বর্তমানের ষষ্ঠ দশকেও সে প্রতিভার গুরুত্ব স্মরণীয়। ফিল্ম টেকনিকের বিবর্তনে গ্রিফিথ আইজেনস্টাইনের মত লুব্চিন্সও উজ্জ্বল তারকা। লুব্চিন্স থেকে আজকের চিত্রপরিচালকদেরও বহু জিনিস শিক্ষা নেওয়ার আছে। হলিউডে চার্লি চ্যাপলিনের ভাস্বর প্রতিভা যখন সবচেয়ে উজ্জ্বল সেই অবস্থায় লুব্চিন্স ঐ হলিউডেই নিজস্ব স্বকীয়তায় ফিল্ম পরিচালক হিসাবে একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। এটা কম কথা নয়।

১৯২২ সালে লুব্চিন্স হলিউডে আসেন। তাঁর পিতৃভূমি জার্মানী। হলিউডে আসার আগে জার্মানীতে তিনি দীর্ঘ তের বছর সিনেমার কাজ করেছেন। ছোট বয়স থেকেই লুব্চিন্সের সিনেমার অভিনেতা হবার বিশেষ শখ ছিল। আঠারো বছরের সময়ই সুদার-ম্যান, শ ও ওয়াইল্ডের নাটকের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাবার পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবসা ছিল। অভিনয়প্রীতির জন্য পৈতৃক ব্যবসার দিকে তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। ১৯০৯ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি বার্লিন বায়োস্কোপে কাজ করেছেন। এখানে তাঁর কাজ চম্ভীপাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্যন্ত। কখনও অভিনয় করতেন, কখনও সেট ঘাড় করে বইতেন আবার কখনও তাঁকে দেখে যেত ক্যামেরার সাজসজ্জাম এদিক-ওদিক করতে। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে তিনি ছিলেন বার্লিনের রাইন-

হার্ড কোম্পানীর অভিনেতা। এই সময়ে তিনি 'সুন্দরাস' নামে একটি ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অবতরণ করেন। ছবিটি খুবই সাফল্য লাভ করে। লুব্চিন্স এই সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই অভিনেতা থেকে অভিনেতা-পরিচালকের পদে উন্নীত হন। প্রথম তিনি তোলেন দু'টি দল রীলারের কমিডি। এরপর তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় কয়েকটি সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ফিচার ফিল্ম। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। আমেরিকায় লুব্চিন্সের প্রথম মহাযুদ্ধান্তর চারটি ছবি আমদানী করা হয়। এই ছবিগুলি দেখে আমেরিকাবাসীরা শুধু চমকিত হননি তাঁরা লুব্চিন্সের প্রতিভার স্বকীয়ত্বকেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠা থেকে হলিউডের ফিল্ম ব্যবসার একটা বৈশিষ্ট্য হোল যে, সে সব সময়েই উঠতি প্রতিভাকে নিজের কৃষ্ণিগত করার চেষ্টা করেছে। জার্মানীতে সাফল্যের সাথে সাথেই লুব্চিন্সকে হলিউড টেনে নেন। সেটা হচ্ছে ১৯২২ সাল। গোড়াতেই আমরা একথা বলেছি।

লুব্চিন্সের ছবি তোলার স্টাইল ও কারিগরী ব্যবস্থা ছিল তাঁর একান্ত স্বকীয়। হাস্য-কৌতুকমূলক 'ইমেজ' সৃষ্টি তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন। দ্রুত প্রকাশমান চতুর প্লট-বিস্তার তাঁর ছবির অন্যতম গুণ। অভিনেতাদের কাছ থেকে যতটুকু নেওয়ার আছে ততটুকু বার করে নেবার অশ্রুত ক্ষমতা ছিল লুব্চিন্সের। জাতিতে তিনি জার্মান—হলিউডের বিদেশী পরিবেশে কাজ করেছেন। ফলে তাঁর অনুভূতি আর দেখার শক্তি খুবই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। কারণ তাঁকে সব সময়ই দৃষ্টি রাখতে হত আমেরিকান দর্শকদের কিভাবে প্রভাবিত করা যায়। তাঁর নিজস্ব সূক্ষ্ম অনুভূতিবোধ ছিল এবং বিদেশে কাজ করায় সেটা আরো সূক্ষ্মতর রূপ গ্রহণ করেছিল। লুব্চিন্সের তোলা কমিডিগুলিকে সাধারণত Comedy of Manners বলা হয়ে

থাকে। হলিউডে এসে লুব্চিন্স অনেকটা চ্যাপলিনের দেখা দেখি কমিডি সৃষ্টিতেই হাত দেন। Comedy of Manners-এ সম্বন্ধীয় তথ্য-কথিত মার্জিত রুচিসম্পন্ন উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয়। হাস্য, কৌতুক ও শ্লেষের পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্রেণীর মানুষের মানস-প্রবণতার অশ্রুতত্বকে ফুটিয়ে তোলাই Comedy of Manners-এর উদ্দেশ্য। লুব্চিন্সের wit ও humour-বোধ এ কান্ত ভাবে ইউরোপীয়। আমেরিকান সিনেমা-দর্শকদের কাছে জিনিসটা নতুন ও মনোমুগ্ধকর। ইউরোপীয় wit ও humour-এর চতুর প্রয়োগের জন্যই আমেরিকায় লুব্চিন্স এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

তৎকালীন হলিউডের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মেরী পিকফোর্ড একটি Costume Drama পরিচালনা করার জন্য লুব্চিন্সকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছিলেন। নাটকটির নাম হচ্ছে Rosita। লুব্চিন্স Rosita-র মূল ভূমিকায় মেরী পিকফোর্ডকে পরিচালনা করেন বটে কিন্তু ছবিটি শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে সাফল্য অর্জন না করতে পারলে পরিচালককে বিশেষ বিপদে পড়তে হয়। এই অসাফল্যের খবর বড় তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। যে পরিচালক সবেমাত্র হলিউডে কাজ আরম্ভ করেছেন (অর্থাৎ লুব্চিন্স) তাঁর মেরী পিকফোর্ডকে নিয়ে এই অসাফল্যের পরিণাম ভয়াবহ বৈকি। তাই লুব্চিন্স ঠিক করলেন এরপর থেকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত অভিনেতাদের নিয়ে ছবি তুলবেন এবং জার্মানীতে ইতিমধ্যে যে নাটকগুলিতে হাত দিয়েছিলেন সেগুলি নিয়েই কাজ চালাবেন। যতক্ষণ না তিনি হলিউডে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারছেন ততদিন এইভাবে চলবে। লুব্চিন্সের পক্ষে এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত। তাঁর উপস্থিতিবোধ ও বিচারশক্তি যে কত তীক্ষ্ণ ছিল তা এর থেকেই বোঝা যায়। এই সময়ে লুব্চিন্স গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর ছবি তোলা থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। ছবির বিষয়ের দিক থেকে তিনি আদর্শ হিসাবে চ্যাপলিন, ডি মিল প্রভৃতিকেই গ্রহণ করেন। অবশ্য এথেকে পাঠকেলা ভাববেন না যে, লুব্চিন্স দ্বিতীয়

শ্রেণীর প্রতিভা ছিলেন এবং কেবল চ্যাপলিন-ডি মিলের অনুকরণ করেছিলেন। আমেরিকান দর্শকেরা তখন যে জিনিস চাইতেন লুইবৎস শুধুমাত্র তাকেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিদেশী নতুন হলিউডে এসে এ ছাড়া তাঁর গতানুগতিক ছিল না।

এই সময়ে লুইবৎসের তোলা ছবি-গুলির মধ্যে *The Marriage Circle* ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবিটিতে রাণী ক্যাথারিনকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। রাণী ক্যাথারিন নানা পুরুষের কাছে প্রেম নিবেদন করে নিজের উচ্চ পদের দায়িত্বকে ভুলে থাকতে চান। লুইবৎস এই কাহিনীর চিত্রগত রূপায়ণে যৌন বিষয়, রাজ-নৈতিক চাল, রাজসভার ভব্যতা প্রভৃতির উপর অনবদ্য শ্লেষোক্তি করেছেন। *The Marriage Circle*-র একটা বিশেষ দৃশ্যের কথা আমরা এখানে বলছি যা থেকে পাঠকেরা লুইবৎস টেকনিকের বৈশিষ্ট্য অনেকটা হৃদয়গম্য করতে পারবেন। একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অসন্তুষ্ট এক দল লোকের সামনে বিপন্ন। অবস্থা এমনই সংগীন যে, ছবির দর্শকেরা সবাই মূহূর্তে গুণছেন এই ব্যক্তি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটি তাঁর জামার তলা থেকে রিভলবার বার করবেন। কিন্তু শেষ পর্বন্ত তিনি যা বার করলেন তা বন্দুক নয় চেক বই। লুইবৎসের প্রতি ছবিতেই এ ধরনের সূক্ষ্ম শিল্পসূক্ষ্মামণ্ডিত প্যাঁচ লক্ষ্য করা যায়। লুইবৎস চলচ্চিত্রের ভাষার আরেকটি দিকে এই সময়ে বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে ফাঁকা স্থানের বিরাটত্বকে ফুটিয়ে তোলা। তাঁর অনেক ছবিতে বিরাট উঁচু দরজা, বহুদূর প্রশস্ত সিঁড়ি, লম্বা কোলানো পর্দা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। এগুলির স্টু-নেওয়া হয়েছে খুব উপর থেকে কোলানো ক্যামেরার সাহায্যে। দর্শকের মনে ফাঁকা শূন্য স্থানের বিরাটত্বের ভাব ফুটিয়ে তুলে পরিচালক দর্শকদের টেনে রাখতে তো পেরেছেনই তাছাড়া তাঁর কমোডিগুলিও অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে। 'সেন্টিমেন্ট' জিনিসটাকে নিয়ে প্রত্যেক চিত্রপরিচালককেই কারবার করতে হয়। তবে লুইবৎস তাঁর ছবিতে জোলো সেন্টিমেন্টকে কখনও প্রদ্রাৱ দেননি। তাকে সব সময়ই রং ঔজ্জ্বল্য ও বুদ্ধিদীপ্ততায় মণ্ডিত করেছেন। এটাই তাঁর স্বকীয়ত্ব। *The Patriot* নামে একটি ছবি তোলা পর লুইবৎসের

নির্বাক ছবি তোলার পর্ব শেষ হয়। এরপর সবাক যুগ।

চলচ্চিত্রে সবাক যুগ আরম্ভ হয় ১৯৩০ সাল সরাবর। নির্বাক ও সবাক ছবি তোলার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য। নির্বাক ছবির টেকনিক সবাক ছবিতে একেবারে অচল। লুইবৎস এতদিন নির্বাক ছবি তুলে স্ব-পরিচালিত এক বিশিষ্ট চিত্র-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু সবাক চিত্র এসে আগেকার চিত্র-পদ্ধতির আদর্শকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। লুইবৎস অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। অপরে শব্দকে চলচ্চিত্রে কিভাবে ব্যবহার করছেন তা দেখার জন্য তিনি চুপচাপ বসে রইলেন। কয়েক বছর কোন ছবি তুললেন না। নির্বাক-সবাক যুগের সন্ধিক্ষণে এই সমস্যা শুধু লুইবৎস কেন হলিউডের অনেকের কাছেই দেখা দিয়েছিল। নির্বাক ছবির রাজা চার্লি চ্যাপলিনও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। শব্দ এসে নির্বাক যুগের পরিচালকদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছিল। এই চ্যালেঞ্জ যারা ঠিকমত গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তী কালে তাঁরা সার্থক ছবি তুলেছিলেন। চ্যাপলিন ও লুইবৎস দুজনেই সবাক চিত্রের সার্থক স্রষ্টা। লুইবৎস যে কিছুদিন চুপচাপ দিন গুণেছিলেন সে শুধু চলচ্চিত্রে শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়ার জন্য।

লুইবৎস প্রথমে যে তিনটি সবাক ছবি তোলেন সেগুলি সবই সংগীত-মুখর। সবাক চিত্রে লুইবৎসের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে যে, তিনি সর্বপ্রথম ক্যামেরাকে শব্দনিরোধক ঘরের বন্দী-দশা থেকে মুক্ত করেছিলেন। অন্য কথায় বলতে গেলে তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা মাইক্রোফোনকে সচল করে তুলেছিলেন। সবাক চিত্রের প্রথম দিকে পরিচালকেরা ক্যামেরায় ছবি আর শব্দযন্ত্রে শব্দ পূর্বাপর এক সঙ্গে গ্রহণ করতেন। ফলে ক্যামেরাকে ইচ্ছামত নড়ানো যেত না, তাকে শব্দনিরোধক ঘরে আবদ্ধ রাখা হত। কিন্তু এতে ছবির গতি ও আবেদন শ্লথ হয়ে পড়ে। সারা ছবিই 'ডায়লগে' ঠাসা হয়ে যায়। শ্রোতাদের চক্ষু ও কর্ণের সমান পরিভূষিত সাধন করা যায় না। তাই লুইবৎস ক্যামেরাকে মুক্তি দিলেন। তিনি অনুসরণ করলেন *Blending* অর্থাৎ

মিশ্রণের নীতি। অর্থাৎ ক্যামেরা তার প্রয়োজন মত ছবি তুলে যাবে শব্দকে আলাদাভাবে ধরে পরে ছবির সঙ্গে *sound image* মিলিয়ে দেওয়া হবে। যেমন লুইবৎসের *Monte Carlo* ছবির একটা দৃষ্টান্ত। এ ছবিতে পরিচালক দ্রুত ধাবমান ট্রেনের চাকার শব্দ-ছন্দকে আলাদা ধরে রেখে একটি গানের সংগীত সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন। তাঁর *The Smiling Lieutenant* ছবির অনেক স্থানেই বিনা মাইক্রোফোনে কাজ এগিয়েছে। এখানে প্রতিটি দরজা খোলা, লম্বা নেমে যাওয়া প্রশস্ত সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতিটি ভঙ্গীর সঙ্গে এমন একটি শব্দক্রম পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, তা দর্শকের মনে শিল্প-রসের অনির্বচনীয় স্বাদ এনে দিয়েছে। লুইবৎস ক্যামেরাকে গতিময় করে তুলেছিলেন বলেই তাঁর ছবির ইমেজ ডায়লগ এবং গান অদ্ভুত এক প্রবহমানতা লাভ করেছিল। এতে দর্শকের চক্ষু-কর্ণ দুয়েরই পরিভূষিত হয়েছিল। যখনকার কথা আমরা আলোচনা করছি সেই সময়ে লুইবৎসের এই নতুন টেকনিকটি চলচ্চিত্রে বিপ্লব এনে দিয়েছিল। লুইবৎসের এই টেকনিক অনেকটা স্টেজ অপেরার সঙ্গে তুলনীয়।

লুইবৎস সাউন্ড ক্যামেরাকে শুধু সংগীতমূলক কর্মোডির ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেননি যথার্থ গাম্ভীর্য বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরও ছবি তুলেছিলেন। তাঁর নিদর্শন হোল ১৯৩২ সালে তোলা *The Broken Lullaby* ছবি। এখানে লুইবৎস কয়েকটি অপূর্ব সুপারিকল্পিত স্টেরিও দিয়ে যুদ্ধ-বিরোধী বিষয়বস্তুকে মনোজ্ঞভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। *Broken Lullaby* গল্প গড়ে উঠেছে বিচিত্র এক মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে। একজন ফরাসী সৈনিক—তার মন অত্যন্ত অনুভব-কাতর। যুদ্ধের সময় সে একজন তরুণ জার্মানকে গুলীবিস্ফোরণ করে মেরেছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার বহুদিন পরেও সে সেই ভয়াবহ স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। গিজার্ড একজন পাদ্রী তাকে বোঝায় যে যুদ্ধে শত্রুকে মেরে সে কতব্য কাজ করেছে, অন্যায় কিছু করেনি। পাদ্রীর এই বিষয়টি দিয়ে লুইবৎস দর্শকের হৃদয়কে ঘটিয়ে তাঁদের ফিল্মের সঙ্গে একাত্মতা

অনুভবের সুযোগ করে দিয়েছেন। পাদ্রীর সান্ত্বনাদানে অবশ্য ফরাসী সৈনিকটি মোটেই আশ্বস্ত হয় না। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করে যে, মৃত জার্মানটির পরিবারে গিয়ে সে তার দোষ স্বীকার করবে। কিন্তু সেখানে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায় এই জন্য যে তাঁরা মনে করেন যে, সে তাঁদের মৃত পুত্রের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু এবং তাঁদের কন্যার রূপমন্ড। এই বিরাট রনসত্যিক আলোড়ন বা দম্ব Broken Lullaby ছবির আসল বৈশিষ্ট্য।

এখন এই ছবির কয়েকটি 'স্টোর' বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। শান্তি-চুক্তি দিবসের দৃশ্য এখানে তোলা হয়েছে এক-পা-বিশিষ্ট একটি সৈনিকের পায়ে ফাঁকের মধ্য দিয়ে। ছবির গোড়াতে এক জায়গায় দেখানো হয়েছে একজন পাদ্রী শান্তির জন্য প্রার্থনা করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভজনালয়ের দরদালানে হাঁটু ভেঙ্গে প্রার্থনারত অফিসার ও তাঁদের চকচকে পোষাক ও তরবারির উপর দিয়ে। এখানে লুবিৎস অপূর্ব এক Irony সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া আছে বৃন্দ কয়েকজন জার্মানের উপস্থিতি—এক বাগানে বিয়ার পার্টির দৃশ্য। ক্যামেরা যখন প্রত্যেক জার্মানের মূখের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন যেন প্রত্যেকটি মুখই তাঁদের অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শেষ দৃশ্য, যেখানে ক্যামেরা ভায়োলিন বাদ্যরত বালক, অপেক্ষমান একটি যুবতী এবং বৃন্দ এক দম্পতির উপর দিয়ে ক্রমান্বয়ে সরে যাচ্ছে, সেটি অপূর্ব ভাবময়। ভজনালয়ের দৃশ্যে লুবিৎস প্রথমে পাদ্রী ও অফিসারদের ছবি তুলেছেন, পরে শব্দ জুড়েছেন। এর ফলে তিনি যে শব্দ ক্যামেরার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন তাই নয় শিল্পসুখমায় সৃষ্টির উপযোগী মালমসলাগুলিকেও উপযুক্তভাবে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'Lubitsch touch'—শেষ ও সুক্ষ্ম বৃন্দ্রর অনবদ্য সংমিশ্রণে যা গড়ে উঠেছে তার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় The Broken Lullaby ছবিতে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, বৃন্দ্রবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য ছবিটি বিশেষ আর্থিক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। উদ্দেশ্যের গভীরতা ও ব্যাপ্তির জন্য

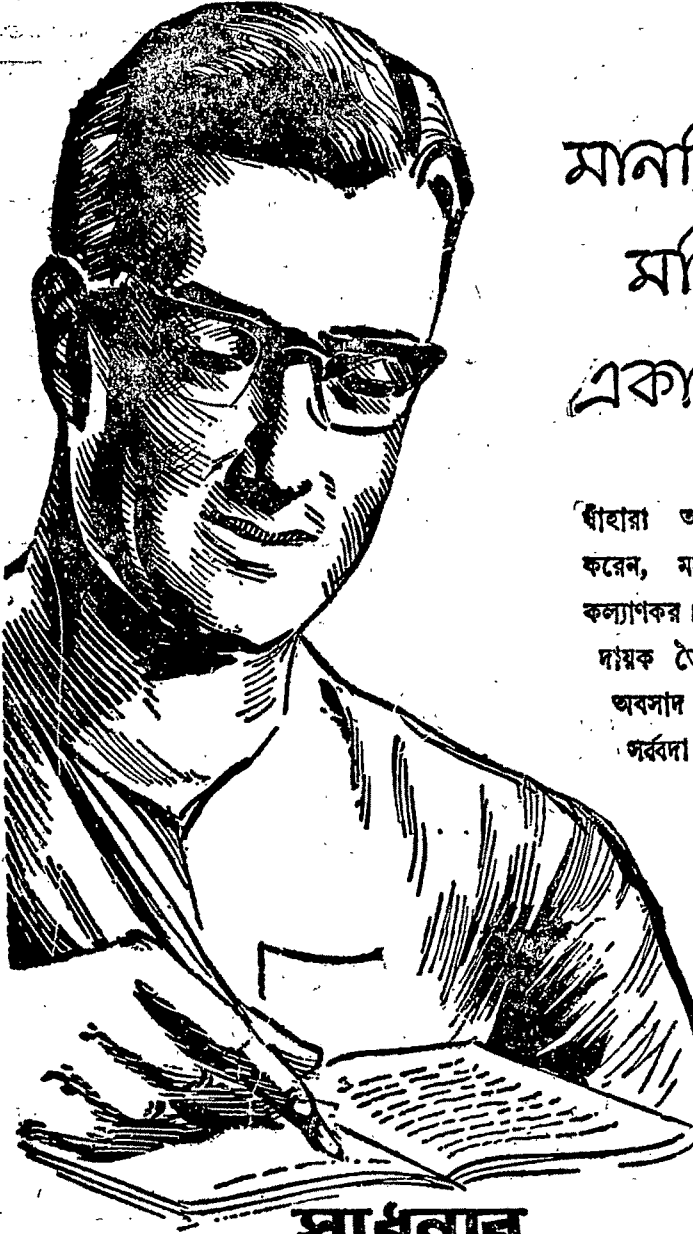
Broken Lullaby সভাই মহৎ সৃষ্টি।

১৯৩২ সালে One Hour With You ছবিতে লুবিৎস আরেকটু নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এতে তিনি সংলাপকে Couplet-এর আকার দেন। অর্থাৎ অনেকটা সেই আগেকার মতই—সঙ্গীত ও গল্পের একত্র সংমিশ্রণ। এখানে ছন্দপ্রধান সংলাপ ছবির স্বচ্ছ গতিধারার সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলে গিয়েছিল এবং এর মধ্যে একটা সজীবতা ও সুখকর দোলার ভাব ছিল। এক প্রেম নিবেদনের দৃশ্যে লুবিৎস মূলে অভিনেতা নেভালিয়রকে তার বস্ত্র সোজাসুজি দর্শকের সামনে পেশ করতে বলেছিলেন। দর্শককে এভাবে সোজাসুজি সম্বোধন করার ছবিটিকে তাঁদের সহজে গ্রহণ করার সুবিধা হয়েছিল। এই সময়ে লুবিৎসের মধ্যে তাঁর টেকনিককে সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর রূপ দেওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। Broken Lullaby-র পর তিনি 'সিরিয়াস' বিষয় নিয়ে আর কোন ছবি তোলেননি। যা তুলেছেন সেগুলিকে আমরা ড্রিং-রুম কমিডি বলতে পারি। হাল্কা বিষয় তবে লুবিৎসীয় বৃন্দ্র-দীপ্ততা ও শ্লেষ মেশানো ছবি। পরিচালক ক্যামেরাকে অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অভিনয়ের ছন্দ, বস্ত্রবোয় সুক্ষ্মতর মোচড়, শ্বেত অর্থ—প্রভৃতি বিষয়কে ধরে রাখার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এতে ছবির গতি শ্লথ হয়ে পড়েছিল। একটা জিনিসকে যতটুকু দেওয়া প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী সুক্ষ্মতর রূপ দিলে সহজেই জিনিসটার প্রাণময়তা ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে লুবিৎস সমাজের উচ্চশ্রেণীর বিবাহ সমস্যার উপর কয়েকটি ছবি তোলেন। সেগুলি হচ্ছে Desire, Design for living, Bluebeard's Eight Wife ইত্যাদি। আমরা শেষোক্ত চিত্রটির একটি দৃশ্য এখানে উল্লেখ করছি। এতে বিখ্যাত গ্যারি কুপার ও ক্লডেট কোলবার্ট অভিনয় করেছিলেন। একটা দৃশ্যে দেখা গেল গ্যারি কুপার অত্যন্ত রূক্ষ ভঙ্গীতে হোটেলের ক্লডেটের ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। কুপারের ঘরে ঢোকা এবং সজোরে দরজা বন্ধ করা পর্যন্ত দেখিয়ে দৃশ্যটি 'ডিসলভ' করে দেওয়া হয়েছে। এর পরেই আমরা দেখতে

পাচ্ছি একটি নাইট ক্লাবে অদ্ভুত রোমান্টিক ভঙ্গীতে কুপার-কোলবার্ট নৃত্যরত। এখন পরিচালক হোটেলের ঘরে কি ঘটেছিল তা কিছই দেখানেন না। সে বিষয়ে চিন্তার ভার লুবিৎস সম্পূর্ণভাবে দর্শকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। দরজা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য 'ডিসলভ' করে নাইট ক্লাবের দৃশ্যে চলে আসার টেকনিকটা একটা Trick বা চাতুরী ছাড়া আর কিছ নয়। চিত্রে এ জিনিসের বেশী প্রয়োগ দিলে বিপদ স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যবশতঃ লুবিৎসের শেষ ছবিগুলিতে এরই প্রাধান্য বিশেষ চোখে পড়ে। এরই জন্য শেষের দিকে হলিউডের ফিল্ম জগতে লুবিৎসের প্রতিপত্তি কমে যায়। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪৭ সালে।

শেষ জীবনের বিচ্যুতি সত্ত্বেও লুবিৎস চলচ্চিত্রের মহৎ প্রভা। তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা যে, তিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমের অভূতপূর্ব শিল্প-সাধকতার সম্ভাবনা বিষয়ে অতিমাত্রার সচেতন ছিলেন। তাঁর ছিল এক তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মন। পরিচ্ছন্ন বৃন্দ্র শ্লেষ আর রসিকতার সচতুর প্রয়োগই তাঁর ফিল্মের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। লুবিৎসের ছবি থেকে এ বিষয়ে আরও দু'একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করবো। লুবিৎস একটি ছবিতে বোঝাতে চান যে, একটি লোকের তাঁর স্ত্রীকে আর ভাল লাগছে না, তাঁদের মধ্যে সম্পর্কটা একেবারেই বিবিধে উঠেছে। স্বামীর স্ত্রী সম্পর্কে এই বিরক্তির ভাবটা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে একটি নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য তাঁদের ঘর থেকে বেরিয়ে লিফটে করে নীচে নামছেন। লিফটে প্রবেশের সময় স্বামী ভদ্র-লোকের মাথায় টুপি ছিল। কয়েকজন নীচে, লিফটটি থামলো এবং এক সুন্দরী যুবতী ভিতরে এলেন। তাঁকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে স্বামী ভদ্রলোক টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে নিনেন। আরেকটি ছবিতে লুবিৎস ঘোড়দৌড়ের মাঠের উত্তেজনাভরা দৃশ্য দেখিয়েছেন। মাঠে জমারোত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা-শোনা আলাপের ব্যাপারটা তিনি উচ্চস্বরের কথা না দিয়ে, চাহনি, চোখ নামানো, মৃদু হাসি, ফিসফিসানি ইত্যাদির সাহায্যে পরিস্ফুট করেছেন। এই দৃশ্যটি অদ্ভুত উৎকর্ষ। চিত্র-পরিচালক লুবিৎসের মহৎ প্রতিভার পরিচয় এই সমস্ত ছোট্ট মৃদু-গুণিতাই পাওয়া যায়।



মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন!

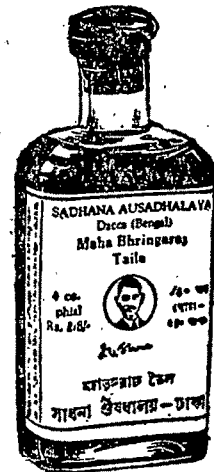
দ্বারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভূঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরামদায়ক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্বদা প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনার মহা ভূঙ্গরাজ তৈল



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলি:) অ্যাসিস্ট্যান্ট

অধ্যক্ষ ত্রিযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
অ্যাসিস্টেন্ট শাস্ত্রী, এল. সি. এস. (লন্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

গুণ্ডা হাতী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

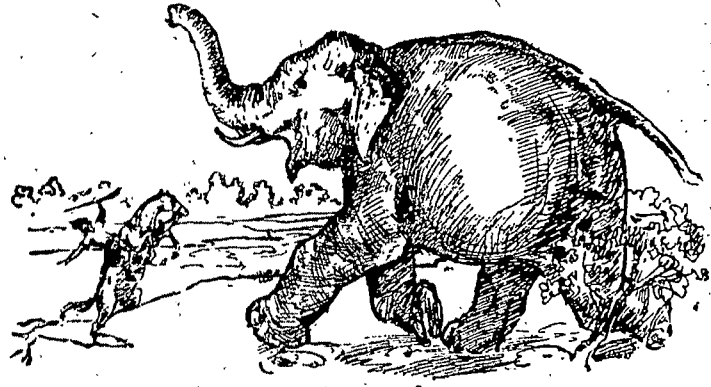
(১)

বহুদিন আগেকার কথা, ষাট বৎসরের কিছু উপর। ছুটিতে বাবা আমাদের দেশে (বাঁকুড়া) নিয়ে গেছেন। বাঁকুড়া জেলা তখনও শাল, পিয়াশাল, পলাশ, কেঁদে ইত্যাদির ঘন জঙ্গলে ভরা। আবার বাঁকুড়া জেলার গায়ে-লাগা মানভূম, সিংভূম এবং মৌদীনীপুরের অঞ্চলগুলিতেও ঘন জঙ্গল ছিল। আরও দূরে ছিল ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ, রাঁচির জঙ্গল এবং মানভূম-সিংভূমের গায়ে উড়িয়া ময়ূরভঞ্জের পাহাড় ও বন-জঙ্গল। বলা বাহুল্য এই সকল আদিম-কালের বনজঙ্গল ছিল বন্য পশুর লীলাভূমি, এখানে স্বাধীনভাবে দূরত বাঘ জঙ্গলে বিচরণ তো করতোই, উপরন্তু ছিল অসংখ্য ভাল্লুক, চিতা, হরিণ, গোর (বাইসন) এবং বহু হস্তী-বৃথ।

বুনো হাতীর দল বড় গ্রাম বা শহরের কাছে সহজে যাওয়া আসা করে না, এবং তখনও করতো না। তবে গ্রামাঞ্চলে শস্যের ক্ষেত নষ্ট বা ফল-বাগানের গাছপালা ফলমূল—বিশেষে কলাগাছ—লুটপাট লুণ্ঠভণ্ড প্রায়ই করতো। চাষীরা ঢোলকানিস পিটিয়ে আগুন জেলে, বা বড় গাদা বন্দকের ফাঁকা আওয়াজ করে হয়ত তাড়াবার চেষ্টা করতো। হাতী আড়বার জন্যে জঙ্গলের সাঁওতাল আজও বিষম শক্তিশালী ধনুকে “কাঁড়” চালায় এবং তখনকার দিনে গ্রামের লোকে তাদের ধান দিয়ে, পরসাদা দিয়ে, এই রকম কাজে লাগাতো। এই “কাঁড়ের” ফলা পান-দেওয়া ইস্পাতের তৈরী এবং কি জোরে বনের সাঁওতাল তাকে চালায়, তার পরিচয় আমার এক বন্ধক আড়ীর সম্প্রতি পেয়েছিলেন। তিনি গত বৎসর বিশেষ কাজে রুরকলায় কয়েকবার যাতায়াত করেন এবং সেই যাতায়াত নিজের চালানো সিট্রোয়েন গাড়ীতেই করেছিলেন।

একবার ফিরবার পথে দেবী হওয়ার একটা ঘন জঙ্গল পার হতে হয় অন্ধকার রাতে। জঙ্গলের পথে হঠাৎ

বাজিয়ে দ্রুত চলবার সময় এক সাঁওতাল গ্রামের পাশ দিয়ে যেতে হয়। সাঁওতালেরা মাঝরাত্রের পর গাড়ীর হর্ণ ও তার এঞ্জিনের ডগ্ ডগ্ গুম্ গুম্ আওয়াজ দূর থেকে ক্রমেই এগিয়ে আসতে শুনে বোধহয় ভাবে যে হাতীর দল গ্রামের দিকে আসছে। তারা মাদল বাজিয়ে এবং পরে শব্দ লম্বা করে “কাঁড়” চালাতে আরম্ভ করে। গাড়ীর লোহার গায়ে ও ছাদে জোরে কড়াং কড়াং আওয়াজ দু-তিনবার হওয়ায় ঐ আড়ীরটির খেয়াল হয় যে “কাঁড়” চালানো হচ্ছে। তাতে তিনি spot light গ্রামের দিকে দিয়ে চীৎকার করে বলেন “বন্ধ কর, গোলাী চালায়



গা।” তাতে কাঁড় চালানো বন্ধ হয়। বাড়ীতে ফিরে এসে তিনি দেখেন যে, সামনের এক মাড়গাড়ে একটা কাঁড়ের ভারী ফলা গিঁথে রয়েছে। ফলাটা মাড়গাড়ের পুরু লোহার চাদর এপার ওপার ফুড়ে ঢুকে গেছে যদিও সেটা অন্ততঃ পঞ্চাশ গজ দূর থেকে ছোঁড়া হয়েছিল।

বুনো হাতী অন্য বন্য পশুর মতই মানুষকে ভয় করে—বরঞ্চ একটু বেশী রকম—এবং এইটাই জঙ্গলের এলাকায় বাসিন্দা মানুষের প্রধান সতর্ক। মানুষের সাজা-শব্দ বা গম্ব পেলেই হাতী চেষ্টা করে সেখান থেকে সরে পড়তে। তবে আচমকা সামনে পড়লে বুনো হাতী তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করতে উদাত্ত হয় এবং তখন খুব ভাল শিকারীও ভাল, ভারী

রাইফল হাতে না হলে, চম্পট দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, যদি না বড় গাছে উঠে পড়া যায়।

তবে মাঝে মাঝে এক একটা পুরুষ-হাতী দল থেকে ছটকে বেরিয়ে ঘুরতে আরম্ভ করে। এই রকম হাতী যদি গ্রামাঞ্চলে এসে ঘুরতে আরম্ভ করে তার অল্প দিনের মধ্যেই সে ব্যাঘাত পারে যে, তার সামনে সাধারণ নিকম্ গাম্বের লোক কত অসহায়। দেখুন স মানুসের ভয় হারিয়ে অতি ভয়ঙ্কর জীব হয়ে দাঁড়ায়—কতকটা মানস্বত্বকে বাঘেরই মত। এই রকম হাতী গুণ্ডা হাতী (Rogue Elephant) নামে পরিচিত। সাধারণভাবে হাতী-শিকার আজকাল নিষিদ্ধ, কিন্তু এ রকম হাতী মানুষের ক্ষতি ও মানুষকে মারার পর গুণ্ডা নামে বিজ্ঞাপিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাকে মারবার জন্য পুরুষ-মোহন করা হয়। অবশ্য সকল পুরুষ-হাতীই মাঝে মাঝে “মস্ত”—অর্থাৎ মস্ত অবস্থায় আসে এবং তখন সেও মানুষের ভয় হারিয়ে ভয়ের কারণ হয়ে

দাঁড়ায়। তবে পোষা হাতীর কানের উপরের ফটা থেকে একটা তীর গম্বের প্রাব হচ্ছে দেখলেই মাহুত তাকে শস্ত শিকল দিয়ে মজবুত খোঁটা বা গাছের সঙ্গে বাঁধে। প্রাব বন্ধ হলেই হাতী ফের আগেকার মত খালি ও আশ্রয়হীন হয়। বুনো পুরুষ-হাতীর ঐ রকম মস্ত অবস্থা আসে কিন্তু তাও সাময়িক এবং ঐ কারণে সে গুণ্ডা হাতীর মত কথাও ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায় না। অবশ্য পোষা হাতীর কটিং কদাচিৎ দারুন সংহারমর্তি দাব এবং দীর্ঘকাল মানুষ মাঝে মানুষের ক্ষতি করে ফেরে হতদিন না শিকারীর হাতে বা ফাঁদে পড়ে তার নিজেরও জীবন শেষ হয়। মধ্যপ্রদেশের মাশুল শুল্কে এক স্থানীয় জমিদারের হাতী এইভাবে

ক্ষেপে গিয়ে “মানুষকে হাতী” নাম পায় এবং কয়েক মাস ধরে বহু নিরীহ চাষী ও কৃষকের মেরে অনেক ক্ষেত নষ্ট করে সমস্ত ত্রুটি আর্জিত করে শেষে এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের রাইফেলের গুলীতে নিহত হয়।

কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায় যে, কোনো বুনো হাতী নিজের দল থেকে বিতাড়িত হলে পরে অনেক সময় এই রকম গুন্ডা হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষের ভয় তার কমে গেলে তখন সে সংহার মূর্তি ধরে। আগেকার দিনে এরকম হাতী জঙ্গল অঞ্চলের কাছের শহরেও ঢুকে লোক মেরেছে এবং মানুষের অন্য অনেক ক্ষতিও করেছে।

যখনকার কথা প্রথমেই বলেছি—অর্থাৎ প্রায় ষাট বৎসর আগে—এই রকম একটা হাতী বাঁকুড়া শহরে ঢোকে। সে সময় আমরা এলাহাবাদের স্কুলে পড়ি। শহর তখন ছোট, রেল লাইন বাঁকুড়া জেলায় তখনও হয়নি এবং সারা জেলায় যাওয়া-আসা, মালপত্র আনা-দেওয়া সব কিছুই গরু-মহিষের বা ঘোড়ার গাড়ি, কিংবা জনমানুষের পায়ের উপর নির্ভর করত। এই হাতীটা লোক চলাচল, এমন কিছু গাড়ীর চলাচল বন্ধ করে, প্রথমে শহরের আশেপাশে ঘাসের সৃষ্টি করে। তারপর একদিন শোনা গেলো যে সেটা শহরে ঢুকেছে। তার বর্ণনা তখন যা শুনছিলাম তা এখন লিখলে লোকে হাসবে। তবে এটা ঠিক যে, সেটা বিরাট আকারের দেহ—অর্থাৎ পুরুষ-হাতী।

গুন্ডা হাতী শহরে ঢুকেছে এ খবরটা জেলা স্কুলে পৌঁছায় একটু

বেলায়। খবর পাবামাত্রই মাস্টারেরা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ছুটি দিতে বলেন এবং হেড মাস্টার তাতে রাজী হওয়ায় সকলেই বাড়ীমুখে পলায়ন দেন। ছেলেদের মধ্যে যারা ছোট ছিল তারা উদ্বেগে ছুটে ছুটে বড়ী যায়, কিন্তু যারা একটু বড় তাদের মধ্যে দু-চারজন “পাগলা হাতী” দেখার লোভ না সামলাতে পেয়ে একটু এদিক ওদিকে যায়।

এদেরই মধ্যে দু-তিনজন জেলা কোর্টের কম্পাউন্ডের কাছে ঐ গুন্ডা হাতীর সামনে পড়ে, তখন কোর্টের বাড়ীর দিকে ছুটে যায়। কোর্টের জজ-হাকিম, উকীল-মোক্তার, আসামী-ফরিয়াদি সকলেই বাইরের দরজা বন্ধ করে ভিতরে কাঁপছিলেন। ছেলেরা খোলা বারান্দায় কোন আশ্রয় না পেয়ে তিনজন তিন দিকে ছুটে যায়। এর মধ্যে একজন—তার নাম আমার মনে নেই কিন্তু তার ছোট ভাই লক্ষ্মীকান্ত আমাদের বয়সী ছিল মনে আছে—ছুটে যায় ট্রেজারীর দিকে, যেখানে বন্দুকধারী পদাশি সান্দ্রী দাঁড়িয়ে ছিল। হাতীটা তাকেই তাড়া করে যাওয়ায় সেই সান্দ্রী ট্রেজারীর মোটা লোহার গরাদ দেওয়া ফটক বন্ধ করে, বীর পুরুষের মত রামনাম জপ করতে থাকেন। যদি তিনি দু-চারটে বন্দুকের আওয়াজ করে হাতীটাকে আটকিয়ে ফটকটা অলক্ষণ খুলতেন তবে ঐ অসহায় রাক্ষস রক্ষা পেয়ে যেতো।

ফটক বন্ধ হতে দেখে সে যখন অন্য দিকে ছুটবার চেষ্টা করছে, সেই সময় হাতীটা তাকে ধরে এবং শূঁড় দিয়ে উপরে তুলে এক আছড়ে ভয়াবহ বালকের চীৎকার চিরাদিনের মত থামিয়ে দেয়। তারপর তাকে পায়ে থেঁৎলে মাংসপিণ্ডে পরিণত করে হাতীটা অন্য দিকে যায়। আদালত-সম্প্রদায় লোকের চীৎকার-চেঁচামেচিতে সে ভ্রূক্ষেপও করেনি। সমস্ত ঘটনাই কোর্টের দোতালার ছাদ থেকে বহু লোকে দেখে।

সান্দ্রী মহাশয় তাঁর বীরত্বের জন্য কি পেরেছিলেন জানি না, আমরা তখন ছেলেমানুষ এবং তখন ইংরাজী রাজত্বের দিন। আজকের দিন হলে হয়ত খবরের কাগজের তীর মন্তব্যের ফলে তাকে কিছু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হতো। আবার এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার মধ্যেও তার “আহিংস নীতি” অটল থাকার জন্য তাকে “পদ্মশ্রী” জাতীয় কিছু দেওয়াও তেমন আশ্চর্য ছিল না। আমাদের কণ্ঠধারদের বিচার-বুদ্ধি এতই সূক্ষ্ম!

হাতীটা সারা দিন শহরের বাইরে ঘুরে, লোকজনের কাজকর্ম বন্ধ করিয়ে, গাছপালা, ফলমূলের বাগান-ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে এক বিষম অবস্থার সৃষ্টি করে।

পরের দিন হাতীর দুর্বৃত্তি ঘনায় এবং সে, বোধহয় পোষা হাতীর গন্ধ পেয়ে বাঁকুড়া শহরের বাইরে লোক-পরের নীলকুঠীর এলাকায় ঢুকে সেখানের বাগানপাট নষ্ট করে সেখানের লোকজনকে তেড়ে যায়। দুই নীলকর সাহেব ভারী বন্দুক রাইফেল নিয়ে তার উপরে গুলী চালায়। রাইফেলের গুলী খেয়ে হাতীর আঁকল হয় এবং সে পালাবার পথ দেখে, কিন্তু তখন দিনের আলো, আর চতুর্দিকে খোলা ডাঙা জমি। উপরন্তু ঐ দুই সাহেবের মধ্যে একজন—নাম বোধহয় ডানকান—শিকারে অভ্যস্ত ছিল এবং তার কাছে শক্তিশালী রাইফেল ছিল। ঐ গুন্ডা হাতীর প্রকান্ড দুই দাঁত দেখে তারও রোখ চাপে হাতী মেরে সেই দাঁত জোড়া ট্রিফরপে জোগাড় করতে। কাজেই দুই সাহেবে মিলে লোকলস্কর ও হাতী নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে, হাতীর পিছনে ধাওয়া করে। তখন দিনের আলোয় চতুর্দিক উজ্জ্বল।

সাহেবেরা বন্দুক নিয়ে গুন্ডা হাতীর পিছন নিয়েছে—এই খবর ছড়িয়ে যেতে সেখানের লোকজনেরও সাহস হয় এবং হাতীটা কোথায় কোন দিকে যাচ্ছে লোকে সেই উঁচু নীচু ডাঙা জমি থেকে দেখে চীৎকার করে জানাতে থাকে। কাজেই দুই সাহেব ঘোড়ায় চড়ে হাতীটার কাছে খুবই শিগগীর পৌঁছে যায়। হাতী-তখন দ্রুত পালিয়ে নদীর দিকে (স্বারকেশ্বর) চলেছে, তার ওপারে পলাশ, শাল, পিয়াশাল ও জঙ্গলী কুলগাছের ঝেপে ভরা ঘন জঙ্গল। সাহেবেরা ঘোড়া ছুটিয়ে

ফোন: ৫৫-৪৩৫২

বিস্তারিত ডেকার্টার

২২-৪২২৩

সার্ভে ড্রইং সরঞ্জাম ও
অফিস সংক্রান্ত ক্রেশনারী
কাগজ বিক্রয় ও প্রিন্টার্স

রহস্যময় ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন: ২২-৪২২৩

কুইন স্টেশনারী স্টোর্স প্রাইভেট লি.

৬৩ ই. রাধাবাওয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

এগিয়ে গিয়ে তার পথ আটকায়। তার-পর ডান্‌কান হাতীর পথে নদীতে নামবার রাস্তায় ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যায়। গন্ডা হাতীটা নদীর দিকে যেতে এই দুই সাহেবকে দেখে থমকে দাঁড়ায় তারপর, পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টায়, যৌদিকে অন্য সাহেবটি ঘোড়ার উপর বসে বন্দুক তোলার চেষ্টা করছিল সে দিকের নদীর পাড়ে উঠবার চেষ্টা করে।

অন্য সাহেবের ঘোড়া ভড়কিয়ে লাফ তে আরম্ভ করে এবং সাহেবও হাতী এগিয়ে আসছে দেখে বেসামাল হয়ে হাতীর উপর গুলী চালায়। হাতীর গায়ে গুলী লগে কিন্তু কোনও সাংঘাতিক জায়গায় না লাগায় হাতীটা বিশেষ ঘায়েল হ'ল না। গুলী-লাগা মাত্রই হাতী কান-ফাটান চীৎকার করে শব্দ গুটিয়ে সাহেবের দিকে প্রচণ্ড বেগে তেড়ে যায়। এদিকে বন্দুকের গর্জন আর হাতীর ভীষণ চীৎকার এই সবই সেই সাহেবের ঘোড়া বিষম লম্প-বন্দ করে সেই সাহেবকে ফেলে দেয়। সাহেবের কপাল ভাল ছিল যে, সে হাতীর দিকে না পড়ে নদীর পাড় গাড়িয়ে অন্য দিকে পড়ে। সাহেবের ঘোড়া ছুটে পালায়। ইতিমধ্যে নীল-কুঠীর দুটো হাতীর পিঠে চড়ে লোক-জনও এসে পড়ে এবং সাহেবের অবস্থা দেখে তারাও চীৎকার চেঁচামেচি করে, হাতী চালিয়ে দ্রুত সৈদিকে আসে। বুনো হাতীটা সেই চীৎকার শুনে আবার দাঁড়িয়ে যায় এবং সেই সুযোগে সাহেবও আবার নদীর পাড়ে উঠে তার বন্দুকটা কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। নীলকুঠীর হাতী দুটোর মধ্যে যেটা শিকারে অভ্যস্ত তার উপর নীলকুঠীর এক গোমস্তা ছিলেন, তিনি বিলম্ব সাহসী। তিনি মাহুতকে বলেন সেই হাতীটাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাতে সাহেব হাতীর পিঠে বা পিছনে আশ্রয় পায়। তাঁর চোখের সামনেই এই সব ঘটে এবং তিনি বুঝেছিলেন যে, সাহেব তার রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে প্রস্তুত হতে হতেই গন্ডাটা তাঁর উপরে এসে পড়বে এবং সে অবস্থায় তাকে গুলী মেরে ফেলা সে সাহেবের সাধের অভীত। তাঁর আদেশে লোকজন চীৎকার করায় এবং হাতী দুটোও দ্রুত এগিয়ে আসায় গন্ডা হাতী ক্ষণেকের জন্য থামে। নইলে আহত গন্ডা হাতী কয়েক মাহুতের মধ্যেই সাহেবের নাগাল পেতো এবং তারপর তাকে শেষ

করতে মিনিট খানেকও লাগতো কিনা সন্দেহ।

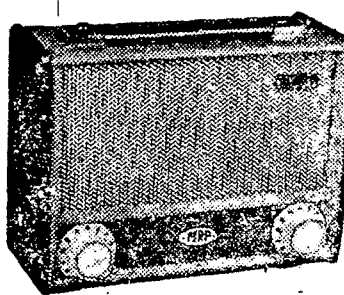
ইতিমধ্যে ঘোড়া চণ্ডল হয়ে উঠছে দেখে ডান্‌কান সাহেব তার দোনলা ভারী রাইফেল নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে নদীর নীচু ও ঢাল পথের পাশের উঁচু পাড় বেয়ে দ্রুত উঠে দেখে অন্য সাহেবকে ফেলে দিয়ে তার ঘোড়া পালিয়েছে এবং আহত বুনো হাতী সাহেবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডান্‌কান ছুটে সৈদিকে গিয়ে হাতীর বিশ-পঁচিশ গজের মধ্যে যখন পৌঁছেছে তখন গন্ডা হাতী ওর দিকে পিছন ফিরে নীল-কুঠীর হাতীগুলোর দিকে দেখছে। সে অবস্থায় তার উপর গুলী চলানো বুঝে জেনে সে সতর্কভাবে রাইফেল ধরে, একটা উঁচু টিপি়র দিকে এগিয়ে উঠে হাতীর দিকে লক্ষ্য করে দাঁড়ায়। এদিকে হাতীটা নীলকুঠীর হাতীগুলো তখনো অল্প দূরে আছে দেখে বোধহয় তার আততায়ীর দিকে ফিরে সৈদিকে দেখে।

ফিরে দেখবার মূহুর্তে তার মাথার পাশের দিকটা এক মাহুতের জন্য ডান্‌কানের লক্ষ্যের মধ্যে আসে এবং এবং সেই ক্ষণেই, নিমেষের মধ্যে ডান্‌কান রাইফেল চালায়। অব্যর্থ লক্ষ্য শিকারীর ভারী এক্সপ্রেস রাইফেলের গুলী অত কাছের থেকে লেগে হাতীর মাথার খুলীতে যেখানে কানের ফুঁকর আছে তার কাছের পাংলা হাড় ফুঁড়ে বিষম জখম করে। গুলী থেয়ে হাতী পড়ে যায় এবং সেই সুযোগে ডান্‌কান আবার গুলী ভরে নিয়ে আরো প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়। গন্ডা হাতী ধড়মড় করে উঠে, ডান্‌কানের দিকে ফিরে শব্দ গুটিয়ে একটা চীৎকার করে তেড়ে আসে। ডান্‌কান প্রস্তুতই ছিল এবং স্থির লক্ষ্য করে গুলী চালায়। সাংঘাতিক গুলীর মার খেয়ে হাতী

আবার পড়ে যায় এবং আর এক গুলীতে এই গন্ডা হাতীর ধ্বংসলীলা শেষ করে তাকে নিঃশব্দ করে ফেলে।

এই হাতীর দাঁতদুটো নীলকুঠীর বৈঠক কামরার দরজার দুই পাশের দেওয়ালে লগানো থাকত। আমরা সেটা দেখি কিছুদিন পরে। তারপর সে নীল-কুঠী বিক্রি হয়ে যায় এবং সেই কুখ্যাত হাতীর শেষচিহ্নও ওখান থেকে সরে যায়। আমরা ঘটনার সময় বাঁকুড়ায় ছিলাম। এই কারণেই সে কথা আজও মনে পড়ে।

বুনো হাতী গন্ডা হয় কেন? এ বিষয়ে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, কেনও পুরুষ-হাতী যদি কোনও কারণে তার নিজের হস্তীযুথ থেকে বিতাড়িত হয় তবে সে ঐভাবে ভয়ঙ্কর সংহার মূর্তি ধরে এবং সমস্ত তল্লাটের লোকের ক্ষতি ও প্রাণনাশ করার চেষ্টায় ঘোরে। বিখ্যাত শিকারী ও হস্তীতত্ত্ববিদ স্যামুয়েলসন অবশ্য এই মতের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন যে, ঐ প্রকৃতির হাতীর বিষয়ে সর্বশেষ খোঁজ নিলে দেখা যায় যে, সে নিকটস্থ ঘন জঙ্গলের কোনও হস্তীযুথের অধিপতি এবং নিজে ক্ষমতায় মত্ত হয়ে এ প্রকার ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে। কিন্তু ফ্লোর নামক আর একজন বিশেষজ্ঞ শিকারী এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করে বলেন যে, স্যামুয়েলসনের মত ভুল ধারণার উপর স্থাপিত। হস্তীযুথপতি অনেক সময় দল ছেড়ে দূরে চলে যায় খাদ্যের সন্ধানে বা অন্য কোনও কারণে, এবং দলের বাইরে থাকার সময় কখনো কখনো ক্ষেত-খামার নষ্ট করার সময় বা অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ মানুষ দেখে তাকে ঘায়েল করে। কিন্তু গন্ডার মত ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত সে কখনও হয় না—হয় যে হাতী যুথভ্রষ্ট বা বিতাড়িত।



এম, আর, গি,
ট্রানজিস্টার রোডও

মণি রোডও প্রোডাক্টস
১৫৭বি, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩

বিদেশী গল্প

সাহিত্য ও
মন

দিত না। যে কোন ধরনের চিন্তা তার কাছে বরণীয় নয়। এক বিশেষ ধরনের ভাবনার প্রতি দেখা যেত তার পক্ষপাত এবং সেই ভাবনা ছাড়া অন্য যে কোন ধরনের চিন্তার প্রতি ছিল তার সুস্পষ্ট

হয়। এই আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয় এই সত্যের ওপর ভিত্তি করেই মানদুষ্কে সব চিন্তা-ভাবনা গড়ে তুলতে হবে।”

কিন্তু এ ছাড়াও যে মানুষের অন্য চিন্তা-ভাবনা থাকতে পারে সে বিষয়ে ফেডেরিক একেবারে অচেতন নয়। তা বলে সেই সব ভাবনাকে কিছুতেই “বিজ্ঞানের” পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাই ও ধরনের চিন্তাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারত না। নাস্তিক হয়েও ধর্ম সম্পর্কে ফেডেরিক অসহিষ্ণু নয়। সে ভাবত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন যোগসাজস আছে বলেই ধর্ম গড়ে উঠতে পেরেছে। কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান অঙ্গীভূত করে নিয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুনিচয়, মানুষের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য। কিন্তু একটা অঞ্চলের দিকে বিজ্ঞান কখন হাত বাড়ায়নি; সে অঞ্চলটি হলঃ মানুষের আত্মা। কালক্রমে এই অঞ্চলকে ধর্মের হাতে ছেড়ে দেওয়া প্রথাগত নিয়ম



হোম্যান
হেম

একটা লোক ছিল। নাম তার ফেডেরিক। ফেডেরিক তার সমস্ত জীবন নিয়োজিত করেছিল বুদ্ধি-চর্চায়। জ্ঞানের পরিধি তার বিরাট। কিন্তু সমস্ত জ্ঞানকে সে সমান মূল্য

বিরূপতা ও ঘণা। বুদ্ধি-বিজ্ঞানকে সে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। চিন্তার পন্থাতি হিসাবে বুদ্ধিবাদ নির্ভরযোগ্য এবং একেই সে বলত “বিজ্ঞান”।

কথায় কথায় বলত, “দুয়ে দুয়ে চায়

হয়ে দাঁড়াল এবং বিজ্ঞানও ধর্মের আজ-গুঁড়ি জল্পনা-কল্পনাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে সহ্য করে যেত। সুতরাং ফেডেরিকও ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণু। কিন্তু যাকে সে কুসংস্কার বলে মনে করত,

তার প্রতি ছিল গভীর বিরক্তি ও ঘৃণা। অমার্জিত ও অসংস্কৃত মানুষ মরমীয়া-বাদকে স্বীকার করতে পারে, জাদু-বিদ্যার প্রতি বিশ্বাস হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উদ্ভবের পর এই ধরণের স্বার্থক ও অকেজো হাতিয়ার ব্যবহার করা একেবারেই ছেলেমানুষী।

এই সে ভাবত আর এই-ই সে বলত। কুসংস্কারের রেশ দেখামাত্র চটে আগুন হত ফেডেরিক; মনে হত সে যেন হঠাৎ অশ্রুচি হয়ে পড়েছে।

কিন্তু যারা শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার রীতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ, যারা তার নিজের লোক, তাদের মধ্যে কুসংস্কারের ছোঁয়া দেখা-মাত্র ক্রোধে ফেটে পড়ত সে। অতি সম্প্রতি আর এক ধরণের কথা শোনা যাচ্ছে। বহু জ্ঞানী-গুণী ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃতিবান কখন কখন নিজদের মধ্যে আলোচনা করেছেন 'কিম্বা' প্রকাশ্যেও বলেছেন যে, 'বৈজ্ঞানিক চিন্তা-পদ্ধতি'কে এ কে বা রে অদ্বান্ত, কালোত্তরীণ আদর্শ, অনাক্রম্য ও ব্রহ্ম-স্বরূপ বলে ভাবা বোধহয় অনুচিত। বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতি পৃথিবীর অন্যান্য চিন্তাপদ্ধতির অন্যতম; এও পরিবর্তন ও বিনাশের অতীত নয়। এই হাস্যকর ধারণাই কিন্তু সব চেয়ে বেশী ব্যথা দিত ফেডেরিককে। তবু এই ধ্বংসাত্মক, অশ্রম্ভেয় ও বিষবৎ ধারণা ছাড়িয়ে পড়ছে; ফেডেরিকও এ কথা অস্বীকার করতে পারে না। ক্ষুধা, যুদ্ধ ও বিপ্লব বিশ্বব্যাপী যে সংকট এনেছে তারই ফলশ্রুতি হিসাবে এখানে এখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এই সব ধারণা। সাদা দেওয়ালের ওপর সাদা ভৌতিক হাতে লেখা এ যেন একটি সাবধান বাণী।

কিন্তু ফেডেরিক জানতো যে, এই ধরণের চিন্তা কোন কোন মহলে ঠাই পাচ্ছে এবং সে জন্য সে দুঃখ পেত। আর যত সে দুঃখ পেত তত বেশী উগ্র হয়ে উঠত। বিশেষ করে যারা এই ধরণের চিন্তাকে গোপনে গোপনে মনে ঠাই দেয় বলে ফেডেরিক মনে করত, তাদের ওপরই সে চালাত প্রচণ্ড আক্রমণ। এই নতুন ধারণা যদি সত্যিই প্রচলিত হয়, মানুষ যদি সত্যিই এই মতবাদকে স্বীকার করে নেয়; তবে একথা ঠিক যে, মানুষের সমগ্র আত্মিক মূল্যবোধ নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। পৃথিবীতে আসবে বিশৃঙ্খলা। কিন্তু এ পর্যন্ত খুব কম শিক্ষিত ব্যক্তিই এই নতুন মতবাদকে

স্বীকার করে নিয়েছেন। অবস্থা এখনও অত ভয়াবহ হয়নি। কোথাও কোথাও কয়েকজন ব্যক্তি এই নতুন মতবাদে দীক্ষিত হয়েছে সত্যি; কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এই ধারণা বড় জোর কয়েকজন অশ্রুত চরিত্রের লোক বা একটা বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিশ্বের একটা বিন্দু, এই ধারণার সামান্যতম স্ফূরণ, এখানে হয়ত দেখা দিয়েছে। কিন্তু তা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবেই। অর্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যদি এই নতুন মতবাদ একবার শিকড় গাড়তে পারে, তবে তার শেষ যে ক্লেথায হবে কিছুতেই বলা যায় না। ওদের মধ্যে এখনই দেখতে পাওয়া যায় নানা ধরণের রহস্যবাদ ও গুরুবাদ। এই সব ধারণায় পৃথিবী আজ পূর্ণ। প্রত্যেক জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায় মরমীয়াবাদ, রহস্যবাদ ও আধ্যাত্মিকতা। এই ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা দরকার। কিন্তু বিজ্ঞান, অনেকটা যেন ব্যক্তিগত দুর্বলতার জন্য এই মূহুর্তে সংগ্রাম করতে নারাজ।

একদিন ফেডেরিক তার বন্ধুর বাড়ি গেল। এই বন্ধুটির সঙ্গে সে বহু বছর পড়াশুনা করেছে। অনেক দিন এই বন্ধুটির সঙ্গে তার দেখা হয়নি। বন্ধুর বাড়ির সিঁড়িতে ওঠবার সময় ফেডেরিক চিন্তা করতে চেটো করল কখন ও কবে তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে। অন্য বিষয়ে তার স্মৃতিশক্তি যত প্রখরই হোক না কেন, এই সামান্য বিষয়টি কিন্তু ফেডেরিক কিছুতেই স্মরণ করতে পারল না। এ জন্য নিজের অজান্তেই নিজের প্রতি বিরক্তি হয়ে উঠল ফেডেরিক। বন্ধুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিল।

বন্ধু আরভিনের সঙ্গে বাক্যালাপ হবার আগেই ফেডেরিক লক্ষ্য করল তার বন্ধুর সদাশয় মুখে ধৈর্যশীল হাসির রেখা। ফেডেরিকের মনে হল যে বন্ধুর মুখে এমন হাসি সে আগে কোনদিন লক্ষ্য করেনি। বন্ধু সত্ত্বেও ফেডেরিক এই হাসির মধ্যে খুঁজে পেল প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ বা শত্রুতা। আর এই হাসি দেখা মাত্রই ফেডেরিকের মনে পড়ল আরভিনের সঙ্গে আগের সাক্ষাৎকার—যা মনে করার জন্য সে এতক্ষণ ব্যথা পরিশ্রম করেছে। মনে হল গতবার আরভিনের সঙ্গে ঝগড়া করে সে বাড়ি যায়নি সত্যি। কিন্তু খুব প্রসন্ন হয়েও ফিরতে পারেনি। মনের মধ্যে গোপন বিরোধ ও অসন্তোষ নিয়ে ফিরতে হয়েছিল তখন।

কারণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সে আরভিনের কাছ থেকে খুব অল্প সমর্থনই তখন পেয়েছিল।

আশ্চর্য, সমস্ত ব্যাপারটা সে কি করে একেবারে ভুলে যেতে পারল? সে ত সব সময়ই জানতো এই অসন্তোষ আছে বলেই সে এত দিন বন্ধুর কোন খোঁজ-খবর নেয়নি। এই-ই একমাত্র কারণ। যদিও না-দেখা করার পিছনে বহু ছল-ছাতা সে ইদানীং আবিষ্কার করেছে।

যখন দু'জন মৃৎখোদিত দাঁড়াল, তখন ফেডেরিকের মনে হল যে, গত দিনের সামান্য ফাটল আজ অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। সেই মূহুর্তেই তার মনে হল যে দু'জনের মধ্যে যেন একটা কিছু এখন নেই যা আগে ছিল। মনে হল আর নেই সেই একই উৎস থেকে গড়ে ওঠা ঐক্য, নেই পরস্পরকে বোঝার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাকুলতা। এর বদলে দেখা দিয়েছে দু'জনের মাঝখানে একটা বিরাত ফাঁক। তবুও তারা পরস্পরকে প্রীতি-বিনিময় করল; আব-হাওয়ার কথা ও পরিচিত লোকদের প্রসঙ্গ নিয়ে নানা কথাই বলে গেল। কিন্তু প্রতি মূহুর্তে ফেডেরিক অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল, সে তার বন্ধুকে বুঝতে পারছে না, তার বন্ধুও তাকে বোঝে না, প্রত্যেকটি কথাই অর্থহীন, আর ওদের মধ্যে প্রকৃত আলাপের কোন সাধারণ ভিত্তিভূমি নেই। তার ওপর আরভিনের মুখে লেগে আছে সেই বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি এবং এই হাসিকে ফেডেরিক প্রায় ঘৃণা করতে আরম্ভ করছে।

এই ক্রান্তিকর আলাপের সামান্য বিরতিতে ফেডেরিক বন্ধুর বহুবার দেখা স্টুডিয়াকে আর একবার ভাল করে দেখে নিল। দেওয়ালের ওপর পিন দিয়ে আটকানো এক চিলতে কাগজ দেখে ফেডেরিকের মনে পড়ল তাদের ছাত্র-জীবনের কথা। সেই সময় এই-ই ছিল আরভিনের অভ্যাস। কোন কবির কোন লাইন বা কোন চিন্তানায়কের কোন উক্তি নিজের মনের মধ্যে সর্বক্ষণ জাগিয়ে রাখার জন্য সে কাগজে লিখে দেওয়ালে টানিয়ে রাখত। ফেডেরিক কাগজটা পড়ার জন্য এগিয়ে গেল।

গোটা গোটা অক্ষরে আরভিন লিখে রেখেছে : "বাহির কিছুই নয়, ভিতরও কিছুই নয়; যাহাই বাহির তাহাই ভিতর।"

ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে এক মূহুর্ত থ' হয়ে দাঁড়াল ফেডেরিক। তাই ত! সে যে

আশঙ্কা করেছে, এবার সেই আশঙ্কাই সামনে হাজির। অন্য সময় হলে সে এই কাগজের টুকরোটাকে অবহেলা করতে পারত, বন্ধুর একটা খেয়াল হিসাবে সহ্য করতে পারত, মানুষের চরিত্রের নির্দোষ দুর্বলতা বলে স্বীকার করে নিতে পারত, একে মেনে নিত বন্ধুর তুচ্ছ উচ্ছ্বাস বলে। কিন্তু এখন তা কিছুতেই ভাবা যায় না। মনে হল শূন্য-মাত্র কাব্যিক ভাবালুতা প্রকাশ করার জন্য এই লাইন কটি লেখা হয়নি অথবা এত বছর পরে আবার যৌবনের অভ্যাসে ফিরে বাবার দুর্বলতাও পেয়ে বসেনি তাকে। ওই কাগজে লেখা আছে তার বন্ধুর বর্তমান চিন্তাধারার সুস্পষ্ট ঘোষণা। এই হল মরমীয়াবাদ। আরভিন বিশ্বাসঘাতক!

আন্তে-আন্তে ফেডেরিক আরভিনের দিকে মূখ্য করাল। তার মুখে হাসি লেগেই আছে।

“আমাকে এর মানে বুঝিয়ে দাও,” ফেডেরিকের কণ্ঠে দাবী।

“তুমি কি এই প্রবাদ কোথাও পড়নি?”

চিৎকার করে উঠল ফেডেরিক, “আলবৎ পড়েছি। নিশ্চয়ই আমি জানি। এই হল রহস্যবাদ, মরমীয়াবাদ। এই কথাগুলোয় খুব কবিত্ব থাকতে পারে; থাক। কিন্তু আমাকে এই প্রবাদের মানে বলতেই হবে। এটাই বা তোমার দেওয়ালে কেন ঝুলছে!”

“উত্তম প্রস্তাব। শোন। সত্যে পৌঁছাবার পথ হিসাবে আমি সম্প্রতি যে মতে বিশ্বাসী হয়েছি তার-ই মূখবন্দ্য হল এই প্রবাদ। এই পথে আমি শান্তিও পেয়েছি।”

রাগ চাপতে থাকল ফেডেরিক। সে বললে, “সত্যে পৌঁছাবার নোতুন পথ? এমন কোন বস্তু আছে নাকি? নাম কি?”

“এমন নোতুন কিছু নয়। তবে আমার কাছে নোতুন। আসলে পথ অতি প্রাচীন ও সম্মানীয়। তার নাম হল জাদুবিদ্যা।”

চরম কথা বলা হয়ে গেছে। এই অকপট স্বীকারোক্তিতে বিস্মিত ও অভিভূত হল ফেডেরিক। সর্বাঙ্গ শিহরিত হল। মনে হল তার বন্ধুর মধ্যেই রয়েছে তার চরমতম শত্রু। সেই শত্রু তার সামনেই দাঁড়িয়ে। সে বুঝতে পারল না সে কাঁদবে না রাগবে। অপূরণীয় ক্ষতি-বোধ তাকে আচ্ছন্ন করল। বহুক্ষণ সে চুপ করে থাকল।

“তা হলে তুমি জাদুকর হবে?” কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফেটাতে চেষ্টা করল সে।

অন্যায়সে উত্তর দিল আরভিন, “তাই-ই—”

ঘরময় স্তব্ধতা; পাশের ঘরের ঘড়ির টিক্-টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ফেডেরিক বললে, “তা হলে বুঝে নিতে হবে যে তুমি বিজ্ঞানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিলে এবং সেই সঙ্গে আমার সঙ্গেও।”

আরভিন উত্তর দিল, “আমার অবশ্য



তা মনে হয় না। কিন্তু যদি সত্যিই তা হয়, তবে আমি নিরুপায়।”

ফেটে পড়ল ফেডেরিক; “তবে তুমি নিরুপায়? এই ছেলেমানুষী, জাদুর প্রতি এই জঘন্য বিশ্বাসের মোহ ভেঙে বেরিয়ে আসতে পার না? আমার সম্মান যদি বাঁচাতে চাও তবে তোমাকে এই-ই করতে হবে।”

আরভিন অঙ্গ হাসল। কিন্তু তাকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছে না।

“তুমি এমনভাবে কথাগুলো বললে যেন ইচ্ছা করেই আমি এই পথ বেছে নিয়োছি। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়, ফেডেরিক। আমার কাছে গ্রহণ বা বর্জনের কোন প্রশ্নই ওঠেনি। আমি জাদুবিদ্যাকে পছন্দ করিনি, বরং জাদুবিদ্যাই আমাকে বরণ করেছে।” খুব ধীরভাবে এই কথাগুলো বললে আরভিন। কিন্তু ফেডেরিকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে এই কণ্ঠের মৃদুতা ধ্বনিত হতে থাকল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফেডেরিক। উঠে দাঁড়িয়ে খুব ক্রান্ত স্বরে বললে, “তা হলে চল।” যাবার সময় হাতটাও বাড়িয়ে দিল না বন্ধুর দিকে।

চিংকার করলে আরভিন, “না, কখনই না। তুমি এমনভাবে যেতে পারবে না। মনে কর আমাদের দু’জনের মধ্যে কেউ একজন মৃত্যুশয্যা; তখন যেমন ভাবে বিদায় নিতে হয়, এস আমরা ঠিক সেই-ভাবে বিদায় নেই।”

“কিন্তু আরভিন দু’জনের কে মারা যাচ্ছে?”

“আজকে বোধহয় আমি, বন্ধু। যে নব-জন্ম পেতে ইচ্ছুক, তাকে ত মৃত্যুর জন্য তৈরী থাকতে হবে।”

ফেডেরিক আর একবার কাগজটার কাছে গিয়ে ভিতর বাহির সম্পর্কিত প্রবাদটা ভাল করে পড়ে নিল।

শেষে বললে, “ভাল। তোমার কথাই ঠিক। যাবার সময় রাগ-ঝাল করে লাভ নেই। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। মনে করে নিলাম আমাদের মধ্যে কেউ একজন মৃত্যুশয্যা। কিন্তু যাবার আগে আমি তোমাকে একটা শেষ অনুরোধ করব।”

“ভাল কথা। বল কি করব?”

“আমার প্রশ্ন যা ছিল, তাই-ই আমার অনুরোধ। এই প্রবাদটির মানে আমাকে বুদ্ধি দিয়ে দাও। ‘তুমি যা জান তাই বল।’

একটু চিন্তা করে আরভিন বললে, “কিছুই ভিতরে নয়, কিছুই বাহিরে নয়। এই কথার ধর্মীয় ব্যাখ্যা তুমি জান। ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান। তিনি যেমন জড়ে তেমনি আত্মায়। প্রতি অণুই স্বর্গীয়। কারণ তিনি বিশ্বব্যাপ্ত। আগে এই ধরনের ধ্যান-ধারণার নাম দেওয়া হত প্যানথেইজম। এখন যদি এই কথার কোন দার্শনিক অর্থ চাও তবে শোন : আমাদের সমস্ত চিন্তার জগতে ‘ভিতর’ আর ‘বাহিরের’ মধ্যে একটা বিচ্ছেদ এসে গেছে। কিন্তু এই বিচ্ছেদের কোন প্রয়োজন নেই। যে জায়গাটুকু আমরা আত্মার ক্ষেত্র বলে নির্দেশ করেছি, তার থেকে অনেক দূর পিছিয়ে থাকতে পারে আমাদের আত্মা এবং সেই ক্ষেত্রের সীমালত পার হয়ে বহুদূর এগিয়েও যেতে পারে। এই বৈপরীত্য নিয়েই আমাদের দুনিয়া গড়া হয়েছে। কিন্তু এই দুই বিপরীতের ওপারে আর এক ধরনের জ্ঞানের সূচনা!..... কিন্তু বন্ধু, স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, যেহেতু আমাদের চিন্তার মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে, সেহেতু তোমার ও আমার বোধগম্য কোন-স্বার্থ-হীন শব্দ এখন আমাদের অনায়ত্ত। এক একটা কথার হাজার রকমের মানে হয়। এবং এখানেই তোমার ভয়ের সূত্রপাত—এখানেই জাদুর আরম্ভ।”

আরভিন ঘরটার চারপাশে তাকিয়ে দেওয়ালের সেলফ থেকে মাটির ছোট একটি মূর্তি পেড়ে ফেডেরিকের হাতে দিয়ে বললে : “এই নাও বিদায় নেবার আগে আমার শেষ উপহার। : এখন যে মূর্তি আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম সে যদি তোমার বাহিরে না থেকে তোমার ভিতরে আসে তুমি আবার আমার কাছে এস। কিন্তু এখন যেমন এই মূর্তি তোমার বাহিরে আছে চিরকাল যদি সে এইভাবেই তোমার বাহিরে থাকে তবে এই বিদায় হল আমাদের শেষ বিদায়।”

আরও কিছু বলার ছিল ফেডেরিকের। কিন্তু আরভিন তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে এমন ভাবে বিদায় জানাল যে তারপর আর কথা বলা চলে না।

ফিরে গেল ফেডেরিক। সিঁড়ি দিয়ে নামল। অথচ আগে এই সিঁড়ি দিয়ে সদৃশ্ত বিজয়ের সঙ্গে, কতবার নেমেছে। মাটির ছোট মূর্তিটা হাতে নিয়ে বিরত ও ব্যাথিত ভাবে ফেডেরিক বাড়ি ফিরে এল। বাড়ির সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়াল। যে হাতে মাটির মূর্তিটা ধরে আছে-সেই হাতের মূর্তিটা খুব শক্ত করে

পাকাল আর মনে হল সে যেন এখনি এই আজগুবি মূর্তিটাকে মাটিতে আছড়ে ভেঙে চুরমার করে ফেলবে। কিন্তু সে এসব কিছুই করল না। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। এর আগে সে কখনও এমন পরস্পর-বিরোধী-আবেগে পীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত হয়নি।

বন্ধুর উপহারটি রাখবার জন্য জায়গা খুঁজতে থাকল সে। শেষে মূর্তিটাকে রাখল তার বুক-কেসের ওপরে। কিছুকাল অবাধ মূর্তিটি ওখানেই থাকল।

দিন যায়। ফেডেরিক মাঝে মাঝে মূর্তিটির দিকে তাকায়, ভাবে এই মূর্তির কি মানে, কোথায় বা এই মূর্তি তৈরী হয়েছিল। এ একটা মানুষের মূর্তি হবে হয়ত; হয়ত হবে কোন দেবতার। পোড়া মাটির এই মূর্তির ওজ্জ্বল্য ফিকে হয়ে গেছে। রোমীয় দেবতা জানুসের মত এর দুটি মুখ। কিন্তু গঠনের স্থূলতা বড়ই চোখে লাগে, কোথাও কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তাই এই মূর্তি কিছুতেই গ্রীক কিম্বা রোমান ভাস্করের হাতের কাজ নয়। বরং মনে হয় আফ্রিকা কিম্বা প্রশান্ত মহাসাগরের কোন আদিম অনগ্রসর কারিগরের হাতের

বিস্তৃত গ্রহণ
অপদারো-আর্গিকা
জামরা সুপরিচিত

ফোন: ৪০-৬৪৫৭
শিশু-ইন্ডাস্ট্রী

ক্রপায়ন ডুয়েলাস
২৬৪, ডায়মন্ড গ্রান্ডার রোড, বেহালা (খালার দক্ষিণ)

কিংকো'র *
আর্গিকা
হেয়ার অয়েল

প্রতি বারক-কিংকো'র কলি!

কাজ। দুটো মুখই এক রকম দেখতে। একটো উদাসীন; মুখ খুলে অলসভাবে হাসছে। আর এই ভুতুড়ে নিবেদন হাসি তাকে আরও বেশি কুৎসিত করে তুলেছে।

ফেডেরিক কিছুতেই এই মূর্তিটাকে সহ্য করতে পারল না। দেখা মাত্রই তার বিরক্তি আসে, বিচলিত বোধ করে। মূর্তিটা তার জীবনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। পরের দিন ফেডেরিক সেই মূর্তিকে উননের ওপর রেখে এল। তারও কিছু দিন পরে রাখল জিনিষপত্র রাখবার তাকে। কিন্তু বারবার ফেডেরিকের দৃষ্টির সামনে মূর্তিটা ভেসে উঠতে থাকে, তার সেই চান্ডা নিবেদন হাসি যেন ফেডেরিকের মনোযোগ কেড়ে নেয়। তাই কয়েক সপ্তাহ পরে সে আবার মূর্তিটাকে সারিয়ে রাখল পাশের ছোট ঘরে। এ ঘরে থাকে ইতালির কতকগুলি ফটোগ্রাফ আর কতকগুলি ট্যাকিটাকি জিনিষপত্র। মূর্তিটা চিহ্ন হিসাবে সে এগুলি পেয়েছে এবং এ দিকে বড় একটা ফিরেও তাকায় না। আজকাল আসা-যাওয়ার পথে মূর্তিটির দিকে তার নজর পড়ে, কিন্তু ভাল করে সে দেখে না। হন হন করে বেরিয়ে যায়। এখানে থেকেও কিন্তু মূর্তিটা তাকে হানা দেয় যদিও এ কথা সে নিজের কাছেও স্বীকার করতে নারাজ।

এই খোল্লুমকুচি, এই দুঃখো, অপদেবতার সংগে, তার জীবনে এল বিরক্তি ও যন্ত্রণা।

ফেডেরিক আজকাল মাঝে-মাঝে কিছু দিনের জন্য বাইরে বেড়তে যায়। কারণ সে সব সময় অস্থিরতা বোধ করে। মনে হয় কে যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এবারও বাইরে গিয়েছিল ফেডেরিক। কয়েক মাস পরে ফিরে এল। পাশের ছোট ঘর দিয়ে বাড়ির ভিতরে গেল, বি.এল.না.পড়া-চিঠিগুলি দেখল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বড় অস্থিরতা বোধ করছিল সে। যেন কিছু একটা করতে তার ভুল হয়ে গেছে। কোন বই ভাল লাগে না কোন চেরারে বসে আরাম পাওয়া যায় না। কারণ কি? ভাবতে লাগলো ফেডেরিক। কোথাও কি যেন ভুল হয়ে গেছে? ভাবতে ভাবতে তার খেয়াল হল যে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এই অস্বস্তি তাকে পুষে বসেছে। সে আবার পাশের ঘরে গেল এবং নিজের আজ্ঞাতেই তার দৃষ্টি মূর্তিটাকে ঝুজতে থাকল।

মূর্তিটাকে না দেখতে পেয়ে ভয় পেল ফেডেরিক। মূর্তিটা নেই। খুঁজে পাওয়া

যাচ্ছে না। সে কি তবে উড়ে গেল? এ-ও কি কোন জাদুমন্ত্র?

নিজের দুর্বলতার হেসে উঠল ফেডেরিক। সমস্ত ঘর তখনই করে দেখল। কোথাও পাওয়া গেল না। বিকে ডাকল। লজ্জিত হয়ে বি.স্বীকার করল যে একদিন ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে মূর্তিটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে।

“কিন্তু টুকরো অংশগুলো কোথায়?” সেগুলোও নেই। এই ছোট মূর্তিটাকে বি. কতদিন নিজের হাতে ধরেছে। তখন একে ফাপা মনে হয়নি। কিন্তু সেদিন হাত থেকে মেঝের ওপর পড়ে মূর্তিটা গুড়ো-গুড়ো হয়ে গেল। আবার জোড়া লাগানি যায় কি না দেখতে দোকানে গিয়েছিল। হেসে উঠেছিল দোকানদার। তাই সে টুকরোগুলো অর্ধাধ ফেলে দিয়েছে।

বিকে যেতে বলে হাসতে থাকলো ফেডেরিক। ভালই হয়েছে। তার খারাপ লাগছে না। বিরক্তি আর থাকবে না। এবার সে শান্তি পাবে। যদি সে প্রথমদিন মূর্তিটাকে ভেঙে ফেলতে পারত! অনর্থক কত কষ্টই না সে ভোগ করেছে। কত অলস, উদাসীন, অশুভ, বিচিত্র শয়তানির দৃষ্টি নিয়ে মূর্তিটা তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। এখন সে আর নেই। এখন সে অন্তত নিজের কাছে স্বীকার করতে পারে যে সেই এই মূর্তিটাকে, এই মাটির দেবতাকে ভয় করত; সত্যিই ভয় করত। এই মূর্তিটা তার কাছে যাবতীয় কুশ্রীতা ও বিরূপতার প্রতীক। স্বাক্ষর সে অন্যায়, গর্হিত ও কুসংস্কার বলে মনে করে, তারই প্রতীক এই মূর্তি, আত্মা ও চেতনাকে যে ভয় দেখিয়ে বশীভূত করে, তারই প্রতীক এই মূর্তি। একদিন মাটির গর্তে ভূমিকম্পের আলোড়নে, পৃথিবীর সংস্কৃতির আসন্ন ধ্বংসের মুখে শোনা যেত এই অপদেবতার আদিম ক্রোধের গর্জন। এই মূর্তিটাই ছিনিয়ে নিয়েছে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে; শব্দ মাত্র ছিনিয়ে নেয়নি, সেই বন্ধুকেই করে তুলেছে তার শত্রু। এখন সেই আপদ আর নেই। গিয়েছে। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। ভালই হয়েছে। তবে সবচেয়ে ভাল হত সে যদি নিজের হাতে আছড়তে পারত তাকে।

এই ভেবে সে নিজের কাজে চলে গেল।

কিন্তু এ-ও যেন এক অভিশাপ। প্রতিদিন দেখে দেখে হাস্যকর মূর্তিটা তার চোখে সয়ে গিয়েছিল, অভিশপ্ত হয়ে

উঠেছিল সে। খুব বিরক্তিও লাগতো না। মূর্তিটা তার গুরুত্ব হারাচ্ছিল আস্তে আস্তে। কিন্তু এখন আবার সেই মূর্তিটার অনুপস্থিতি তার যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াল। যত বার সে ঘর দিয়ে যায়, ততবারই মনে পড়ে ক্ষতি হয়েছে কিছুর, চোখ পাতলেই নজরে পড়ে সেই ফাঁকা জায়গা। এখানেই সে ছিল, আজ নেই। আর এই শূন্যতা তার সমস্ত ঘরে এক বিচিত্র নোতুন ছড়াল।

দিনগুলো খারাপ ভাবে কাটতে লাগলো; রাতি ত আরও খারাপ। পাশের ঘরে যাওয়া মাত্রই তার মনে হয় সেই মূর্তিটার কথা, সেই দুঃখো দেবতা, যে আজ আর নেই অথচ তার সব চিন্তাই ত তাকে নিয়ে। এই যন্ত্রণাদায়ক ভাবনার হাত থেকে নিস্তার নেই। পাশের ঘরের টেবল থেকে একটা শূন্যতা ও রিক্ততা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এই শূন্যতার আভা পড়েছে তার নিজের অন্তরে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে সব। ধীরে ধীরে সেই আভা তাকে ঢেকে ফেলছে। তার বুক ভরে উঠল অশুভ শূন্যতায়।

বহুবার মূর্তিটার অবয়ব কল্পনা করার চেষ্টা করল সে। নিজেকে বোঝাতে চাইল কি বিকট ও বর্বর দেখতে ছিল তাকে। তার জন্য শোক করা অন্যায়। চোখের সামনে সে যেন দেখতে পেল সব কুশ্রীতা নিয়ে দুঃখো মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পেল তার সুচতুর হাসি। ঘণ্টা ও রিক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে ফেডেরিক লক্ষ্য করল সে নিজেই সেই মূর্তিটার হাসি নকল করছে। নোতুন প্রশ্ন এল মনে—দুটো মুখ কি সত্যিই একই রকম দেখতে ছিল? কারিগরের অপটুত্বের এবং রচনে যাওয়ার জন্য একটা মুখের ব্যঙ্গনা অন্য মুখ থেকে একটা আলাদা হয়ে ওঠেনি? একটা অশুভ? অনেকটা স্ফিংক্সের মত? আর তার রঙটাই বা কি বিচিত্র! রঙটা ছিল সবুজ, নীল এবং ধূসর এবং কিছুটা লাল; আর তার ওজ্জ্বল্য জানালায় গরাদে ঠিকরে পড়ত, সকালের শিশির-ভেজা ফুটপাতে ঠিকরে পড়ত।

রাত্রেও এই নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল ফেডেরিক। মনে হল “ওজ্জ্বল্য” কথাটা ব্যবহার করা যায় না। এর অর্থ ও ধর্মান কেমন যেন বিদেশী-বিদেশী। ঠিক প্রকাশ করা যাচ্ছে না। এখন শব্দগুলোকে যদি উলটে-পালটে সাজানো যায়? যদি

ওকে করা যায় “ল্যজ্জাউ”? কি অর্থ দাঁড়াবে তার? কোন অর্থ আছে কি? ধানিটা আরও বিস্তীর্ণ। সে অনেকক্ষণ ধরে এই কথাই ভাবল। এ যেন এক অভিশাপ। এই মূর্তিটার যাবতীয় অনুযুগ তাকে পীড়িত করেছে। তার আরভিন, তার প্রাণের বন্ধু আরভিন, এই মূর্তিটা দেবার সময় কি বিচিত্র ভাবে হেসেছিল। সেই হাসি কত গঢ়, কত বিচিত্র ও শরুতায় কতখানি পূর্ণ।

এই চিন্তার দরুনত গীতি রোধ করার জন্য নিজের সঙ্গে লড়াই চালান ফেডেরিক। কিন্তু প্রতিবার সে হেরে গেল। সে বিপদটাকে দেখতে পাচ্ছে। না, সে কিছুতেই পাগল হবে না। হঠাৎ মনে হল এই-ই বোধহয় জাদু। আরভিন এই মূর্তির সাহায্য নিয়ে জাদুমন্ত্রে বশ করেছে তাকে। সে বোধহয় সম্মোহিত। যুক্তি ও বিজ্ঞানের পূজারী, তাকে, অন্ধকার শক্তির পাদমূলে বালি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাই-ই যদি হয় তবে এ কথা সে কি করে স্বীকার করবে যে, জাদুবিদ্যা বলে সত্য কিছু আছে, কি করে স্বীকার করবে সম্মোহনকে?

না, এই সব স্বীকার করার আগেই তার মৃত্যু হোক!

একজন ডাক্তার প্রতিদিন স্নান করা ও ভ্রমণের বিধান দিল। কখন কখন আনন্দ করার জন্য সরাইখানার যেত ফেডেরিক। কিন্তু তাতেও কোন সফল হল না। সে আরভিনের মৃদুপাত করল, দ্বিভাঙ্গ দিল নিজেকে।

আজকাল সে তাড়াতাড়ি ঘূমাতে যায়। ঘুম আসে না। বিছানায় আই-চাই করে। সে রাতেও তাই হল। শরীর খুব খারাপ লাগতে লাগলো। নিজে কিছু ভাবতে চেষ্টা করল সে। সাস্তুনা খুঁজল। উচ্চারণ করতে চাইলো সুন্দর, সহজ, অকপট, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ বাক্য, “দুয়ে দুয়ে চার”। কিন্তু কিছুতেই মনে এল না। হালকাভাবে শব্দ ও বাক্যাংশ নিয়ে নাড়া-চাড়া করল। শেষকালে তার চোঁটে শব্দ গঠিত হল, একাধিক বার ঘুরতে থাকল। কিন্তু তার অর্থ তখনও তার কাছে ঝাপসা। সেই বাক্য বহুবার নিজের মনে আবৃত্তি করল সে। এই বাক্যই তার ভিতরে জন্ম নিয়েছে। নিজেকে ভোলাবার জন্যই সে কথাগুলো বারবার আবৃত্তি করতে থাকলো, মনে হল এই বাক্যের পথ-রেখা ধরে নরকের পাশ দিয়ে ঘূমের দিকে চলে যাবে সে।

অকস্মাৎ জোরে জোরে আবৃত্তি করতে থাকলো কথাগুলো আর সেই শব্দে যেন বিশ্ব হল তার চেতনা। ঠিক সে বলতে পেরেছে; “এখন তুমি আমার ভিতরে।” চকিতে সমস্ত অর্থ পরিষ্কার হল। সে বুঝলো যে তার কথা মূর্তির মূর্তিটির প্রতি নিবেদিত। মনে হল যে ভবিষ্যতবাণী আরভিন করেছিল তা আজ এই গভীর রাতে সফল হয়েছে। যে মূর্তির মূর্তিটাকে একদিন প্রচণ্ড ঘণায় নিজের মূর্তির মধ্যে ধরেছিল আজ সেই মূর্তি তার বাইরে নেই; সেই মূর্তি ঠাই করে নিয়েছে তার অন্তরে। “বাহাই বাইরে তাহাই ভিতরে।”

বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সে। বরফ ও আগুনে যুগপৎ আলোড়িত। কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। নক্ষত্রগুলি নির্বাক তাকিয়ে আছে তার দিকে। গায়ে জামা চাপিয়ে আলো জ্বললে সে মাঝরাতেই ছুটলো আরভিনের বাড়ি। আরভিনের স্টুডিওতে তখনও আলো জ্বলছে। দরজা খোলা। মনে হয় এ বাড়ির সমস্ত কিছু তার জন্যই অপেক্ষা করছে। খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ডাঙতে থাকলো সে। টলতে টলতে আরভিনের ঘরে ঢুকে টেবল ধরে কোনক্রমে সে নিজেকে সামলে নিল। মৃদু আলোর নিচে বসে আছে আরভিন, তার মুখে চিন্তামগ্ন হাসি।

সহাস্যে উঠে দাঁড়াল আরভিন, “তুমি এলে। খুব ভাল।”

মৃদু কণ্ঠে ফেডেরিক বললে, “আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন নাকি?”

“তুমি এখন থেকে যাবার পর প্রতিদিনই ভেবেছি তুমি আসবে। আমি যা বলেছিলাম তাই-ই হয়েছে, না?”

“তাই-ই হয়েছে। মূর্তিটা আমার ভিতরে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।”

“আমার কথা শুনবে?”

“জানি না, তোমার যা ইচ্ছা, তাই করো। তোমার এই জাদুবিদ্যা ব্যাখ্যায় দাও। বল কি করে এই মূর্তি আবার আমার বাইরে আসবে?”

বন্ধুর কাঁধের ওপর হাত রাখল আরভিন। তাকে চেয়ারে বসিয়ে হাসতে হাসতে তাই-এর মতন বললে আরভিন :

“ওই মূর্তি আবার তোমার বাইরে আসবে। আমাকে বিশ্বাস করো। নিজের

ওপর বিশ্বাস রাখো। এখন তুমি শব্দ-মাত্র মূর্তিটিকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। এবার তোমাকে ভালবাসতে হবে! ও এখন তোমার ভিতরে, কিন্তু মৃত। ও এখনও তোমাকে ভূতের মত ভাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে জাগাও, ওর সঙ্গে কথা বল, ওকে ভালবাস। কারণ ওই মূর্তি বে তুমি নিজেই। তুমি আর ওকে ভয় করো না, ঘৃণা করো না, যন্ত্রণা দিয়ো না। আহা, তুমি বেচারাকে কত কষ্টই দিয়েছ! কিন্তু ওই মূর্তি আর তুমি অভিন্ন যে! দ্যাখো তুমি নিজেকে কত কষ্টই না দিয়েছ।

ফেডেরিক জিজ্ঞাসা করল, “এই কি জাদুবিদ্যার পথ?” ফেডেরিক চেয়ারের ভিতরে ঢুকে গেছে; সে যেন অনেকটা বড়িয়ে গেছে।

আরভিন বললে, “এই-ই সেই পথ। তুমি ইতিমধ্যে বড় জটিল পথ বেছে নিয়েছ। তুমি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছ যে ‘বাহির’ ভিতর’ও হতে পারে। তুমি দুটি বিপরীতের সীমানা পার হতে পেরেছ। এই অভিজ্ঞতা তোমার কাছে নরক বলে মনে হয়েছে। এখন বন্ধু, তোমাকে বুঝতে হবে এই অভিজ্ঞতা আবার স্বর্গীয়। সেই আনন্দে তোমাকে যেতে হবে। এর নাম জাদু। এই ‘ভিতর’ আর ‘বাহির’-এর ধারণাকে ওলট-পালট করে দিতে হবে। তবে তোমার মত জোর-জবরদস্তি করে নয়, যন্ত্রণার পথ বেয়ে নয়। এই পরিবর্তন হবে আপনা-আপনি, খুব স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। তোমার সমস্ত অতীত আর তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ তোমার মধ্যেই নিহিত। এখনও অবধি তুমি ‘বাহিরের’ দাস হয়ে আছ। তোমাকে তার প্রভু হতে হবে। এই-ই হল জাদুবিদ্যার পথ।”

অনুবাদ : রাম ঘসু

‘বেট জেনারেশনের’ আদর্শপুরুষ হলেন হেরম্যান হেস। ১৮৭৭ সালে মধ্যযুগীয় (Sawbia) হেসের জন্ম হয়। জীবনে ইনি বহুপ্রকার জীবিকা গ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে এ’র প্রথম উপন্যাস Peter Lamenzind প্রকাশিত হয়। ১৯১২ সালে ইনি ভারত ভ্রমণ করেন এবং ১৯২১ সালে ‘সিন্ধুপথ’ প্রকাশিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এ’র জীবন-মার্গে বিপুল পরিবর্তন ঘটে। সমস্ত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মৃত্যু ও পরাজিত জাতিগুলির সমস্যা নিয়ে রচিত হয় বিখ্যাত উপন্যাস Demian (১৯১৯)। ১৯৪৭ সালে ইনি নোবেল পুরস্কার পান।

অনুবাদক

বিশ শতকের পোলিশ চিত্রকলায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন তাদেউৎস ম্যাকোন্সকি। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে পোল্যান্ডের চিত্রতালোকে যে যুগান্তর আসে তাতে ম্যাকোন্সকির অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর চিত্রকলায় গীতি-কবিতার অপরূপ লাবণ্য আর মানুষের বাস্তব রূপকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সম্প্রতি তাঁর রচিত ‘স্মৃতিচিত্রণ’ প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন যে “Everything is a delusion and only the charm of simple things helps to forget. That is where I find beauty” এই সুন্দর সরলতা, কাব্য আর বিবর্ততার পূর্ণ। তাঁর মৌলিক সৌন্দর্য চিত্রা হোল সহরতলী, অসুখী মানব-শিশু, নৈসর্গিক চিত্র আর পাখিদের কথা। আধুনিক পোলিশ সাহিত্যিকদের ওপর ম্যাকোন্সকির প্রভাব অসামান্য। তাঁর চিত্রাবলী অবলম্বনে কবির কবিতা লিখেছেন। প্রদর্শনীতে তাঁর প্রদর্শিত চিত্র হাজার হাজার দর্শককে মুগ্ধ করেছে। এই ‘স্মৃতি-চিত্রণ’ নামক গ্রন্থ উদ্ভারের কাহিনী আরও বিচিত্র। জাওরস্কা নামক একজন চিত্র-সমালোচক যখন প্যারিসের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে এটি উদ্ভার করলেন তখন নব উদ্দীপনার সম্ভার হ্রদ শিল্প-রসিকদের মনে। ‘স্মৃতি-চিত্রণ’ পোল্যান্ডে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়ে রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ম্যাকোন্সকি ১৯৩৫ সালে মারা যান।

‘স্যাটারডে রিভিউ’ পত্রিকা বিখ্যাত আমেরিকান সংবাদপত্রগুলির ৪৭ জন পুস্তক সমালোচককে একটি উল্লেখযোগ্য বিচারের ভার দিয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত ‘সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী কতকগুলি বই (উপন্যাস ও উপন্যাস-নয়) নির্বাচন করতে অনুরোধ করেন। ‘মার্ক স্কোরার রচিত সিনক্রোর লাইফ: এ্যান আমেরিকান লাইফ’ নামক গ্রন্থটি সবথেকে বেশী ১৮টি ভোট পায়। ‘রবিট’, ‘মেইন স্ট্রীট’, ‘ডডসওরাথ’ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা এই কথাশিল্পী তাঁর মূল্যবান সাহিত্য-কৃতির জন্য নোবেল পুরস্কার পেরেছিলেন। নাটকীয় সংঘাতের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বিশ্বত্বলাকে নিপুণতার সঙ্গে জে. ডি. সেলিংহার তাঁর ‘ফ্রেন্ড অ্যান্ড জোঁন’ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সমালোচকগণ কতক প্রশংসিত ও গ্রন্থটি মোট ১২ জনের সমর্থন লাভ করতে পেরেছে। নয়জন সমালোচক কতক প্রশংসিত কারসন ম্যাককুলাসের ‘রুক উইদাউট হ্যান্ড’ গ্রন্থে মানবসম্পর্কের মর্মাত্মক বিভেদ, জটিলতা এবং আসন্ন মৃত্যুর প্রতিচ্ছায়া প্রকৃত শিল্প-ক্ষমতার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। ‘দি মেম্বার অব দি ওয়েডিং’ গ্রন্থে রচনার নয় বৎসর পর প্রকাশিত এর

সাহিত্য সমালোচনা

কাহিনী দক্ষিণাঙ্গলের একটি ছোট শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ডব্লু এ সোয়ানবার্গ রচিত ‘সিটি-জেন হার্ট’ এ বারোগ্রাফি অব উইলিয়াম রানডলফ হার্ট; সি. জে. ফার্ন সম্পাদিত ‘লেটার্স অব এইচ. এল. মেনকেল’ (১৯৫৬ সালে পরলোকগত, প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সমালোচক ও প্রবন্ধকারের হাজার চিঠির সংকলন); এবং ম্যাকিনলে ক্যানটরের ‘স্পিরিট লেক’ (১৮৫০ সালে শত্রুভাবাপন্ন ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে সংগ্রামশীল পূর্বাঞ্চল ত্যাগকারী নরনারীর দল এবং মধ্য-পশ্চিমাঙ্গলের ভীষণ নির্যাতনের অপূর্ব আলোচ্য)—এই তিনটি গ্রন্থ সাতটি করে ভোট লাভ করেছে।

উইল এবং এরিয়েল ডুরাটের ২৬ বৎসর পূর্বে আরম্ভ ‘দি স্টোরি অব সিভিলিজেশন’ গ্রন্থের সস্তম খণ্ড ‘The Age of Reason Begins: A History of European civilization in the period of Shakespeare, Bacon, Montaigne, Rembrandt, Galileo and Descartes: 1558-1648’ প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচকগণ গ্রন্থটি রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনন-শক্তি ও সুষ্ঠু বিচার ক্ষমতার প্রশংসা করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রমাগতসরমানতার একটি পূর্ণাঙ্গ, সার্থক এবং হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যাবে এখানে।

মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনী অবলম্বনে আরভিং স্টোন রচিত উপন্যাস ‘দি এগোনি অ্যান্ড দি একস্ট্যান্সি’ এবং দক্ষিণ আমেরিকার জীবন অবলম্বনে হার্পার লি রচিত উপন্যাস ‘টু কিল এ মকিং বার্ড’ গত বছরের অধিক বিক্রিত ও জনপ্রিয় উপন্যাস।

বিখ্যাত মার্কিন মনীষীদের চিঠিপত্রের সংকলন সম্পাদনা করেছেন চার্লস ও এলেনর হার্ড। গ্রন্থটির নাম ‘এ ট্রেজারি অব গ্রেট আমেরিকান লেটার্স’। ব্যক্তিগত পত্রগুলির মধ্য থেকে মূল্যবান পত্রগুলিকেই সংকলনে স্থান দেওয়া হয়েছে। যাদের চিঠি স্থান পেয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন জর্জ ওয়াশিংটন, আলেকজান্ডার হ্যামিলটন, ওয়াশিংটন

আরভিং, আবরাহাম লিংকন, টমাস এ এডিসন, সেরহুড অ্যাডারসন এবং উইল রোজার্স।

জার্মান পাণ্ডিত রুডলফ হেগেল-স্টেঞ্জ কবি, প্রবন্ধকার এবং গল্পকার হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাঁর ব্যবহৃত রূপক ও অলংকারমণ্ডিত ভাষা রাইনার মারিয়ার রিনকেকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ‘বুক অব আওয়ার্স’ এবং ‘দুনও এলিজেন্স’ শব্দ সমাদর লাভ করেন। এ কালের তরুণ জার্মান কবির কাব্যসাধনার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছে। রুডলফ কবিতাকে একদিকে যেমন ছন্দ, তাল, লয় ও ধ্বনি সুসম্মতিভিত্ত করেছেন তেমনি কঠোর কাব্যগঠের মধ্যে এক অসাধারণ গতি-প্রবাহের সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে তিনি একবার সতর্ক করে বলেছিলেন, “The ice on which we are dancing is finely polished, but thin, we must watch out that not too many asses try to go on it”। রুডলফের

যৌবন অতিবাহিত হয়। হার্জ পর্বতমালায়, যেখানে ১৯১২ সালে নরদাউসেন নামে একটি ছোট শহরে তাঁর জন্ম হয়। ‘ফ্যাকালটি অফ আর্টস’ অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি বলকান ও ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। ১৯৪৪ খৃঃ ইটালিতে রচিত ‘ভের্নিসিয়ান ক্রিড’ সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর স্থান সূচিত করে। উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা হিসাবে চারিদিকে নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ‘ব্যালাড অব দি বোর্ড লাইফ’ রচনার জন্য ১৯৫২ সালে জার্মান সমালোচকদের পুরস্কার লাভ করেন। গদ্য রচনারও তিনি সার্থক। আমেরিকা পরিদর্শনের স্মৃতি নিয়ে রচনা ‘হাউ ডু রা লাইক আমেরিকা’ ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি ন্যায়দর্শী নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে নিজের স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তিকে সকলের সামনে তুলে ধরেন। রুডলফ প্রথম উপন্যাস ‘স্লেবল অব দি গডস’ রচনা করে প্রকাশকদের পুরস্কার লাভ করেন। এই কাহিনীতে ঐয়ের রাজকুমার প্যারিসের মধ্য দিয়ে রুডলফ আধুনিক সভ্যতাকে বাগ ও বিদ্রূপের মাধ্যমে সমালোচনা করেছেন। রাজকুমারের রোমাঞ্চের জীবন-কথা, প্রেম, হেলেনকে অপহরণ, ঐয়ের অবরোধ চিত্রিত করেন সুন্দরিত বর্ণনাভঙ্গীর মধ্য দিয়ে। অখণ্ডনীয় ও চিরন্তন জীবন-সত্যকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নাটকীয় মুহূর্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন—যা কোন যুগের মধ্যে বিধৃত নয়—চিরকালের সত্য। রুডলফ একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্মান কথা-শিল্পী হয়েও আমাদের সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত নন।

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা দেবী



(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুচিন্তা স্নান সেরে এসে ধর্ষধবে শাদা গ্রাউস আর থানের উপর তের্মান শাদা পাতলা একখানা চাদর জড়িয়ে এসে নিজের ঘরের সামনে দাঁড়ালেন, দেখলেন তখনও সরু বিছানায় বড় শরীরটা নিয়ে শিশুর মত অঘোরে ঘুমোচ্ছেন সুশোভন। ফিরে এসে চারের টেবিলের কাছে দাঁড়ালেন। দেখলেন সুবল যথারীতি চা দিয়ে গেছে। কিন্তু নিরুপম যথারীতি কোণের চেয়ারটায় বসে নেই। ঘুরে দাঁড়ালেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সুবলের তৈরি সেই দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন।

কিন্তু দুশাটা কি সুবলের তৈরি?

না কি সুচিন্তারই। সুবল শব্দ ক্রুর হাসি হেসে সেটা উদ্ঘাটিত করে দিয়ে গেল।

তা'হলে নিরুপমও চলে গেল?

সুবলের মতই ভাবলেন সুচিন্তা। ভাবলেন কখন গেল? মাঝরাতেই?

নিরুপমের চলে যাওয়ার পর তার সেই শূন্য ঘরে দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল সুচিন্তার। হয়তো বা নিজের অজান্তসারেই। কিন্তু আজ এই সারি-সারি তিনখানা খালি ঘরের অশুভ শূন্যতার দিকে একেবারে শূন্য চোখে দাঁড়িয়ে রইলেন সুচিন্তা পাথরের মত। দীর্ঘশ্বাস তো দূরের কথা বোধ করি নিশ্বাস ফেলতেই ভুলে গেলেন।

কিন্তু সুচিন্তার বড়ছেলে চলে যায়নি।

সুচিন্তার বড়ছেলে তাদের সংসারের রাহুর মেয়ের কাছে সত্যবন্দী। ভোর-বেলা বেরিয়ে অনেকক্ষণ এখান সেখানে ঘুরে পথে পথে বোড়িয়ে তারপর ডাক্তার পালিতের সময় অনুযায়ী তাঁর চেম্বারে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

ডাক্তার বললেন, 'তাই নাকি?'

বললেন, 'এরকম আশা করিনি।'

বললেন 'তাই তো! তাহলে আর দু'একটা সিটিং দরকার।'

সেখান থেকে কলেজ চলে গেল নিরুপম অস্নাত অভুক্ত। ফিরলো বিকেলবেলায়।

বাড়ী ঢুকেই প্রথমটা ঘনে হল মাও হয়তো সারাদিন উপবাসী আছেন। পরক্ষণেই ইচ্ছে করে মনটাকে বিরুদ্ধ করে তুলল। ভাবল তা কেন, পাগলের খেয়ালে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়তো তার সঙ্গে এক টেবিলে বসেই খেয়েছেন হেসে হেসে আর গল্প করে করে।

সুবল তাকিয়ে দেখল বড়দাদাবাবু বাড়ী ঢুকল। বড়ের থেকে একটা পাথর নামল তার। হয়তো বা একটা লজ্জিতও হল। কি জানি বা কোন কাজে গিয়েছিল। আর কি জানি বা সত্যিই আজ সুচিন্তার অফিধে ছিল। নইলে কই দুটো দুটো ছেলে তো বাড়ী থেকে ফাঁকা হয়ে গেল, সুচিন্তাকে তো কোন দিন খাওয়া-শোওয়া ব্যতিক্রম করতে দেখিনি সুবল।

সুচিন্তা একটা বই কোলে করে বসেছিলেন।

নিরুপম বিনা ভূমিকায় বলল, ডাক্তার পালিত বলেছেন আরও দু'একটা সিটিং দরকার।

উত্তর দিতে দেবী হল সুচিন্তার। হয়তো এই আকস্মিক কথাটা অনুপ্রাণিত করতে দেবী হল। দেবী করেও উত্তর দিলেন সংক্ষিপ্ত।

নিরুপম চলে যাচ্ছিল।

হয়তো চলেই যেত। হঠাৎ কি ভেবে বলে উঠল, 'আমি ভাবছি একেই হসপিটালে দেবারই ব্যবস্থা করবো।'

এবার আর সুচিন্তার উত্তর দিতে দেবী হল না।

স্বাভাবিক সময়ের মধ্যেই বললেন, আর স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, 'তা হয় না।'

'তা হয় না? দেবার মত অবস্থা পড়লেও হয় না?'

বড় বেশী উত্তেজনার সময় কি মানুষ বড় বেশী শান্ত ভাব দেখায়? তাই নিরুপমের কথা এত ঠান্ডা, সুদৃঢ় শান্ত।

সুচিন্তা সেই ঠান্ডা মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেও তের্মান ভাবে বললেন, 'না। অন্তত নীতা ফেরার আগে ওকে আমি কিছুতেই কাছছাড় করতে পারি না।'

নিরুপম একবার এই দৃশ্যে স্পষ্ট দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর বলল, 'তা'

হলে বুঝতে হবে আমিও বাড়ীতে না পারি—এইটাই তুমি চাও।’

সুচিন্তা চমকালেন না।

হয়তো এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুতই ছিলেন তিনি। হয়তো বা এতদিন ধরে পৃথিবীর সমস্ত প্রশ্নের জন্যেই ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন নিজেকে।

তাই না চমকে বললেন, ‘আমার চাওয়া না চাওয়ার ওপরই কি সব নির্ভর করছে?’

‘কিছুটা করছে বৈকি।’

সুচিন্তা এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলেন, ‘বিবেক আর বিবেচনার দ্বারা সকলের সমান নয় নিরুপম।’

অনুপম কুটিরের চিরশান্ত বড়-ছেলের মনের মধ্যেও কি কথার বাড় উঠেছে? নিজেকে শান্ত রাখা ক্রমশঃই শক্ত হচ্ছে তার? তাই কথার পিঠে যব-নিকাশ না করে কথা চালিয়ে যায় সে!

‘সমান হওয়াই উচিত না। সেটাই স্বাভাবিক। রোগীর প্রতি সহানুভূতিটা ভাল জিনিস, কিন্তু পাগলকে প্রশ্রয় দেওয়াটা সঙ্গাতও নয় শোভনও নয়। আমার মতে শোভনতাই হচ্ছে মানুষের শেষ কথা।’

‘শেষ কথা কি অত সহজে বলে শেষ করা যায় নিরুপম?’ সুচিন্তা অবিচলিত-ভাবেই বলেন, ‘আর মানুষ মাত্রেরই নিজস্ব একটা মত থাকে। শোভনতার দ্বাপেক্ষিও সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়।’

নিরুপম কি আর কথা চালাত? না থেমে-থেতে? একসঙ্গে এত কথা কবে, কয়েছে নিরুপম?

তবু আরও কিছু হয়তো বলতো সে। বসতেই যাচ্ছিল, কিন্তু স্বপ্ন জানেন নিরুপমের ভগবান কি সুচিন্তার ভগবান কে এসে কাকে রক্ষা করলেন, সুবল এসে জানাল একটা টেলিগ্রাম এসেছে।

আবার আকস্মিক টেলিগ্রাম!

আবার কোনও দূঃসংবাদ না কি?

না দূঃসংবাদ নয়, পরম দূঃসংবাদ।

অন্তঃ সাংসারিক রীতিতে তাই বলে।

‘বিষে’ খবরটাই সুখবর।

নিরুপমকেই জানিয়েছে নীতা দীর্ঘ টেলিগ্রামে। সাগরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে তার। জানিয়েছে সাগরের বিবা-

হিতা স্ত্রী, এই পরিচয়টা সম্পূর্ণ পাকা না হওয়া পর্যন্ত অনেকগুলো ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধের পড়তে হচ্ছিল নীতাকে, সাগরের সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে কোন অধিকারও পাচ্ছিল না। কাজে কাজেই—রেজিস্ট্রিটা করে নিতে হ’ল।

চেষ্টা করছে সে। শিশির নামক সেই বন্ধু থাকবে সঙ্গে, ভাবনার কিছু নেই। প্রথমটা দিল্লীতেই নামতে হবে, সাগরের নানাবিধ ব্যাপার নিয়ে, তারপর চিন্তা করে স্থির করতে হবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ছকটা কি রকম হবে। অবশ্য



‘...আমার মতে শোভনতাই মানুষের শেষ কথা।’

আবেগের বিয়ে নয়, প্রয়োজনের বিয়ে।

অধীরতার বিয়ে নয়, বিবেচনার বিয়ে।

সেই কথাই জানিয়ে দু’জনের জন্যে নিরুপমের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছে নীতা, আর বলেছে ‘এ খবর বাবাকে জানানো অর্থহীন, পিসিমাকে জানানোর সাহস নেই, তাই আপনাকেই জানালাম, আমার জন্যে ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন বড়দা।’

সবশেষে জানিয়েছে নীতা, সাগরকে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব দেশে ফিরবার

সেই জীবনের সবক্ষেত্রে নীতা তার ভাগ্য-লব্ধ বড়ভাইয়ের স্নেহ আর সাহায্যের আশা রাখে।

লেখাগুলোর দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ভাবতে থাকে নিরুপম, এত শক্তি মানুষের কোথায় সঞ্চিত থাকে? যে শক্তিতে নীতার মত একটা কম-বয়সী মেয়ে আদরে আবদারে লালিত, সুখী মেয়ে, অন্ধ স্বামী আর পাগল বাপ, এই দু’ব’হ বোকার ভায়ে ভাগে না পড়ে, ভবিষ্যৎ জীবনের সুশৃঙ্খল সৃষ্টি ছক আঁকবার কল্পনা করতে পারে! এ শক্তি কে জোগায়?

নিরুপমের কি ভবিষ্যতের কোন ছক আছে? কোনদিন ছিল? আজকের

রাত আর আগামীর কাল, এ-ছাড়া এর থেকে দূরপ্রসারী কোন চিন্তাই কি করেছে কোনদিন? শুধু শান্তভাবে দিন যাপন করে যাওয়া ছাড়া জীবনের আর কোন ছক ছিল না নিরুপমের।

ভাগ্যের প্রতিকূলতাই কি মানুষকে শক্তি অর্জনের প্রেরণা দেয়? নিরুপমের জীবনেরও তো প্রতিকূলতা দেখা দিয়েছে, কই নিরুপম তো তাকে সুস্থ চিন্তে মেনে নিয়ে। জীবনের নতুন ছক আঁকবার চেষ্টা করতে পারছে না। পারছে না সেই শক্তি অর্জন করতে, যে শক্তিতে সুচিন্তাকে স্নেহ আর সহানুভূতির চক্ষে দেখা যায়, সুশোভনকে লিকট-আয়্যার বঙ্গে স্বীকার করা যায়।

ভালবাসলে আর ভালবাসা পেলেই কি সম্ভান পাওয়া যায় আপন হৃদয়ের গহন গভীরে কোথায় সঞ্চিত আছে অফুরন্ত শক্তির উৎস।

কিন্তু ভালবাসবে আর ভালবাসা পাবে এমন সৌভাগ্য সংসারে ক'জনের আসে? হয়তো জীবনে কখনোই সেই অলৌকিক-সামান্যের দেখা মেলে না। হয়তো দেখা মিললেও নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ আসে না। হয়তো বা সমস্ত সুযোগের লগ্ন এসেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় বিধি আর কুণ্ডার বিড়ম্বনায়। তাই মানুষের চেহারা এমন জীর্ণ বিবর্ণ ক্লিষ্ট।

সহসা সুচিন্তার কথাই মনে পড়ে গেল নিরুপমের।

এখনকার সুচিন্তা নয়। অনুপম মিস্ত্রির সংসার-পরিচালনার যত্ন সুচিন্তার কথা। নিজীব নিশ্চূপ বিবর্ণ সুচিন্তা। সেখানে মাকে কোনদিন কারো কথার প্রতিবাদ করতে দেখেন নিরুপম। দেখেন সংসারের কোথাও নিজের ইচ্ছেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করতেন। খুব স্পষ্ট মনে আছে নিরুপমের তার দাদামশাই মারা যাবার দিনের ঘটনাটা।

সকালবেলা খবর এসেছিল অসুখ বেশী বাড়াবাড়ি, সুচিন্তা সংবাদদাতার সংগেই চলে যাচ্ছিলেন, সেই সময় অনুপম মাথা চুলকে বললেন, বিকেলের দিকে গেলে হয় না? আমি যে আবার আজ কজনকে নেমস্তন্ন করে প্রেরণা। এ মোহড়াটা মিটিয়ে বিকেলের দিকে গেলে—সুচিন্তা নীরবে যাত্রার আয়োজন করিগত রেখে রাস্তার আয়োজনে লাগলেন। বললেন না, 'তা হয় না'।

ঘণ্টাকয়েক পরে খবর এল রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

নিরুপমের হঠাৎ মনে হল, মায়ের এই নীরব বশ্যতাকে সে চিরদিনই অনু-কম্পার দৃষ্টিতে দেখেছে, মাকে কোনদিন বদ্বতে চেষ্টা করেনি। অথচ একটু ইচ্ছে করলেই মানুষকে বোঝবার চেষ্টা করা যায়। আর সেই চেষ্টার মধ্যেই মানুষের মানবিকতা, মানুষের মহত্ত্ব।

জানো, তবু বদ্বতে চায় না এই এক অশচর্য রহস্য মানুষের।

মহত্বকে সে সম্মান দেয়, শ্রদ্ধা জানায়, কিন্তু মহৎ হবার মোহ তার নেই। যেন 'কী গরজ মহৎ হবার! কী এসে ধার মহৎ না হলে!'

টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে সুশোভনের কাছে গেল নিরুপম। যেখানে সুশোভন একা বসেছিলেন পাগলের চাঞ্চল্য পরিহার করে। সকাল থেকে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে আছেন সুশোভন। যে রকমটা তাঁকে দেখা যায় না। অন্যদিন কিছু না করেন তো ঘরে বসে উদাস কন্ঠে কবিতা আবৃত্তি করেন।

আজ ঘুম ভেঙে পবিত্র যেন নীরব চিন্তামগ্ন।

কে জানে কেন।

নতুন পরিবেশে ঘুম ভেঙে হত-চকিত হয়ে, না রাগের পাগলামী মনে পড়ে? পাগলামীটা 'পাগলামী' এ বোধ কি হঠাৎ জন্মেছে বোধহীন পাগলের?

নিরুপম টেলিগ্রামখানা সামনে ধরে বলল—'পড়ুন'।

'পড়ব। আমি পড়ব।' সুশোভন নিরুপমের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'কী-এ?'

'দেখতে পাচ্ছেন না টেলিগ্রাম চেনেন না?'

'দেখতে পাচ্ছি তো। টেলিগ্রাম চিনব না? তুমি আমায় কি ভাব বল তো?'

কিছুই ভাবি না। পড়ুন, পড়ে বদ্বতে চেষ্টা করুন।

'কেন, কী দরকার?' সুশোভন একগুয়ের ভঙ্গিতে বলেন 'আমি কেন বদ্বতে যাব? কার টেলিগ্রাম তার ঠিক নেই।'

'কার জানেন? আপনার মেয়ে নীতার।'

'আমার মেয়ে নীতার। টেলিগ্রাম করেছে সে?'

'হ্যাঁ। পড়ে দেখুন কি লিখেছে।'

'আমি পড়ব।' ফ্যাল ফ্যাল করে তাকান সুশোভন।

বড় অসহায় লাগে প্রশ্নটা।

নিরুপম নরম স্নেহের গলায় দুঃখ-ভাবে বলে, 'কেন পড়বেন না? পড়তে জানেন না আপনি?'

'জানতামি তো।'

'এখনো জানেন। পড়ুন।'

সুশোভন প্রথম ছটটা বিড়বিড় করে পড়ে কাগজখানা টেলে সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমার ভাল লাগছে না।'

'ভাল লাগছে না? কিন্তু খুব ভাল লাগার কথাই তো রয়েছে এতে। নীতার বিয়ের কথা রয়েছে। বিয়ে হয়ে গেছে। আপনার মেয়ে নীতার।'

'নীতার। আমার মেয়ে নীতার। বিয়ে হয়ে গেছে।' হঠাৎ সুশোভন নিরুপমের রোগাটে কাঁধটো সজোরে চেপে ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠেন, 'মিথো কথা!'

'আমি বলছি মিথ্যা কথা নয়। সত্যিই বিয়ে হয়ে গেছে।'

'বললে শুনবো আমি?' এতক্ষণের চুপচাপ সুশোভন সহসা চীৎকার করে ওঠেন, 'বিয়ে হয়ে গেছে তো, বিয়ের বাঁশী বাজলো কই?'

না, নীতার বিয়েতে বিয়ের বাঁশী বাজেনি। কিন্তু ওদের তো বেজীছিল। কুশা আর ইন্দুনীলের। বাঁশী বাজনা-দারদের অনেক টাকা মজুরী দিয়ে তিন দিন ধরে বাজিয়েছিলেন কুশার বাপ। তবু সে শিশীর সুর মিলোতে না মিলোতে দজনের মধ্যে মতবিরোধ ঘটতে থাকে। মধুচন্দ্রের অবকাশেই ঘটে।

কথায় কথায় যখন তখনই ওদের পরস্পরের প্রতি বাচনভঙ্গীতে খবর-রসের চাইতে লজ্জার ঝাঁজটাই আঁধার দেখা দেয়। অবশ্য এটা মনে করবার হেতু নেই, ওই লজ্জার ঝাঁজের মধ্যে বিচ্ছেদের সংকেত। বরং হয়তো বা নীতার প্রেমের বন্ধনের পাকা গিঠ। শুধু

‘অপরিচয় পরিণয়ে’ যেটা কিছুদিনের পরে এসে দেখা দেয়, ‘প্রণয় পরিণয়ে’ সেটা মধুচন্দ্রের মধ্যেই উর্পক মারে। বোধকরি সেটাই স্বাভাবিক। পূর্বরাগের পাল্লা সাঙ্গ হয়ে গেছে, নব অনুরাগের স্বীড়া-রক্তিম মাধুরীও অন্তর্নিহিত, এতদূরে পৌঁছে, যদি বিয়েটা ঘটে, তাহলে ‘বর-কনের’ পক্ষে নিত্যদিনের ‘স্বামী-স্ত্রীর’ পর্যায়ে এসে নামতে কদিনই বা লাগবে?

বিরোধ রাখে দু’জনের ভবিষ্যৎ অবস্থান নিয়ে।

কৃষ্ণার বাবা মেয়েজামাইয়ের জন্যে এক মাসের মত হোটেল বন্ধ করে রেখেছিলেন। নব-মিলনের পানিসিঁতে চড়ে তারা সে মাসটাকে প্রায় কাবার করে এনেছে। এখন কৃষ্ণা হঠাৎ সূর তুলেছে সে কলকাতায় ফিরে বরের বাড়ীতেই থাকবে, ইন্দুনীলকে ‘স্বরজ্যামাই’ গিরি করতে দেবে না।

ইন্দুনীল বলে, ‘সে অসম্ভব!’

কৃষ্ণা ঝংকার তোলে, ‘অসম্ভব কেন, তাই শুন?’

ইন্দুনীল কোনরকম যুক্তির মধ্যে না গিয়ে বলে, ‘অসম্ভব বলেই অসম্ভব। ওর মধ্যে কেন নেই?’

‘বিয়ে হয়ে মেয়েরাই ‘স্বশুরবাড়ী’ যায় ছেলেরা নয়।’

‘আমার আগে তো সবই উঠে। কনের বাড়ীতে সাতদিন ধর্পা দিয়ে বসে থেকে বিয়ে করে কোন বর?’

‘সে আলাদা কথা—কৃষ্ণা ঝংকার দিয়ে বলে, ‘সে ব্যবস্থায় আমার কোন

হাত ছিল না। কিন্তু এখন আমার জীবন আমার নিজের। আমার ইচ্ছে—’

ইন্দুনীল মৃদু হেসে বলে, ‘তোমার ইচ্ছেয় আমাকে নিয়ে বাদির নাচ নাচতে পারো, কোন বাধা পাবে না। কিন্তু আমাকে নিয়ে ‘স্বশুরবাড়ী’ ঢুকতে চেও না, এই অনুরোধ।’

‘তোমার অনুরোধ শুনছে কে? বন্ধুদের কাছে আমার লজ্জার শেষ থাকবে না যদি তোমায় নিয়ে তোমার ‘স্বশুরবাড়ী’ বসে থাকি।’

ইন্দুনীল হেসে বলে, ‘যাক তব, একটা কারণ আবিষ্কার করা গেল। ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, হঠাৎ ‘স্বশুরবাড়ী’র জন্যে উতলা কেন। হিন্দু, কুলনারীর হাওয়া গায়ে লাগল নাকি। কিন্তু কৃষ্ণা, বন্ধুদের কাছে যে লজ্জার শেষ থাকবে না, এ-বোমটা বড়ি আগে ছিল না? নচেৎ এই সূন্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থাটি তো, বিয়ের আগে থেকেই হয়েছিল। তখন তো কই আপত্তি শুনিনি।’

কৃষ্ণা বলে, ‘আহা তখন আপত্তি করে বিয়েটা পদ্ম কার আর কি! এমন বোকা আমি নই। মনে জানতাম তখন বাবার সব ব্যবস্থা মেনে না নিলে, বিয়ে খতম!’

‘ভাবছি—খতম হলেই বা এসে যেত কি।’

‘আমার এসে যেত!’ কৃষ্ণা মূর্চকি হেসে বলে, ‘নাচাবার জন্যে একটা বাদিরের ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছিল।’

‘জগতে বাদির কি এতই দুর্লভ?’

‘নিশ্চয়! দুর্লভ না হলে আমার বন্ধুগুলো সব আইবুড়ি হতভাগিনী হয়ে বসে আছে কেন। আমার ওপর তো ওদের দস্তুরমত হিংসে। বলে, ‘তুই কি লাকি!’ আসল কথা আজকাল তো আর কারুর মা-বাবা মেয়েদের বিয়ের কথা ভাবে না।’

‘ভাবে না?’

‘খুব কম। বেশীরভাগ মা-বাবাই ভাবে, এত ঝগাটে বাবার দরকার কি আমাদের। ও কাউকে জোটাতে পারে, হবে, না হলে নাই বা হজ। খরচ বাঁচল, ঝগাট বাঁচল।’ অতএব—

‘তা’ জোটাতে বা পারে না কেন সবাই?’

‘আহা!’ কৃষ্ণা ঝংকার দিয়ে বলে, ‘সবাই আমার মত বুদ্ধিমতী কিনা!’

‘বাস্তবিক! কিন্তু আপাততঃ তোমার বুদ্ধিটা আদৌ কার্যকরী হবে না। আমাদের বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে গিয়ে ওঠা আমার পক্ষে অসম্ভব।’

কৃষ্ণা গম্ভীরভাবে বলে, ‘তোমার পক্ষে হতে পারে আমার পক্ষে হবে না। কেন ওবাড়ীতে কি আমার ভাগ নেই?’

‘তোমার ভাগ!’ ইন্দুনীল অবাক হয়ে তাকায়।

কৃষ্ণা মুখ বাঁকিয়ে বলে, ‘আকাশ থেকে পড়ছে যে। তোমার বাবার বাড়ী, তোমরা তিন ভাই। তিন ভাগের এক ভাগ তো তোমার। আর তোমার মানেই আমার। দাবীর সঙ্গেই আমি সেখানে গিয়ে বাস করতে পারি।’

ইন্দুনীল অত্যন্ত জানায় কৃষ্ণার ইচ্ছে হয় সে দাবী খাটাতে যাক, ইন্দুনীল তার মধ্যে নেই।

কৃষ্ণা বলে, ‘ঠিক আছে—আমিই দেখব।’ আর মনে মনে ভিত্তি হাসি হেসে ভাবে, ‘তোমার বাবাটা যে কোথায় তা তো আর আমার বুকে বাকী নেই। পাছে তোমার মার কীর্তি-কলাপ প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই তো। তা—ও বাধা আমি আর বেশীদিন থাকতে দেব নাকি। এক ধার থেকে সব সাফ করে ফেলব না?’

আসল কথা কৃষ্ণার মা কৃষ্ণার মন্ত্রণা-দাতা সহায়। পাড়ার মধ্যে থেকে মেয়ের শাশুড়ী যে একটা পাগল নিয়ে ‘পাগল’ হয়ে বসে থাকবেন, এ তিনি ‘বরদাস্ত’ করতে রাজী নন। ‘স্পর্টই বলে দিয়েছেন মেয়েকে, ‘রোস না, বিয়েটা একবার হতে দে না, তারপর দেখছি।’

কাজে কাজেই যখন তখনই কৃষ্ণা ওই কথা তোলে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে মদির-বিহবল নববিবাহিতার ডুমকাও বাদ যায় না। আদরে সোহাগে প্রণয়ে আর প্রগল্ভতায় ইন্দুনীলকে মুগ্ধ করে ফেলতেও দেবী হয় না তার।

এইভাবেই কলকাতায় ফেরার দিন এসে যায়।

কিন্তু কোন কলকাতায় ফিরবে ইন্দুনীল?

যে কলকাতায় এক অবিবেচক অবোধ পাগল তাদের সমস্ত সুখ-শান্তি হরণ করে বসে আছে!

(ক্রমশঃ)

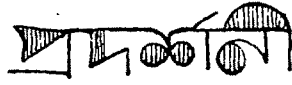
বিবাহের
শয্যাশ্রয়

এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

অনন্তচরণ মল্লিক এও কোং
১৬৭/৪, ধর্মতলা ট্রাট কলিকাতা-১৩
ফোন-২৪-৪৬২৮

প্রজাপ্রিয় ওতুলনীয়
রোল্যান্ড
ট্যালকম পাউডার
বারন কসমেটিক প্রাইভেট

॥ তিনজন তরুণ শিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনী ॥

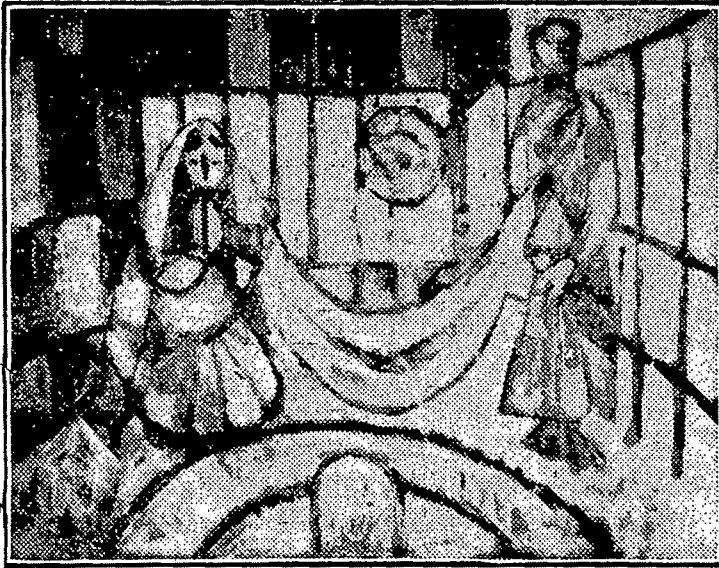


কলারসিক

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে আমরা কলকাতায় তিনটি প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেয়েছি। হায়দ্রাবাদের মহিলা শিল্পী শ্রীমতী জেহরা রহমাতুল্লা কুড়িখানি চিত্র নিয়ে তাঁর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন পাক স্ট্রীটের আর্টিস্ট হাউসে। সম-কালীন শিল্পীগোষ্ঠীর শ্রীবিজন চৌধুরী দশখানি চিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে এবং শ্রীবারীন রায় বাইশখানি চিত্র দিয়ে সাজিয়েছিলেন ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-ভবনের প্রদর্শনী-কক্ষ।

পারিস্ফুট হয়েছে। তাই তাঁর ছবি শুধু চোখ টানে না মনও টানে। অত্যন্ত তাঁর 'প্রার্থনা', 'মমতা', 'মুড়ির সঙ্গে বালক', 'গাগরী ভরণে' কিংবা 'শ্রান্ত' ছবি যারা দেখেছেন তাঁরাই উপরোক্ত কথার সত্যতা স্বীকার করবেন। তেল-রঙে তাঁর দক্ষতা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। কলকাতায় এইটাই ছিল তাঁর একক প্রথম প্রদর্শনী।

শ্রীমতী রহমাতুল্লার মত শিল্পী শ্রীবিজন চৌধুরীও প্রতিভাবান তরুণ শিল্পী। ইনি বিদেশে না গেলেও আঙ্গিক-প্রকরণে ঠিক দেশীয় রীতির



নকুলেশ্বরতলা

শিল্পী : বিজন চৌধুরী

আলাচ্য তিনজন শিল্পীই তরুণ এবং আধুনিক চিত্র-রীতির পক্ষপাতী। এই তিনজনের মধ্যে শ্রীমতী জেহরা রহমাতুল্লা ইতালীতে গিয়েছিলেন শিল্প-শিক্ষার জন্য। ইতালীতে তিনি প্রখ্যাত শিল্পী অ্যাটেনিও করপোরো-র কাছে শিল্পশিক্ষার পাঠ নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। শ্রীমতী রহমাতুল্লা বেশ পরিণত শিল্পী। তাঁর কল্পনা এবং চিত্র-শৈলী আধুনিক হলেও উন্মাদগামী নয়। ক্যানভাসে মোটা জমিন সৃষ্টি করে শুধু মোটা কালো রঙের রেখায় তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর এক একটি কল্পনা। এই রেখার টানে ছন্দ ফুটে উঠেছে, ভাবও

ধার ধারেন না। সম্প্রতি ইনি শিল্পী নীরোদ মজুমদারের কাছে নাকি শিল্প-শিক্ষার পাঠ নিয়েছেন। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে বিজনবাবুর বিষয়বস্তু নির্বাচন। কালীঘাট-মন্দিরকে কেন্দ্র করে অঙ্কিত এই দশখানি চিত্রে তিনি আমাদের চিরপুরাতন বিষয়কে নতুন করে তুলে ধরার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। শিল্পীর চোখ দিয়ে আমরা 'নববর্ষ', 'নকুলেশ্বরতলা', 'শান্তিজল', 'নববর্ষের সিঁদুর পরা'-র দৃশ্যের সঙ্গে 'চড়কের আনন্দ' পর্যন্ত স্পষ্ট করে দেখেছি। 'ফুলবিক্রেতার হাতে ১০৮টি ফুল' দিয়ে গাঁথা মালাও লক্ষ্য করেছি।

মোটকথা, সব চিত্রগুলির মধ্যে আমাদের বাঙালী মানসিকতার ছাপ ফুটে উঠেছে। এই সব চিত্রাঙ্কনে তাঁর হলুদ, নীল আর লাল রঙের ব্যবহার ও হেলানো রেখায় চিত্রের সামগ্রিক ছন্দ-সুসমা তুলে ধরার কৌশল সত্যি প্রশংসার যোগ্য। 'নববর্ষ' (৫) চিত্রে আবার হেলানো ও বৃত্তাকৃতি রেখার সমন্বয় সাধন করেছেন শিল্পী। এই নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আরো সুন্দরতর শিল্প-সৃষ্টিই আমাদের কাম্য। আমরা সেই দায়িত্ব পালনের জন্য বিজনবাবুকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

শিল্পী বারীন রায়ের চিত্র আরো দু'একটি প্রদর্শনীতে পূর্বে আমাদের দেখা ছিল। একসঙ্গে এতগুলি চিত্র দেখে তাঁর শিল্প-প্রবণতা হৃদয়ঙ্গম করতে সুবিধে হল। বারীনবাবু এখনো কোনো বিশ্বাসের উপর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেননি। ফলে কি বক্তব্যে কি প্রকরণে নতুনতর কোনো আঙ্গাদ তাঁর প্রদর্শনী-দর্শনে পেলাম না। অধিকাংশ তরুণ শিল্পীর সম্মুখে একই সমস্যা। তাঁরা কি আধুনিক চিত্র-রীতি মানে জ্যামিতিক প্যাটার্ন কিংবা চ্যাপ্টা রঙ প্রয়োগ বুঝবেন, না অন্য কোথাও সম্বন্ধ করবেন আধুনিক চিত্র-রীতির অর্থ! এদের অনেকগুলি প্রদর্শনী দেখার পরে আজ সঙ্গতভাৱেই এ-প্রশ্ন করা যায়।

কথাগুলো বারীনবাবুর চিত্র-প্রসঙ্গে এলেও এ-প্রশ্ন আমার প্রায় সমস্ত তরুণ শিল্পীদের কাছে। আশা করি তাঁরা এই প্রশ্নটি একটু ভেবে দেখার চেষ্টা করবেন। বারীনবাবুর প্রদর্শনীতে এ-সব সত্ত্বেও কয়েকখানি ভাল ছবি ছিল। তাঁর কম্পোজিশন ও রঙ প্রয়োগের দক্ষতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে 'বালক এবং ফুল' (৬), 'তিনজন' (৭), 'নিজের জগৎ' (১০), 'লাল পাখি' (১৪) এবং 'সাদা বাড়ি' (১৫) চিত্রগুলি দেখে বারীন রায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যায়।

আমরা এই তিনজন তরুণ শিল্পীকে আমাদের অভিনন্দন জানাই। আশা করি তাঁরা তাঁদের ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রয়োগে বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রকলার সম্মান বৃদ্ধি করতে অগ্রসর হবেন।

পরমায়ু

কগাদ চৌধুরী

মানুষের মনে অসীমচিন্তার পরেই সম্ভবতঃ পরমায়ুচিন্তার স্থান। 'দেখুন ত কতদিন বাঁচবো'—বলে জীবনে একাটবার হাঁত বাড়াননি এমন লোক তুচ্ছরূপে আছে কিনা সন্দেহ। পরমায়ু সম্পর্কে আমাদের অনেক ভুল ধারণা আছে। আমাদের বিশ্বাস প্রাচীন কালের লোকদের পরমায়ু আমাদের চেয়ে বেশী ছিল এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরমায়ুর হার কমেছে। ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো। প্রাচীনকালের পৃথিবীতে জীবনমাত্রার প্রণালী ছিল কঠোর এবং প্রকৃতিও ছিল মানুষের প্রতিকূলে। আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রায় প্রকৃতির হাতের পাতুল ছিলেন বলতে গেলে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কেবল অসহায় শিশুরাই না, শক্ত সমর্থ পুরুষরাও করল প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করতে করতেই বিনষ্ট হত। বারংবার পৌছনোর সূর্যোগই ঘটত না সেকালের লোকের। এমন কি আদিম যুগের আদিবাসীদের মধ্যে ৬০ বছরের একটি লোককেও খুঁজলে পাওয়া যেত না। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক যুগেও বয়সী লোক বিরল।

যাই হোক বেঁচে থাকার ইচ্ছার মানুষের আজন্ম অধিকার। তাই বেশীদিন বাঁচার উপায় অন্বেষণে মানুষের গবেষণার অন্ত নেই আজকে। এই গবেষণারই একটা অঙ্গ হল পরমায়ুকে মাথা। অর্থাৎ মানুষের জীবনের মেয়াদ অত্যন্তের বিভিন্ন পর্যায়ে কতখানি ছিল তার একটা হিসেব-নিকেশ নেয়া। রোমান যুগের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তখনকার আমলে একটি নবজাত শিশুর সম্ভাব্য পরমায়ু ২০-২৫ এর মধ্যে ধরা হত। রোমান সাম্রাজ্যের গোড়ার বছরগুলোতে খুব বেশী ৬০ বছরের লোক পাওয়া যেত না কারণ সেকালে ৬০ বছরের মানুষের টাইবার নদীতে ফেলে দেয়া হত। মধ্যযুগে এবং আধুনিক যুগের প্রথমে আয়ুষ্কাল বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, দুর্ভিক্ষ এবং অবিরাম যক্ষ্মাবিগ্ৰহের কুসংস্কার মৃত্যুর দরজা আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে। উক্ত সময়ে ইউরোপে গড় আয়ু ছিল মাত্র ত্রিশ বছর। মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে

ইউরোপে আয়ুষ্কাল দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে নিম্নমিত আদমসুমারী আরম্ভ হওয়ার ফলে মৃত্যুর হার, মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক জানা সম্ভব হয়। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে গত ত্রিশ বছরের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে :

	১৯৩০-৩৫	গড় পরমায়ু
	স্ত্রী এবং পুরুষ	মিলিয়ে
ফ্রান্স	...	৫৬.৭
ইটালী	...	৫৪.৯
সুইডেন	...	৫৪.০
পোল্যান্ড	...	৪৯.৮
হাঙ্গারী	...	৪৯.৮
স্পেন	...	—
কানাডা	...	—
ভারতবর্ষ (স্ত্রী)	...	২৬.৫৬
(পুরুষ) ...	২৬.৯১	

ভারতবর্ষের পরমায়ুর গড়টির দিকে তাকালে মনে হয় ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য মৃত্যুর দেশ। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের প্রতিটি লোকের আয়ু অর্ধেকেরো কম। আরো একটি ব্যাপার সহজেই চোখে পড়ে। প্রতীক্ষার সব দেশেই মেয়েদের পরমায়ু পুরুষদের চেয়ে বেশী। অর্থাৎ শোকের ভার মেয়েদের ওদেশে বেশী বহিবার কথা। কিন্তু শিশু-মৃত্যুর হারে আমাদের মায়েদেরই কাদতে হয় বেশী। আসলে একটি দেশের সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল নির্ভর করে সে দেশের শিশু-মৃত্যুর হারের ওপর। শিশু-মৃত্যুর হারের দিক দিয়ে পৃথিবীতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়, ব্রহ্মদেশ প্রথম, এবং তৃতীয় হল মেক্সিকো। শিশু-মৃত্যুর হার সবচেয়ে কম সুইডেনে, তাই সে দেশের স্ত্রী পুরুষের আয়ুষ্কালও অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশী। কিন্তু ষাট বছরের বড়ো লোকদের সংখ্যা বৃটেনেই বেশী, তারপরেই যথাক্রমে সুইডেন, হল্যান্ড, ফ্রান্স এবং পোল্যান্ডের স্থান। আবার ১৯৫৫ সালের একটি হিসেবে কমবয়সী লোকদের হার পোল্যান্ডেই সবচেয়ে বেশী। ষাট বছরের কম বয়সের বয়স, পোল্যান্ডে তাদের হার শতকরা ৩৯.৫৩ সুইডেনে শতকরা ২৯.১ এবং ইংলণ্ডে ২৮.৪।

মৃত্যুর রাজপথ হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধি, এবং যক্ষ্ম এবং দুর্ঘটনাকে মৃত্যুর গলি

বলা যেতে পারে। এই রাজপথ এবং গলি দিয়ে নিঃশব্দ পদসম্মারের মতো এসে মানুষকে ডেকে নিয়ে যায়। অবশ্য দুর্ভিক্ষের হাতেও পরলোকের দুন্দুভি বাজতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে ছাড়া ইম্মোরোপের কোনো দেশে দুর্ভিক্ষ আজকে বিশেষ কোন সমস্যা নয়। তার ভারতবর্ষের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রভাবে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে পারে। হয়ত আর বছর দশেকের মধ্যে আমরা থালায় 'ব্যালেন্স ডায়েট' নিয়ে খেতে বসতে পারবো।

এই 'ব্যালেন্স ডায়েট' অর্থাৎ সমতাপূর্ণ আহাৰ্য আয়ুবৃদ্ধির পরম সহায়ক। আমাদের দেশের মৃত্যুর হার বেশী এর প্রধান কারণ সমতাপূর্ণ আহাৰ্য আজো আমাদের কাছে স্বপ্নের

১৯৫০-৫৬

স্ত্রী	পুরুষ
৭২.২	৬৫.০
৬৭.৩	৬৩.৮
৭৩.৪	৭০.৫
৬৭.৮	৬২.৮
৬৮.৭	৬৪.৭
৬৩.৫০	৫৮.৭৪
৭০.৮৩	৬৬.৩৩
৩১.৬৬	৩২.৪৫

সামগ্রী। বর্তমান বাজার দরে প্রতিদিনের 'ব্যালেন্স ডায়েটের' মূল্য প্রায় তিন টাকা কার কাছে। কজন লোক প্রতিদিন আয়ু-দেবতাকে তিন টাকা প্রণামী দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারেন সন্দেহের বিষয়। নিউজিগ্যান এডভাইজারী কমিটি স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুদের প্রয়োজনীয় আহাৰ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। এই তালিকানুযায়ী যে সব পুরুষ সাধারণ পরিগ্রহ করেন তাদের প্রয়োজন ৩০০০ ক্যালোরির খাদ্য, সাধারণ পরিগ্রহী মহিলাদের জন্য প্রয়োজন ২৫০০ ক্যালোরির খাদ্যদ্রব্য। অর্থাৎ সাধারণ মধ্যবিত্তের সংসারে আমরা দেড় হাজার থেকে দু'হাজার জোগাড় করতে গিয়েই জীবন-বোঁবনের সুষঙ্গিত ডেকে আনি অকালবোধনে।

কিন্তু যতই হোক, যাই হোক, পরমায়ুচিন্তা মানুষের যাবার নয়। পৃথিবীর ছয়টি ঋতু মানুষের কাছে কখনো পড়েনো হয় না। বিকলের পাকের বসে যে অশীতিবর্ষ লোকটি বসন্তের মদে হাওয়ায় স্বাস্থ্য খুঁজছেন, সন্ধ্যা হলে, লাঠির ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে পার্ক থেকে রেরবার সন্ধ্যার তার সঙ্গে মাত্র একটিই চিন্তার জপমালা দুলতে থাকে : "হে ঈশ্বর, কালকে যেন ঠিক পাকের আসতে পারি।"

মিথ্যাচারিণী

*
মনোবীণা রায়



ABASU

আরম্ভ ত ভালই হয়েছিল কিন্তু
এতদিনের বিশ্বাস আর অত শক্ত
গাথাটা এমন করে ছোট একটি ঘটনার
দ্বারা তেই চলে হয়ে যাবে একথা কি
কি একদিনও কল্পনা করেছিল? মানুষ
য কত মিথ্যে বলতে পারে, কত শঠ হতে
পারে সে শিক্ষা ওর মা-বাবা দেননি।
সেই সত্যি যখন সংসারের আসল রূপটা
দেখল তখন পদে পদে ঘা খেয়ে ওর
মনের কিচর ওলট-পালট হয়ে গেলো।
নাম কেবলই পরলোকবাসী মা-বাবার
স্মরণে নালিশ জানাতে লাগল—একথা
শামরা আমায় আগে বলানি কেন? এত
থ্যের মধ্যে মানুষ বাস করে একথা
সব আমাকে তোমরা বদিয়ে দাওনি!
কিন্তু সে কথা যারা শনে একে সান্ধনা
দেতেন তাঁরা কোথায়। জগৎকে যে সুন্দর
কি দেখতে শিখেছিল, পরম করুণাময়
শাবনকে তাঁর অসীম দয়ার জন্যে যে
সব ব্যর্থ করে কৃতজ্ঞতা জানাতে শিখে-
ল—এতদিন পর মনে হল জগবানের
একটাও ভুল আর মিথ্যে দিয়ে তৈরী।
যা সকলের মধ্যে দইতে তবু পারত;
কিন্তু সেদিন অনু আবিষ্কার করল, যার
স্বাভাবিক আমরণ মুখ-দুঃখের সম্পর্ক
তিয়েছে সে-লোকটিও নানাভাবে

অনুকে প্রভাষণ করে চলেছে, সেদিন
ওর অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে রাখা জীর্ণ
বিশ্বাসের ইমারতটুকু হঠাৎ ঝড়ের ধাক্কায়
ভেঙে গা-ড়ো-গা-ড়ো হয়ে গেল।
ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়—আবার
বিশেষও। কারণ মিথ্যে ছোট হোক বড়
হোক—সে মিথ্যেই। এবং ছোট ছোট
মিথ্যার জাল বুনেই এক বিরাট প্রবণতা
খাড়া হয়ে ওঠে।

সেদিন ধোপাবাড়ী কাপড় দিতে
গিয়ে রোজকার অভ্যাসমত অনু অজয়ের
সব পকেটগুলো হাতড়ে দেখে নিচ্ছিল
কিছু আছে কিনা। ছোট, একটুকরো
কাগজ ছাড়া কিছু পেলো না। কাগজটা
দরকারী কিনা দেখতে গিয়েই অনু হঠাৎ
যেন ঠান্ডা হয়ে গেল। কাগজটা সামান্য
একটি ক্যাশমেরো। কত ক্যাশমেরোই ত
পকেটে পায় অনু। কিন্তু এটা একটা
বিশেষ অশুভ ইজাজের মত ওর চোখের
সামনে যেন দুলতে লাগল। আশ্চর্য!
একটা নাইট ড্রেস কিনেছে অজয়—
লেডিজ নাইট ড্রেস। নাম চল্লিশ টাকা।
কিন্তু আজ পর্যন্ত অনু ত কখনো নাইট
ড্রেস পরেনি। আর কিনেই যদি থাকে
অজয় ত সেটা গেল কোথায়? চৌরগীর
এক বড় ফ্যাশনেবল দোকানের ক্যাশমেরো

এটা। কিন্তু অজয় ত কোনও দিন অনুকে
ওসব দোকানে নিয়ে যায়নি—কিন্তু
কিনেও দেয়নি ওখান থেকে। তবু কিন্তু
অনুর মনে হল হয়ত কোনও সহজ
সমাধানে হবে এর। মিথিমিথি একটা
ক্যাশমেরো নিয়ে এত বিচলিত হবার
কোনও মানে হয় না।

অজয় বাড়ী এলে অনু অপেক্ষা
করল সুযোগ বুঝে কথাটা পাড়বার
জন্যে। খাওয়া-দাওয়া করে রাতে যখন
অজয় খবরের কাগজ নিয়ে বসল তখন
অনু কথাটা জিজ্ঞেস করল। সহজ সরেই
প্রশ্ন করল—

‘তুমি নাইট ড্রেস কেন জেনো
কিনেছ?’

—প্রশ্নটা অজয়কে এমন করে চমকে
দেবে তা কিন্তু অনু ভাবেনি। ওর
চমকানি দেখেই অনুর ছোট সন্দেহটা
হঠাৎ কালো হয়ে মনের কোণ কানচ
এক মুহূর্তে ঢেকে ফেলল।

এক মুহূর্তে কিন্তু অজয় সামলে
নিল নিজেকে। যারা সারাক্ষণ মিথ্যে কথা
বলে তাদের মিথ্যে দিয়ে মিথ্যে ঢাকতে
অসুবিধা হয় না।

অবাক হবার ভাগিতে অজয় ছুট

উঁচু করে জিজ্ঞেস করল—“নাইট ড্রেস? কোন নাইট ড্রেসের কথা বলছ তুমি?”
—“কোন নাইট ড্রেস তা আমি জানব কি করে? চোখে ত দেখিনি। তোমার পকেটে ক্যাশমেমো দেখলাম। তাই জিজ্ঞেস করলাম।”

“আমার পকেটে? কী আশ্চর্য!”
তারপরেই হঠাৎ মনে পড়ল অজয়ের।
—“ও হো—তাই বোলো। সেদিন আমি তার মেম বউয়ের জন্যে কিছু জামা-কাপড় কিনতে গিয়েছিল—ওরই ক্যাশমেমো নিশ্চয়ই।”

কিন্তু এত সহজ উত্তরটা অনুর কাছে যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ মনে হল না। ওর মনে যে সকলকে বিশ্বাস করার বোকামিটা অনেক আগে থেকেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল এটা তারই ফল। সুতরাং অনুর আবার প্রশ্ন করল—

“আমিদের বউয়ের জামার ক্যাশমেমো তোমার পকেটে কেন?”

বিরক্তিতে অজয়ের ভুরুটা কুঁচকে গেল। মেয়েমানুষরা এত জেরাও করতে পারে। তবু উত্তর দিতেই হবে।

—“একটু অসহিষ্ণুভাবেই অজয় উত্তর দিল—“কি আশ্চর্য! তুমি কি বলতে চাও বল ত? সেদিন আমিদের কাছে টাকা ছিল না, আমিই টাকাটা দিয়েছিলাম। তাই ক্যাশমেমো আমার পকেটেই ছিল। কোথায় রেখেছে ক্যাশমেমোটা? দাও আমাকে, টাকাটা আদায় করে নিতে হবে।”

হয়ত এর পরে সন্দেহ থাকত না অনুর। কিন্তু অজয়ের আতিমাত্রায় চণ্ডল হওয়া এবং অত করে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা যেন অনুরকে নিশ্চিত করে জানিয়ে দিল—এটা সত্য নয়। সুতরাং অনুর জীবনে প্রথম মিথ্যা কথা বলল—

“ক্যাশমেমোটা ফেলে দিয়েছি।”

—কেন যে ওই কাগজটুকু অনুর মনের দ্বন্দ্বিতা কেড়ে নিল, তার বিচার করা মুস্কিল। তবে কদিন অহরহ নানা সন্দেহে জর্জরিত হয়ে অনুর হঠাৎ ঠিক করল—এটার সত্য মিথ্যা যাচাই না করলে ওর কিছুতেই নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। অজয়কে না জানিয়ে তাই অনুর একদিন দুপুরবেলা হাজির হল অমিতের বাড়ী। তার মেম বো মিলিভিয়া ওকে দেখে খুশী হয়ে উঠল। বেচারী এদেশে এসে এখনও বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কাউকে পায়নি। অনুর একথা সেকথার পর

চোরগঙ্গীর বিশেষ দোকানটির কথা পাড়ল। মিলিভিয়া এখানে জামা-কাপড় কোথায় কেনে, পছন্দমত জিনিস পাচ্ছে কিনা এবং চোরগঙ্গীতে ওর জানা একটি বিশেষ দোকানে যাবতীয় বিদেশী জামা-কাপড় পাওয়া যায় ইত্যাদি বলে অপেক্ষা করল মিলিভিয়ার উত্তরের জন্য।

কিন্তু মিলিভিয়া একেবারেই ওকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিলো—যখন বলল যে, এখন পর্যন্ত ওর এদেশে জামা-কাপড় কেনবার দরকারই হয়নি, কারণ বিলেত থেকেই সব কিছু ও নিয়ে এসেছে। এরপর নাইট ড্রেসের কথা আর অনুর তোলে কি করে। তবু একবার বলল যে, ‘অমিত-বাবু—একদিন আমাদের বলেছিলেন আপনার নাকি একটা ভাল নাইট ড্রেস দরকার।’

সঙ্গে সঙ্গে মিলিভিয়ার মূখে অর্থপূর্ণ হাসি খেলে গেল। হাউ নটি অফ হিম! আমার তিনটে নাইট ড্রেস ও লন্ডন থেকে কিনে দিয়েছে। আমাকে বদলে বদলে পরতে হয়। আবার আপনাকে বলেছে আমার নাইট ড্রেস দরকার! দাঁড়ান আজ দেখাচ্ছি মজা ওকে।

কি সর্বনাশ! মিথ্যা কথার এত বিপদ তা কি অনুর ভেবেছিল? এখন যদি মিলিভিয়া সত্যি অমিতকে বলে দেয়—অনুর একথা বলেছে ত অমিত অনুরকে কি ভাববে! ছি-ছি কী বিস্তী অবস্থা হল এখন। তাই অনুর মিলিভিয়াকে অনেক করে অনুরোধ করল—যে একথা যেন সে অমিতকে কিছুতেই না বলে। ওটা হয়ত বন্ধুর বাড়ী গিয়ে ঠাট্টা করেই বলেছিল—অনুরই সে কথা সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত হয়নি ইত্যাদি।

বাড়ী চলে এল অনুর। কিন্তু ফিরে এল মনের ওপর এক জগন্দল পাথর চাপিয়ে। অজয় আগাগোড়া বানিয়ে বলেছে। এই রকম সন্দেহই ওর হিচ্ছিল। অথচ আশ্চর্য এতদিন দুনিয়ার সবাইকে ঠিকমত চিনেও নিজের স্বামীর সম্বন্ধে এক নিশ্চিন্ত বিশ্বাস পোষণ করে বসেছিল। সেইজন্যই ওর মনের মধ্যে বিশ্বাস করবার আকাঙ্ক্ষাটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। কেবল চাইছিল, অজয় যে সত্যি বলেছে এটা প্রমাণ হলেই ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মা-বাবা মানদ্রকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলেন—বিশ্বাসের মর্যাদা নাকি খারাপ লোকেরাও দেয়। অনুর এতদিনে বুঝল যে ওর মা-বাবা চিরকাল ওকে

ভুল শিক্ষাই দিয়েছেন। নয়ত তাঁরা যে যুগে বাস করে গেছেন সেটা এখনকার থেকে আলাদা ছিল এবং লোকগুলোও বোধহয় অন্যরকম ছিল। অনুর যে এতদিন ধরে অজয়কে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এসেছে তার কি মর্যাদা অজয় দিল! অনুর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ওকে ঠকাতে ত একটুও বাধিনি অজয়ের? কিন্তু নাইট ড্রেস দিয়ে অজয় কি করে? কাকে দিয়েছে ওটি? শাড়ী ত অনেককেই দেওয়া যায়—কিন্তু নাইট ড্রেস? অনুর যদি ক্যাশমেমোতে দেখতো অজয় চল্লিশ টাকার শাড়ী কিনেছে—তাহলে কি এত অশান্তি হতো ওর? অজয়কে আর ত অনুর বিশ্বাস করতে পারে না। আর বিশ্বাসই যদি না রইল ত কিসের জেরে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক টিকে থাকবে।

অজয় রাগে ফিরলে অনুর আর সহজ স্বাভাবিকভাবে সেদিন কথাও বলতে পারল না। কেবল মনে হতে লাগল অজয়কে এতদিন ধরে ও চিনতে পারিনি। সংসার পর্যন্ত ওর কাজ অর্থহীন মনে হতে লাগল। আর দু-তিন দিন মনের সংগে যুদ্ধ করে হার মানল অনুর। এর একটা পুরোপুরি মীমাংসা না হলে অনুর আর কোন উপায় নেই।

ভগবানে বিশ্বাসী আর মানুষের সত্যায় বিশ্বাসী অনুর অবিশ্বাসের জ্বালায় জ্বলে একদিন দুপুরে চলল চোরগঙ্গীর উদ্দেশ্যে। ক্যাশমেমোতেই নাম ঠিকানা আছে। কাজেই দোকানটা খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না। দোকানে একদিকে যাবতীয় মহিলাদের সাজ-সরঞ্জাম কাপড়-চোপড় সাজানো। সেখানে এক শ্বেতাঙ্গিণী মহিলা চার্জে রয়েছেন। দেখে থানিকটা স্থিতি পেলে অনুর। পুরুষের কাছে নানা প্রশ্ন করা যতো অশোভন ও অসুবিধাজনক, এক্ষেত্রে সেটা সহজ হবে।

মহিলা অনুরকে দেখেই অভিযান করলেন। এই করেই ওর জীবন কেটেছে। খন্দ্রকে খুশী করাই ওর কাজ। সেটাই জিনিস বিক্রীর মূলধন। কি বলবে, কি ভাবে কথা আরম্ভ করবে অনুর ভেবে অসহ্য বোধ করল। কিন্তু তবু সাহস করে এগিয়ে গেলো। সোজাসুজি ক্যাশমেমোটা ধরে বলল।

“এই জামাটা আমার এক বন্ধু কিনছে এখান থেকে। ঠিক তার জোড়া আমার একটা চাই।”

মহিলা কাগজটি নিয়ে দেখে একটু

চিন্তা করলেন। তারপরেই মদুখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

“ও—হ্যাঁ—এই ত কদিন হল আমিই এটা বিক্রী করেছি। মিঃ দাশগুপ্ত তার স্মারি জনো কিনলেন। মিঃ দাশগুপ্ত ত আমাদের পুরনো customer—নতুন বিয়ে করেছেন বললেন। সেই য়োরেটি বন্ধু আপনার বন্ধু! কী চমৎকার দেখতে মেয়েটি। ও—ওই রকম ফিগার হলে তবে তাদের পোষাক পরিয়ে সুখ।”—মহিলা অনর্গল বকে চললেন—“দেখিছ দাঁড়ান—আর একটাই ওর জোড়া জামা আছে—এ দুটো সম্প্রতি লন্ডন থেকে এসেছিল।”

মহিলা বাস্তব হয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন জামা আনতে। অনু বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। হৃদপিণ্ডটা এমন জোরে লাফাচ্ছে যে সেটির শব্দ অনু নিজের কাণেই শুনতে পাচ্ছে। আর দাঁড়িয়ে থাকলে পড়ে যাবে এবার—। মাথাটা যেন কি রকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একটা চেয়ারে অনু বসে পড়ল তাড়াহাড়, বসে প্রাণপণে মনটাকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগল। মহিলা একটা বাজ হাতে বেরিয়ে এলেন। “এই যে এনেছি। আপনার বন্ধু কি যেন নাম? আইরিন না? হ্যাঁ আইরিন ত—কারণ ভুললোক ওকে ওই নামেই ডাকছিলেন—দেখুন আমার কী রকম মনে থাকে। আমার একবার কোনও customerকে জিনিস দিলে তাকে আর ভুলি না। এইজন্যে একবার আমার কাছে কেউ জিনিস কিনলে অন্য কোথাও আর যেতেই চায় না। হ্যাঁ—কি যেন বলছিলাম—ও মনে পড়েছে, আপনার বন্ধু আইরিন ও তার স্বামী আরও জামার অর্ডার দিয়ে গেছে—একটা ইভনিং ড্রেস আর দুটো ব্লাউজ আর স্কার্ট।”

এতক্ষণে স্বর খুঁজে পেলো অনু। ক্ষীণ গলায় বলল—“আইরিন আমাকে আপনার কথা বলেছে। ওই ত আমাকে ক্যাশমেমেটা দিলো। ওরা যেন কোথায় নতুন ফ্ল্যাট নিয়েছে। সে বাড়ীটির আবার ঠিকানা আমাকে এখনও দেয়নি। বোধহয় এর মধ্যে ওরা সে বাড়ীতে চলেও গেছে। আপনাকে কি জামা ডেলিভারীর জন্যে কোনও ঠিকানা দিয়ে গেছে—না এখানেই আসবে বলেছে?”—অশ্চর্য হল অনু, নিজেই বানিয়ে মিথ্যে কথা বলা কত সহজ জেনে। একবার গোয়েন্দাধর্ম আরম্ভ করেছে এখন আর পেছনো চলে

না। মহিলা অনুর জন্যে ক্যাশমেমেটা লিখতে লিখতেই বললেন—

“হ্যাঁ ঠিকানা দিয়ে গেছে বইকি। অর্ডার নিলে আমাদের কিছুর অগ্রিম টাকা ও ঠিকানা রাখতেই হয়। তবে বাড়ী বদলানোর কথা ত কিছুর বললো না ওরা? নিশ্চয়ই এই ঠিকানায়ই জিনিস দিতে হবে। আপনি ঠিকানাটা চান? পুরনো ঠিকানা ত আপনি জানেনই—”

তাড়াহাড়ি অনু বললো—“দেখি ঠিকানাটা। পুরনো বাড়ীর ঠিকানা কিনা দেখলেই বুঝবো।” অকারণে চল্লিশ টাকা খরচ করে জামাটা কিনতে হলো অনুকে—না নিয়ে উপায় কি। মহিলা আবার ভিতরে গিয়ে অর্ডার-এর খাতা বের করে ঠিকানা খুঁজতে লাগলেন।

“এই যে পেরেছি।—ক্যামাক স্ট্রীট। দোতলায় দুই নম্বর ফ্ল্যাট।”

অনু বলল, “হ্যাঁ এই ত পুরনো ঠিকানা। আচ্ছা চলি আজ, নমস্কার।”

ঠিকানাটা মন্থস্ত করে নিল অনু। বেরিয়েই একটা পেমিসল কিনে ক্যাশমেমোর পিছনে ঠিকানাটা টুকে নিল। তারপর চলল ক্যামাক স্ট্রীটে। মাথায় যেন ভূত চেপেছে। যা করছে তার বিরুদ্ধে যাবার ওর ক্ষমতা নেই। এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব যেন ওকে টেনে নিয়ে চলেছে নিজের চরম পরিণতির দিকে।

এবারও ঠিকানা খুঁজতে হল না। দরজায় টোকা দিতেই এক বয়সী এ্যাংলো মহিলা বেরিয়ে প্রশ্ন করল, “কাকে চাই?”

এতক্ষণে শব্দ হয়ে গেছে অনু। খুব স্থির গলায়ই বলল—“আইরিনকে—”

সন্ধিধ দৃষ্টিতে দেখাছিলো মহিলা অনুকে। অপ্রসন্ন গলায় উত্তর দিলো—

‘এখন আইরিনকে পাবেন কী করে? সে ত এখন অফিসে আছে! বিকেল বেলা আসবেন।’

মরিয়া হয়ে অনু বলল—“মিঃ দাশগুপ্ত আজ সন্ধ্যাবেলা আসবেন বলেছিলেন না—সেইজন্যে—”

বাধা দিয়ে মহিলা বললেন—“মিঃ দাশগুপ্তের আগামীকাল আসবার কথা। আর আপনার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?”

আবার সন্ধিধ চোখে দেখলো মহিলা অনুকে। তারপরেই অত্যন্ত অসহিষ্ণু গলায় বলল—“দেখুন মিঃ দাশগুপ্ত সব এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিজেই করে। যদি মিঃ দাশগুপ্ত কোনও চিঠি দিয়ে থাকে ত সেটা দিন।”

গম্ভীর হয়ে অনু বলল,—“চিঠি তিনি দেননি। তবে আমাকে আপনার বিশ্বাস না হলে আমার কিছুর বলার নেই।” বলেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে এলো অনু। যা জানার ছিল তা ত জানা হয়েই গেল। আর কি। এবার কী করা যাবে। অজ্ঞে যে আইরিন নামে এক এ্যাংলো মেয়ের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক পাতিয়াছে সে ত বোকাই গেল। আর রহস্য কিছুর নেই। সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার অনু নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে। সবগ্রাসী একটা আগুন যেন অনুকে পুড়িয়ে ফেলেছে তার লেলিহান শিখা দিয়ে।

প্রতি পাঠ্যগারের যোগ্য পুস্তক

জাতিস্মর কথা

শ্রীসদাশীলচন্দ্র বসু প্রণীত।

এরূপ পুস্তক বাংলাভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

বিদগ্ধ সঁমালোচকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

দেশ পত্রিকা—যে বিষয়বস্তু নিয়ে লেখক অবতীর্ণ হইয়াছেন, তা একেবারে অভিনব বলা চলে।

অমৃত পত্রিকা—কাহিনীগুণি চমকপ্রদ, রহস্য উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর। ভূমিকাটি সুদীর্ঘ। এই জাতীয় গ্রন্থ এক হিসাবে এই প্রথম, সেই কারণে লেখককে অভিনন্দন জানাই।

আনন্দবাজার পত্রিকা—বইটি পাঠকদের খুবই ভাল লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান : প্রকাশক ঘাটশীলা কোম্পানী। ৩, ম্যাক্সো লেন, কলিঙ্গ—১

ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২নং কণওয়ার্লিশ স্ট্রীট, কলিঙ্গ—৬

দাশগুপ্ত, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি প্রভৃতি প্রধান পুস্তকালয়ে।

কোথায় একটু শান্তি! একটু ছায়া? একটু আড়াল—যেখানে অনু নিজেকে লুকিয়ে ঠান্ডা হতে পারবে? গঙ্গা—ওই ত! কিছু দূরে গেলেই ভাগীরথী বয়ে চলেছে। একবার, বাঁপ দিলেই সব শান্তি। ছিঃ ছিঃ, এ কি ভাবছে অনু! ওর যে দুটি ছেলেমেয়ে আছে। তাদের কী হবে? দুঃস্থির বাপের হাতে তাদের ফেলে পালাবে অনু নিজেকে বাঁচাতে? এখন যে বেঁচে থাকটাই অনুর মজুর সমান। আর মরে যাওয়াটাই বাঁচা! কিন্তু সে ও কাপড়ের কাজ।

ঢাঙ্গি এসে দাঁড়াল বাড়ীর সামনে। অভ্যাসমত অনু কখন ড্রাইভারকে ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে তাও মনে নেই। ক্রান্ত অবস্থার শরীর নিয়ে অনু নামল গাড়ী থেকে। ছেলেমেয়ে ছুটে এল। তারা স্কুল থেকে ফিরছে একটু আগে। কী ভাষা কিকি বলে গিয়েছিল ওদের খাইয়ে দিতে। কী অসহনীয় ক্রান্ত—অথচ আবার অনুকে রোজকার মত সংসার করতে হবে। কি নিদারুণ পরিহাস চলেছে ওর জীবন নিয়ে। কাজে লাগল অনু রোজকার অভ্যাসমত। অথচ মনে হল কাজ করছে শব্দ ওর হাত পা। মনটা ওর আয়ত্তের বাইরে।

অজয় ফিরল অফিস থেকে। অনু একবারও তাকে কোন প্রশ্ন করল না। ঝগড়া করল না। ওর কথা বলার আর প্রবর্তি ছিল না। কাজকর্ম শেষ করে অনু ছেলেমেয়ের বাটে শব্দে পড়ল না থেয়ে। অজয়ের এমনিতেই খেলায় কম। অনু খেল না কি খেল, সে খোঁজ নেবার কথা ওর মনেই হল না।

পরদিন যথারীতি দিন আরম্ভ হল। সন্ধ্যা হল। দিন ত আর কারো জন্যে বসে থাকে না। সারাদিন অনুর নিজের কতব্য স্থির করতে লাগল। যতদিন কিছু জানত না ততদিন এক রকম ছিল। এখন সব জেনে সে আর অনু কিছুতেই অজয়ের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে পারবে না। কিন্তু যে আছে ওর নিজের যে ওকে আগ্রহ দেবে। এঘর ওঘর অনু ঘরে ঢুখল। কত গভীর মমতা দিয়ে সংসার আরম্ভ করেছিল। ঘরের মধ্যে কোথায় কী দরকার, কোন ঘরের সঙ্গে কোন পর্দা মানায়, বাচ্চাদের ঘরে কী রকম আসবাব থাকবে সব খুঁটিনাটি ব্যবস্থা। কত মায়া—কত বন্দন দিয়ে গড়া একটা পরিপূর্ণ সংসার শব্দ একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কী রকম মিথ্যা হয়ে গেলো। সংসার

ত শব্দ বাড়ীই টকাঠ নয়; দুটি মানুষ পরস্পরের ভালবাসা একনিষ্ঠতা আর সাহচর্য দিয়ে ইন্ট কাঠ পাথরে প্রাণ সঞ্চার করে। নতুন জীবন সৃষ্টি করে। যেখানে সে সম্পর্ক মিথ্যায় ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেখানে কিছুই তো মূল্য নেই। জানলার বাইরে নিজের হাতে লাগান চাঁপা গাছটির দিকে তাকিয়ে অনুর মন সবুজ ছায়ার ঘেরা সেই ছোট অখ্যাত পশ্চিমের একটি শহরে ফিরে গেল। যেখানে তার কুড়ি বছর কেটেছে। বাবা ডাক্তারী করতেন। কিন্তু তার জীবিকা উপার্জনের চেয়ে লোকসেবার উদ্দেশ্যই বড় ছিল সেখানে। কাজেই যে পরিমাণ ভত্ত তার জটিল সেই পরিমাণেই পকেটে শূন্যতা জমল। মৃত্যুর সময়ে উত্তরাধিকার-সূত্রে খালি কয়েকখানি বই দিয়ে গেলেন অনুকে। ডাক্তারী বই—দর্শনশাস্ত্র আর একটি গীতা। এই তাঁর মহামূল্য সম্পত্তিরূপে দান করলেন অনুকে। বাবা বলতেন, “অনু অমৃত লাভ যাতে নেই তা নিরর্থক। মৈত্রেরী সেই কথাই যজ্ঞ্য-বন্ধকে বলোছিলেন। কথটা বড় মূল্যবান, মনে রাখিস।” লোকে যে ওর ভাল-মানুষির সুযোগ নিয়ে ঠকাবার চেষ্টা করে এটা উনি কখনো মানতেন না। কেউ, অথবা বেশীর ভাগ লোকই চিকিৎসা করিয়ে ফী না দিলে উনি বলতেন, “আচ্ছা, ওরা বড় গরীব, পরসা দেবে কোথেকে।” মা বলতেন, “অন্য ডাক্তার ডাকলে ত ফী দিতেই হতো।” তাতে উনি বিজ্ঞের মত মন্দ মন্দ মাথা নেড়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে বলতেন—“সেই জনেই ত অন্য ডাক্তার ওরা ডাকে না। ডাকলে কি সূচীকিৎসা হতো। বেথোরে ছেলেটি মরত।”—ইত্যাদি।

কদিন বৃকের ভেতরটা জ্বলে গেলেও অনুর কান্না পারিনি। আজ মা-বাবার কথা মনে হতেই চোখ দিয়ে হুহু করে জল নেবে এল। এবং এক মূহুর্তেই ও মন স্থির করে ফেলল যে সেই অখ্যাত শহরেই ফিরে যাবে। বাবার ভক্তরা ত আছেই, তারা অনুকে থাকবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দেবে। এবং সকলেই চেনা থাকায় অসুবিধা হবারও কারণ নেই। বাচ্চা দুটোকে নিজের মত করে মানুষ করতেই হবে। এ অশান্তির সংসারে অবিশ্বাসের আর মিথ্যায় মধ্যে ওদের কোন আদর্শই ত দেওয়া যাবে না।

রাত্রি একটু বেশী দেরী করেই অজয় ফিরল। আজ একটু বেশী খুশী খুশী ভাব। সঙ্গে সঙ্গে অনুর মনে পড়ল গতকাল শুনোছিল আজই অজয়ের

আইরিনের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট। এতক্ষণ ওর সঙ্গে কাটিয়েছে অজয়। জীবনটাকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করেছে সে, অনুকে ঠকানোতে ওর একটুও আত্মপ্লাম্বান নেই। সবই বুঝলো অনু, তবু কিছু বলল না। বলবার দরকার ওর ফুরিয়ে গিয়েছিল।

পরদিন অজয় অফিসে চলে গেলে নিজের হংসামান্য গহনা ও অলপ জমানো টাকা নিয়ে ছেলেমেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে গেল অনু। নিজের গড়া সংসার ছেড়ে সেই ছোট বেলাকার চেনা শহরের উদ্দেশ্যে। যাবার সময় অজয়কে একটা চিঠি লিখে রেখে গেল।

“তোমার সঞ্জিনী জুটেছে। সুতরাং আমার থাকার প্রয়োজন দাঁখ না। তোমার রেখে দেবার জন্যে লোক রেখে নিও। ছেলেমেয়ের ভার আমিই নিলাম। আমাকে খোঁজার চেষ্টা করো না। কাবণ আমি আর ফিরব না। ইতি—

তারপরে কি ভেবে তলায় লিখল—

পুঃ আমার জন্যে ভেবো না। আমিও আমার সঞ্জী পেয়েছি।”

সঞ্জী বলতে বাবার বই কথনা। কিন্তু অনু ইচ্ছে করেই সেটোর আর ব্যাখ্যা দিল না। যা ইচ্ছে ভাবুক অজয়।

অজয় বাড়ী এসে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরদিনই পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে গেল যে অজয় দাশগুপ্তের স্ত্রী সঞ্জী জুটিয়ে পালিয়েছে। সঙ্গে কয়েক হাজার টাকা এবং বহু গহনাপত্র নিয়ে গেছে।

পাড়ার মেয়েরা বলল—“আমরা তখনই জানতাম ও গভীর জলের মাছ। এরকম যে একটা কেলেকারী করবে তা আমরা আগেই জানতাম। আহা এমন স্বামী—।”

ভদ্রলোকরা বললেন—“মেয়েমানুষকে বিশ্বাস নেই।” বলে “মেয়েমানুষের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভেবে তাঁরা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন।

অজয় বলল, “দুখ দিয়ে কালসাপ পূর্বেছিলাম। বিদায় হয়েছে বেশ হয়েছে। উঃ, এতদিন কি মিথ্যাচারিতাই করেছে আমার সঙ্গে।”

কিন্তু তবু যেন মনে জোর পায় না। কী যেন এক নিদারুণ হতাশা আর প্লাম্বান জেগে ওঠে মনে। শূন্য ঘরের দিকে তাকিয়ে কোথায় কোনো জোর পাওয়া যায় না। কেবল মনে হতে থাকে সে হেরে গেছে, অনু ওকে হারিয়ে দিয়ে গেছে।

গৃহকোন



সমস্যা ও সমাধান

বেলা দে

দেশের বর্তমান সমস্যা আলোচনা-প্রসঙ্গে কয়েক বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বর্তমান যুগ তার অতীতের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়েছে। এই যুগে পশ্চিমের এ কেবল বাইরের জগতেই ঘটেছিল, আমাদের মানসিক ক্ষেত্রে ও সাম্প্রতিক জীবনেও এর ছোয়াচ লেগেছে। কয়েক বছর আগেও সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার এমন কি অল্প-আয়ের মানুষও বেশ শান্তিপূর্ণ সন্তুষ্টিতে জীবনযাপন করেছে। জিনিসপত্র সবই ছিল অল্প দামের, খাওয়া-পরাই দৃষ্টিতে ছিল না। কাজেই দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিস বেশ সহজেই ঘরে আনা যেতো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সমাজ-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে; সহজ সরল জীবনযাপনের পরিবর্তে এসেছে জটিলতা ও ক্রিয়মত্ততা; যার ফলে আজকের সংসার নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সংসারতরঙ্গীর কণ্ঠস্বর, মেয়েরা এতে বিশেষভাবে বিব্রত হয়ে পড়ছেন। খাদ্য-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, গৃহ-সমস্যা ইত্যাদি সমস্যার সঙ্গে লোকজন-সমস্যাও বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। এখন এই সমস্যার সমাধান করতেই হবে। বিলাতের ইনস্টিটিউট অব হাউস ওয়ার্কার্স (Institute of House Workers) অন্ততঃ লোকজনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে বেশ এগিয়ে গেছেন।

একটিও লোকের প্রয়োজন নেই আমাদের দেশে এমন গৃহস্থ মধ্যবিত্ত পরিবার অল্পই আছে। কিন্তু এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, তাদের পক্ষে পচিশ লোক ছিল এখন হাজারো একটিতে ঠেকেছে। আর বাকীদের হাজারো একটিও নেই। সকাল থেকে উঠে বাড়ীর মেয়ে-বৌয়েরা বাসনদাজা, মশলাবাটা, কাপড়-কাটা, ঘর পরিষ্কার করা, রান্নাকরা সবই করছেন। অতিরিক্ত পরিভ্রমে স্বাস্থ্যের হানিও হচ্ছে। অথচ আগে যে লোকটি পচিশ টাকার হাসিন্দেখ কাজ করেছে, আজ সে পচিশ টাকা না হলে কাজ করতে চায় না। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই লোকজনরা বাড়ীর কাজকর্ম ছেড়ে ফাঁটরী বা ঘিলে কাজ নিচ্ছে।

তা ছাড়া সীতা কথা বলতে কি, আমাদেরও যেমন খাওয়া-পরাই খরচ বেড়েছে তাহাদেরও তো তাই। কাজেই বেশী আয় না হলে তারাই বা সংসার চালাবে কি করে?

আমার মনে হয় যারা বেশী টাকার বেশী লোকজন রাখেন, তাদের লোক-জনের কাজকর্ম অল্প এবং কাজকর্ম ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। এইসব লোকজনরা বেশ কিছুটা অবসর পায় একথা অস্বীকার করা যায় না, কাজেই সেই অবসরটুকু তারা যদি প্রতিবেশীর গৃহে বাসনদাজা বা কাপড়কাটার অথবা ঘরদোর পরিষ্কার করে আসার কাজ নেয় তাহলে উভয়পক্ষেরই সুবিধা হবে।

তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কাজকর্মের পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন করা দরকার। প্রথমতঃ পরিবারটি ছোট হলেই ভাল হয়। কারণ এমন সংসার আছে যেখানে কাজকর্ম দেখানোর জন্য বাড়ীর গৃহিণী একা আছেন কিন্তু পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী। এমন সংসারে হাজারো দৃশ্যে পান সাজতে হয়, ফুটনো কোটা, রান্নাকরা সবই গৃহিণীকে একাই করতে হয়। ডায়নিংর অসুখবিসুখ আছে, শিশু-পরিচর্যা আছে। আমার মনে হয় এই ধরনের কাজগুলো অন্যায়সেই সংক্ষেপ করা যায়। যেমন, পান খাওয়াটা কমানো যেতে পারে। বাসনগুলো কাঁশা পেতলের না হয়ে খালকা বাসনপত্র হলে নিজেরাই সোজা সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে পারা যায়। ঘুটে-কয়লার ব্যবহার মতদর সম্ভব কমিয়ে ইলেকট্রিকের উদ্দেশ্যে রান্নার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতিদিন মশলা না বেটে গুড়ো মশলার ব্যবহার করতে পারেন। তা ছাড়া বাড়ীর অন্যান্য কাজকর্ম এমন হওয়া উচিত যাতে লোকজন একটি থাকলেও তার মন বলে এবং কিছুটা অবসর সে পায়।

অনেকে আছেন নিজেরা তো কোনো কাজে হাত দেবেন না উপরন্তু লোকজন যে থাকবে সবদা তাদের কাজের খুঁত ধরে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করেন। কিন্তু যদি কাজের ধারা এবং নিয়মালবর্তিতা মনিব এবং লোক-জন উভয়ের মধ্যে জানা থাকে তাহলে কারুরই কিছু বলার থাকে না।

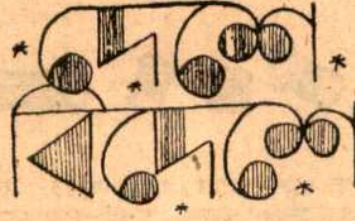
এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি থাকা ভালো—সেটি হচ্ছে নিদেশের মত আমাদের দেশেও 'Institute of House Workers' গঠন করার প্রয়োজন হয়েছে। যদি

উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলিকাতায় এই ধরনের একটি করে ইনস্টিটিউট থাকে এবং সেই সমস্ত কেন্দ্রে লোকজনকে নানারকম গৃহস্থালীর কাজকর্ম শিখা দেওয়া যায় তাহলে খুব ভাল হয়। কারণ গৃহস্থালীর কাজও যে শিক্ষণীয় বিষয় সেটি আজকের দিনে সকলকেই জানতে হবে। এইসঙ্গে ইনস্টিটিউট তাদের মাহিনার হারও ঠিক করে দেন। যাদের চাকর বা রাধার লোক যা-ই দরকার হোক না কেন, সরাসরি তারা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করতে পারবেন। এতে উপযুক্ত মাহিনায় উপযুক্ত লোক সহজেই পাওয়া যাবে। এমন কি এরা বিবাসীও হতে সন্দেশ নেই। এইভাবে অন্ততঃ লোকজন-সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারবে।

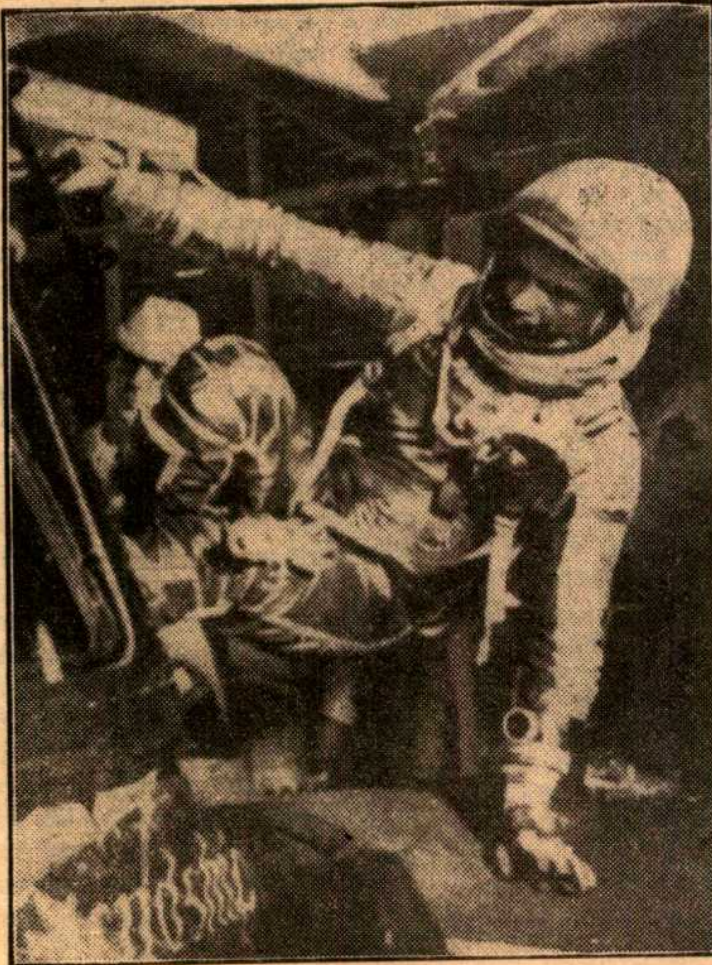
এমন অনেক সংসারে দেখছি, অবিবাহিতা অল্পবয়স্ক মেয়ে অবস্থা ভাল নয় বলে লেখাপড়া বা কোনো কাজ শেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু তাদেরও যদি এই ইনস্টিটিউটে এ-পার্সন ঘর-সংসারের কাজকর্ম ভালোভাবে শিখিয়ে নেওয়া যায় তাহলে তারাও বেশ দূরপাল্লা আয় করতে পারে। ইউরোপ, আমেরিকার প্রায় প্রতি ঘরেই লোকজনের অভাব দেখা যায়। তাই বলে এমন নয় যে গৃহকর্মী একেবারে কাজে সাহায্য পান না। দরকার মত সন্ডাহে দৃষ্টকর্তা গৃহিণীর কাজের সাহায্য করার লোকের অভাব হয় না। এমন কি শ্রমদলী-শ্রী একসঙ্গে কোনো আদর্শ-প্রয়োজন বা নিয়ন্ত্রণে ধার হলে বাড়ীর আলো জ্বালাবার বা ছোট শিশুকে বেচাশুনা করার জন্যও লোক পাওয়া যায়। আমার মনে হয় যে সকল কাজে অন্যায় করতে হয় না অথচ নিজের মনোদা অকুর থাকে আর নিজের পক্ষে দাঁড়ানো যায় তেমন কাজ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাও গ্রহণ করতে পারেন। পরমুখ্য-পেক্ষী হওয়ার চেয়ে নিজের পক্ষে দাঁড়ানো ভালো। অবস্থার বিপাকে পড়ে এবং অসুখের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার দিন আজ আর নেই। সন্ধানী ও-জাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করতে আজ মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। কারণ "মডেল স্ত্রী তোমার ঘর" "শ্রীতি বিবাজ করে।"

॥ অভিনন্দন ॥

মহাকাশ জয়ের ইতিহাসে ২০শে ফেব্রুয়ারী আর একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। দুঃসাহসী মার্কিং বৈমানিক কর্ণেল জন এইচ গ্লেন মহাশয় সাড়ে চার ঘণ্টাকাল অবস্থান করে তিনবার পৃথিবী পরিভ্রমার শেষে নিরাপদে মর্ত্যে ফিরে এসেছেন এদিন। মহাশয়ের প্রথম যাত্রী তিনি নন, তাঁর আগে গত বছর ১২ই এপ্রিল ও ৬ই আগস্ট একইভাবে মহাশয় মর্ত্য পরিভ্রমণ করেছেন সোভিয়েট ইউনিয়নের দুই নৃত্যঞ্জয়ী বীর মেজর গাগারিন ও টিটভ। টিটভ আরও বেশীক্ষণ ছিলেন মহাশয়, পাঁচশ ঘণ্টায় সত্তরবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন তিনি। তবুও গ্লেনের কৃতিত্ব তাতে ম্লান হয়নি এবং অমের্য শক্তি ও ঐশ্বর্য দেশ মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের এই সাফল্যের ফল হবে সুদূরপ্রসারী। সোভিয়েট



নায়ক ক্রুশ্চেভ যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে মহাকাশ জয়ের অভিযানে দুই দেশ যেন হাত-মিলিয়ে চলে পরস্পরের সঙ্গে। যদি সর্বত্রই এই সহযোগিতা সম্ভব হয় তবে পৃথিবীর গ্রহ-বিজয়ের সাধনা যে এই দশকেই সফল হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আমরাও তাই আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই কর্ণেল গ্লেনকে। অনতিবিলম্বে আরও উজ্জ্বল সাফল্যে ম্লান হয়ে যাক তাঁর বিশেষ ফেব্রুয়ারীর গৌরবময় অভিযান।



মহাকাশ যাত্রার পূর্বক্ষেণে কর্ণেল গ্লেন

॥ বৃটিশ গায়েনা ॥

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমান্তে অতলান্তিক মহাসাগরের উপকূলে তিরিশী হাজার বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট বৃটিশ উপনিবেশ গায়েনা ভারত থেকে প্রায় দশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি ভারতীয় উপনিবেশ। কারণ '৫৮ সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায়, বৃটিশ গায়েনার সড়ে পাঁচ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে তিন লক্ষই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। জনশূন্য এই উপনিবেশটিতে আখ, ধান, কফি ও কোকো চাষের উদ্দেশ্যে বৃটিশ বণিক উপনিবেশীরা একদিন ভারত সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এই দেশ থেকে কয়েক হাজার শ্রমিককে ওখানে নিয়ে যান, উত্তরকালে তাদেরই বংশ বৃদ্ধি হয়ে কয়েক লক্ষ মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। বৃটিশ গায়েনার প্রধানমন্ত্রী ডঃ ছেদি জগনও একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত বৃটিশ গায়েনাতেও স্বাধিকারের দাবী প্রবল হয়ে ওঠে এবং সেই দাবীর অনিবার্য ফলস্বরূপ গায়েনা ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলে। ১৯৬১ সালে গায়েনায় সর্বশেষ যে সংবিধান প্রবর্তিত হয় তাতে শূদ্ধ প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দপ্তর ছাড়া, আর সকল দপ্তরের পরিচালন ব্যবস্থা গায়েনাবাসীদের হাতে অপর্ণের ব্যবস্থা হয়। এবং এই নতুন সংবিধান অনুসারে ৩৫ আসনবিশিষ্ট গায়েনার ব্যবস্থা পরিষদের যে নির্বাচন হয় তাতে প্রগতিশীল ডঃ ছেদি জগনের পিপলস প্রোগ্রেসিভ দল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে এবং ডঃ জগনের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

ডঃ জগন প্রগতিপন্থী ও সমাজবাদী, এ কারণে তাঁর এই বিপুল সাফল্য স্বার্থ-নৈষ্য বৃটিশ উপনিবেশী ও গায়েনার প্রতিজ্ঞাশীল দক্ষিণপন্থীদের কাছে বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। গায়েনা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করলে তার খনিজ ও কৃষিজ সম্পদ জাতীয় সম্পদে পরিণত হবে এই তাদের আশঙ্কা। এ কারণে ডঃ জগনের বিরুদ্ধে আজ গায়েনার দুই দক্ষিণপন্থী দল ইউনাইটেড ফোর্স ও পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস এক সাংঘাতিক আন্দোলন শুরু করেছে এবং সেই আন্দোলনের পূর্ণ সুযোগ নিতে এগিয়ে এসেছে বৃটেনের বণিক স্বার্থ। গায়েনার রাজধানী জর্জটাউনে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী সরকার-বিরোধী

বিকোভ প্রবল আকার ধারণ করামাত্রই ব্রিটিশ সরকার গায়েনার শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের কথা ঘোষণা করেছেন এবং গায়েনার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীও এখন বিবেচনা করা হবে না একথা তাঁরা জানিয়েছেন। অবস্থা দেখে মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদীদের বণিক স্বার্থ ও স্থানীয় কায়েমী স্বার্থের সম্মিলিত চক্রান্তের ফলে ব্রিটিশ গায়েনার পূর্ণ স্বাধীনতালাভের সম্ভাবনা আপাতত বেশ কিছুকালের জন্য পৌছিয়ে গেল।

৥ আলজিরিয়া ৥

উত্তর আফ্রিকার শেষ পরাধীন আরব রাষ্ট্র আলজিরিয়ার মস্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফ্রান্সের সীমান্ত-বর্তী সুইজারল্যান্ডের কোন একস্থানে সম্প্রতি ফ্রান্স ও আলজিরিয়ার অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটি সফল আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং আগামী রবিবারেই হয়ত উভয়পক্ষের সম্মতিভ্রমে আলজিরিয়ার পূর্ণ অস্ত-সংবরণ ঘোষিত হয়। এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স আবার যাতে প্রবল বিকোভ মাথা তুলতে না পারে তার জন্যে প্রেসিডেন্ট দ্যাগল প্যারিসে ৪৫ হাজার সৈন্য মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করেছেন। আলজিরিয়ার অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিরা আলোচনার শেষে ফ্রান্সের সর্বশেষ প্রস্তাব নিয়ে আলজিরিয়ার ফিরে এসেছেন এবং তারপরেই অস্থায়ী সরকারের পূর্ণ বৈঠক শুরু হয়েছে। অস্থায়ী সরকারের অনুমোদনলাভ করলে মীমাংসা প্রস্তাবটিকে অস্থায়ী সরকারের ৪৫ সদস্যবিশিষ্ট “পারলামেন্টে” পেশ করা হবে এবং তাঁদের অনুমোদনই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত বলে মনে করা হবে।

কিন্তু আলজিরিয়ার স্বাধীনতার পথে যারা প্রকৃত অন্তরায়, কলোন নামক সেই শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীদের সন্তাসবাদী কার্যকলাপ অব্যাহতই রয়েছে এবং মূল ফ্রান্সেই তাদের গুপ্ত সংগঠন ও এ-এসের কার্যকলাপ সাংঘাতিক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। কয়েক পূর্ব যাবৎ আলজিরিয়ার অবস্থানকারী ফরাসী কলোনের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ এবং তারা কোন অবস্থাতেই ফ্রান্সের আলজিরিয়া ত্যাগের প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে প্রস্তুত নয়। মৃত্যুভয় এদের দাবীতেই ফ্রান্স এতকাল ধরে স্বেচ্ছায় আলজিরিয়ার স্বাধীনতার দাবী প্রত্যাখ্যান বাধ্য হয়েছে। তার ফলে

গত সাত বছরে আলজিরিয়ার উভয়পক্ষে দশ লক্ষেরও বেশী মানুষ হতাহত হয়েছে এবং এই রক্তকরী প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে আলজিরিয়া ও ফ্রান্স উভয় দেশেরই রাজনৈতিক জীবন অনিশ্চিত ও অসহনীয় অবস্থার বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যুভয় আলজিরিয়ার প্রদেশেই যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে প্রায় দু'ভাজন মস্তিস্তম্ভার পতন হয়েছে যার ফলে ফ্রান্সের সম্মান স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্র বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এ অবস্থায় জেনারেল দ্যাগল যে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে আলজিরিয়া সমস্যা সমাধানে অগ্রণী হয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। ফ্রান্সের দীক্ষণপন্থীদের বেপরোয়া কার্যকলাপ দমনের জন্য এমনই একজন শক্তিশালী মানুষের আজ ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থার পুরোভাগে থাকার প্রয়োজন ছিল। সারা পৃথিবীর শান্তি ও মস্তিকামী মানুষের একান্ত ইচ্ছা, তাঁর এই বলিষ্ঠ প্রয়াস পূর্ণ সাফল্য অর্জন করুক। আলজিরিয়ার অগণ্য মৃত্তি যোদ্ধার অকুপণ জীবনদান সার্থক হোক।

৥ ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবলুপ্তি ৥

কারেবিয়ান সাগরে অবস্থিত বার-বাডোজ, জামাইকা, লীওয়ার্ড উইন্ডওয়ার্ড স্বীপপুঞ্জ, ট্রিনিদাদ ও টোবাগো এই কটি স্বীপ ও স্বীপপুঞ্জ নিয়ে ১৯৫৮ সালের ওরা জানুয়ারী গঠিত হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফেডারেশন। এই যুদ্ধরাষ্ট্রের শ্বলভূমির সম্মিলিত আয়তন ৭,৯৪০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩১ লক্ষ ১৫ হাজার। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জনের পিতৃপুরুষ আফ্রিকা-আগত নিগ্রো। ভৌগোলিক পরিচয়ে ব্রিটিশ গায়েনা ও ব্রিটিশ হন্ডুরাস ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রস্তাবিত ফেডারেশনে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই বছর ৩১শে মে তারিখে এই প্রস্তাবিত ফেডারেশনটির স্বাধীনতা অর্জনের কথা। কিন্তু তার আগেই স্বীপগুলির অন্তর্বিরোধ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, ব্রিটিশ সরকারকে শেষ পর্যন্ত ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব বাতিল করতে হয়েছে। স্বীপগুলির অন্তর্বিরোধের প্রধান কারণ হল পারস্পরিক দরদর। কারেবিয়ান সাগরের পূর্ব দিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী স্বীপগুলির অবস্থিতিই প্রায় হুমত মাইল বিস্তৃত সমুদ্রের

উপরে। কিন্তু জামাইকার অবস্থিতি নিকটতম স্বীপ থেকেও অন্তত হাজার মাইল দূরে। সমুদ্রপথের এই দীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম করে এই স্বীপকটির মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব ঘটনা। এ ছাড়াও আছে জন-সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের তার-তম্যের প্রশ্ন। সমগ্র ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিকাংশও বেশী লোক বাস করে জামাইকায়, প্রায় ১৬ লক্ষ। অথচ প্রস্তাবিত ফেডারেশনের সংসদের ৪৫টি আসনের মধ্যে জামাইকার জন্য নির্দিষ্ট আসন মাত্র ১৭টি। জামাইকার একক কর্তৃত্বের আশঙ্কায় এর বেশী আসন অন্যান্য স্বীপগুলি জামাইকাকে দিতে রাজী নয়, আবার জামাইকাও সংখ্যালঘুর কর্তৃত্ব স্থায়ীভাবে মেনে নিতে সম্মত নয়। জামাইকার শিথিল কেন্দ্রীয় শাসনের প্রস্তাবও অন্যান্য স্বীপগুলি গ্রহণে সম্মত হয়নি। প্রাকৃতিক সম্পদের বিচারেও অন্যান্য স্বীপগুলি জামাইকার তুলনায় দীন। সুতরাং স্বাধীন ওয়েস্ট ইন্ডিজ জামাইকা অন্যান্য স্বীপগুলির অধিবাসীদের শোষণ-ক্ষেত্রে পরিণত হবে—এ আশঙ্কাও জামাইকার ছিল। একারণে জামাইকার পক্ষ থেকেই প্রথমে বিচ্ছিন্নতার দাবী ওঠে এবং পরে ট্রিনিদাদ ও টোবাগোও ফেডারেশন গঠনে অসম্মত হয়। একারণে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব বাতিল করতে হয়েছে। ট্রিনিদাদ ও লীওয়ার্ড উইন্ডওয়ার্ড নতুন করে এক ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করেছে, বর্তমানে সে প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারের বিবেচনাধীন। আগামী ৬ই আগস্ট জামাইকার স্বাধীনতার দিননিধির হয়েছে।

৥ আদমের বংশধর ৥

আজ পর্যন্ত কত মানুষ জন্মেছে পৃথিবীতে? এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ‘পপুলাস রিসার্চেস বুরো’। তাঁদের হিসাবমতে সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজার সাত শত কোটি মানুষের জন্ম হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় তিনশত কোটি, বা আস্তিটি ভূমিষ্ঠ ও মৃত পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার চার শতাংশ মাত্র।

সত্যবাহু

২ ঘরে ২

১৫ই ফেব্রুয়ারী—৩রা ফাল্গুন :
প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের (৮৬) জীবনা-
বসান।

চীন ও পাকিস্তানকে ভারত হইতে
অবিলম্বে হাত গুটাইতে হইবে—
এলাহাবাদে কাস্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী
গোলাম মুহম্মদের ঘোষণা।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—৪ঠা ফাল্গুন :
নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতে
তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন সূর্য—প্রথম
দিনে পশ্চিমবঙ্গে ১৯টি লোকসভা ও
৪৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে (মুখ্যমন্ত্রী
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাকুড়ার শালতোড়া
কেন্দ্রে ও কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রী
শ্রীতরুণকান্ত ঘোষের ২৪-পরগণার
হাবড়া কেন্দ্রে সমেত) ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে
সম্পন্ন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—৫ই ফাল্গুন :
নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনে পশ্চিমবঙ্গের
৭টি লোকসভা কেন্দ্রে ও ১২টি বিধানসভা
কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ।

মধ্যপ্রদেশের পিপলসনীতে ভারী
বৈদ্যুতিক বন্ধপাতির কারখানায় ধর্মঘট
ও হাঙ্গামা—কারখানা এলাকায় কারফিউ
জারী—ধর্মঘটীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য
পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস
ব্যবহার।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—৬ই ফাল্গুন :
শিক্ষণ মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রচার
অভিযান অব্যাহতভাবে চলিবে—
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিষ্কলতার প্রতি-
বাদে শিক্ষণ বঙ্গ শিক্ষক সমিতির
সিদ্ধান্ত।

মুসলিম মজি ফোজ কর্তৃক মাদ্রাজ
থানা লুট—দিল্লীতে মুসলিম পতাকা
উড়াইব বলিয়া আফগান—ঘটনা
সম্পর্কে মাদ্রাজ পুলিশপ্রধানের (শ্রী এস
বালকৃষ্ণ শেঠী) বিবৃতি।

সাধারণ নির্বাচনের তৃতীয় দিনে
পশ্চিমবঙ্গে ৯টি লোকসভা ও ১৪টি
বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সমাধা।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—৭ই ফাল্গুন :
জলপাইগুড়ি সংলগ্ন পাক সীমান্তে
সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি।

নির্বাচনের চতুর্থ দিনে পশ্চিমবঙ্গে
১৯টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ
সম্পন্ন।

২০শে ফেব্রুয়ারী—৮ই ফাল্গুন :
পশ্চিম বিহারে সাড়ে পাঁচ সের ওজনের
শিলা বর্ষণের সংবাদ—শত শত গৃহ
ক্ষতিগ্রস্ত ও বহু গরবাদের মৃত্যু।

সাধারণ নির্বাচনের পঞ্চম দিবসে
পশ্চিমবঙ্গে ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ও
১১টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ।

২১শে ফেব্রুয়ারী—৯ই ফাল্গুন :
রাষ্ট্রপ্রধান পর্যায়ে নিরস্ত্রীকরণ শীর্ষ
সম্মেলনে (জেনেভা) শ্রীনেহরু (ভারতের
প্রধানমন্ত্রী) সম্মত—রুশ প্রধানমন্ত্রী
ব্রুসেভের লিপির জবাব প্রেরণ।

নির্বাচনের ষষ্ঠ দিবসে পশ্চিমবঙ্গে
রাজ্যে ৭টি লোকসভা কেন্দ্রে ও ১৬টি
বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সমাধা।

২ বাইরে ২

১৫ই ফেব্রুয়ারী—৩রা ফাল্গুন :
উত্তর বঙ্গের মধ্যে বাতায়ত নিষিদ্ধ-
করণের জন্য পাক সামরিক কতৃপক্ষের
তোড়জোড়।

কাস্মীর প্রশ্নে স্থিতি পরিবর্তে পাঁচ-
খেলার জন্য করাচী ও রাওয়ালপিণ্ডিতে
পাক নেতাদের বৈঠক ও সলাপরামর্শ।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—৪ঠা ফাল্গুন :
বৃটিশ গায়না গভর্নর কর্তৃক জর্জ
টাউনে অবরোধের অবস্থা ঘোষণা। প্রকাশ
সরকারের সাহায্যার্থে বটেন হইতে সৈন্য
প্রেরণ।

বালিন বিমান করিডরে সোভিয়েট
বিমানের ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ—
রাশিয়ার প্রতি পশ্চিমী বৃহৎ শক্তি-
গ্রয়ের কঠোর সতর্কবাণী।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—৫ই ফাল্গুন :
সমগ্র উত্তর ইউরোপে দুই দিবসব্যাপী
প্রচণ্ড বড় ও প্লাবন—জার্মানীর ক্ষতি
অপূরণীয়; বটেনে ১১ জনের প্রাণহানি।

জর্জ টাউনে ব্যবসাকেন্দ্রগুলি
আগ্নিসংযোগ ও দাণ্ডা-হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত
—আইন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য বৃটিশ
বাহিনীর অবতরণ—নিউ আমস্টারডামে
ধর্মঘটের প্রসার।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—৬ই ফাল্গুন :
বালিন বিমান করিডরের ঘটনাবলী
সম্পর্কে পশ্চিমী প্রতিবাদ সোভিয়েট
ইউনিয়ন কর্তৃক অগ্রাহ্য।

চীনের আকাশ-সীমা ভারতীয়
বিমান কর্তৃক লঙ্ঘনের অভিযোগ—
ভারতের নিকট চীন সরকারের প্রতিবাদ-
লিপি।

আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে লন্ডনে,
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের নাগরিকদের
(বৈশিষ্ট্যগত) প্রচণ্ড বিক্ষোভ—
পাকিস্থানে অবিলম্বে সামরিক শাসনের
অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—৭ই ফাল্গুন :
আলজিরিয়ার বিদ্রোহীদের সহিত
ফরাসী সরকারের মতৈক্য ও চুক্তি
অনুষ্ঠানের সংবাদ—সমস্ত বর্ষব্যাপী
আলজিরীয় সংগ্রাম অবসান—প্রাথমিক
আলোচনা সমাপ্ত।

মণ্টেগোমারি সেন্ট্রাল জেলে
(পশ্চিম পাকিস্থান) দাণ্ডাকারী বন্দী-
দের উপর রক্ষীদের গুলীবর্ষণ—এক
হাজার কয়েদীর প্রাচীর ডিঙাইয়া
পলায়নের চেষ্টা।

আগরিক নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে
অস্থায়ী রাষ্ট্রসমূহের বৈঠক দাবী—
ব্রুসেভের (রুশ প্রধানমন্ত্রী) প্রস্তাবের
জবাবে ফরাসী প্রেসিডেন্ট দ্য গলের পাখটা
প্রস্তাব।

২০শে ফেব্রুয়ারী—৮ই ফাল্গুন :
পৃথিবীর কক্ষপথে আকাশে আমেরিকার
মানুষ (মহাকাশচারী জন গ্লেন) প্রেরণ
—ঘণ্টায় ১৭ হাজার মাইল বেগে
পৃথিবী প্রদক্ষিণ।

দূরপ্রাচ্যে বটেনের সশস্ত্র বাহিনীর
জন্য ঐক্যবদ্ধ কমান্ড গঠনের সরকারী
সিদ্ধান্ত।

২১শে ফেব্রুয়ারী—৯ই ফাল্গুন :
মহাশূন্য হইতে গ্লেনের নিরূপদ
অবতরণ—মার্কিন সাফল্যে সারা বিশ্বের
আনন্দোচ্ছাস — প্রেসিডেন্ট কেনেডির
নিকট ব্রুসেভের অভিনন্দন।

ঢাকা সমেত পূর্ব পাকিস্থানের
সর্বত্র শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত—দশ
বৎসর পূর্বের ভাষা আন্দোলনে
নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

সমকালীন সাহিত্য

অভ্যুত্থান

॥ বিবেকবাণী ॥

পশ্চিম জগতে সৌভাগ্যক্রমে দুজন দার্শনিক আজো জীবিত যাদের চিন্তা-ভাবনা মর্তের মানুষের জীবনসমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। আধুনিক কালের মানুষের জীবনে যে অভিশাপ নেমে এসেছে, যে বিপর্যয়ের সামনে আজ সারা পৃথিবীর মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে এঁরা সংগ্রাম করে চলেছেন, এঁদের একজন বার্ট্রান্ড রাসেল, অপর ব্যক্তি জ্যাঁ পল সার্ত্রে। সমগ্র মানব জাতির আসন্ন ধ্বংস এবং অবলুপ্তির নিশ্চিত সঙ্কট থেকে হাণ করার জন্য উভয়েই সচেতন।

ব্যক্তির দিক থেকে অবশ্য উভয়ের মানসিকতার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য বর্তমান। দৃষ্টিভঙ্গীতেও আছে সুদীর্ঘ ব্যবধান। তবে, যে-কোনো দর্শনই নিরর্থক যদি তা সমকালীন রাজনীতির সম্পর্কমুক্ত থাকে, এই নীতিতে উভয়েই নিবাসী।

রাসেল শব্দে যে একজন প্রখ্যাত দার্শনিক তাই নয়, এক হিসাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কয়েক বছর আগে রাসেল স্বয়ং তাঁর শোক-বিজ্ঞাপিত রচনা করে রেখেছিলেন, আজো তিনি মৃত্যুধামে বিরাজমান, এই সৌভাগ্যের অধিকারী পৃথিবীর সকল মানুষ। নিজের সম্পর্কে রাসেলের এই ভবিষ্যৎ-বাণী বিফল হওয়ায় সারা পৃথিবী শুশী। বর্তমান জগতে বার্ট্রান্ড রাসেলদের সংখ্যা খুব বেশী নেই, অথচ প্রয়োজন এমনই বহু মহাজনের। জওহরলাল নেহরু, তাই বলেছেন যে, এই মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করি।

নব্বুই বছরেও রাসেল সজীব, সবল, সপ্রাণিত এবং সক্রিয়। উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভরপুর এই মনীষী আজো আশাবাদী। পারমাণবিক অস্ত্রবিপর্যয় সংগ্রামে বার্ট্রান্ড রাসেল যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং তার জন্য কৈভাবে শেষ পর্যন্ত কারাবরণ করেছেন তা চিন্তাশীল জনসমাজের বিবেককে নাড়া দিয়েছে। বার্ট্রান্ড রাসেল একদা বলেছিলেন যে

সকল প্রকার উৎকট গোড়ামির বিরুদ্ধে আমিও ভীষণ রকমের গোড়া। এদিকে বয়স নব্বুই অতিক্রম করার মতো হলেও মানসিকতার দিক থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল এমন এক বিচিত্রমনের অধিকারী যার বয়স বাড়়ে না। চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর ভীমরথী ধরেন। তাই তিনি যা লেখেন তা কৌতুহলোদ্দীপক, হৃদয়গ্রাহী এবং পাঠক চিত্তে চিন্তা জাগায়।

ভিক্টোরীয় যুগে রাসেলের জন্ম, তাই মনে হতে পারে যে জীবনকে তিনি পরিপূর্ণভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে দেখেছেন, উপভোগ করেছেন, তাই জীবন সম্পর্কে নতুন কিছু বলার আর তাঁর নেই। সে ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। এলিয়টের কথায় তিনি জীবনের সর্বদিক দেখেছেন, (the horror, the boredom, and the glory of life) এবং আজো তাঁর বিশ্বাস যে এবং সেই বিশ্বাস আন্তরিক, যে আমরা যদি কিঞ্চিৎ বিচার এবং বিবেচনা সহকারে বিচরণ করি তাহলে আমাদের জীবন অভূতপূর্ব আনন্দ ও গৌরবের অধিকারী হবে। আলব্যের কামর মতো জীবন তাঁর কাছে absurd নয়। সার্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে জীবনটা একটা অর্থহীন দুঃস্বপ্নও নয়। রাসেলের কাছে জীবন এক বিরাট বাস্তব, সে জীবনকে অজ্ঞান ভরে পান করতে হবে, গণ্ডুষমাত্র গ্রহণ কুরলেই চলবে না।

মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু মানুষ স্বয়ং। ভয়, আতঙ্ক, গোড়ামি, মতান্ধ-মান, নিবুদ্ধিতা প্রভৃতি মনোবৃত্তি মানুষের জীবনে অভিশাপ, একবার যদি কোনো রকমে তাদের নিমূল করা যায় তাহলে মানব জীবনে আসবে শান্তবুদ্ধি, এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান, আর এই পৃথিবীটা বাস করার পক্ষে অনেক মনোরম এবং মধুর হয়ে উঠবে। রাসেলের মতো বিজ্ঞান মানব জীবনের পরম আশীর্বাদ আর সেই সত্য বিজ্ঞান যে মানব জীবনের সর্বনাশা অভিশাপ সেই বিক্রেণেও তিনি সচেতন।

"Has Man A Future?" এই নামে বার্ট্রান্ড রাসেলের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থটি যুগ্ম দৃষ্টিতে হপেনস মতো

পেপ্পারাইন সিরিজে এবং এ্যালেন এ্যান্ড আনউইনের সাধারণ সংস্করণ দশ শিলিং ছ'পেন্সের সংস্করণে পাওয়া যাচ্ছে। ১২৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি তাঁর "Commonsense and Nuclear Warfare" নামক গ্রন্থটির পরিণীত। এই গ্রন্থটি রচনা করার কারণ বার্ট্রান্ড রাসেল বিশ্বাস করেন যে মানুষ আজ এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এতবড়ো বিপদ মানব জীবনে আর কখনো ঘনিয়ে আসেনি। বেদনাবিহীন চিত্তে রাসেল বিশ্বাস করেন যে তৃতীয় মহা-যুদ্ধের যে অশান্ত পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, যে কালো ছায়া ইতিমধ্যেই গগনে গগনে ছাড়িয়ে পড়েছে এবং আকস্মিকভাবে বা সুপারিকম্পিত চক্ৰান্তের ফলে যে কোনো মহাজেত বিরাট দানবের মতো চোখের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে, তখন আর তাকে বাধা দেওয়ার উপায় কোনো শক্তিই থাকবে না। রাসেল বলেছেন যে, আমরা যদি ঝুলির ভেতরকার এই কালো বিড়ালটিকে একবার বোরিয়ে আসার সুযোগ দান করি তাহলে মানব সমাজের অবলুপ্তি কপালে করাঘাত হেনে হাত-পা ছাড়িয়ে শোকপ্রকাশের জন্য আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। যদি মৃষ্টিময় দুচারজন আণবিক যুদ্ধের আওতা থেকে কোনো রকমে চামড়া বাঁচিয়ে বেঁচে থাকে তাহলেও এই পৃথিবীটা তাদের পক্ষে আর বাসযোগ্য থাকবে না।

মুসলং কুলনাশনং — এই আণবিক যুদ্ধ দিয়ে নিজেদের কুলনাশ করে লাভ কি? এই যুদ্ধ কি নিবারণ করা সম্ভব নয়? বার্ট্রান্ড রাসেলের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে এই প্রশ্নের জবাব আছে। যুদ্ধহীন পৃথিবীকে অতি সহজেই একদিন স্বর্ণ-রাজ্যে পরিণত করা সম্ভব হবে। রাসেল বলেছেন যে বিজ্ঞান এবং কারাগারের সাহায্যেই এই অবস্থা সম্ভবপর হবে। জীববিদ্যানুসারে মানুষ সব রকম প্রাণীর সাম্প্রতিকতম সংস্করণ। বিবর্তনী ধারার মানব জীবনের এখনও শৈশবকাল চলেছে। যারা দঃখবাদী তাঁরা রাসেলের এই উক্তি কল্পনাবিলাসীর উদ্ভট চিন্তা বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু মানব জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রাসেলের সুগভীর বিশ্বাস এবং উৎকণ্ঠাকে কেউ বিদূষ করে নস্যাৎ করতে পারাবেন না। মানব জীবনের ভবিষ্যৎ কল্যাণের প্রতি সুগভীর বিশ্বাসই এক হিসাবে বার্ট্রান্ড রাসেলের পাণ্ডাচরিত্রের উৎস।

রাসেলের ব্যক্তির সঙ্গে মিথসেই তাঁর অপূর্ণ লজিক স্বচ্ছতা এবং যথার্থতা, তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়ে পারা যায় না, পৃথিবীর দুঃস্থির এই যে সমাধানের ইঙ্গিত রাসেল করেছেন তা যুক্তিগ্রাহ্য। দানবিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতার

বিরুদ্ধে তিনি অতিশয় তীব্র এবং তিক্ত উক্তি করেছেন। বর্তমান পৃথিবীকে বারি বিপর্যয়ের মুখে টেনে আনতে চান, বারি বর্তমান পৃথিবীকে সশঙ্কিত করে রেখেছেন, বারি আতঙ্কসৃষ্টিকারী তাঁদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য নির্ভীক এবং সাহসিক। তাঁর স্পষ্ট উক্তি তাঁর স্বদেশে এবং বিদেশে অনেক ব্যক্তিকে উত্তপ্ত করেছে, আর সেই সপ্তে দেশবিদেশের হাজার হাজার চিন্তাশীল মানুষের মনকে আন্দোলিত করেছে।

এই গ্রন্থে তিনি অতি সহজ ভাষায় এবং সরল ভঙ্গীতে বিভিন্ন যুগের মানব সমাজের ইতিহাস বিধৃত করেছেন, তাদের উৎপত্তি বিকাশ এবং প্রগতির কথা বলেছেন, তারপর অশ্রুব্যবহার, আধুনিক সংগ্রামের অশ্রু এবং অতীতে যে সব বর্বরবৃন্দ যুদ্ধ সংঘটন করেছেন তাঁদের কথা বলেছেন। বারি এখনও যুদ্ধে বিশ্বাসী এবং যুদ্ধই তাঁদের ধ্যান জ্ঞান তাঁদের তিনি তিরস্কার করেছেন। যেসব যুদ্ধবাজ নেতারা ভুজামি এবং ন্যাকামির দ্বারা যুদ্ধের গুরুত্বটা সাধারণের কাছে প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন, আচারে আচরণে যুদ্ধবিলাসী এবং প্রকাশ্যে অন্যাকথা বলে আসল বক্তব্য প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করেন, তাঁদের তিনি তিরস্কার করেছেন কঠোর ভাষায়। তাঁদের মূখ্যে খুলে দিয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানীদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, আবিবেচক রাজনৈতিক নেতাদের কর্মে বৈজ্ঞানিকদের কোনো সমর্থন নেই। রাজনীতির জঘন্য অপরাধ-প্রবণতায় বৈজ্ঞানিকদের আত্মিক সমর্থন নেই। এই গ্রন্থের প্রকাশ তাই অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে।

মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপযোগী বহুবিধ ঘটনা এখনও ঘটা সম্ভব। ভবিষ্যতে ঘটবে যদি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা যায়। কিছুকাল আগে আলডাস হাক্সলীও অনুরূপ মতের সমর্থনে এই জাতীয় কথাই বলেছেন। দুঃখের বিষয় রাসেল বা হাক্সলী বর্তমান কালের রাষ্ট্রপ্রধান নন, তাঁদের হাতে নেই ভূবনের ভার, তাঁদের হাতে কোনোদিন সে দায়িত্ব আসবেও না, কিন্তু যাঁদের হাতে সেই ভার, তাঁরা কি কোনোদিন এই সব যুক্তি এবং উক্তিতে কর্ণপাত করবেন, এখনও হয়ত সময় আছে।

রাসেলের বারি প্রবল সমালোচক, তাঁরাও এই গ্রন্থ পাঠে আনন্দ পাবেন। এ এক মহামানবীর কণ্ঠস্বর, এমন এক কঠিন-নীরস এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থেও রাসেলের সরস রসিকতা অনুপস্থিত নেই।

বিশ্বভূবনের মানুষের ভবিষ্যৎ সত্যই কি অশঙ্ক্যময়?

নতুন বই

অখণ্ড অমিয় শ্রীগোরাংগ—(দিব্য-জীবন)। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক : গ্রন্থমা। ২২।১, কর্ণ-ওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম সাড়ে আট টাকা।

অচিন্ত্যকুমার কবি, গল্প-লেখক, সাংগীক উপন্যাস রচয়িতা। বৃন্দ্রের সপ্তে হৃদয় মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ গল্পের রচয়িতা, তেমনই বাংলা দেশের ইদানীংকালের দিব্যজীবনী-রচয়িতা হিসাবেও তিনি অগ্রণী লেখক। তাঁর 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ', 'পরমা-



প্রকৃতি সারদামণি', 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী আধুনিক কালের বিস্ময়কর জীবনী-সাহিত্য। বাঙালী পাঠকের কাছে অচিন্ত্যকুমারের আগে আর কেউ এমন-ভাবে দিব্যজীবন-কথার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে পারেননি। এ কথা স্বীকার্য। অচিন্ত্যকুমারের দিব্যজীবনী সিরিজের অন্যতম গ্রন্থ 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগোরাংগ'। মহাপ্রভুর পূণ্যজীবনকথা অতি সুন্দর ভঙ্গীতে কথকতার আঙ্গিকে অচিন্ত্যকুমার পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, এবং অমিয়নিমাইচরিত প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীকে ভিত্তি করে অচিন্ত্যকুমার কাহিনীকারের মত মহাপ্রভুর লীলাপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। সাধারণ পাঠকের কাছে তত্ত্বের চেয়ে তথ্যের মূল্য অনেক। তত্ত্বের কঙ্কর-কঠিন পথ অতিক্রম করে তথ্যবিস্কারের ধৈর্য সাধারণ পাঠকের নেই—তাই অতি সুললিত ভাষায় শ্রীগোরাংগের অপূর্ণ জীবনলীলার ব্যাখ্যা করেছেন। "এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল।" গৌরকৃপার বৈশিষ্ট্য এই যে, তা অনুসন্ধান করতে

হয় না, বিনানুসন্ধানে তা ফলাশ্রিত হয়। "শ্রীরামধার ভাবে এবে গৌর অবতার। হরেকৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার। বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত। যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। জগন্নাথ গৌরাংগদেবের জীবনের বিচিত্র কথা এই "অখণ্ড অমিয় শ্রীগোরাংগের" একমাত্র উপজীবী নয়, সেই সপ্তে অতি সুক্ষ্ম তত্ত্বকথাও সাধারণের পক্ষে বোধগম্য করে ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করা হয়েছে। নবম্বীপের নিমাই পণ্ডিতের জীবনে যে অপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার কারণ সত্যোপলব্ধি। সত্যসম্বন্ধ শ্রীচৈতন্য এক অতীন্দ্রিয় লোকের সম্বন্ধ পেয়েছিলেন। রসস্বরূপ ঈশ্বরের সপ্তে ভক্তের প্রত্যক্ষ সংযোগ শ্রীচৈতন্যের জীবনে প্রকাশিত। আরাধ্য দেবতার বিরহে তিনি ভাবমগ্ন। কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা শ্রীচৈতন্যের শরীরে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, প্লেদ প্রভৃতি বিকার লক্ষণ দেখা যেত, এই ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি। ঈশ্বরের সপ্তে মানব-সম্বন্ধের জ্ঞানই সকল ধর্মের ভিত্তি, ঈশ্বরসম্ভোগ কল্পনা নয়, ঈশ্বরের সপ্তে মানবের প্রত্যক্ষ সংযোগ বর্তমান। শ্রীচৈতন্যের মহাজীবনে এই সত্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ। আজ বাংলা দেশের সামাজিক জীবনে যে বিপর্যয়ের লক্ষণ পরিস্ফুট, যে সামাজিক বিকার সুস্থ সমাজব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার উপ-ক্রম করেছে, সেই বিকৃতি থেকে নিষ্কৃতির পথ মহাপ্রভু শ্রীগোরাংগ, তাই আজ তাঁর দিব্যজীবনের কথা সাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ করার মূল্য অসীম। অচিন্ত্যকুমার মহাপ্রভুর পূণ্য-জীবনী রচনা করে ধন্য হয়েছেন। এই প্রথম খণ্ডে নিমাই মন্দির মস্তকে কেশবভারতীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ এবং কেশবভারতী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম-করণ পর্ব পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে প্রায় চারশত পৃষ্ঠায়।

গ্রন্থটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত এবং মুখপত্র হিসাবে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত জননীর নিকট ইহতে শ্রীচৈতন্যের বিদায় গ্রহণ চিত্রটি বহু বর্ষে মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদ-চিত্র একেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী।

ফেরারী ফোজ (নাটক) উপল দত্ত। প্রকাশক—গ্রন্থমা। ২২।১, কর্ণ-ওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২-৫০ নয়া পয়সা।

উপল দত্ত একালের একজন সুদক্ষ অভিনেতা। অতি অল্পকালে স্বকীয় অভিনয়-বৈশিষ্ট্যে তিনি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তা অচিন্তনীয়। কিন্তু শুধুমাত্র অভিনয়-ক্ষমতা নয়, সাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা আছে তার পরিচয় ইতি-মধ্যে পাওয়া গেছে। 'অমর্তের' পৃষ্ঠায়

প্রকাশিত তাঁর 'চায়ের ধোঁয়ার সঙ্গে' সকলেই পরিচিত। 'ফেরারী ফোজ' নামক উৎপল দত্তের নাটকটি সাধারণ রংমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে, কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট নয়, ঠিক এই ধরণের কাহিনী এই নাটকটির উপজীব্য বোধকারী বাংলা নাট্য-সাহিত্যে তার আর তুলনা নেই। ইতিপূর্বে তাঁর অন্যান্য নাটকও যথেষ্ট মণ্ড-সাফল্য লাভ করেছে, নাট্যকার হিসাবেও উৎপল দত্ত যথেষ্ট স্বীকৃতিলাভ করেছেন। কিন্তু 'ফেরারী ফোজ'র বক্তব্য বিভিন্ন লেখক ভূমিকায় বলেছেন—'তীর্থেশ দশকের প্রথম ভাগের পূর্ব বাংলায় জেগে-ওঠা যুবকদের যজ্ঞকঠিন মুখ-গলোকে সাধারণভাবে সামগ্রিকভাবে এই নাটকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে—' লেখক সেই গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছেন। ফাঁসির মঞ্চে যারা জীবনের জয়গান করে গেছেন 'ফেরারী ফোজ' তাঁদের ইতিহাস। মুকুন্দ দাসের গান একদিন পল্লী অঞ্চলের কৃষক-মজুরকে মাতিয়ে তুলেছিল আর সেদিন হিতেন-দের মত অনেক মীরজাফরকে পেটের দ্বারে অনেক কিছুর করতে হয়েছে। অশোকের মত ছেলেদের স্মৃতিভনের দৃশ্যে শচীর মত মেয়েরা সেদিন সত্যি ক'দে উঠেছে। "এক! অবস্থা করেছে তোমার? তোমাকে এমনভাবে মেরেছে। তোমার মূখটা কি ছুরি দিয়ে খুবলে নিয়েছে ওরা?"—এই কথা বলে। হিতেনের মত নর-পিশাচরা বলেছে—'দেশপ্রেম জিনিসটা একটা স্নায়বিক রোগ'—ভুল বোঝাবুঝি, আর বিশ্বাস-স্বাতকতায় সেদিন অনেকগুলি প্রাণকে বলিদান দিতে হয়েছে। ভবু শান্তি রূপের মতু্য নেই, তাঁরা মরণ-সাগরপারে অমর। অশোকরাও আমাদের betray করেনি। নাট্যকার উৎপল দত্তকে ধন্যবাদ

এমন একটি চমৎকার নাটক তিনি বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিতে পেরেছেন বলে।

পদ্মগন্ধা—(উপন্যাস)—শ্রীসুধময় গুপ্ত। দাম ৬-৫০।

রাত জাগার কাহিনী—(গল্প)—শ্রীসুধময় গুপ্ত। দাম ২-৫০। দামগুপ্ত এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

'পদ্মগন্ধা' একখানি বৃহদায়তনের উপন্যাস। কাহিনী নিত্যন্ত সাধারণ। যে কোন রকমের কাহিনী বিস্তৃত আকারে লিখে গেলেই সার্থক সৃষ্টি হয় না। লেখকের সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যিকতা আছে। 'রাত জাগার কাহিনী' নিত্যন্ত সাধারণ স্তরের রচনা হলেও হাস্যরসাত্মক প্রেমধর্মী কাহিনীর জন্য সামান্য মাত্রায় সফলতা লাভ করেছে। সার্থক শিল্পী হওয়ার জন্য লেখককে আরও পরিশ্রম করতে হবে।

লিপিবিবেক—(প্রবন্ধ)—শ্রীবিজন-বিহারী ভট্টাচার্য। বৃকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড; ১নং শংকর ঘোষ লেন; কলিকাতা-৬। দাম হয় টাকা।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথিতযশা অধ্যাপক। বিবিধ গ্রন্থ রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। ভাষাতত্ত্ব বা ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান প্রাচ্যর সঙ্গে স্মরণীয়। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে রয়েছে তার সুস্পষ্ট পরিচয়। এ গ্রন্থে বিবিধ ধরণের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই স্বতন্ত্র বিষয়নির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সাতাশটি প্রবন্ধ 'লিপি বিবেক' স্থান পেয়েছে। প্রথম তেরটি প্রবন্ধ সবা-পেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আর এগুলি থেকে যথেষ্ট শিক্ষার রয়েছে। শিক্ষিত হয়েও অনেকে শব্দ ব্যবহারে যে কত মারাত্মক ভুল করতে পারেন তার পরিচয় প্রবন্ধ-কার কয়েকটি আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। অপর প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সাহিত্যভিত্তিক। এগুলি সম্পর্কে প্রবন্ধকারের বক্তব্য হচ্ছে "সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের কথা স্বতন্ত্র, এক কালের সীমাস্ত পার হইয়া তাহার অনাগ্রাসেই কালান্তর প্রবেশ করিতে পারে সে জন্য কেহ তাহাদের কাছে পাসপোর্ট দাবি করে না।"

আলোচ্য গ্রন্থখানি বাংলা ভাষার একটি মূল্যবান সম্পদ। এতগুলি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ একত্র করে প্রকাশ করার লেখক ও প্রকাশক উভয়েই ধন্যবাদার্থ।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

ব্রিটেনের চিত্র—সেণ্ট্রাল অফিস অফ ইন-ফরমেশন, লন্ডন কর্তৃক পরিকল্পিত ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

ব্রিটেন আয়তনে খুব বড় নয়। সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য ছবির দ্বারা তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তার যে শিল্প ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাবে এর মধ্য থেকে। আধুনিক সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সে যে সমান তালে চলছে, তা চিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

গান্ধী স্মারক নিধির বই

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

পল্লী-পুনর্গঠন

গান্ধীজীর পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত চিন্তাধারার এক পূর্ণাঙ্গ সংকলন। সরকারী বেসরকারী উভয় স্তরের গ্রাম-কর্মীর পক্ষে একখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত
॥ মূল্য ৩-০০

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

নারী ও সামাজিক অবিচার

শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় অনূদিত

॥ মূল্য ৪-০০

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

গীতাবোধ

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমারচন্দ্র জানা অনূদিত
॥ মূল্য ১-৫০

গান্ধীজীর ন্যাসবাদ

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সংকলিত

॥ মূল্য ০-৫০

সর্বোদয় ও শাসনমুদ্র সমাজ

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

॥ মূল্য ২-৫০

ঃ প্রাপ্তিস্থান :

ডি এম লাইব্রেরী

৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি

সি-৫২ কলেজ স্ট্রীট মাকেট, কলিঃ ১২

এবং

প্রকাশনা বিভাগ, গান্ধী স্মারক নিধি

(বাংলা শাখা), ১১১।এ, শ্যামাপ্রসাদ

মুখার্জি রোড। কলিকাতা-২৬

বিশ্বের অমর সাহিত্যিকদের অসাধারণ গল্পের অনুবাদ সংকলন।

(১) কর এ নাইট অফ লান্স—এমিল জোলা। (২) লেসলি ইন লান্স—গিয়োর-ভ্যানি ফিরোয়েন্টিনো। (৩) লিন্স টু দি নাইট ইন লান্স—গিয়োরভানি বোকেসিও। (৪) দ্যট পিগ অফ এ মরিন—গি দ্য মোপাসা। (৫) ওয়ান অফ ক্লিওপেট্রাস নাইট—থিওফিল গভের। (৬) এ মিডাইজাল রোমান্স—মার্ক টুয়েইন। (৭) দি স্টোরি অফ এ কার্ল গার্ল—গি দ্য মোপাসা।

অনুবাদক—আর্থ'ভট্ট

প্রতিমা বুক স্টল

২৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রেষ্ঠা যুগ

নান্দীকর

আজকের কথা

ভারতীয় চিত্রের বৈদেশিক বাজার:

“ফার ইস্ট ফিল্ম নিউজ” নামে জাপানী চলচ্চিত্রশিল্প ব্যবসায় সংক্রান্ত মাসিকপত্রের সম্পাদক মিঃ গ্লেন, এফ., আলবার্টন সম্প্রতি ভারতবর্ষে পদাৰ্পণ করেছিলেন। বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র সমালোচক সমিতির (Film Critics Club) সভাদের সঙ্গে একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে তিনি ভারতীয় ছবির বৈদেশিক বাজার সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলেছেন, তা ভারতীয় চিত্র-ব্যবসায়ীদের বিশেষ প্রাধিকারযোগ্য। তিনি জাপানে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, বিশ্বের প্রতিটি অগ্রগামী দেশই বিদেশের বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে বেশীর ভাগ ছবিরই দু’টি সংস্করণ তৈরী করে : এক, নিজের দেশের বাজারের জন্য; দুই, স্বদেশবাহিত্য অর্থাৎ বৈদেশিক বাজারে প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে। কিন্তু ভারতীয় প্রযোজকেরা এই প্রথা ছবি তৈরী করেন না জেনে তিনি অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়েছেন। মিঃ আলবার্টনের মতে বিদেশে ভারতীয় ছবির চাহিদা অনায়াসেই বাড়তে পারে, যদি ভারতীয় ছবির বৈদেশিক সংস্করণ সম্বন্ধে ভারতের সেন্সরবোর্ড অধিকতর উদার দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেন এবং ভারত সরকার তাঁদের রাষ্ট্রদূতাবাস-গুলির মারফত নিয়মিত ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী ব্যবস্থার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর এই দু’টি মতই পূর্ণমাত্রায় সমর্থনযোগ্য। ভারতীয় সমাজের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে-সেন্সরকোড (সেন্সর সংক্রান্ত নিয়মাবলী) রচিত হয়েছে, বিদেশে প্রদর্শনের জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত ছবিগুলির ওপর সেই কোডের কঠোর প্রয়োগকে কিছুটা শিথিল করা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে আমরা যখন দেখতে পাই যে বেঙ্গল বা মাদ্রাজে তৈরী ছবির ওপর পূর্বাঞ্চলীয় সেন্সরবোর্ডের কঠোরতা প্রযুক্ত হয় না। অবশ্য এই শিথিল করার ব্যাপারটাকে তাই বঞ্জ

এমন একটা দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হবে না, যাতে মনে হ’তে পারে, ছবির পাঠপাঠীরা ভারতীয় বা কোনো ঘটনা ভারতসমাজ বহির্ভূত।

মিঃ আলবার্টনের দ্বিতীয় মত যে অত্যন্ত সূচিন্তিত, তা ভারত সরকার



অমল দত্ত পরিচালিত ‘মেঘনা আকাশ’ চিত্রের নায়িকা শম্পা।

সম্প্রতি যে অভিমত গ্রহণ করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে, তা থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্যোন্নয়ন সংসদের ১৭ই জানুয়ারীর অধিবেশনে গৃহীত মতামতের ওপর নির্ভর করে ভারত সরকার নাকি

সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তাঁরা ফিল্ম ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া সহ যোগিতার বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসগুলির মারফত নির্বাচিত ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী ব্যবস্থা করবেন সম্ভাব্য জেতুবন্দের সুবিধা জন্য। বর্তমানে স্থির হয়েছে যে, বিদেশের বাজারকে চারটি মণ্ডলে বিভক্ত করে প্রতিটি মণ্ডলের জন্যে তিনখানি করে সর্বসাকুল্যে মোট বারোখানি ছবি প্রতি বছর নির্বাচিত হবে। চারটি মণ্ডল হচ্ছে : (১) মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা; (২) যুক্তরাজ্য (ইউ-কে), ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান ও চীন; (৩) দূরপ্রাচ্য এবং (৪) স্পেন ও ল্যাটিন আমেরিকা।

আশা করা যাচ্ছে, ফিল্ম ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া মোট কুড়িখানি ছবি নির্বাচন করে দেবেন এবং তার থেকে সরকার দ্বারা চূড়ান্তভাবে বারোখানি ছবি নির্বাচিত হবে। সরকার আশা করছেন যে, প্রযোজক বা পরিবেশকরা বিনামূল্যে তাঁদের নির্বাচিত ছবির একটি করে প্রিন্ট এবং প্রচুরসামগ্রী সরকারের হাতে দেবেন। পরিবর্তে এই প্রিন্টের ওপর কোনো রকম এক্সাইজ ডিউটি লাগবে না; উপরন্তু বিদেশে পাঠানোর খরচ এবং প্রদর্শনীর ব্যয়ভারও সরকার বহন করবেন।

ভারতে বছরে গড়পড়তা অন্ততঃ আড়াইশোখানি ছবি তৈরী হচ্ছে। তার মধ্যে বারোখানিকে নির্বাচন করার অর্থ শতকরা ৫ খানি ছবিকে বিদেশে প্রদর্শনযোগ্য বলে বেছে নেওয়া।



শ্রীবিজয় পিকচার্সের ‘আশ্বিনীমা’ চিত্রের নায়িকা কঞ্চন মজুমদার

অত্যন্ত দূরূহ কাজ এবং ততোধিক দূরূহ হিসেব। এ-ছাড়া বৈদেশিক বাজারের দ্বিতীয় মণ্ডলটি, যার মধ্যে মার্কিন রাজ্য থেকে শুরুর করে পৌঁছিয়েত দেশ, চীন, জাপান পর্যন্ত আছে, অত্যন্ত ব্যাপক এবং বৃহৎ নয় কি? তার ওপর ইংলণ্ড বা আমেরিকার পছন্দ এবং চীন বা রাশিয়ার পছন্দের মধ্যে অত্যন্ত দূর ব্যবধান যদিই বা না থাকে, অন্ততঃ বেশ কিছুটা পার্থক্য থাকে স্বাভাবিক নয় কি? প্রথম দেশ দুটি গণতান্ত্রিক এবং দ্বিতীয় দেশ দুটি কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদী। রাষ্ট্র, সমাজ, দর্শন—সব বিষয়েই এদের দৃষ্টিভঙ্গীর এতই পার্থক্য যে, শিল্প-রীতি বা রসজ্ঞান সম্পর্কে তারা একমত হবে, এ-কথা চিন্তাতেও আসে না। সুবশ্য ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি সম্বন্ধে আমাদের মতামত দেবার যোগ্যতা নেই। অতএব তারা যে কি যুক্তিতে এইভাবে ভারতীয় ছবির বৈদেশিক বাজারকে চারটি মণ্ডলে ভাগ করেছেন, তা তাঁরাই জানেন।

আমরা জানি, ভারতীয় ছবি দেখবার জন্যে বিদেশীদের মনে প্রচুর আগ্রহ আছে। নেহরু-গান্ধীর ভারতবর্ষ, রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষকে দেখবার, জানবার, বোঝবার জন্যে চলচ্চিত্রের চেয়ে বলিষ্ঠ শিল্পমাধ্যম আজও সৃষ্টি হয়নি। এই অতি-সত্য কথাটি স্মরণে রেখে আমাদের চিত্র-প্রযোজকদেরও যেমন উচিত ছবির মধ্যে খাঁটি ভারতের আকৃতি-প্রকৃতি ও মানসকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা, তেমনি আমাদের সরকারের উচিত, প্রকৃত ভারতীয় ছবিগুলিকে বিদেশে বহুল প্রচার ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে দেশের শিল্পকে উন্নত করতে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক মদ্রা আহরণের পথ প্রশস্ততর করা।

চিত্র সন্ধানোচনা

ভগিনী নিবেদিতা : অরোয়ার প্রযোজনা; ১৪,০০০ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : বিজয় বসু; চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; সংগীত-পরিচালনা : অনিল বাগচী; চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ; বহির্ভারতীয় দৃশ্যগ্রহণ : জন. সি. টেলর; শব্দধারণ : সমর বসু; সম্পাদনা : বিশ্বনাথ মিত্র; শিল্পনির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী; রূপায়ন : অরুণধী মথোপাধ্যায়, শোভা সেন, সাধনা রায়চৌধুরী, বাণী গাঙ্গুলী, ছন্দা

দেবী, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, অমরেশ দাস, অসিতবরণ, দিলীপ রায়, রবীন্দ্র মজুমদার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী সরকার, শিশির মিত্র, ঠাকুরদাস মিত্র, শিবজু ভাওয়াল, মমতাজ আহমেদ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু প্রভৃতি। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পরিবেশনায় গেল ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে রাধা, পূর্ণ এবং অপরাপর চিত্রগ্রহণে দেখানো হচ্ছে।



বি আর ফিল্মসের 'ধর্মপুত্র' চিত্রে শিশু কাপুর।

'মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল'-কে ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্যে উৎসর্গ করে স্বামী বিবেকানন্দ যৌদিন তাঁকে 'নিবেদিতা' নামে অভিহিত করেছিলেন, সেই পূণ্য দিন থেকে ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর জীবনপ্রদীপ না নেভা পর্যন্ত এই মহীয়সী নারী তাঁর দ্বিতীয় পিতৃভূমি এই ভারতবর্ষের জন্যে কি অজস্র ভালোবাসার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করে গেছেন, ভারতীয়দের—বিশেষ করে আজকের বাঙালীকে তারই সন্ধান দেবার জন্যেই যেন অরোরা বাঙলার চিত্রজগতকে 'ভগিনী নিবেদিতা'-রূপে শ্রদ্ধাজলিটি উপহার দিয়েছেন।

নিবেদিতার জীবনের প্রতিটি ঘটনা একটি চিত্রের মধ্যে উপস্থাপিত করা যেমন সম্ভবও নয়, তেমনি বাস্তবায়নও নয়। জীবনীকার একান্তভাবে সত্যনিষ্ঠ হয়ে যে-ভাবে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে কোনও জীবনীকে সমগ্রতা দিতে চেষ্টা করেন, জীবনী-নাটক বা জীবনী-চিত্র-নাট্যলেখক সেই পন্থা অবলম্বন করলে তিনি মণ্ড-নাটক বা চিত্র-নাটক গড়ে তুলতে পারবেন না, দর্শক মগ্ধ বা পর্দায় যা দেখবে, তা হবে ঘটনাপঞ্জী, নাট্য-বিভূতিবিহীন ও ক্রমবর্ধমান ঔৎসুক্য সঞ্চিত করতে যা একান্তই অক্ষম। তাই জীবনী-মণ্ডনাট্যকার বা চিত্রনাট্যকার জীবনী থেকে মাত্র সেইসব ঘটনাকে বেছে নেন, যোগগুলির সংগে কিছু কল্পনা মিশিয়ে নাট্যরসজারিত করলে একটি অখণ্ড নাট্যপ্রতিমা গড়া সম্ভব হয়। "ভগিনী নিবেদিতা"র চিত্রনাট্যকার

• শ্রেষ্ঠ শিশু ও কিশোর সাহিত্য •

সুখ মিত্র

দূরন্তের ডাক

ঘটনাপূর্ণ রহস্যবহুল কাহিনী
[২.০০]

• আরও কয়েকখানি লোডনীয় বই •

বৃন্দদেব বসু

হামেলিনের

বাঁশিওলা ২.০০

এলোমেলো ২.০০

প্রেমেশ্বর মিত্র

ভানুমতীর বাঘ ২.০০

প্রবোধকুমার সান্যাল

বিচিত্র এ দেশ ২.৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ডাকাতের হাতে ২.৫০

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ল্যাম্পোস্টের

বেলুন ২.০০

মণিলালা অধিকারী

লাল শব্দ ২.০০

বিশ্বনাথ দে

মেঠাইপুরের রাজা ১.৬০

সংকলন

আহ্লাদে আটখানা ৩.০০

বিশ্বকবিবে নিবেদিতা সংকলন

প্রণাম নাও

৪.০০

* জীবনী গ্রন্থ *

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

যাঁরা মহীয়সী ২.০০

বিদ্যাসাগর ০.৮০

ছোটদের

ভালো ভালো গল্প

প্রতিটি দুই টাকা

শিবরাম চক্রবর্তী । হেমেন্দ্রকুমার রায়
বনফুল । শরাদ্দিত, বন্দ্যোপাধ্যায়

সচিত্র তালিকার জনপত্র লিখুন

শ্রী প্রকাশ ভবন

এ-৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা



এন, সি, এ. প্রোডাকসনের সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'কান্ডনজঙ্ঘা' চিত্রে অরুণ মুখার্জী ও হরিধন মুখার্জী

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও ভারতগতপ্রাণা নিবেদিতা চরিত্রকে একটি অখণ্ড নাট্য-মূর্তিরূপে গড়বারই চেষ্টা করেছেন এবং বহুল পরিমাণে সফলও হয়েছেন। তার শৈশবের সত্য-অনুসন্ধিৎসা থেকে শব্দ করে তার পুরনু-খকাতরতা, অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা, স্বামিজীকে অন্তরের অন্তঃস্থলে বন্ধ-পথপ্রদর্শক-গুরুরূপে বরণ করে ভারতকে নিজের কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নেওয়া এবং মাত্র ধর্মের গম্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নিপীড়িত পরাধীন জাতির জ্বালাকে নিজেরই জ্বালা-জ্ঞানে বিপ্লবের তিমিররাগিতে নিজেকে অন্ধান দীপশিখার মত জ্বালায়ে রেখে দেওয়া—এই সমস্তের ভিতর দিয়ে নিবেদিতার মানসনাট্যকে দর্শকসমক্ষে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এমনভাবে উপস্থাপিত করেছেন যে, যা তন্ময়চিত্তে দেখতে দেখতে একান্ত অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে মহৎ কিছু গড়বার চেষ্টা করলে উপকরণের

অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সিদ্ধি যে অনিবার্য, তার জ্বলন্ত প্রমাণ—অরোরার “ভগিনী নিবেদিতা”। এবং এই অত্যন্ত সার্থক চিত্র নির্মাণের গৌরব চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং পরিচালক বিজয় বসুর সঙ্গে এই চিত্র-সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীরই সমবেতভাবে প্রাপ্য।

ছবির নাম-ভূমিকায় অরুণমুখী মুখোপাধ্যায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন বললে যথেষ্ট হবে না; তিনি এই চরিত্রটিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন—She has lived the role. এ-রকম অনুপ্রাণিত অভিনয় আমরা সম্প্রতিকালে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। মাধুর্যময় স্বজন্ম কণ্ঠ যে গৃহীত চরিত্রকে এমন অপরূপভাবে দর্শকসমক্ষে প্রস্থ-টিত শতদল পদ্মের মত বিকশিত করতে পারে, এ না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সমস্ত ছবিটিতে এই চরিত্রখানিকে ঘিরে বহু স্মরণীয় মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে; তবু ওরই মধ্যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে শ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎকারের

দৃশ্যটি। স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন অমরেশ দাস। স্বামিজীরূপে তাকে মানিয়েছে চমৎকার এবং সমগ্র অভিনয়ের ভিতর দিয়ে বিবেকানন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তিনি মূর্ত ও করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বিবেকানন্দকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি; তাই তাঁর চাউনিতে বিদ্যুৎ ছিল কিনা জানি না। কিন্তু অমরেশ দাসের চোখের সঙ্গে স্বামিজীর যে-সব প্রচলিত ছবি আছে, সেই ছবির চোখের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে বললে অত্যাশ্চর্য হবে না। তাঁর অভিনয়কে আর একটু দীপ্ত করে তুলতে পারলে সম্ভবতঃ চরিত্রটি চরিত্রটি হত। এই দুটি প্রধান চরিত্র বাদে ছবিটিতে বহু ছোট-বড় চরিত্র ভীড় করে রয়েছে, নিবেদিতার কর্মজীবনের সঙ্গে যাদের যোগ অবিচ্ছেদ্য। এবং অত্যন্ত আনন্দের কথা, প্রতিটি চরিত্রই হয়েছে সু-অভিনীত। মনে হয়েছে, একটি মহৎ জীবনীচিত্রে অভিনয়ের গুরু দায়িত্বের কথা প্রত্যেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করেছেন। এমন কি, নৌকার মাঝি পর্যন্ত সে-কথা ভোলবার সুযোগ পাননি।

ছবিটির অসামান্যতা উপলব্ধি করার জন্যে এর সঙ্গীতাংশ প্রভূত দায়িত্ব পালন করেছে। এ-বিষয়ে সঙ্গীত-পরিচালক অনিল বাগ্‌চীর সঙ্গে ডঃ গোবিন্দগোপাল, নির্মালা মিশ্র প্রমুখ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীরা অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবার অধিকারী। আবহ-সঙ্গীতের প্রয়োগ বহু জায়গায় ঘটনোপযোগী হ'লেও কয়েকস্থানে অত্যন্ত হুসব বলে বোধ হয়েছে। মনে হয়, এ-ব্যাপারে যেমন, তেমনই ছবির উত্তরাংশে দৃশ্যপটের ব্যাপারেও যে-কাপণ্য লক্ষ্য করা গেছে, তা ছবিখানিকে আগেকের দিক দিয়ে কিছুটা দীন করে ফেলেছে। আলোক-চিত্রের কাজও সব জায়গায় সমান নৈপুণ্য প্রদর্শন করেনি। এই সামান্য দুটো সত্ত্বেও “ভগিনী নিবেদিতা” বাঙলার চিত্রজগতে একটি স্মরণীয় নিবেদন বলেই পরিগণিত হবে।

সংগঠন : দে প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ১১,৬৯২ ফুট দীর্ঘ ও ১২ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : নারায়ণ গণ্গোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য : বিধায়ক ভট্টাচার্য; পরিচালনা : সুশীল মজুমদার; সঙ্গীত-পরিচালনা : কালিদাস সেন; রবীন্দ্র-সঙ্গীত-তত্ত্বাবধান : চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়; গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্র-



সকল সম্ভ্রদায়ের ব্যবহার
উপযোগী প্লেন ও চেক
ডিজাইনের
গগনমুকলা
লুঙ্গি
রং পাকা ও টেকসই
সকল লুঙ্গির দোকানেই পাইবেন

গ্রহণ : বিমল মূখোপাধ্যায়; শব্দধারণ :
সুশীল সরকার; শব্দ-পুনর্বোজন :
শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্প-নির্দেশ :
সুনীতি মিত্র; সম্পাদনা : সুবোধ রায় ও
অর্ণবধর নন্দকর; রূপায়ণ : কণিকা মজুম-
দার, লিলি চক্রবর্তী, ছায়া দেবী, বসন্ত
চৌধুরী, শোভেন লাহিড়ী, পাহাড়ী
সান্যাল, বিকাশ রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়,
অর্জিত চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন মূখোপাধ্যায়,
পারিজাত বসু, হীরালাল, প্রীতি মজুম-
দার প্রভৃতি। মন্ডিমায়া (প্রঃ) লিমিটেডের
পারিবেশনায় গেল ২৩-এ ফেব্রুয়ারী
থেকে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অপরাপর
ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

সম্ভারিণী কথাটির একটি প্রসিদ্ধ
বাক্যাংশের সঙ্গে সংযুক্তি থাকায় যে-
স্বপ্নময় রোমাণের সৃষ্টি করে, আলোচ্য
সম্ভারিণী-চিত্রের কাহিনীটিতে সেই
অতি প্রত্যাশিত বস্তুটির একান্তই
অভাব। কাশীর সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষক সান্যাল
মশায়ের আদরিণী কন্যা গাগণী শূদ্ধ
তার পিতারই মতো সংস্কৃতভাষায় পার-
শির্শিনী নয়, সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর কন্ঠের
ও একটি পরিচ্ছন্ন সুরটিসম্পন্ন মনের
অধিকারিণী। এ হেন কন্যার যখন
নিতান্ত দৈব বিভূষনায় (তা'ছাড়া আর
কি!) এমন একজন ধনীর সঙ্গে বিবাহ
হ'ল, যে বালো লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে
পিতার প্রতিষ্ঠিত লৌহ-ব্যবসায় আত্ম-
নিয়োগ করে বন্ধুত্বমহলে, 'লৌহ-দানব'
খ্যাতিলাভ করেছে, এবং যার সংস্কারাচ্ছন্ন
হৃদয় মন গৃহস্থ ঘরের বয়স্ক মেয়েদের
লেখাপড়া বা গানবাজনা পছন্দ করে না,
তখনই আশা করা গিয়েছিল, আদর্শের
সংঘাতের মাধ্যমে একটি চিরন্তন নাটক
অনিশ্চিত পরিণতির পথে এগিয়ে যাবে।

কিন্তু গল্প সে-পথে গেল না; কারণ
গাগণীর বিদ্রোহী অন্তর স্বামীর ঘর
করতে আসার সময়ে তার পিতা যে
অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন, তাই স্মরণ
করে সান্ধবী খোঁজে এবং স্বামীর হাতের
লাঞ্ছনার শেষ করবার জন্যে নিজেকে অজ্ঞ
নিরক্ষররূপে চালিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
হয়। কাজেই গল্প এবার নতুন খাদে
ইতে শূদ্ধ করল। গাগণী ও দীনেশের
পুত্র-সন্তান হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের
উকীল বন্ধু মনমথ দাশগুপ্তের জন্মলাভ
কন্যাসন্তান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের
আগেই তাদের জন্ম এবং ঐ যুদ্ধের
অন্যে তারা কৈশোরে পৌঁছল। দু'জনের
মধ্যে আছে মনের মিল এবং বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের পরীক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান
তাদেরই করায়ত্ত। যথারীতি এরা প্রেমের



অজয় কন্ন পরিচালিত 'অতল জলের আহ্বান' চিত্রে রঞ্জনা ব্যানার্জি

পরিণতি হিসেবে পরস্পরে বিবাহিত
হ'তে চায় এবং যথারীতি ব্রাহ্মণ ও
বৈদ্যের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনে তারা
প্রথমে গুরুজনের মত পায় না ও পরে
গাগণীপুত্র শূভোর অ্যাক্সিডেন্টের পর
সকল সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু
ইতিমধ্যে গল্পের মধ্যে অন্ততঃ তিনটি
মৃত্যু ঘটে গেছে—সান্যালমশাই, দীনেশের
মা এবং পরে দীনেশ নিজে পরপারে
প্রস্থান করে গল্পকে সহজ হ'তে সাহায্য
করেছেন।

একমাত্র বিকাশ রায় অভিনীত
মনমথ চরিত্রটির (সুলাতা জন্মবার আগে
পর্যন্ত) সরস কথাবার্তা ছাড়া গল্পটির
মধ্যে এমন কিছু নেই, যা মনে দাগ
কাটতে পারে। তাই আজকের দিনে
এ-ধরনের গল্পের চিত্ররূপ দেওয়ার
সার্থকতা কি, তা বুঝে ওঠা শক্ত।
অন্য কন্যা হ'তে শূদ্ধ করে বিধবা
প্রোচা মাতা পর্যন্ত গাগণী চরিত্রটিকে
অগ্রসর হ'তে হয়েছে এবং এই একটি
মাত্র কারণে ছবির নাম 'সম্ভারিণী' হয়েছে
মনে করলে অনায়াস হবে না।

অভিনয়শ্রেণি কণিকা মজুমদার তাঁর
গৃহীত চরিত্রটিকে মর্যাদা দিতে
পেরেছেন। অত্যন্ত সংযত, শান্ত এবং
সংবেদনশীল তাঁর অভিনয়। 'লৌহ-

দানব' দীনেশের ভূমিকায় একটি নয়ন-
গ্রাহ্য গুরু-পরিহিত বসন্ত চৌধুরীকে
প্রথম দর্শনে দানব-ভাবাপন্ন ব্যক্তি বলেই
মনে হয়েছে এবং তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে
স্থূল্যনা দীনেশকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে
সক্ষম হয়েছেন। শূভো এবং সুলাতা—এই



● প্রোত্থাংশে ●
তৃপ্তি মিত্র ● শব্দ মিত্র ● অমর গাঙ্গুলী
কুমার রায় ● শোভেন মজুমদার ● শান্তি
দাস ● রমলা রায় ও দেবতোষ ঘোষ
মণ্ড আলো
অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় । কালিদাস ঘোষ
● নিউ এম্পায়ারে ●
মঙ্গলবার ৬ই মার্চ ৬টা
। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ।

দুই চরিত্রে শোভন লাহিড়ী থেকে লীল চক্রবর্তী অধিকতর সাফল্য অর্জন করেছেন। শোভন লাহিড়ীর কয়েকটি ক্লোজ-আপ সুন্দরতরভাবে উপস্থাপিত করার অবকাশ ছিল। মন্মথ উকীলের ভূমিকায় বিকাশ রায় বাচনে, অংগ-ভঙ্গীতে এবং মেক-আপে একটি নতুন ধরনের উপভোগ্য চরিত্র সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। পাহাড়ী সান্যালের আত্মভোলা, স্থিত-সমাহিত মাস্টার চরিত্র ও ছায়া দেবীর অমপূর্ণা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। অপরাপর ভূমিকায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন কৃষ্ণধন মৃথোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, পারিজাত বসু এবং প্রীতি মজুমদার।

চিত্রগ্রহণের কাজে বিমল মৃথোপাধ্যায় মোটামুটি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাশীর বহিঃদৃশ্যাবলী সুন্দরভাবে গৃহীত। শব্দগ্রহণে একটি উচ্চমান রক্ষিত হয়েছে। শিল্পনির্দেশে সুনীতি মিত্র বিভিন্ন পরিবেশের বৈচিত্র্য রক্ষা করেছেন সূক্ষ্মভাবে। ছবিতে সন্নিবিষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীতগুলি ছবির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। একখানি মাত্র কীর্তনগানের রচনা, সুরযোজনা ও কন্ঠদান সুন্দর হয়েছে।

বিবিধ সংবাদ

চুটী স্বীকার :

গেল সংখ্যায় 'সুর্বস্মান'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "ন্যায়দণ্ড" কবিতাটি থেকে উদ্ধৃতিতে অনবধানতাবশতঃ কিছু ভুল থেকে গিয়েছিল বলে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত। সঠিক উদ্ধৃতি হচ্ছে :

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে॥"

বিশ্বরূপায় "সেতু" :

গেল ২৫-এ ফেব্রুয়ারীর ৩টার অভিনয়ে "সেতু" নাটক বিশ্বরূপায়

"ক্ষুধা" নাটক একটানা চলার যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল, তাকে অতিক্রম করে গেছে। এটি হয়েছে "সেতু"-র ৫৭৪-তম অভিনয়।

শিল্পভারতী প্রোডাকশন্সের নতুন ছবি :

বনফলের একটি জনপ্রিয় গল্প অবলম্বনে শিল্পভারতী প্রোডাকশন্স যে-নতুন ছবির কাজে ব্রতী হয়েছেন, তার শ্রুতমুহূর্ত উৎসব সম্পন্ন হয়েছে গেল ২২-এ ফেব্রুয়ারী ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাব-রেটরীতে হেমন্তকুমারের কয়েকখানি গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে। অরবিন্দ মৃথোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিখানির



'সারাজীহা হামারা' চিত্রে শ্যামা

পরিবেশনসমূহ নিয়েছেন সিনে ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেড।

শিশু নৃত্যনাট্য "ফুলপরী"

গেল শ্রীপদ্মমীর সংখ্যায় নন্দলাল বসু লেনস্থ শ্রীনিবাসচরণ সেনের গৃহ-প্রাঙ্গণে একটি সারস্বত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন যুগান্তরের "স্বপনবুড়ো"—অখিল নিয়োগী। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল "সব-পেয়েছিরা আসর"—এর মেয়েদের দ্বারা নৃত্যনাট্য "ফুলপরী"র সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়।

আগামী সপ্তাহে কলকাতায় 'ফুল কা ফুল'-খ্যাত বশচোপরা পরিচালিত বি আর ফিল্মসের 'ধর্মপুত্র' চিত্রটি কলকাতায় মুক্তিলাভ করছে। আচার্য চতুর্সেন শাস্ত্রী রচিত মনস্তত্ত্বমূলক এই কাহিনীতে রূপদান করেছেন মালা সিনহা, শশী কাপুর, রহমান, মনোমোহন কৃষ্ণ, ইন্দ্রাণী মুখার্জি ও নিরূপা রায়।

গান্ধীকে অবলম্বন করে মার্ক

রবসন যে চিত্রটি তুলেছেন তাতে জে এস কাশ্যপ ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত ভারতীয় শিল্পী অভিনয় করেছেন তাঁরা হচ্ছেন অচলা সচদেব, এস এন ত্রিপাঠী, জয়রাজ, ডেভিড এব্রাহাম, কোশী পাণ্ডোলী, ইয়াকুব। এই সংগে একটি চরিত্রে আছেন বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় নরেন্দ্রনাথ।

তিন দেশী ছবি

॥ চিত্রগ্রহী ॥

হলিউডে চিত্রপরিচালকদের স্বাধীনতা—

পৃথিবীর সব দেশেই চিত্রপরিচালককে প্রযোজকের তর্জনী-শাসন মেনে চলতে হয়। কারণ চিত্রনির্মাণ একমাত্র প্রযোজকের অর্থানুকূলেই হওয়া সম্ভব। এবং হলিউডেও যথারীতি প্রযোজক-প্রতাপ কম না। কিন্তু সম্প্রতি বরফ গলতে সুরু হয়েছে পরিচালকদের স্বপক্ষে।

কাহিনীকার-পরিচালক শ্রী রিচার্ড ব্রুকস কলাম্বিয়ার হয়ে অনেকগুলি ছবি তুলবেন এই মর্মে একটি চুক্তি সই করেছেন। চুক্তিটি হয়েছে কোনো নির্দিষ্ট কাহিনী নির্বাচিত হওয়ার পূর্বেই। পরে ব্রুকস তাঁর প্রথম ছবির জন্যে জোসেফ কনরাডের "লর্ড জিম" উপন্যাসটিকে নির্বাচিত করেছেন। কলাম্বিয়া-ব্রুকসের চুক্তি-নামাটিকে প্রায় একটা "ম্যাগনাকার্টাই" বলা যেতে পারে। এই চুক্তিবলে ব্রুকস তাঁর নতুন ছবি নির্মাণে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা পেয়েছেন। যথা, এই চিত্রের চিত্রনাট্যের একটা শব্দও কলাম্বিয়ার কতৃপক্ষকে দেখাতে হবে না, ছবিটি সম্পূর্ণ শেষ না হলে এক ফুটও প্রযোজকপক্ষকে দেখাতে বাধ্য থাকবেন না ব্রুকস। অথচ ছবিটির পেছনে বিপুল

জেনিভ ওয়াচ হাউস

বি ৯১, নিউ মার্কেট

রোলেক্স ফ্যাক্টরীতে (সুইজারল্যান্ড) শিক্ষাপ্রাপ্ত সবপ্রথম ভারতীয় শ্রী এস, কে মুখার্জী কতৃক নিজ তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রকার ঘড়ি নিখুঁতভাবে প্রস্তুতকারকগণের পদ্ধতি অনুযায়ী মেরামত করা হয়।

ইহা একটি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

সর্বসাধারণের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রার্থনীয় :—

শ্রীশিব পুরস্কারপ্রাপ্ত
চতুর্থ প্রযোজিত
৪২, বাবুসাহেব ফোর্বস
লার্কন্যাডা-৪৩

ডাউনটুন

৫০ তম রত্নাঙ্গী স্মারক উৎসব
রচনা-১ দিনেন মেন
নির্দেশনা-ব্রজ নাথজগু
মিনার্ভা-১২ই মার্চ ৬২ মঙ্গলা বট
চলিত-১, ২, ৩ ও ৩ জঙ্গ

অস্কার (কুড়ি লক্ষ ডলার) বৎসিক নিতে হবে কলাম্বিয়াকে! অনেক সময় ছবি নির্মিত হবার পর প্রযোজকের ইচ্ছানুযায়ী কিছু, কিছু অংশ বাদ দিতে হয় কিন্তু ব্রুকস-এর বেলায় স্থির হয়েছে, চূড়ান্তভাবে বাদ দেয়ার অধিকারী একমাত্র তিনিই। এমন কি প্রযোজকপক্ষ যদি ছবির কোনো অংশ বাদও দেন, তিনি ইচ্ছা করলেই তা পুনর্সংযোজিত করতে পারেন। কলাম্বিয়াকে ব্রুকস-এর যাবতীয় সর্ব মানতে হয়েছে, কারণ হ লি উ ডে কাহিনীকার-পরিচালকদের জয়-জয়কার চলেছে বর্তমানে। হলিউডে খুব কম সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর কাহিনীকার-পরিচালক আছেন। কিন্তু যারা আছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের ছবিই বক্স অফিসখন্য ত বটেই ছবি হিসেবেও অসাধারণ। যথা :

জন হাট্টন লিখিত এবং পরিচালিত

জোসেফ ম্যাকউইকজ " "

বিলওয়ার্ডলাডার " "

জেনেস দেশিন " "

জর্জ সেটন " "

রবার্ট রোসেন " "

শেষোক্ত ছবিটি ১৯৬১ সালের অস্কার পুরস্কারের অন্যতম প্রতিযোগী। আমেরিকার দর্শকরাও, যে সমস্ত পরিচালক নিজের ছবির কাহিনী নিজেরাই লিখেছেন, তাঁদের সম্বন্ধেই বেশী উৎসুক। এমন কি ইউরোপেও

দীর্ঘ কালকাতায় গত ৩ মাস ধাবৎ

প্রতি বৃহস্পতি

সন্ধ্যা ৭টায়

মিডা

সিগারেট

খিয়েটার

ইউনিট-এর

কিন্তু

৩৭-৫১১৫

মহারাজ নিবাস

১৫, হাজরা রোড

সি-৩২

কাহিনীকার-পরিচালক ফেলিসী এবং ইনগেমার বাগম্যানের অবিসংবাদী আধিপত্য।

তবে কলাম্বিয়ার সঙ্গে সর্ভাঙ্গীর্ণ চুক্তি করার একটা ব্যক্তিগত কারণ ছিল রিচার্ড ব্রুকস-এর। কিছুদিন পূর্বে তাঁর মেট্রোর হয়ে "এলমার গ্যান্স্ট্রি" তোলার কথা ছিল। কিন্তু মেট্রোর শেষ পর্যন্ত গল্পটি পছন্দ হয়নি। ফলে ব্রুকস মেট্রোর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। "ইউনাইটেড আর্টিস্টস" প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকদের চিত্র নির্মাণে স্বাধীনতা দেয়ার ব্যাপারে একটা সুনাম ছিল। 'ইউনাইটেড আর্টিস্টস' ব্রুকসকে প্রস্তাব দিলেন 'এলমার গ্যান্স্ট্রি' তাঁদের হয়ে তুলবার জন্যে। ব্রুকস ছবিটি তুললেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের পতাকার।

"দি মালটিজ ফ্যালকন"

"ট্রেজার অফ দি সিয়েরা ম্যাডরে"

"আফ্রিকান কুইন"

"এ লেটার টু প্রি ওয়াইভস"

"অল এ্যাবাউট ইভ"

"সাম লাইক ইট হট"

"দি এ্যাপার্টমেন্ট"

"ওয়ান, টু, থ্রি"

"রিকার্কি"

"নেভার অন সেন্ড"

"মিরাকল অন থার্টিফোথ স্ট্রিট"

"কালিষ্ট গাল"

"হি হাটলার"

ছবিটির জন্যে ব্রুকস কাহিনীকার হিসেবে অস্কার পেলেন এবং এই একই ছবিতে অভিনয় করে বার্ট ল্যাংকেষ্টার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অস্কার এবং শার্ল জোনস অভিনেত্রীর অস্কার লাভ করেন। ১৯৬০ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্মাণের জন্যেও 'এলমার গ্যান্স্ট্রি' নির্বাচিত হয়। এবং সেই থেকে রিচার্ড ব্রুকস স্থির করেছেন যে, নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা না পেলেন কারুর হয়ে ছবি তুলবেন না।

হলিউডে আজকাল কাহিনীকার-পরিচালকের বাণিজ্যিক মূল্য ক্রমশই বাড়ছে। এবং চিত্র নির্মাণের স্বাধীনতাও তাঁরা শৃঙ্খমাত্র পরিচালকদের চেয়ে বেশীই পাচ্ছেন। ফলে হলিউডে যারা শৃঙ্খ ছবির জন্যেই গল্প লিখে

থাকেন তাঁরা ক্রমেই চিত্র-পরিচালনার দিকে ঝুঁকছেন।

অর্থ অস্কার কথা

হলিউডের চলচ্চিত্র জগতে অস্কারের সম্মান অনন্য। অস্কারের স্বর্ণদীপ্ত মূর্তিটির জন্যে তাই হলিউডের লালসার অন্ত নেই। কারণ কোনো ছবির পক্ষে অস্কার পাওয়া মানেই বক্স অফিস মারফৎ উপরি প্রায় ষাট লক্ষ টাকার মতন উপার্জন। এবং তাছাড়া অমের সম্মানের গৌরবটা ত' আছেই। লাভ শৃঙ্খ প্রযোজক পক্ষেরই না, অস্কারলব্ধ চিত্রের পরিচালক, অভিনেতা, কাহিনীকার, ক্যামেরাম্যান প্রমুখ সকলেই নতুন লাভের অংশীদার হন—নতুন নতুন কল্যাণকটে উপার্জনের পথ আরো কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং অস্কার বিচারের কিছুদিন আগে থেকেই হলিউডের বিভিন্ন চলচ্চিত্র-শিবিরে সাজো সাজো রব পড়ে যায় এবং স্বপক্ষে বিপক্ষে সমস্ত রকমের প্রচারযন্ত্রই অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নাটকেরই প্রায় ছোটখাটো একটি সংস্করণ অভিনীত হয় লস এঞ্জেলস-এর রঙ্গমঞ্চে।

হলিউডে এবারো তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না যথারীতি। ইতিমধ্যেই 'আকাডেমি অফ মোশান পিকচার, আর্টস এ্যান্ড সায়েন্স'এর সভ্যদের কাছে নির্বাচনের ব্যালটপত্র চলে গেছে। আগামী ৯ই এপ্রিল অস্কার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে। কিন্তু অস্কার পুরস্কারের জন্যে হলিউড মাথা কুটলেও

এলিট

প্রভাঃ ৩, ৬ ও রাতি ৯টায়
আইন যেখানে স্বেচ্ছাচারিতায় রূপ
নিরেখে...প্রেম যেখানে ডেকে আনে
উচ্ছৃঙ্খলতা আর প্রতিহিংসার বাহি—সে
দেশেরই নরনারীর রোমাঞ্চকর জীবন
কাহিনী।



(ইউ) সহ-ভূমিকায়
ক্যার্ট হুইটম্যান - ইনা বারিন

কোনো কোনো মহলে এই পদ্রুপকারের যথাযথ নিয়ে সম্ভেদ এবং কানাকান কম নেই। সব সময়েই কি উপযুক্ত ছবি পদ্রুপকৃত হয়? বিচারকরা কি প্রকৃতই নিরপেক্ষ এবং সমস্ত দড়ি টানাটানির উদ্দেশ্য? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে নির্বাচকদের এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াটিকে আগে জানা দরকার।

“আকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্ট এ্যান্ড সায়েন্স”এর সভাসংখ্যা খুব বেশী না। আমেরিকার চলচ্চিত্র জগতের কিছু ‘আলোকপ্রাপ্ত বিম্বং-কুল’ আকাডেমির সভা। নিয়মানুসারে আকাডেমির ২০০০ সভ্য চিত্র নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী। কিন্তু বর্তমান বৎসরে সম্ভবতঃ ২০০০-এর বেশী ভোট পড়বে না। নির্বাচন মণ্ডলীর এই সংখ্যাপতাই হলিউডের চিত্র-জগতে মূল অসন্তোষের কারণ এবং এই অসন্তোষের কারণটি একান্তই যুক্তি-যুক্ত। নিখিল আমেরিকার অভিনেতা সংঘের ১৪০০০ সভ্যদের মধ্যে মাত্র ৫০২ জন আকাডেমির সভ্য। চিত্র-কাহিনীকার সংঘের ১১০০ জনের মধ্যে আকাডেমির সভ্যপদ-অধিকারী মাত্র ২১০ জন। ৮৫০ জন পরিচালক নিয়ে গঠিত পরিচালক সংঘের মাত্র ১৩৭ জন পরিচালকের সভ্যপদ আছে আকাডেমিতে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, হস্তকুশলীদের কোনো প্রতিনিধিত্ব আকাডেমিতে নেই।

অস্কার নির্বাচন প্রক্রিয়াটি একটু জটিল। শ্রেষ্ঠ চিত্র, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ অভিনয়, শ্রেষ্ঠ কাহিনী প্রভৃতি প্রতিটি বিভাগের জন্যে পাঁচটি ছবি, পাঁচজন অভিনেতা, পাঁচজন কাহিনীকার প্রাথমিক ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। এরপর আসল অস্কারের জন্যে নির্বাচন হয় পাঁচটি ছবি, পাঁচজন পরিচালক, পাঁচজন অভিনেতা, পাঁচজন কাহিনীকার



মুভি-টক'এর 'শিউলি বাড়ী' চিত্রে উত্তমকুমার

অর্থীঃ প্রতিটি বিভাগের পঞ্চপাশ্চবদের মধ্যে। কিন্তু আকাডেমির সমস্ত সভাই সবক'টি বিভাগে ভোট দিতে পারেন না। সমস্ত সভ্য ভোট দিতে পারেন শুধু একটি মাত্র বিভাগে—শ্রেষ্ঠ ছবি মনোনয়নে। অন্যান্য বিভাগীয় (কাহিনী, অভিনয়, পরিচালনা ইত্যাদি) নির্বাচনে বিশেষজ্ঞ সভারাই শুধু মাত্র ভোটদানের অধিকারী। এই নির্বাচন প্রথায় খুব কম ভোট পেয়েই একটি ছবি, কি একজন পরিচালক নির্বাচিত হয়ে যেতে পারেন। ২০০০ সভ্যদের যদি পাঁচটি ছবি বাছতে হয় তাহলে মাত্র ৪০০টি ভোটের জোরেই একটি ছবি অস্কারের জন্যে মনোনয়ন লাভ করতে পারে। আবার যেহেতু মাত্র ১৩৭ জন ‘ভোটার’ মারফৎ পাঁচজন পরিচালক নির্বাচিত হন, অতএব মাত্র ২৮টি সভ্যের সমর্থনেই পরিচালক অস্কারের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। এই হিসেবে দেখা যাচ্ছে মাত্র ১০০ ভোটে অভিনেতা ৫০-এরও কম ভোটে

কাহিনীকার নির্বাচনের পালা সাংগ হয়।

এবং ভোটরপের সংখ্যাগুলো কখনই জনসমক্ষে প্রচার করা হয় না, আকাডেমির পক্ষ থেকে। এই অহেতুক গোপনীয়তা অনেক সম্ভেদের উৎস। হলিউডের কোনো কোনো মহলের ধারণা নির্বাচনের ভোট সংখ্যা প্রকাশ করলে বক্স অফিসের থলিটা ফটো হতে ত' পারেই, অস্কার মূর্তির দিবা স্বর্ণজ্যোতিটাও নিভে যেতে পারে অকস্মাৎ। আকাডেমির পক্ষে ভোট সংখ্যা প্রকাশের একমাত্র বাধা সম্ভবতঃ সভ্য সংখ্যার স্বল্পতা। হলিউডের প্রতিটি মহলের সমবেত প্রার্থনা আকাডেমির সভাসংখ্যা যাতে বাড়ানো হয়। অবশ্য সভাসংখ্যা আগের চেয়েও অনেক বেড়েছে। টেলিভিশনের পরাক্রমের ফলে সিনেমা শিল্প কিছুটা সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও গত দশ বছরে আকাডেমির সভাসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তবুও যেখানে ‘পাবলিসিটি এজেন্ট’, ‘বিজনেস এগজেকিউটিভ’রাও আকাডেমির সভ্য পদের অধিকারী, সেখানে সিনেমা শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লোকদের অ-সভ্য করে রা নিঃসন্দেহে অসমীচীন।

এই প্রসঙ্গে এবারের অস্কারের প্রতিযোগী হিসেবে রবার্ট রোসেন-এর পরিচালিত ‘দি হাটলার’ ছবির নাম করা যেতে পারে। হলিউডে জোর গুজব যে এবারের অস্কারের আশীর্বাদ এই ছবিটির ওপরেই হয়ত বসিত হবে।



কেশুত

ডেমজ কেশ তৈল

নিখার্স ট্রেন্ড কনিকাস



খেলাধুলা

দশক

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম টেস্ট

ভারতবর্ষ : ২০৩ রান (রুসী স্মিথ ৫৭, সোলিম দুরানী ৫৬। সোবাস ২৮ রানে ৩, স্টেয়ার্স ৬৫ রানে ৩, হল ৩৮ রানে ২ এবং ওয়াটসন ২০ রানে ২ উইকেট)।

ও ৯৮ রান (বোরদে ২৭ এবং উমরীগড় ২৩। হল ১১ রানে ৩, সোবাস ২২ রানে ৪ এবং গিবস ১৬ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৮৯ রান (হেন-ড্রিকস ৬৪, হান্ট ৫৮, সলোমন ৪৩, সোবাস ৪০ এবং হল নটআউট ৩৭। দুরানী ৮২ রানে ৪, দেশাই ৪৬ রানে ২, উমরীগড় ৭৭ রানে ২ এবং বোরদে ৬৫ রানে ২ উইকেট)।

ও ১৫ রান (কোন উইকেট না পড়ে। হান্ট নট আউট ১০ এবং স্মিথ নট আউট ৪)।

১ম দিন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস—১১৩ (৬ উইকেটে)। সোলিম দুরানী ২২ এবং রুসী স্মিথ ১০ রান করে নট আউট থাকেন।

২য় দিন (১৭ই ফেব্রুয়ারী) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২০৩ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস—১৪৮ রান (৬ উইকেটে)। সলোমন ৪ রান করে নট-আউট থাকেন।

৩য় দিন (১৯শে ফেব্রুয়ারী) : ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৮৯ রানে সমাপ্ত। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস—৪৯ রান (৪ উইকেটে)। উমরীগড় এবং বোরদে নট আউট থাকেন।

৪র্থ দিন (২০শে ফেব্রুয়ারী) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৯৮ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস—১৫ রান (কোন উইকেট না পড়ে)।

ত্রিনিদাদ ম্বীপের রাজধানী পোর্ট-অব-স্পেন সহরের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠের প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১০ উইকেটে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিগত ১৬টি টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এই ৬ষ্ঠ জয় এবং ১০টি খেলা ড্র। ভারতবর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত

করতে সক্ষম হয়নি। কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে এ পর্যন্ত ১২টি টেস্ট খেলা হয়েছে—ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ৩ (ইংল্যান্ড, পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে), হার ৩ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২ এবং



ওয়েসলে হল

পাকিস্তানের বিপক্ষে ১) এবং খেলা ড্র ৬। বেশীরভাগ টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে এই মাঠে। গতবার ১৯৫২-৫৩ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট



গারফিল্ড সোবাস

ইন্ডিজ দলের ২টো টেস্ট খেলাই ড্র যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্বদেশের মাটিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এ পর্যন্ত ৩৮টা টেস্ট খেলেছে; খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ১২ হার ৯ এবং খেলা ড্র ১৭। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সমস্ত টেস্ট খেলা ধরলে হিসাব দাঁড়ায়—মোট খেলা ৯০, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ২৭, হার ৩২ এবং খেলা ড্র ৩১। ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্বদেশে ৮টা টেস্ট সিরিজ খেলেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ৪, ড্র ২ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে) এবং হার ২ (অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১৯৫৪-৫৫ এবং ইংল্যান্ডের কাছে ১৯৫৯-৬০ সালে)।

আলোচ্য কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠের প্রথম টেস্ট খেলা চতুর্থ দিনের লাঞ্চার আগেই শেষ হয়ে যায়। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ৯৮ রানে শেষ হ'লে ভারতবর্ষ মাত্র ১২ রানের ব্যবধানে এগিয়ে ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি লাভ করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের তখন জয়লাভের জন্য ১৩ রানের প্রয়োজন হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের ৩৩ মিনিট আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং সাত মিনিটের খেলায় কোন উইকেট না খুঁইয়ে প্রয়োজনের থেকে দু'রান বেশী করে ১০ উইকেটে জয়লাভ করে।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২০৩ রানে শেষ হয়। প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ৬টা উইকেট পড়ে, রান দাঁড়ায় ১১৩। ভারতবর্ষের এই শোচনীয় দুর্গতির মূলে ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার হল, ওয়াটসন এবং স্টেয়ার্সের মারাত্মক বোলিং। প্রথম দিনের তুলনায় ভারতবর্ষ দ্বিতীয় দিনে অনেক ভাল খেলে। দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের বাকি ৪টি উইকেটে ১০০ রান ওঠে ১০৭ মিনিটের খেলায়। প্রথম দিনের খেলা দেখে লোকের ধারণা হয়েছিল দ্বিতীয় দিন কম সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যাবে এবং সেই হিসাবে রানও কম উঠবে। লোকের এ ধারণা ভারতবর্ষ ভেঙ্গে দেয়; তা'ছাড়া এই দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ৬ জন খেলোয়াড়কে আউট করে বোলিংয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ করে। এক কথায় দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ নিজের পক্ষে খেলার মোড় ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে।

তৃতীয় দিনে ২২০০০ হাজার দর্শকের সমাবেশে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ৭ম উইকেটের জুড়ি সলোমন এবং ডাঙ্গা আঙ্গলে নিয়ে উইকেট-রক্ষক হেনড্রিকস খেলতে নামেন। দলের রান তখন ১৪৮ (৬ উইকেটে)। সলোমনের রান ৪; তিনি দ্বিতীয় দিনের নট-আউট খেলোয়াড়।

হেনড্রিক্স এই দিন প্রথম ব্যাট করতে নামেন। আব্দুল ভাগ্যার দরুণ এই খেলায় হেনড্রিক্স আর যোগদান করবেন না বলে খবর ছিল।

দলের ১৮৭ রানের মাথায় ব্যাট নামায় ২২ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। এই সময় ৭ম উইকেটের জুটিতে ৫২ মিনিটের খেলায় ৩৯ রান ওঠে। ২৮৫ মিনিটের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারত-বর্ষের প্রথম ইনিংসের ২০০ রান ছাড়িয়ে যায়। দলের ২০৮ রানের মাথায় দেশাই নতুন বল নিয়ে বোলিং আরম্ভ করেন। খুব তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া গেল। দলের ২১২ রানের মাথায় দেশাইয়ের বলে সলোমন নিজস্ব ৪৩ রান করে উইকেট-রক্ষক ইঞ্জিনিয়ারের হাতে ধরা পড়ে বিদায় নিলেন। সলোমন ১০৪ মিনিট খেলে তাঁর ৪৩ রানের মধ্যে ৫টা বাউন্ডারী করেন। ৭ম উইকেটের জুটিতে ৮১ মিনিটের খেলায় সলোমন এবং হেনড্রিক্স দলের ৬৪ রান তুলে দেন।

এর পর খেলতে আসেন গিবস। কিন্তু তিনি কোন রান না করেই দলের ২১৭ রানের মাথায় উমরীগড়ের বল দু'রানীর হাতে তুলে দিয়ে আউট হ'ন। লাগুর সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের স্কোর দাঁড়ায় ২৩০ (৮ উইকেটে)। উইকেটে তখন ৯ম উইকেটের জুটি হেনড্রিক্স (৪১ রান) এবং হল (৫ রান)।

এই ৯ম উইকেটের জুটিতে হেনড্রিক্স এবং হল দৃঢ়তার সঙ্গে পিটিয়ে খেলে যান। দলের ২৮৭ রানের মাথায় এই জুটি ভেঙ্গে দেন বোরদে, হেনড্রিক্সকে আউট করে। হেনড্রিক্স ১৬০ মিনিট খেলে তাঁর ৬৪ রান করেন, বাউন্ডারী করেন ৮টা। তাঁর এই ৬৪ রানই দুই দলের খেলায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। ৯ম উইকেটের জুটিতে হেনড্রিক্স এবং হল ৭৩ মিনিট খেলে দলের ৭০ রান তুলে দেন। হলের সঙ্গে শেষ খেলোয়াড় ওয়টসন খেলতে নামেন। কিন্তু খালি হাতেই তাঁকে ফিরে যেতে হয়, দলের ২৮৯ রানের মাথায় দু'রানীর বলে ওয়টসন কণ্ট্রোলার হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে আউট হ'ন। হল ৩৭ রান করে নট-আউট থাকেন। প্রধানতঃ সলোমন, হেনড্রিক্স এবং হলের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ১৮৭ মিনিট স্থায়ী থাকে এবং এই সময়ের ৪ উইকেট খুইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪১ রান সংগ্রহ করে ভারত-বর্ষের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ৮৬ রানের ব্যবধানে অগ্রগামী হয়।

চা-পানের বিরতির ২০ মিনিট আগে ব্যাট নামে; খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে প্যাভেলিয়নে আশ্রয় নেন। এই সময় ভারতবর্ষের মিত্রীয় ইনিংসের রান ছিল ৬, ২৫ মিনিটের খেলায় এবং এই ৬ রানই করেন কণ্ট্রোলার। মেহেরার রানের ঘর তখনও খালি। চা-পানের পরবর্তী খেলায় ভারতবর্ষের ভাগ্যন ধরে। চা-পানের পর খেলা আরম্ভ করেন হল এবং তার প্রথম বলেই কণ্ট্রোলার আউট হন। মঞ্জরেকার খেলতে নামেন এবং হলের প্রথম ওভারের মিত্রীয় বল খেলতে গিয়ে নিজেই নিজের উইকেট ভেঙ্গে ফেলে আউট হন। সারদেশাই মঞ্জরেকারের শূন্য স্থানে খেলতে নামেন। তিনি হলের তৃতীয় বলে ২ রান করে হলের 'হ্যাট-ট্রিক' প্রতিরোধ করলেন। কিন্তু চতুর্থ বলে তাঁকে খেলা থেকে বিদায় নিতে হয়। অনেকের মতে সারদেশাই নাকি বল স্পর্শ করেন নি। বলটা তাঁর লেগ-স্টাম্পের অনেক বাইরে ছিল এবং তিনি বলটা খেলোয়াড়ের, কিন্তু স্পর্শ করতে পারেন নি। বলটা উইকেট-রক্ষকের হাতে গিয়ে পড়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলোয়াড়রা একযোগে আবেদন করেন এবং আম্পায়ার এই আবেদনে সাদা দেন। সারদেশাই বিস্মিত হয়ে উইকেট ছেড়ে চলে যান। একই ওভারে হল চারটে বলে তিনটে উইকেট পান মাত্র ২ রান দিয়ে। তাঁর প্রথম বলে কণ্ট্রোলার, মিত্রীয় বলে মঞ্জরেকার এবং চতুর্থ বলে সারদেশাই আউট হ'ন। দলের ৮ রানে ৩টে উইকেট পড়ে গেল। মেহেরার সঙ্গে উমরীগড় খেলতে নামেন। তখনও মেহেরা রান করেননি। দলের ৩৫ রানের মাথায় মেহেরা ৮ রান করে আউট হন। মেহেরা ৬৮ মিনিট খেলে এই ৮ রান করেছিলেন। উমরীগড়ের সঙ্গে খেলতে নামেন বোরদে। খেলা ভাগ্যার নির্দিষ্ট সময়ের ৫ মিনিট আগে উপস্থিত আলোর অভাবে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৪৯, ৪ উইকেট পড়ে। উইকেটে নট-আউট থাকেন উমরীগড় এবং বোরদে।

চতুর্থ দিনের খেলায় ২০,০০০ হাজার দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ওরেল খেলার সূচনা করেন। প্রথম টেস্টে তাঁর এই প্রথম বোলিং। খেলা সবে ১০ মিনিট হয়েছে এমন সময় দলের ৫৬ রানের মাথায় উমরীগড় ২০ রান করে সোবাসের বলে আউট হলেন। হেনড্রিক্সের বদলী খেলোয়াড় রডরিগসের হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন।

বোরদের সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটে খেলতে নামেন দু'রানী। দলের ৭০ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেটের পতন হয়—দু'রানী সোবাসের বলে খোঁচা মেরে বল তুলে দেন; ফাইন-লেগে ওরেলের হাতে বলটা ধরা পড়ে। সূর্যি খেলতে নামেন; কিন্তু দলের ঐ ৭০ রানের মাথায় সোবাসের বলেই বদলী খেলোয়াড়ের হাতে ধরা পড়ে বিদায় নেন। সূর্যি তিনটে বল ঠেকিয়ে চতুর্থ বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে খোঁচা মেরে 'ক্যাচ' তুলেন। ৭০ রানে ভারত-বর্ষের ৭টা উইকেটের পতন। তখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের ২৮৯ রানের থেকে ভারতবর্ষ ১৬ রান পিছনে। ৮ম উইকেটের জুটিতে বোরদে এবং নাদকানী যখন দলের ভাগ্যন কিছুটা সময় রোধ করেছেন এমন সময় দলের ৯১ রানের মাথায় বোরদে নিজস্ব ২৭ রান করে সোবাসের বলে বোল্ড-আউট হ'ন। দলের ৯৬ রানে ইঞ্জিনিয়ার এবং ৯৮ রানে সর্বশেষ খেলোয়াড় দেশাই আউট হ'ন। নাদকানী ১২ রান করে নট-আউট থাকেন।

মাত্র ৯৮ রানে ভারতবর্ষের মিত্রীয় ইনিংস শেষ হয়। এই ৯৮ রানই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব রেকর্ড ১২৪ রান (কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯)। বিগত ১৯৫২-৫৩ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ছিল ১২৯ (বার্বাডোজ)। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় এই নিম্নে ভারতবর্ষ ৭ বার একশত রানের কম রানে আউট হল—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪ বার, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২ বার এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১ বার। ভারত-বর্ষের পক্ষে এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ৫৮ রান—ইংল্যান্ড (ম্যাগস্টার, ১৯৫২) এবং অস্ট্রেলিয়ার (ব্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮) বিপক্ষে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ৮ বার একশত রানের কম আউট হয়েছে—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ বার, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ বার, নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ১ বার করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ৭৬ রান—পাকিস্তানের বিপক্ষে (ঢাকা, ১৯৫৮-৫৯)।

খেলার তৃতীয় দিনে মিত্রীয় ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষ যেমন ফাফট বোলারদের বলে নট স্বীকার করোঁকল, তেমনি করেছিল চতুর্থ দিনে স্পিন

বোলারদের কাছে। চতুর্থ দিনে ফাস্ট বোলারদের বিশ্রাম দিয়ে ওরেল স্পিন বোলারদের হাতে আক্রমণের ভার দেন। চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের বাকি ৬টা উইকেট পড়ে যায় ৪৯ রানে। সোবার্স ২২ রানে ৪টে এবং গিবস ১৬ রানে ২টো উইকেট পান। সোবার্স তাঁর ২য় ওভারে উমরীগড়, ষষ্ঠ ওভারে সেলিম দুরানী এবং রুসী সদ্ভিত এবং ৮ম ওভারে বোরদের উইকেট পান।

জয়লাভের প্রয়োজনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে লাঞ্চ সময়ের ৩৩ মিনিট আগে। জয়লাভের জন্যে তাদের মাত্র ১৩ রানের প্রয়োজন ছিল। হাট এবং স্মিথ লাঞ্চার বিরতির ২৫ মিনিট আগে ১৫ রান তুলে দিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১০ উইকেটে জয়ী হয়। পাঁচ দিনের টেস্ট খেলা চতুর্থ দিনের লাঞ্চার আগেই শেষ হয়ে যায়। বৃষ্টির দরুণ এই চার দিনের খেলায় আবার ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় নষ্ট হয়।

॥ রিজি ট্রফি ॥

সেমি-ফাইনাল

বাংলা : ২৯২ রান (শ্যাম মিত্র ১১৭, প্রকাশ ভাঙ্গারী ৫৮ এবং পি সি পোন্দার ৪৬)

ও ২৯১ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। প্রকাশ ভাঙ্গারী নট-আউট ১১১, শ্যাম মিত্র নট-আউট ৭৯ এবং পঙ্কজ রায় ৪৭)

রাজস্থান : ৩৯২ (স্বর্ষবীর সিং ১২৬, হনুমন্ত সিং ৫৯, অর্জুন নাইডু ৪৬, সি যোশী ৫২। সুশীল কাপুর্ ১০৬ রানে ৬টা উইকেট)

ও ১৯৫ রান (৫ উইকেটে। রুণ্টা ৯৭, মানকড় ৪১, স্বর্ষবীর সিং নট-আউট ২৬। ভাঙ্গারী ৬৬ রানে ৫ উইকেট)

উদয়পুরের রিজি ট্রফি প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে রাজস্থান ৫ উইকেটে বাংলাকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে।

রাজস্থান দলের অধিনায়ক টেসে জয়লাভ করে বাংলাকে প্রথম ব্যাট করতে দেন।

বাংলার সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। দশ মিনিটের মধ্যে বাংলার অধিনায়ক পঙ্কজ রায় এবং তাঁর প্রথম উইকেটের জুটি দেবীন্দ্র সিং দলের কোন রান হওয়ার আগেই আউট হয়ে যান। তৃতীয় উইকেটের জুটি পোন্দার এবং কেনী দলের এই ভাঙন সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করেন—৩য় উইকেটের জুটিতে দলের ৩১ রান ওঠে। এর পর ৪র্থ উইকেটের জুটিতে পোন্দার এবং শ্যাম মিত্র ১০৫ মিনিটের খেলায় ১১২ রান তুলে দেন। দলের ১৪৩ রানের মাথায় পোন্দার

৪৬ রান করে আউট হ'ন। প্রথম দিনের খেলায় বাংলা ৬টা উইকেট খুইয়ে ২৫৪ রান করে। মিত্র ১০১ এবং অম্বর রায় ৩ রান করে নট-আউট থাকেন। সুন্দরম ৫৪ রানে ৩ এবং যোশী ৬১ রানে ২টো উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস ২৯২ রানে শেষ হয়। শ্যাম মিত্র ১১৭ রান করেন।

রাজস্থান এই দিন ২২৯ রান তুলে দেয়, উইকেট পড়ে ৪টে।

তৃতীয় দিনে চা-পানের বিরতির কিছু আগে ৩৯২ রানে রাজস্থানের প্রথম ইনিংস শেষ হ'লে রাজস্থান ১০০ রানে অগ্রগামী হয়। বাংলা ২টো উইকেটের বিনিময়ে এই দিন ৬৭ রান করে।

রাজস্থান দলের স্বর্ষবীর ২১০ মিনিট খেলে ১২৬ রান করেন, বাউন্ডারী করেন ১০টা। ভিন্ন মানকড় নিজস্ব ২৮ রানে রান-আউট হ'ন। ৭ম উইকেটের জুটিতে নাইডু এবং যোশী দলের ৯২ রান তুলে দেন। বাংলার সুশীল কাপুর্ ১০৬ রানে ৬টা উইকেট পান।

খেলার ৪র্থ অর্ধাংশ শেষ দিনে বাংলা ২৯১ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই দিন খেলায় জয়লাভের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পঙ্কজ রায় এবং শ্যাম মিত্র দ্রুতগতিতে রান করেন। তাঁরা ৫০ মিনিটে দলের ৭০ রান তুলে দেন। দলের অধিনায়ক পঙ্কজ রায় নিজস্ব ৪৭ রান করে দলের ১২৮ রানের মাথায় আউট হ'ন। এর পর ৪র্থ উইকেটের জুটি শ্যাম মিত্র এবং প্রকাশ ভাঙ্গারী দলের ১৬৩ রান তুলে দিয়ে অপরাধে থাকেন। ভাঙ্গারী ৩৯ মিনিটে ৫০ রান এবং এক ঘণ্টার খেলায় তাঁর শত রান পূর্ণ করেন। শ্যাম মিত্র ৭৯ রান এবং প্রকাশ ভাঙ্গারী ১১১ রান করে নট-আউট থাকেন।

বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার ফলে রাজস্থান দলের জয়লাভের জন্যে ১৯২ রানের প্রয়োজন হয়। তখন খেলা ভাঙতে ২১০ মিনিট সময় বাকি ছিল। রাজস্থান দলের অধিনায়ক রাণ্টা দলের এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করেন এবং তাড়াতাড়ি রান তুলতে গিয়ে রাজস্থান ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪৫ রান করে। বাংলার প্রকাশ ভাঙ্গারী মাত্র ১৬ রানে এই ৩টে উইকেট পান। কিন্তু খেলার এই মোড় ঘুরিয়ে দেন দলের অধিনায়ক কিশন রুণ্টা। তিনি ৯৭ রান করে আউট হ'ন। জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলতে রাজস্থান দলের ৫টা উইকেট পড়ে যায়। ৫ উইকেটে শেষ পর্যন্ত দলের ১৯৫ রান দাঁড়ায়। প্রকাশ ভাঙ্গারী দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৬৬ রানে ৫টা উইকেট পান।

দিল্লী : ১৪৯ রান (পাই ৫৮ রানে ৫ উইকেট) ও ২৬৭ রান (সুন্দ ৬৮। বালু গুপ্ত ১১১ রানে ৮ উইকেট)

বোম্বাই : ২৯০ রান (হরদিকার ৮৯ এবং তামানে ৫১। সীতারাম ৬৬ রানে ৫ উইকেট)

ও ১০৮ রান (৪ উইকেটে। এম এল আশ্বে ৪৯ এবং আমরোলীওয়ারা ৬৭)

গত বছরের রিজি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাই দল অপর-দিকের সেমি-ফাইনালে দিল্লী দলকে ৬ উইকেটে পরাজিত করেছে।

প্রথম দিনেই দিল্লীর প্রথম ইনিংস ১৪৯ রানে সমাপ্ত হয়, লাঞ্চার পর ৫৫ মিনিট খেলার পর। বাকি সময়ে বোম্বাই ৪ উইকেটে ১১৭ রান করে।

দ্বিতীয় দিনে বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস ২৯০ রানে শেষ হ'লে বোম্বাই ১৪১ রানে অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় দিনে দিল্লীর ৫টা উইকেট পড়ে ১১১ রান দাঁড়ায়।

খেলার তৃতীয় দিনে দিল্লীর দ্বিতীয় ইনিংস ২৬৭ রানে শেষ হয়। খেলায় জয়লাভের জন্যে তখন বোম্বাই দলের ১২৭ রানের প্রয়োজন হয়। এই দিন ২ উইকেটে বোম্বাই দল ১১৬ রান করে।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১১ রান তুলতে বোম্বাই দল চতুর্থ দিনে ব্যাট ধরে এবং ১৫ মিনিটের কম সময়ের খেলায় এই ১১ রান তুলে দেয়। আকাশ লালের বল বাউন্ডারীতে পাঠিয়ে ওয়াদেকার বোম্বাই দলের জয় ঘোষণা করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়: এর পরও বোম্বাই খেলে যায়। ১৩৮ রানে (৪ উইকেট) তারা ব্যাট ছাড়ে।

॥ জাতীয় লন টেনিস ॥

জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় রয় এমারসন পুরুষদের সিঙ্গেলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব লাভ করেছেন। ডাবলসের সেমি-ফাইনালে তাঁর জুডি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লাল 'ওয়াক-ওভার' পান। পুরুষদের সিঙ্গেলস সেমি-ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী রমানাথন কৃষ্ণান নরেশকুমারকে পরাজিত করে ফাইনালে যান। অপর-দিকের সেমি-ফাইনালে রয় এমারসন ভারতবর্ষের জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন। পুরুষদের সিঙ্গেলস ফাইনালে এমারসন স্ট্রেট সেটে কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন। এক বছরের মধ্যে কৃষ্ণান স্ট্রেট সেটে এমারসনের কাছে দু'বার পরাজিত হ'লেন। প্রথম পরাজিত হ'ন কলকাতার এশিয়ান লন টেনিস

প্রতিযোগিতার ফাইনালে। গত বছর উইম্বলডেন লন টেনিস প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার-ফাইনালে কৃষ্ণান স্ট্রেট সেটে রয় এমারসনকে যে পরাজিত করেছিলেন এমারসন তারই প্রতিশোধ নিলেন এই বছরের দাঁটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফাইনালে। গত এক বছরের মধ্যে এমারসনের খেলা প্রভূত উন্নত হয়েছে এবং বর্তমান অবস্থায় তাঁকে আগামীকালের উইম্বলডেন প্রতিযোগিতার যোগ্য অধিকারী বলা যায়।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

মহিলাদের সিংগলস : মিস লেসলী টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৬-৩ সেটে মিস ম্যাডোনা সাকটকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : প্রেমজিৎ লাল এবং জয়দীপ মখার্জী (ভারতবর্ষ) ৬-৩, ৬-২, ১-৬, ৬-৩ সেটে জ্যাভা-নোভিক এবং পিলিককে (যুগোস্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিংগলস : রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৪, ৬-৩ সেটে রমানাথন কৃষ্ণনকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মিস্ত্র ডাবলস : মিস ম্যাডোনা সাকট এবং রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৩ সেটে মিয়াগি (জাপান) এবং মিসেস পি এন আমেদকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিংগলস : বিনয় দেওয়ান (দিল্লী) ৩-৬, ৬-৩, ৬-১ সেটে এস এস মিশ্রকে (হারদ্রাবাদ) পরাজিত করেন।

পেটের পীড়ায়

“এন্টার্সন” একটি বিশ্বকর শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা ব্যবহারে পাকাস্থিক দৌৰ, অস, অজীর্ণ, পুরাতন আমাশয়, তরল মাস্ত, পেট বেদনা, শিশুদের রিকটস প্রভৃতি দ্রুত আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩ টাকা। মাওল পুথক।

হার্ণিয়া (অন্তর্যুক্তি)

বিনা আরে বাহ্য ঔষধ দ্বারা অন্তর্যুক্তি ও কোষবৃদ্ধি হয়। আরোগ্য হয় শুধু আর পুনরুজ্জীবন হয় না। রোগের বিধরণ সহ পত্র লিখিয়া নিয়মাবলী লউন।

হিন্দু রিসার্চ হোম

৩৩, নীলরতন মুখার্জী রোড, শিবপুর
হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৭৫৫

ভারতবর্ষ—ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট

তারিখ : মার্চ—৭, ৮, ৯, ১০ ও ১২

কিংস্টোন—সার্বনা পার্ক

জামাইকা দ্বীপের রাজধানী কিংস্টোন শহরের সার্বনা পার্ক মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা আগামী এই মার্চ থেকে শুরু হবে। কিংস্টোনে প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হয় ৩রা এপ্রিল, ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সংগে। এ পর্যন্ত কিংস্টোনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সংগে বিভিন্ন দেশের ১০টি টেস্ট খেলা হয়েছে। ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের জয় ৪, হার ৩ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২) এবং খেলা ড্র ৩। কিংস্টোনে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি হয়েছে :

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ৭৯০ রান (৩ উইকেটে ডিক্রয়ার্ড), পাকিস্তানের বিপক্ষে, ১৯৫৭-৫৮

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে : ৮৪৯ রান—ইংল্যান্ড, ১৯২৯-৩০

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের এই ৮৪৯ রান—এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রানের রেকর্ড।

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ১৩৯ রান, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৯৫০-৫৪

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে : ১০৩ রান, ইংল্যান্ড, ১৯৩৪-৩৫

সেঞ্চুরী (৩৩)

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ১৪ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪, ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৩ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ২)

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে : ১৯ (ইংল্যান্ড ৭, অস্ট্রেলিয়া ৭, ভারতবর্ষ ৩ এবং পাকিস্তান ২)

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান
ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ৩৬৫ নট-আউট—গারফিল্ড সোবার্স, পাকিস্তানের বিপক্ষে, ১৯৫৭-৫৮।

গারফিল্ড সোবার্সের এই নট-আউট ৩৬৫ রান—এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে : এ স্যান্ডহ্যাম (ইংল্যান্ড), ১৯৩০

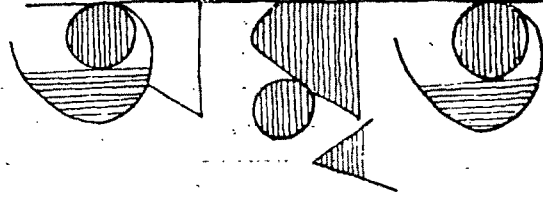
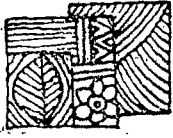
টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী
১৫৫ ও ১১০—ক্রাইড/ওয়ালকট, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ১৯৫৪-৫৫

একটি টেস্টে ম্যাচে দলগত মোট সর্বাধিক রান : ১১২১ রান—ইংল্যান্ড (৮৪৯ ও ২৭২—৯ উইকেটে ডিক্রয়ার্ড)। ১৯৩০ সালে কিংস্টোনের ৪র্থ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ইংল্যান্ড এই ১১২১ রান (১৯ উইকেটে) করে যে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করে তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

এক ইনিংসে এক দলের সর্বাধিক ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী : ৫টি—অস্ট্রেলিয়া (হার্ডে ২০৪, আচার ১২৮, ম্যাকডোনাড ১২৭, বেনো ১২১ এবং মিলার ১০৯)। ১৯৫৫ সালে কিংস্টোনের ৫ম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া এই ৫টি ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী করে যে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করে তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

এক ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সর্বাধিক ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী : ৩টি (ওয়েল ২৩৭, উইকস ১০৯ এবং ওয়ালকট ১১৮)। ১৯৫৩ সালে কিংস্টোনের ৫ম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই ৩টি ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী—ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পক্ষে প্রথম।

একটি টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী এবং ৮টি উইকেট : ১৯৫৪-৫৫ সালের টেস্ট সিরিজে কিংস্টোনের ৫ম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার কিথ মিলার ১০৯ রান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ৮টি উইকেট নিয়ে এই বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করেন।



১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৪শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 9th March, 1962
40 Naya Paise

আলোচনায় কোনো ফল নেই তবু কথা বলতে হয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন প্রসঙ্গের তালিকা সুদীর্ঘ। শিক্ষা-সমস্যাও তার মধ্যে একটি। পুরনো ব্যাধির মতো—এ ব্যাপারের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণাই আমাদের প্রায় গা-সওয়া হয়ে গেছে। এবং এ নিয়ে কাতরোক্তি করলেও বোধকরি কারো সহানুভূতি জাগে না। কিন্তু তবু কথা বলতে হয়, কারণ সমস্যাটা এতই জরুরী যে, নীরব থাকা অসম্ভব।

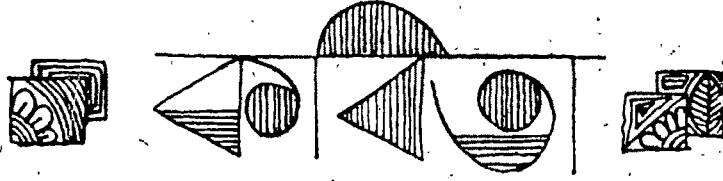
সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন এক বেদনা-দায়ক পরিস্থিতির পরিচয় পাওয়া গেল যাতে বিচলিত বোধ না করে উপায় নেই। উক্ত পরিসংখ্যান বিভাগের পক্ষ থেকে ডক্টর পি, কে, বসু কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে, কলকাতা এবং চব্বিশ পরগণার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা-ব্যবস্থা অত্যন্তই অসন্তোষজনক। পড়াশোনা, গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা, ল্যাবরেটরী এবং কারিগরী শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ সুযোগ আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা নগণ্য। কাজেই বছরের পর বছর পরীক্ষা-পাশের হার কেন এমন শোচনীয় অবস্থায় রয়ে গেছে তার কিছুটা হিঁদিশ পাওয়া গেল এই রিপোর্ট থেকে।

বিশদ আলোচনায় না গিয়েও পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্যে কয়েকটি তথ্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি এখানে। শতকরা দশটির বেশী ছেলেদের বিদ্যালয়ে এবং ত্রিশটির বেশী মেয়েদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে আলাদা কোনো ল্যাবরেটরীর ব্যবস্থা নেই। শতকরা প্রায় চল্লিশটি বিদ্যালয়ে কারিগরী ট্রেনিং-এর জন্যে কোনো আলাদা জায়গা নেই। এবং কোনো কোনো বিদ্যালয়ে কোনো কারিগরী শিক্ষকও নেই। যে-সব বিদ্যালয়ে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানেও ছাত্রদের কোনো বিষয়-নির্বাচনের স্বাধীনতা নেই, কারণ বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই মাত্র একটি অল্প-ব্যয়সাধ্য বিষয়ে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে শোভাবর্ধন করা হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষার

দিকে আগ্রহ সর্বজন-বিদিত। কলকাতার ছাত্রদের শতকরা ৪১ জন এবং চব্বিশ পরগণার শতকরা ৪২ জন ছাত্র বিজ্ঞান পড়ে। কিন্তু ল্যাবরেটরীর এমন দুরবস্থা যে তারা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে কতটা প্রস্তুত হতে পারছে তা সন্দেহের বিষয়। আর কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা এমনই অবহেলিত যে কলকাতার শতকরা ৫ জন এবং চব্বিশ পরগণার মাত্র ১ জন ছাত্র সে শিক্ষার সুযোগ পায়।

রিপোর্টে গ্রন্থাগার, পিরিয়ডিক্যাল পরীক্ষা এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাবের বিষয়েও মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু অন্ধকার যেখানে সর্বব্যাপী, সেখানে ইতস্তত আলোকপাত বা দফাওয়ারী আলোচনায় খুব বেশী লাভ হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র কলকাতা এবং চব্বিশ পরগণা জেলার বিদ্যালয়গুলিতে। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই অঞ্চলটিতেই যে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ সব থেকে বেশী তা প্রশ্নাতীত। কিন্তু সেই সর্বাপেক্ষা বেশী সুযোগপ্রাপ্ত এলাকাতেই শিক্ষা-ব্যবস্থার এমন চমৎকার আভ্যন্তরীণ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে যে এই রাজ্যের পশ্চাদ্গত অঞ্চলগুলির কথা চিন্তা করলে শিহরিত হতে হয়।

বাস্তবিক, মধ্যশিক্ষা কমিশনের সুপারিশে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের ফলে যে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটেছে, অচিরেই সে বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। নয়তো এই বিকলাঙ্গ শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে প্রতি বছর আমরা যে পরিমাণে অর্ধ-শিক্ষিত, অসহায় ছাত্রদের জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ঠেলে পাঠাচ্ছি তাতে অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের নিদারুণ প্রতিফল পেতে হবে। কারণ, মৌখিকভাবে হলেও, সকলেই একথা স্বীকার করেন যে, একটি জাতির প্রকৃত সম্পদ হল তার শিশু এবং বালক-বালিকাবৃন্দ। তাদের 'মানুষ' করে তোলার পথে আমরা যদি গাফিলতি করি তবে তা নিয়তির নির্মম পরিহাসে আমাদের সমগ্র জাতিকেই নিয়ে যাবে ধ্বংসের কিনারে।



মায়াবী নিকেতন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মায়াবী নিকেতনে
তবু কী যাবি তুই?
নিবি কী বৃকে তার
পাথর বাহবারে!

যে মেয়ে মন কাড়ে
মন্ত্র জানে সে;
কঠিন হিয়া তার
কঠিন চেনা তারে!

অবোধ নোস্ তুই
তবু রে ঝাঁপ দিবি
মরণে? চেতনার
রক্তে ভরে দিবি
পাষণ প্রতিমাকে?

মাথার চুল পেকে
গিয়েছে, হায়, তোর!
হৃদয়ে তবু তোর
এ কোন তোলপাড়!!



প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে

আশিস সান্যাল

ক্রমশঃ হারিয়ে যাবো নিষ্ঠুর প্রবাহে। হায়, কোনোদিন আর
তোমাকে হবে না বলা হে আমার প্রিয়তম নন্দিত মোহিনী
বৃকে যে রেখেছি ভাষা অতি সংগোপনে।

জানি, মেঘের দূপারে
যে কথা ছড়াতে চাই দুই হাতে আজো দীপ্ত পথের মন্দিরে
সে আর হবে না বলা। ঘনীভূত শ্রাবণের সহস্র সংগীতে
যেমন জলের ধারা বেগবান পরিণামাবী নদীর শরীরে
ঝরে যাবো নিরুদ্ভার। হে গহন প্রতিবেশী দৈবত রমণী
তোমাকে হবে না বলা সেই ভাষা সংগোপনে
রেখেছি গভীরে।

প্রতি অঙ্গে তবু বিধ। কে আমাকে ভাসিয়েছে

নিমগ্ন ভেলায়?
ভেসে যাবো শব্দহীন নিষ্ঠুর প্রবাহে। হায়, কোনোদিন আর
সম্পন্ন হৃদয় থেকে রূপবান প্রত্যয়ের ঘনিষ্ঠ আশ্রয়ে
দেবো না সম্পূর্ণ প্রীতি। অবেলার অন্ধকারে শব্দ নিবিঁকার
অভিশাপ চূর্ণ করে সময়ের মতো একা দু'র থেকে দু'রে
ভেসে যাবো অবিরাম; হে আমার নিবাসিতা পবিত্র মাহিমা।

অন্তর্জাল

পরিমল চক্রবর্তী

দ্যাখো হে বিষন্ন ছবি, হে হৃদয়, দুই চোখ মেলে।
যন্ত্রণার অন্তরীপে আমি আজ বন্দী হয়ে আছি;
আরো কতোকাল বেলো, অনুভবে দীপ্তিশিখা জেদলে
আমাকেও বাঁচতে হ'বে উল্লসিত মৃত্যুর কাছাকাছি?

আমি তো চাইনি আরু পশ্চিমপথে যেন স্থির জল
অস্থির মৃদু হৃৎ খোঁজে, অবশেষে ঝরে পড়ে যায়
সহসা মৃত্যুর লগ্নে; আজ শব্দ শব্দ শেষের সম্বল
কবিতা এবং গান, যা লিখেছি স্মৃতির পাতায়।

আমাকে ফিরিয়ে দাও, হে বিষাদ, সেই অনুভব
যার স্পর্শে সব কিছুর সোনা হয়; সেই অভিজ্ঞান—
যার তাপে দগ্ধ হয় শারীরিক সম্পন্ন বিভব;
আমাকে শিখিয়ে দাও সেই ধ্রুব আলোর বিজ্ঞান।

না হ'লে কী ক'রে বাঁচি শোকদগ্ধ এই পৃথিবীর
চেনা মাটি আকড়ে ধরে! জীবনের শান্ত পদাবলী
শব্দে শব্দে পার হ'বো না হ'লে কী ক'রে মরণের
দরজার চারকাঠ! আমি যে এখনো সূর্যনিবিড়
সেই স্বপ্নে বেঁচে আছি; পাড়ি দিয়ে স্মৃতিদহনের
যমুনা-মেঘনা-গঙ্গা খাঁজে পাই স্থির অন্তর্জাল।

দুঃসখা

জৈমিনি

একখানি চিঠি পেয়েছি। নিচে ছুবছু ছেপে দিলাম। এ চিঠির বস্তব্য বিষয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই, শুধু এর লেখকের বিষয়ে এইটুকুই জানাতে পারি যে, ইনি আমার আশেপাশে বন্ধু এবং ইদানীং একটি বড় সদাগরী অফিসের মেজো অফিসার। ছাত্রজীবন থেকেই এর কালচারের দিকে ঝোঁক ছিল এবং বন্ধুত্বমহলে ইনি ইন্টেলেক্চুয়াল বঙ্গে খ্যাতির পেতেন।

ভাই জৈমিনি, তুমি এখনো সাহিত্য নিয়ে আছ জেনে ভারি মজা লাগল। মনটা এখনো বিশেষ কোঠায় আটকে রেখেছ দেখছি। স্বর্গরাজ্যে উর্বশী ছিলেন অনন্তমোহনা, আর এই মাটির পৃথিবীতে তুমি। কিছুতেই বয়স বাড়তে দিলে না। সন্দেহ হয়, তুমি বোধ করি সশরীরেই স্বর্গলাভ করেছ। না হলে তোমার বুকের মধ্যে চিৎকার শুনতে পাইনে কেন? জীবনটা যে হিড়হিড় করে তোমাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে কি তুমি সচেতন নও! নাকি সবটাই তোমার সাজানো? বুদ্ধিতে পারিনে। কিন্তু তোমার এই সুবোধ বালকের মতো গোবেচারী ভাব যে আমার দুঃসখের বিষয় তা আমি অকপটেই স্বীকার করছি। তোমাকে আমি আঘাত করতে চাই, জাগিয়ে তুলতে চাই। দোহাই তোমার, এবার একটু সাবালক হও।

সেদিন পিকনিকে যাবার কথা বললাম, তুমি রাজি হলে না। উল্টে আমাকেই তুমি বললে ছেলেমানুষ। কেন বল তো? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে মাঝে মাঝে আমাদের শহরের বাইরে যাওয়া দরকার, ওয়াইল্ড হওয়া দরকার? পোষমানা ভদ্রজীবনে তুমি এতোই অভ্যস্ত যে তার ব্যতিক্রম কল্পনা করলেই তোমার হেঁচকি ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যাওয়া, একটু প্রাকৃত-জনের সংস্পর্শে আসা, একে আমি কিছুতেই ছেলেমানুষি মনে করতে পারিনে।

আমি জানি, তুমি একদিন সোমেন-বিভূতিদের কথা বলবে, লিলি-নন্দা এদের কথা উল্লেখ করে বাঁকা হাসি

‘নাভানা’র বই

ক বি তা

ঘরে-ফেরার দিন ॥ অমিয় চক্রবর্তী	৩০.৫০
বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা ॥ বৃন্দধদেব বসু	৮০.০০
পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী	৩০.০০
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০.০০
বৃন্দধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫০.০০
কংকাবতী ॥ বৃন্দধদেব বসু	৩০.০০
শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর ॥ বৃন্দধদেব বসু	৩০.০০

প্র ব ন্ধ

সব-পেয়েছির দেশে ॥ বৃন্দধদেব বসু	২০.৫০
আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী	৭০.৫০
পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪০.০০
রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়	৩০.০০
রক্তের অক্ষরে ॥ কমলা দাশগুপ্ত	৩০.৫০

উ প ন্যাস ও গ ল্প

প্রথম কদম ফুল (উপন্যাস) ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১২০.০০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প	৫০.০০
এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩০.০০
সমুদ্র-হৃদয় (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪০.০০
গড় শ্রীখন্ড (উপন্যাস) ॥ অমিরভূষণ মজুমদার	৮০.০০
ফরিয়াদ (উপন্যাস) ॥ দীপক চৌধুরী	৪০.০০
চিররূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ	৩০.০০
মেঘের পরে মেঘ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩০.৭৫
বসন্ত পঞ্চম ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২০.৫০
তিন তরঙ্গ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪০.০০
মীরার দুঃপূর (উপন্যাস) ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৩০.০০
চার দেয়াল (উপন্যাস) ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ	৩০.০০
বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩০.৫০
বন্ধুপত্নী ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২০.৫০
মনের ময়ূর (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩০.০০

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

হাসবে। সোমেনরা যে কিছুটা বড় তা আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু খাদের মধ্যে আল-নুনের মতো আউটিঙের দলেও দু-একটি মশলাদার লোক না হলে চলবে কী করে? আর ঐ মেয়েরা! দেখ, তোমাদের ঘোমটাতানা লক্ষ্মীঠাকুরগণদের আমি বাড়িতে বসে সাতবার নমস্কার জানাব, কিন্তু বাইরে? নৈব নৈব চ। আমরা যে বেঁচে আছি এটা বোঝবার জন্যেই লিলি-নন্দা ধরনের মেয়েদের দরকার। কী প্রিলিয়াস্ট, কম্প্যানী! ওরা সামনে থাকলে খঞ্জ লক্ষ্মীয়ে গিরি। ওরা দলে না থাকা আর গুড় দিয়ে চা তৈরি করে খাওয়া একই জাতের জিনিস। অ্যাব-সোলিউটলি বোদা, টেস্টলেস্!



বিশেষ করে লিলি। একটা বেশী হাসে, বেশী কথা বলে, কিন্তু জমাতে পারে দারুণ। আর এমন বেপরোয়া! জানো, সোদিন পিকনিকে গিয়ে ও পেয়ারা গাছে উঠে এমন করে দোল খাচ্ছিল যে সকলেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। ওর যে বয়স হয়েছে, শরীর ভারী হয়ে গেছে, সে যেন ওর খেলায়ই নেই। গাছের ডালে দুলতে দুলতে ও গান ধরল, কথাগুলো ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু কী বলব, মনে হচ্ছিল যেন আস্ত একখানা হিন্দী ছবি দেখছি।

তারপর সন্ধ্যা হয়ে আসতে, সে এক তাজব ব্যাপার। লোকে ওকে শ্যালো বলুক, বেহায়া বলুক, কিন্তু ও যে কত বড় একজন রোমান্টিক মেয়ে তার স্পষ্ট প্রমাণ পেলাম সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই। বাগানবাড়িটার চারদিকে অজস্র ঝোপ-ঝাড় ছিল সে তো বুঝতেই পারছি। সন্ধ্যার সময়ে দলে দলে শেয়াল ডেকে উঠল সেখান থেকে। আর লিলি, বললে বিশ্বাস করবে না, পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটে পা বুলিয়ে বসে অবিকল প্রতি-ধ্বনি তুলল শেয়ালের ডাকের। ওর ঐ উদ্‌মুখী ডাকে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত শিরশিরিয়ে উঠেছিল সোদিন। পারলে আমরা সকলেই শেয়াল হয়ে ওর ডাকের সাড়া দিতাম। সামান্য একটা শেয়ালের ডাকে যে এমন একটা আবহ রচনা করা যায়, কোনোদিন ভেবে দেখেছ তুমি? যাই বল তোমরা, লিলিকে আমি একজন বড় আর্টিস্ট

বলে স্বীকার করবই। সে শিল্পী, মানব-হৃদয়ের শিল্পী। আর এ কথা আমি তাকে জানিয়েও দিয়েছি। কিন্তু মুশ্কিল হয়েছে কি জানো, পিঙ্কু মিত্রটাও রাতারাতি ইনটেলেকচুয়াল হয়ে উঠেছে। শুনলাম নাকি সেও খুব সমজদার হয়ে উঠেছে লিলির ট্যালেণ্টের। এ সব ভড়ং আমার দৃঢ়চেতের বিষ। দেব একদিন এমন একসপোজ করে ওর বউয়ের সামনে, বুঝবে তখন ঠেলা।

বুঝতে পারছি, তুমি এতে বন্ধা দিতে চাইছ। তোমার ভয়, পাছে পিঙ্কুও আমার বউয়ের কাছে লাগিয়ে দেয়। না, সে আশঙ্কা নেই। ওদিকে আমি আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছি।

বুলা জানে আমি কী প্রকৃতির মানুষ। স্বামী হিসেবে আমি কিছুই লুকোইনি তার কাছ থেকে। তুমি তো জানো আমি মাঝে মাঝে 'বার'-এ যাই। বুলাকে আমি গোপন করে যাইনে। কারণ সে জানে, কিছুতেই আমার এসে যায় না। কিছুই আমার অন্তর স্পর্শ করে না। আমি বার-এ যাই, ড্রিংক করি, রেস খেলি, হারি—কিন্তু ভিতরটা আমার শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। কিছুই আমাকে বাঁধতে পারে না, তৃপ্তি দেয় না। কোনো মেয়ে যদি আমাকে তৃপ্ত দিত, বুলা বোধহয় বেঁচে যেত। আমাকে নিয়ে তার কীষে ভয়, সে যদি তুমি

জানতে। বলতে কি, আমার সম্বন্ধে বুলায় এই ভয়টুকুই বা আমার সম্বন্ধে। আর কোথাও কিছু অবলম্বন পাইনে।

কিন্তু তাই বলে যদি তুমি মনে কর আমি হেরে গেছি তাহলে ভুল করবে। আমি হারিনি, লড়াই করে যাচ্ছি। আমি শেষ না দেখে ছাড়ব না।

ভাই জৈমিনি, কয়েক সপ্তাহ আগে তুমি মদ খাওয়ার বিষয়ে দিবা একটা রম্য-রচনা ফেঁদেছিলে। তাতে ইনিয়-বিনিয় বাঙালী যুবকদের মদ্যাসক্তির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলে। তোমার ঐ শৈশব-সারল্য আমি হেসেছিলাম। তোমার মতো ওয়াশ্ডারফুল ফল আমি জীবনে দেখিনি!

মদ খাওয়াটা অন্যায় কীসে? অন্যায় বলে তারা, যারা পায় না। আর এক-দল আছেন, যারা জন্ম-জাত্যামশাই উপদেশ দেওয়াই তাঁদের পেশা। এঁদের মতে চললে সংসারটা ঋষির আশ্রম হয়ে যেত। কিন্তু গত চার হাজার বছরেও যখন তা হয়নি, তখন ও-নিয়ে ভাবনা করাটাকে নিছক পণ্ডশ্রমই মনে করি আমি। যার খুশি খাবে। পেলেও খাবে, না-পেলেও খাবে। একবার বোম্বাই শহরে ঘুরে এলেই বুঝতে পারবে 'না-পেলে' কেমন করে খায় খানেওয়ালারা।

যাক এসব কথা। আমি নিজের হয়ে কিছু সাফাই গাইছি নে। সে দর-কার আমার নেই। কারণ আমার বিবেক অত্যন্ত পরিষ্কার। শব্দ দুঃখ হয় তোমার এবং তোমাদের জন্যে। উপকথা-বর্ণিত সেই বিশেষ জীবটির মতো নাগালের বাইরে সমস্ত আঙুরই তোমাদের কাছে টক হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক তুমি কী হারাইতেছ তা তুমি জানো না।

একটা ককটেল পার্টি আছে পরশু। আসবে? লিলিও আসবে, আলাপ করিয়ে দেব। আর আসবে লিজা, আমার 'নিউ-ফাইন্ড'। বিলিতি সুরে বাংলা গান গাইবে সে, শুনলে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

তুমি হাসছ না? ওহে বোকারাম, জীবনটা যে পার হয়ে যাচ্ছে সেটা খেয়াল আছে? এনজয় কর, ধরো জীবনটাকে, তার শাঁস শুষে নাও। কুইক, কুইক, কুইক.....!

ডালেবাসা জানাই। ইতি তোমাদের রাহুল।

স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

নরেন্দ্র দেব

অনেকের মনেই এ প্রশ্ন দেখা দেয়, স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের সমসাময়িক দুই ক্ষণজন্মা



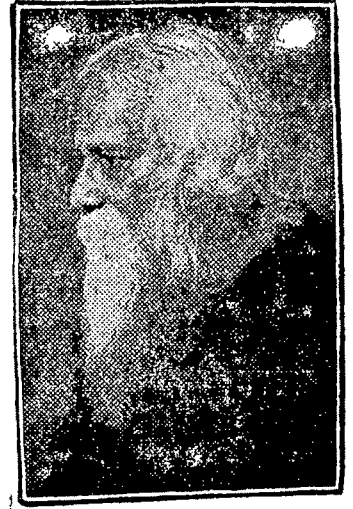
মহাপুরুষ হয়েও কেউ কারুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেননি কেন?

স্বামীজী কবিগুরু চৈতন্য বয়সে প্রায় এক বছর নয় মাসের ছোট। রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ জ্যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে। আর স্বামীজী জন্মগ্রহণ করেন বাংলা ১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ সিমুলিয়ার দত্তবাড়ীতে। সিমুলিয়া ও জ্যোড়াসাঁকো দুটি পাড়া কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের মহান পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। জ্যোড়াসাঁকোয় আদি ব্রাহ্মসমাজ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এক সময় এই আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যও হয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ ছাত্র-জীবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রায়ই আসতেন। উপাসনাতে যোগ দিতেন। ধর্মোপদেশ ও প্রার্থনা-সঙ্গীত শুনতেন। নিজেও তিনি একজন সঙ্গীতানুরাগী সুগায়ক ছিলেন। প্রেম-ভক্তিমূলক ব্রাহ্ম-সঙ্গীতগুলি তাঁর প্রাণ স্পর্শ করতো। হিন্দুধর্মের গতানু-

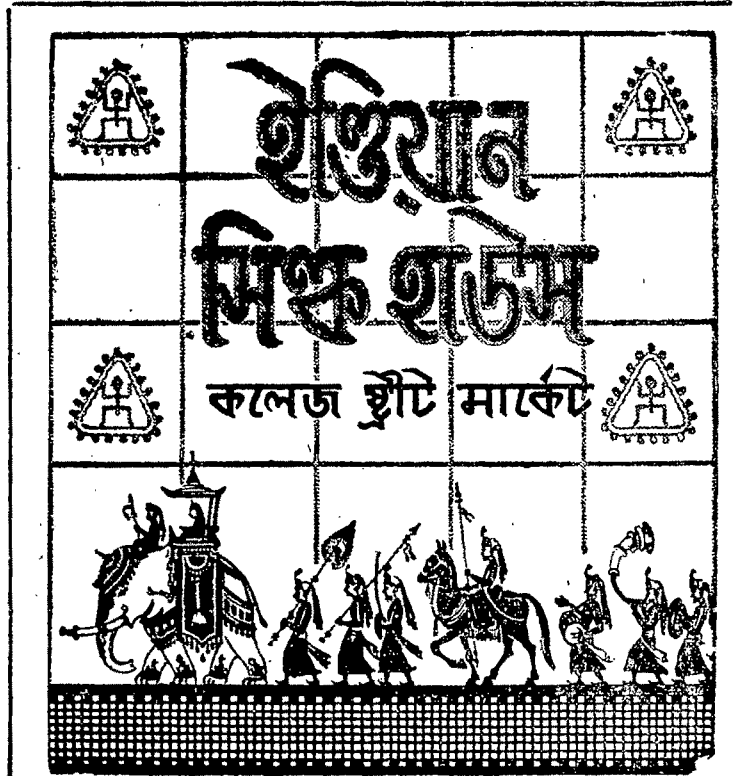
গতিকতাকে তিনি সত্যপথ বলে গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করছিলেন। সত্য-সন্ধানে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাঁর মন। প্রতিমাপূজার সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর মনে বেশ একটু সংশয় দেখা দিয়েছিল এই সময়।

এটা কিছু আশ্চর্য নয়। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত তরুণ বাঙালীদের মধ্যে ডিরোজিয়ার প্রভাব তখন পূর্ণমাত্রায় কাজ করছিল। আচার-আচরণের গোঁড়ামিতে ভরা হিন্দুমানির প্রতি তাঁদের একটা অশ্রব্ধা এবং হিন্দুধর্মের প্রতি একটা বিমুখতাও দেখা দিয়েছিল। অনেকেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু-সমাজের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম সেই সময় দেশবাসীদের বিধর্মী হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিল। হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করেছিল।



তাদের রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ভবতারিণী দেবীর পূজারী সিদ্ধ-সাধক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অধ্যাক্ষ-প্রভাব সেই সময় বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের হিন্দুধর্মের প্রতি পুনরায় আকৃষ্ট করছিল। ছাত্র নরেন্দ্রনাথ যদি দৈবক্রমে এই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা না পেতেন, তাহলে হয়ত তাঁকে আমরা একজন ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক আচার্যরূপেই দেখতে পেতুম। বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ রূপে নয়।

স্বামীজী যখন দেহরক্ষা করেন তাঁর বয়স তখনও চল্লিশ পূর্ণ হয়নি, আর



কবিগুরু তখন বিয়ার্লিশ বৎসরে পদ্যপণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বাতি তখন সারা বাংলাদেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। আর স্বামীজীর যশোভাতি তখন আসমুদ্রাহিমাচল উত্তীর্ণ হয়ে ভারতের বাইরেও নানা দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। অথচ, আশ্চর্য হ'তে হয় এই কথা জেবে যে, ভারত-আকাশের এই দুই প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক ছিলেন যেন পরস্পরের অপরিচিত। অথচ এঁদের চিন্তা ও কর্ম প্রায় একই পথ ধরে চলেছিল হরাবর।

এই দুই সমসাময়িক মহাপুরুষের জীবনানন্দ ও মনের গতি অনুসরণ করলে দেখা যায়, এঁরা উভয়েই একই লক্ষ্যের অভিমুখী। এই দুটি মহাজীবন যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যই দুটি পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনীর মতো - একই সময়ে পাশাপাশি প্রবাহিত হ'য়ে চলেছিল একই শাস্ত্রবৃত্ত সঙ্গীতের কলধনি তুলে। এঁদের পবিত্র প্রাণ-তরঙ্গের উজ্জীবন-শক্তির স্পর্শ পেয়ে ভারতভূমির শব্দক মৃত্তিকা সরস হয়ে উঠেছিল। নীরস তরুলতা হয়ে উঠেছিল মুকুলিত ও মঞ্জরিত। বালুকাক্ষম এই প্রান্তরে সবুজ তৃণ উদ্ভূত হয়েছিল।

শতবর্ষ আগে ভারতবর্ষ ছিল বিদেশীদের পদনত। তার এই পরাধীনতার ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। বারে বারে সে বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং নিজেদের একতার অভাবে, দেশ-প্রেমের অবর্তমানে, গৃহবিবাদ, জাতি-শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আক্রমণকারীদের কাছে শূন্য বার বার পরাজয় মেনে নিয়েই নিষ্কৃতি পাননি, দীর্ঘকাল দাসত্বস্বীকার করতেও বাধ্য হয়েছিল। শক, হুন, তাতার, পাঠান, মোগল ছাড়াও চীন ও রুশের সীমান্ত-বর্তী পার্বত্য দস্যুদের অত্যাচার এবং পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে পোতুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও সর্বশেষ ইংরেজের ভারতবর্ষে অবধি প্রবেশ ও নানা প্রদেশ অধিকার আমাদের দেশের অতি কলংকময় ইতিহাস।

অমিততেজা স্বামী বিবেকানন্দ ও বহুমুখী প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য আবির্ভাব যদিও এই পরপদানত অধঃপতিত ভারতবর্ষেই সম্ভব হয়েছিল, তবু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এর পশ্চাতে রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি একাধিক বাংলার মনীষীর কঠোর সাধনা

ছিল। ইংরেজের দোদণ্ড-প্রভাপে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও ভাষার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ভারতবাসীরা তখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের লৌহ-শৃংখলে বাঁধা পড়ে তাদের ভাষা শিখে ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসনকার্যের সৌকর্য সাধনেই নিযুক্ত হয়েছিল।

ভারতবর্ষের এই পরাধীন অবস্থা বোধকারি বিধাতার অভিপ্রেত ছিল। দীর্ঘকালের অনুষ্ঠিত বিবিধ অনাচার, অনাচার ও মনুষ্যত্বের অবমাননার জন্য এ শাস্তির আমাদের প্রয়োজন ছিল। এর ফলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত না হয়েছি, উপকৃত হয়েছি তারচেয়ে বেশি। বহুজাতি, বহুধর্ম, বহুপ্রদেশ ও বহুভাষায় বিভক্ত এদেশ ইংরেজের দোদণ্ড-প্রভাপে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত এক হয়ে গিয়েছিল, ইংরেজ কিন্তু এটা চাননি। তার রাজনীতি ছিল বিভেদমূলক। কিন্তু শাসনের সুবিধার জন্য সে ইংরাজী ভাষায় আমাদের অভিজ্ঞ করে তোলবার অভি-প্রায়ে সর্বভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করায় আমরা উচ্চাশঙ্কার সুযোগ পাই। এর ফলে আমাদের বুদ্ধি, দৃষ্টি ও চিন্তার সম্যক উৎকর্ষলাভ ঘটেছিল। আমাদের দেশের শোচনীয় অবস্থা সম্যক অনুধাবন করতে পেরে আমরা সৈদীন ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতপথিক মনীষীদের কৃপায় স্বাধীনিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার মধ্যে দীক্ষাজাত করে-ছিলাম। মানুষ সচেতন না হলে তো আপন অবস্থা ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না। সে চৈতন্য এনে দেয় শিক্ষা।

‘সিপাহী-বিদ্রোহ’ নামে অখ্যাত— ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ—আমাদের যে মুক্তি এনে দিতে পারেনি, বরং সমগ্র দেশকে নিরস্ত্র করে নিবীর্ণের পর্যায় নিয়ে গিয়েছিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রমোন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশ্ব-পরিচয় ঘটায় ফলে অন্তরের মধ্যে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি কামনার আলোড়ন ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠেছিল। আমাদের চিন্তায় ভাবনায় এই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল সেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধ্বে থেকেই। বাংলা দেশের শিক্ষিত মনীষী, কবি, চিন্তাশীল সাহিত্যসাধকেরা গানে, গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেম উদ্বেখনের চেষ্টা শুরু করেন। এই সময় নবগোপাল মিত্র, গণেশনাথ ঠাকুর

প্রভৃতির চেষ্টায় প্রবর্তিত ‘হিন্দুমেলা’ শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্ম-বোধ ও স্বাধীনতা-বোধ জাগ্রত করে তোলার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কিশোর মনে দেশপ্রেমের যে বীজ সৈদীন পারিবারিক আবহাওয়ায় উপ্ত হয়েছিল এই মেলার ক্ষেত্রেই তার প্রথম অংকুরের পরিচয় পাই আমরা। দেশের এই নবজাগরণের যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সৈদীন কিশোর নরেন্দ্রনাথ। উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন তিনিও এই দেশাত্মবোধে কিশোর বয়স থেকেই। এই দুই মহাপুরুষের বিচিত্র জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করলে দেখা যায় দু'জনেই অনেকটা প্রায় একই ধাতু দিয়ে গড়া। উভয়েই একই আদর্শের অভিমুখী। অথচ এঁরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে একত্রে চলেননি কোনোদিন। চিন্তায় ও ভাবনায়, আদর্শে ও কর্মে একা থাকলেও এঁদের উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত একটা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। স্বামীজীকে মনে হয় যেন পিনাকপাণি রত্নভৈরব আপন প্রচণ্ড বীর্যের দ্বারা এদেশের নিবীর্ণদের জাগ্রত করে তোলবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন; আর কবিগুরু যেন শান্তম, সুন্দরম, অনন্তমের মধ্যে দীক্ষিত এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানব-প্রেমের রত্নচারী পথিক, দেখা দিয়েছিলেন ভারতাত্মা ও ভারতীয় সংস্কৃতির লুপ্ত-ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলবার জন্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতই মন্ড-গুরু স্বামীজীরও ধ্যানের বস্তু ছিল, নিজের অক্ষয় স্বর্গকামনা নয়, মানব জন্ম থেকে নিজের মুক্তি নয়, স্বদেশের মুক্তি—জননী জন্মভূমির দাসত্বের বন্ধন মোচন। এই অধঃপতিত জাতকে আবার মানুষ করে গড়ে তুলে তার পূর্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। শূন্য ধর্ম নয়,—কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। কালের প্রভাবে ভারতের সনাতন ধর্ম অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে দেখে বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দ সৈদীন গর্জন করে ডাক দিয়েছিলেন—“উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত”—ওঠো, জাগো, যা শ্রেষ্ঠ তাই পাবার চেষ্টা করো। ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, যারা দুর্বল তারা আত্মচেতনা লাভ করতে পারেনা।’ সমস্ত জাতটাকে জেগে উঠতে হবে, বলিষ্ঠ হতে হবে। তাই ভারতবাসীর

মনুষ্যবোধকে নানাভাবে তিনি উদ্ভূত করে তুলতে চেয়েছিলেন।

চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মন্দির-কামনাই ছিল তাঁর ধ্যানের বস্তু ও সাধনার অবলম্বন। অধঃপতিত এই জাতিকে আবার মানুষ্য করে তুলে তার পূর্ব-গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ক্ষীণ ধর্মবিশ্বাসকে তার সন্দূত করে তুলতে হবে। স্বামীজী চেয়েছিলেন আমাদের ভুলে যাওয়া সেই বৈদিক আর্থ-ধর্ম ও সভ্যতাকে ভারতে আবার ফিরিয়ে আনতে। তিনি নিজেকে ছিলেন একজন উচ্চস্তরের বৈদান্তিক। বৈরাগ্যকে মন্দির-সাধনার উপায় বলে বিশ্বাস করতেন। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা অন্তর তাঁর সর্বদাই ছিল ইচ্ছা-দর্শনাবিলাষী। ‘ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা’ তাঁর সাধনার মন্ত্র। ‘আচার্য শংকরের সঙ্গে কল্কি মিলিয়ে তিনি বলেছেন—এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টি মহা-মায়ার মায়ী। রিপু জয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, জপ তপ ধ্যান যোগ ইত্যাদি কৃচ্ছ্র সাধনার দ্বারা পরমাত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াই তাঁর ধর্মসাধনা ও তপশ্চর্যার লক্ষ্য।

স্বামীজী বেশ জোরের সঙ্গেই বলে-গেছেন, ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। বলে গেছেন, আমাদের প্রধান প্রাণশক্তিই হল আধ্যাত্মিকতা। স্বামীজীর মতে প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি প্রধান শক্তিপ্রবাহ আছে। ভারতের সেই শক্তিপ্রবাহ হল তার ধর্ম। এই ধর্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজী বলতেন, “একে তোমরা বলিষ্ঠ করে তোলা। তাহলেই দেখবে দুধারের জলস্রোত তার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক এগিয়ে চলবে।.....ত্যাগই সেই নিশান, ভারতের জয়পতাকা।.....এই পতাকাবান্ড যেন হস্তচ্যুত হয় না কখনো। উঁচু করে তুলে ধরে থাকো ... এই ত্যাগই ভারতবর্ষকে অতীত যুগে জয় করেছিল। একে আবার ভারতবর্ষকে জয় করতে হবে। আজও এই ত্যাগ এই বৈরাগ্যই ভারতের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হয়ে আছে।”

ভারতের এই ত্যাগ ও বৈরাগ্যের বিবেকবাণীকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করতেন খুবই। বলেছেন, “শুনিয়েছি তারই লাগি, রাজপুত্র পরিয়াছে হিম্মরুখা, রিসম-বিরাগি পথের ভিক্ষুক।” কিন্তু জাতীয় উন্নতি তথা আধ্যাত্মিক প্রগতিলাভের পক্ষে এইটিকেই একমাত্র পথ বলে স্বীকার করতে পারেননি। এইখানেই এই দুই মহাপুরুষের চিন্তাধারা ও আদর্শের

মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। কবি বলতেন, “জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে ভগবানই আমাদের সকলকে নিকটে টানিয়েছেন। আর কাহারও টানবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়েই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা—ইহাকেই তো আমি মন্দির সাধনা বলি। জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে আমি মন্দির। সেই মোহই আমার মন্দিরসের আস্বাদন।” তাই উচ্চকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—

“বৈরাগ্য সাধনে মন্দির সে আমার নন্দ
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মন্দির স্বাদ।.....”

কবি জগতকে মায়ী বলে উড়িয়ে দিতে চাননি। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দকে তিনি মিথ্যা মোহ বলে স্বীকার করেননি। সমগ্র সৃষ্টিকেই তিনি বিশ্ব-রূপের প্রকাশ বলে মেনেছিলেন—

“যা কিছু আনন্দ আছে দেখো গন্ধে গানে,
তোমার আনন্দ হবে তারই মাঝখানে।
মোহ মোর মন্দিরপে উঠবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।”

কবি তাঁর আত্মপরিচয়ের মধ্যে বলেছেন, “তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনও অধিকার নেই। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ নিয়ে কোনো তর্ক উঠলে আমি নিরুত্তর হয়ে থাকবো।” আর এক জায়গায় বলেছেন, “ঠিক যাকে সাধারণ ধর্ম বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ দৃঢ়-রূপে লাভ করতে পেরেছি তা বলতে পারিনে।” বলেছেন তিনি, “নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপূরাতন একাত্মতা আমাকে একান্ত-ভাবে আকর্ষণ করেছে।” বিশ্ববনাথের বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানুষের কোনও পৃথক অস্তিত্ব আছে এ তিনি অনুভব করেননি। মানুষকে তিনি কোনোকালেই সৃষ্টিজাড়া কোনও জীব বলে মনে করতে পারেননি। তাইতো প্রসন্নচিত্তে বলেছেন—

“হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল,
কিছুতেই নাই ভাবনা।”

মানুষের স্বাভাবিকগর্বে তিনি সম্পূর্ণ পরিহার করে সারা সৃষ্টির সঙ্গে নিজের একাত্মতাই অনুভব করেছিলেন। বিশ্বের সঙ্গে নিজের কোনো বিচ্ছেদ তিনি স্বীকার করেননি। বরং স্বর্গ, মর্ত্য, পৃথিবীর মধ্যে এক অখণ্ড, অনন্ত প্রাণ-

সত্তাকে তিনি শূন্য অনুভবই করেননি, তার সঙ্গে নিজের একাত্মতাও নিবিড়ভাবে অনুভব করেছিলেন। তাইতো এমন অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন—

“বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো—
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।”

কবির এই বিশ্বাশ্লিষ্ট আত্মদর্শনে স্বামীজী কিন্তু সায় দিতে পারেননি। তিনি একজায়গায় সম্পূর্ণই বলেছেন, “যখন দেখা যায় একই লোক একদিকে ইউরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান এবং ন্যায়-শাস্ত্র সূচপন্ডিত, অন্যদিকে চিরন্তন কুসংস্কারগুলিকে সবলে পোষণ করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন অন্যদিকে অধীনতার শত সহস্র লুপ্ত-তলুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতিমূহুর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন। একদিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্যদিকে জীবনকে ভাবের উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন।” স্বামীজীর এ অভিযোগ তদানিন্তন অনেক উচ্চ-শিক্ষিতের বিরুদ্ধেই আনা চলে।

গুরুদেবের বিরুদ্ধেও স্বামীজীর আক্ষেপ ছিল এইখানে। তিনি তাই উচ্চ-কণ্ঠে বলে গেছেন—“ভারতের কতব্য হল তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে আক্ষুন্ন রেখে চলা। তার বিশেষ নীতি ও আদর্শ হল—‘ধর্ম’। সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি হল তার অপ্রধান কতব্য। রাজনৈতিক প্রাধান্য বা সাময়িক শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা কোনওদিনই আমাদের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিলনা।”

স্বামীজী বলতেন, “কোনও মানুষ বা কোনো জাতিই অপরকে ঘৃণা করে বাঁচতে পারেনা। ভারতের দুর্ভাগ্য সেই-দিনই নির্ণয় হয়ে গিয়েছিল যেদিন সে তার মাতৃভাষার “স্নেহ” শব্দটি উদ্ভাবন করে এবং অপরাপর জাতির সঙ্গে আপন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে।”

একথা আমরা রবীন্দ্রনাথের মূখেও শুনিয়েছি।

“হে মোর দুর্ভাগ্য দেশ,
যাদের করেছ অপমান
অপমানে হ’তে হবে
তাহাদের সবার সমান
মানুষের অধিকারে
বাগ্ধত করেছো যারে
সম্মুখে দাঁড়িয়ে রেখে
তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ’তে হবে
তাহাদের সবার সমান।”

স্বামীজী বলে গেছেন, ভারতবর্ষের মন্দির নির্ভর করে ব্যক্তির শক্তির উপর

এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের মধ্যে ভাগবত শক্তির উপলব্ধির উপর। ‘তোমরা এই মর্মবাণীটি সর্বদা স্মরণ রেখো যে, জনসাধারণের উন্নতিবিধান করতে হবে তার ধর্মবোধকে অক্ষয় রেখে। ভুল না যে তোমার জাতি বাস করছে পর্ণকুটীরে। কেউই তাদের জন্য কখনো কিছু করেনি।’

তবে তাদের আপন করবে কেমন করে? কী দিয়ে জয় করবে তাদের মন। স্বামীজী বলেছেন, “প্রেমই অর্জন করবে সেই জয়।”

কবিগুরুও এই মানবপ্রেমের উপাত্ত। মানুষের উপর তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্বন্ধে ছিল তাঁর সদৃঢ় প্রত্যয়। তিনিও ওই একই পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন বারংবার। মানব-ধর্মই ছিল তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি বলতেন, “এই মানুষের মধ্যেই দেবতা বিরাজ করেন। আমাদের অন্তরস্থ সেই সূক্ষ্ম মানবাত্মাকে জাগ্রত করতে পারলেই আমরা দিব্যজীবন লাভ করতে পারবো।” প্রস্তুত সঙ্গের মুখোমুখি হতে পারবো।” স্বামীজীও এই একই কথা বলে গেছেন বার বার—

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবৈ প্রেম করে যেইজন,
সেইজন সোঁবিছে ঈশ্বর।”

ভগবানকে ডেকে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন—“প্রভু! তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের পরম বন্ধু, তুমিই সমস্ত শক্তির মূল। তুমি অগণন ভুবনের ভার বহন করছো, হে প্রভু! আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ভার বহন করবার শক্তি আমাকে দাও।”

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এ ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। শক্তির প্রার্থনা এভাবে করেননি। কারণ, তাঁকে আমরা বলতে শুনছি, “তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শক্তি।” কবিগুরু, স্বীকার করে গেছেন,

“স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অখণ্ড
মঙ্গল
অমৃত জগত মগন সেই মহাসমুদ্রে—”

সুতরাং আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আস্তিক্যবোধ সম্বন্ধে কবিগুরু, রবীন্দ্রনাথের মতই স্বামীজী একান্ত সচেতন হলেও তাঁর মনে ধর্ম সম্পর্কে কোনও অশ্ব গৌড়ামি স্থান পায়নি।

দীন, দরিদ্র, দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারত-বাসীদের পক্ষ নিয়ে তিনি তিরস্কারের সুরে বলেছেন—“ক্ষুধার্ত মানুষদের ধর্ম-কথা বলা বা তাদের দর্শন শাস্ত্র বুঝাইবার চেষ্টা করা বিভূবিনা মাত্র.....যারা অম্মের জন্য লালায়িত, অনাহারের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করবার চেষ্টা না করে যদি ধর্ম শিক্ষা দিতে যাওয়া হয়, তবে খাদ্যের বদলে তাদের প্রস্তুত খণ্ড মাত্র দেওয়া হবে। তাতে কোনও ফল হবে না।”

স্বামীজী তাই সবাইকে ডাক দিয়ে কাজে নামতে বলে গেছেন। বলেছেন, “বড়লোক, পণ্ডিত, ধনী, এরা শুনলে বা না শুনলে, বুকে বা না বুকে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে তাতে কিছুই যায় আসে না। এরা হচ্ছেন শুধু শোভামাত্র। দেশের বাহ্যর বলতে পারো। কোটী কোটী গরীব নীচ যারা গতর খাটিয়ে খায়, তারাই হল দেশের প্রাণ। সংখ্যায় কিছুই যায় আসেনা। ধনে বা দারিদ্র্যেও যায় আসে না, কায়মনোবাক্যে যদি জাভটা এক হয়, একমুঠো লোকই পৃথিবী উলটে দিতে পারে এ বিশ্বাস তোমরা ভুলো না। বাধা যতই আসবে ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? বাধাই তো সিংহের পূর্বলক্ষণ। বাধা যেখানে নেই সেখানে সিংহ দুলভ!” সাধারণ মানুষের উপর স্বামীজীর এই প্রচণ্ড আশা ও বিশ্বাস থেকে বোঝা যায় তিনি কতবড় গণ-তান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজসেবী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা এই একই চিন্তাধারার সন্ধান পাই। তিনিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন অবহেলিত জনসাধারণই দেশের ভিত্তি ও জাতির মেরুদণ্ড। এরা না-জাগলে দেশ অগ্রসর হতে পারে না।

.....ওই যে দাঁড়িয়ে নর্তাশির
মুক সবে, স্নান মুখে
লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী,
স্বপ্নে যত চাপে তাঁর
বাহ চলে মন্দগতি,
যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
এই সব মৃত স্নান মুক মুখে
দিতে হবে ডাবা,
এই সব শ্রান্ত শূন্য ভণ্ড যুদ্ধে
যদিনিজা তুলিতে হবে অস্ত্র।

ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্ত তুলিয়া শির একর
দাঁড়াও দেখি সবে,
বার ভয়ে তুমি ভীত
সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি
তখনি সে পলাইবে ধেরে।”

তিনি বলেছেন, “দেশের দুর্গতির প্রধান কারণ—গ্রাম ধ্বংস হচ্ছে। শিক্ষিত লোকেরা পল্লীবিক্ষয়।” তিনি মনে করতেন “সরকার পরিচালিত কোনও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান বা তাদের সাহায্য-পুষ্ট কোনও সংঘ বা সমিতির দ্বারা একাজ সফল হওয়া সম্ভব নয়।” কবির ধারণা ছিল “বাইরে থেকে একটা একটা অভাবের তালিকা প্রস্তুত করে দেখা হল সমস্যাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা। যে মূল থেকে তার সকল অভাব শাখায় প্রশাখায় ছড়াচ্ছে সে হচ্ছে—প্রতিহত চিন্তাধারার শূন্যতা। মানুষের চিত্ত সেখানেই সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থ আপন শক্তির যোগে উন্মোচিত করে।

... মানুষের মনের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নি না জ্বলাইতে পারিলে, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া টানাটনি করিলে সে নড়িবে না। আবার সেই দেহকে পুষ্ট করিবার জন্য ব্যবহারিক জগতের বিজ্ঞানকে তাহার সহায় রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই দুইটি যুগপৎ চলিলেই মানুষের মন মুক্ত ও দেহ-সবল হইবে।” কবি বিশ্বাস করতেন, “মানুষের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, তাহাকে উদ্বেগ করিতে পারিলে সব দুঃখ তাপ একসঙ্গে দূর হয়।”

আমরা স্বামীজীর মুখেও এই কথাই শুনছি। তিনিও বলেছেন, “তোমরা বীর হও। দুর্বলতা দূর করো। নিজের ওপর বিশ্বাস আনো। নিজের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এস। মানুষ হও। দেশের মধ্যে দেশবাসীর মধ্যেই তোমার ভগবান আছেন। দেশকে ভাল-বাসো। দেশের সেবা করো।” তিনি বিশ্বাস করতেন “বাংলার যুবকদের অস্থি দিয়ে যে বজ্র নির্মাণ হবে তাই থেকেই ভারতের অধীনতা ঘুচে যাবে।” তিনি বলতেন “শক্তি ফস্তু কি কেউ দেয়? ও তোর ভেতরই রয়েছে। সময় হলোই আপনা আপনি বেরিয়ে পড়বে। তুই লেগে যা না। দেখবি এত শক্তি আসবে যে সামলাতে পারবিনি। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাববে

হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। ত্যাগী হচ্চে আসল কথা। ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগীই সকলকে সমভাবে দেখে, সকলের সেবায় সে নিযুক্ত হয়।”

জাতিভেদ, ধর্মভেদ, ভিন্ন আচার-আচরণ, জাতিত, কর্মভেদ, মানুষকে মানুষের কাছ থেকে যতটা পর করে ও তফাৎ করে রেখেছিল, ভাষাভেদ, আহাৰভেদ, পরিচ্ছদভেদ ও বর্ণভেদ তাদের মধ্যে ততটা বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। কবিগুরু, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ এই দুই যুগধর মহাপুরুষই বলেছেন ‘এহ বাহা’। মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের ভাবগত, আর উচ্চ আদর্শগত এবং হৃদয়ের মুহূর্ত বস্তুগত যে বিপুল ঐক্য রয়েছে সেখানে সব মানুষই এক বা অন্তর্ভুক্ত। এইখানে মানুষের এই মহান অধিকারে রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই পরস্পরের অজ্ঞাতসারে একই উচ্চ আসনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু, তথ্যটি এরা যে কেন পরস্পরের সম্বন্ধে এতটা উদাসীন ছিলেন এটা অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য ও বিস্ময়কর মনে হয়।

তবে, আমরা যদি কেউ এই দুই কালজয়ী মহাপুরুষের আদর্শ ও চরিত্র নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা ও চিন্তা করে দেখি তবে, কোনও গভীর গবেষণা ও একাগ্র অনুশীলন না করেও আমরা অনায়াসে বুঝতে পারবো যে বহুবিষয়ে এঁদের উভয়ের মধ্যে মতৈক্য থাকলেও এক বিষয়ে এঁদের দু’জনের মধ্যে বিপুল প্রভেদ রয়ে গেছে। সেটা দেশাত্মবোধ নিয়ে নয়, জাতিভেদ নিয়ে নয়, বর্ণ-বৈষম্য নিয়ে নয়, ধর্মবিশ্বাস ও কর্মের অনৈক্য নিয়ে নয়। সে প্রভেদ হল, আগে যা’ বলেছি সেই উভয়ের অনুসৃত সাধন পথের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-দেবতার আরাধনার দ্বারা যে চিন্ময় ভাবগত সিন্ধুর পথে অগ্রসর হয়েছিলেন স্বামীজীর পথ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাবের ঐক্য থাকলেও এঁরা পাশাপাশি অগ্রসর হননি। খ্রীষ্টদ্রুর কৃপায় স্বামীজী ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে কৃচ্ছ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এইখানেই প্রধানতঃ দেখি উভয়ের মধ্যে একটা তত্ত্বগত না হলেও পদ্ধতিগত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও কুণ্ঠা ছিল। যা এঁদের উভয়কে পরস্পরের অন্তর্গত করে তুলতে পারেনি।

বাই হোক, স্বামীজী কখনও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোথাও কিছু বলেছিলেন

কিনা তা জানতে পারিনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে স্বামীজীর সম্বন্ধে একাধিকবার কিছু কিছু বলেছিলেন সে পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজীর দেহ-রক্ষার কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন—“অল্পদিন পূর্বে বাংলা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্বে ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।”

ভবিষ্যৎ ভারত সম্বন্ধে স্বামীজীর একান্ত কামনা ও প্রার্থনা ছিল—“নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, জোলা, মালা, মূর্চি, মেথরের ঝুপড়ির ভিতর থেকে; বেরুক মন্দির দোকান থেকে, ভূনাওয়ালার উননের পাশ থেকে, বেরুক কারখানার কামারশালা থেকে, কুমোরের ঘর থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক রোপ জংগল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা হাজার হাজার বছর ধরে অত্যাচার সয়েছে। নীরবে সয়েছে। তার ফলে ওদের মধ্যে জন্মেছে সহিষ্ণুতা। নিয়ত দুঃখভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠা ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে। আধ-খানা রুটি পেলে ত্রিভুবনে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। এদের আছে অশ্রুত, সদাচার বল, যা পৃথিবীর কোথাও নেই। এত শক্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এমন মুখটি চূপ করে দিনে রাতে খাটা, কার্যকালে এরা সিংহবিক্রম। এদেরই মধ্যে তোমার আমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত জেগে উঠবে।”

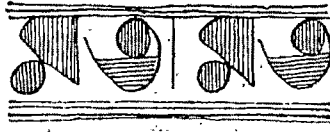
আজ ভারতবর্ষের চারিদিকে চেয়ে দেখতে পাচ্ছি—সেই গণজাগরণ শুরুর হয়ে গেছে। দীন দুঃখী দরিদ্র অবহেলিত ছিল যারা তাদের জন্য গান্ধীবাদী গ্রামোদ্যোগ আর সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা এই দুই আন্দোলন যে চলেছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “একথা মাঝে মাঝে শোনা যায়, যে এককালে আমাদের জীবনযাত্রার যে রকম স্বল্পোপকরণ ছিল তেমনি যদি, আবার হ’তে পারি, তাহলে নাকি দারিদ্র্যের গোড়া কাটা যায়। অর্থাৎ, তার মানে দাঁড়ায়

—সম্পূর্ণ অধঃপতন হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু, তাকে তো পরিগ্রহ বলে না।”

সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন, “ধনকে খর্ব করলেও যেমন অর্থসমস্যার সমাধান হবে না, তেমনি ধনকে বলপূর্বক হরণ করলেও নয়। এমন কি ধনকে বদান্যতা যোগে দান করলেও নয়। এর উপায়—ধনকে উৎপন্ন করবার শক্তি যথাসম্ভব সকলের মনের মধ্যে জাগরুক করা। অর্থাৎ ধন-সাম্যের জন্য সমবায়নীতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা।” তিনি বলেছেন, “একথা আমি বিশ্বাস করিনি, বলের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা ধনের অসাম্য কোনোদিন সম্পূর্ণ দূর হ’তে পারে। কেননা, শক্তির অসাম্যের প্রকাশ নানা আকারের হতেই হবে।”

স্বামীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ শেষ-জীবনে মৃত্ত কণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন “আধুনিককালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎবাণী প্রচার করেছিলেন। সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের লোককে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলের মধ্যেই ব্রহ্মশক্তি, দীরদ্রের মধ্যেই দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা সৈনিক যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ভাগে ফলেছে। তাঁর বাণী মানুষকে যথানি সম্মান দিয়েছে, তথানি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একবোঁকা নয়, তা’ কোনও দৈহিক প্রক্ৰিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ মনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলা দেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দৃষ্টিসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়। ভয় হয়, পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসনে সেই নবোন্মোদিত তেজকে চাপা দিয়ে স্তান করে দেয়। কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে দ্রুত করে।”

দেশের জনসাধারণের শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীজী উভয়েই একই পথের পথিক ছিলেন। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে আশ্রমিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অশ্রুত ঐক্য ও চিন্তার সামঞ্জস্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন “ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একই যোগ করিয়া দাও।” স্বামীজীরও উপদেশ “ওঠো, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, মানুষ হও। যে ধর্ম মানুষ করে সেই ধর্ম আমাদের চাই। যে শিক্ষা সর্ব-প্রকারে মানুষ তৈরি করে সেই শিক্ষাই আমাদের চাই।”



॥ আধুনিক চিত্রকলা প্রসঙ্গে ॥

অমৃত সম্পাদক সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

গত সংখ্যা অমৃতে শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষ আধুনিক চিত্রকলা সম্বন্ধে জৈমিনির মত সমর্থন করে যে পত্র দিয়েছেন আমি তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে আমি চিত্রসমালোচক নই। আমি ছবি দেখি, দেখতে ভালবাসি। আমার চোখ শিক্ষিত নয়। তাই সমালোচকের দৃষ্টিতে এবং টেকনিক্যাল শব্দপ্রয়োগে আমার বক্তব্য ভারাক্রান্ত হবে না। নিতান্ত সাধারণ মানুষের খোলা চোখ ও মন দিয়ে আমিও কয়েকটি প্রদর্শনী দেখেছি। এবং বলতে লজ্জা নেই ছবি দেখে বিরক্ত ত হই-ই নি, বরং মুগ্ধ হয়েছি। মুগ্ধ হয়েছি যে যখন শিল্প ও শিল্পীরা দেশে অবহেলিত, সাধারণ মানুষের কাছে তাদের সামাজিক মূল্য অস্বীকৃত, বঞ্চিত হবার তাদের বিধিলাপি, ঠিক তখনও প্রাণের অমোঘ তাগিদে তাঁরা রঙ ও ভুল নিয়ে মগ্ন। বৈশ্য সভ্যতার প্রতি দারুণ অবজ্ঞা পোষণ করে তাঁদের নিঃশব্দ বিদ্রোহ মানবতার জয় ঘোষণা। শ্রীযুক্ত ঘোষ যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র সমস্যাটা বিচার করতেন তবে ক্যাটালগে লিখিত ছবির দাম হাস্যকর বলে মনে হত না। কারণ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী চিত্র-রসিকেরা যদি সত্যিই ছবি কিনতে চাইতেন তবে অন্য খরচা একটু কমিয়ে ছবি সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে একেবারে অসাধ্য হত না। তা তাঁরা করেন না। অবশ্য না কেনার পিছনে নিশ্চয়ই অন্য যুক্তি আছে। কিন্তু শিল্পীরা ত বছরে একবার মাত্র সহানুভূতিসম্পন্ন ক্রেতার দর্শন পান। তাই উচ্চমূল্যে ছবি বিক্রি করার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিতে বাধ্য। কম দামে বেশি জিনিস বিক্রি করা যায়। ব্যবসায় রীতিতে তাকে স্বীকার করা যায়। কিন্তু জিনিস যখন কম বিক্রি হবে তখন বেশি দাম না করে উপায় কি! তাই ক্যাটালগে উল্লিখিত দাম দেখে

আমার হাসি আসে নি একবারও। বরং দুঃখ পেয়েছি। দুঃখ পেয়েছি এই ভেবে যে জীবনের ওপর অর্থনীতির কি মারাত্মক কর্তৃত্ব! শিল্পীরা, বিদ্রোহীরা, আস্তে আস্তে কি করে শিল্পে অনিভিজ্ঞ বিস্তারনের দানের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছেন। বোধহয় এইভাবে প্রশ্নটিকে বিচার করলে শিল্পী এবং রসিক-সমাজ উভয়েই উপকৃত হবেন।

কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষ যেন এই ধারণা পোষণ করেন যে যেহেতু আধুনিক চিত্র-শিল্পীরা ড্রইং বর্জন করেছেন তাই তাদের ছবি আদৌ শিল্পের পর্যায়ে যায় না। এখানে অবশ্য তিনি কোন শিল্পীর নাম করেন নি। তাই মনে হয় তাঁর এই মন্তব্য সমগ্র আধুনিক চিত্রশিল্পীর প্রতি। আমিও কোন শিল্পীর নাম করতে চাই না। কারণ তাতে তর্ক বিস্তৃত হতে পারে, যদিও সং আলোচনার জন্য তা অপরিহার্য বলে বোধ করি। কিন্তু আমি প্রশ্ন করছি যে সমস্ত আধুনিক চিত্র-শিল্পীরাই কি ড্রইং বর্জন করেছেন? এই-ই কি আধুনিক চিত্রশিল্পের তর্কাতীত বৈশিষ্ট্য? আমি এখনি বেশ কয়েকজন তরুণ শিল্পীর নাম করতে পারি যাঁরা পুরাতন প্রথায় ড্রইং চর্চা করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে তাঁরা ড্রইং আঁকছেন। কিন্তু ছবি আঁকছেন কি না সন্দেহ। অথচ এমন ছবিও আছে ব্যাকরণগত ভুল নিয়ে, ড্রইং-এর চর্চা নিয়েও শ্রেষ্ঠ শিল্পের সম্মানে ভূষিত হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীযুক্ত ঘোষ ড্রইং-এর নোতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভাবের কথা বলেছেন। হয়ত বিশুদ্ধ ড্রইং-এর কথা বলেছেন না। যদি তাই-ই হয়, তবে আমি এই অভিযোগ স্বীকার করতে স্বেচ্ছান্বিত। কারণ আমার মনে হয়েছে আধুনিক তরুণ চিত্রশিল্পীরা ছবির টোন-এর ওপর যত জোব দেন তত জোর আর কোথাও পড়ে না। শ্রীযুক্ত ঘোষ আরও অভিযোগ করেছেন যে আধুনিক শিল্পীরা দেশকে নির্বাসিত করেছেন। সমস্ত অভিযোগের মধ্যে এই অভিযোগটাই মারাত্মক ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমার বিশ্বাস এবং আশা করি বহু পাঠকই একমত হবেন যে দেশের গভীরে শিকড় চালাতে না পারলে কোন শিল্পই

শিল্প হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই শিল্পকে ঐতিহ্যশ্রয়ী হতেই হবে। কিন্তু প্রশ্নটি জটিল। কি আমার দেশ, কি-ই তার ঐতিহ্য? এই ঐতিহ্যের নাম করে পট-পটুয়াদের অনুদারক হব? তাতেই কি পানি যাবে দেশের আত্মার স্থান? না আমার দেশ আছে ছবিতে আলোর ভূমিকা প্রকাশ করায়? কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীযুক্ত ঘোষ বিশ্বাস করেন যে আমাদের আলো সূর্য ইত্যাদি থাকলে ইয়োরোপের মতলি অন্ধকার আকাশ থেকে মুক্তি পাবে। আমি তা মনে করি না। প্রশ্নটি রঙ বা ভঙ্গির নয়। প্রশ্নটি অন্তরের। ভারতের শিল্পধারায় এক বিশেষ ধরনের ইসথেটিকস গড়ে উঠেছে, জীবনকে দেখা ও প্রকাশ করার এক বিশেষ ধরনের মনোভঙ্গি গড়ে উঠেছে যা ইউরোপ থেকে স্বতন্ত্র। আর আমরা ইয়োরোপীয় ডাবনায় শিক্ষিত। এই দুই বৈপরীত্যে এক দারুণ সংকট এসেছে শিল্পীর মনে। কয়েকটি প্রদর্শনী থেকে আমার অন্তত এই ধারণা হয়েছে। আজকে শিল্পীরা পথ খুঁজছেন, দেশের আত্মার পথ, যা জীবন্ত, বিকাশমান, জটিল ও ক্রমবর্ধমান। তাই তাঁরা সহজেই পটের চঙে ফিরতে নারাজ; অতীতের ক্রান্তিহীন পুনরাবৃত্তিতে অক্ষম। আবার ঢালাও পশ্চিমী হতেও স্বেচ্ছান্বিত। তাঁরা স্থানীয়। শ্রীযুক্ত ঘোষ আধুনিক শিল্পীদের সেই সম্বন্ধের সাধনাকে দেখতে পান নি। এবং তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ঐতিহ্যের প্রশ্নটি বড়ই জটিল। তবে আমি শ্রীযুক্ত ঘোষের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে আমাদের দেশে কি সাহিত্যে কি শিল্পে সং ও শিক্ষিত সমালোচনার বড় অভাব। সমালোচনার উদ্দেশ্য দলভারী করা কিংবা কোন্দল করা। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। এখনও পাঠক ও দর্শকের নিজেদের বিচারপন্থি নিয়ে এগিয়ে আসতে পারছেন না বলেই অসাধু লোকেরা আজও কুলগুরু।

ইতি—

হরিদাস রায়, কলকাতা।

অমিত্র
কুমার
স্বৈচ্ছন্দ

নাচের
পুতুল



‘এ লোকটাকে চিনিস?’

‘কোন লোকটা?’ এদিক ওদিক তাকাতে লাগল রামেন্দু।

‘এ যে রে—’ অমল্য তর্জনী তুলল।

‘যে লোকটা জ্যোতিষীকে হাত দেখাচ্ছে?’

‘হ্যাঁ—’ নিজেই কেমন যেন ধারণা করতে পারছে না। অমল্য আবার একটু দেখল খুঁটিয়ে : ‘হ্যাঁ, ও-ই তো।’

হেঁজ-পেঁজির বেশি তো কিছু মনে হচ্ছে না। সাদামাটা জামাজুতো, হয়তো বা একটু ছেঁড়া-খোঁড়ারই গা মে'ষে। চুল উসকো-খুসকো, দৃ-একদিনের দাড়ি গোঁফও বুঝি জমে রয়েছে মুখে। তেমন কিছু সর্বিশেষ বলে তো ঠা'হর হচ্ছে না একনজরে।

‘কে?’ অমল্যর গুঁথের দিকে তাকাল রামেন্দু।

‘না, ভুই কী করে চিনবি?’ এক পা এগিয়ে এল অমল্য। ‘ভুই চলে যাবার পর ও এসেছিল। শালা, হারামজাদা—’

‘সে কি রে! গালাগাল দিচ্ছিস কাকে?’

‘এ গুঁথোরটাকে।’ অমল্য ভড়পে উঠল : ‘শালা আমাকে কম জ্বালিয়েছে? কত ক্ষতি করেছে?’

‘কে ও?’ কোত'হলে তীক্ষ্ণ হল রামেন্দু।

‘মিস্টার রজলাল সান্যাল।’

নামের কোন জায়গাটায় জোর চট করে বুঝে নিল রামেন্দু। ‘মিস্টার—মিস্টার, কেন?’

‘ওরে বাবা, সাহেব যে। শ্রী কিম্বা বাবু ব'লো না, খেপে যাবে।’

‘বলিস কী!’ রামেন্দু হেসে উঠল : ‘সাহেবের সা-ও তো নেই কোথাও।’

‘কিন্তু শালার শা ঠিক আছে।’

আরো উঠে রোল তুলল রামেন্দু। ‘করে কী লোকটা?’

‘এককালে তো রাধাকৃষ্ণ করত, এখন আর কী করবে, এখন টাঁ টাঁ করে।’

হঠাৎ গম্ভীর হল অমল্য। ‘রাজসাহীর ডিস্ট্রিট জজ ছিল।’

‘সে কী রে?’

‘হ্যাঁ, তাই। কোনো দাগ-চিহ্নও নেই বুঝি চেহারায়।’ যেন ধর্ম দেখছে এমনি চাপা আক্রোশের সুরে অমল্য বললে, ‘পাকিস্থান অপ্ট করেছিল শুনছি। পাকিস্থান ফাঁকিস্থান হয়ে গিয়েছে, তাড়িয়ে দিয়েছে ঘাড়ে ধরে।’

‘সত্যি?’ একটু বুঝি বা সহানু-ভূতির সুর আনল রামেন্দু। ‘তা ওখানে ও করছে কী?’

‘মু'ন্ড করছে।’ সবজানতার মতই বললে অমল্য। ‘হাত দেখাচ্ছে কোথাও একটা কাজ-কাম জোটে কিনা। চোরের মন কেবল বোঁচকার দিকে—’

বলতে না বলতেই শুনতে পেল জ্যোতিষীর সঙ্গে রজলালের কী মতান্তর ঘটেছে। মতান্তর হতেই বচসা। আর

বচসার সমাধান না হতেই অর্ধপথে পালাল ব্রজলাল।

‘এখনো মেজাজ আছে ষোল আনা।’ দিক্কারের মতন করে বললে অমূল্য।

পা চালিয়ে দুজনে জ্যোতিষীর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

‘কী হয়েছে?’

‘ভদ্রলোক কি পাগল?’ জ্যোতিষী তাকাল হতভম্বের মত।

‘কেন, কী বলে?’

‘হাতটা কোলের সামনে মেলে দিয়েই জিগগেস করলে, অসুখটা সারবে?’ জ্যোতিষীর মনে ক্রুদ্ধ বিরক্তি : ‘অসুখটা কার তা তো অন্তত বলবে! তবে না বলতে পারি—’

‘আপনি কী বললেন?’

‘বললাম, অসুখটা কার?’ শুনলেই ভদ্রলোক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বললে, কার অসুখ তাই বলুন না হাত দেখে। আচ্ছা মশাই, তা কি কখনো বলা যায়? কার অসুখ আগে শুন, তারপর রেখাবিচার করে বলে দিই সারবে কিনা। আমি তো কী অসুখ জানতে চাইনি, কার অসুখ জানতে চেয়েছি। তাইভেই মাথা-গরম।’

‘বা, রেখাবিচার করে আপনারই তো বলে দেওয়া উচিত কার অসুখ।’ রামেন্দু ব্রজলালের পক্ষ নিতে চাইল। ‘নইলে আপনি কেমন জ্যোতিষী?’

‘কার অসুখ তার জন্যে আবার জ্যোতিষ লাগে নাকি?’ অমূল্য উপহাস করে উঠল : ‘যে মর্তিমান এসেছিল তারই অসুখ। দেখলেন না চেহারাতা?’ গাল-গলার মাংস কেমন ঝুলে পড়েছে। আর অসুখটা তো চোখ বুজেই বলে দিতে পারি। ব্লাডপ্রেসার, হাঁপানি, ডায়-বেটিস—’

‘তা বিচারকালে সব বেরুত।’ জ্যোতিষী বললে শান্ত হবার চেষ্টায় : ‘কিন্তু গোড়াতেই যদি কেউ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, গাল দিয়ে ফেলে—’

‘গালাগালও করেছে নাকি? সব সেরকমই আছে দেখছি, বদলায়নি স্বভাব।’ অমূল্য চিন্তিত মুখে বললে, ‘জমক গেলেও ঠমক যায়নি।’

‘আমিও বলে দিয়েছি, এই কচু সারবে। কিছুতে সারবে না।’ জ্যোতিষী প্রতীশোধ নেবার ভাঙতে বললে।

‘নিশ্চয় শুনতে পারিনি।’ রামেন্দু

বললে, ‘শুনতে পেলে ঠেঙা নিয়ে তেড়ে আসত।’

‘রাখো!’ গর্জে উঠল অমূল্য। ‘সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।’

‘এখন শব্দ বাদরের দাঁতিখুঁচনি।’

হাঁটতে-হাঁটতে এগুলো দুজনে।

রামেন্দু জিগগেস করলে, ‘ভদ্রলোকের উপর তুই এত চটা কেন?’

‘শালা আমাকে কঠিন ফাঁদে ফেলে-ছিল একদিন। তেমনি দেখ না কেমন হাল হয়েছে।’ রসিয়ে-রসিয়ে বললে অমূল্য। ‘উব্ধ হয়ে বসে রাস্তার গণ্ডকারকে হাত দেখাচ্ছে। মাদুলি নিচ্ছে অসুখের। খুব হয়েছে। ঠিক হয়েছে।’

‘কিন্তু, কেন, কী হয়েছিল?’

সদরলাল গুণেন চাটুজের বদলি হলে এল ব্রজলাল। ব্রজলাল নাম শুনলেই ধারণা হয় ফৌটা-তিলক কেটে গায়ে নামাবলী জড়িয়ে বসেছে। কিন্তু এ ব্রজলাল দুঃসহ সাহেব। পোশাকে-আশাকে ছুরির মত ধারালো। মুখে গম্ভীর পাইপ। টাস-টাস ইংরিজি।

কোটের কালো কোট পরেই বাড়ি থেকে সটান আসে না। কালো কোট কোটেই থাকে। অতিরিক্ত কোট চড়িয়ে এসে এজলাসে ওঠবার আগে কালোতে বদলে নেয়। ব্যান্ড শব্দ কোটের সময় টুকু। বাকিটা নেকটাই। এ সব ফুটানিকে মফঃস্বলে কে প্রশয় দেয়? কে অত চক-চকে ঝকঝকে থাকতে আয়াস করে? যিকেল সাহেবদের ক্লাবে গিয়ে টেনিস খেলবারই বা দরকার কী! নাম তো এদিকে ব্রজলাল।

অহংকারে মটমট করছে।

কটা ডিক্রি সই করাতে এসেছিল অমূল্য।

এক নজর দেখেই ব্রজলাল বললে, ‘ডিক্রিতে আমার নামের আগে বাবু লিখেছেন কেন?’

প্রথমটা অমূল্য বিনয় করেই বললে, ‘তবে কী লিখব?’

‘মিস্টার লিখবেন।’

কানে যেন গলানো সিসে ঢালা হল। অমূল্য বললে, ‘এ যাবৎ সবজজ কোর্টের ডিক্রিতে বাবুই লিখে এসেছি। শব্দ জজ—এডিশনাল জজের বেলায়ই মিস্টারের ব্যবহার।’

‘তর্ক করবেন না। এ ব্যক্তিগত রুচির কথা।’ দৃষ্ট মুখ দেয়ালের দিকেই নিবন্ধ রাখল ব্রজলাল। ‘আমি যদি আমার

সান্যালকে স্যানিয়াল করি তাই মানতে হবে দুনিয়াকে।’

‘আর সব সবজজবাবুরা যদি বাবু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, আপনিই বা কেন—’

কথাটা শেষ হতে দিল না। ফেটে পড়ল ব্রজলাল : ‘তারা সব সবজজো, জবোথবো, তারা সবজজ নয়। তাদের মধ্যে শব্দ ও-কার, ভুঁড়ির ওকার। তাদের মধ্যে হসন্ত নেই, স্মার্টনেস-এর হসন্ত। সুতরাং তাদের সঙ্গে তুলনা করবেন না। যা বলছি শুনবেন। মিস্টার লিখবেন।’

‘তা হলে একটা স্ট্যান্ডিং অর্ডার দিয়ে দিন। লিখে দিন অর্ডার-বুকে।’

কথার আসল মানে কথায় নয়, কথার সুরে। পাইপের ডাটটা নির্মম দাঁতে চেপে ধরল ব্রজলাল। ‘আমি মুখে যা বলছি তাই আমার স্ট্যান্ডিং অর্ডার। আপনি সাব-অর্ডিনেট ক্লার্ক, অধীনস্থ কর্মচারী, আমার মৌখিক কথাই আপনার বেদ-বাক্য।’

অমূল্য মুখে আর কিছু বলেনি বটে, কিন্তু তার হাব-ভাব-ভাঙ্গ, এমনকি ভাঙ্গর ছায়াটুকু পর্যন্ত বোঝাতে চেয়েছে এ সাহেব নয় এ খার্নসামা।

সেই থেকে ব্রজলালও রুদ্ধ।

কড়া চোখে ইনস্পেকশন শব্দ করল ব্রজলাল। অমূল্যের সেরেসতার আলমারির মাথায় পাওয়া গেল কতগুলো মামলার পুরোনো রেকর্ড, সাত-আট মাস আগে নিষ্পত্তি হয়ে গেলেও যাদের ডিক্রি এখনো লেখা হয়নি। না, কতক বুদ্ধি হয়েছে লেখা। আরো একটু তালিয়ে দেখল ব্রজলাল। মনে হল ডিক্রিতে পূর্ব-বর্তী হাকিমের, গুণেন চাটুজের, যে সই করা হয়েছে সেটা জাল, অমূল্যের নিজের হাতের তৈরি।

ব্রজলাল কৈফিয়ৎ চাইল।

‘এত সব ডিক্রি ভু-আপ করেননি কেন?’

মুখে যা এল তাই বললে অমূল্য। বললে, ‘বাড়িতে ছেলোটর অসুখ—’

ব্রজলাল কথাটা গায়েও মাখল না। ‘ছেলের অসুখে জগৎ-সংসার চলতে পারে, আপনি কোর্টে আসতে পারেন, খেতে-শুতে চলতে-ফিরতে পারেন, আর সময়-মত ডিক্রি কটাই লিখতে পারেন না?’

অমূল্য চুপ করে রইল।

‘আর এসব কী করেছেন?’ ব্রজলাল কঠিনতর হল। ‘ও ডিক্রিগুলিতে

হাকিমের সই বলে যে হিজিবিজি আঁচড় টানা হয়েছে এ কার হাতের?’

‘সমস্ত আগের হাকিমের।’

‘আমার প্রিডিসেসরের? মানে গুণেনবাবুর?’

‘হ্যাঁ, স্যার, মিস্টার চ্যাটার্জির।’

‘মানে গুণেনবাবুর?’ ফেটে পড়ল ব্রজলাল : ‘মিথ্যে কথা। সমস্ত আপনার হাতের। আপনি গুণেনবাবুর সই জাল করেছেন।’

‘আমাকে যদি বিশ্বাস না করেন—’
এর বেশি কিছু বলতে পারল না অমল্য।

আমলাদের মধ্যে যারা গুণেনবাবুর-
আমলে কাজ করেছে, যারা তাঁর সই চেনে,
সবাইকে এনে দেখাল ব্রজলাল।

কাক হয়ে কাকের মাংস খাওয়া যায়
না, হাঁ—না কিছুই কবুল না করে
আমলারা চুপ করে রইল।

শুধু নিভুতে সেরেস্তাদার এল দেখা
করতে।

‘সমস্ত জাল, স্যার। নিখুঁত জাল।’

‘তা বুঝতে এক্সপার্ট লাগে না, খালি-
চোখেই বোঝা যায়।’

‘ডিক্রির নকলের জন্যে যখন দরখাস্ত
পড়ে,’ বললে সেরেস্তাদার, ‘তখনই
ডিক্রিটা ড্র-আপ করে আর হাকিমের সইটা
নিজেই বসায় কায়দা করে। আঁচড় কেটে-
কেটে রস্তু করে নিয়েছে সই।’

‘টু-পাইস আছে নিশ্চয়ই।’

এর আর কী উত্তর দেবে, শৈশবসরল
গুথে হাসল সেরেস্তাদার। বললে, ‘এর
চেয়ে আরো মারাত্মক জিনিস আছে।
দখলের পরোয়ানা। সেখানেও
জালিয়াতি।’

‘আমি প্রসিডিং করব।’ পাইপের
গহ্বরে জ্বলন্ত কাঠি গুঁজল ব্রজলাল।
‘যদি দস্তখৎ অস্বীকার করে, সাক্ষী
মানব গুণেনবাবুকে। এক্সপার্ট ডাকাব।’

অমল্যার বিরুদ্ধে প্রসিডিং করল
ব্রজলাল।

অমল্য প্রথমে সর্বেশ্বর দেখল।
পরে দেখল ঢালা অন্ধকার।

এ প্রায় কাক মারতে কামান পাতা।
বাড়াবাড়ি মনে হল অমল্যার। ড্র-আপ
করতে দেরি হয়েছে বলে কটা ডিক্রি আর
‘রিট’ যথাসময়ে গুণেনবাবুকে দিয়ে সই
করানো হয়নি। যদি সেগুলো এখন
নিরে যেত ব্রজলালের কাছে, ব্রজলালকেই

বুকল্যান্ড : প্রবন্ধ গ্রন্থের বিশিষ্ট প্রকাশক

**লিপি-
বিবেক**

ডঃ বিজ্ঞানবিহারী
ভট্টাচার্য

৬০০
সদ্য
প্রকাশিত

মোহিতলাল মজুমদারের

**প্রাকান্তের
শরৎচন্দ্র**

১০০০

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের

**রবীন্দ্র সাহিত্যে
গদ্যবল্লার স্থান**

৬০০

সোমেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্র অ ভধান

১ম খণ্ড ৫০০

[দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ]

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**ঊনবিংশ শতাব্দীর
প্রথমার্ধ ও বাংলা
সাহিত্য**

১০০০

ভূদেব চৌধুরীর

বাংলা সাহিত্যের

ইতিকথা

১ম, ২য় ১২০০, ১২০০

**বাংলা সাহিত্যের
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস**

৭০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

**চণ্ডীদাস ও
বিদ্যাপতি**

১২০০

সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

**কালিদাসের কাব্য
ফুল**

৪০০

গোপিকাননাথ রায়চৌধুরীর

**বিভূতিভূষণ : মন ও
শিঙ্গা**

৩০০

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভারতের জ্ঞানাবজ্ঞান

৬০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

ইডেনে শাওয়ের দুপুর

[ট্রিকিটের বই] ৩৭৫

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদিত

নবীনচন্দ্র সেনের

**রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-
প্রভাস**

৮০০

অরবীন্দ্র চৌধুরীর

**বাংলা নাট্যবিবর্ধনে
গি. শচন্দ্র**

৫০০

শিশির দাশের

মধুসূদনের কবিমানস ২.৫০

ধীরানন্দ ঠাকুরের

রাবীন্দ্রকী ৪.৫০

গোপালদাস চৌধুরী ও প্রিয়রঞ্জন সেন

সম্পাদিত

প্রবাদ বচন ৬০০

বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

আজকের তারিখ দিয়ে সই করে দিতে হত। বড়জোর দেরি করার গাফিলতিব জন্যে গালাগাল করত। তার বেশি নয়। সই করার পরিশ্রম ব্রজলালকেই ভুগতে হত অকারণে। গুণেনবাবুর সই নিজে করে দিয়ে অমূল্য বরং ব্রজলালের উপকার করেছে, তার শ্রম লাঘব করেছে। আর টু পাইস? যেখানে সর্বাপেক্ষে ঘা, সেখানে ওষুধ লাগাবে কোথায়! আদালতে হাসলেও মূন্ডো, কাঁদলেও হারী।

শো-কজ-এর উত্তরে অমূল্য নট-গিলটি গিলড করল। বলল, কথিত দস্তখৎ স্বয়ং মিস্টার গুণেন চ্যাটার্জির করা।

দোষ স্বীকার করলে বরং শাস্তিভার কমে। কিন্তু অমূল্য সত্যের ধার দিয়েও গেল না। বললে, হ্যাঁ, প্রমাণ করো।

তা না করে আর উপায় কী। গুণেনকে সমন পাঠাল ব্রজলাল। তছাড়া একজন হস্তলিপিবিদ্যারদকেও ডলব করল।

কেউ-কেউ বললে, এত জবরদস্ত না হলেও চলত।

‘বা, ওতে আমার কী করণীয় আছে?’ নিলিপ্ত মুখে বললে ব্রজলাল। ‘এ বিচারের ডাক।’

অন্ধকারে তবু আশার পাড় বুনল অমূল্য। ভাবল, গুণেনবাবু এলে তাঁর হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে তাঁকে দিয়ে বলাবে, ঠিক মনে করতে পারছি না এ আমার সই কিনা। আর হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট? সে ঢৌক গিলতেও এক্সপার্ট। এ সই অমূল্যের হাতের নয় সরাসরি এ বলতে না পারলেও কান চুলকে এ কোন না বলতে পারবে, এ জটিল হিজিবিজি, পাঠোদ্ধারের বাইরে। সুতরাং সন্দেহের অবকাশ। আর সেই অবকাশেই পাশ কাটানো।

গুণেন এক ডাকে বললে, এ সব সই তার নয়। তবে—

আর বিশেষজ্ঞ যা বললে তা ভয়াবহ।

বললে, ডাকবাংলোতে অমূল্য গিয়েছিল দেখা করতে। ঘর দিতে চেয়েছিল। যেন বলি ও সব সই গুণেনবাবুর। অতদূর না যাই যেন অন্তত বলি, আঁকি-বঁকি লেখা, বৈজ্ঞানিক নিগ্ন অসম্ভব। এও বলা যায় ও ও বলা যায়।

‘ঘর দিতে চেয়েছিল!’ মূল কান্ডের থেকে আরেকটা শাখা বার করল ব্রজলাল।

‘সেটা পরে হবে। কিন্তু বিরোধী সই-গুলো সম্পর্কে আপনার মত কী!’

‘নিজেরা অমূল্যের রচনা।’

এ সময় আরেকটা কান্ড ঘটল। ইংরেজ জজ ছুটি নেওয়ার দরুন রিক্ত সিংহাসনে প্রমোশন পেয়ে উঠে বসল ব্রজলাল। এতদিন খাস কামরায় খালি মেঝের উপর পা রাখছিল, এবার পা রাখল কার্পেটের উপর।

অমূল্য শূদ্ধ অন্ধকার দেখল না দেখল বিভীষিকা।

সাবজজ থাকলে শূদ্ধ দোষীই সাব্যস্ত করতে পারত, শাস্তি দিতে পারত না। ডিপার্টমেন্টাল প্রিন্সিপাল শাস্তি দেবার মালিক স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট জজ।

কী ভাগ্যের পরিহাস, ব্রজলালই কিনা এখন হত্যাকর্তাবিধাতা। হাতে মাথা কাটবার অধিকারী।

কেউ বললে, ‘সোজাসুজি হাতে-পায়ে গিয়ে ধরো। শত হলেও মানুষ তো। একেবারে তো পায়ণ হয়ে যাবনি।’

‘এবার আর ছেলের কথা না বলে স্ত্রীর কথা বোলো। সাহেবদের দয়ামায়া স্ত্রীতে’—পরামর্শ দিল আর কেউ।

সেরেসতাদারকে নিয়ে খাসকামরায় দেখা করতে এল অমূল্য। হাতজোড় করে নিরুপায় মনে বললে, ‘যা অপরাধ করবার তো করেছি। শাস্তিটা যদি একটু কম-সম করে দেন—’

গুম হয়ে বসে রইল ব্রজলাল।

‘ছেলেটার খুব অসুখ। যদি তেমন কঠিন কিছু শাস্তি হয়, ছেলেটার চিকিৎসার ব্যাঘাত হয়, পড়াশোনায় বাধা পড়ে, তা হলে মরে যাব হুজুর—’

ক্ষুদ্র একটু প্রকৃষ্টও হল না ব্রজলালের। পাছে ওরা বেশিক্ষণ থাকে, ইনিয়-বিনিয়ে কাঁদনি গায় চেয়ার থেকে উঠে পড়ল ঝটকা মেরে।

হাতে মাথাটা কাটল না বটে কিন্তু একটা কান কেটে দিল। চাকরিতে নামিয়ে দিল নিচে। কমিয়ে দিল মাইনে।

‘শালা, হারামজাদা—’ অর্ডার শুনবে বলে উঠল অমূল্য। ‘নিজে প্রমোশন পেয়েছে কিনা তাই অন্যকে নামিয়ে দিতে বড়ো সুখ! পাজী, স্কাউন্ডেল—’

আহা-হা দেখ, ভাগ্য কত দূর নামিয়ে দিয়েছে।

রামেন্দুকে বিদায় দিয়ে ট্রাম ধরবে অমূল্য, দেখল স্টপে ব্রজলাল দাঁড়িয়ে।

কই রে তোর গাউন কই, তোর কোট-প্যান্ট, তোর ব্যান্ড-টাই? কই রে তোর সেই ব্রজবুলি, সেই চিবোনো ইংরিজি, দাঁতে কামড়ানো পাইপ? হ্যালো মিস্টার স্যানিয়েল, কাছে গিয়ে ডেকে উঠব নাকি মূখ বাড়িয়ে? কিংবা বক দেখাব? ও কী আর করতে পারে আমার? কলা দৌঁখিয়ে যদি ওকে জয়-জগন্নাথ দেখারও নিমন্ত্রণ করি, ও কিছর বলতে পারে না। মাথা কাটার আর ওর হাত কই, কই প্রিন্সিপিও করার ক্ষমতা? সম্পদ ঘোঁষন কারা শরতের মেঘছায়া। সব উড়ে গিয়েছে এক ফুয়ে। যাত্রা দলের সখী সাজ ফেলে দিয়ে যে চোয়াড়ে ছিল সেই চোয়াড়ে হয়েছে।

ঠিক হয়েছে।

অসুখ তো অন্তত হয়েছে। যার জন্যে হাত দেখাতে হচ্ছে জ্যোতিষীকে। আশ্রবল না গেলে কি আর কেউ জ্যোতিষীকে হাত দেখায়?

আরো হওয়া উচিত। আরো।

যে দাগ একবার দিয়ে দিয়েছে ব্রজলাল তা আর মোছিনি, জীবন থেকে। কটা করে টাকা প্রতিমাসে কম পড়েছে।

কি হে, দাগ পড়নি তোমার? গা থেকে প্রসাধন তুলে নেওয়ার দাগ!

আরো পড়া উচিত।

একটা ট্রাম এসে দাঁড়াল। গুটিগুটি সেকেন্ড ক্লাশে উঠল ব্রজলাল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না অমূল্য।

এমন নয় যে, ফাস্ট ক্লাশে খুব ভিড়, তাই সেকেন্ড ক্লাশে উঠেছে। এমন নয় যে, ট্রামটা হঠাৎ ছেড়ে দিল, ফাস্ট ক্লাশটা নাগালে না আসিতে ধরে ফেলেছে সেকেন্ড ক্লাশ। না, তা নয়, ধীরে-সুস্থে মনঃস্থির করেই উঠেছে।

ট্রাম চলতে শুরুর করে দিয়েছে, অমূল্যও সেকেন্ড ক্লাশেই উঠল। আর খাড়া পিঠ বেগুতে। বসল ব্রজলালের মুখোমুখি।

জীবনে এ এক অভিনব উপভোগ।

দস্তুরমত হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসা যায় এখন। সিগারেট খাওয়া বারণ, নইলে একটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া দেওয়া যেত উপহার। কি হে, পাইপ কোথায়? না কি এখন বিড়ি ধরেছে? ধূমপানের প্রসংগ করা যেত প্রশ্ন কটা।

ব্রজলালের মর্ষের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অমূল্য।

‘চিনতে পাচ্ছেন স্যার?’

এতটুকু চমকাল না ব্রজলাল। বললে,

‘পাচ্ছি। রাজসাহীর সেই অমূল্য পাল না?’

কী আশ্চর্য, চিনতে পেরেছে অথচ এতটুকু কুণ্ঠিত হচ্ছে না। জানলা দিয়ে চোখ ফিরিয়ে থাকছে না। এইখানে নামব বলে যাচ্ছে না পালিয়ে। পরিপূর্ণ সমর্পণে নিলিপ্ত চোখে দেখছে সমস্ত কিছুর। দেখছে বর্ষা শব্দ নিজেকে বাদ দিয়ে।

‘আপনার ছেলেরিট কেমন আছে?’
রজলালই জিগগেস করল।

তাও ভোলেনি দেখছি। প্রচ্ছনে একটু প্রসন্ন না হয়ে পারল না অমূল্য। বললে, ‘ভালো আছে। শিবপুত্র ইঞ্জিনিয়ারিঙে এবার শেষ বছর।’

‘বা, খুব আনন্দের কথা। বেরুতেই একটা চাকরি পেয়ে যাবে নিশ্চয়। আপনার কণ্ঠ দূর করবে।’ রজলাল একটু বর্ষা বা অন্যান্যমত হল। ‘ভগবান একদিক থেকে যেমন নেন আবার অন্য দিক থেকে পূরণ করে দেন।’

তা হলে রজলালকেও পূরণ করে দিয়েছে?

সন্দেহ মুখে অমূল্য জিগগেস করল, ‘এ অঙ্কে কী মনে করে? কোনো চাকরি টাকার করছেন নাকি?’

‘না ভাই, চাকরি কোথায়। এই গভর্ণ-মেন্টের ঘরে কয়েকটা টাকা পাওনা ছিল তারই আদায়ের তদবিরে এসেছিলাম।’

‘পেলেন?’

যেমন সমানে-সমানে কথা হয় তেমনি সমতলস্বরে বললে রজলাল, ‘কই আর পেলাম। টাকাটা স্যাংশন হয়ে আছে। অনেক দিন, কিন্তু ফাইল ‘মুড’ করছে না। এতদিন শুনছি—‘বাউয়েলস মুড’ করেনা, এখন শুনছি ফাইলের ‘মুডমেন্ট’ নেই।’ যেন কতদিনকার পরোনো পরিচিত বন্ধু এমনি স্বচ্ছতায় হাসল রজলাল। ‘তা আপনি এদিকে?’

‘হাইকোর্টে নিখ বোঝাতে এসেছিলাম।’

‘নিখ বোঝাতে?’ ভাবা যেন সব নতুন শব্দে রজলাল।

‘মানে নিখর কোন ফাইলে কোন কাগজ আছে তা বাবুদের চাক্ষুষ বুদ্ধিরে নিতে।’

‘হ্যাঁ, উপরের লোক নিজের থেকে কিছুই বুঝতে চান না। যত উপরে তত উদাসীন।’

হঠাৎ আবার মনোযোগী হল রজলাল। ‘তা আপনি এখন কোথায়?’

‘সেই সাবজজ কোর্টে।’

‘যাকে যেখানে রেখেছেন। নাটকে রাজার পাটও আছে, চাকরের পাটও আছে। শব্দ পাটটুকু করে যাওয়া। আর যে ভালো অভিনেতা সে রাজার পাটও যেমন নিখুঁত করে, চাকরের পাটও তেমনি। কী বলেন?’ বন্ধুর মত তাকাল রজলাল : ‘তা কোর্টে কোন সেরেস্‌তায়? ড্রাই না, ওয়েট?’

হো-হো করে হেসে উঠল অমূল্য। বললে, ‘ওয়েট। এক্সিকিউশান সেরেস্‌তায়।’

‘বা, বেশ, ভালো কথা। তা দেখুন,’ রজলাল সচকিত হয়ে গলা কমাল : ‘আমার একটা এক্সিকিউশান কেস আছে। টাইটেল এক্সিকিউশান।’

‘বলেন কী! আমাদের কোর্টে?’

‘হ্যাঁ, হয়তো বা আপনারই সেরেস্‌তায়।’

আর-গুণ নেই তো ছারগুণ আছে। তার মানে, বিনে পয়সায় তদবির সারবে। কোনো একটা অন্যান্য সর্বিধে পায় কিনা তারই ফিকির নেবে। এদিকে ভগ্ন-বৃন্দ সর্বস্বান্ত চেহারা করেছে, অথচ ডিক্রিয়ারি চালাচ্ছে। স্বস্তির ডিক্রিয়ারি। কারসাজ, শয়তান। শব্দ শব্দ নয়, হস্তে শব্দ।

এতক্ষণে বোঝা গেছে। দাঁড়াও, শিক্ষা দেব। তাই ভেবে অমূল্য বললে, ‘নম্বরটা বলুন।’

রজলাল নম্বর বললে। কাগজে টুকুে নিল অমূল্য।

আরো নিশ্চিত হবার চেষ্টায় জিগগেস করলে, ‘জাজমেন্ট-ডেটর কে?’

‘আর কে! আমি।’ বুক ভাঙা নিশ্বাস ফেলল না রজলাল। নিরুত্তর কণ্ঠেই বললে।

‘আপনি! আপনি ডিক্রিয়ারি নন?’
প্রায় বসে পড়ল অমূল্য।

‘না। আমি দায়িক, দেনদার। আমার বিরুদ্ধেই ডিক্রিয়ারি।’

‘উচ্ছেদের মামলা?’

‘তা ছাড়া আর কী!’

‘বলেন কী!’ হতভম্বের মত চেহারা করল অমূল্য : ‘এও হয় নাকি?’

‘হয়। সব হয়। আর সবই মেনে নিতে হয়।’

‘কিন্তু, কিন্তু উচ্ছেদের গ্রাউন্ড কী?’

‘আর কী। ডিক্রিয়ারি। পর-পর দুমস দিতে পারিনি ভাড়া।’

‘দিত্তেই পারেননি?’ অবিশ্বাস্য মনে হল অমূল্যর।

‘দিতে পারিনি মানে চুক্তির দিনটা

বলিষ্ঠ লেখকের হাতে কি থাকে যাদু?

এ কি বৈষ্ণব সাহিত্যে আর এক অনন্য সৃষ্টি??

বরণীয় লেখক শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্তর স্মরণীয় অবদান

গৌর-প্রিয়া

৩.০০ সম্বন্ধে আপনার বাস্তবিক

অভিমত এদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।।।

আনন্দবাজার (১৪-১-৬২) ... এই বিষয়বস্তুকে নিয়ে এমন উপন্যাসোপম রচনা বোধহয় এর আগে আর হয় নি.....

দেশ (১৬-১-৬২) ... শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভাবনায় যুগল-মুর্তির যেন নতুন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন লেখক তাঁহার আবেগীপালিত ভাষার সাহায্যে। ...

অমৃতবাজার ... Really one should not miss this exiting enchanting and stimulating book

আমাদের অন্যান্য বইয়ের কয়েকটি :

ক্ষিরোদকুমার দত্তের **শরণ সাহিত্য-সমীক্ষা** ৪.৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

মহাশ্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের

রূপমতী

২.৫০

কর্মযোগ ২.০০ **প্রেম** ২.০০

উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

বেলকুঁড়ি

২.৫০

পটভূমিকা

২.৫০

বসু সাহিত্য সংসদ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

ফসকে গিয়েছে। দু'দুবারই ফসকে গিয়েছে। তা ওরকম যায়। মাঝে মাঝে মাথার ঠিক থাকে না।' চোখ বুজেই আবার চোখ মেলল রঞ্জলাল। 'অন্ধকার ঝড়ের মধ্যে মাঠে পড়লে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়।'

কোনো একটা ছলনা বা চাতুরীর কাহিনী অনুভূত থাকছে এমনি মনে হচ্ছে অমূল্যের। ঠিক মত জেরা করলে ঠিক বেরিয়ে যাবে কাপট্য।

'ডিক্রি হয়েছে কবে?'

'এই তো গত মাসে। রুজু হতে না হতেই ডিক্রি।'

'সে কী? লড়েননি মামলা?'

'না, লড়ে কী হবে? কত শত্রুর সংগে কত দিকে আর লড়ব। বিচারে যা আছে তাই হবে।'

'সে কী? আপিলও করেননি?'

'কেউ শোনে না আপিল।' রঞ্জলাল হাসল। 'সব আবেদন নামঞ্জুর। উচ্ছেদের মামলায় আপিল নেই।'

'কী যে বলেন। একটা উচ্ছেদের মামলায় চূড়ান্ত ডিক্রি পেতে বাড়ি-ওয়ালার কম-সে-কম ছ বছর। সেখানে আপনি পত্রপাঠ ছেড়ে দেবেন?'

'কোনো কোনো উচ্ছেদ বৃদ্ধি পত্র-পাঠেই। তেমন যদি বিচার হয় কী করা যাবে বলুন।'

'কিসের বিচার? কার বিচার? খাজিয়ে উঠল অমূল্য।'

'কিন্তু সাধ্য নেই বিচার-ঘরে বসে আপনি এ প্রশ্ন তোলেন। কেননা

আপনি জানেন আসল বিচারক এজলাসে নয়, আসল বিচারক নেপথ্যে। তাকে দেখা যায় না আর তার আসল নামও অদৃষ্ট।'

তত্ত্ব কথা ছেড়ে অমূল্য বাস্তবে এল। বললে, 'ডিক্রিজারিটা ঠেকাতে চান নাকি?'

'ঠেকাব আমার এমন মুখ কই?'

'কেন, বকেয়া বাড়ি ভাড়া সব জমা দিয়ে দিন, দেখি কেমন ডিক্রিজারি না খারিজ হয়।' রঞ্জলালের চোখের মধ্যে তাকাল অমূল্য, পারল তাকাতে। বললে, 'কত ভাড়া?'

'একশো টাকা।'

'মোট?'

'হ্যাঁ, দুখানা মাত্র তো ঘর। আমরা স্বামী-স্ত্রী, আর আমাদের ছেলে। দুখানা ঘরে আমাদের দিবা কুলিয়ে যায়।'

'শুধু দুখানা ঘর।' অনুচ্চারিত নিশ্চয়ই কোনো শাঠ্য আছে সেটা আবিষ্কার করবার লোভে আরো একটু খোঁচা মারল অমূল্য : 'এখানে আছেন কতদিন?'

'এই বছরখানেক। আগে বরাবর কলকাতার বাইরে বিজন-পল্লী রিফিউজি কলোনীতে ছিলাম।' একটু বৃদ্ধি বা ক্লান্ত শোনাচ্ছে রঞ্জলালকে : 'ছেলেটার একটু চাকরি হল, সাধ হল ভব্যতায় আবার উঠে আসে। তারই জন্যে এই ঘর, পাকা ঘর, এই ঘর থেকে ফের আরম্ভ।' ম্লান হাসল রঞ্জলাল : 'আবার আশা নিয়ে পাশা খেলা।'

'বকেয়া বাকি ভাড়া বেশি হবে বলে তো মনে হয় না।' অমূল্য বললে, 'তা হলেই তো চুকে যায়।'

'কিন্তু তার কি আর দরকার আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। উচ্ছেদটা তো ঠেকাতে হবে।'

'একটু সময় পাওয়া যায় না?'

'আপনি যাবেন একদিন কোটে।' লম্বা চালে বলতে লাগল অমূল্য। 'সেরেসতায় আমার সংগে দেখা করবেন। আমি নথিটা দেখে রাখব। দেখি কী করতে পারি। ওকালতনামা ও পিটিশনের খরচা নিয়ে যাবেন।' বলতে কী যে ভালো লাগছে অমূল্যের : 'দরকার হলে একজন উকিল ঠিক করে দেব। প্রাক্তন এক বিচারপতির মামলা, বিনা ফিতে পাওয়া যাবে উকিল।'

'আমাকে চিনবে না কেউ। আমি তো ও কোটে বসিনি কোনোদিন।'

'আমি আপনাকে চিনিই দেব।'

'না, না, তার দরকার নেই। বলবেন আমার এক পূর্বপরিচিত বন্ধু, রঞ্জাবাবু। যখন যেমন তখন তেমন।' উঠে পড়ল রঞ্জলাল। বললে, 'আমি এইখানে নামব। আচ্ছা আসি। নমস্কার।'

আকাশের দেবতারা সব দেখ, শালা বাবু হয়েছে। 'অমানীকে মান দিচ্ছে, নমস্কার জানাচ্ছে। ভাই-মশাই বলছে। এ তোমাদেরই দেখবার মত।

ঠিক হয়েছে—উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে।

আরো হবে। আরো মানে। রাজা সাজা বার করে দেবে।

নিজের মনেই হেসে উঠল অমূল্য।

আগিসে অমূল্যের টেবিলের সামনে ভূতের মতন এসে দাঁড়াল রঞ্জলাল।

সামনে অনেক কাজ নিয়ে বসেছে, চেয়ার ছেড়ে উঠল না অমূল্য। চাপরাশিকে বললে, 'এঁকে একটা কিছু এগিয়ে দে বসতে। ইনি এক প্রাক্তন জেলা জজ।'

একটা টুল এনে দিলেই হত, চাপরাশি একেবারে চেয়ার বাগিয়ে ধরল।

রঞ্জলাল বসল না। বললে, 'আমি একজন সাধারণ মজেল। তার বেশি আর আমার পরিচয় নেই। তারপর—অমূল্যের দিকে প্রার্থনার ভঙ্গিতে তাকাল রঞ্জলাল।

এত বড় উপভোগ্য দৃশ্য বৃদ্ধি আর হতে নেই পৃথিবীতে।

আরও মজবুত... আরও ভাল

পিতলের তৈরী
বাগীর টিউব



'কিন্তু' লিখেন
'স্পেশাল কোয়ালিটি'
হাশ খেঁজা নইবেন।



কিয়ান
লিফট
সক্সোংকুট

সম্পূর্ণ লক্কন মোটা চাদরে
তৈরী ও লক্কনের লুং কেবোজিন
তৈলে নষ্ট হয় না



সেইসময় ২২ নং দাম এও কোং

২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন-২২-৬৫৮০

‘টাকা এনেছেন?’ হাত পাতল অমূল্য।

‘কত টাকা?’

‘চারশো। এটা জমা দিয়ে দিলেই আপাতত ঠেকানো যায় উচ্ছেদ। আমি নথি দেখে রেখেছি। আর দেখুন সেই মর্মে’ হাকিমের অভ্যর্থনা।’

‘আমি বলছিলাম কি, যদি কিছু সময় পাওয়া যেত।’ জিভ দিয়ে ঠোট চাটল রজলাল। ‘এত টাকা দেবার এখন সংগতি নেই।’

‘টাকা না দিলে উচ্ছেদ অবধারিত। কেক খাবেনও, আবার পকেটে করে নিয়ে যাবেন সেটি হবে না।’ কী অন্তত ভালো লাগছে এমন করে বলতে, শাসন করতে! অমূল্য মূর্খিয়ে উঠল : ‘সময় যে চাইছেন কত দিনের?’

‘এই মাসখানেক।’

‘মাসখানেকের মধ্যে টাকা আনবেন কোথেকে?’

‘ছেলের ইনসিওরেন্স অফিস থেকে।’

‘সময় যে দেবে হাকিম, এমন মনে হয় না। তবু দেখি চেষ্টা করে। পিটিশনের খরচা রেখে যান। উকিল-ফি না হয় দেবেন না, কিন্তু, কী চমৎকার হাসল অমূল্য : ‘আমলার তহরিট তো দেবেন।’

‘দেখছি।’ চারদিক তাকিয়ে গলা খাটো করল রজলাল। বললে, ‘যার জন্যে আপনার কাছে এসেছিলাম। একটু শ্রদ্ধা দয়ার জন্যে।’

‘কিসের দয়া?’

‘দয়া করে দখলের পরোয়ানাটা যেন আজ-কালের মধ্যেই ইস্যু করে দেবেন না।’

যেমন দ্রুত চলে গেল রজলাল, অমূল্যের মনে হল টাকা আনতে গেল। কিন্তু কোথায় টাকা।

দয়াও টাকার দামে কিনতে হয়। টাকা নেই তো দয়াও নেই।

ডিক্রিদারের লোক দাঁড়াল অমূল্যের গা ঘেঁষে। ভারী হাতে তদবির করল। অমূল্য দখলের পরোয়ানা দিল ইস্যু করে।

ডিক্রিদারের লোক বললে, ‘কালই যেন নায়েব নাজির বেরোয় দেখবেন।’

‘হ্যাঁ, আজ্ঞে’ ট করে দিয়েছি। এখন নেজারতে, নাজিরখানায় গিয়ে যথাযোগ্য তদবির করুন। ঠিক বেরুবে পরোয়ানা।’

যা বেটা উচ্ছেদ হয়ে। যা বিচারে আছে তাই এখন হতে দে। আউট হয়ে যা। আমাদের কিছু করবার নেই। আমরা নিমিত্তমাত্র। নাচের পদতুল।

হাসল অমূল্য। ‘সাহেব আবার বাবু হয় কী করে? কিন্তু সেখানে কী?’

‘সেখানে দখল জারি হচ্ছে। বাবুর সব জিনিসপত্র বার করে দিচ্ছে রাস্তায়।’

‘তাই তো দেবে।’

‘একটা ইলেকট্রিক ফ্যান ঝুলেছিল



‘আমরা নিমিত্তমাত্র। নাচের পদতুল।’

নাজিরখানার পিওন অবিনাশ এক ঘরে। ডিক্রিদারের লোক সে-ফ্যামিলি ডাকিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে।

অমূল্যকে বললে, ‘আপনি শিগগির একবার চলুন।’

‘কোথায়?’

‘সেই আপনার জজসাহেব রজলাল-বাবুর বাসায়।’

‘হ্যাঁ, ঘর খালি, খোলসা করে দি হবে।’ নিমর্ম হবার মধ্যেও এক দূর আনন্দ আছে। প্রথম কাচারির সেই প্রসিগারেট খাওয়ার মধ্যে সেই আনন্দ স্বাদগন্ধ অনুভব করল অমূল্য বললে, ‘ডেকেশট পজেশনের পরোয়ানা

‘কিন্তু সেই ফ্যানের নিচে বাবু ছিলে শুয়ে।’ প্রায় হাহাকার করে উঠল অবিনাশ।

‘ছেলে শুয়ে মানে? একজন না একজন তো শোবেই ফ্যানের নিচে। হয়তো সেইটেই ছেলের ঘর।’ কী একটু সন্দেহ হতে অমল্য ভুবু কুঁচকোলো : ‘কত বড় ছেলে?’

‘প্রকাণ্ড ছেলে। বিশ-বিশ হবে মনে হয়। আর সেই একমাত্র ছেলে।’

‘হ্যাঁ, কী হয়েছে তার?’

‘অনেক দিন থেকেই নাকি ভুগছিল। আজ সকালবেলা মারা গেছে।’

‘মারা গেছে?’

পৃথিবীর সমস্ত বিষয় ব্যাপারই অমল্য একটা মামলার চেহারায় দেখে এসেছে। রুজু, নিষ্পত্তি, ডিক্রি, আপিল, সেকেন্ড আপিল, ছানি বা রিভিউর চোখে। এখন মনে হল, আর রিভিউ নেই, রিম্যান্ড নেই, সমস্ত আপিলের দরজা বন্ধ। নজির নেই, সাক্ষী নেই, সওয়াল-জবাব নেই, শূদ্ধ এক শূন্য নভাঙ্গনে এক একাকী অন্ধ বিচারক।

‘আমরা পরোয়ানা নিয়ে পেঁছাবার কিছু আগেই মারা গেছে।’ বললে অবিনাশ।

‘তারপরেও জারি হচ্ছে পরোয়ানা?’

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল অমল্য। ‘নায়েবনাজিরবাবু করছেন কী?’

‘নায়েব নাজিরবাবু দৌর করতে চাচ্ছেন, ডিক্রিদারের লোকেরাও খতমত খাচ্ছে কিন্তু রজবাবু নিজেই উদ্যোগ করে বার করে দিচ্ছেন জিনিসপত্র।’ বলতে বলতে কাঁপছে যেন অবিনাশ। ‘পরোয়ানা দেখে বললেন, হ্যাঁ, বিচারে যা আছে তা করতে হবে বৈকি। বিচারই নিভীক, নিরপেক্ষ। নিজেই খবর দিচ্ছেন ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে। একটু কাঁদতে পৰ্বন্ত পাচ্ছেন না।’

‘কাঁদতে পৰ্বন্ত পাচ্ছেন না?’ টুটি টিপে ধরা একটা উদ্গত কান্নার মত শোনাল অমল্যকে।

‘দু একজন পাড়াপড়শি ছাড়া লোকজন কেউ নেই। আমরা উৎপাতের মত চড়াও হয়েছি বলে, আত্মীয়স্বজনরা খায়া এখানে আছে, তাদেরকে খবর দিতে পাচ্ছেন না। শ্মশানে কে নিয়ে

যাবে, কী ভাবে নিয়ে যাবে, কখন নিয়ে যাবে, কিছুরই দিশপাশ নেই। রজবাবু পরোয়ানা হাতে নিয়ে শূদ্ধ বলছেন, বিচার আগে, বিচার আগে, তারপরে আর সব। নায়েবনাজিরবাবুকে বলছেন, ‘হাত লাগান দয়া করে। আগে ফার্ণিচার ফ্যান বাস-সুটকেস বাসনকোসন বার করে দিই, তারপরে থোকাকে বার করে দেব। একসঙ্গেই ঘর খালি করে বেরিয়ে যাব আমরা।’ অবিনাশের চোখের দুই বড়ো কোটরে জল চকচক করে উঠল।

‘কী আশ্চর্য’, অস্থিরের মত বললে অমল্য, ‘নায়েবনাজিরবাবু চলে আসছে না কেন?’

‘রজবাবুই আসতে দিচ্ছেন না। বলছেন, যতক্ষণ ‘রিট’ চালু আছে, ‘রিকল্ড’ হচ্ছে না, ততক্ষণ আপনার কতব্য করে যাবেন। বিচারের ভার দারুণ ভার, তার দাবি সকলের আগে। তার কাছে শোক নেই স্নেহ নেই আলস্য-আরাম নেই। এমন ধরণের কথা কত কি বলছেন। এমন আশ্চর্য, চশমার কাঁচ পৰ্বন্ত মূছছেন না একবারও। নায়েব-নাজিরবাবু বা যদি গাড়িমসি করছেন, ধরছেন ডিক্রিদারের লোককে। বলছেন, পরোয়ানা ‘রিকল্ড’ না হওয়া পৰ্বন্ত আপনি আপনার কাজ করে যান। বিচারের মান রাখুন।’

‘আপনি ছুটে আবার যান সেখানে। নায়েবনাজিরবাবুকে বলুন, পরোয়ানা রিকল্ড হয়েছে। মূলত্ববি হয়েছে ডিক্রি-জারি। আমি কোর্টের অর্ডার নিয়ে যাচ্ছি। ততক্ষণ যেন সব স্থগিত থাকে। অন্তত একটু কাঁদবার জন্যে স্থগিত থাকে।’

একটা উদার দুর্মদ দৈত্য হঠাৎ অমল্যকে ভর করল, পেয়ে বসল। এক খাবলা দিয়ে চারশো-পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করলে। চালান করে জমা করে দিল মূহুর্তে। খসখস করে নিজেই অর্ডার লিখল। খাস কামরায় গিয়ে সেই করিয়ে নিল হাকিমকে দিয়ে।

এতক্ষণ একটা ঝড়ের মত ছুটোছুটি করেছে অমল্য, ঝড়ের মত কথা বলেছে, ঝড়ের মতই কুড়িয়ে নিয়েছে লোকজন।

তারপর নিজেই নথি নিয়ে লোকজন নিয়ে ছুটল অকুস্থলে।

নায়েবনাজিরকে দেখাল, অর্ডার। দেখাল ডিক্রিদারকে।

‘কই আমি দেখি।’ এতক্ষণে চশমার কাঁচ মূছল রজলাল।

এর পর আর কথা কী! নায়েব-নাজির নিবৃত্ত। ডিক্রিদার নিবৃত্ত। নিবৃত্ত রজলাল সান্যাল।

বিমূঢ়ের মত মূখ করে রজলাল বললে, ‘কিন্তু এতগুলো টাকা জমা দিল কে?’

‘দেখছেন না অর্ডার-সিট।’ রজ-লালের মনোযোগ আকর্ষণ করল অমল্য, ‘জাজমেন্টডেটর ডিপজিটস—বয়ং দেন-দারই জমা দিয়েছেন। বিচারের ঐ ভাষা। আর তাকে আমরা মান্য করে চলছি বলেই সংসার চলাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, গলার দ্বার আপনা থেকেই অশ্রুসজল হয়ে উঠল : ‘আপনিও তো শ্মশানে যাবেন?’

‘হ্যাঁ, এই ছার যাবেন শ্মশানে। আমি ছাড়া ওর যে আর কেউ নেই।’

শ্মশানে সব শেষ হয়ে যাবার পর রজলাল অমল্যকে দুই হাতে বৃকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল।

স্বরে অন্তরংগতার নিখাস ঢেলে অমল্য বললে, ‘চলুন, ঘরে ফিরে চলুন।’

নিজেই খানিক সামলে ‘উঠল রজলাল। বললে, ‘হ্যাঁ, ঘরে ফিরে যাব বৈকি। ঘরের উচ্ছেদ তুমি যে রদ করে দিয়েছ। ভগবানের উচ্ছেদই বৃদ্ধি কেউ পারে না রদ করতে। তাই আবার ঘরেই ফিরে যেতে হয়। শোকের পর ভাত খেয়ে ঘুমুতে হয় অঘোরে।’

‘হ্যাঁ, এখনো অনেক কাজ বাকি।’

‘অনেক কাজ। যতক্ষণ বাঁচা ততক্ষণই নাচা।’ অমল্যর কাঁধের উপরে হাত, কয়েক পা হটল রজলাল। একটু বা থামল কিনা বোঝা গেল না। বললে, ‘বিচারে আমিই এখন থোকায় ওয়ারিশ। থোকায় ইনসিওরেন্সের টাকা কটা এখন যে আমাকেই তদবির করে বার করে নিতে হবে।’ না, হাসি নয়, কাঁদছেই রজলাল। আর বলছে, ‘কান্নায় কি আর টাকা ভাসিয়ে দেওয়া চলে?’

রাশিয়ার ডায়েরী

এবং কুমার মান্যম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। পনেরো ।।

আমাদের কয়েকজনের মস্কোয় বস-বাসকালীন রুশ কবি ও ঔপন্যাসিক বোরিস পাষ্টেরনাক নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস-খানির নাম “ডাক্তার জিভাগো”। কিছুকাল আগে পাষ্টেরনাক এই বইখানি “নোভিমির” নামক একখানি মস্কোর সাময়িকপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠান। প্রকাশ, সেই কাগজের কতৃপক্ষ প্রথমে বইটি ছাপতে রাজি হন। পরে বলেন, কয়েকটি অংশ বাদ দিয়ে এবং আর কয়েকটি স্থলে কাটাকুটি করে দিলে বইটি ছাপা সম্ভব হবে। কেননা বইটি ভাল। পাষ্টেরনাক এ প্রস্তাবে রাজি হননি, এবং বইটি তিনি ফেরৎ নেন। এই গ্রন্থে রুশবিপ্লবকালের এবং বিপ্লবান্তর রুশজীবনের অনেকগুলি ছবি বর্তমান,—যেগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লবকালের চূড়ান্ত গৌরব বহন করে না। সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির অভিমত অনুযায়ী এই বইখানি সম্ভবত “রিভিসনিজমের” অভিযোগে পরিপূর্ণ। তাঁদের মনোভাব হল, ‘গতস্য শোচনা নাস্তি’। যা ঘটে গেছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে না। বর্তমানের দেশজোড়া উন্নতি এবং ভবিষ্যতের উন্নততর সম্ভাব্যতা এই নিয়ে বই লেখ—যত পার লেখ! যত টাকা চাও দেবো, যত ইচ্ছা সুখ সম্ভোগ যশ প্রতিষ্ঠা যা চাও—আপত্তি করব না। সোভিয়েট জীবনের মধ্যে সাহিত্যের প্রভাবে যেন নৈরাশ্যের স্পর্শ না আসে। সাহিত্যে কেঁদো না, কবিতায় হা-হুতাশ করো না! প্রেমের গল্প রচনাকালে যার্থ প্রণয়ের ট্রাজেডিতে সাহিত্য ভরে তুল না। গল্প উপন্যাস যদি লেখো, প্রাচীনকে প্রাধান্য দিয়ো না, দৃঃখবাদকে নিয়ে অশ্রুবিলাস করো না। আমরা কমিউনিষ্ট সোসায়েটি গড়তে চলছি, মানুষের উন্নতি করতে বসেছি, দেশের বৃহত্তর জীবনের বস্তু-তান্ত্রিক গঠনের কাজে লেগেছি,—এইসব কর্মে কবি ও কাহিনীকারগণ তোমাদের সাহিত্যপ্রচার দিয়ে সাহায্য করো। মার্ক্সিজম-লেনিনিজম তোমার সাহিত্যের

মূলকেন্দ্র হোক। চল্লিশ বছর আগে নিজেদের মধ্যে কি কি কান্ড ঘটে গেছে, কে কাকে মেরেছে, কার বদলে কে মার খেয়েছে, বিপ্লব কি প্রকারে পরিচালিত হলে ভাল হত,—এসব পুরনো কথা আর তুল না! সামনে এগিয়ে চল, পিছন দিকে চেয়ো না।

কিন্তু পাষ্টেরনাকের সেই প্রাচীন মনে গভীর ক্ষত, ক্ষয় ও ক্ষতির দাগ ছিল। তিনি বোধকারী আশা করেছিলেন, স্টালিনের মৃত্যুর পরে এই বইটি তিনি প্রকাশ করবেন। তিনি টলস্টয়ের শিষ্য, ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং মানুষের বিবেক-সত্তার পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সেই কারণে স্টালিনের আমলে সর্বব্যাপী আতঙ্কের মাঝখানে নিঃশব্দে বসে তিনি কিছু কিছু মৌলিক কবিতা রচনা এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যের কবিতা এবং এটা-ওটা টুকটাকি অনুবাদের কাজ নিয়ে চুপ করেছিলেন। তাঁর স্বাভাব্য-বোধ এবং দেশানুরাগ স্তব্ধবিন্দিত। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে চিরায়ত সাহিত্যের বিচারে তাঁর কবিতাটি প্রচুর।

তিনি তাঁর “ডাক্তার জিভাগো” উপন্যাসটি কবে লিখেছিলেন এবং এ বইখানি কবে কিভাবে ইতালীয় প্রকাশকের হাতে গিয়ে পড়ল সেটি আমার জানা নেই। এইটুকু শুধু জানতে পারলাম, তিনি সরল বিশ্বাসের সঙ্গে এবইটি ইতালীয় প্রকাশকের হাতে দিয়েছিলেন, এবং তাঁর একবারও মনে হয়নি, তাঁর এ বই আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন ঝড়ের ঝাপটা আনবে, অথবা এরজন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করবেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি, তাঁর এবইটি নিয়ে ইউরোপ বা আমেরিকার রাজনীতিকরা এমনভাবে সোভিয়েট বিরোধী প্রচারণা করে বেড়াবেন। পাষ্টেরনাকের মনে এই ধারণা বন্ধমূল হয়েছিল যে, কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নকে শত্রু কলঙ্কিত করার জন্যই এই নোবেল পুরস্কারটি তাঁকে দেওয়া হয়েছে! এই পুরস্কার ঘোষণার পর পাষ্টেরনাক মিঃ খুদচভকে

একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। মিঃ খুদচভ সম্ভবত সেই পত্রের এইরূপ জবাব দেন, আপনার গ্রন্থের মূলনীতির সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্র একমত নন। কিন্তু এই পুরস্কার আপনি নিজে গিয়ে গ্রহণ করতে পারেন, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। আমার মতো আপনারও জন্মভূমি রাশিয়া, আপনিও তার অন্যতম নাগরিক। আপনি আধুনিক সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি বিরূপ, এমন কোনও অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে নেই।

এই পত্র পাবার পর পাষ্টেরনাক নোবেল পুরস্কারটি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু মস্কো লেখক-সংঘ একটি বিশেষ অধিবেশনে পাষ্টেরনাকের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব আনেন, এবং সেই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে তিনি লেখক-সংঘ থেকে বহিস্কৃত হন! এই সময়ে কি একটা উপলক্ষ্যে মিঃ খুদচভ পুনরায় বলেন, কবি পাষ্টেরনাকের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। তিনি কিছু না করলেও তাঁর বেশ চলে যাবে! এমন কি তিনি যদি দেশ ছেড়েও কোথাও চলে যেতে চান, কেউ তাঁকে বাধা দেবেন না।—কিন্তু পাষ্টেরনাক কোথাও যাননি। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, কবি পাষ্টেরনাকের নামটি কেবলমাত্র লেখক-সংঘের খাতায় তালিকাভুক্তই ছিল। লেখক-সংঘের বর্তমান কণ্ঠধারণ সম্প্রদায় তাঁর একেবারেই কোনও আস্থা ছিল কিনা আমার সম্বন্ধে আছে। তাঁর অতি প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ কয়েকজন কবি ও গ্রন্থকার স্টালিন আমলের নানাবিধ যন্ত্রণা ও শাসন বরদাস্ত করতে না পেরে নানা উপায়ে আত্মনাশ করেন! বিগত পঁচিশ বছর ধরে পাষ্টেরনাকের জীবনাদর্শ অত্যন্ত পীড়িত, বিষময় ও বিষন্ন হয়ে উঠেছিল। এই দেশপ্রাণ, মানবতার মূর্তিপূজারী, উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভা এবং সর্বপ্রিয় সাহিত্যকর্মীর মৃত্যু ঘটে ৩০শে মে, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে। যতদূর শুনছিলাম, পাষ্টেরনাক কমিউনিজমের ভিতরকার নিরীশ্বরবাদ পছন্দ করতেন না, এবং

সোভিয়েট সাহিত্যাদর্শের বিশেষ বিরোধী ছিলেন।

দোভাষিণীদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বিদূষী এবং ইংরেজ সাহিত্যে যিনি পারদর্শিনী, সেই শ্রীমতী অকসানা ক্লুগারস্কায়্যা— যিনি ক্রেমলিনে মিঃ খুদুশভের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বাকগুণি আমাদের নিকট ইংরেজিতে অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন, তিনি মস্কোর লেখক-সম্প্রদায়ের বর্তনভোগী মহিলা। তাঁর মুখে শুনেছি, “পাণ্টেরনাক আজও অতিশয় জনপ্রিয়। এসব ঘটনা ঘটবার পরেও তাঁর বই প্রচুর বিক্রি হয়। তাঁর ন্যায় শক্তিশালী কবির সংখ্যা রাশিয়ায় খুব কম। আমরা সকলেই তাঁর অনুরাগী!”

সোভিয়েট ইউনিয়নে আমার প্রথম-কালে কবি পাণ্টেরনাক সুস্থ শরীরেই জীবিত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর কোনও রচনা তখনও পড়িনি বলেই তাঁর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ছিল না। মস্কো থেকে মাইল কুড়ি দূরে ‘পেরেডেল’কিনো’ নামক লেখক-নগরটিতে কবি পাণ্টেরনাক একখানি বহু বনময় বাগানবাড়ির মালিক। উপার্জন তাঁর প্রচুর। তাঁরই বাগানবাড়ির কাছাকাছি আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু পান্ডেল লুকানিৎস্কি ও মালৎজেভের দু’খানি উদ্যানভবনে আমরা মধ্যমাঝে আমোদ করতে যেতুম। বোরিস পাণ্টেরনাক তখনও স্বর্গারবে জীবিত রয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান প্রভৃতি সাংবাদিকরা পাণ্টেরনাকের সঙ্গে তাঁদের নানাসময়ের সাক্ষাৎকারের বিবরণ-গুলি বিকৃতভাবে প্রকাশ করার ফলে পাণ্টেরনাক অতিশয় বিব্রত ও দুঃখিত হন, এবং বাইরের সঙ্গে নিজের বাড়ির টেলিফোনের সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে দেন। এমনি একটা সময়ে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে আমি পাণ্টেরনাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করি। কিন্তু অকসানা আমাকে বলেন, “পাণ্টেরনাকের বাড়িতে হঠাৎ আপনি গিয়ে দাঁড়ালে আপনার অভ্যর্থনাটা ‘অনিশ্চিত’ হতে পারে, কারণ তিনি আজকাল বাইরের কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে আড়ম্বরণ করেন। আমাদের সঙ্গে ইদানীং তাঁর যোগাযোগ নেই।”

শ্রীমতী অকসানার কৈফিয়তে সেদিন আমি সন্তুষ্ট হইনি। কিছুদিন পরে শুনেছিলাম, রিলেচন গ্রিগাঠী নামক একজন ভারতীয় লেখক বোরিস পাণ্টের-

নাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি মনোজ্ঞ বিবরণী প্রকাশ করেন। শ্রীমতী লিডিয়ার মতো খাজা কমিউনিষ্ট মেয়েও আমাকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কেননা আমি পাণ্টেরনাকের বাগানের সীমানা থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে সেদিন বসেছিলাম। কিন্তু তিনি লেখক-সম্প্রদায়ের নিষ্পত্ত লোক নন বলেই সুযোগ ও সাহস পেলেন না।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মিঃ খুদুশভের আমলে কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্বনো ইমারত ভাঙতে আরম্ভ করেছে। ক্ষমা, দয়া, বিবেচনা, উদারতা—এগুলি ষ্টালিন আমলে বহুলাংশে নিষিদ্ধ ছিল। মিঃ খুদুশভ এসে একে একে দরজা খুলে দিচ্ছেন। ষ্টালিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছেন তিনি। নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনছেন ষ্টালিনের পূর্বগো সত্যি-গণকে, যাঁরা এককালের দেশকর্মী, যাঁরা সমগ্র জাতির শুল্কানুধ্যায়ী, যাঁরা জীবনপণ করে সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রতিষ্ঠার কাজে লেগেছিলেন! তাঁদের মধ্যে যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবার-বর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা এবং যাঁরা আজও জীবিত, তাঁদেরকে নানান দেশ-কর্মে নিযুক্ত করা হচ্ছে। মস্কোতে বসে মিঃ খুদুশভের সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তার চেহারা দেখে এটার প্রমাণ পাচ্ছিলাম, ষ্টালিনের সর্বপ্রকার নৃশংসতার অপকর্মে যাঁরা অতি ঘনিষ্ঠ দোসর ছিলেন, এবং যাঁরা ষ্টালিনের রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে একটির পর একটি কাগজে বিনা বিধায় দস্তখৎ করেছিলেন,—তাঁদের হিসাব-নিকাশের দিন খুব সম্ভব এগিয়ে এসেছে! যে দেশের লোক-বহুরের পর বছর ধরে একটি শব্দদেহকে অবিকল অবস্থায় সাজিয়ে রাখতে জানে, তারা যে-কোনও সমাধিস্থ শব্দদেহকেই মাটি খুঁড়ে তুলে প্রতিশোধও তুলতে পারে! সোভিয়েট ইউনিয়নে মৃত্যুর পরেও কেউ নিরাপদ নয়! পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ক্ষমা নেই!

রেড স্কোয়ারের পাশ দিয়ে প্রশস্ত একটি রাজপথ চলে গিয়েছে ‘পুশকিন-স্কায়্যা স্ট্রীট’র দিকে। একদিন সেই পথেরই কাছাকাছি ডানদিকে যে বহু একটি জনবহুল অট্টালিকার গেটের মধ্যে ঢুকলাম, সেটির নাম ‘গুম’। গুম-অর্থে বড়বাজার। সেটি আমাদের কলকাতার ‘হুগ-মার্কেট’। সেখানে শত শত ‘ডিপার্ট-মেন্টাল স্টোর’ কিন্তু বিক্রোতাগণের মধ্যে শক্তকরা আশীর্জনই মেয়ে। একটি ভালো

ফুলহাতা সোয়েটার ৪০০ রুবল, একটি নেকটাই ৭ রুবল, মেয়েছেলের পায়ের সাধারণ একজোড়া ভদ্র জুতো ৩৫০, পুরুষের ৩০০, একটি সস্তা ওভারকোট ৫০০, একটা ভদ্র ১১০০। শ্রেষ্ঠ একটি ওভারকোট অথবা মেয়েদের ফারকোট ২৫০০ রুবল। মধ্যাশ্রিয়া তুলোর চাষের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু এখানে একটি সুতী শার্ট শুধু ১১০ রুবল। সরকারী বিনময় হারে আমাদের হয় টাকায় ওদের পাঁচ রুবল। সেই হিসাবে মস্কোর একমণ সাধারণ চাউলের দাম পড়ে ৪০০ টাকার কিছু বেশী। এক সের আপেলের দাম অবশ্য ৬।৭ টাকা, কিন্তু মস্কোর বাজারে ভাল এক সের আঙুরের দাম পড়ে ৩২।৩৩ টাকা। দুধ সস্তা,— এক পোয়া আন্দাজ ১। আনা। অথচ আগাগোড়া ঘুরে সেদিন সমস্ত বাজারটায় দেখে এলাম, প্রতিটি দোকানে কাতারে কাতারে খরন্দারের ভিড়। দুর্ভিক্ষের কালে কলকাতায় চাউলের দোকানগুলি বেরপ জনপূর্ণ থাকত, এখানকার প্রতি দোকান সেইরূপ। এদের ক্রয়শক্তি দেখে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছি কতদিন। পছন্দসই সামগ্রীটিই আসল কথা, টাকার পরিমাণের কথা ওঠে না। প্রতি মেয়ে-পুরুষ তার হোট ব্যাগ বা পকেট থেকে যে পরিমাণ লেনিন-মার্ক একশ রুবলের নোটের গোছা কথায়-কথায় বার করে, সেটি লক্ষ্য করে অনেক সময় আমার ভাবান্তর ঘটেছে। এই সূত্রে বলা ভাল গত এক মাসে হিজিবিজ প্রবন্ধাদি লিখে আমিও সাত হাজার রুবলের কিছু বেশি উপার্জন করেছি। এখনও নানা লোকের ফরমাস মেটাতে বাকি আছে। আমিও মাঝে মাঝে আমার ক্রয়শক্তির পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম।

সম্প্রতি একটি বিবাহ অনুষ্ঠান লক্ষ্য করলাম। আগেকার কালে বিবাহ অথবা বিবাহবিচ্ছেদ ধর্মমন্দিরের সম্মতি ব্যতিরেকে হবার জো ছিল না। সেই ধর্ম-মন্দিরের যিনি যাজক, তিনি অনুষ্ঠানাদি-সহ বিবাহটি রেজিস্টারী করে নিতেন। এখন রেজিস্টারী আছে, ধর্মমন্দিরও আছে—কিন্তু উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ নেই। বিবাহ এখন অতি সহজ। আগের দিন সন্ধ্যাকালে যে-যুবকটি কমস্থল থেকে ফিরে তার নিজের ঘরটিতে ঢুকল, পরের দিন সকালে পাশের ঘরের লোক দেখতে পেল, সেই ঘরটির থেকেই বোরিয়ে এল হাস্যমুখী একটি মেয়ে! গতরাতে এঘরের যুবকটি যে বিবাহ করেছে, পাশের ঘরের লোক সেটি শোনেনি। এটি

দেখতে পেরেছি, রুশ ছেলেমেয়েরা বিবাহ করতে পারলে তাঁর খুশী। ওরা চায় শান্তিপূর্ণ ঘরসংসার এবং পরিবার। ছেলে অথবা মেয়ে একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই বিবাহ করতে উৎসুক। সুখের ঘর হবে, সাচ্ছল্যে থাকা যাবে, একটি বা দুটি সন্তান থাকবে,—বাস, ভবিষ্যতের ভাবনা ঠেটের উপর! একা থাকার যন্ত্রণা অনেক। নিজস্ব একটি ঘর পাওয়া দুস্কর,—পাঁচজনে মিলে হয়ত একটিমাত্র ঘর, দশজনে মিলে একটি রান্নার কুঠুরি, পনেরোজন মিলে একটি ক্ষুদ্র স্নানাগার, বিশজন মিলে হয়ত হটুগোল! কিন্তু বিবাহ করলে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় একটি এক-কামরা ফ্ল্যাট, একটি রান্না ভাড়ারের কুঠুরি, একটি স্নানাগার। তখন মোটামুটি স্বাধীনতা। ইদানীং প্রতি পরিবারে সন্তানসংখ্যা কম। তার প্রধান কারণ সম্ভবত দুটি। প্রথম—স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উপার্জন করতে হয়; দ্বিতীয়—বসবাস এবং আশ্রয়ের অপ্রতুলতা। এ দুটির যে কোনও একটি কারণ সেখানে সমস্যাকীর্ণ,—মেয়েরা সেখানে সন্তানধারণ করতে চায় না! জন্মরোধ এবং গর্ভস্থ ভ্রূণ-অপসারণ—এ দুটি কাজের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে সামাজিক কানাকানি বা অসম্মান নেই। স্ত্রীলোকরা প্রায়ই সহ-বাসের অব্যবহিত পরে এক প্রকার—তরল ঔষধ ব্যবহার করে, আর নয়ত অসুবিধাজনক অবস্থার উদ্ভব ঘটলে সোজা চলে যায় হাসপাতালে। সেখানে অস্ত্রোপচার করার পূর্বে ডাক্তার দু-চারটি সমাজ ও জৈবনীতির কথা বলেন। মেয়েটি যদি তাঁর হিতোপদেশ না শোনে, তবে কয়েক ঘণ্টার জন্য হাসপাতালে সে থেকে যায়! সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতি নারীর, ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রতি জোর দেওয়া হয় এবং সেখানে ভ্রূণ-অপসারণ আইনসম্মত!

মস্কো এবং অন্যান্য শহরে যথাসম্ভব খোজখবর করে দেখেছি, বেশ্যাবৃত্তি ঘণ্য এবং ব্যাভিচার অতিশয় নিন্দিত। বারম্বার একই মেয়ে বিবাহবিচ্ছেদ সহিবে, কিন্তু উভয়পক্ষের ব্যাভিচার কেউ কোন মতেই সহিবে না! ওরা সন্দেহ নিয়ে ঘর করবে না, সন্দেহজনক হয়ে উঠলে ঝগড়া করবে না, এবং সন্দেহ সত্যে পরিণত হলে বরদাস্তও করবে না। ওরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিয়ে ঘর করতে চায়। একটি বিষয় লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলাম। একজন স্ত্রী এসে যদি তার স্বামীকে ডেকে হঠাৎ বলে, দেখো, আমার এই দ্বিতীয়

সন্তানটি তোমার নয়, অম্বকের—তাহলে স্বামী ছুটে গিয়ে ছুরি-কাটারি খেঁজে না! বরং এইটি বলে, তুমি অম্বককে বিবাহ করতে চাও আমাকে ছেড়ে?—মেয়েটি যদি বলে, হ্যাঁ,—তাহলে স্বামী তার পুন-

বিবাহের বন্দোবস্ত করে দেয়! কিন্তু মেয়েটি যদি তার অপরাধ স্বীকার করে, বা ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তবে বহুক্ষেত্রেই স্বামীটি সেই অবৈধ সন্তানের পিতৃ স্বীকার করে নেয়। একবার একটি মজলিশে উপস্থিত

বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি বরণীয় গ্রন্থ

॥ সাহিত্য-বিষয়ক ॥

বিমানবিহারী মজুমদার : ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫.০০; পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ৬.০০ ॥ অজিত দত্ত : বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ১২.০০ ॥ মদনমোহন গোস্বামী : ভারতচন্দ্র ৩.০০ ॥ ভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক ষষ্টিমুদ্র ৬.০০ ॥ রথীন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্য-বিচিত্রা ৮.৫০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী : আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন ৩.৫০ ॥ অরুণ মুখোপাধ্যায় : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য ৮.০০ ॥ নবজেন্দ্রলাল নাথ : আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য ৮.০০ ॥ সত্যতর দে : চর্যাপদ-পরিচয় ৫.০০ ॥ অরুণ ভট্টাচার্য : কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল ৮.০০ ॥ প্রশান্ত রায় : সাহিত্য দৃষ্টি ৮.০০ ॥ সাধন-কুমার ভট্টাচার্য : রবীন্দ্র নাটক-সাহিত্যের ভূমিকা ৬.০০; নাটক ও নাটকীয়ত্ব ২.৫০; নাটক লেখার মূলসূত্র ৫.০০ ॥ আজহারউদ্দীন খান : বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল ৫.০০

॥ জীবনী সাহিত্য ॥

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী ১.৫০ ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বঙ্গের প্রাচীন কবি ১.০০ ॥ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : ভগিনী বিবোধিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ ৫.০০; শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫.০০ ॥ বলাই দেবশর্মা : ব্রজবান্ধব উপাখ্যান ৫.০০ ॥ প্রভাত গুপ্ত : রবীন্দ্র ৬.০০ ॥ খাজা আহমদ আব্বাস : ফেরে নাই শব্দ একজন ৮.০০ ॥ মণি বাগচি : শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১০.০০; রামমোহন ৮.০০; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৮.৫০; মাইকেল ৮.০০; কেশবচন্দ্র ৮.৫০; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৮.৫০

॥ বিবিধ গ্রন্থাবলী ॥

রাধাকৃষ্ণ : হিন্দু সাধনা ৩.০০ ॥ তারাপ্রসন্ন দেবশর্মা : রামায়ণভক্ত ৮.৫০ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন : রামায়ণী কথা ৮.০০ ॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী : রামায়ণের কথা ১.২৫; ভারত জিজ্ঞাসা ৩.০০; মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন ২.৫০ ॥ শিশিরকুমার নিয়োগী : সহজ কৃতিবাসী রামায়ণ ৩.৫০ ॥ বিবেকেশ্বর মিত্র : পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গে ৩.৫০ ॥ কল্যাণী কালেকর : ভারতের শিক্ষা ১ম খণ্ড ২.৫০; ২য় খণ্ড ৫.০০ ॥ প্রফুল্লকুমার দাস : রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড ৩.৫০ ॥ সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় : আত্মিকার চিত্র ১.৫০ ॥ সুন্দরা বন্দ্যোপাধ্যায় : লাইবেরিয়ার উপকথা ১.৫০ ॥ সুনীলকুমার গুহ : স্বাধীনতার আবেল ভাবেল ৫.০০ ॥ সত্যকিংকর সাহানা : হিন্দুধর্ম ১.৫০; মহাভারতের অনুশীলনভক্ত ২.৫০; চন্দ্রদাস প্রসঙ্গে ২.৫০; শঙ্করলাল রহস্য ২.৫০ ॥ মণীন্দ্র সমাদ্দার : প্রবাসী বাঙালীর কথা ১.৫০ ॥ মানবেন্দ্রনাথ রায় : মার্কসবাদ ১.৫০; দর্শন ও বিপ্লব ১.৫০ ॥ শ্রীজ্ঞানানন্দবী : দেশ-বিদেশের শিক্ষা ৮.০০

॥ গল্প ও উপন্যাস ॥

বৃন্দাবন বসু : আমার বন্ধু ২.০০; চার দৃশ্য ২.৫০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : লক্ষ্মী ২.০০; হালি ২.০০ ॥ বাণী রায় : শূন্যের অঙ্ক ২.৫০ ॥ সুবোধ মজুমদার : অন্তর ও বাহির ২.০০; পলাতক ৩.০০ ॥ বিদ্যুৎবাহন চৌধুরী : অনুস্মৃতি ২.৫০ ॥ কল্যাণী কালেকর : কল্যাণ ও কুমার ১.৭৫ ॥ সুধীররঞ্জন গুহ : স্বপ্নানন্দী ৩.০০ ॥ সুবোধ বসু : মানবের শব্দ নারী ২.০০; স্বর্গ ২.০০; পুনর্জন্ম ২.৫০; উর্দুগামী ৩.০০; পদ্মা প্রমত্তা নদী ৩.৭৫; গল্পলতা ৮.০০; চিমনি ৩.০০; ইগিপ্ত ২.৫০; পদ্মানদীর ডাক ১.৭৫ ॥ সুকুমার রায় : কয়েকটি গল্প ১.০০

জিজ্ঞাসা ॥

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১ : ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

ছিলুম। সেখানে পনেরো ষোলজন পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেটি বিশেষ শিক্ষিত ও ভদ্র নরনারীর আসর। সবাই মিলে গল্পগুজব এবং আমোদ-আহ্লাদ করার পর যখন ফিরে আসি, তখন জানতে পারলুম, উক্ত আসরে দু'তিনটি মহিলার প্রাক্তন স্বামীর নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, এবং ওইখানেই অমরু ভদ্রলোকটির প্রাক্তন এবং বর্তমান মিলিয়ে তিনজন স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। হরত এমন ঘটনা পৃথিবীর বহু দেশেই আছে। কিন্তু সেদিন সেই মজলিশে সকলের মাঝখানে পরস্পরের মধ্যে যে প্রকার সম্ভাব, আন্তরিক সৌজন্য-বিনিময়, মধুর হাসি-পরিহাস এবং সাবলীল বন্ধুত্বভাবটি দেখেছিলুম সেটি স্মরণীয়। সর্বাপেক্ষা ঔৎসুক্যের বিষয়টি ছিল এই, একজন নিঃসন্তান মহিলা তাঁর প্রাক্তন স্বামীর বর্তমান স্ত্রীর গর্ভজাত একটি সন্তানকে প্রতিপালন করার জন্য সাদরে গ্রহণ করেছেন! সোভিয়েট ইউনিয়নের অপর একটি নাম শিশুদলের আনন্দলোক! এটি আর্মি বিশ্বাস করেছে। বালক-বালিকা ও শিশুজাতির স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রতিপালন ও সমাদর-ব্যবস্থার যে সর্বব্যাপী আয়োজন দেখেছি, সেটি সভাই অবিস্মরণীয়। শিশু, স্ত্রীলোক এবং গরু—এই তিন প্রাণী-দলের স্বাস্থ্য যে-দেশে উত্তম, সে-দেশের উন্নতি এবং সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

সেদিন আমরা এলুম সেই বাড়িতে যেখানে টলন্টয় সপরিবারে বাস করতেন। বাড়ির সামনে একটি অত্যন্ত প্রাচীন আমলের পাথর-বাঁধানো পথ—তার উপর দিয়ে চলেছে সেকলে ধরণের ময়লা যেমন-তেমন ট্রামগাড়ি, অদূরে ইটবারকরা পুরনো আমলের মস্ত এক কারখানা বাড়ি—তার না আছে ছিঁরি, না ছাঁদ,—সেই পথের ধারেই একটি ফটকের ভিতরে এসে গাড়ি থেকে নামলুম। ডানহাতি মস্ত এক মাঠের মতো,—সেখানে ঝোপ-ঝাড়, কয়েকটি গাছপালা, আশেপাশে সব বৃক্ষপত্র, ওপাশে কাদের যেন আধমরা বাগান। আমরা ঢুকলুম বাঁহাতি এক বারান্দার পাশ দিয়ে। মেরামতের অভাবে পুরনো বারান্দার একটা অংশ ভেঙে বুলেছে। পরে আমরা শুনলুম, টলন্টয়ের মৃত্যুর পর থেকে এই বাড়িটির পূর্বা-বস্থা অবিকলভাবে রাখার চেষ্টা হয়েছে।

এই উদ্যানভবনটি এখন যে গ্রীহীন বড় রাস্তাটার উপর দাঁড়িয়ে, সেটি

বর্তমানে টলন্টয়ের নামাঙ্কিত। একদা মোট বিঘাদশেক বাগানসমেত এই বাড়িটি টলন্টয় নিজের নামে কেনেন। তখন তাঁর বয়স ৫৩, সেটি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ। সেই বছর তিনি সপরিবারে মস্কোয় আসেন তাঁদের গ্রাম থেকে। টলন্টয়েরা ছিলেন সেকালের মস্ত জমিদার, প্রাচীন আমলের আভিজাত্যে তিনি মানুষ। তাঁর উপাধি ছিল 'কাউন্ট',—আমাদের দেশের মহারাজা অমরুকের মতো! তাঁর জীবনের ৫০ বছর কেটেছে বিলাস আর সম্ভোগের মধ্যে। আভিজাত্য নরনারী সমাজের ভিতরে থেকে নৃত্য-গীত-বাদ্য-মদ্য এবং আলস-লালস-রসরংগের মধ্যে চারিত্র-শৈথিল্য নিয়ে তিনি তাঁর সমগ্র তারুণ্য এবং যৌবনকাল আত্মহারা তন্দ্রায় অতিবাহিত করেছেন।

টলন্টয় প্রথম মস্কোতে আসেন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, তখন তাঁর ৯ বছর বয়স। তার পরে এসেছেন কয়েকবার, থেকেছেন নানা জায়গায়। তিনি যৌবন-কালের একটা সময় 'ব্রাইমিয়ান ওয়ার' উপলক্ষ্যে 'সেবাস্তপল' নগরীর বীরত্ব-ব্যাজক প্রতিরক্ষার যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। সেই যুদ্ধ থেকে তিনি বীরের সম্মান নিয়ে ফিরে আসেন। যেদিন তিনি সপরিবারে মস্কোর বাড়িতে এসে উঠলেন সেদিন তাঁর জগৎজোড়া খ্যাতি। 'আনা কারেনিনা, ওয়ার এন্ড পীস, সেবাস্তপলের গল্প' এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ কতকগুলি গ্রন্থ ততদিনে প্রকাশিত হয়েছে। এই বাড়িটিতে টলন্টয় ১৯ বছর অবাধ প্রীতি শীতকালের মাস-গুলিতে বাস করতেন। তাঁর জন্মস্থান হল মস্কো থেকে ১২০ মাইল দূরে 'যসনায়্য পলিয়ানা' নামক গ্রামে। বিরাশী বছর বয়সে টলন্টয়ের মৃত্যু ঘটে। তাঁর জীবনের মতো এমন কম-বহুল, স্বল্প-দোলায়িত, সমস্যাসমাকীর্ণ এবং এমন পরস্পরবিরোধী রসান্বিত জীবন বোধ করি অপর কোনও রুশ প্রতিভার ছিল না। যে-ব্যক্তি আপন পরিবারবর্গের নিকট নির্দিত, কলংকিত, উপেক্ষিত এবং অতি কঠোর সমালোচনা, বিদ্বেষ ও অনাদরের লক্ষ্য ছিল,—সেই ব্যক্তি আপন দেশ, জাতি, সমাজ ও বৃহত্তর মানব সভ্যতার বিচারে কেমন করে পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে রইল,—এটি ভেবে অনেক সময় অবাধ হতে হয়। জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর কাল তিনি পারিবারিক অশান্তির মধ্যে বাস করেন, এবং স্ত্রীর নিকট তিনি অশ্রদ্ধা ও সন্দেহের পাত্র হয়ে থাকেন। ভারতবর্ষ তাঁকে 'ঋষি' টলন্টয় বলে যখন

শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল, টলন্টয় তখন তাঁর স্ত্রীর ঘৃণা বহন করে চলেছেন! জনৈক রুশ জীবনীকার বলেছেন,— "His domestic relations were difficult and strained.... The last 30 years of his life abounded in painful clashes between the writer and his family, the majority of whom did not share his views."

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে টলন্টয় তাঁর ডায়েরীতে লেখেন, "It is very difficult for me with my family because I cannot share their feelings. All their joys, ex-aminations, social successes, music, furniture, purchases — all these things I consider to be their mis-fortune and harmful for them, and I do not know how to tell them. I can and do say so. but no one understands what I say."

টলন্টয় যখন মস্কোয় এসে বাড়ি কিনে বসবাস আরম্ভ করলেন, তখন তাঁর আটটি সন্তান। সেরগি, তাতিয়ানা, ইলিয়া, লিয়ো, মোরীয়া, আন্দ্রে, মিখাইল এবং আলেক্সি। অর্থাৎ পাঁচ ছেলে এবং তিন মেয়ে। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল নাদেজদা ব্রুপসকায়্য। স্বামী স্বেচ্ছাচারী, আটটি নাবালক ছেলেমেয়ে, বাড়িটি খেতে বড় নয়, অব্যবহৃত বাইরের লোকের আনা-গোনা আর খানাপিনা, বাড়িতে থানা-পুলিশ আর গোয়েন্দার উৎপাত, ছেলে-মেয়েরা কেউ উপযুক্ত লেখাপড়া শিখছে না, চারিদিকে অগোছালো গৃহস্থালী, এলোপাতাড়ি ঘর-কন্নার খরচ, শব্দ-বাড়ির অমন অট্টালিকা আর বনবাগান ছেড়ে আসা, শহরের হট্টগোল—এই সমস্ত অশান্তি ছেড়ে দিলেও স্বামীর স্বভাব চারিত্র সম্বন্ধে,—হুঁ,—নাদেজদা অনেক সময় মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং ঘৃণায় ও অপমানে তাঁর সর্বশরীর কিল-বিল করে উঠত! মস্কোয় তখনও ইলেকট্রিকের প্রচলন হয়নি, শহর তখন প্রাচীন ও জরাজীর্ণ,—সুতরাং নীচের তলায় শোবার ঘরটিতে কেরোসিনের আলোটা জেদলে এবং ঘরের কোণে কাঠের আগুন রেখে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নাদেজদা ক্রোধ ও ঘৃণার সত্ত্বে স্বামীকে নোংরা ভাষায় আক্রমণ করতেন! অতঃপর সেই বন্ধ ঘরের মধ্যে কি প্রকার নাটকীয় দৃশ্য সংঘটিত হত, সেটি বাইরের লোক টের পেত না বটে, তবে দিনমানে নাদেজদা অনেকের সামনে

স্বামীকে ছেড়ে কথা কইতেন না! নাদেজদা সোঁদন বোধ করি অনুমান করতে পারেননি, পৃথিবীর সকল দেশের অগণিত নরনারী পরবর্তীকালে তাঁর এই শাদামাটা নীচের তলাকার স্বল্প-পারিসর শয়ন-কক্ষটিকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান মনে করে ঘাসের জুতো পায়ে পায়ে প্রণাম জানিয়ে যেতে পারে! সেই বিছানা, সেই সামান্য কথানা বই, সেই কেরোসিনের সেজবাতি, ছোট আলমারি, মোমবাতিটা, শ্লেট-চামচ-ডিস, চেয়ার-টেবিল-সোফা,—প্রতিটি সামান্য সাধারণ সামগ্রী,—সেই সব অবিকলভাবে সাজানো! রবীন্দ্রনাথ তাঁর মস্কোযাত্রায় এ ঘরটিতে এসেছিলেন কিনা জানিনে, কিন্তু একটি কবিতার চরণে তিনি আগেই লিখে গেছেন, “তোমার চরণস্পর্শে” বিম্ব-ধূলি মলিনতা যায় ভুলি পলকে পলকে,—মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে বলকে বলকে।... তুমি তাই পবিত্র সদাই।”

আমরা নীচে এবং উপরে প্রশস্ত এবং সংকীর্ণ নানা কক্ষে ও করিডরে চলাফেরা করছিলাম। এ বাড়ির পৃথক দোভাষীগীরা আছেন, টলষ্টয়ের সমগ্র জীবনীতহাসিটি তাঁদের কণ্ঠস্থ। আমাদের পিছনে-পিছনে রয়েছে গাভ—যেমন থাকে সব যাদুঘর এবং চিত্রশালায় বা সংরক্ষণ-কক্ষে।—কোনও সামগ্রী স্পর্শ করা এখানে বিধি নয়।

এ বাড়ির সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তুর মধ্যে টলষ্টয়ের বৈঠকখানা, তাঁর লেখাপড়ার ঘর, তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা তাতিয়ানার বিশ্রান্তালাপের ঘর এবং তাঁর সাত বছরের যে ছেলেটি দুরারোগ্য রোগে মারা যায়, সেই খরধারবৃদ্ধি এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় সন্তানটির লেখাপড়া ও খেলনার সরঞ্জামগুলি যে-ঘরটিতে রক্ষিত, সেই ঘরটি। বস্তুত, সোঁদন দর্শনাথীদের মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তিকে দেখিনি যিনি তাঁর ভাবাবেগ সংবরণ করতে পেরেছেন! টলষ্টয় দাবা খেলতে ভালবাসতেন, সেই দাবার ছকটির উপর তাঁর শেষ খেলার ঘড়িগুলি এলোমেলোভাবে সাজানো। এটি তাঁর বিশ্রান্তালাপের সুপারিসর কক্ষ মেঝের উপর পুঁরু এবং ছবিআঁকা কাপেটটি পাতা। এ ঘরে এলে বুঝতে পারা যায়, সন্তানের আমলের কাউন্টের ঘরে ঢুকেছি! প্রত্যেকটি সুন্দর ডিজাইনের চেয়ারে, নখর রংগীন নখমল আঁটা। ওখানে বসতেন টুংগেনিভ, এখানায় লেনিন, ওধারে গোর্কি আর শেক্স, ওঁপাশে লামেঁ-টভ, তরুণ

মায়াকোভস্কি আর পাণ্টেরনাক, গিসেমস্কি, স্টানিসলাভস্কি, লিওনিড আন্দ্রিয়েভ, মামিন সিবিরিয়াক ইত্যাদি। জনৈক রুশ লেখক বলাছেন,— “For many years Tolstoi's house was a centre of universal attention. Social leaders and scholars, men of letters and students, the peasants of distant regions came to see the great writer there”.

টলষ্টয়ের বড় মেয়ে ছিলেন শিল্পী ও কাব্যরসিকা। তাঁর সখ ছিল স্ক্রনিংশ ও বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভের সমস্ত শিল্পী, কবি, ঔপন্যাসিক, রাজনীতিক এবং অন্যান্য সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের ‘অটোগ্রাফ’ সংগ্রহ করা। সেই সুন্দর খাতাখানি আজও সকলকে খুলে দেখানো হয়। তাতিয়ানা ছিলেন পরমা সুন্দরী এবং নৃত্য ও গীতে ছিলেন বিশেষ পারদর্শিনী। সন্তানের পারিষদ-বর্গের সমাজেও তাঁর যথেষ্ট সমাদর ছিল। পিতা টলষ্টয় যখন আপন প্রাণের গভীর তলদেশের আত্মিক সমস্যাঙ্কমে দিশাহারা হয়ে মহৎ একটি আদর্শের সন্ধান করছেন, জননী নাদেজদা যখন সন্তানদলের ভবিষ্যৎ হিতাহিত চিন্তায় অসীম বিড়ম্বনার ভিতরে দিনযাপন

করছেন, অন্যান্য ভাইবোনেরা চারিদিকে যখন স্বেচ্ছাচারের রাজ্যপাট বসিয়ে হৈ-হুটগোলে উন্মত্ত, তখন জ্যেষ্ঠকন্যা শ্রীমতী তাতিয়ানা রুশজাতির তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কবি, অভিনেতা ও অভিনেত্রী, সাহিত্যোৎসাহী, নৃত্যশিল্পী, গায়ক ও গায়িকা, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, —এঁদের মাঝখানে বসে “প্রসাধনসাধনে চতুরা, জানে সে ঢালিতে সূরা বসনের ভূষণভগ্নীতে।”

তাতিয়ানার সর্বপ্রকার আচরণে অভিজাত রুশসমাজের বিলাস-ব্যসন, রুচি-প্রকৃতি, রসবোধ, আনন্দোচ্ছলতা, পরম রমণীয়রূপে প্রস্ফুটিত হতো।

টলষ্টয়ের লেখাপড়ার ঘরটিতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁর পড়াশুনার টেবিলটি। এটি তিনিদিকে বারান্দার মতো রেলিং ঘেরা। উৎকৃষ্ট আখরোট কাঠের তৈরি সেই আমলের। যতদূর মনে পড়ছে এই বৃহৎ সবুজ কাপড়-ঢাকা টেবলের দুদিকে দুইটি দেরাজ। টলষ্টয় বা লেনিনের আমলে ফাউন্টেন পেন-এর প্রচলন হয়নি, তাই সর্বগ্রহই দোয়াত আর কলম! টেবলের উপর মোমবাতির শেজ। টলষ্টয়ের ব্যবহৃত ব্লিটিং পেপার, একটি



বিশ্ববিখ্যাত শিশুসাহিত্য

লরা ইংগলস ওয়াইল্ডারের

বিজন বনের নিরলা ঘরে

কুলাই নদীর বাঁকে

প্রান্তরে ছোট্ট সহর

মোশেফ ক্রামগোল্ডের

এবার আমার পাল্লা

প্রতিটির মূল্য ১.৫০

ভিক্টর হিউগোর

নীল সাগরের নাবিক

১.০০

পরিচয় পাবলিশার্স : সর্বপ্রকার পুস্তক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

২১, হায়ং খাঁ লেন, কলিঃ-৯ ফোন : ৩৫-২৪১৪

পেন্সিল, দোয়াত-দান, পেন্সিল-কাটা ছুরি, কাগজ-চাপা, একটি চাবি,—এটা-ওটা, টুকটাকি! এই টেবলে বসে টলন্টর একে একে মোট ১০ খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটু রোমাঞ্চ আসে সর্বশরীরে যখন শুনি এই ডেস্কে বসেই লেখা হয়েছিল “Resurrection, Kreutzer Sonata, The Death of Ivan Ilyich, Master and Man, The Living Corpse, What is Art? Reply to Synod! ইত্যাদি। টেবলটির কাছে চেয়ার-খানা অপেক্ষাকৃত নীচু, কেননা তিনি কাগজপত্রের উপর সম্পূর্ণ বসে পড়ে কাজ করতেন। পড়াশুনার সময় তিনি চশমা ব্যবহার করতেন না। জীবনে যিনি সর্বাপেক্ষা দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর কাছের দৃষ্টি ছিল ব্যাপসা। অর্থাৎ তাঁর চোখের চশমা ছিল ‘শর্ট-সাইট’-এর। ডেস্কের ধারেই বাগানের দৃষ্টি জানলা। টলন্টর সর্বাপেক্ষা মনোযোগের সঙ্গে এই টেবলে কাজ করতেন সকালের দিকে। কেউ তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটাত না। লেখার পর তিনি কাটাকুটি করতেন বিশেষ পরিশ্রমে। তাঁর বিশ্বাস, লেখা যত কাটা যায় তত সুন্দর হয়! একটি দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে উঁচুতে পড়বার বা লেখবার একটি ব্যবস্থা রয়েছে। বসে বসে কোমরে ব্যথা ধরলে এখানে দাঁড়িয়ে লেখবার সুবিধা ছিল। “রেসারেকশন” রচনাকালে এটির বিশেষ প্রয়োজন ঘটে। “রেসারেকশনের” প্রথম নামকরণ হয়েছিল ‘কোনি’ কাহিনী। মাঝে মাঝে অন্যান্য কাজ করে ‘রেসারেকশন’ বইটি লিখে শেষ করতে তাঁর দশ বছর সময় লেগেছিল। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ১৯৬২ পৃষ্ঠা এবং এ বইয়ের ১৫০০ শত পৃষ্ঠা প্রুফ এখানে অতি যত্নে রক্ষিত আছে।

টলন্টর অনেক রকম কাজে রস খুঁজে পেতেন। যেমন জুগলে গিয়ে কাঠ কাটা, মাটি খোঁড়া, জল তোলা, জুতো তৈরি, বরফ কাটা, মোজার কলে চাকরি করা, চাবীর সঙ্গে লাগল টানা ইত্যাদি। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কালে তিনি ব্রিলফের কাজে কাঁপিয়ে পড়েন, এবং দুর্ভিক্ষের উপর তাঁর রচনাটি কতৃপক্ষ প্রকাশের সম্মতি দিতে নারাজ হন। তাঁর বহুপ্রকার রচনাপ্রকাশের বিরুদ্ধে গভর্নমেন্টের সেন্সর বিভাগ ও পুলিশ বহু বছর থেকে বিরোধিতা করছিলেন! টলন্টরের আমলে নস্কোবাসীর জীবন ছিল অতি দুর্গত।

রাশিয়ার ধর্মমন্দিরগুলি রুশসম্রাটের সৈন্যচাকরের তাবোদার ছিল, এবং টলন্টর নির্মমভাবে ঈশ্বরের এই প্রতিভূ ‘গর্জা’-সমাজকে আক্রমণ করেছিলেন। এর ফলে তাঁরা টলন্টরকে খৃষ্টীয় ধর্মসমাজ থেকে বিতাড়িত করেন এবং তার জন্য দেশের সর্বত্র টলন্টরের পক্ষ নিয়ে প্রবল আন্দোলন চলে। লেনিন লিখেছিলেন, “বেশ, খুব ভাল। কিন্তু এই আচরণের কৈফিয়ৎ তোলা রইল! জনসাধারণ যেদিন গভর্নমেন্টের অত্যাচারের বিচার করতে বসবে, সেদিন এর হিসাব-নিকাশ হবে বৈকি।”

লেনিনের বিপ্লবের পর এর হিসাব-নিকাশ করতে দেরি হয়নি!

আগাগোড়া সমস্ত বাড়িটি খুঁটিয়ে দেখে যখন বোরিয়ে এলুম, তখন আমার সঙ্গীরা বললেন, আমাদের সকলের হয়ে ‘ভিজিটার্স বুক’-এ আপনিই কিছু লিখে দেবেন!—এই বলে তাঁরা চলে গেলেন। তাঁরা কোথায় যেন সার্কাস দেখতে যাবেন!

কিছু লিখবার আগে আমার সামনে আনা হ’ল কয়েকখানি মূল চিঠিপত্র। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে গান্ধীজী ও টলন্টরের মধ্যে যে কতখানি পর-বিনিময় হয়েছিল, এগুলি সেই! আজকের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির ধার ক্ষয়ে গেছে বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যে-শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও প্রীতির পরিচয় রয়েছে, সেগুলি আমি মন্থ মনে পাঠ করেছিলুম। গান্ধীজী টলন্টরকে শিক্ষকের মতো শ্রদ্ধা করতেন।

আমি খাতার লিখতে বসলুম বটে, কিন্তু আবেগবিহীনভাবে আমার হাত কাঁপছিল। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীমতী লিডিয়া। তিনি বোধ করি আমার মানসিক অবস্থা বুঝেই আমার পিঠের উপর দৃ—একবার হাত চাপড়ালেন ধীরে ধীরে। লেখাটি যখন শেষ করে উঠলুম, তিনি সেটি সযত্নে পাঠ করলেন। পরে বললেন, কোনও ভারতীয় এমন করে আর কোনও দিন এ খাতার লেখেননি!

ফটক পেরিয়ে চলে আসার আগে লিডিয়া রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিলেন!

এই দিনটির ঠিক সাড়ে দশ মাস পরে একদিন প্রাতরাশের পর বিদুষী দোভাষিণী শ্রীমতী অকসানা একখানি সুন্দর মোটর এনে বললেন, চলুন যাই—টলন্টরের জন্মভূমি, আদি বাসস্থান এবং যেখানটিতে তাঁর দেহ-সমাধিস্থল—সেই ‘যশনায় পলিয়ানা’ ঘরে আসি। মোট দশ থেকে বারো ঘণ্টা লাগবে!

শ্রীমতী লিডিয়াও এসে পেঁছলেন। সঙ্গে কিছু আহাৰ্য সামগ্রী নেওয়া হল।

গ্রীষ্মকাল চলে গেছে। এখন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। মেঘ, বৃষ্টি, রৌদ্রের কাল। মস্কোর আবহ অনিশ্চিত। কদিন ধরেই মেঘ আর অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলছিল। রোদ্দ দেখছি আজ। মোটা মোটা ওভারকোট এবং সোয়েটার আমাদের গায়ে। হাত-পা কনকন করছে মস্কোর বাইরে এসে। কিন্তু এটি নাকি শরৎকাল! সকলের গায়ে এগুলি শরত-ঋতুর ওভারকোট! এবার গাছের পাতা ঝরে যাবার দিন আসন্ন, ঠান্ডায় তারা দিনে দিনে শীর্ণ হচ্ছে! মাঠে এবং ময়দানে, বনে-অরণ্যে, গ্রামের পর গ্রামে হরিৎ, রক্তনাল এবং রক্তিম আভা ছড়িয়ে রয়েছে দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়ায়, পপলার এবং ওয়ালনাটে, চেরী-বাচ, ওক, শেগুন-চেনার প্রভৃতির বনে-বনে। এ যেন কোন এক নিজনি পৃথক পৃথিবী,—দিগন্তের পর দিগন্ত অন্তহীন অরণ্যবহুল সমতল। এমন মৃন্ময়, সুশ্যাম ও বিশাল শাল্মলীর শোভা কতবার দেখে এসেছি শীতের দিনে মধ্যভারতে, বিন্ধ্যপ্রদেশে এবং মধ্যপ্রদেশের পথে পথে।

বাঁধানো সুন্দর পথ। সোভিয়েট আমলে দেশের প্রত্যেকটি রাজপথকে প্রশস্ততর করা হয়েছে। কিন্তু এই ‘মহাদেশ’ যে পরিমাণ বৃহৎ, ঠিক সেই পরিমাণে লোকসংখ্যা কম। লোকসংখ্যার স্বল্পতার জন্য কর্মসমস্যা অনেক বেশি। দেশজোড়া বৃহৎ কর্মযজ্ঞ, বৃহত্তর সংগঠন ও নবনির্মাণ—কিন্তু সে-তুলনায় মানুষ নেই! সুতরাং শুধুমাত্র পুরুষের হাতে ছেড়ে দিয়ে মেয়েরা কেমন করে শ্রম ধর-কমা নিয়ে থাকবে? বাইরে থেকে তাই ডাক দিয়ে বাচ্ছে, চলে এসো, ছুটে এসো, ছিঁড়ে এসো! সময় বড় কম। হোটেল খোলা আছে, মেয়েপুরুষ সেখানে যা খুঁশি খাও! ক্রেচ (creche) খোলা আছে, শিশুদেরকে সেখানে নির্ভাবনায় জমা দাও! কিন্তু বসে থেকে না, আলস্যকে প্রশ্রয় দিয়ো না, ব্যক্তিগত কারণের অছিলায় দেশকর্মকে এড়িয়ে যেরো না। সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা একে একে করে দিচ্ছি,—এসো, মাঠে নামো, কারখানায় ঢোকো, খনির তলায় নেমে যাও,—যাও সমুদ্রে, অরণ্যে, সাই-বোরিয়ায়, তুন্দ্রায় ও তাইগায়, মরুভূমিতে, কামস্কাটকায়, নভায় জেমলিয়ায়। এখনও ভালো কথা বলছি, সার্বধান, কথার অবাধ্য হলে জোর করে কাজ

আদায় করব। যা চাও, একে একে সব দেবো। বিশ্বাস কর, সমস্ত দেশের সম্পদ তোমাদেরই। বংশ-পরম্পরায় তোমাদের! এসো,—মেয়েপুরুষ, ইতরভদ্র, নীচু-উঁচু—সবাই একসঙ্গে সকল কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নাও! মনে রেখ, “আরাম হারাম হয়!”

আমাদের সমস্যার সঙ্গে ওদের মিল কম। ওদের দেশে মেয়েপুরুষ বালক-বালিকা মিলিয়ে যে জনসংখ্যা, আমাদের দেশে কেবলমাত্র পুরুষের সংখ্যা তাই! ওদের চারজন লোকে ইলেকট্রিক যন্ত্রের দ্বারা একশ' গজ রাস্তা এক রাতে কাটে, আমাদের দেশে সে-যন্ত্র এলে পুরুষ-সমাজে বেকার-সংখ্যা বাড়ে। ওরা সব প্রকার যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগের দ্বারা একটি ছোটখাটো নগর নির্মাণ করে ছয় মাসে,—সেখানে অল্প লোকের দ্বারা বেশি কাজ মেলে। কিন্তু আমাদের সমস্যা বেশি লোককে কাজ দেওয়া! ওদের দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেই বললেই হয়, কিন্তু আমরা কথায় কথায় বন্যায় ভেসে যাই! ওদের শীতপ্রধান দেশে দশ ঘণ্টা পরিশ্রমেও মেয়েপুরুষ কাবু হয় না, ওদের দেশে আজ ট্রাক্টর ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু আমাদের চার ট্রাক্টরপ্রধান হয়ে উঠলে কোটি কোটি চাষী বেকার হয়ে য়রবে। নতুন সমস্যা দেখা দেবে।

একশ' কুড়ি মাইল পথ। মোটরে মোটামুটি চার ঘণ্টা লাগে। মস্কা থেকে আমরা দক্ষিণ সমতল ধরে যাচ্ছি। মস্কোর চারিদিক জুড়ে যেমন বহু শত গগনচুম্বী 'ক্রেম' শত শত বহু ইমারত নির্মাণের কাজে রত, বাইরে এলে সেটি কম চোখে পড়ে। গ্রামে গ্রামে ছবির মতো কাঠের রং-করা বাড়িঘর,—চালাঘর চোখে পড়ে না। দুধারের পাশ্বেপথগুলি অধিকাংশই কাঁচা, এবং সেই পথ ধরে গ্রামের ভিতরে যাওয়াটা যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়। সেখানে অভাব-অনটন, অসুবিধা এবং দুর্ভোগ চতুর্দিকেই ছড়ানো আছে,—কিন্তু অবস্থার উন্নতি করার জন্য যে অধ্যবসায় এবং প্রচেষ্টা, সেটি চিন্তাকর্ষক। সমগ্র জাতি বেন গৃহস্থানের সন্ধান পেয়ে গেছে, এমনতরো উদ্দীপনার ভাব। হাজার হাজার গ্রামে জলাভাব, লক্ষ লক্ষ লোকের আশ্রয়ভাব, বিবিধ প্রকার বস্ত্র, জুতা, এবং বিভিন্ন প্রকার আবশ্যিক সামগ্রীর অভাব,—কিন্তু এ সমস্ত অভাব মোচাবার জন্য যে সমস্ত দৃশ্যমান সংগ্রাম দিনের পর দিন পরম আগ্রহে লক্ষ্য করছি, সেটি আমার পক্ষে ঈর্ষার বস্তু।

কিন্তু যারা কথায় কথায় সোভিয়েট ইউনিয়নকে একুশ কোটি নরনারীর স্বর্গ-রাজ্য বলে প্রচারকার্য করে, তারা প্রকৃত সোভিয়েট ইউনিয়নের খবর পায়নি, আর নয়ত তারা 'দুর্ভাগ্যক্রমে' দু'চারটি শহর-সহ 'ক্রেমলীন' প্রাসাদগুলি দেখে বাড়ি ফিরে গেছে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রচারপত্রগুলি স্পষ্টত কারণে অতি-শয়োক্তিভে ভরা—সেখানে সোভিয়েট-ইংল্যান্ড-আমেরিকার মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য কম,—সেগুলির দ্বারা রাজ-নীতিক উদ্দেশ্যসাধনের কাজ হয়ত চলে, কিন্তু সত্য নিরূপণের পক্ষে সেই সকল সন্তাদামের প্রচারপত্র যথেষ্ট বলে মনে করিনে!

প্রচারকার্যের পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা বড় হাট, কথায় কথায় আমেরিকার সঙ্গে তার তুলনা! রাশিয়ার বিপুল সাহিত্যসম্ভার নেই আমেরিকায়, কিন্তু আমেরিকার বিপুল বৈজ্ঞানিক সাফল্য নেই রাশিয়ায়! জীবন-যন্ত্রার সর্বব্যাপী মানোন্নয়নকে সার্থক ও

সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমেরিকা 'আড়াইশ' বছর সময় পেয়ে এসেছে, সেখানে সোভিয়েট ইউনিয়ন মাত্র পেয়েছে আর ক' বছর? সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন কেবলমাত্র তার বৈঠকখানাটি সাজিয়ে বসেছে, আমেরিকা তার অনেক আগে সুসজ্জিত করে রেখেছে তার শোবার ঘর থেকে স্নানাগারটি পর্যন্ত! সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন বলে, আমরা তিন বছরে আমেরিকা অপেক্ষা অমূল্য সামগ্রী পাঁচ-গুণ বেশি উৎপন্ন করছি, কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে আমেরিকা মাত্র তিনগুণ বেশি উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছে,—অতএব আমরা তাদের অপেক্ষা অনেক বেশি যোগ্য: তখন আমি নিজে খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসে যাই! হিসেব খতিয়ে দেখি, সোভিয়েট ইউনিয়ন তিন বছরে পাঁচগুণ উৎপন্ন বাড়িয়ে যেখানে এক মণ মাংস পেয়েছে, আমেরিকা সেখানে মাত্র তিনগুণ বাড়িয়ে পেয়েছে দেড় মণ মাংস!

প্রচারকার্যের নির্ভুল হিসেব কোনও দেশে মেলে না! শুধু দেখি, আমার

মধ্যবস্তুর শূন্যগর্ভ নীতি, বরপণ ও বর সংগ্রহের সমস্যা ও নারী লোভাতুর পুরুষের বিকৃত ক্ষুধা লেখক সব কণ্ঠের সুন্দর রূপ দিয়েছেন এই উপন্যাসে।

এমিলি জোন্সার

সুতেরো নম্বর বাড়ী ৩০০০

কবি গোবিন্দ চক্রবর্তী বঙ্গেনঃ—
বাংলার হারিয়ে যাওয়া এক সংস্কৃতিকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন লেখক তাঁর এই উপন্যাসে।

ডবেশ দত্তের

গান গেয়ে যাই ২০০০

বয়সে তরুণ হলেও লেখক বালিষ্ঠ হাতে দাঁখিয়েছেন রূপময়, ভাবময়, দেবতম চিরন্তন প্রেমের বেদনাময়, স্করুণ পরিণতি তাঁর এই উপন্যাসে।

সুদীন চট্টোপাধ্যায়ের

শেষ অভিসারে ২৫০

—: শীঘ্রই বাহির হইতেছে —:

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—

দুই পাখী এক নীড়

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—

কান্না গলির মানুষ



পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

মডো অর্বাচীন ব্যাক্তির চোখের সামনে পড়ে থাকে মস্ত এক গোলকধাঁধা!

কিন্তু একটি কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি। সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্মবহুল আয়ত্বে বহুর পশ্চিমের বৈশিষ্ট্য নয়। বাকি কুড়িটি বছর গিয়েছে অন্তর্বর্তীয়ে, যুদ্ধে, মড়কে, মন্বন্তরে এবং ভিতরে ও বাহিরে বহিঃশত্রুর জগৎ-জোড়া বিরূপ-তায়। তার আপন। বেষ্টনীর বাইরে পৃথিবী ছিল তার প্রতি নিষ্ঠুর এবং অবিরোধক। কিন্তু এই সমস্ত প্রকার বিরোধিতা সত্ত্বেও আপন 'মহাদেশকে' এই অল্পকালের মধ্যে সে যে সজ্জায় সাজিয়েছে, যে আভরণে সে ভূষিত করেছে, যে সম্ভাবনা এবং নিশ্চিত বিশ্বাসের পথ সে সমগ্র জগতের সামনে মেলে ধরেছে, সেটাকে শুধু দ্রুত মৌখিক সুখ্যাতি করে মৃৎ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না,—কেননা সর্বাপেক্ষা দুঃস্থ এবং সর্বাপেক্ষা আশাহত একটা বিরাট মানবমণ্ডলী যেখানে আপন পরম মূল্য খুঁজে পেয়েছে, সেখানে একটি অভিনব সভ্যতার উদ্ভাবন ঘটেছে, একথা মানতেই হবে। প্রাচ্যলোকেই একদা সর্বব্যাপী করুণার বীজমন্ত্র সঙ্গে নিয়ে সর্বাপেক্ষা দারিদ্র্য এবং দুর্গতির মধ্যে খুঁটান সভ্যতার জন্ম হয়েছিল কোন অখ্যাত বৈশ্বল্যের এক আশ্রয়ভূমির পাশে,—কিন্তু আপন রক্তক্ষরণের দ্বারা সে শূন্যতা এনেছিল পৃথিবীর অধিকাংশ ভূভাগে। কমিউনিজমের আমলে সোভিয়েট ইউনিয়নের ও কোথাও সেই 'করণাধারের' অপমৃত্যু ঘটেনি। যারা ক্রিমেলিনের ভিতরকার প্রাসাদগুলির অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করেছে, তারা জানে, নাস্তিক্যবাদের গর্বে গর্বিত মিঃ খৃস্টচল প্রতিদিন প্রতি সময়ে যে সকল কক্ষ-কক্ষান্তরে সকল কাজের সঙ্গে ছুটোছুটি করেন, সেই কক্ষগুলির দেওয়াল ও ছাদের সীলিংগুলি যীশুখৃষ্ট ও বাইবেলের সমস্ত কাহিনীগুলি সহ অপরূপ চিত্রণে শোভামণ্ডিত হয়ে রয়েছে। ওদের দেশে এখন 'কমিউনিজম' দল বা রাজনীতি কোনটাই নয়, ওটা ওদের ধর্ম, তার ধর্মগুরু হলেন লেনিন—কেননা তিনিই ওই ধর্মের প্রবর্তক, এবং তাঁরই পূজা চলে ওদের ঘরে বাইরে। ওইটাই ওদের 'নিত্যকর্মপদ্ধতি'। ওরা এখন বিশ্বাস করে, খৃস্টমতবাদের পরিপূরক হল কমিউনিজম! কেননা, ওরা বলে, কমিউনিজম হল "greatest good of the greatest number".

প্রাচীন মধ্যাশিয়ার টুলা শহর পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। 'উপা' নামক নদী-তীরবর্তী এই শহরটি এককালে অশ্রু-শ্রু ও চর্মসামগ্রী নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং এখনও আছে। ২৫০ বছর আগে পীটার দি গ্রেট জনৈক ইংরাজ ব্যবসায়ীর সাহায্যে এখানে একটি অশ্রু-নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি আজও আছে। এই শহর আজও ধাতব বাসন এবং আদারসমৃদ্ধ রুটি প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ যেন লাহোর শহরের একটা অংশ। পুরনো পল্লী, ভিতরে ভিতরে খোয়াভাঙ্গা পথ, এখানে ওখানে বিপণি বেসাতি, মাঝে মাঝে মাথা তুলছে বড় বড় ইমারত, নতুন নতুন রাস্তা, গরীব গৃহস্থ-পল্লী রয়েছে আশে-পাশে, লরী-বোবাই সজ্জসম্ভার এসে দাঁড়িয়েছে পথের ধারে, পাশ দিয়ে সাইকেল চড়ে বোঁ করে ছুটে যাচ্ছে এক যুবক, শিশুদেহে ধুলোর মধ্যে খেলায় মেতেছে, দোকানে কাজ করছে মেটে রংয়ের মেয়ে,—সমস্তটা জড়িয়ে প্রাচ্যলোকের গন্ধ! এ ছবি আমার চিরদিনের চেনা।

হঠাৎ পিছন পথে দূর থেকে হুইস্‌ল বাজল! আমাদের গাড়িখানা থেমে গেল। একটা হাসলেন আমাদের বলিষ্ঠকায় ভদ্র ড্রাইভার। ব্যাপার কি? দেখতে দেখতে একজন মিলিচম্যান অর্থাৎ পুলিশ অর্থাৎ ট্রাফিক কন্ট্রোল আমাদের গাড়ির সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়াল। আমাদের ড্রাইভার সেইপ্রকার মিষ্টহাস্যেই পকেট থেকে তিনটি রুবল বার করে কন্ট্রোলারের হাতে দিয়ে একটি রসিদ নিলেন। জরিমানা দেওয়া এবং নেওয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষেরই হাসিমুখ দেখে আমি তৃতীয় পুরুষও হেসে বললাম, ঠিক বৃদ্ধিতে পাচ্ছি। দুটি মহিলাকে দুপাশে নিয়ে বাগানবাড়ি বেড়াতে গেলে এদেশে কি ঘৃণ দিতে হয়?

ভীষণ হেসে উঠলেন দুটি মহিলা! শ্রীমতী অকসানা বললেন, বৃদ্ধি, অনেকক্ষণ চা খাননি তাই আপনার রাগ! দাঁড়ান দিচ্ছি—

শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, তুমি জান না অকসানা, ওর অমনি সব বাঁকা-বাঁকা কথাই চোনা! গা জ্বালা করে কথা শুনলে!

অকসানা খুব হাসলেন। বললেন, না, এ সত্য নয়।—শুনুন, আমাদের ড্রাইভার অন্য একখানা গাড়িকে পাশে ফেলে

এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, তাই জরিমানা!

বললাম, কিন্তু পুলিশ ছিল অনেক দূরে, নম্বরও দেখিনি। আমাদের ড্রাইভার গাড়ি ছুটিয়ে পালাতে পারত!

লিডিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হলেন,— Strange you are! This is Soviet Union, dear friend!

হাসিমুখে অকসানা বললেন, না, এখানে কেউ পালায় না। অবশ্য এখানে পথের শাসন খুব বেশি। পথের উপরে সিগারেটের কুচি, দেশলাইয়ের খালি বাক্স, কিংবা ধরুন কাগজের নুটি—এসব ফেলতে দেখলে পাঁচ রুবল জরিমানা হয়!

প্রশ্ন করলাম, মস্কোতে মোটর স্ন্যাকসিডেন্ট কি রকম?

অকসানা বললেন, তিন সপ্তাহের মধ্যে শূন্য! হয়ে যায় এক-আধটা মধ্যে মধ্যে!

তখন ড্রাইভারকে ঠোঁটগেয়ে মারে না? গাড়ি পোড়ায় না রাস্তার লোক?

শ্রীমতী লিডিয়া অধিকতর উত্তেজিত হলেন। বললেন— no accident is wilfully done, mind you, Sir! Everybody knows it!

হাসিমুখে অকসানা বললেন, নিজের গাড়িতে ড্রাইভার সেই আহত কিংবা মৃত ব্যক্তিকে তুলে নেয়। সবাই এসে সাহায্য করে। এইটাই এখানে নিয়ম।

এর পর দু'একটি সাঁকো এবং সমৃদ্ধ জনপদ ও সুন্দর তরঙ্গায়িত পথ পেরিয়ে একটি অধিত্যাকাভূমির পাশে এসে এক নিরিবালি অঞ্চলে নামলাম। এটি টলস্টয়ের বংশের আদি বাসস্থান। এটির নাম 'যশনায়্য পলিয়ানা'।

'আউট হাউসের' সামনে দাঁড়িয়ে-ছিলেন এই মিউজিয়মের ডাইরেটর সাহেব। বয়সে প্রবীণ, নম্র এবং বিনীত, টলস্টয়ের বিশেষ অনুরাগী। অমায়িক সৌজন্যের দ্বারা তিনি অভ্যর্থনা জানালেন। বাইরে থেকে এই এন্ট্রিটের বিরাট অনুমান করা যায় না। আমরা দু'একটি ঘরের ভিতর দিয়ে বাগানের ধারে টলস্টয়ের বসত-বাড়ির সামনে এসে দাঁড়লাম। চারিদিকে বৃহৎ বৃক্ষাদিময় ছায়াঢাকা বন-বাগান। এখানে-ওখানে মালীরা কাজ করছে, জল আনছে, চালা-ঘরগুলি দেখাশুনা করছে। ডাইরেটর বললেন, যা কিছু দেখছেন বা দেখবেন, পঞ্চাশ বছর ধরে সমস্তই অক্ষয় এবং অক্ষত আছে। কোনও সামগ্রী কোথাও

থেকে নড়েনি। আসুন, আগে আপনারা একটু জলযোগ করে নিন।

অদূরে প্রবেশপথের দুপাশে দুটি গোল-গম্বুজওয়ালা পাহারাদারের ঘর। তার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলে বিশাল বনময় একটি মনোহর জগৎ! সমস্ত চেহারাটাই যেন টলটলয়ের ব্যক্তিত্বের বিশালতার সঙ্গে মেলানো। তিনি মস্কোর থাকতেন শীতের কয় মাস,—বরফ গলতে আরম্ভ করলেই তিনি পল্লী-প্রকৃতির আকর্ষণে এখানে চলে আসতেন। এই ব্যবস্থা ছিল প্রতি বছর। তাঁর স্বাস্থ্যাত্মী এবং দৈহিক শক্তি ছিল অপারিসীম। এই একশ' কুড়ি মাইল পথ তিনি বহুবাহু পায়ের হেঁটে এসেছেন! পথের দুপাশে চাষীদের ঘরে রাত কাটাতেন। সাহিত্যের জগতে এত বড় 'দানব' আর কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ। সামনে দেখতে পাচ্ছি বৃহৎ বৃক্ষ-জটিলার তলা দিয়ে সুপ্রশস্ত পথ বহু দূরে চলে গেছে। এধারে পুষ্পোদ্যান, ওধারে পশুপক্ষী পালনের ঘর, আস্তাবল,—এবং বড় বড় গাছপালা যা কিছুর দেখাছি, সমস্তই টলটলয়ের নিজের হাতে পোঁতা। তাঁর সন্তানসংখ্যা মোট তেরোটি। পাঁচটি মারা যাবার পর ছিল আটটি। এখন একটিও নেই। বড় ছেলে সের্গি ৮৫ বছর বয়স অবধি বেঁচে ছিলেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনিও মারা যান। এখনও জীবিত আছেন একটি পৌত্র, তিনি বর্তমানে মস্কোর অধ্যাপক। টলটলয় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ৪৮ বছর ধরে ঘর করেছিলেন। তাঁর এই 'এস্টেট' প্রায় এক হাজার বিঘা জমির ওপর। এরই এক প্রান্তে অরণ্যভূমির সংলগ্ন একটি টিলা পাহাড় চোখে পড়ছে। এই এস্টেটে বসেই তিনি একদা 'আনা কারেনিনা' রচনা করেছিলেন। টলটলয়ের জীবিতকালেই তাঁকে দর্শন করার জন্য পৃথিবীর বহু দেশ থেকে অভ্যাগতরা এখানে আসতেন। এখানকার আশপাশে কয়েকটি গ্রাম টলটলয়ের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং তিনি সেখানে অবৈতনিক পাঠশালা বাসিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে লেখাপড়া শেখাতেন, তাদের বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতেন, রোগভোগে ঔষধপত্র এবং খাদ্য-সামগ্রী পাঠাতেন।

বড় জমিদারবাড়ির ভিতর-মহলের সম্পদ ও বৈভবের চেহারা বোধহয় সর্বত্রই এক। এই সমস্ত বিলাস-বৈভবসজ্জা ও ভোগের সহস্রবিধ উপকরণ ছেড়ে গিয়ে

মস্কোর বাড়ির নীচেরতলার ঘরখানা শুধু তাঁর স্ত্রীর কেন—জগতের কোনও স্ত্রীরই ভাল লাগার কথা নয়! সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিসম্বাদের অন্যতম কারণটি বুঝি বৈ কি। ভোগবিলাসী পুরুষ সম্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, এর উদাহরণ ভারতের মতো অনেক দেশেই হয়ত আছে। কিন্তু সেই পুরুষের সঙ্গে তার স্ত্রীও সব ছেড়ে ভৈরবী হয়ে বেরিয়ে পড়েছে, এমনটি শোনা যায় কম। মেয়েরা সন্তানকে ফেলে পালাতে সহজে চায় না, কিন্তু পুরুষ এক সময় সন্তানকেও স্বীকার করে না। মহৎ শিল্পীর চরিত্রের সঙ্গে যে বহুপ্রকার খেলা-খুঁশির দুরন্তপনা অনেক সময় জড়িয়ে থাকে, এবং সে যে একইকালে মহানুভবতায়, ক্ষুদ্রতায়, উদারতায়, হিংসায়, বেদনায়, কামনায়, ভালবাসায়, কপটতায়, দুঃখে ও বেদনায়, ত্যাগে ও সম্ভোগে, ঘৃণায় ও মমতায়—সে যে বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য হয়ে উঠতে পারে,—এই বিবেচনার অবকাশ ও ধৈর্য যদি টলটলয়ের স্ত্রী খুঁজে না পেয়ে থাকেন, সেটি তাঁর অন্যাশ্য নয়! মহৎ শিল্পী হলেন পরম রসপ্রসূতা,—তাঁর পথ এবং মত, জাত এবং ধাত সমস্তই সাধারণের বাইরে। শিল্পী-স্বামীকে স্ত্রীও চেনে না, শিল্পী-স্ত্রীকে স্বামীও জানে না। দুটি দেহ থাকে এক বিছানায়, কিন্তু দুটি মন দুই আকাশে বিবাগী ভ্রমরের মতো অজানার অবেষণে ঘোরে। আশ্চর্য গভীর সেই অতীত টলটলয়কে পেয়ে বসেছিল তাঁর প্রবীণ বয়সে। স্ত্রী, সন্তান, সংসার, সম্ভোগ, সম্পদ কোনও কিছুরে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। সেইজন্য সর্বাপেক্ষা প্রাধান্যলাভ করেছিল দুখানি গ্রন্থ তাঁর প্রৌঢ় জীবনে। সে দুখানি বই সামনেই সাজানো রয়েছে। পেন্সিলের দাগ দিয়ে-দিয়ে এ দুখানি বই আগাগোড়া তিনি সম্বন্ধে পাঠ করেছিলেন। প্রথম বইখানি : "গৌতম বুদ্ধ, তাঁর জীবন, প্রচার, এবং ভিক্ষু সম্মা।" এই বইখানি জার্মান ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন স্বর্গত অল্ডেনবার্গ। এক এক জায়গায় দাগ কেটে টলটলয় আবার তার পাশে নম্বর টুকুছেন! অপর বইখানির ইংরেজি নাম : "দক্ষিণ আফ্রিকায় জনৈক ভারতীয় দেশপ্রেমিক।" এ বইখানি রচনা করেছেন

Joseph J. Doke, Baptist Minister, Johannesburg, with an introduction by Lord Ampthill, G.C.S.I., G.C.I.E., K.C. Published by the London Indian Chronicle, 164, High Road, London.

বইখানি ইংরেজি, এবং মলাটের উপর গান্ধীজির একখানি ছবি! এই দুখানি বইয়ের কাছাকাছিই রয়েছে একখানি 'পবিত্র কোরান'। টলটলয়কে চিনতে দৌর হয় না!

যে প্রশস্ত কালোবর্ণ গাঁদাআটা সোফার উপর টলটলয় 'ভূমিষ্ঠ' হয়েছিলেন সেটি সামনেই রয়েছে। আর একটি দৃষ্টব্য বস্তু হল, সোভিয়েট আমলে কেবলমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেরই মোট ৮১টি ভাষার টলটলয়ের ৯০ খানি গ্রন্থের সবসম্বন্ধ ৮ কোটি ৬০ লক্ষ রুপি ছাপা হয়েছে! টলটলয় নিজ মাতৃভাষা ছাড়া ১৩টি ইউরোপীয় ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারতেন! ডিকেন্স-এর বই তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু সঙ্গীত ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তাঁর ড্রয়িংরুম দুটি মূল্যবান পিয়ানো রয়েছে। কোথায় ভোজের বা নাচের আসর, কোথায় নিভৃত নিকেতনের "পুরুষসুন্দরীর নৃপদ্যুনিষ্কল, ভগ্ন প্রাসাদের কোনে, মরে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে, কাঁদায় রে নিশার গগন।"—তাও এ অট্টালিকার ভিতরে ভিতরে রয়ে গেছে। তাঁর সাহিত্যসাধনার কক্ষটিতে প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত কে পি এস মেনন একখানি বড় গান্ধীজির ছবি সম্প্রতি উপহার দিয়েছেন!

একদিকে তদানীন্তন রুশ রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম, জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষণা, দেশকল্যাণ-কর্মপথে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ, সমাজজীবনের আশিক্ষা, কুসংস্কার, অজ্ঞান, রক্ষণশীলতা, গির্জাধর্ম, ইত্যাদির বিপক্ষে তাঁর নিষ্ঠুর আক্রমণ,—এবং এদেরই সঙ্গে তাঁর পারিবারিক জীবনের ভয়াবহ অশান্তি ও গৃহকলহ, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রীর মানসিক আতঙ্ক, তাঁর কন্ট্রাক্টরী প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা,—এই বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষ যেন বনস্পতির মতো আপন শাখাপ্রশাখায়, পত্রে-পল্লবে, শিরা-উপ-শিরায় সবগুলিকে ধারণ করেছিলেন!

এখানে নানা কক্ষে প্রমাণ রয়েছে, ভারতকে উত্তমরূপে জানবার জন্য টলটলয়ের ঔৎসুক্য ছিল প্রচুর। ভারতের বেদ বেদান্ত উপনিষদ, ভারতের সমাজ-জীবন, ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম, ভারতের জ্ঞান ও দর্শন, এগুলি বিশেষভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করত বলেই তিনি বহু বিশিষ্ট ভারতীয় পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনের সঙ্গে পত্রাবিনিময় করতেন। একবার একজন

রুশ মহিলা, শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা করসিন ভারতের বহু অঞ্চল ভ্রমণ করে ফিরে যান আপন দেশে। সেটি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ, টলস্টয়ের মৃত্যুর পূর্ব বৎসর। টলস্টয় সেই মহিলাকে আমন্ত্রণ করে 'রশনায় পলিয়ানায়' নিয়ে আসেন এবং তাঁর মুখে ভারত-ভ্রমণ-কাহিনী শোনবার আগে টলস্টয় আশপাশের গ্রামের যেখানে যত বালক-বালিকা ছিল, তাদেরকে ডেকে এনে সেই মস্ত আসরে জড়ো করেন। শ্রীমতী আলেকজান্দ্রা যখন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন, এবং ভারতবর্ষে তোলা তাঁর ছবিগুলি ম্যাজিক ল্যান্টনের সাহায্যে পর্দার উপর প্রতিফলিত করে একটির পর একটি দেখাতে থাকেন, তখন টলস্টয় প্রমুখ সেই সংখ্যাতিত বালকবালিকা মূগ্ধ বিম্বয়ে এক অপূর্ণ অশ্রুচর্য পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকে! একদা রুশসাম্রাজ্যের অর্গণিত অধিবাসী ভারতবর্ষকে জানবার জন্য, কিরূপ উদ্গ্রীব ছিল, তার পরিচয় যেমন সহজে রক্ষিত আছে বহু যাদুঘরে, তেমনি এই টলস্টয়ের বসতবাড়িতেও সেগুলি যেন চারিদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে। বলা বাহুল্য, সোভিয়েট আমলে সেই পরিচয়কে সূনিবিড় করে তোলবার একটি সর্বব্যাপী আয়োজন চলছে। পশ্চিমকে আমরা জানি বহুকাল থেকে। তাদের ন্যাউনাক্স জানি, হাট্টি কাসি চিনি,—বোধ হয় তাদের সঙ্গে আত্মিক যোগটাও ঘনিষ্ঠতর। তাদের ভাষা, সাহিত্য, সমাজনীতি, ধর্ম, রাষ্ট্রদর্শন ও অন্যান্য সংস্কৃতি,—এদের সঙ্গে পরিচয় আমাদের প্রচুর। ইংরেজ, আমেরিকান, রুশ,—এই তিন ব্যক্তি আজও যদি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, আমরা হয়ত ইংরেজ-আমেরিকান দুটির সঙ্গেই বেশি গল্প করি! কিন্তু এটি দেখতে পাচ্ছি সেই

প্রাচীন রুশসাম্রাজ্য, যেটি আজকের দিনে নাম পেয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন—(যাকে বলা হচ্ছে "ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাবলিক", এবং যার মূল নাম হল, "সোভিউজ সোভেট-সকিথ" সোভিসিয়ালিসটিচেসকিথ রেস-পুবলিক"—রুশভাষায় ইংরেজি "S" অক্ষরটি "C"-রূপে ব্যবহার করা হয়, এবং "P" অক্ষরটি "R" হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্র পতাকায় "CCCP" এই কণ্ঠি অক্ষর "কাস্টে-হাতুড়ির" সঙ্গে মিলিয়ে থাকে), এবং যেটি এককালে ছিল "ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এম্পায়ার" যেটির বর্তমান নাম "ইন্ডিয়ান সভারেন্ ডিমক্রাটিক রিপাবলিক"—সেই দুই বহু প্রচ্যুত-ভুখণ্ড আজও পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অনাবিস্কৃত এবং অপরিচিত! উভয় রাষ্ট্রের সরকারি প্রতিনিধিগণের মধ্যে আদানপ্রদান ও আনাগোনার দ্বারা যে-সংযোগটি সম্ভব হয়, তার ফলে একজন কেনে জুতো, অন্যজন কেনে তেল; একজন পাঠায় পশম কিংবা চা, অন্যজন পাঠায় মেনিন কিংবা পাইপ। সংস্কৃতির দিক থেকে একপক্ষ পাঠায় সিনেমার অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে, অন্যপক্ষ পাঠায় হয়ত বা একদল নাট্যনে-গাইয়ে। উজ্জবেক কবি শ্রীমতী জুলফিয়া, এবং উজ্বাইনের নাট্যকার মিন্‌কো ও কবি গ্রেগরী প্রমুখ দু'চারজন সাহিত্যিকমণী অতি অল্পকালের জন্য ভারতে এসেছিলেন, এটি উল্লেখযোগ্য। চল্লিশ বছর আগে দু'জন বাঙালী বিপ্লববাদী লেনিনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা দু'জনেই কৃতবিদ্য লেখক। একজন মানবেন্দ্রনাথ রায় ওরফে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এবং অন্যজন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। বিগত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এম-এন-রায় মহাশয় আমাকে তাঁর জীবনের নানাবিধ ঘটনাবলীর একটি মোটামুটি তালিকা, তাঁর বৈশ্বক কল্পপথ্যর একটি ইতিহাস এবং কয়েকখানি স্বরচিত গ্রন্থ আমার কাছে গচ্ছিত করেন! তাঁর ইচ্ছা

ছিল, আমি তাঁর একখানি প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোড়নের ফলে সেটি আর হয়ে ওঠেনি। বলা বাহুল্য তাঁর সেই জীবনের বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর প্রতি কিছু অনুরক্ত ছিলাম। তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষা আমার নিকট প্রশ্ণার বস্তু ছিল। ছোটবেলায় রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের রাজনীতিক ও বৈশ্বাবিক কার্যাবলী এবং রুশসাম্রাজ্যে তাঁর দূঃসাহসিক অভিযান বৃত্তান্ত আমাদের অনেকের পক্ষে গভীর ঔৎসুক্যের কারণ ঘটিয়েছিল!

টলস্টয়ের বাড়ির উপরতলা থেকে নামবার সময় দৌখ, একখানা ছবিতে তিনি দু'টি বলদের সাহায্যে লাঙ্গলের দ্বারা একটি মাঠে চাষের কাজে রত! ডাইরেক্টর সাহেব বললেন, ওই ক্ষেতটুকু ছিল এক অতি বৃন্দা বিধবা চাষী স্ত্রীলোকের। দু'নিয়ম তার কেউ ছিল না। কিন্তু ওই জমিটুকু চাষ না করলে তার শেষ জীবনে অববন্দ ও জুটবে না! কাউন্ট লিও টলস্টয় বৃন্দার সেই জীবন-মরণ সমস্যা বিবেচনা করে এবং আত্মীয়-পরিজন বন্ধুবান্ধব সকলের বাঙালিরা উপেক্ষা করে নিম্নমিতভাবে ওই বৃন্দার জমিটুকুতে কাজ করতেন।

বেলা পড়ে এল। এবার বিদায় নিতে হবে। বার্ট, ওক, চেরী, ওয়ার্লানট এবং পপলারের ঘন অরণ্যজটিলার মধ্যে দিনান্তের রক্তিম সূর্যের রংগীন বর্ণমালা বিলম্বিত করছিল। ঋষি টলস্টয়ের সমাধিস্থলটি দর্শন করে যাবার জন্য আমরা তিনজন সেই বাগানের ভিতর দিয়ে প্রায় আধ মাইল হাঁটিতে হাঁটিতে এসে থমকে দাঁড়ালুম একটি ছায়চ্ছন্ন বীথির প্রান্তে। পাশেই একটি বনময় জলধারা প্রবাহিত। গাছে গাছে নতুন-কালের পাখীরা দিনান্তের কাকলী কলরবে মূখর হয়েছিল। বিল্লীরব শুনছি আশেপাশে। আমরা তিনজনে স্তম্ভ, চরাচর চারিদিকে নীরব! আমি ভাবছিলাম টলস্টয়ের সেই সুন্দর ছোট গল্পটি,—ভূ-সম্পত্তির লেভে একটি মানুষ সারাদিন ধরে ছুটতে ছুটতে জমি অধিকার করল অনেকখানি। কিন্তু অপারিসমী ক্রান্তিতে সম্মুখবেলায় যেখানে পড়ে সে মারা গেল, সেই জায়গাটুকুর পরিমাপ হল মাত্র সাড়ে তিন হাত।

টলস্টয় বলে গিয়েছিলেন, এই বীথিকার ঠিক এই সংযোগস্থলে মমরিত

সুখে শিখ্রতা আনে

বোল্যান্ড

ফেস পাউডার

ব্যারন ক্যাপোউক প্রোডাক্টস • কলিকাতা

ফোন: ২২-৪২২৩

সার্ভে ড্রইং সরঞ্জাম ও
অফিস সংক্রান্ত স্টেশনারী
কাগজ বিক্রয় ও প্রিন্টিং

রহতম ত্রতীয় প্রতিষ্ঠান

কুইন স্টেশনারী স্টোর্স প্রাইভেট লি.

৬৩ ই. রাধারামপুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

জলাশয়টির ঠিক ধারে,—যেখানে মাঝে মাঝে শরতের সোনার বর্ণ পতঙ্গের গুঞ্জনগান গুনগুনিয়ে যায়—ঠিক সেই-খানে কোমল মৃত্তিকার একটু ভিতরে যেন তাঁর দেহটিকে রাখা হয়! তাই হয়েছে। তাঁর নিষেধ ছিল, কোনও প্রকার সমাধি মন্দির না ওঠে তাঁর দেহের উপর। মৃত্তিকাই হবে তাঁর আস্তরণ, শ্বেতভূষার হবে তাঁর আবরণ! তাই হয়েছে। শব্দ তাঁর মৃত্তিকার চারিপাশে রয়েছে কয়েকটি নামহারা অরণ্যপুষ্প! এটি যেন যুগান্তের বরণমালা!

মহিলা দুটি স্তব্ধ, অকম্প। শ্রীমতী লিডিয়ার দুটি চোখ বেয়ে জল নেমেছে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে সন্ধ্যার দিকে একটি পারিবারিক বচসা বাধে এবং সেটি মনো-মালিন্যের আকার নেয়। টলন্টয়ের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন বৃন্দ ডাঃ মাকোভাৎস্কি। তিনি টলন্টয়ের বিশেষ অনুগত ভক্ত ছিলেন। টলন্টয় সেই রাতেই নিঃশব্দে মস্কোর বাড়ি ছেড়ে মাকোভাৎস্কিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে চলে যান। যাবার আগে তাঁর ঘরেতেই স্ত্রীর জন্য কয়েকছত্র চিঠি রেখে যান। সেই চিঠির বক্তব্য, “আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যেন কোনও প্রকার চেষ্টা করা না হয়!” সেই রাতে ঘন অন্ধকার আকাশ থেকে অবিদ্রান্ত ভূষারপাত হাচ্ছিল। তাঁকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়নি!

মধ্যরাত্রে কোথায় যেন তাঁর এক বৃন্দা ভগ্নী মরণোন্মুখ হয়েছিলেন। টলন্টয় তাঁকে দেখতে যান সেখানে ‘শামাদিন’ নামক এক নার্সারিতে। সেই ভগ্নীর অবস্থার কি পরিণাম দাঁড়াল জানিবে, কিন্তু টলন্টয় সেখান থেকে ফিরবার পথে ২রা নবেম্বর তারিখে ট্রেনের একখানি অতিদ্রুত তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বোধকারি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন, এবং মাকোভাৎস্কি তাঁকে ধরাদরি করে পল্লীগ্রামের শ্বে-ক্ষুদ্র টেশনটিতে নামাতে বাধ্য হন। তার নাম “অক্টোপভো”। এই টেশনের ক্ষুদ্র ঘাটীশালার মেঝের উপর ৮২ বছরের বৃন্দ “পশুরাজকে” শুইয়ে রাখা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মাকোভাৎস্কি তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যের কোনও ব্যবস্থাই করতে পারেননি। পরবর্তী এই নবেম্বর তারিখে টলন্টয়ের মৃত্যু ঘটে! সোভিয়েট আমলে এই টেশনটির নামকরণ করা হয়, “লিও টলন্টয়”। এর চারিদিকে চাষীগ্রাম। তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল হতভাগ্য, দরিদ্র, পরপদদলিত চাষীসমাজ। তার মৃত্যু-

সংবাদ পেয়ে যারা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছিল হাজারে হাজারে এবং লাখে লাখে, তারা সেই চিরকালের হতভাগ্য, চিরবঞ্চিত সর্বহারার দল!

এই দিনটির সাত বছর পরে মস্কোর তিথি অনুসারে ঠিক এই নবেম্বর তারিখে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বলশেভিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়, এবং লেনিন ক্ষমতালাভ করেন!

সোদিন ফিরে এসে অনেকরাতে ‘উক্লাইনা’ হোটেলের নিচের তলায় বসে শ্রীমতী লিডিয়া বললেন,— am a non-believer! কিন্তু আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

তাকে যখন জানালুম, এ ধরনের প্রশ্ন আমার মনে ওঠে না, এবং প্রত্যেক মহাপুরুষের মধ্যেই ভারতবাসীর ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি ক্লিষ্টকণ্ঠে চুপ করে থেকে আবার কথা তুললেন, তা হলে পূজা কি, নৈবেদ্য কী? পরম লক্ষ্য কী?

এ সমস্ত জটিল প্রশ্নের উত্তর আমার বিদ্যাবৃন্দীর বাইরে, এটি তাঁকে আমি স্পষ্টই জানালুম। কিন্তু অপরাহ্নকালে টলন্টয়ের সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে এক সময় সহসা তাঁর চেখে জল দেখেছিলুম—বোধ হয় সেইটির স্রব ধরেই তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, মহৎপ্রাণের জন্য কালো আসে, কেন বলুন ত?

রবীন্দ্রনাথের একটি রচনার কয়েক-ছত্র অনুবাদ করে তাকে বোঝাতে চেষ্টা পেলুম, চোখের জলই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ পূজা!

But what about the offerings to your god?

জবাব দিলুম, জানিনে। তবে অনেকে বলে, হৃদয় হল শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য!

And you told me, knowledge is supreme in human life?

এই গোড়া কমিউনিষ্ট নারীর দিকে চেয়ে বললুম, কি বলেছিলুম আমার মনে নেই। কথার ফাঁসে আমি পড়তে চাইনে। তবে শুনোছি এ Knowledge অন্য। সব টেকনোলজির বাইরে! সোভিয়েট শাস্ত্রে এগুলো বোধ হয় নেই!

You are always very rude! Please do tell me, what is that thing!

বললুম, ম্যাডাম, অধ্যাত্ম চর্চার জন্য আপনাদের দেশে আসিনি। ওটা আমার জানাও নেই! তবে ওটা thing নয়, বোধ হয় কিছু একটা feeling! অনেকে বলে, realisation!

You mean, that is beyond the dialectic materialism?

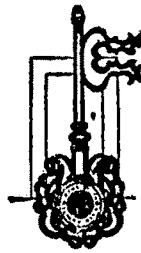
আমি জানিনে।

শ্রীমতী এবার বোধ হয় একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। অনুযোগ জানিয়ে ঈষৎ রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, আপনি কোনও প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে চান না। কিন্তু একটা জটিল সংশয় তুলে রেখে যান। সোভিয়েট নাগরিক কোনও বস্তুর সম্বন্ধে সংশয় পছন্দ করে না। সত্য আমাদের সামনে নির্ভুল স্পষ্ট হোক এই আমরা চাই।— Do you think you like the role of a snake-charmer?

রাত একটা বাজতে চলল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাসলুম। বললুম, আমার ঘাড়ে নালিশ নাই চাপালেন! আমার ধারণা, সোভিয়েট মেয়েরা সাপ নয়!

You think, or you believe?

দুজনেই হেসে উঠে বিদায় নিলুম। অতঃপর একদিন শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে খোঁটা দিয়ে বলেছিলেন, You do not know how your expressions affect me and where they strike. But I hold you responsible for many of my sleepless nights! (ক্রমশঃ)



পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধির

সোনার কাঠি

ব্যক্তিগত কল্যাণ ও জাতীয় সমৃদ্ধি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এই কল্যাণ বা সমৃদ্ধি-সাধন একমাত্র পরিকল্পনাহীন প্রযত্নের দ্বারা ইহলকালে সম্ভবপর। এবং পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে জাতীয় তথা ব্যক্তিগত সঙ্কল্পের উপর।

সুসংগঠিত ব্যক্তির মারফত সঙ্কল্প যেমন ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দূর করে, তেমনি জাতীয় পরিকল্পনারও রসদ যোগায়।

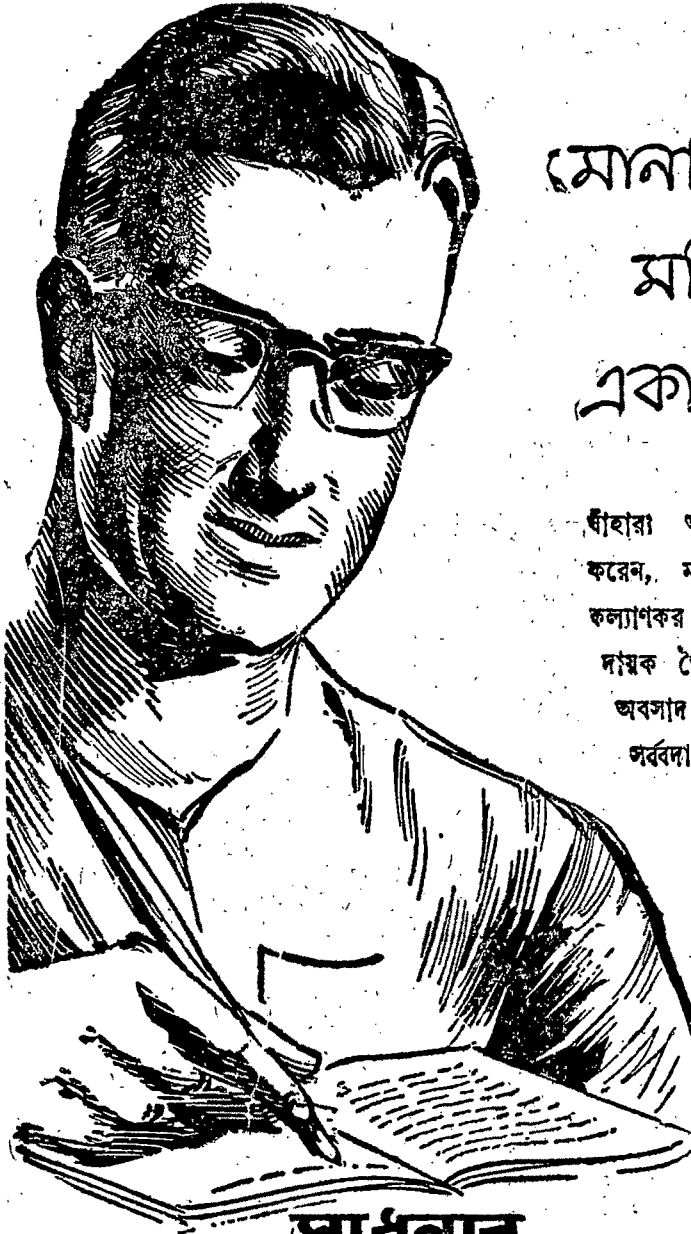
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪নং ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা-১

ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ব্যাঙ্ক অফিস এবং পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে করেশপন্ডেন্ট মারফত

আপনার ব্যক্তিগত সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার গ্রহণে প্রস্তুত





মৌনসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

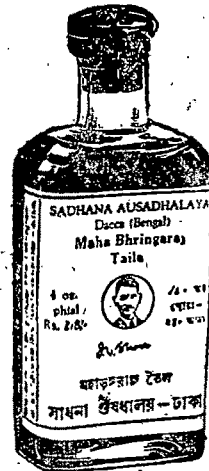
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভূঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই নিদ্রাকর ও আরামদায়ক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্বদা প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনার
মহা ভূঙ্গরাজ
তৈল



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন

অধ্যক্ষ ত্রিযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন, এক, সি, ও.স. (লণ্ডন) এম, সি, এস (আমেরিকান)
ভাগলপুর কলেজের ইন্সপেক্টর শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

অসি রেখা

৬২২৮



[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতিদিন সকালবেলা প্রেস খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহাদুর এসে পড়ে। অন্য সকলের কাজ শুরু হবার আগে তাকে অনেক কিছু করতে হয়—প্রেস-মাস্টারের টেবিলটা ঝেড়ে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা, সেদিনকার 'জব'গুলোর লিফটকরা, কাকে কি 'টাস্ক' দিতে হবে ঠিক করা, কোন 'ম্যাটারটা' মেশিনে চড়াতে হবে, কোন অর্ডারটা আগে 'কম্পোজ' যাবে, কোন কোন 'প্রুফ'গুলো দেখা হয়নি—ইত্যাদি। প্রায় সবই পেস-মাস্টারের কাজ; তারই করবার কথা, কিন্তু বিনোদবাবু প্রতিটি খুঁটিনাটি বাহাদুরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিত হয়ে আছেন। এ সব বিষয়ে সেও রীতিমত ওয়াকিফহাল। আফিসের বাবুরা তা জানেন। সাহেবেরও অজানা নেই। তাই অনেক সময় প্রেস সম্পর্কে হঠাৎ কোনো দরকার পড়লে তাঁর কাছেও বাহাদুরের ডাক পড়ে।

আজ বাহাদুর অনুপস্থিত। ব্যাপারটা কারোই নজর এড়াবার কথা নয়। ছেলেমহলে এই নিয়ে কানায় কানায় শূন্য হলে, যদিও কি ঘটেছে, তার সঠিক খবর কারো জানা নেই। কিছুক্ষণ পরে বিনোদবাবু এলেন; অন্যান্যদের সঙ্গে এসে পড়েন। আজকের এই দেরি এবং তার মূখের ঐ থমথমে ভাব—দুটোর সঙ্গেই যে বাহাদুরের যোগ আছে, বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। দিলীপকে তিনি একটু বিশেষ সুনজরে দেখেন। ছেলেরা তা জানত। তাই তাদের মধ্যে যারা একটু বেশী উৎসাহী মাস্টারের কাজ থেকে রহস্যটা ভেদ করবার জন্যে ওকেই এসে চেপে ধরল। ওর নিজের আগ্রহও কম ছিল না। আস্তে আস্তে বিনোদবাবুর কাছে গিয়ে

দাঁড়াল, এবং তিনি চোখ তুলতেই জিজ্ঞাসা করল, বাহাদুরদা আসেনি কেন, স্যর?

—সে আসবে না, গম্ভীর ভাবে বললেন বিনোদবাবু।

—আসবে না! কেন?

—তাকে বাইরের 'বাগান দফার' 'পাশ' করা হয়েছে। যাও, কাজ করোগে। যেটা না পারবে আমাকে দেখিয়ে নিও।

কথাটা সকলেরই কানে গেল, এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের জায়গায় থ' হয়ে বসে রইল। সেই মহতের কাজ করবার মত মনের অবস্থা কারোই ছিল না। দিলীপও ফিরে এসে বসল তার ছোট টুলটার উপর। জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা ছিল কেন তাকে বাগানে যেতে হয়েছে, কিন্তু মাস্টারের কথা শুনে বুকল তিনি এ সম্বন্ধে আর কিছু বলতে চান না।

ব্যান্ড-মাস্টারের মেয়ের বয়স চৌদ্দ-পনের। তার কাছে একটি কুড়ি-একশ বছরের বস্টাল বয়—এর গোপন আনাগোনা! আইন ভঙ্গের প্রশ্ন তো রয়েছেই, তাছাড়া নৈতিক দিক থেকে এটা আরো গুরুতর। যে-প্রশাসনিক শৈথিল্য এর জন্যে দায়ী তার গুরুত্বও কম নয়। আইন অনুযায়ী চলতে গেলে, অর্থাৎ যাকে বলে 'অফিসিয়াল অ্যাকসন' নিতে হলে জল অনেক দূর গড়াবে, এবং এ-ব্যাপারে সাক্ষাৎ ভাবে যারা জড়িত, তারা ছাড়াও আরো অনেকে জড়িয়ে পড়বে। দুর্নামের পাল্লা হেড-অফিস পর্যন্ত ধাওয়া না করে ছাড়বে না। তার জেরও সহজে মিটবার নয়। সব দিক বিবেচনা করে এবং হয়তো ছেলেটার ভবিষ্যৎ ভেবে কর্তৃমহলে ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই সিদ্ধান্ত হল। কাজ ও

স্বভাবের গুণে বাহাদুর সকলেরই প্রিয়পাত্র। তার উপরে পেটী অফিসার-মহলে তার প্রচুর প্রভাব। স্বপ্রাচুর্যবিশিষ্ট বিবাহের ফাঁকে গেটকীপারের সাহায্যে কিংবা তার চোখে ধুলো দিয়ে আবার পাছে সে গেট থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ব্যান্ড-মাস্টারের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়, তাই ডেপুটি সুপার তাকে বাইরের বাগানে অর্থাৎ জেলের পেছনে বেশ খানিকটা দূরে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। বাগানে যারা কাজ করে, মাঝখানে খাবার সময়টুকু বাদ দিয়ে প্রায় সারা দিনটা তাদের সেখানেই কাটতে হয়। তার উপরে বাগানী সিপাইটিও বেশ কড়া। বিশেষ করে বাহাদুরের বেলায় রীতিমত হুঁসিয়ার থাকবার জন্যে ডেপুটিবাবু তাকে গোপন নির্দেশ দিলেন।

পরোক্ষভাবে বাহাদুরের খানিকটা শাস্তিও হল। সে শূন্য 'স্টার' নয়, 'স্পেশাল স্টার'; লেখাপড়া জানে; প্রেসের কাজে যে সম্মান ছিল, বাগানে তা নেই; জেলের মধ্যে যে অবোধ গতি-বিধির অধিকার ছিল, বাইরে গিয়ে তার অনেকখানি খর্ব হল। ছেলেদের চোখে সে বেশ কিছুটা ছোট হয়ে গেল।

খাবার 'ফাইল' বাহাদুরের সঙ্গে একবার চোখোচোখি হতেই দিলীপ সঙ্গেসঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। কেমন একটা লজ্জা ও সঙ্কোচ যেন তার মাথাটাকে নুইয়ে দিল। তার সঙ্গে কিসের খানিকটা অভিমত। এই পাহাড়ী ছেলেটাকে সে এরই মধ্যে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছিল। তার কোনো বড় ভাই নেই। যদি থাকত তাকেও হয়তো এই চোখেই দেখত। এ কী করেছে, সে সম্বন্ধে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। এই পর্যন্ত জানে, কাজটা ভাল নয়।

ভাল, মন্দ যাই হোক, সকলের আগে তারই কি জানবার অধিকার ছিল না? কিন্তু বাহাদুর তাকে কিছুই বলেনি। এ কথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

খাবার পর, ভিড়ের হাত এড়িয়ে দেবদারু বাঁথিকার ধার দিয়ে দিলীপ বিষয় মনে একা একা একটু ফাঁকার দিকে যাচ্ছিল; পেছন থেকে ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল। বাহাদুর এগিয়ে এসে ওর পিঠের উপর হাত রেখে মৃদু হেসে বলল, কি রে? আমার ওপর রাগ করেছিস?

দিলীপ সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'তোমার নামে ওরা কী সব যা-তা বলছে, বাহাদুরদা।' বলতে বলতে চোখ-দুটো হঠাৎ ছলছল করে উঠল। সেটা লোকোবার জন্যে মাথা নীচু করে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

বাহাদুরের মূখের উপর থেকে হাসির রেখা মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল গাম্ভীর্যের স্ফলন ছায়া। দূরে মাঠের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, বলুক গে! তুই কোনো জবাব করিসনে। একটু ফুরসৎ পেলেই সব তাকে জানাবো।

গেটের পাশ থেকে বাগানী সিপাই-এর হাঁক-ডাক শোনা গেল—'এই কোথায় গেলি রে তোরা?' বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, এখন চাঁল। কেমন?

বাগানে তখন পুরো মরশুম চলছে। 'দফা' নিয়ে ফিরতে রোজই দেরি হয় বাগানীর। ঐদিন এল প্রায় সন্ধ্যার মুখে। অন্য সব ছেলেরা তার আগেই খেয়ে নিয়েছে। ব্যারাকের সামনে খোলা মাঠে "সিনেমা" অর্থাৎ মসৃণ জ্যাকট গায়ে দেখানো হবে। সকলের মুখেই উত্তেজনা। সেই কিস্তিত বস্ত্রটা এসে গেছে। ছোট-বড় সবাই সেখানে ভিড় জমিয়ে কলরব করছে। আর কোনো দিকে কারো নজর নেই। পেটী অফিসাররাও ওদের সামলাতে ব্যস্ত। বাগানের ছেলেরা কোনো রকমে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে নিয়ে ছুটে এসে দলে ভিড়ে গেল। দিলীপের চোখদুটো বাহাদুরকে খুঁজছিল, ইচ্ছা ছিল তার কাছে গিয়ে বসবে, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না। তারপর ছবি শব্দ হতেই আর কিছু মনে রইল না। বাহাদুর তো তুচ্ছ, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার চোখের সন্মুখ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে রইল শব্দ

একখানা সাদা রং-এর পরদা এবং তার উপরে একটি রূপকথার চলমান জগৎ। বসন্তের টিকা না নিলে কী বিপদ ঘটে, কুইনাইন না খেলে একটা ছোট্ট মশা কী কান্ড বাধায়—এই সব দরকারী তথ্য নিয়ে ছবি। পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক লম্বা লাঠির ছুঁচলো ডগা দিয়ে সেই-গুলোই দেখাছিলেন এবং সেই সঙ্গে চলছিল তার অনর্গল বক্তৃতা। দিলীপের কানে তার একটি বর্ণও যায়নি। মৃদু চক্ষু মেলে সে শব্দ দেখাছিল; তন্ময় হয়ে ডুবে গিয়েছিল ঐ দ্রুত অপরিস্রবান ছবিগুলোর মধ্যে। কে জানত এত বিস্ময়ও ছিল পৃথিবীতে!

এক সময়ে সব শেষ হয়ে গেল। পেছনে দাঁড় করানো যাদুযন্ত্রটা এতক্ষণ ধরে যে একটানা শব্দ করে চলেছিল, সেটা হঠাৎ থেমে গেল, ভদ্রলোক তার বক্তৃতা খামিয়ে লাঠি নিয়ে সরে গেলেন। দিলীপ তখনো সেই রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করছে। সহসা যেন কোন রূঢ় আঘাতে স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠল। ভারী রাগ হল ঐ ভদ্রলোকের উপর। এত তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলেন, আর একটু দেখাতে পারলেন না!

সকলের মুখেই 'সিনেমা'র তারিফ, কণ্ঠে আনন্দের উচ্ছ্বাস। তার মধ্যে শোনা যাচ্ছে চীফ অফিসারের হাঁক-ডাক। সবাই গিয়ে এবার লাইন করে দাঁড়াতে হবে ব্যারাকের সামনে। সেখানে এক-দুই-তিন করে 'গুণ্ণিত' মেলানো হবে। তারপর যে যার ঘরে ঢুকতে যাবে। ঠিক সংখ্যাটা যতক্ষণ না মেলে, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিচ্যুত কাটে না, বিশেষ করে যোদিন সিনেমা দেখানো হয়। গেট খোলা থাকে, 'স্টাফ'-এর ছেলেমেয়েরা অবাধে আসতে পায়, তাদের বন্ধুরাও ভিড় করে। সাহেবের হুকুম আছে। ডেপুটি সুপার আইনের দিক থেকে আপত্তি করেছিলেন, 'সিকিউরিটি'র দোহাই দিয়েছিলেন। কোনোটা ইটেকেনি। সাহেব তাঁর সেই বরাবরকার হালকা হাসিটা দিয়েই সব উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন 'আপনার আমার ছেলেগুলোর পকেটে না হয় কিণ্ডং রস্তু আছে, মাঝে মাঝে দু-একটা আসল সিনেমা দেখতে পায়। কিন্তু ওরা?—বলে, সেই বেঁটে লাঠিটা উঁচিয়ে ধরেছিলেন এক পাল ছেলে-মেয়ের দিকে, 'সিনেমার'-গন্ধ পেয়ে যারা ছুটে এসেছে তাঁরই কর্মীদের কোয়াটার্স থেকে। 'ওদের তো এইটুকুই

সম্বল।' হঠাৎ কি মনে করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এখানকার সিনেমার সবচেয়ে কমদামী টিকেটগুলো কত করে জানেন?'

—বোধ হয় পাঁচ আনা।

—তার মানে, ভর গোষ্ঠীর এক দিনের বাজার খরচ।

ডেপুটি বলেছিলেন, আর কিছু নয়, ভিড়ের মধ্যে দুটো-একটা যদি ভেগে যায়, এই ভাবনা।

—ভাবনা ওদেরও আছে। ভেগে যাবে কোথায়? খাবে কী?

এইখানে বোধ হয় একটু ভুল করেছিলেন অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী সুপারিন্টেন্ডেন্ট। আহার ও আশ্রয়ের ভাবনাই মানুষের মনের প্রায় সবখানি জুড়ে থাকে, সন্দেহ নেই; তবু তার বাইরেও এমন কিছু আছে, কোনো অন্তর্নিহিত তাড়না, যার আকস্মিক আবির্ভাব ঐ দুটো প্রবল চিন্তাকে এক মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন সে সব কিছু জ্বল অজানা অনিশ্চিতের গর্ভে ঝাঁপ দেয়, একবারও ভাবে না, কী খাবো কিংবা কোথায় যাবো।

এমনি একটা বিরল অভিজ্ঞতা যে ঐ দিনই তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, তিনি নিশ্চয়ই ভাবতে পারেননি। 'সিনেমা শো' ভেঙে যাবার পর মাঠ যখন ফাঁকা হয়ে গেছে, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সেই লাঠিওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প জমিয়েছিলেন। সন্তোষ-বাবুও ছিলেন তার পাশে। হঠাৎ হস্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এল চীফ অফিসার। বাইরের লোক দেখে একবার একটু ইতস্ততঃ করল। ডেপুটি জিজ্ঞাসা করলেন, ও দিকে সব ঠিক আছে তো?

—না স্যার। শব্দক মুখে জবাব দিল চীফ অফিসার।

—না মানে!

—একটা কম পড়ছে। বাহাদুরকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ডেপুটির মুখে আর কথা সরল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। চীফের রিপোর্ট সাহেবের কানে গিয়েছিল। অক্ষুণ্ণ স্বরে 'সে কি' বলে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকলেন, সেদিকে চেয়ে ডেপুটি সুপার যেন হঠাৎ সর্বাংগে ফিরে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চোঁচিয়ে উঠলেন—'আলার্ম!'

গ্রীন হাউসের ছেলেরা সবে কম্বল-গুলো খুলে বিছানা পাতবার আয়োজন করছে, গেটের পেটো ঘন্টার ঢল ঢল আওয়াজ শব্দে থমকে দাঁড়াল। যারা বেশী দিন ধরে আছে, সমস্বরে চোঁচিয়ে উঠল, 'পাগলা ঘন্টা!' স্টাফ হাঁক দিল,

‘জোড়ায় জোড়ায় বসে পড়।’ দিলীপ ‘পাগলা ঘণ্টার’ নাম শুনেছে, কিন্তু সেই ভয়াবহ বস্তুটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। তার বৃকের ভিতরটা অজান্তে কে’পে উঠল। ততক্ষণে অনেকেই গিয়ে এক সারিতে দুজন-দুজন করে বসে পড়েছে হল-এর সামনেটার। সেও তাদের দেখাদেখি একজনের পাশে গিয়ে বসল। একটু পরেই সহকারী চীফ অফিসার নোট বই আর পেন্সিল নিয়ে ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকল এবং দো, চার, ছয়... বলে জোরে জোরে গণনা শুরু করল। সংখ্যাটা যখন খাতায় টুকে নিচ্ছে, লাইনের মাঝখান থেকে কে একজন বলে উঠল ‘কে ভাগল?’

‘উস্মে তোম’হারা কোন কাম হয়?’ চোখ পাকিয়ে, মুখ ভেঙে জবাব দিল সহকারী চীফ, এবং সঙ্গে সঙ্গে, তেমনি ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

কিন্তু খবর চাপা রইল না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই শব্দ হল চাপা গলার গুঞ্জরণ। অনেকের মুখেই গভীর বিস্ময়। বাহাদুরের পক্ষে এ যেন একেবারে অসম্ভব। দু-একজন বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে জানাল, এ তারা আগেই বুঝতে পেরেছিল। কেউ কেউ এই সুযোগে দিলীপকে খানিকটা খোঁচা দিয়ে গেল—‘কিরে, তোর সঙ্গে এত ভাব; আর শেষটায় তোকে ফেলেই চলে গেল!’ দিলীপ সাড়া দিল না। কথা বলবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না।

পরদিন কানাঘুষার ভিতর দিয়ে আরেকটা আরো সাংঘাতিক খবর তার কানে এসে পৌঁছল—ব্যান্ড-মাস্টারের মেয়েকেও গত রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাহাদুরই যে এ মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়েছে, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। বড় ছেলেগুলোর মধ্যে একটা দল বাহাদুরকে দেখতে পারত না। তারা রীতিমত উল্লসিত হয়ে উঠল। সিরাজুল আর সতীশ এই নিয়ে নানা কুৎসিত কথা রটিয়ে বেড়াতে লাগল। তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হল দিলীপ, মকবুল এবং আরো কয়েকটি ছোট ছেলে, বাহাদুর যাদের বিশেষভাবে ভালবাসত এবং ওদের সংগ্রহ থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করত। দিলীপ একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সতীশদের সব কথার মানেনা বুঝলেও এটুকু বুঝবার বয়স তার হয়েছিল যে, এই মেয়েঘটিত ব্যাপারটা অত্যন্ত খারাপ, এবং পালানোর চেয়েও অনেক বেশী গহীত কাজ করে গেছে বাহাদুর। তার সেই দুপুরবেলা বাইরে বেরিয়ে যাওয়া, গোপনে কাগজ, পেন্সিল, খাবার যোগানো, ব্যান্ড-মাস্টারের বাড়ির দিকে তার গভীর আকর্ষণ, যে অজ্ঞাত কারণে তাকে হঠাৎ প্রেস থেকে বাগানে চালান দিলেন ডেপুটিবাবু—সবটাই একটা

বিশ্রী রূপ নিয়ে দেখা দিল দিলীপের মনে। বাহাদুর যে বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত তার কাছে সব চেপে রেখেছিল, তার কারণ নিশ্চয়ই এই, যে সেটা বলবার মত নয়। এ মেয়েটার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, তার স্পষ্ট ধারণা না হলেও, সেটা যে মন্দ, এ বিষয়ে দিলীপের মনে আর সন্দেহ রইল না। অথচ এই বাহাদুরকে সে কত উপরে আসন দিয়েছিল। সেখান থেকে আরেকজনের এই অপ্রত্যাশিত পতনের আঘাত আজ যেন তারই বৃকে এসে বাজল। এর মধ্যে যে লজ্জা জড়িয়ে আছে, সেও তার অংশীদার। এমন করে তার সব স্বপ্ন যে ভেঙে দিয়ে গেল, সেই পাহাড়ী ছেলেটার উপর দারুণ অভিমানে সমস্ত মন ভরে উঠল।

মকবুলের সঙ্গে দেখা হতেই সে বলল, এ আমি জানতাম। এ ডাইনীটাই ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। এ তো ওদের কাজ। এমন ভাব করবে যেন কত ভাল-বাসে তোকে, ‘তারপর কায়দা পেলেই ঘাড় মটকাবে।’

বলতে বলতে কেমন নির্বিক্ট হয়ে পড়িয়েল যেন কোন অতীত দিনের কোনো প্রত্যক্ষ দৃশ্যবলীর মধ্যে। তারপর হঠাৎ বিজ্ঞের মত রায় দিয়েছিল, অতটুকু ছেলের কাছে যা শুধু আশ্চর্য নয়, একান্ত অপ্রত্যাশিত—‘জানিস? মেয়ে জাতটাই বেইমান। ওদের কখনো বিশ্বাস করিস না।’

জীবনে ঠেকে শেখার চেয়ে বড় পাঠ আর কিছু নেই। অর্বাচনিক সে রাতারাতি প্রবীণ বানিয়ে তোলে, বালকের মুখে যোগায় বৃদ্ধের বুদ্ধি।

বিচারক যখন কোনো অপরাধীকে কারাদণ্ড দেন, সেই সঙ্গে সেই দণ্ডদেশ প্রয়োগ করবার ভার ন্যস্ত করেন কারাগারের অধ্যক্ষের উপর। You are required to execute the sentence according to law. বর্ডাল স্কুল, স্কুল হলেও কারাগার। এখানকার অধিবাসীরা দাঁড়িত বন্দী। একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ নিয়ে তারা আসে, তার থেকে যতটুকু মাফ প্রত্যেকের প্রাপ্য, বাদ দিয়ে, বাকী সময়টা তাদের ঐ বন্দীশালায় আটকে রাখার দায়িত্ব ওখানকার কর্তৃপক্ষের। সেটা লঙ্ঘন করা অপরাধ। নির্দিষ্ট কাল পার হবার আগে যদি কেউ পালিয়ে যায়, তার জন্যে সেই বন্দী যেমন দণ্ডনীয়, তেমনি তার নিরাপত্তার জন্যে যারা দায়ী, তাদেরও শাস্তি পেতে হয়। সুপারের কাজ হল সেই দায়িত্ব স্থির করা। তার আগে এই পলায়নের প্রাথমিক রিপোর্ট দাখল করতে হবে পদূলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, এবং কারাবিভাগের দপ্তরে।

খানিকক্ষণ ব্যর্থ খোঁজাখুঁজির পর সেই রাতেই সুপার তাঁর নিজের আফিসে বসে সেই রিপোর্টের খসড়া তৈরি করছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে ডেপুটি সন্তোষবাবু। দুজনের মুখেই দৃষ্টিস্তার ছায়া। ছেলেটা শুধু পালিয়ে যায়নি, তাদেরই অধীনস্থ কোনো কর্মীর কোয়ার্টার্স থেকে একটা মেয়েকে নিয়ে উধাও হয়েছে। ‘এসকেপ’-এর সঙ্গে অ্যাবডাকশন। পলায়নের সঙ্গে নারী-হরণ। বর্ডালের মুখে একরাশ কালি লেপে দিয়ে গেছে। সুপারের সব আশ্রয় গিয়ে পড়ল এ ‘বৃবক’ ব্যান্ড-মাস্টারের উপর। এতদিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিল লোকটা? ওর বোঁটাই বা কেমনখারা মানুষ? মা হয়ে বয়স্থা মেয়েকে একা ঘরে রেখে সিনেমা দেখতে এল বর্ডালের মাঠে।

দরজার বাইরে শোনা গেল বিনীত গম্ভীর স্বর—একবার আসতে পারি, স্যার? ব্যান্ড-মাস্টার বীরবাহাদুর। ও আবার কী চায়? সাহেব বললেন, ‘এসো।’ বীরবাহাদুর ঘরে ঢুকে মিলিটারী কায়দায় সেলুট করে দাঁড়াল। সাহেবের কণ্ঠে ফেটে পড়ল তাঁর মূহূর্ত পূর্বের রোষ—অ্যাম্পিন কী করছিলে? আজ এসেছ মেয়ে-চুরির নালিশ করতে।

—নালিস করতে আসিনি, স্যার।

—তবে কী জন্যে এসেছ?

—বলতে এসেছি, আমার কোনো নালিস নেই। মেহেরবাগী করে আমায় মেয়েকে এর মধ্যে জড়াবেন না।

—তা কী করে হবে? বাঁজিয়ে উঠলেন সন্তোষবাবু। এত বড় একটা ব্যাপার আমরা চেপে যেতে পারি না। ঘটনাটা ঘটেছে বর্ডাল স্কুলের হাতার মধ্যে।

বীরবাহাদুর কোনো জবাব দিল না, যেন শুনতেই পায়নি কথাগুলো। সাহেবের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। সুপার কয়েক মূহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে ধীর স্বরে বললেন, তুমি আলোচ্য ভাবে পদূলিশ-কেস করতে চাও?

—জী না; পদূলিশে আমি যাবো না।

—কিন্তু তোমার স্ত্রী যে বিশেষ করে বলে গেলেন ডেপুটিবাবুর কাছে—

—মেয়েলোকের কথা ধরবেন না, স্যার। সে যা-ই বলুক, আমি বলছি, আমার মেয়ের ভালমন্দ, মান ইজ্জৎ আমি বুঝবো। তা নিয়ে সরকারের কিছু করবার নেই। দয়া করে আমার পারিবারিক ব্যাপারে আপনারা হাত দেবেন না।

সুদূরটা অনুনয়ের হলেও, তার মধ্যে দৃষ্টি তার আভাস। ডেপুটিবাবু

আবার একটা কি বলতে যাচ্ছিলেন, সাহেব হাত তুলে বাধা দিলেন। এ স্বর তিনি চেনেন। অনেক দিন ঘর করেছেন এই অন্তরে বাহিরে জটিলতাহীন

পর অন্য কিছু বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

ঘোষসাহেব আর একবার তাঁর ব্যান্ড-মাস্টারের মূখের দিকে তাকালেন;

কোনো প্রশ্ন না করে শুধু বললেন, 'আচ্ছা, তুমি যাও।' ডেপুটিবাবুর দিকে ফিরে যোগ করলেন, 'শেষের লাইনকটা বাদ দিয়ে খালি এসকেপ রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিন।'

বর্ষাল স্কুলের যান্ত্রিক জীবন-ধারায় যে-টুকু উজ্জলতা ছিল, এই আকস্মিক দৃষ্টি তার প্রায় সবখানিই যেন একদিনে শুষ্ক নিয়ে গেছে। আফিসে, ব্যারাকে, ওয়াকশপে এমন কি খেলার মাঠেও কেমন একটা থমথমে ভাব। যে-যার রুটিন বাঁধা কজগুলো একটার পর একটা প্রায় নিঃশব্দ করে যাচ্ছে; কোথাও কোনো চাঞ্চলা নেই। বাহাদুরের উপর যারা নানা কারণে বিরূপ ছিল এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম প্রথম বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তারাও যেন হঠাৎ চুপসে গেছে।

স্কুল হিসাবে শিক্ষাবিভাগ বর্ষালকে প্রাইমারী বা প্রাথমিক স্কুলের পর্যায়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু আর একদিক দিয়ে তার মান ছিল হাইস্কুলের। উপযুক্ত বিবেচিত হলে এখানকার ছেলেদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার অনুমতি ছিল। দীর্ঘ দিন সেটা সম্ভব হয়নি। তেমন ছেলে পাওয়া যায়নি। দিলীপকে যদি ঠিক মত তৈরী করা যায়, সে হয়তো একদিন, এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন, তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে, এমন একটা আশা অধ্যক্ষের মনে জেগে থাকবে। তাই তার পড়াশুনোর জন্যে কতগুলো আলাদা বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। আশুবাবুকে ডেকে বলেছিলেন, এ কাজটি আপনাকেই করতে হবে। পুরো ছ বছর সময় পাচ্ছেন; পারবেন না?

আশুবাবু ক্ষণকাল চিন্তা করে উত্তর দিয়েছিলেন, ঠিক বলতে পারছি না স্যার। তবে না-পারবার কোনো কারণ দেখি না। ছেলেটির মেধা আছে, পড়বার ও শিখবার আগ্রহ আছে, আর আমার দিক থেকে চর্চটার কোনো গুটি হবে না।

"তাহলেই হল"—যেন শুধু আশ্বস্ত নয়, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ, এমন সুরে বলেছিলেন ঘোষসাহেব।

তারপর থেকে আশুবাবুর কাজ বেড়ে গিয়েছিল। স্কুলের রুটিন মত ক্লাস নেবার পর, অন্য ছেলেদের ছুটি হয়ে গেলে তিনি দিলীপকে নিয়ে 'স্পেশাল ক্লাস' শুরু করতেন। ওরই মধ্যে এক ঘন্টা ছিল হেডমাস্টারের ইংরেজি ক্লাস।

(—কুমার)



দৃষ্টির মূখেই দৃষ্টির ছায়া

ফৌজী জাতটার সঙ্গে। ভালভাবেই জানেন, এদের মনে কোনো বাঁক নেই, সে চলে সরল রেখার সোজা পথ ধরে। এরা যা বোঝে, একবারেই বোঝে, তার-

পেশী ও রেখায় একটা সংকল্পের ছাপ ছাড়া অর কিছু পড়তে পারলেন না। তার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো ইতিহাস আছে, যা সে ব্যস্ত করতে চায় না। আর,

ধূজটি প্রসাদ

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

১৯১২, গ্রীষ্মকাল, দুপুর। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশ অপেক্ষায় দিনযাপন করছি। ওপরের পড়ার ঘরে একটি কটেজ পিয়ানো থাকত। সেটি বাজিয়ে দাদা, — ডঃ পদ্মপতি (তখনও ছাত্রাবস্থা) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি সহযোগে ‘ভরাবাদর’, ‘মাহাভারত’—গান অভ্যাসের দুঃসাধ্য সাধন করছেন। এমন সময় ‘বড়ো আছ, গিরিজা আছ—’ ডাক দিয়ে ওপরে উঠে এলেন বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ। সঙ্গে ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুঠাম দীর্ঘগড়ন কান্তিময় এক যুবক ও আমাদেরই সমবয়সী। ইনি ধূজটিপ্রসাদ। সত্যেন্দ্রর অনুরোধে দাদা “সে কোন বনের হরিণ”, “আজ কোন নব চণ্ডল ছন্দে মোর বীণা—”, “তুমি যে সুরের আগুন—” ইত্যাদি একেবারে নতুন আনকোরা রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনালেন। পাঁচটা ধূজটিপ্রসাদ গান করলেন। হিন্দী গান, রাগপ্রধান ওস্তাদি চণ্ডে। পিয়ানোর হিন্দী গান জমল না, ধূজটিপ্রসাদ বলেন সারোগারী সংগত চাই। পিয়ানো বন্ধ হোল; আরম্ভ হোল খেলার কথা; কলেজ, প্রফেসর, সাহিত্য প্রসঙ্গ। সে সময়কার ধূজটিপ্রসাদকে যিনি না দেখেছেন তিনি কল্পনা করতে পারবেন না তাঁর প্রশস্তবক্ষ ডমরুকটি সুপদ্রবু চেহারা।

আলাপ জমে উঠল; মৃদু হৃদয় তাঁর সংগীত, সাহিত্য ও খেলার খবরের ওপর দখল দেখে। গানে আমাদের বহর ছিল সুরেন্দ্রনাথের স্বরলিপি মারফৎ রবীন্দ্রসংগীত ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গীতসুত্রসার পর্যন্ত। ধূজটির ছিল গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর ও লক্ষ্মী বেনারসের ওস্তাদের গানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। সাহিত্যে ছিল আমাদের দোঁড় বঙ্কিম, রবীন্দ্র শরৎচন্দ্র প্রভাত মুখোজ্যে ডিঙিয়ে টলন্টয়ের আনা ক্যারেনিনা রেজারেক্সন ও গল্প, ভিট্টর হুগোর লো মিজেরাবল, বার্গাড শ, মেটারলিঙ্ক পর্যন্ত। ধূজটিপ্রসাদ উত্থাপন করলেন

টুর্গোনিভ গোর্কি, ডস্টভয়েস্কি, আনা-তোল ফ্রান্সের কথা। কিছুদিন আগে পড়েছিলাম মডার্ন রিভিউতে প্রকাশিত হরদয়ালের লেখা প্রবন্ধ কাল মাক্সের কথা। ধূজটিপ্রসাদের কাছে ‘দুনিয়াম কাল মাক্সের’ ‘দি ক্যাপিটাল’ তিনি পড়েছেন। শ্রুতিে বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলাম, কেন না হরদয়ালের লেখাতেই ছিল কাল মাক্সের বই দুনিয়ার অতি অল্প লোকেই বুঝতে ও হজম করতে পেরেছে। সেদিনের আড্ডা ভগ্ন হোল রাতি আটটায়।

জ্ঞানার্জনের এই অতিবিস্তৃত সীমানা ধূজটিপ্রসাদের আজীবন উপাস্য ছিল। আজ সদ্য পরলোকগত তাঁর কথা ভাবতে বসে মনে পড়ছে, আচার্য হরিনাথ দের তিরোধান কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা দুটি পংক্তি,—

যাচ্ছে পড়ে দেশের গর্ব,
শ্মশান শূন্য হচ্ছে আলা,
যাচ্ছে পড়ে নতুন করে
সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থ শালা।

আজকের দিনে বাঙ্গালিকই ধূজটিপ্রসাদের মতো পড়াশোনা করা লোক আমাদের মধ্যে বিরল। শূন্য বাংলা-দেশে নয়, সারা ভারতে যারা তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁরা সকলেই পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁর পঠন ও চর্চার ‘বয়সের পরিধি ছিল কৃত ব্যাপক, কৃত বিস্তীর্ণ। সাহিত্য, কাব্য, সংগীতকলা, নৃত্যকলা, চিত্রশিল্প, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নিবিড় অনুরাগ ও জ্ঞান বিস্ময় জাগিয়ে তুলতো। জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞান-পরিবেশন এ দুয়ের সমন্বয়-সাধন ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

ধূজটিপ্রসাদ ছিলেন প্রকৃত অধ্যয়ন-বিলাসী ও জ্ঞানভ্রমুখী। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি নিরলস অধ্যয়ন করে গেছেন। দুরারোগ্য রোগে অবিরাম নিদারুণ দুঃসহ অবস্থায় কাটাতে হয়েছে একাদিক্রমে তাঁকে শেষের

কয়েক মাস। মৃত্যুর সাত-আটদিন পূর্বে তাঁর শয্যাপাশে উপস্থিত হলে বলেছেন—‘আর চলবে না—, যাহোক তোমার লেখা * পড়লাম—আর, পড়লিনে বই আজও কিনে আনিয়োঁছ* পড়াছি— বড় ভাল হয়েছে বোলো তাকে—’। এক চামচ জল গ্রহণ করতে পারেন না, তখনও পড়ার বিরাম নেই। এর একদিন দুদিন পরেই তাঁর বাক-রোধ হয়েছিল। তাঁর নিরলস অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞানের আংশিক পরিচয় রেখে গেছেন তাঁর লেখা গদ্য-কয়েক বই—এর পাতায়। এই রচনাগুলি থেকে অবশ্য তাঁর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের সম্যক পরিমাপ করা চলে না। কারণ তিনি যত বড়ো বিদ্বৎ ও পাণ্ডিত্য ব্যক্তি ছিলেন তার প্রকৃষ্ট প্রতিচ্ছবি তাঁর লেখায় তেমন প্রতিফলিত হয়নি। এক্ষেত্রে সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টা ছিলেন অনেক বড়।

এই অধ্যয়ন-স্পৃহা ও তথ্যসংগ্রহ তাঁর এতই প্রবল ছিল যে, যেকোন উৎকৃষ্ট বই বাজারে উঠলেই—ইংরাজীতে হোক বা বাংলায়, তা তিনি কিনতেন ও আদ্যো-পান্ত পাঠ করতেন। সর্বাধুনিক বই এত অংপই ছিল যা ধূজটিপ্রসাদের অপঠিত থাকত। বহু মূল্য আটের বই সংগ্রহই তাঁর স্বল্প-কয়েক শত; সমগ্র বই-এর সংগ্রহ হবে সাত আট হাজার।

লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিলেন তিনি সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক। কিন্তু তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি সারা ভারতে ব্যাপ্ত ছিল; অসামান্যতা জ্ঞাপক খ্যাতি। ডি-পি অফারস্বর (D P) ছিল সিদ্ধ-পরিচয়। শাস্ত্র বলে গুরুত্ব পরিচয়। ছাত্র। ধূজটিপ্রসাদ ছিলেন সিদ্ধগুরু। তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতিবদ্য ছাত্র অসংখ্য, প্রায় হাজারের কোঠার।

কিন্তু ধূজটিপ্রসাদের পাণ্ডিত্য তথাকথিত অধ্যাপকের সীমায়িত পাণ্ডিত্যে আবদ্ধ ছিল না। পাণ্ডিত্যের জ্ঞান তাঁর কোনো অভিমানও ছিল না, যদিও কেউ কেউ তাঁর লেখায় সে অভিমান আছে বলে মনে করেন। আসলে ধূজটিপ্রসাদের পদচারণের ক্ষেত্রে একটু স্বতন্ত্র। সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করতে হলে একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন। এরই অভাবে অনেকে তাঁর রচনার মধ্যে সর্বজ্ঞের বাক্যবিস্তার দেখতে পান।

*‘কবির সঙ্গে ফ্রান্স যাত্রা’—পরিচয়, আশ্বিন, ১৩৬৮।

* * পদ্মিন সেন সম্পাদিত ‘রবীন্দ্রায়ণ’।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর লেখা হাটের লোকের জন্য নয়; বুদ্ধিদীপ্ত, বুদ্ধিনিষ্ঠ পাঠকেরই জন্য।

তাঁর রচনার পরিমাপ করা আমার কাজ নয়, উদ্দেশ্যও নয়। তাঁর মত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কথায় ফুটিয়ে তোলাও সহজসাধ্য নয়। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মনীষার, বুদ্ধির সঙ্গে প্রকাশ-ক্ষমতার, জ্ঞানের সঙ্গে বিতরণের, সমালোচনার সঙ্গে সহানুভূতির, অধ্যয়নের সঙ্গে বিনয়ের এমন আশ্চর্য মিলন আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর পূর্বসূরী হিসাবে নাম করা যেতে পারে একমাত্র প্রমথ চৌধুরীর ও অতুল গুপ্ত মহাশয়স্বয়ের। চৌধুরী মহাশয়ের বিখ্যাত 'সবুজ পত্র' মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ধূজটিপ্রসাদ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন এবং 'সবুজপত্রের' অন্যতম গণনীয় লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। পরবর্তী কালে প্রবাসী বাঙালীর মুখপত্র 'উত্তরা' পত্রিকার তিনি বরণীয় লেখক হন ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকারও একজন প্রেষ্ঠ লেখকের স্থানাদিকার করেন।

এই 'পরিচয়' পত্রিকার যুগেই তাঁর অন্যতম প্রেষ্ঠ রচনা 'অন্তঃশীলা', 'আবত' ও 'মোহানা' এই উপন্যাসত্রয়ী প্রকাশিত হয়। বাংলা উপন্যাস জগতে এই উপন্যাস-ত্রয়ী ও এদের লেখার রীতি একেবারে অভিনব সৃষ্টি। এই উপন্যাস তিনটি সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—'পোলিটিক্যাল ও সামাজিক আবেষ্টনে দুই সমসাময়িক নরনারীর আত্মজিজ্ঞাসা ও প্রেম-উপলব্ধির ইতিহাস ইহাতে বর্ণিত। বাংলা উপন্যাসের টেকনিকে এ বস্তু আনকোরা না হইলেও নতুন বটে।' ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই উপন্যাস-ত্রয়ীতে



তীক্ষ্ণ মননশক্তির সহিত খাঁটি ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের সমাবেশ হইয়াছে। মননক্রিয়ার পশ্চাদপ্রক্ষেপ, জটিলতা ও অন্তর্মুখীতা বস্তুমচন্দ্রের 'রজনী'তে প্রথম বিকাশ লাভ করে। 'অন্তঃশীলা'র মননক্রিয়া কিছুটা সমশ্রেণীর হলেও 'রজনী'র মননক্রিয়ার সমজাতীয় নয়; বেশ আলাদা। এ-মননক্রিয়া একেবারে নতুন রীতির, নতুন ছাঁদের; মানব-মনের প্রকৃত সত্তার,—সমউল্লী নয়,—গোলকীয় প্রতিরূপ। নিশ্চয়ই অন্তঃশীলার টেকনিক ধূজটিপ্রসাদের অমূল্য দান,—যার জন্য বাংলা উপন্যাস চিরযুগ তাঁর কাছে স্থায়ী রইল। তাঁর অন্যতম বই 'রিয়ালিষ্ট' হল গল্প-সমষ্টি; প্রমথ চৌধুরীর উদ্ভাবিত গল্পলেখার নতুন রীতির প্রভাব এতে সুস্পষ্ট। আঙ্গিক হিসাবে ক্ষিপ্ততা ও বিদ্রূপ 'রিয়ালিষ্ট'কে বাংলা ছোট-গল্পের আসরে পুরোভাগে স্থান দেবে। 'আমরা ও তাঁহারা' বইতে আছে সুরের ও সঙ্গীতের কথা, সাহিত্যের কথা, দেশের ও বিপ্লবের কথা সম্বন্ধে আলোচনা; দু'পক্ষের কথোপকথনের টেকনিকে লিখিত। 'মনে এলো' anecdotes, বলার সরসতা ও ক্ষিপ্ততায় উজ্জ্বল; সমসাময়িক ঘটনা ও অভিজ্ঞতার,—যাঁদের সঙ্গে মেলোমেশা হয়েছিল, তাঁদের বিষয়ে running commentary ইতিহাসের দরবারে একটা বিশিষ্ট স্থান করে নেবে। 'অমৃত' প্রকাশিত 'ক্যালিমিলি'ও এই জাতের রচনা। এ ধরনের লেখায় তিনি ছিলেন অস্বিতীয়।

যাঁরা সঙ্গীতরসের রসিক 'সুর ও সঙ্গতি' তাঁদের সুগভীর চিন্তা, বিচার ও আলোচনার অপূর্ব খোরাক জোগাবে। এই বইটি মারফৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্ম-লেখনী-ধারণের অসামান্য অধিকার ও গৌরব লাভ করেন ধূজটিপ্রসাদ। এতে একদিকে যেমন কবিগুরু কর্তৃক ধূজটিপ্রসাদকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সমজদারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমন ধূজটিপ্রসাদ কর্তৃক কবিগুরুকে বাংলা গানের স্বরূপ ও অভিযান সম্বন্ধে বলতে ও লিখতে প্রবৃত্ত করান হয়েছে। বাংলা গানের স্বরূপ ব্যাখ্যায় কবিগুরুর এ লেখা অমূল্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সম্পদ, প্রেরণা ও ঐতিহ্য বহন করে বাংলা গান তার বাহুল্য ও অসঙ্গতি থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। বাংলা গান 'বাণী ও সুরের অধনারীশ্বর' মূর্তি; যথা কীর্তন, বাউল, রামপ্রসাদী। ধূজটিপ্রসাদ বলে-

ছেন, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যেন এক পাঁচ-তলা মহল, যার স্থাপত্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। যুগ্ম-লেখনীতে এই উভয়বিধ সঙ্গীতের প্রতিভা অপরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ সম্পাদিত রবীন্দ্র-স্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে ইংরেজী রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ধূজটিপ্রসাদের আর একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বই, Tagore, a study; কবিগুরুর মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই লেখা। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা সমালোচনা আর কারোর দ্বারা সম্ভব হয়নি। দুঃখের বিষয় বইটি অপ্রাপ্য ও তার স্মিতীয় প্রকাশন হয়নি।

কিন্তু তাঁর রচনার চেয়ে তাঁর ব্যক্তি ও চরিত্র ছিল সমধিক উজ্জ্বল। তাঁর মতো সদালাপী লোক সচরাচর দেখা যায় না। যে কোন বিষয়ের আলোচনা—তা সাহিত্য হোক, অর্থনীতি কি সমাজ-নীতি হোক, অথবা সঙ্গীত বা চিত্রশিল্প হোক—তিনি তাতে নিমগ্ন হতে পারতেন ও এমন সরস করে তুলতে পারতেন তাঁর কথোপকথন যে শ্রোতৃবৃন্দ বিস্ময়াব্বৃত হয়ে পড়ত। লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন অধ্যাপনা করতেন তখন ছাত্র, সুহৃদ, জনসাধারণ ও রাজকর্মচারী তাঁর পড়ার ঘরে সদাসর্বদা আসতেন তাঁর সরস মূল্যবান কথা শোনবার জন্য; তাঁর পরামর্শ ও প্রেরণা পাবার জন্য। লক্ষ্যে-এ তিনি ছিলেন একটা institution। একাই একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ!

ছাত্র-ভাগ্যের মত তাঁর বন্ধু-ভাগ্যও ছিল অপরিমিত। ভারতে তাঁর সমসাময়িক জ্ঞানী-গুণী লোক কমই ছিলেন যাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিল না। তরুণ লেখক ও সাহিত্যিকবৃন্দের প্রেরণা ও উৎসাহদাতা হিসাবে তিনি ছিলেন অগণী। আজকের দিনের অনেক নাম-জাদা কবি, গল্পকার, উপন্যাসিক, সঙ্গীত-শিল্পী তাঁর প্রশংসা ও উৎসাহ-বাণী পেয়ে ধন্য হয়েছেন। 'অন্তঃশীলা' ও তাঁর অন্যান্য লেখার টেকনিক ও কেউ কেউ অনুকরণ করেছেন। তাঁর প্রভাব স্পষ্টই চোখে পড়ে আজকাল।

বস্তুত ধূজটিপ্রসাদ ছিলেন বহু-মুখী প্রতিভার অধিকারী। একটি ব্যক্তির মধ্য দিয়ে জ্ঞানের ও মানবতার এমন এক পল্লবিত তরুর স্বরূপ বড় একটা দেখা যায় না। এমন কি বিজ্ঞানের সর্বাধীনিক গবেষণারও সংবাদ রাখতে বিরত হতেন না। জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা তাঁর চরিত্রের ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিনয় সরকার প্রমুখ যে কয়েকজন স্বীয় অধিকার বলে সর্বজ্ঞতার গৌরব অর্জন করেছিলেন, ধূজটিপ্রসাদ ছিলেন তাঁদেরই,—বোধ হয়,—শেষ প্রতিনিধি।

॥ চাকার গান ॥

রেলগাড়ির চাকা কত কী বলে! যা ভাবা যায় তাই বলে। আর সব কথাই বলে গানের সুরে। এমন আশ্চর্য গান আর কোথাও শোনা যায় না। রেলগাড়ির চাকার গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েননি এমন মানুষ আমাদের মধ্যে খুবই কম।

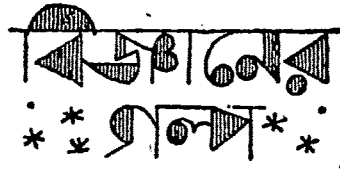
কান পেতে থাকলে শোনা যাবে রেলগাড়ির চাকা বলছে, 'ঘুমোও! ঘুমোও!' আবার গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছলে এই চাকাই আবার গান গেয়ে ওঠে, 'জাগো! জাগো!'

রেলগাড়ির চাকা আরো কত কী বলে! রেলগাড়ির চাকা বলে, 'আমি ঘুরছি তাই তোমাদের আর লম্বা রাস্তা পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হচ্ছে না। আমি ঘুরছি তাই তোমরা নিশ্চিন্ত আরামে প্রান্তর পেরিয়ে নদী ডিঙিয়ে পর্বত ফুড়ে ঠিক জায়গাটিতে পৌঁছে যাচ্ছি।'

রেলগাড়ির চাকা বলে না এমন কথা নেই। রেলের লাইনদুটো যেন আশ্চর্য এক বাদ্যযন্ত্রের চাবি। রেলগাড়ির চাকা ঘুরতে শুরুর করলেই এই চাবিতে আশ্চর্য এক ছোঁয়া লাগে।

অথচ চাকা আমাদের কাছে এক অতি মামূলি জিনিস। চাকায় চেপে ঘুরে বেড়ানোতে আমরা এতই অভ্যস্ত যে এ-সম্পর্কে ভাববার কিছু আছে তা আমরা ভাবিই না। বরং আমাদের নজর এখন রকেটের দিকে, যা চাকা ছাড়াই মহাশূন্যে ছুট দেয়। এমন কি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত গত শিল্পমেলায় চাঞ্চল্যকর খবর ছিল এমন একটি মোটরগাড়ি যা মাটি থেকে কয়েক ফুট উজুঁতে, থেকে চাকার সাহায্য ছাড়াই চলাফেরা করে।

আমরা এখন ভাবতেই পারি না যে এমন সময়ও ছিল যখন চাকা কেউ দেখেনি বা চাকার কথা কেউ শোনেওনি। এক দেশ থেকে আরেক দেশে, যেতে হলে তখন পায়ে হেঁটেই যাত্রা করতে হত। খুব ভাগ্যবানরা যেতেন ঘোড়ার পিঠে চেপে। ভারী মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিভাঁর করতে হত গায়ের জোরের ওপরে। আর জমি সমতল হলে ব্যবহার করা হত কুকুরটানা স্লেজগাড়ি। অবশ্য স্লেজগাড়িকে গাড়ি বলা ভুল, কারণ এই গাড়ির কোনো চাকা ছিল না। একটা বড়ো পাটাতনের সঙ্গে



অয়স্কান্ত

দিড়জাতীয় কিছু বোধে কুকুর দিয়ে টানা—এই হচ্ছে স্লেজ।

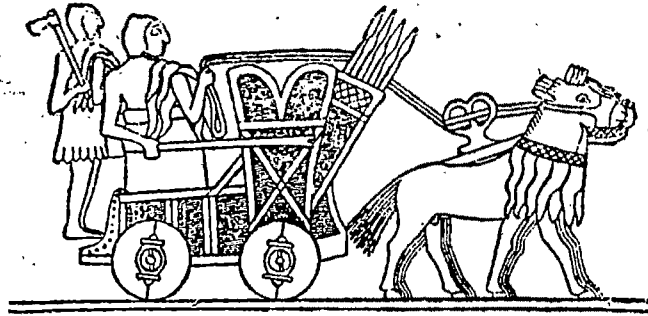
কিন্তু এ-অবস্থা খুব বেশিদিন চলেনি। কিছুকালের মধ্যেই স্লেজ চাকা-যুক্ত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা, অনুমান করেন চাকা আবিষ্কৃত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ থেকে ৩৫০০ সালের মধ্যে।

চাকা যে কতবড়ো আবিষ্কার তা এই রকেটের যুগে আমাদের পক্ষে হয়তো উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে একথাটি আমাদের জেনে রাখা দরকার যে এই অতি সামান্য আবিষ্কারের মধ্যেই আধুনিক যন্ত্রযুগের সূত্রপাত। একটি স্লেজ চাকায়ুক্ত হয়েছিল বলেই হালের চমকপ্রদ রেলগাড়ি ও মোটর যুগে আমরা পৌঁছতে পেরেছি। এমন কি একথাও বলা চলে যে আমাদের যা-কিছু উন্নতি সবই যেন

দেখেই বিজ্ঞানীরা চাকা সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন।

সুমেরীয় ছবিতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালেই চাকাওলা গাড়ির নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের মধ্যে মেসোপটেমিয়ায় ও সিরিয়ার নানান ধরনের চাকাওলা গাড়ির প্রচলন হয়েছিল। কোনোটার মাল নিয়ে যাওয়া হত, কোনোটার যাত্রী, কোনোটা যন্ত্রধর। সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে চাকাওলা গাড়ির প্রথম সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। তুর্কীস্তানেও প্রায় একই সময়ে। ক্রিট ও এশিয়া মাইনরে চাকাওলা গাড়ির প্রচলন হতে আরো শ-পাঁচেক বছর সময় লেগেছিল। আর মিশরীয়দের সম্পর্কে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তারা খ্রীষ্টপূর্ব ১৬৫০ সালের আগে চাকাওলা গাড়ি ব্যবহার করেনি।

তবে একেবারে গোড়ার দিকে চাকা বলতে যে পদার্থটিকে বোঝানো হত তা আজকের দিনে হাস্যকর মনে হবে। নিতান্তই জোড়াতালি দেওয়া একটা ব্যাপার। গোটা চাকাটি হত একটি নিরেট



প্রাচীন সুমেরীয় যন্ত্রধর

চাকার ভর দিয়ে। চাকায় ভর দিয়েই প্রস্তরযুগ রোজযুগে পৌঁছেছে, রোজযুগ লৌহযুগে। এত সরল একটি আবিষ্কার এত জটিল সব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছে ভাবলেও অবাক হতে হয়।

চাকার আবিষ্কার সম্পর্কে সঠিক তথ্য বিশেষ কিছু জানা যায়নি। সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে চাকা অবশ্যই হত কাঠের। এবং কাঠের চাকার কোনো চিহ্ন থাকাই এত হাজার বছর পরে এখন আর সম্ভব নয়। কাজেই প্রাগৈতিহাসিক কালে তাঁর সত্যিকারের একটি চাকাও চোখে দেখা যায়নি। তবে সুখের বিষয়, সত্যিকারের চাকা না থাকলেও চাকাওলা গাড়ির ছবি থেকে গিয়েছে। এই ছবি

বস্তু—রিম বা স্পোকের বালাই ছিল না। তিন খণ্ড কাঠ জোড়া লাগিয়ে তৈরি হত চাকাটি, সেটিকে বাঁধা হত চামড়া দিয়ে আর আশেপাশে লাগানো হত তামার পেরেক। চাকাটি ঘুরবার সময় ঘুরত অক্ষদণ্ড বা ধুরা সমেত। অক্ষদণ্ডটিকে চামড়ার ফিতে দিয়ে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। সিন্ধু, সার্দিনিয়া ও ভূরক্ষ অঞ্চলের গ্রামে এখনো পর্যন্ত এভাবেই গোরুর গাড়ির চাকা লাগানো হয়।

॥ কুমোরের চাকা ॥

চাকার আবিষ্কার মানুষের জীবনে অন্য একদিকেও বড়ো রকমের পরিবর্তন

এনোছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালের আগে পর্যন্ত মাটির পাত্র তৈরি হত শুধু দুটি হাতের সাহায্যে। এমন কি আজকের দিনেও দেখা যায় যে মাটির পাত্র তৈরি করাটা মেয়েদের অবসর সময়ের একটা ঘরোয়া কাজ। এবং শুধু হাতেই তা তৈরি হচ্ছে। ফলে একটি পাত্র তৈরি হতে সময় লাগছে কয়েক দিন।

কিন্তু চাকার ব্যবহার শুরু হবার পর এই মাটির পাত্র তৈরি করাটাই হয়ে উঠল রীতিমতো একটি উৎপাদন-শিল্প। একটি চাকাকে যদি মাটির সঙ্গে সমতল অবস্থায় রেখে ঘোরানো যায় আর চাকার কেন্দ্রস্থলে একতাল কাদামাটিও যদি ঘুরন্ত চাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে— তবে কুমোরের পক্ষে পাত্র তৈরি করার ব্যাপারটি খুবই সহজ হয়ে যায়। যেখানে একটি কলসী তৈরি করতে কয়েক দিন লাগার কথা সেখানে একতাল ঘুরন্ত কাদামাটি থেকে শুধু আঙুল চেপে ধরার কায়দায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাত্রটি তৈরি হতে পারত। আর ঘুরন্ত কাদামাটির তাল থেকে তৈরি হওয়া

পাত্রটির গড়নও হত অনেক বেশি নিটোল।

মাটির পাত্র তৈরি করার জন্যে চাকার ব্যবহার যেদিন থেকে শুরু হয়েছিল সেদিনটিকেই বলা চলে যন্ত্রশিল্পের জন্মদিন। চাকা মানুষের তৈরী প্রথম যন্ত্র। যা ছিল মেয়েদের অবসর সময়ের কাজ, চাকার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তাই হয়ে উঠল পূর্ণাঙ্গ একটি শিল্প। একদল পুরুষের পুরো সময়ের জীবিকা। হালের আদিবাসীদের দিকে তাকালেও একই ব্যাপার চোখে পড়ে। মাটির পাত্র তৈরি করাটা যতোক্ষণ একটা ঘরোয়া কাজ ততোক্ষণ তা মেয়েদের হাতে, যখনই যন্ত্র-শিল্প তখন পুরুষদের হাতে।

গাড়ির চাকা আর কুমোরের চাকা কিন্তু সব জায়গায় একই সময়ে ঘুরতে শুরু করেনি। যেমন, মিশরে, গাড়ির চাকার অনেক আগেই কুমোরের চাকা। এ থেকে বিজ্ঞানীরা এ-সম্মানিত কিন্তু করেননি যে গাড়ির চাকা ও কুমোরের চাকা একেবারে পৃথক দুটি আবিষ্কার। তবে এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কতখানি

তাও এখন পর্যন্ত খুব স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

॥ স্পেক ও রিম ॥

সুন্দেরীয় যন্ত্রের যে-ছবিটি এই-সঙ্গে ছাপা হয়েছে, তার চাকার দিকে তাকালে বোঝা যাবে, এ-ধরনের চাকার স্থায়িত্ব খুব বেশি নয়। নিরেট একটি কাঠের চাকা খুব সহজেই ভেঙে ও ক্ষয়ে যেতে পারে। কাজেই গোড়া থেকেই একটা চেষ্টা ছিল কি-ভাবে চাকাকে আরো মজবুত করে তোলা যায়। এই উদ্দেশ্যে চাকার বেড়কে ঘিরে একটা তামার পাত (তখনো লোহার আবিষ্কার হয়নি) মুড়ে দেওয়া হত। তামার পাতটিকে আটকানো হত তামার পেরেক দিয়ে। ফলে চাকা হয়ে যেত খুবই ভারী। তখন চাকাকে হালকা করার জন্যে চাকার নিরেট অংশে মাঝে মাঝে গর্ত করে দেওয়া হত। এই ব্যাপারটাই পরিণতি স্পেক ও রিম সমন্বিত চাকা। আধুনিক চাকা আজকের চেহারা পেঁছতে অনেক বকমফের পার হয়ে এসেছে।

প্রকাশিত হইল।

প্রকাশিত হইল।

গৌরিকিশোর ঘোষের
বলিষ্ঠ মননের উপন্যাস

এই দাহ

॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

এই বছরের নতুন বই।

গ্রন্থাগারে রাখার মতো বই।

উপহার দেবার মতো বই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অহিংসা ৬.০০
উপন্যাসটির বিষয়-প্রকরণ ও ভাষা একান্তভাবে মানিকবাবুরই।
লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

সাবিত্রী রায়ের

ত্রিস্রোতা ৬.০০
পাকা ধানের গান
১ম পর্ব ৩.৫০
২য় পর্ব ৪.০০
৩য় পর্ব ৫.০০
উপন্যাসটিকে মহৎ ও সাধক সৃষ্টি বলা যায়। —স্বাধীনতা

বিনোদচন্দ্র সেনের

আইনের দুনিয়া ৪.৫০
এখানে রাজনৈতিক আসামীর বেশে দাঁড়িয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু।

অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের

ব্যঞ্জন বর্ণ ৪.০০
এমন সুন্দর উপন্যাস আপনি আগে কখনও পড়েন নি। একথা জোর করে বলা যায়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সমুদ্র মানুষ ৫.০০
মাণিক স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস।

লেখক যে আশ্চর্য জীবন ও জগতের সম্মান দিয়েছেন, তা আমাদের সর্বস্বয় অনুমোদন দাবী করে। —আনন্দবাজার

মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তীর্থ নয় কাণাগাল ৫.০০
বীরভূমের জল মাটি মানুষ দিয়ে গড়া একখানি নিটোল উপন্যাস।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চর্যাপদের হরিণী ৩.০০
তৃতীয় ভূবন ৪.৫০
উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ ভাষায় দীপেন্দ্রনাথ উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়েছেন। —পরিচয়

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের

বিদেশীনী ৪.৫০
বিখ্যাত গ্রন্থ 'সুশান্ত সা' যার অকুণ্ঠ প্রশংসা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির করেছিলেন, তারই পরবর্তী খণ্ড।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পরিচয় ৪.০০
বাংলাদেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানো সামান্য কথা নয়। এই অসাধারণ রসের কান্ডারীর নবতম সৃষ্টি।

মি তাল মঃ ১২ বঙ্কিম চাট্‌যো স্ট্রীট : কলিকাতা ১২ : ফোন ৩৪-২৫৬৩

গুণ্ডা হাতী কদরনাথ চট্টোপাধ্যায়

১১দুই।

ফ্লেচার বলেন যে, গুণ্ডা হাতীর প্রকৃতিই হিংস্র এবং সাধারণ হিসাবে সে মানুষ বা মানুষের প্রতিপালিত জীব দেখলেই আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কোনও সভ্য হাতীও তার সঙ্গী হতে চায় না বরঞ্চ সে নিজে অন্য পুরুষ হাতী দেখলেই তাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে এবং সেই কারণে শত্রুর অনাসব দাঁতাল হাতী একজোট হয়ে তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেয়।

বনজঙ্গলের আদিবাসীরা বুনো হাতীকে বাঘ ভালুক বা গৌর (বাইসন) থেকে বেশী ভয় করে চলে, এবং বুনো হাতীর আক্রমণে অনেক জঙ্গলের লোক কাঠ কাটতে বা বনের ফলমূল তুলতে গিয়ে প্রাণ হারায়। এই কারণে বোধহয় স্যান্ডারসনের মত বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন যে গুণ্ডা হাতী নিজদল থেকে বিতাড়িত হাতী নয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে সেও এক যুথপতি। ফ্লেচার কিন্তু এ বিষয়ের অর্থাৎ বুনো হাতী মানুষকে ওরকম দেখা-দেখি হলেই আক্রমণ করে কেন—অন্য কারণ দর্শিয়েছেন। তিনি বলেন যে হাতীর দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি খুব ভাল নয়, শত্রু তার ঘ্রাণশক্তি অসাধারণ প্রখর। এই কারণে অনেক সময় খুব কাছে না আসা পর্যন্ত হাতী মানুষের খোঁজ পায় না। এবং এরকম হলে হাতী আচমকা আক্রমণ করে। ঘ্রাণশক্তি সম্পর্কে দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে।

একবার তিনি এক জঙ্গলে শিকার করার সময় দেখেন যে ঐ অঞ্চলের রাজার কয়েকটি হাতীকে তাদের মাহুতের দল খাওয়াবার ও খোরাক সংগ্রহ করার জন্য ঐ বনের মধ্যে এনেছে এবং ঐগুলোর মাহুতেরা সবেমাত্র হাতীর কাঁধ থেকে নেমে তাদের পারে শিকল চড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছে। একটা বিশাল দাঁতাল যখন পিছন ফিরে নিকটের এক গাছের গায়ের থেকে পরগাছা লতা ছিঁড়ে নামাচ্ছে, সেই সময়

সাহেব তার দশ-পনেরো গজের মধ্যে এসে তার সুগঠিত দেহ দেখতে দাঁড়ালেন। হাতী সগে সগে হঠাৎ ঘুরে কান খাড়া করে, শব্দ তুলে তেড়ে আসার মত করায় সাহেব তাঁকে আক্রমণ করতে আসছে ভেবে আত্মরক্ষার জন্য রাইফেল তুলতে তার মাহুত তাঁকে বলে যে, হাতীর রাগ অন্য এক পানিয়া মাহুতের উপর। এই বলে সে সেই লোকটাকে দেখালো। সাহেব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে হাতীর সেই শত্রু প্রায় তিনশো গজ দূরে যাচ্ছে তবে হাওয়া সৈদিক থেকে বইছে। দেখা গেলো হাতী সভ্য সভ্যই তাকে লক্ষ্য করে রাগ দেখাচ্ছে। যদিও সে অত দূরে। অত লোকজনের মধ্যে, হাওয়া প্রায় নিস্তব্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে অতদূরের শত্রুর গন্ধ ঠিক পৃথক করে চিনে সৈদিকে তেড়ে যাবার চেষ্টা করছিল।

বনের অন্য জীবজন্তুর অন্ততঃ দুটো ইন্দ্রিয় সতেজ হয়, যেমন বাঘের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু শ্রবণ ও দৃষ্টি খুবই প্রখর। ভালুকের দৃষ্টি-শক্তি ভাল নয় কিন্তু কান ও নাক বেশ সতেজ। এই কারণে বনের অন্য পশু অতি সহজেই মানুষকে এড়িয়ে চলতে পারে। অন্যদিকে মানুষকে যথেষ্ট ভয় করা সত্ত্বেও তার গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত হাতী টেরই পায় না যে কাছের জঙ্গলে মানুষ রয়েছে। সেই কারণে, হাতী যদি বাতাসের সগে অর্থাৎ বাতাস যে মুখে বইছে সেইদিকে চলে তবে অত্যন্ত কাছে না পেঁছানো পর্যন্ত বা সামনা-সামনি না হওয়া পর্যন্ত হাতীর থেরালই হয় না যে সে মানুষের অত কাছে এসেছে। আর ঐভাবে আচমকা মানুষের মুখোমুখি হলে দাঁতাল হাতী বা বাচ্ছা-সুন্দু মাদী হাতী, সগে সগে মানুষকে আক্রমণ করে, আত্মরক্ষার জন্য বা ভয়-ভড়কানোর প্রতিক্রিয়ায়। অন্যথায়, অর্থাৎ বিপরীত হাওয়ার মুখে চলে, হাতী কি হাতীর দল যদি মানুষের গন্ধ পায় তবে সে নিঃশব্দে সরে পড়ার চেষ্টা করে, যদি না সে গুণ্ডা হাতী হয়। ফ্লেচারের মতে জঙ্গলে সাধারণ হাতী মানুষ আক্রমণ করার কারণ এরকম আচমকা দেখা হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

এ-কালের দুটি মহৎ সংকলন গ্রন্থ :

সিন্ধুর স্বাদ ৭.০০ রবীন্দ্র-চর্চা ৫.০০
প্রমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত

সদ্য প্রকাশিত : বাংলা কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট তিনটি সংযোজন

তিনছন্দ
আশাপূর্ণি দেবী ৪.০০

পত্রবিলাস মরসুমী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৩.০০	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২.৫০
বিশিষ্ট কয়েকটি উপন্যাস ও বহুপ্রশংসিত গল্পগ্রন্থ			
গাহসিকা		শব্দভঞ্জন	
প্রমেন্দ্র মিত্র	৩.৫০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩.০০
মায়ামারীচ		পাহাড়ী ঢল	
সুনীলকুমার ঘোষ	৩.৫০	সমরেশ বসু	৩.০০
রাতের ঢেউ		ছায়া-ছবি	
সত্যপ্রিয় ঘোষ	৩.০০	সন্তোষকুমার ঘোষ	৩.০০
রায়মঙ্গল		শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি	
শক্তিপদ রাজগুরু	৩.০০	দিবোন্দু পালিত	২.০০

সু. র. ডি. প্রকাশনী : ১, কলেজ রো, কলকাতা ১

অন্যদিকে গন্ডা হাতীর কথা সম্পূর্ণ আলাদা।

গন্ডা হাতী ক্রমাগত জঙ্গলের মধ্যের বা আশেপাশের ছোট গ্রামের ক্ষেতে ঢুকে দরিদ্র চাষীর ফসল গুট করে খায় ও নষ্ট করে। নিরস্ত্র চাষী প্রাণভয়ে পালানো ছাড়া আর কিছুই বিশেষ করতে না পারায় গন্ডা হাতীর মানুষের ভয় একেবারে যায় এবং সেই কারণে সে মানুষ-দেখলেই সংহার মূর্তি ধরে, এমনকি জঙ্গলে বা গ্রামাঞ্চলে যদি কোনও মানুষের সন্ধান সে পায় তবে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে তাকে শেষ করার চেষ্টাই সে করে থাকে। ফ্রেচারের মতে সাধারণ বন্য দাঁতাল ও গন্ডা হাতীতে প্রভেদ এইখানেই দেখা যায়।

ফ্রেচারের মতে হিংস্র ও ঝগড়াটে পুরুষ হাতীকে দলের অন্যেরা একজোট হয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার পরে সে নির্বাসিত অবস্থায় “গন্ডা” হয়ে মানুষের শত্রুতা করে। এইরকম হাতী যদি পুনর্বীর কোনও দলে জুটে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে সে দলের মূল্যবান এবং অন্য পুরুষ হাতী তাকে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়। নিজ অভিভুততার থেকে ফ্রেচার এইরূপ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

ফ্রেচার নীলগিরির ওয়াইনাদ অঞ্চলে চা ও কফির বাগান করতেন। ঐ পাহাড়ী এলাকার সর্বত্রই তখন ঘন জঙ্গল ছিল এবং সেই পাহাড় ও উপত্যকার বন-জঙ্গলে হাতী, বাইসন; শম্বর, হরিণ এবং সেই সঙ্গে বাঘ ভালুক ও চিতা, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতো। জঙ্গলের ভিতরে নায়ক ও কুরুম্বা জাতের আদিবাসীদের ছোট ছোট গ্রাম ছিল। এই আদিবাসীরাই ছিল ফ্রেচারের শিকার-সফরের সঙ্গী এবং বুনো জন্তুর পায়ের দাগ বা অন্য চিহ্ন ধরে খোঁজ করার কাজে এরা ছিল অসাধারণ দক্ষ।

যে উপত্যকায় ফ্রেচারের বাগান, তারই নীচের দিকে নায়কদের একটি ছোট গ্রাম ছিল। ছয় সাতটি কুণ্ডে ঘরে ছয় সাতটি পরিবার, স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-পিলে নিয়ে সেই গ্রামে বাস করতো। এদের মোড়ল ছিল কুরিয়া নামে এক বৃদ্ধো এবং এই “গাঁইবুড়া” এবং তার গাঁয়ের লোকে বুনো জন্তু-জানোয়ারের চলাফেরার সঠিক খবর দিয়ে সাহেবকে সীদাসর্বদাই “ওয়ারিবহাল” করে রাখায় সাহেব এদের নিজের লোক ভাবতেন।

একদিন সাহেবের খাস শিকারী, “চিক-মারা” এসে জানালো যে কুরিয়ার

গ্রামের তিনজন পুরুষ জঙ্গলে ফলমূল খোঁজার সময় একটা গন্ডা হাতী তাদের আক্রমণ করে। একজনকে তো সে সঙ্গে সঙ্গে ধরে দলে-থেকে শেষ করে, অন্য আর একজনকে গাছে উঠবার সময় শব্দ দিয়ে ধরে, টেনে আছড়ে মারে। তৃতীয়জন কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এই খবরটা দিয়েছে।

খবর পেয়ে সাহেব পরের দিন সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যার গুণে নায়কদের গাঁয়ে পৌঁছে দেখলেন যে গাঁসমুখ সবাই বড় বড় গাছে আশ্রয় নিয়েছে। সাহেবকে দেখে তারা খবর দিল যে হাতীটা আগের রাতে গাঁয়ের ভিতর ঢুকে বিষম উৎপাত করে গিয়েছে।

গন্ডার সন্ধান খোঁজকার শিকারীদের নানাদিকে পাঠানো হলো। দুইদিন পরে প্রায় তিন মাইল দূরের ঘন জঙ্গলে তার খোঁজ পাওয়া গেল। সেইখানে গিয়ে দেখা গেল যে, একটা ছোট নদীর দুই পাশের জলা জমির উপর নিবিড় ঝোপঝাড়েরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে হাতীটা ঢুকেছে। জায়গাটা প্রায় পনেরো কুড়ি বিঘার মতন এবং তার ভিতরে সাত-আট ফুট উঁচু ঘাসের জঙ্গল। সে জঙ্গলে ঢুকলে একপা দূরের কিছু দেখা যায় না, কাজেই সেই অবস্থায় গন্ডা হাতীর খোঁজে এগোনো অত্যন্ত বিপজ্জনক। হাতী হামলা করলে সে ঘাড়ের উপর এসে পড়ার আগে তার কোনোও নিশানা পাওয়া এরকম জঙ্গলে অসম্ভব। অন্যদিকে ঐ জঙ্গলে এগোলে ঘাসপাতা ঝোপঝাড় ভেঙে সরানোর সময় হাতী সঠিক জানতে পারবে যে শিকারীরা কোন দিক দিয়ে এসে কতদূর পৌঁছেছে। সে ইচ্ছামত সরেও পড়তে পারবে বা হঠাৎ চড়াও করতেও পারবে।

খোঁজকারদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হলো যে সাহেব ঐ নাবাল জলা-জমিটার নীচের মুখে দিকে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াবেন আর ঐ খোঁজকার শিকারীর দল জঙ্গল দাবড়ে হাতীটাকে সেদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। বাতাসের গতি দেখে অতি সন্তপণে জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে সাহেব নীচের মুখে পৌঁছলেন। সেখানে খানিকটা জমি একটা বড়-উঁচু ঢিপির মত, এবং একটা বড় গাছও সেখানে আছে। ঢিপির উপর দাঁড়ালে সমস্ত নাবাল জমির এলাকা উপর থেকে দেখা যায়। তার ওপারে সাহেবের লোকজন প্রতীক্ষা করে বসে আছে দেখা গেল। হাত তুলে ইঙ্গিত

করা মাত্রই তারা চীৎকার করে টিল পাথর ছুড়ে হাতীকে তাড়া দিল। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। সাহেব যেখানে দাঁড়িয়ে তার কাছেই এক ঝোপের মধ্য থেকে এক ভীষণ চীৎকার শোনা গেল এবং দেখা গেলো যে, সেই ঝোপঝাড় ভেঙে, ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করে হাতীটা তার প্রকাণ্ড দেহ প্রবলবেগে চালিয়ে, সেই খোঁজকারদের লক্ষ্য করে তেড়ে যাচ্ছে। সাহেব তো গাঁ-গাঁ করে চোঁচিয়ে তাদের পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বললেন এবং তারাও নিমেষের মধ্যে ছাড়িয়ে পড়ে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

হাতীটা ঘনজঙ্গল থেকে বেরিয়ে খোঁজকারদের না পেয়ে সোজা হুঁহু করে চললো পাহাড়ের কাঁধের উপরের দিকে। মাইল খানেক দূরে সে ছোট নদীটা পার করে, পাহাড়ের কাঁধ ডিগ্বিয়ে চলে গেল। সাহেবের দল যখন সেখানে পৌঁছলো তখন সে অদৃশ্য। দিন দুই খোঁজ করার পর জানা গেলো যে সে পাশের জঙ্গলে ঐ অঞ্চলের রাজার এলাকায় ঢুকেছে। সেখানে সাহেবের শিকারের অধিকার নেই, কাজেই সে যাত্রা তাকে ছেড়ে দিতে হলো।

মাস খানেক পরে একদিন সেই জঙ্গলে ভরা উপত্যকায় শিকারের খোঁজে গিয়ে বিকালের দিকে সেই জঙ্গলের পথে এক দাঁতাল হাতী দেখা গেল। হাতীটার বাঁদিকের দাঁতটা ছোট কিন্তু ডানদিকেরটা প্রকাণ্ড এবং বেশ সুগঠিত। হাতীটা প্রায় দু’শ গজ দূরে একটা গাছের ডালপালা টেনে ভেঙে খাচ্ছিলো। দাঁত দেখে দূর থেকেই সেই গন্ডা হাতী বলে তাকে চেনা গেল। সাহেবের হাতে ভারী দোনজা এক্সপ্রেস রাইফল ছিল, আর পিছনে সঙ্গের লোকজনের কাছে আরো ভারী বন্দুক ছিল, তাই সাহেব সেইখানেই, হাতীর উপর নজর রেখে, সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা বসে রইলেন। হঠাৎ হাতীটা কানখাড়া করে সাহেবের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। সাহেবও স্পষ্ট শুনতে পেলেন যে তাঁর সঙ্গীরা মনের আনন্দে চোঁচিয়ে গল্প করতে করতে এগিয়ে আসছে। বৃদ্ধা গেল যে, হাতীটা তাদের গলার আওয়াজ পেয়ে সেদিকে ফিরেছে। সাধারণত সঙ্গের ঐ খোঁজকারের দল

জঙ্গলে প্রায় নিঃশব্দেই চলাতো কিন্তু সেদিন তাদের কিরকম ভুল হয়ে যায়।

আগেরবার ঐ গুন্ডা হাতী লোক-জনের কথাবার্তা ও চোঁচামোঁচ শুনে সেইদিকেই তেড়ে গিয়েছিল। এবারও যদি ফের সেই মত করে, এই ভেবে সাহেব আস্তে আস্তে তাঁর রাইফেলের ঘোড়া দুটো তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন, যাতে খুব কাছ থেকে ঐ দোনলার দুই গুলী হাতীর কানের মধ্যে চালিয়ে তাকে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু গুন্ডা হাতী বিষম চালাক, সে কি মনে করে অন্যদিকে ফিরে দ্রুত সরে পড়ল।

এর পরের বারের দেখায় হাতীটা প্রায় চিরদিনের জন্যে সাহেবের শিকার-যাত্রা শেষ করে দিয়েছিল। সেবার সাহেব সারা সকাল শিকারের খোঁজে প্রান্ত হয়ে স্থির করেন যে জঙ্গলের ভিতরে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দূরের এক ফরেস্ট বাংলোতে রাত কাটিয়ে পরের দিন ভোর থেকে শিকারের খোঁজ করবেন। সেইজন্যে লোক পাঠিয়ে সাহেব তাঁর সহস্রকে একটা ঘোড়া আনতে বলেন। সেইস একলা জঙ্গলে চলতে ভয় পাওয়ায় অন্য যারা সাহেবের সাথী তাদের জন্যে অপেক্ষা করে, বেলাশেষে সন্ধ্যার মুখে জঙ্গলে ঘোড়া নিয়ে হাজির হয়, তাও বিনা লণ্ঠন বা বাতি নিয়ে। তাই সগুঁড়দের মশাল জ্বালিয়ে নিতে বলে সাহেব ঘোড়ায় চড়ে চলেন ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে গন্তব্যস্থলের দিকে। সবার আগে সগুঁড় শিকারীদের সর্দার, চিক্-মারা, এক প্রকাণ্ড মশাল জ্বালিয়ে চললো, তার পিছনে ঘোড়ায় চড়ে সাহেব এবং তাঁর পিছনে এক-একজন করে আরও ছয়-সাতজন।

হঠাৎ পথের মোড় ঘুরতেই দেখা গেল ঠিক সামনেই এক প্রকাণ্ড দাঁতাল পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তার একটা দাঁত ছোট আর অন্যটা বড় দেখে চিনতে কারও দেরী হোলো না যে, এই সেই গুন্ডা। চিক্-মারা 'আনে' (হাতী) বলে চোঁচিয়ে, মশাল ফেলে দিয়ে দিলো জঙ্গলে ডুব। চতুর্দিক অন্ধকার এবং কয়েক হাত তফাতে ঐ ভয়ানক জীব। সাহেব তো হতভম্ব। হাতীটার গম্ভীর ঘড় ঘড় শব্দ ক্রমেই জোর হচ্ছে যখন, সাহেবের ঘোড়া ঠিক সেই মুহূর্তেই যদি ভড়কে গিয়ে একেবারে ঘুরে উল্টো দিকে ছুট না দিতো, তবে সেই বিষম বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল। ঘোড়া তো সেই

অন্ধকারে ঘন জঙ্গলের পথে ছুটে বেশ খানিক যাবার পর একটা ছোট নদীর সাক্ষর মুখে দাঁড়ালো। অল্প পরেই সাহেবের লোকজনও সব হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছালো। একটু স্থির হয়ে দেখে-শুনে বোঝা গেলো যে, হাতীটা পিছন নেয়নি। তখন ফরেস্ট বাংলোয় যাবার পরামর্শ আরম্ভ হোলো। সে-রায়ে দুর্ভোগ অনেক ছিল। বাংলা পৌঁছাবার সোজা পথে যমদূত, অন্য পথে যা ছিল সেটা পাহাড়ী খাড়া পথ, তা-ও ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। সারা রাত সেই জঙ্গল টাঙ্গী ও দায়ের কোপে কেটে পরিস্কার করে ধীরে ধীরে চলতে হোলো। সাত-আট ঘণ্টা চলার পর ভোর পাঁচটার গন্তব্যস্থলে সবাই পৌঁছালো।

তারপর সেই গুন্ডার আর খোঁজ-খবর নেই। প্রায় তিন মাস পরে আবার হঠাৎ তার দেখা পাওয়া গেল এবং এই দেখাই শেষ দেখা।

মাস তিনেক পরে সাহেব পাহাড়-তলীর নীচে এক সপ্তাহের জন্যে শিকারের ব্যবস্থা করেন। সকালের দিকে লোকজন, তাঁবু, বড় বন্দুক, রাইফেল ও থাকা-খাওয়ার অন্য সব সরঞ্জাম পাঠিয়ে, বিকালের একটু আগে শুধু চিক্-মারাকে সঙ্গে নিয়ে সাহেব হাটা পথে তাঁবু ও ছাউনির পথে রওনা দিলেন। পথে যদি বনমোরগ পাওয়া যায় এই ভেবে সঙ্গে শুধু একটা সাধারণ হাঙ্কা বন্দুক ছিল। প্রায় দশ মাইল পথ চলার পর, যখন ছাউনি আর মাইল তিন-চার মাত্র, তখন এক জঙ্গলী হাতীচলা পথের মোড়ের থেকে শোনা গেল যে, কিছু উপরের ঘন জঙ্গলের মধ্যে থেকে কি এক তুমুল গোলমালের শব্দ আসছে। ভীষণ গর্জন, ককর্শ চাঁৎকার এবং হাতীর হাঁকডাকে জঙ্গল যেন কাঁপছে এবং সেই সঙ্গে প্রবল জোরে লাঠিতে লাঠি মারার মত শব্দ। বৃষ্টিতে দেরী হোলো না যে, দাঁতালে দাঁতালে যুদ্ধ চলছে।

চিক্-মারা মোটেই সেদিকে এগোতে রাজী ছিল না কিন্তু সাহেব যখন এগোলেন, সে-ও সঙ্গে চললো। হাওয়ার গতিমুখ ভাল করে দেখে, তার বিপরীত দিক ধরে দুজনে সেই পাহাড়ী পথে চললেন। কাছাকাছি এসে অতি সন্তর্পণে জঙ্গলের ভিতর আর একটু যেতেই দেখা গেলো যে, নীচের এক ছোট খোলা জায়গায় দানবের যুদ্ধ চলছে।

সে এক সারা জীবন মনে রাখার মত দৃশ্য। যোদ্ধাদের মধ্যে একদিকে সেই পরিচিত পুরানো গুন্ডা, তার বাঁদিকের ছোট দাঁত দেখতেই দূর থেকে তাকে চেনা গেল। অন্য দিকে দুটি দাঁতাল, তার মধ্যে একটি ছিল প্রকাণ্ড বড় হাতী এবং তার দাঁতজোড়াও অতি সুন্দর ও লম্বা, অন্যটি তার চেয়ে অনেক ছোট। এই অসম যুদ্ধে গুন্ডার হার নিশ্চিত ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে প্রবল যুদ্ধ চালিয়েছে বৃদ্ধা গেল, কেননা তার বিপক্ষের দুই হাতীরই গায়ে রক্তভরা ক্ষতচিহ্ন। দূর থেকেই দেখা যায়। গুন্ডার অবস্থা খুবই সাংঘাতিক কাহিল দেখা গেল, তার সমস্ত দেহে, অসংখ্য ক্ষত থেকে প্রবাহিত রক্তের স্রোত। দেখা গেল যে, ছোট হাতীটি সামনা-সামনি গুন্ডাকে আক্রমণ করছে। সে যেমন ঘুরছে বা পাশ কাটাবার চেষ্টা করছে, ছোট হাতীটাও সেই মত যুরেকিরে সোজা লড়াই চালাচ্ছে। অন্য হাতীটা গুন্ডার পাশ থেকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে এবং সেই সঙ্গে দাঁত চালিয়ে তাকে বিষমভাবে ঘায়িল করছে। এই প্রচণ্ড ধাক্কায় গুন্ডা এক-একবারে অনেকটা হটে যাচ্ছে কিন্তু ছোট হাতী তার সম্মুখেই যাচ্ছে। গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়ও এই যুদ্ধে একেবারে ভেঙে ছিঁড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট এই রকম বিষম লড়াইয়ের পর দুই পক্ষ যেন কি একটা ইগিতে পৃথক হয়ে গেল এবং গুন্ডা হাতী পাহাড়ের নীচের দিকে পালিয়ে গেল। তার বিপক্ষের দুই হাতী কিন্তু তার পিছন না নিয়ে, ফিরে চড়াইয়ের পথ ধরে উল্টোদিকে গেল। বৃদ্ধা গেল যে, তাদের দল সেই দিকে আছে।

গুন্ডা হাতীর পিছনে একটু দূর গিয়ে দেখা গেল যে, চতুর্দিকে রক্তের দাগ। বেলা পড়ে এসেছিল, তাই সাহেব তাঁবুর দিকে চললেন।

পরের দিন ভোরেই সেই গুন্ডা হাতীর রক্তচিহ্ন ধরে সাহেবের দল একটি ছোট নদীর কাছে পৌঁছাল। আহত হাতী নদীর পাড় ধরে আধ মাইল মত গিয়ে যেখানে জল কম, সেখানে পার হয়েছে দেখে আরও একটু এগিয়ে দেখা গেল, সে ডান পাশে শুয়ে শুয়ে লম্বা করে ছিড়িয়ে, মরে পড়ে আছে। অতটা দূর সে এলো কি করে

ভাই আশ্চর্য, কেননা তার সারা দেহ গভীর ক্ষতে ভর্তি।

যুদ্ধটা কিসের কারণে ঘটেছিল, সেটা জানবার জন্যে সাহেব দলের অন্য কয়েকজন খোঁজকারকে সেই অন্য দুই যোদ্ধা এবং তাদের হস্তীযুগ্মের খোঁজে লাগিয়ে নিজে দু'তিনজনকে নিয়ে গুন্ডার পিছনে গিয়েছিলেন। ছাউনিতে ফিরে আসতে সেই অনার্য জানালো যে, সেই অন্য দুই হাতী তাদের দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে এবং দলটা ছাউনি থেকে মাইল দুই দূরে আছে। তবে হাতীর ভয়ে তারা আরো কাছে গিয়ে সেই দুই যোদ্ধার খোঁজ নিতে পারেনি যে, তাদের অবস্থা কি।

পরের দিন সাহেব নিজেই সেই খোঁজ নিতে খুব সকালেই কয়েকজন লোক নিয়ে বেরোলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই সারি ঘন জঙ্গলে ভরা পাহাড়ের মধ্যে এক উপত্যকায় দলটি দেখা গেল। এদিক-ওদিক ছাড়িয়ে

আঠারটা ছোট-বড় হাতী সেখানে রয়েছে, দেখা গেল, তাঁর মধ্যে বাচ্চা ও মাদী হাতীই বেশী, বড় দাঁতাল মাত্র দুটো, তা-ও সেই দুই যোদ্ধা নয়। অকারণে এতদূরে আসা হয়েছে ভেবে সাহেব দলটাকে আর একবার ভালো করে দেখে ফিরে যাবার উদ্যোগ করলেন এমন সময় এক খোঁজকার সাহেবকে চুপি চুপি বললে, "ঐ একটা প্রকাণ্ড হাতী দূরে একলা দাঁড়িয়ে আছে।" হাতীটা পিছন ফিরে ছিল, সুতরাং অতি সন্তপণে এগিয়ে তার বেশ কাছ এসে দেখা গেল যে, সে সেই মহাকায় যোদ্ধা, যে গুন্ডাকে তার অন্তিম যুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে জখম করে। বুঝা গেল যে, এই দল দখল নিয়ে যুদ্ধ এবং দলপতি একজন সহায়ক নিয়ে গুন্ডাকে মেরে তাড়িয়েছে।

ফেঁচারের অভিজ্ঞতা কিছু অসাধারণ নয় মনে হয়। বছর পঁচিশ আগে

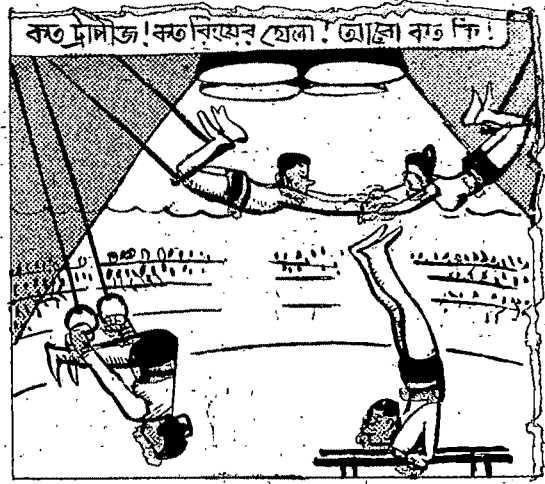
ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে ঐ রকম গুন্ডা হাতী উপদ্রব করে। তারপর এক রাতে সেই তল্লাট কাঁপিয়ে, অন্য একটা হাতীর সঙ্গে তার ভীষণ যুদ্ধ হয়। পরদিন সকালে সেই 'লড়াই' হাতীর খোঁজে বেরিয়ে, শিকারীরা প্রথমে একটা মরা হাতী দেখে যার একটাও গজদন্ত নেই। আরও বেশ কিছুদূর গিয়ে জঙ্গলের কাছে আর একটা মরা হাতী দেখা যায়। এটা অতি প্রকাণ্ড এবং প্রথম নজরে মনে হয় যে, তার চারটা দাঁত।

ভাল করে দেখায় বুঝা গেল যে, দুটো বৃহৎ দাঁত ঐ হাতীর নিজের। অন্য যে দুটো তার গলার নীচে ফুড়ে বসেছে, সে দুটো অন্য হাতীটার। সে গভীরভাবে দাঁত বসিয়ে তারপর মরণ খোঁচা খেয়ে পড়ে যায় এবং সেই সময় ঐ দুটো ভেঙ্গে গিয়ে এই হাতীর গায়েই গিঁথে থাকে। ঐ লড়াইয়ে দলপতি শত্রুকে মেরে নিজেও মরে।

এই খবর অনেক দৈনিকে ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়।



মানুষ সাধারণতই শ্রোতা দেখায়! জাবাব ডাবে, ৩: সে কত বড় বীর!



কত দাঁদ! কত বিজয়ের ছোলা! জাবাব ডাবে, ৩: সে কত বড় বীর!



ফুঃ! বলজা সিদ্দী! আমাদের মত MONKEY BRIDGE বানাতো মানুষের ওরা?



লুজ সাফিহ ডালে ডালে লুকাচর ছোলাত পারও? জাবাব ডাবে, ৩: সে কত বড় বীর!

রাতের এক্সপ্রেসে যে যাত্রীরা রোম ত্যাগ করেছিল তারা শেষে ফেরিয়ানো স্টেশনে এসে ঠেকল। এখানেই তারা ভোর অবধি থাকবে। এখান থেকে তারা ধরবে লোকাল ট্রেন। লোকাল ট্রেনটা বড়ই সেকেন্ডে ধরনের। এই ট্রেন ধরে তারা যাবে মেন-লাইনের সুলমনায়।

ফেরিয়ানো স্টেশনে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় বসে আছে পাঁচজন যাত্রী। এরা সারা রাত এই কামরায় কাটিয়েছে। ভোরের দিকে এল স্থলোকাতি একটি মহিলা যাত্রী। তার সবাঙ্গ কালো পোষাকে আবৃত। মনে হয় শোক-প্রকাশের সময় এখনও পার হয়নি। কোন দিকে না চেয়ে মহিলাটি সোজা সিটে গিয়ে বসল। পিছনে তার স্বামী। ভদ্রলোককে দেখতে ছোটখাট, রোগা, দুর্বল। মুখটা ফ্যাকাসে। চোখ দুটি ছোট কিন্তু উজ্জ্বল। তাকে একটু লাজুক বলে মনে হয়। ব্যবহারে জড়তা প্রকাশ পাচ্ছে। শোকচিহ্ন আছে ভদ্রলোকের অঙ্গে। ভদ্রলোকটি হাঁফাচ্ছে।

যাত্রীরা ভদ্রলোকের স্ত্রীর জন্য বসবার জায়গা করে দিয়েছে। তাই ভদ্রলোকটি যাত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেও একটা সিটে বসে পড়ল। তারপর স্ত্রীর দিকে একটু সরে তার কোটের কলারটি ঠিক করে দিতে দ্বিধে বললে, “এখন অসুবিধা হচ্ছে না ত?”

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর খুবই নম্র।

বিদেশীগল্প পুইজি সিরাবদেল্লো যুদ্ধ

স্বামীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভদ্র-মহিলা আবার তার কোটের কলারটি টেনে মাথার দিকে তুলে দিল। মনে হল ওই কোটের কলারের মধ্যে সে মুখ ডুবিয়ে থাকতে চায়। যাত্রীদের কাছ থেকে

মুখ লুকাবার জন্য ভদ্রমহিলার এই প্রচেষ্টা।

বিশয় হাসিতে মুখ ভরে গেল স্বামীটির। খুবই মৃদু কণ্ঠে বললে, “জযন্য দুনিয়া।”

স্বামীটির মনে হল সব ঘটনা যাত্রীদের কাছে খুলে বলা দরকার। বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। যে, যাত্রীদের সহানুভূতিই তার স্ত্রীর প্রাণ। ভদ্র-লোকটি বললে যে, তাদের একমাত্র ছেলে যুদ্ধে যাচ্ছে। ছেলোটর বয়সও বেশি হয়নি, মাত্র বছর কুড়ি। ছেলোটিকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে স্বামী-স্ত্রী। ছেলোটি রোমে গেল লেখাপড়া করতে। স্বামী-স্ত্রীও সুলমনার ঘর-সংসার ত্যাগ করে ছেলোটির সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল রোমে। যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধে যোগ দিতে হল ছেলোটিকে। কিন্তু তারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল যে, ছেলেকে ছ’মাস যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে না। কিন্তু হঠাৎ টেলিগ্রাম এল। দিন তিনেকের মধ্যেই ছেলেকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে। তার পেয়ে যেন তারা এক-



বার তাদের ছেলের সঙ্গে দেখা করে আসে।

বিরাত কোটের তলায় খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল মহিলাটি। তার বিপুল শরীর মাঝে মাঝে কুঁচকে যাচ্ছিল। মহিলাটির মনে হল যে স্বামীর এত কথা, এত বিবরণ নিরর্থক। সহানুভূতির উদ্রেক করার জন্য তার স্বামী যদি এত কথা বলে থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই বার্থ হয়েছে। কারো মনে এক কণাও করুণা জন্মেনি। ভদ্রমহিলার মনে হল সমস্ত যাত্রীদের ইতিহাস হয়ত তাদের মতনই করুণ। বিরাত কোটের তলায় মাঝে মাঝে বুনো জন্তুর মত ফুলে উঠছিল ভদ্র-মহিলাটি। স্বামীর কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল একজন যাত্রী। সে বললে :

“আপনার ছেলে মাত্র এখন যুধক্ষেত্রে যাচ্ছে। এত দেরীতে! আপনি ত ভাগ্যবান। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। আর, যে দিন যুধ বাঁধলো ঠিক সেই দিনই লড়াইতে পাঠানো হল আমার ছেলেকে। এরই মধ্যে দু-দুবার সে জখম হয়ে ফিরে এসেছে। সেরে উঠতে না উঠতেই আবার পাঠান হল তাকে।”

আর একটি যাত্রী বললে, “আমার কাহিনী শুনবেন মশাই? আমার দুই ছেলে আর তিনটে ভাই-পো। তাদের সবাইকে ঠেলে পাঠানো হয়েছে যুদ্ধে।”

সাহস করে বলে ফেললো স্বামীটি, “হতে পারে। কিন্তু এ যে আমাদের একমাত্র ছেলে। এই ছেলে ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই যে!”

“কিন্তু থাকলেও একই ব্যাপার হত। আবার একটি মাত্র ছেলে থাকার বিপদ অনেক। ছেলোটো বাবা-মার বেশি আদর পেয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে। ধরুন, আপনার যদি কয়েকটি ছেলে থাকত তবে আপনি কি তার মধ্যে একটি ছেলেকে অন্য সকলের চেয়েও ভালবাসতেন? তা সম্ভব নয়। পিতৃস্নেহের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার কোন ব্যাপারই নেই। বাপের ভালবাসা ত আর রুটি নয় যে তাকে সমান করে ভাগ করে দেবেন। ভালবাসার মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার কোন কথাই নেই। বাপের ভালবাসা একটি ছেলের জন্যে যেমন, দশটি ছেলের জন্যেও তেমন। এমন কথা কি বলা যায় যে দুটি ছেলের জন্যে যে কষ্ট তার অর্ধেক হবে একটি ছেলের জন্যে.....”

লজ্জিত স্বামীটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, “হ্যাঁ, আপনি ঠিক কথাই বলে-

ছেন। কথাটা ঠিকই। তবে আমি একটা কথা বলি। অবশ্য আমার কথায় কেউ কিছু মনে করবেন না। আমি কাউকে লক্ষ্য করে বলছি না। কিন্তু ধরুন, আপনার দুটি ছেলে। দুটি ছেলেই যুদ্ধে গেল। ধরুন, তার মধ্যে একজন আর ফিরে এল না। তবে আপনার আর একটি ছেলে ত থাকল। সেই আপনাকে কিছু সান্ধ্বনা ত দিতে পারবে।..... আর যার একটিও রইল না তার.....”

উত্তেজিত হয়ে উঠল যাত্রীটি। রেগে বললে, “ঠিক। তার তবু একটি ছেলে রইল। সেই-ই তার সান্ধ্বনা। কিন্তু একমাত্র পুত্র মারা গেলে পুত্র-প্রাণ ভদ্র-লোকটি ত আত্মহত্যা করে ভবযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। এখন বলুন এই দুটির মধ্যে কোনটে খারাপ? আমার অবস্থা আপনার চেয়ে খারাপ। তাই না?”

আর একটি যাত্রী বলে উঠল, “যত বাজে কথা!” যাত্রীটি মোটা। মুখটা লাল। রক্তজবা চোখ দুটি ঠেলে বেরুচ্ছে যেন।

যাত্রীটি হাঁফাচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে টগবগ করে ফুটছিল যেন। তার প্রাণ-শক্তির প্রাবল্য দুর্বল শরীর বেধে রাখতে পারাছিল না। যেন সেই চণ্ডলতা চোখ দিয়ে ঠিকরে বার হতে চাইছে।

ওর সামনের পাটির দুটি দাঁত নেই। লোকে পাছে সেটি লক্ষ্য করে তাই একটা হাত মুখের ওপর চাপা দিয়ে যাত্রীটি আবার বলে উঠল, “যত সব বাজে কথা! এ সব কথার কোন মানে হয়? আপনারা কি বলতে চান যে শুধুমাত্র আমাদের সর্বিধের জন্য আমরা সন্তানের জন্ম দেই?”

অন্য যাত্রীটিকে বড় অসহায় মনে হল। যে যাত্রীর দুটি ছেলে প্রথম দিন থেকেই যুদ্ধে গিয়েছে, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বললে, “ঠিক। ঠিক বলেছেন মশাই। আমাদের সন্তান ত আমাদের নয়। তারা যে সমগ্র দেশের।”

প্রতিবাদ করে মোটা যাত্রীটি বললে, মিছে কথা। আমরা যখন সন্তানের জন্ম দেই, তখন কি একবারও স্বদেশের কথা আসে? সন্তান জন্মায় যেহেতু তাদের জন্মতেই হয়। এই পৃথিবীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সন্তান আমাদের জীবনটাই আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। এটা ই হল খাঁটি কথা। বলা ভাল আমরাই আমাদের সন্তানদের। কিন্তু আমাদের সন্তানরা কখনই আমাদের নয়।

কুড়ি বছর বয়সে ওরা যা করে, কুড়ি বছর বয়সে আমরাও ঠিক তাই করতাম। ভেবে দেখুন, ঠিক তাই-ই করতাম। আমাদেরও বাবা ছিল, মা ছিল। কিন্তু এখানেই ত শেষ নয়। ঐ বয়সে আমাদের আরও কিছু থাকত। থাকত আমাদের বাম্বধবী, সিগারেটের নেশা। ঐ বয়সে থাকত জীবনের ওপর কত আকর্ষণ, কত মোহ, বন্ধন..... এবং স্বদেশ। ঠিকই। স্বদেশ থাকত। দেশের ডাক এলে বাবা-মার হাজার নিবেদন উপেক্ষা করে আমরা নিশ্চয়ই দেশের ডাকে সাড়া দিতাম। কুড়ি বছর বয়সে এ কাজ আমরা করতাম। কিন্তু আজ আমাদের বয়স অনেক বেড়ে গেছে। এই পরিণত বয়সে স্বদেশের প্রতি ভালবাসা অনেক পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে সন্তানের প্রতি আমাদের স্নেহ। এখন যদি হুকুম হয় যে, আমাদের সন্তানদের যুদ্ধে যেতে হবে না। তাদের জায়গায় আমাদের গেলে চলবে। আমরা কিন্তু সবাই সানন্দে ছেলের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবো। তাই না?”

গাড়ির কামরায় অখণ্ড স্তব্ধতা। সমস্ত যাত্রী মাথা নেড়ে মোটা যাত্রীর কথায় সায় দিল।

মোটা যাত্রীটি আবার আরম্ভ করল, “তাই কুড়ি বছর বয়সে আমাদের সন্তান-সন্ততি যে আরেগে, যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, সেই আবেগ ও আদর্শকে সন্মান করতে হবে বৈকি! এই বয়সে তারা স্বদেশের কথা ভাবে। এই ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য গোলায়-বাওয়া ছেলেরা দেশের কথা ভাবে না। ভাল ছেলেরাই ভাবে। আমি সেই ভাল ছেলের কথা বলছি। সেই সব ছেলেরা তাদের বাবা-মাকে সত্যিই ভালবাসে। কিন্তু তাদের কাছে বাবা-মায়ের ভালবাসার চেয়েও বড় স্বদেশের প্রতি ভালবাসা। এই ত খুব স্বাভাবিক। আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে আমরা বড়ো। আমরা অসমর্থ হয়ে গেছি। তাদের চোখে আমরা অথর্ব। আর দৌড়-ঝাঁপ করতে পারি না। তাই আমরা আছি ঘর আগলবার জন্য। স্বদেশ অনেকটা রুটির মত। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় রুটি। খিদে পেলে আমরা রুটি খাই, প্রাণধারণ করি। স্বদেশও আমাদের সেই নিত্য-প্রয়োজনীয় রুটি। তাই স্বদেশকেও রক্ষা করতে হবে। আমাদের সন্তানরা ছুটে গেলে আমাদের সেই স্বদেশকেই রক্ষা করতে। তাই তারা চায় না তাদের বাবা-

মায়ের অশ্রু ও উদ্বেগ। তারা গিয়েছে কুড়ি বছরের স্ব-ধর্মের ডাকে। যদি তারা না ফিরে আসে, যদি বৃন্দক্ষেত্রে তাদের মৃত্যু হয় তবে সেই মৃত্যুও সুখের। তারা আনন্দিত হয়ে পরপারে চলে যাবে। অবশ্য এই ভাবে বোধ করতে পারে একমাত্র ভাল ছেলেরাই। আমি সেই ভাল ছেলেরদের কথাই বলছি। ভেবে দেখুন, কুড়ি বছর বয়সে বৃন্দক্ষেত্রে যারা মারা যাবে তারা কত ভাগ্যবান। তারা ত জীবনের উজ্জ্বল দিকটাই দেখল। জীবনের যে অন্ধকার দিক আছে, জীবনে যে ক্লান্তি ক্ষয় ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা আছে, জীবনে যে মোহভঙ্গের অবসাদ আছে, তারা সেই সব অন্ধকার রূপগুলো না দেখেই চলে যাচ্ছে। এ কত বড় ভাগ্য। এর চেয়ে আর কত বড় ভাগ্য আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য চাইতে পারি? তাই আমাদের চোখ মূছতে হবে। আর কান্না নয়। আমাদের হাসতে হবে।..... যেমন আমি হাসছি।..... ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হবে।..... যেমন আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। মারা যাবার ঠিক আগে আমার ছেলে বৃন্দক্ষেত্রে থেকে আমার কাছে এই বলে পাঠাল যে সে মারা যাচ্ছে। তাতে তার কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই। এই মৃত্যুই সে চেয়েছিল। এ যে তার মহৎ মৃত্যু। তাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কোন শোকচিহ্নও ধারণ করিনি।.....”

এই বলে সে তার হালকা-রঙের কোটটা ফাঁক করল তার কথার যথার্থতা প্রমাণ করতে। সামনের পাটির দুটি হারানো দাঁতের ওপর ঠোঁটটা বলছে। চোখ দুটি জলে ভরে এসেছে, তারা দুটি স্থির। কিছুক্ষণ পরে সেই মোটা বাত্মাটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেসে উঠল। মনে হল এই হাসিটি যদি কান্না হত তবে বোধহয় সব-চেয়ে ভাল হত।

অন্য বাত্মা সায়া দিয়ে বললে, “ঠিক কথা। আপনি ঠিকই বলেছেন।.....”

বিরাত কোটের তল্লাস শ্বলোকীত মহিলাটিকে বাণ্ডলের মত বেচপ দেখাচ্ছে। কিন্তু সে মন দিয়ে মোটা বাত্মার কথাগুলো শুনছে। আজ তিন মাস ধরে সে খুব আগ্রহের সঙ্গে এই সব আলাপ-আলোচনা শুনবে এসেছে। সে শুনছে তার স্বামীর কথা, বৃন্দ-বান্ধবের কথা। তার ভেতর সে পেতে চেয়েছে সান্ত্বনা। এই সব কথার ভেতর সে পেতে চেয়েছে এমন কোন বাণী যা তাকে রক্ষা করতে পারে, যা তার দুঃখকে

লাঘব করতে পারে। সে বুঝেছে এই সব কথার মধ্যে এমন একটা পথ যাতে মা তার একমাত্র পুত্রকে বিপজ্জনক জীবন কিংবা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েও নিলিপ্ত থাকতে পারে। কিন্তু এত কথার মধ্যে সে কিছুই পায়নি। কোন সান্ত্বনাই মেলে নি। তাই তার দুঃখ আরও বেড়ে গিয়েছে। কারণ সে বুঝেছে যে তার দুঃখ, তার মন কেউ বোঝে না। কেউ নেই যে তার দুঃখের ভার নিতে পারে।

কিন্তু মোটা বাত্মার কথায় সে বিস্মিত হল। সে অভিভূত হল তার আলাপে। মহিলাটির মনে হল তাকে কেউ বোঝেনি, কেউ তার দুঃখের অংশীদার হতে পারেনি; তার জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়। দায়ী সে একমাত্র নিজেই। কারণ সন্তানকে বৃন্দক্ষেত্রে পাঠিয়ে বাবা ও মাকে যে আবেগের উত্তার উঠতে হয়; শব্দমাত্র বৃন্দক্ষেত্রে পাঠিয়ে নয়, সন্তানের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েও যেমন ভাবে অশ্রু-সম্বরণ করে নিলিপ্ত হতে হয়; সে সেই আবেগের উত্তার উঠতে পারেনি এবং অর্জনও করতে পারেনি সেই নিলিপ্ততা।

ওদিকে মোটা বাত্মাটি সহ-বাত্মীদের সঙ্গে কথা বলছে। সে বলছে কি করে তার ছেলে দেশের জন্য, রাজার জন্য কোন খেদ না নিয়ে, আনন্দিত চিত্তে মৃত্যুর দিকে চলে গেল। মোটা বাত্মাটি দিচ্ছে তার ছেলের মৃত্যুর বিশদ বিবরণ। মহিলাটি মাথা তুলে কোণের দিকে সরে গিয়ে অধীর আগ্রহে সমস্ত বিবরণ শুনতে লাগলো। শুনতে শুনতে তার মনে হল সে যেন এক বিচিত্র পৃথিবীতে অকস্মাৎ পা দিয়েছে। এমন জগৎ যে থাকতে পারে সে কথা একবারও সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সহ-বাত্মারা সমস্তের বীর পিতাকে অভিনন্দিত করছে। সব কথা কানে আসছে মহিলা-

টির। তার খুব ভাল লাগছে। সত্যিই, মোটা বাত্মাটি তার দুঃখ অবিচলভাবে সহ্য করছে।

হঠাৎ মহিলাটি মোটা বাত্মাটির দিকে মুখ ফেরাল। সে যেন এতক্ষণ কোন কথা শোনেনি। স্বপ্নোথিতের মত জিজ্ঞাসা করল;

“তাহলে..... আপনার ছেলোট কি সত্যিই মারা গেছে?”

প্রত্যেকটি বাত্মার চোখ মহিলাটির মুখে নিবন্ধ। মোটা বাত্মার বড় বড় ঠেলে-বার-হয়ে-আসা অশ্রু-পূর্ণ চোখ দুটিও গভীরভাবে এসে পড়ল মহিলাটির মুখে। মোটা বাত্মাটি যেন মহিলার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছে। কিছুক্ষণ গেল। কোন উত্তর নেই। কোন কথা বার হল না মুখ থেকে। মনে হল ভদ্রমহিলার অবি-শ্বাস্য রকমের বোকা ও সরল প্রশ্নে মোটা বাত্মাটি চকিতে এইমাত্র সত্য-সত্যি উপ-লব্ধি করল যে, তার ছেলে মারা গিয়েছে, চিরকালের জন্য মারা গিয়েছে, আর কোন-দিন ফিরে আসবে না। তার মুখ কঁকড়ে গেল। বিকৃত হল। তাড়াতাড়ি বুকপকেট থেকে রুমাল টেনে বার করে মুখে চাপা দিয়ে সমস্ত বাত্মাদের বিস্মিত করে মোটা বাত্মাটি বুক-ভাঙা অপ্রতিরোধ্য কান্নায় ডুকে উঠল। অনুবাদ : রাম বসু

কবি, উপন্যাসিক, নাট্যকার ও ছোট-গল্প-লেখক পিরানদেয়ো ১৮৬৭ সালে সিসিলিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কিছুদিন রোমে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৮৯ সালে এঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ সালের পর থেকে ইনি পরিপূর্ণভাবে নাটক রচনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। রোমে ইনি নিজেই একটি নাট্যকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং তার দল নিয়ে সমগ্র ইরোপায় পরিভ্রমণ করেন। অচিরেই তাঁর নাটক প্রশংসিত ও নিন্দিত হতে থাকে। ১৯৩৪ সালে এঁকে নোবেল শ্রদ্ধার দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালে এঁর মৃত্যু হয়। —অনুবাদক

ওরা কাজ করে ৫

প্রবীণ লেখক পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই উপন্যাসের মধ্যে আধুনিক সভ্যসমাজ আজ সভ্যতার পরিচ্ছদে কোথায় এসেছে, সেখানের জীবনের সভ্য, ধর্ম এবং অর্থ কোথায় তা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দেবদ্রী সাহিত্য সমিতি : ৫৭সি, কলেজ স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

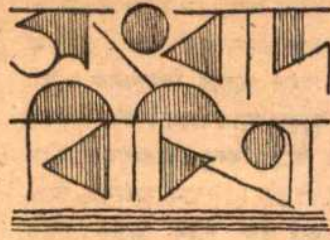
॥ স্বয়ংক্রিয় কলের মানুষ ॥

সামান্য কয়েকদিন আগে কাসেলের প্রধান মন্ত্রীর ডক্টর লার্ডরিংসেন একটা স্বয়ংক্রিয় কলের মানুষের হাত থেকে একটা গোলাপ ফুলের তোড়া গ্রহণ করেছেন। কাসেলে অনুষ্ঠিত বোডিশ আবিষ্কার ও অভিনব বস্তুর প্রদর্শনী উপলক্ষে এই ঘটনা ঘটে।

তিন হাজারেরও বেশী নারী পুরুষ আপন আপন বান্ধি আর খেয়াল খুশি অনুসারে নতুন নতুন জিনিসপত্র আবিষ্কার করেছে। জনৈক পাত্রী এমন এক ধরণের আসবাবপত্র আবিষ্কার করেছেন যে, যেগুলোর দ্বারা একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। একজন জার্মান গৃহিণীর পেঁয়াজ কাটতে বড়ো কষ্ট হতো। পেঁয়াজ কাটবার সময় তার চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তো। এই অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় ভদ্রমহিলা এক ধরণের চশমা আবিষ্কার করেছেন। এই চশমা পরে পেঁয়াজ কাটলে পেঁয়াজের খাল লোকে আর চোখ দিয়ে জল পড়ে না। প্রদর্শনীর মাত্র ২৬ গ্রাম ভারি একটি রেডিও হাজার হাজার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটাই হলো পৃথিবীর সব চাইতে ছোট রেডিও এবং ফ্র্যাকফুটের একজন হেয়ার-ড্রেসার এই রেডিওটা আবিষ্কার করেছেন। একজন জার্মান মহিলা তাঁর স্বামীর নাকডাকার জব্দালায় শাস্তিতে ঘুমোতে পারতেন না। তাই স্বামীর নাকডাকা বন্ধ করার জন্যে তিনি এক প্রকার ব্যান্ডেজ আবিষ্কার করেছেন। প্রদর্শনীর সেক্রেটারি মাক্স গেস্টনার আজ প্রায় ১৪ মাস ধরে একই রেড দিয়ে দাঁড়ি কামাচ্ছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, এতোদিন পরেও রেডটার ধার কিছু মাত্র কমেনি। শুধু তাই নয়, কাসেলের কোনো ভদ্র-লোকের কাছে রেডটা বিক্রি করা যায় কিনা মাক্স গেস্টনার তা একবার ভাল করে ভেবে দেখছেন।

॥ বিপদের মৃত্যুমুখি সারাজীবন ॥

ওয়াস্টার মার্জ হলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু যুদ্ধের সময় তিনি তাজা বারুদ ও বোমা নিষ্ক্রিয় করার পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং বোমা অপসারণ ও নিষ্ক্রিয়করণ দলের দলপতি হন। দলের প্রতিজ্ঞা ছিল যুদ্ধের শেষে তারা আর কোনরকম বোমা বারুদ স্পর্শ করবে না। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। হামবুর্গে যুদ্ধের পর অজান্তে বোমা নিয়ে খেলা করায় চল্লিশটি শিশুর প্রাণ যায়। মার্জ তখন হামবুর্গ বোমা অপসারণ দল গড়ে তোলেন। তারপর থেকে মার্জ ও তার দল লার্ডরিংসেন তাজা বোমা ও বারুদ বোমার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দেয়। তারা ভেবেছিলেন ১৯৪৫ সালে ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের কাজ শেষ



হবে, কিন্তু তা হয়নি। সেদিন থেকে ষোল বছর বাদে ১৯৬২ সালে মার্জ অবসর গ্রহণ করেছেন। কয়েকদিন আগে পর্যন্তও তিনি ৪৪০০ বার নিজের জীবন বিপন্ন করে ৪৪০০টি তাজা বোমা নিষ্ক্রিয় করেছেন। কিন্তু তাঁর দলের কাজ আজও শেষ হয়নি। দেখা গেছে লোকে



ওয়াস্টার মার্জ একটি বোমার ফিউজ নিষ্ক্রিয় করছেন।

কামানের গোলাদিয়ে সিঁড়ি তৈরী করেছে কিম্বা ঘরবাড়ীর ছাদের করো-গেটের টিন অ্যান্ডি এয়ার ক্র্যাফট গোলা চাপা দিয়ে আটকে রেখেছে; এই ভো সেদিনও হামবুর্গ বন্দরের এক কোণে বেশ কয়েকটা তাজা বোমা ও বারুদ পাওয়া গেছে। এবং এই সবই এখনও নিষ্ক্রিয় করতে হবে। মার্জের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল টাইম ফিউজগুলি। এইগুলি নিষ্ক্রিয় করা খুব জটিল কেন না এগুলি যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কাজ করে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকারের ফিউজের সংখ্যা প্রায় ৪০০। স্রেফ আন্দাজের উপর নির্ভর করে এগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। নিষ্ক্রিয় করার সময় বহুবার ফিউজ ছুঁতে গেছে এবং মার্জ ও তাঁর লোকেরা কোনরকম প্রাণে বেঁচেছেন। বোমা ও ফিউজ সম্বন্ধে মার্জের অসাধারণ জ্ঞানের জন্য একমাত্র কানে কম শোনা ছাড়া আর তার কোন ক্ষতি হয়নি। মার্জ জীবিত বটে কিন্তু হামবুর্গের বৃকে ১,৩৭২ জন মৃত্যুর নাম লেখা যে স্মৃতিস্তম্ভটি দাঁড়িয়ে

আছে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয় এই কাজটি কত বিপজ্জনক।

॥ লবণ জল থেকে পানীয় জল ॥

সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করে দক্ষিণ ক্যালি-ফোর্নিয়ার স্যানডিয়েগো শহরটিতে সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিদিন এই প্রকার দশ লক্ষ গ্যালন জল এখানে সরবরাহ করা হবে।

আমেরিকার আভ্যন্তরীণ দপ্তর এ ধরণের তৃতীয় কারখানাটি শীঘ্রই চালু করবেন—এটি স্যানডিয়েগোর সানিকটস্থ পয়েন্ট লোমোতে অবস্থিত। প্রথম কারখানাটি স্থাপন করা

হয়েছে টেকসাসের ফ্রিপোর্টে। এখানে প্রতিদিন সমুদ্রের লবণাক্ত জল হতে দশ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল তৈরী করা হচ্ছে। দ্বিতীয় কারখানাটি রয়েছে দক্ষিণ ডাকোটার ওয়েবস্টারে। এখানে ঐ প্রকার আড়াই লক্ষ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

পয়েন্ট লোমার কারখানাটি আমে-রিকার ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক কর্পো-রেশন নির্মাণ করছেন। স্যান ডিয়েগোর অধিবাসীগণ মোট যে পরিমাণ জল ব্যবহার করে থাকেন তার এক তৃতীয়াংশ এই কারখানা হতে সরবরাহ করা হবে। এই সকল কারখানায় সমুদ্রের জলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করে আর তাকে শীতলীকৃত করে জলোপযোগী করা হয়। এই জলের শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আভ্যন্তরীণ বিভাগ গ্যারান্টি দিয়েছেন। পয়েন্ট লোমার কারখানায় উন্নততর পদ্ধতিতেই পানীয় জল উৎপাদন ও পরিশুদ্ধ করা হবে।



যৌবন সমীপে অকাল বয়স্ক কনাদ চৌধুরী

মাত্র বারো-তেরোটা বসন্ত পেরোলেই আমেরিকার ছেলেমেয়েরা আজকে যৌবনের সিংহস্বরে পেঁপেছে যায়। কিন্তু জীবনপ্রভাতের শিশির শূকোতে না শূকোতেই যৌবনের এই অকালবোধন যন্ত্রের মধ্যে একটা সর্বনাশের ইংগিত পেয়েছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। এবং আমেরিকার বাপ-মা'রাও তাঁদের সন্তানদের অকালবোধন নিয়ে কম চিন্তিত না। ইংলেন্ডের তুলনায় আমেরিকার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত একেবারে ভিন্ন। আমেরিকা নতুন দেশ। কালাপ্রাপ্ত ঐতিহ্যের সঙ্গো তার যোগসূত্র ফাঁগই বলা যেতে পারে। এমনকি বলা যায় মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ থেকে হঠাৎ দেশটা এক লাফে অল্ডাস হার্সলির “দি ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ডে” উপনীত হয়েছে। একদিকে পিউরিট্যান নীতিবোধ অন্যদিকে সিনেমারক এন্ড রোল-চাচা-টুইস্ট-বিক্টরিক, এই দুই দিগন্তের দোলাচলে নতুন আমেরিকার নতুন কৈশোর স্পন্দিত।

আমেরিকার সমাজজীবনের সবচেয়ে উল্লেখ্য সমস্যা হল তার দীর্ঘস্থায়ী ক্রান্তিকাল। প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই মার্কিন দেশ ক্রান্তিকালের দোলনার দুলছে। স্বাধীনতার যুদ্ধ, গৃহ-যুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং বিহিংস্বরাজনীতির সংঘাতে সে সর্বদাই বিবর্তিত। তার ওপর আছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি। কৃত্রিম গ্রহের প্রতি-যোগিতায় যুক্তরাজ্য নিয়তই অস্থির। ঠিক এই দোলাচলভূমিতে জন্ম নিচ্ছে আজকের আমেরিকার দিশেহারা কৈশোর।

তবে আধুনিক মার্কিন দেশের অকালবোধন সমস্যা আবির্ভূত হচ্ছে

ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্কে কেন্দ্র করে। স্কুলের একটি মেয়ের সত্যিকারের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে ছেলে-মহলে তার রমণীয় প্রতিপত্তির ওপরে। ছেলেদের বেলাতেও ওই একই নিয়ম। অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ সমর্থনেই কিশোরী মেয়েরা পুরুষ-বন্ধুদের সঙ্গো সিনেমা, থিয়েটার, নাচের আসর, কিংবা নেহাতই সাম্যাবহারে যায়। এই ‘বিহার’ ওদেশে একটি বিশেষ কৈশোরিক অধিকার। আমেরিকান অভিধানে এই অধিকারের প্রতিশব্দ “ডেটিং”। ডেটিংএর পসার না থাকলে যে কোনো কিশোরীকেই সমাজের অচল আধুনি হিসেবে গণ্য করা হয়। হাই স্কুলের মেধাবিনী ছাত্রীরা পর্যন্ত তাদের মেধার পরিচয় দিতে ভয় পায়, পাছে সহপাঠী ছাত্ররা তাকে “ভালো মেয়ে” বলে এড়িয়ে চলে। ছেলে-দের মত্থেও সেই একই জাতীয় সংগীত “ভালো ছেলে নইকো মোরা, ভালো ছেলে নই।”

অশুভ শোনালেও, আমেরিকার দশ বছর বয়স থেকেই মেয়েরা ছেলেদের কাছ থেকে ‘ডেট’ পেতে আরম্ভ করে। ডেটিংএর প্রাথমিক পর্ব্বারে মেয়েরা সাধারণতঃ সিনেমায়, স্কেটিংএ অথবা টেবিল-টেনিসের আসরে যায়। প্রথম পুরুষস্পর্শের সম্মুখ সে সাড়া দিলেও ডেটিংএর কিছন্ন নিজস্ব নিয়মকানুন তাকে মানতে হয়। যেমন প্রথম এবং দ্বিতীয় ডেটিংএ কোনো মেয়েই তার সহচরের ওষ্ঠবন্ধা হবে না। কারণ একেবারে প্রথম দিনের ঘনিষ্ঠতায় তার ‘নারীমহিমা’র হানি হতে পারে। অভিভাবকরা কামনা করেন তাঁদের মেয়েরা যেন একই ছেলের প্রতি আসক্তা না হয়ে বিভিন্ন ছেলের সঙ্গো ডেটিং করে। তাঁদের ধারণা, ছেলেচেনা চোখ না

থাকলে জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে পতির্নির্বাচনে পারদর্শিনী হবে না তাঁদের মেয়ে। বিয়ের কনেকে যেমন সবলে সাজানো হয় বিবাহবাসরে নিয়ে যাওয়ার আগে, আমেরিকান মা-ও তেমন মেয়েকে সাজান তার সাম্যাবহারের দিনে। পোষাকনির্বাচন নিয়ে মা মেয়েতে প্রায়ই খিটিখিটি বাঁধে। মেয়ে চায় তাকে যাতে একটু বয়সিনী দেখায়, (কারণ তখন তার বয়স মাত্র চোদ্দ!), কিন্তু জননী চায় পোষাক-পরিচ্ছদে কন্যার কৈশোর যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু যথার্থীত মেয়েকেই জিততে দিতে হয়। কাজেই আগে যৌবন আসুক না আসুক, অগাভরণে যৌবনের সুখোদয় ঘটে। হোলতে পড়লেই মেয়েরা ‘গোয়িং স্টেড’র একনিষ্ঠ রাজপথে এসে ওঠে। এই পর্ব্বারে, সে বহু থেকে একের সঙ্গিনী। ‘গোয়িং স্টেড’তে ডেটিংএর প্রণয় পরিণতি। এই পরিণতি তাকে অনেকটা স্বাধীনতা দেয়। অর্থাৎ শনিবারের রাত্রির প্রায় অনেকখানিই তার অধিকারে আসে। এই সময় থেকে সে তার পরি-মণ্ডলে আলোচনার সম্মানযোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের পত্রিকার ‘গসিপ কলামে’ গোয়িং স্টেড জুটিদের নিয়ে বিশদ আলোচনা চলে। কোন জুটি বিচ্ছিন্ন হবার মত্থে, কোন জুটি তখনো ‘ঘনীভূত’ প্রভৃতি খবর কেবল ছাত্র-ছাত্রীরাই পড়ে না, অভিভাবকরাও এই ধরনের খবর সাগ্রহে পড়েন। কারণ এই ধরনের পত্রিকা থেকেই নিজের ছেলে-মেয়েদের গতিবিধির খবর পান তারা। ‘গোয়িং স্টেড’ জুটিকে দেখলেই চেনা যায়। একই বৃত্তে দুটি ফুল হয়ে এরা ঘোরে। পোষাকে পরিচ্ছদে জুটির দুজনেই প্রায় একই রকম। একই ‘লকারে’ এদের বই থাকে। ক্রাসে এদের আসনও পাশাপাশি। এমনকি প্যারো-শ্রাইড দিয়ে চুলের রঙে পর্ব্বন্ত সমতা আনা হয়। কখনো কখনো দুজনের মধ্যে “বন্ধুত্বের” অগুরুী বিনিময়ও ঘটে। স্মৃতিচিহ্ন উপহারের প্রেরণায় একবার একটি কিশোর তার সহচরীর বাহুতে নিজের নামের আদ্যক্ষর গভীর করে ছুরি দিয়ে খোদাই করেছিল।

কিন্তু সকলেই ঠিক একমেবাদ্বিতীয়মের শেকলটা পরতে চায় না। বিশেষতঃ বাপ-মাদের প্রেরণায় বিশেষ কোথাও নিবেদিত না হয়ে সর্বপক্ষে সমান মন দেয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের যে মেয়েটি ‘মুক্ত’ থাকতে চায়, তার সহচর-



যৌবন নৃত্য

সংখ্যা চার থেকে পঞ্চাশ। তবে 'মুক্ত-কন্যা'দের 'বন্ধুদের' গড়-সংখ্যা হল দশজন। 'মুক্তপদ'রা এদিক দিয়ে কিন্তু ভাগ্যবন্ত! তাদের বান্ধবীদের গড়-সংখ্যা বেশী, পনেরোজন।

আমেরিকার ছেলেমেয়েরা কিন্তু চমকিত হাওয়ার পন্থী হয়েই শব্দ যৌবনের হাতে বড় মাপের রাখী পরায় না। ব্যক্তিগতভাবেও তারা বিশ্বাস করে যে তাদের আদরের যৌবন একেবারে অকালবোধনের আগন্তুক না। কিশোর-কিশোরীরা বড়দের যেন কোনো রকমে 'ফমা ঘেন্না' করে মেনে নেয় এবং তাদের মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জের তাকে অতীতের সামগ্রী হিসেবে তুলে রাখে। নিজেদের বড় বজায় রাখবার জন্যে ছেলেদের কিছু মূল্যও দিতে হয়। প্রথমেই তাদের স্বাবলম্বী হতে হয় ছোটবেলা থেকেই। অনেক ছেলেই ২৪ থেকে ৪০ ডলার উপার্জন করে মাসে। কিশোরীরা 'শিশু প্রহরা' (baby sitting) দিয়ে ঘন্টায় ৬০ সেন্ট পর্যন্ত উপার্জন করতে পারে। ছেলেদের প্রিয় পেশা-গুলির মধ্যে খবরের কাগজ ফেরি, গ্যারেজের মিস্ত্রিগিরি, কারখানার প্যাকেজিংএর কাজ প্রভৃতি অন্যতম। এছাড়াও অনেক ছোটকো কাজের সম্ভান রাখে তারা, যেমন ডাকবাংলা রঙ করা, প্রতিবেশীদের গ্যারেজ পরিষ্কার করা, অবজর্না বিক্রি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য উপার্জনের সমস্ত অর্থই ছেলেদের ব্যয়

হয় ডেটিংএর স্বার্থে। স্কুলের একটি ছেলেকে ছুটির পরে মজুরের মত খাটতে হয় একটা নিজস্ব গাড়ি কেনার জন্যে। কারণ গাড়ি না থাকলে প্রিয় বান্ধবীর মন অন্যের দিকে ধাবিত হতে পারেই, ডেটিংএর প্রয়োজনেও গাড়ি একটি একান্তই আবশ্যিক উপকরণ। গাড়ি কেনার জন্যে তেরো বছর বয়স থেকেই তারা টাকা জমাতে আরম্ভ করে। আমেরিকার কৈশোরদর্শনে যানহীন

যৌবনযাত্রা নুনহীন বাজনের মতই স্বাধীন। মধ্যরাত্রির চড়ুইভাতি ও লেকের ধারে নিভৃত জোৎস্না-জটলায় যাওয়ার একমাত্র সেতু, নতুন মডেলের একটি গাড়ি। আমেরিকার গাড়ির লাইসেন্সও দেয়া হয় উদার হাতে। সেখানে এগারো বছরের একটি ছেলে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্যে আবেদন করতে পারে। কিন্তু এই গাড়ির ছড়াছড়ি অন্য এক ধরনের সমস্যা ফেলেছে যুক্তরাজ্যের পথ-পুলিশদের। কিশোর চালকরা অল্পগতিতে তুষ্ট না। যে গতিতে তারা কিশোর অতিক্রম করে পথকে পেরোয় তার চেয়েও দ্রুতগতিতে। ফলে জনবহুল রাজপথেও ঘন্টায় ১৪০ মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে ইঞ্জিন ফেটে অনেক আমেরিকান কিশোর সত্যিকারের যৌবনকে অতিক্রম না করতে পেরে নিহত হয়। এবং শেষ পর্যন্ত এই গাড়ি-সমস্যার তাগিদে আমেরিকার ২৫০০ স্কুলকে ড্রাইভিং শিক্ষার ক্লাস খুলতে হয়েছে। বাবারাও ছেলেদের গাড়ি কিনতে উৎসাহ দেন, কারণ বাড়ির গাড়ির পরমায়ুটাকে কমতে দিতে তারা স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক।

আমেরিকার ব্যাপক যৌবনবন্দনার কারণ সম্ভবতঃ এই যে নিজেদের যৌবনকে আজকের প্রাপ্তবয়স্কারা বিশেষ ধরে রাখতে পারেননি। হয়ত তাই উত্তরসূরীদের আজকে জাগানো হচ্ছে যৌবনযামিনী না যেতেই। এর ফল কিন্তু মারাত্মক হতে পারে। কুশাসাচ্ছন্ন অনিশ্চয়তার মধ্যে হাঁটতে হতে পারে আজ থেকে কুড়ি বছরের পরের যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের। যৌবন যাদের কৈশোরেই করায়ত্ত, যৌবনের সমাপ্তি পেয়েছে বার্ধক্যের বারণসীতে নির্বাসিত হয়ে যেতে পারে।



কিশোরী ক্লাবে জনৈকা নতুন সভ্যার শপথ-গ্রহণ

দিনান্তের রঙ

আশাপূর্ণা
দেবী



(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইন্দ্রনীলের অভিযোগ মিথ্যা বলা যায় না। ওদের সুখ-শান্তি হরণ করছে বৈকি পাগলটা। অথচ নিজের তার সুখের অবধি নেই। খায় ঘুমোয় কথা কয় আর যখন-তখন খোলা গলায় কবিতা আবৃত্তি করে।

দ্রুত পারচারি করতে করতে কবিতা বলা সুশোভনের একটা বিশেষ ভঙ্গী। আজও সেই ভঙ্গীতে উচ্চ থেকে উচ্চ-গ্রামে সুর তুলে আবৃত্তি করছিলেন—

—বীণাতলে হানো হানো খরতর
ঝংকার ঝঞ্জনা,
তোলো উচ্চ সুর।
হৃদয় নির্মাঘাতে ঝঝরিয়া
ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।

গাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন
উধবৈগে—

অনন্ত আকাশে—
উড়ে যাক, দূরে যাক—বিবর্ণ
বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপদে নিশ্বাসে।

বিপদে নিশ্বাসে—বিপদে নিশ্বাসে—
দ্রুত পারচারি খামিয়ে সহসা কপালে হাত
ঘসলেন সুশোভন। বোবা চোখে দেও-
রালের দিকে তাকালেন। মনে আনতে
পারলেন না পরবর্তী লাইনটা কি?

হঠাৎ চাঁৎকার করে উঠলেন,
‘সুচিন্তা! সুচিন্তা!’

সুচিন্তা কাজ ফেলে এসে দাঁড়ালেন।
সুশোভন ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, ‘তার-
পর কি, সুচিন্তা?’

সুচিন্তা হেসে ফেলে বললেন, ‘কার
পর?’

‘আঃ কার পর বুঝতে পারছ না?’
সুশোভন অস্থিরভাবে বলেন, ‘ওই যেটা
আমি বলছিলাম! কি যেন বলছিলাম!
ওই যে—হ্যাঁ হ্যাঁ বিপদে নিশ্বাসে,
বিপদে নিশ্বাসে। কিন্তু তার পর?’

‘বিপদে নিশ্বাসে?’

সুচিন্তা অবাক হলেন, ‘বুঝতে
পারছি না তো?’

‘বুঝতে পারছ না? চমৎকার! দিনাজ-
পুরের বাড়ীর ছাতে আমি চেঁচিয়ে
চেঁচিয়ে মৃৎস্থ করতাম, আর তুমি হাঁ
করে শুনতে না? এখনও বল কিছই
বুঝতে পারছ না! কিছই মনে পড়ছে
না!’

সুচিন্তা বিপন্নভাবে বলেন, ‘না না,
সে সব তো মনে পড়ছে, কিন্তু কিসে
থেকে যেন মৃৎস্থ করতে—’

‘কিসে থেকে আবার! ক্রাশে ফাট’
হয়েছি বলে বাংলার মাস্টারমশাই যে
বইটা আলাদা করে নিজে থেকে উপহার
দিলেন—’

সুচিন্তা বলেন, ‘তাই বল। চরনিকা!’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ চরনিকা। কিন্তু তুমিও তো
আমার কাছ থেকে শুনো শুনো কত মৃৎস্থ
করে ফেলেছিলে, তবে বলতে পারছ না
কেন তার পরটা কি। সেই যে উড়ে যাব
দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা—’

সুচিন্তা আস্তে আস্তে থেমে থেমে
বললেন, ‘আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে
উল্লাসে—’

‘দ্যাটস রাইট!’ চেঁচিয়ে উঠলেন
সুশোভন, ‘ঠিক বলেছ। ক্রন্দনে উল্লাসে
গরজিয়া মত্ত হাহারবে।’

ঝঞ্জার মঞ্জীর বাঁধি উল্লাসিনী কাল-
বৈশাখীর নৃত্য হোক তবে!’

সুশোভন আবার দ্রুত পারচারি শব্দ
করে উদাস কণ্ঠে আবৃত্তি করতে
থাকেন,

‘ছন্দে ছন্দে পদে পদে অণ্ডলের
আবর্ত আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়।
ধূলি সম তৃণ সম, পুরাতন
বৎসরের যত
নিষ্ফল সপ্তয়।’

সুচিন্তা তখন কি কাজ করতে করতে
চলে এসেছেন, ভুলে যান, ভুলে যান এক
পরিণত বয়স্কা বিধবা মূর্তির সামনে,
এক উদভ্রান্তচিত্ত প্রোট পাগল সকালের
রোম্‌দুরের আলোয় ভরা ঘরে এই ঝংকার
তুলেছে। দেখতে পান আলসে-ভাঙা
একটা পুরনো বাড়ীর ছাতে পড়ন্ত
বিকলে একটা কিশোরী মেয়ের ‘হাঁ’ করে
চেয়ে থাকার সামনে একটি সুকুমার
কিশোর একমাথা ঝাঁকড়া-চল দুলিয়ে
এলোমেলো পায়ে ঘুরতে ঘুরতে আবৃত্তি
করে চলেছে—

‘হে নতুন এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন
পূর্ণ করি’
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—
ব্যাপ্ত করি লুপ্ত করি স্তরে স্তরে
স্তবকে স্তবকে
ঘন ঘোর স্তবকে।’

দেখতে পান সেই কিশোরী
ঝংকারের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য দেখা চির-

চেনা ছেলেটার মুখ যেন এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

ক্ষীরভাষি চন্দনপুলির ভক্ত, গাছে চড়ে ফল ফল পাড়ায় ওস্তাদ ছেলেটা যেন এক না-বোঝা জগতের হঠাৎ আলোয় অনা আর একজন হয়ে উঠেছে। তাই প্রথম দিকের মৃদু ভীরা কণ্ঠ তার ক্রমশঃ উচ্চগমে উঠে বলছে—

‘হে দুর্দম হে নিশ্চিত হে নতুন,
নিষ্ঠুর নতুন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস প্রাংশ
করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল।
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি
বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে।
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ
প্রকাশ
প্রণয় তোমারে।’

লুপ্ত হয়ে যায় সংসারের কাজ আর
কাজের সংসার। লুপ্ত হয়ে যায় দিন
রাতি সকাল সন্ধ্যার জ্ঞান, শব্দ চेतনার
মধ্যে ব্যস্ত হতে থাকে,

‘তারপর ফেলে দাও, চূর্ণ করো
বাহা ইচ্ছা তব
ভঙ্গন করো পাখা।

যেখানে নিক্ষেপ করো হুত পত্র চ্যুত
পুষ্পদল,
ছিন্ন ভিন্ন পাখা।

কণিক খেলনা তব, দরাহীন
তব দস্যুতার—
লুপ্তনাবশেষ—
সেখা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ত
তমিস্র সেই,
বিশ্মতির দেশ।

নবাত্মক ইক্ষু বনে—

‘মা।’

ডাক শুনে চমকে পিছনে তাকালেন
সুচিন্তা।

না, অন্য কেউ নয়। চাকর সুবল।
পিছন থেকে ডাকছে সমীহ সম্ভ্রমের
দূরত্ব বজায় রেখে। যা তার নীতি। যা
অনুপম কুটিরের রীতি।

আলসে-ভাঙা গাওলা-ধরা ছাত
থেকে নেমে এলেন সুচিন্তা, নেমে এলেন
দোতলার ঘরের মোজেক-করা মেজের।
ভুরু কুচকে বললেন, ‘কী চাই?’

সুবল মাথা নীচু করে বলল, ‘নীচের
তলার ছোটদা এসেছে ছোটবৌদিকে
নিরে—

ছোটদা এসেছে ছোটবৌদিকে নিরে।
এ কোন ভাষা!

সুচিন্তা কি সত্যিই চेतনার জগতে
ফিরে এসেছেন, না কল্পনার এক রাজ্য
থেকে আর এক রাজ্যে আছড়ে এসে
পড়লেন?

স্পষ্ট শব্দে পাওয়া কথা। তবু
বুঝি নিঃসন্দেহ হতে হয়, ‘কে এসেছে
নীচে?’

‘ছোটদা আর ছোটবৌদি। ইয়ে ওই
যে ওই দিকের সামনের বাড়ীর মেয়ে।’

সুচিন্তা বাধা দেন। ‘জানি। জিগোস
করণে আমায় কিছুর বলতে চায়?’

‘আজ্ঞে, উপরতলার আসছে, তাই
খবর দিতে বলল ছোটদা।’

‘খবর দেবার কি আছে? আসতে
বল।’ বলে সুচিন্তা দেয়ালের কাছে রাখা
নীচু মোড়াতী টেনে নিয়ে বসলেন।

এই ব্যাঘাতে সুশোভনের আবৃত্তি
থামল।

কাছে এসে বললেন, ‘ঘর থেকে চলে
এলে যে? বসে পড়লে যে? চরনিকা
তোমার ভাল লাগে না?’

‘লাগে বৈকি! ওমা সে কী! ভাল
লাগবে না? বসলাম পা ব্যথা করছে
বলে।’

‘পা ব্যথা করছে!’

সুশোভন ঈষৎ ব্যাকুলভাবে বলেন,
‘কেন, পা ব্যথা করছে কেন? খুব হেঁটেছ
বুঝি?’

‘না, হাটব কেন? কোথায় হাটব? তুমি
একটু শান্ত হয়ে বস তো!’

‘বসব? শান্ত হ’রে?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনি ওরা এসে পড়বে।’

‘ওরা? ওরা কারা সুচিন্তা?’

‘ওরা? ওরা—ওই যে আসছে।
আমার ছোট ছেলে আর তার বো।’

ওরা এল।

ইন্দ্রনীল আর নব-পরিণীতা বধু
কৃষ্ণা।

যে বৌকে সুচিন্তা আগে দেখেছেন।
যে শাশুড়ীকে কৃষ্ণা আগে দেখেছে।
কিন্তু মৃথোমুখি দাঁড়িয়ে ‘কী কেউ
কোনদিন বলেছে?’

না—তা বলেনি।

আজ মৃথোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে
কৃষ্ণা কথা বলবে বলে।

ইন্দ্রনীল দাঁড়িয়েছে তার পিছনে।
সত্যিই কাঁচপোকা তেলাপোকার নীতিতে
কৃষ্ণা তাকে টেনে এনেছে, না ইন্দ্রনীলেরই

ভিতরের প্রবল ইচ্ছা তাকে টানছিল অনু-
পম কুটিরের দিকে? শব্দ নিজের মনের
কাছেও সেটা স্বীকার করতে নারাজ
বলেই আত্মসমর্পণের ভঙ্গী দেখিয়ে
কৃষ্ণার পিছন পিছন নিজের বাড়ীতে এসে
চুকেছে সে?

সালস্কারা সুসজ্জিতা কৃষ্ণা নীচু হয়ে
সুচিন্তাকে নমস্কার করল, আর একবার
বাঁকা কটাক্ষে তাকিয়ে দেখল সেই
মানুষটার দিকে। যে মানুষটা সুচিন্তার
পিছন দিকের ঘরের দরজায় বিহ্বল
দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

না, বোঁ-মুখ দেখতে সুচিন্তা
তাড়াতাড়ি সোনা খুঁজতে বাস্ক-আলমারী
খুলতে উঠলেন না! শব্দ বোয়ের
মাথায় একটু মৃদু করস্পর্শ দিয়ে দৃঢ়
স্বরে বললেন, ‘একজন গুরুজনকে প্রণাম
করবার সময় সামনে আর কোন গুরুজন
উপস্থিত থাকলে তাঁকেও প্রণাম করতে
হয় বোঁমা।’

কৃষ্ণা তার এক হাতের মোটা বালাটা
আর এক হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে বেশ
স্পষ্ট গলাতেই বলল, ‘আর গুরুজন
কে?’

সুচিন্তা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে
ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলেন, ‘সুশোভন, এদিকে
একটু সরে এসো তো। বোঁমা প্রণাম
করবে। দেখতে পাচ্ছে না তোমায়।’

‘বোঁমা’ শব্দটা বোধগম্য না হলেও
‘এদিকে এস’ কথাটা বুঝতে পারলেন
সুশোভন, এগিয়ে এলেন।

কিন্তু কৃষ্ণা এ পরিস্থিতি গায়ে
মাখল না। বরং সোজা খাড়া দাঁড়িয়ে
থেকেই প্রশ্ন করল, ‘উনি কে?’

সুচিন্তা এবার ছেলের দিকে
তাকালেন। তাকিয়ে প্রায় হেসে উঠে
বললেন, ‘বাড়ীতে কে আছেন না আছেন,
কার সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়,
এসব কথা যে বাসরঘরেই বৌকে শিখিয়ে
আনতে হয় রে ইন্দ্র, তুই এই এক মাস
ধরে কি তবে করলি?’

বলা বাহুল্য ইন্দ্রনীল নির্বাক।
উত্তর দিল কৃষ্ণাই।

বলল, ‘বাড়ীতে আমার দুই ভাসুর
আর আপনি ছাড়া আর তো কারও থাক-
বার কথা নয় মা। শুনোই আর এদের
কেউ নেই।’

সুচিন্তা সহসা রীতিমত খোলা
গলায় হেসে উঠে বললেন, ‘শোনা কথা
যে কত সময় কত ভুলই হয় বোঁমা।
আমিও তো শুনছিলাম ইন্দ্র বড় ঘরে

—কিন্তু থাক সে কথা। সুশোভন, তুমি ঘরে গিয়ে বোসো।’

সুশোভন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। ত ডাড়াড়ি ঘরে ঢুকে গিয়ে খাটের উপর রসে পড়েন।

কৃষ্ণা সুচিন্তার অর্ধসমাপ্ত কথার অপমান গিয়ে না মেখে এবার বলে, ‘আপনি তো কই আমাদের একটু বসতে বললেন না।’

সুচিন্তা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, ‘এই দেখ কান্ড! তোমাদের আবার বলবো কি? নিজেদের ঘর নিজেরদের জায়গা, বসতে বলবার অপেক্ষা রাখবে না কি তোমরা? কিরে ইন্দু, তোকে আবার ‘আসুন বসুন’ বলে আপ্যায়ন করতে হবে না কি?’

ছেলেদের মধ্যে এক ইন্দুনীলকেই সুচিন্তা মাঝে মাঝে ‘তুই’ বলতেন, কিন্তু মায়ের এমন পরিহাস তরল কৌতুক-কণ্ঠ কবে শুনছে ইন্দুনীল? ঠিক এই ধরনটার জন্যে কি সে প্রস্তুত ছিল?

একটু যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ে সে। কাজেই কথা কৃষ্ণাই বলে।

‘তবু আপনিই যখন বাড়ীর বড়, আপনার একটা অনুমতি চাই বৈকি। আর নিজে থেকে যখন আপনি বলবেন না, তখন আমাকেই বলতে হচ্ছে, কাল থেকে এখানে এসে থাকবো আমরা।’

সুচিন্তা স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তাকেই উদ্দেশ্য করে ফের হেসে উঠে বলেন, ‘বিয়ে হলে বৌকে লোকে গহনা-টহনা উপহার দেয় শুনছি, তা তুই বাকি পয়সার অভাবে অন্য জিনিসের বদলে নিজের বাকশক্তিটাই বৌকে উপহার দিয়ে বসে আছিস ইন্দু? তোরা কথা-গুলোও এবার থেকে ওর কাছ থেকেই শুনতে হবে।’

ইন্দুর ফর্সা মুখটা এবার লাল হয়ে ওঠে।

তবু মুখ তুলে বলে, ‘না, আমিই বলাছি, কাল হোক পশু হোক কি দু-পাচ দিন পরেই হোক, এখানে আসবো আমরা, থাকতেই আসবো। শূন্য বাড়ীটা আমাদের থাকবার উপযুক্ত করতে হবে।’

সুচিন্তা বলেন, ‘সে উপযুক্তটা কি, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না ইন্দু? তোমার ঘর যেমন ছিল তেমনই আছে, ইচ্ছেমত সাজিয়ে গুঁছিয়ে তুমিই নেবে।’

‘সাজানো গোছানোর কথা হচ্ছে না—’ ইন্দুনীল অসহিষ্ণু ভাবে বলে, ‘স্বাভাবিক অবস্থার কথা হচ্ছে। নীতার খবর আমি

শুনছি, খুব শীগগিরই সে দেশে ফিরে আসছে, ওদের দিল্লীর বাড়ীতেই উঠছে। এবার অনারাসেই ওকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।’

‘ওকে’ শব্দটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুশোভনের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বক্তব্য স্পষ্ট করে তোলে ইন্দুনীল।

সুচিন্তা কণ্ঠে কিনা, অথবা কত-কণ্ঠে, তা’ ঠিক বোঝা যায় না, তবে আশ্ব-সংবরণ করেন। করে সহজ গলাতেই বলেন, ‘মানুষ তো আর বাস্তব বিছানা বাসনপত্র নয় ইন্দু, যে তাকে সরিয়ে নিড়িয়ে ঘরের জায়গা বার করা যায়? তার অংক আলাদা।’

ইন্দু ভাবে খুব বোকামী হয়েছে তার একেবারে বৌকে সঙ্গে নিয়ে এবাড়ী ঢোকা। আগে একা নিজে এসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা উচিত ছিল। তবু সুচিন্তার এই স্পষ্ট দৃষ্টিসাহস তাকে প্রায় হতবাক করে ফেলেছে।

কৃষ্ণার সামনে সুশোভন সম্পর্কে এত স্পষ্ট আর প্রখর হবেন সুচিন্তা, এটা ইন্দুনীলের ধারণা ছিল না।

কিন্তু কৃষ্ণাকে না আনলে তার বক্তব্য তো অনুচ্চারিতই থাকতো। ইন্দুনীল কি পারতো মায়ের সঙ্গে এত কথা চালাতে। যদিও কৃষ্ণার চটপটে কথায় অস্বস্তি একটু হচ্ছে তার, তবু মনে করছে কৃষ্ণার আগ্রহে আর চেষ্টায় যদি এবাড়ীতে থাকার ব্যবস্থাটা হয়ে যায় তো বাঁচা যায়। সত্যি, পুরুষ হয়ে পাড়ার মধ্যে শ্বশুরবাড়ীতে বাস করার মত লজ্জা আর কি আছে? যতই কৃষ্ণার মা বলুন, ‘তোমরা ছাড়া আমাদের আর কে আছে’ তবু মন সার দেয় না। আর কৃষ্ণারও তো বিষম জেদ চেপেছে অনুপম কুটিরের বাস করবার।

জেদের পিছনে যে মনোভাবই কাজ করুক, জেদটা ইন্দুনীলের অনুকূল।

কিন্তু জেদের সঙ্গে সঙ্গে যে তার কঠোর শর্তটা সব বানচাল করে দিচ্ছে।

সুশোভন থাকতে কৃষ্ণা এ বাড়ীতে বাস করতে আসবে না।

কৃষ্ণার মাও বলেছেন, ‘না বাপু না। আমার ওই সবেধন নীলমণি একটা মাস্তুর মেয়েকে আমি ‘পাগল ছাগলের’ বাড়ীতে পাঠাতে পারব না। তাকে আগে বিদায় কর, তবে আমার মেয়েকে নিয়ে যাবার কথা মুখে এনো।’

ইন্দুনীল অবশ্য সে কথার উত্তরে বলেছিল। ‘নিশ্চয় যাবার কথা মুখে আমি আনিনি। আপনার সবেধন নীলমণিই যাবার জন্যে অস্থির।’

কৃষ্ণার মা বিরস মুখে বলেছিলেন, ‘তা’ অস্থির হবে বৈকি। কথ্যেই আছে মেয়েসন্তান নিষ্পরের মাটিতে গড়া। গোত্রান্তর করার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরের বন্ধন আপনি কেটে যায়। তবে পরে পসতাতে হবে তাকে, এ তো দিব্য-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।’

মেয়ের কাছে অবশ্য নিভুতে অন্য কথা বলেন তিনি। বলেন, ‘শাশুড়ীর স্বভাব ভাল নয়’ এর চাইতে মম্মার কথা আর কী আছে? যেমন করে পারিস একেবারে শেকড় উপড়ে ফেলগে যা। আর কোথাও জায়গা নেই? থাকুন না গিয়ে তিনি সেখানে। এতখানি ব্যয়স হয়েছে, বড় বড় ছেলেরা। একটু লজ্জা-শরমও নেই ছিঃ। আর তোকেও বলি, বেছে বেছে বিয়ে করবার আর ঘর পেলি না? দেখে-ছিলি তো আগে ওদের রকম সকম।’

কৃষ্ণা বেজার মুখে বলেছিল, ‘আগে অত কি করে জানবো? নীতাদির বাবা, অসুস্থ হয়ে কলকাতার এসেছেন চিকিৎসা করতে, এই জানতাম।’

‘তা’ সেই নীতাদিটি ওদের কে, কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক, সে কথা কোন দিন ভেবেছিলি?’

‘অত কে ভাবতে গেছে? কেউ না কেউ হবেই তাই জানা। বলতো তো পিসিমা।’

‘তোমার মত বিশ্ববোকা আর ভুভারতে কে আছে? আর ওই তোমার নীতাদিটি? সোজা চালাক নয়। একটা ছুতো করে দিবা কেটে পড়ল পাগল বাপটাকে এদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে। যাক, তুমি যদি না পারো, আমাকেই চেষ্টা করতে হবে। পাড়ায় তো মুখ দেখাতে পারছি না। শুনছি না কি পোষা কুকুরের মত সকালে লেকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় পোষা পাগলটাকে, নেহাৎ চেন ধরে নয় এই পর্যন্ত। ছি ছি।’

মেয়ের সঙ্গে কথার ব্যাপারে রসনাকে যে কিছু সংযত করা শোভন, রাগের চোটে সে আর মনে থাকে না কৃষ্ণার মার। কৃষ্ণাও নির্বিকারে শুনেন যায়, এবং তত্ত্বপূর্ণ স্থির সংকল্প করে ইন্দুনীলকে ধরে-বেঁধে এসে হাজির হয়েছে।

সুচিন্তা মানুষকে বাস্তব বিছানার সঙ্গে তুলনা করে আলাদা অংকর হিসেব দেখাতে কৃষ্ণা আরম্ভ মুখে বলে ওঠে, ‘তাহলে বুঝতে হবে আপনি চান না যে আমরা এখানে এসে থাকি?’

সুচিন্তা এবার ছেলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বোয়ের দিকেই তাকিয়ে বলেন, ‘তোমরা যদি ভুল বুঝতে চাও, আমার আর করবার কি আছে বল? শূন্য এইটুকুই বলতে পারি, তোমরা তোমাদের ঘরে এসে থাকতে ইচ্ছে করছ

শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে বললে মিথ্যা বলা হবে না।’

কৃষ্ণা জেদের সুরে বলে, ‘সত্যি বলেই বা বুঝবো কি করে বলুন? আমার মা বলেছেন বাড়ীতে কোনও বাইরের লোক থাকলে আমাকে পাঠাবেন না—’

‘তোমার মা কী বলেছেন না বলেছেন তা’ শোনবার দরকার আমার নেই বোমা’, সুচিন্তা নিষ্কম্প দৃষ্টিতে বলেন, ‘যারা সত্যি বাইরের লোক, তাদের কথায় কান দিতে পারি এত সময়ও আমার নেই।’

সহসা ইন্দ্রনীল বলে ওঠে, ‘তার মানে আমরা থাকি বা না থাকি তোমার কিছুই এসে যায় না। তা’ দেখলাম তো মেজদার ব্যাপারে—’

সুচিন্তা মৃদু গম্ভীর স্বরে বলেন, ‘আর কারো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই ইন্দ্র, তোমার নিজের কথাই বল।’

‘আমার আর কথা কি!’ ইন্দ্রজিত ঠোট কামড়ে বলে, ‘উনি চিরদিন এ বাড়ীতে থেকে যাবেন এমন ধারণা ছিল না বলেই, বাস্বাভাবিক তাই বলতে এসেছিলাম, কিন্তু সেটা এখন সম্ভব নয়—’

‘চিরকালের হিসেব এত চট করে করতে বসা ঠিক নয় ইন্দ্র, তবে একটা অসহায় মানুষের উপস্থিতিতে যদি তোমরা ইচ্ছে করে সমস্যার কোঠায় তোলো, তাহলে সে সমস্যার সমাধান করা আমার পক্ষে সত্যিই সম্ভব নয়।’

কৃষ্ণা বোধ করি নিজের মার কাছে মথুরাকার কথা চিন্তা করেই মোক্ষম কামড়টা দিয়ে বসে। বলে, ‘এবাড়ীর ওপর তাহলে আপনার ছেলের কোন অধিকার নেই?’

সুচিন্তার মনে হয় পায়ের তল্লার মেজেটা সরে যাচ্ছে, তিনি কোন গহবরে তলিয়ে যাচ্ছেন। একসঙ্গে এত কথা তিনি কবে বলেছেন? আর এই কি তাঁর প্রতিপক্ষ? ওই বিশ-বাইশ বছরের মেয়েটার সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করছেন তিনি?

কিন্তু উপায় কি? শুষ্টের খুঁটটা কে রোধ করতে পারে?

আর শুষ্টের সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রেখেই বা কে চলতে পারে?

তাই সমস্ত মুখটা সুচিন্তার কঠিন পাখরের মত হয়ে ওঠে।

সেই পাখরে মুখে স্পষ্ট উচ্চারণ করেন, ‘অধিকার দু’ রকম আছে বোমা! মানুষের আইনে অধিকার আছে বৈকি,

ঘোল আনা অধিকার-ই আছে। তবে যদি আদালতের আইন হাতড়াতে চাও তো বলতেই হয় অধিকার নেই। কারণ বাড়ীর মালিক হিসেবে নাম আছে আমার।’

চমকে ওঠে ইন্দ্রনীল। কই একথা তো তার জানা ছিল না।

ছাইয়ের মত মুখটা হয়ে যায় কৃষ্ণার। কই একথা তো বলেনি ইন্দ্রনীল।

‘ঠিক আছে। এটা জানতাম না।’ বলে ইন্দ্রনীল তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। কৃষ্ণা সঙ্গে সঙ্গে নামে না।

সিঁড়ির নীচে, তবু সুচিন্তা সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ওরা সুচিন্তাকে কি বলে গেল সুচিন্তা কি বললেন ওদের, সে কথা মনে পড়ছে না সুচিন্তার, সুচিন্তার স্মৃতি বুদ্ধিবৃত্তির উপর যেন একটা জরি আঁচল এসে পড়ে সবকিছু ঢেকে দিচ্ছে।

ওই আঁচল নয় বিদ্যুতের চকিত দীপ্তি! আগুনের স্থির দাহ! সুচিন্তা ‘শক’ খেয়েছেন। সুচিন্তা পড়ে যাচ্ছেন।



‘চিরকালের হিসেব এত চট করে করতে বসা ঠিক না.....’

নামে না বোধ করি শেষ হুঁলটুকু বিধিয়ে ধাবে বলে। এই কথাটা বলে সিঁড়ির দিকে এগোয় সে, ‘হ্যাঁ জানা থাকলে আপনাকে ডিসটার্ব করতে আসতাম না। বাড়ী এখন আপনার নামে, তখন অবশ্যই থাকে ইচ্ছে রাখতে পারেন, থাকে ইচ্ছে তাড়িয়ে দিতে পারেন।’

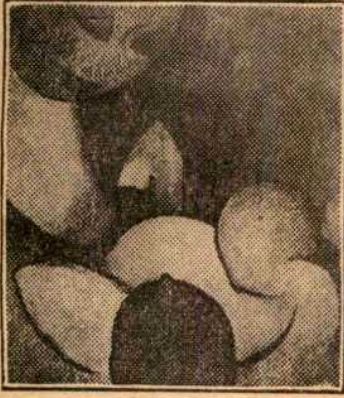
সুচিন্তার ছোট ছেলের বোয়ের শাড়ীর জরি-ঢালা আঁচলটা মিলিয়ে যায়

কিন্তু যদি ওই জরির আঁচল সুচিন্তাকে পুড়িয়ে দেবার মতলব নিন না আসতো! যদি শুষ্ট অনুপম কুটিরে ছোট ছেলে অনুপম কুটিরে এ দাঁড়াতো?

সুচিন্তা কি তার চলে যাবার সা অনুপম কুটিরের গাম্ভীর্যের প্রতি ভেঙে ছুটে গিয়ে আটকাতেন তবে বলতেন, যাবি? কই বা দিকিন? দে কেমন পারিস! (ক্রেমশ)

॥ চিত্রকলার দুটি প্রদর্শনী ॥

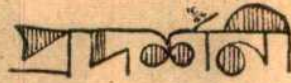
ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে কলকাতায় দুটি একক প্রদর্শনীর আয়োজন করে- ছিলেন শিল্পী শ্রীসত্যেন ঘোষাল ও শ্রীসমর ভৌমিক। শিল্পী শ্রীসত্যেন



শিল্পী : সত্যেন ঘোষাল

ঘোষালের প্রদর্শনীটি উন্মোচন করা হয় পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট হাউসে এবং ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে অনুষ্ঠিত হয় শিল্পী শ্রীসমর ভৌমিকের প্রদর্শনীটি। বলা বাহুল্য, এ-বছরের অঙ্গন চিত্র-প্রদর্শনীর মধ্যে এই প্রদর্শনী দুটি কলারসিকদের মনকে নানা কারণে আকর্ষণ করেছে।

এ-বছরের প্রদর্শনীগুলির মধ্যে দু'একটি ব্যতিক্রম ভিন্ন অধিকাংশ শিল্পীর

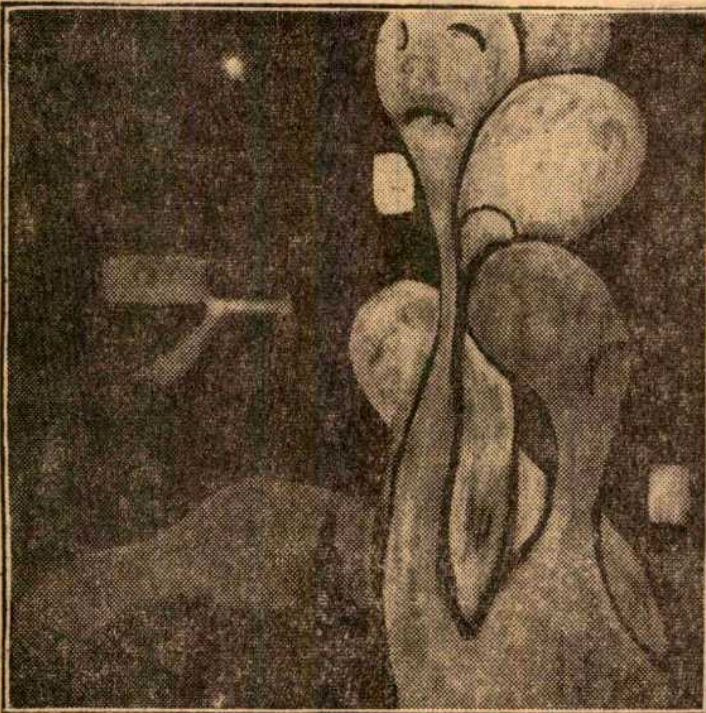


কলারসিক

রচনায় আমরা দেখতে পেয়েছিলাম এক ক্লান্তিকর একঘেয়েমীর পুনরাবৃত্তি। বিমূর্ত শিল্পের নামে প্রায় অধিকাংশ শিল্পীই শিল্পের ব্যাকরণবর্জিত জ্যামিতিক প্যাটার্ন কিংবা অন্য কোনো উপায়ে চিত্র-রচনা করে আমাদের মনে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিলেন। এবং আরো একটি বস্তুকে প্রায় অধিকাংশ শিল্পীই পরিত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র সন্দিগ্ধ করেননি। সেটি হল, ভারতীয় চিত্র-কলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে চিত্র-সৃষ্টির জন্য সচেতন হওয়া। আলোচ্য প্রদর্শনী দুটি সেদিক থেকে আমাদের ক্ষোভকে কিঞ্চিৎ প্রশমিত করেছে।

॥ শিল্পী সত্যেন ঘোষালের প্রদর্শনী ॥

শিল্পী সত্যেন ঘোষাল আর্টিস্ট হাউসে যে ২৭ খানি চিত্র নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন তা দেখে তথাকথিত বিমূর্ত শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট পার্থক্য বুদ্ধিতে এতটুকু কণ্ট হয় না। আধুনিক ধারার এই চিত্র-রচনা পশ্চাতে শিল্পী ঘোষালের যে-মন দীর্ঘ-কাল কাজ করেছে, এই ধারায় উত্তরণের



জীবন-মৃত্যু

শিল্পী : সত্যেন ঘোষাল

পথে তাঁকে যে ধাপগুলি অতিক্রম করতে হয়েছে, তারও কিছু নিদর্শন দিয়ে তিনি সজ্জিত করেছিলেন অন্য একটি ঘর। এই ঘরের প্রতিকৃতি ও নিঃসঙ্গ চিত্র-গুলির মধ্যে তাঁর ভারতীয় মনকে অন-



আশায় আশায় শিল্পী : সমর ভৌমিক

ভব করা যায়। পরবর্তী কালে এই ভারতীয় মন নতুন উপাদান সংগ্রহ করেছে ইউরোপের আধুনিক চিত্র-কলার রীতিনীতি থেকে। ফলে, তাঁর প্রদর্শিত ২৭ খানি চিত্র আধুনিক হয়েও ভারতীয়। তাঁর চিত্র-সংস্থাপন, ছন্দিত রেখা, উজ্জ্বল বর্ণপ্রয়োগ ও সর্ববিষয়ে সুন্দর পরিমিতবোধ আমাদের মুগ্ধ করেছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি যেমন আধুনিক এবং সচেতন, আত্মকেও ঠিক তেমনি তিনি দক্ষ ও বোধগম্য। অর্থাৎ তাঁর সমগ্র রচনা দর্শনান্তে আমরা যেমন বাস্তবকে উপলব্ধি করতে পারি, তেমনি বাস্তবের উদ্দেশ্য বাস্তবোত্তর শিল্প-কল্পনায় আমাদের মনকেও পারি প্রসারিত করে দিতে। এই ঘর শিল্প-সাধনার ফলশ্রুতি নিঃসন্দেহে তিনি শক্তিশালী শিল্পী। শিল্পী শ্রীসত্যেন ঘোষালের মধ্যে আমরা এই শক্তিমন্ডার পরিচয় পেয়ে সত্যি খুশী।

এই প্রদর্শনীর 'ডে-ড্রিমস' (১) চিত্রে নারী যেখানে তার স্বপ্নের জাল বুনছে সেখানে শিল্পী রেখা আর রঙের প্রাণবন্ত রূপ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। 'লাভ এন্ড কনফ্লিক্ট' (৮) চিত্রের চমৎকার কম্পোজিশন, 'মেমোরিস অফ ইয়থ' (১১) চিত্রের সুখ-স্মৃতি, 'মেমোরিস' (১৮) চিত্রের সৃষ্টান্তিত সুন্দর রেখা-বিন্যাস,—সত্যি মনে রাখার মত। এ-ছাড়া তাঁর জ্যামিতিক প্যাটার্নে রচিত 'টয়লেট' (১৩), 'লাইফ এন্ড ডেথ' (২৪) এর কালো পশ্চাৎপটে ধূসর,

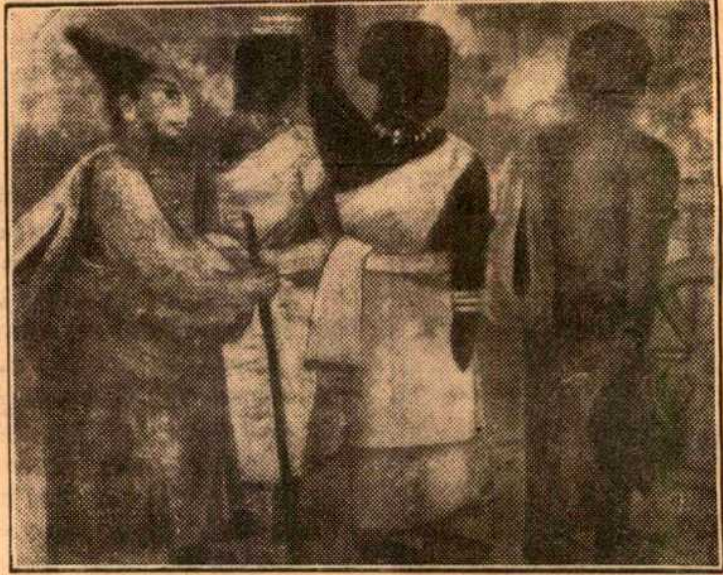
সবুজ আর হলুদের বাজনাযময় বর্ণ,
'ভিক্টরী' (২৬) চিত্রে জয়ের উল্লাসে মাথা
উঁচু করা মানুষের কল্পনা নিঃসন্দেহে
উল্লেখযোগ্য চিত্র।

সন্তোষবাবুর এই আধুনিকতা
আমরা সানন্দে গ্রহণ করছি। শিল্পী
হিসাবে তার বলার মত বক্তব্য আছে, আর
আছে সেই বক্তব্যকে শিল্পের ভাষায় তুলে
ধরার ক্ষমতা। সুতরাং ভবিষ্যতে তার
কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পাবো
বলে প্রত্যাশা করি। সরকারী চারু ও
কলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সপক্ষে
তিনি যেন আমাদের কথাও মনে রাখেন।
আমরা তাকে অভিনন্দিত করছি।

॥ শিল্পী সমর ভৌমিকের প্রদর্শনী ॥

বহুদিন পরে খাঁটি ভারতীয় চিত্র-
রীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটলো
শিল্পী শ্রীসমর ভৌমিকের 'প্রদর্শনীতে'
উপস্থিত হয়ে। পূর্বেই বলেছি ইদানীং
তরুণ শিল্পীরা এ-পথ প্রায় বর্জন কবে-
ছেন। সমরবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি
আমাদের সেই চিরপরিচিত রূপকে নতুন
করে আঙ্গাধন করালেন।

শিল্পী সমর ভৌমিকের এই
প্রদর্শনীতে মোট চিত্র ছিল ৩২ খানি।



বাজারের পথে

শিল্পী : সমর ভৌমিক

এর কয়েকখানিতে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব
লক্ষ্য করিছি। 'ঘোবনে রবীন্দ্রনাথ' (১৮)
প্রতিকৃতি চিত্রখানি অবনীন্দ্রনাথের

বিখ্যাত একখানি চিত্রকে স্মরণ করিয়ে
দেয়। তেমনি মুঘল রাজপুত্র চিত্রকলার
অনুসরণে রচিত 'ধ্যানস্থ' (৪) ও 'উত্তর
মেষ' (৬) চিত্র দু'খানি সুক্ষ্ম রেখা ও
মনোরম রঙে আমাদের মুগ্ধ করেছে।
'কবরে' (১৭) চিত্রখানিতে মুঘল
মিনিয়চার চিত্রের সৌন্দর্য বিধৃত
হয়েছে। এইভাবে ভারতীয় চিত্রের
ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে শ্রীসমর ভৌমিক
বর্তমান বিমূর্ত চিত্রকলার গভীরাকা
স্রোত থেকে আত্মরক্ষা করায় আমরা
আনন্দিত।

চৈনিক শিল্পরীতিতে সিল্কের উপর
রচিত তার 'হুউ-য়েন-সান্ড' (৫) ও 'মণি-
কণিকা' (২৮) সুন্দর রেখা আর রঙে
এই প্রদর্শনীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য
রচনারূপে উপস্থিত হয়েছে। তার
অন্যান্য রচনার মধ্যে 'সহানুভূতি' (১৩)
সোজা বলিষ্ঠ রেখার লৌকিক শিল্প-
স্মৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন। গ্রাফিক
চিত্রকলার মধ্যে 'জাহাজঘাটা' (২৩)
আমাদের ভাল লেগেছে। নিঃসঙ্গ চিত্রের
মধ্যে 'নদীর গতিপথ' (২১) ও 'পাহাড়'
(৩০) উৎকৃষ্ট রচনা। 'বাজারের পথে'
(৩১) ওয়াশ পদ্ধতির একটি চমৎকার
নিদর্শন।

শিল্পী সমর ভৌমিকের অধিকাংশই
টেম্পারার কাজ। এই মাধ্যমে শিল্পীর
দক্ষতা অনস্বীকার্য। এই প্রদর্শনীতে
কয়েকখানি মামুলী ধরণের চিত্রও আছে।
আশাকরি এই তরুণ শিল্পী ভারতীয়
চিত্র-কলার সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে তার
নতুন চিন্তাভাবনা সংযোগ করে
ভবিষ্যতে আমাদের আরো সুন্দর চিত্র
উপহার দেবেন। আমরা শিল্পীর উজ্জ্বল
ভবিষ্যৎ কামনা করি।

সাজসজ্জার বৈশিষ্ট্য

ভারতের সকল প্রদেশের

হাতের তাঁতের

রেশম ও সুতার অনূপম বস্ত্রসম্ভার
আপনার সাজসজ্জা ও গৃহসজ্জাকে
মনোজ্ঞ করে তুলবে।

নানা ডিজাইনের শাড়ী, ব্লাউজপীস, সার্ট
ও সুটের কাপড়, টাই, তোয়ালে, পর্দা
প্রভৃতি সবকিছুই এখানে সত্যি সুলভে
পাবেন।

॥ নিজে এসে পছন্দ করুন খুশী হবেন ॥

হ্যাণ্ডলুম হাউস

২, লিঙ্ডেস স্ট্রীট, কলিকাতা

পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র : ৩এ, গার্ডিন স্ট্রীট, কলিকাতা

আকুতি



কৃষ্ণা
দাম

আনন্দ রত্ন দুজনেই বাড়ী ছিল না। সাধারণতঃ স্কুলের ছুটি কিংবা শনি-রবির বন্ধ থাকলে ওরা মামাবাড়ী বেড়াতে যায়—কালও গিয়েছে!

কিন্তু ওরা বাড়ী না থাকলে নন্দার হয় সব চাইতে বড় মৃস্কল। মনে হয় হাতে যেন কোন কাজ নেই। একটা কাজ দশবার গুঁছিয়ে সেরে, সারা বাড়ীর তদারকী করে, বাতগ্রস্ত শাশুড়ীর হাত-পায়ের গিঁটে বাতের মালিশ লাগিয়েও প্রচুর অবসরের যেন কুল-কিনারা পায় না।

আজও ঠিক সেই অবস্থায় পড়ে-ছিল। হাতে কাজ-কর্ম না থাকায় ভাবছিল ছেলেমেয়ে দুটোকে আর এভাবে কোথাও পাঠাবে না। পাঠান উচিত নয়—ওরা থাকলে বুঝতে পারে না—কিন্তু না থাকলে মর্মে মর্মে টের পায়—ঐ ক্ষুদ্র শিশু দুটি ছাড়া নন্দার জীবন আজ অচল। শৃঙ্খল কর্মহীনতার জন্যই নয়—মনে হয় সমস্ত কিছুর জন্য, এমন কি পাপ-পুণ্য ধর্মধর্ম—তার জন্যও অচল!—মনে হয়।

আর এই ধরনের একটা নিঃসঙ্গ মনোবৃত্তি নিয়ে আজও নন্দা দূরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় পুরোন ঝি নেত্যা এসে ডাকলো—বৌদি শোন, তোমায় কে একজন ডাকছে।

—আমায়? কেউ আসার নামে চকিত হল নন্দা। কোন একটা চেনা-জানা মানুষ এলে মূখের দুটো কথা বলা যায়। সাগ্রহে বললো—কে রে? কে এসেছে?

—কি জানি বাপু! কোনদিন তো দেখিনি এর আগে। খুব লম্বা চওড়া সুন্দর চেহারার মানুষ, তুমি এস না, বাইরের ঘরে বসতে দিয়েছি।

লম্বা চওড়া সুন্দর চেহারা শুনে ভাবতে হল নন্দাকে। কে হতে পারে মানুষটা? বাপেরবাড়ীর কেউ? মতি মামা, হরি দাদা কি কালু জ্যাঠা? এদের সবাইকেই সুন্দর দেখতে! কিন্তু এরা হলে তো নেত্যর না চেনার কিছুর নয়।

চিন্তিত নন্দা বললো—আচ্ছা, আমি দেখছি। তুমি মায়েস কাছের যাও! উনি ডাকছিলেন একটু আগে—দেখ কি বলছেন। আমি যাচ্ছি—

শাশুড়ীকে দেখা-শোনার কথা জানিয়ে দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এল নন্দা। নিচের তলায় কেউ নেই। চিরদিনের নিজের বাড়ী অবনীশের মৃত্যুর পর সে নিজের নতুন আরও বেড়েছে। অরিশ্য পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বলতে যা কিছু, অবনীশ বেঁচে থাকতেই কমতে শুরু করেছিল—মৃত্যুর

পর সম্পূর্ণ এবং সেই জীবনযাত্রাতেই অভ্যস্ত নন্দাদের মধ্যে সুন্দর মানুষ আবার কে আসতে গেলো—অনেক ভেবেও বুঝে পেল না।

কিন্তু তখন না বুঝুক—বাইরের ঘরে এসে হতবাক হতে হল নন্দাকে। বাপেরবাড়ী শব্দরবাড়ী মিলিয়ে সমস্ত নামের তালিকার মধ্যে যার নাম মনে পড়েন—এ সেই লোক!

বিস্ময়ের একটা প্রচণ্ড আবেগে সমস্ত শরীরটা যেন ঝাঁক দিয়ে উঠলো নন্দার। মাথার ঘোমটা খসে গিয়েছে। আগন্তুক মানুষটি এতক্ষণ দেয়ালের ছবিগুলো দেখাছিল, পায়ের শব্দ পেতে প্রসন্ন হেসে সামনে এসে দাঁড়াল!—চিনতে পারিনি তো?

—চিনতে তো পারার কথা নয়। কিন্তু তুমি কি করে এলে?

—যেমন করে আসে। অশোক শান্ত ভাবে হাসলো। বললো—অনেক দিন ধরে তোমার কাছে আসতে চেয়েছি, কিন্তু একটা সংকোচ—তুমি কিছুর ভাবতে পার—এই সব ভেবে আমি আসতে গিয়েও আসতে পারিনি। তুমি ভাল আছ?

—চলে যাচ্ছে কোন রকমে।

কথাগুলো বলতে গিয়ে দেখলো গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। শৃঙ্খল তাই নয় সামনে দাঁড়ান মানুষটির দিকে মাথা তুলে তাকাবার অবাধ ক্ষমতা নেই। বুঝলো এতদিন ধরে যার ছবি মনের মধ্যে মুছে গিয়েছে বলে জানতো—দীর্ঘদিন পর দেখছে সে ছবি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নিজেকে সংযত করে সহজ হয়ে

দাঁড়াল নন্দা। জানতে চাইলো,—তুমি কেমন আছ?

—আমারও চলে যাচ্ছে!

—চলে যাচ্ছে না ছাই! অশোকের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সম্মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে আনলো নন্দা। বললো—আগের চাইতে তুমি কত রোগা হয়ে গিয়েছে।

অশোক হেসে ফেললো। বললো—রোগা হব না, চিরদিন মোটা থাকবো। বয়েস হচ্ছে না!

কথাবার্তা, চোখের দৃষ্টি, গলার দ্বার সবটুকুই সেই আগের মত শান্ত স্নেহশীতল—একদিন যা হৃদয়ের দুকুল উজাড় করে ধরেছিল। অশোক আবার বললো—আমি একটা কথা বলবো?

—বল।

—তুমি কিন্তু ঠিক সেই আগের মত সুন্দর আছ।

এক বলক উষ্ণ রক্ত সমস্ত মূখে ছাড়িয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি মৃদু নীচু করলো নন্দা। বললো—কি যে বল তার ঠিক নেই, যত রাজ্যের বাজে কথা। এস, বাড়ীর মধ্যে এস? কতদিন পর দেখলাম তোমার—অন্তত এক কাপ চা খেয়ে যাও।

অশোককে ঘরে বাসিয়ে চায়ের যোগাড় করতে যেতে হল। রান্নাঘরে নেতা খুব দ্রুতহাতে কাজ করে বেড়াচ্ছে—নন্দাকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসতে দেখে বললো,—লোকটা কে গা বোঁদি?

বিস্ত্র হল নন্দা—বাপের বাড়ীর লোক।

—বাপের বাড়ীর লোক? কৈ বাপ, কোনদিন তো দেখিনে।

এবার ধমক দিল নন্দা—তুমি অনেককেই দেখনি। আমার বাপের বাড়ীর কতজনকে তুমি চেন, জান? তা ছাড়া উনি কখনও আসেননি! ছোটবেলায় উনি আমার পড়িয়েছেন!

—মাষ্টার। নেতাকালীর চোখে এত ক্ষণে সন্দেহের ছায়া বিকর্মিকরে উঠলো।—তাই বল, ঐ জন্যে তেনাকে কখনও দেখিনে।

দাসীর দৃষ্টিসাহসে সমস্ত শরীরটা জ্বলে উঠলো নন্দার। বললো—তুমি

কাকে জেতেছ না দেখেছে সে হিসেব দিতে হবে না। তুমি এখন বাইরে যাও—যা কাজকর্ম আছে দেখে-শুনে করগে, যাও—

কিন্তু নেতাকালীকে ধমকে সরালেও মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বিচিত্র দুর্বলতা অস্থির ভারাক্রান্ত করে তুলতে লাগলো। কিশোরীর সলজ্জ কুণ্ডা নন্দার মনের আগল-ছাড়া রাশকে বার বার টেনে ধরতে চায়? আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে বারো বছর আগের সমস্ত জীবনটা যেন ছান্নাছবির মত চোখের সামনে ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগলো।

চায়ের জল কেটলীর মধ্যে ফুটে শুকোতে লাগলো। একটা মৃদু বেদনার সংগে সেই শেষদিনের কথাটি মনে পড়ছে। সেই শেষ দেখা হয়েছিল—অশোক দেখিনি। দোতলার বারান্দা থেকে নন্দা দেখেছিল। আহত হৃদয় অশোক চলে যাচ্ছে। যেতে গিয়ে একবার শূদ্র পিছন ফিরে তাকিয়েছিল। রাতের ঘন অন্ধকার, নন্দাকে দেখতে পেয়েছিল কি? পায়নি—নন্দা আজও জানে না, শূদ্র এটুকু জেনেছে—সেই বিনা কারণে ভালবাসার অপমান ঘটাতে দুটো জীবন কি নিদারুণভাবেই না রিক্ত হয়ে গেল।

বাবা মনোমোহন ঘোষাল,—জমিদারী ছিল না, কিন্তু এককালে ছিল এই অসার দম্ভে ধরাখানাকে সরার চাইতে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন! তাঁর বিচারে যে মানুষের পরস্যা আছে, সেই শূদ্র মনুষ্য পঙ্কিতে স্থান পেয়েছে—বাকি সবাই অপাংক্ত্যের জঞ্জাল ছাড়া কিছ নয়! শূদ্র এই নয়, আরও আছে, কি ঘরে, কি বাইরে—নিজের অভিমত, নিজের রুচি অরুচি ছাড়া আর কারো কোন ইচ্ছে অনিচ্ছা চাওয়া পাওয়ার উপর পক্ষপাত দেখাননি! কখনও নয়—

আর সেই ইচ্ছের খেলালেই নন্দার জন্য তিনি কিছু শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন! নন্দা স্কুলে পড়েছিল। কিছুদিন কলেজেও! এবং কলেজে ঢোকার সময় কি করণা যে তাঁর হয়েছিল—সে তিনিই জানেন, নন্দা দেখলো তার জন্য এক গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে। অবিশ্যি তার জন্য দূরে যেতে হয়নি। হাতের গোড়ায় অশোক ছিল। দৃঃস্থ আত্মীয়ের ছেলে—বনেদীবাড়ীর চিকে ঢাকা। আবারগের মধ্যে মনোমোহন ঘোষালের কন্যা নন্দা ঘোষালের শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে এল।

কিন্তু বাবা ভুল করলেন সেইখানে! তিনি জানতেন তাঁর মেয়ে তাঁর মতই সংসারের সমস্ত কিছু অর্থের দেনা-পাওনার বৃক্কে-পড়ে নেবে। কিন্তু মেয়ের হিসেবের ভুল প্রথম দেখাতে শূদ্র হয়েছিল—সুন্দর বলিষ্ঠ অশোক—বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র অশোক—তার পরস্যা আছে কি নেই জানে না, জানতে চায়নি, তবু টের পেয়েছে পাঠ্যবস্তুর অন্তরালে আরও একটি মৃদু জগত কখন যেন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। এবং শূদ্র তাই নয়—সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা অবধি স্থির।

কিন্তু সকলের চোখে ধুলো দিলেও বাবার চোখে পারেনি! তাঁর অতিসজাগ দৃষ্টির সামনে সবটুকুই একদিন ধরা পড়ে গেল,—যার বিচারে অশোক নির্বাসিত হতে বাধ্য হল—নন্দারও প্রায় তাই! বছর যোয়ার আগেই কুলে-শীলে প্রতিপত্তিতে সমকক্ষ অবনীশের ঘর আলো করতে চলে এসেছে নন্দা!

কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র পরিহাস,—স্বামী, তার সংসার—সেটুকু নিয়েও তো নন্দা তার জীবন স্বচ্ছন্দে চালাতে পারতো?—কিন্তু পারেনি। মেয়েকে যোগ্য পাত্র সমর্পণ করে হাঁপ ছাড়ার আগেই ফুলের মধ্যে সাপ দেখা দিয়েছিল। বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে অবনীশকে মদ্যপান করতে দেখেছে নন্দা। নন্দার দোষ নেই, ও যোগ্য সহধর্মিণী হবার চেষ্টা করেছে—অবনীশকে ভালবাসতে চেয়েছে, তার সন্তানের জননী হয়েছে—চেষ্টা করে করে বাইরের যা কিছু আছে তার সবটুকুই দিয়েছে বা করেছে। শূদ্র মন দিতে পারেনি।

আর প্রেম প্রীতি ভালবাসা বলতে হৃদয়ের যে সকল গ্রাধুর্ষ আছে—তার কোন কিছুই বোধকারি হাতে করে দেবার বস্তুও নয়। যে নেয়, সে নেয় নিজের অধিকারে। নিজের ক্ষমতাতেই নেয়। তাই অশোক যা নিতে পেরেছিল—অবনীশ তা পারেনি! আর তারই যন্ত্রণায় সারাটা জীবন নন্দাকে স্বিচারিণীর ভূমিকায় কাটাতে হল।

চা তৈরী করতে বসে অতীত ভবিষ্যত বর্তমান তালগোল পাকিয়ে উঠলো। কিন্তু নন্দা সবলে নিজেকে চেপে চা নিয়ে উপরে চলে এল! দেখলো অশোক অপেক্ষা করে বসে আছে! ওকে

দেখে উঠে দাঁড়াল। বললো—অসময়ে এসে তোমায় বিরত করলুম বোধহয়?

—না না, কি যে বল—হাতের জিনিস-গুলো টেবলের উপর ধরে রাখলো নন্দা। বললো—বোস, বসে খেতে খেতে গল্প কর।

—আমি তো বসবো কিন্তু তোমার কৈ?

অশোক চায়ের কাপের দিকে আগুল দেথাতে নন্দা হেসে ফেললো। বললো—আমি খাই নে!

—কেন? আগে তো বহুবাব খেতে জানতাম!

এ প্রশ্নের জবাব দিতে হল। বললো—আগে যাকে চিনতে সে মানুষ কি আর বেঁচে আছে! সামনে যে নন্দা দাঁড়িয়ে আছে সেটা নিতান্তই তার শূকনো দেহটা—আগের নন্দার স্মৃতি চিহ্ন পরিচয় কিছুই সেখানে নেই!

অশোকের স্বাভাবিক হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা ম্লান হয়ে এল। ওর মুখের দিকে চেয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, নন্দার কানে গেল উপর থেকে শাশুড়ী ডাকছেন—বোমা, বোমা—

বৃন্দা শাশুড়ী, তার উপর একমাত্র সন্তান হারিয়ে রোগে-শোকে জীর্ণ, মনের মধ্যে সুক্ষ্ম একটা বিরক্তি ঘনালেও উঠতে হল নন্দাকে। বললে—তুমি একটু বসো তো, আমি আসছি। শাশুড়ী কেন ডাকছেন দেখে আসছি।

নন্দা উপরে উঠে এল। শাশুড়ী ঘরেই ছিলেন। ঘরেই থাকেন অবিশ্বা—ছেলে যেতে বাইরের সঙ্গে সমস্ত পরিচয় তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নন্দা আসতে ওর দিকে চাইলেন। বললেন—বোমা?

—কি দরকার বলুন।

—কে এসেছে যেন শুনলাম—নেতা বলছিল, তোমার বাপেরবাড়ীর চেনা-জানা নাকি—তা ছেলেটি কে?

শাশুড়ী উপরের ঘরে বসেবসে সংসারের বাবত্যয় কিছু খোঁজখবর তদারকী করেন বটে কিন্তু সামান্য একটা মানুষ আসার খোঁজ যে এতখানি গভীরভাবে নেবেন নন্দা ভাবতেও পারেনি। সুক্ষ্ম একটা অপমানবোধ ওকে ভারাক্রান্ত করলো। বললো—ঠিক চেনা জানাও উনি নন—আপনি তো জানেন, আমি কিছুদিন কলেজে পড়েছিলাম। সে সময় উনি পাড়িয়েছিলেন।

স্নেহশীল শাশুড়ীর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। একটু নিঃস্বস্ত থেকে বললেন—বোমা, আমার অবন দবছর আগেও ছিল—

—মা! গলা দিয়ে হঠাৎ একটি আত্নাদের মত স্বর বেরোল। যে কথা মনে আসেনি সে কথা এরা ভাবে কি করে? লজ্জা পাওয়ার জায়গায় বিস্মিত হয়ে বললো নন্দা,—এ আপনি কি বলছেন মা?

অবনীশের মা শান্তভাবে ঘাড় নাড়লেন। বললেন,—বোমা, মানুষের জীবন কোথা দিয়ে যায় আমি জানি। তোমায় এ কথা বলতে হল সে আমার দুর্ভাগ্য!

—কিন্তু একথা বলতে হয়ই বা কেন? সমস্ত মুখখানা রাগে অপমানে কালো হয়ে উঠেছে নন্দার। বললো—আমি তো কচি খুকি নই। এইকি আপনি বলতে চান—দুঃসুখের জন্যে যে এসেছে তাকে আমি চলে যেতে বলবো! বলুন, বলবো?

অবনীশের মা কিছু বললেন না, নন্দাও কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করলো না। বাইরে চলে এল,—বাইরে এসে দেখলো মাথা দিয়ে ঘাড়ের শিরা দিয়ে সমস্তটাই কেমন কঠিন হয়ে উঠেছে। মানুষ এত সামান্য কারণেও এত ছোট কথা ভাবতে পারে? নন্দা যদি অন্যায় করবো বলে মনেই করে শাশুড়ী উপদেশ দিয়ে তাকে রোধ করতে পারবেন?

নিচে চলে এল নন্দা। দেখলো অশোক কিছু খায়নি। চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বসে আছে। হঠাৎ একটা অপরাধ আর স্নেহের মিশ্রণে মনটা ভরে উঠলো। বললো—কি আশ্চর্য, তুমি না খেয়ে বসে আছ?

—তুমি চলে গেলে।

—আমার খুব অন্যায়। অতিথি নারায়ণ—তার মর্ষাদা রাখতে পারিনি। কি করবো শাশুড়ী ডাকলেন যেতে হল! এইবার তুমি খাও, তার আগে আর এক কাপ চা করে দি, এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে?

—না না,—অশোক বাধা দিল—যা আছে, আমি তাই খাব, তুমি বসো!

নন্দা বসলো। দেখলো অশোকের চেহারার মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছে। বয়সের ছাপ পড়েছে মুখের উপর, মাথার

চুল পাতলা, তার মধ্যে স্পষ্ট সাদা রেখার হিজিবিজি। নন্দা বললো,—তোমার কথা এবার বল, সেই থেকে শুনবো শুনবো করছি, শোনা হচ্ছে না।

—কি আর শুনবে! অশোক হাসলো—আমার নিজস্ব কোন কথা নেই।

—নেই কেন, তোমার ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ে—

—বো! অশোক এবার জোরে হাসলো,—ঘর সংসারের কথা দিয়ে বো—এর কথা জানতে চাইছো—বুঝেছি—! কিন্তু বো কোথায় যে ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ে আসবে?

কথা বলার ধরণ দেখে আরক্ত হল নন্দা। শূদ্ধ তাই নয়—আকস্মিক একটি রোমাঞ্চে সমস্ত মন বিচির এক পুলকে ছেয়েও গেল। কিন্তু ভিতরের ভাব বাইরে প্রকাশ করতে দিল না। গম্ভীর হয়ে বললো—বো কোথায় মানে? বাংলা দেশে মেয়ের অভাব হয়েছে নাকি? আমি তো জানি ওটাই সবচাইতে সুলভ বস্তু? কেন, বো আননি কেন? এ তোমার খুব অন্যায়?

—অন্যায় হলে আর কি করবো—একদিন একটা দুর্লভ বস্তু পেতে গিয়েও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল,—তার কথা ভেবেই সময় কেটে গেল। অশোক হাসলো—তা ছাড়া একজনের ছবি যদি মনের সমস্ত দিক নিজের ক্ষমতায় বন্ধ করে রাখে আর একজনকে সেখানে ঢুকতে দিই কি করে?

—বারে। কৃত্রিম বিরক্ত দেখাল নন্দা। বললো—তাই বলে তুমি সারা জীবন এইভাবে কাটাবে নাকি? এ কিন্তু তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না।

—তাহলে সেই উচিতের ভার তুমি নাও—কি নেবে? একদিন তো নেবার কথা ছিল!

সমস্ত শরীরটা গভীর উত্তেজনায় শিরশিরিয়ে উঠলো নন্দার। কিন্তু মুখে বললো—ছি ছি কি যে বল! কি—

কথা কটা বলে নন্দা সামনে বসে থাকতে পারলো না, বাইরে বেরিয়ে এল। শূদ্ধ তাই নয়—একটা অনাস্বাদিত রোমাণ্ডের সঙ্গে পাপ-পুণ্য, উচিত-অনুচিতের বোঝা পড়াও করে নেয়। বার-বার মনে হল মানুষের জীবন তো এত-টুকু গাণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখার জিনিস নয়। তা ছাড়াও অবনীশের নয়—স্নেহে প্রেমে ভালবাসায় যার দান মনের মধ্যে

চির জাগরুক থেকেছে সে অশোক।
সুতরাং অশোকের কথা—

হঠাৎ ও পাশের বারান্দায় নন্দার
দৃষ্টিটা আটকে গেল। দেখলো যে নেতা
এতক্ষণ বিছানাপত্র রোদে দিচ্ছিল—সে
ছড়ানো বিছানা বালিশের মধ্যে হাতে
একটা কিছুর নিয়ে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে!
জিনিসটা একভাবে দেখছে এবং ভাবছে।

কোঁতুহলী নন্দা আস্তে আস্তে
এ পাশের ঘরে চলে এল। নেতা কিছুর
পড়তে পারে না। কিন্তু তবু ওর ধরন
দেখে অবাক হতে হয়। নন্দা জানতে
চাইলে—ওটা কি নেতা? কি দেখছে
তুমি?

—দেখতো বৌদি—সরে এল নেতা,—
দাদাবাবুর হাতের লেখা মনে হচ্ছে।
বিছানাপত্রের রোদে দিচ্ছি, তোশকের
তলায় এটা পেলুম।

কাগজের একটা টুকরো। হাত পেতে
নিতে হল নন্দাকে। কিন্তু আশ্চর্য, হাতে
নিয়ে ভীষণভাবে অবাক হয়ে গেল।
নন্দাকে লেখা অবনীশের একখানা চিঠি!
একবার লক্ষ্যে গিয়েছিল, সেখান থেকেই
लिখেছে—ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ের কথা
लिখে শেষে নন্দার কথা জানতে চেয়েছে!
“—এখানে আসার সময়, তোমার শরীর
খারাপ দেখে এসেছিলাম, জ্বরও ছিল।
এসে অবধি সেই কথা ভাবছি। শরীরের
উপর নজর রেখ।”

চোখের সামনে হঠাৎ একটা অন্ধ-
কারের যবনিকা নেমে এল যেন। নেতা

জিজ্ঞাসা করছে—হাঁ বৌদি, ওটা দাদা-
বাবুর হাতের লেখা, না গো?

—হাঁ! শান্তভাবে মাথা নাড়লো
নন্দা,—সেবার লক্ষ্যে গিয়েছিলেন, সেখান
থেকেই लिখেছেন। কিন্তু এতদিন পর ও
চিঠি বিছানার মধ্যে এল কি করে?

—তাই ভাব বৌদি! কথাটা বলতে
বলতে নেতার গলার স্বর গাঢ় হয়ে
উঠলো! বললো—কাগজখানা হাতে
পেয়েই বুঝেছি ও দাদাবাবুর হাতের
লেখা! কি কান্ড দেখ—মানুষটা কোথায়
চলে গেছে, কিন্তু তার হাতের লেখাটা—
নেতা সব কথাগুলো শেষ করতে
পারলো না। গলার স্বর শেষের দিকে
সম্পূর্ণ চেপে গেল।

একটা ভাবান্তর মন নিয়ে এপাশের
ঘরে চলে এল নন্দা। দেখলো অশোকের
খাওয়া হয়ে গেছে। ওকে চুপকতে দেখে
বললো—এবার আমি উঠি?

—এর মধ্যেই যাবে? নন্দার সমগ্র
সত্ত্বা দিয়ে মনে হল অশোক আরও
কিছুক্ষণ থাকুক। বললো—এখনই যাবে
কেন, এইতো এলে?

—তাহলে থাকি?

—থাকবেই তো। সহজভাবে কথাটা
বলতে গিয়েও হঠাৎ লজ্জায় পড়ে গেল
নন্দা। তাড়াতাড়ি নিজের দুর্বলতা ঢাকতে
বললো—তা ছাড়া কি একটুখানি জলের
মত চা খেলে—বসো, দুপুরবেলা এসেছ,
অতিথিসংস্কার না করিয়েই ছাড়বো
বুঝি?

—সত্যি ছাড়বে না? তাহলে তো
বসতেই হয়। অশোক নন্দার মুখের দিকে
চেয়ে হেসে ফেললো। বললো—গৃহ-
স্বামিণীর আদেশ লঙ্ঘন করার ক্ষমতা
আমার নেই, কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণ
তঁার বধূকে এই অপরাধে ঠেঙ্গাবেন না
তো?

নন্দাও হেসে ফেললো! ঘরের সব
কথা বাইরে বলা যায় না। বললো—তা
কেন! আমার শাশুড়ীও গেরস্ত মানুষ,
দুপুরবেলা বাড়ীতে মানুষ এলে তাকে
না খাইয়ে ছাড়েন না। তিনি আসতে
পারেননি—তঁার ইচ্ছে আমি তোমায়
জানালুম।

কিন্তু নিতান্তই সহজভাবে যে
কথাটি অশোককে বললো—সেই মিথ্যা
কথার গুরুত্রে নিজেই ঘর্মাক্ত হয়ে
উঠলো নন্দা। কেন তার এমন মতিবুদ্ধি
এল? কেন সে অশোককে যেতে না দিয়ে
মিথ্যা আড়ম্বর করে খাওয়ার কথা
জানালো। শাশুড়ী কি ভাববেন? এবং
তার জন্য যে কথা কাটাকাটি বা সম্ভেদ-
জনক উক্তি হবে—সেটা তো বাঙ্খনীয় ছিল
না।

তাছাড়া অতিথিনায়কের দোহাই
দিয়ে লাভ নেই। নন্দা যা করছে সে
নিতান্তই পৌরাণিক যুগের অতিথি-
পরিচর্যা নয়। মনের যে বিচিত্র লোভ
সেখানে মিশেছে—সেটা নিজেরও না
বোঝার মধ্যে নেই। নন্দা এমন লোভী
হল কেন?

খাওয়া সেরেই অশোক বললো,—
এবার তাহলে যাওয়া যাক?

—তোমার খালি যাই যাই! কথাটা
বলেই নন্দা অন্যদিকে চাইলো।—কতকাল
পরে এলে কোন গল্পই তো শোনা হল
না।

—আরও গল্প শোনা?

—নয় কেন?

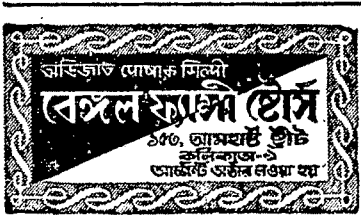
—বেশী প্রশ্ন দিলে যদি কিছু
বাড়াবাড়ি করে ফেলি।

—যাও! অশোকের মুখের দিকে চেয়ে
অসহায়ভাবে হেসে ফেললো নন্দা!—
বুড়ো হয়ে গেলুম, তার আবার বাড়াবাড়ি,
তোমার যত রাজ্যের খালি বাজে কথা।

—বুড়ো মানুষেরা একটু বাজে
কথাই বলে।

—যে বলে সে বলে—তোমার মুখ
থেকে আমি শুনতে চাই নে। নন্দা
অশোকের কথায় আমল দিল না। বললো
—ঘরে গিয়ে বসো গে, আমি আসছি।
আর কিছু না হোক ব্রাহ্মণভোজন
করালুম—তাকে দক্ষিণা দিতেও তো হয়।
সবকিছুতে তাড়া করলে চলবে কেন?

অশোককে ঘরে বসিয়ে আবার
এপাশে চলে এল নন্দা। নিস্তব্ধ নির্জন



অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের জন্য
আমাদের আর একটা নতুন কেন্দ্র

৭নং পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা—১

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এর্ভিনিউ, কলিকাতা—১২

শাড়ী—উপরের ঘরে শাশুড়ী হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন,—নিচে নেতার কাজের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ভিতর ভিতর একটা বিচিত্র সূক্ষ্ম পাপবোধ কেবল যেন সারা মনটাকে অসাড় করে আনলো। কাজটা ভাল হল না, অশোককে চলে যেতে দিলেই হত!

অশোক ঘরের মধ্যে বসে রইলো, চিন্তিত নন্দা শিথিল পায়ে উপরে উঠে এল। অনেকক্ষণ শাশুড়ীর দেখা-শোনা করেনি। বৃদ্ধ মানুষটি! শোকেতাপে জীর্ণ হয়ে আছেন! এবং শূদ্ধ তাই নয়, তখনকার যে কথার জন্য শাশুড়ীর উপর একটি তিক্ত বিরক্তিতে মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল—সেই মনই স্নেহে ভালবাসায় কোমল হয়ে উঠলো! বৃদ্ধো মানুষ, একমাত্র শূভানুধ্যায়ী—তার কথা অমান্য করে নন্দা অন্যায় করেছে।

অনুতপ্ত মন নিয়ে উপরে এসে নন্দা দেখলো শাশুড়ী ঘুমিয়েছেন। চোকাঠের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তাকে দেখলো। দেখতে দেখতে অবনীশের মুখখানা আবার ভাবতে চেষ্টা করলো। কিন্তু আশ্চর্য, যতবার ভাবে—ততবারই কেমন যেন ছবিখানা হারিয়ে হারিয়ে যায়—অস্পষ্ট হয়ে যায়—এবং সেইভাবে কিছুতেই মুখখানা সম্পূর্ণ মনে করতে পারলো না।

এবং সেই চিন্তাধারার সঙ্গে মনে হল নন্দা কিছু অন্যায় করেছে না। কি করেছে সে? অশোক তার জীবনকে সর্বপ্রথম প্রেমের সুধায় ভরিয়ে তুলেছিল।—সেই অশোক আজ বহুদিন পর এসেছে—তার সঙ্গে মুখের দুটো কথা মাত্র—কি এমন অন্যায়ের কাজ? তা ছাড়া নন্দা কিছু কিশোরী বালিকাও নয় যে এত ভাবতে হবে।

সুদৃঢ় পায়ে নন্দা আবার নিচে নেমে এল। তারপর একসময় পায়ে পায়ে অশোকের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অশোক ডাকলো—এসো, আমায় থাকতে বলে, তুমি শূদ্ধই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ—বেশ।

—পালাব কেন? এই তো এলাম।

—কৈ! বিদ্যুৎ চমকের মত একআধ বার আসছো আর চলে যাচ্ছ, একে আসা বলে?

নন্দা এ কথার জবাব দিল না। দরজার কাছে সমান হয়ে দাঁড়াল। অশোক

বললো—ব্রাহ্মণ তো ভোজন করালে, তার কিন্তু একটা দাবী আছে।

—কি?

—সেই থেকে দেখছি, কি একটা ময়লা বিদ্রী শাড়ী পড়ে ঘরে বেড়াচ্ছ। আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না।

—তাহলে? নন্দা নিজের মলিন কালো-পাড় শাড়ীর দিকে চাইলো। শেষে হেসে ফেললো—আমি সাজবো নাকি?

অশোক ঘাড় নাড়লো—আমার ইচ্ছে ততখানিই, তবে ততটা না হলেও কিছুটা বাঞ্ছনীয়।

সামান্যতেই ফুরিয়ে যায় না। তুমি আমার অনুরোধ রাখ, তা ছাড়া—

—কি তাছাড়া—

অশোক একটু ইতস্তত করলো। বললো—তোমার এ জীবনের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই।—তাই এ অনুরোধ, তা ছাড়া তুমি আমায় দক্ষিণা দিতে চেয়েছিলে—এ ব্রাহ্মণ ঐটুকু ছাড়া আর কোন দক্ষিণা চায় না।

কথা কাটাকাটি না করে এ পাশের ঘরে চলে এল নন্দা। আলমারীর পাল্লা খুলে কি শাড়ী পরবে বুঝে পেল না।



বেশী প্রশ্রয় দিলে যদি কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলি

ছেলেমানুষের মত আবদার। বহুদিন আগেকার ঘটনাগুলো ছায়াছবির মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে! সমস্ত মন অব্যক্ত এক ব্যথায় উদ্বেল হয়ে উঠলো নন্দার। বিষমভাবে হাসলো। বললো—এই জন্যে বৃদ্ধি তোমায় থাকতে বলোঁছি? পংগল কোথাকার। যা হয় না—

—কি হয় না! অশোক গলার উপর জোর দিল! বললো—মানুষের জীবন এত

অশোকের অনুরোধ মত যে কাপড়খানাই পরতে যার সঙ্গে অবনীশের সাহচর্য জড়িয়ে রয়েছে যেন। অবনীশের মৃত্যুর পর—ভাল শাড়ী কেনাও হয়নি, প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। সুতরাং তার দেওয়া জিনিসই পরতে হয়। এবং সে জিনিস পরতে গেলে তার সাহচর্য অপেনিই মনে আসে। কোন শাড়ী পরে বেড়াতে গেছে, সিনেমা গেছে, কি উপহার পেয়েছে—কি বসেছে উঠেছে—প্রত্যেকটির

সঙ্গে একটা মানুষের উপস্থিতি আশ্চর্য-ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এক ফুল দিয়ে সাতা দুজনের পূজো করা যায় না। সাধারণ একটা ভাল শাড়ী জামা পরে এ পাশের ঘরে চান এল নন্দা। অশোকের দিকে তাকিয়ে বললো— হয়েছে?

না।

নন্দা খাটের উপর পা বাড়ালিয়ে বসলো। বললো—তাহলে বোকা যাচ্ছে যা ফুরিয়ে যায় তাকে টেনে বাড়ান হাস্যকর।

—কিন্তু ফুরিয়ে যাবে কেন? অশোকের স্বর এবার আহত শোনা। বললো—ফুরিয়ে তো তুমি যাওনি নন্দা। তুমি আছ, আমিও আছি। আমি নিশ্চয়ই জানি একদিন তোমার এ দেহ মন সজা তুমি আমাকেই দিয়েছিলে, আমি অক্ষম ছিলাম—তাই নিতে পারিনি। সে দোষ আমার, তোমার নয়।

অশোকের গভীর সুরে বলা কথা-গুলোয় মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠলো মেন। কিন্তু যে কথা ভুলে যাবার জন্য আজ এতগুলো বছর নিরন্তর চেষ্টা করে আসছে—তাকে স্মরণ করিয়ে লাভ কি?

নন্দা সহজ গলায় বললো—ও কথা বলে আর কি হবে! যা হারিয়ে গেছে ফুরিয়ে গেছে—তাকে ভুলে যাওয়াই ভাল। ভাব চাইতে তুমি বরং তোমার কথা বল।

অশোক হেসে বললো—বললাম তো, আমার নিজস্ব কোন কথা নেই।

—সেটা মিথ্যে কথা! একটা জীবন, সেখানে কোন কথা থাকবে না—এ হয় না। নন্দা অশোকের দিকে তাকাল—কিন্তু তোমার এ ভাবে থাকা উচিত হয়নি। তুমি কেন একজনের জন্যে সর্বস্ব ছাড়বে? সে তো তোমায় কিছু দেয়নি।

—নিশ্চয়ই! দিয়েছে বৈকি? অশোক স্পন্দিত গাঢ় সুরে কথাগুলো বললো। বললো—যে কিছু ছাড়ে সে অনেকখানি পেয়েই ছাড়ে। তবে যে দেয় সে তো জানতে পারে না কি দিলাম—যে পায় সে জানে কি পেল সে।

অশোকের প্রত্যেকটি কথা আবেগে ভাবেশে নন্দাকে অস্থির করে তুললো। কিছু মুখে রুদ্ধ স্বরে কোনমতে বললো—না, ওকথা তুমি বলো না। আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, আমি তোমায় কিছু দিই নি।

—দিয়েছ, তবে জানতে পারিনি। কিন্তু নন্দা—অশোকের মনে হল সামনে বসে মেয়েটির দুটো গাল বেয়ে ফোঁটার ফোঁটার জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অশোক ওড়াতাড়ি নন্দার মুখখানা উচু করে ধরেছে, তুমি কাঁদছো? নন্দা—

যেখানে যেটুকু বাধা ছিল অপসারিত হয়ে গেল। নন্দা নিজেকে ধরে রাখার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না। ওর কম্পিত দেহকে সাগ্রহে ধরে ফেললো অশোক—নন্দা!

—আমি আর পারি নে।

—আমার কাছে যাবে নন্দা? আমার সমস্ত কিছু তোমার জন্যে শূন্য পড়ে রয়েছে। একদিন পাঁচজনের ভুলে দুটো জীবন দুদিকে ছিটকে গিয়েছিল—আজ যদি আমরাই আবার এক হই?

নন্দার চোখের সামনে থেকে সব কিছুই যেন বিস্মৃতির পটভূমিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। শিথিল গলায় বললো—তা কি হয়?

—নিশ্চয়ই হয়! সামাজিক মানুষ যখন হয়েছে বাধা তখন আছেই, কিন্তু তাই বলে তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে না? তুমি শব্দ একবার অনুমতি দাও!

বুকের মধ্যে কোথায় এ জলের উৎস ছিল, নন্দা কোনদিন জানতে পারেনি। রুদ্ধ গলায় বললো—আমি কিছু জানিনে, তুমি যা হয় কর। আমার শব্দ নতুন করে বাঁচতে দাও—!

—ঠিক আছে! আমার এইটুকু হলেই চলবে!

এরপর কতক্ষণ সময় কেটেছে খেয়াল নেই। একটা মৃদু আচ্ছন্ন ভাব সাময়িক-ভাবে সব কিছুকে আবরণ দিয়ে ঢেকে

য়েছেছিল। বাস্তব জগত, তার নিষ্ঠুর সত্য, দৈনন্দিনের তিক্ত যন্ত্রণা সব কিছু অপসারিত হয়ে গিয়ে সেখানে জেগে উঠেছে একটি সংসার। একটি সুন্দর এবং চিরদিনের আকাঙ্ক্ষিত নতুন জীবন, নন্দা ভুবে গিয়েছিল সেই স্বপ্নে—হঠাৎ কানে গেল কে ডাকছে—মা, মা।

নজরটা এমনতেই আছড়ে পড়লো দরজার সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দশ বছরের ছেলে আনন্দ, আট বছরের মেয়ে রনু। একটা তীর হিমপ্রবাহে সমস্ত শরীরটা অসার হয়ে গেল নন্দার। বললো—তোরা? এর মধ্যেই চলে এলি?

—বারে আমাদের তো এখনই আসার কথা!

বিস্মিত আনন্দ কথাগুলো বলতে বলতে অশোকের দিকে চাইছিল। রনু কথা বলেনি সমস্তটুকুই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল। জানতে চাইলো—তুমি কোথায় যাচ্ছো মা।

কোথায় যাব — মেয়ের মুখের দিকে সলজ্জভাবে চাইতে না পেরে নন্দা নিজের দিকে চাইলো। নিজের দিকে তাকিয়ে চাবুক খাওয়া প্রাণীর মত কেঁপে উঠেছে নন্দা। প্রতীক্ষারত স্নেহময়ী মা নয়, সর্বশরীরে অভিসারিকার চিহ্ন নিয়ে লাস্যময়ী নারী। নিজেকে কোথায় গোপন করবে দিশে পেল না নন্দা। শুকনো হেসে বললো—পাগলের মত কি যে বলিস তোরা! কৈ কোথায় যাব? আমি কি কোথাও যাই?

—তবে যে তুমি সেজেছো।

নন্দা আরও জোরে হাসতে চেষ্টা করলো। বললো—ওরে বাবা, সাজবো কেন? ধোপাবাড়ী কাপড় দেব বলে একখানা ফর্সা শাড়ী পরেছি। আর এই হোদের এক মামাবাবু, তাদের দেখবেন বলে সেই থেকে বসে আছেন। বলেছেন—আনন্দ, রনু কত বড় হল, কেমন লেখা-পড়া শিখছে দেখতে ইচ্ছে করে—! —তা, এইবার তুমি যাচ্ছো না অশোক? হাঁ, সন্দেহও হয়ে আসছে। অতটা যেতে হবে, রাস্তাও তো কম নয়—! আনন্দ রনু তোমাদের মামাবাবুকে প্রণাম কর বাবা!

॥ ভাগ্যবান ॥

পূর্বের দুই সাধারণ নির্বাচনের মত এবারের নির্বাচনেও দেশবাসী সারা-ভারতের শাসনদায়িত্ব কংগ্রেসের হাতে দিয়েছেন। এটা অবশ্যই কংগ্রেসের সৌভাগ্যের কথা। সুকৃতির দাবীও নিশ্চয়ই আছে। এই জাতীয় সমর্থনের পিছনে। কিন্তু ভাগ্যের আশীর্বাদও কি কিছু কম আছে তার? বোম্বাইর একটি বিধানসভার আসনে কংগ্রেস ও পি-পস-পি দলের প্রার্থী দুজনেই ভোট পেয়েছিলেন সমান সমান, ১২,৬৪৪টি করে। সুতরাং উভয় প্রার্থীই রাজী হলেন লটারীর মাধ্যমে ভাগ্য-নির্ধারণে। ভাগ্য নির্ধারিত হল, ভাগ্যদেবী বরমালা পরিণয়ে দিলেন কংগ্রেস প্রার্থীর গলে।

॥ বিপর্যয় ॥

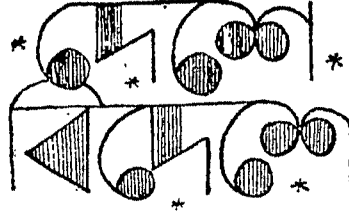
এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল সর্বভারতীয় রথী মহা-রথীদের ভাগ্য বিপর্যয়। একমাত্র কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীনেহরু ছাড়া আর কোন দলের নেতাই এবারের নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি। কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীডাঙ্গো, প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীঅশোক মেহতা, জনসংঘ নেতা শ্রীবাজপেয়ী, স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রীরঙ্গ, সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীলোহিয়া, নির্দলীয় নেতা শ্রীকৃপালনী সকলেই এবার জনগণের কোপদৃষ্টিতে ধরাশায়ী হয়েছেন।

॥ অভিনন্দন ॥

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবার পশ্চিমবঙ্গের দুটি আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। একটি গ্রাম বাঙলার প্রতীক কেন্দ্র শালতোড়া, অপরটি বাঙলার প্রাণ-কেন্দ্র কলিকাতার সবচেয়ে কমচণ্ডল অংশ চৌরঙ্গী। দুই জায়গাতেই তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কয়েক হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। সাংকলনামা পূরুষ তিনি। বাঙলা দেশের জনমতের রায় অনুসারে আগামী পাঁচ বছরের জন্যও বিধানচন্দ্র বিধানসভার চন্দ্র হয়ে থাকবেন।

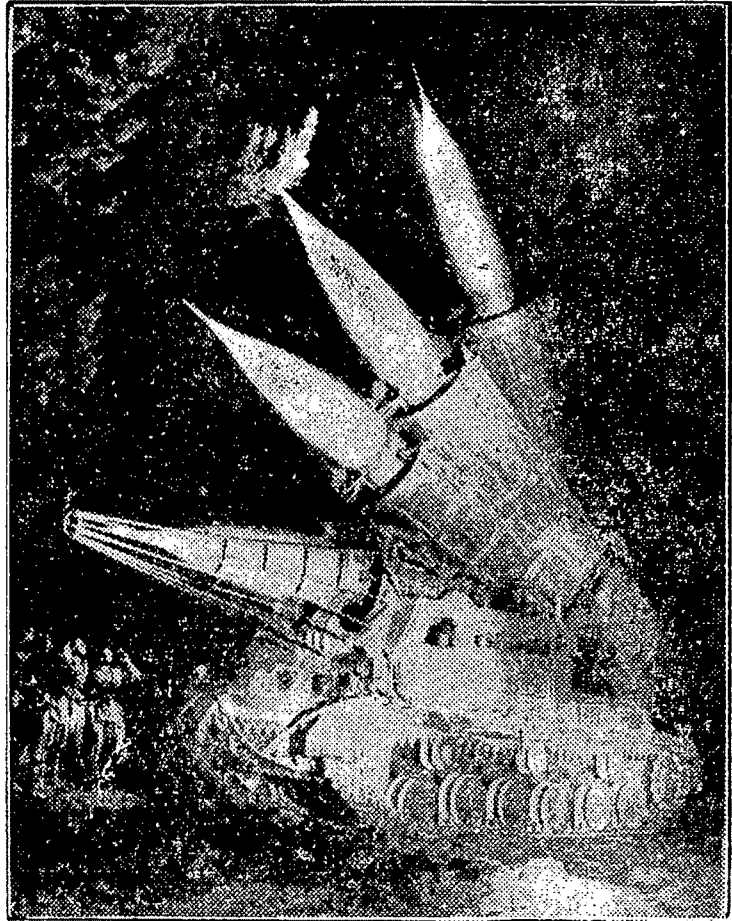
॥ সাক্ষাতে সম্মতি ॥

পাকিস্থানের জঙ্গী প্রধান আম্রুব খান জানিয়েছেন, কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ভারত সফরে যেতে তাঁর কোন আপত্তি নেই যদি অবশ্য তাতে কোন কাজ হয়। বলা বাহুল্য, এই 'যদিটুকুই' এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা এমনকি একমাত্র কথা বললেও অত্যাঙ্গিত করা হবে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আম্রুবের জঙ্গীশাহীর এখন খুব কোণঠাসা অবস্থা। শহীদ সুরাবদীকে স্মরণ করে আম্রুব শব্দ পূর্ববর্গকেই



বিক্ষুব্ধ করেননি, বিক্ষোভের ঢেউ এখন সারা পাকিস্থানে ছড়িয়ে পড়ে দেশ-দেশান্তরেও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় পাকিস্থানের প্রধান ভরসা আমেরিকাও আজ তার প্রতি বিরূপ। এ অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারের আবেদন আম্রুবের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা অবশ্যই সম্ভব ছিল না। কিন্তু সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে আম্রুব কোন ফলের প্রত্যাশী তা স্পষ্ট না করে বলাতে এ সাক্ষাৎকারের সাফল্য সম্পর্কে সূনিশ্চয়তা প্রকাশ করা অতিবড় আশা-বাদীর পক্ষেও সম্ভব হবে না। কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের যা মনোভাব ও

অনুসৃত নীতি সে সম্পর্কে আম্রুবের মতামত সাক্ষাতের পূর্বেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়া উচিত। অন্যথায় কতকগুলি বাক্যব্যয় শব্দ অকারণই হবে না, ভারতের ভবিষ্যৎ মর্যাদার পক্ষেও তা হবে বিশেষ ক্ষতিকর। ভারতের অনমনীয় জেদের জন্যে জনাব আম্রুবকে শূন্যহাতে ফিরে যেতে হল। এ জাতীয় একটা মিথ্যা প্রচার ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদার পক্ষে অবশ্যই বিশেষ ক্ষতিকর হবে এবং আম্রুবের পক্ষেও পাকিস্থানের বর্তমান বিক্ষোভকে সাময়িকভাবে বিজান্ত ও ভিন্নমুখী করা সম্ভব হবে। এ কারণে আম্রুবের সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ গ্রহণের ব্যাপারটাকে বিশেষ উৎসাহজনক বলে মনে করার কোন কারণ নেই। ভারতের পক্ষ থেকে আজ এ ব্যাপারে আরও সূস্পষ্ট নীতি গৃহীত হওয়া উচিত। সাক্ষাৎকারের পূর্বে ভারতের জানা দরকার, কাশ্মীর সম্পর্কে তার নীতি ও মনোভাব সম্পর্কে আম্রুবের বক্তব্য কি



সম্প্রতি মস্কোর সন্নিবর্তে রুশ দৈন্যবাহিনীর যে মহড়া হয়, তাহাতে 'বকট সংযোজিত ট্যাঙ্ক' সর্বপ্রথম দেখা যায়। রকেটটি ট্যাঙ্কের কামানের স্থান গ্রহণ করিয়াছে এবং উহাকে উৎক্ষেপণের অবস্থায় আনা হয়।

এবং বিশেষ কোন ফলের প্রত্যাশা হয়ে তিনি ভারতে আসতে চান।

॥ বর্মার যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ॥

পাঁচটি প্রাদেশিক বিভাগ—শান, কাচিন, কারেন, কায়ো ও চিন এই নিয়ে ইউনিয়ন অফ বর্মা গঠিত। কিন্তু যেটুকু প্রাদেশিক স্বাধিকার বর্মার বর্তমান সংবিধানে স্বীকৃত আছে তা বোধহয় বর্মার অন্তর্গত বিভিন্ন জাতীয়তার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। একারণে বর্মার ঐ পাঁচটি জাতীয়তার প্রতিনিধিরা রেংগুনের এক আলোচনা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে বর্মার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী উত্থাপন করেছেন। তারা বলেছেন, স্বাধীনতার পর গত তের বছরের অভিজ্ঞতায় তারা দেখেছেন বর্মার রাজ্যের স্বার্থে অন্যান্য প্রদেশগুলির স্বার্থ ও অধিকার বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বর্মার প্রধানমন্ত্রী উ নু স্বয়ং সে সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিও বর্মার অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের অভিযোগ-সমূহের সঙ্গে মোটামুটিভাবে একমত হয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম বর্মার রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে গৃহীত হওয়াতেও বিভিন্ন জাতীয়তার মনে যথেষ্ট বিকোন্ডের সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় বর্মার সংবিধানে অনতিবিলম্বেই কিছু কিছু

পরিবর্তনসামর্থ্য হতে পারে মনে হয়। তবে বর্মার মত একটি ছোট ও দরিদ্র দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন কতখানি যুক্তিযুক্ত হবে সেটা অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার। কারণ তার ফলে বর্মার একটি কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও পাঁচটি রাজ্য সরকার গঠন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে গঠিত হবে পাঁচটি রাজ্য বিধানসভা ও কেন্দ্রের সংসদের দুইটি কক্ষ। এতে শাসনের ব্যয় ত বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাবেই বর্মার জাতীয় ঐক্যের অগ্রগতিও এর ফলে বিশেষভাবে বিঘ্নিত হবে।

॥ অপসারণ ॥

সিংহলের গভর্নর জেনারেল স্যার অলিভার গুর্নটিলক অপসারিত হয়েছেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ সিংহলী রাষ্ট্রদূত থ্রীডবলিউ গোপল্লভ। স্যার গুর্নটিলকের এই অপসারিত কারণ সিংহলের সাম্প্রতিক ব্যর্থ সামরিক অভিযানের ব্যাপারে তাঁর সম্মেলনক কার্যকলাপ, সামরিক বড়বন্দে লিখত থাকার অভিযোগে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা নাকি জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলেছে যে, এই সামরিক অভিযানের কথা স্যার গুর্নটিলকের অজানা ছিল না।

॥ বিপন্ন আয়ুবশাহী ॥

ভয় ভেঙ্গে গেছে সারা পাকিস্তানের। যাকে দুর্জয় নিষ্ঠুর ভেবে এতদিন শঙ্কিত হয়ে ছিল পাকিস্তান আজ তার বিরুদ্ধে হঠাৎ বৈপর্য্যোয় প্রতিবাদ জ্ঞা দেখল সে অন্যায় আরও ভীরু, বদাড়াতেই গুলি নিয়েছে সে তার উদাত্ত ফণা। আয়ুবশাহী আজ মর্মান্বন, পাকিস্তানের কোন তরুণপ্রাণ তাকে ভয় করে না। সভা, শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ আজ শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ নেই, পশ্চিম পাকিস্তানেও সকল প্রান্তে উঠেছে আজ তীব্র প্রতিবাদের ঝড়। সকলেরই দাবী, অবিলম্বে অবসান ঘটুক এই ঘৃণিত শাসনের, পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হোক গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। ২১ শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালিত হল পূর্ববঙ্গে, দশ বছর আগে হারিয়ে-যাওয়া দশটি তরুণ প্রাণের গৌরবময় স্মৃতিকে স্মরণ করে, মাতৃভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠায় হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিলেন যারা। ঐ দিনই পূর্ববঙ্গবাসীরা দাবী তুলেছেন, পূর্ববঙ্গে আবার গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করতে হবে এবং সেইসঙ্গে প্রবর্তিত করতে হবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। একজন ক্ষমতালোভী সৈনিকের ইচ্ছাই যে পাকিস্তানের জনমত নয় তা অগণ্য নিভীক কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে সারা পাকিস্তানে। আজ পাকিস্তান পেরিয়ে সুদূর লন্ডনেও পৌঁছেছে আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানবাসীদের তীব্র বিক্ষোভ। লন্ডন-প্রবাসী কয়েক সহস্র পাকিস্তানী শোভাযাত্রা করে পাক দূতাবাসে উপস্থিত হয়ে দাবী জানিয়ে এসেছেন, অবিলম্বে পাকিস্তানে প্রবর্তিত করতে হবে পূর্ণ গণতন্ত্রী শাসন। আয়ুবের দুর্ভাগ্য, তাঁর বন্দুক-বাজী ও সামরিক শাসন লন্ডনে চলে না, তাই মুখ বন্ধেই সহ্য করতে হচ্ছে তাঁকে এই ভয়ংকর তিরস্কার। ২৮শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তা যদি বুনিনাদী গণতন্ত্রের নামে বুনিনাদী ধাম্পা হয় তবে তা যে পাকিস্তানবাসীরা গ্রহণে সম্মত হবেন না, এ আশা করি গণতন্ত্রের শত্রু আয়ুব এতদিনে বুঝতে পেরেছেন।

॥ বর্মার নতুন খবর ॥

বর্মার পূর্ববর্তী সংবাদ এখন পুরাতন। গত ১লা মার্চ ঐদেশের সৈন্যবাহিনীর প্রধান নেতা জেনারেল নে উইন মধ্যরাত্রে অতর্কিতে সমগ্র রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র করায়ত্ত করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রিসহ বর্মার ৪৬ জন বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ককে গ্রেপ্তার করে গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়েছেন। এখন বর্মার সামরিক শাসনাবধীন।

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্তি-সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত উক্ত বিষয়ের গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক আলোচনা ও শক্তি-সাধনার আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। [১৫]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মদ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দুই শতাধিক পদকর্তা হইতে প্রায় চার হাজার পদের টীকা, ব্যাখ্যা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। একটি গ্রন্থে পদাবলী সাহিত্যের সার সংরক্ষিত। [২৫]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত বহু সুন্দর চিত্রাবলীসহ অনিন্দ্য প্রকাশন। ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [৯]

রমেশ রচনাবলী

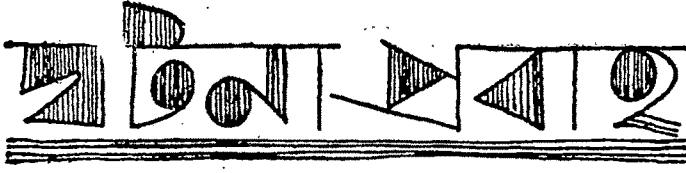
রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস মোট ছয়খানি একত্রে। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক রমেশচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [৯]

পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকতা-১

॥ আমাদের বই সর্বত্র পাইবেন ॥



॥ ঘরে ॥

২২শে ফেব্রুয়ারী—১০ই ফাল্গুন : সাধারণ নির্বাচনের সপ্তম দিবসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৪৬টি বিধানসভা-কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন।

সুরঙ্গপথে হুগলী নদী (গংগা) পারাপারের নতুন ব্যবস্থার সুপারিশ—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মধ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়ের নিকট কলিকাতা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা সংস্থার রিপোর্ট পেশ।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—১১ই ফাল্গুন : দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী জীনেহরুর সহিত মার্কিং প্রেসিডেন্ট কেনেডি'র উপদেষ্টা মিঃ চেষ্টার বোলজের দীর্ঘ আলোচনা।

নির্বাচনের অষ্টম দিনে পশ্চিমবঙ্গের ৬টি নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে ভোট গৃহীত।

এপ্রিলের (১৯৬২) প্রথম পাদে দিল্লীতে সর্ব ভারতীয় নিরস্ত্রীকরণ কংগ্রেসের অনুষ্ঠান—১২ই মার্চ ভারতের সর্বত্র 'নিরস্ত্রীকরণ দিবস' পালন—নারা ভারত শান্তি পরিষদের সিদ্ধান্ত।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—১২ই ফাল্গুন : ভারতের আসাম মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, কেরল (কেবলমাত্র লোকসভা নির্বাচন) ও কেন্দ্র-শাসিত দিল্লী রাজ্যের সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ—আসামে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা সূর্য।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—১৩ই ফাল্গুন : পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের সমাপ্তি দিবসে কলিকাতার ২৬টি বিধানসভা ও ৪টি লোকসভা কেন্দ্রে এবং হাওড়ায় নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত—ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও ভোটগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা আরম্ভ—প্রথমদিনে ভোট গণনায় কংগ্রেস অগ্রগামী—শালতোড়া কেন্দ্র (বাকুড়া) হইতে মধ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত—বিহার আসাম ও অন্ধ্র প্রদেশের মধ্যমন্ত্রীদেরও (কংগ্রেস) নির্বাচনে জয়লাভ।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—১৪ই ফাল্গুন : চৌরঙ্গী কেন্দ্র (কলিকাতা) হইতে ডাঃ রায় (মধ্যমন্ত্রী) ভোটাধিক্যে বিধানসভায় নির্বাচিত—নির্বাচনে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (আরামবাগ কেন্দ্র) শ্রীতরুণকান্ত ঘোষ

(হাওড়া কেন্দ্র) প্রমুখ পাঁচজন মন্ত্রীরও এইদিনে সাফল্য লাভ—পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দলের অগ্রগতি অব্যাহত।

মাদ্রাজ, রাজস্থান, গুজরাট ও পঞ্জাব রাজ্যের মধ্যমন্ত্রীগণের (কংগ্রেস) নির্বাচনে জয়লাভ—মধ্যপ্রদেশের মধ্যমন্ত্রী ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজুর পরাজয়বরণ—পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা।

পাঞ্জাবের তারণ ভোরণ ভোটগণনা কেন্দ্রে অকালী নেতা মাতার তারা সিং গ্রেপ্তার—যান চলাচলে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—১৫ই ফাল্গুন : নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমন্ত্রী ভূপতি মজুমদার ও প্রমমন্ত্রী আবদুল সাব্বারের পরাজয়—অপর ৪ জন মন্ত্রী (কংগ্রেস) ভোটাধিক্যে নির্বাচিত।

অন্ধ্র, আসাম, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যেও কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন—কাশ্মীর বিধানসভায় জাতীয় সম্মেলনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

কংগ্রেসের প্রতি জনগণের নৈতিক সমর্থনে ডাঃ রায়ের (পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমন্ত্রী) অভিনন্দন—জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি মাতৃভূমির সেবায় নিয়োগ করার সংকল্প ঘোষণা।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—১৬ই ফাল্গুন : তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনেও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ—তিনজন উপমন্ত্রীর সাফল্য ও দুইজন মন্ত্রীসহ স্পীকার শ্রীবাঞ্ছন করের পরাজয় বরণ—প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) লোকসভায় নির্বাচিত।

নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী জীনেহরুর বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ। মহাশূর রাজ্যেও কংগ্রেসের একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা।

॥ বাইরে ॥

২২শে ফেব্রুয়ারী—১০ই ফাল্গুন : সোভিয়েট প্রস্তাবিত মহাকাশজয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় আমেরিকা সম্মত—মার্কিং সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়নের

উদ্যম—সাংবাদিক বৈঠকে (ওয়াশিংটন) প্রেসিডেন্ট কেনেডি'র ঘোষণা।

পশ্চিম নেপালের কৈলাবাস সহরে নেপালী বিদ্রোহীদের হানা (২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা) পুলিশের সহিত ৪ ঘণ্টাকাল লড়াই : একজন বিদ্রোহী নিহত ও ৪ জন আহত হওয়ার সংবাদ।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—১১ই ফাল্গুন : শীর্ষ পর্যায়ের অষ্টাদশ জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্রুশ্চেভের দৃঢ় প্রকাশ—প্রেসিডেন্ট কেনেডি (আমেরিকা) ও ম্যাকমিলানের (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী) নিকট সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর লিপি।

একজন জেনারেল সহ ৭৫ জন তুর্কী অফিসার গ্রেপ্তার—তুরস্ক শেষ পর্যন্ত সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্যম বানচাল।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—১২ই ফাল্গুন : নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভের শীর্ষ-সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট কেনেডি কর্তৃক পুনরায় অগ্রাহ্য—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ প্রস্তাবের জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রীপর্যায়ে বৈঠকের পাঠ্য প্রস্তাব।

নেপালে বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে সর্বা-ত্রক অভিযানে সরকারী প্রতুতি।

সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় সৈন্য সমাবেশের আয়োজন—প্রেসিডেন্ট সুকার্নোর আদেশনামা জারী।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—১৩ই ফাল্গুন : 'কাশ্মীর প্রশ্ন আলোচনার্থ' বাস্তব ফললাভ হইলে ভারতে যাইতে রাজী—সাংবাদিকদের নিকট পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের ঘোষণা।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—১৩ই ফাল্গুন : স্যার অলিভার গুর্নাতলকের স্থলে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রস্থ সিংহলী রাষ্ট্রদূত ডব্লিউ গোপালাবা সিংহলের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—১৫ই ফাল্গুন : সায়গনে রাজপ্রাসাদের উপর জঙ্গী-বিমানের আক্রমণ—প্রেসিডেন্ট দিয়েমের (দক্ষিণ ভিয়েতনাম) প্রাণনাশের ব্যর্থ চেষ্টা।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—১৬ই ফাল্গুন : আলজিরীয় বিপ্লবী জাতীয় পরিষদ (পার্লিমেণ্ট) কর্তৃক ফ্রান্স-আলজিরীয় আলোচনার (আলজিরিয়ার যুদ্ধ-বিরতি সংক্রান্ত) ফলাফল অনুমোদন—দ্য গল সরকারের (ফ্রান্স) সহিত আরও আলো-চনা চালাইবার নির্দেশ।

সমকালীন সাহিত্য

অভ্যুৎকর

৥ অলৌকিক রচনা ॥

আপনার অর্থ-সামর্থ্য থাকতে পারে, গাড়ি, বাড়ি, স্ট্রিজ, শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ সব কিছুই আপনার করায়ত্ত হতে পারে অর্থের বিনিময়ে, কিন্তু লেখক হওয়া সহজ নয়। পত্র-পত্রিকায় যেসব রচনাদি প্রকাশিত হয়, বা সভাগৃহে বা বক্তৃতামঞ্চে যা পাঠ করা হয়, তা সর্বদাই যে লেখক-বিশেষ বা বক্তা-বিশেষের নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত তা নাও হতে পারে, অর্থের বিনিময়ে সেই রচনা কোনো শক্তিশাল লেখকের হাত থেকে ধোরিয়ে এসেছে। আমাদের জানা এমন একজন লেখক ছিলেন। যিনি অবিভক্ত বাংলাদেশের একটি বজেট বক্তৃতা অতি অল্প সময়ে লিখে দিয়েছিলেন। যিনি

সেই বক্তৃতা দান করেছিলেন প্রশংসা অবশ্য তিনিই পেয়েছিলেন। আর যিনি লিখেছিলেন তিনি পেয়েছিলেন টাকা। অনেক 'আত্মজীবনী', উপন্যাস, ছোট-গল্প, নাটক এবং ধর্মগ্রন্থ এই জাতীয় ভূত-লেখক বা Ghost-writer-এর দ্বারা লিখিত। বাংলাদেশের নোটবই বা পাঠ্য পুস্তকের রাজস্ব প্রায় আগা-গোড়াই এই ভৌতিক খেলা চলে আসছে। বিখ্যাত অধ্যাপক বা প্রধান শিক্ষকের নাম থাকে টাইটেল পেজে, সেই গ্রন্থ কিন্তু হয়ত কোনও দরিদ্র ছাত্র কিংবা অধ্যাত শিক্ষকের ভূত-রচনা। এসব কথা অনেকেই জানেন। খাঁরা জানেন না তারা সবাকিছুই খাঁটি বলে গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং যিনি লিখতে পারেন না অথচ লেখা কিনতে

পারেন, এবং যিনি লিখতে পারেন কিন্তু অভাবগ্রস্ত, এই দুই শ্রেণীর মানুষের সম্মুখীন, সংযোগে ও সহযোগিতার ফলেই ভূত-লেখকরা সর্গাশ্ব লাভ করে থাকেন।

শুধু যে সভাপতির অভিভাষণ বা আত্ম-জীবনী প্রভৃতির এরা লেখক নয়, প্রেমপত্র পর্যন্ত এদের দিয়ে লেখান হয়ে থাকে। জীবনের বহু বিচিত্র মুহূর্তের কথাও এই ভূত-লেখকদের লেখনী-প্রসূত। অনেক ভূত-লেখক রচিত রচনা সাধক সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে ভূত লেখকরা চিরদিনই স্বাক্ষরকার অস্তরালে থেকে যান, নাম, গোত্র, পরিচয়হীন। ইদানীংকালে ছদ্মনামধারী লেখকের সংখ্যা অনেক। কিন্তু কীতহলী পাঠক অতি সহজেই তাঁদের আসল নামের সন্ধান পেয়ে থাকেন। ভূত-লেখকরা কিন্তু চিরদিনই অজ্ঞাত এবং অধ্যাত থেকে যান, লোক-লোচনের সামনে আসার কোনো সুযোগই তাঁদের নেই।

সম্প্রতি কিন্তু এমন একটি ভৌতিক রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে যা অতীতপূর্ব, সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয় ভৌতিক রচনার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ আর এক ধারার ভূতগত লেখা। অর্থাৎ আসল ভূতের লেখা। জনজন্ম ভূতেরা এখন নাটক নিয়েই পড়েছেন। পরে হয়ত সাহিত্যের অন্য বিভাগেও তাঁদের আবির্ভাব ঘটবে। ক্যানাডার জনৈক মহিলা (বর্তমানে লন্ডন প্রবাসিনী), বার্গার্ড শ এবং আন্তন চেকভের ভূতযোনির দ্বারা লিখিত সতেরখানি নাটকের লেখিকা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন। মনে হয়, এই দুজন লেখক 'স্বভাব যায় না মনে' এই নীতিতে বিশ্বাসী এবং পৃথিবীর মারা কাটালেও সাহিত্যিক নেশার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু এত দেশে এত রকমের লেখক-লেখিকা থাকা সত্ত্বেও এই ক্যানাডা-নন্দিনীরাই অদ্বৈত এই ভাগ্যোদর কেন ঘটল এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক।

প্রাচীন সন্ধ্যার এই মহিলাটির গৃহে চক্র বা Seance বসে। সেইকালে বার্গার্ড শর আত্মাকে আহবান জানানো হয়। এই আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারেও নিশ্চয়ই কিছু গোপন পদ্ধতি আছে। আর অয়ারট সেন্ট লরেন্সের সেই বদ-মেজাজী ভদ্রলোকটি অবলীলাক্রমে তাঁর নতুন নাটকের একটি অঙ্ক বলে যান। বার্গার্ড শ ইংরাজী ভাষার লেখক ছিলেন, তাঁর ইংরাজী রচনা গ্রহণ করা হয়ত এই মহিলাটির পক্ষে সহজ, কিন্তু আন্তন চেকভের রাশিয়ান ভাষার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা করা হয় কে জানে? হয়ত চেকভ এক বার্গার্ড শ ওপারে গিয়ে বেশ

৥ অগ্রণীর বই ॥

জ্যোতিষের গঙ্গোপাধ্যায়
অন্তর্মনা ২১

মনসিজ ৫
একটি বালক-মনের জন্মকালকের সরল অকপট কাহিনী। মধ্যবিত্ত জীবনের নিবিড় আলোয় এই দুই গ্রন্থ। অন্তর্মনার কিশোর অনিল্য মনসিজে যুবক। সে তার পারিপার্শ্ব থেকে সংগ্রহ করা ব্যর্থতার অভিজ্ঞতায় বিষম। অথচ তার ছোড়াপি পারুলের খৈশ আশা নিঃসন্দেহে প্রেমের আলো জ্বালে। বাংলাদেশের শহর জীবনের সংগে গভীরভাবে যে নৈরাশ্য নির্জনতা জড়িত লেখক তাঁর এই দুই গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়
কংস-কবুতরী কথা ২৫০
বাংলাদেশের বাইরে শহর জীবনের গতানুগতিকতা পরিহার করে নতুন জীবন রূপায়ণ করেছেন লেখক। যে জীবনের স্বাধীন অরণ্যের নিবিড়তার, গ্রাম্য সরলতার, অথচ লোভ লাসসা সেখানেও তার পক্ষ বিস্তার করে।

অগ্রণী প্রকাশনী
এস কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

অজয় দাশগুপ্ত
সূর্য তামসী ২১

নির্মিত জড়িত তিনটি মেয়ের জীবনে প্রেম আকাঙ্ক্ষা বেদনা প্রভৃতি নিয়ে একটি পরিবারের অবক্ষয় ভুলে ধরেছেন লেখক যা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহ্য।

শ্রীমন্ত
আমি মুনসিফ ৪
শিবরাত্রি উপলক্ষে পশুপতিনাথ দর্শনকামী তীর্থযাত্রীদের বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী।

দেশে-বিদেশে রবীন্দ্রনাথ ৩৫০

ভারতবর্ষ ও ইউরোপ আমেরিকার সুধীজনের রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ আলোচনা।

রবীন্দ্র মুনোপাধ্যায়
দণ্ডকারণ্য ৪
দণ্ডকারণ্যের পটভূমিকায় বিচিত্র উপন্যাস।

শিল্পীর নবজন্ম ৫
রম্যা রলার 'আমি আমি' না গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ।
বিশ্ব বিশ্বাস

নীল সাগরের জলে ১৫০
কিশোর উপন্যাস।

বন্দ্যু পাতিয়েছেন এবং চেকভের রুশ-ভাষার নাটক 'বার্গার্ড শ' ইংরাজীতে অনুবাদ করে দিচ্ছেন আর মহিলাটিও দ্রুত-লিখন পদ্ধতির দ্বারা তা লিখে নিচ্ছেন। 'বার্গার্ড শ'র রুশভাষা জ্ঞান সম্পর্কেও সন্দেহ করা যেতে পারে, তিনি রুশ ভাষা জানতেন না। হয়ত ওপারে গিয়ে শিখে নিয়েছেন, আর যেন তেন প্রকারের অনুবাদ করলেও কে ধরতে পারবে, কারণ মূল নাটকটি তা আর কারো হাতে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

কোতুহল বড় বড় জিনিষ। তাই এই কোতুহল মনে লাগে যে 'বার্গার্ড শ' কত দ্রুত বলে যেতে পারেন কে জানে, আর এই মহিলাটিই বা কত তাড়াতাড়ি তা লিখে নিতে পারেন। 'বার্গার্ড শ' অতিশয় দ্রুতগতিতেই চিন্তা করতে পারবেন। তিনি স্বয়ং এক নিজস্ব স্ট্র-হ্যান্ড পদ্ধতি শিখেছিলেন এবং তাঁর স্ট্রেকটোরিকেও সেই পদ্ধতি শিখিয়ে ছিলেন। মর্ত্যবাসী হিসাবে 'বার্গার্ড শ' কখনই কোনো লেখা ডিকটেশন দিয়ে লেখান নি, তবে মর্ত্যকায়্য ত্যাগ করার পর হয়ত নতুন শক্তির অধিকারী হয়েছেন। শারীরিক বিকৃতি নাকি হৃদয় পর দেহ থেকে মুছে যায়। অনেক কুরূপ মানুষকে হৃদয় পর মনোহর কান্তি নিয়ে মর্ত্যলোকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। যারা প্রেত-চর্চা করেন একথা তাঁদের। 'বার্গার্ড শ'র ক্ষেত্রেও এমন একটা কিছু ঘটা অসম্ভব নয়। অবশ্য Pygmalion নাটকের মার্কিন রূপান্তর My Fair Lady-র অসমী জনপ্রিয়তাই নাকি এইসব ভৌতিক নাটকের আসল প্রেরণা এই কথাও কেউ কেউ বলছেন।

যাই হোক, এসব আনন্দ সংবাদ সন্দেহ নেই। স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান কমেই হাস পাচ্ছে। একদিন হয়ত সত্যই ঈশ্বরীয়ে স্বর্গ-রাজ্যে যাওয়া সম্ভব হবে। 'বার্গার্ড শ' এবং চেকভ ছাড়াও যেসব সাহিত্যিকরা এঁদের আগে ও পরে স্বর্গলোকে গিয়েছেন, বা প্রায় প্রতিদিনই যাচ্ছেন, তাঁদের রচনাদি আমরা অনুরূপ লেখক বা লেখিকার মাধ্যমে পাচ্ছি না কেন? এর জবাব এই যে, অনুশীলন করলেই হয়ত তা একদিন সত্যই সম্ভব হবে। না পাওয়ার কারণ যথেষ্ট অনুশীলনের অভাব।

১৯৪৯-এর এক সন্ধ্যায় কবি অজিতকুমার দত্তের বাসভবনে অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমবেত হয়েছিলেন। সেইদিন এমন একটি Seance বা চক্রে বসা হয়েছিল। অনেকেই সেই আসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথও। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

“অনেকদিন সঙ্গ পরশ হারা হয়ে আছি কে দেয় সঙ্গসুখ কবি বিনা”। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, “ওখানে কি করেন আপনি?” উত্তর এল—“অনিবচনীয়ের ধ্যান করি।” অনুরোধের খতিয়ে তিনি কয়েক লাইন কবিতাও লিখে দিয়েছেন। সেইদিন তিনি প্রবোধকুমারকে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে অনুরোধ করেন। প্রবোধকুমার সাথক আবৃত্তি করে। তাঁর আবৃত্তি শেষে কবি বলে উঠলেন—“চমৎকার, আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ করে।” অনেক রাত্তি অবধি সেইদিন এই চক্রটি সক্রিয় ছিল। অনেক কথাই সেদিন শোনা গিয়েছিল, যার ব্যাখ্যা চলে না। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকেই লিখিত হল।

তাই মনে হয়, আমরা যুক্তি দিয়ে বৃদ্ধি দিয়ে এইসব অলৌকিক রহস্যের বিচার করতে পারি না বলেই তা যে অর্থহীন একথা মনে করা ভুল। যদি মিডিয়াম বা মাধ্যম শক্তিশালী হয়

তাহলেই এইসব শব্দ-আত্মার আবির্ভাব সম্ভব হয়।

এমনই কোনও শক্তিদর: মিডিয়াম যদি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের প্রতি সন্ধ্যায় আহ্বান করে কিছু কিছু লিখিয়ে নিতে পারেন, তাহলে তার মূল্য কম হবে না। কিংবা এক একটি যুগ ধরে, সেই সেই যুগের চিন্তানায়কদের অনুরোধ করে যদি কিছু লেখান যায়; মন্দ হয় না। তবে কপিরাইট আইনে এই জাতীয় রচনায় আইনগত অধিকার কার?

মনে হয় এই জগতের কোথায় কি আছে, যার রহস্য আমরা জানি-না। ক্যানাডীয় মহিলার অনুলিখিত নাটক আমরা পড়িনি, যারা পড়েছেন তারা তার মধ্যে যথেষ্ট সাহিত্যগুণ এবং লিপিকুশলতার পরিচয় পেয়েছেন।

পরলোকের কথা অতিশয় বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। বিশ্বাস করি না এই কথা বলাও যেমন সহজ তেমনই বিশ্বাস

সমস্যাসঙ্কুল ও দূর্নীতিপীড়িত বর্তমান যুগে

বিশেষ আকর্ষণ!

যুগপদরূষোত্তম খ্রীষ্টীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অমৃতবর্ষী বাণীনিচয়ের পরিবেষণ।

- ১। সত্যানুসরণ—এই অমূল্য গ্রন্থ জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই নিত্য পঠনীয়। হীরকখণ্ডের ন্যায় দূর্নীতিমান উপদেশগুলি বিভ্রান্তির পথে আলোক দেখায়; এই জন্য গ্রন্থখানি ছাত্র সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।
- ২। আলোচনাপ্রসঙ্গে—খ্রীষ্টীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথনের অভিনব সঙ্কলন। “আলোচিত গ্রন্থ অনুকূলচন্দ্রের তত্ত্ব-কথার মহাভারত বলা যায়।” —দৈনিক বসুমতী। ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড।
- ৩। নানাপ্রসঙ্গে—মানবমনের বিভিন্ন, প্রশ্নের—ঈশ্বর, আত্মা, ধর্ম, কর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধে প্রশ্নের অপূর্ব সমাধান। ১—৪র্থ খণ্ড।
- ৪। কথা প্রসঙ্গে—খ্রীষ্টীঠাকুরের নিজ জীবনে অনুভূত, আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিগূঢ় দর্শনসমূহের অপূর্ব ও বিশদ বর্ণনা। ১ম—৩য় খণ্ড।
- ৫। ইসলাম প্রসঙ্গে—সাম্প্রদায়িক বিরোধে খ্রীষ্টীঠাকুরের মীমাংসাবাণী প্রেরিত পদ্রুপের নির্দেশগুলির সত্যসম্প্রদায়ী বিশ্লেষণ।
- ৬। চলার সাথী...সমস্যা সমাধানে ও চরিত্র গঠনে যুগগুরু অমোঘ নির্দেশ।
- ৭। নারীর নীতি—নারী কেমনতর চলনায় চলে সংসার শান্তিময় হয়—তারই অপূর্ব নির্দেশ।
- ৮। নারীর পথে—প্রশ্নোত্তরে নারী জীবন সম্বন্ধে জটিল বিষয়সমূহের আলোচনা।
- ৯। শাস্ত্রবতী—সুত্রাকারে গ্রথিত জীবন চলনার শাস্ত্রবত নীতিমালা।
- ১০। যেমন তাকে দেখি—খ্রীষ্টীঠাকুর/অনুকূলচন্দ্রের রসমধুর লীলা-প্রসঙ্গ—নবযুগের ভাগবত।

প্রাপ্তিস্থান—

সংসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, পোঃ সংসঙ্গ, দেওঘর, জেলা এস-পি। ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২নং কণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স—১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চার্জ স্ট্রীট, কলিং—৯।

করি এই কথাটি উচ্চারণ করাও সহজ। বেতারের যেমন গ্রাহক যন্ত্র আছে এবং প্রেরক যন্ত্র আছে, তেমনই লৌকিক জগতের সঙ্গে অলৌকিক জগতেরও যে যোগসূত্র আছে তা এইভাবে কিছু কিছু ধরা পড়ে। এর মধ্যে অবশ্যই অনেক জুয়াচুরি, ডুন্ডামি প্রভৃতি আছে একথাও যেমন স্বীকার্য, তেমনই এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে চক্রে বসেছেন, সেই চক্রে মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি আবির্ভূত হয়েছেন এর উল্লেখ নিম্নলিখুমারী মহলানবীশকে লিখিত তাঁর চিঠিপত্রে আছে।

Telepathy বা পরচিন্তা-জ্ঞান সম্পর্কে যদি বিশদ গবেষণা করা যায় তাহলে এই আশ্চর্য এবং বিস্ময়কর ঘটনাবলীর একটা রহস্যভেদ করা সম্ভব হয়। যুক্তিগ্রাহ্য কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেখানে অচল সেইখানে এমন অত্যাশ্চর্য কাণ্ড যে কিভাবে সম্ভব তা ভেবে পাওয়া যায় না। Mr. John Langdon-Devis নামক জনৈক মার্কিন বৈজ্ঞানিক রচিত সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থে এই তত্ত্বের উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন—

“Let me say at once that in so far as these faculties exist — telepathy, clairvoyance, precognition and other stranger things still — they are not abnormal, super-normal or supernatural.” তাঁর মতে আমরা বুঝি না বলেই যে এ বস্তু অস্বাভাবিক, অলৌকিক, বা অতি-প্রাকৃত এই ধারণার কোনো হেতু নেই। যা “extra-sensory perception” তার উপযুক্ত বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্লেষণের দ্বারাই এই বিস্ময়কর ঘটনাবলীর যথাযথ অর্থ করা সম্ভব উপেক্ষা বা তাজিল্যের দ্বারা নয়।

বিবাহের

শয্যাপ্রবাস

এর বিবিস্ত প্রতিষ্ঠান

অনুভূতি মল্লিক এও কোঃ
১৬/৪, ধর্মতলা স্ট্রিট কলিকাতা-১৩
ফোন-২৪-৪৭২৮

নতুন বাই

বোদলেয়ার, তাঁর কবিতা—

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু। নাডানা,
৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-
১৩। দাম : আট টাকা।

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, এবং আধুনিক কবিতার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান প্রসঙ্গের সঙ্গে স্মরণীয়। সম্প্রতি ‘বোদলেয়ার, তাঁর কবিতা’ এবং ইতিপূর্বে কালিদাস-রচিত ‘মেঘদূত’ের একটি কাব্যানুবাদ প্রকাশ করে তিনি প্রমাণ করেছেন, কেবল স্বকীয় রচনার দ্বারাই নয়, অনুবাদের ভিতর দিয়েও স্বদেশ এবং বিদেশের কালজয়ী কাব্যসাহিত্যকে আধুনিক বাঙালী পাঠকের সামনে উপস্থিত করে তিনি আমাদের চিত্তপ্রকর্ষ ঘটতে সক্ষম।



অনুবাদ চিরদিনই সাহিত্যোন্নতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা। জীবন্ত প্রাণিদেহ যেমন বাহির থেকে খাদ্য আহরণ করে পুষ্টিলাভ করে, যেকোন জীবিত সাহিত্যই সেইরকম নিজের আয়ত্তের মধ্যে অন্যান্য সাহিত্যকে থেকে বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং রসের উপাদান সংগ্রহ করে। বাংলা সাহিত্যও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কুড়িবার-আলাওলের সময় থেকে সংস্কৃত এবং আরবীয় সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারে প্রচুর ফসল তুলে দিয়ে গেছে। ইংরেজ আগমনের পর ইউরোপীয় সাহিত্য, বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্য অজস্র অনুবাদ এবং ভাবানুবাদের ভিতর দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। এ প্রসঙ্গে, প্রাথমিক প্রয়োজনে রচিত হলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; এবং অনুবাদের বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে স্মরণীয় জ্যোতির্বিদ নাথ ঠাকুর। মধুসূদন দত্ত নিজেকে কোনো অনুবাদ না করলেও তাঁর কাব্যে

ইউরোপীয়-প্রভাব এখন আর গবেষণার অপেক্ষা রাখে না; এবং তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দও যে একটি যুগান্তকারী ‘অনুবাদ’ এ সত্য প্রশ্নাতীত। রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর বছরে পুনরুক্তি-দোষে বিরক্তিকর মনে হবে, কিন্তু প্রভাব এবং প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা ছেড়ে দিলেও নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, অন্তত একটি ইংরেজী কবিতার তিনি সত্যিই অনুবাদ করেছিলেন— যা আদর্শ বলে বিবেচিত। রবীন্দ্রনাথের যুগে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কাব্যসাহিত্য থেকেই রত্নকণা আহরণ করে বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়েছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে শ্রীপ্রমোদ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীবিষ্ণু দের নাম কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু তাঁর আধুনিক সহযোগী বৃন্দের থেকে একটি ব্যাপারে বুদ্ধদেব-বাবুর অনুবাদ গ্রন্থ দু’খানির পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। সে হল অনুবাদের সঙ্গে সংযোজিত সুদীর্ঘ ভূমিকা এবং টীকা। বাস্তবিক এমন যত্ন ও নিষ্ঠা-সহকারে তিনি অনূদিত কবিদের বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন যে সংস্কৃত এবং ফরাসী সাহিত্যে যাদের দখল নেই তাঁরাও কালিদাস এবং বোদলেয়ারকে কবিদের স্ব-স্ব পটভূমিতে বিচার করে প্রকৃত রসানুবাদনে তৃপ্ত হতে পারবেন।

আলোচ্য অনুবাদ-গ্রন্থ ‘বোদলেয়ার, তাঁর কবিতা’ আরো একটি জরুরি কর্তব্য সম্পাদন করবে বলে আমরা বিশ্বাস। এতদিন ইতস্তত অনুবাদ সত্ত্বেও ইংরেজী সাহিত্যে ছিল আমাদের প্রধান প্রেরণা-স্থল। বোদলেয়ারের এই প্রতিনিধি-স্থানীয় অনুবাদ-গ্রন্থের আগমনে ইউরোপীয় ভাবজগতের সর্বাধিক জীবন্ত এবং প্রাণসর অংশ হিসেবে স্বীকৃত ফরাসী সাহিত্যের দরজাও খুলে গেল আমাদের চোখের সামনে। এতে একদিকে যেমন ইউরোপকেও আমরা পূর্ণতরভাবে উপলব্ধি করতে পারব, অন্যদিকে আধুনিক বাংলা কবিতাকেও তেমনই সংবেদনশীল চিত্তে গ্রহণ করা সহজতর হবে।

গ্রন্থের ভূমিকাটি খুবই সুলিখিত এবং টীকাগুলি ইউরোপীয় সাহিত্যে অদীক্ষিত পাঠকের পরম সহায়ক। তাছাড়া এতে আছে, কালপঞ্জি ও বোদলেয়ারের জীবনীপঞ্জি এবং কবি ও তাঁর মানসীদের কয়েকটি রেখাচিত্র ও ফোটোগ্রাফ। কবিতাগুলির অনুবাদের সময় বুদ্ধদেববাবু তাঁর পরিণত কবিত্বজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাই ঢেলে দিয়েছেন, এবং অনুবাদ এক-এক সময় এত সার্থক হয়েছে যে সমস্ত অন্তরাখা

তাতে সায় দিয়ে ওঠে। যেমন 'স্বেতা'
ন্যাসিক কবিতাটি—

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে,
যে আমার উজ্জ্বল উন্মাদ—
অমৃতের দিবা প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার।

বাতাসের সত্তার লবণে
বাঁচায় সে জীবন আমার,
তৃপ্তিহীন আত্মার গহনে
গন্ধ ঢালে চিরন্তনতার।

শাস্বত সৌরভ মাখে হাওয়া
কোঁটো থেকে, কোনো প্রিয় ঘরে;
সংগোপনে, কোনো ভুলে-খাওয়া
ধূপদানি জ্বলে রাতি ভরে।

কেমনে, অন্বেয় প্রেম, ধরি
ভাষায় তোমাকে অবিকার,
এক কণা অদৃশ্য কন্তুরী
অসীমের গহবরে আমার।

সে-উত্তমা, সুন্দরীতমারে,
স্বাস্থ্য আর আনন্দ আমার—
অমৃতের দিবা প্রতিমারে
অমৃতেরে করি নমস্কার।

বইটির মূদ্রণ এবং গ্রন্থন পারিপাট্য
অত্যন্তই তৃপ্তিকর।

আশ্রয় (উপন্যাস) জরাসন্ধ। প্রকাশক
বাক সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা
পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'জরাসন্ধ' বাংলা সাহিত্যের স্বনাম-
ধন্য জনপ্রিয় লেখক। যে অপ্সংখ্যক
লেখক প্রথম গ্রন্থ থেকেই বাংলা
সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভ
করেছেন 'জরাসন্ধ' তাঁদের অন্যতম।
অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাহিত্যিক শক্তিমত্তা ও
নিপিকুলতার আশ্চর্য কৃতিত্বেই তিনি
আজ প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।
তার কাহিন্যের পটভূমিকায় রচিত উপ-
ন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রসারশীল
পটভূমিকায় এক নতুন দিগন্তের সন্ধান
দান করেছে। পরিণত মানসের পরিচয়
'জরাসন্ধের কাহিনীতে পাওয়া যায়।
সেই সঙ্গে আছে সংঘম এবং শালীনতা।
এই পারিমাতিবোধ তাঁর সাহিত্যকর্মের
বৈশিষ্ট্য।

'আশ্রয়' জরাসন্ধের সদ্য প্রকাশিত
উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখকের
স্বকীয় প্রতিভার বিশিষ্ট ভঙ্গীর আশা-
নুরূপ পরিচয় না থাকলেও বৈচিত্র্য এবং
শিল্পতার পরিপূর্ণ ছাপ বর্তমান।
শুভেন্দু আর এষার জীবনের রোদন-
ভরা বার্ষিক ইতিহাস 'আশ্রয়'। কয়লা-
খনির মালিক সোমনাথের প্রথমা স্ত্রীর
সন্তান শুভেন্দুর লেখাপড়ার ব্যবস্থা
হিসে মুরোপীয় ভঙ্গীর স্কুলে। এই-
ভাবে বাড়ি থেকে দূরে সাংসারিক
প্রীতি ও স্নেহবাঞ্ছিত শুভেন্দু বড়
হয়েছে। ধনী-সন্তান শুভেন্দু শেষ

পর্যন্ত সিনেমার তারকা এষাকে বিবাহ
করে বসল, ফলে সোমনাথ বিরক্ত ও
অসন্তুষ্ট হলেন। শুভেন্দুর বৈমাত্রেয়
ভাই দিব্যেন্দু, ব্যাধি-জীর্ণ শরীর নিয়ে
সোমনাথের কাছেই থাকত, সোমনাথের
ম্যানেজার প্রশান্ত এক সূত্রে শুভেন্দুকে
জানিয়ে দেয় যে, সোমনাথ তাকে সম্পত্তি
থেকে বঞ্চিত করা স্থির করেছেন।
সোমনাথের কাছে একদিন শুভেন্দুর
স্ত্রী এষা দেখা করতে এল, শুভেন্দুর
সে খবর জানা ছিল না। সোমনাথ
জানলেন এষা তাঁর এক শুভানুধ্যায়ীর
দৌহিত্রী। তিনি এক পুরাতন প্রেমের
সূত্রে এষার প্রতি স্নেহময় হলেন।
শুভেন্দু পিতার কাছে না এসে অন্যত্র
চাকরী নিল। দিব্যেন্দু অসুস্থ হওয়ার
কলকাতায় এষার সঙ্গে চিকিৎসা-সূত্রে
তাকে আনা হল। সেই সময় অতিরিক্ত
মর্ফিয়া দিয়ে দিব্যেন্দুকে হত্যা করা
হয়, প্রশান্তর পরামর্শেই। ফলে
শুভেন্দুর হল কারাদণ্ড। দীর্ঘ-
কাল কারাবাসের পর ফিরে এসে
শুভেন্দু দেখল এষা তখন দিব্যেন্দুর
স্মৃতি বৃকে নিয়ে বসে আছে। ফলে
শুভেন্দু আবার কারাবরণ করল, আশ্রয়

তার সেইখানেই, সেখানেই শান্ত।
ভাগ্যবিড়ম্বিত শুভেন্দুর জীবনে
নির্জন কারাগারই হল শান্তির নীড়।
সংক্ষেপে এই হল কাহিনী, সুখপাঠ্য
এবং সরল কাহিনী, তবে মনস্তাত্ত্বিক
ঘাত-প্রতিঘাত এবং চরিত্র-চরিত্রের
নিপুণতায় 'জরাসন্ধের এই উপন্যাসটি
নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তা লাভ করবে।
গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও মূদ্রণ সুর্দৃষ্টিসঙ্গত।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

ষষ্ঠি-মধু—সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ।
কুমারেশ ঘোষ কতক ৪৫।এ,
গড়পার রোড, কলিকাতা-৯ হইতে
প্রকাশিত।

'ষষ্ঠি মধু'র এটি দশমবর্ষ দশম
সংখ্যা। অজস্র কার্টুন আর নানাবিধ
হাস্যরসাত্মক রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয়।
এসংখ্যায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নিখিল
ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম
অধিবেশনের কতকগুলি অভিভাষণের
অংশবিশেষ এখানে মূদ্রিত হয়েছে।

আজ
বেকল

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
সুধবৎ নতুন উপন্যাস

শর্বরী

॥ ৫.৫০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

তিন প্রহর ॥ ৩.২৫ ॥

অবধূতের অভিনব উপন্যাস

ফকড়তন্ত্রম্ ১ম পর্ব ॥ ২.৭৫ ॥

ফকড়তন্ত্রম্ ২য় ও ৩য় ॥ ৩.৭৫ ॥

জরাসন্ধের সর্বোত্তম কাহিনী

একুশ বছর ॥ ৩.৭৫ ॥

ইতিহাসের নৃসংসতম খুন্সী

আইখম্যান (২য় সং) ॥ ৩.০০ ॥

নন্দগোপাল সেনগুপ্তর

সমাজ সমীক্ষা : অপরাধ ॥ ৭.০০ ॥

আসন্ন

প্রকাশ : বিভূতিভূষণ মুরোপাধ্যায়ের কন্যা সূত্রী, স্বাস্থ্যাবতী এবং...

শৈলজানন্দের নতুন উপন্যাস

রূপং দেহি ধনং দেহি ॥ ৩.২৫ ॥

মনোজ বসুর সর্বাধুনিক কাহিনী

মায়াকন্যা ॥ ৩.৫০ ॥

ডম্বর ডাক্তার (নাটক) ॥ ১.৭৫ ॥

বনফুলের তিন উপন্যাস

তিন কাহিনী ॥ ৫.৫০ ॥

জসীমউদ্দীনের মধুর স্মৃতিচরণ

ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় ॥ ৩.৭৫ ॥

অমিতাভ চৌধুরীর

মুখের ভাষা, বৃকের রুধির ॥ ৩.৫০ ॥

৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

শ্রেষ্ঠা যুগ

মান্দীকর

আজকের কথা

বর্তমানের ভারতীয় চলচ্চিত্র :

কথ্য উঠেছে, বর্তমানের ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে তেমন 'ভারতীয়ত্ব' নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে হিন্দী ছবি সম্বন্ধে এই কথা উঠলেও আমাদের ঘরের বাংলা ছবিও এই অভিযোগ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আগাগোড়া একখানি ছবি দেখে তার ভারতীয় ভাষায় রচিত সংলাপ এবং কিছু ভারতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া ছবির গল্প বা চরিত্রগুলির মধ্যে কোথাও ভারতীয়ত্বের নামগন্ধ আবিষ্কার করা যায় না, এই সুস্পষ্ট অভিমত এসেছে বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে।

কিন্তু সত্যিকারের "ভারতীয়ত্ব" বলতে আজকের দিনে কোন বিশেষ জীবনধারাকে বোঝায়, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আজকের এই চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে সাধারণ ভারতীয়ত্বের কোনো লক্ষ্য সাধারণ হর নিয়ম করা সম্ভব কি? কে বলে দেবে, "মিস ইন্ডিয়া সৌন্দর্য" প্রতিযোগিতায় যে মেয়েটি তার পরনের শাড়ীর খাঁজে খাঁজে উদ্ভূত যৌবনকে রেখায়িত করে বিচারকদের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাবে, সেই খাঁটি ভারতীয়, না নাগপুরের পার্বত্য-অঞ্চলে আজও যে আদিবাসী রমণী দেহের উপরের ভাগ অনাবৃত রেখে অসংক্ষেপে চলাফেরা করছে, সেই-ই আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয়? যে-নারী স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আজও উদ্ভবধনে প্রাণত্যাগ করছে, সেই ভারতীয়, না যে অন্যায় অত্যাচারকে মুখ বুজে সহ্য না করে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে আদালতের দ্বারস্থ

হচ্ছে, সেই ভারতীয়? সনাতন ভারতীয় প্রথার আজ কোন জিনিসটি চালু রয়েছে, কেউ বলতে পারেন কি? শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার ছিল না; হিন্দুদের মধ্যে পর্দা এবং মুসলমানদের মধ্যে বোরখা প্রচলিত ছিল; বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যে 'কালাপানি' পর হওয়া নিষিদ্ধ ছিল; পুরুষের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল; নারী রজস্বলা হবার পূর্বেই বিবাহিত হওয়া আবশ্যিক ছিল; বর্ণ-হিন্দুদের

দুরূহ ও সময়ের হিসাবে; ফলে মারাত্মক মেরের মার্কিন স্বামী বা বাঙালী ছেলের জামান স্ত্রী হওয়াটা কারুরই চোখে অস্বাভাবিক ঠেকছে না; শব্দরবাবড়ীতে আজ আর অবগুণ্ঠনাবৃত বহু মৃদু পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ায় না, আজ তার স্থান সেই বাড়ীর মেয়ে, তার ননদেরই মত—সে শব্দরকে বাবা, ভাস্করকে দাদা বলে ডেকে দুরূহের ব্যবধানকে লোপ করে দেয়; আবাস কখনও বা নিজের স্বামীটিকে স্থানচ্যুত করে একটি নতুন ফ্যাটে গিয়ে সুখের নীড় বাঁধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাজীব থেকে বাংলা পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতে আসে 'লড়কে লেগে পা' স্থান-এর জিগিরসমূহ ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এবং তারই পরে দ্বিধা-



রাজেন তরফদার পরিচালিত 'অগ্নিশিখা' চিত্রের একটি দৃশ্য

পক্ষে বৃথা মাংসভক্ষণ অনাচার বলে গণ্য হ'ত; বিবাহের পূর্বে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে প্রণয়ের সপ্তার দু'রয়ে কথা চোখের দেখা পর্যন্ত ঘটত না।—এই রকম হাজারো নিয়ম এবং নিষেধের ফিরিস্তি দেওয়া যায় আগেকার ভারতীয় সমাজগুলির, যা আজকের দিনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অচল হয়ে গিয়েছে। আজ অর্থনৈতিক চাপে পড়ে বহু মেয়েকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে উপার্জনের তাগিদে; এ একই কারণে আজ বিবাহের বয়স ১২-১৮ থেকে ২২-২৮ বা তার চেয়েও বেশীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে; সরকার একদিকে পুরুষের একাধিক বিবাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ করেছেন, অপর দিকে বিবাহ-বন্ধনকে শিথিল করেছেন 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' আইন পাশ করে; আজ বিজ্ঞানের কৃপায় ২৪,০০০ মাইল পরিধিবিশিষ্ট পৃথিবী সংকুচিত হয়ে একটি টেনিশবলের রূপ ধারণ করেছে

বিভক্ত ভারতে উদ্ভিত হয় স্বাধীনতার সুখ। স্বাধীন ভারতে কয়েকটি পাঁচ সাল্য পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বহু বিদেশী নানা কার্যব্যাপদেশে যেমন ভারতের গ্রাম-পরিবেশে আস্তানা গেড়েছেন, তেমনই নানারকম বিনিময় পরিকল্পনাসারে ভারতীয়রা শিক্ষা বা

নিম্নলিখিত পুরস্কারপ্রাপ্ত
চতুর্থ প্রযোজিত
৪২, নাবনথ মোড়ের
কলিকাতা-৩০

ডাডনটেন

৫০ ভম রজনী গ্র্যারক উপমর
রচনা-১ মিলন মেন
নির্দেশনা-একন দাশগুপ্ত
মিনার্ভা-১২ই মার্চ '৬২ মজা ৭৮
টিকিট-১, ২, ৩, ৩, ৩

আলো :- তাপস সেন

দক্ষিণ
কলিকাতায়
সাঁড়া
জাগিয়েছে

প্রতি বৃহস্পতি
সন্ধ্যা ৭টার
থিয়েটার
ইউনিট

কুঙ্কুম

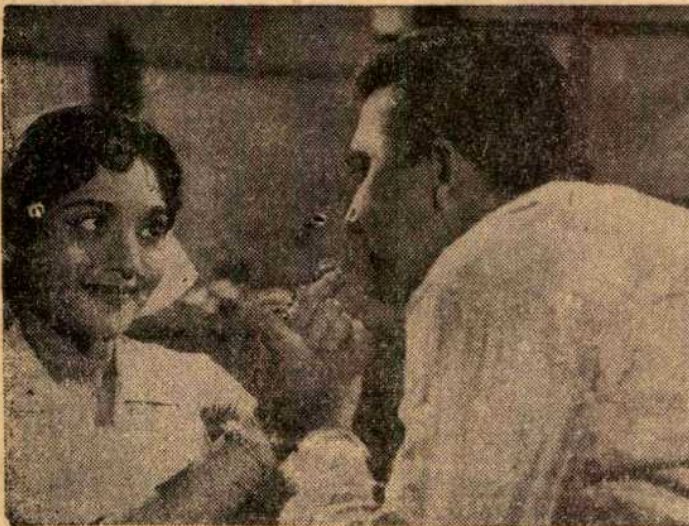
মহারাষ্ট্র নিবাস
১৫, হাজরা রোড
৪৭-৫১৯৫

কর্মক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘন-ঘন যাতায়াত করছেন। বিস্তৃত ভারত-বর্ষের বহুতর জাতি তাদের আচার-ব্যবহারের বিভিন্নতাকে ক্রমেই হারিয়ে ফেলে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে একটা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এ অবস্থায় ভারতের “ভারতীয়ত্ব” ক্রমেই গাঢ় কথার কথাতেই পর্ববাসিত হ’তে চলেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অথবা এই অবস্থায় পরিণত হওয়াই ভারতের “ভারতীয়ত্ব”। কারণ, যুগে যুগে ভারতবর্ষ গ্রীক প্রভৃতি যে-সব জাতিরই সংস্পর্শে এসেছে, তাদের আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, খাদ্য, ভাষা অর্থাৎ সমগ্র সভ্যতাকেই আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যে যা উপহার এনেছে, সবই মিলেমিশে এক হয়ে গেছে—কিছুই ভারত ফিরিয়ে দেয়নি; তাই ভারতের শোণিতে প্রতিনিয়তই বিচিত্র সূর ধ্বনিত হচ্ছে।

আজ বিজ্ঞানের বৃগসম্মিলনে স্বাধীন ভারত তার সমস্ত দেশবাসীকে নিয়ে এক নতুন জাতিতে পরিণত হ’তে চলেছে; ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে এখনও রূপান্তর চলেছে, রূপের পরিণতিতে এসে পৌঁছোয়নি। তাই আজ কি সাহিত্যে, কি সঙ্গীতে, কি চিত্র-কলায়, কি চলচ্চিত্রে—কোনটা ভারতীয় এবং কোনটা ভারতীয় নয়, এ-কথা সঠিকভাবে বলা শূন্য যে অত্যন্ত দুরূহ, তাই নয়; এ-কথা বলবার চেষ্টা করা মৃত্যুর নামান্তর মাত্র।

চিত্র সমালোচনা

ধর্মপুত্র (হিন্দী) : বি, আর, ফিল্মস্-এর নিবেদন; ১০,৮৭৩ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী :



‘কুলা’ চিত্রের একটি বিশেষ মৃদুত বৈজয়ন্তীমালা ও সুন্দর দৃশ্য

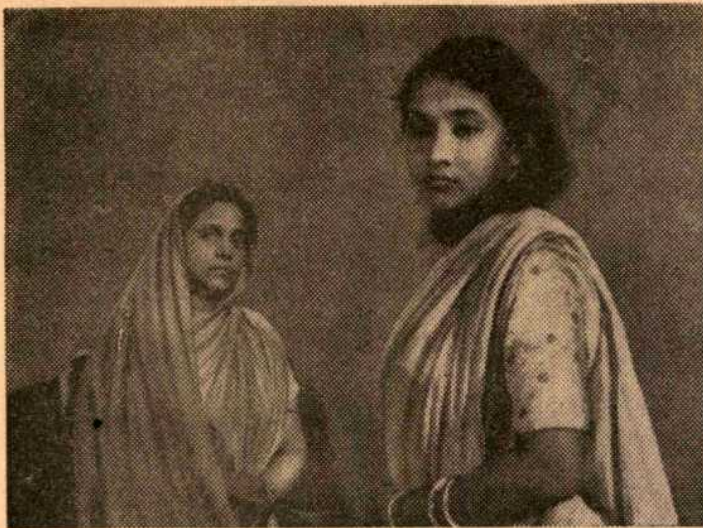


‘উত্তরায়ণ’র একটি মৈত্র ভূমিকায় উত্তমকুমার

আচার্য চতুর্সেন শাস্ত্রী; প্রযোজনা : বি, আর, চোপরা; পরিচালনা : যশ চোপরা; সঙ্গীত-পরিচালনা : এন, দত্ত; গীত-রচনা : শাহির; চিত্রগ্রহণ : ধরম চোপরা; শব্দধারণ : ওয়ালিকার; সম্পাদনা : প্রাণ মেহরা; শিল্পনির্দেশ : সন্ত সিং; সঙ্গীত-গ্রহণ : কৌশিক; রূপায়ণ : নিরুপা রায়, মালা সিংহ, রেহমান, শশী কাপুর, মনমোহন কৃষ্ণ প্রভৃতি। ইন্টার্ল স্যাকিট-এর পরিবেশনায় গেল ২রা মার্চ থেকে ‘প্যারাডাইস, দর্পণা, কৃষ্ণা, কালিকা, মেনকা ও অপরাপর চিত্রগ্রহে দেখানো হচ্ছে।

ধর্মপুত্রের কাহিনী আরম্ভ ১৯২৫ সালে, আর শেষ ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের সময়ে। কাহিনীর মূল বস্তু অত্যন্ত প্রাজ্ঞ এবং প্রাণোন্মাদী সংলাপ ও গানের সাহায্যে ছবির ঘটনার ভিতর

দিয়ে তাকে দর্শকহৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। “ধর্ম তোমার নিজের জিনিস; তুমি যেভাবে ইচ্ছে ঈশ্বরকে ডাকতে পার; কিন্তু দেশ তোমার এক, একই মায়ের সন্তান তুমি”—কাহিনীকার এই কথা বলেছেন ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে। এবং এই কথা বলবার জন্যে এমন চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ করেছেন, এমন সুন্দর হৃদয়গ্রাহী সংলাপ চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান সকল দর্শকই তার তারিফ করেছেন অজপ্ত প্রশংসা ও করতালিসহযোগে। নবাব সাহেবের কন্যা বানুর অবৈধ সন্তান প্রতিপালিত হয় তাঁরই বন্ধুপুত্র ডাক্তার অমৃত রায়ের পুত্ররূপে। পরে সেই অবৈধ সন্তানের জন্মদাতা জাবেদের সঙ্গেই যখন বানুর বিবাহ হয়, তখন বানু তার সন্তানকে ফিরে পেতে চায়; কিন্তু অত্যন্ত দূঃসময়ে বংশের সম্মান-রক্ষা করে যে-ছেলেকে ডাক্তার অমৃত নিজের সন্তান বলে পালন করছেন, তাঁর কাছ থেকে সেই ছেলেকে ফিরিয়ে আনা যায় না, জাবেদের এই কথা বানু বৃদ্ধল। কিছু দিন বাদে ডাক্তার অমৃতের যখন দুই যমজ ছেলেমেয়ে জন্মাল, তখন দৈব-দৃষ্টিবশত বানুর গভস্ত্র সন্তানই যে শূন্য নষ্ট হ’ল, তাই নয়, তার আর কোনোদিন সন্তানসম্ভবা হবার সম্ভাবনা রইল না। এদিকে হিন্দুসম্প্রদায়ের আজাদীর জন্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেতৃত্ব নিয়ে নবাব সাহেব প্রাণ দিলেন পুলিসের গুলিতে; হাতে তাঁর উঁচু করে ধরা ভারতের জাতীয় পতাকা। নবাব সাহেব আর ডাক্তার অমৃতের বাড়ী পাশাপাশি—দুই বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান ঘোচাবর জন্যে দুই বাড়ীর ছাদের মধ্যে পথ তৈরি করে



‘শাস্তি’ চিত্রে অপর্ণা দেবী ও সন্ধ্যা রায়

দেওয়া হয়েছে। এরপর কয়েক বছর কেটে গেছে। ডাঃ অমৃতের পালিত পুত্র দিলীপ এখন ঘোরতর হিন্দু-পূজা, অর্চনা, লেখাপড়া নিয়ে সে থাকে; ধর্ম-হীন আধুনিকতায় তার গা জ্বালা করে; অথচ ডাঃ অমৃতের যমজ দুই ছেলে মেয়ে ঠিক তাই—তারা সহজ স্বচ্ছন্দ আধুনিক জীবনই যাপন করে হেসে-খেলে; ধর্মের অহেতুক কাঠিন্য তাদের সহ্য হয় না। বানুর পরামর্শে ডাঃ অমৃতের মেয়ে দিলীপের সঙ্গে যখন মীনা নামে তার এক বান্ধবীর পরিচয় করিয়ে দেয়, তখন কিন্তু দিলীপের কাঠিন্যের আবরণ ক্ষণতরে সরে যায়। ঠিক এই সময় সারা ভারতে জ্বললে ওঠে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষানল। দিলীপ এই ধর্মোন্মত্ততার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং দু’দিন আগেও যাদের অত্যন্ত আপনার মনে করত,—এবং সত্যিই যারা তার আপনার লোক—সেই বানুদের বাড়ী চড়াও হ’ল। ডাঃ অমৃত ও তার স্ত্রীকেই সে চিরকাল জেলে এসেছে তার বাপ-মা বলে। সেই বাপ-মা যখন তাকে এই দৃশ্যকর্ম বাধা দিলেন, তখন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই সে চেষ্টা করল বানুর বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করতে। এর পর বিচিত্র উত্তেজনার পরিণতিতে মধ্যে যখন সে রবীন্দ্রনাথের গোরার মতই নিজের সত্য পরিচয় জানতে পারল, তখন সে ক্ষোভে, দুঃখে নিজেকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চাইল। তখন সে তার সহকর্মীদের কাছে মূহুর্তে হয়ে দাঁড়াল শত্রু। এই শত্রুভাবাপন্ন সহকর্মীদের সামনে যখন সে বলিস্বরূপ মাথা পেতে দাঁড়াল, তখন তার আসল মা বানু এল তাকে বর্মের মত রক্ষা করতে। অবশ্য সময়মত সঙ্গীন্দ্রধারী সেপাহীর দল এসে পড়ায় সকল দিক রক্ষা হ’ল এবং ভারত-

বিভাগের মধ্যে দিয়ে গম্পেরও ঘটল সমাপ্তি।

ছবিটিতে হিন্দু-মুসলমানের দাওয়া ও ভারত-বিভাগের দৃশ্যে বহুবার নেহরু, গান্ধী, প্যাটেল প্রভৃতি বরণীয় জননেতাদের দেখানো হয়েছে এবং দেশ-ত্যাগের দৃশ্যও অত্যন্ত বিরাটভাবে দর্শকসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মাত্মতার ফলে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে চিরকালের মত শত্রু হয়ে যাওয়া

যে-কি মর্মস্তুদ প্রোজেডী, তা এই ছবি-খানি অত্যন্ত পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করেছে। ধর্ম চোপার চিত্রগ্রহণের কাজ সর্বত্রই একটি উচ্চমান বজায় রাখতে পেরেছে। ছবিতে দেশাত্মবোধক এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক যে-কয়টি গান আছে, তার প্রত্যেকটিই রচনা, সুর ও গায়ার গুণে হৃদয়গ্রাহী। এ ছাড়া প্রেম-সংগীতের মধ্যে অত্যন্ত নিম্নকণ্ঠে গাওয়া “ভুল স্কতা হয় ভলা কোন য়ই প্যারী আখে” গানখানির জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী।

অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নবাব সাহেবের ভূমিকায় রেহমান। তার চলন, বলন, অঙ্গভঙ্গী উচ্চাঙ্গের নাট্যনৈপুণ্যের পরিচায়ক। ডাক্তার অমৃত রায়ের স্ত্রীর ভূমিকায় নিরুপা রায় অত্যন্ত দরদর সঙ্গে অভিনয় করে দর্শক-সহানুভূতি লাভ করেছেন। মালা সিংহকে প্রেমিকারূপে চমৎকার মানিয়েছে; এখানে তার অভিব্যক্তিও সুন্দর। কিন্তু যুবক দিলীপের মা হিসেবে তাঁকে যেমন খুব মানায়নি, তেমনি সেখানে মাতৃসুলভ ভাবভঙ্গীরও কিছু অভাব ঘটেছে। তবে একেবারে শেষের উত্তেজনার অংশে তিনি স্বাভাবিক ক্ষিপ্তকারিতার পরিচয় দিয়ে বানুর মাতৃহৃদয়কে উন্মোচিত করতে পেরেছেন। দিলীপের ভূমিকায় শশী কাপূর চরিত্রানুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন। ডাঃ অমৃতের ভূমিকায় মন-



বি আর ফিল্মসের হিন্দীচিত্র ‘ধর্মপুত্র’ে মালা সিন্হা।

মোহন কৃষ্ণ ও তাঁর গৃহীত ভূমিকার প্রতি
সুবিচার করেছে।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মধুর ভ্রাতৃ-
সম্পর্ক স্থাপনের শতভেদে প্রণোদিত
ছবি হিসেবে “ধর্মপুত্র” সার্থকতা লাভ
করেছে।

বিবিধ সংবাদ

“শিউলি বাড়ী” ও “শান্তি” :

মুভিটক লিমিটেডের নতুন ছবি
“শিউলি বাড়ী” খুব শিগ্গিরই স্ট্রী,
প্রাচী ও ইন্দিরায় মুক্তিলাভ করবে।
সুবোধ ঘোষের “নাগলতা” অবলম্বনে
ছবিখানির জন্যে চিত্রনাট্য লিখেছেন
তপন সিংহ এবং এর পরিচালনা করে-
ছেন পীযুষ বসু। এই ছবিতে প্রধান
শ্রী-চরিত্রে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়াও
অরুণ্ডতী মুখোপাধ্যায় এর সংগীত-
পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।
অপরূপার চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার, ছবি
বিশ্বাস, রঞ্জনা, দিলীপ রায়, গীতালী
রায়, বীরেশ্বর সেন প্রভৃতি। ছবিখানির
পরিবেশনার ভার পেয়েছেন প্রভা
পিকচার্স।

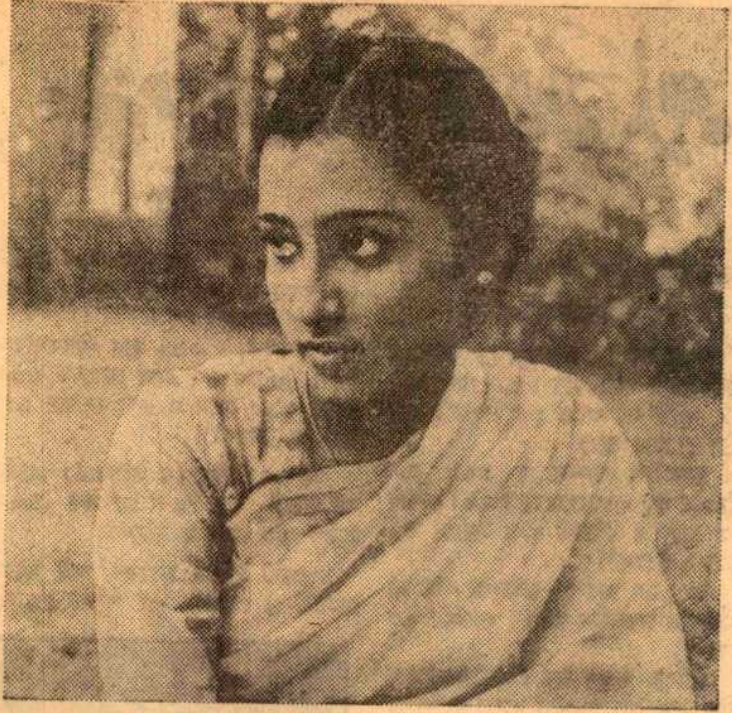
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়
অভিনীত এবং নরেন্দ্র মিত্র লিখিত
“ভবন ডাক্তার” অবলম্বনে রচিত
“শান্তি” ছবিখানি সিনে ফিল্মস
প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনার
শিগ্গিরই মুক্তি পাচ্ছে। ছবিখানির
প্রযোজনা, পরিচালনা, সংগীত পরি-
চালনা ও চিত্রগ্রহণে আছেন যথাক্রমে
চিত্রশোভনা লিঃ, দয়্যাদাই, ওস্তাদ আলি
আকবর খাঁ ও সুধীশ ঘটক।

“ইম্পা”-র ভাঙ্গন :

বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র প্রযোজক
প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান মোশান পিকচার্স
প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সভা-
পতি বিমল রায় সমেত নবীন কর্মকর্তা
অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন স্বাধী-
নৈষী সদস্যের কার্যে বিরক্ত হয়ে পদ-
ত্যাগ করেছেন। অবশ্য মিঃ রুংটা প্রমুখ
অপরূপার সদস্য প্রীয়ারের এই অভিযোগ
স্পষ্ট অস্বীকার করে একটি প্রকান্ড
বাবও দাখিল করেছেন। ভারতীয়
চিত্রজগতে যখন সংহতির একান্ত
আবশ্যকতা তখন “ইম্পা”র এই ভাঙ্গন
অত্যন্ত দুঃখজনক।

স্টারে “শেষাশ্বিন” :

শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবল-
ম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্ত কতক নাট্যা-
কারে গ্রথিত “শেষাশ্বিন”র শত উন্মো-
খন হয়ে গেল, গেল কাল, বহুস্পর্শিত-
বার, ৮ই মার্চ। নাট্যরূপদাতা গ্রীগুপ্ত
দ্বারা এর পরিচালক এবং এতে আত্ম-
প্রকাশ করেছেন কমল মিত্র, অজিত
বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষকুমার, অনুপ-
কুমার বীরেশ্বর সেন, শ্যাম লাহা,



অগ্রগামী পরিচালিত ‘কামা’ ও ‘নিশীথে’ চিত্রে নন্দিতা বসু

প্রেমাংশু বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য,
সুধেন দাস, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা,
লিলি চক্রবর্তী, গীতা দে, সাধনা রায়-
চৌধুরী, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, আশা
প্রভৃতি নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রী।
এবং এঁদের সঙ্গে সম্ভবতঃ প্রথম
মণ্ডাবতরণ করছেন বাসবী নন্দী।

সাদার্শ স্কুল অব মিউজিকের বার্ষিক

অনুষ্ঠান :

গেল ৩রা মার্চ, শনিবার, চৌরঙ্গী
ওয়াই, এম, সি এ, হলে জোসেফ নস্কর
পরিচালিত সাদার্শ স্কুল অব মিউজিক-
এর ১৯তম বার্ষিক যন্তুসংগীত অনুষ্ঠান
হয়ে গেল। শ্রীনস্কর তাঁর স্কুলের ছাত্র-
ছাত্রীদের নিয়ে মোজার্ট, কামিকি,
হাইডন, ক্র্যামার, ব্রাহ্ম প্রভৃতি রচিত
বিখ্যাত সংগীতালেখ্যগুলি গীটার বা
বেহালা সহযোগে পরিবেশন করলেন।
এই সংগে তাঁর নিজের কতকগুলি
রচনাও পরিবেশিত হ'ল। এর মধ্যে রচনা
হিসেবে “ইন্ডিয়ান ক্যাডেট”, “ডল্‌স্‌

কিংকো'র *
আণিকা
হেয়ার অয়েল
প্রতি বরক-কিংকো'র



এম, আর, গি,
ট্রানজিষ্টার রেডিও

মণি রেডিও প্রোডাক্টস

১৫৭বি, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-১০

খেলাধুলা

দশম

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর

ভারতবর্ষ : ৩০৩ রাণ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মঞ্জুরেকার ৮৬, সারদেশাই ৫৮, সুর্তি নট আউট ৫৪, কণ্ট্রাস্টর ৪৬ এবং কুন্দরাম ৪৪)

জামাইকা কোল্টস : ১৩৯ রাণ (মিচেল ৩৮ এবং হেরারউড ২৮। দেশাই ৩১ রাণে ৭ উইকেট এবং বোরদে ৩৯ রাণে ২ উইকেট)

ও ১২৭ রাণ (৬ উইকেটে। মিচেল ৪৯ এবং জনস্টোন ৩১। পর্তোদি ১৩ রাণে ৩)

সাবিনা পার্কে ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম জামাইকা কোল্টস দলের দুদিনের খেলা অসমাপ্তভাবে শেষ হয়েছে। এই খেলায় ভারতীয় দলের এগারজনই ছিলেন টেন্ট খেলোয়াড়।

ভারতবর্ষ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে এবং ৮ উইকেটে ৩০৩ রাণ তুলে প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। জামাইকা কোল্টস দল প্রথম দিন ৩৬ মিনিটের খেলায় ১ উইকেট খুইয়ে ৩৫ রাণ করে।

দ্বিতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ২ই ঘণ্টা আগে জামাইকা কোল্টস দলের প্রথম ইনিংস ১৩৯ রাণে শেষ হলে তারা ১৯৪ রাণে পিছিয়ে পড়ে ফলো-অন করতে বাধ্য হয়।

জামাইকা কোল্টস দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় রমাকান্ত দেশাই ৭টা উইকেট পান—১৭ ওভার, ৫ মেডেন, ৩১ রাণ।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় জামাইকা কোল্টস দলের মাত্র ১ রাণের মাধ্যমে ১ম উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে জনস্টোন এবং মিচেল দলের পতন রোধ করে ৯১ রাণ তুলে দেন। মিচেল উভয় ইনিংসেই নিজ দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ করেন। খেলা ভাঙ্গার নির্ধারিত সময়ে দেখা গেল জামাইকা কোল্টস দলের ৬ উইকেট পড়ে ১২৭ রাণ উঠেছে।

ভারতবর্ষ : ৪০৪ রাণ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কণ্ট্রাস্টর ১৩৯, পর্তোদির নবাব ৮৪, উমরীগড় ৬৭, মেহেরা ৪০ এবং জয়সীমা ৪১। ভ্যালেনটাইন ১০৬ রাণে ২, ওরেল ৩৭ রাণে ২ এবং লেভী ১৩২ রাণে ২ উইকেট)

ও ১৯৩ রাণ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সুর্তি নট আউট ৫৪,

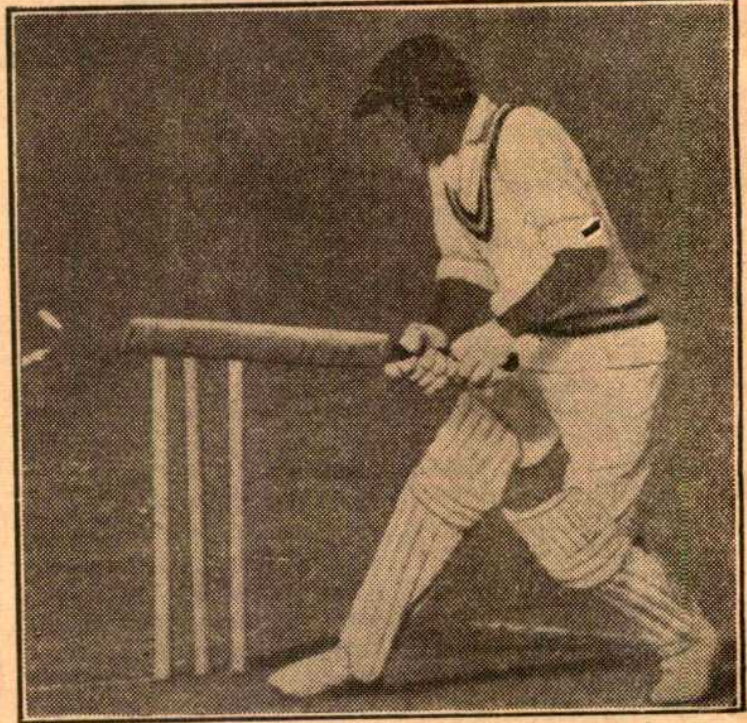
বোরদে ৪০ এবং জয়সীমা ৩১। লেভী ৩৯ রাণে ২ এবং ভ্যালেনটাইন ৫১ রাণে ২ উইকেট)

জামাইকা : ৩৬১ রাণ (ম্যাকমরিস ১৫৪, গ্রিফিথ ৮২ এবং জোসেফ ৩১। প্রসন্ন ১১৮ রাণে ৪ এবং বোরদে ৯৫ রাণে ৪ উইকেট)

ও ১২৯ রাণ (৪ উইকেটে। ওরেল নট আউট ৫৬ এবং জোসেফ ৪৬। সুর্তি ৩৩ রাণে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের এই পঞ্চম খেলাটি ড্র গেছে। এই পাঁচটি খেলার

মিনিটের খেলার দলের ১ম উইকেটে ৬৯ রাণ উঠলে পর জয়সীমা ৪১ রাণ করে আউট হ'ন। জয়সীমা দু'বার আউট হওয়ার থেকে ছাড়ান পেলেও তার খেলা আগের থেকে অনেক ভাল হয়। জয়সীমা তার ৪১ রাণে ৩টে বাউন্ডারী করেন। দলের ১১৩ রাণের মাধ্যমে দলের ২য় উইকেট (মেহেরা) পড়ে যায়। মেহেরা ১২৫ মিনিট খেলে ৪৩ রাণ করে রাণ আউট হ'ন। ৩য় উইকেটে জুটি বাঁধেন কণ্ট্রাস্টরের সঙ্গে পর্তোদির নবাব। ১৪৫ মিনিটের খেলায় ৩য় উইকেটের জুটিতে দলের ১৭১ রাণ ওঠে। চা-পানের সময় দলের রাণ ছিল, ২০১, ২ উইকেট পড়ে। ৩য় উইকেট পড়ে যায় দলের ২৮৪ রাণের মাধ্যমে। পর্তোদি তার ৮৪ রাণে আউট হ'ন, বাউন্ডারী করেন ১৪টা। কণ্ট্রাস্টর ২১০ মিনিটের খেলায় ১৩৯ রাণ করেন, বাউন্ডারী ১৯টা। এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের পক্ষে



আউট : কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেন্ট খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে ওপনিং ব্যাটসম্যান বিজয় মেহেরা স্টেরাসের বলে আউট হয়েছেন।

ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতীয় দলের হার ১ (১ম টেস্ট) এবং খেলা ড্র ৪। অর্থাৎ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল এখনও পর্যন্ত কোন খেলায় জয়লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

কিংস্টোনের মেলবোর্ণ পার্কে শান্তি-শালী জামাইকা একাদশ দলের বিপক্ষে চার দিনের খেলায় ভারতীয় দল টসে জয়লাভ করে এবং প্রথম দিনের খেলায় ৪ উইকেট খুইয়ে ৩২২ রাণ করে। ৮১

প্রথম শ্রেণীর খেলায় এই প্রথম সেঞ্চুরী। ৫ম উইকেটের জুটি উমরীগড় (৫ রাণ) এবং সারদেশাই (শূন্য রাণ) এইদিন নট-আউট থাকেন।

উইকেট ব্যাটসম্যানদের সহায়ক ছিল। জামাইকা দলের ফিল্ডিংয়ে যথেষ্ট গলতি ধরা পড়ে। এর জন্যে জয়সীমা, কণ্ট্রাস্টর এবং পর্তোদির নবাব লাভবান হ'ন।

দ্বিতীয় দিনে সারদেশাই ৫০

মিনিটের খেলায় ২৮ রান করে অসুস্থতার কারণে খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর পর বোরদে (২ রান) এবং সুর্তি (৪ রান) খুব কম রান করে আউট হ'ন। লাঞ্চার সময় স্কার দাঁড়ায় ৪০৯, ৬টা উইকেট পড়ে। দলের ৪২৭ রানের মাধ্যমে উমরীগড় তাঁর ৬৭ রান করে ওরেলের বলে বোল্ড আউট হ'ন। তিনি ১৩২ মিনিটের খেলায় ৬৭ রান এবং তাঁর মধ্যে ৬টা বাউন্ডারী করেন। লাঞ্চার পর ভারতীয় দল ২৫ মিনিট খেলে এবং ৭ উইকেটে ৪৩৪ রান করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। নাদকানী ১০ এবং কুন্দরাম ৪ রান করে নট আউট থাকেন। ৪১৫ মিনিটের খেলায় ভারতীয় দলের এই ৪৩৪ রান ওঠে।

জামাইকা একাদশ দল এই দিনের খেলায় ১ উইকেটে ১৪৯ রান করে। ওপনিং খেলোয়াড়স্বরূপ গ্রিফিথ এবং ম্যাকমারিস পিটিয়ে খেলে ৯৩ মিনিটে ১০০ রান তুলে দেন। ১ম উইকেটের জটিলে গ্রিফিথ এবং ম্যাকমারিস ১৪৮ রান করেন। গ্রিফিথ ৮২ রান করে প্রসন্নর বলে জয়সীমার হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন। ১৪৭ মিনিটের খেলায় তিনি তাঁর ৮২ রাণে ১২টা বাউন্ডারী করেন। ইটোন ম্যাকমারিস (৬১ রান) এবং ডোনাড্ড মিলার (০ রান) নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে জামাইকা দলের নট আউট খেলোয়াড় ম্যাকমারিস এবং মিলার খেলতে নামেন। দলের রান তখন ১৪৯ (১ উইকেট পড়ে)। দ্বিতীয় দিনের তুলনায় এইদিন দুজন খেলোয়াড়ই রান তুলতে বেশ অসুবিধা বোধ করেছিলেন। ৩৫ মিনিটের খেলায় মাত্র ২১ রান ওঠে। দলের ২১১ রানের মাধ্যমে মিলার তাঁর ২৩ রান করে আউট হ'ন উমরীগড়ের বলে। ২য় উইকেটের জটিলে ম্যাকমারিস এবং মিলার দলের ৬৩ রান তুলে দেন, ৮৭ মিনিটের খেলায়। জোসেফস খেলতে নামেন।

লাঞ্চার সময় রান ছিল ২১১, ২ উইকেট পড়ে। ম্যাকমারিসের ৯৭ রান। লাঞ্চার পরই নাদকানী বলে ৩ রান করে ম্যাকমারিস তাঁর শতরাণ পূর্ণ করেন, ২৫০ মিনিটের খেলায়। তাঁর এই শত রানে ১১টা বাউন্ডারী ছিল। লাঞ্চার পরের ৪৫ মিনিটের খেলায় জামাইকা দলের রান দাঁড়ায় ২৫৬ (২ উইকেট)। তখন ম্যাকমারিসের ১১২ রান এবং জোসেফসের ২৮ রান। দলের ২৯৫ রানের মাধ্যমে ৩য় উইকেট পড়ে যায়, জোসেফস ৩১ রান করে আউট হ'ন। ৩য় উইকেটের জটিলে ম্যাকমারিস এবং জোসেফস দলের ৮৪ রান তুলে দেন। চা-পানের সময় জামাইকা দলের রান দাঁড়ায় ৩১৯ (৩ উইকেট পড়ে)। চা-

পানের পরই দলের ভাঙ্গন আরম্ভ হয়। চা-পানের পরবর্তী ৫৭ মিনিটের খেলায় মাত্র ৪২ রান যোগ হয় বাকি ৭টা উইকেট পড়ে।

চা-পানের পর খেলা আরম্ভ হয় এবং কোন রান হওয়ার আগেই দলের ৩১৯ রানের মাধ্যমে ওপনিং ব্যাটসম্যান ম্যাকমারিস বোরদের বল লাফিয়ে পিটতে গিয়ে বোল্ড আউট হ'ন। ম্যাকমারিস ৩৭০ মিনিট খেলে ১৫৪ রান করেন। ওরেলের সঙ্গে ৫ম উইকেটে জুটি বাঁধেন মিচেল। মিচেল ২ রান করলেন; দলের রান দাঁড়াল ৩২১। এই ৩২১ রানের মাধ্যমে প্রসন্নর বল ড্রাইভ করে ওরেল বলটা এক্সট্রাক্টভাবে জয়সীমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েই সাত তাড়াতাড়ি একটা রানের জন্যে দৌড় দিলেন। কিন্তু তাঁর জুড়ি মিচেল এক রান করা অসম্ভব বুঝে নিজের উইকেট ছাড়লেন না। তখন ওরেল নিজের উইকেটের দিকে 'পিউ-মার' করে দৌড়লেন; কিন্তু জয়সীমা ওরেলের উইকেট তাক করে বল ফেরে ওরেলকে রান-আউট করলেন। দলের এই ৩২১ রানের মাধ্যমে আরও দুটো উইকেট পড়ে যায়; ৩২১ রানের মাধ্যমে মোট ৩টে উইকেট পড়ে—৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম উইকেট। জামাইকা দলের প্রথম ইনিংস ৩৬১ রানে শেষ হয়। পারিশ ১৫ রান করে নট আউট থেকে যান। ৩য় দিনের খেলার এক সময়ে দেখা যায় বোরদে ৪টে উইকেট নিয়েছেন ৮.৪ ওভার বল করে মাত্র ১৬ রান দিয়ে। প্রসন্ন এই দিন ৩টে উইকেট পান—মোট উইকেট পান ৪টে।

ভারতীয় দল ৭৩ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলার বাকি সময়ে কোন উইকেট না পড়ে এইদিন দলের ২ রান ওঠে।

চতুর্থ দিনের লাঞ্চার সময় দেখা গেল ভারতবর্ষের রান ৯৮, ৩ উইকেট পড়ে। দলের ৮১ রানের মাধ্যমে কপ্টার (৩য় উইকেট) আউট হ'ন। এই সময় ভারতবর্ষ মাত্র ১৭১ রানে অগ্রগামী ছিল এবং ব্যাট করার মত সক্ষম ছিলেন মাত্র ৪ জন। বোরদে এবং নাদকানী দলের এই ভাঙ্গন কিছু সময়ের জন্যে প্রতিরোধ করেন। দলের ১০১ রানের মাধ্যমে নাদকানী মাত্র ৭ রান করে আউট হ'ন। বোরদের সঙ্গে খেলতে নামেন ন্যাটা খেলোয়াড় সুর্তি। এই ৫ম উইকেটের জটিলে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। ৫ম উইকেটের জটিলে বোরদে এবং সুর্তি ৬০ মিনিটের খেলায় দলের ৭৪ রান তুলে দেন। দলের ১৭৫ রানের মাধ্যমে বোরদে ৪০ রান করে আউট হ'ন। ৬ষ্ঠ উইকেটে সুর্তির সঙ্গে কুন্দরাম খেলতে নামেন। দলের ১৯৩ রানের মাধ্যমে

কপ্টার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সুর্তি ৫৪ রান এবং কুন্দরাম ৭ রান করে নট আউট থাকেন। জামাইকা দলের ফিল্ডিং শেষ দিন মোটেই ভাল হয়নি। এই ফিল্ডিং-এর দোষে ভারতবর্ষ রান করার যথেষ্ট সুবিধা পায়।

দলের ১৯৩ রানের (৫ উইকেটে) মাধ্যমে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর মাত্র ২ ঘণ্টার মত খেলার সময় ছিল। এই ২ ঘণ্টার সময়ে জামাইকা দলের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৬৭ রান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। জামাইকা এই সময়ে ৪ উইকেট খুইয়ে ১২৯ রান করে। সুর্তি ৩৩ রানে ২টো উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। প্রথম ইনিংসের সেগুরী-জুটি গ্রিফিথ এবং ম্যাকমারিসকে সুর্তি আউট করেন। ম্যাকমারিস প্রথম ইনিংসে সেগুরী (১৫৪) করেছিলেন কিন্তু ২য় ইনিংসে শূন্য করে আউট হ'ন। দলের ২৬ রানের মধ্যে ৩টে উইকেট পড়ে যায়। দলের এই শোচনীয় অবস্থায় জোসেফের সঙ্গে দলের অধিনায়ক ওরেল খেলতে নামেন এবং এই ৪র্থ উইকেটের জুটি দলের ১০৩ রান তুলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত খেলা জু করে। জোসেফ ৪৬ রান করে আউট হ'ন। ওরেল ৫৬ রান করে নট আউট থাকেন।

কিংস্টোনের টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ১৯২৯-৩০ সালের টেস্ট সিরিজের ৪র্থ টেস্ট খেলা কিংস্টোনে আরম্ভ হয় ১৯৩০ সালের ৩রা এপ্রিল। এই ৪র্থ টেস্ট খেলাই কিংস্টোনের মাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা। এই ৪র্থ বা শেষ খেলাটি নানা দিক থেকে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই টেস্ট সিরিজের ১ম টেস্ট খেলা জু যায়। ২য় টেস্টে ইংল্যান্ড এবং ৩য় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল জয়লাভ করার খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়। কিংস্টোনের ৪র্থ বা শেষ টেস্ট খেলা তখন বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। স্থির হয়, জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কিংস্টোনের ৪র্থ টেস্ট খেলা চালু থাকবে; অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই খেলা শেষ হবে না। কিন্তু এই খেলায় শেষ পর্যন্ত জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ইংল্যান্ড দলের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিশেষ তাগিদ থাকায় ৯ দিন খেলার পর খেলাটি অমীমাংসিত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। একটানা ৯ দিন খেলা হয়নি; ৩রা এপ্রিল থেকে ৫ই পর্যন্ত খেলা, ৬ই এপ্রিল বিপ্রাম, আবার ৭ই থেকে ১২ই

এপ্রিল—একটানা ৬ দিন খেলা। দীর্ঘতম টেস্ট ক্রিকেট খেলা* হিসাবে এই খেলাটি রেকর্ড* সৃষ্টি করে। ইংল্যান্ড প্রথম ব্যাট করে প্রথম ইনিংসে ৮৪৯ রান তুলে। ফলে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক ইনিংসের খেলায় দলগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হয়।

ইংল্যান্ডের এই বিরাট ৮৪৯ রানের প্রত্যুত্তরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৮৬ রান করে। ইংল্যান্ড ২য় ইনিংসে ২৭২ (৯ উইকেটে) রানের মাধ্যমে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয় খেলার ৯ম দিনে দেখা যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২য় ইনিংসের খেলায় ৪০৮ রান করেছে ৫টা উইকেট খুইয়ে। ইংল্যান্ডের এ স্যান্ডহাম প্রথম ইনিংসে ৩২৫ রান করে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জর্জ হেডলি ২ ইনিংসে ২২৩ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে টেস্ট খেলার এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করেন। এ সব রেকর্ড অবশিষ্ট পরবর্তীকালে ভেঙে গেছে।

কিংস্টোনের মাটিতে শ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য টেস্ট খেলা, ১৯৫৪-৫৫ সালের টেস্ট সিরিজে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৫ম টেস্ট খেলা। এই খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস এবং ৮২ রানে জয়লাভ করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথমে ব্যাট করে প্রথম ইনিংসে ৩৫৭ রান করে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক জনসন দলের প্রথম ইনিংসের ৭৫৮ রানের (৮ উইকেটে) মাধ্যমে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার এই পাঁচজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেন—হার্ডে ২০৪, আর্চার ১২৮, ম্যাকডোনাল্ড ১২৭, বেনো ১২১ এবং মিলার ১০৯। টেস্ট খেলার ইতিহাসে এক ইনিংসের খেলায় এক দলের পক্ষে পাঁচটি সেঞ্চুরী এই প্রথম এবং অস্ট্রেলিয়ার এই বিশ্ব রেকর্ড আজও কোন দল ভাঙতে পারেনি বা অস্ট্রেলিয়ার সমকক্ষতা লাভ করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের এই ৭৫৮ রান (৮ উইকেটে) আবার অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্ট খেলায় রেকর্ড হয়—এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হিসাবে। এই খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্লাইড ওয়ালকট উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১৫৫ ও ১১০ রান) করে একটা টেস্ট

সিরিজে দু'বার টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার যে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো ৭৮ মিনিটে শতরান পূর্ণ করে আধুনিক সময়ের টেস্ট খেলার ইতিহাসে অল্প সময়ের মধ্যে সেঞ্চুরী করার রেকর্ড করেন। উইকেট-কিপিংয়ে বিশ্ব রেকর্ডের সমমর্যাদা লাভ করেন অস্ট্রেলিয়ার জি আর ল্যাংলী। ল্যাংলী প্রথম ইনিংসে ৫ জন (সকলেই 'কট') এবং শ্বিতীয় ইনিংসে ৩ জনকে (সকলেই 'কট') আউট করে একটি টেস্ট খেলায় মোট ৮ জনকে (সকলেই 'কট') আউট করার গৌরব লাভ করেন।

দুই দলের, তিনটি ইনিংসে মোট সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়ায় ৭টা (অস্ট্রেলিয়া ৫ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২)—একটা খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরীর বিশ্ব রেকর্ড। প্রথমবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে (১৯৫২-৫৩) ভারতবর্ষে কিংস্টোনের ৫ম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলা ড্র করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের ৫৭৬ রানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৩টি সেঞ্চুরী—ওয়েল ২৩৭, ওয়ালকট ১১৮ এবং উইকস ১০৯ রান। স্বদেশে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই প্রথম এক ইনিংসের খেলায় ৩টি সেঞ্চুরী করার রেকর্ড করে। তাছাড়া তাদের এই ৫৭৬ রান ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনতিষ্ঠিত টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। এই রেকর্ড অবশিষ্ট পরবর্তীকালের টেস্ট খেলায় মুছে গেছে।

কিংস্টোনের চতুর্থ উল্লেখযোগ্য টেস্ট খেলা—ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্ট (১৯৫৭-৫৮)। এই খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক ইনিংস ও ১৭৪ রানে পাকিস্তানকে শূন্য পরাজিত করেন। কয়েকটি বিষয়ে রেকর্ড স্থাপন করে—তার মধ্যে একটি বিশ্ব রেকর্ড। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ৩২৮ রানের প্রত্যুত্তরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩ উইকেটে ৭৯০ রান করে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই ৭৯০ রান (৩ উইকেটে) এক ইনিংসের দলগত সর্বোচ্চ রান হিসাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে আজও রেকর্ড। এই খেলাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ন্যাটা খেলোয়াড় গারিফল্ড সোবার্স নট আউট ৩৬৫ রান করে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড করেন। ১৯৩৮ সালে ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের লেন হাটন প্রতিষ্ঠিত ৩৬৪ রানের বিশ্ব রেকর্ড নষ্ট হয়ে গিয়ে সোবার্সের রেকর্ড আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৭৯০ রানের মধ্যে হাটের ২৬০ রানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাট এবং সোবার্স ২য়

উইকেটের জুটিতে ৪৪৬ রান করেন; মাত্র ৬ রানের জন্যে তারা ২য় উইকেটের জুটির ৪৫১ রানের বিশ্ব রেকর্ড (পেন্সফোর্ড এবং ব্র্যাডম্যান, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ওভালে, ১৯৩৪) অতিক্রম করতে পারেননি। হাট ২৬০ রান করে রান আউট হন এবং সোবার্স ৩৬৫ রান করে নট আউট থাকেন।

কিংস্টোনে অনতিষ্ঠিত বিগত ১০টি টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ৪ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ১) হার ৩ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২) এবং ড্র ৩ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২ এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১)।

কিংস্টোনের টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯২৯-৩০ : ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ৪র্থ টেস্ট খেলা ড্র।

১৯৩৪-৩৫ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪র্থ টেস্ট খেলায় এক ইনিংস এবং ১৬১ রানে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে।

১৯৪৭-৪৮ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪র্থ টেস্ট খেলায় ১০ উইকেটে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে।

১৯৫২-৫৩ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের ৫ম টেস্ট খেলা ড্র।

১৯৫৩-৫৪ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১২ টেস্ট খেলায় ১৪০ রানে এবং ইংল্যান্ড ৫ম টেস্ট খেলায় ৯ উইকেটে জয়লাভ করে।

১৯৫৪-৫৫ : অস্ট্রেলিয়া ১ম টেস্ট খেলায় ৯ উইকেটে এবং ৫ম টেস্ট খেলায় এক ইনিংস ও ৮২ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে।

১৯৫৭-৫৮ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩য় টেস্ট খেলায় এক ইনিংস এবং ১৭৪ রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করে।

১৯৫৯-৬০ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইংল্যান্ডের ৩য় টেস্ট খেলা ড্র।

৥ অজ্ঞান পুরুষকার ॥

ইস্টার্ন রেলওয়ে দলের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কুশলী খেলোয়াড় হিসাবে ভারত সরকার প্রদত্ত ১৯৬১ সালের 'অজ্ঞান' পুরুষকার লাভ করেছেন। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে এবং ১৯৬১ সালে মালয়ের মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় তিনি ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক স্বরূপে। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৬১ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দল প্রথম সন্তোষ ট্রফি জয়লাভ করে।

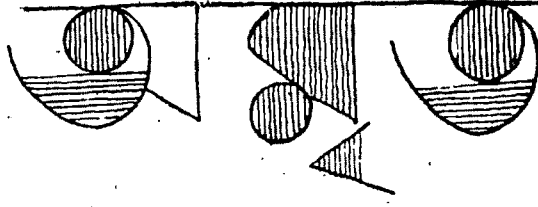
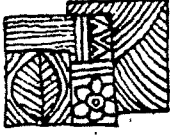
৥ ভ্রম-সংশোধন ॥

গত ৪৩শ সংখ্যা 'অমৃতের' ৩২৫ পৃষ্ঠায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা লিমিটেড' স্থলে 'অমৃতবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড' পড়তে হবে।

* বর্তমানে দীর্ঘতম টেস্ট খেলার রেকর্ড—১০ দিন (ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, ডার্বিন, ১৯৩৮-৩৯)

+ বর্তমানে দলগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড—৯০৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্রোয়ার্ড)—ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ওভালে ১৯৩৮।

অমৃত পবেলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে গ্রীস্মপ্রায় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।



১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৫শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২রা চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 16th March, 1962
40 Naya Paise.

তৃতীয় নির্বাচনের উত্তেজনা শান্ত হ'য়ে এসেছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীমণ্ডলী শপথ গ্রহণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গে। এখন গতদিনের জয়-পরাজয়ের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে সামনে তাকানোর পালা।

সংখ্যাতত্ত্বের জটিল গোলকধাঁসায় না ঢুকেও একটা কথা আমরা সহজেই স্বীকার করে নিতে পারি যে, দেশের জনসাধারণ কংগ্রেসকেই ক্ষমতার আসনে বসার অধিকার দিয়েছেন। সম্ভবত, দেশগঠনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত হ'য়ে পূর্ণতা লাভ করুক এই ইচ্ছাই ব্যক্ত করেছেন ভোটদাতাদের গরিষ্ঠাংশ। মন্ত্রীমণ্ডলীকে সচেতন হ'তে হবে যাতে জনসাধারণের এই ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করে তাঁরা দেশলক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভ করেন।

আমরা জানি, এ কত'ব্য বড় সহজ নয়। স্বাধীনতা-লাভের পর দেশের নানাদিকেই গঠনকর্ম, শুরুর হ'য়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি বহুবিধ সমস্যায় পীড়িত রাজ্যে এ ব্যাপারে চমকপ্রদ সাফল্যের আশা করা অসঙ্গত। কিন্তু মানুষের জীবন ও জীবিকা আজ এতই ভারাক্রান্ত যে, বারেরবারেই তারা প্রতিকারের আশায় উন্মুখ হ'য়ে ওঠে।

গত নির্বাচনে ভোটদাতারা যে যথেষ্ট বেশী সংখ্যায় ভোট দিতে এসেছিলেন তার একটা কারণ বোধ হয় সেইখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ যে-একটিমাত্র উপায়ে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেই ভোটদানের পবিত্র অধিকার বর্ধিত সংখ্যায় প্রয়োগ করে দেশকে দ্রুততর গতিতে বিপন্নতার দিকে নিয়ে যাওয়ার সপক্ষেই রায় দিয়েছেন তাঁরা। নতুন মন্ত্রীমণ্ডলীকে এ বিষয়ে যথেষ্ট ধীরতার সঙ্গে বিচার করে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে।

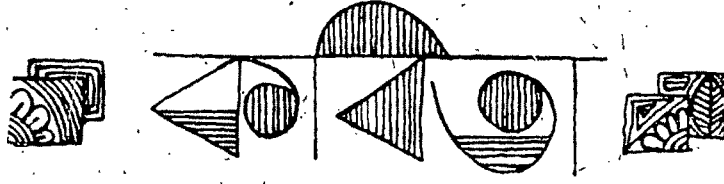
এ রাজ্যের অধিবাসীরা যেসব মৌল সমস্যায় বিব্রত তার পুনরুদ্ধার আমাদের অভিপ্রেত নয়। খাদ্য, গৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়েই করণীয় আছে অনেক কিছুই। কিন্তু একটি ব্যাপারে আমরা বিশেষভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই—তা হল বেকার-সমস্যা।

বর্তমানে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালের দ্বিতীয় বৎসর শুরুর হ'য়েছে। পরিকল্পনার একটি প্রধান লক্ষ্য অবশ্যই দেশে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, কাজ পাওয়ার সুযোগ

যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেলেও তাতে এ রাজ্যের অধিবাসীদের বেকার-সমস্যার সমাধান হয়নি। তার একটা প্রধান কারণ, সম্ভাব্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলিতে রাজ্যবাহিত্র প্রার্থীদের নিয়োগ। ইতিমধ্যে অবশ্য সরকারী দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হ'য়েছে, এবং কর্মলাভের ক্ষেত্রে এ রাজ্যের অধিবাসীদের অগ্রাধিকারও ঘোষিত হ'য়েছে। কিন্তু কার্যকালে এই নীতি কতদূর পালিত হয়, সেইটেই বিবেচ্য।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতা শহর যে অধিকতর পরিমাণে অসন্তোষ-ক্ষুব্ধ, এ দুর্নাম সকলেরই মনে বেদনা সঞ্চার করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো জনভারগ্রস্ত রাজ্যে যদি শিক্ষিত এবং নিরক্ষর এই উভয়বিধ বেকারের সংখ্যাই জ্যামিতিক অনুপাতে বেড়ে চলে তবে শূন্য উপদেশ বা বিদ্রূপের দ্বারা সে অসন্তোষ প্রশমিত করা যাবে কিনা সন্দেহ। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলী তাঁদের ঘোষিত নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করলে এ ব্যাপারে সুফল পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

তাছাড়া এই বিশেষ ক্ষেত্রে তো বটেই, গঠনমূলক কর্মপ্রয়াসের ব্যাপকতর ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলী যে বিরোধী দলগুলির যথেষ্ট সমর্থন লাভ করবেন এটাও খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। অন্যান্য বহু ব্যাপারে মতের অমিল আছে বটে, কিন্তু এই রাজ্যের সমস্ত দলই দেশোন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কার্যকারিতার বিষয়ে একমত। ভারতের অনেকগুলি রাজ্যেই কিন্তু নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি তেমন অনুকূল নয়। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, জাতিগত গোঁড়ামি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অনেক রাজ্যেই। প্রতিক্রিয়ার এই বহুমুখী আক্রমণ দৃষ্টিভ্রান্ত-জনক সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ এই উদ্বিগ্নজনক সমস্যা থেকে মুক্ত। প্রতিক্রিয়াশীল কোনো শক্তিই এখানে জনসমর্থন পায়নি। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ সুস্থ, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে পরিকল্পনামূলক গঠনকর্মের সপক্ষেই রায় দিয়েছেন। কাজেই দেশবাসীর এই অকুপন সহযোগিতায় শক্তিশালী হ'য়ে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীও যে অবিচলিত পদক্ষেপে এক সমৃদ্ধতর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন, এমন আশা করা অসঙ্গত হবে না।



নারী, তুমি উন্মোচিত হও

রাম বসু

যেহেতু হে প্রেম তুমি আর আমি
(নারী, তুমি আলোকিত হও)
যেহেতু হে প্রেম আমি আর তুমি
পরিণত বাসনায় এক বিন্দু হিরণ্ময় অশ্রু;
আত্মার বিপন্ন গর্বে শেষ অঙ্কে আমরা যেহেতু
ভগ্ন সিংহাসনে স্থির, বেলে-পাহাড়ের প্রাক-সন্ধ্যা;
দুরাশার দুধ-নদীর কিনারে খুঁজছি এখনো
একটি সম্পূর্ণ আমাদের
ঝিনুর মতো যা এখনো
সমুদ্রের অবিরল উপাসক মন্ত্র পাঠে মগ্ন :
প্রেম, পল্লবিত হে বৃক্ষ আমার
দৃষ্টি বাহু দিয়ে কাল মাপা ছাড়া গতি নেই আর
এবং সর্বাঙ্গে ধরা ঢেউ নুন রৌদ্রের দহন
যেন অন্ধ হয়ে গেলে
দৃষ্টি হয় গোলাপের চেয়েও নিবিড়
সমস্ত চন্দন বন পড়ে গেলে আকাশের জ্বরে
যেন আর্দ্র নীরবতা হয়ে যায় সূর্যাস্ত-সরনী
কেউ ত জানে না সত্য কি করে জন্মায়
উপমার বাঁকে দৃশ্য অদৃশ্যের মূখ্য দ্যাখে কেন
কেন বা তোমার স্পর্শে আমি হই গোখলির নদী।
নারী, তুমি উন্মোচিত হও ॥

লুপ্তিত বকুল.....

শংকরানন্দ মুনোপাধ্যায়

লালিত সপের শিশু অন্তর্দাহে দৃষ্টি প্রতিদিন
বিষাক্ত ছুরিকা ঐ প্রেমহীন যাতকের ভূমিকা-স্বরূপ
সমস্ত আকাশ ঢেকে কালো মেঘ কালো-পাখা শোন;
সিন্দূরচিহ্ন
সময় হৃদয়ে ঘন নীরবতা মৌন অন্ধকূপ.....
জলশূন্য ঘট, পাত্র.....পূর্ণকলসের সেই প্রতীকী রমণী
মরে গেছে লাস-কাটা-ঘরে, নামহীন মরুভূমি
অগণ্য ব্যর্থতাসহ কুরূপ উটের মত হেঁটে চলে যায়.....
ব্যক্তি ডুবে গেল, তাকে চোরাবাঁলি ঘিরে ধরলো প্রায়;
পাগল হাওয়ায় বাজে ঝোড়ো গান...রাস্তার মাতাল কুকুরীটা
বৃষ্টি দেখে থমকে যায়, আর সেই দোকানীর ফুল
যখন সৌগন্দ্য তার বয়ে আনে সে-মুহুর্তে লুপ্তিত বকুল
ধুলোর সাম্রাজ্যে যেন আলো হতে চায় হতে দীপ্ত
রাজেন্দ্রানী—
দৃষ্টির গভীর ইচ্ছা অতৃপ্তির ছায়া কোন মূকুরের মূখে
নিজের উজ্জ্বল ছবি চিনে নিতে পারে তবু ব্যক্তির
নিবিড়তর সূত্রে ॥



বসন্ত তোমায় ডাকি

কুমকুম দে

আমার সমস্ত মন ভরে গেছে রিঙ্ক বেদনায়
ঝড়ের থাবার নিচে নুয়ে পড়া গাছটার মত—
বিধবস্ত, বিশীর্ণ, জীর্ণ বিদলিত লতায় পাতায়
বসন্ত, তোমায় আমি ডাকি অবিরত!

গোপন কান্নার মত স্তম্ভ সেই প্রতীক্ষা আমার
প্রতিহত হয়ে গেছে অনিরুদ্ধ ঋতুর এ ঝড়ে
তোমার আসার চিহ্ন মূছে গেছে। তবু বারেবার
বসন্ত, তোমায় ডাকি। শীতাত এ প্রচণ্ড প্রহরে ॥

দুবঙ্গ

ডেমিনি

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে
হে প্রবল প্রাণ,.....

এই রবীন্দ্র-সংগীতটি কতোবার গাইতে
শুনোছি আমরা। কিন্তু এর 'নিহিতার্থ'
যে খুব একটা হৃদয়ঙ্গম করোছি এমন
মনে হয় না।

গানটি বৃক্ষবন্দনায় রচিত। অথচ,
সারা পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, বিশেষ
করে এই কলকাতা শহরের গাছগুলোর
কথা ভাবুন, ফার্মারিং স্কোয়ারডের সামনে
চোখবাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে বলে
মনে হবে আপনার।

ইডেন গার্ডেন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে,
কার্জন পার্ক হয়েছে দ্বিখণ্ডিত, কিন্তু
তাতে দৃষ্টিত হলেও শোক-প্রকাশ
করিনি। ইদানীং কয়েক বছর ধরে পথ-
পাশের বড় বড় গাছগুলো যেন ভাবে
দাঁতালো করাতের টানে ধরাশায়ী হচ্ছে
তাতে বিচলিত না হওয়া অসম্ভব।

আমি, জানি, গাছও বড়ো হয়,
তাদের অসুখ করে এবং মারা যায়। কিন্তু
একটি রাস্তায় পর-পর কয়েকটি গাছ
যখন ভবলীলা সংবরণ করে তখন
আশঙ্কা হয়, কোথায় যেন একটা অশুভ
প্রভাব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। হয়তো সেটা
এপিডেমিক, কিংবা আর কিছ্, আমি
জানিনে। কিন্তু দৃষ্টলোকে বলে, 'গাছের
এই দলবন্দ্য মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, তাদের
হত্যা করা হয়। রলা বাহুল্য প্রথমে আমি
এ সব কথা কান দিইনি। কারণ আমি
বুঝতে পারিনি, সংসারে এত রকম কাজ
থাকতে হঠাৎ এই গাছ-মারার 'হবি' পেয়ে
বসবে কেন মানুষকে? কিন্তু পরে
আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, মরা
হাতী লাখ টাকার মতো মরা গাছেরও
দাম অনেক। কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীরা তা জানেন
এবং জানেন বলেই গাছগুলো মরে গেলে
তাঁরা যথেষ্ট অর্থব্যয় করে সেগুলো কেটে
নিয়ে গুদামে তোলেন।

এবং তাঁরা গুদাম-জাত করবেন বলেই
অনেক ক্ষেত্রে গাছগুলোর মৃত্যু ঘটে।
শিকড়ে ঠিক কী দেওয়া হয় এ বিষয়ে
মতভেদ আছে, কেউ বলেন তৃত্তে, কেউ
সংশোধন করে বলেন কারবাইড্। যাই
হোক কিছ্ একটা দেওয়া হয়, এবং
বেখতে দেখতে কয়েকটি বিশাল সবুজ-
পত্র গাছ ক্ষয়রোগীর মতো শূন্য হয়ে
থাকে। তারপর তাদের পাতা খসে, ছাল
ফাটে, ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে তারা পথ-
চারীর বিস্ময় এবং আতঙ্ক উৎপাদন
করতে থাকে। এবং পরিশেষে আসে সেই

বাক - সাহিত্যের বই

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

রবীন্দ্রায়ণ

মজবুত কাপড়ে বাঁধাই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রতি খণ্ডের দাম দশ টাকা
বিকর্ণ-রচিত সুবহুৎ বাস্তবধর্মী উপন্যাস

নৈমিষারণ্য

বাংলা কথা সাহিত্যে উদ্ভাস্ত সমস্যার মতো জন্মের জাতীয় সমস্যাটি
যে উপেক্ষিত হবার নয়, বরং কালজয়ী সাহিত্যের অতিযোগ্য বিষয়বস্তু,
'নৈমিষারণ্য' উপন্যাসটি তাঁর সব প্রথম বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। বৎসরাধিককাল
ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে কাটিয়ে 'বিকর্ণ' ছন্দনামের সংবেদনশীল
কথাসিঙ্গী হাজার হাজার উদ্ভাস্তুর, জীবন-সংগ্রামের বাস্তব চিত্র
এঁকেছেন এই সুবহুৎ উপন্যাসে। প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
'নৈমিষারণ্য' কলির নব-রামায়ণ, নতুন জীবন-সাধনার নতুন উপনিবেশ
রচনার অভিব ইতিকথা। দাম-৯.৫০

গোরাগঙ্গাপ্রসাদ বসুর নতুন রহস্য-উপন্যাস

রক্তের স্বাদ লোনা

সুদৃষ্ট, লেখকের সুবিন্যস্ত রহস্য কাহিনী। এ-কাহিনীর কোনো
নিষাৎ হয় না, আদ্যোপান্ত ঘটনার বিসর্পিততায় ও অবিবাস্য
আকর্ষকতায় বিভ্রান্ত হয়ে এগুতে হয় দুঃস্বপ্ন পরিণতির দিকে।
আর, শেষ পর্যন্ত, সেই অভাবিত পরিণতি, বিহবল বিস্ময়, যার অন্য
কোনো বিশেষণ নেই, বিশেষণ নেই। দাম-৩.০০

নিশিপদ্ম ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪.০০
উপন্যাসিকশ্রেষ্ঠ তারাশঙ্করের গভীর মানবিক আবেদন সম্পন্ন ও
শিল্প-রস-সমৃদ্ধ নতুন উপন্যাস। ১৯৬২ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত ও
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়।

জরাসন্ধের নতুন উপন্যাস

আশ্রয় (২য় মূদ্রণ) ৩.৫০

পাড়ি (৫ম মূদ্রণ) ৩.৫০

সৈয়দ মুজতবা আলীর

শ্রেষ্ঠ গল্প ৪.০০

বিনয় ঘোষের

বিদ্রোহী ডিরোজিও ৫.০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর উপন্যাস

বিদেহী (২য় মূদ্রণ) ২.৫০

ধৃতরাষ্ট্র (নাটক) ২.৫০

রমাপদ চৌধুরীর

চন্দনকুঙ্কুম ২.৫০

বনফুল-এর নতুন বই

দূরবীন ৪.০০

শংকর-এর অসামান্য বই

এক দুই তিন ৪.০০

(চতুর্থ মূদ্রণ নিঃশেষিত প্রায়)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

অগ্নিনিমিত্ত (উপন্যাস) ৫.০০

ডক্টর পদ্মান ঘোষালের

পকেটমার (উপন্যাস) ৪.৫০

নারায়ণ সান্যালের

অন্তলীনা (উপন্যাস) ৫.০০

স্বরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আজ রাজা কাল ফাঁকির

৩.০০

বাক-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

শববাহকের দল, করাতে-কুড়ুলে নিশ্চিহ্ন করে দেয় একটা গোটা শতাব্দীর স্মৃতি।

আমি বৃক্ষবিষারদ নই। নগর-পারিকল্পনার বিষয়েও আমার ধারণা খুবই



ভাসা-ভাসা। কেউ যদি বলেন, বড়ো গাছকে মেরে ফেলা হয় এই জন্যে যে না-মারলে তারা যে-কোনো দিন উপড়ে পড়ে মানুষ মারবে, আমি তার জবাব দিতে পারব না।

তবে একটি কথা আমি বলব, এবং তা সাধারণ একজন পথচারীর ধারণা থেকে। যতো গাছ মরে যাচ্ছে, ততো গাছ কি লাগানো হচ্ছে? না, হচ্ছে না। সাধারণ দৃষ্টিতে কলকাতা যে ক্রমে বৃক্ষ-বিরল হ'য়ে উঠছে এ-বিষয়ে স্মিতের অবকাশ নেই। আমার আপত্তি সেইখানে।

উপরের ঐ রবীন্দ্র-সংগীতের ছত্রগুলি পরীক্ষা করুন, দেখবেন এক মহান বৈজ্ঞানিক সত্য রয়েছে এর আড়ালে। গাছ 'মরু-বিজয়' করে, গাছপালা না থাকলে মাটি ক্রমে মরুভূমি হয়ে যায়। গাছের ঝরাপাতা, মরা শিকড় মাটিতে বালির ভাগ কমিয়ে তাকে শস্যপ্রসবিনী করে, তার অজস্র জীবন্ত-শিকড় মাটিকে আঁকড়ে থেকে বৃষ্টিজলের হাত থেকে ভূমিক্ষয় নিবারণ করে এবং ভবিষ্যৎ অনাবৃষ্টির দিনে রসের জোগান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে নিজের শিকড়ের চারিপাশে বৃষ্টিজলের সঞ্চয় ধরে রেখে মাটিকে সরস করে। তাছাড়া গাছপালার জন্যে হাওয়া স্নিগ্ধ থাকে, এবং বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, গাছের সবুজ আকর্ষণে মেঘগুলোও

বৃষ্টিপাত ঘটায় বেশী পরিমাণে।

কাজেই এ-হেন 'মরু-বিজয়ী' গাছ যে প্রকৃতই মানব-বন্ধু তা আশাকরি তর্ক করে বোঝাতে হবে না।

দিল্লি অঞ্চলে নিবিচারে বৃক্ষহত্যা করার ফলে কী ভাবে রাজস্থানী মরুভূমি আমাদের রাজধানী শহরের দিকে এগিয়ে আসছিল, সে তথ্য আশাকরি সকলেই জানেন। তারপর পরম যত্নে শূন্য হ'য়েছে গাছ লাগানোর পালা।

আমাদের এখানেও আবহাওয়া গত কয়েক বছর ধরে কী রকম উত্তর-পশ্চিম ঝরনের মতো শুষ্ক এবং উষ্ণ হ'য়ে উঠছে তা আশাকরি কাউকে বলে দিতে হবে না। জানি, এখানে 'বন-মহোৎসব' নামে একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান কিছূ-কাল ধরে প্রচলিত হ'য়েছে। কিন্তু তার ফলে বৃক্ষসম্পদ কী পরিমাণে বেড়েছে সেটা অনুসন্ধানের বিষয়। তাছাড়া, এই আনুষ্ঠানিক কর্তব্য বাদ দিলেও, সারা বছরই এক্ষেত্রে করণীয় থেকে যায় অনেক কিছূ।

বৃক্ষরোপণ একদা পুণ্য-কর্ম হিসাবে প্রচলিত ছিল, হিন্দু-সমাজে। আগেকার রাজা-বাদশারাও রাস্তার ধারে গাছ লাগাতেন পাঁথকের সন্নিবিধার জন্যে। শান্তিনিকেতনের দিগন্ত-জোড়া মাঠের মধ্যে আগে যেখানে একটি ছাতিম গাছ এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি তাল-কুঞ্জ ছাড়া আর কিছূই প্রায় ছিল না, সেখানে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বছরের পর বছর ধরে অপার মমতায় একটি ছায়াময় উপবন গড়ে তুলেছেন সে দৃষ্টান্তও চোখের সামনেই রয়েছে। কিন্তু এত জানা সত্ত্বেও কলকাতা উন্নত হ'য়ে উঠছে। যেখানে একটি গাছ মারা যায় বা কাটা হয় সেখানে নতুন গাছ পোঁতা হয় না কেন সে এক বিস্ময়!

এ দায়িত্ব কার আমি জানিনে। সম্ভবত কর্পোরেশনই-এ ব্যাপারের জন্যে দায়ী। তা যদি হয় তবে আমি মুখ বন্ধ করলাম। কারণ পানীয় জল, অচল ড্রেন, সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদি প্রাণঘাতী সমস্যা নিয়ে ঐ অতিকায় প্রতিষ্ঠানটি এতোই আকণ্ঠ নিমজ্জিত যে তাকে গাছের কথা বলা আর 'গাছে তুলে মই টান দেওয়া' প্রায় একই রকম রসিকতা হবে।

কাজেই নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছূই বোধহয় আমাদের করার নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলা এবং এক-একটি মরা গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ার পর সেই অপরিচিত শূন্যতার আকাশের দিকে চেয়ে প্রিয়-বিরোগের বেদনা অনুভব করা! এই আমাদের নিয়তি!

মাথা ধরা, সর্বপ্রকার ব্যাধি ও বেদনা,
সর্দি-জ্বর, ইনফ্লুয়েন্সা প্রভৃতিতে

নিরাপদ
নিশ্চিত ও **এলজিড**
দ্রুত
আরামের জন্য



৫ টি কার্যকরী
উপাদানে
প্রস্তুত

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

জার্মান কবি গ্যেটে

বসন্তধূম্র স্নেহ

প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্য-শিরোমণি গ্যেটে। শেক্সপীয়র সমগ্র ইংরেজ জাতির গৌরব; তেমনি জার্মান দেশের গৌরব গ্যেটে। শেক্সপীয়রের সমগ্র গরিমা তাঁর সাহিত্য-কৃতির ভিত্তিতে, মানুষ হিসাবে সে তুলনায় তিনি নিম্নপ্রভ। কিন্তু গ্যেটের ব্যক্তিগত-গরিমা তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার চেয়েও বড়। তাঁর বহুদুখী প্রতিভা যদি বিভিন্ন বিদ্যানুশীলনে দিকে দিকে প্রবাহিত না হত, তিনি যদি শূন্য কাব্যরচনায় একনিষ্ঠভাবে তাঁর সমগ্র সাধনা নিয়োজিত করতেন তবে কবি হিসাবে ইওরোপের বিশ্বজ্ঞান-সমাজে হোমার এবং শেক্সপীয়রের পরেই তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হতে পারত। কিন্তু তাঁর কবিকৃতিতে তাঁর স্থান-নির্দেশ হয় দান্তে এবং মিল্টনের পরে; যদিও অনেকের মতে কাব্য-প্রতিভায় তিনি উক্ততর স্থানের অধিকারী। গ্যেটের “ফাউস্ট” এক অপূর্ণ সৃষ্টি; তথাপি দান্তের ডিভাইনা কমিডিয়া (Divina Comedia) বা মিল্টনের

প্যারডাইজ লস্ট (Paradise Lost) কাব্যের সহিত তার তুলনা হয় না। তথাপি গ্যেটেকে বলা হয় জার্মানীর শেক্সপীয়র; গ্যেটে শূন্য জার্মানীর গৌরব নন, ইওরোপের অমর কবি-সমাজেও তাঁর আসন অবিসংবাদিত।

গ্যেটে জন্মগ্রহণ করেন ১৭৪৯ সালের ২৮শে আগস্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। ইংল্যান্ডের পক্ষে যেমন লন্ডন, সেই আমলে ফ্রাঙ্কফুর্ট ছিল তেমনি জার্মানীর গৌরবস্থল। নগরটি ছিল প্রাচ্যচণ্ডলতায় মুখর। যেমন পাশ্চাত্য দেশের তেমনি প্রাচ্য দেশেরও বণিকেরা তাঁদের বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টের ব্যবসায়ক্ষেত্রে এসে দেখা দিতেন। গ্যেটের পিতা ছিলেন একজন সম্পন্ন নাগরিক, শিল্প-সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল। ধনী-শক্তির গভীরতা এবং শীলতাও ছিল তাঁর যথেষ্ট। গ্যেটের মা ছিলেন সদানন্দ প্রকৃতির মহিলা। গল্প বলতে তিনি ভালবাসতেন। জগতের প্রতি এবং মানব সমাজের প্রতি তাঁর ছিল উদার দৃষ্টি। গ্যেটের জীবনে এ সকলের প্রভাব বড় সামান্য ছিল না।

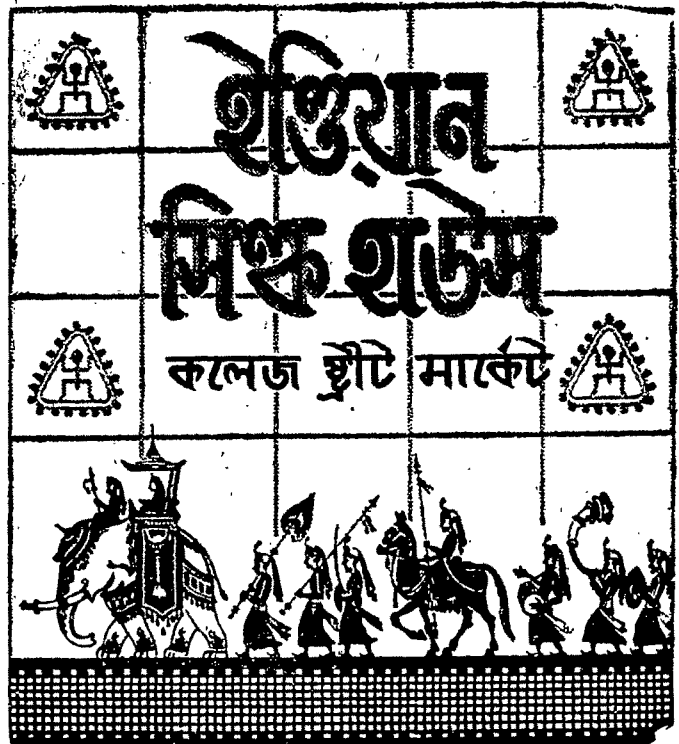
গ্যেটের বাল্যশিক্ষার ভিত্তি ছিল বেশ সুসংগঠিত; শূন্য গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা নয়। তিনি ইংরেজী, ফরাসী এবং ইতালীয়ান ভাষায়ও শিক্ষালাভ করেছিলেন। এই সকল ভাষার মাধ্যমে ইওরোপের সাহিত্য ও চিন্তাজগতের স্ফার তাঁর নিকট উন্মোচিত হতে লাগল।

নারীর যৌবন-লাবণ্য ও সৌন্দর্য-আকর্ষণের মোহ ব্যাপারে গ্যেটের চিত্তে একটি নিদারুণ দুর্বলতা ছিল। জীবনে বহুবার নারীর মোহ-আকর্ষণের ফলে তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে দেখা যায়। তাঁর এই সকল মোহমুগ্ধতার কাহিনী প্রকাশ করতেও তাঁর কিছুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না। তাঁর বয়স যখন পনেরো বৎসরও পূর্ণ হয়নি এমন সময়ে একটি কালিকার সহিত তাঁর প্রণয়-সম্পর্ক ঘটে; কিন্তু এক্ষেত্রে প্রণয়ের ব্যাপারে সার্থকতা লাভ করবার উপায় ছিল না। প্রণয়ে ব্যর্থতার ফলে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই বালিকাটির নাম ছিল গ্রেচেন (Gretchen); গ্রেচেনের স্মৃতি কবির

চিত্তে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যেও স্থানলাভ করেছিল।

গ্যেটে সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর পিতা তাঁকে আইন অধ্যয়ন করবার জন্য লাইপজীক (Leipzig) বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও আইনের চেয়েও কাব্যের প্রতি তিনি সমধিক মনোনিবেশ করেন। এই সময় থেকেই তিনি তাঁর চিত্তের সকল অনুভূতি, আনন্দ, বেদনা সকলই সঙ্গীতে রূপান্তরিত করতে অনুশীলন আরম্ভ করেন; তাঁর কবি-জীবনের অঙ্কুরোদ্গম এইভাবেই আরম্ভ হয় বলা চলে।

ষোড়শ বর্ষ বয়সে লিখিত তাঁর প্রথম কবিতা যীশুখৃষ্টের নরকে অবতরণ (Thoughts on Jesus Christs Descent into Hell) একটি ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ কবিতা বটে, কিন্তু এর মধ্যেও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। দু' বৎসর পরে তাঁর প্রথম নাটক রচিত হয় “প্রেমিকের খেয়াল” (The Lover's Whim). এই নাটকের ভিত্তি তাঁর নিজ জীবনেরই কোনও একটা প্রণয়-কাহিনী। এর পরে রচিত হয় তিন অঙ্কের একটি নাটক “The Accomplice”. এই নাটকখানা মলিয়ার (Moliere) এবং কর্ণাইলের



(Corneille) নাট্যসাহিত্য-পাঠের পরিণতিতে সৃষ্ট। এর পরে গোটে শেক্সপীয়র, লেসিং, হার্ডারের নাট্য-সাহিত্য অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি চিত্র-শিল্পেরও অনুশীলন করেন।

১৭৬৮ সালে ঘটে গোটের জীবনের আর একটি প্রণয় ঘটনা। এই সময়ে জীবনযাপনের অমিতাচারে তিনি আবার গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ফ্রাঙ্কফুর্টের বাড়ীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাড়ীর আবহাওয়ায় এবং অনেকটা তাঁর ভগ্নী কর্ণেলিয়ার প্রভাবে তিনি অবিলম্বে সুস্থ হয়ে ওঠেন। ফ্রাঙ্কফুর্টের সামাজিক জীবনে তাঁর মর্যাদা লাভ হতে লাগল। দেহসৌন্দর্যে তিনি ছিলেন অ্যাপোলো (Apollo), প্রাণশক্তিতে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ, তাঁর বাকবিন্ধ্যিতও ছিল অসাধারণ। সুতরাং নারীর চিত্তে মোহ উৎপাদনের পক্ষে কিছুরই অভাব তাঁর ছিল না। অপর পক্ষে তাঁর চিত্ত ছিল ভাবাবেগের মোহে বিমুগ্ধ, সেখানে ভবিষ্যৎ পরিণাম চিন্তাও স্থান পেত না। একজন সমালোচক নারীর প্রতি মোহমুগ্ধতার সম্পর্কে গোটেকে তুলনা করেছেন টিটিয়ান (Tition) অস্কিত আরিয়েডনি'র (Ariadne) পশ্চাৎদৃষ্ট ব্যাকাসের (Bacchus) সঙ্গে।

১৭৬৯ সালে গোটে স্ট্রাসবুর্গে যান আইন অধ্যয়ন করবার জন্য; এখানেও আইনের চেয়ে সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল সমধিক। এই সময়েও তাঁর জীবনে ভোগস্পৃহা ছিল অত্যন্ত প্রবল; তাঁর জীবন-দর্শন প্রকাশিত হয়েছে এই সময়কার একটি কবিতায়—“যারা জীবনে এসে ভালবাসল না, তাদের পৃথিবীতে না আসাই উচিত ছিল।” স্ট্রাসবুর্গেরই প্রতান্ত প্রদেশে সেনসেনহাইম (Sesenheim) গ্রামে সরল ধর্মব্রাজকের কন্যা ফ্রেডেরিকা (Fredrika) সৌন্দর্য-লাবণ্যময়ী যুবতী; গোটে মুগ্ধ হলেন। অপর পক্ষে গোটেও ছিলেন সুন্দরুণ। ফ্রেডেরিকার পক্ষে তাঁর আকর্ষণও দুর্বীর হয়ে উঠল। গোটের প্রণয়ের আবেগে ফ্রেডেরিকা পল্লবিত এবং মুগ্ধ এবং গৌরবান্বিতও বোধ করলেন। কিন্তু উভয় পক্ষের এত ভাবাবেগ এবং আন্তরিকতা সত্ত্বেও তাঁদের প্রণয় পরিণতি লাভ করল না, সার্থক হতে পারল না। যেমন আরও অনেক ক্ষেত্রে

দেখা গিয়েছে তেমনই এই ক্ষেত্রেও কবি তাঁর প্রণয়ে নিষ্ঠুর পরিচয় দিলেন না। হয়তো আরও কারণ ছিল। গোটে ছিলেন পিতার উপর নির্ভরশীল। পিতা এই বিবাহে সম্মতি দিতেন না নিঃসন্দেহ, অপর পক্ষে এই গ্রাম্য বালিকা স্ট্রাসবুর্গের অভিজাত সমাজে স্বকীয় মর্যাদা হয়তো পেতেন না। গোটে কারও নিকট নিজের অপরাধ-ক্ষালনের জন্য নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য কোনও প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করেননি; কিন্তু নিজের ব্যবহারের সংশোধন ও অনুশোচনায় দৃষ্টি হতে লাগলেন; যুবতী কোনও অভিযোগ বাক্য উচ্চারণ করলেন না। যখন তাঁর সুখ অস্তমিত হল, তখন কবি তাঁর জন্য যে ভাব-জগতের সৃষ্টি করেছেন, ফ্রেডেরিকা তাঁর দয়িতের স্মৃতির চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত সেই জগতে বার হয়ে পড়লেন এবং এই অভিযানে তিনি ছিলেন একক। পরবর্তীকালে যারা ফ্রেডেরিকার পাণিপ্রার্থী হয়ে আসতেন, তাঁদের তিনি বলতেন, যে-হৃদয় গোটের ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছে তাঁর আর কারও প্রাপ্য হতে পারে না।

ফ্রেডেরিকার প্রণয় কবির চিত্তেও গভীর রেখাপাত করেছিল নিঃসন্দেহ। তিনি আত্মজীবনীতে এই বালিকার প্রতি তাঁর হৃদয়ের প্রণয়মুগ্ধতার কাহিনী অত্যন্ত মর্মস্পর্শক ভাষায় লিখে রেখে গেছেন; এবং এই ভাবাবেগের ফলে রচিত হয়েছে জগতের সাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা। একজন সমালোচক বলেছেন যে এই কবিতাগুলি এমনই সুক্ষ্ম সুকুমার রচনা যে অনুবাদে তার মর্যাদা রক্ষা হতে পারে না; অনুবাদে এগুলির প্রকাশ হবে যেন অপটু হাতে ধরার চেষ্টায় বালকের মৃতিতে লাঞ্চিত ছিন্নপক্ষ প্রজাপতি।

গীতিকার্য-রচয়িতা হিসাবেও গোটের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকের মতে গোটে সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকার্য-রচয়িতা। তাঁর এই সকল কবিতা কল্পনার নবীনত্ব এবং শিল্পচাতুর্যে অনেকটা ইংরেজ কবি শেলী এবং টেনিসনের সমানধর্মী; সত্যের দীপ্তিতে এবং ভাবের স্বতঃস্ফূর্ততায় মনে হয় যেন সদ্য কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে, যেমন হয় ফুল থেকে সৌরভের উৎগম। এই সকল গীতিকবিতার মাধ্যমে জার্মান ভাষাও যেন অসামান্য সমৃদ্ধ

লাভ করেছে; ধর্মব্যাখ্যাতা মার্টিন লুথার জার্মান ভাষাকে বিশেষভাবে ভাবপ্রকাশক করে তুলেছিলেন। গোটে সেই ভাষাকে আরও পূর্ণতর পরিণতি দান করলেন। তাঁর প্রতিভাপ্রসাদে এই ভাষার অভূতপূর্ব রূপায়ণ ঘটল। জার্মান ভাষার কলাকৌশল-চাতুর্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর জেলে (Fisherman) কবিতাটি। অনুবাদে অবশ্য ভাষার কারুকার্যের কোনও পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, শুধু কবিতার মর্মকথাটিই ব্যক্ত করা যেতে পারে। যেমন—

কলকল সংগীতে তরতর বেগে বয়ে চলেছে স্ফীত জলরাশি; জেলে বসে আছে, তার দৃষ্টি নিবন্ধ আন্দোলিত ফাতনার দিকে। জলরাশি স্ফীত হয়ে উঠল এবং তার মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়ে এল নারী। সংগীতের ধ্বনিতে সে শূদ্রাল—“মানুষের বৃদ্ধিচতুরতায় প্রলুপ্ত করে আমার মৎস্যকুলকে কেন তুমি নিয়ে আসছ বাহিরের এই মৃত্যুরাজ্যে? স্বচ্ছ জলভলে তারা কি সুখে আছে—যদি তুমি দেখতে পেতে তা হলে তুমিও চিরকালের জন্য ঐ স্বচ্ছ জলতলেই গিয়ে থাকতে কামনা করত। আকাশের সূর্য-চন্দ্রও কি সাগরজলে ডুব দিয়ে আবার স্নিগ্ধ মোহমূর্তিতে দেখা দেয় না? তোমার নিজের মূর্তিও কি স্বচ্ছ জলতলে প্রতি-বিম্বিত হয় না?” জলরাশি স্ফীত হয়ে জেলের চরণ স্পর্শ করল, তার চিত্তে পলক-শিহরণ বয়ে গেল, যেমন হয় প্রণয়ীযুগলের ওষ্ঠাধারের সন্মিলনে। তার সংগীতের মোহ ছিল দুর্বীর। সেই জেলেকে প্রলুপ্ত করে নিয়ে গেল অতলে, আর তাকে দেখা গেল ন।

১৭৭৩ সালে প্রকাশিত হয় গোটের প্রথম বিশিষ্ট নাটক Goetz Von Berlichingen with the Iron Hand. ছোড়শ শতাব্দীর স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীর গোয়েটে'নসকে (Goetz) নিয়ে এই নাট্যরচনা। শেক্সপীয়রের আদর্শে এই নাট্যরচনায় তৎকালে প্রচলিত নাট্যকাব্যের নীতিশৃঙ্খল লঙ্ঘিত হয়। এই নাটকে শেক্সপীয়রের নাটকেরই মত পাত্রপাত্রীগণ চরিত্র-চিত্রণে সজীব মানুসরূপে দেখা দিয়েছে। ১৭৭৪ সালে প্রকাশিত হয় The Sorrows of Werther —

একটি ভাবোচ্ছ্বাসময় কাহিনী। একটি আবেগপ্রধান যুবক বন্ধুপন্থীর প্রতি প্রণয়ে আকৃষ্ট হয়ে প্রণয়ের সাধকতা অসম্ভব বৃত্তে পেরে আত্মহত্যা করে। সামাজিক সম্পর্কের বন্ধন অস্বীকার করেও মানুষের মনোবৃত্তির স্বাধীনতার চিত্র হিসাবে এই কাহিনী সেই সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।

গ্যেটের প্রতিভার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে হুইমারের তরুণ ডিউক Duke Carl August of Sax Weimar) তাঁকে আমন্ত্রণ জানানেন। পরবর্তীকালে গ্যেটের প্রতিভা-দৌলিতে এই হুইমার জার্মানীর সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে। এই স্মৃতিবংশ বর্ষীয় যুবকের ব্যক্তিগত-প্রতিভার হুইমারে যেন সাড়া পড়ে গেল। গ্যেটেকে ছাড়া ডিউকের যেন একদমুও চলে না। ডিউকপন্থী তাঁর বাগ্‌বিভূতিতে মগ্ন। কেউ কেউ গ্যেটেকে অভিহিত করতেন দেবতার মত মানুষ বলে। প্রথম দশ বৎসরে হুইমারে এসে গ্যেটে বিশেষ সাহিত্য-কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। অধিকাংশ সময়ই কেটে যেত আমোদ-উৎসবে। স্থানীয় রংগমঞ্চে তাঁর নাটক অভিনীত হত, তাতে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগদান করতেন। অভিনয়েও অংশগ্রহণ করতেন। এই সময়ে হুইমারে একজন ব্যারনেট-পন্থী ছিলেন। শারলোটে (Baroness Charlotta Von Stein) সুন্দরী, বিদূষী উদার-ভাবাপন্ন। এই মহিলা গ্যেটের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেন; দুঃখে সাহসনা দান করে, অসংগত কর্মচেষ্টার তিরস্কার করে, তাঁর শ্রমের অপনোদন চেষ্টা করে তিনি গ্যেটের জীবনে প্রভূত অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন, যার ফলে কবির আধ্যাত্মিক জীবন কতকটা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

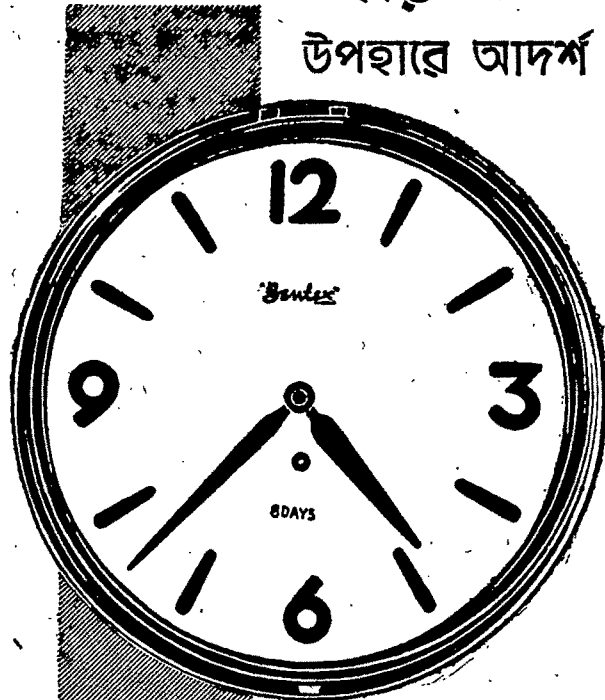
১৭৮৬ সালে গ্যেটে হুইমারের সংসর্গ ছেড়ে দু'বৎসর ইতালীতে গিয়ে ছিলেন। এই ইটালী পর্যটন এবং সেখানে অবস্থান তাঁর জীবনে যেন এক নতুন জগতের আন্বেদন এনে দিল। এই পূণ্যভূমিতে যে জীবনরসধারা অভিব্যক্ত হয়েছিল, যার কল্যাণ ও সৌন্দর্যের সাধন প্রকাশ পেয়েছিল ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের অপূর্ব দীপ্তিতে, গ্যেটের মত রসজ্ঞ শিল্পীর চিত্ত যেন চমৎকৃত হল সেই জগতের মধ্যে এত্রে পড়ে।

গ্যেটে গিয়ে দেখলেন সেই পবিত্র স্থান যেখানে দান্তের দৃষ্টি-সম্মুখে এসে প্রথমবার আবির্ভূত হয়েছিলেন বিয়ান্নিচে, গিয়ে দেখলেন সেই সমাধি যেখানে মাইকেল এঞ্জেলো চিরনিদ্রায় সমাহিত, দেখতে পেলেন র্যাফেলের অমর তুলিকায় অঙ্কিত সুরম্য চিত্রাবলী। তখন তাঁর মনে হল যেন সেইকালের সকল অমর

শিল্পীবৃন্দ এখনও তাঁর চারিদিকে বর্তমান। এই সময়ের স্মৃতিতে তিনি লিখেছিলেন, “যেন এক নতুন জগৎ ক্রমশঃ উন্মুক্ত হয়ে চলেছে আমার সম্মুখে, যা আমি জানতাম তাও যেন এই প্রথম আমার অধিগত হচ্ছে।” এ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিতে এবং সৃষ্টিতে ছিল একমাত্র জার্মানীর ভাবজগৎ এবং জার্মান পরি-

বেনটেক্স ঘড়ি

উপহারে আদর্শ



পছন্দ করার মত
কয়েকটি মডেল।
সবকয়টি মডেলই আমদানী করা
অংশাদি সন্নিবিষ্ট।
চারি অথবা বিদ্যুৎ চালিত
ব্যবস্থা সহ পওয়া যায়।

“Benlex” CLOCKS

নির্ভুল ও দীর্ঘস্থায়ী কাজ

সকল প্রতিষ্ঠিত ডীলারের কাছে পাওয়া যায়।

মেসার্স ডি. গানোব, ... এ-৪৬।৪৭, নিউ মার্কেট
" ইন্ডিয়াস্ট্রিয়াল ওয়াচ এম্পোরিয়াম, এ-৩৩।৩৪, নিউ মার্কেট
" ইন্ডিয়াস্ট্রিয়াল ওয়াচ কোং
" লোবল ওয়াচ কোং
" ডেন্টা টাইম কোং
" এ্যালায়েড ওয়াচ কোং
" ব্যানার্জি স্ট্রাসার্স, ১১৩।১১ বি, রাসবিহারী এ্যাডিন্দ্রা।

বাংলা, বিহার, আসাম ও নেপালের একমাত্র এজেন্ট :-

মেসার্স নরিন্দর নাথ এ্যাণ্ড কোং

পি-৩৬, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১।

ফোন : ২২-২৮২৬

বেশ, এখন তার সঙ্গে এসে যুক্ত হল ক্লাসিক চেতনা এবং ক্লাসিক দৃষ্টি।

ইটালীর প্রভাবে তাঁর প্রথম রচনা ইফিজিনিয়া (Iphigenia)। এটি আগে ছিল একটি গদ্য রচনা। ইটালীর সৌন্দর্যময় পরিবেশে তিনি এটিকে রূপায়িত করলেন সুন্দর নাট্যকাব্যে। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের (Euripidis) কাহিনীতে ইফিজিনিয়া একজন প্রাচীন দেবপূজারিণী। গ্যোটে তাঁকে রূপান্তরিত করেন লাবণ্যময়ী পবিত্রতার আধার এক খুঁটান কন্যারূপে, যার ধর্মচেতনা সেই গ্রীক কবির যুগের চেয়ে আরও অনেক অগ্রসর।

এই সময়ের আর একটি সার্থক রচনা টরকোয়াটো টাসো (Torquato Tasso)। এই নাটকখানার আখ্যায়িকা ইফিজিনিয়ার চেয়ে পরবর্তী যুগের। ঘটনাস্থল প্রাচীন গ্রীস নয়, বর্তমান ইটালী। ইটালীয় কবি টাসো (Tasso) যখন ফেরারী ডিউকের প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন সেই সময়ে ডিউকের ভণ্ডারী প্রতি তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হয়; এই ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক রচিত। এই দু'খানা নাটকই ভাবার সন্মিলন প্রবাহে, ভাবের উৎকর্ষে, চরিত্রচিত্রণে, কবিত্ব-মাদুরে সার্থক রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি। এই দু'খানা নাটকের মধ্যে ক্লাসিক ভাবাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

শেক্সপীয়রের মতো গ্যোটারও চিত্তের অনুভূতি-প্রবণতা ছিল অগাধ। জগতে এমন কিছু ছিল না যা তাঁর চিত্তে এসে স্পন্দন না জাগাত এবং তাঁর চিত্তকে সমৃদ্ধ না করে যেত। আবালবৃন্দবনিতা নির্বিশেষে সকল মানুষ, মানুষের সমাজ, নির্জনতা ও বিহঙ্গণ, গ্রন্থজগৎ এবং

মানুষের জীবনধারা, প্রাচীন জগৎ, আধুনিক যুগ, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান—সকলই তাঁর চিত্তকে স্পন্দিত করত, তাঁর প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করত এবং তাঁর প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করত। তার উপরে ছিল তাঁর ব্যক্তির মহিমা এবং সীমাহীন প্রকাশক্ষমতা।

মানব জীবনের সকল প্রকার ভাব ও সকল প্রকার পরিস্থিতি গ্যোটার সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। মানুষের জীবনপ্রণালী ছিল তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও মননের বিষয় এবং মানুষের জীবনধারার উপরে তাঁর মত আর কেউ এমন শূন্য ও দীপ্ত আলোকসম্পাত করতে পারেননি। তাঁর মননশক্তির প্রগাঢ়তা প্রসঙ্গে অনেকে মতপ্রকাশ করেছেন যে গ্যোটে যদি তাঁর ধীশক্তির সহিত আধ্যাত্মিক বৃত্তিরও অনুশীলন করতেন তবে তিনি হয়ত জগতের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও একজন গুরুস্থানীয় পুরুষ বলে গণ্য হতে পারতেন।

সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও কেউ গ্যোটার সমকক্ষ নেই। আবার শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং প্রশান্ত বিচারক্ষমতার তুলনা হয় না। ম্যাক্স আর্নল্ডের মত বহুশ্রুত সমালোচক গ্যোটে সম্পর্কে মতপ্রকাশ করেছেন, “বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক।”

অন্যদিকে, কেবল শিল্পসম্পর্কিতই নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট বিদ্যাবত্তার পরিচয় রেখে গিয়েছেন। জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, গণিত সকলই তাঁর অনুসন্ধান ও অনুশীলনের বিষয় ছিল। জীব-

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে ক্রমাভিব্যক্তিবাদ (Theory of Evolution) প্রতিষ্ঠা করে বৈজ্ঞানিক ডারউইন (Darwin) অমর হয়ে রয়েছেন, গ্যোটেই তারও পথপ্রদর্শক বলা চলে। গ্যোটে যদি বিশিষ্টভাবে বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করতেন তবে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবেও অমর হয়ে থাকতে পারতেন।

সর্বোপরি গ্যোটে ছিলেন কবি। তাঁর সকল কাব্যকৃতির পরিচয় এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি “ফাউস্ট” (Faust)। এই নাট্য-কাব্যের পরি-কল্পনায় কবির মন বহু বৎসর ব্যাপ্ত ছিল। তিনি কাব্য লিখতে আরম্ভ করেছিলেন ১৭৭৩ সালে, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৯০ সালে; সমগ্র কাব্য সম্পূর্ণকারে প্রকাশিত হয় ১৮০৬ সালে। কাব্যের বিষয় এত ব্যাপক যে অভিনয়ের পক্ষে ঠিক উপযোগী নয়; নাট্য-কাব্য হলেও অভিনয়ের চেয়ে ধরং এটি অধ্যয়নের বিষয়। মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে আছে শৈবতভাব; তার শূন্যবৃত্তি তাকে প্রেরণা দেয় যা কিছু চরম কল্যাণকর তারই অনুশীলন ও সাধনার জন্যে, অপর পক্ষে তার মধ্যেই আছে দুঃপ্রবৃত্তির বীজ, যা ভোগ-বাসনার মাধ্যমে তাকে প্রলুপ্ত করে যত্নসের পাথে। মানুষের চিত্তের এই দুর্বলতাই কাব্য-সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে “শয়তানের” (Satan) পরিকল্পনায়। “ফাউস্ট” কাব্যে নায়ক ফাউস্ট এবং শয়তান-রূপী মেফিস্টোফিলিসের (Mephistopheles) দ্বন্দ্বকে উপলক্ষ করে মানব জীবনের বা মানবাত্মার কাব্যই রচিত হয়েছে বলা চলে।

কাব্যের প্রথমেই আছে প্রস্তাবনা, যেমন দেখা যায় প্রাচীন গ্রীক কাব্যে এবং প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে। প্রস্তাবনাতো আছে নাট্যমণ্ডের অধিকারী, কবি এবং বিদ্বাকের ভূমিকা। ঠিক তারপরেই আর একটি প্রস্তাবনা আছে—স্বর্গরাজ্যে দেবতারা সকলে এসে ভগবানের স্তুতি-বন্দনা করছেন এমন সময় মেফিস্টোফিলিস জানালেন যে এখানে স্বর্গরাজ্যে সকলে সফলতার তৃপ্তিতে মগ্ন হয়ে আছেন বটে, কিন্তু পৃথিবীতে যে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, তার চিত্তবৃত্তির পরিণতিতে সে একটি ব্যর্থসৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে মেফিস্টোফিলিস বললে যে সে ফাউস্টকে দেখেছে। ফাউস্ট জানে গুণে পৃথিবীকে



বিবাহ ও উপহারে
এস. সি. সরকার
গহনা
জুয়েলারী
ফোন-৩৪-৭৪০৩

এস. সি. সরকার ও কোং
জুয়েলার্স

১২০-বি, ৪২ বাজার স্ট্রীট-কলি-১২
২৭৭-১৬৭-বি, ৪২ বাজার স্ট্রীট-কলি-১২

কতকটা সমৃদ্ধ করেছে বটে, কিন্তু তার দুরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নেই। সেজন্যই সে চিরন্তনভাবেই অসুখী, সে ভাগ্যহত। তার নিজের প্রার্থনা অনুসারেই মেফিস্টোফিলিসকে অনুমতি দেওয়া হল সে ফাউস্টকে প্রলুপ্ত করবার চেষ্টা করে দেখতে পারে।

তারপরে মূল কাব্যের আরম্ভ। ফাউস্ট অসামান্য ধীশক্তির অধিকারী, সার্থকভাবে জ্ঞানের অনুশীলন করেছে, সাধনা করেছে, কিন্তু জ্ঞানের সাধনায় সুখের সম্ভান তো পেল না। তখন তার সংকল্প হল সে আত্মহত্যা করবে। তার ফলে বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্মক হয়ে সকল প্রকার মৌলিক পদার্থের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংস্পর্শে এসে হয়ত সে সুখের সম্ভান পেতে পারবে। কিন্তু যখন সে বিষপানে উদ্যত ঠিক সেই মুহূর্তে ইস্টার উৎসবের সঙ্গীতধ্বনি বেজে উঠল, তার স্মৃতিতে এনে দিল তার কিশোর বয়সের কাহিনী যখন ভগবানের কথা এবং স্বর্গের সঙ্গে পৃথিবীর সংস্পর্শের কথা কাল্পনিক বলে মনে হত না। ফাউস্ট দেখতে পেল, উৎসবের শোভাযাত্রা চলেছে শূদ্ধ তরুণ তরুণী নয়, তার মধ্যে আছে সকল শ্রেণীর লোক, ব্যবসায়ী এবং সৈনিক পর্যন্ত। এরা সকলেই তো সুখী। বিশ্বজগতের চিন্তায় তারা ভারাক্রান্ত নয়, পৃথিবীর দুর্ভাবনায় তাদের সুখ-শান্তি তো বিঘ্নিত হয় না—বর্তমানক্ষণের আনন্দে তারা মগ্ন। অপর পক্ষে সে নিজে জ্ঞানের সাধনা করে কি ফল লাভ করল? সে কি আবার নবযৌবন লাভ করে, যৌবনের প্রেমের জীবন লাভ করে সুখের আশ্বাদ লাভ করতে পারে না?

ফাউস্টের এরূপ মানসিক স্বস্তির সময়ে মেফিস্টোফিলিস এসে দেখা দিল। মেফিস্টোফিলিস তাকে আশ্বাস দিল সে ফাউস্টকে দেবে যৌবন, যৌবনের সুখ-সম্পদ এবং যৌবনের আনন্দানুভূতির মোহমাদকতা। ফাউস্ট এ সকলই গ্রহণ করল এবং এর মূল্যস্বরূপ সে মেফিস্টোফিলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করল। মেফিস্টোফিলিস ফাউস্টের আত্মার উপর অধিকার বিস্তার করল এবং তার প্রলোভন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ আরম্ভ করল। মোহ-মাদকতার প্রধান উপায় সুরা এবং নারী। ফাউস্টের মত প্রকৃতির লোক তুচ্ছ সুরার মোহে প্রলুপ্ত হল না; দ্বিতীয়

চেষ্টায় এল সৌন্দর্যের প্রতীক যৌবন-লাবণ্যমণ্ডিত নারী।

মেফিস্টোফিলিসেরই চক্রান্তে ফাউস্টের জীবনে এসে দেখা দিল মার্গারেট। সদা দেবমন্দির থেকে প্রত্যাগতা মার্গারেটের চোখে অপূর্ব সৌন্দর্যের পূর্ণাজ্যোতি, তার নিষ্কলুষ জীবনের সরলতা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যের দীপ্তিতে অপূর্ব মাধুর্য। ফাউস্টের মধ্যেও গুণগরিমার অভাব ছিল না; মার্গারেট তার সরল প্রাণের আবেগে ফাউস্টকে অকৃত্রিমভাবে এবং প্রগাড়াভাবে ভালবাসল এবং সম্পূর্ণভাবে তার নিকট আত্মসমর্পণ করল। ফাউস্টের চিন্তা বীতস্পৃহ ছিল না; তার উপরে ছিল মেফিস্টোফিলিসের প্রভাব; ফাউস্টের প্রেমের প্রভাবে মার্গারেটের জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু মার্গারেটের চিন্তে ছিল ভগবৎভক্তি। সে তার প্রেমাস্পদকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি ভগবান বিশ্বাস কর না?

ফাউস্ট বলল, ভগবান? আমি শূদ্ধ জ্ঞানি আমি তোমাকে ভালবাসি; আমাদের পরস্পরের হৃদয়ের কথা জানি, আমাদের হৃদয়ের আনন্দানুভূতি, আমাদের প্রেম, এই তো জানি, একেই ভগবান সংজ্ঞাও দিতে পার।

মেফিস্টোফিলিসের পরিকল্পনার পরিণতিতে ফাউস্টের প্রেমের আবেগে মার্গারেটের জীবন নিষ্পেষ্ট হয়ে গেল। মার্গারেট জানতে পারল মেফিস্টোফিলিসের পাপচক্রান্তে সে নিজেই হয়েছে তার মা, ভাই এবং সন্তানেরও

মৃত্যুর কারণ বা নিমিত্তভাগী। তথাপি মার্গারেট বরং মৃত্যুবরণ করল তথাপি মেফিস্টোফিলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে স্বীকৃত হল না। মেফিস্টোফিলিস ঘোষণা করল—“মার্গারেটের উপযুক্ত দণ্ডাদেশ হল।” দৈববাণী হল—“মার্গারেটের লাভ হল মৃত্যু।” কাব্যের এইখানেই প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তি। ফাউস্ট এবং মেফিস্টোফিলিস অদৃশ্য হল যেন অন্ধকার এসে তাদের গ্রাস করে ফেলল।

প্রথম খণ্ডে দানবরূপী মেফিস্টোফিলিসের নিকট ফাউস্টের আত্মসমর্পণ; দ্বিতীয় খণ্ডে ফাউস্টের মৃত্যুসাধনায় শূদ্ধ মেফিস্টোফিলিসের বন্ধন থেকে মুক্তি নয়, নিজের অন্তরের মোহ-দুর্বলতা থেকেও মুক্তি। মৃত্যুর উপায় স্বরূপে কয়েকটি স্তরপর্ষায়ে দেখান হয়েছে প্রকৃতির সুস্থতা-বিধায়ক প্রভাব, রাষ্ট্রসেবার কাজে শীলতার অনুশীলন, সৌন্দর্যের প্রভাবে চিন্তাশুদ্ধিসাধন, শ্রমের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত, জনসেবার দ্বারা স্বার্থ-প্রবৃত্তির বিলোপসাধন।

ফাউস্ট নিদ্রাবাসনে দেখল সে এক পুষ্পোদ্যানে শায়িত। বসন্ত সমাগমে প্রকৃতির সৌন্দর্য তার চিত্তেরও স্নিগ্ধতা সম্পাদন করল। তার অন্তরে জেগে উঠল পূর্ণতার জীবনের জন্য সাধনার সংকল্প।

পরবর্তী চিত্রে দেখা গেল ফাউস্ট মেফিস্টোফিলিসের সঙ্গে এসেছে জার্মান সম্রাটের রাজসভায়। রাজ্যের সকল দিকে দূরবস্থা—দারিদ্র্য, অরাজকতা, নীতিধর্ম লঙ্ঘিত, সৈন্যগণের মধ্যে

বেনারসী মাড়ী মেলা

মোহিনী মোহন

কাঞ্চিলাল

এও সন্ত

কলেজ স্ট্রিট জংশন-কলিঃ-৩

ফোন; ৩৪-৪৫২০

বিদ্রোহের পূর্বাভাস। মেফিস্টোফিলিসের দানবীয় শক্তির সাহায্যে ফাউস্ট নতুন অর্থনীতির ব্যবস্থা পুস্তন করে দেশের দারিদ্র্যের প্রতিবিধান ব্যবস্থা করল। সেনাগণের এবং সকলের প্রাপ্য টাকা শোধ করাতে অসন্তোষ-অরাজকতা অপসৃত হল, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পুনরুজ্জীবিত হল, সমগ্র দেশে শান্তির বিধান হল।

সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে এলেন প্রাচীন গ্রীক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-প্রতিমা হেলেন। তাঁর কল্যাণ হস্ত প্রসারিত করে ফাউস্টকে তুলে বসালেন তাঁরই পাশে অপার্থিব জগতের আধিপত্যে। সৌন্দর্যের সঙ্গে হল কল্যাণবৃদ্ধির সমন্বয়।

তারপরে এল যুদ্ধের দৃশ্য। দেশের স্বার্থের জন্য সৈনিকের মৃত্যুবরণ, চিণ্ড-শৃঙ্খলার উপায়।

সর্বশেষে ফাউস্টকে সম্রাট দিলেন সমুদ্রের বেলাভূমির একাধিপত্য। ফাউস্ট বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং নিরলস কর্ম-সাধনার ফলে সমুদ্রের গ্রাস থেকে দেশ উদ্ধার করলেন, সহস্র সহস্র লোকের

বসতি স্থাপিত হল। সাধনার শেষে ফাউস্ট হয়ে দাঁড়াল একজন শ্রমী ও জনগণের উদ্ধারকর্তা।

কর্মবিসানে তার জীবনেরও অবসান হল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মা দানবের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করল। মেফিস্টোফিলিসের দূতেরা চেষ্টা করেছিল ফাউস্টের মৃত্ত আত্মাকে ধরে আনবার জন্য, কিন্তু দেবদূতগণের নিকট তাদের পরাজিত হতে হল।

সর্বশেষ অঙ্কে দেখা গেল স্বর্গ-রাজ্যে ফাউস্টের জন্য অপেক্ষা করে আছে মার্গারেট; প্রেমময়ী মার্গারেটের সুখ পরিপূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ ফাউস্টের উদ্ধারসাধন না হয়। তাই ফাউস্টের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় দেখা গেল মার্গারেটকে, যেমন দান্তের স্বর্গরাজ্যে বিয়াত্রিচে।

ফাউস্ট এক অনন্যসাধারণ কাব্য। নাট্যকারের রচিত হলেও একে রূপক কাব্যও বলা চলে; রূপক বা প্রতীকের মধ্য দিয়ে মানবাত্মার কাব্য বা মানবের জীবনদর্শন। গ্যেটের নিজের স্বীকারোক্তিই আছে যে তিনিও ফাউস্টের ন্যায় জ্ঞানানুশীলনে পূর্ণ-পরিভূষিত পাননি। জীবনের বহু ক্ষেত্রে জীবনসম্ভোগ করতে গিয়ে পরিণামে ব্যর্থ হয়েই ফিরে এসেছেন। ফাউস্টও জ্ঞান-সাধনায় বা জীবন-সম্ভোগেও সুখের তৃপ্তিস্বাদ পেল না। ফাউস্ট দুরাকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্ত, কিন্তু এই অতৃপ্ত যে বিধাতৃ-নির্দিষ্ট বিধাতারই বিধান—Divine discontent! আত্মার মধ্যে যে ভগবৎ প্রেরণা তাতে ভোগসুখে তৃপ্ত হবার নয়। ফাউস্টের আত্মা

ভগবদভিমুখে দিকনির্দেশ পেল না, সেজন্য তাকে সংসারের ভোগসুখে তৃপ্তিকামনা খুঁজতে হল; এবং সে দানবের নিকট আত্মসমর্পণ করতেও কুণ্ঠিত হল না। কিন্তু মানবাত্মার মধ্যে আছে ভগবৎ প্রেরণা, সেজন্য শত প্রকার প্রলোভনে সাময়িকভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকলেও মূল সংপ্রেরণা একেবারে বিলুপ্ত হতে পারে না। সেজন্যই মার্গারেটের প্রেমে আনন্দ-রসানুভূতির যে আশ্বাদ সে পেয়েছিল তাকে ব্রহ্মা-স্বাদসহোদর বলা চলে। সাধনার অবসানে স্বর্গরাজ্যে তারই জন্য মার্গারেটের অপেক্ষা অতিসুন্দর কল্পনা, সেখানে দান্তের বিয়াত্রিচের ন্যায় মার্গারেটই তার দয়িতের পথপ্রদর্শক। নারীকে দেখান হয়েছে স্বার্থবুদ্ধিহীনতা ও ক্ষমা-পরায়ণতার প্রতীকরূপে এবং প্রেমেরও চরম প্রকাশ মূর্তিতে। নারী তার দয়িতের সকল অক্ষমতা বা অন্যায় ক্ষমা করতে সদা প্রস্তুত, তার দয়িত যতক্ষণ তার সঙ্গে এসে সকল সুখের অংশ গ্রহণ না করতে পারে ততক্ষণ তার নিজের সুখভোগেরও পূর্ণ পরিভূষিতসাধন হতে পারে না। তাই গ্রন্থেরও পরি-সমাপ্তি ঘটেছে দুটি ছন্দে এসে যার কোনো তুলনা হয় না—নারী-আত্মা আমাদের নিয়ে চলেছে। চিরন্তনকালের জন্য উর্ধ্বাভিমুখে :

The Woman-Soul leadeth us upward and on.

গ্যেটের সর্বতোমুখী প্রতিভা এক চরম বিস্ময়ের বিষয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কলায় তিনি শৃঙ্খল সমস্ত ইউরোপের সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি আত্মস্থ করেই তৃপ্ত ছিলেন না। তিনি আরবী, পারস্যী ও সংস্কৃত ভাষার কাব্য-সাহিত্যের রসাস্বাদন করে তাঁর নিজের রসানুভূতিতে জরিত করে নিয়েছেন। যে যুগে ভিন্ন দেশ ও জাতি অপরাপর দেশ ও জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতির রসাস্বাদনের পথে এক বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বসংস্কৃতির সূচনা করছিল তখন গ্যেটে সেই সময়কার সমগ্র জগতকে যেন ধারণ করেছিলেন; সত্য সত্যই তিনি ছিলেন একজন যুগশ্রবণ পুরুষ, যেমন ছিলেন স্ক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল, যেমন ছিলেন মধ্যযুগের রোজার বেকন এবং লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci), যেমন ছিলেন বর্তমান যুগের রবীন্দ্রনাথ।

উম্মানথ ভট্টাচার্যের		
নরক	উপন্যাস	৩-৭৫
• যুগ্মী	নাটক	২-২৫
কথকতা		
৩৩সি, নেপাল ভট্টাচার্য লেন, কলি-২৬		

সুখে স্নিগ্ধতা আনে

বোল্যাক্স

ফেস'পাউডার

ব্যারন কস্মোটিক প্রোডাক্টস • কলিকাতা

STAR ISABGOL

FLEA SEED HUSK

SUPERIOR QUALITY

আপনার কোষ্ঠবদ্ধতায় সকল অসুবিধায় একটি নিরাপদ, দ্রুত এবং কার্যকরী প্রতিকার।

Tara Products
CALCUTTA-1.



ঠাকুরমার ঝুলি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত বড়ীটা মরল।

বাড়ির সামনের দুটো মহলে ছোট-ছোট পড়ে গেল। নতুন বয়সের ছেলে-মেয়েরা দৌড়োদৌড়ি করে একজন আর একজনকে খবর দিলে, বড়ী সত্যি সত্যি টেসে গেছে। বাড়ির একটি ছেলে ডাক্তার পড়ে। পড়াশুনা নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত। পিসতুতো বোনের মুখে জ্বলজ্বলে উত্তেজনা দেখেও তার সংশয় গেল না। জিজ্ঞাসা করল, অস্ত্রজেনের নল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বড়ী এতক্ষণে স্বর্গের অস্ত্রজেন টানছে!

ডাক্তার ডেথ্‌ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছে?

পিসতুতো বোন অতশত জানে না। সেও আর একজনের মুখে শুনেই দৌড়ে এসেছে। তাই জোর দিয়ে বলতে হল, হ্যাঁ, সার্টিফিকেট লেখা না হলে যেন বড়ী আবার নড়েচড়ে উঠে বসবে।

নাতির ঘরের দুই ছেলে এক মেয়ে আর নাতনী ঘরের দুই মেয়ে শেষ

পর্যন্ত দল বেঁধে দোতলার এক মহলে হানা দিয়ে দুচোখ টান করে দেখেছে, বড়ীটার আর নড়েচড়ে উঠে বসার সম্ভাবনা নেই বটে। অনেক-বার তারা এই মৃত্যু দেখতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে। ডাক্তারের বাঁচাবার গুরুদ্বন্দ্বীর তোড়জোড় দেখে মনে মনে মুখ বোঁকিয়েছে। ঘুরে ফিরে বারবার বড়ীটাকে জীবনের দরজায় উপস্থিত দেখে মৃত্যুর ওপর তাদের আস্থা যেতে বসেছিল।

বড়ীটা অকৃতজ্ঞও ছিল। যমের এক-একটা হ্যাঁচকা টানার ধকল সামলে উঠে খনখনে গলায় অজানা অচেনা কারো চতুর্দশ পুরুষের উদ্দেশে প্রায়-অশ্লীল কটকটব্য করে, ডাক্তারের উদ্দেশে গালিগালাজ করেছে, আর নাতি নাতবউ নাতনীকে রসনার ঝাঁটায় ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছে। এমন কি উঠতে-বসতে কান্ডজ্ঞানশূন্য যমের পিঠের উদ্দেশেও সম্মার্জনী ছুড়েছে। আর, সব শেষে ঘরের আর এক ততোধিক স্থাবির বৃদ্ধকে যেন নখ-দন্ত মেলে ফালা ফালা

করে দিতে চেয়েছে। বলা বাহুল্য, নখ-দন্ত নেই—বিদারণ কাষাটিও রসনার সাহায্যেই সম্পন্ন হয়েছে। সেই বাণী আর সেই বচনের বোঁশির ভাগ দাস-দাসীদেরই শুনতে হয়। কারণ যার উদ্দেশে বলা তার কানের ওপর দখল একরকম গেছেই।

এই মহলটা বলতে গেলে একটি পরিচারক আর একটি পরিচারিকার হেপাজতে। নাতি নাতনী বা নাতবউ দিনের মধ্যে এক আখবার খোঁজখবর করে যায়। বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত এলে সামনের দরজাটা বন্ধ থাকে। দরজা বন্ধ থাকলে বড়ীর কণ্ঠস্বর এধারে পৌঁছয় না। পৌঁছলে সকলের কান-মাথা কাটা যায়। কারণ সম্মানিত ঘরের কোনো মহিলার কণ্ঠে এমন বিশুদ্ধ অশ্রাব্য সেকেলে গালাগাল একালের কানে গলানো সীসের মত লাগে। নাতির ঘরের ছেলেরাও ভুলেও এ মহলের ধারে-কাছে ঘেঁষে না। কখনো সখনো বড়ীর চোখ কপালে উঠেছে শুনলে দেখতে আসে। কিন্তু এমনি চোখ উঠে অনেক-

বার যমকে কলা দেখাতে দেখে হাল ছেড়ে এখন তাও দেখতে আসে না বড়। নাতির মেয়ে আর নাতনীর মেয়েদুটো মাঝেসাজে উঁকিঝুঁকি দেয়। এসে নিজের নিজের নাম বলতে হয়, নইলে বড়ী সঠিক ঠাওর করতে পারে না কে এলো। নাম ভাঁড়িয়ে মেয়েরা ফটিফটি করে অনেক সময়। আর একজনের নাম বলে দেয়।

কে রে কুমি এলি?

নাতনীর ঘরের বড় মেয়ে কুমলা। ইন্সকুল টপকে সদ্য কলেজে ঢুকেছে। তলায় তলায় রসের কথা শোনায় দিকে ঝোঁক। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেই বোঁশ আসে। কলেজে-পড়া মেয়ে-নাম-বিকৃতির দরুন 'ছ' আগলুল পর্যন্ত জিভ ভেঙিয়েও কোনো সফল পারানি। বড়ী কুমি ছাড়া আর কিছু বলবেই না। কুমলা নামোচ্চারণের একটু বাধাও অবশ্য আছে। বড়ী নিজেই গল্প করছিল। বলছিল, মিনসেটা তো সেই বয়েস-কাল থেকেই কত জ্বালিয়েছে ঠিক নেই, ভিটিকলেমি করে কতবার চোখ কপালে তুলেছে—সতি, সতি, যমে নিজের দিল ভেবে বড়ীর এক-একবার ভয় ধরেছে। তাই সোরাঙ্গীর কল্যাণে ওই নামের ফলটি বাবা বিশ্বনাথের চরণে উৎসর্গ করেছিল একবার। ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয়, কিন্তু বড়ীর সেকেন্দ্রে সংস্কারে নামেও সিকি ভোজন-টোজন হয়ে যায় বোধহয়, সেই জন্যই নাম বর্জিত।

না, আমি নিমি এলাম।

গলার স্বর একটু এদিক ওদিক করে দিলেই বড়ীর ভুল।

আয় নিমি আয়, বোস। কুমিটা আজকাল হাড়বজাত হয়েছ। এদিকে আর আসেই না—মন্দা কলেজে হুট-হুটিয়ে পড়তে যায়, মা-টা তো নিজের দেমাকে জ্বলছে সারাক্ষণ, ডবকা ছুঁড়ী ওদিকে কার সপো রস করে বেড়াচ্ছে কে জানে—

হ্যাঁ রে বড়ী-থুথুড়ি করছে রস—নাম-ভাঁড়ানোর কৌতুক মাথায় ওঠে কুমলার, তোমার খাণ্ডা-কাঠি বড়োর সপো দিনরাত রস করে বেড়াচ্ছে দেখতে পাও না!

বড়ী নিজের ভুল বুঝতে পারে, দন্তশূন্য মুখ-গহ্বর হাসিতে ভরে ওঠে—অ, তুই কুমি—তোরই তবু যা একটু টান আছে, মাঝে মধ্যে আসিস,

আর কেউ তো হাঁদক ভুলেও মাড়ায় না। আয় বোস—

তার বচন শোনার জন্যেই মেয়েরা মাঝে মধ্যে উসকে দেয় তাকে, জিজ্ঞাসা করে, তোমার শরীর কেমন গো?

বড়ীর মুখে বিমর্ষ ছায়া পড়ে তক্ষুনি; হালছাড়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আর শরীর—কালামুখোর একবার দেখা পেলে মুখে নুড়ো জেলে দিতাম, আঁশকাঁটায় বিষ বেড়ে দিতাম—শেকর কাটার জন্য কাঁচি হাতে যত-সব অকালের ঘরের আনাচ-কানাচে ছৌক-ছৌকিয়ে বেড়াচ্ছে—হাঁদক ঘেঁষার নাম নেই।

কালামুখো ব্যক্তিটি স্বয়ং যম। বড়ীর প্রতি দেবতাটির এই অনাসক্তির অভিযোগ মেয়েরা জন্মাবধি শুনতে আসছে। বড়ীর খেদ পুরোপুরি শুনতে হলে এবারে কোন কথা বলতে হবে তাও তারা ভুলেই জানে। মুখ মচকে যমের হয়ে সওয়াল করে তারা, কালামুখো তোমার দিকে ঘেঁষবে কেন শুন—দুর্চারিয়ার মত এই বয়সেও একটা পুরুষমানুষ আঁকড়ে পড়ে আছ, বলতে লজ্জা করে না! শতেক বছর পুরিয়ে আক্কেল দিয়ে তবে যদি যম তাকায় তোমার দিকে।

বড়ীর গালা খনখনিয়ে ওঠে, কি বললি লা আরাগীর বেটীরা, আমি ওই আদিখ্যাতা মিনসেকে আঁকড়ে আছি না ওই হাড়-হাবাতে বড়ো লজ্জার মাথা খেয়ে আমার আঁচল ধরে বসে আছে, অ্যাঁ?

মেয়েরা—সায় দিলেও সেই বাঁকা সুরই ধরবে, বলবে, তা হলেও শুধুমুদ্র যমকে খোঁটা দাও কেন, যমেরও তো দয়ামায়া আছে, তোমাকে নিলে বড়োটার কি দশা হবে, তোমার শোকে বড়োটা যে কেঁদে কেঁদে মরবে।

তাই বল, তাই বল। বড়ীর অসহায় খেদ প্রায় কাম্বার মত শোনায়, তার পরেই পাশের ঘরের বড়োর উদ্দেশ্যে রাগে চিড়িঝড়িয়ে ওঠে, সেই তাপে নিম্প্রভ চোখদুটো আরো শাদাটে দেখায়।—তাই বল তোরা, ওই জনেই যমের অরুচি, সাত যুগ ধরে গায়ে লেপটে থেকেও হাড়হন্দ বড়োর রস যায় না,—কোথায় নিজের হাতে কপালে সিঁদুর লেপে বিদেয় দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসে পর-কালের চিন্তা করবে দুদুন্দ, তা না কিছ হলে তো ডাক ডাক্তার, ডাক বাদ্য—

যেন কোন বোল বছরের রসবতী চোখে ধুলো দিয়ে পালাচ্ছে। আগুন আগুন—রসের নোলায় আগুন জেলে দিতে হয়।

বড়ীর এই রাজ্যাছাড়া খেদ আর উত্তাপের কারণ ছেলেমেয়েরা বা তাদের বাঁপমায়েরা ছেড়ে বাড়ির দাসী-চাকররাও জানে। কারণ, বড়ীর কোঁচকানো কপালের আর কেশ-শূন্য সিঁথির ওই জ্বলজ্বলে সিঁদুর। ওগুলো শেষ পর্যন্ত টিকবে কি টিকবে না ভিতরে ভিতরে বড়ীর সেই স্বন্দর—সেই হাসিও। একের পর এক ফাড়া কাটিয়ে উঠে তার কেমন ধারণা হয়েছে, আশেপাশের ওই সঙ্গীটিই নিতান্ত অবদার আর নিতান্ত স্বার্থপরতার মত মায়ার আকর্ষণে তার উজ্জ্বল যাত্রাপথটি আগলে বসে আছে। ভিতরে ভিতরে এই নিয়েই বহুদিন ধরে একটা বড় রকমের রেষারিষি চলেছে দুজনার মধ্যে—কে আগে যাবে। বড়ীর কিছু হলে বড়ো প্রকাশ্যেই বাস্তব হয়ে ওঠে। আর, বড়োর কিছু হলে বা হবার সম্ভাবনা দেখলে বড়ী তেতে ওঠে। অসুস্থতার কথাটা বড়োর সর্বাগ্রে আবার তাকেই জানানো চাই। শোনামাত্র খনখনিয়ে উঠবেই বড়ী, আমাকে কেন—তোমার তুচ্ছপূর্ব শোনার জন্য চেরটা কাল আমি বসে থাকব নাকি? যারা থেকে চিকিচ্ছে-বাদ্য করবে তাদের ডেকে বললেই হয়!

অর্থাৎ বড়ীর অগ্রগমন অনিবার্য, এ-সব ভাঁওতার ভয় পাবার পাছ নয় সে। ভয় পাক না পাক, মেজাজ সারাক্ষণ চড়ে থাকে সোদিন। নাতি নাত-বো নাতনীকে ডেকে গালাগালি করে, দাসী চাকরের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করে, মেয়ে-গুলোকেও রেহাই দেয় না। বড়ীর বিবেচনায়, সে আর নেই এটাই ধরে নেওয়া সকলের কর্তব্য। সেরকম ধরে নিলে তার সিঁদুরকপালে পাড়ি দেওয়াটা কিঞ্চৎ সহজ হতে পারে বলে বিশ্বাস।

ধরে নিক না নিক বড়োর আগেই গেল বটে বড়ী।

দল বেঁধে দেখতে এসে ছেলেমেয়ে-গুলো হকচকিয়ে গেল কেমন। বহু আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর কোলে শয়ান বৃদ্ধাটিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল তারা। সুন্দরও নয় কদর্যসিতও নয়, অথচ কি এক মহিমা যেন ঘিরে আছে তাকে। হঠাৎ বড়োর দিকে চোখ পড়তে বেশ খতমতই খেয়ে গেল তারা। শ্যামসমন এই মৃত্যুর

করতে পারল না। তারা শোকাচ্ছন্ন নয়, কিন্তু বিচ্ছিন্ন রকমের অন্তর্ভুক্ত লাগছিল তাদের।

সামনে থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে এলো তারা।

জীবনের যে শিখাটি নিবল, সেটি একটানা ছিয়াশী বছর জ্বলছিল। আর কালের বুকে যে বিদায়ী শিখাটি ধুক-পুকিয়ে কাঁপছে এখনো তার বয়েস তিরেনব্দই। কিন্তু বাড়ির সকলের কাছেও তিরেনব্দইয়ের আগে ওই ছিয়াশীর মহাঘাটাই সুবাসিত ছিল। সেই প্রত্যাশার ব্যতিক্রম হয়নি, তাই অনুভূতির রাজ্যে তেমন বড় রকমের কোন আলাড়নেরও কারণ ঘটেনি। তবু বুকের কাছাকাছি কি একটা অজ্ঞাত আবেগের ছোঁয়ায় ভারী অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে নাতনী বিমলা। সেটা শোক নয় ঠিক। বড়ী যত বড়ীই হোক এই চির-বিচ্ছিন্ন মূহুর্তে শোক করা স্বাভাবিক। চিংকার করে কেঁদে উঠলেও সেটা অস্বাভাবিক হত না। চিংকার করে না হোক, ঠাকুমা শেষনিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বিমলা কেঁদেছেও। প্রাচুর্য; অর্থাৎ বড়ীর নাতবউ সুরুটিও কেঁদেছে। কিন্তু বিমলার এই অনুভূতিটা ঠিক শোকের অনুভূতি নয়। কি যে নিজের ঠিক বুঝতে পারছে না। ঠাকুমার শয্যা ছুঁয়ে সে-ই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। মেয়ে কমলা, অমলা বা ভাইপো-ভাইবদের বোবা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়েও সে কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। তারা মৃত্যুকে দেখছিল, আর বিমলার মনে হচ্ছিল মাঝে মাঝে ওরা তাকেও দেখছিল। ওরা চলে যেতে একটু স্বস্তি বোধ করেছে। আরো স্বস্তি বোধ করল দাদুর কথায় সুরুটি উঠে যেতে। দাদু বিভ্রিড় করে বলেছে, সঙ্গে কি যাবে দিয়ে দাও—সবই দিয়ে দাও।

বিমলার মনে হয়েছে, এক সাগর পরিমাণ অভিমান তার থেকেও বড় এক কান্নার স্তম্ভভাৱ থমকে আছে। দাদুর দিকে সহজ দুই চোখ মেলেও কেন তাকাতে পারছে না বিমলা নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় খুব। দাদা অনুপম ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেছে। সে এলেও বিমলার একটু ভালো লাগত হয়ত, তাকে শয্যা বসিয়ে বা দাদুর কাছে থাকতে বলে সে কিছুক্ষণের জন্যে এই পরিবেশ ছেড়ে বাইরে থেকে ঘরে

আসতে পারত। কিন্তু তারও কোনো গাড়া-শব্দ নেই। যোগাড়যন্ত্র করতে ব্যস্ত বোধ হয়। মৃত্যুকে পুরোপুরি বিদায় দিতে সময় লাগে, ব্যবস্থা লাগে।

বউদি এঘর-ওঘর করে টুকিটাকি জিনিসগুলো হাতের কাছে দিয়ে যাচ্ছে। কিছু করতে হবে খেয়াল হতে বিমলা সে-গুলো শয্যার বিন্যস্ত করে রাখতে গেল। কিন্তু হাত গুটিয়ে নিতে চাইছে কেন বুঝতে পারছে না, লোকান্তরিতার জড় বস্তুগুলোর স্পর্শ সবাংগ করিয়ে দেবার মত এমন জীবন্ত লাগছে কেন বুঝছে না। এমন কখনো হয়নি। বিমলা আড়ে আড়ে দাদুকে দেখছে এক-একবার। কিন্তু এই দেখাটা নিজের গোচরে নয়। আর দেখছে চির নীরবতার কোলে শয়ান ছিয়াশী বছরের জীর্ণ বিকলপ্রায় নারীদেহের কাঠামোটাকে। অথচ কি দেখছে হৃদয় নেই—ঠাকুমাকে দেখছে কি মৃত্যু দেখছে কি কপাল আর মাথার জ্বলজ্বলে সিঁদুর দেখছে বিমলা নিজেরও জানে না। বিমলার চোখদুটো অদূরের ওই ঘাড়-পিঠ দূরদূরান্তে বৃষ্টির দিকেই ঘুরেছে আবার। মৃত্যুর এধারে থেকে কি এক মহা সংগতির যোগ যেন জীবনের ওই তটে এসে থেমে আছে। উঠতে-বসতে যে অসহায় জীবন ওদের সকলেরই করুণার পাত্র—তার।

নিজের অগোচরে বিমলা তাই দেখছে। এই বিয়াল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত যা কোনদিন সে দেখেনি। আজও মনে-প্রাণে এই দেখাটাকে বাতিলই করে দিতে চাইছে। কিন্তু একটা অজ্ঞাত অনুভূত উপলব্ধি যেন তার শ্বাস-যন্ত্রটার ওপর চেপে বসছে।

বিধাতা আজকের এই নাটকের উপাদান রচনার মগ্ন হয়েছিলেন বোধ করি প্রায় দুই যুগ আগে।

বংশের কৃতী পুরুষ বলতে বিমলা আর অনুপমের বাবা—মস্ত চাকুরে ছিল তার সময়ের। এই তিন মহলা বাড়ি পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, নিজের উপার্জনে করে গেছে। অনুপম বিমলার থেকে তিন বছরের বড়। কিন্তু বাপের আদর আর প্রশ্রয় বিমলা যত পেয়েছে ছেলে ততো নয়। ঠাকুমা বলত, বাপ-সোহাগী মেয়ে। বলত, তুই আসার পর থেকেই তোর বাপ কাজে কর্মে বেপ্যতির মুখ দেখেছে, তাই এত আদর তোর। এই আদর নিয়ে দাদার সঙ্গে বিমলা দস্তুর মত কাড়াকাড়ি রেবোরিষি করত, আর

তার প্রতি বাবার পক্ষপাতিত্বের দরুন ডগমগিয়ে বেড়াতে।

বাবা বিয়ের আগেও তাকে চোখের আড়াল করতে পারেনি, বিয়ের পরেও না। বিয়ে দিয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানি, জামাই ঘরে এনেছে। বলা বাহুল্য, ছেলেটি বিভ্রালী ঘরের নয়, দারিদ্রের সঙ্গে যুঝে বি-এ পাস করেছিল। সামান্য চাকরি করত, দাদাদের সংসারে থাকত। ভারী কমলনয়ী সস্ত্রী চেহারাটি, শূদ্ধ এই গুণেই বাবার চোখে পড়েছিল বোধহয়।

বিয়ের সময় বিমলা আই-এ পড়ে। তার মতামতের কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, আর বাবা ভালো করল কি মন্দ করল সে ভাবনাও মনে আসেনি। শূভদৃষ্টির সময় মুখখানা দেখে বিমলা মনে মনে খুশি হয়েছিল, ভালো লাগতে এক মূহুর্তও লাগেনি। রূপসী বিমলাও কম নয়, আজ এই বিয়াল্লিশের শিফ্ত, মার্জিত-রুচি সহকর্মী অধ্যাপকদের অনেকের তার প্রতি এক ধরনের সম্রাধ আকর্ষণ উপলব্ধি করতে পারে। বিমলা সেটা অনায়াস বা অশোভন মনে করে না—যে অর্থো কামনার নগ্নতা নেই, তাকে অশ্লীলতাও কিছু নেই। আগের সেই বয়সে ঠাকুমা চোখ রাগিয়ে বলত, ওই বড়ো মিনসের কাছে যাবনি খবরদার, তোকে দেখলে যে আমারই চটকাতে ইচ্ছে করে লা! জামাই দেখে ঠাকুমা আনন্দে আটখানা, বিয়ের রাতেই কানে মুখ লাগিয়ে বলেছিল, দেখলে যে চোখ ফেরানো যায় না দো, আমার কাছে একটু-আধটু আসতে-টাসতে দিস—রংটা একটু মাজা বলেই কেটে ঠাকুরের মত রূপ যেন আরো খুলেছে। তারপর জামাইয়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলেছে, তোমার রাধিকে দেখে নাও গো—না না ও ছুঁড়ীকে নয়, এই আমাকে—ও ছুঁড়ী তো কুন্ডা, রূপসী সেজে মায়ায় বশ করে তোমাকে মজাতে বসেছে।

আরো অনেক কথা বলত ঠাকুমা, যা শুনলে কানে আগলে দিয়ে পালাতে হত। কিন্তু জামাইয়ের রঙ আর রূপের কদর পরবর্তী অধস্তনদের চেয়ে খুব বেশিদিন টিকল না। বাবা কিছু একটা অসামঞ্জস্য অনুভব করেই জামাই গড়তে মনোযোগী হয়েছিল। চাকরি ছেড়ে আরো পড়াশুনা করতে বলেছিল। এটা ওটা পরীক্ষা দিতে বলেছিল, এমন কি নিজের খরচে বিলেত পাঠাতে চেয়েছিল।

জামাই শ্বশুরের মূখের ওপর হাঁ না কিছাই বলত না। মনে মনে শ্বশুরকে ভয়ই করত। ভয় বলতে গেলে সে এ-বাড়ির প্রায় সকলকেই করত। সে-যে বে-খাপ্পা একটা লোক এখানে আছে তা নিজেই উপলব্ধি করত। দাদাদের সংসারে আগ্রহের মত ছিল, এখানেও তাই। কিন্তু সেই পরিবেশ তার পরিচিত ছিল, এটি তাও না।

শেষ পর্যন্ত বিলেত যেতেও অস্বীকার করায় বাবা চটেছিল, বিমলাও খুশি হয়নি। বাবা আর দাদা একটা অকর্মণ্য লোককে মূখ বুজে বরদাস্ত করতে পেরেছিল, কিন্তু বিমলা তা পারেনি। আরো পারেনি দাদার বিয়ের পরে। বাবা বি-এ পাস-করা বউ এনেছিল, বিমলা হঠাৎ যেন তার কাছেই কেমন ছোট হয়ে গিয়েছিল। স্মৃতি কোনদিন কোনরকম কটাক্ষ করেনি, আজও এই নন্দিনীটিকে মনে মনে সে বিলক্ষণ সমীহই করে, কিন্তু দাদার বড় চাকরি শিক্ষা দীক্ষা সবই বউদির যেন একারই গর্বের কারণ। নিজের অগোচরে ক্রমশ বিমলার মেজাজ চড়েছে। এক দুর্বোধ্য বিরূপতার ভিতরটা ভরে উঠেছে। দাদার পাশাপাশি ঘরের এই দোকটা গ্রাম্য পুরুষের ছেলের মত দুবেলা সন্ধ্যাআহ্নিক করে, গায়ত্রী জপ করে, লুকিয়ে লুকিয়ে ধর্মের বই পড়ে। লুকিয়ে পড়ে বিমলার ভয়ে। মাঝে মাঝে এক-আধ দিনের জন্য উধাও হয়ে যায়—কোথায় যায় বিমলা জানে। কোথায় কোনো সাধুসজ্জনের আবির্ভাবের খবর পেলে নিঃশব্দে চোরের মতই পালিয়ে যাবে, তারপর একবেলা বা একদিন বা দুদিন বাদে আবার চোরের মতই ফিরে আসবে। সন্ধ্যাআহ্নিক দেখে বিমলা গোড়ায় গোড়ায় অনেক ঠাট্টাসারা করেছে, অনেক রাগ অভিমানেও করেছে। এমন কি অপমানকর উক্তিও মূখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে অনেক সময়। কিন্তু বোবার শত্রুতা কত আর করতে পারে?

তবু বাবা যতদিন ছিল একরকম চলে যাচ্ছিল। বড়ো-বুড়ীর চোখের সামনে বাবা-মা দুজনেই পর পর চোখ বুজল। তারা ছেলে ছেলের বউ হারালো, কিন্তু বিমলা কতখানি হারালো তা আর কারো পক্ষে অনুমান করাও শক্ত। বাড়ির আধখানা আর নগদ টাকার আধা-আধি বাবা বিমলার নামে লিখে দিয়ে গেছে। পৈত্রিক সম্পত্তির ওপর ছেলেমেয়ের সমান দাবির যুগ নয় সেটা। ফলে এই

প্রাপ্তিটুকুও বাকের ওপর করুণার বোঝার মত চেপে বসেছিল বিমলার। বাবা যেন দাদার প্রাপ্তির আধা-আধি ছিনিয়ে তাকে দিয়ে গেছে। শিক্ষিত মার্জিত দাদা-বউদির এ নিয়ে প্রকাশ্য অভিযোগ অন্তত কিছুর ছিল না। বরং এক ধরনের উদার 'বিবেচনায়' বাবার ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে তারা। কিন্তু এই নিরাপত্তার ফলে নিরুপায় আক্রান্ত বিমলা নিজেকে ছিন্নভিন্ন করেছে।

বাবা মা গত হবার পরেও ঘরের লোকটার একটুও পরিবর্তন হয়নি। উল্টে সে যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়ে নিষ্কিয়তার স্রোতে আরো গা ভাসিয়েছে। উঠতে-বসতে বিমলা জ্বলে উঠেছে। গলা ছেড়ে ঝগড়া বা চেঁচামেঁচি করত না, কিন্তু অল্প কথার বা বলত, গায়ে কেটে কেটে বসার কথা। কিন্তু একটু চক্ষু-লজ্জা একটু আত্মসম্মানবোধও যদি থাকত। শ্বশুরের দয়ার সংগে সংগে স্ত্রীর এই গজনাটুকুও যেন প্রাপ্য ধরে নিয়েছে—তার বেশি কিছুর না। বাড়ি থেকে উধাও হওয়াটা ক্রমশ বাড়তে লাগল, অফিস কামাই করে এক-একবার চার পাঁচ দিনের জন্যে ডুব। গোড়ায় গোড়ায় দাদা খোঁজ-খবর করত, বউদিও ভাবনাচিন্তা করাটা কতব্য ভাবত, আর রাগের মাথায় বিমলা এক-এক সময় তাদেরই ধমকে উঠত, দোহাই তোমাদের, আমাকে পাগল করে দিতে না চাও তো তার জন্যে আর তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।

লোকটা ফিরত যখন বিতুষায় আর তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত ইচ্ছে হত না

বিমলার। সেই অবনত মূর্তি, অবনত মুখ—শত অপরাধের বোকা যেন মাথায়। বিমলার মনে হত, এমন মেরুদণ্ডহীন মানুষ আর দেখেনি। কখনো জ্বলন্ত চোখে চেয়েই থাকত শ্বশুর, কখনো বলত, ফিরলে কেন, যেখানে ছিলে থেকে গেলেই তো হত। অথবা বলত, এখানে তোমার ধর্মকর্মের অসুবিধে হচ্ছে, আর কোথাও ব্যবস্থা করতে পারো না?

বিমলার ধারণা, ব্যবস্থা আর কোথাও করেই নিত, বার বার ফিরে আসে শ্বশুর আর এক বিপরীত আকর্ষণে। সেই আকর্ষণ বিমলা নিজে। এই মানুষের মধ্যেই সময় সময় প্রবল আসক্তি দেখেছে, চোখের কোণে নিবিড় তৃষ্ণা দেখেছে। কিন্তু বিমলার সেটা কাপদুরুষের আসক্তি মনে হয়েছে, সেই নীরব তৃষ্ণার মূহুর্তে নিষ্ঠুর আঘাতে তাকে ফিরিয়ে দিতে একটুও বাধেনি। বিমলা করবেই বা কি, বড় মেয়ে কমলার বয়েস তখন আট, অমলার চার—এমন হবে জানলে এই মেয়ে দুটোই আসতে পেত কিনা সন্দেহ। এই দুটোকেই মানুষ করার ভাবনায় চোখে ঘুম নেই তার। প্রশয় পেলে দায়িত্বজ্ঞান-হীন কাপদুরুষের মত আরো বোকা চাপিয়ে দিতে পারে। দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে জপতপে বসবে, স্বর্গের সিঁড়ির লোভে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াবে। যে জোরে বিমলা লোকটাকে আরো খানিকটা অন্তত কাছে টেনে নিয়ে আসতে পারত, সেই জোরের ওপর তার এতটুকু লোভের আঁচও অসহ্য লাগত। এই নিম্ন

আরও মজবুত... আরও ভাল

পিতলের তৈরী
বার্ণার টিউব



'কিম্বা' লন্টনে
'স্পেশাল কোয়ালিটি'
গ্যাস দেখিয়া লইবেন।



সম্পূর্ণ লন্টন মোটা চাদরে
তৈরী ও লন্টনের নুং কেরোসিন
তৈলে লষ্ট হয় না

কিম্বা
লন্টন
সর্বোৎকৃষ্ট



স্বৈচ্ছমোহন দাস এণ্ড কোং

২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন-২২-৬৫৮০

বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে সামান্য আপসের ইঙ্গিতও সহ্য হত না।

কিন্তু এইভাবে দিন চলার মিরাদও ফুরিয়ে এসেছিল।

একবার কমলা অমলা দুটো মেয়েরই ডিফারেন্স হ'ল হঠাৎ। একজন সারার আগেই আর একজনের। বাড়িতে হাস দেখা দিল। দাদা তার ছেলেপুলে শব্দরবাড়ি সরিয়ে দিল। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসাপত্রের ব্যবস্থায় সেই করল। সেই একবার মাত্র ঘরের লোকটাকে কটা দিন অফিস ভুলে আর পুজো-আচা বাতিল করে ঘরের কতব্য করতে দেখা গিয়েছিল। দাদা সব ব্যবস্থা করলেও ব্যস্ত মানুষ, সব সময় তার বাড়ি বসে থাকা সম্ভব নয়। বার বার ডাক্তারের কাছে ছোট্ট ছুটি করা, ওষুধ আনা, শুল্ক প্রদানের জন্য অষ্টপ্রহর লোক দরকার। এ-লোকটা নির্বিবাদে কটা দিন করেও ছিল। কিন্তু তারপরেই বিমলা স্তব্ধ একেবারে।

ছোট মেয়েটার তখনো বিপদ কার্টেনি। বড় মেয়েটা তখনো পথ্য করেনি। এরই মধ্যে লোকটা একেবারে সাত দিনের জন্যে নিখোঁজ। সব দায়িত্ব নিয়ে দাদা এগিয়ে না এলে ছোট মেয়েটার চোখ বোজাও বিচিত্র ছিল না।

যেমন ফেরে তেমনি ফিরেছিল আবার একদিন। দাদা বউদি এবারে আর চুপ করে থাকেনি। দাদা মৃদু-কঠিন ভৎসনাই করেছে, বউদিও এবারে মিষ্টি অনুযোগ করেনি খুব। কিন্তু তাদের কিছু বলার দরকার ছিল না আর।

ঠিক তার পরদিনই বিমলা যেন চিরদিনের মত প্রস্তুত হয়েই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল শোনো, তুমি আর কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে নাও। তুমি কাছে না থাকলে যে-দুটো এসেছে তাদের মানুষ করার ভাবনা হয়ত, আমি ভাবতে পারব, নয়তো যা ওদের অদৃষ্টে আছে তাই হবে। কিন্তু এ-ভাবে তুমি কাছে থাকলে সে চেষ্টাও করা যাবে না, কোনদিন ওরা দায়িত্ব বুঝতে শিখবে না, আর কিছুদিন গেলে ওরাও তোমাকে অসম্মান করতে শুরু করবে। তাতে তোমার থেকেও ওদের বেশি ক্ষতি। আজ অসুখে মরাছিল, অমানুষ হয়ে সেই মরাই মরবে শেষে।

পরদিন থেকে আর তাকে কেউ দেখেনি।

দিন দশেক বাদে দাদার হঠাৎ হয়েছিল। তার আগে অবশ্য বউদির বক্রোক্তি কানে এসেছিল বিমলার। বউদি অসহিষ্ণু মন্তব্য করেছিল, এই মানুষের ঘর করা কেন—এলে এবারে ঠিক বলব আমি। বিমলা চুপ করে ছিল, কারণ লোকটা কদিনের জন্যে গেছে সে সম্বন্ধে সে নিঃসংশয় নয় তখনো। আরো পাঁচ-সাত দিন বাদে দাদা অফিসে খোঁজ নিয়ে এসে বলল, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। অফিসের

চলছিল জানে। অনেকদিন পর্যন্ত চলেছে। বিমলা এই প্রথম বোধহয় নিজের অগোচরে একটু মর্ষাদা দিতে পেরেছিল লোকটাকে। আর দু'বিশ্ব হলেও, নিভৃত সংগোপনে আশা করছিল, এই মর্ষাদার সান্নিধ্যটুকুও অন্তত থাকে যেন। না, সেই অবনত মূর্তি আর অবনত চোখ আর সে দেখতে চায় না। ফেরেই যদি, করুণার আর অবহেলার পাত্র হয়ে যেন না ফেরে।



পরদিন থেকে আর তাকে কেউ দেখেনি।

প্রাপ্যগন্ডা বিমলার নামে পাঠাতে নির্দেশ দিয়ে গেছে।

বউদি ঘাবড়ে গিয়ে ছুটে এসেছিল। অনেক জেরা করেও ফল হয়নি। বিমলা শব্দ বলেছিল, তোমাদের খোঁজ করার দরকার নেই। বললেও খোঁজাখুঁজি

সংবাদটা ঘরে-ঘরে ঠাকুর কানেও পৌঁছেল। বউদি অতশত খুঁটিনাটি কিছ জানে না, নাত-জামাই গা-ঢাকা দিয়েছে এটুকুই খবর তার কাছে। কিন্তু একটুকুও চিন্তিত বা উতলা হতে দেখা গেল না তাকে। বরং একালের বউয়ের

আঁচল-ধরা পুরুষের মধ্যে সে-কালের পরিচিত পুরুষ-প্রবৃত্তি আবিষ্কার করল বড়ী। হেসে নাভবউয়ের সামনেই নাতনীকে খোঁটা দিল, ছোঁড়া গেরো খুলে পালায়, তুই কেমন বড় রূপসী লো! পরক্ষণেই নিজেরই বিস্মিত, ভালো-মুখো ছেলের পেটে পেটে এত! কোথায় কোন ঠেঁওর-টেরবীর পিছন নিয়েছে দ্যাখ গৈ যা, নইলে এই বয়সে এত ধর্ম রস কেন!

বড়ীর কৌটুকানো মুখে দৃষ্টিচলিত চিত্র ছিল না, বরং ভালো-মুখো ছেলের মধ্যে প্রশস্ত পাবার মতই একটু পুরুষোচিত লক্ষণ দেখেছিল যেন। বিমলাকে কাছে টেনে খাটো গলায় তরল অশ্রু দিতে চেষ্টা করেছিল, কিছু ভাবিস না, যে ঘাটেই জল খেয়ে বেড়াক, নাকে দাঁড়া এখানেই বাঁধা, ঘরে-ফিরে এখানেই এসে-হতো দিয়ে পড়তে হবে। এই হতে দেওয়ার নিজের বড়ীর স্মৃতির সম্পদ যেন। বলত, আজ তোদের দাদুকে এমনি জব্ব্ববু ভালোমানুষ দেখাচ্ছি—এ রকম ছিল নাকি! কম হাড় জব্ব্বালিয়েছে! পোষা ডাইনী ছিল একটা, কলখাগী মেয়েমানুষ—বুঝলি? জিপোস করে দেখগৈ যা, আর আমিও সেই বামনী ছিলাম, গম্ভাচান না করে এলে কাছে ঘেঁষতে দিতাম না, ফিরেও তাকাতাম না। তাকাব কেন লা, আমার কপালে সাবিব্রী কৌটোর সিঁদুর—সোহাগ করে নিজের নিজের কশ-বাণ হাতে তুলে দিয়েছিল, আমার ভয়ই বা কি ভাবনাই বা কি!

নাতনী আর নাভবউ এ গল্প অনেক-বার শুনেছে। বড়ী সেদিনও বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিমলা বড়ীকে সেদিন মনে মনে জ্বলন্ত চিতায় তুলে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেছে।

একে একে এরপর অনেকগুলো দিন চলে যেতে বড়ীরও কেমন খটকা বেঁধেছে। ব্যাগারটা যেন ঠিক তাদের কালের নয়। নাভবউকে ডেকে চুপি চুপি প্রায়ই খবর নিয়েছে ভালো-মুখো ছেলের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল কিনা। আবার মেজাজ চড়লে ভালো-মুখো ছেলের উদ্দেশ্যেই গলা ছেড়ে গাল পেড়েছে।

শীর্ণ দুই হাতে বিমলাকেও এরপর চড়াও করেছিল একদিন। কোলের কাছে টেনে বসিয়েছিল। কানে মুখ লাগিয়ে বলেছে, তোর ভাবনাটা কি, কশ-বাণ হাতে আছে না!

তারপর আঁচলের আড়াল থেকে সেই কশ-বাণ বার করেছে। সাবিব্রী সিঁদুর-

কৌটো। গুণ-করা কাঠের কৌটোর ওপর সাবিব্রী লেখা। আগে এই সিঁদুর-কৌটো নিয়ে ঠাকুমার সঙ্গে অনেক রসিকতা করেছে নাতনী নাভবউ। দাদুর নতুন বয়সের প্রণয়োপহার। দাদু কাশীধামে বেড়াতে গিয়েছিল একবার, সেখান থেকে এনে দিয়েছিল। এই সাবিব্রী কৌটোর সিঁদুরের জোরেই দাদুকে ঠাকুমা কতবার যমের মুখ থেকে আর কতরকমের অনাচার অঘটন থেকে নির্বাসিত ফেরাতে পেরেছে ঠিক নেই। ঠাকুমার সে-সব গর্বের কাহিনী বিমলা আর সুদৃঢ় অজ্ঞপ্রবর শুনতে।

ধরে-বোঁধে সেদিন বিমলাকে কাছে বসিয়ে ঠাকুমা বলেছিল, এই কৌটোর সিঁদুর একবার কপালে পর, সিঁথিতে দে—ভালো-মুখো ছেলের পায়ে বোঁড় পড়বে দোঁখসংখন, কোনো অকল্যাণ ঘেঁষবে না।

বিমলা এত রুদ্ধ আর কখনো হয়নি বোধহয়। রাগে মুখ দিয়ে একটা কথাও বার হয়নি। বড়ীকে ঠেলে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়েছে। বেশ দিনকতক আর কাছে আসেনি পর্যন্ত, মেয়েদুটোকেও আসতে দেয়নি। বিমলা জানে আবেদনটা বড়ী বউদির মারফতও করেছে, কিন্তু বউদি তাকে কিছু বলতে সাহস করেনি—

দিন গেছে, মাস গেছে, বছর গেছে। কিন্তু বিমলার এতটুকু খেদ এতটুকু পরিতাপ দেখেনি কেউ। তার চলন-বলন আরো ধীর-স্থির হয়েছে। সমস্ত মুখে এক অনমনীয় সংকল্পের ছাপ এঁটে বসেছে।

একে একে আই-এ পাস করেছে, বি-এ পাস করেছে, এম-এ পাস করেছে। মেয়ে-কলেজের শিক্ষায়ত্নী এখন। কপালের সিঁদুরের টিপ সম্পূর্ণই নিশ্চিহ্ন, কাছের থেকে লক্ষ্য করলে বাকড়া চুলের সিঁথির ফাঁকে সুক্ষ্ম শিখার মত একটুখানি সিঁদুর-রেখা চোখে পড়ে। বউদি সুদৃঢ়ির ধারণা, ওটুকু শুধু পুরুষের সজাগ দৃষ্টি প্রতিহত করার জন্য, নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য। নইলে ওটুকুও ঘুচত।

দাদুও উঠে গেছে। নাভবউয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও টুকটাকি এটা-ওটা এনে দিচ্ছে বিমলার হাতে। বিড়-বিড় করে বলছে, সব দিয়ে দে—হরি-ছাপের নামাবলী এনে দিয়েছে, জপের মালা দিয়েছে, এমন কি লাল কাপড়ে বাঁধানো হাত-পাখাটাও এনে দিয়েছে। বৈদ্যুতিক হাওয়া বরদাস্ত হত না ঠাকুমার, গরমে শিথিল হাতে ওটাই নড়ত। নিঃপ্রভ চোখে দাদু এ-ঘর ও-ঘরের আনাচ-কানাচ দেখেছে—আর কি দেবে। এত কালের সাংগিনীর প্রতি অভিমানে তার

গলা পর্যন্ত বুজে আছে, কাছে এসেও অন্য দিকে মুখ ফিরায়ে থাকছে।

বউদি চাদর দোসদুতি জামাকাপড় যা দিয়ে যাচ্ছে, আড়ট হাতে বিমলা সেগুলো তবু শয্যার চারদিকে গুছিয়ে রাখাছিল, কিন্তু দাদুর দেওয়া এই-সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি জিনিসগুলোর স্পর্শ বিচর লাগছে তার। অস্বাভাবিক উষ্ণ, অস্বাভাবিক জীবন্ত লাগছে। জীবনের এই আঁচের সঙ্গে কত কালের কোন-সত্তার যোগ যেন। কি এক অজ্ঞাত অন্ত-ভূতিতে বৃকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে বিমলার। মৃত্যুর প্রলেপ-মাখানো এই সমাহিত সামগ্র্যসোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠিক তত বড়ই একটা অসংগতি-বোধ নিজের অন্তস্থল ভেদ করে গুমরে উঠতে চাইছে।

ওধারের ঘরে দিদিমার কাঠের সিঁদুর খুলে বসেছে বউদি। দাদুর কথায় দেখতে গেছে মহাবাহিনীর সঙ্গে দেবার মত আর কি আছে। ঘাড় গুঁজে দাদু আবার এগিয়ে এলো, বিমলার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এটাও দিয়ে দে।

জিনিসটা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বিমলা বিদ্রোহ-স্পৃষ্টের মত বিবম একটা ঝাঁকুনি খেল। সমস্ত সত্তা, সমগ্র অস্তিত্ব, সর্বাত্মকের অপূর্ণ-পরমাণু নাড়িয়ে দেবার মতই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। তারপরই আড়ট কাঠ একেবারে।

দিদিমার সাবিব্রী সিঁদুর-কৌটো।

কৌটো হাতে দিয়ে দাদু চলে গেল। বিমলা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখল। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত, নিঃস্পন্দ, চিত্তাৰ্পিত। এরই তলায় তলায় কিছু একটা বিচিত্র কান্ড ঘটে যাচ্ছে। কি ঘটছে বিমলা জানে না, কি করছে সে, তাও না।

কতক্ষণ গেছে হুঁশ নেই। বউদি সুদৃঢ়ি ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু বিমলা তাকে দেখেছে কিনা সন্দেহ। দাদা অনুপম ফিরে এসেছে, হতচাকিত বিস্ময়ে নির্বাক সেও। বিমলা তাকেও দেখেছে কিনা সন্দেহ। দরজার ওধারে বিভ্রান্ত মূর্তির মত ছেলেমেয়ে-গুলো ভিড় করে আছে। বিমলা তাদেরও লক্ষ্য করেছে কিনা সন্দেহ।

বিমলার একটা হাত সিঁদুরে লালে লাল। সেই হাত নিজের শাড়িতে ঘষছে কখন, শাড়িতে চাপটা চাপটা সিঁদুর। সেই হাত নিজের মুখে লেগেছে কখন, মুখে গালে সিঁদুর লেগে আছে। আর সেই হাত নিজের কপালে লেপেছে কখন, সমস্ত কপাল সিঁদুরে মাখামাখ।

অন্য হাতের চেতনাশূন্য শস্ত মূর্তিতে কৌটোটা ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিমলা।

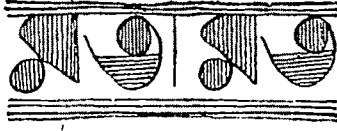
॥ আধুনিক চিত্রকলা প্রসঙ্গে ॥

অমৃত সম্পাদক সমীপে

মহাশয়,

আমি সাধুবাদ জানাতে চাই 'জৈর্মনিন'কে, যাকে বলে অন্তরের অন্ত-স্থল থেকে। তথাকথিত আধুনিক চিত্র-শিল্প সম্পর্কে তিনি একেবারে স্পষ্ট খোলখুলি এমন কতকগুলি রুঢ় সত্য কথা বলেছেন যার জন্য ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য। সবচেয়ে আমাদের আকর্ষিত করে চিত্রসমালোচক আখ্যায় ভূষিত আজকাল যে এক শ্রেণীর সাংবাদিকদের আসরে আগমন হয়েছে, তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে এ'র নির্ভিক সত্যভাষণ; ইনি ঢাল দিয়ে এঁদের না ঢেকে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছেন, এবং দুটো হাত থাকলেই যে চিত্রকর হওয়া যায় না, তেমনি লেখনী ধারণ করার শক্তি থাকলেই যে সুযোগ্য সমালোচক হওয়া যায় না সেই কথা ঘোষণা করে এবং তথাকথিত "শিল্প-সমালোচকরা যা বলেন এবং লেখেন সেইটেই হল সবচেয়ে মজার ব্যাপার" এই আশ্চর্য-রহস্য উন্মোচিত করে দিতে চেষ্টা করেছেন, বলে আমি কর-কম্পন করতে চাই এ'র সঙ্গে।

আমরা যারা দুটি চক্ষু দিয়ে বিশ্বের কিছুটা সৌন্দর্য-আহরিত করতে চেষ্টা করেছি, তারা অন্যদের রসগ্রাহী



চিত্তের কাছে পৌঁছে দেবার লোভও সম্বরণ করতে পারি না। কারণ art is not only creation but also communication. তাই আমরা চিত্র-প্রদর্শনী করতে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াতে উৎসাহী হই। এখানে লোকসানের ভয়টাই বেশী; তার কারণ এখনও এদেশে ছবি কেনাটা বোধ-হয় মূঢ়তারই পরিচায়ক মনে করেন ধূরন্ধর ব্যক্তিরা। ছবি আবার কেন কিনব? বড়জোর দয়া করে দেখতে পারি, এমনই মনোভাব নিয়ে কিছু আপ'ল্টার্ট বুদ্ধি-জীবীরা ভ্রমণে বার হন সম্মার ফাঁকি অবসরে চিত্র-প্রদর্শনীতে। এঁদের দল নিজেরা ছবি বোঝেন না কিন্তু! এঁদের বুদ্ধিয়ে দিতে হয়, এবং এ'র সংবাদপত্র অথবা সাময়িক পত্রের চিত্রসমালোচক কি বলছেন কৌন কৌন ছবির উল্লেখ করেছেন, ক্যাটালগ দেখে তাই মেলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এঁদেরই জন্যে দরকার চিত্র-সমালোচকদের। আমরা যারা ছবি আঁকি, আমাদের জন্যে নয়। ভাবের আদান-প্রদানের মধ্যে সেতুবন্ধন করবার জন্যেই এবং প্রচার ও বিজ্ঞপ্তির জন্যে স্মারস্থ হতে হয় চিত্র-সমালোচকদের, অস্মান-বদনে গিলতে হয় এঁদের মতামত, সহ্য

করতে হয় এঁদের ওস্তাদী। এটা আন্ত-সম্মানজনক সম্পন্ন যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই নিতান্ত অপমানজনক। ফটো-গ্রাফী উদ্ভাবিত হবার পর থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট বা সাররিয়ালিস্ট আর্ট-এর নামে যে অদ্ভুত খামখেয়ালীপনা শিল্প বলে চলছে, তারও প্রশস্তি-রচনা করছেন অশুভ সখ্যতায় এইসব শিল্প-সমালোচক; ভাগ্যান্বেষী শিল্পী ও স্বার্থপর লেখকের একটা দূরভিসন্ধিযুক্ত আঁতাতের ফলেই যে এটা সম্ভব হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। সুযোগসন্ধানীরা চিত্রকর সেজে হাত বাড়িয়েছেন হঠাৎ-সমালোচকের দিকে। মজাটা হল এই যে, দুর্বোধ, অথবা, সত্যিই অবোধ একটা কিছু করে তাঁরা ব্যাখ্যা দিতে সুবিধা দিচ্ছেন চাম্চল্য-সৃষ্টিকারী লেখকদের—যাঁদের পেশা কাগজের জন্য রিপোর্ট সংগ্রহ করা, শিল্পের প্রতি সত্যিকারের অনুরাগ তাঁদের আছে কি-না সন্দেহ। রং তুলির ধার ধারেন না এঁদের অনেকেই। কি দিয়ে ছবি আঁকতে হয়, Creative process টা যে কি, তার প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতাই নেই এঁদের অধিকাংশ ব্যক্তির। অতএব নীলবর্ণ ক্যানভাস অথবা ছুরির খোঁচা কন্ট্রাক্ট একখণ্ড সাদা দেয়ালের মতো বস্তব্যহীন চতুষ্কোণ একটা কিছু ব্যাখ্যা দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন এ'রা; সেই ব্যাখ্যাগুলিও অধিকতর চমকপ্রদ বলেই



এক কোটো ভেপোলীন রাড়ীতে রাখুন

এই শীতে যে কোন সময় বাচ্চাদের ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি হবার ভয় আছে। ফুস-ফুসে শ্বাস জমে, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট হয়। বুকে, পিঠে ও গলায় ভেপোলীন মালিশ করলে আপনার শিশুর সকল কষ্ট অবিলম্বে দূর হবে ও আপনিও চুশ্চিস্তার হাত থেকে রেহাই পাবেন।

কোটা ও শিশিতে পাওয়া যায়

ভেপোলীন

মা লি শের জন্ম

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিঃ • ১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

পরিবেশিত হয় এইজন্য, যে এরা সত্যিই শিক্ষণকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতার অধিকারী নন। অতএব ভাষা-ভাষা একটা কিছু, বিভ্রমসৃষ্টিকারী চটকদার কথার সঙ্গে পশ্চিমী কলা-সমালোচকদের অভিমতের উদ্ভূতি দিলেই হল। সাধারণ পাঠক তাতে সহজেই ঘাবড়ে যেতে পারেন।

এই অশুভ আঁতাতের, এই ভিসাস সার্কেলের, বদল হওয়া যে নিতান্তই দরকার, এই বিষয়ে জৈমিনী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে আবার তাঁকে সাধুবাদ জানাই। না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে সকল সত্যিকারের 'শিক্ষীদেরই। ইতি—দিলীপ রায়, কলিকাতা-২১।

॥ 'আলকাপ' প্রসঙ্গে ॥

প্রশ্বেদ সম্পাদক, 'অমৃত' সমীপে,
সবিনয় নিবেদন,

৪২শ সংখ্যা 'অমৃত'ে শ্রীধর পাণ্ডার 'বীরভূমের আলকাপ' রচনাটি পড়ে আনন্দ পেলাম। বাংলার গ্রামীন লোকনাট্যচর্চায় আঞ্চলিক অবদান হিসেবে 'আলকাপের' মূল্য তিনি কিছটা উপলব্ধি করতে দক্ষ হইয়াছেন। কিন্তু কয়েকটি ত্রুটি নজরে পড়েছে বলে এই চিঠির অবতারণা।

প্রথমতঃ নবান্ন উৎসব উপলক্ষে 'আলকাপ' সৃষ্টি হওয়া। 'আলকাপ' খুব পুরনো যুগের নয়। তাছাড়া নবান্ন উৎসব উপলক্ষেও এর সৃষ্টি নয়। পালায়-পার্বণে বা উৎসব উপলক্ষে লোকসমাজে 'সঙ' অভিনীত হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এরই একটা উন্নত ও স্থায়ী রূপ 'আলকাপ'। আমি ব্যক্তিগতভাবে 'আলকাপ' গানের সঙ্গে প্রায় ছ'বছরের বেশী সময় ধরে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। তাতে যা বুঝিছি, এ পালাগান এসেছে পদ্মাপারের উত্তরবঙ্গ থেকে এবং এ হিসেবে শ্রীপাণ্ডার মতঃ আলকাপ অর্থাৎ 'আওল' (বা আওলা) বা এলোমেলো কৌতুকনাট্য, যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়। 'আওলা' (এলোমেলো অর্থে) শব্দের প্রচলন পদ্মাপারের বলে জানি। তবে আলকাপের ওস্তাদেরা এর অন্য অর্থ করে থাকেন। 'আল' অর্থে তাঁরা বলেন, মোমাহির হুল এবং লক্ষ্য করার বিষয় যে আলকাপ ব্যঙ্গধর্মী নাট্যকলা। এবিষয়ে শ্রীপাণ্ডা বরং খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রী বারাদাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিক' উপন্যাসটি পড়তে পারেন।—যাতে উত্তর-বঙ্গের আলকাপকে পটভূমিকা তথা বিষয়বস্তু করা হয়েছে। প্রশ্বেদ শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে আলকাপের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আলকাপ নিছক কৌতুকনাট্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গনাট্য। 'বৈতালিক' পুরনো দিনের আলকাপের যে রূপ পাচ্ছি, তা 'বিত্রোহী'র, কতকটা বৈশ্বলিক দৃষ্টি-ভঙ্গীসম্পন্ন এক ধরনের সামাজিক আলোচনের শিক্ষারূপ। আর ব্যক্তিগতভাবে আমার অভিজ্ঞতা একে সমর্থন করে। আলকাপের বিষয়বস্তু হচ্ছে ঘরকন্না-সমাজ সংসারের (এবং যুগেরও) প্রচলিত রূপকে ব্যঙ্গের আঘাতে স্পষ্ট করে তুলে ধরার প্রয়াস। শ্রীপাণ্ডা যে-দলের গান শুনছেন, সম্ভবতঃ সেটি বা সেগুণি কোন প্রতিনিধিমূলক দল নয়। আলকাপের নাট্যরীতি বা আঙ্গিক সত্যি বস্তুবাদী এবং বৈশ্বলিক। কেননা কোন লিখিত নাটিকা নেই; ঘটনাটি প্রত্যেক অভিনেতার জানা থাকে মাত্র। ফলে পরস্পরের ক্ষমতা অনুযায়ী টিমওয়ারকের গুণে এর রূপ বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। গুণাগুণ নির্ভর করে অভিনেতার মেধা ও অভিনয়ক্ষমতার উপর। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি যে সমাজতন্ত্রের অনেক বিচিত্র সত্য ও তাৎপর্য আলকাপের নাট্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। যথেষ্ট পরিসর না থাকায় সে-আলোচনা করতে পারছি নে। তৃতীয়তঃ যে কোন কাপ বা নাটিকার মোড়ল থাকার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নাটকের চরিত্র, নানাদরশের হয়ে থাকে। 'অমৃত'ে যে কাপটি উদ্ধৃত হয়েছে, আমার মতে, ওটিতে আলকাপের 'কাপের' রীতি-প্রকৃতি আদৌ ধরা পড়ে কিনা সন্দেহ। আদতে কোন কাপই লেখার গন্ডীতে বাঁধা যায় না। ঘটনা নিছক উপলব্ধি মাত্র। রূপ পায় অভিনেতাদের ক্ষমতামতো। আলকাপের ছড়াগুলিতে ও সমাজবোধ ও বৈশ্বলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ছড়ানো। দেশের সমসাময়িক সমস্ত সমস্যাই আলকাপে প্রতিফলিত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অভিনেতাদের মূল যিনি—যাঁকে

'সঙদার' 'সঙাল' বা কাপ বলা হয়, তাঁর মেধা ও অভিনয়ক্ষমতার উপরই নাটকের ব্যঙ্গ-কৌতুক, হাস্যরস, এককথায় কাপের গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে।

আলকাপ মূলতঃ উত্তরবঙ্গের গান। এদেশে অর্থাৎ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে একে ছাঁচড়াও বলা হয়। উত্তরবঙ্গের বিশেষতঃ মালদহের আলকাপ বিখ্যাত। মালদহের রহিমপুর নিবাসী কোন এক নাপিত 'বেনা কানা': তাঁকেই আলকাপ-ওয়ালারা আলকাপের জনক বলে থাকেন। ক'বছর আগে বীরভূম মুর্শিদাবাদের প্রতিটি গ্রামে দুটি-একটি করে আলকাপ দলের সৃষ্টি হয়েছিল এবং পালা-পার্বণে উৎসবে 'যাত্রার' বদলে 'আলকাপের' রেওয়াজ চালু হয়েছিল। নানা কারণে ইদানীং আলকাপের প্রচুর আর নেই। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় এর অসাধারণ জনপ্রিয়তা।

স্বল্প-পরিসরে সব কথা বলা সম্ভব নয়। শ্রীপাণ্ডাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, এবিষয়ে তাঁর আগ্রহ থাকলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আলকাপ দুটো দলে মিলে হয়—শ্রীপাণ্ডার এ ধারণাও ভুল, তা শ্রদ্ধা 'বৈতালিক' উপন্যাসে যে প্রথম যুগের আলকাপ দেখতে পাচ্ছি, তাতেই বোঝা যাবে। এখনো মালদহ দল বা এদেশের অনেক খ্যাতনামা দলগুলোও একা একা গেয়ে থাকে। আমার অভিজ্ঞতাও তাই। ভাল দলের গান লোকে একদলেই শুনতে চায় সাধারণতঃ।

পরিশেষে জানাই, আমার ধারণা আলকাপ যেন লোকসমাজের এক ধরনের মানসমুদ্র—যাতে প্রতিফলিত হয় কেবল তার আদিত রূপ, স্ববিরোধী হাস্যকর এবং মেকীষ দিয়ে ভরা আচরণের সত্য প্রতি-মূর্তি। আর এরই ফলে আলকাপের জনপ্রিয়তা যত আতান্তিক, একে নোংরা বলে ঘণা করে নিন্দাবাদও তত পটু গ্রামীন লোকসমাজ। ইতি—

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,
মুর্শিদাবাদ।

অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের জন্য

আমাদের আর একটা নূতন কেন্দ্র

৭নং পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

প্রতি বৎসর ভারতীয় ভাষাসমূহের সবশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীকে সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসাবে মোট ১৩টি গ্রন্থের গ্রন্থকার পুরস্কৃত হয়েছেন। আকাদেমির একটি কার্যনির্বাহক সমিতি বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকগুলির উৎকর্ষের ওপর ভিত্তি করেই এই পুরস্কার দান করে থাকেন। আকাদেমির সভাপতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত রচিত 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শান্ত সাহিত্য' এবার আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই খ্যাতিমান অধ্যাপক প্রবন্ধকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং শিশু-সাহিত্য রচয়িতা হিসাবেও প্রখ্যাত। বাঙলা দেশের মানুষের চেখে তাঁর পরিচয় মনোবী-পশ্চিমত হিসাবে। পূর্ববাঙলার সন্তান এই মানুষটি ছাত্র-বৃত্তা হতে অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধনার স্বারা নিজেকে গড়ে তোলেন। তিনি ১৯৩৮ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে আসছেন এবং Obscure religious cult in Bengali Literature এর জন্য পি-এইচ-ডি এবং An Introduction to Tantrik Buddhism এর জন্য পি-আর-এস-গৌরব লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

ডঃ দাশগুপ্ত বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে আছে, 'শ্রীরাধার ক্রমাবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে', 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্চাগীতি', 'দ্রবী', 'শিল্পপলিপি', 'নিরীক্ষা', 'বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ', 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস', 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়' Aspects of Indian Religious thought 'বাঙলা-সাহিত্যের একদিক' 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'উপমা কালিদাসস্য' প্রভৃতি প্রবন্ধধর্মী গ্রন্থ; 'জংলা মাঠের ফসল' নামক উপন্যাস; 'নিশা ঠাকুরের কচড়া', 'এপারে ওপারে', 'সীতা' ও 'দিনান্তের আগুন', 'রাজকন্যার খাঁসি' প্রভৃতি কবিতার ও নাটকের বই; 'শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে', 'ছড়ির দিনে মেয়ের গল্প' প্রভৃতি ছোটদের বই। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলি এখনও গ্রন্থকারের প্রকাশিত হয়নি। শীঘ্রই একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থটির নাম, 'টলস্টয়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ'।

অন্যান্য যারা পুরস্কার পেয়েছেন— শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য— 'ইয়াবুয়িগম' (অসমীয়া); শ্রীরামসিংজী রাথোড়—

সাহিত্য সম্মান

'কাছনান সংস্কৃতি দর্শন' (গুজরাটী); শ্রীভগবতীচরণ বর্মী—'ভুলে বিশরে চিত্র' (হিন্দী); শ্রীএ আর কৃষ্ণশাস্ত্রী—বাংলায় কাদম্বরীকার বস্কমচন্দ্র (কানাড়ী); শ্রীরহমান রাহী—'নোরোজ-এ-সবা' (কাশ্মিরী); শ্রীডি এন গোখলে—'ডঃ কেতকার' (মারাঠী); পরলোকগত পশ্চিম গোদাবরীশ মিশ্র—'অধঃশতাব্দীর উড়িয়া তানাহিরে মো স্থান' (ওড়িয়া); শ্রীনানক



ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত

সিং—'ইক মিয়ান দো তালওয়ারান' (পাঞ্জাবী); মহামহোপাধ্যায় গিরিধর শর্মা; চতুর্বেদী—'বৈদিক বিজ্ঞান অ উর ভারতীয় সংস্কৃতি' (সংস্কৃত); শ্রীএম বরদারাজন—'আগল ভিলাঙ্গু' (তামিল); শ্রীবল্লভ রাপু—'রজনীকান্ত রাও—'আনহেরা ভাঙ্গোথাকর ডরিএমু' (তেলেগু); শ্রীইমতিয়াজ আলি আর্সি—'দেওয়ান-ই-মালিক' (উর্দু)।

এই শ্রুত মূহুর্তে আমরা এঁদের সকলের দীর্ঘ-জীবন কামনা করি। তাঁরা আরও দীর্ঘদিন সাহিত্যের সেবা করুন, দেশের জাতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন, এই প্রার্থনাই করব।

আগামী ৩১শে মার্চ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রত্যেক বিজ্যোতাকে পুরস্কারসহ পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক দেবেন।

* * *

অমর রুশ কথাশিল্পী পুশকিনের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে

১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে। বর্তমান বৎসরে সেনিনগ্রাডে তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করছেন রুশ জনগণ। এই মহান কথাশিল্পীর তিরোভাব-মূহুর্তে সমগ্র জাতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

ভলতেয়ার প্রসঙ্গে পুশকিন বলেছিলেন যে এই মহান শিল্পীর লেখনী উত্তরকালের সাধকদের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ রেখে গেছে। একথা পুশকিনের সৃষ্টি সম্পর্কেও সত্য। একালের ইতিহাসের পাতায় পুশকিনকে আমরা অতীতের মানব বলতে পারি না। তাঁর লেখনী ভাবীকালের মানুষের জন্য অক্ষয় চিরন্তন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে গেছে, সত্যের শাস্বত রূপাঙ্কন করে গেছে।

'আকাদেমি অব সাইন্সেস' অব দি ইউ, এস, এস, আরের রুশ সাহিত্য বিভাগে পুশকিন সম্পর্কিত বহু তথ্য আছে। পুশকিনের স্মৃতিবিজড়িত লেনিনগ্রাডে এই ঐতিহাসিক কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসু পাঠক, শিল্পী নাট্যপ্রযোজক, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং ছাত্র প্রত্যেকের পক্ষেই এটি একটি দর্শনযোগ্য তীর্থক্ষেত্র। এখানে এমন একটি তালিকা আছে যার থেকে পুশকিনের জীবনকালে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত গ্রন্থাদির বিবরণ পাওয়া যাবে। ১৮৮০ সাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত পুশকিন সম্পর্কে আলোচিত রুশ ও অন্যান্য ভাষার সংবাদপত্রাদির নানাবিধ কাটিং সংগ্রহ রক্ষা করা হয়েছে। এমনকি প্রায় একশতাধিক ভাষায় অনূদিত পুশকিনের বিভিন্ন গ্রন্থের নমুনা আছে।

জাপানী ভাষায় অনূদিত 'দি ক্যাপটেনস ডটার' গ্রন্থটি অনেকেরই বিস্ময় উদ্রেক করে। কারণ সমগ্র গ্রন্থটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যময় জাপানী পদ্ধতিতে চিত্রিত। ইথিয়োপিয়ান ও আইসল্যান্ডিক অনুবাদেও রয়েছে। পুশকিনের বিভিন্ন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও আছে। এগুলি মহামূল্যবান জাতীয় সম্পত্তি। পুশকিনের ব্যক্তিগত সংগ্রহের যে সমস্ত বই এখানে রয়েছে তার অধিকাংশে আছে তাঁর দেওয়া ফুটনোট। রুশ ও বিদেশী গবেষকদের নানাবিধ কার্যে সংগৃহীত দ্রব্যাদি এক মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

রাশিয়ার ডায়েরী

দ্রবোয়ি কুমার মাস্যাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ বোল ॥

‘সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়ন’ পৃথিবীর বহু দেশের লেখক-লেখিকাকে আমন্ত্রণ করে তাঁদের দেশে নিয়ে যান। ওঁরা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য অতিথির সর্বপ্রকার দায়িত্ব বহন করেন। আহারাদি, ভ্রমণ, বসবাস, যানবাহন, এমন কি সিগারেটটিও ওঁরা যুগিয়ে দেন। এ ছাড়া অতিথির পক্ষে যেটি প্রথম প্রয়োজন,—সেই দোভাষী একজন সদাসর্বদা মোতায়ন থাকে। অতিথিমাটাই ওদেশে নারায়ণ, শালগ্রাম,—ভাঁড়ি গলায় সোনার পৈতা! তাঁর পূজা না করে কেউ জল খাবে না। তাঁকে দর্শন করে যাবে সবাই, নৈবেদ্য উপচার দেবে বহু লোক বা সংস্থা। তাঁর নাম ছাপা হবে নিম্নলিখিত তালিকায়। নবাবতের আসরে তাঁর প্রচুর অভ্যর্থনা। তাঁর ছবি ছাপা হবে কাগজে। তাঁর ইন্টারভিউ নিতে আসবে সাংবাদিক। তিনি একদিনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে উঠবেন।

বিমি অতিথি নন তিনি শালগ্রামও নন, তিনি শুধু পাথরের নড়ি! তিনি পথটুকু মাত্র। তিনি ছড়িয়ে-গড়িয়ে বেড়ান পথে পথে। তিনি নিজের দায়িত্ব নিজে নেন এবং অবিলম্বেই বুঝতে পারেন, জীবনযাত্রা কি প্রকার ব্যয়বহুল। আমি নিজে মোট পাঁচ দিনের জন্য শালগ্রাম থেকে এই প্রকার ‘নড়ি’তে পরিণত হয়ে-ছিলাম! কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা কিঞ্চিৎ সম্বল থাকায় এবং একটি দোভাষীগণীর সহযোগিতা পাওয়ার আমার পথ দুর্গম হয়নি। পর পর দুই বছরই সোভিয়েট লেখক সংঘের কতৃপক্ষ আমার প্রতি বিশেষ যত্নশীল এবং সহৃদয় ছিলেন। সামাজিক জীবনে তাঁদের সৌজন্য এবং অমায়িকতা বিশেষ স্মরণীয়। দ্বিতীয় বছরে আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও আমি নিজ অর্থব্যয়ে মস্কো রওনা হই।

সোভিয়েট লেখক সংঘের কর্মধারা আমি বিশেষ ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য

করি। সরকারি আপিসের মতোই তাঁদের কর্মব্যবস্থা, এবং নানা বিভাগে সেই কর্ম-প্রণালী বিভক্ত। পৃথিবীর বহু দেশের বহু ভাষাভাষীদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, এমন কি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও এঁরা সংযোগ রক্ষা করেন। সংখ্যাগত ভাষার সঙ্গে এই সাহিত্যিক যোগাযোগ থাকার জন্য দোভাষীর সংখ্যাও এঁদের প্রচুর। গ্রীক, হিব্রু, চীনা, জাপান, তুর্ক, ইতালীয়ান, বিভিন্ন আফ্রিকান ও মিসরী,—এসব ভাষা-জানা লোক এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত। ভারতবর্ষের আছে তামিল ও হিন্দি—অর্থাৎ একটি উত্তরের, অপরটি দক্ষিণের। জগতের বিভিন্ন দেশ থেকে এঁদের নিকট ‘রাইটার্স ডেলিগেশন’ আসে, এবং এঁদেরই তত্ত্বাবধানে আতিথ্য গ্রহণ করে। এঁদের পছন্দমতো পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ রূপভাষায় অনুবাদ করা হয়, কিন্তু তার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণভাবে লেখককে রয়েলটি দেওয়া হয় না। কেননা এঁরা ‘জেনেভা কপিরাইট কন্ভেনশনের’ অন্যতম দরখাস্তকারী নন। সম্প্রতি সোভিয়েট লেখক সংঘের চেম্বার মস্কো আপিসেরই পাশে একটি বৃহৎ প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে, যেটির নাম হল ‘রাইটার্স ক্লাব’। এর পূর্বনো অংশটা যথারীতি জার আমলের জৈনিক ধর্মীর সম্পত্তি। এই সুদৃশ্য অট্টালিকার মধ্যে মস্ত বড় আপিস, নাচগানের হল, সিনেমা ও নাট্যমঞ্চ, মস্ত ভোজনাগার, গল্পগদ্যের জন্য লাউঞ্জ, বহু লেখকের পক্ষে সপরিবারে বসবাসের ব্যবস্থা,—এগুলি একে একে দেখে চমৎকৃত হতে হয়। লেখক সংঘ এই অট্টালিকার জন্য এক কোটি রুবলেরও বেশি খরচ করেছেন।

সোভিয়েট লেখক সংঘের যারা সভ্য তাঁরা হলেন, “men of letters—prose writers, poets, play-wrights, scenario-writers, critics and translators—who by their creative endeavours are taking an active part in building Communist Society may be

members of the Union of Soviet writers.”

লেখক বা লেখিকারা সাধারণত কি লিখছেন, কি লিখবেন, অথবা তাঁদের কিরূপ লেখা উচিত, এটি নিরীক্ষণ পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করা এই সংঘের অন্যতম কর্তব্য। সেইজন্য প্রত্যেক সভ্যের উপর এইরূপ নির্দেশ আছে, “to take part personally in all cases when his creative work is discussed in bodies of the Writers’ Union and also in cases when action is taken concerning his activities or behaviour.”

লেখক সংঘের সভ্য হতে গেলে আগে একটি লিখিত বিবৃতি পেশ করতে হয়!

সোভিয়েট লেখক সমাজের তৃতীয় কনগ্রেসের অধিবেশন বসে সুপ্রীম সোভিয়েট পার্লামেন্টের হল। সেটি ক্রেমলিনের অভ্যন্তরভাগে। সেখানে বিগত ২৩শে মে, ১৯৬৯ সালে যে “Charter of the Union of Soviet Writers” অনুমোদিত হয়, সেইটি আমি এই সূত্রে ব্যবহার করছি। তারই কয়েক ছত্র এখানে আমি পুনরায় উদ্ধৃত করি, কেননা সোভিয়েট সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রকৃত স্বরূপটি এত আমাদের জানবার সুবিধা হবে : “Soviet literature’s role in the bringing about of social changes and as an educative force is enhanced immeasurably in the new historical conditions, in the period of comprehensive building of Communism in the U.S.S.R. Its lofty mission is to facilitate the shaping of the man of Communist Society, to reveal in the best possible, artistic form life’s truth, the advance towards Communism—the main content of our epoch—and the grandeur and beauty of the Communist ideals which are being translated into reality by the Soviet people under the leadership of the Communist Party.”

“.....and also of world literature in all the wealth and diversity of national forms, creatively mastering Marxism-Leninism which endows the artist with the ability to see life’s truth in all its complexity and profundity, Soviet Writers are guided by the Leninist party spirit, which constitutes the

highest form of art's kinship with the people."

"The tasks of the Union are: consistent ideological struggle for the principles of Socialist realism, against all types and forms of bourgeois influence, including revisionism as the chief danger to the development of literature and literary theory — and against dogmatism, sectarianism and vulgarisation....."

"চার্টার" শব্দটির বঙ্গার্থ ঠিক কি প্রকার হয় আমার অজ্ঞাত। নিয়মাবলী, সনন্দ, শাসননীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপত্র,—কোনটা বলব বুঝিনে। তবে আমার মতো যারা বিস্মৃতভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ করেছে, তারা বলবে, চার্টার শব্দটির বঙ্গার্থ, শাসননামা। এই চার্টারের প্রায় প্রতি ছত্রের প্রত্যেকটি শব্দ রাবহারের অন্তরালে একটি বিশেষ নির্দেশ এবং প্রচ্ছন্ন শাসন ও তিরস্কার নিহিত রয়েছে, এটি লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক সোভিয়েট লেখক এরই প্রভাবে 'আজন্ম' মানুষ হয়ে উঠেছেন। তিনি এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলাপ করবেন, এরই ভাবনায় ভাবিত হয়ে লিখতে বসবেন, এবং এরই হাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে তিনি 'স্বাভাবিক' পরিণতি লাভ করবেন। সোভিয়েট লেখকদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনেরও বেশি মাতৃভাষা ভিন্ন, অন্য কোন ভাষা জানেন না। তার ফলে রুশ সাহিত্যের বাইরে তাদের গতিবিধিও কম। কিন্তু ইংরেজি বা ফরাসী বা জার্মানি যারা যৎকিঞ্চিৎ জানেন, তাঁদের পক্ষে অসুবিধা এই—বাইরে থেকে বই, ম্যাগাজিন বা সংবাদপত্র সোভিয়েট ইউনিয়নে আসে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে বহুস্তর পৃথিবীতে ক্রোধও সোভিয়েট সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, এটি তাঁদের পক্ষে জ্ঞানার সুযোগ কম। বড় বড় লাইব্রেরীতে যদি বাইরে থেকে বই আসে, তবে তাদের থেকে নির্বাচন করে নেওয়া হয়, কোন কোন বই সোভিয়েট নাগরিকের পক্ষে পাঠ্য। সেই সকল পাঠ্য বইগুলির তালিকাই যথাসময়ে পাঠকদের সামনে পেশ করা হয়।

'সোভিয়েট লেখক সংঘের' শাসননামার সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতির অবিচ্ছেদ্য এবং অঙ্গাঙ্গী যোগ বর্তমান। রাষ্ট্র, পার্টি এবং লেখক সংঘ সেখানে পরিপূর্ণভাবে একাকার। 'মার্কসিজম-লেনিনিজম' নামক বিদ্যুৎশক্তির জোরে যে বিরাট যন্ত্রের চাকাটা ঘুরছে, লেখকরা হুগ্গেন ভ্রার 'নাট-বল্ট'। এই যন্ত্রের কাজ

হল, নিখুঁত কমিউনিষ্ট সমাজ সৃষ্টি করা। এবিস্ব সমাজ—যেখানে মানুষের সবপ্রকার ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-নিরাপত্তা-উন্নততর জীবন-ব্যবস্থা নিশ্চিত ভাবেই প্রতিশ্রুত—সেই সমাজ-সৃষ্টির জন্যই প্রয়োজনীয় সাহিত্য সৃষ্টি! মানুষকে বিশেষ একটি নীতির প্রভাবে গড়ে তোলবার যে 'মহৎ' দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালনের কাজে প্রধান উপকরণ হল, সাহিত্য। নৈলে সাহিত্যের দাম কত-টুকু? সাহিত্য আলস্য বা বিলাসের সৌখীন সামগ্রী নয়। সাহিত্য জীবনেরই একটা অঙ্গ, প্রয়োজনেরই একটা উপাদান, —অন্ন, বস্ত্র এবং শিক্ষার সঙ্গে সাহিত্যেরও পরম ইউটিলিটি! সোভিয়েট ইউনিয়নে সাহিত্য হল 'সোসালিস্ট রিয়লিজমের' একটি প্রধান উপকরণ।

ছয়টি পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালের শেষ দিকে এবং সপ্তবার্ষিক যোজনার প্রথম বছরে সোভিয়েট ইউনিয়নে আমি উপস্থিত ছিলাম। 'সোভিয়েট লেখক সংঘ' এই যোজনাগুলির সঙ্গে বিজড়িত। তাঁদের শাসনাধীন বিশিষ্ট লেখকরা কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশক্রমে এমন সাহিত্য রচনা করেন যেগুলি যোজনা-সাফল্যের কাজে লাগে। বলা বাহুল্য, লেখক সংঘ কমিউনিষ্ট পার্টিরই একটি অঙ্গ। একটি অন্যটির থেকে পৃথক নয়। যোজনার কর্মপ্রণালী অনুযায়ী যেখানে যত কাজ চলছে, সর্বত্র লেখকরা যাতায়াত করবেন—এটি লেখক সংঘের নির্দেশ। প্রত্যেক রিপাবলিকের লেখকরা প্রত্যেক রিপাবলিকের 'যোজনার' সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। এর ফলে এই হয়, লেখকদের সঙ্গে দেশের বহুস্তর জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। লেখকরা এক 'সমাজ' থেকে ভিন্ন সমাজে, এক 'রাষ্ট্র' থেকে অন্য রাষ্ট্রে, এক 'সম্প্রদায়ের' থেকে অন্য সম্প্রদায়ে,—অর্থাৎ সোভিয়েট দেশ-গুলির অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে চলাফেরা করার সুবিধা পান। তাঁদের সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যয়ভার বহন করেন লেখক সংঘ। এমনি করে পনেরোটি রিপাবলিকে তাঁরা অব্যাহত ভাবে ঘুরে বেড়ান। কোথাও জলবিদ্যুৎ পারিকল্পনার কাজ চলছে, সেখানে গিয়ে বিশিষ্ট লেখক স্থানীয় কর্মীদের নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসে গেলেন। এমনি করে তিনি খনিতে গিয়ে ঢুকলেন, নয়ত গেলেন জাহাজ নির্মাণের কারখানায়, আর নয়ত কলেক-টিভ ফার্মে। কোনও লেখক গেলেন মরুভূমিতে, কেউ পামীরে, কেউ মেরু-সাগরের প্রান্তে, কেউ ক্রাস্কাটকা ক্রিৎবা

শাখালিনে! সকল জায়গা থেকে চলিত জীবনের ছবি তুলে আনা, নতুন ভাষা তুলে ধরা, নতুন উৎসাহের কথা বলা, নবতন অধ্যবসায় ও কর্মশক্তিকে অনুপ্রাণিত করা! নৈরাশ্য, হতাশা, দুঃখ, ব্যর্থতা বা বেদনাবোধ,—এগুলি সোভিয়েট সাহিত্যে থাকার উপায় নেই,—কারণ এগুলি জীবনের আকাশে উজ্জ্বল মেঘ-ছায়ার মতো! সূর্যালোক হল সত্য, মার্কসিজম-লেনিনিজম সত্য, এবং সোসালিস্ট রিয়লিজম সত্য! অন্য সত্য নেই, কারণ—থাকতে পারে না। সোভিয়েট সাহিত্য জমিদারকে কখনও 'সহৃদয়' চরিত্র বলেনি, ধর্মযাজককে কখনও সংপ্রকৃতি বলেনি, বেশ্যাকে কখনও মধুর-চরিত্রা বলেনি, এবং লম্পট কখনও তার গম্পের 'হিরো' হয়নি। যদি কোথাও হয়ে থাকে তবে নিজের 'অপরাধের' প্রায়শ্চিত্ত করে সে জাতে উঠেছে। সোভিয়েট কাব্যে বেদনা বা কান্নার শব্দ শোনা যায় না! কান্না মানেই দুঃখ, রক্তপাত। উৎপীড়ন, অন্যায়, ব্যর্থতা, বেকারবৃত্তি, প্রবণতা, দারিদ্র্য এবং শূন্যতাবোধ। কবিতায় কান্না এবং উপন্যাসে বিরোগান্ত পরিচ্ছেদ,—এগুলি জন্মায় ক্যাপিটালিস্ট সমাজে, যেখানে শূন্য রচনার কৌশলে এগুলি মনোহর এবং বৃজ্জীয়া মনোবস্তুর পক্ষে চিত্তগ্রাহী হয়ে ওঠে। সাহিত্যে যৌন-আবেদন এবং অশ্রু বা নৈরাশ্যের উচ্ছ্বাসকে 'এক্সপ্লাইট' করে ক্যাপিটালিস্ট দেশের প্রকাশকরা ধনী হয়। বর্ণিত এবং বৃত্তিকৃত সমাজ কান্নার জন্য প্রস্তুত থাকে বলেই 'কাঁদুনে' সাহিত্যের ওপর তাদের ঝোঁক। বৃজ্জীয়া লেখকরা এই নৈরাশ্য এবং দুঃখবাদকে ভাগিগরে করে যায়! দেশ যত বেশি অনগ্রসর তার সাহিত্যে তত বেশি কান্না! দেশ যত বেশি নৈরাশ্যে ভরা, তার কাব্য তত বেশি প্রণয়াশ্রুজড়িত। সোভিয়েট কাব্যে অশ্রু কম, এবং সোভিয়েট উপন্যাসে পরিচ্ছেদ-বিরোগের সুর আরও কম। সোভিয়েট গল্পে বিদ্রোহপরাগণ 'প্রেমিককে' সমাজ-শত্রু এবং কোনও 'নায়ক' তার কর্মস্থলের চারিদিকে অসুবিধাজনক পরিস্থিতি দেখে শুনে যদি কেবল নৈরাশ্যের কথা বলতে থাকে তবে তাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে ধরে নেওয়া হয়। সোভিয়েট উপন্যাসে পরশ্রমী সঙ্গে অবৈধ কারবার, স্বাধীনকে লুকিয়ে স্বরীর পক্ষে অভিসারে যাওয়া, কুয়ারী মেয়েকে অগাধ জলে ভাসিয়ে পালানো, ভালবাসা নিয়ে অস্বাস্থ্যকর বিতর্ক বা কান্নাকাটি, বেকার অবস্থার পরিচয়, লম্পট পুরুষ বা মেয়ের প্রীতি

স্নেহপ্রকাশ, জনগণকে বাদ দিয়ে এককের প্রচারকার্য—এগুলি অশুদ্ধ চিন্তার পরিচয়! ওরা চাইছে সবল, সুস্থ, উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, প্রফুল্ল এবং উন্নতিশীল সোভিয়েট রাষ্ট্রের পরিচয় সাহিত্যের ভিতর দিয়ে শুনতে। ওদের দেশের কলেকটিভ ফার্মের চাষীরা যদি উদ্দীপনার অভাবে উপযুক্ত ফসল উৎপন্ন করতে কোথাও পরাক্রম হয়, তাহলে ঔপন্যাসিকদের ওপর অনেকটা দোষ চাপে। দেশের উন্নতি-অবনতির সংগে লেখকের দায়িত্ব জড়ানো।

সোভিয়েট লেখক সংঘের এই চাটাঁর বা শাসননামা মেনে নেনানি, এমন একজন লেখককেও আমি দেখিনি! এই শাসননামা স্বীকার করে নিয়ে কবি পাণ্ডের-নাকও ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর অধি লেখক সংঘের সভাপতিলাভ জ্বিলেন, এবং তাঁর দেয় চাঁদাও দিতেন! শাসননামাটি মেনে না নিলে কোনও সাহিত্যকর্মীর পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোথাও বাস করা দুঃসাধ্য। তাঁর লেখা ছাপা হবে না কোনও কাগজে গভ-বিরোধের জন্য। তাঁর রই—যেটিতে তাঁর নিজস্ব বা স্বাধীন অভিমত বাস্তব অথবা যেটি চাটাঁর বিরোধী,—সে-বই প্রকাশিত হবে না। তাঁকে কেউ সাহিত্যকর্মী বলে স্বীকার করবেন না। তিনি তাঁর অসুবিধার কথা কোথাও প্রকাশ করার সুবিধা পাবেন না। তিনি নিজের বই বা কাগজ প্রকাশ করবেন—এমন কোনও সুযোগও তাঁর থাকবে না। ওঁদিকে আবার তিনি যদি সমর্থ ব্যক্তি হলেও ইচ্ছাপূর্বক 'বেকার' থাকতে চান অথবা অপরের খরচে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চান তবে সেটি বেআইনী হবে! সুতরাং 'নিষ্ফল' সাহিত্যচর্চা ছেড়ে তাঁর পক্ষে ভিন্ন কর্মে যাওয়া ছাড়া গতান্বর্ত নেই। সেই কর্মক্ষেত্রে গিয়ে যদি তিনি চাটাঁর বিরোধী প্রচারকার্য করার চেষ্টা পান তাহলে তাঁর কপালে 'লেবার ক্যাম্প'! যতদূর শুনছি, এই লেবার ক্যাম্প অতি কঠোর কারাগারের শাসন-ব্যবস্থার সমতুল্য। চার্লিন-আমলের লেবার ক্যাম্প বা 'ফোর্ড' লেবারের' অনুকরণে সম্ভবত হিটলার তাঁর 'কন্সট্রাক্টিভ ক্যাম্পের' পরিকল্পনাটি নিয়েছিলেন।

মস্কা থেকে কুড়ি মাইল দূরে 'পেরেডেলিকনো'। এটিকে বলা হয় লেখক-উপনিবেশ। কিন্তু প্রশস্ত পথ থেকে গাড়ি যখন বাঁদিকে বাঁক নিল, দোঁখ আমরা এক বৃহৎ অরণ্যভূমিতে

প্রবেশ করেছি। চারিদিকে বাচ্ এবং ঘুরেছেন, যাঁরা দার্জিলিংয়ের দক্ষিণে পাইনের ঘন জটিলার ফাঁকে ফাঁকে বেশিদূর কোথাও কিছু দেখা যায় না। তখন অপরাহ্নকাল।

সরু পথ তরঙ্গায়িত। ছোটনাগ-বৃহৎ বনস্পতি দলের আবেষ্টনীর মধ্যে পুরের বনে বনে যাঁরা শিকারের অব্যবহাে এসে পড়লুম,—যেখানে উইলো, পপলার,

শেবক-এর সুন্দর মসৃণ এবং সংকীর্ণ বনপথে পরিভ্রমণ করেছেন তাঁরা বৃক্সবনে কোথায় এলুম। অতঃপক্ষণের মধ্যেই আমরা

বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি বরণীয় গ্রন্থ

॥ সাহিত্য-বিষয়ক ॥

বিমানবিহারী মজুমদার : ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫.০০; পচিশত বৎসরের পদাবলী ৬.০০ ॥ অজিত দত্ত : বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ১২.০০ ॥ মদনমোহন গোস্বামী : ভারতচন্দ্র ৩.০০ ॥ ভবতোষ দত্ত : চিত্তান্নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ৬.০০ ॥ রথীন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্য-বিচিত্রা ৮.৫০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী : আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন ৩.৫০ ॥ অরুণ মল্লিক : পাণ্ডায় ৪/উনিবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য ৮.০০ ॥ শিবজেন্দ্রলাল নাথ : আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য ৮.০০ ॥ সত্যরত্ন দে : চর্যাপদ-পরিচয় ৫.০০ ॥ অরুণ ভট্টাচার্য : কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল ৪.০০ ॥ প্রশান্ত রায় : সাহিত্য দৃষ্টি ৪.০০ ॥ সাধন-কুমার ভট্টাচার্য : রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ৬.০০; নাটক ও নাটকীয়তা ২.৫০; নাটক লেখার মূল্যায়ন ৫.০০ ॥ আজহারউদ্দীন খান : বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল ৫.০০

॥ জীবনী সাহিত্য ॥

চারচন্দ্র ভট্টাচার্য : বৈজ্ঞানিক জীবনকার কাহিনী ১.৫০ ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বঙ্গের প্রাচীন কবি ১.০০ ॥ গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী : জীবনী নির্বেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ ৫.০০; শ্রীমারকু ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫.০০ ॥ বলাই দেবশর্মা : ব্রহ্মবান্ধব উপাখ্যান ৫.০০ ॥ প্রভাত গুপ্ত : রবীন্দ্রাব ৬.০০ ॥ খাজা আহমদ আব্বাস : ফেরে নাই গৃহ; একজন ৪.০০ ॥ মণি বাগ্চি : শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১০.০০; রামমোহন ৪.০০; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৪.৫০; রাইকেল ৪.০০; কেশবচন্দ্র ৪.৫০; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৪.৫০

॥ বিবিধ গ্রন্থাবলী ॥

রাধাকৃষ্ণ : হিন্দু সাদনা ৩.০০ ॥ ভারতসম দেবশর্মা : রামায়ণতত্ত্ব ৪.৫০ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন : রামায়ণী কথা ৪.০০ ॥ ত্রিপুরাশংকর সেন শাস্ত্রী : রামায়ণের কথা ১.২৫; ভারত জিজ্ঞাসা ৩.০০; মনোবিদ্যা ও দৈর্ঘ্যাদির জীবন ২.৫০ ॥ শিশিরকুমার নিরোগী : সহজ কৃতিবাসী রামায়ণ ৩.৫০ ॥ বিশ্বেশ্বর মিত্র : পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গ ৩.৫০ ॥ কল্যাণী কালেকর : ভারতের শিক্ষা ১ম খণ্ড ২.৫০; ২য় খণ্ড ৫.০০ ॥ প্রফুল্লকুমার দাস : রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গ ১ম খণ্ড ৩.৫০ ॥ সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় : আত্মিকার চিত্র ১.৫০ ॥ সুন্দরা বন্দ্যোপাধ্যায় : লাইবেরিয়ার উপকথা ১.৫০ ॥ সুন্দরীকুমার গুহ : স্বাধীনতার আবেল তাবেল ৫.০০ ॥ সত্যকিংকর সাহানা : হিন্দুধর্ম ১.৫০; মহাভারতের অনুশীলনতত্ত্ব ২.৫০; চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ ২.৫০; শকুন্তলা রহস্য ২.৫০ ॥ মণীন্দ্র সন্ন্যাস : প্রবাসী বাঙালীর কথা ১.৫০ ॥ মানবেন্দ্রনাথ রায় : মার্কসবাদ ১.৫০; দর্শন ও বিপ্লব ১.৫০ ॥ শ্রীজ্ঞানান্বেষী : দেশ-বিদেশের শিক্ষা ৪.০০

॥ গল্প ও উপন্যাস ॥

বৃদ্ধদেব বসু : আমার বন্ধু ২.০০; চার দৃশ্য ২.৫০ ॥ শৈলজানন্দ মল্লিকোপাধ্যায় : লক্ষ্মী ২.০০; হাসি ২.০০ ॥ বাণী রায় : শূন্যের অক্ষর ২.৫০ ॥ সুবোধ মজুমদার : অন্তর ও বাহির ২.০০; পলাতক ৩.০০ ॥ বিদ্যাবাহন চৌধুরী : অনুস্মৃতি ২.৫০ ॥ কল্যাণী কালেকর : কন্যা ও কুমার ১.৭৫ ॥ সুধীররঞ্জন গুহ : ময়নামতী ৩.০০ ॥ সুবোধ বসু : মানবের শত্রু নারী ২.০০; স্বর্গ ২.০০; পদনর্ভব ২.৫০; উর্ধ্বগামী ৩.০০; পদ্মা প্রমত্তা নদী ৩.৭৫; গল্পলতা ৪.০০; চিহ্নিত ৩.০০; ইতিগত ২.৫০; পদ্মানদীর ডাক ১.৭৫ ॥ সূর্য্যকুমার রায় : কয়েকটি গল্প ১.০০

জিজ্ঞাসা ॥

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ : ১৩৩এ, রাসবিহারী
অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

ওক আর পাইনের তলায় তলায় থমথম করছে নির্জনতা। বহু শত বর্গমাইল-ব্যাপী এমন একটি প্রাকৃতিক শোভা-সমৃদ্ধ অরণ্যভূমি সাহিত্যিকমণ্ডির জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে, এটি সূত্রের বিষয়। এরই মধ্যে অসংখ্য ছোট বড় বাগানবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে লেখকদের নিজেদের খরচে। জংগল জটিলার ফাঁকে ফাঁকে সে বাড়িগুলি ঠাহর করা কঠিন, তবে মাঝে মাঝে পাঁচিল দেখে অনুমান করে নেওয়া যায়।

‘পেরেডেল্কিনো’র লেখকরা অনেকটা ‘আদুরে ছেলের’ মতো। তাদের অভাব কিছু নেই। যার সামান্য শক্তিও আছে, সেও রাষ্ট্রের সহযোগিতা পায়। রাষ্ট্রের হাত থেকে বিনামূল্যে প্রায় চার বিঘা জমি, অকুপণ স্বগদান, এবং সেই স্বর্ণ পরিশোধের উপায়স্বরূপ গ্রন্থপ্রচারের সহায়তা। ‘পেরেডেল্কিনোর’ প্রত্যেক লেখকের একখানা বা দু’খানা মোটরগাড়ি, বাড়িতে টেলিফোন, ইলেকট্রিক, টেলিভিশন, গ্যাস, কলের জল, এবং রসদাদি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা। এক একজনের নামে প্রচুর টাকা স্টেট ব্যাংক খাটে। লক্ষ লক্ষ টাকা একেজো হয়ে ব্যাংক পড়ে আছে যেসব লেখকের একাউন্টে, তাঁরা অনেক সময়ে তার খবরও পান না। পাখির পেট ভরা থাকলে তার কণ্ঠের গান মিষ্ট হয় কিনা অতটা ভেবে দেখিনি। ‘পেরেডেল্কিনো’ সৃষ্টি হবার পর রুশরস-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধিলাভ করেছে কিনা, রুশভাষা না জানার জন্য আমি বলতে পারিনি। তবে ভারতীয় একজন বিশিষ্ট কামিউনিষ্ট বন্ধু কিছুকাল আগে আমাকে বলেছিলেন, আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য খুব গৌরবজনক হয়ে ওঠে। শ্রীমতী অকসানা একদিন আমাকে বলেছিলেন, বেশ ত, সমগ্র সোভিয়েট আমলে যদি একজনও ‘মিখাইল সলোকভ’ হয়ে থাকেন, তবে সেইটাই কি যথেষ্ট নয়?

সেই যথেষ্ট কিনা আমি ভেবে দেখিনি। চূড়ান্ত সম্ভোগের আয়োজন এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকলে নাকি সাহিত্যরচনার মন প্রচলিত হয়, এ ধরনের কথা এক শ্রেণীর লোক বলে বেড়ায় শুনছি।

এই ‘পেরেডেল্কিনোর’ উপাল্লে একদা হিটলারের নাৎসীবাহিনী এসে হানা দি়েছিল, তার আনুপূর্বিক কাহিনী এখানে বসেই শুনছিলাম। চারিদিকের ঘন অরণ্যের ছমছমে নিঃসঙ্গতার মধ্যে এই উপনিবেশটি আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে কেন আত্মগোপন করে রয়েছে। ভিতরে

ভিতরে দুই তিনটি ডিপার্টমেন্টাল দোকান এবং খাদ্যবিক্রেতাদের সূদৃশ্য ষ্টল। আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, তার ভিন-চারখানা বাগানবাড়ির পরেই পাণ্টেরনাকের ‘দাচা’। তখন মাত্র সপ্তাহ-বানেক আগে তাঁর নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির ঘোষণাটি আমরা শুনছি, এবং সেই ঘোষণা শোনামাত্র তাঁকে সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে বিতাড়িত করার আয়োজন চলছিল।

আজ যার কাছে আমাদের আহারের নিমন্ত্রণ, তিনি একজন নামকরা ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক এবং প্রবন্ধকার। এঁর নাম পাভেল লুকনিৎস্কি এবং এঁর বয়স প্রায় ষাট। ঘরে স্ত্রী আছেন, তাঁর নাম ভেরা, এবং একটি বছর আঠেটকের বালক-পুত্র—তার নাম সেরিওজা। বালকের বয়সের তুলনায় পিতামাতার বয়স কিছু বেশি। অভ্যর্থনার মধ্যে সমাদর এবং আন্তরিকতা এত প্রচুর ছিল যে, একবারও মনে হয়নি আমরা ‘পেরের’ বাড়িতে এসেছি। শ্রীমতী নাটাশা এবং লিডিয়া ছাড়া আমরা ভারতীয় মোট ছয়জন। আমরা যখন ভিতরে ঢুকলাম, তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলছে।

ছোট্ট একটি ঘাংলো। পাশাপাশি দুটি ঘর, একটি রিসেপশন ঘর, করিডর, রান্নাভাড়া, বাথ, একটি ডাইনিং ঘর,—উঠানের ওদিকে গরু রাখার চালা, এবং বাগানের দিকে একটি বি-চাকরদের যেমন তেমন স্নানাদির ব্যবস্থা। আমাদের সকলের জন্য পানাহারের ব্যবস্থা এমন প্রচুরভাবে করা হয়েছিল যে, ভোজন-রসিকমাত্রই পূর্নাকৃত হবেন! কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, শ্রীমতী লিডিয়া একসময় চোখের ইশারায় আমাকে জানানেন, ঐগুলির মধ্যে বহু সামগ্রী আমার পক্ষে খাওয়া চলবে না! পুরুষের আহার সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের এই অহেতুক কতৃষ্ণ নিজের দেশ হলে বরদাস্ত করতুম না! কিন্তু তাঁর ইশারা যখন বাধ্য হতে থাকল তখন আর সবাই হৈ চৈ করে তাঁকে নানাবিধ তামাশায় ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন। শ্রীমতী ভেরা নিজের হাতে-প্রায় কুড়ি রকমের আর্মি-নিরামিষ খাদ্য প্রস্তুত করেছিলেন।

পাভেল লুকনিৎস্কিকে প্রথম দৌখ তাসকন্দে। তখন সদাসর্বদা তাঁর পিঠে ঝোলানো থাকত একটি ক্যামেরা। অত্যন্ত সরল এবং নিরীহ ক্যামেরাম্যান মনে করে বহু সময় তাঁকে এড়িয়ে চলে গেছি, কেননা এমন ব্যক্তি সেখানে ছিল

শত শত। কিন্তু আজ তিনি আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামনে এসেছেন। ভাণ্ডা ভাণ্ডা ইংরেজি তিনি বলেন, এবং তাতেই কাজ চলে যায়। সম্প্রতি এই লেখকের ‘নিশো’ নামক উপন্যাসটি বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে ইংরেজি ভিন্ন পাঁচ সাতটি ভাষায় তাঁর বই বেরিয়েছে। আমি দু’বছরে দু’জন লেখককে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। তাঁরা হলেন মালংজেভ এবং লুকনিৎস্কি। এঁদের সঙ্গে ঘুরেছি, এঁদের রান্না-ভাড়া চুকে উৎপাত করেছি অনেকদিন, শোবার ঘর-গোছানোর মাঝখানে বসে মাসিক আয়ব্যয়ের হিসেব কষেছি, এবং অতীত-ভবিষ্যতের আলাপ-আলোচনা করেছি। মালংজেভ একদিন লিডিয়াকে আমার সামনে বললেন, ওঁকে আগে ভাবতুম-কুটুম্ব, এখন দেখছি ঘরের লোক! উনি শোবার ঘরের খাটের তলা থেকে বাজপ্যাঁটা টেনে খুলে বসেন, উনি না পারেন কি?

ঘন্টাচারেক ধরে আজ আমাদের আহারাদির পাট চলছিল। শ্রীমতী ভেরা ওই সময়টুকুর মধ্যেই লিডিয়ার হারফং আমার নানাবিধ আজগুবী প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি দীর্ঘকায়, অতিশয় বলশালিনী,—যাকে বলে ‘রোবাস্ট’,—বড় বড় চোখ, এবং আগাগোড়া গোলাপী-রক্তিম প্রসাধন। এ বাড়িতে ঢোকবার সময় মনে হয়েছিল, লুকনিৎস্কির চেয়ে তিনি অন্তত পঁচিশ বছরের ছোট। এখন ঠাউরে দেখে মনে হচ্ছে, না, বছর দশ বারের ছোট হতে পারেন! প্রসাধনের মূল উদ্দেশ্য তাঁর বাথ হয়নি।

আমার প্রশ্নগুলি যে কোনও গৃহ-স্থের পক্ষে প্রতীকটু। যেমন রাতে কে আগে ঘুমোয়, গরুর খাদ্য কে কিনে আনে, ছেলেরা কাকে বেশি পছন্দ করে, দু’জনের দুখানা গাড়ির পেট্রল একজনে কেনে কিনা, আহাৰ্যসামগ্রী কার রুচি অনুসারে প্রস্তুত হয়, ঘরদোর কে পরিষ্কার করে, দৈনিক বাজার কে করে, খরচ-পত্র নিয়ে কথায়-কথায় বিতর্ক বাধে কিনা, হঠাৎ এ বাড়িতে কেউ এসে পড়লে কে আগে দুঃখিত হয়, শোবার হিসেব কে টোকে, বাড়িতে ঘুটে দেওয়া হয় কিনা, ব্যাংক টাকা কার নামে থাকে, ইত্যাদি—।

শ্রীমতী লিডিয়ার ধারণা, আমার এইসব ইতর প্রশ্নে এবাড়ির গৃহিণী মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন, কিন্তু ষটল তার বিপরীত। ভোজনের আসরের প্রবল হৈ-চৈ থেকে এক একবার আমরা তিনজন

সরে গিয়ে এই গৃহস্থের সম্পূর্ণ ঘরোয়া জীবনের বহুবিধ আলোচনার মধ্যে মিলে যাচ্ছিলুম। প্রসাধন এবং পোষাকের অন্তরালে যে দুটি বিদেশিনী মহিলাকে দেখাচ্ছি, তাঁরা কেবল বাঙালী দেশ বা ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর যে কোনও দেশের ছোট পিসি, মেজ গ্রাসি বা রাগ্যা বৌদির সমতুল্য। আমরা আমাদের তিন-জনের পারিবারিক জীবনের বিবিধ খুঁটি-নাটি মধ্য চলে গিয়েছিলুম। ফলে, সেদিন রাত্রির আকাশের বিদেশী তারা, অশ্বকারের ঝাউ, দেবদারু আর ইউক্যালিপটাসের বনানীকে মনে হয়নি এরা অপরিচিত বা অনাশ্রয়ী। এইটি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঠেকত, সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের পারিবারিক জীবনের দরজা অব্যাহতভাবে খোলা,—সেখানে আন্তরিক আশ্রয়তা ঘনিষে ওঠার দশ মিনিটের মধ্যে ওরা বৈঠকখানা থেকে ডেকে শোবার ঘরে বা রান্নাঘরে নিয়ে আসে! বিছানায় গাড়িয়ে গল্প করে, আলমারিটা খুলে দেয়, আমার জামাটা নিয়ে সযত্নে হুকে টাঙিয়ে রাখে, নানাবিধ সুবিধে অ-সুবিধের কথা বলে, আশ্রয়স্বজনের কাহিনী ফেঁদে বসে! ঠিক এমনি ভাবেই এক নাট্যকার মিঃ ভিনিকভ একদা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। সে-বাড়িতে গিয়ে যখন তাঁদের রান্নাঘরে বসে ভিনিকভের মামীশাহাদুড়ী, শ্বশুরকায়া শ্রী, শ্রীমতী লিডিয়া, ভিনিকভ এবং আমি—এই পাঁচজনে রান্নাবান্না ও কুটনো-বাটনার কাজ নিয়ে মেতে উঠলুম,—তখন পরদেশী আতিথ্যকে নিয়ে না ছিল হুজুগ, না বা অভ্যর্থনার অতিশয়তা। উভয়ের সম্পর্কের মাঝখানে কমিউনিজম বা গণতন্ত্রের কোনটাই ছিল না, ছিল নিছক ঘনিষ্ঠ আশ্রয়ের ঘরোয়া উৎসব। বিস্ময়ের কথা এই, শ্রীমতী লিডিয়া এবং আমি উভয়েই তাঁদের বাড়িতে সম্পূর্ণ নবাগত এবং অপরিচিত। লক্ষ্য করেছি আমাকে পরিচিত করতে গিয়ে লিডিয়াও বহু পরিবারে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। সে যাই হোক, লিডিয়ার সবপ্রকার চোখ রাগানো সত্ত্বেও শ্রীমতী ভেরা আমার কৌতূহলী প্রশ্নগুলির উত্তর যথাযথভাবে সহাস্যেই দিয়েছিলেন। পরের বৎসর লুকনিৎস্ক যখন আমাকে ও লিডিয়াকে তাঁর এই ‘দাচার’ দুপুর বেলা খাবার জন্য পুনরায় নিয়ে আসেন, শ্রীমতী ভেরা প্রস্তাব করেন,—তিনিই তাঁর গাড়িতে আমাদের দুজনকে এখানে ওখানে ঘুরিয়ে

নিয়ে আসবেন। এই দম্পতির অমায়িক সৌজন্য ও মিষ্টি ব্যবহার আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক হয়েছিল।

আজ নাট্যশার পোষাকে কিছু বৈচিত্র্য ছিল। আমাদের ভারতীয়দের ছয়জনের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার চুল অঙ্গপবিস্তার পাকেনি। কিন্তু এখানে এসে সেই গ্রীক ভুল্লোকটিং কথা বার বার মনে পড়ছিল, “What's in age? Its desire which counts” সর্দার শেখোনের চুলের সঙ্গে বৃদ্ধি বিবেচনা যথেষ্টভাবে পেকেছে কিনা, সেটি নাট্যশার প্রতি তাঁর আচরণের দিকে যিনি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিলেন—তিনি শ্রীমতী লিডিয়া! কিন্তু আনন্দ-কলরবের এমন অব্যাহত চেহারা স্বয়ং আতিথ্যসবকেরই ভাল লাগছিল।

পুরুষের প্রকৃতি বোধ করি নাট্যশার নখদর্পণে। তিনি চতুরা, কটাক্ষবতী, রসোচ্ছল, এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘নরসহচরী’! পুরুষের সূর্য্যর পাত্রটি কেমন করে ভরে দিতে হয়, আঙুরি হাঁসকদম্বতির সঙ্গে আঁখিতারকার কলসিত বিদ্যুতের ব্যবহার কি প্রকারে করতে হয়, চাপা কণ্ঠে কী কথা গোপনে বললে পুরুষের বক্ষরক্তধারা নেচে ওঠে এবং সবপ্রকার তন্ময়তার মধ্যেও প্রত্যেকের প্রতি তাঁর সচেতন চোখ ও কান ক্রমশ খোলা থাকে,—আমিও তাঁর এগুলি হাসিমুখে লক্ষ্য করছিলাম। তাঁর প্রতি আমার যথেষ্ট মনোযোগ আছে কিনা এটি তাঁর পক্ষে মাঝে মাঝে জানারও দরকার ছিল। যাই হোক, এক সময় তিনি উঠলেন, এবং বন্ধুদের হাত ধরে নৃত্য ও গীত শুরু করলেন। ওরই মধ্যে সহসা একবার লক্ষ্য করলুম, তিনি আমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন! কেন করছেন জানিনে। বোধ হয় তাঁর এটি জানার দরকার ছিল, আমার নির্বাক ও নির্বোধ চোখ দুটোর মধ্যে কোনও মোহাচ্ছন্নতা আছে কিনা। তাঁকে দেখে আমার তরুণ বয়সে-দেখা একখানা সিনেমার ছবি মনে পড়ে যেত। ছবিটির নাম ছিল, ‘মাতারি’।

আহারাদির মাঝখানে এক সময় লুকনিৎস্ক আমার পাশে বসলেন এবং অন্যপাশে বসে চাপা গজনের সঙ্গে শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, এবার উঠুন, আর আপনার খেয়ে কাজ নেই!—বলতে বলতে তিনি নিজেই দুর্ভিত্তখানা প্লেট সরিয়ে রাখলেন।

অধীর আনন্দের মধ্যেও লুকনিৎস্ক কি যেন বিজ্বলিত করতে-করতে চোখের জল ফেলছিলেন। আমার ধারণা, তাঁর ষট বছর বয়সের পক্ষে যেন এই আনন্দ-পানের মায়া ঈষৎ বেশি হয়েছিল। তিনি সহসা এক সময় আমার গলা জড়িয়ে চুম্বন করে আপন ভাষায় কি যেন বলছিলেন। সেইটি শুনে লিডিয়া বললেন, বেশ ত, এঁকে নিয়ে ঘরে চলুন, ইনি মন দিয়ে শুনবেন।

আমি মৃদু তুলে তাকাতেই লিডিয়া পুনরায় বললেন, লুকনিৎস্ক যা কখনও করেননি, আজ তাই করবেন। ওঁর ঘরে চলুন, উনি ওঁর জীবনের কিছু কিছু কথা আপনাকে বলবেন। আপনাকে উনি বড় ভালোবেসেছেন!

শ্রীমতী নাট্যশার নৃত্যগীতের অব্যাহত ক্ষেত্রটি পাবার জন্য শ্রীযুক্ত শেখোন, তাবান, বেদী, যশপাল এবং চৌহান গেলেন ভেরার শয়ন-কক্ষে, এবং আমরা তিনজনে একদম লুকনিৎস্কের ঘরটিতে। ঘরটি বড় নয়। মাঝারি ধরণের তিনটি শাস-আলমারি,—বইপত্র ঠাসা। মেঝের উপর কাপেট পাতা, সেখানে খান তিনেক গাদি-আঁটা চেয়ার। এপাশে একটি এলোমেলো বিছানা। দেওয়ালে দুর্ভিত্তখানি বড় বড় খংগিত রশ লেখকের ছবি। কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানে ওখানে। একধারে সেরিজার কয়েকটি খেলনা গোছানো।

পাশের ঘরটি উল্লাসে আনন্দে পরিপূর্ণ। কিন্তু এঘরে লুকনিৎস্ক তাঁর চোখের জল মুছে একটি আলমারি খুললেন, এবং ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বলতে লাগলেন, যুদ্ধকালীন লেনিন-গ্রাডের সঙ্গে বিজড়িত তাঁর নিজ জীবনের কথা। আলমারির ভিতর থেকে একে একে তিনি বার করলেন প্রায় ৭০ খানা ডায়েরী। লেনিনগ্রাড নগর জার্মান সৈন্যদলের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ ত্রিশটি মাস। লুকনিৎস্ক সেই সময়ে বর্মসূত্রে লেনিনগ্রাডে ছিলেন। তিনি পালাতে পারতেন কোনমতে,—সন্দেহ নেই, কিন্তু চতুর্দিকব্যাপী অপমৃত্যুর মাঝখানে থেকে পালিয়ে তিনি আশ্রয়শ্রী করতে চাননি। এই ডায়েরীগুলিতে তিনি সেই ত্রিশমাসের প্রতিদিনের আনুপূর্বিক ইতিহাস পেন্সিলের দ্বারা লিপিবদ্ধ করেছেন। মাঝখানে প্রশ্ন করে বসলুম, পেন্সিলে লিখতে গেলেন কেন? তিনি বললেন, কলমের কালি পাব কোথায়? আমার বাসা খুলিসাং হয়ে গেছে তখন

বোমাবর্ষণে। নানা-ন্দমায় পড়ে থাকি। কখনও ইটকাঠের স্তূপের মধ্যে লুকেই। মাঠে পড়ে থাকি রাতে, বরফে চাপা পড়ি! আবার প্রশ্ন করলুম, আহা! তুমি? তিনি জবাব দিলেন, নেই, কিছু নেই! মাঠের ঘাস, মরা জন্তুর শব্দ, জুতোর চামড়া, জঞ্জালের ময়লা কাগজ, সূতী জামাকাপড়,—যা কিছু ছিল লেনিনগ্রাডে সব খেয়ে শেষ করা হয়েছিল। একটি মস্ত ইস্কুলবাড়িতে চারহাজার শিশু-বালক-বালিকাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। একটিমাত্র জার্মান বোমার আঘাতে বাড়িটি উড়ে যায়! সেই চার-হাজার শিশুর শব্দেহগুলি খুঁজে পাওয়া যায়নি। দুর্ভিক্ষ আর দুর্গতির মধ্যে মৃত্যু দেখাছিলুম হাজার হাজার মানুষের।

আপনি বাঁচলেন কেমন করে?

জানিনে। আমার মতন হাজার হাজার মেয়েপুরুষ উপড় হয়ে শূন্যে এখানে ওখানে নড়ে বেড়াত। আমার অসুবিধে ছিল এই, আমার শরীরের একটা দিক পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল! একদিন আর ক্যামেরাটা খুলতে পারলুম না। ডায়েরীতে তখন একেবারেই শব্দ বসানো কঠিন মনে হচ্ছিল! একদিন আমি আমার শেষ সম্বল দুটি মোম-বাতি খেয়ে অস্ত্রান হয়ে পড়ি। ডায়েরী শেষ হবার আগেই আমার মৃত্যু ঘনাইছিল!

লুকনিৎস্কি একবার কতক্ষণের জন্য বাইরে গেলেন। কিন্তু যখন ফিরে এলেন, আমার সন্দেহ হল, তিনি তাঁর আবেগবিহীনতা সামলাতে না পেরে ছুটে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সম্ভবত আরেকপাশ পান করে জলখরা চক্ষু নিয়েই ফিরলেন। শ্রীমতী লিডিয়া একপাশে দাঁড়িয়ে করুণ চক্ষে এটি লক্ষ্য করছিলেন।

পাশের ঘরে নাট্যশািলের নৃত্যগীতের আসর যখন এক একবার উল্লাসে উত্তরোল হচ্ছিল,—লুকনিৎস্কি তখন আমার গলাটা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন! তিনি মাভাল হননি, কিন্তু মধ্যপ্রভাবে তাঁর আবেগবিহীন মানবতার সত্যস্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁর বেদনা এই, সেদিনকার লেনিনগ্রাডের মাত্র একটি নিরুপায় জীবনকেও তিনি বাঁচাতে পারেননি! হাজার হাজার মরছিল শূন্য বোমার, হাজার হাজার মর-

ছিল উপবাসে! সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু পাশে শুয়ে সেদিন কঁকিয়ে কঁকিয়ে মরেছে এক অজলা জল খেতে না পেয়ে, আর আজ আমি পেট ভরে খাচ্ছি,—এই বেদনায়!

লুকনিৎস্কি বলতে লাগলেন, প্রত্যেকটি জীবন্ত জন্তুকে সেদিন খেয়ে শেষ করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি মৃত শব্দ, প্রত্যেকটি কক্ষাল, গলিত যে কোনও দেহ, নরম যে কোনও বস্তু! তারপর আরম্ভ হয়ে গেল শিশুর শব্দেহ, তারপর মৃত গলিত যে কোনও মানুষের! কী করবে বলুন? উত্তাপ, মাংস, মদ, জ্বালানি, কাঁচা বা পাকা কিছু ভোজ্য, পানীয় জল, আলো জ্বালার ব্যবস্থা,—কোথাও কিছু নেই। যারা কিলবিলা করছিল তারা মানুষ নয়, মানবেতর, তারা জন্তু, তারা আদিম আরণ্যক,—সভ্যতার সংবাদ তারা ভুলে গেছে! আমার এই সবগুলি ডায়েরীতে আছে, বর্ষের অনাচারের ভাঙনায় মানুষের সেই ক্রমিক অধোগতির ইতিহাস! এগুলি সেই প্রতি ঘণ্টার, প্রতি রাত্রির, প্রতি বোমাবর্ষণের, প্রতি সিগনাল ক্রিয়ারের! আজ তাই সোভিয়েট ইউনিয়নের সকলের বড় আতঙ্ক, পাছে আবার কোথাও কারও ভুলে যুদ্ধ বাধে! আপনি বিশ্বাস করুন, কোটি কোটি মানুষের ভয়াবহ দুর্গতির ইতিহাস আমাদের বৃকের মধ্যে রক্তের অক্ষরে লেখা! যুদ্ধ আর আমরা চাইনে, চাইনে,—এই রাত্রিকালে আপনার কাছে শপথ করে বলছি, আমাদের কুড়ি কোটি নর-নারীর একজনও কেউ যুদ্ধ চায় না!

তিনি আমার বাহুর মধ্যে যখন আবদ্ধ হলেন, শ্রীমতী লিডিয়া তখন চোখের জল মুছছিলেন। এক সময় লুকনিৎস্কিকে প্রশ্ন করলুম, আপনার পক্ষাঘাত রোগ কেমন করে সারল?

লুকনিৎস্কি বললেন, পামীরের পাহাড়ে এই রোগ সারাবার হাসপাতাল ও স্যানার্টোরিয়াম আছে। সেখানে বহুদিন থাকার পর আমার রোগ সারে। সেখানেই আমি 'নিশো' বইটি লিখি। ফিরে এসে আমার বহু দুর্দিনের বন্ধু শ্রীমতী ডেরাকে বিবাহ করি। সেরিওজা আমার সকল দুঃখের সার্থক সাঙ্কনা!

লুকনিৎস্কির অনেক চোখের জল সেদিন আমার গলার কাছে পড়েছিল। যুদ্ধকালের এমন ভয়াবহ চিত্র তিনি আমার সামনে ধরেছিলেন যে, সেটি যেন আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বইল।

সেই রাতে বনজঙ্গল পেরোবার সময় কেমন একটা বোবা ভয়াবহ অন্ধকার আমার পিছন নিয়েছিল। দ্বিতীয় গাড়ি-খানায় ড্রাইভার ছাড়া আমরা মাত্র দুজন। কিন্তু শ্রীমতী লিডিয়া আমারই মতো নিশ্চল ও নির্বাক হয়ে সমস্ত পথটা এক পাশে বসে রইলেন।

মস্কো আর্ট থিয়েটারে বসে টল-টলিয়ে 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখাছিলুম। একে একে দেখলুম অনেকগুলি। 'ক্রেমলিন ক্রক', চেরী অর্চড, উইনটার টেলস, মেরী গুয়াট' এবং আধুনিক কয়েকটি,—প্রত্যেকটি অনবদ্য। আজকের 'আনা কারেনিনা' নিয়ে বোধ করি ১২ খানি রুশ নাটক, ৮টি ব্যালে, ৫টি অপেরা এবং ২টি সার্কাস—এই দেখা হল! নাটক শূন্য দেখাছিনে, দেখছি প্রেক্ষাগৃহের রসবোধ, দেখতে পাচ্ছি রুশ-জাতির প্রকৃতি। 'আনা কারেনিনা'-র গল্পটি সাহিত্যজগতে অতি প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই নাটক কলকাতার মতো সর্ব-রসগ্রাহী এবং ভারতীয়গণ্য উচ্চশিক্ষিত শহরের মধ্যে অভিনীত হতে থাকলে ইট-পাটকেল ছুড়ে মণ্ডের দফরফা হতো! পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের মেয়ে 'অসতী আনা কারেনিনার' প্রাণ-সমস্যাটা বোঝে এবং বিচার করে, কিন্তু ভারতীয় পুরুষ এটি বরদাস্ত করে না! এর প্রধান কারণ নারীর জননী-রূপ ভারতীয় পুরুষের চোখে নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ। কোনও চিত্রে বা মঞ্চে সতী জননী যদি কাঁদে, ভারত কাঁদে তার সঙ্গে! কলকাতার সিনেমাগৃহে অনেক সময় পুরুষ যখন কাঁদে, মেয়ে কাঁদে না! স্বামী ছাড়া অপর প্রণয়ীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যাপারে মেয়ের চোখে যখন জল আসে, প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে 'বাকুদা' তখন শিশ দিয়ে ওঠে! তারা নাটকের ভালমন্দ বিচার করে না, এবং অভ্যস্ত চিন্তাধারা ও সংস্কারের বাইরে যেতেও চায় না। আমাদের সমাজ-মনের উপর পুরুষের শাসননীতি আজও প্রখর। মেয়ে সেখানে ভয়ভীরু।

'আনা কারেনিনা' রচনাকালে টল-টলি স্বপ্নেও ভাবেননি, এ-বইয়ের ছবি কখনও হবে, অথবা এ-বই কখনও নাট্যকারের মণ্ডস্থ হবে। সেই কারণে সোভিয়েট মণ্ডের সামনে বসে যখন এই পৃথিবীপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাট্যরূপটি অবাধ বিস্ময়ে দেখাছিলুম, তখন মনে হচ্ছিল ওই বৃহৎ উপন্যাসটি আরেকবার

আনুপূর্বিক প্রতি ছয় পাঠ করে যাঁচ্ছ! এই কৃতিত্ব পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে, খবর পাইনি। প্রেক্ষাগৃহের দর্শক-সাধারণ নিশ্চল, উৎসুক এবং নির্বাক। গল্পের মাঝখানে প্রসূতি সদান 'আনার' স্বামী এবং উভয়ের সাক্ষাৎ এবং সেখানে স্বামী স্বীকার করে নিচ্ছেন সেই অবৈধ সন্তানের পিতৃত্ব! দৃশ্যটি কঠিন, এবং প্রেক্ষাগৃহে নিস্তব্ধ। কিন্তু সমস্যাটা ওরা জানে, জীবনের স্থলন-দ্রুতিবিচ্যুতি ওরা স্বীকার করে নেয়। ভুলমুঠই জীবনের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ, ওরা জানে। ওদেশে অপব্যবস্কা শূদ্ধ্যাচারিণী বিধবারা পুনর্বিবাহ করেনি অথবা করবার সুবিধা পায়নি, এমন উদাহরণ প্রচুর। তারা মনোমতো চাকরি করে, নিজের হাতে রাঁধে বাড়ে, নিজের ছোট ফ্যাটটিতে জীবন কাটায়। কিন্তু দৈবাৎ কখনও যদি তারা সন্তান-সম্ভবা হয়,—তারা নদীতে ঝাঁপ দিতে ছোটে না, কেরোসিন তেল খুঁজতে বেরায় না, বিষ কেনে না, গলায় দড়ি দেয় না, গোপনে দ্রুতহত্যার জন্য ডাক্তারকে ঘুরে খাওয়ায় না, অথবা কোনও তীর্থস্থানে গিয়ে ঘরভাড়া করে না। কুমারী কোনও মেয়ে অসুবিধায় পড়লে তাকে কলঙ্কিত করার জন্য সামাজিক আরোজন নেই, নিন্দা ও কানাকানির ঝড় বয় না,—বরং তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা হয়। তার জন্য হাসপাতাল খোলা আছে বিনামূল্যে, সেখানে সন্তান ও প্রসূতির সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করে ছেঁট। অথবা সে-মেরেটি যদি গর্ভধারণে অনিচ্ছুক থাকে তবে অস্ত্রোপচার করে দেওয়া হয়! তার পথ থাকে অব্যাহত। সে সকল অবস্থাতেই সম্মানিত নাগরিক! শূদ্ধ্য তাই নয়, সেই মেয়ের পূর্বহিতহাসের দিকে দ্রুতগমন না করে ছেলে এগিয়ে আসে মেয়েটিকে বিবাহ করতে। ওরা জানে, এইসব নিয়েই জীবন। কিন্তু টলটলয়ের যুগে অবস্প্রকার সমাজদর্শন ছিল না, তাই ওরা এত আগ্রহে 'আনা কারেনিনা' দেখে শিক্ষালাভ করে! ওরা যে এই নাটকের শেষ দৃশ্যে এমন করে কাঁদে, তার প্রধান কারণ—একদিকে রসবোধ, অন্যদিকে আনার জন্য বেদনাবোধ! অসামান্য রূপরাশি নিয়ে 'আনা' যখন স্ট্রেনের তলায় পড়ে মরে, ওরা তখন হায় হায় করে ভাবে, আনা এ-যুগে জন্মালে তার এমন প্রাপসমস্যা দেখা দিত না,—সে হত গৌরবান্বিতা সোভিয়েট নাগরিক!

বস্তুত, একালের সোভিয়েট সাহিত্যের যে-রস তার সঙ্গে পৃথিবীর কোনও দেশের সাহিত্যের মিল নেই! প্রথমত 'পাখির' পায়ে সুতো বাঁধা,—সেই সুতো হল রাষ্ট্রনীতি অর্থাৎ কমিউনিষ্ট সমাজের আদর্শনিয়মতা। সামনের দিগন্তের ডাকে সেই পাখি উড়ুক কতক দূর, কিন্তু বহুদূর নয়! সৃষ্টিধর্মী যে বিবেক, তার মূলমন্ত্র হল, মনোভাবনার অনাবিল স্বাধীনতা। সেখানে পাখির পাখার মধ্যে 'পর' বাঁধা থাকলে সৃষ্টির অপমৃত্যু! চিত্তের কুণ্ঠিত প্রকাশ মানে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের সর্বনাশ! সম্ভবত প্রকাশের এই কুণ্ঠা আছে বলেই টলটলয়ের মতো জগৎজোড়া সাহিত্য-প্রতিভা নিয়ে কেউ সোভিয়েট আমলে আজও জন্মগ্রহণ করেনি। ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা, ঈর্ষা, নীচতা, চক্রান্ত, নৈরাশ্য, চিন্তাদাহ, বিয়োগ-বিচ্ছেদ, স্নেহাশ্রু, নরনারীর অপূর্ণ কামনা-বাসনা, দয়া, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, বিস্ময় ও হিংসা, ঘৃণা ও লালসা—ইত্যাদি এরাই রস-সাহিত্যের উপাদান, অর্থাৎ পদার্থ। কিন্তু উপরোক্ত ষোল-আঠারোটি মনোভাবকে যদি রস-সাহিত্যের থেকে ছাটি দেওয়া হয়, তাহলে গল্প-উপন্যাসে থাকে কি? সেই নিবিড় বিচ্ছেদের বেদনাস্রু, যেটি মানব-বংশপরম্পরায় জনকদ্বিহিতা সীতার চোখে মৃত্যুর মতো টলটল করে,—সোভিয়েট সাহিত্যের ভাষা হল, সেই শ্রীমতী সীতা যে কোনও ফ্যাট্টরীতে কাজ করতে পারতেন এবং যে কোনও সময়ে শ্রীরামের মতো অযোগ্য স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা উঠতে পারত! কেননা সোভিয়েট তথা কমিউনিষ্ট সমাজ অতিশয় উদার এবং বিবেচনাশীল,—সুতরাং সেখানে কেন থাকবে নৈরাশ্যের কান্নাকাটি? কমিউনিষ্ট সমাজে ঈর্ষা, নীচতা, হিংসা, ঘৃণা, বিয়োগান্ত চোখের জল, ভালবাসার জন্য কাতরোক্তি, লালসার লোলরূপ, পাখীর জন্য বেদনাবোধ—এগুলি কেন থাকবে? এসব সমস্যার সমাধান আছে, প্রতিকার আছে এবং এদের মীমাংসাও আছে। সুতরাং অধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য হয়ে উঠেছে বীর্ষ ও তেজোব্যঞ্জক, বিবেচনা ও পরামর্শ-প্রধান,—কিন্তু রসের নিবিড়তা সেখানে আছে কিনা আমার জানা নেই। সোভিয়েট সাহিত্যে অশ্লীলতা, ইতরবৃত্তি, মনো-স্তব্ধের জটিল সমস্যা, অলীক দিব্য-স্বপ্নের অর্থহীন নিঃশ্বাস, চরিত্রের বিভিন্ন বিকার—এগুলি কম। কিন্তু অযোগ্যকে যোগ্য করে তোলা, ভীরুকে বীর্যবান করা, দুর্গতকে তুলে আনা,

প্রতিক্রিয়াশীলকে নিপাতে পাঠাও, প্রাচীন সংস্কারের প্রতি বিদ্রূপবাণ হানো, শক্তিমানকে জয়গা ছেড়ে দাও, দেশ-প্রেমিকের খোঁজে বেরোও, প্রতিভাকে আবিষ্কার করো, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস আনো,—এগুলি সোভিয়েট সাহিত্যের মূল নীতি! যা প্রাপ চায় তাই লিখো না, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লিখো! কেননা তোমার হাতে কমিউনিষ্ট সমাজ-গঠনের দায়িত্ব রয়েছে! তোমার মনে বেদনা, নৈরাশ্য, শূন্যতা—এসব যদি থাকে তার প্রতিকার করে নাও। কিন্তু সুন্দর রচনাভঙ্গীর দ্বারা সেই গ্যাস দেশের মনের উপর ছড়িও না! সেটা অপরাধ। ওই গ্যাসের প্রভাবে দেশের যৌবনকে বিষাক্ত করো না,—সেটা দেশদ্রোহিতা! সোভিয়েট সমাজসৃষ্টির প্রারম্ভে যদি কোথাও অন্যায় বা অন্যচার ঘটে গিয়ে থাকে, তার খোঁটা আজ দিয়ো না, পূরনো কথা তুলো না, পিছনের দিকে চেয়ো না, ইতিহাসের চুলচেরা বিচার করতে বসো না,—সেটা পূরনো কাসম্বি, সেটার নাম 'রিভিসনিজম', সেটায় লাভ কিছু নেই, অথচ সেটায় শত্রু হাসনা হবে! কমিউনিষ্ট সমাজ শূদ্ধ্য এগিয়ে চলুক, পৃথিবীতে নতুন জাতি সৃষ্টি করুক। তারা যেন মাঝপথে থমকিয়ে পিছনের পথের দিকে চেয়ে আত্মবিচার না করে! গতি মানেই অগ্রগতি, গতিহীনতা অপমৃত্যু!

স্বচক্ষে আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু সজ্ঞানে অনুভব করতুম, সোভিয়েট ইউনিয়নের অদৃশ্যালোক লক্ষ লক্ষ ময়দানবে পরিপূর্ণ—যাদের করালচক্ষুর ইতিগতে রাতারাতি উঠে দাঁড়াচ্ছে নিরীশ্বরবাদী বিরাট এক জড়সভ্যতা,—এবং যেখানকার কোটি কোটি নরনারীর দানবীয় অধ্যবসায় ও আশ্চর্য নির্মণকৌশল আমাকে বিস্মিত অভিভূত এবং হতবুদ্ধি করে রেখেছিল অনেকদিন। ওদের সাহিত্যও এই দেশজোড়া জীবনের নবনির্মাণবাদেই পরিপূরক। যারা এককালে ছিল সর্বহারা, অন্যকালে গিয়ে তারা হচ্ছে সর্বস্ববান। পদুজিবাদী পাশ্চাত্যের সঙ্গে আজও ওদের লড়াই চলছে বটে, কিন্তু ওরা নিজেদের ঘরেই সৃষ্টি করতে বসেছে লক্ষ লক্ষ ধনাত্ম্য। কেউ ঠিকিয়ে, বা বাণ্ডিত করে বা শোষণ করে ভাগ্য ফেরাচ্ছে না, কিন্তু অশ্চর্য এক অশ্চর্য দ্বারা প্রতি ব্যক্তি সত্ত্বয় করছে ধনসম্পদ! নামছে না কেউ, উঠছে সবাই। একসঙ্গে! আগে তুলেছে ব্যক্তিকে, তারপর গোষ্ঠীকে, এখন গোষ্ঠী তুলতে বসেছে ইউনিয়নের সকল জাতিকে! এর সীমা ও শেষ কোথায়, ওরা

কি জানে? আমরাই কি জানি? ওরা বলছে, সপ্ত-বার্ষিক যোজনার নিশ্চিত সাফল্যের 'পর' ওরা দৌড়বে ১৯৮০ পর্যন্ত! তারপর হইল সৌর্যবিশ্বের সর্ষ-চন্দ্র-ভেনাস-জুপিটার-স্যাটার্ন! পঁচিশ বছর আগেও কেউ ওদেরকে মানুষ মনে করেনি—যখন ওরা 'অতিমানব' সৃষ্টির গোপন গবেষণাগারে একমনে কাজ করছিল! তারপর হঠাৎ ফিরে দেখল, আমেরিকার দুটো আণবিক বোমায় জাপানের দুটো শহর উড়ে গেল! সেই দৃশ্য দেখে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ওরা নিঃশব্দে গিয়ে ঢুকল বিজ্ঞান গবেষণাগারের রহস্যরম্ভে। অতঃপর কয়েক বছর বাদে হঠাৎ বেরিয়ে এল হাসিমুখে। বলল, হ্যাঁ, এবার আমরাও পেয়েছি! আর ভয় পাইনে!

আজ ওরা সেই এটমের নতুন হাতিয়ারের বলে চাঁদে রেখে এল জ্বর-দখলের নোটিশ, তার উলটো পিঠের ছবি নিয়ে এল, সূর্যের দিকে খবর পাঠাল, মহাকাশ জয় করে আসবার সময় দূরের থেকে 'ক্ষুদ্র' পৃথিবীটির ভাবভঙ্গীটি দেখে এল! ওরা একদিকে পৃথিবীর উপ-নিবেশবাদকে গালি দিচ্ছে, অন্যদিকে ভিন্ন গ্রহে-উপগ্রহে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপনের সক্রিয় চিন্তা করছে! এককালে সমগ্র পৃথিবীর শত্রুতার দিকে তাকিয়ে ওরা ভয়ে কাঁপত, আজ সমগ্র পৃথিবী ওদের শত্রুতার ভয়ে কাঁপছে! আজ মস্কোতে ব'লে দশ হাজার মাইল দূরবর্তী 'কিউবাকে' ওরা রক্ষা করে চলেছে কেবল ঘৃণা ও জ্ঞানের বলে নয়, বিজ্ঞানের আশ্বাসনে, আণবিক শক্তির সাফল্যে! ওদের সামনে গিয়ে মিচ্চমুখে আন্তরিক সারল্য এবং বন্ধুতার সঙ্গে কথা বোলা, দেখবে ওদের চেয়ে নিকটবন্ধু তোমার আর কেউ নেই! তোমার সুখ-দুঃখ, আপদ-বিপদে ওরা বুক দিয়ে এসে পড়বে এবং যে কোনও ত্যাগস্বীকার করবে তোমার জন্য! কিন্তু যদি কোথাও তোমার ছলচাতুরী প্রকাশ পায়, যদি তোমার পকেটে লুকানো ছুরির ফলা ওদের চোখে পড়ে, তুমি যদি 'বিষকুন্ড পয়োমুখম' হও—তবে ওদের চেয়ে ভয়ংকর আর কেউ নেই! ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ওরা গিয়েছিল একাগ্র আন্তরিকতার সঙ্গে, এবং ইউ-২ গ্লেন-ঘটিট ফ্রান্সিস গ্যারী পাওয়ার্স-এর আচরণের ইতিহাস ভুলতেও চেরেজিল! কিন্তু প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বিনসন্তে ক্ষমা চাননি বলেই ওরা সেই সম্মেলনকে তুচ্ছ করে চলে এসেছে!

ওদের স্বভাব-সরলতার সঙ্গে দুটি বস্তু অঙ্গাঙ্গী জড়ানো। একটি তার কোমল করুণা, অন্যটি কঠোর কাঠিন্য! ওরা যখন পৃথিবীব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের কথা বলে, তখন ওদের চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ নেই—এ যেমন সত্য, তেমনই যুদ্ধ যদি বাধে তবে ওদের চেয়ে হিংস্র আর কেউ থাকবে না—এও তেমন সত্য! ইংরেজ এই কথাটি মনে-প্রাণে বুঝেছে বলেই ইংল্যান্ড থেকে জনসাধারণের একটা বড় অংশ আজ এই ধুরো তুলেছে, "Better 'red' than 'dead'!"

প্রত্যহ প্রভাতের মতো আজও টেলিফোন বাজল:

"Its Lydia speaking. Good morning, Mr. Sanyal, when you're coming down? No, no, it must be 8-30. There are heavy engagements for you. Come straight to the breakfast table. I'll be there. Please hurry up."

এ মহিলার বহু সদগুণ আছে। শৃঙ্খল একটি দোষ,—দ্রুততা! ছুটি দিতে চান না, এবং নিঃশব্দ ফেলতে দেন না। পাছে কোনও দ্রষ্টব্য না দেখি, পাছে কোনটা এড়িয়ে যাই,—এই ও'র ভয়। ও'র ইচ্ছা আমি স্বাধীনভাবে ঘুরি, বাজার-হাটের মধ্যে হারিয়ে যাই, কোনও রেস্ট'রায় বসে একবেলা কাটাই, একজ-বিশনে ঢুকে ঘুরে বেড়াই, মেট্রোর সুড়ঙ্গলোকে আনাগোনা করি, গৃহস্থ-পরিবারের ঘরে গিয়ে দৃ-দন্দ বসি, পিচ-জনের সঙ্গে গল্প-গুজব করি। ও'র বিশ্বাস, ভারতীয় দলের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা অনাভিজ্ঞ ব্যক্তি।

সকালের দিকে ভারতীয় লেখকগণকে সম্মানিত করার জন্য একটি অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। মস্কোর একটি প্রশস্ত রাজপথের ধারে প্রকান্ড এক বাড়ির দোতলার একটি বক্ষে আমাদের আনা হ'ল। এটি বৃহৎ মার্বেল হল, চারিদিক সুদৃশ্য। দেখতে পাচ্ছি এটি পুরনো আমলের মস্ত অট্টালিকা। প্রকৃতপক্ষে যা কিছু সুন্দর, শোভন এবং সূর্য্যচিসম্মত, তার অধিকাংশই জার আমলের। এই বাড়িটি সাহিত্যগুরু টল-ষ্ট'য়ের নামে উৎসর্গ করা। এখানে টলষ্ট'য় প্রায়ই এসে সম্মানিত লেখক, গায়ক, শিল্পী প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হতেন। এই বাড়িটির সংগ বহু প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত।

সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে যে দুজন রথী অভ্যর্থনা জানাবার জন্য

উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা দুজনেই বর্তমানে 'পৃথিবীনিবাস' বলেই সুপ্রসিদ্ধ। এঁরাই বিশেষ একটি জরুরী প্রস্তাবের বলে সম্প্রতি কবি বোরিস পাস্টেরনাকে সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত করেছেন। এঁদের একজন হলেন ঔপন্যাসিক এবং লেখক সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট, নাম বোরিস পলেভয়। অন্যজন হলেন কবি এবং সেক্রেটারী, নাম আলেক্সি সুরকভ। প্রথম জন অতিশয় তত্ত্বাবধিক, সপ্রতিভ, মিষ্টভাষী এবং বিনীত। দ্বিতীয় জন বাকচতুর, সরল, হাস্যরসিক, উগ্রতান্ত্রিক এবং জ্বরদস্ত। কোমল এবং কঠোর দুইজন বসেছেন পাশাপাশি। দুইজনে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা জানেন না। এদেশে লেখক সঙ্ঘের যারা অধিনায়ক তাঁরা সুপ্রীম সোভিয়েটের যে কোনও মন্ত্রীর সম-মর্যাদাসম্পন্ন। এই দুইজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকমণির সম্বন্ধে এর আগে কিছু কিছু সংবাদ আমার জানা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান লেখক ও প্রাক্তন কমিউনিষ্ট মিঃ হাওয়ার্ড ফাষ্ট-এর "নেক্ট গড" নামক গ্রন্থে পলেভয় সম্বন্ধে যেমন প্রচুর আলোচনা আছে, তেমনই বহু আমেরিকান, ব্রিটিশ, জার্মান ও ইতালীয়ান সাময়িক পত্রও সুরকভ সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়ে থাকে। "Problem of Communism" নামক সাময়িক পত্রটির পাতাও আমি প্রায়ই ওলটাই। কিন্তু ফাষ্ট-এর বইটি পড়ে প্রথম ফাষ্ট-কেই জেনেছিলাম,—সরল মনে নির্বোধ! আর্থার কোয়েং-স্পারের কয়েকখানি সুখপাঠ্য বই মনো-যোগ সহকারে পড়েছিলাম। তিনি হাঙ্গেরিয়ান কমিউনিষ্ট ছিলেন। কিন্তু এমন উন্মাদগামী, দ্রাস্তচেতন এবং প্রত্যাশাবাদী লেখক খুঁজে পাওয়া ভার! রচনাশিল্পের আশ্চর্য দক্ষতার এবং বিচারবুদ্ধির শোচনীয় অক্ষমতার তার অনেকগুলি বই পরিপূর্ণ। আমি সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হয়েছিলাম যুগো-শ্লেভাভিকয়ার প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিলোভান ভিজিলাস কর্তৃক লিখিত "The New Class" এবং পলাতক উক্রাইনিয়ান কমিউনিষ্ট—তথা পদস্থ সোভিয়েট কর্মচারী ভিক্টর ক্রাজচেনকো-লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "I chose Freedom"—এই দুখানি বই পাঠ করে। ভিজিলাস বর্ণনা করেছেন কমিউ-নিষ্ট সমাজের উদ্দেশ্যে, প্রকৃতি ও মনো-ধর্ম, এবং ক্রাজচেনকো বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজ জীবনের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্ব-

যুদ্ধকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নের ফাঁলিন যুগ! আজ মিঃ খুদুশভ এবং সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি তাঁদের সর্ব-প্রকার কার্যাবলীর দ্বারা সেই হতভাগ্য ক্লাভচেনকোর প্রতিটি বাক্য সমর্থন ও প্রাশস্তি করে চলেছেন! সে যাই হোক, আমি সর্বাপেক্ষা উপকৃত বোধ করি ইংরেজ লেখক ও লেখিকা সিডনি এন্ড বিয়ান্টিস ওয়েব-এর "Soviet Communism: A New Civilisation" নামক বৃহৎ গ্রন্থখানি পাঠ করে।

কয়েকজন বিশিষ্ট এবং খ্যাতনামা সোভিয়েট লেখক এই অভিযন্ত্রণের আসরে উপস্থিত ছিলেন। কেউ তাঁদের কবি, কেউ ঔপন্যাসিক, কেউ বা প্রবন্ধকার। এরা সাহিত্যনায়ক, চিত্রনিয়ামক, এ'রাই সোভিয়েট সাহিত্যের শিক্ষক। এ'দের পরামর্শ, নির্দেশ ও উপদেশ ভিন্ন সোভিয়েট ইউনিয়নে বসে সাহিত্যচর্চা করা সম্ভব নয়। এ'দের স্বীকৃতি না থাকলে সাহিত্যে স্বীকৃতি নেই! এ'রা সাহিত্যের নীতি নির্ধারণ করেন এবং সুপ্রীম সোভিয়েট এ'দের পরামর্শ ও নির্দেশ মেনে নেন। এ'দের ইচ্ছা ও আনিচ্ছার উপর লেখকের সাহিত্য-সাধনার গতি ও প্রকৃতি নিরূপিত হয়। প্রতি তিন বছর অন্তর সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল লেখক মিলে একটি কনগ্রেস বসে,—সেই কনগ্রেসের অধিবেশন স্থল হল সুপ্রীম সোভিয়েটের পার্লামেন্ট ভবন। এই কনগ্রেসের জন্য বহু লক্ষ টাকা খরচ হয় এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে লেখকরা আসেন আমন্ত্রিত হয়ে,—তাঁদের অধিকাংশই বাম-পন্থী লেখক। আমাদের ভারতবর্ষ থেকেও বাক্যবাগীশ এবং ইংরেজি-লেখক ডাঃ মল্লিকরাজ আনন্দ প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই যোগদান করতে আসেন। তিনি বাম কি দক্ষিণ আজও আমি স্পষ্ট বুঝিনি। তবে ভারতীয় কোনও ভাষায় তিনি বিশেষ কিছু লেখেন না, এটি জানা আছে। তিনি খ্যাতিমান, কিন্তু আমার বিশ্বাস, বঙ্গা হিসাবেই তাঁর খ্যাতি বেশি। সোভিয়েট ইউনিয়নে দুইজন ভারতীয় লেখকেরই নাম ইতস্তত শোনা যায়,—যাঁদের রচনা ভারতে সুপরিচিত নয়। একজন ভবানী ভট্টাচার্য, অন্যজন ডাঃ আনন্দ।

কৃত্তা ও ভাষণের মধ্যে কোরিস পলেভরের বিনীত মিষ্ট কথাগুলি যেমন

ভাল লাগল, তেমনি আলোকিত সুরকভের উদ্ভূত পরিহাস-কৌতুক এবং ধারাল বাকপটুতায় আমরা আনন্দ পেলাম। আমাদের মধ্যে বেদী, চৌহান, শেখান, তাবান সবাই কিছু কিছু বললেন। শ্রীযুক্ত জহীর তাঁর ভাষণে হঠাৎ আমার প্রতি এমন শ্রদ্ধাপরবশ হলেন যে, আমার পক্ষে চুপ করে থাকটা এবার যেমানা লাগল। এখানে লক্ষ্য করে দেখছি, জহীর সম্বন্ধে আন্তরিক একটি প্রশ্নানুরাগ সর্বত্র বর্তমান। আমার বিশ্বাস, আমরা যতগুলি লোক ভারত-বর্ষ থেকে এসেছিলাম, তাঁদের মধ্যে মাত্র দুইজন ব্যক্তি সকলের প্রকৃত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তাঁদের একজন হলেন ডাঃ সুনীতিকুমার, অন্যজন এই জহীর।

আমার বক্তব্য ছিল সামান্যই। অভিযন্ত্রণা সভা হল পারস্পরিক সৌজন্য-প্রকাশের ক্ষেত্র, এটিকে সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র বলা চলবে না। আপনারা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, আমরাও আপনাদের কাছে তাই। এটা শুধু 'দেখাসাক্ষাৎ, জানাশোনা নয়। আসল মানুষ আমরা সবাই লুকিয়ে আছি সৌজন্যের অন্তরালে। তারা সভা চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এ'ল আমাদের উভয়ের মনোভাব বা মনুভাব ঠিক কি প্রকার দাঁড়াবে জানিনে। আমরা কেউ কারো লেখা পড়িনি, কেউ কারোকে চিনি। কে কি লেখে কেউ জানিনে; কিন্তু আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আপনাদের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের দোভাষী এবং দোভাষিণীদের উদ্দেশ্যে। তাঁদের যত আগ্রহ অধ্যবসায় পরিশ্রম এবং আত্ম-বিস্মৃত সেবাপরায়ণতার গুণে আপনাদের এই সুন্দর দেশের বহু অপরাধ দৃশ্য উপভোগ করবার সৌভাগ্য হয়েছে। যাঁদের কাছে আমরা উদার আতিথ্যলাভ করেছি, এবং যাঁরা আমাদের মতচ্ছ বিচরণের ক্ষেত্র অবারিত রেখে আপনাদের দেশবাসীর জীবনধারাকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই!

ভারতবর্ষ ফিরে যাবার পর বোরিস পলেভ এবং সুরকভ আমাকে কয়েকখানি পত্র ও অভিনন্দনজ্ঞাপক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। পরের বছরে ও'রাই আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। ও'দের আতিথেয়তা এবং আপ্যায়ন আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। মিঃ

সুরকভের মধ্যে কিছু রূঢ় নাটকীয়তা আছে। আত্মপ্রত্যয়কে দৃঢ় করার জন্য তিনি যখন তাঁর মাতৃভাষায় একপ্রকার স্ন্যকসেন্ট দিয়ে ঈষৎ ঘৃষি পাকিয়ে আত্মবাতন্ত্র্য প্রকাশ করেন, তখন তিনি একটিবারও সন্দেহ করেন না—একজন নিরীহ ভারতবাসী তার অমায়িক দুর্দৃষ্টি ভাষাহীন চক্ষু তাঁর দিকে তুলে মনে মনে রসভোগ করছে! শ্রীযুক্ত সুরকভ এখন "ফরেন কমিশন অফ রাইটস" বিভাগের চেয়ারম্যান, এবং সেক্রেটারী হলেন পলেভয়। এই বিভাগের বিনি ভাইস-চেয়ারম্যান, তিনি মহিলা। তাঁর নাম শ্রীযুক্তা হলেন রমানোভা। ইনি একদা ভারতীয় কবি-সম্মেলনের অধিবেশনে আমার পাশে বসে মধুর গল্প-গুজবে ও হাসি-পরিহাসে মগন ছিলেন। সেদিন 'পুতুলটিকে' দেখে খুশী হয়েছিলাম।

কিন্তু কয়েকদিন পরে সেই পুতুলটি প্রতিমা হয়ে উঠল। সেদিন তাঁর পরি-মন্ডল যখন চালাচলি দেখতে পেলাম, তখন একটু খতিয়েই গিয়েছিলাম। শ্রীমতী লিডিয়ার সঙ্গে গিয়েছিলাম গোর্কি স্ট্রীট থেকে বোকে ভরোভস্কি স্ট্রীটে সোভিয়েট রাইটস ইউনিয়নের হেড আপসে। মস্ত গোলাকার বাগান-বাড়ি, মাঝখানে মহামতি টলস্টয়ের একটি প্রস্তরমূর্তি। বাড়িটি আগেকার আমলের। দেখে মনে হয়, আগেকার কালে রাজপরিষদের কোনও নোবল-এর বাড়ি। এখন সেকালের সেই নোবল বা কুলাক বা জারের খয়ের-খাঁ-পরিষদ,—তাঁরা যে কোথায়, তা কেউই জানে না। সম্ভবত তারা ঝড়ে-বংশে 'লিকুইডেটেড' হয়ে গেছে! ধনরত্ন-সম্ভার নিয়ে দেশ ছেড়ে যারা পালাতে পেরেছিল তারা আর ফিরে আসেনি! সেই সুবৃহৎ গোষ্ঠীর সংখ্যাগতীত স্থাবর সম্পত্তি পরবর্তীকালে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের হাতে আসে। সুতরাং ক্ষমতালাভের পর গৃহীয়ে বসবার সময় তাঁরা বিনামূল্যে 'সাজানো ঘর এবং পাতা উন্মূল' পেয়ে যান। এ বাড়িটি সম্ভবত তাদেরই অন্যতম।

লেখক সংঘের দপ্তরটি অনেকটা একান্তে। ভিতরটি সুপ্রশস্ত নয়। দরজায় ঢুকে এদিক ওদিক ফিরতে গেলে একটু হেঁচট খেতে হয়। ছোট একটি ঘরে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে কাগজপত্র ও ও চিঠির ঝাঁপ নিয়ে একটি মেয়ে টেবলে বসে কাজ করছে। অন্যদিকে দোতলার ওঠবার একটি কাঠের সিঁড়ি। নীচের-

তলায় অভাগতদের আনাগোনা, ওঘরে পরামর্শকক্ষ, ডানপাশের বড় ঘরে ইন্টরভিউ। সুতরাং ওই ঘরটিতেই আমি ঢুকলাম। সেখানে শ্রীযুক্তা হেলেন রমানোভা অপেক্ষা করছিলেন। অত্যন্ত সমদরসহকারে তিনি অভ্যর্থনা করলেন। বেলা তখন ১১টা।

কবি-সম্মেলনের সেই মস্ত ভোজনাদির আসরে অগণিত নরনরীর আনন্দ-উৎসবের মধ্যে এবং রাত্রির আলোকোজ্জ্বল মার্বেল হলের ভিতরে আমার চোখে যে মোহাচ্ছন্নতা ছিল, অজকের এই রুচ স্পষ্ট দিবালোকে সেটি নেই। মহিলার চুলে পাক ধরেছে, বড় বড় চক্ষু, বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, এবং যে-দৃশ্যটি এই দেশে দুলভ—সেটি তাঁর দেহের একটি সুদীর্ঘ কৃশতা। কিন্তু তাঁর ধারালো দৃষ্টির সঙ্গে মূখের মিষ্ট হাসির কেথায় যেন একটা গরমিল আছে লক্ষ্য করে আমি একটা আকৃষ্ট হলাম। যে-মহিলাকে সেই রাত্রে হাস্য-পরিহাসে মূখর হতে দেখেছিলাম, ইনি তিনি নন। ইনি ভাইস-চেয়ারম্যান! পৃথিবীব্যাপী বামপন্থী লেখক সম্প্রদায়ের ইনি অন্যতম বিবেক-রক্ষিকা। আমি সহাস্যে করমর্দন করে আনন্দে গদগদ হয়ে বললাম, না, আপনাকে চিনি।

আমি চিনি। সেই যে সেই রাত্রে,— শ্রীমতী রমানোভা কলকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

আমিও খুব হাসলাম। বললাম, যেখানেই যাচ্ছি, দামী সিলেক্ট পর্দা দেখছি। লৌহ-স্বর্নিকা কোথায়-কোথায় আছে, একটা খোঁজখবর দিন।

আমি কেন দেবো, আপনি খুঁজে বার করুন।

যদি যেখানে খুঁশি যাই?

আপনার খুঁশি!—মহিলা আবার হেসে উঠলেন।

একটা স্মৃতির কথা ছিল। মহিলা সুন্দর ইংরেজি বলেন। সুতরাং আমার পাশে বসে শ্রীমতী লিডিয়াও হাসিমুখে যোগ দিতে লাগলেন। এক সময় রমানোভা বললেন, কই সেদিন আপনি গেলেন না যে, ‘যশনায় পলিয়ানাতে’?

বললাম, অতিভোজনের ফলে পেটের অসুখ করেছিল।

বেশ, এ যাত্রায় তাহলে হ'ল না। আসছে বছর আমিই আপনাকে সেখানে ঘুরিয়ে আনব! এবার বলুন কেমন

লাগছে আপনার? কেমন দেখছেন সব?— তিনি উৎসুক হলেন।

শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, উনি নানা-বিধ ‘প্রেজুডিস’ নিয়ে এখানে এসেছেন।

সত্যি?—উজ্জ্বল চক্ষে রমানোভা বললেন, বলুন না, একটা, কী প্রেজুডিস?

হাসিমুখে এবার বললাম, শ'দা চামড়া কালো চামড়াকে ঘেন্না করে এইটি বিশ্বাস করতুম। আপনারা বিশ্বাস-ঘাতক!

আমরা সকলেই উচ্চরোলে হেসে উঠলাম।

নানাবিধ আলাপচারণের মধ্যে আমি মাঝে মাঝে যখন অন্যদিকে মূখ ফেরাচ্ছিলাম অথবা মূখ নীচু করছিলাম, সেই ক্ষণকালীন অবসরটুকুর মধ্যে রমানোভা যেন বিদ্রোহগতিতে আমাকে নিরীক্ষণ করছিলেন। মৌখিক ভাষণ অপেক্ষা আমার মূখভাবটি তিনি লক্ষ্য করতে গান। বাক্য নয়, প্রকাশভঙ্গী! আমার প্রকৃত স্বরূপ কি, পদার্থ আমার কতটুকু, কি প্রকর চিন্তার ছাপ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি, আমি ঠিক কোন সম্প্রদায়ভুক্ত, আমার মনের সঙ্গে মূখের মিল ঘটছে কিনা, কেমন চোখে দেখছি ওঁদের দেশকে,— এগুলি বোধহয় তাঁর পক্ষে জানা দরকার!

এক সময় রমানোভার প্রশ্নের উত্তরে বললাম, হ্যাঁ, একটি বিষয়ে বেশ স্পষ্টই জেনেছি। আমাদের দুই দেশই পরস্পরের কাছে অজানা! আপনারা অনেক ভুল শুনছেন, এবং আমরা অনেক মিথ্যে শুনছি। আপনারদের সম্বন্ধে নির্ভুল ছবি ভারতবাসীর সামনে বিশেষ করে বাঙালীর সামনে নেই!

শ্রীযুক্তা রমানোভার বোধ করি এমনি একটা ধারণা ছিল, ভারতে দুই-তিনটি রাজনীতিক দল আছে, এবং ভারতীয় যারা এদেশে আসেন তাঁরা কোন না কোনও দলের অনুপন্থী। এ সংবাদ সম্ভবত তাঁর জানা ছিল না, ভারতের অধিকাংশ সরকারি কর্মচারী কোনও রাজনীতিক দলভুক্ত নয়, এবং ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যে দলটি বর্তমান, অর্থাৎ বৃহত্তর জনসাধারণ, তারা কোনও রাজনীতিক দলের ক্রীতদাস নয়। আমার

পক্ষে অধিকতর বিস্ময়ের কারণ ছিল এই, মস্কোতে বসে রুশ নাগরিকের—মুখ থেকে শুনিয়েছিলাম, ভারতের প্রত্যেকটি “অন্ধকার নিঃসঙ্গ কারাগারে হাজার হাজার নির্যাতিত ‘কমিউনিষ্ট’ রোগে, উপবাসে ও উৎপীড়নে শূন্য মৃত্যুর দিন গুণছে!” আমি যখন বললাম, এ সংবাদ মিথ্যা,—তখন দু'একজনের মুখে চোখে আমার প্রতি অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল। এটি তাঁদের বোঝানো কঠিন, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বর্তমান ভারত গভর্নমেন্ট—যার আমলে ভারতের কোনও কারাগারে রাজনীতিক বন্দীদের উপর উৎপীড়ন নেই। বরং পারা যায়, জার আমলের ভৃত ওদেরকে আজও পেয়ে বসে আছে! মাঝে মাঝে আমাদের হোটেলের মধ্যে বসেই অনুভব করতুম, ভারত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে রুশীয় কানকে বিষাক্ত করার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবস্থা আছে। যারা ভারতে সামাজিক অপরাধে অপরাধী, ভারত গভর্নমেন্ট নাকি তাদেরকে ‘কমিউনিষ্ট’ মনে করেন। এ ধরণের নেংরা প্রচারণা ওখানে চলে। আমি দুঃখ পেয়েছিলাম এইজন্য যে, ভারতীয় কমিউনিষ্ট কেউ এটির প্রতিবাদ জানাননি। তৎকালীন কেরালার কমিউনিষ্ট গভর্নমেন্টের পক্ষের কোন কোনও ইংরেজি সাময়িক পত্র ওখানে হাতে-হাতে ঘুরতে আমি দেখেছি, কিন্তু ভারতীয় নির্দলীয় কোনও সংবাদ-পত্র সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে পৌঁছয় না, এটি দুঃখের কথা। এর ফলে কমিউনিষ্ট কাগজগুলির ভাষ্যগুলিকেই ওঁরা ‘বেদবাক্য’ বলে মেনে নেন।

ভারত গভর্নমেন্টের পররাষ্ট্র বিভাগের স্বাভাবিক ঔদ্যোগের সঙ্গে একটি অযোগ্যতা ইউরোপের অনেক দূতাবাসের মতো এখানেও প্রকট। অর্থাৎ তাঁরা ‘সত্যমেব জয়তে’—এই মন্ত্রের বাইরে অন্যান্য ব্যাপার সম্বন্ধে উদাসীন! সভ্য-প্রচারের ব্যবস্থা দুর্বল হলে অসত্যের বড়বন্দ যে প্রশ্রয় পায়, এটি তাঁদের অনুমান করা কঠিন।

রাজনীতি আমার পেশা নয়, এবং আপন জন্মভূমি ছেড়ে বেরিয়ে এখান থেকে বৈশ্বিক রাজনীতির সস্তা মন্ত্র কানে তুলে নিয়ে যাবার জন্যও আসিনি! কিন্তু মাঝে মাঝে দু'একটি আজগুবি কথা কানে এলে বিরক্ত হই।

(ক্রমশঃ)

‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’র শতবর্ষ নিখিল সেন

কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬২ সালে। অর্থাৎ ঠিক একশ’ বছর পূর্বে। অবশ্য, খণ্ড খণ্ড আকারে এই নকশাগুলি ‘আশমানস্থ’ রাম প্রেসে মুদ্রিত হয়ে ‘৪৪নং, হুকো রাম বসু, ইন্সটি’ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বেজায় সস্তা দরে—পরিসায় দুখানা করে। “শ্রী তাল হুল ব্রাক-ইয়ার” কর্তৃক এই প্রবন্ধ-পরিচয়নাগুলি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয় দুই ভাগে।

প্রথম ভাগের বিষয়-সূচী ছিল :

চড়ক, বারেইয়ারি, হুজুক ছেলে-ধরা, প্রতাপচাঁদ, মহাপুরুষ, লাল্লা রাজাদের বাড়ি দাগা, কুশচাঁন হুজুক, মিউটিনি, মরাফেরা, আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দকেরা, নানা সাহেব, সাতপেয়ে গরু, দরিয়াই ঘোড়া, লক্ষ্মীয়ারে বাদসা, শিব-কুক বন্দোপাধ্যায় ছুঁচোর ছেলে বঁচো, জাশ্টিস্ ওয়েলস্, টেকচাঁদের পিসি, পান্নি লং ও নীলদর্পণ, রামপ্রসাদ রায়, রসরাজ ও যেমন কর্ম তেমন ফল, বজ্রমুকি, হোসেন খাঁ, ভুতনাবানো, নাক কটা বৎক, বাবু, পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার, স্নানযাত্রা—এমনই ২৮টি প্রকরণ। আর দ্বিতীয় ভাগে : রথ, দুর্গোৎসব, রামলীলা, রেলওয়ে—এই চারটি প্রকরণ।

নিশাচারী হুতোম-এর জীবনিতে কলিকাতা শহরের এই নকশাগুলি ঠিকই খেঁ: “ইয়ে রাজ-বাড়ীক নকশা, বড় মজাদার হায়। ইয়ে শোভাবজারকি গাজন, বড় তামাশা হায়। ইয়ে হাইকোর্টকা বিচার, আজব তাজব হায়।”

সমাজের গলদ দেখিয়ে এমনিধারা লেখনী ধারণ কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্রও করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের ‘আলালের ঘরের দুলাল’-(১৮৫৮)-কিংবা তারও পূর্বে শ্রীপ্রমথনাথ শর্মা ওরফে ভবানী-চরণ বন্দোপাধ্যায় ওরফে ভোলানাথ

বন্দোপাধ্যায়ের ‘নবাবদ বিলাস’-এ (১৮২৩) এমনই ‘স্যাটারার’ বা ব্যঙ্গ-চিত্র চিত্রিত আছে। সুতরাং, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যুৎপাখ্যক রচনার পথ-প্রদর্শক কালী-প্রসন্ন সিংহ নন। ‘নবাবদ বিলাস’-এর নায়ক বা ‘আলালের ঘরের দুলাল’ অথবা হুতোম বিরচিত ‘ঠনঠনের হঠাৎ অবতার’ বাবু পদ্মলোচন দত্ত অনেকটা যেন এক সূত্রে গাঁথা। বিশেষ তারতম্য চেখে পড়ে না। আখ্যানবস্তু ও রচনাবিন্যাসের দিক থেকেও অনেকটা তারা সগোত্রীয় বলা যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহ টেকচাঁদ ঠাকুরের



কালীপ্রসন্ন সিংহ

আদর্শেই প্রথম অনুপ্রাণিত হয়ে কল-কাতার কথ্যভাষায় তাঁর হুতোম-এর নকশাগুলি চিত্রিত করেছিলেন বাংলা গদ্যের সংস্কার মূর্তির উদ্দেশ্যে। সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শব্দের চাপে বাংলা গদ্য যখন পিষ্ট হতে চলেছিল, তখন রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীগণ গুরুভার সমাসবন্ধ পদ ও যৌগিক বাক্য-প্রয়োগের কবল থেকে তাকে রক্ষা করে অনেকটা ইংরেজী গদ্যের ধাঁচে ঢালাতে সচেষ্ট হন। রূপ দেন অপেক্ষাকৃত সহজ সাবলীল সুন্দরিত রচনার মারফৎ।

গম্ভীর চিমে তালে চলা এই সংস্কৃতাসিত গদ্যরীতিতে লঘু দ্রুত ও

স্বচ্ছল রচনারীতির প্রথম প্রবর্তন করেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)। “শব পেড়া মরা দাহ”-র মিশ্র ভাষায় রচিত তাঁর ‘আলালের ঘরের দুলাল’ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনবস্থ নিয়ে এল। সাধু ও চলতি ভাষায় গুরু-চন্দলী দোষে দুষ্ট হলেও আলালী ভাষায় দেখা যায় : “সমাসযুক্ত পদের পরিবর্তন, ভাষালংকারের বিরলতা, তন্ময় ও বিদেশী শব্দের বাহুল্য, ইডিয়ম ও প্রবাদ-বাক্যের বহুল প্রয়োগ—এই গদ্য-রীতিকে কাদম্বরীর গুরুভার ভাষা থেকে অনেক অগ্রসর ভাষারীতি বলা যায়।” (‘বাংলা সাহিত্যের গদ্য’—ডঃ সুকুমার সেন।)

প্যারীচাঁদের আলালী-ভাষা পুরো-পূরি কথা ভাষায় রচিত নয়। তাঁর ক্রিয়াপদগুলি সাধু ও চলতি ভাষারই সংমিশ্রণ।

কালীপ্রসন্নের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ কিন্তু আগা-গেঁড়াই চলতি ভাষায় রচিত। শব্দ তাই নয়, শতবর্ষ আগে কলকাতার যে ‘কলকোয়েল’ বা চলতি ভাষা চালু ছিল, হুতোমী ভাষা যেন তারই পুরো প্রটোটাইপ্। আঠার শতকের গোড়ার দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ফিরঙী আমলাদের দেশীয় কথ্য-ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে কলিকাতা-শ্রীরামপুর-সুন্দরবন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের যে কথ্য-ভাষা উইলিয়ম কেরী সাহেব তাঁর ‘ডায়েলগ্’ বা কথোপকথনে প্রথম সংকলিত করেছিলেন, টেকচাঁদের হাতেই বৃদ্ধি তা নবজন্মগ্রহণ করে। বাংলায় ইডিয়ম বা ক্রেজ আরম্ভ করতেও বইখানির দান কম নয়। শব্দ গণ্য-মান্য বা ‘বাবু’ সম্প্রদায়ের আলেখ্যেই এই নকশাগুলিতে ধরা পড়েনি, সমাজের নীচের তলার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা, তাদের আচার-ব্যবহার ও চাল-চলনের সুন্দর চিত্রও হুবহু ধরা দিয়েছে হুতোমের নিখুঁত নকশা-গুলিতে। এই নকশাগুলির মারফৎ কালীপ্রসন্ন সিংহের সংস্কারমুগ্ধ বিদ্রোহী মানসেরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মনে করিয়ে দেয় চার্লস ডিকেন্স-এর ‘স্কেসেস্ বাই বব্’ (Sketches by Boz)-এর কথা।

বাঁকমচন্দ্র অবশ্য হুতোমকে তার রুচি-অরুচির বাদ-বিচারে ঠকতে ইতস্ততঃ করেননি। ‘বঙ্গ-দর্শন’-এ হুতোমী ভাষাকে তিনি দরিদ্র, নিস্তেজ, বাঁধনহীন এবং অসুন্দর-অশ্লীল বলে

অভিযুক্ত করেছেন। সমাজের নগ্ন কালো রূপ কলকাতার নকশাগুলিতে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল বলে অনেক নিন্দাবাদও জুটেছিল বেচারী হুতোমের কপালে। তবু কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয় :

“হুতোম পাঁচার নকশা হচ্ছে তখনকার সমাজের আগা-গোড়া বিদ্রূপ এবং অতি চমৎকার লেখা। এ বই সেকালের কলিকাতা শহরের চলতি ভাষায় লেখা। এ রকম চতুর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই।.....”

হুতোমের নকশার দু-একটি নমুনা দেওয়া যাক এখানে :

“আমাদের পাড়ার এক স্যাকরাদের বাড়িতে এক জনের বড় ভয়ানক রোগ হয়; স্যাকরারা বিলক্ষণ সংগতি-সম্পন্ন; সুতরাং রোগের চিকিৎসা করে দ্রুতি কল্পে না, ইংরেজি ডাক্তার বন্দি ও হাকিমের মেলা করে ফেলে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসা হলো, কিন্তু রোগের কেউ কিছুই কতে পালে না, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে বাড়ির মেয়ে মহলে-তুলসী দেওয়া-কালীঘাটে সন্তান-কালভৈরবের স্তব পাঠ-তুচ্ছ-তাক-সাকরিদ-নারায়ণ-বালগুড়-বালসী-শোপদ-নুলপদ ও হালদুপদ প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গার চন্মামেস্তা ও মাদুলি ধারণ হলো-তারকেশবের হতো দিতে লোক গ্যালো-বাড়ির বড় গিন্নী কালীঘাটে বক চিরে মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়াতে গেলেন-শেষে একজন ভূতচালা আনা হয়।.....



আমাদের প্রতিবাসী ভূত নাবানোর কথা প্রমাণ ও বাড়ির গিন্নীদের মধ্যে শূন্য ভূতের আহার জন্য আয়োজন করে দ্রুতি করে নাই।.....

রোজার সঙ্গে দ্রুতি চেলা মাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চল্লিশ ভূত দেখবার উমেদার উপস্থিত, সুতরাং ভূত প্রথমে আসতে অস্বীকার করেছিলেন, তদুপলক্ষে রোজাও “কাল ও কুশানীর” উপলক্ষে একটু বক্তৃতা কতে ভালেন নাই-শেষে দর্শকদের প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার করবার সম্মতিতে রোজা ভূত আনতে রাজি হলেন-চেলারা প্রাবার-দাবার সাজানো থালা ঘেঁষে বসলেন, দরজায় হুড়কো পড়লো-আলো নিবিয়ে দেওয়া হলো; রোজা কোমাকুশি ও আসন নিয়ে শূন্যচার ভূত ডাকতে বসলেন, আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বারোইয়ারির গুদমজাত সংগুনের মত অন্ধকারে বসে রইলোম!...

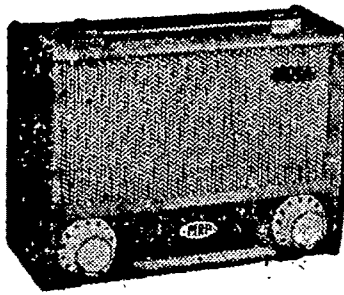
এদিকে রোজা খানিকক্ষণ ডাকতে ডাকতে ভূতের আসবার পূর্বলক্ষণ হতে লাগলো; গোহাড়, ঢিল, ইট ও জুতো হাড়ি বাড়ির চতুর্দিকে পড়তে লাগলো, ঘরের ভেতর গুপ্ গুপ্ করে যেন কে নাচ্ছে বোধ হতে লাগলো, খানিকক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াস্ করে একটা শব্দ হলো, ভূতের বসবার জন্য ঘরের ভিতর যে পিঁড়েখানা রাখা হয়েছিল, শব্দে বোধ হলো সেইখানি দ্রুতির হয়ে ভেঙে গ্যালো-রোজা সভয়ে বলে উঠলেন-শ্রীমুত এসেচেন।

আমরা ছেলেবলা আমাদের বড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনছিলাম যে, ভূতে ও পেঙ্গীতে খোনা কথা কয়, সেটি আমাদের সংস্কারবশ্ত হয়ে গিয়েছিল; আজ তার পরীক্ষা হলো-ভূত পিঁড়ে ফাটিয়েই খোনা কথা কহিতে লাগলেন, প্রথমে এসেই কলেজ বয়দের দলের দু-এক জনের নাম ধরে ডাকলেন, তাদের

নান্দিক ও কুশান বলে গাল দিলেন, শেষে ভূত নিবন্ধন ঘাড় ভাগেবার ভয় পর্যন্ত দেখাতে দ্রুতি করেন নাই। ভূতের খোনা কথা ও অপরিচিতের নাম বলাতেই বাড়ির কণ্ঠা বড় ভয় পেলেন, জোড়হাত করে (অন্ধকারে জোড়হাত দেখা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অন্ধকারে দীর্ঘ দেখতে পান, সুতরাং কর্মকর্তা অন্ধকারেও জোড়হাতে কথা করেছিলেন এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হলো) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত সর মর্ডাণ্ট ওয়েলসের মত যা ধরেন, তার সম্বলছেদ না করে ছাড়েন না, সুতরাং আমাদের ঘাড় ভাগেবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হলো না, শেষে রোজা ও বড়ো বড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালারা অনেক সাধা-সাধনার পর ভূত মহোদয় ষষ্ঠীবাটায় আগত নতুন জামাইয়ের মত বৎকিপ্ত জলযোগ কতে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আঁচতে লাগলোম!

দ্রুতির চটকানো ও চিবোনের চপ্পর চপ্পর ও সাপ্টা ফলারের হাপদর হাপদর শব্দ থামতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় পাশ থেকে ওলা-উঠো রুগীর বমির ভূমিকার মত উকির শব্দ শোনা যেতে লাগলো, ক্রমে উকির চোটে ভূতের বাকরোধ হয়ে পড়ল-বমি! হুড়হুড় করে বমি। গহস্থ মনে কল্লেন, ভূত মহাশয় বৃদ্ধি বমি কছেন সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে আনালেন, শেষে দেখি কি চেলা ও রোজা খোদাই বমি কছেন, ভূত সরে গ্যাচেন-আমরা পূর্বে শুনিনে যে গেরস্তর অগোচরে একজন মেডিকেল কলেজের ছোকরা ভূতের জন্য সংগৃহীত উপাচারে টারটা-মেটিক্ মিশিয়ে দিয়েছিলেন, রোজা ও চেলারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দশা; সুতরাং ভূত নাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিল, সেটুকু উপে গ্যালো!.....”

এমনি ধারা নানা নকশায় বজ্রদুকি, ভাড়ামি আর ভুড়ামির মূখোশ খসিয়ে দেওয়া হয়েছে ‘শ্রী হুতোম পাঁচা কতুক’। ‘হুতোম’ ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০ খৃঃ) তাঁর ‘হুতোম পাঁচার নকশা’-র উনবিংশ শতকের কলকাতা শহরেরই এক বাস্তব রূপ প্রতিফলিত করেছেন পাকা আলোক-শিল্পীর মত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে ভুইফোড় যে ‘বাকু’-সম্প্রদায় কলকাতায় গজিয়ে ওঠে এবং যাদের অনেকেই ‘স্বর্ণকার, বর্ণকার, কর্মকার...



এম, আর, গি,
ট্রানজিস্টার রেডিও

মণি রেডিও প্রোডাক্টস
১৫৭বি, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-১০

কিন্ধা রাজের, মাজের, কাঠের... ইটের সদর্পার, চোঁকদারী, জুয়াচুরী, পোন্দারী" ইত্যাদি করে সহসা বিস্তর বিভ্রাট হয়ে ওঠে, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পাঁচার নকশা' কলকাতার এই 'বাবু' সম্প্রদায় ও কালচারের বাগ্ম্যচিত্র— 'স্যাটারার'। একশ বছর আগেকার কলকাতা আর তার আশে-পাশের সামাজিক গলদের চিত্র এঁকেছিলেন তিনি নিপুণ হস্তে: কোন রঙ ফলাতে বননি। একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করেননি। কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেই তাই তার নকশার দ্বিতীয় সংস্করণের গোর-চন্দ্রকার বলে গেছেন :

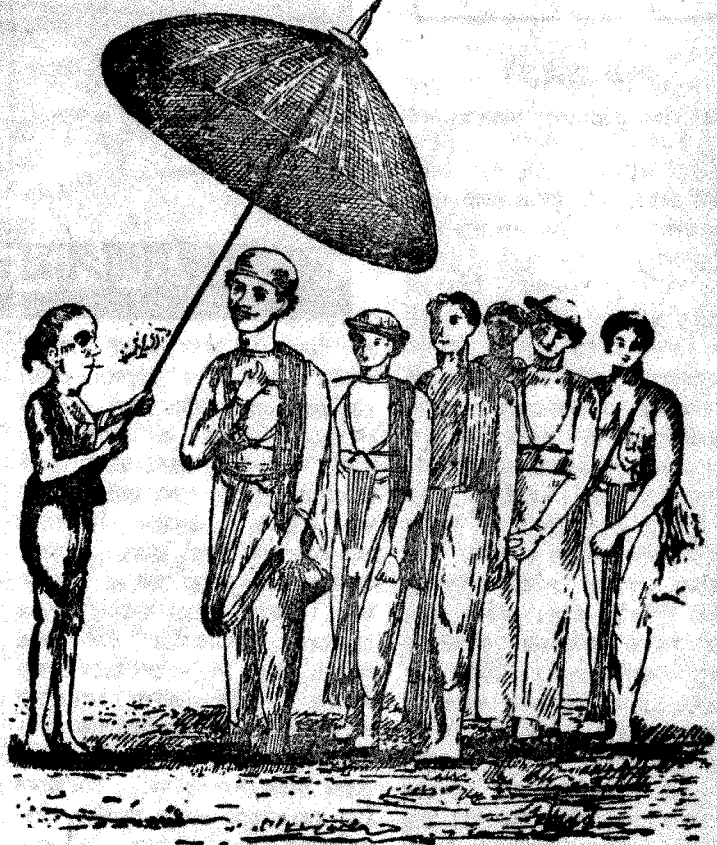
".....হুতোমের নকশা বঙ্গ-সাহিত্যের নতুন গহনা, ও সমাজের পক্ষে নতুন হেরাল্ড; যদি ভাল করে চোখে আগলে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণ এর মর্ম বহন কল্পে পড়েন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো।"

.....পূর্বের বড়-মানুষরা এখনকার বড়-মানুষদের মত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, এড্বেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না; প্রায় সকলেরই একটি একটি (—) ছিল, (এখনও অনেকের আছে)। বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহিকের আড়ম্বরটাও এড় ছিল—দু-তিন ঘণ্টার কম আহিক শেষ হতো না। তেল মাখতেও ঝাড়া চার-ঘণ্টা লাগতো—চাকরের তেল-মাখানির লক্ষে ভূমিকম্প হতো—বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল মাখতে বসতেন, সেই সময় বিবরকর্ম দেখা, কানাজপড়ে সহি ও মোহর চলতো, আচার্য্যর সঙ্গে সঙ্গেই সুবাসে আস্ত যেতেন। এঁদের মধ্যে জমিদাররা রান্ধির দুটো পর্বন্ত কাছারি কতেন; কেউ অমনি গাওনা বাজনা জুড়ে দিতেন; দলদলির তক কতেন ও মোসাহেবদের খেসারদে ফুলে উঠতেন—গাইয়ে-বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো বাপান্ত কল্পেও বকসিস পেতো; কিন্তু ভদ্রলোক ঝাড়ী ঢকতে পেতো না: তার বেলা ল্যাগা তরুরালের পাহারা, আদব-কান্দা। কোন কোন বাবু সমস্ত দিন হুতুতেন—সন্ধ্যার পর উঠে কাজকর্ম কতেন—দিন রাত ছিল ও রাত দিন হতো! রামমোহন রায়, গণেশমোহন দেব, গণেশমোহন ঠাকুর, স্বরিকানাথ ঠাকুর ও জরকৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই

সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হতে আরম্ভ হলো, (বাঙালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো।.....

বাগ্ম-বিবরণে সমুজ্জ্বল এই চিত্র-গুণি ইংরেজ কথাসিঙ্গী চার্লস্

রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরীর মার্জিত, স্বচ্ছ ক্ষরধার লেখনীতেই হুতোমী ভাবার সাধক রসোত্তীর্ণ পরিণতি বলা যায়। আর এখানেই শেষ নয়। হালের 'বেল লেভার' বা রমা রচনায় হুতোমী গদ্য-শিল্পের ধারা বুঝি আজও অব্যাহত রয়েছে।



'হুতোম পাঁচার নকশা' থেকে উদ্ধৃত

ডিকেন্সের Sketches by Boz-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্রীলতা ও অশ্রীলতার বাদ-বিচারে কালীপ্রসন্ন সিংহকে অভিযুক্ত করা হলেও এটা বিবেচনা করে দেখা অনুচিত হবে না যে, হুতোম পাঁচার নকশা যখন রচিত হয় তখন কালীপ্রসন্নের বয়স কতই বা ছিল? (মাত্র ৩০ বৎসর কাল ত তিনি বেঁচে ছিলেন। অথচ এই স্বল্প কালের মধ্যে নকশা ছাড়া তিন-চারখানা নাটক, আঠার-পর্ব মহাভারতের গদ্যনুবাদ, বিদোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি অংশীদারের কি অসাধা সাধনই না করে গেছেন!) সুতরাং 'হাবনস লভ কিং', চপলাতা কিংবা ঝাড়া-বাড়ি যদি কোথাও ঘটে থাকে তাহা বচনার তবে তা ক্ষমা। হুতোম প্রবর্তিত গদ্য স্টাইলের সুন্দর সাবলীল রূপান্তর হল 'বীরবলী' রীতি বা উড়। বস্তুত:

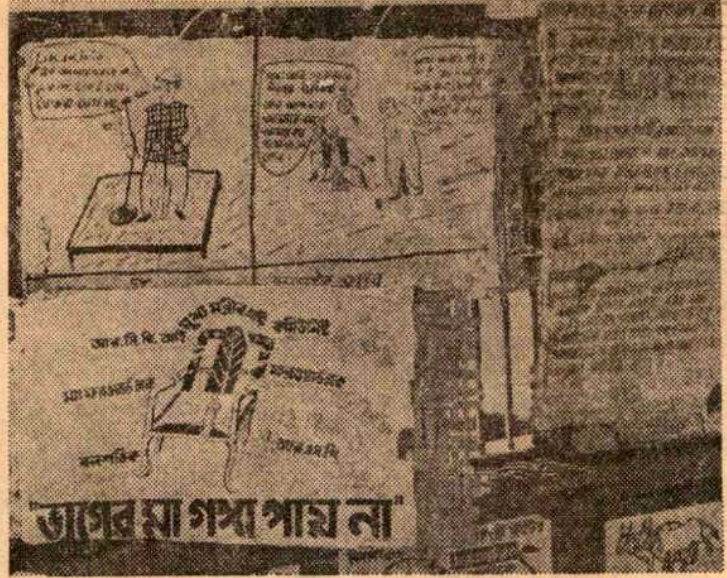
কাজেই দেখা যায়, একশ বছরের আগে জন্মেও অসীম প্রতিভা-দীপ্ত এই প্রগতিশীল কথাসিঙ্গী একশ বছর পরের বাস্তবধর্মী মন নিয়ে একদা হুঁসি লেখনী ধারণ করেছিলেন।



নিবন্ধী অতি দূর স্থিতি

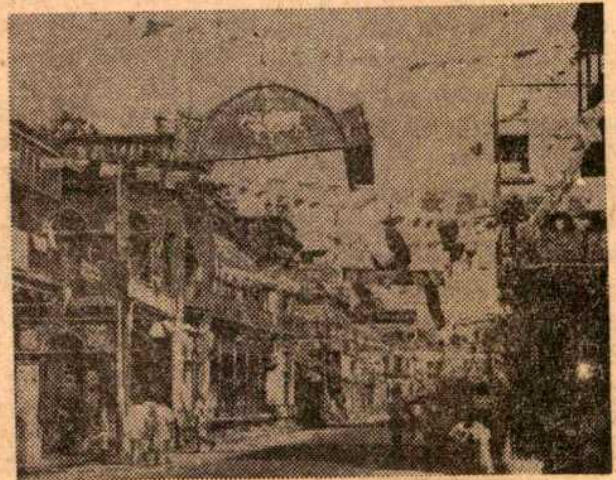
কগাদ চৌধুরী

Pen is mightier than sword
এই ইংরেজী প্রবাদটি তৃতীয়
নির্বাচন মারফৎ যেভাবে সত্যি
প্রমাণিত হয়েছে তার তুলনা মেলা ভার।
সভা-সমিতি, পথ-নাটক, স্লাইড এবং
স্বেচ্ছাসেবকদের অনাগোনা ছাড়াও
এবারের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে
পোস্টারের ভূমিকা ছিল অনন্য। এই
সৈনিক পর্বন্ত রাস্তায় বেরিয়ে আপনি
যদি বাগবাজার স্ট্রীট দিয়ে এক মাইল
রাস্তার ধারের সমস্ত পোস্টার পড়তে
পড়তে হাটতেন ঠিক একটি আড়াইশ
পাতার উপন্যাস পাঠের শ্রম হত আপনার।
না, উপন্যাস বলাটা ভুল হল, নাটক
বলাই উচিত। কারণ, উপন্যাসে পাতায়
পাতায় নাটকীয় উপাদান থাকে না, কিন্তু
নির্বাচনের রংগমঞ্চে প্রতিটি পোস্টারই
একেকটি নাটকীয় চরিত্র। কদিন আগে
পর্বন্ত সমস্ত কলকাতা পোস্টারের
শেকলে বন্দী ছিল। 'ফ্রিডম অফ
এক্সপ্রেশন'এর সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতাটির
চূড়ান্ত ব্যবহার ঘটেছিল কলি-
কাতায় পোস্টারের বিস্তীর্ণ কাগজে।
এবং এই পোস্টার-পর্বের পেছনে
আয়োজন-অনুষ্ঠান ছিল কম না। প্রায়
প্রতিটি বড় রাস্তায় নির্বাচন দিনের



প্রায় দেড় মাস আগে থেকেই বিভিন্ন
পার্টির নির্বাচনী অফিস খোলা
হয়েছিল। এই অফিসগুলিকে একেকটি
পোস্টারের কারখানা বলা যেতে পারে।
চাটাই, আঠা, তুলি, রঙ-এ ভর্তি ছোট
অফিসঘরে প্রায়ই দেখা যেত যুবকেরা
ঘাড় নীচু করে একমনে নির্বাচনের
আয়ত-লিপিকা তৈরী করছে। এ কাজে
এতটুকু শ্রমকাতরতা ছিল না কোনো
মহলে। সকালে বাজারে যাওয়ার রাস্তায়
ছেলেদের পোস্টার-ঘরে কাজ করতে
দেখেছি, রাত্রির সিনেমা শো দেখে ফেরার
সময়েও দেখেছি একশ পাওয়ারের
আলো জ্বালিয়ে মাসীলিপিকে অসি-
ধারার মত কিংবা তার চেয়েও তীক্ষ্ণ
করছে স্বেচ্ছাসেবকের দল। নির্বাচনের
দিন যত এগিয়ে এসেছে পোস্টার প্রতি-
যোগিতাও তত তীব্র হয়েছে। কেউ হয়ত
কোথেকে হাঁপাতে হাঁপাতে
এসে বলল,—মোড়ে ওরা যে
একটা পোস্টার মেরেছে ছড়া
আর ছবি দিয়ে...ইস্ প্রেস্টিজ
গেল.....কথাটা শেষ হতে না

হতেই মধ্য পোস্টার-শিল্পী বেরিয়ে গেল
মোড়ের দিকে সম্ভ্রমহানিকর পোস্টারটি
দেখতে এবং সে ফিরতেই পাণ্ডা পোস্টার-
রের খসড়া তৈরী আরম্ভ হল। এবারের
পোস্টার-প্রস্তুতিতে শৃঙ্খ শিল্পীরই না,
পাড়ার কবিদের যথার্থ কবিত্ব নিয়োগ
করতে হয়েছে। কারণ ছড়াযুক্ত পোস্টার
এবারের নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত বেশী
পাঠক আকর্ষণ করেছে। শৃঙ্খ কবিত্ব-
শক্তিই না, অর্থনৈতিক জ্ঞানেরও ক্ষিপ্ত
প্রমাণ দিতে হয়েছে পোস্টার-লেখকদের।
পরিসংখ্যানের লড়াইতেও যত্নধান পক্ষ-
গুলি সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছে।
কিন্তু এই উদ্ভেজক প্রতিযোগিতার
মধ্যেও স্বেচ্ছাসেবক পোস্টার এবং
নির্বাচনী অফিসগুলির সহঅবস্থান-
নীতি প্রশংসার একটি উজ্জ্বল বিষয়।
একই জানালার একই শিকে দড়ি বেঁধে
দুই বিরোধী পক্ষের ছেলেরা পোস্টার
ঝলিয়েছে। বাতাসের দৌরাঘো একের
পোস্টার উল্টে অপর পক্ষের ঘাড়ে
পড়েছে, সেগুলোকে আবার ঠিক করে
দেয়া হয়েছে, কিন্তু অসহিষ্ণু





হাতে কোনো পক্ষের পত্রিকাই ছেঁড়া হয়নি কোথাও। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। নির্বাচনের দিন তিনেক আগে রাত্রি বারোটোর পর একদল ছেলে মই দিয়ে বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার মারছিল। অপর পক্ষের স্বেচ্ছা-সেবকদেরও পোস্টার মারার কথা ছিল, কিন্তু মইটি তখনও এসে পৌঁছেয়নি।

—আরে, ওদের কাছে চা না, ওদের হয়ে গেলে আমাদের যেন দেয়—!

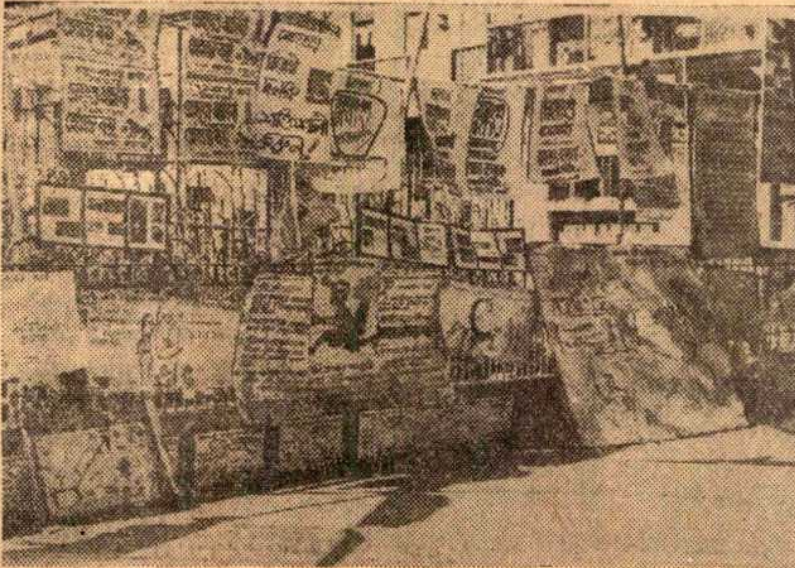
—ওরা.....দেবে ত?

সংশয়ী প্রশ্নকর্তাকে ধমক খেতে শুনলাম।

—ওরা দেবে ত মানে? ওদের আঠা ফুঁড়িয়ে যেতে আমরা দেইনি কাল ওদের। যা যা চা গিয়ে। আমার নাম করে বলিস.....।

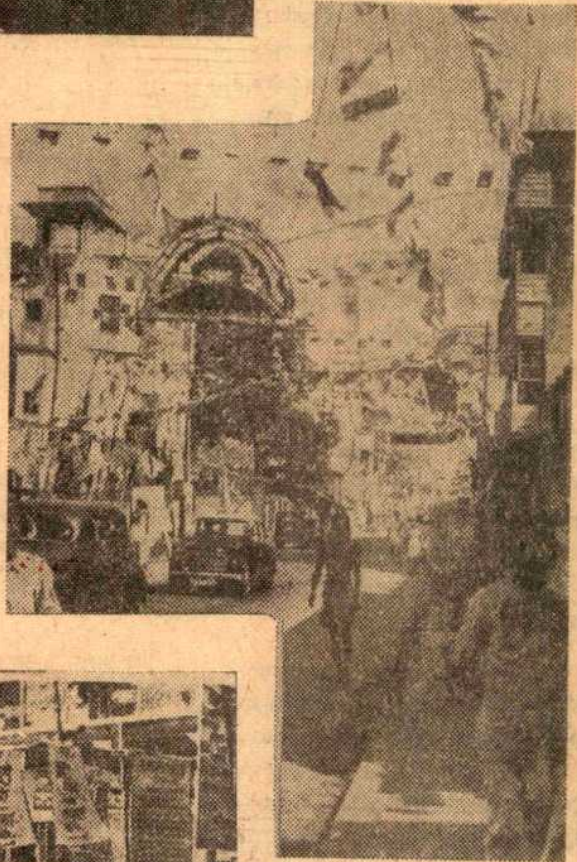
অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটি সত্য। ঘটনাটি ঘটেছিল দক্ষিণ কলিকাতার একটি বিশেষ অঞ্চলে।

কিন্তু এত উদ্যোগ এত আয়োজন আজকে এর কোন মূল্য নেই। ২৫ তারিখের পরের দিনই প্রমোথউস কলিকাতা তার সমস্ত বন্দন ছিন্ন করে ফেলেছে। কাগজ-কুড়িয়ে ছেলেরা প্রাচীর পত্রের শব্দেহুগুণি বহন করে নিয়ে গেছে উপরি উপার্জনের আশায়। আঠার প্রাচীরে যে সমস্ত প্রাচীর-পত্র এখনও প্রাচীরলগ্ন হয়ে আছে তাদের দিকে আর



কেউ তাকায় না আজকে। রায়ে পান খেলে পরদিন সকালে যেটুকু লাল দাগ লেগে থাকে তাঁটের কোণে, গত ২৫শে ফেব্রুয়ারীর পর পথিক-মানে সেটুকু দাগও রাখতে পারেনি প্রাচীর-লিপিকাসমূহ। বাক-বিতণ্ডা, কুৎসা-বিদ্বেষের সমস্ত বিষ ছড়াবার আর কোনো ক্ষমতা নেই এদের, এরা নিজেরাই এখন নীলকণ্ঠ। এখন বিজিত বিজেতা, এমনকি জামানৎ যাদের বাজেয়াপ্ত তাদের নির্বাচনী পোস্টার-গুণিও মূল্যমানে সমান।

কিন্তু এই মন্দা মাত্র পাঁচ বছরের জন্যে। ১৯৬৭ সালে



আবার কলিকাতা প্রাচীরপত্র কল্লোলিনী হবে, ১৯৬৭ সাল অনেক দূরের বছর। ততদিন পর্যন্ত কলিকাতা গণতন্ত্রের বিছানায় শুয়ে ঘুমাবে। আরো হয়ত অনেককেই ঘুমোতে হবে। এবারের পোস্টারগুণি যাদের আনন্দ দিয়েছে তারা সকলেই কি আগামী নির্বাচনের পোস্টারগুণির পাঠক হতে পারবেন? পরমায়ু কি এতই করুণাঘন?

বিজ্ঞানের কথা

অম্লস্ফাট

॥ একটি রোগের লক্ষণ ॥

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪০ সালে মার্কিন দেশে। জনসন নামে এক কোটিপতি ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে হাজির হয়েছিলেন। ডাক্তাররা একবাক্যে রায় দিলেন যে জনসনের শরীরে কোনো রোগ নেই। তাঁর শরীরের সবকিছু প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে সুস্থিহীন। তবুও ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন যে জনসন যেন কিছুদিনের জন্যে হাওয়া-বদল করে আসেন। জনসনের টাকার অভাব নেই, তিনি সানন্দে রাজি হলেন।

সমুদ্রের ধারে অভ্যন্তর স্বাস্থ্যকর একটি জায়গায় হাওয়া-বদলের তোড়জোড় চলেছে, এমন সময়ে একটি কান্ড ঘটল। শেরারের বাজারে একটি ভুল চালের জন্যে জনসন রাতারাতি পেউলিয়া হয়ে গেলেন। ব্যাক্টেরি পদার্থ শরীরে অধিক লেগে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। সুস্থ সবল জনসনের শরীরটিও যেন ভেঙ্গে পড়ল একেবারে। একতলা থেকে দোতলার উঠতে হলেই তাঁর হাঁপ ধরে যায়। সারা শরীরে কেমন একটা জ্বালা বোধ করেন। তৃষ্ণা সব সময়েই গলা গুলিয়ে থাকে।

জনসন আবার এলেন তাঁর ডাক্তারদের কাছে। যে-ডাক্তাররা দুদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন যে জনসনের শরীরে কোনো রোগ নেই, তাঁরাই এবার একবাক্যে ঘোষণা করলেন যে জনসনের ডায়াবেটিস হয়েছে। অথচ সকলেই জানেন যে ডায়াবেটিস রাতারাতি হবার মতো রোগ নয় দীর্ঘদিন ধরে আস্তে আস্তে শরীরে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে জনসনের পেউলিয়া হবার আগে তাঁর শরীরের এই রোগের কোনো সম্পর্ক আছে?

বিষয়টিকে বুঝতে হলে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা তুলতে হবে।

॥ দুই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ॥

আকাশ দিয়ে এক বাক পাখি উড়ে যাচ্ছে। এই পাখির বাকিকে দেখতে হলে আমি মাথা উঁচু করে তাকাব। গাছের ফুলটিকে দেখে আমার ভালো লেগেছে। আমি ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে আলতোভাবে ফুলটিকে ছুঁতে পারি।

মাথা উঁচু করে দেখা বা হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া—এগুলো আমার ইচ্ছাধীন কার্যকলাপ। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সেই বিশেষ অংশের দ্বারা এই সব কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় যার নাম সেরিব্রাল কর্টেক্স বা গুরুমস্তিষ্ক।

কিন্তু আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে এমন অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে যা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। যকৃৎ বা পাকস্থলী বা অন্ত্র বা বিভিন্ন ‘ল্যান্ড’ বা এমনি ধরনের প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গই কোনো না কোনো দায়িত্ব পালন করে, অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই সমস্ত প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াশীলতা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। যে স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা এই ক্রিয়াশীলতা নিয়ন্ত্রিত হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে ডেজেন্টেটিভ বা অনা-নিরপেক্ষ স্নায়ুতন্ত্র।

কিছুকাল আগেও মনে করা হত যে এই দুই ধরনের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও ডেজেন্টেটিভ স্নায়ুতন্ত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি ব্যাপার। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হল যে মানুষের স্নায়ুসমুদয় দু’ভাগে বিভক্ত। একভাগ উচ্চ মনন-ক্রিয়ার জন্যে—যেমন চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাপ্রণোদিত কার্যকলাপ ইত্যাদি। অপর ভাগ স্বয়ংক্রিয় জৈবক্রিয়ার জন্যে। প্রথমটির নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র গুরুমস্তিষ্ক। দ্বিতীয়টির নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র সাবকর্টিকাল রিজিয়ন বা নিম্নমস্তিষ্ক। আর সত্যিকারের শারীরসংস্থান পরীক্ষা করতে গিয়েও দেখা গেল যে উচ্চ ও নিম্ন মস্তিষ্ক পরস্পর-সম্পর্কহীন।

এ-অবস্থায় উপরোক্ত জনসন নামক

ভদ্রলোকটি কি করে যে রাতারাতি ডায়াবেটিস রোগ বাধিয়ে বসলেন তার কোনো ব্যাখ্যাই পাওয়া গেল না।

॥ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য ॥

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য ছিল অন্যরকম। যার মেজাজ খিটখিটে তাঁর গায়ের চামড়াতেও যেন সেই লক্ষণটি ফুটে ওঠে। পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়েছে যে খিটখিটে মেজাজের লোকই সবচেয়ে বেশী চর্মরোগগ্রস্ত হয়। আরো দৃষ্টান্ত আছে। হাসপাতালে দুজন রোগীর একই রোগ হয়েছে, দুজনের রোগের একই ধরনের জটিলতা। একেদ্রেও দেখা গিয়েছে, যে-রোগী হাসি-খুশি থাকতে পারে, রোগকে যে বিশেষ আমল দেয় না, সেই আগে রোগমুক্ত হয়। আর যে-রোগীর সারাদিনটি কাটে প্যান-প্যান করে, রোগকে যে বাড়িয়ে দেখতে চায়, রোগও তাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

যে-কোনো ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে যে তাঁর রোগীদের মধ্যে কয়েকজন অন্ততঃ আছেই যাদের রোগ শরীরের নয়, মনের। অর্থাৎ রোগী নিজের ভাবতে শুরু করে যে তার অমুক রোগটি হয়েছে। জেরোম কে জেরোমের ‘প্রি মেন ইন এ বোট’ উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তাঁদের নিশ্চয়ই স্ব-কল্পিত রোগের দৃষ্টান্ত নতুন করে বলতে হবে না। রোগের কল্পনাই কোনো কোনো লোকের শরীর একেবারে ভেঙ্গে দেয়।

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রা সাধারণত তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠে রোগের লক্ষণ সম্পর্কে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করে। সাধারণত দেখা যায়, এই সময়ে ছাত্ররাও কল্পনা করতে শুরু করে যে তার নিজেরও অমুক অমুক রোগ হয়েছে। অভিজ্ঞ ডাক্তাররা এই সব রোগের নাম দিয়েছেন ‘তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর রোগ’।

সুপরিচিত সোভিয়েট লেখক বোরিস পলেভয় একটি সত্তা বটনাকে অবলম্বন করে একটি উপন্যাস লিখেছেন যার নাম ‘এ স্টোরি অ্যাবাইট এ রিয়েল ম্যান’, একটি সচ্চ মানুষের গল্প। এই উপন্যাসের নায়ক মেরেজিয়েভের সঙ্গে এখনো মস্কো এরোড্রোতে সাক্ষাৎ হতে পারে। যুদ্ধের সময়ে একটি বিমান-দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁর দুটি পা কেটে ফেলাতে হয়েছিল। তিনি হয়ে গিয়ে-

সিদ্ধ
 ফোন: ৫৫-৪৩১২
বেঙ্গল ডেকারেটর
 ১০৮ চন্দ্রনাথ গির্জা রোড, কলিকাতা-৬



মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

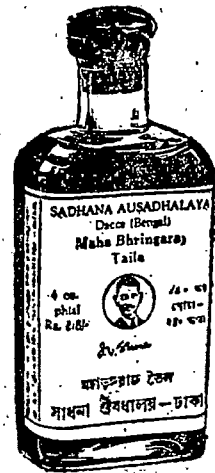
বীহারী অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভূঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্বদা প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম রাখে

সাধনার
মহা ভূঙ্গরাজ
তৈল



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র বোষ,
(এম. বি. বি. এস. (কলি:) আয়ুর্বেদচর্চা)

অধ্যাপক শ্রীবোগেশচন্দ্র বোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী, এফ. সি. ও. স. (লওন) এম. সি. এস (আমেরিকান)
কামলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

অঙ্গি রেখা

৬২২৮



[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাহাদুর চলে যাবার পাঁচ-ছ দিন পর শূন্য স্কুল-বাড়ির কোণের দিকের একটা ঘরে দিলীপ আশুদেবের ক'ছে বসে পড়ছিল। সেদিনকার মত কাজ শেষ হলে বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই তিনি বললেন, তোমার একখানা চিঠি আছে।

—আমার চিঠি! বিস্ময়াবিষ্ট সুরে এই দুটি কথা যেন অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

হ্যাঁ; এই নাও।

দিলীপ হাত বাড়তে গিয়েও পারল না, বিহবল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাস্টারমশাই-এর মুখের পানে। এখানে অনেকের নামে চিঠি আসে। তাদের মা-বাবা-ভাই-বোনদের কাছ থেকে। তার কোনোদিন আসে না। কে লিখবে? কে আছে তার? যে ছিল, একটি মাত্র মানুষ যে লিখতে পারত, সে হয়তো আজও পথে পথে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে কি এতদিন পরে—? আশুদেবের গলা শোনা গেল। বোধ হয় ওর অনামনস্ক ভাবটা লক্ষ্য করে বললেন, বাহাদুর লিখেছে।

‘বাহাদুরদা!’ অস্ফুট কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে, সঙ্গে সঙ্গে ধার খোলা খামখানা যেন ছিনিয়ে নিল দিলীপ। ভাঁজ খুলেই পড়তে শুরু করল।

ভাই দিলীপ,

ভেবেছিলাম, আমার সব কথা তোকে একদিন বলবো। তার আর সময় হল না।

বুঝতে পারছি, ওখানে সকলেই আমাকে ছিঃ ছিঃ করছে। তুইও খুব

দুঃখ পেয়েছিস। ওরা নিশ্চয়ই বলছে, আমি একটা মেয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছি। কিন্তু কেউ জানে না, ও আমার মায়ের পেটের বোন। ওকে বাঁচাবার জন্যেই, শূন্য, নিন্দা নয়, এত বড় একটা অপরাধের বোঝা আমাকে মাথায় তুলতে হল। পালানো ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না।

শুনে তুই অবাক হচ্ছিস নিশ্চয়ই— ব্যান্ড-মাস্টার আমার বাবা, আমাদের মা নেই। এই বোনটাকে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। কয়েক বছর পরে হঠাৎ বাবা আবার বিয়ে করে বসল। আমাদেরও দুঃখের দিন শুরু হল। তারপর কি করে আমি জেলে গেলাম, সে সব কথা এখন থাক।

রনমায়াকে ওরা পেট ভরে খেতে দিত না। যখন তখন মার-ধোর করত। মাঝে মাঝে লুক্কিয়ে একবারটি দেখে আসা ছাড়া আমার করবার কিছু ছিল না। তাও বন্ধ হয়ে গেল। সে সব তো তুই জানিস।

সেদিন হঠাৎ জানতে পেলাম, আমার সং-মা ওকে বিয়ে দেবার নাম করে বিক্রী করে দিচ্ছে তার এক মাতাল বদমাস আত্মীয়ের কাছে, আর বাবা সব জেনেও চুপ করে আছে। তারপর আর স্থির থাকতে পারিনি।

ওকে নিয়ে কোথায় কি অবস্থায় আছি, সে কথা তোকে জানাতে পারবো না। ওর একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই আমি ফিরে গিয়ে ধরা দেবো। দোষ করেছি, তার শাস্তি অবশ্যই নিতে হবে।

কত কথা বলবার রইল। যদি কোনোদিন সুযোগ পাই, সেদিন জানাবো।

স্কুলের ঠিকানায় লিখলে আমার চিঠি ওঁরা তোকে না-ও দিতে পারেন।

তাই মাস্টারমশাই-এর নামে পাঠালাম। তিনি আমাদের দুজনকেই ভালবাসেন। তাঁর হাতে যদি পৌঁছয়, তুই নিশ্চয়ই পাবি।

ওঁকে আমার প্রণাম দিস।

বাহাদুরদা।

আশুদেব নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলেন। ঐ সঙ্গে দু-লাইন তাকেও লিখেছে বাহাদুর—দয়া করে চিঠিখানা দিলীপকে দেবেন; আর সেটা যদি সম্ভব না হয়, যেটুকু তাকে জানানো প্রয়োজন মনে করেন, জানানো কৃতজ্ঞ হব।

দিলীপ পড়া শেষ করেই বলল, আপনি পড়েছেন, স্যার?

তিনি মৃদু হেসে জবাব দিলেন, তোমার চিঠি; আমি কেন পড়বো? কী লিখেছে?

—পড়ে দেখুন। আমি জানি, বাহাদুর কোনো দোষ করতে পারে না। এখনই গিয়ে সবাইকে এ চিঠি দেখাবো।

আশুদেব লাইনকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, তার দরকার নেই। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, সাহেবকে দেখাতে পার।

—আমি এখনি যাচ্ছি।

ছুটে বেরোতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ছেলেদের নামে যে-সব চিঠি আসে, প্রথমে আফিসে খোলা হয়। একজন কেরানী বাবু সেগুলো পড়ে দেখেন; তারপর মস্ত বড় একটা ‘সিল’ মেরে সাহেবের সই নিয়ে ঘর চিঠি তাকে ডেকে পাঠিয়ে বিলি করেন। এ নিয়ম সে জানে। কিন্তু এখানে তার কোনোটাই হয়নি। সাহেব যদি রেগে যান?

আশুদেব তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কী হল? দিলীপ ভয়ে ভয়ে

চোখ তুলল। যে-কথাটা মনে এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারল না। চিঠিখানা শুধু একবার উল্টে দেখল তার থেকেই তিনি অনুমান করে নিলেন, এই মুখ-গুলোর প্রতিটি রেখা, চোখের প্রতিটি ভাষা তার মুখস্থ হয়ে গেছে। আশ্বসের সুরে বললেন, সাহেব যদি জিজ্ঞেস করেন, কোথেকে পেলে এই চিঠি, কেমন করে পেলে, সত্যি কথাই বলো। তাতে তোমার কোনো ভয় নাই।

দিলীপের সমস্ত মুখখানা খুশীর আভাষ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বইগুলো টেবিলের উপর ফেলে বিদ্যাম্বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এর আগে সাহেবের কাছে সে নিজে থেকে কখনো কোনো ব্যাপার নিয়ে যায়নি। এই বিপুলকায় ব্যক্তিটিকে ঘিরে তার প্রথম দিনের সেই ভয় তখনো সব-খানি কার্টেনি। সেই মুহূর্তে কে তার মনে এই দুর্জয় সাহস এনে দিল, সে নিজেই জানে না। উদ্ভববাসে মাঠ পার হয়ে সুপারের আফিসের সামনে পেঁছতেই, গেটকীপার হেঁকে উঠল, কী চাই? তার আগেই সে পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়েছে। সাহেব চোখ তুলে চাইতেই এগিয়ে গিয়ে বলল, বাহাদুর চিঠি লিখেছে, স্যার।

ষোষসাহেবের দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, বাহাদুর চিঠি লিখেছে! কোথায়?

দিলীপ চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখল। তুলে নিয়ে এপিঠ ওপিঠ দেখে বললেন, তোমার চিঠি!

—হ্যাঁ, স্যার।

—কে দিলে তোমাকে?

—মাস্টারমশাই দিয়েছেন। তাঁর নামে এসেছে কিনা?

—কোন মাস্টারমশাই?

—আশুবাবু—স্যার।

চিঠি পড়তে পড়তে সুপারের কপালে কুণ্ডন দেখা দিল। বাঁ হাতে 'কলিং বেলটা' বাজিয়ে দিলেন এবং গেটকীপার এসে দাঁড়াতেই বললেন আশুবাবু।

আশুবাবু জানতেন তাঁর ডাক পড়বে। দিলীপের পিছন পিছন গেটে এসে ও-দিকের আফিসে অপেক্ষা করছিলেন। সাহেবের ঘরে পা দিতেই তিনি দিলীপকে বললেন, আচ্ছা, তুমি এখন যাও। চিঠিটা আমার কাছে রইল। পরে পাঠিয়ে দেবো।

আশুবাবুর দিকে ফিরে বললেন, এ যে দেখছি রীতিমত ভাস্কর ব্যাপার। আপনি জানতেন কিছ?

আশুবাবু মাথা নেড়ে জানালেন, না। 'কলিং বেল'-এ আর একবার আঘাত পড়ল। ব্যান্ড-মাস্টারের জরুরী তলব।

বীরবাহাদুর কদিনের ছুটি নিয়েছিল, কিন্তু বাসা থেকে বেরোতে না। মিনিট করেকের মধ্যেই ধীরভাবে এসে দাঁড়াল টেবিলের ওপারটায়। তার সেই চিরাভ্যস্ত মিলিটারী কুর্পিশের কোনো ব্যতিক্রম ঘটল না, কিন্তু দাঁড়বার ভঙ্গিটা আজ যেন তেমন ঝড় নয়, মাথাটা নুয়ে পড়ছে বৃকের উপর। মুখ দেখে এদের মনের খবর পাওয়া বড় কঠিন, কিন্তু এই মুহূর্তে যে একটি

বিষয়-গম্ভীর ছায়া সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা সহজেই চোখে পড়ে। সাহেব ক্ষণকাল নিবিষ্ট মনে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, গোটাকয়েক কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, বীরবাহাদুর। আশা করি ঠিক ঠিক জবাব দেবে।

—বলুন স্যার, তেমন নীচের দিকে চেয়েই উত্তর দিল ব্যান্ড-মাস্টার।

—এ ছেলেটা তোমার কে হয়?

বীরবাহাদুর জিজ্ঞাসা করতে পারত কোন ছেলেটা, অন্যাবশ্যক বলেই করল না। সোজাসুজি জবাব দিল, আমার ছেলে।

দুর্জনেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন। এমন স্বিধাহীন দ্রুত উত্তর বোধ হয় আশা করেননি। সাহেবের শ্বিতীয় প্রশ্ন শোনা গেল, সে কথা এতদিন চেপে রেখেছিল কেন?

বীরবাহাদুর সাড়া দিল না, মাথাও তুলল না, যেমন ছিল তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। সুপার তিস্ত স্বরে বললেন, জেলখাটা ছেলের বাপ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হচ্ছিল বুঝি?

বীরবাহাদুর মাথা তুলে তাকাল। শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনি মনিব। আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না। যদিও ছেলে আমার চুরি ডাকাতি করে জেলে আসেনি। যে জন্যে এসেছিল, তার জন্যে আমিই অনেকখানি দায়ী, তবু দশজনে আঙুল দৈখিয়ে বলবে, ওটা ব্যান্ড-মাস্টারের ছেলে, ভাবতেই মনটা কেমন ছোট হয়ে যেত। বলি বলি করেও বলতে পারিনি।

—আশ্চর্য! ক্ষুব্ধ কিন্তু নিম্ন-স্বরে যেন আপন মনে বললেন সুপার। বীরবাহাদুর সেদিকে কান দিল না, ধীরে ধীরে আগেকার সুর ধরে বলল, কিন্তু তারপর যে-লজ্জা আমাকে সে দিয়ে গেল, তার কাছে এই জেলে-আসাটা কিছই নয়। আজ আর আমি মাথা তুলতে পারছি না, সাহেব।

—পালিয়ে গেছে বলে?

—না, স্যার, শুধু পালিয়ে গেছে বলে নয়।

—তবে? নিজের বোনকে সঙ্গে নিয়ে গেছে; তার মধ্যে লজ্জার কী আছে?

—কেন নিয়ে গেছে, তা তো আপনারা জানেন না, স্যার। বাপের হাত থেকে

বিনা চশমায় দেখুন

পুনর্জ্যোতি

অজাশ্চর্য বনৌষধি পুনর্জ্যোতি ও উজ্জ্বল জ্যোতি হইতে প্রস্তুত আইড্রপ। সকল বয়সে অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির জন্য ব্যবহার করুন। মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ও ডি পি—১০৫০ নং পঃ।

নিও হারবল প্রোডাক্টস

২৩/৩২, গাড়িয়াহাট রোড,
কলিকাতা-১৯

স্টকিস্ট : মেজ মোডিকেল স্টোর
৬/২বি, লিণ্ডেন স্ট্রীট, কলিকাতা।



কেশু

ডেমজ কেশ তৈল

নিখ্যাত কলিকাতা



ছোট বোনটাকে বাঁচাবার জন্যে। আমি সেই ব্যপ—সে-লজ্জা আমি ঢাকবো কী দিয়ে!

সাহেব এবং আশুবাৰু—দুজনেরই মনে পড়ল দিলীপকে লেখা বাহাদুরের চিঠির সেই কটি লাইন। বলবার মত কিছু খুঁজে পেলেন না। ফৌজ থেকে অপসারিত এই অসহায়, নিরুপায়, ভগ্নবাস্থ্য ব্যাণ্ড-মস্টারের মূখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বীরবাহাদুর তার সেই ফৌজী ভাণ্ডিতে দু-কদম সামনে এগিয়ে গেল। বুক পকেট থেকে বের করল একখানা চার ভাঁজ-করা ফুলস্ক্যাপ কাগজের অর্ধসীট, দুহাতে ভাঁজ খুলে সোজা টেবিলের উপর বিছিয়ে দিয়ে ফিরে এল তার আগেকার জায়গায়। তারপর সোজা হয়ে স্যালুট করে দাঁড়াল। সুপার এক নজরে সেই কাগজখানা দেখে নিয়েই বিস্ময়ের সুরে বললেন, চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ!

—হ্যাঁ, সাহেব। অনেকবার ভেবেছি, ছাড়ব; পারিনি। পনের বছর ব্যাগপাইপ বাজিয়ে বুকটা ঝাঁজরা হয়ে গেছে। বৃড়ো বয়সে কোথায় যাবো, কী খাবো—এই ছিল ভাবনা। কিন্তু আজ আর তা ভাবলে চলে না। ...আর একটা আর্জি আছে স্যার, দরখাস্তটা মঞ্জুর হতে যদি কদিন সময় লাগে, মেহেরবাণী করে তন্দিন আমার ছুটিটা বাড়িয়ে দিবেন।

কয়েক মূহূর্ত ছেদ পড়ল। তারপর আবার শোনা গেল তার মৃদু গম্ভীর স্বর—না জেনে অনেক কসুর হয়তো করেছি আপনার কাছে, অনেক গাফিলতি দেখিয়েছি, তার জন্যে মাপ করবেন।

শেষ দিকে গলাটা একটু ভারী হয়ে উঠল। আশুবাৰু অনাড়ম্বর মূখ ফেরালেন। সাহেব বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। খট করে জুতোর শব্দ কানে যেতেই চোখ তুলে দেখলেন, আবাবউট টান করে বীরবাহাদুর বেরিয়ে যাচ্ছে।

মাস তিনেক পরে দিলীপ একদিন শুনল, বাহাদুর ধরা পড়েছে। ধরা দেবার জন্যে সে নিজেই আসছিল বর্ডাল স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে। গঙ্গা পার হয়ে এপারে আসতেই একজন পদলিশের হেড কনস্টেবল চিনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেষ্টার করে থানায় নিয়ে গেছে। থানা থেকে সেন্ট্রাল জেলে। খবর পেয়ে সাহেব তাকে বর্ডালে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। বর্ডাল স্কুলস্ এ্যাকটু-এর দ্বারা উল্লেখ করে এস্. ডি. ও-কে লিখেছিলেন, এখান থেকে কোনো ছেলে যদি পালিয়ে যায়, পদলিশের কাজ হল সেই পলাতক 'ইনমেন্ট'কে অ্যারেস্ট করে স্কুল-হেফাজতে পৌঁছে দেওয়া। তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের

করা বা না করা—সেটা স্থির বর্ডালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

পদলিশের তরফে সে বিষয়ে বিশেষ আপত্তি না থাকলেও, এস্. ডি. ও, রাজী হননি। উত্তরে জানিয়েছিলেন, আসামী যে শব্দধূল-ফুল কার্ভাডি থেকে পালিয়ে গেছে, তাই নয়, নারীহরণের মত জঘন্য অপরাধের দায়ে সে অভিযুক্ত। বিচার-সাপক্ষে জেল-হাজতই তার উপযুক্ত স্থান। তার হয়ে বর্ডাল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওকালতি করছেন, এটা খুবই বিস্ময়কর।

শেষের দিকে কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ মিশিয়ে যোগ করেছিলেন, সেন্ট্রাল জিনিসটা ভাল; কিন্তু তার অপপ্রয়োগ বা অতি-প্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। বিশেষ করে একজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এই জাতীয় ভাবপ্রবণতা একান্ত অব্যঞ্জনীয়।

চিঠি পেয়েই ঘোষ সাহেব ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেটের বৈঠকখানায় ধাওয়া করেছিলেন এবং আসল ঘটনাটাও খুলে বলেছিলেন। তাতে কোনো ফল হয়নি। প্রশাসনিক ব্যাপারে এস্. ডি. ও, কালেকটরের অধীন হলেও একজন ফাস্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর এলাকার বাইরে। সেখানে তিনি হাত দিতে পারেন না। এর পরে নিষ্ফল ক্ষোভ বৃকে চেপে চূপ করে যাওয়া ছাড়া অধ্যক্ষসাহেবের আর কোনো পথ রইল না।

।। সাত ।।

বিস্তার অলিতে-গলিতে যে হরেক-রকম মানুষের বাস, তার মধ্যে একজাত ভারবাহী জীব আছে, যার নাম 'ওয়ালা'। আগর-ওয়ালা, বদনবদন-ওয়ালা নয় (তাঁরা থাকেন বড়বাজারের প্রাসাদচৌড়ায়), মড়িওয়ালা, বিড়িওয়ালা, ডালওয়ালা, পাপড়ওয়ালা দল। তাদের কর্মক্ষেত্র শহর, আস্তানা শহরতলী। ওখানকার রাস্তায় সারাদিন টহল দিয়ে আর গলা ফাটিয়ে এখানকার গলিতে এসে খোলার ঘরে রাত কাটানো। এছাড়া আর দুজন ওয়ালা আছে; বিস্তার বাসিন্দা না হলেও বিস্তার-বাসীর বৃকের উপর তাদের দিবারাত্রি আসন। তারা হল—পাহারা-ওয়ালা আর বাড়িওয়ালা; পদলিশ ও মালিক; শান্তিরক্ষক ও আশ্রয়দাতা। কিন্তু সেই রক্ষণ ও আশ্রয়ের জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া দূরে থাক, তাদের নাগাল থেকে কী করে দূরে থাকা যায় এখানকার ছেলে-বৃড়ো তাই ভেবেই অস্থির।

বিস্তার থেকে একটা ছোট ছেলে দিন-দুপুরে উধাও হয়ে গেল,—গরিব ব্রাহ্মণ-বিধবার একমাত্র ছেলে—এ নিয়ে আশে-পাশের লোকগুলো একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিল, একথা বলা চলে না। রাস্তায়, পার্কে, হাসপাতালে, ভিখারীদের আড্ডায় এবং আরো অনেক সন্দেহজনক জায়গায়

ব্যাপক খোঁজাখুঁজির পালা বেশ কিছুদিন ধরে চালিয়ে, এটা যে ছেলেখরার কীর্তি, এই ধারণটাই শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তর হল। একটা জায়গা তারা সাবশানে এঁড়িয়ে গিয়েছিল, সেটি পদলিশ-থানা। 'ডয়ের কীর্তি' প্রস্তাবটা কারো কারো মুখে শোনা গেলেও সাধারণভাবে সমর্থন পায়নি। বিদেশী শাসকের পদলিশ। তাকে পীড়নের যন্ত্র ছাড়া অন্য কোনোরূপে তখনো এরা দেখতে শোখেনি। সাধ করে তার কবলে কে পড়ে? কোথা থেকে কী সূত্র ধরে কোন ফ্যাসাদ এসে পড়বে কেউ বলতে পারে না।

সুবিপুল শোকের মধ্যে এক ধরণের বৈরাগ্য আছে। মন সব কিছুতে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে। নির্মলার তখন সেই অবস্থা। সারাজীবন ধরে একটার পর একটা আঘাত তাকে সহিতে হয়েছে। বারবার পড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুর্ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করেনি। এবারে যখন চরম আঘাত এসে পৌঁছল, আর উঠতে ইচ্ছা হল না। মনে হল, করবার আর কিছু নেই। যে তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ মানুষকে চূপ করে থাকতে দেয় না, তেলে তুলে দেয়, সেটা তার চলে গিয়েছিল। দেহের কোনো অঙ্গে ক্রমাগতঃ ঘা দিতে থাকলে কিছুক্ষণ পরে সেখানটা অসাড় হয়ে যায়। দেহের অন্তরে যে মন, তার বেলাতেও তাই। নির্মলার মনে সেদিন কোনো সাড়ি ছিল না।

খোকা চলে যাবার পর কিছুদিন সে ঘর ছেড়ে একবারও বাইরে যায়নি। রান্নাঘরের দরজা খোলেনি। বিজুর মা আসতেন, জোর জুলুম করে দূটো খাইয়ে যেতেন। অন্যান্য বাড়ির মেয়েরাও কেউ কেউ এবেলা ওবেলা ঘুরে যেত। নানা কথা বলে সাহস সানুনা দিত। হারু ছেলোটো বড় মুম্বড়ে পড়েছিল। তার মাও এসে দাঁড়িয়েছে কবার, কিন্তু কি বলবে, কি করবে ভেবে পায়নি। এতটা যে গড়াবে কেমন করে জানবে সে? এ কেমন ধারা ছেলে। মা একটু গায় হাত তুলেছে বলে ঘর ছেড়ে চলে যাবে। তার ছেলেকে তো সে দুবেলা দু'র দু'র করছে, কখনো বা মেয়ে আধমরা করে দিচ্ছে। খানিকক্ষণ কান্নাকাটি চেঁচামিচ করে ঘন্টাখানেক গা ঢাকা দিয়ে থাকে। তারপর আবার যে কে সেই। দুপাক ঘুরে এসেই বলবে, 'মা, ভাত দাও।' এ ছেলে গেল কোথায়।

যে যা বলত, নির্মলার কাজ ছিল শব্দ নিঃশব্দে শুনেন যাওয়া। ভালো কথায় সায় দিত না, মন্দ কথারও প্রতিবাদ করত না। বেশীরাভাগ সময় চূপ করে শব্দে থাকত।

তারপর একদিন আবার তাকে উঠতে হল। বিজুর মার সংসারে বোঝা বাড়িয়ে আর কতদিন চলে? এমনিতেই তাদের

ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। যে রান্নাঘরের পাট চুকে গেছে বলে ধরে নিয়েছিল, আবার গিয়ে বসতে হল তার উনুনের ধারে। যাহোক দুটো ফুটিয়ে নিয়ে মুখে না দিয়েও পারল না। দেহ যতক্ষণ আছে, তার প্রয়োজন মিটিয়ে যেতে হবে। এরই নাম প্রাণ-ধারণের দায়। খড়ে প্রাণ থাকতে তার হাত থেকে কারো রেহাই নেই।

ঘরে বসে থাকলেও চলে না। পুঁজি-পাটা বলতে ষৎসামান্য যা কিছু ছিল সব দুদিনেই শেষ হয়ে গেল। এবার নতুন করে জীবিকার সম্বন্ধে বেরোতে হবে। আবার সেই দোরে দোরে ধর্ণা দেওয়া—ওগো কি রাখবে তোমরা? এতদিন থোকা ছিল। তার জন্যে সব দীনতা সে সয়ে নিচ্ছে। উজ্জ্বলিত হীনতা গায়ে মাথেনি। আশা ছিল, কদিন আর? থোকা বড় হলে আর তাকে পরের দুয়ারে ঘুরতে হবে না। আজ সে আশা নির্মূল হয়ে গেছে। তবু তাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ঔষধতোর, অবজ্ঞার কাছে, হাত পেতে নিতে হবে তাচ্ছিল্যের অন্ন, শূদ্ধ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে! এর চেয়ে বড় প্লানি আর কী আছে?

বিজুর মা প্রায়ই এসে পীড়াপীড়ি করতেন, একটা কিছু কর। হাত পা কোলে করে কান্দন আর বসে থাকবি? ছেলে তো নয়, পেটের শত্রুর। তার জন্যে ভেবে ভেবে শরীরপাত করে কী লাভটা হবে শূনি। বাঁচতে হবে তো?

—বেঁচেই বা আমার কী লাভ হবে দিদি?

—মরণ কি চাইলেই আসে রে? আমাদের যে কাঁচিমের প্রাণ।

সেই পুরনো সান্ধনা। নির্মালা আর কথা বাড়াল না, চুপ করে রইল। সেদিন যেন একটা অন্য সুদ্র শোনা গেল বিজুর মার মুখে। বললেন, আমার বড় ছেলেটাকে তুই দেখিসনি। সাত বছরে পড়তেই কী যে কাল রোগ ধরল। হাত-পাগুলো কাঠি, পেটটা ঢাকের মত। ডাক্তার বলল, বেশী করে ফলের রস আর ছানা খেতে দিন। কোথায় পাবো? দুবেলা দুটো ডাল-ভাত জোটাতে পারি না। পুরো একটা বছর ভুগে ভুগে যেদিন চলে গেল, কি মনে হয়েছিল জানিস? মনে হয়েছিল, ছেলে আমাকে মুক্তি দিয়ে

গেছে। রাত পোহালে তার ভাবনা আর ভাবতে হবে না।

বলতে বলতে, দীর্ঘদিন পিছনে ফেলে আসা সেই রাত্রিটির মধ্যেই যেন তলিয়ে গেলেন বিজুর মা। কিছুক্ষণ পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে নির্মালার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, তোর সে সান্ধনা নেই। তোর ছেলে তো মুক্তি দিয়ে যায়নি। যতদিন বাঁচবি, তাকে যে তারই জন্যে তৈরী হয়ে বসে থাকতে হবে।

নির্মলা চমকে উঠল। এ যেন তারই অন্তরের প্রতিধ্বনি। আশা আর্জনশ্বর। তার মৃত্যু নেই। অন্ধকার প্রান্তরে একটি দুঃস্বপ্নের ক্ষীণ দীপশিখার মত কদিন আগেই সে ধীরে ধীরে নির্মালার বুককের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। বিজুর মার শেষ কথাটি যেন সেই সলতেটাকে একটুখানি উসকে দিয়ে গেল। তাকে বাঁচতে হবে। থোকা ফিরে আসুক আর না—ই আসুক, তারই জন্যে তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

বাইরের দরজার ঝাঁপটা ভেজানো ছিল। তার উপরে কার হাতের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অচেনা গলার



হাঁক—‘চিঠি আছে’। ধড়মড় করে উঠে বসল নির্মলা। লাউয়ে পড়া আঁচলখানা কোনরকমে গায়ে জড়াতে জড়াতে ছুটে গেল দোরগোড়ায়। নিশ্চয়ই খোকার চিঠি! সে ছাড়া আর কে আছে তার? কে পাঠাবে চিঠি! বিজুর মাও ব্যস্তভাবে তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে একটানে দরজা খুলে পিওনের হাত থেকে চিঠিখানা যেন কেড়ে নিয়েছে নির্মলা। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সেই দিকে। চিঠি নয়, কোণের দিকে সূতো দিয়ে গাথা দুখানা ছাপানো কাগজ। ‘বাকী ভাড়ার নালিস করেছে বাড়ি-ওয়ালা’ গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিল আদালতের পিওন, ‘এটা সেই পরোয়ানা। আপনারই নাম তো নির্মলা ভট্টাচার্য? নিন, সুই করুন।’

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের ভিতর থেকে একটা দোয়াত বের করে, কলমের ডগাটা তার মধ্যে ডুবিয়ে বাড়িয়ে ধরল নির্মলার দিকে।

তিন মাসের ভাড়া দেওয়া হয়নি। বাড়িওয়ালার সরকার গত মাসেই শাসিয়ে গেছে, নালিস করবে। নির্মলার খেয়াল ছিল না। ভুলে গিয়েছিল, পৃথিবী বসে নেই। সে যখন তার নিজের দুঃখের কোটরে চোখ বুজে পড়ে আছে, বাইরের দুনিয়া তার সেই পুরনো পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। সে অমোঘ নীতির একচুল পরিবর্তন হয়নি। তোমার দুঃখ একান্তভাবে তোমার। সোঁদিকে তাকিয়ে সংসার তার দাঁবি ছাড়বে কেন?

বিজুর মা জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকা বাকী?

—‘ছটাকা!’ কাগজ দুখানার দিকে চোখ রেখেই বলল নির্মলা।

অঙ্কটা শুনে আর স্বিতীয় কথা নয়, শুধু একটা ভীতিমূলক শব্দ বোঁরয়ে এল বিজুর মার গলা থেকে। এর পরের পর্বগুলো দুঃখের কারোই অজানা নেই। বস্তির ঘরে ঘরে অহরহ সে দৃশ্য ঘটছে। টাকা দিতে না পারলে ঐ পিওন আবার আসবে এবং সেবারে তার হাতে থাকবে মালকোকের পরোয়ানা। মাঝখানে দিন কয়েকের বিরতি, তারপর পেয়াদা এসে টেনে বার করবে ‘অস্থাবর’ বলতে যা কিছু আছে তোমার ঘরে—ভাতের হাড়ি, জলের গেলাস, ডালের বাটি। ছ’মাসের শিশুর দুধের বিন্দুকটাও বাদ যাবে না। তাতেও যদি পাওনা আদায় না হয়, লাঠি হাতে দর্শন দেবে বাড়িওয়ালার ভোজপুত্রী দারোয়ান। বাকী সম্বল যেটুকু পড়েছিল—বাক্স, পেটরা, কাঁথা, কম্বল সব চলে যাবে রাস্তায়। তার সঙ্গে ভাড়াটেকেও যেতে হবে, স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। একটাবেলা না পেরোতেই সেই ঘরে আবার দেখা দেবে নতুন মদ্য, শূদ্র হবে নতুন ঘরকন্না।

বস্তিজীবনের দুর্দিকে এই দুই-ওয়ালা—পাহারাওয়ালা আর বাড়িওয়ালা।

একজনের হাত থেকে রক্ষা পেলেন; আর একজনের কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই। নির্মলার ভাগ্যাকাশে উভয়ের সমবেত আবির্ভাব। প্রথম জন কেড়ে নিয়েছে তার

তাই দিয়েই হয়তো বাড়িওয়ালাকে ঠেকানো যেতে পারে। তারপর বলে কয়ে ঐ কাজটাই যদি আবার পাওয়া যায়, বাকী দুটো টাকা আগাম চেয়ে নেবে।



‘বাঁচতে হবে তো?’

ছেলে এবার স্বিতীয় এসে হাত বাড়াল তার মাথা গুঁজবার আশ্রয়টুকুর দিকে।

কদিন আগে হলেও নিজেকে সে এই ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিত। মনে মনে বলত, যা হয় হোক, করবার আর কিছু নেই। কিন্তু আজ মনে হল এই বাসটুকু তার যেমন করে হোক, বাঁচিয়ে রাখতে হবে; সেইসঙ্গে নিজেকেও। এবার থেকে শূদ্র হবে তার অন্তহীন প্রতীক্ষা। কিন্তু এই আশ্রয় সমস্যার সমাধান হবে কেমন করে? এতগুলো টাকা আসবে কোথা থেকে?

হঠাৎ মনে পড়ল, তার পুরনো মানিব বাড়িতে মাইনে বাবদ কিছু পাওনা রয়ে গেছে। চার টাকার মত হবে। আপাততঃ

‘আগাম’ কথাটা মনে আসতেই নির্মলার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল। আরেকজনের মদ্যে এই শব্দটা শুনেই সেদিন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল, জিহবারও কোনো অর্গল ছিল না। মৃদের মত চিৎকার করে বলেছিল, আগাম বলে ডিস্কা চাইতে লজ্জা করেনা? তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছাকেই মেনে নিয়েছিলেন। আগাম চাইতে যাননি, তারই অন্যান্য জিনদের কাছে বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁর চিরজীবনের আদর্শ। অদৃষ্টের কী পরিহাস! আজ সে নিজেই চলেছে মানিবের কাছে আগাম চাইতে!

(ক্রমশঃ)

বার্লিন থেকে বলছি

দিলীপ ছালাকার

প্যারিস থেকে বার্লিনে সরাসরি কোনো বিমান যায় না। পশ্চিম জার্মানীর কোনো না কোনো বিমান বন্দরে সে আসবেই। আর আসা মানেই আধ ঘন্টা কি এক ঘন্টার ধাক্কা। কথা ছিল পশ্চিম জার্মানীর 'লুফ্ট হান্সা' কোম্পানীর সুপার কন্সট্রলেশন প্লেনে চেপে ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছান। সেখান থেকে আরেক কোম্পানীর প্লেনে চেপে পশ্চিম বার্লিন। প্যারিসের ওলি বিমান বন্দরে গিয়ে শূন্য 'লুফ্ট হান্সা' কোম্পানীর বিমান মেরামত হচ্ছে। সেদিন প্রচণ্ড তুষারপাতে বিমান অবতরণ পথ জমে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর লুফ্ট হান্সার এক কর্মচারি এসে বললেন, আপনাদের জন্য রয়েল এয়ার মরক্কোর একটি বিমান প্রস্তুত। এখনই যদি যেতে চান তো উঠে পড়ুন। আমরা বললাম, তাই সই।

রয়েল এয়ার মরক্কোর বিমানটি ফরাসী নির্মিত 'কারাভেল' বিমান। ফরাসীদের তৈরী 'কারাভেল' বিমানে চড়ে আরাম আছে। এরা যে এত ভাল ও দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান নির্মাণ করতে পারে, আমার তা জানা ছিল না। 'কারাভেল' বিমান জেটচালিত। প্লেনে উঠতে নামতে স্থান-কাল-পাঠের পরিবর্তন। প্যারিস-ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছতে সাধারণ বিমানে যে সময় লাগে কারাভেলে লাগে তার অর্ধেক সময়। বিমানের সিটে বসে খবরের কাগজের পাতা ওলটাইছি। এমন সময় কানে এলো এয়ার হোস্টেসের স্বর, তিনি বলছেন, আমরা ফ্রাঙ্কফুর্ট এসে গেছি। এবার কোমরে বেষ্ট বাঁধুন। আমি ভাবলাম, কলকাতা থেকে হাওড়া পৌঁছতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে ফ্রাঙ্কফুর্ট। তাজব ব্যাপার বৈকি।

পশ্চিম জার্মানীর কোনো বিমানের পূর্ব জার্মানীর আকাশ-সীমা পেরোবার উপায় নেই। তাই পশ্চিম বার্লিন পৌঁছতে হলে বিদেশী বিমান কোম্পানীর স্মরণাপন্ন হতে হয়। ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছে প্যান আমেরিকান বিমানে চাপতে হল। অবশ্য একটিমাত্র বিমান প্যারিস থেকে সরাসরি বার্লিন পৌঁছয়। তাও আবার সপ্তাহে দু'দিন এবং পূর্ব বার্লিনে। পোলিশ বিমান কোম্পানী 'লট'এর 'ইলুশিন' বিমানে। প্যারিস থেকে বার্লিনে সরাসরি ট্রেনে যাওয়া যায়। সময় লাগে বিশ ঘন্টা। আর বিমানে মাত্র তিন ঘন্টা।

পশ্চিম বার্লিনের 'টেম্পেলহফ' বিমান বন্দরটি শহরের বৃক্কে। সাধারণতঃ অমনটা দেখা যায় না। বার্লিনে তার ব্যতিক্রম। টেম্পেলহফ বিমান বন্দরে পৌঁছে দেখি অল্প তুষারপাত শুরু হয়েছে। সে অতি নগণ্য। হোটেল পৌঁছে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফরাসী সাংবাদিকের একদলের সঙ্গে বেরিয়েছি রাত্রির বার্লিন দেখতে। যা ঠান্ডা হাওয়া, তাতে হাড় কাঁপুনি শুরু। রাত সাড়ে বারোটার সময় অঝোরে তুষারপাত শুরু হল। আমরা তখন দু'গা নাম জপ করতে করতে হোটেলের দিকে ছুটছি। একে ঠান্ডা হাওয়া, তার ওপর তুষারপাতের ছাট। বুঝতেই পারছেন কি রকম নারকীয় কান্ড।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি রাস্তাঘাটে কে যেন সাদা কাপেট বিছিয়ে দিয়েছে। সাদা কাপেটের বৃক্কে আমরা জুড়তার ছাপ মেরে চললাম বার্লিনের স্থায়ী প্রদর্শনশালা এক্সজিবিশন হলের দিকে। এই কনকনে শীতকালে

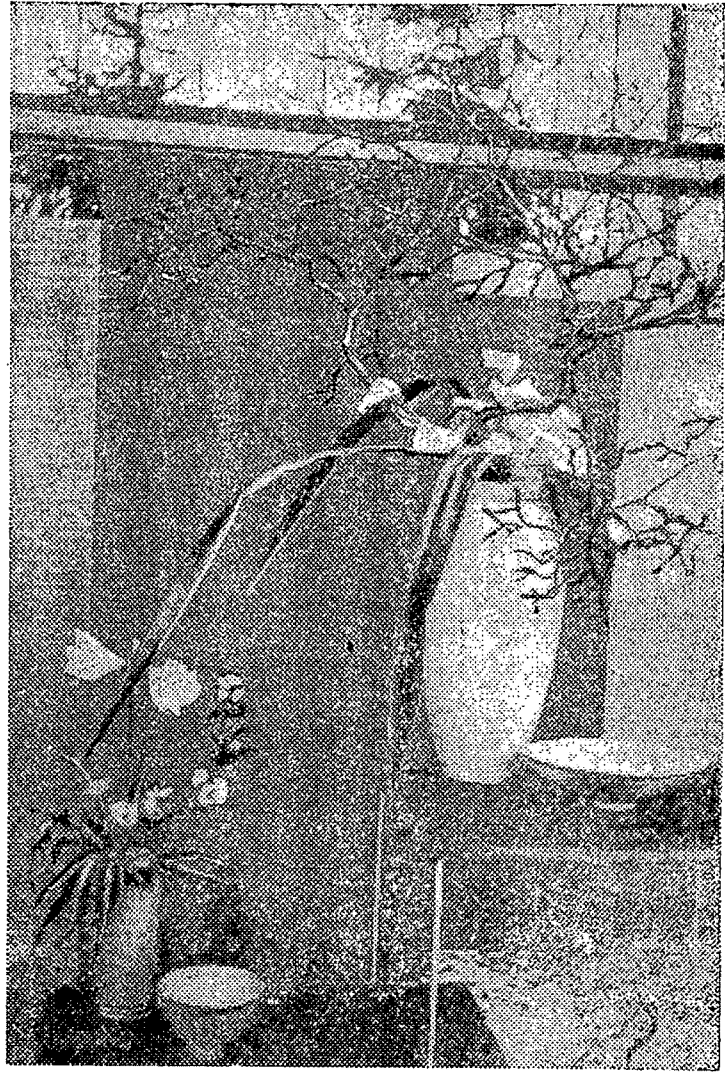
প্রতি বছরে হয়ে থাকে বার্লিনে 'গ্লুন ভোকে' বা শ্যামল সপ্তাহের উদ্‌যোজন। শস্য-শ্যামলা সপ্তাহকে বলা উচিত কৃষি সপ্তাহ। বছর পঁয়তিশ ধরে বার্লিনে নিয়মিত এই প্রদর্শনী হয়ে আসছে। বার্লিনের কৃষি সপ্তাহ উদ্‌যোজন করলেন বার্লিনের শাসনকর্তা ও পৌর সভাপতি হার উইলি ব্রান্ড। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতি হার লুবকে। বক্তৃতা দিলেন পশ্চিম জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী অধ্যাপক হলগটাইন ও কৃষি মন্ত্রী হার শোয়ার্জ।

বার্লিনের পৌরপ্রধান হার উইলি ব্রান্ড বার্লিনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রপতি লুবকে-কে আহ্বান জানালেন সভাপতির ভাষণ দিতে। পশ্চিম জার্মান রাষ্ট্রপতির বার্লিন পরিদর্শন গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম বার্লিন এখন ছোট ন্বিপের মতন। পূর্ব জার্মানীর মাঝখানে তার অবস্থান সমস্যা সৃষ্টি করেছে। চারধারে তার বিদেশী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র। বার্লিনবাসীদের নৈতিক উৎসাহ দেওয়াই এদের প্রধান উদ্দেশ্য। বার্লিনবাসীদের এখন দু'বোঁগের দিন চলছে।

সব বক্তাই বার্লিনের সমস্যা পর্যালোচনা করলেন। তারা সবাই দু'ভাবে ঘোষণা করলেন যে, তারা কোনো মতে পশ্চিম বার্লিনকে পরিত্যাগ করবে না। যে কোনোভাবেই হোক তারা বার্লিনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। বক্তাদের বক্তৃতার আগে ও পরে আবহসঙ্গীত পরিবেশন করল বার্লিনের সিমফনি অর্কেস্ট্রা দল। জার্মানদের ধারাই অনারকসের। আমাদের মতন এরা আবহসঙ্গীত দিয়ে সরকারি সভার উদ্‌যোজন করে থাকে। যা-বৃটেনে বা ফ্রান্সে দেখা যায় না। তবে রক্কে যে, এরা আমাদের মতন একটা হারমোনিয়াম নিয়ে হে'ডেগলার আগন্তুকদের কর্ণপটাহে হাতুড়ি পেটায় না। এদের আবহসঙ্গীত অর্কেস্ট্রা বাদনে সুমধুর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এরা সবাই পেশাদার বাজিরে। বেছে বেছে বাজনা বাজিয়ে মনোরঞ্জন করে। আমাদের মতন কোনো অপেশাদার বা কোনো কর্মকর্তার কন্যার সুখ্যাতি প্রচারের উদ্দেশ্যে এরা শ্রোতৃবৃন্দকে কষ্ট দেয় না। নামকরা পেশাদার অর্কেস্ট্রা বাদকের দলকে এরা দম্ভুরমতন চড়া হারে রূপচর্চা দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। ফলে আবহসঙ্গীত পীড়াদায়ক না হয়ে, হয়ে ওঠে সুমধুর! উদ্‌যোজনের আগে ও পরে বার্লিনের সিমফনি অর্কেস্ট্রা দল বাজাল ফোনডেবার

ও স্ট্রাউস-এর দুইটি সঙ্গীত। জার্মান সঙ্গীতপ্রীতি ও চর্চা জগৎবিখ্যাত। এককালে এই বার্লিন শহরে চলত সঙ্গীত চর্চা। জার্মানরা গণ্ডায় গণ্ডায় বিশ্ব-বিখ্যাত গায়ক ও সুরকার সৃষ্টি করেছে। এখনও বার্লিনের পথেঘাটে পায়চারি করলে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, দেখা যাবে ছোট ছেলেমেয়ের দল রাস্তার ধারে বসে হয় গাইছে নয়তো বাজাচ্ছে। এত রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জার্মান জাত সঙ্গীত-চর্চা ভোলেনি। বিখ্যাত জার্মান সঙ্গীতজ্ঞদের বাড়ীঘর-গুলো এখন প্রায় জাতীয় প্রদর্শনশালা গোছে। কি পূর্ব, কি পশ্চিম জার্মানী, যেখানেই যান না কেন, কোন শহরে কোন জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ হয়ত কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, সেই বাড়ীঘরগুলো এখন মিউজিয়ম। আমি বছর কয়েক আগে পূর্ব জার্মানীতে বিটোফেন হাউসের ও বাথ-এর মিউজিয়ম পরিদর্শন করে দেখেছি, সেখানে শূন্য সঙ্গীতজ্ঞদের ব্যবহৃত বাজনার যন্ত্রাদি নয়, যন্ত্রকন্ঠের বাদ্যযন্ত্র থাকতে পারে তারই প্রদর্শনী। আর সেখানে জনসাধারণ দলে দলে ভীড় করে দেখছে। আমাদের দেশে বোধহয় ওই ধরনের মিউজিয়ম একটাও নেই। শূন্য এখানে প্রদর্শনী নয়, সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে, সেগুলো কেমন বাজে, তার উদাহরণ ব্যাখ্যা করে দেখায় কর্মকর্তারা। এর ফলে বেরসিকরাও সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। জার্মানীতে সঙ্গীতজ্ঞদের বাড়ী-ঘর ও মিউজিয়ম জনসাধারণের কাছে তীর্থস্থান গোছে। জার্মানরা শূন্য সঙ্গীতের চর্চা করেই খালাস নয়, এরা সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের খাতির-যত্ন ও শ্রদ্ধা করে থাকে।

বার্লিনের কৃষি সপ্তাহ যেখানে চলছে, তার হলগুলোর সংখ্যা একটা বা দুটো নয়, গোটা দশেক। এক একটা হলের পরিধি আধ মাইল জুড়ে। পশ্চিম ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ এই প্রদর্শনীতে বোগ দিয়েছে। প্রতিটি দেশ বিরাট জায়গা জুড়ে তাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্যাদি শূন্য প্রদর্শনই করছে না, কিছু কিছু জিনিস বিক্রিও করছে। বিভিন্ন দেশের দোকানে তাদের দেশের অঞ্চলিক পোষাক পরে মেয়েরা জিনিসপত্র বেচেছে দেখলাম। জার্মানীর এক এক অঞ্চলের এক এক রকমের পোষাক। সেই পোষাক পরে ছেলে-মেয়ের দল তাদের অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ



শ্যামল সপ্তাহের পুষ্ক প্রদর্শনী বিভাগের দৃশ্য।

খাবার বেচেছে। মলে হলঘরের একধারে দেশ-বিদেশের নাচিয়েদলের গ্রাম্য নাচ হাঁছিল। সেখানে বেজায় ভিড়।

কৃষি সপ্তাহে শূন্য কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী হচ্ছে না, কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয় যত ধরনের যন্ত্রপাতি, কল-কন্ডা, সার, বীজ তারই প্রদর্শনী। নতুন ধরনের ট্রাক্টর, সার, খেতে জল দেবার নতুন পদ্ধতি, সবই দেখান হচ্ছে। আমাদের মতন কৃষিপ্রধান দেশে এই ধরনের প্রদর্শনীর গুরুত্ব অনেক বেশী।

কৃষি প্রদর্শনীর বিশেষত্ব হল এই ঠাণ্ডায়, যেখানে তুষারপাত হচ্ছে প্রতিদিন ঠিক সেই সময়ে বিরাট হলঘরের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বিরাট বাগান তৈরী। বাগানে যে কত ধরনের ফুল গাছ ওরা লাগিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই শীতকালে যেসব ফুল দেখা যায় না, এরা তার

চারা এনে প্রদর্শনী করছে। এই কৃত্রিম বাগানে ছোটখাট বোটানিকেল গার্ডেন তৈরী করেছে কর্মকর্তারা। এর ফলে বাগান বা ফুল-বিলাসিরা যেমন দেখে তৃপ্তি পাবেন, তেমন উৎসুক উদ্ভিদ-বিদ্যার ছাত্ররা নতুন নতুন জিনিস দেখে হবে সন্তুষ্ট। শূন্য কি বাগান, বাগানের মাঝে ফোয়ারার জল, তারপরে খেলছে বৈদ্যুতিক আলো। বার্লিনের শস্য-শ্যামল সপ্তাহ দেখে আরাম আছে।

১৯৬১ সালের আগস্ট মাসের আগে যে বার্লিনকে দেখেছি, সে বার্লিনের সে রূপ নেই। এখন সে অন্য বার্লিন। ১৯৬১ সালের ১৩ই আগস্টের পর থেকে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের বিচ্ছেদ ঘটেছে পুরোপুরিভাবে। পশ্চিম বার্লিনের চারধারে এখন হয় কাঁটা তারের বেড়া নয়তো ইঁট দিয়ে গাঁথা পাঁচিল। এপাড়া

থেকে ওপাড়ার ঘাবার জো নেই। এমন
কি ওপাড়ার বাড়ীর জানলা দিয়ে
ওপাড়ার উর্কি মারার উপায় নেই।
ওপাড়ার অর্থাৎ পূর্ব বালিনের রেসব

বাড়ী-ঘর পাঁচলের ধারে পড়েছে, তার
দরজা জানলা ইট দিয়ে গেঁথে দেওয়া
হয়েছে। গৃহ দেখা-দেখি নেই। এরই নাম
রাজনৈতিক পরিণতি। আগে পশ্চিম
বালিনের রাষ্ট্রীয় পূর্ব বালিনের লোক-
জনদের দেখতাম। তারা আসত বেড়াতে।
পশ্চিম বালিনের অধিবাসীরা যেত পূর্ব
বালিনে আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা-
শোনা করতে। এখন আর সে উপায় নেই।
গুড়ুগুপথের 'ইউ বান' রেল পশ্চিম
বালিনে বিচরণ করে, পূর্ব বালিনে
তার প্রবেশ নিষেধ। সাকুলার রেলপথ
'এস বান' চলছে রটে কিন্তু পশ্চিম
বালিনের অধিবাসীরা ভাতে চড়ে না।
তারা ওটাকে বরকট করেছে। পশ্চিম
বালিনে এরা রত বাস দেখলাম তত
আগে দেখিনি। এসব, নতুন বাস এসেছে
পশ্চিম জার্মানী থেকে।

এখন আর আসে না। তার ওপর অনেক
দোকানদার তার ব্যবসা বন্ধ রেখে পশ্চিম
জার্মানীতে চলে গেছে। পশ্চিম বালিনে
আজ লোকাভাব। পশ্চিম বালিনের রাসদ
জোগায় পশ্চিম জার্মানীর রেল ও জল-
পথে। এই পথ বন্ধ হলে পশ্চিম বালিন
পূর্ব জার্মান সরকারের কাছে আত্ম-
সমর্পণ করতে বাধ্য হবে। যা চাইছে
পূর্ব জার্মান সরকার। পশ্চিম বালিনে
যাতে লোকজন এবং বিশেষ করে যুবক-
যুবতির দল বাস করে তার জন্যে পশ্চিম
বালিন সরকার নতুন ঘোষণা জানিয়েছে
যে, যারা নতুন বিয়ে করবে, সেই সব নর-
দম্পতিদের আগাম তিন হাজার টাকা
ঋণ দেওয়া হবে। দশ বছরে সে টাকা
শোধ দেওয়া যাবে। এইভাবে সুযোগ
সুবিধার লোভ দেখিয়ে পশ্চিম বালিনের
জনসাধারণকে রাখা হচ্ছে।

সদ্য প্রকাশিত
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সর্বশ্রমিক উপন্যাস
স্বর্ণরেণু দাম : ৪.৫০
দুটি ভরপুর জীবন নিয়ে
আগের ছিনিমিনি খেলা
স্বর্ণরেণু

সুন্দর শোভন সংজ্ঞা:

অন্যান্য উপন্যাস :
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রিমের ফুল ৩.০০
পশুপতি ভট্টাচার্য
শ্রবণময়না ৩.০০
রবরহি
স্মৃতির প্রদীপ জ্ঞানী ২.৫০
জ্যোতির্ময় রায়
ভেঙেছে দুয়ার ২.৫০
চন্দ্রচূড়
নটরাজ ২.৫০
ভ্রমণ কাহিনী :
মারা দাস
কী হেরিলাম নয়নে ২.৫০
নাটক :
শব্দ মিত্র - অমিত্র সৈত্র
কাঞ্চনরংগ ২.৫০
গঙ্গাপদ বসু
অংশীদার ২.৫০

গ্রন্থপীঠ

৥ ২০৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট।
কলিকাতা ৬ ৥

বালিনবাসীরা পূর্ব বা পশ্চিম
বালিনে নির্বিঘ্নে যাতায়াত না করতে
পারলেও বিদেশীরা কিন্তু অনায়াসে চলা-
ফেরা করতে পারে। কেবলমাত্র যা দরকার,
তা হল পাসপোর্ট। পশ্চিম বালিনের
কমিশনারের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে
বন্দুকধারী পূর্ব ও পশ্চিম বালিনের
পুলিশ, তার ওপর রয়েছে গার্লিন ও
রুশ সৈনিকরা। সবাই দেখলাম তৈরী।
হুকুম হলেই গুলী ছুঁড়বে। এইপথ দিয়ে
পাসপোর্ট দেয়িয়ে দুই বালিনে যাতায়াত
করা যার সহজ।

পশ্চিম বালিনের কারা-প্রাচীরের
ধারে কৌতূহল জনতার দল দাঁড়িয়ে
যেন ওপাড়ার সাক্ষাস দেখছে। আগে
পূর্ব বালিন থেকে পশ্চিম বালিনে
প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক আসত কাজ করতে।
তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। তারা

পশ্চিম বালিনের অপেরা হাউস
'উয়েসে অপেরা বালিন' একেবারে নতুন।
এই মাস তিনেক হল তার উন্মোচন
হয়েছে। এ একেবারে বিংশ শতাব্দীর
মধ্যভাগে আধুনিক আর্টের নিদর্শন।
অপেরা হাউসটি একেবারে অতি
আধুনিক, যেন জাহাজ। তবে বসবার
জায়গা যেমন আরামদায়ক তেমনি বৈখ্যন
থেকে বসে দেখুন যা কেন পরিষ্কারভাবে
দেখা যাবে। এখানেই এর বৈশিষ্ট্য।
পূর্ব বালিনে একটা অপেরা হাউস
আছে সেটা নির্মিত হয়েছে ১৯৪৮
সালে। পশ্চিম বালিনের অপেরাতে
দেখলাম 'আল্ ক্রমেন'। 'আল্ ক্রমেন'
অপেরা নাটকের বিষয়বস্তু হল
পৌরাণিক ও আধুনিক। গ্রীক দেব
'জুপিটার'-এর সবতমানে তার স্ত্রী
'আল্ ক্রমেন' আরেকজনের সাথে প্রেম
করেছে। অবশ্য তার প্রেমিকের চেহারা
জুপিটারের মতনই দেখতে। তেমনি তার
যি তার স্বামীর সবতমানে তারই মতন
দেখতে আরেকজনের সাথে প্রেম করেছে।
জুপিটার ও তার চাকর এসে দেখে
ব্যাপার অন্য রকমের। তারপর যা হয়,
সেই চিরায়ত লড়াই ও পরে বিবাদের
নিষ্পত্তি।

নারী চরিত্র যে বিচিত্র, তারই
বিশ্লেষণ করেছে এই অপেরায়।



আর.মি.দে.সহা
১১১-ব্রহ্মাডায়ার স্ট্রীট - কলিকাতা

হ্যালিড
ল্যাবসনেস

লিলি
নবুচেদাতজারনের
জীবন ও মৃত্যু
অম্পকিত
গল্প



আমার গল্পের নায়কের এই জন্মের নাম দেওয়ার অবশ্য কারণ আছে। মনে হয় এই নামের জন্মই অনেক পাঠক গল্পটার প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং কেউ কেউ ভাবতেও পারেন, “বাঃ, মজার গল্প ত।” তা ভিন্ন আমি শোধন করে এন, এন, বলে চালাতে পারতাম। কবর দেবার সময় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে মৃত লোকের নামের দরকার হয়। এই গল্পের নায়ক মারা গেলে অনুষ্ঠান হয়েছিল সত্যি; কিন্তু তখন তার নামের প্রয়োজন হয়নি। সত্যি কথা বলতে আশঙ্কিত নেই।

আমি সম্ভবতঃ এই লোকটার নাম সঠিক জানতাম না অথবা জানলেও ভুলে গেছি। কিন্তু তাতে গল্পের কোন ক্ষতি নেই। কারণ আপনারা হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে আমার গল্পের নায়কের নামের ওপরেও আর একটা নাম আছে। এবং গল্পের জন্য নায়কের নামের চেয়েও এই নামটি কিন্তু আরও বেশি দরকারী। এ কথা গল্প শেষ করার পর আপনারাও স্বীকার করবেন।

গল্পটা হরশ বড়, খুঁই বড়। গল্পটা ভাবার সময় আমি নিজেই এর দৈর্ঘ্যের

কথা চিন্তা করে পিছিয়ে এসেছি কয়েকবার।..... কিন্তু গল্পটার সূত্রপাত হয়েছিল একটা ছোট সূত্র নিয়ে। গোটা সংগীত নয়, রং সংগীতের শেষাংশের সূত্রটা নিয়ে এই গল্পের জন্ম। উপর অংশটি খুব বড়। এত বড় যে কোন পরিণত শিল্পীর রচিত সিম্ফনির শেষের ভাগ বলে চালানো যায়। সংগীত-শিল্প সম্পর্কে আমার ধারণা খুব উঁচু। তাই এই সূত্রটা তুলে আমি আমার এক বন্ধকে দিয়েছিলাম। আমার বন্ধটি খুব বড় সংগীত রচয়িতা হবার আশা রাখেন।

বলেছিলাম, ক্ষমতাবান সে যেন এই সুরটা ব্যবহার করে।

কিন্তু সে কথা যাক। এবার আমি গল্পে চলে আসি।

ছাত্র-জীবনে আমি রেইকজাবিকের (Reykjavik) একটা বাড়ির নিচের তলার থাকতাম। নিচের তলা না বলে একটা গর্ত বলা ভাল। পাতলা একটা কাঠের পাটিশন তুলে বাড়ির চুলো থেকে আমার ঘরের পার্থক্য বজায় ছিল। শীতের সময় আমি লক্ষ্য করলাম যে, বেশ একটু রাত হলে সংগীতের সুরটা ওই ঘর থেকে ভেসে আসে। গায়কের গলাটা মোটা-মোটা, ভাঙা-ভাঙা।

এই গলার সে গান গাইত। গান শেষ হলেও আমি কিছুতেই বন্ধুতে পারতাম না যে গানটা সত্যিই শেষ হয়েছে। মনে হত গায়ক ঠিকমত নিঃশ্বাস নিতে পারেনি। মনে হত গায়ক বুঝি গানের সঙ্গে মারা গেছে। দিনের পর দিন যায়। ওই গানটার সামান্য অংশটা ছাড়া আমি গায়ক সম্পর্কে আর কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু কিছুদিন পরে মাঝে মাঝে অন্য সুরের টুং-টাং আওয়াজ কানে আসতে লাগলো। এই আওয়াজটা খুবই অস্পষ্ট। মাঝে মাঝে মনে হত সংগীতকার এই টুং-টাং আওয়াজ থেকে একটা নতুন সুর সৃষ্টি করতে চান। এ হবে একেবারে নতুন সুর। মাঝে মাঝে থাকবে দীর্ঘ বিরতি। সে যাই হোক, আমি বেশ বন্ধুতে পারতাম যে, সুরটা সংগীতকারের বন্ধুর ভেতর জেগে আছে। গায়কের গলা মোটা, ভাঙা। সুর খেলে না ঠিক মত। তাই বন্ধুর মধ্যে যে সুরটা গুণ গুণ করতো তাকে ঠিকমত গলার তোলা বেত না। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে আগের সংগীতের শেষ অংশটাও বাজত। এ সুর না বাজিয়ে সে থাকতে পরত না। আর এই শুনলেই আমার মনে হত যে এর মধ্যে বিরতি সিম্ফনির সন্ধাননা রয়েছে।

তাই শীতের প্রতি রাতে অশ্রুত মত্তভাবে আমাকে গান শোনাত সংগীতকার। শেষকালে গায়ক সম্পর্কে আমি খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে দেখি এ গায়কটি আর কেউ নয়; এ বাড়ির চুলোগাড়ি যে পরিষ্কার করে সেই-ই। মাঝ রাত্তে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি পশের ঘরে সেরামটার কাছে গেলাম। তখন

চুলোতে আগুন ধরানো হয়ে গেছে। চুলোর মুখটা আধ-খোলা। অন্ধকারে আগুনের লালচে আলো এসে পড়ছে। আর চুলোর ঠিক সামনে বসে আছে নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসন। এই-ই আমার সেই গানের গায়ক। কিন্তু অন্ধকারে সে এমন ভাবে বসেছিল যে আমি তাকে প্রথমে দেখতেই পাইনি।

আমি বললাম, “নমস্কার।”

অন্ধকার থেকে মোটা ভাঙা গলার উত্তর এল, “নমস্কার।”

আমি বললাম, “এখানে বেশ গরম দেখছি।”

সে উত্তর দিল, “আমি চললাম।”

“এটা ত তোমার ঘর।”

সে উত্তর দিল, “না।”

“না? কিন্তু কত সন্ধ্যায় আমি তোমাকে এই ঘরে বসে গান গাইতে শুনছি।”

অপরাধীর মত লোকটি উত্তর দিল, “আমি চললাম।” লোকটি সত্যিই উঠে দাঁড়াল।

“না, না। তুমি আমার জন্য যাচ্ছ। যেও না। আমি তোমাকে বহুদিন গান গাইতে শুনছি। তাই একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।”

সে বললে, “আমি গান গাইনি।”

প্রতিবাদ করে বললাম, “আমি তোমাকেই গান গাইতে শুনছি।”

সে বললে, “না। আমি কোনদিন গান গাইনি; গাইতে পারি না।”

“কিন্তু আমি তোমার গানের সুরটা হীতমধ্যেই তুলেছি। জানো।”

নিজের মনে কতকগুলো কথা বিড় বিড় করে বলতে বলতে দরজা দিয়ে চট করে সরে পড়তে চেষ্টা করল লোকটি।

আমি বললাম, “আমি এসে তোমাকে বিরক্ত করলাম। বরং আমিই চলে যাচ্ছি।”

“আমার ঘুম পেয়েছে” এই বলে লোকটি চলে গেল।

সন্ধ্যার ধারে একদিন একটা পিয়ানোর বাজ্ঞ নজরে পড়ল। তখন তুষার পড়ছে ঘন হয়ে। শুনলাম এই বাজ্ঞের ভিতর থাকে নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসন। মনে হল, সে এই পিয়ানোর বাজ্ঞে থাকে বলেই গানের প্রতি এসেছে এত বড় আকর্ষণ।

প্রায় হস্তা খানেক তার আর কোন সাড়া-শব্দ পেলাম না।

কিন্তু হীতমধ্যে ও হয়ত আমার কথা একেবারে ভুলে গেছে। তাই সে আমার গান গাইতে আরম্ভ করল। সেই একই সুর আর সেই একই ভাবে শেষ হওয়া। আমি আবার ওর কাছে গেলাম।

বললাম, “নমস্কার।”

সে উত্তর দিল, “নমস্কার।”

“তুমি গান গাইছ?” আমি বললাম। সে উত্তর দিল, “না।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “এই সুর তুমি কোথায় শিখেছ?”

“সুর? সুর কোথায় দেখলেন? মোটেই সুর নয়।”

“কিন্তু বরাবরই একই গান গাও।”

“আমি গান গাই না। আমি গাইতে পারি না।”

“গুণ গুণ কর ত?”

কিছুক্ষণ পরে সে বললে, “একদিন গান গাইতে খুব ইচ্ছে করত। কিন্তু সে ত বহুযুগ আগের কথা। আজকাল ও সব কথা ভাবি-ই না একেবারে। চুলো জ্বললে দিয়ে ঠিকমত কয়লা ঢেলে এখানে কিছুক্ষণ বসে থাকি। এ ছাড়া আর কিছুই করি না। আচ্ছা, এবার আসি।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমার বাড়ি কোথায়?”

“পশ্চিমে।”

“পশ্চিমে কোথায়?”

“ওলাকস্টিগ।”

“জায়গাটা কি ভাল?”

“সমুদ্র বড় অশান্ত। অন্য জায়গায় যেমন, এখানেও ভেমন।”

“পশ্চিমে তোমার আত্মীয়-স্বজন আছে বন্ধি?”

“কেউ নেই। সবাই মারা গেছে।”

“তুমি কি কাজ করতে সেখানে?”

“কি করতাম? তার কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে। কখন সাগরে গিয়েছি। কখন মাঠে খেটেছি। যখন যেমন কাজ জুটেছে তখন তাই-ই করছি।”

“এখানে এলে কেন?”

অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিল না সে। শেষকালে বললে, “পশ্চিমের সঙ্গে আমার

পাট বহুকাল আগেই চুকেছে। পশ্চিমের সঙ্গে পাট চুকে গেছে।”

আমি বললাম, “এই শহরে এসে ভাল করেছ। খুব ভাল করেছ। আমার কি মনে হয় জানো? এই শহরটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা।”

চুলোর সামনে একটা বাজের ওপর বহুকণ চূপ করে বসে থাকল সে। এবার এই ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল। অল্প আলো ঘরটাতে ছড়িয়ে পড়েছে। লোকটার জুতো ছেঁড়া। পায়ে আঙুল কটা বেরিয়ে এসেছে। সে একমনে ছেঁড়া জুতো দেখাচ্ছিল।

একটু পরে বললে, “এই শহরে এসে প্রথম রাতটা কাটিয়েছিলাম কবরখানায়।”

ওকে একটু তাকিয়ে দেবার জন্য আমি উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলে উঠলাম, “তাই নাকি? রাত কাটিয়েছিলে? বহু লোক অবশ্য বহু রাত ও জায়গায় কাটাবে।”

সে বললে, “ঠিক।”

ওর গাল বেশ ভারী ভারী। লালচে দাঁড়ি। দীর্ঘদিন দাঁড়িটার কোন ঝগুও নেওয়া হয়নি।

আমি বললাম, “তোমার জুতোর অবস্থা ত খুব কাহিল।”

“ওর জন্যে কি হয়েছে। বছর দুয়েক চলে। কুড়িয়ে পেয়েছিলাম ভাঙাচুরার কাছ। কেউ ভুলে ফেলে গিয়েছিল বোধ হয়।”

চুলোর পিছনে একটা পেরেক ওর টুপিটা ঝুলেছিল। যার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা পেড়ে নিল। সাধারণত ব্যবসাদাররা এই ধরনের টুপি পরে থাকে। কিন্তু একটু পুরানো হলে ফেলে দেয়। পুরানো হলে এ সব টুপির পাশ থেকে সূতো উঠতে থাকে। কখন কখন বাচ্চারা টুপির ঠিক মাঝখানটায় ফুটো করে দেয়।

আমি বললাম, “টুপিটা একটু দেখবো?”

টুপির মাঝখানে ফুটো। বড় ফুটো। বাচ্চাদের হাত গলে যেতে পারে।

টুপিটা উঁচু করে ফুটোর মাঝখানে চোখ রেখে ছাদ দেখতে দেখতে আমি বললাম, “টুপিটাও যে যায়-যায়।—টুপিটা খুব সৌখিন ছিল এককালে।”

আমি টুপিটা ফিরিয়ে দিলাম। দেখলাম ও ঠিক আমার মতই টুপির ফুটো দিয়ে ছাদ দেখছে।

একটু রাগাত কণ্ঠে বললে, “টুপির ফুটো দিয়ে সবাই কি আর ভগবানের দর্শন পায়?” লক্ষ্য করলাম, ওর মুখে মাত্র একটা দাঁত আছে।

দেখতে দেখতে বসন্তকাল এল। খুব সুন্দর কাল। এই সময় জানালার ফাঁক দিয়ে বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব মজা। নিতান্ত নগণ্য তুচ্ছ জিনিস-গুলো মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ভাল লাগে। আর পরীক্ষা সামনে থাকলে ত আর কথাই নেই। তখন ত এগুলো দর্শনবার আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে। রাস্তায় যে-সব ছোট-খাট ঘটনা ঘটে তার গুরুত্ব ও অর্থ যেন ঠিক সময়ই পরিষ্কার বোঝা যায়।

একদিন এ বাড়ীর মাঝের তলার এক কামরায় নতুন পরিবার এসে ঢুকলো। কারা আসছে বা যাচ্ছে তা নিয়ে আমি মোটেই বিব্রত হই না। কিন্তু কোনক্রমে এই নতুন পরিবারটি আসার খবর পেলাম। এরা স্বামী-স্ত্রী আর তাদের একটা মেয়ে। দেখে মনে হয় মেয়েটির বয়স বছর আটকের বেশি নয়। নাম তার লিলি। মেয়েটিকে দেখে আমি আঁচ করলাম যে ওর বাবা মা ঠিক শহরে নয়। কারণ মেয়েটির মাথায় বিন্দুনি, পায়ে পশমের সুন্দর মোজা। আমার জানালার ঠিক ধারেই উঠানের ওপর আরও কতকগুলো মেয়ের সঙ্গে লিলিও খেলছিল। মেয়েটির মা তার ঘরের জানালা থেকে বার বার কান্না পড়ে মেয়েকে ডেকে নানান আদেশ উপদেশ দিচ্ছিল। বুঝলাম মা মেয়েটিকে খুব ভালবাসে।

“রাস্তায় গাড়ি আছে, দেখো। মাতাল আসছে, ঘরে এস খুক। কুকুর, কুকুর, খুকী সরে যা। লিলি, লিলি, পুন্নিশ আসছে কিন্তু!”

জানালা দিয়ে মা এই উপদেশ দিচ্ছে। অথচ এ শহরের প্রত্যেক বাড়ীর ঘেরা-উঠোন, পুরানো পাথর দিয়ে পাঁচিল তোলা। রাস্তার ও দিকে কাঁচা সবজির বাগান। সে দিকটাও ঘেরা। আর রাস্তাটা খুব নির্জন বলতে হবে। পাঁচিলের ওপর বসে বসন্তের রোদ পোয়াতে পোয়াতে নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসন উঠানে ছেলে-মেয়েদের দৌড়া-দৌড়ি দেখাশু। বিশৃঙ্খল দাঁড়ি থাকা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছিল যে, সেও খেলা দেখতে মশগূল। সারাদিন হুড়ো-হুড়ির পর ছেলেমেয়েরা ক্রান্ত হয়ে পড়েছে। খিদেও পেয়েছে তাদের। কেউ

কেউ তাই বাড়ি ফিরে গেল। লিলি একা একাই উঠানে খেলায় মগ্ন। সেই সময় নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসন ডাকল, “লিলি, লিলি।”

লিলি এমন ভাব দেখাল যেন ডাকটা সে শুনতেই পায়নি, যেন খেলায় এত ব্যস্ত যে অন্য কোন দিকে নজর দেবার বিন্দুমাত্র ফুরসৎ নেই। নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসন তাই আবার ডাকল “লিলি, লিলি।”

এবারও সে না-শোনার ভান করল। কিন্তু মা নিকটে আছে কি-না দেখতে একবার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে নিল। মা তার নিকটে নেই। এখন রান্নাঘরে ব্যস্ত।

পাঁচিলের ওপর বসে থেকেই বললে, “আমার মিষ্টি খুকী লিলি, কি আজ নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসনের সঙ্গে একটা কথাও বলবে না?” এবার সে পকেট থেকে কাগজের একটা ঠোঙা বার করল। এই ঠোঙাটাকে এতক্ষণ কত গোপনে না সে রেখেছিল। ঠোঙা দেখা মাত্র মেয়েটি রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে গেল। তবু তার মুখে সংশয়ের ছায়া। হাতদুটো পিছনে বাঁধা। একবার কাগজের ঠোঙার দিকে তাকাল লিলি। আবার সঙ্গে সঙ্গে উপরের ঘরের জানালার দিকেও চাইল। কাগজের ঠোঙায় কিসমিস আছে। কিন্তু তবু লিলি এমন ভাবে তাকাল যেন সে কিস-মিস দেখে একেবারে অবাক হয়নি এবং এগুলোর জন্য তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে দুজনেই পাঁচিলের ওপর বসে কিস-মিস খাচ্ছে। লিলি অনেকগুলো মুখে পুরছে আর মাঝে মাঝে সে একটা-দুটো দাঁতে কাটছে। পাঁচিলের ওপর বসে পা দুদিয়ে দুদিয়ে কিস-মিস খেতে খেতে লিলি ওর এলোমেলো দাঁড়িটার দিকে মাঝে মাঝে ভীষণ সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। তারপর লিলি পাঁচিল থেকে নেমে ওর সামনেই খেলা করতে লাগলো। মা ডাকলো তাকে। খেতে যেতে হবে। কিন্তু-কিছু দেবী করেই গেল লিলি। কাগজের ঠোঙায় তখনও কিছু ছিল।

এইভাবে বসন্ত কাটল। নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসন সম্পর্কে আর কোন ভয় বা সংশয় নেই লিলির। এখন তাকে আসতে দেখতেই সে নিজেই দৌড়ে তার কাছে যায়, পকেটের মধ্যে হাত পরে কিসমিসের ঠোঙা টেনে বার করে। আমি

অনেকদিন সন্ধ্যার সময়ও ওদের দুজনকে পাঁচিলের ওপর বসে থাকতে দেখেছি। দেখেছি লিলি ওর কথা খুবই সাগ্রহে শুনছে। আমার তাই মনে হরোছিল ও নিশ্চয়ই লিলিকে গল্প শোনাচ্ছে।

মেরেটির সঙ্গে এত ভাব দেখে আমি একদিন সোজা জিজ্ঞাসা করলাম, “এরা বোধহয় তোমার আত্মীয়।”

ও উত্তর দিলে, “ওরাও যে পশ্চিমের লোক।”

“তা হলে ওদের বাড়ির খবর তোমার কিছু জানা আছে নিশ্চয়ই।”

“মানে,—আমি জানি।—আমি লিলির কথা বলতে পারি।”

লোকটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। বেশ একটু অশুভ চরিত্রের লোক বলেই মনে হল। কিন্তু ওই অবধি। ওর বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। আমি ওর কথা কেনই বা ভাবতে যাবো শূদ্রশূদ্র। আমার সঙ্গে ওর ত কোন সম্পর্কই নেই। চিন্তা করার বিষয়েরও অভাব নেই। এমন কি আমি যদি কেন্দ্রীয় ধরতেও পারতাম যে লিলি আর তার বাবা-মা পূর্বের লোক,

পশ্চিমের নয়, আমি কেন্দ্রীয় এই মিথ্যার জন্য লোকটিকে দোষারোপ করতাম না।

একদিন আমি ওদের গল্প শুনতে পেলাম : তখন সে বিশ বছরের যোয়ান। মেরেটি তার চেয়ে কয়েক মাসের ছোট হতে পারে। ওদের মধ্যে ভালবাসা হল। ও বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। রীতি অনুসারে বলেছিল যে সে তার জন্য স্নাউটে নতুন ঘর তুলে দেবে। ঘরের সামনে থাকবে শাক সবজির বাগান। সে সময় সে গড়মুন্ডারদের ‘হোপ’ জাহাজে শেয়ারে মাছধরার কারবার করত। দু’চার টাকা রোজগারও বাড়ল। কিন্তু সে কিছুতেই গান গাইতে পারত না। কিছুতেই না। সে মেরেটিরও নাম ছিল লিলি।

মেরেটি জিজ্ঞাসা করল, “তারপর?”

আড়িপেতে শোনার মত অবসর নেই। আমি ভেবেছিলাম যে পশ্চিমের কোন অতি-পুরানো গল্প সে এখন লিলিকে শোনাচ্ছে।

আবার শীত এলো। আমিও উত্তর থেকে ফিরে এলাম। একদিন রাস্তার ধারে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। হঠাৎ নজরে পড়ল কিছুদূরে একটা লোক দাঁড়িয়ে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। যতক্ষণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলছিলাম, ততক্ষণ সে দূরে দূরে ছিল। একা হতেই সে আমার কাছে এল। বিনা স্বিধায় আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, “আমি নেবুচেদান-জার নেবুচেদানজারসন।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কি খবর?”

সে উত্তর দিল, “কিছু না।”

“আমাকে কি কিছু বলবে?”

“না। এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভাবলাম দেখি আপনি আমায় চিনতে পারেন কি-না।”

“কি আশ্চর্য! কেন চিনবো না? আর সবচেয়ে বড় কথা আমি তোমার গান

এখনও ভুলিনি। যাকগে, তোমার শিশু-বান্ধবীর কী খবর?”

“বুড়ো বয়সের পেনসন ছিল আমার। মাত্র ত্রিশ ব্রাউন। কিন্তু সেটাও হারালাম।”

“কেন, কি করে?”

“আর বলেন কেন! জোসেফ, ওই যে সেই লোকটা, এখন সেই জোসেফ লাগাল যে আমি পেনসনের পরসা দিয়ে কিসমিস খাচ্ছি। ব্যাস্ আর যাই কোথা! আইনের ব্যাপার আপনি ত কিছু কিছু বোঝেন।”

“এই জোসেফটিকে ঠিক চিনতে পারছিলেন।”

“জোসেফ আমার এক রকমের আত্মীয়। মাঝে মাঝে মাছ কি এটা ওটা সে আমাকে দিত।”

“তা দেখো। তুমি এক কাজ কর। তুমি মেরের কাছে গিয়ে সব ব্যাপারটা বল। আমার সময় নেই। সময় থাকলে আমি তোমার সঙ্গে যেতাম।”

“এতে কি আর কিছু হবে? কিছুই হবে না। ওর চেয়ে শীতের সময় যদি কোথাও ঘরটর পাই, তাই চেষ্টা করাই ভাল।”

“ঘর?”

“হ্যাঁ, গত বছরের মত একটা ঘর।”

“কেন গত বছরের মত তুমি কি এ বছরও চুলোগুলোর তদারক করবে না?”

“না। ও বাড়ির সঙ্গে আমার সব চুকবুকে গেছে, ও বাড়ির পাল্লা শেষ হয়ে গেছে।”

“কি করে?”

“এমনিই চুকে গেল।”

“তা হলে যাই।”

“আচ্ছা। আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ।”

সে টুপি তুলে নমস্কার করলে।

বহু বছর আর তার কোন খোঁজ খবর পাইনি। ওর কথা আর মনেও হয়নি। তখন আমি ডাক্তারি পড়ি। একদিন চাদর ঢাকা এক লাশ এল মর্গে। দেখি, এ সেই গায়ক। এখন সে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। তবু তাকে দেখা-মাত্রই চিনতে পারলাম। তখন আমি ঠিক তার-ই জন্য বিশেষভাবে

জাগর দীপ !!

জাগর দীপ !!

দীপ শিখার মত অনিবার্য-প্রেমের, কুটিলতা, কুশ্রীতা ও আবির্ভাবের উর্ধে, ভাস্কর প্রেমের শাস্বত কাহিনী।...দেহাতীত-প্রেমের এই কাহিনী লইয়াই সুখ্যাতি মহিলা সাহিত্যিকা অঙ্গদী বসুর নবতম উপন্যাস। দাম-৩.০০

মেরিট পাবলিশাস

৫১, কণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬



সার্ভে ড্রইং সরঞ্জাম ও
অফিস সংক্রান্ত ষ্টেশনারী
কাগজ বিক্রয় ও প্রিন্টার্স
রহস্যময় জরাজীর্ণ প্রতিষ্ঠান
কুইন ষ্টেশনারী স্টোর্স প্রাইভেট লি.
৬৩ ই. রাধারাজ্য স্ট্রীট, কলিকাতা-১

বিচলিত হইনি। সমাজ সংসার ছাড়া বাউন্ডুলে লোকের মৃত্যুর জন্য যতটা সমবেদনা থাকা দরকার, আমার মনে হয়, সে সময় ওর প্রতি আমার সেই রকমের মনোভাব ছিল। তাকে কবর দেবার সময় প্রথমবার একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। এই লোকটার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটা সংগতি রয়েছে। এই হচ্ছে একটা লোক যার কাছ থেকে সমাজ সংসার কোন কিছু আশা করেনি। পিয়ানোর বাক্সের মধ্যে ওর মৃতদেহ আবিষ্কার করা হল। কেউ ওর নাম জানতো না। কেউ জানতো না কোন অঞ্চল থেকেই বা সে এই শহরে এসেছে। তার জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে মাথা ঘামাননি কেউ-ই। এমন কি ডিসেকশন টেবিলে ওর শরীরে যখন আমি ছুরি চালাচ্ছিলাম তখন একবারের জন্যও আমার মনে হয়নি যে ও গান গাইত। কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত। খুব জোর করে বলতে পারি যে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা ওর দেহটাকে চিরে চিরে দেখেছি, দেহের ভিতরের অংশগুলো অতি সাবধানে পরীক্ষা করেছি। আমি জোর করে বলতে পারি মরার পর ওর দেহের অভ্যন্তর এত স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে ওর জীবদ্দশায় ওর বাইরের দিকে কেউ ওতটা স্বস্তির সঙ্গে তাকায়নি।

এসব কথা এখন অপ্রাসঙ্গিক। ডাক্তারি বিদ্যার ওপর বীতশ্রম্ভ হয়ে পড়েছি বহুকাল। এখন আমি অন্য বিষয় চর্চা করি। কিন্তু এতদিন পরে যখন এ প্রসঙ্গ উঠেছে তখন আমার স্বীকার করা উচিত যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নাম করে ওর ক্ষেত্রে সামান্য শঠতা করা হয়েছে। ওর হাড়গুলো সিরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ওর অস্থি-গুলোকে দিয়ে ছাত্রদের পড়ান হচ্ছে। আমি সেই কলেজটির নাম অবশ্য করব না। আর মাংসগুলো অবশ্য ডাক্তারি বিজ্ঞানের কাজে লাগেনি। আমি একটা বৈজ্ঞানিক গোপন কথা ও একটা বৈজ্ঞানিক চক্রান্ত আজ ফাঁস করে দিলাম। আমরা ওর জন্য অন্য কফিনে শবের বদলে পাথরের নুড়ি ভরে দিয়েছিলাম। কতকগুলি ডাক্তারি-পড়া ছাত্র এই কাজের ভার নিয়েছিল। আর আমরা অবশিষ্ট ডাক্তার-ছাত্ররা, সেই কফিনের পিছনে পিছনে গেলাম। উদ্দেশ্য আমাদের সোজা—যেন কবর দেবার আগে কফিন খুলে কেউ না দেখে। আমরা সবাই কফিন ঘাড়ে করে চটে গেলাম এবং তারপর গেলাম কবরখানায়।



লাইফবয় সোপে গান করলে শারীরটা তাজা আর স্বরবক্রে মনে হবে। প্রতিদিন খুলো ময়লা গারে লাগবেই—লাইফবয় সেই খুলো ময়লার রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয়। পরিবারের সকলেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য রোম লাইফবয় সোপে গান করুন।

**লাইফবয় যেখানে,
স্বাস্থ্যও সেখানে!**

হিন্দুস্থান লিডারের তৈরি

L. 30-X31 BG

গোটা দিন কি বিচিত্র শ্লেষাত্মক। বর্ষাদিনের মাত্র দুদিন বাকি। সূর্য ওঠার আগেই কবর দেবার পর্ব শেষ করার জন্য আমাদের ব্যগ্রতা। আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে সেদিন সমস্ত চার্চকে কালো ফিতে দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। শহরের এক গনমাণ্য ভদ্রলোক মারা গেছেন। তাকে কবর দেওয়া হবে। তার-ই সম্মানের জন্য এই সব ব্যবস্থা হয়েছিল। চার্চের কর্মকর্তাদের ধৃষ্টতার জন্যই নেবুচেদানজার নেবুচেদানজার-সনকে কোনক্রমে পুতে দেওয়া হল। কারণ চার্চের কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়ে দিল যে সে রাতেই যদি আমরা তাকে কবরস্থ করতে পারি, ভাল। তা ভিন্ন উপায় নেই। কবর দেওয়াই হবে না।

বাতাস বইছে। তুবারপাত আরম্ভ হয়েছে। আমরা সেই দূর্ভাগ্যের মধ্যেই কাঁফিন ঘাড়ে নিয়ে এগিয়ে চললাম। আমাদের মনে একটা ভয় ছিল। কবর দেবার সেই শোকচ্ছন্ন লগ্নে যখন গাম্ভীর্যের সঙ্গে সব রীতি ও অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে, ঠিক সেই সময় যদি কাঁফিনের তলা ভেঙ্গে পাথরের নুড়ি-গুলো চার্চের চাতালের ওপর ঝরঝর করে ছিড়িয়ে পড়ে তবে আর কোন উপায় থাকবে না। মার্গ পথ যেতে না যেতে কাঁফিনের তলা মচমচ করে উঠল। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে এল। সর্বনাশ হল আর কি। যে ছেলোটো কাঁফিনের মধ্যে পাথরের নুড়ি ভর্তি করেছিল সেই উল্লুকে ডেকে ধমকে দিতে ইচ্ছে হল। তার ওপর কি ভারী হয়ে উঠেছে কাঁফিন। কোমর বেঁকে যাচ্ছে। আমরা সবাই গীর্জায় বসবার ঘেরা আসনের ওপর বসে পড়লাম। লোকে দেখলে ভাবত আমরা মতের আত্মীয়স্বজন হব। শোকের জন্য যেসব ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা এক অজ্ঞাতকুলশীলের ভেগে এল। এই জন্য পাদ্রীকে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছে। ভগবান করুন এইসব কথা সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ির কেউ না জানতে পারে! পাদ্রী তাই খুব তাড়াতাড়ি তার অনুষ্ঠান শেষ করে দিলেন। হস্তাথানেক আগে শহরের এক গরীব বৃদ্ধী মারা গিয়েছিল। তার কবর দেবার সময় একটা প্রার্থনা তৈরী করেছিল পাদ্রী। সেই প্রার্থনটি এর বেলায়ও আবৃত্তি করা হল। বৃদ্ধীর বেলায় পাদ্রীকে লিখতে হয়েছিল ‘আমাদের প্রিয় ভগিনী’ আর এর বেলায় বলতে হবে ‘আমাদের প্রিয় ভ্রাতা’। এই অদল-বদলের জন্য পাদ্রীকে বেশ বিরক্ত হতে হল। একবার ও বলেই ফেললো, “আমাদের এই বিগত ভগিনীর জন্য তার স্বামী ও পুত্র পৃথিবীর অন্যায় থেকে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।” পাদ্রীর এই প্রার্থনা শুনে আমি অবাক। মনে হল কেউ যদি এই আবোল-তাবোল কথাগুলো শোনে সে কি ভাবে? কিন্তু এই অনুষ্ঠানে আমরা ছাড়া আর কেউ

নেই। আর দূরে বসে আছে এক বৃদ্ধী। তাকেও কালো বলে মনে হল। মনে হয় কবর দেবার ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ নেই। তুবারপাত থেকে বাঁচবার জন্য চার্চে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাই আমার ভয় অমূলক।

এবার কাঁফিন নিয়ে কবরখানার দিকে এগিয়ে চললাম। আমাদের পিছনে বিধর্মীর দল। কিন্তু সেই সঙ্গে ওই বৃদ্ধীও বা আসছে কেন? নীল জামা আর শাল মুড়ি দেওয়া বৃদ্ধীর মূখে হাজার হাজার ভাঁজ। কুঁচকে গিয়েছে কোথাও কোথাও। মনটা কেমন করে উঠল। আমি আর অন্য দু’জন সমস্ত ব্যাপারটা তদারক করতে থাকলাম। কি জানি, বৃদ্ধী কবর দেবার সময়টাতে কোন অনর্থ ঘটিয়ে বসে যদি। কবরে মাটি ঢাপা না দেওয়া অবধি আমার বুক টিপ-টিপ করছিল। আমার সঙ্গী দু’জন ক্রান্ত হয়ে পড়ল। অকারণ ঘুরে বেড়াতে পারল না। কবরখানার নিকটেই ‘কাফে উপাসালা’। সঙ্গী দু’জন কাঁফিনে বসল। থাকলাম একা আমি। আমাকেই দেখতে হচ্ছে সমস্ত কান্ড। আমি, বৃদ্ধী, পাদ্রী আর তার সাহায্যকারী, আমরা এই চারজন কাঁফিনের পিছনে পিছনে যাচ্ছি। পাদ্রী আর তার সাহায্যকারীর মাথায় সিল্কের টুপি।

কবরে মাটি দেবার পর পাদ্রী ও তার সঙ্গী চলে গেল। থাকলাম বৃদ্ধী আর আমি। বৃদ্ধী চুপ করে দাঁড়িয়ে তুবার-ঝড় দেখছে। কবরখানার গেটের কাছে আমি বৃদ্ধীর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু বৃদ্ধী আর আসে না। তাই বাধ্য হয়ে আবার কবরের দিকে গেলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আর কিসের জন্য দেরী করছ বৃদ্ধী-মা?”

ভয় পেয়ে বৃদ্ধী আমার দিকে তাকাল। আমার কথার উত্তর দিতে গিয়ে বৃদ্ধীর মুখটা ব্যাথায় কুঁকড়ে গেল। চোঁট দুটো কপিঁছিল। মুখের একটা পাশ হাঁ হয়ে গেল। দেখলাম বৃদ্ধীর একটাও দাঁত নেই। চোখ দুটো লাল টকটকে। জলে ভর্তি। বৃদ্ধো লোকেরা যখন কাঁদে তখন তাদের খুব খরাপ দেখায়। এ বিষয়ে আমি আগে লিখেছি।

আমি বললাম, “কেঁদো না বৃদ্ধী-মা। ভগবান ওকে নিয়েছেন।”

জামার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বৃদ্ধী বললে, “ঠিক কথা।”

বৃদ্ধী কবরের কাছে ঘুরঘুর করুক—এ আমার অভিপ্রেত নয়। তাই বললাম, “ঠান্ডা লেগে যাবে। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাও।”

আমরা একসঙ্গে কবরখানা পার হলাম। আমি বললাম, “তুমি ওর আত্মীয়?”

সে উত্তর দিল, “আমি পশ্চিমের লোক।”

“তুমি কি ওলফস্‌ভিগ থেকে আসছ?”

“হ্যাঁ।”

“তা হলে তুমি ওকে নিশ্চিত জানো।”

“হ্যাঁ। আমরা সমবয়সী। তারপর বিয়ে হল। চলে গেলাম দক্ষিণে। সেখানে চল্লিশ বছর কেটে গেছে।”

“তোমার নাম কি বৃদ্ধী-মা?”

“লিলি।”

“স্বামী বেঁচে আছে?”

“না। অনেক আগেই গত।”

“ছেলে-পিলে কীট?”

“তেরোটি।” বৃদ্ধীর কণ্ঠে এমন একটা উদাসীনতা ছিল যে আমার তখুনি মনে হল বৃদ্ধীর নাতিভাতনীর সংখ্যা হয়ত ষাট পেরিয়ে গেছে।

আমি বললাম, “বিশ্ব সংসারে কত আশ্চর্য কাণ্ডই না ঘটে। ও বড় নিঃসঙ্গ ছিল।”

বৃদ্ধী আমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে এল। আশাই করিনি বৃদ্ধী আমার কথার উত্তর দেবে। আবার ঝড় দেখা দিয়েছে। আমি তাই তাড়াতাড়ি ওকে এড়াতে চাইলাম। টুপিটা খুলে আমি বললাম, “আচ্ছা চল বৃদ্ধী-মা।”

সুন্দর ও বৃদ্ধো হাত আমার দিকে বাড়িয়ে সে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। সে বোঝেছিল বিশ্ব সংসারে একমাত্র একলা আমি তার দুঃখের অংশীদার। স্থিরভাবে বললে, “আমিও যে সারা জীবন নিঃসঙ্গ ছিলাম।”

সংসারের বাঁধ ভেঙ্গে গেল তার। দুঃখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগলো। জামায় চোখ চেপে বৃদ্ধী-মুখ ফেরাল।

নেবুচেদানজার নেবুচেদানজারসনের কথাটা খুবই সত্য। সে মাত্র একটা রাত কবরখানায় কাটিয়েছিল। আর এখানেই আমার গল্পের শেষ। অনুবাদঃ রাম বন্দ্য।

হ্যালন্ডের ল্যান্সনেশ আইসল্যান্ডের রেইকজাভিক জন্মগ্রহণ করেন ১৯০২ সালে। ল্যান্সনেশ প্রথম জীবনে সঙ্গীতচর্চা করেন এবং পরিবারের ইচ্ছা ছিল তাকে সঙ্গীতকার হিসাবে গড়ে তোলার। কিন্তু খোল বছর বয়সে ইনি পিয়ানো শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যচর্চা করতে আরম্ভ করেন। তার উপন্যাস স্বদেশ-বিদেশে প্রচুর সন্ধ্যাতির্জন্ম করে এবং ১৯৫৬ সালে Islandsklukkan নামক তিন খণ্ডের ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্য একে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুবাদক।

কলকাতার শিল্প মেলা বজ্র মেন

স্বপ্ন স্রোতের প্রান্তে ইলেকট্রিক
বাল্বের থোকা থোকা নকল ফলেব
রোশানাইয়ে ফলন্ত কয়েকটি গাছ উজ্জল
বর্ণালীর ইন্দ্রজাল রচনা করেছে
হুন্ডপটির চারধারে,—চিনতে ভুল হয় না
শিল্পমেলাকে। দূর থেকেই চেনা যায়
জ্বলন্ত নিয়ন-চক্ষু জায়াস্ট হুইল—
মেরী-গো-রাউন্ড, আলোক-মালার চক্ৰ
শিশু ও কিশোরদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে
উৎসবের। ফটক দিয়ে ঢুকেই ডানহাতে
ফুট্কার দোকান; তেতুলজলে ভর্তি
ফুলকো গোল গোল ফুট্কার প্রাণহরা
স্বাদ, বলিহারি দিল্লীকা চাটু, চেয়ারে পা
তুলে দিয়ে আঙা মারার মত রেস্টোরাঁ।
আলোয় আলোয় রঙীন ফোয়ারার
ফুলবুদ্বির, ছেলে-পিলেদের মনকাড়া
ন্যাজিক, সাইকেল-চড়া, দু'এক বাজি
বন্দুক-ছোড়া নির্দোষ জুয়া-মেলা।
সুঁতাই জম-জমাট মেলা!! মধ্য অভিপ্রায়
হয়তো পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সমৃদ্ধি
সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে
তোলা, সকলকে এই ফাঁকে একটু শিখিয়ে
নেওয়া; কিন্তু তা' নেহাৎ গরুদমশাইয়ের
মত নয়, বন্দুর মত মনোভাব নিয়ে।
এ ধরনের উৎসবের সঙ্গ আমাদের সার
আছে, মেলার সমস্ত উদ্দেশ্যকে
এ উপায়েই সহজ ও হৃদয়গ্রাহ্য করে
তোলা যায়।

কলকাতা শিল্পমেলা সর্বপ্রথম অনু-
ষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে।
সেই সাফল্যসম্পন্ন শিল্পমেলা দ্বিতীয়-
বার অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই বছর। জন-
প্রিয়তার জন্যে শিল্পমেলাকে মার্চ মাসের
মাক্যামাঝ অবধি রাখার আয়োজন
হয়েছে। এই বৎসর বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্ল-
চন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিকী। পশ্চিম-
বঙ্গের শিল্পসমৃদ্ধির ভাবনা যার
আজীবনের শিরঃপাইডাম্বরূপ ছিল,
তারই সশ্রদ্ধ স্মৃতির উদ্দেশে এই শিল্প-
মেলা নির্বোধিত। বহুসংখ্যক শিল্প-
প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র
পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বলে, পশ্চিম-
বঙ্গকে ভারতের অগ্রগামী শিল্পকেন্দ্র
বলেও অভিহিত হয় না। ছোটোখাটো
কুটির-শিল্প ও নাতিবৃহৎ শিল্পের
ক্রমবিকাশের পরিচয় দিয়ে জনসাধারণকে
উৎসাহিত করার জন্যে মাঝে মাঝে এরকম
শিল্পমেলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

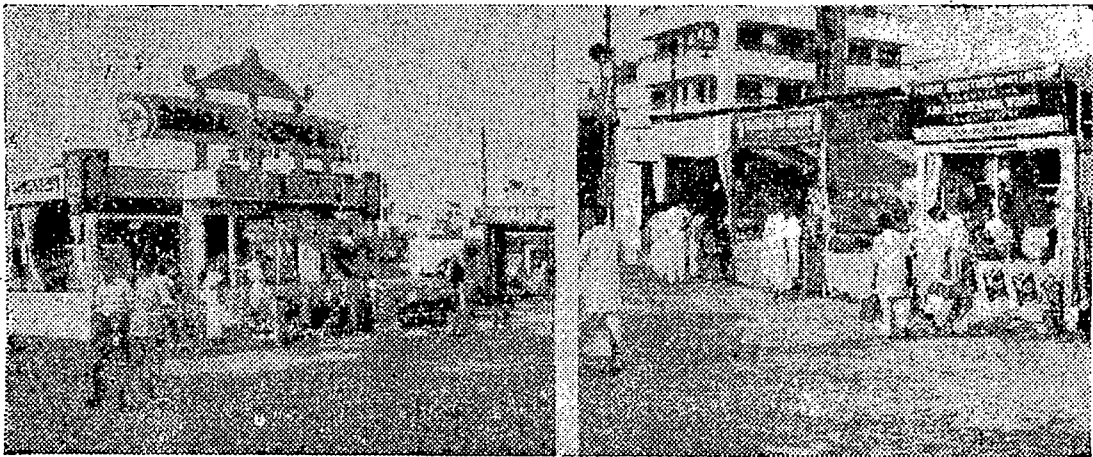
তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের
জন্য প্রাদেশিক সরকার কি কি উপায়
অবলম্বন করেছেন, বিভিন্ন শিল্প-প্রতি-
ষ্ঠানকে বিকাশের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য
কেন্‌ ফোন সুবিধা দিয়ে সরকারী তরফ
থেকে সাহায্য করা হচ্ছে ও ভবিষ্যতে
সাহায্য করা যেতে পারে—সে সমস্ত

প্রশ্নেরও জবাব মিলতে পারে এই
প্রদর্শনীগুলি খুঁটিয়ে দেখলে।

তাই এ-প্রদর্শনীর মারফৎ যেমন
ছোটো-বড়ো-মাক্যার শিল্পসংস্থাগুলির
শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্রমবিকাশ ও বৈচিত্র্য
সম্বন্ধে বোধ জন্মানোর সঙ্গ সঙ্গ
কারজীবী, ব্যবসায়ী ও ক্রেতার মধ্যে
আদান-প্রদান সুগম ও সহজ হয়ে ওঠে,
তেমনি যারা এ-ধরনের ব্যবসা শুরুর
করতে চান তারাও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি
অবগত হতে পারেন। কাজে নামার আগে
সরকারী তরফ থেকে কীভাবে সাহায্য
পাওয়া সম্ভব—বিভিন্ন শিল্পসংস্থার
প্যাভেলিয়ান দেখলে তাও সহজবোধ্য
হবে।

প্রদর্শনীতে ঔষধ, নিত্যপ্রয়োজনীয়
রসায়নজাত দ্রব্য এবং শৌখিন দ্রব্য-
সামগ্রীর স্টলগুলি, বেঙ্গল কেমিকেল,
ক্যালকাটা কেমিকেল, টমকো এবং
নতুনদের মধ্যে মীরা কেমিকেলের মত
প্রতিষ্ঠান সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন।
জেসপ কোম্পানীর যন্ত্রপাতি, জর
ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উষা মেশিন, পাখা,
ইন্ডিয়া সাইকেল ইন্ডাস্ট্রির সাইকেল,
ফিলিপ্স-এর রেডিও ও কিরণ ল্যাম্পের
দেশী-বিদেশী স্টলগুলি পাশাপাশি
সহাবস্থান করছে।

এছাড়াও কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং ও নাগ
এন্টারপ্রাইজের ভারী শিল্পজাত যন্ত্র-
পাতি, 'কলিঙ্গে'র টিউব, মেসার্স কার্টার-
পুলার কোম্পানীর ট্রাক্টর, পশ্চিমবঙ্গ
শিল্পাধিকারের আসল নীলাম্বরী শাড়ী
ও ঢাকাই মসলিনের নমুনা, গ্রামোফোন
ভবনের কুটির-শিল্প, বাঁকুড়ার ঘোড়া ও
পোড়ামাটির পতুলের এমন অপূর্ণ





সম্মেলনসাধন ইতোপূর্বে কোনো মেলায় হয়েছে বলে মনে হয় না।

ক্রেতাদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ঘর-সাজানোর শৌখীন দ্রব্যাদি, ঘোড়া-পতুল প্রভৃতিই তাঁরা কেনা-কাটা করছেন, কেউ কিনছেন শাড়ী কেউবা বড়জোর বেঙ্গল। এনামেলের হালকা বাসন-পত্র কিনছেন। ফিলিপসের দোকানেও ভিড় হচ্ছে রুচিসম্মত গহের মডেল দেখবার জন্যে। ভারী শিল্পের মন্ত্রপাতির স্টলের প্রতি অনেকেই সম্ভ্রম-পূর্ণ দৃষ্টিপাত করেই ফ্রান্ত হচ্ছেন। এই সব জিনিসের কেনা-কাটার প্রশস্ত ক্ষেত্রেও এটা অবশ্য নয়। তার চেয়ে হালকা টয়লেট বাস্তু সংগ্রহ করা অনেক যুক্তিযুক্ত।

মহিলারা অগ্রণী হয়ে এখানে অনেক স্টল দখল করেছেন সেটা সন্দের বিষয়। কেউ দিয়েছেন উদ্ভাস্ত মহিলাদের হাতে-তৈরী পোশাক-আশাকের দোকান, কেউ চামড়ার ও সিল্কের তৈরী হাতব্যাগ, কেউবা খাবারের দোকান, কেউ আর কিছ্।

ওয়াই-ডারু-সি-এ, সুদীক্ষণা, সরোজ-নলিনী নারী কল্যাণ সমিতি, ভারতীয় নারী মঙ্গল সমিতি, শ্রীমিনেতন সকলেই নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন। এই দেখে আশ্চর্য হওয়া যায় যে জাতীয় অর্থনীতিতে মেয়েরাও নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন।

এই মেলায় সংস্কৃতি শাখাটি খুবই সমৃদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য। যুগপদ্রুপ বিবেকানন্দ ও বিজ্ঞানাচার্য সমাজসেবী প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনায়ন পতুল ও চিত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ রূপায়ণ করায় মেলাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর মানব-প্রেমের মধ্যে খুঁজে পেয়ে ত্যাগব্রতের পরিবর্তে সেবামর্মে ভারত-বাসীকে দীক্ষিত করে গেছেন—তার পরিচয় এই জীবনায়নে পরিষ্কৃত হয়েছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনা ও স্বদেশবাসীর সেবামর্মে দীক্ষিত জীবনী ও চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে রূপায়িত করা হয়েছে। বিজ্ঞানাচার্যের কর্মবহুল জীবনের মূল ঘটনাগুলির পরিচয়, ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বাংলার দেশপ্রেমিক সমস্ত মনীষীদের আবক্ষ প্রতিকৃতি এই মণ্ডপের মধ্যে রাখা হয়েছে। তাছাড়া গত একশো বছরে ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কয়েকটি পরিচিতি চিত্র ও লিখনের মাধ্যমে ও একটি অঙ্কিত বৃহৎ মানচিত্রে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে। কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং মডেলও দেখা যাবে। দুটি শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উপায়ই সৃষ্টি ও রুচিসম্মত।

মাটির পতুলের সাহায্যে কুকলীলা আরো একটি দ্রষ্টব্য।

ভারত সরকারের ফিল্ড পাবলিসিটি অডিটোরিয়ামে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত রবীন্দ্রনাথ এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন জগদীশচন্দ্র বসু ও অন্যান্য ডকুমেন্টারী আলোকচিত্র দেখানো হয়েছে। ভারতীয় শিল্পের ক্রমবিস্তারিত মূলক একটি ডকুমেন্টারী ছায়াচিত্রও মেলায় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে দেখানো হয়েছে। জাতীয় নাট্যশালা যার আজীবনের স্বপ্ন ছিল সেই নাট্যগতপ্রাণ শিশিরকুমারের মৃত্যুর উদ্দেশে নিবেদিত 'প্রীরংগম' নামে একটি অভিনয়মঞ্চ নির্মিত হয়েছে এখানে। এই মঞ্চে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য থেকে উদ্ভূত নাট্যসংস্থার অনেক নাটকের অভিনয় হয়েছে ও হবে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, আর্ট সেন্টার অব দি ওরিয়েন্টের 'দাদুর দস্তানা', স্বপনবুড়ো পরিচালিত পাততাড়ির 'ফুলপরা', থিয়েটার কর্ণারের 'এরিনও দিন আসতে পারে' এবং স্বাধীনদ্রুপ-এর নাম এ উপলক্ষে মনে পড়ে।

মেলায় সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় পতুল-নাচ। জননগরের স্বর্ণীর্ণ কালী-কৃষ্ণ হালদারের টক পতুল নাচ পার্টির 'হরিশচন্দ্র' পালা আমাদের অভিভূত করেছে। পতুলের সাহায্যে সম্পূর্ণ একটি পালা অভিনয়, এবং সেই অভিনয়েও এরা উপযুক্ত দৃশ্যসজ্জা নাটকীয় নৈপুণ্য এবং পরিবেশের উপযোগী নাচ ও গানে জীবন্ত করে তুলেছেন। বিশেষ করে মৃত রোহিতাম্বকে কাঁধে নিয়ে শোকাবর্তী শৈব্যার প্রবেশ—শুদ্ধ পতুলের সাহায্যে সর্বপ্রকার কৃত্রিমতার বিহীন এই অভিনয়-সাফল্য দেখেই বুঝতে পারা যায় যে, তাঁদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে। মেলায় আরো নতুন নতুন আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তরুণ অপেরা পার্টি, নাট্য কোম্পানী প্রভৃতির যাত্রাভিনয় এবং 'টোলিভিশন শো' নবতম সংযোজন।

সর্বশেষে উল্লেখ করি যে, শিশুদের উপযোগী নানান আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করে মেলায় কতৃপক্ষ দূর-দর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন। রঙীন ফোয়ারার চারধারে, সবুজ ঘাসের উপরে শিশুদের হৈ-হল্লা না থাকলে উৎসব জন্মে না! ছেলেরদের জন্যে নাগর-দোলা, সাইকেল চড়া, ম্যাজিক ও মিনি-য়েচার জু' স্থাপনের জন্যে শিল্পমেলা সফল হয়েছে। মেলা, মার্চ মাসের মাঝামাঝি কাল অবধি থাকবে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে নিয়ন-চক্ষু জয়ান্ট হুইলের ঘর্ষ শব্দে মেলা প্রাণপ্রিয় মূর্খিত হতে থাকে।

পেটের পীড়ায়

“এন্টাফ্রন” একটি বিশ্বকর ঔষধ। ইহা ব্যবহারে পাকায়িক দোষ, অম, অজীর্ণ, পুরাতন আমাশয়, তরল শ্বাস্ত্র, পেট বেগনা, শিশুদের রিকটস প্রভৃতি দ্রুত আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩ টাকা। বাস্তব পৃথক।

হার্ণিয়া (অস্ত্র বন্ধি)

বিনা স্তরে বাস্তব ঔষধ-জ্ঞান অস্ত্রবন্ধি ও কাম্বন্ধি হার্নিয়া আরোগ্য হয়। ১৪ আর পুনরাক্রমণ হয় না। কাম্বন্ধির নিষ্পত্তি ১৪ পর লিথিয়া নিয়মাবলী ক্রম।

হিন্দু রিসার্চ সোসাইটি

১০, নীলরতন সুধাক্ষী রোড, শিবপুর হাওড়া। ফোন : ৬৭-২২৫৫



(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

‘সজনের শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা, আমাকে খবর হয় টানাটানির বেলা!’ একমুখ বিদ্রূপের হাসি নিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে দ্যাওরের ঘরে এসে হানা দেন মায়ালতা।

কলকাতায় এসে পর্যন্ত মায়ালতা অশনে-বসনে চলনে-বলনে অনেক শহুরে হয়ে উঠেছেন, কিন্তু ব্যাং-বিদ্রূপের ক্ষেত্রে ছড়া কাটতে, প্রবাদবচন আওড়াতে, তিনি পরোপদ্রি তাঁর গ্রাম্য পিসশাশুড়ীর সুযোগ্য ছাত্রী।

সুমোহনের শোনা অভ্যাস আছে, তাই অগ্রাহ্যভরে বলে ওঠে, ‘হঠাৎ আবার কার কি খুঁজে খুঁজে পোলে?’

‘খুঁজে?’

‘ওই আর কি দোষ কি দুর্বলতা। নইলে ছড়া কাটতে বসবে কেন।’

‘হুঁ আমার ছড়া কাটাটাই যত নিম্নের। কারণ সে যে আমি। জগতে যে যা করুক নিম্নে নেই। বলি তোমাদের স্বাধীন বিদ্যাবতী মেয়ের খবর শুনেছ? বর নিয়ে দেশে ফিরছে। কলকাতায় নয় দিল্লীর বাড়ীতে। এখন আদর অভ্যর্থনা করে জামাইকে আকাশ থেকে নামাতে, বাড়ীঘর গুঁছিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের সংসার পেতে দিতে ডাক পড়েছে সজনের শাকের!’

‘ধেন্ডারি। তোমার সজনের শাকটা কি, তাইতো বদ্বাধি না।’

আহা কিছই জানো না? পিসিমার বাকচাটরী শোনোনি কখনো। পাড়গায়ে

জন্মাণি কখনো?’ মায়ালতা মুখ বাঁকিয়ে বলেন, ‘এইগুলো দেখতে পারি না। জন্মকক্ষ যেখানে হ’ল তার সব ভুলে গিয়ে—’

সুমোহন ঠোঁট কুঁচকে হাসে, ‘তা’ তুমিও তো অনেক কিছু ভুলেছ।’

‘ভুলেছি? আমি ভুলেছি? কি ভুলেছি শুন?’

‘কেন মোচা কুটতে, কচুর শাক রাধতে, মেথির গুঁড়ো দেওয়া চিতল মাছের ‘ভাপাসিদ্ধ’ বানাতে—’

‘ভুলবো আবার কেন। ভুলিনি কিছই।’ মায়ালতা সত্যিছিলো বলেন, ‘ভূতের বেগার আর খাটব না বলে ছেড়ে দিয়েছি। কী দায় আমার দশ ঘণ্টা রান্নাঘরে পড়ে থেকে?’

‘তা’ সত্যি! ততক্ষণ বরং হাতে রটুয়া বদ্বাধিয়ে পাড়া-বেড়াতে বেরেদে দেশের দেশের উপকার!’

‘কী বললে ছোটাকুরপো! আমি রাতদিন পাড়া বেড়িয়ে বেড়াই? তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে—তোমার বৌ-ই সংসার মাথায় করে রেখেছে। কেমন?’

‘সর্বনাশ! তুমি আবার আমার কথার মধ্যে থেকে মানে আবিষ্কার করতে বসছ! তার চেয়ে বরং তোমার ওই সজনের শাকের মানেটাই বলে যাও। এত ঘটনা করে এখন আলোচনা বেরিয়েছ, অবশ্যই ব্যাপারটা গুরুতর!’

‘তোমার কাছে আবার গুরুতর! স্বয়ং গুরুতর তোমার কাছে লখ।’

সজনের শাক হচ্ছে এই, তোমরা বুঝলে? কোনও ব্যাপারে জ্যাঠাখুঁড়োর মান্য রাখলেন না মেয়ে, বিয়ে করে বসলেন আপনি আপনি, এখন অসুবিধের সমস্ত জ্যাঠাকাকা! লেখা হয়েছে ‘আপনারা যদি কেউ আসতে পারেন খুব উপকার হয়। একা অসুস্থ মানুষকে নিয়ে অসুবিধে পড়বে—আর তা’ও বলি! ইচ্ছে করে নিজের আখেরটা নিজে হাতে এমন করে খোয়ালি কি বলে? কারুর একটা পরামর্শ পর্যন্ত না নিয়ে। একেই বলে নিজের বদ্বাধিতে ফাঁকি হবো, তো পরের বদ্বাধিতে রাজা হবে না। তোর এত রূপগুণ, এত বিদ্যাবদ্বাধি, বাপের এত টাকা, তুই কোন দৃষ্টিতে একটা অন্ধকে—’

সুমোহন বাধা দিয়ে বলে, ‘থাকনা ওসব কথা! চিঠিটা কাকে লিখেছে? তোমাকে?’

‘আমাকে। হুঁ। আমায় চিঠি দেবে! কত মান্য দিচ্ছে আমায় জ্যেষ্ঠি বলে! চিঠি দিয়েছে আপন লোককেই। জ্যাঠাকে। অবিশ্যি তার মধ্যে তোমারও একটুকরো ছিল, তা আমি অতশত দেখিনি। তোমার দানার ভেবেই খাম ছিঁড়ে পড়ে ফেললাম। তোমার টুকরোতে অবিশ্যি বিশেষ কিছু নেই—’

সুমোহন আবার বাধা দেয়। ‘বৌদি, আবার তুমি পরের চিঠি খুলে পড়েছ? জানো এ অপরাধের বার্তা তোমাদের ছোটবোয়ের কানে গেলে, ফাঁসি হয়ে যেতে পারে তোমার!’

‘ছোটবোয়ের কাছে তো আমি অহৌরাতই ফাঁসির আসামী!’ মায়ালতা

মুখ বাঁকান, 'এখনো অত সাহেব হয়ে উঠিনি ছোট্টাকুরপো যে নিজের স্বামীর নামের চিঠি ও খাম না খুলে রেখে দেব। আর সমস্ত দিন কোঁতুল চেপে হাঁপরে মরবো। অবিশ্যি তোমার চিঠিতে আমার অধিকার নেই। কিন্তু চোখ তো আর মনের শাসন মানে না। রেখে দিতে দিতেই পড়া হয়ে যায়। এই নাও।' চিঠিটা বাড়িয়ে দেন মায়ালতা, 'নাও এখন কে দিল্লীতে যাবে যাও জামাই বরণ করতে!'

'আমার স্মারা ওসব হবে টবে না।' বলে চিঠিটা চোখ বুলিয়ে ফেলে দেয় সুমোহন।

'হবে না তা' জানি। সংসারের সকল কতবোয়র দায় তো ওই বড়োর! কিন্তু এও বালি ছোট্টাকুরপো, রাতদিন তো বিছানায় পড়ে গড়গড়ি দিচ্ছ, একটু উপকারেও লাগতে হচ্ছে করে না?'

'নেভার! একটু উপকারে লেগে কোন মহৎ গৌরব?'

'তা' সবাই বুঝি সব কিছু করে খালি গৌরবের তালে?'

'তবে আবার কি?'

'আর এই যে আমি জীবনভোর তোমাদের সংসারে বেগার খেতে মলাম? কোন গৌরব পেলাম তার থেকে শুনি? অপযশ আর অগৌরবই তো জীবনের সপ্তয়।'

'ওটাও এক ধরণের দামী সপ্তয় বোদি। এই যে' রাতদিন বড়গলায় বলে বেড়াতে পাচ্ছ 'স্মারা জীবন বেগার খেতে মলাম'—এটাই কি কম লাভ?'

নিত্য নিয়মে কথার পিঠে কথা কেটে কথা ক্রমশঃ কলহে পরিণত হয়। মায়ালতা রাগ করে উঠে যান। আর ছেলের কাছ থেকে গিয়ে তাদের কাকার নিন্দে করতে থাকেন। ছেলেরা নিত্য নিয়মে বিরক্ত হয়ে বলে, 'তুমিও যেমন, তাই এখনো আবার যেতে যেতে সেধে সেধে গুর সগো কথা বলতে যাও।'

'যেতে সেধে আবার কি!' মায়ালতা অসন্তুষ্টচিত্তে আত্মদোষ স্থালন করতে বসেন। তারপর সুবিমল এলে চিঠি দেখিয়ে কথা পাড়েন, 'যাকনা, ছোট্টবোকে নিয়েই ছোট্টাকুরপো কিছুদিন দিল্লী ঘুরে আসুক না।' একমুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার বলেন, 'আর ঘুরে আসাই বা কেন, রাজধানী জায়গা, চেষ্টা-বেষ্টা করে যেমন-তেমন একটা কাজ জুটিয়ে

নিয়ে সেখানে থেকে যেতেই বা বাধা কি ছোট্টাকুরপোর? ভাইবির একটা অভিভাবকও হবে। তা'ছাড়া—মেজ-ঠাকুরপোও কিছুর চিরদিন সুচিন্তার বাড়ীর প্রজা হয়ে থাকবে না। মেয়ে এলে যাবে তো দিল্লী? ছোট্টবো সেখানে থাকলে দেখাশোনা তদারকী—'

সুবিমল এতক্ষণ স্ত্রীর আনন্দোন্মাদাসিত মুখের দিকে এক লক্ষ্যে তাকিয়ে সবটা বলে যেতে দিচ্ছিলেন। শেষটায় বাধা দিলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'জগৎ-সংসারের সমস্ত মানুষ-গুলো যদি তোমার হিসেবের অঙ্কে চলাফেরা করতো, সংসারে সমস্যা বলে আর কিছু থাকতো না তাহলে। আহা—সমস্যার কী সুন্দর আর কী নিভুল সমাধান!'

মায়ালতা যথারীতি রেগে উঠে বললেন, 'ভুলটাই বা কি হল বোঝাও আমার? ছোট্টাকুরপোর এখানে কী রাজ-কার্য আছে? এক দাদার অন্ন ধ্বংস হচ্ছে, না হয় আর এক দাদার, অন্ন ধ্বংসাবে। ছোট্টবো এক ভাসুরের সেবা-যত্ন করে সুয়ো হচ্ছে, না হয় আর এক ভাসুরের কাছে সুয়ো হবে, হিসেবে দোষ কোথায়? বরণ সে বেচারার পাগল-ছাগল হয়ে গেছে—'

'থামো চূপ করো।' বলে কথা থামাতে চেষ্টা করেন সুবিমল, কিন্তু মায়ালতা জীবনেও এত সহজে থামেনি থামলেনও না। বললেন, 'ধমকে চূপ করিয়েই তো রাখলে চিরদিন। দু'দিন একটু গা হালকা করে নিশ্বাস ফেলে বাঁচবো, এত সুখ কি আমার হবে? কেন, ছোট্টকর্তা দিল্লী গিয়ে থাকলে কি হয়? তা' তো হবে না। তিনি একেবারে ঝাড়া জবাব দিয়ে বসে আছেন, তাঁর স্মারা এসব হবে না।'

সুবিমল বলেন, 'তার সঙ্গে তা'হলে অলরেডি কথা হয়ে গেছে তোমার। ভাল ভাল।'

'অন্যায় হয়েছে।' মায়ালতা ক্ষুব্ধ বিরক্তিতে বলেন, 'মাঝে মাঝে ভুলক্রমে মনে করে বসি কিনা আমি বুঝি বাড়ীর গিন্নী। যাক আর তোমাদের কথায় আমি নেই; যা হচ্ছে করগে।'

রীতিমাতিক উঠে যান মায়ালতা। সুবিমল ডেকে পাঠান সুমোহনকে, এবং বিনা ভূমিকায় বলেন, নীতার চিঠিটা পড়েছ বোধহয়? তারিখ হিসেবে কালই রওনা দেওয়া দরকার। আমার তো

এখন না মরলে কলকাতা ছাড়বার জো নেই, কাজেই তুমিই প্রস্তুত হও।'

আপাত্তর কোন ফাঁক রাখলেন না সুবিমল।

'যাবে দিল্লী?'

সুমোহন স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষপাত করে।

অশোকা মৃদু ভুলে বলে, 'আমি?'

'তাই বলছি। মনে হচ্ছে দূর ছাই একবার সাধুভাষায় কি বলে যেন, ভাগ্যান্বেষণে না কি। তাই গেলে হয়। আমার মত মহাপুরুষেরও হঠাৎ যেন আরাম-কণ্টকী ধরছে।'

অশোকা ঈষৎ হেসে বলে, 'লক্ষণ ভাল নয়।'

'তাই দেখছি। চলো না চলেই যাই।'

সুমোহন এ ধরণের কথা কখনো বলে না। অশোকা হয়তো একটু অবাক হয়। বলে, 'আমি কোথায় যাবো?'

'কেন দিল্লীতে।'

'নীতার বাড়ী।'

'বাড়ীটা নীতার নয়, মেজদার।'

'তিনি আর তো সেখানে থাকেন না।'

'আমরা গিয়ে থাকলে, তিনি থাকতে পারেন। অথাৎ তুমি নীতার সাহায্যে লাগলে—'

অশোকা মৃদু হাস্য বলে, 'বুদ্ধ্যিটা বা ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ তোমার মৌলিক বলে মনে হচ্ছে না তো—'

'কেন এটুকু বুদ্ধ্যিও আমার থাকতে নেই?'

নেই একথা কে বলেছে?'

সুমোহন উঠে বসে বলে, 'সত্যি আর এ জীবনটা ভাল লাগছে না।'

অশোকা একটু চূপ করে থেকে বলে, 'এ লক্ষণটা শুন কি অশুভ তাই ভাবছি।'

'মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো, তুমি যদি এমন বরফ শীতল না হতে, হয়তো আমি এমন দারুভূতা জগন্নাথ হ'তাম না।'

'ওই ভাবেই লোকে আত্মসংশয় খোঁজে।'

'তা হবে।' বলে একটু পরে বলে

সুমোহন 'যাক আমার কাল যেতে হচ্ছে জানো আশাকারি!'

অশোকা ঘাড় নেড়ে জানায় জানে।

'সকালে একবার সূচিন্তা দেবীর বাড়ী যাবো ভাবছি।'

অশোকা উত্তর দেয় না।

সুমোহন আবার বলে, 'কই কিছু বললে না?'

'বলবার কিছু আছে, বুঝতে পারিনি।'

'ধরো বলতে পারতে, 'আমিও যাবো।'

'কী জন্যে?'

'এমনি। তুমি তো সূচিন্তাকে খুব ভক্তি করো।'

'ভক্তি কার একথা তোমায় কে বললো?'

'এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি আছে।'

'তা' হলে এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধিও থাকা উচিত, বারের বারের যাওয়াটা শোভন কিনা।'

'বাঃ, এর আবার অশোভন কি? সেখানে আমাদের নিজের লোক রয়েছে—'

'মানে যে নিজের লোক তোমাদের সংগ পরিহার করতেই ওই নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন।'

'ওটা তোমার ভুল ধারণা। আশ্রয় নেবার কারণ অন্য।'

'অন্যের কাজের কারণ আবিষ্কার করতে বসলে ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশী। বরং কাল যদি যাও তো মেজদার 'স্যাণ্ডো' 'গুন্ডা'কে নিয়ে যেও, 'উনি সেদিন ওদের জন্যে চণ্ডল হয়েছিলেন।'

স্বভাব-বহির্ভূত অনেক বেশী কথা বলে অশোকা।

বলে, হয়তো আজ সুমোহনের মানসিক আলোড়ন ওকেও নাড়া দিয়েছে বলে। কত কত দিন আগে কবে যেন অশোকাই না বলেছিল, 'চলো না আমরা কোথাও চলে যাই।'

হ্যাঁ, একদিন এই দুর্বলতা প্রকাশ করে বসেছিল অশোকা। কিন্তু সুমোহন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সে কথা। বলেছিল 'ফেরাপনি তো!' বলেছিল 'সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে—স্বীকৃতি প্রলয়ঙ্করী।' একথাও বলেছিল, 'তার মানে এই চাও তুমি, আমার হালটা হাড়ির হাল - হোক। স্বাধীনতার দায়

গলায় বুলিয়ে অস্ত্রের ধান্দায় ঘুরে বেড়াই। হুঃ! ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে—বুঝলে? কেন বড়-গিন্নীর তাঁবে থাকতে আর বুদ্ধি মন সরছে না? নিজের সংসারে গিন্নী হয়ে বসতে বাসনা।'

তারপর আর কোন দিন অশোকা কোন দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেনি।

আজ সুমোহন প্রকাশ করল।

কিন্তু অশোকা হেসে তাকে নস্যাক্ত করল না। বরং সুমোহন শেষ আর

পৃথিবীটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকেছে। তখন নরম গলায় বলল, 'কতদিন আর?'

'কে বলতে পারে কতদিন!' সুমোহন ক্ষুব্ধহাস্যে বলে, 'ভাবছি আমার দ্বারা 'উপার্জন' নামক তুচ্ছ কাজটা আদৌ অসম্ভব কিনা, সত্যিই একবার পরীক্ষা করে দেখবো।'

একথাই অশোকা হেসে ওঠে।

হেসে বলে, 'বেশ তো যদি দেখ অসম্ভব হচ্ছে না, তখন খবর দিও উপার্জনে ভাগ বসাতে যাবো।'



অন্যের কাজের কারণ আবিষ্কার করতে বসলে ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশী একবার যখন বলল, 'দেখ তোমার ওই সংস্কৃতির মান্দারমশাইয়ের মত তেলা-গোলা গম্ভীর মুখখানা সর্বদা চোখের সামনে দেখা এত অভ্যাস হয়ে গেছে যে কিছুদিন আর দেখতে পাব না মনে করে।'

'মোটকথা কাল আমার সঙ্গে যাচ্ছ না?'

'কি যে বল! মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে যেতে আছে?'

সুমোহন হঠাৎ ভারী গম্ভীর হয়ে যায়।

আর শূন্যে পড়ে পানোচার না।
চূপচাপ বসে থাকে দেয়ালের দিকে চেয়ে।

তারপর সূচিন্তার বাড়ী যাবার
তোড়জোড় করে। মূল খবর তো
ওইখানেই।

ওঁদিকে সেদিন এ বাড়ীতে এসেছেন
কৃষ্ণার মা আর বড় মাসী।

মাসী দু'দে মেয়ে, আর অশ্রুশ্রব্দে
সম্ভজত হয়েই এসেছেন। কিন্তু প্রথমটা
থতমত খেলেন সূচিন্তার শান্ত নম্র আর
বিনীত মূর্তি দেখে। বোনের কাছে
পাওয়া রিপোর্ট থেকে তাঁর ধারণা অন্য
রকম ছিল। তবু সূচিন্তা যখন নমস্কার
করে বসতে অনুরোধ করলেন, তখন হুল
একটু না ফুটিয়ে ছাড়লেন না তিনি।
বললেন, 'বেয়ানের তো শুনোই বাড়ীতে
মানুষজন এলে 'এসো বোসো' করবার
অভ্যাস নেই।'

সূচিন্তা মৃদু কৌতুকের হাসি হেসে
বললেন, 'শোনা কথায় কি বিশ্বাস করতে
আছে? কত ভুল খবর কানে এসে
ঢোকে। পাড়া-পড়শীর কাজই তো নিল্দে
রটিয়ে বেড়ানো।'

কৃষ্ণার মার আর যতই বৃদ্ধি থাক,
সুক্ষ্ম পরিহাস বোঝার মত বৃদ্ধিটার
অভাব, তাই তিনি রেগে উঠে বলেন,
'পাড়া-পড়শীর সময় এত সস্তা নয় যে
অকারণ আপনার নিল্দে করে বেড়াবে।
অজ্ঞ দেখছি বেড়ালের ভাগ্যে শিকে
ছিঁড়েছে। নইলে নিজের ছেলে বো তো
এসে খলো পায়ে ফিরে গেছে।'

সূচিন্তার মুখে থেকে সেই কৌতুকের
হাসিটুকু অন্তর্হিত হয়, তিনি মৃদু
গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, 'ছেলে বো তো
কুটুম নয় ভাই, ঘরের লোক। তারা যদি
ভুল করে নিজেদের কুটুম বলে মনে করে,
সেটা ভুলই।'

মাসী ছোটবোনের অনুরোধে হাল
ধরতে এসেছেন, কাজেই ডিউটি পালন
করতে হালটা ধরেন। বলেন, 'তা নতুন
বো তো এসেই আপনার ঘরে হাঁড়ি নেড়ে
ভাত বেড়ে থাকে না বেয়ান, নতুন বো
কুটুমেরই সামিল। তা' ছাড়া বো বরণ
করে ঘরে তোলারও তো একটা রীতি
আমাদের বাঙালী বাড়ীতে আছে।
বেয়ানের বৃদ্ধি সেটা জানা নেই?'

সূচিন্তা সহসা হেসে উঠলেন।
বললেন, 'এখনো ওসব সেকলে রীতি-
নীতি আপনি মনে রেখেছেন? আশ্চর্য
তো!'

মাসী ভারী মূখে বলেন, 'তা'
আমরা তো আপনার মতন এতটা
আধুনিক হতে পারিনি বেয়ান। যেকালে
জন্মেছি সেই কালের মতনই আছি।'

সূচিন্তা বলেন, 'কী মৃদুস্কিল,
'জাছি' বললেই কি থাকা যায়, না
থাকতে পাওয়া যায়? 'কাল' যে নিজের
বেগে ছুটেছে, তার সঙ্গে তাল রাখতে
হবে তো?'

'জানি না ভাই ওসব সাধুভাষা।
আমরা 'কাল'ও বৃদ্ধি না, 'তাল'ও বৃদ্ধি
নয় বৃদ্ধি শূন্য চাল। চালচলনটা
মানুষের মত হওয়া দরকার। এই যে
আপনি কোথাকার কে এক পরের জন্যে
ঘর ভাসাচ্ছেন, এটা কি মানুষ মনিষ্য?'

সূচিন্তা একবার বোধকরি ভাবেন
আর কথা বলবেন না, আর কথা
বাড়াবেন না, কিন্তু দু'দটো মানুষের
সামনে চূপ করে বসে থাকাও যেমন শক্ত,
সামনে থেকে উঠে যাওয়াও তেমন শক্ত।
তাই তেমন হাসিমুখে বলেন, 'আপন
পরের' ব্যাখ্যা বড় গোলমালে দিদি, ওটা
আবার সত্যি পরকে আদর্শেই বোঝানো
যায় না।'

'ওঃ তা বুটে। তা' হলে লোকনির্ল্দে
আপনার কাছে কিছই নয়?'

'কিছই নয় একথা কি করে বলি
বলুন?' সূচিন্তা বলেন, অনেক কিছই।
কিন্তু জগতে আরও তো কিছু থাকতে
পারে?'

'সেই কিছটা আমাদের পক্ষে বোঝা
বড় শক্ত বেয়ান। লোকনির্ল্দের স্বরং
রামচন্দ্র টলোঁছিলেন। অবিশ্য আপনার
রুচি-প্রবৃত্তিতে যা আসবে, তা আপনি
করবেন। তবে আমরা মেয়ে দিয়েছি,
তাই—'

সূচিন্তা বাধা দিলেন। দু'চক্ষুরে
বললেন, 'এইখানটায় একটু ভুল
করছেন। মেয়ে দেননি আপনার।'

'তা' দিলেই বা নিচ্ছে কে? কৃষ্ণার
মা স্কোপে বলেন, 'আমার যেমন বৃদ্ধি,
তাই আবার আসি অপমান হতে। মেয়েও
যে আমার তেমননি, আমার যথাসর্বস্বই
তার, তিনতলা বাড়ী হাঁ হাঁ করছে, তবু
কিনা বিয়ে হয়েছে শব্দরবাড়ী
থাকবো।' ওই মেয়ের জন্যেই 'সর্বদিক
দিয়ে মৃদু যা হে'ট হবার তা' হল। চল
দিদি চল।'

সূচিন্তা বলেন, 'কুটুমকে আদর
আপ্যায়ন করি, এ ভাগ্য হ'ল না। উঠে
যেতে চাইলে একথা বলতে সাহস হবে
না, 'বসুন, একটু চা খান।' মৃদু হে'ট যা
হবার ছেলেমেয়ের স্মারাই হয় একথা
সত্যি। নইলে আপনারদের—কিন্তু যাক
সে কথা। তবে এইটুকু শুনুন, রাখুন,
বানানো কথা নয়, সত্যি কথাই, আমার
ইন্দুর বো যে শব্দরবাড়ী থাকতে চায়
এ শুনুন প্রাণ থেকেই আনন্দ হচ্ছে। তার
জন্মে তার ঘর সব সময় খোলা থাকবে।'

মাসী বিষভিত্ত স্বরে বলে ওঠেন,
'দোরগোড়ায় পাহাড় বসিয়ে রেখে দোর
থলে রাখায় আর লাভ কি বলুন?
বাড়ীতে এক পাগল পোষা, এখানে
থাকবে কি করে সে?'

'তা' হলে আর কি উপায়?'
মাসী বলেন, 'তা' বৃদ্ধি।
নিরুপায়। কৃষ্ণা যা বলেছে, ঠিকই
বলেছে, 'কিছই বাড়ানি। দেখছি
আপনার সমস্ত পৃথিবী একদিকে, আর
ওই পাগল একদিকে। আপনাকে ধন্যবাদ
না দিয়ে পারছি না।'

সূচিন্তা হেসে বলেন, 'আমিও।'
'কি বললেন?'
'কিছ না।'

'তা' হলে বুদ্ধিলাম ওটিকে আপনি
ত্যাগ করতে পারবেন না? সবাই যায়
যাক! মাসী উঠে দাঁড়ান।

সূচিন্তাও উঠে দাঁড়িয়ে বলেন,
'এইটুকুর জন্যে সব যদি সত্যি যায়,
জানবো আমার দুর্ভাগ্য। সেই রাজার
গল্পটা জানেন তো? ধর্মের দায়ে
অলক্ষ্মী কিনে, বেচারার কী দুর্ভাগ্য।
অলক্ষ্মীর দায়ে যশ মান ভাগ্য একে একে
সবাই ত্যাগ করতে চায়—'

'বেয়ান দেখছি অনেক জানেন!'
মাসী একটু লঙ্কার স্বাদ হাসি হেসে

চিন্তাধারী ভাল বই

চালচিহ্ন

কলিকাতা গ্রন্থ

কুমারসম্ভব

অনুবাদ :: অক্ষিপদ গ্রন্থ

মহান শিক্ষানায়কদের

শিক্ষাভিজ্ঞ

স্টোরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আল্ফ্রেড হিগ্গিন্স

কলিকাতা - ১

বলেন, 'তবে সেকালের দৃষ্টান্ত যদি দেখাতে এলেন তো, বলি 'ধর্মের দায়ে' কেনা বলেই, যারা ত্যাগ করেছিল, আবার একে একে সবাই ফিরে এল। এখানে তো সে দায় দেখাচ্ছি না।'

সুচিন্তা হাসেন, 'সবাই কি সব কিছু দেখতে পায় বেয়ান, হয়তো আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন না আমি তা' পাচ্ছি।'

'বেয়ানের দেখাচ্ছি দিব্যদৃষ্টি আছে। আচ্ছা নমস্কার। আপনার কাছে এসে অনেক জ্ঞান পেলাম।' বলে বেয়ানবয় সিঁড়ি-মুখে হন। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে বাধা পান। দুটি হুঁচকুট ছোট ছেলে দৃমদাম করতে করতে সিঁড়িতে উঠছে। তার পিছনে একটি সুকান্তি ভদ্রলোক।

কে এরা। এদের বাড়ীতে তো শুনিন সাতজন্মে কোন আত্মীয়কুটুম্ব আসে না! কৌতূহলের কাছে অহংকার পরাস্ত মানে। মাসী ছোটছেলোটির হাত ধরেন। 'কি খোকা, তোমার নাম কি'

বলা বাহুল্য খোকার পক্ষে ব্যাপারটা আদৌ প্রীতিপদ হয় না। হ'বার কথাও নয়। সে প্রায় ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে গোমড়া মুখে বলে, 'শান্দু মূখার্জি। বলত না—যদি পিছনে বাবা না থাকতেন।

এই গিন্নীগলো যেন ওর দু'চক্ষের বিষ। শূদ্ধ শূদ্ধ কথা কইবার কী দরকার ছিল ওর! চেনে না কিছু না।

কিন্তু ওর মনের মধ্যে থেকে গিন্নী-দের কানে তো কথাটা এসে পৌঁছয় না। তাই মোটা গিন্নীটি সুমোহনকে না দেখার ভানে আবার প্রশ্ন করেন, 'তুমি এদের কে হও?'

'জানি না।'

ইত্যবসরে অন্য ছেলোট পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি উঠে দোতলায় চলে আসে, এবং সুমোহন ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে—'শান্দু, ও কি রকম কথা? বল ঠিক করে।'

শান্দু গম্ভীরভাবে বলে, 'আমি জানি, আমি এদের কে হই?'

'ও হো হো তা'ও তো বটে,' সুমোহন মৃদু-হেসে বলে, 'প্রশ্নটা গোল-মেলে লেগেছে। এখানে তুমি কার কাছে এসেছ সেটাই বল।'

'কার কাছে আবার—মেজজেঠাবাবুর কাছে, কে না জানে।'

জ্যাঠাবাবু।

রহস্যের সূত্র বুঝি খুঁজে পান বড়-মাসী, তাই নিজেরা সামান্য একটু এক পাশ হয়ে সুমোহনকে পথ ছেড়ে দেওয়ার ভগ্নী করে বলেন, 'ও বুঝোছি। সেই ষাঁর মাথার অসুখ, তিনি তো?'

'অসুখ।'

শান্দু মূখার্জি ষাঁর ভাল নাম, আর ডাক নাম নাকি 'ষণ্ডা গুণ্ডা ডাকাত' ইত্যাদি, সে হঠাৎ নিজের মাথাটাতেই একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলে, 'ধ্যৎ। মাথায় আবার অসুখ হয় নাকি? অসুখ তো গায়ে হয়।' বলেই সহসা ছিটকে এঁদের কবলমুক্ত হয়ে পালায়।

কিন্তু এ'রা সহজে এহেন রহস্যের মারখান থেকে সরে যেতে রাজী হন না। তাই কণ্ঠস্বরে ভব্যতার মদুতা এনে বলেন, 'আপনার ছেলে বোধহয়?'

'আর কি—তা'ছাড়া।'

'ষাঁর অসুখ, আপনি তাঁর ভাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তা' আপনারা কোথায় থাকেন?'

সুমোহন ভিতরে অবাক হলেও সৌজন্যের সঙ্গে বলে, 'আজ্ঞে শ্যাম-বাজারের দিকে।'

'ও। তা' আপনাদের বাড়ীতে বোধ-হয় জামগার অনটন?'

'কী বলছেন!'

'না বলছি উনি তো বোধহয় আপনার দাদা। আর আপনারা দেখাচ্ছি মূখার্জি। আর এ বাড়ীর এরা তো মিস্ত্রি, মানে আমাদের কুটুম্ব কিনা, জানি সব। এ'রা তা'হলে কি? বাড়ীওয়ালা?'

সুমোহন গম্ভীর হয়ে যায়। গম্ভীর সৌজন্যে বলে, 'আপনারা এঁদের কুটুম্ব বললেন, অথচ এঁদের বিষয় কিছু জানেন না?'

'না, তেমন জানি না। ভেবেছিলাম তিন কুলে কেউ নেই অসহায় পাগল মানুষটাকে দয়াধর্মের খাতিরে বাড়ীতে জামগা দিয়েছে। ওমা! কে জানে এমন সব ভাই রয়েছেন। তাই ষাঁর ভবে বোধহয় ভাড়াটে।'

'না ইনি, মানে বাড়ীর মালিক ভদ্র-মহিলা একেবারে আমাদের আত্মীয়ের মতই—'

'তা' বুঝোছি।' মাসী কণ্ঠে মধু ঢেলে বলেন, 'নইলে আর পাগল ভাইকে এ'র কাছে ফেলে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্দে আছেন আপনারা। তবে মুশকিল কি এদের ঘরের বোঁ ঘর করতে আসতে পারছে না পাগলের ভয়ে। আমাদেরই মেয়ে, আমরা এ'র ছেলের শাশুড়ী আর মাসশাশুড়ী।' বলে সুমোহনকে 'থ' করে দাঁড় করিয়ে রেখে দুই ভাগনী নীচে নেমে যান।

কিছুক্ষণ ওঁদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে সুমোহন উঠে এসেই দেখে ঘরের মধ্যে মহোৎসবধ্বনি। ছেলেরা কলকাকলী শব্দ করে দিয়েছে আর সুশোভন মহা স্ফুর্তিতে হৈ হৈ করছেন 'গুণ্ডা ষণ্ডা ডাকাত বিচ্ছন্ন, বিষ্ট বিষ্ট, শান্দু শান্দু! কী? মনে নেই? সব কিছু মনে নেই? আবার বলে কিনা ওদের নাম মনে আছে?' ওদের নাম মনে থাকবে না? বলে কি!'

(ক্রমশঃ)

জীব বিজ্ঞান — সমাজ বিজ্ঞান —

মনোবিজ্ঞানের দ্বৈমাসিক পত্র

মানব-মন

পাভলভ ইনস্টিটিউট

১৩২।১এ, কণ্ঠওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৪

রূপান্তরী অভিনীত নাটক

জোছন দস্তদারের

বিংশোত্তরা

(আড়াই টাকা)

সৌরীন সেনের আশ্চর্য উপন্যাস

সায়লা গোখুরী

(তিন টাকা)

প্রাপ্তিস্থান—

ডি, এম, লাইব্রেরী

৪২, কণ্ঠওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক—

ধারাবাহিক

২৯।১, পাণ্ডিত্য রোড, কলি-২৯

এ, সি, আর-২২

॥ অম্বিকা চক্রবর্তী ॥

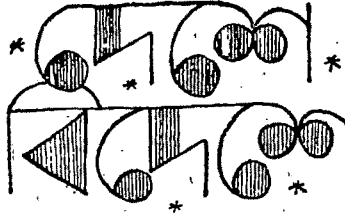
চট্টগ্রাম অষ্টাগার লুণ্ঠনের অন্যতম দস্যুসাহসী নায়ক বীরবিন্দুস্বামী অম্বিকা চক্রবর্তীর আকস্মিক দুর্ঘটনায় জীবনান্ত হ'ল। আঘাত বা বিপর্যয় কিছুর নতুন ঘটনা ছিল না তাঁর জীবনে, জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেই রেখেছিলেন তিনি সারাজীবন। শত্রুর কঠিন আঘাতের চিহ্ন ছাড়িয়ে ছিল তাঁর সবদেহে। তাই



এই অপঘাত মৃত্যুই বোধহয় তাঁর ক্ষেত্রে জীবনের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি। সূর্য সেনের বিশ্বস্ত সহকর্মীর লোমহর্ষক জীবননাটকের শেষ স্ববনিকাপাত হ'ল সূর্য সেনেরই নামাঙ্কিত পথে। তবুও এ মৃত্যুর দুঃখ অসহনীয় হবে তাঁর অগণ্য অনুরাগীর কাছে যারা সকল অবস্থাতেই গ্রাম্থা করেছিলেন, প্রাণভরে ভাল বেসে-ছিলেন এই সর্বভাগী মানুস্যাটিকে।

॥ অভিনন্দন ॥

ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যকে উচ্ছ্বাসিত অভিনন্দন জানিয়েছেন সোভিয়েত সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'টাস'। টাসের মতে ভারতের সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে, নির্বাচক-মণ্ডলীর বিরাট অংশ শ্রীনেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের শান্তি মৈত্রী ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতির সমর্থক। কংগ্রেসের সাফল্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই সাফল্য প্রতিদ্বন্দ্বীরাশীল শাস্তি-গুলির বিরুদ্ধে জাতির দেশপ্রেমিক শাস্তিগুলির সফল সংগ্রামের ফল। কমিউনিষ্ট প্রার্থীকে পরাজিত করে কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।



তাঁর এই সাফল্যকে স্বতন্ত্রভাবে অভিনন্দিত করেছেন রাশিয়ার সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী মঃ জুকভ।

॥ ৩৯০০০ ॥

নির্বাচনে সরকারী ব্যয় পূরণের জন্য কিছু সদাশয় ব্যক্তি বরাবরই পাওয়া যায়। এবার যেন পশ্চিমবঙ্গে তাদের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী হিসাবে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনে যে ৯৬০ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন তার মধ্যে শতকরা ৩৯ জন প্রার্থী প্রদত্তভোটের এক-ষষ্ঠাংশ সংগ্রহ করতে না পারাতে তাঁদের জামানতের টাকা হারিয়েছেন। জামানতের টাকার পরিমাণ ২৫০ টাকা, সুতরাং ৩৭৪ জন পরাজিত প্রার্থীর সরকারী তহবিলে সর্বসাকুল্য দানের পরিমাণ ৯৪০০০ টাকা।

জামানত-বাজেয়াত প্রার্থীর সংখ্যা পি-এস-পি দলেই সর্বাধিক, ৪১। জন-সংঘ ও স্বতন্ত্র দলের ১৯, কমিউনিষ্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের ৯, সমাজতন্ত্রী দলের ৭, আর-এস-পি ও লোকসেবক সংঘের ৩, এস-ইউ-সি-সি দলের ২। কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যেও জামানত জব্দ হয়েছে দু'জনের। বাকি ২৪৩ জন নির্দলীয়।

॥ গোয়া, দমন, দিউ ॥

গোয়া দমন দিউর 'ডি ফ্যাক্টো' ভারতভুক্তি এতদিনে 'ডি জুরি' করা হল। গত ৫ই মার্চ এক অর্ডিন্যান্স জারী করে রাষ্ট্রপতি এই তিনটি প্রান্ত্রন পৃথুগীজ উপনিবেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন, এবং ভারতের অভ্যন্তরে আপাতত তাদের প্রশাসনিক মর্যাদা হয়েছে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল মণিপূর, ত্রিপুরা প্রভৃতির সমরূপ। নতুন সংসদের অধিবেশন আরম্ভ হলে রাষ্ট্রপতির এই অর্ডিন্যান্স আইনের মর্যাদা পাবে।

॥ পাক সংবিধান ॥

প্রস্তাবিত পাক সংবিধানে সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত হয়েছে পাকিস্থানের সাধারণ মানুষ। কারণ পাকিস্থানের

বর্তমান জঙ্গী শাসকদের মতে দেশের শাসনকার্যে অংশগ্রহণের যোগ্যতা তাদের নেই। জঙ্গীশাসকরা স্থির করেছেন, পাকিস্থানের উভয় অংশ হতে সমান-ভাগে তাঁরা আশী হাজার "মৌলিক গণতান্ত্রিক" ছেকে বার করবেন এবং তাঁদের হাতেই ভুলে দেবেন পাকিস্থানের বিভিন্ন আইনসভার সদস্যদের নির্বাচন-দায়িত্ব। কোন গুণের জোরে পাকিস্থানের একজন নাগরিক "মৌলিক গণতান্ত্রিক" হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করবেন এবং কোন পদ্ধতিতেই বা পাকিস্থানের ভাগ্যনিয়ন্তারা দশ কোটি মানুষের মধ্যে থেকে ছেকে বার করবেন ঐ আশী হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীকে তা এখনও জানা যায়নি। তবে এটুকু বোঝা গেছে যে, এই বাছাইর ব্যাপারেও সাধারণ মানুষের মতামতের কোন মূল্য দেওয়া হবে না। পাকিস্থানের সামরিক কতৃপক্ষই স্থির করে দেবেন, কোন কোন অনুগত নাগরিকের পিঠে মৌলিক গণতন্ত্রিকের ছাপ মারা হবে। গোড়াতেই পাকিস্থানের জঙ্গী শাসকদের এই সতর্ক দৃষ্টি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের অপ্রিয়তা সম্বন্ধে তারা কতখানি সচেতন এবং এমন কোন ঝুঁকিই তারা শাসন-সংস্কারের মধ্যে নিতে চান না যার সুযোগে জনসাধারণ তাদের উৎখাত করে দিতে পারে।

স্থির হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে পাকিস্থানের শাসনকার্য পরিচালিত হবে। কেন্দ্রের জন্য থাকবে একটি জাতীয় সংসদ এবং উভয় অংশের জন্য পৃথক দুটি বিধানসভা। পাকিস্থানের রাজধানী হবে রাওয়ালপিণ্ডির নিকট-বর্তী নিম্নায়মান সহর ইসলামাবাদ, কিন্তু তার জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে ঢাকায়। পাকিস্থানের এই ব্যবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার অনুরূপ। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী প্রিটোরিয়া হলেও তার পাল্লামেন্টের অধিবেশন বসে কেপটাউনে। তবে পাকিস্থানের এই আনুষ্ঠিত উদ্দেশ্যহীন নয়, পূর্ববঙ্গের বিক্ষুব্ধ জনতাকে খুশি করার তাগিদ পাক শাসকরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। এই একই কারণে বাঙলা ভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় চাকুরি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে যতদূর সম্ভব সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীপরিষদ এবং রাজ্য দুটিতে গভর্নর ও প্রেসিডেন্ট-

অনুমোদিত মন্ত্রিপরিষদ শাসনকাৰ্য পৰিচালনা করেন। জাতীয় সংসদ বা রাজ্যবিধানসভা দুটির মন্ত্রিসভা গঠনের বা তাদের কাজের কোন সমালোচনা করার অধিকার থাকবে না। আইনসভাগুলির একমাত্র কাজ হবে আইনপ্রণয়ন, কিন্তু সে অধিকারেও প্রেসিডেন্ট যে কোন মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন তার ভেটো শক্তির জোরে। সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের কোন তালিকা ঘোষণা করা হয়নি, উপরন্তু বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা চলবে না। কারণ রাষ্ট্রপতি আইনের উপরে। সুতরাং, সংবিধানের নামে ইনি যে-বিনিয়োগগুলি কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট নামধারী একটি মানদুই পারিকস্থানের ভাগ্যবিধাতা হয়ে রইলেন এবং সে মানদুইটিও আপাতত অপরিবর্তিত থাকলেন তিন বছরের জন্য। কারণ দু'বছর আগে বিপ্লবী পরিষদ নাকি পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেছিলেন জনাব আয়ুব খাঁকে।

॥ বর্মার জগ্গী শাসন ॥

বর্মার অন্তর্গত কয়েকটি জাতীয়তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবীর ফলে গুরুতর আভ্যন্তরীণ সংকট এবং তার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ সামরিক অভ্যুত্থানের সংবাদ গতবারেই কিছুটা জানানো হয়েছিল। ক্ষমতার অধিষ্ঠিত বর্মার সামরিক শাসকরাও নিজদের অভ্যুত্থানের সমর্থনে সেই কথাই বলেছেন। গত ৫ই মার্চ এক সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করে বিপ্লবী পরিষদের অন্যতম নেতা হিগোয়িয়ার আউর্ভিগ বলেছেন, নিছক ক্ষমতার লোভে তারা বর্মার শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেননি। সারা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট বিপর্যয়কর হয়ে উঠতেই তারা নিরুপায় হয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। নইলে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের অনাস্থা নেই। বর্মার প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী উনু ও অন্যান্য ৪৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ আনা হয়নি। সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা জেনারেল লে উইন পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী উনু সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলেছেন যে, তিনি অত্যন্ত দুর্বল লোক, বর্মার বর্তমান বিপর্যয়কর সংকটগুলির সমাধানের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বিভিন্ন রাজ্যের ফেডারেশনের দাবী যদি স্বীকার করা হত তবে বর্মার রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক একা অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

উনু অনুগামীরা ছাড়া আর সকল দলই জেনারেল লে উইনের প্রতি পূর্ণ

আনুগত্য জানিয়েছেন, কমিউনিস্ট প্রভাবিত দল ও সংগঠনগুলিও এ-ব্যাপারে কোন বিধা প্রকাশ করেননি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, রাষ্ট্রের অন্ধকারে নাটকীয়ভাবে ক্ষমতা দখল না করে জেনারেল লে উইন যদি দিনের বেলায় উনু সরকারকে নোটিশ দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চাইতেন তবে তাতেও কোন অসুবিধা হত না। ইতিপূর্বে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে বর্মার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উপজাতির অন্তর্গতী কার্যকলাপে নিরুপায় হয়ে উনু নিজেই একবার জেনারেল লে উইনের হাতে বর্মার শাসনদায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। বছর দেড়েকের চেষ্টায় মোটামুটিভাবে বর্মাকে শান্ত করে এবং গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে নে উইনও সৌদি শ্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এবারের প্রত্যাবর্তন বোধহয় স্বল্পস্থায়ী হবে না, যদিও তাঁর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক শাসনে তাঁরা আস্থা হারাননি।

॥ নেপালে শৈবরশাসন ॥

নেপালের শৈবরশাসনের রূপ ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। গত ৫ই মার্চ এক ঘোষণা জারী করে নেপাল সরকার আত্মগোপনকারী ৭৫ জন দেশনেতাকে একুশদিনের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। অন্যবার তাঁদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকিও ঐ ঘোষণায় ছিল। কিন্তু শৈবরশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত কোন দেশপ্রেমিকই সে হুমকিতে ভীত না হওয়ায় সরকার ইতিমধ্যেই তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে আরম্ভ করেছেন। ভারতে অবস্থানকারী পদচ্যুত কৈরলা মন্ত্রিসভার উপ-প্রধানমন্ত্রী সুবর্ণ সমশেরের যাবতীয় সম্পত্তি সরকার দখল করে নিয়েছেন, কিন্তু সুবর্ণ তাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়নি। তিনি বলেছেন, সব কিছু বিপদের ঝুঁকি নিয়েই তিনি নেপালের শৈবরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছেন। তবে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাকে তিনি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করেন না, কারণ তিনি জানেন সকলের সব হত সম্পদই আবার তাঁরা ফিরে পাবেন। এবং সে ফিরে পাওয়ার দিনও খুব দূরে নয়।

॥ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ॥

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফেডারেশন গঠনের পূর্ব প্রয়াস ব্যর্থ হলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামে একটি ক্ষুদ্রতর স্বাধীন রাজ্য গঠনের উদ্যম এখনও অব্যাহত রয়েছে। জামাইকা, ব্রিনিদাদ ও টোবাগো পূর্ব প্রস্তাবিত ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হতে না চাওয়াতে তাদের বাদ দিয়েই নতুন ওয়েস্ট ইন্ডিজ রাজ্য গঠন করা হচ্ছে। সম্প্রতি

বারবাডোজ, সেন্ট কিটস-নেভিস, এণ্ট-গুয়া, মণ্টসেরাট, ডোমিনিকা, সেন্ট-লুসিয়া, সেন্টভিনসেন্ট ও গ্রেনাডা—পূর্ব ক্যারিবিয়ান সাগরের ছোট-বড় এই আটটি দ্বীপের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়ে গেছে, এবং তারা স্থির করেছেন নবগঠিত ওয়েস্ট ইন্ডিজ কমন্ওয়েলথের অভ্যন্তরেই একটি স্বাধীন রাজ্যরূপে অবস্থান করবে।

বারবাডোজ থাকবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান শাসক গভর্নর-জেনারেলের বাসস্থান এবং প্রত্যেকটি দ্বীপে থাকবেন তাঁর অধীনস্থ একজন কমিশনার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিজস্ব সুপ্রীম কোর্ট থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হবে এবং তার কেন্দ্রীয় সংসদ হবে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ও সেনেট নামধারী দুই কক্ষবিশিষ্ট। প্রত্যেকটি দ্বীপের জন্য মৌলিক প্রতিনিধি থাকবেন একজন, তারপর প্রতি পঞ্চাশ হাজার লোকপিত্ব তাদের প্রতিনিধির সংখ্যা একজন করে বাড়বে।

॥ ভেজাল ॥

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ গত ৫ই মার্চ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশনে রিপোর্ট পাঠকালে গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, চট্যাগিনের মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বছর রাশিয়ায় খাঁটি রুটির বদলে ভেজাল রুটি সরবরাহ করা হত, আর ১৯৫২ সালে পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশনে মালেনকোভ গম সমস্যার সমাধানের যে দাবী করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হার সমতালে অগ্রসর হয়নি বলে রাশিয়ায় এখন রীতিমত খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। একারণে মঃ ক্রুশ্চেভ দলের কাছে ভুয়া পরিসংখ্যানের সাহায্যে খাদ্যসমস্যা সমাধানের মিথ্যা প্রচারনা না করে কয়েক বছরের মধ্যে খাদ্যোৎপাদন দুই তিনগুণ বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

ভয়েস অব আমেরিকার

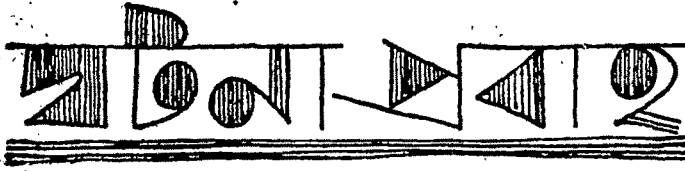
বাংলা অনুষ্ঠান শুনুন

প্রত্যহ

সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ

১৯-৪৬, ২৫-২৬ ও

৪২-১০ মিটারে।



॥ ঘরে ॥

১লা মার্চ—১৭ই ফাল্গুন : পশ্চিম-বঙ্গের নির্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল ঘোষিত—বিধানসভায় (২৫২ আসনযুক্ত) কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি : কংগ্রেস—১৫৭, কম্যুনিষ্ট—৫০, অন্যান্যরা—৪৫।

লোকসভায় কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ও পুনরায় দেশ-শাসনের অধিকার লাভ—রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ ব্যতীত সকল রাজ্যেই বিধান-সভায় কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

উত্তর বোম্বাই লোকসভা আসনে রেকর্ড ভোট পাইয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন নির্বাচিত—মর্যাদার লড়াই-এ নির্দলীয় প্রার্থী আচার্য জে. বি. কৃপালনীর পরাজয় বরণ।

২রা মার্চ—১৮ই ফাল্গুন : পশ্চিম-বঙ্গ হইতে লোকসভায় ৩৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের ২২টি আসন অধিকার—মর্যাদার লড়াই-এ কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী অশোক সেনের জয়লাভ—বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস মহলে মন্ত্রিসভা গঠনের তোড়-জোড়—ত্রিপুরা রাজ্য হইতে লোকসভার দুইটি আসনই কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক অধিকার।

৩রা মার্চ—১৯শে ফাল্গুন : পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বিজয়োৎসব—ময়দানে (কলিকাতা) বিরাট জনসভায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী অতুল্য ঘোষ কর্তৃক দেশবাসীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন—বামপন্থী জোটের বিকল্প সরকার গঠনের ধর্মির সমালোচনা।

৪ঠা মার্চ—২০শে ফাল্গুন : মধ্য-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মায়ের নামে দীঘায় 'অঘোরকামিনী' স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ—শ্রীসুদর্শাজি লাহড়ী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) কর্তৃক ভিক্তিপ্রস্তর স্থাপন।

বিস্ফোডকরীদের প্রস্তরের আঘাতে কেরলের মধ্যমন্ত্রী শ্রী থানু পিল্লাই আহত—ত্রিচুড়ে সরকারী আর্তিথ ভবনের সম্মুখে ঘটনা।

৫ই মার্চ—২১শে ফাল্গুন : কেন্দ্রীয় শাসনাধীন গোয়া, দমন ও দিউর প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারী।

পাঞ্জাবের মধ্যমন্ত্রী শ্রী প্রতাপ সিং কাহিরণের পদত্যাগ ও পুনর্নির্বাচন দাবী—বিভিন্ন বিরোধী দলের বৈঠকে ১৮ই মার্চ 'প্রতিবাদ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত।

৬ই মার্চ—২২শে ফাল্গুন : ঐতি-হাসিক চট্টগ্রাম অঙ্গাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নেতা বীর বিপ্লবী শ্রী অম্বিকা চক্রবর্তীর (৭২) জীবনাবসান।

শিল্পে সরকারী মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক' প্রাণ্ডন অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারীর উক্তি—শিল্প জাতীয়করণের উপর গুরুত্ব আরোপ।

৭ই মার্চ—২৩শে ফাল্গুন : শ্রী বিনোদানন্দ বা সর্বসম্মতিক্রমে বিহার কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত—শ্রী অতুল্য ঘোষের (কংগ্রেস হাইকমান্ড মনোনীত প্রতিনিধি) সংকট সমাধান চেষ্টা সফল—উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও আসামের কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা হিসাবে যথাক্রমে শ্রী চন্দ্রভানু গুপ্ত, সর্দার প্রতাপ সিং কাহিরণ ও শ্রী বি. পি. চালিহা নির্বাচিত।

॥ বাইরে ॥

১লা মার্চ—১৭ই ফাল্গুন : প্রেসি-ডেন্ট আয়ুব কর্তৃক পাকিস্তানের নতুন সংবিধান ঘোষণা—পাকিস্তানে এক কক্ষ-বিশিষ্ট পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্বাধীন সরকার প্রবর্তনের ব্যবস্থা।

২রা মার্চ—১৮ই ফাল্গুন : ব্রহ্ম সৈন্যবাহিনী কর্তৃক শাসনক্ষমতা দখল—প্রধানমন্ত্রী উ নু সমেত নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার—সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল নে উইনের নেতৃত্বে বিপ্লবী পরিষদ গঠিত।

বায়ুমণ্ডলে আণবিক পরীক্ষার জন্য আমেরিকার প্রত্নতি—রাশিয়া চুক্তিতে না আসিলে এপ্রিল মাসেই (১৯৬২)

পরীক্ষা সুরু—টোলিভিন ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির ঘোষণা।

৩রা মার্চ—১৯শে ফাল্গুন : দক্ষিণ নেপালের বীরগঞ্জে সাম্য আইন জারী—বিদ্রোহীদের আক্রমণের জের—কাঠমান্ডুর আকাশে অজ্ঞাত পরিচয় বিমানের আনাগোনা।

রুশ নিরস্ত্রীকরণ শীর্ষ প্রস্তাব সমর্থনের জন্য ব্রুশেভ (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক বেতারে শ্রীনেহরুকে (ভারতের প্রধানমন্ত্রী) ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

৪ঠা মার্চ—২০শে ফাল্গুন : বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক ব্রুশের পার্লামেন্ট বাতিল—রাজনৈতিক নেতাদের সহিত পরিষদ চেয়ারম্যান নে উইনের দীর্ঘ বৈঠক।

নেপালে ৭৬ জন নেতার বাড়ী অবরোধ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত—নির্দেশ-দান সত্ত্বেও ভারত হইতে নেপালে প্রত্যাবর্তন না করার জের।

৫ই মার্চ—২১শে ফাল্গুন : পর-রাষ্ট্রমন্ত্রী পর্ষায়ে জেনেভা সম্মেলন আরম্ভে রাশিয়ার সম্মতি—বুটেন ও আমেরিকার নিকট শীর্ষ সম্মেলনের দাবী ত্যাগ করিয়া ব্রুশেভের পথ প্রেরণ।

ক্যামেরুণে শোচনীয় বিমান দুর্ঘ-টনার বৈমানিকসহ ১১৯ জন আরোহী নিহত।

আলজিরিয়ার সর্বত্র ইউরোপীয় সন্ত্রাসবাদীদের অবাধ দৌরাড্য—বহু লোক হতাহত।

৬ই মার্চ—২২শে ফাল্গুন : নতুন ধরণের অস্ত্রাদি উন্নয়নে রাশিয়া আবার পারমাণবিক পরীক্ষা চালাইবে—প্রধান-মন্ত্রী ব্রুশেভের। সতর্কবাণী—আমেরিকার আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা পুনরারম্ভের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া।

৭ই মার্চ—২৩শে ফাল্গুন : ব্রুশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধের জন্যই ক্ষমতা দখল করা হইয়াছে—বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ হইতে ঘোষণা।

ফ্রান্স-আলজিরীয় শান্তি আলোচনা চূড়ান্ত পর্ষায়ে আরম্ভ।

মধ্য ভিয়েতনামে কম্যুনিষ্ট গেরিলা বাহিনী কর্তৃক একটি জেলা দখল।

সমকালীন সাহিত্য

অভ্যর্থক

॥ তিব্বতী সাধু ॥

যখন মনে হয় একেবারে জনতার ভিড়ে এসে পাড়িছি তখন কিছ্‌সংখ্যক মানুষ আপন মনের মাধুরী রচনা করে তার ভেতরই আত্মগোপন করেন। তখন বাহির্জগতের কোনো ধনি, কোনো ঘটনা বা তত্ত্বজনিত সংঘাত বা কোনো রকম বাহ্যিক মনোভঙ্গীর সঙ্গে তার জন্তরের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। যেটুকুর সঙ্গে তার সংযোগ বা যার সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে থাকে সে তার নিজের মন, নিজস্ব ভাব ও ভাবনা। কবিদের পক্ষেই এই মানসিক পরিস্থিতি ঘটা সম্ভব। ইদানীন্তনের চাপ তাঁদের সহ্য হয় না, চিরন্তনের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তাঁরা আপনার মাঝে আপনহারা হয়ে থাকেন, কিংবা নিজের হাতেগড়া অতীতের স্বর্গধামে প্রত্যাবর্তন করেন।

যারা বলে—জীবনের সূচনা আগামীকালে, তাদের মৃত্যুর পানে তাঁরা করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। আর এমন সূত্রে কথা বলেন যেন জীবনের পরি-সমাপ্তি ঘটেছে তারই আগের দিনটিতে। কবি হিসাবে উইলিয়াম বাটলার ইএটস্‌ এই অতীতের আলিঙ্গন থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারেননি। যে-অতীত তিনি দেখেছেন, যার মধ্যে বাস করেছেন, আর যে-অতীতের পরিচিত মূল্যবোধ তাঁর কাছে প্রিয়, তিনি তার ভেতরই ডুবে ছিলেন। তাঁর সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধ সংগ্ৰহ Essays and Introductions নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে সমালোচক হিসাবেও ইএটস্‌ মানসিকতার ক্ষেত্রে এতটুকু অগ্রসর হতে পারেননি। ইহাৎ এক জায়গায় থমকে থেমে গেছেন।

ইএটসের এই প্রবন্ধাবলী তাঁর চল্লিশ বছরের সাহিত্যসাধনার ফসল। একদা উৎসাহী তরুণ লেখক হিসাবে যিনি উইলিয়াম ব্রেক কেন বিমূর্তনকে (abstract) ঘৃণা করতেন সেই কথা উল্লেখ্য বলছেন, পরিণত বয়সে তিনিই আবার বয়সসুলভ তিস্ততা মিশিয়ে অতি আতিশয্যময় উজ্জ্বল এবং শব্দের দ্বারা বিমূর্তন বিষয়ে আপন প্রীতি ও অনুরক্তির কথা প্রচার করেছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই বস্তুর বাক্য দিকটি তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ব্রেকের দাঁতে সম্পর্কিত বিষয়ে ১৯২৪ খৃস্টাব্দে লিখিত প্রবন্ধের পরিশিষ্টাংশে ইএটস্‌ বলেছেন :—
“Now in reading it I am ashamed when I come upon such words

as ‘Corporeal reason’ ‘Corporeal law’ and think how I must have wasted the keenness of my youthful senses.” —এ এক ব্যর্থ অনু-তাপ। ব্যর্থতারও। কোন কবি অপচয় বা Waste এড়িয়ে যেতে পেরেছেন? মানুষের প্রাণশক্তি চেতনাকে কখনও নিঃসঙ্গ থাকতে দেয় না।

এই প্রবন্ধগুলিতে যে একটিমাত্র সংযোগসূত্র একাধিক করতে সাহায্য করেছে তা এই অপচয়ের চেতনা। ধার-মান চেতনা আর প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষার মাঝে যে ছায়া, যে-ছায়া দেহগত প্রেম এবং অধ্যাত্ম প্রেমের মাঝে, সূত্বদের জগৎ আর সত্যের জগতের মাঝে, বিশেষ এবং অশেষের মধ্যে, সেই ছায়াই এই একাসূত্র। তরুণ বয়সেও তিনি এ-বিষয়ে সচেতন, চিত্রে প্রতীকবাদ সম্পর্কিত প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : “the mind’s eye- soon comes to see a capricious and variable world, which the will cannot shape or change, though it can call it up and banish it again.” —পৃথিবীকে তিনি কিছুতেই যা তাঁর মতে সার্থক সেই বিগ্রহে রূপায়িত করতে পারেননি। অথচ মন থেকে যা তাঁর মতে অসার্থক তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যা সার্থক বলে মনে হয়েছে তার প্রতীক দিয়ে পূর্ণ করার প্রচেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় এবং অলৌকিক চিন্তা ইএটস্‌-এর মতে—
“is thought about perfection and the way to perfection; and symbols are the only things free enough from all bonds to speak of perfection.”

বাইরের তমসাজ্জ্বল জগৎ কিন্তু এই স্বপ্নলোকের ওপর ছায়াপাত করে। কবি স্বপ্নন-পসারি, মৃতের আত্মার সঙ্গেও তাঁর আলাপচার চলে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এই জাতীয় এক অলৌকিক অনুষ্ঠান করা চলে না। যে জগৎ মূল্য-বোধ দিয়ে গড়া তাকে হিসেব-নিকেশ করতে হয় তথ্য দিয়ে গঠিত জগতের সঙ্গে। যে-নারী তাঁর কাছে সার্থকতার প্রতীক সে বিবাহ করে বসে এক সাধারণ সৈনিককে। আয়াল’ন্ড এখন স্বাধীন দেশ কিন্তু তাঁর স্বপ্নদিয়োগড়া দেশের সঙ্গে তার মিল অতি অল্প। তাঁর আশা যে বর্তমানকে সোনার অতীতের কোনো মূর্তিতে রূপান্তরিত করা যাবে। এই স্বপ্ন তাঁকে কর্মের জগতে টেনে আনে। রাজনীতিতে একটা নতুন ধরনের খাদ মিশিয়ে তা গাঁজিয়ে তুলবেন। নতুন রংগমণ স্থাপনের জন্য তিনি সচেষ্ট।

শেলীর মত তিনিও শুনতে পান—
“If ye know these things happy are ye if ye do them.” কিন্তু কর্ম তাঁকে কোনো পথনির্দেশ করতে পারেনা, ফলে আবার ফিরতে হয় স্বপ্নের জগতে। স্বপ্ন এবং বাস্তব ও বাস্তব এবং স্বপ্নের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে ইএটস্‌ একটা শান্তির নীড় খুঁজে পান না। একমাত্র অভব্য আত্মা ছাড়া কেই বা তা পায়?

স্বপ্ন এবং কর্ম দুই-ই অকিঞ্চকর হয়ে পড়ে। কবির মন জনতার প্রতি, সংবাদপত্রের প্রতি, যার প্রাণে গান নেই সেই বর্ষের প্রতি, শিল্পগত সমাজের ফলে যে বিভীষিকার উদ্ভব হয়েছে তার প্রতি ঘৃণা এবং তিস্তায় ভরপুর। ১৯০৭-এ কবি বলেছেন—
“I dreamed of enlarging Irish hate, till we had come to hate with a passion of patriotism what Morris and Ruskin hated,” এ তিনি লিখেছেন কবিতা এবং ঐতিহ্য সংক্রান্ত এক প্রবন্ধে। বন্ধুত্বের প্রতি এই ঘৃণা জীবনের শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। ১৯০৭-এ তাঁর গ্রন্থাবলীর ওপর যে-ভূমিকা লিখেছিলেন ইএটস্‌ তাতেও এই ঘৃণার চিহ্ন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :
“When I stand upon O’Connell Bridge in the half-light and notice that discordant architecture, all those electric signs, where modern heterogeneity has taken physical form, a vague hatred comes up out of my own dark and I am certain that wherever in Europe there are minds strong enough to lead others the same vague hatred arises.” ইএটসের সঙ্গে তাঁকের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ যুক্তির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তিনি লিখছেন না। এ তিনি শিরায়, শোণিতে উপলব্ধি করেছেন, সেই তাঁর শেষ কথা। তিনিই ত’ একদা লিখেছিলেন :—

“Guard me from those thoughts men think
In the mind alone
He that sings a lasting song
Thinks in the marrow-bone?”

অনেকগুলি প্রবন্ধে এই একই কথা তাঁর বস্তব্য, কিন্তু অস্থি-অঙ্গায় (marrow-bone) যখন তিনি চিন্তা করেন তখন ইএটসের কবি-সত্তা এতই প্রবল যে পৃথিবীকে ঘৃণা করা যায় না। তিনি জানেন যে অপরের সঙ্গে স্বন্দেহর ফলে মানুষ অলঙ্কারের সাহায্য নেয় আর কলহ যখন অন্তরের সঙ্গে তখন প্রয়োজন কবিতার। ইএটসের এই স্বন্দেহর অনেকখানি তাঁর নিজেরই সঙ্গে আবার তেমনই স্বন্দেহ বহির্জগতের সঙ্গে। তাই যে ভূমিকাটিতে তিনি তাঁর মনের গহন থেকে ঘৃণার উৎপত্তির কথা লিখছেন, তার মধ্যেই বলেছেন :
“I am like the Tibetan Monk who dreams at his initiation that he himself is eater and eaten. This is Irish hatred and solitude, the hatred of human life that

made Swift write Gulliver and the epitaph upon his tomb (fierce indignation will no more lacerate his heart) that can still wag us between extremes and doubt our sanity."

ইএটস্ আপন মনকে প্রবোধ দিয়ে বলছেন—‘আমি শব্দ আমারই রূপান্তর ঘটতে চাই, পৃথিবীর রূপান্তর আমার কাম্য নয়।’ এই কারণেই তিনি সিনজের অনুরক্ত পথের বন্ধ ভিখারী দৃঢ়তা আর জীবনের কুশীলতা নিয়ে অনুশোচনা করছে, কিংবা বন্ধা আরান রমণী তার নিরাক্ষিত পুত্র-সন্তানটির জন্য বিলাপ করছে, যা যে তরুণী বধূটি বন্ধ স্বামীকে বিবাহ করে বসেছে তাদের কথাই সিনজ লিখেছেন। কোনো কিছুর রূপান্তর ঘটানোর বাসনা তাঁর নেই, কারো সংস্কার নয়, খোলা জানালার সুমুখ দিয়ে চলেছে জীবনের অন্তহীন মিছিল, উত্তাপ আর উত্তেজনার সর্ব তাদের কন্ঠ।

যে-পৃথিবীর মানব বাণীহীন হয়েছে, স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারে না, সেই পৃথিবীকে উদ্ধার করতে ইএটস্ কৃতসঙ্কল্প। নতুন নাটক এবং নতুন কাব্যের মাধ্যমে : "I want to write in whatever language comes most naturally when we soliloquize, as I do all day long, upon the events of our own lives or of any life where we can see ourselves for the moment." এর পরই ইএটস্ বলেছেন, সারা জীবন ধরে আমি চোখে ধরা পড়-প্রকরণ বজ্রন করার প্রয়াস করে বা শব্দ কোনে লাগে এমন শব্দ-বিন্যাসের চেষ্টা করছি। শব্দ ব্যাকের দ্বারা পৃথিবীর নাড়ির গতি পরিবর্তন করা যায়। ইএটস্ জানেন যে জীবনের জন্য তাঁর গভীর আবেগ এবং ‘সুস্বাদু’ এবং ‘তরুণী’ অবস্থার জন্য তাঁর জীবন-ব্যাপী আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে আবেগের বহিঃনির্বাপিত করতে পারেনি। বৃথাই তিনি নৈবর্তিক ধ্যানে মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করেছেন। কবিত্বকে ব্যক্তিগত আবেগ-বহিঃস্থত করার তিনি চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনো কবির কি এতখানি নৈবর্তিক হওয়া সম্ভব। তাঁর এই প্রবন্ধবলীতে ব্যক্তিগত আবেগ আছে বলেই তার আবেদন আছে। এই লেখক কখনো পৃথিবীর সঙ্গে কলহরত আবার পর মৃদুতাই তার সংঘর্ষ লাগছে আপন মনের সঙ্গে। ইএটসের কবি-মানসে স্বপ্ন এবং সত্য এমনই অঙ্গাঙ্গী মিশে আছে যে একের থেকে অপরকে বেছে নেওয়া কঠিন :

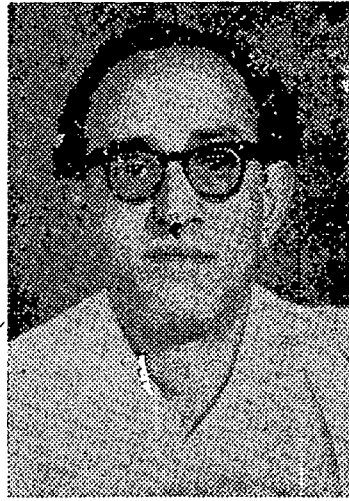
"And yet, and yet
Is this my dream or truth?"
উইলিয়াম বাটলার ইএটস্ নিজের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাননি। *

* W. B. YEATS: ESSAYS AND INTRODUCTIONS (Macmillan: 38s).

নতুন বই

তিন প্রহর— (উপন্যাস) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থপ্রকাশ—৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৩-২৫ ন. প।

খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধুনাতম উপন্যাস হল ‘তিন প্রহর’। নির্মল চৌধুরী নামে এক অকৃতদার, অকৃতার্থ জমিদার-পুত্র তার প্রৌঢ় বয়সের রোগজর্জর রায়তে পিতৃ-পিতামহের শূন্য প্রাসাদে বসে গত জীবনের কাহিনী চিন্তা করছেন—এই হল উপন্যাসটির রচনারীতির ছক। একটি রাত্রির তিনটি প্রহরে উত্তম পুরুষের জবানীতে কাহিনী বিস্তার



করার অসুবিধা আছে যথেষ্ট। প্রথমতঃ এতে বারে বারে ফ্লাশ-ব্যাক করার ফলে রসভাস ঘটে; দ্বিতীয়ত, শব্দমাধুর্য এক-জনের জবানীতে চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হয় বলে তারা জীবন্ত হয়ে উঠতে চায় না; এবং তৃতীয়ত, নায়কের চরিত্র-বিষয়ে অন্যান্য চরিত্রের মানস-প্রতিক্রিয়া সুপারিশফুট না হওয়ায় সেই মূল চরিত্রটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বলতে বাধা নেই, নারায়ণবাবু এই প্রতি-বন্ধকগুলি অনায়াসেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। বর্তমান ও অতীত, এবং চিন্তাভাবনা ও ঘটনা-সংঘটনের মধ্যে এমন একটা মাত্রা বজায় রেখেছেন তিনি যাতে বহুস্বর বাদ্যযন্ত্রের মতো একটা স্বরসম্ভব বেঁজে উঠেছে উপন্যাসখানির মধ্যে।

‘তিন প্রহর’ের চরিত্রগুলি লেখকের অসামান্য সৃষ্টি। কিশোর বয়সে থিয়েটারের মোহে পড়ে কাহিনীর নায়ক নির্মল কী করে ঘটনার আনিবার পরিণতিতে ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে, তার রূপায়ণ যেমন বাস্তবসম্মত, তেমনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। আর কলকাতার

স্টেজের নায়িকা উবারাণী এবং কাম্বীর বাইজ সর্বসত্যী তাদের বিশিষ্ট ধরনের একনিষ্ঠতার ভো স্থায়ী আসন পেয়ে যায় পাঠক-চিহ্নে। ছোট্ট একটি পার্শ্ব-চরিত্র হলো স্টেজের এক স্ট্রা চন্দ্রনা নিষ্ঠার সঙ্গে অধিকৃত, এবং জবরদস্ত গদগ্জা জগৎ পালও লেখকের সহানুভূতি থেকে বাঞ্ছিত নয়।

নারায়ণবাবুর ভাষা অত্যন্তই হৃদয়-গ্রাহী। অল্প কথায় এমন নিপুণ বর্ণনা দিতে পারেন তিনি যে তা গীতিকবিতার মতো বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে। বইখানির প্রচ্ছদ ও গ্রন্থন সুরচিসম্পন্ন।

মণ্ডকন্যা—(উপন্যাস) ধনঞ্জয় বৈরাগী।

গ্রন্থম, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—সাত টাকা।

বর্তমানে পুরনো মণ্ডাভিনয়ের সঙ্গে নব-নাট্যাঙ্গোলনকারীদের একটি প্রতি-যোগিতা চলেছে। সে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই ‘মণ্ডকন্যা’র কাহিনী-বিন্যাস। নাট্যকার সুরজিৎ শব্দ নাটককে ভাল-বাসে না। নাট্যালয়ও তার প্রাণের বস্তু। দুটি জিনিসেরই উন্নতি সাধন করা তার লক্ষ্য। পুরনো রংগালয়ের কত বাস্তব আর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজেদের ইচ্ছামত অভিনয় করায় বা করে। সেখানেই সংঘাত বাধে সুরজিতের সঙ্গে। ওদিকে নবনাট্যাঙ্গোলনকারীদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় নানা কারণে। সুরজিৎ, অলক, সুবোধ হাজরা, কুন্তল এদের মত মানব প্রতি যুগেই জন্ম নেয় নতুনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর অহংকারহীন অভিনেত্রী সুরজিতার মত অভিনেতা-অভিনেত্রী তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। পুরনো মণ্ডের আভ্যন্তরীণ যে রূপটা ধনঞ্জয় বৈরাগী ভুলে ধরেছেন তা বিস্ময়কর লাগবে অনেকেরই কাছে। পুরনো পচ-রা রাজস্রুটাকে কিভাবে জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখা হয়েছে নানা উপায়ে, তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যে সব নরনারী সার্থক শিল্পী হবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মণ্ডে যায়, তাদের শেষ পরিণতি কি? সার্থক আর অসার্থক উভয় ধরনের শিল্পীদের বিরো-গান্তক পরিণতি লেখকের সহানুভূতি-শীল লেখনীস্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে।

নাট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় বৈরাগী যে উপন্যাস রচনারও সিদ্ধহস্ত, তার পরিচয় বহুদিন পূর্বেই আমরা পেয়েছি। তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবধর্মী ঘটনার ওপর কাহিনী-বিন্যাস ও সার্থক নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি। এই বৃহদায়তনের উপন্যাসটিতে অধিক চরিত্র সৃষ্টি করে লেখক কাহিনীতে অতিরিক্ত মাত্রায় জটিল করে তোলেননি। চরিত্রগুলি আপন স্বাভাবিক উজ্জ্বল। অল্প চরিত্রের মাধ্যমে বিরাট যুগ-

জিজ্ঞাসার যে সমস্যাকে তিনি তুলে ধরেছেন তা তাঁর সার্থক শিক্ষণীয়তার পরিচায়ক। গ্রন্থের প্রচ্ছদটি মনোরম।

পিপাসা— (উপন্যাস) চিত্তরঞ্জন

ঘোষ। প্রকাশক—শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক—
পাধ্যায়। ২০, গ্রেণ্ড স্ট্রীট, কলিকাতা
—৫। দাম সাড়ে তিন টাকা।

সমাজকে অস্বীকার করে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। কারণ মানুষের প্রয়োজনে সমাজের উৎপত্তি। আর যারা সমাজকে অস্বীকার করে থাকতে চেয়েছে অবৈধ উপায়ে, পরিণতি ভয়াবহ। 'পিপাসা' গ্রন্থের মূল বোলা নায়ক একজন নয়, অনেক। বোলা নায়ক নেই। বোলা গ্রাম থেকে অপহৃত হয়ে এল পশ্চিমের শহরে। শ্রীমান সত্য তাকে মহাসংকটের সামনে ফেলে পালিয়ে গেল বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। বোলা বেঁচে থাকতে চাইল। নিজের বড় ভাই তাকে অসৎ পথে প্ররোচিত করেছে। সে ঐ জীবনকে অস্বীকার করে নিতে বাধ্য হওয়ার সংশ্লিষ্ট সমাজের যাবতীয় বন্ধন অস্বীকার করে উদ্ভাস হয়ে উঠেছে। প্রভাতকে বিয়ে করে সুখী হতে পারল না। বেলার মৃত্যু-কামনা প্রভাতের আত্মহত্যার পথকে স্বরাস্ত করল। সুগত বিয়ে করল বোলাকে রোগের জন্য—ডালবাসার জন্য নয়। তাই বোলাকে আত্মহত্যা করতে হল। বেলার ছোটবেলার বন্ধু দেবনাথ অধিকাংশ ঘটনার পাশে তার দুর্ভেদ্য রক্ষণশীল মন নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে।—তার উদারতা হয়ত বোলাকে শৃঙ্খল নয়, সমাজের অসুখী নারীদের আত্ম-উদ্ধারের পথকে মুক্ত করে দিয়ে সমাজ-জীবনকে আরও নির্মল করে তুলতে পারে।

শ্রীযুক্ত ঘোষের এ কাহিনী নতুন না হলেও সংশ্লিষ্ট-স্বভাবের গুণে সার্থক হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন চরিত্রের উত্থান-পতন, নাটকীয়তা কাহিনীর জটিলতা বর্ণনা করেছে। কিন্তু লেখকের দিক থেকে বলা যায়, জীবনকে উপলব্ধি করার জন্যেই এই জটিলতা। এবং কিছুর অংশে তা সার্থকও হয়েছে। দেবনাথ ও সুগতের চরিত্র অবশ্য আরও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কোথাও কোথাও অতি দীর্ঘ সংলাপ কাহিনীর মধ্যে একঘেয়েমি এনেছে। কিন্তু লেখকের মন যে জীবন-মুখী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অভয়ের কথা ও ঠাকুরাণীর কথা—

(বিচিত্র প্রবন্ধ) ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত। প্রকাশক—
জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড। কলিকাতা—১৩। দাম পাঁচ টাকা।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেন্দ্রী মহাশয় লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে,—তার মধ্যে দ্বিবেন্দ্রী মহাশয় লিখেছেন : “মানসীতে প্রকাশের পূর্বে ‘অভয়ের কথা’ এক এক ঠাকুরা আমার পার্শ্ববাগানের বাসায় পড়া হইত। সন্ধ্যার পর এজন্য ছোট মজলিস বসিত। কি যে আনন্দের তুফান উঠিত, যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন, সাক্ষ্য দিবেন। যে-বাহিঁ এতকাল ভ্রমচ্ছন্দ ছিল, তাহা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আমাদের চোখ বলিসিয়া গেল।” এই হল অভয়ের কথার পূর্ব পরিচয়। রিপণ কলেজের গণিতাধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বেন্দ্রান্ত হজম করেছিলেন ‘অভয়ের কথা’ তার পরিচয়। এমনই এই গ্রন্থ যে মোহিতলাল মজুমদারের মত সমালোচক ভূমিকাসূত্রে বলেছেন—“এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধিতে কুলাইবে না, তবে যে সাহস করিয়াছি, তাহার কারণ, ইহার বিষয় অতি উচ্চ তত্ত্বকথা হইলেও, ব্যাখ্যান ও রচনাভঙ্গীতে ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যপদবীতে পৌঁছিয়াছে।” ১৩২১ সালে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, তার আগে ‘মানসী’ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে পাণ্ডিত্যজনের প্রশংসা লাভ করে। তত্ত্বকথা অপেক্ষা জীবন ও জগতের রহস্য এই গ্রন্থে বিধৃত। জ্ঞান ও প্রেম এই গ্রন্থে আছে আর আছে নিখিল মানব-প্রাণের চিরন্তন আকৃতি—এই গ্রন্থকে গভীর ছন্দে রূপায়িত করেছে। এই অপরূপ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। ১৩২১-এ বঙ্গ-সাহিত্যে কি বিস্ময়কর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে ‘অভয়ের কথা’ তার দৃষ্টান্ত। এমন একখানি ধ্রুপদী সাহিত্য প্রকাশ করে প্রকাশক সংসাহসের পরিচয় দান করেছেন সন্দেহ নেই।

উত্তর তরুণের নায়ক— (কাবিতা)

দিলীপকুমার সেন। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ১সি, রাণীশঙ্করী লেন, কলিকাতা—২৬। দাম দু টাকা।

সাম্প্রতিককালে অনেকগুলি কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রকাশিত চিন্তা-চেতনার বৈচিত্র্য বাঙলা কাব্য-

অশোক গুহের অবিস্মরণীয়
উপন্যাস

গোরা কালার হাট

মূল্য—৮-৫০ নং পঃ

আনন্দবাজার বলেন : উপন্যাসের চরিত্র ও আখ্যানভাগের নাট্যপ্রবাহ চিরকালীন অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত ও একটি নির্দিষ্ট যুগের জীবনধারার নিরপেক্ষ। সানন্দে লক্ষ্য করা যায় যে, লেখক সব প্রশ্নকে সযত্নে প্রশ্নায় দিয়েছেন। এর ফলে বইটির কোথাও সমাচার সাহিত্যের আদল আসেনি। যুগান্তর বলেন : একালের বাংলা উপন্যাস বিষয়বস্তু ও রূপকর্মের বিচিত্র পথে পদ-সজ্জার করেছে। ভৌগোলিক পরিধির বিস্ময়কর আবিষ্কার ও ঐতিহাসিক পটভূমির সূক্ষ্ম গলিপথের কোতুলকী অনুসন্ধান যেমন এর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে, তেমনি এর ফর্ম ও টেকনিক নিয়েও নতুন পরীক্ষা চলেছে। ‘গোরা কালার হাট’ পড়তে পড়তে এই কথাই মনে হলো।

স্বাধীনতা বলেন : স্বভাব শিল্প-কীর্তি হিসেবে অশোক গুহের সাহিত্য শক্তির স্বাক্ষর তার প্রথম উপন্যাস ‘গোরা কালার হাট’ সত্যি আমাদের বিস্মিত করেছে। আরও সবাই বলেন ১৯৬১ সালে প্রকাশিত অনবদ্য ক্লাসিক উপন্যাস।

লন্ডন ইউনিভার্সিটির বঙ্গ-সাহিত্যের অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশের আরও একটি মননশীল উপন্যাস

সোমাস্ত

মূল্য : ৩ টাকা

আর বিশ্বনাথনের স্বনামে বিশ্বনাথ রায়ের দৈনন্দিন জীবনের মধ্য আলেখ্য

চৌধুরী বাড়ি

মূল্য : ৪ টাকা

(সিনেমায় রূপান্তরের পথে)

মাইকেলের

মেঘনাদ বধ কাব্য

মূল কাব্যসহ টিকাটিপ্পনী ও নানাবিধ মৌলিক সমালোচনাসহ এম-এ ও বি-এ এবং বিশেষ বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের অপরিহার্য গ্রন্থ। সম্পাদনা করেছেন :
অধ্যাপক কমল গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ
মূল্য : চার টাকা

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

১৯এ বসিঙ্গ চ্যাট্‌জেন স্ট্রিট,
কলিকাতা—১২

সাহিত্যের ইতিহাসকে অনেকখানি সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। 'উত্তর তরঙ্গের নায়ক' সেক্ষেত্রে অনু-স্নেহযোগ্য নয়। তরুণ কবিদের মধ্যে যে কয়েকজন কিছুটা স্বাভাবিক-চিহ্নিত, গ্রীসেন তাঁদেরই একজন। প্রকরণ-নৈপুণ্যে, চিত্রকল্পে এবং প্রতীকের ব্যবহারে সং কবিচিন্তার পরিচয় রয়েছে তাঁর কাব্যে। পৌরাণিক কাহিনীগুলি নবতর ব্যাখ্যা সজীবতা লাভ করেছে এবং এই গ্রন্থ পাঠ করবার সময় যে পরি-মণ্ডলে পাঠক উপস্থিত হয় তা ক্ষমতা-শালী কবির দ্বারাই সৃষ্টি করা সম্ভব। কাব্য-গ্রন্থটির সংলগ্ন 'শ্বেত আকন্দ' একটি কাব্যনাট্য, যা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সমকালীন জীবনের নিরাশা নিরানন্দময় অস্তিত্বের মূলে যে অবিশ্বাস ও সংশয়, যা প্রতি মহাতে-নরকে নির্বাসিত করে তা কবিমনের গভীরে আন্তরিক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। কাব্যনাট্যে তারই জিজ্ঞাসার ও উত্তরের ইঙ্গিত বর্তমান। সার্থক প্রতীকধর্মী কাব্যনাট্য রচনার প্রয়াস হিসাবে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আয়তন ছোট হলেও কিছু অংশ অভিনয়যোগ্য। মূদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

পথ অন্তহীন— (উপন্যাস) অমিয়া চক্রবর্তী। প্রকাশক : সান্যাল এন্ড কোং। ৪৬, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯। দাম—২-৫০ নয়া পয়সা।

গতানুগতিক ভঙ্গীতে রচিত উপ-ন্যাস। শৈশবে যে রনজু একদিন চুল ধরে টেনে রসিকতার চেষ্টা করেছিল নায়িকা লীলা অবশেষে একদিন রনজু-দার সঙ্গেই অনির্দিষ্ট দুর্গম পথে যাত্রা করে। তবে রচনার মধ্যে যথেষ্ট সংযম এবং কৃতিত্বের পরিচয় আছে। গল্পটি সুখপাঠ্য। ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।

অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক অভিধান (অভিধান) যতীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রকা-শক : ক্যালকাটা টেলিট বুক সোসাইটি, ১৩, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দশ টাকা।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে অভি-ধান প্রকাশিত হচ্ছে—এ এক সুলক্ষণ। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার বৈদেশিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির বা বৈদেশিক ভাষার ভাবগত অর্থ প্রকাশ করতে হবে, তাই পরিভাষা রচনা করা একটি দুরূহ কর্ম এবং তার অসীম গুরুত্ব। মাঝে মাঝে বিভিন্ন সূত্রে পরি-ভাষা কমিটি গড়ে উঠেছে এবং তাঁরা কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ রচনা করেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অবশ্য হাস্যকর হয়েছে যেমন 'কেরাণী'কে করণিক করা হয়েছে। এমন ধরনের শব্দরচনা করা কর্তব্য যা সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়। পরিভাষা প্রণয়ন প্রসঙ্গে আর একটি প্রয়োজন সমতারক্ষা, বিশ্ব-বিদ্যালয় একরকম পরিভাষা প্রণয়ন করবেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আর একপ্রকার এবং রাইটার্স বিল্ডিং অন্য-প্রকার। এই অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। উদ্দেশ্য যেখানে এক সেখানে সহজেই একটা সমস্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ দত্ত দীর্ঘ-দিনের অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম সহকারে 'অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক অভিধান' প্রণয়ন করেছেন, তাঁর এই প্রচেষ্টা অভি-নন্দনযোগ্য। গ্রন্থটিতে পারিভাষিক শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ-কৌশল প্রদর্শন করায় মূল্যবোধ পেয়েছে। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক অভিধান প্রথম প্রচেষ্টা। জ্ঞানাস্রবীর কাছে এই গ্রন্থটি যে এক মূল্যবান সম্পদ সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নয়।

II সংকলন ও পত্র-পত্রিকা II

দশক-নব বাংলা নাট্য পরিষদ পরি-চালিত—সম্পাদক : রবি মিত্র, দেব-কুমার বসু। ৬, বসিকুম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। বিশেষ সংখ্যা : ২৫ নং পঃ।

'দশক'র আলোচ্য সংখ্যাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অল্পকয়েক দিনের মধ্যে গভীর মননধর্মী বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকা-শিত হয়ে পাঠকসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছে। শিল্প বা সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় এমন একটি পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। 'দশক' সে প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছে।

এই সংখ্যায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-সম্পর্কিত সচিত্র আলোচনা খুবই মূল্য-বান। অনুসন্ধানসূত্র পাঠকমাত্রেরই অনেক কিছু জানতে পারবেন এর থেকে। 'সৌন্দর্য ও বর্বরতা' নামক আলোচনার সেকাল ও একালে সৌন্দর্যের ওপর অত্যাচারের তথ্যভিত্তিক আলোচনা শিল্প-রসিক মাত্রকেই মুগ্ধ করবে। আরও অনেকগুলি মূল্যবান আলোচনা সংকলিত হওয়ায় এই বিশেষ সংখ্যাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সাম-কালের কয়েকজন দেশী শিল্পপীর শিল্প নিদর্শনও তুলে দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক কবিতা—সম্পাদনায় : দত্ত। আধুনিক কবিতা কার্যালয় : পোস্টাল কলোনী, কলিকাতা-৩২। দাম ৭৫ নং পঃ।

সাম্প্রতিককালের কবিদের বিভিন্ন কবিতার সংকলন। প্রফুল্লকুমার দত্তের বাংলা কবিতায় 'আধুনিকতা' শীর্ষক আলোচনা আরও দীর্ঘ হওয়া উচিত ছিল। আভিসংক্ষিপ্ততা দোষে লেখাটি সম্পূর্ণত্যাগ করতে পারেন। সাম্প্রতিক কালের প্রবীন ও নবীন মিলিয়ে বিশজনেরও বেশী কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। আধুনিক চেক সাহিত্যিক ক্যারেল হাইনেক ম্যাখ্যার 'মে' নামক কাব্যগ্রন্থের সুন্দর রম্মানবাদ করেছেন শিবপ্রসাদ বিশ্বাস। সম্পাদকের দায়িত্বশীল হলে ভবিষ্যতে পত্রিকাটি আরও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে কাব্যরসিকদের কাছে।

নবজাতক—সম্পাদক : সুজিতকুমার নাগ। সম্পা পাবলিসিটি : ৪৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—২৫ নং পঃ।

জরাসন্ধ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সত্যরত্ন মিত্র, তন্ময় বাগচী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা সংকলন করা হয়েছে ছোটদের উপযোগী করে।

দৈকত—সম্পাদক : অরবিন্দ কলি। শিলিগুড়ি হতে প্রকাশিত। ৫ম, ৬ম ও ৭ম সংখ্যা।

শিলিগুড়ি হতে প্রকাশিত এই পত্রিকাটিতে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, সংবাদ, মহিলামহল প্রভৃতি অনেককিছুই স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলি ভাল হয়নি। অন্যান্য রচনা সাধারণস্তরের। অঙ্গসজ্জায় ও সম্পাদনায় সম্পাদককে আরও অবহিত হতে হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত?

মানব-মন

বর্তমান সংখ্যা পড়ুন।

পাভলভ ইনস্টিটিউট

১০২।১এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৪

যে শ্রম সূহ

নান্দীকর

আজকের কথা

দলিল-চিত্র কথা :

চলচ্চিত্র প্রধানতঃ তিনটি উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় :

(১) কোনো ঘটনার রেকর্ড বা নথি রাখার জন্যে;

(২) কোনো ঘটনা বা বিষয়কে সৃষ্টি-কর্মিতার সাহায্যে নবরূপ দানের জন্যে

(৩) কাহিনী-চিত্র নির্মাণের জন্যে।
দলিলচিত্র কথাটা সাধারণভাবে প্রথম উদ্দেশ্যে নির্মিত চলচ্চিত্র সম্বন্ধে

প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ঘোড়দৌড়, ফুটবল খেলা, টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ, জাতীয় সীতার প্রতিযোগিতা, উইম্বেল্ডনে টেনিস খেলা, অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বা ইংলন্ডের রাণী এলিজাবেথের ভারতভ্রমণ কিংবা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ ইত্যাদি ঘটনার চলচ্চিত্রিক রেকর্ডকে যদিও আমরা সংবাদ-চিত্র নামে অভিহিত করি, তবুও ও এক দিক দিয়ে দলিলচিত্রের পর্যায়ভুক্ত। যে ইংরেজী কথার বাংলা হচ্ছে, দলিল-চিত্র, সেই ডকুমেন্টারী কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন জন গ্রীয়ারসন এবং তিনিও এটি পান ফরাসী ভাষা থেকে। ফরাসীরা

তাদের দেশে জনপ্রিয় ভ্রমণচিত্র সম্পর্কে 'ডকুমেন্টের' কথাটি ব্যবহার করত। ১৯২০-দশকের শেষভাগে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি নির্মিত ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গ্রীয়ারসন এই ডকুমেন্টারী শব্দটি প্রথম চালু করেন।

১৯১৩ সালে প্রস্তুত হবার্ট পলিং-এর 'উইথ স্কট ইন দি অ্যান্টার্টিক' থেকে সুরু করে ১৯২৫ সালে সোডাস্যাক এবং কুপার নির্মিত 'গ্র্যাস' এবং ১৯২৭ সালে ডরু রুটম্যান নির্মিত 'বার্লিন' পর্যন্ত বহু বিষয় ও ঘটনা নিয়ে বহু দলিল-চিত্রই তৈরী হয়েছে; কিন্তু ১৯২২ সালে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির 'নান্দুক অব দি নর্থ' নামে এস্কিমো-জীবন নিয়ে নির্মিত ছবি এখন সাধারণো আত্মপ্রকাশ করল, তখনই একটি দলিল-চিত্র যে কি অপরূপভাবে সৃষ্টিধর্মী হতে পারে, তা লোকে বিশ্বাসের সঙ্গে নিরীক্ষণ করল। ফ্ল্যাহার্টি মাত্র এস্কিমোদের দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধকে দরদের সঙ্গে চিত্রিত করেই সন্তুষ্ট থাকেননি, তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতিকে মানুষের নিজের কাজে লাগাবার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার ওপরই সভ্যতার অগ্রগতি নির্ভর করছে। এই ছবি দেখে পল রোথা মন্তব্য করেছেন, "ছবিখানি জীবন্ত দৃশ্যতোলায় ব্যাপারে একটি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠা করেছে।" জন গ্রীয়ারসন বলেছেন "সাধারণ অনুভূতির স্পন্দনকে এমনই দরদের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে যে; হালিউডের কৃত্রিম দৃশ্যপটের ভিতর থেকে আজ পর্যন্ত এতখানি প্রাণস্পর্শী নাটক সৃষ্টি হয়নি।" "রবার্ট ফ্ল্যাহার্টিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি বাস্তবের চিত্রায়ণে সৃষ্টিধর্মিতার প্রয়োগ করেন। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্কে তিনি প্রকাশ করেছেন সুসম্মান্য কাব্যের ভঙ্গীতে।

ফ্ল্যাহার্টিকে বাদ দিলে কিন্তু দলিল-চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ইংলন্ডের দলিল-চিত্র পরিচালকেরা। এদের মধ্যে প্রথমেই আসেন জন গ্রীয়ারসন। হেরিং মাছধরা জেলের জীবনী নিয়ে রচিত "ড্রিফটার্স" ছবি তিনি তৈরী করেন ১৯২৯ সালে। যদিও তিনি এই ছবিতে রুশ চলচ্চিত্ররীতির বহুল প্রয়োগ করেন, অবু ও যেভাবে তিনি এই ছবির মাধ্যমে সমাজসেবাপরায়ণ একটি সম্প্রদায়কে সাধারণের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তাতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। গ্রীয়ারসনের নেতৃত্বে এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড যেসব দলিল-চিত্র নির্মাণ করেছেন তাদের মধ্যে কান্ডি



'শান্তি' চিত্রে নায়কের ভূমিকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

কামস্ টু টাউন" (বেসিল রাইট ১৯৩১-৩২) "ওর হিল অ্যান্ড ডেল" (বেসিল রাইট ১৯৩২), "উইন্ডমিল ইন বারবাজেজ" (বেসিল রাইট ১৯৩৩) "কাগো ফ্রম জামাইকা" (বেসিল রাইট ১৯৩৩), "ইন্ডাস্ট্রিয়াল বটেন" (গ্রীয়ার-সন ও ফ্লাহার্টি; ১৯৩৩), "গ্র্যাটন ট্রলার" (এডগার অ্যানার্ট ১৯৩৪) এবং "এরো এঞ্জিন" (আর্থার এটন ১৯৩৪)—এই ছবি ক'খানির নাম উল্লেখযোগ্য।

দলিল-চিত্র নির্মাণে ইংলন্ডের এই সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বহু বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানও বিস্তৃত জনসংযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই কাজে ব্রতী হন। বর্ম অয়েল কোম্পানীর শেল ফিল্ম ইউনিট, সিলোন টি প্রোপাগান্ডা বোর্ড, দি ট্রাভেল এ্যাসোসিয়েশন, ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নাম এই সম্পর্কে করা যেতে পারে। এই সংগে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগও নিজস্বের পক্ষ থেকে ছবি করতে সুরু করেন। এই সব প্রচেষ্টার ফলে "কন্টাক্ট" (পল রোথা ১৯৩২), "সংগ অব সিলোন" (বেসিল রাইট, ১৯৩৫), "হার্ডিং প্রবলেম" (আর্থার এলটন ও এডগার অ্যানার্ট, ১৯৩৫), "ওয়ার্কস এন্ড জবস" (আর্থার এলটন, ১৯৩৫), "এনাফ টু ইউ" (এডগার অ্যানার্ট, ১৯৩৬), "দি স্মোক মেনাস" (জন টেলর, ১৯৩৭), "টো ডে উই লিভ" (রাবি, আই গ্রীয়ারসন, ১৯৩৭), "দি লন্ডনাস" (জন টেলর, ১৯৩৮), "ফোর ফেসেস" (আলেকজান্ডার শ, ১৯৩৮), "ওয়েল্থ অব এ নেশন" (ডোনাল্ড আলেকজান্ডার, ১৯৩৮) প্রভৃতি খ্যাতিমান দলিল-চিত্রের জন্ম হয়।

এই সময়ে গোমে ব্রিটিশ ইন্সট্রাকশনাল কোম্পানী রুশ উলফ, প্যারিস-স্মিথ ও মেরী ফিল্ডের নেতৃত্বে যে সব দলিল-চিত্র নির্মাণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "দি মাইন" (জে বি হোমস, ১৯৩৫), "চিলড্রেন অব দি ফিউচার" (ডোনাল্ড টেলর, ১৯৩৫); "দি ফেস অব বটেন" (পল রোথা ১৯৩৫), "শিপ ইয়ার্ড" (পল রোথা ১৯৩৫), "দি

গ্যাপ" (ডোনাল্ড কার্টার ১৯৩৭), "দিস ওয়াজ ইংল্যান্ড" (মেরী ফিল্ড ১৯৩৮), এবং "দে মেড দি ল্যান্ড" (মেরী ফিল্ড, ১৯৩৮)।

১৯৩৩ সালে এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড ভেঙ্গে যাবার পর জন গ্রীয়ারসন জি পি ও ফিল্ম ইউনিটে যোগ দেন প্রধান প্রযোজকরূপে। এই ইউনিটের আমন্ত্রণে ১৯৩৬ সালে ক্যাভালক্যান্ট এর অন্যতম প্রযোজক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই ইউনিট যে-সব উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরী করেছিল, তাদের নাম—"আন্ডার দি সিটি" (আর্থার এলটন ও আলেকজান্ডার শ, ১৯৩৪), "ওয়েদার ফোরকাস্ট" (এভেলিন স্পাইস, ১৯৩৪), "এয়ার মেল" (আর্থার এলটন ও আলেকজান্ডার শ, ১৯৩৫), "কেলফেস" (গ্রীয়ারসন ক্যাভালক্যান্ট, ও অডেন, ১৯৩৫), "নাইট মেল" (ওয়া, রাইট ও ক্যাভালক্যান্ট, ১৯৩৬), "উই লিভ ইন টু ওয়ার্ল্ডস" (ক্যাভালক্যান্ট ১৯৩৭) এবং নর্থ সী (হারি ওয়াট, ১৯৩৮)।

এইভাবে যে তিনশো দলিল-চিত্র যুদ্ধপূর্ব যুগে তৈরী হয়েছিল, তার উপকরণও যেমন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হয়, তেমনি তাদের প্রকাশভঙ্গীও ছিল বিচিত্র। "সং অব সিলোন"-এ ছিল ক্যাব্যাক সুখমা, "সীপইয়ার্ড"-এ ছিল প্রচণ্ড গতিশীল ইমপ্রেশনিজম, "হার্ডিং প্রবলেম"-এ বাস্তব সমাজ-চেতনা এবং "ফেস অব ব্রিটেন"-এ বিশাল পরিধিবিশিষ্ট মূল্যায়ন।

এর পর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল, তখন ইংলন্ড সরকার যুদ্ধ-প্রচার কার্যের জন্যে "তথ্য বিভাগ"-কে ঢেলে সাজলেন এবং জি, পি, ও-ফিল্ম ইউনিটের সহায়তায় তৈরী হ'ল "দি ফাস্ট ডেজ", "স্কোয়ার্ডন ১৯২" প্রভৃতি ছবি। বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি প্রদর্শনীর প্রথম পাঁচ মিনিট প্রতি চিত্রগৃহে "প্রচার-চিত্র" দেখানো হ'তে লাগল। এ ছাড়া পঞ্চাশটি প্রদর্শনী-গাড়ী করে শহরে বা গ্রামে বিকুলো জনতাকে প্রচার-চিত্র দেখানো হ'তে লাগল। এর প্রত্যক্ষ ফল হ'ল এই যে, সাধারণ লোক চলচ্চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত হ'তে লাগল। লোকের জ্ঞানের পিপাসা বেড়ে গেল; মানুষ এই বিশাল পৃথিবীর কোথায় কি আছে, বিভিন্ন দেশবাসীর জীবনযাত্রা কি প্রণালীতে নির্বাহিত হয়, এই সব জিনিস সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্যে চলচ্চিত্রের স্বেচ্ছা হ'তে লাগল। যুদ্ধ থেমে গেলেও তথ্য ও প্রচার বিভাগের কাজ থামল না। সংবাদ-চিত্র ও দলিল-চিত্র সমাজ-জীবনে তাদের স্থান

কার্যমী করে মাত্র টিকেই রইল না, দিন দিন শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হ'তে থাকল।

ইংলন্ডের বাইরে রাশিয়াতে কাহিনী-চিত্রই দলিল-চিত্রের রূপ গ্রহণ করেছিল। পুডভিকিনের "মাদার", "স্টর্ম ওভার এশিয়া" বা আইসেনস্টাইনের "ব্যাটলসীপ পোটোমকিন" হচ্ছে আসলে রাষ্ট্রীয়-সংগ্রামের চিত্র, যে-সংগ্রাম ও-দেশের জন-সাধারণের জীবনে প্রত্যক্ষ বস্তু। তাই সমাজ-চেতনাসম্মিত বাস্তবতা রাশিয়ার কাহিনী-চিত্রেও রূপায়িত হওয়া সহজ হয়েছিল। এবং কাহিনী-চিত্রগুলি দলিল-চিত্রের মর্যাদা পেয়েছিল। ইংলন্ড ও রাশিয়া ছাড়া ইয়োরোপের কোথাও দলিল-চিত্র নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। ফ্রান্সে যে-ক'টি দলিল-চিত্র সৃষ্ট হয়েছিল, তার জনক হ'ল ওখনকার "আর্ভাগার্ড" আন্দ্রে এবং অনবদ্য দলিল-চিত্র ক্যাভালক্যান্ট যে শেষ পর্যন্ত গ্রীয়ারসনের আহবানে ১৯৩৪ সালে ইংলন্ডে চলে গিয়েছিলেন, সে খবর আগেই বলা হয়েছে। হল্যান্ডের জারিস আইভেন কয়েকটি সাংখ্যিক দলিলচিত্র করার পরই রাশিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। রাশিয়ান যুবলীগের হয়ে "কোমসোমোল" ছবি করার জন্যে। তিনি পরে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সহযোগিতায় স্পেনদেশে তুলেছিলেন "স্প্যানিশ আর্থ"। ১৯৩২ সালে বন্দুয়েল স্পেনের অর্থসভা জরিফ হাউসে নোদের দৃষ্টি ও অশ্রুকারময় জীবন-যাত্রা নিয়ে "ল্যান্ড উইদাউট ব্রেড" নামে একটি অনবদ্য দলিল-চিত্র তুলেছিলেন।

আমেরিকার প্রথম উল্লেখযোগ্য দলিল-চিত্র নির্মিত হয় ১৯৩৬ সালে; রুজভেল্ট সরকারের পুনর্বাসন পদ্ধতির ওপর প্যারে লোরেন্স তৈরী করেন "দি প্লাউ ও দি ব্রোক দি প্লেনস"। কৃষি-নিরাপত্তা দপ্তরের হয়ে লোরেন্স "দি রিডার" নামে দলিল-চিত্র প্রস্তুত করেন, সেটি আমেরিকায় নির্মিত দলিল-চিত্রগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ১৯৩৫ সাল থেকে আমেরিকা সমকালীন বিষয় নিয়ে "মার্চ অব টাইম" সিরিজ শুরুর করে। এবং এরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে কানাডা শুরুর করে "কানাডা ক্যারিজ অন" ও ইংলন্ড করে "দি মডার্ন এজ"। অপূর্ব জীবন্ত চলচ্চিত্রায়ণ, অত্যন্ত সুন্দর নাটকীয়তাপূর্ণ নেপথ্য বিবৃতি এবং সম্পাদকীয় চাতুর্যের দ্বারা লম্বা অসামান্য গতিশীলতা এই সিরিজের ছবিগুলির প্রাণ। পল স্ট্র্যান্ড মেক্সিকো ধীরজীবনের ওপর তৈরী করেছিলেন "দি ওয়েড", (১৯৩৫), রাল্ফ স্টিনার ও উইলার্ড ভ্যান ডাইক সম্মিলিতভাবে নাগরিক জীবনে সামাজিক সঙ্কটসমূহের প্রয়োজনীয়তাকে উপলক্ষ্য করে নির্মাণ করেছিলেন "দি সিটি" (১৯৩৯)। ভ্যান

দক্ষিণ
কলিকাতায়
সড়কা
জাগিয়েছে

প্রতি বৃহস্পতি
সংখ্যা ৫৮৪
খিয়েটার
ইউনিট-এর

কলিকাতা

মহারাজ নিবাস

৪৭-৫১৯৫

১৫, হাজরা রোড

ডাইক "চিলড্রেন মাস্ট লাগ" (১৯৪১) এবং "ভ্যালি টাউন" (১৯৪১) নামেও দু'খানি সুন্দর দলিল-চিত্র তৈরী করেছিলেন।

জর্জ গ্রীয়ারসন ১৯৩৯ সালে কানাডা সরকারের ন্যাশানাল ফিল্ম বোর্ডের সর্বময় কতীর পদ গ্রহণ করেন এবং আইভেন্স, স্টুয়ার্ট লেগ ও রোমান্ড স্পাটশউডের সহযোগিতায় "কানাডা ক্যারিজ অন" এবং "ওয়ার্ল্ড ইন অ্যাকশন" নামে দু'টি সিরিজের মাধ্যমে বহু দলিল-চিত্র নির্মাণ করেন।

স্ক্যান্ডিনেভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, ইটালী, এমন কি প্রাচ্যে জাপান, চীন ও ভারতেও দলিল-চিত্র প্রস্তুত হতে শুরু করেছে যুদ্ধপূর্ব সময় থেকেই। দলিলচিত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজকারী সকল জাতির সকল লোকই পূর্ণ সজাগ। ফিল্ম হচ্ছে সংস্কৃতি নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক মাধ্যম। দলিল-চিত্রের সাহায্যে আমরা যেমন আমাদের জাতীয় সভ্যতাকে অপর দেশের সামনে উপস্থাপিত করতে পারি, ঠিক তেমনি অপর দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারি এই সব দেশে তৈরী দলিল-চিত্র ফলনের ফলে।

বঙ্গীয় নাট্য সংসদের "জনক" :

গেল রবিবার, ১১ই মার্চ নিউ এম্পায়ার মঞ্চে বঙ্গীয় নাট্য সংসদের সভ্যরা সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী রচিত নতুন নাটক "জনক"-কে মণ্ডস্থ করেছিলেন।

সুইডিস লেখক অগাস্ট স্ট্রীনবার্গের ১৮৮৮ সালের রচনা "ফাডরেম"-এর বাঙলা রূপান্তর করেছেন সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী "জনক" নামে। নরনারীর সম্বন্ধ বড় বিচিত্র। নারী একাধারে কন্যা, জামা, জননী; পুরুষও একাধারে সন্তান, স্বামী ও পিতা। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ পুরুষ ও নারী কখনও পরস্পরকে ভালবাসে, কখনও একজন নিজেকে অসহায় জ্ঞানে অপরকে পক্ষপটে আশ্রয় নেয়; আবার কখনও অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক অপরকে কাছ থেকে দূরে সরিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাতে নিপীড়িত করতে চায়—নিজের বিষে সে খালি নিজেই জর্জীরত হয় না, তার চারপাশের আবহাওয়াকেও বিষাক্ত করে তোলে।

যুদ্ধাহত স্বয়ংস্বত্বকে লতা শূন্য করেছিল মায়ের ভালোবাসা দিয়ে। কিন্তু স্বয়ংস্বত্ব তার সেবার সুস্থ হয়ে উঠে প্রতিদানে লতাকে দিল প্রেমের ডালি, এবং

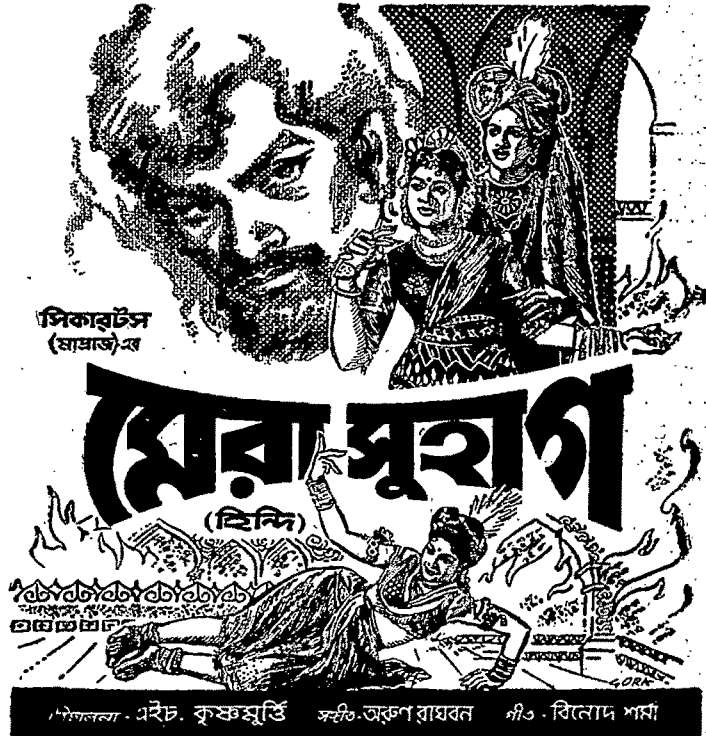
সুন্দরী যুবতী লতাকে করল তার জীবনের সহধর্মিণী। নাটকের সুদৃশ্যতা এর অনেক পরে। তখন লতা-স্বয়ংস্বত্বের কন্যা সিনিয়ার কৌশলজ পাশ করে কলেজে ভর্তি হবার জন্যে তৈরী। যুদ্ধে অসামান্য সাহসিকতা দেখাবার জন্যে স্বয়ংস্বত্ব ভিক্টোরিয়া ক্রস স্মারক সমানিত। উল্কার মধ্যে কয়লার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে সে অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে পরিচয় যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে। এমন সময় সংঘাত বাধল কন্যা সীতার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা উপলক্ষ্যে। পিতা চায় মেয়ে উচ্চ শিক্ষিতা হোক; মা চায় মেয়ে বিবাহ করে সংসারী হোক; কারণ ইতিমধ্যে মেয়ে চিত্রবিদ্যা শিখতে গিয়ে শিক্ষকের প্রণয়ভাজন হয়েছে। এই মতবিরোধের যে

কি বিপর্যয়কারী পরিণতি সম্ভব, স্ট্রীনবার্গকে অনুসরণ করে "জনক"-এর নাট্যকার তাই দেখাতে চেয়েছেন। "কোনো পিতাই বলতে পারে না, সে যাকে সন্তান মনে করছে, সে তারই ওরসজাত কিনা", এই ফ্রয়েডী-মতের ওপর নির্ভর করে নাটকের ঘটেছে বিস্তার, পুঞ্জীভূত হয়েছে ট্রাজেডী, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর হিমশীতল হাত এসে স্বয়ংস্বত্বকে দিয়েছে চরম সান্নিধ্য।

মনস্তত্ত্বপ্রধান নাটকটিকে একটি মাত্র ঘটনাস্থলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নাট্যকার মুনসীরানার পরিচয় দিয়েছেন যেমন, ঠিক সমানভাবেই তিনি বাঙলা রূপায়ণে বৈদেশিক দৃষ্টিটিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিতে

শুক্রবার, ১৬ই মার্চ

যাদুর চমক...সঙ্গীতের রসিক...আপনাকে মগ্ন করবে
মাদ্রাজের আর একটি সঙ্গীতমুখর শ্রেষ্ঠ হিন্দী ছবি



—আগামী শুক্রবার হইতে—

নিউ সিনেমা :: কৃষ্ণ

(শীত-তাপ
নিয়ন্ত্রিত)

দর্পণা

(শীত-তাপ
নিয়ন্ত্রিত)

কালিকা ন্যাশনাল



ভূপেন সান্যাল ও এস. গৃহঠাকুরতা পরিচালিত 'চেউয়ের পরে চেউ' চিত্রে শংকর ও শম্মা। রেনেসাঁ ফিল্মস পরিবেশিত চিত্রে এই সম্ভাবনাপূর্ণ অভিনেতা ও অভিনেত্রী দুজন চিত্র-জগতে নতুন

পারেননি। দু'চারটি শব্দ পরিবর্তন-সাপেক্ষ হ'লেও মোটের ওপর নাটকের ভাষা এমন সহজ ও স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে যে, মনেই হয় না নাটকটি কোনো বিদেশী ভাষা থেকে তর্জমা করা হয়েছে। নাট্যকার সোমেন্দ্রচন্দ্র এর জন্যে আমাদের উচ্চ প্রশংসার অধিকারী।

অভিনয়ে ক্যাপ্টেন স্বয়ম্ভু ভট্টাচার্যের ভূমিকায় সোমেন্দ্রচন্দ্র অসামান্য নাট্য-নিপুণতার পরিচয় দিলেন। তিনি যে ধীরে ধীরে একটি মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন, তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কৃত হয়েছে তাঁর ক্রমবিবর্তনশীল অভিনয়ের মাধ্যমে। লতার ভূমিকায় মিনতি গুপ্তা তাঁর চরিত্র প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সংযত অভিনয়ের ভিত্তি দিয়ে; তাঁর পরিমিত-বোধ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। এ ছাড়া সুনীলধর, ডাক্তার সেন, নকুল, শিবু এবং সীতার ভূমিকায় যথাক্রমে অদিৎ কুন্ডু, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, প্রদীপ গুপ্ত, চিন্দু গোস্বামী ও শিপ্রা নিয়োগী স্ব স্ব ভূমিকানুযায়ী যথাযথ অভিনয় করেছেন।

দৃশ্যপরিকল্পনা ও আলোকসম্পাতে অমর ঘোষের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

বিশিষ্ট সংবাদ

চিত্রশোভনার "শাস্তি" : আজ শুক্রবার, ১৬ই মার্চ সিনে ফিল্মসের পরিবেশনায় চিত্রশোভনা প্রযোজিত এবং দয়্যাদাই পরিচালিত "শাস্তি" চিত্রের উন্মেষন হচ্ছে উত্তরা, পূর্ববঙ্গী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর ছবিঘরে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত এই কাহিনীটির রূপায়ণে আছেন সন্ধ্যা রায়, অপর্ণা দেবী, পদ্মা-দেবী, মালবিকা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সবিতারত দত্ত,

কালী সরকার, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি। ছবিটিতে সুদারোপ করেছেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ এবং এর চিত্রগ্রহণ করেছেন সুধীশ ঘটক।

মুভিটক প্রাইভেট লিমিটেডের "শিউলি-বাড়ি" :

সুবোধ ঘোষের "নাগলতা" অবলম্বনে তপন সিংহ কর্তৃক চিত্রনাট্যকারে গ্রথিত এবং পায়ুষ বসু পরিচালিত "শিউলি-বাড়ি" প্রভা পিকচার্সের পরিবেশনায় শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা ও শহরতলীর অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে খুব শিগ্গে গিরই। ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন অরুণ্ডতী, রঞ্জনা, গীতালি রায়, উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, দিলীপ রায়, তরুণকুমার এবং বীরেশ্বর সেন। চিত্র গ্রহণ করেছেন দীনেন গুপ্ত এবং সংগী পরিচালনা করেছেন অরুণ্ডতী মুখোপাধ্যায়। ছবির সুন্দরকার হিসেবে শ্রীমত মুখোপাধ্যায়ের এই প্রথম আত্মপ্রকাশ।

পরলোকে কাজরী গৃহ :

চিত্র ও মঞ্চাভিনেত্রী কাজরী গৃহ মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে অকালে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্বামী ডাঃ রবেন সরকার অকল্যাণ্ড নার্সিং হোমের অন্যতম সত্ত্বিকারী। এইখানেই একটি অস্ত্রোপচারের পর সহসা শ্রীমতী গৃহের অবস্থার অবনতি ঘটায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কলকতার চলচ্চিত্র সমালোচকের রায়ঃ

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি ১৯৬১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশী-বিদেশী ছবিগুলি সম্পর্কে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের রায় ঘোষণা করেছেন। এঁদের মতে সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসনের "তিন কন্যা" শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং এর পর গুণানুসারে আছে— "গংগা-মদুনা" (হি), "পুনশ্চ", "মধ্য-রাডের তারা", "সম্পদী", "কানুন" (হি), "চার দিওয়ানী" (হি), "উসনে কথাখা" (হি), "জিস দেশমে গংগা বহতী হৈ" (হি) ও "স্বয়ম্বর"।

শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন সত্যজিৎ রায় (বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে), নীতীন বসু (হিন্দী) এবং উইলিয়াম ওয়াইলার ('বেন-হুর'—বিদেশী ছবি)।

বিদেশী ছবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ দশটি বলে বিবেচিত হয়েছে : বেন-হুর,

স্টার থিয়েটার

[সীতাতপ নিয়ন্ত্রিত] ফোন : ৫৫-১১৩৯

নতুন নাটক

শেষাঙ্গি

কাহিনী : শক্তিপদ রাজগুরু
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
গান : শৈলেন রায় • সুর : দুর্গা সেন
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬টা
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬টা

৥ রূপায়ণে ৥

কমল মিত্র - অজিত বন্দ্যো - আশীষ কুমার
অপর্ণা দেবী - লিলি চক্রবর্তী - বাসবী নন্দী
অনুপকুমার - চন্দ্রশেখর - বীরেশ্বর সেন
গীতা দে - সাধনা রায়চৌধুরী - জাহাঙ্গীর
শ্যাম লাহা - প্রেমেন্দ্র বোস - ডানু বন্দ্যো

দি অ্যাপার্টমেন্ট, কানাল, গাল' সীক্স হুদার, দি মিলিয়নিয়ারেস, অন দি বীচ, সাউথ পার্সিফিক, পেপে, দি সিংগার নট দি সঙ্গ এবং এলমার গ্যান্স্ট্রী।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীরাপে সম্মানিত হয়েছেন—উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন (বাংলা সন্তপদী), দিলীপকুমার ও বেজব্রতীমালা (হিন্দী গঙ্গা-যমুনা), চার্লটন হেস্টন (বেন-হুর) এবং শার্লো ম্যাকলেন (দি অ্যাপার্টমেন্ট)।

এছাড়া সুর রচনায়—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (স্বরলিপি) ও রবিশঙ্কর (সম্ভারাগ)—বাংলা; নৌশাদ (গঙ্গা-যমুনা)—হিন্দী; গীতি-রচনায়—গৌরী-প্রসন্ন মজুমদার (স্বরলিপি)—বাংলা; শাকীল বাদায়ুন (গঙ্গা-যমুনা)—হিন্দী; সংলাপ রচনায় : সন্তোষকুমার ঘোষ (স্বয়ংবরা)—বাংলা; বাজাহত মির্জা (গঙ্গা-যমুনা), রাজেন্দ্রকৃষ্ণ (ছায়া) ও এস খলিল (উসনে কথা থা)—হিন্দী; চিত্রগ্রহণে : অজয় কর ও দীনেশ গুপ্ত (সন্তপদী ও সম্ভারাগ)—বাংলা; বাবা-সাহেব (গঙ্গা-যমুনা)—হিন্দী; শব্দ-ধারণে : বাণী দত্ত (স্বরলিপি)—বাংলা; ধরমসে (গঙ্গা-যমুনা)—হিন্দী।

গেল ৩রা মার্চের সাধারণ সভায় নির্বাচিত বি এফ জে এ-র কার্যনির্বাহক সমিতিতে আছেন : সর্বশ্রী ভূষারকান্ত ঘোষ (সভাপতি), মনুজেন্দ্র ভঞ্জ (সহ-সভাপতি), বাণীশ্বরী ঝা ও সেবানুরত গুপ্ত (যুগ্ম-সম্পাদক), গিরীন্দ্র সিংহ (কাষাধ্যক্ষ) এবং নিমলকুমার ঘোষ, বি সি আগরওয়াল, মহেন্দ্র সরকার, পঙ্কজ গুপ্ত, এ এস মালিহাবাদী, কলপভদ্র সেনগুপ্ত, অজিত মুখোপাধ্যায়, রণধীর সাহিত্যালঙ্কার, এ এম কুমার ও শীতেন্দ্রনাথ মল্লিক।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা :

পোলিস ফিল্ম ফেস্টিভালের সাফল্যজনক আয়োজনের পর সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা তাঁদের সভা এবং বিশেষ আমন্ত্রিতদের জন্যে কয়েকটি চেকো-স্লোভাকিয়ার চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। ইতিমধ্যেই ২রা মার্চ তারিখ দক্ষিণ কলকাতার মুল্লুগুনে ১৯৫৭ সালে ভেনিস ফেস্টিভালে সমালোচকদের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি জিঁরি ওয়েসের “উলফ্ ট্র্যাপ” এবং গেল ৮ই মার্চ লোটাস সিনেমায় জেরোস্লাভ মার্চ পরিচালিত মোরাভিয়ান রোমান্টিক কম্‌ডি “ইট ওয়াজ নট ওয়েডিং ইয়েট” নামে একটি রঙ্গীন চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আরও দুটি বিখ্যাত ছবি ডঃ ফাউস্ট-এর কম্‌ডি অবলম্বনে গঠিত “আউট অব বীচ অব ডেভিলস” এবং

ওটাকার ভার্ভা পরিচালিত সন্তদশ শতাব্দীর কাহিনী অবলম্বনে গঠিত “এগেনস্ট অল”—খুব শিগগিরই দেখানো হবে।

রূপালী পিকচার্সের ‘মহামানবের তীরে’ :

বর্তমান সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে রচিত বিমলেন্দু ঘোষের “মহামানবের তীরে” কাহিনীটির চিত্ররূপে দিচ্ছেন রূপালী পিকচার্স নামে একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান। ছবিটির পরিচালনা করবেন

“চিত্রভানু” নামে একটি কলাকুশলী-গোষ্ঠী এবং এতে সুরারোপ করবেন হৃদয় কুশারী।

দশরূপকের “উর্বাশী নিরুদ্দেশ” :

আসছে রবিবার, ১৮ই মার্চ বেলা ১০টাের নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে দশ-রূপক নাট্যগোষ্ঠী মন্থন রায় রচিত অভিনয় নাটক “উর্বাশী নিরুদ্দেশ” অভিনয় করছেন। আশা করি, এই অভিনয়েও দশরূপকের ঐতিহ্য বজায় থাকবে।

শুক্রবার, ১৬ই মার্চ

উত্তরা : গুরবা : উজ্জ্বলা

নিউ তরুণ -- মৃণালিনী -- অজন্তা
মামাপুরী -- পার্বতী -- অশোক

চিত্রশোভনা প্রযোজিত

শ্রী

কাহিনী : নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পরিচালনা : দয়্যাদাই

সঙ্গীত : ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ

শ্রেষ্ঠাংশে : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সম্ভা রায়,
পদ্মা দেবী, অপরী দেবী, তুলসী চক্রবর্তী,
কালি সরকার, পবিতারত দত্ত, মালবিকা



খেলা খেলা

দশক

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট

ভারতবর্ষ : ৩৯৫ রান (বোরদে ৯৩, নাদকাণী নট আউট ৭৮, ইঞ্জিনার ৫৩, উমরিগড় ৫০; সোবার্স ৭৫ রানে ৪, হল ৭৯ রাণে ৩, গিবস ৬৯ রানে ২ এবং স্টেয়ার্স ৭৬ রানে ১ উইকেট)।

ও ২১৮ রান (ইঞ্জিনার ৪০, নাদকাণী ৩৫ এবং উমরিগড় ৩২। হল ৪৯ রানে ৬, গিবস ৪৪ রানে ৩ এবং সোবার্স ৪১ রানে ১ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৬৩১ রাণ (৮ উইকেটে ডিক্লার্ড। সোবার্স ১৫৩, কানহাই ১৩৮, ম্যাকমারিস ১২৫, মেনডোনকা ৭৮, ওরেল ৫৮ এবং স্টেয়ার্স নট আউট ৩৫। প্রসন্ন ১২২ রাণে ৩, দুরাণী ১৭৩ রাণে ২, দেশাই ৮৪ রাণে ১ এবং নাদকাণী ৫৭ রাণে ১ উইকেট)।

১ম দিন (৭ই মার্চ) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস—২৮০ রান, ৭ উইকেট পড়ে। নাদকাণী ২২ এবং ইঞ্জিনার ৬ রান করে নট আউট থাকেন। লাণ্ডের সময়ের স্কোর—৮৯ রান, ৪ উইকেট পড়ে। উমরিগড় ৫ রান এবং বোরদে কোন রান না করে উইকেটে নট আউট ছিলেন। চা-পানের সময়ের স্কোর—২০৮ রান, ৫ উইকেট পড়ে; উইকেটে ছিলেন বোরদে এবং দুরানী।

২য় দিন (৮ই মার্চ) : লাণ্ডের ১০ মিনিট পর ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৯৫ রানে সমাপ্ত হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস—১৫৭ রান, ১ উইকেট পড়ে। ম্যাকমারিস ৬৬ এবং কানহাই ৭৫ রান করে নট আউট থাকেন।

৩য় দিন (৯ই মার্চ) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস—৩৯৮, ৫ উইকেটে। সোবার্স ৬৩ এবং ওরেল ৪৩ রান করে নট আউট থাকেন। লাণ্ডের সময়ের স্কোর—২৬২, ১ উইকেটে। ম্যাকমারিস ১১১ ও কানহাই ১৩৪ রান করে নট আউট ছিলেন। চা-পানের সময়ের স্কোর—৩২৯, ৫ উইকেটে।

৪র্থ দিন (১০ই মার্চ) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ৬৩১ রাণে (৮ উইকেটে)

প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। লাণ্ডের সময়ের স্কোর : ৫১২ (৬ উইকেটে)—সোবার্স ১১৭ এবং মেনডোনকা ৩৬ রাণ করে নট আউট ছিলেন। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস : ৮৩ রাণ (৩ উইকেটে)—নাদকাণী ৯ এবং উমরিগড় ১২ রাণ করে নট আউট থাকেন।

৫ম দিন (১২ই মার্চ) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৮ রানে সমাপ্ত। ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক ইনিংস এবং ১৮ রানে জয়লাভ করেছে। প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষকে ১০ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পরাজিত করে। এখনও বাকি আছে তিনটি টেস্ট খেলা। টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ২-০ খেলায় এগিয়ে রইলো।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপ-গুলির মধ্যে জামাইকা দ্বীপ আকারে বড়। কিন্তু জামাইকার রাজধানী কিংসটনের সার্বিনা পার্ক ক্রিকেট মাঠ পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠের থেকে আকারে অনেক ছোট। মাত্র হাজার বার লোকের বসবার মত স্থান আছে এই মাঠে। সার্বিনা পার্ক মাঠের দ্বিতীয় স্টেডিয়াম টেসের বাজিতে ভারতবর্ষের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাস্টর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেলকে হারিয়ে দিয়ে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ নেন। এই নিয়ে কন্ট্রাস্টর উপস্থাপি ৭টা টেস্ট খেলার টেসে জয়ী হলেন—১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ ৪টে টেস্ট এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলতি টেস্ট সিরিজের ১ম ও ২ টেস্ট।

মাত্র কুড়ি মিনিট খেলা হয়েছে, দলের রান ১৪। এই অবস্থায় অধিনায়ক কন্ট্রাস্টর মাত্র ১ রান করে আউট হলেন। এই ভাঙ্গন রোধ করা গেল না। দলের ৪৪ রানে জয়সীমা, ৭৯ রাণে মঞ্জুরকার এবং লাণ্ডের তিন মিনিট আগে ৮৯ রানের মাথায় সূর্য বিদায় নিলেন। লাণ্ডের আগে আর কোন রান হ'ল না। লাণ্ডের সময়ের স্কোর ৪ উইকেট পড়ে ৮৯ রান। উইকেটে অপরাধী ছিলেন ৫ম উইকেটের জুটি উমরিগড় (৫ রান) এবং বোরদে (০)। এই ৫ম উইকেটের জুটিই দলের প্রাথমিক ভাঙ্গন রোধ করে দলের ৯৪ রান তুলে দেয়। ১২৭ মিনিটের খেলায় দলের ১০০ রান দাঁড়ায়। উমরিগড় দলের ১৮৩ রানে আউট হ'ল। তার এই

আউট হওয়ার ব্যাপার নিয়ে মাঠের দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়। স্কোর-বোর্ডে তাঁর নামের পাশে দেওয়া হয় 'কট'। অথচ তিনি বলই স্পর্শ করেননি। পরে আম্পায়ার কোলী ভ্রম-সংশোধন করেন—তখন দাঁড়ায় উমরিগড় 'এল-বি-ডবলিউ' হয়ে আউট হয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে লোকের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়।

প্রথম দিনের ১২৭ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের ১০০ রান এবং ২৩৪ মিনিটের খেলায় ২০০ রান পূর্ণ হয়। চা-পানের বিরতির সময় দলের রান দাঁড়ায় ২০৮, ৫টা উইকেট পড়ে। উইকেটে তখন অপরাধী ছিলেন বোরদে এবং দুরানী। দলের ২৩৪ রানের মাথায় আম্পায়ার ডেভিসের সিদ্ধান্তে দুরানী 'এল-বি-ডবলিউ' আউট হ'ল। আউটের জন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পক্ষ থেকে আবেদন ওঠে। আম্পায়ার ডেভিস কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আউটের নির্দেশ দেননি। তিনি প্রথমে ইতস্তত করে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ফেলেন, তারপর পকেট থেকে হাত বের করে আউটের সাক্ষ্য হিসাবে আঙুল তুলেন। দুরানী সম্পূর্ণভাবে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনবার পিছন ফিরে তাকিয়ে যান। এই সিদ্ধান্তে শঙ্কিত তিনি কেন বহু লোকই খুঁশি হ'তে পারেননি। বোরদে এবং দুরানীর ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৪৫ মিনিটের খেলায় দলের ৫১ রান ওঠে। বোরদের সঙ্গে খেলাতে নামেন নাদকাণী। বোরদের দুর্ভাগ্য, তিনি সেগুরী রান পূর্ণ করতে পারলেন না, মাত্র ৭ রানের জন্যে। ১৯৫৯ সালে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেই দিল্লীর ৫ম টেস্ট খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে বোরদেকে আর একবার দুর্ভাগ্যের কবলে পড়তে হয়; ৯৬ রান করে নিজের উইকেট ভেঙে ফেলে আউট হ'ল। ঐ খেলার প্রথম ইনিংসে তিনি সেগুরী (১০৯) করেছিলেন। টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসে সেগুরী করার গৌরব থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত হ'ল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় আজও কোন ভারতীয় খেলোয়াড় এই সম্মান লাভ করতে পারেননি। শেষ কালে 'চার রান' এই দুর্লভ সম্মান থেকে বোরদেকে বঞ্চিত করে। এবার তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছে—সাত রান। বোরদে ১৮৬ মিনিট খেলে তাঁর এই ৯৩ রান করেন। বাউন্ডারী করেন ১৩টা। প্রধানতঃ তাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার জন্যেই শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রান সংখ্যা (৭ উইকেটে ২৬৩ রান) ভদ্রলোকের পাতে দেওয়ার অবস্থায় দাঁড়ায়। বোরদে যখন উমরিগড়ের সঙ্গে খেলতে নামেন তখন ভারতবর্ষের ৪টে উইকেট পড়ে মাত্র ৮৯ রান। বোরদে ৫ম উইকেটের জুটিতে উমরিগড়ের সঙ্গে

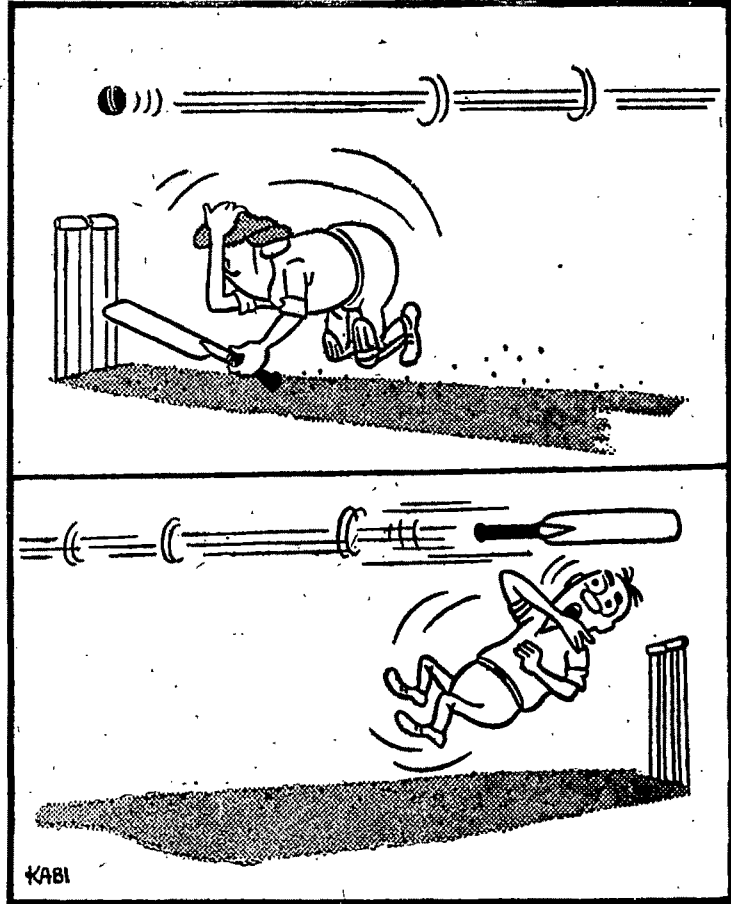
দলের ৯৪ রান, ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দু'রানীর সঙ্গে ৫১ রান এবং ৭ম উইকেটের জুটিতে নাদকাণীর সঙ্গে দলের ২৯ রান তুলে দেন। প্রথম দিনে ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ২৮০, ৭ উইকেট পড়ে। নাদকাণী (২২) এবং ইঞ্জিনীয়ার (৬) নট আউট থাকেন।

সাবিনা পার্কে'র উইকেট ব্যাটস-ম্যানদের সহায়ক ছিল। প্রথম দিনের খেলায় ফাস্ট বোলার হল এবং স্টেয়ার্স মারমুখী বল দিতে কুসূর করেননি। সূতি হলের বলে এবং জরসীমা স্টেয়ার্সের বলে আঘাত পান। নাদকাণীকে লক্ষ্য করেও রাম্পার ছাড়া হয়। কিন্তু নাদকাণীকে বিচলিত করতে পারেনি।

প্রথম দিন ৯৮ ওভার খেলা হয়। এর মধ্যে হল এবং স্টেয়ার্স ৩৯ ওভার বল করে ১২৪ রান দেন। এই থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে ফাস্ট বল এখন আর 'জুজু' নয়।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের বাকি ৩টে উইকেটে ১১৫ রান যোগ হয় পূর্ব দিনের ২৮০ রানের (৭ উইকেটে) সঙ্গে। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস লাগুনের পর ৮ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। প্রথম দিনে ৫ম উইকেটের জুটি উমরীগড় এবং বোরদে ৯৪ রান তুলে ভারতবর্ষের প্রাণ-কর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় সেই ভূমিকায় দেখতে পেলাম ৮ম উইকেটের জুটি নাদকাণী এবং ইঞ্জিনীয়ারকে। এই জুটিও ৯৪ রান তুলে দলের রান সংখ্যা ভঙ্গ করেছিলেন। ৮ম উইকেটের জুটি নাদকাণী এবং ইঞ্জিনীয়ার ১০২ মিনিটের খেলায় ৯৪ রান তুলে দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় তাঁরা ৮ম উইকেটের জুটির রেকর্ড রান করেন। পূর্ব রেকর্ড ছিল ৭৪ রান (কৃপাল সিং এবং রামচাঁদ, মাদ্রাজ, ১৯৫৮)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজের ৫ম টেস্ট খেলায় নাদকাণী এবং ইঞ্জিনীয়ার ৮ম উইকেটের জুটিতে ১০১ রান করে নতুন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

শেষ উইকেটে নাদকাণীর সঙ্গে খেলতে-নামেন প্রসন্ন। এই ১০ম উইকেটের জুটিতে ৩৭ রান ওঠে—ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে এই রানও ভারতীয় দলের পক্ষে রেকর্ড হয়েছে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১০ম উইকেটের জুটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের রেকর্ড ২৭ রান (গডাড এবং ট্রিম, বোম্বাই, ৫ম টেস্ট, ১৯৪৮-৪৯)। নাদকাণী ১৯৫ মিনিটের খেলায় ৭৮ রান করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে যান। এই ৭৮ রানই তাঁর টেস্ট



হলের বলঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রখ্যাত ফাস্ট বোলার ওয়েসলি হল ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনে তিনজনকে আউট করে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে শততম উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন।

খেলার এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান। তাঁর এই ৭৮ রানে ১০টা বাউন্ডারী ছিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা ভাল হয়নি; তবে এই প্রথম ধাক্কা সামলাতে বেশী সময় লাগেনি। দলের ১৬ রানের মাথায় কনরাড হান্ট মাত্র ৯ রান করে দেশাইয়ের বলে ক্যাচ তুলে কস্ট্রাক্টরের হাতে ধরা দিয়ে বিদায় নেন। ম্যাকমরিসের সঙ্গে খেলতে নামেন কানহাই। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষ সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের রান দাঁড়ায় ১৫৭, ১ উইকেট পড়ে। ২য় উইকেটের জুটি ম্যাকমরিস ৬৬ এবং কানহাই ৭৫ রান করে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল আরও ৪টে উইকেট খুইয়ে দ্বিতীয় দিনের ১৫৭ রানের (১ উইকেটে) সঙ্গে ২৪১ রান যোগ করে। রান দাঁড়ায় ৩৯৮, ৫ উইকেট পড়ে। লাগের রান ছিল ২৬২, ১ উইকেটে (ম্যাকমরিস নট আউট ১১১ ও কানহাই নট আউট ১৩৪)। চা-পানের বিরতির সময়ের রান ৩২৯ (৫ উইকেটে)। এই দিন ভারতীয়

দলের বোলিং ভাল হয়েছিল; কিন্তু ফিল্ডিংয়ের দোষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বেশী রান তুলেছে। ইঞ্জিনীয়ার সোবার্সের তোলা 'ক্যাচ' ধরতে পারেননি। এই সময় সোবার্সের রান ছিল মাত্র ২। অন্য দিকে কানহাই নিজস্ব ১১৩ রানের মাথায় সূতির বলে ক্যাচ তুলেন। মঞ্জরেকার পাঁয়তারা ভাঁজতে গিয়ে বল ফস্কান। এই তের (একশত তের) রানের গাঁট থেকে ছাড়ান পেয়ে কানহাই শেষ পর্যন্ত ১৩৮ রান করে আউট হন। প্রথম দিন উমরীগড় এবং দু'রানীর আউট সম্পর্কে আম্পায়ার কোলী এবং ডেভিস মারাত্মক রকম ভুল সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়ে ছাড়ান পেয়েছিলেন। কিন্তু এই দিন সাবিনা পার্কে'র দর্শকদের একাংশ শূদ্ধ মূর্খের শব্দে বিস্ফোভ জানায়নি, মাঠের মধ্যে হরির লুট দেয় এবং তা আমাদের দেশের হরির লুটের বাতাসা নয়—ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোতল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঘরোয়া ব্যাপার। আম্পায়ার কোলীর ভুল সিদ্ধান্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের জো সলোমন রান-আউট হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, যে

সময়ে ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক ইঞ্জিনিয়ার হাত দিয়ে সলোমনের উইকেট ভেঙ্গে দেন, সে সময়ে তাঁর হাতে বল ছিল না। আম্পায়ারের আউট দেওয়ার সিদ্ধান্তে সারা মাঠ গর্জে উঠে। তারই ঠেলা সামলাতে পাঁচ মিনিট খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন অফ স্পিনার প্রসন্ন। তিনি কানহাই, ম্যাকমরিস এবং রডরিগসকে আউট করেন। মাত্র ৬ রান দিয়ে প্রসন্ন কানহাই এবং ম্যাকমরিসের উইকেট পান। দ্বিতীয় উইকেটের জুটি কানহাই এবং ম্যাকমরিস ভারতীয় দলের পক্ষে মহা দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ান। এই জুটিতে ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দলের রেকর্ড ২৫৫ রান ওঠে। ২য় উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ড ৯৭ রান (প্যারোদা এবং ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, কিংস্টন ১৯৫২-৫৩)। লাগের পরবর্তী খেলা থেকে চা-পানের বিরতির মধ্যে অর্থাৎ ১২০ মিনিটের খেলায় এই দিন ৪টে উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৬৭ রানে। ২২ রানের মধ্যে ৩টে উইকেট পড়ে—২য়, ৩য় এবং ৪র্থ উইকেট। দলের এই ভাঙ্গন প্রতিরোধ করেন ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি সোবার্স এবং অধিনায়ক ওরেল। তৃতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান দাঁড়ায় ৩৯৮, ৫ উইকেটে। উইকেটে নট আউট থাকেন ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি সোবার্স (৬৩) এবং ওরেল (৪৩)। এই দিন ৬ষ্ঠ উইকেটের অপরাধিত জুটিতে দলের ৭৮ রান ওঠে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩ রানে অগ্রগামী হয়।

চতুর্থ দিনে দলের ৬৩১ রানের (৮ উইকেটে) মাধ্যম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্রথম ইনিংস খেলার সমাপ্ত ঘোষণা করে। এই ৬৩১ রানই স্বদেশের মাটিতে ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পক্ষে দল-

গত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব রেকর্ড—৫৭৬ রান (কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩)। ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় দলগত সর্বোচ্চ রানের ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান রেকর্ড : ৬৪৪ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড), নিউ দিল্লী, ১৯৫৮-৫৯। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় এই নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫ বার এক ইনিংসে ৬০০ রান করলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভারতবর্ষ এক ইনিংসের খেলায় আজও ৬০০ অথবা ৫০০ রান তুলতে পারেনি। আলোচ্য কিংস্টনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের তিনজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেছেন। ১৯৫৩ সালেও কিংস্টনের পঞ্চম টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের তিনজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী (ওরেল ২৩৭, উইকস ১০৯ ও ওয়ালকট ১১৮) করেছিলেন।

গারফিল্ড সোবার্স ১৫৩ রান করে দুরানীর বলে দেশাইয়ের হাতে খরা পড়ে আউট হ'ল। সোবার্স তাঁর ১৫৩ রানে ১১টা বাউন্ডারী এবং ৪৮টা ওভার-বাউন্ডারী করেন। প্রসন্নের এক ওভারেই তিনি মারেন ৩টা ওভার-বাউন্ডারী। সোবার্স নিজস্ব ২ এবং ২৮ রানে যা আউট হওয়ার থেকে রক্ষা পান। এই দুটি ঘটনা বাদ দিলে তাঁর খেলা খুবই উপভোগ্য হয়েছে এবং তাঁর খেলার জন্যই দলের বিপুল সংখ্যক রান উঠেছে। তিনি ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ওরেলের সঙ্গে দলের ১১০ রান এবং ৭ম উইকেটের জুটিতে নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় মেনডোনকার সঙ্গে দলের ১২৭ রান তুলে দেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, টেস্ট ক্রিকেট খেলায় গারফিল্ড সোবার্সের এই ১২২ সেঞ্চুরী, ভারতবর্ষের বিপক্ষে চতুর্থ সেঞ্চুরী। নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় মেনডোনকা ৭৮ রান করে নাদকাণী বলে আউট হ'ল। ৮ম উইকেটের জুটি মেনডোনকা এবং স্টেয়ার্স দলের ৭৪ রান তুলেন।

চতুর্থ দিনের খেলায় পার্টনারসীপ রেকর্ড : ৭ম উইকেটে ১২৭ রান (সোবার্স এবং মেনডোনকা) ১০৮ মিনিটের খেলায়; পূর্ব রেকর্ড : ১১৮ রান—উইকস এবং ক্রিস্টিয়ানী, নিউ-দিল্লী, ১৯৪৮-৪৯। ৮ম উইকেটে ৭৪

রান (মেনডোনকা এবং স্টেয়ার্স) ৫২ মিনিটের খেলায়; পূর্ব রেকর্ড : ৭০ রান—সলোমন এবং এ্যাটকিনসন, নিউ-দিল্লী, ১৯৫৮-৫৯।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার ওয়েসলি হল চতুর্থ দিনের খেলায় তিনটি উইকেট নিয়ে টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে তাঁর একশত উইকেট পূর্ণ করেন। বর্তমানে হিসাব দাঁড়িয়েছে—মোট টেস্ট খেলা ২০ এবং ২২৮৯ রানে ১০৩ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনায় ভারতবর্ষ শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। খেলায় আবার ফাস্ট বোলারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের ৫০ রানের মধ্যে ৩টে উইকেট পড়ে যায়। হল ১০ ওভারে ৩২ রান দিয়ে এই ৩টা পান। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে স্কোর বোর্ডে মূল্য নীচু করে ভারতবর্ষের স্কোর দাঁড়িয়ে থাকে—৮০ রান, ৩টে উইকেট পড়ে। ৪র্থ উইকেটের জুটি নাদকাণী (৯) এবং উমরিগড় (১২) নট আউট থাকেন।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতবর্ষ শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ৪র্থ উইকেটের জুটি নাদকাণী এবং উমরিগড় দলের ৬৬ রান তুলে দেন। লাগের সময় স্কোর দাঁড়ায় ১৬২ রান, ৮ উইকেটে। ৯ম উইকেটের জুটি ইঞ্জিনিয়ার এবং দেশাই দুজনের সঙ্গে খেলে দলের মূল্য রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করেন। ৯ম উইকেটের জুটিতে ৪৮ রান ওঠে। এই দিনও হল ৩টা উইকেট পান—মোট ৪৯ রানে ৬টা উইকেট। ২১৮ রানে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'লে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক ইনিংস এবং ১৮ রানে জয়লাভ করে।

সাধারণ পাঠাগারের উপযোগী
গল্প ও উপন্যাসের সমস্ত বই
কলিকাতার কমিশনে সংগ্রহ করুন।

**দামোদর
প্রকাশনী**

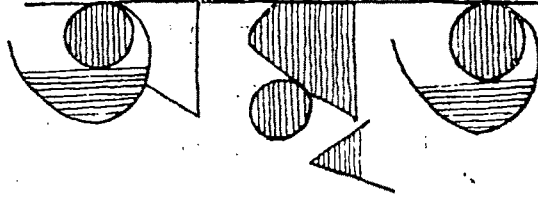
বর্ধমান শহরের সর্বাধুনিক

পুস্তক বিপণি

॥ বিজয় তোরণ : বর্ধমান ॥

কিংকো'র *
আণিকা
হেয়ার অয়েল
প্রতি বারক-কিংকো'র কলিকাতা





১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৬শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৯ই চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 23rd March, 1962
40 Naya Paise.

দোলযাত্রা ভারতের এক সুপ্রাচীন উৎসব। শ্রীতের শেষে যখন বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ঘটে তখন প্রকৃতির সেই তারুণ্যের প্রভাব মানুষের হৃদয়কেও আলোড়িত করে তোলে। প্রতিদিনের নীরস কর্মপ্রবাহের মধ্যে চলতে চলতে একদিন বাসন্তী-পূর্ণিমার আনন্দিত লগ্নে মানুষ তার চারপাশে চোখ মেলে তাকায়। গাছে গাছে নতুন পাতা, পাখিদের কল-কাকলী এবং এলো-মেলো দক্ষিণা হাওয়ার চাঞ্চল্যে সমস্ত চিন্তাবৃত্তি উন্মুখ হয়ে ওঠে। তখন জীবনধারণের যেসব সংকীর্ণ বৃত্তে মানুষ নিজেকে আবদ্ধ রেখে দিনাতিপাত করে তার বাহিরে এক বহুং অস্তিত্বের বিষয়ে সে সচেতন হয়ে ওঠে। এবং এই বিরাত্তির অনুভূতি তাকে চির-পরিচিত আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশীর সঙ্গেও এক নতুন মিলনে একাত্ম করে তোলে।

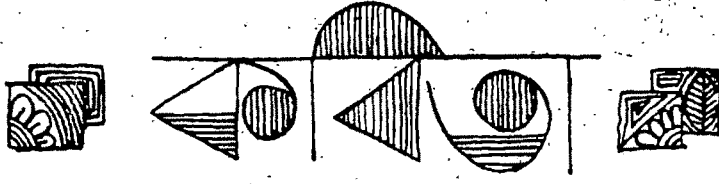
দোলের দিনে তাই এত রঙের খেলা। এই আবার-কুঙ্কুম তো কেবল বাহিরের আনন্দোচ্ছ্বাসের উপকরণ নয়, হৃদয়ের আবেগরঞ্জিত সৌহার্দ্যেরই প্রতীক। তাই এদিনে কোনো ভেদাভেদ থাকে না, উচ্চ-নীচ শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলকেই প্রীতি-সম্ভাষণ জানানো যায়, সকলের সঙ্গেই মিলিত হওয়া যায় বসন্তের আনন্দোৎসবে।

কিন্তু কেবল তাই নয়, দোলপূর্ণিমার পুণ্যাতিথি আরও একটি বিশেষ কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে বাঙালীর ইতিহাসে। এই দিনেই চার শ' বছর আগে বাংলার তদানীন্তন সাংস্কৃতিক মহাপীঠ নবম্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু। বাংলার তখন দারুণ দুর্দিন, মদুসলমান আগমনে প্রাচীন হিন্দু ধর্মের ভিত্তিভূমি বিচলিত, অনাচার ও অবিচারে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে সমাজের সংগঠন। এমন সময়ে বাংলার ভাগ্যলোকে এক বিরাত ব্যক্তিত্বের প্রভাব নিয়ে

আবির্ভূত হলেন শ্রীগোরাঙ্গদেব, করুণা ও প্রীতির মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত করে তুললেন সমগ্র জাতিকে।

আজ বহু শতাব্দীর দূরত্ব থেকে ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে যখন তাঁর এই অলোকসামান্য কীর্তিকে বিচার করি, তখন হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রশ্রয়ে আমাদের মন আপনাই নত হয়ে আসে। বাহিরের আঘাতে যে সময় হিন্দু সমাজ তন্ত্র-ন্যায়-স্মৃতির সহস্র বন্ধনে নিজেকে কেবলই সংকুচিত করে নিচ্ছে, অনাচারের সামান্যতম আশঙ্কাতেই নির্মমভাবে পরিত্যাগ করছে অসহায় পর-পীড়িত নরনারীকে, তখন শ্রীগোরাঙ্গ এসে দাঁড়ালেন মর্ত্যমান অভয়বাণীর মতো। জাতি-বর্ণ-আচারের ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে গেল, যারা অন্ত্যজ এবং আশাহীন তারা উঠে দাঁড়াল, সকলেই এক উদার মানবিকতার তড়িৎস্পন্দনে অনুভব করল তারা মানুষ। আর এই অনুভূতির প্রবল বন্যায় সমগ্র বাংলাদেশে দেখা দিল এক নতুন চেতনা, যার ফলে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল বাঙালীর জাতিসত্তা। তারপর থেকে অনেক শক্তির মানুষ এসেছেন বাংলাদেশে, জ্ঞানবিজ্ঞান-ললিতকলায় বাঙালী আজ সমগ্র পৃথিবীতেই সুপরিচিত। কিন্তু সেই ছত্রভঙ্গ দুঃসময়ের ব্যাকুল প্রয়োজনের মুহূর্তে শ্রীগোরাঙ্গদেব তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বের প্রসাদে যেভাবে সমস্ত দেশটিকে এক অখণ্ড প্রেমের মধ্যে ধারণ করেছিলেন তা অতুলনীয়।

দোলযাত্রার এই পুণ্যদিনে সেই দেশনন্দিত যুগাবতারের উদ্দেশ্যে আমরা প্রণাম জানাই। এবং আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান সন্ধিক্ষণে যখন ভাগ্যহত পশ্চিমবঙ্গ আবার নব-নব গঠনকর্মের সাহায্যে এক উন্নতিশীল ভবিষ্যতের আশায় উন্মুখ, তখন আমাদের যাত্রাপথের পাথেয় হিসাবে প্রার্থনা করি তাঁরই পরম মমতাময় আশীর্বাদ।



॥ চতুর্দশপদী ॥

বিষ্ণু দে

দেখোঁছ জলের রাগ, বেগের আগুনে মাটিলেপা
মাথা কোটে,

পাথরে বালিতে তোড়ে সে যে কী না করে!
ঘোঁট করে, ফোসে, ফোলে, নিজের ধর্মই ভোলে ক্ষাপা,
কাদা ছাইভস্ম মাখে, নড়ি ভাঙে ফুৎকারে শীকরে।

জলের অশ্রুত রাগ, গদা হানে লৌহ ভীমসেন
আর হিড়িম্বানন্দন যেন, ভাঙে অন্ধকার বনে
উরু বা গর্দান,

কিংবা যেন নব্য মল্ল একাই খোঁজেন
ছায়ায় আপন শত্রু, যত ছায়া সরে তত মনে
রাগ হয়। দৃশ্য চৈতন্যের রাগ,

যেমন হাওয়াই হাঁকে
হিরোশিমা সাহায়ায়—

কিন্সা আরো মোটা মেগাটনে
আর কোথাও জুজুমানা বোমা ফাটে।

কোয়েলের ক্ষিপ্ত বাঁকে
ঘূর্ণির উলঙ্গ শক্তি, আপন শক্তির ঘোলা লোভে
দেখোঁছ নদীর প্রাণস্রোতের প্রতীক বদ্বী ডোবে॥



ছিন্নভিন্ন গান

মার্নস রায়চৌধুরী

শেষহীন হিংসা করি তোমাদের, যারা উচ্চারিত সুখে, রোগহীনতায়।
আমি রক্তগ্ন নই কিন্তু সুখী নই। আমি মেরুহীন গোলকের অস্থির ঘূর্ণনে
কখনো আনন্দ তবু আমাকে ডেকেছে হাত নেড়ে?
পাতা ঝরে গেছে, যায় সমস্ত শ্রমের বেলা পীত অপচয়ে
ধান, গম, নারকোলে অথবা প্রণয়বিন্দু ফাল্গুনের লালে
হাত রাখতে গিয়ে সব পড়ে গেল। বদ্বী
অঙ্গারে তুমুল হাসে নিয়তি আমার।

মৃত্যুকে দেখিনি আজো। মাঝেমাঝে ঘটনাচক্রে ঐকতানে
অহুন্দ বিবাদী গলা বেজে ওঠে, ছিন্ন তারে শব্দ ডিসকর্ড।
ধরো ধরো, ভয়াবহ ওই কলরোল ধায় আমার প্রিয়র নির্বসন
দ্রিয়ামায় কিংবা ভোরে—জটিল আক্ষেপ যেন ভীষণ মর্ছায়
চতুর্দিক ঝাপসা করে টেনে নেয় তাকে মহালুপ্তির গহবরে।

মৌলিক উৎকণ্ঠা এই। অসুখ অসুখ শব্দ রক্তময় গ্রামেবাসে লোকে
জনপদ শ্বিধান্বিত, বিস্ময়ে আমাকে দেখে ছিন্ন পাদকায় স্লান বসনে কিস্তুং
আমি কি অনন্তকাল রাজপথে অন্তিমযাত্রার অনুগামী।

দুবদুধ

জৈমিনি

নিচের চিঠিখানি পরিচয়-পত্রের অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া চিঠির ভিতরে যতোটুকু জানা যায়, তার বেশী আমি জানিও না লেখকের সম্বন্ধে। পাঠক নিজগুণে যা হয় বুঝে নেবেন।

প্রিয় জৈমিনি মহাশয়, বাংলা আমার ভালো আসে না। তবু বাংলাতেই লিখছি, কারণ রাহুল জানিয়েছে আপনিন সাহিত্যিক। ইংরেজীতে আপনার মনে বিরূপ ভাব জাগতে পারে। সেজন্যে মাতৃভাষার স্মরণ নিলাম।

রাহুল আপনার বন্ধু। তার চিঠি আপনি 'অমতে' ছেপেছেন। কিন্তু এ চিঠি দেখে মনে হল সে আপনার বন্ধুর চেয়েও কিছু বেশী। অন্তত তার তাই হওয়ার ইচ্ছা-ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। ভালো কথা। আমার তাতে কোন খগড়া ছিল না। কিন্তু এ চিঠিতে সে আমার নামও উল্লেখ করেছে, আমার ডাকনাম। তাইতেই কিছুটা অসুবিধে হয়েছে। নয়তো কে কাকে কী লিখল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতুম না।

সত্যি বলতে কি, রাহুল যে আমাকে পিঙ্কু মিস্ত্রির বলে উল্লেখ করেছে এতে তার হীনতাই প্রকাশ পেয়েছে। বিলেত ফারার আগে ও-নামটা আমার চালু ছিল বটে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার পর সকলেই আমাকে মিস্টার মিত্র বলে ডকে। রাহুলেরও তাই উচিত ছিল। অন্তত আমার ভদ্দ-নাম পিনাকীও সে বলতে পারত। তা না বলে সে যেভাবে আমার উল্লেখ করেছে তাতে তার অত্যন্ত মীননেস প্রকাশিত হয়েছে। এর পর আমি যদি বলি, সে আমার সম্বন্ধে ইনফর্মারিট কমপ্লেক্সে ডুগছে, আশা করি সে আপনার 'বন্ধু' হলেও আপনি তাতে ক্ষুব্ধ হবেন না।

কিন্তু, আচ্ছা রাহুল কি সত্যি আপনার বন্ধু? কিছু মনে করবেন না, ওর মতো একটা অন্তঃসারহীন মূর্খ যে আপনার বন্ধু হতে পারে, আমি ভাবতে পারিনে।

অন্য কথা ছেড়ে দিলাম, যে চিঠি-খানি আপনি ছেপেছেন তার মধ্যেও যে সব উচ্চমার্গের বাগাড়ম্বর দেখতে পেলাম তাতে গা-জ্বালা করে। আমি হলপ করে বলতে পারি, যে সব কথা ও বলেছে তার মানে কী তাই ওর বোধগম্য নয়। মদ, রেস ইত্যাদি নিয়ে অনেক নাটকোপনা করে ও বলেছে, কিছুতেই ওর কিছু এসে যায় না, কিছুই ওর অন্তর স্পর্শ

করে না। কী লাগার দেখুন, দু-পেগ হুইস্কির লোডে বড়লোক বন্ধুদের বাড়িতে ছৌঁক ছৌঁক করে বেড়ায়, রেসের মাঠে দশ টাকা চোট খেলে ওর রাড-প্রেসার বেড়ে যায়, ও বলে কিনা কিছুই ওর অন্তর স্পর্শ করে না!

আসলে ও একটা হিপোসক্ৰীট, এবং হ্যাংলা। ছেলেবেলায় কবে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার উপরে একটা ইস্কুলমার্কা প্রবন্ধ লিখেছিল, সেই থেকে ওর ধারণা হয়েছে ও মস্ত বড় একজন ইনটেলেকচুয়াল। কিন্তু তারপর কতো জল গাওয়া

বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি বরণীয় গ্রন্থ

৥ সাহিত্য-বিষয়ক ৥

বিমানবিহারী মজুমদার : ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫.০০; পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ৬.০০ ৥ অজিত দত্ত : বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ১২.০০ ৥ মদনমোহন গোস্বামী : ভারতচন্দ্র ৩.০০ ৥ ভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক ষষ্ঠমুদ্র ৬.০০ ৥ রথীন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্য-বিচিত্রা ৮.৫০ ৥ নারায়ণ চৌধুরী : আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন ৩.৫০ ৥ অরুণ মুখোপাধ্যায় : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য ৮.০০ ৥ শ্বিজেন্দ্রলাল নাথ : আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য ৮.০০ ৥ সত্যরত্ন দে : চর্যাগীতি-পরিচয় ৫.০০ ৥ অরুণ ভট্টাচার্য : কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার অভিব্যক্তি ৮.০০ ৥ প্রশান্ত রায় : সাহিত্য দৃষ্টি ৮.০০ ৥ সাধন-কুমার ভট্টাচার্য : রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা ৬.০০; নাটক ও নাটকীয়তা ২.৫০; নাটক লেখার মূলসূত্র ৫.০০ ৥ আজহারউদ্দীন খান : বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল ৫.০০

৥ জীবনী সাহিত্য ৥

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী ১.৫০ ৥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বংগের প্রাচীন কবি ১.০০ ৥ গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী : ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ ৫.০০; শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫.০০ ৥ বলাই দেবশর্মা : ব্রহ্মবান্ধব উপাখ্যান ৫.০০ ৥ প্রভাত গুপ্ত : রবীন্দ্রবি ৬.০০ ৥ খাজা আহমদ আব্বাস : ফেরে নাই শব্দ একজন ৮.০০ ৥ মণি বাগচি : শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১০.০০; রামমোহন ৮.০০; রবীন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ৮.৫০; আইকেল ৮.০০; কেশবচন্দ্র ৮.৫০; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৮.৫০

৥ বিবিধ গ্রন্থাবলী ৥

রাধাকৃষ্ণ : হিন্দু সাধনা ৩.০০ ৥ তারাপ্রসন্ন দেবশর্মা : রামায়ণভট্ট ৮.৫০ ৥ দীনেশচন্দ্র সেন : রামায়ণী কথা ৮.০০ ৥ ত্রিপুত্রাশংকর সেন শাস্ত্রী : রামায়ণের কথা ১.২৫; ভারত জিজ্ঞাসা ৩.০০; মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন ২.৫০ ৥ শিশিরকুমার নিয়োগী : সহজ কৃতিবাসী রামায়ণ ৩.৫০ ৥ বিশেষবর মিত্র : পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গ ৩.৫০ ৥ কল্যাণী কালেকর : ভারতের শিক্ষা ১ম খণ্ড ২.৫০; ২য় খণ্ড ৫.০০ ৥ প্রফুল্লকুমার দাস : রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গ ১ম খণ্ড ৩.৫০ ৥ সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় : আফ্রিকার চিত্র ১.৫০ ৥ সুন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় : লাইবেরিয়ার উপকথা ১.৫০ ৥ সুন্দীলকুমার গুহ : স্বাধীনতার আবোল তাবোল ৫.০০ ৥ সত্যকিঙ্কর সাহানা : হিন্দুধর্ম ১.৫০; মহাভারতের অনুশীলনতত্ত্ব ২.৫০; চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ ২.৫০; শকুন্তলা রহস্য ২.৫০ ৥ মণীন্দ্র সমাদার : প্রবাসী বাঙালীর কথা ১.৫০ ৥ মানবেন্দ্রনাথ রায় : মার্কসবাদ ১.৫০; দর্শন ও বিপ্লব ১.৫০ ৥ শ্রীজ্ঞানান্বেষী : দেশ-বিদেশের শিক্ষা ৮.০০

৥ গল্প ও উপন্যাস ৥

বৃন্দাবন বসু : আমার বন্ধু ২.০০; চার দৃশ্য ২.৫০ ৥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : লক্ষ্মী ২.০০; হাসি ২.০০ ৥ বাণী রায় : শূন্যের অঙ্ক ২.৫০ ৥ সুবোধ মজুমদার : অন্তর ও বাহির ২.০০; পলাতক ৩.০০ ৥ বিদ্যাসুন্দর চৌধুরী : অনুস্মৃতি ২.৫০ ৥ কল্যাণী কালেকর : কন্যা ও কুমার ১.৭৫ ৥ সুধীররঞ্জন গুহ : ময়নামতী ৩.০০ ৥ সুবোধ বসু : মানবের শত্রু নারী ২.০০; স্বর্গ ২.০০; পদার্থ ২.৫০; উদ্ভাসময়ী ৩.০০; পশু-প্রভাতা নদী ৩.৭৫; গল্পপলতা ৮.০০; চিমনি ৩.০০; ইংগিত ২.৫০; পশুমানবী ডাক ১.৭৫ ৥ সুকুমার রায় : কয়েকটি গল্প ১.০০

বয়ে গেছে সে খেলাই ওর নেই। এখন ওর কাজ হল হাই সোসাইটির আশে-পাশে ঘুরে বেড়ানো, এবং ইউরোপীয় সভ্যতার তলানী যা কিছু জোটে তাই রাস্তার ময়লা কাগজ কুড়ানো লোক-গুলোর মতো মনের মধ্যে বস্তাবন্দী করা। একেই বোধহয় সাধুভাষায় আপনারা বলেন পল্লবগ্রাহিতা। কিন্তু ওর ঐ সাজানো ময়রপুচ্ছগুলো এতোই নড়বড়ে যে চলতে গেলেই খসে খসে পড়ে।

ওর যে কিছু ভাল লাগবে না তাতে আর বিচর কী! ও শুনছে, ভালো না লাগাই এখন ইউরোপের চলতি হাওয়া। ও বোধ করি আরো অনেক কথা শুনছে, যেমন ধরুন এগজিস্ট্যান্সিয়ালিজম। কিন্তু কথাটার মানে কী তাই বোধ হয় ও জানে না। তবে হ্যাঁ, বাংলাটা জানে। আগে বলত অস্তিত্ববাদ, কিন্তু যেই শুনল কবি অমিয় চক্রবর্তী কোথায় নাকি লিখেছেন অস্তীতিবাদ, ওমনি লুয়ে নিল: কথাটা। এখন ও দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতো বলে বাছে অস্তীতিবাদ, অস্তীতিবাদ। সাথে কি আর লিল ওর কথা শুনলে এতো হাসে।

কিন্তু জানেন, ওটা এমন বোকা, লিল যে হাসে তাও ও টের পায় না। ও মনে করে, হাসিটা লিলির পুরস্কার। কোনটা পুরস্কার আর কোনটা তিরস্কার সে ভেদরেখাটাও লুপ্ত হয়ে গেছে ওর কাছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। রাহুলের বিষয়ে আমার সবচেয়ে বড় আপত্তি হল, ও একটা মানুষই নয়, ভুতুড়ে খোলসমাত্র। অস্তীতিবাদ নিয়ে ও এতো সোরগোল করে, কিন্তু ওর অস্তিত্বটাই ওর কাছে সবচেয়ে ফাকা ব্যাপার। একদিন ওর সঙ্গে আমার এ বিষয়ে কথা হয়েছিল, দেখলাম কথায় কথায় সাংগে কামে আওড়াতে লাগল, নিজে কিছুই বলতে পারল না। আমি জিগোস করেছিলাম, তোমার আগাজমা কী? ও এমন হাঁ করে চেয়ে রইল যে ওকে রাস্তার ধারের লেটার-বক্সের চেয়েও করুণ দেখাল। আগাজমা কথাটাই ও শোনে নি কোন দিন, সেটা যে ইংরেজী এনগেজমেন্টের ফরাসী সংস্করণ তাও ও জানে না।

বুঝুন একবার ব্যাপারখানা! ও ব্যক্তি, কিন্তু ওর কোন এনগেজমেন্ট নেই। অন্তত সে বিষয়ে ও সচেতন নয়। অথচ অস্তীতিবাদ আওড়ায়। আপনি যে ওর সঙ্গে মেশেন কী করে সেই ভেবেই অবাক হয়ে যাচ্ছি।

অস্তীতিবাদ (বাংলাটা কিন্তু চমৎকার হয়েছে!) আমিও মানি। আর মানি বলেই আমি আগাজমা খুঁজি। আমি জানি ব্যক্তি হিসেবে আমি একা, নিঃসঙ্গ। কিন্তু আমি সমাজে বাস করি। কাজেই সমাজের সঙ্গে আমার কতক-

গুলো পয়েন্ট অব কন্টাক্ট দরকার। সেইটেকেই বলি আমরা আগাজমা। রাহুল এ সব কিছু বুঝে না। অথচ বার-এ যায়, পিকনিক করে, মেয়েদের সঙ্গে মেশে। কী মুখের মতো বেঁচে আছে ও, ভাবুন তো আপনি?

ও সব ব্যাপার আমারও আছে। কিন্তু আমি জানি কেন আছে। সেটা হল আমার আগাজমা, সমাজের সঙ্গে পয়েন্ট অব কন্টাক্ট। এই জানাটা যে কতোটা মনে জোর এনে দেয় তা যদি রাহুল জানত তবে আর সে এমন ফ্যা ফ্যা করে বেড়াত না। আনন্দের লেভে হনো হয়ে উঠত না।

আপনি তো সাহিত্যিক, ওর চিঠি-খানা ভালো করে পড়লেই দেখবেন তার প্রত্যেকটি অক্ষরের আড়ালে ওর লালসাকাঙাল চোখ দুটি চক্চক করে উঠছে। কিন্তু যে লোক প্রকৃত ইনটেলেকচুয়াল তার এমন হবে কেন? হাই সোসাইটিতে ওঠা এত সহজ নয়। সেখানে আত্মকে বিবিস্ত রাখতে হয়, সরিয়ে রাখতে হয়। তখন ফুটি আর ফুটি থাকে না—জীবনের সার কথা তখন হয়ে দাঁড়ায়—ঈট, ড্রিংক অ্যান্ড বি গ্লুদামি।

বাস্তবিক রাহুলের জন্যে আমার করুণা হয়। উচ্চ-বর্ণের অ্যারিস্টোক্রেট সমাজে আসন পাওয়ার জন্যে কতোই না ঘরপাক খেল ও। কিন্তু বোকাটা জানে না, সেটা এমন এক মিউজিক্যাল চেয়ার, যাতে স্থান সংগ্রহ করা সকলের বরাতে ঘটে না। তাই আপ্রাণ চেষ্টায় হুগোড়

করেও যে-মিডল ক্লাসের মানুষ ও, সেই মিডল ক্লাসেই পড়ে রইল, আমাদের কাছে পাতা পেল না। সিংহচর্মধারী গর্দভ আর কাকে বলে।



আজ আর বেশী নয়। এ চিঠি যদি ছাপেন, আমার কাছে দুখানা অফ-প্রিন্ট পাঠাবেন। রাহুল আর লিলিকে দেখাব। ওর একটা দুঃখ পাওয়া দরকার।

নমস্কারান্তে বিনীত
পিনাকী মিত্র।

১৯৬১ সালের বাঙলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, গ্রন্থটি রচনার জন্য সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছেন। লেখক এই গ্রন্থে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিকাল হইতে যে শক্তি-সাধনা চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রকৃতি কি, কী-ই বা তাহার বিভিন্ন রূপ এবং সেই সঙ্গে আঞ্চলিক শান্ত সাহিত্যই বা কি-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সম্পর্কে গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন। শক্তি-সাধনার আধ্যাত্মিক রূপটিও এই গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে পরিষ্কৃতিত হইয়াছে। এই বিষয়ের একটি বিশ্বকোষ এবং গ্রন্থটি বিদগ্ধ ও অনুসন্ধানপূর্ণ পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য।

[মূল্য পনের টাকা]

আপনার সংগ্রহে ও গ্রন্থাগারের পক্ষে
একটি যথার্থ মূল্যবান বই
আমাদের সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা ১

॥ আমাদের বই দর্শন পাইবেন ॥

॥ শ্রীশ্রী গৌরসুন্দর ও ভাবসাধনা ॥

॥ মনোরঞ্জন বসু ॥

ভারতবর্ষে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। মহাপুরুষদের জীবনই তাঁদের বাণী। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁরা নানা কথা বলেছেন, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁরা এমন সব আলোচনা করেছেন যা মানুষের মনে আজও জীবন্ত হয়ে আছে। বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করব এবং সেই সঙ্গে তাঁর দার্শনিক মতামত সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলব।

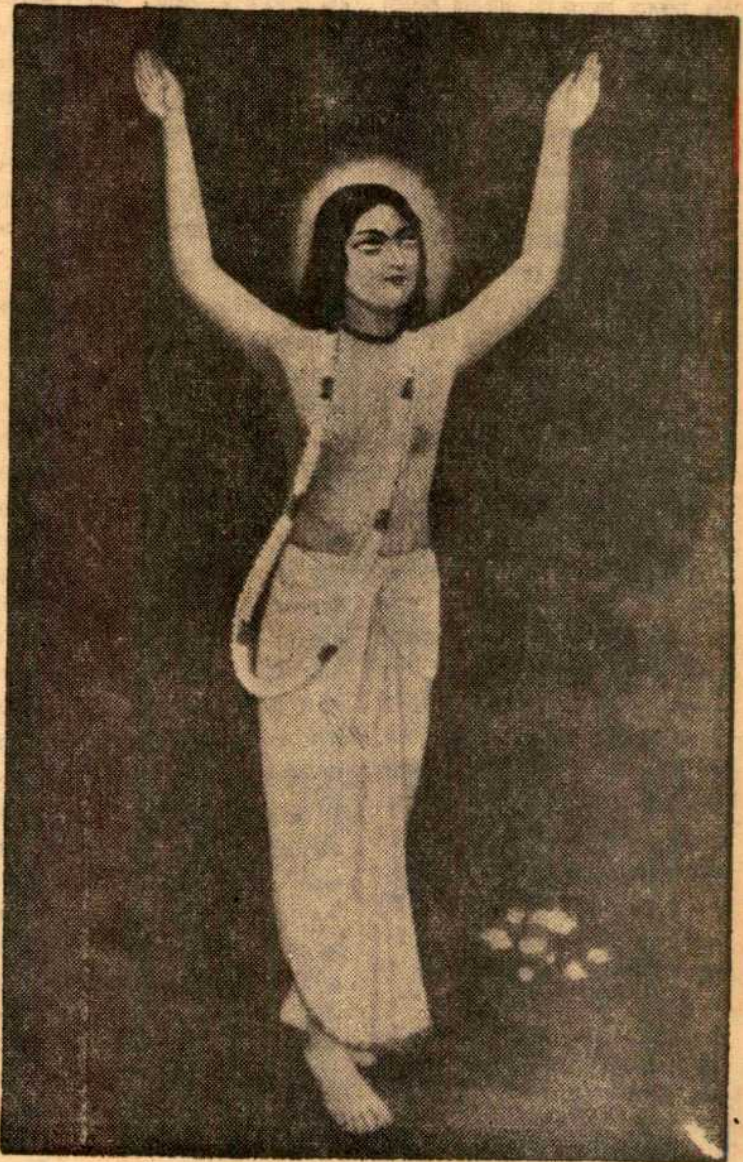
শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সাধনা মূল্যবতঃ ভাব-সাধনা। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার অলৌকিক ঘটনাবলী অভিনব। আদি-মধ্য-অন্ত লীলায় তিনি নানাভাবে নানারূপে আমাদের অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন। মহাভাবকের প্রাকৃত, অ-প্রাকৃত বিচিত্র লীলার কথা যখন আমরা পাঠ করি বা শ্রবণ করি তখন দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, আমাদের চিত্ত চলে যায় সেই এক অচিন্ত্য রহস্যালোকে যা হিসাবের বাইরে। তর্কে সে রহস্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, সে এক অদৃষ্ট জগৎ—ভাবের ধারার সে জগতের রসোপলব্ধি হয়—সাধা-সাধন সেখানে এক হয়ে যায়।

যীশু খ্রিষ্টের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে যেমন তাঁর বৈষয়িক খতিয়ানের হিসাব নিঃপ্রয়োজন, সেইরূপ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথা বলতে গেলেও শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর কতখানি ব্যুৎপত্তি ছিল সে প্রশ্নও নিরর্থক। নব্য-ন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারধারায় তিনি পারদর্শী ছিলেন কিনা, ব্যাপ্তির কোন বাড়তি লক্ষণ তিনি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিনা, শঙ্কর বেদান্তের মায়াবাদ-খণ্ডনের প্রচেষ্টা তাঁর ছিল কিনা—এ-সব প্রশ্ন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দিব্যভাব সম্পর্কে অবাস্তব ও অবাস্তর বলেই মনে হয়।

যিনি সম্প্রদায়গত হয়েও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে, স্বয়ং ব্রহ্ম-দর্শী, সাধা-সাধন যেখানে একত্রে মিলিত হয়েছে, অলৌকিক জীবনই যার বাণী, তাঁর সম্পর্কে এ-সব

প্রশ্ন তুলে তাঁর গৌরব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নিতান্তই বাতুলতা বলে মনে হয়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তখন 'কাশী-



ধামে। সনাতন গোশ্বামীর মন্ত্রদীক্ষা সবে সমাপ্ত হয়েছে। তিনি তাঁকে অধ্যাত্ম বিষয়ে নানাপ্রকার উপদেশ দেন ও পরমানন্দ নামে একজন সুকণ্ঠ কীর্তনীর ডাকে কীর্তন গান শোনান। ‘কাশীর সম্যাসীরা মহাপ্রভুর বেদান্ত শ্রবণ ও আলোচনা সম্পর্কে অ-মনোযোগ এবং নাম-সংকীর্ণতার উপর অধিক মনোযোগ লক্ষ্য করে প্রভু সম্পর্কে নানাপ্রকার নিন্দা করতে লাগল। প্রভুর ভক্তরা এসব কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করতেন এবং প্রভুকে সব কথা নিবেদন করতেন। কিন্তু প্রভু শুনে কেবলমাত্র হাসতেন। একদিন একজন মহারাত্রীর ভক্ত মনে মনে ঠিক করলেন যে সম্যাসীদের ও মহাপ্রভুকে তিনি একইসঙ্গে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করবেন এবং উভয়ের মিলন ঘটাবেন। তাঁর বিশ্বাস সম্যাসীরা একবার দেখলে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তাঁর সম্পর্কে আর কোন অ-বথা কথা বলবে না। সেই-রূপই ব্যবস্থা করা হল। নির্দিষ্ট দিনে সম্যাসীরা মহারাত্রীর স্বাক্ষরের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন এবং খ্রীষ্টীগোর-সুন্দরও সেখানে এলেন। সম্যাসীদের মধ্যে অগ্নী ছিলেন প্রকাশানন্দ সরস্বতী। সম্যাসীরা যেখানে উপবেশন করলেন মহাপ্রভু সেখানে উপবেশন না করে হস্ত-পদ প্রক্ষালনস্থানে উপবেশন করে এক অলৌকিক শক্তি সৃষ্টি করলেন। সম্যাসীগণ ঐ শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে ঠাকুরকে বললেন, ‘তুমি ঐ অপরিচ-স্থানে উপবেশন করেছ কেন?’ উত্তরে মহাপ্রভু বললেন, ‘আমি হীন, আমি মুখ, আপনাদের সঙ্গে একত্রে বসবার যোগ্যতা আমার নেই।’ প্রভুর দিব্যকান্তি দেখে ও সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনে সম্যাসীরা মুগ্ধ হলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি সম্প্রদায়ী সম্যাসী, তুমি বেদান্ত শ্রবণ কর না কেন?’ উত্তরে মহাপ্রভু বললেন, ‘আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার বক্তব্য আমি নিবেদন করতে পারি।’ সম্যাসী বললেন, ‘তোমার রূপ নয়ন-মনোহর, বাক্য শ্রবণ-সুখকর, তুমি নিঃসংশোভে তোমার সব কথা বলতে পার।’ প্রভু বললেন, বেদান্তের প্রচলিত ব্যাখ্যা তাঁর ভাল লাগে না। তিনি মনে করেন ব্রহ্ম যেমন সত্য, ব্রহ্মের আচিন্ত্য-শক্তি, ব্রহ্মের শক্তিউদ্ভূত জগৎও তেমন সত্য। প্রভু আরও বললেন, ‘সামান্য-বুদ্ধি মানুষকে প্রতি পদেই ভুল-প্রান্তি করতে দেখা যায়।’ ব্রহ্ম, প্রমাদ, বণ্ণেন্দ্রিয়া, (বিপ্রলিপ্সা) ও ইন্দ্রিয়-অপট্য রূপ কোন না কোন একটি দোষ মানুষের আছে। সুতরাং

সেই অলৌকিক, আচিন্ত্য-স্বভাব ব্রহ্ম-বস্তুকে মানুষের প্রত্যক্ষানুপ্রমাণসকল স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু সেইহেতু ব্রহ্মবস্তুর কোন প্রমাণ নাই এরূপও বলা যায় না। সকল বস্তুর প্রমাণ সমান হয় না—পরব্রহ্ম সর্বাত্মর, সর্বাচিন্ত্য, ও আশ্চর্য-স্বভাব বস্তু। তার প্রমাণও সেই-রূপ হওয়া উচিত। ‘সর্বপুরুষ পরম্পরায় লৌকিক ও অলৌকিক সর্ববিদ জ্ঞানের নিদান বলে যাকে অ-প্রাকৃত বাক্য বলা হয়, সেই স্বতঃপ্রমাণ বেদই একমাত্র স্ব-প্রকাশ পরব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ।’ বেদব্যাসের ভাষাও ঠিক এই ধরনের কথা বলা হয়েছে,— ‘তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপান্যাদানু-মেয়মিতি চেদেবসপ্যানির্মৌক্য প্রসঙ্গঃ’। তর্কের প্রতিষ্ঠা নেই বলে তর্ক-মূলক ব্রহ্ম কারণ-বাদের পরিবর্তে বেদ-মূলক ব্রহ্ম কারণবাদই আশ্রয় করা উচিত। এখানে বলা যেতে পারে যে যেরূপ তর্কের অ-প্রতিষ্ঠা না হয়, সেইরূপ তর্কই আশ্রয় করা উচিত, তাহলেও তর্কের অ-প্রতিষ্ঠা-রূপ দোষ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না; কারণ প্রতিষ্ঠিত তর্কের স্থিতিকরণও তর্ক-সাপেক্ষ। আচিন্ত্য বিষয়সকলের উপর তর্ক প্রয়োগ উচিত নহে, যা প্রকৃতির অতীত তাই-ই আচিন্ত্য।

‘ব্রহ্ম শব্দের মূখ্যার্থ’ দ্বারা অসমোর্থ চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ ভগবান বোধিত হয়ে থাকেন। পুরুষমুক্ত মস্তিষ্কে যে রূপাদ বিভূতির উল্লেখ আছে, তাই খ্রীড়গবানের চিহ্নবিভূতি। যা ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন-কালীয় ভক্তগণ আবহমান ভক্তি-ভাবেও হৃদয়ে অভিন্নভাবে অনুভব করে এসেছেন, তা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় বলে কি অস্বীকার করা কি যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? দিব্য পৈচক স্বর্ষকে দর্শন করে না বলে সূর্যের অস্তিত্ব কি অস্বীকৃত হবে? খ্রীড়গবানের নিত্য-লোক-সকল, নিত্য পরিকরসকল, ও নিত্য লীলা প্রাকৃত মনে করা বা অস্বীকার করা অপরাধ।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করা, জীব ও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন জ্ঞান করা, ‘পরিণামবাদে দোষারোপপূর্বক বিবর্তবাদ স্থাপনের চেষ্টা করা, প্রণবের মহাবাক্য আচ্ছাদনপূর্বক তৎসম্যাদি প্রাদৌশিক বাক্যসকলের মহাবাক্য প্রচার করা, জ্ঞান-বিশেষ রূপ ভক্তির প্রাধান্য অস্বীকারপূর্বক জ্ঞানসামান্যের প্রাধান্য স্থাপন করা, ও প্রেমরূপ পরম পূর্বস্বার্থের উল্লেখ না করে মোক্ষরূপ পূর্বস্বার্থের উৎকর্ষ বর্ণনা করা কি দোষাবহ নয়? বস্তুতঃ বিশ্ব কি

কারণমূলক? জীবই কি ব্রহ্ম? ঐ ব্রহ্ম কি নিগূণ? তাদৃশ ব্রহ্ম ভাবাপতিই কি জীবের পরম পূর্বস্বার্থ? জ্ঞানই কি ঐ পূর্বস্বার্থের সাধন?—না তা কখনও হতে পারে না। এই প্রতিপক্ষ অনুভূতমান বিশ্ববসংসারকে স্বপ্নবৎ, অলৌকিক, মিথ্যা বলে ধারণা করব কি করে? শ্রুতি যার সৃষ্টি, স্থিতি, বিলয় নির্দেশ করছে, সূত্র যার সৃষ্টি, স্থিতি, বিলয় বিচার করছে, ইতিহাস-পুরানে যে সৃষ্টি, স্থিতি, বিলয় বর্ণিত হয়েছে তাকে কি কখনও অসৎ বা অবস্তু বলা যায়? সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম যার নিমিত্ত ও উপাদান, সেই বিশ্ববসংসার কখনও অলৌকিক হতে পারে না।

একই ব্রহ্ম বিশ্বের নিমিত্ত ও উপা-দান উভয়ই। তা অসম্ভব নয়। ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তিযোগ হেতু উভয়ই সম্ভব হয়ে থাকে। অপরিণামশক্তি স্বরূপশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম বিশ্বের নিমিত্ত কারণ এবং পরিণামশক্তি দ্বারা শক্তি দ্বারা সেই একই ব্রহ্ম বিশ্বের উপাদান কারণ হয়ে থাকে। ব্রহ্মের যুগপৎ কার্যাকারে পরিণাম এবং অপরিণত স্বরূপে অবস্থান আপাততঃ বিরুদ্ধবোধ হলেও, আচিন্ত্য শক্তিযোগ হেতু মায়ামুক্ত দ্বারা কার্যাকারে পরিণাম ও স্বরূপশক্তি দ্বারা অপরিণত স্বরূপে অবস্থান সঙ্গতই। জগৎ ব্রহ্মের শক্তি-বিশেষ। একদেশস্থিত অগ্নির প্রসারণী জ্যোৎস্নার ন্যায় কেন্দ্রস্থানীয় ব্রহ্মের বৃত্তস্থানীয় প্রসারণীশক্তিই জগৎ। সুতরাং ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম-স্থিত পরিণাম-ভূত জগৎও সত্য।

এই মতবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলা যায়। নিছক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা ও জটিল পরি-স্থিতির উদ্ভাবন করা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। মহাভাবকের কথা যেভাবে প্রচারিত হয়েছে তারই অতি সামান্যংশ এখানে বলা হল। আমরা পূর্বেই বলেছি খ্রীষ্টীচৈতন্য মহাপ্রভুর অধ্যাত্ম সাধনা মূখ্যতঃ ভাব-সাধনা—যে ভাবের বলা একদিন সারা ভারতকে শ্লাঘিত করেছিল—ভক্ত হৃদয়ে সে ভাবের অনু-ভূতি আজও প্রাণবন্ত হয়ে আছে। বর্তমান সমস্যা-অধুর্ভূত সংসারে সেই ভাবের স্পর্শ আজ বিশেষ প্রয়োজন। এই ভাবোপলব্ধির জন্য প্রথম দরকার চিত্তশুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। মানুষের বাহ্যমুখী মন অন্তর্মুখী করবার সাধনা ভাব-সাধনার প্রাথমিক উপাদান। ভক্তি-বেদ্য-প্রেমোদ্রেক্য ভাব সাধনার সাধন জগতে আশেষ মঙ্গল করে সক্ষম বলে আমার বিশ্বাস।



আবরণ

নারায়ণ গাঙ্গোপাধ্যায়



তবলা জবাব দেয় না। আজ দু বছর ধরে এসব তার অভ্যাস হয়ে গেছে। সূর্য উঠবে, বেলা বাড়বে, সংসারের কাজ চলবে, ইন্দুমতীর মুখও চলতে থাকবে সেই সঙ্গে। কুৎসিত কটু গালিগালাজ। পানের থেকে চুর্ণটি খসলে চোঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করবেন, অকারণে ঝগড়া করতে থাকবেন বাতাসের সঙ্গে। মধ্যে মধ্যে তরলা বলতে ইচ্ছে করে : মা এবার নতুন 'কছর' বলুন—প্রত্যেকদিন একঘেয়ে গালাগাল শুনতে শুনতে কানের পোকা বেরিয়ে গেল যে!

রাত তিনটেতেই জটাধর হালদারের মা ইন্দুমতীর ঘুম ভাঙে। তারপর আরো ঘণ্টাখানেক কোনোমতে পড়ে থাকেন বিছানায়। কান পেতে শোনেন বাইরের বড়ো কাঁঠাল গাছটার প্যাঁচা ঝগড়া করছে, সারা রাত চোঁচিয়ে এতক্ষণে কিম-ধরা কুকুরগুলো ভাঙা গলায় খেউ খেউ করছে এখনো। তত্তপোষের নিচে সারি সারি হাঁড়ি-কলসীর ভেতরে নেংটি ইন্দুরের কুটাকাট আর আরশোলায় ফরফরানি কানে আসে, বড়ী বিভ্রিবিড় করে বলেন, খেলে, মুখপোড়ারা ছিটি-সংসার সব খেয়ে দিলে!

বাইরে অন্ধকার ফিকে হয়, ঠান্ডা হাওয়া আসে, জানলা দিয়ে শুকতারটা একটা রূপোর ধুকধুকির মতো জ্বলতে থাকে। শেখরাতের গাড়ীটা গুম গুম করে দূরে চুর্ণী নদীর সাঁকো পার হচ্ছে—তার আওয়াজ পাওয়া যায়। তখন ইন্দুমতী বিছানা ছাড়েন। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বোয়ের ঘরে একবার কান ফিৎফিৎ করে! আমার বরাতের জোর!

পাতেন, ভেতর, থেকে ঘুমন্ত বউয়ের নিঃশ্বাসের শব্দ আসে। সকালবেলায় মুখ দিয়ে দুর্গা নাম বেরোয় না—কেবল বলেন, হারামজাদী!

তারপর কুরোতলায় গিয়ে নামেন। ফিরে বারান্দায় আসতে আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটে। একটা কম্বলের আসন পেতে মালা জপ করতে করতে দেখেন, থিড়িক দরজার পাশে সজনে গাছদুটোর ওপর দিয়ে আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। তখন বোয়ের ঘরের দরজা খোলবার আওয়াজ পাওয়া যায়—ঘুম-জড়ানো চোখ মুছতে মুছতে তরলা বেরিয়ে আসে।

‘কালী-তারা-মহাবিদ্যা-বোড়শী-ভুব-নেশ্বরী’তে ছেদ পড়ে হঠাৎ। ইন্দুমতীর দুটো মাড়ির অবশিষ্ট দাঁতগুলোতে হঠাৎ কড়-কড় করে একটা হিংস্র বিস্ফোব সাদা দিয়ে ওঠে।

—নবাব-নন্দিনী গা তুললেন এত—

জটাধর হালদারের সংসারের অবস্থা নেহাৎ খারাপ নয়। আগে কিছু জমিদারী ছিল, এখন তিন শরিকে ভাগ হয়ে গিয়েও জমিজমা থেকে যা আসে তাতে সারাটা বছর মোটামুটি চলে যায়। তা ছাড়া মালদান ওদিকে গোটা দুই বড়ো বড়ো আমের বাগানও ভাগে পড়েছে, সে দুটো জমা দিয়েও বছরে হাজার বারোশে টাকা আসে। সবই আছে, কেবল জটাধর হালদাই নেই।

ইহলোকে নেই সে কথা বলা যায় না; কেবল কোথায় আছে সে-কথাটাই জোর করে বলা শক্ত। ঠিক দু বছর আগে কৃষ্ণনগরের কোনো কু-পল্লীতে একটা খুন করে ফেরার হয়েছে সে। পদলিশে এখনো তার সন্ধান পায়নি।

অপ বয়সেই সম্পত্তি ভাগের একরাশ কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে জটাধর বখে গিয়েছিল। অন্য শরিকের দাদা-কাকারা বাধা দেননি, ভেবেছিল আর একটু উড়তে শিখুক জটাধর, আরো কাপ্তেন হোক—

তারপর। তারপর বাকী সম্পত্তিটা বেশ নির্বিবাদে তাদের মতোয় চলে আসবে।

ভয় পেয়ে ইন্দুমতী ছেলের বিয়ে দিলেন। খুঁজে পেতে আনলেন গরীবের ঘরের সুন্দরী মেয়ে তরলাকে। কিন্তু রাত-চোরা গোরুর ঘরের খড়-বিচুলিতে মন ভরে না। জটাধরের হাল-চাল এক বিন্দু বদলালো না—উল্টে তরলাকে মারধোর শুরু করে দিলে।

ততক্ষণ পর্যন্ত বোয়ের সঙ্গে কোনো বিরোধ ছিল না ইন্দুমতীর। শান্ত নির্বিবাদে বোটার ওপর ছেলের অত্যাচারে তাঁর চোখে জল আসত। সাধামতো ছেলের হাত থেকে বোকে বাঁচাতে চেষ্টা করতেন, অনুতাপ করে বলতেন, আমারই ভুল হয়েছিল। ও বাদরের গলায় কি আর মৃত্যুর হার মানায়!

কিন্তু চাকাটা হঠাৎ উল্টো দিকে ঘুরল। ছেলে নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। নিজের সমস্ত লজ্জা, সব জ্বালা বিষ হয়ে ঝরে পড়ল বোয়ের ওপরেই। সামনে জটাধর নেই বলেই তার অপস্বার্থের পুরো বোকাটা তিনি চাপিয়ে দিতে চাইলেন তরলার কাঁধে, নামাতে চাইলেন মনের ভার।

—সোনার সংসার ছিল আমার। এই বিষকন্যা ঘরে এসেই সব ভাঙিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে।

সত্যিই তো—বিষকন্যা ছাড়া কী আর! জটাধর বয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু বেপাড়ায় গিয়ে হঠাৎ একখানা ছোরা বের করে জ্বলজ্বালন্ত মানুষ খুন করে বসবে—একথা কে ভাবতে পেরেছিল! খবরটা পাওয়ার পরে তিনদিন ধরে গুম হয়ে

বসে ছিলেন ইন্দুমতী। তারপরে তাঁর মুখ খুলল। রাক্ষুসী—সর্বনাশী—ডাইনি!

ভালো মানুষের মেয়ে হলে—মন ভালো হলে—গা-ভরা রূপ নিয়ে কি আর স্বামীকে বশ করতে পারত না? পুরুষ-জাত একটু উড়ু-উড়ু করেই, বার-টান তার বরাবরই থাকে; তাকে শিকলি দিয়ে বাঁধা, ঘরমুখো করা—এই তো বোয়ের কাজ। কত উড়া পায়রা বোয়ের গুণে ঘরে ফিরে এসেছে, শিষ্ট-শান্ত ভালো-মানুষ হয়ে সংসার করছে, বছর বছর বোকে গয়না গাড়িয়ে দিয়েছে। তরলাও কি পারত না? রূপে মূর্খের মন ভোলে, গুণে ডাকাত পর্যন্ত বশ হয়—আর তরলা বাঁধতে পারল না জটাধরকে? ইচ্ছে থাকলেই পারত। আসলে ডাইনিটা সংসারকে খেতেই এসেছে—তারই দোষে আজ তাঁর ছেলে এমন করে সর্বনাশের পথে নেমে গেল।

চিৎকার করে এসব কথা বলতে থাকেন ইন্দুমতী, তারপর হাউ হাউ শব্দে কান্না শুরু করে দেন। তরলা জবাব দেয় না। অশ্রুচরিত্র মেয়েটির। ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা অবধি মাথা নীচু করে খাটে, ভেতরে এতটুকু অবসর যদি কখনো পায়—রান্নাঘরের বারান্দায় থামের গায়ে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। সজনে গাছের মাথার ওপর দিয়ে চোখের শূন্য দৃষ্টি ছাড়িয়ে দেয় আকাশের দিকে, কী যে ভাবে সেই-ই জানে।

আজ দু বছর ধরে এই ভাবেই চলছে।

ইন্দুমতী কখনো কখনো বলেন, দুই হয়ে যা—চিরকালের মতো। সরে যা আমার

সামনে থেকে। তোকে আর আমি সহিতে পারছি না। আমার ছেলেকে তুই খেয়েছিস, এবার আমাকে খাবি।

বৌ যায় না। গরীবের ঘরের মেয়ে, বাপের বাড়ী ফিরে কী দশা হবে সে-কথা তার অজানা নেই; তা ছাড়া ইন্দুমতীরই বা কী গতি হবে? আজ দু বছরের মধ্যে তিনি যেন দশ বছর বৃড়িয়ে গেছেন, চলতে-ফিরতে মাথা কাঁপে, দু পা চলা-ফেরা করলে বুক ধরফড় করতে থাকে। কেবল গলার জোরটাই বেড়েছে, কিন্তু সে জোরে রান্না করে খাওয়া যায় না—এমন কি এক গ্লাশ জলও গাড়িয়ে খাওয়া চলে না। বৌ সে কথা বোঝে—ইন্দুমতী যে বোঝেন না তা নয়।

সুতরাং এক রাশ হিংস্র বিবেষ আর আশ্রুচরিত্র নীরব সহিষ্ণুতার একটা চুক্তি দুজনের মধ্যে তৈরী হয়ে গেছে। আজ বৌ সামনে না থাকলে ইন্দুমতী দম ফেটে মরে যাবেন; আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর একটানা চিৎকার শুনতে না পেলে তরলার হয়তো মনে হবে পৃথিবীটা অস্বাভাবিক রকম স্তব্ধ হয়ে গেছে—সে স্তব্ধতা সহ্য করা যায় না।

সেদিনও ইন্দুমতীর তিনটির আগেই ঘুম ভাঙল। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন। মনে হয়েছে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জটাধর, হাতে ছোরা, সারা গায়ে রক্তমাখা। চিৎকার করে যেন বলছে : বৌ কোথায়? এবার সেটাকে খুন করব।

ঘামে নেয়ে গেছেন ইন্দুমতী, এখনো ধড়-ফড় করছে বুকের ভেতর। কাঁপা হাতে টিপরের ওপর রাখা নিরু-নিবু লণ্ঠনের আলোটা বাড়িয়ে দিলেন, মরা লালচে আলোয় ঘর ভরে উঠল। যদিও স্বপ্ন দেখেছেন, তবু মনে হতে লাগল, এখনো কোনো ছায়ার আড়ালে ছোরা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জটাধর—একটা বিকট চিৎকার করে তাঁর সামনে যে-কোনো সময় লাফিয়ে পড়তে পারে।

লণ্ঠনের আলো বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তন্তুপোষের তলায় ইন্দুরের খুট-খুটনি খেমে গেল। তাঁর পায়ে কাছ একটা অনাধিকারী বেড়াল গুঁটি-শুঁটি মেয়ে

অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের জন্য

আমাদের আর একটি নূতন কেন্দ্র

৭নং পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা—১

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এর্ভিনিউ, কলিকাতা—১২

রাগিরাপন করছিল, জানলা গলিয়ে এক লাফে বাইরে উধাও হল সেটা। ইন্দুমতী বালিশের তলা থেকে গীতা বের করলেন। সংস্কৃত অনেক কণ্ঠে ধরে ধরে পড়তে পারেন, গীতার অর্থ যে বোঝেন তা-ও নয়, তবু ওটা মাথার নীচে থাকলে কেমন যেন ভরসা পান।

সংস্কৃত শ্লোক ছেড়ে দিয়ে ইন্দুমতী গীতার বাংলা ব্যাখ্যা বানান করে করে পড়তে লাগলেন, 'সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হে কৌন্তেয়, তুমি একমাত্র আমারই উপাসনা কর। কোনো চিন্তা করিয়া না, আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব।'

একটু একটু করে পড়তে লাগলেন, আর মধ্যে মধ্যে চোখ তুলে জানলা দিয়ে দেখতে লাগলেন অন্ধকার রং বদলাচ্ছে কিনা। জটাধরের রক্তমাখা ডগ্গর চোহারাটা এখনো যেন সামনে ভাসছে। লণ্ঠনের লাল আলোয় ঘরের কোনায় কোনায় যেখানে ছায়া জমেছে, সোদিকে এখনো ভালো করে চাইতেও সাহস পাচ্ছেন না ইন্দুমতী। ঘরে থাকতে ভয় করছে, ঘরের বাইরে যেতেও পা উঠছে না।

এরই মধ্যে একবার অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন বোয়ের ঘরের দিকে। শ্রীকৃষ্ণের অমৃত-বাণী একবারের জন্যে ভুলে গিয়ে হিংস্র স্বরে বললেন, হারামজাদী।

বাইরে কাকের প্রথম কোলাহল ফুটে উঠল, শোনা গেল পাখিদের কলধ্বনি। পশ্চিমের জানলা দিয়ে আকাশ ছাইয়ের রং ধরল। তখন লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে ইন্দুমতী খাট থেকে নামলেন, দরজা খুলে ভোরের শিশিরে ভেজা হাওয়া শ্বাসের সঙ্গে বুক ভরে টেনে নিলেন।

সদর দরজায় বাজের মতো শব্দ করে কড়া নড়ল সেই সময়। যেন ভেঙে ফেলতে চাইল একেবারে।

জটাধর? দারণ ভয়ে ইন্দুমতী আতঁনাদ করে উঠলেন একটা। আর ব্যতিব্যস্ত হয়ে মাটিতে আঁচল লোটাতে লোটাতে তরলা বেরিয়ে এল।

—কী হয়েছে মা—কী হল?

দরজায় আবার বিকট শব্দ কড়া নড়ল।

ইন্দুমতী বিবর্ণ হয়ে বসে পড়লেন বারান্দার ওপর। ফিস-ফিস করে বললেন, শুনছ না—কড়া নড়ছে?

—কড়া নড়ছে তো হয়েছে কী? আমি দেখছি কে এল—

আঁচল তুলে নিয়ে তরলা বারান্দা থেকে নেমে গেল। ইন্দুমতী চিৎকার করে বলতে গেলেন, যোনা না—যোনা না, জটাধর এসেছে, তোমায় খুন করবে।—কিন্তু একটা শব্দও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না। মাথাটা আরো বেশি করে কাঁপতে লাগল, আতঙ্কে পাথর হয়ে তিনি সদর দরজার দিকে চেয়ে রইলেন।

তরলা খিল খুলল। ছোরাটা এইবারে বজাকে উঠবে, ইন্দুমতী ভাবলেন। দেখলেন, সভয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেল তরলা, মাথার ঘোমটাটা বুক পর্যন্ত টেনে নামালো।

ভেতরে ঢুকলেন পালিশের দারোগা। সঙ্গে জন তিনেক কনষ্টেবল; তিন জন গ্রামের ভদ্রলোক।

—ভোরবেলায় বিরক্ত করলুম, কিছ্র মনে করবেন না।—সংক্ষেপে মার্জনা-পর্ব সেরে নিয়ে জুতো মচমচিয়ে দারোগা ইন্দুমতীর সামনে এসে দাঁড়ালেন : আপনার ছেলে জটাধর কোথায়?

কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই বিহবল ভাবটা কেটে গেল ইন্দুমতীর। শব্দ

একবার মনে হল, পালিশ কি স্বপ্নেরও খবর পায়?

ইন্দুমতী দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, আমার ছেলে এখানে নেই।

—কোথায় আছে?

—জানি না।

—সে কবে এসেছিল এখানে?

—দু বছরের মধ্যে নয়।

—সত্যি বলছেন?—দারোগার গলার আওয়াজ চড়া হল : কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি, কাল সন্ধ্যার পর জটাধরের মতো চেহারার একটা লোক চুর্নী'র খেয়া পার হয়ে এদিকে এসেছে।

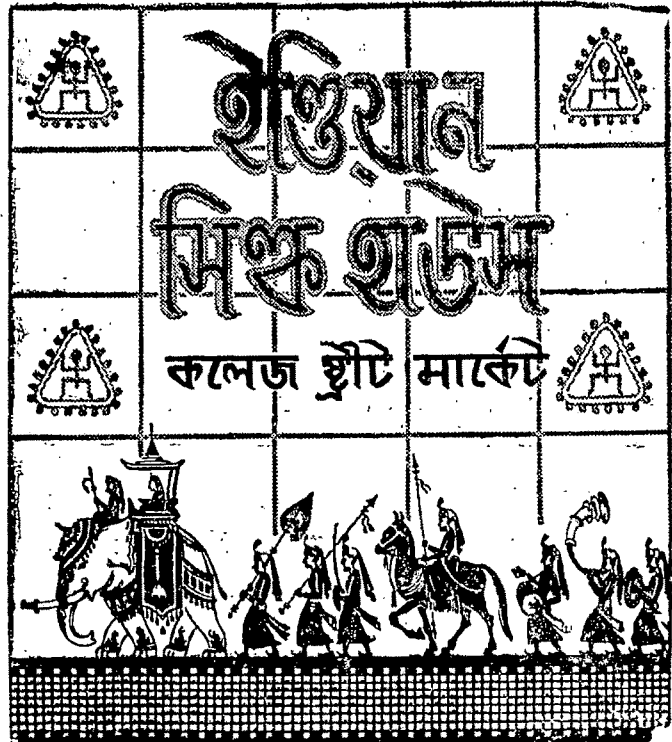
ইন্দুমতী এতক্ষণে শক্ত হয়ে উঠলেন।

—হতে পারে। কিন্তু জটাধর দু বছরের মধ্যে এ বাড়ীতে আসেনি। বিশ্বাস না হয়, খুঁজে দেখুন।

—তাই দেখব।—দারোগা পকেট থেকে একখানা হলদে কাগজ বের করলেন : এই সার্চ ওয়ারেন্ট। আর গ্রামের ঐরা সব সাক্ষী হয়ে এসেছেন।

—বেশ, করুন সার্চ।

দারোগা একবার ইন্দুমতী আর এক-বার ঘোমটা-টানা তরলার দিকে চেয়ে



দেখলেন। তারপর বললেন, আপনারা দু'জনে ভেতরে যাবেন না, বাইরেই থাকুন।—সাক্ষীদের ডেকে বললেন, আসুন আপনারা।

খানা-তাল্লাস শুরু হল।

তত্ত্বপোষের তলা থেকে হাঁড়ি বেরুল, কলসী বেরুল, ইঁদুর আর আরশোলা বেরুল, কেবল জটাধরকেই পাওয়া গেল না। তারপর শুরু হল বাজ-প্যাঁটারা তচ-নচ করা—হাঁদি তা থেকে জটাধরের কোনো নিশানা মেলে।

আর তখনই কেঁচো খুঁড়তে শাপ উঠল।

তরলার বাজ থেকে বেরিয়ে এল খান তিনেক চিঠি। ফিকে নীল কাগজে লেখা—ঠিকানা নেই, তারিখ নেই। তলায় কেবল সই করা : মধু।

চিঠিগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়েই দারোগার ঠোঁটের কোনো বেঁকে গেল একটুখানি।

—এ চিঠি কে লিখেছে? আপনার ছেলে?

সাপের ছোবল পড়বার মতো চমকে উঠলেন ইন্দুমতী। জটাধর জীবনে কাউকে চিঠি লিখেছে বলে তাঁর মনে পড়ল না।

—আমার ছেলে?

—ঠিক বুঝতে পারছি না।—দারোগা একটু হাসলেন : তবে আপনার ছেলের পক্ষে একটু বেশি কার্যবাক বলে মনে হচ্ছে। নামটাও জটাধর নয়—মধু। তিনটে চিঠিতেই কী আছে—জানেন? তোমার জন্যে আমি পাগল। তোমার কণ্ঠ আর সইতে পারছি না। এসো—পালাই। দু'জনে নতুন জীবন শুরু করব কোথাও গিয়ে।—দারোগা আবার হাসলেন : এ চিঠিতে আমার কোনো কাজ হবে না বোধ হচ্ছে। ওহে রামলাল, বোমার বাজেই ওগুলো রেখে দাও।

সাক্ষী তিনজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে একজন

বললেন, মধু মানে—আমাদের বলাই হাজারার ছেলে নয়তো, হে রাধাকান্ত? দাঁড়া চেহারাখানা, ভালো থিয়েটার করে।

ইন্দুমতী আবার মিনিটখানেক আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলেন, বাড়ী-

হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরলা। নড়ছে না—যেন নিঃশ্বাসটুকুও পড়ছে না তার। সকালের লাল আলো পড়েছে তার গায়ে, মুখ থেকে ঘোমটা সরে গেছে; ইন্দুমতীর মনে হল, জটাধর তাকে খুন করে পালিয়ে গেছে, তার সর্বাত্মক ও রোদ নয়, রক্ত!

আর তখনই, সমস্ত অশ্লীল কৌতুককে খান-খান করে দিয়ে, ইন্দুমতীর বিখ্যাত গলা খন-খন করে উঠল।



...তিন হাত পিছিয়ে গেল তরলা।

শুদ্ধ লোকের কুঁসিত কোঁতালের দৃষ্টি এক সঙ্গে গিয়ে পড়েছে উঠানের আর এক প্রান্তে। সেখানে সজনে গাছটার

—কী সব যা-তা বলছ আমার সত্যী-লক্ষ্মী বোমার নামে! মুখে পোকা পড়বে না তোমাদের? ও চিঠি আমারই ছেলে লিখেছে। তোমাদের ভয়ে ফেরার হয়েছে, নাম দিয়ে চিঠি লিখবে কোন সাহসে? নিজের বোকে নিয়ে পালাতে চেয়েছে, তাতেই বা কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে শুন? পারো তো তাকে ধরো গে, কিন্তু বোয়ের নামে কুকথা বললে বোঁটিয়ে বাড়ী থেকে বিদায় করে দেব।

সজনে গাছটার তলায় তরলা মৃদুচ্ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

সার্ভে ড্রইং সরঞ্জাম ও অফিস সংক্রান্ত স্টেশনারী কাগজ বিক্রয় ও প্রিন্টার্স

রহস্যময় ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

কুইন স্টেশনারী স্টোর্স প্রাইভেট লি:

৬৩ ই. রাধাকান্ত স্ট্রীট কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৪২২৩

ব্যাশিয়ার ডায়েরী

দ্রবোধী কুমার-মান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

II সতেরো II

মস্কো থেকে বিমানযোগে মধ্যরাত্রে বেরিয়ে যখন উক্ৰাইনের রাজধানী কিয়েভ নগরের বিমানঘাটিতে এসে নামলুম, মস্কো টাইমে রাত তখন পৌনে দুটো। কলকাতায় বোধ হয় সকাল ছটা বাজে। মস্কো থেকে কিয়েভের দূরত্ব বোধ করি সাত-আটশ' মাইলের মধ্যে। সময় লাগল দেড়ঘণ্টা। এবার আমার সঙ্গে এলেন শ্রীমতী অকসানা। এ'র কৃতিত্ব, বিদ্যানু-রাগ এবং যোগ্যতা দোভাষী-সমাজে একে বিশিষ্ট আসন দিয়েছে। শ্রীমতী অকসানা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন দোভাষীপন্থে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ তিনি ঘুরেছেন। কলকাতার গড়িয়াহাট রোড, ক্যানিং, বারুইপুুর বা ডায়মন্ডহারবার তাঁর অজানা নয়। প্রধানমন্ত্রী মিঃ খন্ডুচভকে যে কথাগুলি আমি বলিছিলুম, এবং মিঃ খন্ডুচভ তার জবাবে তাঁর কলকাতার মধুর অভিজ্ঞতার যে পরিহাসসূচক বর্ণনা করেছিলেন, সেগুলি যথার্থভাবে এবং অতি দ্রুততার সঙ্গে শ্রীমতী অকসানা উভয় পক্ষকে উভয় ভাষায় বুঝিয়ে দিয়ে-ছিলেন। তাঁর নামডাক প্রচুর। ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, ইংরেজ সংস্কৃতি ও সভ্যতা—তাঁর বিশেষ প্রিয়। তাঁদের আদি বাড়ি হল আমেরিনিয়ায়। তাঁর বাবা ছিলেন চিকিৎসক। তিনি বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় মারা যান। অকসানার মাও নেই। এই মহিলা মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে একটি শিশুকন্যাকে নিয়ে বিধবা হন, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর বিবাহ করেননি, এবং তাঁর কোনও প্রণয়ীও নেই। কন্যা ও জামাতাকে নিয়ে তিনি মস্কোর একটি ফ্ল্যাটে বাস করেন ও রাইটাস' ইউনিয়নের কাজকর্ম এবং পড়াশুনো নিয়ে থাকেন। তাঁর বয়স বছর বিশাল্লিশ। ঈশ্বর খবাকায় এবং চেহারার ছেলেমানুষের মতো। দুটি দল্লভ বস্তু আছে তাঁর চেহারায়। ঘন কালো চুলের রাশি, এবং দুটি বড় বড় কালো চোখ। স্পষ্ট বোঝা যায়, এককালে তিনি আমেরিনিয় সুন্দরী ছিলেন। তিনি

রাইটাস' ইউনিয়ন থেকে মাসিক বেতন পান ২,৫০০ রুবল। ভারতীয় বিনিময় মূদ্রায় সেটি দাঁড়ায় ৩০০০ টাকা। তাঁর কন্যাই তাঁর ঘরের কণ্ঠী। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠাবতী দোভাষী। পৃথিবীর বহু ভাষার বহু গ্রন্থে অকসানার কৃতিত্ব ও যোগ্যতার নানা উল্লেখ আছে। তাঁর বন্ধু-সমাজ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এবং তাঁর সম্পূর্ণ নাম অকসানা সিমেনভনা ক্রুগারসকায়। তাঁর স্বামীর নাম ক্রুগারস্কি। পৃথিবীর সব দেশের মতোই সোভিয়েট ইউনিয়নেরও বিবাহিত নারী স্বামী ও শ্বশুরবংশের উপাধিতেই চলেন। সেখানে বিপ্লবের গন্ধও নেই।

অত রাতে কোনও ব্যক্তি বিমানঘাটিতে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারেন এটি ভাবিনি। কিন্তু দুইজন ব্যক্তি এগিয়ে এলেন এবং করমর্দন বা সৌজন্য-প্রকাশের বিস্ময়কর অবকাশ আমাকে না দিয়ে যেভাবে ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন, সেটির ভাষা নিতান্ত লৌকিকতা-পূর্ণ ছিল না—তাতে অনুরাগ এবং আন্তরিক প্রীতির নিবিড় উত্তাপ ছিল। ইনি দশাশই, দীর্ঘাকার, গলার আগুয়াজ মোটা, এবং মুখে মস্ত একজোড়া গোঁফ। ইনি উক্ৰাইনের প্রসিদ্ধ নাট্যকার মিঃ মিন্‌কো। দ্বিতীয় ব্যক্তি সুদর্শন, অমায়িক এবং মিষ্টভাষী। তিনি একজন বিশিষ্ট কবি। নাম মিঃ পলটকিন গ্রেগরি। গ্রেগরি কয়েকটি ইংরেজি শব্দ জানেন মাত্র। মিন্‌কো তাও না। এঁদের সর্ব-প্রকার আচরণের মধ্যে একটি মিষ্ট মধুর 'প্রাচীন' বন্ধুত্বের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছিল, এবং এটি উভয় পক্ষেরই দূর্ভাগ্য যে, আমরা কেউ কারও ভাষা বুঝিনে!

মিন্‌কোর সমস্ত আচরণ, আলাপ, আত্মপ্রত্যয় এবং কেমন একটা বেপরোয়া ভঙ্গীর মধ্যে যে-ব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল, সেটির বৈশিষ্ট্য আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এমন অভিজ্ঞ হয়ে পড়েছিলাম যে, এক সময় অকসানাকে একপ্রকার আবেদনই জানালুম, কাল সকালে এ'র সঙ্গে আবার দেখা হবে ত?

সকালে! আরে, এই ত' সকাল!—মিন্‌কো ঘনঘোষণে বললেন, বেশ জমিরে—আসুন, বসা থাক। অতশত বুঝিনে মশাই, আপনাকে নিয়ে সোজা আমরা আনন্দ করতে চাই! ফেরবার তাড়া নেই ত? বাস, আর কিছু জানতে চাইনে। ও সব ব্যবস্থা আমরা করে নেবো। অনেককাল পরে পাওয়া গেছে একজন ভারতীয় লেখককে। সহজে কি ছাড়ব মনে করছেন? আপনাদের বিমান তিন ঘণ্টা লেট, আর সেই তিন ঘণ্টা আমরা দুই বন্ধু কাঁধে-কাঁধে মাথা রেখে ঢুলা-ছিলাম!

তাঁর এই আল্‌গা ঘরোয়া কথাবার্তা-গুলি আমাকে বুঝিয়ে বলতে গিয়ে শ্রীমতী অকসানা এবং গ্রেগরি খুব হাস-ছিলেন। আমিও মশগুল হইছিলাম।

আমাদের নিয়ে একখানি গাড়ি ছট-শিল শহরের দিকে। মিন্‌কো আবার বললেন, আরে হ্যাঁ, মশাই। দেরি হচ্ছে হোক। বেশ ত, বাকি রাতটুকু এখানেই আনন্দ করে কাটিয়ে যাই! এই ছোট্টটাকে বললুম, বা, মাল-টাল কোথায় পাস নিয়ে আয়! হতভাগাকে নড়ানো গেল না, মশাই? বলুন ত, কী দূরবস্থা—?

গাড়ির মধ্যে সবাই হেসে একেবারে লুটোপুটি। সোভিয়েট ইউনিয়নের চার-দিকে যে গান্ধী'র দেখতে দেখতে অভ্যন্ত হয়ে উঠেছিলুম,—মিন্‌কোর আবির্ভাবের ফলে সেই মেঘজাল কেটে গিয়ে আকাশ যেন রৌদ্রে ঝলমল করে উঠল! বলা বাহুল্য, এই ব্যক্তির সান্নিধ্য আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছিল! এ'র সম্পূর্ণ নাম হ'ল ভ্যাসিলি মিন্‌কো। সম্প্রতি বিশেষ সুখ্যাতির সঙ্গে এ'র নাটক এখানকার প্রধান রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। এ'র স্ত্রী সেই রঙ্গমণ্ডের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী। তাঁর খ্যাতি প্রচুর।

শ্রীমতী অকসানা এবং বন্ধুরা সেই শেষরাতে আমাকে নিয়ে 'ইন্‌টেরিস্ট' হোটেলে দোভাষার একটি ঘরে তুললেন। দরটি বড়, এবং সম্পদশালী হোটেলের নিয়মমাত্তক বিবিধ মূল্যবান আসবাব-সজ্জায় আগাগোড়া পরিপূর্ণ। 'ইন্-

টরিস্ট' হোটেলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিদেশী পর্যটকরা সাধারণত এখানেই এটেন এবং অজস্র রুবল ব্যয় করে থাকেন। একজন ব্যক্তির পক্ষে ভদ্রভাবে থাকতে গেলে দৈনিক দেড়শত রুবলেরও বেশি পড়ে এখানে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের এটি একটি প্রধান উপায়।

পরিদর্শন সকালে যথাসময়ে মিন্‌কো এবং গ্রেগরি এসে উপস্থিত হলেন। আভ্যর্থনা জানালুম বটে বিশেষ সমারোহে এবং সমাদর সহকারে, কিন্তু সেটাও এক কৌতুকজনক পরিস্থিতি। কেননা উভয়ের উভয়ের কাছেই দরবেশ্য। তবু হাসি, আনন্দ, স্পর্শ, আলিঙ্গন—এদের নিজস্ব ভাষা আছে—সেটি বুদ্ধিতে দোভাষীর দরকার হয় না! তাঁরা বহু একখানি গাড়ি এনেছেন। আমি যতদিন খুশি এই কিয়েভ শহর বা উক্রাইন রিপাবলিকের যে কোনও অঞ্চলে থাকব এবং ঘুরে বেড়াব। মিন্‌কোর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব লেখক-মহলে অতিশয় পরিচিত।

মিন্‌কো তাঁর বিশাল বুদ্ধিমান ওপর হাত চাপড়ে বললেন, শুনে রাখুন মশাই, আপনাদের সেই 'স্বপ্নময় পরী-রাজ্যে' এই আমরা দুই পাশ্চাত্য—আমি আর গ্রেগরি প্রাণভরে ঘুরেছি। যা দেখেছি, তা জীবনে ভুলব না। সোনার দেশ, আনন্দের দেশ ভারত! কী আশ্চর্য মন্দির, কী সুন্দর স্থাপত্য, কী মধুর জনসাধারণ... আমাদের চিরজীবনের সার্থকতা!

কিছুকাল আগে ভ্যাসিলি মিন্‌কো এবং স্টার্টকন গ্রেগরি এই দুজনে গিয়েছিলেন ভারতপ্রমণে। ঘুরতে ঘুরতে—তাঁরা গিয়ে পৌঁছেন বোলপুর এবং শান্তিনিকেতনে। সেই সঙ্গীতময় মহাকাব্য 'টেগোয়ের' রূপরাজ্যে একজন বিশিষ্ট প্লেথক ও পলিডের' সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব হয়। বড় মধুর প্রকৃতির মানুষ তিনি। প্রশ্ন করলুম, কে তিনি? তাঁর নাম কি বলুন ত?

মিন্‌কো এবং গ্রেগরি হাত নেড়ে মাথা চুলকিয়ে পকেট থেকে নোট বই বার করে সেই ব্যক্তির নামোচ্চারণের চেষ্টা পেলেন। বললেন, "অদান্...না, না,—আনাদ...আন্দাস...ইন্কার..."

একজন অপরজনের ভুল সংশোধনের চেষ্টা করতে গিয়ে যখন ঘরময় তুমুল হট্টগোল পাকিয়ে তুললেন, তখন আমাকে

বলতেই হল, আপনারা কি 'অনুদাশ'করায়ের কথা বলছেন?

লাফিয়ে উঠলেন দুজনে জয়োল্লাসে। পরে বললেন, আপনি গিয়ে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা নমস্কার জানাবেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে "টেগোর" এবং ভারত সম্বন্ধে বহু শিক্ষালাভ করছি। আমাদের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

অতঃপর, রবীন্দ্রনাথের আলোচনাকালে তাঁরা জানালেন, চল্লিশ বছর আগে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের "গার্ডেনার" নামক বইটি প্রথম উক্রাইনীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সেই বইটি পাঠ করে উক্রাইনের সাহিত্যরসিকরা বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। সেই ইংরেজি বইটি এসেছিল অনেক হাত ঘুরে। কেননা ভারতের ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় সাহিত্যের বই এদেশে আসবার যো ছিল না। আমরা যে ভারতের সাহিত্যপাঠের জন্য কত ব্যাকুল, এটিও আপনাদের কাছে জানাতে পারতুম না। বিবর্তীয় বিশ্ববন্ধের প্রাক্কালে এই কিয়েভ শহরের রংমণ্ডে রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" অভিনীত হচ্ছিল!

মিন্‌কো এবং গ্রেগরির মুখে চোখে গৌরবোজ্জ্বল শ্রদ্ধা প্রকাশ পাচ্ছিল। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে ভ্যাসিলি মিন্‌কো একখানি সচিত্র ছোট বই সবলে লিখে প্রকাশ করেন। বইটি উক্রাইনীয় ভাষায় লেখা। নাম "নমস্কে ইন্ডিয়া"। বইখানি তিনি আমাকে উপহার দেবার জন্য আজ এনেছেন। গ্রেগরি তাঁর একখানি কবিতার বই আমাকে উপহার দেবার সময় লিখে দিলেন, "দিল্লী দূর নহে! আমি সেই গ্রন্থকার যিনি শোভাসমুদ্র এবং জ্ঞানবৃক্ষ ভারতকে ভালবাসবার শিক্ষালাভ করেছেন।"

গ্রেগরির সুন্দর ও প্রসন্ন-স্মিত মুখখানির দিকে আমি একবার চেয়ে দেখলুম। এই সুদর্শন কবির বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, এবং বাল্যস্মৃতি মিন্‌কো বোধ করি পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে এমন দুজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে খুঁজে পাব, এতটা আশা করিনি। কর্মদর্শন করতে গেলে সোজা বুদ্ধি জড়িয়ে ধরে, এমন অভিজ্ঞতা সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র। সেই আলিঙ্গনের মধ্যে ঠান্ডা রাজনীতির বদলে ভালবাসার নিবিড় উত্তাপ অনুভব করতুম।

কিয়েভ নগরী বর্তমানে উৎকৃষ্ট একখানি ছবি: মতো সুন্দর এবং মনোজ্ঞ। একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর এই সুদ্রী এবং সম্পদশালী নগরী অবস্থিত, এবং এরই নীচে দিয়ে পূর্ব ইউরোপের অন্যতম প্রধান নদী 'নীপার' নগরীটিকে বেষ্টিত করে বয়ে চলেছে। মেঘে রোদ্রে ঠান্ডায় ভারি মনোরম লাগছিল।

উক্রাইনের সভ্যতা এবং জাতিতাবাদ ইউরোপ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই রাষ্ট্রের জাতিতাবাদের যিনি প্রধান মন্ত্রগুরু, তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাসের পুত্র এবং নিজেও ক্রীতদাস। তাঁর নাম—'তারাস শেভচেনকো'। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কিয়েভ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্রীতদাসের মতোই বিনা শিক্ষায় মানুষ হতে থাকেন। কিন্তু চারিদিকের দেশ-জোড়া দুর্গতির চেহারা দেখে তাঁর মনে বেদনা ও যন্ত্রণা সঞ্চারিত হতে থাকে, এবং সেগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর মানবতাবোধ কাবোর আকারে প্রকাশ পায়। তাঁর কবিতা যেমন সমাদৃত হয়, তেমন তাঁর আঁকা সুন্দর ছবিও প্রসিদ্ধিলাভ করে। অতঃপর তরুণ বয়সে তিনি শিক্ষালাভের জন্য রাজধানী পিটার্সবার্গে যান এবং সেখানে গ্রাজুয়েট হন। এই সময় তাঁর কবিতাটির সর্ব প্রচারিত হয় এবং পাঠক-সাধারণের কাছে প্রচুর সমাদর লাভ করেন। কিন্তু তাঁর সেই সকল রচনায় উদ্ভূত স্বদেশানুরাগ এবং জাতিতাবাদ প্রকাশ পাবার ফলে "হোথা বার বার বাদশাহজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।"—রাশিয়ার সম্রাট জার সামান্য একজন ক্রীতদাসের এই স্পর্ধিত স্বদেশপ্রেম বরদাস্ত করতে না পেরে শেভচেনকোকে সৈন্যদলে যোগদান করার জন্য কঠিন নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে শেভচেনকো এতদূর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন যে, দেশের জনগণ দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা চাঁদপ্বরূপ সংগ্রহ করে তাকে তাঁর মনিবের হাত থেকে 'ক্লেম' করেন,—কারণ তিনি ক্রীতদাস! সুতরাং এই সম্পূর্ণ 'স্বাধীন' নাগরিককে দুরন্ত করার একমাত্র উপায় ছিল, দেশরক্ষার অজুহাতে তাকে সৈন্যদলে নিয়ে আসা। কিন্তু সম্রাটের মতলব ছিল ভিন্নপ্রকার। তিনি শেভচেনকোকে সাইবেরিয়ার সমাজচ্যুত নিজের তম্বারপ্রান্তরে নানা অর্জিলায় প্রার পনেরো বৎসরকাল আটক করে রাখেন। এই বিপ্লববাদী কবির

বিবৃদ্ধে জার আমলের পুলিশ একটি কৃত্রিম অপরাধের তালিকা সৃষ্টি করে। অতএব সৈন্য হিসাবে নয়, রাজবন্দী হিসাবেই শেভচেনকো সাইবেরিয়ার নিবাসিত থাকতে বাধ্য হন। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন পুলিশ-পীড়নের ভয়ে জনসাধারণ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে সাহস পায়নি। অতঃপর ৪৪ বৎসর বয়সে শেভচেনকো পুনরায় পিটার্সবার্গে চলে যান। তিন বৎসরকাল সেখানেই তিনি বাস করেন, এবং কিয়তে নয়—পিটার্সবার্গেই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

একটি বাগানের কোলে শেভচেনকোর বিরূপ প্রস্তরমূর্তি আজ একটি দ্রুতব্যা সামগ্রী। কিয়ৎ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু সেটি এখন শেভচেনকোর নামাঙ্কিত। এই রত্নবর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনের ছাত্র-সংখ্যা এখন ছয় হাজারেরও বেশি, এবং শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ৭ শতেরও ওপর। প্রকান্ড রাজপথ, একটি বৃহৎ উদ্যান, একটি বাদ্যঘর ও চিত্রশালা, একটি অপেরা হাউস, কাশাপ সাগরের তীরে একটি বন্দর,—এ সমস্তর মধ্যেই এখন শেভচেনকোর অবিস্মরণীয় নামটি সংযুক্ত। এই ক্রীতদাস-কবিকে নিয়ে উক্রাইনের সাহিত্যে নানা কথা ও কাহিনী প্রচলিত। তিনি উক্রাইনীয় সাহিত্যের একজন দিকপাল এবং তাঁকে নিয়ে পর্যালোচনা-সাহিত্যে ‘থেসিস’ লেখা হয়। সম্প্রতি উক্রাইনের প্রবীণ এবং প্রসিদ্ধ লেখক গ্রীষ্মক ইউজিন কিমগদুক শেভচেনকোর একখানি প্রামাণ্য জীবনী-গ্রন্থ রচনা করেছেন। একটি মধ্যবিত্ত পল্লীতে ছোট একটি বাড়িতে যেখানে শেভচেনকো স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন, সেটি এখন জাতীয় মিউজিয়ম। শেভচেনকোর সমগ্র জীবনের আনন্দ-পূর্বক ইতিহাসের সমস্ত খুঁটিনাটি এই অতি সাধারণ ‘ক্রীতদাসের’ স্বল্প-পারিসর বসতবাড়িতে সম্বন্ধে সংরক্ষিত রয়েছে। সেই বাড়িটিতে ঘন্টা দুই আমরা অতিবাহিত করলাম। এটি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা চলে, পূর্ব ইউরোপে ক্রীতদাস প্রথার যুগে শেভচেনকো নিজে ক্রীতদাস হয়েও ক্রীতদাস জাতির মধ্যে প্রথম বৈশ্ববিক এবং স্বদেশানুরাগের প্রেরণা আনেন। এটি লক্ষ্য করার বিষয়, শেভচেনকোর মৃত্যুর পর কিছুকালের মধ্যেই রুশ সাম্রাজ্য থেকে ক্রীতদাসপ্রথার উচ্ছেদ ঘটে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। “Slavery” বা “Slave trade” এবং “Serfdom”—এই দুইয়ের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। প্রথমটি হল ক্রীতদাস কেনা-বেচার ব্যবসায়,—এবং সেই ব্যবসারে বিভিন্ন দেশ-বিদেশের বাজারে মেয়ে বা পুরুষ কেনাবেচার মধ্যে লাভ-লোকসানের কথা থাকত। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায় এই ব্যবসায় ছিল বহুবিস্তৃত। সকল দেশে এই দাস-প্রথা এখন নিষিদ্ধ হলেও কৈয়দানী-ভাবে এবং সংগোপনে এই ব্যবসায় আজও চলে আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, পাকিস্তানে এবং ভারতবর্ষে। এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে একাধিক অবস্থালী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বাঙ্গালী হিন্দু মেয়ে ‘বিক্রি’ হয়েছে পাঞ্জাবে, সিন্ধুতে, এবং প্রাক্তন মেন্সোপোটেমিয়াতেও। মাত্র কিছুদিন আগে দন্ডকারগের আশপাশ থেকে কিছু কিছু আদিবাসী মেয়েকে ‘বিক্রি’ করা হয়েছে পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতের কোন কোন রাজ্যে। ইংরেজ আমলে লার্ড-বেলার্টরা হিমাচল রাজ্যের বাৎসরিক মেলায় ‘আম্মার’ খোঁজ করতে গিয়ে মেয়েছেলে কিনত। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখনও মধ্যপ্রাচ্যে মেয়ে বিক্রি হয়। এখনও করাচী-লাহোরের লোকেরা পূর্ব-বঙ্গে গিয়ে বহু মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে বাবার আগে তাদের মা-বাপকে ন্যাক ‘বকশিস’ দিয়ে যায়। এগুলি অবশ্য ক্রীতদাসপ্রথার আধুনিক সংস্করণ।

রুশ সাম্রাজ্যে ছিল, “Serfdom”। তারা গৃহপালিত ‘দাসানুদাস’। অমুক প্রিন্স বা জমিদারের রাজ্যে এতগুলি ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল এবং এতগুলি সার্ব, অর্থাৎ নজরবন্দী দাসদাসী। এদের কোনও বেতন বা মাসোহারা ছিল না। এরা অপর কোথাও জীবিকা নেবার জন্য সংরে যেতে পারত না, এবং এদেরকে বেড়া ঘিরে রেখে গৃহপালিত অন্যান্য পশুর মতো রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। অসুস্থ বিসুখে এদের চিকিৎসা করার রীতি ছিল না। এরা কাপড় চোপড় পাবার অধিকারী ছিল না, তবে নিজেদের কাপড় বা কম্বল এরা বনে নিতে পারত। এদের মাসিক ছিল আমাদের দেশের প্রাক্তন সামন্ত নরপতিদের মতো। দেশের ভিতরে ভিতরে এদের নিয়ে কেনা বেচা চলত। একটি উৎকৃষ্ট গাভী বা কলবান খোঁজার দাম যখন ছিল ২৫০ রুবল, তখন এক-

জন মেয়ে-সার্কের দাম ছিল ১০০, এবং পুরুষ-সার্কের দাম ১৫০ রুবল। এরা নিজেদের ফসল ফলিয়ে খেত এবং এদের দিয়ে রাষ্ট্র বা জমিদারীর সর্বপ্রকার “forced labour” করিয়ে নেওয়া যেত। এই ‘সার্ক’-দের নতুন চেহারা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল হিটলারের আমলে “কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প” এবং স্টালিনের আমলে সোভিয়েট ইউনিয়নের “ফোর্স’ড লেবার ক্যাম্প”। আজও সোভিয়েট ইউনিয়নের কোথাও এইপ্রকার ক্যাম্প আছে কিনা আমি খোঁজ পাইনি। নবনির্মণের কাজাখস্তান এবং সুদূর সাইবেরিয়ার কথা আমি শুনিনি। কিন্তু বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টি এবং মিঃ খ্রুশ্চভের ডাক হ’ল উদার মানবতার ডাক। সোভিয়েট ইউনিয়নের কোথাও মানবের বিরুদ্ধে উৎপীড়ন চলছে, এমন কোনও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ আমার কানে ওঠেনি! হুমকি আছে, শাসন ও শাসিত আছে, কিন্তু “প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভুতে কাঁদে।”—এমন উদাহরণ কোথাও আমার চোখে পড়েনি বা আমি কানে শুনিনি!

মস্কো শহর যেমন কঠিন কর্মপ্রতী এই অক্লান্ত অধ্যবসায়ী, কিয়ৎ শহর তেমন নয়। এখানকার বাড়ির-দোরগুলি সর্বালঙ্কারে ভূষিত। মেয়ে-পুরুষের পরণে একই ডিজাইনের এমন সুদৃষ্ট আলগা জ্যাকেট অন্য কোথাও দেখিনি। এগুলি অনেকটা ফুরফুরে পোষাক। গলায়, বক্ষে ও দুই হাতে রংগীন পশমের কাজ। চাষী বা মজুরশ্রেণী থেকে আরম্ভ করে অবস্থাসম্মত পরিবারের যে কোনও মেয়ে-পুরুষ এই সুদৃষ্টি-সম্পন্ন ফুরফুরে মোটা সূতি বা রেশমী জামাটি পরে। এই জামার ডিজাইনটি ন্যাক হাঙ্গেরিয়ান। রাশিয়ান মেয়ে বা পুরুষের মুখশ্রী অপেক্ষা উক্রাইনীয় মুখশ্রী কিছু ধারালো, কিছু লাবণ্যময়। মস্কোর রাজপথের ঠিক মাঝখানে সুদূর দীর্ঘরেখায় ‘পুশ্প-পথ’ নেই, কিয়ৎ শহরের বিস্তৃত রাজপথগুলির ঠিক মাঝখানে বহুবর্ণা গৃহপবীথিকা চলেছে, এবং তার দুই পাশ দিয়ে চলেছে অশ্রান্ত-ভাবে বানবাহনাদি। কেউ ফুল ছেঁড়ে না, গাছ উপড়ে নিয়ে কেউ রাতারাতি পালায় না। বড় বড় গোলাপ আর ডালিয়া, বড় বড় সুস্বাদু এবং নামহারা রঙীন ফুল—অজস্র ফুলে রয়েছে মাইলের পর

মাইল। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট দেশের বিশেষ কোথাও জমির এমন উর্বরতা, এবং ফলনের এমন অজস্রতা সহসা চোখে পড়ে না। এককালে বরিশাল জেলাকে যেমন বলা হত, “granery of Bengal”। তেমনি উক্রাইন রাজ্য ছিল “granery of Europe” হিসাবে পরিচিত। প্রাকৃতিক সেই প্রাচুর্যের ফলে রাজধানীতে যে, বিপুল সম্পদের চিহ্ন। ছড়ানো থাকে, এখানকার প্রতি প্রশস্ত রাজপথগুলিতে তার সাক্ষ্য রয়েছে। হিটলারের নাৎসী সৈন্য-বাহিনী সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে প্রথম ভাগেই অধিকার করেছিল উক্রাইনের। এই বৃহৎ প্রদেশটি ওই ‘গ্র্যানারির’ লোভে,—যার মোটামুটি আয়তন হল ফ্রান্সের সমতুল্য, অর্থাৎ ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৬৪ বর্গমাইল, এবং যার লোকসংখ্যা ৪ কোটিরও বেশি। পশ্চিম সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপ হিটলারের পদানত ছিল প্রায় তিন বছর, এবং কেবলমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেরই ৮ কোটি নরনারী হিটলারের সৈন্যদলের কাছে বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। উক্রাইনের জনসাধারণ চিরদিন আবেগপ্রবণ জাতীয়তাবাদী এবং অতি প্রখরভাবে স্বদেশপ্রেমিক। ওদের প্রকৃতির মধ্যে বাঙ্গালীর খাছু বর্তমান। ওরা বরাবর গানে, গল্পে, সাহিত্যে, কাব্যে, চিত্রে এবং বিভিন্ন শিল্পে দেশপ্রেমকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। হিটলারের অধিকারের কালে একজন প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকার গ্রীষ্মক সিডর আতেমিভিচ কউপাক অতি সংগোপনে সমগ্র উক্রাইনে একটি বিরাট ‘গেরিলা-বাহিনী’ গড়ে তোলেন, এবং তারা নাৎসী সেনাবাহিনীকে প্রতি পদে বিপর্যস্ত করে। প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চভ স্বয়ং উক্রাইনের অধিবাসী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে তিনি একাদিকে বিরাট এক গেরিলাবাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন, এবং অন্যদিকে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা পরিচালনা করতে থাকেন। সম্ভবত যুদ্ধের কালেই তিনি স্টালিনের নানাবিধ স্বার্থান্বেষী আচরণ এবং দেশ-রক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত ঔদাসীন্য ও অক্ষমতা লক্ষ্য করে বিরক্ত হতে আরম্ভ করেন। যতদূর বুঝতে পারা যায়, মিঃ ক্রুশ্চভ স্টালিনের চৌহদ্দির মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন না। একবার আমি এক রুশ বন্ধুকে বলি, সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উন্নতি ঘটেছে স্টালিনের আমলে—একথা অস্বীকার করা চলে না। আপনাদের

এই সব রকেট ওড়ানো, হাইড্রোজেন বোমা বা ব্যালিস্টিক মিস্সলস্—এদের বৈজ্ঞানিক ভূমিকা তিনিই রচনা করে গেছেন!

বন্ধুর হাসলেন। বললেন, আমাদের পার্টি কি ঘাস খাচ্ছিল? পার্টির প্রোগ্রামের বৈজ্ঞানিক বিভাগটি কারা দেখাশোনা করত?

তিনি কি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন না?

বন্ধুর ইংরেজিতে বললেন, নামে-মাত্র! তাঁর কৃষ্ণগত ছিল জনকয়েক। তারা মিলিটারী আর পলিশের কর্তা। আর জনপরিচয়ক ভদ্রলোক যারা ছিলেন তাঁরা হলেন ‘ইয়েস-মেন’। আপনি নিশ্চয়ই জানবেন, নীচেরতলাকার বৃহৎ জনসাধারণ এবং দোতলার পার্টি,—এরাই নির্মাণ করেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। দোতলার লোক বাস করেছে শূন্য ক্রেমলিনে ‘আইভারি টাওয়ারে’—নীচেরতলার সংগে তাদের কায়িক কোনও যোগ ছিল না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে স্টালিন প্রাণভয়ে ভীত ছিলেন, এবং সর্বদা আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকতেন। সমস্ত যুদ্ধের কালে কেউ তাঁর দেখা পায়নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। একদা এই গ্রীষ্মকী অকসানাই আমাকে বলেন, “It was not Stalin's victory, it was the victory of the Soviet people.”

সেদিন মোটেই যাচ্ছিলুম। দুজনে কোথায় যেন। আমি প্রশ্ন করেছিলুম, তাঁর মৃত্যুতে আপনারা দুঃখবোধ করেননি?

অকসানা জবাব দিয়েছিলেন, করেছিলুম বৈকি। কেদেও ছিলুম—। হাজার হোক, পুরনো লোক একজন চলে গেল! উনি বন্ড কানপাণ্ডা ছিলেন।

অকসানার ভাবখানা এই। উনি দুঃখ দিয়েও গেছেন অনেক, দুঃখ পেয়েও গেছেন কম নয়। শেষের দিকে ঘরের দেওয়ালের আশে-পাশে সামান্য সাড়াশব্দ পেলেই তিনি ঠক ঠক করে কাঁপতেন। কারোকে বিশ্বাস করবার সাহস পেতেন না, এবং কারও সংগে বিশেষ দেখাশোনাও করতেন না।

হিটলারের সৈন্যবাহিনী এবং বোমাবর্ষণ অধিকাংশ কিয়েভ নগরীকে ধূলিসাৎ করে। অবশিষ্ট থাকে নগরের

একটি ভাঙা-চোরা স্বপাংশ কঙ্কাল। সর্বব্যাপী সেই ভূনাবশেষ ছেড়ে জনসাধারণের একটি অংশ দেশ-গায়ের দিকে পালায়, এবং অগণিত অধিবাসীর অপমৃত্যু ঘটে। যুদ্ধের সময় কিয়েভ নগরীতে বাস করত ৮ লক্ষ নরনারী, নাৎসী সেনার আক্রমণ ও বোমাবর্ষণের ফলে দেড় লক্ষ নরনারী ও শিশু প্রাণ হারায়। এখন এই বৃহৎ, সুন্দর ও সম্পূর্ণভাবে নবনির্মিত কিয়েভ নগরীতে ১২ লক্ষ লোকের বসবাস। এই পার্বত্য রমণীয় নগরীর বিশেষ বিশেষ ‘বারান্দা’ থেকে নীচের দিকে দূর-বিস্তার নীপার নদীর দুই পারের হরিৎ শোভা দেখলে চোখ জড়িয়ে যায়। কিয়েভের অন্য একটি নাম হল, ‘গ্রীন সিটি’, অর্থাৎ হরিৎনগর। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে মাত্র দশ-এগারো বছরের মধ্যে এমন একটি বিরাট শহর সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ করা যায়, এটি বিস্ময়জনক। হাজার হাজার প্রাসাদোপম অট্টালিকার নবনির্মিত রূপের দিকে তাকিয়ে নতুন রাজপথে হাঁটা কিছুরোমাঞ্চকর বৈকি। অনেকগুলি প্রশস্ত চিত্রণ পথের এখনও নামকরণ করা হয়নি, আবার অনেকগুলির নাম রাখা হয়েছে লেনিন স্ট্রীট, শেভচেনকো স্ট্রীট, টলষ্টয়, পুশকিন ও গোর্কি স্ট্রীট ইত্যাদি। মস্কো অপেক্ষা কিয়েভের সৌন্দর্য, নির্মাণ-পদ্ধতি বা স্থাপত্য-শিল্প অধিকতর মনোরম। এখানকার রুচি, সংস্কৃতি, গঠন-কৌশল ও প্রকাশ-ভঙ্গী আগাগোড়া লালিতকলাসম্মত, এবং নগরের অট্টালিকা-শ্রেণীর ‘ব্যালকনি-গুলির’ নয়নাভিরাম শোভা একমাত্র ভারতীয় এবং রাজস্থানী স্থাপত্য-শিল্পের সংগেই তুলনীয়। মস্কোর বিচারশীল আড়ম্বর্তা অপেক্ষা এখানকার শিল্পসম্মত সাবলীলতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নগরীর সর্বত্র পুষ্পশোভার দিকে তাকালে ইন্দ্রলোকের পারিজাত কাননের কল্পনা মনে মনে ভেসে বেড়ায়। জগন্মখ্যাত লেখক গোগল এবং বিশ্বপ্রস্তুত শিল্পী রোপিন—এঁরা দুজনে উক্রাইনের লোক। ডসটয়েভস্কি ছিলেন উক্রাইনের নিকট-আত্মীয়। শিল্পী রোপিন—যাঁর অনন্যসাধারণ চারুশিল্প লেনিনগ্রাড হারমিটেজের মহাসম্পদ, তিনি টলষ্টয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

উক্রাইনের প্রকৃত ও পুরাতন রাজধানী ছিল খারকভ নামক অপর একটি বৃহৎ নগরী। বিগত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে

সেই রাজধানী কিয়েভে স্থানান্তরিত হয়। রুশ-বিশ্ববের পর দেশব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বের কালে উক্ৰাইন প্রদেশ অন্তত বার-তিরিশেক সোভিয়েট ইউনিয়নের দখল-বেদখল হয়। একদিকে উক্ৰাইনের প্রখর জাতীয়তাবাদ, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আভ্যন্তরীণ চক্রান্ত, অন্যদিকে তদানীন্তন বিংশশতাব্দীর আক্রমণ, হাঙ্গারী, চেকোস্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ডের লোভ, এবং সর্বোপরি পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যের অধিকারের প্রশ্ন! প্রধানমন্ত্রী সেনিনের জীবিতকালেই উক্ৰাইনে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দার্ভিক্ষ দেখা দেয়। সমগ্র ইউরোপে ষোড়শ সর্বোপেক্ষা উর্বর ফসলোৎপাদন ক্ষেত্র, সেই ভূভাগে লক্ষ লক্ষ নরনারী ও জীবজন্তু অতি শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করত বাধ্য হয়। সেটি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ। সেই সর্বনাশা দার্ভিক্ষের মূল কারণগুলির সংগে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে অবিভক্ত বাঙ্গলার ভয়াবহ দার্ভিক্ষের কারণগুলি বহুলাংশে মিলে যায়। কিন্তু লেনিনের দূরদর্শিতা ও রাজনীতিজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা যেমন উক্ৰাইনের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত ছিল, বাঙ্গলার অদূরদর্শী সাম্প্রদায়িকতা তেমন সেই দার্ভিক্ষকালের মধ্যেই নতুন ফসলের পরিবর্তে সর্বনাশের বীজ বপন করতে থাকে! আজ উক্ৰাইন ধনে-সম্পদে গরিমায় প্রোজ্জ্বল, কিন্তু পূর্ববঙ্গ অনড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কিয়েভ শহরে ৩ লক্ষ ইহুদীদের বসবাস ছিল। কিন্তু নাসী সৈন্যদল কিয়েভ শহরে প্রবেশ করে প্রথমেই ১ লক্ষ ইহুদীকে ঘিরে হত্যা করে! নগরের মাঝখানের একটি খালের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ নরনারী ও শিশুর মৃতদেহ জড়ো করা হয়। এই জল-প্রণালী-পথটির নাম, 'বেরিয়ার'।

কিয়েভ শহরটি নবম শতাব্দীতে এক রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বংশের তিনটি রাজকুমারের মধ্যে যার নাম ছিল 'কিয়াই', তাঁরই নামানুসারে নগরের নাম রাখা হয় কিয়েভ। 'কিভান রুশ' নামক এক উন্নত ও পরাক্রমশালী জাতি বহু শতাব্দী ধরে এখানে তাদের রাজধানী স্থাপন করে। তারপর এই নগর তাতার গোষ্ঠীর কবলিত হয়। সৈদনকার রুশ সাম্রাজ্যে অর্থাৎ আজকের সোভিয়েট ইউনিয়নে খৃষ্টধর্ম কেমন করে প্রথম এই উক্ৰাইনে প্রবেশ করেছিল, সেই ক্ষুদ্র কাহিনীটি বেশ কৌতুকপ্রদ।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে যখন বাইজানটাইন্ সভ্যতা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে এবং মধ্য এশিয়ার পথে বেশ অগ্রসরবাদী হয়ে উঠল, সেই সময় এই কিয়েভ নগরের সামন্ত নরপতি বেসিল ভ্যাডিমির একটু সচেতন হয়ে ওঠেন। তিনি তৎকালে 'পেগানিজম' অনুসরণ করতেন। কিন্তু পেগানিজমের মধ্যে মানবধর্ম থাকলেও নির্দিষ্ট কোনও ধর্ম-বিশ্বাস এর অঙ্গ নয়। সম্ভবত এই পেগানিজম থেকেই পরবর্তীকালে রুশীয় 'নিহিলিজম'-এর জন্ম হয়। রুশসাম্রাজ্য তথা বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাচীন ঐতিহ্যে নাস্তিক্যবাদ, নিরীশ্বরবাদ এবং সর্বধর্মবিরোধী ও সমাজচিত্তহীন মনোভাব কাজ করেছে অনেককাল থেকে। কিন্তু লেনিনের সর্বোপেক্ষা বাহাদুরী হল, সকল জাতি শ্রেণী সম্প্রদায় সভ্যতা ও ধর্মমতকে এক বিরাট অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এনে সমানাদিকারবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আজ বোরিং প্রণালী থেকে বুলগেরিয়ার পূর্বপ্রান্ত এবং বলটিক স্টেটস থেকে

পামীরের শেষপ্রান্ত অবধি বিরাট ভূভাগকে সমস্বার্থ ভাবনার মধ্যে একত্রিত করার অর্থই হল, 'নবসভ্যতার' প্রবর্তন। সে যাই হোক, বেসিল-ভ্যাডিমির যদি সেই সময় বাইজানটাইন্ সভ্যতার আওতায় এসে ইহুদী বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন, তবে রুশ সাম্রাজ্যের পরবর্তী চেহারা দাঁড়াত অন্য প্রকার। কিন্তু যেহেতু পবিত্র কৌরানে মদ্যপান একেবারে নিষিদ্ধ, সেই কারণে তিনি গোড়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং হাজার হাজার নরনারীকে নীপারের কঠিন ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে স্নান করিয়ে শৃচিশুদ্ধ করে তোলেন। বেসিল-ভ্যাডিমির বোধ করি অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। যদিও তিনি প্রচুর মদ্যপান করতেন এবং তদানীন্তন 'ভ্যাসিলকভ' নামক একটি জনপদে তাঁর ৮০০ সংখ্যক যুবতী স্ত্রী ছিল—তবুও তিনি বহু সংখ্যক গির্জা বা ধর্মামন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সোভিয়েট দেশগুলির প্রাক্তন ইতিহাসের মধ্যে হারেম, ক্রীতদাস, দাসরক্ষণ, বহুবিবাহ, ধর্মান্ধতা এবং নিরীশ্বরবাদ

মধ্যবিশ্বের শূন্যগর্ভ নীতি, বরণ ও বর সংগ্রহের সমস্যা ও নারী লোভাতুর পুরুষের বিকৃত ক্ষুধা লেখক সব ক'টির সুন্দর রূপ দিয়েছেন এই উপন্যাসে।

এমিল জোলা

ভবেশ দত্তের

সতেরো নম্বর বাড়ী ৩.০০

গান গেয়ে যাই

২.০০

বয়সে তরুণ হলেও লেখক বলিষ্ঠ হাতে দেখিয়েছেন রূপময়, ভাবময়, দেবতম চিরন্তন প্রেমের বেদনাময়, সুরুণ পরিণতি তাঁর এই উপন্যাসে।

সুদীন চট্টোপাধ্যায়ের

শেষ অভিসারে ২.৫০

—ঃ শীঘ্রই বাহির হইতেছে :—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—

দুই পাখী এক নীড়

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—

কানা গলির মানুষ



পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

১ নং বর্গওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

সর্বত্র ছড়ানো। আমাদের দেশের প্রাক্তন সামন্ত নৃপতির সঙ্গে ওদের গণগোত্রের বিশেষ অমিল নেই।

কিয়েভ নগরে সেই বেসিল-ভ্যাডিমির নামাঙ্কিত একটি রাজপথ রয়েছে। এখানে যতগুলি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ধর্ম-মন্দির চোখে পড়ে, তাদের মধ্যে সেন্ট ভ্যাডিমির, সেন্ট এন্ডরুজ, সেন্ট সোফিয়া প্রভৃতি গির্জায় আজও প্রচুর নরনারী প্রার্থনার জন্য সমবেত হয়। খৃষ্টধর্মের সর্বপ্রকার রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ যারা পালন করে থাকে, সমগ্র উক্রাইনে তাদের সংখ্যা প্রচুর। সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ গির্জাই দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত। সেগুলি আজও আছে অক্ষত অবস্থায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি পাঠাগার, যাদুঘর, চিত্রশালা বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে এখন পরিণত হয়েছে।

আমি সর্বাপেক্ষা অভিভূত হয়েছিলাম নতুন কিয়েভ নগরীর উপান্তে 'লাবরা' নামক একটি পুরনো পল্লীতে গিয়ে। এখানে একটি সাধু-মোহান্তের মঠের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, এই সৌদীন পর্যন্ত যার নাম ছিল 'পেচারস্কি মনাস্ট্রি'। বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে নাৎসী সেনাবাহিনী অকারণে এবং বিনা বিবেচনায় এই ইউরোপপ্রসিদ্ধ এবং বিবিধ রত্নরাজ্যমণ্ডিত বিরাট তীর্থ-মন্দিরটির অধিকাংশই ধ্বংস করে যায়। সৌদীনকার উন্মত্ত বিদ্বেষ এবং পাশবিকতা বহন করে রয়েছে আজও এর চারিদিককার ধ্বংসস্তপের জটলা। এই ধর্মমন্দিরটি সমস্ত ইউরোপের চোখে ঠিক আমাদের কাশীর বিশ্বনাথ, গয়ার গদাধর, বন্দাবনের গোবিন্দজী, সোরাষ্ট্রের সোমনাথ, পুরীর জগন্নাথ, বা দক্ষিণদেশের রামেশ্বরমের মতো ছিল। এই মণিমাণিক্যখচিত বহু বর্ণাঢ্য সুবিশাল ও সুউচ্চ তীর্থমন্দিরটি নির্মিত হয় একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, এবং এটি তীর্থশ্রেষ্ঠ হিসাবে সর্বত্র সুবিদিত ছিল। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে মোট ১৬টি 'পীঠ' বর্তমান,—আমাদের যেমন ৫১ পীঠ,—'লাবরা' 'পেচারস্কি' হল তাদেরই অন্যতম পুণ্য-পীঠ। এই সুবৃহৎ ও সুমহান আশ্রতনের মধ্যে আজও তিন-চারটি কারুকার্য-চিহ্নিত দেওয়াল, কয়েকটি মণিরত্নখচিত খিলান, ভিতরের বেদীর সমান্য একটু অংশ, এবং বিরাট গম্বুজের কিয়ৎ

পরিমাণ পার্শ্বদেশ আজও সর্বস্বান্তের মতো দাঁড়িয়ে যুদ্ধের সর্বব্যাপী বীভৎসতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আরেকবার আমি বিশ্বাস করলাম, বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো আর কোনও জাতি বা দেশ এমন সর্বশূন্য হয়নি। 'লাবরা' চেহারা দেখে আমার মন হায় হায় করে উঠেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সোভিয়েট ইউনিয়নের আর্থিক ক্ষয় ও ক্ষতির একটি তালিকা প্রস্তুত হয়। তাতে দেখা যায়, মোট ৬৭,১০০ কোটি রুবল অর্থাৎ ভারতীয় টাকায় ক্ষতির হিসাব দাঁড়ায় কমবেশী ৮০,০০০ কোটি টাকা। এই পরিমাণ টাকায় ভারতের ৮।১০টি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ চলে যেত। যাই হোক, যুদ্ধ শেষ হবার ছয় বৎসরের মধ্যে সুপ্রীম সোভিয়েট থেকে একটি আইন পাস করা হয়, তার নাম

"Peace Defence Law". এই আইনটি পাস হয় ১২ই মার্চ, ১৯৫১ তারিখে। এটিতে বলা হয়, "যুদ্ধের প্রচারকার্য যে কোনও উপায় বা আকারেই হোক, উহা শান্তিকে বিঘ্নিত করে এবং নতুন যুদ্ধের আশঙ্কা সৃষ্টি করে। এই প্রকার কার্য মানবসমাজের বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ। যুদ্ধ-মনোভাবের প্রচারকার্যের অপরাধে যিনি অপরাধী হবেন, স্বভাব-দুর্বৃত্তের মতোই তিনি শাস্তি লাভ করবেন।" অতঃপর সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর বহু দেশে এক একটি শান্তি-কর্মী স্থাপনের জন্য আবেদন জানান, এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য নিজেদের দেশে এবং অন্যান্য দেশে 'শান্তি সম্মেলন' উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ রুবল খরচ করেন। তাদের বর্তমান জাতীয় স্লোগান হল, "মীর-দুশবা"। অর্থাৎ 'শান্তি ও বন্ধুত্ব'। বড় বড় সোভিয়েট শহরের এক-একটি প্রধান চৌমাথায় এই দুটি শব্দ আলোকিত করে টাঙ্গানো থাকে। "মীর" নামক একটি রুশ ভাষার সাময়িকপত্রে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছিল।

কিয়েভ থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে সম্প্রতি একটি 'লেখক-উপনিবেশ' গড়ে তোলা হচ্ছে। একদিকে আরণ্য-প্রদেশ, অন্যদিকে বিস্তীর্ণ শস্যময় ক্ষেত্র। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সুপ্রশস্ত জাতীয় রাজপথ পূর্ব ও পশ্চিমে। এই প্রশান্ত এবং নিরিবিলি পরিবেশের মধ্যে 'লেখক-উপনিবেশটি' গড়ে তোলবার সর্বপ্রকার দায়িত্বভার ভুলে নিয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী মিঃ নিকিতা খ্রুশ্চভ। তিনি উক্রাইনেরই লোক। নিজে একটি চাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ডনবাস অঞ্চলের কয়লাখনিতে তিনি একদা মজুর ছিলেন। চারিদিকের বাউ, বাচ্ এবং ওক গাছের জটলার আশেপাশে এখন পর্যন্ত মোট ২৬ খানা দোতলা বাগানবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে, এবং ইতিমধ্যেই কয়েকজন লেখক সপরিবারে এই উপনিবেশে এসে বসবাস করছেন। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। এখানে তাঁর একটি সুন্দর বাড়ি তৈরী হচ্ছে। এই বাড়িগুলি তৈরীর জন্য সমস্ত টাকাকড়ি স্টেট থেকে অগ্রিম দেওয়া হচ্ছে প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের একাউন্টে। তাঁরা তাঁদের সুবিধামতো আপন আপন রয়েলটি থেকে এই দেনা শোধ করবেন,—এইটি আশা করা যায়।

আমি যখন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াছি, এবং আশেপাশে মোট কয়টি ডিপার্টমেন্টাল দোকান বাজার বসেছে তার খোঁজ-খবর নিচ্ছি, তখন অদূরবর্তী একটি পুস্তোদ্যান থেকে বেরিয়ে এলেন শ্বেতশ্মশ্রুত এবং চশমা-চোখে একজন শান্ত প্রকৃতি লেখক। এর নাম ইউজিন কিউইগক। এর কথা আগেই বলেছি এবং একে দেখবার আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইনি এর সদ্যপ্রকাশিত বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ "শেভচেনকো, তাঁর জীবন ও সাহিত্য" এক কপি বিশেষ স্নেহ ও প্রীতিসহকারে আমার হাতে দিলেন। পাতা উলটিয়ে লক্ষ্য করলাম, রুশ এবং উক্রাইনীয় লিপির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। অনেকগুলি উক্রাইনীয় অক্ষর রুশ অক্ষরের সঙ্গে মেলে না। পুরে শুনোছিলাম, উক্রাইনের ভাষা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। বাগলা ভাষার সঙ্গে যেমন মৈথিলী হিন্দী। মিঃ খ্রুশ্চভের নিজস্ব ভাষা রুশ নয়। রুশ ভাষা উক্রাইনের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য। এখানে এসে প্রথম শুনলাম, সোভিয়েট ইউনিয়নের পনেরোটি রিপাবলিক দেশে মোট ১০০টিরও বেশি ভাষা বর্তমান। কিন্তু ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নরনারীর মাতৃভাষা হল রাশিয়ান। রুশ-ভাষা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা, বলা বাহুল্য, সর্বাপেক্ষা প্রোক্ষদল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের নতুন আমলে বহুশ্ম নগর হল মোট দশটি, মাকারি বড় শহর হল ১৫৬৯টি, এবং ছোট শহর ২৪২২টি। ছত্রিশ বছর আগে, অর্থাৎ

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তিন বছর পূর্বে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মাঝারি শহরের সংখ্যা ছিল ৭০৯, এবং ছোটর সংখ্যা ১২১৬। এই কালের মধ্যে বৃহত্তম নগরগুলির প্রত্যেকটি প্রায় পাঁচ গুণ প্রসার লাভ করেছে। যেমন আমাদের কলকাতা, কানপুর, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি নগর ক্ষণীতলাভ করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বৃহত্তম নগরগুলি স্বভাবতই শিল্পপ্রধান—যেমন মস্কো, লেনিনগ্রাদ, বাকু, খরকভ, গোর্কি, তাস-কন্দ, কুইবিশেভ, নভোসিবারস্ক, সোয়ে-দলভস্ক এবং কিয়েভ। কিয়েভ হল সোভিয়েট ইউনিয়নের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী—লেনিনগ্রাদের পরেই এর স্থান। রাষ্ট্রসঙ্গে উক্রাইন এবং বাইয়েলো-রাশিয়ার পৃথক ভোটাধিকার আছে। এই দুই ভূভাগ পূর্বতন রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিলেও এদের সঙ্গে রাশিয়ার একটি পুরাতন বন্ধুত্ব-চুক্তি সূত্র অদ্যাবধি বর্তমান। এই দুই রিপাবলিকের প্রবল জাতীয়তাবাদ এবং প্রধর আত্মাভিমান ইউরোপে বিশেষ প্রসিদ্ধ। আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এসে এরা বিবিধ সমাজউন্নয়ন ও দেশগঠনকর্মে যথার্থ সম্মানলাভ করেছে।

কিয়েভ ছাড়াও উক্রাইনের প্রত্যেকটি বড় শহর নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রাক্তন রাজধানী খারকভ খ্যাতিলাভ করেছে তার বিশাল ও প্রাচীন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য। স্লামিয়ানস্ক, জাডনভ, ক্র্যমারস্ক,—এরা বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। বিপ্লবের পূর্বে জনৈক আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ার মিঃ হিউ কুপার উক্রাইনে এসে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন-কারী বৃহৎ নগর নির্মাণ করেন, তার নাম 'নেপ্রসট্রয়'। জনৈক স্কচ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ হিউয়েস ডেনেংস কয়লাখনি অঞ্চলে অপর একটি নগরীর পত্তন করেন। এক কালে সেই নগরীর নাম ছিল 'শীউ-জভকা'। কিন্তু পরবর্তীকালে স্টালিন সেই নগরীর নাম বদল করে নুভন নাম রাখেন 'স্টালিনো'। কীর্তিনির্মাণের অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু নিজের হাতে কোনও কীর্তির উপর স্বাক্ষর করতে নেই। ওটি ছেড়ে দিতে হয় পরবর্তীকালের জনগণের স্বেচ্ছার উপরে। ভারতবর্ষ এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত-সম্পন্ন। অজন্তা-এলোরা-তাজমহল-কুতুব-খাজুরাহো-কোনারক,—এবং অন্যান্য হাজার হাজার ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের গায়ে বা কোনও দিলে সেই সব মহৎ শিল্পীর নাম কোথাও নেই। আমেরিকান

বা স্কচ ইঞ্জিনীয়ারের সেই দুর্লভ সুরক্ষিতবোধ ছিল। উক্রাইনের নীপার এবং বাগনদীর সংযোগস্থলে অপর একটি নগর 'নিকলায়েভ' অবস্থিত। লেনিনের সহকর্মী এবং লালফৌজের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ ট্রটস্কী, যার প্রকৃত নাম 'ব্রগস্টিন' তিনি নিকলায়েভের একটি বিদ্যালয়ে ছোটবেলায় শিক্ষালাভ করেছিলেন। এই নগরটি একটি জাহাজঘাটা। এখানে জাহাজনির্মাণের মস্ত কারখানা।

যে কয়টি অটালিকা নাৎসী সেনাদলের ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল তাদের মধ্যে আমাদের এই ইন্-ট্রিষ্ট হোটেলের বাড়িটি একটি, এবং অন্যটি হল প্রাক্তন রুশসাম্রাটের প্রতিনিধি ভাইসরয়ের প্রাসাদ। মিঃ খৃষ্টভের বিশেষ চেষ্টায় এই প্রাসাদটি দান করা হয়েছে উক্রাইনের লেখক ও সাংবাদিক সমাজকে। এই প্রাসাদটির মধ্যে বিচরণ করে যে বিলাসবৈভব, অঙ্গসজ্জা এবং আসবাবপত্র দেখলুম, সেগুলি অবশ্য ভাইসরয়ের পরিবারের পক্ষেই মানানসই। এই প্রাসাদের বড় বড় সুসজ্জিত হল-এ লেখক-শিল্পী-গায়ক-সাংবাদিক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মীরা নিয়মিত সমবেত হন। উক্রাইন লেখক সম্ভের সেক্রেটারী ভ্যাসিলি কোজাচেঙ্কো আমাদের এদিক ওদিক দেখাতে লাগলেন। ইনি একজন বিশিষ্ট কবি ও গদ্যলেখক। মানুঘাটি নম্রাভাষী।

স্বাধীনচেতা উক্রাইন বিগত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বিশেষ বিশেষ চুক্তিসহ সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যোগদান করে। স্পষ্টতঃ, এর প্রধান কারণ ছিল হিটলার এবং নাৎসীবাহিনীর দিগ্বিজয়-জনিত আশঙ্কা। সমস্ত ইউরোপের সঙ্গে উক্রাইনও কাঁপছিল। পূর্বে ইউরোপে উক্রাইনের উপর হিটলারের লোভ ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। সেইজন্য আতঙ্কিত পশ্চিম উক্রাইন, কুবোভিনা এবং বেসারাবিয়ার একটি অংশ মিলিয়ে উক্রাইনের 'স্বাধীন' রিপাবলিক সৃষ্টি হল। হিটলারের পরাজয়ের পর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে একটি 'বন্ধুত্ব-চুক্তি' বলে সোভিয়েট গভর্নমেন্ট কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলটি উক্রাইনের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। উক্রাইনের রাজনৈতিক ভূগোলের সঙ্গে পূর্বকালের বঙ্গদেশের সঙ্গে অনেকটা মেলে। অর্থাৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি এক এক যুগে এক একটি কামড় বসিয়ে 'সুজলা সুফলা' শস্যশ্যামলা উক্রাইনের কয়েকটি অঞ্চল

হেনরি টুথ-এর	
জনসেবার পরমাণবিক শক্তি	১-২৫
মিখাইল সলোভভ-এর	
স্তম্ভ দেবতা	১.০০
এইলিন চ্যাঙ-এর	
ফসলের গান	১.০০
হিউ স্টেন ওয়াটসনের—	
আধুনিক কালের বিপ্লব	২৫
লিওনার্ড সেপিরোর—	
রাশিয়ার ভবিষ্যৎ	২৫
আলফ্রেড জুবাবায়ানের—	
আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ	২৫
বি, জে, পি, উডসের—	
অর্থনৈতিক সহযোগিতা	২৫
রকফেলার রিপোর্ট—	
গণতান্ত্রিক আদর্শের ক্ষমতা	৩৭
জুলে ম্যানকেনের—	
প্রতিরক্ষার অর্থনীতি	৩৭
পিটার হালাজের—	
আন্তর্জাতিক শ্রম উৎসব	৩৭
অমলেন্দু দাশগুপ্তের—	
দেশোন্নয়নে গণতন্ত্র	৩৭
দেশোন্নয়নে সমাজতন্ত্র	২৫
লেফ্টার বি, পিয়ার্সনের—	
বিশ্ব রাজনীতিতে গণতন্ত্র	৫০
কোয়েলার আন্ড্রেজিড প্রমুখ—	
পরাজিত দেবতা	১.০০
অ্যান্ডার হেলারের—	
আর কমরেড নই	১.০০
অশোক মেহতার—	
পরিকল্পিত অর্থনীতির	
রাজনীতি	১.১২
বাট্রাম ডি উলফের—	
সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা	১.৫০
যোশেফ কোরবেলের—	
চেকোস্লোভাক গণতন্ত্রে	
কমিউনিষ্ট শৃঙ্খলা	১.৫০
ফাদার রিগনের—	
নয়া চীনের কারাগারে	
সুলাভ ১.০০, শোভন ১.৫০	
ডেভিড ক্যাম্যান করেলের—	
যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক পদ্ধতি	
সুলাভ ২.০০ শোভন ৩.০০	
লরা ইংগালসের—	
প্রান্তরে ছোট শহর	১.৫০
যোশেফ ক্রামগোল্ড-এর—	
এবার আমার পালা	১.৫০

পরিচয় পাবলিশার্স

২১, ইলিয়াং খাঁ লেন, কলি-৯
ফোন : ৩৫-২৪১৪

দখল করেছিল। কেউ গ্রাস ক'রেছিল একটি জেলা, কেউ ডিভিসন, কেউ মহ-কুমা, কেউ বা পছন্দসই একটি অঞ্চল। কেউ কেউ নিয়েছে অঙ্গ, কেউ প্রতাঙ্গ। কিন্তু হিটলার এসেছিল সর্বগ্রাস করতে! সে যাই হোক, সোভিয়েট আমলে উক্রাইন ফিরে পেয়েছে তার জ্বর-দখলকরা সম্পত্তি। কিন্তু স্বাধীন ভারতে বঙ্গদেশ মার খেল সবচেয়ে বেশী, এবং ভূ-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে বাণ্ডিত রইল তার চেয়েও বেশী। এটি ভাগ্যেরই বিদ্রূপ। কেননা, পৃথিবীর মধ্যে সবাপেক্ষা উদার এবং নীতিবদ্ধ গভর্নমেন্টের হাতে ক্ষুদ্র এবং হীনবল পশ্চিমবঙ্গ কেবলমাত্র জাতীয় সংহতিরক্ষার মহৎ শিক্ষার গুণে আপন ন্যায্য অধিকার থেকে বাণ্ডিত হয়ে রইল,—এটিও দাঁড়িয়ে দেখলাম।

উক্রাইনের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের আরেকটি সৌজন্য প্রকাশ পেলে এই সেদিন মাত্র—১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে যেদিন ক্রাইমিয়াকে সংযুক্ত করা হল উক্রাইনের সঙ্গে।

ইউরোপের সর্বপ্রথম স্লাভরাষ্ট্র উক্রাইন আগে তাতার, পরে লিথুয়ানিয়া এবং অতঃপর বহুকাল অবাধি পোল্যান্ডের অধীনে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে রুশিয়ার সম্রাটের সাহায্যে উক্রাইন পোল্যান্ডের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু অন্যদিকে ক্রাইমিয়ার তাতার জাতি বারম্বার উক্রাইনের দক্ষিণাঞ্চল আক্রমণ করার ফলে জনসাধারণ পর্বদন্ত হতে থাকে। উক্রাইনের ভূমিজ ও খনিজ সম্পদ ইউরোপ-প্রসিদ্ধ। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে যত চিনি উপলব্ধ হয়, তার চার ভাগের তিন ভাগ একা উক্রাইন সরবরাহ করে। শূদ্ধ চিনি নয়, সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাদ্য, শাতব সামগ্রী এবং কয়লা উক্রাইনই নিয়মিত যোগান দেয়। কার্পাথিয়ান পর্বতশ্রেণীর ধারে ধারে এত বড় সম্পদশালী ভূভাগ উক্রাইনের মতো শ্বিতীয় নেই। উক্রাইনের জনসাধারণ হাস্যরসিক, প্রমোদপ্রিয়, ভাবপ্রবণ, সাহিত্যোৎসাহী এবং শিল্প ও সংস্কৃতিবান। এই রাষ্ট্রে 'কলেকটিভ' ফার্ম'-এর সংখ্যা ১৫,০০০-এরও বেশী, এবং এই রাষ্ট্রের নিজস্ব 'রিস্তম-নীলিমরগ' জাতীয় পতাকা বর্তমান। পূর্বে ইউরোপের সর্বপ্রধান চারটি নদী—দানিউব, নীল্টার, বাগ ও নীপার তাদের অর্গণিত শাখানদী এবং উপনদী নিয়ে উক্রাইনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পশ্চিমের যে অঞ্চলটি রুদ্দেশিয়া নামে এককালে চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্গত ছিল, সেটি এখন এসেছে উক্রাইনের মধ্যে। এটি যখন

ট্রান্স-কার্পাথিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—সম্ভবত শ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে। এই ট্রান্স-কার্পাথিয়ার মন্ত নগর 'উজগোরদের' ভিতর দিয়ে সাধারণত চেকোস্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। বিগত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গারীর 'জাতীয়' আন্দোলনকে 'সংযত' করার জন্য উজগোরদ নগরটি সোভিয়েট ইউনিয়ন ব্যবহার করেছিলেন কিনা, এ খবরটি পাইনি। কিন্তু এই খবরটি সহজেই পাওয়া যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সোসালিস্ট রাষ্ট্র এই সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট কতৃপক্ষ বিগত ৪৫ বৎসর কাল ধরে আপন রাষ্ট্রসীমানা নির্ণয় ও প্রশাসনব্যবস্থায় যেকলাকুল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, সেটি ইতিহাসেও অনন্য। আজ তাঁরা আর 'রিভিসনিজম' বা ইতিহাস-বিশ্লেষণ চান না, 'পাকা-চুলের' মুখ থেকে ভালমন্দ বিচার সহ্য করেন না, এবং এ নিয়ে কোথাও বিতর্ক দেখা দেয়, সেটাও তাঁদের মনঃপূত নয়। তাঁদের এই আচরণ ভাল কি মন্দ, সেটি তাঁদের ঘরের কথা,—অপরের নিন্দা-সুখ্যাতির দিকে তাকালে তাঁদের চলে না। কেননা সোসালিস্ট রাষ্ট্রকে সুস্থায়ী ও দৃঢ় করে তোলার কাজে তাঁরা জীবন-মরণ পণ করেছেন। পাণ্টেরনাকের 'রিভিসনিজম'ে তাঁদের এখন প্রয়োজন নেই, উক্রাইনের রসসাহিত্য এখন তাঁদের কাজে লাগছে না, প্রতি মানুষের বিবেকসত্তার অখন্ড এবং অব্যাহত অভিব্যক্তি আপাতত ধামাচাপা থাক, এবং নবগঠিত এই বিরাট সোসালিস্ট স্টেটের চিন্তামানস কোনও প্রকার সাহিত্যের দ্বারা বিভ্রান্ত বা ভিন্নমুখী হয়, এটি তাঁরা বরদাস্ত করতে একেবারেই প্রস্তুত নন। তাঁরা এখন মহৎ রসসাহিত্য চান না,—তাঁরা সেই প্রকার 'সাহিত্য' চান যেটি তাঁদের কমিউনিষ্ট সমাজকে নিখুঁতভাবে গড়ে তোলার উপকরণ হবে, যেটি প্রয়োজনে লাগবে। যেদেশে গোগল, পুশকিন, ডসটয়ভস্কি, টলষ্টয়, গোর্কি, শেক্সপীয়ার এমন সর্বব্যাপী নিতাপূজাপন্থিত,—সেই দেশের গভর্নমেন্ট বা পার্টির লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত কর্মী উচ্চ রসসাহিত্যের যথার্থ মূল্য বোঝে না—এই আজগুবি ভাবনাটাও যুক্তিযুক্ত নয়। ওরা সব বোঝে, কিন্তু সব চিন্তা সরিয়ে রেখে সবাত্রে ভাবে আপন রাষ্ট্রের স্থানীয় কথ্য। নতুন রাষ্ট্রনির্মাণ করে ওরা পৃথিবীর সর্বত্র পাঠিয়েছে একটা চ্যালেঞ্জ! অর্থাৎ 'আমাদের' এই

সমাজনীতির ব্যবস্থা যদি কারও এখন ভাল লাগে তবে গ্রহণ করতে পার, ভাল যদি না লাগে পরোয়া নেই! কিন্তু 'আমাদের' সঙ্গে শত্রুতাসাধনে চেষ্টা আর করো না—সাবধান, এই দ্যাখো ১০০ মেগাটন বোমা।

ওরা শূদ্ধ যে পাণ্টেরনাকের বইখানি বন্ধ করেছে তাই নয়, পৃথিবীর কোনও দেশ থেকে কোনও ভাষার অব্যাহত বই-কাগজও ওদের দেশে না ঢোকে, এই ব্যবস্থাও ওরা চালু রেখেছে। এরই অপর নাম 'আয়রণ কার্টেন'!

সোভিয়েট ইউনিয়নের রুশ ভাষায় মহাকাব্য রবীন্দ্রনাথের বই মোট ৮ কোটি সংখ্যক ছাপা হয়েছে। যে যেমন পেরেছে কিনেছে। প্রত্যেক নগরে রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসব পালন করা হয়েছে। নগরে নগরে শতবার্ষিকী কমিটি! ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে কোটি কোটি। প্রত্যেক রিপাবলিকের রাজধানীতে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য, গীত, জলসা, এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। সমগ্র লেখক-সমাজ, পন্ডিত, মনীষী, এবং সর্বশ্রেণীর বিন্দবঙ্গমাজ সর্বত্র বহুতা করেছেন। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে একখানি বৃহৎ ইংরেজি গ্রন্থ রুশ ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে! এই রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসবে যোগদান করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারত গভর্নমেন্ট মারফৎ জনকয়েক ভারতীয় লেখককেও আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, বিনা নিমন্ত্রণে ইংল্যান্ড, জার্মানী ও আমেরিকার কয়েকজন লেখককে পাঠানো হয়েছিল, অথচ ভারত গভর্নমেন্টের বিশেষ বিভাগ এই আমন্ত্রণের উত্তরে আপন সৌজন্য রক্ষা করেননি। কিছুদিন আগে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও ভারততত্ত্ববিদ মিঃ চেলিশেভ এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সভায় এটি নিয়ে মৃদু গল্পন করে যান!

দেখতে দেখতে ৮ কোটি বই যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেল, সে-দেশের গভর্নমেন্ট খুব নিবোধ নয়। যারা নিজের দেশের পাণ্টেরনাককে ভূবিষে পরের দেশের রবীন্দ্রকুরকে তুলল, তাদের একটা নিজস্ব নীতি আছে বৈকি! কে না জানে, রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে রয়েছে মানবচিন্তার নিম্নল ও স্বচ্ছন্দ মস্তিষ্ক একটি আশ্চর্য অভিব্যক্তি? কে না বোঝে, রবীন্দ্রসাহিত্য মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের যে-উৎপীড়ন—তার

ভয়হীন প্রতিবাদ? কে না পড়েছে, রবীন্দ্রসাহিত্য করুণা, মমতা, সমবেদনা, ওদার্য এবং ঈশ্বরবিশ্বাসে পরিপূর্ণ? সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে পাঠ করেছে বেদ এবং উপনিষদের নিত্যকালজয়ী মহামন্ত্র-গদ্যলির ব্যাখ্যা,—এটি কি রোমাঞ্চকর নয়? সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ ঈশ্বরবিশ্বাসী, এটি মন্ত ছিল। ওরা ধর্মীরবিশ্বাসী, এটি মিথ্যা। ওরা পূর্বনো ঈশ্বরবাদকে শোধন করতে বসেছে নতুন একটা জীবনের আসনে বসে। ধর্ম এবং ঈশ্বর পাছে ওদের রাষ্ট্রধর্ম ও জীবন-নীতিকে ‘অহিফেন’ সেবন করায়—এই ওদের ভয়। ওরা ঈশ্বরপ্রধান ধর্মকে তাড়ায়নি,—দেশজোড়া খৃষ্টমাস-উৎসব তার প্রমাণ,—যখন লক্ষ লক্ষ লোক খৃষ্ট-মাস-ফাদারকে নিয়ে মেতে ওঠে! ওরা তাড়িয়েছে গির্জা-প্রধান ধর্মকে,—যে-গির্জার অনুশাসন এবং চক্রান্ত ওদের সমাজজীবনে এনেছিল অবর্ণনীয় দুর্গতি! ওরা রবীন্দ্রনাথের ভিতরে খুঁজে পেয়েছে মানবের বিশুদ্ধ চিন্তার সেই মহৎ ঈশ্বরভাবনা, সেই উদার জীবনধর্ম, সেই শূচিচিন্তা চিন্তার বৃহৎ পটভূমি, এবং সেই বিশ্বজয়ী নির্বিড় আনন্দকল্পনা! ওরা ওদের প্রত্যেকের জীবনে এবার রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে গেছে সকলের বড় বন্ধু!

সোদিন রাতে ক্লান্ত হয়ে ফিরে নীচের তলাকার ডাইনিং হলের মন্ত আসরে খেতে বসেছিলুম। নৈশ ভোজনে যারা আসে তারা শ্রেষ্ঠ সজ্জায় সজ্জিত। মেয়ে-পুরুষ চারিদিকের সেই বিশাল কক্ষে যেন বলমল করছিল। ওরা খায় বেশি, এই ধারণাটা দেখছি ভুল। আমরা খাই কত কম, এই প্রমাণটি পদে পদে মেলে! এখানে আমি একমাত্র প্রাচ্যদেশীয় লোক, সেজন্য আমার প্রতি অনেকের চোখ ছিল। শ্রীমতী অকসানা আজ একটি সুন্দর লতাপুষ্পশোভিত রেশমী গাউন পরে-ছিলেন। এক সময় যখন তিনি আমার টেবল থেকে উঠে হোটেলের হিসাবের খাতায় সই করতে গেলেন, সেই সময় ওদার থেকে একজন অতি সুশ্রী যুবক আমার সামনে এসে হাসিমুখে ‘ক্ষমা করুন’ বলে দাঁড়াল। সম্ভ্রান্ত কোনও পরিবারের ছেলে, সন্দেহ নেই। অতি বিনীত মিষ্ট কন্ঠে এবং ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, যদি অনুমতি করেন ত আপনার ‘মহিলাটিকে’ নিয়ে আমি একটু নাচতে চাই!

রাত প্রায় বারোট। হলের মধ্যে তখন জোড়ায়-জোড়ায় বল-নাচ আরম্ভ হয়ে গেছে। টেবলগুলির ফাঁকে ফাঁকে নাচ চলছিল এবং তারই তালে তালে প্লাট-ফর্মের উপরে ইউরোপীয় বাজনা বাজছিল।

যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে বল-লুম, ও’র সঙ্গে হঠাৎ নাচতে ইচ্ছে হল কেন?

ও’র মদুখরী এবং বিশেষ ক’রে চোখ দুটি বড় সুন্দর!

আমি বললুম, উনি আমার ‘মহিলা’ নন। আমি ভারতীয়, এবং উনি একজন সোভিয়েট মহিলা। আমার অনুমতি না নিয়েই ও’র সঙ্গে আপনি নাচতে পারেন। আপনারা দুজনে নাচলে আমি খুশী হব।

কতক্ষণ পরে অকসানা ফিরে এসে আবার টেবলে বসলেন। তিনি বয়স্কা নারী, কিন্তু তম্বা। তাঁর দেহের তারুণ্য, মাথায় ঘন কালো কৃষ্ণত কেশরাশি এবং সুন্দর দুটি চক্ষুর বৃহৎ কৃষ্ণতারকা অনেক সময় ইরাণী বা কাশ্মিরী মেয়েকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি আর্মেনিয়ান সুন্দর রক্ষা করেছেন।

যুবকটি তার টেবল থেকে উঠে আবার এসে দাঁড়াল, এবং সর্বিনয়ে তার প্রস্তাব অকসানার কাছে নিবেদন করল। অকসানা একটু হাসলেন তার দিকে চেয়ে। পরে বললেন, “Thank you very much. But ‘am afraid, I am too old to dance with you, my dear boy.”

কথাটি তিনি রুশ ভাষায় বলেছিলেন। যুবকটি স্নান মুখে ফিরে গেল।

শ্রীমতী অকসানা তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট আয়নাটি বার ক’রে প্রায়ই লিপস্টিক বুলিয়ে নেন দুটি পাংলা,

ঠোটে, এবং সিগারেট খান অনেক সময়ে। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল। পোষাক পরিচ্ছদের বিলাসও তাঁর কম নয়। তিনি বিধবা। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি সাহাস্যে বললেন, আপনাকে বুদ্ধি দিয়ে বলা একটু কঠিন। তবে আমার রুচির-প্রকৃতির সঙ্গে এসব মেলে না!

আমি তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করতুম।

শ্রীমতী অকসানা আমাকে নিয়ে গেলেন প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে উক্কাইনের একটি পল্লীঅঞ্চলে। চারিদিকের বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরে বড় বড় এক একটি গ্রাম দেখতে পাচ্ছি। কোথাও পাকা একতলা বা দোতলা বাড়ি, কোথাও বা পাকা একতলার মাথায় করোগেটের বড় বড় চালাঘর। এখন শরৎকাল। বহু ফসল উঠেছে মাঠে মাঠে। বিশাল সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র একটি খড়ু-বৈচিত্র্য দেখি। একই সেপ্টেম্বর মাস—কিন্তু কোথাও বরফ পড়েছে, কোথাও বৃষ্টি, কোথাও গরমে পড়েছে, কোথাও মধুর বসন্ত, এবং কোথাও বা বৃষ্টির কাল এখনও আসেনি। গ্রামের পর গ্রাম এবং মাঠের পর মাঠ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম। যে-দেশের বিশাল-তার তুলনায় জনসংখ্যা একে-বারেই কম, সেই দেশে চাষ-নিয়ন্ত্রণ বা জমি ও গ্রাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকলে চলবে কেন? আমাদের দেশে অধিক সংখ্যক লোকের তুলনায় জমি অল্প, ওখানে অধিক জমির তুলনায় অল্প লোক।

একটি ‘কলেটিভ ফার্ম’-এর হেড আপিসে এসে নামলুম। এই ফার্মের নাম, “রেড রেড প্রিডিসার”। এখানকার কর্তা হলেন আইভান কাবানেৎজ। তিনি মাঠ ময়দানের নানা জায়গা ঘুরে সমস্ত দেখাতে ও বোঝাতে লাগলেন। ইলেকট্রিক

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস

মনে রেখ

জীবনে বর্তমান শৃঙ্খল ততটুকুই কি পরমায়ু তার স্মৃতির? জীবনশিপের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৃত্তের মধ্যেই যেন ‘মনে রেখ’ উপন্যাসের সমূহ কাহিনীর সমুদয় নর-নারীর সুখ-দুঃখের সুন্দর ছবি। মনে রাখার মতো কতো প্রেম কতো প্রবণতা, কতো সিদ্ধি কতো ব্যর্থতা সবই যেন অনিবার্য একসূত্রে এক নিরবচ্ছিন্ন জীবনপ্রবাহের অমৃতসংগমে সমুদ্রস্থিত। ‘মনে রেখ’ উপন্যাসের গঠনশৈলীতে স্বনামধন্য প্রবোধকুমার নতুন রীতি ও নতুন স্বাদের এক আশ্চর্য স্বাক্ষর রেখেছেন। দাম : সাড়ে ছয় টাকা।

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট : কলিকাতা।

মেনিনের সাহায্যে পর্বতপ্রমাণ এক একটি গমের মত পড়াই, বাড়াই, মাড়াই ও গুঁড়ানো হচ্চে। লোকজন যারা আছে তারা যোগান দিচ্ছে, কিন্তু পরিগ্রহ করছে মেনিন। এখানে কুয়া থেকে পানীয় জল তুলে সেটিকে শোষণ করে নেওয়া হয়। এক স্থলে গাভী ও বাছুরের গাল খোঁসেড়ে আটকানো, তাদের স্বাস্থ্যশ্রী দেখে খুশী হইলুম। এখানে স্কুল, ক্লাব, সিনেমা, হাসপাতাল, প্রসূতিসদন, পার্টি অফিস, সবই বর্তমান। শিশুদের স্বাস্থ্য দেখলে আনন্দ পাওয়া যায়। প্রত্যেকের গায়েই শোষাক, অনেকের খালি পা, অনেক ধুলোমাখা। এই ফার্মে প্রায় ৩৭০০ লোকের বাস। আশেপাশে জলাশয় এবং সেখানে নানাবর্ণের হাজার হাজার হাঁস। মুরগির পেন, শূকরের বড় বড় আর্থনিক ডিজাইনের খোঁসড়া, গরুর গোমাল, সমস্তগুলির ব্যবস্থা অতি উত্তম। হেড আফিসের বাগলাটিকে ঘিরে একটি জনপদ গড়ে উঠেছে।

মাঠের মধ্যে খাল কেটে আলু রাখা হচ্ছে উপরটার ঘাস মাটি চাপা দিয়ে। একপাশে ডিনটি বলিস্টকায় চাবী মেয়ে করেকাটি বড় বড় ঘন দুধের বোতল, ক্রাস ও পাউরুটি নিয়ে টিফন করতে বসেছে। ওদের আহাৰ্য-পরিমাণ দেখলে গা হুমছম করে।

দুজন চাবী মহিলা আমাদের জন্য প্রচুর আহাৰের আয়োজন করেছিলেন। ওদের ঘরদোর যেমন তেমন। বাড়ির ছেলেরা মায়া গিয়েছে বিগত বিশ্ববন্দে। একটি বছর পনেরো বয়সের লাভুক মেয়ে আমার হাতে একটি সাবান দিয়ে তোয়ালে নিয়ে দাঁড়াল। এটি বাংলাদেশের পল্লী-গ্রামের বাড়ির ছোট উঠোন। এখানে এখানে দুচারটি ফুলের গাছ। ঘরের পাশে পাদাড়, সেটি জঙ্গাল ফেলার জায়গা। এখানে গরু রাখার চালা। এখানে রান্না ভাড়ার। আমাদের জন্য ঘরের চেহারা ফিটফিট, নতুন পর্দা বুলছে। আমার দেশের সেই চিরকালের পরিচিত ঘরের সামনের আগুনা, সেখানে দাঁড়িয়ে ছোট, সাকানটি দিয়ে হাত ধুতে ধুতে ওই নতুন পর্দা ভদ্র মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের স্নানের ঘরটি কোথায়?

একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল হাসিমুখে। এ হোল মেয়েটির মামা। সে ইংরেজি জানে। সে জবাব দিল, বাথরুম আমাদের নেই!

নেই? তবে স্নান করা কোথায়?

যুবকটি বলল, এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটা বিল আছে, সেখানে আমরা স্নান করে আসি। মেয়েরা জল তুলে আনে কুয়া থেকে।

কিন্তু স্নান ছাড়া আরও যে দু'একটা প্রকৃতির ভাড়া আছে?

ছেলোটা খবর আমদের, সুতরাং প্রচুর পরিমাণে হেসে উঠল। আমি কিন্তু আশ-পাশে তাকিয়ে সন্তোষজনক জবাব পেলুম না। শূদ্ধ ভাবলুম হেড আফিস অঞ্চলে যদি এই অবস্থা আজও থাকে, তাহলে দূরে গ্রামাঞ্চলের দিকে কি প্রকার?

একটি তেপায়া টুলের উপর জলের ছোট ট্যাঙ্কটি বসানো ছিল, এবং মেয়েটি তাই থেকে গণে করে জল নিয়ে আমার হাতে যখন একটু একটু করে ঢালতে লাগল, তখন একথা বুদ্ধিতে বাকি রইল না, এ অঞ্চলের জলকষ্ট নিবারণের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ আজও করে উঠতে পারেননি। কিন্তু এখানে এই ভয় ও মিষ্টভাষী পরিবারটিকে দেখে সৈদীন বড় আনন্দ পেয়েছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় চিত্রশালা দেখে খুশী হই বটে, কিন্তু একটি সজ্জন পরিবারের মধ্যে এসে তাদের সুখদুঃখের সংগে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারলে তার চেয়ে অনেক বেশি লাভবান বোধ করি।

যুবকটির সাহায্যে এ মেয়েটিকে নানা প্রশ্ন করলুম। সে খুশী হয়ে জবাব দিচ্ছিল। সন্তত যাবিক কোর্স শেষ করে সে রেশমের কারখানার কাজ করবে। তার বাবা নেই। সে এখানে মা ও দিদিমার কাছে থাকে। তার পায়ে জুতো নেই, গ্রামের বহু মেয়েই জুতো পরে না। খালি পায়ে চলা আরাম। তারা নিজেরাই রান্নাবান্না, জলতোলা, ঘরের সকল কাজ-কর্ম, বাসন মাজা, সাবান কাটা, সমস্তই করে। সে বিকালে চুল বাঁধে, ভাল পোষাক পরে। এ গ্রামের সবাই তাদের বন্ধু। মা ও দিদিমা পেন্সন পান। তাদের নিজস্বের গরু, হাঁস আর মুরগি আছে। তারা ভাত-রুটি দুই পছন্দ করে। এগ্রামে কারো বিশেষ জসুধে বিসুধ নেই। তাদের ইচ্ছুক 'ইন্ডেন' নাম সে শুনিয়েছে।

আহারাদির আয়োজন ছিল প্রচুর। আমরা ছিলুম জন ছয়েক। কিন্তু মহিলা দু'টি পনেরো জনের খাদ্য ছয়জনকে খাওয়াবার চেষ্টা পাচ্ছিলেন। ওই যুবকটি একসময় কথা পাড়ল। বলল, আচ্ছা এটা কি হল বলুন ত? কেবালা থেকে জোর করে কমিউনিস্ট

গভর্ণমেন্টকে উচ্ছেদ করলেন আপনাদের প্রেসিডেন্ট! আমরা দুঃখিত হয়েছিলাম।

মুখ তুলে হাসলুম,—আপনাদের দুঃখের কারণ?

যুবকটি বলল, হাজার হোক কমিউনিস্ট গভর্ণমেন্ট—!

কথাটা আমাকে পরিস্কার করতেই হল। বললুম, কমিউনিস্টদের সংগোপন আবেদনের ফলেই ওদের গভর্ণমেন্টকে ডিসমিস করতে হয়েছিল। নচেৎ নেহরু ওদের সম্মানকে শেষ অবধি বাঁচাবার চেষ্টা পেয়েছিলেন।

কি রকম?—সকলেই যেন উৎসুক হয়ে উঠলেন।

আমি সর্বিনয়ে বললুম, আপনাদের এই সুন্দর দেশ ভ্রমণ করে আমি আনন্দ লাভ করতে এসেছি। রাজনীতি আমার পেশা নয়। এ সম্বন্ধে সোভিয়েট পররাষ্ট্র বিভাগে আপনারা খোঁজ নেবেন। আশা করি তারা সত্য সংবাদ জানেন। আমি শূদ্ধ এইটুকু বলতে পারি, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রশাসনিক, বিদ্যা এখনও অর্জন করেননি, এবং তাদের দেশ-কর্মের নীতি এখনও স্পষ্ট হয়নি।

ছোকরার চোখে মুখে আরও কিছু উৎসুক প্রশ্ন এবং কিস্ময় ছিল, কিন্তু শ্রীমতী অকসানা তাকে নিরস্ত করে বললেন, আমার মনে হয়, ভিন্ন দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে আমাদের মাথা না ঘামানই ভাল।

ডাইরেক্টর এবং তাঁর সহকর্মীরা অকসানার আবেদনটি মেনে নিলেন। যুবকটি এক ফাঁকে শূদ্ধ আমাকে বললেন, আপনার কথায় অবাক হইলুম। এসব আমরা কিছই জানতুম না।

আমি বললুম, ভারতের প্রকৃত সংবাদ প্রত্যেক সোভিয়েট নাগরিক পান এইটিই আমার কাম্য।

সন্ধ্যার দিকে সৈদীন আমরা কিয়েভে এসে আবার পৌঁছলুম।

গ্রেগরি পলটকিন এসে নিয়ে গেলেন নাট্যকার বেসিল মিনকোর বাড়ির দোতলায়। রাত আটটা তখনও বাজে। সেখানে উপস্থিত রয়েছেন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিসেস মিনকো, তাঁর দুই ননদ, দুই মহিলা কবি ও গল্পলেখিকা, অপর একজন অধ্যাপিকা এবং আমার সংগে শ্রীমতী অকসানা। পূর্বের মধ্যে মিনকো, গ্রেগরী এবং উক্রাইন রাইটার

ইউনিয়নের সেক্রেটারী বেসিল কোজা-
চেনকোকে নিয়ে আমরা চারজন।
মিন্‌কোর বৃন্দা জননী এবং দুটি বালক-
বালিকা আড়ালে রইল। এটি মিন্‌কোর
ফ্ল্যাট। বাড়িটি নতুন এবং ফ্ল্যাটটি বেশ
প্রশস্ত। ফ্ল্যাটভরা আসবাবপত্রের
প্রত্যেকটি নতুন, আধুনিক এবং রুচি-
সম্মত। বইপত্র চারদিকে ঠাসা। শুনলাম
সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে ছোট বড়
লাইব্রেরী একটি আছে। চোখেও
দেখছি। লিফট-চালিকা মেয়ে উপর-
নীচে করতে করতেও বই পড়ে!

মিন্‌কো আমার বাড়িকে, মিসেস
মিন্‌কো ডানপাশে। কিন্তু এই কদিনে
মিন্‌কো আমার বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠে-
ছিলেন তাঁর সরল ও সবল প্রকৃতির জন্য।
এদেশে কেউ সোডার জল মিশিয়ে মদ্য-
পান করে না। আহারাদির মাধ্যমে
মিন্‌কোর পান-প্রাচুর্যের দিকে এক এক-
বার ভীতচক্ষে যখন লক্ষ্য করছিলাম,
তখন তিনি বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে একবার
বলতেন, ভয় পাবেন না, আমি জাত-
কসাক! কসাকের নেশা হয় না।

চৈত্রে দেখলাম তাঁর দিকে। টলটলয়ের
‘কসাক-সু’ বইটি মনে পড়ে গেল।
কসাকরা কখনও কোথাও বশ্যতা স্বীকার
করেনি। পর্বতে, অরণ্যে, মরুভূমিতে,
রণক্ষেত্রে, এবং সাংঘাতিক জীবনযাত্রার
তাঁরা অজ্ঞেয়। রুশার্মলবের সেই ভয়াবহ
তারিখ “২৫শে অক্টোবরে” এরা যদি
পলাতক করেনীশ্বকে একটি নাটকীয়
মুহুর্তে পরিত্যাগ করে লেনিনের পাশে
এসে না দাঁড়াতে, তবে সেই বিপ্লবের
সাক্ষ্যলাভ কবে ঘটত কে জানে। আমি
এই প্রথম দেখলাম একটি জাত-কসাকের
চোখেরা। দুর্ভিক্ষ এবং বীর কসাক সম্বন্ধে
মনে মনে বে-ধারাগাটা এতকাল লালন
করে এসেছি, মিন্‌কোর সমস্ত সরল
আচরণ, স্পষ্ট ভাষণ, মধুর আপ্যায়ন,
এবং সর্বোপরি তাঁর ভরহীন স্বভাব-
স্বচ্ছতা সৌন্দর্য আমার পক্ষে বিশেষ
আনন্দের কারণ হয়েছিল।

আমাদের নৈশভোজন চলছিল পাঁচ
ঘণ্টার কিছু বেশি। শব্দ ভোজন নয়,
মন-জানাজানি, মানুষ চেনাচিনি। ওরই
মধ্যে একবার গিয়ে ঢুকলাম তাঁদের রান্না-
ঘরে এবং শয়নকক্ষে। বৃন্দা জননী
ছেলের পাগলামির ভয়ে আড়ালে
লুকিয়েছিলেন, সেটি নিয়ে প্রচুর আমোদ
করা গেল। মিন্‌কোর স্ত্রী এবং ভগ্নীয়া
হৈ-ঠে নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। প্রায়
তিনটি বেশ বড় ঘোড়াল র-মদ্য পানের
পর রাত বারোটা নাগাদ মিন্‌কো একটি

আশ্রয় হয়েছেন! কোজাচেনকো এবং
গ্রেগরী বললেন, ওর সঙ্গে আমরা কেউ
পেরে উঠিনে! অকসানা হেসেই খন।
মিন্‌কো আমাকে লক্ষ্য করে ওঁদেরকে
বলছিলেন, ছেলোটো এল, এত দূর দেশ
থেকে, চলনা ওকে নিয়ে দুচারদিন
বাগান-টাগান কিংবা শিকার-টিকার
করিগে! অকসানা, তোমাকে ভাল কথায়
বলছি,—মস্কোর দিকে কেটে পড়ো! একে
আমরা ছাড়ব না—!

উনি যে পরদেশী?

ধ্যেং তোর! যে সত্যিকার বন্ধু সে
পরদেশী হবে কেন? সে ঘরের, সে
বন্ধুর—!

সবাই প্রচুর পরিমাণে হাসছিল।
মিন্‌কো আর একটি বোতল খুজ-
ছিলেন, কিন্তু সেটি বোধ হয় তাঁর চোখের
আড়ালে সরানো হয়েছিল।

রাত দেড়টা বেজে গেছে। অপরিমেয়
আহার্য সামগ্রীর চক্রান্ত থেকে একসময়
মুক্তি নিয়ে হাত ধরে এলাম। বিগত ছয়
ঘণ্টার মধ্যে কোনও সময় মনে হয়নি,
এটি আমার নিজের বাড়ি নয়। আমার
পক্ষে সমস্ত ফ্ল্যাটটি অব্যাহত ছিল।
কিন্তু এখানেও জর্জিরার মতো সেই
সামাজিক রীতিটি বর্তমান। যে-অভ্যা-
গতকে আপন পরিবারভূক্ত ব্যক্তি মনে করা
হয়, তিনি এ বাড়ির প্রত্যেক মহিলাকে
আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে বাধ্য!

শ্রীমতী অকসানা ভারত ভ্রমণ
করেছেন বোধ হয় বার দুই। তিনি
জানেন, ভারতে এ রীতি নেই। সুতরাং
তিনি আমার মুখের দিকে চৈত্রে হেসেই
অস্থির। অবশেষে মিন্‌কোর স্নেহসিক্ত
কঠোর শাসন ধনিত হল, যাও বলছি—
জানো, তুমি ঘরের লোক—!

মহিলারা কলকণ্ঠে হাসাহাসি কর-
ছিলেন। বলা বাহুল্য আমাকে বশ্যতা
স্বীকার করতে হয়েছিল! বিদায় নেবার
সময় বৃন্দা জননী এবার এগিয়ে এসে
নিজেই হাত বাড়িয়ে আমাকে নিয়ে শির-
চুম্বন করলেন। বয়স তাঁর অনেক। মিন্ট
ও শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, তুমি যাবে,
মন ভাল ঠেকছে না। ভালয় ভালয় দেশে
ফিরো, আমি আশীর্বাদ করি। মনে করে
চিঠি দিও, রাবা। এবার যখন আসবে
আমাদের কাছে থেকে!

জননীর আশীর্বাদে নিরাপদেই
ফিরেছিলাম! মিন্‌কোকে ভুলতে অনেক-
দিন লেগেছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেক
রিপাবলিকে রাইটার্স ইউনিয়ন যেমন এক
একটি প্রবল পরাক্রমশালী দৃঢ়ভিত্তিক
প্রতিষ্ঠান, উক্রাইনেও তাই। সকল
বিভাগের লেখক, কবি, নাট্যকার, প্রভৃতি
মিলিয়ে এদের বর্তমান সভ্যসংখ্যা ৫৩০
জন। সমগ্র উক্রাইনে এঁদের দশটি শাখা
আপিস, নিজস্ব শাসনতন্ত্র, নিজেদের
বোর্ড, অর্থভান্ডার, ও খানা সাময়িক পত্র,
একখানা গেজেট, একটি ক্লাব, সিনেমা
হল, বড় একটি লাইব্রেরী, একটি ক্লাব
ও ক্যান্টীন, নিয়মিত নির্বাচন, মস্ত
আপিস। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী,
ইন্‌ফরমেশন অফিসার, কমিউনিষ্টিক
কর্মিটি। এ কর্মিটির প্রত্যেক ব্যক্তি উচ্চ
বেতন পান। সর্বোপরি লেখকদের দখলে
এই বিরাট রাজপ্রাসাদ! সে যাই হোক,
প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী অলোদিয়া ক্রাভেৎজ
আমার বিশেষ বন্ধু। কিন্তু তাঁকে পাওয়া
গেল না। তিনি সম্প্রতি ভ্রমণে
বেরিয়েছেন।

লেখক সংখ্যার পক্ষ থেকে আমাকে
একটি সুদৃশ্য ও রঙ্গীন সুচীশীলপ-
সমন্বিত উক্রাইনীয় পোষাক উপহার
দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটি মানিয়ে
যেত শ্রীমতী অলোসিয়ার তনুলতায়।
আমি এর যোগ্য নই।

স্টেট পাবলিশিং হাউসে গিয়ে দুই
ব্যস্তির সঙ্গে গল্পে মেতে উঠেছিলাম।
তাঁদের একজন হলেন চীফ এডিটর মিঃ
রোমান চুমাক এবং অন্যজন পররাষ্ট্রীয়
সাহিত্য-প্রকাশন বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ
নিকোলাই দিমিত্রেনকো। এরাই উক্রাই-
নীয় সর্বপ্রকার সাহিত্যপ্রকাশের সর্ব-
সর্বা। এঁরা যখন শুনলেন, ভারতবর্ষের
যে কোনও লেখক কণ্ঠপক্ষের বিরোধ-
ভাজন হওয়া সত্ত্বেও যে কোনও বিষয়ে
যথেষ্ট স্বাধীনতার সঙ্গে লিখতে এবং
পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে পারেন, তখন
এঁদের ওৎসুক্য লক্ষ্য করলাম।

এই ঘরেই একটি অতি সুশ্রী মেয়ে
বসে-বসে কাজ করছিল। মেয়েটি তরুণী
কবি। এর মধ্যেই তাঁর নাম-ডাক হয়েছে।
ডাইরেক্টর মহাশয়ের নির্দেশে মেয়েটি
একখানি সুশ্রী বহুবর্ণ মলাটের বই এনে
আমাকে উপহার দিল। বইখানি উক্রাইন
ভাষায় অনুবাদ করা “রামায়ণ”। লেখক
নন্দলাল দত্ত! এর পরে মস্কোর শিশু-
সাহিত্য প্রকাশ ভবনে আরেকজন
বাঙালী লেখকের একখানি গল্পের বই
দেখেছিলাম। তাঁর নাম খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
ভারতের অন্যান্য ভাষা থেকেও নানা রূপ-
কথার শিশুপাঠ্য বই রচনাভাষ্য বিশেষ
শিশুপ্রিয়তা অর্জন করেছে! (ভ্রমশঃ)

মতামত

॥ অভিমত ॥

সবিনয় নিবেদন,

‘অমৃত’র আমি একজন অনুরাগী পাঠক। এর প্রতি অনুরক্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ—যে গল্পগদ্যলি প্রকাশ হয়, তাতে কাহিনী থাকে। সেগুলি আধুনিক রীতিদৃষ্ট নয়। কয়েকটি বিশেষ ধর্ম, ব্যঙ্গনা-মুহুর্তা ও অহেতুক ভাবানুভূতি চরিত্রগুলিকে ভার-জ্বাল করে না। যদিও নতুন রীতির সব লেখাই যে এই দোষযুক্ত তা বলছি না, তবুও যে কোন কারণেই হোক না কেন এ রীতির পাঠক অভ্যস্ত কম। দুর্বোধ্য বলেই শুধু নয়—সব প্রশ্নের সূত্রে মীমাংসা পাওয়া যায় না, এটিই বিশেষ কারণ। যারা এই রীতিতে গল্প লেখেন, তাঁদের অভিমত, পর্বতকে ঈশ্বরের কাছে আসতে হবে। অর্থাৎ পাঠককে এগিয়ে আসতে হবে তাঁদের কাছে। এক-কথায় পাঠক না বদলেও তাঁদের কিছু এসে যায় না। তাঁদের গোষ্ঠী বদলেই ফল লাভ। এই স্রোতে অমৃত গা ভাসায় নি। সুতরাং পরিচালক গোষ্ঠীকে এ জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এবার অমৃত সম্বন্ধে আমার কিছু অভিমত ব্যক্ত করছি। প্রথম কথা অনুবাদ গল্প সম্পর্কে। বেশীর ভাগ অনুবাদ গল্পে আমি তৃপ্ত হতে পারিনি। এর কারণ যে গল্পগদ্যলি অনূদিত হয়, সেগুলির মূল লেখক বেশীর ভাগ প্রতিদ্বন্দ্বি স্থানীয় নন। এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে স্থান সংকুলানের জন্য হয়তো অনুবাদক সব সময় ইচ্ছা থাকলেও ভাল লেখা দিতে পারেন না। সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নমস্কারান্তে
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
কদমতলা, হাওড়া

[আমরা কিছুকাল আগে ভারতের অন্যান্য প্রতিবেশী সাহিত্যের গল্প অনূদিত করে প্রকাশ করেছি। বর্তমানে বিদেশী সাহিত্যের গল্পানুবাদ প্রকাশ করছি। বিদেশী গল্পগদ্যলি বেশীর ভাগই নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের রচনা। তাঁদের সকলের রচনার ভালো ইংরেজী অনুবাদ পাওয়া কঠিন, এবং মূলভাষা থেকে অনুবাদ করানো সময়-সাপেক্ষ। সে জন্য মোটামুটি পছন্দমত গল্প নিয়েই আমাদের খুশি থাকতে হয়েছে। যাই হোক, পাঠকের বক্তব্যটি বিবেচনাযোগ্য। তাঁকে এ জন্য ধন্যবাদ জানাই।

—সম্পাদক।]

॥ যৌবন সমীপে প্রসঙ্গে ॥

সবিনয় নিবেদন,

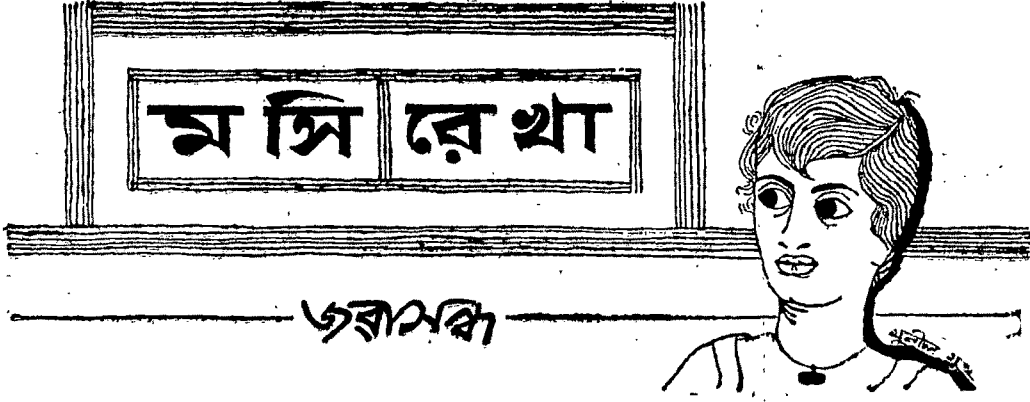
৯ই মার্চ সংখ্যার অমৃত পত্রিকায় কগাদ চৌধুরী লিখিত যৌবন সমীপে অকাল বসন্ত আলোচনাটি পড়ে একটু শঙ্কিত হলাম। আমেরিকার কিশোর-কিশোরীরা যৌবন চেতনাকে যেভাবে স্বাগত জানাচ্ছে সেটি সভ্যতার পরিচায়ক না উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক স্বয়ং লেখকই সে প্রশ্ন তুলেছেন। সভ্যতা, সুদৃষ্টি, শালীনতার পাঠ ভারতবর্ষ অন্ততঃ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নিশ্চয়ই নিতে চাইবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতারও বনেদী গোষ্ঠীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে ধরা হয় কিনা সন্দেহ। অর্থপ্রাচুর্য জীবন-যাপনের মান যেমন উন্নত করে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার যেমন সুযোগ এনে দেয়, পৃথিবীর চক্ষে ক্ষমতাবান শক্তি-রূপে রাষ্ট্রকে যেমন সম্মানিত করে, তেমনি ক্ষয়ক্ষতির দিকও রয়েছে। অর্থ-প্রাচুর্যে রাষ্ট্রে ‘অলালের ঘরের দুলাল’ (এবং দুলালীরও) সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্র আজ সেই সমস্যার সম্মুখীন।

লেখক এবং জনপ্রিয় পত্রিকার সম্পাদকের প্রতি আমার নিবেদন এই জাতীয় আলোচনা লেখা বা প্রকাশনা থেকে তাঁরা বিরত থাকলেই বোধ হয় ভালো হয়। আমেরিকার সভ্যতার খুঁটি-নাটি সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল যথেষ্টই রয়েছে। কিন্তু যে জাতীয় জীবনাদর্শের চিত্র এদেশের অপরিণত কিশোর-কিশোরীদের মাথা বিগড়ে দিতে পারে তার প্রচার বিষয়ে সংযত হওয়া প্রয়োজন মনে করি। লেখক তাঁর আলোচনায় ‘দিশেহারা কৈশোরের’ নিম্নদাই করেছেন অবশ্য, তবু ধীরভাবে ভেবে দেখতে বলি, এ জাতীয় আলোচনা থেকে অনুমত নবগঠনমুখী ভারতের কিশোর-কিশোরীদের অকল্যাণের আশংকা রয়েছে কিনা। আমার বক্তব্যকে লেখক বা প্রকাশক ভুল বুঝবেন না, আশা করি।

নমস্কারান্তে
দীপালী সেন,
সিউর্ডি, বীরভূম

[‘অমৃত’ সমস্ত রকম জাতীয় বিষয়ই ছাপা হয়। আমেরিকা একটি মহান দেশ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সু-উন্নত। কিন্তু সে সমাজেরও সমস্যা আছে। ভারতে রাষ্ট্রদ্রুতরূপে নিষ্পত্তি বিখ্যাত মার্কিনী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক গল-ব্রেথ যাকে ‘অ্যাক্সিয়েন্ট সোসাইটি’ বলে-ছেন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার চেহারা কেমন দুর্নিশ্চিন্তাজনক হয়ে উঠেছে সেটাই আলোচ্য নিবন্ধের বক্তব্য বিষয়। আমরাও অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দিকে দ্রুতগতিতে এগোতে চাই। কিন্তু এ বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার যে তাতে যেন সামাজিক বিকৃতি না আসে। সেই আশাতেই এ নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। আশা করি পরলোখিকাও আমাদের বক্তব্যকে ভুল বুঝবেন না। —সম্পাদক]





[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিজ্ঞান মা বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।
নির্মলা তাড়াতাড়ি দরজায় শিকল তুলে
দিয়ে বাইরের ঝাঁপটা ভেজিয়ে রেখে
তাকে গিয়ে বলল, ওদিকটায় একটা
নজর রাখবেন দিদি। আমি চট করে
একবার ঘুরে আসি।

—কোথায় যাচ্ছিস এত বেলায়?

—দৌখ, সেই টাকা কটা পাওয়া যায়
কিনা।

—ও বেলায় যাস। এখন বেরোলে
রান্না করবি কখন?

—না, দিদি, মনে যখন পড়ল, কাজটা
সেইই আসি।

বলতে বলতে সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে
গেল। বিজ্ঞান মা সেইদিকে তাকিয়ে
ভাবতে লাগলেন, কদিন আগে এই টাকার
কথা তিনিই ওকে মনে করিয়ে
দিয়েছিলেন। নির্মলা ত্যাঁচ্ছল্যভরে জবাব
দিয়েছিল, থাকগে, ওর জন্যে আর ওখানে
যেতে হচ্ছে করে না।

বিজ্ঞান মার হাতে কোনো কাজ ছিল
না। রান্নাবান্নার পাট অনেক আগেই সেয়ে
ফেলেছেন। স্বামী খেয়েদেয়ে কাজে
বেরিয়েছেন, ছেলে শুলে। নির্মলা যখন
গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপরেও
অনেকক্ষণ বাইরের দরজার চৌকাঠে
হেলান দিয়ে রাস্তার ধারেই দাঁড়িয়ে
রইলেন। ফাঁকা রাস্তা। পুরুষেরা যে যার
জীবিকার ধাঁধায় বেরিয়ে পড়েছে, মেয়েরা
ভিতরে—কেউ বাকী রান্নাটা সেয়ে রাখছে,
কেউ খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে ফেলেছে।
মাঝে মাঝে কাঁচি ছেলের কান্না, আর
মায়েদের চিংকার ছাড়া আর কোনো শব্দ
নেই। কলের জল চলে গেছে; সেখানটাও
জনহীন।

বিজ্ঞান মার হঠাৎ নজরে পড়ল,
শহরের দিক থেকে দুজন পুন্ডলিশের লোক
কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে এবং
এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু একটা বোধ-
হয় খুঁজছে। ওদের দেখেই দ্রুতগতিতে
বিরক্তি এবং তার সঙ্গে কিছু আশঙ্কাও
ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে
সরে যাবেন এমন সময় একজন পুন্ডলিশ
বলে উঠল, 'ওগো বাছা, শুনছ?' বিজ্ঞান
মা বাধ্য হয়েই দাঁড়ালেন। লোকটি এগিয়ে
এসে বলল, এখানে খোকার মা বলে কেউ
থাকে?

বিজ্ঞান মার বুকের ভিতরটা কেঁপে
উঠল। পুন্ডলিশের লোক যখন খোঁজ করতে
এসেছে, নিশ্চয়ই কোনো নতুন বিপদ দেখা
দিয়েছে হতভাগীর। কোনো রকম শিবা
না করে বলে ফেললেন, না; ওনামে
এখানে কেউ থাকে না।

—আশে-পাশে কোনো বাড়িতে?

—কোথাও নেই।

—তোমরা এখানে কদিন আছ?

—পাঁচ ছ বছর হবে।

পুন্ডলিশ কনটেবল তার সংগীর দিকে
ফিরে বলল, তাহলে ঠিকই বলছে।
এ বসতিতে হবে না। ওদিকটায় চল।
শিবা লোকটি এদিক ওদিক এক-
বার দেখে নিয়ে বলল, আম গাছ আর
জলের কল কিন্তু ঠিক মিলে যাচ্ছে।

প্রথম পুন্ডলিশটি হেসে উঠল—তা
মন্দ বলনি। গোটা বেলেঘাটায় আম গাছও
আর নেই, কলও এই একটি।

সংগীটি বিরক্তির সুরে বলল, তা না
হয় আছে, কিন্তু আর কত ঘুরবে বল
দিকনি? সেই সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে
পানের সূতো ছিঁড়ে গেল। চল এবার

ফিরি। এরকম খোঁজার কোনো মানে
হয় না।

পুন্ডলিশের লোকেরা নিজেদের মধ্যে
কিসব বলতে বলতে শহরের দিকে চলে
গেল। বিজ্ঞান মা তার আগেই দরজা বন্ধ
করে দিয়েছেন। এরা যে খোকার খবর
নিয়ে আসতে পারে, এরকম কোনো
সম্ভাবনা তাঁর একবারও মনে হয়নি।
পুন্ডলিশ তার খোঁজে এসেছিল, শুনতে
পেলে এই দুঃসময়ে নির্মলা পাছে আরো
ব্যাকুল হয়ে পড়ে, তাই এ ব্যাপারটা তার
কাছে বেমানান চেপে যাওয়াই স্থির
করলেন।

সদর দরজা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়বার
বেশ কিছুক্ষণ পরে ভীম নামে চাকরটি
বিরক্ত মুখে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে
খুলে দিল এবং নির্মলাকে দেখেই
ঝাঁজিয়ে উঠল, কী চাই? পরক্ষণেই
বিশ্ময়ের সুরে বলল, খোকার মা! ইস,
তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না। খুব অসুখ
করেছিল বুঝি?

নির্মলা স্তান হাসির সংগে জবাব
দিল, না তো। মা কোথায়?

—ঘুমুচ্ছে। উঠতে সেই চারটে,
নীচে নামতে পাঁচটা। তুমি কি আর
কোথাও কাজ করছ?

—না।

—ভালোই হয়েছে তাহলে। তিনদিন
হল বাসন মাজার লোক নেই। আমাকে
বলছে খুঁজে আন। আমি কোথায় পাই,
বল দেখি? তুমি যাবার পর তিন তিনটা
নিয়ে এলাম। সব দুদিন চারদিন কাজ
করেই পালিয়ে গ্যাছে। দিনরাত খিটখিট
করলে টেকে। তোমার আমার কথা
আলাদা। কেমন একটা মায়ী পড়ে গ্যাছে।
কি বল?

হঠাৎ বোধহয় খেয়াল হল, নির্মলা

এতক্ষণ দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত খামিয়ে বলে উঠল, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এসে বসো তাহলে। কাল থেকেই আসছ তো?

নির্মলা ঢুকতে ঢুকতে বলল, দেখি, ও'রা যদি বলেন.....!

—বলবে না মানে? তোমার মত লোক পাবে কোথায়?

ওপর থেকে গৃহিণীর গলা শোনা গেল—করে? কার সঙ্গে বক-বক করছিছ? দুপুর বেলা দু'মিনিট একটু চোখে বুজবো, তারও কি জো আছে? চম্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে যেন কাগ-পড়ছে আর চিল উড়ছে।

ভীম এইসব মন্তব্য গানে না মনে খুশী-ভরা দরজা গলায় ঘোষণা করল, খোকার মা এসেছে, মা! গৃহিণী এবার আর বিরক্তি প্রকাশ করলেন না, বিশেষ উৎসাহও দেখালেন না। সংক্ষেপে বললেন, বসতে বল।

পাঁচটা নয়, তার অনেক আগেই আজ তাঁকে নীচে নামতে দেখা গেল। নেমেই অনুযোগের সুরে বললেন, ধন্য মানুষ তুমি বাছা। সেই যে গেলে, তারপর একবার একটা খবরও কি নিতে নেই এখানকার, লোকগুলো রইল না গেল? অ্যান্ডিন কাজ করলে, এত করে খাওয়ালাম, দাওয়ালাম, কাপড় চোপড় দিলাম—

কথার মাঝখানেই ভীম অনেকটা যেন কৈফিয়তের মত বলে উঠল, ও'র খুব শক্ত অসুখ করেছিল, মা। দেখুন না চেহারা কত খারাপ হয়ে গেছে।

—তুই খাম, বাপু, ধমকে উঠলেন গৃহিণী, অসুখ যেন আর কারো করে না। এই যে আমি তিন মাস ধরে অম্বলে ভুগছি, খবর রাখিস তোরা?

ভীম চুপ করে গেল। নির্মলা গোড়া থেকেই নীরব ছিল। সে জানে এসব অভিযোগ শুধু শুনে বেতে হয়, উত্তরে কিছু বলতে নেই, বললে তার খণ্ডন হয় না, বরং অনাবশ্যক তিক্ততা বেড়ে চলে।

আরো কিছুক্ষণ সংসারের নানা আপদ-বিপদ ঝঙ্ক-ঝঙ্কাটের একটানা বর্ণনা দিয়ে এবং তাঁকেই যে সব এক হাতে টানতে হচ্ছে, নৈলে কে কোথায় ভেসে যেত; ইত্যাদি তথ্য সগর্বে পরিবেশন করে গৃহিণী এতক্ষণে কাজের কথায়

নেমে এলেন—তা, অ্যান্ডিন পরে কী মনে করে?

এর পরেই টাকার কথাটা পাড়তে নির্মলার বড় লজ্জা হল। কিন্তু না বললেও চলে না। সুযোগ সুবিধামত আরেক দিন এসে বলবে, তারও উপায় নেই। ভাড়া না মেটালে যে কোনো মুহূর্তে তাকে পথে দাঁড়িতে হবে। তাই কয়েকবার ইতস্ততঃ করে, মাটির দিকে চেয়ে কানরকমে বলে ফেলল, টাকা কটার বড় দরকার ছিল মা। বাড়িওয়ালা—

—ও, তাই বল। টাকার তাগাদায় এসেছ? আমি আরো ভাবছিলাম—

সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীর দু'চোখে দ্রুতটি ফুটে উঠল। মাথার উপর আঁচলের কোণটা তুলে দিয়ে বললেন, আজ এত সকাল সকাল?

কর্তা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে খুশী গলায় বললেন, কে এসেছে দ্যাখ।

তার পিছনে নতুন আগন্তুকের দিকে নজর পড়তেই গৃহিণী কলকন্ঠে চোঁচিয়ে উঠলেন, ও মা! ওকে কোথেকে ধরে আনলে?

—ভুল করলে দিদি। আমিই বরং ও'কে ধরে নিয়ে এলাম। ও'র সেই



—ও, তাই বল। টাকার তাগাদায় এসেছে?

সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হতেই গৃহিণী চাকরটাকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখ' তো কে?' ভীম গিয়ে কপাট খুলতেই কর্তাকে ঢুকতে দেখা গেল,

ক্লাইভ স্ট্রীটের কোর্টর থেকে। যে তেপান্তরে এসে ডেরা বেঁধেছে—

নির্মলা অজানতে কখন মুখ তুলে ডাকিয়েছিল। সেদিকে একবার চেয়েই

আগন্তুক সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। গৃহিণী তার বিস্ময়বিহীন দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন, ও কেউ না। আমাদের বাসনমাজার বি, খোকার মা। চল ঘরে চল।

বলে, বৈঠকখানার দিকে ইঙ্গিত করে নিজেই প্রথম পা বাড়ালেন, এবং চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে খোকার মার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাকে খানিকক্ষণ বসতে হবে বাছা।

নির্মলা এক পলক তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। যে স্বর শুনে মাথা তুলেছিল, তার আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অনুমানে যখন বাকল ওঁরা সকলেই ওদিকে এগিয়ে গেছেন, সেই মুহূর্তে কাউকে কিছুর না বলে এবং কোনো দিকে না চেয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ল। তখন শূন্য একটি মাত্র চিন্তাই তাকে অধিকার করে বসেছিল—যত দ্রুত এবং যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে তাকে দূরে গিয়ে পড়তে হবে। কেন, এমন করে পালাবার কী অর্থ হতে পারে সেকথা ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না।

ঘন্টাখানেক পরে চা জলখাবারের ব্যবস্থা করবার জন্যে গৃহিণী যখন এদিকে আসবার প্রয়োজন হল, নির্মলাকে দেখতে না পেয়ে ভীমকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোথায় গেল রে?

—কী জানি মা, আমি তো বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, নেই।

একটু আগে বড় মেয়ে ফিরেছে স্কুল থেকে। বলল, কার কথা বলছ? খোকার মা?

ভীম বলল, হ্যাঁ, দাঁদিমাণি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?

—আমি যখন আসছিলাম, হঠাৎ দাঁদিমাণি ওদিকে গিয়ে ঘাচ্ছে। ডাকলাম; সাড়া দিল না। কিছুর একটা ভাবছিল বোধহয়। শুনতে পারিনি। জোরে হেঁটে চলে গেল।

—শুনতে ঠিকই পেয়েছে। পাঁচ মিনিট বসিয়ে রেখেছি বলে গোসা হয়েছে মহারাণীর।

—কী জন্যে এসেছিল?

—টাকা আদায় করতে, আর কী জন্যে?

—দিয়ে দিলেই পারতে। গরিব মানুষ। দরকারে না পড়লে আসত না।

গৃহিণী ঝাঁজিয়ে উঠলেন, আমি কি বলোছি দেবো না? বিজন এল তাই একটু বসতে বলেছিলাম। অপরাধের মধ্যে তো এই।

—কে এল? বিজনের সুরে প্রশ্ন করল মেয়ে।

—তোর বিজন-মামা। ও, তুই ব্যাং এখনো দেখিসনি?

—না; কোথায়?

—ওপরে, আমার ঘরে।

মেয়ে ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। ঠিক পাশেই

বলতলার কতী হাত মুখ ধুচ্ছিলেন। খোকার মা সম্পর্কে এদের সব কথাই তাঁর কানে গিয়েছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। দোতলায় উঠবার আগে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভীমকে শূন্য ডেকে বললেন, তোরা কাজ সারা হলে একবার ওপরে আনিস।

নির্মলার জীবনে বিজন ব্যানার্জি নামক ব্যক্তির যে ছায়া পড়েছিল, সেটা ঠিক চলতি মেঘের ছায়া নয়। কোলকাতার শহরে অবস্থাপন্ন ঘরের সাক্ষ্য-লালিত, আমদে ও প্রিয়দর্শন, মেজদির এই

● সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি অপরিহার্য গ্রন্থ ●

সৈদিন
চৈত্রমাস

দিব্যেন্দ্র পালিত

৩-৫০

বয়সে তরুণ হলেও শক্তিশালী লেখক হিসেবে দিব্যেন্দ্র পালিত ইতিমধ্যেই বিশিষ্ট। তাঁর নবতম উপন্যাস 'সৈদিন চৈত্রমাস'-এর বিষয়বস্তু প্রেম, পরিণতি, ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণে নব্বয়ের গুণে অসামান্য। সমালোচকের মতেঃ তরুণ কথাস্রষ্টার হাত থেকে এরকম একখানি জীবন ঘনিষ্ঠ আলোচনা পাওয়া ভাগ্যের বিষয়, একথা স্বীকার করি। লেখকের এই গ্রন্থ সুপরিণত জীবন-বীক্ষা এবং শিল্প-বিবেকের সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলা উপন্যাসের নতুন পথ-সম্ভাবনার নিরীক্ষা হিসেবে 'সৈদিন চৈত্রমাস' উল্লেখযোগ্য।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

প্রবীণ সাহিত্যিকের এই উপন্যাসটি চিরকালীন ভূমি মাতা ভূমি কন্যা বিষয় এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সারবন সত্যের উন্মোচন গুণে অসাধারণ। উপরন্তু তাঁর লাবণ্যময় ভাষা ও বর্ণনার সরসতার অত্যন্ত সুখপাঠ্য এই গ্রন্থ সবপ্রণয়ী পাঠকের মনোরঞ্জন সমর্থ হবে।

বৃহন্নলা

শ্যামল

গণ্গোপাধ্যায়

৪-৫০

লেখক হিসেবে এই প্রথম উপন্যাসেই শ্যামল গণ্গোপাধ্যায় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। নায়ক প্রমথ সর্বতোভাবে আধুনিক যুব-মানসের প্রতি-নিধি; সৎ হবার প্রাণপণ চেষ্টা তার মধ্যে—কিন্তু বর্তমান যুগ ও পরিবেশ ক্রমাগত আঘাত করছে তাকে; প্রেম কিংবা যে-কোন আশ্রয় অবলম্বন করে সে বাঁচতে চায়। ক্ষয়িত সত্তার সূচক রূপায়ণে উজ্জ্বল এই উপন্যাসখানি সম্প্রতি-কালের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সত্য ঘটনা যে কল্পিত কাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী চাণ্ডাল্যকর ও উপভোগ্য, তার প্রমাণ 'থানা থেকে আদালত'। চিরঞ্জীব সেন মূলত সেই সব কাহিনীই নির্বাচন করেছেন, সভ্য মানবের অন্ধকার মন ও বিকৃতি, গোপন প্রবৃত্তি ও প্রতি-হিংসার পরিচয় হিসেবে যে-গুণি একদা আইন-আদালতের পৃষ্ঠায় প্রভূত সাড়া তুলেছিল।

থানা থেকে

আদালত

চিরঞ্জীব সেন

৩-০০

● অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ●

বিদ্যুৎ (উপন্যাস (২য় সং)। নারায়ণ গণ্গোপাধ্যায়। ২-৫০ ॥ দস্তুর দরু। (২য় সং) দরবেশ। ৩-০০ ॥ সাহিত্যের সভ্য (প্রবন্ধ)। তারাপ্রসাদ। বাল্যোপাধ্যায়। ২-৫০ ॥

বঙ্গ চৌধুরী : ৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

আদরে দেওরটিকে ঘিরে তার কুমারী মনে একদিন গভীর মোহসঞ্চার ঘটেছিল। ওদের দুজনের সম্পর্কে তার বাবা যে ইচ্ছা ও আশা পোষণ করতেন, এবং যা তিনি মেজোমেয়ের কাছে অপকাশ রাখেননি, সেইটুকু আশ্রয় করে সে নিজের জন্যে একটি স্বপ্নলোক গড়ে তুলেছিল। তারপর সে স্বপ্ন বৈদ্য ভেঙে গেল, সেদিন, আঘাত যতই লাগুক, যা পায়নি, তার জন্যে হা' হতাশ না করে, যা পেল, তার মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। ঠিক সেই সময়ে ধুমকেতুর মত আবার যদি ঐ বিজন এসে না দাঁড়াত তার নতুন পথের দোর গোড়ায়, নির্মলা হয়তো সেই দূর গ্রামোপান্তে খড়োঘর আর ধানের গোলা ঘেরা দরিদ্র সেকেন্ড মাস্টারের স্বাদগন্ধহীন স্বপ্নপরিষর সংসারের মধ্যেই নিরুদ্বেগে জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তার ভাগ্য-বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। তাই তার বিবাহিত জীবন শূন্য হতে না হতেই এক পরম সিম্বন্ধে বিজন ব্যানার্জির পুনরাবির্ভাব। কেবল মাত্র আবির্ভাবের আঘাতটাই হয়তো তেমন সন্দেহপ্রসারী হত না। কিন্তু বিজন সেদিন সেই বিগত দিনের মতই নির্মলার একান্ত সান্নিধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তার অন্তরের গোপন-লালিত ক্ষত স্থানটিকেও অকপটে উন্মুক্ত করে তুলে ধরেছিল। একদিন যাকে কামনা করেছিল, আজ সে অপ্রাপনীয়। জেনেও সেই ঈর্ষিত সম্পর্কের নিষ্ফল দাবি শিথল করতে চায়নি। নির্মলা সেটা রুঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। তা ছাড়া আর কীই বা তার করবার ছিল? সেকথা কি বিজন জানত না? জানত। কিন্তু জানা আর মানা তো এক জিনিস নয়। প্রাপ্যকে নতশিরে গ্রহণ করবার মত মনোবল সংসারে বড়ই দুস্প্রাপ্য। বিজনের তা ছিল না। হয়তো সে বয়স তার নয়, কিংবা সে চারিত্রিক দৃঢ়তা তার অস্বস্ত হয়নি। তাই যাবো যাবো করেও তার যাবার দিন কেবলই পিছিয়ে গেছে। চিরজীবনের তরে যাকে হারালাম, তাকে যতটুকু কাছে পাওয়া যায়—এই দুজনের মোহ সে ত্যাগ করতে পারেনি। তার হাসি-গল্প-আমোদ-তামাসার অন্তরালে ছিল লোভ। নির্মলার কাছে সেটা লুকনো ছিল না।

এমন সময়ে এল নরেন এবং তাকে নিয়েও শূন্য হল নানা রকম ঠাট্টা-পরিহাস, রঙ্গ-রসিকতার পালা। সেখানে প্রধান নায়কের অংশ নিল বিজন। কে জানে, সেটা কি শূন্য নিরুদ্বেশা সরল কৌতুক না তার মধ্যেও লুকিয়ে ছিল কোনো হিংস্র আঘাত—চেয়ে দ্যাখ নির্মলা, কী তুমি পেতে পারতে আর কী পেরেছ? অসলে যা-ই হোক, অন্য সকলে যেভাবেই নিক নির্মলার কানে কিন্তু এই রুঢ় ইঙ্গিতটাই সেদিন মধুর হয়ে উঠেছিল।

বিজনের প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি হাসির আবরণ ভেদ করে অবজ্ঞা ও অপমানের বিষ মাখানো ধারালো তীর সোজা এসে বিধেছিল তার বুকে।

এ ইঙ্গিত তো নির্মলার কাছে নতুন নয়। মেজদির মধ্যে এবং অন্য কারো কারো চোখে এর সুস্পষ্ট আভাস সে আগেই পেয়েছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে ঐ বিশেষ লোকটির অনেক তফাৎ। ঐ একটি মাত্র মানুষের কাছে সে হার মানতে পারে না। নিজের মনে যদি একে মিথ্যা বলে জানত, হয়তো এ আঘাত তার গায়ে লাগতনা। কিন্তু তখনো যে তার অন্তরের অনেকখানি জুড়ে আছে না-পাওয়ার ক্ষোভ। কালক্রমে একদিন হয়তো সেটা নিভে যেত। কিন্তু তার আগেই, যাকে আশ্রয় করে সে জন্মলা, সেই এসে তাতে ইন্ধন যোগিয়ে বসল। তার মূর্খ, অধঃসভা, দরিদ্র শুল্কমাস্টার স্বামীর সম্বন্ধে সভা, সুশিক্ষিত বড়লোক বিজন ব্যানার্জির সেই ভীষণ ব্যাঙ্গোক্তি—যে যা তাকে সেই-ভাবেই দেখা উচিত ছিল নির্মলার মনে যে দাব-দাহের সৃষ্টি করেছিল, সে সেখানেই থেমে যায়নি, ছাড়িয়ে পড়েছিল তার ছোট্ট শান্ত সংসারের বুকের উপর। সে যেন একটা উদ্ভত চ্যালেঞ্জ, স্বন্দ-যুদ্ধে আহ্বান। তারই প্রত্যুত্তরে শূন্য হল তার জীবনব্যাপী নিম্ন সংগ্রাম। সেখানে ঐ বিজন তার প্রতিবন্দী, এবং তার বিরুদ্ধে নিজেকে ও নিজের স্বামীকে সে আগাগোড়া অস্ত্রের মত ব্যবহার করে গেছে। সর্বস্ব পণ করে, বহু দুঃখ বরণ করে গ্রাম্য জীবনের সেই দীনতার ভিতর থেকে স্বামীকে টেনে তুলে ঐ দাম্ভিক লোকটার সমস্তরে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তার কিছুমাত্র স্বেচ্ছা ছিল না। এ যেন এক সর্বনাশের খেলা, যেখানে হার মানুষকে নিরস্ত করে না, মাতিয়ে তোলে। তেমনি এক মত্ততার উন্মাদনা নির্মলার সমস্ত চেতনাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তাকে ফিরে তাকাবার অবকাশ দেয়নি, একটির পর একটি দুঃখ দুর্দশার ভিতর দিয়ে শূন্য অন্ধ বেগে চালিয়ে নিয়ে গেছে। তারপর একদিন অকস্মাৎ সে ধ্বংস-যজ্ঞের অবসান, এবং তার শেষ আহুতি তার হতভাগ্য স্বামী।

কিন্তু মৃত্যুকে অস্বীকার করাই বোধ হয় জীবনের ধর্ম। প্রত্যক্ষ সভা হলেও তাকে চরম সভা বলে মানুষ কোনোদিন মেনে নেয়নি। চির-আবহমান জীবন-ধারাকে সে ব্যাহত করেছে কিন্তু অবলম্বিত করেনি। নির্মলার মত সর্বস্বহারা সামান্য নারীর ক্ষুদ্র জীবনেও মৃত্যু শেষ ছেদ টেনে দিতে পারল না। একটি অসহায় শিশুকে বুকে করে আবার শূন্য হল তার বাহা। আবার সেই নিরলস সংগ্রাম, কঠোর বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার লড়াই,

অবিচ্ছিন্ন নৈরাশ্যের অন্ধকারে দুরাগত আশার সঞ্কেত।

থোকাকে আশ্রয় করে নতুন করে বুক বেঁধেছিল নির্মলা। প্রচন্ড ঝড়ের তাড়নায় যে ভবিষ্যৎ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, তারই ভস্মস্তূপের উপর গড়ে তুলেছিল স্বপ্নসৌধ। সেখানেও যখন আঘাত এসে পড়ল, নিরলস অন্ধকার ছাড়া তার চোখের সমুখে সেদিন আর কিছুই রইল না। তারপরেও তাকে উঠতে হল। থোকা তো তাকে একেবারে মৃদু দিয়ে বারানি। তাছাড়াও রয়ে গেছে মানুষের সেই চিরন্তন জীবনধারণের দায়। কিন্তু সে শূন্য দায়, তার সঙ্গে একটুখানি ক্ষীণ প্রত্যাশা—থোকা যদি ফিরে আসে। যে সংগ্রাম দিয়ে তার জীবনারম্ভ, স্বামী-গৃহে প্রথম মিলনের মাধবটুকু পর্যন্ত যার তাপে শূন্য হয়ে গিয়েছিল, তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। সে পরাজিত, ক্ষত-বিক্ষত। জয়ী হয়েছে তার প্রতিবন্দী, বিজন ব্যানার্জি। সে আজ কোথায়, কী করছে, কেমন আছে, নির্মলা জানে না। মাঝে মাঝে শূন্য সেই শেবদিন-দেখা দম্ভারক্ত উদ্ভত মুখখানা চোখের উপর ভেসে ওঠে। তার সঙ্গে মিশে রয়েছে জয়ের উল্লাস। নির্মলার বুকের ভিতরটা বী-বী করে জ্বললে যায়। তীব্র কিন্তু চাপা আগুন; তার চারিদিক ঘিরে পুঞ্জীভূত পরাজয়ের কালি। তারই ছাপ তার মুখময়। সে মুখ নিয়ে তার আপন-জনের কাছে যদিবা গিয়ে দাঁড়াতে পারত, সেই একজনের চোখে পড়তে পারে না। পাছে সেই ভয়াবহ দৃষ্টান্ত কোনোদিন দেখা দেয় তাই বড়দি, মেজদির কাছ থেকেও তার এই অজ্ঞাতবাস। চরম দুঃখের দিনেও তাদের একটা খবর পর্যন্ত দেবার চেষ্টা করেনি।

কিন্তু সংসারে দৈবের হাত কে এড়াতে পারে? সেই দুর্ঘটনাই ঘটল তার জীবনে। একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অবস্থার মধ্যে অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল সেই মানুষটির সঙ্গে। সেখানে কী তাদের পরিচয়? একজন সাদরে গৃহীত আত্মীয়, আরেকজন বিভাড়িত চাকরানী।

পুরনো মনিবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নির্মলার মনে হল, পলকের তরে দেখা সেই দরো চোখ যেন তাকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে। কী ছিল তার মধ্যে? বিস্ময়? না, তার সঙ্গে মেশানো কিছু অনুকম্পা? এর চেয়ে আকোশ, অবজ্ঞা কিংবা অপমানও ছিল অনেক বেশী সহনীয়।

(জমশঃ)

হস্ত-কারিগরী মাংস্র নক্সা কেন্দ্র



নীহার বস্ত্রন মেনগুপ্ত

উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে স্বাধীনতালাভের পর নতুন ভারত সরকার দেশীয় (Cottage Industry) কুটিরশিল্পকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্যে বন্দপরিকর হন। এই কুটির-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়াই সর্ব-ভারতীয় হস্তকারিগরী সংস্থার সৃষ্টি। লুপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত হস্তশিল্পের পুন-রুদ্ধার কার্য-ই শব্দে এই সংস্থার একমাত্র কার্যক্রম নয়—প্রতি গ্রাম, প্রতি জনপদের প্রতিটি (Artisan) বাহাতে জীবনসংস্থানের প্রয়োজনে সুখ-সুবিধা-ভোগ ও আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারে, তজ্জনা এই সংস্থার সর্ব-প্রকারের উদ্যম ও দৃষ্টি। প্রান্তিক নক্সাকেন্দ্রগুলির সৃষ্টির মূলেও এই সং অভিপ্রায়। দেশীয় কারিগরেরা যাহাতে এইসব নক্সা-কেন্দ্রগুলি হইতে গৃহ-অলংকরণ কার্যে উপযুক্ত তথা সুন্দর সুন্দর নক্সা পাইতে পারে; সর্বভারতীয় হস্তকারিগরী সংস্থা হইতে ইহার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। এইসব নক্সা সাহায্যের বিনিময়ে কোনরূপ মূল্য গ্রহণ চলিবে না। তবে নক্সাটি বাস্তবকার্যে রূপায়িত করার পর উক্ত নক্সাটিকে প্রান্তিক কেন্দ্রে (Zonal Design Centre) ফেরৎ দিতে ইইবে,—যাহাতে এই একই

নক্সাবারা অপর কোন কারিগর এই একই প্রকারের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। একটি বিষয় এখনো বিবেচনাসাপেক্ষ,— সুবিধাভোগকারী এই একই প্রকারের নক্সা সর্বভারতীয় হস্তকারিগরী সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় নাই।

প্রান্তিক নক্সাকেন্দ্রগুলিতে নিম্ন-লিখিত বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া নক্সা প্রস্তুত হয়, যথা : তামা, পিত্তল, কাঠ, বেত, পাথর, হাতিদাঁত, মোষের শিঙা, মাটি, কাগজের মণ্ড, তাঁতের কাপড়।

স্থানিক চলিত-হস্ত-জাত শিল্পকে (Traditional) কেন্দ্র করিয়া প্রধানতঃ প্রান্তিক নক্সাকেন্দ্রগুলির নক্সা প্রস্তুত করার বিধি। অবশ্য নক্সা-শিল্পী (Designer) এই বিধিব্যবস্থাকে নানা-প্রকার নিরীক্ষণ-পরীক্ষণের মধ্যে একটি নতুনতর বস্তুর রূপদানের জন্য সচেষ্ট থাকেন। কারণ, বাজার-চলিত স্থানীয় 'ট্রাডিশনাল' বস্তৃশিল্পগুলি দেখা যায়, হয় কোনটা ভুলংকরণের চাপে ভাঙ্গাশস্ত, নয়তো কোনটা ব্যবহারের পক্ষে পীড়া-দায়ক। এই অবস্থাকে একটা সুসম্মত বা সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা নক্সা-শিল্পীর হাতে। নক্সাশিল্পীর দৃষ্টি রাখিতে হয় :

(ক) ট্রাডিশনাল যে বস্তৃশিল্পগুলি নিত্যকর্মে অত্যধিক চলিত, তাহার কর্ম (Form) সহজ রাখিয়া ব্যবহারের পক্ষে সহজ উপায় বিধান।

(খ) আর যে বস্তৃশিল্প গৃহকর্মে কমবেশী ব্যবহৃত (যেমন গহনা রাখিবার বাস, পাউডারের কৌটা, সিগারেটের বাস, সিন্দূর, কুমকুম রাখিবার আধার ইত্যাদি) তাহার গঠনব্যবস্থা সহজ রাখিয়া কম-বেশী নক্সা (লতা, ফুলপাতা, পাখী প্রভৃতি) উৎকীর্ণ করিয়া দেওয়া।

(গ) আর যে বস্তৃশিল্পগুলি সৌখিন, —বাসিবার ঘর প্রভৃতি সজ্জা-অলংকরণের পক্ষে অপরিহার্য, তাহার গঠনপ্রণালী সুচিন্তিতভাবে অত্যন্ত কারুকার্য-প্রধান হইলেও কোন ক্ষতি নাই।

শব্দে কাগজের উপর পূর্ণ নক্সা আঁকিয়া দেওয়াই নক্সা-শিল্পীর একমাত্র দায়িত্ব নয়,—তাহার দায়িত্ব আরো ব্যাপক, তাহার দৃষ্টি হওয়া চাই আরো গভীর। কাগজে-অঙ্কিত নক্সাটির সঙ্গে বাস্তব-সৃষ্ট বস্তৃটির হুবহু সংগতি রহিল কিনা, এই দায়িত্ব নক্সা-শিল্পীর। এই কারণে কেন্দ্রীয় বেতনভূক কারিগরদের সঙ্গে থাকিয়া নক্সা-শিল্পীকে কাজ করিতে হয়। তাহাদের দৃষ্টি সংশোধন



করিয়া দিতে হয়। সঙ্গতিরক্ষার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

এই নতুন বস্তুটি সৃষ্ট যখন হইল, তখন “স্পেসিমেণ” হিসেবে নক্সাকেন্দ্রে এটি রক্ষিত থাকিবে।

যদি থাকে, এই নতুন ‘স্পেসিমেণ’—পিতলের একটি ‘স্যুপ-বোল’ (Soup-Bowl)। সংসারকাষে এই ‘স্যুপ-বোলটি’ নিত্যব্যবহার্য বস্তু। ইহা স্মরণ রাখিয়াই নক্সাশিল্পী কারিগরদের সহায়তায় যতটা সম্ভব সহজ

‘ফর্ম’ (এই ফর্ম অবশ্যই স্থানীয় বা Regional-Tradition-এর অঙ্গীভূত হওয়া চাই) আর ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা দিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন এই ‘স্যুপ-বোলকে’ নক্সাকেন্দ্রের ‘শোরুম্বে’ বন্দী করিয়া রাখিলে চলিবে না,—বস্তুটিকে যথারীতি বাজারে প্রচলিত করিয়া সংসার কার্ষের ব্যবহারে আনিতে হইবে। এই দায়িত্ব একমাত্র নক্সাকেন্দ্রের নয়,—যতটা সর্বভারতীয় হস্তকারিগরী সংস্থার।

নিয়মানুযায়ী আশে-পাশের গ্রাম ও শহরের যাবতীয় কারিগরদের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া পত্র দিয়া তাহাদের নক্সাকেন্দ্রে ডাকিয়া আনা হয়। ‘স্যুপ-বোলটি’ তাহাদের নিকট দিয়া বলা হয়, এই বস্তুটি বাজারে ছাড়িতে হইবে; কাজেই ‘প্রোডাকশান’ দরকার। এই ‘প্রোডাকশানের’ জন্যে বস্তুটি লইতে কে রাজী আছে?

কিন্তু আশ্চর্য এই, আমন্ত্রিত কারিগরদের মধ্যে নতুন বস্তুটি দোঁখিয়া মনে এক ম্বল্ব উপস্থিত হয়। কারণ, উহারা প্রথমতঃ বংশপরম্পরাগত বস্তুশিল্প তৈরীতে অভ্যস্ত এবং সিদ্ধহস্তঃ দ্বিতীয়তঃ সেই সমস্ত বস্তুশিল্পের বাজারে প্রচলনের চিন্তা করিতে হয় না,—উপরন্তু শিল্পপতিরা নিজ গরজেই সেগদুলি শতকরা দরে খরিদ করিয়া লন। এমনভাবেই দেশীয় কারিগরেরা অন্ন-সংস্থান করিয়া আসিতেছে।

নতুন বস্তুটির ‘প্রোডাকশানের’ বর্ধকি তবে কে লইতে পারে?—পারে মাত্র তিনজন।

(এক) কারিগর-স্বারা পরিচালিত কোন কো-অপারেটিভ সংস্থা;

(দ্বি) কোন শিল্পপতির ফার্ম;

(তিন) ন্যস্তো সর্বভারতীয় হস্ত-কারিগরী সংস্থা। *

* ফটোগদুলি বোস্বাই হস্ত-কারিগরী সংস্থার নক্সাকেন্দ্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—লেখক।



দোলযাত্রা ও সেকালের

লেখক

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

দোলযাত্রা বাংলার একটি ধর্মীয় আনন্দের উৎস। দোলের দিনে সমস্ত বাঙালী আবার-সম্ভাষণে স্বাগত জানায় বসন্তকে, রঙের আলতা আঁকে ফাল্গুন-চৈত্রের পায়ে। এই দিনে বাঙালী প্রায় রঙ-বন্দী হয়েই থাকে। বাংলা-দেশের লেখকরাও এই বসন্ত-বন্দনা থেকে বাদ যান না। বৈষ্ণব কবিতা থেকে আধুনিক কবিতার লেখককুল সকলেই তাঁদের সাহিত্যের উপচারে বসন্তের গান গেয়েছেন। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের বাসন্তিক পদগুলি আজো অম্লানঃ

“সখিরে বরষা বহিয়া গেল

বসন্ত আওল
ফুটল মাধবী লতা
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে
গুঞ্জরে ভ্রমরী যত।”

ভারতে সর্বত্রই দোলযাত্রা বা হোলীর ধুমধাম হয়ে থাকে। বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও উৎকলে হোলীর আমোদ কিছু বেশী হয়। দোলের দিন হিন্দু নরনারী আবার-কুমকুম মেখে নানা রং-কৌতুক করে থাকে। কেউ কেউ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ শংখচূড় বা হোলিকা বধ করে এই উৎসব করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ফাল্গুন মাসে বন্দাবনে পূর্ণিমার পূর্ণদিন শ্রীকৃষ্ণ সারা রাত তুন্দুল যুদ্ধের পর মেঘাসুদরকে বধ করে মহানন্দে পরদিন অতি প্রত্যুষে দোল-ক্রীড়া করেছিলেন।

দোলযাত্রা প্রসঙ্গে ভূদেব মুখো-পাধ্যায় লিখিত “আচার প্রবন্ধ” পুস্তকে উল্লেখ আছে যে, বাঙলা ও উৎকলে দোল, অন্যান্য স্থানে হোলী উৎসব বলে প্রচলিত। মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, গুজরাট, উৎকল ও মিথিলায় এই দিন মন্বাদি বলা হয়। মিথিলায় এই দিনকে কাল-যুগান্তও বলে।

দোলযাত্রা প্রসঙ্গে Major C H Buck লিখিত “Faiths, Fairs and Festivals of India” গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে—

“The name is a corruption of the Sanskrit word Holaka. meaning ‘half-ripe corn’, and seems to have originally been the Vasant-utsava, or Spring festival, when ceremonies were performed in honour of the crops and to ward off disease from the fields.”

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় “পূজা-পার্বণ” গ্রন্থে দোলযাত্রা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

“কেহ কেহ দোলযাত্রাকে বসন্তোৎসব

মনে করিয়াছেন। কিন্তু বসন্তোৎসব নামে কোন উৎসব পাজিতে নাই, স্মৃতিতে নাই, পুরাণে নাই। পূর্বকালে মদনোৎসব হইত, বহু দিন অজ্ঞাত হইয়াছে। কিন্তু সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা নয়, চৈত্র শুদ্ধ ব্রহ্মোদশী ও চতুর্দশী। দ্বিতীয়তঃ দোলযাত্রা একটি নয়, বৎসরে দুইটি। একটির নাম দোল, অপরটির নাম হিন্দোল চলিত ঝুলন-যাত্রা। সূর্যরূপ বিষ্ণু বৎসরে দুইবার দোলায় আরোহণ করেন।”

উক্ত গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে—

“ঋগ্বেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ আরম্ভে নতুন বৎসর আরম্ভ করিলেন। তোমাদের দোলযাত্রা তাহারই স্মৃতি। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল ছয়-সাত সহস্র বৎসর পূর্বে প্রথম দেখিয়াছি, ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমায় দোল দেখিয়াছি।”

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন লিখিত “স্কন্দপুরাণে” (উৎকল খণ্ড) উল্লেখ আছে—“ফাল্গুন মাসে ভগবানের দোলা-রোহণরূপ অত্যন্তম উৎসব করিবে, ভগবান গোবিন্দ জনগণের প্রীতি অনুগ্রহ-প্রকাশার্থেই দোলারোহণে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।”

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য “পুরোহিত দর্পণ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে—“পূর্ণিমা থেকে পঞ্চমী পর্যন্ত ছয়টি তিথিতেই দোল করা যেতে পারে। কিন্তু পূর্ণিমার দোলই প্রশস্ত। সকল দোলেই পূর্ণদিনের অধিবাসাদি অবিকল পূর্ণিমার দোলের ন্যায় করতে হয়। শালগ্রামেও ঋণার্শি এই প্রণালীতে দোল করা হয়ে থাকে।”

দোলমণ্ডপ নানা রকম ফুল ও ধ্বজা দিয়ে সাজানো হয়। তারপর সংকল্পান্তে গোবিন্দের ধ্যান, হোম ও পূজা হয়। দেবতার বিগ্রহ দোল-মণ্ডে রেখে পূজা করাই হলো দোলযাত্রা উৎসবের প্রধান কর্ম। দেব-মন্দিরে কিংবা কোন কোন গৃহস্থের ঠাকুর-বাড়ীতে বিগ্রহ দোলায় স্থাপন করে পূজা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে তার সংখ্যা খুব বেশী দেখা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দোলযাত্রার দিনে আবার ও রঙ নিয়ে হাসি-আনন্দ করাই চাখে পড়ে।

দোলযাত্রাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান ও কবিতা। সেকালের বিখ্যাত কবিওয়ালা রূপচাঁদ পক্ষীর দুইটি গানের কিয়দংশ উল্লেখ করলাম—

(১)

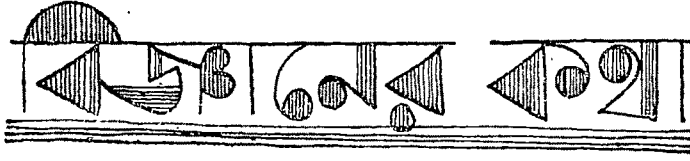
“হোলি খেলে লয়ে তালে,
মিলে রজগোপিনী।
মৃদঙ্গ বাজিছে রঙ্গে, কেড়ান
ধা ধা, নি নি নি নি নি॥
লালে লাল বন্দাবন, লাল পশুপক্ষীগণ,
লাল যমুনা-জীবন,
লালে লাল রাধারণী॥”
ইত্যাদি

(২)

“এসে ফাগুন কে দিন, আই সজনী।
পূর্ণিমাসী শশী, ভাই উজারা চাঁদনী॥
বলে মলয়া পবন, কোয়েলা কুহরে ঘন,
গায়ে সব জন, বাহার সোহিনী॥
লালে লাল যমুনাতীর,
ওড়ে কুমুম আবার,
জাবট ধীর সমীর, লাল রজভামিনী॥”
ইত্যাদি

আমাদের দোলযাত্রা বা হোলীর ধুমধামের মত এক সময় জার্মানিতেও একটি উৎসব প্রচলিত ছিল। আবেনাস্ (Joannes Boemus Aubanus) উল্লেখ করেছেন—সমস্ত জার্মানী পান-ভোজন ও রসরঙ্গে আত্মহারা হতো, ভাবতো যেন এমন দিন আর আসবে না। অধিবাসীরা মৃত্যু মুখোশ পরে ছদ্মবেশ ধারণ করে সর্বত্র লাল ও কালো রঙে রঞ্জিত হয়ে উলগবৎ ছুটছুটি করতো। নেওগর্গাস্ (Naogeorgus) রুরোপীয় কার্নিভাল (Carnival) নামক যে উৎসবের কথা লিখেছেন, তা পাঠ করলে ঠিক যেন ভারতের হোলীর উৎসব বলে বোধ হয়।

দোল-পূর্ণিমার পূর্ণময়ী তিথি আমাদের কাছে আর একটি কারণে বিশেষ স্মরণীয় দিন। তার কারণ ১৯২২ সালে অথবা ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবম্বীপ-ধামে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই দিনটিও ছিল ফাল্গুন মাসের দোল-পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবীর দুলাল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই পূর্ণময়ী তিথিতে।



অগ্নিস্ফুটন

॥ আমরা ঘুমোই কেন ॥

খুবই শক্ত প্রশ্ন। আজ পর্যন্ত এ প্রশ্নের হাজার রকমের জবাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো জবাবই সর্বজন-গ্রাহ্য হয়নি।

জীবনকে যদি একটা ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে জীবনের যে-অংশ আমরা ঘুমিয়ে কাটাই সেই অংশকে তুলনা করা চলে ঘড়িকে দম দেওয়ার সময়ের সঙ্গে। ঘুম হচ্ছে জীবন-ঘড়ির দম। দম-দেওয়া ঘড়ির ক্ষেত্রেই ঘুম থেকে জেগে ওঠা মানুষ নতুন উৎসাহ নিয়ে সারা দিনের কাজকর্ম শুরু করতে পারে।

কিন্তু প্রশ্নটা তবুও থেকে যাচ্ছে। আমরা ঘুমোই কেন? একেবারে না ঘুমিয়ে কি কোনো মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব?

অথচ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে আমরা যখন ঘুমোই তখনো কিন্তু আমাদের শরীরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে না। যেমন, ঘুমের সময়েও আমাদের মেরুদণ্ডের স্নায়ুক্রিয়া বা স্নায়ুনাট্য সজাগ থাকে। সজাগ থাকে আমাদের মস্তিষ্কের কোনো কোনো অংশও। অর্থাৎ, আমাদের শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের এক-অংশের বিশ্রামের প্রয়োজন আছে, অপর অংশের নেই। অবিশ্রান্ত কর্মতৎপরতার আরো একটি দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদপিণ্ড। আমরা যতোদিন বেঁচে থাকি ততোদিন এই প্রত্যঙ্গটি হৃদযন্ত্রের জন্যেও বিশ্রাম নেয় না। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের ফল সম্পর্কেও একই কথা। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, হৃদপিণ্ড বা ফুসফুসের মতো আমাদের মস্তিষ্কও কেন অবিরাম ক্রিয়াশীল থাকে না? কেন প্রতি চাব্বিশ ঘণ্টায় কয়েক ঘণ্টার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়? অন্যদিকে, জন্তুজানোয়ারদের দিকে তাকালে দেখা যাবে, জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে অনেকেই পুরোপুরি ঘুমোয় না, এমন কি কোনো কোনো জন্তুজানোয়ারের বিশ্রাম পর্যন্ত দরকার হয় না।

ঠিক কোন্ অবস্থায় যে মানুষের ঘুম পায় তাও নির্দিষ্টভাবে ছক কেটে দেওয়া সম্ভব নয়। একই বই কারও চোখে ঘুম আনে, কারও চোখ থেকে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। শব্দ বা আওয়াজ হতে থাকলে সাধারণত কোনো মানুষেরই ঘুম আসে না। আবার বিশেষ ধরনের আওয়াজ না হলে ঘুমোতে পারেন না, এমন মানুষেরও অভাব নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ির একতলায় একটি ছাপাখানা আছে। ছাপাখানায় এমনই কাজের চাপ যে, তিনশো পঁয়ষাট দিন সারা রাত ধরে মেশিন চলে। একদিন কি কারণে রাষ্ট্র-বেলা মেশিনগুলো বন্ধ ছিল। সেদিন আমার আত্মীয়দের বাড়ির কেউ-ই সারারাত ঘুমোতে পারেনি। এমনি ধরনের দৃষ্টান্ত আরো অজস্র দেওয়া যেতে পারে। ঘুমন্ত অবস্থায় কাউকে নাড়া দিলে তার ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু চলন্ত ট্রেনে যে ঘুমোয় তার ঘুম কিন্তু ট্রেন কোনো স্টেশনে থামা মাত্র ভেঙে যেতে পারে। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার জন্যে কি-পরিমাণ আয়োজন করতে হয়েছিল তা সবাই জানেন। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙেছিল। কিন্তু আধুনিক এক কুম্ভকর্ণকে আমি জানি, সিগারেট খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ার ফলে সিগারেটের আগুনে মশারি পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পরেও তার ঘুম ভাঙেনি।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। মোট কথাটা এই যে, কেন-যে মানুষ ঘুমোয় আর কেন-যে মানুষের ঘুম ভেঙে যায়—তার কোনো ধরাবাঁধা কারণ নেই।

অনেকের মতে, ঘুম হচ্ছে মানুষের একটা অভ্যাস। ঠিক রাত্রিবেলাতেই মানুষের কেন ঘুম পাবে, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। মানুষের আশেবশ অভ্যাস রাত্রিবেলায় ঘুমোনো—তাই সে রাত্রিবেলাতেই ঘুমোয়। কিন্তু এমন মানুষকেও নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে যে সারাদিন

ঘুমোয় আর সারারাত কারখানার নাইট-শিফটে কাজ করে। আর বেশ কিছুকাল ধরে যদি ব্যাপারটা চলে তাহলে ক্রমে সে এই চক্রেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

আবার অনেক সময়ে ঘুমের সঙ্গে অন্য কোনো জাগতিক ব্যাপারের এমন একটা অগাঙ্গী সম্পর্ক ঘটে যায়, যাকে পাভলভের ভাষায় বলা যেতে পারে 'কন্ডিশনড্ রিফ্লেক্স' বা শর্তাধীন পরাবর্ত। যেমন, ঘুমপাড়ানী গান বা রাত্রির কোনো বিশেষ পোশাক ইত্যাদি। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি বিশেষ বালিশে মাথা না দিতে পারলে ঘুমোতে পারেন না তাহলে বলতে হবে বালিশটি তাঁর ক্ষেত্রে 'কন্ডিশনড্ স্টিমুলাস' বা শর্তাধীন উদ্দীপক। পাভলভ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন যে, কন্ডিশনড্ স্টিমুলাসের অভাবে তাঁর পরীক্ষাগারের কুকুর ঘুমোতে পারেনি।

কুকুর ও ঘোড়া মানুষের মতোই ঘুমোয় ও স্বপ্ন দেখে—একটিটি এখানে জেনে রাখা দরকার। কিন্তু এদের চেয়ে অনেক নিম্নতর স্তরের জীব গিনিপিগ—তার কিন্তু ঘুম প্রায় না-থাকার মতো। বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, উন্নত ও জটিল স্নায়ুতন্ত্রবিশিষ্ট জীবরাই ঘুমপ্রবণ। অর্থাৎ ঘুম হচ্ছে একটা মামূল বা বুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে বোঝার মতো টেনে চলতে হচ্ছে। আর এটা যে কত বড়ো বোঝা তা একটু হিসেব নিলেই বোঝা যাবে। মানুষের জীবনের তিন-ভাগের এক ভাগই কাটে ঘুমিয়ে।

তাহলে এবার ঘুম সম্পর্কে একটি ভুলে পৌঁছনো যেতে পারে। ঘুম হচ্ছে একধরনের প্রতিবেদন বা বাধ বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ইনহিবিশন। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক।

পাভলভের কন্ডিশনড্ রিফ্লেক্স সম্পর্কে আমরা আগের একটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। পাভলভের সেই বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্টটি নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। একটি কুকুরকে খাওয়ার আগে ঘণ্টার শব্দ করা হত। এমনি কিছুদিন চলবার পরে দেখা গেল শব্দ ঘণ্টার শব্দ হলেই খাবার না থাকা সত্ত্বেও কুকুরের মূখ থেকে লালার ঝরছে। এক্ষেত্রে ঘণ্টার শব্দটি হচ্ছে কন্ডিশনড্ স্টিমুলাস। আর মস্তিষ্কের যে বিশেষ ক্রিয়াশীলতার ফলে কুকুরের লালার ঝরছে, তাকে বলা হয় কন্ডিশনড্ রিফ্লেক্স।

পৰ্ববেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে স্টিম্‌লাস যতো জোরালো হবে, মস্তিস্কের ক্রিয়াশীলতাও হবে ততো তীব্রতর। আমাদের অধিকাংশ বোধ ও অনুভূতির মাত্রা এই কণ্ডিশনন্ড্‌ রিফ্লেক্স্‌-এর দ্বারাই নিরূপিত হয়ে থাকে। আবার স্টিম্‌লাস যদি একাধিক হয় ও প্রায় একই ধরনের হয়—তাহলে বিভিন্ন স্টিম্‌লাসের মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারটি এসে পড়ে। কতখানি পার্থক্য করা হবে তাও নির্ভর করে কণ্ডিশনন্ড্‌ রিফ্লেক্স্‌-এর ওপরে। যেমন, কুকুরকে খাওয়ার সময় যদি সব সময়েই একটি বিশেষ ধরনের শব্দ করা হয় এবং কোনো সময়েই আরেকটি বিশেষ ধরনের শব্দ করা না হয়—তাহলে প্রথম শব্দটির ফলে রিফ্লেক্স্‌ তৈরি হবে, দ্বিতীয় শব্দটির ফলে বাহ্যত হবে না।

‘বাহ্যত’ বললাম এই কারণে যে দ্বিতীয় শব্দটির ফলে মস্তিস্ককে কোনো প্রতিক্রিয়াই হবে না তা ঠিক নয়। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বাহ্যত ক্রিয়াশীল স্টিম্‌লাসও মস্তিস্ককে একটা অস্বীকৃতি সৃষ্টি করে। অর্থাৎ একটা বিশেষ দিকে চালিত হওয়া সম্পর্কে অনীহা। এই অবস্থাকেই বলা হন ইন্‌হিবিশন। ওপরের দৃষ্টান্তটি অনুসরণ করে বলা যায়, বিশেষ এক ধরনের শব্দ মস্তিস্ককে এমন এক বিশেষ ক্রিয়াশীলতা সৃষ্টি করছে যার ফলে কুকুরের মূখ থেকে লালার ঝরে। আবার অন্য এক বিশেষ ধরনের শব্দ কুকুরের মস্তিস্ককে সৃষ্টি করছে ইন্‌হিবিশন। এই ইন্‌হিবিশন খুবই গভীর ও ব্যাপক হতে কোনো বাধা নেই। আবার মস্তিস্কের দুই বিশেষ অংশের ইন্‌হিবিশন অন্যরাসে বৃদ্ধি হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইন্‌হিবিশন হয় তীব্রতর। এইভাবে প্রতিক্রিয়াটির শূন্য। এবং ক্রমে মস্তিস্কের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অংশ ইন্‌হিবিশনের আওতায় এসে পড়ে। তখন আর সত্যিকারের কার্যকরী কণ্ডিশনন্ড্‌ স্টিম্‌লাসও কোন কণ্ডিশনন্ড্‌ রিফ্লেক্স্‌ তৈরি করতে পারে না। এই অবস্থারই নাম ঘুম।

তাহলে এককথায় বলা যেতে পারে, ঘুম হচ্ছে মস্তিস্কের ইন্‌হিবিশন। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে যে, ঘুমন্ত অবস্থায় গোটা মস্তিস্কই ইন্‌হিবিশনের আওতায় এসে পড়ে। কারণ, পৰ্ববেক্ষণের ফলে জানা গিয়েছে যে, ঘুমন্ত অবস্থাতেও মস্তিস্কের কোন

কোন অংশ সজাগ থাকে। উল্টো দিকে, একথাও আমরা বলতে পারি না যে, জাগ্রত অবস্থায় আমাদের গোটা মস্তিস্কটিই সজাগ। তখনো মস্তিস্কের বিশেষ বিশেষ অংশে ইন্‌হিবিশন সৃষ্টি হতে পারে। একটা খুবই সাধারণ দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আমরা যখন সিনেমা দেখি তখন আমাদের মস্তিস্কের যে-যে অংশ থেকে দেখা ও শোনার ব্যাপারদুটি নিরূপিত হয় তা খুবই সজাগ থাকে এবং ফলে প্রত্যেকটি স্টিম্‌লাস সেখানে যথোপযুক্ত রিফ্লেক্স্‌ সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু সেই একই সময়ে আমাদের মস্তিস্কের অন্য একটি অংশ—ধরা যাক আমাদের মস্তিস্কের যে-বিশেষ অংশের ক্রিয়াশীলতার ফলে আমাদের মূখ থেকে লালার ঝরে সেই অংশটি—ইন্‌হিবিশনের আওতায় এসে যেতে পারে। তখন আর পাশের লোককে কুড়মুড় করে চানচুর চিবোতে শুনলেও আমাদের মূখ থেকে লালার ঝরবে না। অবশ্যই এই ইন্‌হিবিশন খুবই ক্ষণস্থায়ী হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা পৰ্ববেক্ষণ করে দেখেছেন, মস্তিস্কের বিশেষ কোন অংশে যে-যে কারণে ইন্‌হিবিশন সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেই সেই কারণেই মানুষের ঘুম পায়। অর্থাৎ ইন্‌হিবিশনের অবস্থা আর ঘুম পায়ার অবস্থা মূলত এক। ইন্‌হিবিশনের অবস্থা যখন মস্তিস্কের অধিকাংশ অংশ জুড়ে বসে তখনই মানুষ ঘুমোয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দিকে তাকিয়ে এই তত্ত্বটিকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যারা একই ধরনের কাজের মধ্যে থাকেন তাঁদের কাছে দিনযাপনের ব্যাপারটি হয়ে ওঠে নিতান্তই একঘেয়ে। এই একঘেয়েমি শেষ পর্যন্ত ইন্‌হিবিশন সৃষ্টি করে থাকে। আবার এই একঘেয়ে জীবনের মধ্যেই যদি কখনো কোনো উত্তেজনার ব্যাপার ঘটে যায় তাহলে ইন্‌হিবিশনের অবস্থা সৃষ্টি হতে বিলম্ব হতে পারে। আবার যারা নানা বিচিত্র কাজের মধ্যে দিয়ে সারা দিনটা কাটান তাঁদের ক্ষেত্রে ইন্‌হিবিশন আসে মস্তিস্কের নানা পৃথক পৃথক অংশের ইন্‌হিবিশন যুক্ত হয়ে। যে কথটা আগেই বলছি, গোটা মস্তিস্কই একই সময়ে সজাগ হয় না বা একই সময়ে নিস্ত্রিয় হয়ে পড়ে না। কম-বেশি মাত্রার ইন্‌হিবিশন সব সময়েই থাকে। বৈচিত্র্যপূর্ণ দিনযাপনের মধ্যেও কম কম মাত্রার অনেকগুলো ইন্‌হিবিশন

যুক্ত হয়ে বেশি মাত্রার ইন্‌হিবিশন সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার দিনযাপনের উত্তেজনা যদি একই ধরনের হয় তাহলে মস্তিস্কের বিশেষ একটি অংশই সক্রিয় থাকে। এবং এই একটানা সক্রিয়তাই শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করে ইন্‌হিবিশন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা জানি, কোনো একটি বিশেষ উত্তেজনা যদি একটানা চলতে থাকে তাহলে তা শেষ পর্যন্ত অবসাদ আনে।

সহজেই অনুমান করা চলে, ইন্‌হিবিশনে আচ্ছন্ন হবার প্রক্রিয়াটি আচমকা ঘটতে পারে না। অনেকগুলো পর্যায় পার হয়ে তবেই মস্তিস্কের ইন্‌হিবিশনের সেই অবস্থা আসে যাকে বলা হয় ঘুম। এই কারণেই চোখ বৃজলেই মানুষের ঘুম আসে না। একটি তন্দ্রার অবস্থা পার হয়ে তবেই মানুষকে ঘুমের অবস্থায় পৌঁছতে হয়।

একজন রুগী এসেছে ডাক্তারের কাছে। তার বক্তব্য : আচমকা তার দুটি কানই কালা হয়ে গিয়েছে, কোনো শব্দই সে আর শুনতে পাচ্ছে না।

ডাক্তার তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। তাঁরও ধারণা হল, রুগী সত্যিই কালা। শেষকালে তিনি রুগীকে বললেন, ‘আপনার ডানহাতটা এই তামার পাতের সামনে রাখুন।’ বলাতে কাজ হল না, লিখে জানাতে রুগী তার ডানহাত তামার পাতের ওপরে রাখল।

প্রথম কিছুক্ষণ ধরে একটি ইলেকট্রিক বেল বাজল। তারপরেই সুইচ টিপে সেই তামার পাতের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হল। চমকে উঠে আর ‘উঃ’ বলে চিৎকার করে রুগী হাত সারিয়ে নিল তার।

এমনি চলল বেশ কয়েকবার। প্রথমে ইলেকট্রিক বেল, তারপরে তামার পাতের বিদ্যুতের প্রবাহ। প্রতিবারেই রুগীর চমকে ওঠা ও অস্ফুট চিৎকার।

শেষকালে একবার যথারীতি ইলেকট্রিক বাজল কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে তামার পাতের বিদ্যুতের প্রবাহ চালু করা হল না। কিন্তু দেখা গেল, রুগী এবারের আগের মতোই চমকে উঠেছে ও অস্ফুট চিৎকার করেছে।

ডাক্তার হেসে বললেন, ‘এই তো, আপনি ভালোই শুনছেন দেখছি।’

পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, রুগীর না-শোনাটা ইন্‌হিবিশন, শোনাটা কণ্ডিশনন্ড্‌ রিফ্লেক্স্‌।

১১ চালকহীন ট্রেন ১১

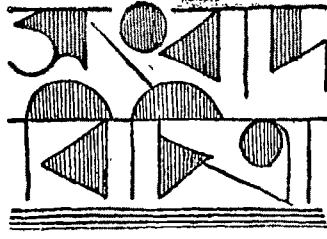
মস্কোয় ভূগর্ভ রেলপথে চালকহীন ট্রেন গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে সর্বাঙ্গীন সাফল্য লাভ করা গেছে। একটি ইলেকট্রনিক কম্পাউটিং যন্ত্র এই ট্রেনটিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মস্কোর সুড়ঙ্গ রেলপথের প্রধান কর্মকর্তা আলেকজান্দার নোভোখোভস্কি 'তাস'-প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, এই ট্রেনটি মালবাহী ছিল, কিন্তু যাত্রীবাহী ছিল না। মালের পরিমাণ এমন ছিল যাতে সমস্ত আসন যাত্রী ভর্তি থাকলে যে ওজন হত—সেই সমান ওজনের ট্রেনই ইনজিনকে টানতে হয়। ইলেকট্রনিক ড্রাইভারটি নিখুঁতভাবে ট্রেনটিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। এই পরীক্ষা সফল হবার পর আপাতত মস্কোর সুড়ঙ্গ রেলপথে মোট ৮০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে ২০ কিলোমিটার পথ এই ইলেকট্রনিক ড্রাইভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিতভাবে চালানার ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই করা হবে।

আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে মস্কোর এই সুড়ঙ্গ রেলপথে দৈনিক মোট প্রায় ৩০ লক্ষ লোক যাতায়াত করে। সমস্ত ট্রেনে যদি ইলেকট্রনিক ড্রাইভার চালিত ইনজিন যোগ করা হয় তা হলে আরো বেশী ট্রেন এই সুড়ঙ্গপথে যাতায়াত করতে পারবে এবং ট্রেনগুলিতে যাত্রীর ভীড় কম হবে। মস্কোর এই সুড়ঙ্গ রেলপথকে গত কয়েক বৎসরে বহুল পরিমাণে স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে। যেমনঃ সাব স্টেশনগুলিকে পত্রাদির স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে, মাত্র কয়েকটি ডেসপ্যাচারের সাহায্যে এই বৈদ্যুতিক রেলপথের সমগ্র বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় টিকিট বিক্রয় ও যাত্রীদের ওঠা-নামা (এসক্যালটর) তো বহুদিন পূর্বেই চালু হয়েছে। এই স্বয়ংক্রিয়করণের ফলে শতকরা ১৬ জন কর্মীর কাজ কমে গেছে এবং এরা সকলেই অন্য কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছে।

১১ বিনা পেট্রোলে আগামী দিনের গাড়ী ১১

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মিউনিখের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় যুরোপের একটি সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ক্ষুদ্র গবেষণাগারে এমন একটি জিনিস আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে যা আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে সম্ভবত আনবিক শক্তি অপেক্ষা অধিক বিপ্লব আনবে। এই দুটি গবেষণাগারে যে বিষয়ে কাজ হচ্ছে তার নাম জুস্টি গ্যাস পদার্থ। ভবিষ্যতের শক্তির উৎস।

এই অভিনব শক্তির উৎসের নীতি খুবই সরল। এটি মধ্যবর্তী তাপশক্তিতে পরিবর্তিত না-করা রাসায়নিক বিক্রিয়া-



জনিত উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির সরাসরি ব্যবহার। রাসায়নিক কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুস্টি বিশেষরূপে নির্মিত সীছদ ইলেকট্রোডের মাধ্যমে সংমিশ্রিত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎশক্তি মারফৎ এই 'পরশ পাথর' আবিষ্কার করেছেন। তরল পটেশিয়াম দ্রবকে ইলেকট্রো লাইটরূপে ব্যবহার করা হয়; হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়নগুলির মিলনে সৃষ্টি হল সৃষ্টি জলে একটি ধনাত্মক ও অপর একটি ঋণাত্মক অর্থাৎ বিপরীতধর্মী দুটি ইলেকট্রডকে তড়িৎসঞ্চারিত করা হয়; ফলে কোন শক্তি অপচয় না করে এ দুটি ব্যাটারীর মত কাজ করে চলে। যতক্ষণ দুটি সীছদ ইলেকট্রোডের একটিতে হাইড্রোজেন ও অপরটিতে অক্সিজেন সরবরাহ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া চলার সব সময় এই ব্যাটারী কাজ করবে ও তড়িৎশক্তি সরবরাহ করতে থাকবে।

পর পর অনেকগুলি এ ধরনের ব্যাটারী সাজিয়ে, যাকে জ্বালানী পদার্থ বলা হয়, উৎপন্ন বিরাট শক্তিশালী তড়িৎ প্রবাহের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে ইলেকট্রিক মোটর চালান হয়। বর্তমানের ইন্টার্নাল কম্বাশন ইঞ্জিনের ৩০ শতাংশ শক্তি ব্যবহার করা যায়; সেই তুলনায় নতুন শক্তির ৮০ ভাগ ব্যবহার করা যায়। এটিই এই নতুন শক্তির সুবিধা এবং শক্তির উৎস হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস সর্বত্র সীমিত পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই এই 'বাস্তব জ্বালানী' পেট্রল ও ডিজেল অয়েল অপেক্ষা অনেক সস্তা।

ভবিষ্যতের এই নতুন পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক মাত্রেই জানেন। এখন পৃথিবীর সর্বত্র টেকনিক্যাল উন্নতির সাহায্যে এই শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। মিউনিখের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রোলাইটরূপে জোরালো সক্রিয় জ্বালানী সেথানল ও ইথার ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ এই দুটি থেকে অসংখ্য হাইড্রোজেন অণু নির্গত হয়ে বিক্রিয়াকে যথেষ্ট বেগবান করে তুলে বিক্রিয়াজনিত শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। স্থান সংকুলান ও হালকা শক্তির

উৎস হিসাবে জুস্টি গ্যাস পদার্থ মহা-জাগতিক রকেটযান, জাহাজ ও স্থলযানে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে যখন এই শক্তি দিয়ে মোটর গাড়ী চলবে তখন মোটর গাড়ীর পেট্রল ট্যাংকের জায়গায় থাকবে জ্বালানী পদার্থ ভর্তি হালকা ধাতুতে মোড়া দুটি গ্যাস সিলিন্ডার। বাজে যন্ত্র, ক্লাচ, গ্যায়ার, একজস্ট, শব্দ, ধোঁয়া সেদিন কিছুই থাকবে না। গাড়ী হালকা হবে, কম খরচে চলবে। তবে বিজ্ঞানের সাফল্যের পূর্বে আরও কয়েক বছর ধৈর্য ধরতে হবে বৈকি!

১১ ফুলের স্বপ্নপদ্ম ১১

১৮৭৯ সালে সিলি স্বপ্নপদ্মের সেন্ট মেরীজ-এর একজন কৃষক স্বপ্ন কাছ থেকে একটি টুপি বাক্স ধার করেন এবং সেই বাক্সে মরসুমের গোড়ার দিকে উৎপন্ন ডাফোডিলের কয়েকটি গুচ্ছ প্যাক করে পাঠান লন্ডনের বিরাট কভেন্ট গার্ডেন মার্কেটে। যে ব্যবসায়ীর কাছে এই ফুল তিনি পাঠান সেই ব্যবসায়ীটি এই ফুলের জন্য তাকে দেন মাত্র ৭ শিলিং ৬ পেন্স (৫ টাকা)।

আজকাল অবশ্য নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত এই কয় মাস ধরে জাহাজ এবং বিমানে প্রচুর সিলি ফুল যাচ্ছে লন্ডনে। স্বপ্নপদ্মের চিল্লিটি স্বপ্নের মধ্যে পাঁচটিতে বিশেষ করে প্রচুর ফুলের চাষ হচ্ছে—এই স্বপ্নপদ্মটি ব্রিটেনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কর্ণওয়ালের ল্যান্ডস এন্ডের উপকূল থেকে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখন এই স্বপ্নপদ্মের প্রত্যেক কৃষক গড়পড়তা মরসুমে ৩,০০০ বাক্স ফুল জাহাজে করে পাঠাচ্ছে। একজন ভাল সংগ্রাহক এক ঘণ্টায় ১০০ গুচ্ছ ফুল (প্রতিটি গুচ্ছে বারোটি ফুল থাকে) অর্থাৎ প্রতি তিন সেকেন্ডে একটি ফুল সংগ্রহ করতে পারে।

প্রতি বছর হাজারে হাজারে পর্যটক এই 'ফুলের স্বপ্নপদ্ম' আসছেন ফুলের সমারোহ দেখবার জন্য। স্বপ্নপদ্ম এই সময় তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে অভ্যর্থনা জানায় এই সব পর্যটকদের। একদল সন্ধ্যায় ১,০০০ বছরেরও বেশি আগে এই স্বপ্নপদ্মে প্রথম ফুলের বাল্ব নিয়ে আসে। ট্রেসকো স্বপ্নপদ্মের অ্যাবী উদ্যানটি এখন সত্যিই দর্শনীয়, এখানে বিশ্বের প্রায় ৩,৫০০ রকমের ফুলের চাষ হচ্ছে।

স্বপ্নপদ্মের মধ্যে যেটি বৃহত্তম সেটিও ঘুরে আসতে একজনের এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। এই বৃহত্তম স্বপ্নপদ্ম হল সেন্ট মেরীজ। এটি লম্বায় দু মাইলেরও কম। স্বপ্নপদ্ম ক্ষুদ্র হলেও প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নানা-ধরনের ফুল ও পাখির জন্য পর্যটকদের সকল সময় তা আকর্ষণ করে এসেছে।

হেনারির হোটেলের দরজা ঠেলে
দু'জন লোক ঢুকল। লোক দু'জন বসল
সোজা কাউন্টারের কাছে।

জর্জ জিজ্ঞাসা করল, “আপনাদের কি
দেবো?”

দু'জনের মধ্যে একজন উত্তর দিল,
“বলছি। কি খাবি রে এল?”

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।
রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।
জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কাউন্টারের
কাছে বসে দু'জন লোক মেন্দু পড়ছে।
কাউন্টারের অন্য ধারে বসে আছে নিক
এডামস্। নিক খুব করে খুঁটিয়ে দেখছে

“আমার ঘড়িটা কুড়ি মিনিট ফাট।”

“ঘড়ির নিকুচি করেছে। কি আছে
তাই বলুন।” বলে উঠল প্রথম লোকটি।

জর্জ উত্তর দিল, “বেশ ত।
স্যানডুইচ খান না! কি স্যানডুইচ খাবেন
বলুন? ডিম আর হ্যাম, না হয় ডিম আর
বেকন-এর স্যানডুইচ দেবো? না হয় খন
লিভার আর বেকন।”

গড়ন। মুখ দুটি আলাদা। কিন্তু সাজ-
গোছ হুবহু এক রকমের। দু'জনের
গায়েই ওভারকোট। কিন্তু কোটটা গায়ে
যেন মানায়নি। বড্ড ছোট; আঁট হয়।
কাউন্টারের দিকে কুন্দুই দিয়ে সামনের
দিকে একটু ঝুঁকি বসল তারা।

এল জিজ্ঞাসা করল, “মদ পাওয়া
যাবে?”



লোক দু'জনকে। এদের আসার আগে
নিক জর্জের সঙ্গে কথা বলছিল।

“অপেলের সস আর আলু বাটার
সঙ্গে শূরুরের রোগ্টাই খাওয়া যাক,” বলে
উঠল প্রথম লোকটি।

“ওটা ত এখনও তৈরী হয়নি।”

“চুলোর ছাই, তৈরী হয়নি ত কাডে’
লেখা আছে কিসের জন্য?”

জর্জ মোলায়েম সরে বসে, “আজ্ঞে
ওটা ডিনারের খাবার। ছটার সময়
পানেন।”

কাউন্টারের পিছনের ঘড়ির দিকে
তাকাল জর্জ।

“এখন মাত্র পাঁচটা বাজে।”

স্বিক্তীয় লোকটি উত্তর দিল, “চোখ
খুলে দ্যাখো না। এখন তোমার ঘড়িতে
পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট।”

“আলুবাটার সঙ্গে মটরসুটি দেওয়া
মোরগের মাংস এক প্লেট।”

“আজ্ঞে, ওটাও ত ডিনারের।”

“যা চাইবো তাই কি ডিনার? এই
করেই কি দোকান চালাও নাকি
ছোকরা?”

“খান ডিম আর হ্যাম, না হয় ডিম
আর বেকনের স্যানডুইচ.....”

এল হঠাৎ বলে উঠল, “আচ্ছা, হ্যাম
আর ডিম খাওয়াই যাক।” এল-এর
মাথায় ডার্বি টুপি; গারে ওভার-কোট।
ওভার কোটের বুকুর বোতাম কটা
আঁটা। তার মুখটা সাদা এবং ছোট।
ঠোঁট দুটি খুবই দৃঢ়। গলায় তার
সিকের মাফলার, হাতে দস্তানা।

অন্য লোকটি বলে উঠল, “আমাকে
বেকন আর ডিম-ই দিন।” এই লোকটি
প্রায় এল-এর মতন লম্বা। ওরই মতন

জর্জ উত্তর করল, “পানেন। সিলভার
বিয়ার, বেভো, জিনজার-এল.....”

“আমি জিজ্ঞাসা করছি কিছু নেশা
ধরবার মদ পাওয়া যাবে কি না?”

“আজ্ঞে, ঐ যে বললাম”

অন্য লোকটি বললে, “ববার, কি গরম
এই শহরে।”

এল বললে, “রাত্রে কি হয় এখানে?”
লম্বাটি উত্তর দিল, “ডিনার খেতে
আসে লোকজন। রাজসিক ডিনার চলে।”

জর্জ বললে, “ঠিক বলেছেন।”

এল জর্জকে জিজ্ঞাসা করল, “ঠিক
বলেছে না?”

“নিশ্চয়ই।”

“তুমি ত বেশ মজার লোক হে!”

“নিশ্চয়ই,” জর্জ উত্তর দিল।

অন্য লোকটি বসে, “মজার লোক?
না তুমি একেবারেই মজার লোক নও।
তাই না, এল?”

এল বললে, “ও বোকা।” নিকের দিকে তাকাল এল, জিজ্ঞাসা করল “কি নাম হে?”

এ্যাডামস্।”

“এও খুব ভাল হোকরা। ম্যাকস, দেখ্ দেখ্ এ হোকরাও খুব ভাল,” এল বললে।

ম্যাকস উত্তর দিল, “এ শহরের সব লোকই ভাল।”

হ্যাম আর ডিম এবং বেকন আর ডিম দেবার জন্য কাউন্টারের ওপর দুটো প্লেট রাখল জর্জ। আলুভাজা দেবার জন্য আর দুটি প্লেট রেখে জর্জ রান্নাঘরের ছোট্ট দরজা বন্ধ করে দিল।

এল জিজ্ঞাসা করল, “কোনটা তোমার?”

“মানে নেই?”

“হ্যাম আর ডিম।”

ম্যাক্স বললে, “তুমি অতি সজ্জন হে।” সামনের দিকে আরও একটু বদুকে ম্যাক্স হ্যাম আর ডিম খেতে আরম্ভ

করল। ওরা দস্তানা না খুলেই খাচ্ছে। জর্জ মন দিয়ে ওদের খাওয়া দেখছে।

জর্জের দিকে তাকিয়ে ম্যাক্স জিজ্ঞাসা করল, “কি দেখছ হে অমন করে?”

“কিছু না তা।”

“আ মলো যা। আমি দেখলাম তুমি তাকিয়ে আছ।”

এল বললে, “ও কিছু না ম্যাক্স। হোকরা বেশ মজা পেয়েছে বোধ হয়।”

জর্জ হেসে উঠল।

ধমকে উঠল ম্যাক্স, “আর দাঁত বার করতে হবে না, বদুকে হোকরা, আর সাত পাঁচ দাঁত বার করতে হবে না।”

“বেশ,” উত্তর দিল জর্জ।

ম্যাক্স এলকে বললে, “ঠিক বোঝে। সব ঠিক বদুতে পারে। বদুকে।”

এল বললে, “দারুণ বোঝে।” ওরা আবার খাবার দিকে মন দিল।

এল ম্যাক্সকে জিজ্ঞাসা করল,

“কাউন্টারের ও দিকে ওই হোকরার কি নাম যেন।”

ম্যাক্স নিককে বললে, “ও হে হোকরা, তুমি এক কাজ কর দেখি। তুমি একবার এদিকে দেখে এসো না। নতুন বন্ধুদের সঙ্গে ভাব-সাব হোক।”

নিক জিজ্ঞাসা করল, “কেন? কি ব্যাপার?”

এল বললে, “কথা শোন। যা বলাচ্ছি।” নিক কাউন্টারের ও দিকে সরে গেল।

জর্জ জিজ্ঞাসা করল, “আপনারা কি করতে চান?”

এল বললে, “চোপ্ রও। তোমার মাথাবাথা কেন? রান্নাঘরে কে?”

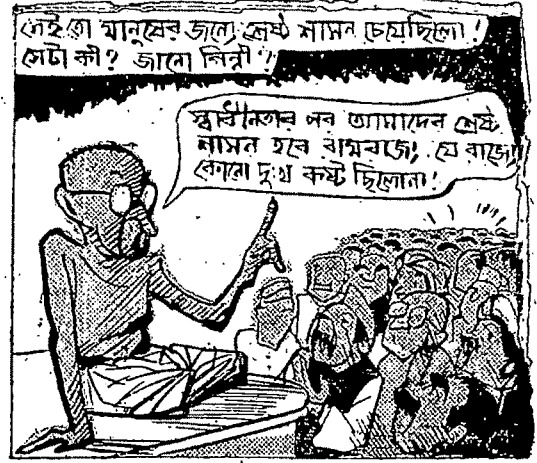
“নিগ্রো।”

“মানে?”

“নিগ্রো, যে রান্না করে।”

“এখানে আসতে বল।”

“কেন? কি করতে চান?”



“এখানে আসতে বল।”

“এ কি মগের মল্লুক?”

ম্যাক্স উত্তর দিল, “কি মল্লুক তা আমরা ভাল জানি। কি, আমাদের বেরাকুব বলে মনে হচ্ছে?”

এল বললে, “তুই থাম বেরাকুব। ওই বাচ্চাটার সঙ্গে বকবক করছি। কেন? এত বাজে বকিস।” তারপর জর্জের দিকে ফিরে বললে, “শোন বাচ্চা, তোমার ওই রাঁধুনীকে একবার ডাক।”

“কিন্তু কেন? মতলবটা কি আগে শুন।”

“মতলব আবার কি থাকবে? তুমি ত বুদ্ধিমান ছোকরা। মাথা খাটো। আদাজ করো তোমার ওই নিগ্রো রাঁধুনীর সঙ্গে আমাদের কি কাজ থাকতে পারে।”

জর্জ কাউন্টারের পাশ থেকে রান্নাঘরের ছোট দরজাটা খুলে ডাকল, “শ্যাম, চট করে শূনে যা ত।”

দরজা খুলে শ্যাম ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, “কি?” কাউন্টার থেকে দু’জন লোক শ্যামের ওপর ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিলে।

এল বললে, “বেশ, বেশ। যেমন দাঁড়িয়ে আছ তেমন দাঁড়িয়ে থাকো ত একটু।”

রান্নাঘরে কাজ করছিল শ্যাম। গায়ে তার সাদা তোয়ালে জড়ানো। শ্যাম দু’জন লোকের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আসে আসে বললে, “আজ্ঞে।” কাউন্টারের পাশের টুল থেকে উঠে দাঁড়াল এল।

সে বললে, “আমি এই রাঁধুনী আর ওই সোনারচাঁদকে নিয়ে একবার রান্নাঘরে যাচ্ছি। যাও, রান্নাঘরে যাও শ্যাম। যাও, তুমিও যাও হে ছোকরা।” শ্যাম আর নিকের পিছ পিছ বেঁটে-খাটো লোকটিও রান্নাঘরের দিকে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কাউন্টারে বসে থাকল ম্যাক্স। আর তার সামনা-সামনি বসে আছে জর্জ। ম্যাক্স জর্জের দিকে তাকারনি। কাউন্টারের পাশে বিরাট আয়না ঝোলানো। ম্যাক্সের চোখ সেই আয়নায়। হেনারি সেলোনের আয়না এখানে টানিয়েছে।

আয়নার দিকে তাকিয়েই ম্যাক্স বললে, “কি হল চাঁদ-বদন। মূখে রা নেই কেন?”

“আপনাদের মতলব কি?”

ম্যাক্স চিংকার করে বললে, “শূন-হিস এল, এখানে চাঁদ-বদন যে আমাদের মতলব জানতে চায়।”

রান্নাঘর থেকে এল-এর উত্তর এল, “তা না হয় বলেই দে।”

“তোমার কি মনে হয় সোনার চাঁদ? আমরা কেন এসেছি?”

“বুঝতে পারছি না।”

“তবু, আদাজ করতে পারছ না?”

সমস্ত সময় ম্যাক্স আয়নার দিকে চোখ রেখে কথা বলছিল।

“না, বলতে ভরসা পাচ্ছি নে।”

“শূন-হিস এল, “চাঁদ-বদন আমাদের মতলব বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বলতে ভরসা পাচ্ছে না।”

রান্নাঘর থেকে এল উত্তর দিল, “আমি সব শূনেতে পাচ্ছি।” রান্নাঘর থেকে ডিস-প্লেটগুলো কাউন্টারে দেবার জন্য একটা ফুটো ছিল। রান্নাঘর থেকেই সে জর্জকে বললে, “আর একটু সরে দাঁড়াও হে চাঁদ-বদন। ঠিক, ম্যাক্সের একটু বাঁ দিক ঘেঁসে দাঁড়াও।” এল যেন ছবি তুলবে। তাই সে ফটোগ্রাফারদের মত দাঁড়বার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে।

ম্যাক্স বললে, “যাক গে। কথা বল। বল ত দেখি বাছা, কি আমাদের মতলব? বলেই ফেল না।”

জর্জ নিরুত্তর।

“যাক গে। শোন আমিই বলছি। আমরা একজন লোককে খুন করবো বলে এসেছি। সুইডেনের একটা লোক। তুমি ত তাকে চেনো। ওল এন্ডারসনকে চেন না? ইয়া লম্বা-চওড়া একটা লোক।”

“চিনি।”

“সে ত রোজ রাত্রে এখানে খায়। খায় না?”

“মাঝে মাঝে এখানে খায়।”

“রোজ ছুটার সময় সে এখানে আসে। কেমন তাই না?”

“এলে ছুটার মধ্যেই আসে।”

“আমরা সব খবরই রাখি। বুঝলে হে সোনার চাঁদ। যাকগে। অন্য কথা বল। সিনেমা-টিনেমা দেখ?”

“কচিং-কখন।”

“না না, আরও বেশি করে সিনেমা দেখ। তুমি কি ভাল ছেলে! সিনেমা খুব ভাল লাগবে তোমার।”

“কেন, ওল এন্ডারসন কি করেছে? কিসের জন্য আপনারা ওকে খুন করতে চান? ও কি অন্যায় করেছে আপনাদের কাছে?”

“আমাদের কাছে কোন অন্যায় করার কোন সুযোগই সে পায়নি। সে আমাদের কখন দেখেওনি।”

“আর সে জীবনে মাত্র একবারই আমাদের দেখবে,” রান্নাঘর থেকে বলে উঠল এল।

জর্জ জিজ্ঞাসা করল, “তবে তাকে খুন করবেন কেন?”

“একজন বন্ধুর জন্যে আমাদের এ কাজ করতে হচ্ছে। শূন-হিস একজন বন্ধুর উপকারের জন্যে; বুঝলে কি থোকা?”

“চুপ কর ম্যাক্স। তুই বড় বাজে বকিস,” রান্নাঘর থেকে ধমকে উঠল এল।

“কি করব? থোকা-মণিকে শান্ত রাখতে হবে ত। সেই জন্যে বলছি। কি বল চাঁদ-বদন?”

“তুই বড় বাজে বকিস ম্যাক্স। দেখ ত রান্নাঘরে নিগ্রো আর আমার সোনা কেমন মজায় আছে। ওদের এমন ভাবে বেঁধে রেখেছি আহা! ওরা যেন মঠের মধ্যে দু’জন সম্মাসিনী!”

“তুইও কি সেই মঠে আছিস নাকি রে?”

“কি জানি।”

“হ্যাঃ হ্যাঃ তুই-ও সেই মঠে।”

জর্জ ঘড়িটার দিকে তাকাল।

“কোন খন্দের এলে বলবে। আজকে রাঁধুনীর ছুটি। খাবার-দাবার নেই। যদি কেউ তাতেও না থামে, বলবে, যাও বাপ, নিজে রান্নাঘরে গিয়ে নিজের খাবার তৈরী করে নাও।”

“তা না হয় হল। কিন্তু আমাদের কি উপায় হবে?”

“কিছু বলা যায় না। এ সব ব্যাপারে আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না।”

ঘড়ির দিকে তাকাল জর্জ। এখন ছটা বেজে পনেরো। রাস্তার দিকের দরজা খুলে গেল। রাস্তার সোয়ারী-মোটরের একজন ড্রাইভার এল।

ড্রাইভার বললে, “ওহে জর্জ, খিদে পেয়েছে। যা হয় কিছু দাও।”

জর্জ উত্তর দিল, “শ্যাম বাইরে গেছে।

আর আধ-ঘণ্টা খানক বাদে ফিরবে বোধ হয়।”

ড্রাইভার বললে, “তা হলে অন্য দোকানে যাই।” জর্জ ঘড়ির দিকে তাকাল। এখন ছ’টা বেজে কুড়ি মিনিট।

“চমৎকার,” বলে উঠলো ম্যাক্স। “খাসা ছেলে তুমি।”

রান্নাঘর থেকে এল বললে, “তা ভিন্ন এখান থেকে ওর মাথা উড়িয়ে দিতাম না। না বলে উপায় ছিল।”

“না, তা না। এ বড় খাসা ছেলে। বড় ভাল। খুব মনে ধরেছে আমার।”

ছ’টা বেজে পণ্ডান্ন মিনিট। জর্জ বললে, “না ও আর আজকে আসবে না।”

আর ক’টি লোক এল। ওদের জন্যে হ্যাম আর ডিমের স্যান্ডউইচ তৈরী করার জন্য রান্নাঘরে এল জর্জ। লোক দু’টি এখানে থাকে না; নিয়ে যাবে। রান্নাঘরে গিয়ে জর্জ দেখল এল ছোট দরজার পাশে একটা টুলের ওপর বসে আছে। ডার্বি-টুপি মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়েছে। পাশে রয়েছে শটগান। নিক ও নিগ্গো আর এক পাশে। একজনের পিঠ আর একজনের পিঠের দিকে। প্রত্যেকের মুখ তোমালো দিয়ে বাঁধা। জর্জ নিজেই স্যান্ডউইচ তৈরী করে অয়েল পেপারে মড়ে ব্যাগের মধ্যে ভর্তি করে লোক দ’টিকে দিল। লোক দু’টি দাম দিয়ে চলে গেল।

ম্যাক্স বললে, “সোনার চাঁদ ছেলে। তুমি রাখতেও পার! তোমার বৌ তোমার ওপর খুব মর্দাশ হবে। বুঝলে!”

জর্জ বললে, “তা ওল এন্ডারসন আজকে আর আসছে না।”

ম্যাক্স বললে, “আরও মিনিট দশেক দেখি।”

ম্যাক্স আন্ননার দিকে একবার, একবার ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকলো। ঘড়ির কাঁটা সাতটার ঘরে। আরও পাঁচ মিনিট পার হল।

ম্যাক্স বললে, “চলে আয় এল। চল, চলে যাই। আজকে আর আসবে না।”

এই সময় আর একটা লোক এল। জর্জ বললে যে, রাধুনীর অসুখ। আজ কোন খাবার নেই।

“তা আর একটা রাধুনীর ব্যবস্থা করলে ত পারতে। এই করে কি হোটেল চালাবে?” লোকটা বোরিয়ে গেল।

ম্যাক্স বললে, “আয় এল।”

“এই দু’টি সোনার চাঁদ আর নিগ্গোর কি ব্যবস্থা করবি?”

“ঠিকই ত আছে।”

“ঠিক আছে?”

“আলবাব। এরা কি করবে?”

“কি জানি। মন সায় দিচ্ছে না। পথটা বন্ধ পিছল। আর তুই বড় বাজে বকিস।”

“তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কথা না বললে এরা যে ভয়ে সিটিয়ে থাকতো।”

“তবু তুই বন্ধ বেশি কথা বলিস।” এল রান্নাঘরে থেকে বোরিয়ে এল। আঁট হয়ে আছে ওভারকোট। শটগানের মুখটা কোমরের কাছে দুলছে। ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে। দস্তানা পরা হাত দিয়েই ডার্বি টুপিটা আবার মাথায় ঠিক করে বসাল এল।

সে জর্জকে বললে, “তা হলে যাই সোনার চাঁদ। তোমার ভাগ্য খুব ভাল।”

ম্যাক্স বললে, “মাইরি, ঠিক বলেছিস। রেস খেলতে আরম্ভ কর হে চাঁদ।”

দরজা দিয়ে দু’জন লোক চলে গেল। জর্জ ওদের দেখতে থাকল জানালা দিয়ে। লাইট পোস্ট পার হয়ে ওরা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। আঁটমাট ওভারকোট আর ডার্বি টুপিতে ওদের অদ্ভুত দেখাচ্ছে। দরজা ঠেলে রান্নাঘরে ঢুকল জর্জ। নিক আর রাধুনীর বাঁধন খুলে দিল সে।

হাউ মাউ করে উঠলো রাধুনী। “ওরে বাবা আর এক মিনিটও এখানে থাকছি নে। ওরে বাবা, পালাতে পারলে বাঁচি।”

উঠে দাঁড়াল নিক। জীবনে তার এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি।

সে বললে, “কি ব্যাপার! এ সবে মনে কি?” বোঝা যায় এই ব্যাপারটার খুব গর্ব বোধ করছে নিক।

জর্জ বললে, “ওরা ওল এন্ডারসনকে খুন করতে এসেছিল। এখানে থেতে এলেই ওরা এন্ডারসনকে গুলী করবে।”

“ওল এন্ডারসনকে?”

“হ্যাঁ।”

গলাসি দরতোর ওপর বড়ো আঙুল বোলাতে থাকল শ্যাম।

সে জিজ্ঞাসা করলে, “ওরা সব চলে গেছে?”

জর্জ উত্তর দিল, “হ্যাঁ, সবাই গেছে।”

শ্যাম বললে, “খুব খারাপ লাগছে। এত খারাপ লাগছে!”

জর্জ নিককে বললে, “শোন, তুমি বরং একবার ওল এন্ডারসনের কাছে যাও।”

“বেশ।”

শ্যাম বললে, “এ সব ব্যাপারে একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকুন। একেবারে মাথা গলাবেন না।”

জর্জ বলে উঠল, “তোমার ভয় লাগে ত তুই যাসনে।”

নিক জর্জকে বললে, “আমিই যাবো। সে থাকে কোথায়?”

মুখ ফিরিয়ে নিল শ্যাম।

সে বললে, “ওরা ফর্দিস ফর্দিকর সব জানে।”

জর্জ নিককে বললে, “এন্ডারসন থাকে হিশার বাড়ী।”

“আমি যাই।”

নিষ্পন্ন গাছের ফাঁক দিয়ে রাস্তায় আলো গলে পড়ছে। নিক বড় রাস্তা ধরে একটা লাইট পোস্ট পার হল। অন্য আর একটা লাইট পোস্টের কাছে এসে নিক গলির দিকে বাঁক নিল। রাস্তার ওপর পর পর তিনটে বাড়ীই হিশার। তিনটেতেই ভাড়াটে থাকে। সিঁড়ির দু’ধাপ উঠে কলিং বেল টিপল নিক। একজন মহিলা দরজা খুলে দিল।

“এ বাড়ীতে কি ওল এন্ডারসন থাকেন?”

“আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?”

“যদি বাড়ীতে থাকেন তবে একবার দেখা করব।”

নিক মহিলাটির সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে এলো বারান্দার শেষে। দরজার কড়া নাড়ল মহিলাটি।

“কে?”

মহিলাটি বললে, “আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চান মিঃ এন্ডারসন।”

“এই যে আমি, নিক এ্যাডামস্।”

“ভেতরে এস।”

দরজা খুলে নিক ভিতরে গেল। জামাকাপড় পরেই বিছানার শুরুর আছে

ওল এন্ডারসন। এন্ডারসন আগে হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান ছিল। বিছানাটা তার দৈহিক অনুপাতে ছোট। দুটো বালিশের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছে এন্ডারসন। সে নিকের দিকে একবারও তাকালো না।

জিজ্ঞাসা করল এন্ডারসন, “কি ব্যাপার?”

উত্তর দিল নিক, “আমি ছিলাম হেনরির হোটেল। এমন সময় দুটো লোক এল। তারা আমাকে আর রান্নানীকে বেধে ফেলল। তারা বললে, তারা আপনাকে গুলী করবে।”

নিক যখন এই কথাগুলো বললে, তখন নিজের কানেও কথাগুলো বোকা বোকা শোনাগেল। উত্তর দিল না ওল এন্ডারসন।

“ওরা আমাদের বেধে রান্নাঘরে ফেলে রেখে দিল। আপনি যখন ওই হোটেল থেকে যাবেন, তখন ওরা আপনাকে গুলী করবে।”

দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে থাকল এন্ডারসন।

“জর্জ আমাকে এই খবরটা দিতে পাঠাল।”

উত্তর দিল এন্ডারসন, “তা আর আমি কি করতে পারি?”

“ওদের কেমন দেখতে, তা-ও বলতে পারি।”

উত্তর দিল এন্ডারসন, “না তা আর বলে কি লাভ? আমি শুনতেও চাই না।” দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল সে। “তুমি এই খবরটা দেবার জন্য এত দূর এসেছ, তার জন্য ধন্যবাদ।”

“না, না, ধন্যবাদের কি আছে!”

নিক বিছানার ওপর শায়িত বিরাট শরীরের দিকে তাকাল।

“আমি কি পুঁলিশে খবর দেবো?”

“না; পুঁলিশ কিছুই করতে পারবে না।”

“আমি কি করতে পারি, বলুন।”

“না, তুমি কিছুই করতে পারো পারো না।”

“তাহলে ব্যাপারটা একটা ধাপ্পা, তাই না?”

“না, ব্যাপারটা মোটেই ধাপ্পা নয়।”

ওল এন্ডারসন দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরল।

দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলছে যেন এন্ডারসন। “কি ব্যাপার জানো? আমি

কিছুতেই মন স্থির করতে পারিনি।—যাবো? কি যাবো না? কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না। সারাদিন বিছানায় শুয়ে পড়ে আছি।”

“আপনি কি এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারেন না?”

“না। না। কত পালিয়ে বেড়লাম। আর পালিয়ে বেড়াতে পারি না।”

সে দেওয়ালের দিকে তাকাল।

“আর কিছুই করার নেই।”

“কোন রকমে আর কোন কিছুই কি করা যায় না?”

আগের মতন নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিল, “না। আর কিছু সম্ভব নয়। আমিই অন্যায় করেছি। এখন আর কিছু করা যায় না। আর কিছুক্ষণ পরে আমি বাইরে যাবো।”

“তাহলে আমি বরং জর্জকে এই খবরটা দিয়ে আসি।”

নিকের দিকে তাকাল না এন্ডারসন, বললে, “যাও। এসেছিলে, তার জন্য ধন্যবাদ।”

চলে এল নিক। জামা-কাপড় পরা বিছানায় শায়িত এন্ডারসনের দিকে আর একবার তাকাল সে। এন্ডারসন দেওয়ালের দিকে চেয়ে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই সেই মহিলাটি বললে, “উনি আজ সারাদিন ঘরের বাইরে যাননি। মনে হয়, শরীরটা আজ ভাল নেই। আমি একবার বললাম: মিঃ এন্ডারসন, বড় সুন্দর শীত পড়েছে। একবারটি অন্ততঃ ঘুরে আসুন। কিন্তু বেড়াতে যেতে ভাল লাগলো না ওঁর।”

“না, ওঁর বাইরে যেতে ভাল লাগছে না।”

মহিলাটি বললে, “ওঁর শরীর খারাপ। আমারও মনটা ভাল লাগছে না তাই। কি সুন্দর মানুষ উনি। আগে ত হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন।”

“আমি জানি।”

“ওঁর মৃত্যুর দিকে না তাকালে কিন্তু এ-কথা কিছুতেই বোঝা যায় না।” রাস্তার কাছে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল দু’জন। “উনি এত শান্ত, এত ভদ্র।”

নিক বললে, “তাহলে আমি যাই মিসেস্ হিশা।”

“আমি মিসেস্ হিশা নই। এই বাড়িটা মিসেস্ হিশার। আমি দেখা-শোনা করি। আমার নাম মিসেস বেল।”

“তাহলে আসি মিসেস্ বেল।”

“আচ্ছা।”

অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে নিক আবার লাইট পোস্টের কাছে এল। তারপর বড় রাস্তা ধরে সে এল হেনরির হোটেল। কাউন্টারের পিছনে ছিল জর্জ।

“ওলের সঙ্গে দেখা হল?”

নিক উত্তর দিল, “হল। ও ঘরে আছে। বাইরে আসবে না।”

নিকের গলার শব্দ পেয়েই রান্না-ঘরের দরজা খুলে বাইরে এল শ্যাম।

“আমি ও-সব কথায় কান দেবো না,”—এই বলে আবার দরজা বন্ধ করে দিল শ্যাম।

জর্জ জিজ্ঞাসা করল, “সব বললে?”

“বললাম। যা জানি সব বলছি। কিন্তু ও ত এ-সবই জানে।”

“ও কি করবে?”

“কিছুই না।”

“তাহলে ওকে যে খুন করবে।”

“আমারও তাই মনে হয়।”

“শিকাগোতে নিশ্চয়ই কোন কেলেক্কার করে এসেছে লোকটা।”

“আমারও তাই ধারণা।”

“কি ভয়ানক কাণ্ড বল ত!”

“ভয়ানক না? ভয়ংকর!”

ওরা আর কথা বললে না। একটা তোয়ালে নিয়ে কাউন্টার মুছতে থাকল জর্জ।

নিক বললে, “আমি ভাবছি লোকটা কি কাজ করেছে, যার জন্য এরা গুলী করতে চায়?”

“কাউকে হয়ত ফাঁসিয়ে থাকবে।

তাই এরা শোধ তুলতে এসেছে।”

নিক বললে, “আমি বাপু এই শহরে আর থাকছি না।”

উত্তর দিল জর্জ, “সেই ভাল। শহর ছাড়াই ভাল।”

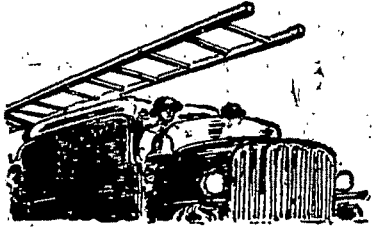
“ভাবলেই মাথা ঘুরে যায়। লোকটা ঘরে শুয়ে আছে। সব জেনেশুনেই শুয়ে আছে। জানে ঘরের বাইরে পা দিলেই তার কি হবে। ভাব ত ব্যাপারটা! ভাবলেই রক্ত হিম হয়ে আসে।”

জর্জ বললে, “কিছু না ভাবাই ত সবচেয়ে ভাল।”

অনুবাদক : রাম বসু

লেখকপরিচিতি

অমৃত : ১ম বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।



আগুন! আগুন! অভিও মেন

পাথরে পাথরে ঘবে মানুষ-যোঁদন প্রথম আগুন জ্বালতে সক্ষম হলো, সেদিন থেকেই আগুন মানুষের পরম মিত্র। এই আগুন মানুষকে সভ্যতার ওপরের ধাপে উন্নীত করেছে। শিকার-লব্ধ কাঁচা মাংস ও বনের ফল-মূল ছেড়ে মানুষ শস্যপক মাংসের আশ্বাদ গ্রহণ করে। পরম ভূষিত পেলো, ক্রমে ভাত ফুটিয়ে খেতে শিখলো, শীতের রাতে আগুন জ্বললে হাত-পা সেকে বাঁচলো। অন্যান্য কাজেও আগুনকে ব্যবহার করে প্রকৃতির ওপরে বেশ খানিকটা প্রভুত্ব করলো। কিন্তু প্রকৃতির এই দুর্জয় শক্তিকে ব্যবহার করতে গিয়ে মাঝে মাঝে বিপর্যয়ও দেখা দিলো। প্রকৃতিও তার প্রতিশোধ নিতে লাগলো, মানুষের একটু অসাবধানতা দেখা দিলে। প্রাকৃতিক দুর্জয় শক্তিগুলিকে মানুষ বশ করে কাজে লাগাতে গিয়েছে বটে কিন্তু একটু অসাবধান হলেই দুর্মদ তেজী ঘোড়ার মত অন্যান্য সওয়ারকে তারা মাটিতেও ফেলে দেয়। তাই আগুনের হাতে অসাবধান মানুষ দম্ব হয়ে পড়েও মরতে লাগলো। হিসেব করলে দেখা যাবে সভ্যতার শৈশব থেকেই আগুন মানুষের একই সঙ্গো শত্রু ও মিত্র।

বর্ণাশ্রমে প্রকৃতিভেদে আগুনকে উনিশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আগুন লাগার কারণ উনিশ দফা বিশেষজ্ঞদের বিবেচনায়। শহরে যত আগুন লাগে তার অধিকাংশই ঘটে গৃহস্থ-বাড়ীতে, দোকান-পাটে, ছোট-খাট ফ্যাক্টরীতে, গদ্যমে এবং পুজোর প্যাণ্ডেলে। কিম্বা ইলেক্ট্রিক ল্যাম্পপোন্টে। উপরোক্ত প্রকারে আগুন লাগার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্বলন্ত চুঙ্গী, ইলেক্ট্রিক সর্ট সার্কিট। গদ্যমে আগুন লাগার কারণ রাসায়নিক দ্রব্য-

জনিতও হতে পারে। বিশেষ করে পাটের গদ্যমে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য রাখার ফলে তা উত্তপ্ত হয়ে অনেক সময় অগ্নিকাণ্ডের হেতু হয়, তা দেখা গিয়েছে। পাট, গন্ধক কি কাঠের গদ্যমে অনেক সময় অসাবধানে রাখিত মোমবাতি কিম্বা অন্যান্য নস্কভাবে নিষ্কৃতি সিগারেট বা বিড়ির টুকরো থেকে বহু অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শহর-তলীতে যে সব অগ্নিকাণ্ড হয় তার কবলে বহু পাটকল, সুতোকলকে ভস্মীভূত হতে দেখা যায়। পাট বা তুলোর গদ্যমেও শহরতলীতে অনেক আছে এবং তারাও এই অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রেহাই পায় না। শহর-তলীতে আর এক ধরনের অগ্নিকাণ্ড সচরাচর দৃষ্ট হয়, তা হচ্ছে কুটির বা খড়ের গাদায় অগ্নিসংযোগ। এ ধরনের আগুন অত্যন্ত বিপজ্জনক কেন না, তা গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিতে পারে। তাছাড়া রাসায়নিক বিশ্লেষণক দ্রব্যের ফ্যাক্টরীতে বা রেলওয়ে ইঞ্জিন, মোটরে ও ট্রাম-বাস প্রভৃতি যানবাহনে আগুন লাগার কাহিনী তো অনেকেরই জানা আছে।

ইতিপূর্বে মোটামুটি জ্বলন্ত চুঙ্গী, জ্বলন্ত মোমবাতি, ইলেক্ট্রিক সর্ট সার্কিট এবং অন্যান্য নস্ক হাতের নিষ্কৃতি বিড়ির টুকরো প্রভৃতি থেকে আগুন লাগার কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কিন্তু মফস্বলে বা শহর-তলীতে আরো এক ধরনের আগুন দেখা যায়—যা হয়তো রেলওয়ে ইঞ্জিনের উর্ধ্বক্ষিত জ্বলন্ত কয়লা বা উত্তপ্ত ছাই থেকে অনেক সময় ঘটে। ফ্যাক্টরীর ফার্নেস থেকেও অনুরূপভাবে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে। এ-ছাড়া খনি-অঞ্চলে খনির মধ্যে আগুন লাগার দুর্ঘটনার কথা প্রায়ই শোনা যায়। নদীতটে জলের

ওপরেও আগুনের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। নদীর ওপরে পাট বা খড়-বোঝাই নৌকা বা জাহাজে আগুন লেগে বহু প্রাণ ও সম্পত্তি বিপন্ন হতে দেখা যায়। শহরে ও গ্রামে বহু পেট্রোল-ভন্ট আছে। সেখানেও কখনো কখনো আগুন লেগে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে।

অগ্নি-বিশেষজ্ঞরা আগুনকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। কার্বোনেশাস বা কার্বনঘটিত, ইলেক্ট্রিক ও কেমিক্যাল।

এই কার্বোনেশাস আগুনের মধ্যে যাবতীয় গৃহের অগ্নিকাণ্ড, চটকল, সুতোকল, পেট্রোল-ভন্ট প্রভৃতি অগ্নিকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বাড়ীতে সামান্য আগুন লাগলে স্টিরাপ পাম্পের সাহায্যে জল দিয়ে সহজেই নিভানো যেতে পারে। জামা-কাপড়ে আগুন লাগলে ছুটোছুটি না করে কম্বল জড়িয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নেভানোর ফলপ্রসূ উপায় অনেকেরই জানা আছে। এ-ছাড়া বহু বাড়ী, অফিস বা সিনেমা-হাউসে সোডা-এসিড এক্সটিংগুইশার বা বালি-ভর্তি বা ফোম-ভর্তি (foam) ফায়ার-কিং দেওয়ালে টাঙানো থাকে। সময়ে ঐগুলি খুব প্রয়োজনে লাগে। চটকলে আগুনের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল থাকায় নির্মাণের সময়েই মাথার ওপরে লম্বা পাইপের সাহায্যে ছোট ছোট স্প্রিংলার লাগানো হয়। ঐগুলির মধ্যে ছোট ছোট ভাল্বে আছে এবং জলপূর্ণ বহু পাইপের সঙ্গে ঐগুলি সংযুক্ত। আগুন লাগার পরে বিশিষ্ট তাপমাত্রায় ঐ ভাল্বেগুলি ফেটে আপনা থেকেই জল পড়তে থাকে এবং আগুনের সঙ্গে প্রাথমিক যুদ্ধ চালায়। যে কোনো বাড়ী বা চটকলের বহু অগ্নিকাণ্ডগুলিতে দমকলের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। বাড়ী বা যে কোনো জায়গায় যখন বৈদ্যুতিক কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটে তখন মেন-সুইচ বন্ধ করে দিয়ে সাধারণ আগুনের মতই জল দিয়ে তাকে নেভানো যায়। কিন্তু মীটার-বোর্ডে আগুন লাগলে কার্বোন টেট্রা ফ্লোরাইড বা কার্বনডাইঅক্সাইড ছাড়া নেভানোর উপায় নেই। জল দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করলে শক্ থেকে অপমৃত্যু ঘটান সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে বালি ছুঁড়েও অনেক সময় আগুন নেভানোর প্রাথমিক চেষ্টা করা যেতে পারে।

কেমিক্যালঘটিত আগুন বালি দিয়ে নেভানো যায়। কিন্তু পেট্রল বা তৈল-

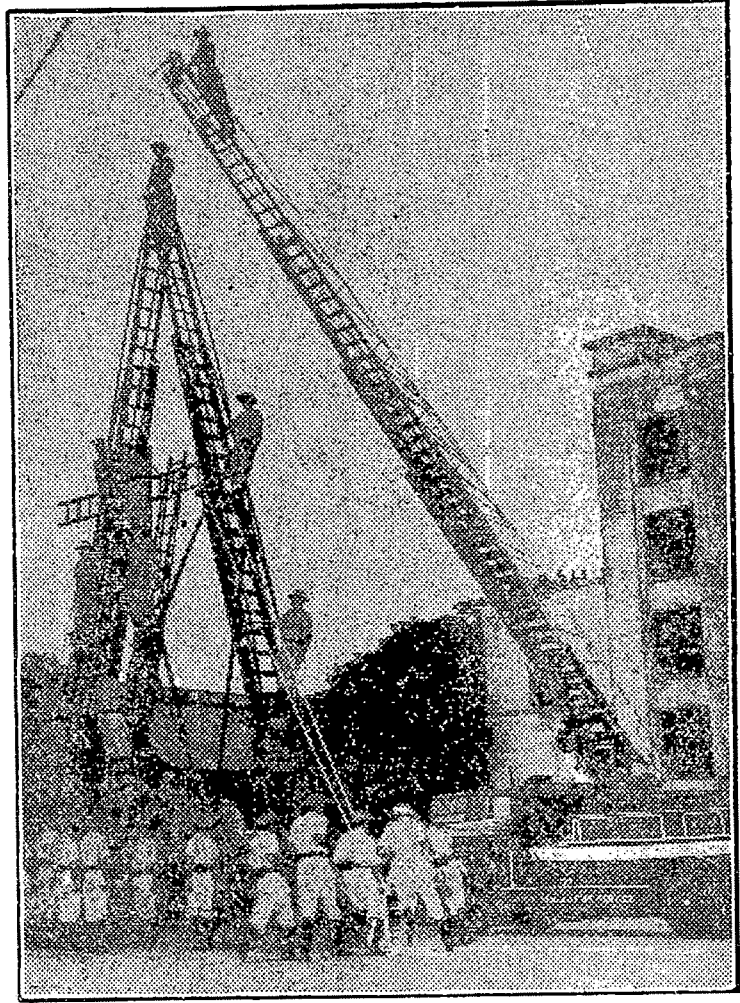
জাতীয় অন্য কিছুতে আগুন লাগলে ফোম-কম্পাউন্ড (foam compound) ছাড়া নেভানোর উপায় নেই। এই ফোম সোপেনাইন, ষাউন্ডের রস্তু ও এলুমিনিয়াম সাল্ফেট প্রভৃতির মিশ্রণে প্রস্তুত। তৈলাক্ত দ্রব্যের ওপরে সাদা ফেনার ফেনায়িত ধারা পতিত হয়ে অক্সিজেনের সংস্পর্শচ্যুত আগুনকে সহজেই নিভিয়ে ফেলে। আগুন নেভাবার সমস্ত মাধ্যম বা দ্রব্যের উদ্দেশ্য বাতাসের অক্সিজেনকে জ্বলন্ত জিনিসের সংস্পর্শচ্যুত করা।

কোল্‌গ্যাসঘটিত আগুন অধিকাংশ ঘটে গ্যাসপোস্টে, গ্যাসের কারখানায় এবং খনিতে। এ ধরণের ছোটখাট আগুন কাদার তাল দিয়ে কোল্‌গ্যাস নির্গমনের পথ বন্ধ করে নিভিয়ে দেওয়া যায়।

উপরোক্ত বিশেষ বিশেষ ধরণের আগুন ছাড়া কল-কারখানার অধিকাংশ আগুন নেভাতেই প্রবল ধারায় জলের প্রচুর সরবরাহের প্রয়োজন। লম্বা লম্বা হোস পাইপের সাহায্যে এই জল পাওয়া যায় রাস্তার হাইড্রেন্ট, পুকুর, খালবিল প্রভৃতি থেকে। তাছাড়া দমকলের গাড়ীতেও হাজার গ্যালন জলের ট্যাঙ্ক পরিবহণ করতে পারে। আগুন নেভানো ছাড়াও নিমজ্জিত ব্যক্তি বা প্রাণীকে উদ্ধার করা, ইলেক্ট্রিক শক্-খাওয়া অচেতন ব্যক্তিকে, আটতলার সমান উঁচু টাওয়ার থেকে নামিয়ে বাঁচানো, ঝড়ে ভূপতিত বৃক্ষ সরানো—সমস্ত কত ব্যকমেই দমকল বাহিনীকে সাড়া দিতে হয়। বহুচালিত একশো ফিট উঁচু মইয়ের সাহায্যের হাওড়ার ব্রিজ থেকে পাগলকে নামাতেও দমকল বাহিনীকেই খবর দিতে হয়। মেম-সারের আদুরে বেড়ালকে পাঁচতলা বাড়ীর উঁচু কানিশ থেকে নামিয়ে আনার মত কৌতুককর পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে হয় দমকল বাহিনীকে।

আগুন লেগে আমাদের জাতীয় সম্পত্তির কী বিপদুল পরিমাণ ক্ষতি হয় এবং দমকল বাহিনীর কত তৎপরতায় কী পরিমাণ ক্ষতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—নিম্নোক্ত পরি-সংখ্যান তালিকা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যাবে। বিগত তিন বৎসরের তালিকা অনুসরণ করে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া গেছে।

বৎসর	মোট অগ্নি- কান্ডের সংখ্যা	অগ্নিকান্ড সং- শ্লিষ্ট গৃহ ও সম্পত্তির পরি- মাণ	অগ্নিকান্ড সং- শ্লিষ্ট গৃহ ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ	অগ্নিকান্ড সং- শ্লিষ্ট গৃহ ও সম্পত্তির অব- শিষ্ট পরিমাণ
১৯৫৮-৫৯	২,৬০৫	টঃ ১,৭৪,৩১,৯৭৯	টঃ ৪০,৫৮,৩৫১	টঃ ১,৩৩,৭৩,৬২৮
১৯৫৯-৬০	২,৮৮৫	টঃ ১,৮১,৯৯,০৪০	টঃ ৪১,১৬,০৮১	টঃ ১,৪০,৮২,৯৫৯
১৯৬০-৬১	৩,০৯২	টঃ ১,৫৮,৪১,১২৪	টঃ ২৫,৪১,২০৮	টঃ ১,৩২,৯৯,৯১৬



নতুন অগ্নিনির্বাপক মন্ত্রের সাহায্যে সম্মিলিত মহড়া

গত ১৯৬০-৬১ সালে দমকল বাহিনীকে ৩,০৯২টি ডাকে সাড়া দিতে হয়েছে। তার মধ্যে ৭০৩টি নিরর্থক এবং ৩১৩টি উদ্ধারকার্য সম্পাদন করার জন্যে। ৭০৩টি নিরর্থক ডাকের মধ্যে ৩০০টি সামান্যতম আগুন লাগার সম্ভাবনাতেই দমকলকে ডাকা হয়েছে। ২০০টির ওপর মিথ্যা ডাকে দমকল বাহিনীকে পরবৃন্দস্ত করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাকা হয়েছে—যা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। গত বছরে প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার

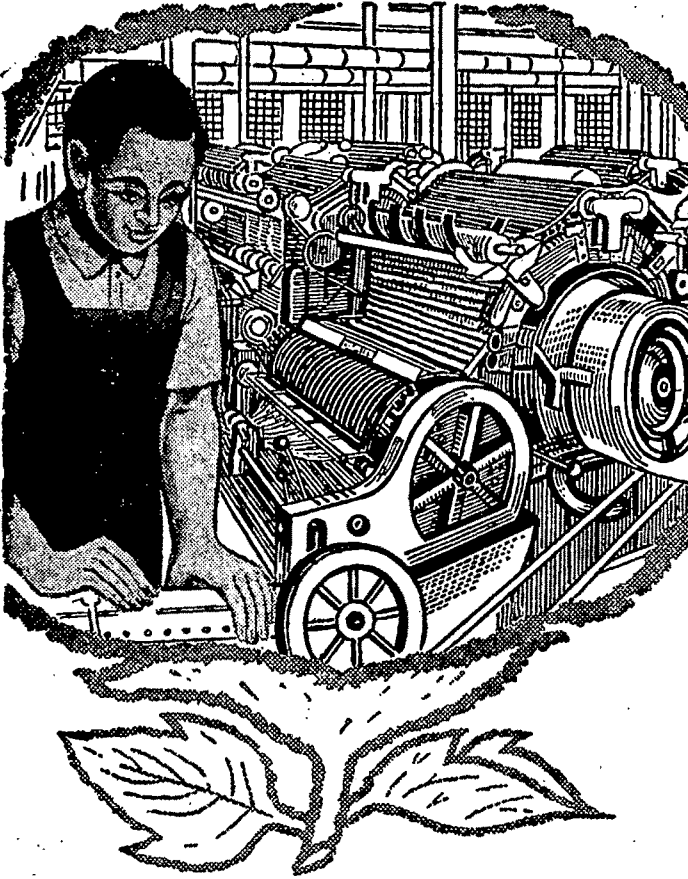
জাতীয় সম্পত্তি দমকল বাহিনীর তৎপরতায় রক্ষা পেয়েছে। তালিকা থেকে দেখা যেতে পারে যে, জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ নিম্নগামী। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে অধিক সংখ্যক আগুন লেগেছে বাড়ীতে এবং তার কারণ জ্বলন্ত চুল্লী, জ্বলন্ত বাতি কিংবা বিড়ি-সিগারেটের টুকরো। বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য সর্বাধিক আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। গত বছরের আগুনে সাড়ে পঁচিশ লক্ষ টাকার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চটকল, স্নাতোকল ও কয়েকটি বড় বড় কারখানা।

গত ৫ই মার্চ থেকে ১১ই মার্চ অবধি জনসাধারণকে অগ্নির ক্ষতিকারক প্রভাব ও নির্বাপনের উপায় সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারতবর্ষে অগ্নি-নিরোধ সপ্তাহ প্রতিপালন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ও

কলকাতা শহরে পোষ্টার ও রাজপথে গথের পরিষ্কারত দমকল বাহিনীর যান-বাহন থেকে বহুভার মারফৎ অগ্নি-নিরোধ সস্তাহ উদ্ভাপিত হয়েছে। আকাশবাণী থেকে এ উপলক্ষ্যে অগ্নিবিশেষজ্ঞদের বহুভার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে দমকল বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে এতদুপলক্ষে ৫ই, ৬ই ও ১০ই মার্চ তারিখে বিভিন্ন প্রকারে অগ্নি-কান্ড ও তার নির্বাপনের উপায় চিত্তাকর্ষক অভিনয়ের সাহায্যে দেখানো হয়।

সোডা-এসিড-এক্সটিংগুইসারনিঃসৃত জলধারায় কার্বোনেশাস্ গ্রুপের কাগজ, কাঠ ও খড়ের গাদায় আগুন নেভানোর পদ্ধতি দেখানো হয়—যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ফোম-কম্পাউন্ডের সাহায্যে তৈল ও তৈলজাতীয় রঙ বা বার্ণিশের অগ্নিকান্ড নির্বাপনের প্রক্রিয়াও দেখানো হয়।



ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে সার্বিক প্রচেষ্টায়

বাংলাদেশের বঙ্গশিল্প জগতে বঙ্গলক্ষ্মী এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। ৫০ বছরেরও উপর অক্লান্ত পরিশ্রম আর দেশবাসীকে সর্বতোভাবে সেবা করার ঐকান্তিক আগ্রহের ফলেই এই বিরাট ঐতিহ্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধন চাহিদা মেটাবার জন্য উন্নতধরনের যন্ত্রপাতি আমদানী করে মিলের উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।



বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

KALPANA-BL 9, B.

বাসরোধকারী প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নি-কুন্ডের মধ্যে এ্যাস্বেষ্টাস্ স্ফুট পূরে বিভিন্ন এ্যাপারেটাসের সাহায্যে প্রবেশের ক্রীড়া-কৌশল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। জলের সাহায্যে আগুন নেভানোর বহু কৌশল দেখানো হয়। সাধারণ পাকাবাড়ীতে বাগদামে সোজা জলের জেট (Jet) হোস্ পাইপের সাহায্যে নির্গত করে আগুন নেভানো সম্ভব। কিন্তু পাটগাদামে বিরাট অগ্নি-কান্ড হলে সিলিং-এ সারি সারি ফুটো করে হোস্ পাইপের মুখে রিভলভিং নজল (nozzle) লাগিয়ে আগুন নেভাতে হয়। এক একটি রিভলভিং নজল (nozzle) দশ ফুট ক্ষেত্র অর্ধাধি বিস্তৃত আগুন নেভাতে সক্ষম।

খড়ের চালে আগুন নেভাতেও রিভলভিং জেট ব্যবহার করা হয়। নাহলে সোজা জেট-এর প্রবল আঘাতে খড়ের বাড়ী-ঘর ধূলিসাৎ হওয়ার সম্ভাবনা। তৈলজাতীয় দ্রব্যের অগ্নি-কান্ড নির্বাপনে ফগ্-নজল-এর ব্যবহারও দেখানো হয়েছিল। ফগ্-নজল থেকে উৎক্ষিপ্ত জলকণা চারিদিকে কুয়াশার সৃষ্টি করে। তার ফলে তৈল-জাতীয় পদার্থের ওপরে কুয়াশার আন্তরণ সৃষ্টি হওয়ায় অগ্নিজ্বলের অভাব ঘটে এবং আগুন নিভে যায়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খেলা দেখানো হয় একটি পাঁচতলা উঁচু টাওয়ারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে। টাওয়ারের অধিবাসীদের ভয়াবহ চীৎকারের মধ্যে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে টেলিস্কোপিক ল্যাডার (বিশেষ ধরনের মাই), একশো ফুট উঁচু মাই এবং বদলন্ত রঞ্জুর সাহায্যে টাওয়ারের অধিবাসীদের নিরাপদে অনাহত অবস্থায় মাটিতে নামিয়ে আনা হয়। তারপরে চতুর্দিক থেকে সুকোশলে হোস্ পাইপ-নির্গত জেট বা জলধারার সাহায্যে দ্রুত অগ্নি নির্বাপন করা হয়।

উপরোক্ত অভিনয় থেকে প্রত্যক্ষ করা যায় কীভাবে প্রকৃত অগ্নিকান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করা হয় এবং মানুষের প্রাণ ও ধনসম্পদকে বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কী বিপুল পরিমাণ চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

আগুনের হাত থেকে বাঁচতে হলে ছোটো বড়ো কোনো আগুনকেই অবহেলা করা উচিত নয়। নিজে সেই আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে সচেতন হয়ে দমকল বাহিনীকে ডাকা বিধেয়।



(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুয়াশার আচ্ছাদনে ঢাকা পৃথিবীতে কি সুখের কিরণ এসে ধাক্কা মারে? বিদীর্ণ করে দেয় সেই ব্যাপসা-ব্যাপসা চাদরখানা? তাই হঠাৎ এক একটা বস্তু দৃশ্যমান হয়ে ওঠে? স্পষ্ট চেহারা নিম্নে জেগে ওঠে গাছপালা রাস্তা বাড়ী।

দ্রুতচৈতন্যের কুয়াশার চাদর বিদীর্ণ করে জেগে ওঠে চেনার দীপ্তি?

সুশোভন চলে যাবার পর সুশোভন আর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে পায়চারি করছেন না। জানলার কাছে চেয়ারটা টেনে চূপ করে বসে পথের লোক চলাচল দেখছেন।

সুচিন্তা শরবতের গ্লাসটা হাতে করে এসে দাঁড়ালেন, পিছন থেকে বললেন, 'কী অত দেখছে?'

সুশোভন মুখ ফিরিয়ে চিন্তিত স্বরে বললেন, 'দেখ সুচিন্তা, কেবলই মনে হচ্ছে কোথায় যেন কিছু ভুল হয়েছে।'

'কোথায় আবার কি ভুল হলো?' বুকের ভিতর চমকে-ওঠা শব্দকে সংযত রেখে সুচিন্তা বললেন, 'এই শরবতটা সময়ে খেতে ভুল হয়ে গেছে বটে। খেয়ে নাও।'

'থামো। রাখো ওসব। বলতো, ওই যারা চলে গেল ওরা আমার নিজের লোক না?'

সুচিন্তা নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেন, 'নিজের লোক বৈকি। তোমার ভাই ভাইপো।'

'তবে? ওরা কেন চলে যাবে? তুমি ওদের চলে যেতে বলবে কেন?'

'আমি ওদের চলে যেতে বলছি।'

সুচিন্তা অভিযোগের মত ক'রে বললেন।

সুশোভন বলেন, 'চলে যেতে বলনি। থাকতেও তো বললে না? ওরা আমার নিজের লোক।'

সুচিন্তার মাথার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বিদ্রোহের আলোড়ন জেগে ওঠে। বলে ওঠেন, 'ওরাই বা তোমার কাছে থাকতে চাইল কই? এত যদি নিজের লোক?'

'সেই তো। কি যে হ'ল, ঠিক বন্ধতে পারছি না। আচ্ছা সুচিন্তা, এ বাড়ীটা তো তোমার। এখানে ওরা থাকবে কেন? ওদের তো বাড়ী আছে। বস্তু ভাবনা হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে কোথায় যেন মস্ত কী একটা ভুল হচ্ছে।'

'অত ভাবতে হবে না তোমায়—' সুচিন্তা প্রায় ধমকে ওঠেন, 'ভাবতে গেলে কষ্ট হয় তোমার জান না? নাও শরবতটা খেয়ে নিয়ে বোসো। খবরের কাগজ পড়ি। আজ তো কাগজ পড়াই হ'ল না।'

সুশোভন শরবতের গ্লাসটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'থাক। কাগজ থাক। কষ্ট হয় বলে ভাবব না? ভেবে ঠিক করব না ভুলটা কোথায়?'

'ডাক্তারবাবু তোমায় ভাবতে বারণ করেছেন।'

'ডাক্তারের কথা আমি শুনবো না। বস। আমি ভাববো।'

হ্যাঁ সুশোভন ভাববেন।

ভেবে ভেবে আবিষ্কার করবেন ভুলটা কোথায় ঘটছে।

ভাঁড়ারঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে একটা চিঠি পড়ছিল অশোকা।

মায়ালাতা ঘরে ঢুকেই চোখে শাণিত জ্বালা আর মধুর হাসি চেপে নিয়ে বলেন, 'ছোটাকুরপোর চিঠি এল বুঝি ছোটবো?'

অশোকা চিঠিটা থেকে চোখ তুলে বলে, 'হ্যাঁ।'

'ভাইয়ের কাছে তো এই আজ সকালেই চিঠি এসেছে। আবার এবেলা। যাই বল ছোটবো তোমরা ভাই ডুবে ডুবে জল খাও। লোকদেখতা মনে হবে যেন দু'জনে আদায় কাঁচকলায়, কিন্তু চোখের আড়ালে গিয়ে তো একেবারে বিরহ ধরছে না। সেই নতুন বিয়ের বরের মত চার পৃষ্ঠা চিঠি। তা' শুননি একটু কি লিখেছে।'

অশোকা আস্তে চিঠিখানা বড়জায়ের সামনে নামিয়ে দেয়।

মায়ালাতা উদ্যত হাতখানা টেনে নিয়ে কণ্ঠে হেসে বলেন, 'ওমা, তোমাদের স্বামীস্বীর প্রেমপত্র, ও আবার আমি পড়বো কি? মর্মার্থটা জানতে চাইছি।'

'মর্মার্থ' আমি নিজেই বন্ধতে পারছি না।'

'বল কি ছোটবো? খুব বুঝি কাব্য করেছে?'

'সে করবার ক্ষমতা থাকলে তো?' অশোকা মৃদু হেসে বলে, 'বলেছে দিন

তিনেকের মত সাগরময়ের জন্যে একজন নার্স ঠিক করে নীতা কলকাতায় আসছে ওর বাবাকে দেখতে, নীতা ফিরে যাবার সময় আমি যেন তার সঙ্গে দিল্লী বাই।

‘তার মানে? ছোট্টাকুরপো কি সত্যিই জামাই-বাড়ীতে বসবাস করবে ঠিক করেছে?’

‘বাড়ীতে নয়, পাশের বাড়ীতে। সাগরময়ের সঙ্গে চেম্বারে বসতে একজন লোক তো সবদা থাকা দরকার—’

মায়ালতা ভুরু কুঁচকে বলেন, ‘চেম্বার! কেন সেই অন্ধ অম্বার ডাক্তারী করবে নাকি?’

‘তাই তো লিখেছেন।’

‘তবে আর কি, তুমি তা’হলে এবার বাজ্রবিছানা গছোতে বোসো। সাথে কি আর বলেছে অকৃতজ্ঞ পৃথিবী।’

মায়ালতা চোখের জল চাপতে চাপতে দুম দুম করে চলে যান।

আশ্চর্য মানুষের মন! অহরহ বাদে ‘তার’ বলে মনে করেছেন মায়ালতা সারা-ক্ষণ বাদে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছেন, ‘একটু সরেও না! সরলে হাত পা মেলে বাঁচি!’ তাদের সরে যাবার সম্ভাবনার কথামাত্র শুনেনি, মায়ালতার বৃকের মধ্যে থেকে কান্না উঠলে উঠছে।

মন কেমনে? অভিমানে? না তাঁর ওপর টেক্সা মেরে চলে যেতে চায় এই ঈর্ষা? কিসে তা? মায়ালতা নিজেই জানেন না। শুধু কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

কিন্তু মায়ালতার সেই চিরদিনের ভাগ্য।

এত যন্ত্রণার সমর্থন জোটে না স্বামী-পুত্রের কাছে। সুবিমল ব্যাংগ স্বরে বলেন, ‘ভালই তো, এবার হাতপা মেলে বাঁচবে। ব্যাংক টাকা জমাবে।’

ছেলেরা তাকিল্যের স্বরে বলে, ‘উনি চলে যাবেন বলে কান্না পেয়ে যাচ্ছে তোমার? বলিহারী মা। বৃদ্ধিতে পারছি না কোনটা তোমার অভিনয়, এতদিনের হাত-পা ছোঁড়া, না এখনকার অশ্রুবিসর্জন!’

মায়ালতা আবার চিরদিনের প্রতি-পক্ষের উপর গিয়ে পড়েন, যথারীতি দেয়ালকে প্রতীক করে। ‘উঃ একেই বলে দর্শিনী! এতদিনের এত কিছু সবই ভস্মে ঘাঁ! কে কোথা থেকে ‘তু’ করে একটু ডেকেছে, অমনি সব বিস্মরণ হয়ে সেখানে ছুটে গিয়ে পড়ে থাকতে

গেলেন। এদিকে তো—বাবুর এত টনটনে মান, অথচ জামাইয়ের চাকরিগরি করতে মানে বাধবে না? মেয়েকেও বলিহারী, পাগল ছাগল বাপটা পড়ে রইল কার না কার কাছে, এখন আদর বাড়ল কাকার। কেন? না কাকাকে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি হবে। কাকা জোটা বলে কোন দিন জানল না, পুঁছল না—আর আজ—আমি হলে ছারা মাড়াই না অমন মেয়ের।’

দেয়াল কথা বলে না।



‘ছোট্টাকুরপোর চিঠি এল বৃদ্ধা ছোটবৌ?’

কথা বলে তারা, যারা চিরদিন কলকণ্ঠ।

কৃষ্ণা চিঠির মাধ্যমে বলে, ‘আশ্চর্য নিশ্চিন্ততা তোমার নীতাদি। তোমার যে একটি বাবা আছেন, সেটা বোধকরি ভুলেই গেছ? আরও ভুলে গেছ, বাঁর ঘাড়ে তাঁকে চাপিয়ে রেখে দিয়েছ, সে ভদ্রমহিলার সংসার আছে, সমাজ আছে, ছেলেরা আছে। তিনি যদি ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, দোষ দিতে পারবে? দেশে তো ফিরেছ শুনছি, বাবার কথা আদৌ ভাবছ না কেন?’

ভাষাটার চালাকির খেলা আছে।

‘তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন’, একথা বলেনি কৃষ্ণা, ‘যদি’ দিয়ে সাফাই রেখেছে। ইন্দুনীলের অজানতে চিঠিটা লিখে পোষ্ট করে দেয় সে।

অনুপম কুটিরের আশা এখনও ছাড়েনি কৃষ্ণা। আসল কথা, মার সঙ্গে তার যেন আর কিছুতেই বনছে না, আর এদিকে বাপের তুচ্ছতাচ্ছল্য ভাবটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। ‘তাঁদের যথাসর্বস্ব কৃষ্ণারই’ একথা বতই তাঁরা মুখে জাহির করুন, যতক্ষণ তাঁরা জল-জ্যান্ত জীবিত, ততক্ষণ তো নয়?—ততক্ষণ তো এ সংসারে কৃষ্ণাদের পোষ্ট ঘরে থাকা মেয়ে আর ঘরজামাই।

তা’ছাড়া ওই কথা।

অসহ্য লাগছে মায়ের সদাসর্বদা আক্ষেপ এবং মেয়ের প্রতি দোষারোপ, আর বাবার ভীক্ষা এক-একটি ব্যাণ্ণের হুল! তাঁদের মমজ্বালা, এইভাবেই প্রকাশ পায়, কিন্তু সেটা কৃষ্ণার কাছে ক্রমশঃ মর্মান্তিক হয়ে উঠছে।



সেদিন মা আর মাসীর সফরকাহিনী শুনলে পর্যন্ত নীতাকে চিঠি লেখবার ফন্দিটা মাথায় ঢুকছিল তার। সত্যিই তো লোকটার দৃঢ়তা ভাই, ভাজ আত্মীয়-স্বজন, মেয়ে-জামাই সব রয়েছে, তবু নিলজের মত সূচিন্তা তাকে আগলে রাখবেন?

ওদিক থেকে যদি কোন সদুপায় হয়তো হোক না।

এখন অহরহ মনে হতে থাকে কৃষ্ণার, সেই তখন নির্বোধের মত অত উতলা না হলেই হতো। জগতে কত ‘প্রথম প্রেম’ ব্যর্থতার রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণারও না হয় যেত। এতদিনে তাহলে দিবা একখানি বাড়ী, গাড়ী আর মোটা আয়ে সমৃদ্ধ বরের গলায় মালা দিয়ে স্വാভাবিক সুস্থ জীবন পেয়ে বাঁচতো।

মনে হতে থাকে, সাত জন্মে কেউ যেন প্রেমে পড়ে বিয়ে না করে। বড়জোর বিয়ের আগে একটু আধটু প্রেমের খেলা করা চলতে পারে, কিন্তু সেই পলকা সুতোয় ভর দিয়ে ঝুলে পড়াটা বোকার মত চরম। বিয়ে করতে হলে বেশ

শস্ত্র একগাছা 'কাছির' দরকার। যা দিয়ে
জীবন-তরণীখানিকে বাঁধা যায়।

চিঠি পাঠিরে উত্তরের আশায় দিন-
গুনতে থাকে কৃষ্ণ।

কিন্তু নীতা কি উত্তর দেবে?

দিলে কী উত্তর দেবে?

নীতাকে আর তার সেই অন্ধ হয়ে
যাওয়া স্বামীকে দেখতে ইচ্ছে করে,
দেখতে ইচ্ছে করে নীতার এই বিয়েটা
নিতান্তই নিরুপায়তার ফাঁসে ফাঁসি-
লাগানো না, কীটপাথরে যাচাই হওয়া
প্রেমের সোনার গড়া মালা স্বেচ্ছায় গলায়
পরা? একবার দেখে আসা অসম্ভব নয়,
কিন্তু যাবার কথা তুলতে সাহস হয় না।
সাহস হয় না ইন্দ্রনীলকে নীতার কাছা-
কাছি দেখবার। নীতাকে ঠিক ঈর্ষা
হয়তো করে না কৃষ্ণ, কিন্তু ভয় করে।

এ চিঠি দিল্লীতে নীতার হাতে পড়ে,
যখন নীতা সাগরময়ের জন্যে একজন
নার্স ঠিক করে, আর তাকে ছোটকাকার
কাছে জিম্মা দিয়ে কলকাতায় আসবার
ব্যবস্থা করছে।

তাই চিঠির আর উত্তর দেওয়া হয় না।
ভাবে নিজেই তো যাচ্ছ উত্তর হয়ে। কী
আর উত্তর দেব। আর ভাবে, সত্যিই
কি সূচিন্তা পিসিমা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন,
অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন?

নীতা কি তা'হলে ভুল দেখেছিল?
ভুল ধারণা নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল? কিন্তু
তাই কি সম্ভব? তাহলে হয়তো বা এই
স্বাভাবিক। নীতাও তবে কোনদিন ক্লান্ত
হয়ে উঠবে, অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে, সাগর-
ময়ের অক্ষমতার ভার বইতে বইতে!
শিউরে ওঠে নীতা, প্রাণপণে বলে,
না না না।

ট্যাবলেটের শিশিটার ঢাকনি খুলে
উপড় করে ফেললেন সূচিন্তা, মাত্র আর
একটা আছে। আজ পর্যন্ত চলবে।
আবার আজই আনানো দরকার। আশা-
তীত কাজ দিচ্ছে ওষুধটা।

হ্যাঁ আশাতীত, ধারণাতীত।

সুশোভন ক্রমশঃই যেন ঠিক হয়ে
আসছেন। ডাক্তার পালিত বলছেন,
নতুন এই ওষুধটা চিকিৎসা-জগতে সাড়া
এনে দিয়েছে। বলেছেন নিয়মিত ব্যবহার
করে চলতে।

ফুরিয়ে গেছে ওষুধটা।

আনিয়ে রাখতে হবে।

অতএব বলতে হবে নিরুপমকে।

নিরুপমকে। যে নিরুপমের সঙ্গে
সেই রাত থেকে কোন কথা নেই
সূচিন্তার। সেই যে রাতে সূচিন্তা সারা-
রাত জেগে বসে শুধু মানুষের হৃদয়-
দৈন্যের কথা ভেবেছেন।

আজকাল আর ডাক্তারের কাছে নিয়ে
যেতে হয় না সুশোভনকে। বোধকরি
রিপোর্ট দিতে হয় ডাক্তারের কাছে, আর
সে রিপোর্ট নিরুপম নিজেই বুঝে-সুঝে
দিবে আসে, মাকে প্রশ্ন করে না।
ওষুধপত্র? সেও সময় বুঝে কোন এক
সময় এনে সুশোভনের টেবিলে রেখে
যায়।

কিন্তু এবার আর রাখবে না।
সূচিন্তা জানেন। এখনো ফুরোবার সময়
হয়নি। বেশ কতকগুলো ট্যাবলেট
সুশোভন সৌদিন ফেলে দিয়েছিলেন রাগ
করে।

বলেছিলেন 'খাবো না খাবো না।
শুনবো না তোমার ওই লক্ষ্মীছাড়া
ডাক্তারটার কথা। ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে
ও আমাকে কী যেন করে দিয়েছে। মনে
হয় আগে যেন কত আনন্দ ছিল আমার,
কত ভাল লাগতো এই সকাল সন্ধ্য
দুপুর বিকেল, কোথায় চলে গেল সেই
আনন্দ আর ভাললাগা। এখন সব সময়
যেন কী একটা কষ্ট হয়, ভয়ঙ্কর একটা
ভুলের ভাবনা, অথচ ভুলটা কোথায় ঘটছে
খুঁজে পাচ্ছি না, এসব করছে কে? ওই
ডাক্তারটা তো? ওর ওষুধ আমি ফেলে
দেব।'

সত্যি ফেলে দিয়েছিলেন বেশ
কয়েকটা।

অনেক বুঝিয়ে আর ধমকে নিবৃত্ত
করেছিলেন সূচিন্তা তাঁকে। কিন্তু
ষেগুলো গেল, সেগুলো তো গেলই।
নিরুপম জানে না এই যাওয়ার কথা। ও
আন্দাজমত সময়ে এনে কোন এক সময়
টেবিলে রেখে যাবে।

সূচিন্তাকে কোনদিন জিগ্যেস
করবে না, 'মা ওষুধটা কি ফুরিয়েছে?'

সেই প্রশ্নটুকু যদি সূচিন্তার মস্ত
একটা দাহকে শান্তিভুলে ঠান্ডা করে দেয়,
তা হলেও না। স্পষ্ট বলে না, কিন্তু স্পষ্ট
জানিয়ে দেয় সে, মায়ের সঙ্গে কথা
বলতে তার প্রবৃত্তি হয় না।

কিন্তু সূচিন্তাকেই ছেলেকে ডেকে
কথা বলতে হবে। ওষুধটা না আনালেই
নয়। নতুন এই ওষুধটার আশাতীত ফল
পাওয়া যাচ্ছে।

শিশিটা আলোর সামনে তুলে ধরলেন
সূচিন্তা। না আর একটার বেশী নেই।
নিরুপমকে বলতে হবে।

কিন্তু যদি না বলেন।

কী হয় যদি ওষুধটা আর না আসে।
হঠাৎ নিতান্ত জড়বস্তু এই ওষুধটার
উপর ভরানক একটা ঈর্ষার জ্বালা
অনুভব করেন সূচিন্তা। মাথার চুল
থেকে পায়ের আঙুলের ডগা পর্যন্ত যেন
চিন্চিন্ করে ওঠে সে জ্বালায়।

এইটাই! এইটাই তবে একমাত্র কারণ,
সুশোভনকে সেই ভয়াবহ অন্ধকারের
গহ্বর থেকে টেনে তোলবার। সূচিন্তা
কিছু নয়! কিছু নয় সূচিন্তার মান
সম্ভ্রম জীবন, আর জীবনের শান্তি!
নিজেকে ধ্বংস করে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো
করে যে ফসল ফলালেন সূচিন্তা, সে
ফসল ঘরে তুলে নিয়ে যাবে অন্য আর
একজন।

কী হয় তবে, যদি সূচিন্তা আবার
নিজে হাতে সে ফসল উড়িয়ে পুড়িয়ে
ছত্থান করে দেন?

না, মাথা হেঁট করে নিরুপমকে
গিয়ে বলবেন না সূচিন্তা, 'ওষুধ চাই।'

ওর শান্ত হয়ে আসা স্মারুতে
স্মারুতে আবার যদি বিশৃঙ্খলার চাপুল
দেখা দেয় তো দিক। সূচিন্তা নিষ্ঠুর
উল্লাসে ফিরে ফিরিতি পরীক্ষা শুরুর
করবেন সূচিন্তার প্রাণান্তকর দুরূহ
সাধনা সত্যিই মলাহীন কি না। ফেলে
দেবেন, এই শেষ ওষুধের মাত্রাটাও ফেলে
দেবেন সূচিন্তা। দেখবেন দুরন্ত বুনো
সাপটা বিষপাথ্রে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল,
না শান্ত হাচ্ছিল—সাপড়ের সুরে না
বাঁশীতে।

খোলা শিশিটা জানলার বাইরে ধরে
উপড় করতে গেলেন সূচিন্তা। আর
যেমন সহসা অন্তত একটা ঈর্ষার
জ্বালায় দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা
চিন্চিন্ করে উঠেছিল, তেমনি সহসাই
শিথিল হয়ে গেলেন। শান্ত হয়ে
গেলেন। একটা অবশ্য শিকারে 'ছিঁ ছিঁ'
করে উঠে ভাবলেন, সর্বদা পাগলের সঙ্গে
থেকে থেকে আমিও কি পগল হয়ে
যাচ্ছি?

নিরুপম আর ইন্দ্রনীলের ঘর দুটো
আর আজকাল খোলা থাকে না। ওষুধ

চলে যাওয়ার পর থেকে নতুন চাকর দিনে একবার বাড়ামোছা করে দরজা বন্ধ করে রেখে দেয় যাতে ধুলো ঢুকে আর দূর বার না তার কাজ বাড়ায়। নিরুপমের ঘরে ঢুকতে গিয়ে এই কপাট-বন্ধ দরজা দুটো খেন নতুন করে দৃশ্যমান হয়ে উঠল সুচিন্তার ভাগ্যলিপির ইসারা বহন করে।

দুটো দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। পাশের ওই আধভেজানো দরজাটাও হয়তো কোন দিন আস্তে আস্তে পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে যাবে।

তবু এখনো আধভেজানো আছে।

সাহস করে ঠেলে ঢুকতে পারলে ঢোকা যায় এখনো।

সুচিন্তা সাহস করলেন।

আস্তে আস্তে ঠেলে ঢুকে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'নিরু আছে?'

যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করেও গলাটা নিজের কানেই কেমন অস্বাভাবিক ঠেকলো সুচিন্তার। লজ্জা পাবার মত কাঁপা কাঁপা অস্বাভাবিক।

কিন্তু করবার কি আছে।

দেহবস্ত্রের সব কিছুকে কি সব সময় আপন আয়ত্তে রাখা যায়?

নিরুপম বই থেকে মুখ তুললো।

সুচিন্তার মনে হল এঘরে একটু বসেন।

কিন্তু নিরুপম তো বলবে না, 'একটু বোসো না মা।'

কোন দিনই বলে না, 'আর আজ বলবে? কিন্তু নাই বা বলল? নিজের ছেলের ঘরে, নিজেই যদি বসে পড়েন সুচিন্তা, বলার অপেক্ষা না রাখেন, ক্ষতি কি?'

সুচিন্তা যেন মনের শক্তিকে কাজে লাগিয়েই বসে পড়লেন। বললেন, 'ওখুঁটা আনতে হবে, ফুরিয়ে গেছে।'

নিরুপম এ প্রশ্ন করল না, 'সে কী এখনি ফুরিয়ে গেল কেন?' বলল না 'এখনি তো যাবার কথা নয়।' শুধু বলল 'আজ্ঞা।'

ওর চোখে কোন প্রশ্ন ফুটে উঠল কি না সুচিন্তা-টের পেলেন না।

কিন্তু সুচিন্তা চাইছিলেন প্রশ্ন ফুটে উঠুক। একটা কিছু বলুক ও।

সেই বলার পথ ধরেই সুচিন্তা কথা বলবেন। কাজের কথা নয়। দরকারি কথা নয়, শুধু কথা।

সারা জীবন কথা না করে করে হাঁপিয়ে উঠেছেন সুচিন্তা। যে সুচিন্তার ছেলেবেলায় বিশেষণ ছিল 'কথার ভটচাষ।'

নিজের সমস্ত কথাকে 'সীল' করে ফেলেছিলেন সুচিন্তা ভাগ্যের উপর অভিমানে, জীবনের উপর অভিমানে।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে 'কে দিল সেই অভিমানের মূল্য, কে বদল সুচিন্তাকে?' তবে কেন সুচিন্তা এখনো চুপ করে থাকবেন? সুচিন্তা কথা বলবেন।

হয়তো বলবেন বলেই বন্ধপরিষ্কার হয়ে এসেছেন। তাই বলেন, 'ওখুঁদে ফুরোলে আবার আনবার আগে ডাক্তারকে রিপোর্ট দিতে হয়?'

'রিপোর্ট' প্রত্যেক সপ্তাহেই দিতে হয়।'

বইতে চোখ রেখেই বলে নিরুপম।

'কই কোন দিন তো কিছু জিগ্যাস কর না?'

'জিগ্যাস করবার কি আছে? দেখতেই তো পাওয়া যায়।'

এরপর আর কি বলবেন সুচিন্তা?

তবু বললেন, 'ওখুঁটা তো এখনি ফুরোবার কথা নয়; ফুরোলে কেন সে কথা তো কই জিগ্যাস করলে না?'

'অত হিসেব করবার সময় কার আছে?' নিরুপম ফের বইতে ভাল করে চোখ ফেলে।

'তা বটে। তোমাদের সময় মূল্যবান।'

সুচিন্তা ছেলের মূল্যবান সময় আর নষ্ট না করে চলে আসেন।

ভাবলেন তিনি কি চেষ্টা করেননি কোন দিন?

বারে বারেই তো চেষ্টা করেছেন আলো জ্বালাতে। কিন্তু ভাগ্যের বণ্ডনায় সে আলো যদি জ্বলে না ওঠে, যদি 'নিভে যায় বারে বারে', তবে সুচিন্তা কি করবেন। নিজের সমস্ত কথা নিজের

মধ্যেই বন্ধ রাখতে হবে, সুচিন্তাকে। কেউ শুনবে না তাঁর কথা।

কিন্তু যদি কেউ শুনতে চায়? না, সেটা অপরাধ। সেটা নিন্দনীয়।

এ-ঘর আর ও-ঘর।

দুটি মাত্র ঘরে মানুষের পদধ্বনি আজও আছে, হয়তো আর থাকবে না। নিখর হয়ে যাবে অনুপম কুটির।

'ও-ঘরে' এসে বসলেন সুচিন্তা খবরের কাগজখানা হাতে করে। বসলেন চেয়ারটা টেনে।

'তুমি আমার এত কাছাকাছি বসছো কেন সুচিন্তা? এটা তো নিয়ম নয়।'

গম্ভীর ভাবে যেন জিজ্ঞাসা রান্না দিলেন সুশোভন।

খবরের কাগজখানা হাত থেকে পড়ে গেল সুচিন্তার। ভয়ঙ্কর একটা আহত বিস্ময়ে পাগলের মতের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে বললেন, 'নিয়ম নয়! কে বললে নিয়ম নয়?'

'আমিই বলছি।' সুশোভন নিজের চেয়ারটাই একটু টেনে নিয়ে সুচিন্তার থেকে বেশ খানিকটা দূরত্বে সরে গিয়ে বলেন, 'আমরা এত রুঢ় হয়েছি, আমাদের আবার বলবে কে?'

সুচিন্তা বরফের মত ঠান্ডা হয়ে যাওয়া গলায় বলেন 'রোজই তো আমি এই চেয়ারটায় বসে কাগজ পড়ে শোনাই তোমায়।'

'আর বসবে না।'

আরও গম্ভীর হন সুশোভন।

'হ্যাঁ বসবো। রোজ বসবো।'

সুচিন্তা যেন লাঠির আগ্রা ডুরিরে পরীক্ষা করে দেখতে চান নদীর জল কতখানি গভীর। অথবা আদৌ সেটা জল কি রোদে চকচকে বালির আস্তরণ।

'হ্যাঁ বসবে? রোজ বসবে? সুচিন্তা তুমি পাগল না কি? দেখতে পাও না তোমার এই পাগলামীর জন্যে তোমার ছেলেরা সবাই রাগ করে করে চলে গেল।'

সুচিন্তা নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে দৃঢ়ম্বরে বলেন, 'আবার ও কথা বলছ?'

সৈদিন না তোমার বললাম ওরা বিদেশে চাকরী করতে গেছে।

‘না, তুমি ভুল বলছ।’ অবশ্য জেদের সঙ্গে বলেন সুশোভন, ‘তোমার সেই ছোট ছেলেরি তো যারনি। তাকে আমি দেখেছি। সেই যে সৈদিন এল। আর তার বোও এল। আমি তোমার কাছে দাঁড়িয়ে আছি বলে রাগ করে চলে গেল তারপর।’

সুচিন্তা তেমন ভাবেই তাকিয়ে থেকে বললেন, ‘বেশী কথা না তোমায় বলতে যারণ করছি?’

এ কথায় পূর্ব স্বভাবমত রেগে উঠলেন না সুশোভন। বলে উঠলেন না, ‘তোমার যারণ আমি শুনলে তো?’ শব্দ স্নানভাবে বলেন, ‘বেশী—বেশী কথাগুলো বে মাথার মধ্যে হুড়োহুড়ি করে। না বলে থাকবো কি করে? কত ভাবনা, কত কথা! ভেবে ভেবেই তো বুঝতে পারছি ভুলটা কোথায়।’

‘বুঝতে পারছ? খরে ফেলেছ ভুলটা কোথায়?’

সুচিন্তা পাথরের মত মূখে প্রশ্ন করেন।

সুশোভন আরও স্নান মূখে বলেন, ‘জানি তুমি রাগ করবে। কিন্তু রাগ করলে চলবে কেন সুচিন্তা? আমরা যে বড় হয়েছি, আমাদের তো সব বুঝতে হবে।’ মুখটা গম্ভীর করেন সুশোভন।

হঠাৎ সুশোভনের সেই মুখটা যেন পেশী ঝুলে-পড়া এক বস্ত্রের মতের মত দেখতে লাগে। সুশোভনের যে বরেন্দ্র হয়েছিল, মুখ দেখে কি কোনোদিন মনে পড়তো?

হাস্যোন্মাসিত সেই তাজা মুখখানা তা’হলে চিরদিনের মত হারিয়ে ফেললেন সুশোভন? এই পেশী ঝুলে পড়া শিখিল মুখটাকে গম্ভীর করে বসে কেবল তা’হলে এখন ভাবতে থাকবেন ডিম্ব, কি নিয়ম, আর কি নিয়ম নয়!

কিন্তু এই তো চেয়েছিল সবাই। চেয়েছিলেন সুচিন্তাও। এর সাধনাতাই তো সুচিন্তা বসে বসে তাঁর সর্বস্ব উৎসর্গ করছেন, জীবনের সর্বকিছুর আহুতি দিচ্ছেন সেই সাধনার হোমকুণ্ডে।

তবে সুচিন্তা অমন নিখর হয়ে যাচ্ছেন কেন?

সাধনার সিঁথিলাভ করলে কি কেউ সেই সিঁথির মূর্তি দেখে স্তম্ভ হয়ে যান?

সুচিন্তা কি সৃষ্টিছাড়া?

তা শব্দ সুচিন্তা নয়, সংসারে এক-আধটা তেমন সৃষ্টিছাড়া মানুষও থাকে বৈ কি। নইলে অশোকা কেন বলে বসবে, দিল্লী বাবো? পাগলতো হইনি।’ কিন্তু কেন বলল? এ সংসারে তো অশোকের অহরহ দম কন্ড হয়ে ওঠে। সমস্ত প্রাণ এখান থেকে মুক্তির জন্য আহুতি দিতে চায়।

সুবিমল এসে বললেন, ‘দু’ চারদিন হয়েছে এসে না ছোট বোমা। কখনো তো কোথাও যাওয়া হয় না।’

অশোকা মৃদু হেসে আস্তে বলল, ‘সে যখন মেজদা ভাল ছিলেন, চারদিক ভাল ছিল, তখন যাওয়া হতো তো আলাদা কথা!’

সুবিমল একটু চুপ করে থেকে বললেন, ‘কিন্তু মোহন মনে হয় ওখানেই সেটল করতে চায়। কলকাতায়তো এবার কিছুর হলো না।’

কোনখানেই কখনো কিছুর হবে না বড়দা।’ বলে মাথা নীচু করে হাসে অশোকা।

‘আমার ভাইটাকে বাবু, তুমি বড় বেশী হেনস্থা করো। এমনও তো হতে পারে, এখন ওর মধ্যে কোন চেষ্টা এসেছে।’

‘এলে থাকে সে তো খুবই সুখের কথা বড়দা।’

‘আমি ভাবছিলাম,’ সুবিমল বলেন, ‘তোমরা ওখানে থাকলে ভবিষ্যতে শোভনকে হয়তো নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হত না।’

‘কিন্তু তাঁরতো এখানে বেশ ভালই আছেন।’

সুবিমল একটু হেসে বলেন, ‘তা আছে। তবে ‘ভাল থাকটা’—সংসারের ন্যায়-নীতির অঙ্ক না মিললে, শেষ পর্যন্ত ফল ভাল হয় কিনা সেটাই আজ পর্যন্ত বিচার হয়নি। যাক, দেখা যাক।’

‘কিন্তু আমাকে কি আপনি যেতে বলছেন?’

সুবিমল মৃদু হেসে বললেন, ‘প্রশ্নটা বড় সাংঘাতিক করলে মা। তুমি চলে যাওয়া মানেই তো বাড়ীর আলো নিভে যাওয়া, গান থেমে যাওয়া, তবু স্বার্থ-বুদ্ধি ত্যাগ করেই বলাই, সংসারে বোধহয় মাঝে মাঝে ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। এর থেকে ক্ষেত্রবিশেষে আত্মবিশ্বাস আসে, আত্ম-অহমিকা যোচে, আর, একত্রে পাকচক্রে বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে মনের উৎকর্ষ ঘটে। মোহনের চিঠি পড়ে, আমার এই ধারণাটা দৃঢ় হ’ল।’

অশোকা চুপ করে থাকে।

অশোকা চুপ করে শব্দ ভাবে।

সুমোহনের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বিকাশ দেখা দেবে, এমনও সম্ভব? তা’ যদি হয়, তা’ হলে বলতে হবে দিল্লীর বাতাসে যাদু আছে।

কিন্তু অশোকেরও কেন এই এতদিন ধরে একত্রে থাকতে থাকতে সুমোহনের বাতাস লেগে গেছে, তাই ওর মনে হয়, ‘থাক না, কি দরকার আর ব্যবস্থার পরিবর্তনে? চলে তো যাচ্ছে। ভাবে শব্দ সুবিমলই যে তাকে ভালবাসেন, তা’ নয়, মায়ালতাও তো কম ভালবাসেন না।

—হ্যাঁ অশোকের বিশ্বাস স্ত্রীতে মায়ালতা তাকে ভালবাসেন।

মায়ালতাকে অশোকা বোঝে।

বোঝে বলেই হয়তো জীবনের এতগুলো দিন এমনভাবে কাটিয়ে দিতে পারল সে। সংসারের এই বুদ্ধিহীন লোকগুলোই তো বুদ্ধিমান লোকদের পায়ের বেঁড়ি।

সত্যিই যদি অশোকার চলে যেতে হয়, হয়তো মায়ালতার জন্যই তার মন কেমন করবে বেশী। অপটু আর অসহিষ্ণু মানুষ্টা অসহায় হয়ে পড়ে কতটা কষ্ট পাবে, সে তো আর অশোকের অজানা নয়।

(কুমারঃ)

ওস্তাদ মসীদ খাঁর কৃতী ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত অমূল্য গ্রন্থ

তবলা শিক্ষা ও সংস্কৃতি

দেবপ্রী সাহিত্য নগর

৫৭১, কলেজ স্ট্রীট, কলি—১২

জার্মান কবিতা :

তত্ত্বময়তা ও প্রাচুর্য (২)

শিল্পের তারিফ পেলেও হোম-স্পেরলিন গোর্বের অন্তরংগ গোষ্ঠিতে ঠাই পাননি, যে-গোষ্ঠির সভা অবশ্য ছিলেন মাত্র দুইজন—গোর্বের ও শিল্পের। তথাপি এই তিন কবি কেই, তাঁদের ব্যক্তিগত ও চিন্তার নানান প্রকট ভিন্নতা সত্ত্বেও, একটি বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাঁদের কাব্য-প্রকৃতির কোনও সন্দেহের ছেঁতে। সে-ভাবে, শেষপর্যন্ত, গ্রন্থের ও বিন্যাসের, শব্দের ও প্রসঙ্গতার। কাব্য-চিকীর্ষার অমিত শক্তি এঁদের সदैব সৃষ্টিশীল না-রাখলেও এবং কল্পনার অনাচারে বিপথে বা উন্মার্গে যাওয়ার সাক্ষ্য এঁদের মধ্যে নেহাত কদাচিৎ না-হলেও, এঁদের রোমান্টিকতা ধ্বংসাত্মক কোনও বাহ্যিক চিত্তাকর্ষক বলে কাছে টেনে নেয়নি। প্রলয়কে বরণ করেনি। ‘প্রতীচী-প্রাচ্য দীবান’ (‘ডেস্ট-ওয়েস্ট-লিখের দিভান’)—এ গোর্বের প্রলয়-প্রলয় করে হাহাকার করে প্রাচীন্মুখে ধারমান যদি বা শান্তির সম্মানে, তবু পরিশেষে :

ঈশ্বরের প্রাচী,
ঈশ্বরের প্রতীচী;
উত্তরের, দক্ষিণের দেশ যত
তাঁর হস্তে শান্তিতে আশ্রিত।
(ভালিসমানে : করচ)

শিল্পের ‘ঘন্টার গান’ রূপক-ব্যবহারে অতি-রোমান্টিকতা দেখায় নিঃসন্দেহে। একটি ধাতব ঘন্টা, কিন্তু কী সজাগ করেছেন শিল্পের তাঁকে! কবিতাটির শীর্ষফলাকে, জাতি-বাণী ‘ভিডস ভোকো। রুড’ অস. ‘প্লাগো।’ ফুলগুরা ফাগো * বলে : ‘আমি জীবনতদের ডাকি, মৃতদের জন্য শোক করি, বিদ্যুৎকে ডাঙি!’ ‘নগণ্য পার্থিব জীবনের থেকে অনেক উঁচুতে, স্বর্গের সুনীল চত্বরে, বজ্রের প্রতিবেশী হয়ে, তারকাদের রাজ্যের কিনারায়’ দুলবে ঐ ঘন্টা! কিন্তু তবু এই অপরূপ, রোমান্টিক রূপক-ঘন্টা, এর

* চমৎকারী বাণী : তবু এর উৎস সত্যি অকিঞ্চকর! জার্মান কবিতার অক্সফোর্ড সঙ্কলনের সম্পাদক ফ্রীদলর সাহেব জানিয়েছেন যে উক্ত জাঁপি আসলে শ্যাউফহাউসেনের বিখ্যাত গীর্জা-ঘড়িতে খোদাই-করা। — Das Oxford Buch Deutscher Dichtung, 1952. Ahmer-Kungen, P. 593.

ইউরোপীয় সাহিত্য সারি-ক্রম

সার্থ-বাহ

ধাতু পর্যন্ত সংঘম ও দাত্য-শান্ত এক নৈতিক, লাভ করে শিল্পের হাতে :

তবে তা’ যেখায় কঠিনের সাথে কোমলতা, শক্তির সাথে মেশে এসে নম্রতা,— সেখা সজাত একটি মহৎ ধর্ম।

(‘দাস লিড ফন দের প্লোকে’ : ঘন্টার গান)

হোম-স্পেরলিনের কবিরা ‘আত্মিক’ (গাইস্টিগেন) যদি বা, তবু জাগতিক (ভেস্তলিখ)।

নৈরাজ্য নয়। এঁদের কবিতায় ধরা থাকে, শেষপর্যন্ত, প্রলয়ের অপর দিক—সৃষ্টি, স্থিতি ও শান্তির সনাতন বিশ্ব-রূপ, যাকে এক কথায় বলা যায় ‘লিবেস-কসমস’। আধুনিক জার্মান কবিতা উক্ত ছবি বিস্মৃত হয় না একেবারে। কিন্তু বিংশশতকী সাহিত্যের অঙ্গনে পূর্ণতার স্থিরচিত্র অবশ্যই বিপর্যস্ত ও বেপথু। জ্ঞানকে বিশ্বাসের কাছে বিড়ম্বিত হতে হয়, বিশ্বাসকে সইতে হয় বোধের ঝুঁক-মারি এবং প্রতিষ্ঠিত মূল্যদের প্রায় সব-গুলিকেই নিয়ে টানাছেঁড়া শুরুর করে আমাদের সর্বসহা ও সর্বনাশী বিংশ-শতক। তাই গোর্বের-শিল্পের-হোম-স্পেরলিনের সারগর্ভতাই এক হিসাবে তাঁদের কবিতাকে দুর্য্যস্ত ও নির্দিষ্ট অন্যরাজ্য-রূপে দেখান বিংশশতকী আধুনিকদের, যাঁদের কাছে পরবর্তী যুগের (জার্মান রোমান্টিক যুগেরই ‘প্রতিবিহিত’ দ্বিতীয় অংক এই যুগ, যাঁতে গোর্বীয় স্থিরত্ব ও পূর্ণতা আক্রান্ত হ’ল রোমান্টিক আতিশয্যের দ্বারা) বিহবলতা ও অনিশ্চিত মোটেই অনর্থক ঠেকল না।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ে জার্মান রোমান্টিকতা নৈতিপ্রাধান্যে ভুগেছিল সম্যকভাবে। চিন্তার প্রেরণায় নয়, ইন্দ্রিয়গত কোনও আবেশেই এ-সময়ের কবিদের ধাতস্থ দেখা যায়। বস্তুতঃ যে-বিশেষ ছোপ গীতি-কবিতায় এঁরা ধরিয়েছিলেন তা’ ভাবনার প্রতিযোগী অনুভূতিরই। এঁদের কবিতার স্বরূপ নিশ্চিত করে তাই জার্মান ‘গেফ, হুৎস-

লিরিক’ বা ‘অনুভূতি-কাব্য’। ছন্দ, পরি-বেশ, আবেগ, বাচন ও চিত্তকম্প—সব কিছুতেই ‘গেফ, হুৎসলিরিক’ পূর্ববর্তী কাব্যের প্রেক্ষিতে যেন বামপন্থার নিদে’শক।

নতুনতর কিছু উপলব্ধি, অধি-কাংশেই বিবাদজনক ও নৈতিবাচক, এই উগ্র রোমান্টিকতার আয়ত্তে এসেছিল। কল্পনার আদলও পাণ্টে গিয়েছিল। লোকগাথার দৃষ্টান্তে রচিত একটি তৎকালীন বালাদের কাহিনীতে হৃদয়গত বিষয়ের অবতারণা তাই কেমন মানানসই হয়ে ওঠে। ফ্রেমেন্স ‘ব্রেনভানোর কবিতায় কুহকিনী লোরেলাই মৃত্যু-ইচ্ছা পোষণ করে, অনুতাপ ও বিষাদে ভরা তার মন :

আঁখিদুটি মোর অগ্নিশিখা
বাহুলতা যেন যাদুকৃতি—
ঠাই দিক মোরে অগ্নিশিখা!
ভস্ম করে দাও যাদুকৃতি!.....

আর বেঁচে থাকা ঠিক নয়,
আর কাঁরে বাসি নাক ভালো,
দাও প্রভু, মৃত্যুর আশ্রয়.....

(‘লোরেলাই’)

দুঃখের সন্ততি বলে কবিতাকে স্পষ্ট চিনে নিলেন কেউ (য়ুস্টিনুস কেরনর : ‘পোয়েসিস’), দুঃখই শূন্য সত্য, জানলেন কেউ বা (প্লাতেন : ‘ভেনেদিক’); অপর কেউ তিমিয়ার লুপ্তি চাইলেন জীবন-যন্ত্রণার (লেনাউ : ‘বিতো’) এইমতো রোমান্টিক অশান্তি ও দৃষ্টিভ্রান্তাগার ব্যাপক ও ধারাল অভিব্যক্তি মিলল হাইনের কবিতায়—

আমার দুঃস্তর দুঃখদের
নিরে রচি ছোট ছোট গান
(‘লিরিশেস ইন্ডেরমেদজো’ ৩৬)

এই দুঃখবোধ, অনচ্ছ এবং হয়ত সর্বাংশে সকারণও নয়, রোমান্টিক কবিতাকে চিরকাল দানা বাঁধায়। হাইনের ক্ষেত্রে তাই এক প্রায়-প্রতীকী নিশ্চয়তা এসে জুটেছিল অনুভবের বর্ণে :

নির্জন, রাগিময় সমুদ্রে বসতি
পেতেছে একটি যুবাজন, তার ঠাসা
বিষাদে হৃদয় আর সন্দেহে মগজ,
সে শূন্য উর্মির পান্থ ওষ্ঠ নেড়ে
(‘দি নদসে’ ৭—‘ফাগেন-জিডাসা’)

এ যুবীর প্রশ্নগুলি মর্মস্পর্শী : মানুষের অর্থ কী? কোথা থেকে এসেছে সে? যাবে কোথায়? আপাতঃ আধ্যাত্মিকতা প্রশ্নগুলিতে, তবু ঐ নিঃসঙ্গ সমুদ্রতীরী স্পষ্টতই ভাবাবেগে বিচলিত। শূন্য,

অন্ধকার সাগরে বিশৃঙ্খল উদ্ভিদের কাছে জবাব খুঁজছে যে, জ্ঞানের স্থিরত্বও তার বিশ্বাস কম। সমস্ত আয়োজনটাই রোমান্টিক উৎকর্ষের এক মূখচ্ছবি। তাই, প্রশ্নগুলির উত্তর আসে না প্রকৃতির কাছ থেকে : কলম্বরে ছুটে চলে ঢেউ, হাওয়া বয়ে যায়, মেঘ ধায়, নক্ষত্রেরা জ্বলাতে থাকে উদাসীন আর ঠান্ডা। অতএব অটুট থাকে বাধা ও উদ্বেগ; 'উত্তরের অপেক্ষায় যে-থাকে সে একটা পাগল'।

হাইনের 'জিঙ্কাস' ক্লাসিকল' প্রকৃতিকে দূর, কৃপণ ও নির্লিপ্ত দেখতে পায়। জীবন-রহস্যের কিনারা করবে কে তবে? আরও অসহ এই নিঃসাড় নিয়তি, কারণ সমুদ্রচারী ঐ জিঙ্কাস, ব্যক্তিটি যথেষ্ট-বয়স্ক কোনও অভিজ্ঞ, পরিপক্ব মানুষ নয়, সে এক যুবজন। ('য়ুগাও লিঙ-মান')। রোমান্টিক যন্ত্রণা তারই প্রাপ্য এবং উপভোগ্যও বটে। অন্ততঃ হাইনের আন্তরিক আস্থা ছিল যৌবনের শক্তিতে ও বিহ্বলতায়। চাপল্য বা বিক্রম, দু'য়ের কোনওটি যদিও হাইনের কবিতায় (বা জীবনে) যৌবনদত্ত ব্যবহার হিসাবে পরিপুষ্ট হয়নি, তবু একথা-ঠিক-যে জার্মান রোমান্টিকতার সমগ্র গানটিতে অন্তরার মূর্তি যৌবনের রেখায় সম্পন্ন। বলাই বাহুল্য, যৌবনের বিস্ময়বোধ, হৃদয়তা ও সাহস রোমান্টিক বেগবস্তার পিছনে শক্তি। হাইনেকে তাই দেখা যায় স্পষ্টভাবে যৌবনের স্থায়ী কামনা করতে; বক-বক-করা বড়ো ('আলতের পলাতের') হ'তে একেবারেই প্রস্তুত ন'ন তিনি* চোখের সামনে লেখক বা কবির রচনায় বার্ষিক্যের সঞ্চার লক্ষ্য করা তাঁর কাছে দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা, যদিও যৌবনের অপসরণ ঠেকাতে ক'জনই বা পারেন! হাইনের মতে, তা পেরেছিলেন যদি গোয়তে, পারেননি স্লেগেল, পেরেছিলেন যদি খামিসো, পারেননি তিক।

যৌবনের সুখ, দঃখ, স্বপ্ন, হতাশা, বিচার, বিক্রম ইত্যাদি নানা আন্দোলনে প্রাণময় যে জার্মান রোমান্টিক কবিতা, তা' অনিবার্যভাবে প্রেমের অশ্বৈতে যথেষ্ট আস্থা রেখেছিল। হাইনে ও তাঁর সমসাময়িক, এদুয়ার্দ মোয়রিকে এই প্রেমোদ্রিত কাব্যে বোধ, আঙ্গিক ও উপজীব্যের বিস্তর ঐশ্বর্য উন্মোচিত করলেন। একাধারে বিষয়, উদ্ভাস

প্রেমাতুর ও বিদূষপ্ৰবণ, হাইনে ('সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একজন প্রিয় পশ্চিমা, যার কবিতা, শেক্সপীয়র-সনেটগুলির পর, বাঙালী কবি সবচেয়ে বেশী অনুবাদ করেছিলেন) রোমান্টিকতার গোয়তে-কথিত 'ব্যাদি'তে ভুগেছিলেন বেপারোয়া-ভাবে, আর স্বাধ্বের জন্য আকুল না-হলেও আরোগ্য ও আয়ুর কামনায় দিনপাত করেছিলেন প্রেমের বরাভয় ফিরে-ফিরে পেয়ে। হাইনের অশান্তি সমানে জটিল ও ক্ষুরধার। প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় যেমন ব্যগ্র ও অটল তিনি, তেমনই তা'র ফল তাঁকে বিপ্রলব্ধ করে, তা'র প্রাপ্তিযোগে তেমনি ব্যাহত তিনি। দেশত্যাগী তিনি, কিন্তু স্বদেশ : তা'র মাটি, গাছ, ফুল আর ভাষা তাঁর স্বপ্নের অমরা। আবার, তবু দেশপ্রেম বা ঐতিহ্য-প্রশস্তি তাঁর ধাত্রে একেবারেই সয় না। চাঁদ, সমুদ্র, রাত্রি, স্বপ্ন, কুমারী মেয়ে, আকাশ, মে-মাস, ঝড়, সুখ—এসব শুধু তাঁর কাব্যের পুনরাবর্তিত উপাদান নয়, এদের অনেকেই তাঁর চিত্তলোকে প্রত্যক্ষে আহত, উদ্ভিষ্ট প্রোত্বর্গ। কিন্তু তবু এদের নিয়ে মিল গড়াও সম্ভব নয়, সন্তোষের কোনও আস্তানায় ওঠাও সম্ভব নয়। এরা আর হাইনে কেবল এক ফারাকের প্রতিচ্ছায়া। কেবল রোমান্টিকতার ধ্বনি, প্রতিধ্বনির জন্য কান পাতলে শোনা যাবে। অসার্থক ও মৎসরী হাইনে সন্দেহের ধ্রুবপদই গেয়েছেন। এখানেই হাইনে আধুনিকতা-সংক্রামিত; বাসন্ত বিষাদে-ভরা রোমান্টিক সৌন্দর্যের সঙ্গে, যেমন ভেগ'র হাইলমান বলেন, হাইনের কবিতায় মিশে যায় নতুন এক যুগের হতাশ সন্দিগ্ধতা। যে-হাইনে সমুদ্রকে 'সৌন্দর্যের মাতা', 'প্রেমের মাতামহী' ('স্তূর্ম' : ঝড়) বলেন, তাঁকেই লিখতে হয় :

আশা আর প্রেম! টুকরো টুকরো ভেঙ্গে
যায় সব!

আর আমি, যেন এক শব্দেই,
রাগতঃ সমুদ্র যারে ছুঁড়ে-ফেলেছিল,
শূন্যে থাকি বেলার উপর,
শূন্য, নগ্ন বেলার উপর।

(গীদ নর্দসে—'দোরশিফরুখিগে' :
নিমজ্জিত)

হাইনের নিটোল কাব্যিক অনন্ডবেও বিচক্ষণ আধুনিক সমালোচনা ক্রটিমতার ছাপ দেখেছে এবং গোয়তে-শিলর-হোয়লেন্দারলিনের পর হাইনেকে শ্রেষ্ঠ উনিশশতকী জার্মান কবি বলতে জার্মান সমালোচকরা অনেকেই এখন সম্মত হন। যখন হাইনের পরিবর্তে এদুয়ার্দ মোয়-

রিকেকে তাঁরা উক্ত মর্যাদা দেন, তখন অন্ততঃ এটুকু মানতে হয় যে আরেকজন নিঃসংশয়ে দক্ষ ও সর্বথা পঠিতব্য (এবং তদনুপাতে অবহেলিত) উনিশশতকী কবির সমাদর কালক্রমে সম্ভব হচ্ছে। আরও যে এই মোয়রিকের কবিতার অর্থ, বুননে ও চণ্ডে আধুনিক কবিতার অঙ্গীকার বিস্ময়করভাবে জ্ঞাত। হৃদয়-তল্লাশে হাইনের মতোই অনলস, মোয়রিকে যেন আরো নির্বিড়। এবং সে-নির্বিড়তার মূলে উনিশশতকী ভাবা-বেগের চেয়ে বেশী যেন বুদ্ধিবৃত্তি। মোয়রিকের একটি কবিতা, 'কুমারীর প্রথম প্রেমগীতি' ('এস্টেস লিবেসলিড আইনেস ম্যাদখেনস')-তে রূপক-ব্যবহার এমন সজীব ও সর্ববিশ্ব যে এ যুগের একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ কবিতাটিকে অবচেতনের মনস্তত্ত্বে দস্তুরমতো শিকিত মনে করেন। বস্তুতঃ, নিছক হৃদয় থেকে মনে, হৃদয়-তল্লাশ থেকে মনস্তত্ত্বে, প্রবেশ করার ক্ষমতা মোয়রিকের নিজস্ব। এছাড়া, অবশ্যই কাব্যের অন্যান্য ধর্ম, যাদু ও প্রসাদ মোয়রিকের কবিতায় পর্যাপ্তভাবে বর্তমান। তাঁর উপন্যাস 'মালের নলতেন'-এর নায়ক হৈনির মতো মোয়রিকে রোমান্টিকতার ঝড়ো হাওয়ায় সর্বসঙ্গে শিহরিত, এবং, পরিশেষে, প্রেমের ছাউনিতে আশ্রিত; কিন্তু অভিব্যক্তিতে তিনি যে-প্রসর ও ভীততা আয়ত্ত করেছিলেন তা' যেন যুগ-শিক্ষার পরিসীমা ছাপিয়ে গেছিল। মোয়রিকের আঁকা একটি চিত্রে হাস্যমুখে একটি লোক তাঁর বুক-চিরে হৃদ্যপাণ্ড দেখাচ্ছে : মনে হয় এইমতো কোনও তুখোড় আত্মবিদ্বেষ ও আন্তরিকতা একাধারে মোয়রিকের কবিসত্ত্বকে ধারণ করেছিল। এবং এই জাতীয় বৈদগ্ধ্যই আধুনিক মনে তাঁর প্রবেশ সহজসাধ্য। তাঁর 'পেরোগ্রনা' শীর্ষক প্রেমের কবিতা থেকে একটি নিম্নোক্ত অংশে মোয়রিকের অসামান্য কাব্যের ষষ্ঠিকণ্ঠ পরিচয় :

একদা পবিত্র এক প্রেমের চান্দ্র কুঞ্জবনে
এসে ঢুকেছিল একটি বিভ্রম।

বেপথদূরীর আমি চিনেছিলাম

বহু বরষের ছজনাকে।

আর, চোখে অশ্রু নিয়ে বীভৎস তবুও
সে মামাকুশাঙ্গী অনুঢ়াকে
হেঁকে বলিছিলাম চ'লে যেতে
আমা থেকে দূরে।

হায়, তা'র উন্নত ললাট
নত হয়েছিল, সে-যে ভালবেসেছিল

আমাকেই;

* Buch der Lieder: Heinrich Heine. Wilhelm Goldmann Verlag. 1957. এই সংস্করণে সন্নিবেশিত 'Vorrede Zur Zweiten Auflage von Heinrich Heine, 1837'. দ্রষ্টব্য।

তবু সে গৌছিল চলে মৌনের সাহিত্য
সোজা বাঁহরের
শাদা বিশ্বলোকে।

(‘গেরোগ্রিনা’ ৩)

মোয়রিকের জার্মান কবিতার পরি-
ণতি প্রামাণিক এবং সে-পরিণতি প্রকৃত-
পক্ষে অতিক্রান্ত হয়েছিল বিংশশতকী
সেতফান গেরগের প্রতিভাতেই। কিন্তু
মোয়রিক ও গেরগের মাঝখানে বেশ
কয়েকজন জার্মান কবির সার্থক
অবস্থিতি। এদের মধ্যে মাইয়র ও
স্পিতেলরকে যদিবা কবি হিসাবে একটু
বেশী মাত্রায় জানপাখী মনে হয়, মৌলিক
গীতিকাব্যে একনিষ্ঠ তেওঁদের স্তম্ভের
কবিষে রোমান্টিকতার যাদু ঠুনকো নয়।
আর স্তম্ভের স্বপ্নের মতো পড়ে থাকা
কীপগুলির মারা কাটিয়ে, আমরা আরো
দুজন কবির রাজ্যে গিয়ে আটক হবই।
ফ্রীদরিখ নীতশে ও আরনো হোলৎস।
জার্মান কবিতার দার্শনিক নীতশের
অবদান মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। ‘এক
হোমো (মানুষকে দেখো) কবিতায়
আবেগান্বিত নীতশে হাইনের উত্তর-
পুরুষ, কিন্তু তাঁর আবেগের মর্ম যেন
উন্নততর :

আলো সব কিছুর আমি ধরি,
অগার সব যা ছেড়ে যাই
আমি শিখা অবিসংবাদী।

সরল, তবু আশ্চর্য সম্ভ্রম নীতশের
জার্মানে। উপলব্ধির নিষ্ঠা, ধার ও
উদ্ভাস। ‘আলসো স্প্রাথ ওসরাভুস্ট্রা’
(ওসরাভুস্ট্রা এই মতো বলাইছিল)-র
উপসংহারে নীতশে বলেন :

“আমাকে গেয়ে শোনাও এখন সেই
গান, যার নাম ‘আরো একবার’, যার
অর্থ ‘অনন্ত’—গাও, হে উন্নততর মানব,
ওসরাভুস্ট্রার গোল-হয়ে-গাওয়া গান!

হে মানব, করো অবধান!

কী বলে গভীর মধ্যরাত?

যুমিয়েছিলাম, আমি যুমিয়েছিলাম,
গভীর স্বপ্নে উঠেছি জেগে,

জীবন গভীর,

দিবস জার্মেনি তারে এমতো গভীর।

গভীর পরিভাপ তাঁর,

আনন্দ—গভীর আরো হৃদযাতনার চেয়ে;

খেদ বলে : চলো! চলো!

তবু সর্ব আনন্দ কামনা করে অনন্তকে,
গভীর, গভীর অনন্তকে।

কবিতার রূপ বা ফর্মের সম্বন্ধে
উনিবিংশশতকী প্লাতেন ও নোভালিস
অনুসন্ধিৎসু ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু

আঙ্গিকগত কোনও প্রকট বৈচিত্র্যের তাঁরা
সম্মান করেননি। এ জাতীয় বৈচিত্র্য
যাঁর কবিতার প্রস্ফুট, তিনি আরনো
হোলৎস (মৃত্যু ১৯২৯)। হোলৎস
কবিতায় ছন্দ, মিল, অর্থালংকার, এমনকি
ভাষিক সাঙ্গত্য পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া
অবিবেচনা মনে করেননি, কারণ, অনুভূতি
বা ধারণাকে, তিনি মানতেন, সরাসরি
উচ্চারণে রূপায়িত করা কেবল শব্দের
দ্বারা সম্ভব, এবং সেই রূপায়নই কবিতা।
বাক্যের সম্প্রভা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য
ব্যক্ত-করা। তাঁর কবিতাগুলিকে তিনি
বলতেন ‘মিতেলাখসেনভেসেন’। নীচের
কবিতায় হোলৎসের সার্থকতা লক্ষ্য
করুন :

বাঁহরে বালিয়াড়ি

একা-একা বাড়ীখানা,
একঘেয়ে,
জানালাতে
বৃষ্টি।

আমার পিছনে
টিকটিক,
ঘাড়টি,
আমার কপাল
শারিসতে ঠেকিয়ে।

ফস্কা।

বিলকুল ভেগেছে।

ধূসর আকাশ
ধূসর সাগর
এবং ধূসর

চিত্ত।

গোয়তের পর যুরোপীয়তায় লিপ্ত
হয়েছিলেন সেতফান গেরগেই সবচেয়ে
বেশী। এবং গোয়তীয় ঐশ্বর্য না-
থাকলেও, গেরগের দৃষ্টিভঙ্গী ও
কাব্যিক অভ্যাসে গোয়তে-শোভন চিত্ত-
ময়তা, জিজ্ঞাসা ও প্রসারতার সাক্ষ্য
মেলে। জার্মান কাব্যে গেরগের যথার্থ
অনুবাদ কী এবং কতোখানি তা
নির্ধারণ করা শক্ত দুইটি কারণে। প্রথমতঃ
গেরগের কাব্যে বিষয়বস্তু প্রায়ই চিত্তা-
কর্ষক নয় : তাঁর ‘তৃতীয় মানবিকতা’র
তত্ত্বে ও তাঁর ব্যক্তিগত মীমাংসা-সম্ভোগের
একঘেয়েমিতে বাঁধা পড়ে কবিতাগুলি
কল্পনার গতিশীলতা যেন নষ্ট করেছে
(এবং সেই কারণে গেরগের কবিতাপাঠে
পাঠকের ব্যগ্রতা কমে আসে)। দ্বিতীয়তঃ
আরেকজন কবি, রাইনার মারিয়া রিলকে,
গেরগের প্রায় সমপর্যায়ের ভাববাদী,
সমকালীন জার্মান কাব্যে এমন তীব্রতা ও
গুরুত্বের স্বাদ এনেছিলেন তাঁর অজস্র
গীতিকবিতা ও সনেটগুলির মারফত, যে
গেরগের সম্বন্ধে ওৎস্কা যেন স্বতঃই

কম হয়, বিশেষতঃ ভিনদেশী পাঠকের,
যে চমকপ্রদেয় সম্মানেই কাব্য ঘাঁটে।

তাছাড়া, ক্রীময়াজ জার্মান আধ্যাত্মিক
লোকে ও রাষ্ট্রে পয়গম্বরের ভূমিকা
নেবার যে-ডাড়া গেরগে অনুভব
করেছিলেন, তা হয়ত কবিজনোচিত ছিল
না। অহমিকা এবং তা থেকে অসুস্থ শূন্য
শক্তিবাদে বিশ্বাস সেতফান গেরগেকে
কী-ভাবে উন্মাদগামী করেছিল, তাঁর
এক চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন
মার্কিণ সমালোচক, এরিক বেন্টলি তাঁর
‘দি কাল্ট অফ দি সুপারম্যান’ নামক
গ্রন্থে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, আধুনিক
জার্মান কবিদের মধ্যে গেরগের স্থান
খুব উচ্চ। তাঁর কাব্যে ভাবনা ও
বাচনের প্রশংসনীয় একা, তাঁর কার্যকর
পরিণতির ঐশ্বর্যময় ইতিবৃত্ত এবং তাঁর
আবেগ ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতা গেরগেকে
বিংশশতকী জার্মান কবিদের একজন
অগ্রগণ্য প্রমাণ করে।

ফরাসী স্যাবিলিজমের আওতা ধাতস্থ
করেছিলেন গেরগে। মালার্মেকে পুরো
দম্ভুর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাই,
গেরগের পরিণত বয়সের একটি কবিতায়
বোদলেয়রের সুস্পষ্ট অনুকরণ খুব
আকর্ষক ঠেকে না :

আমি একটি ও আমি দুজন
আমি জনারিতা ও গভীর
আমি অস্ত ও অস্বাধার
আমি নিহত ও আমি হনন।

কিন্তু এইমতো দ্বন্দ্বমূলক সংহতির
আম্বাদ গেরগের পক্ষে এক সময় খুবই
দুর্লভ ছিল। বিদ্রান্ত হয়ে এক সময়
তিনি, ‘আলবাগাল’ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা,
‘অ-প্রকৃতি’ বা ‘উনাতুর’-এর আলোরায়
পিছনে দৌড়েছিলেন আত্মহারা হয়ে।
প্রকৃতির সঙ্গে রক্ষা করতে গেরগের সময়
লগেছিল। আবার, যদি বা প্রকৃতি-
স্বীকার করলেন গেরগে, শান্তির
সম্মানে তাকে প্রকৃতি ফেলে ছুঁতে হ’ল
আরেক সত্যের পিছনে। না প্রাকৃতিক,
না বান্ধিক, কোনও স্বর্গেই বসবাস
না-করে গেরগে হাজির হলেন মরমিয়ার
নন্দনলোকে, যেখানে ‘ভূমি’ বলে ডাকবার
জন্য শ্বিতীয় কাউকে সর্বদা উপস্থিত
করা যায়, তাকে প্রায় সর্বকিছই শোনান
যায় এবং যেখানে প্রকৃতি বা মানব কেউই
আত্মস্থ চিত্তের সম্ভ্রমকে বিবর্ত করে না।

নান্দনিক থেকে ভাষিক ইতিভে
জার্মান কবিতা অবশ্য ফিরে ফিরে
পৌছেছে। কিন্তু গোয়তেতে বা হোর-
দেবরিলনে, কিম্বা, এমনকি, নীতশেতে,
গীতিকবিতার ছান্দসিক লক্ষ্য এবং
কল্পনার সম্পদে আস্থা বতটা অটুট
থাকে, গেরগেতে মনে হয় তা-ও তত্বে
বা ব্যক্তিগত কোনও বিশেষ মন্ত্রণার
রাহ-গ্রন্থ। তবু, সৌন্দর্যের সাধক গেরগে
প্রাকৃতিকে আত্মস্থ গেরগে, বা, যুগ-
যুগায় ধারাল, জিজ্ঞাসু গেরগে কবিষে

অনবদ্য হয়ে ওঠেন। প্রজ্ঞাপারমিতা গেরগের বখন বলেন : জীবন জাগ্রত হয় শব্দে বাদুর ছোঁয়ায় (‘নয় শব্দে দেন বসাইব রাইব দাস লেবেন ডাখ’)। তখন সে-বাদু সৃষ্টি রহস্যের মর্ম। পর্যবেক্ষণ নিম্নলিখিত সঙ্গীতধর্মী হয় গেরগের সেই বিখ্যাত কবিতায় যার প্রথম পংক্তি— ‘দেখছিলাম রূপালী চাতকদের উড়ে যেতে’ (‘ভাইসে শভালবেন জাহ’ ইখ ফ্লাসেন’)। ব্যথার নিবেগ, ঘরোয়া আত্মমত প্রত্যীককে এসে ছোঁয় তাকে আপন করতে :

ঘরে এসেছিল পুত্র আমার।

সমুদ্র বাতাস তার চুলে লেগে.....

দৃষ্টি তখন তার ভারী,

সেই রহস্যের বোঝে যা আমি কখনও

জানব না;

আর কেমন বেন ঢাকা,—

বখন সে এলো বসন্ত থেকে আমাদের শীতে।

বর্তমান শতাব্দীর তিনজন অগ্রগণ্য ইউরোপীয় কবি, বা, দুজনেরও যদি নাম করতে হয়, তাহলে রাইনার মারিয়া রিলকে নিশ্চিত একটি। যেতদূর মনে পড়ে, তিনজনের এমতো বাছাইয়ে টি, এস, এলিয়ট রিলকেকে গণনা করেছিলেন ডর, বি রিটস ও নিজের সঙ্গে)। আধুনিক কবিতায় রিলকে এমন একটি বিশিষ্ট অধ্যায় এবং সে-অধ্যায়ে এমনভাবে একক অমচ সঙ্গম। তিনি আর এতো সার ও সঙ্কল সেই অধ্যায়) যে এ-সুগের ইউরোপীয় কবির প্রধানতম হিসাবে তাকে গণ্য করাও বোধহয় নিছক পক্ষ-পাতিত্ব নয়। কারণ, বোধে ও অভিব্যক্তিতে যে-সংযোজনালি রিলকীর স্বতন্ত্রতায় চিহ্নিত, তারা সমানে স্থির ও বহু; এবং উপজীব্যের যে-ক্ষেত্র রিলকের করো আতত, তা পরিমাপে, রূপে, নিসর্গে ও হার্পে—স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে,—মহত্বম অর্থে ব্যাপক।

মুখ কথার রিলকের কাব্য সম্বন্ধে কোনও বক্তব্যে পেশান প্রায় অসম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে মাত্র দু’একটি ঐতিহাসিক-পঞ্চায়-উপনীত তথ্য বড়-জোর আলোচিত হতে পারে। দু’বক রিলকেকে যদিও আমরা দেখতে পাই তাঁর বাস্কা, লৌ আন্তেরাল সালামে (নীতিশের জীবনে এক রঙ্গমরী নারী) স্তেফান গেরগের কবিতা-আবিস্ত শব্দে নিয়ে বাছেল, তবু গেরগের উদার প্রাতি-বিলাস—অপ্রকৃতি রিলকেকে-বে আদ-পেই আকৃষ্ট করেন তা সূচীশিত। যে-বৎসর গেরগের ‘আখার কাল’ নামক কাব্যগ্রন্থে মরমী গেরগের নব-আবিস্তার ঘটল, তার মাত্র দুই বৎসর পরেই রিলকে, তখন রুস দেশে প্রবাসী, লৌ-এর হাতে তুলে দিচ্ছেলেন তাঁর প্রত্যক ঈশ্বরানু-

ভূতির সেই অভূতপূর্ব কবিতা, যা পরে ‘দাস শতুদেনবুখ’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। রিলকের এই প্রাজ্ঞ ধ্যান কবিতার অভূতপূর্ব। একেবারে অকুণ্ঠ ও পূর্ণ বিবেক নিয়ে রিলকে যৌবনে যে-আত্মনির্গমে পৌঁছেলেন, তা ‘গীতা-ঞ্জলি’র কবির পক্ষেও বয়ঃপ্রাপ্তি দাবী করেছিল, জার্মান কবিদের কথা বাদ দিলেও। (হোরগেরলিনের তরুণ বয়সের রচনা, তথাকথিত, ‘জ্যাকুয়েন স্তোত্রগুলি’তে অবশ্যই রিলকের মরমী শক্তি নেই)। সবচেয়ে বিস্ময়কর রিলকের ‘ঈশ্বর’, যিনি সহচারী, সহমরী, এমন কি, মানুষিক! ‘শতুদেনবুখের’ কবিতায় মনোরম তবু অচপল এক ভাস্কর্যে ঈশ্বরের যে-প্রতিকৃতি নির্মিত হয়, তা দান্তের স্বয়ম্ভু ভগবান, বা রবীন্দ্রনাথের ‘জীবননাথ’, বা সান হুয়ান দেলা ক্রুথের ‘প্রেমময় বিধাতা’ (‘আল আমাদো’) থেকে অনারূপ। উল্লেখের বোঝা বইতেও ঈশ্বরকে রাজী করান রিলকে (‘ইখ বিন, দু এয়াংস্তালখের.....’) ঈশ্বরকে ডাকেন ‘প্রতিবেশী’ বলে (‘দু নাখবার গড’)। ভাব্যের রূপে, রাত-পোয়ানো মোরগের ডাকে, শিশিরে, পোতাশ্রয়ে, অর্ণবপোতে, মাতুরূপে, আগন্তুককে ও মৃত্যুতে জন্ম-মরণের বৈষত পূর্ণায়ত ঈশ্বরকে টের পান (‘দু বিস্ত দি বসুকুনফত.....’)। বোধের তীরত্বা বচনে এমতো প্রতিবিশ্ব পায়, যার তুলনা বা রূপান্তর অভাবনীয় :

দেবে নিভিয়ে দাও আমার চাউনি,

আমি তোমায় দেখতে পাব

করবে বন্ধ করো আমার কান,

আমি তোমায় শব্দেতে পাব

আর যদি না-ই থাকে পা,

পারব তোমার কাছে যেতে

(‘লোয়শ মির দি আউগেন আউস...’)

গেরগের উন্টোপথে, বলা যায়, জ্ঞানের সঞ্চিত অমৃত বা গরলের ছিটে লেগে রিলকের ঈশ্বর-চিত্র কালক্রমে জীর্ণতা আহার্য করেছিল। ছবিটি নষ্ট না হলেও ফ্রেমের কাঠে, কাঁচে, চিত্রপটের বুননে সংলগ্ন ও অশান্তির আবছারা নির্বাডল ফুটে উঠেছিল। ‘শতুদেনবুখের’ রিলকে তার পরবর্তী ‘বুখের বিল্ডের’ কাব্যগ্রন্থে মরমীরা ভূক্ত হারিয়ে ফেলেছেন অসেকখানি। পরিবর্তে এসেছে বহিঃপ্রকৃতির ভূমার তাঁর অভিজাত অন্ত-চেতনাকে অব্যাহত রেখে, প্রাণের প্রাপ্য সববিধ বোধগত রাজাজানি সহ্য করার আবেগ।—

জরে আর লাগে না বিস্ময়।

পরাজিত-হওয়ার নিহত বৃক্ষ তার

অস্তিত্ব প্রস্তুত্রে একটি মৃদু বিশ্ব-

মততা যাতে প্রতিচ্ছবি ফেলে কোনও

আন্তর সামোর’—প্যারিসে অবস্থানকালে লিখলেন রিলকে কয়েক বৎসর পরে। ‘নয়ে গোদখতে’ নামক ‘নুতন’ কবিতার সঙ্কলনে রিলকেকে দেখা গেল যেন নুতন করে জাগতিক, জগৎময় ও বৈচিত্র্য-বিলাসী। নুতন কবিতা রচনার স্থানও বর্ধময় কাগজ, প্যারিস বা নেপলস; এবং প্রসারিত কাব্যিক চিন্তার আরম্ভাধীন বিষয় ভেনাস, আর্থেমিস, অরফরাস থেকে বৃক্ষ, সোন হুয়ান ও এলোওনোরা দুজে পর্যন্ত। ‘নয়ে গোদখতে’র কবিতা-গুলিতে রিলকের কবি-চরিত্র স্পষ্ট হ’ল। স্পষ্ট হ’ল যে তিনি, দূস্তর ও তীর-এক অন্তর্লোকের বাসিন্দা বাদি বা, তবু এক শহুরে মানুষ, যার মধ্যে সমস্ত ভাষার পরিণাম শতাব্দীর জটিল আঁচে ফোটান। চিত্রকর্মে, ভাবসংগ্রহে, প্রতীক-পদ্ধতিতে ও বাচনে মরমী শব্দতাকে রিলকে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন বৃদ্ধিজন্যের জিজ্ঞাসা মানসিকতার।

যথেষ্ট সঙ্গীতসম্পন্ন এক মরমীরা বিশ্ব থেকে নিষ্কান্ত রিলকে যে-ভাবে বাহ্যিক-বৈষম্যে গ্রহণ করলেন, এবং তদবধি আমরণ যে-দোটারায় প্রান্তিহীন হাতড়ে ফিরলেন কোনও অনন্তমণীর চিত্তশুদ্ধি ও শব্দের প্রতিমা, তার বৃত্তান্তই রিলকের যুগ-বিধত কাব্যসম্বন্ধ। উনিশশ শতাব্দীর জার্মান মহাকাব্যের সেই ‘আখিক স্বর’ রিলকেরও অধিকারে। তাঁদের অন্তঃস্বপ্ন ও যুগভেদে কেবল রঙ পাণ্টেছে : রিলকেতেও দেব-পারমর্ষে গরমিল—আরও স্পষ্টভাবে, দ্রুতের বিধাম ও সূক্তের প্রমাদে, ফারাক,—অস্তিত্বের ভিত্তিকে প্রশ্নাধীন করে। সম্ভবতঃ বিস্মৃতি খুঁজতে গোয়তের মতো রিলকেও দুট, এমন কি নবীর টঙে চড়াশত। হোরগেরলিনের ঈশ্বরকে আরো প্রত্যক্ষে সওয়াল করেন রিলকে ও আরো খতিয়ে দেখেন সৃষ্টির লাভলোক-সান তত্ত্বটি। অতীতের চিত্তবিস্রমগুলিই বৃক্ষ কেবল হুঁসিয়ার রিলকেকে আতিথ্য দেয়নি! তাঁর বিখ্যাত ‘দুইনিসের এলোগিন’-এ রিলকে অকপটে বলে দেন :

নয় অঙ্গর, নয় মানুষেরা;

আর ইতিমধ্যে চতুর জন্তুদের চোখে-

পড়েছে যে

নই আমরা সর্বিশেষ নিরাপদে

ওয়াকফ-হাল

এই পরিজ্ঞাত পাখিখীতে।

দেবতা, মানুষ, এমনকি জন্তুও, আর পুরাতন ইন্দ্রজালের বেটনীতে আটক থাকছে না। নিকষিত নৈঃসঙ্গ! ‘রোর’-মিশে এলোগিনের গোয়তে তাঁর প্রাচীন রোমের ধ্বংসরূপে এই মিস-পায় মানুষিক অস্তিত্বের দ্বারা পাতও দেখতে পাননি।



সুবৃহৎ তাঁবুর চক্ৰাকার আবেষ্টনীর মধ্যে বর্ণবহুল আলোক-উদ্ভাসিত, বাদ্য-মুখর আনন্দউচ্ছ্বল পরিবেশে হর-পরীদের মত সুন্দরী, দীপ্তবসনা, ক্ষিপ্ৰ-গমনা, বিদ্যুৎ-চঞ্চলা তরুণী, বৃকোদরের মত শক্তিশ্বর পালোয়ান, তাকলাগানো যাদুকর ও কসরতকরদের চমকপ্রদ ও লোমহর্ষ ভেলকি, পশু-পাখিদের অবিশ্বাস্য আচরণ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও শৃংখলাবোধ, দেখন-হাসি ভাঁড়দের উদ্ভট কাণ্ডকারখানার আজব দুনিয়া সার্কাস আজো পরিবারের সকলে মিলে অনাবিল আনন্দ-উপভোগের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র।

চলন্ত শিবির-নগরী সার্কাস চক্ৰ-বাহিত নিখুঁত ও বিরাট ব্যবস্থাপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। প্রত্যেকটি সার্কাস-প্রযোজনাই হচ্ছে এক অনিশ্চিত ঝুঁকি নেওয়া। ধরুন এক শহর থেকে শহরান্তরে একটি বৃহৎ, এমন কি নাতি-বৃহৎ সার্কাস দল চলেছে। তখন তার ব্যবস্থাপকদের প্রথমে ঠিক করতে হবে সেই গন্তব্য শহরের রেলস্টেশনের প্ল্যাট-ফর্ম তাদের বিচিত্র লট-বহর, জন্তু-জানোয়ার-হাতী-ঘোড়া - বাঘ - ভাল্লুক প্রভৃতি নামানোর উপযুক্ত কি না! তারপর ঠিক করতে হবে খেলা-দেখানোর তাঁবু পড়বে কোথায়।

প্রথমে, তা শহর থেকে দূরে হলে চলবে না, তার ওপর তার মাটি ঢাল, কিম্বা ঢেউখেলানো, বেশি শক্ত, কিম্বা

বেশি নরম,—কোনটা হলেই চলবে না। এর পর আছে সেই আজব উপনিবেশের হরেক রকম রান্নার জোগাড়, প্রভূত জলের ব্যবস্থা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও থানা পুলিশের সঙ্গে টাক্স, শান্তি ও নিরাপত্তার দরদস্তুর ও ব্যবস্থাপনা। জীব-জন্তুদের সম্পর্কে সতর্কতা। খেলা আরম্ভ হলে তাঁবুর একটি ছোট ঝুঁটি, থেকে আরম্ভ করে দাঁড়-খেলার প্রতিটি দাঁড় সম্পর্কে হুঁসিয়ারী। একটি খণ্ডিত মূহুর্তের ভুলে একজন খেলোয়াড়ের জীবন সংশয় হবার সম্ভাবনা।

সার্কাসের নরনারী

সার্কাসের নরনারীদের জীবন যাযাবর। কিন্তু সাধারণ যাযাবরের মত তা বিশৃঙ্খল, নোংরা, কিম্বা টিলেঢালা অগোছালো নয়। ক্রান্তিহীন অনুশীলন ও পরিচর্যায় সতেজ ও সতর্ক। এতটুকু অনিরম, অসতর্কতা কিম্বা ঘুটি-বিচুটি, এমন কি মন খারাপ কি অসুস্থতার জন্যে হাজার-হাজার দর্শকের বহু প্রতীক্ষিত একটি খেলা নষ্ট, কিম্বা নিজের ও পরের জীবন সংশয় হতে পারে।

অথচ আজো যতদিন তাঁদের যৌবন ততদিনই তাঁদের জীবিকার নিশ্চয়তা। পরবর্তী ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, অনেক সময়েই অন্ধকার। একদিন তো ছিল যখন তাঁদের সার্কাস-জীবন বা শিক্ষা আরম্ভই হতো নিষ্করণ শঙ্কা-গ্রাস ও নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে। শ্রীমতী মহাশেবা ভট্টাচার্য তাঁর 'প্রেমতারা' উপন্যাসটি লিখেছেন সেই করুণ কাহিনী অবলম্বনে। আর সমারসেট মন্টের একটি জগদবিখ্যাত ছোটগল্প হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সার্কাস খেলোয়াড়দের জীবনের মর্মান্তিক দিকটা নিয়ে।

সার্কাসের ভাঁড়

বিখ্যাত বৃটিশ সার্কাস পরিচালক বাণ্যম বলেছেন যে, সার্কাসের দুই প্রধান অবলম্বন। এক হাতি, দুই ভাঁড় বা ক্লাউন।

এই ক্লাউন বা বিদূষক হচ্ছেন সার্কাস নগরীর মহাশয় ব্যক্তি। রাজদরবার ও রণমণ্ডের পালা শেষ করে সার্কাসে



“হাতি যখন ব্যাণ্ডের তালে তালে পিলসুজের ওপর নাচে.....”,



ব্রিটিশ সার্কাসের ভাড়া ককো। জন্ম রাশিয়ায়; আসল নাম নিকোলাই পলিয়াকফ।

তাদের আবির্ভাব ঘটে প্রায় শ'দুই বছর আগে।

এই আধখাপা, খাপছাড়া, বিদঘটে পোষাক পরা, অঘটন ও ফ্যাসাদ বাঁধাতে পারদর্শী, চির-উৎসাহী ও চির-ব্যর্থ, অসামঞ্জস্য ও অপকর্মের প্রতিমূর্তিদের দ্বারাই হয় সার্কাস কতৃপক্ষের প্রকৃত গণ-সংযোগ।

বিগত শতাব্দীতে রাণী ভিক্টোরিয়া ব্রিটিশ সার্কাসের ভাড়া সেরউডকে দেখে রয়্যাল বক্সে হেসে লুটোপুটি খেয়েছেন। কেপটাউনে স্চায়স ব্রাদার্সদের দেখে হাসতে-হাসতে এক মহিলা শিরা ছিঁড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

সেকালে ভাড়েরা প্রধানত হাস্যোদ্ভেক করতেন সাজ-পোষাক ও আকার-আকৃতির দ্বারা। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের লক্ষ্য হলো আচরণ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির দ্বারা হাসির তৃফান জাগানো। যেমন অবিস্মরণীয় ব্রিটিশ ক্লাউন ককো পিয়ানো বাজাতে বসলেন। কিন্তু দেখা গেল কিছুতেই জুং হচ্ছে না। চেয়ারটা পিয়ানো থেকে বস্তু দূরে। আমরা হলে চেয়ারটা সরিয়ে পিয়ানোর কাছে নিয়ে

আনতাম। কিন্তু ককো মাথাভারী আমলাতন্ত্রের বড়কর্তাদের মত সেই সামান্য কাজটা করতে একটা কান্ড-কারখানা বাঁধিয়ে দিলেন। হৈ-হুল্লোড় করে আরো সজুদের জড়ো করে পেলাই পিয়ানোটাই চেয়ারের কাছে সরিয়ে

আনলেন। অথচ মজা এই যে দর্শকেরা যখন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন, স্বয়ং কর্মকর্তা তখন মহা দার্শনিকের মত গুরুগম্ভীর।

একটা আপ্ত বাক্য প্রচলিত আছে যে, ভাড়েরা 'জন্মায়' কিন্তু তৈরী হয় না। কিন্তু উল্লেখ্য এমন একজন ভাড়ের কথ্যও মনে পড়ছে না যিনি প্রথম থেকেই সার্কাসের ভাড়ের জীবন শুরু করেন। প্রায় প্রত্যেকেই জীবনে বিরাট ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর, সম্ভব ও অসম্ভব অবস্থার মধ্যে থেকে জীবন-সমীক্ষা করে কিম্বা কোন-কোন ক্ষেত্রে সার্কাসের সর্ব-বিদ্যা পারংগম হবার পর ভাড়ের পেশা অবলম্বন করেছেন।

বিখ্যাত ডাচ সার্কাস-ভাড়া Olschorsky বারোটি ভাষা জানতেন। পত্নী ও কন্যা নিয়ে তিনি উত্তর মন্ডলের চিরভ্রমার দেশগুলি থেকে আরম্ভ করে চীন হয়ে আমেরিকা পেঁছে সার্কাস ভাড়ের বৃত্তি গ্রহণ করেন। পথে তাঁর মেয়েটি মারা যায়, বারংবার তিনি নানা বিপদের সম্মুখীন হন, তবু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সেই পরিব্রাজকতায় তিনি অবিচলিত থাকেন।

প্যারিসের একদা-বিখ্যাত ইংরাজ-ভাড়া Footit ও নিগো ভাড়া Chocolat-এর জীবন ও নানা অভিজ্ঞতা ও ব্যর্থতায় ছিল ঐশ্বর্যময়। অতএব দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাড়েরা আজন্ম ভাড়া নন। তাঁরা স্বয়ংসিদ্ধ।

কিন্তু মন্থকিল বেঁধেছে রাশিয়ায়।

আরও মজবুত... আরও ভাল

পিতলের তৈরী
বার্গার টিউব



কিম্বা নতুন
'স্পেশাল কোয়ালিটি'
মাশ দোখিয়া লইবেন।



সম্পূর্ণ লক্ঠন মোটা চাদরে
তৈরী ও লক্ঠনের নুং ফেরোসিন
তৈলে নষ্ট হয় না

কিম্বা
লক্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট



সেইসময়ই নতুন দাম এও কোং

২৩৩, ৩নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন-২২-৬৫৮০

‘৬৮ সালে নভেম্বর মাসে রুশ প্রধানমন্ত্রী রুশ্চেভ মস্কো সার্কাসে যান। সার্কাসের আর সব খেলা তাঁর কেমন লেগেছিল তা জানা যায়নি, তবে প্রকাশ পায় যে, উক্ত সার্কাসের স্বনামধন্য ভাঁড় ও রাশিয়ার জন্তুদের ছেলেমেয়েদের হীরো পেপডও তাঁকে হাসাতে পারেনি।

অতঃপর সোভিয়েট কালচার পত্রিকা লেখেন ‘বর্তমানে রাজনৈতিক শিক্ষাহীন ভাঁড় আর ভালো ভাঁড় হতে পারে না।’ সুতরাং ঐ বছরেরই ৪ঠা ডিসেম্বর মস্কোতে যখন নিখিল রাশিয়া ভাঁড় সম্মেলন হলো তখন তা হলো রুশ্চবার। চারদিন সেই সম্মেলনে আলোচনার পর রাশিয়ার ৫০০ ভাঁড় প্রতিনিধি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ভাঁড়দের আরো সমাজ-সচেতন হতে হবে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রা বিশ্বপক্ষে আরো তীক্ষ্ণতর করে তুলতে হবে। আশা করা যায়, কিছুকালের মধ্যেই আমরা রাশিয়া থেকে এই প্রশ্নের জবাব পাবো যে রাষ্ট্রায়ত্বকদের হুকুমে ভাঁড় তৈরী হয় কিনা।

সার্কাসের জীব-জন্তু

জীবজন্তুদের খেলা হচ্ছে সার্কাসের অন্যতম আকর্ষণ। আপাত-আশ্চর্য মনে হলেও খাঁচার জন্তুমানো ও বড় হওয়া জীব-জন্তুর চেয়ে জগলী জীব-জন্তু বিশেষ বায়-বিসংহিতভাবে খেলা দেখানো সহজ ও নিরাপদ। তার কারণ জগলী জীব-জন্তুদের সঙ্গে মানুষের অপরিস্রবের দর্শন তারা মানুষকে ভয় করে এবং তাদের ভয়-দেখানো সহজ। কিন্তু জন্মবন্দী শ্বাপদেরা পরিচয়ের জন্যে মানুষের দূর্বলতা ও ভয়ের কথা জানে এবং তারা তার সুযোগ নেয়।

বায়-বিসংহের চেয়ে নাকি ভালুকদের খেলা দেখানো শক্ত। তাদের মেজাজ আরো বেশিক এবং মৃদু দেখে তাদের মেজাজের আঁচ পাওয়া শক্ত।

সিংহদের দেখানো প্রথম শুরু করেন বালিনের এক সার্কাসে টমাস ব্যাটি নামে এক ইংরাজ। অনেকের তখন ধারণা ছিল তিনি প্রাচ্যদেশীয় কোন শিক্ষক-বাকডের ওষুধ ব্যবহার করে শ্বাপদদের শান্ত ও শিষ্ট করেন।

বর্তমানে কিন্তু সার্কাসে জীব-জন্তু ব্যবহার করার বিরুদ্ধেই ইউরোপে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। সুইডেনে

তা ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে আলোচনের আকারও প্রবল। আশো-জনকারীদের বৃত্তি অনুসূচ :

ভয়াল অরণ্যে গোলাকার গ্যালারীতে উপবিষ্ট হাজার হাজার জীবজন্তুদের মত্ত উল্লাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ-পৃষ্ঠ চাবুকের ভয়ে যদি কোন মানুষকে পশুর মত আচরণ করে ‘খেলা’ দেখাতে হতো তা হলে সেই মানুষের যে অবস্থা হতো,—অবোধ, অসহায়, প্রকৃতির দাস জন্তুজানোয়ারদের সার্কাসের ‘খেলা’ দেখাতে গেলে অবস্থা হয় তার চেয়ে অনেক মর্মান্তিক! —তার একবার সম্ভবপর ব্যতিক্রম হতে পারে ঘোড়ারা। গতি ও হৃদয় তাদের স্নায়ুতে-স্নায়ুতে।

কিন্তু ধরুন বায়। বায় মানুষ খাবে,—এটা প্রকৃতির বিধান। বায়ের দোষ নয়। অথচ সেই বায়ের মূখের মধ্যে যখন তরুণী সার্কাসিবালা মাথা ভরে দিচ্ছে অথচ বায় পরমসহিষ্ণু বৈকবের মত শব্দ, ন্যাডটুকু নেড়ে বাচ্ছে তখন তা দেখে আমরা বহুবীর উল্লাসে হাততালি দিচ্ছি। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছি যে, বায়ের প্রকৃতির, তার প্রতিটি রক্তকণার ধর্মে পরিবর্তন করতে তার ওপর কতখানি অত্যাচার করা হয়েছে?

হাতি যখন ব্যাণ্ডের তালে-তালে পিঙ্গলসুজের ওপর নাচে তখন তো আমরা আনন্দে উথলে উঠি। কিন্তু একবারও কি হাতিটীর মাথায় লম্বা-লম্বা, ফালি-ফালি দাগ লক্ষ্য করেছি? দেখেছি কি কখনো সেই নাচের মহড়ার সময় ট্রেপারের হাতে নিষ্ঠুর মার খেয়ে হাতীর খুঁদে-খুঁদে চোখদুটি জলে ভরে উঠতে?

বিখ্যাত সার্কাস ট্রেগার মিঃ আলফ্রেড কোট ‘ওয়াই সার্কাস অ্যানিমাল’ নামে একটি বই লিখেছেন। তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে, একবার তাঁর শিক্ষার্থীনে একটি বায় একটি মানুষকে হত্যা করে। তখন তিনি কি করলেন? —না, “এবার আমার পশু হবার পালা এলো” এবং আমি অতি ভয়ঙ্কর ও হিংস্র পশুই হলোম।”

আর এক জায়গায় অনুসূচ

বাহাদুরী করেই লিখেছেন, “পশুদের শিক্ষা দিতে হলে মিষ্টি ব্যবহার ও আদরের মতই প্রয়োজন কড়া চাবুক ও ডাণ্ডা।”

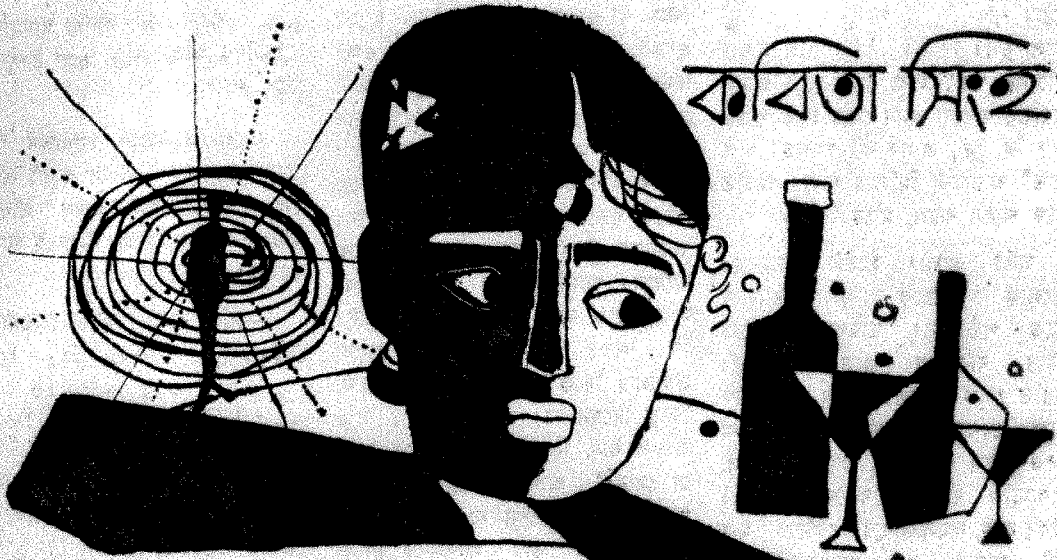
আরেকজন ট্রেগার লিখেছেন, “বেশ ভালো রকমের শিক্ষিত হাতী মানেই বেশ দাগা-হাতী। কারণ হাতীকে শিক্ষা দেবার একটি মাত্র উপায়ই আছে : “অশুশের যথেষ্ট ব্যবহার।”

জীবজন্তুদের ওপর মানুষের নিষ্ঠুরতাটা বহুমেয়েদের মত। তাদের প্রতি আমরা বতই নিষ্ঠুর হই, তার প্রতিভার নিজেদের সমাজজীবনকেও ততই নিষ্ঠুর করে তুলি।

শেষ-বিশেষ সার্কাস

পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত সার্কাস হচ্ছে জার্মানীর—ক্রোন, ফ্রাজ এ্যালতফ, ফিশ্চার, ভিলিয়ামস ও হেজেনব্রেক প্রভৃতি। ফ্রান্সের,—ফেরের বোগলিয়, র্যানসে ও মেডরাগো। সুইডেনের সার্কাস স্কট। সুইজারল্যান্ডের গেরুডার সি (Gebruder Knic)। ইতালীর—টগনি। স্পেনের—সার্কাস কার্সেলিয়ার। উত্তর আমেরিকার—রিং লিং ও পোলাক্। আফ্রিকার—প্যাজেল। অস্ট্রেলিয়ার—রিথ। সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্র পরিচালিত সার্কাস, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে মস্কো সার্কাস। বর্তমানের—বেট্রাম মিলসের অলিম্পিয়া এবং হ্যারিংগে।

উপরোক্ত সার্কাসগুলির বেশির ভাগই আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। ফলে তুলনামূলকভাবে তাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলি মনে হয়েছে তা হচ্ছে : রাউনের উম্বট ভাঁড়ামি এবং রুশ-নিঃস্বাস দড়ির খেলার বৃটিশ সার্কাস-গুলি অভুলনীয়। রাশিয়াদের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁদের কসাকদলের তাক লাগানো ঘোড়ার খেলায়। রুশ সার্কাসের সঙ্গে থাকে আবার যাদুকরের দল। ফরাসী ভাঁড়দের চটুলতাও বেশ ভালো। প্যানিশদের পোষাক-পরিচ্ছদ জন্ম-কালো। জীবজন্তুর খেলার জার্মানরা সেরা। তারাই প্রথম সার্কাসের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারদের সার্কাসের খেলা দেখায় এবং আজো বিশিষ্ট ট্রেগাররা আসে জার্মানী থেকেই।

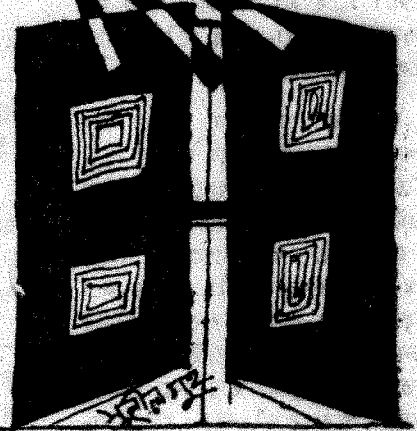


কবিতা সিংহ

জানলা খুলেই জানলা। আরতি
এড়াবে কি করে? এড়াবার দরকারই বা
কি? বেশ লাগে ভদ্রলোককে। আর
ভদ্রলোকের মেয়েকে। গোলাপী পদ্ম
হাওয়ার উড়লে যে নীল ডিস্টেন্সার-
করা ঘরের চিলতে দেখা যায়, তাই বা
কি কম লোভনীয়!

আরতির জানলার পর্দায় অমন
গোলাপী নেই। তার রং রক্তহীন, শাদা।
হাসপাতালের মত ধোয়া, পাট-ভাস্ক।
তার ফাঁক দিয়ে আরতি অসময়ে চাঁর
করে দেখে, সময়ে সোজাসুজি দাঁড়িয়ে
দেখে। আরতি তোয়ালে নিয়ে মূখের
জলের ফোঁটার ফোঁটার চাপল। আপনি
জল শুধে নিল ভোয়ালে। গোড়ালির
ওপর ঘুরে গেল আরতি, ভদ্রলোকের
ঘরে আলো জ্বলল বলে। বিছানায় এসে
বসল, পায়ে তলার ধলোর কথাগুলো
খেঁড়ে। হাতদুটো মাথার তলার রাখতেই
সদ্যস্নাত শরীরের গন্ধ আসতে
লাগলো আরতির নাকে। সেই গন্ধে
ম' ম' আরতি খানিকক্ষণ গড়ল। তার-
পর বুকে বালিশ রেখে, ট্রেপে শোয়া
সৈন্যের মত মাথাটা একটু একটু একটু
উঁচু করে ঠিক চোখ পর্যন্ত জানলার
উচ্চার রাখল। ভদ্রলোক বারান্দার
দাঁড়িয়ে। টপ করে ডুবে গেল আরতি।
বালিশে নিজের চুলের গন্ধ পরের বলে
মনে হল। আরতি উঠে ঘরের আলোটা
নিভিয়ে দিল। দিয়ে আবার দেখতে
লাগল। এবার বেশ নিভারি।

মেহ
মবুজ
দাহাড়
দোরিড়ে



দেখবার অনেকগুলো রকম আছে
আরতির। তারা চার-পাঁচজন আরতি।
কজন ছোটো, আবছা, না-তৈরী।
কজন বেশ তৈরী। যেমন, যে-আরতি
আজ থেকে পাঁচ বছর আগে শান্তি-
নিকেতনে ছোট্টোলে থাকত, সেই
আরতি। তার রুম-মেট ছিল শ্রাবণী।
ভদ্রলোকের অপদার্থ একটা মোরে।
সকালবেলা উঠে বিছানাটুকুও তুলত
না। তুলেই কি তাকে মানাত? অমন
চোখ বার, অমন আঙুল। শ্রাবণীকে চা
তৈরী করে দিত আরতি ঘরে, স্টোভে।
ডিম ভেজে দিত। আর বলত, বুঝলি
শ্রাবণ, পরীক্ষাটা চুকে গেলেই টপ
করে একটা-শ্রাবণী তখন খিসিস নিয়ে
বাস্ত,—দর, আমি ওসব বিয়ে-টিকের
মধ্যে যাচ্ছিনে।

সেই শ্রাবণী আজ ডকটরেট হয়ে
ঘর করছে ডিব্রুগড়ে। আর সেই

আরতির এখনো ঘিয়েই হল না। সেই
লোভী আরতিটা।

ভদ্রলোকের ঘর। কতটুকু বা দেখা
বার এখান থেকে। জানলা, বারান্দা আর
দরজা। ডবল বেড খাটের খানিকটা।
তার উপর গোলাপী ফুলকাটা বেড-
কভার। সামনে সোজাসুজি রেডিও-
গ্রামের উপর ক্ষুটিকের পুতুল। তার
ওপাশে কি, আর দেখা বার না। দেখতে
ইচ্ছে করে। খুব দেখতে ইচ্ছে করে।
ছাদে উঠলে হয়ত দেখা যায়। কিন্তু
ছাদটা বাড়িঅলার। ওপরে হেড-
মিস্ট্রেস স্বেমাদি থাকেন, ও'র ঘরের
বারান্দা থেকে পরিষ্কার দেখা যাবে।
কিন্তু উনিও এখানে নেই। কবে যে
আসবেন? আর মিলে। ভদ্রলোকের
মেয়ে। আরতিদের স্কুলেই পড়ে। যে-
স্কুলে আরতি পড়ায়, সেই স্কুলে।

ছুটে ঘরে ঢুকল মিলদ। ওদের ঘরে। সঠাম শাদ টি পা। নরম বাদামী কালো চুল। ঠিক দিগে গেল মাথার সাটিনের 'বো', লাল ফ্রিজ-দেয়া জামা। আরতি কখনো এমন মেয়ে হতে পারত কি? হি, হি, এ-সব কী ভাবছে। বাক, লোভী আরতিটা মিলিয়ে বাক। আরতি তাকে শাসন করল, মূছে দিল।

আম্মা এলো। সাতটা বেজেছে। ভদ্রলোক মেরেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খেতে পাঠালেন। তারপর সিগারেট খরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আরতি ঢোক দিলল। বেন ভদ্রলোক তাকে দেখতে পাচ্ছেন। পাচ্ছেন না যদিও জানে আরতি, তবু মনে হল, মূখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দু'জনে। তাঁক, নাক, কমলালেবুর কোয়ার মত ঠোঁট, গেরুয়া রং। অবশ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছে না আরতি। কারণ, এখন ভদ্রলোকের পিঠে সব আলো, চুলে সব আলো। মূখে সব অন্ধকার, বৃকে সব অন্ধকার। বোকার। ওর স্ত্রী না মারা গেলেই পারতেন।

আরতির ঘর বেন মৃত্যুর ঘর। সেখান থেকে এখন যে আরতি বখ-ঠোঁটের এপাশে কথা বলছে, সে বেন ও'রই স্ত্রী। মৃত স্ত্রীর যদি সত্য থাকত, সে যেমন করে তার সঙ্গে কথা বলত, তেমনি করে—তুমি কী! অমন করে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে? কেন, বেরিয়ে পড়না একটু। বন্ধু নেই তোমার? (এত সুন্দর তুমি। তবু বন্ধু নেই?) আছে। তারা সুখী, না? বো-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখী? তোমার তারা করুণা করে? দৃখী ভাবে?—বেশত একলাই যাও না.....আমিত থাকি সব সময়, পাশে থাকি।

ঠিক এমনি সময় ভেসে ওঠে আর একটা আরতি, হিংস্রটে আরতি, প'চশ বছরের নয়, সত্তের বছরের আরতি, তার বৃক জ্বলে যায়। ও'র মৃত স্ত্রীর সঙ্গে তার বিদেহী ভালোবাসার সঙ্গে সে যেন রক্তমাংসের সত্যই হয়ে যায়। মনে মনে সে চেঁচায়, না, না, কেউ আপনার পাশে থাকে না। মরলে আবার মানুষকে মনে রাখতে হয় নাকি? স্মৃতিকে মূছে ফেলেন। না, বন্ধু—অমন করে আপনি হটিবেন না। কেন হাটেন? ঐ বারান্দার অন্ধকারে, একা? আপনি যখন সর, সর, শাদা-কালোয় গুটাইপকাটা (এত সর, স্ত্রীপ যে, দূর থেকে ছাই ছাই লাগে) প্যাণ্টের দু'পকেটে হাত রেখে,

তার ওপর ঘোর বাদামী, কার হাতে বেন বোনা কাউচগান পরে ঝুকে ঝুকে হাটেন, মাথা নীচু করে কপালের ওপর বাদামী রঙা মুক চুল ফেলে মোটা শেলের চশমার তলার আকর্ষণবিস্তার চোখদুটি নামিয়ে ছোট বান, মনে হয় আপনি বেন সত্যিই তাকে অনুভব করতে করতে যাচ্ছেন। তাকে নয়, তার অভাবকে অনুভব করতে করতে যাচ্ছেন। আপনি তাকে ভুলে বান। সত্যি ভুলে বান। বাননি, আমি জানি। কি করে? আপনি কেন কোনো জানালার দিকে তাকান না? তাকান, কিন্তু দেখেন না। আপনি বৌদিক দিয়ে অফিস বান, ঠিক তার উল্টোদিক দিয়ে যে মেয়েটি আপনার মেরের স্কুলে পড়তে যায়, জানেন না আপনি, তার নাম আরতি। তার আপনাকে ভালো লাগে। আপনার মেয়েকে ভালো লাগে। কেন জানেন না আপনি? কেন আপনাকে জানা যায় না?

—সুখমাদি, কাল দুপুরে রওনা হয়েছিলেন বৃখি? ব্রেন এত লেট করল?

—হ্যাঁ ভাই, দেখনা, সব কি অবস্থা যে হয়ে আছে ঘরটার। আবার সকালে স্কুল। মিহিদানা খাবে? খাও না, মিটসেকে রেখেছি—হাতে যা ধুলো,—

—না, না, থাক না, বরং আমিই আপনাকে একটু সাহায্য করি, কোমরে অচিল জড়িয়ে আরতি সুখমা সেনের দিকে তাকালো,—বাটা কৈ?...ওমা এক দক্ষিণের বারান্দার জানলাটাই বখ, খুলে দিই.....

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুলো না আরতি, পর্দা না দিয়ে ও জানলা আমি খুলেছি।

—কেন সুখমাদি, কি হয়েছে? আরতির মুখের রঙে রক্ত রইল না।

—বিকাশ ঘোষ এসে উঠেছে এ-পাড়ায়, ওই পাশের বাড়িতে,

—ওঃ ওই নতুন ভাড়াটে পাশের বাড়ির। বাচ্চা মেয়ে নিয়ে উঠেছেন যে ভদ্রলোক, খাঁর নাকি স্ত্রী নেই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনীষা। হ্যাঁ, সে ত সুইসাইড করেছে। ল্যাব ম্যারেজে ঘোষা...হলুদ বেডকভারটা টান টান করতে করতে ঠোট বিকালেন সুখমা সেন। অনেকখানি। আরতি অবাক হয়ে তার বেডকভার পাটা দেখল, জানালায়

পর্দা দেয়া দেখল, ঘরের কোণে জলের-কুঁজোর পাশে মাকড়শার জাল দেখল, সুখমাদির আঁধার হয়ে আসা ঘরে সুইট টিপে আলো জ্বালা দেখল।

আলো জ্বালাতেই আরতি মুখ-রোচক প্রসঙ্গের সংবাদ সম্মানে সবাক হল। জংখরা মেসিনে তেল পড়ার মত আটকে যাওয়া চিন্তা হঠাৎ কাজ শুরুর করলো।

—সত্যি বাপু কিছু বোঝবার যো নেই।

—আরে আমরাই কি বুঝছি? মনীষাই কি বুঝছিল? তাহলে কি এই দাঁড়াত!—বিনুকে, মানে আমার মাসতুতো বোনকে, তখনি বলোঁছ, বিনু, তোমার ওই রাগামালো দেওর প্রেম করছে করুক, তুমি কিন্তু ওর মধ্যে থেক না। কথা কি শুনলো বিনু? বিনু কেন, যে যেখানে ছিল সবাই ওরা সব হেস্প না করলে মনীষাকে নিয়ে কি করে ও বর্ধমান পালালো...হ্যাঁ মিহিদানাটা, দু'প্লেট ভরে মিহিদানা আনলো আরতি। মিহিদানা খেতে সুখমাদির ঠোঁট তৈলাক্ত হবে। গল্পটা আরো ধারালো করে শুনবে আরতি।...লোকটার গল্প।

—বিয়ের পর থেকেই তুলকালান্ন খগড়া।

—কি নিয়ে সুখমাদি?

—কি নিয়ে নয় বলা, বাপরে, ফাটাকাটি খগড়া, তারপর বিকাশ বিলেতে গেল, বাস এখানে ফিরতেই ওই কাণ্ড, আমার ত মনে হয় ওই হোড়াই ওকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে, কাগজে কেমন বেরুলো, ভুলে মালিশের ওষু খাইয়া.....

আলমারীতে নতুন খবরের কাগজ পেতে ন্যাপথালিনের বল ছড়াতে ছড়াতে আরতি বলল, —নাকি?

—আবার জানো না, এ পাড়ায় এসে আমার কাছে এসেছিল,

—সে কি কথা?

—হ্যাঁ বিশ্বাস করো। কল কিনা আপনিত বৌদির দাঁদ, আপন আমারও দাঁদ, আমার মেয়েকে স্কুলে পৌছে দিই আমি নিজাই। কিন্তু ফেরার সময় ঠিক আমার ওপর আমার বিশ্বাস হয় না, আপনি যদি...ওর

মেয়েটা আমাদের নাসারী সেকসনে পড়ে আর কি।

—হ্যাঁ আমিই ত পড়াই। ভালো নাম সুপ্রিয়া, ডাক নাম মিনু...তা আপনি কি বললেন সুস্মাদি—?

—বললাম ওসব আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর আমি মোটেই ওর দিদির বয়সী নই। তাছাড়া একলা থাকি, অমন যাতা অজ্ঞহাতে রাখন-তখন...আর তাছাড়া কমবয়সী আয়াটা মেয়ে পৌছাবে না, আনবে না, ত করবেটা কি? শুনিনে...

মাথা দু'লিমে দু'লিমে আরতি সবটা মিহিদানা খেলো। তার পর উঠে পড়ে পড়াম করে দক্ষিণের জানলাটা খুলে দিল।

—তবুও সুস্মাদি দরজাটা একটু খুলি। কি আর হবে, কি আর করবে ওই, (টোঁক গিলল আরতি) বিজী লোকটা।

আরতি বারান্দার বেরিয়ে এসে দোতলার ভদ্রলোকের পুরো ঘরটা আজ দেখতে পেলো। রেডিযোগ্রামের পাশে আছে বুক-সেলফ, তার ওপাশে লাল কার্পেটের উপর এক প্রস্থ সোফা কোঁচ। আর দেখা গেল বুককাটা জামা পরা এক মেমসাহেব, কাঁচের কাটপ্লাস, সোডার বোতল, অচেনা বলেই চেনা কালো বোতল। ভদ্রলোক সেটা মেম-সাহেবকে এগিয়ে দেবার সময় তিনি ও'র গ্রীবায আলতো চুমু খেলেন। মিনু ছবির বই উন্টোচ্ছে কার্পেটে উপড় হয়ে। আয়া ঘুরে গেল একবার, সত্যি বড় বেশী অল্পবয়সী। এতগুলো নতুন অলিঙ্গতা একসঙ্গে হওয়ার আরতি যেন নড়তে পারে না বারান্দা থেকে।

রাস্তার বেরিয়ে আরতি তার বেঁটে ছাতাটা খুলল। সামনের অতি ছোট্ট মেয়েটাকে তার আয়া সাতরঙা ছাতাটা খুলে দিল। দারুণ দুপুরে। পথের উল্লার ছায়ারা ছোট। জজ কোর্ট রোডের দু-পাশের বড় বড় মহীরুহের পাতাগুলো রোদ পড়ে উজ্জ্বল মরকত, ছায়ার অংশ নিকষ কালো। পাতাগুলি কল্যাণী। কিন্তু তাতে হাওয়ার যে শিশু তা উদাস, বেদে। আবেগের জন্য কান্না, আবেগের জন্য বিম্বব, আবার আবেগের জন্য জঙ্ঘা যেন রিলে রেস দিতে দিতে এগুচ্ছে আরতির বুকের মধ্যে।

নাসারী রূপে আরতিই পড়ায়। জিজ্ঞেস করেছিল,

—তোমার নাম কি?

—সুপ্রিয়া ঘোষ—মাথা নীচু করে হলুদ আর লাল পর্দা দিয়ে নক্সা করতে লাগল মেয়েটি। শান্ত মেয়ে। মনে হয়েছিল আরতির। পরে মনে হওয়া কেটে গিয়েছিল। বাপের মত বহুবর্ণী মেয়ে সুপ্রিয়া।

না আরতি আর ঐ সাতরঙা ছাতার দিকে তাকাবে না।

মোড় বেঁকতেই পিছন ফিরল সুপ্রিয়া। হুটতে হুটতে আরতির কাছে এল।

—আমি জানি,...

—ওর রোদে-বসে-বাওয়া চোখ, তামা-তামা মুখ, খুলো লাগানো নীল ওভারঅল, লাল বর্ডার দেয়া মোজার তলায় কালো ধুলোকাদা মাথা নটিবর স্মার দিকে তাকিয়ে আরতি বর,

—কি জানো?

—বড় দিদিমণি দেখতে পাবেন বলে আপনি মোড় না বেঁকলে কথা বলেন না। আপনি তখন আমাকে চেনেনই না, আমি জানি মিছিমিছি, তবু কষ্ট হয়।

—তুমি বস্ত্র পাকা মেয়ে,

—হ্যাঁ, বাবাও তাই বলেন,

আরতি আয়ার দিকে তাকালো। আয়ার পীনোমত বকে কাঠপলার মালায় সোনার দানাগুলো আগুনের মত জ্বলছে। আরতির মনে আগুন জ্বলে উঠল। সে এই কচি মুখ শিশুটাকে ব্যবহার করতে চাইল। আমাকে বলল,—তুমি যাও, আমি মিনুকে নিয়ে যাচ্ছি।

আয়া হেসে এগিয়ে গেল। নাকের লাল নাকছাবি, নীল নাকছাবি দু'আলোয় ঝিলিক দিল। আয়া ট্রাফিক সিগন্যাল জানে না। জানলে শব্দ লাল পরত....

এবার আরতি আর সুপ্রিয়া একলা। এখন সুপ্রিয়াকে জিজ্ঞেস করা যায়...ম-ম রাতে ও কার কাছে শোয়, মাঝরাতে কেঁদে উঠলে আয়া আসে কিনা? সোঁদিন যে মেম-সাহেব এসেছিল সে কে?...কিন্তু অনেকক্ষণ শ্রম সত্ত্বেও আরতি সুপ্রিয়াকে ব্যবহার করতে পারল না। সে জিজ্ঞাসা করল,

—বাড়িতে বড় একা একা লাগে না?

—হ্যাঁ, বাবাটা দৃষ্ট—

—কেন?

—নিজে বই নিয়ে বসে থাকে, খালি আপিস যায়, সন্ধ্যাবেলা খালি বেড়াতে যায়।

—না-না, তোমাকে বাবা কত ভালোবাসেন?

—সুপ্রিয়া পা দিয়ে একটা টিল ছুড়ল। তার উত্তর দিতে দেরি হল না।

—কই ভালোবাসে? একটুও ভালো-বাসে না।

আরতি টোঁক গিলল।—বাবা তবু কাকে ভালোবাসেন?

নিজেকে ছি-ছি করল আরতি। নিজেরই নিজেকে ঘেন্না হল।

—সম্বাইকে। আমাকে বাবা একটুও বকে না। অড্রে গিসি এলো শব্দ সেই সুন্দর সুন্দর গ্লাসে শেরি খাওয়ায়। এমন কি সোঁদিন যে আপনি গিয়েছিলেন, বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সোঁদিন, সোঁদিন আপনাকেও যেন ভালোবাসে ভালোবাসে বলে মনে হল।

—কেন মনে হল? মস্তচালিতর মত বয়স আরতি।

আপনাকে বাবা আমাকে দেরি করে আনার জন্য বকল না, কত গল্প করল, শরৎ খাওয়ালো, আমাকে শব্দ বকে,—

—কারণ তোমার বাবা তোমাকেই শব্দ ভালোবাসেন!

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুপ্রিয়াকে কোলে তুলে নিল আরতি, নতুন গম্বুতে শেখা কচি আঙুল গুনল সুপ্রিয়া, এক, দুই, তিন, চার, চারদিন হল,—

—কি চারদিন হল?

—আপনি আমাকে কোলে নিলেন।

সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়া, মিলু, মিলু..... আরতি এত কোঁদে ফেলল যে, চোখের সানপ্লাস খুলে ফেলতে হল।

আরতি বিছানায় শয়েছিল। তার স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগছে কদিন। ধুলোর চারপাশে মস্তারস লাগিয়ে যা হয়—তাই। সব জেনে-শুনেও এ কি স্বপ্ন। ওঁর কথাই ইন্দ্রজালে? কিসের জন্য আরতির দুর্বলতা? ওঁর চোখ, চুল, মিলু, না রেডিযোগ্রামের উপরের ফটিকের বালারিনা?

আরতির বুক জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে।

—তুমি কিন্তু ভীষণ বাড়িরে তুলেছ আরতি,—

আরতি মূখ থেকে হাত সরিয়ে চোখের জলের পর্দার মধ্যে দিয়ে টলমল করতে দেখল সুখমা সেনের ছবি।

—প্রায়ই বিকাশের বাড়ি যাচ্ছ,—

আরতি বিছানায় উঠে বসল, বলল—

—সুপ্রিয়াদের বাড়ি যাচ্ছ,—

—আমি যে দেখেছি তোমার। তোমার জানালা থেকেই, তুমি বিকাশের সঙ্গে গল্প করছিলে। সুপ্রিয়া ত ছিল না!

—হিল, ও ওয়ার্ড-মেকিং খোঁজছিল।

—খুব সাবধান আরতি। ঝাকে আত্মীয়-স্বজনও বিশ্বাস করে না,... হ্যাঁ কি কি অত গল্প করছিলে বলো? মনীষার কথা? ও ব্যক্তি মিথ্যা মিথ্যা করে সব যা ভা, না আরতি। তুমি জানো না, বিলেতে ও বে ল্যান্ডলেডের বাড়ি ছিল সেখানকার মেয়েটা এদেশে এসেছে, ওর কাছে আসে। আর কে একটা কাজিনের সঙ্গেও কি সব এ্যাকফরার,.....

—হ্যাঁ সেই কথাইত হাঁজিল,—

—কি? কি?

—ওই যে লন্ডন টিউব স্টেশনে বরফের জন্য ট্রেন বন্ধ হয়ে বাতোরর প্যাট বলে একটি মেয়ে ওর কাছে,—

—হ্যাঁ হ্যাঁ ওর কাছে,—

—সারারাত ছিল। সেই রাত্রির কথা বলছিলেন,—

—আর সোদিন সম্ভার বারান্দার দাঁড়িয়ে?

—সে প্যারিসের গল্প,—

—ছিঃ ছিঃ, এসব কথা তোমরা বলা-কওয়া করো, লজ্জা করে না,

—না, কারণ এসব কথা উনি মনীষাকেও চিঠিতে লিখেছিলেন। গোপন করেননি তো,—

—মনীষা তার স্ত্রী ছিল,—

—তিনি মনে করেছিলেন মনীষা তার স্ত্রী ও বন্ধু দুই-ই ছিল,—

—ওঃ এই? আচ্ছা, আচ্ছা! তাহলে মনীষার কথা কিছ, বলল না,—

—না, উনি এখন অস্ত্রের ছোট বোন প্যাট আসার জন্য বাস্তু। অস্ত্রে সাউথ ইন্ডিয়া গেছে, প্যাট ওর কাছে দিন-সাতেক থাকবে,.....

সমস্ত গা ঘুশায় শিউরে উঠল সুখমা সেনের,—তুমি মরেছ, তুমি মরেছো আরতি,—

আরতি সুখমা সেনের পিঠ দেখলো। পিঠ ছোটো হয়ে দরজার ওপাশে চলে গেল।

—বিছানায় লুটীয়ে পড়ে প্রচুর হাসলো আরতি। হাসল। হেসে হেসেই বাড়াসকে বলল,—মনীষা আত্মহত্যা করেছে। তাহলে কেন সবাই ওঁকে বলে উনি.....হঠাৎ কাড়িকাঠের দিকে চোখ পড়ল আরতির। বাঁকা হুক বুলছে। আরতির মূখ বীভৎস হয়ে গেল। চোখ বোরেরে পড়ল একটু। মনীষাকে তাহলে কি হতাই করা হয়েছিল?

—আমি এসব কথা কিছুই লুকোইনি, মনীষাকে জানিয়েছি, বড়টা বড়োছিল ততটা,—

উনি আরতিকেও জানিয়েছেন।

মনীষা কি বিশ্বাস করতে পারে একঘরে শূয়ে, এক রাত্রি কাটিয়েও বিকাশ, প্যাটের তার সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে জেনেও,.....

আরতিই কি বিশ্বাস করতে পারে একঘরে শূয়ে, এক রাত্রি কাটিয়েও বিকাশ প্যাটের তার সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে জেনেও,.....

আরতিকে কোন ঘরে ঠেলে দিল বিকাশের স্বীকারোক্তি। মনীষার সঙ্গে একঘরে। স্বীকারোক্তি প্রমাণ সাপেক্ষ। কে তা বিশ্বাস করে? বিশেষ করে যে ভালোবাসে। যার হারাই হারাই ভয় সবদা। মনীষা বিশ্বাস করেনি, আরতি বিশ্বাস করে না। তাহলে প্যাট আসছে কেন? শূয়েই কি ভারত দেখতে? না সেই বরফ-ঝরা রাতে.....(আরতির বৃকের ওপর মনীষার বৃকের ভিতর বসা বিচ্ছেদ হ'ল বসামুখে!) সেই বরফ-ঝরা রাত আরতির চোখের সামনে ফুটে উঠল। প্রস্থ পেল। তার পেছনে কত না-বলো ছায়া-ছায়া এপ্রিলের বিকেল, ট্রামলাগার স্কোয়ারের সম্ভা (এসব আশপাশ আমাকে বলেননি বিকাশবাবু। আশপাশ একথা মনীষাকেও বলেননি বিকাশবাবু।) মনীষা বৃকেছিল। আমি বৃকেছি। প্যাট আসছে কেন? তার জন্য আপনার চিন্তা কিসের? তার বিছানার তলার আশপাশ নরম পালকের লেপ রেখেছেন, তার বাবিশের ওআড় দুবার পাণ্টে এনেছেন নিউমারকেট থেকে।

কেন কেন?

আরতি জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার বাম্ববী প্যাট আসছে কেন?—উনি

হেসে বলেছিলেন,—আমার আত্মীয়েরা, বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়েরা বলে, আমার জন্য—

আরতির সামনের কাট প্লাসের পাঠে রাখা আইসক্রীম গরম ঠেকেছিল তখন।

ভয়। বিষম ভয়। ঈর্ষা বড় ঈর্ষা! আরতি মনীষাকে দেখতে পেরেছে। ঈর্ষার রং সবুজ। তাঁর সবুজ। আহা ঈর্ষার সেই সবুজ পাহাড়। জেড্ পাথরে গড়া কোণা-উঁচু সবুজ পাহাড়। ঘষড়ে ঘষড়ে চুড়ার উঠতে বৃক কেটে যায়। বৃক কেটে যায়। সত্যি এসব কথা বিকাশ ঘোষ আরতিকে কেন বললেন? মনীষাকে পাঠানো চিঠিগুলোর কার্বন কপি রাখলেন আরতির বৃকে। আরতিরও বৃক কেটে যায়। জেড্ পাথরের কোণা-উঁচু সবুজ পাহাড়। তার ধারালো শাণিত পাথরে পাথরে সোনালী বিন্দুতে বিন্দুতে আগুন জ্বলছে। অজস্র অগ্নিবিন্দু। আরতি আর ঈর্ষার সরাইপের মত পাহাড় বাইতে পারে না। পাহাড়ের ওপাশে তার সমস্ত উপশম। আরতি মনীষাকে দেখতে পায়। তার রক্ত তার ঈর্ষা। তার লাল, তার সবুজ আরতিকে জানালার কাছে নিয়ে যায়। সামনেই উনি, নিঃসঙ্গা দাঁড়িয়ে আছেন। বারান্দার পিছনের ঘরে মিল, খেলেছে। অন্ধকারে ওর মূখ দেখা যায় না। কিন্তু আরতি জানে উনি আরতির দিকে তাকিয়ে আছেন। উনি আরতিকে তা জানাতে চান। তাই ভাণ্ডা বদলালেন।

আর, আরতি তাই দড়াম করে জানালা বন্ধ করে দিল। বন্ধ করেই আরতি দুঃভাগ হয়ে গেল। তার এক-ভাগ শান্তিতে বলল, মহিমায় বলল,—আমার সুপ্রিয়া আছে, সংসার আছে, তুমি আছে। আর একভাগ সোজা চলে গেল ঠিক মনীষার মত একটা কাপ, একটা চামচ আর 'বঁব' লেখা একটা চোখের লোশানের কাছে। তার পর 'সে ফিরে তাকাগো মনীষার দিকে। মনীষাকে বলল,—মনীষা তোমার চেয়ে আমার স্নেহ, আমার ঈর্ষা, আমার দুঃখ আরো বেশ। তুমি শূখ স্বামীর বাম্ববীদের ঈর্ষার ভয়ে শূখিয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলে। আর আমাকে তোমার স্বামীর বাম্ববী এবং প্রথম ভালোবেসে বিয়ে করা বোঁ-এর ঈর্ষার সারা জীবন ভরবে থাকতে হবে। তবু এই জনোই আমার বাঁচতে হবে, অন্ততঃ আমি, এই পৃথিবীতে একজনও থাকবো যে নিজেকে দিয়ে জানতে পেরেছে, বিকাশ তার বোঁ-এর মৃত্যুর কারণ, সে তার বোঁ-এর হত্যাকারী নয়।

॥ রাজস্থানী চিত্রকলা ॥

ঐতিহাসিক মুঘল চিত্রকলার উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীর পর অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর কতৃপক্ষ এবার রাজস্থানী চিত্রকলার এক মনোহর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। প্রদর্শনীটি কাথেন্ড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে ৫ই মার্চ পর্যন্ত অগণিত দর্শককে শ্রব্দ আকর্ষণই করেনি, সীতাকার আনন্দ প্রদানেও সক্ষম হয়েছে।

মুঘল চিত্রকলার ন্যায় রাজস্থানী চিত্রকলাও ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের এক অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমাদের চেতনা জাগ্রত হয়। বিশেষ করে ১৯১৬ সালে প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী মুঘল ও রাজস্থানী চিত্রের অগ্বেষে শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সার্থকভাবে আকর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে জাতীয়-চেতনা সম্প্রসারণের ফলে আমরা এই লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের নিদর্শনসমূহের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। যে-সব রাজ-পরিবার বা অভিজাত ব্যক্তির সংগ্রহে রাজস্থানী চিত্রকলা দীর্ঘকাল ধরে আত্মগোপন করেছিল, ক্রমান্বয়ে তা উদ্ধার করে জনসমক্ষে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হয়। তবে ১৯৪০ সালের আগে উত্তর ভারতের এমন অনেক স্থান ছিল যেখানকার চিত্রকলা সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই অবগত হতে পারিনি। উত্তর ভারতের সেই অখণ্ড আবিষ্কৃত এবং খ্রীঃপূর্বীক কানোড়িয়া কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্থান ও মালওয়া অঞ্চলের চিত্রকলাই ছিল আলোচ্য প্রদর্শনীর প্রধানতম সম্পদ। অকুণ্ঠ চিত্রে বলবো : এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে অ্যাকাডেমী তার মহান দায়িত্ব পালনে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে রাজস্থানী চিত্রকলার ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। প্রধানতঃ ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী কালের মধ্যে রাজস্থানী চিত্রকলা ওরহা (মালওয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত), অম্বর (রাজস্থানের পূর্ব প্রান্ত), বিকানীর, বোধপুর্, কিশাণগড়, কোটা, মেবার, বুন্ডি ও মালওয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিকশিত হয়ে ওঠে। এই ধারার-ই অন্য এক বিবর্তিত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কাংড়া তথা পাঞ্জাবের পাহাড়ী চিত্র-শৈলীর মধ্যে।

দর্শনী

কলারনিক

রাজস্থানী চিত্রের বিষয়বস্তুতে ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যের প্রাধান্য ঘটলেও এর আঙ্গিক-প্রকরণে সমসাময়িক মুঘল চিত্রকলার প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে মুঘল চিত্রকলার উপরেও আমরা রাজস্থানী চিত্রকলাকে প্রভাব বিস্তার করতে দেখছি।

প্রখ্যাত কলা-সমালোচক ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী মুঘল ও রাজস্থানী চিত্রকলার পার্থক্য নির্ণয় করে একদা যে-সব বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন রাজস্থানী চিত্রের বর্তমান আবিষ্কৃত রূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সেই বক্তব্যের বহু অংশ নিঃসংশয়ে অনেকের পক্ষেই গ্রহণ করা বোধহয় সম্ভব হবে না। ডঃ কুমারস্বামী তাঁর 'রাজপুত পেন্টিং' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মুঘল চিত্রকলার

সঙ্গে রাজস্থানী চিত্রকলার পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছিলেন :

'Mughal art is secular, intent upon the present moment, and profoundly interested in individuality. All its themes are worldly and though sheer intensity of observation—passionate delineation — sometimes raises individual works to the highest possible rank, yet the subject matter of Mughal art, as such, is of purely aristocratic interest.'

এই উক্তি মুঘল চিত্রকলা সম্বন্ধে সর্বাংশে যেমন প্রযোজ্য নয়, তেমনি রাজস্থানী চিত্রকলার অনেক নিদর্শন সম্পর্কে এই উক্তি সার্থকভাবেই প্রয়োগ করা যায়। এই প্রদর্শনীতেই এমন অনেকগুলি চিত্র ছিল যা দিয়ে ডঃ কুমারস্বামীর উক্তি খণ্ডন করা যায়। প্রদর্শিত ৬৯, ৭০, ৭১ ও ৭২নং চিত্রের সর্বাংশে মুঘল চিত্র-শীতির সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। এই চিত্রগুলি ওরহা ও অম্বরের প্রাদেশিক রাজ-দরবার থেকে সংগৃহীত। এই দুই দরবারের

মাথা ধরা, সর্বপ্রকার কথা ও বেনা,
সর্দি-জ্বর, ইনফ্লুয়েন্স প্রভৃতিতে

নিরাপদ
নিশ্চিত ও
দ্রুত

এলজিড

আরামের জন্য



৫ টি কার্যকরী
উপাধানে
একত

বেঙ্গল ইমিউনিটির ডেপী



মেবারের ১৭২০ সালের একটি চিত্র

সঙ্গে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে মৃৎকলা-দরবারের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ফলে, এখানকার চিত্র-রীতিতে মৃৎকলা চিত্রকলার প্রভাব পড়েছে। এই চারখানি চিত্রের পার্থক্য শুধু এর বিষয়বস্তুর মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ ভারতীয় কাব্যের রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীই এর মূখ্য বিষয়। মৃৎকলা চিত্রকলায় যেমন পারস্যশৈলীর অলঙ্কৃত সৌন্দর্য্য একটি মূখ্য বৈশিষ্ট্য, তেমনি রাজস্থানী চিত্র-কলাও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে এর উদ্ভূত গীতি-কাব্য-ধর্মী অবদান সূচ্যময় জন্য। ডঃ কুমারস্বামীর বিতর্কিত সিদ্ধান্তের পক্ষে অগ্রসর না হয়ে আমরা মোটামুটি উপরোক্ত পথে এই দুই চিত্র-রীতির পার্থক্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে বিকানীর, যোধপুর, কিষণগড় ও কোটা—এই চারটি রাজ্য থেকে সংগৃহীত বেশ কিছু সংখ্যক চিত্র-দর্শনের সুযোগ ঘটেছিল সকল দর্শকের। এর কয়েকখানি চিত্রের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে মৃৎকলা চিত্রকলার প্রভাব তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। পার্থক্য যা ছিল তা অতি সামান্য। যেমন, মৃৎকলা সম্রাটদের প্রতিকৃতি সাধারণতঃ হস্তীপৃষ্ঠে কিংবা দণ্ডায়মান অবস্থায় শিল্পীরা চিত্রিত করতেন আর রাজস্থানী শিল্পীরা রাজপুত রাজাদের হস্তীর বদলে অশ্বের পৃষ্ঠে বসিয়ে মূলতঃ সেই একই প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন (৬১, ৬২, ৬৩)। কিষণগড়ের রাজা সবন্ত সিং তাঁর দরবারে একটি বিশিষ্ট ধারার চিত্র-রীতির উদ্ভাবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। আঙ্গিকে অনেকখানি মৃৎকলা প্রভাব থাকলেও বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। রাজা সবন্ত সিং নিজেকে কৃষ্ণ বলে মনে করতেন আর তাঁর প্রেমিকা-কবি বানী-থানীকে মনে করতেন শ্রীরাধারূপে।

ফলে, রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কাহিনী নিজের উপর আরোপ করে তিনি শিল্পী-দের নির্দেশ দিয়ে এমন সব চিত্র-রচনা করান যার মধ্যে রাজা সবন্ত সিং ও তাঁর প্রেমিকা-কবি বানী-থানীর প্রেম-কাহিনীই রূপায়িত হয়েছে। কিষণগড়ের চিত্রকলায় তাই বস্তুকম ভ্রু-রেখা আর আরত চক্ৰের এক অপূর্ব সূক্ষ্ম ফটে

সুসজ্জিতা জয়পুরের রমণী :
১৮৫০ সালের চিত্র

উঠেছে (৬৫, ৬৬, ৬৭)। কোটা থেকে সংগৃহীত চিত্রখানি (৬৮) রাজা রাম সিংহের 'সিংহ-শিকার' সেই একই মৃৎকলা শিকার-চিত্রের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

যাহোক, রাজস্থানী চিত্রের সব চেয়ে ঐশ্বর্যময় অবদান পেরোছি আমরা মেবার (উদয়পুর), বন্দি ও মালওয়ার থেকে সংগৃহীত চিত্রগুলির মধ্যে। এই চিত্রগুলির মধ্যে মৃৎকলা চিত্রকলার প্রভাব প্রায় নেই বললেও চলে। কারণ, এই স্থান-গুলির উপর দিল্লী-দরবার কোনো কালেই

তেমন আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়নি। বরং মৃৎকলা-সম্রাটদের সঙ্গে বৈরী মনো-ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় মেবার এমন এক চিত্রকলা আমাদের উপহার দিয়েছে যার মধ্যে হিন্দী ও সংস্কৃত মহাকাব্যের ভাবধারাই প্রাধান্য পেয়েছে। এই সব চিত্রের কোনোখানি রূপায়িত হয়েছে পণ্ডিতদের গল্প অবলম্বনে, কোনোখানি গ্রহণ করেছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, আবার কোনখানিতে স্থান পেয়েছে ভারতীয় রাগ-রাগিণী তথা কাব্যের প্রতীকধর্মী বিমূর্ত চেতনার উজ্জ্বল উপকরণ। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ভারতীয় কবির 'আমরু শতক' কেশব দাসের 'রসিক প্রিয়া' সুরদাসের 'সুর-সাগর' আর ভারতীয় রাগ-রাগিণীকে ভিত্তি করে যে-সব প্রেমের কবিতা লেখা হয়েছে, সেগুলিই ছিল এই অঞ্চলের শিল্পী-মনের প্রেরণার উৎস।

এই সব কাব্যের এক একটি বিষয় বা চিত্রকল্প নিয়ে শিল্পী এমন সব চিত্র-রচনা করেছেন যার মধ্যে ভারতীয় জীবন-দর্শন অনবদ্য কাব্যিক সূক্ষ্মায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি চিত্রের পদ্ম, পদ্মপাত বৃক্ষ, পাখী, জীব-জন্তু, রঙ-মানব-প্রকৃতির বিশেষ বস্তুব্যাক বিশেষ অর্থে বাস্তব করার জন্য শিল্পী ব্যবহার করেছেন। রাজস্থানী শৈলীর মত এমন ব্যঞ্জনময় চিত্র-শৈলী ভারতে আজ পর্যন্ত তাই দেখা যায়নি। ডঃ কুমারস্বামীর ভাষায় বলা যায় : "What Chinese art achieved for landscape is here accomplished for human love. The arms of lovers are about each other's necks, eye meets eye, the whispering Sakhis speak of nothing else but the course of Krishna's courtship, the very animals are spell-bound by the sound of Krishna's flute and the elements stand still to hear the ragas and raginis."

প্রদর্শনী কক্ষের ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮ নং চিত্রগুলি দেখার সময় উপরোক্ত কথাগুলিই বারংবার আমার মনে পড়েছে। রাগমালা সিরিজের এই চিত্রগুলি ছাড়াও আরও অনেক চিত্র ছিল যেগুলি দর্শন করেও অনায়াসে বলা যায় : "Rajput art 'creates a magic world where all man are heroic, all women are beautiful and passionate and shy, beasts both wild and tame are the friends of man, and trees and flowers are conscious of the footsteps of the bridegroom as he passes by'" — Dr. Coomaraswamy.

আমরা প্রদর্শিত ১২১ খানি চিত্র মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করছি। অশা করি অ্যাকাডেমীর কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতেও এইভাবে ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের ঐতিহ্যময় প্রদর্শনীর আয়োজন করে আমাদের ক্রমবর্ধমান শিল্প-জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করবেন।

॥ স্বাগতম ॥

গত ১২ই মার্চ মার্কিন প্রেসিডেন্টের পত্নী শ্রীমতী জ্যাকুলিন কেনেডি নয় দিনব্যাপী ভারত সফরের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লীতে এসেছেন। ভারত ও আমেরিকার মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করতে কোটি কোটি আমেরিকাবাসীর অন্তরের শুভেচ্ছা নিয়ে তাঁর এই শুভাগমন। স্ত্রী, শিক্ষিতা ও আধুনিকা “আমেরিকার প্রথম মহিলা নাগরিক”—এই মহিলা নানা গুণে বিভূষিতা। সাংবাদিকতার ডিগ্রিধারী এই মহিলা রিপোর্টার হিসাবে কাজ করবার সময়ে শ্রীযুক্ত কেনেডির সঙ্গে পরিচিতা হন। শ্রীমতী কেনেডি চিত্রশিল্পানুরাগিনী। তিনি ‘ন্যাশনাল গ্যালারি অব আর্টসে’র



॥ উত্তর বিশ্লেষণ ॥

সারাভারতে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়েছে এবং অভাবিতপূর্ব কোন ঘটনাই তাতে ঘটেনি। কংগ্রেসই সকল রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসন-কর্মতায় পুনর্নির্ধারিত হয়েছে, দুটি অঙ্গরাজ্য মধ্য-প্রদেশ ও রাজস্থান ছাড়া বিরোধী শক্তি



ভারত সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপেরত মাননীয় শ্রীমতী কেনেডি।

মাননীয় সদস্য। সেখানকার গ্যালারিতে তাঁর অঙ্কিত চিত্র রয়েছে। তাছাড়া অশ্বচালনা ও সস্তরগপটিরিসী এই মহিলা ফরাসী ও স্প্যানিস ভাষায় অনঙ্গল কথা বলতে পারেন।

শ্রীমতী কেনেডির অন্যতম গুণ হল তিনি সুগৃহিণী। বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে বাস করেও তিনি বাসগৃহের মধ্যে এক অরাজনৈতিক আবহাওয়া ও বিশুদ্ধতার সৃষ্টি করেছেন। স্ত্রী ও জননীর কাজকেই তিনি নারীর প্রধান কর্তব্য মনে করেন। তাঁর ভারত সফর সুখকর, আনন্দদায়ক ও মৃগলময় হোক এই কামনা করি।

কোথাও তাদের ধারে-কাছে আসতে পারেনি। তবুও এ জয় কংগ্রেসকে নিশ্চিত হওয়ার কোন অবকাশ দেয়নি, বিরোধী দলগুলিকে ত একেবারেই না।

সর্বভারতীয় দল হিসাবে এবারে কংগ্রেসের প্রভাব কমেছে। লোকসভার ৪৯৪টি নির্বাচনযোগ্য আসনের মধ্যে ৪৮৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাঁরা ৩৫৪টি আসনে জয়ী হয়েছেন এবং প্রদত্ত ভোটের মধ্যে তাঁরা পেয়েছেন ৪,৪৮,৭০,২২৭টি অর্থাৎ ৪৫-২৪ ভাগ মাত্র। '৫৭ সালের নির্বাচনে তাঁরা পেয়েছিলেন প্রদত্ত ভোটের ৪৭-৮ শতাংশ। আসন সংখ্যাও তাঁদের কমেছে ১৮টি।

স্বিতীয় বৃহত্তম দলরূপে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন কমিউনিষ্ট পার্টি। ১৩৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাঁদের জয়ের সংখ্যা ২৯। ভোট পেয়েছেন মোট ১,০৫,৮৬,৬০৩, অর্থাৎ সমগ্র প্রদত্ত ভোটের ১০-৬৭ শতাংশ। গতবার তাঁদের পক্ষে ভোট পড়েছিল ৮-৯২ শতাংশ, এবং এ হিসাবে সর্বভারতীয় দলরূপে তাঁদের স্থান ছিল তৃতীয়। তবুও নির্বাচনের সামগ্রিক ফলে কমিউনিষ্ট দলের উৎসাহিত হওয়ার মত কিছু ঘটেনি। পাঁচ বছরের চেষ্টার সারা ভারতে যদি মাত্র ২টি আসন বেশী পাওয়া যায় তবে গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা লাভের জন্য তাদের অন্তত এক শ' বছর অপেক্ষা করতে হবে।

নির্বাচনে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করেছেন স্বতন্ত্র দল। সদ্য গঠিত এই রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী দলটি এইবারই প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে ১৮টি আসনে জয়ী হয়েছেন এবং ভোট পেয়েছেন মোট ৮৪,৪৩,১৩৪টি, অর্থাৎ প্রদত্ত ভোটের ৮-৫০ শতাংশ। উড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদ স্বতন্ত্র দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাঁদের আসনসংখ্যা আরও চারটি বেড়েছে এবং বিদভের নেতা শ্রীআনেও স্বতন্ত্র দলে যোগ দেওয়ায় লোকসভায় ঐ দলের সদস্যসংখ্যা এখন ২০। এ সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা আছে। এই দক্ষিণপন্থী দলটির বিশেষ সাফল্য কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সকলেরই বিশেষ চিন্তার কারণ হয়েছে। কংগ্রেসের সম্মুখে এখন প্রশ্ন, তাঁরা আরও দক্ষিণ-ঘেঁসা হয়ে বড়লোকদের মন বোগাবেন, না আরও বামপন্থী হয়ে জনসমর্থনের উপর নির্ভরশীল হবেন। বর্তমানে শেষোক্ত চিন্তাধারার দিকেই কংগ্রেসের বৌক বেশী, একারণে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিষ্ট দলের সম্পর্ক হয়ত আরও বেশী নিকট হবে। এইবারেই কমিউনিষ্টরা বোম্বাই ও দিল্লীতে প্রকাশ্যে এবং বহুস্থানে অপ্রকাশ্যে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন, এরপর হয়ত সকল স্থানেই তাঁরা স্বতন্ত্র, জনসংঘ প্রভৃতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে প্রকাশ্যে সমর্থন করবেন।

নির্বাচনে এবার সবচেয়ে খারাপ অবস্থা প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের। গতবারের স্বিতীয় বৃহত্তম সর্বভারতীয় দল পি-এস-পি এবার জনসমর্থনের বিচারে চতুর্থ স্থানে নেমে এসেছেন এবং আসনের বিচারে তাঁদের স্থান পঞ্চম। ১৬৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাঁরা পেয়েছেন মাত্র ১২টি আসন। ভোট পেয়েছেন ৭০,২৯,১৬০, সমগ্র প্রদত্ত ভোটের যা ৭-০৮ শতাংশ, গত নির্বাচনে যে সংখ্যা ছিল ১০-৪১। প্রজা-সমাজ-তন্ত্রী দলের এই বিপর্যয় সহজবোধ্য।

কংগ্রেসের বিরোধী গণতন্ত্রী দলরূপে বে ডুমিকা তার ছিল, তা আজ আর তার নেই। অন্তর্বিবোধ, দুর্বল নেতৃত্ব, সমাজ-তন্ত্রী দলের সৃষ্টি ইত্যাদি কারণগুলি ছাড়াও কংগ্রেসের রাজনৈতিক চরিত্র-বদলও তার বিপর্যয়ের অনিবার্য কারণ। ইংলন্ডের রক্ষণশীল ও প্রামিক দলের সঙ্গে ভারতের কংগ্রেস ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের যে তুলনা হত, ভারতে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা অচল। কারণ কংগ্রেসই বর্তমানে চিন্তা-ধারায় ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে ইংলন্ডের প্রামিক দলের অনুরূপ এবং এই কারণেই দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল দলের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছে স্বতন্ত্র দল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ দক্ষিণপন্থীরাও হয়ত অনতিবিলম্বেই কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বতন্ত্র দলে যোগ দেবেন। এ অবস্থায় প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিভাজনের অনু-গামীদের মত বামপন্থী দলের ডুমিকা গ্রহণ করা মোটেই অবিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে না। অবশ্য প্রেস্টিজ ও কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতি এই জাতীয় একটা ঘটনার পথে যে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একথাও সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, কংগ্রেসের বর্তমান ডুমিকার প্রজা-সমাজতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দলের অস্তিত্বের আর কোন সার্থকতা নেই। তাদের অধিকাংশ নেতাই এখন উন্মত্ত এবং অন্যান্য কর্মীদের স্থানীয় প্রভাবও ক্রমেই কমে আসবে। শ্রদ্ধা তাদেরই নয়, কমিউনিষ্ট দলকেও ক্রমে ক্রমে কংগ্রেসের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হবে। শ্রদ্ধা আন্তর্জাতিক আন্দোলনের জন্যেই হয়ত তাদের শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না, যদিও তার সম্ভা-বনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইংলন্ডে কমিউনিষ্ট দল কয়েকবারই প্রামিক দলের অভ্যন্তরে মিশে যাওয়ার প্রস্তাব করেছে।

উগ্র জাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থী দল জনসংঘের সাফল্যও এ নির্বাচনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাদের আসন সংখ্যা লোকসভায় ৬ থেকে বেড়ে এবার ১৪ হয়েছে এবং তারা ভোট পেয়েছেন ৬০,৬৬,৬৩৪টি যা প্রদত্ত ভোটের ৬.১১ শতাংশ। ভবিষ্যতে ঘটনা পরস্পরায় স্বতন্ত্র দল ও জনসংঘের সম্পর্ক অনেক নিকট হবে এবং তাদের একেবারে মাধ্যমে একটিই সবভারতীয় শক্তিশালী দক্ষিণ-পন্থী দল গড়ে উঠাও অসম্ভব নয়। যদি তা হয় তবে ভারতের রাজনীতি যে এখনকার তুলনায় অনেক বেশী জটিলসা-মুত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৥ দুই লক্ষ হতাহত ॥

ফ্রান্সের সামরিক দপ্তর থেকে এক ঘোষণায় বলা হয়েছে—১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বর থেকে ১৯৬১ সালের শেষ পর্যন্ত আলজিরিয়ার যুদ্ধে ১,৫৮,২৫০ জন প্রাণ হারিয়েছে। তার মধ্যে আল-জিরায় জাতীয়তাবাদীদের সংখ্যা ১,৪১,০০০ এবং ফরাসী সৈনিক ও শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা ১৭,২৫০। এ ছাড়াও আহত হয়েছে ৫১,৮০০ জন ফরাসী সৈনিক। আলজিরীয় জাতীয়তাবাদীদের আহতের সংখ্যা জানা যায়নি, তবে বলা হয়েছে এ পর্যন্ত সাত হাজার আহত আল-জিরায়কে ফরাসী হাসপাতালে শুল্লেখ করা হয়েছে।

সাত বছরের সংগ্রামে দু' লক্ষেরও বেশী লোক হতাহত হওয়ার পর ফরাসী সরকার বোধহয় জীবনের এই অমের অপচয়ের অর্থহীনতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই এখন একটা মীমাসায় আসার জন্যে তাদের খুবই আগ্রহ। কিন্তু আলজিরিয়া তাতে শান্ত হবে বলে মনে হয় না। কারণ সামাজিক স্বার্থে ফ্রান্স একদিন যে অশুভ শক্তিকে জাগিয়ে তুলে-ছিল আজ তা তার নাগালের বাইরে। 'কলোন' নামে পরিচিত আলজিরিয়ার দশ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশী আজ আর কোন যুক্তিতেই ফরাসী সরকারের কথা শুনবে চলেতে রাজী নয়। একারণে ফ্রান্স সম্মত হলো কলোনরা হয়ত কিছুতেই আলজিরিয়ার শাসন-দায়িত্ব এ দেশের জাতীয়তাবাদীদের হাতে তুলে দিতে সম্মত হবে না। ফলে এড্রিয়ান বৈঠকে আলজিরীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ফরাসী সরকারের একটা আপোস হয়ে গেলেও আলজিরিয়ার অশান্তি হয়ত অব্যাহতই থাকবে। কলোনদের সম্ভা-বাদী সংগঠন ও-এ-এস বর্তমানে যেভাবে আলজিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে এমন কি খোদা ফ্রান্সে সম্ভাবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে মনে হয় না যে, ফরাসী সরকারের বর্তমান আপোসমুখী মনোভাব তাদের উপর কোনরকম প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। সুতরাং ফ্রান্স আলজিরিয়াকে স্বাধীনতা দিতে সম্মত হলেই আলজিরিয়ার শান্তি এসে যাবে একথা ভাষা বোধহয় ঠিক হবে না। কলোনদের দমনের আন্তরিক ইচ্ছা নিয়েই ফরাসী সরকারকে আলজিরিয়া সমস্যার সমাধানের জন্য আগ্রহ হতে হবে।

৥ মধ্য আফ্রিকার সংকট ॥

মধ্য আফ্রিকার বর্তমান সংকটের মধ্যে আলজিরিয়া সমস্যার অতি নিকট সম্পর্ক। উভয় ক্ষেত্রেই মাতৃ-রাষ্ট্রকে আজ উপনিবেশীদের অন্যায় জেদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর যে-কোন

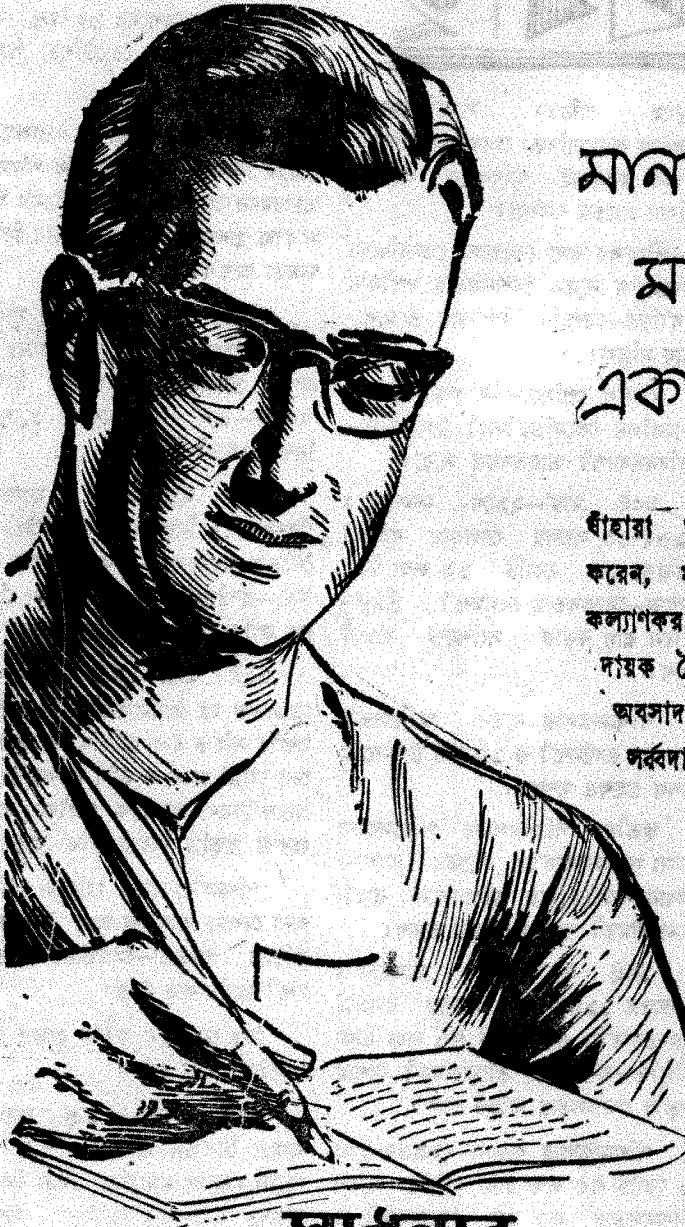
ক্ষেত্রে মাতৃ-রাষ্ট্রের শাসকবর্গের নতি-স্বীকারের অর্থ হবে অপরক্ষেত্রে উপ-নিবেশীদের অন্যায় জেদের কাছে হার মানা।

উত্তর ও দক্ষিণ রোডেসিয়া এবং নিয়াসাল্যান্ড এই নিয়ে ১৯৫০ সালের ১লা আগস্ট ব্রিটিশ সরকার গঠন করেন মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন। এই যুক্তরাষ্ট্র-টির আয়তন প্রায় ৫ লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ। এর মধ্যে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীর সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ ও এশীয় উপনিবেশীর সংখ্যা আধ লক্ষ। বাকি সত্তর লক্ষ আফ্রিকার আদিবাসী। কিন্তু মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের শাসন-ব্যবস্থায় এই সত্তর লক্ষ মানুষের কোন স্থান নেই। মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নেরই অপর সংস্করণ। এ কারণে মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা কোন-দিনই এই ফেডারেশনের গঠন বা শাসন-ব্যবস্থাকে সমর্থন করেনি এবং ফেডা-রেশনের অপর রাজ্য নিয়াসাল্যান্ড প্রথম থেকেই ফেডারেশন ত্যাগের দাবী জানিয়েছে। অন্য দুটি অঙ্গরাজ্যও কৃষ্ণাঙ্গদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার ও মর্যাদার দাবী প্রবল আকার ধারণ করে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে সমগ্র মধ্য-আফ্রিকা ফেডারেশনের কৃষ্ণাঙ্গরা দাবী জানায়, হয় তাদের অধিকার স্বীকার করতে হবে নয়ত ফেডারেশন ভেঙে দিতে হবে। ব্রিটিশ সরকার বর্তমানে সেই দাবীতেই সাড়া দিয়া মধ্য আফ্রিকার শাসনতন্ত্রে কিছুটা অদল-বদলে অগ্রণী হয়েছে। ফলে ঐ উপনিবেশটির শ্বেতাঙ্গ শাসকরা আলজিরিয়ার কলোন-দের মত এখন মাতৃ-রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করেই মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের সমগ্র শাসনকর্তা নিজেদের কৃষ্ণাঙ্গত করতে উদ্যত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের শ্বেতাঙ্গ শাসক-দের এই চক্রান্ত যদি ব্রিটিশ সরকারের কাছে কোন বাধা না পায়, তবে হয়ত অবিলম্বে সেখানকার শ্বেতাঙ্গ উপ-নিবেশীদের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের প্রবল সংঘর্ষ দেখা দেবে। ব্রিটিশ সরকারের বর্তমান মনোভাব দেখে মনে হয়, মধ্য আফ্রিকার বর্তমান ভাগ্যনিয়ন্তা স্যার রয় উইলেন্সনকে খুব বেশী অসন্তুষ্ট করার ইচ্ছা তাদের নেই। এ অবস্থায় মধ্য আফ্রিকাতেও যদি আল-জিরিয়ার ইতিহাসের পুনরাবর্তি হয় তবে সেটা আশ্চর্যের কিছু হবে না।

৥ সংশোধন ॥

জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার যে হিসাব গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তার গিরোনামের অঙ্কের পরিমাণ ৩৯০০০ না হয়ে হবে ৯৪,০০০।

‘পরমাণু’ আশ্রয় নিষিদ্ধকরণের জন্য
কার্যকরী চুক্তি অনুষ্ঠান প্রয়োজন’—
ওয়ারশিষ্টনে সামবাদিক বৈঠকে কেনেডি
(মার্কিন প্রেসিডেন্ট) বিবৃতি—সফল
মিলিলে শীঘ্র সম্মেলনে যাইবেন বাগদা
অভিমত প্রকাশ।



মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

বাহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভূঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই শিথিলকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্বদা প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনার মহা ভূঙ্গরাজ তৈল



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,

(এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য)

অধ্যক্ষ ত্রিযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী, এক, সি, এন, (লওন) এম, সি, এস (আমেরিক)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

সমকালীন সাহিত্য

অভ্যুত্থান

॥ ঘরের মানুষ টলস্টয় ॥

টলস্টয় তনয় সারজী টলস্টয় লিখিত পিতৃস্মৃতি *Tolstoy Remembered by his Son*, নামে ইংরাজী অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মৌরা বাডবার্গ এবং প্রকাশ করেছেন লন্ডনের ওয়াইডেন ফেল্ড্‌ এ্যান্ড নিকলসন কোম্পানী। এই গ্রন্থটির মূল্য পঁচিশ শিলিং।

টলস্টয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সারজী টলস্টয় লিখিত এই স্মৃতিচিহ্ন টলস্টয় প্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এক মূল্যবান সংযোজন, জীবনীত্বাসের কাঠামোর ওপর এই সব মালমশলা একটা রক্তমাংসের মূর্তিগঠনে সহায়ক হবে।

টলস্টয়ের হিমালয়সদৃশ এক-গুরুত্বপূর্ণ সংক্রান্ত যে ধারণা এবং কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সারজী টলস্টয়ের এই স্মৃতিকথা তা মূছে দিতে পারবে না, তবে স্নেহময় পিতা হিসাবে তিনি তেমন কঠোর বা দুরবিগম্য ব্যক্তি ছিলেন না। টলস্টয়ের পুত্র টলস্টয়কে ভীতিমিশ্রিত ভালোবাসার চোখে দেখেছেন।

এই স্মৃতিচিহ্ন ইয়াসনায়্যা পলিয়ানা তালুকে কি পরিবেশের মধ্যে টলস্টয় দিনাতিপাত করেছেন তার এক নিখুঁত চিত্র রচনার সহায়তা করবে। সেই পল্লী-অঞ্চলে বিচিত্র প্রামাণ্য মানুষের মিছিল, সেই সঙ্গে আছে সফরবিলাসী ভ্রমণকের ভীড়, আর আছে নানা রঙ্গের ছিট-কাপড়ের ফেরিওয়ালা, জুতা বিক্রেতা।

গোড়ায় গোড়ায় ইয়াসনায়্যা পলিয়ানার আনন্দময় আবহাওয়ার আমেজ ছিল, কাজের সঙ্গে মিশিয়ে ছিল আনন্দ। বীজের মরশুমের টলস্টয় লিখেছেন "War and Peace", তখনও পর্যন্ত অধ্যাত্ম আবেগ তাকে দংশন করেনি। তিনি লিখেছেন এই মহৎ উপন্যাস আর স্ত্রী সোফিয়া হাসিমুখে বারবার সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি কপি করে যাচ্ছেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই উপন্যাস লেখা সুরু

হয় টলস্টয় তার বিষয় বলে-ছিলেন—"অতীব অনুকূল পরিবেশ ও পাঁচ বছরের বিরামবিহীন পরি-শ্রমের ফল।" তিনি নিজে এই উপন্যাসকে ইলিয়াডের সঙ্গে তুলনা করেছেন, আর সমালোচকরা বলেছেন : "St. Peter at Rome is a trifle compared with Tolstoy's 'War and Peace'" — (আরনলড্‌ বেনেট)।

সামর্য্যর কাছাকাছি আর একটি তালুকের দিনগুলিও আনন্দময় ছিল। সেখানে স্বেতপ অঙ্গলের উর্বর কালো-রংগের মাটি নানা জাতীয় গুল্ম, ওষধিলাতা, সব প্রভৃতি প্রচুর ফলত আর মাথার উপর উড়ে বেড়াতে বিরাট বাজ-পাখি আর ঈগলের কাক, বাতাসে প্রতি-ধ্বনিত হত 'ঝ' 'ঝ' পোকাকার ঐক্যতান।

এই অঞ্চলে শিকার করার সময় টলস্টয় যে আনন্দ এবং উদ্দাম উত্তেজ-জনার স্পর্শ লাভ করেন তাতে তাঁর হৃদয় মন ভরপুর হয়ে ওঠে, তখনও তাঁর মানসিক প্রশান্তির জগতে বিকৃত সংশয় এবং উদ্বেগ এসে আবিলাতা সৃষ্টি করেনি। প্রকৃতি তার সব কটি মূর্তি নিয়েই টলস্টয়ের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং তাঁর জীবনে তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তাঁর শিকারের অভিযানগুলি নিরর্থক হয়ে উঠত যদি তাঁর পিছনে পল্লীপ্রকৃতির এই শান্ত শ্যামলিমার প্রশান্ত প্রলেপ না থাকত। সারজী লিখেছেন :

"The solitary aspect of it appealed to him; he loved to feel himself a part of the countryside, loved the exhilaration of hunting that makes the sportsman forget the petty trifles of life."

পল্লীদৃশ্য টলস্টয়ের গভীর আন-রাগের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াসনায়্যা পলিয়ানা এবং সন্নিবৃত্ত অঞ্চল নিকলস্কয় টলস্টয়ের অন্তরকে সুধার ভরিয়ে দিয়েছে। নিকলস্কয় গভীর খাদ এবং ঘন জঙ্গলের জন্য পরিচিত। এইখানের একটি 'ওয়াটার-মিল' (জলচক্র) টলস্টয় তাঁর "Resurrection" উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন।

এই বিস্ময়কর চরিত্রের মানুষটির ব্যক্তিগত ঘর-সংসারের ব্যাপারে মাঝে মাঝে উৎপীড়িত হয়ে উঠত, ঘরের মানুষও তাকে নিয়ে বিরত হত, 'সমাজ সংসার' মিছে সব, 'মিছে এই জীবনের কলরব' জাতীয় মনোভঙ্গী যখন টলস্টয়কে আচ্ছন্ন করত তখন ঘরের মানুষ যেন তাঁর চোখ থেকে একেবারে অবলুপ্ত হত। বাড়ির মানুষ তাঁকে ভালোবাসত, তাঁর গায়ের গন্ধ, তাঁর তামাকের গন্ধ সব কিছুই তাদের কাছে মধুর মনে হত, তবু টলস্টয়ের পারি-বারিক স্নেহ ভালোবাসার কোনো বহিঃপ্রকাশ ছিল না। কাউকে চুমু খাওয়া বা আদর করা টলস্টয়ের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। সাধারণ নিরিখে তাঁকে স্নেহময় বলা যায় না।

সারজী টলস্টয় এই বিষয়ে লিখেছেন :

"We not only loved him, he occupied a great place in our lives, but we felt that he obliterated our personalities, so that some times we wanted to escape—He was not affectionate in the usual sense of the word; there was no kissing no presents, but we always felt he loved us and knew when he was satisfied with our behaviour. We liked Father's smell, the smell of his flannel blouse, healthy sweet and tobacco."

টলস্টয়ের তথাকথিত 'দীকার' (Conversion) কালের অনেক বছর আগে থেকেই স্বতোৎসারিত স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে নৈতিক ও অধ্যাত্ম-জীবনের একটা সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করা যায়। Anna Karenina রচনার অনেক আগেই তাঁর বিশ্লেষণী হাতিয়ার তৈরী হয়ে ছিল, তার ফলে অনেক সময় তাঁর কর্মের মধ্যে সমতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠত।

টলস্টয়ের জীবনের প্রথম দিককার রচনায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ স্পষ্ট, নীতিবাদের নায়ক সবদাই টলস্টয়ের আপন আদর্শে গঠিত। Anna Karenina-র এই বিষয়ে আর এতটুকু সংশয় থাকে না। টলস্টয়ের পুত্রও সেই কথাই বলেছেন। তিনি বলেন যে 'লৌভনের' চরিত্রটি, জীবন সম্পর্কে তার মনোভঙ্গী, টলস্টয়ের নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আলোড়নেরই প্রতিচ্ছবি। অপর পক্ষে "War and Peace"-এ প্রিন্স এন্ড্রু এবং পিয়ার চরিত্রে টলস্টয়ের মানসিক অন্তর্ভাবের পরিচয়

পাওয়া যায়। পীরায় এবং লেভিন এই দুইটি চরিত্র একই জীবনের পুনরাবৃত্তি।

টলস্টয়ের ধর্মীয় সংশয় এবং ধারণা যে তাঁর সাহিত্যকর্মকে অনেকভাবে ব্যাখ্যাত করেছে সে কথা তুর্গেনিভ বলেছেন এবং তাঁর মন্তব্য স্বাভাবিক। টলস্টয়ের বর্ণনা যখন বেগবতী নদীর মতো প্রবাহিত তখন সহসা তার সেই গতিপথে বাধা বেধে দেওয়ার মত দৃশ্যপট দার্শনিক মন্তব্য এসে জুড়ে বলেছে।

১৮৭৬ খৃস্টাব্দে টলস্টয়ের সর্বপ্রথম অনুভব করতে শুরু করলেন যে, তিনি বিলাস এবং স্বার্থপরতার জীবনযাপন করছেন। আগের মতুর চিন্তা তাঁর মনে একটা ভার হয়ে উঠল। একথা মনেপড়েছে বলা যায় এই চিন্তা তাঁর সাহিত্যকর্ম এক ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। একটা অপরাধবোধ তাঁর মনকে আকুল করে তুলল। জীবনের একটা আধ্যাত্মিক বাধনে বাঁধার চেষ্টা করতে গিয়ে নদীর গতি শুরু হল। সার্জি এই অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—
“that initial pang of despair and disgust with unjust and fishy life.”

গোঁড়া চার্চের মতবাদের মধ্যে টলস্টয়ের যে পথ খুঁজছিলেন তা না পেলেও সেন্ট-ম্যাথের বাণী—“That ye resist not evil”—এর মধ্যে আপন মনোভাবের প্রতিধ্বনি পোরেছিলেন।

যে সব সামান্য সুখ ও সুবিধা তিনি এতকাল ভোগ করেছেন, এখন তিনি তা ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে শুরু করলেন। সার্জি লিখেছেন—
“After the ‘Crisis’ father saw in the denial of everything he had previously loved and believed in the criterion of the rightness of his new opinions.”

এই সময় টলস্টয়ের মনে একটা ধর্মীয় ‘ম্যানিরা’ জেগে উঠেছিল, এবং এই বিকার সম্পর্কেও টলস্টয়ের মনে সংশয় জেগেছে। কাউন্টের টলস্টয় এই মনের এক নীরব দর্শক ছিলেন, অসহায় এবং সম্পূর্ণ অক্ষম। টলস্টয়ের স্ত্রী সোফিয়াকে এই গ্রন্থে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। গোকার গ্রন্থের চাইতেও সার্জির ‘Tolstoy Remembered’ তাই একখানি উজ্জ্বল গ্রন্থ।

লেডী সিনাথিয়া এ্যাসকাইথের ‘Married to Tolstoy’ নামক কিছুকাল আগে প্রকাশিত গ্রন্থটির সঙ্গে সার্জির পিতৃস্মৃতি পাঠ করলে টলস্টয়, এবং যাদের মানব টলস্টয় সম্পর্কে একটা পেশোণা ধারণা গড়ে উঠবে টলস্টয় গবেষকদের মনে।

নতুন বই

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ (পরিবর্ধিত

তৃতীয় সংস্করণ)—অমল হোম।

এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চার্টার্ড স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

দাম : সাড়ে তিন টাকা।

বারা রবীন্দ্র-চর্চা ও রবীন্দ্রজীবন ব্যাখ্যার দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন শ্রীযুক্ত অমল হোম তাঁদের মধ্যে সুপরিচিত। দীর্ঘদিন রবীন্দ্র-সামিধ্য লাভ করার ফলে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তি ও শ্রুতি হিসাবে তিনি চিনেছেন। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথের



পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

বহু রচনার প্রেক্ষিত ও প্রেরণা সম্বন্ধে বিচিত্র তথ্য তাঁর জানবার সৌভাগ্য হয়েছে।

অমদাশঙ্কর রবীন্দ্রজীবন পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথকে ‘জীবন-শিল্পী’ নাম দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবনকেই শিল্পীর একাগ্র মমতার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন—এ নামকরণ থেকে তা প্রতিভাত হয়। সেই হিসাবে এই ‘পুরুষোত্তম’ নামটিও সার্থক। সুন্দরের ধ্যানরতী কবি বিচিত্রলীলায় কাব্যের নর্মবাঁধিতে যেমন সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন তেমনি স্বদেশের অগ্নি-পরীক্ষার সময়ে দেশ ও দেশের সম্মানে অন্যায় ও অসত্যের অবিচল প্রতিবাদে মুখের হতেও স্খিয়া করেননি। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য তাই এক রৌদ্রস্নাত চেতনার জাগরণ, বাথাময় অগ্নিবাস্পে পূর্ণ আকাশ-চ্যুত আলোকের নিষ্কর।

গ্রন্থটি মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সমাজসচেতন ছিলেন না, কল্লেক বছর পূর্বে এরকম একটা অভিযোগের ঝড় বয়েছিল। প্রথম ভাগে

গ্রন্থকার সেই অভিযোগ খণ্ডনকল্পে বিভিন্ন ছোটগল্প, উপন্যাস ও কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্র-মনসের একটি যোগ্য প্রতিলিপি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। চিত্রা কাব্যের ‘প্রেমের অভিযোজনের আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন একটি দীন কেরানীও রবীন্দ্রনাথের লেখনীর স্পর্শ পেয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগ পর্বও রবীন্দ্রনাথের সেই নিভীক মানসের পরিচয়ই বহন করে—অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে বা নিরস্তর সংগ্রাম করে গেছে। সম্প্রতি অথবা এ অভিযোগ আর ওঠে না। রবীন্দ্র-মানস সম্বন্ধে বহু বিনীত গ্রন্থাংশীল সূচিস্থিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ পড়লেই সে কথা বোকা যায়। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে লেখক তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। এই অংশটি নতুন সংযোজিত হয়েছে।

আমেরিকা ও ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত এনসাইক্লোপিডিয়ায় যেমন রবীন্দ্র-পরিচিতি প্রসঙ্গে বহু হাস্যকর ও ভ্রান্ত মন্তব্য করা হয়েছে, তেমনি স্বদেশেও বর্তমানে একদল সাম্প্রতিক সমালোচকের হাতে কবিকে এখনো নিগাহীত হতে হচ্ছে। উপন্যাস ও কবিতার ক্ষেত্রে টলস্টয়, টমাস হান্স এবং র্যাবো ও বোদলের-এর সঙ্গে তাঁর প্রতিতুলনা করে রবীন্দ্রনাথকে খাটো করার এই প্রচেষ্টাকে গ্রন্থকার নিন্দা করেছেন। সম্প্রতিকার এই প্রান্ত মূল্যায়নের বিরুদ্ধে গ্রন্থকার বহু তথ্য ও বক্তৃতি দেখিয়েছেন তার জন্য যথেষ্ট সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি বহু বিদেশী কবি, যেমন বাঁবা, রিলকে ও ইয়েটস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে মনোভাব অবলম্বন করেছেন তাতে ঐ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তাঁর সামগ্রিক পরিচয়ের অভাব চোখে পড়েছে—এ কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। র্যাবো, রিলকে বা ইয়েটস—এঁদের ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো বহু অসঙ্গতি আছে, তবে যুগের যে যন্ত্রণা ও জটিলতার মধ্যে তাঁদের জীবন কেটেছে, জীবন-মন্থিত সেই হলহুল পান করে তাঁদের কাব্যও যে নীলকন্ঠ—এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সর্বোপরি যে কোনো কবিবই ব্যক্তিগত জীবন বাই হোক না কেন কাব্য সর্ব-সময়েই Transcendental। কবিদের সমগ্র অস্তিত্বের যন্ত্রণা-বোধের কাব্যও যে তাই—একথা অস্বীকার করা যায় না।

তবে এই গ্রন্থ পাঠ করলে মনের মধ্যে বহু আলোচনা ওঠে এজন্যই এই গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথ ও

শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে যে নতুন আলোক-পাত করা হয়েছে তাও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণই এর জনপ্রিয়তা সূচিত করে।

The Ritual Art of the Bratas of Bengal by Sudhansu Kumar Ray প্রকাশক : ফার্মা, কে, এল, মুম্বোপাধ্যায়। ৬-১এ, বাহুরাম অক্টর লেন, কলিকাতা-১২। দাম : ১৬ টাকা।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বাঙালার ব্রতকথা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, গুরুসদয় দত্ত প্রভৃতি যে অনুসন্ধান ও আলোচনা শুরুর করেন, তাঁদের কাজের ওপর ভিত্তি করে লেখক সেই পথে অগ্রসর হয়েছেন। ব্রত কি, ব্রতের অর্থ কি ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরুর হয়েছে। ব্রতের আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলির তাৎপৰ্য নিয়ে মানসিক থেকে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্যে লেখক প্রাচীন ভারত, মিশর, সুমের প্রভৃতির পুরাতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে বাংলার ব্রত বিচার করে দেখিয়েছেন। বাংলার ব্রতের আলপনার সঙ্গে প্রাচীন লিঙ্গ সভ্যতা ও প্রাচীন মিশরের আলপনার সাদৃশ্য থেকে বাংলার লোক-সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে বাংলার পট ও মৎ-লিপির অনেকগুলি একবর্ণ ও বহুবর্ণ ছবি এবং নক্সা সংযোজিত করে বইটির মূল্যবোধী করা হয়েছে। বাংলার লোক-লিঙ্গ ও লোক-সংস্কৃতির অনুরাগীদের কাছে বইটি প্রয়োজনীয় হবে।

আলিপন—(লোকালিপন) প্রতিভা-বালা বর্নন : লেখিকা কতৃক ৬৬টি আহিরীচৌলা খ্রীষ্ট, কলিকাতা-৫ থেকে প্রকাশিত : দাম দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলাদেশের লোকলিঙ্গের একটা বিশিষ্ট প্রকাশ আলিপনা। আমাদের দেশজ লোকচার ও ধর্মচার থেকেই এর উৎপত্তি। মেয়েদের সঙ্গেই এর বিশেষ সম্পর্ক। আলপনা অঙ্কন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার হলেও এর মনোরম একটা শিল্পগত দিক রয়েছে। এই শিল্পগত রূপের জন্যই লোকচার-ধর্মচারকে ছাড়িয়ে আমাদের কাছে আলপনার আজ বিশেষ মূল্য রয়েছে। অরল্য একথা ঠিক শব্দ অলঙ্করণ মূল্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে আলপনার মর্যাদা আবার ফুর করা হয়। লেখিকা দ্বিপদ্য জেলার বাসিন্দা। আলোচ্য বইতে তিনি বিভিন্ন পদ্ধতি ও ব্রত অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংবদ্ধ

তেরটি আলপনা আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমরা দেখে আনন্দিত হলাম যে এগুলি তিনি সম্পূর্ণ পরম্পরাগত রীতিতে এঁকেছেন। আধুনিকতার মোহবির্কৃতির ছোঁয়াচ এতে লাগেনি। বাংলার মা-বোনেরা এই আসল নক্সাগুলি থেকে বিশেষ উপকৃত হবেন। শহর-বাসীর পক্ষে গৃহসম্ভার জন্যও এই নিখুঁত আলপনাগুলি অনুধাবনযোগ্য। আমরা আশা করবো লেখিকা ভবিষ্যতে আমাদের লোকচারের সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় আলপনার একটা পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশ করবেন। তা না হলে আমাদের লোকলিঙ্গের একটা বিশিষ্ট দিক বিলুপ্তির অশঙ্কায় লুপ্ত হবে। বইটির অঙ্গসৌষ্ঠব মনোরম।

মহাবিশ্বের রহস্য—বি, ডি, লিমা-পুস্তক। অনুবাদ : প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—ম্যাসনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম—৩ টাকা।

বিশ্বরহস্য এবং মহাশূন্য ভ্রমণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই বইটিতে করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে সিওলকভস্কির মহাশূন্য যাত্রার স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে বইটি লেখা। আজ পর্যন্ত এবিষয়ে মানুষ কতদূর অগ্রসর এবং অদূর ভবিষ্যতে কতদূর এগোতে পারবে সেই সম্ভাবনারই আলোচনা করা হয়েছে। সৌর-জগতে চলাফেরা করতে হলে কতরকম সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন তার বিশদ এবং মনোগ্রাহী আলোচনা কোতুলোদ্দীপক। এজন্যে যেমন আকাশ-খানের নিমণ-পদ্ধতি, শক্তি-রহস্য, ধাতুতত্ত্ব, ভূপদার্থবিদ্যা, প্রাণী-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করার প্রয়োজন হয়েছে তেমনি সেগুলি সর্বজনগ্রাহ্য করে বোঝানো হয়েছে। এইসব দূর-হ বিষয়গুলির অনুবাদ সুন্দর এবং সাবলীল। কোন-খানে কোন আড়ম্বর্তা নেই। এজন্যে অনুবাদক ধন্যবাদের পাত্র। ছাপা বাঁধাই সুসুচিসম্মত। কেবল ভূমিকাকারের এইচ, জি, ওয়েলস প্রভৃতি লেখকদের সম্বন্ধে বক্তব্যের সঙ্গে সকলে একমত নাও হতে পারেন।

ধর্নি থেকে প্রতিধ্বনি (কবিতা)। তুষার চট্টোপাধ্যায়। কবিতা প্রকাশ ভবন, ১১, রাণী শংকরী লেন, কলিকাতা-২৬। পরিবেশক, সিগনেট বুক শপ। দাম দু-টাকা।

পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে তুষার চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। বলিষ্ঠ জীবন-

চেতনা আর সহজ সুদের অধিকারী এই কবি আপন স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। জীবন-সম্পর্কীয় চেতনার ব্যাপকতা ও গভীরতা তাঁর কাব্যভাবনার সুস্থ কবিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

বক্তব্যের স্বজ্ঞতা তুষারবাবুর কাব্য-ভাবনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সহজ-ভাবে সাক্ষাতিকতার মধ্য দিয়ে আপন বক্তব্যকে তুলে ধরতে তিনি সক্ষম। 'কম কথা বলে তিনি আলো জ্বালাতে জানেন।' অস্তরের সুতীর আবেগ যখন চিত্ত-মগ্নতা জটীলাবর্তে ঘূর্ণায়মান তখন তিনি সেই অ-স্বাভাবিক ভাবে সংযত ও পরিমার্জিত বাক্যভঙ্গিমাধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন।

ছন্দের কবিতার সঙ্গে কয়েকটি গদ্যকবিতাও এ বইয়ে স্থান পেয়েছে। গদ্যকবিতার সবুজ স্বাভাবিক রূপটি পরিষ্কট। এই বিশেষ ধরনের কবিতা-রচনায় যে দুর্বলতার ছাপ রয়েছে তাকে খুব গভীর বলা না গেলেও ঐ দোষটি কাটিয়ে ওঠা উচিত। তুষারবাবু ক্ষমতাবান কবি। সুতরাং চেষ্টা করলে এ দুটি তিনি দূর করতে পারবেন।

তুষারবাবুর কবিতার সব থেকে বড় গুণ চিত্রকল্প। ঘরোয়া ছবিগুলি সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারেন তাঁর কাব্যগঠনে। এবং সেজন্য তাঁর কবিতা-গুলি যথেষ্ট আন্তরিক হয়ে ওঠে।

বইটির প্রচ্ছদ ও বাঁধাই অতি চমৎকার।

অনন্যা—(কবিতা সংকলন)। সম্ভার প্রকাশনী, ৮।৪এ, কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'ভগ্নদূত সাহিত্যিক গোষ্ঠী' কতৃক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত তরুণ কবিদের কবিতার সংকলন। প্রায় শতাধিক কবিতা এ সংকলনে স্থান পেয়েছে।

এই বহুদায়তনের সংকলনটি হাতে নিয়ে কাব্যরসিক মাদ্রেই হতাশ হবেন। এর মধ্যে 'ভাল' কবিতার সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশই অগভীর ভাব এবং নিতান্তই অর্থহীন শব্দময়তায় পূর্ণ। ছন্দের দিক থেকে বেশীর ভাগই দুর্বল। কবিতা লেখা সহজ কিন্তু ভাল কবিতা লেখা কঠিন—এ কথা আজকের তরুণ কবিদের স্মরণ রাখতে হবে। আরও স্মরণ রাখতে হবে যে ভাল কবিতা লিখতে হলে সুগঠিত মন সুগভীর জীবনদর্শন আর বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা-শক্তি প্রয়োজন।

শ্রেষ্ঠম যুগ

নান্দীকর

চিত্র সম্মানোচনা

শাস্তি: চিত্র শোভনার নিবেদন; ১১,৭৬২ ফুট দীর্ঘ ও ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী: নরেন্দ্রনাথ মিত্র; আরাপণী: শাকুচি; পরিচালনা: দয়াভাই; সংগীত পরিচালনা: ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ; রবীন্দ্র সঙ্গীত তত্ত্বাবধান: অনাদি দাস্তিদার ও মায়া সেন; গীত রচনা: শ্যামল গুপ্ত; চিত্রগ্রহণ: সুধীশ ঘটক; শব্দধারণ: মণাল গুহঠাকুরতা ও সঞ্জিত সরকার; সংগীত-গ্রহণ: শ্যাম-সুন্দর ঘোষ ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা: রবি চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা: সুকুমার সেনগুপ্ত; রূপায়ন: সম্মা রায়, মালবিকা গুপ্তা, পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, রেবা, আশা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সবিভাগত দত্ত, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্তী, মিহির ভট্টাচার্য ইত্যাদি। সিনে ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ১৬ই মার্চ থেকে উত্তরা, পূর্ববী, উজ্জলা ও অপরা-পর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

বাস্তব জীবনের কঠিন আঘাতে আদর্শ ভেঙে যায় বারে বারে। আমাদের দেশের বিচিত্র অর্থনৈতিক কাঠামো চিকিৎসা শাস্ত্রে স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত ভুবন মুখোপাধ্যায়কে অর্থের দায়ে নৈতিক পদ-স্থলনে বাধ্য করে। গ্রামে চিকিৎসার অভাবে লোক মারা যায়। কিন্তু গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করতে গেলে ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে না পেয়ে চিকিৎসকের প্রাণ যায়। আজকের সমাজ-জীবনে মানুষের মূল্য নিরূপিত হয় তার ব্যক্তিগত ব্যালান্সের মাপকাঠিতে; তাই গুণী ছেলের জীবন থেকে শহুরে বিদুষী দয়িতা সেরে যায় সবয়ে, যখন সে শোনে, তার প্রেমাস্পদের জীবনাদর্শে চোন্দলতা বাড়ী ও গোল্ডেন ক্যাডি-

লাকের স্বপ্নভরা ধনোপার্জনর কোনো স্থান নেই। তাই পাওনাদার হরিধন কুশুর হাত থেকে পৈতৃক ভদ্রাসনটিকে বাঁচাবার কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে সোনার ছেলে ভুবন ডাক্তারকে বিবের জ্বালায় সকল জ্বালা জুড়োবার পথ খুঁজতে হয় এবং নিজেরই চিকিৎসাধীন রোগিনীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হচ্ছে



দয়াভাই পরিচালিত সদ্যমুক্ত 'শাস্তি' চিত্রে সম্মা রায়

দেখেও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হয় ভদ্রাসন বাঁচাবার টাকা ঘুঘুর পথে এসে পৌঁছানোর ফলে। এই হত্যাকাণ্ডে পল্লোক সহায়তা করার দরুণ ভুবন ডাক্তার জেলে যায় সাত বছরের জন্যে।

লোকে তাকে ভাড়িয়ে দেয়। তবু সে গ্রামে থাকে; আবার গ্রামেই চিকিৎসা করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবার দৃষ্টি

মুক্ত-অঙ্গন

শোভনিক পরিচালিত

দক্ষিণ কলিকাতার অন্যতম নাট্যশালা
প্রতি শনি ও রবি

ল'ল'না

প্রতি বৃহস্পতিবার
রবীন্দ্রনাথের

তাসের দেশ

অভিনয়
সম্মা ৭টার

জেলে ফেরত ভুবন যখন সাত বছর পরে তার পোড়ো ভিটেতে ফিরে এল, তখন হয়েছে ছবিরা কাহিনী শুরুর। গ্রামের লোক ছি-ছি করে উঠল-খুনেটা কোন্ মুখে আবার গায়ে বাস করতে এসেছে? মৃত রোগিনীর প্রেমাস্পদ ভুবনেরই বন্ধু লতিফ জ্বলে উঠল তাকে দেখে; নুরুকে মেরে আশ মেটেনি, ভুবন আরও খুন করতে চায় চিকিৎসার নাম করে? পিতৃব্যতুল্য নন্দ ডাক্তারও এসে বলে—গ্রামে থাকা হবে না, ছি-ছি। খালি প্রতিবেশিনী সদু মাসীমা, আর কোলে

দক্ষিণ
কলিকাতার
সাদা
জাগিয়েছে

প্রতি বৃহস্পতি
সম্মা ৭টার
ঘিয়েটার
ইউনিট-এক

কুশুর

৪৭-৫১৯৫

মহারাজ মিথাস
১৫, হাজরা রোড

সাধনা তাকে পেয়ে বসেছে। নরুর কবর ছাড়ে বসেছে, সাত বছরের কারাবাসেই তার শাস্তির শেষ হয়নি; আপন-পূর সকলের লাঞ্ছনা ভোগ করেও বেদিন সে নিজেকে ন্যায়নিষ্ঠ চিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, সেইদিন হবে তার কর্তব্যচ্যুতির অপরাধের শাস্তির সমাপ্তি। কিন্তু আমাদের মনে জাগে আরও প্রশ্ন। ভুবন ডাক্তারের এই যে শাস্তি, এই শাস্তি কি তার প্রাপ্য ছিল? আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থ-নৈতিক কাঠামোর কি এ-ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই? কবে সোঁদিন আসবে, যখন ভুবন ডাক্তারের মত যুবক গ্রামে চিকিৎসা করতে গিয়ে জীবনের উপযুক্ত রসদ থেকে বঞ্চিত হবে না? কবে মানুষ তার সদগুণ এবং অর্জিত বিদ্যার সম্যক অনুশীলনের সুযোগ পেয়ে মানুষের সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে, বিচিত্র অর্থনীতির জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হবে না?

নরেন্দ্র মিত্র রচিত “ভুবন ডাক্তার” কাহিনীটির আরুণী অর্থাৎ চিত্ররূপ-রোপ করেছেন “শাকুন্তল” ছদ্মনামে কুশলী

গোষ্ঠী। যে-ভাবে জেল ফেরত ভুবন ডাক্তারকে দিয়ে ছবির আরম্ভ করা হয়েছে এবং যে-ভাবে তার অতীত কাহিনীকে ফ্ল্যাশ-ব্যাকের সাহায্যে বিবৃত করে আবার বর্তমানে ফিরে আসা হয়েছে, তাতে এই কুশলীগোষ্ঠী যথেষ্ট মনন-শীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে কয়েকটি জায়গায় ছবিটির মধ্যে কিছু ভারসাম্যের অভাব বোধ হয়েছে। নিম্নের সঙ্গে ভুবনের বিবাহের কথা, নিম্নের বিষপান, ভুবনের নিজেকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা, নরুর কাকা জনাই খাঁর কাছ থেকে ঘুঘুর টাকা নেবার সময়ে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিষয়কে যেমন আরও বিস্তারিত করবার সুযোগ ছিল, তেমনই বিদ্যুৎ প্রাণীর একখানি চিঠিকে প্রচুর সময় নিয়ে পড়া, নিম্নের জ্ঞানলাভের পর ‘আমায় বাঁচালে কেন?’ এই প্রশ্নের বারংবার আবৃত্তি, প্রভৃতি বিষয়ের যথেষ্ট সঙ্কোচ সাধনেরও সুযোগ ছিল। নিম্নের মধ্যে ‘মরি ‘মরি পরেছে রাই’ গানখানিও সুপ্রযুক্ত হয়নি।

“শাস্তি”র বিশিষ্ট সম্পদ হচ্ছে এর বাস্তবধর্মী দৃশ্য-সংস্থাপন ও চিত্রগ্রহণ।



‘মেরি-সুহাগ’ চিত্রে দক্ষিণ ভারতের খ্যাত-নামা নর্তকী গিরিজা

ছবিটি দেখে মনে হয়, যেন এর সমস্ত-টাতেই স্বাভাবিক বাস্তবতার স্রোত নৈঃশব্দে রয়েছে, কোনো কৃত্রিম দৃশ্যপট ব্যবহার করা হয়নি। পরাগ্রামের পরিবেশ এমন সুস্পষ্টভাবে চোখের সামনে ধরা দিতে খুব কম বাঙলা ছবিতেই দেখা গেছে। সুবালোক এবং ইলেকট্রিক আলোকের সুষ্ঠু সংমিশ্রণে ক্যামেরার কাজ বহু জায়গাতেই একটি উল্লেখ-যোগ্য ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা দিয়েছে। বহির্দৃশ্য এবং আভ্যন্তরীণ দৃশ্য—উভয় ক্ষেত্রেই এই বাস্তবধর্মী চিত্রগ্রহণ রীতি ছবিটিকে রসোত্তীর্ণের পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। চিত্রশিল্পী সুধীশ ঘটক এবং শিল্পনির্দেশক রাবি চট্টোপাধ্যায় রসিকজনের অকুণ্ঠ প্রশংসালভ করবেন তাঁদের শিল্পকর্মের জন্য। ঠিক সমান কথা কিন্তু শব্দধারণ সম্পর্কে বলা চলে না। এমন কি, সংগীত গ্রহণের কাজেও উন্নতির অবকাশ ছিল। ছবিতে একমাত্র পুরুষকণ্ঠে গাওয়া গান, “চরণ ধরিতে দিও গো আমারে”—এটিকে ছবির শেষের দিকে প্রসঙ্গ-সংগীত রূপে (theme song) উপস্থাপিত করা হয়েছে—এই গানখানির উচ্চ পদার্থগুণি আরও সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করলে গান-খানির ব্যঞ্জনা আরও গভীর হতে পারত এবং গায়ক সাগর সেনের প্রাতি ডের বেশী সন্নিবিষ্ট হত। আলি আকবরের সুরারোপে কোনো নতুন পেলুম না, যদিও তাঁর রচিত আবহ-সংগীত—বিশেষ করে যে-সব জায়গায় সেতারের ব্যবহার হয়েছে—উচ্চ প্রশংসালভের যোগ্য। কিন্তু এখানেও সংলাপের সঙ্গে আবহ-সংগীতের মিশ্রণে শব্দ পুনর্ব্যোজনার কাজ আরও উন্নত ধরনের হওয়া সম্ভব ছিল। ছবির সম্পাদক তাঁর কাঁচির অধিকতর ব্যবহারের দ্বারা ছবিকে ঢের বেশী গতিসম্পন্ন করতে পারতেন।

অভিনয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নায়কের ভূমিকায় অত্যন্ত সংযত ভাবে



ভি এ পি প্রোডাক্‌সনের সুনীল বাল্যোপাধ্যায় পরিচালিত ‘কাজল’ চিত্রে সুপ্রসিদ্ধ চৌধুরী

চরিত্রটির ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাংক্ষাকে রূপদানে সমর্থ হয়েছেন। ছবিটিতে নায়িকা বলতে কেউ নেই। মালিকি গদ্যে অভিনীত প্রীতি এবং সম্মা রায় অভিনীত নির্মলা বা নির্মল-দুই-ই পাম্ব'চরিত্র। আধুনিক বিদুষী কন্যা প্রীতি মোড়িক্যাল কলেজের ভালো ছেলে ভুবন মুখার্জিকে নিয়ে সমাজের 'উচ্চ বৃদ্ধ' বাসী বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল। এই স্বপ্নবাসিনীর ভূমিকাকে মালিকি গদ্যে তার বাচনে, ভঙ্গীতে, বেশে এবং দেহসৌন্দর্যে একটি অপূর্ণ শ্রীমন্ডিত করেছেন। সম্মা রায় গৃহীত নিম্ন ভূমিকাটি চরিত্ররূপে কোনো সম্পূর্ণতা পায়নি 'আরুণ'র দোষে। তবু যেটুকু সুযোগ তিনি পেয়েছেন, তার সম্ভাবহার করতে কার্পণ্য করেননি। নায়কের মায়ে চরিত্রটি পদ্মা দেবীর অভিনয়গুণে আন্তরিকতার স্পর্শ লাভ করেছে। সন্দ, মাসিমা, হরিধন কুন্ডু, লতিফ, জনাই খাঁ, নন্দ ডাঙ্গার ও ভোলাদার ভূমিকায় যথাক্রমে অপর্ণা দেবী, তুলসী চক্রবর্তী, সবিভারত দত্ত, কালী সরকার, সফেতা সিংহ ও মণি শ্রীমাণি চিত্রবর্ণিত কাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন। রায় বাহাদুরের ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্য যত না সফিস্টিকেটেড, তার চেয়ে বেশী রুঢ়। অপরাপর ভূমিকা যথাযথ।

দয়্যভাই পরিচালিত চিত্রশোভনার প্রথম প্রয়াস "শাস্তি" চিত্ররীতিতে নতুন-

স্টার থিয়েটার

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফোন : ৫৫-১১০৯
নতুন নাটক

শেষাঙ্গি

কাহিনী : শক্তিপদ রাজগুরু
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গদ্য
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
গান : শৈলেন রায় • সুর : দুর্গা সেন
প্রতি বহুস্পতি ও শনিবার ৬টা ৩০ মিনিট
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬টা

৥ রূপায়ণে ৥

কমল মিত্র - অজিত বন্দ্যো - আশীষ কুমার
অপর্ণা দেবী - লিলি চক্রবর্তী - বাসবী নন্দী
অনুপকুমার - চন্দ্রশেখর - বীরেশ্বর সেন
গীতা দে - সাধনা রায়চৌধুরী - আশা দেবী
শ্যাম লাহা - প্রেমেশ্বর বোস - জ্ঞান রত্ন



তপন সিংহ পরিচালিত তারাশঙ্করের 'হাসিলী' ব্যাকের উপকথার একটি দৃশ্য
চন্দন রায় ও লিলি চক্রবর্তী

রের আভাস দিয়েছে এবং এইখানেই এর সার্থকতা।

(১) "ডাউন ট্রেন"-এর পঞ্চাশত্ব অভিনয়-
উৎসবঃ

চতুরঙ্গ সম্প্রদায়ের "ডাউন ট্রেন" রসিকজন প্রশংসান্য একটি সুবিদিত নাটক। ১৯৫৮ সালের ২৮শে মার্চ রঙমহল রংগমঞ্চে এর প্রথম অভিনয়ের পর থেকে এর জয়যাত্রা আজ ঐতিহাসিক খ্যাতিলাভ করেছে। বিস্বরূপা প্রবর্তিত গিরিশ-নাট্য-প্রতিযোগিতায় প্রেষ্ঠ স্থান অধিকারী হয়ে একদা "ডাউন ট্রেন" চারটি বিভাগীয় পুরস্কার সমেত গিরিশ পুরস্কার লাভ করেছিল এবং পরে বিস্বরূপা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত 'গিরিশ থিয়েটার'এ কিছুদিন নিয়মিতভাবে অভিনীত হয়েছিল পরিবর্তিত রূপে। 'গিরিশ থিয়েটার' বন্ধ হয়ে যাওয়ার চতুরঙ্গ সম্প্রদায় আবার "ডাউন ট্রেন"-এর অভিনয় শুরুর করেন এবং গেল ১২ই মার্চ মিনার্ভা মঞ্চে তার পঞ্চাশত্ব অভিনয় সুসম্পন্ন হয়। অভিনয়ের আগে মঞ্চে পঞ্চাশটি স্বাধীন জ্বালানো হয় এবং সভাপতিরূপে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসু সম্প্রদায়কে তাদের অভাবিত সাফল্যের জন্যে অভিনন্দিত করেন। পরে সমবেত কণ্ঠে "ধনিল আহরান" গানখানি গাওয়া হবার পরে "ডাউন ট্রেন"এর অভিনয় আরম্ভ হয়। অভিনয়ে চতুরঙ্গের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাগজালা অভিনয়ে সমবেত দর্শকদের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা লাভ করেন। পরিচালক এবং প্রধান চরিত্র-অভিনেতা বরুণ

দাশগদ্য প্রথম দিকটার অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে অভিনয় করায় শোণবীর কিছু অসুবিধা হাছিল; পরে অবশ্য তিনি এ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। আমরা "চতুরঙ্গ" সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নতুন নাট্যাভিনয় প্রত্যাশা করছি।

নবনাট্য-এর নতুন নাটক "অবগুণ্ঠন"ঃ

সমর সেট মন্-এর বিখ্যাত উপন্যাস "পেপেন্টড ভেল"-এর দ্বারা অবলম্বনে সুনিমল মজুমদার ও সুজন বিশ্বাস কর্তৃক রচিত এবং দেবব্রত সুর চৌধুরী পরিচালিত নবনাট্য নাট্যসংস্থার নতুন নাটক "অবগুণ্ঠন"-এর অভিনয় হয়ে গেল ১৩ই মার্চ রঙমহল রংগমঞ্চে "নবগ্রাম সেবক সংঘ"-এর সাহায্যকর্তৃক।

সেঙ্গপায়ের বলেছেন, বাস্তব জীবনে এমন বহু ঘটনাই ঘটে যা নাটক-উপন্যাসের ঘটনাকে হার মানিয়ে দেয়। তাই সার্থক বৈজ্ঞানিক তুম্বারমৌলি সেনের স্ত্রী মল্লিকা ওরফে মলি সেনেরও যে পদস্থলন ঘটবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সেই মলি সেন যখন তার পরিচিত সমাজচ্যুত হয়ে এক নির্বাসনব দেশে কলোয়ার মহামারীর মধ্যে নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ নরনারীদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখে জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করে, বৃদ্ধিতে পারে যে, দৈহিক যৌনসম্ভোগেই সুখের চরম নয়, আত্ম সেবাতে আত্মত্যাগেই প্রকৃত সুখ, তখন দর্শকের সামনে ফুটে ওঠে মলি সেনের

বিচিত্র চরিত্রবৈভব সে মৃৎখ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মলি সেনের দিকে।

কিন্তু নাট্যকাররা মলি সেনের প্রতি সুবিচার করেননি; প্রথম দৃশ্য থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তার চারিত্রিক বিবর্তনকে গ্রহণযোগ্য করবার মত প্রস্তুতির আশ্রয় নেননি। ঘটনা এবং সংলাপ—এই উভয়ের সুষ্ঠু সংমিশ্রণে চরিত্র গড়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ঘটনাবলি ঘটেছে আকস্মিকভাবে এবং সংলাপের সাহায্যে চরিত্রকে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। তাই নাটকের মধ্যে আকস্মিকতা যতখানি ফুটেছে, নাট্যকারী সম্ভাব্যতঃ ততখানি হুটে উঠতে পারনি। সেই কারণে আমরা শোভনলালের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-পরী মলি সেনের যৌন-সংসর্গকেও যেমন শোভন বলে মনে করতে পারিনি, তার মৃৎ থেকে স্বামীর কাছে ডাইভোর্সের (বিবাহ-বিচ্ছেদের) প্রস্তাবকেও তেমনই অশালীন বলে মনে করতে বাধ্য হয়েছি। আবার আরিন্দমের মৃৎ থেকে মলি সেনের চরিত্র বিশ্লেষণকেও যেমন সহজপাচা বলে বোধ হয়নি, করুণাময়ীর আশ্রম দেখে মলি সেনের মৃৎে সেবার কার্যে আত্মোৎসর্গ করবার ইচ্ছা প্রকাশকেও ভুতের মৃৎে রাম নাম বলে মনে হয়েছে। এবং সব শেষে তুষারমৌলির স্মৃতিস্তম্ভের সামনে মলির উচ্ছ্বাস আমাদের মনে বোচারার প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করার চেয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা চূড়ান্ত ন্যাকা-মোর রূপ দিয়েছে। সমস্ত নাটকটাকেই বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশের একান্ত অভাব।

নাটকের দৃশ্যবিন্যাসেও একাধিক গুটী লক্ষ্য করা গেছে। একটি দৃশ্যকে কেমন কথার ওপর শেষ করতে হবে বা চরিত্রের কোন বিশেষ অভিব্যক্তির কিংবা নাট্যকারী কোন ক্রিয়া (action)-র ওপর পর্দা ফেললে দর্শকের মনে একটি নাট্যকৌতূহল জাগাতে সমর্থ হবে, এসব তত্ত্ব নাট্যকারম্বর এখনও আয়ত্ত্ব করতে পারেননি। তাই নাট্যকারী ক্লাইম্যাক্স কোথাও গড়ে উঠতে পারনি। আমরা কতকগুলি ঘটনাকে ঘটে যেতে দেখলাম, কিন্তু তাদের সঙ্গে কোথাও একান্ত হতে পারলাম না।

মলি সেনের কঠিন চরিত্রটিতে রূপদান করেছেন মিতা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালকের শিক্ষার তিনি চরিত্রটিকে বধাসম্ভব গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করেছেন, যদিও তাঁর কন্ঠস্বর বেশ স্বাভাবিকভাবে এবং অনায়াসে পরিবর্তনশীল নয়। বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসক তুষারমৌলির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পরিচালক দেবব্রত সূর-চৌধুরী স্বয়ং। তাঁর স্পষ্ট বাচন এবং সংযত সংবেদনশীল অভিনয় চরিত্রটিকে একটি সমগ্র রূপদানে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য ডিগলিপুত্রের একটি দৃশ্যে মলিকে সন্তানসম্ভবা জানবার পর তার মগ্নতাপের আগে ক্রুর দৃষ্টি নিয়ে মলির

প্রতি ধীর পদাবিক্ষেপে ধাবমান হয়ে দর্শকের মনে সাময়িক বিভ্রান্তি ঘটানো চরিত্রোচিত হয়েছে বলে মনে করতে পারছিলাম। শোভনলালের ভূমিকায় নিমল ভট্টাচার্যকে মানিয়েছিল চমৎকার, অভিনয়ও তিনি করেছেন চরিত্রোচিত। আরিন্দমের ভূমিকাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন সত্যীপ্রসাদ বসু। করুণাময়ীর ভূমিকায় তারা ভাদুড়ী যথেষ্ট অনুরূপ করে অবতীর্ণ হননি বলে মনে হল। অপরূপ ভূমিকা চলনসৈ।

আলোক-সম্পাত এবং দৃশ্য-পরি-কল্পনায় অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আবহ-সঙ্গীত নাটকের প্রথম দিকে পাত্রপাত্রীর সংলাপের সঙ্গে উচ্চ গ্রামে বেজে প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেও পরের দিকে নাট্যকারী ভাব প্রকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

রাতকুটুরী, সাম্প্রিক, জনরব, বন্দিতা, মেঘনাদ বধ প্রভৃতি বহু নাটকের সার্থক অভিনয়কারী সম্প্রদায় “নব নাট্যম্”—এর নবতম প্রচেষ্টা “অবগুস্তন” নাটক এবং মণ্ডারোপ—উভয়দিক দিয়েই আরও বেশী সার্থক হয়ে উঠে আমাদের আনন্দ দেবে, এই আশা আমরা করি।

বিবিধ সংবাদ

জর্জিয়ার নৃত্যগোষ্ঠী :

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জর্জিয়ার লোকনৃত্য-সম্প্রদায় ভারত সরকারের আমন্ত্রণে আমাদের দেশে এনেছেন। তাঁরা ইতিমধ্যেই দিল্লী ও আমেদাবাদে তাঁদের নৃত্য প্রদর্শনী শেষ করে বর্তমানে বোম্বাই শহরে তাঁদের আসর বাসিয়েছেন। তাঁদের সফরের সমাপ্তি

‘একবার দেখলে অনেকবার মনে পড়বে; একদিন দেখলে অনেক দিন মনে থাকবে’—

মুভিটিক গ্রা: লি: এন্ড'

শিউলিবাড়ি

দুর্বাধ ঘোষের ‘নাগলতা’ অবলম্বনে

চিত্রনাট্য: তপন সিংহ

পরিচালনা: দীপ্যবৎসু



সুনির্মিত
উত্তমকুমার
অরুণা
মুখিবিহার-রজনী
দিলীপ রায়
গীতানি রায়
বীরেশ্বর সেন
উত্তমকুমার
সঙ্গীত
জগদীশ মুখোপাধ্যায়
সংলাপ
দায়নন্দ

শুক্রবার ২৩শে মার্চ থেকে

শ্রী - ইন্দিরা - প্রাচী

(শীতাতপনিয়ন্ত্রিত চিত্রগ্রহণ)

পদ্মশ্রী (যাদবপুর) - সূচীয়া (বেহালা) - নবরূপ (হাওড়া)
অলকা (শিবপুর) - পারিজাত (সালিকিয়া) - গৌরী (উত্তরপাড়া)
উদয়ন (শেওড়াফুলি) - কৈরী (চুঁচুড়া) - নেত্র (দমদম) - জয়শ্রী (বরানগর)
কল্যাণী (নৈহাটি) - সন্ধ্যা (খড়দহ) - লক্ষ্মী সিনেমা (কাঁচরাপাড়া)

ঘটবে কলকাতার প্রদর্শনীর পর। এখানে ২১-এ মার্চ থেকে শুরু করে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিন এঁদের আসর বসবে লোয়ার সাকুলার রোডের নিজাম প্যালেস গ্রাউন্ডে। ভারত সরকারের পক্ষে বোম্বাইয়ের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার জর্জিয়ান নৃত্যগোষ্ঠীর এই ভারত সফরের সমস্ত আয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং কলকাতায় এঁদের আসর বসাতে এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার।

ককেশাস পর্বতচূড়ার দক্ষিণে এবং ককেশাসগিরের পূর্বে অবস্থিত জর্জিয়া রাজ্যের বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থান এই দেশের লোকনৃত্যকে যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনই করেছে এই জাতির ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ। জর্জিয়ান নৃত্য মেয়েদের সুস্বয়ং পেলব ভঙ্গিমার সঙ্গে মিশেছে পুরুষদের শৌর্যবীর্যের প্রকাশক দৃঢ় নৃত্যভঙ্গী—কেমলেকতোরের এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ দর্শকমনে বিমুগ্ধ বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

জর্জিয়ান লোকনৃত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি এমনই বহুবিস্তৃত যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালী, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি যে-দেশেই তারা গেছেন, সেদেশেই তারা অজস্র প্রশংসার জয়মাল্যে ভূষিত হয়েছেন। কলকাতার নৃত্যরসিকরা এই অসামান্য নৃত্য-প্রদর্শনী দেখবার সুযোগ পেয়ে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন।

মেন মাস্ক থিয়েটার :

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মেন ইউনিভার্সিটির নাট্যাঙ্ক বিভাগ ১৯০৬ সালে “মেন মাস্ক থিয়েটার” নামে একটি গোষ্ঠী গঠন করেন, যার কাজ হচ্ছে, ঐ বিভাগের ছাত্ররা নাট্যাঙ্কনয় ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং ব্যবহারিকভাবে যে শিক্ষা লাভ করেছে, তারই নিদর্শন সাধারণের সামনে তুলে ধরা। জগতের বিভিন্ন জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ়তর করার চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার যে বিশেষ আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তারই অধীনে আমেরিকান ন্যাশনাল থিয়েটার অ্যান্ড অ্যাকাডেমীর সহযোগিতায় কুইন্স সদস্যবিশিষ্ট এই “মেন মাস্ক থিয়েটার” সম্প্রতি ভারতবর্ষে এসেছেন আমেরিকান সমাজ জীবনের প্রতীক পাঁচটি বিখ্যাত নাটকের অভিনয় মানসে। এরা মাত্রাজে অভিনয় শেষ করে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন গেল ১৬ই মার্চ তারিখে এবং ১৯-এ থেকে ২২-এ পর্যন্ত চারদিন স্থানীয় হিন্দী হাই স্কুলে তাদের অভিনয়-আসর বসিয়ে ছিলেন। এঁদের অভিনীত নাটকগুলি হচ্ছে—ইউজিন ওনীলের “আঃ, উইল্ডারনেস্”, উইলিয়াম সেরোমানের

“মাই হার্ট্‌স্ ইন দি হাইল্যান্ডস্” থর্নটন ওয়াইল্ডারের “হ্যাপি জার্নি”, পল গ্রীণের “স্যাটার্ডে নাইট” এবং ভোর শ্যারির “সানরাইজ আর্ট ক্যাম্পোবেলো”। ১১ থেকে শুরু করে ৩৪ বছর বয়সের শিল্পী সমন্বিত এই দলটিতে অধিকাংশেরই বয়স কিন্তু দুই-য়ের কোঠায় অর্থাৎ তরুণের দল। ১৭ই মার্চ ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিসের আমন্ত্রণে—এঁরাই এই নাট্যগোষ্ঠীর ভারত ভ্রমণের ব্যবস্থাপনা করেছেন—এঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেখলাম, এঁদের চাখেমুখে



জর্জিয়ান লোকনৃত্যের একটি দৃশ্য ছাত্রসুলভ অনুসন্ধিৎসা, সারল্য ও প্রীতি স্বলম্বল করছে। এঁদের অভিনয় সম্বন্ধে অভিমত পরে প্রকাশিত হবে।

“অঘটন আজো ঘটে” :

গেল শনিবার, ১৭ই মার্চ থিয়েটার সেন্টারে মৃত্যুসম্প্রদায়ের ধর্মমূলক আধুনিক নাটক, দিলীপকুমার রায় লিখিত উপন্যাস অবলম্বনে মনঞ্জয় বৈরাগী কর্তৃক নাট্যকারে গ্রাথিত “অঘটন আজো ঘটে”র মণ্ডাভিনয়ের শততম রজনী অনুষ্ঠিত হ’ল। যারা প্রচণ্ড যুক্তিবাদী এবং দৈবশক্তিতে অবিশ্বাসী, তাঁদের কাছে হয়ত এ-নাটকের কোনো মূল্য নেই, কিন্তু যারা তা নন—এবং আজও পর্যন্ত এই ‘নন’-এর দলই সংখ্যায় যথেষ্ট ভারী, তারা যে এই নাট্যাঙ্কনয়

দেখে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠবেন, এ-বিষয়ে অনুমান সন্দেহ নেই।

বঙ্গীয় নাট্য সংসদের “পান্থশালা” :

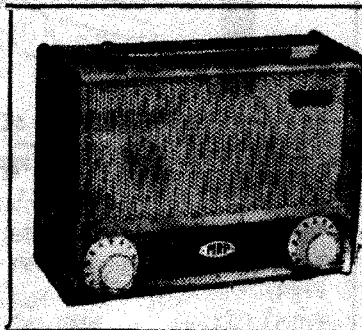
আসচে ৮ই এপ্রিল (২৫-এ চৈত্র), সকাল ১০-৩০টার নিউ এম্পায়ার রঙ্গ-মঞ্চে বঙ্গীয় নাট্য সংসদের সভ্য-সভ্যারা রমেন লাহিড়ী রচিত “পান্থশালা” নাটকটিকে মঞ্চস্থ করবেন।

শিশির মল্লিক প্রোডাকশন্স :

নাট্যানুগামী দর্শকবৃন্দের কাছে শিশির মল্লিক নামটি নিশ্চয়ই অপরিচিত নয়। পুরানো রঙমহল এবং সলিল মিত্রের আমলের নতুন স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত বহু সাফল্যমণ্ডিত নাটকের যশ্ম এবং একক প্রযোজকরূপে তাঁকে দেখতে পাওয়া গেছে বহু বছর। তিনি যে বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গেও বিশেষভাবে জড়িত, যারা ডি-লুক্স পিকচারের দীপচাঁদ কংকারিয়ার ব্যবসায়-জগতের সঙ্গে পরিচিত, তারা সেকথা ভালোভাবেই জানেন। চলচ্চিত্রের প্রযোজক হিসেবে তাঁকে আগে আমরা একাধিকবার দেখছি। তাঁর প্রযোজিত, অপূর্বসাফল্যমণ্ডিত “ককাল”—এর কথা কে না জানে? বর্তমানে বহুদিন বাদে তিনি আবার চিত্র প্রযোজনার কাজে ব্রতী হয়েছেন। বিশ্বনাথ রায় লিখিত “নতুন দিনের আলো”র কাহিনী অবলম্বনে যে-ছবির প্রযোজক হিসেবে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, তার পরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনা, গীত রচনা, সংগীত-পরিচালনা, শিল্প নির্দেশনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে অগ্রদূত-গোষ্ঠী, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, হেমন্তকুমার, সত্যেন রায়-চৌধুরী ও বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। ছবি-খানিতে অংশ গ্রহণ করছেন সান্বিতী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সন্ধ্যা রায়, বিশ্বজিৎ, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি। পরিবেশনসহ নিয়েছেন শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স।

ভারতীয় সংগীত সম্মেলন :

আসচে ৩১-এ মার্চ ও ১লা এপ্রিল ভারতীয় সংগীত সম্মেলনের আসর বসছে আমহাস্ট স্ট্রীট পোস্টোপিসের পাশে ১৮, ডাঃ ক্যারিক বসু স্ট্রীটে। প্রথম দিনে আধুনিক সংগীতের অধিবেশনে সর্বশ্রী মায়া দে, হেমন্তকুমার, সন্ধ্যা মুনোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সত্যীনাথ,



এম, আর, গি,
ট্রানজিষ্টর রোডও

মণি রেডিও প্রোডাক্টস

১৫৭বি, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩

পঞ্চজ মল্লিক, নির্মলেন্দু চৌধুরী, উৎপলা, প্রতিমা, বালসারা প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় দিনে মার্গ-সংগীতে ভীমসেন ঘোষী, মুনাক্ষর আলি খাঁ, সুনন্দা পট্টনায়ক, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিলায়েত হোসেন খাঁ (সেতার), আলি হোসেন (সানাই) প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করবেন।

নাট্যম্ সম্প্রদায়ের “পথের ডাক” অভিনয়
‘নাট্যম্’ সম্প্রদায়ের প্রথম নিবেদন তারাগ্রন্থক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ সামাজিক নাটক “পথের ডাক” আগামী ২৮শে মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হবে। অভিনয়ের পুরোভাগে আছেন অতীন রায়চৌধুরী, রথীন চন্দ্র, কুঙ্কলাল রায়চৌধুরী, মণি গাঙ্গুলী, রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শচীন সেন, তারা ভাদুড়ী, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা দে প্রভৃতি। অংশ চ্যাটার্জী নাটকটি পরিচালনা করছেন।

তিন দেশী ছবি

একটি ফরাসী ছবি

আন্দ্রে কেরেটে ফরাসী দেশের জনৈক যশস্বী পরিচালক। “নিউ ওয়েভ” পরিচালকদের গোষ্ঠীভুক্ত না কেরেটে, তাকে বরং রেনোয়ার উত্তরসূরীরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে “জাটিস ইজ ডান্” (১৯৫৩) এবং “উই আর অল মারডারাস” (১৯৫৭) ছবি দুটি পরিচালনা করে সমাজসচেতন পরিচালক হিসেবে সমগ্র চিত্রজগতের অভিনন্দন লাভ করেছিলেন তিনি। কোন কোন সমালোচক রেনোয়ার এবং মারসেল কানের সঙ্গে তাকে এক আসনে বসাতে পর্যন্ত বিধা করেন।

সম্প্রতি কেরেটের একটি ছবি ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে আমেরিকায় সাদা ফেলে দিয়েছে। ছবিটির নাম—“Le Passage du Rhin” ইংরেজীতে নামকরণ হয়েছে “টুমরো ইজ মাই টাউন”। যুদ্ধকালীন সমাজের এক বিবর্ণ চেহারা উন্মোচিত করেছেন কেরেটে তাঁর সাম্প্রতিক ছবিতে। যদিও রেনোয়ার ভুবন-বিদিত চিত্র “গ্র্যান্ড ইলিউশ্যন”-এর স্বাক্ষর আছে কেরেটের ছবিতে, তথাপি তীক্ষ্ণ ব্যাংগ আধুনিক মানুষের অসহায় একাকীত্ব তিনি একেবারে নিজস্ব আঙ্গিকে উপস্থিত করেছেন।

গত বিশ্বযুদ্ধের দুজন সৈন্য টুমরো ইজ মাই টাউন ছবির নায়ক। এই ফরাসী সৈন্যদের বন্দী করে যুদ্ধবন্দী হিসেবে জার্মানীর একটা গ্রামে পাঠানো হয়। গ্রামে তাদের থাকতে দেওয়া হয় একটি ভদ্র পরিবারের তত্ত্বাবধানে। শান্তি যুদ্ধে যোগদান করার পূর্বে ছিল প্যারিসের কেকবিক্রেতা। তার সংকল্প, যুদ্ধ যতদিন না থামে সে জার্মান পরিবারটির সংগেই প্রমদান করে কাটিয়ে

দেবে। কিন্তু অপর বন্দীটির সংকল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে সে ছিল সাংবাদিক। পৃথিবীকে আজীবন ধরে গ্রহণ করেছিল উদার চোখে। সে জার্মানী থেকে পালানোর প্যারিসে। কিন্তু জার্মানিকবলিত প্যারিস তাকে আরো নিরাশ করল। প্যারিসের লোকজন যেন তার বন্দীবাসের জার্মানদের চেয়েও অনেক নীচুমানের লোক। যে সংবাদপত্রে সে কাজ করত তার প্রকাশক ইতিমধ্যে জার্মানদের সহযোগী হয়ে উঠেছে। তার প্রণয়নীও উক্ত প্রকাশকের রক্ষিতা। জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে বাঁচবার একটা আশ্রয় খুঁজলো। কিন্তু স্বদেশের পৃথিবী যেন ক্রমশঃই তার কাছে কুটিল এক গোলক-ধাঁধা। কেউ বিশ্বস্ত না, স্বৈর্ঘ্যের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। অবশেষে তার মনে হল যে এর চেয়ে জার্মান বন্দীবাসে থাকাই তার পক্ষে যেন শ্রেয় ছিল।

বন্দী দুজনের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন যথাক্রমে শার্লস আজনভুর এবং জর্জেস রিভেরে।

একটি ব্রিটিশ ছবি

ব্রিটেনের জ্যাক ক্রেটন “নিউ ওয়েভ” পরিচালক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত “রুম এটু দি টপ” পরিচালনা করে ইংল্যান্ডের নব্যচিত্র আন্দোলনের অন্যতম পরিচালক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। এর আগে তাঁর একটি ছবি “দি বিম্পাক ওভারকোট” (গোগলের অমর গল্প “ওভারকোট” অবলম্বনে তোলা) যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল। কিন্তু ক্রেটনের তৃতীয় ছবি “দি ইনোসেন্সেস” তোলা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমানিটি-সিজম-এর দিকে ফিরেছেন ক্রেটন তাঁর বর্তমান ছবিতে। “দি ইনোসেন্সেস”-এর কাহিনীর ভিত্তি হল হেনরি জেমস-এর বিখ্যাত উপন্যাস “দি টাণ্ড অফ দি স্ক্রু”। কাহিনীটি নিঃসন্দেহে রোমাণ্টিক। এমন কি একমাত্র ‘রেবেকা’-র সঙ্গেই এই

ছবি তুলনীয়। রেবেকার সঙ্গে দি ইনোসেন্সেস-এর একটা ক্ষীণ কাহিনী-গত সাদৃশ্যও আছে।

মিস গিডেনস নাম্নী এক তরুণী গভরনেন্সের চাকরী নিলেন এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়িতে। তাকে দুটি ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করতে হবে। কিন্তু চাকরী-স্থলে গিয়ে গিডেনস দেখলেন যে সমগ্র প্রাসাদটি যেন একটি অশরীরি ভয়ে মুহাম্মান। এর আগের একজন পরিচারকের সঙ্গে মিস গিডেনস-এর পূর্ব-বার্তা গভরনেন্সের প্রণয় ছিল। কিন্তু পরিচারকটি গভরনেন্সের সঙ্গে কখনই সদয় ব্যবহার করেনি। পরিচারকটি একটি শোচনীয় দুর্ঘটনায় নিহত হয় এবং গভরনেন্স লেকের জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। সেই থেকে সমগ্র প্রাসাদ এবং ছেলেমেয়ে দুটি যেন ভূতগ্রস্ত।

জ্যাক ক্রেটন ছবিটিতে অসাধারণ এক গাধিক গাম্ভীৰ্য এনেছেন। একটা অশরীরি রোমাণ্ট প্রাসাদে, নলখাগড়ায় ভরা পুকুরে—সমস্ত প্রকৃতিতেই যেন আটকে আছে। প্রকৃতিও অসীম রহস্যময়ী। রাত্রি ঝড় এসে জানালায় করাঘাত করে, ঘরের পাতলা পর্দাগুলো হঠাৎ হাওয়ার ফেপে ফুলে ওঠে এবং এই আধিভৌতিক পরিবেশের মধ্যে মিস গিডেনস দুটি অশরীরি মূর্তি দেখেন গ্রামের চার্চের চুড়ায় এবং লেকের ধারে। মিস গিডেনস এই পরিবেশ থেকে ছেলে মেয়ে দুটিকে উদ্ধার করার আশ্রয় চেষ্টা করেন।

ডেবোরাচার অসামান্য অভিনয় করেছেন মিস গিডেনস-এর ভূমিকায়। তাঁর নিজের মতে এইটেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। “দি ইনোসেন্সেস”-এর সংগীত ছবিটির এক বিশেষ সম্পদ। সংগীত পরিচালনা করেছেন জর্জেস অরিক। বাইরের শব্দ এবং ধ্বনির ব্যবহারে ছবির রোমাণ্টিক আবহাওয়াটি চমৎকার ফুটিয়েছেন অরিক সংগীত পরিচালনার মারফতে।

—চিত্রকর্ষ

সরস নাটক

* সাতটি সরস নাটকের অভিনব সংকলন *

১. বড়ো শালিকের খাড়ে রৌ (মাইকেল) ॥
২. লম্বার একাদশী (দীনবন্ধু মিত্র) ॥
৩. অসীকবার (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) ॥
৪. ধারনা কি ভায়না (গিরিশ ঘোষ) ॥
৫. কৃষ্ণের বল (অমৃতলাল বসু) ॥
৬. আলিবারা (কীরোদ-তরা এপ্রিলের মধ্যে জানালে প্রসাদ) ॥
৭. পুনর্জন্ম (ডি এল রায়) ॥
৮. বর্তমান ও পরবর্তী খণ্ডগুলি পেতে আলাদা ডাকখরচ লাগবে না।

॥ এ মাসেই প্রকাশিত হবে ॥

পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সমুদ্রপ্রান্তে বিদেশী পতঙ্গীজদের পদসম্মারের কাহিনী অবলম্বনে ‘আগন্তুক’-রচিত একাঙ্ক নাটক

অবিস্বাস্য ॥ ০.৭৫ ॥

বৈদ্যনাথ মুনোপাধ্যায় লিখিত ও প্রবু রায় অঙ্কিত সরস গল্পগ্রন্থ

ভৃগুরোল ॥ ২.০০ ॥

শুক্লা

১৫৯এ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

খেলাধুলা

৫ম

৥ টেস্ট ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গ ৥

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের টেস্ট পর্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হয়েছে। পাঁচ অঙ্ক নাটকের এখনও তিন অঙ্ক বাকি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ভারতবর্ষের পর পর দুটি টেস্ট খেলায় হার—শুদ্ধ ভাষায় শোচনীয় পরাজয় আর গ্রাম্য কথায় গো-হার। ভারতবর্ষকে হারানোর হাল করে ছেড়ে দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার ওয়েসলি হলের মারমুখী বল। প্রথম টেস্টে হল পেয়েছেন ৪৯ রানে ৫টা উইকেট। দ্বিতীয় টেস্টে ১২৮ রানে ৯টা উইকেট—১ম ইনিংসে ৭৯ রানে ৩ এবং ২য় ইনিংসে ৪৯ রানে ৬টা উইকেট। প্রথম টেস্টে স্টেয়ার্স পান ৮৫ রানে ৪টে এবং দ্বিতীয় টেস্টে ১০১ রানে ১টা। ভারতীয় খেলোয়াড়রা ফাস্ট বোলার ওয়েসলি হলের স্টেয়ার্সের বল খেলতে খুব অসুবিধা বোধ করেননি। প্রধানতঃ হলের বলেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা বেশী কাবু হয়েছেন এবং প্রধান ভয়ের কারণ তিনিই। দ্বিতীয় টেস্টের ১ম ইনিংসে ফাস্ট বোলাররা খুব বেশী প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি—হল ৭৯ রানে ৩ এবং স্টেয়ার্স ৭৬ রানে ১টা উইকেট। ফাস্ট বোলারদের ভাগে পড়ে ৪টে উইকেট, ১৫৫ রানে। এই হিসাব থেকে অনেকেরই ধারণা হয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ফাস্ট বল সম্পর্কে ভারতীয় খেলোয়াড়দের এতদিনের ‘জুজু’ ভয় কেটে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েসলি হল সহজে হাল ছাড়লেন না। প্রধানতঃ তাঁরই মারাত্মক বোলিংয়ে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস কম রানে শেষ হয় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ শোচনীয়ভাবে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ দলটির সঙ্গো খেলতে পারেনি। ভারতবর্ষ ক্রিকেট খেলার সর্বিভাগে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—কোন কোন বিষয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফিল্ডিংয়ের দোষে এবং বোলার বদলীর নীতিগত ভ্রুটিতে বোলাররা অকারণে মার খেয়েছেন। দল গঠনে ভারতবর্ষকে কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হয়। অসুস্থতার দরুণ পর্তোদির নবাব এবং মারদেশাইকে দলে পাওয়া যায়নি। অন্য দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলেও কয়েকজন খেলোয়াড় রদবদল করা হয়। ১ম টেস্টের

আহত উইকেট-কীপার হেনড্রিকসের শূন্যস্থানে আইডার মেনডোনকা, ফাস্ট বোলার চেস্টার ওয়াটসনের বদলে উইলী রডরিগস এবং কমি স্মিথের বদলে ইস্টন ম্যাকমারিস দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত হন। দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় চারটি ক্ষেত্রে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত দর্শকসাধারণ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এ নিম্নে যথেষ্ট বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে: সলোমনের আউটে বোলল নিকপেপ করে নিকোভ প্রদর্শনও হয়েছে। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে হারাতে হয়েছে উমরীগড় এবং দুরাণীর উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মঞ্জরেকারের। খেলার পরিস্থিতি বিচার করলে ভারতবর্ষের ক্ষতির পরিমাণই বেশী। ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলায় প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। কোথায় ৪ উইকেট পড়ে ৮৯ রান আর ৩৯৫ রানে ইনিংস শেষ। শেষের ৩ উইকেটে দলের ১০২ রান ওঠে। ভারতবর্ষের প্রথম সারির খেলোয়াড়রা বিগত দুটি টেস্টে খেলাতেই ব্যাটিংয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে শেষের দিকের খেলোয়াড়রা দলের মুখ রক্ষা করেছেন। তৃতীয় দিনের খেলার শেষ সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের হাতেই খেলা ছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল তখনও খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি, মাত্র ৩ রানে (৫ উইকেটে ৩৯৮ রান) এগিয়েছিল। সারা দিনের খেলায় ২৪১ রান, চারটে উইকেট খুইয়ে। তবুও ইঞ্জিনীয়ার সোবাসের এবং মঞ্জরেকার কানহাইয়ের ‘ক্যাচ’ ফেলোছিলেন। খেলার গতি ওয়েস্ট-ইন্ডিজের পক্ষে সম্পূর্ণ ঘুরে যায় চতুর্থ দিনের খেলায়। ভারতীয় দলের অধিনায়ক কপ্টকটরের দুটিপূর্ণ খেলা এবং নীতির জনেই অবস্থার এই পরিবর্তন ঘটে। ভারতবর্ষকে বিরাট সঙ্গস্যার মুখে পড়তে হয়। ফিল্ডিং সাজানো এবং বোলার পরিবর্তনের দোষেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা বিপুল সংখ্যক রান তুলতে সক্ষম হন। সোবাস এবং মেনডোনকা স্পিন বোলারদের যথেষ্ট সমীহ করে খেলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাছে ভারতীয় ফাস্ট বল ছিল মড়ি-মড়িকির সমান। দুরাণী এবং প্রসমের স্পিন বলে যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের রাণের গতি প্রায় থেমে গেছে এবং ব্যাটসম্যানরা আড়ুট হয়ে খেলছেন ঠিক

সেই সময়ে নতুন বল নেওয়াতে রাণের গতি বেড়ে যায়। ক্যাচ ফেলা কিম্বা ক্যাচ ধরতে না পারার হিড়িক দেখে বোলারদের ভিড়মি খাওয়ার মত অবস্থা হয়। শেষ দিকে দুরাণী এবং প্রসম ভাল রকমের বল ফেলতে পারেননি। ব্যাটসম্যানরা তখন মরিয়া হয়ে খেলেছেন। ২৬০ রাণের পিছনে পড়ে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে আবার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। দু’ ঘণ্টার খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিকে খুইয়ে ৮০ রাণ। আবার ফাস্ট বলের আতঙ্কে ব্যাটসম্যানরা কাবু হন। হলের বলেই ৩ জন আউট। শেষ দিনের খেলায় ভারতবর্ষ দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারেনি। সম্পূর্ণ পরাজয়ের মনোভাব নিয়ে খেলেছে। অতি নির্ভরশীল খেলোয়াড় বোরসে এবং দুরাণী গোলা করেছেন। লাভের সময়ই ভারতবর্ষ ইনিংস পরাজয়ের সম্মুখীন হয়—৮ উইকেটে পড়ে ১৬২ রান।

দ্বিতীয় টেস্ট খেলার পঞ্চম অর্ধাংশে শেষদিনের খেলার সূচনা দেখে ভারতীয় সমর্থকেরা আশা করেছিলেন, ভারতবর্ষ হয়ত খেলাটা অমীমাংসিতভাবে শেষ করবে। চতুর্থ দিনের চতুর্থ উইকেটের নট আউট খেলোয়াড় উমরীগড় এবং নাদকাণী খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলেছিলেন। সাধারণত যে সব বলে অনায়াসে চার রান করা যায়, সে সব বলও তাঁরা ঠেকিয়ে যান। খেলায় কোন রকম ঝুঁকি নেননি। এতটা না করলে এই জুটিই ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি লাভের প্রয়োজনীয় ১৮ রান তুলে দিতে পারতেন। কিন্তু এত করেও উমরীগড় ভুল করলেন। গিবসের বল না মেরে ঠেকা দিতে গিয়ে খোঁচা মেরে বল তুলে দেন—ক্যাচটা লুফেন সোবাস। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৫ম দিনের খেলায় ৩০ রান ওঠে—এই জুটিতে মোট ৬৬ রান। উমরীগড়ের বিদায় থেকেই দলের ভাঙ্গন শুরু হয় এবং ৮ম উইকেট পড়ে যায় দলের ১৫৭ রানের মাথায়। এর মধ্যে সোবাসের বলে মঞ্জরেকারের এল-বি-ডবলউ আউট প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণায় আম্পায়ারের নিভুল সিদ্ধান্ত হয়নি। সোবাসের এই বলটা লেগ স্ট্রাইকের অনেক বাইরে পিচ থেকে মঞ্জরেকারকে আঘাত করে। এইদিন পিচ স্পিন বোলারদের কিছুটা সাহায্য করেছিল। কিন্তু এইদিনের উইকেটে খুব বেশী রান করার যে কোন সম্ভাবনা ছিল না এমন নয়। ৯ম উইকেটের জুটি ইঞ্জিনীয়ার এবং দেশাই দলের ৪৮ রান তুলে দেন। আসল কথা, লড়াই করার মত ভারতীয় দলের শক্তি ছিল না। ভারতীয় দলের বোলিং স্থানীয় দর্শক সাধারণকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু বোলার একা খেলে কম রানের মধ্যে বিপক্ষ দলের পতন ঘটতে পারে না। বোলারের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে ফিল্ডিং এবং মাঠে খেলোয়াড়

সাজানোর ওপর। খেলার এই দুটি বিষয়ে ভারতবর্ষ আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে খেলা হার-ছাড়া করেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ খে শক্তিশালী দল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এই দলের ওয়েসলি হল যে বর্তমান সময়ের বিশ্বশ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য 'রাবার' বিজয়ী ভারতবর্ষ যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে এমন নিঃকণ্ট খেলার পরিচয় দিবে তা কেউ ধারণা করেন নি। সম্প্রতি ভারতবর্ষের অধিনায়ক কপ্টার্টর বলেছেন, তাঁর দৃঢ় ধারণা যে, হলের বোলিং আয়ত্ত করা অসম্ভব নয়। তিনি স্বীকার করেছেন, দলের মাথার দিকের চারজন বাটসম্যানের ব্যর্থতার জন্যেই ভারতবর্ষকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। এই চারজনের মধ্যে তিনি নিজেকেও ধরেছেন।

১৯৫২-৫৩ সালের প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পাঁচটা টেস্ট খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ কেবল দ্বিতীয় টেস্ট খেলার ১৪২ রানে হার স্বীকার করেছিল। বাকি চারটে খেলা ড্র ছিল। কিন্তু এবারের সফরে ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে সুনাম যথেষ্ট নষ্ট করেছে। এ পর্যন্ত সফরের ৬টা খেলা হয়েছে। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের হার ২ এবং খেলা ড্র ৪। ভারতবর্ষ প্রতিটি খেলার টেসে জয়লাভ করেছে। দলের পক্ষে কম ভাগ্যের কথা নয়। কারণ ক্রিকেট খেলার টেসে জয়লাভের গুরুত্ব অনেক বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষ টেসে জয়লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছে খেলার সেই অনুপাতে সাফল্য লাভ করতে পারে নি। বরং ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে টেস্ট খেলার। এখনও তিনটে টেস্ট খেলা বাকি। ভারতবর্ষ যদি তৃতীয় টেস্ট খেলার জয়লাভ করে তবেই পরবর্তী দুটি টেস্ট খেলার ওপর দর্শক সাধারণের আগ্রহ থাকবে। নতুবা ভারতীয় দলকে এই সফরে বেশী রকম আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। দুটি টেস্ট খেলার ভারতবর্ষের শোচনীয় ব্যর্থতার পর স্থানীয় দর্শক সাধারণের উপর প্রতিক্রিয়া কি রকম দাঁড়িয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে বারদোজের আসন্ন তৃতীয় টেস্ট খেলার।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় টেস্ট

তারিখ : মার্চ ২৩, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮

রিজটাউন

রিজটাউন বার্বাদোজ স্বীপের রাজধানী। এই রিজটাউনের মাটিতে ১৯৩০ সালের ১০ই জানুয়ারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বনাম ইংল্যান্ডের বে টেস্ট খেলা শুরু হয় সেই খেলাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে প্রথম টেস্ট খেলা। সেই প্রথম টেস্ট খেলার ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পক্ষে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী (১২২ রান) করেন সি এ রোচ। এই খেলারই দ্বিতীয় ইনিংসে জর্জ হেভলি, যিনি পরবর্তীকালে 'ব্র্যাক ব্র্যাডম্যান' নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন, ১৭৬ রান করে ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট খেলার জে নি হবসের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ১৫৯ রানের রেকর্ড ভেঙে দেন।

রিজটাউনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য টেস্ট খেলা—ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তানের ১৯৫৭-৫৮ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসে ৫৭৯ রান (৯ উইকেটে) করে ইনিংস ডিক্লারড করে। এই ৫৭৯ রানই রিজটাউনে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলার ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পক্ষে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পক্ষে হাল্ট (১৪২ রান) এবং উইকস (১৯৭ রান) সেঞ্চুরী করেন। পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে মাত্র ১০৬ রান করে ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের এই ১০৬ রানই রিজটাউনের টেস্ট খেলার ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড। পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে দ্রুততার স্ফো খেলে ৬৫৭ রানে (৮ উইকেটে) দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। পাকিস্তানের ওপনিং ব্যাটসম্যান হানিফ মহম্মদ ব্যক্তিগত ৩৩৭ রান করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। মাত্র ২৮ রানের জন্যে হানিফ মহম্মদ ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় লেন হাটনের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের তৎকালীন বিশ্ব রেকর্ড (এক ইনিংসের খেলার) ভাঙতে পারেননি। হানিফ মহম্মদের সেই ৩৩৭ রান রিজটাউনের টেস্ট খেলার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান হিসাবে আজও অক্ষর আছে। শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ—পাকিস্তানের এই প্রথম টেস্ট খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি—খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। নিশ্চিত জয়লাভ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বঞ্চিত করেন হানিফ মহম্মদ।

রিজটাউনে বেশী ভাগই টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এ পর্যন্ত রিজটাউনে ৮টা টেস্ট খেলা হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্ফো বিভিন্ন দেশের। খেলার ফলাফল : ড্র ৫, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ২ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮১ রানে, ১৯৫৩-৫৪ সাল এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৪২ রানে, ১৯৫২-৫৩ সাল) এবং হার ১ (ইংল্যান্ডের কাছে ৪ উইকেটে, ১৯৩৪-৩৫)।

রিজটাউনে টেস্ট রেকর্ড

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান
ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ৫৭৯ রান
(৯ উইকেটে ডিক্লারড), পাকিস্তানের
বিপক্ষে, ১৯৫৭-৫৮।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে : ৬৬৮
রান—অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫।

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান
ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ১০২ রান,
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৯৩৪-৩৫।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে : ১০৬
রান—পাকিস্তান, ১৯৫৭-৫৮।

সেঞ্চুরী সংখ্যা ১৬

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ১০
(ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৬, অস্ট্রেলিয়ার
বিপক্ষে ২, পাকিস্তানের বিপক্ষে ২ এবং
ভারতবর্ষের বিপক্ষে ০)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে : ৬
(ইংল্যান্ড ৩, অস্ট্রেলিয়া ২, পাকিস্তান
১ এবং ভারতবর্ষ ০)।

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান
ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ২২৬ রান
—গারফিল্ড সোবার্স, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে,
১৯৫৯-৬০।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে : ৩৩৭
রান—হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান),
১৯৫৭-৫৮।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত দুই এবং তিনশত
রান

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে : ২২৬
গারফিল্ড সোবার্স (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে,
১৯৫৯-৬০); ২২০ ক্রাইড ওয়ালকট
(ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৪); ২১৯
ডি এ্যাটকিনসন (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে,
১৯৫৪-৫৫)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে : ৩৩৭
হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), ১৯৫৭-
৫৮)।

৥ অর্জুন পুরস্কার ৥

প্রতি বছর ভারতবর্ষের পবিত্র সাধারণতন্ত্র দিবসে দেশের গুণী ব্যক্তিদের রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় খেতাবে সম্মানিত করা হয়। এ পর্যন্ত কয়েকজন ক্রীড়াবিদও এইদিনের রাষ্ট্রীয় খেতাব পেয়েছেন। সামরিক এবং পুলিশ বাহিনীতে যেমন বিশেষ রাষ্ট্রীয় খেতাব দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সে রকম বিশেষ ব্যবস্থা ক্রীড়ামহলে ছিল না। ১৯৬২ সালে অর্জুন পুরস্কারের প্রবর্তনে সে অভাব পূরণ হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিলকে খেলাধুলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের কৃতী ক্রীড়াবিদ নির্বাচনের ভার দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে খেলাধুলার বিভিন্ন বিষয়ে ২০ জন ক্রীড়াবিদ কেন্দ্রীয় সরকার



এয়ান লামসডেন



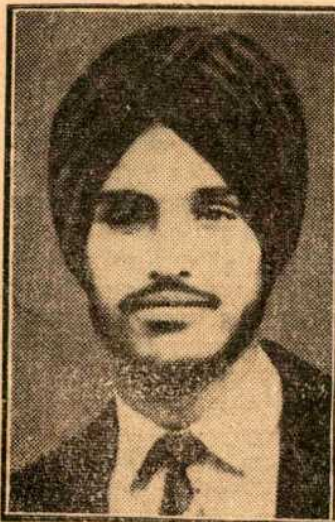
প্রদীপ বানার্জি



সেলিম দুরাণী



নান্দনা নাটেকার



গুরুবচন সিং



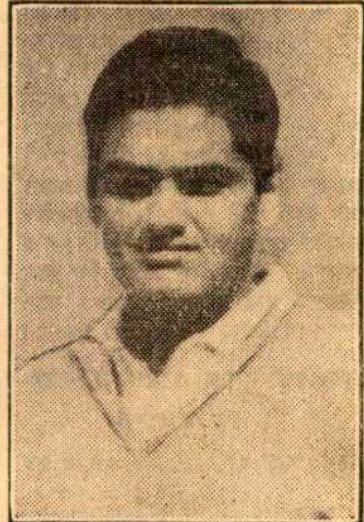
পুণ্ডিত পাল সিং

কর্তৃক প্রবর্তিত অর্জুন পুরস্কার লাভের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। গত ১৪ই মার্চ রাষ্ট্রপতি ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন ১৯৬১ সালের জন্য নির্বাচিত সেরা ক্রীড়াবিদদের অর্জুন পুরস্কার প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণন, ক্রিকেট খেলোয়াড় সেলিম দুরাণী, দাবা খেলোয়াড় ম্যান্দুয়েল অ্যারন এবং পোলো খেলোয়াড় মহারাজ প্রেম সিং উপস্থিত ছিলেন না।

এই বাৎসরিক 'অর্জুন' পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থায় আমাদের জাতীয় জীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

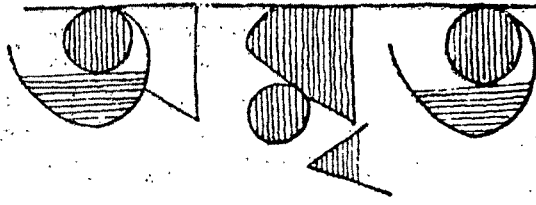
অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদগণের নাম :

ফুটবল : প্রদীপ বানার্জি; ক্রিকেট—সেলিম দুরাণী; হকি—পুণ্ডিত পাল সিং; লন টেনিস—রমানাথন কৃষ্ণন; টেবল টেনিস—জয়ন্ত ভোরা; এ্যাথলেটিক্স—গুরুবচন সিং; ব্যাডমিন্টন—নান্দনা নাটেকার; বাস্কেটবল—সরবাজি সিং; মহিলা হকি—এয়ান লামসডেন; জিমন্যাস্টিক—শ্যামলাল; শ্বাশ্বতমুদ্রা—এল 'বাউ' ডিসুজা; ভারোত্তোলন—এ এন ঘোষ; সস্তরগ—জেম বজরগী প্রসাদ; রাইফেল শূটিং—মহারাজা কারণী সিংজী; কুস্তি—হাবিলদার উদয়চাঁদ; ডলিবল—এ পালনিচামী; পোলো—মহারাজ প্রেম সিং; স্কোয়াশ—ক্যাপ্টেন কে এস জৈন; গলফ—ক্যাপ্টেন পি জি শেঠী; দাবা—ম্যান্দুয়েল অ্যারন।



রমানাথন কৃষ্ণন

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কতৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মাদ্রাস ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।



১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৬ই চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 30th March, 1962.
40 Naya Paise.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে অধ্যাপক গ্রীসতোন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চস্তরের পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষারই বাহন হিসাবে গ্রহণ করার জন্যে পরামর্শ দান করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি একথাও ঘোষণা করেছেন যে, মাতৃভাষা যদি সমস্ত প্রকার শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গৃহীত না হয় তাহলে আমাদের জাতীয়-জীবনে চিন্তার অগ্রগতি ব্যাহত হবে, অতএব অবিলম্বে এ বিষয়ে আমাদের তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

কথাটা নতুন কিছু নয়, রবীন্দ্রনাথ একথা বহু বৎসর পূর্বেই আমাদের জানিয়ে গেছেন। স্যার আশুতোষ এ পথে অনেকদূর অগ্রসরও হয়েছিলেন। কিন্তু তার পর থেকে বাংলাভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে কতদূর পর্যন্ত স্থান দেওয়া যায় তাই নিয়ে বহু দ্বিধা এবং মতভেদ দেখা দিতে শুরু করেছে। এবং বর্তমানে পরিস্থিতি এমনই জটিল আকার ধারণ করেছে যে, বিদ্যামন্ডলী ইংরাজি ভাষাকেই যেন আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে আঁকড়ে ধরতে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছি।

এই অবস্থায় অধ্যাপক বসুর সুচিন্তিত মত যে আমাদের চিন্তাক্ষেত্রের নৈরাজ্য দূর করতে অনেকখানি সাহায্য করবে তাতে দ্বিমতের অবকাশ ছিল না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ঘটনা অন্য পথে মোড় নিয়েছে।

সে যাই হোক, যাঁরা ইংরাজি ভাষাকে স্থিত-মর্যাদায় বহাল রাখতে চান, মাতৃভাষার দাবিকে তাঁরাও সরাসরি নাকচ করতে ভরসা পান না। একটি স্বাধীন, আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন জাতির সামনে কথা বলতে গেলে মাতৃভাষার বিষয়ে যতোখানি প্রশস্তিবাচন প্রয়োজনীয় তা তাঁরা সঠিকভাবেই উচ্চারণ করেন। কিন্তু তারপরেই তাঁরা একটি কুটতকের আশ্রয় নিয়ে প্রশ্ন করেন, বাংলাভাষার বর্তমান অপরিণত অবস্থায় উচ্চতর শিক্ষা, বিশেষকরে বিজ্ঞান-শিক্ষা কি তার মাধ্যমে হওয়া সম্ভব? অধ্যাপক বসু বহুকাল আগেই নানা উপলক্ষে এবিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে জানিয়েছেন যে, তা সম্ভব। আলোচ্য ভাষণে তিনি আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ঘোষণা করেছেন, এই অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থাটিকে গত এক শতাব্দী ধরে অস্বাভাবিক পথে চালিত করে ইংরাজি ভাষার সাহায্য নেওয়ার ফলেই আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের গতি হ্রাসান্বিত হতে পারেনি।

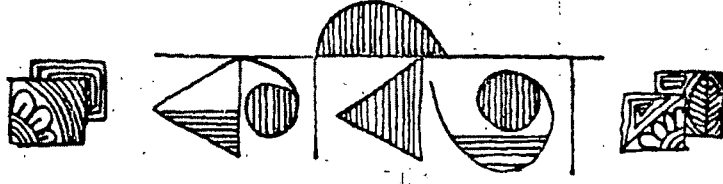
অথচ আশ্চর্য এই যে, এর বিপরীত কথাটাই আমরা এতদিন শুনতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমরা ইংরাজি শিক্ষায় পারংগম দিকপাল পাণ্ডিত এবং ইংরাজের ইন্সকুলেপড়া শিক্ষারতীদের মুখে অক্লান্তভাবে উচ্চারিত হ'তে শুনছি এদেশে ইংরাজি শিক্ষার কী ভগবদ-প্রেরিত মহিমা। এবং সব থেকে দৃষ্টান্তের বিষয়, বহু সদ্বৃদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয় ভদ্রলোকও এই মত নির্বীচনে মেনে নিতে দ্বিধা করেন না।

ইংরাজি শিক্ষা এদেশে ইউরোপীয় চিন্তাজগতের যে নতুন অভিঘাতের দ্বারা আমাদের সচেতন করে তুলেছিল, তার কার্যকারিতাকে খাটো করে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু দু-তিন দশক পার হ'তে না হতেই সে-শিক্ষাপদ্ধতি যে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে এক দুর্লভ্য বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছিল তাও অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হত তাহলে সারা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যাও যেমন বেড়ে যেত, তেমনি উপস্থিত প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতীয় ভাষাগুলিও উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র ভাবসমূহকে ধারণ করার মতো ঐশ্বর্যশালী হ'য়ে উঠত।

কিন্তু এতদিন তা সম্ভব হয়নি। এবং এই না-হওয়ার সমস্ত অক্ষমতাকে মাতৃভাষার উপরে চাপিয়ে দিয়ে আমরা পরম বিজ্ঞের মতো ইংরাজি ভাষার অসাধারণ ভাবপ্রকাশের ক্ষমতার কথা বলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে উৎসাহী হ'য়ে উঠি। একে ঠিক সুস্থ মনোভাব বলা যায় না। ইংরাজি শিক্ষা কেউ আইন করে বন্ধ করে দিতে বলে না। জ্ঞানবিজ্ঞানে যাঁর প্রকৃত কৌতুহল তিনি আপন তর্কিদেই ইংরাজি শিখবেন। এবং শূন্য ইংরাজিই বা কেন, অন্যান্য বিদেশী ভাষাকেও তিনি আয়ত্ত করতে চাইবেন। কিন্তু তাই বলে দেশসুস্থ মানদ্বকে ইংরাজি শিক্ষার মাশুল না দিলে শিক্ষার রাজ্যে অপাণ্ডিত্যের করে রাখতে হবে এ জুলুম কিছতেই সমর্থনীয় নয়।

সত্যি বলতে কি, এমনতেই বহু দেরি হ'য়ে গেছে। এমন দেশবরেণ্য বৈজ্ঞানিক গ্রীষ্মক বসুর আন্তরিক আবেদন সত্ত্বেও যদি প্রাচীনপন্থী শিক্ষারতীগণ তাঁদের পূর্বনো যুক্তিগুলি আবার গুরুগম্ভীরভাবে আওড়াতে শুরু করেন, তাহলে বদ্বতে হবে দেশগঠনের কাজ হ্রাসান্বিত হ'তে এখনো অনেক দেরি।

অথচ হাওয়ার গতি যেন সেইদিকেই প্রবাহিত।



অনন্ত সাগরে ভেসে যায় আজি

শান্তি চট্টোপাধ্যায়

অনন্ত সাগরে ভেসে যায় আজি সকালে ভাসানো
তরী, হে আমার তরী। আমরা কে বিকাল বেলায়
বলে গেলো; ক্ষয়হীন নিবিড় সূর্যমা ঘরে আনো—
প্রান্তরে, তোমার এ কী বসে-থাকা স্মরণ-অতীত?
আমি কি তোমারই প্রতি ভাসিয়েছিলাম তরীখানি
হে নতুন জন্মভূমি, লক্ষ্যহারা কুটজ ফুলের
হে নতুন, দেশহীন, পারাবার প্রভৃতি সন্ধানী—?
আমার তরীর চেয়ে দীর্ঘ ও ব্যাপক তরী আছে।

সমষ্টির কাছে আমি শূন্যহাতে কীভাবে দাঁড়াই?
নির্লিপ্ত তোমার সাজে; অতিরিক্ত দেহপরিবশ
আমি কি তোমার চেয়ে কোনো বড়ো দেহতে মিলাবো?
অথবা কোথাও স্বেচ্ছাচার বলে সত্য কিছু নাই—
পরাধীন ভালোবাসা; এমন কি সাগরের জল
নিতেও না পারে এই তরীখানি, কিংবা নিতে পারে।

রহস্যের দিকে

পদ্মকর দাশগুপ্ত

নৈঃশব্দের বৃকে, শোনো, ব্যাকুল তন্ময় সুর বা...
দ্যাখো, সে বিষয় সুর এই স্তম্ভ দিনের অন্তিম
দৃশ্যের নিবিড়ে হয় সঞ্চারিত; দিগন্তে—পশ্চিমে
একটি পাটল মায়া সূর্যাস্তের স্মৃতি হয়ে রাজে।

কে যেন করুণ ছায়া ছড়ালো নীলাভ মৃষ্টি হতে
চতুর্দিকে; আর এই প্রান্তরের নিঃসঙ্গ গভীরে—
এ নির্জনতায় এক স্লান আলো ছায়ার শরীরে,
আকাশের মতো কাঁপে, কুয়াশার বিবর্ণ পরতে।

বৃকের নিভতে কোন দৃষ্টির অদৃশ্য গুটি ফেটে
আমাকে কোমল, সূক্ষ্ম, বর্ণময় রেশমে জড়ায়;
হাওয়া বয়ে আনে মৃদু, শীতল ক্লান্তিকে।

কুহক! কুহক! যেন চারিপাশে। আবিষ্ট সন্ধ্যায়,
কুয়াশা, আকাশময়, মন্থর ডানায় কেটে কেটে
তিনিটি পাখি উড়ে যায় দিগন্তের রহস্যের দিকে।



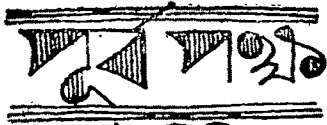
ঘরে ফেরার বেলা

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

অন্ধকারে ফিরলি ঘরে, আকুল চোখে কাঁদা
বন্ধ হ'ল, এখন হিম হিংস্র কোনো হাওয়া
ফিরিয়ে দিলে সবল হাতে; 'ক্ষিপ্ত' পায়ে যা
মায়ের হাতে স্বপ্নগুলি সাজিয়ে দিয়ে 'আয়'।

চক্ষে জ্বলে সর্বনাশের আকাশ-জোড়া আলো
দলে উঠছে অশথ গাছের পায়ের নীচে মাটি
যেমন তুমি ঘর ভাঙলে মত্ত হাতের শিরা
রক্তে হবে শীতল লাল রঙিন পরিপাটি।

কেমন করে ফিরবি ঘরে, পিছন ফিরে দ্যাখ
গৃহের মত অন্ধকার অতীত দিন তোর।



ভৈরব

সৈদিন আমাদের আড্ডায় কথা হচ্ছিল কুস্তি নিয়ে। সাধারণত এসব দৈহিক পরাক্রমের বিষয়ে আমরা আলোচনা করিনে। রাজনীতি, ক্রিকেট, বাজার দর, সিনেমা ইত্যাদি নিরাপদ ব্যাপারের মধ্যেই নিজেদের নিবন্ধ রাখি। কিন্তু আমাদের আড্ডায় প্রাচীনতম সদস্য হরেনবাবু সম্প্রতি ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছিলেন; সৈদিন হঠাৎ তাকে আড্ডায় আবিষ্কার করে তাঁর ঐ অদর্শনের কৈফিয়ৎ তলব করতেই কুস্তির কথা উঠে পড়ল।

না, হরেনবাবু নিজে কুস্তি করেন না। তিনি আমার-আপনার মতোই একজন জীর্ণদেহ বাঙালী এবং কায়ক্রেশে আপিস আর টিউশানী করে সংসার নির্বাহ করেন। তাঁর মুখে কুস্তি-প্রশস্তি শুনে আমরা সকলেই অস্প-বিস্তর তাক্সব ব'নে গেলুম। অনুভব বয়সে অনেক কাঁচা, সে বলল, 'কিন্তু হরেনদা, এ বয়সে ও সব কসরং কি আর শরীরে সহাবে?'

হরেনবাবু উচ্চহাস্য করে বললেন, 'আমি কি আর শরীর দিয়ে কুস্তি করছি? আমার কুস্তি মনে মনে। ওতে মন পুষ্ট হয়।'

বিজন এক কোণে বসে ছিল। সে আর্টিস্ট মানুষ, সর্বদাই যেন ক্রান্ত এবং উদাসীন। হরেনবাবুর কথায় সে প্রতি-ধ্বনি করল, 'মন পুষ্ট হয়?'

নস্বতো কী?'

'আমার মনে হয়, ওতে মন দুষ্ট হয়—কালিমালিপ্ত হয়।'

'একেবারে বাজে কথা। দুজন সুগঠিতদেহ পুরুষসিংহ পরস্পরের সপক্ষে লড়াই, এতে মন আনন্দিত হয়ে ওঠে না? তোমার কি মনে হয় বিজন যে আনন্দ কেবল পটে-আঁকা ছবিতে? বাস্তবে কোনো আনন্দ নেই।'

'হয়তো আছে।' বিজন মৃদুহাস্য সহকারে বলল, 'বিশেষ করে সে বাস্তবে যদি থাকে কিল-চড়, লাঠি, চুল ওপড়ানো এবং গাথা ফাটিয়ে দেওয়া।'

হরেনবাবু উত্তেজিত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, আমি মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'না হরেনবাবু, চুপচাপ চলবে না। বিষয়টা কী, তাই আগে বোঝা যাক। আসল কথা হল, আপনি বলছেন, কুস্তি দেখে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার মধ্যে বিলম্বিতা আছে, আর তারই ফলে আমাদের মন পবিত্র হয়। কিন্তু বিজন বলেছে, কুস্তির

বাক - সাহিত্যের বই

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

ববীন্দ্রায়ণ

মজবুত কাপড়ে বাঁধাই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রতি খণ্ডের দাম দশ টাকা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নতুন বই

সাংস্কৃতিকী

বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিকের সংস্কৃতমূলক নিবন্ধ-সংগ্রহ। 'সাংস্কৃতিকী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ বিষয়ের মূল্যবান আলোচনায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার বহুমুখিতা প্রকাশ পেয়েছে। দাম—৫.৫০

বিনয় ঘোষের নতুন বই

স্মৃতিচিহ্ন সমাচার

উইলিয়াম হিক, ফ্যানি পার্কস, এলিজাবেথ প্রভৃতির অতুলনীয় স্মৃতিকথা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত এ-যুগের বাংলার গোড়াপত্তনকালের সামাজিক জীবনের অনবদ্য আলোচ্য। অসংখ্য দৃশ্যপ্রাপ্য আর্টলেট-সম্বলিত সুবৃহৎ গ্রন্থ। দাম—১২.০০

শরাদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রস-রচনা

হ স স্ত্রী

ওস্তাদ কথাকল্পপীর বর্ণাঢ্য ও হাস্যরসোজ্জ্বল কাহিনীসমষ্টি। কী ঘটনা-বিন্যাসে, কী পাঠ-পাঠীর মনোবিশ্লেষণে, কী রস-ব্যঞ্জনাতে 'হসন্তীর' কাহিনীগুণি পাঠকচিহ্নকে যুগপৎ আবিষ্ট ও উন্মেষ করে। দাম—৪.৫০

বিকর্ণ-রচিত সুবৃহৎ বাস্তবধর্মী উপন্যাস

নৈমিষারণ্য

হাজার হাজার উন্মেষতুর জীবনসংগ্রামের বাস্তব চিত্র। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 'নৈমিষারণ্য' কলির নব-রামায়ণ, নতুন জীবন-সাধনার নতুন উপ-নিবেশ রচনার বাস্তবধর্মী উপন্যাস। দাম—৯.৫০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর নতুন রহস্যোপন্যাস

ব্রাহ্মের স্বাদ লোনা

ঘটনার বিসর্পিততায় ও অবিশ্বাস্য আকস্মিকতায় বিভ্রান্ত হয়ে দূর, দূর, বৃকে এগুতে হয় দুঃস্থের পরিণতির দিকে। দাম—৩.০০

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জরাসন্ধের

নিশিপত্তম (উপন্যাস) ৪.০০

আশ্রয় (উপন্যাস) ৩.৫০

(দ্বিতীয় মূদ্রণ প্রকাশিত হ'ল)

(দ্বিতীয় মূদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে)

সৈয়দ মজতবা আলীর

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প

৪.০০

অগ্নিমিতা (উপন্যাস) ৫.০০

জরাসন্ধের উপন্যাস

শংকর-এর জনপ্রিয়তম বই

পাড়ি (পঞ্চম মূদ্রণ) ৩.৫০

এক দুই তিন (৪র্থ মূদ্রণ) ৪.০০

বনফুল-এর নতুন বই

উত্তর পঞ্চানন ঘোষালের

দূরবীণ

৪.০০

পকেটমার (উপন্যাস) ৪.৫০

বাক-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

আনন্দ পাখিবিক্রী, ওতে মন কল্যাণিত হয়।
বাস, আপনি এক-এক করে উত্তর দিন।

হরেনবাবু একটু চুপ করে থেকে হেসে
বললেন, 'একবারে সপ্তেকীসের বিচার।
কিন্তু হেমলক কই?'

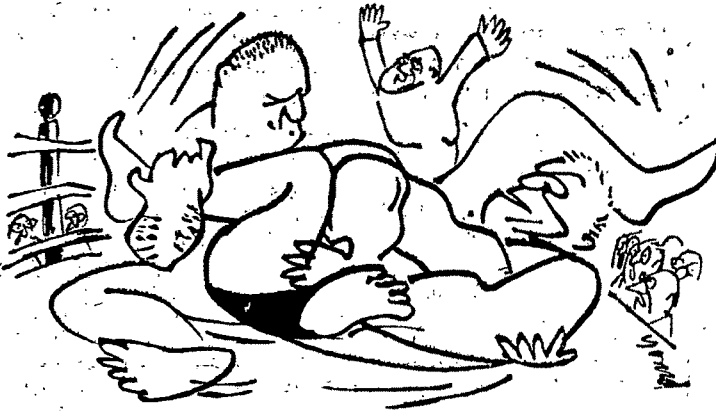
আমি লাজিত হয়ে বাড়ির ভিতরে
কফির জন্যে ফরমাস পাঠালাম।

হরেনবাবু বললেন, 'প্রথম কথা হল,
বিজন ভায়া যে সব বর্ণনা দিল ফ্রি স্টাইল
কুস্তিতে ওসব ব্যাপার তেমন কিছু হয়
না, ওসব হল ক্যাচ-আজ-ক্যাচ-ক্যান
কুস্তির ব্যাপার। শ্বিডীয়ত, কুস্তিতা হয়
দুজন সমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে। আমার

এসব বোধহয় লক্ষ্য করলেন না। সোজাসে
তিনি বলতে শুরু করলেন—

'বস্টন ক্র্যাব? একেবারে মোক্ষম প্যাঁচ।
মানে ধর, তোমার প্রতিপক্ষকে তুমি উপড়
করে ফেলে দিয়েছ, তারপর তার পা
দুখানি উঁচু করে তুলে চাপ দিচ্ছ। একটু
নড়েছে কি শিরদাঁড়া ভেঙেছে। ঠিক
যয়ৎসের মতো। হার স্বীকার না করে
কোনো রাস্তা নেই।'

'অর্থাৎ, হয় হার স্বীকার, নয়তো
হাড় ভাঙা। বেশ বেশ। আর ঐ
এরোসেন স্পিন, ওটা কী বস্তু?'



মতো লোকের সঙ্গে একজন ভীম
পালোয়ানের হয়না। কাজেই এর মধ্যে
বীভৎসতা কিছুই থাকে না—থাকে
যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের প্রতিযোগিতা।
ভীতীয়ত, এ ধরনের কুস্তি যেহেতু একটা
স্পোর্ট সেইহেতু সব খেলাই যেমন
মনকে পবিত্র করে কুস্তিও সেই রকমই
করে। মন কল্যাণিত করার কোনো
সন্দেহনাই এতে নেই।'

অনুতোষ সায় দিয়ে বলে উঠল,
আমারও তাই মনে হয়, হরেনদা। শান্তি-
চর্চা না করেই বাগলালী ডবতে বসেছে।
শরীরটা এতো অবহেলার জিনিস নয়,
তাকে সুস্থ না রাখলে সেও আমাদের পক্ষে
পক্ষে অপারূপ করে জাড়ে।' বিজন তার
কথার কোনো জবাব দিল না। হরেনবাবুর
দিকে তাকান প্রশ্ন করল, 'জাচ্ছা
হরেনদা, বয়্যার হাগ বা ডব্লক
জর্জালেন জিনিসটা কী রকম?'

মার্ভেলাস? একজন মল্ল যখন
আরেকজনকে বুক জাপটে ধরে দুবাহুর
চাপ দিতে থাকে তাকেই বলে বয়্যার
হাগ। বাজাধনের আর তখন ট্যা-ফো
করার উপায় থাকে না।'

'ঠিকই তো। আর ঐ বস্টন ক্র্যাব,
ওটা কী রকম প্যাঁচ?' নিরীহভাবে প্রশ্ন
করল বিজন। কিন্তু তার আপাত
নির্বীহতার অন্তরালে আমি যেন ঝড়ের
সংকেত অনুভব করলাম। হরেনবাবু

'খুবই সোজা। ধাঁ করে প্রতিপক্ষকে
চিং করে দুহাতে মাথার উপর তুলে বোঁ-
বোঁ করে ঘোরানো। বেশী ছটফট করলেই
পতন ও মর্ছা।'

'শুধু কি তাই? রক্তবমন ও মর্ছা,
তাই বা বাদ থাকে কেন?' বিজন ফেটে
পড়ল হঠাৎ, 'হরেনদা, আপনার উচিত
তার-ধনুক হাতে নিয়ে জঙ্গলে চলে
যাওয়া এবং জীব-জন্তু মেরে তার কাঁচা
মাংস খাওয়া। দেখবেন, সেও খুব উত্তম
ধরনের একটা স্পোর্ট।'

'নাঃ, তা করব কেন?' হরেনবাবু
জবলে উঠে বললেন, 'ঘরের মধ্যে বসে
নন্দনতত্ত্ব আলোচনা করব আর ফুলের
ঘাসে মর্ছা হবে।'

বিজন উত্তেজিতভাবে কী যেন
বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম,
'অর্ডার, অর্ডার! এ সব ব্যক্তিগত আক্রমণ
চলবে না। তাছাড়া, ভিতরের দরজার
দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, 'আপাতত
মুখকে ব্যাপ্ত রাখার অন্য উপায় এসে
গেছে। এখন পাঁচ মিনিটের জন্যে
বিরতি।'

সকলেই যার-যার আলম, ভাজার
শ্লেট এবং কফির কাপ তুলে নিলেন।
ভূত ঠে নিয়ে চলে গেল।

আমি বললাম, 'আসল কথা হল,
রুটি। সকলের সব জিনিস ভালো লাগে
না।'

'ওটা নতুন করে না বললেও চলে।'
বিজন বলল, 'কিন্তু কতকগুলো ব্যাপার
আছে যা সকলেরই ভালো লাগা উচিত—
যেমন সুবোঁদয়, গান বা শিশুর মৃৎ।
আবার অন্য কতকগুলো ব্যাপার আছে
যা সকলেরই খারাপ লাগা উচিত—যেমন
পচা ইঁদুর, বস্তীর ঝগড়া বা কুস্তি।'

'কখনো নয়।' অনুতোষ বলে উঠল,
'বিজনবাবু, আশ্চর্য হয়ে কী করে যে
কুস্তিকে পচা ইঁদুরের সঙ্গে এক ক্লাসে
ফেললেন বুকতে পারিনে। মল্লযোদ্ধার যখন
এসে সকলের সামনে দাঁড়ায়, আমার তো
দেবদূতের মতো মনে হয়। কী সুপার্ব
কর্ম থাকে এক-একজনের যদি একবার
দেখতেন তো বুঝতেন।'

'ঠিক বলেছ।' হরেনবাবু সায় দিয়ে
বললেন, 'আমার তো নেশা ধরে গেছে।
খবর পেলেই দেখতে যাই।'

'ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন।' বিজন
বিষমভাবে বলল, 'আপনার ভিতর যে
জংলী মানুষ্টা লুকিয়ে আছে তারই
খোঁরাক জোটেতে যান আপনি কুস্তি
দেখতে। আসলে আপনি একটি স্যাডিস্ট,
কাউকে পীড়ন করলে আনন্দ বোধ করেন।
কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তা হয়তো সম্ভব
নয়। তাই আপনি বকলমে কাজ সারেন।'

হরেনবাবু এই আকস্মিক আক্রমণে
কেমন থ' বনে গেলেন। উদ্ভাসিতভাবে
বলতে লাগলেন শুধু, 'বাজে কথা, একে-
বারে বাজে কথা। আমি ভাবতেও পারিনে।'

'সে তো ঠিকই। ভাবলে আপনি
লজ্জা পেতেন, যেতেন না।' বিজন বলল,
'সুন্দর সুগঠিত দেহ কার না ভালো
লাগে? অনুতোষ ঠিকই বলেছে, এক-
একজন মল্ল যেন ভাস্করের প্রতীক।
কিন্তু কথা কি জানেন, কুস্তির সময় তারা
যে সব কান্ড করে, যেমন গরিলার মতো
গর্জন করা, চুল ওপড়ানো, রক্তগঞ্জা বইয়ে
দেওয়া, এ সব শুধু দর্শকদেরই
মনোরঞ্জন জেনো। এ সব বীভৎসতা
না থাকলে এত লোক দেখতে
যেতো না, পরসা উঠত না। কাজেই
এটা হলো ব্যবসাদারী। ব্যবসার
জন্যেই তাদের পড়ে-পড়ে এমন মার খেতে
হয়। কী করুন ব্যাপার ভাবলেও আমার
কণ্ট হয়। অথচ আমাদেরই আদিম
নিষ্ঠুরতাকে খোঁশ করার জন্যে এত
আয়োজন!.....হয়তো এককালে আমরা
নরবলি দিয়েও এমনি উল্লাস অনুভব
করতুম।'

আমার ভিতর একটা ধমকসে আর-
হাওয়া নেমে এল। আমি জোর করে
হেসে বললাম, 'বিজন, তুমি তুলি ছেড়ে
কলম ধর। আমার মনে হয় পাখিবিক্রীতে
তাহলে অচিরেই স্বর্গরাজ্য স্থাপিত
হবে।'

শুনে সকলেই একসঙ্গে হেসে
উঠলেন। সৌদাম্য মতো আমাদের কথা
কুস্তি সাঙ্গ হল।

ব্রহ্মবান্ধবের সম্মানে

মুখ্যমন্ত্রোক্তন বন্যোপাধ্যায়

মহাকালের দরবারে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাংলা কলকথায় ইংরাজী ১৮৬১ সাল এক পরমাশ্চর্য জন্মলগ্ন। কতো শিশু মায়ের কোল জুড়ে বসতো কিন্তু সেদিন কী কেউ কল্পনা করে ছিল—এদেরই মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ প্রফুল্লচন্দ্র, নীলরতন, মতিলাল, মদন-মোহন, ব্রহ্মবান্ধব, বিজয়রত্ন স্মৃতিধীরের দল, অর্ঘ্যবসুদের সখা, ভাবগঙ্গার পুত্রেরা। বাংলার মননের ইতিহাসে এ এক বিরল ঋতুর পরিবর্তনের যুগ। সিপাহী বিদ্রোহ মোটে চার বছর আগের ঘটনা। ইংরাজ এসেছে, পশ্চিম থেকে এসেছে জোয়ার—তার দূর্বীর স্রোত শূন্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস রাষ্ট্রবোধ, সমাজ-সচেতনতা নিয়েই ধাক্কা দিতে না, আনছে জীবনযাত্রার অভ্যস্ত উপকরণের বাইরের বহু জিনিষ, নতুন মূল্যায়ন, প্রশস্ততত্ত্ব দৃষ্টিও। শিক্ষার নতুন রীতিনীতি গৃহীত হচ্ছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাবালক হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ পর্ব সামাজিক শালত জীবনে আগুনের পরশমাণি ছইয়েছে। বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে তাঁর। রামমোহনের নেতৃত্বে বে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে ও কেশব সেনের ব্যক্তিগত যার প্রতিপত্তি সেই সমাজ তখন বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যৌবন শতদলে টলমল করছে। ওদিকে আগুনের জীবনের আর এক বিশ্লেষণের ভিত্তি স্থাপন হচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে—দক্ষিণপাণি দেবতার আবির্ভাব। দেবী ভবতারিণী নামছেন আকাশ বেয়ে, মেঘাঙ্গী বিদ্যুৎবাহিনী এলোকেশী। মাইকেল লিখছেন, বাক্স আসছেন। বাংলা দেশে সমস্বয়ী সাধনার বীজ-চেতনার রপন হচ্ছে। এই মিতালীর প্রথম সূর্য প্রথম প্রণয়পবনগঞ্জন বাংলা দেশেই। কবি, সাধক, কর্মী জ্ঞানী সবাই “মুখ্যমন্ত্রায়ন পেতে আঁচ কান গান বিরাটব বলে”। কিন্তু যে গান গাওয়া হলো, যে গীত রচিত হলো গোড়জনের মধ্যপানের জন্য তা পশ্চিমী জারিকরসে শোধিত হলেও ভারতীয় মূলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাকে ‘রেনাসাস’ বাল, ‘রিকরমেশন’ বাল, কাউন্টার ‘রিকরমেশন’ বাল বা ‘রিভাইভালিসম’ বাল ভাতে কিছু যায় আসে না।

শতবর্ষ আগের এমনি একটি দিনে (১২ই ফেব্রুয়ারী) হুগলী জেলার একটি গণ্ডগ্রামে আবির্ভূত হলেন এক বীর শিশু। সাধক নামকরণ হলো—

ভবানীচরণ—এ যেন নিয়তির নির্দেশ, জন্মাবধি মায়েরই পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত, যিনি ভবিষ্যতে শ্রীঅরাবিন্দের কল্পনার ভবানী মন্দিরের একনিষ্ঠ সেবক হয়েছিলেন। পরের যুগে যে নাম তিনি গ্রহণ করলেন তাও অত্যন্ত অর্থবাহ। ব্রহ্মবান্ধব কাকে বালি আমরা—না যিনি ব্রহ্মের অর্থাৎ সর্বৎ খলু ইদং—এর, আপামর সাধারণের, আশ্রয়স্থল পর্যন্ত জগতের সুহৃদ বা মিত্র। সর্ব-ভূতাহিতায় সর্বজনসুখায় যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, আর বান্ধব ত শূন্য উৎসব বাসনের সঙ্গী নন, রাজস্বারে শ্বশানেও যিনি পাশে দাঁড়ান, আশ্বাস দেন যিনি। জানি এখনি হয়তো সমালোচনা হবে যে ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন গোড়া ন্যাশনালিস্ট এবং সেকালে এঁরা সকলেই ছিলেন ইংরেজ-বিশ্বেষী, তাই যদি হয় তাহলে তিনি সকলের বান্ধব

কোন ন্যায়সূত্রে। কিন্তু ভুলসে চলবে না যে ভারতবর্ষের অস্তরঙ্গ চেতনার মৈত্রীভাবনা ওতোপ্রোত ও তার রূপ বিভিন্ন। শত্রুভাবে ভজনারও কল্পনা আছে জগৎস্থিতায়। দূরদৃষ্টিতে তিনি বহুপূর্বেই দেখেছিলেন যে ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়াই ইংরেজের সবচেয়ে বড়ো কল্যাণকর পথ, বিশ্ববিধান সেই ছিল অমোঘ নিয়ম।

ব্রহ্মবান্ধবের সম্মানে যে উপমাটি মনে পড়ে সেটি হচ্ছে বেদের সেই প্রথম মন্ত্র, জাগরণের প্রথম ছন্দ—অগ্নিমীলে পুরোহিতং হোতারং রজুধীতম—অগ্নি মানেই হচ্ছে অগ্নিগণী যিনি আগুয়ান, এগিয়ে যান। আগুন শূন্য ত অগ্নিকান্তে ঘাসে জ্বলানো অনলশিখা নয়—মানুষের মনের অভীপ্সা জীবনের উদ্দেশ্যী চেতনাও। আগুন পাবনও বটে—সে পুড়িয়ে দিয়ে কালো দাগই রেখে যায় না, অগ্নারেই তার শেষ নয়, অনগ্ন হয়েও সে বেঁচে থাকে প্রতিজ্ঞায়, তপস্যায়, আনন্দে, সেবার, মাধুর্যে, জ্ঞানে, স্বাধীনতায স্মরণে বিরাট সন্নাট হয়ে—সেই আগুন তার তার প্রতীককেই আমরা নমস্কার কার—স্তুত করি, ‘ঈদং স্তুতো’। এই আগুন-ছোঁয়া মানুষই ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। প্রথম জীবনে তিনি

মনোজ বসুর
সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাস

রাজকন্যার
স্বয়ম্বর
৥ ৪.০০ ৥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
রসমধুর কাহিনী

কন্যা সূত্রী,
সাহাবতী এবং
৥ ৪.০০ ৥

নীহারঞ্জন গুপ্তের
সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাস

স্ববরা
৥ ৫.৫০ ৥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস
তিন প্রহর ৥ ৩.২৫ ৥
অবধূতের অভিনব উপন্যাস ৥ ৩.২৫ ৥
ফকরুদ্দীন ১ম পর্ব ৥ ২.৭৫ ৥
ফকরুদ্দীন ২য় ও ৩য় ৥ ৩.৭৫ ৥
জরাসন্ধের সর্বোত্তম কাহিনী
একুশ বছর (২য় সং) ৥ ৩.৭৫ ৥
ইতিহাসের নৃশংসতম খুনী
আইখম্যান (২য় সং) ৥ ৩.০০ ৥
নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
সমাজ সমীক্ষা :
অপরাধ ও অনাচার ৥ ৭.০০ ৥

শৈলজানন্দের নতুন উপন্যাস
রূপং দৌহি ধনং দৌহি ৥ ৩.২৫ ৥
মনোজ বসুর সর্বাধুনিক কাহিনী
মাম্বাকন্যা ৥ ৩.৫০ ৥
ডব্বারদাস্তার
(কৌতুক-নাট্য) ৥ ১.৭৫ ৥
বনফলের তিন উপন্যাস একত্রে
তিন কাহিনী ৥ ৫.৫০ ৥
জসীমউদ্দীনের মধুর স্মৃতিচরণ
ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় ৥ ৩.৭৫ ৥
অমিতাভ চৌধুরীর
মুখের ভাষা,
বৃকের রুধির ৥ ৩.৫০ ৥

কলিকাতা

৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট.
কলিকাতা-৯

ঘুরলেন কেশবচন্দ্রের শিষ্য হয়ে—কিন্তু মন ভরলোনা—The Quest eternal তাঁকে করলে প্রোটেক্টেট, পরে তিনি মেরীমাতার পূজারী রোম্যান ক্যাথলিক, আবার ঘুরে ফিরে বৈদান্তিক-অদ্বৈতবাদী। বাইরে ধর্মের খোলসে কি আসে যায়, আসলে তাঁর বৈদান্তিক-মন জীব শিবকে এক করে সোহং এর বাণী শুনলে। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হলেন তিনি শ্যান্‌তিনিকেতন স্থাপনে, কৈম্ব্রজে গেলেন তিনি বৈদান্ত শিক্ষা দিতে, কিন্তু দেশের জন্য গভীর মমত্ববোধ থাকতে দিলে না এই সন্ন্যাসীকে সাগরপারে, তিনি ফিরে এসে বার করলেন “সম্মান” কাগজ। রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি তাঁর ভাষায় যে মন্দিররস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বেইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথম দেখা গেছে বাংলা দেশে আভাসে ইংগিতে সম্মানবাদের সূচনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতো বড় প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কম্পনার অতীত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের আবর্তে ঝাঁপ দিলেন তিনি।

এই মানুষটি কিরকম ছিলেন তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন। তাছাড়া সাময়িক পত্রিকায় তাঁর নিজের লেখা আছে, যা থেকে এই অগ্নিগর্ভ সন্ন্যাসীর মনের বিপুল ব্যাধার কিছুটা পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন—তেজস্বী, নিভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী, অধ্যাত্ম বিদ্যায় যার অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি। শান্তিনিকেতনে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার সহযোগী হিসেবে আশ্রমের সংলগ্ন গ্রাম্যপথে পদচারণ করতে করতে কবির সঙ্গে আলোচনাকালে কত দূরই তত্ত্বের গ্রন্থি মোচন করতেন তার সাক্ষীও স্বয়ং কবিগুরু।

নিজের কথা নিজেই বলেছেন। ঘর নেই, স্ত্রী-পুত্র নেই, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান পরিব্রাজক সন্ন্যাসী—একদিন কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে গোয়ালিয়রে গিছিলেন দেশ স্বাধীন করবার কম্পনার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার মতলব নিয়ে। আবার ইচ্ছা ছিল নরমদার ভাঁয়ে আশ্রম স্থাপন করে ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করবেন, কিন্তু একটি কথা শুলের মত বিধতো তাঁকে—ভারতকে স্বাধীন করতে হবে। কিন্তু কবে—জরুরী ধরিয়ে দিতো তাঁর মনে। তাই তাঁর মনে জেগে উঠলো স্বরাজ্যগড় স্থাপনের প্রতিজ্ঞা—গোলামগড় নয়—তাই তিনি বললেন—“শ্রীকৃষ্ণের বাণী” যখন বাজল তখন কি আর ভাবনা থাকে—সৌজন্য-ভদ্রতা কি আর রক্ষা করা যায়... যখন ভাই ঘরে আগুন লাগে তখন কি

আর শান্তশিষ্ট হইয়া বসিবার সময় থাকে—তখন কেবল এগোমেদো চাল—কেবল রোল কেবল গোঙ্গ। তখন আর পুকুরের জল—কি নরমদার জল, জ্ঞান থাকে না। কেবল ঢালো ঢালো নিবাও নিবাও। শুনোছি মুন্ডির সংবাদ। আমার জপতপ বান্ধন-ছাটন সব ঘুটিয়া গিয়াছে—আকুল-পাগলপারা উধাও হইয়া বেড়াইতেছি। আর গোলামগড়ে থাকিতে চাই না—এ স্বরাজ্যগড় গাড়িতে—স্বরাজ্যতন্ত্রের প্রজা হইতে আমার প্রাণ সদাই আনয়ন। আর সংশয় করিও না, সন্দেহ করিও না—সংবাদ আসিয়াছে—ভারত স্বাধীন হইবে—বিলম্ব আর নাই।”

কিন্তু এই স্বরাজ্য অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবের কাছে শুধু political emancipation নয়, আরো মহৎ আরো উদার আরো বিরাট পরিকল্পনা। তাই ব্রহ্মবান্ধব বললেন, মানবসমাজ একটি রথ—বিশ্ব-রথী টানছেন ছোট্ট জগন্নাথকে দেখে বিশ্বনাথের ধ্যান করি, সংসাররথ ও কর্মচক্রের কথা ভাবি, ভাবি সেই বিশ্ব-রথের চালককে—দে দোল দে দোল। দেশকে তাঁরা দেখেছিলেন, মন্মথীরূপে নয়, চিন্ময়ী মা হিসাবে। চার অধ্যায়ের আভাসে ব্রহ্মবান্ধবের উল্লেখ অনেককেই এক-সময়ে কবির প্রতি বিরূপ করেছিল। বাদানুবাদ তকও হয়েছিল যথেষ্ট। অনেক কৈফিয়ৎ রবীন্দ্রনাথকে দিতে হয়েছিল, তারই এক জায়গায় কবি বলেন—যে একজন মহিলা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন, যে তাঁর মতে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে উপাখ্যায়ের জীবনের বহিরংশ প্রকাশ পেয়েছে আর অতীতের চরিত্রে ব্যস্ত হয়েছে তাঁর অন্তরতর প্রকৃতি। একথাটি প্রাণধানযোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বললেও একথা থেকে যায় যে প্রহর শেষের রাঙা আলোর চৈত্র মাসে কিসের সর্বনাশ তিনি দেখেছিলেন। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের দূরপ্রসারী দৃষ্টি ঠিকই ধরেছিল যে রক্তগঙ্গা বগ্নাবার মেকী ভগীরথ তিনি ছিলেন না, তাই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে—রবিবাবু, আমার পতন হয়েছে। যাই হোক চার অধ্যায় সম্পর্কিত আলোচনা-আভাস ও তার কৈফিয়ৎ গ্রন্থ বাহ্য, আসলে শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছিলেন—He was a great soul.

সাহিত্য-রস-রসিক ব্রহ্মবান্ধবের দু'পাশে ভারতজীবনের দুই পথ-পরিচায়ককে দেখি—রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ। Sophia পরে (১৯০০ সাল ১লা সেপ্টেম্বর) তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলে অভিনন্দন জানালেন—The world poet of Bengal. অর্থাৎ ভাষায় চরিত্র বহুরের

রবীন্দ্রনাথের যে ছবি আঁকলেন তা সাহিত্যের ইতিহাসে অনবদ্য, শিল্পী মনের নিখুঁত অলংকরণের পরিচয়—কবি কি রকম—সদ্য বিকশিত চাঁপা ফুলের মত রং তাঁর, চিকন কালো অলকদাম পশ্চাদ্ভঙ্গ দাঁট চোখ, চিহ্নিত-বৎ শ্রুৎগল, উন্নতনাসিকা, মরাল-গ্রীবা, তন্তকাম্বনবর্ণ, দীপ্তদীর্ঘদেহ-মহিমা যেন রায়ফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর ছবি—দেবদারু, গাছের মত তার শিকড়গুলি চলে গেছে মাটির নীচে, অনেক অনেক দূরে—তার শীর্ষ-দেশ গগনচুম্বী যেন আকাশ বিধ করবে। আবার শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে লিখলেন—এ হচ্ছে মানস-সরোবরের অরবিন্দ—অমলশূভ্র অরবিন্দ, প্রক্ষুটিত শতদল—সাপ্তিকতর দিব্যশ্রী-বজ্রের মত বহিঃগর্ভ, কমলপর্ণের ন্যায় কান্তপেলব, এ হেন জ্ঞানাত্ম ও এমন ধ্যানসমাহিত মানুষ তোমরা চিহ্নবনে খুঁজিয়া পাইবে না। যার কাছে মরণকে মনে হইবে বসন্ত-বিলাস—কামান-বন্দুক জেল-কারাগার আইন-আদালত লাটবেলট সব ফকিরার—ফিরিগির হুড়ুম হুড়ুম দুর্দিনেই অক্কা।”

সাহিত্যিক ব্রহ্মবান্ধবের সম্যক পরিচয় Sophia, Twentieth Century প্রভৃতি কাগজে ও “বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি”, “সমাজতত্ত্ব”, “আমার ভারত উদ্ধার”, “ব্রহ্মমৃত”, “পাজাপাবণ” প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যাবে এবং “সম্মান” প্রতি ছত্রে ছত্রে। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রেণের সন্ধ্যার দত্তর “নবজীবন” এই সম্পর্কে বহু তথ্যের সম্বন্ধ দিয়েছেন যার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ও ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বহু গবেষণা করেছিলেন, তাঁর অকালমৃত্যুতে অনেক মূল্যবান তথ্য ও তার সম্যক বিচার হয়তো অপ্রকাশিত থেকে যাবে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই মনীষীর তিরোধান হয়। ব্রহ্মবান্ধব বুঝেছিলেন যে, এ হচ্ছে মায়ের দাবী—শ্রীঅরবিন্দের কথায় The Demand of the Mother—শুধু নবজাগরণ নয়, নব জন্মও। তাই তাঁর কাছে স্বাধীন ভারতবর্ষ কাঠ পাথর মাটি ছিল না। তার ধ্যানমূর্তি দেখে ছিলেন তিনি, ভাবৈকসিদ্ধিতে ভরপুর হয়ে মেতেছিলেন “ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে”—সে শুধু রাজনীতি নয়, পরিপূর্ণ জীবনেরও নীতি। তাই তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, এমন কোন ব্রিটিশ জেল নেই যা আমাকে ধরে রাখতে পারে। পারেওনি, মৃত্যুর দয়ার দিয়েই তিনি অমৃতত্বকে প্রমাণ করে গেলেন।



।। এক ।।

“শুনছ, বাবা?”

“শুনাছি মা, শুনাছি। শারলক-হোমস অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, তার মূখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। তাই না?”

“না বাবা, তুমি কিছই শোননি। আমি এখন পড়ছি—আইরীশ অ্যাডলারের ঘরের মধ্যে ঘন ধোঁয়া এসে ঢুকেছে, বাইরে ‘আগুন’ ‘আগুন’ চিৎকার। শোননি?”

দিনেশ গাঙ্গুলি সত্যিই কিছু শোনেননি, শোনার ভান করছিলেন এতক্ষণ।

শারলক হোমস কে, তার বাড়ি কোথায়, অবস্থা কেমন, এসব কিছই এতদিন তাঁর জানা ছিল না। তাঁর বি-এ পাস শারলক হোমস ভক্ত মেয়ের পাগলায় পড়ে এখন জানতে হচ্ছে। বাবা শারলক হোমস কে জানেন না, এ বড়ই লজ্জার কথা। তাই কণকপ্রভা তাঁকে মাঝে মাঝে এক একটা গল্প পড়ে শোনায় এবং ডিটেকটিভের অনুসন্ধানের বিশেষ কৌশলটি বঝিয়ে দেয়। আপাতত সে পড়ছিল এ ‘স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া’ নামক গল্পটি। কিন্তু স্ক্যান্ডালের কথা শুনলে জমিদার দিনেশ গাঙ্গুলি গোড়ায় যতটা কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন, ততটা বরাবর বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাঁর নতুন তৈরি মস্ত বড় বাগান-বাড়িখানা এত দিন পরে আজ ভাড়া হয়ে যাবার কথা, তাঁর বৃদ্ধ বিশ্বস্ত কর্মচারী কালীচরণ অনেকক্ষণ গেছেন দলিল সই করিয়ে অগ্রিম ছ মাসের ভাড়া আনতে, কিন্তু তাঁর আসতে দেরি দেখে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন, আর

সেজন্য শারলক হোমস ক্রমেই মাথায় উঠছে, মাথার ভিতরে যেতে পারছে না।

এমন সময় সংবাদ এলো কালীচরণ এসে গিয়েছেন। দিনেশ গাঙ্গুলি খবর শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কনক-প্রভা দুঃখিত মনে বই বন্ধ করল।

দিনেশ গাঙ্গুলি তাঁর অফিস ঘরে গিয়ে কালীচরণের কাছ থেকে নগদ বারো শ’ টাকার বারোখানি নোট গুনে নিয়ে রাসিদ বইখানা মিলিয়ে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “কোনো সন্দেহ করেনি তো?”

“না।”

“অন্য লোক শত্রুতা করে কিছ লাগাননি তো?”

“আজ্ঞে না, সময় পায়নি, যতীনবাবু আজই ভোরবেলা পেঁপেছেন কি না।”

“ও’রা কবে আসছেন ও বাড়িতে?”

“যতীনবাবু বললেন মাস পরলা একটু অসুবিধা হবে, কারণ তাঁর পরিবার দুদিন আগেই এসে পড়েছেন। লখনৌ থেকে আসছেন, এখানে ওঠবার জায়গা নেই আর।”

“তুমি রাজি হয়েছ?”



“বলেছি, তাই আসবেন।”

দিনেশ গাঙ্গুলি মনে মনে খুশি হসেন, বললেন, “তা হলে এসো এখন।”

“আর একটি কথা”—কালীচরণ দসুজেকে বললেন, “যতীনবাবুকে বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, তিনি দেখে বললেন, ‘এতবড় বাড়ি তাঁরা লোক মাত্র চার পাঁচ জন, সাব-লেট করতে পারব তো’? আমি বললাম ‘তা নিশ্চয়ই পারবেন’। তিনি বললেন ‘তা হলে দিলে একটুখানি লিখে দিয়ে যান।’

“তুমি দিলে?”

“জানি কি না, উনি তো দুদিনেই বাড়ি ছাড়বেন, দুনিয়াও ছাড়তে পারেন, তাই দিলাম।”

“বেশ করেছে,” বললেন দিনেশ গাঙ্গুলি, “যা করেছে সবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।”

দিনেশ গাঙ্গুলি কনককুঞ্জের ভবিষ্যৎ ভাবেন না, সব সময় এখন তার বর্তমান-টাই তাঁর লক্ষ্য। অতএব শব্দে বারো শ টাকার কথা ভাবলেন, আর একবার যতীন রায়ের ভবিষ্যৎটা ভাবলেন এবং মনে মনে হাসলেন।

তাঁর খুশি হবার কারণ—এ বাড়ি কেউ ভাড়া নেয় না। নিলে অন্তত আট শ টাকা হ’ত আজকের দিনে। তাই বারো শ টাকাকে তিনি লটারিতে পাওয়া টাকার তুল্য মনে করলেন।

যতীনবাবু, লখনৌ থেকে ‘দুশ টাকার মধ্যে নির্জন স্থানে বাড়ি চাই’ বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। দিনেশ গাঙ্গুলি টেলিগ্রাফ করে বাড়ির অবস্থা এবং ছ মাসের ভাড়ার কথা জানিয়েছিলেন তাঁকে।

ও বাড়ি কেউ ভাড়া নেয় না, কারণ ওটি ভূতের বাড়ি। এর আগে পর পর দুজন ভাড়াটে রাতে ভূত দেখে বিষম চিংকার করে মারা গেছেন। মৃত্যুর ঠিক আগে শব্দ বলে যেতে পেরেছেন, ‘ভূত!’ দুজনেই একই কথা বলেছেন। তারপর শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্বে ‘মহুতের জাদিত স্বপ্নে বলেছেন, ‘দুন্দর চেহারা, কথা বলে অনেক কিন্তু তার কোনো মানে হয় না।’

কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে শহরে। রাতে কেউ এখন আর ও বাড়ির নামনে দিয়ে হাঁটে না, কি জানি যদি ঘাড় হঠকান

শহর থেকে দূরে মাত্র তিন মাইলের মধ্যে এই কনককুঞ্জ। দিনেশ গাঙ্গুলির একমাত্র সন্তান শ্রীমতী কনকপ্রভার নামে এই বাড়ি। এমন বাড়ি, অথচ ভূত।

টিল ছোঁড়ে না, দরজায় গুতো মারে না, শব্দ সামনে এসে এলোমেলো কথা বলে, হাঁপার এবং মাঝে মাঝে বলে—‘ওঠ এখান থেকে, এ বাড়ি আমার।’

ভূতের এটি একটি অতি জঘন্য মিথ্যা কথা। কারণ বাড়িটি সম্পূর্ণ নতুন এবং জমি কেনার দলিলে কোনো গোলমাল নেই। প্রথম ভাড়াটে মারা গেলে দিনেশ গাঙ্গুলি শুনিয়েছিলেন, ভূত ওটিকে নিজের বাড়ি বলে দাবী করছে। সেজন্য তিনি ভূতকে দেখাবার জন্য বাড়ি-সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল কনককুঞ্জের একটি ঘরে টাঙিয়েও রেখেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। দ্বিতীয় ভাড়াটেকেও ভূত উদ্বেষ করেছে, তাকেও মরতে হয়েছে। ভূত যে এমন মিথ্যা কথা বলতে পারে তা ভেবে দিনেশ গাঙ্গুলি অত্যন্ত মনমরা হয়ে পড়েছেন। এ বাড়িটি এখন তাঁর কাছে প্রায় অভিশাপের মতো দাঁড়িয়ে গেছে।

দিনেশ গাঙ্গুলি ব্যবসায়ী। তিনি জেনেশুনে ভূতের বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন। ভূতের হাতে মৃত্যু জেনেও নতুন ভাড়াটেকে সেই মৃত্যুর মুখে পাঠাচ্ছেন সামান্য টাকার লোভে।

যতীন রায়ের এই বাড়িটি নেবার কারণ, তাঁর স্বাী উন্মাদ। সব সময় চেঁচান এবং তাঁর প্রত্যেকটি কণ্ঠনিঃসৃত শব্দই কণ্ঠভেদী। তাঁকে নিয়ে লোকালয়ে কোথাও শান্তিতে থাকবার উপায় নেই। প্রতিবেশীদের আপত্তি হয়। তাই যতীনবাবু কলকাতার বাইরে একখানা নিরী-বিল বাড়ি খুঁজছিলেন। লখনৌতে মনোরমা দেবীকে নিয়ে টেকা অসম্ভব।

কিন্তু এটি যে ভূতের বাড়ি তা তিনি কি করে জানবেন? যখন জানলেন, তখন ছ মাসের ভাড়া আগ্রহ দেওয়া হয়ে গেছে এবং এ বাড়িতে এসে ওঠা হয়েছে।

একজন লোক নতুন ভাড়াটে দেখে তাঁকে অযাচিত ভাবে জানিয়ে গেল কথাটা। “মশায় করেছেন কি? এমন বাড়ি ভাড়া নিলেন? এ যে ভূতের বাড়ি!”

যতীনবাবুর মুখে কথা নেই। অনেক রূপ স্তম্ভিতবৎ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন “সত্যি কলছেন?”

লোকটি যত রকমে সম্ভব যতীনবাবুর মনে বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করল এবং বেটুকু বাকি রইল অন্য লোক পাঠিয়ে সেটুকু পূরণ করল।

যতীনবাবু বিপদ গন্যেন, কিন্তু বাড়ির কাউকে কিছু জানানেন না। ভাবলেন যদি মিথ্যা হয়, আগেই কেন সবাইকে ভয় পাওয়াই। কিন্তু লোক দুটি শপথ করে বলে গেছে, তাই এ বাড়ির দুজন ভূতের-ভয়ে-মরা লোককে ঘাড় বয়ে নিয়ে গেছে শ্মশানে, আরও যারা ঘাড় দিয়েছিল তাদেরও দরকার হ’লে পাঠাতে পারে।

যতীনবাবু বলেছিলেন, “না তা আর দরকার হবে না।”

।। দুই ।।

মনোরমার জন্য বরাবরই পৃথক ঘর, এখানেও সেই ব্যবস্থা হল। তবে এমন একটি ঘর নেওয়া হ’ল যার ঠিক সামনেই আর একখানা ঘর, যাতে রাতে ঐ ঘরে যতীনবাবু লুকিয়ে স্বাক্ষর পাহারা দিতে পারেন।

ছেলে জ্যোতিষ ও মেয়ে মিনু—তাদের প্রত্যেকের ঘর আলাদা এবং তাদের মায়ের ঘর থেকে অনেক দূরে। ছেলোট সাদ্য এম-এ পাস। তার একটি ভাল চাকরির চেষ্টা করতে হবে কলকাতায়, এবং মেয়েটিরও বিয়ের চেষ্টা। কলকাতা আসার এও অন্যতম উদ্দেশ্য।

স্নাত এগারোটার যতীনবাবু এলেন তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটিতে। সে ঘর অন্ধকার। বাইরে চারদিকেই অনেক ফাঁকা জমি, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। অনেক গাছ লাগানো হয়েছে, সেগুলো বড় হয়নি এখনও। কিছু ফাঁকা, কিছু বাগান। তাই জায়গাটা বড়ই নির্জন বোধ হয়। ভূতের পক্ষে আদর্শ বাড়ি।

ভূত রাত বারোটায় আসে, তাই তিনি তার কিছু আগেই এসেছেন। তাঁ ভিন্ন মনটাকেও তাঁর করতে হবে। সাহস এবং শক্তি দুই-ই তাঁর আছে, কিন্তু তবু ভূত তো, তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে তা তাঁর জানা নেই। ভূত সম্ভবত তাঁর স্বাীর ঘরেই আগে আসবে, কারণ ঐ ঘরটোতেই আলো জলছে। তাঁর ঘরেও আসতে পারে, কিন্তু আলো থাকতে অন্ধকার তার পছন্দ হবে কি না কে জানে। শব্দ মনের জেরে এতখানি বদুকি নেওয়া।

রেডিসাম ডায়ালের হাতবাড়িটি দেখে নিলেন। ইতিমধ্যে এক ঘটা কখন যে কেটে গেছে। শব্দ সময় সম্মুখত। তার-

পূর জননিষ্ঠ অন্তরকারে ঝাঁপিয়ে পড়া। ভাবতেও সমস্ত গায়ে কাঁটা গাঁজিয়ে যাচ্ছে।

প্রীতমকাল। বাইরের আকাশে তখন ঝড়ের সংকেত। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকচ্ছে আর গুরু গুরু গর্জন। মেঘ রুদ্ধে ঘনিয়ে আসছে। উত্তর-পশ্চিম আকাশে, জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রেশ। এ পথেই হয়তো ভূতের অভিসার ঘটবে।

ঝড় উঠে এলো। আর তারই পাশাপাশি আরও একটা সৌ সৌ শব্দ। তীরের বেগে একটি ছায়া মর্মিত এসে নামল বারান্দায়। বিদ্যুতের আলোয় চকিতের জন্য দেখা গেল তাকে। সুন্দর চেহারা, সেন মেঘের একটি দূত। কিংবা সেন রোমক পুরাণের দেবতা মারকুয়ারি। যতীনবাবুর নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। সে যে দিক থেকে এসেছে, সে দিকে সে ভীতভাবে একবার তাকাল, তারপর কি সব বলতে বলতে এগোতে লাগল ঘরের আলোর দিকে। কি বলছে বোঝা গেল না, কিন্তু সেগুলো সবই বাংলা কথা। যতীনবাবু বুঝলেন, বাঙালীভূত।

ভূত এগিয়ে এলো মনোরমার ঘরের সামনে। যতীনবাবুর গা ঘামছে। ইতিমধ্যে বাইরে ঝড় উঠে এসেছে, বৃষ্টিও তার সঙ্গে। বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে তাঁর পিঠে। কিন্তু এক সেক্টিমিটার নড়বার উপায় নেই, তাঁর সমস্ত শক্তি লুপ্ত। চোখ বুজে আছেন, আর কাঁপতে কাঁপতে চকিতে চোখ খুলে এক একবার ভূতকে দেখছেন। তিনি একটি অসোচ্চ অপরিহার্য পরিণামের অপেক্ষা করছেন নিশ্বাস বন্ধ করে। মনে হচ্ছে যেন ভূত এইবার তার মারণক্রিয়া আরম্ভ করবে। কিছুই তো করবার নেই এখন, চেঁচাতে গেলে ভূত আরও ক্ষেপে যেতে পারে। আর চেঁচাতে চাইলেও গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবে না। তিনি বোকায় মতো চেয়ে রইলেন ভূতের দিকে।

এর শব্দেতে পেলেন, ভূত আপন মনে বকে চলেছে। ফ্রয়েড! ফ্রয়েড কি করবে? আর না?—আপন মনেই বকতে বকতে। হঠাৎ মনোরমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

যতীনবাবুর অবস্থা অবর্ণনীয়। তাঁর চিন্তাশক্তিও আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ভিজ্জে জামায় জমে বসে আছেন একই—জারগায়। মাঝে মাঝে চকিতে চোখ খুলেছেন এবং ভূতের শেষ মারটির জন্য অপেক্ষা করছেন। তারপর হঠাৎ চমকে উঠে শব্দলেন ভূত চিংকার করে উঠল স্কিক্সোফ্রেনিয়া! ঝড়ের শব্দের সঙ্গে সে চিংকার বিগুনে বাঁধস লেনিলা।

যতীনবাবুর দৃষ্টি ব্যাপসা। কি যে দেখছেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

তবু অনুমানে বুঝতে পারলেন ভূত মনোরমার সামনে গিয়ে বসল। এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল ভূত স্কিক্সোফ্রেনিয়া! বলে চিংকার করছে। তাঁর কোতাহল অদম্য হয়ে উঠল এতক্ষণে। তবে কি এটি কোনো ডাক্তারের ভূত? কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করবেন? কে যেন তাঁর সকল শক্তি হরণ করে নিয়েছে। রাত একটা, বাইরে ঝড়-বৃষ্টি, ভিতরে ভূত, আর পাগল স্ত্রী।

তিনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। মনে ক্লান্ত আরও বেশি। আর কিছু ভাবতে পারছেন না। শব্দ দেখছেন। দেখছেন ভূত মনোরমার সঙ্গে কথা বলছে।

মনোরমা। “তুমি কে? পৃথিবী কতটুকু?”

ভূত। “তিন হাজার ছেলে। সমস্ত গাছ। ভালবাসা মহৎ। সাইকোঅ্যানালিসিস।”

মনোরমা। “তুমি হাসতে পার?”

ভূত। “আকাশে শব্দ তারা। জানি না। শব্দ অপমান। অপমান। অপমান। সব কাটাকাটি। সাইকোঅ্যানালিসিস।”

এই জাতীয় আলাপ। বাইরেও ঝড়ের প্রলাপ।

ভূতের স্কিক্সোফ্রেনিয়া? মানে, সেও পাগল? এ কি রহস্য! দুজনের একই অসুখ, একই সব লক্ষণ। প্রথম রাগিটা তা হলে নিরাপদেই কাটল, তা হলে খুব অনিষ্ট বোধ হয় করবে না ভূত। কিন্তু এ সব কথা আপাতত কাউকে বলা হবে না।

বাইরের লোকেরা যতীনবাবুকে জীবন্ত দেখে অবাক হয়েছে এবং এসে নানা রকম জেরা করেছে কিন্তু যতীনবাবু বলেছেন, “কৈ ভূত তো দেখিনি।”

শব্দে সবাই হতশ হয়ে ফিরে গেছে। বার বার লোক এসেছে জানতে, সবাই ভাবছে যতীনবাবু তাদের ঠকাচ্ছেন।

।।তিন।।

এরপর থেকে প্রতি রাতেই ভূতের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। যতীনবাবু দিনে ঘুমোন, রাতে সেই ঘরটিতে গিয়ে পাহারা দেন। প্রতি রাতে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। ভূতের ইতিহাসে এমন কখনও শোনা যায় নি, ভূতেরও যে মাথা খারাপ হতে পারে এ কথাও তাঁর জানা ছিল না। তাই তিনি মনে মনে স্থির করলেন, এর পরিণাম না দেখে কাউকে কিছু বলবেন

না। ছেলেমেয়েরাও এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারল না।

কিন্তু, অশুভ এক ব্যাপার। যত দিন যায় তত দেখেন মনোরমার মধ্যে একটা স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটছে এবং ভূতের মধ্যেও। সুতরাং ভূতকে আর শব্দপক্ষ ভাবা বা তাকে কোনো বাধা দেওয়ার কথাই আর ওঠে না।

আরও কয়েকদিন পরে দেখা গেল ওদের দুজনের কথা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। দুজনেরই কথার একটা মোটামুটি অর্থ হয়, দুজনেরই চোখের দৃষ্টি অনেকটা স্বাভাবিক, আগের মতো অতর্কিত উদাস নয়। তবু কোথায় যেন একটুখানি বাধা। ওদের মনের আকাশে সূর্য উঠেছে কিন্তু কুয়াসা এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নি। মনে আশা জাগে।

যতীনবাবু একটা আরামের দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন সেই অন্তরকার ঘরে বসে। তাঁর নিজের ঘাড় থেকেই যেন একটা ভূত নেমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

এবং এখনও তিনি এ বিষয়ে কাউকে একটি কথা বললেন না। স্ত্রীকেও না। ঘটনা যেমন চলছিল তেমন চলতে লাগল। কিন্তু পরদিন অর্থাৎ এক মাসের মাথায় আরও একটি প্রচণ্ড বিপদ্য তাঁর জন্য অপেক্ষা করে ছিল।

সে দিন যতীনবাবু যথাসময়ে তালোত প্রফুল্ল মনে ভূতের অপেক্ষা করছিলেন। ভাবছিলেন আরও কয়েকদিন পরে ভূতকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং তাঁর অভ্যর্থনার জন্য একটা গোপন অনুষ্ঠানও করবেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে। তার মতো বন্ধকে তিনি ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরবেন।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, তাকে শেষ পর্যন্ত শাল্য বলতে হ'ল।

মনোরমা এখন দিনের বেলা স্বাভাবিকভাবে কাটান, কিন্তু কথা খুবই কম বলেন। মাত্র একটা কি

মনসা চট্টোপাধ্যায়ের

নতুন উপন্যাস

লগ্ন-মধুর

ঘটনার বৈচিত্র্যে অপরূপ

মূল্য—দুই টাকা

কথা ভারতী

১৭, সুভাষ পল্লী, বনহুগলী,
কলিকাতা-৩৫

দুটো। বড় অবসর দেখায় তাঁকে।
যমোন খুব বেশি। রায়ে ডেকে ভুলে
খাওয়াতে হয়। যতীনবাবুর ভয় হয়
এমন অবস্থায় ভূতের সঙ্গে বেশিক্ষণ
থাকলে আবার অবস্থা খারাপের দিকে
না যায়।

কিন্তু তাঁর ধারণা সত্য নয়।
মনোরমা তাঁর সেই নির্দিষ্ট ঘরটিতে
ঘুমিয়ে ছিলেন, যতীনবাবু বিপরীত
ঘরে যথারীতি পাহারা দিচ্ছিলেন। ভূত
তার নির্দিষ্ট সময়ে এসে পড়ল। আসবার
সময় কেমন একটা সোঁ সোঁ শব্দ হ'ল,

রোজই হয়। মনোরমা সঙ্গে সঙ্গে জেগে
উঠলেন। মনের সঙ্গে মনের কিভাবে
এই জাতীয় যোগাযোগ ঘটে যতীনবাবু
ভাবতে লাগলেন। যে ঘুম সহজে ভাঙে
না, গারে ধাকা মেয়ে ভাঙাতে হয়, সে
ঘুম ভূতের আবির্ভাবে আপনা থেকেই

সুপ্রিয়া চৌধুরীর সৌন্দর্যের গোপন কথা...

‘লাক্সের মধুর পরশ আত্মায় সুন্দর রাখে’

কীপসী সুপ্রিয়া চৌধুরীর স্নিগ্ধ রমণীয়
রূপ, সবার মুক্ত দৃষ্টির জিহ্বাসা! আর
বিশুদ্ধ, কোমল লাক্সের মধুর পরশে
তাঁর বিশ্বাস। লাক্স আপনার রূপেরও
গোপন কথা হোক! লাক্স মধুর...
লাক্সের কুসুম কোমল ফেনার পরশে
চেহারায় নতুন লাবণ্য আনবে!
সুবাসভরা লাক্সের মধুর গন্ধ আপনার
চমৎকার লাগবে! লাক্সের রামধনু
রঙের বিচিত্র মেলা থেকে মনের মতো
রঙ বেছে নিন। আপনার প্রিয়
সাদ্যাটিও পাবেন। লাবণ্যশ্রীর
জন্য লাক্স ব্যবহার করুন।

চিত্রতারকাদের বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য-সাবান



সুপ্রিয়া চৌধুরী বলেন - ‘সাবানাটিও চমৎকার, আর রঙগুলোও কত সুন্দর!’

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরি

LTS. 110-X52 BO

ভেঙে গেল! মনোরমা জেগে উঠেই ভূতকে দেখে আনন্দে চোঁচিয়ে উঠলেন—‘অবনী!’ ভূত চোঁচিয়ে উঠল—‘দিদি!’

যতীনবাবু আবার স্তম্ভিত। তিনি দেখতে লাগলেন ওরা দুজনে দুজনকে এতদিন পরে চিনতে পারল, আজ যেন ওদের মাঝখানে যে একটি আড়াল ছিল সেটি ঘুচে গেছে। ওদের মধ্যে যে ভাই-বোনের সম্পর্ক তা যতীনবাবু জানতেন না, অবনী নামক ভূতের মানবিক রূপ তিনি আগে দেখেন নি, কারণ তাঁর বিয়ের আগেই অবনীর মৃত্যু হয়। যতীনবাবু, বৃদ্ধিতে পারলেন ওদের দুজনেরই মাথা আজ সম্পূর্ণ সুস্থ, মনের আকাশ থেকে কুয়াসা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে, সেখানে এখন নির্মল রোদের হাসি।

দুজনের উল্লাস চলল অনেকক্ষণ। কিন্তু মনোরমার মন্থখানা হঠাৎ খুব বিষন্ন হয়ে উঠল। তাঁর চোখে জল। ভূতকে, মানে, অবনীকে বললেন, “কিন্তু তুমি তো বেঁচে নেই!”

“তাতে আর কি হয়েছে দিদি। তুমি তো জান আমার মাথা খারাপ হওয়াতে আমি আত্মহত্যা করেছিলাম। অবশ্য ভূত হওয়ার পরেও সেটা বৃদ্ধিতে পারিনি, আজ কদিন হ’ল একটু একটু মনে পড়ছে। কিন্তু এখন আমি কত ফ্রী! তা ছাড়া মাথাও তো ভাল হয়ে গেল।”

“কিন্তু তুমি আগের চেয়ে অনেক বড় হয়েছিস এখন। ভূতেরাও কি বয়সে বাড়ে? বড়ো হয়? এবং শেষে মারা যায়?”

“আমি তো সে সব জানি না। এতদিন মাথা খারাপ ছিল, এখন সব জানতে পারব, এবং তোমাকে জানিয়ে যাব। কিন্তু ভূত হয়ে কি কম শাস্তি পেরিয়েছি? আজ তেইশ চব্বিশ বছর ভূতের রাজ্যে কেবল ছুটে বেড়াচ্ছি। সব স্পষ্ট মনে পড়ে না, তবু বড় বড় কয়েকটা কথা মনে পড়ে। দিদি, তুমি শুনলে অবাক হবে ভূত সমাজেও অনেক পাগল আছে, কিন্তু আমার নতুন ধরনের পাগলামি দেখে এক বিজ্ঞানী ভূত আমাকে তাড়া করে ফিরছেন এতদিন ধরে। তাঁর নাম ফ্রয়েড। তিনি আমাকে দেখলেই বলেন ‘তোমার সাইকোঅ্যানালিসিস করব, মনঃসমীক্ষা করব।’ আমার তখন মাথা একেবারে খারাপ, তাই তাকে দেখলেই আমার খুব ভয় হত, মনে হত তিনি আমাকে ধরে বেঁধে

চিকিৎসা চালাবেন আমার উপর। আজ এখন মনে হচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভাল ছিল।”

মনোরমা বললেন, “তাঁর তাড়ায় ছুটে এ বাড়িতে না এলে আমাদের তো দেখাই হত না।”

সে কথা ঠিক। আমি প্রাণ ভয়ে আশ্রয় খুঁজে বেড়াতাম। অনেক বাড়িই পরীক্ষা করেছি। কিন্তু দেখি সব বাড়িতেই দু একটা করে ভূত আছে। যেটার নেই সে বাড়ি আবার আমার পছন্দ নয়। অনেক ঘুরে এই বাড়িটা



“তুমিই তো তাড়ালে গাল দিয়ে।”

পেয়ে গেলাম, দেখলাম খালি আছে, মানে ভূত নেই। এটুকু জ্ঞান আমার ছিল যে পাগলের সঙ্গে অন্য ভূত থাকতে রাজি হবে না। মানুষ থাকলেও বস্তু অসুবিধা হয়। তাই এই বাড়িটা দখল করতে চেয়েছিলাম মানুষ তাড়িয়ে দিয়ে। সে জন্য তাদের বলতে হত, ‘এ বাড়ি আমার।’ কিন্তু দিদি, তোমাকে দেখে মাথা খারাপ অবস্থায় চিনতে না পারলেও ভিতরে ভিতরে কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল।”

যতীনবাবু এর পর আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। যখন বললেন আর কোনো ভয় নেই তখন অন্ধকার থেকে উৎসাহের সঙ্গে বোঁরয়ে এসেই ভূতকে সম্বোধন করলেন “ওরে শালা ভূত, তুমি আমাদের উচ্ছেদ করতে এসে এখন ধরা পড়ে গিয়েছ” বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হাসতে লাগলেন। এতদিনের রুদ্ধ ভাবাবেগ তিনি মুক্ত করলেন হো হো-র ভিতর দিয়ে।

তারপর চেয়ে দেখেন ভূত মিলিয়ে গেছে।

মনোরমা তিরস্কারের সুরে বললেন, “তুমিই তো তাড়ালে গাল দিয়ে।”

“গাল দেব কেন, আমি তো শূন্য সম্পদের উল্লেখ করছি।”—বললেন অপ্রস্তুত যতীনবাবু।

এর পর থেকে দিন ভালই কাটতে লাগল। ভূত এখন আর নিয়মিত আসে না, মাঝে মাঝে আসে এবং পরিবারের সবাই মিলে একর বসে আলাপ করে। প্রথম দিকে যতীনবাবুর ছেলে এবং মেয়ে—জ্যোতিষ এবং বন্দনা—ভূত মামার সামনে আসতে রাজি হয়নি, কিন্তু পরিবারের এতবড় উপকারী বন্ধু হিসাবে

তাকে সবাই মিলে আদর আপ্যায়ন না করলে সে হবে কৃতঘ্নতা, তাই ভূত এখনই আসে (এবং রাত বারোটা না হ’লে আসে না), তখনই ছেলেমেয়েদেরও ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়া হয়।

ভূতরাজ্যের অনেক কথা জানা যায় তার কাছে থেকে। ফ্রয়েডের ভূত এখন আর তাকে চিকিৎসার জন্য তাড়া করে না, এখন ফ্রয়েড ভূতই অবনী-ভূতের মাথা কি করে ভাল হ’ল তা জেরা করে করে জেনে নেন, এবং খাতায় নোট করে রাখেন। বলেন, ‘দুজন স্কিকজোফ্রেনিয়ার রোগী একর মিলতেই দুজনেরই মাথা ভাল হ’ল, এ নিয়ে গবেষণা করলে ভূত-সমাজের মস্ত উপকার করা হবে। দুটি জগতের মধ্যে যোগসূত্রটি কি, সেটাও আবিষ্কার করা দরকার।’

যতীনবাবু এ সব শুনে ভাবতে থাকেন। এইভাবেই চলতে থাকে ওদের নতুন পর্যায়ের জীবনধারা, পারিবারিক ভূতের সঙ্গে।

॥ চার ॥

“বাবা, তুমি সেই থেকে আজ পর্যন্ত বসলেই না গল্প শুনতে।

তোমার কি হয়েছে। আমাকে সব খুলে বল।”

দিনেশ গাঙ্গুলি কনকপ্রভার কথায় একটু আরামই বোধ করলেন। মনের কথা এ রকম ভাবে মনে মনে রেখে তাঁর বড়ই অস্বস্তি হচ্ছিল। কিছু অন্তত প্রকাশ করলে হয় তো মনটা হাল্কা হতেও পারে। বললেন, “এক প্রভাতের হাতে পড়েছি, মা।”

“সে আবার কি? সব খুলে বল।”

দিনেশ গাঙ্গুলি কনকপ্রভাকে সব কথাই খুলে বললেন। তাঁর ধারণা তাঁর এ ভাড়াটে যতীন রায় ভূতসিদ্ধ; সেই ৬ বাড়িতে ভূত পাঠিয়ে দুজন ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করেছে, এবং নিজে এসে দুজন উপ-ভাড়াটেকে সাবলোট করে সুখে বাস করছে। কনককুঞ্জ খালি পড়ে ছিল বেশ ছিল, তাতে একটা সাম্রাজ্য ছিল, কিন্তু এখন কোনো সাম্রাজ্য নেই। কনককুঞ্জের সেই দুর্দান্ত জ্যোতিষ ভূতটা গেল কোথায়? জীবনে এতবড় ধাম্পার সম্মুখীন তিনি কখনও হননি। তাঁর এখন ক্রমেই ধারণা হচ্ছে যতীনবাবু সমস্ত জেনেশুনে ও-বাড়ি নিয়েছে, সে ভূত বশ করার কৌশল জানে।

দিনেশ গাঙ্গুলি মেয়ের কাছে নিজের মনের কথা কিছুই গোপন করলেন না। এবং যতীন রায়ের নাম উল্লেখের সময় তাঁর প্রতি কোনো সম্মান দেখানো প্রয়োজন মনে করলেন না।

কনকপ্রভা কিন্তু সব শুনে খুব উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। “বাবা, তুমি আমার হাতে সব ছেড়ে দাও, এ রহস্য আমি ভেদ করে দেব। আমি দেখাব আমার ডিটেকটিভ গল্প পড়া সার্থক হয়েছে। আমি তোমার বাড়ি ঠিক উদ্ধার করে দেব, তুমি কিছু ভেবো না। এ কথা আগে বলতে হয়। ভূতের রহস্যও আমি ভেদ করে দেব।”

মেয়ের বুদ্ধির উপর দিনেশ গাঙ্গুলির খুব শ্রদ্ধা নেই। সে গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, সে নিশ্চয় বড় গোয়েন্দাদের সমগোত্রের মনে করে নিজেকে। তবু তিনি বললেন, “আমি যখন বুঝতে পারছি না কিছু, তখন আর আপত্তি কি? এত গোয়েন্দা বই পড়েছি, তুই হয় তো পারবি। পারলে বড় রকমের পুরস্কার দেব।”

বললেন বটে, কিন্তু তা নিতান্তই ঝোঁকের মাথাম। মেয়েদের বুদ্ধির উপর তাঁর কোনো দিনই ভরসা নেই। কনকপ্রভার বইপড়া বিদ্যা যতই থাক, হাতে-কলমে ও কি করবে? কিন্তু ধরেছে যখন তখন তিনি আর আপত্তি করতে পারলেন না। বরং উৎসাহই দিলেন। এবং সেই সঙ্গে নিজে যথারীতি উকিলাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। যতীন

রায়কে উচ্ছেদ করা চাইই যেমন করে হোক—

কিন্তু দিনেশ গাঙ্গুলির যত বুদ্ধিই থাক, একটি বিষয়ে তিনি ভুল করলেন। অর্থাৎ তিনি নিজের মেয়ের বুদ্ধির উপরে ভরসা না করে ভুল করলেন। অবশ্য এ ভুলের দরুন যে ক্ষতি হতে পারত, সে ক্ষতির হাত থেকে কনকপ্রভার বুদ্ধিই তাঁকে বাঁচিয়ে দিল।

II পাঠ II

ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত।

কনকপ্রভা যতীনবাবুর পরিবারের সঙ্গে কৌশলে পরিচিত হয়েছে, নিজের পরিচয়টি গোপন রেখে। রোজ যাচ্ছে সেখানে, এবং কোনো কথাই তার বাবাকে বলছে না এখন। এবং তিনিও মেয়ের গোয়েন্দাগিরির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন।

কনকপ্রভার ক্ষমতা আছে বটে। সে সামান্য কয়েক দিনের আলাপেই যতীনবাবুদের আত্মীয়ের মতো হয়ে উঠেছে। এইবার তার কথা বাঁধ করার পালা।

সে প্রত্যেকটি ধাপ এগোয় আর একটু করে ভেবে নেয় শারলক হোমস হলে এ অবস্থায় কি করতেন। খুব বিধার সঙ্গে অথচ অত্যন্ত আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে সে। বাড়ি উদ্ধার তাকে করতেই হবে, এবং প্রমাণ করে ছাড়বে যে উকিলের বুদ্ধির চেয়ে ডিটেকটিভের বুদ্ধি বেশি।

অল্পদিনের মধ্যেই সে ভূতের তথ্যও জেনে ফেলল এবং একদিন তার বাবার বিশেষ অনুমতি নিয়ে এবং কোনো বিপদ হবে না গ্যারান্টি দিয়ে কনককুঞ্জে রাত একটা পর্যন্ত রইল এবং অবনী-ভূতের সঙ্গে আলাপ করল। তার বাবাকে অবশ্য ভূতের কথা এখনও কিছু সে জানায়নি, জানাবার ইচ্ছাও তার হয়নি নানা কারণে, এবং সবগুণি কারণই বৈধ।

তার গাড়ি কনককুঞ্জ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, তার অনুসন্ধান কাজ শেষ হ'লে সে একাই ফিরে আসে। বেশি রাতে অবশ্য সে একদিনই গিয়েছিল সেখানে।

যতীনবাবুর কাছ থেকেই সে বেশির ভাগ তথ্য জেনেছে। ভূতের বিষয়ে যা কিছু আলাপ সবই তার যতীনবাবুর সঙ্গে। যতীনবাবুর পুত্র জ্যোতিষের সঙ্গেও সে বহু বিষয়ে আলাপ করেছে, তবে ভূতের বিষয়ে কম, ভবিষ্যতের বিষয়ে বেশি। কোন ডিটেকটিভ বড় তা নিয়ে তর্কও হয়েছে অনেক বার। শারলক হোমস, শোয়ারো, ফাদার ব্রাউন, ডব্লিউ থনডাইক—এদের তুলনামূলক বিচার হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কনক-

প্রভা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে প্রত্যেকের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য মেলালে তবে একটা আদর্শ ডিটেকটিভ তৈরি হতে পারে।

অর্থাৎ এ বিষয়ে সে জ্যোতিষের কাছে হার স্বীকার করল, এবং তার সাফল্যের মূলেও রয়েছে এই হার স্বীকারের ব্যাপারটি।

একটি মাস কেটে গেছে। কনকপ্রভার কর্মোদ্যম অনেকগুণ বেড়ে গেছে। তার বাবাও বসে নেই।

এখন কনকপ্রভার সামনে দুটি পাখী, হাতে একটি মাত্র ঢিল। দুটি পাখী এক ঢিলে মারার বিদ্যাও তার অধিগত।

অবশেষে ঢিল নিক্ষেপিত হল।

তারপর একদিন যখন রাইরে থেকে এসেই দেখে তার বাবা উচ্ছেদের মামলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কনকপ্রভা ঠিক সেই মুহূর্তে তার বাবার দুখানা হাত ধরে বলল, “বাবা, তুমি করছ কি? তুমি মোকদ্দমা করতে চলেছ? না বাবা, এ সব কিছুই করতে হবে না, বাড়ি আমি উদ্ধার করছি, সেখানে ভূতের চিহ্ন নেই আর, সব ব্যবস্থা পাকা, বাড়ির যাবতীয় ভাড়াটের টাকা এখন আমার। আমি এইমাত্র রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে ফিরছি। বলেছিলাম না, আমার হাতে সব ছাড়তে?”

ঠিক এই মুহূর্তে নাটকীয় ভঙ্গিতে এক যুবক এসে দাঁড়াল সেখানে। কনকপ্রভা দিনেশ গাঙ্গুলিকে দেখিয়ে তাকে বলল, “ইনি আমার বাবা।” যুবক দিনেশ গাঙ্গুলিকে প্রণাম করল।

দিনেশ গাঙ্গুলির মুখে কথা নেই। কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না।

কনক বলল, ইনি তোমার কনককুঞ্জের ভাড়াটে যতীনবাবু রায়ের ছেলে—নাম জ্যোতিষনাথ রায়—বর্তমানে আমার স্বামী। এখন বুঝতে পারছ বাবা?”

দিনেশ গাঙ্গুলির দুখানা পা ১০১৬-০৫ কিলোগ্রাম ভারী বোম্ব হতে লাগল, আর জিভ ৩৭-৩২৪২ কিলোগ্রাম। তিনি নড়তেও পারলেন না, একাট কথাও বলতে পারলে না, গলা থেকে শুধু একটুখানি ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ বেরুলো। তাঁর পা দুখানা থর থর করে কাঁপছে।

কনকপ্রভা বলল, “বাবা সব বুঝিয়ে বললেই বুঝতে পারবে—চল”—বলে তাঁর দুখানা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ভিতরে। গিয়ে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ছুটে গেল মাকে ডাকতে।

জ্যোতিষ নিষেধের মতো সেই-খানেই দাঁড়িয়ে রইল।

রাশিয়ার জয়েরা

দ্রবোই কুমার মাস্তাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। আঠারো ।।

আকাশের বহু তারকা আজও দৃশ্যমান হয়নি এবং আলোর এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেই সব তারকাদলের খবর আগেই দিয়ে রেখেছেন। সোভিয়েট রিপাবলিক পূর্বে ছিল বোলটি, এখন কেরেলিয়-ফিনিস অঞ্চল খাসমহল রাশিয়ার মধ্যে আসার ফলে—পনেরোটি দাঁড়িয়েছে! একই রিপাবলিকের মধ্যে কয়েকক্ষেত্রে ভাগ আছে অনেক। সেগুলির কোথাও নাম হয়েছে 'অটো-নামাস রিপাবলিক' কোথাও 'রিজিয়ন', কোথাও বা 'ন্যাশনাল এরিয়া'। এককালে খোদ রুশজাতি রাশিয়াতে ছিল সংখ্যালঘু, কিন্তু আজ রাশিয়ান ফেডারেটেড রিপাবলিকের 'রাষ্ট্রীয়' সীমানা পশ্চিমে, দক্ষিণে এবং দূরপ্রাচ্যের দিকে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে বর্তমানে রুশ নাগরিকের সংখ্যা অপর জাতি অপেক্ষা বেশি। সোভিয়েট ইউনিয়নের ৮৫ জাতির স্বাভাব্য ও সংস্কৃতি পৃথক, এবং ১০০টির বেশি পৃথক পৃথক ভাষা—এদের মধ্যে ৫২টি মাত্র রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু ও'রা বলছেন, এখনও অগণিত উপজাতি ও বিভিন্নভাষী সম্প্রদায় চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে, যারা 'ন্যাশনাল এরিয়ার' মধ্যে দানা বাঁধবে এবং ক্রমশ তাদেরকে স্বীকার করে নেওয়া হবে! অর্থাৎ অদৃশ্য তারকার সংখ্যা এখনও অনেক। বহুলোকের ধারণা, পৃথিবীর এই বৃহত্তম ভূভাগকে প্রশাসনিক আয়ত্তের মধ্যে আনবার যে-মূল পরিকল্পনা,—মহামতি লেনিন সেটি আমেরিকান ব্যবস্থাপনা থেকে কতকটা গ্রহণ করেছিলেন! লেনিনের 'মাক্টর-প্ল্যানের' মধ্যে যে দূরদর্শিতা ছিল, সেটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং আর্থিক। তিনি এই শতাধিক 'অনেককে' একটি অতি সুদক্ষ অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রীয় যোগসূত্রে বেঁধে রাখার পদ্ধতি রেখে গেছেন। আমাদের দেশে সম্প্রতি 'নাগাল্যান্ড' সম্বন্ধে যে 'স্কটিস প্যাটার্নটির' কথা শোনা যাচ্ছে, সেটি অনেকটা এই প্রকার।

ইউরোপীয় রাশিয়া অপেক্ষা এশিয়া-টিক রাশিয়া অনেক বড়। এশিয়াটিক অংশটা পূর্ব ও পশ্চিমে—ওখটস্ক সাগর থেকে কাশ্যপ সাগর—এত বৃহৎ ও সর্ব-গ্রাসী যার পরিমাপ করা কঠিন। এই ভূভাগের যে-অঞ্চলটার নাম 'খাকুট', সেটির মূল নাম 'যক্ষকুট' কিনা জানিনে, কিন্তু শব্দমাত্র এই দূরপ্রাচ্যের অঞ্চলটির আয়তন হল ১১ লক্ষ বর্গমাইল। এই 'খাকুট' অটোনামি ফেডারেটেড রাশিয়ার অন্তর্গত এবং এ-অঞ্চল স্বর্ণ ও হীরকের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার ভূরপৃষ্ঠ দুস্তর, অতিশয় জনবিরল ও বসবাসহীন। যাকুটের মধ্যমলোক বিদীর্ণ করে বৈকাল-হ্রদ-উদ্ভূত 'লেনা' নদ চলে গিয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে মেরুসাগরের দিকে। এই নদের উপকূলবর্তী যে প্রাচীন 'খাকুটস্ক' জনপদ ছিল, সেটি এখন আধুনিক নগর হয়ে উঠেছে, এবং যে বৃহৎ ভূভাগে মাত্র ৫ লক্ষ তুর্কীয় আদিম জাতি আজও বাস করে, তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়! প্রাচীন যাকুটস্কের উপান্তে একদা লেনিন তাঁর স্বল্পকাল-ব্যাপী নির্বাসনকালে তাঁর সহকর্মচারিনী এবং সহনির্বাসিতা স্ত্রীমতী নাদেজদা ক্রুপস্কায়াকে বিবাহ করেন। জনশ্রুতি এই, সেস্ট পিটার্সবার্গে অবস্থানকালীন বিপ্লব প্রচারকার্যের যুগে তাঁরা উভয়ে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পরবর্তীকালে এই বিপ্লব-বাদিনী সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা লেনিনের আদর্শ সহধর্মিণী হয়েছিলেন। তাঁদের সন্তানাদি ছিল না। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'পুরুষের বংশ প্রায়ই লোপ পায়। সে যাই হোক, সেকালের রুশ সাম্রাজ্য ভাঙলো ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, এবং তার তোড়জোড় সম্পূর্ণ আলগা হয়ে গেল অল্পকালের মধ্যে। এই খণ্ডিত, পরস্পর অসম্পৃক্ত, বিক্ষিপ্ত—রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে বিরাট একটি নতুন এবং পৃথক 'জগতের' অতি বিচিত্র পরি-কল্পনা রূপায়িত করার আনুপূর্বিক কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন লেনিন। বোধ হয় এইটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্যই সে-কালের 'আইভান-দ-টেরিবল্'-এর পর একালের ঐতিহাসিকরা 'স্টালিন-দ-রুখলেস'কে মনে রাখবে।

আমি যখনই কোনও সোভিয়েট বন্ধুর মুখের উপর তাঁদের দেশের সূচন্যটি করতে গেছি, তাঁরা ঈষৎ নিরুৎসাহের সঙ্গে শুনেছেন। ভাবখানা এই, আপনার সূচন্যটি আগাগোড়া মানতে পারাছিনে, কেননা এখনও আমাদের অনেক কাজ বাকি। কথটা মিথ্যে নয়। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি—এদেরকে আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখা সহজ। এসব দেশে যানবাহন-সুযোগ-সুবিধা অজস্র। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট বাসস্থান, অনায়াসলভ্য আহাৰ্য—এগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম অংশে ভাল। কিন্তু যেটি পূর্বাংশ, যেটি বৃহত্তর—যেটির নাম প্রাচ্যখণ্ড, সেখানে আজও লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল ভূভাগে আদিমকালের যানবাহন ছাড়া অন্য গতি নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরু কিছুকাল আগে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ বর্তমানে গরুর গাড়ির যুগ থেকে বাইসাইকেলের যুগে এসেছে! কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিকাংশ প্রাচ্য ভূভাগ যোড়াতানা খোলাবাক্সের যুগ থেকে সাইকেলের যুগে এসে পৌঁছেছে কিনা, সেই খোঁজ হয়ত তিনি রাখেননি। সুপ্রসিদ্ধ সোভিয়েট লেখক মিঃ এন-এন-ব্যারানস্কি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেও যেটুকু বলেছেন, তাতে বুঝতে পারা যায়, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অপেক্ষা সোভিয়েট প্রাচ্যখণ্ডে যথেষ্ট উন্নত নয়! সোভিয়েট ইউনিয়নে এখনও বহু শহর আছে যেখানে হয়ত মোটর ট্রাক পৌঁছেছে, কিন্তু গাড়ির সংখ্যা একবারেই কম। গরুর গাড়ি সোভিয়েট ইউনিয়নে নেই। কিন্তু ঘোড়ার গাড়িরা দূর থেকে দূরে মাঠের ধুলো উড়িয়ে চলেছে—এটি পরিচিত দৃশ্য। মস্কোর মতো বড় বড় শহরের আশেপাশে শহরতলীতে এমন বহু পথ-ঘাট আছে যেখানে ধুলো। এবং কাদা বাঁচবার জন্য প্যাট এবং ঘাগরার ঝুলে দুই হাতে ভুলে ধরে যেতে হয়,—জুতো জোড়টার অবস্থা যাই হোক না কেন!

কিন্তু বিষয় লাগে এদের 'দানবীয়' অখাবসার লক্ষ্য করে। দুর্গমকে সুগম

ক'রে তোলবার এমন সর্বব্যাপী চেষ্টা আর কোন দেশে আছে আমি জানিনে। প্রতিদিনের এমন অক্লান্ত সংগ্রাম, এমন অদম্য পরিশ্রম এবং অশ্রান্ত উদ্দীপনা—এমন ক'রে দেখতে বাকি ছিল বৈকি। সাইবেরিয়ার যে সকল বদনাম চিরদিন ধরে ছিল, সেগুলি আজ ঘুচতে বসেছে। আগামী পঁচিশ বছরের কাজের পর সাইবেরিয়া প্ৰবৃত্তীয় ইউরোপ হয়ে উঠবে, এই কথাটি পশ্চিম ইউরোপেই শোনা যাচ্ছে। ভল্গা বা উরল নদের কথা এখন পূরনো। মানুষের মুখে মুখে ফিরছে এখন অব, এনিস, লেনা, ইতীশ, আলদান, আমুর, আংগারা—এই সব নদী। পাহাড়ের পর পাহাড় কেটে নদীকে ঘোরানো হচ্ছে; নদী ও খালকে মচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অনুর্বর ও নিরুজ্জ্বল ভূভাগে; হাজার হাজার বর্গমাইলব্যাপী চিরমধ্যমী পাথরের 'চাটানযুক্ত' ভূভাগ থেকে পাথর এবং গ্লেসিয়ারের কঠিন দেহকে উপড়ে ফেলে মাটি বার করা হচ্ছে; কৃষ্ণ অরণ্য সৃষ্টি ক'রে মেঘদলের দিকে আমন্ত্রণ পাঠানো চলছে। দক্ষিণ সাইবেরিয়ার প্রত্যেকটি পূর্বোক্ত বৃহৎ নদী—যেগুলি গঙ্গা-গোদাবরী-শতদ্রু-সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষাও বড়,—সেগুলিকে ধরে-বধে আজ মোট ১১টি বৃহৎ জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। সাইবেরিয়া এখন আর সেই প্রাচীন সাইবেরিয়া নেই! সব-গুলি একসঙ্গে ধরলে এখন মোট ৯০টি জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। বিগত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লেনিন-প্রবর্তিত যে 'গোয়েলারো' বিদ্যুৎ-পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তার ফলে পাওয়া যায় মোট ৫০ কোটি কিলোয়াট শক্তি। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে সেটি হয়ে ওঠে ৩২,০০০ কোটি, এবং সাইবেরিয়ার অঞ্চলেই সেটি দাঁড়ায় ১৫০০০ কোটি। ছোট এবং বড় নদী নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রবাহিত হয় মোট ১ লক্ষ ৮ হাজার জলধারা। এদের মধ্যে বৃহৎ নদীর সংখ্যা মোট ১৫০০। এগুলির অধিকাংশই প্রাচ্যখন্ডে। বর্তমান শতাব্দীর সভ্যতার ইতিহাসে পৃথিবীর যেখানে যত গঠন-নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল সাইবেরিয়ার নব্যবিস্কৃত সুবৃহৎ ভূখণ্ড—এতে সন্দেহ নেই! আবিস্কারের এখনও অনেক বাকি। কিন্তু আবিস্কার যেটুকু হয়েছে, তাতে কেবল-শুধু কয়লার হিসাব পাওয়া গেছে

১,৩০,০০০ কোটি টন। ষষ্ঠ-বার্ষিক পরিকল্পনায় শব্দ 'কুজনেৎস্ক' অববাহিকায় যে পরিমাণ সস্তা কয়লা পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি বহন করার জন্য দরকার হয়েছে দৈনিক ৫৫ খানা রেলগাড়ি।

এগুলি অবিশ্বাস্য সত্য। কিন্তু এইগুলির জন্যই সম্ভবত সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীজোড়া সম্পূর্ণ শান্তি এবং সর্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণ চাইছে। ওদের সময় নেই। যুদ্ধের কথা ওরা ভাবতেই চায় না। ওরা দেশের সকল অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ পথে অপরিমেয় 'যথের ধনের' সম্বল পেয়েছে। কিন্তু সেসব ভোগ করার মতো জনসংখ্যা ওদের দেশে নেই। এই কারণেই একদিন এক রুশ বন্ধু হাসি মুখে আমাকে বলেছিলেন, আপনাদের দেশে 'রেকর্ডজি' পুনর্বাসন নিয়ে এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে,—বেশ ত, দিননা আমাদের দেশে পাঁচ-দশ লাখ পরিবারকে পাঠিয়ে! বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে! সোসালিজমের সর্বশেষ ব্যাখ্যা হল, রাষ্ট্র-সীমানার অবলুপ্তি!

কিন্তু জাতি-বৈশিষ্ট্য? কালচার? বিশেষ বিশেষ সভ্যতার ডিস্টিকশন?

বন্ধুটি হেসেছিলেন। বলেছিলেন, হ্যাঁ, সব নিয়ে পৃথিবীব্যাপী একই বৃহৎ মানবপরিবার! প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই এক একটি অলঙ্কার! সব 'অনৈক্য' এক একটি নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে মিলছে একই 'মহামানবের সাগরতীরে!' সোস্যালিজম বলছে সেই বিশাল মানব-সংহতির কথা।

কথাটি শ্রুতিমধুর!

সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তরে, দক্ষিণে এবং পূর্বে এমন অগণিত সংখ্যক ছোট বড় জনপদ রয়েছে,—যেগুলিতে পৌঁছবার জন্য কোনও পথঘাট বা 'এপ্রোচ' এখনও নেই। নেনেৎস, কোমি, যামালো, তাইসিব, চুচটস্ক, আমুর, কারা-কলপক, কারাকুম ইত্যাদি ভূভাগে অসংখ্য নতুন জনপদ আগে থেকেই রয়েছে, অথবা নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে,—কিন্তু সেসব অঞ্চলে চাকাযুক্ত গাড়ি আজও পৌঁছয়নি! মাঝখানে কোথাও দিকচিহ্নহীন তুষার ক্ষেত্র, দর্ভেদা 'তুন্দ্রা'লোক, 'তাইগার' গহন অরণ্যগাণী, অনুর্বর ধূসর শস্যজলাহীন এবং মানব-শূন্য ও পশুকালপারিকণী বিন্ধীর্ণ অঞ্চল। কোথাও ভীষণ মরুলোক, দুস্তর নগ্নপাথরের পাহাড়, কোথাও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বীভৎসা রূপ।

সুতরাং এইসব জনপদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় বিমানের সাহায্যে! উত্তরে সুমেরুলোক, পূর্বে কিউরাইল, স্যাখালিন, কামস্কাটকা, দক্ষিণে কাজাখ-স্তান পেরিয়ে মধ্যএশিয়ার নিচে পামীর, এবং পশ্চিমে কৃষ্ণসাগরের অপর প্রান্তে অবধি—এই সুবিন্ধীর্ণ 'পৃথিবী' এখন বিমানের সাহায্যে করায়ত্ত। এইজন্য সমগ্র পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা সোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ বিমানপথের পরিমাণ ও সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। মালপত্র, ডাক ও প্যাসেঞ্জার বহনের অবিশ্রান্ত কাজে পৃথিবীর অপর কোনও দেশে এত অধিক সংখ্যক বিমান ব্যবহার করা হয় না। বিমান দুর্ঘটনা সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বাপেক্ষা কম বলে শুনেনি! চোখে দেখছি যে কোনও মাতের কাদায়, ধুলোয়, পাথর-কাঁকরে, এবড়ো-থেবড়ো ময়দানে, অসমতল প্রান্তরে, জলাবিলের আশেপাশে—সোভিয়েট বিমান যখন-তখন নামাওটা করছে।

'কোদি' শব্দটির রুশ অর্থ আমার জানা নেই। কিন্তু ভারত বা পাকিস্তানে এলে ও-দুটি অক্ষরের অর্থ মিলতে দেঁরি হয় না। 'কো'-অক্ষরটির অর্থ পাহাড়। যেমন কো-মারী, বা মারী পাহাড়। 'অদি'-র অর্থ সবাই জানে। যেমন, হিমাদ্রি। এই 'কোদি' অঞ্চল নিয়েই পশ্চিম সোভিয়েটের একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, যার নাম হল 'মল্‌দাভিয়ান রিপাবলিক'। এর একদিকে কার্পাথ-য়ানের কোদি, এবং অন্যদিকে বোলাই-নিয়ার কোদি-মালভূমি। ফলে গরম প্রচুর, এবং শীতের হাওয়া কম। মল্‌দাভিয়ার পশ্চিমে রুমানিয়া এবং পূর্বে, উত্তরে ও দক্ষিণে উক্ৰাইন। এই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াটির দরুণ মল্‌দাভিয়ার ফসলাদির প্রাচুর্য প্রসিদ্ধ। মল্‌দাভিয়ার রাজধানী 'কিশিনেভ' যেন একটি বৃহৎ পটভূমিতে আঁকা মালভূমির উপরে অবস্থিত আধুনিক নগর। সমগ্র মল্‌দাভিয়ার মৃত্তিকার বর্ণ হল ঘন কৃষ্ণ। এই রাষ্ট্রের উত্তরে 'বেলগি স্টেপ' এবং দক্ষিণে 'বুদজাক স্টেপ'—এ দুটি অঞ্চল শস্যরিক্ত এবং অনুর্বর। সোভিয়েট ইউনিয়নে এমন বহু ভূভাগ আছে যাদের বহু নিম্নস্তর অবধি নিরস ধূলো-কাঁকর ছাড়া মৃত্তিকার কোনও চিহ্ন নেই! প্রাণোচ্ছলতা ও দয়াহীনতা—এ দুটি যেন পাশাপাশি।

ইউনিয়নের পশ্চিমে উক্ৰাইনের পর বাইলো-রাশিয়ার ভূভাগের আয়তন

সর্বাপেক্ষা বেশি। এই বাইলো-রাশিয়া রাষ্ট্রের পশ্চিম সীমান্ত নগরী 'ব্রেস্ট' বিত্তীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে নাৎসী-বাহিনীর দ্বারা প্রথম আক্রান্ত হয়। পোল্যান্ড তার আগেই হিটলারের পায়ের তলায় দলিত! ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন এবং ২২শে জুনের মাঝখানের মধ্যরাত্রে যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন অত্যন্ত আক্রান্ত হয়, ব্রেস্ট দুর্গ এবং নগরীতে তখন নাচ, গান, ভোজ, আমোদ-আহ্লাদ এবং সামাজিকতা চলছিল। এই ঘটনার প্রায় দু'বছর আগে জার্মানী ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটি 'অনাক্রমণ ও বন্ধুত্ব' চুক্তি হয়েছিল, যেটির চেহারা ছিল 'খাঁড়া আর কুমড়ার' মধ্যকার বন্ধুত্বের! ফলে, বিশ্ববাসীর মনে একটি চমক এবং ইউরোপ-আমেরিকায় একটি আতঙ্ক দেখা দেয়। কিন্তু এই সাময়িক বন্ধুত্ব-স্থাপনের সুযোগে, যতদূর মনে পড়ে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাদের রাষ্ট্রীয় সীমানাটিকে পোল্যান্ড এবং পূর্ব ইউরোপে কিছু কিছু প্রসারিত করতে থাকেন। সম্ভবতঃ এই কারণে অর্থাৎ পরিশ্রমলব্ধ ফললাভের উপরে সোভিয়েট ইউনিয়নের 'অন্যায়' অধিকার বিস্তারের আয়োজন দেখে হিটলার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন! সে যাই হোক, ব্রেস্ট দুর্গের সেনাবাহিনী এবং নগরের জনতা নাৎসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে যে জীবনপণ সংগ্রাম করতে করতে তলিয়ে যান, সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসটি সম্প্রতি রচনা করেছেন একজন রুশ লেখক মিঃ স্মিরনভ তাঁর "Heroes of the Brest Fortress" গ্রন্থে। সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁদের দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নামকরণ করেছেন "Great Patriotic War." সোভিয়েট জনগণের এই মরণপণ যুদ্ধকে দেশপ্রেমিকগণের উন্মত্ত সংগ্রাম বলে মিঃ স্মিরনভ যেভাবে মানুষের অতিমানবিক সংগ্রামের কাহিনীটিকে বর্ণনা করেছেন সেটি বিশেষ মনোজ্ঞ হয়েছে।

বাইলো-রাশিয়ার ভাগ্য বহুকাল থেকেই বিভীষিত ছিল। ইতিহাসের এক এক পর্বে এই অরক্ষিত রাষ্ট্র বারম্বার মার খেয়ে এসেছে জার্মানী, সুইডেন, পোল্যান্ড এবং ফ্রান্সের হাতে। এছাড়া দক্ষিণ থেকে তরবার হস্তে বার বার রক্তচক্ষে ছুটে এসেছে ক্রাইমিয়ার দস্যু তাতারের দল! তারা খান খান করে

কেটেছে দেশ, জাতি ও সমাজকে। রক্তে ভেসেছে দেশ, দুর্ভিক্ষে মরেছে অগণ্য, এবং তারই উপরে দাঁড়িয়ে এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে নানা জাতি। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোল্যান্ড যখন স্বাধাভিভূত হল, বাইলো-রাশিয়া এসে ঢুকল রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাইলো-রাশিয়ার পশ্চিম অংশ গিয়ে পড়ে আবার পোল্যান্ডের মধ্যে। অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে, অর্থাৎ হিটলারের কাছে পোল্যান্ডের পরাজয়ের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্ভবতঃ ঈষৎ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাইলো-রাশিয়ার পশ্চিম ভূভাগ নিজেদের অধিকারে টেনে নেন। সেই দুর্দিনের মধ্যে পোল্যান্ডের মধ্যে প্রতিবাদ ফোটেন। বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে সোভিয়েট ইউনিয়ন একদিকে যেমন সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আপন রাষ্ট্রসীমানাকে সে সর্বাপেক্ষা মজবুত করে তুলেছে! এটি স্পষ্ট, যতদিন পৃথিবীতে যুদ্ধের আশঙ্কা বলবৎ থাকবে ততদিন সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের চারপাঁচটি রাষ্ট্রের উপর তার রাজনীতিক 'প্রভাব প্রভুত্ব' কোনমতেই ত্যাগ করবে না। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের হাংগারীর ব্যাপারে তার বদনাম রটেছে অনেক, কিন্তু আত্মরক্ষার মূল প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে সে পূর্ব ইউরোপের স্বকীয়তাবাদকে আর বিশ্বাস করবে না! 'আরশোলাকে' সে আর 'পাখি' হয়ে উড়তে দেবে না! সোভিয়েট

ইউনিয়ন হল 'ঘরপোড়া গরু', সিঁদুরে মেঘ দেখলেই সে ডরায়! সমস্ত ইউরোপের মধ্যে পশ্চিম জার্মানি হল তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অবিশ্বাসের ক্ষেত্র। ওখানে হিটলারের চিতাভস্মের অন্তঃপরমাণু ছড়িয়ে রয়েছে।

বালটিক ইউনিয়নের তিনটি রাষ্ট্র এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার তিনটি রাজধানী তালিন, রিগা ও ভিলনিয়াস; এ ছাড়া কালিনিনগ্রাড—বাইলো-রাশিয়ার রাজধানী মিনস্ক এবং পশ্চিমে তার দুটি প্রসিদ্ধ নগর ব্রেস্ট ও গ্রুদনো; উক্রাইনের উজগোরদ, দ্রোগোবিচ লভো, লুটস্ক এবং রাজধানী কিয়ভ; এবং মলদাভিয়ার রাজধানী কিশিনেভ ও ইজ্‌মাইল,—এই সুবিশাল এক একটি নগর এবং এদের সবাইকে কেন্দ্র করে বিরাট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সর্বপ্রকারে দুর্ভেদ্য ও অপরায়েয় করে রেখেছে!

কিয়ভ থেকে সোজা দক্ষিণে রেলপথ চলে এসেছে উক্রাইনের শেষ প্রান্তে কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে—সেখানে সর্বাপেক্ষা প্রধান বন্দর 'অডেসা'। এটি শূন্য বন্দর নয়, এটি প্রখ্যাত শিল্পনগরী এবং সাহিত্য, ললিতকলা ও অন্যান্য সংস্কৃতির পীঠস্থান। এককালে রুশ লেখকদের পক্ষে ছিল এই নগরী একটি প্রধান ও আনন্দলাভের ক্ষেত্র। শিল্পী, সংগীতবিদ, গায়ক, অভিনেতা, কবি ও উপন্যাসিক—এবং সকল সমাজের সৌখীন সম্প্রদায় এখানে এসে বাসা নিতেন। কলাবিদ

জ্বালা খাঁর

নয়নী ও রাজনীতি

রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে একটি দেশ বিধ্বস্ত হয়ে গেল, একটি জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতি নিশ্চিত দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, সংখ্যাগত নয়নীর অশ্রুসজল ইতিহাস রচিত হ'ল স্বাধীন ভারতবর্ষে।

বাংলায় সমস্যা প্রসঙ্গে জ্বালা খাঁর মত বাক-বৈদগ্ধ এবং মননবৃদ্ধ রচনা বাংলা সাহিত্যে এর আগে আর ছিল না।

দাম : ৫.০০

আনন্দ পাবলিশাস

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মহলের কেউ অডেসায় না এলে এককালে সবাই তাকে জাতে তৈলত। এখানে সমুদ্র-সৈকতের শোভা অতি মনোরম। এখানকার সাগরের উপকূলবর্তী রাজপথে অগণিত সংখ্যক পুরনো আমলের অট্টালিকা এককালে রাজারাজড়া এবং সম্রাটের পরিষদ-মহল ও ভূস্বামীদের সম্পত্তি ছিল। বিশেষ আইনের বলে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁদের হাত থেকে এগুলি দখল করে নেন। এগুলি এখন জনসাধারণ হাওয়া-মহল স্বরূপ ব্যবহার করে। জনসাধারণ মানেই 'রবোচি',—অর্থাৎ কর্মী। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি কর্মী বছরে একমাস করে বেতনসহ ছুটি পায়। সেই ছুটি নিয়ে তারা যে কোনও রাষ্ট্রের অন্তর্গত স্বাস্থ্যাবাসে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারে,—যানবাহনের খরচ নেই। একমাসের মধ্যে ৬ দিন বাদ দিতে হয় যাতায়াতের এবং গোছগাছের জন্য। বাকি ২৪ দিন তারা যে রাজকীয় অবস্থার মধ্যে বাস করে সেটি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। মাথাপিছু খরচ পড়ে দৈনিক ৫০ রুবল। এর মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ স্টেট থেকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ১২০০ রুবলের মধ্যে ৮৪০ রুবল স্টেট দেন। প্রতিদিন 'পূর্ণভোজ' ৪ বার, প্রত্যবে কফি বা চা বিস্কুট। স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে হলে একটি পৃথক ঘর ও দুটি নিত্য ধোপদস্ত সুকোমল বিছানা। ঘরময় সুসজ্জিত আসবাবপত্র, একটি আধুনিক স্নানাগার, ঘরে রেডিও, টেলিফোন ও টেলিভিশন,

পাইপযোগে ঠান্ডা ও গরম জল, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধপত্রাদি, আমোদ-প্রমোদ ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা। অনেক ছুটি জমিরে দুমাস বা তিনমাসের জন্যও বিদেশে বেরিয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে বা পুরুষ 'রবোচি' একাই হাওয়া বদলাতে যায়। মুচি, মেথর, কামার, ছুতোর, মজুর, মিস্ত্রি, জমাদার, চৌকিদার, হাডি-ডোম, বামুন-বোম্ভম,—এরা সবাই সুসজ্জিত চেহারা ও পোষাকে একাকার! নানা লোকের সঙ্গে নানা সময়ে আলাপ চলছে,—লেখাপড়া জানে সবাই। চেহারা ভদ্র, পোষাক পরিচ্ছন্ন, কথাবার্তা পাশি শরী,—আচরণ সামাজিক, ব্যবহারের বেশ সৌজন্য,—দু' ঘণ্টা আলাপের পর যদি বন্ধুতে পারি এব্যক্তি কসাইখানার 'রবোচি' বা অমুক মেরেটি ব্যাডুদারনি,—তখন আর মনোবিকলনের কথা ওঠে না। শুধু মনে মনে একটু হতচকিত হতে হয়।

অডেসায় ছয় লক্ষ লোকের বাস। এখন অধিকাংশই উক্রাইনীয় ও রুশ, এবং অলপাংশই ইহুদী। ইহুদীদের ইতিহাস হত্যাকাণ্ডেরই ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার-আমলে শত সহস্র ইহুদী মার খেয়ে মরে। 'হাওয়াড ফাশ্টের' কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তবে কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠ ইহুদী কবি সোভিয়েট আমলে স্টালিনের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে মরেছে, নয়ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। নাৎসী আমলে অডেসায় কত সংখ্যক ইহুদী হত্যা হয়েছে তার হিসাব পাইনি। কিন্তু এই অডেসা নগরী হিটলার-বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে অপরাধের বীরত্বের সঙ্গে প্রায় আড়াই মাস লড়াই চালিয়ে 'বীর নগরী'র সন্মান অর্জন করেছিল।

অডেসায় প্রতি বছরে দুই লক্ষ লোক হাওয়া বদলাতে আসে বাইরে থেকে। এখানে স্বাস্থ্যাবাস এবং বিশ্রামবাস মিলিয়ে একশতটি অট্টালিকা সকল সময় মজুত থাকে। এই শহরের অতি সুশ্রী বহু-বহু ও প্রশস্ত পথটির নাম 'প্রিমস্কি' বুলেভার', সেই পথের 'পোটেমকিন' সোপানপথটি' নগরীর ভিতর দিয়ে চলে গেছে বন্দরের প্রান্ত অবধি। এই সোপানপথেরই অদূরে অডেসা নগরীর প্রথম মেয়র রিচেলিউ-এর মনোরম প্রস্তরমূর্তি দণ্ডায়মান। কিছুদূরে রুশ কবি পুশকিনের প্রস্তর প্রতিমূর্তি। এই বন্দর নগরীতে এককালে বাস করে গেছেন পুশকিন, গোগল এবং গোর্কি,—রুশ সাহিত্যের তিনজন দিকপাল। এঁদের তিনজনের নামে অডেসার তিনটি বহু-রাজপথ উৎসর্গ করা। বস্তুত, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রায় প্রত্যেক প্রাসিদ্ধ শহরে ও জনপদে পুশকিন, টলস্টয় এবং বিশেষ করে গোর্কির নামে

স্মৃতিফলক, স্তম্ভ, মূর্তি, লাইব্রেরী, থিয়েটার, অপেরা, সার্কাস, রাজপথ, স্বাস্থ্যাবাস, যাদুঘর, চিত্রশালা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এত বেশি সংখ্যক উৎসর্গীকৃত যে, পর্যটকের মনে সদাসর্বদা একটি বিস্ময় থেকে যায়। আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য জগতের প্রায় সর্বদেশেই নিন্দিত এবং বহুক্ষেত্রে ধিকৃত, কিন্তু আধুনিক সোভিয়েট কত পক্ষ রুশীয় ক্লাসিক সাহিত্যকে যে-সম্মান, সমাদর ও দেশজোড়া শ্রদ্ধা দিয়ে থাকেন, জগৎবাসীর পক্ষে সেটি চমকপ্রদ। কিন্তু শুধু রুশীয় বললে আমার ভুল ঘটবে। উক্রাইন, উজবেক, কাজাখ, তুর্কোমেন, আর্মেনিয় প্রভৃতি সকল রিপাবলিকের লেখকগণকেও তাঁরা প্রচুর পরিমাণে সমাদৃত করেছেন।

অডেসায় ইয়ং পায়োনীয়ার্স প্যালেস এবং সী-মেনস্ ক্লাব—এ দুটি প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে দেখার জিনিস। অডেসার আঞ্চলিক যাদুঘরে বিশ্বতীর বিশ্ববৃক্ষের ঐতিহাসিক দলিলপত্র এবং বহুবিধ উপকরণাদি সংরক্ষিত রয়েছে। নাৎসী-বাহিনীর বিরুদ্ধে অডেসার অধিবাসীরা যে বিক্রম ও বীরত্বের সঙ্গে আপন জন্মভূমিকে রক্ষা করতে চেয়েছিল, তার আনুপূর্ববিক কাহিনীটি এই যাদুঘরে সময়ে রাখা হয়েছে।

"অডেসা" শব্দটি গ্রীক 'অডিসাস' থেকে উদ্ভূত। যোলশত বছর আগে গ্রীকরা এখানে একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করে তার নাম দেয় 'অডিসাস'। বহু শতাব্দী পরে তুরস্কের অধিকার-কালে এই জনপদের আরেকটি নামকরণ করা হয়, 'যোনিদুনিয়া'। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন-দি-গ্রেট 'যোনিদুনিয়াকে' দুনিয়ার কোথাও তিস্তে দেননি! তিনি 'অডিসাস' শব্দটির উপর প্রসাধনসাধন করে নতুন নামটি সমাদরে বাসিয়ে দেন, 'অডেসা'। আকারান্তে স্ত্রীলিঙ্গ। তুরস্কের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন এখানে একটি বহু-দূর্গ নির্মাণ করেন। অডেসার দুটি রূপ আছে। সোভিয়েট অডেসা এবং জার আমলের অডেসা। পুরনো অডেসা দরিদ্র এবং ঘিজি। নানা অঞ্চলে বিস্তি। পথ-ঘাট এবং যানবাহনের চেহারা, পুরনো বাড়িঘরের অবস্থা—এগুলি অপরিচ্ছন্ন। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি-রিপাবলিকের লোক কৃষ্ণাগরের উপকূলকে অতিশয় পছন্দ করে। প্রতি বছরে দুই লক্ষেরও বেশি লোক আসে সমুদ্রতীরবর্তী অডেসায়। যারা আসে তাদের অধিকাংশই সমুদ্রের তীরভূমিস্থ প্রত্যেকটি শহরে এক এক দফায় বেরিয়ে যায় জাহাজযোগে। 'চেজাস'দের মুখে চোখে যে একটি স্বাভাবিক 'হ্যাংল্যামি' পুরী-গোপালপুর-ওয়ালুটেসারে দেখা যায়, কৃষ্ণাগরের

উমানাথ ভট্টাচার্যের উপন্যাস

নরক ৩-৭৫

শিক্ষণ জগত নিয়ে এত স্পষ্ট
কথা এর আগে বলা হয়নি।

নাটক

নীচের মহল (২:৫০)

সুগী (২:২৫) জল (২:৫০)

কথকতা

৩৩সি, নেপাল ভট্টাচার্য লেন,
কলি-২৬।

প্রকাশিত হইল

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জলভরা মেঘ

দাম : ২, টাকা

১লা বৈশাখ বাহির হইতেছে

শক্তিপদ রাজগুরু

পালা বদল

দাম : ২, টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

এস, চক্রবর্তী প্রিন্টার্স

২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

উপকূলেও তার ব্যতিক্রম নেই! তফাৎ শুধু এই, এটি ইউরোপীয় খণ্ড। এখানকার সমুদ্রতীরে ঘাগরা, গাউন বা প্যান্ট খুলতে বাধে না।

অডেসায় মোট সাতটি রংগালয় বর্তমান। এই নগরীর অপেরা এবং ব্যালে চিরদিনই প্রসিদ্ধ। সোভিয়েট ইউনিয়নে যাদের খ্যাতি সর্বাপেক্ষা বেশি—সেই চেকভাষিক রুবেনাষ্টিন, চাচিয়াপিন বা সিবিনভ—তাদের ন্যায় সঙ্গীতকার, গায়ক, শিল্পী প্রভৃতির এককালে এই রংগালয়গুলিতেই দেশবাসীকে তানিয়ে-মর্গিতরে গেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি রংগালয়ের বহু প্রাসাদ, তার বৈভবসজ্জা, তার বিশাল সৌন্দর্য এবং অলংকরণ—যে কোনও রাজপ্রাসাদের দৃশ্যের পাশাপাশি দাঁড়াতে সমর্থ। রংগালয়ের প্রতি মোহ রুশ জাতির চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

অডেসায় যাদুঘরের সংখ্যা অনেক-গুলি। যেটিতে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য শিল্পকলার নিদর্শন ও চিত্রাবলী সংগৃহীত রয়েছে, তাদের মধ্যে ভারতীয় শিল্পকলার সামগ্রীগুলি অতি যত্নে রক্ষিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের বহু যাদুঘরে বহুকাল আগে থেকে ভারতের চারুশিল্প, সূচীশিল্প, রেশমবস্ত্রাদি-শিল্প এবং ললিতকলার বিভিন্ন নিদর্শন বিশেষ সমাদরের সঙ্গে রক্ষা করা আছে।

উক্রাইনের মূল ভূভাগ থেকে ক্রাইমিয়া উপদ্বীপটি একটি সুন্দর সূর্য-যোগে যেন কৃষ্ণসাগরের জলের উপরে ভাসছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর এই মনোরম উপদ্বীপটিকে এর পূর্ব-ব্যবস্থার থেকে সরিয়ে উক্রাইন রিপাবলিকের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। উক্রাইন থেকে দুইটি রেলপথ নেমে এসে পূর্ব ও পশ্চিমে ক্রাইমিয়ার দুটি প্রধান বন্দর 'কার্চ' এবং 'সেবাস্তপোল' মিলেছে। নাৎসীবাহিনীর অবরোধকালে দুই মাসে এই উপদ্বীপে প্রায় ৮০ হাজার ইহুদী, জিপসি এবং অন্যান্য প্রাচ্য জাতিসহ সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে হত্যা করা হয়। ক্রাইমিয়ার ইতিহাস রক্তাক্ত, প্রাচীন ও জটিল।

আড়াই হাজার বছর আগে এখানে যারা আদিবাসী ছিল, তাদেরকে বলা হত বার্বি 'সেলব'। ক্রাইমিয়া তখন 'তারিস' নামে পরিচিত। গ্রীকরা এখানে আসে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, এবং উপনিবেশ গড়ে তোলে। কিন্তু সীজারের আমলে এই উপদ্বীপ রোমক প্রদেশ হয়ে ওঠে। 'জেনোয়ার' অধীনে ক্রাইমিয়া থাকে কমবেশি দুই শতাব্দী। এক হাজার বছর পরে এখানে আসে মুসলমান তাতার। তারা এখানে রাজধানী স্থাপন করে নাম দেয়, 'বার্চিনরাই'। কিন্তু পরবর্তীকালে

‘অনন্য’ ডাইজেস্ট পত্রিকায় মনোনীত
একখানি উচ্চপ্রশংসিত বই, যা এখন প্রত্যেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক পড়ছেন
বাঁচতে সবাই চায় জীবনের সার্থক পরিভূষিত লাভের
একান্ত ঘরোয়া আলোচনা

অসীম বর্ধন ৩-৭৫

আনন্দবাজার : “অনেক চমকপ্রদ তথ্য, মনোরম।”
যুগান্তর : “রিচিত তথ্য, উপন্যাসের চেয়ে আকর্ষণ, বাংলা সাহিত্যে
সুন্দর নয়।”

বসুমতী : “গল্প ছেড়ে পড়তে ইচ্ছে করে, বিচিত্র, আকর্ষণীয়।”

অমৃত : “মূল্যবান চিত্তাকর্ষক, বাংলাভাষার দেখা যায় না, উচ্চাঙ্গের
আকর্ষণীয়।”

দেশ : “বহুরের উল্লেখযোগ্য বই।”

মানসী : “আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণার উৎস।”

ভারতবর্ষ : “বাঁচতে যারা চান তারা এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন।
খুব চমৎকার।”

সমকালীন : “পাঠকমহলে নতুন জীবনদর্শনের পথ দেখাবে। একখানি
অবশ্যপাঠ্য বই।”

প্রচ্ছদপট : “আশ্চর্য, আগাগোড়া সুখপাঠ্য, সুন্দর, উজ্জ্বল।”

জয়ন্তী : “মজলিশি ভঙ্গি, চিন্তা ও গবেষণা... লাভবান হবার আশা আছে।”

স্বাধীনতা : “বাঁচবার জন্য মানুষের করণীয় যা কিছু.....।”

আরও কয়েকখানি মনোরম বই

উপন্যাস : **গাঁয়ের নাম কেয়াপুর** দীপককান্তি দে ৩-০০

বসুমতী : “সুন্দর।” দেশ : “পড়তে ভাল লাগে।”

ঘরে বাইরে : “বলিষ্ঠ ও চিন্তাশীল সৃষ্টি। মনোরম।”

জয়ন্তী : “হাল্কা রেখায় নরম নজর মতো।”

একটি মৃথ তিনটি মন বাসুদেব সাহা ৩-৫০

যুগান্তর : “বৈচিত্র্যময়, অনুপম, স্বল্পবরে লেখা।”

বসুমতী : “মনকে আকৃষ্ট করবে।”

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : “ভালো লিখিয়ে।”

প্রচ্ছদপট : “একেবারে আবিষ্কৃত করে রাখে। কৃতিত্বের পরিচয়।”

জয়ন্তী : “চরিত্রসৃষ্টিতে দখল আছে।” দেশ : “অনিন্দ্যসুন্দর।”

মিলক গ্রাহে মাতুষ অদ্রীশ বর্ধন ৩-০০

আনন্দবাজার : “সার্থক বিজ্ঞানাত্মক কাহিনী। পরম উপভোগ্য।

জল ভাণ বা এচ, জি, ওয়েল্‌স্‌এর সমপর্যায়ভূক্ত নতুন
প্রচেষ্টা। পরম স্বাদু, অতি সুন্দর, চিত্তাকর্ষক, উজ্জ্বল।”

অমৃত : “চাপ্তাল্যকর, সুন্দর।”

রোমাঞ্চ : “সিডাই রুদ্‌শ্বাসী, মৌলিক সায়েন্স ফিক্‌শ্যান। চমকপ্রদ
কল্পকাহিনী, বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করবে।”

জয়ন্তী : “পড়তে ভাল লাগবে। মন আকাশপারে প্যাড়ি জমতে চাইবে।”

স্বাধীনতা : “আশ্চর্য একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী।”

দেশ : “রহস্যময় রোমাঞ্চকর।”

কবিতা : **পত্রলেখা** কামাখ্যাশঙ্কর গুহ ২-৭৫

বসুমতী : “আকর্ষণীয়, রসরঞ্জিত, সুপাঠ্য, সুখপাঠ্য।”

জয়ন্তী : “সম্ভ্রমের উদ্রেক করল।”

তুষার থেকে সাগরে শ্যামলবিহারী সরকার ২-০০

আনন্দবাজার : “আবেগ আছে, পড়তে ভালো লাগে।”

বসুমতী : “ভাব-রূপের সঙ্গে রসের প্রস্রবণে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। কবির
গুণগন্যই পরিচয়। পরিচ্ছন্ন, সুস্বাদু পরিচায়ক।”

জয়ন্তী : “শব্দময়।”

অাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌

মনোরম গ্রন্থের প্রকাশক : পোস্ট বক্স ২৫৩৯ : কলিকাতা ১
(পরিবেশক : রায়চৌধুরী, ৩নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঙ্গ ৯)

তুর্কিরা এসে তাতারদের খাঁ-বংশকে মারধর করে তাড়িয়ে নিজেদের রাজ্যপাট বসায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাড়ে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে ক্রাইমিয়া রাশিয়ার অধীনে আসে। এই উপস্বীপ নাৎসীবাহিনীর অধীনে ছিল প্রায় সাড়ে আট মাস। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্টালিন-এখানকার প্রায় ৪০ হাজার শাসী গ্রীক অধিবাসীকে উচ্ছেদ করে কি এক রহস্যজনক রাজনীতিক কারণে সারা সোভিয়েট ইউনিয়নের সবত্র ফোড়নের মতো ছড়িয়ে দেন। বোধ হয় ভয় ছিল, গ্রীকরা দানা বাঁধলে পরনো কথা উঠতে পারে! যেমন ভারতের ‘ঝাড়খণ্ড’ পার্টির নেতা শ্রীযুক্ত জয়পল সিং একবার রাগ করে বলেছিলেন, “আমরাই এই ভারতের আদিবাসী! আর্থ’রাই বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।” তারাই আমাদের দেশে বসে এতকাল ধরে অন্যায় প্রভুত্ব করছে!” এই কথাগুলির মধ্যে যুক্তি আছে বলেই আশঙ্কা আছে। স্টালিন একথাগুলি বুঝতেন।

বিশ্বযুদ্ধের পর ১৬১৭ বৎসর-কালের মধ্যে ক্রাইমিয়া এখন আবার দাঁড়িয়ে উঠেছে। ক্রাইমিয়ার উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য এখন প্রচুর। আঙ্গুর, লেবু, তামাক, লৌহ-সার, মাছ এবং লবণ তার প্রধান সামগ্রী। উৎকৃষ্ট মদের জন্য ক্রাইমিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্বদিকে প্রসারিত শাখা-উপস্বীপ ‘কার্চ’ ‘আজব’ সাগরের মাছ নিয়ে কারবার করে। উত্তর ভূভাগে ‘পেরেকপ’ নামক ঘোলাটে সামুদ্রিক অঞ্চল লবণের জন্য বিখ্যাত। যেমন ভারতবর্ষের পশ্চিমে ‘কাচ্ছ’ অঞ্চল।

যুদ্ধের কালে সোভিয়েট ইউনিয়নে চারটি নগর ‘বীর নগরীর’ সম্মান লাভ করে—লেনিনগ্রাড, স্টালিনগ্রাড, অডেসা এবং সেবাস্তপল্। এর মধ্যে সম্প্রতি একটি শহরের নাম বদল করা হয়েছে। বিগত নবেম্বর, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে কমিউ-নিষ্ট পার্টির ২২শতম কনগ্রেসে “স্টালিনোচ্ছেদ” (De-Stalinisation) প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পর ‘স্টালিনগ্রাড’ নামটি মুছে দিয়ে “ভলগোগরদ”—এই নামটি দেওয়া হয়। সেবাস্তপল্ নামটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ক্রাইমিয়ার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই বন্দরনগরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে যে যুদ্ধ বাধে, সেই যুদ্ধে টলস্টয় যোগদান করেছিলেন। সেবাস্তপল্-এর নিকটবর্তী ‘বালাক্লাভা’

নামক জনপদে ইংরেজের “Charge of the Light Brigade” ইংরেজ সাহিত্যে প্রখ্যাত। প্রাচীন তাতারদের রাজধানী “বাকিসরাই”—তে খানদের রাজপ্রাসাদ ক্রাইমিয়ার অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। সেই তাতার সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী বিরাট গোষ্ঠী আজও ক্রাইমিয়াতে বর্তমান।

শ্রীমতী অকসানা জেট বিমানযোগে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যে বিমানঘাঁটিতে এসে অবতীর্ণ হলেন, তার নাম ‘সিমফেরোপল্’। এটি মস্কো শহর। কিন্তু এর বিমানঘাঁটি কাঁচা মাটি, ইন্স-পাটকেল ও ঘাসভরা মাঠ—যেখানে ফুটবল খেলা চলে। ‘বান্ ওয়ে’ এখনও প্রস্তুত হয়নি, ‘স্টারোলাল’ চলছে। অদূরে একটি জঙ্গলের আশেপাশে দু’একটি ‘হেলিকপ্টার’ ওঠানামা করছে। চারিদিকে রৌদ্রতপ্ত সেই প্রাচীন পৃথিবী,—যেন মধ্যভারতের একটি সূর্য্যাম ধূলিধূসর অঞ্চল! এক একটি বিমান নামছে উঠছে,—আর ধুলোয় সব অন্ধকার! মনে পড়ে গেল কোচবিহার ও ‘বাগডোগরার’ বিমানঘাঁটি। মনে পড়ছে কাঠমান্ডুর বিমানঘাঁটি। তারা এমনি কাঁচা এবং অন্তিমত ছিল। আমি বসে রইলাম একস্থলে। বেলা দ্বিপ্রহর এখনও হয়নি। শীত নেই।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম পকেটে আমার ‘পেলিকান্’ কলমটি নেই,—পড়ে গেছে কোথাও! অকসানা সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জায়গায় ট্রাক টেলিফোন করলেন। যদি স্থান মেলে, অবশ্যই ফেরৎ পাবো। সোসালিস্ট দেশে লোভ নেই, অকসানা বললেন। সূত্রাং হোটেল, শহরের পথে, বিমানের মধ্যে, গাড়ির ভিতরে—যেখানেই সেটি খুঁজে পাওয়া যাক, সোভিয়েট নাগরিক ওটা ফেরৎ দেবে! কলমটিতে আমার নাম লেখা আছে স্পষ্টাক্ষরে। ‘পেলিকান্’ সোভিয়েট ইউনিয়নে নেই।

কলমটি ফেরৎ আসেনি! অভঃপর অকসানা আমাকে একটি কলম উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সোভিয়েট কলম রড়ই অপদার্থ! ওটায় কাজ চালানো কঠিন ছিল।

‘পল্’ শব্দটি এ তাল্লাতে প্রচলিত। ষ্টাভরোপল, সেবাস্তপল, নিকোপল, সিমফেরোপল্ ইত্যাদি। বিমানঘাঁটির সঙ্গে ‘সিমফেরোপল্’ শহর একাকার। এই শহর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি রেলপথ চলে গেছে সেবাস্তপলে—

একবারে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে; অন্যটি দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড় এবং উপত্যকার ভিতর দিয়ে চলে গেছে ইয়ালতায়—এটিও কৃষ্ণসাগরের উপকূলে গিয়ে পৌঁছেছে। সিমফেরোপল থেকে ইয়ালতা মোটরপথে কমবেশি ১০০ কিলোমিটার।

আমাদের সঙ্গে জুটে গেলেন এক আমেরিকান দম্পতি। স্বামীর বয়স আন্দাজ ৭০ এবং স্ত্রীর বয়স ৬০। নাম, ফ্রেড প্যাটারসন। তাঁদের বাড়ি আমেরিকার অন্তর্গত জর্জিয়ার আটলান্টায়। স্বামীটি “কেয়ার টেকার” ব্যবসায়ী। অর্থাৎ মৃতদেহ বহন করার জন্য যে কফিন-বাক্স দরকার হয়, উনি আপন কারখানায় সেগুলি উৎপাদন করেন! এক সময় বৃন্দ আমাকে বললেন, এসব কারবারে আজকাল লাভ তেমন নেই! আমাদের ওদিকে লোকজন বিশেষ মরতে চায় না।—ভদ্রলোক তাঁর টারিফ্ট-কন্স-সেসনের সঙ্গে রুবল এবং ডলারের বিনিময় হার বুঝতে না পেরে অনেক সময়ে লোকসানের ভয়ে খুঁৎখুঁৎ করতেন, এবং অকসানা তাঁকে বিনিময় হার বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা পেতেন। মিসেস প্যাটারসনের নিজেরও একটি পেন্সিলের কারখানা আছে। সেখানে কি প্রকার পেন্সিল প্রস্তুত হয়, তার নমুনাস্বরূপ তিনি একটি পেন্সিল আমাকে উপহার দিলেন। কলমের অভাবে পেন্সিলটি পেয়ে আমার নোট নেবার সন্নিবিধ হয়ে গেল। চারিদিকের অকূল অপরিচয়ের মধ্যে ভারতীয় একজনকে পেয়ে এই আমেরিকান পর্যটক-দম্পতি অনেকটা যেন ‘মনের মানু’ খুঁজে পেলেন। আমরা একই হোটেলের থাকতুম এবং নীচের তলার ডাইনিং হল—এ এসে একই টেবলে বসতুম। ওঁদের নিজস্ব দোভাষী না থাকার জন্য বিবিধ অসুবিধা ছিল। শ্রীমতী অকসানা আপন কর্তব্যবোধে ওঁদেরকে সাহায্য করবার চেষ্টা পেতেন। বিদায় নেবার দিন মিসেস প্যাটারসন আমাকে বলেছিলেন, অকসানার মতন মেয়েকে দেখে এদেশের মেয়ের সম্বন্ধে আমার ধারণাই বদলে গেল!

প্রায় ঘণ্টা দুই অপেক্ষার পর একথানা বড় গাড়ি এল। এই গাড়িটি নিয়ে আমরা মাঠ, ময়দান, কলকারখানা, বড় বড় গমের গোলা, ধূলিধূসর পথঘাট, নতুন নগর নির্মাণের এলাকা, তুষাদপ্প প্রান্তর এবং পাহাড়তলীর আশপাশ পেরিয়ে যেতে লাগলাম।

উত্তরে বালটিক সমুদ্র এবং দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর—এই দুইয়ের মাঝখানে

কমবেশ এক হাজার মাইল জোড়া সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম-প্রতিরক্ষার বেন বিরাট এক দুর্ভেদ্য দেওয়াল দাঁড়িয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ-সাগরের পশ্চিমে রুম্যানিয়া ও দক্ষিণে তুরস্ক। কাশ্যপ সমুদ্রে যেমন কেরোসিনের জাহাজ চলাচল করে 'বাকু' থেকে 'মাখাচকালি', অস্ত্রাখান ও গুরিয়েভ' এবং দক্ষিণে দুটি পারস্যবন্দর পাহলভি ও বন্দরশেখে, তেমনি কৃষ্ণসাগরের নানা অঞ্চলে, বিশেষ করে কাচ উপস্বীপের দুই পারে, মাছের জাহাজ আনাগোনা করে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য-এশিয়া পারিপ্যন্ত করে যে রসহীন জলহীন এবং মৃত্তিকাহীন কাকির-পাথর-বালু ও ধূলি-রুদ্ধ ভূভাগ চলে এসেছে সুদূর পূর্ব-প্রাচ্যে, যেটাকে বলা হয় 'স্টেপ' (Steppe) বা 'ক্ষুধাত' স্টেপ—তার থেকে ক্রাইমিয়া উপস্বীপও রক্ষা পায়নি! পুরাকালে এই উপস্বীপে বাস করত নানা সভ্যতালেশ-বর্জিত জাতি, তারপরে এখানে তাতাররা এসে অধিকার বিস্তার করে। সকল দলের মধ্যে লড়াই চলে বহুকাল। কিন্তু তাতার জাতি অবশেষে এখানে প্রাধান্য লাভ করে। তাতার রাজ্যপাটের পরে আসে তুর্কিরা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাশিয়ার জার-তুর্কী দলকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ক্রাইমিয়া অধিকার করেন। অতঃপর সন্ধ্যার পারিষদবর্গ, রাজ-পুরুষগণ এবং জমিদার সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্রাইমিয়ার শ্রেষ্ঠ স্থানগুলিতে প্রাসাদ এবং অট্টালিকা নির্মাণ করতে থাকেন। এর প্রায় একশ' বছর পরে রুশ এবং উক্রাইনের জনসাধারণ এসে ক্রাইমিয়ার নানা অঞ্চলে জনপদ গড়ে তোলে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ক্রাইমিয়ার সংগ্রামে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহামতি টলস্টয় একজন সেনানায়ক হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'টেল্‌স্‌ অফ সেবাস্তপল' তার পরিচয়। ক্রাইমিয়ার অধিকাংশ ভূভাগ চিরকাল অনুর্বর রক্ষা ময়দান এবং নিরস অনুচ্চ পাহাড়ের হাড়পাঞ্জরায় ঢাকা। কিন্তু দক্ষিণ ভূভাগে কৃষ্ণসাগরের আশেপাশে যে উপত্যকাগুলি পাওয়া যায়, সেইগুলিতে জনপদ সৃষ্টি হয়েছে একটির পর একটি।

সোভিয়েট আমলে ক্রাইমিয়ার জমিদার ও ধনীগোষ্ঠীকে বিভাঙিত করে তাদের শত সহস্র অট্টালিকা ও প্রাসাদকে জনসাধারণের স্বাস্থ্যসাধার কেন্দ্রে

পরিণত করা হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল দেশ থেকে এখন সকল শ্রেণীর কর্মীরা এই সকল সানাতোরিয়ামে জল হওয়া বদলাতে আসে।

আগুনের বহু ক্ষেতের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটিছিল। একদিকে পাহাড় অন্যদিকে উপত্যকা। এই পর্বত-শ্রেণীর নাম 'আলুস্ত'। মাঝে মাঝে পাহাড়ের এক একটি বাঁকে পাথরের বড় বড় পড়ুল সাজানো, সেগুলি ভাস্কর্যের নিদর্শন। পাহাড়ের আশেপাশে অরণ্যের ছোপ। পথ কোথাও কোথাও সঙ্কট-সঙ্কুল। আমরা অপরহাকালে এক সময় কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী 'ইয়ালতা' শহরে এসে পৌঁছলাম, যার সংকীর্ণ পরিসরের একপাশে পাহাড়, অন্যপাশে সমুদ্র। শহরটি দৈর্ঘ্যে কিছু বড়, প্রস্থে সামান্য।

আমাদের মোটর এসে থামল ইন্টারিস্ট হোটেলের সামনে। হোটেলের নাম, "অরিয়ানদা"। হোটেলের দোতলায় ২৪০নং একটি ঘর আমার জন্য বরাদ্দ ছিল। এত বড় হোটেলের পাশেই একটি গিলি। মৃত্যুমুখি একটি কয়লার ডিপো। সেখানকার চিমনি থেকে উঠছে কয়লার ধোঁয়া। তার পিছনে সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণী। হোটেলের পূর্বদিকে রাজপথ। তারপরেই দিগন্তজোড়া কৃষ্ণসাগর। এখানে এখন বসন্তকাল।

ইয়ালতার সাগরের তীরে 'মেরিন পাকের' পাথরে এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ রয়েছে, "এখানে যত-গুলি প্রাসাদ, অট্টালিকা, উদ্যানবাটি প্রভৃতি আছে, যেগুলি একদা সন্ধ্যা-গণের, রাজগোষ্ঠীর, ধনপতি দলের, জমিদার সম্প্রদায়ের এবং রাজমহারাজা-দলের (Grand-Dukes) সম্পত্তিরূপে পরিচিত ছিল, সেগুলি অতঃপর চাষী ও কর্মীগণ ব্যবহার করবেন।" —লেখাটার তলায় লেনিনের সই! তারিখ —ডিসেম্বর ২১, ১৯২০।

এইরূপ সুবহু সম্পত্তির সংখ্যা কেবলমাত্র ইয়ালতাতেই ১০০-র কিছু বেশি। কিন্তু আমার পক্ষে বিস্ময় এই যে, হাজার হাজার সুসজ্জিত নরনারী ও শিশুমহলে সদাসর্বদা চোখের সামনে দেখাচ্ছিল, তারা খাস ইউরোপীয় ত' বটেই, তাদের আগাগোড়া সমস্ত চালচলন, কথালাপ, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার মন, শিক্ষাদীক্ষা, সমস্তই সম্ভ্রান্ত চেহারায় নড়াচড়া করছে! এরা বৃজ্যোয়া,

—যদি বৃজ্যোয়ার মানে কিছু থাকে! শ্রেষ্ঠ পোষাক, শ্রেষ্ঠ খাদ্যের জন্য ব্যয়োন্মুখতা, শতকরা পঁচিশ জনের হাতে হীরের আংটি, চেহারায় লাবণ্য, সুরুচি ও শিক্ষার দীপ্তি, স্বাস্থ্যশ্রী দেখলে মন-কেমন করে ওঠে,—এরা চাষী-মজুর কোন কালে? চাষী ও মজুর বলতে যে দুশাটা দেখা অভাস, যেটা জানা বস্তু—সেটা চোখে পড়ছে না! চোখে যেটা পড়ছে সেটা ভর ও শিক্ষিত সমাজ—যেটার চোখে মূখে ধনগোরবের আভা দেখতে পাই। অকস্মাত এক সময় বললেন, এখানকার স্থায়ী জনসংখ্যা মাত্র হাজার পঁয়ত্রিশ। কিন্তু পথঘাটে কাতারে কাতারে বাদের দেখছেন তারা বাইরে থেকে এসেছে। তারা চেঞ্জার্স। বছরে তিন লক্ষ চেঞ্জার্স এখানে আসে। আমি যখন প্রশ্ন করলাম, এরা চাষী আর 'মজুর' কিনা, অকস্মাত বললেন, 'লেবার' বলে আমাদের কিছু নেই। সবাই ওয়াকার, 'কর্মী'। পাটির লোক মানে, কর্মী,—তিনি দৈবাৎ মন্ত্রী হতে পারেন! মন্ত্রী হলেও কর্মী!

একদিকে বিরাট পর্বতশ্রেণীর দেওয়াল এবং ঠিক তার নীচেই সমুদ্র—এই দুইয়ের মাঝখানে যেটুকু সামান্য ও দীর্ঘলম্বিত অধিতাকার অবকাশ—সেইটুকুর মধ্যে ইয়ালতার সৈকত-শহর চার ভাগে বিভক্ত। 'আলুপ্কা', 'মিস-হোর', 'সিমিজ', এবং 'গুরজ্জ'। এখানকার 'মাসান্দ্রা' নামক এক মহল্লায় যে উৎকৃষ্ট আগুনের মদ তৈরী হয় সেটি প্রসিদ্ধ। এখানে এককালে কবি ও ঔপন্যাসিক, গায়ক ও অভিনেতা এবং অন্যান্য শিক্ষককর্মীদের মস্ত আড্ডা ছিল। পুরুশকিন, লার্মেন্টভ, নেক্রাসভ, লেসিয়া, টলস্টয়, করোলেনকো, চালিয়াপিন, গোর্কি, মায়াকভস্কি,—এবং যার জন্য সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এই ইয়ালতা,—তিনি হলেন আন্তন চেকভ! এখান থেকে সামান্য দূরে সমুদ্রতটপ্রান্তবর্তী একটি পাহাড়ের মধ্যে অরণ্যবেষ্টিত 'তেসলি' নামক অট্টালিকায় ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। এখানকার 'কাৎসিভেলী' নামক একটি গ্রামের কাছাকাছি যে স্বাস্থ্যাবাসটি দেখতে পাওয়া যায়, তার নামটি যেন চেনা-চেনা,—"গুলাবভাই জলিব"।

স্থানীয় 'মিসহোর' এবং 'গাসপ্রা' নামক দুটি পার্বত্য অঞ্চলের সংগে টলস্টয় এবং গোর্কির নাম বিশেষভাবে সংযুক্ত। ওঁরা দুইজন প্রায় একই কালে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইয়ালতায় আসেন। গোর্কি তখন হলেন যুবা, গরীব, বাউঁড়ুলে, জীবনদর্শী! কাউন্ট টলস্টয় বৃদ্ধ, অশান্ত, ধনাঢ্য, খৃষ্টানধর্মসমাজ- (Holy Synod)-বিভাঙিত, স্বাধীনচিত্ত এবং তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধিৎসু। গোর্কি পায়ে হেঁটে ঘুরছেন দেশ দেশান্তর,—

গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া,—এবং তাঁর চলচুলো নেই! অবশেষে দক্ষিণ উক্রাইন থেকে তিনি আবার পায়ের হেঁটে ‘পেরেকপ’-এর ভিতর দিয়ে দক্ষিণ সমুদ্রপথ ধরলেন। আগে গেলেন সেবা-স্তপল, সেখান থেকে সোজা উত্তর-পূর্বে শাখা-উপশাখা ‘কাচে’, তারপর কিছু দিন রইলেন সমুদ্রস্রবীর মনোরম ‘ফির-দোশিয়ায়’। এখানে ডকে কুলিগারি করলেন তিনি কিছুদিন। অবশেষে ‘মিসহোর’ থেকে ‘গ্রাসপ্রায়’ এসে একটি ঘর ভাড়া নিলেন। তিনি বলেছিলেন, “আমার দরকার টেলিটায়ের সামিধ্য।” এই ‘গ্রাসপ্রাতেই’ টেলিটায় একটি রাড়ি নিয়ে তাঁর সেই আপন সমুদ্র গ্রামের নাম অনুসারেই এটির নাম রেখেছিলেন, “বশনায়্য পলিয়ানা সানাতোরিয়য়”। এই স্বাস্থ্যাবাসের প্রবেশপথে টেলিটায়ের প্রথম আগমনের তারিখ উৎকর্ণি রয়েছে। এই বাগানবাড়ির বারান্দাটি ছিল সাহিত্যভূমি! সবাই এখানে এসে মজলিশ বসাতেন। তাঁদের মধ্যে যারা নিত্যকার অভ্যাগত তাঁরা হলেন, চেকভ, গোর্কি, করোলেনকো এবং কুপারিন। সেই আড্ডার বড়ো টেলিটায়ের ঘরে যুবাব দল ‘পার্ক ঘাটতো’ কম নয়, কিন্তু তার ফলে বৃহত্তর দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে একটির পর একটি শতদল প্রস্ফুটিত হত। টেলিটায় তাঁর আলাপ বা বিশ্রম্ভালাপে ছিলেন চিরতরুণ। বন্ধুসমাজে তিনি ব্যসোচিত গাম্ভীৰ্য রাখতেন না।

‘ইয়ালতা’ শব্দটি গ্রীক ‘ইয়ালতা’। এই নগরীর থেকে বেরিয়ে ‘আলদুস্তা’ পাহাড়ের আশে-পাশে অতি-প্রাচীন সাই-থিয়ান যুগের রাজধানী ‘নিয়াপালিস’-এর ভগ্নাবশেষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ‘কোসকা’ পর্বতের অতি-নিভৃত সানু-দেশে বনময় অঞ্চলে সুপ্রাচীন ‘তোরী’ জাতের কয়েকটি শব্দ কক্ষকা এবং গৃহাসমাধি পাওয়া গেছে। এ-ছাড়া কয়েকটি পাথরের আবাস এবং একটি ক্ষুদ্রাকার দুর্গ খুঁজে বার করা হয়েছে। এখানকার পাহাড়ের কোনটির নাম দেওয়া হয়েছে ঘোড়া, কোনটির বিড়াল, কোনটির বা নাকুজ! একটি বিরাট পাহাড় পড়ে রয়েছে সমুদ্রগর্ভে, মাথাটি রয়েছে উঁচুতে। তার পাশে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে যখন জগৎ-প্রাসিদ্ধ ‘ইয়ালতা কনফারেন্স’ এখানে অনুষ্ঠিত হয়, তার আগেই ‘নাৎসীবাহিনী’ এই নগরটিকে প্রায় ছারখার করে চলে গেছে। এই কনফারেন্সে যোগদান করেন আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, এখনও জীবিত—মিং চাংচিল, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের ডিক্টেটর মিঃ স্টালিন। তাঁরা কোথায়

এসে উঠেছিলেন এবং সম্মেলনের অধিবেশনটি কোথায় সৌদীন বসে—সেটি আমার দেখা দরকার ছিল। অকসানো বললেন, এই সম্মেলন মোট ১৫ দিন ধরে চলে। তিনি আমাকে নিয়ে চললেন সব প্রথমে চাংচিল সাহেবের ‘বাসস্থানে’। ইয়ালতা শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে সমুদ্রসৈকতের সন্নিবর্তে একটি বনময় নিভৃত পাহাড়তলীর কাছে পাওয়া গেল প্রকাশ্য রাজবাড়ির এক তোরণস্বর। কিন্তু তারপরেই একটি গল্প আরম্ভ হল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের পর জনৈক রুশ রাজকুমার এই আলুপকা পর্বতের নীচে তাঁর প্রণয়িনীসহ বিচরণ করতে এসে এই অধিকা প্রদেশটিকে পছন্দ করেন। তাঁর ধনাঢ্য পিতা তখন ইংল্যান্ডের রুশীয় রাজদূত এবং বিশেষ জনপ্রিয়। রাজকুমারের নাম ‘কাউন্ট ভরনজ্জভ’। তিনি প্রথমেই ইংল্যান্ড থেকে ডেকে আনলেন এক কৃষ্টি স্থাপত্যবিদ মিঃ এডওয়ার্ড ব্রোরকে এবং দেখিয়ে দিলেন, এখানকার ৩৫০ বিঘা চেউ-খেলানো পাহাড়তলীতে এমন এক প্রাসাদ নির্মাণ করতে হবে যার চেঁহারা ‘আন্তর্জাতিক’ সংস্কৃতির ছাপ থাকবে। ইংরেজ, রুশ, গ্রীক, রোমক, মদ্র, ইতালিয়ান, জার্মান, ফরাসী,—কারও চিহ্ন বাদ যাবে না। বড় শক্ত কাজ—ভারলেন মিঃ ব্রোর। কিন্তু লোক কই? পাথর কাটবে কে? পাহাড় সরাবে কারা? সমুদ্রকে সায়েস্তা রাখার লোক কই?—কুমার ভরনজ্জভ একটু হাসলেন। সমগ্র রাশিয়ায় তাঁর বহু সংখ্যক এন্টেট, কে না জানে? তিনি সেই সব এন্টেট থেকে ৮০ হাজার ‘দাসানদাস’ (serfs) বা ভূমিদাস আনালেন, কেননা তারা বিনা পারিশ্রমিক এবং বিনা খাই-খরচায় এখানে কাজ করবে। এই প্রাসাদ নির্মাণ করতে লেগেছিল মোট ১৮ বছর। কিন্তু পাথর কাটা ও বহন করার কাজ যথেষ্ট ‘হালকা কাজ’ মনে করে তিনি প্রতি বছর ৬ হাজার দাসী ‘কিনে’ আনতেন। প্রাসাদের একদিকে সোপান-শ্রেণী এক এক পর্যায়ে নেমে গিয়েছে কক্ষসাগরের ঘাটে—মোট ৩টি স্তরের দুই দিকে ৬টি বিভিন্ন অভিব্যস্তির ‘সিহ্ন’ আসান। প্রাসাদের তিন দিকে বিশাল মাল্লা-কাননে মোট ২০০ রকমের বৃক্ষ-চারা জগতের বিভিন্ন দেশ থেকে আনা। ভূমধ্যসাগরের দুই-পারের দেশ থেকে এসেছে বিভিন্ন গাছ। মেক্সিকো, লেবানন, ইতালি, ইংল্যান্ড, স্পেন—কোনও দেশ বাদ যায়নি। এই প্রাসাদে প্রবেশ করার কালে মনে হল, ‘তাজমহলের’ প্রথম গেটটির মধ্যে প্রবেশ করলুম, অথবা ঠিক যেন দিল্লী দুর্গের নহবৎখানার নীচেকার প্রবেশপথ। তারপরে আরম্ভ হল মর-সভার নিদর্শন, এবং ক্লাসিক গ্রীক ডাম্পকলার এক-একটি প্রতিমূর্তি।

ইউরিপাইডিস, সফ্রোটস, এস্কুলাপিয়াস, ডিমসথেনিস ইত্যাদি। চারিদিক ঘিরে জগৎবরণ্য প্রাচীন শিল্পীগণের আঁকা রঙীন চিত্রশালা, এবং কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে, নীচে থেকে উপর পর্যন্ত যে সকল বিলাস-বৈভবসজ্জা নিঃশব্দ দেখে যাচ্ছিলুম,—সেগুলি যেন দিব্যবসনের মতো একটা অবাস্তব রূপলোকের ছায়া ও কামা। মাঝে মাঝে ‘মিনারেট’ খিলান ও পাথরের জাপরির দিকে চেয়ে এবং রেশমীশিল্পে বোনা তুর্ক-মূর্তি লক্ষ্য করে ভারতীয় স্থাপত্যের কথা ভাবছিলাম। ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর “Crimean Etudes” নামক গ্রন্থে এই রাজবাড়ি এবং ‘আলুপকা পাক’ সম্বন্ধে বিশেষ মনোজ্ঞ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। রুশবরণ্য কবি মায়াকভস্কি এখানে তাঁর “Krym” কাব্য রচনা করেন। এই প্রাসাদ এখন যাদুঘরে পরিণত। ওখান থেকে সৌদীন বেরিয়ে এক ঘটি খাবার জল পেলে খুশী হতুম!

ফিরবার পথে একটি প্রাসাদ পাওয়া গেল, যেটি প্রায় সমুদ্রের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। এই সুদৃশ্য প্রাসাদটির নাম ‘সোয়ালোজ নেস্ট’, অর্থাৎ পাখীর বাসা! কোন্ কোন্ পাখী কবে এখানে বাসা বেঁধেছিল, সেটি শোনবার জন্য সমুদ্রতটবর্তী এক বাগানের বারান্দা ‘ক্যাপটেনস্ কণারে’ দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালুম। অতঃপর ওই ফিরবার পথেই পাওয়া গেল ‘সিমিজ’ প্রাসাদ—যেখানে স্টালিন ছিলেন কয়দিনের জন্য। ওটির চারিদিকে এখন একটি জনপদ গড়ে উঠেছে। প্রাসাদটি এখন শিশুদের স্বাস্থ্যাবাসে পরিণত।

সোভিয়েট ইউনিয়নে যিনি আজও সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও প্রসিদ্ধ বন্ধু, এবং যিনি স্মৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে সোভিয়েট ইউনিয়নকে বহু দুর্দিনের বহু দুর্দশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বহু উপকরণাদি সরবরাহ করেছিলেন, সেই পরলোকগত মহৎ-প্রাণ প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট যে-প্রাসাদটিতে ১৫ দিন যাবৎ বাস করেছিলেন, সেটি সমুদ্রসৈকতের ঠিক উপরে বিশাল বিস্তৃত গ্লিভাডিয়া প্রাসাদ। এটি আধুনিক-কালের, অর্থাৎ সম্রাট স্মৃতীয় নিকোলাসের অতিপ্রিয় রাজবাড়ি। এর বহুব্যাপী বিস্তার, এর কাননকুললোক, এর আহারাদির স্থান ও বৈভবসজ্জা,—সবই রাজকীয়। এরই ভিতরের বিরাট একটি কক্ষে সম্মেলন বসেছিল। এই প্রাসাদটি, দুইতলা, এবং এটি সম্রাটের নিজস্ব প্রাসাদ ছিল বলেই সমুদ্রের দূর-দূরান্তের থেকে চোখে পড়ে! এখন এখানে ৭০০ স্বাস্থ্যকামী কর্মী নিয়মিত পালানুগে বসবাস করে। এই প্রাসাদের বাগানে কয়েকটি কলাগাছ ও ডুমুরগাছ দেখেছিলাম। রাঙ্গা রাঙ্গা ডুমুর দেখেছি বটে, কিন্তু কলাগাছে

‘কাঁদ’ পড়তে ওরা কেউ কখনও দেখেনি!

একশ বছর আগে ইয়ালতার যে চেহারা ছিল, সেটি আমাদের পশ্চিম-বঙ্গের ‘দিয়া’র অনুরূপ। সমুদ্র আছে, স্বাস্থ্য আছে, সৌন্দর্য আছে—কিন্তু সুযোগ-সুবিধা নেই। না উপযুক্ত যান-বাহন, না বসবাসের সুব্যবস্থা, না বা শহর-বাজারের উপকরণাদি। ইয়ালতার এই ‘আদিম’ অবস্থার প্রথম প্রতিকার হয় যখন রেলপথ নেমে আসে উল্কাইন থেকে সিমফেরোপলে, এবং সেখান থেকে ‘আলুস্টা’ নামক একটি গ্রামের গা ঘেঁষে প্রশস্ত পার্বত্য-পথে মোটর চলে আসে সোজা ইয়ালতায়,—আন্দাজ ৭০ মাইল পথ। সিমফেরোপল নগরটি এখন যান-বাহনের প্রধান-কেন্দ্র। ‘আলুস্টা’ জন-পদটি যেমন ষষ্ঠ শতাব্দীতে ‘বাইজান-টাইন’ সভ্যতার আমলে সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি তুর্কি আমলে ক্রাইমিয়ার রাজধানী সিমফেরোপল-এরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখন এর তুর্কি নাম ছিল, ‘আল-মেচেং’।

ইয়ালতার উন্নতি আরম্ভ হয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে রেলপথ ও মোটর-পথের কুপায়। পরপরায় যখন শোনা গেল, ক্রাইমিয়া উপদ্বীপ একটি স্বাস্থ্যান্ধারের প্রধান কেন্দ্র, তখন পিল পিল করে ছুটে এল রাজপুরুষ এবং ধনী ব্যবসায়ীরা। ফলে, যে সমস্ত জমির বিঘা-পিছ, দাম ছিল দশ টাকা, রাতারাতি তার দর উঠে গেল হাজার টাকায়। জমি নিয়ে লোফাল্‌ফি, এবং ব্র্যাক-মাকেট চলল—যেমন বাঙ্গলাদেশের পার্টিশনের কালে দক্ষিণ কলকাতার কোন কোনও ‘ব্যাঙ্ক’ জমি নিয়ে জুরা খেলতে বসেছিলেন, এবং ‘পচা চিংড়ি’ বিক্রি করেছিলেন ‘তাজা রুই মাছের’ দরে! তেমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রাক-সোভিয়েট যুগে রাশিয়ায় ছিল প্রচুর। আজ সোভিয়েট আমলে তাদের ভূ-সম্পত্তি কিছু নেই বটে, কিন্তু তাঁদের বংশাবলী হাওয়ার মিলিয়ে যায়নি! তাঁরাই ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ‘ধর্মে’ এখন অনেকাংশে দেশ-জোড়া কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী,—দেশকে তাঁরা নতুন করে নির্মাণ করেছেন আপন অধ্যবসায়, কর্মশক্তি ও প্রতিভার দ্বারা। কিন্তু তাঁরাই উচ্চবিশ্ব, তাঁরাই শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, লেখক, ডাইরেক্টর, রাজনীতিবিদ, এবং নানা বিভাগের ‘কর্মী’—যাদের লক্ষ লক্ষ ‘টাকা’ উপার্জন,—যে-টাকা সোভিয়েট স্টেট ব্যাঙ্কে মোটা সন্দেশে খাটছে! তাঁরা যখন মস্কোর তুষারচ্ছন্ন রাজপথ দিয়ে কাঁচ-বন্দ মোটরের মধ্যে কোর্টের উপর ওভার-কোট চাপিয়ে আরামে বসে চলে যান আপন আপন কর্মস্থলে, আমি তখন দেখি ওই রাজপথেই সাংঘাতিক ঠান্ডার



আঁঠ! লাইফবয় ব্রান করতে কি মজা! কত
তাজা আর স্বস্তির লাগে! লাইফবয় সাবান দেখে,
ব্রান করলে খুলে মরবার রোগবীজাণুও
খুঁজে যায়। পরিবারে সকলেই বাস্তব স্বাস্থ্য
রোগ লাইফবয় দেখে ব্রান করুন।

**লাইফবয় যেখানে,
স্বাস্থ্যও সেখানে!**

ক্রিস্টিয়ান ভিভারের তৈরি

L. 29-X31 BG

মধ্যে বৃন্দা ঝাড়ুদারনি কোদাল নিয়ে বরফ কেটে নদমা খুলে দিচ্ছে! সর্বা-পেক্ষা নিশ্চ-বেতনভোগী এই বৃন্দার অতিমানবিক কণ্ঠসহিষ্ণুতার দিকে চেয়ে আমার চোখ বাৎপাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে কতদিন! আমার ভিতরের 'ম্যাক্সিম গোর্কি' অনেকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে 'গোর্কি' শ্রুটিটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

ইয়ালতার সর্বপ্রধান আকর্ষণ আন্তন চেকভের বাসস্থান। তাঁর নামের প্রকৃত উচ্চারণ নিয়ে একটি বিতর্ক আছে। শেকভ নয়,—চেকভ, এখানে জানলুম। বিগত ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর একটি বৃহৎ রোজ প্রতিনির্ভিত স্থানীয় 'মেরিন পার্কে' এবং লেনিনের একটি বিশাল প্রতিনির্ভিত নগরের নাভিকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। চেকভ এখানে অসুস্থ দেহে পাঁচ বৎসরকাল বাস করেছিলেন। উনিশ শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি নিজের চেষ্টায় দেশবাসীর কাছে চাঁদা তুলে ইয়ালতার যে প্রথম যক্ষ্মা-হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন, সেটির উদ্বেোধন করা হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, এবং তার নাম দেওয়া হয় "যাউজলার" (Yauzlar)। বর্তমানে এটি "চেকভ সানাতোরিয়াম" নামে পরিচিত। সমুদ্রোপকূলবর্তী 'মেরিন পার্কে' বিগত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে চেকভের কাছাকাছি গোর্কির একটি মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইয়ালতার প্রসিদ্ধ রংগমণ্ডির নাম 'চেকভ থিয়েটার'। 'বৈকব' শ্রুটিতে যেখানে গোর্কি কিছু দিন বসবাস করেছিলেন, সেই স্থানে একটি ইস্কুলের সংগে চেকভের নাম জড়িত। এই নগরের নানা স্থানে নানা সময়ে চেকভ বাস করেছিলেন, সেজন্য নানা বাসস্থানের গায়ে আজও তাঁর নাম উৎকীর্ণ করা আছে। সমস্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং জগতের নানা দেশ-দেশান্তর থেকে প্রতি বছরে কম-বেশি ৮০ হাজার লোক চেকভের যাদুঘরটি দেখতে আসেন। রুশ লেখক সমাজে তিনি সর্বাঙ্গাঙ্গী মিলিতপ্রকৃতি ও ভদ্রচিন্তা বলে পরিচিত ছিলেন।

শ্রীমতী অকসানার সংগে এক দিন সকালে চেকভের বাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। বড় রাস্তার পাশে এবং পাহাড়তলীর একটু নীচের দিকে চেকভের বাগানবাড়ি। এই বাগানটি বৃহৎ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ এবং টলটল য়া করেছিলেন তাঁর নিজের এন্টেট 'যশনায়ার পলিয়ানায়', চেকভও তেমানি নিজের হাতে এই বাগানের প্রত্যেকটি গাছ একদা পুতেছিলেন। আজ এগুলি অনেক বড় হয়েছে। দুইশত রকমের গাছের মধ্যে ইউক্যালিপটাস, খেজুর, বিভিন্ন শ্রেণীর গোলাপ, এবং জাতিশয় বিস্ময়কর,—ভারতীয় লাইল্যাক! নিজের বাগানটি সৌন্দর্যমণ্ডিত করার পর চেকভ সানন্দে বলেছিলেন, "সবাই

যদি নিজের-নিজের জায়গাটুকু এমনি করে সাজাত, পৃথিবী কী পরমাশ্চর্য হত!"—তাঁর বন্ধু 'গোর্কি' এই কথা কয়টি গুঁছিয়ে তুলে রেখেছেন এখানে। এই বাগানেরই একটি নিভৃত কোণে একখানা সযত্ন-রক্ষিত বেণ্ডের নাম, 'গোর্কি বেণ্ড'। নামটি দিয়েছিলেন চেকভ নিজে। এইটি ছিল দুই বন্ধুর নিরি-বির্জল বসবার আসন। এই অঞ্চলটির নাম 'আউটকা' এবং এখানে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে চেকভ নিজে এই বাস্তু জমিটি ধারে খরিদ করেন। জমিটির পরিমাণ বিঘা-তিনেক। কিন্তু জমি ক্রয়ের মাত্র কয়েক দিন আগে চেকভের পিতা পাভেল ইয়েগোরোভিচ চেকভ হঠাৎ মারা যান। আন্তন পাভেলোভিচ চেকভ স্থির করেন, তাঁর নিজের বাড়ি মস্কোর অন্তর্গত 'মৌলখোভো' ছেড়ে এই ইয়ালতার বাড়ি-ঘর বানিয়ে তিনি সপরিবারে বাস করবেন। তাঁর সহোদরা মেরিয়া পাভ-লোভনা এসে উপস্থিত হলেন। এই মহিলা আজীবন এই বাড়িটিতে 'চেকভ মিউজিয়মের' ডাইরেক্টরস্বরূপ বাস করে গেছেন। এই চেকভ মিউজিয়ম তাঁরই কীর্তি এবং চেকভ এই সম্পত্তি উত্তরাধিকার দান করে যান। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ৯৪ বৎসর বয়সে এই মহিয়ার মৃত্যু হয়।

এই বাড়ির নক্সা প্রস্তুত করেন স্থাপত্যবিদ লিও শাপোভালভ। চেকভ নিজে দাঁড়িয়ে তাঁর পছন্দ-মতো ভিতর মহলটি প্রস্তুত করান। আর্থিক অবস্থা কোনও কালেই তাঁর ভাল নয়। খ্যাতির অনুপাতে রোজগার নেই, কিন্তু বাড়ি তৈরীর সখ লেখকেরই বা থাকবে না কেন? নিজের পছন্দসই একখানি বাড়ি বানিয়ে তোলা মানে নিজের পছন্দসই একখানি সার্থক উপন্যাস রচনা করা! যে-আংকক চেতনায় একটি ছোটগল্পের নিভুল নির্মাণ-কৌশলকে প্রকাশ করা যায়, সেই একই চেতনা এবং একই প্রতিভা কাজ করে বাসগৃহ রচনায়! এই বাড়িটিও তাই চেকভের বিবেচনায় একটি মনোরম ছোটগল্প! কিন্তু মাস-তিনেকের মধ্যে টাকার অভাবে জমিটিকে বন্ধক রেখে রাজমিস্ত্রি এবং মাল-মসলার দেনা শোধ করার পর দেখা গেল, আসল বাড়ির কাজ কেবল তখন সবেমাত্রই আরম্ভ হয়েছে! তখন নিরুপায় হয়ে তিনি 'নিবা' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশকের নিকট এই প্রকার একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, তাঁর সমস্ত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের যা কিছু রচনা,—তাদের সর্বপ্রকার স্বত্ব এঁদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে কিস্তি-বিস্তিতে তিনি মোট ৭৫ হাজার রুবল পাবেন! চেকভ মোট ৮ শত ছোট ও বড় গল্প বা উপন্যাস এবং ৫ খানা বড় নাটক লিখেছিলেন। 'নিবা' পাবলিশার-

এর মালিক ছিলেন 'এডল্ফ মার্কস',—সম্ভবত তদানীন্তন একজন ইহুদী! তিনি প্রথম চোটেই খরচ-খরচা বাদ দিয়ে ১ লক্ষ রুবল লাভ করেন। সে যাই হোক, সেই আমলে চেকভের মোট ২০ খণ্ড বইয়ের ৭ লক্ষ কপি ছাপা হয়েছিল। বিপ্লবোত্তর কালে সোভিয়েট যুগে মোট ৭২টি ভাষায় চেকভের গ্রন্থ ৫ কোটি ৫০ লক্ষ কপি ছাপা হয়। অদ্যাবধি জগতের অন্যান্য প্রায় ৭০টি ভাষায় চেকভের গল্প ও নাট্যসাহিত্য অনুবাদ করা হয়েছে। আমি নিজে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে চেকভের তিনটি ছোটগল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলাম!

চেকভের বাড়িটির বর্ণ শাদা। তাঁর মৃত্যুকালে ভিতরের প্রত্যেকটি কক্ষ যেমন মেঝেবে সাজানো ছিল, আজও অবিকল সেইভাবেই আছে। তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী মেরিয়া পাভেলোভনা অনেক অভাব-অভিযোগ-অসুবিধার মধ্যে এই সম্পত্তিটি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রক্ষা করে এসেছিলেন। তিনি নিজেই তাঁর একটি স্মৃতিকথায় বলে গেছেন, "I was greatly worried about the future of our Yalta home and at one time had to negotiate with the editorial offices of magazines and newspapers inviting them to help preserve this literary monument... After the October Revolution the situation changed fundamentally.... It was placed on a firm footing...." বিগত বিপ্লবযুদ্ধের কালে এই মিউজিয়মটিকে নানা কারণে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়নি এবং এটি জার্মান সেনাদলের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা এটিকে স্পর্শ করেনি! চেকভের বাড়িটি সওয়া দুই তলা, এবং অতি সুশ্রী। জার্মান অবরোধকালে মিউজিয়ামটি ছিল, এবং মেরিয়া মোতলায় বাস করতেন। তাঁর বয়স তখন ৮০ বছরের কাছাকাছি। প্রতি ঘরে চেকভের প্রতিটি ব্যবহৃত সামগ্রীর আশে-পাশে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এই বাড়ির সংগে ম্যাক্সিম গোর্কির যোগ অনেকখানি। চেকভের সংগে গোর্কির বন্ধুত্ব হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই ইয়ালতায়, এবং সেই থেকে গোর্কি চেকভের প্রায় প্রতি-দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বিপ্লববাদী গোর্কি পলাতক অবস্থায় কিছুকালের জন্য চেকভের এই বাড়ির মধ্যে আশ্রয়গোপন করেন।

চেকভ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী আজব সমুদ্রের ভীরবর্তী 'টাগানরগ' নগরে। তিনি 'দাসান্দাস' (serf) বংশের সন্তান। তাঁর ঠাকুরদাদা ও বাবা অতিশয় বদমেজাজী, রুদ্ধ-প্রকৃতি এবং স্বেচ্ছা-চারী ছিলেন। তাঁদের উৎপীড়ন, অনাচার ও কুবাক্যে চেকভ পরিবারে নিত্য অশান্তি দেখা দিত। চেকভের পিতা তাঁর অনাচার ও দুর্ভব-প্রকৃতিতে

ঠাকুরদাদাকেও ছাড়িয়ে যেতেন। তাঁর ঠাকুরদাদার নাম ইয়েগোর মিখাইলভিচ, এবং বাবার নাম পাভেল ইয়েগেরোভিচ। চেকভের ঠাকুরদাদা ভূমি-দাস প্রথাকে অতিশয় ভালবাসতেন, কিন্তু নিজের 'দাসত্ব' থেকে মুক্তি চাইতেন। অবশেষে সুযোগ মিলল। তিনি তাঁর প্রভু-জমিদার মিঃ চার্টকভকে সর্বসাকুল্যে ৩৫০০ রুবল সেলামী দিয়ে নিজকে, স্ত্রীকে এবং তিনটি ছেলেকে 'ক্লে' করলেন। বছর ১৩ বয়সের একটি মাত্র মেয়ে, অর্থাৎ চেকভের পিসিমা, পিছনে পড়ে রইল সামান্য টাকার অভাবে। কিন্তু মেয়েটির কাম্বাকাটি দেখে দয়া-পরবশ হয়ে চার্টকভ মেয়েটাকেও মুক্তি দিলেন! অতঃপর সকলে স্থানত্যাগ করে চলে যান। তাঁরা ছিলেন দরিদ্র চাষী পরিবার।

চেকভ তাঁর বাবার মফঃস্বল শহরের মৃদুখানায় বসে লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁরা ছিলেন পাঁচ ভাই ও এক বোন। অতি নম্রমধুর এবং ভদ্রস্বভাব চেকভ ২৪ বছর বয়সে চিকিৎসক হন। ইয়ালভায় তিনি নিজে যখন যক্ষ্মা-রোগে ভুগছেন, তখন দেশের বহু স্থান থেকে অসংখ্য যক্ষ্মারোগী তাঁর কাছে সাহায্য ও পরামর্শ চেয়ে পাঠাত। ইয়ালভায় যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পিছনে এইটিই ছিল প্রধান কারণ। তাঁর জীবন-সংগ্রাম অতিশয় কঠোর ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। যৌবনকালে তিনি বিবাহ করেননি। কিন্তু তাঁর বিবাহের ব্যাপারটি খুবই কৌতুকপ্রদ। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর সাড়ে চার মাস আগে মস্কোতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, একথা আগেই বলে এসেছি। এই মহিলার পিতৃদত্ত নাম হল, 'অলগা লিয়োনার-দোভনা কৌনপার'। শ্রীমতী অলগা প্রাসিন্থা অভিনেত্রী ছিলেন, এবং চেকভের নাটক 'সী-গাল' ও 'আংকল বানিয়া' নিয়ে মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাকালে তিনিই এই দুই নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অতি অল্পকালের মধ্যে সেই থিয়েটার পাটি' বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীসহ ইয়ালভায় অসুস্থ চেকভকে তাঁর নিজের নাট্যকাভিনয় দেখাবার জন্য এসে উপস্থিত হয়। এই সূত্রে সুন্দরী, মিষ্টভাষিনী ও মধুর-প্রকৃতি শ্রীমতী অলগা চেকভের সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাঁদের বিবাহ হয়। স্বামী অপেক্ষা অলগা ৮ বছরের ছোট ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চেকভের মৃত্যুর পর এই সাক্ষী রমণী স্বামীর স্মৃতি বহন করে ৫৫ বৎসরকাল বৈধবা জীবন যাপন করেছিলেন। আমি যৌদিন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তখন তিনি সবেমাত্র ৯০ বৎসর পার হয়েছেন!

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে

চেকভ তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা দঃসাহসিক অভিযান করে ইয়ালভা থেকে স্থলপথে ছয় হাজার মাইল পূর্ব-পথে শাখালিন দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর এই অভিযানপথে শত শত বৃহৎ নদী, মরুভূমি, সাইবেরিয়ার চির-তুষারাবৃত ভূভাগ, ভয়াবহ মরুভূমি, বন্য ও হিংস্র উপজাতি-অধুষিত ভূভাগ, হাজার হাজার বর্গমাইলব্যাপী অরণ্য ইত্যাদি পার হয়ে এবং আমুর নদ ও তাতার প্রণালী অতিক্রম করে ওখটস্ক সাগরবর্তী শাখালিন দ্বীপে পৌঁছতে হয়। রেলপথে, শালতি ও বার্জে, ঘোড়ার বা উটের পিঠে, পায়ে-হাটা-পথে—অতি-মানবিক পরিশ্রম করে তিনি সেই দ্বীপে পৌঁছেন! আমাদের দেশে ইংরেজ আগলে আশ্রয়িত দ্বীপ যে-কাজে লাগত, জার-সম্রাটদের আমলে রাজনৈতিক ও সাধারণ রুশকয়েদীগণকে ঠিক সেই ভাবেই শাখালিনে নির্বাসন দেওয়া হত। আপন দেশ, জাতি ও জনজীবনকে উত্তমরূপে জানবার জন্য এই হৃদয়বান রুশ-অভিযাত্রী এইভাবে রাশিয়া ভ্রমণ করেন। শাখালিন দ্বীপে কয়েদী সম্প্রদায়ের অতি বীভৎস জীবনযাত্রা দেখে তিনি স্তম্ভিত হন। তিনি তিন মাসকাল শাখালিনে ভ্রমণ করেন এবং কয়েদীগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চেষ্টা পান। তিনি তাঁর চোখের সামনে অসংখ্য কয়েদীর শোচনীয় মৃত্যু দেখে শিউরে ওঠেন। অবশেষে তিনি শাখালিনের আদম-সুমারী পরিচালনা করে দশ হাজার কয়েদীর তালিকা ও 'কার্ড' প্রস্তুত করেন। চেকভ তাঁর শাখালিন দ্বীপ অভিযানের বিশদ বর্ণনা করেন তাঁর একখানি গ্রন্থে। গ্রন্থখানির নাম "Island of Sakhalin" ফিরবার পথে তিনি জাহাজযোগে দূর ও দক্ষিণ প্রান্তের সমুদ্র হয়ে সিংহলের রাজধানী কলম্বোয় অবতরণ করেন এবং যে-চারটি 'পুতুল-হাতী'—তার মধ্যে দুটি শাদা আইভরি নির্মিত—কিনে আনেন, সেগদুল আজও তাঁর দেয়ালে সাজানো রয়েছে। তাঁর জীবনকালে ক্রাইমিয়ার ইলেকট্রিক জরলেনি। তিনি মোমবার্ভার আলোয় কাজ করতেন। চেকভের সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হয় মস্কোয়। তিনি এক জায়গায় কোনও কালে স্থির থাকেননি। কস্তুরী মৃগের মতো আপন গন্ধে আস্থার হয়ে তিনি কেবলই জায়গা বদল করতেন। 'গুবনয়া স্ট্রীট, নং ২৩'—নামক মস্কোর একটি ফ্ল্যাটে বসে তিনি প্রথম জীবনে যে রচনাটি লিখেছিলেন, "A letter to a learned neighbour"—সেইটি তাঁকে প্রথম খ্যাতি এনে দেয়।

বিবাহের তিন বছর পরে তিনি অন্যান্য বারের মতো এবারেও মস্কোয় যান। কিন্তু আর তিনি ইয়ালভায় ফেরেননি। তাঁর বাবার তারিখটি পূরনো পার্জি-অনুসারে ছিল ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের

১লা মে। মস্কোয় গিয়ে তিনি পূরনায় শয্যাগত হন এবং রক্তবমি করতে থাকেন। অতঃপর জুন মাসে চিকিৎসকের নির্দেশক্রমে তিনি সস্ত্রীক দক্ষিণ জার্মানীর 'বাদেনওয়েইলার' নামক 'স্বাস্থ্য-শহরে' যান, কিন্তু সেখানেও তাঁর রোগের উপশম হয় না। সুতরাং সেখান থেকে তিনি তাঁর পরম অনুরক্তা সহোদরাকে লেখেন, ইয়ালভায় তিনি ফিরে আসতে চান। তিন দিন পরে এই চিঠি যখন শ্রীমতী মেরিয়ার হাতে এসে পৌঁছয় ঠিক সেই দিনই অর্থাৎ ২রা জুলাই, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের রুশ-লেখক সমাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর ও ভদ্র-প্রকৃতি আন্তন পাভলোভিচ চেকভ 'বাদেনওয়েইলার' স্বাস্থ্যনিবাসে মারা যান। মৃত্যুশয়রে তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী শ্রীমতী অলগা কৌনপার উপস্থিত ছিলেন।

এই ঘটনার ৫৫ বৎসর পরে শ্রীমতী অলগা তাঁর মস্কোর বাড়িতে বসে শ্রীমতী লিডিয়ার সাহায্যে আমার নিকট স্বামীর মৃত্যু-দিবসের ঘটনাদুলি বর্ণনা করেছিলেন!

এখানে একটি ছোট ঘটনার কথা বলি।—

আমার দ্বিতীয় দফার সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণকালে অর্থাৎ ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় 'খাদ্য ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন' আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের ফলে খাদ্যসমস্যার বিদ্যুৎপ্রতিকার হয়নি, কিন্তু নানা-স্থলে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলছিল। এ সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক উদ্বেগ থাকার জন্য শ্রীমতী প্যাটারসন আমার হাতে ৪।৫টি আমেরিকান কাগজের কাটিং দিয়েছিলেন। সেগদুল পাঠ করে শ্রীমতী অকস্মাৎ ঈষৎ উত্তেজনার সঙ্গে প্রশ্ন করেন, কে এরা?

আমি বলি, এরা এক শ্রেণীর বামপন্থী, সরকার-বিরোধী!

Do you mean, they're communists?

আমি জানিনে।

অকস্মাৎ বার-দুই ভারত ভ্রমণ করেছেন। তিনি ভারতের রাজনৈতিক সংবাদ রাখেন। একটু থেমে তিনি বলেন, They can never be communists, I tell you Mr. Sanyal; These people are bandits and marauders, and they are enemies of the people!

অতঃপর অকস্মাৎ আমাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, কমিউনিস্টরা কখনও জনসম্পত্তি ধ্বংস করে না! আমাদের বিপ্লবকালে আমরা জনসাধারণের সামান্য-তম সামগ্রীও নষ্ট হতে দিইনি!—We never destroy even a needle, nor we demolish even a cow-shed!

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণকালে শ্রীমতী অকস্মাৎ কথাদুলি বর্ণে বর্ণে মিলিয়ে নিজেছিলাম। —(ক্রমশঃ)

‘স্বামী-বিবেকানন্দ ও কাবিগুরু রবীন্দ্রনাথ’ প্রসঙ্গে

৪৪শ সংখ্যা (শুক্লাব ২৫শে ফাগুন, ১৩৬৮) অমৃত প্রিন্টার্স দ্বারা লিখিত ‘স্বামী বিবেকানন্দ ও কাবিগুরু রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অনুসৃত সাধন-পথের প্রভেদ সত্ত্বেও এই দুই বরগণীয় মহাপুরুষের মধ্যে যে আদর্শ চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে একটা সুগভীর ঐক্য বিদ্যমান, উভয়ের রচনা ও বাণী থেকে বহু উদ্ভূতির সাহায্যে লেখক তা প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখক স্বদেশ-প্রেম, মানব-প্রেম ইত্যাদি বহু বিষয়ে উভয়ের মতৈক্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে, তাঁদের জীবনাদর্শ এবং কৃতির মধ্যে সাদৃশ্য যেখানে সর্বাধিক সেই বিষয়টি অনুজ্ঞিত হয়ে গেছে। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এরা দু-জনেই ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনাদর্শের উদ্ভাটক, এবং আমেরিকা ও ইউরোপে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আধা-



য়িকতার—বেদান্তের—অমৃত-বাণীর ব্যাখ্যাতা। ‘ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি’ রূপে পাশ্চাত্যে হয়েছিল উভয়ের প্রতিষ্ঠা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বেদান্ত প্রচার করেন স্বামী বিবেকানন্দ আর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকেই পাশ্চাত্যবাসীদের উপনিষদের বাণী শোনাতে আরম্ভ করেন রবীন্দ্রনাথ। Sadhana নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁর ‘হার্ডি’ বক্তৃতামালা লিখিত হয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আরবানো, ইলিয়নস-এ অবস্থানকালে।

পরাদর্শী ভারতেরও যে সমস্ত পৃথিবীকে দেবার মত নিজস্ব সম্পদ আছে, শিক্ষা আছে—যে-শিক্ষাকে রোমী রলী বলেছেন—

Grandiose teaching of The East—
তা বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যবাসীকে প্রথম শোনান বিবেকানন্দ, তারপর রবীন্দ্রনাথ। অধ্যাপক-সাধন-মার্গের পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতের বাণী প্রচারক এই মহামানবসম্মত পরম্পরের আত্মার আত্মীয়, এদের আত্মিক সম্পর্ক এই ক্ষেত্রেই ঘনিষ্ঠতম—একটি মহাজীবন যেন আর একটি মহাজীবনের পারিপার্শ্বিক। পশ্চিমে ভারতের আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচারে উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ বিবেকানন্দের দ্বারা আংশিকভাবেও প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদ্ভিত হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা বা জবানবন্দে এ ভিজ়াসার জবাব পাওয়া যায় না। এই বিজ়াসিতব্য বিষয়টি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ তথা ভারতের শাস্ত্রবিত্ত আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান ফরাসী মনীষী রোমী রলীর নিম্নোক্ত কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :—

“As for Tagore, whose Goethe-like genius stands at the junction of all the rivers of India, it is permissible to presume that in him are united and harmonised the two currents of the Brahmo Samaj (transmitted to him by his father, the Maharshi) and of the new vedantism of Ramkrishna and Vivekananda. Rich in both, free in both he has serenely wedded the West and the East in his own spirit. From the social and national point of view his only pub-

lic announcement of his ideas was, if I am not mistaken, about 1906 at the beginning of the Swadeshi movement, four years after Vivekananda's death. There is no doubt that the breath of such a forerunner must have played some part in his evolution”. (The Life of Vivekananda And The Universal Gospel — by Romain Rolland P.318-19, Foot Note)।

রলী এখানে যা বলেছেন তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ব্রাহ্মসমাজ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নব-বেদান্তবাদ এই দুটি ধারা এসে একীভূত এবং সমন্বিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। এবং তিনি তাঁর নিজের আত্মার মধ্যে মিলন ঘটিয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, পুরোগামী বিবেকানন্দের আদর্শ তাঁর জীবনের রূপবিকাশে অন্ততঃ আংশিকভাবেও সক্রিয় হয়েছিল।

এই উদ্ভূত্যাংগে :
‘his only public announcement of his ideas’

এই কথাগুলি দ্বারা রবীন্দ্রনাথের যে রচনাটি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি “পূর্ব ও পশ্চিম” নামে “সমাজ” গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তারিখ সম্বন্ধে রলী ভুল করেছেন। প্রবন্ধের নীচে লেখা আছে ১৩১৫—কাজেই ১৯০৬ সালে এটি রচিত হয় নি, হয়েছিল তারও বছর দুই পরে।

‘সমাজ’-এ ‘আচারের অত্যাচার’, ‘প্রাচ্য ও প্রতীচ্য’ ‘পূর্ব ও পশ্চিম’ প্রভৃতি আর্টিট প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এগুলি ১২৯২ থেকে ১৩১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে লিখিত। কয়েকটি প্রবন্ধেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের কথা বলা হয়েছে। ‘পূর্ব ও পশ্চিম’ শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বসিয়েছেন :

“পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের পথিকৃৎদের মধ্যে অধুনাতনকালে দেশের মধ্যে যাহারা সকলের চেয়ে বড় মনীষী তাহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবন যাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়।” (সমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১২০—২১)

অতঃপর রানারের বিষয় উল্লেখ করে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলেছেন, নরেন্দ্র দেব মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে (অমৃত পৃঃ ৪১৬) তা

সাহিত্যিক ২৥০

প্রবীণ সাহিত্যিক পৃথিবীশত্রু ভট্টাচার্য এই উপন্যাসের মাধ্যমে আধুনিক সমাজ-বিবর্তনের স্রোতে মানবসমাজে কী অনুপ্রবেশ করলো আর স্রোতের মধ্যে কী ভেসে গেল। এই হিসাবের শেষে হাতে কি অবশিষ্ট রইল, তারই ছবি প্রাজল ভাষায় অভুলনীর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

দেবপ্রী সাহিত্য সমিতি
৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

পেটের পীড়ায়

“এন্টাভ্রুগ” একটি বিশ্বকর শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা ব্যবহারে পাকায়িক দোষ, ভ্রু, অজীর্ণ, পুরাতন জ্বাশয়, তরল দাঁত, পেট বেদনা, শিশুদের রিকটন প্রভৃতি ক্রম আরোগ্য হয়। মূল্য ক্রতি শিশি ৩ টাকা। সান্তনু পুথক।

হাণিরা (অল্প রস্কি)

বিনা অস্ত্রে উৎকর্ষ করা অস্ত্রবুদ্ধি ও কৌশল হাণিরা আরোগ্য হয় ও আর পুনরুজ্জীবন হয় না। রোগের বিপরীত সহ পাত্র লিখিয়া নিয়মাবলী লউন।

হিন্দু রিসার্চ হোম

১৩, নীলরতন মুখার্জী রোড, শিবপুর
হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৭০০

উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। কৌতুহলী পাঠক রবীন্দ্র রচনাবলীর ১২শ খণ্ডের ২৬৬ পৃষ্ঠায় এর সম্বন্ধ পাবেন।

দেব মহাশয় স্বামীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য দুটি সূত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন। শেষেরটি একটি পত্রাংশ। এর পিছনে একটু ইতিহাস আছে। ১৯২৮, ৯ই এপ্রিল 'রবীন্দ্র কাব্যে ত্রয়ী পরিবর্তন' নামক গ্রন্থপ্রণেতা 'ডাঃ সরস্বতীলাল সরকারের কোনো পত্রের উত্তরে আমি চক্ৰবর্তী যে পত্র দেন তার অনুক্রমিকায় কবি স্বয়ং এইটি লেখেন। (রবীন্দ্র-জীবনী— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭২)

স্বামীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কিন্তু শুধুমাত্র 'পূর্ব' পশ্চিম' প্রবন্ধের উদ্ভূতি এবং এই পত্রাংশটিতেই পূর্ণবিস্তৃত নয়। ১৯২৬ সালের ২৪শে এবং ২৫শে জুন সুইজারল্যান্ডের ভিলেনেভুতে (Villeneuve) এবং ১৯৩০-এর আগস্ট মাসে (তারিখ অনু-ল্লিখিত) রোমার রোলার সংগে রবীন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে কথালাপ হয়। শেষোক্ত দিন প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ ভারতে দেবতার উপদেশে জীববলির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, আমাদের ধর্মের সংগে এর কোনো সম্পর্ক নেই, অথচ অনেকে ঐতিহ্যগত বলে এর সমর্থন করেন। রোলাঁ তখন খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র-গুলিতেও যে জীববলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সে কথা বলেন। অতঃপর এদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় এবং যাতে প্রসঙ্গক্রমে বিবেকানন্দের কথা এসে পড়ে সেই অংশটুকু : Alex Aronson & Krishna Kripalani সম্পাদিত

Rolland and Tagore (P99...100) নামক বই থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হল :

Tagore:— "I have never been able to love the God of the old Testament. He is the Lord with the rod".

Rolland — "But even in the New Testament the same motive occurs. Jesus is the lamb and the Lord sacrificed for the sake of humanity. The emphasis is wrongly placed, and the attitude is not spiritual in the large sense.... Do you think that Vivekananda in India tried to check the abuses in this line?"

Tagore:— "So far as I can make out, Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life... We must rise higher in our spiritual experience in the domain

where neither good nor evil exists. It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them...." My attitude towards truth is different. Truth cannot afford to be tolerant where it faces positive evil, it is like sunlight which makes the existence of evil germs impossible...."

রবীন্দ্রনাথের শেষের কথাগুলি থেকে সত্যের প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে স্বামীজীর সংগে তাঁর পার্থক্যের আভাস পাওয়া যায়।

রোলারকে—

The Life of Vivekananda and the universal Gospel (Tr. from the original French by E. F. Malcolm—Smith M.A., Ph.D.) রচনায় প্রচুর তথ্য সরবরাহ করেছিলেন Prabuddha Bharat পত্রিকার তদানীন্তন প্রধান সম্পাদক স্বামী অশোকানন্দ। রোলাঁ তাঁর বইয়ের বিভিন্ন স্থানে ফুটনোটে এর নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের এই প্রাক্ত সন্ন্যাসীর নিকট এক পৃষ্ঠে রবীন্দ্রনাথ স্বামীজী সম্বন্ধে লেখেন :

"বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্যে দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান।

একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থ-বোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্ম-বোধকে অসীম মন্দির পথ দেখালে। এ তো কোনো বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুৎমাগের বিরোধিতা এর মধ্যে আপনাই এসে পড়েছে, তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাভাব্যতার সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে। সে অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মবিস্ময়।

বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বেগন বলেই কর্মের মধ্যে দিয়ে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মন্দির পবিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।"

(এই পত্রখানি 'কিশোর বাংলা' পোষ, ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।)

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ কোথাও কিছু বলেছিলেন কিনা তার সম্বন্ধ আমরা পাইনি। আমরা যতদূর জানি সমসাময়িক বাঙালী কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়া আর কারও সম্বন্ধে কোথাও তিনি কিছু বলেননি। কিন্তু দেশ-বিদেশের সাময়িক পত্রাদিতে অনু-সন্ধান করলে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আরও উস্তির সম্বন্ধ পাওয়া আশ্চর্য নয়। আপাততঃ যা পাওয়া গেছে, পরিমাণে স্বল্প হলেও তা বিশেষ মূল্যবান। তার থেকে জানা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের জন্যে যে স্বামীজী জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সে কথা রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে শুনিয়েছিলেন অর্ধ শতাব্দীরও উদ্ভবকাল পূর্বে। তাঁর উক্তি থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক ভারতবর্ষে একটি প্রেরণা-দায়ক বাণী-প্রচারক বিবেকানন্দের মাহাত্ম্য তিনি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতেন। স্বামীজীর দীর্ঘদিনের সেবার বাণী যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বেগনের সহায়ক এই সত্যটি তিনি তাঁর অননু-করণীয় ভাষায় অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে গেছেন।

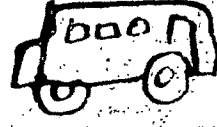
—শ্রীললিতা কুমার ভদ্র,
কলিকাতা : ৬

ক্রিং কো'র *
আগিকা
হেয়ার অয়েল
প্রতি বরক-ক্রিং কো'র কলিকা



দিনখানি ডাল বই
চালচিত্র
কলিদাস রায়
কুমারসম্ভব
অনুবাদ : কলিদাস রায়
মহান শিক্ষানায়কদের
শিক্ষাতত্ত্ব
গৌরমোহন বন্দোপাধ্যায়
আত্মভিত্তিক পাবনিসার
কলিকাতা - ১

বেবুয়ের খাতা



অস্ফল্লভ

॥ বাস-টার্মিনাসের একটি কিশোর ॥

শহরের নানা অঞ্চলে ওকে দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে বাস-টার্মিনাসে। বছর পনেরো বয়সের একটি ছেলে। পরনে ছিটের শার্ট ও হাফপ্যান্ট। মাজা মাজা গায়ের রঙ। বাঁ বগলে ধূপকাঠির প্যাকেটের একটা বাঁশডল। ডান হাতে ধূপকাঠির একটি প্যাকেট বাড়িয়ে ধরে অতি বিনীত ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়ায়।

‘এক প্যাকেট ধূপকাঠি নেবেন?’

গলার স্বর এখনো মিষ্টি ও কোমল। অর্থাৎ, এখনো সেই নিষ্পাপ কৈশোর যখন মাসের আঁচল থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় নিয়ে এই বিপুল পৃথিবীর দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থাকার কথা। যখন এই পৃথিবীর রুদ্ধ দিনগুলো থেকে ওকে আডাল করবার জন্যে মাথার ওপরে থাকার কথা বটের মতো ছায়া মেলা মস্ত একটি নির্ভর। কুঁড়ির মতো ফুটন্ত সেই আশ্চর্য কৈশোর যখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একজন মানুষের কাছে পৃথিবীটা সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

‘এক প্যাকেট ধূপকাঠি নেবেন?’

এবারে মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝা যাবে, কৈশোর শব্দ রয়েছে গলার স্বরে ও গায়ের চামড়ায়। চোখের দৃষ্টিতে নেই, কথা বলার সুরে নয়, দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতেও নয়। চোখের দৃষ্টিতে মিনতি, কথা বলার সুরে আবেদন, দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে ভিক্ষুকের প্রত্যাশা। কাঁচ একটি চারাগাছ যেন ছায়ার আশ্রয় হারিয়েছে। প্রচণ্ড তাপে একটু একটু করে পুড়ছে আর একটু একটু করে কুকড়ে যাচ্ছে। ব্যাকল গ্রন্থি মেলে দিয়েও মাটির নিচে একবিটু রসের সম্ভান পায়নি।

‘স্কুলের মাইনে দিতে পারিনি। নিন না এক প্যাকেট ধূপকাঠি!’

কথাগুলো অনেকটা কান্নার মতো বেরিয়ে আসে। এ কান্নার কোনো ভাষা নেই। আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামলে কখনো কখনো মনে হতে পারে, এমনি এক



কান্নার শব্দ চরাচরকে ব্যাপ্ত করেছে। কান পেতে থাকলেও পৃথিবীর আরেকটি দিনের উচ্ছ্বাসিত ঘোষণা শোনা যাবে না। ডবলডেকার বাসের থর-থর কাঁপুনিকেও এই কান্না তুলিয়ে দিতে পারে।

‘নিন না!’

কিন্তু আজকের দিনের মানুষ বুদ্ধে পাথর বেঁধে চলাফেরা করে। অনেক ঠকেছে সে, অনেক শূন্যেছে। আর তাই সে-পাথরটায় কান্নার দাগ পড়ে না।

‘নেবেন?’

পাথরটা একটু নাড়া খায়। পাথর ঠেলে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসে : ‘কোন স্কুলে পড়ো তুমি?’

স্কুলের নাম বলে। সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেট থেকে বেরিয়ে আসে কোনো একটি স্কুলের কোনো একটি ক্লাশের বইয়ের তালিকা।

কিন্তু মানুষটি অনেক ঠকেছে। অনেক শূন্যেছে। তাই সে বলে, ‘মাইনে দেবার রসিদ-বই আছে?’

প্রত্যাশায় উন্মুখ জবাব পাওয়া যায় : ‘বাড়িতে আছে। বাবার কাছে।’

আরো একটি-দুটি প্রশ্ন ও তার জবাবের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে পুরো একটি কাহিনী। নিম্ন মধ্যবিত্ত বারা হয়তো চাকুরি থেকে ছাঁটাই হয়েছেন। হয়তো অনেক চেষ্টা করেও কোনো চাকুরি বোগাড় করতে পারেননি। এক-কালের গৃহস্থখয়ের বোঁ ও পরবর্তী-কালের জননীকে হয়তো বাধ্য হয়েই বাসনমাজার কাজ নিতে হয়েছে। কিংবা এমনও হতে পারে যে বাবা নিজেই এক-কালে শিক্ষক ছিলেন। উন্মাদ জীবনে এখন হয়তো কোনো মাঝারি গোছের ব্যবসাদারের গদিতে নিতান্তই অল্প মাইনের খাতা-লিখিয়ে। শিক্ষক বাপের বড়ো ছেলের তাই লেখাপড়া শেখার জন্যে এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। কিংবা হয়তো এসব কিছুই নয়। এককালের মোটামুটি দূ-বেলার দুটি অল্প জোটা একটি পরিবার হয়তো দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে

এমন একজনের আশ্রয় খুঁজিয়েছে যিনি বিছানা নিলে এই সংসারটিও অচল। সেই ব্যাধির পুঁতিগন্ধ হয়তো কিশোরটির নিশ্বাসেও পাওয়া যেতে পারে। হাজার ধূপকাঠি জ্বালিয়েও তা চাপা দেওয়া যাবে না।

হয়তো তাও নয়। আধি নেই, ব্যাধি নেই, তবুও এই দেশের উৎকট রক্তের স্ব-বিরোধিতায় হাস্যকর বর্তমান কালটাই একটি সংসারের টুকুটি টিপে ধরেছে। সেই মানুষটি হয়তো সুস্থ শরীরেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে। সেই জননীটি হয়তো মুখ বুজেই সকালে বিকেলে বাসন মাজছে—তবুও পনেরো বছরের একটি কিশোরকে স্কুলের পরে খেলার মাঠে পাঠবার সুযোগটি কিছুতেই তৈরি করা যাচ্ছে না।

এমনি আরো কত কি। কলকাতার রাস্তায় নিঃশ্বাসের মতো নিঃশব্দে বক-বকে মোটরগাড়ি যাতায়াত করে। আবার সেই একই রাস্তায় ডবলডেকার বাস উদ্ভাসিত গতিকের সংঘাত করতে গিয়ে গৌঁ গৌঁ আওয়াজে ফেটে পড়তে চায়। তবুও তারই মধ্যে দিয়ে ট্রাম চলে নিতান্তই ধরাবাঁধা রাস্তায়। তার যতোটা না বেগ তার চেয়ে বেশি শব্দ। এখানেই শেষ নয়। এই সমস্ত যান্ত্রিক আয়োজনকে তাক্সিলা করেই যেন পাশাপাশি চলে ঠেলাগাড়ি, রিকশা আর গোরুর গাড়ি। কলকাতার সরু রাস্তায় এই বিচিত্র ট্রাফিক পাগলা ষাঁড়ের মতো ফুঁসছে আর দাপাদপি করছে। সব মানুষই এই পাগলা ষাঁড়কে সমীহ করে চলে। আর এই অবস্থায় আচমকা যদি একদিন দেখা যায় যে পনেরো বছরের একটি কিশোর খেলনা-গাড়িতে চেপে এই পাগলা ষাঁড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছে তাহলে প্রথমটায় হাসি পাবে এবং সেই হাসিটাকে খানিকটা ভাবনা দিয়ে চাপা দিতে পাললে শিউরে উঠতে হবে।

বুকে পাথর দেওয়া মানুষটাও প্রথমে হয়তো হেসে উঠেছিল। তাই জিজ্ঞেস করে, 'কতদিন এ লাইনে আছ?'

'আজ্ঞে!'

'বলি, কতদিন আছ এ লাইনে?'

মানুষটা অনেক ঠকেছে। অনেক শুনছে। তাই যখন চোখে পড়ে যে সেই মিনতিভরা চোখদুটোতে ফুটে উঠেছে কেমন একটা অসহায় দৃষ্টি—তখন নিজের কৃতিত্বে নিজেই উল্লসিত হয়।

তাই আবারও বলে, 'তোমাকে না পরশু দেখেছিলাম গলায় কাছা বদলিয়ে ভিক্ষে করতে?'

'আজ্ঞে!'

'মনে নেই সেই যে রাসবিহারীর মোড়ে—মনে নেই? আমি তোমাকে দূ-আনা পয়সা দিয়েছিলাম।'

এবারে স্পষ্ট জবাব শোনা যায়, 'না, আমি নই।'

'আলবৎ তুমি! আমি নিজের চোখে দেখলাম!'

এবারে আরো স্পষ্ট জবাব শোনা যায়, 'আপনি ভুল দেখেছেন।'

কিন্তু মানুষটা যতোই ঠকে থাকুক আর যতোই শুন্যে থাকুক, তাকেও এই দেশের উৎকট স্ব-বিরোধিতায় হাস্যকর বর্তমানেই বেঁচে থাকতে হচ্ছে। আর মাঝে মাঝে তারও মনে হয় যে বেঁচে থাকাটা নিতান্তই একটা খেলনা-গাড়িতে চেপে পাগলা ষাঁড়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া। আর তাই অনেক ঠকবার পরেও আর অনেক শুনবার পরেও তাকে অনেক কিছু বুঝতেও হচ্ছে।

এবার থেকে 'ভবষুদের খাতা' নামে একটি বিভাগ চালু করা হল। এক সপ্তাহ পর পর এই বিভাগে সহর কলকাতার বিচিত্র জীবনের রেখাচিত্র প্রকাশিত হবে।

তখন ধূপকাঠির প্যাকেটটা হাতে নিয়ে গন্ধ শোঁকে আর বলে, 'নাঃ, গন্ধ নেই একেবারে।'

উৎকণ্ঠিত প্রতিবাদ ওঠে, 'একটা জ্বালাব—দেখবেন?'

আশ্চর্য সাহস বলতে হবে। কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় ধূপকাঠি জ্বালিয়ে প্রমাণ-দিতে চায়।

'জ্বালাই?'

'না থাক।'

'নব্বেন একটা প্যাকেট?'

এবারে যেন শূন্যই মিনতি নয়, শূন্যই আবেদন নয়, শূন্যই ভীতির মতো প্রত্যাশা নয়। খানিকটা যেন দাঁবিও।

'নব্বেন?'

বুকের পাথরে কান্নার দাগ পড়েনি। কারণ মানুষটা অনেক ঠকেছে। অনেক শুনছে। কিন্তু এই মানুষটাকেও কারও না কারও কাছে কোনো না কোনো সময়ে দাঁবি নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। কারণ মানুষটা বেঁচে আছে।

তাই সে বলে, 'আমার তো ধূপকাঠির দরকার নেই।'

কথাগুলো ঘোষণার মতো শোনার না। কৈফিয়ত দিচ্ছে যেন।

'স্কুলের মাইনে দিতে পারিনি। নিন না একটা প্যাকেট!'

এই দেশের উৎকট স্ব-বিরোধিতায় হাস্যকর কালটাই যেন জবাবদিহি চাইছে। কান্না হলে বুকের ওপরে বাঁধা সেই পাথরটায় কোনো দাগ পড়ত না। যদি কান্না হত তাহলে অনেক ঠকে ও শুন্যে শেখা মানুষটা অনায়াসেই বলতে পারত, 'না, আমার দরকার নেই।' কিন্তু এবারে কান্না নয়—জবাবদিহি। কি আশ্চর্য যে সেই শব্দ আর নিরেট পাথরটা একটু একটু করে গলতে শুরুর করল।

এক প্যাকেট ধূপকাঠির সমস্ত ধোঁয়াকে তালগোল পাকিয়ে যদি মহা-শুন্যে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে তা কি একটি নীহারিকার জন্ম দিতে পারে? সেই নীহারিকা কি কোনো দিন হয়ে উঠবে একটি দেদীপ্যমান নক্ষত্র? এই হিসেব মানুষটির জানা নেই। তাই সে এতকথার পরেও প্রশ্ন করতে পারে, 'কত দাম এক প্যাকেটের?'

'দূ-আনা।'

স্কুলের মাইনের হিসেব মানুষটার জানা আছে। দূ-আনাকে কত দিয়ে গুণ করলে সেই সংখ্যাটা পাওয়া যায় তা কষবার জন্যে খাতা-পেনসিলের দরকার হয়তো নাও হতে পারে। তবুও বী বগলের বাণ্ডিলটার দিকে তাকিয়ে সমস্ত হিসেবই যেন গোলমাল হয়ে যায়।

সে বলে, 'ধূপকাঠির দরকার সত্যিই আমার নেই। আমি বরং তোমাকে দূ-আনা পয়সা দিচ্ছি। তুমি এমনি নাও।'

'না, আমার দরকার নেই।'

কান্না নয়, জবাবদিহি নয়, প্রচণ্ড একটা ধমকের মতো শোনায় কথাগুলো।



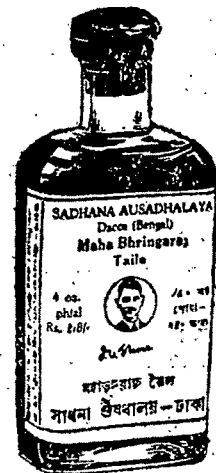
মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন!

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভুঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই শিথলকর ও আরামদায়ক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্বদা প্রযুক্ত ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনার
মহা ভুঙ্গরাজ
তৈল



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র বোষ,

এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র বোষ, এম. এ.

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী, এফ. সি. ও. এ. (লণ্ডন) এম. সি. এম. (আমেরিকা)

ভাঙ্গলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

অঙ্গি রেখা

৩৪৫



[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নির্মালা সেই যে এসে বারান্দার মেঝের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছিল, আর ওঠেনি। ভুলে গিয়েছিল, আজ তার রান্না হয়নি, খাওয়া হয়নি। অনাহারের জ্বালা আর কতটুকু? তার চেয়ে অনেক বেশী তীব্র দহনে তার সমস্ত অন্তরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। তাকে নিয়ে বারংবার এ কী পরিহাস করে চলেছেন ভাগ্যবিধাতা? পরাজয় মেনে নিয়েই তো সে এককোণে পড়েছিল; সকলের চোখের আড়ালে। সেটুকু স্বস্তিও তার অসহ্য হল? সেখান থেকে টেনে বার করে দাঁড় করিয়ে দিলেন গর্বোন্মিত বিজেতার কৃপাদৃষ্টির হীনতার তলে। তবে কি বুঝতে হবে তার সংগ্রাম শেষ হয়নি? সেই ইংগিত লুকিয়ে আছে ঐ দুর্বিষহ আঘাতের মাঝে? কিন্তু কী নিয়ে লড়াই সে? থোকা যে তার দুটো হাতই ভেঙে দিয়ে গেছে। কিংবা হয়তো তারই জন্যে আবার এই নতুন আহবান।

টিনের বাঁপে ক্রুর হাতের আওয়াজ পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই বিজুর মা। খোঁজ নিতে এসেছেন, খাওয়া হল কিনা; ওখান-কর খবর কী? নির্মালা শুয়ে শুয়েই চোঁচিয়ে সাড়া দিল, আসুন দিদি; খোলা আছে। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঢুকল ভীম। নির্মালা তাড়াতাড়ি উঠে বসে আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে ফেলল। বিস্ময়ের সুরে বলল, 'তুমি।' সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে খরের দিকে যেতে যেতে বলল, দাঁড়াও, আলো জ্বালি।

ভীম এদিক ওদিক তাকিয়ে বারান্দার একপাশে বসল এবং নির্মালা আলো নিয়ে বেরিয়ে এলে বলল, অনেক দিন আগে একবারই এয়েছিলাম তোমার বাসায়। ভাবনা ছিল চিনে আসতে পারবো কিনা। দেখলাম ভুলিনি।

তা, তুমি হঠাৎ কাউকে কিছ না বলে চলে এলে যে?

নির্মালা একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, গিন্নীমা ব্যস্ত রয়েছেন, দেখলাম। ভাবলাম আরেকদিন এলেই হবে।

—বাস্ত না আরো কিছ! গরিব লোককে খালি খালি ঘোরানো। থাক, টাকার জন্যে তোমাকে আর যেতে হবে না। আমি নিয়ে এয়েছি।

—তুমি কেন আবার কষ্ট করতে গেলো? দ্যাখ দিকন। ভীম টাঁক থেকে নোটকথানা বের করতে করতে বলল, কষ্ট কিসের? একটু বেড়িয়ে গেলাম। এমনি তো বাসা থেকে বেরোবার যোটি নেই। চম্বিশ ঘন্টা খালি খাটো। তুমি থাকতে তবু খানিকটা আজাড় ছিল।

নির্মালা চুপ করে শুনছিল। তার দিকে এক পলক তাকিয়ে ভীম অনুরোধের সুরে বলল, চলনা আবার?

—তোমরা বরং অন্য লোক খুঁজে নাও, ভীম।

—কেন, তোমার হাতে তো কাজ নেই বলাছলে?

নির্মালা জবাব দিল না। কেন যে ওখানে গিয়ে তার আর দাঁড়বার উপায় নেই, সে কথা কাউকে বলা যায় না। ভীম তার নিজের বুদ্ধি দিয়ে যা ব্রহ্মল নার থেকেই বলল, গিন্নী একটু খিটখিট করে। বাবু কিন্তু মনুষ্যতা বড় ভালো। এই দায়িত্ব যেই কানে গ্যাছে তুমি খালি হাতে ফিরে এয়েছ, ওপরে ডেকে নিয়ে টাকাটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, যা ভীম, এখনি দিয়ে আয়।

নির্মালা বিস্মিত এবং খানিকটা লজ্জিত হল—বাবু পাঠিয়েছেন তোমাকে।

—তুমি ভাবছ গিন্নী পাঠিয়েছে? হুঃ! তুমিও যেমন। যাক; এবার আমি উঠি। কতো কাজ পড়ে আছে। বাড়িতে আবার নতুন কুটুম্ব এয়েছে। যে-সে কুটুম্ব নয়, খোদ কস্তার বড় কুটুম্ব। তবু তো আপন নয়, শুনলাম। মাসতুতো না পিসতুতো কী একটা হবে।

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলল ভীমচন্দ্র। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বলল, আমার কথাটা একবারটি ভেবে দেখো, থোকার মা।

ভীম চলে যাবার পরেও বাইরের দরজা খোলা ছিল। নির্মালা ইচ্ছা করেই বন্ধ করেনি। ভেবেছিল; এদিকটা একটু গুঁছিয়ে রেখে বিজুর মার কাছে যাবে। টাকা কিছটা যোগাড় হয়েছে, এখবরটা দিয়ে আসা দরকার। নিশ্চয়ই উন্মত্ত হয়ে আছেন।

মিনিট কয়েক পরে হারিকেনটা হাতে করে উঠানের মাঝামাঝি এসেই যেন ভূত দেখে থমকে দাঁড়াল। সেই দীর্ঘ সন্ধ্যাম দেহ। একটু যেন অনদ্ভুত, অবনত, সেই কন্ঠ, কিন্তু সেদিনের তুলনায় অনেক ধীর, অনেক গম্ভীর—'তুমি কি বাইরে যাচ্ছিলে?'

নির্মালা মুহূর্ত মধ্যে নিজেকে সংযমের আবরণে ঢেকে ফেলল। মনঃ স্বরে বলল, হ্যাঁ।

—খুব জরুরী দরকার?

—না।.....বলে ফিরে এল, এবং ঘরের ভিতর থেকে একখানা পিঁপড় এনে পেতে দিল বারান্দার কোণে। বিজন তার উপর বসতে বসতে বলল, খুব অবাক হয়ে গ্যাছ, না? ভাবছ, বাড়ি চিনলাম কী করে।

নির্মালা জবাব দিল না, হাত কয়েক দূরে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিজন

নিজে থেকেই জানাল, চাকরটা আসছে শূনে ওর পেছন নিয়েছিলাম। ও অর্বাচী জানে না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসোনা?

নির্মলা বসল না, কোনো উত্তর করল না, যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। বিজন কিছুক্ষণ উঠোনের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, ভাবছ, এতদিন পরে খোঁজ নেবার কী দরকার ছিল। কী করব, বল? খুঁজে পাবার মত কোনো সূত্রই তো রাখনি। আমি না হয় কেউ নয়। বৌদিকেও তো একখানা পোষ্টকার্ড লিখে জানাতে পারতে, কোথায় আছ, কেমন আছ।

সহজভাবে বললেও কথাগুলোর মধ্যে অনুযোগের সূর অস্পষ্ট রইল না। কিন্তু নির্মলা নিরুত্তর। বিজনও জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল না, নিজের কথার সূত্র ধরেই বলে চলল, কোথাও কোনো খবর না পেয়ে তোমাদের দেশের বাড়িতেও আমাকে যেতে হয়েছিল। গিয়ে দেখলাম, দরজায় তালা, উঠানে এক হাঁটু জঙ্গল। বছর কয়েক আগে তোমরা কোলকাতায় চলে এসেছ, এর বেশী আর কেউ কিছু,

বলতে পারল না।.....কী হয়েছিল নরেন্দার?

—অ্যাকসিডেন্ট।

—অ্যাকসিডেন্ট! তারপর?

—হাসপাতালে গিয়ে আর দেখতে পাইনি।

কিছুক্ষণ দৃষ্টি নেই নীরব। তারপর বিজনই আবার কথা বলল, খোঁকা কোথায়? তাকে তো দেখছি না।

—সে নেই।

কী বললে! আর্টকন্স্টে যেন চোঁচিয়ে উঠল বিজন।

—বাড়ি থেকে চলে গেছে, আর আসেনি।

—বলকি! কদিন হল?

—আজ সাত মাস দশদিন।

—খোঁজ করনি?

বলেই সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, তুমি আর কী খোঁজ করবে? কাকে দিয়েই বা করবে? বয়স কত ছেলের?

—দশ বছর।

আবার সেই দৃঃসহ নীরবতা এবং এবারেও বিজনই সেটা ভগ্ন করল। ধীরে ধীরে যেন বহুদিনের ওপার থেকে ডাকল, নির্মলা।

—বলুন।

—তুমি আমার সঙ্গে চল।

—কোথায়! বিস্ময়ে চোখ তুলল নির্মলা। স্বল্প আলোকেও সে বিস্ময়িত দৃষ্টির শিখা বিজনের নজর এড়াল না। বলল, না, না; আমার বাড়িতে নয়। সে কথা বলবার মত স্পর্শ আমার নেই; যদিও, নিশ্চয়ই জানো, যদি যেতে, তোমাকে মাথায় করে রাখতাম। বলছিলাম বৌদির কাছে চল। তোমার দিদি, মায়ের পেটের রোন; সেখানে যেতে তো কোনো বাধা নেই।

—আমি কোথাও যাবো না।

—যাবে না।

—না।

—কেন?

শূন্য প্রশ্ন নয়, একটা ক্ষণ বেদনার সূর ফটে উঠল তার মধ্যে। নির্মলা জবাব দিল না। বিজন বলল, দেখা যাক না হত, সে কথা ছিল আলাদা; কিন্তু দেখবার পর তোমাকে একা এই অবস্থায় ফেলে আমি নিশ্চিত মনে চলে যাবো, এই কি তুমি বলতে চাও?

—আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। দয়া করে এ নিয়ে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

—বেশ; করবো না। কিন্তু কিসের জন্যে তুমি নিজেকে এমন করে ক্ষয় করে চলেছ, কার ওপরে তোমার এ দুর্জয় অভিমান, তাও কি কখনো জানতে পারবো না?

—কারো ওপরে আমার কোনো অভিমান নেই।

বিজন আহত দৃষ্টিতে একবার সেই আনত মূখের দিকে তাকাল। হারিকেনের মৃদু আলোয় বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর ধীরে ধীরে বলল, বুঝতে না পেরে একদিন যে আঘাত তোমাকে দিয়েছি, যত অপরাধ করছি তোমার কাছে, তার কোনোটাতেই আমি ছোট করে দেখছি না। তবু বলবো, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছিলে। আমার সৌন্দর্য্যের সেই মনটাকে যদি—

—‘ওসব কথা থাক’, বাধা দিয়ে বলে উঠল নির্মলা।

—বেশ। কিন্তু আজকের এই কথাটা তোমাকে শুনতে হবে নির্মলা। একটা কোনো ভার আমাকে দাও। বল, তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি।

সেই পুরনো ডাক—‘নির্মলা’, যা শুনলে একদিন তার বুকের ভিতরটা উদ্বেলিত হয়ে উঠত। আজ সেখানে কোনো সাড়া নেই। তবু কী ছিল এ তিনটি অক্ষরের মধ্যে, একটা শ্লেষাত্মক রূঢ় উত্তর মূখে এসেও আটকে গেল। তার বদলে বোরিয়ে এল শান্ত কিন্তু দৃঢ় কটি কথা—অনেক দিন আগে এই কথাটা আপনি আরেকবার জানতে চেয়েছিলেন। সৌন্দর্য্যে উত্তর দিয়েছিলাম আজও তাই দেবো। আমার জন্যে আপনাকে কিছুই করতে হবে না। যেমন আছি, তেমনি থাকতে দিন। আর—

হঠাৎ থেমে যেতেই বিজন সাগরে বলে উঠল, বল। নির্মলা তেমনি অবিচলিত কণ্ঠে যোগ করল, আর কোনোদিন আমার সামনে আসবেন না।

বিজনের মাথাটা নেমে এল বুকের উপর। কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে থেকে, একটি স্থলিত নিঃশ্বাস নিঃশব্দে বুকে চেপে উঠে দাঁড়াল এবং ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। নির্মলা যেখানে ছিল সেখান থেকেই বলল, শুনুন।

এই সকল পরম্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

লিখে কালি শুকায় না,
কিন্তু কাগজে দৃঢ় শুকায়।

রাঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাবে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা গুয়ে-মুছে যায় না
অশ্রু কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা বঙ্গালি

অল্প কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের সৌরভ অর্জন করেছে।



সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাস

বিজন ফিরে তাকাল।

—দয়া করে মেজদি বা আর কাউকে আমার কোনো কথা জানাবেন না। আশা করি আমার এই শেষ অনুরোধটুকু রাখবেন।

বলেই, বোধ হয় তার বহু-স্বস্তি-রক্ষিত দীর্ঘ সংস্মের কাঁধটিকে আসন্ন ভাঙনের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্যে সবেগে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। বিজনও মূহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বিজুর মা সে রাতে আর সময় করে উঠতে পারেননি। পরদিন তার সংসারের সকাল বেলার প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই বাস্তু হয়ে এসে পড়লেন। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল? টাকা পেয়েছিছ?

—পেয়েছি; কিন্তু পুরোটা এখনো যোগাড় হয়নি।

আর কত চাই?

নির্মলা দুটো আঙুল তুলে দেখাল। বিজুর মা স্তান মুখে বললেন, মাসের শেষ, আমারও হাতে কিছু নেই। ওকে বললাম, ও'রও সেই অবস্থা।

—ছিঃ ছিঃ, এই নিয়ে আবার ওকেও বিরক্ত করতে গেছেন? এমনভেই যা করছেন আপনারা—

—কী আর করছি বল? করবার দাবী থাকলে তো করবো?

‘বাসায় কে আছে?’ ভেজানো দরজার ওপার থেকে কার গলা শোনা গেল। বিজুর মা বললেন, তুই বস, আমি দেখি। ফাঁপের কাছে এগিয়ে গিয়ে না খুলেই বললেন, কে গা?

—খোলো, বলছি।

ফাঁপটা টানতেই একজন ফেরি-ওয়াল গোছের লোক এগিয়ে এল। মাথায় মস্ত ঝড়ি, তার উপরে গোটা দুই মূখবন্দ টিন, তার পাশে সরাসরি মাটির হাঁড়ি ঝাঁকাটা নামিয়ে রেখে সোকাটি বলল, তুমি—আপনি থাকেন এখানে?

ততক্ষণে নির্মলাও এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে দেখিয়ে বিজুর মা বললেন, না; ও থাকে। কেন?

লোকাটি তাঁফ দৃষ্টিতে দুজনকে লক্ষ্য করে বলল, আপনারা?

—আমরা বামুন।

—পেন্নাম। কিন্তু দারোয়ানজী যে বললে একজন বি থাকে এ বাসায়। ভাড়া দিতে পারেনি বলে মাসের এই কড়া দিন পরেই উঠে যাচ্ছে। তাইতো দেখতে এন্। আমার একটা বাসা চাই কিনা? একখানা ঘর এট-টু রান্নার জায়গা হলেই চলবে। বোধ করি, ভুল করে অন্য বাসায় ঢুকেছি। বড়ো মানুস, ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। আপনারা কিছু মনে করবেন না, মা।

মাথার বিড়োটা ঠিক করে নিয়ে ঝড়িটা তুলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে পেছনে এসে দাঁড়াল বাড়িওয়ালার দারোয়ান। তাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, এই যে দারোয়ানজী দ্যাখতো কাণ্ড। ভুল করে কোথায় ঢুকতে কোথায় ঢুকে পড়েছি। ছিঃ ছিঃ।

—ভুল কেনো হবে? এহি বাসা আছে।

—কিন্তু তুমি যে বললে, কে একজন বি নাকি থাকে সেখানে—

—হাঁ, হাঁ। পছন্দা উস্কো, বি আছে না কী আছে।

চোখের ইঙ্গিতে নির্মলাকে দেখিয়ে নিল দারোয়ান। গোঁফের কোণে এক ঝলক মূর্চক হাসিও দেখা দিল সেই সঙ্গে।

ঝাঁকওয়াল লোকাটি বড় বড় চোখ করে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল নির্মলার দিকে। ফিস্ ফিস্ করে যেন নিজের মনে বলল, বলছ কি তুমি! বামুনের মেয়ে, ঐ রকম লক্ষ্মী ঠাকুরের মত চেহারা—

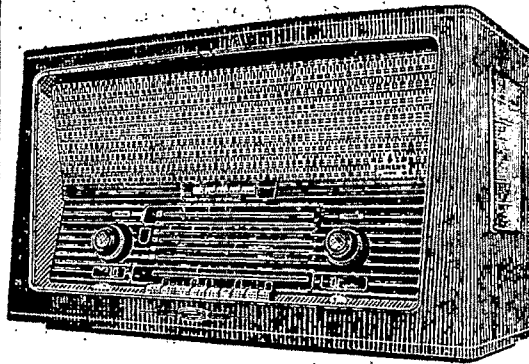
তারপরেই মনস্থির করার ভাণ্ডাতে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, না বাপ, এ বাসায় আমার দরকার নেই। বামুনের মেয়েকে ঘরছাড়া করতে পারবো না।

—ঠিক আছে। তুমি না লেবে জে দোসরা আসবে। ভাড়াটিয়াকা অভাব হবে না।

এই বলেই দারোয়ান চলে যাচ্ছিল।

SIEMENS
INDIA

সিমনস্ — এর
গ্র্যাণ্ড সুপার ৭১০ ডব্লু



৫টি লাইট স্পিকার যুক্ত!

প্যানোরমিক শব্দ বাবস্থা!

পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আন্দামানের পরিবেশকঃ

নান গ্র্যাণ্ড কোম্পানী

৯৭, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা - ১

সিমনস্ গ্র্যাণ্ড সুপার ৭১০—ডব্লু, এ ধরণের এক অম্বিতীয় সেট। ভারতেই তৈরী। সুন্দর ডিজাইন ও সুদক্ষ কারিগরী। পৃথিবীর যেকোনো কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বেতার এ সেট গ্রহণ করতে পারে। নিখুঁত স্পষ্ট শব্দ শুনতে পাওয়ার আনন্দ আপনি এই সেটে পাবেন।

সিমনস্ গ্র্যাণ্ড সুপার ৭১০ - ডব্লুঃ ৯৭২, টাকা ও স্থানীয় কর।
অপর তিনখানি বিশিষ্ট নতুন মডেলও জবিলবে আসছে।
স্পেশাল সুপার ৬১২-ডব্লু-ও ৫৫০, টাকা এবং শুল্ক ও স্থানীয় কর।
স্ট্যান্ডার্ড সুপার ৬১১-ডব্লু-ও ৫৮২, টাকা ও শুল্ক এবং স্থানীয় কর।
সুপার রা ১০১-৩২৪, টাকা এবং শুল্ক ও স্থানীয় কর।

নির্মলা বলল, ঘর আমি ছাড়বো না। সরকার মশাইকে বলে দিও।

—ভাড়া? ফিরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল দারোয়ান

—ভাড়া দিয়ে দেবো।

পুরো?

নির্মলা জবাব দেবার আগেই বিজুর মা অনুরোধের সুরে বললেন, পুরো কি আর পারে, বাবা? বিধবা

বিজুর মার দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে, যেন কত বড় অপরাধ করছে, এমনিভাবে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, মা চাকরুন?

—বল না, বাবা?

—কত টাকা হলে ওদের পুরো ভাড়াটা শোধ যায়?

—বেশী কিছু না, দুটো টাকা।



“ও’কে রক্তাম, ও’রও সেই অবস্থা”

মানুষ; সামান্য কিছু বাকী থাকবে। সেটা আসছে মাসে নিও।

বাকী থাকলে হোবে না। দোসরা ময় দেখো..... বলতে বলতে দারোয়ান দাপটের সঙ্গে বোরিয়ে গেল। সেই দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে ফেরিওয়ালো লোকটি বলল, সব কসইএর দল, বুঝলে মা? দয়াময়ী বলতে কিছু নেই, কোথাও নেই।

কিন্তু সময় গতিকে তাও অনেক হয়ে দাঁড়ায়। বুঝতেই তো পারছ।

লোকটি মাথা নিচু করে কি ভাবল, দু-একবার ইতস্ততঃ করল, তারপর তেমনি কুণ্ডার সুরে বলল, টাকাটা যদি আমি দিয়ে দি?

না, না; তা কি করে হবে? সপ্তে সপ্তে বলে উঠল নির্মলা।

—এমনি তো দিচ্ছি না, মার

দিচ্ছি। তোমার যখন সুবিধে হবে, শোধ করে দিও।

—তাতে হয়তো অনেক দিন লেগে যাবে।

—নাগলই বা। তোমার আশীর্বাদে সেজন্যে আমার কোনো কষ্ট হবে না।

—তাছাড়া তোমাকে তো আমরা চিনি না। কোথায় কেমন করে—

—সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না। আমিই এসে নিয়ে যাবো—বলে, আর কোনো ওজর আপত্তি তুলবার সুযোগ না দিয়েই ফতুরার পকেট থেকে দুটো টাকা তুলে নিয়ে সসজ্জাতে বাড়ির খরল বিজুর মার সামনে। তিনি টাকাটা নিয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার সুরে বললেন, বেঁচে থাকো, বাবা। ভগবান তোমার মংগল করুন। গরিব বিধবার কত বড় উপকার যে করলে তুমি, সে শুধু আমরাই জানি।

—ও সব কথা বলো না, মা। কে কার উপকার করে? যা কিছু করবার এ একজনই করছে—বলে, আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালো।

—তুমি কোন্সায় থাকো, বাবা? জানতে চাইলেন বিজুর মা।

—এই তো কাছই, এখান থেকে আধ কোশটাক হবে। এই রকমই বসিত। পাঁচ বছর আছি সেখানে। বেশ ছিলাম, মা। জমিদারের লোক এসে বলল, সব উঠে যাও।

—কেন?

—তাই দ্যাখো না? ওখানে নাকি নেক্ না কী হবে। বাবুরা 'বাইচ' খেলবে, সাতার কাটবে। তার জন্যে মর তোমরা। গরিবের ঠাই কোথাও নেই, মা। তাদের কথা কে ভাবে? হাই; আজ-কালের মধ্যেই যেখানে হোক একটা আশুতানা দেখতে হবে।

বুড়িটা মাথায় তুলতেই নির্মলা বলল, তোমার টাকা দুটো পেতে কিন্তু কদিন দেরি হবে। এ মাসে বোধ হয় পেয়ে উঠবো না।

তার জন্যে তুমি কিছু ভেটো না। যেদিন পার দিও। আচ্ছা, তাহলে এখন আসি, মা।

বিজুর মা বললেন, এসো। তোমার নামটা তো বললে না, বাবা?

—আমার নাম গোকুল, গোকুল দাস। আমরা হোলাম বাড়রী।

—কী কর তুমি?

—যা দেখছেন; জিনিষ ফেরি করি।
মুড়ি, মুড়িকি, মোয়া, যখন সেটা চলে।
তোমাদের আশীর্বাদে তাতেই চলে যায়।

দিন পূরনের পরে বিকালের দিকে
নির্মলা ঘর কাঁট দিচ্ছিল। বাইরে থেকে
দরজা গলার হাঁক শোনা গেল—মা
ঠাকরুণ আছেন?

—কে?

—আজ্ঞে, আমি গোকুল।

নামটা শুনেই নির্মলার মুখ শুকিয়ে
গেল। টাকা দুটোর জন্যে এ কদিন তার
কিছুমাত্র স্বাস্থ্য ছিল না। দিন কয়েক
হল কাজ অবশ্য একটা জুটেছে। মাইনে
আগের মতই। কিন্তু সেটা হাতে
আসতে এখনো প্রায় এক মাস। এদিকে
ভাড়া মিটিয়ে দেবার পর একেবারে
নিঃসম্পদ অবস্থা। গোকুল যে এরই
মধ্যে এসে পড়বে জানাচ্ছিল না। থাকলেই
বা কী করতে পারত? গিয়ে কী বলবে,
একটা মাস কি করে ঠেকিয়ে রাখা যায়,
এই সব ভাবতে ভাবতে অপ্রসন্ন মুখে
এগিয়ে গিয়ে খাপটা খুলে দিল।
গোকুলের মাথার আজ আর ঝড় নেই।
ভিতরে ঢুকে হাতজোড় করে প্রায় মাটি
ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, এনু একবার
খবর নিতে। আসবার কি আর বো
আছে, মা? দুটি বেলা খালি চরকির
মতো ঘোরা আর ঘোরা, তবে তো দুটো
পরশ আসে। না খাটলে ঘরে বাঁসিয়ে
কে খাওয়া বল? তার ওপরে আবার
বাসা বদলির খামেলা। তোমার আশী-
র্বাদে ঘরখানা ভালোই পেয়েছি। সামনে
এই রকম এটু উঠানও আছে। তা,
তোমার সেই ভাড়ার গন্ডগোল মিটে
গ্যাছে তো? কসাই ব্যাটাদের পাওনা
টাওনা সব চুকিয়ে দিয়েছে?

—হ্যাঁ, সে সব মিটিয়ে দিয়েছি।
তোমার টাকাটা কিন্তু আজ দিতে পাচ্ছি
না, গোকুল।

—কী মুশ্কিল! আমি কি টাকার
ভাগদার এসেছি? সে তুমি যেদিন
খুশি দিও।

—বেশী দেরি হবে না। একটা
নতুন কাজ পেয়েছি। প্রথম মাসের
মাইনেটা পেলেই দিয়ে দেবো।

গোকুলের মুখে একটা স্পান ছায়া
পড়ল। কপালে দেখা দিল কুণ্ডল-রেখা।
বলল, কী কাজ? যা করছিলে, তাই?

—তাছাড়া আর কী করবো, বল?

—না মা ও কাজ তুমি ছেড়ে দাও।
বেরাম্বন, বনছোট, পরের এটো বাটা কি
তোমার কাজে? ওতে যে আমাদেরও
পাপ হয় মা?

নির্মলা বিস্মিত হল। যা শুনল,
শুধু একটা মত নয়, এই নিতান্ত নিম্পর
সামান্য-পরিচিত লোকটির কাছ থেকে
এই গভীর আত্মীয়তার সুর সে একে-
বারেই আশা করেনি। এরই মাঝে তাকে
কিছুক্ষণের জন্যে অভিভূত করে ফেলল।
সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না।
গোকুল মূহূর্তকাল কি ভেবে নিয়ে,
মাথা নেড়ে দুটোর সঙ্গে বলল, না মা,
তোমাকে আর এই ছোট কাজ করতে
আমি দেবো না। তুমি আজই গিয়ে
সেখানে জবাব দিয়ে এসো।

নির্মলার ওষ্ঠ প্রান্তে স্পান হাসি
ফুটে উঠল—নিরুপায়ের করুণ হাসি।
শান্তভাবেই বলল, তা না হয় দিলাম।
তারপর?

—পরের ভাবনা তোমাকে ভাবতে
হবে না। 'মা' বলে যখন ডেকেছি, সে
ভার আমার।

—তা কি হয় গোকুল? এই দুঃসময়ে
যে উপকার তুমি করছ, আমার চিরদিন
মনে থাকবে। তার ওপরে—

—এই দাখ, উৎসাহটা আবার কী
কোরলাম? এতো সামান্য দুটো টাকা।
তাও ধার।

—টাকাটা সামান্য। কিন্তু তার
পেছনে যা রয়েছে, মোটেই সামান্য নয়।
তার ওপরে এই যে খোঁজ খবর নিচ্ছ, এও
কি কম? এমন মাঝে মাঝে এসে এক-
বার করে দেখে যেও; তাহলেই হবে।
যতদিন শান্তি সামর্থ্য আছে, নিজের
শেটটা নিজেরই চালিয়ে নিতে পারবো।
তার জন্যে যেন কারো কাছে হাত পাততে
না হয়, এইটুকুই আমার কামনা।

গোকুল দাঁতে জিব কেটে ঘন ঘন
মাথা নেড়ে বলল, ছিঃ ছিঃ, হাত পাততে
যাবে কোন্ দরখে? তাও আবার
আমার মত ছোট জাতের কাছে। কিন্তু
তোমার এই কাজটা আমার ভালো লাগে
না মা। একলা মানুষ; দুবেলা তিন-
বেলা নয়, একবেলা দুটো নিরিমিয়া।
তার জন্যে তোমাকে পরের বাড়ি বাসন
মাজতে হবে, আমরা থাকতে? এডা
কেমন ধারা কথা?

—আমার কপাল; তোমরা কি
করবে? অন্য কাজ আমাকে দিচ্ছেই বা
কে? জানাও তো নেই তেমন কিছু।

—কে বললে নেই? খাটতে যখন
পেছপাও নও, এক সন্ধ্যা আহা আর
দুখানা বস্তুর, এ তুমি ঘরে বসেই
যোগাড় করতে পার। এ টুকুর জন্যে
তোমাকে পরের দেরি ঘুরতে হবে না।

—আমি তো বুঝতে পারছি না, ঘরে
বসে কী আমি করতে পারি, আর সে সব
ব্যবস্থাই বা কে করবে।

—আমি করবো। তার জন্যে
তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি খালি
একবার গিয়ে তোমার সেই বাসার কাজটা
ছেড়ে দিয়ে এসো।

—এখনই ছেড়ে দেবো?

—হ্যাঁ, এখনই। আর সেখানে
তোমার যেতে দিচ্ছিনে।

নির্মলা তখনও একটু ইতস্ততঃ
করছে দেখে আরো খানিকটা জোর দিয়ে
বলল, তোমার কোনো চিন্তা নেই, মা।
তুমি আমাকে চেন না। গোকুল বাড়ি
বে-সে পান্তর নয়; যা ঘরে তা না করে
ছাড়ে না।...বলে, সগর্বে মাথা নাড়তে
লাগল। তারপর হঠাৎ আসন্ন সন্ধ্যার
ঘনায়মান ছায়ার দিকে নজর পড়তেই
লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। দরজার দিকে
যেতে যেতে বলল, কালকের দিনটা বাদ
দিয়ে, পরশু আবার আসবো। তুমি
কালই গিয়ে ওখানকার সম্পন্ন চুকিয়ে
দিয়ে এসো।

পরক্ষণেই বাইরে থেকে হাঁক শোনা
গেল—খিলজা তুলে দাও, মা।

(ক্রমাগতঃ)

সামান্য পরিশ্রমের উপযোগী
গল্প ও উপন্যাসের সমস্ত বই
কালিকাতার কমিশনে সংগ্রহ করুন।

দ্যামোদর
প্রকাশনা

বর্ধমান শহরের সর্বাধুনিক
পুস্তক বিপণি

॥ বিজয় ভোষণ : বর্ধমান ॥



পোষাক বিলাসিনীদের স্বপ্নবাজ্য পারী

দিলীপ মালবায়

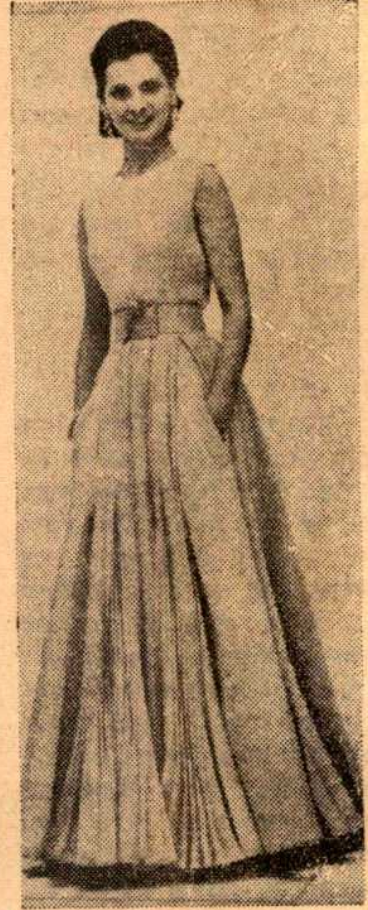


কথায় বলে পারীর ফ্যাশন। পারীর ফ্যাশন প্রবাদ বিশেষ। পারী শৌখিন জিনিসপত্রের কেন্দ্রস্থল। আবার ব্যবসাকেন্দ্র তো বটেই। শৌখিন জিনিসপত্রের মধ্যে শৌখিন পোষাক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহিলা পোষাকের ফ্যাশন-কেন্দ্র পারী। পুরুষদের পোষাকের ফ্যাশন-কেন্দ্র লন্ডন। পারীতে মহিলাদের শৌখিন পোষাকের ডিজাইন প্রতিদিনই বদলাচ্ছে। কোনো বছরে নামকরা শিল্পীদের আঁকা চিত্রপটের রং বা ভাঙ্গা নকল করে চলে হজুক কোনো বছরে বা চলতি নাচের নামকরণে।

এবার যেমন হয়েছে 'টুইশ্ট' নাচের নামে পোষাকের নাম।

ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়া-আফ্রিকায় যেখানেই ইউরোপীয় পোষাকের চলন, সেখানকার মহিলা-মহল সর্বদা পারীর মুখ চেয়ে থাকেন—কবে আবার পোষাকের পরিবর্তন হবে। সেই সূত্রে পোষাকের ব্যবসায়ীরাও।

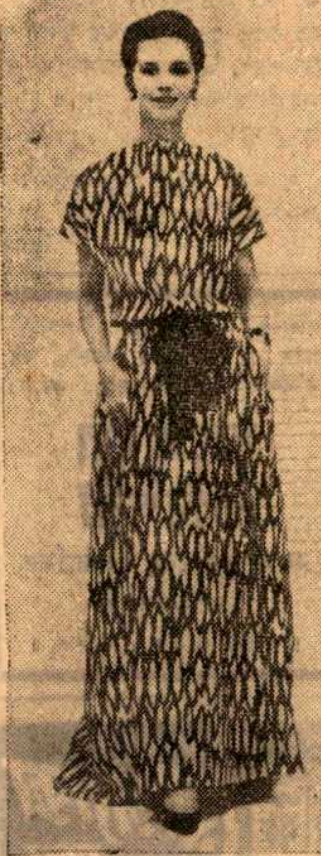
শৌখিন পোষাক আমাদের কাছে বিলাসিতা। কিন্তু ফরাসীদের মতে বিভিন্ন ধরনের শৌখিন পোষাকের ডিজাইন দেওয়া ও তৈরী করা লালিত-কলা শিল্পের একটা অঙ্গ বিশেষ। পারীর এই সব শৌখিন পোষাকের প্রদর্শনীর সম্মান কম নয়। এদের মতে বিভিন্ন ধরনের শৌখিন পোষাকের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নারীর সৌন্দর্যকে আলাও ফুটিয়ে তোলা। তাদের মতে পোষাকের একঘেরেমেতে নারীর সৌন্দর্য ফোটে না বরং তাদের মনে এনে দেয় নিরাশ্রয়। পারীতে পোষাকের দোকান ও দর্জির দোকানের অন্ত নেই। কিন্তু যে-সে, রাম্মা-শাম্মা এই সব শৌখিন পোষাক তৈরী করতে পারে না। পারীতে মাত্র পনেরটি শৌখিন পোষাকের প্রতিষ্ঠান আছে। তারাই মহিলা-জগতে পোষাকের ভাগ্যবিধাতা বিশেষ। তাদের পরিকল্পনায় তিন মাস কি ছ' মাস অন্তর মহিলা-পোষাকের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। এই সমস্ত মহিলা-পোষাকের প্রতিষ্ঠানদের বলা হয়, 'ওত কুচুরিয়ে' অর্থাৎ উচ্চাঙ্গের সীবন শিল্পপালয়। এই সব সীবন শিল্পপালয়ের মালিকরা প্রায় সকলেই লালিত-কলায় পারদর্শী। বিভিন্ন চিত্রশিল্পীর চিত্র থেকে ভাব নিয়ে অনেক সময়ে বিশেষ ধরনের পোষাক তৈরী হয়। বিভিন্ন চিত্রশিল্পীরা যে ধরনের রং ব্যবহার করেছেন, 'ওত কুচুরিয়ে'ও সেই



স্যা লর' সাধ্যাপোষাক

ধরনের রং ব্যবহার করে থাকেন পোষাকে। মহিলার দেহের আয়তন অনুসারে আবার বিভিন্ন ধরনের পোষাকের পরিকল্পনা করা হয়। এই সব শৌখিন পোষাকে শালীনতার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। দেহকে অনাবৃত না রেখে নারীদের বিভিন্ন অঙ্গের পরিস্ফুটনই এদের শিল্পের সার্থকতা। শৌখিন পোষাকের ডিজাইন কখনই এক ধরনের হয় না, কখনো বা মধ্যযুগের ইউরোপীয় পোষাকের অনুকরণে আধুনিক ইউরোপীয় পোষাক, কখনো বা ভারতীয় শাড়ির অনুকরণে বা মোমটার অনুকরণে পোষাকের চলন হয়। কিছুকাল আগে বাঙ্গলা দেশের ধর্মিতর অনুকরণে কয়েকটি পোষাক প্রদর্শিত হয়েছিল। আবার কখনো চীনাঙ্গের পোষাকের অনুকরণেও বহু শৌখিন পোষাকের প্রতিষ্ঠান নতুন পোষাক তৈরী করে। গত বছরের প্রদর্শনীতে মেক্সিকোর আদিবাসীদের পোষাক প্রদর্শিত হয়েছে।

এই সমস্ত শৌখিন পোষাকের কাপড়ও শিল্প প্রদর্শনীর অভ্যন্তর-



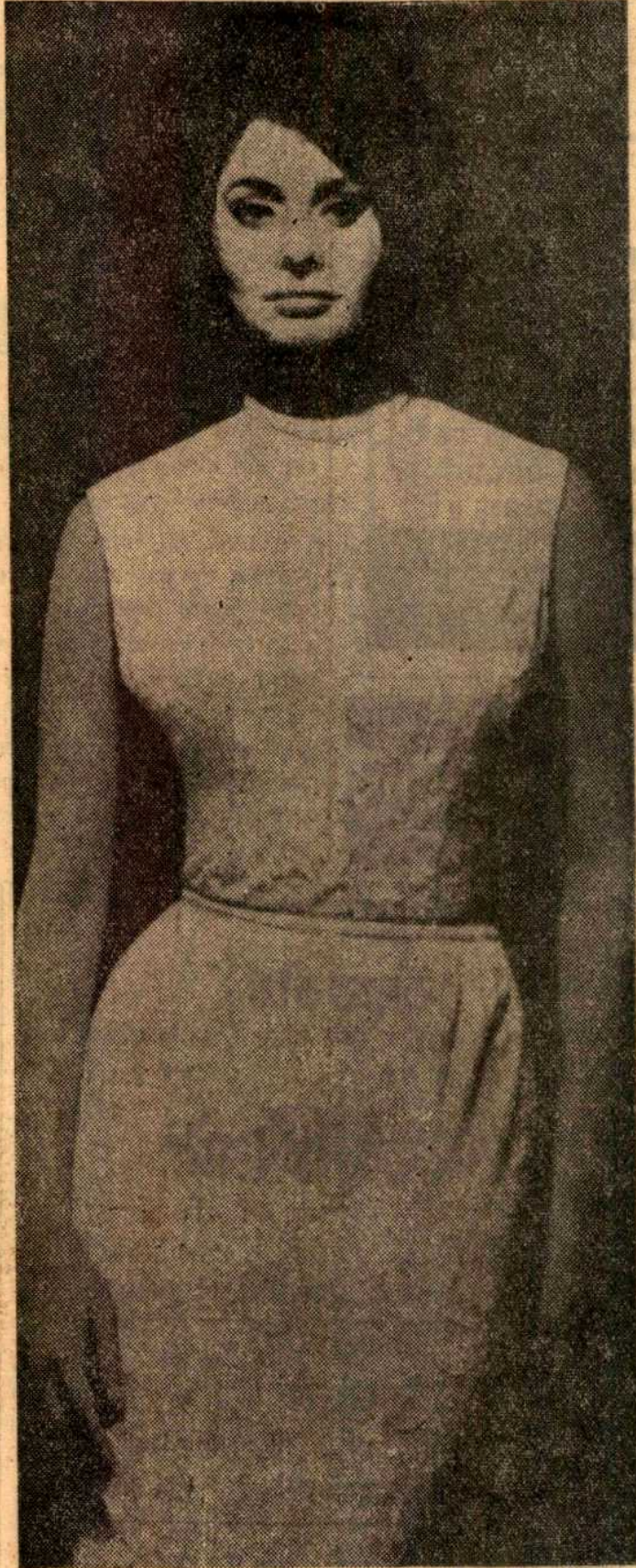
রিশির সাধ্যাপোষাক

মাসিক তৈরী হয়ে থাকে। বড় বড় মিলে এই ধরনের কাপড় সাধারণতঃ তৈরী হয় না। ছোটখাট কাপড়ের কসেই শৌখিন পোষাকের কাপড় তৈরী হয়। এই সব বিশেষ ধরনের কাপড়ের ওপর সময়ে সময়ে হাতের কাজ থাকে।

শৌখিন পোষাকের মডেলদের বলা হয় 'মাইনকা'। বিভিন্ন মাইনকাদের দেহের ওপর পোষাকের মাপ-জোক চলে। অনেকটা চিত্রশিল্পীর মডেলের মতন এই সব মাইনকাদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রদর্শনীতেও এই সব মাইনকারাই বিভিন্ন পোষাক পরে ক্রেতাদের সামনে করেকবার হয়ে যায়। অনেক সময়ে পোষাকের জনপ্রিয়তা মাইনকাদের দেহগুলির ওপর নির্ভর করে। এই সমস্ত মাইনকা এক একজন সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা। উচ্চতায় সাড়ে পাঁচ থেকে ছ ফুট হওয়া চাই। অবশ্য মাপে খাটও হর কখনো। ক্ষীণকটি অপরিহার্য। দেহের সমস্ত অঙ্গ সৌন্দর্যের আদর্শ-স্থানীয় হওয়া চাই। মাইনকাদের মাসিক আর আটশ থেকে দেড় হাজার টাকা। এদের মাইনকা না বলে মেনকা বলা উচিত।

শৌখিন পোষাকের প্রতিষ্ঠান-গুলোতে বছরে দুবার করে প্রদর্শনী হয়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের পোষাকের জন্যে জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে আর শরৎ ও শীতকালের জন্যে জুলাইএর শেষ সপ্তাহে। এবছরের বসন্ত-গ্রীষ্মকালীন পোষাকের নতুন হল আটসাঁট পোষাক বা পরে টুইশ্ট নাচ নাচা যায় সহজে। তবে এবছরে তেমন অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেনি।

সংবাদপত্রে, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় বিশেষ সমালোচনা চলেছে পোষাকের। প্রতি সংবাদপত্রের শৌখিন পোষাক-বিশেষজ্ঞরা এখন বিশেষ ব্যস্ত, আর এই সব সমালোচকদের সমালোচনার ওপর পোষাকের কার্টাও নির্ভর করে। গোটা পনের সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকা তো শুধু এই শৌখিন পোষাককে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয় একমাত্র পারীতে। অন্য দেশে তো আছেই। এই প্রদর্শনীকে বলে



পী ল.রোশ-এর পোষাক

“কালকশির”। প্রথম একমাস শুধু সংবাদপত্র ও বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দালালদের জন্যে পোষাকগুলি প্রদর্শিত

SELLING CASH OR ON INSTALMENTS
big Varieties of:-
**RADIO SETS
RADIOGRAMS
ELECTROGRAMS
TRANSISTOR RADIOS
PHILIPS
TAPE RECORDERS
RECORD PLAYERS
L. P. RECORDS
RADIO PARTS ETC.**
RADIO & PHOTO STORES
65, GANESH CH AVENUE
CALCUTTA-13.
24-4793 Gram-Transistor

ফোন: ৫৫-৪৩৯২
বিদ্যুৎ ডেকারেটর
১১৩ চিত্রব্রজ এডিনিউ-কলিকাতা ৬

হয়। তারপর অন্যান্য ক্রেতাদের জন্যে। সাধারণতঃ জগতের বিভিন্ন পোষাক প্রতিষ্ঠানের দালালরা এই সব পোষাকের মডেল কিনে নিয়ে যায়, তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্যে। এক একটি মডেলের দাম তিন থেকে ছ’ হাজার টাকা।

আগে প্রদর্শনীর সাথে সাথেই সংবাদপত্রে মডেলের ছবি ছাপাতো, এখন সে নিয়ম বদলেছে। প্রদর্শনী হবার একমাস পরে সংবাদপত্রে মডেলের ছবি ছাপা হয়। কারণ, নইলে মডেলের ছবি দেখে ছোট-খাট দোকানদাররা মডেলের নকল পোষাক তৈরী করে সস্তা দামে বিক্রি করে, যার ফলে ‘ওত কুচুরয়ের’ পোষাক অনেকে কিনতে চায় না। তাদের ব্যবসার স্বার্থেই এই নিয়ম করা হয়েছে। প্রদর্শনীর সঙ্গে পোষাকের ডিজাইনগুলোর জন্যে বিশেষ গোপনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কারণ, বিভিন্ন দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চররা এই সব ডিজাইন চুরি করার জন্যে পারীতে ঘোরা-ফেরা করে। এই ধরনের কাজকটি

দুর্ঘটনা কিছুকাল আগে ঘটে গেছে এখানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিখ্যাত পোষাক-পত্রিকা পারীর কোনো এক বিখ্যাত পোষাক প্রতিষ্ঠানের বিনানুমতিতে কয়েকটি পোষাকের ডিজাইন প্রদর্শনীর আগেই প্রকাশ করে। এবং সেই ডিজাইন দেখে নিউইয়র্ক শহরের কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনুরূপ পোষাক তাদের নিজেদের নামেই বাজারে চালু করে। আর একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের ডিজাইন চুরি করে নিউইয়র্কে ছটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠান পোষাক তৈরী করার মামলা চলছিল ছ’ মাস ধরে।

এখন প্রতি বছরে বিক্রির সুবিধার জন্য প্রদর্শনী উদ্‌যোজনের একমাস পূর্বসংবাদপত্রেই ডিজাইনের ছবি বা বিশেষ সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছে না। কারণ, সংবাদপত্রের সমালোচনা ক্রেতাদের মনের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। তাতে নাকি পোষাক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ লোকসান হয়। পত্রিকায় বিভিন্ন পোষাকের প্রতিষ্ঠানের পোষাকের সমালোচনা নিভর করে পত্রিকার মালিকের অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপর। বর্তমানে কয়েকটি কোর্টপাতি একাধারে পত্রিকার আর্থনৈতিক মালিক, বিভিন্ন শিপের মালিক আর অন্যথায় শৌখিন পোষাক প্রতিষ্ঠানেরও মালিক। সুতরাং মালিকের স্বার্থেই পোষাকের সমালোচনা হয়ে থাকে। যে সব পোষাক প্রতিষ্ঠানের প্রচুর বিজ্ঞাপন দেওয়ার সমর্থ নেই, তাদের পোষাক সম্বন্ধে পত্রিকায় বিশেষ তেমন সুখ্যাতি বরে সমালোচনা বেরোয় না।

পারীর শৌখিন পোষাকের ব্যবসায় প্রাতি বছরে দেড়শত কোটি টাকার লেন-দেন হয়ে থাকে। আর প্রায় পাঁচ লাখ লোক এই ব্যবসায় নানাভাবে জড়িয়ে আছে। এই ব্যবসা ফ্রান্সের একচেটে ব্যবসা। শৌখিন পোষাকের সঙ্গে আসে এসেন্স-সুগন্ধি আতর ইত্যাদি দ্রব্য। জগৎবিখ্যাত এসেন্সগুলো এই সব শৌখিন পোষাক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি।

মহাশয় বিচিত্রার সংযোজন

ভারততীর্থ

অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য রচিত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মনোরম কাহিনী। দুই টাকা।

মহামোড়িয়েট

মৈত্রেয়ী দেবী রচিত রূপ ভ্রমণ কাহিনী। রাশিয়ায় রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও প্রচার বিবরণ। তিন টাকা পঞ্চাশ নং পঃ।

সমারসেট মম-এর

আবরণ

সুজন বিশ্বাস অনুদিত The painted veil এর পূর্ণাঙ্গ সাবলীল অনুবাদ। পাঁচ টাকা।

বিচিত্র

৬ বাক্স চার্টার্ড স্ট্রিট কলি-১২

বিদেশী গল্প

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে তারা ডাইনিং রুমের ভ্যাপসা গরম আর চোখ-ধাঁধানো আলো থেকে বাইরে এসে ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়াল। হাতের তালুর ওপর চিবুকাটি রেখে চোখ বন্ধ করল মেয়েটি। এই তম্বীর প্রত্যেক ভঙ্গীতে স্নিগ্ধ সুষমা ফুটে ওঠে। সে তার স্বাভাবিক মধুর হাসিতে বিভোর হয়ে বসে :

“আমি একেবারে মাতাল হয়ে গেছি। আমি একেবারে বম্ব পাগল। তোমার বাড়ি কোথায়? কোথা থেকে আসছ? তিন ঘণ্টা আগে আমার ধারণাও ছিল না যে, পৃথিবীতে তুমি আছ। তুমি কোথা থেকে এই স্টীমারে উঠলে তাও আমি টের পাই নি। কোথা থেকে উঠলে? সামারা থেকে? যাকগে, তাতে কিছ্ আসে যায় না। আমার মাথাটা ঘুরছে, না আমরাই ঘুরে যাচ্ছি?”

সামনে বিস্মৃত আলো, অন্ধকার। অন্ধকার থেকে বয়ে আসা মৃদু ও উষ্ণ বাতাস তাদের মুখের ওপর ভেঙে পড়ছে। একটা বস্তু তৈরী করে আলো তাদের পাশ কাটিয়ে ছুটে যাচ্ছে। জলের বাল্কম রেখার ভিতর দিয়ে স্টীমারটা একটা ধাক্কা দিয়ে জাহাজ-ঘাটায় থামল।

লেফটেন্যান্ট মেয়েটির হাত তুলে নিল। দিল ওষ্ঠের স্পর্শ। সুগঠিত সুন্দর ছোট হাত, রৌদ্রের গন্ধ লেগে আছে। আর সে ভাবল এই পোষাকের তলায় যে শরীর লুকিয়ে রেখেছে মেয়েটি তা আরও কত সুন্দর ও দৃঢ়। সেখানে আরও গাঢ় রৌদ্রের গন্ধ। দক্ষিণের সমুদ্রের গরম বালির ওপর পুরো একটা মাস রৌদ্র-স্নান করে ফিরছে মেয়েটি। (আনাপা থেকে ফেরার পথে এই গল্পই করেছে সে।) এই কথা ভাবতে ভাবতে লেফটেন্যান্টের বুক শঙ্কা ও আনন্দে ভরে উঠল।

সে বসে, “চল নেমে পাড়.....”
মেয়েটি অবাক। জিজ্ঞাসা করল,
“কোথায়?”

“এখানে, এই জাহাজ-ঘাটে।”
“কেন?”

উত্তর দিল না লোকটি। মেয়েটি আবার তার হাতের তালুর ওপর উষ্ণ গাল রেখে বসে, “পাগল একটা.....”

নিরস কণ্ঠে লোকটি আবার বললে,
“চল। আমি তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই।”

ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বললে, “তবে তাই হোক।”

স্টীমারটি জাহাজ-ঘাটায় সজোরে ধাক্কা খেল। এ-ও গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল। স্টীমারের কাছ টানা হচ্ছে। স্টীমার একটু পিছিয়ে এল। জলকল্লোল হল স্পষ্টতর। ঘাট থেকে স্টীমার অবাধ কাঠ পাতা হল। লেফটেন্যান্ট তার জিনিসপত্র ঠিক করে নিল।

একটু পরেই দেখা গেল তারা নিরুদ্ম টিকিট-ঘরের পাশ দিয়ে পায়ের পাতা-ডোবা আধাভজে বালির ওপর দিয়ে ধলোয় ধুসারিত একটা ঘোড়ার গাড়ির



পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা গাড়িতে উঠল। গাড়ি যাচ্ছে ধুলোয় নরম ঢালু পথের ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে নজরে পড়ছে বাঁকানো ল্যাম্প-পোস্ট। কিন্তু এই পথের যেন শেষ হবে না। একটু পরে গাড়ি চড়াই-এর দিকে উঠতে লাগলো। পাথুরে পথের নড়িতে গাড়ির চাকা কাঁচ-কাঁচি আওয়াজ তুলছে। এখানেই বোধহয় এই শহরের বাজার। বাজার যদি নাও হয় তবে বাজারের মত কিছু হবে। তারপর এল সরকারী অফিস; তারপর গম্বুজ। গরমকালের রাতি নৈমেছে মফঃস্বল শহরে। সেই রাতির উষ্ণতা ও গন্ধ পাচ্ছে ওরা। গাড়ি থামল একটা হোটেলের দরজায়। দরজায় আলো জ্বলছে। ওরা দেখতে পাচ্ছে সেই আলোর ওপারে কাঠের সিঁড়ি সোজা ওপরে উঠে গেছে। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে লালচে সার্ট আর ফারকোট পরা দারোয়ান। দারোয়ানের ঢের বয়স হয়েছে। দাড়ি কামায়নি বহুদিন। গাড়ি থামতেই সে জিনিসপত্র কাঁধে নিয়ে এদের আগে আগে গেল। দারোয়ান ওদের নিয়ে এল বড় একটা ঘরে। ঘরটা বড়, কিন্তু আলো-বাতাস নেই। সারাদিন রোদের তাতে ঘরটা তখনও আগুন হয়ে আছে। জানালায় দেখা যাচ্ছে সাদা পর্দা আর দুটো নোতুন বাতি। ওরা ঘরের ভেতর পা দিতেই দারোয়ান ঘরের বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। লেফটেন্যান্ট মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল প্রবল আবেগে। সাড়া দিল মেয়েটি। ওদের পরস্পরের ওষ্ঠ মিশে গেল নিরুদ্দ্ব কামনায়। আবেগের এই চূড়ান্ত মুহূর্ত তারা সারা জীবন মনে করে রেখেছে। সারা জীবনে আগে তাঁর অনুভব কখন আসে নি।

বেলা দশটা বেজে গেছে। অশ্রুত সূর্য উঠেছে। গলে পড়ছে রোদ। গরম লাগছে বেশ। চারদিকে খুশি-খুশি ভাব। দূরে চার্চের ঘণ্টা বাজছে। বাজারে উঠেছে মৃদু গুঞ্জন। খড় আর আলকাতারার গন্ধ একসঙ্গে মিশে ঘোষিত হচ্ছে রাশিয়ার মফঃস্বল শহরের বৈশিষ্ট্য। এমন সময় 'নামহীন আগন্তুক', এই মহিলাটি, চলে গেল। ও নিজের নাম কখন বলে নি। নিজেকে বলেছে 'নামহীন আগন্তুক'। ঠাট্টা করেই বলেছে। কিন্তু এই ঠাট্টাই থেকে গেল। সারা রাত তাদের প্রায় ঘুম হয়নি; ভোরের দিকে চোখ বজে এসেছিল। মেয়েটি হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে যখন বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল তখন মনে হল তার বয়স ষড়্জের সাতেকো। ওকে কি খুবই

লজ্জিত দেখাচ্ছে? না, খুব বেশি নয়। বরং সে আগের মতই হাসিমুখি ও প্রাণবন্ত। সে তার স্বভাবের স্বাভাবিকতায় প্রাণ-চঞ্চল। দাগ পড়েনি কোথাও।

আবার একসঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব করতেই মেয়েটি বলে উঠল, "না, না, তা হয় না। না তুমি যেও পরের স্টীমারে। আমরা একসঙ্গে যাবো না। তা হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তা সহ্য করতে পারবো না। আমি তোমাকে একটা সত্যি কথা বলছি, শোন। তুমি যা আমাকে ভাব তা আমি একেবারেই নই। আমার জীবনে এমন ঘটনা আগে কখন ঘটেনি আর ভবিষ্যতে কোনদিনও ঘটবে না। এ যেন অকস্মাৎ গ্রহণ ঘনিরে এল..... কিংবা কি বলব আমাদের দু'জনকেই কী একটা নেশায় পেয়েছিল..... এ যেন 'সান-স্ট্রোক'.....!"

বাধ্য হয়ে রাজী হল লোকটি। স্টীমার ছাড়ার আগেই ওরা জাহাজ-ঘাটে পৌঁছল। লেফটেন্যান্ট তখনও খুশী, তখনও লঘু ও চঞ্চল। ডেকে বহু লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরা চুমু খেল। অল্পক্ষণ পরেই স্টীমার ছেড়ে দিল। লাক্ষিয়ে পড়ল লেফটেন্যান্ট।

আগের মত খুশী ও হালকা মেজাজ নিয়ে সে ফিরে এল হোটেলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার মধ্যে পালা-বদল আরম্ভ হয়েছে। সে যেন অন্য ঘরে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি যখন ছিল তখন ঘরটি দেখাচ্ছিল আরেক রকম। তার অস্তিত্বে এখনও ঘরটি পূর্ণ—আবার শূন্য। অশ্রুত! মেয়েটি গায় মেথোঁছিল ওঁড়িকোলন। এই গন্ধ ঘরে ভাসছে এখনও। সব চা যায় নি। কাপে কিছুটা পড়োঁছিল। চা-সুন্দর কাপও রয়েছে টেবিলে ওপর। কিন্তু মেয়েটি আর নেই। আদ্র কোমলতার লেফটেন্যান্টের বুক ভরে উঠল। সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে থাকলো সে।

মনে হল তার চোখ জলে ভরে আসছে। তাই হেসে উঠে সে বললে, "কি অশ্রুত ঘটনা! আমি তোমাকে একটা সত্যি কথা বলছি, শোন। তুমি আমাকে যা ভাব তা আমি একেবারেই নই। আর সে চলে গেছে, সেই অশ্রুত রমণী!"

সেই বিছানা পাতা আছে। ও যেন বিছানার দিকে আর তাকাতে পারছে না। বিছানার পাশে পর্দাটা টেনে দিল। বাজারের গুঞ্জন, গাড়ির চাকার আওয়াজ কানে আসছিল। ও আর এ সব শুনতে চায় না। জানালাটা বন্ধ করে সোফায় গা

এলিয়ে দিল। ঠিকই, এখানেই পর্বান্ত হওয়া উচিত। মেয়েটি চলে গেছে। এতক্ষণ বহুদূর গিয়ে থাকবে হয়ত। হয়ত সে লাউজে বসে আছে কিংবা হয়ত দাঁড়িয়ে আছে ডেকে। দেখছে তার চারপাশে বিপুল নদী রোদে ঝিকিয়ে উঠছে, পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে জলজ উদ্ভিদ, দূরে হ'লদে ঢালু তট, আর ভলগার বিশাল বিস্তৃপ্ততার জল আর আকাশের নিবিড় দিগন্ত। বিদায়, তা হলে চিরকালের মত বিদায়। আর কোথায় দেখা হতে পারে? সে সম্ভাবনা কোথায়? লোকটি ভাবল, "না আমি পারবো না। না আমি কিছুতেই সেই শহরে যেতে পারবো না, যেখানে সে, তার তিন বছরের মেয়ে, তার স্বামী আর পরিবার পরিজন নিয়ে আরও দশপাঁচটা গৃহস্থবধূর মত অতি সাধারণ জীবন কাটায়।" আবার একবার মনে হল মেয়েটি যে শহরে বাস করে সে যদি হত এক অশ্রুত বিচিত্র শহর। একেবারে অতুলনীয়, অনন্য, অনবদ্য সেই শহর। পৃথিবীতে আর তার জুড়ি নেই। মনে হল, মেয়েটি যদি সেই বিচিত্র শহরে একা-একা থাকত, ভাবত তাদের দৈব-মিলনের কথা। আর এদের দেখা হত না কোনদিন, কোন দিন আর! না, এই অসম্ভব কথা সে কি করে ভাবছে! এই সব নিরর্থক, আজগুবি, আবাস্তব চিন্তার কোন মানে হয়! কিন্তু সে বিচিত্র বস্ত্রণয় কাতর। ভবিষ্যত মনে হয় নিষ্ফল অন্ধকার। এ কথা ভাবতেই ভয় আর হতাশায় তার দেহ মোচড় দিয়ে উঠল।

"কি আপদ!" এই ভেবে লোকটি উঠে দাঁড়াল। ঘরময় পায়চারি করতে থাকল। পর্দাটা ফাঁক করে বিছানাটা আর একবার দেখল। "...আমার কি হয়েছে? না, এই কি প্রথম আমি একজন মহিলার সঙ্গে.....। তা নয়। তবে তার মধ্যে এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে? সত্যি সত্যি কি হয়েছে আমার? মনে হয় এ যেন সান-স্ট্রোক! কিন্তু আসল কথা আমি কি করে সময় কাটাব। ওকে ছাড়া এই অপরিচিত শহরে কি করে কাটাব সমস্ত দিন?"

লোকটি ভাবতে থাকে। এখনও তার সব মনে পড়ে। খুঁটিনাটি বিবরণও বাদ যায় না। সে টের পায় মেয়েটির জামাকাপড়ের গন্ধ, তার অটুট সুন্দর শরীর, তার কণ্ঠের প্রাণবন্ত স্বাভাবিক সুর। মনে পড়ল সেই রমণীর অপরূপ উজ্জ্বাসময় নারীত্ব যা তাকে মাতিয়ে রেখেছিল। তবু আর এক সত্য আছে। অচ্ছে আর একটি অনুভব। মেয়েটি যতক্ষণ তার

কাছে ছিল ততক্ষণ সে টের পায় নি। সে বৃথাতেও পারে নি তার মধ্যে অন্য এক বোধ এমন তীব্রভাবে কোনদিন কাজ করতে পারে। সে কল্পনাও আসেনি আগে। যখন এই দৈব-মিলনের প্রথম সূর্যপাত হয়; তখন সে ভেবেছিল একটা মজার ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। বেশ আনন্দের, স্ফূর্তির ব্যাপার! কিন্তু এ কী অনদ্ভব তাকে গ্রাস করছে এখন! “সব-চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমার এই যে আমি এই কথা আর কোনদিন তাকে শোনাতে পারব না”, সে ভাবল। “কি করবো আমি এখন? তার স্মৃতি আর সেই স্মৃতির সান্নিধ্যহীন যন্ত্রণা নিয়ে আমি কি করে কাটাব সমস্ত দিন এই ভলগা-পারের পান্ডববর্জিত শহরে? অথচ এই ভলগার উপর দিয়েই সে লালচে রঙের একটা স্টীমারে চলে গেছে।”

এই চিন্তা থেকে মুক্তি তাকে পেতেই হবে। মনকে ডোবাতে হবে অন্য কিছুর ভিতর। তাকে যেতে হবে অন্য কোথাও। খুব দুর্ভাগ্যে উঠে দাঁড়িয়ে সে মাথার টুপি পরে নিল, হাতে নিল ছাড়ি। ফাঁকা বারান্দা দিয়ে জুড়োর দ্রুত শব্দ তুলে সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে সোজা এসে দাঁড়াল হোটেলের দরজার সামনে। কিন্তু কোথায় যাবে? দরজার সামনেই ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোচোয়ানের বয়স বেশী নয়। পরিপাটি বেশভূষা। সিগারেট টানতে টানতে সোমারীর জন্য অপেক্ষা করছে। ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট। ও কি করে গাড়ির ওপর বসে ওমন নিরুদ্বেগ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সিগারেট খেতে পারে? বাজারের দিকে যেতে যেতে লোকটি ভাবল, “হয়ত এই শহরে একমাত্র আমিই অসুখী!”

বাজার ভেঙে এসেছে। লোকটা বাজারের ভিতর দিয়ে এলোমেলো ঘুরতে লাগলো। এলো গাড়িবোঝাই শশার নিকটে, পা দিয়ে পরখ করে দেখল গাদা-করা নতুন সার, হাঁড়ি-কলসির দোকানের পাশে এসে দাঁড়াল। খরন্দার ভেবে মেয়ে-দোকানীরা ওর দিকে তাকিয়ে দেখল। হাঁড়ি-কলসি বাজিয়ে বাজিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল, বললে, “এমন জিনিস আর কোথাও পাবে না।”

• বাজারটাকে কী অসহ্য রকমের স্থূল মনে হল তার! সে গেল গির্জার দিকে। প্রার্থনা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। কিন্তু এখনও উচ্চ-কণ্ঠ সঙ্গীতের রেশ সুস্পষ্ট। নদীর পারে ইস্পাত-খুসর পরিসরে একটা পাহাড়ের

চুড়ায় যে অনাদৃত বাগান ছিল, লোকটা সেই বাগানের ভিতর বারবার ঘুরতে লাগলো।... রোদ জ্বলছে যেন। জামার বোতাম আর কাঁধের ওপর সেনাপতির তকমাটা তেতে উঠেছে। কপালের ওপর টুপিটা এটে আছে আর তার চার পাশে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মৃদু পড়ে যাচ্ছে। হোটেলের ফিরে খুবই আরাম বোধ করল সে। ঠান্ডা, নিজস্ব, প্রশস্ত খাবার-ঘরে ঢুকে প্রাণ জড়িয়ে গেল। তাড়াতাড়ি টুপিটা খুলে জানালার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। খোলা জানালা দিয়ে আসছে গরম বাতাস। হোক গরম, তবু বাতাস। সে খাবার আনতে বলল।

সব কিছুই সুন্দর। প্রত্যেকটি বস্তু অপরিমিত আনন্দ আর বিপুল তৃপ্তিতে অভিষিক্ত হচ্ছে তার চার পাশে। এমন কি এই গরম, বাজারের গন্ধ, এই অশুভ বিদ্রী মফঃস্বল শহর আর তারই হোটেল আনন্দে পরিপূর্ণ; তবু তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। সে পর পর কয়েক গ্লাস ভডকা খেল। খেতে খেতে মনে হল যদি কোন অলৌকিক যাদুমন্ত্রবলে তার সেই নাম-হীন আগন্তুক যদি আর একবার আসত, যদি সে শব্দ আর একটা মাত্র দিন তার সঙ্গে কাটাতে পারত, শব্দ তার সঙ্গে থাকতে পারত যদি, প্রমাণ করতে পারত, তাকে বোঝাতে পারত যে সে তাকে কত গভীর ভালবাসে; তবে সে ঠিক তারপরের দিনই কোন খেদ না নিয়েই মরতে পারত। কিন্তু এ প্রমাণ করার কি দরকার? তাকে বোঝানোরও বা কি প্রয়োজন? সে জানে না কেন। কিন্তু বাঁচার চেয়েও তার

প্রয়োজন যে আরও গভীর, সে এই কথা বৃথাতে পেরেছে।

প্রথম গ্লাস ভডকা ঢেলে নিয়ে সে নিজের মনেই বিড় বিড় করে উঠল, “আমার শিরাগুলো জ্বলে যাচ্ছে।”

খাবারের ডিশ সরিয়ে দিল সামনে থেকে। দুধহীন কফি আনতে বলে সিগারেট ধরিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলো কি করে মৃদু ফেলা যাবে এই আকস্মিক ও অপ্ৰত্যাশিত প্রেম। কিন্তু মৃদু দেওয়া অসম্ভব। এই বোঝা নামাবার নয়। হঠাৎ টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে ছাড়ি আর টুপি হাতে করে নিয়ে পোস্ট অফিসের দিকে বেরিয়ে পড়ল। মনে মনে তৈরি করে নিল টেলিগ্রাফের বয়ান। সে লিখবে : “এখন থেকে আমার গলা আমার জীবন তোমার হাতের মতোই।” পোস্ট অফিসটা একটা পদ্রনো বাড়িতে। টেলিগ্রাফ কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল সে। মেয়েটি যে শহরে বাস করে তার নাম সে জানে। জানে মেয়েটির স্বামী আছে, আছে তার তিন বছরের কন্যা। কিন্তু নাম জানে না। স্টীমারে ডিনারের সময় আর হোটেল সে বহুবার মেয়েটিকে তার নাম বলতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু সে একবারও বলেনি। প্রতিবারই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কখন মৃদুকণ্ঠ বলেছে, “কেন তুমি আমার নাম জানতে চাইছ? ধর, আমি সেই রূপকথার রাজকন্যা। এই ভাল। তাই না?”

পোস্ট অফিসের গায়েই ফটোগ্রাফারের দোকান। সামনেই টানানো আছে একটা

আরও মজবুত... আরও ভাল

পিতলের তৈরী
বার্ণার টিউব

‘কিমান’ লাইট
‘স্পেশাল কোয়ালিটি’
গ্যাস সঞ্চয়ী হয়বেন।



সর্বোৎকৃষ্ট

২৩৩, ৩৩৩ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন-২২-৬৫৮০

অফিসারের ছবি। সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকিল। অফিসারের কপালটা ছোট, বুক টান করা। অনেকগুলো পদক ঝুলছে। ...কিন্তু কী ভীষণ স্থানে, অর্থ-হীন, ভয়াবহ এই সব দৈনন্দিন জীবন আর জীবনের তুচ্ছতা যখন প্রাণবন্তগায় কাতর—হ্যাঁ, সে এবার ঠিক বুঝতে পেরেছে,—যখন হৃদয় বেদনায় অভিভূত, যখন ভাল-বাসা প্রবল, আনন্দ যখন অপরিমিত। কী বা-মূল্য আছে এই দৈনিক জীবনের তুচ্ছতার?

তারপর চোখ গিয়ে পড়ল নব-বিবাহিত দম্পতির ছবির ওপর। বরের গায়ে কোট, গলায় সাদা টাই। ছাঁটা চুল। বৌয়ের হাত ধরে খজুড় ও আড়ল্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ খামল একটা ছাত্রীর ছবির ওপর। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর হিংসায় তার বুক ভরে উঠল। যেসব লোক কখন যন্ত্রণা ভোগ করে নি, কখন কষ্ট পায় নি, তাদের প্রতি হিংসায় সে পূর্ণ হয়ে উঠল। চোখ ফিরিয়ে আনল রাস্তায়।

“আমি কোথায় যাবো? কী করব আমি?”

জনহীন পথ। বাড়িগুলো সব এক রকম দেখতে। দোতলা। সাদা রঙের বাড়ি। মধ্যবিত্তদের আবাস। বড় বাগান। কিন্তু দেখে মনে হয় বাড়িতে জনপ্রাণী নেই। রাস্তায় ধুলোর সাদা কাপেট পাতা। কিন্তু চারদিক আলোর আলোয় অন্ধ। সূর্যালোকে ভেসে যাচ্ছে সব কিছু। আলো, আনন্দিত কামনায় তাঁর আলো। কিন্তু এই সূর্যালোকও এখানে যেন একটু বেমানান। পাহাড়ের ওপর দিয়ে পথ বেকে গেছে। মনে হচ্ছে স্বচ্ছ ও কম্পিত আকাশের মধ্যে গিয়ে মিশেছে সেই পথটা। এ পথে আছে দক্ষিণের ইংগিত। এ পথের দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ল সেবেস্তাপোল...কারচ... আনাপার কথা। তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়ে নিল সে। জ্বলন্ত রোদের জন্য সোজা-সুজি তাকাতে পারছে না সে। তাই বাঁকা চোখে মাটির দিকে তাকাতে চেষ্টা করল। হাঁটতে আরম্ভ করল। কিন্তু যেতে পারছে না। পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে। হোঁচট খাচ্ছে। কোনক্রমে টলতে টলতে এগিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট।

হোটলে ফিরে এসে মনে হল ক্লান্তি ও শ্রান্তিতে সে চুরমার হয়ে গেছে। মনে হল সে যেন এখনি সাহারা মরুভূমি পাড়ি দিয়ে এসেছে। কোনক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে সে তার নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। নিজের প্রশস্ত ঘর। পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। মেয়েটির কোন চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এই ঘরে। কেবল পড়ে আছে তার একটা চুলের কাঁটা। বিছানার পাশের ছোট টেবিলের ওপর সে নিজেই রেখেছিল এই পিনটা। সে খুলে ফেললো সৈনিকের পোষাক। আয়নায় নিজেকে দেখল। সেনা বিভাগের অতি সাধারণ অফিসারের মুখের মত তার মুখ। রোদে পোড়া, ককর্শ। গৌফের উজ্জ্বলতা নেই, রোদে কলসে গেছে। চোখের মণিতে নীল রঙের অস্পষ্ট আভাস। সেই মুখ এখন কী উদ্ভবন, সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে কী এক ক্যাপামি। সে সোজা বিছানায় চিং হয়ে শুয়ে পড়ল। পায়ে জুতো আছে, তাই জুতো সমেত পা দুটো তুলে দিলো খাটের বাজুর ওপর। জানালা খোলা, কিন্তু পর্দা ফেলা আছে। মাঝে মাঝে ঘরে আসছে এক ঝলক বাতাস। সেই বাতাসের সঙ্গে আসছে আগুনের হলকা, আসছে নিজের ও নিঃশব্দ জগতের সংকেত। মাথার তলায় হাত দিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। চোখ জলে ভরে এসেছে। দাঁতে দাঁত চেপে তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করল সে। কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙতেই দেখল পর্দার ওপারে সূর্য জ্বলত যাচ্ছে। তার আভায় অপরিমিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আকাশ। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলাও কষ্টকর। ঘরটা উন্নতের মত গরম। তার মনে পড়ল গত দিনের কথা, মনে এল আজকের সকালের কথা। কিন্তু সেও যেন দশ বছর আগের কথা।

সে। আস্তে আস্তে হাত মুখ ধুয়ে নিল। পর্দাটা তুলে দিয়ে বেল বাজালো। আনতে বললো চা আর বিল। খুবই সুস্থির ভাবে লেবু দিয়ে চা খেতে লাগলো লেফটেন্যান্ট। তারপর গাড়ি ডাকতে বললো। দারোয়ান তার সন্টকেশ তুলে দিল গাড়িতে। গাড়িতে বসে দারোয়ানকে দিল পাঁচ রুবল বকশিস।

ঘোড়ার গাড়ির লাগামটা হাতে নিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে কোচোয়ান, “কাল রাতে আপনি আমার গাড়িতেই এসেছিলেন।”

গাড়ি যখন জাহাজঘাটে এল তখন ভলগার ওপর ঘনিয়ে আসছে গ্রীষ্মের নীলাভ সম্মা। নদীর আশে-পাশে ইতঃস্তত জ্বলছে বহুবর্ণের ছোট ছোট আলো। স্ট্রিমারের মান্ডুলের ওপর ঝুলছে লন্টন।

কোচোয়ান বললে, “আপনাকে ঠিক সময়ে পেঁাছে দিয়েছি।”

তাকেও পাঁচ রুবল বকশিস দিয়ে টিকিট কেটে সে নেমে এল ঘাটে। স্ট্রিমার এসেছে। গতরাত্রির মতই থান্ডা খেল ঘাটে। মাথাটা একটু ঘুরে গেল। গতরাত্রির মতই স্ট্রিমারের কাছ টানা হল। স্ট্রিমারের ঘুরন্ত চাকার জন্য জল পাক খেতে থাকলো গতরাত্রির মতই। স্ট্রিমারে অনেক লোক। সব কটা আঁধো জ্বলছে। রান্নাঘর থেকে খাবারের গন্ধ ভেসে আসছে। এইবার সে যেন তৃপ্ত হয়ে উঠল, এইবার সে যেন বন্দুখ খুঁজে পেল।

এক মিনিট পরেই স্ট্রিমার ছেড়ে দিল। সেই একই পথ, একই নদী। মেয়েটি গিয়েছে সকালের স্ট্রিমারে। সে যাচ্ছে এখন।

সূর্যাস্তের রঙ মিলিয়ে গেল। গভীর হল গ্রীষ্মের রাত্রি। বিস্তীর্ণ হয়েছে বিপুল অন্ধকার। সামনের দিকে ছাড়িয়ে পড়ছে। দূরে ও নিকটে কাঁপছে আলোর ঘুমন্ত প্রতিবিন্দ। জল-কল্লোলে ভেঙে যাচ্ছে সেই আলোর মৃদু রেখাগুলি। ভেঙে ভেঙে জ্বলছে, চারপাশের আবিস্ট অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছে, দূরে, দূরে, বহু দূরে.....!

ডেকে চেয়ার পেতে বসে আছে লেফটেন্যান্ট তার বুক পাথর জমে উঠেছে। মনে হচ্ছে তার বয়স আরও দশ বছর বেড়ে গেছে।

অনুবাদ : রান্না বন্দু

ইভান বুনিন (১৮৭০-১৯৫৩) রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। ভুগেনিভ ও টলষ্টয়ের মত রাশিয়ার জীবন ও নিসর্গে মূখ্য বুনিনের রচনায় পাওয়া যায় কবিতার ঐশ্বর্য। কিন্তু গৌকির মত দ্রুত বিখ্যাত তিনি হন নি। গৌকির সঙ্গে বুনিনের বন্ধুত্ব ছিল। রুশ বিপ্লবের পর বুনিন গ্যারিসে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৩৩ সালে বুনিনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি সাম্যবাদীদের প্রতি প্রসন্ন হতে পারেন নি কোনদিন। ১৯৫৬ সালের পর বুনিনের বহু গ্রন্থ রুশ দেশে পুনরায় প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। —অনুবাদক



আর্থনিক জীবন যোগ্যত্ব অমৃত

আর.জি.দে.সব

১১১-ব্রহ্মজয়র স্ট্রীট • কলিকাতা

নির্বাচনের প্রচার কৌশল মেতাজ মজুমদার

ভারতবর্ষে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন কর্তৃক সপ্তাহ হ'ল শেষ হয়েছে। হিমাচল প্রদেশ থেকে শুরুর করে কন্যা-কুমারিকা, এদিকে আসাম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সুবিস্তৃত আমাদের এই মাতৃ-ভূমির প্রত্যেকটি গ্রাম জনপদ এই নির্বাচনের সময় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল—পরিমাণে কোথাও কম, কোথাও বেশি। কিন্তু এই বিশাল ভূখণ্ডের একজন মানুষও ছিল না যে এই নির্বাচনের কথা না জানতো, 'ভোট' বলে একটা জিনিস আছে তা না বুঝতো—যদিও নির্বাচন বা ভোটের তাৎপর্য সে সঠিকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপলব্ধ করেনি। পূজো-উৎসব ইত্যাদির মধ্যে যেমন একটা উদ্দীপনার, হৈ-হুল্লোড়ের অনিবার্যতা আছে, সেই জিনিসটা এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের মন বৃন্দী ও হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল।

লোকের মন বৃন্দী ও হৃদয়কে স্পর্শ করার জন্য যে-সব দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন তাঁদেরও আয়োজনের চেষ্টা ছিল না। হ্যান্ডবিল, পোস্টার, হোডিং, ব্যাঙ্গচিত্র, বক্তৃতা ইত্যাদি তো ছিলই—এবার নতুন যোগ হয়েছে চলচ্চিত্র। সংবাদ প্রকাশ, নিখিল ভারত কংগ্রেস এবার একটি এক হাজার ফুটের চলচ্চিত্র পশ্চিম, মধ্য, উত্তর ও পূর্ব ভারতে দেখিয়েছেন,—এই সবাক চলচ্চিত্রটির বিষয়বস্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসের দান, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর দেশগঠনে কংগ্রেসের ভূমিকা, বিভিন্ন বিরাট বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার সফল্যামণ্ডিত রূপায়ণ। এটি এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে মাদ্রাজ, অন্ধ্র, কেরল প্রভৃতি দেশে আঞ্চলিক ভাষায় ডাবিং করে নিয়ে তা লক্ষ লক্ষ লোককে খোলা ময়দানে দেখানো হয়। বিহার ও উত্তরপ্রদেশেও এটি বিপুল জনসমাদর লাভ করে। একটি স্বরোয়া অনুষ্টানে এই ছবিটি আমার দেখবার সুযোগ হয়। শিল্পকলার বিচারে এতে আগাগোড়া একটি স্থূলতার প্রলেপ থাকলেও অশিক্ষিত বা অল্প-

শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে এর আবেদন লক্ষ্য করার মত। ভাকরা-নাঙ্গাল, হীরা-কুন্দ, ভিলাই, রৌরকেল্লা, বিশাখাপত্তন, দামোদর ভ্যালি ইত্যাদি জায়গায় যে-সব বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে, দেশে যে অগণিত রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে, অসংখ্য গ্রামে যে হাজার হাজার হাসপাতাল, স্কুল, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র খোলা হয়েছে, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করা হয়েছে, বস্তি ভেঙে স্বাস্থ্যকর শ্রমিক-বাসস্থান নির্মিত হয়েছে—এসবের একটি সত্য ও সামগ্রিক পরিচয় এই ছবিতে যে আছে, তা অতি বড় নিন্দুক-কেও স্বীকার করতে হবে, সৃষ্টির এই বিরাট স্বজকে অস্বীকার করে তার থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকবার উপায় তার নেই। এই সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নির্বাচনী বক্তৃতার টেপ-রেকর্ডিংও এই সব জায়গায় শোনানো হয়েছে, তার ফলও অনিবার্যভাবে এই সব প্রচার যারা করেছেন তাঁদের স্বপক্ষে গিয়েছে।

নির্বাচনে এবার প্রচার-মাধ্যম হিসাবে কত জিনিসের যে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। মধ্যপ্রদেশের বিধানসভার নির্বাচনে একটি কেন্দ্রের প্রার্থীর প্রতীক ছিল হাত। তিনি তিন মাস যাবৎ একটি আস্ত জ্যান্ত হাতিতে চড়ে তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তাঁর স্বপক্ষে প্রচার করেছেন, পাছে তাঁর প্রতীক লোকে ভুলে যায় সেই জন্যই এত আয়োজন। উত্তরপ্রদেশের একজন প্রার্থীর প্রতীক ছিল সাইকেল, তিনি নির্বাচনে নিজে রাতদিন একটি সাইকেলে চড়ে প্রচার চালিয়েছেন, তাঁর স্বেচ্ছা-সেবকদেরও অন্য বাহন আশ্রয় করতে দেননি। একজন জনসংঘের প্রার্থী হাতে জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে এবং সিংহাসনের মত একটি ডুলিতে এক বিরাট প্রদীপ জ্বালিয়ে বাহকের কাঁধে চাপিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। পক্ষান্তরে এক ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী স্থানীয় একটি সার্কাস থেকে দুটি সিংহ ভাড়া করে

নিজের নির্বাচন এলাকায় ঘুরেছেন, অবশ্য সিংহ দুটি খাঁচায় বন্দী ছিল। লোকে তাঁর বক্তৃতা শুনে আসুক বা না আসুক সিংহ দেখতে যে ভিড় জমাতো সে খবর দিতে সংবাদদাতা ভুল করেননি। মহীশূরে দুটি দীর্ঘশৃঙ্গ মহীশূরী বলদ জনৈক কংগ্রেসপ্রার্থীর প্রতিটি নির্বাচন-সভায় হাজির থেকে বস্তার প্রতীক চিনিয়ে দিতে শ্রোতা ও দর্শকদের সাহায্য করত। বিহারে জনৈক নির্দলীয় প্রার্থীর প্রতীক ছিল ফুল। তিনি প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যেকের বাড়ীতে একটি করে গাঁদাফুল উপহার পাঠাতেন, ফুলের সঙ্গে তাঁর নামের কার্ড এবং কেন তিনি ফুল পাঠাচ্ছেন তা জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আবেদনও আটকানো থাকতো। জয়পুরে এক প্রার্থী প্রকাশ্যস্থানে প্রায়োপবেশন করে শুরেছিলেন, তাঁকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে না দিলে তিনি অন্নভ্রল গ্রহণ করবেন না এই রকম ভয় দেখিয়ে। শেষে স্থানীয় মাতঙ্গরদের বহু আবেদন-নিবেদন, আশ্বাস ও স্তোত্রবাক্য তাঁকে আত্মহত্যার পথ থেকে ফিরিয়ে আনে।

এসব খবর এই তিন মাস যাবৎ যারা নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েছেন তাঁরা সবাই জানেন। এসব খবরের কতখানি সত্য, কতখানি বা অতিরঞ্জিত, তা বিচার করার ভার পাঠকদের ওপর রইল। বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা খুব বেশি ঘটেনি। বাংলাদেশের প্রচারকার্য এই সব কৌশলের তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম। এবার তার কিছুর পরিচয় দিই।

বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে এই তিন মাস যাবৎ আমি নিছক কৌতূহলবশতই নির্বাচন-কৌশল দেখবার জন্যে নানা প্রার্থীর সঙ্গে ঘুরেছি। গ্রাম শহর ইত্যাদিতে তাঁদের বক্তৃতা শুনেছি। এই-সব নির্বাচনী সভায় কত মজার মজার ঘটনা যে দেখেছি আর কত অদ্ভুত অদ্ভুত বক্তৃতা শুনেছি তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিস্মৃত বিবরণ দেবার এখানে জায়গা নেই। তার গোটা কয়েক পাঠকে উপহার দিতে চাই।

তার আগে বাংলাদেশে নির্বাচনী-প্রচার কি কি ধারায় চলেছে সেটা বলে নেওয়া ভালো। বাংলাদেশে কংগ্রেস এবং বামপন্থী ছিট দলের জোট—এঁদের মধ্যেই নির্বাচন মন্বদ প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। মাঝে প্রজা-সোস্যালিস্ট, স্বতন্ত্র, জনসংঘ, হিন্দুমহাসভা দল এবং নির্দলীয়রা

হিলেন। নির্বাচনী প্রচারণা প্রথমে ও প্রবল ছিল কংগ্রেস ও বামপন্থী জোটের মধ্যে—বামপন্থীরা চান বিকল্প সরকার গঠন করতে, কংগ্রেস চান নিজেদের সরকার কয়েক রাখতে। দলীয় সরকার গঠন করা সম্বন্ধে অন্যান্য দলের কোন ইচ্ছা ছিল না, থাকলেও তাঁরা প্রকাশ্যে সে কথা বলেননি, আর নির্দলীয় প্রার্থীদের এত বড় বৃকের পাটা হয়নি যে, নির্দলীয় সরকার গঠনের কথা বলেন।

বিকল্প সরকার গঠন করার ধ্বনি (slogan) নিয়ে যে ছটি বামপন্থীদল একসঙ্গে গাথা পড়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন কমিউনিস্ট, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী বা আর-এস-পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-সি-পি-আই বা বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি এবং বোলশেভিক পার্টি। বাংলাদেশে মধ্য লড়াই হয়েছে এদের সঙ্গে কংগ্রেসের। নির্বাচনী প্রচারণা-কৌশলও তীক্ষ্ণ ও তীব্র ছিল এই দুই দলের।

আমি বয়োবৃদ্ধ হওয়ায় ১৯৩৬ সালের পর থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত যত নির্বাচন হয়েছে তার প্রত্যেকটিই দেখেছি। এই সমস্ত নির্বাচন খাঁরী দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন, এবারকার অর্থাৎ ১৯৬২ সালের নির্বাচনে যত রকমের প্রচারণামাধ্যম নেওয়া হয়েছিল আগেকার কোন নির্বাচন সেদিক দিয়ে এর ধারে-কাছেও আসতে পারে না। ব্রিটিশ আমলের নির্বাচনে প্রধান ছিল হ্যান্ডবিল, শোভাযাত্রা, পোস্টার এবং বক্তৃতা। বারাম সালের নির্বাচনে এর সঙ্গে যোগ হল নির্বাচনী গান এবং 'পোস্টার নাটক'। 'পোস্টার নাটক' জিনিসটি হচ্ছে বিনা সাজসজ্জামে বক্তৃতা-মঞ্চের ওপরেই রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক নাটক। সাতান্ন সালে এ সন্দের সঙ্গে যোগ হল কার্টুন। আর এবার এসব ছাড়াও নতুন এল চলচ্চিত্র (অবশ্য বাংলাদেশে নয়)। বেতার-বক্তৃতার প্রস্তাবও উঠেছিল, কিন্তু সব দল তাতে রাজি না হওয়ায় সেটা আর

এবার হল না। হয়ত সাতবাঁটি সলে হবে।

নির্বাচনী-গান হিসাবে শুনোঁছ আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতের সুরে গীত রাজনৈতিক গান এবং কোন কোন লোক-প্রসিদ্ধ রেকর্ডের গানের ব্যঙ্গ-অনুকৃতি বা Parody। এই লোক-সঙ্গীতের মধ্যে বাউল, ভাটিয়াল, গম্ভীরা, টুঙ্গ, কীর্তন, সারি, জারি, বামুদ, পাঁচালি, কবিগান, তরঙ্গ সব আছে। উত্তরবাংলায় শুনোঁছ ডাওয়াইয়া, মুর্শিদাবাদে শুনোঁছ গম্ভীরা ও গাজনের গান। এসব গানই রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের কবিদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে নিজেদের শিল্পীদের দিয়ে গাইয়েছেন। কোন কোন গান রচনা হিসাবে অতি উচ্চ স্তরের—সেটাও লক্ষ্য করেছি। গানের ব্যাপারে বামপন্থীরা কংগ্রেসীদের চেঁকা দিলেও প্যারডি গানে কংগ্রেসীরাও কম বাননি। একটি গান শুনোঁছ রামপ্রসাদের রচনার প্যারডি—'আমার দেমা মিনিস্টারী—আমি নিমকহারাম নই শংকরী' ইত্যাদি।



কংগ্রেসীদের আরেকটি প্যারিডি শুনোঁছি চাকদেহে—‘আজি শত্বে শত্বে মঙ্গল গাও চীনারা এসেছে স্বারে, জ্যোতি বসু লয়ে পাঁচ ভাই দেখ অভ্যেক করে তারে’। এ ছাড়াও প্যারিডি শুনোঁছি এসব গানের—‘দেশ দেশ নন্দিত করি’, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা, আমার সাধ না মিটিল, বড় আশা করে এসোঁছি, যেদিন সুনীল জলিখ হইতে, আমার সোনার বাংলা, মৃত্ত-বেণীর গগ্গা বেথায়, ফান্দে পাঁড়িয়া বগা কান্দেদে, আজি এসোঁছি এসোঁছি বঁধু হে, ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে, ওগো তোরা কে যাবি পারে’ ইত্যাদি বহু গানের। এগুলির কিছু কংগ্রেসের কিছু বামপন্থীদের রচনা। পাঠক লক্ষ্য করবেন এই গানগুলির আধার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানেশ্বরলাল—সবাইকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এসব গানের অধিকাংশই নির্বাচনী সভা শুরুর হবার আগে গাওয়া হত। সভার শেষে (বিশেষ করে কংগ্রেসীদের নির্বাচনী-সভার) দেশাত্মবোধক বিখ্যাত বিখ্যাত গানের আয়োজন থাকত। অনেক নামকরা পেশাদার শিল্পী এসব গানের আসরে অংশ নিয়েছেন। চলচ্চিত্র-শিল্পীরা সক্রিয় ছিলেন বোম্বায়ে, মেননের পক্ষে। বামপন্থীদের সভার শেষে বেশির ভাগ দেখেছি পোস্টার নাটক। এগুলি সাধারণত আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মত অভিনীত হত। এই নাটকগুলির বিশেষত্ব স্ট্রী-চারিত্রের অনুপস্থিতি। মণ্ডসজ্জাও করা হত না, এমনকি যবানকাও ছিল না। এই রকম অনেক নাটক পরিবেশন করেছেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ক্রান্তি শিল্পী সংঘ, উৎপল দত্ত ও তাঁর সম্প্রদায় ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটি যে ভালো তা বলি না, কিন্তু এদের মধ্যে কিছু কিছু নাটক যে রং-বাগ-শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ সংলাপে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা অস্বীকার করা যাবে না।

সাহিত্যিকরা এই নির্বাচনে মোটামুটি নিষ্কর্ত ও নিরপেক্ষ ছিলেন। তবে চিত্রশিল্পীরা নিরপেক্ষ ছিলেন না। বিশেষ করে কার্টুন শিল্পীরা। কলিকাতা উত্তরের লোকসভা-নির্বাচনে শ্রীঅশোক সেন এবং শ্রীসেনহাংশু আচার্যের (বামপন্থী সমর্থিত কম্যুনিষ্ট প্রার্থী) পক্ষে ষত কার্টুন রচিত হয়েছে ভারতের কোথাও তা হয়েছে কিনা সন্দেহ। কংগ্রেসী, কম্যুনিষ্ট দুই পক্ষেরই এত চমকপ্রদ, শিল্পগুরুসম্মিত অথচ তীক্ষ্ণ ব্যাংগে উজ্জ্বল কার্টুন দেখেছি যে

এই সব নাম-না-জানা শিল্পীদের ক্ষমতার প্রতি প্রশ্ন না জানিয়ে পারিনি। এই ধরনের কার্টুনগুলির প্রদর্শনী সারা কলকাতার লোকের কাছে বহুতা বা বিবৃতির চেয়েও শতগুণে আকর্ষণীয় ছিল। বাগবাজারের একটি রাস্তায় প্রায় আধ মাইল লম্বা এই রকম ছবির প্রদর্শনী দেখেছি—সেখানে চমৎকার সহাবস্থান। রাস্তার এক ফুটপাথের দেওয়ালে কংগ্রেসীদের চিত্র, অন্য ফুটপাথের দেওয়ালে কম্যুনিষ্টদের। কিন্তু কেউ কারুর ছবি ছিঁড়ে দেননি, বিকৃত করেননি। এই একটি রাস্তায় আমার নিজের হিসাবে প্রায় তিন লক্ষ লোক দিন পনের এই প্রদর্শনী দেখেছেন, পৃথিবীর কোন চিত্র-প্রদর্শনীতে পনের দিনে এত ভিড় হয় না। এই কার্টুনগুলি বহু পত্র-পত্রিকা থেকে সমগ্র সংগৃহীত, পুনর্চিত্রিত এবং সুসজ্জিত আকারে প্রদর্শিত। অথ্যাত অজ্ঞাত বাঙালী শিল্পীরা কার্টুন রচনায় যে কতখানি দক্ষ এই ছবিগুলি তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তবে কার্টুন যতখানি কলকাতায় রচিত এবং

প্রদর্শিত হয়েছে, মফঃস্বলে তা হয়নি। বোধ হয় নির্বাচনপ্রার্থীরা এ বিষয়ে সে রকম মনোযোগ এবার দেখাননি। একজন পর্যবেক্ষক ঠিকই বলেছেন, এবার নির্বাচনে কলকাতায় বহুতার লড়াইয়ের চেয়ে কার্টুনের লড়াইই হয়েছে বেশি। এই কার্টুনগুলির ক্যাপশনও এদের প্রতিভার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

সবশেষে বহুতা। বহুতার বিশদ বিবরণ দেব না, তবে আমার সংগ্রহে যে-সব বিচিত্র বহুতার বিবরণ আছে তার কয়েকটি পাঠকে উপহার দেব। কান্দী অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা চীন সম্পর্কে দলীয় নীতি বিশ্লেষণ করার সময় বললেন, চীন সাম্রাজ্যবাদী দেশ নয়, চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হবে না, কারণ চীন কোনদিন ভারত আক্রমণ করবে না। এই নেতাই কলকাতায় এক বিরাট জনসভায় বললেন, না হয় তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম চীন ভারত আক্রমণ করেছে, কিন্তু ভারত সরকারের কামান বন্দুক ছিল না? সৈন্য ছিল না? তারা

গ্রীষ্মকালীন বর্ণ পরিচর্যা

শীতল ও সুগন্ধী
ল্যান্ডেডার ওয়াটার দিয়ে
গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ
দিনগুলির
উষোধন করুন



আফগান স্নেহ

সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক

খব! সাবান,
আফগান স্নেহ এবং
আফগান ট্যালকম পাউডার
সূর্যের প্রখরতা থেকে আপনার
ত্বকে রক্ষা করবে—দুর্গন্ধ
দূর করে এবং সূক্ষ্মত
দিন স্থায়ী সজীবতাকে
সুনিশ্চিত করে

তখন কি করছিল?—তারা কেন চীনে
বাধা দেয়নি—যেন, চীনের ভারত-ভূমি
গ্রাস করার দায়িত্ব চীনের নয়, দোষ ভারত
সরকারের, যেহেতু তারা বাধা দেয়নি।
নৈহাটিতে এই দলেরই অন্য একজন নেতা
বললেন, চীন ভারত আক্রমণ করে খুব
ভুল করেছে। বরানগরে অন্য একজন
বললেন, চীন ভারত আক্রমণ করেছে বলে
কারো কারো ঘুম হয় না, কিন্তু পাকিস্তান
যে বেরুবাড়ী নিয়ে নিল তখন তারা
কয় রাত্রি জেগে ছিলেন। একজন পুরাতন
ইতিহাস উল্লেখ করে দেখিয়ে দিলেন
জলপাইগুড়ি পর্যন্ত বাংলাদেশের অংশ
চীন নিজের বলে দাবী করতে পারে।
চীন যে তা করছে না, সেটাই চীনের
মহত্ব। পাঠক লক্ষ্য করবেন, এরা কেউই
মূল প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, পরস্পরের
প্রতি পাল্টা অভিযোগ মাত্রই করলেন।—
একজন কংগ্রেসী নেতা বেহালায় বস্তুত
করার সময় বললেন, একশো বছর আগে
এই বেহালায় জঙ্গল ছিল, বাঘ-ভালুক
ঘুরতো, রাস্তাঘাট ছিল না—আজ দেশ
স্বাধীন হওয়ার পরে দেখুন সেখানে
বিরাট পট্টের রাস্তা হয়েছে, ইলেকট্রিক
হয়েছে, যদু কলোনীতে কত বড় বড়
লোক বাড়ী করেছে, রাস্তা দিয়ে
স্টেট বাস চলছে, ইলেকট্রিক পাথর
কত বড় কারখানা হয়েছে।—দুটো নির্বা-
চনে আপনারা কংগ্রেসকে ফিরিয়ে
দিয়েছেন, নির্বাচিত করেননি—সে কি
আমরা এই সব উন্নতিমূলক কাজ করছি
বলে? কই কমিউনিস্টরা তো এসব করতে
পারেনি! বহরমপুর লোকসভার বামপন্থী
প্রার্থীর বিরুদ্ধে জনৈক কংগ্রেসী নেতার

উক্তি—আপনারা দেখুন অমৃত বাবু কটা
রাস্তা, কটা হাসপাতাল আর স্কুল করে
দিয়েছেন—আর আমরা কি করছি। তিনি
ভারতের বাইরের ব্যাপার নিয়ে অন্য দেশে
জেলে ছিলেন, তাঁর নিজের এলাকার
জন্যে তিনি কি করলেন। বহরমপুর
বিধানসভার প্রার্থীর পক্ষে প্রচার—
বিরোধী প্রার্থী এম-এ, বি-এল—দেখুন
কার গুণ বেশি। যেন বামপন্থী প্রার্থী
এম-এ পাশ হলে তিনি আর নির্বাচনে
দাঁড়াবেন না। বেকার-সমস্যা সম্পর্কে
একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে জনৈক
কংগ্রেসী নেতা কাটোয়ায় বললেন—
আমাদের দেশে আগে কিছুর তৈরী
হত না, এখন সব তৈরী হচ্ছে, ব্রেড
তৈরী হচ্ছে, লোকে নিজে হাতে দাড়ি
কামাচ্ছে, তাই নাগিতরা আজ বেকার,
সেলাইয়ের কল তৈরী হচ্ছে, তাই
দাড়িরা বেকার। আলিপুরদুয়ারে জনৈক
কংগ্রেসী নেতা বললেন—বামপন্থীরা
সরকার হাতে পেলে চা খাওয়া বন্ধ
করে দেবে। বামপন্থী নেতা বললেন—
আমাদের হাতে সরকার এলে দেখব
দেশের লোক যাতে আরও বেশি করে
চা খেতে পারে।

কাঁদার ভাষায় একে বলে 'ব্যালু' দিয়ে
ব্যালু ভাঙা—অর্থাৎ প্রশ্ন করলেই তার
উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করা। এতে
ফলও হত দেখাতাম। একজন প্রশ্ন করলেন
মহেশতলায়, 'বিধান রায় বোবাজার ছেড়ে
চৌরঙ্গীতে গেলেন কেন?' বস্তু সঙ্গে সঙ্গে
প্রশ্ন করলেন 'জ্যোতি বসু পাল্টা সরকার
বানাতে চান, তিনি কেন চৌরঙ্গীতে

বিধান রায়ের বিরুদ্ধে লড়ছেন না?
তাহলে বাংলাদেশের কে মধ্যমশ্রী হবেন,
বিচার হয়ে যেত!' এই রকম বিচিত্র সব
'ব্যালু' দিয়ে 'ব্যালু' ভাঙা পন্থাটি আমি
বাংলাদেশের বহু দলীয় নির্বাচনী সভায়
শুনছি।

তবে চরম শুনছি বামপন্থী ফ্রন্টের
এক বর্ষীয়ান নেতার মুখে বস্তুত।
তিনি বয়সের জন্যেই বেশি হয় লোকের
নাম ইত্যাদি গোলমাল করে ফেলতেন।
সাঁইথিরায় এক সভায় তিনি বললেন—
'এই যে বাস্কমচন্দ্র সেনের বাংলা, নেতাজী
সুভাষচন্দ্র ঘোষের বাংলা, জগদীশচন্দ্র
রায়ের বাংলা.....'। তাঁর মুখে শ্রীযুক্ত
অশোক সেন হয়েছেন অশোক দত্ত,
শ্রীম্মহাশয় আচার্য প্রথমে প্রেমাংশু
আচার্য, পরে প্রেমাংশু ভট্টাচার্য এবং সব
শেষে প্রেমাংশু সেন ও অশোক ভট্টাচার্য!
সুহাসিনী দেবী হয়েছেন সুপ্রসাবিনী
দেবী! 'জনগণমন' হয়েছে 'ঘনমনগণ'।
উত্তর বড়তলায় এক বামপন্থী প্রার্থীর
সমর্থনে এক সভায় তিনি বললেন—'এই
যে বামপন্থী প্রার্থীকে আমরা দাড়ি
করিয়েছি, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত দেশের
সেবা করেছেন, তিনি মরেও অমর!.....
তিনি গরীব, শীতে জামা-কাপড় নেই,
তাকে শব্দ ভোট দিলেই হবে না, চার
আনা করে পয়সাও ভোটের বাজারে দিতে
হবে! তাঁর জয়ের জন্য হিন্দুদের মসজিদে
মসজিদে প্রার্থনা করতে হবে, মৃত্যুঞ্জয়ী
বীরের নামে গিজায় গিজায় পুজো দিতে
হবে!' কিন্তু লোকে যা বোঝার ঠিকই
বুঝেছে।

* সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজন প্রশংসিত *

ছোট ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক গল্পিকা

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত

আগামী বৈশাখে ৪৩শ বর্ষে পদার্পণ করবে

—এতে আছে—

পাতার পাতায় ছবি, দেশ-বিদেশের রকমারি রাজার খবর, নানা রকম জানবার বিষয়, জ্ঞান-
বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী, খেলাধুলার খবর, ধাঁধা ইত্যাদি
বিভিন্ন বিষয় যা শিশুদের চমৎকৃত ও উৎসাহিত করবে। তা ছাড়া গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখাও
উপযুক্ত বিবেচিত হলে ছাপা হয়। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিকেরা 'মৌচাক'-এ নিয়মিত
লেখেন।

প্রতি

সংখ্যা

৪৫ নং পঃ

বার্ষিক মূল্য—৫

সাপ্তাহিক মূল্য—২-৫০ নং পঃ

অবিলম্বে ছেলেমেয়েদের গ্রাহক ক'রে দিন

বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

চাঁদা মণি অর্ডারযোগে অগ্রিম প্রেরিতব্য। পক্ষান্তরে প্রথম সংখ্যাটি

ভিঃ পিঃ যোগে পাঠানো হয়।

এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ,

১৪, বাস্কম চাট্‌জো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মৌচাক



(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তবে মায়ালতার সতেজ এবং স্ফূর্তি, মন্তব্যগুলি শুনলে আর কারও পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত, দূরে চলে গেলে অশোকর মায়ালতার জন্যে মন কেমন করবে।

মায়ালতা সেই অবধি যখন তখনই তারস্বরে, 'মানুষ জাতটা যে কতখানি নৈমক-হারাম' তা' ব্যক্ত করছেন, এবং পরস্পরে ঘোষণা করছেন 'রাজা নইলে রাজ্য চলে, আর উনি নইলে সংসার চলবে না! ইং'। ঘরের অভাবে ছেলের বিয়ে দিড়ে পারছি না, এবার ছেলের বিয়ে দেব, দিচ্ছে মান-মর্যাদার ওপর থাকবো। এখনকার মত দাসী-বাঁদী হয়ে থাকতে হবে না।' তাছাড়া নীতার উপদেশে তিনি বলছেন না এমন কথা নেই।

মুখের আর বিশ্রাম নেই ভদ্রমহিলার।

বাক্যের যদি শক্তি থাকতো নীতা এতদিনে ভস্ম হয়ে যেত।

কিন্তু এ যুগে বাক্য শক্তিহীন, তাই নীতা ভস্ম হওয়া তো দূরের কথা, বরং আগের থেকে মোটা-সোটা বড়-সড় হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য, এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও কী করে বজায় রেখেছে নীতা তার মুখের দীপ্তি, স্বাস্থ্যের লাভণ্য।

হাওড়া স্টেশনে সহসা মুখোমুখি হয়ে এই প্রশ্নটাই প্রথম মনে এল কৃষ্ণার।

মুখোমুখি হওয়াটা অপ্রত্যাশিত। প্রায় গল্পের ঘটনা-চক্রের যোগাযোগের

মত। নীতা দিল্লী থেকে এসে স্টেশনে নেমেছে, আর কৃষ্ণা ইন্ডনালিকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরছে প্ল্যাটফর্ম থেকে। এক-জনের গতিভঙ্গী দ্রুত চঞ্চল ব্যস্ত, আর একজনের শীথল স্তিমিত বিলম্বিত।

তবু মুখোমুখি হয়ে গেল।

নীতা বলে উঠল, 'আরে, তুমি!'

কৃষ্ণা বলে উঠল, 'আরে, আপনি!'

তারপর দ্রুত লয়ে দু'জনের মধ্যে যে কথার আদান-প্রদান হলো তা'তে এই প্রকাশ পেল, নীতা অবস্থা একটু সামলে নিয়েই এসেছে বাবাকে দেখতে। দু'তিন-দিনের বেশী থাকার জো নেই। হয়তো পশুই ফিরতে হবে। নীতার কাকা ওখানে গিয়েছেন, তাই আসা একটু সহজ হলো।

আর কৃষ্ণা?

সে এসেছিল ইন্ডনালিকে তুলে দিতে। বর্ধমান কলেজে একটা সামান্য মাইনের লেকচারারের কাজ জোগাড় করে ইন্ডনালি কৃষ্ণা এবং তার মার সহস্র নিবেদন অগ্রাহ্য করে চলে গেল।

কিন্তু নিবেদন কেন? একটা কিছুর তো করবেই? নীতা বলে, 'আর প্রথমেই খুব ভাল একটা হবেই, তার কোন মানে নেই! তবু শিক্ষার লাইন তো!'

কৃষ্ণা ঠোট উল্টে বলে, 'শিক্ষার লাইন! কিন্তু দু'জনে দু' জায়গায় পড়ে থাকারই বা কি মানে আছে? চেষ্টা করলে কি আর কলকাতায় ওই শিক্ষার লাইনে কিছু জুটতো না?'

'তা কেন জুটবে না?' নীতা সবিম্বরে বলে, 'কিন্তু কলকাতার

বাইরে কেউ কিছুর করবে না, সেটার মধ্যেও তো কোন যুক্তি নেই। দু'জনে দু' জায়গায় পড়ে থাকার অর্থ কি বলতো? তুমিও কিছুর কাজকর্ম করছো নাকি?'

'মাথা খারাপ! দাসত্বের মধ্যে আমি নেই বাবা। কিন্তু ওর ওই সাধের বর্ধমানে তো আর আমি গিয়ে থাকতে পারব না।'

'তুমি গিয়ে থাকতে পারবে না?'

'কেটে দু'খানা করলেও না! একটা সভ্য শহর খুঁজে পেল না! এত রাগ হয়েছে আমার। ভেবেছিলাম স্টেশনেও আসব না, নেহাৎ জীব দয়া হিসেবেই এলাম। শুনলে বিশ্বাস করবেন, আমার বাবা আশ্বাস দিয়েছিলেন কোন বন্ধুকে ধরে খুব ভালমত একটা কাজ জুটিয়ে দেবেন, বাবু বললেন, 'ও কাজ আমার ভাল লাগবে না।'

বাবা বললেন, 'বেশ, বাইরে যেতে চাও তো বল, তাই পাঠাবার চেষ্টা করি।' শুনলে কী মজাই লেগেছিল আমার। ভেবেছিলাম আমিও তা'হলে ছাড়ছি না। উঃ আমার দু'তিনটে বন্ধু বিয়ে করেছে কেমন বরের সঙ্গে বিলেত, আমেরিকার চলে গেল। তা তা'তেও বাবু বললেন, 'আপনার টাকার বাইরে গিয়ে কুতী হয়ে আসবো, এটা ঠিক মনের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।' বিশ্বাস করছেন? ওর মনের সঙ্গে খাপ খেল কিনা ওই পচা দেশের পচা কাজটি। কী বলবো, আমি যে বাড়ীতে কী পোজিশনে আছি, ও'র বৃদ্ধিকে ছি ছি করছে সবাই! তা'ছাড়া

বিয়ে হয়েও বাপের বাড়ীতে পড়ে থাকা—

কথাটা শেষ করতে গিয়ে থেমে যায় কৃষ্ণা। বোধহয় ভাবে নীতার মন্থোমুখি বাপের বাড়ী পড়ে থাকার কারণটা বলা সমীচীন হবে কিনা। চিঠিতে অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু মন্থোমুখি।

নীতা অবশ্য ওই অসমাপ্ত কথা থেকেই প্রশ্নের উপাদান পায়। 'বিস্ময়ে বলে, 'বাপের বাড়ীতে পড়ে থাকা?'

'ওই আর কি! কেন আপনি আমার চিঠি পাননি?'

'হ্যাঁ পেরেছিলাম।' নীতা মৃদু হাস্য বলে, 'তবে তাতে তোমার বাপের বাড়ী পড়ে থাকা, অথবা তার কারণ ঠিক ধরতে পারিনি। এখন অবশ্য পাচ্ছি।'

'পাচ্ছেন যখন, তখন আর বেশী কি বলার আছে?'

নীতা সামান্য ক্ষণ চুপ করে থেকে চিন্তিত ভাবে বলে, 'কিন্তু আমি তো সমানেই শুনছি বাবার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে! আচ্ছা উনি কি মানুষ দেখে অসহিষ্ণু হচ্ছেন?'

কৃষ্ণা এবার নিজস্ব ভঙ্গীতে ব্যংগ্য দিলে বলে ওঠে, 'উনি কী হচ্ছেন না হচ্ছেন, তা' দেখবার অবকাশ আমার হয়নি নীতা-দি। কিন্তু অসহিষ্ণুতা তো অন্য পক্ষেও দেখা দিতে পারে? আর সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধিও যে আপনার নেই, তা নয়। আমার 'মা-বাপ' বলে একটা পক্ষ আছে, এবং তাঁদের মতামত বলেও একটা জিনিস আছে।'

কথা হচ্ছিল চলন্ত মোটরে।

প্রজাপিত-উত্তরণীয়

রোল্যান্ড

ট্যালকম পাউডার

ব্যারন কমস্যাটিক প্রোডাক্টস

ফোন ২২-৪২২৩

কুইন স্টেশনারী স্টোর্স প্রাইভেট লি.

৬৩ ই. রাধাবাড়ম্বর স্ট্রীট-কলিকাতা-১

কৃষ্ণা যে গাড়ীতে এসেছিল, সেই গাড়ীতেই নীতাকে ভুলে নিয়েছে। কৃষ্ণার বাবার গাড়ী দু'খানা, একটা তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের, অপরটা পরিবারের। কাজেই অসুবিধের কিছু নেই।

নীতা বিষণ্ণভাবে বলে, 'তা সত্যি! দেখি কী অবস্থা!'

কৃষ্ণা বিদ্রূপে ঠোঁট কুঁচকে বলে, 'অবস্থা যাই হোক, ব্যবস্থা কিছু করতে পারবেন বলে, মনে হয় না।'

'তার মানে?'

'মানটা গিয়ে দেখে বদলন গে। আশ্চর্য হয়ে সরে আসা ছাড়া আমার আর কিছু করা সম্ভব হয়নি।'

নীতা চুপ করে যায়।

বাকী পথটা চুপ-চাপই কাটে।

ভারী চিন্তায় পড়ে যায় নীতা। ভাবে তবে কি এতদিন যা রিপোর্ট পেয়ে এসেছি, সব ভুল? 'নীতার' দৃষ্টিচলিতা নিবারণ করতে নিরুপম মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে দিয়ে এসেছে?

সুশোভন বেশী কিছু অস্বাভাবিকতা করছেন?

সুচিন্তা ভয়ংকর একটা অসুবিধাকর অবস্থার কাটাচ্ছেন?

নীতার স্বাধ-বুদ্ধিই কি ওই শাস্ত ভদ্র নিলিপ্ত-স্বভাব মহিলাটির শান্তি কেড়ে নিয়েছে?

কিন্তু শব্দই কি নীতার স্বাধ-বুদ্ধি? তার জনোই কি নীতা? আরও কিছু কি ছিল না নীতার সৌন্দর্যের সেই আয়োজনের মধ্যে? বৈদ্য নীতা প্রথম তার বাপকে নিয়ে অনূপম কুটিরের দরজায় এসে নেমেছিল।

সুশোভন-পাগল, সুশোভন তো ব্যস্ত করেই বসেছিলেন। নিজেকে, কিন্তু যে পাগল নয়; যার সব-কিছুই অব্যক্ত ছিল? সেই অব্যক্ত স্থিরতার মধ্যেও কি

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন আজীবনের সঞ্চিত এক ঐশ্বর্যের ভান্ডারের আভাস? সেই ঐশ্বর্য কি তাকে শব্দ-বিধবৃত্তই করেছে? কোন উপায় খুঁজে দেয়নি?

দেখি, গিয়ে দেখি। কেমন আছেন সুশোভন।

বাবা, বাবা, তুমি কি আমার চিনতে পারবে?

এখনো কি তুমি আমার নামটি মনে রেখেছ? বন্ধুতে পারছি না, এতদিন ধরে ওরা আমার ঠিকিয়ে এসেছে কি না। বাবা, তুমি যদি আমার চিনতে না পারো? আমি কি সহিতে পারবো সেই দুঃখভার?

অনূপম কুটিরের দরজার কাছে নীতাকে নামিয়ে দিল কৃষ্ণা।

'তুমিও নামো না।' একথা বলার সাহস হ'ল না নীতার, আর বোধকরি ইচ্ছেও হল না। একা গিয়ে দাঁড়াতে চায় সে বাবার সামনে। কে জানে, কেমন ভাবে তিনি গ্রহণ করেন অনেক দিনের অপেক্ষা, হয়তো বা ভুলে-যাওয়া কন্যাকে।

কিন্তু সুশোভন কি ভুলে গেছেন? ভুলে গেছেন 'নীতা' বলে কেউ ছিল না—না—আর সুশোভন ভুলে যাবেন কি করে? তিনি যে অবিরত ভেবে ভেবে আবিষ্কার করে ফেলেছেন, ভুলটা কোথায়!

নীতার সমস্ত আশংকা সমস্ত উদ্বেগ লুপ্ত করে দিয়ে সুশোভন মেয়েকে বন্ধুর মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। তার মাথার গালে হাত বুলোতে বুলোতে রুদ্ধকণ্ঠে বার-বার বলতে লাগলেন 'নীতা, নীতা। তুই এসেছিস। তুই এলি। এতদিন কেন আসিসনি।'

তারপর এক সময় সাগরের নামও উল্লেখ করলেন সুশোভন। বললেন, 'সাগর, সাগর বলে সেই ছেলেটি! তার সঙ্গে তোর কবে যেন একদিন বিয়ে হয়েছিল না? ওরাতো তাই বলল। তাকে আনলি না কেন?'

সুখে আনন্দে মনটা ভরে উঠতে চায় নীতার, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নীতা কি প্রতি-মুহুর্তে আশা করছিল, এইবার সুশোভন উৎফুল্ল আনন্দে চীৎকার করে উঠবেন, 'সুচিন্তা সুচিন্তা কোথায় আছ তুমি? কী বাজে বাজে কাজ করছো বসে বসে? দেখতে পাচ্ছ না কে এসেছে!'

না, সুশোভন চেঁচিয়ে উঠলেন না।

সুশোভন বন্ধুতে শিখেছেন, অমন করে চেঁচিয়ে ওঠাটা নিয়ম নয়। চেঁচিয়ে

ওঠবার জন্যে যে নিশ্চিন্ততার সুখ থাকা দরকার, তা আর নেই। সুশোভনের। সুশোভন এখন অবিরত চিন্তা করছেন। আর সেই চিন্তার ভারে ভারেই বুঝি ভারী হয়ে উঠেছেন সুশোভন।

নীতাই জিজ্ঞাস করলো, 'সুচিন্তা পিসিমা কই?'

সুশোভন চিন্তিতভাবে বললেন, 'জানি না তো। কোথায় গেল।'

'তুমি জানো না?'

'আমি? আমি কি করে জানবো? ও কখন কি করছে, আমরা বলে!'

'কিন্তু বাড়ীটা এমন ফাঁকা লাগছে কেন? নীচে শব্দ একটা নতুন চাকরকে দেখলাম। বলল 'সবাই ওপরে আছেন!'

সুশোভন গম্ভীর ভাবে বলেন, 'সবাই তো চলে গেছে।'

'চলে গেছে?'

'হ্যাঁ! সুচিন্তার ছেলেরা চলে গেছে, রাগ করে।'

'রাগ করে? রাগ করে কেন?'

সুশোভন আরও গম্ভীর মুখে বলেন, 'রাগ করতে পারে। রাগ করা তাদের অনায়াস নয়।'

নীতাও যেন দেখতে চায় নদীতে কত জল। তাই বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, 'কিন্তু কেন বল তো বাবা? সুচিন্তা পিসিমা তো ছেলদের বকেন না?'

'বকার কথা নয়, বকার কথা নয়! সুশোভন মৃদু গলায় বলেন, 'অন্য কথা। আচ্ছা নীতা, সুচিন্তার বাড়ীতে আমি কেন বল তো? কবে এলাম? কে আমাকে নিয়ে এল এখানে?'

সুশোভন স্বখন ভাবছেন 'এ বাড়ীতে আমি কবে এলাম,' তখন সুচিন্তা বাড়ীতেই ছিলেন।

হাতে ছিলেন।

কবে যেন একদিন সুশোভন বলে-ছিলেন, 'তুমি তোমার ঠাকুরমার মতন কাঁচা আমের আচার করতে পার না সুচিন্তা?' আজ তাই চেষ্টা করছেন সুচিন্তা পারেন কিনা।

কিন্তু কবে বলেছিলেন সুশোভন?

সে তো অনেক দিন আগে। তখন সুশোভন সংসারের নিয়ম-অনিয়ম ভাবতে শেখেননি। কিন্তু তখন তো কাঁচা আম ছিল না।

ছাত থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন সুচিন্তা।

'নীতা! নীতা এসে পড়েছে?'

'হ্যাঁ পিসিমা!' নীতা কাছে এসে প্রণাম করে।

সুচিন্তা আশীর্বাদ জানিয়ে বলেন, 'আসার আগে একটা খবর দিলে না কেন? নিরুদ তাঁ হলে হয়তো স্টেশনে—'

'আর ব্যস্ত করতে ইচ্ছে করল না। তা'ছাড়া শেষ পর্যন্তই ঠিক করে উঠতে পাচ্ছিলাম না আসতে পারবো কি না।'

'কেমন আছেন সাগরময়?'

নীতা মৃদুস্বরে বলে, 'এমনিতে তো ঠিকই আছে।' আর কিছুর বলে না। যেটুকু বৈঠক সে সম্পর্কে কিছুর বলে না। শব্দ আরও নীচু গলায় বলে, 'বাবাকে তো খুবই ভাল দেখছি। এতটা তো আশাই করিনি।'

সুচিন্তা নিশ্চিত স্বরে বলেন, 'হ্যাঁ অনেক উন্নতি হয়েছে। ডাক্তার পালিত প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন।'

'ডাক্তার পালিত! নীতা কেমন এক বিষণ্ণ সুরে বলে, 'ক্রেডিটটা কি ডাক্তার পালিতের? অসাধ্য সাধনের প্রশংসাটা তাঁরই প্রাপ্য? অসাধ্য সাধন তো আপনিই করলেন পিসিমা।'

সুচিন্তা হেসে উঠলেন না, রেগে উঠলেন না, আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠলেন না। মৃদু প্রতিবাদের সহজ সুরে বললেন, 'পাগল মেয়ে! আমি আবার কতটুকু কি করলাম? এটুকু সেবা যে কোন সাধারণ নার্সেও করতে পারতো।'

'পশু হবে তুমি? পশু? দিগ্গমী হবে তো?' সুশোভন একটু খেমে বলেন, 'আমি যাবো তোমার সঙ্গে।'

'তুমি যাবে।'

নীতা একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। দেখে সুচিন্তার মূখের দিকে। পড়ন্ত বিকেলের ব্যাপসা হয়ে আসা আলোয় কি যেন একটা সেলাই করছেন সুচিন্তা বারান্দার কোণের দিকে পাতা বেতের মোড়াতার বসে। মৃদু নীচু, মাথার কাপড়টা যথাস্থানে সংরক্ষিত। বসার ভঙ্গীটা স্থির।

সুশোভনের এই ঘোষণায় সেই স্থিরতার কোন পরিবর্তন হল না।

নীতা ইতস্তত করে বলে, 'এত তাড়াতড়ি তুমি কি করে যাবে বাবা?'

সুশোভনের হাতে একটা বই ছিল।

অনবরত সুশোভন তার প্রথম থেকে শেষ, আর শেষ থেকে প্রথম পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন। ওই করেন। বই একটা হাতে চাই তাঁর আজকাল। হাতে রাখেন আর পাতা উল্টান। তার লেখায় মনঃসংযোগ করতে পারেন, এতটা মানসিক ঐশ্বর্য আসেনি।

নীতার প্রশ্নে সুশোভন দু'তিনবার বইটার পাতাগুলো উল্টে গেলেন। তারপর ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি মানে কি নীতা?'

ঃ অঞ্জলী প্রকাশনীর বই :
আধুনিক শ্রেষ্ঠ সংকলন
সুধীরঞ্জন মৃথোপাধ্যায় (সম্পাদিত)

সুদূরের গিয়াসী

সৈয়দ মদুজতবা আলী
সুবোধ ঘোষ
সতীনাথ ভাদুড়ী
অন্নদাশঙ্কর রায়
বিমল মিত্র, নরেন্দ্র মিত্র
বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী
সন্তোষকুমার ঘোষ
আরও বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের
লেখা আছে
৥ পাঁচ টাকা ৥

একটি আধুনিক ও মধুর
উপন্যাস প্রকাশিত হল।
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মৃথোপাধ্যায়

সোনাঝরা সঙ্ক্‌য়া

ডিমাই সাইজ : সুন্দর প্রচ্ছদপট
৥মাত্র দু' টাকা ৥
পরিবেশক : নব গ্রন্থ কুটীর
৫৪।৫৫, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নীতা অপ্রতিভ মুখে বলে, 'তাড়া-তাড়ি মানে মোটে তো হাতে আর একদিন সময়। তোমার কত গোছ-গাছ।'।

'আমার আবার কী গোছগাছ।'। সুশোভন ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে বলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি না নিয়ে গেলে আমাকে কে নিয়ে যাবে? আমি কি মনে করতে পারছি দিল্লীটা কোন দিকে?'

'তবে?' নীতা উৎসাহের স্বরে বলে, 'তবে এখন তুমি কি করে যাবে বাবা? এখন থাক, আমি পরে আবার এসে নিয়ে যাব।'।

'না পরে নয়, এখন!'

নীতা আর একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখে। সূচিন্তা সেই ভাবেই কাজ করে যাচ্ছেন। এসব কথার ছন্দাংশও ওর কানে বাজে, এমন মনে হল না।

অতএব আর একটু গলা চড়ালো নীতা। 'তুমি এক্ষুণি যেতে চাইলে সূচিন্তা পিসিমা রাগ করবেন বাবা। তাই না পিসিমা?'

সূচিন্তা এবার এদিকে তাকল। আর নীতার চোখের ইসারার কৌশলকে আমল মাত্র না দিয়ে সহজভাবে বলেন, 'না, রাগ করবো কেন?'

'হ্যাঁ রাগ করবে কেন।'। সুশোভন বইয়ের পাতাগুলো আবার ফরফর করে উল্টে বলেন, 'রাগ করবার কি আছে? এটা তো আমার বাড়ী নয়, এখানে তো আমার থাকবার কথা নয়।'।

নীতা বাবার কাছে ঝুঁকে দৃঢ়স্বরে বলে, 'ও কথা—ও কথা বলতে হয় না বাবা। সূচিন্তা পিসিমার বাড়ী কি আমাদেরও বাড়ী নয়? সূচিন্তা পিসিমাতো আমাদের নিজের লোক।'।

'না না! তুমি ভুল বলছ।'। উদ্বেজনায় চেয়ারে ঠেলে উঠে দাঁড়ান সুশোভন, বলেন, 'সূচিন্তা কি করে আমাদের নিজের লোক হবে? সূচিন্তা কি মূখার্জি?'

'মূখার্জি না হলেও নিজের লোক হয় বাবা।'।

'না, হয় না।'। সুশোভন দৃঢ় স্বরে বলেন, 'ওসব তোমার চালাকী! তার মানে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে না?'

'বাঃ, নিয়ে যাব না কেন? কিন্তু সূচিন্তা পিসিমা ভো আর দিল্লী যাচ্ছেন না— নীতা যেন বাপকে বিপদ সম্পর্কে

অবহিত করিয়ে দিতে চায়, 'কে তোমাকে বল করবে?'

'তুমি করবে।'। সুশোভন বিরক্ত স্বরে বলেন, 'তুমি পার না? তুমি আমার মেয়ে।'।

স্থির পাথরের পুতুলের মাথাটা এবার একটু ঝুঁকে পড়ে, বোধহয় আকাশের আলোটা আরো কমে এসেছে বলে। একটু আগে সেখানে যে বহুবিচিত্র বর্ণচ্ছটার সমাবেশ হয়েছিল, তার সব লুপ্ত হয়ে, একটা গভীর ছায়া নেমে আসছে।

নীতা শেষ চাল দেয়, 'তা' আমরা সবাই একসঙ্গে চলে গেলে পিসিমা কি করে থাকবেন? পিসিমার দুঃখ হবে না?'

নীতা খুব জোরে হেসে উঠে বলে, 'দুঃখ কি উচিত অনুচিত মেনে চলে বাবা?'

কিন্তু ওর হাসির রেশ ফুরোবার আগেই পাগল মানুষটা ওদের স্তম্ভ করে দিয়ে বলে, 'দুঃখ তা না চলতে পারে, মানুষকে উচিত অনুচিত মেনে চলতেই হয়।'।

নীতা স্তম্ভ হয়ে গিয়ে তাকিয়ে থাকে বাপের দিকে নয়, অদূরবর্তী নীর দিকে, অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের নীচে একটা মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে আছে যে হাতের সেলাইটার উপর বৃথা চেষ্টার ভান ছেড়ে দিয়ে।

বুদ্ধিমত্তার দ্রষ্টব্যবস্থার আরার ফিরে



'...তার মানে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে না?'

সেই আগের অভ্যাসে আগের ভঙ্গীতেই কথা বলে নীতা বাপের সঙ্গে।

সুশোভন কিন্তু মেয়ের এ চালেও মাৎ হল না; গম্ভীর স্বরে বলেন, 'দুঃখ হলে চলবে কেন? দুঃখ হওয়া উচিত নয়।'।

এসেছে, ফিরে এসেছে উচিত-অনুচিত বোধ, এর চাইতে আনন্দের আর কি আছে? কি থাকতে পারে? তবু ওরফের একটা ভয়ে বেন অসাড় হয়ে গেল নীতা।

বুদ্ধিমত্তার সেই হারিয়ে যাওয়া বুদ্ধি প্রথম ফিরে এল কি একটা তীক্ষ্ণ ছাঁরির ফলা হয়ে। যে ছাঁরি একটা নরম

হুঁপ-ডকে উপড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে।

উঠে আলো জেলে দেয় নীতা।

সহসা ঘোষণা করে, 'আচ্ছা বাবা, তুমি তা'হলে বোসো, আমি একবার ও বাড়ির জেঠিমাদের সঙ্গে দেখা করে আসি। কাল সময় হয় না হয়।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুশোভনও বাস্তু ভাবে বলেন, 'তুমি একলা যাবে না, আমিও যাবো।'

'তুমি? তুমি এখন আবার এই সন্ধ্যাবেলা—আজ থাক বাবা, কাল বরং দিনের বেলা যেও।'

পাগলের একগুয়েমিটা যায়নি। সুশোভন বলেন, 'না এখনই যাবো। সন্ধ্যাবেলায় যেতে নেই? তুই কি বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাবি নীতা? সন্ধ্যাবেলা তুই পারবি আর আমি পারবো না?'

নীতা হতাশ ভাবে বলে, 'থাক গে বাবা দু'জনেই বরং কাল যাবো। আজ আর ইচ্ছে করছে না।'

'এক্ষণি ইচ্ছে করছিল, এক্ষণি করছে না? আশ্চর্য নীতা, আশ্চর্য। তোরা বলতিস আমার মাথায় গোলমাল, মাথার গোলমাল তোদেরই।'

নীতা আবার আশাব্যবহিত হয়ে ওঠে কেন? পাগল বাপের সুস্থ মতিটো কি ওকে বিচলিত করছিল? ও কি সে মতি সাহস করে সহ্য করতে পারছিল না? তাই এই শিথিল কথা-গুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য পায়? সেই স্বাস্থ্যের সাথে হেসে বলে সে, 'কে কবে তোমায় ওকথা বলেছে বাবা? সুচিন্তা পিসিমা বারি?'

সুচিন্তার কথা হচ্ছে না। তোমরাই বলেছ।'

'কই আমাদের তো মনে পড়ছে না?'

সুশোভন বিরক্ত স্বরে বলেন, 'মনে পড়ছে না? ভাল করে মনে করে দেখ।'

'স্বাভা তো আর এক নতুন পাগলামী শুরু করেছেন বাড়ী।'

নিরুপম এলে নীতা প্রথম এই কথাই বলে।

পাগলামী!

নিরুপমের মনের মধ্যে অনেকগুলো ভাব ছুটোছুটি করে ওঠে। কলে এসে

কি তরী ডুবল? মেয়েকে দেখে অধিক আনন্দে অধীর হয়ে কি পুনরুদ্ধারিত চৈতন্য আবার হারালেন সুশোভন? পরক্ষণেই ভাবল, নীতা আরও কত সুন্দর দেখতে হয়েছে। তা হোক, দেখতে নেই, 'বড়দা' হতে হলে অনেক বড় হওয়া দরকার।

কিন্তু নীতার স্বামী অন্ধ হয়ে গেছে। সে আর কোনদিন দেখতে পাবে না নীতার এই লাভ্যে ঝলমল হৃদয়-ঐশ্বর্যে দীপ্ত সুন্দর মুখ। আশ্চর্য ভবু এই মুখ ঝলমলেই আছে, ঝলমলেই থাকবে।

নীতার কথার উত্তর ভুলে নিরুপম বলে, 'কখন এলে?' তার নিজের মুখটাও যে ঝলমলে হয়ে উঠল, সে নিজে টের পেল না।

'সেই কোনকালে।' আপনায় তো দেখাই নেই। কোথায় থাকেন সারাদিন?'

ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে এখানে সেখানে। তুমি একাই এলে?'

দিল্লী থেকে একা। হাওড়া স্টেশন থেকে ছোটবাবুর বো গাড়ী চাড়িয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল।'

ছোটবাবুর বো।'

'কৃষ্ণা কৃষ্ণা। ইন্দুর বো।' হেসে ওঠে নীতা। তারপরই গম্ভীর হয়ে বলে, 'ইন্দুর বো'র কলেজে লেকচারারের কাজ নিয়ে চলে গেল, বো। তাকে তুলে দিতে স্টেশনে গিয়েছিল, জানেন না এসব?'

নিরুপম মাথা নাড়ে।

'মেজদাও তো চলে গেছেন। এরকম কেন হয়ে গেল বলুন তো? এরকম তো আমি ভাবিনি।'

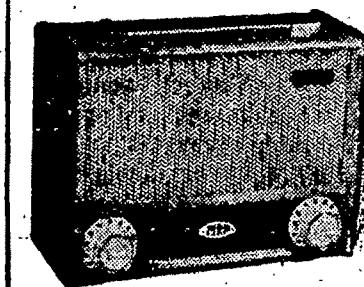
নিরুপম চুপ করে থাকে।

নীতা বিষয় মুখে বলে, 'আচ্ছা বড়দা, সত্যি কি মানুষ এত দুর্বল জীব? সে ইচ্ছে করলে উদার হতে পারে না? মহৎ হতে পারে না? সুন্দর হতে পারে না? অন্যের প্রতি মমতাসীল হতে পারে না? পারে না, না? অথচ পারলে জীবনটা কত সহজ হতে পারে। আগে আমার কি মনে হোত জানেন? মানুষ বুদ্ধি ইচ্ছে করলেই এসব পারে। এখন দেখছি তা পারা যায় না। সেই একটা ইচ্ছের বদলে আমরা ছোট হই সঙ্কীর্ণ হই নিষ্ঠুর হই, কপণ হই, হয়তো বা নোংরাও হই, আর জীবনকে ক্রমশঃ জটিল করে তুলি। ভবু ওই ইচ্ছেটুকু করি না।'

নিরুপম গম্ভীর হাস্যে বলে, 'দু-একজনে ইচ্ছে করলে তো কাজ হবে না। একযোগে পৃথিবীর সমস্ত লোক যদি মহাপুরুষ হয়ে ওঠে তবেই না।'

নীতা বলে, 'ওটা তো আপনার ঠাট্টার কথা। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত লোক তো একটা আস্ত জিনিস নয়? প্রত্যেকে তো আলাদা এক একটা ব্যক্তিমানুষ। কেবল-মাত্র নিজেকেই যদি ভাল করবার চেষ্টা করা যায়, কিছই কি হয় না তাতে? শুধু নিজের ভালটি তো আমরা দেখতে ছাড়ি না? পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ দূরবস্থায় পড়ে আছে, অতএব শুধু, আমার অবস্থা ভাল করে আর কি হবে? একথা তো ভাবি না? আমার ছেলেটিকে ভাল করে পড়াতে চাই, আমার মেয়েটিকে ভাল বিয়ে দিতে চাই, আমার পরিজনকে ভাল খাওয়াতে, পরাতে চাই, আমার বাড়ীটিকে ভাল সজাতে গোছাতে চাই, এসব তো আমরা চাই? আর চাইবার সময় পৃথিবীর সম্বন্ধিয়ার কথা ভাবতে বসি না? তবে না হয় মহৎ হবার ব্যাপারে কেবলমাত্র নিজের ওপর দিয়েই এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখা গেল?'

(ক্রমশঃ)



এম, আর, গি,
ট্রানজিস্টার রেডিও

মিগ রেডিও প্রোডাক্টস

১৫৭বি, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-১০

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিদগ্ধজনের আলোচনা নিয়ে একটি মূল্যবান সংকলন প্রকাশিত হয়েছে সোবিয়ত রাশিয়ায়। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইয়ে, পে, চেলশেফ ও এন, এস, গোলড্‌বেগ। গোলড্‌বেগ কিছুদিন আগে মারা গেছেন। ভারতীয় আলোচকদের মধ্যে আছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, গোপাল হালদার, হীরেন মুখোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ ও বিষ্ণু দে। এঁদের প্রত্যেকেরই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় চিন্তা-ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত স্মৃতিকথাধর্মী প্রবন্ধটি খুবই বৃহদায়তনের; রবীন্দ্র চিত্রকলার ওপর লিখেছেন বিষ্ণু দে; সংগীতের ওপর লিখেছেন শান্তিদেব ঘোষ; রবীন্দ্রপ্রভাব (সাহিত্যে ও জীবনে) সম্পর্কে লিখেছেন গোপাল হালদার; রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক ভারত সম্পর্কে লিখেছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ; রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদর্শিত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়।

মোট আটজন সোবিয়ত বিশেষজ্ঞের রচনা সংকলনে স্থান পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন আ দে লিংমান (রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মত); আ পে ন্যাত্যক-দানিলচুক (রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টি); আ আ গার্বড্‌স্কি (রবীন্দ্রনাথে শেষ জীবনের গীতি কবিতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য); ই আ ভলন্তিক ও আ ই চিচেরফ (১৯০৬-৮ সালের জাতীয় আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তার প্রতিফলন); আ কা জেওফ (রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শিত); ইয়ে এম বীকভা (ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ); এল এস গামাইউনফ (সোবিয়ত দেশে রবীন্দ্রনাথ) এবং ভে আ নীভকভা (সোবিয়ত দেশে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ ও সমালোচনা)। চেকোস্লোভাকিয়া ও রুমানিয়া থেকে লিখেছেন যথাক্রমে দুশান জুভাবিটেল (স্বদেশী আন্দোলনের বিচারে রবীন্দ্রনাথ: ১৯০৫ সালের পর) ও ভে বেনেৎসিয়ান্দ (রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকৃতির সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিবর্তন)। এল আ স্ত্রিজেন্সকায়া কৃত ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্টে আছে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনাবলীর নিষ্পত্তি ও সোবিয়ত দেশের বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলীর অনুবাদের তালিকা।

আগামী শরৎকালে জর্জ বার্ণার্ড শ রচিত এন্ড্রোকলস্ অ্যান্ড দি লায়ন নামক পুস্তকটি নতুন ৪০ অঙ্কের বর্ণমালায় মৃদুগের ব্যবস্থা হয়েছে। নতুন বৃটিশ বর্ণমালা রচনায় শ' জীবনের একটা বড় অংশ অতিবাহিত করে যান। তিনি মৃত্যুর পর এক বিরাট অধিদান করে যান এ সম্পর্কে গবেষণার

সাহিত্য সম্মান

জন্ম। গবেষণা পরিচালনায় এই উৎসর্গীকৃত অর্থ ব্যয়িত হয়। তাই এতদিনে ৪০ অঙ্কের বর্ণমালা রচনা সম্পূর্ণ হল।

শ'র এই পুস্তকটির একটি মূল্য সংস্করণ প্রকাশিত হবে। পুস্তকটির বামদিকের পৃষ্ঠাগুলি পুরো স্বাভাবিক বর্ণমালায় এবং ডানদিকের পৃষ্ঠাগুলি নতুন বর্ণমালায় মুদ্রিত হবে।

* * *
নিউ ইয়র্ক ওয়াশিংটন পত্রিকার স্বর্গত জোসেফ পুলিৎসার 'পুলিৎসার' পুরস্কারটির প্রবর্তিত। মূলতঃ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এ পুরস্কার দান করা হলেও সাহিত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের জন্যও পুরস্কার দেওয়া হয়। বর্তমানে আমেরিকান সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি পুলিৎসার পুরস্কার লাভ। ১৯৬১ সালে যে ১৪ জন পুলিৎসার পুরস্কার লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ৫ জন লাভ করেন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির জন্য। এই পাঁচজনের মধ্যে আছেন হার্পর লী ও ফিলিস ম্যাকগিনলী নামে দুজন মহিলা।

হার্পারলীর পিতা এবং ভগিনী ছিলেন আইনজীবী। লীও আইন পড়েন। লেখক মারেই আইন পড়বে—লী একথা বিশ্বাস করেন। বহু সাধনার ফলশ্রুতি নিয়ে তাঁর প্রথম উপন্যাস টু কিল এ মিকিং বাড' যখন প্রকাশিত হল তখন বিদগ্ধজনের অকুণ্ণ অকুণ্ণ প্রশংসালাব করে। বছরের সেরা ও সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাসস্বরূপে খ্যাতিলাভ করে। দুটি প্রবন্ধ আর তিনটি ছোটগল্প নিয়ে অতিদুঃসাহসভরে লী একদিন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কঠোর সাধনা আর গভীর জীবনদর্শন তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিয়েছে অল্পকালের মধ্যেই।

ফিলিস ম্যাকগিনলী সম্বন্ধে 'পাশ্চ' পত্রিকার পিটার ডিকসন বলেছেন যে, 'জীবিত মার্কিং কবিদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। তাঁর রচিত কবিতার সুনীর্বাচিত সংগ্রহ 'টাইমস থ্রী সিলেকটেড ভ্যলুস ফ্রম থ্রী ডেকেডেস'এর জন্য পুলিৎসার পুরস্কার লাভ করেন। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাসমূহ অন্তরের অকৃত্রিম সহানুভূতির মধ্য দিয়ে লঘু ছন্দে প্রকাশ করেছেন ম্যাকগিনলী। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত

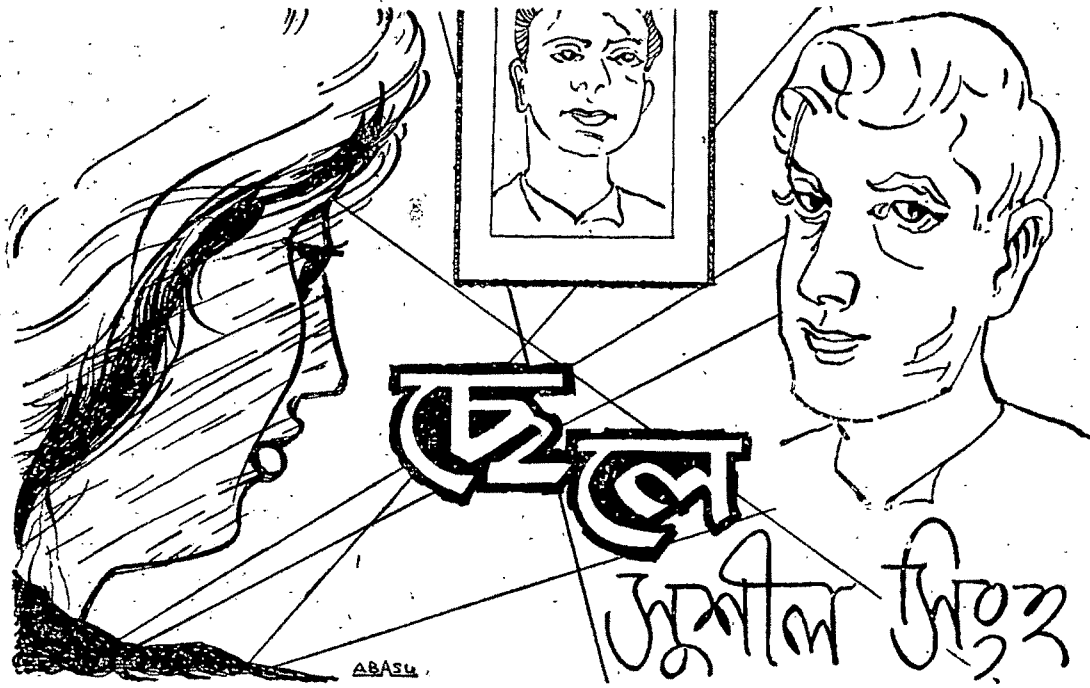
প্রকাশিত কবিতা থেকে ৩০০টি কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বার পর ত্রিশ বৎসর ধরে তাঁর কবিতার ক্রমউৎকর্ষমানতার একটি রূপ স্বচ্ছন্দে উপলব্ধি করা যায়। ম্যাকগিনলীর 'মেরী ক্রিসমাস হ্যাপী নিউইয়ার', 'স্টোনস ফ্রম এ গ্লাস হাউস', 'এ শর্ট ওয়াক ফ্রম দি স্টেশন', 'দি প্রাইভস অব দি হার্ট', প্রভৃতি গ্রন্থও সমালোচকগণ কতৃক প্রশংসিত হয়েছে। পুলিৎসার পুরস্কার লাভ করবার আগে আমেরিকান প্যারোটি সোসাইটির 'এডনা সেন্ট ভিনসেন্ট মিলে' পুরস্কার লাভ করেন ম্যাকগিনলী।

* * *
এডিনবারা বার্ষিক সংগীত ও নাটকোৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ। এবারে উৎসবের সময় সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। উৎসবের ইতিহাসে এই প্রথম সাহিত্য স্বতন্ত্র কলা হিসাবে মর্যাদা লাভ করল। উৎসবে যোগদানের জন্য প্রায় ৫০ জন ঔপন্যাসিক আমন্ত্রিত হয়েছেন; তাঁদের মধ্যে আছেন ভারতীয় লেখক কুশওয়ান্ত সিং। প্রায় ১১টি দেশ এই সাহিত্য সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করবে। সম্মেলনে প্রধানত সমকালীন উপন্যাস সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

আমন্ত্রিত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আছেন নর্মান মেইলার ও উইলিয়াম ফকনার (যুক্তরাষ্ট্র), ইলিয়া এরেনবুর্গ (রাশিয়া), আইভো আন্ড্রুচ (যুগোস্লাভিয়া), আলবের্তো মোরাভিয়া (ইতালী), ফ্রান্সোয়া সা গার্ন, সীমন দ্য বোভয়র ও জাঁ পল সার্দে (ফ্রান্স) এবং গ্রাহাম গ্রীন, কিংসলি এমিস, আর্ল রাসেল ও সি, পি, স্নো (ব্রিটেন)। এঁদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীগণ হলেন উইলিয়াম ফকনার, আইভো আন্ড্রুচ, এবং আর্ল রাসেল।

* * *
জার্মানীর অধিবাসীদের পুস্তক প্রীতির একটা ঐতিহ্য রয়েছে। বেদসহ বহু সংস্কৃত পুস্তক জার্মান ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। গত বছর পশ্চিম জার্মানীতে ২২,৫২৪টি নতুন বই প্রকাশিত হয়, তার পূর্ব বৎসর হয় ১৬,৫০২টি। এর ফলে বিশ্বের বৃহত্তম চারটি পুস্তক প্রকাশক দেশের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীও সেগুটির মধ্যে অন্যতম দেশে পরিণত হয়েছে। প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে শতকরা ২১-৭ ভাগ হল সাহিত্য, তার পর হল আইন ও প্রশাসন সম্পর্কিত পুস্তক, ধর্মীয় ইতিহাস, সভ্যতা, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তক।

গত বছর অনূদিত পুস্তকের সংখ্যা ১,৬০৫ থেকে বেড়ে ২,৬১০তে দাঁড়। এবং এগুলির মধ্যে অর্ধেকের বেশী ছিল সাহিত্য পুস্তকের অনুবাদ।



দোকানে কোন হাতী ছিল না। খেলনা বলতে ছিল কিছু রং-করা কাঠের ঘোড়া। আর ন্যাকড়ার পতুল। ন্যাকড়ার পতুলে মন উঠল না। বাচ্চা-ছেলে নাড়াচাড়া করতে নষ্ট করে ফেলবে। কাঠের ঘোড়া কিনলেন তিনি। টাফ। একটা নিকার-বোকার কিনতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু সুরমা কি ভাবে ভেবে নিলেন না।

এককালে সুরমা ছাত্রী ছিল তাঁর। এই তিন বছর আগেও সে থাকত এই হস্টেলে। সেবার যখন সুরমার পান-বসন্ত হলো। সুরমার অসুখের কথা উঠলেই সবাই শতমুখে স্নেহদীর সেবার কথা বলে। সেবা স্নেহদীর স্বভাবে আছে। বোধ হয় সে কথা মনে করাই সুরমা ছেলে কোলে দেখা করতে এসেছে। সে কথা থাক। ছাত্রীর দেড় বছরের ছেলেকে নিকার-বোকার কিনে দিলে কে কি ভাবে মনে করে স্নেহদী নিজের ইচ্ছাকে শামকের মত নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিলেন।

হাতে খেলনা নিয়ে ফিরে এলে সুরমা একবার গতানুগতিক আপত্তি করতে চেয়েছিল। কিন্তু মূখে কিছু বলতে পারলো না। বাচ্চার হাতে খেলনা দিয়ে তাকে কোলে নিয়ে গালের ওপর গাল চেপে ধরলেন স্নেহদী। এতক্ষণ ধরে হস্টেলের যে সব মেয়েরা তাকে কোলে নিয়ে ফিরছিল, তারা কেউ কেউ দেখল

যে, বাচ্চাকে আদর করার বেলার আই-বুড়ো স্নেহদী যেন তাদের চেয়েও খুশী হয়ে গেছে।

সুরমাকে এগিয়ে দিতে গেটের কাছে এগিয়ে এসে 'আবার আসিস' বলতে গিয়ে স্নেহদী খাপছাড়া ভাবে বললেন, হ্যাঁরে, ছেলেকে তোর হস্টেলে দিবি তো?

সুরমার তো প্রথমে হাসিই পেয়ে গেল। বলল, আগে বড়ো হোক।

—নিশ্চয়ই। ছেলে তো তোর বড় হবেই। কিন্তু শোন, ওকে যখন স্কুলে দিবি, দু-এক বছরের মধ্যেই ওকে হস্টেলে দিয়ে দিস। কেন জানিস?

এই গায়ে-পড়া পরামর্শে আর স্নেহদীর কথা বলার ধরণে সুরমা অবাক হল। সে মনে মনে ভাবল, ছেলের স্বাদ জানে না স্নেহদী। যদি জানতো, তাহলে ঐ কথা বলতো না কখনো। কেউ কি সাধ করে ছোট ছেলেকে হস্টেলে দেয়? আশ্চর্য!

স্নেহদী নিজের মনে বলে চললেন, খুব ছেলেবেলা থেকে হস্টেলে থাকলে, মার কাছ থেকে দূরে থাকলেই, ছেলেরা মাকে বুঝতে পারে। ছেলে মাকে বুঝবে, এটা খুব দরকার। আমি একটি মেয়েকে জানি, তার একমাত্র ছেলে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত মার কাছে থেকে হস্টেলে গিয়েছিল। তারপর কি হলো জানিস? সে এক আশ্চর্য ঘটনা—

সুরমা মাঝপথে বলে বসল, আমি আজ চলি স্নেহদী।

—আয়। আবার আসিস, এই বলে বাচ্চার গালে চুমো দিলেন স্নেহদী। সুরমা হাত বাড়িয়ে তার ছেলেকে কোলে নিল। রিক্সা করে কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর সুরমার খেয়াল হলো যে, আসার সময় সে স্নেহদীকে প্রণাম করে আসেনি। ভুল হয়ে গেছে।

॥ ২ ॥

রোজকার মত আজও মিনা এলো সন্ধ্যার আগে। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী মিনার সঙ্গে স্নেহদীর বিশেষ যোগাযোগের এক ছোট ইতিহাস আছে।

—“আমি একটি মেয়েকে জানি, তার জীবনে আশ্চর্য এক ঘটনাজড়ী হয়েছে—” এই কথাই স্নেহদী বলে-ছিলেন মাস পাঁচেক আগে ফোর্থ ইয়ার সেমিনারে। আর এই পাঁচ মাসে মিনা যেন দিনে দিনে স্নেহদীর ছায়া হয়ে উঠেছে। স্নেহদী সব ছাত্রীর সামনে বলেছিলেন, “দ্যাখো, মেয়েদের মাতৃ-রূপের কথাটা খুব ফলাও কর বলা হয় বটে, ওটা কিন্তু একটা সংস্কার।”

তিনি আরও বলেছিলেন—

সে দিনের ঘটনা একটু বিশদ করে বলতে হয়।

পাঁচ মাস আগে সেমিনারের সাহিত্য-সভায় সেই কথাটা মিনা অত সহজে কি

করে বলতে পেরেছিল, তা তাঁর মন জানে। বেদনার থেকেই তো বোধের জন্ম। এ কথাটা মিনা এখন খুব ভালো বোঝে।

সেদিন সেমিনারে হেনা একটা প্রবন্ধ পড়ছিল। হেনা একটা বেশী পরিমাণে লেখে। প্রবন্ধই বেশী। বাইরের আকাশ নিভু নিভু। জানালা দিয়ে বেলাশেষের নারাজী রোদ্দুর এখানে ওখানে ছিটিয়ে পড়ছিল। মেয়েরা উসখুস করছিল। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় ফিসফিস করছিল। আসলে হেনার প্রবন্ধে কারোই মন ছিল না। তাদের বসার, চাহনিতে, ইসারায়, চুড়ির আওয়াজে—একটা খেয়াল করলেই সে অমনোযোগ দেখা যেত।

তবু খুব মন দিয়ে পড়ছিল হেনা। আর সমান মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলেন স্নেহাদি। হাতের পাতার ওপর চিবুক রেখে সামান্য ঝুঁকে বসার ভঙ্গীতে এক মনে শুনছেন তিনি। চওড়া পাড় সাদা মেঝের তাকের শাড়ী স্নেহাদির চার পাশে কেমন এক সাদা আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। কানের পাশে চুলে কয়েকটি রূপালি রেখা যেন তাঁর বিশেষ প্রসাধনের মত বিকর্মিক করছে। স্নেহাদিকে সাহিত্যের পরিবেশে এভাবে যখন মেয়েরা দেখে, তখন তাদের মনে হয় যদি একজন ভদ্রলোক—যার বয়স পঞ্চাশ ছুঁয়েছে, যিনি ঢিলে—হাতা পাঞ্জাবি পরেন, চুলে পাক ধরেছে, মাঝে মাঝে চুরট খান যিনি, অনেক বই লিখে, অনেক অনেক নাম হয়েছে যার—তিনি যদি স্নেহাদির বর হতেন তাহলে কি সুন্দর হতো!

সত্যি, সাহিত্যের কথা উঠলেই স্নেহাদি মানুষটাই যেন পাটে যায়। তখন তাঁকে এতো ভালো লাগে। না হলে, তাঁকে নিয়ে মেয়েদের—বিশেষতঃ হস্টেলের মেয়েদের—অস্বস্তিও অনেক। স্নেহাদির ব্যতিক্রম কি কম? হস্টেলের মেয়েদের যে-কোন সময় বারান্দায় দাঁড়ানো তিনি দেখতে পারেন না। যে-কোন মেয়ে দাঁড়ালেই স্নেহাদি ডাক-বেন—। মেয়েরা বলে, ‘গলা তো নয়। আকাশ।’ মেয়েদের দৃপ্তের বেলায় জানালা খুলে পর্দা সরিয়ে রাখাও তিনি পছন্দ করেন না। গরম কালেও না। এমন কি রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দৃপ্তের, মেয়েরা যদি আলুকাবালি, ফুটকা, চানাচুর আনিতে যায়, তাতেও তাঁর ঘোর আপত্তি। কোন কোন প্রগল্ভা ছাত্রী নিজেদের মধ্যে মন্তব্য

করে, “নিজের চুলে পাক ধরেছে কিনা। তাই বাইরের জগতকে এত ভয়!”—

কিন্তু সাহিত্যের বেলায় এই মানুষই অন্য হয়ে যান। মেয়েরা তা দেখেছে, দেখে। আর মেয়েদের ওপর তাঁর জোরও সেইখানেই। কত যে পড়েন স্নেহাদি! পাতার পর পাতা, বই-এর পর বই। দেশ, বিদেশ। অহরহ। বাম্বা! যেন বই-এর মধ্যে ডুবে আছে। তিনি বলেন, “সাহিত্য ভালবাসলে গোটা পৃথিবীকে ভালবাসা যায়। মনের কাছে গোটা জগৎ, সব কিছু ধরা পড়ে।”

সেদিন সেমিনারে অবশেষে হেনা থেমেছিল। তার প্রবন্ধটা আকারে যেন ‘দুই বোন’ উপন্যাসের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। মেয়েরা নড়ে বসল। হেনা স্নেহাদির দিকে ও পরে তার সতীর্থদের দিকে, নিজের পিঠ নিজে চাপড়ানোর ভঙ্গীতে একবার তাকিয়ে বসল। আর একটা যন্ত্রণা ব্যাক। এবার স্নেহাদি সকলকে আহ্বান করলেন পঠিত রচনার বিষয়ে কিছু আলোচনার জন্যে। কিন্তু কেউ বড় একটা গুঠে না। তখন তিনি নিজেই—

সেমিনারের এক কোণে বসে নিজের মনে আকাশ দেখছিল মিনা। সে নিজেও জানত না যে, সে উঠে দাঁড়াবে। আহত হওয়া মাত্র সে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে অবাক করে বলল, “হেনার প্রবন্ধটা আমার ভালো লাগেনি। মেয়েরা দুই জাতের—মা আর প্রিয়া, এই ফরমেলার ওপর রবীন্দ্রনাথ যে উপন্যাস লিখেছেন, হেনা সেই এক কথাই বলেছে। কেবল মাতুরূপের কথাটাই বারবার বেশী করে বলেছে। আমি ভেবেছিলাম—”

—কি ভেবেছিলে?

কথার পিঠে কথা এগিয়ে দিতে দিতে মিনা যেন একটা হাঁপিয়ে উঠল। চার পাশে চাইল। তারপর বলল, মা আর প্রিয়া ছাড়াও মেয়েদের আর এক ক্লাত আছে। মা আর প্রিয়া হবার বাসনা যাদের মধ্যে মাথা কোটে, অথচ যারা মা, প্রিয়া কিছুই নয়, তারাও তো মেয়ে। আমি..... আমি..... আধুনিকাদের কথা বলছি। রবীন্দ্রনাথ এদের দেখেননি।

এত গুছিয়ে যে বলতে পারবে তা মিনা জানত না। কিন্তু বলেই তার মনে হলো, সে ধরা পড়ে গেছে। সে বসে পড়ল। হেনার মৃদু গম্ভীর। অন্য ছাত্রীরা বেশ হাসি-খুশী।

স্নেহাদি চেয়েছিলেন মিনা আরো

কিছু বলুক। কিন্তু আর কিছুতেই সে কিছু বলল না।

অতএব মিনার তোলা প্রসঙ্গ ধরে স্নেহাদি একাই অনেক কথা বললেন।

সেদিন উপসংহারে তিনি যা বললেন তা শুনে ছাত্রীরা রীতিমত বিস্মিত হল। তিনি বললেন, দ্যাখো মেয়েদের মাতুরূপের কথাটা খুব ফলাও করে বলা হয় বটে, ওটা কিন্তু একটা সংস্কার। মা হওয়াকে মেয়েরাই খুব বেশী বড়ো করে জাহির করে। কেন জান?

বলতে বলতে স্নেহাদি তাঁর ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রীদের দিকে চাইলেন। সব কাঁচি চোখ তখন তাঁর ওপর স্থির হয়ে আছে।

—কেননা অধিকাংশ মেয়েই মা হওয়ার বেশী কিছু হতে পারে না। অথচ মা হওয়ার পরও জীবনের অনেক বাকী থাকে। আমি একটি মেয়েকে জানি, তার জীবনে আশ্চর্য এক ট্রাজেডী হয়েছিল—

গল্পের আভাসে সেমিনার উৎসুক হয়ে উঠেছে। একজন বলেই ফেলল, কি ট্রাজেডী স্নেহাদি?

—আজ থাক। সন্ধ্যা হয়ে এল।

এই বলে স্নেহাদি আর দাঁড়ালেন না। সভা ভঙ্গ হল।

সভা ভঙ্গ হল বটে, কিন্তু সেই থেকে মিনা রইল স্নেহাদির পায়ে পায়ে। যেন ছায়া হয়ে উঠল সে। আর দেখতে দেখতে কেমন বদলে গেল সে। যে মিনার সাহিত্যে রুচি ছিল না, সে এখন কত বই পড়ে। শব্দ পড়ে? ভীতি আধুনিক যে সব ছোটগল্প, যাতে ভঙ্গীর প্যাঁচগুলো বর্ষার ফলার মতো বেঁধে বলে অনেকেই পড়তে চায় না, তাও যে বেশ রসিয়ে আশ্বাদ করে।

স্নেহাদি বলেছেন, এর পর আপনাই ওর ক্লাসিকে উৎসাহ আসবে। ক্লাসিক পড়লেই, পৃথিবী চিরকালের বন্ধ হয়ে যায়। সত্যি!

শুনে মিনার বুকের মধ্যে গুরুগুরু করে উঠেছে। কেউই দেখতে পার না, তার মনোযোগের পাশাপাশি আছে সমান অমনোযোগ। সে যখন মনটা সব চেয়ে বেশী গুছিয়ে নিয়ে বসে, ঠিক তখনই মনের ভিতবে ভিতরে ফাঁস আলগা হয়ে যায় তার।

আসলে যন্ত্রণার ঘণ্টা। সকলের আড়ালে বুকের মধ্যে সেই ঘুরুরী চেনা

অনুভূতি খোঁজে গল্পের জগতে।
মিনাকে তাই একটা পাখী মনে হয়।

কিন্তু কতদিন? কতদিন পারা যায়
এমনিভাবে নিজের বৃকে একা বসে
বেড়াতে?

তাই আজ মিনা এসেছিল স্নেহদীর
কাছে নিজেকে মেলে দেবে বলে। এসে
দেখল অন্ধকার ঘরে স্নেহদী একা বসে
আছেন চুপ করে। মিনা আসতে বললেন,
আজ সুন্দর। এসেছিল জানিস মিনা।
ওর ছেলে দেখিয়ে নিয়ে গেল। ও, তুই
তো আবার সুন্দরকে চিনিস না। বোস,
আমি আসছি। এই বলে স্নেহদী যেন
একটা টান দিয়ে নিজেকে বাইরে নিয়ে
গেলেন। ঘরের আলো জেলে দিলেন
যাবার মুখে।

।। ৩ ।।

স্নেহদী তাঁর ঘরে ফিরে এসে
দেখলেন ঘরখানা অন্ধকার।

—আলো নেভালি কেন? চুপ করে
বসে আছিস যে—

কোন সাড়া দিল না মিনা।

পারে পারে কাছে এসে বললেন,
কি হয়েছে রে?

অন্ধকার ঘরে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছে
মিনা।

আলো জ্বলল। ভেজা চোখে ঘরের
দেওয়াল ঝাপসা ঠেকল মিনার কাছে।

—আমার মা নেই স্নেহদী।

—আগে তো কোনদিন বলিসনি।

—আমার মা অনেক দিন আগে চলে
সেছেন। তখন আমি খুব ছোট। উনি
আমার—

—তাতে কি হয়েছে? ছিঃ কাঁদতে
নেই। আমি তো আছি।

এই বলে মিনার পিঠে হাত রাখ-
লেন তিনি।

কী গভীর আশ্বাস সে স্পর্শে।
চন্দনের মত শীতল সৌগন্ধী যেন মিনার
সবটুকু ছুঁয়ে রইল। এই আশ্বাসের
ঋণ চেয়েই তো সে বসে আছে।

স্নেহদীর বৃকে মৃদু লড়কিয়ে ছোট
মেয়ের মত কাঁদল মিনা। অনেকক্ষণ।
চোখ মুছল তারপর।

—কি হয়েছে বলতো। কি চাই
তোর? আমার বল—

বলল মিনা। /

যে স্নেহদী হস্টেলের মেয়েদের
বারান্দায় দাঁড়ান পছন্দ করেন না, কেউ
দাঁড়ালেই যাঁর গলা নাম ধরে পিছন
থেকে আঁকশির মত এগিয়ে আসে,
মেয়েদের যিনি সর্বক্ষণ দু'চোখ জেলে
পাহারা দিচ্ছেন বলে মেয়েদের ধারণা,
সেই তাঁকেই সব বলল মিনা। একটুও
বাধল না তার। সব বলল। পড়ো
গল্পটা।

—হ্যাঁরে, ঠিক জানিস তো! নিজের
মনকে ভুল বুদ্ধিসানি তো? অনেক
সময় কিন্তু তা-ও হয় বাপু।

মিনা উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে
রইল।

স্নেহদী কৌতুক করে বললেন,
রামায়ণের মারীচের গল্পটা কিন্তু শুধু
সীতা হরণের জন্য নয়। ভালোবাসা
অমনি সোনার হরিণ সেজে সামনে এসে
দাঁড়ায়। হাতের মৃদু পাবার আগেই
দেখা যায়, ওটা হরিণ নয়, রাক্ষস—।

—মানে?

—ওঁকি অমন চমকে উঠলি কেন?

—কই না!

—আমি একটি মেয়েকে জানি, এক-
দিন তোর মত সেও—

—কি হয়েছে?

—না, তুই কেবলই চমকে উঠিস।
অবশ্য তোর গল্প আর সেই মেয়েটির
গল্প একেবারে আলাদা। সে এক
আশ্চর্য ট্রাজেডী—

বয়স বিস্মৃত হয়ে দুটি অনুভূতি
ইচ্ছা কিংবা বাসনা যেন মানুষী রূপ
ধরে স্নেহদীর ঘরে বসে আছে।

তবু সোঁদীনও গল্পটা বলা হল না।

।। ৪ ।।

সাত দিন পরেই সে গল্প শুনল
মিনা।

সে যে শুনতে পেল, তা কি শুরুরই
তার শোনার আগ্রহের জন্য? সেই পাঁচ-
মাস আগে সেমিনারে, সুন্দরকে গেটে
এগিয়ে দিতে গিয়ে, আজ মিনার সামনে
বসার আগে, আজও অন্ধকারে একা একা
গল্পটা বলার জন্য স্নেহদী কি ছটফট
করছিলেন না?

কে জানে! যাঁর চুলে দু'এক গাঁছ
রূপালি রেখাকে বিশেষ প্রসাধন বলে
মনে হয়, তাঁর মুখে দেখে বোকা যায় না
কিছুই।

স্নেহদী সে গল্প শোনালেন।

বললেন, খুব ছোট করে তোকে
বলি। আমি একটি মেয়েকে জানি,
ম্যাট্রিক পাশ করার পরই তার বিয়ে
হল। তখন কত আর বয়স তার?
সতেরো। বিয়ের বছর দেড় পরেই
মেয়েটি মা হলো। কিন্তু তার ভাগ্য
মন্দ। ছেলোটি তিন দিনের দিন মারা
গেল। আবার সে মা হল। এবার মরা
ছেলে। আবার মা হল। এবার বাঁচল।
এই ছেলোটি যখন তিন বছরের তখন
বিধবা হল মেয়েটি। তিন দিনের জ্বরে
স্বামী চলে গেল তার।

ছেলে। একটা ছেলে ছাড়া তার
পৃথিবীতে কিছুই রইল না তার। সম্ভা
বেলায় স্বামীর ছবির সামনে দাঁড়ায়।
ছবির কাঁচ মোছে। ছেলে ছবিতে
বাবাকে দেখে। ক্রমে ক্রমে ছবির সামনে
দাঁড়ালে চোখ ভিজে ওঠা ফরোলা তার।
একটু একটু করে ছেলে বড় হয়।
দিনের পর দিন যায়। রোজই সূর্য এক
জায়গায় ওঠে। রোজই সূর্য এক
জায়গায় নিভে যায়। ছেলে বড় হবে।
অনেক বড় হবে। অনেক, অনেক বড়
হবে। এ ছাড়া আর সামনে কিছু নেই।
কিন্তু ছেলে বড় হবে শুধুমাত্র এই
চিন্তার একটি মেয়ের গোটা দিনের
সমস্ত সময় কুলোবে কেন?

তারও কুলোল না। এতদিনে মেয়েটি
পাড়া-বেড়াতে আরম্ভ করল। অন্যের
খুঁৎ কাড়া স্বভাব হল তার। ভিতরে
ভিতরে ভরানক হিংস্রটে হয়ে উঠল
সে। কেবল পরচর্চা তার মুখে।

ঠিক এই সময় তার জীবনে এলো
সেই ভদ্রলোক। তিনি আগেও আসতেন।
এসেছেন। আবার নতুন করে এলেন।
সেই ভদ্রলোকের উৎসাহে, পরামর্শে
আবার নতুন করে সুন্দর হল পড়া।
পরীক্ষার প্রস্তুতি। একের পর এক।
পাশের খবর। বছরের পর বছর। মেয়েটি
এগিয়ে চলল। ছেলেও বড় হচ্ছে। একের
পর এক ক্রাশে উঠছে সেও।

একদিন সম্ভ্যার অন্ধকারে চমকে
উঠল মেয়েটি। গা ধুয়ে সে ঘরে এসে
দাঁড়িয়েছে। সাদা থান, সাদা জামার
দিকে চেয়ে হাত যেন ছটফট করে উঠল
তার। তার একটুও ইচ্ছে হল না
ওগুলো ছুঁতে। রং চাই তার। সাজতে
মন চাইছে। এ যে কি ভীষণ যন্তণা
তা বুদ্ধি বলে বোঝান যায় না। বিধবার
থান, যা তার দাঁতে করে কুটি কুটি করে

ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে, তাই টেনে নিল সে। কিন্তু সেদিন তার নিজের মনের সঙ্গে মূখ দেখাদেখি হল। হতা-ভাগী টের পেল যে সে মরেছে।

মাঝে মাঝে হঠাৎ পরপর কদিন বিকেলের দিকে তিনি আসতেন না। তখন মেয়েটির যেন অসম্ভব মনে হতো বেঁচে থাকা। ভীষণ কান্না পেত তার।

স্নেহাদি রহস্য করে বললেন, মানে তোর যা হয়, তারও হতো। তবে তার অসুখটা তোর চেয়েও করুণ। তুই তবু তোর বন্ধু-দেব—এই তো আমাকে তোর মনের কথা বললি। সে বোঝার তা-ও পারতো না। তারপর একদিন তিনি আবার আসতেন। কিংবা তিনি আসার আগেই মেয়েটির ছেলে গিয়ে ডেকে আনত তাকে। বলতো, “মামা, বারে আমাদের বাড়ী যাওনি কেন? চলো—”

এম-এ পাশ করলো মেয়েটি। পাশের খবর পেল যেদিন, সে রাতে নিজের ছেলেকে অনেক আদর করল সে। আর বিশ্বাস কর, ভীষণ স্বাধীনপরের মত সে ভালল এই ছেলে আছে বলেই ওই ভদ্রলোক সবার চোখের সামনে দিয়ে তার বাড়ী এসেছেন। কোন কথা ওঠেনি। দু’হাতে সে আঁকড়ে ধরল ছেলেকে। শূদ্ধ স্বার্থে নয়। যতদিন সে বাঁচবে ততদিন সে তার ছেলেকে বুকের কাছে এমনি করে রাখতে চায়। ওই ভদ্রলোককে শূদ্ধ দু’চোখ ভরে দেখতে চায়। “ঠাকুর, আর কাউকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না”; এই বলে সে কাঁদল। অনেকক্ষণ।

কিশোর ছেলে বলল, মা তুমি কাঁদছো কেন?

মা উত্তর দিল না।

—বাবার কথা তোমার মনে পড়ছে? না মা?

মা এবারও কোন উত্তর দিল না।

স্নেহাদি বললেন, মেয়েটির কোন দোষ নেই। সে আগে মা হয়েছে। পরে প্রিয়া। সবই তার ভাগ্য। সে কি করবে? কোন উত্তর তার মুখে জোগাল না। এদিকে ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসতে থাকলেন। দু’জনের মধ্যে যেন এক অনদ্ভূত, অদৃশ্য অথচ সব কিছুর বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

দু’বছর পরেই স্কুলের পড়া শেষ করলো ছেলে। তার ছবি নেওয়া হলো

একটা। তবে যৌবনের ইসারা জেগেছে দৃষ্টিতে, নাসায়। কিশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ সারা মুখে জ্বল জ্বল করছে।

ছেলে ভর্তি হলো কলকাতার কলেজে। ফিজিক্সে অনাস নিয়ো। এবার সে হুটেলে থাকবে। তাকে হুটেলে পাঠানো এক পর্ব। পনেরো দিন আগে থেকে জিনিস গুছোতে লাগল তার মা। পনেরো দিনে পনেরো-শো বারে পনেরো লক্ষ কথা বললো ছেলের সঙ্গে। তারপর ছেলেকে পেরিছে দিতে সে-ও কলকাতায় এলো। সঙ্গে এলেন সেই ভদ্রলোক।

খাটে বিছানা পেতে, কোথায় ট্রাক রাখবে, কোথায় বই, কোথায় কুঞ্জো, কোথায় রাতে জল ঢাকা গ্লাস এই সব ঠিক করে দিতে দিতে মেয়েটি তার ছেলের রুমমেটকে বারবার বলল, তোমরা দু’ভাই-এর মত থাকবে। কেমন?

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন লাগান ব্যালকনিতে। সেখানে দাঁড়িয়ে বোধহয় চার পাশের পাড়া সম্পর্কে একটা ধারণা করছিলেন। পাশে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটি। ছেলেটির রুমমেট তখন জানতে চাইল ছেলেটির কাছে, উনি কে হন তোমার?

—মামা।

—নিজের মামা বুঝি?

—হ্যাঁ, ছেলেটি বলল।

সেদিন ছেলেকে হুটেলে রেখে ফেরার সময় হুটেলে গেটের বাইরে পা দিতেই টপ্ টপ্ করে জল পড়ল মার চোখ দিয়ে। ছেলেটি তা জানল না।

পূজোর ছুটি তিন মাস পরেই। কোন ট্রেণে আসবে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে ছেলে। মা এসেছে চেষ্টানে। পাশে ভদ্রলোক। গাড়ী চুকছে। প্ল্যাটফর্মে সাড়া পড়েছে। ট্রেণের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছেলে দাঁড়িয়ে। কিন্তু একি, কাছাকাছি আসতেই সে ভেতরে ঢুকে গেল কেন? হাসল না পর্যন্ত। বাস আর বেডিং নামাচ্ছে। পাশে গিয়ে দাঁড়াতে খুব সহজ গলায় ছেলে শূদ্ধ বলল, ও, চেষ্টানে এসেছো বুঝি?

রাতে অনেক পদ রামা করল মা। ভদ্রলোকেরও নিমন্ত্রণ ছিল। ছেলে এক-সঙ্গে খেতে বসল না। রুদ্ধ স্বরে বলল, ক্ষিদে নেই আমার।

রাতে বাড়ী নির্জন হলে, কি ঘুমিয়ে পড়লে সে মাকে বলল, বাবার ছবিটা কোথায় গেল? সেটা কি হারিয়ে গেছে?

বাবার ছবি সামনেই ছিল। কাচের ওপর ধুলো জমেছিল। এইমাত্র।

পূজোর কটা দিনও ছেলে বাড়ী থাকল না। ফিরে গেল ফাঁকা হুটেলে।

এরপর সে ছুটিতে বাড়ী আসা কমিয়ে দিল। কমাতে কমাতে আসা বন্ধ করল সে।

—আর বাড়ীই এলো না ছেলেটি? কি হলো তার?

—সে অনাস পেলো। এম-এস-সি পাশ করলো। তার পর মার সঙ্গে দেখা না করেই আরো পড়বে বলে চাকরী নিয়ে পশ্চিম জার্মানী চলে গেল।

—আর সেই ভদ্রলোক?

—তিনি আসা বন্ধ করলেন।

—মেয়েটি?

—মেয়েটি সে শহর থেকে অন্য জায়গায় চলে গেল। কাজ নিলে সে। ডুবে গেল বই-এর মধ্যে। শূদ্ধ বই। এখন সমস্যা কি হয়েছে জানিস মিনা, মেয়েটি ভীষণভাবে চিন্তা করছে যে সে পশ্চিম জার্মানীতে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে কিনা। রাজ কাগজে সে জার্মানীর খবর খোঁজে। মাঝে মাঝে তার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। ভাবছে সেখানেই যাবে কিনা। ছেলের কাছে যেতে মার তো কোন লজ্জা নেই। আবার মেয়েটা ভাবছে—কি ভাবছে জানিস? ছেলেটিও তো পূর্ণ পুরুষ হবে। তখন হয়তো সে বুঝতে পারবে তার মাকে। তখন হয়তো—থাক্ গে। তাকে মোটা-মুটি খসড়া দিলাম। এই নিয়ে একটা গল্প খাড়া করিস তো। দেখবো তোর কেমন হাত হয়েছে।

—আচ্ছা স্নেহাদি—

মিনাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই স্নেহাদি বললেন, বুঝি রাপ্ত বুঝি। সামনের ছুটিতেই তাকে শব্দরবাড়ী পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আমি দোব তোর বিয়ে। হলো তো?

এই বলে স্নেহাদি এমন ভাবে হাসলেন যে মিনা আর কোন প্রশ্ন করার অবকাশ তো পেলই না বরং খানিকটা যেন লজ্জা পেল।

মিনার বিয়ের পর তিন বছর কেটে গেছে। প্রথম দেড় বছর সে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছিল স্নেহাদির সঙ্গে। তারপর নানা ব্যাপারে আর হয়ে-ওঠেনি।

তারপর সূরমার মতই ছেলে কোলে মিনা এসেছিল স্নেহাদির সঙ্গে দেখা করতে। একজন অধ্যাপিকা বললেন, ওমা। তুমি জানো না? এইতো এক মানুষ হলো স্নেহাদি পশ্চিম জার্মানী গেছেন।

এই বলে তিনি মিনার ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করে চুমো দিয়ে বাচ্চাটাকে আরো হাসাবার জন্যে পেটে নাক দিয়ে বলতে লাগলেন, ওরে বাপরি, বাপরি.....ও বাবু, বাবু.....ও সোনা সোনা.....ও, মাগিক, মাগিক.....ও বাপি, বাপি.....

বই রাখা অন্ধকারে বই রাখা

বই আমরা কিনি, চেয়ে-চিন্তে আনি; কখনো বা জোর করে, এমন কি চুরি করেও যে না আনি এমন নয়। ফুল চুরি আর বই চুরিতে পাপ নেই—একথা বলে মনকে চোখও ঠারি, বোঝাই।

বই আনি, বই পড়ি, হয়তো বা মর্মও বুঝি। কিন্তু বইয়ের মর্যাদা আমরা বুঝি ক'জন। যেমন দাঁতের মর্যাদা বুঝিনে, তেমনি বইয়ের মর্যাদাও না। এখানে মর্যাদা অর্থে বই রাখা এবং বই রক্ষা দুই-ই বোঝায়। একথানা কি দুখানা বই প্রায় সব বাড়িতেই কেনা হয়। যেমন বস্কমস্টার, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বই। প্রথমে তাদের প্রতি আনকোরা নতুনের বন্ধ-আন্তি যে না হয় এমনও নয়, তারপরে দেখতে দেখতে পুরনো হয়ে যায়। মলাট খুলে আসে, কতরার বিড়ি বা সিগারেটের ছাঁকায় এখানে ওখানে ছিদ্র-কলঙ্ক ধরে, গৃহিণীর মধ্যাহ্ন সন্ধানিদ্রার সাথী হয়ে মাথার তেল আর ঘামের ছাপের দাগও পাতায় পাতায় দেখা দেয়। আবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও দাগরা দি করতে ছাড়ে না। তারা পাতায় পাতায় নিজেদের বা-মিতা-মিতানীদের নাম লিখে সদ্য-আয়ত্ত্ব বিদ্যা ফলায়। তারপরে সে-বই এখান থেকে ওখানে, এ-কানাচ থেকে ও-কানাচে ঘোরাফেরা করে। এবং একদিন উইপোকা আরশোলা এবং ইঁদুরের খাদ্য হয়ে কৈবল্যপ্রাপ্ত হয়।

এতো গেল এক-আধখানা বই আর অসাধনানী পরিবারের কথা। এরা বহু হলেও পুঁথি-বাই এদের সাময়িক। এরা নিয়ম নয়, এরা ব্যতিক্রম।

বাদের এ-বাই সাময়িক নয়, বরং স্থায়ী—তাদের কথাই বলা যাক। এদেশে পুঁথি-ক্রেতার সংখ্যা বহু নয় বলে প্রকাশক এবং লেখকেরা আক্ষেপ করেন বটে। কিন্তু এদের সংখ্যা শতকরা হিসাবে অতি সামান্য হলেও কম নয়। এঁরা বই কেনেন, বই পড়েন, আবার এঁদের মধ্যে কেউ বা পড়ুন না পড়ুন, সংগ্রহ করাই তাঁদের বাতক। তাই বই রাখা এবং

রক্ষা, এই দুই ব্যাপারেই এঁরা অবহিত হতে চান। কেউ বা পারেন কেউ বা পারেন না।

বই যাঁরা রক্ষা করতে চান, তাঁরা কেউ বা সেগুঁলি তোরগজাত করে রাখেন। যখন দরকার হয়, তোরগ থেকে বের করে পড়েন। কেউ বা রাখেন আল-মারিতে, কেউ বা খোলা তাকে। আবার কেউ বা এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়েও রাখেন। বাজজাত, আলমারী-জাত বই মানুস-শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু খোলা তাকের আর ছড়ানো-ছিটানো বই-এর সৈদিক থেকে নিরাপত্তা আদৌ নেই। সেগুঁলি পরিবারের মজি এবং অতিথিদের খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভর করে।

তবুও অনেকে মনে করেন, এতে বইয়ের আবহাওয়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তোরগজাত করলে তা সম্ভব নয়। আল-মারীজাত করলে তবু কাচের আবরণের ফাঁক দিয়ে আবহাওয়ার ঝিলিক সে মারতেও পারে।

তাই বই যাঁরা রাখেন, তাঁরা কাচের আলমারীকেই রক্ষার সেরা পদ্ধতি বলে মনে নিয়েছেন। এ-পদ্ধতিতে গৃহিণীর গজনা সহিতে হয় না, পারিবারিক মজির উপর ভরসা করতে হয় না; অতিথিদের পরস্বাপহরণের লোভকেও দমিয়ে দেওয়া হয়। আলমারি সৈদিক দিয়ে পুঁথির সবচেয়ে নিরাপদ আগ্রয়।

পুঁথি যখন ছিল মাটির ফলকে সীমাবদ্ধ, তখন তা রাখার সমস্যা ছিল না। আসুদুবানিপাল তা তাঁর লাইব্রেরীতে সাজিয়ে রেখেছিলেন খরে খরে। তারপরে মিশরে প্যাপিরাস আবিষ্কৃত হতে তারা তাতে আরক মাখিয়ে মিমির সঙ্গে কবর-জাত করে রাখত পিরামিডের ভিতরে। হয়তো তাদের ঘট পটশাডের মধ্যেই রাখত। আর অন্য দেশে কাগজের প্রচলন হতে ঐ পদ্ধতিই চলে আসিছিল। আমাদের দেশে হাড়ি বা পাটরা থেকে

কত যে পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার খবর চন্দ্রকান্ত দে বা মুনসী জসীম-উদ্দীন রাখেন; আর রাখতেন দীনেশ সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাইরা।

কিন্তু বাজ-প্যাটরা বা হাড়িতে রাখাটা রোমানরা সভ্য হতে তাদের বোধ হয় মনোপদতঃ হল না। তাই তারা বই রাখার জন্য তৈরি করলে সুদৃশ্য আলমারী। সে-আলমারী কাঠের। এইবার দেখতে-দেখতে কাঠের আলমারীর প্রচলন হল সারা পাশ্চাত্য জগৎ জুড়ে। আমরা তখনো হয়ত পুঁথি কাঠের পাটায় মড়িয়ে রাখছি। তার উপর কাপড় জড়িয়ে রাখছি। রাজা-বাদশারা হয়তো কাঠের আলমারীর নমুনা রোমানদের কাছ থেকে ধার করে নিজেদের গ্রন্থাগারে চালিয়ে-ছিলেন, কিন্তু আমরা জনগণ তার ধার ধারিনি। এমন কি ইউরোপেও তার বহুল প্রচলন মাত্র সৈদিনের। সৈদিনের বলতে অবশ্য দুশো-তিনশো বা তার বেশি বছরই বোঝায়। স্যামুয়েল পেপিস বই নিয়ে যে বিপদে পড়েছিলেন, সেকথা লিখেছেন তাঁর রোজনামাচায়—বই এত বেড়ে গেছে যে সেগুঁলি এখন গাদা হয়ে আমার চেয়ারগুলোর উপর পড়ে আছে। তাই তিনি নিজে এক কাঠের বড় বড় আলমারী তৈরি করিয়ে সে সমস্যার সমাধান করেন। আজও সেই আলমারী-গুলো ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানা-ডালেস কলেজে দেখা যায়। আলমারীর প্রচলন হলেও সেগুঁলি হয়ত বেটপ, বেমানান ছিল, অনেক জায়গা জুড়ে থাকত; পুঁথি-সমস্যার সমাধান হোত না। এমন কি বিরাট গ্রন্থকীট যাঁরা আছেন, এখনো এ বিপদ তাঁদের রয়েছে গেছে। রাশিয়ার বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আইসেনস্টাইনের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। আলমারীতে আলমারীতে তাঁর গৃহখানি এমন বোঝাই হয়ে গিয়ে ছিল যে, তিনি আর দরকার মতো কোন বই খুঁজে পেতেন না। তখন তারই দোসরা কপি কিনে আনতে দোকানে ছুটতেন। আর একজনের সম্পর্কে গল্প আছে—তিনি পুঁথিতে পুঁথিতে রুম্মশ্বাস গৃহে নিঃশ্বাস ছাড়বার ঠাইও পেতেন না। শেষে হোটোলে গিয়ে তাঁকে ঠাই নিতে হয়েছিল।

এই জাতের গ্রন্থকীটদের কাছে সমস্যা সমস্যাই থাকবে, তার নিরসন হবে না। কিন্তু এঁদের বাদ দিয়েই আমাদের কথা। তাই আজকাল ঘর বড়ো মাপ-মতো আলমারী তৈরির ঝোঁক ওদেশে

দেখা যাচ্ছে। বড় বাড়ির গ্রন্থাগারের বইয়ের আলমারী বা তাকের মা মাপ হবে, ছোট ফ্ল্যাট-বাড়ির তা হবে না। আবার কোন-কোন প্রকাশক তাঁদের প্রকাশিত বই যোগ্য তাক-সমেত দেবারও বিজ্ঞাপিত দিচ্ছেন। এইভাবেই পুঁথি রাখার সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা চলছে।

সেদিন নিউইয়র্ক টাইমসের এক ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেখা গেল, এ নিয়ে বই খাঁরা রাখেন তাঁরা তো ভাবছেনই, সঙ্গে সঙ্গে ভাবছেন স্থপতিরা, ইঞ্জিনিয়ারেরা বাড়ি তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে বুক-কেসেরও যাতে বন্দোবস্ত হয়, তা নিয়ে অনেক ঘাম ঝরাচ্ছেন। আমার দেশেও গৃহ-পারিকল্পনার কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে, এখানেও সেকথা যদি আমাদের স্থপতিরা ভাবেন তো ভালই হয়।

পুঁথি রাখার সমস্যার পর পুঁথি রক্ষার কথা ভাবা দরকার।

পুঁথির অনেক শত্রু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায়, সে শত্রুদল হচ্ছে রোদ, জল, ইন্দুর, উইপোকা আর সবচেয়ে বড় শত্রু পিঁড়তের মূর্থ পুত্র। তিনি আরো কয়েকটি শত্রুর কথা হয়তো বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাঁরা হচ্ছে বন্ধু, গৃহগত অতিথি, রাজনৈতিক বিপ্লব, যুদ্ধ প্রভৃতি।

পিঁড়তের মূর্থ পুত্র বইয়ের মর্ম না বুঝে সেগুলি হয় মূর্খদের দোকানে ওজন দরে বিক্রয়ে দেয়, নয়তো ম্যাকে-জিলায়েলের সেলে চড়ায়। তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যেই জ্ঞানী-গুণীরা তাঁদের সংরক্ষিত পুঁথি কোন বড় গ্রন্থাগারে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে দেন। কিন্তু বন্ধু শত্রু বা

গৃহগত অতিথির হাত থেকে তাঁরাও অব্যাহতি পান না। যদি বা অব্যাহতি পান, তিনি নির্বিশ্বাস। একঘরে হয়ে থাকেন। আবার রাজনৈতিক বিপক্ষ বা বৃক্ষের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়াও মুশকিল। গত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে বহু দেশের পুঁথি-বিলাসীরা তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। তবে স্পেন্ডার সাহেবকে এমন একজন পুঁথি-বিলাসী অধ্যাপক বলেছিলেন—এখানে সস্তা সংস্করণের বই রাখি, দুলভ বইয়ের দিক মড়াইনে। এগুলির উপরে মায়াম নেই। একবার যাবে তো আর-একবার হবে।

মানুষের শত্রুতার পরে আসে আর আর প্রাণীর শত্রুতার কথা। মানুষ শত্রুর কথা পিঁড়তেরা তেমন করে বলেননি, মাঝে মাঝে দু-একজন দু-একটা মাত্র বচন ঝেড়েছেন। যেমন সেই সংস্কৃত প্রবচন—লেখনী, পুঁথিকা বামা পরহস্ত গতা গতা। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর বেলায় তাঁরা নিঃসঙ্কোচেই বলেছেন। আর র‍্যারিস্টল-হারেস থেকে প্লিনী, মায় ছোট প্লিনী অবধি কেউ বাদ যাননি। আবার রবার্ট বার্ন স তো গ্রন্থকীটদের কাকুতি-মিনুতি করেও পদ্যও লিখেছেন। অবশ্য, সে মিনুতি তারা খুঁটপূর্ব যুগ থেকে এই যুগ পর্যন্ত শোনেনি, ভবিষ্যতেও শুনবে না। তাই পুঁথির সেরা দৃশমন গ্রন্থকীটদের হাত থেকে বই রক্ষার নানা প্রচেষ্টা আগেও চলেছে এখনো চলছে, আগামীতেও চলবে। বাইরের শত্রু আরশোলা, ইন্দুর আর উই তো আছেই। এই দৃশমনদের একদল আবার পুঁথির মধ্যেই জন্মায়। যেমন সিলভার ফিস, বাটল প্রভৃতি।

অন্ধকারে এদের জন্ম আর বৃদ্ধি। এদের খাদ্য পুঁথির কাগজ, কাঠ বা চামড়া, কাপড় বা সিরিশ আঁঠা। বাংলা বইয়ের সংস্করণগুলি এদের কাটুনিতে কেটে যায় একথা বীরবল পরিহাস করে বলেছেন বটে; কিন্তু গ্রন্থ-সংগ্রাহকদের কাছে এরা পরিহাসের বিষয় নয়। তাই পুরানো যুগের রোমে এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সেডার তেলের প্রয়োজন হয়েছিল, আর এযুগে আমরা পাঁছ ন্যাপথলিন ও ডি ডি টি। আবার আমাদের সাবেককালের পিঁড়তেরা পুঁথিতে কালজিরে ছাড়িয়ে রাখতেন কেউ বা নিম পাতা, তামাক পাতাও ব্যবহার করতেন। এযুগেও কেউ কেউ তা করে থাকেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মীনেন্দ্রনাথ আর এক কবরেজী ডি ডি টির আরিষ্কার করেছেন। লবঙ্গ, দারুচিনি ও গোলমরিচের গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে এই শত্রুনাশক ওষুধি তৈরি এবং এটি যে বহু পরীক্ষিত এবং সুফল-প্রসূ তাও স্বীকৃত। এছাড়া এই বিজ্ঞানের যুগে যে-কেউ মশকায় ধূম দেবার মতো ধূম দিয়েও শত্রুকুল ধ্বংস করতে পারেন, তবে যে ধূম ধূপের ধোঁয়া নয়, সে ধোঁয়ার কুড়লী সৃষ্টি করতে হলে কার্বন ডায়ক্সাইড, ম্যাল-ডিহাইড কি থাইমলের স্মরণই নিতে হবে। আর তাতে হাতে হাতে ফল। এ সব নিয়ে বিশদভাবে লেখা কেতাবের পর কেতাব আর পত্রিকার পর পত্রিকা আছে। সে সব খাঁরা পড়তে চান, তাঁরা খুঁজে-পেতে এনে পড়বেন। যদিও সে সময় নেই, তাঁদের এটি পড়লেই হয়ত মোটামুটি কাজ দেবে। অতএব অতি বিস্তরেণ অলং।



অন্তঃসলীলা

ভবেন্দ্র চক্রবর্তী



সামান্য একটা শাট ইন্সট করার ব্যাপার নিয়ে এতখানি গড়াবে কোন পক্ষই আশা করতে পারেনি বোধহয়।

মিলু ভাবতে পারেনি শব্দমাত্র একটা চাকরি করার এতখানি দম্ভ হতে পারে মনিষের। উপায় করে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ভরণপোষণ না করে কে? তার জন্যে কারণে-অকারণে কথা শোনাতে হবে? কথায় কথায় নিজের প্রাধান্য প্রমাণ করতে হবে?

তাই আজ প্রকাশের মুখের উপর শুনিয়ে দিয়েছে মিলু। শুনিয়ে দিয়েছে ঐ সামান্য আয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে চার-জনের সংসার চলে না, চলতে পারে না। মেয়ের স্কুলের মাইনে আছে, ছেলের দুধ, প্রকাশের হাত-খরচা, দোকান, বাজার চলে না, চলে না।

কথাটা উঠেছে প্রকাশের একটা শাট ইন্সট করার ব্যাপার নিয়ে। মিলু বলেছে আর পারি না বাব্বাঃ। সারাদিন কাজ আর কাজ। মেয়েকে সময়মত সাজিয়ে গুড়িয়ে স্কুলে দিয়ে আসতে হবে, নিয়ে আসতে হবে। ঘন্টার ঘন্টার ছেলের দুধ বালি গরম করতে হবে। সংসারের যতো কাজ একার হাতে। তার ওপর—

প্রকাশ হেসে ফেলে—তার ওপর আমার শাট কেচে দেওয়া, শব্দকোতে দেওয়া, ইন্সট করা, কত কাজ।

—কাজ বৈকি, কোলকাতার শহরে একটা জামাকাপড়ে চলে না।

—কি করা যাবে, একার আয়।

কথাটা খট করে লাগে কানে।

প্রকাশের মুখের ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করে—একার? আর কে আয় করবে বল।

—আমি তোমার কথা বলছি না। আজকাল স্বামী-স্ত্রী দুজনে উপায় না করলে—

—ঐ তোমার একটা দুঃখ। কথা কেড়ে নেয় মিলু। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলে কিন্তু আমার সময় কোথায় বল।

প্রকাশ নীচু গলায় বলে—সময়ও নেই, আর—

—আর স্কুল ফাইনাল পাশ করিনি। টাইপ জানি না। চাকরি করার গুণ নেই আমার, এই তো বলবে।

সে কথা বলছি না মিলু, একজনের আয়ে এর চেয়ে ভাল চলে না।

—কেন, তোমার চেয়ে আর কেউ কোথায়ও বেশি উপায় করে না?

এ কথার কোন জবাব নেই বলেই চোখ-কান লাল হয়ে উঠে প্রকাশের।

—থাক তোমাকে তাহলে আর কল্ট করে—

—পারব না আমি। দুদিন বাদে বাদে কাচা ইন্সট করা পারবোই তো না।

ধপাস করে উনোন থেকে ইন্সটটা নামিয়ে রেখে আরো অনেক কথা শুনিয়ে যায় মিলু।

শুনিয়ে যায় যে এ সংসার সে বাপের বাড়ি থেকে মাথায় করে নিয়ে আসেনি। কতদিন বলেছে তিন গজ

কাপড় কিনে আনলে নিজের হাতে সে জামা তৈরী করে দেবে—ইত্যাদি।

কথার সঙ্গে দ্রুতপদে হাতের কাজ সমাধা করতে থাকে মিলু।

প্রকাশ নরম গলায় বলতে চেষ্টা করে—জানি তোমার শাড়ি আমার শাট ছেলেমেয়ের জামাকাপড় অনেক কিছুই দরকার। বলছিলাম খরচা না কমাতে পারলে—

ঝাঁঝেরে ওঠে মিলু—খরচা এর চেয়ে আর কমানো যায় না। আয় বাড়াতে হবে।

—কিন্তু জান তো এ বাজারে চাকরিটা টিঁকিয়ে রাখাই দায়।

—কাজেই কতখানি তোমার ক্ষমতা, তাও একবার ভেবে দেখো।

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারে না প্রকাশ।

—খরচা আরো কমানো যায়। এক-খানা ঘরেই তো আমাদের চলছে—অথচ ঐ ছোট ঘরখানা তুমি আটকে রেখেছ। কাউকে ধারে কাছে ঘেঁসতে দেবে না।

—দোবই তো না। আমার ঠাকুরের ঘর। আর ওতে কতই বা বাঁচবে?

এ কথার কোন সাড়া দেয় না প্রকাশ। ভাবে, এ ঘরখানা ছেড়ে দিলে মাসে অন্ততঃ দশটা টাকা বাঁচত।

মিলুর চোখে এতক্ষণে জল আসে—কোন কিছুই তো বাচ-বিচার নেই। একটা ঘরে তো আর ঠাকুর বসানো চলে না। পরণের কাপড়খানাকে একটু

গুঁছিয়ে পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় মিলু।

প্রকাশ ঘড়ি দেখে। প্রায় চারটে বাজে। মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে গেল বোধ হয়।

আজ ইচ্ছে করেই আপিসে যায়নি প্রকাশ। একদিন বিশ্রাম নেবে বলে—ট্রামে বাসের কোলা থেকে একদিন নিস্তার পাবে বলে। কিন্তু.....

মিলুর কাছে টাকাটাই যেন সবচেয়ে বড়। সব শান্তির মূল। শব্দ ঐ ঠাকুর আর ঠাকুরঘর। মিলুর ক্ষেত্রে একটা অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম। এমন বয়স হয়নি যে ঠাকুরকে অমন ধরা ছোঁয়ার বাইরে রেখে পূজো করতে হবে।

সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে ইন্সটিটা নিজের হাতে বসিয়ে দেয় প্রকাশ। কালো কয়লার লাল আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কালো আর লাল। মিলুও যেন এই দুই বিপরীতধর্মী গুণের সমন্বয়। একই সময়ে একদিকে অর্থের আকাঙ্ক্ষা অন্যদিকে মোক্ষের।

মোক্ষ কপাটা বোধহয় একটু বাড়ি-বাড়ি হয়ে গেলে। বলা বাক ধর্মের। ধর্মের নামে এমন কান্ড ঘটতে আর কোথাও দেখিনি প্রকাশ। সারা দুপুরটা মিলু ঐ ঠাকুর ঘরে খিল দিয়ে কাটিয়ে দেয়। মেয়েটা স্কুলে যায়, প্রকাশ আফসে বেরিয়ে যায় আর এ ঘরে তালা বন্ধ করে মিলু ও ঘরে চলে আসে। কোলের ছেলেটাকে বোধহয় পাশেই ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

তারপর শব্দ হয় সাধনা না আরাদনা, না প্রার্থনা। ঠিক কোন শব্দটা ব্যবহার করা উচিত হবে—ভাবতে পারল না প্রকাশ। পূজো কিংবা আহুতকে বলতে পারত। কিন্তু কোনদিন তো ফুল বা ফল বাজার থেকে আনতে রলেনি মিলু। আর খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিরিবাল হয়ে কে কবে আহুতকে বসেছে। বত অনাসৃষ্ট!

মাস দুয়েক হল এ বাতিকটা দেখা দিয়েছে। তার আগে এ ঘরখানা ছিল ঘুঁটে কাঠ ইত্যাদি কম-দামী জিনিসের স্টোর। বর্তমানে হয়েছে তীর্থক্ষেত্র।

প্রথমটায় প্রকাশের খুব ইচ্ছে হত জানতে কোন ঠাকুর কেন পূজো করে, গুরু কে?

মিলু বলত—সময়মত জানব।

কাজেই বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে চিন্তা করার গুরুত্বটা লাঘব করে নিতে পেরেছে প্রকাশ। ভেবেছে, এ একটা রোগ,

নয়তো খেলা। একদিন সেরে যাবে, নয়তো শেষ হবে।

রোববার কিংবা ছুটির দিন ছেলে-মেয়ে দুটোকেই এ ঘরে বাপের পাশে শুনিয়ে দেয়। প্রকাশের খবরের কাগজ পড়ার ব্যাঘাত ঘটে। আর নিশ্চিন্তে ও ঘরের দরজা বন্ধ করে মিলু। বেরোয় সেই সাড়ে তিন-চারটেয়। কলে জল আসার পর।

এ তো গল একদিক।

অন্যদিকে অর্থের লিপ্সা। বেশি টাকা ভাল খেতে পরতে কে না চায়! কিন্তু এ যেন সবার সব উদাহরণকে ছাপিয়ে উঠেছে। কোন যুক্তি তর্ক চলবে না। বাঁচতে গেলে টাকা চাই আরো, আরো অনেক। এই তো মাস-তিনেক আগে আপিসের ক্রেডিট সোসাইটি থেকে শ' পাঁচেক টাকা ধার করে দিতে হয়েছে মিলুর হাতে। বানিয়ে বলতে হয়েছে ছ-সাত মাসের ওভারটাইমের টাকা এক-সঙ্গে পাওয়া গেছে। সেদিন কি আনন্দ মিলুর।

কত হিসেব হয়ে গেল কাপড় হবে জামা হবে, বিছানার চাদর, বালিশের ওরাডের কাপড়, একটা স্টোভ কিনতে হবে। ইচ্ছে ছিল নতুন ডিজাইনের এক-জোড়া কানপাশা গড়াবে। কিন্তু তা হবার জো নেই। পাশের বাড়ির বিড়ালটা রোজ চুরি করে মাছ খেয়ে যায়। একটা মিট-শেফ আগে দরকার। আর একটা ইলেকট্রিক ইস্ত্রি। অত জামাকাপড়। কত অসুবিধে হয় রোজ। কোনদিন হয়তো উনোনে আগুন থাকে না, আর থাকলেও একটা জামা ইস্ত্রি করতে তিনবার ওঠানো নামানো করতে হয়।

তা না হয় হল। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না।

কেনা হল না কেন, বা টাকাটা কোথায় রেখেছে, এসব প্রশ্ন করেনি প্রকাশ।

মিলুও উদ্ভাচ্য করেনি আর।

অতএব ঐ পরিচ্ছেদটার ঐখানেই সমাপ্ত ঘটেছে।

ইন্সটিটা অনেক সময় বসিয়েছে উনোনে। একটা পুরনো ন্যাকড়ায় জড়িয়ে ধরে নামাল। এত গরম হয়েছে যে ন্যাকড়টা পুড়ে গিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। কি জ্বালাতন।

ঘেমে নেয়ে কোনরকমে শার্টের ওপর সন্তর্পণে ঘসতে থাকে প্রকাশ। ইস্ত্রি বন্ধের সামনের দিকটার এতটা পুড়ে গেল।

লজ্জা লজ্জা। মিলু এসে কি বলবে। মূর্চক হাসবে নয়তো আড়-চোখে তাকাবে। আর আসার সময়ও তো হয়ে গেছে বৃষ্টি।

ঘড়ি দেখেই আঁতকে ওঠে প্রকাশ। ছটা বাজে। স্কুল থেকে ফিরে আসতে তো এত সময় লাগার কথা নয়। মেয়েটাকে নিয়ে গেল কোথায় মিলু।

কিংবা এমনো তো হতে পারে—একটা ভয়ানক খারাপ কিছু ভেবে বসল প্রকাশ। মেয়েদের কিসে যে কি হয়ে যায় বলা দুস্কর। তা নইলে দশ মিনিটের রাস্তা স্কুল থেকে নিয়ে আসতে এত সময় লাগবে কেন?

ঠিক সে সময় বছর খানেকের কোলের ছেলেটা ঘুম থেকে জেগে কেঁদে উঠল। তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নেয় প্রকাশ।

কিন্তু এখুনি একবার স্কুলে যাওয়া দরকার যে। খবর নেওয়া দরকার মেয়েকে তার মা স্কুল থেকে নিয়ে গেছে কিনা এবং কখন।

আর তো বসে থাকা যায় না। সওয়া চারটে নাগাদ যে লোকের ফিরে আসার কথা—সে—

কড়া নাড়ার শব্দ। ষাকু বাঁচা গেছে। ঐ বৃষ্টি মিলু এল। এক রকম ছুটে এসে দরজা খুলে দেয় প্রকাশ।

এক গাল হাসি নিয়ে প্রবেশ করে বন্ধু গজেন। মিলু নয়।

—কি রে তুই এ সময়ে বাড়িতে? আজ কাজে বেরোসনি?

জবাব দেয় না প্রকাশ। ঐ হাসিটাকে তো বরদাস্ত করতে পারেই না, বরং রাগ আছে।

এই তো কালই গজেন কথায় কথায় একটা খারাপ কথা বলেছে। বলেছে—কি রে তোর জামাটা ছেঁড়া কেন? তোর বউ তো আজকাল অনেক উপায় করছে।

প্রকাশ প্রশ্ন করেছিল—মানে?

—মানে সূদের ব্যবসা।

প্রথমটায় হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু শেষপর্যন্ত গজেনের কথা বিশ্বাস করতে না পারলেও একটা দোন্-মেনু ভাব নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল।

একটা খটকা। সূদের ব্যবসা?

টাকা আছে কিন্তু মিলুর হাতে।

তবু এমন একটা নীচ কাজ করবে মিলু ভাবতে পারল না প্রকাশ। আবার কেনাকাটার অভাব পরিকল্পনা একটাও

কার্যকরী হ'ল না, টাকারটা মিলে বেমালুম চোপে গেল—ওও একটা প্রশ্ন।

গজেনের কথা মিথ্যা হোক।

একান্তই যদি সত্য হয় তাহলে ওদের দাম্পত্যজীবনের বিষময় পরিণতির কথা ভেবে শিউরে ওঠে প্রকাশ। কাজেই আজকের কথাকাটাটির মধ্যেও ঐ নিম্নম কথাটা শুনিয়ে দিতে পারেনি সে।

গজেনই প্রশ্ন করল আবার—কিরে, বৌদি কোথায়?

—ভাবছি, সেই যে মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে গেছে—

—কোন ভাবনা নেই, হয়তো কোন আদায়-উসুল আছে। একবারে সেরে আসবে।

ওর মুখের দিকে শূন্য স্পষ্ট একবার চাইল প্রকাশ।

গজেন বললে—দ্যাখ্ প্রকাশ, তুই যদি অফেন্স্ নিস্ তাহলে আমার কিছু না বলাই ভাল। কিন্তু আমার একটা কত'বা আছে। কারণ সব বৃদ্ধি-পরামর্শ—বলতে পারিস্ সমস্ত প্ল্যানটাই আমার।

অসম্ভব নয়। ভাল প্রকাশ। ইদানীং গজেনের গতাগতি এ বাড়িতে বেড়েছে। মিলের সংগে প্রয়োজনীয় কথার মাত্রাও বেড়েছে। কিন্তু এতদিন এ সবার তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি সে।

—মানে? জিজ্ঞাসা করল প্রকাশ।

—মানে আমি মনে করি এতে কোন দোষ নেই। বিজিনেস ইজ্ বিজিনেস্। একার আয়ে আজকের দিনে চলতে পারে না। এটা কথার এবং কাজে আমি বিশ্বাস করি। কাজেই—

—যাক্ ওসব আমি শুনতে চাইনি। প্ল্যানটা যখন তোর, আর আমাকে না জানিয়ে এতদিন যখন চলেছে, তখন—

—তুই দেখছি সত্যি রেগেছিস্। তাহলে আমরাই ভুল করছি। জামা-কাপড় বিছানা-বালিশের ঢাকনা করেই টাকারটা খরচ করা উচিত ছিল।

প্রকাশ মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে রইল। গজেন বললে—আমি ভেবেছিলাম সবই পরে করা যাবে। টাকারটাকে রোল করিয়ে নিলে মন্দ কি।

প্রকাশ ব্যঙ্গের সুরে বললে—তুই বিজিনেসম্যান, তোর মাথার টাকা রোল করানোর চিন্তা আসাটাই খুব স্বাভাবিক।

—কিন্তু দূরদর্শিতা নেই। তোদের দাম্পত্যজীবনে এ নিয়ে একটা মনো-মালিন্যের সৃষ্টি হতে পারে, ভার্যিনি। তাই সব ব্যবস্থা করে দেওয়া, মায় পাটি' পর্যন্ত ঠিক করে দেওয়া—

—ওসব আলোচনা থাক্।

এবার চুপ করল গজেন। ... পকেট থেকে দেশলাই সিগারেট বের করে একটা ধরাল।

প্যাকেটটা এগিয়ে দিল প্রকাশের দিকে।

গজেন লক্ষ্য করল প্রকাশ গম্ভীর-মুখে ছেলেকে পায়চারি করছে। সিগারেট দেশলাই ছুঁল না।

প্রকাশ তার অক্ষমতা, তার ক্ষুদ্রতা অনুভব করতে পারল। তারই স্ত্রী-পুত্র পোষণের জন্য এই বহুকথিত ঘৃণ্য কাজে সংসারের আয় বাড়ছে। এতে কিছু বল-বার বা আপত্তি করার উপায় নেই। অথচ মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাবার সময় অভি-ভাবকের খাতায় ওরই নাম লেখাতে হয়েছে। সবার খাওয়া-পারার ভাবনা এত-দিন ওকেই ভাবতে হয়েছে।

দায়িত্ব এতদিন ছিল একার। আজ দুজনার। এতদিন সে ছিল সর্বসর্বা, আজ অংশীদার। হলেন ভাল, না হলেনও একরকম চলবে। প্রয়োজন কমেছে, গুরুত্ব কমেছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করলে সে—অচ্ছা গজেন, তোদের এই ব্যবসা কান্দন শূন্য হয়েছে, আর কি রকম আর হচ্ছে বলতে পারিস্?

—মাসখানেক। আর আয় প্রথম মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকার বেশি হবে না। তবে হ্যাঁ, চালাতে পারলে—

—ভবিষ্যৎ ভাল। বাক্যটা পূর্ণ করে প্রকাশ।

আবার নীরবতা।

ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল।

কে'দে-উঠল বাচ্চাটা—মা-মা দাব।

গজেন বললে—আহা, কান্দছে যে।

প্রকাশ গদগদ হাসল—মা এলেই হাসবে।

গজেন তুলে নিয়ে থ'মাতে চেপ্টা করে। কান্নার মাত্রা বেড়ে যায়।

সদর খোলা ছিল।

বাঁ হাতে মেয়ের হাত ধরে ডান হাতে একটা কাপড়ের প্যাকেট নিয়ে এল মিলে।

প্যাকেটটা রাখল। ছেলেটাকে ধরল। কান্না থামল।

মেয়ে বলল—জান বাবা, আজ ইন্সকুলে না—

—আমাকে নয়, তোমার মাকে বলো।

—বলেছি তো। জান বাবা, মা না তোমার জন্যে একটা শার্ট আর একটা কাপড় কিনেছে। আমাদের জন্যে কিছু কেনিনি।

গজেন বললে—তাহলে বৌদি, বেশ দু'পয়সা হচ্ছে?

মিলে মূর্চ্চা হাসল।

—জানেন বৌদি, নতুন একটা পাটি' ঠিক হয়েছে। বেশ কাজ হবে। গজেন লক্ষ্য করল, প্রকাশ মুখ ঘুরিয়ে কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

গম্ভীরমুখে গজেন বললে—ও, প্রকাশ তো আবার এসব পছন্দ করে না। চলুন ঘরে গিয়েই বরং বিজিনেস্ টক্ টা সেরে ফেলা যাক্।

মিলে জানাল—ঠাকুর ঘরে প্রবেশ নিষেধ, জানেন না?

—আমার ত নয়?

—আপনার কথা অবশ্য্য স্বতন্ত্র।

আশ্চর্য। এর পরেও কি প্রকাশের থাকা উচিত এ সংসারে? কিন্তু বৌকের মাথায় কিছু একটা করে বসা ঠিক নয়। তাই বাধ্য হয়ে কাগজের ওপর সে আরো বেশি ঝুঁকি বসল।

মিলে গজেনকে বললে—চলুন, চুরি করে আমিও ভাল কাজে এগোতে পারছি না। কার কাছে ধরা পড়ে যাব!

—মানে?

—এই তো দেখুন না, আপনার বন্ধু বাড়িতে থাকলে কত সাবধানে কাজ করতে হয়। পাছে কোন শব্দ না হয়।

—বুঝি। কিন্তু, প্রকাশের দিকে আড়চোখে তাকাল গজেন।

—আসুন। মিলে পা বাড়াল।

মেয়ে বললে—ইস্ আমি বুঝি যাব না? তাহলে কাকু যাবে কেন?

সে কথা কেউ গ্রাহ্য করল না।

ওদের পেছনে মেয়েটিও গেল।

প্রকাশ মুখ তুলল।

তাহলে ও পবিত্র ঘরে প্রবেশের আধ-কার সবার আছে। নেই শূন্য প্রকাশের। সত্যি, অবাক করে দেবার মত চরিত্র মেয়েদের। বিশেষ করে মিলের। এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কেচ বলেও কি কিছু থাকতে নেই?

নিশ্চল বসে থেকে এর বেশি কিছু আর ভাবতে পারছে না প্রকাশ।

—বাবা বাবা, শীগগির দেখবে এস। মেয়েটা দৌড়ে এল এ ঘরে।

গম্ভীরমুখে প্রশ্ন করে প্রকাশ—কি হয়েছে রে?

—এসো না। মেয়েটা টানতে শূন্য করেছে।

—কি হয়েছে খলি তো? বিরীতি প্রকাশ করল প্রকাশ।

কানে এল ছোটঘরে দুজনেই হাসছে ওরা। গজেনের গলা অপেক্ষাকৃত উঁচু পর্দায়।

বলছে—তাহলে বৌদি, আপনাকে বলেছেন ঠাকুর, আর আমি বলেছি সুন—আসলে—

হাসির ভায়ে পরের কথাটা চাপা পড়ে গেল।

মেয়েটা টেনে এনে পেঁপে দিয়েছে ততক্ষণে।

আসলে—প্রকাশ দেখল—একটা সেলাই কল। আর নৈবেদ্যের মত তাকে ঘিরে রয়েছে নানারঙের শার্ট'ং। ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে রাজ্যের কাটা কাপড়ের টুকরো।

প্রকাশ কী বলবে, ভেবে পেল না।

॥ লোকান্তরে ॥

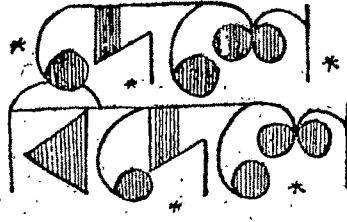
খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ ২১শে মার্চ, মঙ্গলবার রাতিতে লক্ষ্মী শহরে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। কার্জনিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাসিত রসায়ন বিভাগের ঘোষ অধ্যাপকরূপে প্রখ্যাত বিজ্ঞানসাধক ডঃ গুহ জৈব রসায়নের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান নিয়ে বহু মৌল গবেষণা করেছেন। ভারত সরকারের কৃষি ও খাদ্য গবেষণা বিভাগের উপদেষ্টারূপেও দেশের অকৃত্রিম সেবা করেছেন।

মাত্র আটান বছর বয়সে এমন এক জন প্রাতিভাবান ব্যক্তির জীবনাবসান হল। দেশ ও জাতির এ ক্ষতি অপরিসীম। ডঃ গুহের সর্ধর্মিণী সুপরিচিতা সমাজ-সেবিকা শ্রীমতী ফুলরেণু গুহকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

॥ যুদ্ধ-বিরতি ॥

উপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সৈনিকদের গৌরবময় সংগ্রামের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। স্থিতীয় বিষয়বস্তুর পর এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্যিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে প্রায় ষাটটি দেশ, কিন্তু আলজিরিয়ার মত মুক্তিযুদ্ধে তাদের কাউকেই দিতে হয়নি। এই রকম নৃশংস নির্যাতনের মর্মেখামুখি দাঁড়িয়ে অকৃতোভয়ে সাত বছর ধরে সংগ্রাম করার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না; যদিও স্বাধীনতার জন্য এ-দেশের মানবকেও যথেষ্ট দুঃখ বরণ করতে হয়েছে। সাত বছরের সমস্ত সংগ্রামে কত প্রাণ উৎসর্গিত হয়েছে, তার কোন সঠিক হিসাব নেই। সরকারী হিসাবে হতাহতের সংখ্যা দুই লক্ষের মত হলেও, বেসরকারী হিসাবে এই সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ এবং এই হিসাবকে অতিরঞ্জিত বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ, সরকারী সৈনিক ও বেসরকারী সন্ত্রাসবাদী স্বেচ্ছাঙ্গণদের বেপরোয়া আক্রমণে অরণ্য-প্রান্তরে কত অজ্ঞাত মানব যে প্রাণ হারিয়েছে, তা সরকারী কতৃপক্ষের জানা থাকার সম্ভাবনা কম। স্বাধীন আলজিরিয়ায় হয়ত নতুন করে তার ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব হবে এবং সেদিন পৃথিবী আর একবার চমকে উঠবে সাম্রাজ্যিক বর্বরতার প্রকৃত রূপের পরিচয় পেয়ে।

আলজিরিয়ায় যুদ্ধবিরতি হয়েছে, এইবার অস্থায়ী সরকারের হাতে আলজিরিয়ার শাসন-দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। তবে তার আগে ফ্রান্স-আলজিরিয়া চুক্তি ফ্রান্সের জনসাধারণের সম্মতিত কিনা, তা জানার জন্য আগামী ৮ই এপ্রিল ফ্রান্সে গণভোট গৃহীত



হবে। গণভোটে যদি সরকারী কার্যক্রম অনুমোদন লাভ করে, তবে আলজিরিয়ার শাসন-দায়িত্ব আচর্যেই আলজিরিয়াবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আলজিরিয়ার শান্তি তাতে সুনিশ্চিত হবে—এমন কথা বলা যায় না। কারণ, যে-কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, ‘কলোন’ নামে পরিচিত আলজিরিয়ার দশ লক্ষ স্বেচ্ছাঙ্গণ উপনিবেশীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আজ ফরাসী সরকার বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করে আলজিরিয়ার স্বাধীনতার দাবী মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন। একারণে বেপরোয়া কলোনদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যুদ্ধবিরতির পরেও বন্ধ হয়নি। যুদ্ধবিরতির পরের দিনেই সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে সাতাত্তরজন আলজিরিয়াবাসীর প্রাণহানি হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ‘কলোন’রা পাল্টা সরকার কার্যক্রম করে আলজিরিয়ার শাসন-ক্ষমতা জোর করে দখল করে নেওয়ার মতলব করছে—এমন সংবাদও ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। আর কলোনদের সংগঠন যে খুব দুর্বল নয়, তার পরিচয়ও পাওয়া গেছে যুদ্ধবিরতির প্রতিবাদে তাদের ডাকা সাধারণ ধর্মঘটের আশাতীত সাফল্যে। সুতরাং ফরাসী সরকার বিরোধ মীমাংসার সম্মত হলেও, আলজিরিয়ার অশান্তি অবিলম্বে দূর হওয়ার আশা সুদূর-পর্যন্ত।

॥ নিরস্ত্রীকরণ ॥

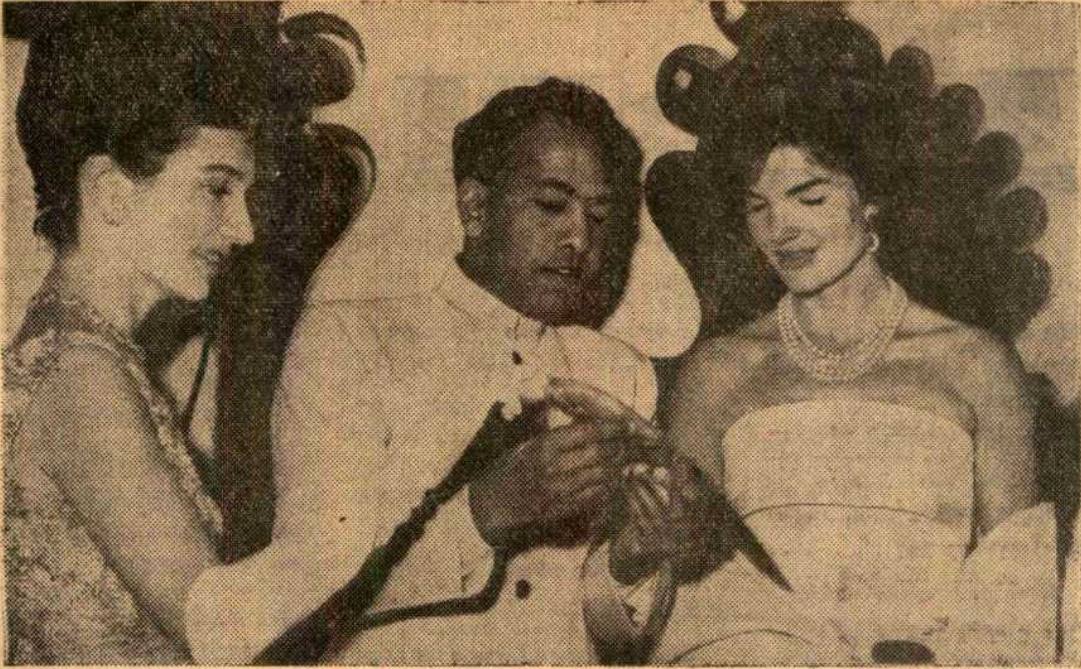
রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তমত জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন শুরু হয়েছে। ১৮টি রাষ্ট্রের এই সম্মেলনে যোগদানের কথা ছিল, কিন্তু ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত যোগ দিতে অসম্মত হওয়ায় ১৭টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলন শুরু হয়েছে। ক্রুশেভ চেয়েছিলেন, এই সম্মেলনকে শীর্ষ-সম্মেলনে পরিণত করতে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরোধিতায় সে-প্রস্তাব কার্যকর হওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের ইচ্ছামত বিভিন্ন রাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এসেছেন সম্মেলনে এবং ক্রুশেভ তাতেই সম্মত হয়েছেন। কিন্তু ফ্রান্স যে গো ধরেছিল, তা মানা হয়নি বলে ফ্রান্স সম্মেলন বর্জন করেছে। ফ্রান্সের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল, ১৮-রাষ্ট্র সম্মেলনের আগে পারমাণবিক শক্তি-সম্পন্ন চারটি রাষ্ট্র—যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন,

ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে বসতে হবে এবং তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তই অনুমোদন করাতে হবে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে। ফ্রান্সের প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত-বিরোধী বলে তা গ্রহণ করা হয়নি। আর ফ্রান্সও সেই ছতোয় প্রত্যাখ্যান করেছে জেনেভা সম্মেলনের আমন্ত্রণ।

বলা বাহুল্য, ফ্রান্সের এই সম্মেলন ত্যাগের ফলে সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কারণ, ক্রুশেভ বা বলেছেন, পরীক্ষা বৃষ্টির সিদ্ধান্ত ফ্রান্সকে বাদ দিয়ে গ্রহণ করার অর্থ হবে পশ্চিমী শক্তিবর্গকে অব্যবহিত পরীক্ষাকার্য চালানোর সুযোগ দেওয়া। যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেন নিজেরা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ না করেও ফ্রান্সের পরীক্ষার মাধ্যমে তারা অব্যবহিতভাবে নতুন নতুন পারমাণবিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। অথচ জেনেভা সম্মেলনে পরীক্ষা বৃষ্টির সিদ্ধান্তে সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্মত হলে তার আর এ-সুযোগ থাকবে না। সুতরাং জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত যাদু ফ্রান্সের ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক না হয়, তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে তা মানবে না, তা একরকম নিভিয়েই বলা যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই মনোভাবকে অযৌক্তিক বলে মনে করারও কোন কারণ নেই। আজ যদি ক্রোকোভোভারিয়া বা পোল্যান্ডের মত কোন ক্রিমিউনিষ্ট রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ফ্রান্সের মত দায়িত্বহীন মনোভাবের পরিচয় দিত এবং তাদের হাতে যদি পারমাণবিক অস্ত্র থাকত, তবে পশ্চিমী শক্তিবর্গও সোভিয়েটের নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবকে আন্তরিক বলে মনে করত না বা সম্মতিও জানাত না তাতে। তবুও জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন সম্পর্কে এখনই কোন নৈরাশ্যজনক মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। কারণ, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আছে আটটি জেট-বাহিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যাদের উপেক্ষা করা কোন শিবিরের পক্ষেই সহজ হবে না। এ-ব্যাপারে ভারতের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সম্মেলন যদি সফল না হয়, তবুও কারণ পক্ষেই এমন মনোভাব দেখানো সম্ভব হবে না, যাতে বিশ্ববাসীর মনে তাদের শান্তি-নীতি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে।

॥ সিরিয়া-ইস্রায়েল সংঘর্ষ ॥

আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইস্রায়েলের বিরোধ বা ছোটখাট সংঘর্ষ কোন নতুন ঘটনা নয়। সুযোগ পেলেই আরবরা আঘাত হানে ইস্রায়েলীদের, ইস্রায়েলীরাও প্রতি-আঘাত হানতে কখনও বিবধা করে না। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে প্যালেস্টাইনের ওপর বৃটেনের রক্ষণ-



উদয়পুরে মহারাণার 'শিব নিবাস' দরবার-কক্ষে মার্কিশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত কেনেডির পত্নী শ্রীমতী জন এফ কেনেডি (ডান দিকে), মহারাণা (মধ্যভাগে) এবং শ্রীমতী কেনেডির ভ্রাতৃপ্রেমসী লী র্যাডজিউইল (বাম দিকে) মনোযোগ সহকারে কারুকার্যশীত একটি ছুরিকা পর্যবেক্ষণ করছেন।

ব্যবস্থার অবসানের পর রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তক্রমে ২০ লক্ষ নর-নারী-অধুষিত ৭,৯৯০ বর্গমাইল আরতন-বিশিষ্ট এই ইহুদী রাষ্ট্রটি গঠিত হওয়ার পরেই ইজিপ্ট, ইরাক, জর্ডন, লেবানন ও সিরিয়া—এই পাঁচটি আরব রাষ্ট্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারণ, আরব রাজ্যে ইহুদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তারা স্বীকার করে না। কিন্তু নব-জাগৃত ইহুদী জাতীয়তাকে পরাস্ত করা আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৫০ সালে ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা বলে সাময়িক যুদ্ধবিরতি হয়েছে আরব ইস্রায়েলের মধ্যে, রাষ্ট্রসংঘের উপর অপিত হয়েছে মধ্যস্থতার দায়িত্ব। কিন্তু পূর্ণ শান্তি কোনদিনই স্থাপিত হয়নি বা আরব রাষ্ট্রগুলি মেনে নেয়নি এখনও ইস্রায়েলের রাষ্ট্রসত্তাকে। 'ফেট' অফ ওয়ারের অবসান হয়নি তাদের মধ্যে।

গত ১৭ই মার্চ, শনিবার গ্যালিনী সাগরের পূর্ব উপকূলে হঠাৎ একটা গুরুতর রকমের সংঘর্ষ হয়ে গেল সিরিয়া ও ইস্রায়েলের মধ্যে। সিরিয়ার অভিযোগ অনুসারে ইস্রায়েলই সীমান্ত লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী এবং এই মর্মে অভিযোগও উত্থাপন করেছে সে স্বশক্তি পরিষদের কাছে। তবে সিরিয়ার দক্ষিণ সীমান্তের কমান্ডার দাবী জানিয়েছেন—স্থল ও আকাশপথে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে তারা দুইশত ইস্রায়েলী সৈন্যকে হত্যা করেছেন। ইস্রায়েলও অনুরূপভাবে সীমান্ত লঙ্ঘন ও অস্ত্র-সংবরণ চুক্তি

ভঙ্গের অভিযোগ এনেছে সিরিয়ার বিরুদ্ধে এবং এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য অবিলম্বে অধিবেশন আহ্বানের জন্য সে-ও স্বশক্তি পরিষদকে অনুরোধ জানিয়েছে।

ওদিকে জর্ডন ও ইজিপ্টের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, ইস্রায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা সর্বতোভাবে সিরিয়াকে সমর্থন করবে। জর্ডনের রাজা হুসেন জর্ডনস্থ সিরীয় রাষ্ট্রদূতকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, সিরিয়ার ওপর যে-কোন আক্রমণকেই জর্ডন তার নিজের ওপর আক্রমণ বলে মনে করবে এবং তা প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। ইজিপ্টও অনুরূপভাবে বলেছে যে, সিরিয়ার সঙ্গে সম্প্রতি তার যে বিরোধী হয়ে থাক না কেন, ইস্রায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে সে সর্বশক্তি দিয়ে সিরিয়াকে সাহায্য করবে।

॥ শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ॥

গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে এই বছরের মার্চ পর্যন্ত চীন ও ভারত সরকারের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে যে সকল পর্যালোচনা হয়েছে সম্প্রতি, সেগুলি ভারত সরকার প্রকাশ করেছেন। পরগুলির মধ্যে বিশেষ লক্ষ্যণীয় হল চীনের আক্রমণাত্মক মনোভাব ও চড়া পুরের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন। ২৬শে ফেব্রুয়ারীর পরে চীন সরকার ভারতের সঙ্গে চীনের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের উল্লেখ করে বলেছেন, 'চীনা ও ভারতীয় জনসাধারণ পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বা-

পন্ন, চীন ও ভারত এশিয়ার দুটি বৃহৎ প্রতিবেশী শক্তি।...যত দেরীতেই হউক না কেন; কোন দিন-না কোন দিন চীন ও ভারতের সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করিতেই হইবে। তবে চীন ও ভারতের জনসাধারণের স্বার্থে এবং এশিয়া ও বিশ্বের শান্তির জন্য বিলম্বে সমাধান হওয়া অপেক্ষা শীঘ্র হওয়াই কাম্য।' ভারত সরকারও চীনের এই পত্রের উত্তরে গত ১৩ই মার্চ এক পত্রে বলেছেন, "আন্তঃরাষ্ট্র বিরোধের মীমাংসার ক্ষেত্রে ভারত সকল সময়েই শান্তিনীতির অনুসারী। এই কারণেই চীনা সৈন্যবাহিনী বলপূর্বক ভারতীয় অঞ্চল অধিকার করা সত্ত্বেও ভারত সরকার ধৈর্য হারান নাই। কিন্তু চীনা সৈন্য ভারতীয় এলাকা হইতে স্বেচ্ছায় চলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ভারত সরকার চীনের সহিত শান্তিপূর্ণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না।"

চীনের বর্তমানে যে আক্রমণাত্মক মনোভাব, যে কারণে তার নিকটতম ও সবচেয়ে নিভরযোগ্য মিত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে বিরোধে নামতেও তার স্বেচ্ছা নেই, তার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করতে যাওয়ার একমাত্র অর্থ হল একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া। যা আজ ভারতের পক্ষে কখনোই নেওয়া উচিত হবে না। সুতরাং শান্তিপূর্ণ নীতি থেকে ভারতের এক্ষেত্রে কোনমতেই বিচ্যুত হওয়া চলবে না। তবে ভারতের নিশ্চেষ্ট ও নিকল্প থাকলেও চলবে না।

সবিন্যাস

॥ ঘরে ॥

১৫ই মার্চ—১লা চৈত্র : পশ্চিম-বঙ্গের নতুন বিধানসভায় প্রবল হট্টগোল—রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের উত্তর শুচনা।

নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব—মূল্যবান রোধের জন্য লোকসভায় বিরোধী সদস্যদের দাবী।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধানে বহু প্রশ্নের মীমাংসা সহজতর হইবে—রাজ্য-সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য—জেনেভার সপ্তদশ রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের অগ্রগতিতে আশা।

১৬ই মার্চ—২রা চৈত্র : চীনা সৈন্য অপসারণ দ্বারা ই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ভিত্তি রচনা সম্ভব—চীনের নিকট ভারত সরকারের প্রস্তাব—রাজ্যসভায় চীন-ভারত পরাবলী উপস্থাপিত।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে শোচনীয় বিশৃঙ্খলা—শিক্ষিতের হারের হিসাবে রাজ্যের ক্রমাবনতি—রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কে বিরোধীপক্ষের অভিযোগ।

১৭ই মার্চ—৩রা চৈত্র : মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কর্তৃক দেশগঠনের কাজে সংগত আলোচনা ও সহযোগিতার আহ্বান—রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের উত্তরদানকালে দাবী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় রাজ্যপালকে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর কর্তৃক রবীন্দ্রভারতী ভবনে সারা ভারত শিল্পী সম্মেলনের উদ্বোধন।

১৮ই মার্চ—৪ঠা চৈত্র : বিশ্ব ব্যাংকের অর্থনৈতিক কমিশনের কলিকাতায় উপ-স্থিতি—মহানগরীর মাণ্ডার পল্যানের রূপায়ণ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সহিত আলোচনা।

১৯শে মার্চ—৫ই চৈত্র : ভারতের মজদুরী বাণিজ্য বর্ধনের উপর মাদ্রাসার কমিটির গুরুত্ব আবেগ—লোকসভায়

সরকারপক্ষ হইতে কমিটির সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট পেশ।

সাম্প্রদায়িক দলসমূহ নির্বিশেষ করার প্রশ্ন সরকারের বিবেচনাধীন আছে—রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর উক্তি।

আলজিরিয়ার যুদ্ধ-বিরতিতে শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) আনন্দ প্রকাশ—আলজিরীয়দের অভুলনীয় সংগ্রামের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা।

২০শে মার্চ—৬ই চৈত্র : খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহের (৫৮) লক্ষ্যে—এ পরলোকগমন।

রাজ্যসভায় গোরা, দমন ও দিউর ভারতভূক্তি সংক্রান্ত বিল গৃহীত।

নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনার পাশাপাশি কাস্মীর প্রশ্নে পাক-ভারত বিপক্ষীয় আলোচনা হইতে পারে না—পার্লামেন্টে শ্রীনেহরুর উক্তি।

২১শে মার্চ—৭ই চৈত্র : নাগাভূমি সীমান্তে হাফলং-এর নিকট বিদ্রোহী নাগাদের অব্যাহত উৎপাত—আগুন লাগাইয়া ৬টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস। (১৫ই মার্চের ঘটনা)।

শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় বিরাট মিছিল—দেশপ্রিয় পাক্ পিচ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বিশাল সভার অনুষ্ঠান ও মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম আলোচনা।

॥ বাইরে ॥

১৫ই মার্চ—১লা চৈত্র : জেনেভা বৈঠকের (সপ্তদশ রাষ্ট্র) শুচনাতেই যুদ্ধ-মার্কিণ পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাব পেশ—চার বছরের মধ্যে তিন পর্বায়ে পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণে গ্রোমিকোর (রাশিয়া) দাবী : মার্কিণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডীন রাস্ক কর্তৃক চার দফা পাল্টা প্রস্তাব।

মর্যাদা পাক শাসনতন্ত্রের প্রতিপালক এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে ঢাকার আবার হাট ধমংগটে।

১৬ই মার্চ—২রা চৈত্র : জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনকে ঘুরোয়া বৈঠকে পরিণত করিতে শ্রীমেননের (ভারত) আহ্বান—বটেন ও আমেরিকাসহ ৭টি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রস্তাব সমর্থন।

পশ্চিম নির্ভীকতার বিরোধ প্রসঙ্গে আমেরিকার মধ্যস্থতায় শীঘ্রই নেদার-ল্যান্ড-ইন্দোনেশীয় বৈঠকের ব্যবস্থা।

১৭ই মার্চ—৩রা চৈত্র : গ্যালিলি সাগরতীরে ইস্ত্রায়েলী ও সিরীয় সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে ৭ ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ—উভয়-পক্ষেই বহু হতাহত।

নির্জন স্বীপে বন্দী কংগোলী নেতা গিজেন্গার দেহে আর্সেনিক বিষ-প্রয়োগের সংবাদ—লন্ডনের মত লন্ডন-পৃথ্বী গিজেন্গাকেও হত্যা করার জঘন্য চক্রান্ত।

১৮ই মার্চ—৪ঠা চৈত্র : আলজিরিয়ায় সশস্ত্রব্যাপী যুদ্ধের অবসান—ফরাসী-আলজিরীয় অস্ত্র সম্বরণ চুক্তি সম্পাদিত।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র নির্বাচনের অনুষ্ঠান—প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণচন্দ পুনরায় সুপ্রীম সোভিয়েট নির্বাচন-প্রার্থী।

১৯শে মার্চ—৫ই চৈত্র : পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের আলোচনা পুনরায় সোভিয়েত রাশিয়ার সম্মতি—জেনেভায় সাংবাদিক বৈঠকে সোভিয়েট উপ-রাষ্ট্রমন্ত্রী জোরিনের ঘোষণা।

২০শে মার্চ—৬ই চৈত্র : ফরাসী-আলজিরীয় যুদ্ধ বিরতির চুক্তির ভিত্তিতে ৮ই এপ্রিল ফ্রান্সে গণভোট গ্রহণ।

‘ভারত সরকার নিরস্ত্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণকে অবিচ্ছেদ্য মনে করেন’—জেনেভায় ১৭ রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে গ্রীক মেননের ঘোষণা।

২১শে মার্চ—৭ই চৈত্র : মহাকাশ গবেষণায় যুদ্ধ-মার্কিণ সহযোগিতা ব্যাপারে কৃষ্ণচন্দ্রের আগ্রহ—মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির নিকট পত্র প্রেরণ।

জেনেভায় শ্রিশক্তি পারমাণবিক পরীক্ষা নির্বন্ধকরণ আলোচনার শুচনাতেই অচলাবস্থা।

সমকালীন সাহিত্য

অভ্যুদয়

॥ ট্রাজেডির মৃত্যু ॥

সমালোচক সম্পর্কে কিছু লিখতে হলো দুটি বিষয় সর্বাগ্রে বিচার্য। তিনি কি বলতে চান। এবং কিভাবে। বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে যদি আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তাহলে সমালোচকের যিনি সমালোচক তাঁর কাজটা সহজ হয়ে যায়। অনেক সময় বক্তব্য বিষয় বা প্রতিপাদ্য বিষয়টির সম্পর্কে হয়ত তেমন কোনও হল জাগে না যেমনটি পাওয়া যায় যুক্তির উপস্থাপনে, লেখকের বুদ্ধিমত্তা, লিপিচ্ছাত্বব' সেইখানেই পাঠককে আকৃষ্ট করে।

The Death of Tragedy গ্রন্থটি এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। মিঃ জর্জ স্টাইনার অনেক কথায় এইটুকু বলতে চেয়েছেন যে নাটক এবং কবিতায় যে খাটি ট্রাজেডির পরিবেশন করা হয়েছে তা স্তম্ভশতাব্দীতেই শেষ হয়েছে, ট্রাজেডির মৃত্যু ঘটেছে একালে। তাঁর বক্তব্যটি কিছুতেই পাঠকচক্ষে কোত'হল উদ্বেক করত না যদি না আঁত মনোহর ভঙ্গীতে তিনি সেই বক্তব্য বিষয়টুকু পাঠকের কাছে নিবেদন করতেন।

এই উক্তি স্বপক্ষে মিঃ স্টাইনার তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছেন। কনোইলার লখ নাটকাবলী সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ এবং নিখুঁত, এবং সেইসব নাটক যাদের পড়ার সুযোগ ঘটেনি তাঁদের কাছেও এর মূল্য অসীম।

উপসাহসরে তিনি যে সব কথা বলেছেন তার ফলে অপরও তার মত সমর্থন করবে, তাঁর অনুভূতির অংশ-ভাগী হবে। ক্লিইট এবং বাখনার সম্পর্কে তাঁর যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হবে। বাইরণ, কীটস' এবং শেলীর নাট্যভাবনা সম্পর্কে তাঁর উদ্ঘাটিত বহু পাঠককে আবার পুরাতন বইয়ের পাতা ওলটাতে প্রলুব্ধ করবে। লেখকের পাওনা হিসাবে এটা কম কথা নয়।

একথা কিন্তু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয় না যে আমাদের এই কাল, যে কাল হতাশা, বেদনা এবং বণ্ডনায় পরিপূর্ণ, সেই কাল ট্রাজেডির মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু জর্জ স্টাইনারের The Death of Tragedy পাঠ করলে সেই ধারণা মনে জাগবে। তিনি শব্দ এই নিদারুণ সত্যটি আমাদের শুনিয়েই ক্ষান্ত হননি, কিভাবে তা ঘটেছে তার আনুপূর্বিক বিবরণ দান করেছেন। ট্রাজেডির দুঃসময় চলছিল অনেককাল থেকেই। প্রাচ্য

ধারণানুসারে অহং থেকে মৃত্যু, খৃষ্টীয় অনুশাসনমতে প্রেমের পুনরুজ্জীবনদান-কারী শক্তি এবং মৃত্যুর পর অপার আনন্দ, মার্কসীয় ভাববাদ মতে পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করা সম্ভব প্রভৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যুক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় অনেক প্রাচীন বিশ্বাস এবং ধারণার আজ অবসান ঘটেছে। আধুনিককালের ঘৃণা আর শঙ্কা আমাদের ট্রাজেডির অভিমুখী না করে ট্রাজেডির সম্পর্কে নিরাসক্ত করে তুলছে। স্টাইনার বলেছেন—

"Each day we sup our fill of horrors — in the Newspaper, on the Television Screen, on the Radio — and thus we grow insensible to fresh outrage. Compared with the realities of war and oppression that surround us, the gravest imaginings of the poets are diminished to a scale of private or artificial terror." — তাঁর এই গ্রন্থ এক হিসাবে ট্রাজেডির মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা।

স্টাইনার বর্ণিত এই নিদারুণ ঘটনার কথা পাঠ করলে চিত্ত হবে বিবাদমগন। আর কোনো নব-এন্টিগোন, ইউরিপিডস' কিংবা হামলেট রংগমঞ্চে দেখা যাবে না, নতুন কোনো বিরোগান্ত নায়ককে দেখা যাবে না, অদৃশ্য দানবের ডাঙনায় আকুল নায়কের স্বগতোক্তি শোনা যাবে না। ইদানীংকালে অবশ্য কয়েকটি নাটকের পরিসমাপ্তি বেদনাদায়ক, কিন্তু মিঃ স্টাইনার আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যেন সেগুলিকে খাটি ট্রাজেডি মনে করে ভুল না করে বসি। খাটি ট্রাজেডিতে কতিপয়শব্দের অবকাশ নেই, নেই এতটুকু বিচার-বিবেচনা। তার মধ্যে আছে শব্দ, অম্ব প্রয়োজন আর 'Man's encounter with it shall rob him of his eyes'. আমাদের কারো কিছুই করার সুযোগ থাকবে না। "Tragic drama tells us that the spheres of reason, order and justice are terribly limited and that no progress in our science or technical resources will enlarge their relevancy."

'অম্ব নিয়তির' কবলে যে অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে তার সংকটপ্রাণে ছুটে যাওয়ার মধ্যে কোনও যুক্তি নেই। ইব-সেনের নায়িকার বেদনার অবসান আঁত সহজেই ঘটবে এঁদের উদার বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের মাধ্যমে। আর্থার মিলারের নায়কের মানসিক ক্ষত আঁত সহজেই নিরাময় হবে পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়-বৃদ্ধিতে। ক্লিফোর্ড ওডেটের নায়কদের

পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় ক্রেসডোজের কোনও হেতু নেই, কারণ সেই সমাজের কর্মীদের বেতন উত্তম এবং বেকারী দূর হয়ে গেছে। নব স্বর্গরাজ্য রচিত হয়েছে।

মিঃ স্টাইনার 'ট্রাজেডি' বলতে গ্রীক অর্থে যে ট্রাজেডি বোঝায় সেই ট্রাজেডিই বোঝেন। শব্দ মাত্র অম্ব নিয়তির করালিত মানবের যন্ত্রণাকে যদি প্রকৃত ট্রাজেডি মনে করা যায়, তাহলে মানব-মনের অন্তঃস্বপ্ন, যে সংঘাতের হাত থেকে যুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায় না তাকে কি আখ্যা দেওয়া যায়? যুক্তির দাবী এবং ভাবাবেগের দাবীর মধ্যে যে সংঘাত, রোমান্টিক আবেগ এবং দৈহিক প্রেম-ব্যাকুলতার মধ্যে যে সংঘাত, কম্পনা ও বাস্তবের মধ্যে যে সংঘাত, সে কি মানব-জীবনে এক নিদারুণ ট্রাজেডি নয়? মিঃ স্টাইনার বলেছেন— 'the evasion of tragedy is a constant practice in our own contemporary theatre' — আংশিকভাবে সত্য হলেও তিনি যখন একালের কোনো নাটককেই খাটি ট্রাজেডি হিসাবে গ্রহণ করতে চান না তখন তাঁর বক্তব্যের ধার অনেকখানি হ্রাস পায়। তিনি টেনেসি উইলিয়ামসকে উপেক্ষা করেন, আর্থার মিলার সম্পর্কে তাঁর ধারণা অন-দার। এমনকি ইউজিন ও'নিলের Mourning Becomes Electra — সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলেছেন— "as a case of adultery and murder in some provincial rat hole." গার্সিয়া লোরকা সম্পর্কে এতটুকু উল্লেখ নেই। আলবার কামু'র নাটকের বিরোগান্ত পরিবেশও তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। এন্টিগোনের কাহিনী নিয়ে আনোইল ট্রাজেডি রচনা করেছেন একথা তিনি স্বীকার করেছেন, তবে তাঁর অন্যান্য রচনার ট্রাজিক অর্থ তিনি উপেক্ষা করে গেছেন।

স্টাইনার ক্রুডেলের রোমান ক্যাথলিক প্রচার-প্রচেষ্টা সম্পর্কে বেশ সজ্ঞেদে লিখেছেন, তেমনই ভঙ্গীতে ব্রেকটের রচনায় পেয়েছেন মার্কসীয় দর্শনের সূর। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন মনে জাগে, যে লেখকের মতে স্তম্ভশতাব্দীতেই ট্রাজেডির মৃত্যু ঘটেছে, তিনি কেন পরবর্তী যুগের নাটকাবলী আলোচনা-সূত্রে এমন ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন। এই প্রশ্নের জবাব স্টাইনারই অবশ্য দিয়েছেন, একালের নাটক যে খাটি ট্রাজেডি নয় সেই কথা প্রমাণ করার জন্যই তাঁকে অনেক যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করতে হয়েছে। এই বক্তব্য স্পষ্ট করার সহজ উপায় হল মারলোর "Dr. Faustus" এবং গ্যোতের "Faust" নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ। মারলোর ফাউস্টস' বেদনাত' চাঁৎকার সহকারে নরককুন্ডে নিপতিত, আর গ্যোতের ফাউস্টকে সমাবেদকন্ঠের স্বর্গীয় সংগীত সহকারে বরণ করা হয়। খাটি

ট্রাজেডি, যথা, হ্যামলেট, লায়র, ট্রিডিপাস প্রভৃতির নিষ্কৃতি নেই। উনিবিংশ শতাব্দীর, রোমান্টিক আদর্শের সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় না।

দ্রুপদী ভঙ্গীতে ফিরে যাওয়ার যে ইদানীন্তন কোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিশেষতঃ ফরাসী নাট্যকার—আনুইল, কাক্তু, গীদ, সারতে প্রভৃতির নাটকে গ্রীক নাটকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার দিকে আগ্রহ দেখা যায়, তেমনই প্রবণতা আছে ইউজিন ও'নিল এবং এলিয়টে।

টাইনারের যুক্তিতে—
“Great Theatre is not conceived in imitation” — । কিন্তু সমালোচকদের মতে আনুইলের ‘Antigone’ সফো-ক্রেসের নাটকের চাইতেও উৎকৃষ্টতর। ভাষা সম্পর্কেও টাইনারের উক্তি কৌতূহলোদ্দীপক, তাঁর মতে ট্রাজেডির কাব্যের সঙ্গীতবাক্যর থাকা চাই। যদি গীতিকবিতার মাধুরী না পাওয়া যায় তাহলে সঙ্গীতের অন্য কোনো রূপকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। টাইনার বলেন যে, ভাগনারের ‘Festpiel haus’-এ ট্রাজেডির নব-জন্ম ঘটেছিল, কিন্তু সঙ্গীত-রচয়িতা ভাগনারকে তার জন্য নতুন শ্রোতা, নতুন আগ্রহের নাটক প্রভৃতি সৃষ্টি করতে হয়েছিল। শ্রোতাকে গড়ে নেওয়াটা একটা বৃহত্তর প্রশ্ন। ট্রাজেডির অবক্ষয়ের সঙ্গে জড়িত আছে সপরিবারে চিত্তবিনোদনের জন্য থিয়েটারে যাওয়ার আধুনিক মনোবৃত্তি। গ্রীকরা যেতেন ধর্মীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। সেকুস-পীয়র ট্রাজেডি লিখেছেন মূল্যবোধঃ এক উচ্চাশীকৃত সম্প্রদায়ের দিকে চেয়ে।

সর্বশেষে টাইনার কিণ্ডিং স্বগতোক্তি করেছেন যে, হয়ত ট্রাজেডির নিছক অপমৃত্যু ঘটবে না, অন্য কোনো মাধ্যমে, অন্য কোনোখানে, অন্য কোনো মহত্বের হয়ত ট্রাজেডি সৃষ্টি হবে, তবে ক্ষেত্রে ট্রাজেডির পুনরুজ্জীবন অসম্ভব নয়। অতঃপর রেখটের ‘Mother Courage সম্পর্কে’ বলেছেনঃ—
“I saw Helen Weigel act the scene with the East Berlin ensemble, though acting is a paltry word for the marvel of her incarnation.... As the body was carried off, Wiegell looked the other way and tore her mouth wide open. The shape of the gesture was that of the screaming horse in Picasso's Guernica. The sound that came out was raw and terrible and beyond all description. But in fact there was no sound. Nothing. The sound was total silence. It was silence which screamed and screamed through the whole theatre so that the audience lowered its head as before a gust of wind.”

লেখক টাইনার এইভাবে সমালোচক টাইনারের কাছে পরাজিত হয়েছেন। এই অভিনয়ের দৃশ্য যারা দেখেছেন তাঁরা বিচার করবেন টাইনারের উক্তির তীক্ষ্ণতা।

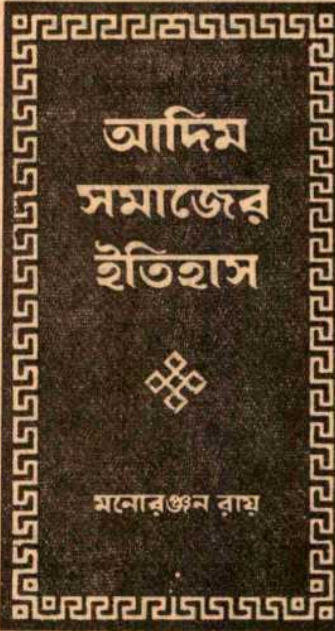
যারা দেখেননি এই কটি লাইন পাঠ করলেই মনে হবে ইন্ট বার্লিনের রপগ-মণ্ডের সামনে বসে আছি। চোখের ওপর একটা ছবি ভেসে ওঠে। এর নাম সমালোচনা। মিঃ টাইনারের অবশ্য এ কথাও স্মরণ করা কর্তব্য যে আধুনিক কালের ট্রাজেডি দর্শকের চোখে তাঁদের নিজস্ব কাল এবং পরিবেশের নিরিখেই ট্রাজেডি হিসাবে গৃহীত হবে। অতীতের ট্রাজেডি আধুনিককালের ট্রাজেডির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকর হয়ে উঠবে। *

“THE DEATH OF TRAGEDY —
By George Steiner :: Faber and Faber — 30 sh.)

নতুন বই

আদিম সমাজের ইতিহাস—(প্রবন্ধ)
মনোরঞ্জন রায়। পরিবেশক—
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমি-
টেড। ১২, বস্কর চ্যাটার্জ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২। দাম—৫ টাকা।

আদিম সমাজের সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণা ক্রমশই স্পষ্টতর হচ্ছে।



মর্গ্যান, এঙ্গেলস প্রমুখ মনীষীরা এ বিষয়ে যে চর্চা শুরু করেছিলেন ফ্রেজার, গার্ডন চাইল্ড প্রভৃতি এ-যুগের মনীষীদের হাতে সেই সাধনা আরো সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। গ্রন্থকার উপরোক্ত পুরাতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ববিদদের গবেষণা অনুসরণ করে আদিম সমাজের অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক ও গোত্র-সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠান ও তাদের ভাবধারা সম্বন্ধে সূচাব্দ আলোচনা করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন আদিম মানুষেরা নিজেদের

টীকিয়ে রাখবার জন্য সভ্যতার শৈশবে কী ভাবে গোত্র, পরিবার প্রথা প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠান থেকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছিল এবং এ সব প্রতিষ্ঠান ও প্রকৃতির উপরে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য জাদু, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি অলৌকিক উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করেছিল। বর্তমান সভ্যতার রাষ্ট্রবন্দে যে মানুষ বিজ্ঞানের যুক্তি ও আলোকে সর্বাঙ্কু যাচাই করে গ্রহণ করে তার জীবনযাত্রার মধ্যেও এমন বহু অসংগতি চোখে পড়ে যার মধ্যে আদিম জীবনের সুস্পষ্ট স্ফাব্দক রয়েছে। বহু উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে সভ্যতার বর্তমান স্তরে মানুষ উন্নীত হয়েছে সে কথা অতীতের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়। পুরাতত্ত্বের এই চর্চার ফলে বিজ্ঞানের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সাহায্যে মানব-সমাজের বহু অসংগতি দূর হতে পারে, বহু অস্বাভাবিক ও ধারণার নির-সন হতে পারে—যার অলৌকিক শিকড় এই সমাজের মাটিতে আজও বদ্ধমূল।

গ্রন্থকার সামাজিক সংগঠনের বিকাশ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস, মর্গ্যান ও ফ্রেজারের ধ্যান স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁদের মতের পাশাপাশি গার্ডন চাইল্ডের মতামতের পাথক্য আলোচনা করতে বিরত থেকেছেন যার ফলে গ্রন্থটি আধুনিক কালের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়নি।

আধুনিক কালের প্রজ্ঞাতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্যে আদিম গোষ্ঠীগাঁড়ি সম্বন্ধে জ্ঞান এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মর্গ্যান ও এঙ্গেলস অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ। গার্ডন চাইল্ডের আধুনিকতম প্রজ্ঞাতাত্ত্বিক জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে সঠিক পন্থা অনুসরণ করতে সাহায্য করেছে। এই ধরনের কিছু কিছু তুলনা-মূলক বিশ্লেষণ করে দেখালে গ্রন্থটি আরো চিত্তাকর্ষক হত।

গ্রন্থকার ‘ভাবধারা’ পর্যায়ে জাদু ও ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত আলোচনার ফ্রেজারের মনশিষ্য ফ্রেজার অপেক্ষা যুক্তিনিষ্ঠ গার্ডন চাইল্ডের উপরে নির্ভর করে ভালোই করেছেন। ফ্রেজারের মতে জাদু-বিশ্বাস বিজ্ঞানের সহোদর। কিন্তু গার্ডন চাইল্ডের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর মতানৈক্য আছে। গার্ডন চাইল্ড জাদু ও ধর্মের অভিন্নহৃদয় আত্মীয়তার বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের উৎস স্বতন্ত্র।

চাইল্ড সে যুগের মানুষের তৈরী মৃন্ময় পাত্রাদি নির্মাণের শিল্পদক্ষতা ও উপযোগিতা বিচার করে ঐ শিল্পকেই বিজ্ঞানের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এই গ্রন্থ রচনার অধ্যবসায় ও পরি-প্রমের নিদর্শন প্রচুর আছে। পরবর্তী সংস্করণে প্রজ্ঞাতাত্ত্বিক গবেষণাগত নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে পুরাতত্ত্বজ্ঞ মনীষীদের

সিদ্ধান্তের তুলনামূলক আলোচনা সংযোজিত হলে গ্রন্থটি আরো সুসম্পূর্ণ হবে।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

পরিচয়—সম্পাদক গোপাল হালদার ও
সম্পাদকগণ চট্টোপাধ্যায়। ৮৯,
মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭।
দাম : এক টাকা।

‘পরিচয়’ পত্রিকার ঐতিহ্য সুবিদিত। বহুদিন ধরে বাঙালার পাঠক-সাধারণকে একটি বুদ্ধিগাণী মনো-রম পঠনীয় বিষয়বস্তু হিসেবে পর আস দিয়ে এসেছে। কিন্তু ‘পরিচয়’ কিছুকাল ধরে তার পূর্বে ঐতিহ্য হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ছিল। সাম্প্রতিক ‘ফাল্গুন’ সংখ্যাটি সে ঐতিহ্যের পুনরুত্থানের প্রয়াস।

এ সংখ্যার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা রবীন্দ্রনাথ ও নন্দন তত্ত্ব (নীরেন্দ্রনাথ রায়); রবীন্দ্র ও বাঙালার ঐতিহ্য (গোপাল হালদার); আদর্শ ও বাস্তব (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়); আফিকার নবজাগৃতির পটভূমিকা (অশু দত্ত); আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ (অশোক রায়)—এই কয়েকটি আলোচনা। অনেকদিন ‘পরিচয়ে’ এতগুলি মূল্যবান রচনা একসঙ্গে ছাপা হয়নি—কেবলমাত্র বিশেষ সংখ্যাগুলি বাদ দিয়ে। যশোদা-জীবন ভট্টাচার্যের গল্প শিকার কাহিনী রয়েছে। কবিতা আছে পুষ্কিন, সেরমন্তক, মারাকভস্কি ও লিখেবের সেনের। অন্যান্য বিভাগীয় রচনা লিখেছেন, গোপাল হালদার, রবীন্দ্র মজুমদার, অমল দাশগুপ্ত, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণা হালদার, দেবেন রায়, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, জিৎসে, অরুণ দেব প্রভৃতি।

সম্প্রতি—সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়। ২৮ কিংসলাল বর্ন রোড, দালখিরা, হাওড়া। দাম ৬০ নং পত্র বাঙ্গালদেশের মানুষ যে কতদূর সংস্কৃতিবান তার পরিচয় পাওয়া যাবে অসংখ্য পত্রপত্রিকার মধ্যে। প্রতি বৎসর বহু নতুন ও পুরানো পত্রিকার জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে।

আলোচ্য পত্রটি ‘সিরিয়ার’ ধরনের বলসে অত্যন্ত হবে না। এবং এ ধরনের পত্রিকা আরও ‘সিরিয়ার’ রচনা নিয়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত। উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের প্রবন্ধটি এবং সম্প্রতি প্রকাশিত তিনটি কবিতা-গ্রন্থের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। কল্যাণ দৌহরীকৃত জিন ফেডম্যান ও অ্যান্ড গ্যাটেনবার্গ সম্পাদিত ‘বিল্ট জেনারেশন এন্ড এয়ারের ইয়ং ম্যান’ পুস্তকের ভূমিকার অনুবাদ ‘বিল্ট সম্প্রদায় ও

ব্রহ্ম যুবাব্দ’ নামে রচনাটি অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। শেখর বসু ও স্মরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প এবং আলোক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, গৌর পাল, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, পরিচয় করি।

বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি বরণীয় গ্রন্থ

॥ সাহিত্য-বিষয়ক ॥

বিমানবিহারী মজুমদার : মোড়ন শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫.০০; পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ৬.০০ ॥ অজিত দত্ত : বাংলা সাহিত্যে হালদার ১২.০০ ॥ মদনমোহন গোস্বামী : ভারতচন্দ্র ৩.০০ ॥ ভবভূষণ দত্ত : চিত্তাম্বরক বাল্মীকিচন্দ্র ৬.০০ ॥ রথীন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্য-বিচিত্রা ৮.৫০; বাংলা সাহিত্যে প্রথম চৌধুরী ৭.০০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী : আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন ৩.৫০ ॥ অরুণ মুখোপাধ্যায় : উদ্যোগ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য ৮.০০ ॥ শিবজেন্দ্রলাল দাশ : আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য ৮.০০ ॥ সত্যজিত দত্ত : চর্যাপদ-পরিচয় ৫.০০ ॥ অরুণ ভট্টাচার্য : কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার কতকগুলি ৮.০০ ॥ প্রসন্ন রায় : সাহিত্য দর্শন ৮.০০ ॥ সখল-কুমার ভট্টাচার্য : রবীন্দ্র শাস্ত্রী-সাহিত্যের ভূমিকা ৬.০০; নাটক ও নাট্যকীর্তি ২.৫০; নাটক সেবার মূল্যায়ন ৫.০০ ॥ আজহারউদ্দীন খান : বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল ৫.০০

॥ জীবনী সাহিত্য ॥

চারচন্দ্র ভট্টাচার্য : বিজ্ঞানিক জীবনের কাহিনী ১.৫০ ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বঙ্গের প্রাচীন কবি ১.০০ ॥ গিরিজালোকর রায়চৌধুরী : কবিতা নির্বেদনা ও বাংলায় বিদ্যাব্যব ৫.০০; শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫.০০ ॥ বলাই দেবলক্ষ্য : ব্রহ্মবাক্য উপাখ্যান ৫.০০ ॥ প্রভাত গুপ্ত : রবীন্দ্র ৬.০০ ॥ খাজা আহমদ আব্বাস : ফেরে নাই শব্দ, একজন ৮.০০ ॥ হরি বার্গাচি : শিশিরকুমার ও বাংলা শিরোচর ১০.০০; রামমোহন ৮.০০; রবীন্দ্র নৈকেন্দ্রনাথ ৮.৫০; লাইকেল ৮.০০; কেশবচন্দ্র ৮.৫০; আচার্য প্রকৃদচন্দ্র ৮.৫০

॥ বিবিধ গ্রন্থাবলী ॥

রাধাকৃষ্ণ : হিন্দু সাধনা ৩.০০ ॥ তারাপ্রসন্ন দেবলক্ষ্য : রামায়ণতত্ত্ব ৮.৫০ ॥ নীলেশচন্দ্র সেন : রামায়ণী কথা ৮.০০ ॥ ত্রিপুরালোকর সেন শাস্ত্রী : রামায়ণের কথা ১.২৫; ভারত জিজ্ঞাসা ৩.০০; মনোবিদ্যা ও মৌলিক জীবন ২.৫০ ॥ শিশিরকুমার নিরোগী : লজ্জা কুন্তিবাসী রামায়ণ ৩.৫০ ॥ বিশেষত্ব মিত্র : পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গে ৩.৫০ ॥ কল্যাণী কালেকর : ভারতের শিকা ১ম খণ্ড ২.৫০; ২য় খণ্ড ৫.০০ ॥ প্রফুল্লকুমার দাস : রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড ৩.৫০ ॥ সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় : জাতিভাষার চিত্র ১.৫০ ॥ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় : লাইবেরিয়ার উপকথা ১.৫০ ॥ সুনীলকুমার গুহ : স্বাধীনতার আবোল তাবোল ৫.০০ ॥ সত্যকিংকর সাহানা : হিন্দুধর্ম ১.৫০; মহাভারতের জনশৈলিন্দতত্ত্ব ২.৫০; চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে ২.৫০; লক্ষ্মীলাল রহস্য ২.৫০ ॥ রবীন্দ্র সমালোচনা : প্রবালী বাঙালীর কথা ১.৫০ ॥ রানবলেন্দ্রনাথ রায় : রাকসবাস ১.৫০; লক্ষ্মী ও বিপ্লব ১.৫০ ॥ শ্রীজ্ঞানানন্দেবী : দেশ-বিদেশের শিকা ৮.০০

॥ গল্প ও উপন্যাস ॥

ব্রহ্মদেব বসু : জামার বন্ধু ২.০০; গার মৃদা ২.৫০ ॥ মৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : লক্ষ্মী ২.০০; হাসি ২.০০ ॥ বাণী রায় : শূন্যের জগৎ ২.৫০ ॥ সুবোধ মজুমদার : অন্তর ও বাহির ১.০০; পলাতক ৩.০০ ॥ তিদাহবাহন চৌধুরী : অনুস্মৃতি ২.৫০ ॥ কল্যাণী কালেকর : কল্যাণ ও কুমার ১.৭৫ ॥ সুপ্রিয়রঞ্জন গুহ : রজনালী ৩.০০ ॥ সুবোধ বসু : মানবের পত্র, নারী ২.০০; স্বর্গ ২.০০; পূর্বভব ২.৫০; উদ্ভাস ৩.০০; পদ্মা প্রজ্ঞা ৩.৭৫; গল্পসংগ্রহ ৮.০০; চিত্রা ৩.০০; ইন্দ্র ২.৫০; পদ্মানদীর ডাক ১.৭৫ ॥ সুকুমার রায় : কয়েকটি গল্প ১.০০

জিজ্ঞাসা ॥

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ : ১৩৩এ, রাঙ্গাবিহারী
আ্যাভিনিউ কলিকাতা-২৯

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভাব মহোৎসব

শ্রীমনন

বাঙালীর প্রাণের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসবকে কেন্দ্র করে গেল ২১এ, ২২এ ও ২৩এ মার্চ বাঙালীর সংস্কৃতি কেন্দ্র এই শহর কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে গেল, তা ধর্মপ্রাণ বাঙালীমাতৃকেই আবার নতুন করে আশার বাণী শুনিয়ে নবভাবে সজীবিত করেছে।

গেল বুধবার, ২১-এ মার্চ উষাকালে মঙ্গলারাত্রিক শেষে শ্রীশ্রীনামবজের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুরুর সূচনা হয়।

ঘোষ, বিশ্বনাথ মূখোপাধ্যায় এম-এল-এ, বিভা মিত্র এম-এল-এ, সুধারাণী দত্ত এম-এল-এ, অনিল মৈত্র এম-এল-এ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য বিধুভূষণ ঘোষ প্রভৃতি।

নগর-সংকীর্তন শেষে ঐ দিন সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কে যে মহতী জনসভা হয়, তার সভাপতিরূপে ভাষণদান কালে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সমবেত লক্ষাধিক জনসমুদ্রের উদ্দেশে বলেন, আজকের এই দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালা দেশ যেন হরিনামের বাতী ভুলে না যায়।



‘নিমাই সন্ন্যাস’ যাত্রাভিনয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (শচীমাতা), মনোজ বিশ্বাস (নিমাই) ও বীণা চক্রবর্তী (বিষ্ণুপ্রিয়া)

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মশোভিত সুউচ্চ ও সুশোভিত মণ্ডের পশ্চিমে আর একটি বর্ণাঢ্য মণ্ডে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ণায়ব মূর্তির পূজা, হোম ও আরাতি এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

ঐ দিন বেলা সাড়ে তিনটায় অগণিত ভক্ত সমাবেশে হরিনামমুখর যে বিচিত্র নগর-সংকীর্তন দেশপ্রিয় পার্ক থেকে বেরিয়ে সুদীর্ঘ পথপরিক্রমা করে আবার দেশপ্রিয় পার্কে ফিরে আসে তার পুরোভাগে যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পদব্রজে পরিক্রমা করতে দেখা গিয়েছিল, তার মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার স্পীকার কেশবচন্দ্র বসু, মন্ত্রী কালীপদ মূখোপাধ্যায়, মন্ত্রী অজয় মূখোপাধ্যায়, উপ-মন্ত্রী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষারকান্ত

সভার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করে শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী শ্রীশ্রীগোরাঙ্গদেবের পূণ্যদর্শ মানুষের জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠবার জন্যে প্রার্থনা জানান। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের উদ্বোধনী সংগীতের পর মহোৎসব কর্মিটির অন্যতম সহ-সভাপতি মন্ত্রী কালীপদ মূখোপাধ্যায় উপস্থিত ভক্ত, বক্তা, শিল্পী ও জনসাধারণকে স্বাগত সম্ভাষণ করেন। সভার অন্যতম বক্তা ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবকে বাঙালা দেশের গেল পাঁচশো বছরের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার প্রতিনিধি বলে বর্ণনা করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত মানুষের দুঃখ দূর করার জন্যেই তাঁর ধরাধামে অবতীর্ণ

হবার প্রয়োজন হয়েছিল। সভাতে পন্নী-কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ মহাপ্রভুর দর্শন ও জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন। সভার শেষে শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভাব মহোৎসব সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীতুষারকান্ত ঘোষ সভাস্থ অতিথিবৃন্দ, ভক্তজন ও সমবেত জনসাধারণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাশেষে কীর্তন ও ভজনানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে যে-সব শিল্পী অগণিত শ্রোতাকে আনন্দদান করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেনঃ ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, উপলা সেন, মাধবী ব্রহ্ম, মানবেন্দ্র মূখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ মূখোপাধ্যায় ও ব্রজেন সেন। এঁদের সঙ্গে মৃদংগ বাজিয়েছিলেন বিজয় সেনগুপ্ত (কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে), কুমুদ ঘোষ, রাধাকান্ত নন্দী, শ্যাম মূখোপাধ্যায়, দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও নিমাই ভট্টাচার্য।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার ২২-এ মার্চের অনুষ্ঠানে শ্রীরামরতন সাংখ্যশাস্ত্রীর “শ্রীশ্রীগোর কথা” অগণিত ভক্তদের সামনে সেই মহতী জীবনের প্রকৃষ্ট রূপকে উদ্ঘাটিত করেছিল। এর পর শ্রীমতী কান্তিলতা দেবীর সুস্বাদু কথকতা শ্রোতৃবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দানে সমর্থ হয়েছিল। সত্যেন্দ্র মূখোপাধ্যায় পরিবেশিত ভক্তি-কীর্তনের পর হাওড়া সমাজ অভিনয় করেন তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যসৃষ্টি ‘নদের নিমাই’ (নদীয়ালালা)।

শেষ দিনে, শুক্রেবার ২৩-এ মার্চ প্রথমেই প্রসিদ্ধ বাউল পূর্ণ দাস শ্রীগোরাঙ্গগীতি পরিবেশন করেন। এর পর অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীরাধরমণ কীর্তন সমাজের লীলাকীর্তন। এই সন্ধ্যায় প্রধান আকর্ষণ ছিল মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ রচিত ও মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্ত ঘোষ প্রযোজিত “শ্রীনিমাই-সন্ন্যাস” লীলা-দিনয়। শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের সভাবন্দ কর্তৃক নিবেদিত এই লীলাভিনয়ে নাট্য-পরিচালক ছিলেন শ্রীমিহির গণ্ডোপাধ্যায় এবং সংগীত-পরিচালনায় ছিলেন শ্রীকমল দাসগুপ্ত। এই মধুর লীলাভিনয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে মৃদু ও আনন্দিত করেছিলেন সম্প্রদায়ের সকল শিল্পীই এবং তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করা যায় শচীমাতার ভূমিকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য অনবদ্য অভিনয়ের কথা। এর পরই নাম করতে হয় বিষ্ণুপ্রিয়া ও নিমাইয়ের ভূমিকায় যথাক্রমে বীণা চক্রবর্তী ও মনোজ বিশ্বাসের মনোজ্ঞ অভিনয়ের। এ ছাড়া দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন গৌরগোপাল (নিতাই), সুধীর মূস্তাফি (শ্রীবাস), সত্যরায় (ন্যায়রত্ন) ও প্রমোদ গুহ (বিদ্যা-বাগীশ)। মূকুন্দের ভূমিকায় নীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর মধুর গানে সমবেত শ্রোতৃদের মৃদু করেছিলেন।

শ্রেষ্ঠ গুরু

নান্দীকর

আজকের কথা

সমাজ দর্পণ :

বহুকাল আগে একটা গান প্রচলিত ছিল, যার গোড়ার দুটো পংক্তি হচ্ছে : “জগৎখানা নটবরের যেন নাট্য রঙ্গমণ্ড। সে যে একা সেজে নানা সাজে ভাঙে গড়ে এ প্রপঞ্চ।।” গান হিসেবে যাই হোক না কেন, দার্শনিক তত্ত্ব ফুটে উঠেছে এই দুটি ছন্দে। মায়াময় সংসারের ভাঙাগড়া—সবই সেই নট-শ্রেষ্ঠ ভগবানের নাট্যাভিনয়, সেই এক নিজেকে বহুধা বিভক্ত করে ভাঙাগড়ার নটকাভিনয়ে মগ্ন। আবার জগৎখানা একটি নাট্যমণ্ড এবং আমরা মানুষ সেখানে অভিনেতা—একথা বলে গেছেন সেন্সপায়ার। কিন্তু এই অভিনয় জিনিসটা কি? “রূপং রূপং প্রতি-রূপং।” রূপেরই প্রতিরূপ। আরিস্তোতলও একই কথা বলেছেন—আর্ট হচ্ছে সত্যের নকল (art is an imitation)। রঙ্গমণ্ডে আমরা জীবনেরই প্রতিচ্ছবি দেখি। তাই যেমন কথা আছে—“মুখমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণ-স্বরূপ”, ঠিক তেমনই প্রবচন আছে—“রঙ্গমণ্ড সমাজের দর্পণস্বরূপ”। গোপদে অনন্ত আকাশ যেমন প্রতি-বিস্তৃত হয়, তেমনই রঙ্গমণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় গোটা সমাজের চেহারা। সমাজের চেহারা বলতে মাত্র তার বাহ্যিক রূপটাই নয়, তার চিন্তা, ভাবনা, ধ্যান, ধারণা সংবলিত গোটা মানসরূপটো। মনে রাখতে হবে, দর্পণের একটা অর্থ যেমন মূকুর বা আয়না, তেমনই আর একটি অর্থ হচ্ছে—চন্দ্র। এবং চন্দ্র বলতে খালি চন্দ্র-চন্দ্রই বোঝায় না, মনশ্চন্দ্র বা জ্ঞান-চন্দ্রও তার মধ্যে এসে পড়ে। তা ছাড়া মাত্র মূকুর বা আয়না অর্থে যে দর্পণ, তাই কি অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস? মানুষের মুখমণ্ডল থেকে শব্দ করে বিরাট বহিঃপ্রকৃতি, মায় সূর্যকে পর্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করবার যার ক্ষমতা, সে বস্তু কি তুচ্ছ? মনে করুন, দর্পণ আবিষ্কারের আগেকার যুগের কথা। নিজের মুখ দেখা থেকে আরম্ভ করে মাথার চুল আঁচড়ানো, গালি কামানো, ঠোঁটে লিপিস্টিক ঘসা, গালে রক্ত পাউডার লেপা—সবই চিন্তার বাহরে। একখানি ছোট দর্পণ তাঁর হাতে থাকলে কি স্নানরতা রাধাকে সংগে বলতে হত—‘তেই দিও না জলে, ওগো প্রাণসখি; দরশনে দাগা দিলে হবে

পাতকী?’ “দশরূপক” নাট্যসম্প্রদায় তাঁদের সম্প্রতি-প্রকাশিত অভিনয়সূচী-পুস্তিকায় অথথাই সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন—“রঙ্গমণ্ড সমাজের দর্পণ-স্বরূপ” প্রবচনটি ‘গভীর চিন্তাপ্রসূত নয়।’ তাঁরা আর একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে নিশ্চয়ই কথাটার স্থূল আক্ষরিক অর্থকে এড়িয়ে গিয়ে নিহিতার্থকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন। ঠিক এই নিহিতার্থবোধ ছিল যুগেই বাংলাদেশে নীলকরের অত্যাচারকে প্রতি-



মুন্ডীতকের শিউলি বাড়ির নায়িকা চরিত্রে অরুণ্ধতী মুনোজ্জি

ফলিত করে দীনবন্ধু যে লোকনাট্য লিখেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন—“নীলদর্পণ।”

চিত্র সমালোচনা

শিউলিবাড়ি : মুন্ডীতক প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন; ১১,৮৫৯ ফুট দীর্ঘ ও ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : সুবোধ ঘোষ; চিত্রনাট্য : তপন সিংহ; পরিচালনা : পীযুষ বসু; সংগীত-পরিচালনা : অরুণ্ধতী মুনোজ্জি; চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত; শব্দধারণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়, নূপেন পাল ও সুশীল সরকার (অন্তর্দৃশ্য), অবনী চট্টোপাধ্যায় (বাহ্যদৃশ্য); সম্পাদিত-গ্রহণ ও পুনর্শব্দযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ;

শিল্প-নির্দেশনা : সুনীতি মিত্র; সম্পাদনা : সুবোধ রায়; রূপায়ণ : উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, বীরেশ্বর সেন, দিলীপ রায়, মিহির ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, মনি শ্রীমানি, জয়নারায়ণ, ননী মজুমদার, চন্দন রায়, কালী চক্র-বর্তী, অমল চট্টোপাধ্যায়, অরুণ্ধতী মুনোজ্জি, রজনী বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, গীতালি রায়, রুবী বেরা, সুমিতা মুনোজ্জি, পিঙ্কি প্রভৃতি। প্রভা পিকচার্সের পরিবেশনায় গেল ২৩-এ মার্চ থেকে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে। সুবোধ ঘোষের ‘নাগলতা’ উপন্যাসের পটভূমিকা বহু-বিস্তৃত। রুদ্ৰবাবু এবং তার কিয়ের অবৈধ সন্তান বিজনবিহারী

তার বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর যখন নিজের জন্ম-পরিচয় জানতে পারা মাত্র পনেরো বছর বয়সে কুফলগরের বাস ছেড়ে রাতের অন্ধকারে ভবিতব্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চেরেছিল, সেই সময় থেকে আর্থ ক্যাটিংয়ের কল্ট্রাক্টর হয়ে ‘মিটিসাহেব’ নাম কেনবার মাঝে তাকে দশটি বছর ধরে যে-কৃচ্ছসাধন করতে হয়েছিল, তার সাধনক্ষেত্র ছিল সুন্দর রাজস্থানের চিতোরগড়, ঝাংসী, ঢোলপুর, জম্বলপুর, এবং সবশেষে উড়িষ্যার জঙ্গল থেকে পালানো যাবার পথ। এবং এই কৃচ্ছসাধনের রূপই বা কি বিচিত্র : উটওয়ালার চাকর, মেওয়া-ওয়ালার তরখানায় মেওয়া চোলাই করে মদ তৈরীর সাকরেন্দ, সাহেবের বেয়ারা,

রেলের লাইনম্যান, সার্ভে পার্টির চেন-ম্যান। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জানা না থাকলে 'মিটিসাহেব' বিজনবিহারীর চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক ধারণা সম্ভব নয়, মাত্র তার শৈশবে বাবার সঙ্গে পাঞ্জা লড়া বা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে একলা ট্রেনে চেপে মানকর গিয়ে সেখান থেকে হেঁটে মেজদির শ্বশুরবাড়ী মাগিকপুরে বাওয়ার বৃত্তান্ত থেকে। মেজদির শ্বশুরবাড়ীর সরকারমশাই বটুকবাসুর মেয়ে কাজলীর সঙ্গে বিজনের যখন ডাব হয়েছিল, তখন তার নিজের বয়স পনেরো এবং কাজলীর বয়স দশ। সাত বছর পরে জম্বলপুরে রেলের লাইনম্যান থাকবার সময়ে লোকো শেডের গেটম্যান টেলদার সিংয়ের কাছ থেকে 'সাদি' করবার তাগিদে সে যখন আবার কাজলীকে দেখতে এসেছিল, তখন কাজলীর নববধূরূপে—মাত্র পনেরো দিন হ'ল তার বিয়ে হয়েছে। এবং তখন কথায় কথায় সেই সাত বছর আগের ডেপো মেয়েটা স্পষ্টই বলেছিল : 'তুমি হ্যাঁ বললে আমি না বলতাম না। কখনো না। আমি যে সত্যিই ভেবেছিলাম, তুমি ঠিক সময়মত এসে পড়বে। না এসে পারবে না।' এই কথা মনের মধ্যে গাথা ছিল বলেই চাঁফ সার্ভেয়ারের চেনম্যান বিজনবিহারী মাটিকাতার ঠিকেনারী পেয়ে কলকাতা থেকে এক বছরের মেয়াদে কোদাল গাইতি ইত্যাদি ধারে পাবার বন্দোবস্ত করবার পর কাজলীর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে

বিধবা কাজলীকে দস্যুর মত লুট করে আনতে পেরেছিল।

কিন্তু 'শিউলিবাড়ি' ছবিতে বিজন-বিহারীর কুচ্ছসাধনের জীবনের যেমন কোনো উল্লেখ নেই, তেমনই নব-বধূ কাজলীর সঙ্গে জম্বলপুরের লাইনম্যান বিজনের সাক্ষাতের দৃশ্য। তাই পথচলতি বালক বিজন থেকে মূন্ডারি ভাষাভাষী 'মিটিসাহেব-বেশী' বিজনকুমারে পরিবর্তন যেমন আকস্মিক, তার চেয়েও বেশী অসম্ভব মনে হয়েছে এক যুগ অদর্শনের পর বিধবা কাজলীর অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক বিজনবিহারীর সঙ্গে চিরপরিচিতের মতো অন্তরঙ্গভাবে কথা বলা।

একটি স্থান-কালের দিক দিয়ে বিস্তৃত পরিবর্তনের কাহিনীকে একটি ন্যায়দীর্ঘ চমকিয়ে রূপান্তরিত করতে গেলে চিত্রনাট্যকারকে মোটামুটি গল্পটিকে একটি সঙ্কীর্ণ বেটনীর মধ্যে আনতে গিয়ে 'কোনটা রাখি কোনটা ছাড়ি'—গোছের ঘোঁষাবাদ পড়তে হয়, তার হাত থেকে চিত্রনাট্যকার তখন সিংহ মূর্তি পাননি। এবং ফলে একেবারে শেষের পর্বায়ে এসে পৌঁছোবার আগে পর্যন্ত অর্ধাৎ বিঘোম্পারী করালী-চরণের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত দৃশ্য-রচনার বহু স্থানেই বহু ফাঁক লক্ষ্য করা গেছে।

কিন্তু সুবোধ ঘোষের 'নাগলতা'কে একটি বিষয়ে 'শিউলিবাড়ি' চিত্র-কাহিনী অতিক্রম করে গেছে। জন্মকে অতিক্রম করে মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হ'ল তার কাজ—'দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম মম, কিন্তু পদব্রহ্ম করায়ত্ত মোর', সুতপূর্যে করণের এই বাণীকে মৃত করতে গিয়ে কাহিনীকার সুবোধ ঘোষ যেখানে বিশ্বাসপ্রস্তু, যেখানে তিনি বিজনবিহারী এবং নিরুপমাকে (কাজলীর পোশাকী নাম) অপমানিত জীবনের সম্মতি সাধনের স্মার পর্বন্ত নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন, সেখানে ছবির কাহিনী মনুষ্যসমাজের বিবাহ-প্রথাকে নস্যাত করে দিয়ে নরনারীর জন্মপরিচয়কে সুস্থ জীবনধারণের পক্ষে একটি অত্যন্ত অনাবশ্যক জিজ্ঞাসা বলে প্রমাণ করবার দৃষ্টি সাধনা করেছে। এদিক দিয়ে 'শিউলিবাড়ি'কে পোলিশ-চিত্র 'আসেস অ্যান্ড জায়-মন্ডস' (Ashes and Diamonds) থেকেও দুঃসাহসিক আখ্যা দেওয়া যায়। পৃথক পৃথক যখন নিজের কাঁকা করালীচরণকে নিজের হাতে টেনে হিঁচড়ে তুলে 'এখানে তোমার ঠাই নেই' বলে শিউলিবাড়ি থেকে রওনা করিয়ে দিল, তখন থেকে শেষ পর্যন্ত 'শিউলি-বাড়ি' ছবি দৃশ্যের পর দৃশ্য দিয়ে যে-ভাবে যে-কথা বলেছে, সে-ভাবে সে-কথা বাংলা ছবি কেন, পৃথিবীর কোন দেশের কথানা ছবিতে শোনা গেছে, তা

আমাদের জানা নেই। এবং এই যে বলা, তা এমনভাবে বলা যে, অন্তর মথিত হয়, হৃদয় স্তম্ভ হয়, চকু আঁচ হয়, ছবির সঙ্গে একান্ত হয়ে মন সুন্দর বেদনায় অভিষিক্ত হয়।

ছবিতে বহিদৃশ্য এবং অন্তর্দৃশ্যের মিলন ঘটেছে বারে বারে। দিন-রাতি, আলো-আঁধারি, রোদ-রষ্টির খেলা—সমস্তই অতি বিচিত্রভাবে রূপায়িত হয়েছে দীনের গুস্তর ক্যামেরার সাহায্যে। শব্দধারণও যতদূর সম্ভব প্রতীতিগ্রাহ্য; বিশেষ করে 'বাহিদৃশ্যের' এত ভালো শব্দগ্রহণ কীচিং কানে আসে। শিক্পনির্দেশে যথেষ্ট বাস্তব-ধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছবিতে একটি মাত্র গান 'রাই জাগো' বারে বারে এসেছে যেন গল্পের মূলে বাণী বহন করে। এবং গানখানি বাঁধবার শোনবার মতো। আবহসংগীতে অপূর্ব ভাবসূচি করেছেন আলি আকবর খাঁ তার একক স্বরোদ বাদনে। অপরাপর জায়গায় আবহসংগীত অত্যন্ত সীমিত। অরুণতী মূখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনায় মৃদু সংগীতরচনার পক্ষ-পাতিত দেখিয়েছেন।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় বিধবা কাজলী বা নিরুপমাবৈশিষ্ট্য অরুণতী মূখোপাধ্যায়ের। 'মাটিবালু'র অন্তরকে জাগিয়ে রাখার কাজ, তার সিংগনীর নিরুদ, এই সহজ কথাকে তিনি কোন সময়েই বিস্মৃত হননি। নায়ক-বেশে উত্তমকুমার তাঁর স্বভাববিস্ময় সহজ অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছেন। জমিদার রত্নবাবুর চরিত্রকে মৃত করে তুলেছেন ছবি বিশ্রাম তাঁর সাবলীল অভিনয় দ্বারা। রজনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুনন্দা (বা নন্দুয়া) সুন্দর; বিশেষ করে জন্ম-রহস্য জানবার পর তাঁর

স্টার থিয়েটার

শ্রীমতী নিবাসিত। ফোন : ৫৫-১১৩৯

মুদ্রন নাটক

শেষাঙ্গি

কাহিনী : শ্রীমতী রাজকুমার

নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত

দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু

গান : শৈলেন বসু ও সুর : হুগো সেন

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬১ টার
বিক্রয় ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬১ টার

৥ রূপায়ণে ॥

কমল সিং - অজিত বন্দ্যো - আশীষ
কুমার - অর্পণা দেবী - জিলা চক্রবর্তী
বালবী নন্দী - অমলকুমার - চন্দ্রশেখর
বীরেশ্বর সেন - গীতা দে - শাধলা
রাজকুমারী - আশাদেবী - শ্যাম লাহা
প্রসাদে বোস - ভানু বন্দ্যো



শ্রীমন্ত

মহাকবি সিন্ধুনাথের

হ্যাঁজা

হ্যাঁজা

৩০ পর্বে

৩০ পর্বে

৩০ পর্বে

৩০ পর্বে

৩০ পর্বে

৩০ পর্বে

৩০ পর্বে

৩০ পর্বে

৩০ পর্বে

৩০ পর্বে

৩০ পর্বে

৩০ পর্বে

আবেগপূর্ণ অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী। অপরাপর চরিত্রে দিলীপ রায় (পদ্মকর), বীরেশ্বর সেন (জমিদারবাবু), চন্দন রায় (কমল), তরুণকুমার (শিখ বাবসায়ী) প্রভৃতি কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন।

শিউলিবাড়ীর মত দৃশ্যসাহসিক চিত্র উপহার দেবার জন্যে তরুণ পরিচালক পণ্ডিত বসু এবং প্রযোজক প্রবোধ মজুমদারকে ধন্যবাদ জানাই।

‘হিজ মাস্টারস ভয়েস’ রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ‘মায়ার খেলা’

‘মায়ার খেলা’ মধ্যযুগে শৃঙ্গার রসের নাটক। প্রেমিক জীবনের একটি সামগ্রিক রূপ এই গীতি-নাটকের উপজীব্য। এর প্রতিটি নাটকীয় মুহূর্তে কবিগুরু হৃদয়রসে সিঞ্চিত অমিয়-মধুর বাণী, এর চরম পরিণতিতে দুহিতার নির্মম নির্দেশে কবির পরিণত বিবেচনার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। রবীন্দ্রকবীর অন্তর্নিহিত গঢ় সত্য ও তথ্যের আলোকে উদ্ভাসিত এই গীতি-নাট্যটি তাই বিশেষভাবে মনকে দোলা দেয়। এ নাটকের শিল্পী নির্বাচনে নিরীতিশয় সাবধানতা অবলম্বন না করলে কেবল যে নাটকীয় রস ফুটিয়ে তোলা কঠিন তাই নয়, বিচ্ছিন্নভাবে কোন একক বা সমবেত সংগীত সার্থক হলেও সমগ্র নাটকের একটি নিটোল পরিচ্ছন্ন রূপ পরিস্ফুট করাও দুঃসহ। বলতে গেলে সমস্ত গীতি-নাট্যটি মায়াকুমারীগণের সমবেত সংগীতের পটভূমিতে বিধৃত। প্রেমিকা বা প্রেমা-



তপন সিংহ পরিচালিত তারাসংকরের অমর কাহিনী অবলম্বনে চিত্রায়িত হান্দাল বাকের উপকথা চিত্রে কালী ব্যানার্জি ও নিভাননী

স্পদের পরিবর্তনশীল রসভাস ফুটিয়ে তোলা সতাই এক দুঃসহ শিল্পকর্ম—বিশেষ করে নিরত গীতিপ্রোতে সত্তার-মান ঘটনাবলী রবীন্দ্র-সংগীতের অপরিবর্তনীয় সুরসৌন্দর্যে সুসমঞ্জস রাখা কুশলী কলাকারের পক্ষেও কণ্টসাধ্য কর্ম। সুখের বিষয় ‘হিজ মাস্টারস ভয়েস’ রেকর্ডে পরিবেশিত ‘মায়ার খেলা’ গীতিনাট্যটির সাফল্য এই সূকঠিন পরীক্ষার কঠিন পাথরে সোনার আখরে জ্বলজ্বল করছে।

গত ঘোলই মাচ’ শুক্রবার কলকাতার লাইটহাউস মিনিয়োর থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে গ্রামোফোন কোম্পানী মায়ার

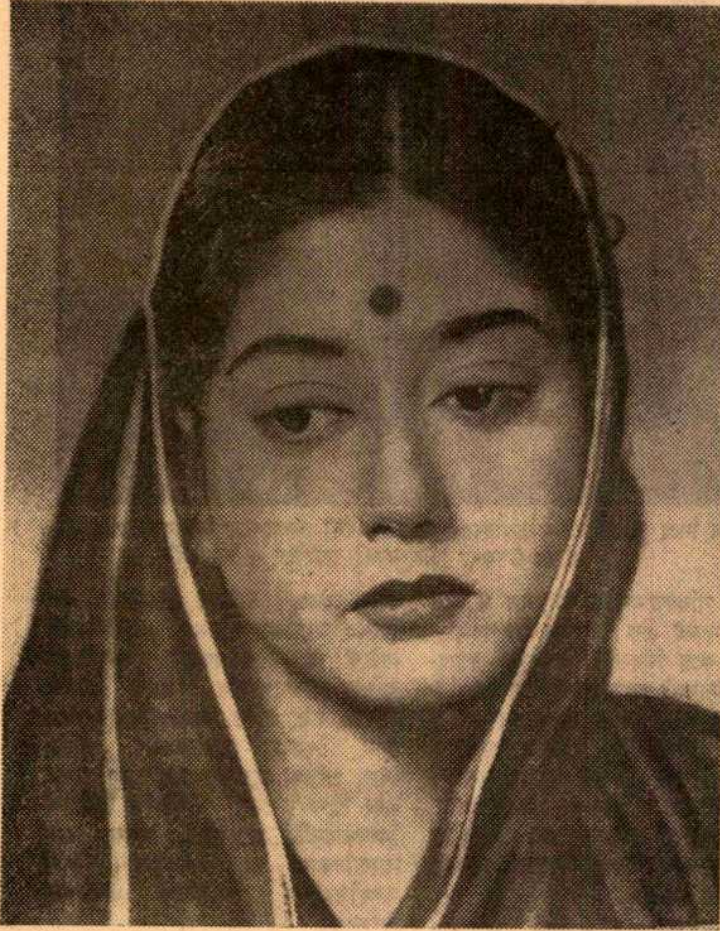
খেলা রেকর্ড বাজিয়ে শোনাবার এক বিশেষ আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে নাটকে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্বিভেন মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু গুপ্ত, শ্যামল মিত্র, সুমিত্রা সেন, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, বনানী ঘোষ, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা সেন এবং শ্রীপর্ণা ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বভারতীর কয়েকজন সদস্য এবং সাংবাদিকগণ ও কয়েকজন বিশিষ্ট সংগীতরসিক অতিথিও উপস্থিত ছিলেন।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রমদা, শ্বিভেন মুখোপাধ্যায়ের অশোক, শ্যামল



রেকর্ডে ‘মায়ার খেলা’ গীতিনাট্যে অংশগ্রহণকারী শিল্পীগণসহ গ্রামোফোন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে টি জর্জ (কেন্দ্রস্থলে) ও রেকর্ডিং অধিকর্তা মিঃ পি কে সেন (পিছনের সারিতে দর্শনদক্ষিণে)

(বাম হতে) : শ্যামল মিত্র, শ্বিভেন মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু গুপ্ত, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা রায়, মিঃ জর্জ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, শ্রীপর্ণা ঘোষ, কৃষ্ণা সেন, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়।



বিমল ঘোষ প্রোডাকসনের 'বন্দু'

মিষ্ট্রের অমর এবং মঞ্জু গুপ্তের শান্তা তাঁদের শিল্পী-জীবনের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে। অন্যান্য ভূমিকায় অংশগ্রহণকারীরাও অতি সুন্দরভাবে তাঁদের নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; তাতে সমগ্র নাটকটি একটি স্ফটিকখণ্ডের মত নির্মল পরিচ্ছন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মায়ার থেলা গোটা নাটকটি এক-খানি মাত্র ৩৩৫ আর পি এম, লং প্লেইং রেকর্ডে (EALP 1269) প্রকাশিত হয়েছে। এতেও নাটকটি উপভোগ

চিত্রে সানিহ্রী চ্যাটার্জি

করবার পক্ষে খুবই সুবিধা হবে। তবে যারা সাধারণ রেকর্ডে পেতে চান তারাও যাতে প্রায় সমান সুবিধা ভোগ করতে পারেন, তারজন্য একই সঙ্গে ছয়খানি ৭৮ আর পি এম রেকর্ডের অটো-ক্যাপলিং সেট (P 11958-63) হিসাবেও প্রকাশিত হয়েছে। এই সেট স্বয়ংক্রিয় রেকর্ড প্লেয়ারে বাজাবার সুবিধা পাওয়া যায়। উভয়প্রকার সেটেই পরিচ্ছন্ন চিত্রসংযোজন গ্রামোফোন কোম্পানীর সুরচিহ্ন পরিচয় দেয়। আমরা 'মায়ার থেলা' গীতিনাট্যটির বহুল প্রচার কামনা করি।

দক্ষিণ
কলিকাতায়
ম্যাডা
সংগীয়েছে

প্রতি বহুসংখ্যক
সংখ্যা ৭৫০০
খিয়েটোর
ইউনিট-এর

কৃষ্ণচন্দ্র

মহারাজ নিবাস
১৫, হাজরা রোড

৬৭-৫১৯৫

বিবিধ সংবাদ

দশরূপকের 'উর্বশী নিরুদ্দেশ' :

লক্ষপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায় লিখিত 'উর্বশী নিরুদ্দেশ' নাটকটি একটি কম্পোনামূলক রোমাঞ্চ নাটক, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় ফ্যান্টাসি (fantasy)। কিন্তু নাটকটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে গিয়ে কৃতি নাট্যকার পরেশ ধর এর মূল সুরটিকে ব্যাহত করেছেন, একথা দৃষ্টের সঙ্গে বলতেই হচ্ছে। বিশেষ করে নির্ভয় ডাক্তারের

সঙ্গে গৌতম-ভগ্নী কুপার সম্পর্কটিকে এক তরফা প্রেম নিবেদনের অবতারণা করে নাটকটিকে না কম্পোনামূলক, না বাস্তব—একটি জগাখিচুড়ীতে পরিণত করেছেন। এতে মূল নাটকের সুর গেছে কেটে এবং নাটকটি হয়ে পড়েছে অবাস্তব।

তার ওপর এর প্রযোজনাও হয়েছে অত্যন্ত গুটিপূর্ণ। এমন কি, মণ্ড-পরিচ্ছন্নায় কাণ্ডনজ্ঞার দৃশ্য সৃষ্টি-ভাবে দেখানো হয়নি চন্দ্রালোকের মায়ী সৃষ্টি করতে না পারার জন্যে। যদিও নাট্যপ্রযোজনায় এই মণ্ড-পরিচ্ছন্নায়টিই উল্লেখযোগ্য অবদান। সবচেয়ে গুটিপূর্ণ হয়েছে সাজসজ্জা। উর্বশীকে ষে-সাজে প্রথম আবির্ভূত করানো হয়েছে, তা উর্বশী সম্বন্ধে হতাশারই সঞ্চার করে। উর্বশীর ভূমিকাভিনেত্রী রুবি মিত্র সুরূপা গৃহস্থ ঘরনী সাজতে পারেন, কিন্তু উর্বশীরূপে একেবারেই অচল। উর্বশীর অভিনয়ও হতাশাবাজক, তাঁর বাচন ঐ ভূমিকার অত্যন্ত অনুপযোগী। স্বগৃহস্থ দেবতাদের ষে-রূপসজ্জায় মণ্ডে আনা হয়েছে, তাও ফ্যান্টাসি-সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিরোধী।

তাদের মধ্যে তপন দাসের চিত্র সেনের ভূমিকাভিনয় দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। আর আনন্দ দিয়েছে ভূত্য শ্যামুর ভূমিকায় যতীন কর্মকারের অভিনয়। কুপার-রূপিনী হিমালী গাঙ্গুলী তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ সত্ত্বেও অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। অপরাপর ভূমিকার মধ্যে ভাস্করের ভূমিকায় তারক ধর ও গৌতমের ভূমিকায় পান্না চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

নাট্যকার সম্বন্ধে অন্তর্ধান :

গেল বছর ৫ই মার্চ বাঙলার সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এ-বছরের ২৪-এ মার্চ তাঁর বাৎসরিক কার্য উদ্‌যাপিত হয়েছে তাঁর পুত্রদের দ্বারা। ঐ দিনই সম্মান্য মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে নাট্যকার সম্বন্ধে কার্য-নির্বাহক সমিতির সভায় শচীন্দ্রনাথের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে প্রথম বছরের (১৯৬১ সালের) শচীন্দ্র নাট্যপুরস্কারটি ঘোষিত হয়। বর্তমান বাঙলার লক্ষ-প্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ডাক্তার নীহার গুপ্তের বদান্যতায় এই পুরস্কারটি এবারে পেলেন বাঙলার জীবিত নাট্যকারদের মধ্যে প্রবীণতম, বর্তমানে বারাগসী বাসী শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। যে ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাব প্রথম আই. এফ. এ, শীল্ড বিজয়ী হয়ে বাঙলার গৌরব বর্ধিত করে, সেই বছরই বাঙলা রঙ্গমণ্ডে বাজীমাং করে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত



এস ডি বনসালের 'অতল জলের আহ্বান' চিত্রে সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও রঞ্জনা ব্যানার্জি 'বাজীরাও'। আমরা এই প্রবীণ নাট্যকারের সম্মানে আনন্দিত। আমরা তাঁর অটুট স্বাস্থ্য ও সক্রিয় লেখনীসহ দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

মণ্ডমুখের বার্ষিক পুরস্কার :

১৯৬১ সালে রচিত বা প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে যে-নাটক প্রথম স্থান অধিকার করবে, তার নাট্যকারকে ১৯৬২ সালের ১০০০ টাকা পুরস্কার দেবার জন্যে মণ্ডমুখের কর্তৃপক্ষ নাট্যকার সংঘকে ভারাপণ করেছেন। কোন সূত্র অবলম্বন করলে বিচার সম্পর্কে একটি ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে আসা যায়, এ-সম্পর্কে মতামত দেবার জন্যে সংঘ কর্তৃপক্ষ নাট্যমোদী সুধীবন্দকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে লিখিত প্রস্তার ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে 'সম্পাদক, নাট্যকার সংঘ, ৩০২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯'—এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

মুখোশের উৎসব :

"অঘটন আজো ঘটে"র ১০০-রজনী "অতিক্রান্ত হওয়ার সাফল্যে "মুখোশ"—এর সভাবন্দ তাঁদের শ্রদ্ধানুধ্যায়ী অগণিত বন্ধুবান্ধবকে যে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন, তাতে উপস্থিত বার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। ঐ উৎসবমুখরিত সন্ধ্যায় আমরা সর্বান্তঃকরণে এই কামনা জানিয়েছিলুম যে, "মুখোশ"—এর দলগত সাফল্য যেন

বৎসরে বহুবার ঐ-ধরণের সন্ধ্যাকে ফিরে ফিরে আনতে সমর্থ হয়।

বর্মীশেল রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যাভিনয় :

গেল ২৩-এ মার্চ বিশ্বরূপা রং-মঞ্চে বর্মীশেল রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্য বিভাগ কর্তৃক বীর মুখোপাধ্যায় রচিত "সংক্রান্তি" নাটকটি সূচ্যাত্তর সঙ্গে অভিনীত হয়। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই নাটকটিতে যারা অত্যন্ত প্রশংসনীয় অভিনয় করেন, তাঁরা হচ্ছেন মলয় মুখোপাধ্যায় (রতন) এবং পরিচালক স্বয়ং (শুদ্ধ)। এ ছাড়া সূচ্যভিনয় করেছেন বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (চন্দ্রমাধব), বিনয় চট্টোপাধ্যায় (হর্ষ-নারায়ণ), প্রদীপ ঘোষ (সরারাম), জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় (রমাই), দুলাল দত্ত (চরণ), তারা ভাদুড়ী (নিস্তারিণী), মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় (সীতা) ও স্বপ্না মিত্র (দুর্গা)।

জর্জিয়ান নৃত্য সংকলন :

এ-হস্তার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ জর্জিয়ান নৃত্য সংকলন ২৯-এ মার্চ থেকে আরম্ভ হয়ে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিন প্রতি সন্ধ্যা সাতটার সময়ে নিজাম প্যালেসের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

সমাজের বিচারে একজন অভিশাপ, আর একজন পতিহারা বলেই দাসীর পর্যায়ভুক্ত—অবিচারক্রান্ত দুই বিদ্রোহীর গড়া শান্তিতীর্থ

মুভিটিক শ্রী: এম. উত্তমকুমার . অরুণকী

ছবি বিশ্বাস-রঞ্জনা-দিলীপ রাই-গীতালি রাই

শিউলিবাড়ি

সুখোঁষ ঘোষের 'নাগলতা' অবলম্বনে




চিন্নাট: তপন সিংহ
প্রযোজনা: গীতালি রাই
সঙ্গীত: অরুণকী মুখোপাধ্যায়
আলোকচিত্র: দীনেন গুপ্ত

পরিবেশনা: ব্রজ সিনেচার্স

দর্শকদের তৃপ্তি-উজ্জল
২য় সপ্তাহ

শ্রী - ইন্দিরা - প্রাচী

পদ্মশ্রী (যাদবপুর) - সূচিরা (বেহালা) - নবরূপম (হাওড়া) - অলকা (শিবপুর)
পারিজাত (শালিকিয়া) - উদয়ন (শেওড়াফুলি) - কৈরী (চুঁচুড়া) - নেত্র (দমদম)
জয়শ্রী (বরানগর) - কল্যাণী (নৈহাটি) - সন্ধ্যা (খড়দা) - শ্রীলক্ষ্মণী (কাঁচরাপাড়া)

খেলাধুলা

দশক

ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর

বার্বাদোজ : ৩৯৪ রান (কিং ৮৯, হল ৮৮, স্মিথ ৬১। প্রসন্ন ১৫৮ রাণে ৪ উইকেট)।

ভারতীয় একাদশ : ৮৬ রান (ইঞ্জিনিয়ার ৩৬ এবং জয়সীমা ৩৪; হল ৭ রাণে ২, সোবার্স ৮ রাণে ২ এবং গ্রিফিথ ৩০ রাণে ২ উইকেট। কন্ট্রোল্লর এবং মঞ্জরেকার তাঁদের নিজস্ব ২ রাণের মাধ্যমে গ্রিফিথের বলে আহত হয়ে প্রথম ইনিংসের খেলা থেকে বরাবরের মত অবসর গ্রহণ করেন।

ও ২১০ রান (মঞ্জরেকার ১০০, স্মিথ ৩১ ও নাদকাণী ৩১। কন্ট্রোল্লর, উমরীগড় এবং প্রসন্ন খেলায় অনূপস্থিত ছিলেন)।

বার্বাদোজ দলের বিপক্ষে চারদিনের খেলায় ভারতীয় একাদশ দলের অধিনায়ক কন্ট্রোল্লর টেসে হেরে যান—ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তাঁর এই প্রথম টেসের হার। সারা তুচ্ছ-তাক বিশ্वास রাখেন তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন এই টেসের হারই ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভের শুভসূচনা। সফরের প্রথম খেলা থেকেই ভারতীয় দল উপস্থাপিত ৬টা খেলায় টেসে জয়ী হয়েছিল কিন্তু কোন খেলায় জিততে পারেনি—ভারতবর্ষের হার ২ এবং খেলা ৬। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ভারতবর্ষ টেসে হেরে গিয়েও খেলায় জয়লাভ করতে পারেনি; উপরন্তু প্রথম ইনিংসের খেলায় কন্ট্রোল্লর গ্রিফিথের 'বাম্পার' বলে ঘায়ের হয়ে দারুণ দৃশ্চলিত্য ফেলে ছিলেন।

বার্বাদোজ দলের প্রথম ইনিংসের সূচনা ভাল না হলেও তারা প্রথম-দিকের ধাক্কা খুব সামলে নিরেছিল। দলের ১২০ রাণের মধ্যে ৪টে উইকেট পড়ে যায়—৩৯ রাণে ১ম, ৯৮ রাণে ২য়, ১১৮ রাণে ৩য় এবং ১২০ রাণের মাধ্যমে ৪র্থ উইকেট। এদের মধ্যে তিনজন খেলোয়াড় রান-আউট হন। দলের এই বিপর্যয়ের মধ্যে ৫ম উইকেটের জুটি সোবার্স এবং এ্যান্থনি কিং ৬৫ মিনিটের খেলায় দলের ৫৫ রাণ তুলে দেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে কিং এবং হোয়াইট খুব তাড়াতাড়ি রান

তুলেন—৪০ মিনিটে ৬৩ রাণ। এর পর প্রথম দিনের খেলায় ৬ উইকেট পড়ে বার্বাদোজ দলের ৩১৯ রাণ ওঠে। কিং (৮৭ রাণ) এবং ওয়েসলি হল (৪৬ রাণ) নট আউট থাকেন। ৭ম উইকেটের এই নট আউট জুটি এইদিন ৮১ রাণ তুলে দেন। এইদিনের খেলায় অনেকগুলি 'কাচ' মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খায়।

দ্বিতীয় দিনে লাগের আগেই বার্বাদোজ দলের প্রথম ইনিংস ৩৯৪ রাণে শেষ হয়। ভারতীয় দলের খারাপ ফিল্ডিংয়ের দরুণ অনেক বেশী রাণ ওঠে; ৩০০ রাণের মধ্যেই বার্বাদোজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'লে বলবার কিছু থাকতো না। দ্বিতীয় দিনে প্রসন্নের বলে ওয়েসলি হল দু'দবার মঞ্জরেকারের হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে শেষ পর্যন্ত ৮৮ রাণ করে আউট হন। প্রথম প্রণের ক্রিকেট খেলায় এই ৮৮ রাণই হলের পক্ষে সর্বোচ্চ রাণ। কিং এবং হলের ৭ম উইকেটের জুটিতে শেষ পর্যন্ত ৮৭ রাণ ওঠে।

লাগের কিছু আগে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দলের মাত্র ২ রাণের মাধ্যমে সারদেশাই এবং স্মিথ গোলা করে খেলা থেকে বিদায় নেন। এরপর গ্রিফিথের বাম্পার বলে আহত হয়ে কন্ট্রোল্লর এবং মঞ্জরেকার খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। গ্রিফিথ, হোয়াইট এবং রক-বিশেষ করে গ্রিফিথের বোলিং পদ্ধতি সম্পর্কে ভারতীয় দলের অভিযোগের যথেষ্ট কারণ ছিল। গ্রিফিথের বাম্পার বলে মঞ্জরেকার কপাল-জেরে সামান্য রক্ত আঘাত পেয়েছিলেন, কিন্তু কন্ট্রোল্লর গুরুতর রক্তের আঘাত পেয়ে খুব জোর বেঁচে গেছেন। এই অবস্থায় দলের খেলোয়াড়দের মনোবল ভেঙে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভারি পরিণতি দেখলাম—৮৬ রাণে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ, মাত্র আড়াই ঘণ্টার খেলায়। গ্রিফিথ, সোবার্স এবং হল দুটো করে উইকেট পান। মঞ্জরেকার এবং কন্ট্রোল্লর সেই যে খেলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন আর খেলতে নামেন নি। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে জয়সীমা এবং ইঞ্জিনিয়ার ৫৭ মিনিটের খেলায় দলের ৬১ রাণ তুলে দেন।

ভারতীয় দল ৩০৮ রাণের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ

করে। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতীয় দলের কন্ট্রোল্লর ছাড়া আরও দু'জন—উমরীগড় এবং প্রসন্ন অসুস্থতা এবং দুটো খাওয়ার দরুণ ব্যাট করতে নামেননি। দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের ২টো উইকেট পড়ে গিয়ে মাত্র ৫৬ রাণ ওঠে।

একদিন বিশ্রামের পর তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় দিনের ৫৬ রাণের সঙ্গে কোন রাণ যোগ হল না। এদিকে দু'জন খেলোয়াড়—সারদেশাই এবং পতোদির নবাব আউট হলেন, গ্রিফিথের একই ওভারের বলে। লাগের সময় স্কোর দাঁড়ায় ১২১ রাণ, ৪ উইকেট পড়ে। উইকেটে নট আউট ছিলেন মঞ্জরেকার (৩৫ রাণ) এবং নাদকাণী (২৯ রাণ)। ৫ম উইকেটে এই জুটি ৮০ মিনিটের খেলায় দলের ৬৫ রাণ তুলে দিয়ে লাগের সময় নট আউট থাকেন। দলের ১৩৬ রাণের মাধ্যমে নাদকাণী ৩১ রাণ করে আউট হলে মঞ্জরেকার এবং নাদকাণী ৫ম উইকেটের জুটি ভেঙে যায়। ৫ম উইকেটের জুটিতে ৯৫ মিনিটের খেলায় দলের ৮০ রাণ ওঠে। ৬ষ্ঠ উইকেট ১৬৩ এবং ৭ম উইকেট দলের ২১৩ রাণের মাধ্যমে পড়ে যায়। ৭ম উইকেটে মঞ্জরেকারের সঙ্গে জুটি বাঁধেন রজনী। রজনী আশ ঘণ্টা উইকেট কামড়ে থেকে মাত্র পাঁচ রাণ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর এই খেলার দরুণই মঞ্জরেকার শত রাণ পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৭ম উইকেটের জুটিতে দলের ৫০ রাণ ওঠে। রজনীর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। মঞ্জরেকার শত রাণ করে নট-আউট থাকেন। ভারতীয় দলকে এক ইনিংস এবং ৯৫ রাণে হার স্বীকার করতে হয়। দুই দলই হাফ ছেড়ে বাঁচে।

এই খেলাটির প্রতি ভারতীয় দলের কোন আকর্ষণ ছিল না। দলের অধিনায়ক গুরুতরভাবে আহত এবং তাঁর উদ্বেগজনক অবস্থায় সমস্ত দলটি মুষড়ে পড়ে। খেলার আইন অনুযায়ী দায়ে পড়েই তাদের বাকি খেলাতে যোগ দিতে হয়েছিল।

৥ বাম্পার প্রসঙ্গ ॥

বার্বাদোজ দলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসের খেলায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কন্ট্রোল্লর গ্রিফিথের বাম্পার বলে গুরুতরভাবে জখম হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন। এই আঘাতের জেরে অনেকদূর গড়িয়েছিল। আঘাতের ফলে কন্ট্রোল্লরের দেহের বাম-দিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। প্রাণরক্ষার জন্যে শেষ পর্যন্ত তাঁর মাথায় দুটি জটিল অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি এবং

সম্পাদক-বিশ্বের খেলোয়াড় এবং ক্রীড়া-মোদীদের অনুরোধ জানিয়ে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁদের অনুরোধ ছিল—কম্প্রাইজের আশা আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে দ্বন্দ্বের কাছে প্রার্থনা করা। এই থেকেই অবস্থার গুরুত্ব অনুমান করা যায়।

বাম্পার বলে : কম্প্রাইজের গুরুত্বের জন্ম উপলক্ষ্য করে ইতিমধ্যে বিলেতে বাম্পার-বল অর্ধে হিসাবে ঘোষণার জন্য আলোচন-আরম্ভ হয়েছে। লন্ডন ক্রিকেট সোসাইটির সভাপতি ডঃ ডবলউ আর ককসার্ট এই আলোচন-প্রধান উদ্যোগী। বাম্পার বলে : কম্প্রাইজ-এবং মজুরের আহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে তিনি এম-সি-সি কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন, বাম্পার বল সম্পর্কে আশা ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, বাম্পার বল দিয়ে ব্যাটসম্যানকে ভীত করা অথবা আঘাত করা ছাড়া বোলারের আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই। ক্রিকেট খেলার স্বার্থে বাম্পার এই দিক থেকে খুবই ক্ষতিকর। তাই তাঁর প্রস্তাব, আম্পায়ারের বিচারে বাম্পার বল ধার্য হলে বোলারের বিপক্ষে দলকে প্রতি বাম্পার বলে ৬ রান করে খেসারত দেওয়ার ব্যবস্থা রাখলে ব্যাটসম্যানের আহত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। ডঃ ককসার্টের এই প্রস্তাব কার্য-করী হলে ব্যাটসম্যানদের আর বাম্পার বাপ ডাক ছাড়তে হবে না। বাম্পার বল ঐ ডাকেই মাঠ-ছাড়া হবে। বাম্পার বলের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন ব্রুটেনের প্রখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক পিটার উইলসন। তাঁর মতে, বাম্পার বলে আহত হওয়ার পর আহত খেলোয়াড়ের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করার প্রথা ভঙ্গ্যমি ছাড়া আর কিছু নয়।

ইংল্যান্ডের ভূতপূর্ব টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং খেলোয়াড়-নির্বাচক সমিতির সভ্য সিরিল ওয়াসব্রুক বাম্পার বলের পক্ষ নিয়ে বলেছেন, ফাস্ট বোলারের প্রধান অস্ত্রই হ'ল এই বাম্পার বল। বাম্পার বল ব্যাটসম্যানকে আতঙ্কিত করে এ কথা ওয়াসব্রুক বিশ্বাস করতে রাজী হননি। তাঁর মতে বাম্পার বল দেওয়ার অর্থ অন্য কিছু নয়, হুক করে 'চার' অথবা 'ছয়' রান করার জন্যে ব্যাটসম্যানের প্রতি বোলারের চ্যালেঞ্জ।

ক্রিকেট খেলার পদ্ধতির ইতিহাসে দেখা যায়, বোলাররা যেমন একাদিকে নতুন নতুন অস্ত্রে ব্যাটসম্যানদের আক্রমণ করার উপায় উদ্ভাবন করেছেন অন্যদিকে ব্যাটসম্যানরাও তেমনি বোলারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার উপায়ও মাথা খেলিয়ে বের করেছেন। কিন্তু বাম্পার বল সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। এই বলের মুখে পড়ে অনেক প্রখ্যাত ব্যাটসম্যানকে শারীরিক আঘাত পেতে হয়েছে। খেলায়

আকস্মিক আঘাতের উপর কারও হাত নেই। কিন্তু বাম্পার বলের আঘাত আকস্মিক ঘটনা নয়। খেলোয়াড়দের এই আঘাত থেকে রক্ষা করা অসম্ভব কাজ নয়।

॥ জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ॥

জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত তিন বছরের বিজয়ী বোম্বাই দল এক ইনিংস ও ২৮৭ রানে গত বছরের রানার্স-আপ রাজস্থানকে পরাজিত করে উপযুক্ত চারবার রিজ ট্রফি জয়লাভ করেছে। এই নিয়ে বোম্বাই ১৩ বার রিজ ট্রফি জয়লাভ করলো। আলোচ্য ফাইনাল খেলা নির্দিষ্ট পাঁচদিন পর্যন্ত গড়ারনি। চতুর্থ দিনের লাগের পরবর্তী ৪৫ মিনিটের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিশ্চয়ি হয়ে যায়। বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস ৫৩৯ রানে শেষ হয় ৫০০ মিনিটের খেলায়। রাজস্থানের দুটো ইনিংস ২৯৮ মিনিট স্থায়ী ছিল, প্রথম ইনিংস ১৮৫ মিনিট এবং দ্বিতীয় ইনিংস ১১৩ মিনিট। বোম্বাই দলের ৫৩৯ রানের মধ্যে অর্ধেকের বেশী রান তুলে দেন অজিত ওয়াদেকার (২৩৫ রান) এবং গুলাবরাই রামচাঁদ (১০০ রান)। এই দুজনের পঞ্চম উইকেটের জুটিতে দলের ২৬৩ রান উঠে যায়। রাজস্থান দলের প্রথম ইনিংসে বোম্বাই দলের পক্ষে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন বালু গুপ্তে (৩৫ রানে ৪ উইকেট) এবং সরদ দিওয়াদকার (৬৮ রানে ৫ উইকেট)। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় পাই, রামচাঁদ, গুপ্তে এবং দিওয়াদকার—প্রত্যেকেই দুটো করে উইকেট পান। দুটো ইনিংসের খেলায় বালু গুপ্তে ৬১ রানে ৬টা উইকেট পান। অপরদিকে দিওয়াদকার পান ৭টা উইকেট ৮৭ রানে।

বোম্বাই : ৫৩৯ রান (অজিত ওয়াদেকার ২৩৫, জি এস রামচাঁদ ১০০ এবং সরদ দিওয়াদকার ৪৪)

রাজস্থান : ১৫৭ রান (সুর্ঘবীর সিং ৩২, বালু গুপ্তে ৩৫ রানে ৪ এবং সরদ দিওয়াদকার ৬৮ রানে ৫ উইকেট) ও ৯৫ রান (সি জি যোশী ৪৮, পাই ৩১ রানে ২, রামচাঁদ ১৬ রানে ২, গুপ্তে ২৬ রানে ২ এবং দিওয়াদকার ১৯ রানে ২ উইকেট)।

রিজ ট্রফির খেলায় বিশ্ব রেকর্ড

রিজ ট্রফির খেলায় অনর্ধিত নিন্দ-লিখিত রেকর্ডগুলি আজও পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর খেলায় বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে অক্ষুণ্ণ আছে।

একটি খেলায় সমষ্টিগত সর্বাধিক রানের রেকর্ড : ২৩৭৬ (৩৮ উইকেট)—বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র, পুণা, ১৯৪৮।

পার্টনারশিপ রেকর্ড : ৫৭৭ রান (৪র্থ উইকেটের জুটিতে)—ভি এস হাজারে এবং গুল মহম্মদ, হোলকার দলের বিপক্ষে, বরোদা, ১৯৪৬-৪৭।

এই ৫৭৭ রান যে কোন উইকেটের জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড।

৪৫৫ রান (২য় উইকেটের জুটিতে)—বি বি নিম্বলকার এবং কে ভি ভান্ডারকার (মহারাষ্ট্র), কাথিয়াড় দলের বিপক্ষে, পুণা, ১৯৪৮-৪৯।

এক ইনিংসের খেলায় দলগত সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৬টি—হোলকার; মহাশূর দলের বিপক্ষে, ১৯৪৫-৪৬।

একটি খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৯টি—বোম্বাই (৫) বনাম মহারাষ্ট্র (৪), ১৯৪৮-৪৯।

॥ জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ॥

ভূপালের আইসবাগ স্টেডিয়ামে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালের (১৯৬২) দ্বিতীয় দিনে গত বছরের রানার্স-আপ পাঞ্জাব দল ১—০ গোলে ভূপাল দলকে পরাজিত করে রণধ্বামী কাপ জয়লাভ করেছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্যভাবে অসমীয়াসিত ছিল। গত বছরও ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে পাঞ্জাব গোলশূন্যভাবে রেলওয়ে দলের সঙ্গে খেলা জু করেছিল কিন্তু দ্বিতীয় দিনে ০—১ গোলে পরাজিত হয়েছিল। এই নিয়ে পাঞ্জাব ৮ বার ফাইনালে জয়লাভ করলো (১৯৩২, ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৯-৫১, ১৯৫৪, ১৯৬২)। প্রতিযোগিতার রানার্স-আপ হয়েছে ৫ বার। অপরদিকে ভূপাল দল ফাইনালে জয়ী হয়েছে ২ বার (১৯৪৫ ও ১৯৪৮) এবং রানার্স-আপ হয়েছে ২ বার।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতার ভূপাল প্রথম রাউন্ড থেকেই খেলে ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকে পাঞ্জাব দল খেলেছিল কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে। ভূপাল এ বছরের রানার্স-আপ হিসাবে মানাভাদার কাপ পেয়েছে।

এবারের প্রতিযোগিতায় ২৩টি দল যোগদান করে। শেষ সময়ে মহাশূর প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে। সরাসরি কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলেছিল চারটি দল—বোম্বাই, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ (গতবারের বিজয়ী), সার্ভিসেস এবং পাঞ্জাব (গতবারের রানার্স-আপ)। কোয়ার্টার-ফাইনালে ভূপাল ১—০ গোলে বোম্বাইকে, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ৩—০ গোলে মহাকোশলকে, সার্ভিসেস ২—০ গোলে দিল্লীকে এবং পাঞ্জাব ১—০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনাল

পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। বাংলার প্রথম খেলা পড়েছিল দিল্লীর সঙ্গে ৪র্থ রাউন্ডে। দিল্লী ১—০ গোলে বাংলাকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে ০—২ গোলে সার্ভিসেস দলের কাছে পরাজিত হয়। এবার প্রতিযোগিতায় মাত্র একটা হ্যাট-ট্রিক হয়েছে। মহাকোশল দলের কাশীপ্রসাদ ৪র্থ রাউন্ডে উত্তর প্রদেশের বিপক্ষে এই হ্যাট-ট্রিক করেন।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথমার্ধ

প্রথম রাউন্ড : ভূপাল ৩ : উড়িষ্যা ০ :

মহাকোশল ৫ : আসাম ১

দ্বিতীয় রাউন্ড : মহাকোশল ১, ৪ :

রাজস্থান ১, ০ :

তৃতীয় রাউন্ড : ভূপাল ৪ : পাতিয়ালা ০ :

মহাকোশল ৪ : মহারাষ্ট্র ০

চতুর্থ রাউন্ড : ভূপাল (ওরাকুডার) :

মহীশূর; মহাকোশল ৩ : উত্তর-

প্রদেশ ১

কোয়ার্টার-ফাইনাল : ভূপাল ১ :

বোম্বাই ০; ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ৩ :

মহাকোশল ০

সেমি-ফাইনাল : ভূপাল ০, ১ :

ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ০, ০

দ্বিতীয়ার্ধ

প্রথম রাউন্ড : বিহার ৩ : কেরালা ০ :

মধ্যভারত ২ : অন্ধ্র ১

দ্বিতীয় রাউন্ড : দিল্লী ৪ : বিহার ২ :

বিদর্ভ ০, ১ : মধ্যভারত ০, ০

তৃতীয় রাউন্ড : দিল্লী ৩ : হামদাবাদ ০ :

বিদর্ভ ০, ০ ২ : গুজরাত ০, ০, ১

চতুর্থ রাউন্ড : দিল্লী ১ : বাংলা ০ :

মাদ্রাজ ২ : বিদর্ভ ০

কোয়ার্টার-ফাইনাল : সার্ভিসেস ২ :

দিল্লী ০; পাঞ্জাব ১ : মাদ্রাজ ০

সেমি-ফাইনাল : পাঞ্জাব ১, ৪ :

সার্ভিসেস ১, ১

ফাইনাল

পাঞ্জাব ০, ১ : ভূপাল ০, ০

॥ চতুর্থ এশিয়ান গেমস ॥

আগামী আগস্ট মাসে জাকার্তায় চতুর্থ এশিয়ান গেমস আরম্ভ হবে। এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগ্য ভারতীয় ক্রীড়াবিদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে 'যোগ্যতার নূন্যতম মান' নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই মান বিশ্ব অলিম্পিক মানের তুলনায় অনেক নীচু স্তরের। ভারতীয় অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভাপতি রাজা বালিন্দর সিং ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের যোগ্যতার এই নূন্যতম মাপকাঠি সম্পর্কে বলেছেন, বিগত টোক্রিও ক্রীড়ানুষ্ঠানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্রীড়া-কুশলতা এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির বর্তমান ক্রীড়া-মানের উপর লক্ষ্য রেখে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের জন্য

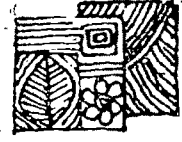
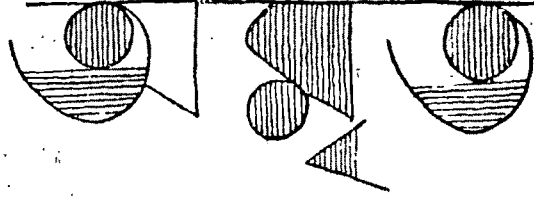
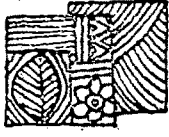
এই নূন্যতম মান নির্ধারিত হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন, ভারতবর্ষের পক্ষে এই নির্ধারিত ক্রীড়ামান কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই উচ্চ স্তরের।

ইতিমধ্যে ৪৪ জন ক্রীড়াবিদকে (৩৫ জন পুরুষ এবং ৯ জন মহিলা) বাংগালোরের শিক্ষণ-শিবিরে মহড়া দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ৩৫ জন পুরুষ এ্যাথলিটের মধ্যে বাংলার কোন প্রতিনিধি স্থান পাননি। আমন্ত্রিত ৯ জন মহিলার মধ্যে বাংলার হকিন্স (১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়) এবং রাউটন (হাইজাম্প) আছেন। এই ৪৪ জন এ্যাথলিটের থেকে চূড়ান্তভাবে ভারতীয় দল গঠন করা হবে।

যোগ্যতার মান

বিষয়	পুরুষ	মহিলা
৮০ মিঃ হার্ডলস	—	১১-৬ সেঃ
১০০ মিঃ দৌড়	১০-৭ সেঃ	১২-৩ সেঃ
২০০ মিঃ দৌড়	২১-৫ সেঃ	২৬-১ সেঃ
৪০০ মিঃ দৌড়	৪৮-৫ সেঃ	
৮০০ মিঃ দৌড়	১ মিঃ ৫২-২ সেঃ	
১,৫০০ মিঃ	৩ মিঃ ৫৮-২ সেঃ	
৫,০০০ মিঃ	১৪ মিঃ ৪১ সেঃ	
১০,০০০ মিঃ	৩০ মিঃ ৪২ সেঃ	
৩০০০ মিঃ স্টিপলচেজ	৯ মিঃ ৩-৯ সেঃ	
১১০ মিঃ হার্ডলস	১৪-৫ সেঃ	
৪০০ মিঃ হার্ডলস	৫২-৮ সেঃ	
৪×১০০ মিঃ রিলে	৪১-৪ সেঃ	৪৯-০ সেঃ
৪×৪০০ মিঃ রিলে	৩ মিঃ ১৮-০ সেঃ	
ম্যারথন দৌড়	২ ঘঃ ২৭ মিঃ ২২ সেঃ	
হাই জাম্প	৬ ফুঃ ৬ ইঃ	৫ ফুঃ ১ ইঃ
লং জাম্প	২৪ ফুঃ ৬ ইঃ	১৮ ফুঃ ৮ ইঃ
হপস্টেপ ও জাম্প	৫০ ফুঃ ৬ ইঃ	
পোল ভল্ট	১৩ ফুঃ ৯ ইঃ	
শটপুট	৪৯ ফুঃ ৩ ইঃ	৪২ ফুঃ ১০ ইঃ
ডিস্কাস নিক্ষেপ	১৫০ ফুঃ ১১ ইঃ	১৪০ ফুঃ ৯ ইঃ
বর্শা নিক্ষেপ	২৩৩ ফুঃ ৩ ইঃ	১৫১ ফুঃ ১ ইঃ
হাতুড়ি নিক্ষেপ	১৯৭ ফুঃ ০ ইঃ	
ডেকাথলন	৫,৯৬৮ পয়েন্ট	

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে গ্রীস-প্রিয় সরকার কর্তৃক পটিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।



১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৮শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৩শে চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 6th April 1962.
40 Naya Paise.

সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার-বিতরণ সভায় উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন সমবেত সর্বভারতীয় সাহিত্যিকদের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে প্রাণধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, যে-সব অভিশাপে সমাজ-জীবন জর্জরিত, সেগুলি দূর করে এক সমাধিক সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্যে সাহিত্যিকগণ যেন মানুষের মনকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভূত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বর্তমান কালের ভীতি, বিদ্বেষ ও বিভেদমূলক মনোভাবের কথা উল্লেখ করে জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিক ঐক্যসাধনের পথে সাহিত্যের বিশেষ কার্যকারিতার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আমরা সকলেই জানি যে, এ যুগটা হল বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির যুগ, এবং একালে শিল্প-সাহিত্য কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। পারমাণবিক শক্তি এবং রকেট-বিদ্যার প্রসাদে মানুষ আজ একদিকে যেমন সমস্ত পৃথিবীকে করতলস্থিত আমলকারী মতো আয়ত্ত করে, মহাকাশ-বিজয়ে উদাত, অন্যদিকে তেমন এক সর্বনাশা বিচ্ছিন্নতা-বোধ তার সৃষ্টি-প্রতিভাকে সঙ্কুচিত করে ব্যক্তিগত খেলা-খুঁশির সঙ্কীর্ণ বৃত্তে আবদ্ধ করতে চাইছে। শিল্প-সাহিত্য ব্যক্তি-মানুষের সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-ব্যক্তি বনবাসী নয়, সমাজবাসী। সমাজের সঙ্গে নাড়ির যোগ ছিন্ন করে কোনো সাহিত্যই দীর্ঘদিন জীবিত থাকতে পারে না, এবং সেই জন্যেই একাকীত্বের সাধনায় প্রাথমিক কিছু বিভূতি লাভ করলেও এ যুগের সাহিত্যকর্মে ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। তাই সমগ্র মানবসমাজই আজ এক নিদারুণ স্ববিরোধিতার সম্মুখীন—তার একদিকে ভবিষ্যৎ জয়ের বিপুল সম্ভাবনা, অন্যদিকে গভীর হতাশার ঘূর্ণাবর্ত।

এই আপাত বৈষম্যকে অতিক্রম করতে না পারলে আমাদের অগ্রগতির সাধনা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ঠিকই বলেছেন, সকলের আগে দরকার মানুষের মনকে সুসংস্কৃত করে তোলা। বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কার মানুষকে যতোই শক্তিশালী করুক, তার মানবিক মূল্যবোধগুলি যদি ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যায়, তবে মানুষ এবং উচ্চতম পর্যায়ের ইলেকট্রনিক মস্তিস্কের

মধ্যে বোধ হয় কোনো পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু অসাধ্য-সাধনকারী একটি নিখুঁত যন্ত্র হওয়াই মানুষের পরম চরিতার্থতা নয়। তার মহত্তম গৌরব এই যে, সে যন্ত্র নয়, যন্ত্রের আবিষ্কারক ও স্রষ্টা, এবং তার যন্ত্র-সাধনার একাগ্র লক্ষ্যই হল মানবসমাজের উন্নতিবিধান।

বৈজ্ঞানিকগণ এ-যুগের ঋষিতুল্য ব্যক্তি, তাঁদের জ্ঞানসাধনায় আমরা গৌরবান্বিত। কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিককেও এই বিরাট কর্মক্ষেত্রে হাত মिलाতে হবে। মানব-মনের যে দুজ্জ্বল অংশে সৌন্দর্যনির্ভূত ও প্রেম-প্রীতির রসলোক অবস্থিত, তারই আনন্দধারায় মানুষের চিত্তকে মালিন্যমুক্ত করে দিতে হবে তাঁদের। এ-যুগের ব্যথিত মানবাত্মা সেই শূদ্রশ্রমি দাবি করে তাঁদের কাছে।

বিশেষ করে আমাদের মতো একটি সদ্যস্বাধীনতা-প্রাপ্ত, গঠনশীল দেশে যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সামাজিক মনোভাবের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি তাতে সন্দেহ নেই। সামাজিক উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থিত, এবং অনতিদূর অতীতে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির মিল অতি সামান্যই। দেশের সঙ্গে প্রকৃত যোগাযোগের অভাবে এবং পৃথিবীতে বিদ্যা ও ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতার প্রভাবে কেউ যদি ইয়োরোপীয় সমাজমানসের সমস্যাকে আমাদের সমস্যা বলে

সাহিত্য-রূপায়িত করেন, তবে সে সাহিত্য কালক্রমে মূল-মূল্যহীন এবং অসার হ'তে বাধ্য। অন্যপক্ষে, কেউ যদি মনে করেন পূর্বাব্দদের আচারিত শিল্পমধ্যম ও বস্তুর পৌনঃপুনিক উপস্থাপনার জোরেই তাঁরা বর্তমান কালের পাঠকেও অভিভূত করতে পারবেন তবে তাঁরাও দ্রাবিড়-বিলাসের বিপাকে পড়বেন।

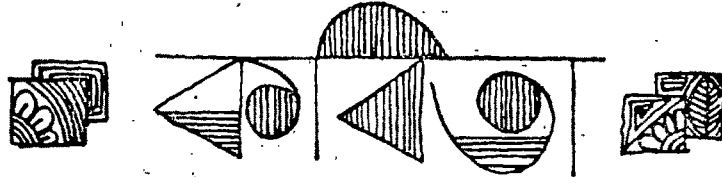
আসল কথা হল, বর্তমান সমাজজীবনের গভীরে একান্ত হ'য়ে তার সমস্ত যন্ত্রণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করা, এবং সেই পথে দেশের মানুষকে তাদের মানবিক মহত্ত্বের বিষয়ে সচেতন করে তোলা। সেই নবজাগরণের মহান রত্নের বিষয়েই অবহিত হতে বলেছেন ডক্টর রাধাকৃষ্ণন। আশা করি আমাদের সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হবেন।

আগামী সংখ্যা থেকে প্রথিতযশা
কথাসিল্পী

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন
ধরণে লিখিত আকর্ষণীয় উপন্যাস

মেঘের উপর প্রাসাদ

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।



পদাবলী

দক্ষিণারঞ্জন বসু

মধ্যরাত্রি গত। সবেমাত্র শেষট্রাম
দৃষ্টির সীমান্ত পার দূরন্ত গতিতে।
গর্বোন্মত্ত মনুমেন্ট ময়দানে সদাব্যস্ত
মৃক অভিনয়ে। ন্যায়াধীশ মহামায়া
ধর্মাদিকরণ আর অদূরে প্রবহমানা
গংগা পূণ্যতোয়া। পাপীরা নিভয়।

একরাশ অন্ধকার মূড়ি দিয়ে ক্লান্ত আমি
ঘুমন্ত যখন, তখনো ক্যালকাটা ক্লাবে
ঠুন ঠুন ঠোকাঠুর্কি গ্লাসে। হঠাৎ পি-জিতে
ভয়ংকর রোগী কোনো যন্ত্রণায় হাঁক ছাড়ে—
জীবনের সমাপ্তি হুংকার। পাশাপাশি
হাসিকানা সম্ভোগের বেদনার বিচিত্র
সংসার! কে জানে কী কান্ড চলে এত রাতে
আলিপদুর চিড়িয়াখানায়?

আত্মশুদ্ধি আত্ম-তিরস্কারে। শতাব্দীর
শরাঘাতে সে নীতি বাতিল। স্মৃতির চুমোয়
সুখ আশ্চর্য অপার। মৃগ্য করে অতীতের
স্নিগ্ধ পদাবলী। উদ্ভ্রান্ত আমারে তাই
শূনি বারে বারে ডাকে যেন পশ্মা-ধলেশ্বরী।
বর্তমান প্রত্যক্ষত জ্ঞাত। ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষার
সারাংশ নির্যাস—সবার হৃদয় হোক
আনন্দের প্রশান্ত সাগর।

*
* *

পশ্চাৎপট

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

জানি অন্যতম দিন চলে গেছে। আমার শৈশবে—
মনে পড়ে জলাশয়, নিবঁচন বৈশাখের মেঘ,
ছায়া...পাহাড়ে মন্দির; দূরের স্টীমারে যেন কবে
সফেন নদীর লাল খুলেছিলাম বৃক্ষরেখা...দৃশ্যের আবেগ।

পুরানো মালার নৌকা, নৌকা ঢেউ, নদী জলমালা
ঘূমের ভিতরে যায়, জাগরণে যায় উড়োপাখি...
কোথা যাবো ও আমার নৌকা...নদী...যামিনীর জ্বালা!

শোভিত রৌদ্রের মধ্যে জেগে আছি পীত পুষ্পে বিরত জোনাকি।

দুঃসংস্থা

ডেমনি

আমি বাঙালী। এই দেশের বাতাসে আমি প্রথম নিশ্বাস গ্রহণ করেছি। এর অল্পজলে পুষ্ট হয়েছি আমার দেহ, এর ভাষা ও সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছি আমার মন। এদেশে জন্মলাভ করে আমি ধন্য।

এবং কেবল বাঙালী নয়, আমি হিন্দু। যে উদার বিশ্ববোধের ফলে হিন্দুধর্ম যুগে যুগে নানা বিপরীত ভাবধারাকে নিজের মধ্যে সংহত করে ধর্মের সংহিতা-শাসিত গান্ধি ছাড়াই জীবনচর্যার এক মহত্তম উপায় হয়ে উঠেছে, আমিও তার অংশীদার। এজন্যে আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু সেইসঙ্গেই আমি অনুভব করি, এই মহান জীবন-যাপন-পদ্ধতি প্রবহমান রাখতে হলে আমাদেরও কিছু করণীয় আছে। অতীতে যেমন বহু পরাক্রান্ত সমস্যাকে সাহসের সঙ্গে আয়ত্ত করে নিয়ত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এ ধর্ম তার জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছে, বর্তমানেও তেমনি ছোটবড় সমস্ত সমস্যাকে অতিক্রম করেই আমাদের এগোতে হবে।

কিন্তু আমি ধর্মসংস্কারক নই। একজন সাধারণ-শিক্ষিত বাঙালী ধর্ম-সম্বন্ধে যতোটুকু বোঝেন আমি তার চেয়ে একবর্ণও বেশী বুঝিনে। কাজেই, ধর্ম কী এবং কী নয়, সে সব উচ্চ-বিতর্কে আমি একান্তই অনধিকারী।

তবু আমার মতো মানুষেরও সমস্যা আছে। এবং আমি অনুমান করি, এ সমস্যা আমাদের অনেকেই। ধর্মের সাধনতত্ত্বের দিকটা গোপন ও ব্যক্তিগত। কিন্তু তার একটা আচরণগত দিক আছে। সেটা প্রকাশ্য। আমরা সমাজের শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই এই আচরণগত দিকের সঙ্গে সংপৃক্ত। এ সব ব্যাপার আমরা আলোচনা করলে তাকে অর্নধিকার চর্চা বলা যায় না। বরং, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ এ সব ব্যাপার চিরকালই আলোচনা করেছে এবং নিয়ত আলোচনার ভিতর দিয়ে তাকে রূপান্তরিত করেছে, এইটে বলাই বোধ-হয় যুক্তিসঙ্গত। সেই নজর, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমিও একটি বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই। আমার

বা ক-সা হি ভোর ব ই

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

রবীন্দ্রায়ণ

মজবুত কাপড়ে বাঁধাই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রতি খণ্ডের দাম দশ টাকা

অযাত্রায় জয়যাত্রা ॥ নিষ্ঠূতিভূষণ মৃধোপাধ্যায় ৪.০০

অযাত্রাকে হ্রস্বেপ না করে পাঞ্জিকা-নিষিদ্ধ তারিখে দুরান্তরে পা বাড়িয়েছেন লেখক। বাধা-বিঘ্নসংকুল পথ ও পথপ্রান্তের নয়নাভিরাম দৃশ্য, নানা অত্যাশ্চর্য ঘটনা, নানা নর-নারীর কৌতুহলী সংস্পর্শ থেকে একটি সজীব ও সংস্কারমুগ্ধ মন জয়যাত্রার অমিত আনন্দ আহরণ করেছে শেষ পর্যন্ত। 'অযাত্রায় জয়যাত্রা' অনিন্দ্য রচনাভঙ্গিতে, অনির্বচনীয় রস-ব্যঞ্জনায় প্রবীণ কথাসিল্পীর স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি।

সাংস্কৃতিকী ॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫.৫০

বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিকের সংস্কৃতিমূলক নিবন্ধ-সংগ্রহ। 'সাংস্কৃতিকী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ বিষয়ের মূল্যবান আলোচনায় সুনীতিকুমারের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার বহুমুখিতা প্রকাশ পেয়েছে।

স্মৃতিচিহ্ন সমাচার ॥ বিনয় ঘোষ ১২.০০

উইলিয়াম হিকি, ফ্যানি পার্কস, এলিজা ফে প্রভৃতির অতুলনীয় স্মৃতিকথা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত এ-যুগের বাংলার গোড়াপত্তনকালের পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনবদ্য আলোক। অসংখ্য দৃশ্যপ্রাপ্য আর্ট লেট-সম্বলিত সুবহু গ্রন্থ।

হসন্তী ॥ শরদীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪.৫০

ওস্তাদ কথাসিল্পীর বর্ণাঢ্য ও হাস্যরসোজ্জ্বল কাহিনীসমষ্টি। কী ঘটনাবিন্যাসে, কী পাঠ-পাত্রীসমূহের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণে, কী রস-ব্যঞ্জনায় 'হসন্তী'র কাহিনীগুণি পাঠকচিত্তকে যুগপৎ আবিষ্ট ও উদ্বেল করে।

নৈমিষারণ্য ॥ বিকর্ণ ৯.৫০

বিকর্ণ ছদ্মনামের সংবেদনশীল কথাসিল্পী হাজার হাজার উদ্ভাস্তুর জীবন-সংগ্রামের বাস্তব ও বলিষ্ঠ চিত্র একেছেন এই সুবহু উপন্যাসে। পাঁচ শতাব্দিক পুঁথির সম্পূর্ণ নৈমিষারণ্য কলির নব-রামায়ণ, নতুন জীবন-সাধনার নতুন উপনিবেশ রচনার কালজয়ী ইতিকথা।

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জরাসন্ধের

নিশিগম্ম (উপন্যাস) ৪.০০ **আশ্রয় (উপন্যাস) ৩.৫০**

(দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে) (দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে)

শংকর-এর জনপ্রিয়তম বই আশুতোষ মৃধোপাধ্যায়ের

এক দুই তিন (৪র্থ মত) ৪.০০ **অগ্নিমিতা (উপন্যাস) ৫.০০**

বিমল মিত্রের সুবোধ ঘোষের

স্বপ্নী (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৪.০০ **চিত্তচকোর (দ্বিতীয় মুদ্রণ)**

সমরেশ বসুর ৩.০০

জোয়ার ভাটা ৩.০০ রমাপদ চৌধুরীর

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর **চন্দন কুঁকুম ২.৫০**

আরও আলো (উপন্যাস) নারায়ণ সান্যালের

৫.০০ **অন্তলীনা (উপন্যাস) ৫.০০**

বাক-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

পাঠকবর্গের কাছ থেকে আমি উদারতা প্রার্থনা করি।

আমার বিষয়বস্তু, বল হরি... হরিবোল!



চমকে ওঠবার কারণ নেই। আমি মোটেই রসিকতা করছি, আমার বস্তু অত্যন্ত গুরুতর।

মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় ঐ মিলিতকণ্ঠে উচ্চারিত হরি-ধ্বনি আমরা সকলেই শুনছি। এবং

মৃতদেহের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেছি। চারিদিকের চলমান জীবনযাত্রার মধ্য থেকে একটি মানুষ চিরকালের জন্যে চলে গেল, এতে কার না দঃখ হয়! কিন্তু সেইটুকুই কি সব? না, আমি তা বলতে পারব না। সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ঐ উচ্চারিত হরি-ধ্বনির ফলে আমি যতো না অনুভব করেছি সদ্যমৃত ব্যক্তিটির জন্যে বেদনা, তার চেয়েও বেশী উপলব্ধি করেছি নিজের মৃত্যুর বিষয়ে আতঙ্ক।

বাস্তবিক, 'জন্মিলে মরিতে হবে' এ সত্য আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আমাদের আজীবন প্রচেষ্টা হল সেই কঠোর সত্যটাকে ভুলে থাকা। আমাদের জীবিকা-নির্বাহের সহস্ররকম উদ্যোগ-আয়োজন থেকে শত্রু করে শিষ্য-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচার পসরা সবই জীবনের দিকে চালিত, জীবনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। মৃত্যুর সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রাখাই আমাদের আজন্মলালিত আকাঙ্ক্ষা। এর মধ্যে আচম্কা হরিধ্বনি শুনলে বৃদ্ধের মধ্যে একবার ধক করে ওঠে বইকি!

বরং একটু বেশীই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়, শব্দটা যদি শোনা যায় গভীর

রাতে। এবং আপনি থাকেন একা। অপরিচিত মৃত ব্যক্তিটি তখন আর ঠিক যেন অপরিচিত থাকেন না। সুপরিচিত লক্ষণগুলির মধ্যে তাঁর বিদেহী আত্মা যেন অবয়ব লাভ করতে থাকেন। এবং যাকে জীবনে হয়তো কখনো দেখেননি, জীবদ্দশায় যিনি হয়তো ছিলেন অত্যন্তই একজন মানবহিতৈষী ব্যক্তি, তিনিই কিছুকালের জন্যে মানবহীন হিসাবে রূপায়িত হতে থাকেন আপনার মনের মধ্যে। যাঁরা সোৎসাহে হরিধ্বনি দিতে দিতে চলে যান, মৃত ব্যক্তির সেই সব আত্মীয়বন্ধ একথা অনুমানও করতে পারেন না। পারলে নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হতেন। এবং শোকপ্রকাশ বা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করার অন্য উপায়ের কথা ভাবতেন।

কিন্তু এই ভয়াবহতাকে বাদ দিলেও ব্যাপারটার অন্য একটি দিক আছে, যা অত্যন্তই করুণ এবং হৃদয়হীন। কল-কাতার মত জনবহুল শহরে মরণাপন্ন রোগীর অভাব নেই। যে বৃদ্ধ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে শায়িত, কিন্তু যাঁর চেতনবৃত্তি আচ্ছন্ন হয়নি, বাড়ীর পাশে অকস্মাৎ হরিধ্বনি শুনে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাঁর মনে, কেউ ভেবে দেখেছেন কি? কিংবা ভেবে দেখুন সেই রাতি-জাগরণকালন্ত মায়ের কথা যিনি মৃতদেহ সন্তানের শিররে বসে আচম্কা শুনতে পান হরিধ্বনি। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, যে মৃত ব্যক্তিকে বহন করার সময় উচ্চারিত হয় এই হরিধ্বনি, তাঁর কন্ঠে ভাষা থাকলে তিনিও এতে আপত্তি জানাতেন। কিন্তু ভাষা যাদের কন্ঠে জীবন্ত হয়ে আছে, মৃতদেহকে বহন করার সময় তাদের মন হয়তো হ'লে যায় মৃত, তাই তারা তা টের পায় না। এবং কন্ঠের মতো আবৃত্তি করে যায় পর্যায়ক্রমিক হরিধ্বনি। একে অদ্ভুতের পরিহাস ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে!

আমি তাই- অনুরোধ জানাই, প্রত্যেকটি সং-নাগরিককে এ বিষয়ে বিবেচনা করতে, এবং পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে এমন একটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে, যা প্রতিবেশীর বিষয়ে সহানুভূতিশীল এবং মানবিক। অভ্যাসের জড়তা কোনোকালেই শ্রমঘণী হতে পারে না।

উত্তরকাল

॥ প্রগতিশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ॥

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি শতাব্দীকাল ধরে যে মানবিক মূল্যবোধে আমাদের উজ্জীবি ত করে ছে 'উত্তরকাল' ভবিষ্যৎ বাণীবিশ্বের সম্ভাবনা কে স্বীকার করেও সেই জীবন্ত, ঐতিহ্যের, উত্তর সাধক হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দলমতানির্বিশেষে আমরা প্রতিটি সংশ্লিষ্ট সম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীকে 'উত্তরকাল'ের সঙ্গে যোগিতা করার আমন্ত্রণ জানাই।

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে

প্রকাশিত হচ্ছে

সম্পাদক ॥ সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্রী ॥ প্রসূন বসু

প্রথম সংখ্যায় থাকছে

- সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতা সম্পর্কে একটি তত্ত্বমূলক আলোচনা ॥ এলিক হাটলে
- বহু বিতর্কিত 'নতুন রীতি' প্রসঙ্গে বিচারমূলক প্রবন্ধ ॥

- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- আধুনিক কবিতার ধর্ম ॥ কৃষ্ণ ধর
- কৃষ্ণ আয়িকার মূর্তি-আন্দোলনের গবেষণামূলক বাল্যচরিত্র ॥

রবীন্দ্র-মঞ্জুদার

এ ছাড়াও

- কবিতা ॥ বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, অসীম রায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়।

- গল্প ॥ মিহির সেন, কালিদাস দত্ত
- আলোচনা ॥ চিন্মোহন সোহানবীশ, সরোজ রদ্যোপাধ্যায়, সার্বভৌম সিংহাস্ত, রঞ্জিত রায়, অজিত মল্লোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় দাশ প্রভৃতি।

দাম : ০.৭৫ নং পঃ
বাৎসরিক : চার টাকা
বার্ষিক : আট টাকা

ঠিকানা ॥ ৫১ পটুয়াটোলা লেন, কলি-১
ফোন : ৩৪-৬২১০

ইন্ডিয়ান মিষ্ট শাউন্স কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ প্রাচীনকালেও ছিল। সেই আলেক-জান্ডারের সময় থেকেই কিংবা তারও আগে থেকে। মধ্যযুগে একটা ছেদ পড়ে। বায়, কারণ স্থলপথ হয় বিপদসংকুল। জলপথের সন্ধান একান্ত আবশ্যিক হয়। এই কাজটি ভারতের দিক থেকে না হয়ে ইউরোপের দিক থেকে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ইউরোপ ভারতকে বহু শতকের পর আবার নতুন করে আবিষ্কার করে। ভারত আবিষ্কার করতে বেরিয়ে আমেরিকা আবিষ্কারও করে। তার ধারণা ছিল ওটাই ভারতবর্ষ। ওখানকার আদি-বাসীরাই ভারতীয়।

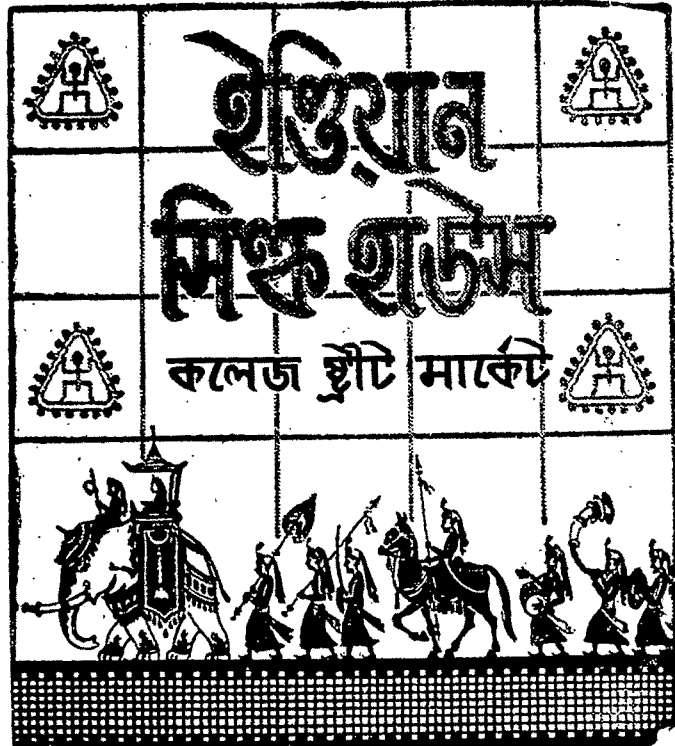
এদিক থেকে একটা পালটা আবিষ্কার বকেয়া ছিল। চার শতাব্দী পরে ভারতও করে জলপথে আবার নতুন করে ইউরোপ আবিষ্কার। রামমোহন রায় করেন ইংলণ্ডে পদার্পণ। তাঁর আগে আব্দুল তাবিব। সেই যে ইউরোপ আবিষ্কার সেটা শব্দ ভৌগোলিক অর্থে নয়। তার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্যও ছিল। সেটা কেবল স্পেসের দিক থেকে নয়। টাইমের দিক থেকেও। ইউরোপ যখন জাহাজে করে ভারতে এলো, তখন এলো আধুনিক যুগ থেকে মধ্যযুগে। আর ভারত যখন জাহাজে চড়ে ইউরোপে গেল তখন গেল মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে। রাম-মোহন রায় দেশে থাকতেই আধুনিক যুগের স্বরূপ দেখলেন। পশ্চিমকেও দেখতে পেলেন তার স্বস্থানে। কল-কাতার ইংরেজকে দেখে ইউরোপের ইউ-রোপীয়কে চেনা সম্পূর্ণ হয় না। রামমোহনের জীবনে এই সম্পূর্ণতার প্রয়োজন ছিল।

একই কারণে মাইকেল মধুসূদনও যেতে ব্যাকুল হয়েছিলেন সেদেশে। এ ব্যাকুলতা ব্যাপকভাবে ছিল সেকালের শিক্ষিত ভারতীয়দের অন্তরে। কিন্তু

অতি অল্পক্ষেত্রেই তুষ্ট হয়েছিল। যাঁরা ইউরোপে যেতে পারেননি তাঁরাও আধা বিলিতী শহর কলকাতায় বসে বিলাতের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন। কিংবা বম্বেতে বসে। কিংবা মাদ্রাজে বসে। এগুলিও আধা বিলিতী শহর। বা সিকি বিলিতী শহর। এদের মধ্যে মাদ্রাজ যদিও জ্যেষ্ঠ তবু কলকাতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ কলকাতা ছিল রাজধানী। কেবল বাংলার নয়, সারা ভারতের। ইংরেজ আমলের আগে হাজার হাজার বছর কেটেছে, পৌরাণিক মতে সত্য যেরূপে ম্বাপর যুগ ও কলিযুগের একাংশ। কিন্তু ভারতের রাজধানী এর আগে কখনো ভারতের পূর্বপ্রান্তে সমুদ্রের এত কাছে ছিল না।

সমুদ্রের এক পারে লন্ডন, আরেক পারে কলকাতা। মাঝখানে জাহাজ চলাচল। অব্যাহত বাতায়ত।

জাহাজ যখন কলকাতার ভিড়ত তখন তার থেকে নামত আধুনিকতম বইপত্র, খবরের কাগজ, যন্ত্রপাতি, শিল্প-দ্রব্য, সাজ-পোশাক, মনিহারি, অসংখ্য কোঁত-হলপ্রদ সামগ্রী বা কম্পিন কালে ভারতে উৎপন্ন হয়নি বা হতো না। দেশ একটু একটু করে আধুনিক হয়ে উঠল এবং কতক পরিমাণে পাশ্চাত্য। যেমন গাখিক ধরনের গিজার বা কলোনিয়াল শৈলীর বাসভবনে। কলকাতার ধনী ও অভিজাতদের জীবনধারা দুই খাতে প্রবাহিত



হলো। একটি আধা হিন্দু আধা মোগলাই। অপরটি তৎকালীন অর্থে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। লাট বেলোটারা যে ধারার বাহক। মধ্যবিন্দু বলে আস্ত একটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। এ'রা হাফ শহুরে, হাফ গ্রাম্য। পরিবার পড়ে থাকে গ্রামে। এ'রা রোজগার করেন শহুরে। মনটা মধ্য-যুগে, চোখ দুটো আধুনিক যুগে। বন্ধুতে পারেন না ব্যাপারখানা কী। কারা সব এসেছে, কেন এসেছে, কী নিয়ে এসেছে, কী নিতে এসেছে। ওরা কি রাজা, না সওদাগর, না ধর্মপ্রচারক, না পণ্ডিত, না সৈনিক। সমুদ্রের ও-পারেও দেশ আছে? সে দেশও মাটির? গায়ের রং অমন কেন? ওরা কী ভাবে?

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হলো। ইংরেজীর মাধ্যমে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হলো। নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে ছাপাখানার সূচনা হয়েছিল। বাংলা হরফে ছেপে বই বেরোল, পত্রিকা বেরোল। যারা ইংরেজী ভালো জানে না তারা বাংলা পড়ে জগতের সঙ্গে যুক্ত হলো। ভারতও সে জগতের অন্তর্গত। তার আগে ভারত সম্বন্ধেই বা কে কত-টুকু জানত! এমন কি বাংলাদেশ সম্বন্ধেও জানবার উপায় ছিল না তেমন। ঐ লোকমুখে শোনা বা স্বচক্ষে দেখা। সংস্কৃত বা আরবী শিখে সম-সাময়িক বিষয়ে জ্ঞান লাভ হতো না। ফারসী শিখে যা হতো তাও হাতে-লেখা ফারসী কেতাব পড়ে। সেও কতকালের পুরোনো। আধুনিক জগৎ তখনকার দিনের সংস্কৃত আরবী ফারসী ভাষার পরম বিম্বানদেরও জ্ঞানগম্য ছিল না। অথচ একটি সাধারণ ইংরেজেরও ছিল। মানুষমন্ডলেরই প্রাণে জ্ঞানের জন্যে আকুলতা আছে। গাছের প্রাণে যেমন আছে আলোর জন্যে আকুলতা। গাছকে যদি ঢেকে রাখা হয় তবে শূন্য রস টেনে সে বাড়ে না। বেঁচে থাকতে পারে। এ দেশের মানুষ দীর্ঘকাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পায়নি বলে বাড়েনি। পণ্ডিতরাও মাথায় খাটো বঁহরে বড়। তাঁদের মনটা পৌরাণিক। তাঁরা যে কোন যুগে বাস করছেন তাই তাঁরা জানতেন না। শূন্য জানতেন যে সেটা কলিযুগ। সুতরাং অবজ্ঞেয়। নেতৃত্ব অনায়সেই আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে চলে গেল। এ'রাই হলেন সমাজের ভ্যানগার্ড।

কলকাতা ভারতের রাজধানী না হলে কী হতো বলা যায় না, কিন্তু বারো মাস বিশ দিন চাঁদ্রবশ ঘণ্টা ভারতশাসনের

কেন্দ্রস্থলে বাস করে শিক্ষিত মানুষ হলো ভারতমন্ডল। তার চেতনা যেমন একটা রেখা ধরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাতায়াত করতে থাকল তেমনি আর একটা রেখা ধরে ভারতবর্ষের বর্তমান থেকে সুদূর অতীতে। সে অতীত পুরাণ পারাবারের ও-পারে উপনিষদ প্রান্তে অবস্থিত! যেমন সে পশ্চিম মহাসিন্ধুর ও-পারে ব্রিটেন দ্বীপে আবর্তিত। মাঝখানে ইরান, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি কত না দেশ। শিক্ষিত মানুষের সেসবে আগ্রহ নেই। মাঝখানে তেমনি কত না পুরাণ, কিংবদন্তী, মঙ্গলকাব্য। শিক্ষিত মানুষের তাতেও রুচি নেই। মাঝখানকার দেশকাল লঙ্ঘন করে তার চেতনা গিয়ে উপনীত হয় একদিকে উপনিষদ প্রান্তে, অপরদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রান্তে। রামমোহন রায় যেমন ইউরোপ পুনরাবিষ্কার করেন তেমনি উপনিষদ পুনরাবিষ্কার করেন। যেমন স্পেন্স অতিক্রম করেন তেমনি টাইম অতিক্রম করেন। সেই সময় থেকে শিক্ষিত মানুষমন্ডলেই স্পেন্স-টাইম সচেতন। দেশকাল সচেতন।

রামমোহন এর মধ্যে কোন স্বতো-বিরোধ দেখতে পাননি। নিজের জীবনে ও মনে তিনি এক প্রকার সামঞ্জস্য ঘটান। ভারতবর্ষের রেনেসাঁস ও রেফর্মেশন উভয়েরই তিনি সূত্রপাত করে যান। বাংলাদেশে ও তার বাইরে সারা ভারতে নবজাগরণের সাড়া পড়ে যায়। সমাজ-সংস্কারের ধুম পড়ে যায়। ধর্মেরও নব-যুগ আসে। সাংক্ষাণ্ডাবে না হোক পরোক্ষভাবে এটা তাঁর সেই সামঞ্জস্যের ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ এর মধ্যে এমন কোনো কথা ছিল না যে ইউরোপকে ও আধুনিককে বর্জন করতে হবে, কেবল ভারতের “সনাতন”কে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু শতাব্দী না ঘুরতেই বিরোধ দেখা দিল। অর্থনৈতিক বিরোধ থেকে রাজনৈতিক বিরোধ, রাজনৈতিক বিরোধ থেকে নৈতিক তথা সাংস্কৃতিক বিরোধ। মনে হলো পশ্চিমের সূর্য যে আলো দিচ্ছে সেটা আলো নয়, আলোয়। আটলান্টিকের পার থেকে যে হাওয়া আসছে সেটা বসন্তের হাওয়া নয়, বসন্তরোগের হাওয়া। পশ্চিম-দিকের দোর-জানালা বন্ধ না করলে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি সমাজ ধর্ম সূর্যচি ও সূর্যনীতি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। ভারতের আত্মা হারিয়ে যাবে।

সেই আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীটারই এক ভাগ এই সময় হয়ে ওঠে রিয়ান-

গার্ড। অপর ভাগটার হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চায়। ভ্যানগার্ডের ভাগ্য নির্ভর করে ইংরেজের ওঁদাদের উপরে। সে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শাসনের অংশ দেয়, শোষণ কমায়ে, তবেই জোর গলায় বলতে পারা যাবে যে ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রেসী, লিবারল মতবাদ, মানব প্রগতি ইত্যাদি কথার কথা নয়, কথা অনুসারে কাজও হচ্ছে, ইংল্যান্ড এরই জন্যে ভারতে এসেছে ও ভারত এরই জন্যে ইউরোপ গেছে। ইউরোপ একটা নতুন যুগের প্রতীক। ভারতের যুগান্তর ও রূপান্তর তাকেই আশ্রয় করে হবে।

কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার নিজের ঘরেই সংকট ছায়া ফেলোছিল। অপরিমিত জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। অপরিমিত শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত ধনবৃদ্ধি হয়েছিল। অপরিমিত ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত জনবৃদ্ধি হয়েছিল। জ্ঞান আর শক্তি আর ধন এক শিবিরে। জন অন্য শিবিরে। ডিসরেলি বলেছিলেন, ইংল্যান্ড আসলে এক নেশন নয়, দুই নেশন। ধনীরা এক নেশন, দরিদ্ররা আরেক নেশন। শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রত্যেকটি নেশন তলে তলে দুই নেশনে বিভক্ত হয়ে যায়। তেমন এক নেশনের সঙ্গে অপর নেশনের শক্তি-বৈষম্য ও ধন-বৈষম্য বেড়ে যায় শিল্পবিপ্লবের আনুষ্ঠানিক প্রতি-যোগিতায়। ইংল্যান্ড এগিয়ে গেলে জার্মানী রাগ করে, জার্মানী এগিয়ে গেলে ফ্রান্স ভয় পায়। রাশিয়া এগিয়ে চাইলে জার্মানী প্রমাদ গণে। ঘরে শত্রু অভদ্র হয়ে উঠছে, বাইরে প্রতিবেশী রদ্র হয়ে উঠছে। মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবেরও জল্পনা-কল্পনা চলছে। শতাব্দীর পূর্বাহ্ন যেমন আশা-শ্বিত করোঁছিল, শতাব্দীর সারাহ্ন তেমনি আশঙ্কিত করে।

সুতরাং ইউরোপ নিজেই নিজেই নিয়ে বিব্রত। ইউরোপীয় মনীষীরাই ইউরোপের কঠোরতর সমালোচক। রেনেসাঁসের সময় থেকেই ইউরোপে যেমন একটা মানবিক ধারা ছিল তেমনি ছিল একটা ধার্মিক ধারা। ধার্মিকরা রেনেসাঁসকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করেননি, কারণ বিজ্ঞান এসে তাঁদের চিরচরিত জগৎজিজ্ঞাসা ও জীবনদর্শন লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন-চিন্তাকে তাঁরা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। স্বাধীন বিশ্বাসের উপর তাঁরা

খড়্গহস্ত। অপর পক্ষে মানবিকরা কোমো প্রকার ভগ্নায়া কিংবা অর্থারিটি মানবার পাত্র নন। তার চেয়ে আগুনে পুড়বেন। কারাগারে পচবেন। ইউরোপীয় সভ্যতা রেনেসাঁসের প্রসাদেই আধুনিক সভ্যতা হয়েছে। রেনেসাঁস উল্টে দিলে তার আধুনিকতার স্রোত উজান বইবে। তাকে ফিরে যেতে হবে মধ্যযুগে। শিক্ষিত ইউরোপের যাঁরা ভ্যানগার্ড তাঁরা এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না। অথচ ফরাসী বিপ্লব দেখে শিল্পবিপ্লব দেখে তাঁদের কতক হলেন ক্রমে রিয়ারগার্ড। ফিরে চল রেনেসাঁসের পূর্বে। রাফেলের পূর্বে। ধনতন্ত্রের পূর্বে। ইউরোপ যখন ছিল সুন্দর। মানুষ যখন ছিল পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক। ইউরোপের রেনেসাঁসের আদি পুরুষরাও মধ্যযুগকে লঙ্ঘন করে পাড়ি দিয়েছিলেন সুন্দর গ্রীক যুগে। খৃস্টানকে ডিঙিয়ে পেগান জীবনদর্শে। গোড়ার দিকে তাঁরাও এর মধ্যে স্বতাবিরোধ লক্ষ্য করেননি। সামঞ্জস্য ঘটতে চেয়েছেন। কিন্তু রেনেসাঁসের কিছুকাল পরে যে রেফর্মেশন এলো আর তার প্রতিক্রিয়ায় যে কাউন্টার রেফর্মেশন দেখা দিল সেটা ধর্ম ও সমাজঘটিত হলেও জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যসৃষ্টি নিয়ে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। সংস্কারকরা ছিলেন প্রতিমাপূজার শত্রু। যীশুর জননী মেরীর মূর্তি তাঁরা সহ্য করবেন না। গির্জাকে মূর্তি দিয়ে তাঁরা সাজাবেন না। অথচ মূর্তিপূজাকে অবলম্বন করেই পরম সুন্দর হয়েছিল ইউরোপের মধ্যযুগের ভাস্কর্যশিল্পের আর্ট। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় কাউন্টার রেফর্মেশন নিছক প্রতিক্রিয়া নয়। পূর্ববর্তীরা যেমন প্রোটেষ্ট্যান্টরা তেমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেননি। পরে যাঁরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন তাঁরা ধর্ম জিনিসটাকেই পরিহার করলেন। তাতে প্রোটেষ্ট্যান্টরা ক্যাথলিকদের উপর জয়ী হলেন না। জয়ী হলো সেকুলার মনোভাব।

আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভ্যানগার্ড থেকে যাঁরা বেরিয়ে গিয়ে রিয়ারগার্ড রচনা করলেন তাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতার উপর দোষারোপ তো করলেনই; ভ্যানগার্ডকেও অব্যাহতি দিলেন না। ধর্ম আর সমাজ নিয়ে গভীর মতবিরোধ। তেমন জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যবোধ নিয়েও। সাকারবাদ থেকে যে সৌন্দর্য সারা ভারত জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে নিরাকারবাদ থেকে তার তুলনায় কতটুকু

হয়েছে? কেন আমাদের পিতৃপিতামহের মন্দিরে যাব না? কেন বঞ্চিত হব সৌন্দর্য থেকে? আমরা কি বাইরের লোক যে বাইরে থেকে দৃষ্টিপাত করে তৃপ্ত হব। আরো গভীরে যেতে হবে। নইলে আর একটা কোণার্ক আর একটি নটরাজ গড়তে পারব না। তেমন সংস্কৃত কাব্যে নিমগ্ন হতে হবে। নইলে আর একখানি রামায়ণ বা মহাভারত হবে না। বর্জন যদি করতে হয়, ইউরোপকে কর, রেনেসাঁসকে কর, রেফর্মেশনকে কর, কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে নয়, বর্ণাশ্রমী সমাজকে নয়, মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রাকে নয়, কারুশিল্পকে নয়। ইংরেজ আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, গ্রাম-সংগঠন ধ্বংস করেছে, সভ্যতার পায়ে কুড়ুল মেরেছে। আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত ভ্যানগার্ড তাতে সায় দিয়ে এবং পশ্চিমের অনুকরণে রেনেসাঁস ও রেফর্মেশন ঘটিয়ে এমন কী অর্জন করেছেন বা সৃষ্টি করেছেন যা দিয়ে ক্ষতিপূরণ হতে পারে! ইংরেজ তো মোয়া দিচ্ছে না। স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হলেও তো আত্মশাস্তি চাই, তার উদ্বেগ চাই। সে কি শৃঙ্খল কথায় হবে। তার জন্যে চাই বিপরীত মার্গ গ্রহণ। এ মার্গ বর্জন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের প্রেরণা ছিল পাশ্চাত্য তথা আধুনিক সভ্যতাকে সহর্ষে গ্রহণ করার, সেই সংগে ভারতের উপনিষদযুগের সভ্যতাকে সম্বন্ধে ফিরিয়ে আনার। এবং উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন করে উভয় তটে অবাধে গমনাগমন করার। সে সময় নব্য-শিক্ষিতরা সকলেই একমত। স্বেচ্ছা দেখা গেল শতাব্দীর শেষভাগে। পাশ্চাত্য তথা আধুনিককে গ্রহণ করতে স্বেচ্ছাভাব এলো। অনেকের আত্মসন্মানে বাধল। একেবারে ইংরেজী বাদ দিতে না পারলেও ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি বিমুগ্ধ হলেন তাঁরা। ফরাসী ঔপন্যাসিক জোঁলার বই পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এমন উত্তেজিত হলেন যে ভাটপাড়ার পিণ্ডিতের মতো পাঁতি দিলেন ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ে কাজ নেই, তার বদলে সংস্কৃত সাহিত্য পড়। বিজ্ঞানশিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হলো না বাটে, কিন্তু মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হলো তা অনেকে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করলেন। যুক্তিবাদ পিছ হটল। সামনে এলো অবতারবাদ, গুরুবাদ, সাকারবাদ। “আনন্দমঠ”। সন্ন্যাসীনেতৃত্ব। ব্রাহ্ম হলেন ব্রাহ্মণ। প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মচর্যশ্রম।

শতাব্দীসাত্তাহের প্রেরণা অবাধ গ্রহণের ও মিশ্রণের নয়। প্রধানত বর্জনের, সামান্য মিশ্রণের। চরমপন্থীরা তাতেও নারাজ। তাঁদের ভারত হবে ইউরোপের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই সংগে আধুনিকের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ মধ্যযুগের ভারত। তাঁরা বর্জন করবেন ইউরোপকে তথা আধুনিককে। তাঁদের বর্জনশীলতা সেইখানেই থামবে না। উপনিষদেও তাঁদের কণ্ঠ নেই। গীতা, চন্দী, পুরাণ ও ব্রতকথা হলেই তাঁরা নিশ্চিত ও নিরাপদ। মেয়েদের যদি পড়াশুনা করতেই হয় তবে মহাকালী পাঠশালায়। বাড়ীতে যারা থাকবে তারা শিখবে ব্রতকথার মাধ্যমে। ভারতের স্বধর্ম বলতে তাঁরা বুঝবেন পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম। তার ঘাঁটি হচ্ছে গ্রামে ও মেয়ে-মহলে। এসব ঘাঁটিতে ইংরেজীকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাংলা ঢুকতে পারে, কিন্তু সে বাংলা হবে পুরাতন সংস্কৃতির বাহন। আধুনিক সংস্কৃতির নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহী, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভারবাহী নয়। স্বদেশ ও স্বধর্ম একাকার হয়ে স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এর মধ্যে বর্জনের ভাবটাই প্রবল-তর ছিল, গ্রহণের ভাবটা অতি ক্ষীণ। এবং চরমপন্থীরা যেমন আধুনিক ইউরোপকে বর্জন করলেন তেমন উপনিষদের ভারতকে। তাঁদের আন্তরিক আনুগত্য পৌরাণিক বর্ণাশ্রমী ভারতের প্রতি। বেদ তাঁদের নমস্কা, কিন্তু স্মৃতি তাঁদের নিয়ামক। দর্শনে তাঁরা অদ্বৈতবাদী, কিন্তু কার্যত কালীপূজক। এটাও যে একপ্রকার বর্জন তা কেউ ভেবে দেখলেন না। সংরক্ষণ মানে শিকার তুলে রাখা নয়। জীবনে প্রয়োগ করতে করতে চালু রাখা।

সুবিধামতো ভুলে যাওয়া হলো যে মুসলমান বলে আর একটি সম্প্রদায় আছে। তারও কিঞ্চিৎ বস্তব্য থাকতে পারে। মুসলমান সমাজে রামমোহনের মতো কেউ জন্মাননি, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনও হয় এক পুরুষ বিলম্বে। রেনেসাঁস বা রেফর্মেশন কোনোটাই ঠিকমতো স্টার্ট পায়নি সে সমাজে। পেতো আর কিছুদিন পরে। যদি না হিন্দু সমাজ বিপরীত মার্গ ধরত। মুসলমান সমাজের ইংরেজী শিক্ষিত ভ্যানগার্ড দেখল বিপরীত মার্গ নিলে মোগল ভারতে উপনীত হওয়া দুরূহ। পেঁছবে হয়তো হিন্দু ভারতে। সে ভারত মুসলমানের জন্যে নয়। তার চেয়ে ইংরেজের সংগে হাত মেলানো শ্রেয়। রাজনীতি

ক্ষেত্রে একটা বাঁধা বথরা মেলার আশা আছে। একেবারে বর্ণিত হবার ভয় নেই। মুসলমান সমাজেও স্বেচ্ছা ছিল। কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষিত ভ্যানগার্ড মোটামুটি একমত। মোল্লা মোলানাদের কথা আলাদা। তাঁদের চোখে সব কিছুই বর্জনীয়। যেমন আধুনিক ইউরোপ তেমনি উপনিষদের ভারত তেমনি আধুনিক ভারত। তাঁদের গ্রহণযোগ্য শব্দ শরিয়তী রাষ্ট্র। তাঁদের আনুগত্য ভারতের প্রতি নয়, ইসলামের প্রতি। ইংরেজের হাত থেকে ভারত ফিরে গেলে তাঁরা শিখতীয় আওরংজেবকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষেক করতেন।

আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ইউরোপ আবিষ্কার তথা আধুনিক আবিষ্কার এই দুই আবিষ্কারের উল্লাসে মগ্ন। দেখতে দেখতে সাহিত্যে শিল্পে শিক্ষায় সমাজে ধর্মে পরিবর্তন ও পরিবর্তন এলো। মনে হলো না যে একটা কিছু হারিয়ে যাচ্ছে যা আরো মূল্যবান। যার ক্ষতিপূরণ নেই। শতাব্দীর জমা-খরচের হিসাব-নিকাশের সময় যখন এলো তখন দেশের চিন্তাশীলদের মধ্যেই মত-ভেদ লক্ষিত হলো। যাঁদের মধ্যে যুগ-চেতনা প্রথরতর তাঁরা বাড়িয়ে দেখলেন সেতুবন্ধ দিয়ে গমনাগমনের ফলে যা লাভ করা গেল তাকেই। সেই বিচিত্র অভিজ্ঞ-তাকেই। যাঁদের মধ্যে দেশচেতনা বা দেশাত্মবোধ প্রবলতর তাঁরা বাড়িয়ে দেখলেন যা হারিয়ে গেল বা ভেঙে গেল বা লুট হয়ে গেল তাকেই। সেই বিচ্ছিন্ন আত্মগত ঐতিহ্যবাহী জীবনধারাকে। মুসলমানরাও তাকে তেমন ছিন্নভিন্ন

করেনি রেল স্টেশনের কলকারখানা যেমন করেছে। এইসব কলকারখানা ইংলণ্ডে অবস্থিত ও এর লভ্যাংশ ইংরেজের ভোগে লাগে। ভারত শব্দ কাঁচামাল যোগায় ও তাঁর মাল কিনতে বাধ্য হয়। তার চিরকালের কারুশিল্প বিনষ্ট হয়। দারিদ্র্য ব্যাপক ও গভীর হয়। বৃহত্তর স্বার্থ বিপন্ন হয়। মনের অন্ধকার দূর হলে হবে কী, বাহির অন্ধকার। যার অতীত এত গৌরবময় তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তমসাজ্জ্বল।

যুগদশী চিন্তানায়করা স্বীকার করতেন না যে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পশ্চিমের সঙ্গে তার আদান-প্রদান অনাবশ্যক। তাঁরা বরং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাবটাকেই বড় করে দেখতেন ও তার জন্যে পশ্চিমের সঙ্গে সম্বন্ধটাকে একান্ত আবশ্যক বলে গণ্য করতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান না হলে ভারতীয় সভ্যতা পূর্ণ হবে না, অপূর্ণ থেকে যাবে, বহু শতাব্দী পেছিয়ে থাকবে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যে পশ্চিমের সাহায্য বিনা ভারতের ভিতর থেকেই আপনি উঠে আসবে এটা তাঁরা মনে নিতে পারতেন না। ভারতকে একলা ছেড়ে দিলে সে-যে ইউরোপের মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানে আধুনিক হবে এটা তাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ ছিল না। পরের কাছে শিখতেই যখন হবে তখন সম্বন্ধ একটা পাতাতে হবেই। তবে সেটা যে প্রভুভূত্যের সম্বন্ধ হবে এমন কোনো কথা নেই। সেটা হবে সমানে সমানে সম্বন্ধ। তার লক্ষণ ইউরোপে দেখা যাচ্ছে। ভারতেও দেখা

যাবে। ভারতও স্বাধীন হবে। স্বাধীনতা কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নয়।

অপর পক্ষে দেশভক্ত মনীষীরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী না করলে তার স্বধর্ম রক্ষা করা যাবে না। পরধর্ম তার পক্ষে ভয়াবহ হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান পরের কাছ থেকে পাওয়া গৌরবের কথা নয়। পার্থক্য ভোগ-বিলাস যে চায় না তার ওসব নিয়ে হবে কী? ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে ভারতেরই স্বেচ্ছা হবে বিশ্ব। ভারতের অধ্যাত্ম সম্পদ যদি হারিয়ে যায় তবে বিজ্ঞানলব্ধ ঐশ্বর্য তার কোন কাজে লাগবে? যা আছে তাকেই সমস্ত শক্তি দিয়ে সংরক্ষণ কর। যা নেই তার জন্যে উদ্বাহু হতে যেয়ো না। ভারতের যা আছে আর কারো তা নেই। দৃষ্টিকে দেশের উপর সন্নিবদ্ধ কর। দেশের বর্তমান থেকে যে রেখাটি ধরে দেশের অতীতে যাওয়া যায় সেই রেখাটি ধর। দেশ থেকে যে রেখাটা ধরে পশ্চিমে যাওয়া যায় সে রেখাটা ছাড়ে। আধুনিকতার মোহ কাটাও। আধুনিক তো চিরন্তন নয়। সেও পুরাতন হবে। দুর্দিনের দম্ভ দুর্দিন পরে বদবদনের মতো মিলিয়ে যাবে। “কত চতুরান মরি মরি যাওত।” আধুনিক ইউরোপেরও আদি অবসান আছে। সনাতন হচ্ছে ভারত। তার নেই আদি অবসান। পরাধীনতা দূর করাই আপাতত একমাত্র কর্তব্য। স্বাধীন ভারত বিচ্ছিন্ন হবে কি না এখন থেকে ভাবতে হবে না। বাইরে থেকে বড় জোর বিজ্ঞানকে নিতে পারে। আর সব তার আছে।

সব মানুষের অগ্রগতির যদি একটাই পন্থা থাকে তবে মানতে হবে যে ইউরোপ এগিয়ে রয়েছে, ভারত পেছিয়ে রয়েছে, সঙ্গ রাখতে হলে পিছু নিতে হবে, ধরে ফেলতে হবে, ছাড়িয়ে যেতে হবে। জাপান যা করতে চেষ্টা করেছে স্বাধীন হয়ে থাকলে ভারতও বোধ হয় তাই করত। তা করলে কিন্তু স্বীকার করা হতো যে সব মানুষের জন্যে একই রাস্তা। সব মানুষের একটাই সভ্যতা। একটাই বিজ্ঞান। একটাই বিজ্ঞানদৃষ্টি-রিয়ালিটি। একটাই ন্যায় অনায়্যবোধ। সাহিত্যে ও আর্টে একটাই বিশ্বজনীন বাণী। এইখানে দেখা দিল মতবিরোধ। আবিষ্কারের ঘোর কৈটে গেছে। ইউরোপকে বা আধুনিককে দেখে পরম বিস্ময় জাগছে না। প্রতিদিন তার বর্ষরতার সংবাদ টোটে পড়ছে। তার স্বার্থপরতার আঁট গায়ে লাগছে। যেসব

বিনোদনী মাড়ীর মেলা

মোহিনী মোহন

কাঙ্ক্ষিত

১৩ মাস

কলেজ স্ট্রীট জংশন, কলিঃ-১

ফোন: ৩৪-৪৫২০

কারণে গ্রীস রোম বিলীন হলো সেইসব কারণে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাও অধঃপাতে যাবে। তা হলে ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া কেন? পথ এক নয়, পথ একাধিক। ভারতের পথ আধ্যাত্মিকতার। ভারত সে পথ এগিয়ে রয়েছে, ইউরোপ রয়েছে পিছিয়ে। পাল্লা দিতে হয় ভারতের পিছ পিছ ইউরোপই দেবে।

পথ এক নয়, পথ দুই। ক্রমেই এ ধারণা দৃঢ়মূল হতে থাকে। পরাধীনতার বেদনার এ ধারণা জাত হলো বললে সবটা বলা হয় না। জাপান তো পরাধীন হয়নি। সেখানেও এর অনুরূপ দেখা গেল ওকাকুরার রচনায় ও কার্যকলাপে। আধুনিক পাশ্চাত্য আর্টের সংরক্ষণ থেকে তিনি তাঁর দেশজ শিল্পাদর্শ সংরক্ষণের উদ্যোগ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি ও টেকনোলজি এসে জাপানের সৌন্দর্য নাশ করছে দেখে দৃষ্টে মহামান হয়ে তিনি বুদ্ধের দেশের শরণ নেন। সৌন্দর্যের ঐতিহ্যগত আদর্শে ভারত, চীন ও জাপান একপন্থী, কারণ সে আদর্শ প্রকৃতির অনুকৃতি নয়, চিত্তের গভীরতর স্তরে তার ভিত্তি। প্রাচ্যের সৌন্দর্যসাধনা অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ওকাকুরার সঙ্গে ঠাকুর-বাড়ীর ঘনিষ্ঠতা হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। এই কবি যে একদিন বিশ্ববিখ্যাত হবেন তা কবিও জানতেন না, ওকাকুরাও না। কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি কণ্ঠগোচর হবার অল্প দিন পরে ওকাকুরার দেহান্ত হয়। তাঁর দেশ তাঁর কথা শুনল না। ইউরোপের পথের পথিক হলো। সংসারের বিনিময়ে আত্মাকে হারালো। তাই তিনি ভ্রমহৃদয়ে অকালে শেষ নিশ্বাস ফেলেন। জাপানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার মতোই জাপানকে সাবধান করে দেন। ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে অপ্রিয় হন। ন্যাশনালিজম জাপানের বা ভারতের স্বধর্ম নয়। তবু উভয় দেশেই প্রবল। তাই এদেশেও তিনি অপ্রিয় হন।

এর মধ্যে একটু ভুল বোঝা ছিল। আধুনিক যুগে পড়বার আগে ইটালী ও জাপানের ও ভারতের মতো আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের আদর্শে বিশ্বাস করত। সাধারণভাবে ইউরোপও তাই। রেনেসাঁস না ঘটলে, পরে শিল্পবিস্তার না ঘটলে সে বিশ্বাস এখনো ভেঁসনি থাকত।

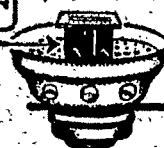
প্রভেদটা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানসাধনার। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নয়। স্বধর্ম ও পরধর্ম এরূপ ক্ষেত্রে কেমন করে দেশানুসারী হবে?

শুধু ভারতে নয় বা জাপানে নয় সব দেশেই দুটো বোঝাপড়া এক সঙ্গে চলছিল। একটা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের। আর একটা স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের, পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের। দৈনন্দিন জীবনে একটার থেকে আরেকটা পৃথক করা শক্ত। রেল-গাড়ী বিদেশ থেকে আমদানী, তার থেকে লোকে ধরে নিল ওটা বিদেশী বা পশ্চিমী। আসলে ওটা একেলে। দেড়শ বছর আগে কোনো দেশেই ওর অস্তিত্ব ছিল না। মিলেতেও বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতি প্রথমে বিরাগ জাগিয়েছে। লোকে যন্ত্র ভেঙে দিয়েছে। রেনেসাঁসের একাধিক কারণের একটা হলো মন্ডবন্দ। সেটার উপরেও বহু লোক ক্ষিপ্ত হয়েছে। মনে করেছে ওটা নিছক মন্দ। “ভালো”, “মন্দ” এই দুটি কথা নৈতিক বিচার থেকে ঐতিহাসিক বিচারে সম্প্রসারিত হলে কোনো আবিষ্কার বা উদ্ভাবন বা অভিনবত্বই তার নাগাল এড়ায় না। আস্ত একটা যুগকেই “মন্দ” বলে সম্বোধন হয় ও সম্বোধন হলেই বিনা-বিচারে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। আদি কালের ইতিহাস আমরা জানিনে। জানলে হয়তো এটাও জানা যেতো যে সেকালের লোক গোবর গাড়ীকেও “মন্দ” বলে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিল।

“ভালো” আর “মন্দ”, “শাদা” আর “কালো”, “স্বধর্ম” আর “পরধর্ম”, “আধ্যাত্মিক” আর “জড়বাদী” এসব গণনা ইতিহাস ভূগোল উপর বা দেশ-কালের উপর চাপালে তার পরিণাম হয় যা গ্রহণযোগ্য তার বাহ্যিক বা বর্জন। এবং যা পরিবর্তনযোগ্য বা পরিত্যক্ত তার সংরক্ষণ। যে সব দেশ অতীত পুরাতন বা দীর্ঘকাল হতে বিচ্ছিন্ন নে সব দেশ বহিরাগত ও নৃতনের প্রতি একটা মারমুখো ভাব মজ্জাগত। সে-দেশের মানুষ সিদ্ধান্ত করে বসে আছে যে ঘরে বা আছে তাই ভালো, আর বাইরে থেকে বা আসে তাই মন্দ। আগে থেকে যা আছে তাই স্বধর্ম, পরে যা এলো তাই পরধর্ম। এখানে যুগের পিণ্ডি চাপানো হয় বিদেশের উপরে। অতীত সম্বন্ধে মানুষের একটা মোহ আছে। তার সবটাই সুন্দর। যেটা যত প্রাচীন সেটা তত সুন্দর। সে কখনো মন্দ হতে পারে না, অপূর্ণ হতে পারে না। তাকে পরিবর্তন করতে হাত ওঠে না। মানুষের এই আসক্তি প্রকৃতির মধ্যে নেই। সে নিম্নম হস্তে ভালো মন্দ সব ভেঙে ফেলে। সব আবার গড়ে তোলে। তার স্বধর্ম বলে যদি কিছু থাকে তবে তা নিত্য ভাঙা নিত্য গড়া। নিত্য মাজা নিত্য ঘষা। নিত্য ধরা নিত্য ছাড়া। তার মধ্যে একটা কণ্ঠি-নিউইটি আছে। কিন্তু সেটা তার নিজের প্রবহমানতা। সেটুকু বাদ দিলে আর সব জিনিসের বেলা ডিস্কর্সানিউইটি। পূর্ণহেদ। কত সভ্যতা গেল আর এলো। এলো আর গেল। আধ্যাত্মিক

আরও মজবুত... আরও ভাল

সিডলের তৈরি
বার্ণার টিউব



‘কিমান’ নষ্টবে
‘স্পেশাল কোরালিট’
গ্যাস ঘোষা লাইকেন।



সম্পূর্ণ লক্ঠন মোটা চাদরে
তৈরি ও লক্ঠনের নুঁকে রোপিত
তৈলে নষ্ট হয় না

কিমান
লক্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট



মোহাম্মদ দাশ এণ্ড কোং

২৩৩, ৩নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-২

ফোন-২২-৬৫৮০

হলেও কি রক্ষা আছে, যদি না নিত্য ভাঙে নিত্য গড়ে? নিত্য মাজে নিত্য ঘষে। নিত্য ধরে নিত্য ছাড়ে। নিত্য ভাবে নিত্য বিচার করে। নিত্য শোধরায় নিত্য বদলায়। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে ভারতও তাই করে এতকালে বেঁচে আছে। কিন্তু কোনো অবস্থায় আত্মাকে হারানো চলবে না। অস্থানং সততং রক্ষণং।

ঊনবিংশ শতকের স্বর্ণলংকায় বাস করেও রাসকিন, এডওয়ার্ড, কাপে'ন্টার প্রভৃতি অনেক মনোবীর মনে সন্দেহ জেগেছে ইংলণ্ড ঠিক পথে চলেছে না ভুল পথে। তেমন বিশাল ও বলবান রুশ সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ ও আভিজাত্য ভোগ করেও টলস্টয়ের সন্দেহ জেগেছে ততঃ কিম। এরা এক একজন এক একটা নির্ণয়ে উপনীত হয়ে এক একটা পথ নির্দেশ করেছেন। এমনি একটা পথ নির্দেশ করেন কার্ল মার্কস। সে পথ তাঁর নিজের দেশ নয়। নেয় তাঁর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য এক দেশ। রাশিয়া। এতদিনে আরো অনেক দেশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে আছে চীন। সেই বার ঐতিহ্যের ভিত্তি ছিল নৈতিক। দেখা যাচ্ছে নৈতিক বা জড়বাদী, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, ভালো বা মন্দ কোনো বিশেষণই এক্ষেত্রে খাটে না। ঐতিহাসিক ভবিষ্য বলে একটা তত্ত্ব লক্ষ লক্ষ মানুষের গন অধিকার করেছে। স্বয়ং ইতিহাস নাকি একটা পথ নির্দেশ করেছে। সে পথ নাকি একটাই পথ। সব দেশের সব মানুষের জন্যে। কেউ যদি তা না মানে তবে তাকে গায়ের জোরে মানতে হবে। সেটাও নাকি ইতিহাসের নির্দেশ। ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন ইতিহাসের প্রশ্নপরে নেই। আছে নীতিশাস্ত্র। নীতিসম্মত পথ নির্দেশ করেছেন গান্ধী। সেই পথটাও শুধু একটা দেশের জন্যে নয়, সব দেশের জন্যে। কিন্তু কেউ যদি তা না মানে তাকে গায়ের জোরে মানতে হবে না। দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। মহৎ দৃষ্টান্ত।

উপরে যে পথগুলোর ইঙ্গিত দেওয়া হলো সেগুলো এক একটা দেশে নিবন্ধ নয়। এক দেশ থেকে অপর দেশে গৃহীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং জাপানের শুধু একটিমাত্র পথ বা ভারতের কেবল একটিমাত্র পন্থা এ ধরনের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই সেকেলে হয়ে গেছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে-ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে

প্রায়ই শোনা যেতো। প্রায়ই অপর কোনো দেশের উপর নজর রেখে। দুটো দেশ যেন দুটো বিপরীত মেরু। আকাশ আর পাতাল যেন বিপরীত। প্রথম মহা-যুদ্ধের পর মানুষের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদলে যায়। দেশ অনুসারে বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু “ভালো” আর “মন্দ” বাঁটোয়ারা হয়নি। “শাদা” আর “কালো” গায়ের চামড়ায় থাকতে পারে, মনের বা চরিত্রের গঠনে নেই। “স্বধর্ম” আর পরধর্ম” ব্যক্তির জীবনে সত্য হতে পারে, জাতির জীবনে অমথ্য। “আধ্যাত্মিক” ও “জড়বাদী” এখন কোনো দেশেরই গায়ে বসে না।

রবীন্দ্রনাথ আজন্ম রামমোহন-প্রবর্তিত নতুন ঐতিহ্যে মানুষ। যুগপৎ যুগসচেতন তথা দেশসচেতন। এর মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা অনুভব করেননি। অকুণ্ঠিতভাবে দক্ষিণ হস্তে দেশের কছ থেকে বাম হস্তে যুগের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। বজ্রনের কথা উঠলে দেশের দেবদেবী ও সাকার আরাধনা ত্যাগ করেছেন। পক্ষান্তরে সাহেবীয়া পাহারার। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জাতীয়তাবাদের তরঙ্গ ওঠে। সেটাও একটা বাইরের ঢেউ। নেপোলিয়নের পায়ের তলায় জাতীয়তার ঢেউ ওঠে যে দেশেই তিনি যান। ইটালিতে জার্মানিতে রাশিয়ায়। তেমনি ওঠে ব্রিটানিয়ার পদতলে। গরিব গেরিলাম দেশ ইটালী, জার্মানী, রাশিয়া। পরা জয়ের বা পরাধীনতার উত্তর দিল জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হয়ে। ভেবে দেখল না যে সেটাও হলো নেপোলিয়নেরই নৈতিক জয়। তেমনি ভারতবর্ষেও দেখা দেয় জাতীয়তাবাদ। ব্রিটিশ শাসনের উত্তরে গরিব গেরিলাম দেশের পোরুষের অগ্নীকার। ইংরেজী শিক্ষাই ছিল তার মূল্য। যদিও তার মন্ত্র লেখা হলো সংস্কৃত তথা বাংলায়।

বিরোধ পরিহার করা গেল না। গোড়ার দিকে মনে হয়েছিল চাইলেই মিলবে স্বাধিকার। এমন ইংরেজও ছিলেন যারা ভারতের পক্ষে। কিন্তু বিশ্ববিপ্লবের হাতে কামধেনু পড়েছে। বিশিষ্টকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দেবেন, তা কি হয়! দেশের মনোভাব দিন দিন বিকৃত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও অবিচলিত থাকতে পারেন না। একটু একটু করে দেশচেতনার আচ্ছন্ন হন। দেশের অতীতের অভিমুখে যে রেখাটি গেছে সেই রেখা ধরে চলেন। পশ্চিমের অভিমুখী রেখাটি—আধুনিকের অভিমুখী রেখাটি—একবারে পরিত্যক্ত না হলেও গোণ হয়ে যায়। অতীত বলতে দেশের লোক বোঝে পৌরাণিক অতীত। ছবি আঁকতে বসলে পুরাণ থেকেই শিল্পীরা সৃষ্টির প্রেরণা পায় বেশী। তা ছাড়া অত বড় একটা মধ্যযুগকে ডিঙিয়ে যাবেই বা কী করে? বেদ উপনিষদ যতখানি সুন্দর রামায়ণ মহাভারত ততখানি নয়। রামায়ণ, মহাভারত যতটা সুন্দর ভাগবত বা চণ্ডী ততটা নয়। মানুষ দেশকেও “দশপ্রহরণ-ধারণী” দেবীমূর্তি বলে বন্দনা করতে ভালোবাসে। সে যে মাতৃমূর্তি। পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করে হিন্দু-সমাজ থেকে যারা বিদায় নিয়েছিলেন, তাঁদের একজনকেই দেখা গেল বঙ্গ-মতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে। স্বদেশী আন্দোলন সাকারবাদী আন্দোলন হয়ে উঠল। মধ্যযুগ ফিরে এলো। অধুনিক যুগ হলো রাজনীতিনিবন্ধ। আধুনিক রাষ্ট্র যাদের উদ্দেশ্য তাঁদের উপায় পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয়, মনোবৃত্তির উদ্বেগন।

স্বদেশী যুগের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী হয়েছিলেন। স্বদেশীক শিক্ষার জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বদেশ পৌরাণিক সাকারবাদী স্বদেশ নয়। তাঁর কাছে ধর্ম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন নয়। ধর্ম তাঁর কাছে সব কিছুর উর্ধ্ব। জাতীয়তাবাদের খাতিরেও তিনি অধর্ম করবেন না। দেশের স্বাধীনতার জন্যেও খুন-ডাকাতি সমর্থন করবেন না। অন্ধ কুসংস্কারকে মস্তি: আন্দোলনের মিত্র করতেও তাঁর আপত্তি। মিথ্রই কপট শত্রু। অন্ধতা থেকেই পরাধীনতা এসেছে। অন্ধতার মধ্যে প্রবেশ করলে স্বাধীনতা আসবে কোন মায়াবলে! রবীন্দ্রনাথ ঋদ্ধিবাদী সিদ্ধান্তে অটল। তাঁর প্রোগ্রাম গঠন-কর্মে সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্বাধীনতার বার্নিয়াদ মজবুৎ করা। আবেদন আর নিবেদন নয়, বয়কট আর বোমা নয়, নিরলস সংগঠন ও সেবা। সেই উপায়ে দেশকে আপনার করে নেওয়াই দেশজয়। অবশেষে অপসরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। লোকে মনে করল পদলিখের ভয়ে শান্তিনিকেতনে গা ঢাকা দিলেন। ধীরে ধীরে যুগচেতনার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিলেন। সে যুগ স্বদেশী যুগ নয়, আধুনিক যুগ। তার সঙ্গে আড়ি করে পূর্ণভাবে বাঁচা যায় না। ইংরেজের সঙ্গে আড়ি করেও অগ্রসর হওয়া যায়

না। “এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীস্টান।”

স্বদেশী যুগের অবসানে রবীন্দ্রনাথের মন যখন তৈরি হলো তখন তিনি হলেন আবার পশ্চিম অভিমুখে যাত্রী। বাইশ বছর বাদে। এবার ইউরোপকে—সেই সূত্রে বিশ্বকে—তার কিছু দেবার ছিল। সে দেওয়া তাঁর দেশের হয়ে। তাতে ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগেরও অন্তঃসার। উপনিষদের তথা বাউল বৈষ্ণব কবিরপন্থের বাণী। পুরাণের নয়। এই বাইশ বছরে তাঁর নিজেরও উপলব্ধি জন্মেছিল। একজন আধুনিক কবি সাধকের। কিন্তু তিনি শুধু দিতে বার্নান। নিতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। জাতীয়তার অভিমান তাঁকে উদাসীন বা অগ্রহিষ্কৃত করেনি। দিতে হলে নিতে হয়। নিতে না পারলে দিতে পারা যায় না। আদান প্রদানেই তাঁর বিশ্বাস। “দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে।” এই তাঁর আদর্শ। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ হলো মেলা আর মেলানো। পরাধীনতা বা সাম্রাজ্যবাদ একে উলটে দিতে পারে না। তিনি কিপলিং নন যে বলবেন, “পূর্ব হচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম। দুই কখনো মিলবে না।” তবে কিপলিং তার সঙ্গে এটুকুও জুড়ে দি়য়েছিলেন যে, “পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকেও যদি আসে তবু তারা মিলবে যখন দুই বলবান পুরুষ মুখোমুখি দাঁড়াবে।”

শান্তিনিকেতনের আশ্রম থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি তাঁর “যাত্রার পূর্বপত্র” রচনা করেন। তাতে বলেন, “যুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া আমরা যদি সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে?”

“যুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্তনের পথে চলিতেছে—আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চূপ করিয়া থাকিতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে। বিশ্ব-জগতেও আমরা কেবলই পরিবর্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি। তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই যে, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হইতেছে? অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যু-



লাইফবয় দেখে মনে কললে শারীরিক তাজা আর স্বচ্ছতা
মনে হবে। প্রতিদিন ধূলা ময়লা গায়ে লাগবেই—লাইফবয়
সেই ধূলা ময়লার রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয়। পরিবারের
সকলেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য রোজ লাইফবয় স্ট্রিং মনে করুন।

**লাইফবয় যেখানে,
স্বাস্থ্যও সেখানে!**

হিন্দুস্থান লিডারের তৈরী

L. 30-X31. BQ

উৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না? বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। যুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে। যুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব—তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।”

এই রচনারই এক জায়গায় আছে, “আমার বলিবার কথা এই যে, আমাদের মধ্যেও তেমনি পূরণ করিবার মতো একটা অভাব আছে, এবং সেই অভাবই আমাদের মধ্যে দুর্বলতার অবসাদের মধ্যে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে। এ কথা শুনিলেই দেশাভিমানীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকতার নহে, তাহা বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বস্তুধর্ম—যুরোপ তাহারই জোরে পৃথিবীর অন্য সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না। কেবল বস্তুসমূহের উপরেই কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বস্তুধর্মের জোরে কোনো জাতিই বললাভ করে না। প্রদীপে অজস্র তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জ্বলে না এবং সলিতা পাকাইবার নৈপুণ্য সন্দেহ হইয়া উঠিলেও দীপ জ্বলে না—যেমন করিয়াই হউক, আগুন ধরাইতেই হইবে। আজ পৃথিবীকে যুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুজোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের

কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহই ধর্মের জোরে, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই। তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।”

দেশে দেশে অমিল যেমন আছে মিলও তেমনি আছে। প্রথম পরিচয়ে অমিলটাই বেশী করে নজরে পড়ে, কিন্তু নিকট পরিচয়ে মিলটা আরো বেশী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আর অমিলের কথা অত বেশী শোনা যায় না, যত বেশী শোনা যায় মতবাদে অমিলের কথা। আমেরিকাতেও কমিউনিষ্ট আছে, রাশিয়াতেও ডেমোক্রাট আছে। যে যার সুযোগের অপেক্ষায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ন্যাশনালিজম এখন আর উৎকট আত্মস্বার্থবাদ নয়। এক দেশ অপর দেশকে অনেক সময় বিনা শর্তে সাহায্য করছে। যেহেতু সে অবিকশিত। কিন্তু এই অবস্থায় পোঁছতে অনেক দিন লেগে গেল, অনেক সংঘাতের ভিতর দিয়ে আসতে হলো। সংঘাত ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের বেলা নেশনে নেশনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেলা কতকটা নেশনে নেশনে, কতকটা মতবাদে মতবাদে। এক দিক থেকে ওটা জাতিগণের সঙ্গে তার উভয় পার্শ্বের প্রতিবেশীদের রণ। আরেক দিক থেকে

ওটা নাৎসী ফ্যাসিস্ট মতবাদের সঙ্গে তার বিরুদ্ধমতবাদী কমিউনিষ্ট তথা ডেমোক্রাটদের দ্বৈরথ। বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদ ইতিমধ্যেই তার তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। মতবাদগুলোরও আর সে ধার নেই। এখন আর সেগুলোকে খীসিস অ্যান্টি-খীসিসের মতো লাগে না। মনে হয় একটা আরেকটার বিপরীত নয়। কিন্তু প্রতিবন্দী। দুই ঘোড়া যেমন বাজী রেখে দোড়ায়। একটা আরেকটাকে ছাড়িয়ে গিয়েই হারিয়ে দেবে, গর্দা দিয়ে দিয়ে নয়। সেইজন্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ যত গর্জাচ্ছে তত বর্ষাচ্ছে না। পরমাণবিক বোমার ভয়ে নিবৃত্ত রয়েছে এটা অর্থসত্য। নিবৃত্তি আসছে ভিতর থেকে। গণতন্ত্রী দেশগুলিতেও পাবলিক সেক্টর হয়েছে এবং বাড়তে লেগেছে। সাম্যবাদী দেশগুলিতেও গণতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করছে।

বিশ্ব শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে যে পিছুটান দেখা দিয়েছিল সেটা প্রথম মহাযুদ্ধের পর মল্লধর হয়। কেবল ধর্মমিশ্রিত রাজনীতিতেই একটা স্বপথে ফিরে চলার ধ্যান ছিল। চরকা খাদিকে যদি অর্থনীতি বলা হয় তবে অর্থনীতি-ক্ষেত্রেও। কিন্তু দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে স্থাপত্যে স্বদেশের চেয়ে স্বকালের দিকে টান বাড়ে। কখনো প্রকাশ্যভাবে কখনো প্রচ্ছন্নভাবে। ক্লাসিকাল সংগীতে ও নৃত্যেও আধুনিক রুচি ও রং লাগে। আধুনিক না বলে পাশ্চাত্য বলেও ভুল হয় না। পশ্চিমের উপর বিরাগটা রাজনীতিতিনিপুণদের মধ্যেই প্রকট। সাধারণ লোক তো বিদেশী ফিল্ম বলতে অজ্ঞান। তেমনি বিলতি থেলা দেখতে পাগল। বিরোধটা একদা মনে হয়েছিল সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার। পরে মনে হলো নেশনের সঙ্গে নেশনের। পরিশেষে বোঝা গেল পলিসির সঙ্গে পলিসির। ওরা যুদ্ধ চায়। আমরা যুদ্ধ চাইনে, যদি না সিংধান্টটা নিজের দায়িত্বে নিতে দেওয়া হয়। এতদিনে সেটা স্বীকৃত হয়েছে। এরই নাম স্বরাজের অন্তঃসার।

কিন্তু মানুষের জীবন থেকে ধর্মের অন্তঃসার বা নীতির অন্তঃসার যদি উবে যায় তা হলে অন্ধ জাতীয়তাবাদের মতো অন্ধ প্রগতিবাদও মানুষের দুর্গতির হেতু হবে। সে প্রগতি অধোগতি। তার থেকে উদ্ধার জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে হবে না। হবে কয়েকটি চিরন্তন সূত্রে বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার ফলে। সত্য আর প্রেম আর সৌন্দর্য আর ন্যায় অনাধুনিক হয়ে



সার্ভে ডুইং সরকার ও
অফিস সংক্রান্ত ক্ষেত্রের
কাগজ বিক্রয় ও প্রিন্টার্স
সহস্রম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান
কুইন স্টোরারী স্টোর্স গ্রাইডে নিঃ
৬৩ ই, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

হায়ানি। প্রগতির সঙ্গেও এদের অনাস্বীয়তা নেই। রেনেসাঁস শব্দ এই কথাই বলার অধিকার দাবী করেছে যে প্রকৃতির তথা মানুষের জীবনধারা বহু বিচিত্র ও বড় জটিল। বাবাজীরা তাকে যেমন দোরঙা ও সরল ঠাওরান তেমন সে নয়। রেনেসাঁস সভ্য আর প্রেম আর সৌন্দর্য আর ন্যায়কে মধ্যযুগীয় বলে খারিজ করেননি। আধুনিক সভ্যতা যদি নীতির ও ধর্মের শাসকেও খোসার সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেয় তা হলে তারও শাস বলতে বিশেষ কিছু থাকবে না। গণতন্ত্র বা শ্রেণীসাম্য অতি মূল্যবান, সন্দেহ নেই। কিন্তু এহো বাহা। আগে কহো আর। বিশ্বজনীন চিরন্তন স্থিতিকেন্দ্র আছে, গতিই সব নয়।

রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে “সভ্যতার সংকট” লিখেছিলেন। “পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট” লেখেননি। কারণ পূর্ব পশ্চিমের বৈষত্য ততদিন তাঁর মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। এক কালে যেমন আমাদের রেল-স্টেশনগুলোতে হিন্দু, জল ও মুসলমান জল ছিল, এখন নেই, তেমনি এক কালে কবিগুরুর মনেও পূর্ব পশ্চিমের ভেদ-বিশিষ্ট ছিল, শেষে থাকে না। এর সূচনা যোজ করলে পাওয়া বাবে “গোরা”তেই। তাতে যে ভারতবর্ষের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার জাত নেই, ‘বিচার’ নেই, স্বাণা নেই। সে শব্দ, কল্যাণের প্রতিমা। সে ভেদবিশিষ্টকে প্রেম দিয়ে অতিক্রম করেছে। যেমন আনন্দময়ী রূপে তেমনি সূচরিতা-রূপে। আরো পরে আরো পরিণত হয় তাঁর অভেদবিশিষ্ট।

“I have no hesitation in saying that those who are gifted with the moral power of love and vision of spiritual unity, who have the least feeling of enmity against aliens, and the sympathetic insight to place themselves in the position of others, will be the fittest to take their permanent place in the age that is lying before us, and those who are constantly developing their instinct of fight and intolerance of aliens will be eliminated. For this is the problem before us, and we have to prove our humanity by solving it through the help of our higher nature. The gigantic organizations for hurting others and warding off the blows, for making money by dragging others back, will not help us. On the contrary, by their crushing weight, their enormous cost and their deadening effect upon living humanity, they will seriously impede our freedom in the large life of a higher civilization.” (Na-

tionalism in India, lecture delivered in America in 1916, published in the book Nationalism).

“ঘরে বাইরে”র সমসাময়িক যে ইংরেজী বক্তৃতার থেকে উদ্ধার করা হলো তার শেবাংশের “উচ্চতর সভ্যতা” ভারতীয় বা পাশ্চাত্য নয়, মানবিক। “আমরা” সেখানে বস্তু ও প্রোতা উভয় পক্ষ। বস্তু ভারতীয়, প্রোতা মার্কিন। আর যেসব মূলনীতির উল্লেখ করা হলো সেগুলি যে কোনো ধর্মশাস্ত্রের বা নীতি-শাস্ত্রের নীর বাদ দিয়ে স্ক্রী। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের উদ্দেশেও বলেছেন, ১৯১৬ সালে যা বলেছেন তা আজকের উদ্দেশেও বলা। আজকের রাশিয়াকে আমেরিকাকে ইংল্যান্ডকে ফ্রান্সকেও বলা। বোঁচে থাকলে কবিগুরু, আবার সেইসব কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

বর্জন তাকেই করতে হবে যা মূল-নীতিবিরুদ্ধ, যা অমানবিক, যা হৃদয়-হীন ও অসাড় করে, যা বৃহত্তর জীবনের মূল্য বিবাহত করে। তা পাশ্চাত্য বলে নয়, আধুনিক বলে নয়, পাশ্চাত্য বলেই বা আধুনিক বলেই কোনো জিনিস বর্জন করার কথা ওঠে না। কিন্তু কিছু গ্রহণ করব কি না সেটা নির্ভর করে তার গ্রহণযোগ্যতার উপরে। তার প্রাচীনত্বের উপরেও নয়। তার ভারতীয়ত্বের উপরেও নয়। তবে ভারত তার আত্মাকে হারাতে না, আত্মাকে দুর্বল হতে দেবে না, আত্মস্থ হবে।

পরাদীনতা থাকলেই তার গ্লানি থাকে। তার দরুণ জ্বালা থাকে। পরাদীনতা মন্দ। মন্দের অন্ত চাই। তার জন্যে সংগ্রাম করাই জগতের নিয়ম। কিন্তু পৃথিবীতে মন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভালোও থাকে। এমন কিছুও থাকে যা ভালোমন্দের দ্বারা বিশেষিত বা

নিঃশেষিত নয়। সেইজন্যে মন্দকে অগ্রাহ্য করতে গিয়ে সমগ্র রিয়ালিটিকে অস্বীকার করতে নেই! ভারত পরাদীন হলো, পতিত হলো নিরস্ত্র হলো, ভূগম্যনোবল হলো। চারিদ্রাঘ্ট হলো কিন্তু এই সব নয়। ভারত একরাষ্ট্র হলো, বহির্জগৎ হতে অবিচ্ছিন্ন হলো, আধুনিক যুগে পদাৰ্পণ করল, আলোকিত হলো, অগ্রসর হলো, বিকশিত হলো, নবজাত হলো, পুনঃসংস্কৃত হলো। ভারতকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, সে চ্যালেঞ্জের উত্তরে ভারত তার আত্মাকে না হারিয়ে নির্মোক্ষমুক্ত হলো, নবকলেবর ধারণ করল। পরাজয়-সত্ত্বেও সে অপরািজিত।

এত কিছু কি সম্ভব হতো যদি ইংরেজ শব্দ শত্রুতা করত? রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন তাকে শত্রুজ্ঞান করেননি, যদিও তার দৃষ্টিতে সমর্থনও করেননি। তার কাছে আবেদন নিবেদনও করেননি। তাঁর দৃষ্টি ইংরেজকে ছাড়িয়ে উনিবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসের উপর পড়েছিল। রোমান্টিসিজম ও লিবারল মতবাদের উপর পড়েছিল। তিনিও সেই মূল স্রোতের মীন ছিলেন। বাংলার বৃক্ষজলার মাছ হলে স্বাধীনভাবে বাড়তে ও সাঁতার কাটতে পারতেন না। ভাষ্যতের সরোবরের মৎস্য হলেও তাঁর গতি রুদ্ধ হতো, বৃদ্ধি বিবাহত হতো। এখন যে বহু শতাব্দীর পরে স্রোত ফিরে এসেছে এটা বহির্বিষয়ের সঙ্গে খাল কেটে সংযোগ ঘটানোর ফলে। স্বাধীনতা তাকে উদ্দাম করেছে। *

* শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।



বিবাহ ও উপহারে

এস, সি, সরকারের

গহনা

অঙ্কনকারী

কল-৩৪-২৫০৩

এস.সি.সরকার কোং

ভূমিপোষ

২৫-বি, বহাডুর স্ট্রীট-কলি-১২

১৬৭-বি, বহাডুর স্ট্রীট-কলি-১২

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু, রবীন্দ্রনাথ ॥

অমৃত সম্পাদক সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

একই কালে দুই কালজয়ী মহাপুরুষ স্বামীজী ও কবিগুরু একই আদর্শে উদ্ভূত হয়েও যে পরস্পর কি ভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, সেটাই আশ্চর্য। গত ৪৪ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় “স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ” আলোচনা কালে এ বিষয়ে আলোকপাত করে একটা সংশয় দূর করেছেন। আমি তাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় এক জায়গায় লিখেছেন—“একটা তত্ত্বগত না হলেও পদ্ধতিগত বিধা, মন্বদ ও কুণ্ঠা ছিল যা এঁদের উভয়কে পরস্পরের অন্তরঙ্গ করে তুলতে পারেনি।” আমার মনে হয় এ জায়গায় আর একটু পরিষ্কার করলে ভাল হয়।

একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন কবি হার ধর্ম আমার মনে হয় স্বেত বা অস্বেত নয় কিন্তু “That Light whose smile kindles the Universe” সেই উপলব্ধিকে ভাষায় রূপ দিয়ে ছন্দ-মধুর করে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করাই কবির ধর্ম। তাই তো রবীন্দ্রনাথ জগতের সৌন্দর্য আর প্রিয়-জনের মাদুরের মধ্য দিয়েই সেই সচ্চিদানন্দের প্রকাশ দেখতে চান। তাঁর কাছে—

“অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভির মন্দির স্বাদ.....।”

তিনি দেশবাসীকে উদ্ভূত করেছেন কাব্যের মধ্যে দিয়ে।

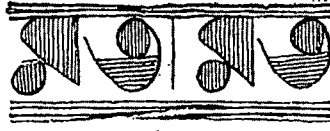
“এই সব শ্রান্ত শব্দক ভণ্ডন বুকে
ধনিয়া তুলিতে হবে আশা.....।”

কিন্তু বিবেকানন্দ দেশবাসীকে উদ্ভূত করেছেন কর্মের মধ্যে দিয়ে, সেবার মধ্যে দিয়ে। এই সেবা ও কর্মের মধ্যে দিয়েই আসবে মিলন, ত্যাগ, ঐক্যবোধ। শব্দ দেশকেই মূর্ত্ত করা নয়, নিজেকেও মূর্ত্ত করা সেই সত্ত্ব।

। “পাশমুগ্ধ সদা শিবঃ।”

তিনি বেদান্তকেশরী, তাঁর কাছে ‘জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য।’ সবই মায়ী।

সে সময়ে দেশেও শিক্ষিতের সংখ্যা নামমাত্র ছিল—বলা যায়। সুতরাং ঐ অবস্থায় সাহিত্য বা কাব্যের মধ্যে দিয়ে ভারতবাসীকে উদ্ভূত করার সার্থকতা হয়তো মনে নিতে পারেননি স্বামী বিবেকানন্দ। মানুষ একই কল্পনাপ্রধান, তার ওপর কাব্য তাকে তার ডানায় বসিয়ে নিয়ে যায় আরও দূরের ভাবলোকে



কর্ম যেখানে হয় ব্যাহত। নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি, শক্তি ও সত্তা তখন হারিয়েছে দেশবাসী। সব যেন পগু হয়ে পড়েছে দাসত্বের চাপে। তাই স্বামীজী গর্জন করে উঠলেন, “উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাণ্য বরণ নিবোধত।” ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুধর্মের রক্ষা এবং প্রচার ও নতুন ভারতের জাগরণ তখন একান্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি বলতেন, “ধনী ও পণ্ডিত দেশের শোভামাত্র। দেশের বাহার বলতে পার।” তিনি তখন ‘আপন প্রচণ্ড বাঁধের দ্বারা এদেশের নিবীষদের জাগ্রত করে তোলবার জন্য অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন।’ তাছাড়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে যে অমৃতসাগরের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তার কাছে কাব্য ও কাব্য-প্রতিভা হয়তো ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি কবির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগোতে পারেননি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিমনে বিবেকানন্দের উদ্দীপ্ত বাণীর যে প্রতি-ক্ষিয়া হয়নি তাই বা বলি কেমন করে? কবিগুরুর কুণ্ঠা ও বিধা ছিল। হয়তো কবিমনের কোনো কোমল স্তরে আঘাত লেগেছিল। সেই কোমল মীড়ের টানে মন্বদ ছিল—একদিকে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের অন্য দিকে অভিমানের। কারণ বিবেকানন্দের জীবিতকালে তাঁর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কিছু লিখেছেন বলে জানি না। তবে বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর একাধিকবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিষয়ে লিখেছেন।

একথা হয়তো বলা চলতে পারে যে আরও পরিণত কালে স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত থাকলে কবিগুরু বিবেকানন্দের হাত ধরে এগোতে পারতেন অনায়াসে। কারণ শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন...“তিনি এদেশের লোককে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলের মধ্যেই ব্রহ্মশক্তি আছে, দরিদ্রের মধ্যেই দেবতা তোমাদের দেবা চান...তঁর বাণী বখনই মানুষকে সন্মান দিয়েছে তখনই শক্তি দিয়েছে...” একথা রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের জীবিতকালে বলতে পারেননি।

এবিষয়ে আরও কেউ আলোকপাত করলে উপকৃত হব। ইতি—কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য, গৌরঙ্গপুর।

॥ শিশু শিক্ষার তামাসা ॥

অমৃত সম্পাদক সমীপেষু—
মহাশয়—

আপনাদের গত ৯ই মার্চ সংখ্যায় সম্পাদকীয়ে শিক্ষা বিষয়ে সমরোপযোগী মন্তব্যে বিশেষ আনন্দিত হলাম। বস্তুতঃ আপনাদের মত সংস্থাই হচ্ছে জনমতের ধারক ও বাহক। আপনাদের সমালোচনার মাধ্যমেই দেশের নীতি নির্ধারিত হয়। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে বিস্ময়-কর অযোগ্য শিক্ষকতার কয়েকটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানাতে চাই। আশা-করি অপ্রাসংগিক হবে না।

দু’বৎসর আগে আমার মেয়ে কলকাতায় এক প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ২য় শ্রেণীতে পড়ত। সে একদিন স্কুল থেকে কিছু রংগীন সূতা, একটা সূচ ও এক টুকরা চট নিয়ে এসে বলল, কাপেট বুনতে হবে। প্রশ্ন করে জানলাম সেলাইয়ের ‘অ-আ-টাও’ স্কুলে শেখানি। বছরের শেষ দিকে মেয়ে বলল দিদিমাণি বলেছেন মা, দিদিকে দিয়ে যাহোক কিছু করে নিয়ে যেতে। তুমি কাপেটটা তড়াতড়া করে দাও আমাদের স্কুলে ইন্সপেক্টর আসবে। একটা কিছু করে দিলাম বটে এবং স্কুলে ওদের সেলাইয়ের নামও হয়েছিল শুনিয়েছি কিন্তু এই কি শিশুশিক্ষা পদ্ধতি!

বর্তমানে আমি ২৪-পরগণার একটি মহকুমা সহরে আছি। সেখানকার কয়টি ভয়াবহ নমুনা দিচ্ছি। নবম শ্রেণীর এক আত্মীয়-কন্যার কাছে জানলাম ‘নটী’ শব্দের অর্থ “যে সমস্ত মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়।” আমার মেয়ের শিক্ষিকা পড়াচ্ছেন কলকাতায় ১৩ তলা বাড়ী আছে। মেয়ে বললে আমেরিকাতে আরো অনেক বড় ১৫০ তলা বাড়ী আছে। শিক্ষিকা বললেন কেন বাজে কথা বলে! ১৫০ তলা বাড়ী কখনো হয়? তাহলে নটীর তলাগুলো মাটির তলায় বসে থাকে না? আরেকদিন মেয়ে বলছে বাদুড় ডিম পাড়ে না—ওদের বাচ্চা হয়। শিক্ষিকা বললেন—যাঃ তা কখনো হয়? বাদুড় তো পাখী—ওরাও ডিম পাড়ে। অন্য একদিন মেয়ে গৃহপালিত পাখীদের মধ্যে হাঁসের নাম বলে এক ধমক খেল। মেয়ের খাতায় ভুল অংক দেখে বললাম রূপে সব দেখাওনা কেন? বললে দেখতে চায় না শব্দ করে নিয়ে যেতে বলে। আর পড়ার ব্যাপারে সব বাড়ী থেকে জেনে এসে—এটা তো এখন বলতে গেলে প্রবাদেই দাঁড়িয়ে গেছে।

তবুও দেখুন এই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার হাতেই সন্তানদের শিক্ষার ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে বসে আছি তারা একদিন বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার হবে ও দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গঠন করবে। ইতি ভবানীয়া—জনৈক্য অভিভাবিকা প্রতিমা বসু, বারাসত।



শীতের সন্ধ্যায় কম্বল পায়ে ওপর চাপিয়ে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বসে ভাবছিলাম, ঠিক এই সময় সেই পাহাড়ী ছোট শহরটির মাইল দেড়েক বাইরে সেই নালার ধারে ছোট ভাঙা টিনের ঘরে বসে কাচা কাপড় ভাঁজ করতে করতে রাজলক্ষ্মী ধোপানী নিশ্চয়ই নিদারুণ শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। তার কণ্ঠের কথা স্মরণ করে একটা মানসিক বিলাসে আরামে সিগারেট ধরলাম।

রাজলক্ষ্মী ধোপানী, তবু ওর কথাটা ভুলতে পারিনি।

সেদিন সন্ধ্যার ঘোর অন্ধকারে ওর ঘরে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তা যেমন ভরাবহ, তেমন বিস্ময়কর।

কয়েক মাস আগে সাঁওতাল পরগণার ছোট পাহাড়ঘেরা শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে মাসীমা, মাসতুতো বোন আর ছোট একটি মাসতুতো ভাই। পাথুরে রাস্তা নীচু হয়ে আবার পূর্বদিকে যেখানে চড়াই হয়ে উঠেছে, সেখানেই আমাদের বাসা। সামনে ছোট বাগানের এক কোণে মস্ত ইন্দুরা। বাগানে কিছু বুনো ফুল-গাছ আর গোটা কতক মস্ত পাইন গাছ।

বিকলে অল্প শীতে একটা চাদর-মুড়ি দিয়ে বারান্দায় বসতাম প্রায় রোজই। কোনো আরামপ্রিয় স্বভাব বরাবর। বেড়াতে বেরোলে পা-দুটো এত বেশী চলে যে, চোখের দেখাটা তেমন মন দিয়ে দেখা হয় না। তাই বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে নীরবে নিশ্চিন্তে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগত। তাতে যেটুকু দেখা হয়, মন দিয়ে, শব্দে চোখ দিয়ে নয়।

চলতে চলতে দেখা আর স্থির হয়ে বসে দেখার ভেতর যে তফাত আছে, সেটা মাসতুতো বোন সন্ধ্যাকে কোনমতেই বোঝানো যেত না।

সন্ধ্যা বলতো—ও তোমার ছুতো। আসলে কুঁড়ে স্বভাব তোমার।

তা যদি হয়, তাই।

সন্ধ্যা আরও চটতো।—যদি-টিদি নয়, যা বলচি ঠিক। তুমি আজ আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে দ্যাখো!

হেসে বলি,—কি করে দেখব? বাইরে বেরোলে দেখা আর হবে না। তোমরা যা বেড়াতে বেড়াতে দেখো, তা দেখো না, চোখ বোলাও।

তবে যা খুশি করো। আমরা একটু চোখ বুলিয়ে আসি চারদিকে। চলো মা।

মাসীমা ওদের নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যান।

চুপ করে বসে থাকি চেয়ারটার ওপর। বাড়ির পশ্চিম দিকটা ফাঁকা। সামনে একটা টিলা। বেশ উঁচু। কিছুক্ষণ সবুজ আগাছার ঘেরা পাথরের চিবিটি আমার দেখতে বেশ লাগে। সূর্যটা যখন পশ্চিমে হেলে পড়ে, একটা মস্ত ইস্পাতের কড়ার মত চিবিটা ঝকঝকিয়ে ওঠে। যেন নিজের ধারালো কাঠিন্যকে এই সময়টাই ঠিক-ঠিক প্রকাশ করতে পারে। চারদিকের লাল মাটি আর আগাছার ধূসরতার ভেতরে জীবন্ত জ্বলন্ত বালু মনে হয় ওই পাথরের চিবিটাকে। এটা কবির কিনা জানিনে, তবে এটা আমার কাছে সে সময়ে সত্য বলে মনে হয়েছে।

—বাবু!

মুখ ফিরিয়ে তাকাই।

—আপ লোগকা কাপড়-উপোড় ধোবিখানামে যাবে?

একটা কাপড়ের বড় পোটলা হাতে সামনে এলো। ধোপানী। সূর্যগত দেহে যৌবনের কাঠিন্য ঠিক ওই পাথরের চিবির মত উজ্জ্বল, জ্বলন্ত। পোটলাটি বারান্দার ফেলে কপালের ওপর থেকে

চুল সরায়। ফিকে নীল পাড়-হীন এক-খানা পাতলা কাপড় পরনে, তলার সায়া নেই। পশ্চিমের ঢলেপড়া সূর্যের আলোর ওর লম্বা পা দুখানার আশ্চর্য গঠন স্পষ্ট চোখে পড়ে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, চোখ ফেরান যায় না। এই বিহারী ধোপানীর লম্বা মাংসল দেহখানি যে কোন বাঙালী মেয়ের স্বর্গার-বস্তু হতে পারে।

আমার মনুষ্য চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে ফিক করে হেসে ফেলে।

আমাকে লজ্জা পেতে হয়। একটু কেসে। বলি,—যাবে, কাপড় যাবে। মস্জিদী বাড়ি নেই। একটু বোস, এখনি হয়তো এসে পড়বে।

ধোপানী আর একবার হাসে। দাঁত-গুলো ভাল নয়। অনেকটা মাড়ির নীচে ছোট ছোট দাঁত, দোড়াপাতায় দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কালো ছোপ। হাসলে কালচে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে।

হাতদুটো তুলে চোখের পাতাদুটো ঘসে। দোরে দোরে ঘুরে চোখে হয়তো জ্বালা ধরেছে। চোখে পড়ে হাতে উল্কি। নীল রঙের উল্কির নীচেই রূপোর ময়লা-জমা করেক গাছা চুড়ি।

চোখদুটো মোছবার সময় রকের নীল কাপড়ের আঁচল খসে পড়তেই হাত নামিয়ে আঁচল পিঠের ওপর তুলে দিয়ে হাসে। হাসিটা মোটেই সাদা-সিঁদে নয়। যেন কিছু একটা বলতে চায়।

আমি প্রায় ঘেমে উঠি। পাহাড়ী শাঘিনীর সামনে পড়ে রীতিমত ভয় পেয়ে শাই।

ওর পরনের পাড়-হীন নীল কাপড়-খানা বেশ দামী। নিশ্চয় কোন আধুনিকা হাওয়া-বদল-কারিগীর ধুতে-দেয়া কাপড় পরেছে ও। ভয়েলের এমন শাড়ি ও পারে কোথায়।

নয়তো হাওয়া-বদল করতে এসে কোন বাবু ওকে দিয়ে গেছে কিনা কে জানে?

চোখদুটো খুব ডাগর নয়, বরং ছোট বলা চলে, কিন্তু গ্লান বিষণ্ণতায় ভরা। এমন ঘোঁবনবতীর এমন বিষণ্ণ চোখ বড় বোমানান ঠেকে।

বিষণ্ণতার ভেতরে একটা হিংস্র লোভানী মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। তাকানটা বড় অশুভ। বিষণ্ণ অথচ সময়ে সময়ে হিংস্রতার তীক্ষ্ণ।

এমন চোখ আমি অতি অল্প মেয়ের দেখেছি।

সিঁথিতে মেটে সিঁদুর। বিবাহিতা।

ও আবার তাকায়।—বাবুজী বাহার গিয়া নোহি। আপকা বেমারী হইয়েছে?

একটা অস্বস্তি বোধ করে হাই তুলে বলি—না। বেমারী কিছু হয়নি। এমনি বেরোইনি।

—এখানে সোবাই বাহার যায়। তোমার মোতো বাত্ হামি শুনিনি।

বলেই হেসে ফেলে।

তা আর কি করা যাবে! আমার কথাটা যদি ওর কাছে নতুন লাগে তা কি আর করা যাবে? বেরোতে ভাল না লাগলেও যে বেরোতে হবে এমন কোন কথা নেই।

একটু হেসে চুপ করে থাকি।

ও গা দোলাতে দোলাতে বলে,—আপনি কি পোড়েন?

ওর ভাঙা ভাঙা বাংলা শব্দে মন্দ লাগে না।

বলি,—হ্যাঁ, লেখাপড়া করি।

লেখাপড়া করেন। হামার ঠিক মালুম হইয়েছে।

ঠিক ধরে ফেলেছে। নিজের বুদ্ধির তারিফে নিজেই গা দোলায় আর হাসে।

হাসিটা ওর ভাল লাগে না। প্রায় আধ ইঞ্চি মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। তা ছাড়া হাসিটার যেন অন্য অনেক মানে আছে, মনে হয়। হাসির পরিষ্কার মানেটা না বুঝলেও এটা বুঝি যে হাসির মানেটা খুব ভাল নয়।

একটা আদাজ করে নিই মনে মনে। মেয়েটা নিশ্চয়ই খারাপ। হাওয়া-বদল-কারী বাবুদের ধরে কিছু পরসে রোজগার যে করে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

মেরোটি নষ্ট ভেবে মনে মনে রীতি-মত উৎসাহিত হই এটা ঠিকই, কিন্তু সাহস কম তাই ভয় করে। মধ্যবিস্তৃত ঘরের রোম্যান্টিক ছেলে। একটু আধটু প্রেম-ট্রেম করে থাকি। তাও জোলো-জোলো প্রেম। এই পর্যন্তই।

এমন একটি দুঃসাহসিক বিহারী মেয়ের সান্নিধ্যে এসে প্রথম ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। বাঙালী মেয়েগুলো নিতান্তই কোকিলের জাত। মিষ্টি

বুলি বলে। চেপে ধরলেই কাঁ কাঁ ডাক ছাড়ে। এ মেরোটিকে যেন অজগর বলে মনে হয়। ধরে গিলবে, শব্দ হবে না একটুও।

এমনি সব ভাবনা আসছিল মনে। বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম ভেতর ভেতর।

খুব সাহস করে আলাপ জমাবার মামুলী ফরমূলা। অনুযায়ী বললাম,—তোমার নাম কি?

রাজলক্ষ্মী। খুব ভাল নাম। তোমি কি বোলেন?

ভালই। কোথায় থাকো?

কালীকাছা। এ শহর থেকে এক কোশ তফাতে। উই মনিয়া পাহাড় আছে, তোমি জানে?

ঘাড় নাড়ি। না জানলেও ঘাড় নাড়ি।

উ পাহাড় সে একদম বরাবর বদল পড়ে গা। তাহে একটা নাল্য দেখা যাবে। উধার হামার ঘর।

খুব বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলি,—হুঁ।

আপলোগকা ঘর কাঁহা?

কলকাতায়।

কলকাতা। হামার একবার যেতে ইচ্ছা করেন।

ও খুব হাসতে থাকে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসে। বারান্দাটা বেশ অন্ধকার হয়ে আসে।

আমার কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। অন্ধকার বারান্দায় এমন একটা যৌবনের এত কাছাকাছি বসে থাকা কখনো অভ্যাস নেই। ভয়টা সেই জনেই। তার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা উত্তেজনার আরামও পাচ্ছিলাম না এমন নয়। দুর্বল মনে সে উত্তেজনা ভয়ে ঢাকা পড়োঁছিলো।

সাহস নেই একেবারে। বলি,—অন্ধকার হয়ে এলো। তুমি না হয় কাল এসো।

না। আমি আজ কাপড় লিয়ে যাবে।

যেতে হবে অনেকটা।

ও কথা বলে আমার কাছে সরে আসে। অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়ছে। নিজের বুদ্ধির শব্দ নিজে

শুনতে পাই। কি চায় মেয়েমানুষটি।
অন্ধকারে আমার এত কাছে আসতে চায়
কেন?

আন্ধারের ভয়ে উঠে পড়ি চেয়ার
থেকে।—কই ওরা তো এখনো আসছে
না।

বলতে বলতে বারান্দার পশ্চিম
কোণে চাঁল ওর কাছ থেকে বেশ খানিকটা
তফাতে। টেরিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখি
রাজলক্ষ্মী চেয়ারের কাছে দাঁড়ায়।

হঠাৎ বলে,—তবে আমি চলে যাব
বাবুজী?

আমি কিছু বলবার আগেই গেটের
সামনে জড়তোর শব্দ পাই। মাসীমারা
এসেছেন।

হাব্দুল আছিস?

বলি,—হ্যাঁ মাসীমা, আসি।

মাসীমা, সন্ধ্যা ওরা সবাই এসে
যেন কৈফিয়ত দেবার মত বলে ফেলি,—
একটা ধোপানীকে বসিয়ে রেখেছি। জামা-
কাপড়গুলো এত ময়লা হয়েছে। সব
কাচতে দিয়ে দিন।

ভাল করেছিস।

মাসীমা, সন্ধ্যা ওরা সবাই এসে
পড়াতে আগের স্বস্তি অনেকটা ফিরে
পাই। রাজলক্ষ্মী আর একটা কথাও
বলে না। কাপড় নিয়ে ঠিকানাটা বলে
দিয়ে চলে যায়।

ও চলে যাবার পর আমার আফসোস
আরম্ভ হয়।

পরদিন বিকেলেও বারান্দায় একা
একা বসে আফসোস করছিলাম। এমন
সুযোগ কি মানুষের জীবনে দুবার
আসে। কলকাতার ছেলে—হাব্দুলচন্দ্র
আমি। এমন সুযোগ হারিয়েছি শুনলে
বন্ধুরাই বা বলবে কি? বেড়াতে এসে
এমন একটা জীবন্ত রোমান্সের সুযোগ
হারলাম।

এমনও তো হতে পারে যে রাজ-
লক্ষ্মী হয়তো খারাপ নয়। প্রথম
দর্শনেই আমার প্রেমে পড়েছে, তা যদি
হয়ে থাকে, তবে ওকে এমনভাবে এড়িয়ে
যাওয়াটা আমার অপরাধই হয়েছে।

আর কি ও ফিরে আসবে। এঁক
বাঙালী মেয়ের ছাতে, বারান্দার প্রেম,
না বড়জোর কলেজের কফি হাউসের
প্রেম। রাজলক্ষ্মীর মনোভাব কত সহজ
সতেজ। ওর মত এগিয়ে আসতে কটা
মেয়ে পারত!

এমনি সব অশুভ কল্পনা করে মনে
মনে যত তৃপ্ত হচ্ছি, তত আফসোস
করছি।

ঠিক এমনি সময়ে গেটে আবার
রাজলক্ষ্মীকেই দেখলাম। সোজা বারান্দার
দিকে আসছে।

আজ তো আমাদের এখান থেকে
কাপড় নেবার কথা নয়, আজ আবার
আসছে কেন?

মনে আবার সন্দেহ আর ভয় এসে
দানা বাঁধে।

বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে সোজা বারান্দার
ওপর উঠে আসে রাজলক্ষ্মী।

তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফেরাই,
যেন ওকে দেখতেই পাইনি।

এসে পোটলাটা নামিয়ে বসে পড়ে
রাজলক্ষ্মী।

অগত্যা মুখ ফিরিয়ে ফ্যাকাশে
একটু হেসে বলি,—কি ব্যাপার?

মাইজী, আজ দোঠো কাপড়া দেবে
বোলোছিলো।

তাই নাকি?

তা হবে। কাপড়গুলো মাসীমা
যখন ঘরে দিচ্ছিলেন, তখন আমি
বারান্দার পশ্চিম কোণে এসে দাঁড়িয়ে
সিগারেট খাচ্ছিলাম। হয়তো মাসীমা
আর দুখানা শাড়ি আজ দেবেন বলে-
ছেন। কি দরকার ছিল বলবার? আর
দুখানা শাড়ি না হয় কলকাতায় গিয়ে
কাচিয়ে নেয়া যেত। মাসীমার যত
কাপড়!

মাসীমার ওপর একটু রাগ হয়।
উনি না বললে তো রাজলক্ষ্মী আবার
আজ আসতো না। এসে আমাকে
আবার এক অস্বস্তিতে ফেললে।

এইমাত্র ভাবছিলাম রাজলক্ষ্মী
এলে কত ভাল হয়, কিন্তু
আসামাত্র মনটা বিরূপ হয়ে
উঠল। ওর সতেজ ভঙ্গী, ওর
ভীষণ যৌবন ভাবতে ভাল লাগছিল,
উদ্ভেজনার আরাম বোধ হচ্ছিল। কিন্তু
সশরীরে এসে পড়াতে কেমন একটা ভয়
অস্বস্তি পেয়ে বসল আমার।

বাবুজী!

চমকে মুখ ফিরিয়ে বলি,—এ্যা,
কিছু বলছ?

ও হাসে। বলে,—আপকা শাদী
হয় নাই?

এবারে আমি একটু হাসি। না,
আমাদের এত অল্প বয়সে বিয়ে হয়
না। তোমাদের বোধ হয়?

হ্যাঁ। আমার দশ বরষ হইল শাদী
হইয়েছে।

দশ বছর। তোমার ছেলেপুলে
কিটি?

এতক্ষণে একটু স্বস্তি পাই।
আলাপটাকে সাধারণ সাংসারিক দিকে
ঘোরাতে পেরেছি। যদিও এ ধরনের
আলাপ সম্পূর্ণ মেয়েলী। আমার
কোনকালেই এ রকম আলাপে খুব
উৎসাহ নেই। তবু ওর সঙ্গে একমাত্র
সাংসারিক আলাপ করলে হয়তো বা

উত্তরসূরী

কবিতা সংগীত শিল্পচর্চা ও সমালোচনার ত্রৈমাসিক মন্থপত্র

প্রবন্ধাবলী : ধ্বজীপ্রসাদ মুনোপাধ্যায় (পদ্মনন্দন), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
ত্রিদিব ঘোষ, অরুণ ভট্টাচার্য, শংকরানন্দ মুনোপাধ্যায়,
বিমল কর, সনৎকুমার গুপ্ত।

কবিতাবলী : অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কিরণশংকর মেনগুপ্ত,
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার
সরকার, বীরেন্দ্র গুপ্ত, গোবিন্দ মুনোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ
চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, শংকরানন্দ
মুনোপাধ্যায়, শোভন সোম, মানস রায়চৌধুরী ও তরুণতর
কবিদের কবিতা।

বিদেশী কবিতা : মণীন্দ্র রায়, মণ্ডলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ দে প্রভৃতির
সেক্সুপীয়র, রুশ কবিতা, জাপানী কবিতার অনূবাদ।

আলোচনা : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মিহিরকুমার গুপ্ত, অরুণ দত্তগুপ্ত
প্রভৃতি।

সম্পদ স্টলে পাওয়া যাচ্ছে ॥ দাম এক টাকা

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৯বি-৮, কলিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০

অবাঞ্ছিত আলাপ থেকে রেহাই পাব, এই জন্যে খুশী হই।

অবাঞ্ছিত কথাটা বোধ হয় একটু ভুল বললুম। মনে মনে ওর কথাবার্তাগুলো ভেবে খুশী হই, শুধু খুশী নয়, মনে মনে খুব কামনা করছি, কল্পনা করছি, ও এর চেয়েও বেশী জোরালো অভদ্র কথা বলছে, আমি মনে মনে শুনে উল্লসিত হছি। কিন্তু সামনে এলে কোন অভদ্র অশালীন ব্যবহার করে বসবে বা কথা বলে বসবে, এইটাই যেন আমি কোনমতে সহ্য করবার সাহস পাচ্ছি না।

নিজেই ভেবে অবাক হই, তবে কি আমি মনে মনে অভদ্র—বাইরে ভদ্র। শালীনতা, নীর্তবোধ এগুলো অভ্যাস মাত্র, আসল স্বভাব কি তবে বন্য নীর্তির চেয়ে একটুও ওপরে নয়?

ভারী আশ্চর্য তো!

রাজলক্ষ্মীর আয়নায় নিজের একটা অন্যরূপ দর্শন হোল।

আমি কলকাতার হাবদুলচন্দ্র। শিক্ষায় সভ্যতায় এই ছোটলোক ধোপানী মেয়েটার চেয়ে কত ওপরের তলায় বাস করি। কিন্তু মনে মনে আমি রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কত ওপরে বাস করি, সেটা দেখতে গিয়ে দৃষ্টিটা ঝাপসা তৈর্যে। ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না।

লেডকা-উডকা হামার নৈই।

রাজলক্ষ্মী বলবার সময় মাথাটা একটু নীচু করে।

লজ্জায় নয় নিশ্চয়ই। লজ্জা পেতে রাজলক্ষ্মী জানে না। নিশ্চয়ই বিষমতায় বা আক্ষেপে! ঠিক বঝলাম না। কেন না পরক্ষণেই ও হেসে ফেললে—লেডকা হামি চাই না। বহু ভল আছি।

একটু থেমে বলে,—লেডকা হোলে কানা, বোবা হতে পারে তো?

আমি হেসে ফেলি,—তা কেন হবে? তোমার এমন চেহারা!

ফিক করে হেসে ফেলে রাজলক্ষ্মী,—সৌন্দর্য! আপকা পছন্দ নৈই আছে। হামি সুন্দর নৈই।

ওর বিনয়ে উৎসাহিত হই।—তুমি ভুল বলছ। তোমার শরীরের ইয়ে মানে কি বলে ভেরী নাইস।

রাজলক্ষ্মী হেসে ওঠে।—নাইস।

ইংরেজি কথাটার মানে ও জানে না। তবে 'নাইস' মানে যে ভাল একটা কিছু, এটা বোঝে। অন্ধকারটা জমে আসছে। কালকের চেয়েও বেশী সময় কেটে গেছে। বাইরে এ দিকটার রাস্তার আলো আজ জ্বলেনি কেন জানি না, তাতে অন্ধকারটা যেন আরও বেশী মনে হচ্ছে।

মাসীমারা আজ আসতে দেরী করছে কেন তাও ঠিক বঝতে পারছি না।

রাজলক্ষ্মীর তো ভয় করবার কথা নয়! কালকেও তো ও একা একা গেছে।

আদমীর ভয় নৈই, বাংলা উই যে বোলে ভুত। ভুতের ভয় কোরে।

ভুত কোথায়?

উ মাঠের উধার একটা কুঠি আছে। হামরা জানে, ভুত থাকে উধার।

আরে ধুস!

বীরের মত উঠে পড়ি। যত সব কুসংস্কার। গেয়ো বলিষ্ঠ মেয়েটা



আপকা পছন্দ নৈই আছে। হামি সুন্দর নৈই।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ উঠে পড়ে। পোটলাটা হাতে তুলে নেয়। বাঁহাতি কাঁধের ওপর।

বাবুজী।

তাকাই ওর দিকে।

হামাকে একটু উই মাঠের উধারে লিয়ে যাবে? একটু ভয় করে।

কেন ভয় কি?

মানুষের ভয় করে না, অথচ প্রেতাত্মার ভয় করে। আশ্চর্য সংস্কার এদের। মাখে কি আর অশিক্ষিত গেয়ো বলে।

ওদের কুসংস্কারের অজ্ঞানতার কথা ভেবে মনে মনে একটা অনুকম্পা বোধ হয়।

ঠিক আছে। চলো।

বেরোই দুজনে। রাস্তাটা সত্যি আজ বড় বেশী অন্ধকার। ওর মূখটা

পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। নীরবে ও আমার পাশে পাশে চলছে। একটা কথাও বলছে না।

মাঠের ওপর উঠে পড়ি। নাঃ! অন্ধকারটা বড়ই বেশী। বুকটা কি একটু ছাঁৎ ছাঁৎ করছে! ধূস! যত দূর কুসংস্কার। রাবিশ চিন্তা।

মাঠের মাঝামাঝি চলে এসেছি। অন্ধকারটা ক্রমেই যেন চেপে ধরছে। একা একা ফিরব কি করে? বুকটার ভেতর কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে না? ধূস! যত সব কুসংস্কার!

বাবুজী!

ফিসফিসিয়ে ওঠে কানের কাছে রাজলক্ষ্মী। বুকের নবোতে ঢোল বাজল যেন। দূরদূর করছে বুক।

উদার দেখো।

সটান লম্বা ভাঙা বাড়টার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রাজলক্ষ্মী।
রাম - রাম - রাম - রাম— সত্যিই একটা সাদা মত কি নড়ছে চড়ছে। মাথাটা রিম-কিম করছে।
রাম - রাম - ধূস যত সব - রাম-
রাম—কুসংস্কার - রাম - রাম—যত
বাজে - রাম - রাম—আজগুঁবি।

রাজলক্ষ্মী অকস্মাৎ আমার হাতের ডানাটা ওর বুকে চেপে ধরেছে।
—বাবুজী!

কই ওর গলার স্বরটা তো এবার ভয়ের নয়? রাম - রাম—কি ব্যাপার। ওর নরম বুকের চাপে - রাম - রাম
কি গরম গা রাজলক্ষ্মী! -রাম - রাম—
বাবুজী!

রাজলক্ষ্মী দাঁড়িয়ে পড়েছে! কি আপদ! মাঠটা পেরোলে বাঁচি। রাম -
রাম - ও যে ওর দেহটা আমার পিঠে
চাপছে - রাম - রাম - বলা যায় না অপ-
দেবতা-টেবতা-ধূস! রাম - রাম - রাম—
যত সব কুসংস্কার— রাম - রাম—

ভাঙা হিন্দীতে রেগে বলে উঠি,—
ঠাড়া রহা কাঁহে। বেগসে চলো।
আরে!

রাজলক্ষ্মী ছাড়ে না। একি সাংঘা-
তিক মেয়েমানুষ। ও কি চায়! এই
অন্ধকার মাঠে ও কিসের প্রত্যাশা
করছে? ভাঙা বাড়টার নজর পড়ে।
সাদা একটা কি নড়ছে। রাম - রাম—
ধূসের। বস্তু গরম লাগছে—রাজলক্ষ্মী
করছে কি? একি! রাম - রাম!

ছোড় দেও। ছোড় দেও।

জের করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে
দৌড় লাগাই। সোজা দৌড়।

হাঁপাতে হাঁপাতে একেবারে বাড়ির
গেটের কাছে।

মামীমারা এসেছে। ঘরে আলো
জ্বলছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোকা
যাবে না। এ কথা কাউকে বলা
যাবে না। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে
জিরোতে থাকি। অনেকটা জিরিয়ে
স্বাভাবিকভাবে হাসি-হাসি মুখে ঘরে
ঢুকব।

* * *

দিন দশেক কেটে গেছে। কদিন
ধরে ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।
আকাশটা মেঘলা। সূর্যের দেখা নেই।
আলোর দেখা নেই। একটু যেন শীতও
পড়ছে। মুড়ি-সুড়ি দিয়ে ঘরে বসে
দিন কাটাই। সাইকেল-রিপ্তা করে
বাজার যাই। এ ছাড়া আর বাইরের
দিকে পা বাড়াইনি।

কটা দিন বসে বসে ভেবেছি। ভেবেছি
রাজলক্ষ্মীর কথা। সেদিনের ব্যাপারের
মানোটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।
ভূত-টুত সব বাজে। ওটা রাজলক্ষ্মীর
একটা ভাঁওতা। আসল উদ্দেশ্য রাজ-
লক্ষ্মীর অনেক দেবীতে বুদ্ধিতে পেরে
মনে-মনে কপাল চাপড়াচ্ছি।

কোন সতেজ যৌবনের এর চেয়ে বলিষ্ঠ
আহবান আর কি হতে পারে। অপূর্ব
সাহস রাজলক্ষ্মীর। তেমনি বুদ্ধি!
কেন যে আমি উদ্দেশ্যটা তখন ধরতে
পারিনি। ভূত-টুত বাজে ঠিকই।
যত সব কুসংস্কার।

কিন্তু তখন, ওর অন্য উদ্দেশ্যটা
কোন মতেই আমার মাথায় এলো না।

এমন সুযোগ কি জীবনে
আর আসবে? এমন নিটোল যৌবন কি
কখনো এত কাছে পাব?

বিয়ে হবে হয়তো এক রুদ্র বি-এ,
বি-টি মাস্টারনীর সংগে। শিক্ষিত
হাদুলচন্দ্র এক রুদ্র সভ্য জোলো
যৌবন নিয়ে জীবন কাটাবে!

অথবা কোন লাজুক রোমান্টিক
মেয়ে এসে জুটবে জীবনের
কোন কোন অধ্যায়ে। এমন
বেপরোয়া যৌবন আর কি পাব?
আফসোসে মৃতপ্রায় হয়ে রইলাম
কদিন।

এদিকে যতই দিন যেতে লাগল
মাসীমা ততই উদ্ভবন হয়ে উঠতে
লাগলেন। আজ বাদে কাল আমরা
কলকাতায় রওনা হবো। ধোপানীর
পান্ডা নেই। কাপড় কাচতে যে
তেরো দিন লাগে এ তো কখনো শূনি
বাপু! যা না হাবুল, ধোপানী-
মাগীর বাড়ি একবার ঘুরে আস।
কাপড়গুলো শেষ অব্দি খোয়া যাবে?

যাচ্ছি-যাবো যাচ্ছি-যাবো করে
দুদিন কাটালুম। আর তো কাটে না!

সত্যিই তো আমরা কাল রওনা হবো।
আজ বিকেলে একবার যেতেই হয়।

মনে মনে একটু ভয়ও হচ্ছে। রাজ-
লক্ষ্মীর স্বামী আছে নিশ্চয়ই। বেশ
জোয়ান স্বামী। তাকে যদি আমার
নামে কিছুর বলে থাকে, তবে বিদেশ-
বিভূয়ে বেদম মার খেতে হবে।

কি করা যায়! মাসীমা তো বাড়িতে
তিশ্তোতে দিচ্ছেন না। যেতেই যখন

কোন বাড়তি খরচ নেই

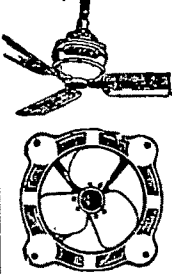
সপার ডি লুক্স

মার্ক'ন ফ্যান

সহজ মাসিক কিস্তিতে নিন
মার্ক'ন ইলেকট্রিক করপোঃ
(প্রাঃ) লিঃ

ফোন : ৩৫-৩০৪৮
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সকাল ৭টা হইতে রাাত্রি ৮টার মধ্যে যোগাযোগ করুন।




হবে। কপাল ঠুকে যাই। মার যদি খেতেই হয়, উপায় নেই।

ছোট মাসতুতো ভাইটাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। তবু একটু ভরসা।

বিকেলের দিকে ঠিকানাটা নিয়ে রিক্সা নিয়ে রওনা হলাম।

প্রথমে রাস্তা অনেকটা সোজা, শহরের প্রান্ত পর্যন্ত। তারপর শব্দ হোল দুধারে জঙ্গল আর পাথুরে উঁচু-নীচু পথ। চলছি তো চলছি। পথ আর ফুরোয় না।

সামনে অস্পষ্ট বিরাট পাহাড়টার দিকে সূর্য হলে পড়েছে। রক্তিম সূর্য স্তিমিত হয়ে আসছে।

রিক্সাটা একটা সরু রাস্তার সামনে দাঁড়াল।

ইবার আপ খুঁজে লিবেন বাবু। গাড়ি আউর যাবে না। হামি এখানে আছি। ভাইটার হাত ধরে রিক্সা থেকে নেমে পড়ি। বছর আটেক বয়েস ওর, খুব চটপটে ছেলে। ওরই ওপর ভরসা করে এগোতে থাকি। কালীগছা পড়া। খুঁজে বার করতে হবে রাজলক্ষ্মী ধোপানীর ডেরা।

এদিকটায় বস্তির মত সব ঘর। মাটির দেয়াল। ওপরে কোথায় টিন, কোথায় পুরোনো টালি।

আশে-পাশে রীতিমত জঙ্গল। কি বিপদে যে পড়লাম আজ। এদিকে আবার অন্ধকার হয়ে আসছে। বৃষ্টিতে পথ পিছল—লাল মাটির এটেল কাঁসা আর জলে।

খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। একজন বললে, ওই নালাটা পার হয়ে রাজলক্ষ্মী ধোপানীর ঘর।

জঙ্গলের জমিটা নীচু হয়ে একটা নালায় মিশেছে। নালায় জল নোংরা, কিন্তু স্রোত রয়েছে। কে জানে কোন পাহাড়ী নদীর সঙ্গে এর যোগাযোগ রয়েছে কিনা?

নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। ভাইটাকে আগে নামিয়ে দিই। কে জানে নালাটার কোথায় কি আছে। ভাইটাকে বলতেই ও নেমে পড়ে। সোজা পার হয়ে যায় কিন্তু ওর হাফ প্যান্টটা ভিজে যায় অনেকটা। এসে কাপড় হাটুর ওপর তুলে সন্তপণে নালাটা পার হয়েই একটা বাড়ির উত্তোনে এসে পড়ি। পুরোনো ইঁটের দেয়াল।

ধুসে-পড়া মাটির পলাস্তারা। ওপরে টিন। ঘরখানার বারান্দায় বসে এক জোয়ান বড়ো বিহারী লোক লম্বা ধাঁচের একটা বিড়ি টানছে।

জিজ্ঞেস করি—রাজলক্ষ্মী ধোপানীর বাড়ি এটা।

বড়োর চোখদুটো বড় বড়, রাঙা। তাকানিটা অত্যন্ত রুদ্ধ। ঘড়ি-ঘড়ে গলায় বলে,—কাঁহে? কি চাই?

আমাদের কাপড় নিয়ে এসেছে। আমরা কাল চলে যাব। তাই—

বড়ো উঠে পড়ে—আসুন। ভিতরে আইয়ে। বিস্কি জেনো যেতে পারে নেই। কসদুর মাপ করবেন বাবু।

একটু সাহস হয় এবার।

ভেতরে ঢুকি। সর্বনাশ। এ যে অন্ধকার পুরী। একটা ফোকর পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। স্যাতসেঁতে একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

বাঁ দিকে একটা বাঁশের মাচার ওপর স্তূপাকার নোংরা কাপড়।

বড়ো একটা অশুভ ধরণের লম্বা ল্যাম্পো জ্বালায়। আলোর চেয়ে কেরোসিনের শীষের ধোঁয়া ওঠে বেশী।

বারান্দার এক কোণে একটা লোক গামছা পরে বসে রয়েছে।

লোকটার চোখদুটো আরও বড়—লাল। গালভর্তি দাঁড়ি। হাতদুটো কনুই থেকে উলটো দিকে বাঁকা। কেমন যেন জজুখুবু ধরণের লোকটা।

আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে অন্ধকার ঘর থেকে রাজলক্ষ্মী বেরোয়।

এই তো রাজলক্ষ্মী!

আমাকে দেখেই ওর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ভীষণ অপ্রতিভ অপরাধীর মত তাকায়। নীরব নিস্তব্ধ। একটা কথাও বলে না।

একবারও 'বাবুজী' বলে ডাকে না। স্তম্ভিত থমথমে ভীত মুখখানা অপার কারুণ্যে ভরা।

মনটা কেমন বিমর্ষ হয়ে ওঠে।

ওকে উদ্দেশ্য করে বলি,—আমাদের কাপড়গুলো।

বড়ো কটমট করে তাকায় রাজলক্ষ্মীর দিকে। যেন মেরে বসবে এখনি।

রাজলক্ষ্মী ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে আমাদের কাপড়গুলো এক-এক করে বার করে দেয়।

ইতিমধ্যে চোখে পড়ে বারান্দায় বসা লোকটা রাজলক্ষ্মীর শাড়িটা ধরে টানছে—আর মুখে একটা গোঁ—গোঁ আওয়াজ করছে।

এাই শূয়ার!—জোয়ান বড়ো একটা ধমক দেয়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বিনীত ভঙ্গীতে বলে,—হামার ছেলে। কথা বলতে শুনতে পারে নাই। আউর এ হামার লেড়কার বহু।

রাজলক্ষ্মীর স্বামী এই কদর্য বোবা লোকটা।

লোকটা ওর বাবার কথা আন্দাজ করে আমার দিকে তাকিয়ে নোংরা লালচে বড় বড় দাঁত বার করে হাসে।—আঁ—আঁ—হেঁ—হোঁ—।

অস্পষ্ট শব্দ করে।

সমস্ত শরীরটা আমার গুলিয়ে ওঠে। বমি-বমি লাগে। কি জঘন্য! কি সাংঘাতিক!

রাজলক্ষ্মীর মাথাটা নীচু। তাকাতে পারছে না। মুখখানা স্লান—অপার কারুণ্যে ভরা। মুখ নীচু করে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর যেন ঘোরান নেই।

ভীষণ শীত পড়েছে কলকাতায়। সন্ধ্যাবেলায় কম্বলটা পায়ের ওপর চাপিয়ে আলোয়ান মর্দি দিয়ে বসে বসে ভাবছিলাম। এই প্রচণ্ড শীতে কালী-মাথা কদমাস্ত্র নোংরা নালায় ধারে সেই স্যাতসেঁতে ঘরটায় অন্ধকারে বসে বসে রাজলক্ষ্মী কাঁপছে নিশ্চয়।—আঁ—আঁ—হেঁ—হোঁ—অস্পষ্ট গোঙানীর মত আওয়াজ করছে বোবা জঘন্য লোকটা। শব্দ ঘোবন নয়—জীবনটাট ওই ঘরে কাটবে। আমরণ!

বেদনায় বুকটা টন-টন করে ওঠে। একটা নিষ্ঠুর আরামবোধ আমার সমস্ত মনটাকে ছেয়ে ফেলে। একটা সিগারেট ধরাই।

রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠের কম্পনার ফাঁকে ফাঁকে কম্বলের তলায় পা-দুটো গরম করে নিই। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জাবর-কাটা গরুর চোখের মত আমার চোখদুটো আধ-বোঁজা হয়ে আসে। আহা রে, রাজলক্ষ্মীর কি কষ্ট!

ভেবে কি আরাম পাচ্ছি?

আশ্চর্য!

বাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধ কুমার মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর.)

II উনিশ II

মস্কা থেকে মাত্র মাইল করেক দূর। জল, কাদা, ডোবা ও নালা ডিঙিয়ে এক চাষী পরিবারের ছোট কাঁচা পাকা একটি বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়ালুম। শ্রীমতী লিডিয়া অনুযোগ করলেন, দেখুন দোঁথ আমার জুতো-মোজাটার কী দশা হল? সব আপনার জন্যে! আসুন—

একজন প্রোড়া চাষী স্ত্রীলোক অভাধনা জানিয়ে ভিতরে আনলেন। চাষী হিসাবে অবস্থা ভাল বৈকি। ঘরদোর পরিচ্ছন্ন, খেলনা সাজানো, দুপাট্টা কাঁচের জানলার মাঝখানে ঠান্ডা আটকাবার জন্য পেঁজা-তুলো ফেলে রাখার পরিচিত কৌশল, কোন কোন বসবার চেয়ারে গদি, ধবধবে বিছানা ও চাদর—বেশ ফিটফাট। ভিতরের ঘরের কোলে চলাফেরার জায়গা সঙ্কীর্ণ। ওরই মধ্যে কার্পেট পাতা, টেলিভিশন ও রেডিয়ার সেট। এখানে-ওখানে দেওয়ালে লেনিন ও অন্যান্য ছবি। ছোট ছোট ঘরদোর, তবে পরিপাটি। ঘরের ভিতরে বেশ দামী কাঠের আসবাবপত্র ও খার্টবিছানা। লক্ষ্য করে দেখেছি, কলেকটিভ ফার্ম-এর হেড আপিসের সংলগ্ন গৃহস্থগণের অবস্থা বেশ সচ্ছল। যারা দূর অঞ্চলে বসবাস করে তাদের সুযোগসুবিধা এবং ঘরদোরের চেহারা স্বভাবতই সদরওলাদের অপেক্ষা কম। সেইজন্য বড় শহর এবং কলেকটিভ ফার্মের কৃষিপ্রশাসন-কেন্দ্রের কাজাকাছি বাস করার একটা স্বাভাবিক চেষ্টা অনেকের মধ্যে দেখা যায়।

বাড়িটির ভিতরে একটি বড়পিসি কোণের মধ্যে একটি ধোঁবিখানা দেখছি। এটি কাপড়চোপড় সিন্ধ করার দেশি-প্রথার ভাঁটি। ধোবা নামক আলাদা কোনও শ্রেণী নেই—ওসব ব্যাপার নিজেরই সারতে হয়। গ্রামে মেথর, ব্যাড়ুদার, বর্দাকুরাস, কামার, কুমোর, মচি নাপিত, ফড়ে, গয়লা—এসব বলতে কিছু বোঝায় না, সব নিজেরাই। কি-চাকর-রাঁধনির নাম কেউ একালে শোনেনি। গ্রামের হাটতলায় মোটামুটি ঘরকন্নার

জিনিসপত্র পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটার-সার্কাসের দল গ্রামাঞ্চলে গিয়ে তাঁবু খাটায়। ছোট ছেলেমেয়েদের নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। 'ইয়ং পায়োনীয়ার্স' ছুটিছটিন্ধকালে মেট্রনদের সঙ্গে এক্সকারসনে এসে থেকে যায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তাদের বাড়ি, বাগান, তাঁবু, খেলার মাঠ, যানবাহন, আমোদ-প্রমোদ, সঁতার—যা কিছু খরচ সব কতৃপক্ষের। এইভাবে তারা বৃহত্তর দেশের সঙ্গে পরিচিত হয়। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, রক্ষণাবেক্ষণ, পালন, এবং শিক্ষিত করে তোলার ভার কতৃপক্ষের হাতে। পিতামাতা সেখানে মৃদু নয়। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে যন্ত্র বেশি।

বৃন্দা চাষী স্ত্রীলোকটির আর্থিক অবস্থা ভাল। ছেলেমেয়েদের কথা তুলতেই লিডিয়া আমাকে ইশারা করলেন। ওই প্রশ্নটিতে বৃন্দার মন ব্যথায় টন-টনিয়ে উঠতে পারে। কেননা বিগত বিশ্ব-যুদ্ধের কালে বৃন্দার দুটি ছেলেই প্রাণ-দান করেছে। আমি চুপ করে গেলাম। মেয়ে দুটি এবং এই মহিলা স্টাইপেন্ড ও মাসোহারা পায়। মেয়ে দুটি এখনও ছাত্রী। এই প্রবীণা নারীর কাছে বসে যখন দেশের বিবিধ সাজুলোর বর্ণনা শুনাচ্ছিলাম, তখন ভাবলাম বহিরাগত বিদেশীর কাছে নিজের দেশের অনুজ্ঞাল ছবি কেই বা না তুলে ধরতে চায়? আমরা যখন ভারতবর্ষের যারানসী তীর্থস্থানটি পর্যটকের সামনে তুলে ধরি, তখন কি দশাশ্বমেধ গোষ্ঠী আফিসের সামনের চওড়া রাস্তাটার কথা বলি! কিন্তু পৃথিবীর যে কোনও দেশের পর্যটক ওখানে এসে দেখে যায় প্রতিদিনের একটা বীভৎস দৃশ্য! অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, উলংগ মূর্খ, কুষ্ঠব্যাদিগ্রস্ত এবং ভিখারীর মস্ত এক জনতা ওখানে দেখতে পাচ্ছি আজ চল্লিশ বছরেরও বেশি। সর্বাপেক্ষা লজ্জার কথা, ওটা উত্তরপ্রদেশ এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরুর দেশ!

আশেপাশে একটা কেমন দারিদ্র-দশার চেহারা দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ—এই দুটি মাত্র মন্তব্য করে পালাবার জন্য

আমি আসিনি! আমার মতো সামান্য ঐন্ড্র মন্তব্য বা নিন্দা-সুখ্যাত শোনার জন্যে সোভিয়েট সরকারও বসে নেই! যারা প্রাণান্তকর অধ্যবসায়সহকারে শত শত বছরের অবর্ণনীয় দুর্গতির থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা পাচ্ছে একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থার ভিতর দিয়ে, আমার ন্যায় অজানা একজন বিদেশী পর্যটক যাবার আগে দুটো ফোড়ন কেটে যাব—আমি সে-অধিকার অর্জন করিনি। বরং আমি এই আশপাশে দুর্দশার চিহ্ন দেখে কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের একান্ততা বোধ করছি! আমার কেমন বেন ভাল লাগছে চারিদিকের এই সরল স্বাভাবিক একটি সাজসজ্জাহীন চেহারা। এর মধ্যেও অসীম বৈচিত্র্যের আকর্ষণ রয়েছে, নচেৎ আমি আনন্দ পাচ্ছি কেমন করে? ছোট বাগান, বন-বাঁদাড়, কাঁচামাটির পথ, গোয়ালো রয়েছে গরু, কোপঝাড়, আপেল গাছে এখনও ফল ধরে রয়েছে, উঠানে বসে একটি মেয়ে বাজারের জলে বাঁলিশের ওরাড়ে সাবান দিচ্ছে, পাশের বাগান থেকে কাদের বাড়ির বউ তার স্বামীকে পাঠাচ্ছে বাজারে, রোদ্দে এসে দাঁড়িয়েছে দুটি মেঘশাবক—এত সেই চিরকালের সব দেশের গ্রামের ছবি, এই ত' আনন্দ!

প্রবীণা মহিলাটি এদেশের ফসলের মাঠের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে প্রায় নবেম্বরের শেষ দিক পর্যন্ত একদিকে চাষ হয়, অন্যদিকে ফসল ওঠে। বছরে একবার চাষ,—সেই জন্য কাজকর্মও তাড়িমুড়ি। বরফে ঢাকা পড়বার আগে মাঠের সমস্ত ফসল বোনা শেষ করতে হয়। তারপর আসে শীতকাল, তুষার জমতে জমতে অরশেষে কটিন হয়ে ওঠে। ফলে, বরফের নীচে মাটিতে একটি বারুহীন উষ্ণতা এবং গুমোটের সৃষ্টি হয় এবং জল চুইয়ে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। সে-তুষার-প্রান্তরের উপর শীতকালে ছেলেমেয়েরা ঝিক খেলে, ঠিক তারই নীচে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে ফসলের অঙ্কুর মাথা তোলে। এর পর যত বরফ গলে, যত রোদ্দ বড়ে, এবং গরম পড়ে,—ততই ফসল পাকতে থাকে। ওদের সর্বাপেক্ষা

আনন্দের মাস হল দুটি—জুন এবং জুলাই। অগাষ্ট মাসও অনেকটা আনন্দ-দায়ক। গ্রীষ্ম ও বসন্ত হল জুলাই! ওদের জুলাই মাসে কখনও-কখনও আমাদের বৈশাখের মতো গরম পড়ে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মস্কোতে ৯৫° ডিগ্রির কান্নাকাছি তাপমাত্রা উঠেছিল। কিন্তু গরমকালে বৃষ্টি হবামাত্র প্রচুর ঠান্ডা পড়ে। ফেডারেটেড রাশিয়ার সারা বছরে বৃষ্টি পড়ে যখন তখন। কিন্তু বৃষ্টি ঘনীভূত হয় সেপ্টেম্বরে। শীত-কালের পর ওরা বরফ থেকে পায় প্রচুর জল,—তাতে ফসলের মাঠ হয় অতিশয় উর্বর। সেই কারণে যে-বছর বরফ পড়ে কম, সে-বছর ওদের ফসল এবং শাক-সব্জির বাজার মন্দা। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ওদের প্রিয় সব্জি আলুর ফসল এইজন্য মার খেয়েছিল।

মধ্যাহ্নকালের কিছু বিলম্ব ছিল। শ্রীমতী লিডিয়া আবার আমাকে ফিরিয়ে আনলেন মস্কোতে। একথা আমার মনে ছিল, কোন কোনও দেশের পর্যটক, প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রদূতবাসের লোকদের নাকি মস্কো শহরের কুড়ি মাইলের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না! কিন্তু ভারতীয়রা এমন অবাধ এবং স্বচ্ছন্দগতি ছিলেন যে, এরকম কোন কথাই তাঁদের মাথায় আসেনি। আমার কথাই ধরি। আমি একা পথ চিনে চিনে যথেষ্ট ভ্রমণ করেছি, যে কোনও অঞ্চলে অবাধে গিয়েছি, একা বিশেষ বিশেষ নম্বরের বাসে যখন-তখন ছুটোছুটি করেছি। কিন্তু কেউ আমাকে আহতুক প্রশ্ন করেনি, বা অনুসরণ করেছে এমন মনে হয়নি। বরং অসুবিধায় পড়ে যখন কারোকে কিছু প্রশ্ন করেছি তখনই দু-চারজন এগিয়ে এসে সাগ্রহে আকার ইঙ্গিতে পথনির্দেশ করে দিয়েছে। তথাকথিত ‘পুলিশ স্টেটে’ এসেছি, কিন্তু কই, পুলিশ চোখে পড়ছে না ত? পথ-ঘাটে কচিৎ দেখি ‘মিলিচম্যান’—তারা যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বহু বড় বড় রাস্তায় তাও নেই। তবে আমার দ্বিতীয় দফার ভ্রমণ-কালে অবশ্য দু-একবার কেমন যেন একটু খটকা লেগেছিল। সেটি আমি পছন্দই বলি। কোন কোনও দিন একবার অথবা দুবার আমার হোটেলের ঘরে হঠাৎ কোন বেজে উঠত এবং আমাকে প্রশ্ন করা হত, অমরক ব্যক্তি আমার ঘরে উপস্থিত আছে কিনা। আমি যখন বলতুম, সেই অমরক ব্যক্তিকে আমি চিনি তখন ওঁর থেকে ফোন ছেড়ে দেওয়া হত!

হঠাৎ হয়ত নারী-কণ্ঠের আওয়াজে আমাকে ডাকা হ’ল, এবং এমন দু-একটি কথা বলা হল যা অপরিচিত পুরুষকে কোনও দেশের মেয়েই বলে না! এসব শুনে আমার মনে পড়ত ঘটলিন আমার কথ্যাত ‘অগ’প্‌’ বা ‘এন-কে-ভি-ডি’র কথা। আমার পাপ-মন কাঁটা হয়ে উঠত, একা ঘরে গা হুমছমা করত, এবং ঘরের মধ্যেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা অলীক দুর্ভাবনাই আমাকে পেয়ে বসত! হয়ত রৌডিয়ো-প্লাগ কিংবা কালো বর্ণ ভেন্টিলেটরের ফাঁকগুলি, যার স্থানীয় নাম ‘ফর্তোশকা’—সেগুলির মধ্যে অদৃশ্যভাবে টেলিভিশন বা টেপ-রেকর্ডিং বা আর কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিটাস আমার বিরুদ্ধে কাজ করছে কিনা ভাবতুম। তখন ঘরের বিছানা, টেবিল, দেওয়াল, টিপাই, টেবল-ল্যাম্প, এমন কি ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত আমার কাছে প্রত্যেক হয়ে উঠত! রবীন্দ্রনাথের একটি ছত্র মনে পড়ে যেত, “যদি দশ দিক ভরে ওঠে দশটি সন্দেহে, তবে কোথা সুখ?”

বিদূষী দোভাষিণী শ্রীমতী অকসানাকে আমি এই টেলিফোনের বৃত্তান্তটি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার সন্দেহ, মাঝে মাঝে আমার সাড়া নেওয়া হচ্ছিল! শ্রীমতী অকসানা আমার কথায় হেসেছিলেন! কিন্তু ওটা আমার কাছে দুর্বোধ্যই রয়ে গেল।

একটি সিনেমাচিত্রে গোর্কির বাল্য ও যৌবনকে কিছুকাল আগে চিত্রিত করা হয়েছিল। ওটি আমার পক্ষে দেখা দরকার, লিডিয়া জানতেন। সেইজন্য তিনি আমাকে নিয়ে এলেন একটি পুরনো আমলের বড় বাড়িতে। এই বাড়ির নীচের ভল্লার একটি প্রেক্ষাগৃহে নানা ছবির প্রজেকশন দেখান হয়। কিন্তু আজ আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেউ দর্শক নেই। ছবিটি রুশ ভাষায় বলা হচ্ছে, এবং এটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে গোর্কির বাল্য ও কৈশোর, দ্বিতীয় খণ্ডে তারুণ্য ও যৌবন। মোট চার ঘণ্টায় দুখানি ছবি দেখান হচ্ছে। ডাইরেক্টর-মশায় আমাদের দুজনকে পিছন দিকের কুশনীটিতে সমাদরসহকারে বসিয়ে মিনিট পাঁচেক আলাপ করে বিদায় নিলেন, এবং তারপর ছবিটি আরম্ভ হ’লে শ্রীমতী লিডিয়া প্রত্যেকের প্রত্যেকটি কথা সময়ে অনুবাদ করে আমাকে বোঝাতে লাগলেন। গোর্কির শৈশব আরম্ভ তাঁর দিদিমা ও দাদা-

মশাইয়ের কাছে। নোংরা, দরিদ্র ও হত-ভাগ্য জীবন। ‘নিজনি-নভগোরদ’ শহরের ময়লা বসিত, চারিদিকে জীবনের অপচয়ের মাঝখানে দারিদ্র্য-দুর্ভাগ্যের দুর্দশা, সামনে ও পিছনে নৈরাশ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকার,—গোর্কি তার মধ্যে মানুষ হচ্ছেন! মানুষ মানুষের প্রতি উৎপীড়ন করছে, প্রতারণা ও শোষণ করছে, অসাধু এবং তস্করের জটলা, নোংরা-হোটেল, অর্থহীন মাতাল স্ত্রীলোক পথে-ঘাটে গড়াগড়ি যায়, অমানুষিক পরিশ্রম করেও পেটে অন্ন জোটে না,—বালক গোর্কি তাদেরই মধ্যে ঘুরে বেড়ায়! কত ছোট ছোট ঘটনা, মানবতার কত আবেদন, জীবনের কত অপমান, মনুষ্যত্বের কত অধঃপতন, অন্যায়-অবিচারের কত দন্দ,—ওদেরই সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে ধূল্যবল্লীস্থিত ছোট ছোট ভালবাসা আর করুণা, ছোট ছোট মমতার অমৃতবিন্দু। ছবিটি আশ্চর্য। আমি যেন ধীরে ধীরে এই জীবনীচিত্রটির মধ্যে অনেকটা নিজেরই ছায়া দেখতে-দেখতে তিলিয়ে গেলুম! দুঃখ, যন্ত্রণা, বেদনা, কষ্টক, পরিহাস এবং ভাগ্যের সেই সকল শোচনীয় বিভ্রমনার মধ্যে এমন করে বোধ হয় আর কোনও দিন ডুব দিইনি! বহুকাল পরে একটি ছবির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে এমন এক রোমাঞ্চ-কম্পন এবং অনুপ্রেরণা নিজের মধ্যে উপলব্ধি করছিলাম যেটি আমার কাছে নতুন। ছবিটির সঙ্গে আমার এমন একটা হৃদয়বেগ, মানস-নৈকট্য এবং আত্মীয়তা ঘটিছিল,—যেটি আমাকে আগাগোড়া মুগ্ধ, অভিভূত ও স্তম্ভহিত করে রেখে দিল সুদীর্ঘ চার ঘণ্টা কাল। সোভিয়েট ইউনিয়নে সিনেমা ফিল্ম-শিপের এই বিস্ময়কর উন্নতি আমার জানা ছিল না। সর্বপ্রকার ঐতিহাসিক খুঁটিনাটিসহ এমন একটি সার্থক ছবি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতুম না! আরেকটি যুগ্মের ছবি ‘ফেট অফ ম্যান’ দেখে এমনিই অভিভূত হয়েছিলাম।

চার ঘণ্টা পরে গোর্কির সেই আশ্চর্য ‘বাস্তব’ জগৎ থেকে বেরিয়ে যখন সোভিয়েট জগতে অবতীর্ণ হলাম—তখন এটাকেই যেন সম্পূর্ণ ‘বাস্তব’ মনে হতে লাগল! সৌন্দর্য অবেলায় হোটলে ফিরে আহারের টেবলে বসে শ্রীমতী লিডিয়ার সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারিনি!

ভারতীয়দের অধিকাংশই একে একে দিল্লী রওনা হয়ে গেছে। প্রিয়বন্ধু ও

পশ্চিমত চৌহানকে গত পরশু মধ্যরাত্রে লিভিয়ার সঙ্গে গিয়ে প্লেনে তুলে দিয়ে এসেছি। তাঁর চলে যাবার পর অত্যন্ত খালি-খালি লাগছে। বেদী, তাবান ও বংশপাল এবং জহীর শব্দ আছেন, আর আছেন অবশ্যম্ভাবী শেখোন। আমি কবে যাব, 'রাইটার' ইউনিয়ন থেকে তার সাড়া শব্দ এখনো পাইনি। এদিকে সারাদিনের মধ্যে দুই-তিনবার মস্কায় তুবারপাত হচ্ছে। এটা নাকি হেগলকাল। রাস্তায় রাস্তায় তুলোর মতো তুবার উড়ছে আপটা ঝড়ে হাওয়ায়। রাস্তার থেকে বড় ঝড় কোদাল দিয়ে বরফ সরানো হচ্ছে মাঝে মাঝে। কিন্তু না, এটা নাকি শীত-কাল নয়! শীতকাল আসবে ডিসেম্বরে। তার চেহারা কেমন জানিনে। তখন নিঃপত্র গাছগুলি হবে শাদা, যানবাহন পথে আটকে যাবে, বাড়ি ঘর দেখা যাবে না, দরজা জানলা বরফে চাপা পড়বে, বরফের ঝড় বইবে ইত্যাদি।

শ্রীমতী লিভিয়ার সঙ্গে পথে বেরিয়ে নানা হোটেল, বাগানে, বাজারে, এবং বহুবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ঘোরাঘুরি করছিলাম। রাইটার ইউনিয়নের দোভাষীদের সাহায্যে যেমন একদিকে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করার সুযোগ পাই, শ্রীমতী লিভিয়ার কল্যাণে অন্যদিকে তেমন পাই বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ ও কার্যকর পরিচয়। গ্রেট-বাসের ভিড়ের মধ্যে হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে যাবার সময় যে সাধারণ মেয়ে-পুরুষের জনতাটাকে দেখতে পাই, সেটা আমার লাভ! মস্কায় হোটেলের নীচের তলাকার রেস্টোরাঁয় যখন দুজনে 'সামসা' বা শিগগাড়া খেতে ঢুকি, তখন যে আন্তঃপ্রাদেশিক লোক-সমাজকে চোখের সামনে লক্ষ্য করি, সেটি আমার পক্ষে বিশেষ উৎসাহের বস্তু। এমন কতকগুলি পথ আমরা বেছে নিয়েছিলাম যেগুলি মস্কার সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। এটি জানি ৮০০ বছরের এই প্রাচীন শহরের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ইতিহাসের অনেক প্রবাহ। কিন্তু সেই পুরাকাল কোথাও ধ্বংসস্তূপের জটলা হয়ে নেই। একটি বিষয় বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য। মস্কার নাড়ির মধ্যে বিপ্লবের চেতনা রয়েছে বহু শতাব্দী থেকে। প্রতি শতাব্দীতে জনসাধারণ বহুবার মাথা তুলতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছে। ঝড় উঠেছে, আগুন জ্বলেছে, অসন্তুষ্ট জনতা মাথা ঠুকেছে ক্রেমলিনের রক্তিম দেওয়ালে,

এবং বলসিত তরবারির থেকে তাজা রক্তের দাগ কখনও শুকোয়নি! প্রায় দেড়শ বছর আগে কবি পদশকিন সম্বন্ধে যেখানে দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করতেন, সেই পথটির নাম এখন 'টিভস্কয় বুলেভার'। আধুনিক রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং অধুনা পরলোকগত পাণ্ডুরনাকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মায়াকভস্কি— যিনি স্টালিনযুগের অসহনীয় যন্ত্রণা সহিতে না পেরে আত্মনাশ করেছেন,—তাঁর নামের সঙ্গেও এই পথটি জড়িত! রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের নির্দেশবলে যিনি বিশেষ একখানি গ্রন্থ রচনার অপরাধে ("Journey from Petersburg to Moscow") দশ বৎসর নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, সেই "র্যাডিশচেভ" যে পথটিতে বসবাস করেছিলেন, সেটি এখন প্রসিদ্ধ। এটির পর দেখতে পেলুম "স্পার্টাকভস্কায়া স্ট্রীট," যেখানে দ্বাদশ বৎসরের জন্য বাস করে ছিলেন 'করমজিন'—সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "The History of the Russian Empire" এর লেখক। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বন্দী অবস্থায় জাতীয়তাবাদী কবি পদশকিনকে নির্বাসনভূমি থেকে ক্রেমলিনে আনা হয় জারসম্রাট প্রথম নিকলাইয়ের সামনে। অতঃপর মস্কাতে তিনি নজর-বন্দী থাকেন, এবং যে-বাড়িটিতে তিনি বাস করেন, সেই ছোট পুরনো বাড়িটির সামনের পথটির নাম এখন 'কাল'-মার্ক'স স্ট্রীট'। এখানকার বড় রাস্তা-গুলিকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় ডাকা হয়। যেমন "রুয়ে" —Rue Gorki, পেরলুক, বুলেভার, ড্রাজেখ, প্রয়েজ্দ্ ইত্যাদি। সম্রাট নিকলাইয়ের হাতে কঠোর শাসিত লাভ করে যে তরুণ বিপ্লববাদী কবি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কারাগারের মধ্যে যক্ষ্মারোগে ভুগে মারা যান, তাঁর নাম ছিল

পলেজায়েভ। তাঁর সঙ্গে 'স্পাস্কারা' পথটি চিহ্নিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে টলস্টয়ের জন্মের প্রায় বছর পনেরো আগে রুশসাহিত্যে যে অসাধারণ প্রতিভার জন্ম হয় তিনি ছিলেন ডসটয়েভস্কি, টুর্গেনিভ এবং টলস্টয়ের প্রভূতির সাহিত্য-শিক্ষক। তাঁর নাম ছিল 'লারমন্টভ'। তিনি অতি প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার। তাঁর স্বদেশানুরাগযুক্ত কাব্য রচনার জন্য ২৬ বৎসর বয়সের মধ্যে দুইবার তিনি নির্বাসনদণ্ড লাভ করেন। তাঁর নামে পথ, উদ্যান এবং বাড়ি ইত্যাদি নামাঙ্কিত। রুশসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক টুর্গেনিভ তাঁর 'রুদিন' উপন্যাসে 'পকস্কি' নামক যে মন্ডলীটির বর্ণনা করেছেন, সেটির মূল স্থানটি হল "বল-শয় পেরলুক নম্বর ৮"। এ-ছাড়া আছেন ডিউচেভ, চার্গিশেভস্কি, বেলিন্স্কি, বট্‌কিন, আকাসভ, জাগারস্কি, স্চেপকিন ও গোগল। গোগল তাঁর "Dead Souls" রচনাকালে প্রফেসর পডোগিন-এর যে বাড়িতে বাস করেছিলেন সে-বাড়ির একটি অংশ আজও রয়েছে। সেখান থেকে কিছ্র দূরে রয়েছে গোগলের বিরাট প্রস্তরমূর্তি 'গোগলেভস্কি বুলেভারে'। গোগলের মৃত্যু ঘটে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। তারপর একে একে দেখে বেড়াচ্ছিলাম হারজেন, ডসটয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, গণ্ডারভ, নেক্রাসভ প্রভৃতির নামাঙ্কিত বিভিন্ন পথঘাট। সমগ্র প্রাচীন মস্কার ছড়িয়ে রয়েছে শেভচেনকো, অস্ট্রভস্কি, পিসেমস্কি, টলস্টয়, গোর্কি ও চেকভ। এ-ছাড়া স্মার্তসোভ, সন্তভ, মূর্তি, প্রাসাদ, উদ্যান, লাইব্রেরী, চিত্রশালা, যাদুঘর ইত্যাদি। হিসাব নিয়ে দেখছি কেবলমাত্র মস্কো নগরীতেই রয়েছে ৮৭০টি স্থাপত্য-কীর্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ, ১১৬ যাদুঘর এবং 'মেট্রোর' ভূ-গর্ভস্থ রেলপথ ও স্টেশন বাদ দিয়ে উপরিভাগে

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস

মনে রেখ

জীবনে যতটুকু শৃঙ্খল ততটুকুই কি পরমায়ু তার স্মৃতির? জীবনশিখরের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৃত্তের মধ্যেই যেন 'মনে রেখ' উপন্যাসের সমূহ কাহিনীর সমুদয় নর-নারীর সূখ-দুঃখের সুরম্যছন্দ। মনে রাখার মতো কতো প্রেম কতো প্রবণতা, কতো সিন্ধি কতো ব্যর্থতা সবই যেন অনিবার্য একাসূত্রে এক নিরবচ্ছিন্ন জীবনপ্রবাহের অমৃতসংগমে সমুপস্থিত। 'মনে রেখ' উপন্যাসের গঠনশৈলীতে স্বনামধন্য প্রবোধকুমার নতুন রীতি ও নতুন স্বাদের এক আশ্চর্য স্বাক্ষর রেখেছেন। দাম : সাড়ে ছয় টাকা।

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট : কলিকাতা।

মোট ১১টি রেল-স্টেশন। 'মস্কা'— এই শব্দটি মূলতঃ ফিনিস ভাষায় মস্কেয়া থেকে এসেছে। এবং মস্কা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রাজকুমার দোল-গোরুক ছিলেন ইংরেজরাজ দ্বিতীয় হ্যারল্ডের কন্যা রাজকুমারী গাইথার গর্ভজাত সন্তান। দোল গোরুকের পিতা ছিলেন কিয়েভের সামন্তরাজ 'ভুয়াদিমির মনোমাখ'। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই, তাঁরা পুরনো ইতিহাসের ভিতর থেকে সোভিয়েট-ভূমি বহিষ্ঠত কোনও তথ্য কারোকে আর শোনাতে চান না! তাঁদের অতি প্রখর দেশপ্রেম ও 'জাতীয়তাবাদের' তলার আগের আমলের তথ্যপূর্ণ ইতিহাসগুলি দিনে দিনে যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। এটি দেখতে পেয়েছি ক্রেমলিনসহ রাশিয়ার প্রায় সর্বত্রই—স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চারু-শিল্প, নাট্যমণ্ড, বহুবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বহু চিত্রশালা ও যাদুঘর, এমন কি সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান—জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পৃথিবীর বহু জাতির প্রত্যক্ষ অবদান, সহায়তা, সংগঠন এবং বহুপ্রকার কার্যিক সংযোগ রয়ে গেছে অনেককাল থেকে,—কিন্তু সোভিয়েট আমলে তাদের উল্লেখ শোনা যায় না! ইতালীয়, ফরাসী, ইংরেজ বা জার্মান—এদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-চিত্রশিল্প বা প্রদর্শনীয় সামগ্রী জার-সম্রাটদের আমলে যদি প্রস্তুত হয়ে না উঠত, তাহলে মস্কা বা লেনিনগ্রাডকে দরিদ্র মনে হত! ক্রেমলিনের ভিতরের অনেকাংশ, এবং বাইরের সুউচ্চ আরম্ভম প্রাকার—এগুলি ইতালীয় স্থাপত্যবিদের দ্বারা নির্মিত। একালে সোভিয়েট আমলেও নানা সংগঠনের কাজে ইংরেজ বা আমেরিকানদের যথেষ্ট হাত আছে।

পুরনো মস্কোর একটি অঞ্চলে,— এককালের একটি অতিশয় দরিদ্র বসতি-পল্লীতে,—একদিন এসে পৌঁছলাম। সে-আমলের সেই দারিদ্র্য এখন আর নেই, মস্কোর এবং নবনির্মাণ ঘটে গিয়েছে অনেক,—কিন্তু রয়ে গেছে আশেপাশে প্রাচীরের স্বাক্ষর। সেই অঞ্চলেরই নিরি-বিলি একটি অংশে একটি মস্ত গেটের মধ্যে প্রবেশ করে যে কোর্টইয়ার্ড অর্থাৎ বড় উঠানে এসে দাঁড়ালুম, তার ঠিক মাঝখানে বিরাট প্রস্তরমর্তি রয়েছে যার, তিনিই একদিন রুশসাহিত্যের ভিতর দিয়ে 'উৎপীড়িত মানবাত্মার' বেদনা-সঞ্চিত কণ্ঠের বাণী বহন করে এলোছিলেন,—তিনি ফিয়োডোর ডস্টয়-

ভস্কি! এবাড়িটি ২নং ডস্টয়ভস্কি গল্লীট। বিগত শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই বাড়িরই যে-অংশটায় পথ-পরিভ্রমণে যে সকল রুশ হতভাগ্যরা মৃত্যুর আগে হাসপাতালের নামে একটা আশ্রয় খুঁজে পেত, সেই মেরিনস্কি হাসপাতালের একটি ঘরে ডস্টয়ভস্কির জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন এই হাসপাতালেরই এক স্বল্প-বিত্ত ডাক্তার, এবং বাড়িরই একটি অংশে তিনি বসবাস করতেন। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল কষ্টের, এবং ডস্টয়ভস্কি যাদের চোখের সামনে অল্পে অল্পে বড় হতে থাকেন তাদের জীবন ধিকৃত, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, বিকলাগ, মমূর্ষু এবং স্বাত্মীয়-স্বজন বন্ধু-গণের দ্বারা পরি-ভ্রষ্ট। সেই অন্ধকার হাসপাতালের নারকীয় অবস্থার মধ্যে মরণোন্মুখ 'প্রত্যাহ্বাদদের' বিকৃত কণ্ঠের প্রলাপ-জড়িত কান্না বালক ডস্টয়ভস্কির মনে জন্মিত জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে অসীম নৈরাশ্য ও ব্যর্থতাবোধ। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি বেদনায় করুণার, ভালবাসার আলোড়িত হতেন। চারিদিকের অন্তহীন নৈরাশ্যের মধ্যে তিনি খুঁজে বেড়াতেন প্রতিকার। তাঁর মনে অসন্তোষ এবং বিপ্লবের আগুন ধকধক করে জ্বলত। এই বাড়িতে তিনি প্রথম ১৫ বছর অর্বাধ এবং পরে আরও দু'বছর অতিবাহিত করেন। মস্কোর এই অঞ্চলের নাম তৎকালে ছিল, "God's House", এবং এখানে চোর, ডাকাতি, খুন, বৈশ্য, ভিখারী, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকত। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর প্রথম বই "Poor people" প্রকাশ করেন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে, এবং বিশেষ জনপ্রিয় হন। অতঃপর তিনি তাঁর তরুণী 'সেক্রেটারী' (!)—কে বিবাহ করেন। এই মহিলা আপন সুদীর্ঘ জীবনকালে ডস্টয়ভস্কির সমস্ত রচনা, এবং ১৮৪৬ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ অর্বাধ লেখকজীবনের সবপ্রকার খুঁটিনাটি সামগ্রীর ৬০০০ দফার একটি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করে যান। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই মহিলার মৃত্যু ঘটে।

ডস্টয়ভস্কি বিপ্লববাদের মন্ত্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং 'গুস্তদলের' নানা অংশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তৎকালীন জারের শাসন ছিল অতি কঠোর এবং নৃশংস। পূর্বোক্ত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে একটি গুস্তদলের রাজনীতিক পরামর্শভার অধিবেশন-

কালে তিনি সবান্ধবে গ্রেপ্তার হন, এবং পিটার্সবার্গের কুখ্যাত "পিটার এন্ড পল" কারাদাগারে ১১ মাস কাল তাঁকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়, এবং সেই বন্দীদশার মধ্যেই তিনি তাঁর ফার্সীর দৃষ্টান্ত লিখ করেন।

সম্ভবত উনিশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে অপর কোনও লেখক ডস্টয়ভস্কির মতো এমনভাবে কার্যকর উৎপীড়ন বরদাশত করেননি। সেই উৎপীড়ন ও যন্ত্রণার হাত থেকে তিনি চিরকালের মস্তি পেলেই হয়ত ভাল হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফার্সী তাঁর হয়নি। পরবর্তীকালে যাকে লিখতে হবে "Crime and Punishment," "Brothers Karamasov," "Possessed" ইত্যাদি জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ, যাকে অল্প-সংস্থানের জন্য সাপ্তাহিক কাগজের দরজার-দরজায় ঘুরতে হবে, শূকনো বাসি রুটির ওপর কামড় দিতে গিয়ে যার চোখের লোনা জলে সোটি ভিজবে,— তাঁর ফার্সী বাবার সৌভাগ্য হবে কেন? সম্ভবত রুশসম্রাটের দূরদৃষ্টি ছিল! কোনও এক কঠিন শীতাত্ত প্রভাতে "পিটার এন্ড পল" দাগের বধ্যভূমির সামনে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে যখন ডস্টয়ভস্কি তাঁর সহকর্মীদের একটির পর একটি 'গিলোটিনের' সাহায্যে মাথা-কেটে-নেওয়া রক্তাক্ত কবলের চেহারায় দেখে 'সকৌতুকে' তাঁর নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সেই মুহূর্তে জারের পেয়াদা ছুটেতে ছুটেতে আসে একটি 'দুঃসংবাদ' নিয়ে,— ডস্টয়ভস্কির উপর থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে! কেননা মৃত্যু অপেক্ষাও তীব্রতরো শাস্তি হল সাইবেরিয়ার 'তুবার-তুনার' মধ্যে দশ বছরের জন্য পাঠিয়ে তিল তিল করে তুবারক্ষতের দ্বারা পচিয়ে মারা। সুতরাং "পিটার ও পল" দাগবাসের কালে শ্রীমান ডস্টয়ভস্কির সর্বগো যে 'ভান্ডাবেড়ী' ছিল, সেটি পরে তিনি ঐ বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে ঠিক সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় সাইবেরিয়ায়! প্রহার উৎপীড়ন অনাহার ও ব্যাধির ফলে তদানীন্তন সাইবেরিয়ার 'স্বভাব দুর্ভাগ্য' কেউ পাঁচ বছরের বেশী বাঁচেনি। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা কাল শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় 'কাজ' করেও এই বিরাট সাহিত্যপ্রতিভা দশ বৎসর কাল 'ক্ষতবিক্ষত' অবস্থায় বেঁচে এক-দিন ছাড়া পেয়ে চলে আসেন!

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ তখনও জন্মগ্রহণ করেননি, তখন সিপাহী বিদ্রোহের কাল। কিন্তু ডসটয়ভস্ক সাইবেরিয়া থেকে ছাড়া পেয়ে একদা অন্ধকার রাতে যেদিন এক জীর্ণবাস প্রেতচ্ছায়ার মতো তাঁর সহোদরা ইভানভার সামনে এসে দাঁড়ান, তখন সেই মহিলা সাশ্রুনেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই কয়টি ছত্র উচ্চারণ করতে পারতেন :

“দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রত্নদেতে, বলো, কোন্ রাজ্য কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—”

“বন্ধন-পীড়ন-দুঃখ-অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কণ্ঠে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান—”

নীচের তলাকার কয়েকটি ঘর আজ ডসটয়ভস্কের যাদুঘরে পরিণত। এই ঘরগুলির মধ্যে ডসটয়ভস্কের জীবনকালের সেই সব প্রত্যেকটি সামগ্রী, তাঁর সকল গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ছাপা বই, কয়েকটি গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি, সোভিয়েট আমলের নতুন সংস্করণ, নানা চিত্র, ডসটয়ভস্কের মূর্তির সুন্দর কয়েকটি ছাঁচ, তাঁর ব্যবহৃত নানা খুঁটি-নাটি জিনিসপত্র অতি যত্নে সংরক্ষিত রয়েছে। আমি ঘুরতে ঘুরতে “Crime and Punishment” নামক গ্রন্থের কাটাকুটি করা রুশভাষায় লেখা অতি বিবর্ণ পাণ্ডুলিপিখানির সামনে এসে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ালুম। আমার তরুণ বয়সে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ থেকে দুই তিনটি ছত্র আমার মনোস্থ ছিল—যেখানে “রাসকলনিকভ” তার বাম্বেবী ‘সোনিয়াকে’ বলছে, “I did not bow down to you, personally, Sonia, but to the suffering humanity in your person.”

“উৎপীড়িত মানবাত্মার” বন্ধন-জর্জরতা নিয়ে ডসটয়ভস্ক প্রথম যেদিন সাহিত্য রচনা করেন, তখন তরুণ জন্মদার পুত্র টলস্টয় রাজকীয় বিলাস-ভৈরবের মধ্যে প্রমোদ সাগরে ভাসমান এবং গোপ্য তখনও জন্মগ্রহণ করেননি।

ডসটয়ভস্ক কারাগার থেকে ফিরে দুইবার দীর্ঘকালের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে যান। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে এবং ১৮৬৮ সালে জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডে কিছুকাল বসবাস করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যতদূর শূন্য, পিটার্সবার্গে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর একটি পৌত্র, আন্দ্রে ডসটয়ভস্ক এখন লেনিনগ্রাডের একজন বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার। এই ব্যক্তি একটি ভূমিকর্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করে কিছুকাল আগে পৃথিবীপ্রসিদ্ধ হন। রুশবিপ্লবের পর বৎসর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে একটি বিশেষ সোভিয়েট আইনবলে ডসটয়ভস্ক ও টলস্টয়ের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। বিপ্লবের পর থেকে রাশিয়া উক্রাইন, সাইবেরিয়া ট্রান্সককেশিয়া প্রভৃতি ভূভাগে সর্বনাশা দুর্গতি, নৈরাশ্য, অপচয়, দুর্ভিক্ষ, পাশবতা ও জয়-পরাজয়ের মধ্যেও তদানীন্তন শীর্ণকায় সোভিয়েট কতৃপক্ষ নিজ-দিগকে জনপ্রিয়তা করার জন্য সর্বজন-প্রস্রব্ধ মনীষী ও প্রতিভাধরদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণরত হয়েছিলেন—এটি সুস্পষ্ট। মহামতি লেনিনের অপরায়ে দূরদর্শিতা ছিল।

রুশবিপ্লবের পরে জারের পুত্রশির পুরনো ভাঁড়ারে ডসটয়ভস্কের “Possessed” উপন্যাসের যে কয়টি ‘পরিচ্ছেদ’ লুপ্তায়িত ছিল, সেগুলি আবিষ্কার করে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি ছাপা হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। বর্তমানে দশটি খণ্ডে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে, এবং বিগত ১৯১৭ থেকে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ অবধি সোভিয়েট

ইউনিয়নের মোট ১৪টি ভাষায় ১৪৮ দফায় সবসম্মত ৮,৬,০৭,০০০ সংখ্যক গ্রন্থাবলী বিক্রি করা হয়েছে। ‘ডসটয়ভস্ক মিউজিয়াম’ থেকে বেরিয়ে আসার সময় এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলুম তাঁর কোনও গ্রন্থ বাঙলাভাষায় ছাপা হয়ে থাকলে আমি তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেবো।

মস্কোর অন্যতম আকর্ষণ “ইয়ং পাইয়োনীয়ার্স কোর”। সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র ‘লেনিন’ শব্দটির মতো ‘ইয়ং’ শব্দটি সর্বত্র পূজ্য। ইয়ং মানে যারা পুরনো কাহিনী বা ইতিহাস ঘাঁটে না। ইয়ং তারাই যারা অন্ধ সত্যতার সঙ্গে নির্দেশ মানে,—যারা কথায় কথায় বিচার-বিশ্লেষণ করতে বসে না। ‘ইয়ং’ শব্দ তাদেরকেই বলা হবে, যারা বিশ্বাস করবে, এই ষড়ৈশ্বর্য ও মহাপুণ্যময় সোভিয়েট “জগতের” বাইরে বৃহত্তর জগতের সকল দেশের সর্ববিধ সমাজব্যবস্থা অতি প্রাচীন এবং অন্ধকারময়। এই ‘ইয়ং’দের কাছে একথা সত্য হয়ে ওঠে না যে জীবনের পক্ষে সর্বপ্রকার উন্নতিশীল বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল আমেরিকায়, ইংল্যান্ডে, জার্মানীতে, ফ্রান্সে বা ইতালীতে! এদের এইভাবে প্রভুত করা হয় যাতে এরা ভবিষ্যৎকালের

১৯৬১ সালের বাঙলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শান্ত সাহিত্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, গ্রন্থটি রচনার জন্য সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছেন। লেখক এই গ্রন্থে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিকাল হইতে যে শক্তি-সাধনা চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রকৃতি কি, কী-ই বা তাহার বিভিন্ন রূপ এবং সেই সঙ্গে আঞ্চলিক শান্ত সাহিত্যই বা কি-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সম্পর্কে গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন। শক্তি-সাধনার আধ্যাত্মিক রূপটিও এই গ্রন্থে সুন্দররূপে পরিষ্কৃতিত হইয়াছে। এই বিষয়ের একটি বিশ্বকোষ এবং গ্রন্থটি বিদগ্ধ ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য।

[মূল্য পনের টাকা]

আপনার সংগ্রহে ও গ্রন্থাগারের পক্ষে
একটি যথার্থ মূল্যবান বই
আমাদের সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা ৯
॥ আমাদের বই সর্বত্র পাইবেন ॥

উন্নততর কমিউনিষ্ট সমাজের কণ্ঠধার-
স্বরূপ হয়ে ওঠে। এরাই আগামী-
যুগের সর্বাধিক ও সাধিকা। কেবল
মাত্র মস্কো নগরীতে এদের জন্য
৬৫ খানা প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং
২০০ 'মন্ডলী' বর্তমান। কলকাতা
শহরের রাজপথে দমকল ছুটেলে যেমন
অন্যান্য যানবাহন এবং পথচারীরা
আড়গত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, ঠিক তেমনি
'ইয়ং পাইয়োনীয়ার্স' কোর-এর মিছিল
চলতে থাকলে নগরে, জনপদে ও গ্রামে
জনসাধারণ থমকিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।
এদের স্বাস্থ্যশ্রী, সৌন্দর্য, পোষাক, সানন্দ
হাসি, কুচকাওয়াজ, পদক্ষেপ, সমস্ত-
গুণ যেন একটি অভিজাত প্রকৃতি ও
শোভন রুচির পরিচয় দিতে থাকে।
এটি অনুভব করেছি, এদের সংগে
বৃহত্তর সাধারণের কোথায় যেন একটি
পাথক্য থেকে যাচ্ছে! দেশের সব ছেলে-
মেয়েই সোভিয়েট রাজ্য সন্তান, কিন্তু
দুর্যোগী অপেক্ষা সুর্যোগীর ছেলে-
মেয়েরা সমাদর পায় কিছু বেশী।

করেকটি 'হাউস অফ পাইয়োনীয়ার্স'
আমি ঘুরেছিলাম। একটিতে ছেলে-
মেয়েরা 'কাজ' করে সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা।
প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কক্ষে এক একটি
বিষয়ে শিক্ষা করা চলে। ছবি আঁকা,
নাচ, গান, কাদামাটির পুতুল তৈরি,
গল্প ও কবিতা লেখা, ছোট ছোট
এইরোপেলন নির্মাণ, কামারশালা,
ছুতোরের কাজ, রেডিও ও টেলিভিশন
চর্চায়, সিনেমাছবি তোলার যন্ত্রাদি,
রেলগাড়ী চালানো, পদার্থ ও রসায়নের
গবেষণা, জ্যোতিষতত্ত্ব, ব্যায়ামচর্চা,
গৃহনির্মাণশিল্প, বিদ্যুৎযন্ত্রাদি পরি-
চালনা, আবৃত্তি অনুশীলন, বৃত্তা-
শিল্প অর্থাৎ যে কোনও বিষয়ে
৬ বৎসর থেকে ১৮ বৎসর বয়স্ক
ছেলেমেয়েদের গুৎসূচ্য থাকে—এই
প্রতিষ্ঠান তাদের সবপ্রকার চর্চার
ক্ষেত্র। এখানে বিনামূল্যে আহারাদির
ব্যবস্থা শূন্য নয়, সকল বিষয়ে সর্ব-
প্রকার উপকরণাদি ও সামগ্রী সরবরাহের
জন্য 'জনগণ' তথা পার্টি তথা গভর্ন-
মেন্ট প্রতিনিয়ত অকাতরে লক্ষ লক্ষ
রুবল খরচ করেন! এখানে প্রত্যেক
বালক-বালিকার মেধা ও প্রতিভাকে
উন্মেষিত করা হয়! আমি 'গল্প-
কবিতা-সাহিত্যের' ঘরে ঢুকে দেখি,
১৬।১৭ বছরের কয়েকটি ছেলে ও মেয়ে
হাতে কলম ও টেবলের উপর খাতা
রেখে দেওয়াল, কড়িকাঠ ও জানলার

বাইরে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।
অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সোভিয়েট সাহিত্য!
কিন্তু সে যাই হোক, ইলেকট্রিকের
সাহায্যে কক্ষসংরক্ষিত জলাধারে জাহাজ
চলছে, রেলপথে একটি সম্পূর্ণ ট্রেন
ছুটেছে, নদীর বাঁধ থেকে জল প্রবাহ
নামছে, বিমানের গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে,
ট্রাক্টরে চাষ করছে, আগুনে লোহা-
গালাই হচ্ছে, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাজ
চলছে—এক একটি বালক-বালিকাদের
নির্মিত এই সব অসাধারণ কর্মপ্রতিভার
চেহারা দেখে অভিভূত হতে হয়!
প্রত্যেক কক্ষে বিভিন্ন সামগ্রীর আলোক-
চিত্র টাঙ্গানো এবং সেইগুলিই মডেল।
প্রতি কক্ষে শিক্ষক ও সহায়ক। বয়সে
পারা যায়, খেলা ও কৌতুকের ছলে
শৈশব থেকেই শিক্ষা আরম্ভ! সর্ব-
পেক্ষা আনন্দের বিষয় এই, কোনও
শিশু, কিশোর বা তরুণ—এগুলিকে
শিক্ষা মনে করছে না, এ সমস্তই যেন
তাদের অবসর-বিনোদনের জীড়া-কৌতুক
মাত্র! এই সকল ভবনে ঠান্ডার কালে
কেন্দ্রীয় উত্তাপ সিস্টেম এমন ব্যবস্থা
আছে যাতে বালক-বালিকারা হালকা
সুতী পোষাক পরে এই সব কাজ সম্পন্ন
করতে পারে। আমি লক্ষ্য করেছি,
প্রত্যেকটি "হাউস অফ পাইয়োনীয়ার্স"
বালক-বালিকাদের এক একটি মস্ত
আকর্ষণের কেন্দ্র! আমি ঈর্ষাকাতর
মন নিয়ে এই শিশুতীর্থগুলি সানন্দে
দেখে বোঁড়িয়েছি।

মস্কোর দেড় শতাধিক মিউজিয়-
মের মধ্যে লেনিন মিউজিয়মটি সর্ব-
পেক্ষা প্রশস্ত রাজপথের উপরে
দাঁড়িয়ে। এটি 'ল্যান্ড মার্ক'। বহু পথ
এখানে এসে মিলেছে। পাশ দিয়ে রেড
স্কোয়ার ও ক্রেমলিনে যাবার পথ।
ওপারে 'মস্কোয়া' হোটেল। অদূরে
'বলশয়' থিয়েটার। কিছু দূরে এগিয়ে
গেলে 'হল অফ কলমস'। আরেকটু
অগ্রসর হতে থাকলে বৃহৎ অট্টালিকা-
গুলিতে বিভাগীয় মন্ত্রণালয়। এই
অঞ্চল আদি ও অকৃটিম জার আমলের
অভিজাত মস্কো। এখানে এলে
মস্কোর বিশালতা অনুমান করা যায়।
বহু প্রশস্ত রাজপথ এই কেন্দ্র থেকে
শাখা বিভক্ত হয়ে নানা দিকে চলে
গেছে। লেনিন মিউজিয়মের বিরাট
রঙিন অট্টালিকার নীচে এসে অনেক-
গুলি নম্বরের মোটরবাস দাঁড়ায়।
শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে নিয়ে এই
মিউজিয়মে একদিন প্রবেশ করলেন।

লেনিনের প্রকৃত নাম 'লেনিন' নয়,
যেমন 'গোর্কি' 'গোর্কি' নয়। ট্রান্স্কর
প্রকৃত নাম 'ট্রান্স্ক' নয়। প্রথমজনের
নাম ভাদিমির ইলিচ 'উলিয়ানভ',
দ্বিতীয়জন 'ব্ল্যাঙ্কিম 'পেসকভ', এবং
তৃতীয়জন 'ব্ল্যাঙ্কিম' লেনিনের পিতার
নাম ইলিয়া নিকলারোভিচ উলিয়ানভ,
এবং মাতা জার্মান রক্তোদভবা শ্রীমতী
মেরিয়া আলেকজান্দ্রোভনা বার্গ,—
জনৈক ডাক্তারের কন্যা! ভল্গা নদীর
তীরবর্তী সিমবাস্কে নামক এক জন-
পদে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লেনিন জন্মগ্রহণ
করেন। এটি তাতার অঞ্চল, এবং এক
প্রণয়ী হৃদয়-অধ্যুষিত। লেনিন তাতার
পরিবারের সন্তান হলেও তাঁর শিষ্য
হৃদয় রক্ত ছিল কিনা, এটি গবেষণার
বিষয়। লেনিন প্রথম বৈপ্লবিক ক্রিয়-
কলাপের জন্য গ্রেপ্তার হন ১৮৯৭
খৃষ্টাব্দে, এবং তাঁর এক বৎসরের
জন্য কারাবাস হয়। কিন্তু মুক্তি পাবা-
মাত্র তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা
হয়েছিল। সেই 'লেনা' নদতীরবর্তী
যাকুটস্কে জনপদে থাকাকালীন তিনি
'লেনিন'—এই নামটি গ্রহণ করেন।
অনেকে বলে, 'লেনা' থেকেই 'লেনিন'
শব্দটি পাওয়া! যেমন গঙ্গা থেকে
গাঙ্গেয়। সাইবেরিয়ায় তিনি তিন বছর
নির্বাসনে ছিলেন। লেনিনকে একদা
তাতার দেশের কাজান বিশ্ববিদ্যালয়
থেকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অভিযোগে
বিতাড়িত করা হয়েছিল! তিনি উচ্চ-
শিক্ষিত পরিবারে মানুষ, এবং সেখানে
বৈপ্লবিক হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে বড়
হন। বিপ্লববাদী কর্মতৎপরতার অভি-
যোগে লেনিনের বড় ভাই আলেকজান্দার
ধরা পড়েন, এবং জারসম্রাট তৃতীয়
আলেকজান্দারের হুকুমে তাঁর ফাঁসী
হয়! সম্ভবতঃ এই শোচনীয় ঘটনার
ফলে লেনিন প্রতিশোধস্বহূপারায়ণ
হয়ে ওঠেন! অক্টোবর বিপ্লবের পর
রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় নিকলাসকে
সপরিবারে হত্যা করা হয়। কিন্তু তার
সঙ্গে তাতার-প্রকৃতি লেনিনের প্রতি-
শোধস্বহূ জড়িত ছিল কিনা একথা
কেউ বলেনি। কার্ল মার্কসের যখন
মৃত্যু হয়, লেনিনের বয়স তখন তেরো।
তিনি মন্ত্র পেয়েছিলেন মার্কসের কাছে,
এবং তাকে আকার দিয়েছিলেন আপন
জীবনে! মার্কসের থিয়োরী, লেনিনের
প্র্যাকটিস। মানব সভ্যতার ইতিহাসে
এত বড় ঘটনা কোথাও নেই যে, এক-
জনের একটি অভিনব 'থিয়োরী' নিয়ে
অন্য আর একজন পৃথিবীর বৃহত্তম

রাষ্ট্রটিকে এক হাতে ভাঙবে, এবং অন্য হাতে গড়বে! এটি সুস্পষ্ট যে, এই জড়বাদী 'অতি-মানবের' অভ্যুত্থানের ফলে বিগত ৬০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর রাজনীতিক প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। লেনিন এনেছেন ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যস্বাধীনতার একটা সুপট আদর্শিক পদ্ধতি, সভ্যতা-বিতর্নের মধ্যে যেটি একেবারে নতুন,—এবং গান্ধী এনেছেন আদর্শিক স্বাধীনতাস্বাধীনতার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা। বলা বাহুল্য মানব-কল্যাণের জন্য দুজনেই কাজ করেছেন। কিন্তু লেনিনের এই আদর্শিক পদ্ধতিটি মেনে নেবার আগে অগণিত লক্ষ নরনারী প্রাণবলি দিয়েছে, এবং সেখানে লেনিন কারোকে ক্ষমা করেননি। আপন মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য বা একটি বিশেষ ঐহিকতার সার্থক রূপায়নের জন্য গণমৃত্যু তাঁর কাছে সামান্য বস্তু ছিল! বিপ্লবের পর-বর্তী প্রথম তিন বৎসরকালের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রায় ৭০ লক্ষ নরনারীর অকাল-মৃত্যু ঘটে। "It is reckoned that two and a half years of the civil war alone were responsible for the premature death of about seven millions of people." (Paul Haensel, 1930) কিন্তু দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেনিনের কটনীতিক কলাকৌশল যদি বা বার বার পরিবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর বজ্রকটিন প্রতিজ্ঞা অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। "It was one of Lenin's firmly held principles that...once a revolution was started, to carry it through at all hazards to the bitter end. But so dire was the condition of the people, so implacable was the enmity of practically all the governments of the world, and so fierce and persistent were the attacks which the most powerful of them promoted and supported that the Soviet Government only just managed to survive."—Sydney Webb.

এই যাদুঘরটির মধ্যে লেনিনের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং অন্যান্য ইতিহাস নানা চিত্রে ও বিবিধ দলিল-পত্রের দ্বারা আলোচনা করা হয়েছে। ওদের মধ্যে একটির সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ালুম। লন্ডন নগরে লেনিন তাঁর সকল কমিউনিষ্ট সহকর্মীগণকে নানা স্থান থেকে ডাক দিয়ে একটি ছরুরী সম্মেলন আহ্বান করেছেন, এবং এই অধিবেশনের ব্যয়-স্বরূপ বিলাতের 'হাউস অফ লর্ডস'-এর একজন লর্ডের

কাছ থেকে তিনি ১৫০০ পাউন্ড ধার করেছেন! সম্ভবতঃ সেদিনকার সেই লর্ড কখনোও করেননি যে, এই ব্যস্তির সাংঘাতিক প্রাণশক্তির আঘাতে রুশ-সাম্রাজ্য এবং জার সম্রাটের শ্বেচ্ছাতন্ত্র অদূরবর্তী কালে চূর্ণবিচূর্ণ হবে। বাই হোক, সোভিয়েট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর লেনিন এই ঋণ সম্পূর্ণ-ভাবে পরিশোধ করে দেন। লেনিনের মৃত্যু ঘটে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে মস্কো থেকে মাইল পাঁচশেক দূরে এক গ্রামে। যে-ট্রেনখানা সেই 'শোকযাত্রাকে' নিয়ে তুষারসমাকীর্ণ মস্কোতে এসে পৌঁছয়, সেই তারিখটি ছিল ২৩শে জানুয়ারী, ১৯২৪—সেই ট্রেনের ইঞ্জিনটিকে কেন্দ্রীয় যাদুঘরের অপর একটি অংশে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে!

মস্কো নগরে সর্বাপেক্ষা যে বৃহৎ চিত্রশালাটি জনপ্রিয়, আমার নব-নিষৃত্তা দোভাষিণী প্রীমতী মেরিয়ম সালগানিক একদিন সেখানে আমাকে এনে হাজির করলেন। তাঁর ইচ্ছা আমি দেখি মস্কোর বৈশিষ্ট্য ও বৈভব, মস্কোর যা কিছু মনোজ্ঞ এবং ঔৎসুক্যজনক। যেখানে এসে উপস্থিত হলুম সেটি জগৎপ্রসিদ্ধ 'ত্রোত্নাকভ' চিত্রশালা। প্রকৃতপক্ষে লেনিনগ্রাডের উইন্টার প্যালেসের অন্তর্ভুক্ত 'হারমিটেজ' চিত্রশালা দেখার পর মনে করেছিলুম, ওর পর এদেশে চিত্রশালার প্রেষ্ঠ আর কোথাও নেই। কিন্তু সেই ভুল 'ত্রোত্নাকভ' চিত্রশালার এসে ভাগলো! জার সম্রাটের আমলের এটি অপর একটি সৌন্দর্যলোক। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মস্কোর একজন বিশিষ্ট রাজকুমার ত্রোত্নাকভ ছিলেন চারশিল্পের বিশিষ্ট অনুরাগী। তিনি তাঁর অসীম অধ্যবসায় সহকারে এবং বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে স্বদেশ এবং বিদেশের অসংখ্য শিল্পীর আঁকা মনোরম চিত্র সংগ্রহ করেন। প্রায় চল্লিশ বৎসরকালব্যাপী রাজকুমার ত্রোত্নাকভ তাঁর এই নিজ শ্বেতমন্দির প্রাসাদে অপারিসীম উদ্যম ও প্রচেষ্টায় হাজার হাজার বহু বর্ণাঢ্য এবং মনোহর চিত্র সম্মিলিত করে যে রূপস্বর্ণ-স্রষ্টাস্বরূপ সমগ্র ইউরোপে সুপ্রসিদ্ধ হন, সেটি তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রুশ জাতির হাতে অকাতরে তুলে দেন। সোভিয়েট আমলে এটি রাষ্ট্রীয়করণ করে নেওয়া হয়। রাজতন্ত্র, রাজা-রাজড়া বা জমিদারগোষ্ঠীর প্রতি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের বিস্ময়াবহ শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু ত্রোত্নাকভ সম্বন্ধে

সকলেরই একটি বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা লক্ষ্য করোছি।

এই প্রাসাদটিকে আগাগোড়া সংস্কার করে নানাভাবে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এখানে যে সকল দুঃপ্রাপ্য ও দুর্লভ তৈলচিত্র রাখা হয়েছে, সেগুলির নকল পৃথিবীর অন্য কোনও শিল্পাগারে নেই। মোটামুটি একাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে উনিশ শতাব্দী পর্যন্ত, অর্থাৎ অল্প-বিস্তর ৯০০ বৎসরের একটি চিত্রপ্রদর্শনী এখানে চারিদিকে যেন ঝলমল করছে। এই জগৎপ্রসিদ্ধ চিত্রশালায় উনিশ শতাব্দীর রুশশিল্পী পেরভ, মাকোভস্কি, লেভিটান ও পোলেনভের ছবি সম্বলিত রক্ষিত রয়েছে। জগৎবরণে শিল্পী রোপিন ও সুরিকভের জন্য পৃথক কক্ষ নির্বাচন করা হয়েছে। ঘন্টা চারেক আমি অতি-ভূত হয়ে এগুলা দেখেছিলাম।

পুর্নাকিন যাদুঘর এবং প্রাচ্য সংস্কৃতির শিল্পশালা সমানই ঔৎসুক্যজনক। এই দুই যাদুঘরের প্রাচীনকালের গ্রীস, রোম, বাইজানটাইন, ব্যাবিলোনিয়ান, আসিরিয়ান, স্লাভ, তাতার, মঙ্গোল, ইরাণ, মধ্যপ্রাচ্যলোক, চীন, জাপান এবং ভারতীয় বহু শিল্পসামগ্রী পরম বড়ো সংগ্রহীত রয়েছে। ভারতের রেশম ও পশমের নানা বস্ত্রাদি, কার্পট, তালপাতার পুঁথি, কাঠের ও হাতীর দাঁতের সামগ্রী, মূর্তি, খেলনা—প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী বর্তমান।

প্রীমতী লিডিয়া আমাকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও নানাবিধ জন-কল্যাণমূলক কর্মকেন্দ্রে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে। তাঁর কুপায় দেশের হৃদ-স্পন্দনের সঙ্গে পরিচয় ঘটত। ওর সঙ্গে গোর্কি মিউজিয়ামটি দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। এটি সুবৃহৎ এক অট্টালিকার দোতলায় অবস্থিত। গোর্কি কেবল লেখক নন, তিনি রুশ-বিপ্লবের অন্যতম মন্ত্রগুরু। তিনি ছিলেন জাম্যমাণ এবং পৃথক। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন লেনিন, তিনি টলষ্টয় প্রমুখ প্রবীণ এবং আধুনিক লেখক-সমাজের বন্ধু। তিনি কুলীমজরু, দরিত্র, হতভাগ্য, বৈশ্য, ঠগ, এবং সমগ্র রাশিয়ার নিম্নতম ব্যক্তিগণের মানবতার গোঁব ও মহিমাকে আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর বাড়িতে বসে তাঁর রচনা শুনতে আসতেন লেনিন, টলষ্টয়, ভেরো-শিলভ প্রভৃতি ব্যক্তিরা। লেনিনের ঠিক আগে তিনি রাশিয়ার বিপ্লবী

দলকে সর্বপ্রকারে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি কারাবাস করেছেন, অন্তরীণাবস্থা হয়েছেন এবং নজরবন্দী অবস্থায় থেকেছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুর। পলাতক জীবনে পথে পথে তাঁর ছদ্মবেশে দিন কেটেছে। স্টেশনে তিনি ঘুমিয়েছেন, উপবাস করে কাটিয়েছেন। কারখানায়, গুটীমারে, দোকানে, হোটেলে, জাহাজঘাটায়, গুন্ডার আড্ডায়, বস্তিতে, পতিতা পল্লীতে, দেশে-বিদেশে—তাঁর বিরাট ও রহস্যময় জীবন ছড়ানো। সাহিত্যে তিনি এনেছেন নতুন আঙ্গিক, নতুন সুর, নবচেতনা। টলন্টয়ের বাড়িতে তিনি নিয়মিত অভ্যাগত। টলন্টয়ের পর তাঁর সমকক্ষ লেখক রুশ-সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন প্রকার ছবি, দলিল, সংবাদপত্র, মূর্তি, গ্রন্থাদি নিয়ে বড় বড় কক্ষগুলি পরিপূর্ণ। গোর্কি মিউজিয়মের ডাইরেক্টর এবং দুইজন মহিলা বিশেষ পরিগ্রহ করে এক একটি কক্ষের ইতিহাস বোঝাচ্ছিলেন।

দুটি কাহিনীর সাক্ষ্য এই মিউজিয়মে নেই। বিশ্বস্তসূত্রে আমার জানা ছিল, লেনিনের সঙ্গে গোর্কির প্রবল মতভেদ ঘটে বলশেভিক বিপ্লবের প্রথম অবস্থাতেই। এই বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হবার এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৯১৭ ২১শে নভেম্বর তারিখে ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর নিজের কাগজ 'নভারা জিজুন'-এ লেখেন :

"Blind fanatics and unscrupulous adventurers are rushing headlong toward 'social revolution'—as a matter of fact it is the road to anarchy, the ruin of the proletariat and the Revolution."

"The working class cannot fail to realise that Lenin is experimenting with its blood, and trying to strain the revolutionary mood of the proletariat to the limit, to see what the outcome will be."

"The working class must not allow adventurers and madmen to thrust upon the proletariat the responsibility for the disgraceful, senseless, and bloody crimes for which not Lenin, but the proletariat will have to account."

বলা বাহুল্য তৎকালীন অরাজকতার যুগে এবং লেনিনের অনমনীয় দৃঢ়তা ও কঠিন প্রতিজ্ঞার ফলে যে সকল অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ঘটে এবং বলশেভিকরা যে সকল নিদর্য এবং নির্বিচার আচরণের পরিচয় দেন—গোর্কি সেগুলির বিপক্ষে প্রবল আন্দোলন

লন এবং প্রতিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা পান। কিন্তু দুর্দর্শী এবং যুক্তিবাদী লেনিন অবশেষে গোর্কিকে তাঁর কর্মনীতি বদ্বাতে সমর্থ হন, এবং অতঃপর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে ওঠে। শ্বিতীয়টি হল এই, লেনিনের মৃত্যুর পর যখন গটালিন সোভিয়েট রাষ্ট্রের কণ্ঠধার হন, সেই সময় দশ বৎসরকাল গোর্কির সাড়াশব্দ, পাওয়া যেত কম। রাষ্ট্রের উন্নতির প্রয়োজনে তৎকালে যে ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করা হ'ত, এবং উচ্চশিক্ষিত মহলের চিন্তাধারা যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'ত, তার সঙ্গে গোর্কির সম্পর্ক সহযোগ ছিল কিনা, এটি বিবেচ্য। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন রবীন্দ্রনাথ মস্কো গিয়েছিলেন, তখন জীবিত লেখকগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন গোর্কি, ম্যাক্স-ভার্লক, পাষ্টেরনাক প্রভৃতি। কিন্তু এরা কেউ মহাকাব্যের কাছে কেন এগিয়ে আসেননি, কেনই বা গটালিনের সঙ্গে মহাকাব্যের সাক্ষাৎকার ঘটেনি,—এগুলি আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নূতনকালের নব-রুচির নতুনাতোর প্রতীক, তিনি নিজের বাড়িতে যে 'নোটামপু' সৃষ্টি করেছিলেন তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। সেই রবীন্দ্রনাথ যখন মস্কোতে গিয়ে পৌঁছিলেন, তখন তাঁর সামনে মস্কো আর্ট থিয়েটারের দেশপ্রসিদ্ধ প্রাতিষ্ঠাতা টানিসলাভস্কি অথবা দানচেনকো,—এরা কেউ এগিয়ে আসেননি, এটি বিস্ময়জনক। আমার ধারণা, তাঁরা কেউ সাহস পাননি! আমার আরেকটি বিশ্বাস, গটালিন আমাদের কতৃপক্ষের নিকট রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে 'বাঞ্ছিত' অতিথি ছিলেন না! গোর্কির মৃত্যুর বছর দুই আগে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লেনিনগ্রাডে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা কিরভকে হত্যা করা হয়। তার আগে এবং বিশেষ করে তার পরে লেনিনের বহু সহকর্মী নেতা কারারুদ্ধ হন। উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী অগণিত সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে দেশব্যাপী বড়বন্দার অভিযোগে নির্বিচারে হত্যা, উপপীড়ন এবং নির্বাসন দেওয়া হয়। কিরভকে হত্যা করার মধ্যে গটালিনের কোনও সূক্ষ্ম চক্রান্ত ছিল কিনা অথবা কিরভ-হত্যা উপলক্ষ্য করে প্রাতিষ্ঠানিক-নিষেধনের বিপুল আয়োজন করা হয়েছিল কিনা—এটিও আমার জানবার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু এটি বিশ্বাস

করার বহু কারণ ঘটেছে যে, গোর্কির শেষ জীবন ছিল বেদনাময় ও নৈরাশ্য-পূর্ণ। দেশের চারিদিকে অন্তহীন অবিচার এবং মানবতার বীভৎস অবমাননা দেখে তাঁর স্বাস্থ্য ভেগে পড়ে। মৃত্যুর আগে তিনি মৃত্যুই কামনা করেন, এবং তিনি যে 'নভারিস' ব্রেকডাউন ও ভ্রমহৃদয়ে মারা যান, সেইটিই তাঁর অকাল-মৃত্যু! তাঁর মৃত্যুর দুই বছর আগে তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তান ম্যাক্সিম পেসকভ (এটি গোর্কিরও প্রকৃত নাম) কিরূপ অবস্থায় মারা যান এ নিয়ে নানা গুজব আছে। সেটিও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু এই খবরটি আমি পেরেছিলাম, বিমানঘাটিতে দাঁড়িয়ে সামরিক কুচকাওয়াজ দেখার সময় ঠান্ডা লেগে নাকি প্রফেসর পেসকভের নিউমোনিয়া রোগ হয়। এই রোগে ১১ দিন ভুগে তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর। তাঁর স্ত্রী নাদেজদার সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ হয়। পেসকভের মাত্র দুই কন্যা। বড় মেয়েটির নাম 'মার্ফা'—সে চিত্রশিল্পী এবং ইংরেজি জানে। ছোট মেয়ে 'দারিয়া' হল 'ভচতানগুভ' থিয়েটারের একজন বিশিষ্ট অভিনেত্রী। নাদেজদা নিজেও একজন চিত্রশিল্পী। এই দুটি তরুণী-কন্যার সাগ্রহ আতিথেয়তা আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। গোর্কির স্ত্রী, পুত্রবধূ ও নাৎনী দুটির সঙ্গে আমার দুই বৎসরব্যাপী ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের জন্য শ্রীমতী লিভিয়ার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা থেকে গেছে।

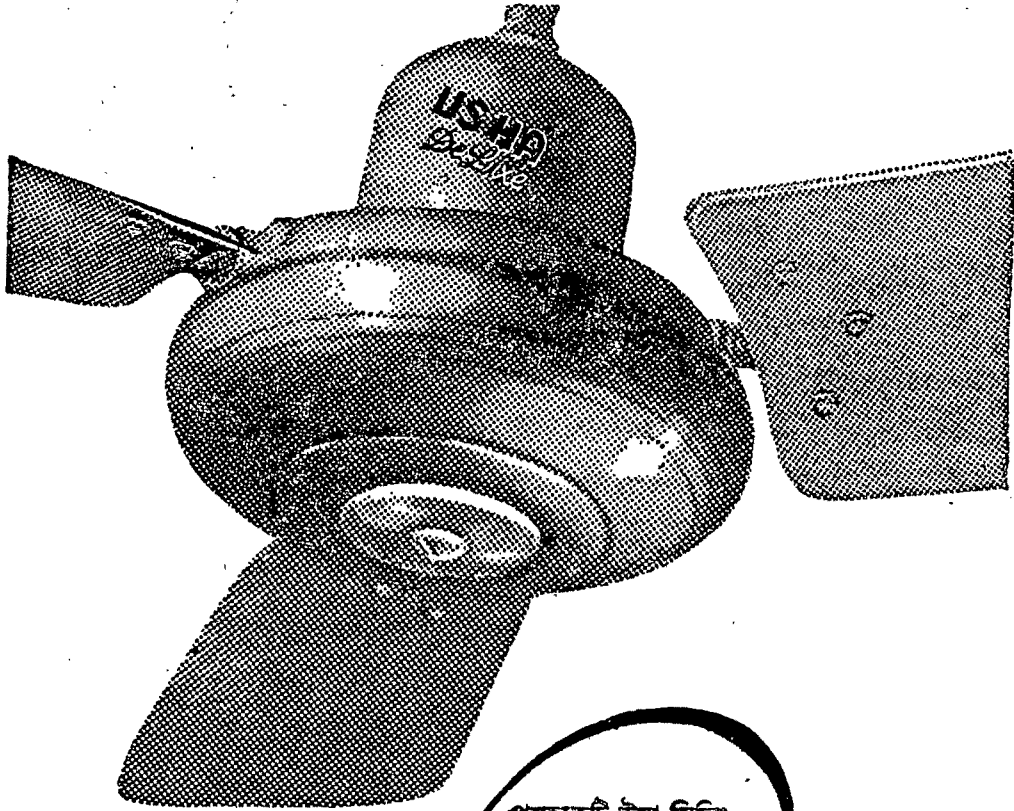
খনকুবের আমেরিকা বা পশ্চিম ইউরোপ থেকে যারা সোভিয়েট ইউনিয়নে ভ্রমণ করতে যায়, তাদের চোখে দেখা যায় সোভিয়েট রিপাবলিকগুলি মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত গৃহস্থ,—তবে উন্নতিশীল! তারা দেখে, জনসাধারণের পোষাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত শাদামাট, বৈচিত্র্যহীন, এবং বৃহৎ একটা অংশ দৃষ্টান্ত—যাদের বসবাস-ব্যবস্থাও বিশেষ দুর্গত। তারা জন্তুর মতো পরিগ্রহ করে, এবং কায়-ক্লেমে দিন কাটায়। সোভিয়েট নারীর বিলাসসজ্জা বা প্রসাধনাদি নেই, রূপ-রসের অবসর নেই এবং সুখসম্ভোগে অবগাহন করার কোনও সুযোগ তাঁরা পায় না।

এশিয়া বা আফ্রিকা থেকে যারা যায়, তারা অনুমত জগতের অধিবাসী,—তাদের অন্য চোখ! তারা মধ্যবিত্তকে উচ্চবিত্ত মনে করে, স্বল্পবিত্তকে ভাবে স্বচ্ছল পরিবার,—কেননা তারা গিয়েছে দরিদ্রের

দেশ থেকে! মস্কা নগরের জনসাধারণের দিকে চেয়ে ভারতীয় আমি যদি বলি, তাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল এবং পোষাক-পরিচ্ছদ অতি সুশোভন, তখন আমার মনে রাখা দরকার যে, আমি আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড বা পশ্চিম

জার্মানী দেখিনি! পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানগরী কলকাতার বহু অঞ্চল এবং শহরতলীর প্রায় সর্বত্র অতি বীভৎস এবং কদর্য নোংরায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আমি কলকাতার অধিবাসী হ'য়ে যদি ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস

বা বন্ ইত্যাদি নগরগুলি দেখার আগেই হঠাৎ বলে বসি—মস্কা, লেনিনগ্লাড বা কিয়েভের মতো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নগর পৃথিবীতে কোথাও নেই, তাহলে সেটি ভুল হবে! এইটুকু শুধু বলা চলে, কলকাতার পৌরসভার যারা নির্বাচিত উপ-



কার্যকারিতা
গুণ ও
সৌন্দর্য্য

প্রত্যেকটি উষা সিলিং
ফ্যান ডবল
বল-বেয়ারিং যুক্ত
সেইজন্য ইহা অনেক
বেশী দীর্ঘস্থায়ী

সহজ কিস্তিতেও পাওয়া যায়

উষা

বৈশিষ্ট্যের প্রতীক

অর্কাটিক

বিক্রয় হয়

অথ ইন্ডিয়ান গার্ডেন লি., কলিকাতা-৩১

দেষ্টা, বা পরামর্শদাতা—তারা পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ নগরে গিয়ে যদি নগর-রক্ষা, তার শ্রীবৃন্দ, স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে আসেন, তাহলে কলকাতা বহু কচ-কচির হাত থেকে বাঁচে। প্রতি বছরে কল-কাতার প্রত্যেক নবনির্বাচিত মেয়র বিদেশে আমন্ত্রিত হন শুনছি। কিন্তু এমতপ্রকার ভ্রমণের ফলে যে-শিক্ষা ঘটে, তার কোনও সুফল নাগরিকরা কখনও পেয়েছেন বলে শুনিনি।

শ্রীমতী লিডিয়ার কৃপায় মস্কোর জনসাধারণের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিলুম। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য তারা, যারা 'ভেল-গেশনের মেম্বার'। তারা সরকারি আতিথ্যের বাইরে আসতে পায় না, মোটরের ভিতর ছাড়া তাদের জগৎ নেই, দেশবাসীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটে না। তারা অগণিত অভাবনা পায়, ভূরিভোজ পায় তার চেয়েও বেশি। তার-পর কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, কিছু হোটেলের চাকর, কিছু বা থিয়েটার, নাচগান, রঙ্গরঙ্গ—এইগুলি দেখে তারা খুশী। অতঃপর বিদায় নেবার আগে কয়েকটি 'মেমেন্টো' বা উপহার পাওয়া। যারা 'হোষ্ট' বা অতিথিসেবক, তারা সস্তা সোজানোর মত্থাস পরে রইল, আর যারা অভ্যাগত তারাও তাদের মত্থাস পরে বাড়ি ফিরে গেল। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারত গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে প্রেরিত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সম্ভবত একটিও পৃথিবীর কোনও দেশে গিয়ে আপন যোগ্যতা প্রমাণিত করেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে তার বিপরীতিই প্রমাণ করে ফিরেছে। আমি অবশ্য নাচ-গান-সিনেমার কথা বাদ দিয়ে বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সেখানেও কিছুকাল আগে ডঃ কেশকার তাঁর অজ্ঞতা এবং অন-ভিজ্ঞতা প্রমাণ করার জন্য কলকাতার একখানা থেলো ধরণের বৈষ্ণবভক্তিমূলক সিনেমা-ছবি পাঠিয়েছিলেন মস্কোর 'ফিল্ম ফোর্টভ্যালো'। সেই ছবিটি দেখে মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসের লোকেরা, ভারত-প্রেমিক রুশ নাগরিকরা, এবং অন্যান্য ভারতীয় সেখানে যাঁরা আছেন,—তাঁরা এই বাংলা ছবিটির 'আজগু'রী' এবং 'অবাস্তব' চেহারা দেখে বিস্ময় দিয়ে-ছিলেন। যাই হোক, সেই ছবিটি বার দুই দেখিয়ে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। আমার বিশ্বাস, ডঃ কেশকার উপরোক্তের দায়ে ঢেরকি গিলেছিলেন।

তিড়ের মধ্যে বাসে উঠছিলুম, ট্রলি-বাস ধরছিলুম, ট্রামে উঠে বসছিলুম, এবং নিরুদ্ভিষ্টভাবে যে কোনো পথে হাট-ছিলুম। হাটে বেশি মেয়ে-পুরুষ। পথে নোড়ি-কুকুর নেই, পথের মাঝখানে গরু দাঁড়িয়ে জঞ্জাল চিবায় না, কাকের ভিড় নেই, কোনও আঁস্তাকুড়ে, মৌল অধি-কারের নামে ফুটপাথে কেউ দোকান ফাঁদে না,—হুলা করে কেউ দল বেঁধে

ফুটপাথ অবরোধ করে না! ওদের ভগ্নী, চেহারা, পোষাক, এবং আভ্যন্তরীণ গাম্ভীর্য—ওদের কর্মজীবনের গুরুত্বের পরিচয় দেয়। নগর-সম্প্রসারণের দিকে নতুন-নতুন অট্টালিকা, পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত পথ-ঘাট, সুচিক্ণ যানবাহনাদি, বহুস্থলে ফুলের সম্ভার, পারস্পরিক সহমর্মিতা, একের সঙ্গে অন্যের বন্ধুত্বাযোগ, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি স্বভাবসিদ্ধ দরদ, শিশুদের প্রতি অতিশয় যত্ন—যেটি লক্ষ্য করে মনে হয় জায়া অপেক্ষা জননীর প্রকাশ অনেক বেশি! কোথাও যৌবন-চাম্চলা দেখাচ্ছে, যৌবন-চাপলা দেহলীলার সঙ্গে কোথাও উচ্ছ্বাসিত হচ্ছে না! এদেশে এলে মনে হয়, কামিনী তার মূল প্রকৃতিকে ভুলে গেছে। সোভিয়েট কবিতা ও গল্পে সেই কামিনীর মৃত্যু হয়েছে; সেই চিরকালিনী কোনও শিল্পে, চিত্রে, সিনেমায়, রঙ্গমঞ্চে, প্রাচীরপটে, রেল-স্টেশনে, জাহাজ-ঘাটায়, দোকানে, বাগানে, কারখানায়, আপিসে,—কোথাও সে নেই! পুরুষ এসে সামনে দাঁড়ালে, পাশে বসলে, নিঃসঙ্গলোকে কাছাকাছি থাকলে—কোনও মেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থরথরিয়ে ওঠে না, চোখে বিদ্যুৎ খেলে না, দেহে তরঙ্গ দোলে না, দেহাঙ্গের জটিল জটীর ভিতর থেকে সেই আদিম অঙ্গুর কামসর্প ফণা তুলে মোচড় খায় না! কামিনী বোধ হয় মরে গেছে। কিন্তু তার চিতাভস্ম মেখে উঠে এসেছে 'সোভিয়েট নারী',—যার অপর নাম 'পুরুষ-মেয়ে'। সে পাহাড় কাটে নদী বাঁধে, মাঠ চাষে, নগর বসায়, কারখানা চালায়, চাকা ঘোরায়, জাহাজ ভাসায়। সে শূদ্ধ মেয়ে নয়, কর্মী-মেয়ে, সৈনিক-মেয়ে, বরকন্দাজ-মেয়ে, প্রহরী-মেয়ে। এ মেয়ে অলঙ্কার-প্রসাধনে ভোলে না, ঘরকন্নার মিষ্টকথায় ভোলে না, প্রণয় নিবেদনে ভোলে না। এ মেয়ের হাতে দাও হাতিয়ার, পায় দাও জুতো, পরে দাও ওভারকোট, মাংস আর রুটি দাও ডোজের থালায়, কাঁধের উপর তুলে দাও দেশ-গঠনের বোঝা! এ মেয়ের মন তবুই পাওয়া যায়! তারপর যেটা রইল সেটা কামিনী নয়, প্রণয়িনী নয়, মায়াবিনী মোহিনী নয়,—সে শূদ্ধ রইল জননী,—জীবজন্মের আধার মাত্র! কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আজ সেক্ষেত্রেও তাঁরা সজাগ। সবাই জানে, সোভিয়েট ইউনিয়নে আজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন জনসংখ্যা-বৃদ্ধি। কিন্তু যে কোনও মেয়েকে প্রশ্ন করো, আজ জবাব পাবে,—একটি অথবা দুটির বেশি তাদের সন্তান নেই! প্রায় প্রতি পরিবারে মেয়ে-পুরুষ উপার্জন করে,—কিন্তু সন্তান ধারণ ও পালনের সময় তাদের নেই! বিবাহ এবং ভালবাসার ব্যাপারটাও যেন অনেকটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার সঙ্গে সমতুল্য। এটা যেন প্রাণের কথা নয়, প্রয়োজনের কথা! এ সম্বন্ধে জনৈক রুশনারীর কয়েক ছত্র স্বীকারোক্তি তুলে দিই : টেলিফোনে

পুরুষ প্রস্তাব করছে, "আপনাকে সোদিন অমুক জায়গায় দেখে আমার ভাল লেগেছে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমি আপনাকে বিবাহ করতে চাই।"

এদিক থেকে মেয়ে জবাব দিল, "আমার মনোস্থির করার জন্য কিছু সময় দরকার!"

ছোকরা যদি পীড়াপীড় করে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে এই জবাবটি সে পেতে পারে,—"দেখুন, কিছু মনে করবেন না! আমি আরেকজনকে কথা দিয়েছি। তবে হয়, মাসখানেক পরে আপনি একবার খোঁজ নিতে পারেন।"

কিছুকাল আগে জগৎপ্রসিদ্ধ আমেরিকান ধর্মযাজক ডঃ বিলি গ্রাহাম মাত্র পাঁচ দিনের জন্য মস্কো ভ্রমণ শেষ করে ফিরে যান। তিনি রুশ তরুণ-তরুণী-গণের আচার-আচরণ লক্ষ্য করে মূগ্ধ হন। কলকাতার 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' সংবাদপত্রে খবরটি ছিল এই প্রকার : "Dr. Billy Graham praised in Paris recently the 'high standard of morality' of the Russians. He also said that during his short stay in Moscow he noticed that young people there were well disciplined and well behaved. 'We went to a park,' he said, 'where thousands of young people were gathered. It was the week-end. They would hold hands, but were very disciplined. We saw nothing beyond that.' It may be recalled here that Dr. Graham said in London a few days ago, 'It looked as though your parks had been turned into bedrooms with people lying all over the place. I was so embarrassed that I took my wife out of them.'" (22-6-59).

গ্রাহাম সাহেব কিছুদিন আগে দিল্লীতে ধর্মযাজক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু সোদিন মস্কোর উপান্তে সেই অতি বৃহৎ ও ব্যাপক "শিল্প ও কৃষি" প্রদর্শনীর মধ্যে প্রবেশ করে হাজার হাজার নরনারীর সম্মেলনের মধ্যে চলাফেরা করার কালে ধর্মযাজকের কথগূলি আমার মনে পড়ছিল। তাঁর এই পর্যবেক্ষণটি নির্ভুল, এ আমি মনে করিনে। কেন তাই বলি। আমাদের দেশে ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা বহুক্ষেত্রে বিলাস, সন্তোষ এবং অশুভ অবসরের মধ্যে মানুষ হয়। অল্পবয়সের জন্য যেখানে সংগ্রাম নেই, সংস্থানের জন্য যেখানে দুর্ভাবনা নেই,—সেখানে আদিম দৃষ্টি ক্ষুধার দ্বিতীয়টি বোধ করি সহজেই পেয়ে বসে। প্রণয় সেখানে অন্যতম বিলাস। মান-অভিমান, হাসি-অশ্রু, চাম্চলা-চপলতা, এবং 'বসনের ভূষণ-ভগ্নীতে, অধরের আরক্ত ইঙ্গিতে',—শূদ্ধ থাকে অবসর বিনোদনেরই অভিব্যক্তি! মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে দেখা যায়, মেয়েরা সারাদিন সংসার-কর্মে রত। তার হাতে পরিচর্যার ভার, অম্ব্যাজন পরিবেশনের দায়িত্ব, সংসারকে সুশৃঙ্খল ও সচল রাখার কঠিন কর্মের নিত্য উদ্বেগ,—তার

অবসর-বিনোদনের সময় নেই। সোভিয়েট মেয়ের বহুগুণ সংসার হল সোভিয়েট রাষ্ট্র, ওই বিরাট যন্ত্রের সঙ্গে পুরুষের মতো তারও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ওই নব্য-যুগসভ্যতার দানবাকার যন্ত্রের সঙ্গে তার নিত্যজীবন বাঁধা, সেখানে সে পুরুষের মতোই অহিনির্শি যোগান দিচ্ছে প্রাণান্তকর উপকরণ। চারিদিক থেকে সেখানে কঠিন ডাক দিচ্ছে “Young People”-কে ‘কমসোমলকে’— যারা নব্য-কালের তরুণ তরুণী! ডাক দিয়ে বলছে, হাজার হাজার মাইল দূরে যাও! সুমেরু সাগরে, বোরিংয়ের তীরে, চুকট্কা উপদ্বীপে, কামস্কাটকায়, শাখালিনে, আমুরে, তাইমিরে অথবা কাজাখ-স্তান কিংবা ব্যুরিয়া-মঙ্গোলিয়ায়! সময় নেই, একেবারেই সময় নেই! কুড়ি কোটি নরনারীর মাত্র আশী কোটি হাত-পা! কিন্তু ৮৭ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী ভূভাগের পক্ষে এই কয়টি হাত-পা কতটুকু? এই ত’ কিছুকাল আগে একটি কাগজে দেখলাম, একটি যুবতী সোভিয়েট মেয়ে তার আত্মীয়-স্বজনকে দোহন ক’রে বছর দুই যাবৎ নিষ্কর্ম হয়ে প্রজাপতির মতো ফুরুরিয়ে বেড়াচ্ছিল! ধরা পড়বার পর তার শাস্তি হল, ৫ বছরের জন্য লেবার ক্যাম্প! সোভিয়েট ইউনিয়নের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিদ্‌মাত্র পার্থক্য নেই! উভয়ের শক্তি এক, উপার্জন এক, জীবন-যাত্রার ধারা এক, খাদ্য ও বসবাস একই ধরনের। লক্ষ লক্ষ মেয়ে আর পুরুষ সদা-সর্বদা একই কর্মে, একই যন্ত্রে, একই যন্ত্রে নিয়োজিত হচ্ছে! সেখানে ছুটি নেই, বিরতি নেই, রংগরংগ অবসর নেই! ডাঃ গ্রেহামের চোখ বোধ হয় এদিকে পড়েন!

“শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী”টির উদ্‌ঘা-ধন করা হয় ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে। এটি স্থায়ী প্রদর্শনী। কিন্তু এটি একটি উপ-নগর কিনা সেটি ঠাহর করে দেখতে হয়। মোট প্রায় ১৭০০ বিঘা জমির উপর এই উপনগরকে নির্মাণ করা হয়েছে। এটির মধ্যে ছোট-বড় মিলিয়ে ৩০০-রও বেশি ইমারত গড়া হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে ১৫টি রিপাবলিকের প্রতীকস্বরূপ ১৫টি অতি বৃহৎ এবং অতি মনোরম অলঙ্কারযুক্ত সুদৃশ্য প্রাসাদ দণ্ডায়-মান। প্রত্যেকটি প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য এই, তার প্রাতিটি রিপাবলিকের নিজস্ব নির্মাণ-পদ্ধতি, স্বকীয়তা, স্বাভাব্যতা, সংস্কৃতি এবং বিবিধ অর্থনৈতিক পরি-কল্পনার সাক্ষ্য বহন করছে! সমগ্র উপ-নগর এমন বিশেষ শ্রেণীসংগতভাবে গঠিত, যার ঠিক কেন্দ্রটিতে এসে দাঁড়ালে পাওয়া যায় এক বিশৃঙ্খল, চক্রাকার, এবং বাঁধনো সরোবর—এবং তার ভিতরে বৃহৎ এক চক্রে ১৫টি বিশাল স্বর্ণপ্রতিমা-মূর্তি! এদের ঠিক মাঝখানে মস্ত এক ফোয়ারা থেকে উৎস্কৃত হচ্ছে রাশি রাশি শিকরকণাযুক্ত জল। চেয়ে দেখছি চারি-

দিকে বড় বড় হোটেল, রংগালয়, নাটমঞ্চ, সিনেমা, উদ্ভিদ-গবেষণাগার, পুষ্টিগো-দ্যান, নানাবিধ কৌতুকের কেন্দ্র, বিশ্রামা-গার, যন্ত্রবিজ্ঞানের কেন্দ্র, শিল্পোৎ-পাদনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বিজ্ঞানভবন, পশু-পালনের শিক্ষাগার,—এবং সর্বোপরি সোভিয়েট আমলের সর্ববিধ কীর্তির আনন্দপূর্বক ইতিহাস। এই বিশাল উপনগরীর সম্মুখ-দুরান্তে যে সুপ্রশস্ত রাজপথ মস্কো থেকে বেরিয়ে দূর-দুরান্তের সমতল দেশের দিকে চলে গেছে, তার ঠিক সামনে এই প্রদর্শনীর মূল পরিচয় স্বরূপ দুটি বিশালকায় নরনারীর সম্মিলিত প্রস্তর-মূর্তি মস্ত উঁচু বেদীর উপর দণ্ডায়মান! শূন্য মূর্তি বললে ভুল হবে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর এবং অনুপ্রেরণাদায়ক এই যুগলমূর্তিটি পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। প্যারিসের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই বিস্ময়কর ভাস্কর্য প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এই নরনারীর যুগলমূর্তির মধ্যে আছে একটি উদ্‌দাম গতিবেগ, প্রচণ্ড শক্তির অভিব্যক্তি, সোস্যালিস্ট সভ্যতার জয়যাত্রার পুরুষ এবং নারী শ্রমিকের দুর্দমনীয় এবং অপরাঙ্ক্যে অধ্যবসায়! পুরুষের হাতে নবনির্মাতার প্রতীক-স্বরূপ হাতিয়ার, নারীর হাতে কাস্তে-কাটা ফসলের ঝুরি! দেশ-কাল-সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতা—সমস্ত অতিক্রম ক’রে চির-কালীন মানব-মানবীর দীর্ঘজীবন-অভি-যানের যে প্রবল সৌন্দর্যের মহিমা এই যুগলের প্রাতি দেহেরেখায় অভিব্যক্ত করা হয়েছে, সেটি পৃথিবীর যে কোনও দেশের পর্যটককে অভিভূত করতে সমর্থ। এই বিশাল মূর্তি ছায়ার মতো অনেকদিন আমার পিছন নির্মোছল।

ছোট্ট একখানি ইলেকট্রিক ট্রেন এই প্রদর্শনীর চারিদিকে যাত্রীদের নিয়ে ঘোরে। এ যেন অনেকগুলি ‘বোগিযন্ত্র’ একখানি রথ,—চেহারাটি ঝলমল করছে। এই বৃহৎ একজীবিশন খুঁটিয়ে দেখতে গেলে দিন পনেরো লাগে। রেলগাড়িটি থাকার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে এই প্রদর্শনীটি দেখতে নেওয়া চলে।

শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে নিয়ে এলেন “স্পোর্টস” হল। এই বিশাল হলটির মধ্যে আর্থবিক কাজের যন্ত্রপাতি, বড় বড় বিচিত্র মেশিন, অদ্ভুত ধরণের বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতার উপকরণ রাখা হয়েছে। একটি রকেটের সামনে এসে দাঁড়ালুম। এই রকেটটি কিছুদিন আগে ৪০০ কিলোমিটার উঁচু শূন্যলোকে গিয়ে আবার অক্ষত অবস্থায় সকল যন্ত্রপাতি-সহ নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে আসে। এটি যেন লেহিনিমিত অতিকায় এক সরী-সৃপ। কাম্বানের নলের মতো এর আকার, এবং আমাদের দেশের পৌষ-পার্বণের ‘পুলিপঠের’ মতো এর গঠন, পেটের

কাছটি মোটা। ভিতরে তুলো এবং কাপড়ের টুকরো রাশি রাশি। মানুষ অথবা অন্য জন্তুর পেট কাটলে যেমন নাড়ি-ভাঁড়-অন্তস্ত্রের বিভিন্ন রহস্য-কুণ্ডলী বেরিয়ে আসে, তেমনি এই রকেটের বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকার ক্যাবিনগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন ও বিচিত্র যন্ত্রপাতি—যেগুলি আমার বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে। সুমেরু দিকে পাঠাবার জন্য যে রকেটটি ছাড়বার কথা চলছে তার একটি ডিজাইন এখানে দেখানো হচ্ছে। জনৈক আর্থবিক বিজ্ঞানবিষয়ের অধ্যাপক ইংরেজিতে আগাগোড়া ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেবার জন্য ঘণ্টাখানেক ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন। তাঁর পক্ষে সবটা জলের মতো স্বচ্ছ। আমার বিবাস, সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণকালে এমন অখণ্ড মনোযোগ সহকারে আর কোনও বিষয় শুনিনি। আমার আগ্রহের সীমা ছিল না।

বোধহয় রুম্বাসেসেই শুনছিলাম। অতঃপর আগাগোড়া বুঝে নিয়ে একসময় বাইরের ‘হাওয়া’ এসে স্থানান্তরিত করলুম! শ্রীমতী লিডিয়া প্রশ্ন করলেন, আপনি কি ইউনিভার্সিটিতে একদা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন?

বললুম, কিস্তি কালেও না!

তা হলে ওই অধ্যাপককে ওসব জটিল প্রশ্ন করছিলেন কেন?

লোকটা তোতাপাখির মতন মুখস্থ বলছে কিনা তাই জানবার চেষ্টায় ছিলুম!

শ্রীমতী প্রশ্ন করলেন, আপনি নিজে কিছু বুঝলেন?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলুম, একবর্ণও না!

উচ্চকণ্ঠে লিডিয়া হেসে উঠলেন। বললেন, আপনি ত সর্বশেষে লোক! টেরিবল্.....টেরিবল্! চলুন, এবার ওই আর্মেনিয়ান হোটেল,—আপনাকে মাছ-ভাত খাওয়াব! সত্যি বলতে কি, আমিও কিছু বুঝতে পারিনি।

এই দিনটির ঠিক দুই সপ্তাহ পরে ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ তারিখে যৌদীন উল্লাইন থেকে আকাশ-পথে পুনরায় মস্কোর বিমানঘাটিতে নামলুম, সেই দিন সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ‘লুনিক’ নামক একটি রকেট মহাকাশের দিকে ছোড়া হয়, এবং সেটি পরদিন মধ্যরাত্রি পেরিয়ে ২ মিনিট ২৪ সেকেন্ড বাদে চন্দ্রের খালের উপরে গিয়ে পড়ে! এই ঘটনার সমগ্র পৃথিবীতে একটি সাড়া পড়ে যায়। এ সম্পর্কে আমার কাছ থেকে একটি বিবৃতি নিয়ে ‘প্রাভদা’ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছিল।

পৃথিবীর সকল দেশের রাষ্ট্রনায়কসহ ভারতের প্রধানমন্ত্রীও এই অত্যশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সাফল্যের জন্য মিঃ খুশ্চভের নিকট অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)



আপাত উল্লেখে খটকা লাগবারই কথা।

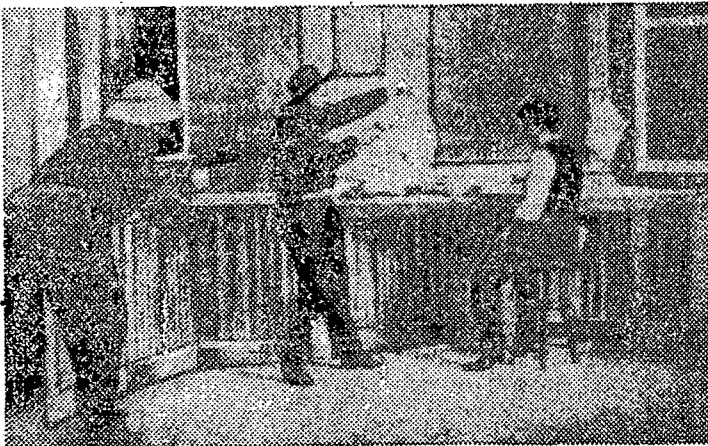
বর্তমানে পাশ্চাত্য সিনেমার, টেলিভিশনে ও সস্তা বইয়ের বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও চটকদার এবং আর্থিক সাফল্যের প্রায় সোনার কাঠি হচ্ছে 'ওয়েস্টনার'—চলতি কথায় যাকে বলে 'কাউবয়' কাহিনী। অথচ তাই হচ্ছে এখানের শিক্ষাবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, মনোবিজ্ঞানী ধর্মনৈতাদের প্রধানতম সমস্যা ও বিরক্তি।

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে বিশাল, বন্দুর, রক্ষ, মাঝে মাঝে শুধু গ্রামিণ বৃক্ষ কিম্বা ফণিমনসার ঝোপ-ঝাড়সম্বলিত বিরলবসতি অঞ্চলের নিষ্করণ ও ভয়াল পটভূমিতে তেজীয়ান অশ্বারোহী, চোপ্তের মত চোঙাউজার ও সাঁট-কুতী পরিহিত, মাথায় লম্বাটে টুপি ডাকাত দলের ট্রেন কিম্বা ব্যাংক লন্টন, গরুর পাল, গুপ্তধন, কিম্বা তৈল কূপের ভাগ কিম্বা বে-আইনী অধিকার নিয়ে খুন-রাহাজানি ও লন্টন-ধর্ষণ, তারপর আচমকা ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের

দমনকারী কোন বীরের আবির্ভাব হয়ে দুর্ভেদ্য খতম ও শিষ্টের দ্রাণ করে কাহিনীর অবসান।

প্রতিহিংসা-রিরংসা এবং লোভ ও শয়তানীর জন্যে মানুষ ও ঘোড়ার ঘৃণী জাগানো এই ছবিগুলি হলিউড ও ব্রিটিশ ফিল্ম কম্পানীগুলির দৌলতে আমাদের দেশেও অপরিচিত নয়। তাই তাদের মোস্কা ধাঁচটা আমাদের জানা। নায়ক কত ব্যনিস্ত, কত স্বপরাষণ, সদর্শন পরিচ্ছন্নভাবে কামানো, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ও কেতাদুরস্ত। নিখুঁত ঘোড়া-সোয়ার ও বন্দুকটি বাগিয়ে ধরার কায়দা সহজাত। তুলনায় 'ভিলেন' বা দুঃমণ হচ্ছে নোংরা খোঁচা-খোঁচা দাঁড়িগোফ, চাল-চলন কিম্বা বন্দুক বাহনে একটু ঢিলে-ঢালা।—সুতরাং তাদের দর্শনমাত্রই বোঝা যায় কার কি ভূমিকা।

ওয়েস্টনার ছবিগুলির অপরিহার্য সরঞ্জাম হচ্ছে বন্দুক। কাহিনীর সবাই,—এমন কি নাপিত ও দোকানদাররাও অবলীলাক্রমে বন্দুক ব্যবহার করে। বন্দুকের আওয়াজই হচ্ছে তার আবহসঙ্গীত।



গ্রেট ট্রেন রবার'র একটি দৃশ্য

তবে সুখের বিষয় অত বন্দুক-বাজির তুলনায় খুন-জখম হয় কম। একটি উদাহরণযোগ্য ওয়েস্টনারে সর্বসমেত ১৪৯-বার গুলী চালানো হলো। কিন্তু কেউ মরলো না। একজন গুরুতরভাবে আরেকজন সামান্য জখম হলো।

গ্রাস ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করা হয় আরো ভয়ঙ্কর কোন হিংস্রতার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে। তখন নীরবতা ঘনিয়ে আসে, চরিত্রগুলি মন্ডর ও নিঃশব্দ পদক্ষেপে চলাফেরা করে। মনে হয় নায়কের এবার আর পরিদ্রাণের উপায় নেই। এমন সময় চকিতে অশ্বখরধ্বনি জেগে ওঠে। নায়কের অনুগামীরা ঝড়ের বেগে উপস্থিত হয়।—প্রত্যেক ছবিতে অনুরূপ একটি দৃশ্য প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

প্রত্যেকটি কাহিনীই অনুরূপিত হয় উদার, রক্ষ, রোদ্দন্দ্ব প্রান্তরে। ঘরের মধ্যে যে কটি ছবি তা হয় শেরিফের আফিসে, নয় কোনো ভাঁটিখানায়। অর্থাৎ নায়ক বা দুঃমণ কেউ যে সাধারণ মানুষ, কিম্বা তাদের স্ত্রীপুত্র-কন্যা আছে,—এমন কোন ইঙ্গিত কদাচিতঃ পাওয়া যায় না। সভ্য জগতের বাইরে সে যেন কোন এক বন্য-আইনের ভয়ঙ্কর জগৎ।

কাউবয়দের ইতিকথা

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরা-পূর্বে দারুণ মাংস দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। টেকসাসের গোপালেরা সেই সুযোগ গ্রহণের জন্যে আড়াই লক্ষ লম্বা-শিং গরু নিয়ে উত্তরে কানসাসে রেল সংযোগের দিকে যাত্রা করলো।—এইভাবেই রেল লাইনের কাছে গড়ে উঠতে লাগলো এবিলেনে, ডর্জিসিটি, উইচিটা এবং কানসাস প্রভৃতি গো-হাট সहर।

তখনকার দিনে ঐ গরু চালানী ব্যবসায়ে যারা এলো তারা ছিল পুরোনো গো-ব্যবসায়ী গৃহস্থধ্বের পুরোনো সেপাই-ম্যাক্সিকান কিম্বা নিগ্রা বা রেড ইন্ডিয়ান সঙ্কর কয়েকজন ইংরাজ। মোটের ওপর তারা ছিল কঠোর পরিপ্রণী এবং সংপ্রকৃতির লোক। মাত্র মূর্ত্তিমেন্ন হয়তো বা ঠ্যাগাড়ে, খুনে কিম্বা বন্দুকবাজ।

ইতিমধ্যে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে টেক্সাসে হলো দারুণ অনাবৃষ্টি—তারপর এলো ভয়ঙ্কর শীত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মাংসের দাম অকস্মাৎ একেবারে পড়ে গেল। হাজার হাজার গো-ব্যবসায়ী বা কাউবয়দের এলো চরম দুর্দিন।

তাদের মধ্যে অনেকে খুন, রাহাজানি ও ছিনতাইয়ের পথ ধরলো। বন্দু বন্দুকে



ওয়েট ইয়ার্প

খুন করলো, পারিবারিক কলহে বন্দুক আমদানী হলো, ব্যাঙ্ক ও রেল লন্ঠন সন্দেহ হলো।

সেই ভয়ঙ্কর হিংস্রতার মধ্যে কয়েকজন ডাকাতের কুখ্যাত চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়লো। যেমন :-

(১) ওয়েট ইয়ার্প :- বেলন্ত গোফ এই দস্যু বহু বন্দুক লড়াইয়ের নায়ক।



ওয়াইল্ড বিল হিকক্

১৯২৯ সালে ৮০ বছর বয়সে সে মারা যায়। শেষ জীবনটা অবশ্য তার ছিল শান্তিপূর্ণ।

(২) ওয়াইল্ড বিল হিকক্ :- কানাস নগরীর এই দুর্দান্ত 'মার্শাল' ছিলেন রীতিমত সুপুরুষ। কাঁধ পর্যন্ত তার কৌকড়া বাদামী চুল লুটেতো। তবে সে ছিল যেমন বেপরোয়া মদ্যপ তেমন



জেমস জেমস

বদমেজাজী দাম্ভিক। বন্দুকের গুলীতে অত্যন্ত ১০০টি লোক খুন করে। কিন্তু মাত্র ৩৯ বছর বয়সে পেছন থেকে আরেকজন দাকাতের গুলীতে তার প্রাণ যায়।

(৩) জেমস জেমস :- পুরোনো থে-আইনীর ফেরারীদের মধ্যে সবচেয়ে

কুখ্যাত। বহু বাটপারী ও ব্যাঙ্ক লুণ্ঠের নায়ক। তবে ট্রেন ডাকাতিতেই সে ছিল বিশেষজ্ঞ।

(৪) জন ওয়েলসলে হার্ডিন :- টেকসাসের এক পাদ্রীর ছেলে। প্রথম খুনের বউনি হয় ১৫ বছর বয়সে। পরবর্তী ৩ বছরে সেই খুনের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭-এ।

(৫) বিলি দি কিড :- নিউইয়র্ক কস্তারী এই বাক্তা শয়তান সবসময়ে ২১টি খুন করে। তার মধ্যে অবশ্য রেড ইন্ডিয়ানদের ধরা হয় না। প্রত্যেকটি খুনই সে করে অনায়াস যুদ্ধে।

(৬) বচ কার্সিড :- সর্বশেষ স্বনাম-ঘণ্য দস্যু। ১৯০১ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ও ট্রেন লুণ্ঠ প্রভৃতি করে দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিয়ে যায়।

এই দস্যু সর্দারদের মধ্যে আরেক-জনের নামও উল্লেখ করা দরকার—ব্র্যাক বার্ট। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় ট্রেন লুণ্ঠের ব্যাপারে সে ছিল ওস্তাদ। সর্বসময়ে ২৮ বার ট্রেন লুণ্ঠ করে। কিন্তু অন্যথা ছাড়া-ছবির নায়ক হবার মত অন্য কোন গুণ এই ধূর্ত শয়তানের ছিল না। রোগা-খর্বাকৃতি এই ডাকাত থলে কেটে কুতী তৈরী করতো। হাতে থাকত একটি সর্ট গান ও কুড়ুল। কখনো সে ঘোড়ায় চাপেনি এবং ডাকাতের সময় গুলী চালায়নি।

ওয়েলসলের জনপ্রিয়তার কারণ ও ফলাফল

উপরোক্ত দস্যুদের জীবনী, তদন্তীয় ঘটনাবলী ও সেই সঙ্গে বেপরোয়া কম্পনা মিশিয়ে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার গল্প রচনা হয়েছে। তবে তাদের মোম্বা ধারাটা যে একই তা আগেই বলা হয়েছে।

প্রথম ওয়েলসলের ছবি তোলা হয় ১৯০৩ সালে, 'দি গ্রেট ট্রেন রবার' ছবিটি তৈরী করতে খরচ হয় ১৫০ পাউন্ড, ১২ মিনিট মত সৌটি দেখা যেত এবং সূটিংয়ের সময় লাগে ৪ দিন। নায়কের ভূমিকায় রণো বিলি এন্ডারসন পারিশ্রমিক পান দৈনিক ১ পাউন্ড ৫ শিলিং। কিন্তু আজকাল তৈরী হয় শত শত পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ফিল্ম। টেলিভিশন ফিল্মের নায়ক ডেল রবার্টসন পান বছরে ৩৫০,০০০ পাউন্ড। 'ওয়েট ইয়ার্প' নামক ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে হিউ ও'ব্রিয়ান মাইনে পান বছরে ১০০,০০০ পাউন্ড।



জন ওয়েলসলে হার্ডিন

সত্যিকারের ডাকাত ইয়ার্প অত টাকার কথা জীবনে শোনেওনি।

প্রশ্ন হতে পারে কেন 'ওয়েলসলার' ফিল্মগুলির এই অবিশ্বাস্য চাহিদা? তার অসংখ্য ব্যাখ্যার মধ্যে দুটি রুঢ় ও সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যাখ্যার উল্লেখ করলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে।



বিলি দি কিড

প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষের মধ্যে যে নিদ্রার রূর ও প্রতিহিংসা-পরাণ প্রবৃত্তিগুলি ঘুমিয়ে থাকে তা এই ছবিগুলি দেখে জেগে ওঠে এবং নিষ্কণ্টক বিকল্প চরিত্রত্ব লাভ করে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যার মতে প্রত্যেক মানুষের মনেই অশান্ত ধারাবাহিক লুকিয়ে



বচ কার্সিড

আছে। বুদ্ধিব্রাস নাগরিক জীবনে যেখানে জানালায় ধারে টবে একটি ক্যাকটাসের চারা রেখে মানুষ উদার প্রান্তরের স্বপ্ন দেখে সেখানে ঐ ছবি-গুলির আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক।

তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে শিশুমনের ওপর ঐ মারাত্মক ছবিগুলির প্রভাব সম্পর্কে। বটেন ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সরকারী উদ্যোগে তার ফলাফল নিয়ে গবেষণার জন্যে কমিটি বসেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি অন্তত কয়েকবার দেখেছি টেলিভিশনে ঐ ছবি দেখতে দেখতে শিশুরা আঁৎকে কেঁদে উঠেছে।

‘ওয়েস্টনারের’ পার্শ্বিক সমর্থকেরা বলেন যে, ঐ ছবিগুলির মর্ম-নীতিই হচ্ছে অন্যায় ও অসৎ-এর ওপর ন্যায় ও সৎ-এর জয়। হিংসা যেটুকু তা হচ্ছে পৌরুষ, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অনন্য-করণীয়। তাছাড়া দেখানো হয় আইন, সম্পত্তি অধিকার ও বিচারের জয়।

কথাটা কিন্তু আংশিক সত্য। কারণ আগেই বলেছি ‘ওয়েস্টনারের’ কাহিনী-গুলির সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন সম্পর্ক নেই। সে বেন পরিবার-পরিজনহীন সভ্যতার বাইরে কয়েকটি দুর্ধর্ষ মানুষের মারামারি হানাহানি।

তাছাড়া কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ন্যায়-রক্ষক নায়কই শেষ পর্যন্ত খুন করছেন বোশ। দুঃখমন্দের পক্ষে কোন সহানুভূতি—তারা কেনই বা দুঃখমন্ হলো, তাদের কোন হৃদয়-সম্মত কিম্বা দ্বিধা কোন কিছুই স্থান নেই। তারা যেন বারনা দিয়ে তৈরী আকার্ট দুঃখমন্।

আরেকটি যুক্তি হচ্ছে শিশুমনের যে আক্রমণাত্মক ও হিংস্র দিকটি আছে এই জাতীয় ছবি দেখে তা বিকম্প পরিতৃপ্তি লাভ করে শান্ত বা নিঃশেষ হয়ে যায়।

আমেরিকার এই বিষয়ে কেফেউভার তদন্ত কমিটির সামনে সাক্ষী দিতে গিয়ে প্রীমতী ম্যাককবে নামে এক বিশেষজ্ঞ বলেন,

“মূলত যুক্তিটা হচ্ছে অনুরূপ : যদি কোন লোক তৃষ্ণার্ত হয় তা হলে এক গ্লাস জল খেলে বহুক্ষণ তার আর তৃষ্ণা লাগবে না। অনুরূপভাবেই, ঐ মতানুসারী একটি লোক যদি একবার

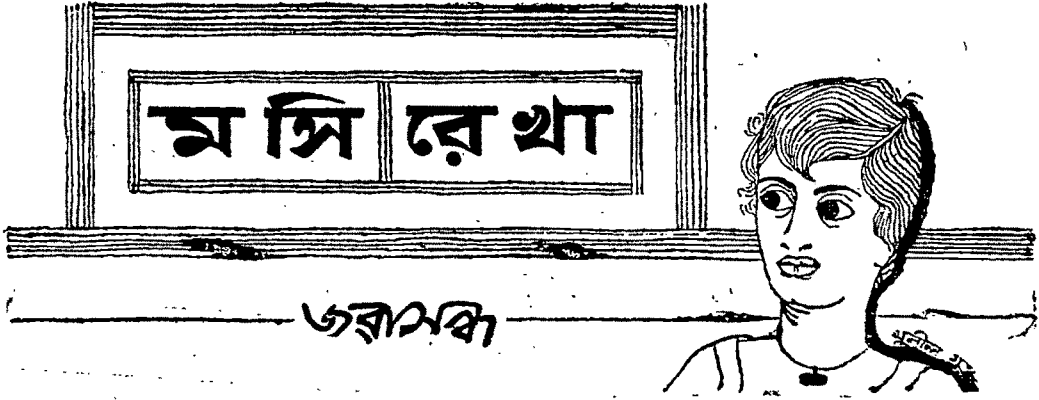
ক্রুদ্ধ হয় কিম্বা বিক্রুদ্ধ হয় তা হলে যেহেতু সে তার মনের ক্ষোভ ও ক্রোধকে ঝেড়ে ফেলাতে পেরেছে তাই বহুক্ষণ সে ক্রুদ্ধ না হয়ে শান্তিতে থাকবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে নিষ্কল্যাণে টেলিভিশনে হানাহানি-খুনোখুনি দেখলে শিশুমনের আক্রমণাত্মক মনো-ভাবগুলি সত্যিই নিগত হয়ে যায় কিনা? গেলেও কতক্ষণের জন্যে।

প্রীমতী ম্যাককবের মতে যেহেতু ছবিগুলির সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই তাই শিশুমনের ওপর তার কোন স্থায়ী প্রভাব নেই। বরং সেই ক্রুদ্ধ, হিংস্র হানাহানি দেখে তার মনের অনেক ক্রুর প্রবৃত্তি জেগে ওঠারই কথা।

পাশ্চাত্যে এমন কি পৃথিবী জুড়ে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যে অপরাধ-প্রবণতা, হিংস্রতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখা যাচ্ছে তার জন্যে অনেকেই ‘ওয়েস্টনার’ ছবির প্লাবনকে দায়ী করেন। কিন্তু মনে হয় সে শুধু একটি ক্ষুদ্র অংশকে আঁতরিজ্ঞ প্রাধান্য দেওয়া।





[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যেমন বলে গিয়েছিল, একদিন পরে সকাল বেলা গোটা নয়কের কাছাকাছি গোকুল আবার এসে উপস্থিত। মাথার ঝড়িটা আগের দিনের চেয়ে বড় এবং বেশ খানিকটা ভারী। দওয়ার কোলে নামিয়ে রেখেই, মাথার উপর থেকে বিড়ে পাকানো গামছাখানা খুলে হাওয়া খেতে সুরু করল। সড়া পেয়ে নির্মালা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বিস্ময়ের সুরে বলল, এ সব কী?

—দাঁড়াও, বলছি, মুখে সেই সদ্য-প্রসন্ন হাসি।

—ঈস, কী রকম ঘেমে গ্যাছ! দাঁড়াও, আমি পাখা নিয়ে আসছি।

—শোনো একবার কথা! আমি কি তোমাদের মতো ভন্দরনোক যে বসে বসে পাখার হাওয়া খাবো। এই আমাদের পাখা... বলে, ঘূর্ণমান ময়লা গামছাটা আরও জোরে চালিয়ে দিল। তারপরেই, যেন কোনো বড় রকমের সর্বনাশ ঘটছে, এমনি ভাবে চোঁচিয়ে উঠল, ওডা কী করছ! তোমার বাড়ি এসে ঐ পিণ্ডে পেতে বসবো আমি?

চিংকার শুনে নির্মালা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এবার হেসে ফেলল, কিসে বসবে তাহলে?

দওয়ার সামনে খোলা উঠানের উপর জাঁকিয়ে বসে গোকুল তখনই সে প্রশ্নের সমাধান করে দিল। মাথা দু'লিয়ে বিজের মত বলল, এবার বুঝেছ? আমার বাবা কি বলত জানো? বলত, মাটিই খাঁটি, আর সব নকল।

খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে গোকুল এবার তার ঝড়ির দিকে ঘন দিল। একটি একটি করে জিনিষগুলো নামিয়ে রাখতে লাগল—একটা মস্ত বড় কড়া, দুটো ধামা,

একগোছ বাঁশের শলা, আরো কী সব টাকিটাকি। তারপর বেরোল একটা গুড়ের হাঁড়ি, দু'চারটে টিনের কোটা এবং তার পাশ থেকে আর একটা ছোট ঝড়িতে কিছু আতপ চাল, ডাল, তেল মসলা সৈন্দব নুন আর কিছু তার-তরকারী। উপরের জিনিষগুলো খালি করবার পর বেরিয়ে পড়ল প্রায় আধ ঝড়ি ধান।

নির্মলা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, শুধু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে ছিল। নামানো শেষ হলে বলে উঠল, এ কী কান্ড করেছ! এ সব দিয়ে কী হবে?

—কোনটা দিয়ে বল? এক এক করে বাকিয়ে দিচ্ছি।

—এত ধান কিসের?

—ঐয়ে ধান। ঐ ভাজবে। এই যে কড়া দেখছ না?

নির্মলা হেসে উঠল, ওমা! ঐ ভাজবো কেমন করে!

—যেমন করে সব্বাই ভাজে।

—শিখোঁছ নাকি কোনোদিন?

—আমি শিখিয়ে দেবো।

—তুমি!

—পেতায় হচ্ছে না? ভাবছ ওডা মেয়েছেলের কাজ। তোমার গোকুল সব পারে, মা। আশেপাশের দশখানা ঘরে একবার জিজ্ঞেস করে এসো—কোন মেয়েছেলেডা আমার চেয়ে ভালো ঐ ভাজে!

নির্মলা বুঝতে পারল, না জেনে বড় কঠিন জারগার আঘাত করে বসেছে। ভাড়াভাড়ি বলে ফেলল, না, না, তোমার সঙ্গে তাদের তুলনা! কিন্তু আমি কি পারবো?

—খুব পারবে, খুশী হয়ে বলল গোকুল, একবারের বদলে দশবার দেখিয়ে দেবো। তার জন্যে কী?

—আচ্ছা, আর বাকী ওসব কি?

—শুধু ঐ ভাজলেই তো হবে না। তার থেকে তৈরী হবে মোয়া—যারে বলে জয়নগরের মোয়া। এই গুড় আর মসলা-পাতি—

হঠাৎ নির্মালার মূখের দিকে নজর পড়তেই মাঝপথে থেমে গিয়ে গভীর বিস্ময়ে বলে উঠল, কী হল, মা?

পরিবর্তনটা এমন আকস্মিক ও এত সুস্পষ্ট যে, কারো চোখেই এড়ার না। মূহূর্তপূর্বে যে কৌতুক হাসির উজ্জ্বল রেখাগুলো নির্মালার চোখে-মুখে দেখা দিয়েছিল, চোখের নিম্নে মিলিয়ে গিয়ে সবটা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল একটি দুঃস্বাদ করণ ছায়া। গোকুল আরেকবার তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল। অক্ষুট কণ্ঠে বলল, 'ও কিছু না। হ্যাঁ, কী বলছিলে, বল।' গোকুল পাছে অন্য কিছু মনে করে কোনোরকম আঘাত পায়, এই ভেবে নির্মালা আবার যথাসাধ্য সহজ হবার চেষ্টা করল। কিন্তু দুজনের মধ্যে আগেকার সেই সুরটুকু আর ফিরে এল না।

গোকুল যে-সব জিনিষের ফেরি করে, তার মধ্যে প্রধান পণ্য—জয়নগরের মোয়া। জয়নগর নামক জায়গাটি কোথায় সে জানে না। যেখানেই থাক, এই বেলে-ঘাটার বিন্তর একখানা খোলার ঘরের মধ্যেই তার সবটুকু স্থান-মাহাত্ম্য এসে বাসা নিয়েছে। পাড়ার পাড়ায় এ-বস্তুর ভীষণ চাহিদা এবং সেটা ক্রমশঃ বাড়ির মুখে। নিরাসিত যোগান দেওয়া ওর একার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠছে

না। গ্রামের বাড়িতে দাঁটি ছেলে আর তাদের মা। সামান্য কিছু জমি-জিরেত আছে; সে-সব আগলাতে হয়। তাদের কাউকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাই সে এমন একজন লোক খুঁজছিল। যে তাকে মোয়া তৈরীর কাজে সাহায্য করতে পারে। নির্মলাকে দেখে এবং ঘটনাচক্রে তার সব কথা জানবার পর, প্রথমে মনে হয়েছিল, এই গ্রাহ্য-কন্যাটিকে তার জীবিকার হীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে তার ভরণপোষণের ভার নিজের হাতে তুলে নেবে। কিন্তু যখন বুঝল, এ-ময়ে নিজের পা ছাড়া কিছুতেই অন্য কিছু উপর ভর করবে না, তখন সে স্থির করে ফেলল, একেই সে শিখিয়ে-পড়িয়ে তার ব্যবসায়ের অংশীদার করে নেবে। নির্মলার উপরে প্রথম থেকেই যে মায়া পড়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শ্রম্যা এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রমবোধ। তার থেকে এই মেরেটির

কর্মকমতার উপরেও একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। একে দিয়ে তার 'জয়-নগর' পরিকল্পনা সফল হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

এই সহায়-সম্বলহীন বিধবা গ্রাহ্য-কন্যাটির আত্মসম্মানবোধ কতখানি সজাগ, সেটুকু বুঝতে গোকুলের দেরি হয়নি। এর মধ্যে কোনো সাহায্য বা অনুকম্পার গন্ধ পেলে পাছে সে পিছিয়ে যায়, তাই সমস্ত ব্যাপারটাকে নিছক একটি যৌথ কারবারের প্রস্তাব হিসাবে হাজির করল। বোঝাতে চাইল, কোনো নিঃস্বার্থ পরোপকারের বাসনা নিয়ে সে আসেনি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যবসায় এবং পরিপ্রভের বিনিময়ে নির্মলার সেটুকু ন্যায্য পাওনা, সেইটুকুই তাকে দেওয়া হবে। তার বেশী আর কিছু নয়। নির্মলা অবশ্য শব্দ সেইদিকটাই দেখল না। ব্যবসায়-বৃদ্ধির অন্তরালে হৃদয় বলে আর একটি অদৃশ্য এবং দলভ বস্তুও তার দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু এ নিয়ে সে আর কোনো কথা তুলল না। শব্দ চাল, ভাল, সবিজ ইত্যাদির চুপড়িটা চোখের ইসারায় দেখিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'ওগুলোও কি মোয়া তৈরীর জন্যে?' ইঙ্গিতটা বুঝলেও গোকুলকে কিছুমাত্র অপ্রতিভ বোধ হল না; যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, এমনিভাবে কিংবা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, এই দ্যাখ, আসল কথাটাই ভুলে গেছি। এ তর্রাটে কিছু পাওনা-আদায় আছে। সে-সব সেরে ঘরে ফিরতে বেলা গাড়িয়ে যাবে। তারপর কি আর হাঁড়ি ঠেলতে ইচ্ছে করে?' বলে, যেন ভিক্ষা চাইছে এমনিভাবে হাত দুটি জোড় করে যোগ করল, 'এ-বেলাভা মায়ের হাতের দুটি পেসাদ পাবো।'

বলবার পর আদ্র দাঁড়াল না। এক-রকম পালিয়ে যাবার মত দ্রুত পারে

কোররে চলে গেল। দরজার পাশ থেকে চোঁচিয়ে বলল, বারোডার মধ্যেই এসে পড়বো।

সেই রাত্রে গোকুলের প্রস্তাবটা বিজ্ঞর মাকে জানাতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে মত দিলেন। বললেন, মানুষ দেখলেই বোকা যায়। ও তোকে ঠকাবে না। তুই আর দোমনা করিসনে। এতে ভালোই হবে। কিছু কিছু আমিও তোকে দেখিয়ে দিতে পারবো।

প্রথম দিকে নির্মলাকে যে মোয়াটা তৈরী করতে দেওয়া হল, সেটা যেট চাহিদার সামান্য অংশ। ক্রমে তার উৎসাহ বেড়ে গেল, জিনিষও ভাল হতে লাগল। সেই সঙ্গে কাজের পরিমাণও বাড়ল। সমস্ত সকালটা যায় খৈ ভাজতে এবং সেগুলো বাছতে। দুপুর বেলা নামমাত্র বিশ্রামটুকু সেরে নিয়েই মোয়ার কড়া নিয়ে বসতে হয়। সম্ভ্রম পর্বন্ত কাজ চলে, কখনো একটু রাতও হয়ে যায়।

গোকুল দুবেলা আসে; ওজন করে খান দিয়ে যায়, হিসাব মত মোয়া বুঝে নেয়। সপ্তাহের শেষে নির্মলার পাওনা মিটিয়ে দেয়। নির্মলা মাঝে মাঝে বলে, এখন থাকনা তোমার কাছে। পালিয়ে ভেে আর যাচ্ছে না।

—পালিয়ে না যাই, মরে তো যেতে পারি।

নির্মলার বকের ভিতরটা ধক করে ওঠে। বাইরে সে-ভাব গোপন রেখে হালকা সুরে বলে, 'ইস্ মরতে দিচ্ছে কে তোমাকে?' গোকুলের ভারী মজা লাগে। হাসতে হাসতে বলে, শোনো কথা। বুড়ো হয়েছি, এবার যেতে হবে না? এমনি-তেই কত পাপ করেছি তার ঠিক নেই। তার ওপরে আবার বামুনের কাছে দেনা রেখে মরবো? সম্ভ্রমনাশ!

যত দিন যেতে লাগল, গোকুল মাল তৈরীর কাজটা নিজের হাত থেকে ক্রমশঃ নির্মলার হাতে দিয়ে, শব্দ যোগানের দিকে মন দিচ্ছিল। মাস কয়েক পরে একদিন এসে বলল, তোমার হাতে কি যাদু আছে মা? এরই মধ্যে আমার খন্দেরগুলোকে ভাগিয়ে নিলে। এখন আর গোকুল বুড়োর জিনিষ কারো মখে রোচে না। বলে কি জন্যে? সেই যে সেদিন দিয়ে গেলে, সেইরকমভা এনো।

নির্মলা মনে মনে গর্ববোধ করে, কিন্তু বাইরে প্রতিবাদ জানায়, এ তোমার

WE SELL IN CASH OR ON INSTALMENTS.
big Varieties of:-
**RADIO SETS
RADIOGRAMS
ELECTROGRAMS
TRANSISTOR RADIOS
PHILIPS
TAPE RECORDERS
RECORD PLAYERS
L. P. RECORDS
RADIO PARTS ETC.**
RADIO & PHOTO STORES
65, GANESH CH. AVENUE
CALCUTTA-13
24-4793 Gram-Transistor

অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের জন্য
আমাদের আর একটি নতুন কেন্দ্র

৭নং পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এর্ভিনিউ, কলিকাতা-১২

মানানো কথা, গোকুলকাকা। তোমার ধরে-কাছে যে-যেতেও আমার আরো এক হুগ লাগবে।

—না, মা। তোমার হাতখানি বড় মিষ্টি। ওর ছোঁয়া যাতে লাগে, তারই সোমাদ বেড়ে যায়। রান্না খেয়েও দেখলাম কিনা? একেবারে অমৃত।

রোদের দিকে তাকিয়ে গোকুল হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল। হুঁড়িটা মাথায় তুলতে তুলতে বলল, বেলা হল, আসি। তোমার আবার রান্নাখান্না আছে তো।

বৃন্দের মনোগত ইচ্ছেটা নির্মলার কাছে গোপন রইল না। বলল, তোমাকে যে দুটো খেয়ে যেতে বলবো, আজ আর তার উপায় নেই। ওদিকের পাট বন্ধ।

—কেন? অবাক হয়ে তাকাল গোকুল।

—আজ আমার একাদশী।

—ও, বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কের মত বাইরের দরজার দিকে পা বাড়াল।

সেদিন বিকালেই গোকুল আবার এসে উপস্থিত। নির্মলা একটা কি সেলাই নিয়ে বসেছিল। মৃদু হেসে বলল, আজ তো আমার ছুটি, গোকুল-কাকা।

গোকুল সে প্রসঙ্গে না গিয়ে একটা সরাদাকা ছোট নতুন হাঁড়ি বারান্দার উপর রেখে বলল, তুলে রাখো।

—কী ওটা?

—কিছু না, দুটো মোয়া। কাল সকালে চান করে উঠে মূখে ফেলে জল খেও।

—না, গোকুলকাকা। এটা তুমি নিয়ে যাও।

—আমি খালের ঘাট থেকে ডুব দিয়ে এসে শব্দ কাপড়ে আলাদা বাসনে তোমার জন্যেই করোঁছি, মা।

—না, না, সেজন্যে নয়।

—তাহলে?

নির্মলা চুপ করে রইল। গোকুল বলল, পেরথম বৈদিন এই মোয়ার কথা বলি, সেদিনও তোমার মন্থখানা এমনি অধার হয়ে গিয়েছিল। নিচই এটটা কোনো দঃখ আছে তোমার মনে। ছেলের কাছেও কি সেডা বলা যায় না, মা?

—আমাকে তুমি মাপ করো, গোকুল-কাকা। ও-মোয়া আমি মূখে তুলতে পারবো না। আমার খোকা বড় ভালবাসত।

—তোমার খোকা!

—হ্যাঁ, একদিন বায়না ধরে বলল, দিতেই হবে কিনে। ঘরে একটি পয়সা নেই, কি দিয়ে কিনি? উল্টে আরে বকেছিলাম। তারপর আর কোনোদিন চায়নি।

বলতে বলতে নির্মলার দৃঢ়তা ছাপিয়ে বেরিয়ে এল জলধারা। গোকুল

হাঁড়িটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে নতমূখে বেরিয়ে চলে গেল।

॥ আট ॥

আশুতোষবাবুর চাকরির মেয়াদ শেষ হল। দীর্ঘ তিরিশ বছর একনাগাড়ে বস্টালে কাটাবার পর এবার তাঁর অবসরের পালা। যাবার আগে ছেলেরা তাদের সেকেন্ড স্যরকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে চায়। হলঘরের কাঠের পার্টিশন দিয়ে সকোলাহলে চেয়ার



নির্মলার দৃঢ় চোখ ছাপিয়ে

সেই দিকে চেয়ে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খোকাকর কথা এই প্রথম শুনল নির্মলার মূখে, চোখের জলও দেখল এই প্রথম। আর কোনো কথা না বলে

বোঁগু সাজাবার প্রথম পর্ব শুরুর হয়েছে। সভা হবে। মাঝে মাঝে সুপার বা বাবু-দের কেউ যখন বদলি হয়ে যান, তখনো এই প্রথম সভার আয়োজন হয়ে থাকে।

আজকের ব্যাপারটা আরো বড়। বদলি নয়, বরাবরের মত বিদায় নিচ্ছেন মাষ্টার-মশাই। তাই অনুষ্ঠানটাও ব্যাপক। শূদ্ধ দুটো ফুলের মালা আর একটা তোড়া দিয়ে কাজ সারা নয়, তার সঙ্গে কলাগাছ ও দেবদারু পাতার গেট, রঙ্গীন কাগজের শিকল, দেয়ালের গায়ে মৌসুমী ফুল আর পাতার জড়ানো বড় বড় রিঙ। ওঁদিকে আর একটা বিশেষ আয়োজন চলছে। বদলির বেলায় মা কখনো হয় না। একটি ছোটখাট বিদায় ভোজ। তাদের বড় আদরের 'সেকেন্ড-সার'কে ঘিরে বসে শেষবারের মত পায়েস খাওয়াবে ছেলের দল। 'স্টার বয়'রা তাদের মাসিক এক টাকা সরকারী রোজ-গার থেকে দরাজ হাতে চাঁদা দিয়েছে, অন্যান্য ছেলেরা, পালপার্বণে যাদের বাড়ি থেকে কিছু কিছু হাতখরচ আসে, তারাও কম দেয়নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা। কাজ যত তার অনেক বেশী করলর।

সকলেই আছে, সকলেই কিছু না কিছু করছে, নেই শূদ্ধ একজন। এই অনুষ্ঠানের কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না। একটি 'স্টার'এর হঠাৎ নজরে পড়তেই বলে উঠল, ওরে দিলীপ কোথায়? তাকে তো দেখছি না।

সালসা ভিটল

স্বাী ও পুরুষের শারিরীক দুর্বলতা, অকাল বার্ধক্য, শক্তিহীনতা প্রভৃতি হইতে মুক্তি দিয়া দুর্বল স্নায়ু-মণ্ডলীকে সবল সজ্জা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করে। মূল্য ও সকল প্রকার স্ট্রোরোগ চিকিৎসা কেন্দ্র

ইউনানী ড্রাগ হাউস

১৮, সূর্য সেন স্ট্রীট,

কলিকতা-১২

কলেজ স্কোরারের সম্মুখে দোতলা

তাইতোঃ—অনেকেই তাকিয়ে দেখল এদিক ওদিক। পাশ থেকে কে একজন ব্যঙ্গের সুরে মন্তব্য করল, সে তো আর তোর আমার মত খারাপ ছেলে নয়; সে পড়ছে।

—যাঃ, আজকের দিনে পড়বে কিরে! অসুখটসুদ্ধ করিনি তো?

কেশব একটা উঁচু টুলের উপর দাঁড়িয়ে কলাগাছে দেবদারু পাতা জড়াচ্ছিল। বলল, সে এসব হৈটে ভাজ্য-বাসে না। তাছাড়া আশুবাবু-স্যর চলে যাচ্ছেন!

অনেকেই সায় দিল। মাষ্টারমশাই যে সকলকেই ভালবাসতেন এবিষয়ে বিমত না থাকলেও দিলীপের উপর যে তাঁর একটি বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল, এটা কারোই অজানা নয়। দিলীপও যে তাঁর প্রতি কতখানি অনুরক্ত তাও সবাই জানে। আর একটি ছেলেকে বলতে শোনা গেল, ওরই সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হল। আসছে বছর পরীক্ষা।

সভারমন্ডের আগে পর্যন্ত ছেলেদের যত কিছু হাঁকডাক, ছটোছাটি, সেকেন্ড মাষ্টার মশাই ঘরে ঢুকবার পর তাঁর দিকে নজর পড়তেই সব যেন মস্তবলে বন্ধ হয়ে গেল। সাহেব তখনো আসেননি। ডেপুটি সুপার সেই শূন্য আসনের ঠিক পাশটিতে আশুবাবুকে নিয়ে বসিয়ে দিলেন। কালও যিনি ছিলেন স্বভঃপ্রফুল্ল, সদাহাস্যময়, একটা রাত যেতেই কে যেন তাঁর মুখের উপর থেকে সব দীপ্তিরেখা নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেছে। গালদুটো ঝুলে পড়েছে, চোখের কোলে কালি, নিম্প্রভ দৃষ্টি, তার মধ্যে কেমন একটা অসহায় ব্যাকুলতা। ছেলেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, সেকেন্ড স্যরকে যেন চেনা যায় না। দিলীপ বসেছিল একেবারে গেছনের বেগিতে। ছেলেরা কেউ কেউ তাকে

সামনের দিকে বসাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। সবচেয়ে উঁচু ক্রাসের ছাত্র হিসাবে, সেইটাই তার স্থান। কিন্তু কিছুতেই তাকে টেনে আনা যায়নি। মাষ্টার মশাই-এর মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই সেই যে মাথাটা নুয়ে পড়েছিল আর চোখ তুলতে পারেনি।

মিনিট কয়েক পরেই সুপার এসে পড়লেন। একটি ছোট ছেলে তাঁকে এবং আশুবাবুকে নিজেদের বাগানের ফুল তুলে নিজের হাতে গাঁথা মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানাল। দু'তিনটি ছেলে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে বিদায়ী শিক্ষককে প্রণাম নিবেদন করল। তার মধ্যে ছন্দ মিল এবং ভাষার রুচি যাই থাক, একটি গভীর আন্তরিকতার সুর সকলের অন্তরে গিয়ে পৌঁছিল। হেড-মাষ্টার মশাই তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মীর গুণাবলী বর্ণনা করে বহুতা দিলেন। ডেপুটিবাবুও কিছু বললেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অনেকের ইচ্ছা, দিলীপ কিছু বলুক। সেই তো বর্তাল স্কুলের উপযুক্ত প্রতিনিধি। অধ্যক্ষের অনুরোধে সে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু একটি কথাও বলতে পারল না। আশুবাবুকে যখন আহ্বান জানানো হল তিনি খানিকক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'তিরিশ বছর যারা আমাকে ঘিরে ছিল, তারা আমার কাছে নেই, অথচ আমি আছি, একথা এখনো আমি ভাবতে পারছি না। যে-কটা দিন বাঁচবো, তোমরা আমার সমস্ত মন, সমস্ত চেতনা জুড়ে থাকবে। আর আমি কিছু বলতে পারছি না।

সকলের শেষে ঘোষ সাহেব যে সামান্য কটি কথা যোগ করলেন, সেটা আশুবাবুরই প্রতিধ্বনি। বললেন, আশুবাবু বর্তাল স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, একথা প্রত্যক্ষ হলেও সত্য নয়। এটা উনি যেমন বিশ্বাস করতে পারছেন না, আমরাও মনে নিতে পারি না। এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে আমাদের সকলেরই নানা রকম আকর্ষণ আছে, আছে ঘর-সংসার, আত্মীয়বান্ধব এবং তার সঙ্গে কত রকম পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন। ও'র থাকবার মধ্যে শূদ্ধ এই স্কুল আর তার একপাল ছেলে। তার বাইরে ও'র কোনো অস্তিত্ব নেই। ও'কে আমরা কোনো দিনই হারাবো না। যেখানেই থাকুন, এই ছেলেগুলোর মধ্যেই ও'কে আমরা দেখতে পাবো।

(ক্রমশঃ)



সকল সম্ভ্রদায়ের ব্যবহার
উপযোগী প্লেন ও চেক
ডিজাইনের
গণমুকলা
লুঙ্গি
সহ পাকা ও টেকসই
সকল লুঙ্গির দোকানেই পাইবেন

বিজ্ঞানের কথা

অগ্রস্কান্ত

॥ পূরনো প্রশ্ন : নতুন পৃথিবী ॥

প্রশ্নটা পূরনো। খাদ্যের উৎপাদন কি পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে? এমন দিন কি আসবে না যেদিন পৃথিবীর বিপুল-সংখ্যক মানুষের তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন হবে খুবই কম এবং পৃথিবীতে স্থায়ী দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে? গত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই প্রশ্ন বার-বার উঠেছে। এবং এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা মোটো-মোট দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু আজকের পৃথিবীটা নতুন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি আজকের দিনে এতই দ্রুত যে পৃথিবীর সম্পূর্ণ একটি নতুন রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই নতুন পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে এতকালের পূরনো প্রশ্নগুলোকেও আবার নতুন করে যাচাই করে নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। খাদ্য-উৎপাদন ও জনসংখ্যার প্রশ্নটা খুবই পূরনো। কিন্তু আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা এ-প্রশ্নের যে-জবাব দিয়েছেন তা একেবারেই নতুন। আমরা সকলেই কোনো না কোনো সময়ে এই প্রশ্নটা নিয়ে ভাবিত হয়েছি। কাজেই হালের জবাবটাও আমাদের সকলেরই জানা দরকার।

॥ চাষযোগ্য জমি ॥

বর্তমানে পৃথিবীতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের মাত্র তিনভাগের একভাগ। পৃথিবীর মোট ভূখণ্ড হচ্ছে মোটামুটি ৩৩০০ কোটি একর। এই ৩৩০০ কোটি একর জমির মধ্যে বর্তমানে চাষ হচ্ছে প্রায় সাড়ে-তিনশো কোটি একর জমিতে। অর্থাৎ শতকরা-মাত্র দশভাগে। শতকরা প্রায় ২০ ভাগ হচ্ছে খাস-জমি। শতকরা প্রায় ৩০ ভাগে রয়েছে বনজঙ্গল। আর বাকি ৪০ ভাগে পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, শহর, গ্রাম, ইত্যাদি।

তবে পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশেই প্রতি বছরেই নতুন নতুন জমি চাষযোগ্য করে তোলা হচ্ছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৯

সালের মধ্যে প্রায় ৯০ কোটি একর জমিতে নতুন চাষ শুরু হয়েছে। অবশ্য ফসলের চাষ শতকরা প্রায় ত্রিশ ভাগে, বাকিটা খাস-জমি। মোট হিসেব নিলে দেখা যাবে যে বর্তমানে পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের শতকরা প্রায় ত্রিশভাগই আবাদী। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর মোট আবাদী জমির পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীর ভূখণ্ডের বাকি সমস্তভাগ এখনো পর্যন্ত চাষের অযোগ্য। তার মানে কথাটা দাঁড়ায় এই যে আগামী বছরগুলিতে পৃথিবীর মোট আবাদী জমির পরিমাণ মোটামুটি এই একই থেকে যাবে। অন্যদিকে পৃথিবীর জনসংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়ে চলবে। এবং জনসংখ্যা বতোই বাড়বে ততোই মাথাপিছু আবাদী জমির

পরিমাণও কমবে। এমন কি ১৯৫১ থেকে ১৯৫৯ সালের হিসেবেও দেখা যায় যে যে-হারে জনসংখ্যা বেড়েছে তার চেয়ে কম হারে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বেড়েছে। কয়েকটা অঙ্কের হিসেব তুলে ধরে ব্যাপারটাকে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

চাষযোগ্য জমির হিসেব (কোটি একরে)

	আবাদ	খাস-জমি
১৯৫১	৩২১	৫৭০
১৯৫৯	৩৪৭	৬০৫

পতিত জমির হিসেব (কোটি একরে)

	অনাবাদী	অরণ্য
১৯৫১	১৪৯৬	৯৫৬
১৯৫৯	১৩৫৫	১০০৫

জনসংখ্যা

১৯৫১ সালে ২৪৩ কোটি

১৯৫৯ সালে ২৯৩ কোটি

অর্থাৎ আট বছরে আবাদী জমির পরিমাণ বেড়েছে ২৬ কোটি বা শতকরা

পরিব্রাতা বিজয়কৃষ্ণ

এই সংঘাত-সংকুল জীবন-বিগ্রহকে অতুলনীয় তুলিকায় রূপায়িত করছেন কথাসিংশী ফাল্গুনী মৃধোপাধ্যায়

দেবপ্রী সাহিত্য সমিধ :

৫৭সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফালা খাঁর

নয়নী ও রাজনীতি

রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে একটি দেশ বিধ্বস্ত হয়ে গেল, একটি জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতি নিশ্চিত দুরভাগের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, সংখ্যাগত নয়নীর অগ্রদূত জল ইতিহাস রচিত হল স্বাধীন ভারতবর্ষে।

বাংলালীর সমস্যা প্রসঙ্গে ফালা খাঁর মত এমন বাক-বৈদগ্ধ এবং মননকণ্ঠ রচনা বাংলা সাহিত্যে এর আগে আর ছিল না।

দাম : ৫-০০

আনন্দ পাবলিশার্স

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৮ ভাগ এবং জনসংখ্যা বেড়েছে ৫০ কোটি বা শতকরা ২০ ভাগ।

মাথাপিছ জমি (একরে)

আবাদী খাস-জমি মোট		
১৯৫১ ১-০২	২-০৬	৩-৬৮
১৯৫৯ ১-১৮	২-১৭	৩-৩৫

অর্থাৎ আট বছরে মাথাপিছ আবাদী জমি কমেছে ০-১৪ একর, খাস-জমি কমেছে ০-১৯ একর।

এই হিসেবগুলো খুব ভালোভাবে বোঝা দরকার। চাষযোগ্য জমির হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৫১ সালে আবাদী জমি ছিল ৩২১ কোটি একর। ১৯৫৯ সালে তা হয়েছে ৩৪৭ কোটি একর। অর্থাৎ ২৬ কোটি একর জমি এই আট বছরে নতুন করে আবাদী হয়েছে। শতকরা হিসেবে ৮ ভাগ বৃদ্ধি। অন্যদিকে ১৯৫১ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২৪০ কোটি। ১৯৫৯ সালে তা হয়েছে ২৯০ কোটি। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০ কোটি। শতকরা হিসেবে ২০ ভাগ বৃদ্ধি। অর্থাৎ যে-হারে আবাদ বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হারে বেড়েছে জনসংখ্যা। তার ফল হয়েছে এই যে মাথাপিছ জমির পরিমাণ আট বছরের মধ্যেই ০-১৪ একর হিসেবে কমে গিয়েছে।

পঞ্চাশ দশকের চিত্রটি যদি এই হয় তবে ষাট দশকের চিত্রটি নিশ্চয়ই আরো অনেক অনুজ্ঞদল।

তবুও ষাট দশকের বিজ্ঞানীরা রীতিমতো সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করেছেন যে অন্তত আগামী চল্লিশ বছরে পৃথিবীতে খাদ্যের ঘাটতি পড়ার কোনো আশঙ্কা নেই। অবশ্যই কথাটার মানে এই নয় যে খাদ্য-উৎপাদনের জন্যে অতঃপর বিশেষ কোনো তৎপরতার প্রয়োজন নেই।

॥ দেশভেদে মাত্রাভেদ ॥

ব্যাপারটাকে তালিয়ে বদ্বতে হলে আমাদের আর একবার কতকগুলো সংখ্যার হিসেবে যেতে হবে। আমরা জানি, একর পিছ ফলনের পরিমাণ সব দেশে একই মাত্রার নয়। খাদ্য-সমস্যার সমাধানের আসল রহস্য এইখানে। প্রথমে সংখ্যাগুলো কতকগুলো ছকের মধ্যে ভুলে ধরা যাক।

আবাদী জমি (কোটি একরে)

	১৯৫১	১৯৫৯	বৃদ্ধি
এশিয়া	৮৫-৩	১০৭-৩	২২-০
ইউরোপ	৩৭-১	৩৮-১	১-০
দক্ষিণ আমেরিকা	১৬-৩	১৮-০	১-৭
উত্তর আমেরিকা	৬১-০	৬৩-৮	২-৮
আফ্রিকা	৬০-০	৫৮-৩	১-৭
ওস্ট্রেলিয়া	৫-৯	৬-৯	১-০

জনসংখ্যা (কোটিতে)

	১৯৫১	১৯৫৯	বৃদ্ধি
এশিয়া	১২৮-৪	১৬৩-৭	৩৫-৩
ইউরোপ	৩৯-৬	৪২-১	২৫-০
দঃ আমেরিকা	১১-৩	১৩-৫	২-২
উঃ আমেরিকা	২২-১	২৬-০	৩-৯
আফ্রিকা	২০-২	২৪-৬	৪-৪
ওস্ট্রেলিয়া	১-৩৩	১-৫৪	০-২১

মাথাপিছ আবাদী জমি (একরে)

লাভ (+) বা

১৯৫১ ১৯৫৯ ক্ষতি (-)

এশিয়া	০-৬৬	০-৬৬	—
ইউরোপ	০-৯৪	০-৯০	-০-০৪
দঃ আমেরিকা	১-৪৪	১-৩৩	-০-১১
উঃ আমেরিকা	২-৭৬	২-৪৫	-০-৩১
আফ্রিকা	২-৯৭	২-৩৭	-০-৬০
ওস্ট্রেলিয়া	৪-৪৪	৪-৪৮	+০-০৪

এই সংখ্যাগুলিও খুব ভালো করে লক্ষ্য করুন। এশিয়ায় মাথাপিছ আবাদী জমির পরিমাণ দেখা যাচ্ছে ০-৬৬ একর। ছকের এই বিশেষ স্তম্ভে তাকিয়ে দেখুন পৃথিবীর অন্য কোনো মহাদেশে মাথাপিছ একরের পরিমাণ এত কম নয়। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকায় মাথাপিছ আবাদী জমির পরিমাণ ২-৪৫ একর। ওস্ট্রেলিয়ায় ৪-৪৮ একর। এই অঙ্কের হিসেবই ঘোষণা করছে যে এই দুটি মহাদেশে খাদ্যের ফলন উন্নত হবে। আফ্রিকার দিকে তাকালেও এই একই ঘোষণা পাওয়া যাচ্ছে। এই মহাদেশে মাথাপিছ আবাদী জমির পরিমাণ ২-৩৭ একর। তবে আফ্রিকা সম্পর্কে বলার কথা এই যে এই মহাদেশটিতে ফসলের ফলন খুব বেশি নয়। কেন বেশি নয় তা বোঝার জন্যে আমরা তাকাব ইউরোপের দিকে। ছক থেকে দেখা যাচ্ছে ইউরোপে মাথাপিছ আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ০-৯০ একর। কিন্তু এই মহাদেশটিতে কৃষিব্যবস্থা এতই উন্নত যে এই অল্প পরিমাণ জমিতেও উৎকৃষ্ট ফলন সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য মহাদেশকে অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্যে কোন পথে অগ্রসর হতে হবে তার হিঁদস রয়েছে ইউরোপের কৃষিব্যবস্থায়।

॥ যৌথ খামার ও যন্ত্রীকরণ ॥

ইউরোপের কৃষিব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে যৌথখামার ও যন্ত্রীকরণ। একা একা চাষ নয় বা মাষাতার আমলের লাঙ্গল দিয়ে চাষ নয়—ট্রাক্টরের সাহায্য নিয়ে, কৃষি-বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার ও সাফল্যকে প্রয়োগ করে, বিপুল আকারে যৌথচাষ। অবশ্যই খুঁটিনাটি বিষয় আরো অনেক আছে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে এই পদ্ধতিগত পরিবর্তন। বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহাদেশে যদি এই আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ শুরু হয় তাহলে আগামী চল্লিশ বছরে পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব দেখা দেবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

সুখে স্বিস্ততা আনে
বোল্যাক্স
ফেন্স পাউডার
ওয়ারেন কঙ্গলোটি & প্রোডাক্টস • কলিকাতা

দি
বেঙ্গল ডেকরেটর
২২০, চিত্তরঙ্গন এডিনিউ • কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪০২২

বেসুত
ডেমজ কেশ তৈল
নির্ম্মাণ ঐক্য কলিকাতা-৬

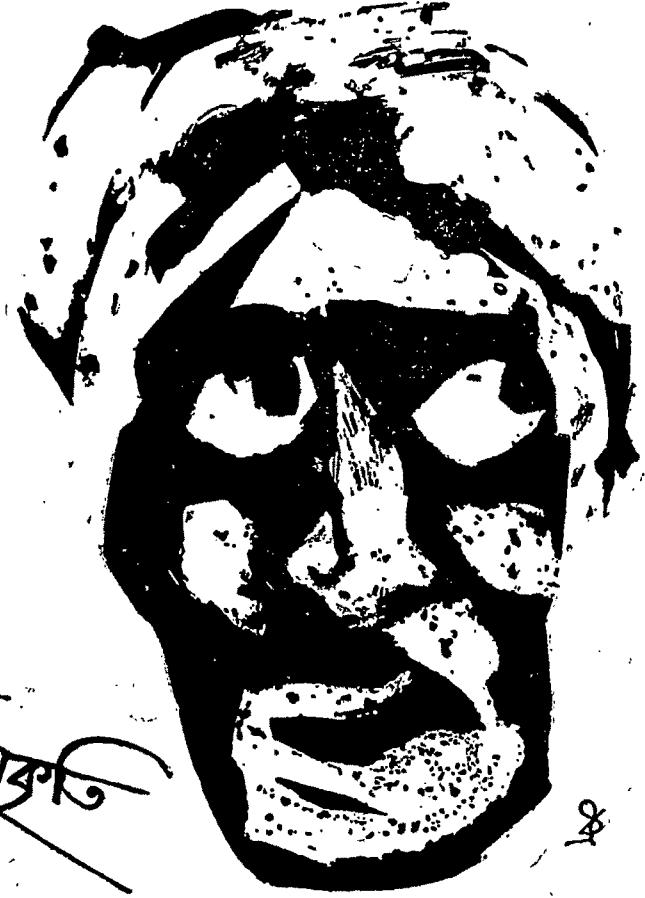
বিদেশী গল্প।

লোকটার মুখের কাটা দাগ প্রায়-সম্পূর্ণ তোরণের মত। পাশদুটো সেই দাগ থাকার জন্য মুখটা ভীষণ ক্রম্ব দেখায়। রগ থেকে গালের হাড় অব্যাহি বিস্তৃত সেই দাগ। এই দাগের জন্য লোকটার মুখ বিকৃত দেখায়। লোকটার সত্য নাম আমি বলব না, বলবার প্রয়োজন নেই। তাকুয়ারেম্বোর সকলেই তাকে কলোরেডা খামারের ইংরেজ বলে ডাকে। আমিও তাই বলব। লোকটার দুটো খামার, কলোরেডা আর কার-ডোসো। লোকটা খামার দুটোকে বিক্রি করার কথা চিন্তাও করতে পারত না। আমাকে অনেকেই বলেছে যে, এই ইংরেজ অনেক সময় অশুভ অশুভ কাজকর্ম করে। বলা ভাল, বিচিত্র তার রণ-কৌশল। কেউ আবার বলে রিয়ে গ্রাণ্ড দো সোল থেকে এসেছে এই ইংরেজ। জায়গাটা সীমান্ত প্রদেশে। কিন্তু সবাই বলে লোকটা ব্রেজিলের চোরা কারবারী। খামারের ওপর যন্ত্রণা বিশেষ নেই। মাঠময় আগাছা; পানীয় জলের উৎস শূন্যকিয়ে কাঠ। এই সব অবহেলা তার নজরে পড়ত মাকে মাকে।

কলোয়ারের আকৃতি
জর্জ লুইস বরজেস

এল; এত ক্লান্ত, পাশ্চুর, বিবর্ণ। আবার কখন কখন তাকে দেখাত আগের মত বদ-মেজাজী মালিক। লোকটাকে আজও আমার মনে পড়ে। মনে পড়ে তার শীতল চোখ দুটি, তার শরীরের কৃশতা তার ধূসর গৌরব। করো সপ্তে সে মিশত না। স্পেনীয় ভাষায় সে কথা বলত। কিন্তু সে ভাষাও সে জানত না। কথার মধ্যে ব্রেজিলীয় শব্দ ব্যবহার করত ভুরিভুরি। তার নামে চিঠিপত্র আসত না। কাচিং-কখন আসত ব্যবসার বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি।

গৃহীত করেছে এই কথা বোঝানোর জন্য আমি খুবই ব্যগ্র। আমি বললাম, যে জাতি ইংলন্ডের আর্থিক সম্পদ আহরণ করতে পেরেছে, সে জাতির বিনাশ হবে না কোন দিন। ইংরেজটি আমার কথা তখন সায় দিল। তারপর মৃদু হেসে বললে যে, সে ইংরেজ নয়, আইরিশ। ভূনগারভান প্রদেশের বাসিন্দা সে। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখে কুলুপ আঁটল। এ কথা বলা তার উচিত হয়নি। সে যেন একটা ভীষণ গোপনীয় শব্দ ফাঁস করে দিয়েছে।



তখন খামারের কুলিদের সঙ্গে সমান-ভালে পরিচয় করত সে। খামারের কুলিরা তাকে বদমেজাজের লোক হিসেবে জানত। কিন্তু তারা বলত, লোকটা রাগী হলেও সৎ, বিবেকবান। কুলিদের মতে লোকটা পাঁড়-মাতাল। বছরে প্রায় দু'বার সে ঘরের মধ্যে দিন দু' তিন নিজেই বন্দী করে রাখত। শারো সঙ্গে দেখা করত না, কথা বলত না। দিন দু' তিন পরে সে বইয়ে আসত। তখন সে যেন অন্য মানুষ। কখন মনে হত সে যেন ঘরের ঘোরের মধ্যে আছে। কখন মনে হত, সে যেন এইমাত্র বিরাট বৃক্ষক্ষেত্র থেকে ফিরে

উত্তরদেশের বিভিন্ন জেলার আশ্রিত তখন সফর করছি। এই সময় লোকটার সঙ্গে আমার আলাপ। বর্ষাকাল। কারাগুয়াতা নদীতে বান ডেকেছে। বাওয়া ঘাবে না। বাধ্য হয়ে আমাকে সেই রাতের জন্য কলোরেডা খামারের ইংরেজের কাছে আশ্রয় চাইতে হল। কয়েক মিনিট পার হয়ে গেলে আমার তখন মনে হল এখানে আশ্রয়ের জন্য না এলেই ভাল হত। আমি তাই সেই ইংরেজটির মনের দু'বলতম স্থানে আঘাত দিয়ে সহানুভূতি জাগাবার চেষ্টা করলাম। এই প্রাণির জন্য আমাকে আশ্রয় দিয়ে সে যে আমাকে অনু-

স্বাদের খাওয়া-দাওয়ার শেষ হয়ে গেলে আমরা আকাশের অবস্থা দেখার জন্য বাইরে এলাম। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণদিকের পাহাড়ের পিছনদিক থেকে ফুটে বেরুচ্ছে বিদ্যুতের ঝলকানি আর শোনা যাচ্ছে মেঘের ডাক। বুঝলাম আবার ঝড় উঠবে। আমরা খাবার ঘরে ফিরে এলাম। ঘরটা ছোট, ঝিঞ্জি। কুলি এসে এক বোতল মদ টেবিলের ওপর রেখে গেল। আমরা কেউ কোন কথা বলিনি বহুক্ষণ। শব্দ নিঃশব্দে মদ খেতে লাগলাম আমরা দু'জন।

সময় কত খেয়াল নেই। মনে হল নেণা ধরেছে। আমি তখন ওর গালের

কাটা দাগটার কথা ক্ষিপ্রস্রাস করেছিলাম। কিন্তু কেন? আজ আমার কিছু মনে নেই। কোন উৎসাহ, উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস বা বিরক্তির বশে আমি সেই প্রশ্ন করেছিলাম, তা আজ বলতে পারব না। কিন্তু আমার কথা ইংরেজটির কানে যেতেই তার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল। কিন্তু তা এক নিমেষের জন্য। মনে হল ইংরেজটি যেন এখনি আমাকে ঘর থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেবে। একটু পরে স্বাভাবিক শান্ত স্বরে বললে, “আমি এই কাটা দাগের গল্প শোনাতে পারি। কিন্তু এক শর্তে। আমার গল্প শোনার পর আমাকে লজ্জা বা অপমানের হাত থেকে রেহাই দিতে পারবেন না।”

আমি রাজী হলাম। ইংরেজী, স্পেনিস এবং মাঝে মাঝে পর্তুগীজ ভাষা মিশিয়ে এক বিচিত্র ঢঙে ইংরেজটি আমাকে এই গল্প শোনাল :

সে হবে ১৯২২ সালের কথা। অথবা ১৯২২এর দু'এক বছর আগে পিছেও হতে পারে। আমি তখন থাকতাম কনট প্রদেশের একটা শহরে। আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্য তখন আন্দোলন চলছে। বহুলোক যোগ দিয়েছে সেই আন্দোলনে। আমিও যোগ দিলাম। সৈদিন যারা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তাদের কেউ কেউ আজও বেঁচে আছে। কেউ কেউ নিরাপদ জীবনযাপন করছে। কেউ কেউ হরত এখনও বৃটিশের পতাকা কাঁধে নিয়ে সমুদ্র অথবা মরুভূমিতে আজও লাড়াই করছে। কথাটা শুনে অবাক হতে পারেন। কিন্তু সত্য। আর সৈদিন যারা স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বারা মহৎ তারা মারা গেছে। ব্যারাকের উঠানে তাদের সারবন্দী দাঁড় করিয়ে বৃকের ওপর সকালবেলা গুলী চালিয়েছে আধ-মৃত সৈন্যরা। আবার কেউ কেউ গৃহযুদ্ধের গোপন গৃহায় অপরিচিত ভাগ্যের মধুমোখি দাঁড়িয়েছে। তারা কিন্তু সবচেয়ে হতভাগ্য নয়। আমরা ছিলাম রিপাবলিকান, ক্যাথলিক। আমার মনে হয় আমরা ছিলাম রেগ্যাণ্টিক। আয়ারল্যান্ড আমাদের কাছে শুধুমাত্র আপাতিব্ধ ভবিষ্যত নয়। সে ছিল আমাদের রক্ত তিলক বর্তমান।.....একটি সম্ভার কথা আমি জীবনে ভুলব না। সৈদিন মনুষ্টার থেকে এল আমাদের

পার্টির একজন সভ্য। তার নাম জন ভিনসেন্ট মুন।

বয়স তার কুড়ি বছর হবে প্রায়। ছেলেটার গঠন ভালই, বড় কোমল। ওকে দেখা মাত্রই আমার মনে হল ওর চরিত্রে দৃঢ়তার বালাই নেই। তাই ওকে দেখে আমার খুবই অস্বস্তি লাগত। ছেলেটি খুবই পড়ুয়া। সাম্যবাদীদের সব বই ও খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়েছে। পড়ার জন্য সে খুব গর্বও বোধ করে। সেই সব কেতব তার কণ্ঠস্থ। যে কোন বিষয়ের আলাপ-আলোচনাকে সে দ্বন্দ্বমূলক বস্তু-বাদের দোহাই পেড়ে খামিয়ে দিতে পারে। মানুষ মানুষকে নানান কারণে ভালবাসতে পারে কিংবা ঘৃণা করতে পারে। কারণগুলি বড় বিচিত্র, বড়ই বিভিন্ন। তাকে গণনা করা অসাধ্য। কিন্তু মুন সেই বড় বিচিত্র জটিল কারণের ধারেকাছে ঘেসতে না। তার কাছে মানুষের ইতিহাস বড় সোজা, খুব সরল। তার কাছে মানুষের ইতিহাস হল অর্থনৈতিক সংগ্রাম। সে খুব জোর গলায় বলত যে আমাদের বিপ্লব সফল হবেই, হতে বাধ্য। আমি উত্তরে বলতাম যে, ভুললোকেরা একমাত্র ব্যর্থতার প্রতিই আকৃষ্ট।...রাত হল। আমরা কখন হলঘরে কখন সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তর্ক করছি। তর্ক করতে করতে কখন আমরা আকাবাঁকা পথের দিকে পা বাড়িয়েছি। মূনের মতামত আমাকে বড় একটা বিচলিত করতে পারত না। কিন্তু আমি বিরত বোধ করতাম মূনের অনমনীয় কণ্ঠস্বরে। আমাদের এই নোড়ুন কন্ঠের মুন বড় একটা তর্ক করত না। সে শূন্য অবজ্ঞার সঙ্গে এবং কিছুটা রাগতভাবে গোটা কতক আইন আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিত।

বেড়াতে বেড়াতে আমরা রাস্তার শেষ ঘরটার কাছাকাছি এসেছি। এমন সময় গুলীর আওয়াজ কানে এল। আমরা বিমূঢ় হয়ে গেলাম। সামনে কারখানার ব্যারাক। দেওয়ালগুলো মোটা মোটা। ব্যারাকের জানলা ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি সেই ব্যারাকের গা ঘেঁসে এগিয়ে গেলাম। থোলা-ওঠা রাস্তা। যেতে না যেতেই দেখি একজন সৈনিক। রাগে গণ গণ করছে সে। তার মাথার টুপিটাও যেন জ্বলছে। আমাদের দেখামাত্র সৈনিকটি চিৎকার করে আমাদের থামতে বলল। আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার কন্ঠের ভিতর জন ভিনসেন্ট মুন সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। সে ভয়ে বিকৃত হয়ে গেছে। আমি তাই আবার তাড়াতাড়ি করে এসে সৈনিকটিকে

এক ধাক্কা ফেলে দিয়ে মূনের কাছ ধরে খুব জোরে ঝাঁকানি দিলাম। আমার রাগ হয়ে গেল প্রচণ্ড। আমার পিছ পিছ আসার জন্য আমি হুকুম দিলাম। কিন্তু হাঁটতে অবধি পারছে না। ভয়ে সে জড়োসড়ো হয়ে আছে। আমি তাই বাধ্য হয়েই তাকে আমার হাত ধরে আসতে বললাম। চারপাশে তখন গুলী-বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা তার ভিতর থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। কানের পাশ দিয়ে গুলীর শব্দ ছুটে যাচ্ছে। একটা গুলী এসে বিঞ্চল মূনের ডান কাঁধে। তবু আমরা পাইন বনের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যেতে থাকলাম। মুন মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

১৯২২ সালের সেই শীতের রাতে আমি জেনারেল বার্কলের বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিলাম। আমি জীবনে এই জেনারেলকে দেখিনি। শুনেছিলাম জেনারেল বাড়ি নেই। কোন সরকারী কাজে গেছে বাংলাদেশে। সেখানেই আছে সে। বাগানবাড়ি খুব সার্বিক নয়। প্রায় শ'খানিক বছর আগে এই বাগানবাড়ি তৈরী হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে বাড়িটি পড়ো-পড়ো হয়ে গেছে। খুব অশুদ্ধকার। চারিদিকে নানা গলির মত বারান্দা। ধাঁধা লাগে। মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট হলঘর। এত হলঘরের যে কি প্রয়োজন থাকতে পারে, জানি না।

সমস্ত নিচের তলাটা জুড়ে ছিল মিউজিয়াম আর বিরাট লাইব্রেরী। বেশির ভাগ উনিশ শতকের ইতিহাসের বই। খুবই তর্ক-সঙ্কুল সেই সব গ্রন্থ। মতামতের সঙ্গে সায় দেওয়া মুসকিল। দেওয়ালে টানানো ছিল নিশাপুন্দের খজা। সেই খজুর অসমাপ্ত বৃত্তে তখনও যেন বড় আর যুদ্ধের উন্মত্ততা টের পাওয়া যাচ্ছিল। বেশ মনে আছে আমরা পিছনের দরজা দিয়ে জেনারেলের বাগানবাড়িতে ঢুকেছিলাম। দেখলাম মূনের ঠোঁট দুটো শূন্যে কাঠ হয়ে গেছে। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে মুন বলল যে আজ রায়ে ঘটনা বড়ই উপভোগ্য। আমি নিজে মূনের প্রাথমিক চিকিৎসা করলাম। তাকে দিলাম এক কাপ গরম চা। ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে দেখলাম মূনের আঘাত অতি সামান্য। কিন্তু হঠাৎ মুন পাগলের মত বলে উঠলো : “কিন্তু আপনি অসম্ভব বারুক নিয়েছেন।” পরিস্কার ভাবে কথা বলতে পারছিল না মুন। কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল।

আমি ওকে উদ্বেগন হতে নিষেধ করলাম। গৃহযুদ্ধের সময় এমন ঘটনা

রোজ রোজই ঘটে। নিয়মমাফিক আমাদের এই সব কাজ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে আমি ঠিক তাই-ই করলাম। তা ছাড়া একজন পার্টি সভ্য যদি জেলে যায় তবে আমাদের বিশ্লবও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

পরের দিন মুন প্রকৃতিস্থ হল। আমি একটা সিগারেট ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। ও আমার কাছ থেকে সিগারেটটা নিল এবং আমাদের বৈশ্লবিক পার্টির আর্থিক সংগতি সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত ভাবে জেরা করতে থাকল মুন। তার প্রশ্নগুলি অতি স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল। আমি মুনকে বলছিলাম যে, আমাদের অবস্থা বিশেষ সংকটজনক। আমি ওকে মধ্যে কথা বলি। আমাদের অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ তখন। ওই কটি গুলী শব্দ সমস্ত দক্ষিণ প্রদেশ বিচলিত হয়ে উঠল। আমি মুনকে বলছিলাম যে আমাদের কোম্পানী আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। ওভারকোট ও রিডলবার আনতে আমি আমার ঘরে গেলাম। ফিরে এসে দেখি মুন সোফায় পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। মূনের ধারণা যে তার জ্বর হয়েছে। কাঁধের কাছে সে খুব যত্নে বোধ করছে।

তখন আমার মনে হল মূনের এই কাপুরুষতা কোনদিন ঘুচবে না। আমার নিজেরই খুব জড়তা বোধ হল। তবু আমি মুনকে সাবধানে থাকার জন্য অনুরোধ করে চলে এলাম। আমি এই ভবিষ্যৎ লোকটির জন্য লজ্জিত হয়েছিলাম। যে লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল জন ভিনসেন্ট মূনের, প্রকৃতপক্ষে আমি নিজে সেই লজ্জা পেলাম। যেন আমি নিজেই কাপুরুষ হয়ে গেছি, ও নয়। একটা মানুষের কাজের দায়ভাগ গ্রহণ করতে হয় সমস্ত মানুষকে। তাই কোথাও কোন অব্যাহতা দেখা দিলে তা সংক্রমিত করবে সমগ্র মানবজাতিকে। তাই একজন ইহুদীকে ক্রমবিস্তারিত করে মানুষজাতিকে রক্ষা করা সম্ভব। সম্ভবত সোপেনহাওয়ারের কথাই ঠিক : আমি আর আমি নই। আমি অন্যালোক হয়ে গেছি। প্রত্যেকটি মানুষের ভিতর আছে মানুষজাতি। মনে হল ওই হতভাগ্য জন ভিনসেন্ট মূনের সঙ্গে সেক্সপীরের কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

জেনারেলের সেই বিরূপ বাগান-বাড়িতে আমরা ন' দিন কাটলাম। যুদ্ধের যন্ত্রণা ও গোরবের কথা আমি কিছুই বলব না। আমি শুধুমাত্র কাটা দাগের গল্পটাই আপনাকে শোনাব। আমরা ন' দিন বাগানবাড়িতে ছিলাম। কিন্তু আমার

মনে হয় এই ন' দিন যেন একটাই দিন। মাঝখানে কোন ছেদ নেই; বিরতি নেই। দশ দিনের দিন যেন বিরতি এসেছিল। দশ দিনের দিন যেন আরম্ভ হল স্বর্ভাবিক দিন। এই দিন এল আমাদের ইংরেজ সৈন্য। তারা এই বাড়ি দখল করে নিল। এলফিন শহরে আমাদের যোলাজনকে মেশিনগানের গুলীতে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা সেই হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলাম তখন। খুব ভোরে আবহা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমি বাগান-বাড়ির বাইরে আসতাম। আর ফিরতাম রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি। ওপরের তলায় আমার সংগী জন ভিনসেন্ট মুন আমার জন্য অপেক্ষা করত। ও নিচে নামতই না। কারণ ও আহত। আমি চোখ বোজালেই ওর ছবি দেখতে পাই। দেখি ও যেন মড অথবা ক্রজউইজ-এর যুদ্ধের সম্পর্কিত একটা বই হাতে নিয়ে বসে আছে। এক রাতে ও আমাকে বললে, "গোলা-বন্দুক আমার খুব ভাল লাগে।" জন আমাদের পরিকল্পনা জানতে চাইত। আমি বলতাম। সে সব শুনে আমাদের পরিকল্পনার সমালোচনা করত, পরিবর্তন করতে বলত। সে অতি তীর ভাবে সমালোচনা করত আমাদের "করণ আর্থিক সংগতির" জন্য আর বিবাদাচ্ছন্ন কণ্ঠে ভবিষ্যৎবাণী করে বলত যে আমাদের চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে এল বলে। দৈহিক শক্তিতে সে অক্ষম, সে কাপুরুষ। কিন্তু কাপুরুষ হবার জন্যও সে বিচলিত নয়। তার মানসিকতার প্রাচুর্য যেন সেই দুর্বলতা ঢেকে দিয়েছে। সে এই ভান করত সর্বদা। এই ভাবে দশ দিন কাটল।

দশ দিনের দিন শহরটা অধিকার করে নিল ইংরেজ সৈন্যরা। আমরা বলতাম তাদের ব্ল্যাক আন্ড টেন। ঘোড়া-সওয়ার সৈন্যরা নির্বাক ভাবে শহরের আলিতে গলিতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে ধোঁয়া আর ছাই উড়ছে। রাস্তার কেপে মানুষের একটা লাশ টানানো রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে আমি মোটেই বিচলিত হয়নি। মনে হল সৈন্যরা বন্দুক ছোঁড়া অনিশ্চলিত করার সময় যে নিশানা টাঙিয়ে রাখে ওই লাশটি যেন তাই-ই... আমি ভোর বেলা বাড়ি ছেড়েছি। সে দিন ফিরলাম দুপুর বেলা। লাইব্রেরী ঘরে মূনের গলার আওয়াজ কানে এল। মুন কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। ওর গলার স্বর থেকে মনে হল ও টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছে। আমার কানে এল ও আমার নাম বলছে তাকে। তারপর বলছে

যে আমি আসব সন্ধ্যা সাতটার পরে। আমি যখন বাগান পার হতে যাবো তখন যেন আমাকে বন্দী করা হয়। মুন টেলিফোনে নির্দেশ দিচ্ছে। বুদ্ধিলাম আমার যুক্তিবাদী বন্ধু যুক্তিসঙ্গত ভাবে আমাকে বিক্রি করার ব্যবস্থা করছে। তারপর আমি শুনলাম মুন নিজের নিরাপত্তার জন্য গ্যারান্টি চাইছে।

এবার আমার গল্পটা একটু জড়িয়ে যাবে, খেই হারিয়ে যেতে পারে। আমার মনে আছে আমি সেই অন্ধকারে বিভীষিকাময় বারান্দা আর খাড়া সিঁড়ি বেয়ে গুলতরকে অনুসরণ করেছিলাম। ঘরের অন্ধ-সন্ধি আমার চেয়েও ভাল করে জানত মুন। সৈন্যরা এসে আমাকে বন্দী করার আগেই গুলতরকে ধরতে হবে। গুলতরটি কিন্তু আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছিল দু' একবার। শেষকালে জেনারেলের মিউজিয়াম থেকে একটা ছুরি তুলে নিলাম। ছুরিটা আধ-খানা চাঁদের মত। আমি সেই আধখানা চাঁদের মত ছুরি দিয়ে ওর মুখে রক্তের অ-খানা চাঁদ একে দিলাম। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। কিন্তু তবু আপনার কাছে আমি অকপটে সব কথা বললাম।

এইবার ইংরেজটি থামল। দেখলাম ওর হাত কাঁপছে।

আমি বললাম, "আর মূনের 'ক হল?"

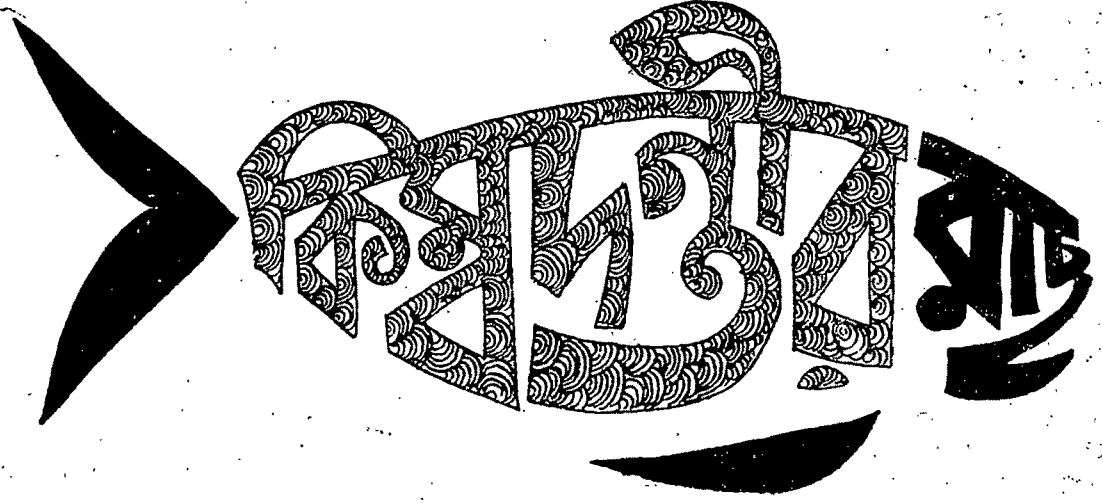
"সে জুডাসের মত বিশ্বাসঘাতকার পথে অর্থ নিয়ে ব্রিজলে পালিয়ে গেল। বিকেল বেলা দেখল পার্কের মাঝখানে মাতাল সৈন্যরা গুলীবর্ষণ করছে একটা নিশানা।

ভেবেছিলাম গল্পটা আরও চলবে। তাই আমি চুপ করে ছিলাম। কিন্তু ইংরেজটিও নির্বাক। তাই আমি তাকে গল্পটি শেষ করতে বললাম।

ওর মুখ থেকে একটা গোষ্ঠানর শব্দ বার হয়ে এল। তারপর খুব শান্ত মধুরভাবে সাদাটে মত স্থানটি দেখাল। একটু জড়িত কণ্ঠে বললে, "আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন না? দেখতে পাচ্ছেন না আমার মুখের ওপর আঁকা আছে সেই লজ্জা আর কলঙ্কের চিহ্ন। গল্পটা একটু ঘুরিয়ে বলতে হল। তা ভিন্ন আপনি হয়ত শুনতেন না গল্পটা।

যে লোকটা আমাকে অশ্রয় দিয়েছিল, আমি সেই লোকটারই সর্বনাশ করেছি। আমার নাম জন ভিনসেন্ট মুন। এইবার আমাকে ঘৃণা করুন।"

সুৰঙ্গন মুখোপাধ্যায়



হরপ্পা ও মহেঞ্জদাড়োর মৎস্যের গায়ে নানা ধরনের মাছ আর মাছ-ধরা জালের নক্সা কাটা দেখে পাণ্ডিতদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে মাছের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও মানুষ অবহিত ছিল। মানব-সভ্যতার শৈশব কাল থেকেই মৎস্যকুলের সঙ্গে মানুষের কেবল খাদ্য-খাদক সম্বন্ধই যে ছিল না—এমন প্রমাণ অজস্র। যুগ যুগ ধরে মাছের পাখার বিচিত্র বর্ণালী, স্বচ্ছ জলে তার লীলাময় স্বচ্ছন্দ গতির সঞ্চার

শিল্পীর মনেও বহু প্রেরণা জন্মিয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীও অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ব্যস্তির সঙ্গে তুলনা দিতে গিয়ে সেই সফরকারী উপমা টেনেছেন, গন্ডুঘমাট্র জলেই যে ফরফর শব্দে বিচরণ করে। সদা-চঞ্চল সফরীর সঙ্গে লাস্যময়ী তরুণীর চপল চাহনির তুলনা করেছেন কাবি। গৃহস্থ-বধূও সামাজিক শব্দ ক্রিয়াকর্মাদিতে মৎস্যের মৃগল-চিহ্ন ব্যবহার করে এসেছে। মহেঞ্জদাড়ো এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত সূত্রাদি থেকে তখনকার কালের সামাজিক

মানুষের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে মৎস্য-কুলের যোগাযোগ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত মনোজ্ঞ তথ্য জানা যায়।

ভারতের পৌরাণিক সাহিত্যে এ সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রচলিত আছে।

সন্ত ঋষির (সেডেন প্যাট্রিয়াক) রাজত্বকালে মনু যখন মনুস্যসমাজের আইন-প্রণয়নের কর্তা, তখন হরগ্রীব নামে এক রাক্ষস কদাচারে বেদকে অপবিত্র করে। ব্রহ্মা তখন এক বিরাট প্লাবনে পৃথিবী ধুংস করার আয়োজন করলেন—কেননা, পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়েছিল। মহাপ্লাবনের প্রলয়ে কেউ জীবিত রইলো না। শুধু সাতজন ঋষি এবং মনু নেহাৎ পৃথিবীতে বেঁচে গেলেন। শ্রীমন্ভাগবতে কথিত আছে বিষ্ণু এমন সময় মৎস্য অবতারের রূপ ধরেছিলেন। বিষ্ণু ক্ষুদ্র সফরীর বেশে সপ্তর্ষিকুলের সত্যব্রতের কাছে প্রাণরক্ষার আবেদন জানালেন। সত্যব্রত মূনি সফরীকে এক জলাধারে রাখলেন। কিন্তু তখনই হলো আসল মনুস্কল। ক্ষুদ্র সফরী ক্রমে ক্রমে নিজ দেহের আয়তন বৃদ্ধি করতে লাগলো। ঋষিও তার শরীরের আকার অনুযায়ী ক্রমশঃ বৃহত্তর জলাধারে তাকে রেখে তার অসুবিধা দূর করতে লাগলেন। সর্বশেষে সেই মাছ এতই বৃহদাকার ধারণ করলো যে, তাকে সমুদ্রে স্থাপন করতে হলো। সমুদ্রে পড়েই সেই মাছ এক অতিকায় সোনালি মাছে রূপান্তরিত



হরপ্পা ও মহেঞ্জদাড়োর মৎস্যের গায়ে নানা ধরনের মাছ আর মাছ-ধরা জালের নক্সা

হলো। তার শব্দই হলো হাজার মৌজা মাইল লম্বা। ঋষির কাছে মৎস্যরূপী ভগবান আসন্ন প্রলয়ের খবর দিলেন যা সাতদিনের মধ্যেই সংঘটিত হবে। ভগবান সেই ঋষিকে প্রত্যেক গাছের বীজ, প্রত্যেক ধরনের প্রাণীমণ্ডল নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে বাস করতে আদেশ দিলেন। একটি নৌকা ঋষিদের কাছে পাঠানো হলো। সেই বীজ ও প্রাণীদের নিয়ে ঋষিকুল নৌকার ভিতরে আশ্রয় নিলেন। মনু একটি বিশাল সাপ দিয়ে সেই অতিকার সোনালি মাছের শিং নৌকার গলিইয়ের সঙ্গে বেঁধে দিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে পুণ্যবান ঋষিকুল, প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ মহাপ্রলয়ের হাত থেকে বেঁচে গেল। এই কাহিনীর সঙ্গে বাইবেলে বর্ণিত নোয়া-উপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে। জয়দেবের গীত-গোবিন্দেও মৎস্য অবতারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। অগ্নি ও মৎস্যপূরাণ এবং মহাভারতেও অনুরূপ কাহিনী পড়া যায়।

মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, নবনির্মিত দীঘি বা পুষ্করিণী খনন করিয়ে সেখানে মাছ বা কচ্ছপ ছেড়ে দেওয়া উচিত। এতে জল নির্মল ও পরিষ্কার থাকে।

শুকর সংহিতা থেকে জানা যায় যে, বেদব্যাসের ভ্রাতা পরাশরের অপ্রকৃতিস্থ ছয় পুত্র একটি পুষ্করিণীতে দাঁড় দিয়ে মাছেদের বেঁধে, ও তাদের উপরে আরো নানা উপপাত করে কৌতুক উপভোগ করতেন। ঋষি পরাশর এই দেখে একদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের শাপ দিলেন। এই শাপে তারা মাছের আকার প্রাপ্ত হয়ে দিনযাপন করতে লাগলো। পার্বতী তাদের এই শাপমোচন করেন। যখন একদিন কুমারকে বৃকে করে তিনি স্তন্যপান করছিলেন, তখন কয়েক ফোঁটা স্তন্যদুগ্ধ ঐ পুষ্করিণীর জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ঋষিপুত্রেরা পুষ্করিণীর সেই দুগ্ধমিশ্রিত জলপান করে মানুষ্যের মূর্তি ফিরে পায়। এই গল্পের অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, জলাশয় থেকে মৎস্যকুল নির্মল করলে জল নোংরা ও অব্যবহার্য হয়ে উঠবে।

মাছেদের ঘর-কন্নাও খুব আকর্ষণীয়। বিষ্ণু পুরাণে ঋষি সৌভরীকে নিয়ে এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী আছে যা খুবই কৌতুকপ্রদ। সৌভরী দ্বাদশবর্ষকাল জলের তলায় তপস্যা করেন। তপস্যাকালে মৎস্যরাজ সম্মতের অসংখ্য দন্তান-সম্পত্তি তাঁর ধারে কাছে থেলে

করে বেড়াতে। সেই দেখে ক্রমে ক্রমে ঋষির মনে মোহ জন্মালো। তিনি রাজ্য মান্ধাতার সমীপে গিয়ে গৃহস্থ হবার বাসনা জানালেন। মান্ধাতার কন্যারা তাঁকে বিয়ে করে ঘর-কন্না করতে সম্মত হলো। অন্যতকাল পরেই পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্র-বধূ ও নাতি-নাতনী পরিবৃত হয়ে মূর্খি ভাবলেন—“এ কী হলো? জলের তলায় অবস্থান কালে মাছেদের দেখেই আমার মনে মোহ উপস্থিত হয়েছিল, সেই পরিণামে আমার তপস্যায়

বিঘ্ন হয়েছে। এখন আমি সম্পূর্ণ মায়্যা-পাশে আবদ্ধ হয়েছি।”

গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনে গ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ‘মৎস্যকুলের মধ্যে আমি মকর।’ পুরাণে কর্ণে মকর-কুণ্ডল ভূষিত বিষ্ণু-মূর্তির বর্ণনা আছে। বিষ্ণু যখন মৎস্য অবতারের রূপ ধারণ করেছিলেন তখন সেই বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে তাঁর উত্তমাঙ্গের মূর্তি অর্ধ-মানুষ্য সদৃশ। অধমাঙ্গের আকৃতি মৎস্যের ন্যায়। শিল্প-

প্রকাশিত হলো
রাজশেখর বসু-সংকলিত
আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান

চলন্তিকা

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ৯ম সংস্করণ
দাম—৮.৫০

বৃন্দাবন বসুর অন্যতম প্রেম উপন্যাস

যেদিন ফুটল

কমল

পরিমার্জিত ৩য় সংস্করণ
দাম—৪.০০

শোণপাংশু (উপন্যাস) ৪.০০

শেষ পাণ্ডুলিপি

(উপন্যাস) ৩.২৫

সুশীল রায়ের নতুন উপন্যাস

ত্রিনয়না

দাম—৫.০০

উইলী ক্যাথারের অনূদিত উপন্যাস

ভবিষ্যৎ ২.৫০

আর্চবিশপের মৃত্যু ৪.০০

সুধমা দেবীর উপন্যাস

স্বাহা

দাম—৫.০০

প্রকাশিত হলো

দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস

মালদা থেকে মালাবার

দাম—৩.০০

এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস
পাতালে এক স্বত্ব (১ম)

৬.০০

এই গ্রন্থের ক্রন্দন ৬.০০

ঝড় এলো ৫.০০

শঙ্খবিষ ৫.৫০

রোয়াক ৩.৫০

অমল হোম প্রণীত রবীন্দ্রলেখ্য

গুরুষোভম

রবীন্দ্রনাথ

পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ

দাম—৩.৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

১ম খণ্ড—৫.০০; ২য় খণ্ড—৫.০০

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রাচীন ইরাক ৬.০০

প্রাচীন মিশর ৫.৫০

অপূর্বরতন ভাদুড়ীর

মন্দিরময় ভারত

১ম খণ্ড—৫.০০

২য় খণ্ড—৬.০০

সুলেখা সরকারের

রান্নার বই ৫.০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাট্‌জো স্ট্রীট; কলিকাতা-১২

সাহিত্যে মৎস্যকন্যাদের আকৃতির বর্ণনাও অনূরূপ।

মীনের মত চক্ষু সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। তাই পার্বতীর চক্ষুর সৌন্দর্যের জন্য তাঁর আরেকটা নাম মীনাক্ষী। মাদুরা পাণ্ডুরাজাদের স্মারক-চিহ্ন ও মদ্রাদিতে মাছের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। দেবী মীনাক্ষী ছিলেন তাঁদের আরাধ্যা দেবী। বিজয়নগর রাজ্যের মদ্রাতেও মৎস্য এবং বিষ্ণুর মৎস্য অবতারের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। পুন্ড্রকোট্টার গুহাভ্যন্তরে মন্দিরের গাৱের ফ্রেস্কো পেণ্টিং-এ মাছের অনেক চিত্র আছে।

নৈষধের গ্রন্থে মাছের মত বিচিত্র জীবদের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। জলের মধ্যে সগুণমান এই বিচিত্র জীবেরা পরস্পরকে ভক্ষণ করে জীবন যাপন করে। ছোট মাছকে বড় মাছ খেয়ে ফেলে। বড় মাছকে তিমিমাছ গিলে খায়। তিমিকে আবার তিমিগিল ভক্ষণ করে। তিমিগিলকেও গিলে খায় আবার এক বিশাল হাঙ্গর, কৌতুক করে তাকে বলা যেতে পারে তিমিগিল-গিল। মৎস্যন্যায় শব্দটিও মাছদের বিচিত্র জীবনযাত্রা থেকেই উদ্ভূত। মহাভারতের বনপর্বে দেখা যাবে একটি ছোট মাছ মনুর কাছে এসে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। স্বগোষ্ঠীয় বৃহতের উপাধীন থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য সে বলছে—“হে প্রভু! তোমার মত পুণ্যবান ব্যতীত আমার মত ক্ষুদ্রের স্বার্থরক্ষা কে-ই বা করবে। জগতে বৃহৎ ক্ষুদ্রের উপর সদাই অত্যাচার করে। মৎস্যকুলের বৃহতেরা ক্ষুদ্রকে আত্মসাৎ করে জগতের এই নিয়ম পালন করে চলে। তোমার মত মহৎ ও পুণ্যবানেরই আমার মতো দুর্বল ও ক্ষুদ্রের জীবন রক্ষা করার দায়িত্ব আছে।”

তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায় যে, দেবতাদের যজ্ঞের সময় একবার যজ্ঞের সমিধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বহন করার ভার পড়েছিল অগ্নিদেবের উপরে। তিনি ও তাঁর দুই ভাই মিলে এই কঠোর সম্পাদন করার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অগ্নিদেবের দুই দ্রাতা এই ভার বহন করে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে প্রাণত্যাগ করলো। অগ্নিদেব প্রাণের ভয়ে দেখলেন, এই ক্ষীণ শরীরে একা কাজ করতে গেলে মৃত্যু অবধারিত। জলের তলায় অগ্নিদেব আত্মগোপন করলেন। তখন একটি মাছ অগ্নির অনুসন্ধানরত দেবতাদের কাছে লুকিয়ে থাকার গোপন খবরটি ফাঁস করে দিলো। অগ্নিদেব রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাদের শাপ দিলেন, “হে মৎস্যকুল! তোমরা যেমন দেবতাদের কাছে আমার ধরিয়া দিয়েছ তার ফলস্বরূপ আমি শাপ দিচ্ছি যে, ধীবরেরা জাল ফেলে তোমাদের জল থেকে ভাঙায় তুলে নিধন করবে এবং রসনার প্রয়োজনে যখন তখন তোমাদের সকলে শিকার করবে।”

হিরণ্য নামে এক অসুর স্কন্দের সেনাপতি। বীরবাহুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে মাছের রূপ ধারণ করে জলের তলায় লুকিয়েছিল—পূরণে এ গল্প প্রচলিত আছে। তিমিধ্বজ নামে খ্যাত মৎস্যরূপী আর এক অসুরকে রাজা দশরথের সাহায্যে ইন্দ্র পরাস্ত করেন। গণেশপূজারূপ থেকে জানা যায় যে, বিশাল হাঙ্গররূপী মৎস্যাসুরকে গজানন পরাজিত করে তাকে বিশেষ নিগ্রহ করেন।

পূরণে মৎস্যদেশের উল্লেখ আছে। আসলে বিরাট রাজ্যকেই মৎস্যদেশ হিসেবে অভিহিত করা হত। পাণ্ডবেরা যমুনার তীরবর্তী রোহিতক ও সুন্দর-সেনদের রাজ্য পার হয়ে এই বিরাট দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বিরাট রাজ্যের রাজধানী বৈরাট, জয়পুর রাজ্যের উত্তরে চিল্লিশ মাইল দূরে অব-

স্থিত ছিল। পাণ্ডাল রাজ্যে পাণ্ডাল-দুহিতা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে মৎস্য-মন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। তীরন্দাজদের শর-সম্বধানের নৈপুণ্য পরীক্ষা করার জন্যে। এই কাহিনী অনেকেরই জানা যে নীচে অবস্থিত তৈল-পাত্রে মাছের ছায়া দেখে



লুকিয়ে থাকার গোপন কথাটি ফাঁস করে দিল

একটি খাড়াই স্তম্ভের উপরে বেঁধে রাখা মাছের চোখ বিধে অজুন দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলেন।

পৌরাণিক সাহিত্যে সং ব্যক্তির সঙ্গেও মাছের তুলনা করা হয়েছে—যে অপরের কোনো অনিষ্ট কখনো চিন্তা করে না।

বৃহদারণ্য উপনিষদে এক স্থলে জীবাত্মার সঙ্গে মাছের উপমা করে বলা হয়েছে যে, ‘বৃহৎ মাছ যেমন নদীর দুই তীরেই পরিত্রা করে বেড়ায় তেমনি জীবও ঘুম ও জাগরণ এই দুই অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে।

কাজেই দেখা যায় যে, আদিকাল থেকে মাছ শব্দ মানুষের রসনার তৃপ্ত সাধন করেই আসে—তার চিন্তা-জগতেও প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য-শিল্প ও দর্শনও মৎস্যকুলের কাছে অনেক ঋণী। আজকের দিনেও প্রচলিত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও মঙ্গল-কর্মাদির প্রাচীন ঐতিহাসিক উৎস অনুসন্ধান করে জানা যেতে পারে মৎস্যকুলের কাছে মানুষের এই ঋণ কেবলমাত্র কিম্বদন্তী নয়।

আসন গ্রন্থ

বীরের জন্যে—পদ্মরাগমণি (চাঁদ), চন্দ্রের জন্যে—শ্বেতমস্তা বা চন্দ্রকান্তমণি, বঙ্গলের জন্যে—প্রবালরত্ন বা অনুরাগমণি, বৃদ্ধের জন্যে—মরকতমণি (পান্না), বৃহৎপতির জন্যে—পীতপদ্মরাগমণি, শত্রুর জন্যে—হীরক বা বরুণমণি, শালির জন্যে—নীলকান্তমণি বা সন্ধ্যামণি, রাহুর জন্যে—গোমেদকমণি, ক্তুর জন্যে—বৈদূর্যমণি বা রাজপট।

আমাদের গ্রন্থ জিওলজিক্যাল সডে অব ইন্ডিয়া অফিসের পরীক্ষায় অর্থাৎ প্রমাণিত হইলে ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।

আসন গ্রন্থ বাবসায়ী

এম, পি, জুয়েলার্স

১, বিবেকানন্দ রোড (চিৎপুর জং), কলিঃ-৭, ফোন: ৩৩-৫৭৬৫

॥ নতুন গতিসম্পন্ন জেট বিমান ॥

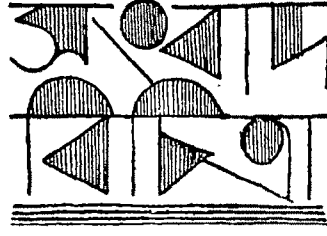
খ্যাতনামা সোবিয়ত যাত্রীবাহী-বিমান ডিজাইনার ভ্যাদিমির মিয়ামিশ-চেফের তথ্য থেকে জানা গেছে যে, ১৯৭০ সালের পূর্বেই সোবিয়ত ইঞ্জিনিয়াররা এমন দ্রুতগামী যাত্রীবাহী জেট বিমান নির্মাণ করতে সমর্থ হবেন যা দু-হাজার কিলোমিটার বেগে অর্থাৎ শব্দ-তরঙ্গের চেয়ে চের বেশি দ্রুতবেগে যাবে। আরো জানা গেছে ১৯৮০ সাল নাগাদ ঘণ্টায় তিন হাজার কিলোমিটার বেগে গামী ও অন্তত ২৫০জন যাত্রীবাহী বিমান নির্মিত হবে। এসব বিমানে দৈনিক ১,০০,০০০ যাত্রী বহন করা সম্ভব হবে।

মিয়ামিশ-চেফ ও তাঁর সহকর্মীরা এমন একটি যাত্রীবাহী বিমান-ডিজাইন করার কাজে রত আছেন যা খাড়াভাবে মাটি থেকে আকাশে উড়তে পারবে, শব্দতরঙ্গের চেয়ে দ্রুতগতি অর্জন করবার কালে 'শক' প্রতিরোধ করতে পুরোপুরিভাবে সমর্থ হবে এবং ৩০ কিলোমিটারেরও বেশি উচ্চতা দিয়ে উড়ে যেতে সমর্থ হবে। এই নতুন ধরনের বিমান ১০০ জন যাত্রী বহন করতে সক্ষম হবে।

॥ মরুভূমির বৃকে ফলের উদ্যান ॥

মরুভূমি ও চিরন্তন অনাবৃষ্টির দরুণ লতা-গুল্মহীন ধূ-ধূ প্রান্তরে শস্য-শ্যামলিমায় ভরিয়ে তোলা মানুষের চিরকালের স্বপ্ন। সেকালে মানুষের জন্য খাল কেটে কৃষা খুঁড়ে সেচের ব্যবস্থা করে মরুভূমিতে শস্য ফলিয়েছে। আজ সেই কাজে এগিয়ে এসেছে ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ও প্রকৃত-বিজ্ঞানী। নতুন কারিগরি জ্ঞান, নতুন কৃত্রিম পদার্থের সাহায্যে তারা বৃষ্টির জল সংগ্রহ করেছে। মাটির নীচে জল মজুত করেছে। প্রাকৃতিক মরুদ্যান তৈরী প্রাকৃতিক আশ্চর্য কিন্তু মানুষের তৈরী মরুদ্যান আজ বহু মরুভূমিতে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

আধুনিক জমি পুনরুদ্ধারকারীদের মধ্যে হাইড্রো-ভায়ান নামে একজন জার্মান রাসায়নিককে পথিকৃত বলা যায়। এক অভিনব পন্থায় তিনি জলহীন মরুভূমির জমিকে উর্বর করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। পশ্চিম জার্মানীর ছোট্ট একটি রাসায়নিক পদার্থ নির্মাণের কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার হাইড্রো-ভায়ান এমন একটি কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত করেছেন যেটি শূন্য বালুয়াম জমিতে দুঃসহ তাপের মধ্যেও কয়েক সপ্তাহ জল ধারণ করে রাখতে সক্ষম। আর এই কৃত্রিম ফেনাময় পদার্থের উপর, স্বাভাবিক মাটির মতই লতা-গুল্ম, এমনকি গাছপালা পর্যন্ত চমৎকার জন্মায় ও বাড়তে থাকে।



হাইড্রো-ভায়ান ১৯৫৩ সাল থেকে দীর্ঘ কাল ধৈর্যের সঙ্গে নানারকম প্ল্যান্টকের ফেনার ওপর দৌশ-বিদৌশ বিভিন্ন লতা-পাতা লাগিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। চার বছর অবিরাম পরীক্ষার পর তিনি সেই বিশেষ কৃত্রিম ফেনাটি পেলেন যার ওপর স্বাভাবিক জমির মত সবরকম লতা-পাতা বাঁচে। অগ্নিনিবাপক পাইপের মত জিনিস দিয়ে এই তরল ফেনা জমির ওপর ছিটিয়ে দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে জিনিসটি কঠিন সচ্ছিন্ন শোষণক্ষম ফেনার গদিতে পরিণত হয় এবং তলার মাটি তার থেকে জলীয় ভাগ টেনে নিতে পারে না।

কয়েকজন জার্মান বিশেষজ্ঞ সৌদি আরবের এর-বিজাদ নামক স্থানে তপ্ত মরুভূমির বৃকে এক ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে ঐ ফেনা ছিটিয়ে দেবার কয়েক মিনিট বাদে প্রতি দশ বর্গ ফুট স্থানে ১ই গ্যালন মাপে জল ঢেলে চলে যায়। তিন সপ্তাহ পরে এসে তারা দেখে যে তখনও প্রতি দশ বর্গফুটে আধ গ্যালন মাপক জল রয়েছে। মরুভূমিতে যেখানে ১১৫ ডিগ্রি তাপ ওঠে যেখানে সূর্যের তেজে জল সংগে সংগে বাষ্প হয়ে যায়

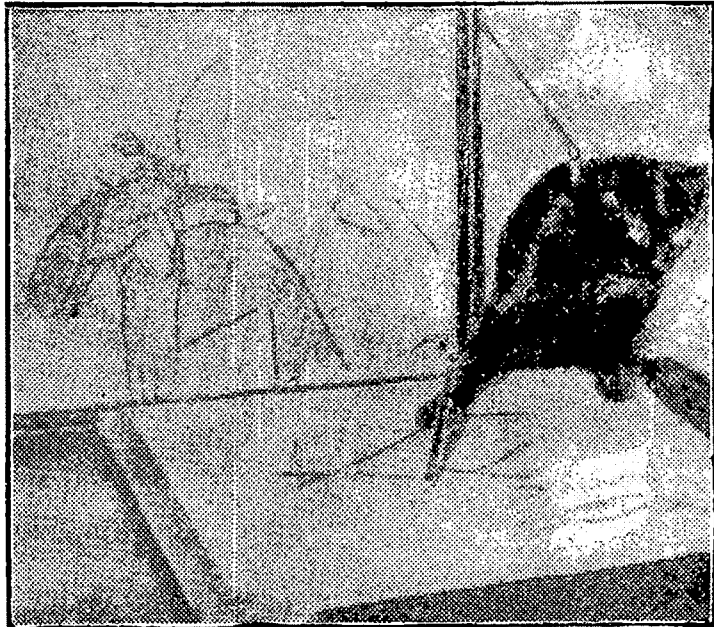
কিংবা জমি শুষ্ক নেয়, সেখানে এই ঘটনা নিতান্তই আশ্চর্য।

এই পরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মরুভূমির বৃকে আজ ২০০০টি কমলা লেবু ও লেবু গাছ লাগান হয়েছে। পাঁচটি ছাড়া আর সব গাছ বেঁচে আছে ও বড় হচ্ছে। তাই আশা করা যায় পত্র-পুষ্প তৃণের শস্য-শ্যামলিমায় মরুভূমির রূপান্তর ঘটাবার মানুষের চিরন্তন স্বপ্ন এবার সত্যিই বোধহয় বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে।

॥ বিড়ালের আঁকা ছবি ॥

মানুষে ছবি আঁকে। উপযুক্ত শিক্ষা দিলে অন্য কয়েকটি প্রাণী মানুষের মত আচরণ করতে পারে সত্য, কিন্তু বিড়ালের পক্ষে ছবি আঁকার মত শক্ত কাজ করা সম্ভব তা এতদিনে জানা গেল। গত বছর লন্ডনে তার অঙ্কিত একটি একক-প্রদর্শনী হয়ে গেছে। সেটি গৃণীজনের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।

বিড়ালটির নাম টিপসি। জীবনে সে মোট ২৫টি ছবি এঁকেছে। আঁকার পদ্ধতিটিও খুবই আশ্চর্য। টেবিলের ওপরে একটি পেন্সিল ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। আর টিপসি ঐ পেন্সিলটি ধরে ছবি আঁকতো। টিপসি গত ১২ই মার্চ মারা গেছে। তার এই বিরোগান্ত পরিণতি খুবই দুঃখজনক। টিপসি তারই এক স্বজাতীরকে তাড়া করে রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া কালে গাড়ী চাপা পড়ে মারা যায়।



টিপসির আঁকা 'ঘোড়সওয়ারের' ছবি। ডানদিকে টিপসি আর বাঁদিকে ছবিটি রয়েছে।

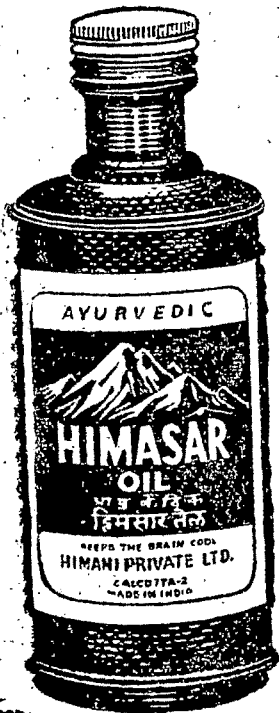
হিমালী

হিমসার

আয়ুর্বেদিক কেশতৈল ও

হিমসারিন সাবান

দিনের সূর্যতেই হোক কি শেষেই হোক
হিমালী হিমসারিন সাবান দিয়ে স্নান করে
দেখুন—কি চমৎকার লাগে ! এতে গাত্র
চর্মে সজাগ হয়, গাত্রবর্ণ সতেজ হয় এবং
মনের তৃপ্তিবোধ করে আসে ।
আর স্নানের শেষে—শীতল সুবাসিত
হিমালী হিমসার কেশতৈলে কেশের
জোড় আসে ।



পূর্ণাঙ্গ স্নানের সাযগ্ৰী

হিমালী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২



(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

‘সে এক্সপেরিমেন্ট তো তুমিই করছ,’ নিরুপম মৃদু হেসে বলে, ‘রেজাল্ট দেখে না হয় বিবেচনা করে উৎসাহিত হওয়া যাবে। কিন্তু নতুন পাগলামীর কথা কি বলছিলে?’

‘একে তুমি নতুন আর এক পাগলামী বলছ কেন?’—

নিরুপম নয়, প্রশ্ন করলেন নিরুপমের মা। বললেন, ‘এইটাই তো আশা করছিলাম আমরা। এই তো আশ্বাস দিচ্ছিলেন ডাক্তার।’

‘তা’ বটে!’ নীতা আস্তে আস্তে বলে, ‘তবু কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।’

সুচিন্তা সহজভাবে বলেন, ‘হচ্ছে না, তার কারণ অনেক দিন পরে হঠাৎ দেখছ তুমি।’

হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যার সেই স্তব্ধতার পর থেকেই আশ্চর্য রকম সহজ হয়ে গেছেন সুচিন্তা। হয়তো রাত্রির অন্ধকারের নিভৃত প্রাণনায় অর্জন করেছেন এই সহজ হবার শক্তি। হয়তো বার, বার বলেছেন, সুশোভন সেয়ে উঠুক স্বাভাবিক হয়ে উঠুক, এই তো চেয়েছি এত দিন ধরে।

হয়তো ভেবেছেন, পৃথিবী অকৃতজ্ঞ, পৃথিবী নিষ্ঠুর, এমন কথা ভেবে বিচলিত হচ্ছি কেন আমি? তার নিষ্ঠুরতার মধ্যেই তো কল্যাণ হাতের স্পর্শ, তার অকৃতজ্ঞতাই তো মস্তির বাহক।

তাই নীতা যখন এসে বলল, ‘বাবাকে আপনি ঠেকান পিসিমা! আবার এই এক

নতুন পাগলামী নিয়ে ভীষণ অস্থিরতা করছেন!’—তখন সুচিন্তা সহজভাবে বললেন, ‘একে তুমি পাগলামী বলছ কেন? এই তো আশা করছিলাম আমরা।’

সত্যিই তো, এই তো আশা করবার কথা।

নীতা কি এই আশা নিয়েই তার বশবাক নিয়ে একদিন অনূপম কুটিরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ানি?—

তবু নীতা ভাবছে, ‘কিন্তু এতটাই কি আশা করেছিলাম আমি?’

ভাবনায় বাধা পড়ল।

সুশোভন এসে সুচিন্তার দিকে তাকিয়েও না দেখে ব্যস্তভাবে বললেন, ‘আজ না আমাদের ওবাড়ী যাবার কথা ছিল নীতু?’

‘হ্যাঁ, এই তো যাবো।’ নীতা বলে, ‘আচ্ছা পিসিমা, আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।’

সুচিন্তার উত্তর দেবার আগেই উত্তর দিয়ে ওঠেন সুশোভন। গম্ভীর অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, ‘সুচিন্তা কেন ওখানে যাবে? সুচিন্তার যাবার কী দরকার? সুচিন্তা তো ওদের আত্মীয় নয়।’

লাল হয়ে ওঠে নীতা, অপ্রতিভ মুখে তাকিয়ে দেখে সুচিন্তার দিকে। কিন্তু না, সেখানে কোন বৈলক্ষ্য ধরা পড়ে না। নির্বিকার মুখে তাকিয়ে আছেন সুচিন্তা। কিন্তু নীতা হঠাৎ রেগে ওঠে, চটে ওঠে। বলে ওঠে, ‘আমরাও তো সুচিন্তা পিসিমার আত্মীয় নই বাবা! তবু—’

সুশোভন বাধা দেন; আরো গম্ভীর মুখে বলেন, ‘আত্মীয় নয়, সে কথা তুমি আমায় শেখাবে? আমি জানি না? না জানলে চলে যেতে চাইছি কেন? পরের বাড়ী থাকতে নেই বলেই না।’

‘আঃ বাবা, কী বলছ সব?’

‘ঠিকই বলছি—’ সুশোভন উত্তেজিত মুখে আরো কী একটা বলতে যান, কিন্তু ওদের দু’জনকে অবাক করে দিয়ে সুচিন্তা সশব্দে হেসে উঠে বলেন, ‘এই শব্দ হল বাপ-বোঁটির বগঁড়া। নাও বাপ, কোথায় তোমাদের সেই পরমাশ্রয়ীরা আছেন, একলা একলাই দেখগে যাও। আমার আর গিয়ে কাজ নেই। কিন্তু রাতের খাওয়াটা খেয়ে টেয়ে ফিরবে না তো? যেমন অসময়ে যাচ্ছে!’

নীতা স্বল্পবাক সুচিন্তার এই প্রগল্ভতা দেখে একটু অবাক হয় বৈ কি, তবু তাড়াতাড়ি বলে, ‘না না, সে কী! খেয়ে আসবো কি?’

ওর কথা শেষ না হতেই সুশোভন ভুরু কুঁচকে বলেন, ‘তা’ ওরা যদি খেতে বলে খেতেই হবে। ওদের কথা না শুনলে সুচিন্তার কথা শুনলে ওরা নিন্দে করবে না?’

‘তা’ বটে, তোমার যে আবার আজ-কাল লোকনিন্দের জ্ঞান টেনে নিয়েছে। কিন্তু না বাপ, না। খেয়ে-টেয়ে এসো না। কাল তোমরা চলে যাবে বলে আমি আজ ভাল ভাল রান্না করিয়েছি।’ বলে হাসিমুখেই চলে যান সুচিন্তা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নীতা সেই চলে যাওয়ার দিকে। তবে কি কাল সে

যা দেখেছিল তা' ভুল? কৃষ্ণার চিঠির সেই কথাই সত্যি? সুশোভনের দ্বায়ে সর্বস্বান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন সুচিন্তা? তৃষিত হয়ে উঠেছেন মৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায়? তাই সাধারণ সৌজন্যে 'যাক না আর দুটো দিন, থাকো না আর কটা দিন,'—এটুকু বলবার ইচ্ছেও খুঁজে পাচ্ছেন না? আর মৃষ্টির আশায় হালকা হয়ে উঠেছেন? প্রগল্ভ হয়ে উঠেছেন?

নইলে নীতা তো সুযোগ দিচ্ছিল।

হিসেব মিলোতে কষ্ট হচ্ছে নীতার। ধারণা করেনি 'চলে যাওয়াটা'—এত সহজ হবে। আশ্চর্য! আশ্চর্য! কোথাও কোন বেদনা বাজবে না? কোথাও কোন বাধা—'না না না' বলে আত্ননাদ করে উঠবে না? বাতাস লাগা বাসি ফুলের মত নিঃশব্দে গাছ থেকে ঝরে পড়বে নীতার অনেক ভাবনা আর কম্পনা দিয়ে গড়া একটী অনৈসর্গিক ফুল।

তা'হলে সুশোভনের সবটাই পাগলামী?

ঠকাতে চাইছেন সুচিন্তা। মানী শিশুরা যেমন মার খেয়ে মাকে ঠকাতে চায় 'লাগিনি, কিছু লাগিনি।' বলে।

'লেগেছে' স্বীকার করলেই তো ধূলিসাৎ হ'ল সমস্ত অহংকার।

না, ধূলিসাৎ হয়ে যায়নি অহংকার।

উত্তীর্ণ হয়েছেন সুচিন্তা। অন্তত আজকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু কেমন লেখা হবে শেষ পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্রখানা! সে পড়া কি তাঁর আছে সুচিন্তার?

ওরা চলে গেলে অনেকক্ষণ স্থানচ্যুত মত বসে রইলেন সুচিন্তা। বসে বসে বোধ হয় হিসেব কসতে লাগলেন আরও কত-ক্ষণ তাঁকে এমন বর্মান্বিত হয়ে থাকতে হবে। এখনই যে সমস্ত দেহমন উন্মুখ হয়ে চাইছে একটু শান্ত বিশ্রাম। চাইছে একখানি নিভৃত নিজস্ব কোণ, যেখানে নিজেকে শিথিল করে বিছিয়ে দেওয়া যায়। নামিয়ে রাখা যায় বর্ম-চর্ম। লাভ-লোকসান, দেওয়া-পাওয়া, ভাগ্য-ভগবান, সব কিছুর চিন্তাবিহীন, মৃত্যুর মত মধুর মনোহর সেই বিশ্রামটুকু ছাড়া আর কিছু চাইবার নেই সুচিন্তার।

কিন্তু এখুনি নয়, এখনো অনেক-গড়ুলো ঘণ্টা বাকী। অনেকগুলো দিন আগে যে গাড়ীখানা অনুপম কুটিরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই গাড়ীখানা আবার যখন অনুপম কুটিরের দরজা থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেবে, অদৃশ্য হয়ে যাবে অনুপম কুটিরের সামনের রাস্তা থেকে, ধূলোয় নিশ্চল হয়ে যাবে তার চাকার দাগ, তখন সুচিন্তার ছুটি।

চাকার সেই দাগ কোথাও কোনখানে গভীর বিদারণ রেখা রেখে গেল কিনা, সে হিসেব কষা হাস্যকর। পৃথিবী যৌবনের, পৃথিবী নতুনতর। জীর্ণ বার্ধক্য যদি সে পৃথিবীর জীবনের আসরের এক কোণে এসে দাঁড়াতে চায়, যদি বলে এ আনন্দ-যজ্ঞে যে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, একবাক্যে ছিছি করে উঠবে সবাই, হেসে উঠবে একযোগে। বলবে 'কী লোভী, কী খেলো! জান না পৃথিবীর একটা 'বিস্মৃতির ঘর' আছে?' সেখানে আশ্রয় নাওগে। তুমি, সেই তোমার জায়গা। আমরা তোমাকে ভুলে যেতে চাই, ভুলে থাকতে চাই। তুমি যদি সামনের লাইনে এসে দাঁড়াতে চাও, সেটা হবে পৃথিবীর ছন্দপতন।'

সুচিন্তা মস্ত-জপার মত করে বলতে লাগলেন, 'তাই হোক—তাই হোক।



'আজ না আমাদের ওবাড়ী যাবার কথা ছিল নীতা?'

নীতা তো বাবার অকৃতজ্ঞতায় লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'বাবাকে আপনি ঠেকান পিসিমা—এ ও'র আর এক নতুন পাগলামী।'

কিন্তু সুচিন্তা সে সুযোগ হাতে তুলে নিলেন না। বরং উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'সে কী। পাগলামী কেন? এই তো আমরা আশা করছিলাম।'

সুচিন্তার সবটাই করুণা?

তাই সুশোভন চলে যাবেন বলে ভাল ভাল রান্না করিয়ে সে কথা ঘোষণা করে বলতে পারছেন সুচিন্তা! সহজেই বলতে পারছেন! কিন্তু তাই কি? দীর্ঘকাল ধরে নীতা কেবল ভুল দেখে এল? না, না, তা' অসম্ভব! পৃথিবীর কাছে বড় বেশী ঠকে গেছেন বলেই হয়তো, পৃথিবীকে

আমার জন্যে থাক সেই বিস্মৃতির তমসা।
পৃথিবী ভুলে যাক আমাকে। ছুটি হোক
আমার। আমার এই জীবন-যজ্ঞের
হোমানলে কী আহুতি দিলাম সে কথা
ভেবে ছোট হ'ব না। ওই হোমানলের
ভস্মটীকাটুকুই রইল আমার জমার
খাতায়।

গত কয়েকটা দিন যে সুশোভনের
প্রতি ভয়ংকর একটা অভিমানে নির্বাক
হয়ে থেকেছিলেন, তা মনে পড়ে লজ্জিত
হলেন সুচিন্তা। আর একবার মন
জুগলেন, 'ও সহজ হয়ে উঠুক, সুস্থ হয়ে
উঠুক, নিজের কেন্দ্রে নিজের আত্মীয়দের
কাছে ফিরে যাক। শেষ পরীক্ষার সেই
প্রশ্ন-পত্রটা যেন আমার কাছে কঠিন হয়ে
না ওঠে, যেন নিভুল সমাধানে উজ্জ্বল
হয়ে উঠতে পারে আমি।'

কিন্তু কোনটা নিভুল? সুচিন্তা কি
তা' নিশ্চিত জানেন? এখনো যে কোথায়
যেন জমাট বেঁধে রয়েছে ভয়ানক একটা
ভয়, সেখানে চোখ ফেলতে সাহস
হচ্ছে না।

কিছুদিন থেকে সুশোভন যেন
গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, একটু বা
অপ্রসন্ন। কিন্তু আজ ওবাড়ী থেকে
ফিরলেন একেবারে হেঁ হেঁ করতে করতে।
মনে হল যেন সেই পুরনো খুশী ফিরে
পেয়েছেন।

হাঁক পাড়লেন, 'সুচিন্তা, সুচিন্তা!
সব ঠিক করে এলাম। একেবারে টিকিট
কেনার ব্যবস্থা পর্যন্ত কম্পাটী। নীতা
ভেবেছিল আমাকে দিল্লী নিয়ে যাবে না,
ভুলিয়ে ফেলে রেখে চলে যাবে। বুঝে
ফেলেছিলাম আমি নীতার মতলব। তাই
তো ওবাড়ীতে গেলাম। ওখানে আমার
দাদা রয়েছে। সে সব করে দেবে।.....
কী সুচিন্তা, তুমি এমন চুপ করে রইলে
যে? আর সব কারা যাবে আমার সঙ্গে,
সে কথা জিজ্ঞাস করলে না?'

সুচিন্তা হেসে উঠে বললেন,
'জিজ্ঞাস করবার অবকাশ দিচ্ছ কই?
রেলগাড়ীর মত কথা চালিয়ে যাচ্ছ—'

'রেলগাড়ী, রেলগাড়ী!' আস্তে
আস্তে মাথা নাড়লেন সুশোভন, বল-
লেন, 'কত দিন যে রেলগাড়ী চড়িনি।
সেই স্টেশন, সেই প্ল্যাটফর্ম, সেই জানলা
দিয়ে ধুলোর ঝড় আসা! আঃ, ভেবে
এত ভাল লাগছে! ওদের সঙ্গে আমারও
'আহ্লাদে লাফাতে ইচ্ছে করছিল।'

সুচিন্তা অবাক হয়ে বলেন, 'ওদের
সঙ্গে! কাদের সঙ্গে?'

'আরে তাইতো! তোমায় ভো বলাই
হয়নি এখনো। স্যাম্পো গুস্তা যাচ্ছে হে
আমার সঙ্গে। ওর বোনেরা যাবে না, ওদের
ইস্কুল। ওদের মা যাবে। সেই যে লক্ষ্মী
ছোট বোমা!'

সুচিন্তা নীতার দিকে এক নজর
একটু কৌতুকের দৃষ্টি ফেলে মখে
গম্ভীর করে বলেন, 'আর আমি যদি
তোমায় যেতে না দিই?'

'যেতে দেবে না? তুমি আমার যেতে
দেবে না?'

'আইতো ভাবছি! যাবার সময়
আটকে ফেলব।'

সুশোভনের ভুরু কুঁচকে ওঠে,
সহসাই আবার উজ্জলতা ত্যাগ করে
গম্ভীর হয়ে যান তিনি। ভারী গলায়
বলেন, 'ছেলেমানুষী কোর না।' বলে
আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে যান।

আর বোধকার এক মহত
পরেই ঘর থেকে সুচিন্তার খোলা গলার
হাঁস শুনতে পান, 'থাক বাবা, কাজ

● অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র প্রামাণিকের

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা

(পঃ বঃ সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক
শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন রায়ের ভূমিকা সম্বলিত)
রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বাংলা সাহিত্যে
এই প্রথম। কবিগুরু গ্রাম-কেন্দ্রিক ভারতবর্ষের যে আদর্শ কল্পনা
করেছিলেন, জাতীয়-জীবনের পুনর্গঠনের যে আশা তিনি পোষণ
করেছিলেন, গ্রন্থকার তা নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সহিত আলোচনা
করেছেন। ১ সাড়ে চার টাকা ॥

● শ্রীপ্রণবের

সংকেত

বইখানি লেখকের বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ
চমকপ্রদ। লেখক অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক-এর দৃষ্টি নিয়ে মানব-চরিত্র
অন্বেষণ করেছেন। তার স্বাক্ষর মিলবে অশ্লীল প্রতিটি চরিত্রে।

● গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

আকাশ নন্দিনী ॥ ৩.৫০ ॥
রাত্রির বয়স ॥ ৩.৫০ ॥
গ্র্যান্ড হোটেল ॥ ৬.০০ ॥

● রমেশচন্দ্র সেনের

কাজল ॥ ৬.০০ ॥
নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ॥ ২.৫০ ॥

● সুশীল ঘোষের

গ্রন্থসারথি ॥ ৬.০০ ॥

● গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

মিলনান্ত ॥ ৩.০০ ॥

● রূপদর্শীর

জলবন্তরলম ॥ ৩.৫০ ॥

● অবধূত

উদ্ভারণপদের মাট (নাটক) ॥ ৩.০০ ॥

● সজনীকান্ত দাসের

রবীন্দ্রনাথ

জীবন ও সাহিত্য

॥ ৬.০০ ॥

● ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের

ভারাক্ষর ॥ ৮.০০ ॥

● ডঃ সুকুমার সেনের

বিচিত্র নিবন্ধ ॥ ৬.০০ ॥

● শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বাংলা গদ্যের রূপবিকাশ ॥ ৬.০০ ॥

● শিবনারায়ণ রায়ের

নায়কের মৃত্যু ॥ ৪.৫০ ॥

● রাজকুমার মুনোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাগার প্রচার ॥ ২.০০ ॥

নেই ফ্যাপাকে ক্ষেপিয়ে। নীতা, খেতে দিই এখন? রাত তো অনেক হল।'

ভুরু, কোঁচকালেন সুশোভন।
সুচিন্তা এত হাসছে মানে? সুচিন্তা
কবে এত হাসে?

তারপর, রাত যখন আরও অনেক
হল, যখন অনুপম কুটিরের সমস্ত
অলো নিভে গেল, তখন অনুপম
কুটিরের বাতাস অন্ধকারে জেগে থাকা
মানুষের নিশ্বাসে মর্ম্মিয়ে উঠল।

অনুপম কুটিরের বড় ছেলে অবাক
হয়ে ভাবল, 'অসহনীয় অবস্থা তো
অবসান হচ্ছে, তবে স্বস্তির নিশ্বাসে
হালকা হয়ে উঠতে পারছি না কেন?
ভাবল, ওই অসহনীয় অবস্থাটা বিদায়
হবার সংগে সংগে আরও কি যেন বিদায়
নিচ্ছে। কোথায় যেন একটা সেতু ভেঙে
পড়ছে। সমস্তটা কেমন যেন ধূসর হয়ে
যাচ্ছে। আর হঠাৎ এক সময় অবাক হয়ে
ভাবে, কিন্তু এত অসহনীয়ই বা ভেবে-
ছিলাম কেন? হয়তো এমনিই হয়,
সামিখ্যের ধূলি-মাণিক্যে যে ক্ষমাকে
কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, বিদায়ের
বিষয় মূহুর্তে কোথা থেকে এসে
দাঁড়ায় সেই ক্ষমা। তখন সমস্ত প্রাণ
'হায় হায়' করে ওঠে। বলে 'অতটা রুঢ়
বুঝি না হলেও চলতো! আর একটু ভাল
ব্যবহার করলেও হতো!'

অনেক অনেক মাইল দূরে অনুপম
কুটিরের মেজছেলেও এই রাতে জেগে
উঠে, তার সন্দেহবিহীনতা অবাঙালী বধুর
নিশ্চিন্ত ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে
বসে ভাবছিল, 'এটা কী করলাম। এর কি
সত্যিই দরকার ছিল? পৃথিবী যদি
তার নিজের ছন্দে চলে, তাতে আমার
অসহিষ্ণু হবার মানে কি? আমার ছন্দ
এলোমেলো করে কী লাভ হল আমার?'

অনুপম কুটিরের ছোট ছেলে জেগে
ওঠেনি।

সে ঘুমোচ্ছে।

অনভাসিত কর্ম্মভারে ক্রান্ত দেহটাকে
স্বপ্ন পরিষর শয্যায় বিছিয়ে ঘুমের

মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে সে। হয়তো
এই কর্ম্মের ক্রান্তির মধ্যে থেকেই একদিন
সুখী হবে সে। সুখী হবার উপাদান তার
মধ্যে আছে।

কিন্তু তাতে কি কিছ্ বদলাবে
অনুপম কুটিরের জীবন? তার মূল্য তো
নিরূপণ হয়ে গেছে। এখন বাকী জীবন
সেই মূল্যহীনতার বোঝা বয়ে বেঁচে
থাকা। না, সম্ভ্রা উপন্যাসের নায়িকার
মত মৃত্যুকে ডেকে এনে সে বোঝা তার
লৌক্যে তুলে দেবেন না সুচিন্তা। শব্দ
এখন থেকে জীবন আর মৃত্যু এ-দুইয়ের
মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

চিরশান্ত অনুপম কুটির মাঝখানের
এই কতগুলো দিনের উত্তাল ঝড় তুলে
আবার শান্ত হয়ে যাবে, স্তম্ভ হয়ে যাবে,
ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে যাবে।

শহরের থাবা ক্রমশঃ আরও কঠিন
মুঠোর চেপে ধরবে এই শহরতলীর
হৃৎপিণ্ড। যেখানে যত সবুজের ইসারা
এখনো বাতাসে ঝিলমিলিয়ে প্রাণের সাড়া
তুলছে, শহর তাদের উপড়ে ফেলবে
নির্মম কাঠিন্য। পুকুর-ভরাট-করা নরম
মাটির বৃক ফুটো করে বিধবে লোহার
শূল। গাঁইতি আর শাবল, কোদাল আর
কর্ণিকের ধাতব শব্দে বাতাস মূর্খরিত
করে তুলে, তুলবে বিরাট বিরাট প্রাসাদ।
তার মাঝখানে কোথায় হারিয়ে যাবে
অনুপম কুটির। যারা নতুন আসবে, যারা
এই রাস্তায় হাঁটে চলেবে, ভীড় করবে,
গাড়ী ছোটবে, তারা কোন দিন জানতেও
পারবে না ওই রংমুছে যাওয়া নেম-শ্লেট
লাগানো বাড়ীটার দরজায়, একদিন
একখানা গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছিল। সে
জাতে ভরে এনেছিল অনেক রঙের
চাতুরী, অনেক আলোর আলপনা। তার-
পর আবার একদিন সব রং আর সব
আলো মুছে দিয়ে চলে গিয়েছিল,
গৃহস্থের সর্বস্ব হরণ করে।

না, নতুন যারা আসবে, তারা আজ-
কের এই মর্ম্মরিত রাত্রিকে নিয়ে গল্প
করবে না। হয়তো কোনদিন কেউ কাউকে
বলবে, 'ওই রং-জব্বলা দোতলা বাড়ীটার
কারা থাকে রে?' হয়তো সে-তার উত্তরে

ঠোঁট উল্টে বলবে, 'কে জানে! একটা
বিধবা বাড়ি আর একটা টাকমাথা
ছেলেকে তো দেখি শব্দ!'

কিন্তু সে তো পরে।

আজকের রাত নিশ্বাসে মর্ম্মিয়ে।

আজ ঘুমের ওষুধে কাজ হয়নি,
সারা ঘর পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন সুস্থ
হয়ে ওটা সুশোভন। এখন ভাববার
ক্ষমতা হয়েছে তার, ভালমন্দ ভাববার।
তাই ভাবছেন সুচিন্তার বৃষ্টিটা বড়
কম। লোকে কি মনে করবে, একথা
ভাবে না। আমার কাছে বসে, আমার সংগে
হেসে হেসে কথা কয়। আবার—বলছে
আমায় যেতে দেবে না, যাবার সময় আট-
কাবে! 'হি হি সে কী বিক্ৰী হবে! বারণ
করে দিতে হবে ওকে। বলতে হবে
'সুচিন্তা আমারও কি ইচ্ছে করে না
তোমার কাছে বসি। তোমার হাতে হাত
রাখি, কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো হল না।
বুঝতে হবে না ওটা নিয়ম নয়?'

আর নীতা?

নীতাও জেগে আছে বৈকি, কিন্তু
সে তো অনুপম কুটিরের নয়। হাজার
মাইল দূরে চলে গেছে নীতা। এক-
জোড়া ঘুমন্ত চোখের উপর বিষম দৃষ্টি
মেলে দাঁড়িয়ে আছে, আর মৌন প্রশ্ন
বাকুল হয়ে বলছে, 'তুমি বলছ 'আমার
চোখ দিয়েই তুমি দেখবে। কিন্তু
জীবনের সব কতক পালন করে, আমার
চোখ দুটি অহরহ তোমায় দিয়ে রাখতে
পারবে তো?'

তারপর, অনেকক্ষণের পর, ফিরে
এল সে অনুপম কুটির, দেখল সুশোভন
পায়চারী করছেন।

বলল, 'বাবা, জল খাবে?'

'না থাক।'

'বাবা, ঘুম আসছে না?'

'আসবে।'

'কই তুমি তো ঘুরছো! তার চেয়ে
আমরা সবাই মিলে জেগে বসে গল্প
করি না?'

'সবাই মিলে মানে কী নীতা?' ভুরু
কোঁচকান সুশোভন।

'কেন আমি, তুমি, সুচিন্তা পিসিমা।
ডেকে আনবো পিসিমাকে?'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন সুশোভন।
তীর ভংসনার স্বরে বলেন, 'আগে তো
তুমি এমন অসভ্য ছিলে না নীতা!'

(ক্রমশঃ)



উপহারে ও ব্যবহারে

নিউব্যাংক ব্যাংকের জন্য

১১০ রাসবিহারী এন্ড সন্স
কলিকাতা-১

বাস্তবনালায়

২ ॥ দুইটি চিত্র-প্রদর্শনী ॥

মাঠের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্ভাষে কলকাতায় দুটি চিত্রকলার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। একটি দিল্লীর লালিতকলা অ্যাকাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১৯৬২ সালের চিত্রকলার জাতীয় প্রদর্শনী; অন্যটি আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারী কর্তৃক আয়োজিত শ্রীমতী কমলা রায় চৌধুরীর একক প্রদর্শনী। দুটি প্রদর্শনীই নানা কারণে কলকাতার কলারসিক মানুষদের মনো-যোগ আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু আবার বহুবিধ কারণেই প্রদর্শনী দুটি দেখার পর অনেক দর্শকই যে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছেন, সে কথাও আমাদের অবদিত নেই।

লালিতকলা অ্যাকাডেমীর প্রদর্শনী ॥

লালিতকলা অ্যাকাডেমী জাতীয় শিল্পকলাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে, প্রতিভাবান নতুন শিল্পীকে আবিষ্কার এবং তাঁর সৃষ্টি-কর্মকে দেশবাসীর কাছে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তারই অঙ্গ হিসাবে সর্বভারতীয় শিল্পীদের সৃষ্টি-কর্ম শৃঙ্খল দিল্লীতে প্রদর্শন না করে এবর ভারতের অঙ্গরাজ্যের প্রধানতম শহরগুলিতে প্রদর্শনের জন্য নিয়ে এসেছেন। কলকাতার মানুষ তাই অনেক আশা নিয়ে ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে 'চিত্রকলার জাতীয় প্রদর্শনী' দেখতে ভিড় করেছিলেন। সর্বভারতীয় চিত্রকলার গতি-প্রকৃতি বুঝবার জন্য এই প্রদর্শনী অনেকখানি সাহায্য করেছে।

এই প্রদর্শনীতে শতাধিক শিল্পীর প্রায় দেড়শতাধিক চিত্রকলা, গ্রাফিক চিত্র এবং প্রায় তিরিশটি ভাস্কর্যের নিদর্শন উপস্থিত ছিল। প্রতিযোগী হিসাবে যোগ দেননি এমন কিছু সংখ্যক প্রখ্যাত প্রবীণ শিল্পীরও চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শনে সজ্জিত ছিল এই প্রদর্শনী। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও একটা কথা অনায়াসে বলা যায় : চিত্রকলার এই জাতীয় প্রদর্শনী ভারতীয় জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার নবজাগৃতির বিশেষ কোনো বাণীই বহন করে আনেনি। কলকাতার আমরা সারা বছর ধরে আধুনিক শিল্পকলার যে বিমূর্ত বিচিত্র বস্তু দর্শন করে প্রায় ক্লান্ত, এ-যেন তাঁর উন্নত (কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুন্নতও বটে) এক সংস্করণ। কিছু

প্রদর্শনী

কলারসিক

কিছু ব্যতিক্রম যে আছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়ে কখনো জাতীয় চরিত্র অনুধাবন করা যায় না। ইউরোপীয় চিত্রকলার সর্বগ্রাসী আঙ্গিক দক্ষতার কাছে আধুনিক ভারতীয় চিত্র-শিল্পীদের এই অকারণ নতি স্বীকার লালিতকলা অ্যাকাডেমী আয়োজিত প্রদর্শনী দেখে পুনর্বার বিস্ময়ের সঙ্গে হৃদয়গ্রাম করলাম।

এই প্রদর্শনীর অনেকগুলি চিত্রের মধ্যে শিল্পী অরুণ বসুর 'পুরুষকার-প্রাপ্ত চিত্র 'এ ম্যান এন্ড ওয়াল পেইন্টিং' (১৩), শ্যামল দত্ত রায়ের 'জলরঙে অঙ্কিত 'ফিশিং' (২৬), রাজেন মেহরার 'নিঃসর্গ চিত্র 'গার্ডেন সিন' (৪২), এম, রেড্ডিপ্পা নাইডুর 'স্নেক উইথ অ্যানিম্যাল' (৪৫), বিনোদ্রী প্যাটেলের 'হিসেলস এগাস' (৫৬), এস, কে, রাজা-ভেলুর 'মাদার এন্ড চাইল্ড' (৬৪), দেবকুমার রায় চৌধুরীর 'ল্যান্ডস্কেপ' (৬৫), হিম্মত সাহার 'মাই গ্লো জিরো' (৭০), শেখ গুলাম মোহম্মদের 'চেজ' (৭৬) প্রভৃতি চিত্র অনেকেরই ভাল লাগতে পারে।

আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে এন, এস, বেঙ্গের 'জানি' (৯১) এই

প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্র। শিল্পী সতীশ গুজরামের কাঠের গুঁড়ো ও মোরে নির্মিত জমিনের উপর 'প্রজনার' (১০০) চিত্রখানি নতুনত্ব সৃষ্টির দিক দিয়ে অনেকের ভাল লাগতে পারে। তবে এই জাতীয় কাজে মোস্তফার শিল্পীদের দ্বারা ই তিনি বোধ হয় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। শিল্পী কে, কে হেম্বারের 'এ সংগ ইন ইয়েলো'-র (১০১) ছন্দিত বর্ণাঢ্য রূপ ব্যক্তিগত-ভাবে আমার অন্ততঃ ভাল লেগেছে। এ-ছাড়া কে, এস, কুলকার্নি, রামকিশোর, ভবেশ সান্যাল, অবনী সেন, পুরিতোষ সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীদের রচনা-গুলি তাঁদের প্রতিভার প্রেক্ষিত দান না হলেও সামগ্রিক বিচারে মন্দ নয়।

গ্রাফিক চিত্রকলায় শিল্পী সোমনাথ হোড় তাঁর পূর্বে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই প্রদর্শনীর 'ফিশারম্যানস নেট' (১৭১) ও 'বার্থ অফ এ-হোয়াইট রোজ' (১৭২) এটিং-এর দুটি উল্লেখযোগ্য চিত্র। জয়ন্ত পারিখের কাঠখোদাই 'ওয়েটিং ফর কাট'-ও একটি সুন্দর রচনা। এ-ছাড়া শ্রীমতী উষা পশবিচারের এটিং ও এন, কুমার রেড্ডীর এনগ্রাইভিং ও এটিং-এর কাজ যথেষ্ট পরিণত বলে মনে হয়।

ভাস্কর্যের নিদর্শনের মধ্যেও কয়েকটি সুন্দর কাজ লক্ষ্য করেছি। তবে অধিকাংশ ভাস্কর্য-শিল্পী যেভাবে বিমূর্ত ধারার দিকে ধাবিত হয়েছেন



তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে শিল্পের এই শাখাতেও হয়তো এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে।

যাহোক, ললিতকলা অ্যাকাডেমী যদি সত্যিকার জাতীয় শিল্পকলা সৃষ্টির দিকে ভারতীয় শিল্পীগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, তবে আমরা সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হবো। এবং বলা বাহুল্য, জাতীয় ঐতিহ্য বর্জন করে সে-শিল্প-ধারা কোনদিনই গড়ে উঠবে না, একথাটাও তাঁরা যেন স্মরণে রাখেন। আলোচ্য প্রদর্শনীতে এই বস্তুর অভাব ঘটায় আমাদের মত অনেক দর্শক-ই হতাশ মনে ফিরে এসেছেন।

। শ্রীমতী কমলা রায় চৌধুরীর প্রদর্শনী।

পার্ক স্ট্রীটের আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারী-আয়োজিত শ্রীমতী কমলা রায় চৌধুরীর একক প্রদর্শনীও অনেক আশা নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। কারণ, বেশ কিছুকাল আগে শ্রীমতী রায় চৌধুরী কলকাতার শিল্পপরিসরিক মানুষদের তাঁর প্রতিভার দানে মুগ্ধ করেছিলেন। শিল্প-শিক্ষার জন্য প্যারিসের দুটি বিখ্যাত স্টাডিওতেও তিনি কাটিয়ে এসেছেন অনেক দিন। দেশে ফিরে আসার পর সম্ভবতঃ এই তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। ফলে, আমরা তাঁর কাছে নতুনতর শিল্প-সম্পদ প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা, আমাদের সেই প্রত্যাশা অপূর্ণ হয়ে গেল।

আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে ইতঃপূর্বে দু'জন তরুণ শিল্পী শ্রীপ্রকাশ কর্মকার ও শ্রীবিজয় চৌধুরীর প্রদর্শনী দর্শনের পর শ্রীমতী রায় চৌধুরীর প্রদর্শনী দেখতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে এর সার্থকতা নিয়ে। শিল্পী শ্রীকর্মকার ও শ্রীচৌধুরীর মত শ্রীমতী রায় চৌধুরীও বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন পৌরাণিক বা লৌকিক কাহিনী থেকে। এবং এই বিষয়বস্তুর রূপায়ণ-কলায় শ্রীকর্মকারের মত না হলেও শ্রীচৌধুরীর মতই শ্রীমতী রায় চৌধুরী প্রায় একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মত একজন প্রতিভাময়ী শিল্পীর নিকট থেকে আমরা অন্যতর কিছু প্রত্যাশায় ছিলাম। জানিনে, এই ধ্যান-ধারণার পশ্চাতে শিল্পী নীরোদ মজুমদারের কোনো প্রভাব কাজ করেছে কি না। কোনো শিল্পীর স্বাধীন প্রভাবিত হওয়ায় আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শিল্পী যদি সেই প্রভাবে আত্মস্থ করে

নিজস্ব ধারায় তাকে রূপদান করতে ইচ্ছা করে তবে নিশ্চয়ই তাঁকে আমরা সানন্দে গ্রহণ করতে পারি না। আর ঠিক এখানেই রয়েছে শ্রীমতী রায় চৌধুরীর দুর্বলতা।

যাহোক, যে আটখান চিত্র নিয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে তার প্রতিটি চিত্র শ্রীমতী রায় চৌধুরীর নিপুণ চিত্র-সংস্থাপনের স্বাক্ষর বহন করলেও উপরোক্ত কারণে মনের উপর খুব বেশী দাগ কাটে না। তাছাড়া শ্রীমতী রায় চৌধুরীর পৌরাণিক বিষয়-বস্তু নতুন মূল্যবোধেও আমাদের মনকে উদ্বুদ্ধ করেনি। তাঁর 'দুর্গা' (১) সেই চিত্রাচারিত দুর্গারই মতন। তবে চিত্র-সংস্থাপনে, রং প্রয়োগে এবং হেলানো রেখার প্রচ্ছন্ন জ্যামিতিক ভঙ্গীতে তিনি যে পারদর্শিনী, একথা স্বীকার্য। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে তার 'পিয়েটা' (২) চিত্রখানি। এখানে ক্রুশাবিশ্ব মৃত খৃষ্টের প্রতি দুই জননারী আঁত বালিষ্ঠ রেখায় আর রঙ মৃত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চিত্রের মধ্যে তাঁর 'নতুন ধান' (৭), গীতা-পাঠ (৬) ও 'রক্তবীজ বধ' (৩) কম্পোজিশনের দিক থেকে মন্দ নয়।

আমরা আশা করি শ্রীমতী রায় চৌধুরী নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে নতুন আঙ্গিকে তাকে মৃত করার জন্য তাঁর সমস্ত শ্রম বাগ করে বালিষ্ঠভাবে অগ্রসর হবেন। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীর প্রতীক্ষায় রইলাম।

॥ আর্টস এন্ড প্রিন্টস্ গ্যালারীর প্রদর্শনী ॥

শীতের মরশুমের কলকাতায় চিত্র-প্রদর্শনীর যে জোয়ার এসেছিল এখন গ্রীষ্মের এই দাবদাহে, তাতে ভাটার টান শুরু হয়েছে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কলকাতার প্রধানতম প্রদর্শনী কক্ষগুলি প্রায় নীরব। কিন্তু কলকাতার স্থায়ী আর্ট গ্যালারীগুলি তাদের নিখরাত কর্মসূচী অনুযায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করে চলেছেন। ফলে, দর্শকেরা অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবন কিংবা আর্টিস্ট হাউসে কোনো চিত্র-প্রদর্শনীর সন্ধান না পেলে অন্ততঃ এই সব আর্ট গ্যালারীতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের শিল্প-ক্ষুধা নিবৃত্ত করে আসতে পারেন।

মার্চের শেষ সপ্তাহে পার্ক ম্যানসনের আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে শিল্পী শ্রীমতী টপাস ক্রাক-এর এক চিত্র-প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছেন কলকাতাস্থ ব্রিটিশ হাই-কমিশনারের স্ত্রী শ্রীমতী বিশপ। প্রদর্শনীটি আগামী ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে। এই প্রদর্শনীতে শ্রীমতী টপাস ক্রাক-এর ২৭ খানি চিত্র স্থান পেয়েছে।

বিদেশিনী এই শিল্পের কোনো চিত্র এর আগে আমরা আর দেখেছি কিনা মনে পড়ছে না। কলকাতায় এই তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী।

শ্রীমতী ক্রাক শিল্প-কলা বিদ্যালয়ে খুব বেশীদিন শিল্প-শিক্ষার সুযোগ পাননি। তিনি তাঁর অবকাশে নিজে বসেই মূলতঃ চিত্র-রচনার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর চিত্রের কম্পোজিশন, রঙ প্রয়োগের পদ্ধতি দেখলে স্পষ্টই মনে হবে তিনি অ্যাকাডেমিক শিক্ষার শিক্ষিতা; বরং বলা যায় তিনি একটু বেশী মাত্রায় অ্যাকাডেমিকধর্মী।

যাহোক, আলোচ্য চিত্রগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) প্রতিকৃতি চিত্র, (২) নিঃসর্গ চিত্র, (৩) স্থির চিত্র। প্রতিকৃতি চিত্রগুলিতে শিল্পীর দক্ষতার চিত্র সুস্পষ্ট। বিশেষ করে 'শ্রমিক' (৬), 'হলুদ জামা' (১২) ও 'উড়িয়ার মানুষ' (২১) তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈল-রঙের চমৎকার মাধ্যমে এই প্রতিকৃতি চিত্রগুলির মধ্যে ধরা দিয়েছে।

নিঃসর্গ চিত্রগুলি আমার মনকে খুব বেশী আকর্ষণ করতে পারেনি। শ্রীমতী ক্রাক গ্রাম-বাংলার নিঃসর্গ নির্বাচন করায় আমি খুশি কিন্তু এগুলিতে নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেলাম না। সবুজ, হলুদ আর লাল রঙ মিলে-মিশে অপূর্ণ কোনো রূপের দুয়ার এখানে দর্শকের জন্য উন্মোচিত করে দেয়নি। বরং তাঁর 'কাম্মীরে সূর্যাস্ত' কিম্বা 'প্রিয় পাহাড়' (৯ ও ৮) বাংলার নিঃসর্গ চিত্রের তুলনায় মনোরম। এখানে বর্ণ-প্রলেপনে আলো-ছায়ার খেলাকে অনেক নৈপুণ্যে বিধৃত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছি। কম্পোজিশনও সুন্দর।

স্থির চিত্রের মধ্যে এই প্রদর্শনীতে অধিকাংশই ছিল ফুলের স্টাড। ফুলের স্টাডিতে শিল্পীর দক্ষতা অনস্বীকার্য। তবে নতুন কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলিকে দেখার চেষ্টা করা হয়নি। 'লালফুল' (১৪) নামক চিত্রখানিতে তিনি পুরু জমিন সৃষ্টি করে যেভাবে তা চিত্রিত করেছেন, কিংবা 'বাঁশের অর্কিড' স্টাডিতে চমৎকার বেগুনী রঙ প্রয়োগের যে দক্ষতা দেখিয়েছেন নিঃসন্দেহে তা প্রশংসার যোগ্য।

আমরা আশা করি শিল্পী শ্রীমতী ক্রাক এই অ্যাকাডেমিক চিত্র-রচনার সংগে সমসাময়িক জীবনের ঘটনা নিম্নেয় শিল্প-রচনায় অতঃপর উৎসাহ বোধ করবেন।

এই সপ্তাহে থিয়েটার রোডের অশোকা আর্ট গ্যালারীতে শিল্পী লক্ষ্মণ পাইরের চিত্র-কর্মের একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। 'অমৃত' পাঠকদের কাছে তাঁর আলোচনা আমরা আগামী সপ্তাহে পূর্ব-বেশনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

দুর্গাদাস ভট্ট

বহিঃসং



আমাদের শহরে তখন কলকাতার “ড্যামচিপ”-বাবুরা এসে ভিড় করতে শুরুর করেছেন। সেখানকার বাতাসে আসন্ন যুদ্ধের দামামা বাজছে। এ, আর, পি, রায়ক আউট, সাইরেন, ওসব না দেখেও তাদের কথা এত শুনছি, যে শুন শুন দেখা হয়ে গেছে। এমন কি আমাদের লালবাগের বাড়ীর মালিকদেরও তখন পায়ালারি ছোট ঘুপসি ঘর, টালির ঢালা থেকে শুরুর করে একতলা, দু’তলা—প্রতিটি ঘরেই অটল ভাড়াটে আসতে শুরুর করেছেন। লোকজনে একেবারে ভরে গেছে মহকুমা শহরটি। বাজারে কিছু পাবার জো নেই। মাছ, মাংস, শাক-শস্কজী, বা পাচ্ছেন কলকাতার বাবুরা “ড্যামচিপ” বলে খলিয়ে পড়ছেন।

আরো অনেকের মত নবাগতের দলে মিশে রূপাদিরাও এলেন। স্থান করে নিলেন আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীতে। শহরে লোক তাঁরা। চেহারা, সাজপোশাক ঝকঝকে, তকতকে। কাজেই আমরা দূর থেকে দেখছিলাম। কাছে ঘেঁষতে সাহস হ’ত না। কিন্তু কি আশ্চর্য! সেই অপরিচয়ের সুস্বাদু পদাট্টা বেশীক্ষণ টিকল না। ছোট ভাই সোমনকে সঙ্গে করে রূপাদি আমাদের বাড়ীতে এলেন।

ছোড়দি তখন কুয়োতলায় একগাদা এ’টো বাসনকোসন ছাড়িয়ে ছাই দিয়ে মাজাছিল, বাড়ীর ঝি কি কারণে যেন কামাই করেছিল সেদিন। কোন রকম ভূমিকা না করে একটা ভাঙা থান ই’ট টেনে নিয়ে ছোড়দির গা ঘেঁষে বসলেন রূপাদি। বললেন, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম ভাই। আমি রোয়াকের উপর দাঁড়িয়ে রূপাদিকে ধুটিয়ে দেখছিলাম। হ্যাঁ সুন্দর বটে রূপাদি। বোধহয় মার মত সুন্দর। কিম্বা অত সুন্দর না হলেও মেজকাঁকিমার মতন তো বটেই। তবে বয়স অনেক কম। এদিকে ছোড়দির তখন কাঁহিল অবস্থা। ছাইমাথা হাতখানা জল ঢেলে ধুয়ে বলছে, ‘ও কি, ওখানে বসলেন কেন? আপনার শাড়ীটা—’

‘আরে তাতে কি হয়েছে! কাছাকাছি না বসলে আলাপ জমে না।’

এইভাবে শুরুর। রূপাদির ঘন ঘন বাতায় বাড়ীর সকলেরই নজরে এল। বিশেষ করে মেজদার। আমি ভাবলাম মেজদারও যা চমৎকার চেহারা তাতে আর আশ্চর্যের কি, তখন বয়স ছিল অল্প। আমার বন্ধু ঘেঁটুর সঙ্গে সেদিন রাম-

চন্দ্রের ধনুক নিয়ে তর্ক হ’ল। আমি বললাম—রামচন্দ্রের ধনুক ছিল বাঁশের। ঘেঁটু বলল—না সেটা ছিল সোনার তৈরী।

এই তর্কের একটা জুতসই জবাব পাবার জন্যে মেজদার ঘরে গেলাম। মেজদা চাপা গলায় রূপাদির সঙ্গে গল্প করছিল। গাল দুটো লাল টুকটুক করে রূপাদির। কি কারণে লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়েছে। আমাকে সেখানে দেখেই মেজদা চোঁচিয়ে বলল—‘ভরাদুপু’রে খেলা করে বেড়ানো হচ্ছে!’ আমি বললাম—‘না মেজদা, খেলাছি না। একটা কথা—কোন কথা নয়, যাও ওপরের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুরুর পড়গে যাও।’

আমি আর একটুও না দাঁড়িয়ে চলে এলাম। কিন্তু কিছুতেই পড়াশুনো করা এবং ঘুমিয়ে পড়ার সম্পর্ক খুঁজে পেলাম না।

মেজদার গ্রামোফোন আর রেকর্ডের বাজ্ঞে কারুর হাত দেবার হুকুম ছিল না। আমার মনে আছে আমাদের বাড়ীতে প্রথম যৌন রেকর্ডের গান বাজল আমি একেবারে

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার চোখ মূখের অবস্থা দেখে ছোড়দা রলৈছিল, ভোম্বল, অমন বোকার মত ডাব ডাব করে কি তাকিয়ে দেখাচ্ছিস। এই গ্রামোফোন বাজটার মধ্যে একটা মানুষ আছে বুজেছিস; তার মূখ থেকেই গান বেরোয়।

কথাটা কিন্তু আমার মনে ধরেনি। সেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ সুযোগ পেলাম। সবাই একেবারে চুপচাপ, বোধকরি যুমিয়ে পড়েছে। আমি আস্তে আস্তে রেকর্ডের বাজটা খুলে ফেললাম। তারপর একখানা রেকর্ড বার করে হাত বোলাচ্ছি, ঠিক সেই সময় ঘরের অপর প্রান্তের একটি দরজা দড়াম করে খুলে গেল। যেন লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকলেন মেজদা। প্রথমেই হোঁ মেরে আমার হাতের রেকর্ডটা ছিনিয়ে নিলেন। তারপর আমার ডানগালে লাগালেন ভারি ওজনের একটি চড়। মাথাটা ঘুরে গেল আমার। তারপর কি হ'ল কিছুই মনে রইল না।

অথচ একদিন জানলাম দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, পাশের বাড়ীর কুচি গাছটা সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে। ঝাউ গাছটা হাওয়া লেগে দুলছে। রূপাদি মেজদার বাজ থেকে খানদশেক রেকর্ড বার করে নিয়ে টিপি টিপি এগিয়ে গেলেন সদর দরজার দিকে। তারপর দরজাটা খুলে সামনের ছোটমাঠটা পেরিয়ে নিজেদের বাসার দিকে ফিরলেন। কুচি তলায় ওদের দুজনে দেখা। রেকর্ড-কটি বৃকের ওপর থরে কেমন যেন উদ্ভত ভাগিতে রূপাদি হাসলেন। তারপর চোখের ইঙ্গিতে বললেন—নিয়ে চললাম রেকর্ডগুলি, নিজেদের গ্রামোফোনে বাজাবো। মেজদা ঘাড় নাড়লেন। আশ্চর্য! এর বেলা মেজদার আপত্তি নেই, যত দোষ আমার বেলায়।

ঠিক পরের দিন বাড়ীতে একটা গানের আসর বসল। বৈঠকখানা ঘরের সব আসবাবপত্র বার করে ফেলে সতরীশ আর গালচে পাতা হল। যে ঝাড়-লষ্ঠনীট সারা বছর শুধুশুধুই কোলে আজ সেটাকে পরিস্কার করে বড় বড় মোমবাতি জেলে দেওয়া হল। বাবার একজন বাল্য-বন্ধু এবং নামজাদা কবি সুরাজিবাবু সেদিন কবিতা পড়ে শোনাবেন। সেই প্রসঙ্গে সেজিও ও ছোড়দির মাষ্টার রেখে শেখা গান আমরা সবাই শুনব। আমি পড়ব রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা। বাবা একজন বিদেশী সাহিত্যিক সম্পর্কে

বলবেন। জ্যাঠামশাই প্রধান অতিথি সুরাজিবাবুর কবিতার ওপর আলোচনা করবেন। আর সব শেষে রূপাদি নাচবেন। সঙ্গে গান গাইবেন রূপাদিরই ছোট বোন মন্দিরাদি।

সব কর্মসূচিই ঠিকমত এগুচ্ছিল। হঠাৎ মনে হ'ল মেয়েদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন উঠেছে। কে যেন বলছে—রূপা নাচবে না, তার শরীর খারাপ। অথচ এত সাজগোজ করল। ছোড়দি অবাক। মন্দিরাদি ওর কানে কানে কি একটা বলতেই ছোড়দি বলল—তাইত রে মেজদাকে তো কই দেখাচ্ছি না। নাচের আসরে তাহলে আজ রূপাদিকে দেখতে পাব না। মনে মনে বেজায় আফসোস হ'ল। কিছুক্ষণ আগে দোতলার ঘরে, যেখানে দিদিদের সব প্রসাধনের জিনিস থাকে—সেখানে জেসিমেটোবলটার সামনে দাঁড়িয়ে রূপাদিকে সাজগোজ করতে দেখেছি। দেশলাই কাঠির পেছন দিয়ে কাজললতার কাজল নিল রূপাদি। টানা ত্রুটি আরো টেনে দিল। তারপর মূখ ফেরালো। আমি তাকিয়ে দেখলাম ঠিক রাণীর মত দেখাচ্ছে রূপাদিকে। কপালের মাঝ থেকে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা দু'দিকে গাল অবধি নেমেছে, শ্বেতপাথরের মত ঘাড়, গলা ঘিরে সাদা টগরের গোড়ের মালা বৃক, ছাড়িয়ে উরু অবধি নামানো। নিটোল স্বাস্থ্য কানায় কানায় ভরা। তাই ধূপছায়া শাড়িখানা আরো সুন্দর মানিয়েছে। আমার দিকে একটু তাকিয়ে রইল। মনে হ'ল যেন চোখ দিয়ে আরতি করল রূপাদি। বলল—ভোম্বল, কাছে আয়! কাছে যেতেই বলল—চোখ বোঁজ! চোখ বুজলাম।—হাঁ কর। এই মরেছে হাঁ করতে বলছে কেন রূপাদি, তবু ভয়ে ভয়ে হাঁ করলাম। মূখের মধ্যে শব্দ শব্দ কি যেন পড়তে দিল। বেশ ভুরভুরে গন্ধ। জিভ দিয়ে চেটে বুঝলাম লজেন্স। দু'বার চুষে নিয়ে চোখ খুললাম। রূপাদি তখন মিটিমিট করে হাসছে।

কিন্তু রূপাদি কেন নাচবে না? আমার মনে হ'ল গোটা আসরটাই যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে। কোথা থেকে যেন এক বলক ঝড়ে হাওয়া উঠে এসে সব আলো নিভিয়ে দিয়েছে। ভাবলাম আমি নিজে গিয়ে অনুরোধ করি রূপাদিকে। চুপি চুপি এগুলামও। আমাদের বাড়ীর একতলার এবং দোতলার প্রতিটি ঘর আঁতর্পাতি করে খুঁজলাম। না, সে কোথাও নেই। এবার রূপাদিদের বাসাটা খুঁজে দেখতে হয়। কুচি আর মাধবী-

লতার জটলা পেছনে রেখে ওদের বাড়ীর সিঁড়িতে পা দিলাম। বেশ একটু ছাত পার হয়ে তবে ওদের শোবার ঘর। সে ঘরেও রূপাদি নেই। তবে সে কোথায়? রাত হ'লেও অন্ধকার নেই। দু'খসাদা জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। আম কঠালের বাগানের মধ্যে ছাতিম গাছটায় বোধ হয় ফুল ফুটেছে নইলে এমন নেশা-খরানো গন্ধ আসবে কিসের? ওদের চিলেকোঠার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় রেশমী শাড়ির খসখস আওয়াজ পেলাম। তবে কি চিলেকোঠার ওদিকটার বসে আছে রূপাদি।

ঠিক তাই। চাঁদের দিকে মূখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রূপাদি। ভাগিটা কেমন যেন উদাস। গলার মালা ছিঁড়ে গিয়ে খুলোয় লুটোচ্ছে। আমি যে এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, খেয়াল নেই। এবার আমি দেখলাম রূপাদির টানা টানা দু'চোখ থেকে যেন দু'টি সোনালী নদী নিটোল গালের ওপর এসে নেমেছে। চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। মাঝে মাঝে যেন কুঁপিয়ে উঠছে রূপাদি।

ভেতরটা কেমন যেন একটু মোচড় দিয়ে উঠল আমার। এক লইমায় যেন বুঝে ফেললাম এ ব্যাপারটার জন্য মেজদাই দায়ী। সে থাকলে কেউ যদি আনন্দ পায় তো, থাকতে বাধা কোথায় তার? এমন করে কি কাউকে দুঃখ দিতে হয়?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রূপাদিকে দেখলাম। তার এই তন্ময় মূহুর্তটা ভেঙে দিতে ইচ্ছা করল না। একটু যেন লজ্জাও করল। নিজের মনকে নেড়ে-চেড়ে দেখছে রূপাদি, ঘন নিঃশ্বাস ফেলেছে—হয়ত কত দুঃখের স্মৃতি উথলপাখাল হয়ে উঠেছে। এখন নিঃসঙ্গতাই তার সঙ্গী। আমাকে যেদিন বাবা বকেছিলেন, আমি ওই ফরাসভাঙার মাঠে গিয়ে একটা চজতে গাছের ওপর উঠে বসেছিলাম। একলা থাকতে ইচ্ছে করছিল। মনটাকে যেন কোলের ওপর রেখে আলগা করে হাত শ্বলুছিলাম। সেদিন আমার চোখ দিয়েও জল পড়ছিল, রূপাদির মতোই।

চুপিচুপিই ফিরে এলাম আমাদের বৈঠকখানায়। সেখানে তখন দারুণ উত্তেজনা। জনকয় পুলিশ সঙ্গে করে একজন অফিসার এসেছেন। বাবা এবং

জ্যোতামশাইকে বলছেন—তাকে বাইরে আসতে বলুন, ওয়ারেন্ট আছে।

ওয়ারেন্ট মানে সেদিন বুঝতাম না। যেমন বুঝতাম না, কি করে বড়দা-মেজদাদের দল শব্দ আন্দোলন করে এত বড় ইংরেজ সরকারকে ভারত ছাড়ার কথা বলছে। বলছে করেশ্ব ইয়ে মরেগে। মোটকথা সেদিন বড়দা এবং মেজদা যে বাড়ীতে ছিল না এ কথাটা পুন্ডলিশকে বিশ্বাস করানো গেল না। টুপিআটা বিরাট চেহারার অফিসারটি বললেন—তা হলে আমরা বাড়ী সাচ করব। সাচের কথা শুনলে জ্যোতামশাই আর বাবা ভীষণ রেগে গেলেন।

কিন্তু তাতে কিছু আটকাল না। নিরাপত্তা আইনে বড়দার জেল হয়ে গেল। মেজদার নামেও ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছিল—

কথাটা শুনলে বাবা হাসলেন। পুন্ডলিশের নাগাল থেকে পালিয়ে যাওয়া কি অতই সহজ!

তবু কিছু চেষ্টা করে সুদূর পশ্চিম থেকে একজন আত্মীয়ের সাড়া পাওয়া গেল। তাঁর ব্যবসায় একজন লোক দরকার তাই মেজদাকে পত্রপাঠ সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে লিখলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই সব ঠিকঠাক। আমি রূপাদির মুখের দিকে চাইতে পারছিলাম না। এইসব ঘটনার পর মাত্র একবার তাঁকে জানলাম দেখেছিলাম। রুদ্ধ মুখ। শব্দ চূল। হাত নেড়ে আমায় যেন ডাকলেন। আমি একছুটে একেবারে কাছটিতে গিয়ে দাঁড়িলাম। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে রূপাদি আলমারি খুললেন। মুখের ওপর খানিকটা সুগন্ধ এসে ঝাপটা মারল। একটা কাগজের মোড়ক থেকে লজেন্স

গলার কাছে কিছুটা দলাপাকান বাতাস আটকেছে, খানিকটা দম নিয়ে বললাম, ‘জায়গাটার নাম তো জানিনে রূপাদি। মেজদাকে জিগ্যাস করে আসব?’

‘দূর বোকা। ও তাহলে কি ভাববে বল ত?’

‘কি আবার ভাববে? বলব মেজদা রূপাদি বলছে.....’ ফোলা ফোলা হাত দিয়ে আমার মুখখানা চেপে ধরলেন রূপাদি। কথা বলতে দিলেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম চোখের ভাষা কেমন যেন হয়ে গিয়েছে রূপাদির। টানা টানা নিঃশ্বাস পড়ছে। গালের ওপর চাপা উত্তেজনা। আস্তে করে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ‘আমারই বা কিসের এত দায়।’

এমনি করে আরো দুটো দিন বয়ে গেল। দিন রাতের পল প্রহরকে পেছনে রেখে এমন একটা দিন এগিয়ে এল যেদিন মেজদা তার কর্মস্থলের দিকে পা বাড়াবে। শেষ রাত থেকে মা কাঁদছেন। কাকিমা কাঁদছেন। জ্যোতিমার মত শস্ত মানুষটিও চোখের জল মুছছেন। যেন দুটি দুঃখিনী পর পর ঘটে যেতে চলেছে। বাবা বললেন, ‘তোমরা কী বল ত। বাড়ীর একটি ছেলে তার ভবিষ্যৎ শূন্য করতে চলেছে, তোমরা কোথায় আশীর্বাদ করবে, ওকে সাহস দেবে, তা না.....!’

এবার যেন একটু বৃক বাঁধলেন সবাই। সত্যিই তো দুঃখের ভিমেই তো মগ্ন আলোক জ্বলছে। সাময়িক দুঃখকষ্টকে এত বড় করে দেখলে ভোঁ চলবে না। তাই ট্রেনের সময় যখন প্রায় সমাগত—রিজায় চাপতে যাচ্ছে মেজদা, একে একে সকলে এসে দাঁড়ালেন। মা মেজদার কড়ে আঙুলটি দাঁত দিয়ে অঙ্গ চাপ দিয়ে আশীর্বাদ জানালেন। যেন কোন অমঙ্গল তাকে স্পর্শ না করে। কাকিমা এগিয়ে এসে ওর মাথাটি বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুলের মধ্যে হাত বুলািয়ে বললেন, ‘সাবধানে হাস, বুঝলি।’ জ্যোতিমা বললেন, ‘পৌছে চিঠি দিবি।’ বাবা বললেন, ‘আর দেরী নয়, ট্রেন ফেল হ’য়ে যেতে পারে।’

আমরা সকলেই গেটের কাছে এসে দাঁড়িলাম। এলো না শব্দ একজন। আমি বার বার কুঁচি গাছের ফাঁক দিয়ে ওদের ছাতের দিকে তাকিলাম। কেউ নেই। শব্দ একবার যেন মনে হ’ল কে একজন ছুট দিয়ে ছাত থেকে ঘরের



চাঁদের দিকে মুখ ফিঁরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রূপাদি

কিন্তু দিন তিনেক গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর সে এসে জানালো যে তার নামে এখনো ওয়ারেন্ট বেরোয়নি, তবে বেরিয়েছে বলে সবাই মনে করেছিল। বড়দার হঠাৎ জেলে যাওয়ায় মা একেবারে ভেঙে পড়লেন। যখন শুনলেন মেজদারও জেল হতে পারে বললেন—ওগো ওকে তোমরা দূর দেশে পাঠিয়ে দাও যাতে পুন্ডলিশে খুঁজে না পায়।

নিয়ে আমার হাতে দিলেন। আমি বললাম, ‘লজেন্স ভাল লাগছে না।’

‘কেনরে? মন খারাপ?’

আমার মুখটা নরম গালের ওপর চেপে ধরলেন রূপাদি। ভাসা ভাসা চোখ দুটি আমার চোখের ওপর রেখে বললেন, ‘তোমার মেজদা কোথায় চাকরি করতে যাচ্ছে রে ভোম্বল?’

দিকে গেল। আমার মনে হ'ল ও রূপাদি ছাড়া আর কেউ নয়।

মেজদার রিক্সাটা যখন ভজুয়ার তেলোভাজার দোকানের পাশ দিয়ে মিউনিসিপালিটির তৈরী সাকোর ওপর উঠল—আমিও রাস্তা ঘুরে রূপাদিদের বাড়ীর দিকে পা চালালাম। সিঁড়ি আর ছাতের ওপর দিয়ে ওদের ঘরের মধ্যে পৌঁছলাম। সামনেই রূপাদি। জানলার দাঁড়ানো অবস্থায় নয়। ঠিক হুমাড়ি খেয়ে মেঝের ওপর কি যেন একটা দেখছে। কি দেখছে রূপাদি? ডে'রো পি'পড়ের লড়াই নাকি? না তো? গোটা কয়েক ফটো পর পর সাজানো। সবগুলিই পুরুষ মানুষের ছবি, তার মধ্যে মেজদার ছবিও আছে। তন্ময় চোখে অটেল আলো ছড়িয়ে পড়ছে। গালে ঠোঁটে, কপালে কি সব অচেনা রঙ। আমি যে তার পাশটিতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে, রূপাদির খেয়াল নেই। হঠাৎ চোখ পড়তেই কেমন বেন চমকে উঠল রূপাদি। টানা প্রজোড়া কোঁচকালো, 'ভোম্বল, তুমি কতক্ষণ?'

'এই তো এলাম।'

'রূপাদির গলার আওয়াজ' কেমন যেন রাগ রাগ।

'আমায় ডাকেনি কেন?'

গোলাপী ঠোঁট কে'পে উঠছে। রূপাদির।

'আমি আমি তো.....'

তোরা সবাই সমান।'

রীতিমত চিৎকার করে ধমকে উঠল রূপাদি। আমি বুদ্ধলাম নিজে'র অজান্তেই আমার চোখে জল এসেছে। গলার মধ্যে কি যেন কুণ্ডলি পাকাচ্ছে। মূখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে আমাকে দুটো বাহু মেলে টেনে নিলেন রূপাদি। আমার মাথার চুলের মধ্যে ওর সরু সরু আঙুলগুলো চালাতে চালাতে বললেন, 'তুই রাগ করিসনে ভোম্বল! আমি..... আমি আজ.....' টপ করে কপালের ওপর চোখের জল পড়তেই বুদ্ধলাম উনি কাঁদছেন। সারা শরীর কাঁপতে লাগল রূপাদির। কিছুক্ষণ আমাকে ধরে থাকার পর যেন সামলাতে পারলেন না। বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে বালিশে ঘাড় গুঁজে শুয়ে পড়লেন। থাক-থাক এলো চুল সারা পিঠখানার ওপর ছড়িয়ে পড়ে একটা অশ্চর্য ধরণের বিষম পরিবেশ তৈরী করল। আমি তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে। রূপাদির কান্না আর বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত ভেঙে-পড়া তনুদেহ আমার সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে। শুনতে পাচ্ছি কেমন যেন চাপা একটা গুঞ্জন উঠছে। এ গুঞ্জন কান্নার।

আমার ভাবনার কোন এক গোপন স্তরে সেই কান্নার রেশ বোধহয় কোন

দিনই স্মান হয়নি। নইলে দীর্ঘ তের চৌদ্দ বছর পরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবেই যখন রূপাদিকে দেখলাম, ঠিক তখন সেই কান্নাঘেরা মূহুর্তটা আমার এত করে মনে পড়ল কেন। খোলা জানলার পাশে বসে বোধহয় চুল শুকোচ্ছিলেন রূপাদি। কলকাতার সেই ঘন বসতিপূর্ণ ঘিঞ্জি এলাকায় আমার এক বন্ধুর বাড়ী খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি। বন্ড উল্টো-পাল্টা নম্বর এদিকে। তিনের পর সাতাশের সি। কিছুতেই ঠিক বাড়ীটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার দরকার উনিশ নম্বর বাড়ী।

একখানা পুরনো ধরণের বাড়ীর দরজায় আলকাতরা দিয়ে উনিশ লেখা আছে মনে হ'ল। শেকল ধরে নাড়লাম। উত্তর নেই। ওপর দিকে তাকাতেই রূপাদির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ওপরের ঘরের জানলার পাশে চুল এলো করে বসেছিলেন রূপাদি।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। মনের মধ্যে কারা যেন সব উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বেশ মোটা হয়েছেন রূপাদি। অল্প বয়সের সেই সূতাম তব্বী নয়। আজ রীতিমত মহিলা। তবু চিবুকের সেই নরম খাঁজটি আজও অটুট। প্রু কুঁচকে তাকানোর সেই চেনা ভঙিটাও অটুট। সংশয়ে দুলে বললাম, 'রূপাদি না!'

'আরে ভোম্বল। আমি ঠিক ধরেছি—' হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে এসে দরজাটা খুলে দিলেন রূপাদি, হাতে টান দিয়ে বললেন, 'ওপরে চল।'

রাস্তার ওপরে রূপাদির এ ধরণের নিঃসংকোচ বাবহারে আমি নিজেই যেন লজ্জা পাচ্ছিলাম। হাজার হোক এখন আমি ছোট নই, রীতিমত ডিগ্রি ক্লাসের ছাত্র। কচি গোঁফজোড়া নিরামিত ঠিক-ঠাক করছি। লুকিয়ে সিগারেটও খাচ্ছি।

চুপচাপ দোতলায় উঠে এলাম। সিঁড়িটা যেন কেমনধারা। দু'জনে পাশাপাশি ওঠা যায় না। ধাপগুলোও উঁচু উঁচু ঘরের সামনে ছোট একটা বারান্দা মতন, সেখানে দাঁড়ালে ভেতর দিকের একটা রোয়াক চোখে পড়ে। আলো বাতাসও কম।

শুধু রূপাদির ঘরখানা রাস্তার ওপর। চমৎকার করে সাজানো গোছানো। দরজায় আকাশ রঙের পর্দা।

এককোণে একখানা ডবল বেড খাট। সাদা ধবধবে চাদরে ঢাকা। আর এককোণে ড্রেসিং টেবিল, আলমারী, গিলট ট্রাস্ক। তোরণ বাস্তব সব সন্দের করে গুঁছিয়ে রাখা। মোটকথা সব কিছু'র ওপরে একটা সুস্থ সৌন্দর্যবোধের চিহ্ন।

আমাকে বিছানায় বসতে বলে ছোট একটা গদিজাটা টুলের ওপর রূপাদি

বসলেন। তারপর কত যে কথা বলে গেলেন, তার ঠিক নেই। বার বার লালবাগের সেই ফেলে-আসা দিনগুলো সামনে এসে দাঁড়ালেন। যেন লালবাগ তার রক্তের লালে মিশে গেছে। কিন্তু যে কথাটা আমি শুনতে চাইছিলাম সেটার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন রূপাদি। কিছুতেই মেজদার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন না। অন্তত একটিবারও তিনি মেজদাকে স্মরণ করুন। কেমন আছে সে? কি করছে সে? এ প্রশ্নটা রূপাদির মনে একটিবারের জন্যেও দুলে উঠছে না কেন?

কিন্তু না। বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেওয়ার পর, চা ও জলখাবার শেষ করার পরও সে প্রশ্নগুণ এল না। আমি বললাম, 'আজ উঠি রূপাদি।'

আমার মূখের ওপর কি একটা—কুহক মন্ত ছড়িয়ে দিলেন রূপাদি। 'এ দৃষ্টি তো আমি ও'র চোখে কোন দিন দেখিনি।

কালো কুচকুচে মণি দুটোর মধ্যে এক মায়াবী আলো জ্বলছে। বললেন, 'তুই তো ভারি সুন্দর হয়ে উঠেছিস ভোম্বল!'

রূপের প্রশংসায় শুধু মেয়েদের নয়, ছেলেদেরও মন গলে। কিন্তু আমার মনে হল এ ঠিক রূপকে চোখে দেখা নয়, অনুভব করা নয়, এ আরো, আরো কিছু।

চমকে তাকালাম রূপাদির মুখ ও দেহের দিকে। এ যেন এক ভেঙেপড়া মন্দির। এককালে যার গায়ে অজস্র সৌন্দর্যের অলঙ্করণ শোভা পেত। এখন সে সব কিছুই নেই। আছে শুধু একটা মোটাসোটা অস্তিত্ব। টয়েলেট ঘসে ঘসে মূখের স্বাভাবিক কোমলতা ক্ষয়ে গেছে। ঠোঁটে নেই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের শ্রী, গালের কৃত্রিম রঙের ছোপ যেন বড় বেশী স্পষ্ট।

ও'র চোখের কোলে ক্রান্তির দিকে চোখ পড়ার পর মুখ নামিয়ে নিলাম। ও'র চোখের ভাষা একেবারে পাণ্টে গেছে এবার। একটা দুঃসহ লজ্জা দেহটিকে পাকে পাকে জড়িয়েছে। অটেল প্লাসিতে সারা মুখ ছেয়ে গেছে। মাথাটা বুক'র ওপর বন্ধ পড়েছে।

আমি আর কথা বললাম না। সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় এসে নামলাম। কিন্তু আমার মনে মন্দির দেখে আসার শান্তি পেলাম না। পেলাম না সেই পবিত্রতা।

দুই পার্শ্বীয় মেছু

পাল বাক

কগাদ চৌধুরী

ইংল্যান্ডের রুডিয়াড কিপলিং-এর প্রাণশিচুত আমেরিকার পাল বাক। কিপলিং-এর সেই অমানুষিক মন্ত্র : The East is East and the West is West, and the twin shall never meet. এর উজ্জ্বল প্রতিবাদ পাল বাকের প্রথম উপন্যাস “ইস্ট উইন্ড : ওয়েস্ট উইন্ড”। শব্দে তার প্রথম উপন্যাসেই নয়, তার আত্মবিশ্বাস সাহিত্যসাধনায় বাক প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য, এই দুই সহোদর সভ্যতার সেতুবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। বাকের বাবা মা ছিলেন প্রেস-বিটারিয়ান মিশনারী। তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল চিয়াংকিয়াং-এর চীনা সম্প্রদায়ের মধ্যে। বাকও বেড়ে উঠেছিলেন চীনের মহান প্রাচীরের মধ্যে। ইংরেজীর আগে তিনি চীনে ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর শৈশবসঙ্গীরা সকলেই ছিল চীনা। চীনা রীতিনীতি, সংস্কার তাঁর জীবন-ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশে গিয়েছিল। ইংরেজীতে লেখার সময়ও চীনে ভাষা আজো তাঁর চিন্তার বাহন। এবং বলা যায় বাকের উপন্যাসগুলি তাঁর চিন্তাধারার ইংরেজী অনুবাদ মাত্র।

পাল বাকের সাহিত্য-জীবনের উন্মেষ হয়েছিল তিনজনের প্রভাবে। জনৈক চীনা-সেবিকা ছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম প্রভাব। মহিলাটি তাঁকে নিয়ে যেতেন বোধ ও তাও ধর্মভেদের অশুচ্য কাহিনীর অলৌকিক জগতে। ভ্রমণবিলাসী বাবা শোনাতেন দুঃসাহসিক ভ্রমণকাহিনী এবং মার ছায়ায় বসে বাক শুনতেন সঙ্গীতের কথা। এই গ্রিবেগী সঙ্গমের স্রোতে বাক তাঁর সাহিত্যকে পেয়েছিলেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি আমেরিকায় আসেন উচ্চশিক্ষার জন্যে। ১৯১৪ সালে স্নাতক হয়ে আবার ফিরে যান চীনে। তিন বছর পরে কৃষি মিশনারী ডাঃ লেসিং বাককে বিয়ে করে উত্তর চীনের একটি ছোট্ট শহরে এলেন। এবং এই শহরটিকেই বাক ভ্রমণ করেছেন তাঁর বিশ্ববাসিত উপন্যাস “গুড আর্থ”-এ। “গুড আর্থ” প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। এই উপন্যাস বাককে দুটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবং অসামান্য যশ উপহার দিয়েছিল। ২১ মাস ধাবৎ “গুড আর্থ” ছিল ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সর্বাধিক বিক্রীত গ্রন্থ। “দি এক্সাইল” এবং “দি ফাইটিং এঞ্জেল”

লিখেছিলেন বাক তাঁর বাবা-মার জীবনী-গ্রন্থ রূপে। পরে এই দুটো গ্রন্থ “দি স্পিরিট এন্ড দি ফ্লেশ” নামে একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। নোবেল আকাদেমি পাল বাক সম্পর্কে তাঁদের বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এই জীবনী-গ্রন্থ দুটির ভিত্তিতে। উপন্যাস, অনুবাদ গ্রন্থ এবং জীবনী মিলিয়ে বাকের গ্রন্থসংখ্যা চল্লিশটিরও বেশী। জাপানের পটভূমিকায় রচিত তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ “এ ব্রিজ ফর জর্জিং” গত ২রা এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছে। কোরিয়ার পটভূমিতে তিনি একটি নতুন উপন্যাস লিখেছেন ইদানিং। বাক শব্দে

প্রাচ্যের পটভূমিকাতেই উপন্যাস লেখেন নি। আমেরিকার প্রচার-পাগল সভ্যতাকে তাঁর ব্যঙ্গ করে একটি অসাধারণ উপন্যাস লিখেছিলেন “দি আদার গডস” নামে।

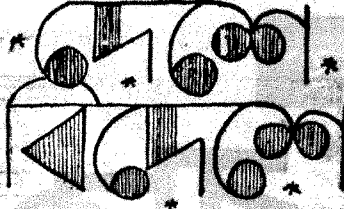
বাকের কর্মপরিধি শব্দে সাহিত্যেই সীমিত নয়। চীনে থাকাকালীন নানকিং এবং চুংইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বছর ইংরেজীর অধ্যাপনা করেছেন, মিশনারীর কাজও করেছিলেন কিছু দিনের জন্যে, এশীয় ছেলেমেয়েদের জন্যে আমেরিকায় ১৯৪৯ সালে ‘ওয়েলকাম হাউস’ নামে একটা সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেছেন পাল বাক। দু’বছর আগে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গান্ধী-বক্তৃতামালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বাক। ‘পাল বাক’ নামে পরিচিতা হলেও প্রীমতী পাল-এর বর্তমান নাম পাল ওয়ালশ। ডাঃ লেসিং বাকের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয় ১৯৩৪ সালে। তার পরের বছর তিনি বিয়ে করেন তাঁর প্রকাশন সংস্থার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড জে ওয়ালশকে। এদিক দিয়ে আগাথা ক্রিষ্টির সঙ্গে তাঁর মিল আছে। আগাথাও তাঁর মত প্রথম স্বামীর পদবীতে আজো অভিষিক্ত।



নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ॥

পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের প্রশ্নে জেনেভায় ১৭-রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পরীক্ষাবন্ধের চুক্তি সব পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশে ঠিকমত পালিত হচ্ছে কিনা দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শকদল মোতাবেন রাখার যে প্রস্তাব করেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ, সোভিয়েট ইউনিয়নের মতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরীক্ষণ-যন্ত্র বর্তমানে এত শক্তিশালী যে কোন দেশের পক্ষেই এখন গোপন পরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়। সুতরাং স্থায়ীভাবে অপর রাষ্ট্রে পরিদর্শকদল মোতাবেন রাখার কোনই দরকার নেই। সোভিয়েট ইউনিয়ন একথাও বলেছে যে ভিন্ন রাষ্ট্রে গুপ্তচরবাহী চালানোর উদ্দেশ্যেই যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শক দলের প্রস্তাব করেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের এখতি ঠিক যে বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে রাশিয়া ও আমেরিকার নিরীক্ষণযন্ত্র বর্তমানে এত শক্তিশালী ও উন্নত যে কোন রাষ্ট্রে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো হলে তা অবশ্যই ধরা পড়বে, এবং এভাবে বিচার করলে পরিদর্শক দল উপস্থিত থাকার প্রয়োজন সত্যি থাকে না। কিন্তু যন্ত্রে ধরা পড়বে তা যে সব সময় সত্য বলে স্বীকৃত হবে তার নিশ্চয়তা কি? যুক্তরাষ্ট্রের যন্ত্রে হয়ত ধরা পড়ল যে, রাশিয়ায় একটি প্রচণ্ডশক্তির পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, কিন্তু রাশিয়া যদি তা না স্বীকার করে তখন তা প্রমাণের উপায় কি হবে? অথবা যুক্তরাষ্ট্র যদি তার নব উদ্ভাবিত কোন পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করার জন্য অজহাত হিসাবে বলে যে, তার নিরীক্ষণযন্ত্রে রাশিয়ায় পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে, তাকেই বা অস্বীকার করা যাবে কেমন করে। কিন্তু পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন চারটি দেশেই যদি চার রাষ্ট্রের প্রতি-নিষিদ্ধ উপস্থিত থাকেন তবে এ ধরনের মিথ্যা প্রচার চালানোর কোনই সুযোগ থাকবে না। এ অবস্থায় পরিদর্শকদলের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য বলেই মনে হয়। রাশিয়ার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সম্ভব না হলেও অনুরূপ কোন প্রস্তাবে একমত হতে হবে। অন্যথায় তার নিরস্ত্রীকরণের



রূপারে আগ্রহের আন্তরিকতা সম্বন্ধে অনেকের পক্ষেই প্রশ্ন তোলা সম্ভব হবে।

৥ সিরিয়ার সামরিক অভ্যুত্থান ॥

সিরিয়ায় স্বল্পপস্থায়ী অসামরিক শাসন আনিদর্শকালের জন্য অস্তিত্বিত হল। সামরিক অভ্যুত্থানের ফলেই ১৯৬১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর সিরিয়ার পুনর্জন্ম হয় এবং সামরিক শাসনেই ছিল সে গত বছর ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। তারপর ডঃ মুদরুফ দাওয়ালিবার নেতৃত্বে যে মন্ডিসভা গঠিত হয় তার পক্ষে তিন মাসের বেশী ক্ষমতাসীনি থাকা সম্ভব হল না।

সিরিয়ার স্বল্পপস্থায়ী অসামরিক শাসনব্যবস্থা কাউকেই খুশি করতে পারেনি। গঠনের এক মাসের মধ্যেই দাওয়ালিবি মন্ডিসভাকে জাতীয়করণ আইন বাতিল করতে গিয়ে গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। মিশরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাকালে ঐ জাতীয়করণ আইন গৃহীত হয়েছিল। সিরিয়ার সদ্য নির্বাচিত জাতীয় সংসদে যখন জাতীয়করণ বিলটি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় তখন ছাত্র ও শ্রমিকগণ দামাস্কাসের রাস্তায় শোভাযাত্রা করে তার বিরুদ্ধে বিকোভ জানিয়েছিল। ভূমি সংস্কার ও শ্রমিক সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত নীতি সৈন্যবাহিনীকেও ক্রমে বিকল করে তোলে। এই সকল বিকোভ ও অসন্তোষের ফলেই ডাঃ দাওয়ালিবার নরম দক্ষিণপন্থী মন্ডিসভার পক্ষে ঠিক থাকা সম্ভব হল না। সদ্য ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত সমরনায়করা পদচ্যুত মন্ডিসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও দাম্ভাজ্যবাদীদের প্রতি তীব্রগণীতির অভিযোগ এনেছেন এবং দারিদ্র্য পালনে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে পালারেস্ট ও গণপরিষদকেও বাতিল করে দিয়েছেন। মিশর ও ইরাকের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলাও সিরিয়ার বর্তমান জঙ্গী-শাসনের অন্যতম মৌলনীতি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৥ বিকলু আর্জেন্টিনা ॥

১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সৈন্যবাহিনীর অভ্যুত্থানের ফলে

আর্জেন্টিনার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। তারপর থেকে দক্ষিণ আমেরিকার ঐ শ্রিতীয় বৃহত্তম দেশটিতে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা শুরুর হয় আজ পর্যন্ত তা শান্ত হয়নি। সম্প্রতি আবার এক ভয়ংকর রক্তের সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিউজ পদ-ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। পেরণ আর্জেন্টিনার অধিবাসীদের কাছে, বিশেষ করে শ্রমিক সমাজের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। কারণ তার ন' বছরের শাসন-কালে শ্রমিকদের আনন্দবৃদ্ধি পেয়েছিল ৪৭ শতাংশ এবং সারা দেশের লোক পেয়েছিল সস্তায় চিকিৎসার সুযোগ ও বাথকো পেন্সনের সুবিধা। তার ওপর তার সহধর্মীনি ইভা পেরনের জনপ্রিয়তা ছিল সীমাহীন। কিন্তু ইভার মৃত্যুর পর কতকগুলি সামাজিক ব্যবস্থার রদবদল করতে গিয়ে পেরণ ক্যাথলিকদের বিরোধ-ভাজন হন এবং প্রধানত সেই কারণেই তাকে শেষপর্যন্ত দেশত্যাগে বাধ্য হতে হয়। আর্জেন্টিনায়ও সেইদিন থেকে দাম্পাহাঙ্গামা ও অশান্তি স্থায়ী ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

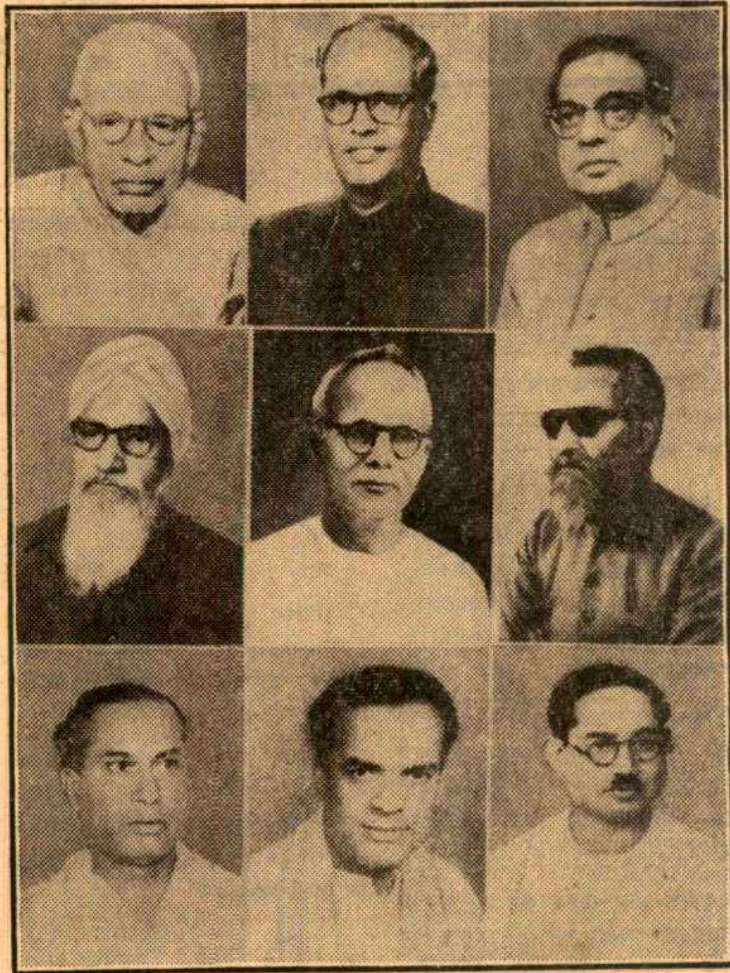
পেরনের পদচ্যুতির পর সৈন্যদলের সমর্থনে প্রথমে প্রেসিডেন্ট হন জেনারেল লোনার্ড তার কয়েক মাস পরে হন পেড্রো এরামবুর্দ। কিন্তু তাদের কার্য-ক্রম আর্জেন্টিনাবাসীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি, একারণে ১৯৫৮ সালে সাংবিধানের ব্যবস্থানুসারে আবার যখন সাধারণ নির্বাচন হয় তখন মৃত্যুত পেরন-পন্থীদের সহায়তার আত্মরো ড্রুশিউজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তারপর এবারের অগরাজ্যগুলির বিধানসভা ও গভর্নরদের নির্বাচনে দেখা যায় যে, অধিকাংশ নির্বাচনেই পেরনপন্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছেন। পেরনের এই পুনরাবির্ভাব সম্ভাবনা আর্জেন্টিনার গোড়া ক্যাথলিক সমাজ ও সৈন্যবাহিনীর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা আর্জেন্টিনা জুড়ে সৈন্যবাহিনী ও পেরন-বিরোধী ক্যাথলিকদের দাম্পাহাঙ্গামা শুরুর হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিউজ প্রথমে অভ্যুত্থাত দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিদ্রোহদমনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু তার পক্ষে শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। গত ২৮শে মার্চ সৈন্যবাহিনীর প্রবল চাপে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। আর্জেন্টিনায় যদি শেষপর্যন্ত সামরিক শাসনই কায়েম হয়

তবে তার ফল আর্জেন্টিনার পক্ষে খুবই মারাত্মক হবে। কারণ, লাতিন আমেরিকা সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বর্তমান অনু-সৃত নীতি হল, কোন রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান হলেই সেখানে যাত্রাত্মক সাহায্য বন্ধ করা।

॥ পাক বিপাক ॥

পাকিস্থানের জাতীয় সংসদ ও তার দুই বিধানসভার নির্বাচনের দিনক্ষণ ও পদ্ধতি ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের নির্বাচন হবে ২৮শে এপ্রিল ও প্রাদেশিক বিধানসভা দুটির নির্বাচন হবে ৬ই মে। জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা ১৫০-৭৫ জন পূর্ব পাকিস্থানের ও ৭৫ জন পশ্চিম পাকিস্থানের। নির্বাচনের দুই প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্যরা সমান-ভাগে কেন্দ্রীয় সংসদের আরও ছয়জন মহিলা সদস্যকে নির্বাচিত করবেন। প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিরও সদস্যসংখ্যা হবে ১৫০। জাতীয় সংসদ ও বিধানসভার সদস্যদের নির্বাচিত করবেন, সারা পাকিস্থানের প্রায় দশ কোটি মানুষের মধ্যে হতে ছেকে বার করা আশী হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী। নির্বাচন ব্যবস্থাকে এইভাবে মূঠোর মধ্যে পুরেও আরব-শাহীর পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি। তাই স্থির হয়েছে, প্রত্যেক নির্বাচকের কাছে তাঁর ফটো সম্বলিত একটি কার্ড পাঠানো হবে, যাতে কোন-ভাবে তাদের চিনতে অসুবিধা না হয়। ভোট দেওয়ার আগে তাদের একবার শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে নেওয়া হবে। এত আটঘাট বেঁধে যে নির্বাচন হচ্ছে তার প্রকৃত মূল্য কতটুকু তা বুঝতে পাকিস্থানের অধিবাসীদের, বিশেষকরে পূর্ব-পাকিস্থানের অধিবাসীদের কোন অসুবিধা হয়নি। একারণে পূর্ব পাকিস্থানের জনপ্রিয় নেতা জনাব সুরাবদীকে গ্রেপ্তার করে যেদিন থেকে আরব সরকার নতুন সংবিধানকে কার্যকরী করতে উদ্যোগী হয়েছেন, সেদিন থেকেই সাম-রিক শাসন উপেক্ষা করে সারা পূর্ব-পাকিস্থানে এক প্রবল আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আন্দোলনকারীদের দাবী—(১) অবিলম্বে সুরাবদীকে মুক্তি দিতে হবে, (২) প্রস্তাবিত সংবিধান প্রত্যাহার করতে হবে এবং (৩) যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন পাকিস্থানে পুনঃপ্রবর্তিত করতে হবে। প্রথমে পীড়ন করে পাকিস্থানের জঙ্গী শাসকরা এই আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার স্বকল কলেজ বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রদের সামরিক-ভাবে বিরত করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলন তাতেও থামেনি এবং স্কুল

সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকবৃন্দ



৩১শে মার্চ নয়াদিল্লীতে বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানে শ্রীনেহরুর অসুস্থতার জন্য উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন ভারতীয় ভাষায় বিশিষ্ট অবদানের জন্য উপরোক্ত সাহিত্যিকদের ১৯৬১ সালের সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার বিতরণ করেন। এই পুরস্কার প্রত্যেক বৎসর বিতরণ করা হয়। ডান দিক হইতে, প্রথম সারিতে—শ্রীভগবতীচরণ বর্মা (হিন্দী), ডাঃ এম বরদারাজন (তামিল), শ্রীগিরিশর শর্মা চতুর্বেদী (সংস্কৃত গবেষণা) দ্বিতীয় সারিতে—শ্রীইমতিয়াজ আলি আর্শি (উর্দু), পরলোকগত পণ্ডিত গোদাবরী মিশ্র (উড়িয়া), শ্রী এস নানক সিং (পাঞ্জাবী), তৃতীয় সারিতে—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত (বাংলা), শ্রী বি রজনীকান্ত রাও (তেলেগু), শ্রীরামসিংহী রাথোদ (গুজরাটী)

কলেজ খোলার সঙ্গে আবার ব্যাপকভাবে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরুর হয়ে গেছে। দলে দলে ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঢাকার, রাজসাহীতে, পাবনায়। কিন্তু তাতেও আন্দোলন থামেনি। এরপর আরব খাঁকে হয় আরও নিষ্ঠুর হতে হবে নয়ত নতি স্বীকার করতে হবে সামরিকভাবে। শোনা গেছে, সুরাবদীকে আপাতত মুক্তি দিয়ে নতি স্বীকার করার কথাও মনে এসেছে আরবশাহীর। কিন্তু যে ব্যবস্থাই তাঁরা করুন না কেন, পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রবর্তন না করা পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্থানের বিক্ষুব্ধ কোটি কোটি মানুষকে যে কিছুতেই শান্ত করা হবে

না একথাটা যত তাড়াতাড়ি তাঁরা বুঝবেন পাকিস্থানের পক্ষে সেটা ততই মঙ্গলের কারণ হবে।

॥ ইকুয়েডরে বিদ্রোহ ॥

দক্ষিণ আমেরিকার আরও একটি দেশ থেকে সামরিক অভ্যুত্থানের সংবাদ এসেছে। ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট জাণিয়ে-ছেন, দক্ষিণ ইকুয়েডরে সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছে এবং ইতিমধ্যেই তাদের হাতে কয়েকটি শহরের অধিকার চলে গেছে। যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয়, আরব রাষ্ট্রগুলির মত লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিতেও কোথাও আর গণতান্ত্রিক শাসন অবশিষ্ট থাকবে না।

সবিন্যাস

২২শে মার্চ

২২শে মার্চ—৮ই চৈত্র : চীন-ভারত বিরোধে সালিশী অসম্ভব না হইলেও বিষয়টি এখন চিন্তার বাহিরে—নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দলের উপর্যুপরি চতুর্থবার রণজি ট্রফি লাভের কৃতিত্ব।

২০শে মার্চ—১ই চৈত্র : প্রাচ্যীয় পরিচালনাধীনে শিল্প-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করাই সরকারী নীতি—বিধান পরিষদে (পশ্চিমবঙ্গ) মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কতৃক শিল্পনীতি বিবেচন।

তিম্বত সম্পর্কে নতুন চুক্তির প্রস্তাব বিষয়ে চীন সরকার কতৃক ভারতকে নতুন নোট প্রেরণ—প্রশ্নটি বিবেচনাধীন আছে বলিয়া লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২৪শে মার্চ—১০ই চৈত্র : বিন-বিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রয়োজন—কলিকাতা বিনবিদ্যালয়ের সমাবর্তনে উৎসবে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অভিমত প্রকাশ।

১ ঘণ্টা শিফট করিয়া শ্রমিকদের জন্য সম্মত হইতে পারিলে কাজের ব্যবস্থা—কেরলের রাজ্যপাল শ্রী শ্রী ভি ভি গিরির সুপারিশ।

২৫শে মার্চ—১১ই চৈত্র : উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষার বর্তমান স্থান অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে—বিনবিদ্যালয়ের (কলিকাতা) সমাবর্তনে উৎসবে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের দাবী—উপাধ্যায় শ্রীমদ্রাজেন লাহড়ী কতৃক অধ্যাপক সত্যেন বসুর অভিমতের বিরোধিতা।

পশ্চিমের রাজ্যের ভারতভুক্ত হুগলি অঞ্চলের জন্য ফরাসী পালামেন্টে বিল উত্থাপনের সংবাদ।

উৎসবের (রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী-জেনারেল) নিকট সহস্রাধিক গোলাবের

স্মারকলিপি প্রেরণ—পতঙ্গীজ কবল হইতে মন্ডিলাভে আনন্দ প্রকাশ।

২৬শে মার্চ—১২ই চৈত্র : ভারতকে আরও প্রায় ২৫৭ কোটি টাকা ঋণদানের ব্যবস্থা—দিল্লীতে ভারত-মার্কিন চুক্তি স্বাক্ষরিত।

পাক সরকার কতৃক বে-আইনীভাবে কণ্ঠফুলি পরিচালনা সূত্র—পাকিস্থানের নিকট ভারত সরকারের প্রতিবাদ—ভারতীয় সীমান্তের তিনশত গজের মধ্যে পাকিস্থানীদের পরিখা খননের বিরুদ্ধেও ভারতের প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

২৭শে মার্চ—১৩ই চৈত্র : পশ্চিম-বঙ্গ বিধানসভায় ১৯৫১-৫০ সালের অডিট রিপোর্ট পেশ—সরকারী অর্থের যথেষ্ট অপব্যয় সম্পর্কে মন্তব্য।

কয়লা, বিদ্যুৎশক্তি ও পরিবহনের অভাবে তৃতীয় পরিচালনার সুপারিশে বাধাসিষ্ট—কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী কে সি রেড্ডির ভাষণ।

২৮শে মার্চ—১৪ই চৈত্র : হিন্দী সীমান্তে সশস্ত্র পাক হানা প্রতিরোধে রাজ্য সরকার কতৃক সবপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন—বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের ঘোষণা।

পাট সমেত সকল কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য বহাল রাখার প্রস্তাব—সরকারের বিবেচনাধীন আছে বলিয়া লোকসভায় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলের উক্তি।

২২ বাইরে

২২শে মার্চ—৮ই চৈত্র : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান বিচ্ছিন্ন হইলে সমগ্র পাকিস্থানেরই অবলুপ্তির কারণ হইবে—পাকিস্থান দিবস উপলক্ষে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সতর্কবাণী।

২৩শে মার্চ—৯ই চৈত্র : নয়া শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্থানে সর্বাঙ্গিক গণ-আন্দোলন বিস্তার—কুষ্টিয়ায় ছাত্রবিরোধ দমনে লাঠি

চলনা ও কাদুনে গ্যাস প্রয়োগ—সর্বত্র ব্যাপক ধরপাকড়।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে (জেনেভা) আগবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি প্রসঙ্গে আবার রাষ্ট্র-প্রোগ্রামকো (মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী) বাক-সংঘর্ষ।

২৪শে মার্চ—১০ই চৈত্র : ঢাকায় বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর পুনরায় লাঠিচার্জ ও কাদুনে গ্যাস প্রয়োগ—বহু ছাত্র গ্রেপ্তার।

আলজিয়াসে ফরাসী বাহিনীর প্রতি গুলি সামরিক বাহিনীর ইতস্ততঃ গুলীবর্ষণ—বম্ব-এল-উমে গুলি বাহিনীর ঘাঁটি সৈন্যদল কতৃক পরিবেষ্টিত।

পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে বৃটেনে পালামেন্ট স্কোয়ারে সহস্রাধিক নরনারীর বিক্ষোভ।

২৫শে মার্চ—১১ই চৈত্র : ঢাকায় এই পর্যন্ত দুইশত ছাত্র গ্রেপ্তার—পাক শাসনতন্ত্র-বিরোধী (আয়ুব খাঁ প্রবর্তিত) বিক্ষোভ প্রদর্শনের জের।

২৬শে মার্চ—১২ই চৈত্র : আল-জিরার গুলি সামরিক সংস্থার নেতা জেনারেল এডমন্ড পুহো ধৃত—ফ্রান্সের একমাত্র জীবিত মর্শাল আলকোজ জুই স্বগৃহে আটক।

জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠক পুনরায়ম্ভ।

নেপালী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারী ফৌজের অভিযান—৪ জন বিদ্রোহী নিহত হওয়ার সংবাদ।

২৭শে মার্চ—১৩ই চৈত্র : আমেরিকা আগবিক পরীক্ষা পুনরায়ম্ভ করিলে রাশিয়াও পরীক্ষা চলাইবে—রাষ্ট্রসংঘ বেতারে প্রোগ্রামকোর ঘোষণা। বিক্ষোভকারীদের উপর সৈন্যদের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে আলজিয়াসে সাধারণ ধর্মঘট।

২৮শে মার্চ—১৪ই চৈত্র : সিরিয়ার পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থান—জঙ্গী পরিষদ কতৃক শাসনক্ষমতা দখল—প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিসভার পদত্যাগ—পলামেন্ট বাতিল।

পদত্যাগের জন্য আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিসের প্রতি সশস্ত্র-বাহিনীগুলির চরমপ্রতি।

নতুন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্থানে ছাত্রবিক্ষোভ অব্যাহত।



আনন্দে
উজবে...

জাতিক আধাজন..

সবার মলারঙনে...

পবিত্রীভবমণীয়া
কিনতেন

কমরঙনে

কমিউনিস্ট, এম, এল, ওয়ান এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড।



হালিকাতা

সমকালীন সাহিত্য

অভ্যুদয়

॥ বাঙালী ভদ্রলোক ও ইংরাজের মত ইংরাজী ॥

সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে সম্প্রতি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বাঙালী ভাষার সমর্থনে সত্যোদ্ভাষক বঙ্গের উত্তর নিন্দা এবং ইংরাজীর সমর্থনে বিজয়লক্ষ্মীর বক্তব্যের প্রশংসা করে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে, আরো হয়ত হবে। এ হল পূর্ব-ভারতের দৃশ্য। ওদিকে উত্তর ভারতের সংবাদপত্রে আর একজাতের উক্তিভেদ ভীষণ বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলও আরেকজন বাঙালী ভদ্রলোক।

কিছুকাল আগে ইংরাজী ভাষার খ্যাতিবান লেখক খুসাবন্ত সিং একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—
In my opinion, no Indian living or dead, has written the English language as well as Nirad Chaudhuri. As a matter of fact there are few English writers who have the same mastery over their mother tongue shown by this 'Bengali Bhadralog' in the two books he has written — আর এই বঙ্গসম্প্রদায় যদি আর কিছু নাও লেখেন তাহলেও ইংরাজী সাহিত্যের লেখক হিসাবে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। এই-টুকু পাঠ করে নিশ্চয়ই বাঙালী মাত্রেই বুকটা আহ্বাদে ফেটে আটখানা হয়ে উঠবে। কিন্তু তাঁরা যদি এই বিশুদ্ধ ইংরাজী রচনাশক্তির secretটা জানতে পারেন তাহলে বোধকরি চোখ কপালে তুলবেন।

একটু পরিষ্কার করেই ঘটনাটি বলা যাক। সম্প্রতি দিল্লীতে এক ইংলিশ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন মিঃ নীরদ চৌধুরী, তিনি ইংরাজী-প্রেমিক এবং ইংরাজী অন্য অনেক সদগুণেরও প্রেমিক। তার মতে "all that good and living within us was made, shaped, and quickened by the same British rule—" ইত্যাদি। এই উক্তি তাঁর Autobiography of an Unknown Indian নামক বিখ্যাত গ্রন্থের উৎসর্গপত্র আছে। মিঃ চৌধুরীর বক্তব্য সুস্পষ্ট এবং সরল। তিনি ভারতীয়দের ইংরাজী রচনার গলদ কোথায় তার মূল আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে যদি প্রাত্যহিক পথ্য হিসাবে roast beef এবং yorkshire pudding না ভক্ষণ করা যায় তাহলে কেবলদিনই কোনো ভারতীয়ের লেখনীতে ইংরাজী বোল একেবারে খাঁটি

ইংরাজের মত খাসা হবে না। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে ভোজ্যবস্তুর এমন নিবিড় আত্মীয়তার কথা বাল্যকালে এক মাস্তুর-মশাই-এর মুখে শুনোছি। অন্যভাবে, তিনি বলতেন—“সূরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজী লেখেন সে যেন একেবারে ফুলকো লুচি।”—ফুলকো লুচি দেখলেই আমার আজো সূরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজীর কথা মনে পড়ে। এখন থেকে ভালো ইংরাজী দেখলেই roast beef এবং yorkshire pudding-এর কথা মনে হবে দেখছি।

‘ইন্ডো-আংলোয়ান’ সাহিত্য নামধের বস্তুটি এখন বিলুপ্তির পথে। অধ্যাপক কে. আর. শ্রীনিবাস আরেক্ষার একদা এই অভিধাটি চালু করলেও এখন ইংরাজী ভাষার ভারতীয় লেখকের অধিকতর স্পষ্ট নামকরণ তিনি করেছেন। মিঃ ই. এম. ফরেষ্টার একদা ভারতীয় লেখকদের এই ইংরাজী ভাষায় রচনাকর্মের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু এই জাতীয় প্রশংসায় ইংরাজী ভাষার ভারতীয় লেখকদের কতদূর অগ্রগতি হয়েছে তা জানার উপায় নেই। ইংরাজী ভাষার ভারতীয় লেখক নতুন নয়, বাঙালী লেখকলৌকিকদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, তরু দত্ত, অরুণ দত্ত, শশিচন্দ্র দত্ত ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন ঘোষ ও সরোজিনী নাইডু, রবীন্দ্র দত্ত, হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আচার্য রজেন্দ্রনাথ শীল ও শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, ধন-গোপাল মধুসোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্রনাথ রায়, বর্তমান কালের ভবানী ভট্টাচার্য, ডঃ সুধীন ঘোষ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরদ চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এরা সকলেই roast beef এবং yorkshire pudding পথ্য হিসাবে গ্রহণ করে তবে ইংরাজী লিখেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে তাঁদের ইংরাজী রচনা ডি. এল. রিচার্ডসন, এডমন্ড গস, জর্জ বার্নার্ড শ, এজরা পাউন্ড, ইএটস্. ই. এম. ফরেষ্টার প্রভৃতি অসংখ্য ইংরাজী ভাষার লেখক ও সমালোচকবৃন্দ কতক প্রশংসিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই তারিখে জন ড্রিস্কওয়াটার বেথুন গৌরদাস বসাককে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটিও স্মরণ রাখা কতব্য : “endeavour to impress on him (মধুসূদন দত্ত) the same advice which I have already given to several

of his countrymen, which is that he might employ his time to better advantage than in writing English Poetry”—এই উক্তির অর্থ মধুসূদন বুদ্ধিহীন এবং ১৮৬৫-৬৬শে জানুয়ারী তারিখে গৌরদাসকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—মাতৃভাষায় লিখলেই বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত না হয়ে একটা চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব। মাইকেলের ক্ষেত্রে যা সত্য, নিঃসন্দেহে অপরের ক্ষেত্রেও তাই সত্য। তাই roast beef খেয়ে এবং না খেয়ে যে সব ভারতীয় লেখক ইংরাজী ভাষায় লিখেছেন—তাঁরা একজনও চিরস্থায়ী নাম রেখে যেতে পারেননি।

মিঃ চৌধুরীর এই উক্তিটির নানাদিক আছে, বড়ই জটিল কথা, এর আবার রাজনৈতিক দিকটাও চিন্তা করা প্রয়োজন। তবে প্রশ্ন এই যে-সব খাঁটি ইংরেজ লেখক স্বদেশ ছেড়ে অন্যত্র বাস করেন এবং সম্ভবতঃ বিদেশী পথ্য গ্রহণ করেন, তাঁদের ইংরাজী কি ‘জুল্ম’ হয়ে পড়ে। হিন্দি শিক্ষার যে আন্দোলন এখন এদেশে চালু, তার সঙ্গে যদি উত্তর-ভারতীয় ডাল, রোটি, পরোটা, কাবাব প্রভৃতি খাদ্য দীক্ষণ ও পূর্ব-ভারতীয়দের গ্রহণ করতে হয় তাহলে পাকস্থলী ও গহস্থালী উভয় অঙ্গেই বিস্ফলব শুরু হবে।

জর্জ বার্নার্ড শ নামক জনৈক আইরিশ ভদ্রলোক অনেকদিন ইংলণ্ডে বাস করে ইংরাজী ভাষায় উত্তম নাটক এবং প্রবন্ধাবলী রচনা করে পরলোকগমন করেছেন ছিয়ানস্বই বছর বয়সে। তিনি সারা জীবনে নিরামিষভোজী ছিলেন এবং কদাপি মদ্যপার্শ্বও করেননি। তাঁর লিখিত ইংরাজীর নিন্দা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। বিদেশী হয়েও জোসেফ কোনরাদ যে ইংরাজী ভাষায় তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন তা নিশ্চয়ই ইংরাজের মত ইংরাজী নয়।

ইংরাজীতে লিখতে বসলেই ঠিক খাঁটি কুলীন ইংরাজের মতই তা লিখতে হবে এমন কোনো যুক্তি নেই। কেনই বা সেই চেষ্টা করবেন সেই লেখক? তিনি তাঁর নিজস্ব ভাষা এবং পদ্ধতি সহযোগেই সাহিত্যসৃষ্টি করবেন। বাঙালী লেখক যদি লেখেন “If Krishna keeps who can kill”. কিংবা “How many times Nera goes under a bael tree?” তাহলে হুটী কোথায়। এই জাতীয় উক্তি বাংলা দেশের প্রখ্যাত দৈনিকপত্রের সম্পাদকীয়তে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে।

মিঃ আর্থার কোয়েটলার তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত The Lotus And The Robot গ্রন্থে (এই গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করার কথা ভারত সরকারের বিবেচনায় ধীন), জাপানীদের ইংরাজী জ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত নিবোধের মত উক্তি করেছেন। জাপানীরা যে রকম একগুয়েমিসহকারে

নিজেদের ভাষা আঁকড়ে পড়ে থাকে তা তার পক্ষে উদ্ভার কারণ হয়েছে। একদা য়োরোপীয় ভ্রমণকাহিনী-লেখকরা ভারতীয় চীনা এবং জাপানীদের মধ্যে ইংরাজী কিভাবে বিকৃত হয়ে উচ্চারিত এবং লিখিত হয় তার নমুনা দিতেন। এখন অবশ্য সে রেওয়াজ উঠে গেছে। কোয়েন্টলার বলেছেন, জাপানীরা ইংরাজী কেতায় চিন্তা করতে পারে না, তাই তাদের ইংরাজী অশুদ্ধ এবং অক্ষম। মিঃ কোয়েন্টলার অতঃপর ইংরাজী ভাষার এক জাপানী অধ্যাপককে অত্যন্ত তাল্খিয়া করেছেন, অধ্যাপক ভদ্রলোকের ইংরাজী অবশ্য অতিশয় জাপানীমাকর্ষ। মিঃ কোয়েন্টলার শেষ পর্যন্ত হতাশভরে বলেছেন যে—জাপান এশিয়া ভূখণ্ডের সবচেয়ে পশ্চিমঘেঁষা দেশ হলেও—তারা “drastically cut off from verbal commerce with the West.”

মিঃ কোয়েন্টলার অবশ্য বলেননি বা যুক্তি প্রদর্শন করে বোঝাতে পারেননি যে জাপানীরা কেন ইংরাজী শিখবে, কিংবা মিঃ কোয়েন্টলার জাপানী ভাষা শিখা করবেন কিনা।

ইংরাজের মত ইংরাজী লেখার প্রতি অত্যধিক আগ্রহের বিচিত্র পরিণতি ঘটা সম্ভব। ঈশ্বর করুন ভারতীয় লেখকরা যেন ইংরাজের মত চিন্তা করতে শুরু না করেন, বেন তাঁরা মনে প্রাণে ভারতীয়ই থাকেন। Roast beef এবং yorkshire pudding বিলাতেও ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠবে, কারণ আন্তর্জাতিক খানা পরিবেশনের দারুণ প্রতিযোগিতা বর্তমান ইংলণ্ডে এখন চালু হয়েছে। ইংরেজরা মুখ বদলাতে শুরু করেছেন, ফলে তাঁদের ইংরাজীও হয়ত ক্রমশঃ জলবৎ তরল হয়ে উঠবে।

মিঃ নীরদ চৌধুরী অবশ্য বলেছেন ভারতীয় লেখকরা তাঁদের বিষয়-বস্তুটা যেন খাঁটি ভারতীয় রাখেন। এই উক্তিও অবশ্য মিঃ চৌধুরীর মৌলিক উক্তি নয়। তবে এই উক্তিতে প্রমাণ যে মিঃ চৌধুরীর পাকস্থলী যেখানেই থাকুক, তাঁর হৃদয়টা হয়ত এখনও ভারতীয় আছে। তবে ‘ডেক’ এবং ‘কিডনী-পাই’ আহার্য হিসাবে গ্রহণ করলে যদি ইংরাজের মত ইংরাজী লেখা যায়, অনেকে হয়ত মিঃ নীরদ চৌধুরীর ‘প্রেসক্রিপশন’ গ্রহণ করবেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় উত্তম ইংরাজী শিক্ষার উপায় হিসাবে ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু পথের কথা ভাবেননি। নেহাৎ পুঁইশাক এবং কুচো ঝিড়ির তেঁজে এখনও পড়ে থাকার জন্য বাঙালী ভদ্রলোকদের ইংরাজীর উন্নতি নেই! Timeless England-এর প্রিয় লেখক মিঃ নীরদ চৌধুরীকে তাই কে একজন সাটিফিকেট দিয়েছেন—“Everyone is pleased to have met you, especially as you fell in

with all our habit and customs as if you had been among us for years”

মিঃ চৌধুরী এই সাটিফিকেটটি সম্বন্ধে তাঁর “A Passage To England” গ্রন্থে মর্দিত করেছেন।

॥ পি, ই, এন্-এর বার্ষিক সভা ॥

গত ১লা এপ্রিল বালীগঞ্জের এক মনোজ্ঞ পরিবেশে পি, ই, এন্-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার অধিবেশন বসেছিল। এই উপলক্ষে পি, ই, এন্-এর নিয়মিত সদস্য ছাড়াও বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি উক্ত সংস্থার বিদ্যায়ী সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সমবেত হয়েছিলেন। সুধীর বাবুর প্রস্তাবানুসারে শ্রীভুবনকান্ত ঘোষ সর্বসম্মতিক্রমে পি, ই, এন্-এর নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পি, ই, এন্-এর জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করার সংকল্প জ্ঞাপন করেন। সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় এবং কোষাধ্যক্ষ পদে পুনর্নির্বাচিত হন শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু। এঁরা ছাড়া সভায় উপস্থিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, বৃন্দদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, লীলা মজুমদার, পদলিনবিহারী সেন, মনোজ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, কৈদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বিশদু মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, প্রতিভা বসু, হিরণকুমার সান্যাল, সুমধনাথ ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, মনোজ বসু, মণীন্দ্র রায় এবং আরো অনেকে। সভার শেষে একটি সু-পরি-কল্পিত নৈশভোজে উপস্থিত ব্যক্তি-বর্গকে আপ্যায়িত করা হয়।

নতুন বাই

কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং—

(গল্প-সংগ্রহ) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ প্রকাশ, ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ১ হইতে মূল্য বসু কতক প্রকাশিত। মূল্য ৪-০০।

‘কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং’.....

এই অসমাপ্ত বাক্যের আকর্ষণীয় নামধেরা গ্রন্থটি লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ গল্পকার ও ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। হাল্কা ছাঁদের এই প্রথম গল্পটির নামেই বইখানির নামকরণ হয়েছে। গল্পের আসল মজাটা সৃষ্টি হয়েছে নাতনীর বিবাহের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিষয়ে। কিন্তু এই বিভ্রমের মধ্যে থেকেই পাত্রের সম্বন্ধ মিলেছে এবং গল্পের পরিণতি সার্থকতার উপনীত হয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প ‘দুঃসাহসী’-তে হাস্যরসের

ধোরাক আছে প্রচ্ছন্নভাবে। প্রচ্ছন্ন-ভাবে বললাম এই কারণে যে, আপাত-দৃষ্টিতে এই হাসি ধরা না পড়লেও এর মধ্যে ফলগুধারার মত দরদের একটি হাস্যরস প্রবহমান দেখা যায়। মেয়েরা দুঃসাহসী ছেলে পছন্দ করে বলে স্কুল - ফাইনাল - পরীক্ষার্থী একটি মেয়েকে নিয়ে, বিনা টিকিটে রেলযাত্রা করে নায়ক ধরা পড়ে এবং মোবাইল বিচারালয়ের বিচারকের হাতে এসে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু পরি-শেষে বিচারকের অনুকম্পা প্রকাশ পায়। ফাইনের টাকা নিজের পকেট থেকে বার করে, প্রেমিক বিচারক দুই তরুণ-তরুণীর মিলনেজ্জাক পূর্ণ করার সুযোগ দেন। নায়ক হিমালীর কথায় এবং গাড়ির জানালা থেকে মেয়েটির উদ্ভিজ্জিত মুখ ও দরদ-ভরা দৃষ্টি শেষ



পর্যন্ত রেলওয়ে গ্যাজেটটিকে আভ-ভূত করে।

তৃতীয় ‘কল্পনা চার রূপ’ গল্পটি দ্বিতীয় ‘দুঃসাহসী’ গল্পেরই সম-প্রকৃতিবিশিষ্ট পরিপূর্ণতার সহায়ক। গল্পলেখক ‘দুঃসাহসী’ গল্পে যে ভুল করেছেন নায়ক হিমালীর চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে এবং নায়িকা দীপ্তির ভাব-ভঙ্গী সম্পর্কে এঁরটি চিঠির সাহায্যে সেই ভুলটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং হিমালীর আসল নাম যে হিমালীশ এবং দীপ্তির আসল নাম যে সুলতা তা প্রকাশ পেয়েছে সুলতা কর্তৃক লেখককে লিখিত চিঠিতে। এই কাহিনীর কল্পনায় মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকতার পরি-চয় পাওয়া যায়। তাছাড়া হাল্কা ছাঁদের উপভোগ্য গল্প লেখার কুশলী লেখক বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য এখানেই মাধুর্যে মুখর। পরবর্তী গল্প ‘মেঘকুলতল ঘরের কেছা’ অপেক্ষাকৃত আরও রসঘন। মাঘারমশায়ের মেয়ে মিতুর বিয়ের জন্য গোবরের অক্ষরের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের ব্যাপারটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ‘ভালবাসা

একটি আর্ট" আর একটি মজার গল্প। রিয়েল ঘটনা নিয়ে, ভালবাসার নানা নট্যটি নিয়ে লাগসই বহু কথা আছে এই গল্পে। শ্বিভেন এই গল্পের নায়ক। সে গ্রামের সুবা অর্থীণ সুবর্ণা থেকে শহরের সরমা, মৃণাল প্রভৃতিতে জাম্প দিতে থাকে। একেই লেখকের কথার, "শ্বিভেন এদিকে ক্রমাগত নিত্য-নতুনের মধ্যে দিয়ে ভালবাসাটাকে রীতিমত একটা আর্টের পর্যায়ে তুলে ধরেছে।" অতঃপর লেখক এই আর্টের বিশ্লেষণ করেও বলেছেন, "বিশেষ করে যে ভালবাসা আর্টের স্তরে উঠে গেছে তার একটি শক্তি হচ্ছে, সে একই সময়ে আত্মপ্রকাশ আর আত্মগোপন দুটোতেই সমর্থ।" মনস্তত্ত্বের দিক থেকে 'ভালবাসা একটি আর্ট' নামক গল্পটি একটি সার্থক সৃষ্টি। এই গল্পের মিলনাত্মক পরিণতিতে বিভূতি-বাবু যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, ভালবাসার ক্ষেত্রে দক্ষ আর্টিস্ট শ্বিভেনের চেয়েও তাঁকে আমরা তারিফ করি।

প্রথম দিকের এই গল্পগুলি ছাড়াও, 'সত্যিই বাব এসেছিল', 'গোবর্ধন দারোগা বনাম রাধামাণি দাসী' 'দেব-স্থান', 'কাশ্যাপ গোস্বামী সিংহ রাশি', 'স্বয়ংবতা', 'সংক্রামক', 'বাস্তববাদী', 'বৈদিক ও গান্ধব', 'ভাষা ও ভালবাসা' এবং 'দুটি দিনের ইতিবৃত্ত' নামক প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই বিভূতিবাবুর অভিনব কাহিনী-কল্পনা ও গল্প-

গ্রন্থনের নিজস্ব ভঙ্গী পাঠক মাত্রেরই উপভোগের কারণ হবে। কয়েকটি গল্পের মধ্যে বর্তমান সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ঘটনা ও ব্যক্তির চালচলনের উপরেও যথাসম্ভব গল্পের শূচিভা রক্ষা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনেছেন গ্রন্থকার।

রবীন্দ্র শিশু-সাহিত্য পরিকল্পনা—
(প্রবন্ধ)। খগেন্দ্রনাথ মিত্র। নবাবুধ প্রকাশনী। সি৫১, কলেজ স্ট্রীট মাকেট। কলিঃ-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতো শিশু-সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের অবদান প্রশংসার সঙ্গে স্মরণীয়। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশের প্রাচীন রূপকথা ও ছড়া-জাতীয় রচনাগুলি বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেদের জন্য' লেখা-গুলিকেই প্রথম সার্থক শিশু-সাহিত্য বলতে হয়। কারণ তার আগে যা রচিত হয়েছে সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল শিশু-শিক্ষা, সাহিত্য রচনা নয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সাহিত্যজীবনে 'ছেলেদের জন্য' যা লিখেছেন তার পরিমাণ বড় কম নয়। বর্তমান গ্রন্থের লেখক প্রবীণ শিশু-সাহিত্যিক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সেই সাহিত্যের বিষয়ে আলোচনার সুত্রপাত করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই গ্রন্থে একটি সুদীর্ঘতম ভূমিকা ছাড়াও

যে অধ্যায়গুলি আলোচিত হয়েছে তার সূচীপত্র হল—সূচনা, শিশু ও শিশু-ভোলনাথ, ছড়ার ছাঁচ ও গল্প-সংগ, ছড়া ও খাপছাড়া, সে, নাটিকা, আত্মচরিত এবং রবীন্দ্রনাথ ও লেড তলস্তয়ের শিশুসাহিত্য। আলোচনা প্রসঙ্গে খগেন্দ্রবাবু অভিজ্ঞ শিশু-সাহিত্যিক বলেই কয়েকটি গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য কি 'ছেলেখেলা' না গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এর উত্তরে তিনি বলেন—পরিণত বয়সে কঠোর মানসিক শ্রম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে তিনি হালকা ধরণের শিশু-সাহিত্য রচনা করেছেন বটে, কিন্তু প্রথম বয়সের অনেক রচনা বিশেষ করে 'শিশু' বইটির কবিতাগুলি উচ্চতর সাহিত্যের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থেকেই জন্মলাভ করেছে। আরেকটি প্রশ্ন : 'শিশু'র সব কবিতাই কি শিশু সাহিত্য হিসাবে সার্থক? এর উত্তরে লেখক বলেছেন—শিশুর অনেক কবিতা উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিক দিয়ে ঠিক শিশু-সাহিত্য নয়, তবে অতুলনীয় শিশু-সম্বোধী কবিতা। লেখকের এ মন্তব্য মূল্যবান তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথকে তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নিয়ে বিচার করেছেন বলে তাঁর মন্তব্যগুলিও হয়েছে সুস্পষ্ট ও আন্তরিক।

যাঁরা শিশু-সাহিত্য বা শিশু-শিক্ষা নিয়ে ব্যাপৃত তাঁরা এবং সাধারণভাবে সমস্ত অভিভাবকই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

তলিয়ে যাবার আগের কদিন—
(উপন্যাস)—সুধাংশুজ্যোতিন ডায়-চার্জ। দেশ প্রকাশনী, ১৪৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিঃ-৬। দাম তিন টাকা।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা বাঙলাদেশে এক দীর্ঘস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এই জমিদারী ব্যবস্থা বাঙলার সমাজজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিল। ভাল ও মন্দ মিশ্রিত এই ব্যবস্থা সাধারণ বাঙালী মাত্রেরই জীবন অসহনীয় করে তোলে। জমিদারদের থেকে তাদের কর্মচারীদের অকথ্য অত্যাচার আমাদের অজ্ঞাত নয়। সেই জমিদারী ব্যবস্থার দীর্ঘ ইতিহাস অবলম্বন করে লেখক তাঁর কাহিনী গড়ে তুলেছেন। বহু চরিত্রের ভিড়ে কাহিনীর বিরাট ফুটে উঠেছে। নানাবিধ টুকরো ঘটনার মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে নিজের অভিজ্ঞতাকে যেন বলে গেছেন। কোথাও আড়ম্বর্তা নেই। বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। গ্রন্থটির সুপ্রচার কামনা করি।

বলিষ্ঠ লেখকের হাতে কি থাকে যাদু ?

এ কি বৈকল্য সাহিত্যে আর এক অনবদ্য সৃষ্টি ??

বরণীয় লেখক শ্রীমণালকান্তি দাশগুপ্তের স্মরণীয় অবদান

গৌর-প্রিয়া

৩.০০ সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত

অভিমত এদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন ।।।

আনন্দবাজার (১৪-১-৬২) ... এই বিষয়সত্ত্বে নিয়ে এমন উপন্যাসোপম রচনা বোধহয় এর আগে আর হয় নি.....

দেশ (১৬-১-৬২) ... শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভাবধন বৃগল-মূর্তির যেন নতুন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন লেখক তাঁহার আবেগস্পন্দিত ভাষার সাহায্যে। ...

অমৃতবাজার ... Really one should not miss this exiting enchanting and stimulating book . . .

আমাদের অন্যান্য বইয়ের কয়েকটি :

ফিরোদকুমার দত্তের **শরণ সাহিত্য-সমীক্ষা ৪.৫০**

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

মহাত্মা অম্বিনীকুমার দত্তের

রূপমতী

২.৫০

কর্মযোগ ২.০০ প্রেম ২.০০

উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

বেলকুঁড়ি

২.৫০

পটভূমিকা

২.৫০

বসু সাহিত্য সংসদ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রেষ্ঠা যুগ

নান্দীকর

আজকের কথা

চলচ্চিত্র শিল্পের জাতীয়করণ :

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে বোম্বাই। ভারত সরকারের বেতার ও তথ্য বিভাগীয় ফিল্মস্ ডিভিশনও এই বোম্বাই শহরেই। এবং চলচ্চিত্র শিল্পের নানান সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তাও চালান এই বোম্বাইয়েরই চলচ্চিত্র-শিল্পপতিরা, প্রধানতঃ এঁদের সর্বভারতীয় সংস্থা ফিল্ম ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ায় মারফত। এই ফেডারেশনে মাদ্রাজ এবং বাঙলার প্রতিনিধিও আছেন। এমন কি, এই সংস্থার সভাপতি পদে আমাদেরই বাঙলা দেশের শ্রীঅজিত বসু মশায় আছেন। তবে ভারত সরকারের কর্তারা ভারতের চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে করণে অকারণে যাদের সঙ্গে আলাপ, আলোচনা, পরামর্শাদি করেন, তাদের অধিকাংশই বোম্বাইয়ের বাসিন্দা বা ওখানকার শিল্পের সঙ্গে কোনো-না-কোনো ভাবে জড়িত।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনপর্বে উত্তর-বোম্বাই এলাকায় ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননের সমর্থনে বোম্বাই চলচ্চিত্র-শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের ধূরন্ধররা যে-বিরাট সক্রিয় সহযোগিতার মেতে উঠেছিলেন, তা কালক্রমে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে। পরবর্ত্তরে প্রকাশ, মেননের সমর্থকদের মতপাত্র শ্রীএ, এম, তারিখ পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশনে একটি প্রস্তাব আনছেন; এই প্রস্তাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের জাতীয়করণ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করবার জন্যে পার্লামেন্টের সদস্য এবং চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিস্থানীয়দের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আশা করা যায়, এই কমিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে অনেকখানি সহায়ক হবে। এই ক্রমবিস্তারমান শিল্পটি সম্পর্কে আমাদের জাতীয় সরকারের সুষ্ঠু, দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে এবং এর সহায়তাকল্পে সক্রিয় গঠনমূলক অংশগ্রহণে উৎসাহ করে তুলতে এই কমিটি তার কর্মপন্থাকে বহুদা প্রসারিত করতে পারে। এই কারণে এই কমিটি গঠন সম্পর্কে শ্রীতারিখের প্রস্তাবটি পার্লামেন্টে গৃহীত হলে চলচ্চিত্রমৌদী মাত্রই আনন্দিত হবেন।

এই প্রসঙ্গে লোকসভা কর্তৃক গঠিত এস্টিমেটস্ কমিটি প্রদত্ত চলচ্চিত্রসংক্রান্ত বিবরণীর কথা উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রীসভা এবং চলচ্চিত্রশিল্পের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা এবং নির্বিড়তর পরামর্শ-সাধন সম্ভব করবার জন্যে বিবরণীতে চলচ্চিত্রের জন্যে একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।



আহ উইন্ডারনেস নাটকে জ্যাক আর্সেন্ট ও মেরী জো ব্রুশ

এস্টিমেটস্ কমিটির মতে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের আজ এমন বয়স হয়েছে যে, গঠনমূলকভাবে এর সাধারণ মানকে যথেষ্ট উন্নীত করা উচিত এবং এর জন্যে প্রয়োজন, যতশীঘ্র সম্ভব, একটি ফিল্ম কাউন্সিল গঠন।

২৪-এ মার্চ লোকসভায় প্রদত্ত ১৫৯তম বিবরণীতে এস্টিমেটস্ কমিটি এক জল্পনায় বলেছেন, বর্তমান চলচ্চিত্র-শিল্পে শিল্পগত নৈপুণ্য দেখানোর চেয়ে আর্থিক লাভের দিকে যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাকে দমন করা প্রয়োজন।

সম্প্রতি আমাদের জাতীয় সরকার বিশেষভাবে মনোনিীত সমিতি দ্বারা

উৎকৃষ্ট ব'লে বিবেচিত চলচ্চিত্রগুলিকে সর্বভারতীয় এবং রাজ্যভিত্তিতে পদক, মানপত্র এবং কিছ্, কিছ্ আর্থিক পুরস্কার পর্বন্ত দান করছেন। কিন্তু অপর দিকে সরকার কোন একটি ছবির আর্থিক লাভ বা ক্ষতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেই সেই ছবির টিকিটবিক্রয়লব্ধ অর্থের অন্যান্য এক-তৃতীয়াংশের বখরা-দার। এর ওপর মদ্রিতচিত্রের ওপর প্রদর্শনী-কর এবং ফিল্মস্ ডিভিশন নির্মিত সংবাদ ও দলিলচিত্রের আবশ্যিক প্রদর্শনের জন্যে দেয় ডাড়াও প্রযোজকের তহবিল থেকে কাটা যায়। ফলে, ভারত-বর্ষের অধিকাংশ প্রযোজকই একখানি মাত্র

চিত্র প্রযোজনার পরেই অদৃশ্য হয়ে পড়েন। আমরা যতই চলচ্চিত্রকে অন্যতম জাতীয় শিল্প আখ্যায় ভূষিত ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিনা কেন, আসলে ভারতীয় চলচ্চিত্র অন্ততঃ প্রযোজনার ক্ষেত্রে—একটি নিছক জুয়াখেলা মাত্র।

তাই দেখি, ভারত ১৯৬০ সালে ৩২০খানি ছবি প্রস্তুত করলেও ১৯৬১তে মাত্র ২৯৭খানি ছবি সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। জনপ্রিয় শিল্পীদের যেন-তেন-প্রকারে ছবির মধ্যে অবতীর্ণ করাবার আপ্রাণ চেষ্টার ফলে চলচ্চিত্র-নির্মাণের ব্যয় আজ গগনচুম্বী হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যায়, খরচের ধাক্কা

সামলাতে না পেয়ে বহু ছবিই অর্ধপথে পরিত্যক্ত হচ্ছে। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত হিসেব করলে প্রায় ২০০খানি ছবিকে অসম্পূর্ণ দেখতে পাওয়া যাবে এবং তারা রুম করে ২ কোটি টাকা মূল্য ধন আটক করেছে। আজকাল সিনেমাতিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ প্রায় ৩৮ কোটি টাকা হলেও প্রযোজকের ভাগে গিয়ে পড়ে মাত্র ১২ কোটি টাকা, যদিও তারা ছবির নির্মাণকাৰ্যে ব্যয় করে থাকেন অন্যান্য ১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ভারতের চলচ্চিত্রশিল্প বিদেশ থেকে মানবশক্তি দিয়ে আনলেও প্রযোজকরা বছরে ৩ কোটি টাকা লোকসান দিতে বাধ্য হচ্ছেন অর্থাৎ আর যার পক্ষেই হোক না কেন, চলচ্চিত্রশিল্প প্রযোজকদের পক্ষে আজও ব্যবসাবাস্তব হয়ে উঠতে পারেনি। আবার প্রযোজকদের অংশের এই যে ১২ কোটি টাকা, তার বেশীরভাগটাই অর্জিত হয় গোটা কুড়ি ভাগ্যবান ছবি ব্যাড়া; বাকী ২৮০খানি ছবির অর্ধেক 'অদ্যভক্ষনদুর্গণ'। কাজেই ভারতীয় চলচ্চিত্রকে একটি মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে খালি বৎসরান্তে ঘটা করে দুটো মেডেল বা গুটি চারপাচি প্রযোজককে হাজার কতক টাকা পুরস্কার দিলেই আমাদের জাতীয় সরকারের এই বিরাট সম্ভাবনাময় শিল্পের প্রতি কতব্য শেষ হবে না, তাঁদের আরও চোখ খুলে, গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং সমগ্র চলচ্চিত্রশিল্পের জাতীয়-



‘হাসিনী বাকের উপকথা’ চিত্রের একটি দুর্লভ মুহূর্তকে অকৃত্রিম ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নিভাননী।

করণ যদি এখনি সম্ভবপর নাই হয়, অন্ততঃ চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীশিল্পের আশু জাতীয়করণ ঘটিয়ে শিল্পটিকে এমন একটি সুবিন্যস্ত এবং সমভাবে বন্টিত অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে চলচ্চিত্র-প্রযোজনা একটি যথার্থ ব্যবসায়ের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

মেইন মাস্ক থিয়েটারের নাট্যানুষ্ঠান :

সম্প্রতি ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের উদ্যোগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগ, মেইন মাস্ক থিয়েটার কল্‌কাতার হিন্দী হাই স্কুলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে তাঁদের অভিনয়কলার পরিচয় দিয়ে গেলেন। এই দলের শিল্পীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগে শুধু যে অভিনয়কলাই শিখেছেন, তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই নাট্যপ্রযোজনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে—দৃশ্যপট নির্মাণ ও অঙ্কন, আলোকসম্পাত, সাজসজ্জা প্রস্তুতিকরণ ও নির্বাচন, প্রতি দৃশ্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, মেক-আপ বিদ্যা, মণ্ড-তত্ত্বাবধান, দৃশ্যাপসারণ, অভিনয় শিক্ষা ও পরিচালনা প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুথিগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেন। তাই এঁদের পরিচয়লাপিতে দেখি, সতেরোজন শিল্পীর মধ্যে মাত্র তিনজন শিশু শিল্পী ও একজন বয়স্ক শিল্পী ছাড়া প্রত্যেকেই অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় একটি কাজের ভার বহন করছেন। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়কে এঁদের বর্তমান পরিচালক হার্সেল, এল, ব্রিকার ‘শিক্ষামূলক অভিনয়’ (educational theatre) নাম দিয়ে বলেছেন, এই রকম অভিনয় মারফত দলের শিল্পীরা তাঁদের শিক্ষালব্ধ দক্ষতার প্রমাণ উপস্থিত করার সুযোগ পাচ্ছেন।

মেইন মাস্ক থিয়েটারের চারদিন-ব্যাপী নাট্যানুষ্ঠানে যাদেরই উপস্থিতি থাকবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরাই এক-বাক্যে স্বীকার করবেন, বহুভাষ্যর না করেও একটি অভিনয়কে কি করে রসোত্তীর্ণ করতে হয়, সে-কৌশল এই গোষ্ঠীর প্রত্যেক শিল্পীই আয়ত্ত্ব করেছেন। পঞ্চাদশটি হিসেবে প্রধানতঃ কালো পর্দা ও সময় সময় উজ্জ্বল ধূসর রঙের (Silver gray) পর্দা ব্যবহার করে অত্যন্ত অল্প সাজসজ্জার সাহায্যে তাঁরা সুন্দর আলোকসম্পাতের সহায়তায় যে-ভাবে নাটকগুলির দৃশ্যরচনা করে-ছিলেন, তা আমাদের যাত্রাভিনয়ের মতই দর্শকের কম্পনাশিত্রির ওপর নিভরশীল। কিন্তু বিদেশে নাট্যপ্রযোজনার এই সহজ রীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও নাটকীয় রসসৃষ্টিতে এতটুকু বাধা জন্মাননি, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে। সামনে দু’টি, পেছনে দু’টি করে চারখানি চেয়ারকে মঞ্চের ওপর বসিয়ে থগ’টন ওয়াইন্ডারের একাধিককা ‘হ্যাপি জার্মি’র অভিনয়ে যে-ভাবে চলন্ত মোটর গাড়ীর সজ্জিত সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যেমনই কৌতুকপ্রদ, তেমনই শিক্ষণীয়।

তিনটি একাধিককা এবং দু’টি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে মন্থ করেছেন বর্তমানের অন্যতম প্রেম্ভ মার্কিন নাট্যকার উইলিয়াম সারোয়ান রচিত ‘মাই হার্টস ইন দি হাইল্যান্ডস’ নামে একাধিককাটি। এমন মানবতার আবেদনপূর্ণ নাটক এবং তা-এমন অসামান্য সুন্দর অভিনয় আমরা কখনও দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারছি না। পুত্র ‘জনি’র ভূমিকায় বারো বৎসর বয়স্ক অভিনেতা মাইকেল এগার্ট যে সাবলীল আন্তরিকতাপূর্ণ অভিনয়-কলার নিদর্শন দেখিয়েছেন, তা সহজে বিস্মৃত হবার নয়। সঙ্গে সঙ্গে পিতা

স্টার থিয়েটার

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ফোন : ৫৫-১১৩৯

নতুন নাটক

শেষাঘি

কাহিনী : শক্তিপদ রাজগুরু

নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত

দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু

গান : শৈলেন রায় • সুর : দুর্গা সেন

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬। টায়
বিববার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬। টায়

৥ রূপায়ণে ৥

কমল মিত্র - অজিত বন্দ্যো - আশীষ
কুমার - অর্পণা দেবী - লিলা চক্রবর্তী
বাসবী নন্দী - অনঙ্গকুমার - চন্দ্রশেখর
বীরেশ্বর সেন - গীতা দে - সাধনা
রায়চৌধুরী - আশাদেবী - শ্যাম লাহা
প্রেমাংশু বোস - ভানু বন্দ্যো

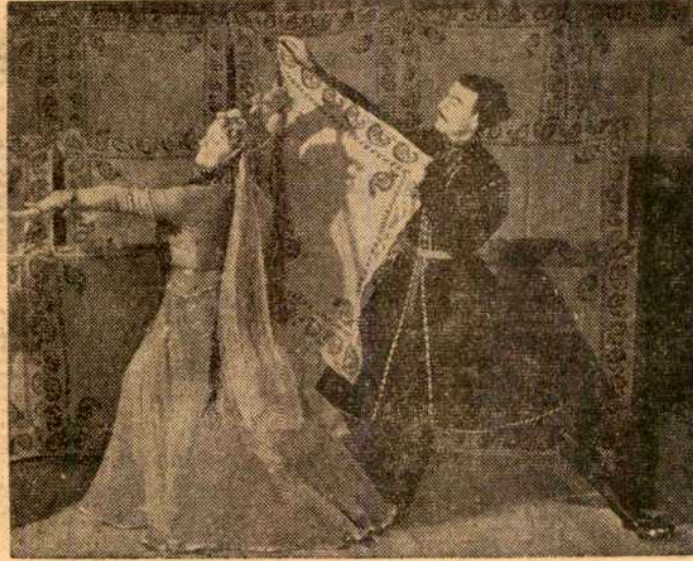
বেন আলেকজান্ডারের ভূমিকায় অ্যালবার্ট ডুকলোজ এবং জ্যাকপার ম্যাগ্নেগরের ভূমিকায় জন নিকলসের অভিনয় দর্শকমনে গভীরভাবে মুগ্ধিত থাকবে। এর পরেই রুজভেন্টের মনোবল অবলম্বনে ডোর শ্যারি লিখিত "সান-রাইজ অ্যাট ক্যাম্পাবেলো"র অভিনয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রতিটি ভূমিকা এবং বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেন্টের ভূমিকা যে-নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল, তার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা না করে থাকা যায় না। মেইন মাস্ক থিয়েটারের শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যেকেই অভিনয়ে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও এই দলের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হচ্ছেন রবার্ট, এস জয়েস এবং শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হচ্ছেন সারা লুই জনসন। এঁদের সঙ্গে অ্যালবার্ট ডুকলোজ, জ্যাক আর্সেনলট, মেরী জো হুস, ডিয়ান, ই পিটভেন্স, জন নিকলস, সিসিলিয়া, কে রিকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

জর্জিয়ান নৃত্যসংকলন :

৬০ জন সদস্যসমন্বিত জর্জিয়ান লোকনৃত্য সম্প্রদায় গেল ২৯শে মার্চ থেকে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় তাঁদের নাচের আসর বাসরেীছিলেন লোয়ার সাকুলার রোডের "নিজাম প্যালেস" প্রাঙ্গণে। পাঁচদিনে অনাদুন ষোল সতেরো হাজার লোকের এই নাচ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। এবং এঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একজনও নেই, যার এই নাচ বার বার দেখবার ইচ্ছা হয়নি।

এঁদের পুরুষদের নাচের মধ্যে আছে অবিশ্বাস্য উদ্দীপনা; এ-নাচে প্রচণ্ড দেহের কসরতের প্রয়োজন; অতিদ্রুত পদক্ষেপ, শুন্যে লম্ফন এবং নানা রকম দেহভঙ্গী নিয়ে পুরুষদের বিভিন্ন নাচ গঠিত। দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। আবার কোনো কোনো জায়গায় বিচিত্র ভঙ্গী হাসিরও উদ্ভেক করে। আবার এই পুরুষরাই যখন মেয়েদের সঙ্গে নাচে, তখন তাদের পদক্ষেপের ভঙ্গী যায় বদলে, উদ্দামতা হয়ে যায় অন্তহিত; তখন তারা নারীর প্রতি স্বেভাবিক সজ্জমসুলভ আচরণ বজায় রেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাচের মধ্যে দিয়ে প্রেম নিবেদনকে প্রকট করে।

এই দলের প্রত্যেকটি মেয়েকেই সন্দরী বলে মানতেই হবে। অবশ্য এঁদের সৌন্দর্য স্টেটুকে চোখে পড়ে, কেউ এঁদের মুখমণ্ডলে এবং করালিতে সীমায়িত। মেয়েদের পোশাক এমনই যে, মাত্র মুখমণ্ডল ও করপজব বাবৃত থাকে; দেহের অপরাপর অংশ, এমন কি পদপল্লব পর্যন্ত আবৃত। ছাড়া এঁদের দীর্ঘায়তনও সৌন্দর্যের িক-যাকে বলা যায়, stately ures। এঁদের নাচকে এক কথায়



জর্জিয়ান লোকনৃত্য সংকলনের একটি দৃশ্য

কমনীয় বা graceful আখ্য দেওয়া যেতে পারে। এঁরা দেহকে কোনো সময় ভাঙেন না বা বাঁকান না; মাত্র লঘু বা দ্রুত পদক্ষেপের দ্বারা স্থান থেকে স্থানান্তরে যান এবং কিছু হাতের ভঙ্গী করেন। এঁদের সুবম, লালিত্যপূর্ণ গতিভঙ্গী নয়নকে মগ্ন বিদ্রান্ত করে। একই দীর্ঘ পংক্তি-বন্ধ থেকে দুই বা চারভাগে বিভক্ত হয়ে আবার ঘূর্ণনের দ্বারা দীর্ঘ পংক্তি-বন্ধ হওয়া সুন্দর মণ্ডমায়ার সৃষ্টি করে।

জর্জিয়ান লোকনৃত্যের সঙ্গে যে যন্ত্রসঙ্গীত এবং সময় সময় কন্ঠসঙ্গীত চলেতে থাকে, তার সঙ্গে প্রাচ্য, এমন কি

ভারতীয় লোকসঙ্গীতের প্রচুর মিল আছে। এঁদের যে-ড্রাম, সে 'তা' আমাদেরই ঢোলকে খানিকটা বেঁটে করে নেওয়া; একজায়গার ত' চমৎকার সানাই, এমন কি সপ্পের 'পেপাঁটি' পর্যন্ত শুনতে পাওয়া গেল। অবশ্য পিয়ানো-অর্গান্ডিয়ালটি প্রতীচীরই প্রতীক।

নৃত্যে মেয়েদের মধ্যে স্ত্রীমতী সুখিখিভিলি (দলের পরিচালক ইলিকো সুখিখিভিলির স্ত্রী) নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠা। পুরুষদের মধ্যে নকল দুই মল্লবীরের কুন্তি প্রতিযোগিতার নর্তক গ্যুরচাভা, পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে নৃত্য-কলা প্রদর্শক নিমো র্যামিখিভিলি, এল,

দক্ষিণী

'দক্ষিণী-ভবন'

১, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট, কলিকাতা-১৬ ৥ ফোনঃ ৪৬-২২২২

নুতন শিক্ষাবর্ষ

'মে' মাস থেকে দক্ষিণী'র নুতন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। 'এপ্রিল' মাস থেকে নুতন শিক্ষার্থী ভর্তি আরম্ভ হয়। কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা শিক্ষাদান করা হয়। সতেরোটি পর্যায়কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে শিক্ষাক্রম নির্ধারিত তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনার সহিত পরিচয় হবে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে ঔপনিষদিক বিষয়বস্তু, স্বরাসিপি-পাঠ ও স্বরসাধনা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট। ভারত-নাট্যম, কথাকালি ও মনিপুরী নৃত্যপদ্ধতির সমন্বয়ে নৃত্যকলার শিক্ষাক্রম নির্ধারিত। বয়স্কদের পাঁচ বছরের ও শিশুদের তিন বছরের পাঠক্রম। শিক্ষা-পারিষদ : শ্রদ্ধ গৃহঠাকুরতা, সুনীলকুমার রায়, বীরেশ্বর বসু, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, অশোকতর, বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল নাগ, প্রফুল্ল মল্লোপাধ্যায়, হেনা সেন, সিন্ধা বসু, মঞ্জরী নাল, দেবী চাকলাদার ও লীলা দত্তগুপ্ত এবং আদিত্য সেন রাজকুমার, নন্দিতা রায় ও স্থিতি গৃহঠাকুরতা। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তি সম্র : মণ্ডল, বৃহস্পতি ও শনিবার বিকাল ৪-৮ ৥ এবং রবিবার সকাল ৮-১২ ও বিকাল ৪-৬ ৥

ডাম্বাড়জে ও মিথৈইডজে প্রভৃতি দর্শকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছেন। ড্রাম-বাদকম্বয়ও প্রেক্ষাগৃহে হর্ষোৎফুল্ল করতালিধ্বনি তুলেছিলেন।

জর্জিয়ান নৃত্য-আসরের উদ্বেগধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শিশু রংমহলের স্বারা জর্জিয়ান নৃত্য সম্প্রদায়ের সংবর্ধনা :

গেল বুধবার, ২৪শে মার্চ শিশু রংমহলের খুদে শিল্পীরা সোবিয়ত রাশিয়া থেকে আগত জর্জিয়ান নৃত্য-শিল্পীদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাদের প্রীতিবিধানের জন্যে রবীন্দ্র-রচনা থেকে সংগৃহীত আলোচ্য “আনন্দ” নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করেছিল। কবির চোখ দিয়ে বিভিন্ন ঋতুতে এই বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখে নাচে-গানে সেই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ত হয়ে যাওয়ারই আলোচ্য চিত্রিত হয়েছে এই “আনন্দ” নৃত্যনাট্যিকাতে। অল্প-বয়সী ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বেশে, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভঙ্গীতে যে সহজ স্বতোৎসারিত আনন্দের প্রকাশ করে, তার সুর এসে পেঁচাছোয় প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি দর্শকের অন্তরে। এবং এর সঙ্গে

আছে সুন্দর মঞ্চপরিচ্ছদনা, আলোক-সম্পাত ও যন্ত্রসঙ্গীত। জর্জিয়ান নৃত্য-শিল্পীরা শিশু শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখে প্রশংসামুখর হয়ে উঠেছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে “নাইন্থ সার্কল” :

যুগোশ্লাভ ফিল্ম চিত্র, ১৯৬০ সালে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত “দি নাইন্থ সার্কল” ছবিখানি গেল ১লা এপ্রিল, রবিবার স্থানীয় রাই সিনেমায় প্রদর্শিত হয়। ফ্রান্স স্টিগলিক পরিচালিত এই ছবিখানিতে নাৎসী অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে একটি ‘জু’-মেয়েকে একটি ছেলে মাত্র আনুষ্ঠানিক বিবাহ করবার পর ধীরে ধীরে দু’জন কিভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শেষপর্যন্ত গভীরভাবে ভালোবাসতে শুরু করে এবং নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্যে ছেলেটি কি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা করেও বাধ্যতাকে বরণ করে, তারই প্রাণপশাণী কাহিনী

বর্ণিত হয়েছে। রুথ এবং ইভোর ভূমিকায় ডুসিকা জেগারাক এবং বোরিশ ডাণিকের অভিনয় অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। আইড্যান ম্যারিগকেকের আলোকচিত্রের কাজ আলোছায়ার সংমিশ্রণে ভাবপ্রকাশক হয়েও বাস্তব-ধর্মী। সিঁড়িতে মেয়েটিকে অনুসরণকারী ছেলেকে যে-ভাবে ক্যামেরাকে চক্কা করে ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে, তা অত্যন্ত অভিনব এবং ভাবোদ্দীপক।

অগ্রগামী “কান্না” :

ডি-লুক্স ফিল্ম নিবেদিত এবং অগ্রগামী শিল্পগোষ্ঠী প্রযোজিত ও পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে গঠিত নবতম চিত্র “কান্না” আসছে ১২ই এপ্রিল থেকে উত্তরা, পূর্ববী ও উজ্জ্বল্য দেখানো হবে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন উত্তমকুমার, রাধামোহন ভট্টাচার্য, শ্যামল, শোভা সেন, সুলতা চৌধুরী ও নবাগতা নন্দিতা বসু। এতে সুরযোজনা করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

জালান প্রোডাকশন্স-এর “হাস্যলীলাবির উপকথা” :

শ্যামলাল জালান প্রযোজিত এবং তপন সিংহ পরিচালিত “হাস্যলীলাবির উপকথা” খুব শিগগিরই মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তি পাচ্ছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জনপ্রিয় এবং বলিষ্ঠ উপন্যাস অবলম্বনে পরিচালক তপন সিংহ নিজেই এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে—কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, বীরেন্দ্র সেন, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, লিলি চক্রবর্তী, নিধাননী প্রভৃতি। এতে সুরযোজনা করেছেন হেমন্ত মৃধোপাধ্যায়।

গিরিশ জন্মোৎসব :

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী ঘাতে দেশের মানুষের নিকট সুলভ হয় সেই ব্যবস্থা করার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানিয়ে গত ৩০শে মার্চ সন্ধ্যায়—বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্মরণসভায় একটি প্রস্তাব করা হয়। নট ও নাট্যকার মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দজী পোরোহিত্য করেন। এই সমাবেশে খ্যাতিমান সাহিত্যিক সমালোচক ও নাট্যকার গিরিশ-প্রতিভার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে মহাকবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাধর্ম নিবেদন করেন। এই সভায় প্রখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী এবং প্রতিষ্ঠান ও নিজেদের শ্রদ্ধা নিবেদনে যুক্ত করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীবিবেকানন্দ মৃধোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের লোকোত্তর

মাথা ধরা, সর্বপ্রকার ব্যথা ও বেদনা,

মর্দি-জ্বর, ইনফ্লুয়েন্সা প্রভৃতিতে

নিরাপদ

নিশ্চিত ও

দ্রুত

আরামের জন্য

এলজিড



৫ টি কার্যকরী
উপাদানে
প্রস্তুত

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

খেলাঘর

দশম

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় টেস্ট

ভারতবর্ষ : ২৫৮ রান (পতোদির নবাব ৪৮, দুরানী ৪৮ নট-আউট এবং জয়সীমা ৪১; হল ৬৪ রানে ৩, ওরেল ১২ রানে ২ এবং সোবার্স ৪৬ রানে ২ উইকেট)।

ও ১৮৭ রান (সারদেশাই ৬০, মঞ্জরেকার ৫১ এবং সূর্তি ৩৬। গিবস ৩৮ রানে ৮ এবং স্টেয়ার্স ২৪ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৪৭৫ রান (জো সলোমন ৯৬, রোহন কানহাই ৮৯, ফ্রাঙ্ক ওরেল ৭৭, কনরাদ হান্ট ৫৯, সোবার্স ৪২, এ্যালেন নট-আউট ৪০ এবং ম্যাকমারিস ৩৯। দুরানী ১২৩ রানে ২, নাদকারী ৯২ রানে ২, বোরদে ৮৯ রানে ২ এবং উমরীগড় ৪৮ রানে ২ উইকেট)।

প্রথম দিন (২০শে মার্চ) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৫৮ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ৫ রান (কোন উইকেট না পড়ে)।

দ্বিতীয় দিন (২৪শে মার্চ) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস : ২৬৩ রান (৪ উইকেটে)। সলোমন ২৩ রান এবং গিবস ১ রান করে নট আউট থাকেন।

বিশ্রামের দিন : ২৫শে মার্চ

তৃতীয় দিন (২৬শে মার্চ) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস : ৪২৭ রান (৮ উইকেটে)। ওরেল ৬৪ ও ডেভিড এ্যালান ৯ রান করে নট আউট থাকেন।

চতুর্থ দিন (২৭শে মার্চ) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ৪৭৫ রানে সমাপ্ত। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস—১০৪ রান (২ উইকেটে)। সারদেশাই ৪৭ এবং মঞ্জরেকার ১৪ রান করে নট আউট থাকেন।

পঞ্চম দিন (২৮শে মার্চ) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস চা-পানের বিরতির ১৮ মিনিট পূর্বে ১৮৭ রানে সমাপ্ত।

খেলার ফলাফল : ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক ইনিংস ও ৩০ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

বার্বাদোজের রাজধানী ব্রিজটাউন সহরের কেন্সিংটন ওভাল মাঠে ভারত-বর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের শোচনীয় পরাজয়ে উভয় দলের পরবর্তী চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্ট খেলার বিশেষ আকর্ষণ রইলো না। মোট পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পর পর তিনটে টেস্ট খেলায় জয়লাভ করে টেস্ট সিরিজে ইতিহাসে 'রাবার' দলের গোড়।



লান্স গিবস

দুটো খেলার ফলাফল নিয়ে তাদের বিশেষ কোন মাথা ব্যথা নেই, রেকর্ড করা ভিন্ন। ভারতবর্ষের পক্ষে এই দুটো খেলার গুরুত্ব এই কারণে আছে যে, তারা বিগত তিনটে টেস্ট খেলায় যে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তার কিছুটা লাঘব হবে যদি বাকি দুটো টেস্টে সাফল্য লাভ করতে পারে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজ বাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওটে টেস্ট সিরিজ খেলেছে এবং পাঁচটা টেস্ট খেলার প্রতিটি সিরিজে 'রাবার' পেয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের সমস্ত খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' পায়নি। সেই দিক থেকে ভারত-বর্ষের বিপক্ষে ১৯৬২ সালের টেস্ট সিরিজের বাকি চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্ট খেলার গুরুত্ব ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে কমেনি। তারা ইতিমধ্যে ওটে খেলায় জয়লাভ করে 'রাবার' পেয়ে গেছে। বাকি দুটো টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল

জয়লাভ করলে তাদের টেস্ট খেলার ইতিহাসে জাতীয় রেকর্ড হবে—টেস্ট সিরিজের সমস্ত খেলায় জয়লাভ করে 'রাবার' লাভ।

ব্রিজটাউনের সদ্য সমাপ্ত কেন্সিংটন ওভাল মাঠের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কন্সট্রাক্টর খেলতে নামেননি। বার্বাদোজ দলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসের খেলায় তাঁর মাঠ দূর রানের মাথায় তিনি গ্রিফিথের বাম্পার বলে গুরুতররূপে আহত হয়ে ঐ খেলা থেকে বরাবরের মত অবসর গ্রহণ করেন। তৃতীয় টেস্ট খেলার সময়েও তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেননি। হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। কন্সট্রাক্টরের অনুপস্থিতিতে দলের সহ-অধিনায়ক পতোদির নবাব ভারতীয় দল পরিচালনা করে বিশ্ব টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে দ্বিতীয় নজির স্থাপন করেন—সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একই দেশের পক্ষে পিতা-পুত্রের অধিনায়কত্ব লাভ। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একই দেশের পক্ষে পিতা-পুত্রের অধিনায়কত্ব লাভ বিরল। এ-ব্যাপারে প্রথম নজির স্থাপিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এফ জর্জ ম্যান যখন ইংল্যান্ড দলের নেতৃত্ব করেন। জর্জ ম্যানের পিতা ফ্রাঙ্ক ম্যান ইংল্যান্ড দল পরিচালনা করেন ১৯২২-২৩ সালে।

ওরেল যথেষ্ট কটনীতির পরিচয় দিয়েছেন। টেস জয়ী হয়েও তিনি ভারত-বর্ষকে প্রথম ব্যাট করতে দিয়েছেন। গ্রিফিথের বলে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কন্সট্রাক্টরের আহত হওয়ার ঘটনাকে তিনি যে অনেকখানি সহানুভূতির চোখে দেখেছেন, তা এই সিদ্ধান্তে প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতীয় দলের পক্ষে যে সব অভিযোগ উঠেছিল ওরেল তার মূখ্য বন্ধ করার জন্য চেষ্টার চেষ্টা করেন নি। ভারতীয় খেলোয়াড়রা বেশী পরিমাণ বাম্পার এবং বাউন্সার বল খেলতে অভ্যস্ত নয় এবং ভারতবর্ষের ব্যাটিং বিপক্ষের প্রধান কারণও তাই বলা হয়েছিল। তৃতীয় টেস্ট খেলায় তাই দেখা-লাম গোণাগুণিত বাম্পার বা বাউন্সার বল দেওয়া হয়েছে। বল ধো করার অথবা আম্পায়ারিং সম্পর্কে কোন অভিযোগ ওঠেনি। এদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল তাদের সূন্যাম অনুযায়ী ফিল্ডিং করতে পারে নি—চারটে 'কাচ' পড়ে গেল। তবুও প্রথম দিনেই ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৫৮ রাণে শেষ হয়ে যায়। উইকেট রাণ ভোলায় পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। অভিযোগ করার মূখ্য রইলো না। ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের দুর্বলতা ধরা পড়ে গেল। এরপর ওরেল নিজ দলের ব্যাটিংয়ের স্বকীয়ত্ব বিসর্জন দিয়ে মন্ডর গতিতে ব্যাট করার পন্থা অবলম্বন

করেন। উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার, পিটিয়ে না খেলে, ধীরস্থির ভাবে চতুর্থ দিন পর্যন্ত খেলাটা গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ক্ষতিবিক্ষিত উইকেটে ভারতীয় দলকে পুনরায় খেলতে দেওয়া আর ভারতবর্ষের থেকে ২৫০ রানের মত বেশী রান করে দলকে এগিয়ে রাখা। প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে কম রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাতে পরাজয় বরণ করে; সুতরাং ভারতবর্ষের ব্যাটসম্যানের দৌড় সম্পর্কে ওয়েস্ট ইন্ডিজের গণনা ভুল হয়নি। তবুও শেষের দু'দিনে উইকেট বতটা ধারণা হবে ধারণা করা হয়েছিল তা মোটেই হয়নি। ফাস্ট এবং স্পিন—দুই শ্রেণীর বোলারই এখন ভারতীয় খেলোয়াড়দের জুজু হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব আক্ষেপ করেই জমৈক সমালোচক ভারতীয় খেলোয়াড়দের 'আদার হ্যাণ্ড' বলে 'কে'তে গম্ভ্য' করতে প্রস্তাব করেছেন। তৃতীয় টেস্ট খেলার শেষে ভারতীয় দলের অস্থায়ী অধিনায়ক পতোদীর নবাব মন্তব্য করেছেন, কন্সট্রাক্টরের আহত হওয়ার ঘটনা দলের মনোবল স্বর্থে ভেঙ্গে দিয়েছে এবং যা বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন বিপর্যয় ঘটে গেছে। অধিনায়কের এই মন্তব্য একদিক থেকে সত্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল অন্য দিক থেকে ভারতীয় দলের খেলার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, খেলাটি দারুনিতভাবে অমীমাংসিত থেকে যাবে এই ধারণা নিয়ে খেলার দরুনই ভারতীয় দলকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা আত্মপ্রসাদে মোহাজ্জ্ব হয়ে 'নরম' বল যেভাবে খেলে দলের পতন ঘটিয়েছেন সে রকম মার 'নরম' বলে দেওয়া উচিত হয়নি। ৪২ ওভার খেলার পর বল বেশ নরমই ছিল এবং অধিনায়ক ওরেল ভারতীয় দলের খেলার মতিগতি লক্ষ্য রেখে শেষ পর্যন্ত পুনরো বলই কাজ হাসিল করেন।

টসে জয়ী হয়েও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল রান করার উপযুক্ত উইকেটে ভারতীয় দলকে প্রথম ব্যাট করতে ছেড়ে দেন। নিজের দল সম্পর্কে স্বর্থে আস্থা না থাকলে কোন অধিনায়কই এইভাবে বিপক্ষ দলকে দান ছাড়েন না। এ কাজ দলের পক্ষে স্বেচ্ছায় মতাবরণের সম্মিল। জুয়া খেলার সমানও বলতে পারেন। আবার বলতে পারেন, দু'বল দলের প্রতি করুণা প্রকাশ।

লাগের সময় ভারতীয় দলের সমর্থকদের খাওয়া মাথায় উঠে গেল—৪৫ উইকেট পড়ে মাত্র ৯০ রান, দু'ঘণ্টার খেলায়। উইকেটে তখন খেলছেন উমরীগড় এবং পতোদীর নবাব, দুজনেরই রানের ঘরে ১ রান। ৫ম উইকেট পড়ে যায় দলের ১১২ রানের মাথায়—উমরীগড় ৩৫

মিনিট খেলে মাত্র ৮ রান করে হলের বলে এ্যালানের হাতে ধরা পড়েন। ৬ষ্ঠ উইকেটে পতোদীর সঙ্গে খেলতে নামেন বোরদে। এই জুটি ৪৪ মিনিটের খেলায় ৪১ রান তুলে দিয়ে ভেঙ্গে যায়, বোরদে ১৯ রান করে আউট হ'ন। ৮ উইকেট পড়ে যখন দলের ১৮৮ রান তখন ৯ম উইকেটে নাদকাণীর সঙ্গে দু'রাণী খেলতে নামেন। এই ৯ম উইকেটের জুটি নাদকাণী এবং দু'রাণী ৫০ মিনিটের খেলায় দলের ৪২ রান তুলে দেন। দু'রাণীকে হল বাউন্সার এবং স্টেরাস বাম্পার ছাড়েন। দু'রাণী স্টেরাসের বাম্পার বলে 'হুক' করে বাউন্সারী করেন। দলের ২৩০ রানের মাথায় দলের ৯ম উইকেট (নাদকাণী) পড়ে যায়। শেষ খেলোয়াড় দেশাই খেলতে নামেন। শেষ উইকেটে দলের ২৮ রান যোগ হয়। ২৫৮ রানে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয় মোট ৫ ঘণ্টা ১০ মিনিটের খেলায়। দু'রাণী ৪৮ রান করে নট আউট থেকে বান। এই ৪৮ রান তুলতে তাঁর ৮০ মিনিট সময় লাগে, বাউন্সারী করেন ৮টা। পতোদীর নবাবও করেন ৪৮ এবং একই সময়ের খেলায়, তবে বাউন্সারী ৬টা। ভারতবর্ষের প্রথম পাঁচজন ব্যাটসম্যান ৯৫ রান করেন এবং শেষের ৬ জনে ১৬১ রান। প্রতিবারের মত এবারও শেষের খেলোয়াড়রাই ভারতীয় দলের মূখ্য রক্ষা করেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল কড়া ফিল্ডিং করলে ভারতীয় দলের অবস্থা আরও গোচরীয় হ'ত। জয়সীমা, সারদেশাই, দু'রাণী এবং দেশাইয়ের 'ক্যাচ' ফসকে যায়। উইকেট-কিপার এ্যালান ৪টে 'ক্যাচ' ধরেন।

এই দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল মাত্র ১০ মিনিট খেলবার সময় পায় এবং কোন উইকেট নষ্ট না করে ৫ রান করে।

দ্বিতীয় দিনের ৫ই ঘণ্টার খেলায় পূর্ব দিনের ৫ রানের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ২৫৮ রান যোগ করে, ৪৫ উইকেট খুইয়ে। লাগের সময়ের স্কোর ৬৭ রান (১ উইকেট), চা-পানের সময়ের স্কোর ১৮২ রান (২ উইকেট) এবং খেলা ভাগ্যের নির্দিষ্ট সময়ে স্কোর দাঁড়ায় ২৬৩ রান (৪ উইকেট)।

ভারতীয় দলের নিখুঁত বোলিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে রান তুলতে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। ১২০ মিনিটের খেলার মাত্র ৬২ রান ওঠে। লাগের জন্যে খেলা ভাগ্যে আর দেরী নেই, শেষ ওভার খেলা হচ্ছে। এই শেষ ওভারের সর্বশেষ বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ৬৭ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়লো, ম্যাকমার্স ৩৯ রান করে দু'রাণীর বলে উইকেট-কিপার ইঞ্জিনীয়ারের হাতে ধরা পড়ে আউট হলেন। দ্বিতীয় উইকেটে হাণ্টের সঙ্গে খেলতে নামেন কানহাই। দলের ১৫২ রানের মাথায় হাণ্ট নিজস্ব

৫৯ রান করে খেলা থেকে বিদায় নেন। হাণ্ট-২১৫ মিনিট খেলে ৫৯ রান করেন, বাউন্সারী ৭টা। দ্বিতীয় উইকেটে হাণ্ট এবং কানহাই দলের ৮৫ রান তুলেন। তৃতীয় উইকেটে কানহাইয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধেন সোবার্স।

লাগের পর থেকেই কানহাই মাথা চাড়া দিয়ে খেলতে থাকেন। নাদকাণীর বলে দলের ১১৯ রানের মাথায় কানহাই একটা 'ক্যাচ' তুলেন। উমরীগড় বলটা হাত থেকে ফেলে দেন; কানহাইয়ের রান তখন মাত্র ২৬। সেই কানহাই ৮৮ রানের মাথায় আবার একটা 'ক্যাচ' তুললেন সূতির বলে, এবার 'ক্যাচ' ফেলে দেন দু'রাণী। এর পরই মাত্র ১ রান করে নিজস্ব ৮৯ রানের এবং দলের ২২৬ রানের মাথায় কানহাই রান আউট হ'ন। দু'রাণী কানহাইয়ের 'ক্যাচ' ফেলাতে বোলার সূতি হাত কামড়েছিলেন, এবার তিনিই নিখুঁতভাবে বল ছুঁড়ে কানহাইকে রান-আউট করেন।

কানহাই তাঁর ৮৯ রান তুলতে ১৩০ মিনিট সময় নিয়েছিলেন, বাউন্সারী মেরেছিলেন ১২টা আর ওভার-বাউন্সারী ৩টে। কানহাই এবং সোবার্সের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ৭৪ রান ওঠে। চতুর্থ উইকেট (সোবার্স) পড়ে যায় দলের ২৫৫ রানের মাথায়। পঞ্চম উইকেটে সলোমনের সঙ্গে গিবস খেলতে নামেন। খেলা ভাগ্যের নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ২৬৩, ৪ উইকেটে (সলোমন ২০ এবং গিবস ১ রানে নট আউট)—ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫ রানে অগ্রগামী, হাতে জমা থাকে ৬টা উইকেট।

তৃতীয় দিনের খেলাতেও ভারতীয় দলের বোলিং খুবই নিখুঁত হয়। রানের গতি মন্থর—খুবই মন্থর। প্রথম দু'ঘণ্টার খেলায় মাত্র ৫৮ রান। সারাদিনের সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার খেলায় ১৬৪ রান—উইকেট পড়ে আরও ৪টে। অর্থাৎ মোট রান দাঁড়ায় ৪২৭ রান, ৮ উইকেটে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৬৯ রানে অগ্রগামী হয়। হাতে জমা থাকে ২টো উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২—০ খেলায় অগ্রগামী থেকেও অতি সতর্কতার সঙ্গে ব্যাট করে। খেলার ধরণ দেখে দর্শক সাধারণ খুশী হতে পারেননি। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া মন্থর গতিতে রান করার নীতি ক্রিকেট খেলার স্বার্থের পরিপন্থী। এই মতবাদের বড় সমর্থক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল নিজেও। কিন্তু এই দিনে ৬ষ্ঠ উইকেটে সলোমনের সঙ্গে খেলতে নেমে ওরেল নিজেই তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধতা করলেন—১০২ মিনিটে ৮ রান, ১৫০ মিনিটে ১৯ রান, ১৬০ মিনিটে ২৫ রান এবং ২৮০ মিনিটের খেলায় ওরেলের ৫০ রান পূর্ণ হয়। এই দিনে তিনি তাঁর ৬৪ রান করেন ৩০০ মিনিট খেলে। সমস্ত মাঠ জুড়ে ওরেলের খেলায়

বিরক্ত ভাব। ওরেলের কথার সঙ্গে তাঁর খেলার ফেন মিল নেই—ওরেলের এই নীতি বেশী ভাগ দশকই বরদাস্ত করেননি। ওরেলের প্রত্যেকটি বল খেলার আগে এবং পিছনে টিটকারী, হাততালি আর জুতোর আওয়াজ ফেউয়ের মত সমানে লেগে ছিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ৩০০ রাণ পূর্ণ হতে ৪০৮ মিনিট সময় লাগে। উইকেটে তখন ছিলেন ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি সলোমন এবং ওরেল। বেচারি সলোমন! মাত্র চার রাণের জন্যে সেগুরী করতে পারলেন না। ৬ষ্ঠ উইকেট (সলোমন ৯৬ রাণ) পড়ে যায় দলের ৩৭৮ রাণের মাথায়। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে সলোমন এবং ওরেল ১৯৭ মিনিটের খেলায় ৯৬ রাণ তুলে দেন। সলোমন ২৮৫ মিনিট খেলেছিলেন, বাউন্ডারী বাড়ি মেরেছিলেন ১১টা। এর পর ৭ম উইকেট (স্টেয়ার্স ৭ রাণ) দলের ৩৯৪ রাণে, ৮ম উইকেট (হল ৩ রাণ) দলের ৩৯৯ রাণের মাথায় পড়ে যায়। ৯ম উইকেটে ওরেলের সঙ্গে জুটি বাঁধেন এ্যালান। খেলা ভাঙ্গার সময়ে স্কেয়ার বোর্ডে বদলে থাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৪২৭ রাণ, ৮ উইকেটে—ওরেল ৬৪ এবং এ্যালান ৯ রাণ করে নট আউট থাকেন।

চতুর্থ দিনে দলের ৪৫৪ রাণের মাথায় ওরেল নিজস্ব ৭৭ রাণ করে উমরীগড়ের বলে, বোল্ড আউট হন। ওরেল ৩৫১ মিনিট খেলেছিলেন, বাউন্ডারী মেরেছিলেন মাত্র ৭টা। ৯ম উইকেটের জুটিতে ওরেল এবং ডেভিড এ্যালান মূল্যবান ৫৫ রান তুলে দেন। শেষ উইকেটে খেলতে নামেন ভ্যালেন্টাইন। ১০ম উইকেটের জুটিতে ২১ রাণ ওঠে, ভ্যালেন্টাইন ৪ রাণ করে আউট হন। ডেভিড এ্যালান ৪০ রাণ করে নট আউট থাকেন। এই দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭২ মিনিট খেলে পূর্ণ দিনের ৪২৭ রাণের (৮ উইকেটে) সঙ্গে ৪৮ রাণ ঝগা করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ৪৭৫ রাণে শেষ হয়, ১২ ঘণ্টা ২২ মিনিটের খেলায়। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২১৭ রাণে অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ২৩৬ রাণে অগ্রগামী হয়ে এক ইনিংস এবং ১৮ রাণে জয়ী হয়েছিল।

লাগের ৪০ মিনিট আগে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। দলের তখনও কোন রাণ উঠেনি, জয়সীমা আউট হলেন স্টেয়ার্সের বলে এল-বি-ডবলিউ হয়ে। সারদেশাইয়ের সঙ্গে খেলতে নামেন সূরিত।

সূরিত ১৩৫ মিনিট খেলে নিজস্ব ৩৬ রাণ করে দলের ৬০ রাণের মাথায় স্টেয়ার্সের বলেই এল-বি-ডবলিউ হয়ে আউট হন। তৃতীয় উইকেটে সারদেশাইয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন মঞ্জুরেকার। এইদিন আর কিছু অঘটন ঘটেই ন, রাণ দাঁড়ায় ১০৪, ২ উইকেটে। সারদেশাই ৪৭ এবং মঞ্জুরেকার ১৪ রান করে নটআউট থাকেন। ভারতবর্ষের এই ১০৪ রাণ তুলতে ৪ ঘণ্টার সামান্য বেশী সময় লাগে।

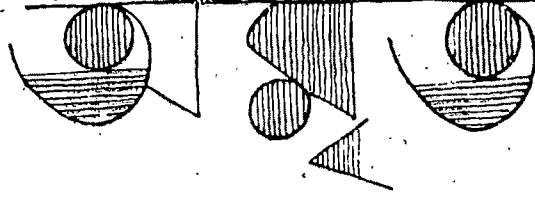
পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের লাগের সময় স্কেয়ার দাঁড়ায় ১৪৯ রাণ, ২ উইকেটে। সারদেশাই ৬০ এবং মঞ্জুরেকার ৪১ রাণ করে নটআউট ছিলেন। এই তৃতীয় উইকেটের জুটি ভাঙ্গার জন্যে ওরেল উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। আটজন বোলারকে দিয়ে বল দিয়েও লাগের আগে তৃতীয় উইকেটের জুটি ভাঙতে পারেননি।

খেলায় অপ্রত্যাশিত সাফল্যলাভের মধ্যে যথেষ্ট শিহরণ এবং আনন্দ আছে। ক্রিকেট খেলায় তার সম্ভাবনা অন্যান্য খেলার থেকে অনেক বেশী। আলোচ্য তৃতীয় টেস্ট খেলায় তার ব্যতিক্রম হয়নি। সমস্ত কিছু শিহরণ এবং অনিশ্চয়তা যেন তোলা ছিল। লাগের পরবর্তী খেলার জন্যে। লাগের পর তখন ২৫ মিনিট খেলা হয়েছে; অফ-স্পিনার লান্স গিবস বল করতে এলেন। এর আগে গিবস ৩৮ ওভার বল করে একটা উইকেটও পাননি, ২০টা মেডেন পেয়ে ৩২ রান দেন। সুতরাং তাঁর বলে খুব ভয়ের কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি যে আজ খেলতে আসবার সময় তাঁর বাম দিকে শেয়াল যাত্রা করে এসেছেন এ কেউ জানতেন না। বল করতে এসে গিবস ভারতীয় দলের মাথা খারাপ করে দিলেন। ১৩ ওভার বলে মাত্র এক রান দিয়ে গিবস ভারতীয় দলের ১৫৮ রানের মাথায় সারদেশাইকে, ১৫৯ রানের মাথায় মঞ্জুরেকার এবং পতোদির নবাবকে খেলা থেকে বিদায় করলেন। সারদেশাই ৩০২ মিনিট খেলে তাঁর ৫০ রান পূর্ণ করেন। মঞ্জুরেকার তাঁর ৫১ রান করতে ২৫৫ মিনিট সময় নেন। সারদেশাই এবং মঞ্জুরেকারের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ৯৮ রান উঠে ২৪৫ মিনিটের খেলায়। চা-পানের বিরতির ১৮ মিনিট আগে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ১৮৭ রানে শেষ হয়ে যায়। লাগের পর দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট স্থায়ী ছিল।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস লাগের পর ৫৫ মিনিটের খেলায় শেষ হয়েছিল। তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের জয়লাভের প্রধান কারণই হল গিবসের ব্যক্তিগত সাফল্য। গিবস ১৫০ ওভার বল দিয়ে ১৪টা মেডেন পান এবং মাত্র ৬ রান দিয়ে পর পর ৮টা উইকেট পান। গিবসের বলে ক্যাচ লুফেন সোবার্স ৩টে, ওরেল ২টা, হাট ১টা এবং উইকেট-কীপার এ্যালান ১টা ক্যাচ ধরেন এবং ইঞ্জিনিয়ারকে স্টম্পড-আউট করেন। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের বাকি ২টা উইকেট পান স্টেয়ার্স। প্রথম ইনিংসের খেলার গিবস মাত্র ১টা উইকেটে পেয়েছিলেন ২৫ রানে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে তিনটে টেস্ট খেলায় গিবস মোট উইকেট পেয়েছেন ১৭টা (১৫০.২ ওভার, ৬৬ মেডেন, রান ২২৬)। এ পর্যন্ত গিবস ১৪টা টেস্ট ম্যাচ খেলে উইকেট পেয়েছেন ৬১টা, ১৫৫৪ রানে।

লান্স গিবস তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামেন স্বদেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫৭-৫৮ সালে। ১৯৫৮-৫৯ সালের ভারত-পাকিস্তান সফরে গিবস পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩টে টেস্টে ৮টা উইকেট পান। ভারতবর্ষের বিপক্ষে গিবস মাত্র একটা টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন, কিন্তু কোন উইকেট পাননি। ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েই গিবস আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে রাতারাতি নাম করে ফেলেন। সিডনির তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসের খেলায় গিবস চারটে বলে ৩টে উইকেট পান এবং চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে হ্যাট-ট্রিক নিয়ে ৫টা উইকেট পান। এই সফরের টেস্ট খেলায় লান্স গিবস নিজ দলের পক্ষে বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ করেন (ওভার ১৯২.২, মেডেন ৬৫, রান ৩৯৫, উইকেট ১৯, এভারেজ ২০.৭৮)। এত দিন ভারতীয় দলের কাছে ওয়েসলি হল ছিলেন 'জুজু' এখন আবার লান্স গিবস।

কোন একজন খেলোয়াড়ের অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে তারই নামে সমস্ত টেস্ট খেলাটি অভিহিত করার রীতি অনেক দিন থেকেই ক্রিকেট মহলে সুপ্রচলিত আছে। সেই দিক থেকে বলবো ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সদ্য সমাপ্ত তৃতীয় টেস্ট খেলাটি 'ল্যান্স গিবসের খেলা'।



১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৯শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৩০শে চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 13th April, 1962
40Naya Paisa.

ইংরাজি অথবা বাংলা, শিক্ষার মাধ্যম কী হবে সে বিষয়ে 'অমৃত'র ৪৭ সংখ্যায় আমরা মন্তব্য করেছিলাম। আমরা স্বাধীন কণ্ঠে জানিয়েছিলাম, বাংলা-ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমরা এ সংশয়ও প্রকাশ করেছিলাম যে, হাওয়ার গতি বোধহয় অন্যদিকে।

হ'য়েছেও ঠিক তাই। অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষার সম্পক্ষে ভাষণ দেওয়ার পর অন্যতম অতিথি শ্রীযুক্ত বিজয়ালক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁর সমাবর্তন ভাষণে ইংরাজির অনুকূলে মত-প্রকাশ করেন, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসদুর্জিৎচন্দ্র লাহিড়ীও তাঁর বক্তৃতায় সেই প্রস্তাবেই সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তারপর থেকে ইংরাজি বনাম বাংলা বিতর্কটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যিক মহলেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু প্রায় সকলেই এত উচ্চকণ্ঠে নিজ-নিজ বক্তব্য প্রকাশের জন্যে ব্যস্ত যে, অন্যের বক্তব্য ধীরভাবে বিচার করে দেখা বোধহয় অনেকের পক্ষেই সম্ভব হ'য়ে উঠছে না। সেইজন্যেই আমরা স্বতীয়বার এই একই বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজনীয় মনে করছি।

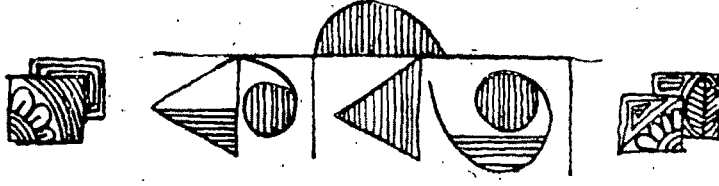
সমস্যাটা এ নয় যে, ইংরাজি রাখব কি বাংলা রাখব। আলোচ্য হল এই যে, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজিকে বজায় রাখা হবে, অথবা মাতৃভাষার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা মেনে নেব। এর সঙ্গে ইংরাজিকে বিদায় করার কোনো সম্পর্ক নেই। ভাষা হিসাবে আমরা অবশ্যই ইংরাজি শিখব। কারণ বর্তমান জগতের ভাবধারার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হলে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় ইংরাজিই যে সব থেকে কার্যকর মাধ্যম এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যারা ইংরাজির সম্পক্ষে, তাঁরা নিছক ইংরাজি-শিক্ষায় খুশি না হ'য়ে সমস্ত শিক্ষণ-ব্যবস্থাকেই ইংরাজির মূখ্যোপেক্ষী করে রাখতে চান, আপত্তি ওঠে সেইখানেই।

উপাচার্য শ্রীযুক্ত লাহিড়ী ইংরাজির সমর্থন করতে গিয়ে আরও একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন, যেটা ভারতের জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁর আশংকা, প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যেই যদি সেই অঙ্গুলের মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে জাতীয় সংহতি ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যাবে। এ যুক্তির সারবস্তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। এমন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিতে পারত, যদি ভাষা হিসাবেও ইংরাজির চর্চা বন্ধ হ'য়ে যেত। কিন্তু কেউই তো তেমন প্রস্তাব

উত্থাপন করেননি। ইংরাজি যেমন শেখানো হচ্ছে সেইভাবেই শিখিয়ে অন্যান্য বিষয়গুলির শিক্ষাদান মাতৃভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হলে অসুবিধাটা ঠিক কোথায় হবে তা বোঝা মুশ্কিল।

আসলে আমাদের চিন্তাসূত্রের মধ্যেই কোথায় যেন একটা জট পাকিয়ে উঠেছে। যারা স্বক্ষণশীল এবং কোনো রকম পরিবর্তনের নামেই যারা বিচলিত হ'য়ে ওঠেন, তাঁরা যতোই না কেন ইংরাজির মহিমা প্রচার করুন, অনেক উপকারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদেশী ভাষা যে আমাদের চিন্তাপণ্ডিতের প্রশ্রয় দিয়েছে তাও প্রায় দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। মেকলের বিষবৃক্ষ সত্যিই তার বিষময় ফল উপহার দিতে শুরুর করেছে। ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত হ'য়ে সমাজের এক স্তরের মানুষ এমন একটি নতুন কৌলীন্যের আঙ্গবাদ পেয়েছেন যা তাঁরা দেশের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে প্রস্তুত নন। সম্ভবত সেইজন্যেই এত 'গেল গেল' রব; কিন্তু রাজ্য সরকার যখন মাতৃভাষাকে রাজ-সম্মান দিয়ে বরণ ক'রে নিয়েছেন, তখন শিক্ষার বাহন হিসাবেও মাতৃভাষার দাবি বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

এই প্রসঙ্গে 'অমৃত'র বর্তমান সংখ্যার 'মতামত' বিভাগে যে চিঠিখানি প্রকাশিত হল, যুক্তিবস্তুর দিক দিয়ে তা বিশেষভাবেই প্রশংসনীয়। পত্র-লেখক আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় সু-উন্নত দেশ জাপানের দৃষ্টান্ত দিয়ে পর-ভাষা ইংরাজির শিক্ষা-মাধ্যম ছাড়াই কীভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলির সমকক্ষ হওয়া যায় তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। আমাদের দেশেও এককালে ইংরাজি শেখা, ইংরাজিতে চিন্তা করা এবং ইংরাজিতেই স্বপ্ন-দেখার যে দুরূহ তপস্চর্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীবৃন্দ আত্মনিয়োগ করেছিলেন, অজস্র বিদেশী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং ইংরাজিতে কবিত্যুতি লাভের প্রয়াসী শ্রীমধুসূদনের মর্মান্তিক বিলাপোক্তিই তাঁদের পরম ব্যর্থতার স্মারক হ'য়ে আছে। দুরূহের বিষয়, প্রায় জীবনব্যাপী সংগ্রামের পর যে স্বপ্নভঙ্গের ফলে উক্ত মহাকাব্য মাতৃভাষারূপ খনির সন্ধান পেয়ে প্রায় ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান হ'য়ে উঠেছিলেন, সে সাধনার ফলশ্রুতিতে আমরা উত্তরাধিকারী হ'তে পারিনি। তাই, পোষমানা পাখির মতো বাহিরের বন্ধন ঘুচে গেলেও আমরা ঘুরে-ফিরে সেই পুরনো খাঁচাতেই ফিরে যেতে চাই। একে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কী বলা যায়!



কানামাছি—আন্তর্জাতিক

হরপ্রসাদ মিত্র

হাওয়ায় সন্ধ্যার গন্ধ—এখানটা বৃহৎ বন্দর,
জাহাজে আলোর মালা, নিচে জল। রাতের জেটিতে
আমাকে আসতেই হয়। দেখতে হয়। ধরি একে তাকে।
চলছে সোনার ব্যাবসা। এ খেলাটা আন্তর্জাতিক।
আমি এ বৃহৎ বস্ত্রে—কানামাছি—সামান্য চেতনা—
ভগ্নুর জীবিকা মাত্র,—তাই ঘুরি,—ঈশ্বর জানেন।
কেউ ধরা পড়ে, কেউ সৌম্য মূখে বিপদ এড়িয়ে
আবার সমুদ্রে ভেসে চলে যায় নতুন হাওয়াতে॥

সোনায় দেদীপ্যমান পৃথিবীর বিশাল বাজারে
দিন যায়, রাতি হয়,—রাত বাড়ে,—আমি সেই রাতে
একটি গভীর কী যে খুঁজে খুঁজে পেয়েছি রাতিকে—
তখনো চলছে খেলা সোনার গোলক ছোঁড়াছড়ি
কোনো সূর্যকরোজ্জ্বল ভিন্ন দেশে, অন্যান্য বন্দরে।
এখানে বিরতি মাত্র,—
—রমণী,—বিস্মৃতি।

এ কানামাছির মনে এ-লক্ষ্যও আন্তর্জাতিক।

প্রতিবেশী

মঞ্জুলিকা দাশ

শহরের পাশে যেন গ্রাম থাকে
শাণিত বৃদ্ধির পাশে হৃদয় যেমন!
সারাদিনমান থাকুক, খাটুক
ওরা নাগরিক হয়ে, তার পরে বিশ্রামের শান্তি পাক
গ্রামে এসে ফিরে, রাতিতে ঘুমাক!
বসুক নদীর ধারে এক ছুটি রবিবারে শেষে!

শহরের পাশে যেন গ্রাম থাকে
শাণিত বৃদ্ধির পাশে হৃদয় যেমন!
পরিচয় হোক বিনিময়ে শহরে ও গ্রামে।
একটি জানালা যেন খোলা থাকে,
অনেক দুয়ার!

পাথকেরা পথ দিয়ে চলে যায়,
মানুষেরা দোর দিয়ে আসে!

ঘুম ভেঙে উঠে হাটপথে ট্রেন ধরে
অফিসে পৌঁছলে পরে মনে হয় যেন,
শহরের লোকগুলো কুগ্রিম, কুপণ বড়ো
এ শহর ভারী বাস্তু, অস্থির অস্থির!
আহা শহরের পাশে যেন গ্রাম থাকে
শাণিত বৃদ্ধির পাশে হৃদয় যেমন!



হাল ধরে বসে আছি

করুণাসিন্ধু দে

হাল ধরে বসে আছি। দুই চক্ষু অপলক চাওয়া
ধোঁয়াটে বতুল রেখা দূরপথে, চেনা অচেনার
রঙ করে; গোখলির তন্ময়তা গাঢ়-হিম-ছাওয়া,
সর্বস্ব অবশ করা বধির শ্রবণে বিবন্ধ কার
পদধ্বনি, শব্দময় বৃকের ছলিত তাড়নায়
ছুটে আসে প্রতিশ্রুতিময় ঢেউয়ে; এ-পাড়, ও-পাড়
রোমাঞ্চিত রঙ তুলে তোলপাড় কম্পিত নৌকায়
অনড় নোঙর খুলে; মজ্জা খুলে খেয়া-পারাপার।

কে আসে চপল ছন্দে এলোকেশী উদ্রান্ত বাতাসে
অনাক্ষরী ছন্দবেশে অলঙ্ক নয়নাভিরাম
চরণ, বাদামে রেখে, হিরন্ময় স্পর্শের নির্বাসে
ফোটার আলোর ফুল কোঁতুলে। আমি তার নাম,
বংশ, পরিচয় ভুলে বাই নিতে পারানির কড়ি;
বাড়ি আসি শূন্য হাতে, শূন্য বৃকে, শূন্য কিষে ধরি!

দ্বন্দ্ব

জৈমিনি

সম্প্রতি কলকাতা করপোরেশনের এক সভায় বিরোধী দলের কয়েকজন পৌরপিতা শহরের জঞ্জাল পারিষ্কার, পয়ঃপ্রণালী পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে রীতিশ্রদ্ধ হ'য়ে করপোরেশনের কার্য-নির্বাহের ভার মিলিটারীর হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। এ প্রস্তাব গৃহীত হয়নি, এবং তা ভালোই হয়েছে। কিন্তু যে-মনোভাব থেকে মিলিটারী ডাকার ইচ্ছা জাগে, সেবড় সাধারণ নয়। জৈমিনিও তাই তার অনতি-সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিচার করে দেখতে উৎসুক হ'য়ে উঠেছে।

একথা অবশ্যই ঠিক, বছরের পর বছর ধরে করপোরেশনে যে অবস্থা চলছে তাকে কোনো বিচারেই আদর্শ বলা চলে না। অকর্মণ্যতার ফিরিস্তি এতোই সুপরিচিত যে সে বিষয়ে পুনরুজ্জ্বেল নিষ্প্রয়োজন। এবং সত্যি বলতে কি, এমন একটা দঃসহ অবস্থা বেশীদিন চললে শত্রু মিলিটারী কেন, দমকল বা ভুতের রোজাও ডাকতে চাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, সময়টা এখন বড়ই খারাপ, নিজেদের অসহায়তা প্রকাশের সময়ও এখন ভেবেচিন্তে কথা বলা উচিত। নয়তো একটা 'হিতে বিপরীত' ঘটে যাওয়া আশ্চর্য নয়।

পৃথিবীর মানচিত্রটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। মিলিটারীর আজ কী দৌদন্দ প্রতাপ। এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রতিদিনই খবরের কাগজের হেডলাইন অধিকার করে বসছে। দিকে দিকে আজ কেবল গোপন ষড়যন্ত্র, বোয়ানেটের ঝলকানি এবং দ্রুত পট-পরিবর্তন। প্রতিদিনই নতুন নতুন বিস্ময়—গোয়েন্দা সিরিজের গল্পের চেয়েও যা রোমাঞ্চকর এবং রোমহর্ষক।

বিশেষ করে এশিয়ার যে অংশে ভারতবর্ষ অবস্থিত তার কথা ভাবুন। পাকিস্তানের মিলিটারী শাসন তো পুরনো ঘটনা, নেপালের সরকার-চ্যুতি এবং ব্রহ্মদেশের সামরিক অভ্যুত্থানও বাস-খবর হ'য়ে এসেছে। তাছাড়া উত্তরে রয়েছে চীনের সামরিক ছাউনি এবং দক্ষিণে লঙ্কাকাণ্ডের গোপন প্রশ্রয়দাতা হিসাবে গভর্ণর জেনারেলের পদচ্যুতি। এরই মাঝখানে, তরুণ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত একটি দ্বীপের মতো ভারতবর্ষ। গণতন্ত্রের সাধনা চলছে এদেশে; ব্যক্তিস্বাধীনতার অগ্নিপরীক্ষা।

নাভানা'র বই

ক বি তা

ঘরে-ফেরার দিন ॥ আমিয় চক্রবর্তী	৩.৫০
বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা ॥ বুদ্ধদেব বসু	৮.০০
পালা-বদল ॥ আমিয় চক্রবর্তী	৩.০০
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫.০০
বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫.০০
কংকানবতী ॥ বুদ্ধদেব বসু	৩.০০
শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর ॥ বুদ্ধদেব বসু	৩.০০

প্র ব ন্ধ

সব-পেয়েছিঁর দেশে ॥ বুদ্ধদেব বসু	২.৫০
আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী	৭.৫০
রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়	৩.০০
পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪.০০
রক্তের অক্ষরে ॥ কমলা দাশগুপ্ত	৩.৫০

উ প ন্যাস ও গ ল্প

প্রথম কদম ফুল (উপন্যাস) ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১২.০০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প	৫.০০
এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩.০০
সমুদ্র-হৃদয় (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪.০০
গড় শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার	৮.০০
ফরিয়াদ (উপন্যাস) ॥ দীপক চৌধুরী	৪.০০
চিররূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ	৩.০০
মেঘের পরে মেঘ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩.৭৫
বসন্তপঞ্চম ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২.৫০
তিন তরুণ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪.০০
মীরার দুপার (উপন্যাস) ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৩.০০
চার দৈয়াল (উপন্যাস) ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ	৩.০০
বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩.৫০
বন্ধুপত্নী ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২.৫০
ঘনের ময়ূর (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩.০০

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

হঠাৎ এর মধ্যে মিলিটারীর নাম শুনলে চমকে উঠতে হয় তাতে সন্দেহ নেই।

আমি জানি, ভারতের মতো বিশাল দেশ, যেখানে দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্য আছে, সেখানে প্রতিবেশী অনগ্রসর দেশগুলির মতো স্বাভাবিক মিলিটারী শাসন কার্যে মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মিলিটারী আসার মতো প্রাথমিক শর্ত, অর্থাৎ নিজের চিন্তাপাণ্ডিত্য এবং অসহায়তা-বোধ, তা যে এখানে একেবারেই নেই তাই বা বাল্য কী করে! ইংরেজিতে একটা কথা আছে, কিশোর যাকে বন্দি করতে চান প্রথমে তার বিশ্বাসঘাতকতা ঘটান। সেই বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে যেন দেখতে পেলাম পৌর-পতাদের সৈনিকের প্রস্তাবে। এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত।

এবং অব্যাহত হওয়া উচিত, মিলিটারী শাসনের প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের কতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে।

মনে করা যাক, একজন ভদ্রলোকের যম হরিবাবু। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, স্কুল-বাইনাল পরীক্ষার্থী এক ছেলে এবং ছয় ভিনেবের একটি মেয়ে। হরিবাবু বজায় মিলিটারী-ভক্ত এবং তাঁর এই ভক্তি ক্রমে বাড়ির অন্য সকলেও নবীচরণে মেনে নিয়েছে। এখন দেখা যাক, ন্যায়শাস্ত্রের বিধান অনুসারে তাদের আচার-আচরণ কোনপথে পরিণত হতে পারে।

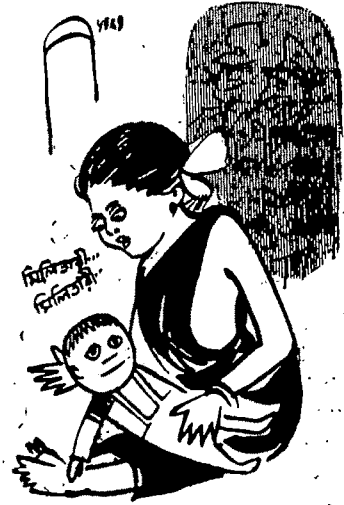
হরিবাবু আপসে চাকরি করেন। এতোক চাকরিজীবীর মতো তিনিও

আপিসের নানা ঝগাটে মোটেই প্রসন্ন নন। এতদিন এসব চিন্তাচঞ্চল্য ঘটলে গিল্লির কাছে মনোবেদনা জ্ঞাপন করে, কিংবা তাঁর অসহযোগিতা থাকলে নানা ছদ্মভাষা ঝগড়া করে এবং গোপনে ইন্সপেক্টরকে 'দুষ্কের দমন, শিষ্টের পালন' ইত্যাদি আনন্দমত-পড়া ন্যায়-পরায়ণতার বিষয়ে সজাগ হ'তে অনুরোধ জানিয়েই তিনি কথামুখে শান্তিলাভ করতেন। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর মানস জগতে সহসা মিলিটারীর অভ্যুদয় ঘটায় সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। তিনি চোখ বুজলেই আজকাল মিলিটারী দেখতে পান এবং তাঁর আপসে বড়কর্তার আসনে একজন থাকার কোর্তা-পরা সামরিক অফিসার বসে আছেন ভেবে উল্লসিত হন। তাঁর ধারণা, পুরাণে যে কবিক অবতারের কথা আছে, তিনি আসলে একজন মিলিটারী অফিসার ছাড়া আর কিছুই নন। কিন্তু মিলিটারী যদি সত্যি আসে তবে যে-চাকরিটা তিনি করছেন তা করতে পারবেন কিনা এসব স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনা তাঁর কাছে অবান্তর। নিজের নাকের যে দশাই ঘটুক, পরের যাত্রা-ভোগ হবে এই আনন্দেই তিনি আত্মহারা।

হরিবাবুর স্ত্রীও কম যান না। তিনিও তো স্বামীর আদর্শই মানুষ! সংসারে নানারকম অশান্তি ক্রমিক ব্যামোর মতো আর দশজন মহিলার যেমন গা-সওয়া হ'য়ে যায়, তাঁরও এতদিন তেমনিই ছিল। ইতিমধ্যে মিলিটারীর আবির্ভাব ঘটায় পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করল। আজকাল তিনি সুবেশা, সালংকারা প্রতিবেশিনী দেখলেই মনে মনে মিলিটারীর হস্তক্ষেপের জন্য ব্যাকুলতা বোধ করেন। তাঁর ধারণা, মিলিটারীর তাঁর এতোদিনের ত্যাগস্বীকারের মাইমা বুঝবে এবং ধর্মরাজ-নিযুক্ত ভলা-টিয়ারের মতো কলকাতা শহরের যাবতীয় ঈর্ষাযোগ্য শাড়ী এবং নতুন প্যাটার্নের গহনা সংগ্রহ করে তাঁর চরণে উৎসর্গ করে দেবে।

হরিবাবুর ছেলে পরীক্ষার হলে বসে প্রশ্নকর্তার হৃদয়হীনতা, ইন-ভিজিলেন্সের দৃষ্টিভঙ্গির প্রথরতা এবং ভবিষ্যৎ পরীক্ষকদের অনুদার-চিন্তার বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে সমস্ত পরীক্ষা গ্রহণ ব্যাপারটাই মিলিটারীর হাতে চলে যাওয়ার জন্যে প্রার্থনা জানায়। তার বিশ্বাস, সে সময়ে খাতায়-কলমে

এই শ্রেয়ত্ব সময়ে তাকে নাজেহাল হ'তে হবে না, এবং স্রেফ কতকগুলি পাক-প্রচলিত রসিকতা এবং চলতি সিনেমার দৃষ্টি কল মনমাতানো গান শুনিয়েই সে মিলিটারীর হাতে সোনার মেডেল পাবে।



সবশেষে হরিবাবুর ছোট মেয়েটি। কিন্তু খুকুমণির বয়স কম হলেও বুদ্ধি কম নয়। বিশেষ করে এমন একটি জিনিষাসের পরিবারে তার জন্ম যে কিছু না শিখেই তার পক্ষে অনেক কিছু শিখে ফেলা সম্ভব। কাজেই একদিন দুপুরে তার মা যখন একখানি উপাদেয় উপন্যাস হাতে করে দিবানিদ্রার সাধনায় মগ্ন, তখন খুকুমণিও তার খেলার পুতুলটি কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে শুরু করল। ভোরপর, যেহেতু খুকুমণি নিজে ঘুমোতে দেবী করে, অতএব পুতুলও ঘুমোতে চাইল না। তখন তীতি-বিরক্ত হ'য়ে খুকুমণি ডেকে উঠল—জুজু নম, হাল্দিম বুড়ো নয়, ডাকল—'মিলিটারী, ও মিলিটারী, একবার আস তো!'

ঘটনাবলি কাল্পনিক, কিন্তু সত্যের ছিঁটেফোঁটা এতে নেই এমন নয়। বিশেষ করে পৌরপিতাদের এই আবেগ-কম্পিত প্রার্থনার কথা মনে রাখলে ব্যাপারটাকে দুবার করে ভাবতেই হয়। কিন্তু মিলিটারী যে সর্বরোগহর দাওয়াই নয়, পশ্চিমবঙ্গের বড়ারের ওপরের অমানুষিক ঘটনাবলীই তো তার যথেষ্ট প্রমাণ! আরো তাজা প্রমাণ কি গায়ের চামড়া দিয়ে অনুভব করতে হবে?

॥ ১লা বৈশাখ বেরুচ্ছে ॥

বৈদ্যনাথ মথোপাধ্যায়ের
সরস গল্পগুচ্ছ

ভুজুরোল

দাম ২.০০

৥ দ্রুত ছাপা হচ্ছে ॥

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক
মূল্য তথা মণ্ড-সম্ভাবনার
দিকে লক্ষ্য রেখে সযত্নে
নির্বাচিত সাতটি নাটকের
অভিনব সংকলনঃ বুড়ো

প্রথম খণ্ড. শালিকের ঘাড়ের রোঁ,
দাম ৮.০০

দ্বিতীয় একাদশী, অলীক-
খাব, আলিবাবা, কপণেশ
খন, যামসো কি. ভায়সা
ও পুনর্জন্ম।



১৫৯এ, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট—কলিকতা-১২

প্রাচীন ভারতে মনের চিকিৎসার ধারা— তন্ত্রশাস্ত্রের মেন—

সীতা বলছি ভাই, আমার মনটা বড়ো খারাপ লাগছে, অথচ আমি তো এর কোনো কারণই খুঁজে পাচ্ছিনে।— বলেছিলেন আন্তনিনও।

আন্তনিনওর এই কথাগুলো দিয়েই সেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকটির আরম্ভ হয়েছে। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, আন্তনিনওর মনে ভাবী দুর্ঘটনার ছায়াপাত হয়েছিল। মনোবিদ বলবেন, তাঁর বিষাদের কারণ অনাগত ঘটনার ভেতরে নেই, এর কারণ লোকোনে রয়েছে তাঁর মনের গহনে, অচেতন স্তরে। আন্তনিনওর মতো আমরাও অনেক সময়ে বলে থাকি, 'কিছুই ভালো লাগে না', অথচ তার কোনো সুস্পষ্ট কারণ অনেক সময়ে নির্দেশ করতে পারিনে। তবে একথা বুঝি যে, এই ভালো-না-লাগাটা মনের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। এটাকে একটা সাময়িক রোগ বলতেও কারো আপত্তির কোনো কারণ নেই। শব্দ বিষাদ নয়, আমাদের মনে যখন অবসাদ বা নৈরাশ্য জাগে, অথবা মনটা যখন রিপূর তাড়নায় চণ্ডল হয়, তখনও কিন্তু আমরা মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যখন অপরিমিত বা লোভ যখন দুর্দমনীয় হয়, অপরের সৌভাগ্য দেখে যখন আমরা ঈর্ষায় জ্বলে মরি, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় যখন আমাদের 'হিতাহিতবুদ্ধি' লেপ পায়, তখনও নিঃসংশয়ে আমাদের মনের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। অবশ্য, এই সব ক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসকের আগ্রহ নিতে হয় না। যারা একটু আত্ম-বিশ্লেষণ করতে পারেন, তাঁরা নিজেদের দোষত্রুটি সম্পর্কে কখনো উদাসীন থাকতে পারেন না। কাজেই এ সব স্থলে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের শৃঙ্খলে নিতে পারেন। কিন্তু এমন অনেক প্লামুরোগও আছে, যেখানে রোগী নিজের ওপরে প্রভূত হারিয়ে ফেলেন। কাজেই সেখানে চিকিৎসক না ডেকে উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু আমাদের লোভ, গর্ব, ঈর্ষা

প্রভৃতির মূলে থাকে সুশিক্ষার অভাব বা কুশিক্ষার প্রভাব। আমরা অনেকে সামান্য কারণে রেগে যাই, অল্প কারণে ধৈর্য হারাই, এক জায়গায় অপমান হজম করে আর এক জায়গায় তার প্রতিশোধ নিই, এ সবও নিশ্চয়ই সুস্থ মনের লক্ষণ নয়। সুস্থভাবে বিচর করলে এ-কথা বলতেই হয় যে আমরা সবাই কম বেশি মনের রোগে ভুগি। মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড বলেছেন, 'The healthy man is virtually a neurotic' তবে যতক্ষণ আমরা পরিবেশের সপক্ষে নিজেদের মানিয়ে চলতে পারি, ততক্ষণ সমাজের চোখে আমরা সুস্থমনা বা নর্মাল। সুতরাং মনের দিক দিয়ে সুস্থ বা অসুস্থের পার্থক্য শব্দ মাত্রাগত বা পরিমাণগত, প্রকারগত নয়।

একালে পাশ্চাত্য দেশে মনস্তত্ত্ব নানা শাখায় বিভক্ত হয়েছে, তার ভেতর

একটি হচ্ছে অ-প্রকৃতিস্থ মানবের মনস্তত্ত্ব বা Abnormal Psychology। যারা উন্মাদ তারা তো সমাজের একটা সমস্যা বটেই, যারা নানা প্লামুরোগে ভুগে অথবা একটা বিষাদের ছায়া বাদের মনকে বিশেষভাবে অচ্ছন্ন করেছে, তাদের অবস্থাটাও কম গুরুত্ব নয়। আর সব চেয়ে ভাববান কথা হচ্ছে এই যে, মানুষ যতই উন্নত হচ্ছে, তার সভ্যতা যতই বেড়ে চলেছে, মনের ব্যাধিও ততই প্রসার লাভ করেছে। পাশ্চাত্য দেশে মনের রোগ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, ভবিষ্যতেও এবিষয়ে অনেক আলোকসম্পাত করবেন, কিন্তু প্রাচীন ভারতেও যে মনের প্রকৃতি ও বিকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল, তার নজীর রয়েছে যোগশাস্ত্রে, আয়ুর্বেদে ও নানা তন্ত্রশাস্ত্রে। বিষয়টিকে পুরাকালের পণ্ডিতেরা দুর্দিক থেকে আলোচনা করেছেন, প্রথমত, কেমন করে মনকে সুস্থ রাখা যায়, তার নির্দেশ দেওয়া, স্থিতিবীর্য। কেমন করে মানুষকে মনের রোগ থেকে মুক্ত করা যায়, তার উপায় প্রদর্শন করা।

মহর্ষি চরকই বোধ হয় সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ভাষায় এই কথাটি যোষণা করেছিলেন যে রোগ শব্দ দেহেরই নয়,

তারশঙ্করের মহৎ ও বৃহৎ নতুন উপন্যাস

প্রকাশ আসন্ন

কাল্পনা

৫-৫০ নং পঃ

দ্বিতীয় মূদ্রণ বেরিয়েছে

দ্বিতীয় মূদ্রণ বেরিয়েছে

মুখের ভাষা

সমাজ সমীক্ষা :

বুকের রূপের

অপরাধ ও অনাচার

অমিতাভ চৌধুরী ॥ ৩-৫০ ॥

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ ৭-০০ ॥

ছদ্মসের ভিতর প্রকাশিত আমাদের উপন্যাসগুলি :

তিন কাহিনী

ফকড়তন্ত্রম ১ম ২য়-৩য় পর্ব

বনফুল ॥ ৫-৫০ ॥

অবধূত ॥ ২-৭৫/৩-৭৫ ॥

তিন প্রহর

রূপং দেহি ধনং দেহি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৩-২৫ ॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৩-২৫ ॥

রাজকন্যার স্বয়ম্বর

শব্দরী

মনোজ বসু ॥ ৩-৭৫ ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ ৫-৫০ ॥

কলিকাতা

৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

মনেরও রোগ হয়ে থাকে। সংসারে সুস্থ মানুষের সংখ্যা খুবই কম, আমরা প্রায় সবাই ব্যাধিগ্রস্ত। মনের দিক দিয়েও এ কথা সত্য। আমাদের জালাস, উদ্বেগ, দৃশ্চিন্তা, মোহ, ভয়, অবসাদ, নৈরাশ্য এগুলো কি মনের ব্যাধি নয়? আবার কাম, ক্রোধ, গর্ব, ঈর্ষা, উদ্ভাৎসব, এগুলোও তো মনেরই বিকার। এই সব বিকারের উৎস কোথায়? মহামতি চরক বলেন—রজেগুণ আর তমোগুণ। ধন, মান, যশ বা ক্ষমতালভের জন্যে দুর্দমনীয় আকাংক্ষার মূলে রয়েছে রজেগুণ, আবার আলাস্য, জড়তা, অবসাদ ও নৈরাশ্যের মূলে আছে তমোগুণ। মহামতি চরক অন্যত্র বলেছেন, মানুষ তার মনের ব্যাধির জন্যে নিজেই দারী। মনের ব্যাধির একটা কারণ হচ্ছে প্রজ্ঞাপরাধ বা জ্ঞানপূর্বক পাপকর্ম করা, পাপাচিন্তা করা বা পাপবাক্য বলা। আবার নিজেই অনেক ক্ষেত্রে মানসিক রোগের চিকিৎসা করা যায়। সে চিকিৎসা কি? একালে অনেকেই হয়তো শুনেলে চমকে উঠবেন। আর্থ বা মনের রোগ থেকে মুক্তি পাবার উপায় হচ্ছে পাঁচটি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য, স্মৃতি ও সমাধি। জ্ঞান মানে শাস্ত্রজ্ঞান, বিজ্ঞান মানে আধ্যাত্মজ্ঞান, স্মৃতি মানে নিজের স্বরূপ চিন্তন, সমাধি মানে চিত্তের একাগ্রতা।

মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড বলেন, আমাদের যে সব বাসনা সমাজের চোখে নিষিদ্ধ বা ঘৃণিত, আমরা সেগুলোকে দমন করতে চেষ্টা করি, কিন্তু সেগুলো মরে না, সেগুলো মনের অচেতন স্তরে গিয়ে আশ্রয় লয়। আবার স্বপ্নের ভেতর এই সব বাসনাই চরিতার্থ হয় কিন্তু প্রায়ই তারা ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়, কাজেই আমরা তাদের চিনতে পারি না। এই দমিত বাসনাই হচ্ছে আমাদের স্নায়ুরোগের কারণ। হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগের মূলেও থাকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। এ দেশের পাভজল দর্শনও কিন্তু মনের এই অচেতন স্তরের কথা স্বীকৃত হয়েছে। পতঞ্জলি বলেন, আমাদের অগণিত বাসনা সংস্কারে পরিণত হয়, আর এই সংস্কারই আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। যা কিছু মনের বাইরে চলে যায়, তাই যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এ কথা সত্য নয়। আমাদের বাসনাগুলো সংস্কাররূপে মনের অচেতন স্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকে। সুতরাং মনের জন্মবিদ বা অচেতন স্তরের কথা

মনস্ববী ফ্রয়েডের বহু পূর্বে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন। অবশ্য, মানসিক রোগীদের মনঃসমীক্ষণ করতে গিয়েই ফ্রয়েড তাদের মনের নিজ্ঞান স্তরের সম্বন্ধ পেয়েছেন। অর পতঞ্জলি মনকে কেমন করে একটি লক্ষ্যের দিকে স্থির করা যায় তার উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে মানুষের প্রবৃত্তির উৎস সম্বন্ধ করেছেন। তাঁর মতে আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে জন্ম-জন্ম-জন্ম স্তরের সংস্কার, তবে মানুষ জীব-চেষ্টার দ্বারা সংস্কারের বীজকে দূষ করতে পারে।

মনের রোগীদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করেও ফ্রয়েড তাদের অচেতন মনের গোপন বাসনার সম্বন্ধ পেয়েছেন। তিনি বলেছেন 'Dreams are the via regia to the unconscious' ফ্রয়েডের এই স্বপ্ন-তত্ত্ব যে ভারতে অজানা ছিল না, এ কথা সহজেই প্রমাণ করা যায়। ভারতের ঋষি বলেছেন, আমরা যখন জেগে থাকি, তখন আমাদের জাগ্রদাবস্থা, যখন ঘুমন্ত অবস্থায় বাসনার প্রভাবে কল্পিত দৃশ্যাদি দেখি, তখন আমাদের স্বপ্নাবস্থা, আর যখন আমরা অঘোর ঘুমিয়ে পড়ি, তখন সুষুপ্তির অবস্থা। বোগীদের অবশ্য এ ছাড়া আর একটা চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থা আছে, সেটা হচ্ছে সমাধির অবস্থা। স্বপ্ন হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীরের ব্যাপার, আর এই সূক্ষ্ম শরীর হচ্ছে বাসনাময়। স্বপ্ন সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে আরও অনেক আলোচনা আছে উপনিষদ ও দর্শনসমূহে। কোন্ রোগের সঙ্গে কোন্ স্বপ্নের কি সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে আর্যবেদে। সে আলোচনা কতটা বিজ্ঞানসম্মত, বলতে পারিনে।

শোনা যায়, কেউ কেউ স্বপ্নে ভাবী বা অনাগত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে থাকেন। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্ব এর কোনো কারণই নির্দেশ করতে পারেনি। তাই আমাদের বলতে হয় 'There are more things in Heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your Philosophy' অবশ্য, স্বপ্নে কেন সময়ে সময়ে ভাবী ঘটনার ছায়াপাত হয় অথবা দূরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়, তার একটা ব্যাখ্যা ভারতীয় দর্শনে রয়েছে। স্বপ্নাবস্থায়ও কচিৎ কখনও মনের সত্ত্বগুণ প্রবল হতে পারে, আর সত্ত্বগুণের ধর্মই হচ্ছে বস্তুকে

প্রকাশ করা। তাই স্বপ্নেও মানুষ কখনো কখনো দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করতে পারে। মানুষ তখন দূরের ঘটনা বা ভাবী কালের ব্যাপার দেখতে পায়। তবে স্বপ্ন দেখার সময় প্রায়ই রজোগুণ বা তমোগুণ প্রবল থাকে। তাই স্বপ্নদর্শনের কালে যে প্রত্যয় জন্মে, উহা প্রায়ই মনের ভ্রান্তি-মাত্র। (Illusion বা Hallucination) মানসিক উত্তেজনা বা চাঞ্চল্যই অনেক সময়ে এরূপ ভ্রান্তির কারণ। আর এই উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য তো মনেরই বিকার। মনের স্বাস্থ্যের অধিকারী বলবো তাঁকে, যিনি কিছুতেই নিজের স্নায়ু-মণ্ডলীকে চঞ্চল বা উত্তেজিত হতে দেন না।

আমাদের চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ হচ্ছে দু'টি—রাগ (অনুরাগ) আর শ্বেষ। এই রাগ আর শ্বেষকে যিনি যে পরিমাণে জয় করতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ মনের দিক দিয়ে সেই পরিমাণে সুস্থ।

অবশ্য, কামারিপন্থকে জয় করাই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। ব্যাপক দৃষ্টিতে 'কাম' কথাটার অর্থ কামনা আর সংকীর্ণ দৃষ্টিতে কাম মানে ইন্দ্রিয়বিশেষের সম্ভোগের আকাংক্ষা। ফ্রয়েড বলেন—এই কামারিপন্থকে দমন করাই কল্যাণের পন্থা নয়, শ্রেয়ের পথ হচ্ছে কামকে উদ্ভূত করাই, শিল্পসাধনা, সাহিত্য-চর্চা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রভৃতি খাতের ভেতর দিয়ে কামকে প্রবাহিত করা, একেই বলে কামের উদ্ভাস বা Sublimation।

কিন্তু কেমন করে কামনার রোড় ফিরিয়ে দিতে হয়, সে সম্পর্কে প্রাচীন মনীষীদের ধারণার কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। বোগীরা অবশ্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের পথই অবলম্বন করে থাকেন। তাঁদের মতে ইন্দ্রিয় বা মনকে জয় করার প্রধান উপায় 'প্রতিপক্ষ-ভাবনা' বা অভ্যস্ত চিন্তার বিপরীত কোন চিন্তাকে আশ্রয় করা। তুমি বার দোষ দর্শন কর, তার গুণের কথা চিন্তা কর, যাকে তুমি ঈর্ষা কর, তাকে ভালোবাসতে শেখ, তার প্রতি মৈত্রীভাবনা অভ্যাস কর, আবার যে দেহটাকে নিত্য বলে মনে করছো, তার অনিত্যতার কথা চিন্তা কর, যে দেহটা পরম রমণীয় বলে মনে কর, তার বীভৎসতা ও কদর্যতার কথা স্মরণ কর;—এরই নাম প্রতিপক্ষ-ভাবনা। কিন্তু

এ পথ সবার জন্যে নয়। এ পথ অবলম্বন করলে হিতে বিপরীতও হতে পারে।

ইন্দ্রিয়জয়ের দ্বিতীয় পথ হচ্ছে সংযম বা মিতাচারের পথ। সকল বিষয়ে আতিশয়া বর্জন করে চলাটাই কল্যাণের পথ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ভেতর, ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে। এই সামঞ্জস্যের কথা আছে ধর্মশাস্ত্রে, অর্থশাস্ত্রে, কামশাস্ত্রে। শাক্যমুনিও ‘মধ্যপন্থার’ কথাই বলেছেন। আমাদের দেশে একটি চমৎকার প্রবচন আছে :

‘অতি উঁচু হয়োনা, ঝড়ে ভেঙে নেবে, অতি নীচু হয়োনা ছাগলে মূড়ে খাবে।’

মহামতি চরক বলেছেন, ‘ব্যায়াম করা, হাস্য করা, কথা বলা, কামের সেবা করা, রাগি জাগরণ করা, এগুলো উচিত হলেও বৃদ্ধমান ব্যক্তি এ সব বিষয়ে মাত্রা লঙ্ঘন করবেন না’।

মহর্ষি চরক সকল বিষয়েই মাত্রা রক্ষা করে চলার ও মনকে সকল বিষয়ে নিরুদ্বেগ রাখার উপদেশ দিয়েছেন। মনের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে চাই পরিমিতবোধ। যিনি মিতাহারী, মিতাচারী, মিতভাষী, যিনি সহজে নিজের স্নায়ুমণ্ডলীকে চঞ্চল বা উত্তেজিত হতে দেন না, তাঁকেই মনের দিক দিয়ে সুস্থ মানুস বলা যায়।

আমরা মনকে উদ্ভূত রাখার কথা বলেছি। কিন্তু শৃঙ্খল শিল্প-সাধনার ভেতর দিয়ে কামের সম্পূর্ণ উৎগতি হতে পারে না। শিল্পী যতই শিল্প-সাধনার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করুন না কেন, তাঁর মন মাঝে মাঝে জৈব স্তরে নেমে আসবেই। কারণ কোন সাধনার বলে জীব শিবে পরিণত হতে পারেন, তাতো তাঁর জানা নেই। একমাত্র ধর্ম-সাধনার ভেতর দিয়েই মানুষ তার কামকে উদ্ভূত রাখতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রে যাকে কুণ্ডলিনী-জাগরণ বলা হয়, তারও মূল কথা কামের উদ্ভূতায়ন, sublimation of the libido। সাধকের জীবনে কেমন্ করে এই উদ্ভূতায়ন ঘটে, সে আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধ নয়। সংক্ষেপে বলে রাখি, ভাস্কর সাধকের ভূতশাস্ত্র, আসনশাস্ত্র, প্রাণায়াম প্রভৃতি সব কিছুই একই লক্ষ্য। তারপর পূজার সময়ে সাধকের চিন্তা করতে হয় যে, আমি আমার ইন্দ্ৰদেবতার সঙ্গে অভিন্ন’ দেবো ভূত্বা দেবং যজ্ঞে’। এই রকম চিন্তনের দ্বারা সাধকের দেহ ও মনের

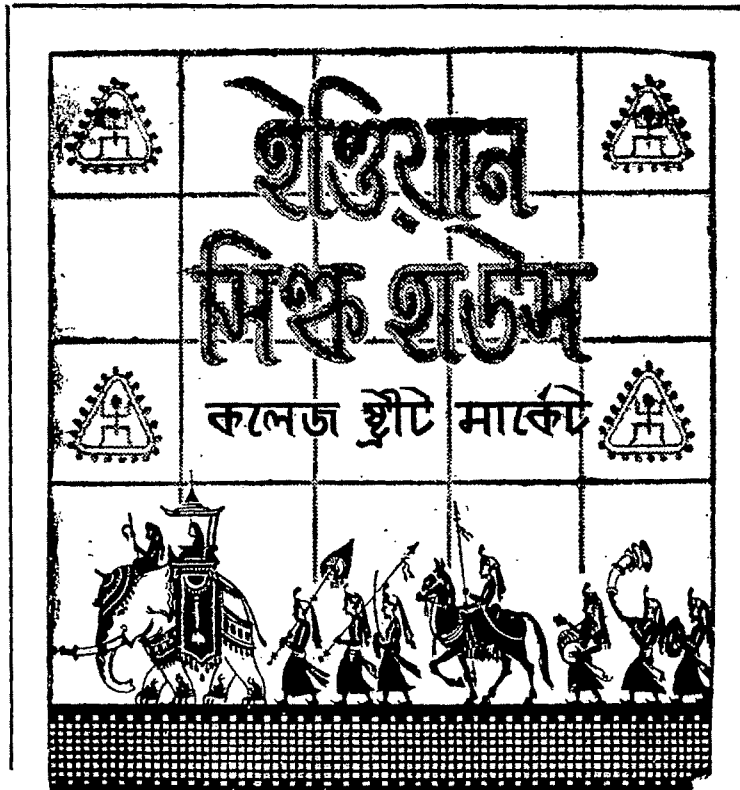
রূপান্তর ঘটে। সাধক তখন নতুন জন্ম লাভ করেন। বৈষ্ণব সাধক বলেন, ‘কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, বন্ধুত্ব প্রভৃতি সকল তাঁকে অর্পণ করতে হবে, তা হলে তন্ময়তা আসবে’। এই তন্ময়তা এলেই তো সাধকের দেহ হয় ভাগবতী তনু। তখন তাঁর কাম পরিণত হয় প্রেমে। জীবনে দেখা দেয় সামঞ্জস্য, মন পূর্ণ হয় শান্তি ও আনন্দে। তবে এর জন্যে চাই সাধনা। বিনা সাধনায় কোনো সিদ্ধিই তো লাভ করা যায় না।

এ কালের একটা প্রধান ব্যাধি হচ্ছে অবসাদ। এই অবসাদের মূলে কখনো থাকে বাস্তব কারণ, কখনো থাকে কল্পিত কারণ। কখনো এর মূলে থাকে ভগ্নস্বাস্থ্য, কখনো দুরাশা, কখনো মনস্তাপ, কখনো পারিবারিক জীবনে সংগতির অভাব। এই অবসাদের ঔষধ বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়। গীতার একটি কথা আছে—‘নান্বানম্ অবসাদয়েৎ’ অর্থাৎ আত্মাকে কখনো অবসন্ন হতে দেবে না। এই জন্যে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে একটি ভাবনাকে অবলম্বন করে নিজের সমস্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই ভাবনাকে বলে auto-suggestion। একটি প্রাচীন শ্লোকে বলা হয়েছে—‘যার যেমন ভাবনা, তার

তেমন সিদ্ধি’। বেদান্ত বলেছেন—‘যে নিজেকে বন্ধ বলে মনে করে, সে বন্ধ হয়ে যায়, আর যে নিজেকে মুক্ত বলে মনে করে, সে মুক্তই হয়ে যায়। এই জন্যে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’, ‘আমি ব্রহ্ম, আমি নিত্য-শুদ্ধ, বুদ্ধ-মুক্ত’ অথবা ‘আমার মনঃশক্তি অতি প্রচণ্ড, আমি এই শক্তির বলে অসাধ্য সাধন করতে পারি’ এমনি কোনো মন্ত্র বা বাণী কয়েকবার জপ করতে হবে। ফরাসী মনস্তাত্ত্বিক এমিল কুয়ে সে কথাগুলো প্রতি সন্ধ্যায় বিশবার জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সে কথাগুলো এই—

‘Every day, in every way, I am getting better and better’.

আমরা ভারতীয় মনীষীদের মতে মনের স্বাস্থ্যরক্ষার কয়েকটি উপায়ের নির্দেশ করলাম, কারণ ‘Prevention is better than cure’ কিন্তু যদি আধিগ্রস্ত রোগী নিজের চিকিৎসা নিজে করতে অক্ষম হয়, তা হলে উপায়? মনের রোগ কত রকমের, তার চিকিৎসার পদ্ধতিই বা কি, এ সম্পর্কেও প্রাচীন ভারতে একদিন বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ বিষয়ের দিগদর্শন করব।





॥ মাতৃভাষার স্বপক্ষে ॥

মহাশয়,

গত শতাব্দীর অমূল্য পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পাঠ করে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। ইংরেজির অন্ধ অনুরাগীদের যুক্তিগুলির প্রতিবাদী করে আপনারাও যে আজ উচ্চ কণ্ঠে একথা প্রচার করতে শুরু করেননি যে, ইংরেজির দক্ষিণ্য ব্যতীত আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব সেজন্য আপনারা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্থ।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি তার পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে কেন এ প্রশ্নের উত্তরে এ যাবৎ একাধিক জোরালো যুক্তির অবতারণা করেছেন ইংরেজির একনিষ্ঠ সেবকবৃন্দ। প্রথমতঃ ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা। বহির্ভারতীয় দেশগুলির সঙ্গে উন্নত সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে ইংরেজির শরণ নেওয়া ছাড়া গতানুগতিক নেই। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজির সাহায্য ব্যতীত ভাবগত ঐক্যের বিনিয়াদ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ ভারতের সকল আঞ্চলিক ভাষাই আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কাজেই ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে নির্বিবাদে মেনে নেওয়াই হবে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার কাজ।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, এ-যুগে কোন দেশের পক্ষেই অন্যান্য দেশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে এককভাবে উন্নত হওয়া সম্ভব নয়। সন্দেহ নেই যে ভারতকেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে উন্নত সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু তাই বলে ভারতের সকল মানুষের উপর ইংরেজি ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে না দিলে যে এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না এ-যুক্তি অবিবাক্য। ভাবগত ঐক্য গঠনে ইংরেজিই যে একমাত্র সহায়ক এ কথাও মেনে নেওয়া যায় না। আর শব্দ-বিজ্ঞানচর্চা সত্যেন বসুই নন আরও

অনেক জ্ঞানীগুরুগণ ব্যক্তিও নির্বিবাদে কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার পুস্তক রচনা করা সম্ভব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরেও মাতৃভাষাতে বিজ্ঞান শেখানো দুরূহসাধ্য নয়। কাজেই ইংরেজির-সপক্ষে যে সব যুক্তি দেখানো হয়েছে সেগুলিকে নির্বিবাদে বাতিল করা চলে।

এই প্রসঙ্গে জাপানের কথা উল্লেখ করা চলতে পারে। ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া সত্ত্বেও জাপান ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করেনি এবং একমাত্র বাতুলের পক্ষেই এ কথা সম্ভব যে ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন না করে জাপান ভুল করেছে। জাপানী জার্গনের লেখক শ্রীবিশ্বদেব বসু বলেছেন, জাপান প্রতীচীকে আমাদের চাইতে অনেক বেশী অন্তর্গত করে নিয়েও কখনও পরভাষার দাসত্ব করবার মতো আত্মঘাতী ভুল করেনি। কিন্তু এদেশের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই আত্মঘাতী ভুল করবার জন্যই আজ বন্ধ-পরিবৃত। এদেরকে আজ বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, জাপানে যা সম্ভব হয়েছে ভারতেও তা সম্ভব হবে। ইতি—

পৃথ্বীশ চট্টোপাধ্যায়।

এয়াসফিল্ড, দার্জিলিং।

॥ শিশু শিক্ষার তামাসা ॥

মহাশয়,

গত ২৩শে চৈত্রের অমূল্য 'মতামত' বিভাগে 'শিশু শিক্ষার তামাসা' শীর্ষক প্রকাশিত পত্রটির ওপর আমার কিছু বক্তব্য আছে। লিখে জানালাম। আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ করলে বাঞ্ছিত হবো।

পত্রলেখিকা শ্রীমতী বসু কতকগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখে পরিশেষে শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। কিছুদিন পূর্বে শিক্ষকদের ধর্মঘটের পর থেকে দেখা যাচ্ছে অভি-

ভাবকদের এক অংশ শিক্ষকদের হয়ে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছেন। প্রকাশিত পত্রটিতে এই মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায়।

শ্রীমতী বসু তাঁর মেয়ের কথা লিখেছেন। স্কুলে সেলাইয়ের কোনো-রকম শিক্ষা না দিয়েও তাঁর মেয়েকে শিক্ষিকা বললেন যাহোক কিছু একটা করে আনতে; কারণ ইন্সপেক্টার আসবে স্কুলে। যদি সত্যিই এইরকম ঘটে থাকে, সেই স্কুলের শিক্ষিকা বা কর্তৃপক্ষের দোষ সন্দেহ নেই, কিন্তু শ্রীমতী বসু কি তখনই এই ব্যাপারটার একটা প্রতিবাদ বা ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করতে পারতেন না? কারুর নিন্দা করার পূর্বে দেখা উচিত আমাদের নিজের নৈতিক দায়িত্ব আমরা যথাযথ পালন করছি কিনা। কারণ, অনায়াসকারী এবং অনায়াসসহকারী উভয়েই সমান দোষী।

আর তাঁর মেয়ের কথা লিখেছেন। অযোগ্য শিক্ষিকা ভুল পড়িয়েছেন তাকে। এখানে প্রশ্ন করা যায়, তিনি কি শিক্ষিকার কাছ থেকে নিজে জেনেছেন কি যে তাঁর মেয়ের অভিযোগগুলি সত্য কি না? তাঁর পত্রপাঠে মনে হয় তিনি ভাঁ করেন নি। শিক্ষক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি শিশু মনস্তত্ত্ব বড় জটিল। সময়ে সময়ে তাদের ব্যবহারের এবং কথাবার্তার কোন অর্থই বুঝে পাওয়া যায় না। শ্রীমতী বসু শব্দমাত্র তাঁর মেয়ের কথা শুনেই দেশের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে প্রশ্ন করলে যদি ভুল উত্তর দেয় তাহলেই কি তার জন্যে শিক্ষক শিক্ষিকাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে? স্কুলে ছাত্র ছাত্রী কতটুকু সময় থাকে? তার চেয়ে অনেক বেশী সময় তারা বাড়ীতে অভিভাবক-অভিভাবিকার কাছে থাকে না কি?

নমস্কারান্তে—

ভবদীয় দীপক মজুমদার
ভদ্রকালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
হুগলী।



ফাল্গু

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়



প্রাণপণ শক্তিতে রমা চোখদুটো ফিরিয়ে নিল। আশ্চর্য, এত চেষ্টা, এত দিনের তালিম, তবু কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারে না। কেবল দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে কাঠগড়ার দিকে গিয়ে পড়ে। যেখানে ক্রান্ত, অবসন্ন একটা মানুষের কাঠামো দুটো হাত জোড় করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বিহ্বল দৃষ্টি, মনে হয় এত বড় একটা নাটকে তার যেন কোন অংশ নেই, নেপথ্য ভূমিকাও নয়। সে শুধু একজন দর্শক মাত্র। কোর্ট ঘরে ভিড় করে বসে থাকা কৌতুহলী জনতারই একজন।

বলুন, থামলেন কেন? জানি এসব কথা বলতে আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া তো আর উপায় নেই। পৃথিবী একটা নরক, কিংবা বৃষ্টি তার চেয়েও ভয়ানক জায়গা।

সরকারি উকিলের কণ্ঠে দরদ আর সহানুভূতির প্রলেপ।

রমা ঢোক গিলল। একটা হাত দিয়ে নিজের শাড়ীর আঁচল চেপে ধরল। এছাড়া ধরে-কাছে আর বৃষ্টি কোন অবলম্বন নেই।

ঠিক সরকারি উকিলের পাশে বসা বাপের দিকে চোখ পড়ল। দু'চোখে চকুটি আর উন্মাদ কঠিন, খর্জু একটা অবয়ব। একদৃষ্টে মেয়ের দিকে চেয়ে রয়েছেন। কোন ভুল নয়, কোন বিচ্যুতি নয়। রাজিব্বারে মেয়েকে টেনে এনেছেন বিচারের আশায়। বিচার চাই। তার জন্য

যদি সত্যকে বিকৃত করতে হয়, প্রয়োজন হয় অন্ততভাষণের, তাতেও ক্ষোভ নেই।

মেয়েকে তাঁর বিশ্বাস নেই। এই বয়সের কোন মেয়েকেই নয়। এই বয়স আলো অন্ধকার চেনে না, নিজের ভবিষ্যত নয়। কম্পনার রং বুলিয়ে সহজকে, সাধারণকে রমণীয় করে তোলে।

বলুন, কোর্টের অমূল্য সময় এভাবে নষ্ট করবেন না। ধর্মাবতারের কাছে সব কিছু বলুন।

সরকারি উকিল আবার অনুরোধ করলেন।

তারপর, তারপর অনুদা আমার বলল, চল তোমাকে মাসীমার বাড়ী রেখে আসি।

জজের চশমার মোটা কাঁচটা ঝকঝকিয়ে উঠল। গম্ভীর কণ্ঠধ্বনিও হল কোর্টঘরের লোকদের সচকিত করে, অনুদা কে?

আসামী, ধর্মাবতার, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি উকিল বলে উঠলেন, ভাল নাম অনুতোষ। অনুতোষ রায়।

জজ চোখ ফেরালেন রমার দিকে। রমা ঘাড় নাড়ল। স্প্রিং দেওয়া কলের পদতুলের মতন।

আসামীর দিকে চোখ না ফিরিয়েও রমা বদলে পাবল, একটা মানুষের কাঠামো তীব্র এক দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে খরখরিয়ে কেঁপে উঠল। নিষ্পৃহ দুটি চোখে ফুটে উঠল ঘৃণা আর বিরক্তির

প্রতিচ্ছায়া। শপথ নিয়েছে রমা। সত্য কথা বলবার শপথ। কিন্তু এভাবে সত্যের অপলাপ করতে বিবেকেও একটু বাধা নেই। বিবেক বিসর্জন দিয়েই বৃষ্টি রমা এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। অনুর সঙ্গে সম্পর্কের সামান্যতম জোরটুকুও মুছে ফেলার দূর্বীর প্রতিজ্ঞা করেছে।

তারপর। সরকারি উকিল খেই ধরিয়ে দিলেন।

তারপর, দাঁত দিয়ে ঠেঁট চেপে রমা ভাবতে শুরু করল, কি তারপর, মিথ্যার তরঙ্গের পর তরঙ্গ সাজিয়ে অন্তহীন সমুদ্রের সৃষ্টি করতে হবে। একটা মানুষ, একটা ভালবাসা যাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সেই দূস্তর সাগরে।

রুদ্ধ কক্ষে বাপের তর্জন মনে পড়ে গেল।

এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমি বেঁচে থাকতে বামনের মেয়ের সঙ্গে কায়স্থের ছেলের বিয়ে হতে দেব না। কখনই নয়। যে চুনকালি তুমি নিজে দু'হাতে মুখে মেখেছ, সে কলঙ্ক মোছার ভার তোমারই ওপর। তোমার চেয়ে সমাজ অনেক বড়, হৃদয় নিয়ে প্রেমের খেলার চেয়ে শাস্ত্রের অনুশাসন অনেক মূল্যবান। তাছাড়া, সব চেয়ে বড় কথা, অন্যায়ের প্রতিকার চাই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

একবারে কোণের দিকে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে রমা এক মনে কথাগুলো

শুনছে। গুরুর বচনের মতন তৎপাত চিন্তে।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত ! নিজের স্ত্রীকে অশেষ যত্নগা দিয়ে তিলে তিলে দংশে দংশে মারার কাহিনী অজানা নয় রমার। তারপরে বাপের লাম্পটের ইতিহাসও জানার সুযোগ হয়েছে। গভীর রাত্রে স্থলিত পায়ে বাড়ী ফেরার দৃশ্য চোখ না বুজেও রমা দেখতে পায়। এসব পাপ নয়। পাপ শুধু একটা মেয়ের ভালবাসার পাত্রের হাত ধরে বাড়ী ছাড়া। অপরাধ শুধু প্রিয়ের আহবানে সাড়া দেওয়া।

দিন পাঁচেক অসহ্য যন্ত্রণা। নরক যন্ত্রণাও বুঝি এত ভয়াবহ নয়। নিজেকে নিরশেষ করার অনেক চেষ্টা রমা করেছে। উপায় খুঁজেছে। দাঁড়ি, আগুন কিংবা জল, কিন্তু সুবিধা হয়নি। চাকরি থেকে অবসর নেওয়া বাপ দাঁট সজাগ দৃষ্টি সর্বদা জ্বালিয়ে রেখেছেন। কঠোর প্রহরা। মেয়েকে চোখের সামনে থেকে নড়তে দেননি।

কঠিন হাতে টানতে টানতে নিয়ে গেছেন পুন্নিশের কাছে। নিজেকে দাঁড়িয়ে থেকে এজাহার লিখিয়েছেন। আগের রিপোর্টের সঙ্গে তাল রেখে মেয়ের সর্বনাশের ফিরিস্তি দিয়েছেন।

ভুল রমা সত্যিই করেছিল। বাড়ী থেকে পালিয়ে নয়, শহর থেকে না পালিয়ে। অনু বারবার বলেছে, চল রমা, আমরা দূরে কোথাও চলে যাই। এ-শহর নিরাপদ নয়, কোথায় কখন কার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই বিপদ।

কিন্তু রমা ঘাড় নেড়েছে। না, না, তা সম্ভব নয়। বাইরে কোথাও যাওয়া মানে অনুতোষকে চাকরি ছেড়ে যেতে হবে। দারিদ্র্যের জ্বালা হাড়ে হাড়ে জানে রমা। সেই অন্ধকার দিনগুলো এড়িয়ে যাবার জন্যই সাহস করে সমাজের বেড়া ভেঙে বাইরে এসেছে। আবার নতুন করে তমসা-ঘন জীবনের মধ্যে সে ফিরে যেতে চায় না। তা ছাড়া, এটুকু নিশ্চয়ই জানতো, তার খোঁজ কেউ করবে না। বাপ তো নয়ই। দুটি মেয়ে আর দুটি ছেলেতে ঈতিমধ্যেই তলাফটো সংসারের পানিসটা টলমল করছিল। অভাবের লোনাভল ঢুকে বিপর্যস্ত করছিল মাঝিকে। অক্ষম হাতে দাঁড় বেয়ে বেয়ে সে পানিসিকে নিরাপত্তার কূলে ভিড়ানো প্রায় অসম্ভবই ছিল। কাজেই একজন যাত্রী যদি স্বেচ্ছায় মরেই গিয়ে থাকে তবে সেটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

খুঁজে খুঁজে তাকে ফিরিয়ে আনার দুর্বৃন্দ্রি মাঝির হবে না।

কিন্তু রমা ভুল করেছিল। হিসাবের ভুল। বাপের ব্রাহ্মণ্যভেজের পরিমাপ বুঝি তার জানা ছিল না। পাড়ায় কানা-ঘুঘো একটু গিয়েছিল বাপের কানে। রমা আর অনুতোষের হৃদ্যতার সংবাদ। রমার বাবা আর কালীবলম্ব না করে পুন্নিশের সাহায্য নিলেন। পুন্নিশ অনুতোষের মেসে হানা দিল। বেড খালি কিন্তু আস্তানার পাতা মিলল। সম্পর্কে এক বোনের বাড়ী গিয়েছিল অনুতোষ। সেখানে পুন্নিশ যখন গিয়ে পৌঁছল তখন রমার অঙ্গে সস্তা বেনারসী, গলায় বাঁস ফুলের মালা, কপালে, গালে চন্দনের ফোঁটা।

অনুতোষ একটি কথা বলেনি। ঘাড়-হেঁট করে পুন্নিশের সঙ্গে চলে এসেছে। আপত্তি জানিয়েছিল রমা। চীৎকার করে বলেছিল, আমি সাবালিকা। স্বেচ্ছায় আমি ঘর ছেড়েছি। অনুতোষের কোন দোষ নেই। আমাদের গ্রেপ্তার করার আপনাদের কোন এজিয়ার নেই।

পুন্নিশ রমার বাপের দিকে জিজ্ঞাসা দৃষ্টি মেলে চেয়েছে। রমার বাপ দাঁতে দাঁত ঘসেছেন। তারপর ইন্সপেক্টরকে আড়ালে ডেকে বলেছেন, শয়তানী বৃন্দ্রিটা একবার দেখুন স্যার। আমার চেয়ে যেন বয়স ওর বেশী জানা। সামনের আশিবনে সতেরোয় পড়বে। এসব ওই হতভাগার ট্রেনিং। শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক করে রেখেছে। উঃ দিন কাল কি হ'ল। মধুজোজবাড়ীর মেয়ে, যাদের চন্দ্র সূর্য কোন দিন দেখতে পায়নি, সেই বাড়ীর সম্ভ্রম—

কথাটা রমার বাবা আর শেষ করতে পারেননি। বৃকভাঙা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গিয়েছিলেন।

পুন্নিশ ইন্সপেক্টর থামেনি। রমার দেহের খাঁজে খাঁজে কৌতূহলী চোখ বুন্নিয়ে বয়সের হিসাব নেবার চেষ্টা করেছে। বোল-বছর বয়সের পক্ষে বেশ বাড়ন্ত গড়ন। দেখে তো মনে হয় বয়স বিশের এপারে নয়। যাক, যার গরু সেই হিসাব করুক। এসব ব্যাপারে পুন্নিশের মাথা গলাবার দরকার নেই।

তারপর রমার বাপকে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে। নকল ঠিকুজী কোর্স্ট তৈরী করা। দিনরাত থানায় গিয়ে বসে থাক। সরকারি উকিলের

বাড়ী দৌড়ানো। মকদ্দমার তালিফ-তদারক।

এতে কষ্ট হয়নি, সব চেয়ে মুস্কিলে ফেলেছে নিজের মেয়ে। ফণা ভুলে ছোবল দেবার চেষ্টা করেছে। কথার ছোবল। বেশ সময় নিয়েছে তার বিষদাতি ভাঙতে। দিনের পর দিন খাওয়া বন্ধ। তার ওপর চড় চাপড় তো ছিলই।

যখন বাপের কথায় রমা সায় দিয়েছিল, তখন তার নিস্বেতজ, অসহায় অবস্থা। ঘরের মেঝেয় চূপচাপ শুয়ে পড়েছিল। গাল বেয়ে অজস্র অশ্রুর ধারা। ভাল করে কথা বলার শক্তিও নেই।

তারপর তাসের পর তাস সাজিয়ে ঘর গড়ে তোলার মতন, মকদ্দমা গড়ে উঠল। সরকারি উকিল সাহায্য করলেন। রমার বাপের তো তৎপরতার অন্ত নেই। সত্য মিথ্যায় মিশিয়ে অনুতোষের নামে অনেক কথা শোনান হ'ল রমাকে। এমন কথাও বলা হ'ল অনুতোষ বিবাহিত। দেশের বাড়ীতে তার বোঁ আছে, ছোট্ট একটা ছেলেও।

চোখ বন্ধ করে রমা সব শুনল। বিশ্বাস করল কিনা সেটা তার মূখের চেহারা দেখে বোঝা গেল না।

অনুতোষ হাজতে একটি কথাও বলল না। তিনকল্লের তার কেউ ছিল না। বাপ যখন মারা যায় তখন অনুতোষের বয়স বছর এগারো। মা যাবার সময় বয়স কুড়ি। এক রকম চলে যাচ্ছিল অনুতোষের। পিছন দিকে চাইবার যেমন কেউ ছিল না, সামনের দিকে নজর দেবার মতনও কিছু নয়।

হঠাৎ সব কিছু বদলে গেল। অনুতোষের নিমেষ পরিষ্কার আকাশে রামধনুর ঝিলিক। নিষ্পৃহ জীবনে একটা মোহ।

কারখানা থেকে বেরোতেই একেবারে মূখোমুখি।

ভাইয়ের হাত ধরে রমা ফিরছিল। আধ ময়লা শাড়ী, এলো খোঁপা, প্রসাধনের বালাই নেই। কিন্তু অনুতোষের ভাল লেগে গেল।

সুদর্শন বর্ণ আর ডাগর দুটি চোখ। টোঁটের কোণে অঙ্গ হালিস রেশ।

অনুতোষের পরণে নীল সার্ট আর প্যান্ট। তাও ধোপদরস্ত নয়। জায়গায়

জায়গায় তেল আর কালির ছোপ। তরুণ রমা ফিরে ফিরে দেখল।

সেই দেখা শেষ নয়, বরং সেই দেখাই কাল হল।

তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেক দিনই এক সময়ে অনুতোষকে সে পথে দেখা গেল। আগে সে নাইট ডিউটি করতাই চাইত না, কিন্তু আজকাল অশ্রুত উৎসাহ দেখা গেল নিশাচরবৃত্তিতে। অন্য কর্মীদের সঙ্গে ডিউটি বদল করতে লাগল।

রমাও ভাইকে ভোরে স্কুলে পৌঁছে দিতে ঠিক ওই রাস্তাই ধরল। যেতে যেতে বায় বার চোখ ফিরিয়ে দেখতে লাগল। কি অসভ্য লোক, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঠিক একভাবে চেয়ে রয়েছে।

একদিন সুযোগ জুটে গেল।

কারখানার পাশেই এক ময়দান। কোথা থেকে এক সার্কাসের দল এসে তাবু ফেলল। বাঘ, হাতি আর ভল্লুক। তাদের হাঁক ডাকে পাড়া সরগরম।

ভাইকে নিয়ে যেতে যেতে রমা থমকে দাঁড়াল। বাঘের খাঁচার পাশে দারুণ ভিড়।

রমার ভাই আবদার ধরল, দাঁদি একটু দেখব।

অত ভিড়ের মধ্যে যাবো কি করে মান্দু। অসহায় চোখে রমা এদিক ওদিক চাইতেই নজরে পড়ে গেল। অনুতোষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মূর্চক হাসছে।

রমা কিছ্র বলবার আগেই অনুতোষ এগিয়ে এল। মান্দুর কথা বোধ হয় তার কানে গিয়েছিল।

এস ভাই, আমি তোমাকে বাঘ দেখিয়ে নিয়ে আসছি।

মান্দু নির্বিকারে, নির্নিশ্চয় অনুতোষের একটা হাত আঁকড়ে ধরল। এক পা এগিয়েই অনুতোষ রমার দিকে ফিরে বলল, আপনিনও আসুন না।

রমা আরক্ত মুখে বলল, আমি আর কি দেখব।

অনুতোষ হাসল, কেন, বাঘ অনেক দেখেছেন বুঝি?

রমা আরও রাঙা হ'ল। কোন কথা না বলে অনুতোষের পিছন পিছন এগোতে লাগল।

কছে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝা গেল।

ভিড়টা ঠিক বাঘের জন্য নয়। বাঘের খাঁচার মধ্যে একটি মেয়ে। বয়স হয়তো

রমার মতনই হবে। স্বাস্থ্যবতী, তলবী। এত জলপ আবরণ জড়িয়ে কেউ লোক-চক্ষুর সামনে এসে দাঁড়াতে পারে এ যেন রমার ধারণারও অতীত ছিল। পাতলা কাপড়ের পাঁচি বুক বাঁধা। কটিতে কোপানি।

অনুতোষের পাশে দাঁড়িয়ে রমার অবস্থা কাঁহল। বিশেষ করে আশপাশে দাঁড়ানো লোকের মন্তব্যের টুকরো কানে যেতে রমার আর চোখ তোলবার উপায় ছিল না।

অনুতোষ বেপরোয়া। গৃহ উৎসাহে মান্দুকে বাঘের আচার আচরণ শিকার ধরার পদ্ধতি বুঝিয়ে চলেছে।

একটু পরে রমাই মনে করিয়ে দিল, চলুন, মান্দুর স্কুলের দেরী হয়ে যাবে।

অনুতোষ অপ্রস্তুত হবার ভান করল, তাইতো, ওর স্কুলের কথাটা আর আমার খেয়াল ছিল না।

মান্দুর কিন্তু হুঁস নেই। এমন বাঘ ছেড়ে স্কুলের শিক্ষকদের কাছে যেতে সে রাজী নয়।

কিন্তু যেতে হ'ল। দিদি হাত টেনে ধরল। অনুতোষ রইল পাশে পাশে।

তারপর থেকে রোজ। মান্দুকে স্কুলে নিয়ে যাবার সময় নয়, ফেরার পথে।

ক্রমে ক্রমে সাহস বাড়ল। দুজনেরই। হাঁটি হাঁটি পা পা করে রাস্তা থেকে সস্তা রেক্টরেণ্টে গিয়ে ঢুকল। দু'কাপ চা সামনে নিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে বসে রইল দুজনে। প্রথম প্রথম নিজেদের সংসারের কথা আত্মীয়স্বজনের খবর। তারপর আবেল তাবোল কথা শুরু হ'ল। চিরন্তন আবেগ, হাতে হাত রেখে প্রতিশ্রুতি। পুরোনো সংসার ছেড়ে নতুন সংসার গড়ার স্বপ্ন।

অনুতোষের কেউ কোথাও ছিল না, কিন্তু রমার জাদিরেল বাপ ছিল। অভিভাবক বলতে ওই একজন, কিন্তু একাই একশ। মেয়ে কুল ছাড়া, গোত্র ছাড়া কারো গলায় মালা দেবে আর তিনি নির্বিশেষে চোখ বুজে তাই মেনে নেবেন। এমন মনে করার কোন হেতু ছিল না।

তাই অনুতোষ স্পষ্টই বলল, চল আমরা চলে যাই কোথাও।

উদাস দুটি চোখ তুলে রমা জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

অনেক দূরে কোথাও! যেখানে তোমার বাপের ছায়া পৌঁছবে না।

না, না, রমা ঘাড় নেড়েছে, তোমার চাকরি? চাকরির কি হবে?

ঠিক হয়েছিল অনুতোষ চাকরি ছাড়বে না। শূদ্ধ বাসা বদলাবে। মেস

ভবানীপুর
গিনি ম্যানমেন
জুয়েলার্স



ফোন: ৪৭-৩২৬৯
৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড, যদু বাকুর বাজার
ভবানীপুর • কলিকাতা - ২০

Advt. Agency

ছেড়ে শহরতলীর কোথাও আস্তানা পাতিবে।

রমার বাপ যে মেয়ের বিয়ের একে-বারেই চেষ্টা করেননি এমন নয়। তিনি আশা করছিলেন মেয়ের রূপ যখন রয়েছে তখন রূপের ওপর পাত্রপক্ষ হয়তো বিশেষ জোর দেবে না।

“কিন্তু তাঁর ভুল ভাঙতে দেবী হ'ল না। মেয়েকে দেখে যাও বা দু' একজনের পছন্দ হল, বাপের দানের ফিরিস্তি শুনাই তাঁরা পিছ হাটলেন। বেশ তো, মেয়ে সুন্দরী, বেশী কিছু দিতে না চান, কিছু তো দেবেন। অন্ততঃ গাঁটের পরস্যা খরচ করে তাঁরা মে ছেলের বিয়ে দেবেন না, এটা তো ঠিক।

দু' একজন হয়তো খালি হাতেই মেয়ে নিতেন, কিন্তু তাঁরা খেয়ে গেলেন মেয়ের বাপের চরিত্র-মাধ্যমের পরিচয় পেয়ে। তাঁরা খবর না দিয়ে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন অপ্রস্তুত অবস্থায় মেয়েকে দেখবেন, কিন্তু মেয়ের বাপের অবস্থা দেখে তারাই অপ্রস্তুত হলেন।

একদিন কথাটা রমার বাপের কানে উঠল। পাড়ায় পরোপকারী ছেলের অভাব ছিল না। অনায়াস, অসত্য দেখলেই যারা জ্বলে ওঠে। বিশেষ করে নিজেদের মদ্যের গ্রাস পরকবলিত হ'লে। যারা রমাকে পথে-ঘাটে দেখলে উৎসাহে শিশ দিত, কুৎসিত, অঙ্গভঙ্গী করত, মাঝে মাঝে কথা বলার চেষ্টা, তারাই রমার সঙ্গে বেপাড়ার অনুভবের অন্তরংগতা দেখে সমাজ-হিতৈষী সাজল। রং ফলিয়ে

রমার বাপের কাছে এই অবৈধ সম্পর্কের রসাল বর্ণনা দিল।

মেয়েকে বাপ সোজাসুজি ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন।

পাড়ার ছেলেরা কি সব দেখেছে বলছে। কারখানার কোন মিস্ত্রির সঙ্গে ঘোঁসাঘোঁসি দাঁড়িয়ে—

রমা সব কিছু অস্বীকার করল। বরং পাড়ার ছেলেরাই যে তার পিছনে লেগেছে, সে কথাই বলল।

রমার বাপ বিশ্বাস করলেন মেয়ের কথা। আর এই ব্যাপারের তিন দিন পরেই রমা নিখোঁজ।

রাতে নেশাটা বেশ জ্বর হয়েছিল। রমা যে নেই সেটা খেয়াল হল অনেক পরে।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে রমার বাবা চুপচাপ বারান্দায় বসেছিলেন, ছেলে এসে কাছে দাঁড়াল।

দিদি এখনও আসেনি বাবা।

প্রথমে কথাটা তাঁর কানেই যায়নি। ছোট কথা কানে যাবার মতন অবস্থাও তাঁর ছিল না। মাঠে বেশ কিছু গেছে। ঘোড়ার পায়ে অঞ্জলি দিয়েছেন এক গাদা টাকা। যা বাকি ছিল শোক ভুলতে খরচ করেছেন। অথচ এখনও প্রায় সারাটা মাস বাকি। তাই বসে বসে ভাবছিলেন। কালই কোন বন্ধুর কাছে হাত পাতা ছাড়া আর গতান্বর্ত নেই।

হুঁস হতে ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, যাবে আর কোন চুলোয়। দেখ সুখীদের বাড়ী আছে। আসবে এখন।

সুখী মানে সুখদা। বিয়ে হয়েছিল বছর দুয়েক। এর মধ্যে হাতের লোহা ঘুচিয়ে, সিঁথের সিঁদুর মূছে বাপের বাড়ী ফিরে এসেছে। প্রায় রমারই সম-বয়সী। সংসারের কাজ শেষ করে মাঝে মাঝে রমা যায় সুখীদের বাড়ী।

রাত বাড়তে রমার বাবার খেয়াল হ'ল। কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিজে গিয়ে দাঁড়ালেন সুখীদের বাড়ী।

না, রমা নেই সুখীদের বাড়ী। আজ সকাল থেকে আসেনি। তবে, তবে মেয়ে গেল কোথায়!

উঠতি বয়সের মেয়ে। দুবেলা যথেষ্ট খোরাক না জুটলেও স্বাস্থ্য যথেষ্ট সংগ্রহ করেছে। ভয়ের কথা। শহরের আলি-গলিতে লোভের ফাঁদ, বিপদের হাতছানি। একবার ভলিয়ে গেলে আর খোঁজ পাওয়া দুস্কর।

রাতে আর কিছু করলেন না কিন্তু সারাটা রাত রমার বাবা জেগে রইলেন। শব্দ জাগা নয়, বসে বসে মেয়ের চোপদ-পদব্দ নরকস্থ।

ভোরে উঠেই ছুটলেন থানায়।

এবার পাড়ার ছেলেরা অগ্রণী হ'য়ে এল। স্বভাবপ্রবৃত্ত হয়ে খবর জোগাল। পুলিশকে অনুভবের পাক্সা দিল। তার পর মেস থেকে গন্ধ শব্দে শব্দে দুজনকে পাকড়াও করতে পুলিশের অসুবিধা হ'ল না।

সরকারি উকিলই কথাটা বললেন। বয়স কমিয়ে বিশেষ সুবিধা হবে না। নকল কোন্ঠি তৈরী করেও নয়। ডাক্তাররা এসব মানতে চাইবে না। তাও বা দু' এক বছরের এদিক-ওদিক হ'লেও কথা ছিল। শিং উঠিয়ে একবার সরকারি উকিল লড়বার চেষ্টা করতেন। বাড়ন্ত গড়নের নজর দেখিয়ে। কিন্তু মেয়ের বয়স অনেক। সেটা প্রমাণ হ'লেই সব জারিজুরি ফাঁক। সমস্ত কেসটা শব্দ বয়সের বড়িতে বোকাই করাটা সমীচীন হবে না। যদি প্রমাণ হয় মেয়ে সাবালিকা, তা হ'লেই আসামী বেকসুর খালাস পাবে। কাজেই মেয়ে স্বেচ্ছায় যায়নি, হুঁসটাই প্রমাণ করতে হবে।

সেই কথাই মেয়ের বাপকে বললেন। ধমক দিয়ে হোক, গাল দিয়ে হোক মেয়েকে শাস্ত করতাই হবে। বাপের

প্রশান্ত চৌধুরীর নতুন উপন্যাস

॥ নাই বা দিলেন নায় ॥ ২-৫০

প্রশান্ত চৌধুরীর

পলাতক

২.০০

মীরটোল-এর

জীবন জিজ্ঞাসা

২.০০

মরোজকুমার রায় চৌধুরীর

মনোভাষ্য

২.০০

রক্ত সেন-এর

পট ও পদতুল

২.৫০

শৈলজানন্দ মথোপাধ্যায়-এর

এক অপরূপ

৪.০০

অচিন্তাকুমার সেনগুপ্তের

আগে কহ আর

৩.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর

ভাবীকাল

৩.০০

ডাঃ নীহাররঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়-এর

মন পবন

৩.০০

সুলেখা দাশগুপ্তা-এর

মিত্রা

৪.০০

টি. এল. বি. প্রকাশন :: ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ ১২

ইজ্জত, বংশের মর্যাদা নিশ্চয় ঠুনকো প্রেমের চেয়ে বড় নয়। অতএব।

অতএব মেয়ের ওপর নিষাতন চলল। একটানা।

ফল হ'ল। রমা রাজী হ'ল বাপের শেখানো বদলি বলতে।

সরকারি উকিল আবার মনে করিয়ে দিলেন, আপনি গেলেন মাসীর বাড়ী?

মুখ নীচু করে রমা মাথা নাড়ল। না, মাসীমার বাড়ী যাওয়া হয়নি। চলন্ত এক ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে অনুদা আমার উঠতে বলল। আমি উঠলাম।

এই পর্যন্ত সত্যি, কেবল মাসীমার বাড়ী যাবার ব্যাপারটা ছাড়া। সে রাতে ট্যাক্সির কোটরে রমা খুব ঘন হয়ে বসেছিল অনুতোষের বৃকের কাছে। খুব মৃদু কণ্ঠে ড্রাইভারে কান বাঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি চিরদিন আমার এমনি কাছে রাখবে তো। নেশা কাটলে দূরে সরিয়ে দেবে না?

জীবনটাকে পরিষ্কারভাবে রমা দেখেছে। কিছুর নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, কিছুর সমবয়সীদের মারফৎ। পুরুষ ভালবাসে, কাছে টানে তারপর সাময়িক উচ্ছ্বাস প্রশমিত হ'লে বাসি-মালার মতন পরিত্যাগ করে। পিছন ফিরে দেখে না। গায়ে কতটুকু কাদা লাগল তার খোঁজ রাখে না। এ পথ অনিশ্চিতের পথ। মোহের পাশাপাশি দাহও আছে। হিসাবে ভুল হ'লে একটা নারীকে ধুলোয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, একটা জীবনের পরি-সমাপ্তি।

অনেকদিন ধরে অনুতোষকে রমা যাচাই করেছে। পাশাপাশি এসেছে দুজনে, খুব কাছাকাছি, তবু কোনদিন অনুতোষ এই সান্নিধ্যের অমর্যাদা করেনি। নিজেকে নিবেদন করেছে পরিচ্ছন্ন ভাষায়, রমাকে কাছে টেনেছে, সসম্ভ্রমে।

অনেক ভেবে-চিন্তে তবে রমা এই বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে। যে আলোর মোহে ঘর ছেড়েছে, সে যে আলোয়া নয়, এটুকু বিশ্বাস তার ছিল।

সরকারি উকিল একটা পা তুললেন পাশের খালি চেয়ারে। পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমাটা মুছলেন। তাড়া-হড়ো করার কিছু নেই। অনেকদিন ধরে শেখান হ'য়েছে। ঠুনকো-পরা ছাকরা

গাড়ীর ঘোড়ার মতন ঠিক চলবে সোজা শড়ক ধরে। এদিক ওদিক হবার ভয় কম।

এসব কেসে প্রথম প্রথম যা একটু অসুবিধা। তেজী ঘোড়ার মতন ঘাড় বোঁকিয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে আবেগ স্তিমিত হয়ে যায়, উদ্দীপনা, উত্তেজনা সব নিশ্বেজ। তখন সব কিছুর

এস একটু দেখা করে যাই। আমি নাম-লাম, আর বেগেতে পারলাম না। সে রাতেই বিয়ে হয়ে গেল। সব আয়োজন তৈরীই ছিল।

আপনি আপত্তি করেননি? সরকারি উকিল চশমাটা কপালের ওপর তুলে দিল।



তুমি চিরদিন আমার এমনি কাছে রাখবে তো?

ঠিকভাবে দেখবার সুযোগ পায়। চোখের সবুজ চশমাটা খসে পড়ে।

তারপর। রমা থেমে আছে দেখে সরকারি উকিল কথার খোঁচা দিলেন।

অনেকক্ষণ ট্যাক্সি চলার পরে খেয়াল হ'ল যে মাসীমার বাড়ী যেতে তো এতক্ষণ লাগার কথা নয়। অনুদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এত দেরী হচ্ছে কেন? অনুদা বলল, সোজা রাস্তায় মিছিল বোঁকিয়েছে, তাই গাড়ী ঘুর পথে যাচ্ছে।

রমার বাবা উল্লসিত হলেন। অবশ্য মনে মনে। অপহৃত মেয়ের বাপের উল্লাস প্রকাশ করা অনুচিত। বিশেষ করে কোর্ট-ঘরে। ধর্মাবতারের সামনে। এতদিন ধরে তালিম দেওয়া সাথক। ঠিক ঠিক বলে যাচ্ছে মেয়েটা। কোথাও ভুলচুক করছে না।

একটা বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি থামল। অনুদার নির্দেশে। নিজে নেমে দাঁড়িয়ে অনুদা বলল, আমার এক বোনের বাড়ী,

আসামীর উকিল এতক্ষণে দাঁড়িয়ে উঠল। আপত্তি জানানোর ভঙ্গীতে।

এভাবে ফরিদাদীর মুখে উত্তর তুলে দেবার অধিকার বে-আইনী।

কিন্তু ততক্ষণে রমা শেখানো উত্তর বলতে শুরু করেছে।

—আমি অনেক আপত্তি করেছি, মিনতি করেছি, কান্নাকাটি করেছি, কিন্তু কেউ শোনেনি আমার কথা।

থেমে থেমে ঢোঁক গিলে আস্তে আস্তে রমা কথাগুলো বলল। চোখের সামনে ভেসে উঠল সে রাত্রের দৃশ্য। রমারই আগ্রহ ছিল বেশী। সেই অনু-তোষকে বলেছিল, গন্ধর্ব্ব বিয়েতে আমার বিশ্বাস নেই, হিন্দু-মতে বিয়ের আয়োজন কর।

কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ।

আমরা পুরুষ আর নারী। আমরা ধর্মে হিন্দু। তোমার শাস্ত্র আমার শাস্ত্র

এক। যদিও হৃদয় মম, এই মস্তে দুজনেই বিশ্বাসী। কাজেই কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু কোন অসুবিধা কি হয়নি? নিজের হাতে রমা সিংখের সিঁদুর মুছেছে, ছাত্তের শাখা ভেঙেছে। বাপ সামনে দাঁড়িয়ে সব কিছু করিয়েছেন। কোন প্রতিবাদ শোনেনি। তবে কোথায় গেল সেই ধর্মের অনুষ্ঠান, লোকাচার, শাস্ত্রের বিধান! অনুতোষের কাছ থেকে যে বিচ্ছেদের ভয়ে রমা ধর্মের সাহায্য খুঁজছিল, নিজের হাতে সেই ধর্মের বন্ধন সে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে।

এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল! কোন পথ! এ যন্ত্রণা, এ লাঞ্ছনা আর রমা সহ্য করতে পারছিল না। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে এ এক জীবনমৃত অবস্থা।

কাঠগড়ার দিকে চোখ ফেরাতে গিয়েও রমা সামলে নিল। হয়তো অনুতোষ বিস্ফারিত দুটি চোখে তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে। মনে মনে ভাবছে, যে মুখে আকাশের চাঁদের ছায়া দেখেছিল অনুতোষ, স্বর্গের প্রতিচ্ছবি, সে মুখে এত পাঙ্কলতা, এত রুদ্ধ!

কি হবে অনুতোষের! যেভাবে সব দিক বেঁধে রমার বাবা কেস শুরু করেছেন, যেভাবে রমা একটা মিথ্যার পর একটা মিথ্যা বলে চলেছে, যেভাবে সরকারি উকিল তৎপর, মাজা অনুতোষের হবেই। কত বছর! এক, দুই, দীর্ঘ পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছর কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অনুতোষ থাকবে। আর এক কারার অন্তরালে থাকবে রমা। দু'চোখে প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালিয়ে অপেক্ষা করবে। দীর্ঘ পাঁচ বছর, তর্জিন হয়তো রমার বাবা থাকবেন না। কোন বাধা থাকবে না, কোন অন্তরাল নয়। অনুতোষের কাছে যেতে রমার কোন অসুবিধা নেই।

অনুতোষ উকিল দিতে চাননি। উকিল দিয়েছে অনুতোষের জনদুয়েক বন্ধু। বন্ধুরা যে খুবই স্বল্পবিস্তর সেটা উকিলের চেহারা দেখেই মালুম হয়। অর্ধভুক্ত, শীর্ণ একটা মানুষ জরাজীর্ণ গাউনের আবরণে আত্মরক্ষা করছে। কেসের ব্যাপারে আসামীর চেয়েও নিস্পৃহ, আরো নির্বীৰ্য।

কিন্তু এর পরেও অনুতোষ কি গ্রহণ করবে রমাকে? একটা ছলনা, একটা প্রবণতা, একটা শঠতাকে নিয়ে ঘর করবে!

একবার অনুতোষের কাছে যেতে পারলে রমা সব কিছু বোঝাতে পারবে। নিজের অসহায় অবস্থা, নিজের রিক্ততা। দু'চোখের জল দিয়ে, হৃদয়ের স্পন্দন দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে অনুতোষের মনের সব অবিশ্বাস মুছে দেবে।

অনুতোষ উকিল দেয়নি। ভেবেছিল প্রয়োজন হবে না। কোর্টে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করে রমা মিথ্যা বলবে না। অন্তত এমন একটা জীবন-মরণের সমস্যার ব্যাপারে। কিন্তু অনুতোষের বুদ্ধি ভুল ভেঙেছে। সাপিনীর মতন শূন্য ফণাই প্রসারিত করেনি রমা, ছোবলে ছোবলে অন্তরের সবটুকু বিষ ঢেলে দিচ্ছে। কেবল কাছে আসাটাকেই যে অস্বীকার করছে এমন নয়, অনুতোষকে আততায়ী সাজিয়েছে। ছলে, বলে, কৌশলে সে

গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল লিমিটেড

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণ এবং সহৃদয় ক্রেতাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সরকারের নতুন মেট্রিক পদ্ধতি ওজন প্রবর্তিত হওয়ায় ১লা এপ্রিল ১৯৬২ হইতে আমাদের তৈয়ারী সমস্ত রুটীর নতুন ওজন অনুযায়ী বাজারে সমস্ত দোকানে এবং আমাদের ওয়াটারলু স্ট্রীটস্থ এবং হুগ মার্কেট গুলে নিম্নলিখিত রুটীগুলি মোড়কে পাওয়া যাইবে।

নতুন ওজনের বিবরণ

বড় রুটী	...	...	৪৫২ গ্রাম
মাঝারি ঐ	...	...	২২৬ গ্রাম
ছোট ঐ	...	...	১১৩ গ্রাম

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ—আমাদের কুপন বই কিনিলে কলিকাতার গ্রাহকদিগের জন্য নিয়মিত প্রাতঃরাশ সরবরাহ করা হয়। আপনি আপনার রুটি অনুযায়ী যে-কোন খাবার কুপনের পরিবর্তে পাইতে পারেন।

একখানি কুপন বই মাত্র ৮.১৫ নঃ পয়সা

আজই আপনি গ্রাহক হউন।

ক্রেতাদের সুবিধার জন্য আমাদের আরও একটি বিকল্প কেন্দ্র এসম্মানেডে শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল লিমিটেড

কলিকাতা-১

একটা নারীত্বের অবমাননা করেছে।
অমর্যাদা করেছে পবিত্র এক চিত্তের।

কিন্তু উপায় নেই। কোন উপায় নেই।
এ কথা কি করে অনুতোষকে রমা
বোঝাবে। একটা মানুষ কত নৃশংস হতে
পারে, কত হৃদয়হীন, রমার বাব তার
প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। দয়া, মায়া, মমতার
কোমল তন্ত্রীগুলো নির্মম হাতে অপ-
সারিত করেছেন। মানুষ নন, তীর একটা।
প্রতিহিংসা, একটা জ্বলন্ত কোভ সর-
কারি উকিলের পাশে বসে নির্দেশ দিয়ে
চলেছে।

এ বিবাহে আপনি যে আর্পিত
করেছেন, তার প্রমাণ?

আসামীর উকিল আর একবার দাঁড়িয়ে উঠলেন। তাঁর চেয়েও জ্ঞাজীর্ণ একটা এভিডেন্স এ্যাঙ্কের পাতা খুলে ষিড়-বিড় করে কি পড়ে গেলেন

ধর্মবিতার মাথা নাড়লেন। নাকচ
করলেন আপত্তি। রমার দিতে চোখ
ফেরালেন প্রশ্নের উত্তরের আশায়।

রমা নিশ্চল। পাথরের মতন অন-
ভূতিহীন। কানের পাশে হাজার শেলভার
গুঞ্জন ধ্বনি। কি এদের প্রশ্ন? কিসের
উত্তর এরা চায়?

সরকারি উকিল আবার প্রশ্নটা
বললেন। রমার দিকে চেয়ে।

সরকারী উকিলের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়েই রমার দৃষ্টি চেখ তার বাপের মৃত্যুর দিকে ন্যস্ত হ'ল। অগ্নি-বর্ষা' দৃষ্টি চোখ ইংগিতময়। দাঁত দিয়ে সবলে ঠোঁটটা চেপে ধরেছেন। দৃষ্টি বিছা-স্ন-কণ্ঠত।

কি একটা মনে করিয়ে দিচ্ছেন
রমাকে। এত দিনের, এত কষ্টে তালিম
দেওয়া সব কিছুর রমা বদলি বিস্মৃত
হ'ল।

মনে পড়ে গেল। একটু একটু করে সব কিছু। একজনের পীড়নের সব চিহ্ন আর একজনের বলে ঢালাত হবে, সেই নির্দেশই ছিল। নীল নীল দাগ, বাহু, মূলে, প্রাকোষ্ঠে, দৃ গড়ে। বিয়েতে আপত্তি করেছিল, যেতে চ্যানি বাসর-ঘরে, তাই নির্যাতন করেছে অনুভব।

দুটো হাত সামনের দিকে ক্রমা প্রসা-
 রিত করল। দেখুন ধর্মাবতার, সরা কোর্ট
 ঘরে জমট-বাঁধা লোকের দল চোশ ফেরাক
 এদিকে। একটা পদতন্ত্র দেবতার
 নির্মালাকে কিভাবে দানব হিন-ভিন

করেছে। কালিমালিপ্ত, সারা পৃথিবী
নিরীক্ষণ করুক।

এই যে, কথাটা বলেই রমা নিজের
হাতের দিকে চোখ ফেরাল, তারপর
অনেকক্ষণ আর চোখ তুলতে পারল না।

প্রকোষ্ঠে, বাহুমূলে অনেকগুলো
কালিশিটে। রক্ত জমে নীল হয়ে রয়েছে।
কিন্তু মণিবন্ধে লালচে একটা আঁচড়,
রম্মর সুগৌরব ত্বকে উষার রক্তিম আভা
নিরে ফটে উঠেছে। এ চিহ্ন কিন্তু অন্য-
লোকের। কাঠগড়ায় নিম্বেজ হ'য়ে পড়ে
থাকা মানুষটা সে রাতে কতকটা সজীব
ছিল, কতটা প্রাণবন্ত এ চিহ্ন তারই
নিরিখ।

মনে আছে রমার। সবটুকু মনে আছে।

খাটের বাজরু ধরে রমা চুপচাপ
দাঁড়িয়েছিল। একটু বৃষ্টির অনামনা।
বার কয়েক অনুতোষ ডেকেছে। রমা
শুনতে পারিনি। এই এসো। রমার হাতটা
চোপে ধরে অনুতোষ আকর্ষণ করেছে।
আকর্ষণটা বৃষ্টির একটু জোরই হয়ে
গিয়েছিল। হাতের চুড়িগুলো লেগে
অনেকটা কেটে গিয়েছিল। ক্ষতমুখে
বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ।

অনুতোষ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।
বলেছিল, ছি ছি, তুমি যে লেদ মেশিন
নও সেটা মনেই ছিল না। মিস্ট্রীর হাত
তো। বন্ড লেগেছে না?

তারপর আদরে সোহাগে ডুবিয়ে
দিয়েছিল রমাকে।

কই দেখান ধর্মাবতারকে। হাতটা
তুলে ধরুন। সরকারি উকিল গলা চড়াল।

হাতটা সন্তর্পণে তুলে, ধরতে গিয়েই
রমা কান্নায় ভেঙে পড়ল। মণিবন্ধের
লাল আঁচড়ের মতনই আরক্ত দৃষ্টি চোখে
দিকে তার নজর পড়েছে। আশ্চর্য, সে
দৃষ্টি চোখে ঘৃণা নয়, বিতৃষ্ণা নয়, বিরাগ
নয়, অপরিসীম ভালবাসা। অনেকদিন
আগের রমার জীবনের সবচেয়ে মোহময়
একটি রাতে খুব কাছে-আসা মানুষের
প্রেমাতুর দৃষ্টি দৃষ্টির প্রতিচ্ছায়া।

না, না, না, এ আমি পারবো না।
 নিজেকে ভেঙে এভাবে মিথ্যার পর মিথ্যা
 সাজাতে আমি পারব না ধর্মবিতার।
 আমার মজ্জায় মজ্জায়, তন্তুতে তন্তুতে
 যে মানবচোখ মিশিয়ে গেছে, তাকে অস্বী-
 কার করতে আমি পারব না। আমি
 স্বেচ্ছায় গেছি ওর কাছে, আমি নিবেদন
 করছি, তবে ও নিয়েছে আমাকে।

কাঠগড়ার কাঠামোটো বন্ধি নড়ে উঠল। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত শিলা চূর্ণ হয়ে একটা স্রোতস্বতীর কলধারা শোনা গেল।

কিংকো'র *
আণিকা *
 হেয়ার অয়েল
 প্রস্তুতকারক-কিংকো'র কলিকাতা



আরও মজবুত... আরও ভাল

পিতলের তৈরী
বার্নার্ টিউব

‘কিয়ান’ লন্টনে
‘স্পেশাল কোয়ালিটি’
গ্যাস মোছিয়া লইবেন।





সম্পূর্ণ লন্টন মোটা চাদরে
তৈরী ও লন্টনের নং কেয়োসিন
তৈলে নষ্ট হয় না।

কিয়ান লন্টন সর্বোৎকৃষ্ট



সেইসময়ই হন দাম এও কোঁঃ

২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা - ৯

ফোন-২২-৬৫৮০

নিকো বীজাণুনাশক সাবান পার্ক-ডেভিসের তৈরী

আপনার স্বক্কে পরিষ্কার ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং ফুস্কুড়ি, মেচেতা, ঘাঘাটি ও এধরনের অন্যান্য সংক্রামক চর্মরোগ থেকে মুক্ত রাখে। নিয়মিতভাবে শ্যাম্পু হিসাবে ব্যবহার করলে নিকো সারানের জীবাণুনাশক ফেনা মরামাস বা মাথার খুস্কির একটি ভাল প্রতিষেধক। সুপরিষ্কৃত জীবাণুনাশক গুণসম্পন্ন সাবান নিকো একই সঙ্গে তিন রকমের উপকার দেয়—পরিষ্কারক, বীজাণুনাশক ও চর্মরোগ প্রতিষেধক। প্রতিদিনই আপনার স্বকের প্রয়োজনীয় যত্ন নিন—নিকো দিয়ে।



ক্যাডার

নবীন

সংস্করণ

সংস্করণ

[উপন্যাস]

১১১

“গাড়ীখানি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে-ছিল। একখানি গো-শকটের পাশ কাটাতে গিয়া অকস্মাৎ একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং প্রায় পনেরো ফুট নীচে গিয়া উলটিয়া পড়ে। পাঁচজন আরোহীর তিনজন তৎক্ষণাৎ নিহত হন, বাকী দুইজন হাসপাতালে পৌঁছিব্যার পূর্বেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।”

বিহারের কোন দূর প্রান্ত থেকে সংবাদ। এতবড় খবরের কাগজটার খবর সামান্য অংশই জুড়ে আছে—তন্ন-তন্ন করে না খুঁজলে চোখেই পড়তে চায় না। প্রত্যেক দিনের অসংখ্য বড়ো বড়ো ঘটনার তরঙ্গের মধ্যে কয়েকটা কালো অক্ষরের বৃন্দ। যে হাজার হাজার মানুষ এই বাংলা খবরের কাগজটা পড়ে, তাদের কেউ ও নিয়ে এক মিনিটও মাথা ঘামাবে না। শুধু এই কাগজের পাঠকেরাই বা কেন, হাজারীবাগ জেলার যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে, চার দিন আগে-কার এই ব্যাপারটা এখন তাদের কাছেও পুরোনো হয়ে গেছে। ভাঙা মোটরটাকে হয়তো সারিয়ে নেওয়া হয়েছে, শ্রুতিকে গেছে রক্তের দাগ—যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তারাও আর এ নিয়ে এখন গল্প করে না।

খবরের কাগজে কয়েকটা অক্ষরের বৃন্দ হয়ে উঠে পাঁচজন মানুষ চির-কালের মতো অন্ধকারের সমুদ্রে মিশল। সুখ-দুঃখ মন্দ-ভালোর দায় মিটিয়ে বেঁচে গেল তারা। আর তাদের স্মৃতি স্বাদের বৃকের ভেতর রেখে গেল—

এইখানে প্রভাত সরকারের ভাবনাটা ধামল। পশ্চিমমুখো করে রাখা গাড়ী-

টার সামনের কাছে ধারালো রোদ এসে পড়েছে। বৃষ্টিহীন বৈশাখের রোদ। চোখ-মুখ-কপাল একসঙ্গে একটা হিংস্র দহনে জ্বালা করে উঠল তার। রোদটা হয়তো আসছিল অনেকক্ষণ থেকেই, কিন্তু প্রভাত সরকার এতক্ষণে তার অস্তিত্বটা অনুভব করল।

মোটর দুর্ঘটনা। সারা ভারতবর্ষে, এই কলকাতায়—প্রত্যেক দিন, প্রতি ঘণ্টায় ঘটে চলেছে হয়তো। মানুষ মরছে, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসছে, অক্ষম বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রভাত সরকারের তাতে কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। এই বৈশাখ মাসের বিকেল চারটের সময়, গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে সকালের বাসী-হয়ে-মাওয়া কাগজটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে সে-ও আরো দশজনের মতো ওই ছোট খবরটুকুর ওপর কৌতূহলহীন দৃষ্টি মাত্র এক মিনিটের জন্যে বুলিয়ে নিতে পারত। কিন্তু প্রভাত সরকার ওটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না—কোনো মোটর অ্যাকসিডেন্টের খবরই সে সহজে ভুলতে পারে না। কেবল বিকেলের রোদ নয়—আর একটা জ্বালা, আর একটা দুঃসহ দহন তার কপালের ওপর—কপাল ছাড়িয়ে তার মস্তিস্কের ভেতরে জ্বলতে থাকে। প্রভাত সরকার ভাবে, নিজের হাতে শেষ অ্যাকসিডেন্টটা না ঘটানো পর্যন্ত এই জ্বালার হাত থেকে তার পরিণাম নেই।

প্রায় এক ঘণ্টা আগে গিন্নী এবং দিদিমণি সামনের বড়ো দোকানটাতে ঢুকেছেন। কী সব কাপড়-জামা কিনবেন

তারা! তার মানে আরো একটি ঘণ্টার আগে তারা বেরুবেন না। কতী সঙ্গে থাকলে তবু একটু তাড়াতাড়ি হয়—কিন্তু কোনো ভরসা নেই না-মেয়ের বেলায়। রাত আটটায় দোকান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের পছন্দের পালা চলতে পারে।

কাগজটাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে, প্রভাত সরকার মাথাটা গাড়ীর দরজার দিকে এলিয়ে দিলে। রোদটা এখন আর সোজাসুজি মুখে পড়ছে না। পকেট থেকে তেলের রং-ধরা রুমালটা বের করে কপালের ঘাম মুছল একবার—তারপর আচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। পাঁচ-গলা পথের ওপর টায়ারের দাগ ফেলে চলা বড়ো বড়ো ডবল-ডেকারের আসা-যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তার দৃষ্টি আটকে রইল রাস্তার ওধারে সার-বাঁধা গাছগুলোর দিকে—যেখানে দুপুরের গরম হাওয়ার এখনো সমানে পাতা-ঝরানোর পালা চলছে।

ঘটনাটা ঘটেছিল চার বছর আগে। না—একটু বেশি। চার বছর দুই মাস। সেদিন অশ্বত্থের মেঘে আকাশ কালো হয়ে এসেছিল। তারপর নেমেছিল সেই বৃষ্টি—যে বৃষ্টিতে তিন-চার হাতের পরে আর হেড লাইটের আলো যেতে চায় না—উইন্ড-স্ক্রীনের ওপরে ওয়াইপার দুটো অসহায়ভাবে যেন ঝর্ণা ঝল রোধ কর-বার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে।

তার আগের দিন রাণীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। আর সেই বৃষ্টি-ঝরা সম্মত প্রভাত সরকার গাড়ী নিয়ে তাদের পেঁদে

দিতে যাচ্ছিল একুশ মাইল দূরের জংশন স্টেশনে।

কিন্তু সে গাড়ী আর স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

প্রভাত সরকার আবার সেই রুমালটা দিয়ে কপাল-মুখ মুছে ফেলল। বিকেলের রোদে লালচে আভা পড়ছে, তবু সমস্ত চৌরঙ্গী যেন কামারশালার মতো গনগনে তাপ ছড়াচ্ছে। প্রভাত সরকারের সেই পুরোনো বড়ো পুকুরটাকে মনে পড়ল। বৈশাখের আগুন-ঝরা দিনেও কী ঠান্ডা, কী গভীর তার জল।

সেই পুকুরে রাণী ডুবছিল।

সাঁতার জানত না তা নয়। অত বড় পুকুরটা এপার-ওপার করতে গিয়ে খুব সম্ভব পায়ে খিল ধরে গিয়েছিল। প্রভাত সরকার চলছিল একটু দূরের মাঠের পথ দিয়ে সাইকেলে চেপে। হঠাৎ পাঁচ-সাতটি মেয়ের চিংকার কানে এল তার : ডুবে যাচ্ছে—ডুবে যাচ্ছে—সাইকেলটাকে মাঠের ভেতর আছড়ে ফেলেই প্রভাত ছুটে এসেছিল ঘাটে। তারপর গায়ের জামাটা খুলে সোজা ঝাঁপ দিয়েছিল পুকুরে।

রাণী তখন একবার উঠছে, একবার ডুবছে। সন্ধ্যার কিশোরীরা ঘাটে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চিংকার করছে, সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়ার মতো সাহস কারো নেই। ভীরের বেগে জল কেটে প্রভাত সরকার এগিয়ে গিয়েছিল, মূঠোয় আঁকড়ে ধরেছিল খোলা চুলের রাশ। দু' মিনিটের মধ্যে টানতে টানতে ডাঙায় এনে ফেলেছিল।

ততক্ষণে অনেক লোক জড়ো হয়েছে এসে। প্রভাত কেবল বলেছিল, সামান্য জল খেয়েছে মাত্র, বিশেষ কিছু হয়নি। তবু একটু দেখুন মেয়েটিকে—তারপর জামাটা তুলে নিয়েই উদ্ভাসে ছুটেছিল—সাইকেলটা মাঠের মধ্যে পড়ে আছে তার।

পরের দিন সকালে ব্যাপারটা যখন তার মনেই নেই, চক্রবর্তী কোম্পানির আফিসে বসে যখন সে সপ্তাহের পেট্রোল আর মবিলের হিসেব করছিল, সেই সময় এলেন অমূল্য বাবু। এখানকার স্কুলের হেড মাস্টার। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স, চওড়া কালো ফ্রেমের চশমার আড়ালে শান্ত-গম্ভীর চোখ, পরনে খন্দরের ধূতি-পাঞ্জাবি-চাদর, হাতে ছড়ি।

প্রভাত ভদ্রলোককে চিনত। এখানকার দ্রামকুক্ষ মিশনে তাকে বক্তৃতা দিতে শুন-

ছিল একবার। ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে কী যেন তিনি বলেছিলেন অনেকক্ষণ ধরে—প্রচুর ইংরেজি আর সংস্কৃত আউড়েছিলেন সেই সঙ্গে।

প্রভাত তাঁর ছাত্র নয়, তবু তিনি ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

অমূল্যবাবু মিনিটখানেক কালো ফ্রেমের চশমার আড়াল থেকে গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন তাকে। তারপর সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার নাম প্রভাত সরকার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার মতো ছেলে আমি দেখিনি।

প্রভাত কথাটা বুঝতে পারেনি। বোকার মতো তাকিয়ে থেকেছিল তাঁর দিকে।

হেড মাস্টার বলেছিলেন, লোকে একটা ভালো কাজ করে তার পাঁচগুণ পাবলিসিটি চায়। তুমি তার উল্টোটী করে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে এলে? জানো, কাল সারাদিন খোঁজ-খবর করে মাত্র আজ সকালে আমি তোমার সম্বন্ধ পেয়েছি?

—মাপ করবেন, আমি ব্যাপারটা ঠিক—

আমি রাণীর বাবা। কাল তুমিই আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছ জল থেকে।

প্রভাত মাথা নীচু করল।

—আমি এখানে নতুন, মাসখানেক মাত্র এসেছি। কেউ আমাকে চেনেন না—আমার সঙ্গেও বিশেষ কারো—

অমূল্যবাবু কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকেছিলেন তার দিকে।

—দেশ বদলি এদিকে নয়?

—না, পাকিস্তানে। ঢাকায়।

—সেইজন্যই এত লাজুক। তুমি আমার মেয়েটাকে বাঁচিয়েছ সেজন্যে তোমায় কী বলে যে আশীর্বাদ করব জানি না। কিন্তু আর একটু কষ্ট তোমায় করতে হবে।

—বলুন।

—আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার বাড়ীতে তুমি আসবে—রাতে যা হোক দুটো খাবে ওখানে। না বললে শুনব না। আমার বাসা চেনো তো?

প্রভাত মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, সে চেনে না।

—চিনতে অসুবিধা হবে না। হাই-স্কুলটা দেখেছ তো? তার ঠিক উল্টো দিকেই হলদে রঙের একতলা বাড়ীটা। ঠিক সাতটায় তোমায় এক্সপেক্ট করব। মনে থাকবে তো?

বেতেই হয়েছিল প্রভাতকে।

ছোট সংসার। অমূল্যবাবু তাঁর স্ত্রী, বি-এ ক্লাশে পড়া তাঁর ছেলে অলকেশ আর স্কুল-ফাইনালের ছাত্রী মেয়ে রাণী—যার ভালো নাম সুস্মিতা।

অভ্যর্থনা, আশীর্বাদ, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া আর গালগল্প। প্রায়-রাত এগারোটা পর্যন্ত। এরই মধ্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত পরিচয় জেনে নিয়েছিলেন অমূল্যবাবুর স্ত্রী।

—কে আছেন তোমার?

—কাকা আছেন। এলাহাবাদে থাকেন।

—বাপ মা ভাইবোন?

—কেউ নেই।

—সে কি কথা!—বাড়ীশুদ্ধ সবাই একসঙ্গে চমকে উঠেছিলেন।

তখন নিজের কথাগুলো সব খুলে বলতে হয়েছিল। বাপ-মার একমাত্র সন্তান সে। দেশ ভাগ হওয়ার পরেও তাঁরা কয়েক বছর পাকিস্তানেই ছিল। তাঁরপর বাবাকে একটা রাজনৈতিক মামলায় জড়িয়ে দশ বছরের জন্যে জেলে পাঠানো হয়—তিন বছরের মধ্যে জেলেই মারা যান তিনি। সেবার সে ম্যারিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে। বাবার মৃত্যুর খবর আসবার কয়েক দিন পরেই মা আত্মহত্যা করেন। তারপর—

তারপর স্নোতের মুখে। কাকার ওখানে আর যায়নি—কারণ কাকা কুড়ি বছর দেশছাড়া। বাবা রাজনীতি করতেন আর জেল খাটতেন বলে সরকারী চাকুরে কাকা পাকিস্তান হওয়ার অনেক আগেই সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। প্রভাত সেখানে অনুগ্রহ চাইতে যেতে পারেনি। পাঁচ বছর এলো—মেলো ভাবে ঘুরেছে এদিক ওদিক; দু-একটা ছোটখাটো চাকরি জুটেছে আবার ছেড়েও গেছে। শেষ পর্যন্ত এই চক্রবর্তী মোটর কোম্পানিতে—

আরো অনেকের সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই। তবু অমূল্যবাবুর স্ত্রীর চোখে জল এসেছিল। আর অমূল্যবাবু বলেছিলেন, দাঁড়াও—দাঁড়াও—নিজের পায়েই দাঁড়াও। বী সেল্ফমেড।

আর রাত এগারোটার বিদায় নেবার সময় রাণী বলেছিল, আবার আসবেন কিন্তু।

—আসব।

সেই শব্দ। তারপর থেকে নিয়মিত আসা-যাওয়া। দিনের পর দিন—মাসের

পর মাস। আর সামনের ছোট গের্টটির পাশে দাঁড়িয়ে রাণীর চুপি চুপি বলা : তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না—কাউকে নয়।

সেদিন তাদের টিনের ঘরের মেসে, নড়বড়ে তক্তাপোশে শুয়ে—সারাটা রাত প্রভাত আর যুস্মোতে পারেনি। মাথার পাশের খোলা জানলা দিয়ে শরতের ঠান্ডা আসছিল, ভবু জানলাটাকে সে বন্ধ করতে পারেনি—কিছুতেই। মনে হয়েছিল—সারাটা আকাশ জুড়ে তারায় তারায় যেন বিয়ে-বাড়ীর আসর বসেছে—যেন ওদের ভেতর থেকে রাণীর দুটো লজ্জা-জড়ানো কোমল চোখ একভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বাইরে টপটপ করে শিশির বরিষছিল ধুলোয়—ভিজ়ে মাটি থেকে যেন চন্দনের গন্ধ আসছিল—বিশ্বীর ডাকে কে যেন গম্ভীর গলায় মন্ত্র পড়ছিল, বাইরে পাতায় পাতায় ভাঁজ-ভাঙা চেলির মতো খস খস করে আওয়াজ উঠছিল। ভিজ়ে মাটির গন্ধের সঙ্গে ভোরের প্রথম শিউলি ফোটার গন্ধ না আসা পর্যন্ত একটা অসম্ভব স্বপ্নের ভেতর তার রাত-জাগা চোখ দুটো মগ্ন হয়ে ছিল।

সেই রাতে—সেই কম্প-কামনা ভরা প্রহরগুলোতে একথা প্রভাত সরকারের কখনো মনে হয়নি রাণী—যার ভালো নাম সন্মিতা—সে হেড্‌ মাস্টারের মেয়ে। টাকা হয়তো বেশি নেই, কিন্তু অন্য সম্মান তাঁর আছে। আর তিন কুলে যার কেউ নেই—নিতান্তই স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে যে এই ছোট শহরটোতে এসে ভিড়েছে, চক্রবর্তী কোম্পানিতে যে একশো টাকা মাইনেতে হিসেব-পত্র দেখে আর ড্রাইভার না থাকলে কখনো কখনো গাড়ীও চালায়—তার সঙ্গে অমূল্য বিশ্বাসের আকাশ-মাটির তফাৎ। জানলা দিয়ে আকাশের যে তারাগুলোকে সে দেখেছিল, রাণী তার কাছে তাদের মতোই সুন্দর।

কিন্তু বয়েস তখন বাইশ বছর, আর বাইশ বছরের চোখে তখনো কৈশোরের রূপকথা। তখনো বিকেলের সোনালি আলোতে দূর রাজপুত্রীর সোনার চুড়ো দেখা যায়, তখনো অনেক রাতে বাড়ির হাওয়া দেখা দিলে মনে হয়, দরজার বাইরে কেশর-ফোলানো একটা মস্ত কালো ঘোড়া এসে পা ঠুকে ঠুকে গর্জন করে চলেছে; নদীর বুকের ওপর এক-খানা সাদা মেঘ হঠাৎ একটুখানি নীচু হয়ে এলে তখনো মনে হয়, ওই মেঘের ভেতর থেকে টপ করে কে যেন জলের

ভেতর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল—চাকিতের জন্যে দেখা গেল তার মুখখানা, তার গলায় দুলে উঠল মৃত্যুর হারের বলক, রিক-মিক করল দুটি হীরে-বসানো কাঁকন, তারপর নদীতে একটুখানি হাসির কল-ধ্বনি তুলে সে কোন্ অতলে মিলিয়ে গেল।

—ক্যাঁ-আঁ-আঁ-চ।

একটা ককশ তীব্র আওয়াজে চমকে চোখ তুলল প্রভাত সরকার। সে নদী নেই—মেঘ নেই—সেই হীরে-বসানো কাঁকনের বিদ্যুৎ নেই। বিকেলের রোদে জ্বলন্ত চৌরঙ্গী। পীচ-গলা পথে টায়ারের ছাপ, গরম হাওয়ায় পোড়া পেট্রলের গন্ধ।

হঠাৎ ব্রেক কবে একটা ট্যান্ডি দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার সামনেই ঠেলাগাড়ী নিয়ে একটা কালো কুঁজো লোক বোকার মতো দাঁড়িয়ে। লোকটার মাথার পাকা চুল আর গায়ের ঘাম রোদে জ্বলছে।

পাঞ্জাবী ট্যান্ডি ড্রাইভার গালাগাল দিচ্ছে অশ্রাব্য কটু ভাষায়।

—উল্লুক, গান্ধা, বৃদ্ধ, কাঁহাকা! এখনি যে জান চলে যেত।

প্রভাত সরকার সোজা হয়ে উঠে বসল। এখনি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছিল, একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছিল এই মনে হতেই। ট্যান্ডির ধাক্কায় ঠেলা কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ত আর কালো, কুঁজো ওই ক্রান্ত বৃদ্ধো মানুষটা সোজা চাপা পড়ত ট্যান্ডিটার তলায়। তৎক্ষণাৎ তার জীর্ণ পাজিরগুলো মড়মড় করে গর্দিয়ে যেত, জ্বলন্ত পীচের রাস্তার গরমে খানিকটা গরম রক্ত ধোঁয়া হয়ে আকাশে উড়ে যেত, খানিকটা বীভৎস মাংসের তাল কিছুক্ষণ পথের ওপর ছড়িয়ে পড়ে থাকত আর সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কালকের কাগজে একটা দু'লাইনের খবর

হয়ে যেত। দয়া করে খবরটা যারা পড়ত, এক মিনিটের বেশি তাদের মন সেখানে আটকে থাকত না। কিন্তু কিছুই হল না। একজন ট্রাফিক পুলিশ এগিয়ে এল, ঠেলাগুলার ঘাড় গোট দুই ধাক্কা দিলে, বোধ হয় আরো কিছু গালাগাল করল। খানিকটা পোড়া গ্যাসের উত্তাপ ছড়িয়ে বেরিয়ে গেল ট্যান্ডিটা। ড্রাইভার শেষ-বারের জন্যে গলা বাড়িয়ে বলে গেল, এইসেই মরতা হ্যাঁয় শালা লোগ! ট্রাফিক কনস্টেবল নিজের জায়গার ফিরে গেল আর তেমনি কুঁজো হয়ে গাড়ীটা ঠেলতে ঠেলতে ক্রান্ত পায়ে এগিয়ে চলল সেই বৃদ্ধো ঠেলাওলা, গলা-পীচের সঙ্গে তার ঘাম-ভেজা পায়ের ছাপ পড়তে লাগল পথের ওপর। যেন শেষ অ্যাক্সিডেন্টটা না ঘটা পর্যন্ত লোকটা ওই ভাবেই এগিয়ে চলতে থাকবে—যেন এই ওর নিয়তি!

লোকটা চাপা না পড়ায় যেন মনে মনে খানিকটা নিরাশ হল প্রভাত সরকার। আবার রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল, প্রান্তভাবে তাকিয়ে দেখল সামনের দোকানটার দিকে। দেড় ঘণ্টা হতে চলল, মা-মেয়ের বোরিয়ে আসার লক্ষণ নেই এখনো। রাত আটটায় দোকানের চাকর ঝাঁট দিয়ে বাইরে না ফেলে-দেওয়া পর্যন্ত হয়তো বেরুবেন না ওঁরা।

ডিমখানি ডাল বই
চালচিহ্ন
কালিদাস রায়
কুমারসম্ভব
অনুবাদ : কালিদাস রায়
মহান শিক্ষানায়কদের
শিক্ষাতত্ত্ব
চৌরমোহন স্বয়ংপ্রবৃত্ত
জ্যোতিষমিক পাবলিশার্স
কলিকাতা-২

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত বিশিষ্ট গ্রন্থ

রবিচ্ছবি ॥ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ৬.০০

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা

গীতবিতান পত্রিকা ৮.০০

সম্পাদক ॥ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

গীতবিতান ২৫বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫

রোদের খারটা একটু কমে এসেছে, একটা শিথিল অবসাদ এসে জড়িয়ে ধরেছে শরীর। প্রভাত সরকার চোখ বুজল। ট্যাক্সির রেক-কবার আওয়াজের সঙ্গে মিলিয়ে ওই রকম আর একটা শব্দ। প্যাঁচা ডাকছিল।

প্যাঁচা ডাকছিল গমোট অন্ধকারে। এক পশলা বাঁটির পর ভিজ়ে মাটি আর পাতার গন্ধ উঠছিল। সেই গেটটার পাশেই দাঁড়িয়েছিল রাণী। প্রভাত সরকার অপেক্ষা করছিল হাত তিনেক দূরে।

—প্রভাত শেষবার বলেছিল, চলো—পালিয়ে যাই দূরজনে।

—তারপর?

—যেখানে হোক জীবন শুরু করব আমরা। পৃথিবী অনেক বড়ো জায়গা—আমি দেখেছি।

—সে হয় না। আমি পারব না।

—তোমার সাহস নেই?

—না। বাবা-মাকে কষ্ট দিতে পারব না আমি।

—তবে আমাকে কেন তুমি আশা দিয়েছিলে? কেন বলেছিলে—

রাণী তার জবাব দিতে পারেনি। চৌদ্দ বছরের স্কুলের মেয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সতেরো বছরের কলেজের মেয়ে তাকে নতুন করে ভেবে দেখেছে আবার। চোখে তখন আর নতুন রং নেই—এসেছে সঁতর্কতা, দেখা দিয়েছে বিচার। সেদিনের কৃতজ্ঞ আবেগকে ছাপিয়ে উঠেছে হেড মাস্টারের শাস্ত-শাসন। রাণী জেনেছে জীবন জুয়ো-খেলবার জিনিস নয়।

প্রভাত সরকার না বুঝেছিল তা নয়। সে-ও জেনেছিল একটা মৃত্যু থেকে বাঁচানোই আর একটা মৃত্যুর ভেতরে ঢেলে নেবার অধিকার দেয় না। তবু অসম্ভব আশায় সে অপেক্ষা করেছিল।

—আমার জন্যে তোমার কষ্ট হবে না?

—হবে। কিন্তু—

কিন্তুটার কোনো জবাব নেই। রাণী কাঁদছিল। প্রভাত সরকার কাঁদতে পারেনি—কেবল মাথার ভেতরে ঝড়ো-হাওয়ার মাতামাতি শুনতে শুনতে সরে গিয়েছিল সেখান থেকে—যেন দু-চোখ বুজ়ে হাটতে শুরু করে দিয়েছিল। আজ সঙ্গে তার সাইকেলটা ছিল না—মনে হাঁছিল একটা নিরালোক-নির্জন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সে চলেছে।

কোনো লক্ষ্য তার সামনে নেই তার পথ কোনোদিন কোথাও আর শেষ হবে না।

রেল-লাইনে গিয়ে চলন্ত গাড়ীর সামনে পেতে দেবে গলাটা? একটা কাপড়ের ফাঁস পরে বলে পড়বে কোনো গাছের ডাল থেকে?

তবু আরো একটু বাকী ছিল। প্রভাত সরকারের জীবনে সব চাইতে বীভৎস কৌতুকটা অবশিষ্ট ছিল তখনো।

চক্রবর্তী বলেছিলেন, মথুরার কল রাত থেকে ভয়ানক জ্বর হয়েছে। গাড়ীটা নিয়ে তোমাকেই যেতে হবে।



“চলো—পালিয়ে যাই দূরজনে”

শেষ ভাবনাটার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের মা-কে মনে পড়ে গিয়েছিল। চালের আড়াটার সঙ্গে বাঁধা শরীরটা বুজছে। পিঠ বেয়ে নেমেছে ধূমাবতীর মতো রুদ্ধ চুল। প্রভাত সরকার কতদিন সে আতঙ্কটা ভুলতে পারেনি কত রাত অসহ্য দুঃস্বপ্নে সে জেগে উঠেছে ঘুম থেকে, তারপর আলো জেলে বসে থেকেছে চুপ করে—দু-চোখের পাতা বন্ধ করতে সাহস হয়নি।

আত্মহত্যা করেনি প্রভাত সরকার—কিছুই করতে পারেনি। শুধু একটা আহত জন্তুর মতো লুকিয়ে থেকেছে নিজের ভেতর—নিজের ক্রত লেহন করেছে। আর চক্রবর্তী কোম্পানির অফিসে বসে গাড়ীর তেলের হিসেব লিখতে লিখতে প্রত্যেকটা তারিখের সঙ্গে সঙ্গে রাণীর বিয়ের দিন গুণেছে।

প্রভাত সরকার চুপ করে থেকেছিল এক মিনিট। তারপরে বলেছিল, যাব।

না—আর কোথাও তার বাধা নেই। প্রভাত সরকার এখন সব পারে। কাল রাতে রাণীর বিয়েতে সে পরিবেশন করে এসেছে—এমন কি, আসবার সময় এক গ্লাস দুই-মিষ্টি খেয়ে আসতেও তার বাধেনি। স্বপ্নের ঘোরে কিছুদিন রাজ্যের সিংহাসনে বসেছিল, এখন আবার যথা-স্থানে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে নিজের তুচ্ছতার ভেতরে, অভ্যস্ত দীনতায়।

একশ মাইল দূরে জংশন স্টেশন। এখানকার ছোট লাইনের গাড়ী সেখানে যেতে প্রায় দু-ঘণ্টা সময় নেয়। বরষাদ্রীরা অবশ্য এখান থেকেই ট্রেনে উঠবে, গাড়ী বদল করবে জংশনে গিয়ে। আর বর-কনে, বরের কাকা আর ছোটভাই সোজা মোটরে

জংশন-স্টেশনে চলে যাবে—গিয়ে উঠবে বড় ট্রেনের রিজার্ভ-করা কম্পার্টমেন্টে।

বাড়ীতে যখন উলু, শাঁখের শব্দ আর কান্নার পালা চলছিল, তখন প্রভাত সরকার চুপ করে বসে ছিল মোটরের স্ট্রিয়ারিঙে মাথা গুঁজে। যা কিছু ঘটছে—তার সঙ্গে কোথাও তার বিন্দুমাত্র যোগ নেই। বর-কনকে নিরাপদে একুশ মাইল দূরের জংশন-স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে তার ছুটি। তারপরে যা খুশি করতে পারে সে। গাড়ীটা নিয়ে ছুটে যেতে পারে দিগ-দিগন্তে, আছড়ে পড়তে পারে নদীর জলে, যা খুশি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে। তখন আর কোনো দারিদ্র তার নেই—নিজের কাছে নয়, পৃথিবীর কাছেও নয়।

এক সময় বিদায়ের পালা শেষ হল। বর-কনে আর বয়ের ছোট ভাই উঠল পেছনে, কাকা এসে বসলেন তার পাশে। প্রভাত সরকার পেছন ফিরে তাকিয়েও দেখল না—যোমটার আড়াল থেকে রাণী তাকে চিনছে, পারল কিনা তাও সে জানতে চাইল না।

কাকা তাকে বললেন, চলো হে ড্রাইভার, আর দেরী করলে—

ড্রাইভার! একবারের জন্যে মাথার আগুন জ্বলল, মনে হল চিংকার করে ওঠে : আমি ড্রাইভার নই, ভদ্র ভাবায় কথা বলুন। কিন্তু প্রভাত সরকার জবাব দিল না। শাঁখের আওয়াজ, উলু আর মেয়েলি কান্নার ঘূর্ণির মধ্যে গাড়ীতে স্টার্ট দিলে সে। হেড-ল্যাম্পের অমূল্য বিশ্বাসের বাড়ীর সীমানা কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেক পেছনে সরে গেল।

শহর পেরিয়ে শহরতলী। তারপরে মাঠ, বন, জলা, ছোট-বড়ো গ্রাম। কিন্তু মাইল পাঁচেক এগোতেই দেখতে দেখতে ধোঁয়াটে কালো মেঘে ছেয়ে গেল পশ্চিমের আকাশ।

কাকা বললেন, বৃষ্টি আসবে নাকি?

জবাব এল মাঠের বৃক থেকে ছুটে-আসা এক ঝলক দূরন্ত হাওয়ায়। পশ্চিমের ধোঁয়াটে কালো মেঘ চক্ষের নিম্নে দক্ষিণে-পূর্বে-উত্তরে ছড়িয়ে পড়ল। নারকেল গাছের সারি নূয়ে পড়ল হাওয়ার বেগে, ধুলোয় অন্ধকার হল চারিদিক, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল।

সামনের উইন্ড-স্ক্রীনের ওপর দিয়ে যেন ঝর্ণার ধারা নামল। ওয়াইপার দুটো অসহায়ভাবে ক্রান্ত বাদুড়ের মতো এক-

তানা ডানা নেড়ে চলল—কিন্তু চোখের দৃষ্টি কিছুতেই সামনে এগোতে চায় না। আকাশ-ভাঙা ঝর্ণার ধারা এই মূহুর্তে জলপ্রপাত হয়ে উঠেছে যেন।

কোথাও গাড়ীটা দাঁড় করানো দরকার—কিন্তু দুধারে দীর্ঘ গাছের সারি ঝোড়ো হাওয়ায় পাগল হয়ে উঠেছে। এখানে দাঁড়ানো নিরাপদ নয়—যে-কোনো সময় গাছ ভেঙে পড়তে পারে গাড়ীর ওপর। আর একটু এগিয়ে কোনো ফাঁকা জায়গা দেখে—

কিন্তু সে সন্যোগ আর সে পেলো না।

এক মিনিটের মধ্যেই ঘটল ব্যাপারটা। স্ট্রিয়ারিঙের শাসন অস্বীকার করে পিছলে গেল গাড়ীর চাকা এবং তারপরে—একটা প্রকাণ্ড জামগাছ সেই বৃষ্টির ভেতর যেন দৈত্যের মতো গাড়ীটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গাড়ীর জামতব অন্তিম হাহাকার আর মানুষের আতর্নাদ ঘূর্ণির মতো জেগে উঠল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আর—

আর, পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হল।

শুধু দু-জন বেঁচেছিল সেই দুর্ঘটনার। প্রভাত সরকার আর রাণী। যেন প্রভাতের মনের সমস্ত হিংসা সেই দুর্ঘটনার রূপ নিয়ে দু-জনের ভেতরকার সমস্ত বাধা মুছে দিয়েছিল। তারপর উদ্ভাস মস্তুর আনন্দে রাণীর হাত ধরে সে ছুটে বোরিয়ে পড়তে পারত—বলাতে পারত, এইবারে ভূমি আমার—আর কেউ আমার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

কিন্তু রাণীকে পায়নি প্রভাত সরকার—সেই অ্যাক্সিডেন্টের ভেতর দিয়েই সে তাকে হারিয়েছে চিরকালের মতো। রাণী আজ কোথায় আছে—কী ভাবে আছে সে জানে না। শুধু এ-কথা জানে, পৃথিবীতে রাণীই সব চাইতে ঘৃণা করে তাকে। রাণীর কাছে আজ সে খুনী ছাড়া আর কিছুই নয়। অ্যাক্সিডেন্টটা আপনা থেকে ঘটেনি, সেই-ই ঘটিয়েছে। তার বিকৃত মনের অন্ধকার থেকে কখন বোরিয়ে এসেছে ঘাতক, ইচ্ছে করেই গাড়ীটাকে নিয়ে আছড়ে ফেলেছে গাছের গায়ে—বিস্ময়ের পরদিনই রাণীকে বিধবা করে সে তার কুৎসিত বীভৎস প্রাতিশোধ নিয়েছে।

আজ এতদিন পরে প্রভাত সরকার ভাবে—সত্যিই কি সেদিনের দুর্ঘটনার ওপরে তার কোনো হাত ছিল না? চেষ্টা করলে গাড়ীটা বাঁচানো কি একান্তই অসম্ভব ছিল? সে কি সত্যিই হত্যাকারী? এমনি একটা কিছু ঘটানোর

জন্যেই কি কালো আকাশটার মতো একটা ভয়ঙ্কর প্রস্তুতি চলছিল তার ভেতরে?

এই প্রশ্নটার উত্তর মেলে না। মাথার ভেতরে যেন কতগুলো বিবাক্ত পোকা এসে বাসা বেঁধেছে—তারা তাকে কখনো কখনো অসহ্য দংশনে পাগল করে দেয়। কল-কাতার পথে ট্যান্সির শাসন মেনে নিরু-ত্তাপ স্তিমিত ভাবে গাড়ী চালাতে চালাতে একটা হিংস্র কামনা কখনো কখনো তাকে পেয়ে বসে—ইচ্ছে করে তার সর্বশেষ বীভৎস অ্যাক্সিডেন্টটার মধ্য দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যাব সে।

নীচের ঠোঁটে দাঁতের একটা ভীক্ষু চাপ পড়তে প্রভাত সরকার জেগে উঠল।

দোকানটা থেকে মা আর মেয়ে বোরিয়ে আসছেন এতক্ষণে। ছোট-বড়ো প্যাকেটের বোঝা নিয়ে দুটি ভারবাহী জম্বুর মতো এগিয়ে আসছেন গাড়ীর দিকে।

একবারের জন্যে প্রভাত সরকার বীভৎস মুখভঙ্গি করল একটা—ডাম্পার নেমে পড়ল গাড়ী থেকে। ওঁদের একটু সাহায্য করা দরকার। (ক্রমশঃ)

এই সকল পরম্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

লিবে কালি শুক্লরঙ্গ স্ফ, ক্রিত্ত্ব কাশ্মীর প্রত উল্লস।

রঙের স্বকণ্ড গভীরতা, চিত্র অরবৎ লেখ্য এগিয়ে চল।

লেখ্য গুর-পুস্তক স্বরঙ্গ স্ফ, অস্ত্র কলম পরিষ্কার রং।

সুলেখা কালি

শ্রী কলম কারপে না হলেও স্বকণ্ড এই তারপরেই সুলেখা স্বরঙ্গ স্বকণ্ড বিস্তারের পৌর স্বকণ্ড করেছ।



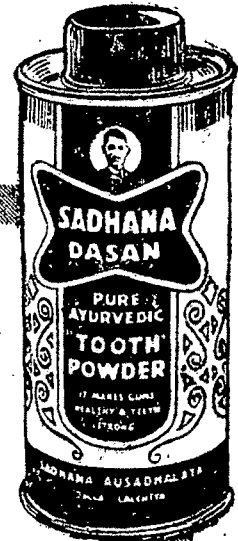
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

কলিকতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাস

মুখের দুর্গন্ধ অতি অপ্রীতিকর



মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে সমাজে
অবাধ মেলামেশা করা যায় না।
কাজেই ইহা অনেকের জীবন
দুঃখময় করে। প্রতিদিন সাধনা
দশন ব্যবহার করিলে মুখের
দুর্গন্ধ দূর হয়, মুখ জীবাণুমুক্ত
হয় ও দন্তরাজি হৃদ্ব, সুবল
ও সুন্দর হয়।



সাধনা ঔষধালয় - ঢাকা

২০৬নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা-৬

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর

কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ—ডী. বোগেনস্ট্রোম বোম, এম. এ. আর. ব্রহ্মচন্দ্রশাস্ত্রী

এম. সি. এস. (কিওনা) এম. সি. এস. (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র বোম,

এম. বি. বি. এস. (কিঃ) স্নায়ুর্বেদবিদ।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার মান্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১১. কুড়ি ১১

সাতটি পাহাড়ের ওপর মস্কো নগরী আজ প্রসার লাভ করেছে। এদের মধ্যে একটি হল ক্রেমলিন, আরেকটি লেনিন পাহাড়। এদের যদি পাহাড় বলা তবে আমাদের দেওঘরের সেই ক্ষুদ্র নন্দন পাহাড় দোষ করল কোথায়? সুতরাং এসব পাহাড় ৪০।৫০ ফুট উঁচু হবে কিনা সেটি মেপে দেখতে হয়। উরল পর্বতশ্রেণীর এত নামডাক, কিন্তু তা'রা পর্বত নয়, কেননা আমাদের গয়া, হাজারিবাগ, কোড়ারমা বা রাঁচি অঞ্চলে যে পাহাড়গুলি দেখি, উরল পর্বত প্রায় তার কাছাকাছি। বিহার রাজ্য অতিক্রম করার কালে যারা পরেশনাথ পাহাড়টিকে দেখেছেন, তাঁরাই বুঝবেন, যদি আমি বলি, উরল পাহাড়ের শ্রেণী উচ্চতায় পরেশনাথের আধাআধি। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রকৃত পর্বতশ্রেণী হল দক্ষিণে পামীর, তিয়েনশানের একটি অংশ, এবং ককেশাস পর্বতমালা। কিন্তু অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে বহু, ব্যাপক এবং আদি-অন্তহীন সমতল, তার তুলনা পৃথিবীতে নেই।

ওই সাতটি পাহাড়ের একটি হল ক্রেমলিন। টোলিন আমলে ক্রেমলিনের প্রাকার-তোরণ পেরিয়ে একটি মাছিও ভিতরে ঢোকেনি। আজ ক্রেমলিনের ভিতরকার বড় বড় বাগান এবং বহু প্রাচীন গির্জাগুলি জনসাধারণের অবারিত ক্ষেত্র। আমার নিজের নানাবিধ কৌতূহল ও উৎসুক্য থাকার জন্য বার আশে ক্রেমলিনের মধ্যে ঢুকতে হয়েছিল। ক্রেমলিনের বাগানে দাঁড়িয়ে এখন ছবি তোলা চলে, এবং সরকারি প্রাসাদগুলি ও মিউজিয়ামের ভিতরে প্রবেশকালে হয় পাস, নয়ত 'অনুমতি' দরকার।

ক্রেমলিন শব্দটির বাংলা আমি জানিনে। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি এর নাম ছিল 'মস্কো দুর্গ'। মস্কো, মস্কোয়া, মাস্কোভি—এ নামগুলি রুশীয় নয়, এগুলি ফিনল্যান্ডের কাছে

পাওয়া। 'মস্কো দুর্গ' বা ক্রেমলিন রুশ-সংস্কৃতিকে ৮০০ বছর ধরে বহন করে আসছে। পুরাকালে ক্রেমলিনের অনেকাংশ ছিল দারুণ। কিন্তু এই দুর্গে আগুন জ্বলেছে অনেকবার—যখন এর প্রাকার তৈরি হয়নি। তাতার, মোগল, হুন—এরা আগুন জ্বালিয়েছে বার বার, ছারখার করে গেছে ক্রেমলিন। এদের মধ্যে কেউ-কেউ সিংহাসনে বসে গায়ের জোরে রাজ্যপাটও চালিয়েছে। মুসলমানের আক্রমণও এককালে রোধ করা যায়নি, আজও অগণিত সংখ্যক মুসলমান রয়েছে মস্কো-লেনিনগ্রাড এবং রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে। প্রতি শতাব্দীতে ক্রেমলিন ক্রমাগত নতুন-নতুন করে তৈরি হয়েছে। একবার ভেঙেছে, আবার গড়েছে। এমনি করে চলে গেছে অনেক কাল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে সেন্ট ল্যাজারাস নামক যে গির্জা নির্মাণ করা হয়, সেটি আজও রয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অপর একটি অতি বহু গির্জা নির্মাণ করেন জনৈক ইতালীয় স্থাপত্যবিদ 'আরিসটটল ফিয়ারাবলি'—এটি প্রাচীন রুশ স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন, এবং এটির নাম 'উসপেনস্কি ক্যাথড্রাল'। এই গির্জার মধ্যে ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত কলাবিদ্যার নানা উপকরণ সংরক্ষিত। শব্দ, চিত্রশালা নয়, ঐতিহাসিক সামগ্রীর সংরক্ষার দিক থেকে সম্রাট

আইভান-দি-টেরিবল্ যে দারুনীর্ঘ সিংহাসনে বসতেন, সেটিও রয়েছে। পর-বর্তীকালে প্রত্যেক জার-সম্রাটের অভ্যেকস্থল হয়ে এসেছে এই 'উসপেনস্কি' ধর্মমন্দির। এই ধর্মমন্দিরের কঠোর এবং নিম্ন শাসন রুশীয় সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে এতকাল। রুশ ধর্মসমাজের সঙ্গে মিলিয়ে এখানকারই 'হোলি সাইনদ' থেকে মহামতি টলষ্টককে 'ধর্মচ্যুত' ঘোষণা করা হয়! লেনিন সেদিন রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, "জনসাধারণের হাতে এর প্রতিকারের দায়িত্ব তোলা রইল! তারাই সেদিন এই অবমাননার বিচার করবে!"

বিচার তিনিই করেছিলেন। ক্রেমলিনের গির্জাগুলি এখন বাদুঘরে পরিণত!

দ্বিতীয় প্রধান গির্জাটি হল 'গ্র্যান্ড আর্কাঞ্জেল ক্যাথড্রাল'। এটিও আরেকজন ইতালীয়ন স্থাপত্যবিদ 'আলোভিস নোভি-র' পরিচালনায় নির্মাণ করা হয়। এটির অভ্যন্তরভাগ প্রাচীন ইতালীয় স্থাপত্যকলার পরিচয় দিচ্ছে। এই গির্জার মাটির নীচে আজও বহু সম্রাট, সম্রাজ্ঞী এবং রাজপুত্র-কন্যাগণের মৃতদেহ নিহিত রয়েছে। রাজপরিবারের নরনারীরা যে গির্জাটিতে প্রার্থনা করতেন, সেটির দাঁতভাঙা নাম—'ভ্যাগোভেশচেনস্কি'। এটি অনাগুলির চেয়ে ঈষৎ ক্ষুদ্রকার। কিন্তু এই ধর্ম-

প্রবোধকুমার মান্যাসের উপন্যাস

মনে রেখ

জীবনে মতটুকু শৃঙ্খল ততটুকুই কি পরমাণু তার স্মৃতির? জীবনশিখের একটি ভাষ্যপূর্ণ বস্তুর মধ্যেই যেন 'মনে রেখ' উপন্যাসের সমূহ কাহিনীর সমুদয় নর-নারীর সুখ-দুঃখের সুরমূর্ত্তি। মনে রাখার মতো কতো প্রেম কতো প্রবঞ্চনা কতো সিদ্ধি কতো ব্যর্থতা সবই যেন 'অনিবার' একান্তে এক নিরবচ্ছিন্ন জীবনপ্রবাহের অমৃতসংগমে সম্মিশ্রিত। 'মনে রেখ' উপন্যাসের গঠনশৈলীতে স্বনামধন্য প্রবোধকুমার নতুন রীতি ও নতুন স্বাদের এক আশ্চর্য স্বাক্ষর রেখেছেন। লাম : সাড়ে ছয় টাকা।

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রীট : কলিকাতা।

মন্দিরের ভিতরভাগ অমলা রত্নরাজির
ম্বারা খচিত। চারিদিকে ধর্মচিত্রের মনো-
রম দৃশ্যাবলী। বহু মূল্যবান এবং বহু-
বিচিত্রবর্ণ পাথরের কাজ সমস্ত মন্দিরের
উপর আন্তর্গত। সম্পদের, প্রাচুর্যের এবং

বর্ণাঢ্যতার এমন আশ্চর্য সমারোহ ক্রটিং
চোখে পড়ে।

এর পর ক্রেমলিনের বাগানে এসে
দাঁড়িয়ে সর্বাপেক্ষা যে উচ্চ গম্বুজটি
দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হল পঞ্চদশ
থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি
আইভান-দি-গ্রেট আমলের ২৭০ ফুট
উঁচু 'বেল-টাওয়ার', অর্থাৎ ঘণ্টা-
গম্বুজ। 'পেট্রক মালি' নামক এক
স্থাপত্যবিদ ১০ বৎসর কাল ধরে এই
বেল-টাওয়ারটি নির্মাণ করেন। মাটির
তলায় ১২৫ ফুট নীচের থেকে পাথরের
ভিত গেঁথে এই টাওয়ার নির্মাণের কাজ
চলে। বিশালকায় যে লোহার ঘণ্টাটি
বাগানের উপর আজ ভাঙা অবস্থায়
পড়ে রয়েছে, এটি ছিল ওই গম্বুজের
উপর বসানো। এটি নাকি পৃথিবীর
সাতটি 'আশ্চর্যের' অন্যতম।

প্রথম আমলে এই অতিকায় ঘণ্টা
বৃষ্টি ঝোলানো থাকত এক দানবাকার
কাঠের ফ্রেমে। রুশরা সাধারণতঃ একটু
খর্বকায়, বোধ হয় সেইজন্যই বৃহৎ এবং
বিশালতার প্রতি রুশপ্রকৃতির চিরকালের

একটা কোঁক দেখা যায়,—এই ঘণ্টা তার
সাক্ষ্য। এটির ওজন প্রায় ২০০ টন। এটি
২ ফুট পুরু এবং ১৯ ফুট উঁচু। যে
ভাঙা টুকরোটি এর পাশেই পড়ে
রয়েছে, সেটির ওজন ৬ টন। অদূরবর্তী
যে বেল-টাওয়ারটির নির্মাণকার্য আরম্ভ
হয় চতুর্থ আইভানের আমলে, সেটির
কাজ শেষ হয় 'রোরিস গডুনভের'
রাজত্বকালে। এই বেল-টাওয়ারের রয়েছে
২২টি বড় এবং ৩০টিরও বেশি লোহ-
ঘণ্টা। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এটির নির্মাণ
শেষ হয়। সে যাই হোক, ১৭৩৭
খৃষ্টাব্দে দারুময় মস্কোতে যে সর্বব্যাপী
অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তার ফলকে পূর্বোক্ত
অতিকায় ঘণ্টার ফ্রেমটিতে আগুন লাগে।
ফলে, এই ঘণ্টা ছিটকে গিয়ে পড়ে
নিকটবর্তী প্রকাণ্ড এক গহবরে, এবং এর
বিপুল পরিমাণ ওজনের সংঘাতে একটি
টুকরো ভেঙে পড়ে! কিন্তু প্রাচীন
স্থাপত্যরক্ষাধর্মী রুশ জাতি তাদের এই
পূরনো 'সম্প্রদায়িক' বস্তুটির দুর্দশা
সহ্যে না পেয়ে এই গহবরটিতে জল
ঢেলে ঠান্ডা করতে থাকে। পরবর্তী যুগে
নেপোলীয়নের সেনাদল যখন ক্রেমলিনে
আগুন লাগায়, তখনও এই ঘণ্টাটি বেঁচে
যায়। এটি যেন রুশ জাতির কঠিন
প্রাণের সাক্ষ্যস্বরূপ। ওরা অত্যন্ত
রক্ষণশীল, কোনও সামগ্রী ফেলতে
চায় না!

জার সম্রাটগণের আমলে ক্রেমলিনের
প্রাসাদগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য ও
স্থাপত্য-শিল্প যারা অধিকাংশে রচনা
করেছেন তাঁরা বাইরের লোক। সাহিত্য ও
চারুকলায় রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের সুনাম
ছিল, কিন্তু ইতালী ও ফ্রান্স হল
রাশিয়ার ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের গুরু।
ক্রেমলিন প্রাসাদগুলিতে ইতালীয়
ভাস্করের কাজ বোধ হয় সর্বাপেক্ষা
বেশি। সোভিয়েট আমলে ভাস্কর্যকলা
ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেকে
মেলতে চেয়েছে। কিন্তু যেটুকু তার
রসোত্তীর্ণ রূপ, সেটুকু এসেছে প্রাচীরের
অনুকরণে। সোভিয়েট নির্মাণকার্যে
বিশালতা এসেছে, প্রবলতা এসেছে,
স্পষ্টতর ব্যঞ্জনা এসেছে,—কিন্তু সূক্ষ্ম
অঙ্গগুলির সেই সৌন্দর্য-সংবেদনটি নেই,
লাবণ্যের সেই ললিত প্রকাশটি যেন
হারিয়েছে! একথাটি স্পষ্ট, ক্রেমলিন
প্রাসাদগুলির নির্মাণকালে ইতালীয়
স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যটি না থাকলে
এগুলির আভ্যন্তরীণ চেহারা এমন
সৌন্দর্যমন্ডিত হতে পারত না। 'গ্রানো-
ভিটায়া প্লাটা, গোল্ডেন জারিসিনা

WE SELL IN CASH OR ON INSTALMENTS
big Varieties of:-
RADIO SETS
RADIO GRAMS
ELECTROGRAMS
TRANSISTOR RADIOS
PHILIPS
TAPE RECORDERS
RECORD PLAYERS
L. P. RECORDS
RADIO PARTS ETC.
RADIO & PHOTO STORES
65, GANESH CH AVENUE
CALCUTTA-13
24-4793 Gram-Transistor

মাথা ধরা, সর্বপ্রকার ব্যথা ও বেদনা,
সর্দি-অর, ইনফ্লুয়েন্সা প্রভৃতিতে

নিরাপদ
নিশ্চিত ও
দ্রুত
আরামের জন্য

এলজিও

৫ টি কার্যকরী
উপাধানে
প্রস্তুত

বেঙ্গল ইমিউনিটির ভৈরী



প্লাটো, এবং টেরেন্স প্রাসাদ—এগুলিই বর্তমানে 'গ্র্যান্ড ক্রেমলিন' প্রাসাদের অন্তর্গত ইতালীয় শিল্পসৃষ্টির সাক্ষ্য দেয়। এই 'গ্রানোভিটারা' এককালে জার-আমলে রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনার প্রধান স্থান ছিল, এবং রুশসম্রাট-পরিবার যখন পিটার্সবার্গ থেকে মস্কোয় আসতেন, তখন এই প্রাসাদেই তাঁদের বসবাসের আয়োজন করা হত। বর্তমানে এই প্রাসাদের বিশাল এবং বিস্তৃত কক্ষে সুপ্রীম সোভিয়েটের, পার্টি কংগ্রেসের এবং নিখিল সোভিয়েট লেখক-কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই সুবৃহৎ সোভিয়েট পার্লামেন্ট ভবনের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে চারিদিকে যে ওক, ওয়ালনাট, শেগুন প্রভৃতি কাঠের মনোরম কাজ দেখেছিলুম, সেটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

সোভিয়েট আমল ক্রেমলিনের ঐতিহ্যের পক্ষে নতুন। সেই ঐতিহ্যে ছিল প্রাচীরের সুযম ধারাবাহিকতা। তারা একে একে পাশাপাশি জায়গা পেয়ে বসে গেছে, কারো সঙ্গে কারোর বিরোধ ঘটেনি। কেউ সেখানে 'উটকো' নয়। সোভিয়েট আমল সেখানে গায়ের জোরে এসে জায়গা জুড়ে বসেছে বটে, কিন্তু নিজেকে মেলাবার জন্য সঙ্গতিবদ্ধতার প্রয়াস পেয়েছে। 'গ্র্যান্ড ক্রেমলিন প্যালেস'—যেখানে 'অক্সো-এশিয়ান' ও ভারতীয় লেখকগণকে অভ্যর্থনা করা

হয়েছিল, সেখানে যেদিন একাকী এসে এদিক-ওদিক চেয়ে দাঁড়ালুম—সেদিন বিশ্বাস করেছিলুম, ক্রেমলিনের প্রাচীর এবং ঐশ্বর্যময় সংস্কৃতি সোভিয়েট আমলে অধিকতর শোভার বলমূল করে উঠেছে! যে-বৈশ্ববিক চেতনা ও চিন্তা বাইরে দেখে বেড়াছি, এখানে এসে সেই চেতনা সংযত, শোভন ও সুন্দর হয়েছে। জারের গোষ্ঠীর হয়ত কেউ আজ বেঁচে নেই, কিন্তু সেকালের অভিজাত এবং উচ্চ সংস্কৃতিবান ধনী-গোষ্ঠীর বংশ-পরম্পরা হাওয়ায় মিলিয়েও যায়নি! তারাই রয়েছে আজকের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে, তারাই রয়েছে সকল প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকেন্দ্রের উচ্চ শীর্ষে—তাদের উচ্চশিক্ষা, বিদ্যা, মনীষা, সুবৃদ্ধি-বোধ—নতুন ক্রেমলিনকে সৃষ্টি করেছে! কমিউনিস্ট পার্টির সকলেই 'ভুইফোঁড়', একথা মনে নিতে বাধে।

সমগ্র ক্রেমলিন এবং প্রত্যেকটি ক্যাথিড্রাল আজও বাইবেলের বহু চিত্রিত গল্পে পরিপূর্ণ। বাইবেল সংক্রান্ত প্রত্যেকটি খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ, প্রত্যেক মহাপুরুষ বা সেইস্ট, খ্রীশ্বখৃষ্ট ও মাতা মেরী, জ্যোতির্মন্ডলীযুক্ত ধর্ম-প্রচারক খৃষ্ট, দু'হাজার বছরের খৃষ্ট-ধর্মের গতি-প্রকৃতি ও অনুশাসন, ধর্মসভা ও প্রচারের বহুবিধ ঘটনাবলী—আগাগোড়া আজও ক্রেমলিনের প্রায়

প্রত্যেক প্রাসাদে, দেওয়ালে, সীলিংয়ে, বিবিধ রত্নখচিত ঐতিহাসিক সামগ্রীতে হয় খোদিত, না হয় চিত্রিত। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়ানোর কালে এটি প্রত্যেক দর্শকের মনে হতে পারে, মিঃ খৃষ্টচন্দ্র যেখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিরীশ্বর ও নাস্তিক্যবাদী বলে প্রায়শই ঘোষণা করে থাকেন, ঠিক সেইখানে সেই ক্রেমলিনে তিনি চারিদিকের খ্রীশ্ব-খৃষ্ট, মাতা মেরী, খৃষ্টধর্ম এবং বাইবেলের বিবিধ অনুশাসনের দ্বারা 'পরিবৃত'! ক্রেমলিনের ভিতরে গিয়ে ঘুরে, বেড়ানোর অর্থ, খ্রীশ্বখৃষ্টের জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে তাঁর সমগ্র জীবন, ক্রীশ্বখৃষ্টের জন্মস্থান হওয়া, তাঁর পুনর্জন্ম, খৃষ্টধর্মের জয়যাত্রার কাল প্রভৃতির মধ্যে বাস করে আসার মতো! বিগত ৪৫ বৎসর কালের ভিতরে সোভিয়েট কৃষ্ণ-পক্ষ নিজস্বগণকে 'নাস্তিক' বলে ঘোষণা করে অগণিত সংখ্যক ষড়যন্ত্রী ধর্ম-যাজককে ঠেংগিয়ে মেরেছেন এবং তার ফলে খৃষ্টীয় ধর্মমন্দির এবং খৃষ্টান-সভাভা সমগ্র ফেডারেটেড রাশিয়া, উক্কাইন এবং অন্যান্য অঞ্চলে নতুন চেহারা দাঁড়িয়ে উঠেছে! আমার ধারণা, নিরীশ্বর ও নাস্তিক্যবাদ হল সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি সাময়িক চিন্তাবিকার, কেননা ভিতরে-ভিতরে মর্মান্বহণের মধ্যে যে ধর্মভীরুতা ও মানবতাবাদ লক্ষ্য

সদ্য প্রকাশিত

প্রখ্যাত শিল্পী দেবব্রত মুনোপাধ্যায়ের

রূপ-কথা

আমাদের দেশের ষত মঠ, মন্দির এবং গৃহের অনিবচনীয় শিল্প-সুসমা, রোমাঞ্চকর নির্মাণকৌশল আর অলৌকিক কীর্তি-কাহিনী ও কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত অপূর্ণ রূপকথা। পাতায় পাতায় ভারতের ঐতিহ্যবাহী রেখাচিত্রের সমারোহ। ছোটদের জন্য লেখা হলেও এ এই সকলের পড়বার।

[দাম আড়াই টাকা]

ছোটদের
ভালো ভালো গল্প
দিয়েছেন : বনফুল
শিবরাম চন্দ্রবতী
হেমেন্দ্রকুমার রায়
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
[প্রতিটি দুই টাকা]

সোভিনীয়
কিশোর রচনা সংকলন
প্রণাম নাও
[দাম চার টাকা]
গল্প সংকলন
আহ্লাদে আটখানা
[দাম তিন টাকা]

শ্রী প্রকাশ ভবন

এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২

শ্রেষ্ঠ শিশু ও কিশোর সাহিত্য

কয়েকখানি ভালো বই

প্রেমেন্দ্র মিত্র	ডানমতীর বাঘ	২.০০
প্রবোধকুমার সান্যাল	বিচিত্র এ দেশ	২.৫০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	ডাকাতের হাতে	২.৫০
বৃন্দাবন বসু	হার্মেলিনের বাঁশিওয়া	২.০০
বৃন্দাবন বসু	এলোমেলো	২.০০
মণিলাল অধিকারী	লাল শতখ	২.০০
বিশ্বনাথ দে	মেঠাইপুত্রের রাজ্য	১.৬০
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ল্যাম্পোস্তের বেলুন	২.০০
সুখ মিত্র	দুরাস্তের ডাক	২.০০
ডাঃ শচীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	পায়ে পায়ে মরণ	২.০০
স্বদেশরঞ্জন দত্ত	দাঁদা গচ্ছীয়াসী	১.০০

[সচিত্র তালিকার জন্য পত্র লিখুন।]

সদ্য প্রকাশিত রোমাঞ্চকর উপন্যাস

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অশরীরী আতঙ্ক

স্বনামধন্য লেখক তাঁর লেখনী-মাধ্যমে সুন্দর একটি অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এই উপন্যাসে।

[দাম তিন টাকা]

করোঁছি, সেটি আমার কাছে কোঁড়কের বস্তু! কমিউনিষ্ট নেতাদের দেখাদেখি অনেক সোভিয়েট মেয়ে চোঁচিয়ে বলে, তাঁরাও non-believer নাস্তিক! কিন্তু কোন কোনও ভারতীয়কে প্লেনে চড়িয়ে দেবার সময় একাধিক রুশ মেয়েকে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলতে শুনেছি, “ভারতীয়রা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন! সেই ঈশ্বর যেন ওঁদেরকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেন!”

নন সেন্স!—পাশ থেকে হেসে রলে ফেলোঁছি,—“সোভিয়েট ইউনিয়নে যে-সব ভারতীয় আসেন, তাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী নন!”

মুখ ফিরিয়ে শ্রীমতী বললেন, ছি, অমন কথা মুখেও আনতে নেই! ঈশ্বর আপনারা মানেন,—তিনি আপনাদের সঙ্গে সংগে থাকুন।

আমার দ্বিতীয়বার সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ উপলক্ষে ‘এয়ার ইন্ডিয়া সুপার কন্টেনেশন’ বিমানে মস্কোয় গিয়েছিলুম। প্লেনটি লেট ছিল প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল। মস্কো বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত একদল রুশ লেখকবন্ধু ও দুইজন দোভাষিণী এতে একটু ভয়

পান। যাই হোক, মস্কো টাইম রাত প্রায় ২টার সময় প্লেনটি নিরাপদে মস্কো বিমানঘাঁটিতে নেমে আসে। অভ্যুপরি একজন দোভাষিণী আমাকে বলেন, আপনার বিমানের আলোটি প্রথম যখন দৃশ্যমান হল, তখন একদণ্ডে সেইদিকে কিংবা আপনাদের ঈশ্বরের দিকে চেয়ে-ছিলুম, আমার মনে নেই! সমস্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে একমনে প্রার্থনা করছিলুম, বিমানটি কতক্ষণে বিমানঘাঁটির ভূমি স্পর্শ করবে।

তিনি কার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে-ছিলেন, সেটি তিনি বলেননি।

ক্রেমলিনের অপর একটি অংশের নাম ‘অরুজিনায়া প্লাটা’, অর্থাৎ ‘গ্রেট-আর্মারি’। এটি মস্ত এক যাদুঘর। এই যাদুঘরের বাইরের দিকে যে কামান-গুলিকে সম্বন্ধে রাখা হয়েছে, সেগুলি নেপোলিয়ন মস্কোত্যাগের কালে এখানে ফেলে গিয়েছিলেন! এই দিনে আমার সঙ্গে ছিলেন স্বামীসহ শ্রীযুক্তা আশাদেবী আর্থনায়কম এবং দোভাষিণী শ্রীমতী নিনা। ক্রেমলিনের এই অংশ নির্মাণ করেন, শ্রীমতী নিনার কথায়,—‘পীটার-দি-গ্রেট’! এই যাদুঘরে প্রাচীন রুশ রাজগোষ্ঠীর বিবিধ সম্পদ বর্তমান। সেনাপতিগণের ব্যবহৃত ইশপাত-নির্মিত অসংখ্য ডিজাইনের শিরস্ত্রাণ, বর্ম-তরবার ও ঢাল সুসজ্জিত রয়েছে। প্রত্যেকটি সুসজ্জিত সেনাপতিকে আপন-আপন দেহে অন্তত একমণ ওজনের পোষাক ও অস্ত্র বহন করতে হত! সেই চেহারা কি প্রকার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত, এই শিরস্ত্রাণ, বর্ম, বর্ম, ঢাল-তরোয়াল তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিচ্ছে। তাতার, হুন, মোঙ্গোল, তুর্কী, স্লাভ, কসাক,—কারও পোষাক বাদ পড়েনি। সোনা, রূপা, হীরার এবং অন্যান্য জহরতখচিত, বিভিন্ন কালের

বিভিন্ন অস্ত্রাদি এই যাদুঘরকে আকর্ষণ ওৎসুক্যে ভরিয়ে রেখেছে। ঠগ্নোদশ শতাব্দী থেকে উনিশ শতাব্দী—প্রতি যুগের সামরিক সজ্জা এখানে সুসজ্জিত। মূল্যবান ধাতব, জড়োয়া, বিচিত্র অলংকার, একটি সুসজ্জিত অশ্ব-বাহিনীনিখুঁত রাজকীয় শকট, স্বর্ণ-মন্ডিত বাইবেল ও অন্যান্য গ্রন্থ, যীশু-খৃষ্টের বিভিন্ন মূর্তি ও তেলপট, বহু-বর্ণাঢ্য প্রস্তর, রত্নখচিত পেটিকা, হীরামুক্তা-মাণিক্যকময় দ্রব্যাদি, সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মণিমুক্তাময় রাজসজ্জা, অলংকার, আইভার, আসবাব,—এবং মাণিক্য-স্বর্ণ-মুক্তা-প্রবালমন্ডিত বিভিন্ন সেট—যেগুলি দেশ-দেশান্তর থেকে রাষ্ট্রদূতরা এনেছেন, অথবা যেগুলি সম্রাটদের উপহার-সামগ্রী,—যুগ থেকে যুগান্তরে যেগুলি সংগৃহীত,—আজ সেগুলি প্রদর্শনীর উপকরণ মাত্র! প্রত্যেকটি বেন জীবন্ত, কিন্তু তারা বহন করছে অতীতের মরা ইতিহাস!

পীটার-দি-গ্রেট এবং আইভান-দি-গ্রেট সম্বন্ধে একটি অকুণ্ঠ প্রাণ্ডা সোভিয়েট ইউনিয়নে ছড়ানো আছে। এঁদের কীর্তি অবিনশ্বর—ওরা বলে। এর একটা প্রধান কারণ, ওরা বলে—পীটার শূন্য সম্রাট ছিলেন না, মানুষ ছিলেন। তিনি কল্যাণপ্রতী, দরদী, দেশসেবক এবং সর্বজনের বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজে রান্না করতেন, বিলাসের প্রতি তাঁর বিমুখতা ছিল, তাঁর রাজসভ্যালে অনাচার ঘটেনি! পীটার ছিলেন অতিকায় পুরুষ, সাত ফুট লম্বা, অতিশয় বলবান। তিনি শিল্পী ছিলেন। সুচীশিপে তাঁর দক্ষতা ছিল। নিজের হাতে তিনি নিজের এবং অন্যের পোষাক তৈরি করে দিতেন। নিজের জুতো তিনি নিজে তৈরি করতেন, এবং তাঁরই হাতের একজোড়া জুতো এখানে শোভা পাচ্ছে। এই ‘দানবীর’ বহু জুতো জোড়ার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ ভাবতে হয়, পৃথিবীর কোন দেশে কে এমন অতিকায় ব্যক্তি আছে যার পায়ে এই জুতো লাগে! এই যাদুঘরে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বিচিত্র ‘বাড়ি’ আজও সচল অবস্থায় দন্ডায়মান। বাড়িটি ছোট, কিন্তু সেটিকে বেণ্টন করে রয়েছে একটি ‘পান-ডায়াল’। এই বাড়িটিতে নিরন্তর একটি সঙ্গীতের সুর বেজে চলেছে, এবং প্রতি তিন মিনিট অন্তর একটি ঈগলপাখীর মুখ থেকে তার শাবকের মুখে খাদ্য-বিশদ পাত হবার সংগে সংগে একটি মধুর ঘণ্টা বেজে উঠছে। বাড়িটি দ্রুত!

সাধারণ পাঠাগারের উপযোগী
গল্প ও উপন্যাসের সমস্ত বই
কলিকাতার কমিশনে সংগ্রহ করেন।

দ্যামোদর প্রকাশনা

বর্ধমান শহরের সর্বাধুনিক
পুস্তক বিপণি

॥ বিজয় তোরণ : বর্ধমান ॥

অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের জন্য

আমাদের আর একটা নতুন কেন্দ্র

৭নং পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা—১

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এর্ভিনিউ, কলিকাতা-১২

ক্রেমলিনের বাগানে দাঁড়ালে নদীর
দিকে সমগ্র বিরাট মস্কা নগরী দৃশ্য-
মান হয়। এটি উপত্যকা, এবং প্রাকার
বোঁদিত। একদিকে মস্কায়া নদী,—
যেটির অপর নাম ভলগা-মস্কা ক্যানাল;
অন্যদিকে আরেক নদী—যার নাম 'নেগ্-

লিনায়া'। ক্রেমলিনের চতুর্দিক উচ্চ
প্রাকার বোঁদিত, যেটি দিল্লীর লাল-
কেল্লার অনুরূপ। প্রাকারের উচ্চতা
কোথাও ৩০ ফুট, এবং স্ফীতি ১৭
ফুট। এই ক্রেমলিন এককালে দুটি নদী
এবং দুটি পরিখার দ্বারা পরিবোঁদিত

ছিল। এখন পরিখা নেই, তার স্থলে
আছে ক্রেমলিন গার্ডেন একদিকে, এবং
পূর্বপ্রাকারের বাইরের দিকে এখন
প্রসারিত 'রেড স্কোয়ার'! রেড স্কোয়ার
চতুষ্কোণ নয়, বহু কোণ! এটি বাগান
নয়,—পাথর-বাঁধানো ঢেউ-খেলানো নাতি-

সাধতার সৌন্দর্যের গোপন কথা...

'লাক্স' আমায় সুন্দর রাখে'



সুন্দরী চিত্রতারকাদের রূপ লাবণ্যের
গোপন কথা হোল লাক্স! সাধনাকে দেখুন!
'লাবল্যভরা রূপ লাক্সের পরশে আরও কত
'সুন্দর, আর কমলীয়!... আপনিও লাক্স
ব্যবহার করেনতো? 'লাক্স' মাথুন... লাক্সের
কুহুম কোমল ফেনার পরশে চেহারায়
নতুন লাবণ্য আনবে! লাক্স মাথুন...
হৃদয়ভরা লাক্সের মধুর গন্ধ আপনীর
মেথকার লাগবে! লাক্স মাথুন...
লাক্সের রামধুন রঙের বিচিত্র মেলা থেকে
মনের মতো রঙ বেছে নিতে পারবেন!
আপনীর প্রিয় সাদাটিও দ্যাবেন!
লাবণ্যশ্রীর জন্য লাক্স টয়লেট সাবান
ব্যবহার করুন!

চিত্রতারকাদের
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য-সাবান



সুন্দরী সাধনা বলেন, 'লাক্স সাবানটি আমি ভালবাসি আর এর রঙ শুকনোও আমার জন্য ভাল লাগে!'

LTS-111-XS2 BC

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

বহুৎ ময়দান। চতুর্থ দিকটিতে প্রাচীন পারিবার নাবাল অংশে বড় বড় গাছপালা, এবং ঘোষপাড়। সেখানে রাজপথ এবং ক্রেমলিন প্রবেশপথের মাঝখানে সাঁকোর মতো আর একটি পথ প্রাকারের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। ক্রেমলিনের প্রাকারের কোণে কোণে কয়েকটি 'টাওয়ার' বা চুড়া বর্তমান, তারই একটির ডগায় রয়েছে মস্কো একটি ঘড়ি। এটিকে বলা হয়েছে 'ক্রেমলিন-ক্লক',—এবং এই নামে একটি নাটক অভিনীত হয় আর্ট থিয়েটারে। কিন্তু উক্ত প্রত্যেকটি টাওয়ারের এক একটি পৃথক নাম ও ইতিহাস আছে। যেমন একটির নাম 'সুইয়ভস্কায়া'—এটি পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি নিশাণ করা হয়। মস্কো নগরীতে যখন প্রথম পারিস্রুত জল সরবরাহের কথা উঠে,—সেটি বৃষ্টি সন্তদশ শতাব্দী,—তখন এই টাওয়ারটিকে জল-টেনে-তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়। সেটি 'স্বদেশী কৌশল', কেননা সেটি পাতকস্রার যুগ, তখন মোমবাতি-জ্বালা রাষ্ট্রশাসন,—মস্কো তখনও 'নগর' হয়ে ওঠেনি।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্রেমলিনের চারদিক কাঠের বেড়া দিয়ে আড়াল করা ছিল। তারপর হুজ পাথরের পাঁচিল, এবং তার সঙ্গে একটি গম্বুজ, যার নাম 'তাইনিৎস্কায়া'—যেটির ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে মস্কোয়া নদীতে পেঁপেছে জল আনা হত। এটি আজও ভেঁজনি আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরেকটি টাওয়ার বানিয়ে অন্য একটি সুড়ঙ্গ তৈরি হয়। কে যেন এর প্রথম নামকরণ করল, 'ফলভস্কায়া', তারপর আবার কে যেন দেড়শ বছর পরে এর নাম বদলে রাখল, 'স্পাসস্কায়া'। এটি তৎকালীন ক্রেমলিনের প্রধান তোরণ হয়ে উঠল। তারপর একে একে মাথা তুলে দাঁড়াল এক একটি টাওয়ার—যাদের নাম 'সবাকিনা, এলে-নিনস্কায়া, বরভিৎস্কায়া, ট্রাইৎস্কায়া' ইত্যাদি। বৃষ্টিতে পারা যায়, প্রত্যেক যুগে ওই প্রাকার রক্ষার জন্য প্রহরার পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। বাইরের দিকে যখন পাঁচিল রক্ষার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে, ভিতর দিকে সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধেই এক একটি গির্জা ও ধর্ম-মন্দির উঠে দাঁড়াচ্ছে। সেটি মধ্যযুগ। প্রতি রাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক। তখন ধর্মের জন্য ধর্মীয় উন্মাদনা,—অর্থাৎ মারামারি কাটাকাটির যুগ। রাষ্ট্র তখন ধর্মকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ। যদি কারও গির্জা বা সিনাগগ, মসজিদ বা মঠ ভাঙ্গানো, তবে

সেই রাষ্ট্রের জাতি গেল! সে তখন অপমানিত, পরাজিত। রাশিয়ার বর্বরযুগ মানে ধর্মোন্মাদনার যুগ। ধর্মের জন্য নরহত্যা, রক্তপাত, অগ্নিবোম,—এগুলি খৃষ্টের দর্শন নয়, কিন্তু খৃষ্টান সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য!

একদিন আমি আবদার ধরে বস-লুম, এবার আর যাদুঘর নয়, ক্রেমলিনের যারা 'যাদুঘর'—তাদের আপিস দেখব! আপিসের বাবে যাব।

শ্রীমতী অকসানা হাসিমুখে বললেন, তথাস্তু। চলুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব—এই বলে তিনি টেলিফোন তুলে ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করলেন।

ক্রেমলিনের বাইরের চেহারা দৈত্যাকার, ভিতরের চেহারা যক্ষপুত্রী। আজ যখন ভিন্ন এক পথ দিয়ে ঢুকলুম, তখন পটপরিবর্তন ঘটেছে। এও এক বাগান, কিন্তু সে-বাগান নয়। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কাছাকাছি একটিও ক্যাপিটুল, একটিও জনপ্রাণী। নিস্তত্বে, গম্ভীর,—চারিদিকের পৃথিবী যেন রুম্বাস্বাস। রৌদ্রদীপ্ত সকাল,—কিন্তু সে-রৌদ্র এবং সেই দিনমান আমার কাছে এত অপরিচিত এবং এমন বিদেশী যে, আমার যেন পা উঠছে না। বাগানের ধারে পূর্বমুখী একখানা হরিদ্রভ বর্ণের অট্টালিকা। উপর তলাকার একটি কক্ষের বড় বড় দুটো জানলা খোলা। এই বাড়িটিতে স্টালিন ছিলেন প্রায় ৩০ বছর। ওই খোলা জানালার সামনে এসে তিনি দাঁড়াননি কোনদিন, কিন্তু ওই ঘরটিতেই তিনি থাকতেন! এখন ওখানে কেউ থাকে না। বিশেষ প্রহরীরা শুধু তালচাচি খোলে, ঘরে আলো-বাতিস আলো, আবার বন্ধ করে দেয়। তাঁর মহল এখন শূন্য। অতঃপর 'গ্র্যান্ড প্যালেসের' দরজায় এসে পেঁপেছলুম। সামনে কয়েকজন সামরিক মোটা গরম পোষাকপরা সশস্ত্র পাহারা। সেই তাদের পিতলের মতো ঠান্ডা ভাষা-হীন মূখ। 'ওৎসুক্য', প্রশ্ন, হুকুম, প্রশংসা, বিরক্তি,—কোনটার চিহ্ন নেই সেই মুখে। শ্রীমতী অকসানার হাত থেকে একজন কাগজটি নিল, এবং শ্রীমতী তাঁর নিজের পরিচয়-পত্রের কাডটি বার করে দেখালেন। ওরই মধ্যে একজন আমার দিকে তাকাল, এবং তার ইম্পাতবর্ণ চক্ষু-তারকার মধ্যে আমিও যেন দেখে নিলুম উত্তর মেরুলোকের শ্বেতভঙ্গুরের কঠিন তুহিন দৃষ্টি!

সিঁড়ি বেয়ে আমি উপরে উঠে চললুম। সে-ব্যক্তি আসতে লাগল আমার

পিছ পিছ। 'গোল্ড রাশ' নামক ছবিতে 'চার্লি' চ্যাপলিনের পিছ পিছ মানুুষের গম্ব পেয়ে শ্বেতভঙ্গুর যেমন মৃত্যুর মতো কিয়ৎক্ষণ অনসরণ করেছিল!

দৌড়লা থেকে আবার যেন কোন পথ এবং করিডর পেরিয়ে ভিন্ন এক প্রাসাদের বারান্দার দিকে এসে পেঁপেছলুম। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে অপর এক সশস্ত্র সৈন্য এগিয়ে এসে আমাদের দায়িত্ব নিল! পিছন ফিরে দেখি, সেই 'যমদূত' কখন অদৃশ্য হয়েছে! এক গেলাস খাবার জল পেলে ভাল হত!

শুকেকল্ট এবং রুম্বাস্বাস আমি কেবল একা নই! ওয়াশিংটন, লন্ডন, প্যারিস, ঘন-কেনে নয় রুম্বাস্বাস? অনিশ্চয়তা, সংশয়, আতঙ্ক, অবিশ্বাস,—এরা যেন ব্যগ্রব্যাকুল চক্ষে এই দানব-বাকার ক্রেমলিনের প্রতি পদধ্বনির দিকে কান পেতে রয়েছে পৃথিবীর চারিদিক থেকে! নিত্য গোপনতার কঠিন বর্মে ক্রেমলিন আগাগোড়া আচ্ছাদিত। ক্রেমলিনের প্রত্যেকটি কক্ষ এক একটি লোহার সিঁধদুক। প্রতি কর্মচারীর প্রকৃতি অতল পাথর। এই ক্রেমলিন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর প্রথম যুগে বহন করল পৃথিবীর বিজাতীয় ক্রোধ, স্টালিনযুগে বিজাতীয় ঘৃণা, খৃষ্টাব্দের যুগে অবিশ্বাস এবং আতঙ্ক। আজ ক্রেমলিনকে ভয় দেখাবার আগে নিজেরই ভয় করবে, অস্ত্রের বনং-কায় শোনাতে গেলে এই যুগান্তক দৈত্যের করাল চক্ষে অনুকম্পার বক্র হাসি ফুটেবে,—এই ক্রেমলিন আজ পাশ্চাত্য জগৎকে বললেন। আজ মস্কোতে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি, হাজার-হাজার আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, জাপানী পর্যটক! এরা জানতে এসেছে ক্রেমলিনের মূলে প্রকৃতি, সন্দান করতে এসেছে তার মানবিক সত্তা, তার লৌহবর্মের কাঠিন্যের অন্তরালে আবিষ্কার করতে এসেছে মাধুর্যের সঞ্চেত যদি কিছু থাকে। ক্রেমলিনের অন্তঃপূরে ঢুকলে গা ছমছম করে।

এই প্রাণীহীন শব্দহীন ক্রেমলিনের এক মহল থেকে অন্য মহল পেরিয়ে চার তলার সুদীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করার পর সহসা বেরিয়ে এল যেন যক্ষপুত্রীর এক রাজকন্যা। বছর তিরিশ বয়সের অতি সুদৃষ্টী এক হাস্যমুখী মহিলা অভিবাদন জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। এক সময় ফিরে হঠাৎ দেখি, পিছনের সেই সশস্ত্র ব্যক্তি কোন বাকি কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে! এবার বোধহয় দেখব 'ভানুমতীর খেল'!

থমথম করছে জনশূন্য জীবনশূন্য, শব্দশূন্য অন্য এক প্রাসাদ! চকমিলানো অট্টালিকার মধ্যস্থলে প্রাচীন জমিদার-বাড়ির মতো উঠোন। প্রাসাদ-অলিন্দে তির্যকভাবে সূর্যালোক পড়েছে বিশাল বাঁকা তলোয়ারের মতো! করিডরের ডান-দিকের দেওয়ালগুলিতে বৃহৎ এক একটি আলমারি বইঠাসা। এটি লাইব্রেরী, এগুলিতে মোট ৩০ হাজার বই তাল-চাঁবি বন্ধ—এগুলি লেনিনের নিজস্ব সম্পত্তি। তিনি এই লাইব্রেরী ক্রেম-লিনকে দান করে গেছেন। আমরা এসে পৌঁছলাম লেনিনের আপিসে, এবং তৎসংলগ্ন তাঁর ফ্ল্যাটে—যেখানে তাঁর স্ত্রী রুপস্কায়া এবং তাঁর ভাণ্ড মেরিয়া বাস করতেন। আপিস এবং বসবাসের ব্যবস্থা তাঁর একই ফ্ল্যাটে ছিল।

বিগত ১৭১২ খৃষ্টাব্দে পীটার-দি-গ্রেট মস্কো থেকে তাঁর রাজধানী তুলে নিয়ে ৩০০ মাইল উত্তরে পিটার্সবার্গে গিয়ে স্থাপন করেন। মস্কো শব্দ থেকে যায় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতির কেন্দ্র। একালে অক্টোবর বিপ্লবের পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট গভর্নমেন্ট একটি বিশেষ ডিগ্রির দ্বারা মস্কোকে পুনরায় রাজধানী ঘোষণা করেন, এবং ওই বৎসরেই ১৬ই মার্চ তারিখে এক-খানি স্পেশাল ট্রেন পিটার্সবার্গ বা তদানীন্তন পেট্রোগ্রাড থেকে ছেড়ে মস্কোর দিকে রওনা হয়। এই গাড়িখানি ছিল সৈনিকের চলন্ত সোভিয়েট গভর্নমেন্ট,—এবং এটিতে লেনিন, ট্রটস্কি, জিনোভিভ, কামেনেভ, রোথারিন-সহ অন্যান্য ‘কমিসার’ বা মন্ত্রীরা যাত্রী ছিলেন। পরবর্তী প্রায় পাঁচ বৎসরকাল লেনিন এই তিনতলার ফ্ল্যাটটিতে বাস করেন। ক্রেমলিনের ভিতরকার এই বিরাট ও বৃহত্তম প্রাসাদটিই এখন সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং গভর্নমেন্টের মূল কেন্দ্র। আমাদের পায়ের তলাকার সমস্ত পথ মূল্যবান কাপেট দিয়ে ঢাকা। মেঝে, দেওয়াল, সিঁড়ি, কাঁড়কাঠ, বারান্দা এবং সকলপ্রকার আসবাবপত্র নতুন পালিশে ঝলমল করছে। ঠান্ডার জন্য দেওয়ালের অনেক উঁচু পর্যন্ত পালিশকরা মোটা কাঠ দিয়ে ঢাকা।

আমরা লেনিনের আপিসে এসে ঢুকলাম। এই কক্ষে বসে তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর অবধি ৪ বৎসর ৯ মাসকাল দিন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময়ে রাষ্ট্রপরিচালনা করেন,—কেননা তিনিই ছিলেন প্রধান-মন্ত্রী। তিনি তাঁর মাসিক বেতনস্বরূপ ৫০০ রুবল নিতেন, এবং কেনও উপ-রোধেই তার বেশি তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হননি। আমাদের দেশে পশ্চিম-বঙ্গের পরলোকগত রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৫০০০ টাকার বদলে মাত্র ৫০০ টাকা নিতেন, এবং বাকি টাকা তিনি যক্ষ্মা রোগীদের কল্যাণকল্পে দান করতেন। কেরালায় প্রাক্তন কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠাকালে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী লেনিনের আদর্শ অনুসরণের জন্য এইরূপ এক প্রস্তাব তুলেছিলেন! কিন্তু তারপরে আর কোনও খবর জানিনে। লেনিনের স্ত্রী রুপস্কায়া ছিলেন শিক্ষা বিভাগের উপ-মন্ত্রী, স্বয়ং লেনিন ছিলেন প্রতিরক্ষা এবং শ্রম বিভাগের সর্বময় কর্তা। লেনিনের ভাণ্ডও কি যেন কাজ করে উপার্জন করতেন। রান্নাবান্না, বাসনমোছা, ঘর ঝাড়া, বিছানা করা, কাপড় চোপড় কাচা ইত্যাদি দুইজন মহিলাই করতেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে লেনিনের শরীরে প্রথম এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কবে যেন দ্বিতীয় পক্ষাঘাতের আক্রমণে তাঁর শরীর একে-বারে ভেঙ্গে পড়ে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর তারিখে ক্রেমলিন থেকে তিনি শেষবারের মতো বিদায় নিয়ে যান। মস্কো থেকে মাইল তিরিশেক দূরে ‘লেনিনিস্ক-গোবক’ নামক একটি ধনময় বাগানবাড়িতে তিনি জীবনের শেষ ১৩ মাস অতিবাহিত করেন। অবশেষে দুঃরা-রোগ্য ব্যাধিতে তাঁর মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে একপ্রকার অকালমৃত্যু ঘটে! তাঁর স্ত্রী রুপস্কায়ার মৃত্যু ঘটে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। রুপস্কায়ার চিরদিনের দুঃখ ছিল, তাঁর সন্তানাদি হয়নি! আমাদের বাঙ্গলা-দেশে রাজা রামমোহন ছাড়া আর বিশেষ কোনও মহাপুরুষ বা দীপ্তিবজ্রী মনীষার

‘পুরুষবংশ’ থাকেনি। ইশ্বরচন্দ্র, মাই-কেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র, শরৎচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু, চিত্তরঞ্জন, এবং একালের সুভাষচন্দ্র—কারও থাকেনি।

লেনিনের আপিসটি ঠিক যেমন তাঁর কালে ছিল, আজও অবিকল তেমনি

সুসংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

নতুন ক্যাটালগের জন্য লিখুন

নতুন প্রকাশ ॥ অজয় দাশগুপ্তের
দিনাঙ্ক—২.০০ ॥ মীরা চৌধুরীর
দুই পৃথিবী—২.০০ ॥ এথলাস-
উদ্ভীনের ছেলেদের হাসির ছড়া মজার
পড়া—১.০০।

পূর্বের প্রকাশ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
মোটাক—৫.০০ ॥ স্বরাজ বন্দো-
পাধ্যায়ের রংগঙ্গাগ—৩.০০ ॥ শচীন
ভৌমিকের সায়ান্থ যুথিকা—৩.০০ ॥
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর খালি পোল ও
টিনের ঘরের চিত্রকর—২.০০ ॥
মনোতোষ সরকারের এক আকাশে এত
রঙ—২.০০ ॥ অজিত মুখোপাধ্যায়ের
ছয় স্বপ্ন সাত রঙ—২.০০ ॥ মনসা
চট্টোপাধ্যায়ের একটি মৃহুত—২.০০

পরবর্তী প্রকাশ ॥ রজত সেনের দ্বিতীয়
বাশর—২.০০ ॥ মিহির আচার্যের
গাম্ভীর্য মৌন—২.০০ ॥ বিষ্ণু দেব
মাইতির দেশ বিদেশ—৪.০০।

বিশ্বকর্ষী

এ বারো কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা — বারো

নতুন ক্যাটালগের জন্য লিখুন

সুসংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন

কেশ পরিচর্যা ও মৎস্যজীবী আর্দ্রজীৱ

কেশালিন

স্বপ্না কোমিকেল ওয়ার্কস, কলিকাতা-১০



রয়েছে। সমগ্র ক্রেমলিনের একমাত্র এই ঘরটি—যেটি লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে দপ্তরের কাজে আর ব্যবহার করা হয়নি! সামনে বৃহৎ দুখানা মানচিত্র টাঙ্গানো। একখানা সমগ্র রুশ সাম্রাজ্যের, অন্যখানা ককেশিয়ান দেশগুলির। তাঁর সময়ে এই ককেশিয়ায় ছিল ৫০টি পৃথক জাতি এবং উপজাতি; এবং তাদের অনেকগুলি সামন্ত সর্দারদের দ্বারা শাসিত হত। লেনিনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ককেশাস বিভিন্ন সমস্যায় এবং অন্তঃস্বর্ষে জর্জরিত ছিল। সামনের দেওয়ালে কার্ল মার্কসের সেই পরিচিত গৃহস্থ-শ্রমশ্রুত বৃহৎ একখানা ছবি ঝুলছে। ঘরের মধ্যে বড় বড় পাঁচটি আলমারিতে বই ঠাসা—এইগুলি সকল সময়ে তাঁর কাজে লাগত। রুশ সাহিত্যের ক্লাসিক গ্রন্থ তাঁর প্রিয় ছিল। টলস্টয়, গোর্কি, লারমণ্ডভ, টুর্গেনিভ, চেকভ, গোগল,—এগুলি সাজানো রয়েছে। ইংরেজি সাহিত্য অনেক। লেনিন পাঁচটি ইউরোপীয় ভাষায় অনর্গল লিখতে, পড়তে এবং বক্তৃতা করতে পারতেন। এখানে দুটি উল্লেখযোগ্য বস্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেনিন কবিতা পাঠ করতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কাব্যগ্রন্থ পেলে তিনি মহাখুশী। বোধ হয় এইজন্যই তৎকালে ইংরেজ সাহিত্য-মূল্যবী এইচ-জি ওয়েলস মস্কো ভ্রমণ উপলক্ষ্যে এসে লেনিনের সঙ্গে আলাপ করে লেনিনের কড়া সমালোচনা করে লিখেছিলেন, “লেনিন রোমান্টিক”। কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। মানব-ইতিহাসের কোনও যুগে এমন একটা অভিনব রাষ্ট্র-পরিবর্তনকার ছক আর কেউ মনে-মনে আঁকেননি। সুতরাং তাঁকে ‘রোমান্টিক’ বলতে বাধবে কেন ?

লেনিনের নিজস্ব টেবলটি পুরনো, কোথাও কোথাও কার্পাসের দাগ। সেই টেবলের উপর রয়েছে মোমবাতি, দোয়াত-দান, দুটি কলমের একটিতে নিব নেই, লোহার ছোট কাগজ-চাপা, কাঁচি ও ছুরি, আলপিন ও রিপ কয়েকটি, এককোণে পুরনো আমলের টেলিফোন যন্ত্র। লেনিনের বেতের চেয়ারখানা অতিশয় দরিদ্র—যেমন দরিদ্র ছিল মস্কো তৎকালে। অন্য দ্রুতব্যবস্থাপনা হল, একটি আলমারির উপরের তাকে লাল মলটে বাঁধানো মোটা একখানা বই; সেটিতে লেখা রয়েছে, “Indian National Congress” এই নামে কোনও ইংরেজি বই ভারতবর্ষে আছে কিনা অথবা লেনিনের আমলে

ছিল কিনা আমার জানা নেই। ডাঃ পট্টিভ সীতারামায়া এককালে ইংরেজিতে একখানা গ্রন্থ রচনা করে নাম দিয়েছিলেন “The History of the Indian National Congress”। কিন্তু আমার যতদূর ধারণা, লেনিনের মৃত্যুর আগে সে-বই প্রকাশিত হয়নি! যাই হোক, আলমারিটি তালোচ্য বস্তু না থাকলে বইটি দেখে নিতে পারতুম। বইটি ওখানে থাকার ব্যাপারে আমার মনে নানা প্রশ্ন থেকে গেছে।

লেনিনের টেবলটির মাথার দিকে মোটা মোটা চামড়ায় বাঁধানো গদির চেয়ারে বিশিষ্ট দর্শনপ্রার্থীর বসবার জায়গা। তারই সামনে একটি ‘ডার-উইনীয়’ ‘বানর-মূর্তি’ শোভা পাচ্ছে। মূর্তিটি তার নর, দেহটি বানর,—লেনিনকে এটি কে যেন উপহার দিয়েছিল।

আপিসঘরের মাঝখানের দরজাটি পর্দা সরালেই বিরাট ‘সেনেট হাউস’। অনেকটা যেন হেড-মাষ্টারের ঘরের সামনে ছাত্রদের হল। এখানে মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর দল বসতেন পরামর্শ সভায়। এই সেনেট হাউসের সভারা তৎকালে শুধু যে বিরাট সৌভিয়েট রাষ্ট্রের পরিচালনা করে হিম্মত খেতেন তাই নয়, এইখানে বসে পৃথিবীকে ডাক দিয়ে বলা হত, “Workers of the world, unite”! এই সেনেট হাউসে বসেই লিয়ে ট্রান্সক সৌভিয়েট ইউনিয়নের ‘লাল ফৌজ’ এবং ‘রেড গার্ড’ বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন এবং পৃথিবীব্যাপী কমিউনিষ্ট বিপ্লব-সাধনের ছক কেটেছিলেন।

লেনিনের শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে প্রথম মনে হয়, লোকটা গরীব-গেরস্থ ছিল! সাধারণ স্বল্পবস্ত্র কেরানীর ঘর,—যেখানে মোটামুটি কাজ চলা গোছ সবই আছে কিন্তু বৈভবসজ্জার কোনও প্রাচুর্য নেই। ক্রেমলিনের মধ্যে এমন শাদা-মাটা ও বড়পাঁস ছায়াছন্ন ঘর থাকতে পারে, এটি অভিনব। একগাছা ছড়ি, ছাড়া, দু একটা কাঠের বাস্র, পুরনো টাইপ-রাইটার, দেওয়ালের পেরেকের দাঁড়ারখানা ছবি, জুতো রাখার স্ট্যান্ড, একটি আলমারি, সাধারণ শোবার খাট, ভাঙ্গা চিরুনি, তেলের শিশি, পাউডরের একটা কোটো, ব্যাপসা একখানা আয়না, একটি লোহার সিঁদুক,—এটা-ওটা আরও কত কি। রুপসকায়ার শোবার ঘরে লেনিনের লেখা বইয়ের দেওয়াল। ভিন্সের

ঘরে শেলাইয়ের সরঞ্জাম। রান্নাঘর ও খাবার জায়গাটির ঢুকে দেখি,—আ কপাল, সেই তিনজনের মতন সামান্য চিনেমাটির বাসন। তিনটি ডিস, তিনটি পেয়লা, কটি প্যান আর কেটলি,—ঘরটা, আগা-গোড়া অতি সাধারণ। কিন্তু অপারিসমীম শ্রম ও যত্নে সবগুলি সুবিন্যস্ত করা। বাথরুমের ঘরটা একটু ভূতুড়ে। কোথাও চাকাচকোর ছাপ নেই। লেনিনের এই গরীবানা চাল দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম! গান্ধীজীর জীবনযাত্রা মনে পড়েছিল।

ঘণ্টা দুই আগে ডেবোঁছিলুম এই বিশাল প্রাসাদ এক জনহীন প্রেতপুরী! এবার শ্রীমতী অকসানা আমার সেই ভুল ভেঙ্গে দিলেন। আমরা যেখানে এতক্ষণ চলাফেরা করছি, শুনলাম তার ঠিক নীচে আনাস্তাস মিকোয়ান প্রমুখ প্রত্যেকটি মন্ত্রী এখন ‘কাজ’ করছেন, তবে মিঃ খুদশচভ এখন আমেরিকায়! পাশের মহলে অতিশয় কর্মব্যস্ত তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ভরিশলভ। অদূরে ম্যালিনভস্কির দপ্তর। এই প্রাসাদে নাকি হাজার হাজার ‘কর্মী’ এখন ঠাসা, প্রতিটি দপ্তর জন-পরিপূর্ণ! অগণিত সংখ্যক পরিবার আছে ক্রেমলিনে—অসংখ্য নরনারী। আহা-বাসস্থান সব এখানে। সংসার-যাত্রার নিত্যপ্রয়োজনীয় রসদাদি নিয়ে ট্রাকের পর ট্রাক এসে ঢুকছে ক্রেমলিনে। এখানে আপিস ছুটির পর জনসমারোহ নেই, টিফনের ছুটির নাম করে কেউ বাজারহাট করতে বেরোয় না, এক চেয়ারে কোট ঝুলিয়ে অন্য টেবলের ধারে বসে কেউ এ্যামেচার থিয়েটারের গল্প, কিংবা আপিস ইউনিয়নের মারফৎ মাইনে বাড়াবার কৌশল আঁটে না! আমি মনে মনে আমাদের রেলওয়ে আপিস, কাস্টমস্, ডাক বিভাগ, কর্পোরেশন এবং রাইটার্স’ বিল্ডিংয়ের কথা স্মরণ করে একটু অবাক হয়েই অকসানার দিকে সোঁদন তাকিয়ে ছিলাম। এখানকার বিরাট প্রশাসনযন্ত্র নিঃশব্দে চলে। পাছে, একপক্ষ অন্যপক্ষের আলাপ শুনতে পায়, এজনা ‘সান্ড-প্রুফ’ টেলিফোন কিস্ক’ বসানো আছে প্রতি কক্ষে। ক্রেমলিনের প্রতি কক্ষের দরজা লোহার সিঁদুকের ডালার মতো। তার ভিতর ও বাহির মতাপূরীর মতো অসাড়। সেখানে বেয়ারা ছেটে না, ঘণ্টা বাজে না, টেলিফোন ডাকে না, ব্যক্তিগত আলাপ চলে না, চায়ের ফরমাস করে না, ফাইল

নিরে দৌড়াদৌড়ি হয় না, দর্শনপ্রার্থী আসে না, উমেদার এসে সামনে বসে না। সিগারেট-বিড়ির ধোঁয়া ওঠে না! কঠিন উদাসীন নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য যেন চারিদিকের দিবালোকেও একপ্রকার ভয় ও দুর্ভাবনার ছায়া বিস্তার করে রয়েছে।

বারান্দা পেরিয়ে আসার সময় সেই সুন্দরী মহিলা হাস্যমুখে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে এক বাক্যে যথারীতি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই আগেকার পাহারাদারীটি এগিয়ে এসে আমাদের 'দায়িত্ব' নিল। কয়েক পা এগিয়ে এসে দেখলাম, একটি টেবলের ওপর মোটা একখানা সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো খাতা। শ্রীমতী অকসানা প্রশ্ন করলেন, 'ভিজিটার্স' বকে লিখবেন কিছ?

খাতাখানার মধ্যে জগতের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ হাতে কিছ, কিছ লেখা রয়েছে দেখলাম। ভারতীয়গণের মধ্যে রয়েছেন বেনারসী-দাস চতুর্বেদীর স্বাক্ষর। পাতা ওলটাতে গিয়ে এক স্থলে দেখি, বাঙলা লেখা! তার তলায় পরিচিত নাম সহ—'অনিলাকুমার চন্দ'!

আগে আমি বাঙলার লিখে নাম সহ করলাম অতঃপর অকসানার অনুরোধে তার ইংরেজি ব্যাখ্যা লিখলাম এবং আমার অনুরোধে তিনি সেটি রুশ ভাষায় তজমা করে দিলেন। হঠাৎ ফিরে দেখি, সেই সোনালি, নীল এবং খাঁকি পেয়াকপরা লোহকঠিন মিলিটারি পাহারার পিতলের হাঁড়ির মতো মুখে সপ্রশংস হাসির আভা ফুটে উঠেছে। এতক্ষণ পরে মনে হল, সে মানুষ,—তার চু-কুণ্ডন আছে, চক্ষুতারকার চাঞ্চল্য আছে, মানবিক প্রকৃতির দোলায়িত স্বন্দরূপ আছে!

উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পর করমর্দন করার কালে অনুভব করলাম, লোকটার হাতের তালুর মধ্যে তাতার কিংবা কসকের কাঠিন্য বর্তমান।

জার, সীজার, কাইজার—এ শব্দগুলি পড়ুনো। কিন্তু এগুলির মূল অর্থ একই, এবং উৎপত্তিস্থলও বিশেষ পৃথক নয়। তাতার বংশ একদিন ক্রেমলিনের সিংহাসন দখল করেছিল। আইভান-দি-টেরবল্ তাদের পরাস্ত করে' নিজেকে জার অর্থাৎ সম্রাট বলে প্রথম ঘোষণা করেন কিনা, এবং তিনিই তৃতীয় আইভান কিনা—এটি স্পষ্ট জানতে পারলাম না।

কিন্তু তাঁরই আমল থেকে মস্কা বা ক্রেমলিন শক্তিশালী হতে থাকে। তারপর একে একে চতুর্থ আইভান, তাঁর পুত্র ফিয়োডোর,—এঁরা রাজত্ব করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মস্কা আক্রমণ করে পোল্যান্ড। তারা এসে রুশ রাজপুরুষ-গণের বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে ক্রেমলিন জয় করে এবং সিংহাসনে বসে। তদানীন্তন রুশ রাজকুমার 'দিমিত্রি পোজ্‌হারস্কি' এবং তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী 'কুজমা মিনিন'—এঁরা দুজন বিদ্রোহের ধ্বজা তোলেন এবং পদানত রুশ জনসাধারণ বিপ্লবের আগুন জ্বালায়। সেই বিপ্লবে পোল্যান্ডের হাত থেকে শাসনদণ্ড খসে পড়ে। সেই বিপ্লবের নামও 'অক্টোবর বিপ্লব'। তবে সেটি সংঘটিত হয় ৩৫০ বছর আগে। আজও রেড স্কোয়ারে সর্বাপেক্ষা সুন্দর প্রতিমূর্তি হল, 'পোজ্‌হারস্কি ও মিনিন'।

এই বিপ্লবের ঠিক ১০০ বছর পরে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে পীটার-দি-গ্রেট তাঁর নবনির্মিত নগর পীটার্সবার্গে রাজধানী তুলে নিয়ে যান। আমার এখনও বিশ্বাস, সেট পীটার নামক যে 'সাধুর' কথা বলা হচ্ছে, তিনিই পীটার-দি-গ্রেট। রুশ জাতি মহামতি লেনিনের মতো সম্রাট প্রথম পীটারকেও ভালবাসে। কিন্তু পীটারের নামটি তুলে দিয়ে লেনিনের নামটি বসাবার সময় সোভিয়েট কতৃপক্ষের চক্ষুদলজ্জা বা আড়ম্বল্য এসেছিল কিনা, অথবা 'সাধুর' গল্পটা অলীক কিনা—এসব তথ্য আমার জানা সম্ভব ছিল না। সোভিয়েট আমলে, লক্ষ্য করবার বিষয় এই, পৃথিবীর এই বৃহত্তর ভূভাগের প্রাচীন ইতিহাসের নানা কথা ও কাহিনী নিয়ে গবেষণার সুযোগ কম। সোভিয়েট ইউনিয়ন আপন দেশের পূর্বনো ইতিহাসকে সম্ভবত গোঁরবজনক মনে করে না বলেই ওটাকে যেন ভুলে থাকতে চায়।

এরপর ওই ক্রেমলিনের মধ্যেই রয়েছে একটি রূপকথার জগৎ এবং সেটি হল ১৬শ থেকে ১৯শ শতাব্দীর রাজকীয় সম্পদের সমারোহ। এক একটি হলে চারদিক থেকে উজ্জ্বল স্বর্ণাভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সোনালি ফ্রেস্কোর কাজ, মার্বেল পাথরের উপর মনোরম ভাস্কর্য কলা,—তার খিলান এবং গঠনের মধ্যে কারুশিল্প। মাঝে মাঝে ওরই মধ্যে বলা হচ্ছে বাইবেলের গল্প! প্রতি বৃহৎ কক্ষই যেন তার আপন কাহিনী বলে যাচ্ছে।

স্বরাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা কক্ষ, সরকারি ডিক্রি ঘোষণা কক্ষ, পররাষ্ট্রীয় অভ্যাগতগণকে অভ্যর্থনা করার কক্ষ। ওরই মধ্যে বিরাট এক নাটমঞ্চ। প্রতি হলের মেঝে পালিশ করা কঠোর তৈরি। প্রতি কক্ষ যীশুখৃষ্ট, মাতা মেরী, যোসেফ এবং খৃষ্টাশিষ্যবর্গের সকল অবস্থার চিত্র পরিপূর্ণ। একটি কক্ষে নন্দকান্তি ইভ এবং গ্র্যাডামের আগাগোড়া কাহিনীটি চিত্রিত। সমগ্র ক্রেমলিনকে যদি কেউ বলে, খৃষ্টান ধর্মের অন্যতম তীর্থপ্রদর্শনী, তাহলে ভুল হবে না!

একটির পর একটি বিশাল স্বর্ণালি তোরণ পেরিয়ে যখন একাকী এসে জার-সম্রাটের আবাসিক মহলে প্রবেশ করলাম, তখন পূর্বনো ইতিহাস যেন আমার দুই পায়ে কাঁপন আনিছিল। শয়নকক্ষটিতে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর শয্যা আজও প্রস্তুত! দেওয়ালগুলির মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানময় তাঁদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী; চেয়ার-গুলির প্রত্যেকখানি যেন একেকটি রক্তমণিখচিত সিংহাসন! দেওয়ালগুলি স্বর্ণোজ্জ্বল, চতুর্দিকে বহুবর্ণাভা মর্মরশোভা, প্রত্যেকটি প্রবেশপথ স্বর্ণময়, প্রতি কক্ষ একেকটি স্বর্ণপুন্ডরী! আমি পীটার-দি-গ্রেট এবং তাঁর পুত্রের শয়ন-কক্ষগুলি দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। এই কক্ষগুলিকে শীতের দিনে উষ্ণ করে রাখার নানাবিধ কৌশলগুলি লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল।

শ্রীমতী অকসানা আমাকে নিয়ে এলেন একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে, যেটির নাম, 'ইন্সটিটিউট অফ রাইটার্স'। এটি মস্ত আপিস, এবং এখানে লেখকরা 'জন্মগ্রহণ' করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে যে সব কবি ও কাঁচা তরুণ-তরুণী প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, যারা কুড়ি-কিন্তু ফুল হয়ে ওঠেনি, এই মস্ত প্রতিষ্ঠানটি ছাদরই জন্য। আজ শনিবার,—লেখক-লৌখিকারা এখন অনুপস্থিত, সেইজন্য ডাইরেক্টর এবং সেক্রেটারীর সঙ্গেই আলাপ করতে বসলাম। তাঁরা অতি সজ্জন,—আমাকে এই প্রতিষ্ঠানের বিষয় হাসিমুখে বোঝাতে লাগলেন।

এই বাড়িটিও যথারীতি জার আমলের। এখানে লেখকরা উপযুক্তভাবে পরিচালিত হন, এবং তাঁদের সাহিত্য-প্রবেশপথে সর্বপ্রকার সহায়তা করা হয়। এখানে তাঁদের স্ব স্ব পান্ডুলিপি পাঠ, আলোচনা বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা হয়ে থাকে। কি কি গুণপনা নব্য লেখক-লেখিকার পক্ষে থাকা প্রয়োজন, এর

জবাবে তাঁরা বলেন, সাহিত্য-বিষয়ে লেখকদের 'সোভিয়েট' হওয়া প্রথম দরকার। রুশভাষা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ডিগ্রি না থাকলে এখানে সভা হওয়া যায় না! সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেকটি প্রসিদ্ধ লেখক এখান থেকে পাস করে বেরিয়েছেন। নবাগত লেখক-লেখিকাকে 'উপযুক্ত' বিবেচনা করলে এখান থেকে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। কেননা তাদের স্বাভাব্য ও দারিদ্র্য থাকলে 'কাজ' চলবে না! প্রত্যেক লেখক-লেখিকার পক্ষে অন্তত দু'বছরের কম-অভিজ্ঞতা থাকা দরকার—সে কাজ করতানায়। আপিসে, বা ক্ষেতখামারে—যেখানেই হোক। তাদের পক্ষে জীবনকে এবং জীবনের রূপ বাস্তবতাকে জানা একান্ত দরকার। নতুন লেখকদের বই ছেপে দিয়ে এখানে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। মোট ৪৫ জন প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকা নব্য লেখকদের পাণ্ডুলিপি একে একে বিচার করে দেন, এই সব চাপা উচিত কিনা! আমার হাতের কাছে একখানি কবিতার বই দেখলাম, এখানি এক নব্য কবির রচনা। 'সামান্য' ৫,০০০ কপি মাত্র ছেপে নব্য কবিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। শুনলাম কোনও লেখকের একখানি বই মাত্র প্রকাশিত হওয়ার অর্থই হল, সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বীকৃতি পাওয়া। সেই লেখকের পথ সেদিন থেকে কুসুমাস্তীর্ণ!

এই প্রতিষ্ঠান থেকে যারা 'মানন' হয়েছে তাঁরা সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে, পৃথিবীর অপর কোনও দেশে রসিকসমাজে সমাদৃত হয়েছে কিনা, এইটি ভাবতে ভাবতে আমি যখন বিদায় নমস্কার জানিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিলাম তখন ডাইরেক্টর সাহেব প্রশ্ন করলেন, এবংপ্রকার প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে আছে কিনা! হাসিমুখে বললাম, ভারতীয় লেখকরা কোনও শাসন-বন্দন স্বীকার করেন না!

উভয়পক্ষেই হাসাহাসি। অকসমা আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সোভিয়েট লেখকদের পক্ষে যেন স্কুল-বোর্ডিংয়ের মতো। তথ্য খেলার মাঠ আছে মস্ত। যত জোর পায়ে আছে, ফুটবল কিক করো। যত খুঁশি ছোটো স্কুলের মাঠে। কিন্তু তুমি প্রাচীরবেষ্টিত! ভিতরে কড়া নিয়ম! ঠিক সময় স্নানাহার আর পড়াশুনা! ঘড়ির কাঁটা ধরে নিয়ম-পালন। পরীক্ষার পাস করো, প্রাইজ নাও, হাতহালি পাও!

মানুষ হও! কিন্তু অবোধ হয়ে পাঁচিল টপকে পালাতে চেষ্টা না—ওতে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে। মনে রেখ, তুমি কামিউনিষ্ট সমাজের লেখক!

কেউ পাঁচিল টপকায়নি! সেই কারণে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে সোভিয়েট সাহিত্য মেলেনি!

এর চেয়ে অকসমানার সঙ্গে সেদিন মেঘলা ও টিপটিপ বৃষ্টির দিনে মস্কো চিড়িয়াখানা দেখে বেশি আমোদ পেলাম! আলীপুর চিড়িয়াখানার মতো এটি সম্পদশালী নয়, জীব জ্ঞানোয়ার বড় কম। বৈচিত্র্য তার চেয়েও কম। সেদিনকার ঠান্ডা ছিল অতি প্রবল। কিন্তু সেই অসহনীয় ঠান্ডার মধ্যে একমাত্র দ্রুতব্যা জন্তু ছিল উত্তর মেরুলোকের তিনটি শেবতভল্লুক। ওদের পক্ষে মস্কো এখন 'গরম' দেশ। দুটি ভল্লুক আরামে ঘুমোচ্ছে, কারণ কৃত্রিম উপায়ে তাদের উপর 'ঠান্ডা' বৃষ্টিপাত করা হচ্ছিল। তৃতীয়টি এই 'অসহ্য গরমে' বরফজলের পর দিয়ে ছোটোছোটো করছে! ওরা বিশেষ হিংস্র। একটি প্রশস্ত পরিখা মাঝখানে রেখে ওদেরকে খোলা জায়গায় দেওয়া হয়েছে। এদিকে একটি 'উষ্ণ' প্রাঙ্গণে রাখা হয়েছে নেহরুর দেওয়া ভারতীয় হাতীটিকে! এইটি সকলের পক্ষে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। অপর একটি অঙ্গনে একটি বৃহদাকার ও সুপুষ্ট সিংহের কোলের কাছে তার ঘনিষ্ঠ 'বন্ধু' একটি কুকুর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে রয়েছে! শীতপ্রধান দেশের চিড়িয়াখানায় বর্ণবৈচিত্র্য কম!

দ্রুপকাল দেশের আকাশ যে ঘননীল, এটি রাশিয়ার অধিবাসী জানে না! সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তকালে ভারতের আকাশে প্রত্যক্ষ এটি এবং মিশ্রিত ১৮টি বর্ণের সমারোহ দেখা যায়, এটি শুনলে ওরা অবাক হয়ে থাকে! দ্রুপকাল আকাশের সকল রং যে ভারতীয় পাখিরা আপন-আপন দেহে জড়িয়ে বনে-বনে কুজন-গুজন করে বেড়ায়, এটি ওদের অজ্ঞাত। ময়ূর-ময়ূরী ওদের কাছে স্বপ্নবৎ।

গোর্কি স্ট্রীটে এক অট্টালিকায় এসে থামলাম। এটি শিশুসাহিত্য প্রকাশন-রাজ্য! প্রতিটি রিপার্বালকে এমনই একেকটি প্রকাশন-রাজ্য বর্তমান। মাত্র এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় বছর কম বেশি ৬০০ খানা শিশুপাঠ্য সাহিত্যের বই ছাপা হয়, যার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ কোটি। পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিশু-

পাঠ্য গল্প ও রূপকথার বই এখান থেকে ছাপা হয়। বাঙ্গলা বইও রয়েছে অনেক-গুলি। বয়সেরও ভাগ আছে। ৩ থেকে ৭, ৭ থেকে ১২, ১২ থেকে ১৬ ইত্যাদি। পাঠ্য তালিকার শ্রেণীবিন্যাস আছে, সুস্থ মন, প্রকৃতি ও সদভ্যাসের উপর জোর দেওয়া। নৈতিক চেতনা, শ্রম ও সম্ভ্রম-বোধ, কর্মের প্রতি নিষ্ঠা, প্রত্যেক বিষয়টির প্রতি অনুরাগ, এবং জীবন সম্বন্ধে সমগ্র ঔৎসুক্য—এইগুলি নিয়ে শিশুচিন্তাগ্রাহী রসসাহিত্য! এখানে সব পাঠশালার বই যায়, শিক্ষকদের কাছে বুলেটিন পাঠানো হয় গ্রন্থাদির বর্ণনা দিয়ে—যাতে তাঁরা নির্বাচন করে নিতে পারেন। শিশুসাহিত্যের লেখকরা আসেন শিশু উৎসবে যোগদান করতে। বইয়ের অন্তর্গত 'হিরো' এবং 'হিরোয়িনকে' যথাযথ পোষাকে মণ্ডের উপরে দেখানো হয়। শিশু-পত্রলেখকদের মন্তব্য ও অভিমতগুলি জমিয়ে রেখে অনুমান করে নেওয়া হয়, তারা কি কি ধরনের বই ভালবাসে! তখন ডাকা হয় লেখকদের এবং অন্যান্য সভ্যদের। ১৯৪৯ থেকে দশ বছর পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের শিশুসাহিত্যে ১,২০,০০০ খানা বই ছাপা হয়েছে। এই বিচিত্র গ্রন্থ প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ হল, বহু বইয়ের ভিতরে বর্ণিত রূপকথার এক একটি বর্ণনা এখানে জীবন্ত দৃশ্যে রূপান্তরিত করে দেখানো হয়ে থাকে, এবং শিশুরা এসে তাদের 'পরিচিত' দৃশ্যগুলি হুবহু দেখে আনন্দে মেতে ওঠে! এই প্রতিষ্ঠান 'রামায়ণ ও মহাভারতের' বহু কাহিনী নিয়ে বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। এখানকার প্রবীণ ডাইরেক্টর মিঃ আইভান ভেভিভ আগাগোড়া আমাকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

অতঃপর প্রীমতী অকসানা আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন মস্কোর একটি মুসলমান পল্লীতে। নতুন ও পুরাতন মস্কো মিলিয়ে রয়েছে একই সঙ্গে। এটি মস্কোর পুরনো পল্লী! আশপাশের চেহারাটি যথেষ্ট সুশ্রী নয়। এখানে ওখানে আবর্জনা; অপরিচ্ছন্ন নালীপথে নোংরা চোখে পড়ে। এই বিজ পল্লীর একস্থলে এসে আমাদের গাড়ি থামতেই একটি দরিদ্রা নারী এগিয়ে এল একটি পাত্র হাতে নিয়ে! সে চাইল মসজিদের দরূণ চাঁদা, আমি বুকলাম এটি ভিক্ষা। পাশের একটি গলিতে ডেলা-ডুমুরি ডিঙ্গিয়ে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল মস্কোর প্রধান মসজিদের

সময়ে। আজ রশ্মীয় মুসলমানগণের একটি বিশেষ পার্বন উপলক্ষে মসজিদের মধ্যে এখনই প্রার্থনা আরম্ভ হবে। অকস্মাৎ গাড়ির মধ্যে রইলেন, আমি মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলাম। জুতো না ছাড়লেও চলত, কিন্তু আমি ছেড়েই ঢুকলাম। হলটি বৃহৎ, এবং ভিতরটি সম্পদশালী। দেওয়ালে ও থাম-গুলিতে নানাবিধ চিত্রন। মক্কাভিত্তিরে বড় বড় ছবি। পশ্চিমের দেওয়ালের দিকে উঁচু পাথরের বেদীতে ইমামের আসন। ভারতের শ্রেষ্ঠ মসজিদগুলির অভ্যন্তর-ভাগের তুলনায় এই কক্ষটি কম সম্পদশালী নয়। ভিতরে একটিও স্ত্রীলোক নেই। পঙ্কশমশ্রু-বিলম্বিত সৌম্যমূর্তি করেকজন পাগাড়পরা বৃদ্ধ মুসলমান উপস্থিত রয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি কোটপ্যান্ট ও চাঁদিটুপিপরা। ষাঁদের টুপি নেই, তাঁরা মাথায় রুমাল বেঁধে নিলেন। মেঝের উপর মোটা জাজিমপাতা। তারই উপর বসেছেন সবাই। ভিতরে জনতা পরিপূর্ণ, তিল-ধারণের ঠাই নেই। সকল বয়সের পুরুষরাই উপস্থিত রয়েছেন। চেহারায় বা পোষাকে দাঁড়াদশা বা অপরিচ্ছন্নতার লেশমাত্র নেই। আমি এতদিনে অনেকটা লোক চিনতে শিখেছি। এদের মধ্যে তাতার, মঙ্গোল, উজবেক, তুর্ক, কসাক, ককেসীয়, —প্রায় সকলেই আছেন। আমাকে এদের অনেকে ভারতীয় মুসলমান ঠাট্টা নিয়ে নিয়েছিলেন! কেননা আমিও এক ফাঁকে মাথায় রুমাল বেঁধে নিয়েছিলাম! অতঃপর আমি অগ্রসর হয়ে ইমামের আসনের কাছে গিয়ে আসন নিয়ে যথারীতি পিছন দিকে পা মূড়ে বসলাম, এবং বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে ইমামের আরবীয় ভাষায় বক্তৃতা শুনে লাগলাম! ভাষা বঝিনে, কিন্তু তাঁর দীপ্তকণ্ঠে যে-ভাষণ উচ্চারিত হচ্ছিল, সেটি বিশেষ প্রেরণাদায়ক। এই ভাষণের ফাঁকে-ফাঁকে যখন নমাজ পড়া এবং বিশেষ ভঙ্গীতে পিছন দিক উঁচু করে মেঝের উপর মাথা নোওয়ানো, এবং একবার দাঁড়িয়ে একবার হাঁটু মূড়ে বসে আবার মাটিতে মাথা রেখে পিছন দিক উঁচু করে প্রার্থনা করা আরম্ভ হয়ে গেল,—আমিও তখন “ভারতীয় মুসলমান” হয়ে উঠতে বাধ্য হলাম! ‘হিন্দুশ্রেষ্ঠ’ ব্রাহ্মণকুলে আনুষ্ঠানিক পরিবারে আমার জন্ম, এটি আরেকবার উপলব্ধি করার আগেই আমাকে বারম্বার

সকলের দেখাদেখি উপাড় হতে হচ্ছিল এবং বিজারিজ করে কিছু একটা বলতে-বলতেই আন্দাজ করার চেষ্টা পাচ্ছিলাম, অন্যান্য সকলের সঙ্গে সমানতালে আমি নিজের সোজা হয়ে উঠতে, উঠে দাঁড়াতে ও আবার নিজের কান ধরে হাঁটু মূড়ে বসতে সমর্থ হচ্ছিলাম কিনা! এইভাবে কতক্ষণ অবধি ‘মাকে-কানে-খৎ’ দিয়ে-ছিলাম আমার মনে নেই! কিন্তু জীবনের ওই প্রথম সুন্দর অভিজ্ঞতাটি নিয়ে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন আমার মুখে-চোখে শ্রদ্ধানুরাগ লক্ষ্য করে শ্রীমতী অকস্মাৎ বললেন, আপনি যে একজন ভারতীয় মুসলমান, আমি জানতুম না!

আমি হাসলাম। হিন্দু এবং মুসলমানের নামের মধ্যে যে পার্থক্যটি সর্বত্র বর্তমান, অথবা বিশেষ নামের সঙ্গে বিশেষ একটি ‘ধর্ম’ জড়ানো থাকে,—আধুনিক সোভিয়েট নাগরিকরা এ সম্বন্ধে তেমন অবহিত নন। এটি নিয়ে তাঁরা মাথাও ঘামান না!

সোভিয়েট ইউনিয়নের কয়েকটি হাসপাতাল আমি নিজের গরজেই দেখে-ছিলাম। সেদিন মস্কোর একটি আধুনিক হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এটি মস্কোর একটি পুরনো কালের অভিজাত পল্লীতে অবস্থিত, এবং এটির নাম “The First Clinical City Hospital”. অকস্মাৎ সঙ্গে ছিলেন। এখানকার যিনি ‘ভাইস-চীফ’, তাঁর অনুরোধে আমরা ঔষধ-মাখানো সেই পরিচিত বেতবর্ণের একটি পোষাক পরে নিলাম। এই চিকিৎসাকেন্দ্রে মেয়ে-পুরুষ এবং বালক-বালিকা—সকলেই থাকে। অপরিপুষ্ট দেহ, বিকলাঙ্গ, বর্ণাশ্রয়িতা, ভৌতিক চেহারা, অগ্নাবিকার, অপ্রাকৃতিক ভঙ্গী, মূদ্রাদোষ, রক্তন অভ্যাস, অকাল বার্ধক্য—এইগুলির সূচিকিৎসা এখানে হয়ে থাকে। রোগীর পক্ষে কোনও প্রকার খরচপত্র এখানে নেই। রোগী দেখতে আসার সময় আত্মীয়রা কেউ তিন-গুণ দামে দাগী কমলালেবু বা আধ-পচা আপেল কিনে চোকে না, অথবা হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন নিয়ে বাইরে থেকে কেউ ঔষধ কিনে আনে না! আমার প্রশ্নের উত্তরে জানলাম, রোগীদেরকে এখানে দুফালা বাসি রুটির গায়ে বনস্পতি-মাখন ছুঁইয়ে এবং ময়লা এক পেয়লা চা সঙ্গে দিয়ে ‘ব্রেকফাস্ট’ বলে চালানো হয় না! এখানে প্রতিদিন

মোট পাঁচ বার পূর্ণভোজ্য দেওয়া হয় প্রতি রোগীকে, এবং তার মধ্যে প্রতি দফায় তিন প্রকার ফল, খাঁটি দুধ, মাখন ও চীজ, মাংস, ডিম এবং স্ত্রীম-চালা সুপ! এই হাসপাতালের অট্টালিকা থেকে আন্দাজ ৩০০ গজ দূরে আর একটি বৃহৎ বাড়ি হ’ল। এই হাসপাতালের রান্না-ভাঁড়ার এবং ঔষধ-পত্রাদির স্টোর, এবং উভয়ের মাঝখানে একটি ভূগম্ভস্থ ক্ষুদ্র ‘রেলপথ’ ইলেকট্রিকের সাহায্যে দিবা-রাত্রি আনা-গোনা করছে আহাৰ্য ও ঔষধপত্র নিয়ে! আগা-গোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চলে। আমরা এই সুবৃহৎ চিকিৎসাকেন্দ্রের তিনতলা অট্টালিকার প্রায় প্রতি কক্ষই ঢুকে একে একে পর্যবেক্ষণ করছিলাম।

কাঁচের একটি মস্ত ঘরে একখানা টেবলের ওপর বছর বারো বয়সের একটি ছেলেকে শুইয়ে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছিল। আপাদমস্তক আচ্ছাদিত জন-আম্বিক ডাক্তার সেই কাজে ব্যস্ত। ওদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ চেনবার উপায় নেই। ছেলের বৃকের একটি পাশে উপর থেকে নীচে পর্যন্ত ছুরি দিয়ে সম্পূর্ণ দুফালা করে চিরে ফেলার ফলে রক্তের ধারা নেমেছে। বৃকের ভিতর থেকে রক্তিম তাল-মাঁসের মতো একটি মাংসপিণ্ড বার করে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, সেটি ধুক ধুক করছে কিনা! এটি নাকি ‘হুপিণ্ডের অস্ত্রোপচার’!

এটি আমার পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা বলেই আমি উৎসুক হয়ে উপরের কাঁচের ভিতর দিয়ে নিরীক্ষণ করছিলাম। ছেলোটর চোখ খোলা, এবং সে নিঃসাড়। বোধ হয় “কাজ” করতে কিছু অসুবিধা হচ্ছিল, সেই কারণে আরেকবার ছুরি বসিয়ে পাকা পেঁপের মতো বৃকের বিশেষ অংশটা আরেকটু চিরতে হল! এবার হঠাৎ আমার পাশ থেকে শ্রীমতী অকস্মাৎ মূত্থের একটা অস্ফুট শব্দ করে সরে গেলেন এবং সম্ভবত বাথ-রুমের দিকে গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ যাবৎ অসুস্থ ছিলেন! তাঁর ভিতরের জননীর হুপিণ্ডে বোধ হয় দোলা লেগেছিল।

ভাইস চীফ বললেন, এটি হার্ট অপারেশন! এখানে ফুসফুসটি খুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। জন্মের ফুসফুস এনেও জোড়া দেওয়া হয়। ছেলোটর বাঁচবার আশা ছিল না।

সমস্ত টেবল এবং ডাক্তারদের

পোষাকে রঙের ছড়াছাড়ি দেখে প্রশ্ন করলুম, এবার বাঁচবে মনে হয়?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, দিন তিনেক পেরোলে বলা বাবে। আশা করি বাঁচবে!

প্রথমবার সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে জেনেছিলাম, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু অপেক্ষা সেখানে জনপ্রিয় অপর আরও দুইজন ভারতীয়! তারা হলেন বোম্বাই সিনেমা চিত্রের অভিনেতা এবং অভিনেত্রী! তাঁদের সূখ্যাতি ঘরে ঘরে এবং মুখে মুখে শুনিয়েছিলুম। তারা ওদেশে গিয়েছিলেন তাঁদেরই একথানা ছবি সঙ্গে নিয়ে। এই ছবির কাহিনীকার জনৈক ভারতীয় কমিউনিষ্ট! ছবিটি বা কাহিনীটি কেমন আমার জানা নেই। কিন্তু সেই ছবির একটি ‘অপদার্থ’ এবং ‘চটখুশী’ গান সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বত্র জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এই কারণে যে, সেটি নাকি ‘ভারতীয় সংগীতের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ’! গানটি আমি শুনিয়েছি। ভাষাটি অশ্রাব্য এবং ইতর। কিন্তু এটির মধ্যে নৃত্যরস-ভঙ্গীর একটি চাল থাকার জন্যই এর জনপ্রিয়তা বেশী। কলকাতার বিড়ির দোকানে, চায়ের হোটেলে, ইন্সকুল-কলেজ পালানো ছেলে-মহলে, এবং বারোয়ারী সর্বস্বতী পূজার লাউড-স্পীকারে—এই গানটি একদা আসর জমাতো! যাই হোক, এটি ‘ভারতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ’ এ আমার মনে হয়নি!

দ্বিতীয়বার যাত্রাকালে আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের চব্বিশখানি গানের ‘রেকর্ড’। এগুলি দিয়েছিলেন ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র কর্মী শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার মহাশয়। আমি সেগুলি উপহার দিয়েছিলাম মস্কোর ‘House of Friendship’ বা মৈত্রীভবনে গিয়ে। তাঁরা বিশেষ সমাদর ও আনন্দের সঙ্গে ‘রেকর্ড’গুলি গ্রহণ করেছিলেন। মস্কা বেতারে এগুলি বাজানো হয়েছিল।

‘মৈত্রীভবন’টি একটি আঁচ সূদৃশ্য অট্টালিকা। দূরের থেকে এই বৃহৎ অট্টালিকাটি কে অলংকার-বহুল স্থাপত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে হয়। মস্কোর সর্বাপেক্ষা জনবহুল একটি রাজপথের সামনে এটি দাঁড়িয়ে। পৃথিবীর সকল জাতির প্রতিনিধিগণকে এখানে আনা হয়। ‘রুশ-ভারত সংস্কৃতিক সম্পর্ক’ সংস্থার পক্ষ থেকে আমার ওপর একদিন ডাক পড়ে এবং সেইদিন এই ‘মৈত্রীভবনে’ গিয়ে কয়েকটি কথা বলেছিলাম। সেই আসরে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন বাঙালী জ্ঞানেন। প্রথম হলেন বিদ্যুৎ

শ্রীমতী বিকোভা,—আমার বিশেষ পরিচিত। দ্বিতীয়জন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংস্থার ভারতীয় বিভাগের কৃতী অধ্যাপক ‘গ্নাচুক দানিলভুচক আলেকজান্দার’,—এঁর সঙ্গে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আগ্রা সাহিত্য সম্মেলনে আমার অলাপ হয়। ইনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেখানে বাঙালায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৃতীয়জন হলেন মিঃ ই-এন-কমারভ। ইনি পররাষ্ট্র বিভাগের সাংস্কৃতিক উপভাগের তরুণ কর্মী,—এঁর নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত আছে! এ ছাড়া ইনি প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে গবেষণার কাজ করেন অধ্যাপকরূপে। এই সভায় ‘প্রাবদা’, ‘ইজডেসতিয়া’ প্রভৃতি সংবাদপত্রের লোক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি স্বরূপ ছিলেন বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ প্রবীণ অধ্যাপক মিঃ বালাবুশোভিচ। ইনি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একজন বিশেষ বন্ধু, এবং এঁর কাছে আমার সম্বন্ধে ডাঃ সুনীতিকুমার একখানি পত্র লিখেছিলেন। ভারত-সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এঁর ভাষণ সোঁদন উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছিল!

প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে অপর একজন ভারততত্ত্ববিদ হলেন সূদর্শন অধ্যাপক মিঃ চেলিশেভ। ইনি সূদর্শ হিন্দী ভাষায় কথা বলেন। ভারত এবং কলকাতার সঙ্গে ইনি বিশেষ পরিচিত। সোভিয়েট ইউনিয়নে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসবে ইনি ছিলেন প্রধান কর্মাধ্যক্ষ।

চেলিশেভের বাড়িতে সোঁদন মধ্যাহ্নভোজনে গিয়েছিলাম।

পুরাতন মস্কোর একটি অঞ্চলে চেলিশেভ সপরিবারে বাস করেন। এঁর খ্যাতি, সমাদর এবং প্রতিষ্ঠার তুলনায় বসবাস ব্যবস্থাপতি যথেষ্ট উন্নত নয়। যে-বাড়ির নীচের-তলায় একটি স্বল্পপারিসর ফ্লাটে উনি থাকেন, সে-বাড়িটি সাবেকালের হলেও বিশেষ মজবুত। কিন্তু সমস্ত বাড়িখানা বারোয়ারী। কে কোন তলায় রয়েছে, কার সঙ্গে কার যোগ, কে কখন কোন দিক থেকে আসছে যাচ্ছে, কে পরিষ্কার রাখছে এই ধূলিমলিন মস্ত বাড়িখানার পাঁচ-দুয়ারী ঘরদোর,—‘কাকস্য পরিবেদনা!’ এই কারণে লক্ষ্য করছি, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশিষ্ট কর্মচারী, খ্যাতিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ নাগরিক,—যথা উপমন্ত্রী, ডাই-রেক্টর, ইউনিয়ন সেক্রেটারী, কমিটির চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যান, দোভাষী বা দোভাষিণী ইত্যাদি—এঁরা কেউ সামাজিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলে আপন আপন বাসস্থানে আমন্ত্রণ করে পরদেশীকে সহজে নিয়ে যেতে চান না! ওঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের স্থান হল হোটেল,

আপিস, একজিভিশন, লবী, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, পথঘাট ইত্যাদি। অথবা বাইরে-বাইরে! এর দুটি কারণ আমি বন্ধুতে পরিতুম। প্রথম, পরদেশীর সম্বন্ধে সন্দেহ বা আড়ম্বল। দ্বিতীয়, পরদেশীর সামনে সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে গৃহস্থালীর অভাব-অসুবিধাগুলি চেপে রাখা,—কেননা সেখানে আত্মসম্মানের প্রশ্ন জড়িত। অনেক সময় আমি স্বল্পকালের পরিচিত কোন কোনও ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে যখন দেখতুম, চমৎকার সজ্জা ফ্যাটে তিনি বসবাস করছেন, তখন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ঘরদোর দেখতে পাচ্ছি—কেন—এ প্রশ্ন আমার মনে আসত! সর্বাপেক্ষা আনন্দ পেয়েছিলাম শ্রীমতী অকসানার সরল স্বীকারোক্তিতে। তিনি বারম্বার বলতেন, আমার ওখানে আরেকটি ঘর থাকলে আপনাকে আমি কয়েকদিন রেখে দিতুম! কিন্তু বড় জায়গা কম। একটিতে থাকে আমার মেয়ে-জামাই, আরেকটিতে আমি! আমার অপর দোভাষিণী শ্রীমতী লিডিয়া তাঁর পারিবারিক জীবনের কথা আলোচনাই করতে চান না! শব্দ বলতেন, আমি একটি ঘরে থাকি, এবং আমার ছেলে যখন ছুটিতে আসে, আমার কাছেই থাকে!

সোভিয়েট রাষ্ট্রের একটি আইন আছে এই, প্রতি নাগরিককে অন্তত তিরিশ বর্গফুট পরিমাণ পাকা আশ্রয়-স্থল (living space) দেওয়া চাই! কিন্তু আরও বছর দশকের আগে এই আইনটি বধ্যযথভাবে কার্যকরী করা সম্ভব বলে মনে হয় না। আমাদের ভারত-বর্ষে কুঁড়েঘরে এবং গাছতলাতেও আমরা ডেকে আনি ‘অতিথি নারায়ণকে’! আমরা হৃদয়ের প্রাচুর্য প্রকাশ করি, জড়বস্তুর প্রাচুর্যের দ্বারা ‘বহিরাগতকে’ অভিভূত করার চেষ্টা পাইনে। ভারতীয় চিত্রে দৈন্যবোধ নেই বলেই আমরা আমাদের অভাব ও দারিদ্র্যকে প্রকাশ করে থাকি এবং অন্যের সাহায্য গ্রহণ করি! আমরা ঘরে ‘উচ্ছেদ’ ভেজে বাইরে ‘পটোল’ বলে চালাইনে! যারা বাইরে থেকে আসে তারা আমাদের অভাব-অভিযোগ দেখে যায়, কিন্তু স্বভাব-দৈন্য নিয়ে কেউ কথা তোলে না! বরং দরিদ্র ভারতকে সম্মানই দিয়ে যায়! আমেরিকান লেখক ‘লুই ফিশার’ গান্ধীজির পর্ণকূটরে একদা সাত দিন বাস করেছিলেন। তিনি নিজের রান্না করতেন, বাসন মাজতেন, ঘর দোরে ঝাঁটা দিতেন, নিজের কাপড় নিজে কাচতেন! ইংরেজ মেয়ে কৃষ্ণাবেন গান্ধীজির পাল্লায় পড়ে দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন! দীনবন্ধু এন্ড্রুজের কথা আজও কেউ ভোলেনি! আরও অনেক উদাহরণ আছে। ভারতবর্ষের তথাকথিত ‘দারিদ্র্য’

অবগাহন করে অনেকেই পদ্মলাভ করেছেন! আমরা আমাদের দূরবন্ধ্যার কথা বলতে কোথাও ভয় পাইনে, এবং আমাদের প্রকৃত ব্যাধি চেপে রাখিনে। ভিতরের ছুঁচোর কীতর্ন ঢেকে বাইরে কোঁচায় পশুন করিনে। অন্দর-মহলের কলঙ্ক আড়াল করবার জন্য বাইরের জানলায় সিস্কের পর্দা বোলাইনে! আমাদের যারা ভাল করে চেনে তারা আমাদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও চেনে, দুর্গত অবস্থা জেনেও সম্মান করে, কারণ আমরা 'বিদূরের' বংশ!

অহংকার করিনে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নিকট ধনরাজ আমেরিকা দ্বাদশ বৎসর কাল ধরে যে-গঞ্জনা সহ্য করেছে, বিশেষ করে 'জুন ফন্টার ডালসেস' আমলে,—তার পরেও আমেরিকার কাছে থেকে অগণ্য কোটি টাকার অকুপণ সাহায্য পাওয়া—যে কোনও রাষ্ট্রের ইতিহাসে এটি অভিনব ঘটনা! তার তুলনায় এখন পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়! কিন্তু শুধু একটি গিলাই ইপ্পাত কারখানা সৃষ্টির বাহাদুর নিয়ে সমগ্র সোভিয়েট ইউ-

নিয়নে যে বিপুল প্রচারকার্যের চেহারা দেখেছি তাতে রবীন্দ্রনাথের একটি 'কণিকা' আমার মনে পড়ত :

"শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির, লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।"

আমার বিশ্বাস, সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ ভরতকে আমেরিকার সাহায্যদানের প্রকৃত পরিমাণটি জানে না! তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের 'দনের' কথাটাই বড় বড় অক্ষরে পড়ে। এটি রাজনীতি কিনা আমি জানিনে।

সোম্যদর্শন মিষ্টভাষী এবং বন্ধুবৎসল চেলিশেভের আতিথ্যেরতায় আমি মূগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর ছোট্ট ফ্ল্যাটে চলাফেরার জায়গা কম, কিন্তু ওইটুকুর মধ্যে তাঁর হৃদয় ছিল দিকচিহ্নহীন! ঘরে তাঁর স্ত্রী এবং বিধবা জননী! জননী তাঁর স্বাভাবিক আড়ম্বর্তা কাটিয়ে কিছুতেই সামনে আসতে পারলেন না। স্ত্রী রান্না করেছেন সকাল থেকে। যেমন লজ্জাশীলা, তেমনই মধুরভাষিণী! আমাদের সামনে বসে কিছুতেই তিনি থেতে পারলেন না! ঘরের সমস্ত কাজকর্ম শাশুড়ী ও পুত্রবধূই সম্পন্ন করেন। বাজারহাট সবই তাঁদের করতে হয়।

চেলিশেভ জার্মান বৃন্দে বোমারু বিমানের পাইলট ছিলেন।

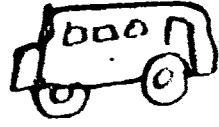
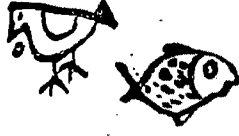
আহারাদির পরে চেলিশেভের ঘরটির মধ্যে গড়াইছিলুম। আমাকে রাগাবার জন্য চেলিশেভ আগে গ্রামোফোন রেকর্ডে হিন্দী গান দিলেন। কিন্তু আমার চোখ পাকানো দেখে রবীন্দ্রনাথের "রোদন ভরা বসন্ত" চড়ালেন।

গানে, গল্পে, 'তামাশায় ও তন্দ্রায় চেলিশেভের সঙ্গে কেটে গেল প্রায় সারা দিন। বাইরে রোদ দেখে উঠতেও ইচ্ছা হাঁছিল না। চেলিশেভও নানা আছিলায় আটকে রাখার চেষ্টা পাচ্ছিলেন। এই মিষ্টস্বভাব ব্যক্তি আমার নিকট স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

কিন্তু ওই অতি-সাধারণ মধ্যবিত্ত "বাগ্যালী" ঘরকন্নার মধ্যে বসে আমার একবারও মনে হয়নি, নিজের দেশ-গাঁ ছেড়ে আমি উত্তর মেরুবলয়ের সীমানা-বর্তী মস্কা শহরের একটি যেমন-তেমন পল্লীর মধ্যে বসে অলস অপরাহ্ন অতিবাহিত করছি। আর কোনও দিন একটি রুশ পরিবারকে এমন একান্ত আপনজন মনে হয়নি! (ক্রমশঃ)



বেঙ্গলুরু খাতা



অসংকলিত

॥ হাট-বাজারের কয়েকজন মানুষ ॥

রাস্তাঘরে না ঢুকলে কোনো একটি পরিবারের সত্যিকারের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা হয় না। তেমনি বাজারে না ঢুকলে স্থানীয় মানুষজন সম্পর্কে সত্যিকারের ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। রাস্তাঘরে যেমন কোনো আশ্রয় থাকে না, তেমনি বাজারেও কোনো আড়াল নেই। আপনার পাশের ছাটের যে-মানুষটির সঙ্গে নিত্য যাওয়া-আসার পথে রোজ দু-বেলা আপনার দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে বা যে-মানুষটির সঙ্গে আপনি গিয়ে বসছেন একই চায়ের দোকানে বা একই খেলার মাঠে বা একই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসরে বা একই ট্রামে-বাসে-আপিসে, তাকেও কোনোদিন বাজারের মধ্যে আবিষ্কার করতে পারলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে মানুষটির সঙ্গে আপনার পরিচয় অসম্পূর্ণ ছিল।

বাস-স্টপের মেয়েটির কথা দিয়েই শুরু করা যাক। আপনিও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, রোজ ঠিক একই সময়ে এই মেয়েটি বাস-স্টপে এসে দাঁড়ায়। দীর্ঘাঙ্গী নিশ্চয়ই, কিন্তু তলবী নয়। আর এই কারণেই মেয়েটিকে বেন আরো বেশ চোখে পড়ে। শরীরের পুড়ি গায়ের গোলাপী রঙের সঙ্গে বেন ভারি চমৎকার মানিয়েছে। মেয়েটিকে অন্য-মনস্কভাবে বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আপনি নিশ্চয়ই অনেককিছু কল্পনা করেছেন। হয়তো একজন ভাগ্যবান নায়কের কথা ভেবে খানিকটা ঈর্ষাও অনুভব করেছেন মনে মনে। তাই আপনাকে বলছি, মেয়েটিকে অনুসরণ করে একদিন আপনিও বাজারের মধ্যে আসুন। দূর থেকে লক্ষ্য করুন, মেয়েটি কী কেনে আর কি-ভাবে কেনে। বাস-

স্টপের রহস্যময়ী তখন নিতান্ত আটপোরে সাজে আপনার বাড়ির মেয়ের মতোই আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে। কারণ মেয়েটিকে বাজার করতে না দেখলে আপনি নিশ্চয়ই কল্পনাও করতে পারতেন না যে মেয়েটির হাতের শোখিন

ভাঙা বাজার সবে হাই তুলছে। আর ছকবাঁধা রাস্তায় একটি মাত্র পাকে সমস্ত কেনাকাটি উদ্দেশ্যে শেষ করে। তারপরে এসে দাঁড়ায় বাস-স্টপে। পাশে গিয়ে দাঁড়ালে এখন হয়তো আপনি ওর হাতের শোখিন চামড়ার ব্যাগ থেকে আঁশটে গন্ধটুকুও পেতে পারেন।

এই মেয়েটি সম্পর্কে আপনার যদি আর কোনো কৌতূহল না থাকে তাহলে লুটিং ও গেজি পরা ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। ভদ্রলোকের সাজ-পোশাক হয়তো খানিকটা বিভ্রান্তিকর। কিন্তু মুখের সিগারেটের স্ম্যান্ডার্ট দেখতে পাচ্ছেন কি? যিনি এমন অবহেলার সঙ্গে এমন দামী সিগারেট টানতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই নিদেনপক্ষে কোনো সওদাগরী আপিসের ছোটখাটো অফিসার। হয়তো কোনো একদিন চাকরির উমেদার হয়ে এই ভদ্রলোকের সঙ্গেই আপনার সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে। কাজেই ভদ্রলোককে খুশি করবার হৃদিশ আপনার আগে থেকেই জানা দরকার।

লক্ষ্য করে দেখুন, আলুর দোকানে গিয়ে ভদ্রলোক হয়তো সবচেয়ে দামী আলুই কিনলেন একসের। কিন্তু সেই-সঙ্গে একটি কমদামী ছোট আলু ফাউ চাই। তেমনি এক ছটাক কাঁচালঙ্কার দাম যাই হোক না কেন তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু দুটি কাঁচালঙ্কা তাঁকে ফাউ হিসেবে পেতেই হবে। তেমনি মাছের দোকানে। তেমনি অন্য সবই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি বুঝতে পারবেন, ভদ্রলোকের কাছে ফাউটাই হচ্ছে আসল। যেখানে ফাউ নেই, সেখানে তিনি পারতপক্ষে যেতে চান না।

কিন্তু সকলেই যে এই ফাউয়ের দলে তা ভাববার কোনো কারণ নেই। খাঁক



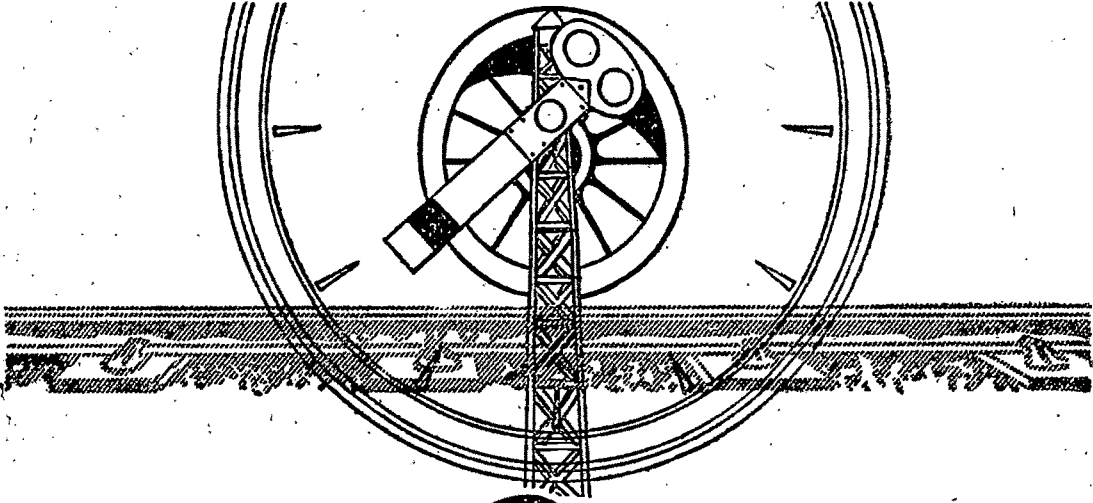
চামড়ার ব্যাগের মধ্যে রয়েছে এক পোয়া আলু, দু-পরসার কাঁচালঙ্কা, একটি পাতিলেবু ও আধপোয়া কাটা পোনা। নিত্য তিনশো পয়ষাট দিন এই একই বাজার। আসে খুব ভোরে যখন ঘুম-

হাফথ্যান্ট পরা মোটাসোটা গোলগাল চেহারার ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে দেখেন। গোল মুখখানা যেন ভরাট হাসিতে আরো গোল হয়ে উঠেছে। কারো পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকেন না, কারো সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলেন না। মূর্তিমান বিনয় বা অমায়িকতা যেন আধা-

মিলিটারি সাজপোশাক পরে বাজারের অলিগলিতে চলাফেরা করছে।

এই ভদ্রলোককে দেখে মনে হবে তিনি বাজারে এসেছেন অনেককাল পরে আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্যে। কুশল প্রশ্ন করছেন, বাড়ির খোঁজখবর নিচ্ছেন, এমন কি চলতি দা-

একটি গজবের ওপরে রসালো মন্তব্যও করছেন। তাঁকে দেখে মনে হবে; বাজারের থলেটা তিনি বোধহয় ভুলে নিয়ে এসেছেন স্বেগে। আর থলেটা যখন স্বেগেই আছে তখন একপো বেগুন-বা একপো পটল বা একপো মাছ কিনে নিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি। হ্যাঁ, রীতিমতো পয়সা



দশলক্ষাধিক

কর্মচর্যল কর্মী



গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে
বা হিমশীতল রাতে, প্রতি-
দিন-আমাদের নিজে ও
জগৎপের প্রতিটি মুহুর্তে
নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে
কর্মব্যস্ত রয়েছেন ভারতের
দশলক্ষাধিক রেলকর্মী।



নির্জন রেললাইন ধরে অগ্রসরমান গ্যাংম্যান, নিঃসঙ্গ কেবিনঘরের সিগন্যালম্যান, ধাবমান ট্রেনের নিরাপত্তায় নিযুক্ত পয়েন্টসম্যান, শব্দহীন সিগন্যাল-এ নিবদ্ধ-দৃষ্টি ড্রাইভার, ইঞ্জিন-এর অঙ্গার-স্বধার নিয়ন্ত্রণে মাধনে ব্যাপ্ত কায়ারম্যান, আর, শতশত টিকিট-এর ক্লাস্টারহীন কেনাবেচায় মগ্ন বুকিংক্লার্ক.....এঁরা সবাই, এবং, আরও অনেকেই, দেশের উন্নয়ন ও দেশের কল্যাণের জন্ত দিনরাত, চব্বিশ ঘণ্টা রেলের চাকাকে সচল রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।



ভারতীয় রেলপথ

জাতির সেবায় ১০১ বছর •

দেশের সেবায় ও দেশের সংগঠনে
উৎসর্গীকৃত



দিয়েই তিনি কিনছেন, দরদস্তুরের ধার দিয়েও যাচ্ছেন না। কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে আপনি বুঝতে পারবেন, এই ভদ্রলোকের কাছে আনাজ বা মাছের দর ঠিক বাজার-দর নয়, তার চেয়ে কম। এই ভদ্রলোককেও আপনি ভালো করে চিনে রাখুন। আপনার যদি কোনোদিন কাউকে চাকরি দেবার ক্ষমতা হয় তাহলে হয়তো এই ভদ্রলোকই হবেন আপনার প্রথম সাক্ষাৎপ্রার্থী। না, কারও পক্ষ নিয়ে কিছু বলবার জন্যে নয়, নিজের জন্যে ভেবে নয়-ই, তিনি এসেছেন নিতান্তই আপনার হিতৈষী হিসেবে কিছু সং-পরামর্শ দেবার জন্যে।

লক্ষ্য করতে পারেন আরো অনেককেই। কিন্তু আপনি না চাইলেও থাকে লক্ষ্য করতেই হবে তিনি হচ্ছেন মর্ত্তিমান যোমণার মতো সেই ভদ্রলোকটি যিনি চাকরের মাথায় মস্ত ধামা চাপিয়ে আঁপির পাঞ্জাবির বুকেপকেটে এক গোছা নোটের ঝিলিক তুলে বাজার উজাড় করার উল্লাসে মেতে উঠেছেন। আপনার যদি তাড়া থাকে তাহলে এই ভদ্রলোক যেখানে গিয়ে দাঁড়াবেন সেখান থেকে শত হস্ত দূরে থাকাই আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তবে দূর থেকে লক্ষ্য করতে পারেন, ইনি কত সহজে বাজারের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। একে সওয়া গছাতে পারলে যে-কোনো বেসাতী নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

ফোন: ৫৫-৪০৫২

বঙ্গল ডেকরেটর

১১০ টিয়ারজন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

প্রসাধন ও তুলনীয়

বোল্যাক্স

চ্যালকন পাউডার

বায়ারল কসমেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড



সার্ভ ড্রাইং সরঞ্জাম ও অফিস সংক্রান্ত ফেশনারী কাগজ বিক্রয় ও প্রিন্টার

৪২৩৫ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন: ২২-৪২২৩

কুইন ফেশনারী স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড

৬০/২, রাধাকৃষ্ণনগর স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

অন্যদিকে আপনার লক্ষ্যপথ থেকে সব সময়ে আড়ালে থাকতে চাইবেন এমন মানুষেরও অভাব নেই। এঁদের যাতায়াত একটু বেগার দিকে যখন সারা সকালের হস্ত কোচেকনার পরে বাজার একটু যেন কিমিরে পড়তে চাইছে। চাষীদের ডাল-গুলো ততোক্ষণে প্রায় খালি, উঁচু জায়গার স্থায়ী পসারীরা জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে শুকিয়ে-আসা আনাজের সজীবতা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে, জলে আর কাদায় থিকথিক করছে বাজারের সরু সরু রাস্তাগুলো, আর একটা ভ্যাপসা গুমোট অনেক মানুষের নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাল-গোল পাকিয়ে বন্ধ বাতাসে পাক খাচ্ছে।

ইনিও এসেছেন মাঝারি আকারের একটি থলে সঙ্গে নিয়ে। নজর বিশেষ করে মাটির দিকে। সারা সকাল ধরে হাজার মানুষের নাড়াচাড়ায় বাজারের কিছু কিছু পণ্য ততোক্ষণে বাতিল হয়ে গিয়ে জলেকাদায় মিশে গিয়েছে, যাকে বলা চলে বাজারের উচ্ছিন্ন। ইনি এসেছেন সেই উচ্ছিন্ন সংগ্রহ করতে। পচা আলু, পোকা খাওয়া বেগুন, হলদে হয়ে যাওয়া পটল—কোনো কিছুই ইনি বাতিল করেন না। অত্যন্ত মমতার সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকের সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে সবকিছু সংগ্রহ করে চলে।

এই ভদ্রলোককে অবশ্যই পাল্লা দিতে হয় আদুড় গা একপাল বাচ্চার সঙ্গে। এরা তাড়া দিলে পালায় না, ধমক দিলে ভয় পায় না, মার খেলেও কাঁদে না। সারা বাজারে এরা ছিটিয়ে-ছিটিয়ে থাকে। কোথাও এক চিলতে পচা কুমড়াও এঁদের চোখের আড়ালে থাকবার উপায় নেই।

আর আছে এমন একদল মানুষ যাদের দিকে নজর দেবার অবসর কারও নেই। এরা আসে দলে দলে, মুখ বুজে সারা বাজারে ঘুরে বেড়ায় আর শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে শস্তা দামের শাকপাতায় বাজারের থলে ভর্তি করে বাড়ি ফিরে যায়। মাছের বাজারের ধারেকাছে যায় না। মাংস বা ডিমের দোকানের দিকে দূর থেকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর হয়তো ভাবে যে মাছের বা মাংসের খানিকটা গন্ধ যদি থলেতে পড়বে বাড়ির হেঁসেলে হাজির করা যেত!

তাই আপনাকে বলছি, সময় পেলে একবার বাজারে আসবেন। আপনার প্রতিবেশীদের চিনবার জন্যে ভেবে বটেই, নিজেকে চিনবার জন্যেও।

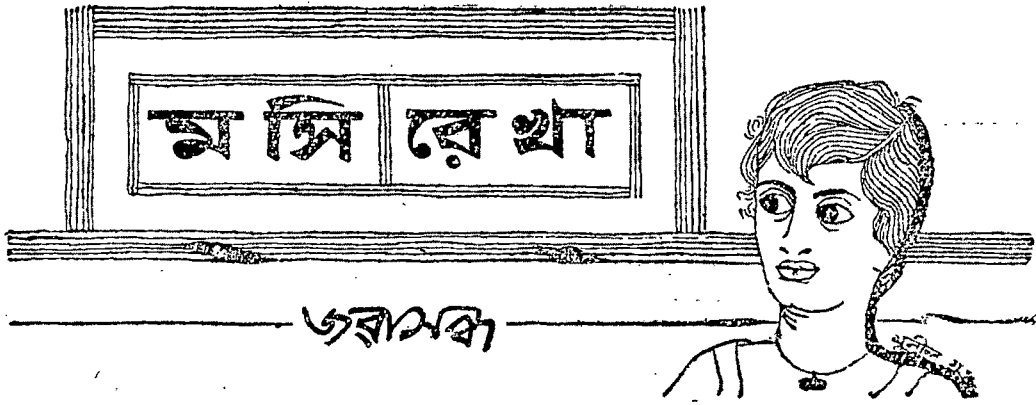
তাছাড়া বাজার করার প্রচণ্ড একটা নেশাও আছে। এমনতে আপনি হয়তো বিরক্ত হবেন, কথায় কথায় হয়তো আক্ষেপ জানাবেন যে সকালে উঠে এই একটি বামেলা আপনাকে রোজ পোয়াতে হচ্ছে; কিন্তু একদিন বাজারে না গিয়ে দেখুন, মনে হবে শরীরের ভেতরটা হাঁসফাঁস করছে। যারা রোজ বাজার করে তাদের পক্ষে একদিন বাজার করতে না পারাটা রীতিমতো অস্বস্তির ব্যাপার।

আর বাজারে যদি আসেন-ই তবে একটু সময় নিয়ে আসবেন আর চোখ-কান খোলা রেখে চলাফেরা করবেন। কিছুদিনের মধ্যেই আপনার ধারণা হবে যে বাজার এক অতি আশ্চর্য জায়গা। এখানে হেন বিষয় নেই যা নিয়ে বিশেষজ্ঞের মন্তব্য শোনা যায় না। সর্ব-বিষয়ে পারঙ্গম ব্যক্তিদের যদি সাক্ষাৎ পেতে চান তাহলেও এই সেই জায়গা। ঘোড়দৌড়ের মাঠে কোন্ ঘোড়া অবধারিত জয়মালা পাবে, খেলার মাঠে কোন্ খেলোয়াড় অবধারিত গোল করবে—ইত্যাদি খবর বাজারের মানুষের নখদর্পণে। এমন কি কোন্ সিনেমা মার খাবে বা কোন্ মন্ত্রী নির্বাচনে গণেশ ওলটাবে, তাও এখানে কারও অজানা নয়।

আর যদি আপনার আরো একটু অন্তর্দৃষ্টি থাকে তাহলে বাজারে এসে দেখতে পাবেন পৃথিবীর এক আশ্চর্য দৃশ্য। দাঁড় দাঁড় করে আগুন জ্বলছে আর একদল বোবা মানুষ ফোটা ফোটা চোখের জল ফেলে সেই আগুন নেবাতে চেষ্টা করছে।

আপনার প্রতিবেশী যে-ভদ্রলোককে চিরকাল নিরীহ ও নির্বিরোধী বলে জেনে এসেছেন, যিনি কোনোদিন চড়া গলায় কথা বলেননি, নিজের ছেলে-মেয়েকে যিনি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালো-বাসেন—তিনি যদি হঠাৎ একদিন বাজার থেকে ফিরে এসে অতি তুচ্ছ একটা কারণে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছেলেমেয়েদের মারধোর করতে শুরু করেন, তাহলে বুঝবেন যে বাজারের আগুন তার চোখের জলের পূর্জিকো নিঃশেষ করেছে।

তবুও আপনাক অনুরোধ করছি, খানিকটা সময় হাতে নিয়ে একদিন বাজারে আসুন। এই আগুন আর এই চোখের জল একদিন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। সময় থাকতে এই আগুন আর এই চোখের জলকে চিনে রাখুন। তাহলে আপনি নিজেকেও চিনতে পারবেন।



[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাল সকালেই চলে যেতে হবে। সহকর্মীদের সঙ্গে দেখাশুনোর পালা মিটিয়ে সন্ধ্যার পর আশুদ্বাবু সাহেবের বাড়ি গেলেন শেষ বিদায় নিতে। কথা-বার্তা যেটুকু হল, বেশীর ভাগই নীরবে, দুঃজনের মনে মনে। অনেকক্ষণ চুপ করে থসে থাকবার পর সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, দেশের বাড়িতেই যাচ্ছেন তো?

—আজ্ঞে না। সেখানে কেউ নেই। ঘরদোরও না থাকার মধ্যে।

—তাহলে?

—আপাততঃ গুরুদেবের কাছে যাচ্ছি। তারপর তিনি যা আদেশ করেন।

—সারা জীবনের সব কিছু রোজ-গার তো গুরুদ্বীকেই দান করে বসে আছেন। বাকী জীবনটা—

আশুদ্বাবু দাঁতে জিব কেটে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, তাঁকে দান করতে পারি আমি! সে স্পর্ধা কোনো-দিন মনেও আসেনি। বলতে পারেন, তাঁরই অনুগ্রহের দান তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি। তিনি যে গ্রহণ করেছেন, তাতেই আমি ধন্য।

সাহেব অনেকটা নিজের মনে বললেন, তার মানে পেনসন আর প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা কটাও ঐভাবেই যাবে। যাক, ওসব কথা তুলে যাবার সময় আর আপনার মনে দুঃখ দিতে চাই না। এখনই ইচ্ছা হবে একবার ঘুরে যাবেন। আপনার বর্ডার আপনারই রইল।

আশুদ্বাবু দূরোখ ছলছল করে উঠল। উত্তরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মত কী একটা বলতে গেলেন, পারলেন না। সাহেব কিছুক্ষণ পরে বললেন, আপনি ছিলেন, একটা বিষয়ে একবারে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

আশুদ্বাবু চোখ তুলতেই যোগ করলেন দিল্লীপের কথা বলছি। যাবার আগে পরীক্ষাটা দিয়ে যেতে পারবে কিনা, কে জানে?

—যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আপনার আদেশ আমি পালন করতে পারিনি, স্যার।

—না, না; এর বেশী আপনি আর কী করতে পারতেন? এত অল্প সময়ের মধ্যে যতখানি এগিয়ে দিয়ে গেলেন, সেটা আর কাউকে দিয়ে সম্ভব হত না।

—বিশেষ করে ওর কথাটাই আমাকে সব সময়ে পীড়া দেবে। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে হয়তো আপনাকে বিরক্ত করবো।

—একশবার করবেন। আমিও যখন যা হয়, আপনাকে জানাবো।

আশুদ্বাবুর গুরুদেব সম্বন্ধে তাঁর সহকর্মী মহলে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। থাকাই স্বাভাবিক। কে তিনি, কী নাম, কী তাঁর কীর্তিকলাপ, কোথায় আশ্রম—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন প্রায়ই লেগে থাকত সকলের মুখে। আশুদ্বাবু বিব্রত বোধ করতেন; তিনি জানতেন উত্তরটা তাদের খুশী করতে পারবে না। নাম একটা ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা অন্য দশজনের মত সাধারণ, সাদামাটা। আদিতে ‘স্বামী’ নেই, অন্তেও নেই ‘আনন্দ’। ‘আশ্রম’ বলতে হুগলী জেলার কোন এক নগণ্য গ্রামের শেষপ্রান্তে গঙ্গাতীরে গাছপালার আড়ালে খানকয়েক টালিছাওয়া মাটির ঘর। কার্যকলাপও প্রচার করবার মত কিছু নয়। গ্রামের বেশীর ভাগ লোক জেলে। জমিজমা নেই; পাশের গ্রামের মুসলমানদের মত কল-কারখানায় খাটে না, গরলাদের মত দুধ-ছানার কারবার করে না, তাদের

একমাত্র আশ্রয় গঙ্গা। মৃত্যুর পর সকলেরই, ওদের জীবনে এবং মরণে। কিন্তু মাটি-মা যেমন সহজে বরদা নন, ‘বহু খোঁড়াখুঁড়ি’র পর ‘শস্যকণার’ সম্ভান মেলে, গঙ্গা-মাও তাই। অনেক কাঠখড় দড়াদড়ি না হলে তাঁর ‘শস্য’-ভান্ডারে পৌঁছানো যায় না। সে সব সরঞ্জাম জোট্টোন বলে বছরের পর বছর ধরে গঙ্গা এদের কোলে ঠাই দেওয়া ছাড়া অপর কিছুই বড় একটা দিতে পারছেন না। তবু গঙ্গাকে এরা ছাড়েনি। বাপ পিতামহের ফেলে যাওয়া খানকয়েক ভাঙ্গা নৌকা আর গেটাকয়েক ছোঁড়া জাল নিয়ে ভোর না হতেই ভাসতে শুরু করে এবং সন্ধ্যার পর প্রায় শূন্য হাতে ঘরে ফিরে আসে।

এমন সময় ওদের পাড়া থেকে কয়েক গজ দূরে এক সারি বহু পুরনো আম-কাঁঠালের জটলার ধারে কোথেকে এসে ডেরা বাঁধলেন এক ‘সাধুবাবা’। অদ্ভুত সাধু। দাড়ি আছে, জটা নেই, গেরুয়া পরেন কিন্তু গাঁজা খান না, ধূনি জ্বালান না। সারাদিন ঘরে বসে কী সব পড়েন আর সন্ধ্যার ঠিক আগে চোখে চশমা এবং পায়ে স্যান্ডাল পরে গঙ্গার তীর ধরে অনেক দূর চলে যান। সংগী-সাথী কেউ নেই, রবিবারে কিংবা ছুটির দিনে বিভিন্ন স্ট্রেন ধরে একদল নানা বয়সী ভদ্রলোক আসেন ওঁর কাছে। সোঁদিন আর উনি পড়েন না, বেরোন না, প্রায় সারাদিন ধরে চলে শূন্য কথাবার্তা।

‘ভদ্রলোকের’ পাড়াটা এখান থেকে কিছু দূরে। তাঁরা এদিকটায় বড় বেশী ঘেঁসেন না। দু’একজন কালেভদ্রে দেখা দেন, মাছ সংগ্রহ কিংবা আদায় তহশিলের প্রয়োজনে। প্রবীণ লোক। তাঁদের কেউ কেউ সাধুর সংগ লাভ করতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে

গেছেন। এ কেমনধারা 'সাধু' ধর্ম কথা নয়, আধ্যাত্মিক আলোচনা নয়, মহাপুরুষ প্রসঙ্গ বা দার্শনিক মতবাদ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ নয়, এর বড় কিছু জিজ্ঞাসা ও আগ্রহ কেবল বৈবয়িক বিষয়ে। গ্রামে এবং তার আশে-পাশে কত লোকের বাস, কী তাদের উপ-জীবিকা, কী রকম আয়, যুবকেরা কী করে, লেখাপড়ার হার কত ইত্যাদি। পাণ্ডা প্রশ্ন করে তারা এই সাধুটির সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগ্রহ করলেন, তাও নৈরাশ্যজনক। এক সময়ে নাকি কোন সরকারী আফিসে চাকরি করতেন; অবসর নেবার পর সংসারের কোলাহল ভাল লাগল না, তাই নিরিবিলি দেখে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। বৃটিশ দাপটের যুগ। 'সরকারী' নামটা শুনলেই মন সন্ধিগ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁরা ফিরে গিয়ে নানা কথা রটিয়ে দিলেন। কেউ বললেন, লোকটা পুন্ড্রেশের স্পাই, কেউ বললেন, ফেরারী আসামী, যারা আরো বৃদ্ধিমান তারা গম্ভীরভাবে রায় দিলেন, স্পাই, তবে পুন্ড্রেশের নয়, ওর আসল মতলব নতুন কোনো টাকাস বসাবার মালি-মসলা যোগাড় করা। অতএব শত হস্তে—যে-কটি নিষ্কর্মী যুবক তাস পিটে আর থিয়েটারের রিহাসাল দিয়ে দিন গুজরান করছিল এবং একদিন সদলবলে এসে সাধুটিকে বাজিয়ে দেখবার মতলব আঁটছিল, তাদেরও সাবধান করে দিলেন প্রবীণ অভিভাবকেরা—ভুলক্রমেও যেন

এদিকটা কেউ না মাড়ায়, কোথাকার কোন স্বদেশী হাঙ্গামায় ফাঁসিয়ে দিতে কতক্ষণ!

'সাধু'ও 'ভদ্রপাড়া'য় না ঘেঁসে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন জেলেপাড়ার দিকে। তারা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'সাধুবাবা' নিজে থেকে এসে পায়ের ধুলো দিয়েছেন তাদের কুঁড়েঘরের আঙিনায়। কিন্তু ভোরপেরেই রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেল যখন উনি ঠাকুর-দেবতা, নামকীর্তন, পূজা-পাঠ বা ঐ জাতীয় কোনো প্রসঙ্গে না গিয়ে সোজা-সুজি ঘর-সংসারের কথা পাড়লেন, জানতে চাইলেন সারা বছর মাছ ধরতে হলে কথানা নৌকা চাই, কটা জাল, তার মোটামুটি খরচ কত, কার কী পরিমাণ দেনা আছে মহাজনের ঘরে। সকলের শেষে অকপটে স্বীকার করলেন তিনি 'সাধু' নন, সাধারণ সংসারী মানুষ, ওদের মধ্যে থেকে আপন জনের মত বাকী কটা দিন কাটিয়ে দিতে চান। তরপরেও আরো কিছুদিন গেল তাদের সন্দেশ ঘুরতে। কিন্তু বৃদ্ধির দৌড় তো বেশী নয়। তাই শেষটায় আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এগিয়ে এল খোলা মনে একরাশ অভাব-অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি নিয়ে। সাধুর নতুন নামকরণ হল 'বাবাঠাকুর'। ইতিমধ্যে তারা টের পেয়েছিল, প্রতি মাসের প্রথম দিকে কতগুলো করে মণিঅর্ডার আসে আশ্রমের ঠিকানায়। সেই দিকেই পড়ল ওদের লোলুপ দৃষ্টি। দলবেঁধে এসে প্রার্থনা জানায় বাবাঠাকুর যদি দয়া করেন, তাহলেই তাদের সব কষ্ট দূর হতে পারে। তিনি বললেন, 'ও টাকা' তোমাদের দেবার উপায় নেই। ওর অনেক ভাগিদার। (হেসে একগোছা মণিঅর্ডারের ফরম

দৌঁধিয়ে দিলেন) তোমাদের টাকা তোমরা যোগাড় করবে।

—আমরা কোথায় পাবো। একেবারে আকাশ থেকে পড়ল মাতব্বরের দল।

—পাবে ব্যাংক থেকে।

ব্যাংকের নাম শুনেছে কেউ কেউ, শহরে গিয়ে চোখেও পড়েছে দু-একজনের, মস্ত বড় পাকা বাড়ি, গেটে বন্দুকধারী দারোয়ান, সামনে দাঁড়িয়ে আছে মোটর। যারা ঢুকছে আর বেরোচ্ছে তারা সব বড় বড় বাবু। জাঁদরেল চেহারা, জমকালো পোষাক—আসাক। সেখানে পাশ্চাত্য পাবে তাদের মত গরীব মানুষ। বাবাঠাকুর কি ঠাট্টা করছেন তাদের সঙ্গে?

তিনি বললেন, সে ব্যাংক নয়, এ অন্য ব্যাংক। তোমরাই হবে তার মালিক, তোমাদেরই কারো ঘরে বসবে তার আফিস। ধারও নেবে তোমরা, তার সুদ থেকে যে লাভ হবে সেটাও তোমাদের।

একজন, যে ওদের মধ্যে সব চেয়ে চালাক, হেসে বলল, টাকাটা আসবে কোথেকে?

—সহরের বড় ব্যাংক থেকে। ধারও বটে, মূলধনও বটে। তার জন্যে তোমাদের সবাইকে জোট বাঁধতে হবে। টাকা যেটা আসবে, তোমাদের সকলের টাকা, সমান অংশ, সমান অধিকার। তা দিয়ে যা কিছু কেনা হবে, নৌকো, জালের সুতো, বাঁশ দাঁড়, আলকাংরা—তারও মালিক ঐ জোট, যার নাম সমবায় সমিতি। মাছ যা উঠবে, একসঙ্গে নিয়ে যাবে সহরে, বিক্রী করে যে টাকা পাবে, তার থেকে ব্যাংকের কিস্তি শোধ দিয়ে বাকীটা ভাগ হয়ে যাবে তোমাদের অর্ধাংশ সমিতির মেম্বরের মধ্যে।

মাতব্বরের চোখে মুখে ঔৎসুক্যের আলো ফুটে উঠল, তার মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন। সঙ্গে সঙ্গেই আবার ম্লান ছায়া পড়ল তার উপর। এত বড় কান্ড করবার মত কে আছে তাদের মধ্যে? সবাই নিরক্ষর মুখ। লেখাপড়া, ভাবির-জালাস, হিসাব-পত্তর—বামেলা তো কম নয়। ঠাকুরমশাই বললেন, আমি তোমাদের সাহায্য করবো।

১৯২২-২৩ সালের কথা। গ্রামাঞ্চলে সমবায় ঋণ সমিতি গঠনের দিকে কিঞ্চিৎ নজর দিয়েছেন ইংরেজ সরকার। মহাজনেরা যথার্থই বাধা দিচ্ছেন। জাল



কোন বাড়তি খরচ নেই

সপার ডি লুক্স

মার্ক'না ফ্যান

সহজ গ্রাসিক কিস্তিতে নিন
মার্ক'না ইলেকট্রিক করপোঃ
(প্রাঃ) লিঃ

ফোন : ৩৬-৩০৪৮
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সকাল ৭টা হইতে রাতি ৮টার মধ্যে যোগাযোগ করুন।

ফিতার দৌরাখ্যও কম নয়। সরকারী মহলে একদা কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি ছিল মৈত্র মশায়ের—(এটাই তাঁর পৈতৃক পদবী)—সৌহার্দ্যও ছিল সহকর্মীদের সঙ্গে। তারই বলে অনেক অনাবশ্যক জটিলতার হাত এড়িয়ে আবশ্যিক মঞ্জুরিটা অল্পদিনেই এসে গেল। একটা অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত ক্ষুদ্র গ্রামের কট-গুলো গ্রীহীন ভাঙা কুঁড়েঘরের এক-কোণে গড়ে উঠল এ তল্লাটের প্রথম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি।

ছোট-বড় সব রকম ব্যাংক-ব্যবসায়ের আসল মূলধন টাকা নয়, মততা; এই দুর্ভাগ্য দেশের জাতীয় চরিত্রে যার একান্ত অভাব। মৈত্র মহাশয়ের সে কথা জানা ছিল এবং সেই জন্যে গোড়া থেকেই ওদিকটার নজর রেখেছিলেন। এই লোক-গুলোর অপারিসীম অজ্ঞতাও তাঁকে কম বাধা দেয়নি। সেটা দূরে করবার জন্য এদের কয়েকটি ছেলেকে কিছুটা লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হয়েছিল। বাপ-দাদার পেশা থেকে সরিয়ে না এনে কিংবা তাঁর উপরে কোনো রকম অনিচ্ছা বা অশ্রদ্ধার উদ্বেক না করিয়ে যতটা শেখানো যায়, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য; যাতে করে কালক্রমে তাদেরই কাউকে ব্যাংকের কাগজপত্রের দিকটার ভার ছেড়ে দেওয়া যায়।

এই গ্রামের গ্রাহন-পাড়ায় একাটি পরিবারের সঙ্গে আশুবাবুর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল এবং সেই সূত্রে কিঞ্চিৎ আর্থিক যোগাযোগও রাখতে হয়েছিল। তাদেরই কারো অসুখের খবর পেয়ে একটা রবিবার এখানে কাটাতে এসেছিলেন। সন্ধ্যাবেলা গঙ্গাতীরে বেড়াতে গিয়ে একটি বৃন্দ জেলের সঙ্গে কথায়-বার্তায় 'বাবাঠাকুরের' যে বর্ণনা শুনিয়েছিলেন, তাতেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন। আলাপ-সালোপের পর আকর্ষণ রূপে গাঢ় হতে থাকে। পরের আর একটা রবিবার সকালের দিকে এসে দেখেন ঠাকুরের ঘর-ভর্তি বাইরের লোক। বেশীর ভাগই তার মত নীচু-স্তরের চাকরিজীবী। নানা কাজের ভার তাঁদের উপর। সেই সম্পর্কে উপদেশ ও নির্দেশ নিতে এসেছেন গুরুদেব। মনোদাতা বা দীক্ষাদাতা গুরুদেব নন, যে যে কাজে তাঁরা রতী তারই প্রেরণা ও পরামর্শদাতা, সেই অর্থে গুরুদেব। কেউ কোন এক বস্তুতে নাইট-স্কুল চালান, কেউ কোনো কোনো নিম্নবিত্ত ভদ্রপরিবারের মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু কাঁচামাল যুগিয়ে তৈরী মাল

বাজারে দিয়ে কিঞ্চিৎ বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন, কারো কারো গোপন কর্মস্থল মাচেস্ট অফিসের কেরানী সমাজ। অল্প সূদে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিনাসূদে কিছু কিছু ধার দিয়ে রাঘব-বোয়ালরূপী পশ্চিমী দারোয়ান এবং

নির্মাল্যটি কার হাতের? পাঁড়েজীনা খাঁ-সাহেব? স্কারভাঙ্গা না আফগানিস্তান?

—আজ্ঞে, আফগানিস্তান হলে কি আর এত অল্পের ওপর দিয়ে যেত? এটা আমাদের বড় দারোয়ানজীর ভাড়া করা



...বাবাঠাকুরের যে বর্ণনা শুনিয়েছিলেন, তাতেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন।

নেকড়েদুপী কাবুলিওয়ালার কবল থেকে ধীরে ধীরে সেই দেনারডোবা লোক-গুলোকে বের করে বানার দুরূহ কাজের ভার নিয়েছেন তাঁরা। টাকাটার যোগান দেন মৈত্রমশাই। নিজের টাকা নয়, দশ-জনের কাছ থেকে যা আসে। এমন একজন 'শিষ্য' বসেছিলেন পিছন দিকে; মাথায় একটা ব্যান্ডেজ। গুরুদেব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মাথায় এ আশীর্বাদী

লেটেল। আশীর্বা বিশেষ সূর্যবিধে করতে পারেন।

—'ওদিকেও বৃষ্টি অসূর্যবিধে হচ্ছে?' বুড়ো আঙুলের উপর তর্জনী দিয়ে টাকা বাজাবার ভাঙ্গা করলেন।

—খুব। এ মাসে নতুন মক্কেল একটাও জোটোন, পুরনোর মধ্যেও তিনজনকে ছাড়িয়ে এনেছি।

—আহা বেচারী! তুমি তার আঁতে

ঘা মারবে, আর সে বড়ি হাত-পা কোলে করে চুপ করে বসে থাকবে?

ঘরের আরেক দিকে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের বলিষ্ঠ যুবকের দিকে ফিরে বললেন, 'মহীনের কী খবর? ঘাড়ের ব্যথা সেরেছে?'

ছেলেটি সলজ্জ ভাবে মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

কে একজন জিজ্ঞাসা করল, ঘাড়ের ব্যথা হল কেমন করে?

—ও, তাজান না বড়ি? মহীনবাবুর বিদ্যালয়গার হবার সখ চেপেছিল। হাওড়া স্টেশনে এক বাবু ছোট্ট একটা সন্টকেসের জন্যে কুলী ডাকা ছিলেন। ওর সেটা সহ্য হল না। বলে-বসল, আমাকে দিন, কুলী-ভাড়াটাও দিতে পারেন ইচ্ছা করলে। বাবুটির কেমন সন্দেহ হল, ছোকরার কোনো মতলব আছে নিশ্চয়ই। কোন কথা না বলে মালটা কুলীর ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন। কুলী ব্যাপারটা অত সহজে ছেড়ে দিল না। মূখ ভেঙে কী একটা ঠাট্টা করতেই ও-ও তেড়ে জবাব দিল। তারপর যা হয়ে থাকে। ভিড়ের মধ্যে পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর কিংগু দাওয়াই। তবে বাঙালের ঘাড় তো, অত সহজে সোজা হবার নয়। এবারে নিয়ম করে কুলীগার চলেছে মহীনচন্দ্র। আফিস ছুটির পর পাঁচটা ছবিশের ট্রেনে বাড়ি ফিরত, এখন ছটা বিয়াল্লিশের গাড়ি ধরতে হচ্ছে। এক ঘণ্টা মোটটানা চাকরি।

এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, মোট বইতেও তো লাইসেন্স লাগে। পুর্লিশে ধরছে না?

—ধরতে পারলে তো? মহীন যে সেখানে মোটওয়ালার নিজের লোক। কারো ভাই, কারো বড় কুটুম্ব। 'চলুন জামাইবাবু, আসুন দিদি, এইটুকু মাল, কুলী কী হবে?' বলে, বাঁ কাঁধের ওপর একটা পেলাম ট্রাক্ তুলে আর ডান হাতে বিছানাটা জাপটে ধরে এগিয়ে চলল। এর পরে আর লাইসেন্স চাইবে কে?

মহীন বলল, রেলের বাবুরা কেউ কেউ জেনে গেছে? কিছুর বলে না।

—বলবে কী? ওরাও ছা-পোষা মানুষ, গরিব ভদ্রলোকের ওপর তাদের কুলী-পল্টনের জলদমবাজি চোখের ওপর দেখছে তো? সঙ্গে যদি একটু বেশী মোট-ঘাট থাকে, একেবারে কাঁদিয়ে ছেড়ে দেয় ব্যাটার।

—সত্যি; মহীনবাবু একটা কাজের কাজ করছেন, প্রশংসার সুরে কে একজন বলে উঠলেন, 'ওর মত আর দু'চারটি ছেলে যদি এগিয়ে আসে, কুলীগলো শায়েস্তা হয়ে যাবে।'

মৈত্রমশায় বললেন, সে চেপ্টাও চলছে। মহীন বসে থাকার ছেলে নয়। কী হল? জোটাতে পারলে দু-একটি সাকরেন?

—আজ্ঞে, আসছে হস্তা থেকে দুজন বন্ধু জুটবে বলে মনে হচ্ছে। আসতে তো চায় অনেকেই। কিন্তু ভারী মোট বইবার

মত গায়ের জোর থাকা চাই। সে রকম লোক পাওয়া শক্ত। তারপর কুলীগলো ক্ষেপে আছে। তার জন্যও তৈরী থাকতে হচ্ছে।

মহীন উঠে এসে কড়কগুলো রেজার্গি মৈত্রমশায়ের পায়ের কাছে রেখে বলল, পাঁচ টাকা দশ আনা আছে; গেল হস্তার রোজগার।

মৈত্রমশায় জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

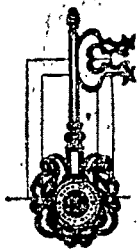
মহীন যোগ করল, সাহায্য নেবার মত গরিব পাঁচ বৈশী ছিল না, দু'চারটি সৌখীন বড়লোক ধরলাম। কিছু বখ-সিস্ পাওয়া গেল। না দিয়ে ছাড়লেন না।

—বাঃ, তাহলে রোজগারও হচ্ছে কিছু? তা, এক কাজ কর। কালকের মত এ চাকরিটা বাদ দাও। এখানে কত আছে বললে? পাঁচ টাকা দশ আনা। আচ্ছা; তার সঙ্গে এই নাও চার টাকা ছ আনা। এই টাকাটা তোমাকে বৌবাজারে একটা বাড়িতে পেঁপে দিতে হবে। দাঁড়াও ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি।'..... বলে একটা খাতার পাতা ওলটাতে লাগলেন এবং তারই ভিতর থেকে একটা নাম-ঠিকানা খুঁজে একটুকরা কাগজে লিখে দিয়ে টাকা সমেত এগিয়ে ধরলেন মহীনের দিকে।

বললেন, গলিটা খুঁজে পেতে একটু কষ্ট হবে। একটা অভ্যন্ত পুরনো বাড়ির একতলার পেছন দিকে থাকেন ভদ্রলোক। ভেতরে চলে গিয়ে ওর হাতে দিও টাকাটা, আর কাউকে দিও না।

বেলা বাড়তেই অনেকে উঠে পড়লেন। একটু পরে কলকাতার দিকে যাবার একটা ট্রেন ছিল। তাতেই ফিরবেন বেশীর ভাগ। যাবার আগে প্রায় সকলেই কিছু কিছু টাকা 'গুরুদেবের' পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলেন। তিনি কারো মাথায় হাত রেখে, কারো বা বাহু ধরে, পাত বিশেষে নানা রকম সরস মন্তব্য এবং সন্দেহ পরিহাসের ভিতর দিয়ে একে একে সবাইকে বিদায় দিলেন। দু'চারজন যারা রয়ে গেলেন, উঠে গিয়ে বোধহয় রান্না-বান্নার তদারকি লাগলেন। মৈত্রমশায়ের একটি ভৃত্যজাতীয় লোক আছে। তার নাম মধু। রবিবারে তার বেশ কিছু কাজ বাড়ে।

(ক্রমশঃ)



পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধির সোনার কাঠি

বাংলার কল্যাণ ও জাতীয় সমৃদ্ধি পরম্পর সংশ্লিষ্ট। এই কল্যাণ বা সমৃদ্ধি-সাধন একমাত্র পরিকল্পনাধারী ব্যবস্থার দ্বারাই স্বল্পকালে সম্ভবপর। এবং পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে জাতীয় তথ্য ব্যক্তিগত মস্তিষ্কের উপর। সুসংগঠিত ব্যাকের মারফত মধ্য যেকোন ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দূর করে, তেমনি জাতীয় পরিকল্পনারও রস-যোগ্য।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া লিঃ

হেও অফিস : ৪নং ব্রাইট স্ট্রিট, কলিকাতা-১

ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ব্রাঞ্চ অফিস এবং পৃথিবীর
যাবতীয় প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে কয়েকশত মারফত

আপনার ব্যক্তিগত সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার গ্রহণে প্রস্তুত



দুটি হাতের জাদুর প্রভাব

ঐশ্বর্য পলাশ মিত্র

মাত্র দুটি হাত! অথচ আশ্চর্য এর জাদুর প্রভাব! এর প্রভাবে (না ভালো-বাসায়?) আপনি কি থেকে কি হয়ে উঠতে পারেন তা ভাবলেও হৃদপিণ্ডটি চঞ্চল হয়।

সারা দেশটাই চলছে এই দুটি হাতের-জাদুর প্রভাবে। যিনি যেখানে আছেন, যেমনভাবে আছেন, যেমন পেশায় আছেন, নেশায় আছেন, সকলেই ব্যাকুল এই হাতের জন্যে।

বুঝতে পারছেন অনুমান করি, হাততালির কথাই বলা হচ্ছে। লক্ষ্য করুন, দেখবেন দুনিয়াটাই চলছে এই হাত-তালিতে। সর্বভূতে নারায়ণের মতো হাততালিও সর্বঘণ্টে বিরাজমান—এটা ধর্মশাস্ত্র না পড়েই বলা যায়।

হাততালি কোথায় বা নেই! এখানে-সেখানে আনাচে-কানাচে অলিতে-গলিতে-রাজপথে-ক্লাবে-পার্টিতে সভায়-অনুষ্ঠানে, এমন কি শোকসভায়। রাম-শ্যাম যদু-মথু থেকে জজ-ব্যারিস্টার সাহিত্যিক শিক্ষণী-কেরানী মন্ত্রী নেতা সকলেই, আজ্ঞে হ্যাঁ, সকলেই লালায়িত এই হাততালির জন্যে। সে হাততালি লীলায়িত হাতের হোক, কিংবা কঠিন শির-বের-করা হাতের হোক, সেদিকে দেখার দরকার নেই। আসল কথা, হাততালি আমাদের চাই। এটাই আমাদের অন্তরায়ের একমাত্র শ্লেগান।

বয়েস যখন আপনার কাঁচা ছিল, অর্থাৎ আজ মাননীয় শ্রীযুক্ত অমুকচন্দ্র অমুক হলেও যখন আপনি নাদু কিংবা পঙ্কজ কিংবা মোনা নামে জনপ্রিয় ছিলেন সেই সময় হাততালি পাবার দিকে

আপনার জেমন লোভ ছিল না। আপনি তখন ব্যস্ত থাকতেন হাততালি দিতে।

রাস্তায় সেই ঝাঁকড়া চুলের লোকটা দিনদুপুরে আপনার চোখের সমুখ থেকে ছোট্ট ছেলোটর আসত জিভটা যখন কেটে ফেলল তখন আপনার চোখ দুটিতে অন্তত বিস্ময়-মুগ্ধ জিজ্ঞাসা। এর কয়েক মূহূর্ত পরেই ছেলোটর কাটা জিভ মস্ত দিয়ে লোকটা যখন জুড়ে দিলে সেই সময় আপনি কি করেছিলেন? কি আবার করবেন? হাততালি দিয়েছিলেন প্রাণভরে। সে-হাততালি খামতেই চায় না।

এবং সেই প্রথম আপনি হাততালির স্বাদ পেয়েছিলেন। তারপর থেকেই 'লেডকালোক এক দফে হাততালি বাজাও' শুনলেই কে যেন পাগলাঘণ্টা বাজাতে আপনার নির্ভেজাল রক্তে। অন্য ছেলে-দের সঙ্গে পছন্দ দিয়ে আপনি যত জোরে পারতেন, যত ভালোভাবে পারতেন হাততালি দিতেন। সে কী আনন্দ! কী শিহরণ! হাততালিকে ভুলতে পারত না আপনার শিশুমন।

এবং আজ জীবনের আরেক সীমানা

শীঘ্রই বাহির হইতাহ্

রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র দত্ত, পরশুরাম, জগদীশ গুপ্ত, মণিলাল গাঙ্গুলী, প্রেমাস্কর জাতখী, ধুজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, পার্শ্বমল গোস্বামী, অশীন্দ্রলাল বসু, শরদীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মনোজ বসু, শৈলজানন্দ, প্রমথ বিশি, সরোজ রায়চৌধুরী শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, সুশীল রায়, নরেন্দ্র মিত্র হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গাঙ্গুলী, অচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল কর, সুরেশ বসু ও তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প।

এবং

অলৌকিক গল্পসাহিত্য সম্পর্কে অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন লিখিত সুবিপ্লুত ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কতক সরস রম্য রচনাসহ ৩৮ জন প্রতিভাবান সাহিত্যিকের রচনা সমৃদ্ধ অলৌকিক ও রহস্যময় গল্পের একমাত্র সংকলন।

বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

অন্য ভুবন

পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠা

দাম-১০০

মজবুত বাঁধাই, আর্ট পেপার জ্যাকেট এবং প্রতিটি রচনা চিত্র-সম্বলিত

ঃ প্রাপ্তিস্থান :

গ্রন্থভারত :

৪১বি, রাসবিহারী এডেন্স, কলি-২৬
ফোন : ৪৬-৭৫২৯



কথাশিল্প :

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

১/০২, এফ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,

কলিক

কলিকাতা-২৬, টেলিফোন : ৪৬-৮৪৭৫

এসেও হাততালিকে ভুলতে পারেননি আপনি।

তবে আগের তুলনায় কিছটা পার্থক্য আপনার নজরে পড়বে বৈকি। আগে আপনি শুধু হাততালি দিয়েই যেতেন। আজ কিন্তু আপনি দিয়ে ততো তৃপ্ত নন, যতটা পেয়ে।

এখন আপনার তাই লক্ষ্য, কিভাবে এবং কোন উপায়ে হাততালি আপনি পেতে পারেন। শুধু আপনি কেন, সব মানুষেরই নজর বা মোড় ঘাই বলুন না কেন ঐ হাততালির দিকে। চারদিক থেকে এ-জিনিস এমনভাবে আপনাকে বেঁধে রেখেছে যে, পালাবার ইচ্ছে থাকলেও পালাতে আপনি পারবেন না। তাই আপনার পরলোকপ্রাপ্তির পরেও কোনো বিরাট জ্ঞান-সদনের শোকসভায় আপনার নামে পড়বে হাততালি। ঘন ঘন হাততালি।

শুধু শোকসভায় কেন। হাততালি সর্বত্রব্যাপী। সিনেমা-থিয়েটারে যান হাততালি। মনুমেন্টের সভাতেও হাততালি। এমনকি দুহাত-চওড়া কালী লেনের সাপ-খেলাতেও হাততালি। ক্রিকেট-ফুটবলের মাঠে হাততালি। ডিনার পার্টিতে হাততালি। অর্থাৎ হাততালি রয়েছে সর্বভূতে। সর্বরূপে। নানান স্থানের নানান সুরে চলেছে ঐ হাততালি। কখনও আস্তে। কখনও জোরে। বিচ্ছেদহীন বিরামহীন ঐ হাততালি।

মেমও নয় সাহেবও নয়, অথচ মেম-সাহেব-এরকম মানুষের হৃদিস অবশ্যই পেয়ে থাকবেন। কিন্তু হাতও নয় তালিও নয়, অথচ হাততালি-এরকমটি আপনি পারেন না। অর্থাৎ হাততালি বললেই হাত এসে যাবে। সে-হাত হাজারো রকমের। হাজারো গড়নের।

অষ্টাদশী তরুণীর নরম সুডৌল হাত, খেটে-খাওয়া-মানুষের শক্ত কঠিন হাত, রোগা লোকের শির-বের-করা হাত, কথা-কলি ভারতনাট্যম অজ্ঞতা পোজের হাত— ঐ সব রকমের হাতই আপনি পাবেন।

হাত সর্বরকমের হোক। হাততালির সময় কিন্তু সব মিলেমাশে একাকার। সমস্ত হাতের এতো বড় মিলন এটা কিন্তু কম কথা নয়। কারণ সপ্তে কারণ বিভেদ নেই। অতএব হাততালির মধ্য মিলনের ঐ পথপ্রাপ্তিতে আপনি গর্ববোধ করতে পারেন।

এ ঘেন সেই বাজারের হটমলা। দূর থেকে মনে হবে এক সুরের কাকলী। কাছে গেলেই শোনা যাবে কেউ দর করছে চিংড়িমাছ, কেউ ঝগড়া করছে পালংশাক-ওলার সঙ্গে।



আজ কিন্তু আপনি দিয়ে ততো তৃপ্ত নন, যতটা পেয়ে

হাততালিও ঠিক তাই। কাছ থেকে এক এক জনের হাততালি এক এক রকম মনে হলেও দূর থেকে কিন্তু সমস্ত হাততালির এক সুর।

লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা, হাততালি শুনে স্থির থাকতে পারেন না অনেকেই। ও-পাশের কোণের ছারপোকা-ভর্তি-চেয়ার থেকে প্রথমে এক জোড়া হাত বেজে উঠল। তারপর আর কি! জোড়া হল নানান হাত।



ভয় ঐ পেছনের হাততালিকেই।

একেবারে অটোমেটিক। তারপর আস্তে, জোরে, আরো জোরে। তারপর আবার আস্তে, ক্রমে আরো আস্তে। ঐ হল হাততালির সাইকল (ইকনমিস্টের বিজনেস সাইকলের মতো আর কি)।

ঐভাবে চলেছে হাততালি। সেই সপ্তে চলেছে একে নিয়ে গবেষণা।

অনেকে বলেন, হাততালি-নাকি খুব উচ্চদের উপদ্রব (অর্থাৎ ঘৃণ্য)। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। শোনা যায়, হাততালি নামক উপদ্রব সাহায্যে অনেকেই নাকি কাঁহিল করা সম্ভব। অর্থের চেয়েও সময়-বিশেষে হাততালি নাকি বেশি ফলপ্রসূ।

অবশ্য যারা সাধুপুরুষ, হাততালিকে তাঁরা আমল দেন না (এটি একটি আস্ত যাক্য)। কিন্তু জনসম্মত হতে যাঁদের সাধ তাঁদের প্রধানতম কর্তব্য হল হাততালির পালস্টাকে বোঝা। এটা না বুঝলেই ধনে-প্রাণে মৃত্যু।

লক্ষ্য করেছেন কি, বস্ত্রতা গান বা অভিনয় যখন মোটেই জমাছে না, শ্রোতার দল তখন জোরসে হাততালি দিয়ে চলেছেন। বস্ত্র বা শিল্পী বোধহয় ভাবলেন তাঁদের অনুষ্ঠান শ্রোতৃবৃন্দের মনে খুশির আমেজ এনেছে। কিন্তু সত্যি কি তাই?

না মশাই তা নয়। বস্ত্র বা শিল্পীর অত্যাচারে শ্রোতার অগ্নিশর্মা হয়েছেন। এবং সেইজন্যই এতো হাততালির ঘটা। এর অর্থও খুব পরিষ্কার। অর্থাৎ, বস্ত্র বা শিল্পীমশাই, দয়া করে থামুন এবার। আমরা আপনার কী সর্বনাশ করেছি যে এভাবে অত্যাচার চালাচ্ছেন? পায়ে পড়ি আপনার। রেহাই দিন-হে, নরোত্তম!

রেহাই পাব বললেই কি পাওয়া যায়। হাততালির ঘটা শুনে বস্ত্র বা শিল্পী দম নিয়ে আবার শুরুর করলেন তাঁদের অত্যাচার।

মজাটা দেখুন একবার। বস্ত্র বা শিল্পীর এটুকু বোকবার ক্ষমতা হল না, যে-হাততালি তাঁদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে, সেটা সামনে হলেও আসলে সেটা কিন্তু পেছনের হাততালি।

ভয় ঐ পেছনের হাততালিকেই। এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উন্মাদ হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব নয়। সুতরাং নিজের মগ্গল চাইলে হাততালিতে উল্লসিত হবেন না মোটেই। যে কোনো ব্যাপারেই হোক না কেন, আপনাকে কেন্দ্র করে হাততালি দিলেই আনন্দে অজ্ঞান হবার আগে দয়া করে হাততালির পালস্টাকে বুঝতে চেষ্টা করুন প্রথমে। জেনে নিন হাততালিটা বাস্তবিকই সামনের না পেছনের। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা যদি হয় চল্লিশ কোটি, তার মধ্যে চারজনকেও পাবেন কিনা সম্ভব যারা প্রকৃতপক্ষেই সামনে হাততালি দিতে অভ্যস্ত।

বিদেশী গল্প

এক বে ছিল চাষী, নাম ছিল তার কোর্যা। চাষবাস করে কিছু টাকা জমিয়েছিল কোর্যা। সেই টাকা নিয়ে কোর্যা গেল শহরে; ইচ্ছা তার ক্রীতদাস কিনবে।

ক্রীতদাসের বেচা-কেনা করতে যে ব্যাপারী সে কোর্যাকে অনেকগুলি ক্রীতদাস দেখাল। কিন্তু একটাও পছন্দ হল না তার।

অসন্তুষ্ট হয়ে ব্যাপারী বললে, “আপনার জন্য ওদের সবাইকে ডেকে আনতে হবে এখানে দেখছি।” তখন বেলা দুপুর। ক্রীতদাসরা তখন সবাই অঘোরে ঘুমিয়ে।

যোহানের
ভি
য়নসেন

হুত
অবস্থা

খুব সহজ গলায় কোর্যা বললে, “আমি অন্য ব্যাপারীদের কাছে যাই।”

“দাঁড়ান, দাঁড়ান।” ব্যাপারী চেন ধরে টান দিল আর সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল ক্রীতদাসরা। তাদের চোখে তখন খুম জড়িয়ে আছে। কোর্যা সকলকে একে একে চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

একজন ক্রীতদাসকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, “দেখুন, দেখুন মশাই একে দেখুন। সুন্দর জোয়ান। কেমন? মনে ধরেছে? বকের ছাতিটা দেখেছেন? শক্ত; না? ধাক্কা দিয়ে দেখুন। পরখ করে লিন। আর কান্ডি-গুলো দেখেছেন মশাই। আর কন্ডুরা-গুলো বেহালার তারের মত। এই, মদুখ খোল।”

ব্যাপারী ক্রীতদাসের মুখের ভিতরে আঙুল পুরে দিয়ে তার মদুখটা আলোর দিকে ঘুরিয়ে দিল। “এবার এর দাঁত-গুলো ভাল করে দেখুন।” ব্যাপারী তার এই ক্রীতদাসকে নিয়ে খুবই গর্বিত। ক্রীতদাসের দাঁতগুলোর ওপর ছুরির উল্টো পিঠ দিয়ে একবার টান দিল

ব্যাপারী। “দেখেছেন তো! এই দাঁত-গুলো লোহার মত। ইচ্ছে করলে পেরেক কামড়ে দুখানা করে দিতে পারে।”

এই অবসরে কোর্যা নিজেও ভেবে দেখেছে। বেশ তারিফ করার ভিগাতে কোর্যা ক্রীতদাসের সবার্গে হাত বুলিয়ে নিল। আঙুলের ডগা দিয়ে ক্রীতদাসের পেশীগুলো টিপে দেখল বেশ শক্ত কি না। শেষে এই ক্রীতদাসকেই কেনার জন্য মন স্থির করে ফেলল কোর্যা। মদুখ গোমড়া করে দাম দিল। ব্যাপারী ক্রীতদাসের হাতকড়ি খুলে দিল। কোর্যা ক্রীতদাসকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে এল।

তুমি তোমার অরণ্যে ফিরে যাবে; ঠিক যাবে। আমি তোমাকে কথা দিলাম। আমার কথার ওপর ভরসা করতে পার। তোমার এখন কাঁচা বয়স। তোমার ধারণা নেই তোমার এখন বয়স-কাল। তুমি যদি মনপ্রাণ দিয়ে আমার ক্ষেতে পাঁচটা বছর কাজ কর তা হলে আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে রেহাই দেবো। তুমি মর্দুতি পাবে। যদিও আমি তোমাকে সারা জীবনের মত কিনে নিয়েছি, তবু আমি তোমায় মর্দুতি দেবো। কিন্তু পাঁচটা বছর তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে খাটতে হবে। ঠিক? এই কথা রইল।”



বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন ক্রীতদাস অসুখে পড়ল। দিনের পর দিন রোগা হয়ে যেতে থাকল সে। ক্রীতদাস এখন এক জায়গায় মোটামুটি স্থায়ী আশ্রয় পেয়েছে। তাকে আর বাজারে দাঁড়াতে হবে না। তাই তার মনটা এখন অরণ্যের জন্য হু হু করে উঠল। সেই অরণ্য, যেখান থেকে সে এসেছে। ক্রীতদাস সেই অরণ্যে ফিরে যেতে চায়। ক্রীতদাসের এই উদাস উতলা ভাব ভাল লাগলো কোর্যার। সে এই সব উপসর্গ চিনতো খুব ভাল করেই। একদিন কোর্যা দেখল যে ক্রীতদাস মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। জীবনে আর তার কোন আশঙ্কিই নেই। কোর্যা ক্রীতদাসের পাশে বসে ভাবতে ভাবতে অনেক কথাই বলে গেল।

“ভয় পাচ্ছ কেন? ভয় পেয়ো না।

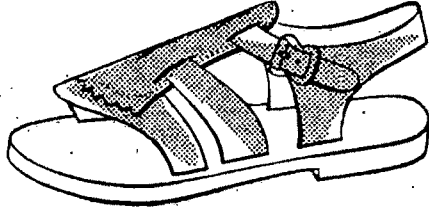
ক্রীতদাস কাজে লেগে গেল। দৈত্য-দানবের মত হাড়গোড় ভাঙা খাটুনি খাটে মাঠে। দরজার ওপর বসে তার দিকে তাকিয়ে থাকে কোর্যা। খুব ভাল লাগে তার। বাদামী চামড়ার নিচে ক্রীতদাসের পেশীগুলো দলা পাকাচ্ছে, নাচছে, কাঁপছে। ক্রীতদাসকে এমনভাবে খাটতে দেখে খুব আনন্দ পায় কোর্যা। ঘন্টার পর ঘন্টা দরজার ওপর ঠায় বসে সে তাকিয়ে থাকে। আর অন্যদিকে মনও থাকে না তার। কোর্যা অনুভব করতে আরম্ভ করল যে শরীর অতি অপূর্ব বিস্ময়, শরীর বড় নয়নাভিরাম।

ক্রীতদাস গৃহতে থাকে পাঁচটা বছর। পাঁচটা বছর—তার হাতে যতগুলো আঙুল আছে ততগুলো অয়নান্ত পার হয়ে গেলে শেষ হবে পাঁচটা বছর। এই পাঁচটা বছরে সূর্য দশবার মদুখ খোলাবে।

তাই প্রতিদিন বিকেল বেলা ক্রীতদাস আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে, সূর্য ডুবে যাচ্ছে। পাথর কিম্বা টিপি দিয়ে সে দিন গোনে। সূর্যের প্রথম অয়নান্ত যৌদিন হল সেদিন ক্রীতদাসের ডান হাতের বড়ো আঙুল মস্ত হল। আবার একটা অয়নান্ত। কত বৃগ পরে যেন এই মুখ ঘোরাল সূর্য। এইবার

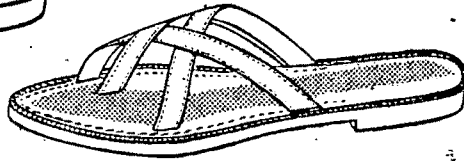
মস্ত হল তজ্জনী। আরও কটি আঙুল মস্ত হলে শেষ হবে তার দাসত্ব।
তাই দিনকাল গোনা হয়ে ওঠে ক্রীতদাসের ধর্ম। এই প্রতীক্ষা হল তার অন্তরের সম্পদ, তার আশ্রয় ঐশ্বর্য। কেউ এই সম্পদ কেড়ে নিতে পারে না। এই ঐশ্বর্য নিয়ে বিবাদ বাধবে না কারো সঙ্গে।

সময় যত পার হয়ে যায় গণনা হয়ে ওঠে বিরাটতর, প্রশস্ততর এবং গভীরতর। বছর পার হয়ে যায় অপরিমিত কম্পনার মত। ক্রীতদাস সময়ের এই ধারা কিছতেই বন্ধতে পারে না। কিন্তু অস্ত-মুখী সূর্যের রক্তিম আভার নিচে দাঁড়িয়ে ক্রীতদাস প্রতিদিন তার আশাকে উজ্জীবিত করে নেয়, প্রতিদিন উৎসর্গ করে

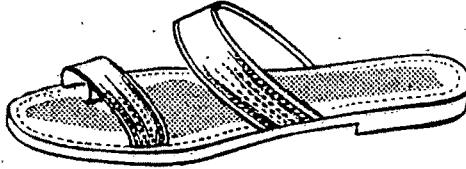


জাল ৫৫৭-১৭৫

বাবু ৩২৫



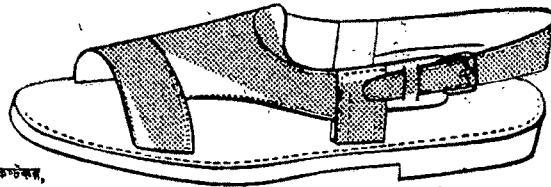
সুদাস ৬৫০



কেমন

না-জুতো

না-চটি



প্রিন্স ১৫৯৫

গরুর গায়ে ঘোড়ার মতো শৃঙ্গপারে যেমন কটকর,

চটিতেও যেমন সুবিধের নয়। সবচেয়ে ভালো

স্যান্ডাল কেমন না-জুতো, না-চটি।

শা-চাকা নয়, আবার শা-খোলাও নয়। গরুর

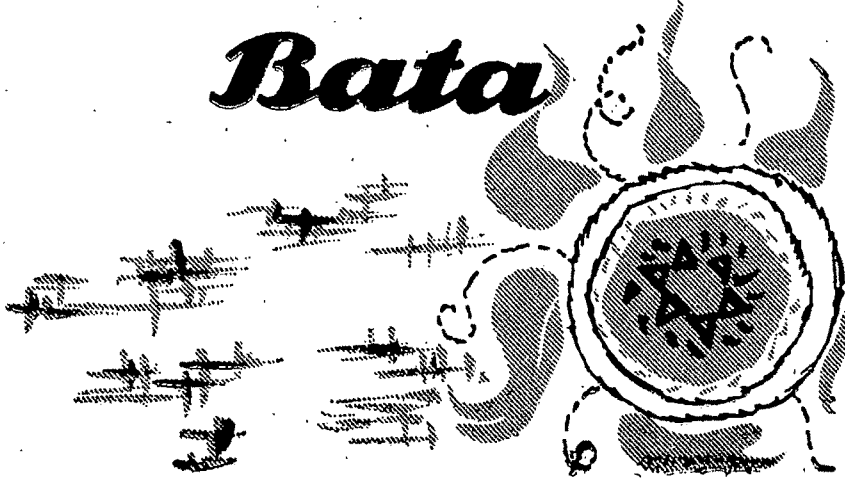
তেজ থেকে বাচবে, আবার হাওয়াও খেলাবে।

পাখির প্রিয় তাই বাটার স্যান্ডাল। এবিধের পয়কই তো

প্রকৃত সমরদার। হাতের ঘোঁসেও তল্লা, কটক

পঠন, উৎকৃষ্ট উপাদানে বাটার স্যান্ডাল।

Bata



তার বিশ্বাস। সময়, যা নিতাই বর্তমানে বিলম্বিত, তা ক্রীতদাসের কাছে মনে হল অনন্ত, অসীম। সেই সময় হরত কিছু পার হয়ে গেছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ এখনও বহুদূর, দূরান্তরে।

এইভাবে ভাবতে ভাবতে ক্রীতদাসের মন অনেক গভীর হয়ে ওঠে। তার মস্তিষ্ক আকুলতা অসীমকে নিয়ে এসেছে সময়ের সীমায়। আর তাই তার বিশ্বও হয়ে উঠেছে সীমাহীন, চিন্তা হয়েছে অপরিমিত। প্রতি সন্ধ্যায় ক্রীতদাস তাকিয়ে থাকে পশ্চিম দিগন্তে, প্রতি সূর্যাস্ত তার অন্তরে দান করে গভীরতা।

শেষে পাঁচটা বছর পার হয়ে গেল। (কথাটা কত সহজেই না বলা যায়!) ক্রীতদাস মালিকের কাছে এসে মুক্তি চাইল। সে এবার যাবে অরণ্যে, তার বাড়িতে।

চিন্তা করতে করতে কোর্যা বললে, “তুমি সত্যিই মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেছ। তোমার বাড়ি কোথায়, বল। তোমার বাড়ি কি পশ্চিমে? আমি বহুদিন তোমাকে পশ্চিমের দিকে ডাকিয়ে থাকতে দেখেছি।”

ঠিক, তার বাড়ি ওই দূর পশ্চিমের দিকে।

“তাহলে সে ত অনেক দূর”, কোর্যা বললে। ঘাড় নাড়ল ক্রীতদাস,—অনেক দূর। “কি করে যাবে? তোমার কাছে টাকা-কড়ি আছে?”

বিমর্ষ হল ক্রীতদাস। চুপ করে থাকল। না। ঠিকই জে। তার কাছে টাকা-কড়ি নেই।

“কথা শোন। টাকা না থাকলে তুমি যে কোথাও যেতে পারবে না। তুমি যদি আমার কাছে আরও তিন বছর, না, না, দু’ বছর; তুমি যদি আমার কাছে আরও দু’ বছর কাজ কর আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে পারি। তোমার পথের খরচা সেই টাকার চলে যাবে।”

মাথা নিচু করে ক্রীতদাস মেনে নিল এই প্রস্তাব। আবার মাঠের কাজে লেগে গেল। সে এবারও মনেপ্রাণে খাটে। কিন্তু এবার সে আর আগের মত সময়ের জন্য ব্যকুল হয় না, গুণেও রাখে না। বরং দেখা যায় ক্রীতদাস এখন দিবা-স্বপ্নে মগ্ন। কোর্যা শোনে ক্রীতদাস ঘুমের ঘোরে ভুল বকছে, কাঁদছে। কিছুদিন পরে আবার সুস্থে পড়ল সে।

কোর্যা ক্রীতদাসের পাশে বসে খুব ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে অনেক কথাই বলে গেল। তার কথাগুলো খুবই বিচক্ষণ বলে মনে হল। মনে হল তার প্রতিটি কথার পিছনে আছে সৎ অভিজ্ঞতা, আছে জ্ঞান।

সে বললে, “আজ আমি বুড়ো হয়ে গেছি। একদিন আমারও যৌবন ছিল।

সেদিনও আমার বুক ওই পশ্চিমের জন্য উত্থাল-পাথাল করত। ওই বিরাট অরণ্য আমাকেও হাতছানি দিয়ে ডাকত। কিন্তু অত দূর যাবার মত উপযুক্ত টাকা পরস্যা আমার ছিল না। আজ আর আমি কখনও সেখানে যেতে পারব না। আমি মারা গেলে আমার আত্মা হয়ত সেখানে পৌঁছাবে, কিন্তু আমি সেখানে আর যেতে পারব না। তোমার এখন বয়স-কাল। শরীর ভাল, খেটে কাজও কর। কিন্তু আমার বয়স-কালে আমি যতটা শক্তিমান ছিলাম, যে ভাবে খাটতে পারতাম তুমি কি তা পার? এই সব কথা ভেবে দ্যাখো। বুড়ো মানুষের কথাগুলোকে একেবারে হেলা-ফেলা করো না। বাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ, সে দিকেও একটু নজর দিও।”

খুব ধীরে ধীরে সবল হয় ক্রীতদাস। আবার ক্ষেত-খামারের কাজে মন দেয়। কিন্তু আগের মত উৎসাহ-উদ্দীপনা আর নেই। কাজকর্মের দিকে আকর্ষণ আর নেই। আর তার কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই। কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে সে আজকাল ঘামিয়ে নেয়। একদিন কোর্যা ক্রীতদাসকে চাবুক মারল। চাবুক খাওয়ার পর হুস ফিরে এল ক্রীতদাসের। সে কাঁদল।

দু’ বছর এই ভাবে পার হয়ে গেল।

তারপর কোর্যা সত্যি সত্যি ক্রীতদাসকে মুক্তি দিল। সে পশ্চিমের দিকে রওনা হল। কিন্তু কয়েক মাস পরে অতি দীর্ঘ অবস্থার আবার ফিরে এল সে। সে তার অরণ্যকে খুঁজ পায়নি।

কোর্যা বললে, “দেখলে ত? আমি তোমাকে আগেই বারণ করেছিলাম। কিন্তু আমি এমন কোন কাজ করবো না যার জন্যে কেউ বলতে পারে যে আমি তোমার ওপর দুর্ব্যবহার করেছি। আর একবার দ্যাখো। এবার তুমি যাও পূর্বের দিকে। যে অরণ্য তুমি খুঁজছো তা হয়ত আছে ওই পূর্বের দিকেই।”

ক্রীতদাস আবার যাত্রা আরম্ভ করল। এবার সে সর্বোদয়ের দিকে মুখ করে গেল। অনেক ঘোরার পর সে নিজের অরণ্য এবার খুঁজে পেল। কিন্তু সে নিজের অরণ্যকে ঠিকমত চিনতে পারল না। ক্রান্ত ও পরাজিত হয়ে সে আবার মূখ ঘোরায় পশ্চিমের দিকে, ফিরে আসে মালিকের কাছে। বলে সে অনেক অরণ্য খুঁজে পেয়েছে, ছোট-বড় অনেক অরণ্য। কিন্তু কোনটাই তার নিজের অরণ্য নয়।

কোর্যা কেশে বলল, “হু”।

তারপর খুব খুশী হয়েই বলে উঠল, “এবার আমার কাছে থাক। আমি যতদিন বেঁচে আছি, এ মাটিতে বাস করার মত ঘর তৈরি পাবে। আমি মারা গেলে আমি

জানি আমার ছেলে তোমার দেখাশোনা করবে।” ক্রীতদাস কোরয়ার কাছেই থাকে।

কোর্যা বুড়ো হয়ে গেল। কিন্তু ক্রীতদাসের অটুট যৌবন। কোর্যা তাকে আদর-যত্ন করে, ভাল করে খাওয়ার পরায়। সে দীর্ঘায়ু হোক এই-ই কোরয়ার বাসনা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে যেন তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে। আর নির্দিষ্ট সময় অন্তর ক্রীতদাসকে চাবুক মারে যেন সে বিনয়ী হয়, মান্য করতে শেখে। তার বিশ্রামের দিকেও নজর রাখে কোর্যা। প্রতি রবিবার তার ছুটি। সে এই ছুটির দিন টিপির ওপর গিয়ে বসে আর পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কোরয়ার ক্ষেতে সোনার ফসল উপছে ওঠে। সে জংগল কেনে। ক্রীতদাসের কাজের কামাই যেন না হয়। তাই সে জংগল পরিষ্কার করে, সেখানে আবাদ করে। ক্রীতদাসও মনপ্রাণ দিয়ে গাছ কাটে। কোরয়ার এখন অনেক টাকা। একদিন কোর্যা বাজার থেকে কিনে নিয়ে এল এক ক্রীতদাসী।

দশ বছর কেটে গেল। কোরয়ার ঘরে এখন ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর ছাঁটি বড় বড় সন্তান। বাপের মত তারাও কঠোর পরিশ্রম করে। ওদের বাবা ওদের বলে, যখনই কাজ করবে দেখবে সময় পার হয়ে গেছে। আমাদের সময় পার হয়ে গেলে আমাদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে চির-কালের অরণ্যে। প্রতি বিশ্রাম-বারে ক্রীতদাস তার সন্তানদের নিয়ে টিপিটার ওপর দাঁড়ায় আর দেখে ডুবন্ত সূর্যকে। ক্রীতদাস তার সন্তানদের অন্তরে জাগায় অরণ্যের আশঙ্কা।

কোর্যা বুড়ো হয়ে গেছে, এখন সে জীর্ণ। কোর্যা চিরকালই বুড়ো। কিন্তু এখন সে শুধু মাগ বয়স ছাড়া আর কিছু নয়। কোরয়ার ছেলে-পিলে কোনদিনই স্বাস্থ্যবান নয়। কিন্তু তারা নির্ভয়। তাদের এক একটা ক্রীতদাস এক এক আঘাতে শত্রু নির্মূল করতে পারে। এদের শরীর খুব ভাল। লোহার মত পেশী শক্ত চামড়া দিয়ে মোড়া, দাঁতগুলো বাঘের মত। কিন্তু সময় এখন নিরাপদ। ক্রীতদাসরা কুড়ল দোলায় আর গাছ কাটে।

অনুবাদ : রাম বসু

ডেনমার্কের কৃষক পরিবারে জন্ম হয় য়েনসেনের। কোপেনহেগেনে ডাক্তারি পড়বার জন্য তাকে পাঠান হয়। কিন্তু লেখাপড়া ভাল লাগলো না তার। ইনি ভবঘুরে হয়ে যান। এই সময় আরম্ভ হয় তার সাহিত্য-সাধনা। ১৯৪৪ সালে লং জার্নি উপন্যাসের জন্য একে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। উপন্যাসটি ‘খণ্ডে বিভক্ত’। এই উপন্যাসে আদিম মানুষ থেকে আমেরিকা আবিষ্কার পর্যন্ত মানুষের উন্নতি ও বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে এর মৃত্যু হয়।

—অনুবাদক

শ্রীমান সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এই কম। ইতো আশ্চর্যের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সমগ্র যুগোশ্লাভীয় সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়। সেইসঙ্গে অনুসন্ধানসূত্র পাঠক ওদেশের সাহিত্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলেও এখনও পর্যন্ত ফরাসী, ইংরিজি, রুশ, আমেরিকান সাহিত্যের তুলনায় এক আনাও জানতে পারিনি। সম্প্রতি ইতো আশ্চর্যের কিছু রচনার বঙ্গানুবাদ দেখা গেছে ইতস্ততঃ।

শ্রীমান সাহিত্যের অপর একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ সিরিল কসম্যাক। ১৯৫৩ সালে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'এ ডে ইন প্রিন্স' প্রকাশিত হওয়ার কিছুকালের মধ্যে ইংরিজিসমেত আরও অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। উপন্যাসে এক বিপ্লবী বীরের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আশ্রয়হীন, কারাবাস, বিদেশে পলায়ন এভাবে কাটাবার ১৫ বৎসর পর সে নিজের দেশে আবার ফিরে এল স্বাভাবিকভাৱে। বাড়ীর মধ্যে এসে প্রকৃতির শান্তি স্বচ্ছ মাধুর্যময় মধ্যে শুনতে পেয়েছে শান্তির জন্য যারা সংগ্রাম করেছিল তাদের মৃত্যুপংগ সংগ্রামের কথা। এক কুমারী মাতার সন্তান সমগ্র কাহিনীর মূল কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে—তার সামনে দিয়ে চলে গেছে বিচিত্র চরিত্রের মিছিল।

উত্তমপুরুষে লেখা গ্রন্থখানি আত্ম-স্মৃতিমূলক, ছেলেবেলা আর অতীতের স্মৃতিবিজড়িত, হারিয়ে-যাওয়া মানুষের বেদনাময় জীবনের শোকোচ্ছাস, যুগ্ম-কালীন জীবনের ভয়াবহ আর মমন্তুদ পরিপাতি উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে একটি মানুষ-বার প্রাণে আছে আনন্দ, মানুষের জন্য ভালবাসা।

তৎকালীন ইটালীর অন্তর্গত শ্লাপে কসম্যাকের জন্ম ১৯১০ সালে। ছোটবেলা থেকে সুবিশাল সমুদ্রের সান্নিধ্যে মানুষ-মোবনে সরকারী আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান ১৯৩১ সালে। ১৯৩৮-৪২ পর্যন্ত প্যারিসে বাস করে ১৯৪৩-এ লন্ডনে চলে যান। দ্বিতীয় যুদ্ধকালে যুগোস্লাভিয়ার এসে মার্ক্স-ফোঁজে যোগ দেন।

এই সমাজ-সচেতন কথাশিল্পীর রচনায় পল্লী অঞ্চল একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

'আধুনিক' কথাটির অর্থ সুস্পষ্টভাবে না বলেও একথা বলা যায় যে সিনক্রয়ার লাইস একজন আধুনিক মার্কিন উপন্যাসিক। অর্থাৎ বিশ শতকের মার্কিন লেখকদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় লাইসের 'মাইন স্ট্রীট' আর

সাহিত্য সম্মান

১৯৩০ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। লাইসের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'এ্যারোস্মিথ' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'বাবিট'। বাবিট একটি টাইপ চরিত্র।—এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে মার্কিন জীবনের আত্মপ্রবণতার এক আশ্চর্য রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। 'এ্যারোস্মিথে' বিজ্ঞানের আশীর্বাদ-অভিশাপের কথা অপূর্ব ব্যঙ্গ ও সত্যতার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে।

লাইস মূলত হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক রচনায় দক্ষ। তাঁর এই শিল্প-স্বর্ষমার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে জীবনের সত্য ও সুন্দর রূপের অন্তরালবর্তী ক্রোড়িতা, গ্লানি মালিন্য। লাইস ব্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন বস্তব্য বিষয়কে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার জন্য।

ইংরিজি সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমহোদয় মিস মুরিয়েল স্মাকের রচনার সঙ্গে পরিচিত। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর দি কমফোর্টস, দি ব্যাচেলার্স, রিভিন্স, দি ব্যালাড অব পেকাম রাই, দি প্রাইম অব মিস জীন রিডি প্রভৃতি ছয়খানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

অবজারভার পত্রিকার গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করবার পর প্রকাশকদের আগ্রহে স্মাকের প্রথম উপন্যাস 'দি কমফোর্টস' রচিত হয়। এই উপন্যাস রচনার জন্য তাঁকে এক নির্জন বাড়ীতে গিয়ে থাকতে হয়েছিল। স্মাকের রচনায় লঘু রসিকতাকে যেমন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তেমনি গভীর জীবন-জিজ্ঞাসাও ফুটে উঠেছে। মোটামুটিভাবে ছোটবেলা থেকেই তিনি একজন প্রকৃত পড়ুয়া। চোখের সামনে যখন যে বই পেয়েছেন একাগ্রতার সঙ্গেই পড়ে গেছেন। রবি হিসাবে স্মাক জন্ম মেসফিল্ডের ভক্ত। তাঁর বিভিন্ন রচনায় উনিশ শতকের বিভিন্ন লেখকের কথা বলা হয়েছে। নিজের সম্বন্ধে স্মাক বলেছেন এক জায়গায়, "নিজেকে উপন্যাসিক হিসাবে ভাবতে আমার এখনও একটু দ্বিধাবোধ হয়। আমাকে একজন উপন্যাসিক না বলে লেখিকা বলাই সমীচীন বলে আমি মনে করি।"

জার্মান সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মহিলা শিল্পী বারবারা কোরনিং প্রথম জীবনে সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব

যেন পূর্ব হতেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কারণ ১৯৫৮ সালে যখন তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'দি চাইল্ড অ্যান্ড ইটস স্যাডোজ' প্রকাশিত হয় তখন অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমান জার্মান সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁরও স্থান স্বীকৃত।

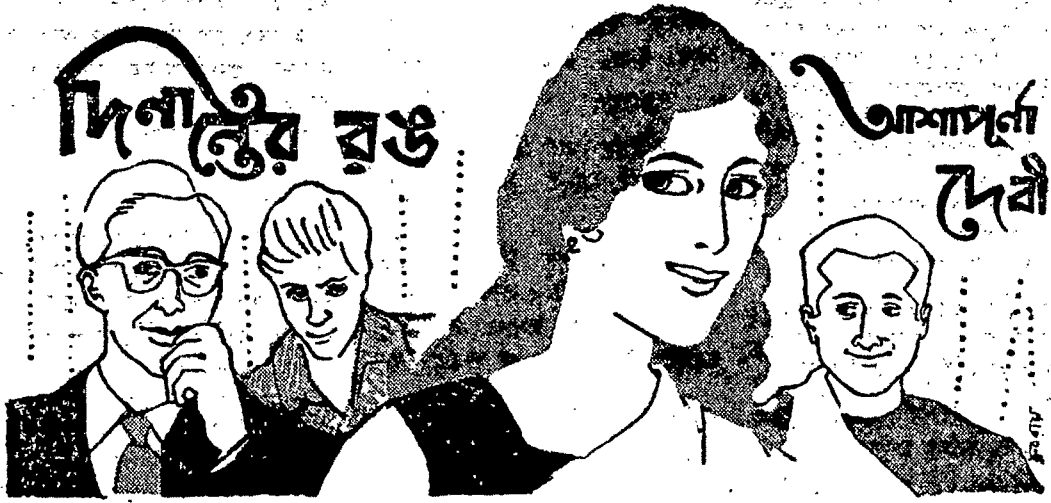
পশ্চিম জার্মানীর বইয়ের দোকানে আজকাল বেশীর ভাগ মেয়ে-বিক্রেতা দেখা যায়। কারণ মেয়েরা নাকি ভাবী ক্রেতার মনের ভাবাট ঠিক ধরে ঠিক বইটি গছিয়ে দেয়।

পশ্চিম জার্মানীতে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পুরুষদের বহু কাজ মেয়েদের হাতে চলে যাচ্ছে। যুদ্ধের পর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মত বইয়ের ব্যবসাতেও এখন মেয়েদের প্রাধান্য। একপুরুষ আগেও এই ব্যবসায়ে সব মেয়েরা কাজ করত, তাদের ব্যঙ্গ করে বলা হত 'উ'হু ঘরের মেয়ের দল' যারা 'কাজের কাজ না করে বৃষ্টি-গত ও সাংস্কৃতিকমূলক কাজে' নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। এখন বইয়ের ব্যবসায় চারভাগের তিনভাগই মেয়ে কর্মচারী।

কেন যে মেয়েরা এই কাজে বেশী নামতে চায় বলা কঠিন। তবে হয়তো এই কাজটি তাদের বেশ খাপ খায়। লোকের মনের ভাব মেয়েরা বেশ ভাল বোঝে। মেয়েরা এখন সুধু আর বইয়ের দোকানে কাজ করে না, অনেকেই তারা রীতিমত বইয়ের ব্যবসাদার। প্রায় শতকরা তিরিশ ভাগ প্রতিষ্ঠানের হয় তারা মালিক, নয় পরিচালক।

প্রকাশক হিসাবে মেয়েরা এখনও তত উঠতে পারেনি বটে, তবে কিছু কিছু মেয়ে-প্রকাশক পশ্চিম জার্মানীতে আছে। বহু প্রকাশক সংস্থা আজকাল মেয়েদের পাঠক হিসাবে কাজে লাগায়। এদের কাজ হচ্ছে মেয়ে-মহলে কি ধরণের বইয়ের চাহিদা তা ঠিক করা। অনুবাদক হিসাবেও বহু মেয়ে কাজ করে।

বইয়ের ব্যবসাতে মেয়েদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে খুব সমালোচনা হচ্ছে। একজন নামজাদা সাহিত্য-সমালোচক বলেছেন, 'বর্তমান যুগে আমাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক ও আর্থিক ক্রিয়াকলাপ মহিলাদের মদ্যুরে প্রতিফলিত হবে।' এ সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত মতামত এখনই প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও মনে হয় নিশ্চিত পরিবর্তন এক্ষেত্রে আসবেই। কেননা মেয়েরা বর্তমানে অধিক সংখ্যায় আধুনিক ব্যবসায় ও জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করছে।



(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতএব সুবাই মিলে গল্প করার প্রস্তাব বাতিল হয়। কোনো এক সময় রাত্রি শান্তিও হয়। ভোরের বাতাসে রক্ত বৃক্ষত মানুষগুলোর মদে শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দ গুঞ্জরণ করে ফেরে—।

কিন্তু এখনো রাত্রির পরে আবার সকাল আছে।

এখনো শব্দ রাত্রিতে গড়া দিন আসেনি।

সুচিন্তা কি কাজে দরজার সামনে দিয়ে চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান, ঘরে ঢুকে পড়েন। বলেন, 'কী হচ্ছে এ?'

সারা ঘরে জামা কাপড় তোয়ালে এটা-সেটা জিনিসপত্র ছড়িয়ে আর দুটো ডালা-খোলা শূন্য সুটকেস হাঁ করে রেখে সুশোভন ঘেমে-টেমে হিমসিম খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সুচিন্তা এসে বললেন, 'এটা কী হচ্ছে?'

সুশোভন বীরদর্পে বললেন, 'গোছাচ্ছি।'

'গোছাচ্ছ? তা' ভালই করছ, সুচিন্তা হেসে উঠে বলেন, 'বেশ, অনেকক্ষণ তো গোছালে, এবার ছাড়ো আমি গদাছিয়ে দিই।'

সুশোভন কিন্তু সে দিক দিয়ে গেলেন না, হঠাৎ খাটের ওপর বসে পড়েন। কী একটা হাতে ভুলে নিয়ে মোচড়তে মোচড়তে বলেন, 'আমার কোন কণ্ট হচ্ছে না। কিছুর না।'

'হাসব না কেন?'

'আমি চলে যাচ্ছি, তুমি হাসবে? তোমার মন কেমন করছে না?'

সুচিন্তা স্থির হয়ে যান। দুই চোখে ফুটে ওঠে একটা গভীর ছায়া, বলেন, 'তুমি তো বলেছ আমরা বড় হয়েছি, আমাদের মন কেমন করতে নেই, করা নিয়ম নয়।'

সুশোভন আবার চণ্ডল ভাবে উঠে পড়ে বলেন, 'তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারিনি সুচিন্তা। আমি বলছি, মন কেমন করার কথা বলা নিয়ম নয়। তা' বলে তুমি হাসবে?'

'হাসলে তোমার ভাল লাগে না?'

সুশোভন অস্থির ভাবে একবার খুব কাছাকাছি সরে আসেন, তারপর আবার সরে গিয়ে চাপা ব্যস্ত স্বরে বলেন, 'লাগে লাগে, খুব ভাল লাগে। কিন্তু আমি চলে যাবার দিন নয়।'

সুচিন্তা ওই অস্থির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি ফেলে বলেন, 'তবে তুমি চলে যাচ্ছ কেন?'

'চলে যাচ্ছি কেন? সাম্নে আর তোমায় ছেলেমানুষ বলি সুচিন্তা? চলে যেতে হবে বলেই চলে যাচ্ছি। আমার কী কণ্ট হচ্ছে না? কিন্তু কি করা যাবে? সমাজ আছে, সভ্যতা আছে। তবু কণ্টও আছে। থাকবে।'

সুচিন্তা হঠাৎ সেই মেজাজ ছড়ানো কাপড় চোপড়ের স্তরের ওপর বসে পড়েন। কী একটা হাতে ভুলে নিয়ে মোচড়তে মোচড়তে বলেন, 'আমার কোন কণ্ট হচ্ছে না। কিছুর না।'

সুশোভন আবার পায়চারী করতে থাকেন, পায়ের কাছের জিনিসগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যান বলে পা ফেলাটা কেমন এলোমেলো লাগে। কিন্তু কথা বলেন শান্ত। বলেন, 'ওকথা বলে তুমি আমায় ভোলাতে পারবে না সুচিন্তা! আমি কি তোমাকে জানি না? জানি না আমি চলে গেলে তুমি কাদবে!'

'না না না। আমি কিছু করবো না।'

'বাবা, আমাদের যে একবার ডাক্তার পালিভের কাছে যেতে হবে।'

বাইরের বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে নীতা।

তারপর?

তারপর কয়েকটা বস্তু কেটে গেল শব্দ ছুটোছুটি হুড়োহুড়িতে। ডাক্তারের বাড়ী থেকে ফিরে ওরা আবার গেল দোকানে, গেল আবার কোথায়। সুশোভনের লম্বাভাঙ করেফেলা জিনিসগুলো গদাছিয়ে তুলতে, খাওয়া-দাওয়া সারতে, কোথা দিয়ে চলে গেল সময়। এসে পড়ল ওবাড়ীর ছোট বৌ আর তার ছেলেরা।

একসঙ্গে যাবে সবাই।

এবাড়ীর বড় ছেলে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

দুর্ভট্ট ছেলে দুটো হৈ চৈ করে আগেই গিয়ে গাড়ীতে উঠেছে। নীতা বাবাকে নিয়ে নামছে। বাস্তব মনোভবে আশোকা বলে ওঠে, 'দাদা, আপনিও চলুন না স্টেশনে।'

'আমি স্টেশনে?' সুচিন্তা যেন ভয়ঙ্কর একটা হাসির কথা শুনেন।

আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'কী কান্ড! আমি এখন চেষ্টা নে বাবো? দেখ চারদিকে কত কাজ থই থই করছে!'

'কাজ! কাজের কথা ভাবছেন আপনি এখন? বিশ্বাস করবো তাই? আমার চোখকে আপনি ফাঁকি দিতে পারবেন না দিনি!'

সুচিন্তা খুব জোরে হেসে উঠে বলেন, 'এক ফোঁটা মেয়ের সাহস দেখ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এত চোখকে ফাঁকি দিয়ে এলাম, এখন উনি এলেন আমার ফাঁকি ধরতে। চল দরজা অবাধি যাই। গাড়ীতে সাবধানে যেও, দূরন্ত ছেলেরা!'

আর কতক্ষণ? কতক্ষণ আর পারবেন সুচিন্তা?

এত রকমের প্রশ্নপত্র আসবে, একথা কি আগে বুঝতে পেরেছিলেন?

তবু চালিয়ে যাচ্ছেন সুচিন্তা।..... চালিয়ে যাবেন কথার দাঁড় বেয়ে বেয়ে।

এই তো শেষ টেউ।

তারপর তো ছুটি।

সারা জীবনে আর কোন কথা না কইলেও হয়তো চলে যাবে সুচিন্তার।

তাই সুচিন্তা এখন অকারণ কথা বলছেন। বলছেন, 'সিঁড়ির সামনে জুতো রাখল কে? হি হি! তাড়াতাড়ির সময়!'

বলছেন, 'মালপত্র সব গুণে গাড়ীতে উঠিয়েছ তো? নামাযার সময় আবার গুণে নামিও!'

বলছেন, 'তুমি যাচ্ছ ছোট বো, খুব শ্রান্তি পাচ্ছ। নীতা একা, দু'দিকে দুটো রোগী—'

আরও কত কীই যেন বলছেন সুচিন্তা। যে সুচিন্তাকে একসঙ্গে এতকথা কইতে কেউ কখনো দেখেনি।

হ্যাঁ, কথার দাঁড় বেয়েই পার হয়ে যাচ্ছিলেন সুচিন্তা ভয়ঙ্কর এই ঘূর্ণি টেউটা, হয়তো পার হয়েই যেতেন, কিন্তু হাতের দাঁড় হাতেই রয়ে গেল তাঁর, অকস্মাৎ নৌকোখানা একটা পাক খেয়ে উল্টে গেল!

গাড়ীতে উঠে বসার পূর্ব মনুহতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন সুশোভন; বললেন, 'আমি বাবো না, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না!'

'বাবা বাবা, ট্রেনের সময় হয়ে গেছে—' নীতা ব্যাকুল হয়ে বাপের পিঠে হাত রাখা, 'দেবী করলে ট্রেন ফেল করবো।'

কিন্তু সুশোভন এ ব্যাকুলতায় বিচলিত হলেন না, বললেন, 'করুক ফেল! আমার মন কেমন করছে।'

'সুশোভন!'

সুচিন্তা কাছে এগিয়ে এসে বলেন, 'কী হচ্ছে? দেখছ না নীতার কণ্ঠ হচ্ছে।'

সুশোভন সহসা বাঘেত মত গর্জন করে উঠলেন, 'আর আমার? আমার কণ্ঠ হচ্ছে না? দেখতে পাচ্ছো না— তোমার জন্যে আমার মন কেমন করছে!'

ঘড়ির কাঁটা কাঁটা ফোঁটাচ্ছে! নীতা কাতর মিনতিতে ভেঙে পড়ে, 'আমি আবার তোমায় নিয়ে আসবো বাবা, এখন চল, আজ চল!'

কিন্তু পাগল কবে মিনতিতে ভোলে?

পাগল সেই এক বুনো জেঙ্গের ভগ্নীতে বলে, 'না। ইচ্ছে হচ্ছে না বলছি যে!'

ড্রাইভারটা একটা বিরজিবাজক



'না না না। আমি কিছু করবো না!'

পাড়ার লোকের আর পথের লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি কৌতুক সজাগ হয়ে উঠেছে, নিরুপম একবার সেদিকে তাকিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। চাপা তাঁর কণ্ঠে বলে, 'কী ছেলেমানুষী করছেন, নিজেই তো যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন!'

'হয়েছিলাম! এখন হচ্ছি না! বাস! চলো সুচিন্তা, চলো চলো, আমার পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি!'

গাড়ীর দিকে পিঠ ফেরালেন সুশোভন।

মন্তব্য করে ওঠে, অশোকা ব্যগ্রভাবে বলে, 'উঠে আসুন মেজদা!'

'আঃ! তুমি আবার কথা বলছ কেন? তুমি কে?'

নিরুপম কথায় জোর দিয়ে বলে, 'রাস্তার মাঝখানে কী হচ্ছে? উঠুন গাড়ীতে। নইলে বাধ্য হয়েই জোর করে—'

সুশোভন যেন ভয় পান, দিশেহারা আতনাদে বলে ওঠেন, 'সুচিন্তা, এরা আমার জোর করে নিয়ে যাবে। তুমি

আটকে রাখো! তুমি যে বলেছিলে আটকে রাখবে, যেতে দেবে না!

না, এ যুগে পৃথিবীর নিব্বা হবার দায় নেই।

সমস্ত দুঃসহ লজ্জার ভার মানুষকেই বহন করতে হয় তার রক্তমাংসে গড়া সাড়ে তিনহাত মাপের দেহটুকুর মধ্যে।

সেই দুঃসহকে সহ্যত করে এগিয়ে এলেন সূচিন্তা, কঠিন স্বরে বললেন, 'সুশোভন! গাড়ীতে ওঠো।'

'না উঠবো না—' সুশোভনের স্বরে আর কাতর নয়, রুষ্ট, 'আমি যাবো না। আমি তোমার অবাধ্য হবো।'

নীতা হতাশ দৃষ্টি মেলে বলে, 'তবে থাকুন।'

অশোকা গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে, 'তাই ভাল বোধ হয়।'

নিরুপম বলে, ঠিক আছে। যান আপনি বাড়ীর মধ্যে যান! আর অনেকদিন পরে মায়ের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলে, 'কি করা যাবে, নিয়ে যাও। রাস্তার সমানে এভাবে—! যা ভাবা গিয়েছিল, তা' কিছই হয়নি দেখা যাচ্ছে। যেমন ছিলেন থাকুন তেমন।'

'তা' হয় না! সূচিন্তা স্থির অকম্পিত গলায় বলেন, 'তা' হয় না।'

এ গলা কবে যেন একদিন শুনোছিল না নিরুপম? এই গলা এই কথা। কিন্তু এখন সেকথা ভাবার সময় নেই। নিরুপম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে বলে, 'নিয়ে যাওয়া যাবে কি করে?'

'যে করে হোক! ঠিক হয়ে যাবে। গাড়ীতে চাপলেই ভুলে যাবে।'

'আর যদি বিপদে ফেলেন?'

'বিপদে!'

সূচিন্তা ছেলের দিকে—স্পষ্ট চোখে সোজাসুজি তাকাল, অনেক অনেকদিনের পর। হয়তো বা জীবনে এই প্রথম। তাকিয়ে কি হাসেন? বোঝা যায় না, শুধু কথাটাই বোঝা যায়, 'বিপদে পড়ার ভয় পাছ? তা দরকার হলে সেটুকু বিপদকে মেনে নিতেই হয়।'

আন্তে আন্তে পিছিয়ে এলেন সূচিন্তা, সরে এলেন অনুপম কুটিরের দেয়ালের আড়ালে। বাইরের যে দরজাটা খুলতো জীবনেও কোনদিন নিজে হাতে বন্ধ করেননি, সেটা চেপে বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলেন।

তারপর?

তারপর কি ঝড় উঠল?

মেঘ ডাকল?

বাজ পড়ল?

না বাজ নয়, ঝড় নয়, ভয়ানক রেগে ওঠা একটা ক্ষাপা মানুষের গর্জনের স্বর।

আর সেই গর্জনকে তুলে নিয়ে গেল আরও রেগে ওঠা দুঃসহ একটা গাড়ী, তার চাকার শব্দে আরও প্রবল গর্জন তুলে!

কিন্তু তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারল কই সে? ভয়ঙ্কর ছুট দিয়েও তো পারল না। শুধু ছাড়িয়ে ছত্রখান করে দিয়ে গেল। মিশিয়ে দিয়ে গেল বাতাসের স্তরে স্তরে, উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে গেল আকাশের কিনারায় কিনারায়। তাই আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে বাজতে থাকল সে স্বর।

হয়তো চিরদিন বাজবে।

'সূচিন্তা আমায় জোর করে নিয়ে যাচ্ছে!...সূচিন্তা, আমায় ধরে রাখো! সূচিন্তা আমি তোমায় দেখতে না পেলে মরে যাবো।'

দেখতে না পেলে মরে যাওয়া যায়?

ক্ষাপার কথা ক্ষাপাই জানে, সুস্থ মানুষেরা জানে তা' যায় না! তাই সূচিন্তা মরে যাবেন না। মরে গেলেন না। শুধু সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার সময় বস্ত্রবেশী আস্তে হাঁটলেন। উঠে এসে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন একেবারে শূণ্য হয়ে যাওয়া বাড়ীটার।

কেউ কোথাও নেই।

খাঁ খাঁ করছে বাড়ীটা।

নিখর হয়ে পড়ে আছে।

সূচিন্তা হাঁটা থামিয়ে বসলেন।

ওই নিখরতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিখর হয়ে বসে রইলেন ও'র সেই একদা অতিথিকে উৎসর্গ করে দেওয়া বড় ঘরখানায়।

ঘরটা কত বড়!

অনেকদিন ধরে ছোট ঘরটায় থেকেছেন বলেই কি এই মাপজানা ঘরটাকেও এতবেশী বড় লাগছে সূচিন্তার? না কি ক্রমশঃই বড় হয়ে যাচ্ছে ঘরটা? তাই যাচ্ছে যেন, দেয়ালগুলো পিছিয়ে পিছিয়ে অনেক অনেক দূরে সরে যাচ্ছে প্রকান্ড একটা শূন্যতাকে জায়গা করে দিয়ে। যে শূন্যতা সূচিন্তাকে গ্রাস করে নেবে।

কিন্তু তাই কি?

নিজেই সূচিন্তা অবাক হয়ে দেখছেন, গ্রাস করতে তো আসছে না,

শুধু দেয়ালের বাইরের জগতাকে অনেকখানি দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আর সূচিন্তার এই শূন্য জগতটা? সেটা ভরে উঠছে, ভয়ানক যন্ত্রণাময় একটা সুখে। সূচিন্তা জানেন না, সূচিন্তা বুঝতে পারছেন না, সূচিন্তা অবাক হয়ে ভাবছেন, কী এই সুখ? যা দিয়ে অতখানি শূন্যতা ভরে ওঠে?

সে কি আকাশে বাতাসে ছাড়িয়ে পড়া ওই শব্দটা? যে শব্দ এখনও থামছে না! কোনদিনই থামবে না।

॥ সমাপ্ত ॥

ঃ অঞ্জলী প্রকাশনীর বই :

শুভ ১লা বৈশাখের

আধুনিক শ্রেষ্ঠ সংকলন

সুধীরজন মৃধোপাধ্যায় (সম্পাদিত)

সুদূরের গিয়াসী

সৈয়দ মজতবা আলী

সুবোধ ঘোষ

সতীনাথ ভাদুড়ী

বিমল মিত্র, নরেন্দ্র মিত্র

বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী

অন্নদাশঙ্কর রায়

সন্তোষকুমার ঘোষ

আরও বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের
লেখা আছে ॥ পাঁচ টাকা ॥

একটি আধুনিক ও মধুর
উপন্যাস প্রকাশিত হল।

গ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মৃধোপাধ্যায়

সোনারবা

সঙ্ক্যা

ডিমাই সাইজ : সুন্দর প্রচ্ছদপট

৥মাত্র দু' টাকা ॥

পরিবেশক : নব গ্রন্থ কুটির

৫৪-১৫এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকতা-১২

চার ও কারুশিল্পের দুইটি প্রদর্শনী

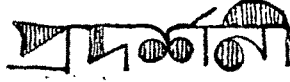
গত ২৯শে মার্চ থিয়েটার রোডের অশোক-গ্যালারীতে উন্মোচিত শিল্পী লক্ষ্মণ পাইয়ের চিত্রকলার প্রদর্শনীটি আমরা দেখে এসেছি। আর সেইসঙ্গে দেখে এসেছি ৩০, চিত্ররঞ্জন এভিনিউতে গত ১লা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক উন্মোচিত ভারতীয় হস্তশিল্পের পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন সংস্থার স্থায়ী প্রদর্শনীটি। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এই দুটি প্রদর্শনীই কলকাতার শিল্পরসিক ব্যক্তিদের কাছে ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। আমরা প্রদর্শিত নিদর্শনগুলি দেখে আনন্দিত হয়েছি। উদ্যোক্তারা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

।।শিল্পী লক্ষ্মণ পাইয়ের প্রদর্শনী।।

সাম্প্রতিক কালে যে কয়জন ভারতীয় চিত্রকলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে দেশ-বিদেশে খ্যাত হয়েছেন, শিল্পী লক্ষ্মণ পাই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯২৬ সালে লক্ষ্মণ পাই গোয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু চিত্রবিদ্যায় তিনি শিক্ষালাভ করেছেন বোম্বের জে. জে. স্কুল অফ আর্টসে। ১৯৫১ সালে প্যারিস এবং ১৯৫৮ সালে লন্ডনের বিভিন্ন শিল্প-বিদ্যালয়েও তিনি শিক্ষালাভ করেন। এই সময় থেকেই শিল্পী শ্রীপাই প্যারিস লন্ডন, বোম্বে, দিল্লী, নিউইয়র্ক, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি একক চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করে কলারসিকদের সপ্রশংস অভিনন্দনে ধন্য হয়েছেন। কলকাতায় এই তাঁর প্রথম একক চিত্র-প্রদর্শনী। সেই দিক থেকে, ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে শিল্পীর তৈল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র ছিল ২৭ খানি। এ-ছাড়া জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র এবং এঁটি ও সিল্কের উপর অঙ্কিত কিছু চিত্রকলার নিদর্শন। সব কয়টির মাধ্যমেই শিল্পী শ্রীপাই তাঁর স্বকীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন।

তাঁর তৈল-রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে ইউরোপীয় চিত্রকলার রীতি-নীতি আত্মস্থ করার প্রবণতা থাকলেও ভারতীয় চিত্রকলার ছন্দিত রেখার সূক্ষ্মাঙ্গ তিনি সেই চিত্রগুলিকে এমন এক প্যাটার্ণে বাঁধতে পেরেছেন যে, সেগুলিকে আমাদের ভারতীয় মন অতি সহজেই গ্রহণ করতে পারে। মূলতঃ নানা রঙের বর্ণাঢ্য জমিনের উপর এমন সূক্ষ্ম ছন্দিত রেখার সৌন্দর্য ইদানীংকালে



কলারসিক

আমরা অন্য কোনো শিল্পীর কাছ থেকেই পাইনি। এক কথায়, তাঁর চিত্র-সংস্থাপন, বর্ণাঢ্য জমিন এবং গতিময় ছন্দিত রেখায় বিধৃত চিত্র-বস্তব্য আমাদের মুগ্ধ করেছে।

উদাহরণ হিসাবে তাঁর 'বালিকা' (৫), 'নুড়ি' (৭), 'গাছ' (১০), 'ঘাস' (১৩), 'প্যারিস' (২৩), 'স্মিক' (২৪), প্রভৃতি চিত্রগুলিকে উপস্থাপন করা যায়। এগুলিতে শিল্পী জমিনের উপর এমন সূক্ষ্ম রেখায় তাঁর বস্তব্য তুলে ধরেছেন যে, প্রতিটি দর্শক তা দেখে অভিভূত হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। এ-যেন দক্ষ শিল্পীর সহজ সূক্ষ্ম সাবলীল ভঙ্গী ও বিন্যাসকলার এক প্রাণবন্ত-রূপ।

আবার এর পাশাপাশি তিনি মোটা রেখার টানেও দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁর 'ঘনিষ্ঠতা' (১৬) চিত্রে। এই একই শিল্পীর হাত দিয়ে যখন বুদ্ধজীবনের ঘটনা অবলম্বনে সূক্ষ্ম অথচ বলিষ্ঠ রেখার চমৎকার এঁচিগুদুল সৃষ্টি হয় তখন স্পষ্ট অনুভব করা যায় শিল্পী পাই ইউরোপীয় চিত্রকলার রূপ-রসে মুগ্ধ হলেও, তাঁর মনের জমিনে ভারতীয় চিত্রকলার প্রভাব কতখানি। শ্রীপাই, ইতঃপূর্বে শ্রীপাইয়ের 'গীতগোবিন্দ', 'রামায়ণ' এবং গান্ধীজীর জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত চিত্রগুলি দেশ-বিদেশের কলারসিকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দনলাভে ধন্য হয়েছে। আমরা সেগুলি দেখিনি। কিন্তু, বুদ্ধের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর এঁচিগুদুল দেখে একথা সহজেই বলতে পারি—শিল্পী পাই ছন্দিত রেখা দিয়ে সত্যিই কথা বলাতে পারেন। এই একই কথা বলা যায় তাঁর সিল্কের উপর রচিত পটচিত্রগুলি দেখে। এখানে তিনি যেন রঙের যাদুকর। রঙের এমন প্রাণবন্ত উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য সমাবেশ খুব কম শিল্পীর কাছেই প্রত্যাশা করা যায়।

শিল্পী লক্ষ্মণ পাই আমাদের অনেক প্রত্যাশা পূর্ণ করেছেন। অশোকা গ্যালারী তাঁর মত একজন বলিষ্ঠ শিল্পীকে আমাদের কাছে তুলে ধরে ধন্যবাদভাজন হলেন। আমরা শিল্পী ও উদ্যোক্তা উভয়ের উদ্দেশ্যেই আমাদের অভিনন্দন জানাই।

।।হস্তশিল্পের স্থায়ী প্রদর্শনী।।

ভারতীয় হস্তশিল্প যুগ-যুগান্তর হয়ে তার অনুপম কারুসৌন্দর্যে বিশ্ব-বাসীকে মুগ্ধ করেছে। স্বাধীন ভারতে

সেই লক্ষ্যপ্রায় ঐতিহ্যধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপক আয়োজন করেছেন নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থা। সারা দেশব্যাপী এই সংস্থার কর্মকেন্দ্র এখন বিস্তৃত। সেখানে শিল্পীরা কাজ করছেন, উদ্ভাবন করছেন, নতুন নক্সা, হস্তশিল্পের নতুন নিদর্শন। এ-ছাড়া অসংখ্য শহর-নগর-গ্রামে হস্ত-শিল্পীরা কর্মনিরত। এঁদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় কারুশিল্পের যেসব সৌন্দর্যময় নিদর্শনগুলি প্রস্তুত হচ্ছে তার জন্য বাজার চাই। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী কারুশিল্পের সম্পদ পেঁচে দেবার মত সংস্থা চাই। বিশেষ করে বিদেশের বাজারে ভারতীয় কারুশিল্প যাতে সুদৃঢ়ভাবে পেঁচে দেওয়া যায় তার জন্য সম্প্রতি গড়ে উঠেছে ভারতীয় হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন নামক একটি সংস্থা।

এই সংস্থার আঞ্চলিক কর্মকেন্দ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যা, ত্রিপুরা আর মণিপুরের জন্য এতদিন পর্যন্ত কোনো সংস্থা ছিল না। গত ১লা এপ্রিল এইসব রাজ্যের জন্য পূর্বাঞ্চলীয় সেই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হলো। দেশ-বিদেশের মানুষ এলে এখন এখানেই তাঁরা দেখতে পারবেন পূর্বাঞ্চলীয় তথা সব ভারতীয় কারুশিল্পের নিদর্শন।

চিত্ররঞ্জন এভিনিউস্থ কারুশিল্পের পূর্বাঞ্চলীয় এই সংস্থার স্থায়ী প্রদর্শনী-কক্ষটি দেখে আমরা খুশি হয়েছি। অতি চমৎকারভাবে সমস্ত কক্ষটি সজ্জিত। প্রতিটি গ্যালারীতে আছে বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান থেকে সংগৃহীত অপূর্ব সব হস্তশিল্পের নিদর্শন। এর মধ্যে বাংলার পুতুল আর খেলনা, বালুচর শাড়ি, শিং-এ প্রস্তুত দ্রব্য, হাতীর দাঁতে প্রস্তুত শিল্পকর্ম, বাঁশের কাজ, বাঁকুড়ার পোড়ামাটির কাজ, ঢোকরা কামারের ধাতুশিল্প, উড়িষ্যার মৃদুখাস, আসামের ঢোকা, হায়দ্রাবাদের লাক্ষায় প্রস্তুত কারু-দ্রব্য, মুরাদাবাদের ধাতুদ্রব্য, কাশ্মীরের মাজ-সজ্জার অলঙ্কার প্রভৃতি নিদর্শন-গুলি দেখে যে কোনো দর্শক শুবু মুগ্ধ হবেন না, সেগুলি নিজের প্রয়োজনে কিংবা গৃহসজ্জার জন্য ক্রয় করতেও ইচ্ছুক হবেন। এমনি ক্রেতা সাধারণ এবং বিদেশী ক্রেতাদের জন্য এই যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো, এ অত্যন্ত সমন্বয়-যোগ্য হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীমতী রঞ্জনা রায় এই নব-উন্মোচিত কর্মকেন্দ্রের বর্তমান ভার-প্রাপ্ত কর্মকর্তা। আশা করি তাঁর অনলস শ্রম আর সাধনায় এই কেন্দ্র সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। আমরা এই নবজাত কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই।

প্রায় সাড়ে ছয়ফুট দীর্ঘ ঐ যে মানুষ্যটি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে বারো বারো হোঁচট খাচ্ছে এর ওর তার সাদর আহ্বানে—ওর নাম কাজল আচার্য। খেলার জগতে মানুষ্যটি সুপরিচিত। সকলেই তাকে চেনে। শুধু চেনেই না, সদাঙ্গাপী নিরহংকার আর পরোপকারী এই লোকটিকে অনেকেই ভালবাসে। আর এই ভালবাসার প্রকাশ যত তত এমন ভাবে তারা প্রকাশ করে থাকে যে, কাজলের মাঝে মাঝে লজ্জা পায়। তবে বাধা দেয় না। শুনতে ভালই লাগে।

যারা ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করে তারা ক্ষেত্র বিশেষে কাজলকে এড়িয়ে চলে। নইলে সময় রক্ষা করে চলা সম্ভব নয়। কাজলকে এর জন্য দায়ী করা চলে না। ওর জনপ্রিয়তাই এর অন্যতম কারণ। ক্রাউকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে উপেক্ষা করতে সে পারে না। তা সে যে কোন স্তরের লোকই হোক না কেন। এর জন্য ঘরে-বাইরে তাকে কথা শুনতে হয় বটে, কিন্তু স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

ভালবাসা

বিজুতিভূষণ গুপ্ত

খেলার কথা যদি কেউ তুলতে পারে তা'হলে ত' কথাই নেই। স্থান, কাল আর পাত্রের হিসেব থাকে না। একেবারে বিভোর হয়ে আলোচনার ডুব দেয়! চোখ বৃজে মুখে মুখে আলোচ্য খেলার অতীত এবং বর্তমানের এক ধারাবাহিক ইতিহাসই হয়তো শুনিয়ে দেবে।

বহু গুরুত্বের অধিকারী কাজল আচার্য একটি বিষয়ে অত্যন্ত দুর্বল। নিজের সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিরূপ সমালোচনা সে শুনতে পারে না। অসহ্য লাগে। অথচ কে কোথায় তার বিষয়ে আলোচনা করছে সেদিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কান সজাগ। এক এক সময় প্রশ্ন করতেও স্মিধা করে না।

যারা কাজলকে অন্তঃপ্রহর ঘিরে আছে সত্যি আর মিথ্যার মিলিয়ে তারা সব মনের মত করেই সব সময় জবাব

দেয়। কাজল বাধা দিয়ে ওদের আরও উৎসাহিত করে তোলে। হুঁচটচুটে লজ্জিত মুখে কান পেতে শোনে। এর একটানা স্তব-স্তুতি শুনতে শুনতে এর বিপরীত কিছু কানে এলেই ইদানিং সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

কাজল প্রশংসা পাবার যোগ্য এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু ভাই বলে ওর এই কাঙ্গালপনা ওকে যে মোটেই মানায় না এ কথা একদিন কাজলের-বাল্য-বন্ধু স্পষ্ট করেই তাকে মূখের উপর শুনিয়ে দিল।

অনুপ বলল, প্রশংসা আর ভালবাসা সকলেই চায়। কিন্তু তার জন্যে এতটা আগ্রহ প্রকাশ করা মোটেই শোভন নয় কাজল। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু।

এই সহজ কথাটা কাজল সহজ মনে গ্রহণ করতে পারে না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, তোমার এ কথার মানে কি অনুপ?

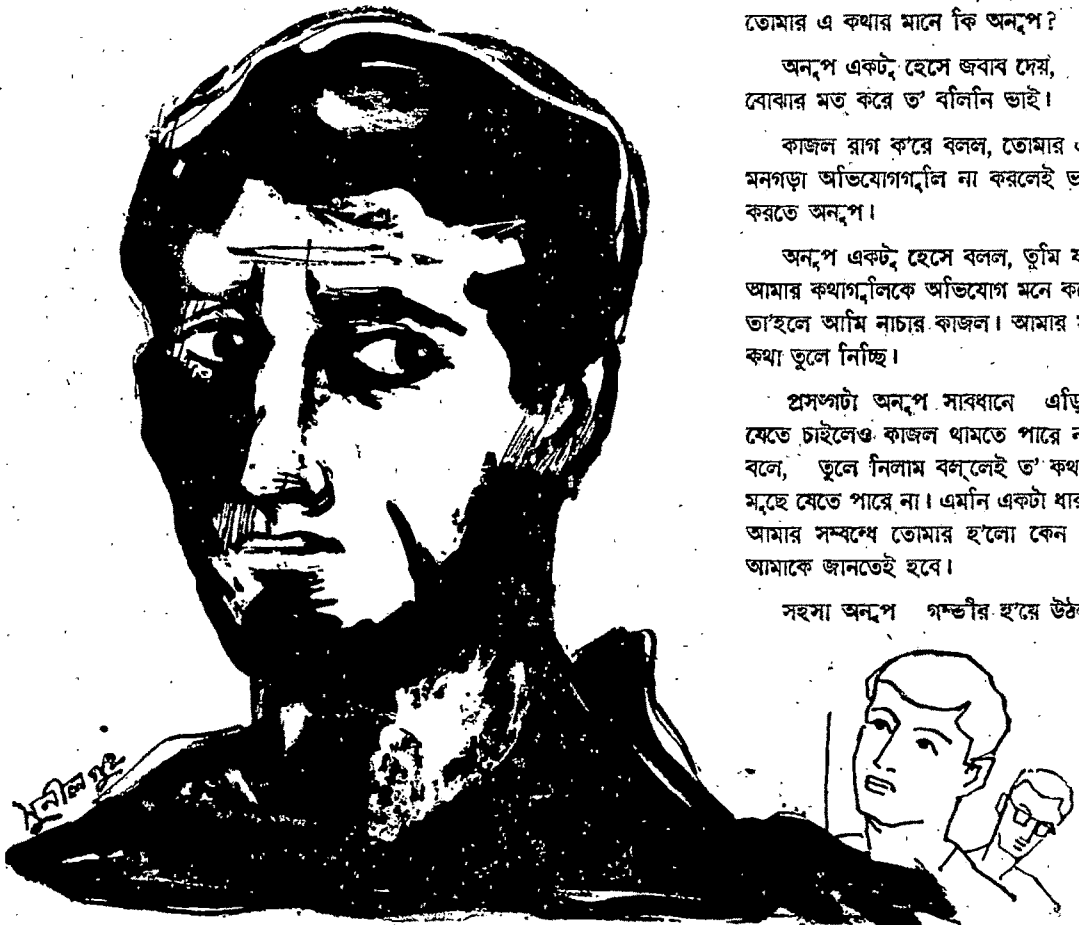
অনুপ একটু হেসে জবাব দেয়, না বোঝার মত করে ত' বলিনি ভাই।

কাজল রাগ করে বলল, তোমার এই মনগড়া অভিযোগগুলি না করলেই ভাল করতে অনুপ।

অনুপ একটু হেসে বলল, তুমি যদি আমার কথাগুলিকে অভিযোগ মনে করো তা'হলে আমি নাচার কাজল। আমার সব কথা তুলে নিচ্ছি।

প্রসঙ্গটা অনুপ সাবধানে এড়িয়ে যেতে চাইলেও কাজল থামতে পারে না। বলে, তুলে নিলাম বললেই ত' কথাটা মূছে যেতে পারে না। এমন একটা ধারণা আমার সম্বন্ধে তোমার হ'লো কেন তা আমাকে জানতেই হবে।

সহসা অনুপ গম্ভীর হয়ে উঠল।



বলল, তোমার কোন প্রশ্নেরই আর জবাব আমার কাছ থেকে পাবে না।

কাজল বলল, জবাব দেবার নেই বলেই দিতে পারছি না। তুমিও আমার কাছে ধরা পড়ে গেছো। সময়ই মানুষকে মানুষ চিনবার সুযোগ দেয়। তুমিও দিয়েছো। তার জন্য ধন্যবাদ! তবে তোমাকে এত ছোট করে ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

এবারে অনুপের বিস্মিত হবার পালা। বলল, অর্থাৎ.....

কাজল গম্ভীরভাবে বলল, আমার জনপ্রিয়তা তোমাকে বিচলিত করেছে তাই.....

অনুপ এতক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, এর পরে তোমাকে বলবার আমার কিছু থাকতে পারে না। থাকা উচিতও নয়। আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা তোমায় বলে যাই.....

বলতে গিয়েও অনুপ শেষ পর্যন্ত কথাটা অসমাপ্ত রেখে ঘর ছেড়ে চলে গেল। চলে না গিয়ে তার উপায় ছিল না। যারা ইদানিং কাজলকে ঘিরে তার কাছে গৃণ-গৃণ করে স্তব-স্তুতি করছে তাদের দলে অনুপ কোনদিন যোগ দিতে পারেনি—বরং তার দোষ-ত্রুটি যখনই চোখে পড়েছে, বিনা বিধায় সেইদিকে কাজলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাকে ছোট করবার জন্য নয়—তুলে ধরবার জন্য। কাজলও তা জানে। স্তুরাং সরে যাওয়া ছাড়া আর কোন মধ্যপথ তার ছিল না।

কাজল অনুপের বাল্যবন্ধু। যে প্রতি-কূল অবস্থার ভিতর দিয়ে একটু একটু

ক'রে পরম নিষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে নানা দুঃখ-কষ্ট আর বাধা-বিঘ্ন হাসি-মুখে অতিক্রম ক'রে নিছক নিজের চেষ্টায় কাজল ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে দেশের মধ্যে নিজের একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে তার জন্য অবশ্যই সে প্রশংসা পাবার যোগ্য। এ ছাড়া আরও অনেক উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। পাড়ার কোথায় কোন বাড়ীতে কে অসুস্থ হয়ে পড়েছে—ডাক কাজলকে। কাকে হাস-পাতালে অবিলম্বে একটা ফ্রি-বেড ক'রে দিতে হবে সেখানেও কাজল। এ সব কথা একবারও অনুপ অস্বীকার করে না। বরং এই আদর্শ চরিত্রের লোকটিকে উদাহরণ হিসেবে নিজেই সে বহু লোকের কাছে গল্প করেছে। সম্ভবতঃ সেইজন্যই কাজল-চরিত্রের একটা দিকের এতবড় দুর্বলতা অনুপকে ব্যাধিত ক'রে তুলেছিল। কণ্ঠে দেখা দিয়েছিল প্রতিবাদের সুর। কিন্তু কাজল বদল না। ভুল করল। তার প্রতিবাদকে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা মনে করে মর্মান্তিক বিদ্বেষ ক'রে বসল।

অনুপ দূরে সরে গেল। সে যে এভাবে চলে যাবে এ কথা কাজল ভাবতেও পারেনি। তবে তাকে ফিরেও ডাকেনি। সহস্র রকম কাজের মধ্যে তাকে বিব্রত থাকতে হয়। উৎসাহ, উদ্দীপনা আর আনন্দের মধ্যে তার দিন চলে যাচ্ছে। অনুপের না আসার ফাঁকটা ধীরে ধীরে কমে গিয়ে একেবারে বৃজে গেল। অন্তত বাইরে থেকে তাই মনে হ'ল। কিন্তু এই বিরামহীন উদ্দীপনা আর চলার গতি সব সময় একই খাতে বয়ে যায় না। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটে। মনের তীব্র গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দেহ মূখ থবড়ে পড়ে। মনকে ফিরে দাঁড়িয়ে নতুন করে ভাবতে হয়। তুলনামূলক চিন্তাটা কাজলের মধ্যেই আজ নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে কাজল। পর পর বার দুই ইনফ্লুয়েন্সা হবার পর হঠাৎ

ঠান্ডা লেগে বৃকে সর্দি বসে গিয়েছে। জ্বর ছাড়তে চায় না। সপ্তাহখানেক চিকিৎসার পর ডাক্তার সন্দেহ করলেন প্লুমুরিস বলে। এক্সরে প্লেট ডাক্তারের অনুমানকে সত্য বলে ঘোষণা করল। চিকিৎসার ধারা পাণ্টে গেল। নড়া-চড়া এমন কি পাশ ফেরাও নিষেধ। শয্যায় একমাত্র আশ্রয়স্থল। খাওয়া থেকে শরু করে অন্যান্য যাবতীয় কাজই তাকে এই ছোট গম্ভীর মধ্যে বসে করতে হয়। বিকেল হলোই কাজল ছট-ফট করে। মাঠ তাকে আকর্ষণ করে। ডাক্তারের বিধি-নিষেধের গান্ডি ডিঙিয়ে বাইরে বার হ'তে ইচ্ছে হয়। বহু বছরের এই অভ্যাস তাকে চপ্পল করে তোলে। তারপরেই দেখা দেয় একটা অপরিচিনিত ক্রান্তি। অবসাদে দুঃখ বৃজে আসে।

বাড়ীর প্রত্যেকটি লোকের চোখে-মুখে একটা শঙ্কিত ভাব। যদিও প্রকাশ্যে কিছু না বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। কাজল ম্লান মুখে হাসে। ভিতরে অস্বস্তি বোধ করে। সে ছেলে মানুষ নয়। ডাক্তারের বিধি-নিষেধ রোগের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাকে সজাগ করে তুলেছে। কথা বলতে ভাল লাগে না। কথা শুনতেও বিরক্তি বোধ করে। ডাক্তারের নির্দেশও তাই। তবুও তাকে চুপ ক'রে থাকতে হয়। বাধ্য হ'য়েই চুপ করে থাকে। যারা তাকে ভালবাসে বলে দাবি করে, তার একান্ত অনুগত ভক্ত, তারাই আজ ওর জীবনসংশয় করে তুলেছে। অসুস্থ হ'য়ে পড়ার খবর ছড়িয়ে পড়তে যতটুকু সময় লেগেছে—তারপরেই দলে দলে দর্শন-প্রার্থী আর মণ্ডল-প্রার্থীর আগমন শরু হ'য়েছে। এদের বিমুখ করা সহজ নয়—সম্ভব নয়। হয়তো বা শোভনও নয়। কিন্তু সবচেয়ে মূর্খিল হ'য়েছে যে যারা দেখতে আর দেখা দিতে আসে তারা আসল উদ্দেশ্যই ভুলে যায়। যার ফলে রুগীর ঘর শেষ পর্যন্ত খেলার মাঠে রূপান্তরিত হয়।

সকলের মুখেই এক কথা। একই আশ্বাস-বাণী। কিছুই হয়নি তার। দুটো দিন চুপ ক'রে শুয়ে থেকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অথচ মুখে যারা এ কথা বলে কাজে তারা ঠিক বিপরীত পথ ধরেই চলেছে। কাজল শব্দ বিস্মিত হয় না, মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।

প্রাদেশিক ক্রিকেট দল গঠন নিয়ে পরিচালক এলেন কাজলের উপদেশ

মুখে স্মিতভাৱে
বোল্যান্ড
ফেস পাউডার
ব্যারন কম্পোজিট প্রোডাক্টস • কলিকাতা

আর.জি.দে.সন্ত
১১১-মহম্মাদজান স্ট্রীট • কলিকাতা

নিতে। সঙ্গে তার আরও জনকয়েক খেলোয়াড় এসেছে। আলোচনার নামে খানিক হজা করে গেল। শুধুই কি এই—

বিমল বলছিল, একটু তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন, কাজলদা। খেলার মাঠ একেবারে অন্ধকার। গণেশ বাবুর সঙ্গে ছেলেদের মোটেই বনিবনা হচ্ছে না। ওর কেতাবী ধরনের শিক্ষা হজম করা শক্ত। তার উপর বড় মুখ খারাপ করেন কথায় কথায়।

বিমলের কথার জের টেনে অমল বলে, সহজকে শক্ত করে দেখানই গণেশ-বাবুর বৈশিষ্ট্য।

বিমল বলল, ঠিক সেই জন্যই ওর হাত দিয়ে আজও একটিও উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় বার হ'লো না। বন্ধুত্বলেন কাজলদা, আপনার এই সামান্য কটা দিনের অনুপস্থিতিতে কথটা আরও বেশী করে মনে পড়ছে।

ওদের আলোচনার ভিতর দিয়ে ওরা যে প্রচ্ছন্নভাবে কাজলকে স্তুতি করে চলেছে তা অতি সহজেই তার কাছে ধরা পড়ল। খুশী হওয়ার পরিবর্তে আজ কিন্তু তার মূখের উপর খানিকটা বিরক্তির ভাব ফটে উঠল।

নিজের আলোচনায় ওরা এমনই মগ্ন যে, কোনকিছুই তাদের চোখে ধরা পড়ল না। অমল পুনরায় বলল, মিথ্যেই আমরা আলোচনা করছি। বর্তমান যুগে যত গোলযোগ, যত অনাচার আর অবিচার তার মূলে রয়েছে দল। সুতরাং মিথ্যে দৃষ্ট করে কি হবে।

রাজেন চুপ করে শুনছিল। এতক্ষণে সেও মুখ খুলল, আজকের দিনে রাজনীতি কোথায় নেই ভাই? চায়ের দোকানে, হোটেলে, হাটে, মাঠে ঘাটে, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, বাপের সঙ্গে ছেলের, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর এমনকি নাবালক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এ রোগের সংক্রামক জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

কাজল এতক্ষণ ধরে চোখ মেলে ওদের আলোচনা শুনছিল। হঠাৎ সে চোখ বড়ো পাশ ফিরে শুনলো।

তবুও ওদের হৃদয় নেই। বিমল চোখ টিপে বলল, কাজলদার গতমাসের রেডিও-টকটা নিশ্চয় খুব মনোযোগ দিয়ে শুনিয়েছিল রাজেন?

রাজেন একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল, শুনিয়ে বৈকি—

বিমল বলল, কাজলদাও এই কথা-গুলিই সেদিন দৃষ্ট করে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি খেলোয়াড়দেরও বাদ দেননি। তাদের অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির কথাটাও বেশ জোর দিয়ে উল্লেখ করেছিলেন। তাদের দুর্বল মনোবৃত্তির জন্য কোথায় যে তারা দিনের পর দিন নেমে যাচ্ছে সে কথাও সাহসের সঙ্গে বলেছেন। অথচ এই একটা যন্ত্রণার ইতিপূর্বে এই পাপ প্রবেশ করবার সুযোগ পেত না।

রাজেন বলল, কিন্তু যারা কানে তুলে গুঁজে বসে আছে তাদের কাছে চীৎকার করে লাভ কি?

কাজল একথানা হাত তার কানের উপর চাপা দিল। ওরা নিজের কথায় এমনই মত্ত যে, সেদিকে কারুর চোখ পড়ল না।

বিমল বলল, লাভ একেবারে নেই এ কথা ঠিক নয় রাজেন। এই ধরনের চীৎকার করবারও প্রয়োজন আছে। নইলে কাজলদার মত লোকেরও ধৈর্য-চ্যুতি ঘটত না রাজেন।

দেওয়াল ঘড়িতে এইমাত্র চারটা বাজল। একটায় ওরা এসেছে। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে যত ওরা আলোচনা করেছে তার মধ্যে এক মূহুর্তের জন্যও কাজল যোগ দেয়নি। যোগ দেবার মত মনের অবস্থাও তার নয়—দেহের অবস্থাও নয়। ডাক্তারের নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চায়। এখন দাদা দেখা দেবেন। ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। এ কাজটি তিনি নিজের হাতে করেন। আর কারুর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হতে পারেন না। দাদার কথা ভাবতে গিয়ে আজ বহুদিন পরে কাজলের অনুপের কথা মনে পড়ল। মনে মনে হিসেব করে দেখল কতদিন সে এমুখো হয়নি। অথচ এমন একদিন ছিল যে, দিনান্তে দু'বার তাদের দেখা না হ'লে—দিনটা অসম্পূর্ণ মনে হ'ত।

কাজলের দাদা দেখা দিয়েছেন। তার দৃষ্টিতে বিরক্তি—মুখে লেগে আছে, অনুযোগের আভাস। কিন্তু ওষুধ খাইয়ে যেমন নিঃশব্দে তিনি এসেছিলেন তেমন নিঃশব্দেই চলে গেলেন।

দাদা চলে যেতেই এই সর্বপ্রথম কাজল মুখ খুলল, তোমাদের মাঠে খাবার সময় হ'য়ে গেল যে বিমল। বাবে না?

এই ছোট প্রশ্নটির দ্বারা কাজল যে কথা ওদের বলতে চেয়েছিল তার ধার দিয়েও ওরা গেল না বরং মাঠে না গিয়ে বিকেলটা ওরা এখানেই কাটাবে সমবেত-

গান্ধী স্মারক নির্ধারিত বই

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত
পল্লী-পুনর্গঠন

গান্ধীজীর পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত
চিন্তাধারার এক পূর্ণাঙ্গ সংকলন।
॥ মূল্য ৩-০০

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত
নারী ও সামাজিক অবিচার

॥ মূল্য ৪-০০

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত
গীতাবোধ

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমারচন্দ্র জানা
অনুদিত ॥ মূল্য ১-৫০

গান্ধীজীর ন্যাসবাদ

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, অনুদিত
॥ মূল্য ০-৫০

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
॥ মূল্য ২-৫০

ঃ প্রস্তুতির পথে :

গান্ধীজীর আরও দু'খানি বই

১। সভ্যই ভগবান ২। সর্বোদয়

ঃ প্রাপ্তিস্থান :

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি

সি-৫২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিঃ ১২

এবং

প্রকাশন বিভাগ, গান্ধী স্মারক নির্ধারিত
(বাংলা শাখা), ১১১/এ, শ্যামাপ্রসাদ
মুখার্জি রোড। কলিকাতা ২০

শ্রীফাল্গুনী মূখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

ভাগীরথী বহে ধীরে ৩।

লেখার মূডন দৃষ্টিভঙ্গি সকলকে আকর্ষণ করেছে !

দেবশ্রী সাহিত্য সমিতি : ৫৭সি কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কন্ঠে এই কথাটাই সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাঠ ত চিরদিনই আছে একাদিনের অনুপস্থিতিতে এমন কিছু অঘটন ঘটবে না।

কাজলের অন্তরাঙ্গা ভিতরে ভিতরে কাকিয়ে উঠল—হায় ভগবান!... আর পাশের ঘরে বসে তার দাদা রুম্ম রোষে নিজের হাত কামড়াচ্ছিলেন। আর ভাবছিলেন এই সব ভদ্রসন্তানদের আর কি করলে ভদ্রভাবে বিদায় করা যায়। নিচে গিয়ে একবার চাকরবাকরদের উপর হুঁকি দিয়ে এলেন, যত সব অকর্মার দল—এদের বাড়ীতে ঢুকতে দিস কেন?

ওরা প্রথমে হকচকিয়ে যায়। পর-মুহূর্তেই বলে, কাল থেকে সদর দরজাই খুলে না। আপানি দেখে নেবেন বড়বাবু।

দাদা এটাও চান না। বলেন, ভদ্র-লোকের ছেলেরা এলে দরজা খুলিবেন কিরে। যতসব!

তাহলে বড়বাবু—ওরা একযোগে প্রশ্ন করে।

উত্তর খুঁজে পান না দাদা। তিনি চলে যাবার জন্য উদ্যত হন। চলে যেতে গিয়েও তাঁকে থামতে হয় অনুপকে দেখে। বলেন, ঠিক হয়েছে। তুমিই পারবে অনুপ। তোমাকেই আমি মনে মনে চাইছিলাম।

অনুপ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়।

দাদা বলেন, ছেলেটাকে ওরা শেষ না করে ছাড়বে না দেখছি। আমার হয়েছে যত জ্বালা। না পারি সমর্থন করতে, না বলতে পারি সোজাসৃজি চলে যেতে।

অনুপ এতক্ষণে কথা বলে, আপনি কিসের কথা বলছেন দাদা! কাজল ভাল আছে তো?

দাদা হতাশ কন্ঠে জবাব দিলেন, তবে আর বলছি কি তোমায়। ভাল থাকতে কাজলকে তার ছাত্র আর বন্ধুরা দেবে না। অসহ্য। বুঝলে অনুপ, রুগীর ঘরকে ওরা মাঠ বানিয়ে ছেড়েছে।

অনুপ বলে, প্রশ্ন দিচ্ছেন কেন বড়দা। তারা যখন বোঝে না তখন সোজা-সৃজি বুকিয়ে দিল।

দাদা বলেন, আমার অবস্থায় পড়লে তুমিও পারতে না ভাই। ওরা ত তোমারও পারিচি তুমি একবার বুকিয়ে বলে দেখনা।

অনুপ আপত্তি জানাল, বলতে হলো আপনাকেই বলতে হবে। এখানে অধিকারের প্রশ্ন আছে। আমার কথা যদি না শোনে। মিথ্যা অপমান হতে আমি চাই না।

দাদা বলেন, আমি ভেবেছিলাম কথাটা কাজলই ওদের বলবে। কিন্তু ও যখন চুপ করে আছে তখন—

কথা দিয়ে অনুপ বলে, ঠিক সেই কারণেই আপনার এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

দাদা বলেন, কথাটা আমিও স্বীকার করছি ভাই, কিন্তু কাজল হয়তো এটা পছন্দ না করতে পারে।

অনুপ বলল, কাজলের মনে করার প্রশ্ন এখানে না। তুলে তার অসুখের কথাটাই প্রথমে আমাদের ভাবা উচিত ছিল। তাছাড়া কাজল যদি পাগল হয় তাই বলে আর সকলে সেই সঙ্গে পাগল হতে পারে না। ব্যক্থা একটা করতে হবে বাকি।

অগ্রহভরে দাদা বলেন, নিশ্চয় করতে হবে ভাই। তবে আমি লাঠি না ভেঙ্গে সাপ মারতে চেয়েছিলাম।

অনুপ বিচিত্র ধরনের একটু হেসে বলল, কিন্তু একসঙ্গে সকলকে খুঁশী করা সম্ভব নয় বড়দা।

অনুপ মুহূর্তের জন্য থামল—একটু চিন্তা করল। তারপর দ্রুত বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। কিছু অনুমান না করতে পেরে বিহ্বল দৃষ্টিতে দাদা চেয়ে রইলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এল অনুপ। সঙ্গে রয়েছেন ডাঃ দত্ত। তিনি খেলোয়াড় কাজলের একজন অকৃত্রিম ভক্ত। এবং কতমানে তাঁর চিকিৎসার তার নিয়েছেন। অনুপ তাঁকে এখানকার পরিস্থিতি সবিস্তারে জানতেই তিনি আর কালবিলম্ব না করে ছুটে এসেছেন।

খেলার মাঠের রাজনীতির সমালোচনা তখনও পুরোদমে চলেছিল। ডাঃ দত্ত ঘরে প্রবেশ করতেই মন্ত্রকলে ওরা থেমে গেল।

ডাঃ দত্ত চিকিৎসকের গাম্ভীৰ্য নিয়ে প্রশ্ন করলেন, এঁরা সব?

অনুপ জবাব দিল, আপনার রুগীর ছাত্র আর বন্ধু এঁরা।

ডাঃ দত্তের কন্ঠে বিস্ময় এবং বিরক্তি প্রকাশ পেল, তিনি কাজলের দাদার পানে মূখ ফিরিয়ে অনুযোগ দিয়ে বললেন, বাদলবাবু কি এঁদের জানিয়ে দেননি যে কাজলবাবুর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটান মানেই তার কতবড় ক্ষতি করা? আমি বার বার করেই একথা আপনাকে জানিয়ে গেছি যে খুব বড় প্রয়োজনেও যেন কেউ তাঁর ঘরে এসে বিরক্ত না করে। কিন্তু দেখছি চিকিৎসকের নির্দেশ খুব ভাল করেই আপনি পালন করেছেন।

কাজলের দাদা অসহায়ভাবে একে একে সকলের মুখের পানে চোখ বুলিয়ে নিয়ে অক্ষটকণ্ঠে অনুপকে বলতে থাকেন, দেখ দেখি অনুপ, কি বিপদে পড়লাম। মনে... বুঝতেই ত পারছো তুমি... মানে এরা সব শিক্ষিত ভদ্রসন্তান সব কথা কি এদের বলা চলে? আমার হয়েছে যত বিপদ—

ডাঃ দত্ত ততক্ষণে গিয়ে কাজলের শয্যার পাশে সাবধানে বসেছেন। তার বন্ধুর দল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে তারা চলে গেল।

ডাঃ দত্ত এতক্ষণে স্বাভাবিক হেসে মদ্র কন্ঠে বললেন, 'চোখে আগুলা দিয়ে না দেখালে যারা দেখে না তাদের পরিষ্কার করেই বলতে হয় কাজল-বাবু।

কৃতার্থের হাসি হাসলেন কাজলের দাদা। কাজলও মিটি-মিটি হাসছিল। ডাঃ দত্তের ব্যবস্থায় সেও যে কত খুশী হয়েছে তা ওর মুখ দেখেই অনুমান করা যায়।

অনুপ এতক্ষণে চুপ করে ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাঃ দত্ত প্রস্থান উদ্যত হতেই সেও তার পিছু নিল।

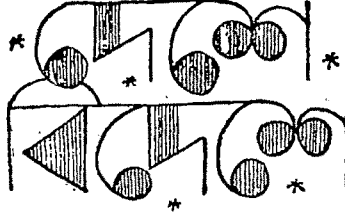
কাজল কাতরভাবে তাকে পিছু ডাকল। অনুপ ফিরে দাঁড়িয়ে ওর চোখে চোখ রেখে একটু হাসল—কথা বলল না। কাজলের মুখেও ঠিক একই ধরনের হাসি ফুটে উঠল। বিপরীত বার আর পিছু ডাকল না।

॥ সিরিয়ায় ওলট-পালট ॥

অবিস্বাস্য দ্রুতগতিতে সিরিয়ার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে চলেছে। গত সপ্তাহের সংবাদ ছিল, সিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান। মাত্র তিন মাস স্থায়ী সিরিয়ার অসামরিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সৈন্যদল সেখানে শাসন-বল্ব অধিকার করে। এই সৈন্যশাসন কয়েক হওয়ার পরেই প্রচারিত হয় যে, ক্ষমতাসীন সৈন্যবাহিনী নাসেরের সমর্থক এবং অবিলম্বে সিরিয়া শিশিরের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত না হলেও তাদের বর্তমান বৈরী ভাবের অবসান হতে খুব বেশী সময় লাগবে না। কিন্তু নাসের-সমর্থক সৈন্যদের শাসন সিরিয়ায় ভাল-ভাবে কয়েক হওয়ার আগেই আবার সেখানে এক অভ্যুত্থান হয় এবং সেই অভ্যুত্থানের ফলে সিরিয় সৈন্যবাহিনীর প্রথম অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত অসামরিক শাসকরাই আবার সিরিয়ার শাসনব্যবস্থার পুরোভাগে ফিরে আসেন। কিন্তু সে আসন রক্তমাংসে আর নিষ্কণ্টক নয়। একারণে শেষ পর্যন্ত কোন পক্ষ যে সিরিয়ার শাসনক্ষমতায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবেন তা আজ কারও পক্ষেই সূচনামূলকভাবে বলা সম্ভব নয়। সৈন্যবাহিনীর সহায়তা উভয়পক্ষেই আছে। একারণে মনে হয়, সমগ্র সিরিয়াব্যাপী নাসের-পন্থী ও নাসের-বিরোধীদের মধ্যে একটা ভয়ংকর রক্তের গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

॥ পূর্ব-পাকিস্থান ॥

পূর্ব-পাকিস্থান এখন সামরিক শাসনের দাপটে অতিষ্ঠ। পূর্ণ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দাবীতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল আয়ুবশাহীর প্রচলিত নিষেধতেনেও তা থামেনি, ফলে নিষেধতেনের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে সেখানে। স্বয়ং আয়ুব এখন উপস্থিত হয়েছেন ঢাকায়, আন্দোলনের কণ্ঠরোধের উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে। লাঠি, গুলী, জেলের ভয় চলে গেছে পূর্ব-পাকিস্থানের যে বেপরোয়া হেলোদের, তাদের শায়েস্তা করা যায় আর কোন উপায়ে তাই এখন চিন্তা হয়েছে পাকিস্থানের জনসমর্থনহীন জঙ্গী নায়কদের। বৃনিয়াদী গণতন্ত্রের নামে যে বৃনিয়াদী ধাম্পা দিতে চেয়েছিলেন জনাব আয়ুব, পূর্ব-পাকিস্থানে তা অস্তিত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্থানের সকল মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান



করেছেন আয়ুবের তথাকথিত সংবিধানকে। যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল পাকিস্থানের জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক বিধানসভার, তার জন্যে একটা মনোনয়ন-পত্রও নাকি পড়েনি পূর্ব-পাকিস্থানের কোন কেন্দ্রে। এমন অসহযোগের উদাহরণ সারা পৃথিবীর কোন দেশের আন্দোলনেই বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই জনাব আয়ুব নাকি ভেবেছিলেন এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বৃনিয়াদী গণতন্ত্রের উপযুক্ত পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি পাকিস্থানে। একারণে অস্তিত পূর্ব-পাকিস্থানে আরও কিছুকাল সামরিক শাসন অপরিবর্তিতই রাখবেন তিনি। আর তার ফাঁকে চিন্তা করবেন, কেমন করে বেপরোয়া বাঙালীগুলোকে বশে আনবেন তাঁর সংগীনের নীচে। বাঙলাভাষা ভুলিয়ে দিয়ে বাঙালীদের অবাঙলাভিতে পরিণত করার অদ্ভুত চিন্তাও এসেছে তাঁর মাথায়। কিন্তু এসবে যে কিছুই ফললাভ হয় না তা

বুঝতে এতটুকুও অসম্ভব হত না জনাব আয়ুবের, যদি পেশী দিয়ে চিন্তা না করে' মস্তিষ্কের বৃদ্ধিতে নির্ভরশীল হতেন তিনি। যদি সংগীনের ফলা থেকে চোখ সরিয়ে তাকাতেন ইতিহাসের নির্দেশের দিকে।

॥ ফ্রান্স ও আলজিরিয়া ॥

বৃদ্ধিবিবর্তিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো আলজিরিয়ায় বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি এখনও আসেনি। আর তা যে খুব সহজে আসবে না এ আশঙ্কা থেকেই ছিল। তবে আলজিরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ফ্রান্স যে সত্যিই আগ্রহী তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। এখন প্রধানত ফরাসী সৈনিকদের সঙ্গেই আলজিরিয়ার শেবতাগ্গ সন্তাসবাদীদের সংগ্রাম চলেছে এবং জেনারেল দ্যগলের দৃঢ় ও কঠোর নীতির ফলে অবিলম্বেই আলজিরিয়ায় পূর্ণ শান্তি কয়েক হবে, এবিস্বাস আজ ফ্রান্সের সকল দল ও মতাবলম্বী মানুষেরই সূচনামূলক হয়েছে। আলজিরিয়ার প্রশ্নে ফ্রান্সে যে গণভোট হবে তাতে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্ট দলগুলি সম্পূর্ণভাবে জেনারেল দ্যগলকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিউনিষ্টরা এইবারই প্রথম জেনারেল দ্যগলের সমর্থনে ভোট দেবেন।

পাঠক পাঠিকাদের হাতে নববর্ষের শ্রেষ্ঠতম অবদান।

সদ্য প্রকাশিত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দুই গাখ এক বীড়

৪ টাকা

সদ্য প্রকাশিত

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কানা গলির মানুষ

২৫০ নং পঃ

ভবেশ দত্ত

গান গেয়ে যাই

২ টাকা

সুদীন চট্টোপাধ্যায়

শেষ অভিযারে

২৫০ নং পঃ

এমিলিজোলা

সতেরো নম্বর বাড়ী

৩ টাকা

সুখপাঠ্য, মননশীল, আভিনব জমাত কাহিনী—পূর্ব পাকিস্থান-খ্যাত, বহু উপন্যাস লেখার প্রখ্যাত—লেখক সুধীর চৌধুরীর আধুনিককালের শ্রেষ্ঠতম পত্র উপন্যাস।

সদ্য প্রকাশিত

মনের ময়ূরী

২ টাকা

জ্ঞানতীর্থ — ১নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

তার কারণস্বরূপ তাঁরা বলেছেন, আলজিরিয়া সম্পর্কে জেনারেল দাগলের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তন দাগল-নীতিরই পরাজয়ের সূচনা। আলজিরিয়াকে জোর করে সাম্রাজ্যিক নাগ-পাশে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসীবাদীরা দাগলকে ফ্রান্সের একমাত্র পদে অধিষ্ঠিত করিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়ে জেনারেল দাগল বুঝেছেন, ইতিহাসের চাকাফে পিছন দিকে ঘোরানোর সামর্থ্য তাঁর নেই।

কিন্তু দাগলের আজকের নীতি, তাঁর পূর্বনীতির বিপরীত হলেও একথা সত্য যে, প্রকৃত অবস্থার বিচারে তাঁর কোন ভুল হয়নি। এবং তাঁর কাজের ফলে শুধু তাঁরই সম্মান বাড়েনি, ফ্রান্সেরও অশেষ উপকার হয়েছে। আলজিরিয়াকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত করে জেনারেল দাগল কিভাবে আফ্রিকার প্রাপ্তন ফরাসী

দ্বিতীয় বহুরে আরও ভাল হবে

সব বয়সের ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্র

বৈশাখ (মে) সংখ্যায় থাকবে

নারায়ণ-গঙ্গোপাধ্যায়ের
ধারাবাহিক উপন্যাস

ও

সত্যজিৎ রায়ের মজার বড় গল্প

সেন্টোপাসের খিঞ্চে

তাছাড়া পুরনো 'সন্দেশ'র দুঃপ্রাপ্য লেখা। জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা। জীবনী। কবিতা ও ছড়া। মজার খেলা। ম্যাজিক। ধাঁধা। নতুন প্রতিযোগিতা। হাত পাকাবার আসর। ছবিতে গল্প। নতুন নতুন কয়েকটি বিভাগ।

বহুরের চাঁদা বাদের শেষ হল, তারা পত্রপাঠ টাকা পাঠাও। চাঁদা মণি অর্ডারে, পোস্টাল অর্ডারে, চেকে অথবা হাতে জমা দেওয়া যায়।

'সন্দেশ' কর্তৃক :

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১০।

(নিউ সিনেমার পাশে)

উপনিবেশগুলির কাছে সমর্থনা ও সমর্থনলাভ করেছেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল। সেনেগলের প্রেসিডেন্ট সেন্থর এই উপলক্ষে বলেছেন, আফ্রিকার ফ্রান্সের উপনিবেশমুক্তির পূর্ব শেষ হল। এবার ফ্রান্সকে আবার অতীতের মত সকল স্বাধীনতার জননী ও ধাত্রীর ভূমিকা নিতে হবে। আইভরি কোস্টের প্রেসিডেন্ট-হাউফোনেট বইগনি বলেছেন, ফ্রান্স আবার জগতের সম্মুখে তার প্রকৃত রূপ দেখানোর সুযোগ পেল। এঁদের প্রশংসা অবশ্য নতুন ঘটনা নয়, আফ্রিকার নরমপন্থী নেতাদের কাছে জেনারেল দাগল বরাবরই মৃদ্ধিদাতারূপে বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। কিন্তু সেনেগল, আইভরি কোস্ট ছাড়াও ফ্রান্সকে অভিনন্দন জানিয়েছে গিনি, মালি ও নাইজার রিপাবলিক যারা আলজিরিয়ার মুক্তির দাবীতে বরাবরই ফ্রান্সের বিরোধিতা করেছে। নাইজার নতুন করে ফ্রান্সের সঙ্গে 'কূটনৈতিক সম্পর্ক' স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং গিনিও এই মর্মে আশা প্রকাশ করেছে যে, এর পর ফ্রান্সের সঙ্গে তার পূর্ব বিবাদের মীমাংসা হয়ে যাবে। এই সকল ঘটনা থেকে হয়ত ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীরা বৃদ্ধিতে পারবে যে, উপনিবেশগুলিকে মুক্তি দিয়ে ফ্রান্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। উন্নয়নকারী অনগ্রসর দেশগুলির মৈত্রী ও সহযোগিতা ফ্রান্সের বৈবয়িক উন্নতির বিন্যাসকে আরও দৃঢ় করে তুলবে।

৥ চীন-সোভিয়েট বিরোধ ৥

চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে আদর্শগত বিরোধের ফলে চীনের অর্থ-নীতির উপর যে গুরুতর চাপ পড়েছে তার ফল মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। রাশিয়া-এ-পূর্ব চীনকে যত টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে তার সবকিছুর দাম অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রাশিয়া চীনের উপর নোটিশ জারী করেছে। অথচ পূর্বের ব্যবস্থানুসারে ও টাকা, বিশেষ করে কোরিয়া যুদ্ধে ব্যয়ের টাকা চীনের শোধ করার কথা ছিল না। শুধু টাকা ফেরৎ চেয়েই রাশিয়া চাপ করেনি, চীনে শিক্ষাদানরত প্রায় তিন হাজার রুশ কারিগর ও যন্ত্রবিদ বিশেষজ্ঞকেও রাশিয়া হঠাৎ চীন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ফলে চীনের বহু জাতীয় প্রকল্প এখন উপযুক্ত পরিচালক ও দক্ষ কারিগরের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বহু অসমাপ্ত প্রকল্পের রূপ-প্রস্তুতি পর্যন্ত নাকি রুশ বিশেষজ্ঞরা

যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। চীনের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সান-মেন গর্জ, যার কাজ শেষ হলে দশ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হত, নয়জন সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ হঠাৎ চলে যাওয়াতে তার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চীনের সঙ্গে সোভিয়েটের বাণিজ্য বর্তমানে পঞ্চাশ শতাংশ কমে গিয়েছে, এবং চীনে গুরুতর খাদ্যসংকট ঘটা সত্ত্বেও রাশিয়া শুধু যে চীনকে গম সরবরাহ বন্ধ করেছে তাই নয়, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে গম বয়ে আনার জন্যে জাহাজ চেয়েও চীন রাশিয়ার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এই খাদ্যাভাবের ফলে বিভিন্ন কারখানাতে এখন কাজ চালানোও চীনের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ চীনের একটি বিরট ইম্পাটের কারখানাতে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় নয় হাজার থেকে কমে এখন তিন হাজারে দাঁড়িয়েছে, এবং কয়লা-খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা সামগ্রিকভাবে প্রায় চল্লিশ শতাংশ কমেছে। বিভিন্ন অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত প্রকল্পের করণ দৃশ্য এখন চীনের সবটাই দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ জোরের সঙ্গে একদিন যে সকল প্রকল্পের কথা প্রচার করত চীন, সেইলয়াং প্লান্তির কারখানা বা চ্যাংচুন মোটর কারখানার উৎপাদন সম্পর্কিত অগ্রগতির কথা আর শুনেতে পাওয়া যায় না। চীনের খাদ্যসংকট আজ কল্পনাতীত। '৬১ সালে চীনকে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার কাছে থেকে গম আনতে হয়েছে ৪০ লক্ষ ৫ হাজার টন বা তার নিজস্ব উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, বর্মার ফ্রান্স পাঃ জার্মানী, নিউজিল্যান্ড, বটেন প্রভৃতি দেশ থেকে বার্লি, ময়দা, ভুট্টা, চাল, চিনি, গুড়ো দধ প্রভৃতি খাদ্যপণ্য আনতে হয়েছে ২৪ লক্ষ ৬১ হাজার টন। চীনের প্রয়োজনের তুলনায় এ আমদানী সামান্য, কিন্তু আরও আনতে, হলে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ও জাহাজ ইত্যাদির সুবিধা থাকার দরকার চীনের বর্তমানে তা নেই। ফলে মহা-চীনের শতকরা আশীজন লোকই পুষ্টির অভাবে জীর্ণ। এ অবস্থায় রাশিয়ার সঙ্গে চীনের বিরোধের যদি কোন নিষ্পত্তি না হয় তবে চীনের বৈবয়িক অবস্থা যে আরও শোচনীয় হবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

সুনাম

॥ ঘরে ॥

২৯শে মার্চ—১৫ই চৈত্র : পূণার সমিহিত পিম্প্রতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শ্রেণিপটোমাইসিন কারখানার উন্মোচন। উন্মোচনী ভাষণে শ্রীনেহরুর দাবী : বাধি নির্মূল করার উদ্দেশ্যেই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে।

রাজ্যসভার শ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ হইতে (বিধানসভার ভোটে) ৪ জন কংগ্রেস ও ২ জন কম্যুনিষ্ট প্রার্থী নির্বাচিত।

বিশ্ববিশ্বখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী পাল বাকের কলিকাতা উপস্থিতি ও সম্বর্ধনা লাভ।

৩০শে মার্চ—১৬ই চৈত্র : চা ও রবার বাগিচা শ্রমিকদের অন্তবর্তী-কালীন বেতন বৃদ্ধি—ভারত সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বেতন পর্ষতের সুপারিশ গ্রহণ।

সীমান্ত-বিরোধ মীমাংসার জন্য নিকট ভবিষ্যতে চীনা প্রধানমন্ত্রীর (চৌ এন-লাই) সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই—লোকসভায় শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

৩১শে মার্চ—১৭ই চৈত্র : আগামী আর্থিক বর্ষে (১৯৬২ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬৩ সালের মার্চ পর্যন্ত) ৬৫ দফা পণ্যের আমদানী হ্রাস কিংবা নিষিদ্ধ—সরকার কর্তৃক বার্ষিক আমদানী নীতি ঘোষণা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শ্বিতীর লোকসভার অবসান।

দিল্লীতে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় ১০ জন শ্রেষ্ঠ লেখককে উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণ কর্তৃক সাহিত্য আকাদেমীর জাতীয় পুরস্কার (১৯৬১) অর্পণ—বাংলা ভাষায় অনবদ্য সৃষ্টির জন্য ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত পুরস্কৃত।

১লা এপ্রিল—১৮ই চৈত্র : পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতে নতুন মোটর ওজন চালু—বাজারে বাজারে রক্তা ও বিক্রেতার মধ্যে বিদ্রোহিত সৃষ্টি।

২রা এপ্রিল—১৯শে চৈত্র : মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও বিহার—

ভারতের এই ৪টি রাজ্যে নতুন রাজ্য-পাল নিযুক্ত—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি।

অস্থাবর সম্পত্তি ও ব্যাংক সংক্রান্ত পাক-ভারত সমস্যার আংশিক সমাধান—দিল্লীতে তিনদিনব্যাপী বৈঠকের শেষে যুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার।

৩রা এপ্রিল—২০শে চৈত্র : শ্রীনেহরু পুনরায় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচিত।

নেতাজী সম্পর্কে বোম্বাই-এর সাম্প্রতিক পত্রে ('উইমেন্স ওন উইকলি') আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশের জের—সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রী এন জি হ্যামিলটনের কলিকাতার আদালতে বিনাসত্বে ক্ষমা প্রার্থনা।

৪ঠা এপ্রিল—২১শে চৈত্র : পদ-ত্যাগের পর শ্রীনেহরু পুনরায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত—দিল্লীর রাষ্ট্রপতি-উদ্বল হইতে ঘোষণা—কেন্দ্রে নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তোড়জোড়।

সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত প্রান্তন মধ্যমন্ত্রী (মধ্যপ্রদেশ) ডাঃ কাটজুর আবার নির্বাচন প্রতিশ্রুতি—একটি উপনির্বাচনের জন্য যথারীতি মনোনয়ন-পত্র পেশ।

॥ বাইরে ॥

২৯শে মার্চ—১৫ই চৈত্র : সৈন্য-বাহিনী কর্তৃক আজার্গিটনার প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিজ পদচ্যুত—বন্দী অবস্থায় প্রেসিডেন্টকে কারাধীপ মার্টিন গার-মিয়ান প্রেরণ।

রাশিয়ার সহিত অস্ত্র-পরীক্ষা (পারমাণবিক) বন্ধের আন্দোলনায় কার্যতঃ অচলাবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে—ওয়াশিংটনে সাংবাদিক বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির উক্তি।

৩০শে মার্চ—১৬ই চৈত্র : কর্ণফুলী বাধি নির্মাণ সম্পর্কে ভারতের প্রতিবাদ পাকিস্তান কর্তৃক অগ্রাহ্য—একতরফা কাজ হয় নাই বলিয়া পাক সরকারের সদন্ত ঘোষণা।

আজার্গিটনার প্রেসিডেন্ট পদে সেনর গুইদোর শপথ গ্রহণ।

ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট জুলিও হ্যারোসেমোনা মন্ত্রিসভার পদত্যাগ।

৩১শে মার্চ—১৭ই চৈত্র : শত্রুগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব নাই : বহিস্তরের তাপমাত্রা ৫৭০ ডিগ্রী—সৌভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার।

১লা এপ্রিল—১৮ই চৈত্র : পশ্চিম ইরানের সমিহিত ওরোগিয়ে স্বীপ ওলন্দাজ কবল হইতে মুক্ত—জাকার্তা বেতারের ঘোষণা।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে মধ্য সিরিয়ার প্রবল বিক্ষোভের সংবাদ।

২রা এপ্রিল—১৯শে চৈত্র : মিশরের সহিত পুনর্মিলনে সিরীয় সামরিক কমান্ডের সম্মতি—সিরিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গতি পরিবর্তন—নাসের (আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট) সমর্থক কমান্ড কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

নিরাপত্তার আশ্বাস পাইলে আমেরিকা আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করিতে প্রস্তুত—জেনেভায় ৬৭-জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধির বিবৃতি।

৩রা এপ্রিল—২০শে চৈত্র : উত্তর সিরিয়ার পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা—বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন।

আলজিয়ারে ফরাসী সৈন্যদের সহিত মুসলিম বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ।

৪ঠা এপ্রিল—২১শে চৈত্র : আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে জেনেভা সম্মেলনে (১৭-জাতি) রুশ-মার্কিন বিতন্ডা।

বৃটিশ খণ্ডমাস স্বীপে (প্রশান্ত মহাসাগরীয়) আমেরিকার আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা চালনার সিদ্ধান্ত।

**হিন্দু সমাজের অচলায়তন
পণপ্রচার বিরুদ্ধে দৃঢ় আঘাত
হেনেছে,**

সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
করণ অথচ মধুর উপন্যাস

“প্রিয়া ও জয়া”

৩.০০

প্রকাশক—হীরামোহন মদ্যোপাধ্যায়

নব বলাকা প্রকাশনী

৪নং নবরচন্দ্র লাহা লেন, কলি-৩৬

এ. সি. আর-২৮

সমকালীন সাহিত্য

অভ্যর্থক

॥ সাহিত্য পুরস্কার ১৩৬৮ ॥

সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে সরকারী পুরস্কার বাদ দিয়ে যে সমস্ত বেসরকারী পুরস্কার প্রতি বৎসর দেওয়া হয়ে থাকে, অল্পকালের মধ্যে সেগুলি যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছে। পুরস্কার-গুলি সাহিত্যিক ও পাঠক উভয় মহলেই ক্রমাশঃ একটি বিশেষ আলোচ্য বস্তু হয়ে উঠেছে।

১৩৬৮ সালের পুরস্কারসমূহ এংরা উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য লাভ করেছেন : শ্রীবিমল মিত্র, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুখলতা রাও, শ্রীকুমারদরজন মল্লিক, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার। পুরস্কার-গুলির নাম—মতিলাল পুরস্কার, শিশিরকুমার পুরস্কার, প্রফুল্লকুমার পুরস্কার, সুরেশচন্দ্র পুরস্কার, মোচাক পুরস্কার, উল্টোরথ পুরস্কার।

তাছাড়া এই বছরের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ পুরস্কার দিচ্ছেন শ্রীঅশোককুমার সরকার। তাঁর মাতামহী স্বর্গতা সরলাবালা সরকারের নামে পুরস্কারটি ঘোষণা করা হয়েছে। রবীন্দ্র-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র-গবেষণার জন্য এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে।

॥ শিশির কুমার পুরস্কার ॥

'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রদত্ত এই পুরস্কারটি লাভ করেছেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার। পদাবলী সম্পর্কীয় গবেষণা অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পুরস্কারটির আর্থিক পরিমাণ এক হাজার টাকা।

॥ মতিলাল পুরস্কার ॥

'যুগান্তর' পত্রিকা প্রদত্ত এই পুরস্কারটি এই বছর লাভ করেছেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীবিমল মিত্র। বহু-



কুমারদরজন মল্লিক



নরেন্দ্র মিত্র



বিমল মিত্র



সুখলতা রাও



হরপ্রসাদ মিত্র

দায়তনের উপন্যাস রচনায় শৃঙ্খল নয়, প্রকৃত শৈল্পিক গদ্যসম্মিলিত কাহিনী সৃষ্টিতে তিনি একালের সার্থক কথাকার-

দের মধ্যে অন্যতম। ১৯১২ সালে জন্ম, শ্রীযুক্ত মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম-এ। পুরস্কারটির আর্থিক পরিমাণ এক হাজার টাকা।

॥ মোচাক পুরস্কার ॥

উল্লেখযোগ্য শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রতি বৎসর এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে। এ বছর প্রখ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক শ্রীমতী সুখলতা রাও পুরস্কারটি লাভ করেছেন। শিশু-উপযোগী বহু গ্রন্থ রচনা করে তিনি ইতিমধ্যে খ্যাতিলাভ করেছেন। পুরস্কারটির আর্থিক পরিমাণ ৫০০ পাঁচশত টাকা।

॥ প্রফুল্ল সরকার পুরস্কার ॥

প্রবীণতম কবি শ্রীকুমারদরজন মল্লিক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রদত্ত এই পুরস্কারটি পেয়েছেন। তাঁর রচিত 'শতদল', 'অজয়', 'উজানী' 'বনমল্লিকা', 'একতারা' 'নুপূর' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত। বর্তমানে নিজের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার উজানী গ্রামেই বাস করছেন। পুরস্কারের আর্থিক পরিমাণ এক হাজার টাকা।

॥ সুরেশচন্দ্র পুরস্কার ॥

একালের অন্যতম কথাসিঙ্গাপী শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের নামে ঘোষিত এই পুরস্কারটির আর্থিক পরিমাণ এক হাজার টাকা। দীর্ঘকাল যাবৎ নিরলসভাবে সাহিত্য-সেবা করে আসছেন শ্রীযুক্ত মিত্র। চাকুরী জীবনের জটিলতা তাঁর শিল্প-প্রতিভাকে স্তিমিত করতে পারেনি। দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে।

॥ উল্টোরথ পুরস্কার ॥

উল্টোরথ পত্রিকা প্রদত্ত এই পুরস্কারটি প্রতি বৎসর একজন কবিকে দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্য থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। পুরস্কারটির আর্থিক পরিমাণ ৫০১ টাকা।

নতুন বই

চলন্তিকা—রাজশেখর বসু-সংকলিত।

(সংশোধিত ও পরিবর্তিত নবম সংস্করণ)। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ১৪, বস্কম চাট্‌জো স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য সাড়ে আট টাকা।

কিছুকাল দুঃপ্রাপ্য থাকার পর 'চলন্তিকা' নব-কলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছে, এতে আমরা অত্যন্তই আনন্দিত। ছোট আকারের বাংলা অভিধান এবং সেই সঙ্গে সম্প্রসারণশীল বাংলা ভাষার চলতি শব্দগুলির সংকলন হিসাবে 'চলন্তিকা' উপযোগিতা প্রায় তিরিশ বছর আগেই সর্বজনস্বীকৃত হয়েছিল। সে উপযোগিতা এই দীর্ঘ কালের ব্যবধান সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ আছে, এতে



সংকলন-কর্তার গভীর বাস্তববোধ এবং অপরিসীম দূরদৃষ্টিই প্রমাণিত হয়। প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রসূত হয়ে 'চলন্তিকা'র বিষয়ে যা জানিয়েছিলেন—'বাংলা ভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় পেতে যে ইচ্ছা করবে তোমার বই ছাড়া তার গতি নেই', সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

বাস্তবিক, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাজশেখরবাবু ছিলেন একজন অশচর্য-কর্মী ব্যক্তি। পরশুরাম এই ছদ্মনামের অন্তরালে তিনি যেমন তিল-মধুর হাসির-গম্ভীর রসধারায় বাঙালীকে আত্মসচেতন করে তুলেছেন, তেমনি অভিধান-সংকলন, রামায়ণ ও মহাভারতের সারসংবাদ, পারিভাষিক শব্দ-প্রণয়ন এবং শ্রীমদভগবদ গীতার অনুবাদ করে আমাদের অতীত ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ কর্তব্যের বিষয়ে সচেতন করে তুলেছেন। তাঁর নিরীভমান সংস্কারমূলক

মন এবং যুক্তিবাদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার জন্যে তিনি পিতামহসদৃশ বয়সেও তরুণতম আধুনিক যুবকের সমকালীন হ'তে পেরেছিলেন। এই সমকালীনতার স্পষ্ট ব্যক্তিত্বই মৃত হয়ে উঠেছে 'চলন্তিকা'র মধ্যেও। এর শব্দ-সম্ভারন, অর্থভেদ, পারিভাষিক শব্দার্থের তালিকা সবই আধুনিক পাঠকের পরম আশ্বাস ও আনন্দের বিষয়। অভিধান-গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও একে কখনোই মৃত শব্দের জাদুঘর বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন প্রবহমান জীবনেরই প্রদর্শনী। এর 'চলন্তিকা' নাম আজ আক্ষরিকভাবেই সত্য হয়ে উঠেছে।

রাজশেখরবাবুর পরলোকগমনের পর এই নবম সংস্করণই প্রথম আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রকাশকবর্গ অভিধানখানিতে কিছু সংশোধন ও পরিবর্ধন ঘটিয়েছেন দেখে মনে হল, 'চলন্তিকা' নিশ্চয়ই ভবিষ্যতেও চলমান জীবনের সহযাত্রী থাকবে।

অভিধানখানির ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

চার চোখ (কাব্য সংকলন)—কুমার। রাম বসু। গিরিশংকর। দিলীপ রায় ॥ ২২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—১ ॥ দাম : তিন টাকা ॥

রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক কাব্য-আন্দোলন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পেরিয়ে আমাদের সম্মুখে এক মহৎ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। কাব্যনাট্য সেই দ্বারেরই অন্যতম ফসল। আলোচ্য সংকলনের কবি চতুষ্টয় তাঁদের কল্পনা-প্রতিভার দানে তাকে পরিপুষ্ট করার আমরা আনন্দিত।

অবশ্য, আধুনিক যুগের কাব্য-নাট্য-প্রবর্তাদের সম্মুখে উদাত সমস্যাগুলি আমাদের অজানা নয়। কাব্যের মাধ্যমে নাটক রচনা সত্যি কঠিন কাজ। কারণ, ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে অন্তঃসংঘাতের গভীরতায় চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়ে দর্শককে বাস্তবের সম্মুখীন করার দায়িত্ব ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র বিমর্ত কাব্যের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া কোনো কাব্য-নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব না। আর, যেহেতু কাব্যের মাধ্যমেই তাকে এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়, সেইহেতু বিষয়-নির্বাচনের সময় পাত্র-পাত্রীর এমন এক উদ্ভঙ্গ অবগম্য মূহুর্তের সংঘাতে কাব্য-শরীর গঠন করা প্রয়োজন যার মধ্য দিয়ে অভিনয়কালে আমরা জীবন-সত্যকেও সহজে উপলব্ধি করতে পারি। এবং বলাবাহুল্য, এ-যুগের হৃদয়-যন্ত্রণাকে বিস্মৃত হয়ে যোগোক্তীর্ণ কাব্য-নাট্য রচনার প্রয়াস অসম্ভব ঘটনা।

'চার চোখ' কাব্য-নাট্য-সংকলনের বিভ্রান্তিকর মূখবন্দ সত্ত্বেও কবি কুমার

ধরের 'স্মিতীয় নায়িকা', রাম বসুর 'তন্দ্রা ভেঙে ফেরা' ও 'গিরিশংকরের 'চেরাগ বিবির হাট' কাব্য-নাটক সম্বন্ধে আমাদের উপরোক্ত ধ্যান-ধারণার প্রায় সীমান্ত স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। একমাত্র কবি দিলীপ রায়ের 'সংলাপ' এর ব্যতিক্রম। শ্রীরাম নাটকের আঙ্গিকে কাব্য-সংলাপই পরিবেশন করেছেন। একে নাট্যকাব্য বলা যায়, কাব্য-নাট্য বলা সত্যি কঠিন।

যা হোক, আলোচ্য সংকলনের কবি কুমার ধর আমাদের কাছে 'রূপবতী পৃথিবীর' যন্ত্রণা-জর্জর 'বিস্মৃত নায়ক' অমলকে উপহার দিয়েছেন। স্বল্প-পাণ্ডিত ভারী অমল, রমা আর জয়ন্তীর আবেগ-মথিত নাটকীয় মুহূর্তগুলিকে তিনি সুন্দরভাবে কাজেও লাগিয়েছেন। ফলে, কুমারবাবুর কাব্য-নাট্যে অনেক স্মরণীয় উক্তির সম্ভান পানেন পাঠক-পাঠিকা।

কবি রাম বসুর 'তন্দ্রা ভেঙে ফেরা', তাঁর এ-পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্য-নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কুমারবাবুর মত রম বসুও নির্বাচন করেছেন এমন এক বিষয়বস্তু যা অন্তঃসংঘাতে কাব্যের বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণে নিয়ত উদাত। তছাড়া তাঁর দৃশ্য-পরিরূপনা, কাব্য-সংলাপ রচনা অভিনয়োপযোগী বলে আমার অন্ততঃ মনে হয়েছে।

'চেরাগ বিবির হাট'-এ নাট্যকার গিরিশংকর সাংকেতিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। বিষয়বস্তু রবীন্দ্রানুরাগী হলেও গিরিশংকর তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যেও উজ্জ্বল। তবে, তাঁর নাটকে অন্য দু'জনের তুলনায় কাব্যগুণ কিঞ্চিৎ কম।

কবি দিলীপ রায়ের 'সংলাপ' এই সংকলনের দুর্বলতম সংযোজন। বিচ্ছিন্ন কতকগুলি চরিত্র কাব্যিক সংলাপ আবিষ্কৃত করেছে মাত্র। কিছু অংশের কাব্যগুণ অবশ্যই আছে। কিন্তু তাকে কাব্যনাট্য বলি কি করে?

আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধিত হবে। এবং দিলীপ রায় আমাদের সুন্দর কাব্যনাট্য উপহার দেবেন। আমরা এই সংকলনের সমাদর কামনা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ-সজ্জা মনোরম।

চৈত্রে রচিত কবিতা—উৎপলকুমার বসু। কৃতিবাস প্রকাশনী। দাম : দুটাকা।

অনুভবের শূন্যতা, শিথিল-সচেতনতা ও পরিশীলিত মনোয়তা উৎপল বসুর কবিতাকে বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে। পঞ্চাশের তরুণ কবিদের মধ্যে উৎপল-কুমার বসু তাই স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। এবং একথা একান্তভাবে উল্লেখ্য যে, কোন

প্রকার চতুর চমক বা তথাকথিত উদ্ভাস উচ্চাখলতাকে আশ্রয় করে সহজ আপাত-সামান্য জাভের চেষ্টা এই কবি কদাচ করেননি। শিল্প এবং সৌন্দর্যের আনিষ্ট বিন্দুর অভিমুখে অভিজ্ঞতার সং এবং গোপন সুরাণ ধরে ক্রমে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারেই তিনি নিরন্তর পারিশ্রমী। এই নিবিষ্ট যাত্রার অভিজ্ঞান তাঁর কবিত্বভিত্তিতে পরিব্যস্ত।

তাঁর কবিতা ইংগিতময়—প্রতীক-ধর্মী। কবিতার বিষয়বস্তু এখানে সামাজিকতা নয়, কবির নিগূঢ় ব্যক্তিগত উপলক্ষি। নির্বাচিত শব্দের ব্যঞ্জনাময়, অন্তর্লীন ধ্বনি-সংগীত তাঁর কবিতাকে গুণান্বিত করেছে। ফলতঃ আলোচ্য কবিতাগুলি পাঠকের চেতনায় আবির্ভূত সঞ্চারিত। এবং এইটাই তাঁর প্রথম কবিতার বই একথা মনে রাখলে তাঁর ভবিষ্যতের বিষয়ে আমাদের আগ্রহ-শীল করে তোলে।

অনেক সময় ব্যাকরণ লঙ্ঘন করে কবি প্রাচ্যশিল্পের উপর নির্ভর করে কবিতার ছন্দ-শরীর নির্মাণ করেছেন এবং প্রায়শই সার্থকও হয়েছেন। তবে ইংগিতময় প্রতীক-মাধ্যম প্রকাশ তাঁর কবিতাকে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট করে তুলেছে। অবশ্য 'ময়ূর'-এর মতো অনবদ্য সুন্দর রচনাও তাঁর রয়েছে। যে কবিতাগুলি বিশেষভাবে ভালো লেগেছে, 'চৈত্রে রচিত কবিতা', 'আবিষ্কার', 'দুঃসময়' ও 'পারিলখন'—তাদের কয়েকটি।

একটি প্রেমের কাহিনী—(উপন্যাস)

গুড়িপতি ডেম্ফটচালম। অনুবাদ :
বোম্বালা বিশ্বনাথম্। প্রকাশক—সুন্দর
বুক হাউস, ৭৮/১২, মহাত্মা গান্ধী
রোড, কলকাতা—১। দাম দুটাকা।

বোম্বালা বিশ্বনাথম্ প্রতিবেশী সাহিত্যের অনুবাদক হিসাবে বিশেষ অর্জন করেছেন। ভারতের সকল প্রদেশের সাহিত্যই তিনি কিছু কিছু বাংলায় ভাষান্তরিত করেছেন, 'অমৃত' পত্রিকার পাঠকদের কাছে তিনি সে হিসাবে সুপরিচিত। তাঁর অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও সুস্পষ্ট। 'একটি প্রেমের কাহিনী' তেলেগু ভাষায় লিখিত 'মরদানম' নামক এক বিয়োগান্ত প্রেমের গল্প। কাহিনীতে সেই চিরন্তন ত্রিভুজের সমস্যা। প্রেম যেন শিখের করাত, 'আসিতে যাইতে কাটে' ও এই প্রেমের রথ 'চলিতে চালাতে নাহি জানে'। রাজেশ্বরী যখন অসহায় অবস্থায় বিজড়িত, কামনার আগুনে পড়ে সে অগারত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, প্রেমিকপ্রবর তখন তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। অল্পবয়সী এক বালক রাজেশ্বরীকে শান্তি ও সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করে, তবু তাতে প্রাণ ভরে না। শেষ পর্যন্ত প্রেমিক আমির ফিরে আসে, এবং আত্মহত্যা করে। কাহিনীটি করুণ, স্থানে স্থানে শ্লীলতা-বর্জিত, তবু তা রসোত্তীর্ণ। কাহিনীটির মধ্যে এক চিরকালিক আবেদন আছে। প্রচ্ছদটি সুন্দর একেছেন গণেশ বসু। ছাপা মনোজ্ঞ।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

রুশ ভারতী—সম্পাদক মহাদেবপ্রসাদ সাহা। ৭৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হতে প্রকাশিত। দাম ৭৫ নয়া পয়সা।

দ্রোমাসিক পত্রিকা 'রুশ ভারতী'র এইটি প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। অধ্যাপক অরুণ বসুর 'সৌভিয়েত সাহিত্যের সত্য-মিথ্যা' ও শঙ্কর চক্রবর্তীর 'মহা-কাশজয়ী মানুষ' এই সংখ্যার উল্লেখ-যোগ্য আলোচনা। আলেকজান্ডার শিফ-মান রচিত 'তলস্তয় ও বিবেকানন্দ', 'আমার লেখা' প্রসঙ্গে গোকর্ষী, মিকো-ইরানের 'বিমান' থেকে 'মহাব্যোমযান' রচনাগুলি মূল্যবান সংযোজন। নীরেন্দ্রনাথ রায়ের পুশকিনের কবিতার অনুবাদ ও পুস্তক সমালোচনা, অরুণা-চল বসু-কৃত 'জলমাঠ রেলস্টেশন : রাজলিভ' কবিতাটি পত্রিকাটির মূল্য বর্ধিত করেছে। আলোচ্য সংখ্যাটি সুসম্পাদিত ও সুসুন্দর।

শতভিষা—সম্পাদক অলোকরঞ্জন দাশ-গুপ্ত। ১এ, বিজয় মধ্যার্জি লেন, কলকাতা—২৫ হতে প্রকাশিত। দাম চল্লিশ নয়া পয়সা।

কবিতা সংকলন। বহু দিন ধরে কবিতার এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে। আধুনিক বাঙলা কাব্যাদোলনের ক্ষেত্রে 'শতভিষা'র অবদান কম নয়। বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে যে সমস্ত তরুণ কবি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাদের অনেকেই এ পত্রিকায় লিখেছেন এবং লিখছেন। আলোচ্য ফাল্গুন (১৩৬৮) সংখ্যায় লিখেছেন—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, দিলীপ রায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশ্রী রায়, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি এবং রবার্ট বার্নস ও হাইনরিখ হাইনের কবিতার অনুবাদ আছে। এ ছাড়া আরও দুটি সংকলিত আলোচনা করেছেন তরুণ মিত্র ও আলোক সরকার।

চিত্রপট—সম্পাদক মৃণালকেশ্বর রায়। বাংলা দেশে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে চিত্রপটের স্থান সর্বোচ্চ। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা মাত্র ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে চলচ্চিত্র বিষয়ক অনেকগুলি মূল্যবান রচনা তাঁরা পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। মাত্র দুটি সংখ্যায় তাঁদের এ প্রয়াস প্রশংসনীয়। এ সংখ্যায় তাঁদের উল্লেখ-যোগ্য রচনা আছে তাঁরা হলেন—বেলা বালাজ, কিরণময় রাহা, জগমোহন, ধ্রুব গুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, জি জোজিনসের প্রভৃতি। তাছাড়া আরও অনেকের প্রয়োজনীয় আলোচনা আছে।

বিশ্ববাণীর নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন !

নববর্ষের প্রথম দিনে আমাদের নবতম অঙ্গদান

শ্রীবাসব-এর

গোমতী গঙ্গা

৮.০০

একখানি প্রাণ রসোচ্ছল অসামান্য উপন্যাস। বলিষ্ঠ কাহিনী।
অপূর্ব পটভূমিকা। লাক্ষ্মী আর কলকাতা। সংগীত ও
সঙ্গত। রোমাঞ্চ ও রোমান্স। সুন্দর ও সংঘাত।

বিশ্ব বাণী

১১এ, বারানসী মোড় স্ট্রীট, কলকাতা—৭

শ্রেষ্ঠান ঘূহ

নান্দীকর

আজকের কথা

আলো চাকিরের এ-পাঠ ও-পাঠ :

অরোরা নির্বেদিত "ভগিনী নির্বেদিতা"র সমালোচনা-প্রসঙ্গে আমরা শোহিগুম, "অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে মহৎ কিছ, গড়বার চেষ্টা কলো উপকরণের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সিদ্ধি যে অনিবার্য" তার জ্বলন্ত প্রমাণ—অরোরার 'ভগিনী নির্বেদিতা'।..... 'ভগিনী নির্বেদিতা' বাংলার চিত্রজগতে একটি স্মরণীয় নিবেদন বলেই পরিগণিত হবে।"

আমাদের এই মন্তব্যকে সাধক করে 'ভগিনী নির্বেদিতা' ১৯৬১ সনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানের অধিকারী হয়ে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প দীর্ঘ-জীবী হোক!

১৯৫৩ সাল থেকে শুরুর করে গেল নব্বইয়ের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ বছর বাংলা ছবি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছে। আর্থিক অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বাংলা ছবি যে উন্নতমানের পরিচয় দিচ্ছে বার বার, এর জন্যে বাংলার লেখক, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, কলা-কুশলীগোষ্ঠী, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সবশেষে উল্লেখ্য হলোও সবচেয়ে মূখ্য প্রযোজক-সম্প্রদায় নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করতে পারেন। মাত্র সর্ব-ভারতীয় সম্মান নয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিও প্রথমে লাভ করেছে বাংলা ছবি-ই। আজ ভারতবর্ষে যে বিশ্বের চলচ্চিত্র-মানচিত্রে গৌরবের আসন অধিকার করেছে, সেও বাংলাদেশী পরিচালক-প্রযোজক সত্যজিৎ রায়েরই দৌলতে।

কিন্তু এই মান-সম্মান, খ্যাতি-প্রতিপত্তির পিছনে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কি দেখতে পাই? বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প আজ বোর দুর্দিনের সম্মুখীন। বাংলাদেশে স্থায়ী চিত্র-গৃহ আছে আড়াইশোর কাছাকাছি এবং মাত্র কলকাতাতেই চিত্র-পরিবেশকের সংখ্যা প্রায় একশো। অথচ আগে দেখা যেতঃ পশ্চাৎখানি বাংলা ছবি প্রতি বছর মুক্তিলাভ করত—১৯৫৫ সালে ৫৫ খানি মুক্তি পেয়েছিল,—সেখানে গেল দু'বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, ৩৪ থেকে ৩৬-র বেশী ছবিকে পদ্যায় দ্বান দেওয়া যাচ্ছে না। শোন যাচ্ছে, এ-বছর যেভাবে ছবি তৈরীর কাজ চলছে, তাতে বছরের শেষে খান পাঁচশেকের বেশী ছবি তৈরী হবে

কিনা সম্ভব। অতএব নির্মাণ-ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা ক্রমেই কর্ম-হীন হয়ে পড়ছেন। বাংলা দেশের চল-চিত্র-প্রযোজনা-শিল্পে কর্মবেশী সাড়ে তিন হাজার কর্মীর মধ্যে মাত্র শ'পাঁচেক কাজে নিযুক্ত আছেন, বাকী তিন হাজার আজ বেকার। এবং বাংলা দেশেই বাংলা ছবির চাহিদা যেভাবে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, তাতে আশঙ্কা করা অসংগত হবে না, এমন দিন শিগগিরই আসবে, যখন জনকয়েক 'বাংলা ছবি-না-করে-পারি না' মনোবৃত্তিসম্পন্ন দুঃসাহসী আদর্শবাদী চিত্রনির্মাতা এবং তাঁদের সঙ্গে কর্মরত শ'দুইতিন কলা-কুশলী ও কর্মী বছরে দশ-পনেরোখানা বাংলা ছবি তৈরী করতে থাকবেন এবং বাকী কর্মীরা—যাঁদের সংখ্যা ৩২০০-৩৩০০ শ' হবে, তাঁরা ক্ষুধার অন-সংগ্রহের জন্যে অপর কোনো কর্মে ব্রতী হবেন এবং যারা তা না পারবেন, তাঁরা নিশ্চিত মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকবেন।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক-বোধে দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সাহায্য করেন এবং নানা প্রকারে নৃত্য, নাটক, সংগীত প্রভৃতি চারুকলায় পুষ্টপোষকতা করেন। কিন্তু বিশ্বের সাংস্কৃতিক দরবারে যে-সব শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশী গৌরবময় আসন পাবার অধিকার আজও আছে, বাংলা ছবি যে তার অন্যতম, 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'অপূর সংসার' প্রভৃতি চিত্রের আন্তর্জাতিক সম্মানলাভের পর পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এ-কথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারেন না। অথচ এই 'অমৃত'-এরই পাতায় বহু আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও বাংলার চলচ্চিত্র-প্রযোজনা-শিল্পকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের সরকার একেবারে নির্বিকার। সরকারের অজানা থাকবার কথা নয় যে, সমগ্র পশ্চিম বাংলায় চলচ্চিত্রের প্রদ-র্শনী-লব্ধ অর্থের শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ মাত্র তাঁদের প্রমোদকরের চাহিদা মেটাতে। বাকী টাকা অত্যন্ত শত-করা বাট ভাগ নিয়ে নেন চিত্র-প্রদর্শকেরা এবং কুড়ি থেকে পঁচিশ ভাগ নিয়ে নেন চিত্র-পরিবেশকেরা তাঁদের কমিশন বাবদ। অর্থাৎ একশো টাকার টিকিট বিক্রি হলে সরকার, প্রদর্শক এবং পরি-বেশকের পাওনা মিটিয়ে প্রযোজকের ভাগ্যে জোটে গোটা আঠারো থেকে কুড়ি টাকা। অথচ প্রযোজককে যে খালি ছবি তৈরী করবার জন্যেই খরচ করতে হয়, তাই নয়; সেই ছবির মুক্তির জন্যে

প্রতি রীলে ৪০ টাকা করে সেন্সার-ফি, মুক্তিপ্রাপ্ত প্রতিটি প্রিন্ট বাবদ প্রায় ৭০০ টাকা কেন্দ্রীয় একসাইজ ডিউটি, ছবির মুক্তির জন্যে বিজ্ঞাপনের ব্যয়, যা অত্যন্তঃপক্ষে ৩০।৪০ হাজার টাকা, এমন কি শহরের যে-কটি প্রধান চিত্র-গৃহে ছবিটি মুক্তি পাবে, সেগুলিকে সুসজ্জিত করারও ব্যয়ভার বহন করতে হয়। বলতে ভুলে যাচ্ছিলুম, চিত্র-সমালোচকদের প্রীতিবিধানের জন্যে ছবির মুক্তি উপলক্ষে প্রায়ই যে-জল-যোগের ব্যবস্থা করা হয়, এর খরচও আসে এই প্রযোজকের পকেট থেকে। অথচ মজা এমনই যে, যে-ভদ্রলোক ছবিটির জন্যে গোড়া থেকে শেষ অবধি সমূহ খরচ করলেন, তাঁরই পাওনাটা ছবির জগতে সবশেষে বিবেচ্য; এমন কি, ছবিটি যদি কোনো দিনই অত্যন্তঃ খরচের টাকাটাও ভুলে আনতে না পারে, তা'হলেও অপর তিনপক্ষ—সরকার, প্রদ-র্শক ও পরিবেশক—তাঁদের প্রাপ্যের একটি নয়া পরস্যও ছাড়বেন না। এই ঘোরতর অবিচার সত্ত্বেও বাংলা ছবি আজও তৈরী হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় ও আন্ত-র্জাতিক সম্মান লাভ করছে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্বিকার-চিত্তে বহুসংখ্যক প্রমোদকর লব্ধ অর্থ পেয়ে আনন্দিত হচ্ছেন।

খালি সরকারই বা বলি কেন, বাংলা ছবির প্রতি মমত্বপূর্ণ দৃষ্টি ক'জন বাংলাদেশীর আছে? আমরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত বহু কৃতী বাংলাদেশীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি,—এঁদের মধ্যে চিকিৎসক, আইনজীবী, রাজনীতিজ্ঞ, অধ্যাপক, সাংবাদিক, চিত্রকর, ডাক্কর, পুস্তকবিদ্যা-বিশারদ, স্থপতি, ব্যবসায়ী, পদস্থ সর-কারী কর্মচারী সকলেই আছেন,—এঁদের কাউকে বলতে শুনলাম না যে, তিনি বাংলা ছবি দেখে থাকেন বা বাংলা ছবি সম্বন্ধে কোনও খবর রাখেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ মরুশিখ চালেই বলেছেন, 'হ্যাঁ, সত্যজিৎ রায়ের এ যে বইখানা—হ্যাঁ, পথের পাঁচালী—ওটা দেখেছিলুম বটে, মন্দ লাগেনি', কিন্তু বেশীর ভাগই জানিয়েছেন, তাঁদের কর্ম-ব্যস্ত জীবনে বাংলা ছবি দেখে সময় নষ্ট করবার মত সময়ের অত্যন্ত অভাব। 'বাড়ীর মেয়েরা আর এ ছেলেগুলো-গুলো কখনও-সখনও মার বলে শুনিনি বটে, তবে ও-সব দেখে রাজে পরস্য নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না', একথা যারা গুরুগম্ভীরভাবে বলেন, তাঁদের অনেককেই কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় তাদের আড্ডায়, প্রতি শনিবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে, প্রতি ছুটির দিন ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বা বাগানবাড়ীর হৈ-হজরতে সময় কাটাতে দেখা যায়। এবং শুনেন আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এঁরাই বাংলা ছবির সবচেয়ে বেশী নিন্দে করে থাকেন।

কাজেই মৃদুটিমেয় আপনি-আমি চাইকার করলে কি হবে, বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প থাক আর যাক, এর জন্যে সরকার বা পণ্ডিতমন্ডল শিক্ত বাঙালী সম্প্রদায়ের মস্তিষ্ক সামান্য মাত্রও আলোড়িত হবে না।

বাংলা দেশেই বাংলা ছবি ক্রমে ক্রমে কোপঠাসা হচ্ছে কেন, হিন্দী ছবির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার তা বারে বারে আর্থিক ক্ষেত্রে হার স্বীকার করেছে কেন, সারা বাংলার চিত্রগৃহগুলির প্রদর্শনী-সময় হিসেব করে সারা বছরে বাংলা ছবি তার ষেটুকু ভূনাংশ সময় পায়, তাও ক্রমে ক্রমে যাচ্ছে কেন, অ-বাংলা ছবির দর্শকদের মধ্যে বাঙালী দর্শকের সংখ্যা বছরের পর বছর কি অনুপাতে বেড়ে যাচ্ছে, এ সম্পর্কে যেমন উচ্চ পর্যায়ের সরকারী তদন্ত হওয়া যতশীঘ্র সম্ভব দরকার, তেমনই বাংলা ছবির প্রযোজনার ক্ষেত্রে আর-বারের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করা অবশ্য প্রয়োজনীয় জেনে এই শিল্পের চিরস্থায়ী সঙ্কট-মোচনেও সরকারী হস্তক্ষেপের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করছি।

আমরা ১৯৬১ সালের ১৬ই জুনের এবং ১৯৬২ সালের ৫ই জানুয়ারীর “অমৃত”-এ বৈ-কথা লিখেছিলাম, তারই পুনরাবৃত্তি করে বলছি : ‘বহু অসুবিধা সত্ত্বেও বাংলা ছবি আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অসামান্য মর্যাদার আসন পেয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আমাদের এই গৌরবময় শিল্প সম্বন্ধে অবহিত হতে বলি এবং একটুও কাল-বিলম্ব না করে এই শিল্পটিকে কি উপায়ে সুস্থ অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সে সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করতে অনু-রোধ করি। বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পকে যদি মাত্র কোনো ক্রমে টিকে না থেকে শ্রীবিশ্বের পথে এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে বাংলা ছবিকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই তার বিক্রীর বাজারকে বাড়াতে হবে, তার মূর্তির পক্ষে অধিকতর প্রশস্ত করতে হবে, মাত্র সারা ভারতে নয়, সারা বিশ্ব য়াতে তার চাহিদা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি হয়, সেই অকথ্য সৃষ্টি করতে হবে। বাংলা চলচ্চিত্র-জগতের প্রযোজক ও স্টুডিও-মালিক থেকে শুরু করে বিশিষ্ট কলা-কুশলী এবং শিল্পবীন্দ এক টেবিলে বসে একটি সুষ্ঠু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করুন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সেই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করতে আহ্বান করুন।’ এবং সঙ্গে-সঙ্গে আর একটি কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন : ‘বাঙালী বাংলা ছবি দেখুন—বাংলা ছবি দেখুন—বাংলা ছবি দেখুন।’

ভগিনী নিবেদিতার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ

“ভগিনী নিবেদিতা”র সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ একটি অসাধারণ ঘটনা। বিখ্যাত কোনো কাহিনীকারের রচনা অবলম্বনে গঠিত কাল্পনিক চিত্র নয়, এমন একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহিলার জীবনীচিত্র, যিনি ১৮৯৮ সালের ২৮-এ জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়াবার পর থেকে ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দার্জিলিংয়ে তাঁর জীবনপ্রদীপ না নেভা পর্যন্ত তাঁর এই ম্বিতীয় পিতৃভূমি ভারতবর্ষের সঙ্গে

মনকে তন্ময় ও অভিভূত করা নিঃসন্দেহ উচ্চাঙ্গের শিল্পরীতি ও মননশীলতার পরিচায়ক।

ভেবে বিস্মিত হ’তে হয়, নৃপেন্দ্রকর রচিত চিত্রনাট্যকে সম্বল ক’রে তর, পরিচালক বিজয় বসু—এই ছবি প্রস্তুতি সম্পর্কেই তাঁর নাম আমরা পূর্বে জেনেছি—কোন মন্তব্যে এই অসাধারণ সাধন করলেন। যেভাবে তিনি প্রাতি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তাঁর গৃহীত চরিত্র সম্বন্ধে অনুপ্রাণিত করেছিলেন



রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত বঙ্গবরের শ্রেষ্ঠ চিত্র “ভগিনী নিবেদিতা” চিত্রের নাম-ভূমিকার প্রতিভাময়ী শিল্পী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

একান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে-ছেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ছিল, এমন দু-একজন লোকের ইয়ত এখনও সন্ধান মিলতে পারে। তাই এই জীবনীচিত্র-রচনায় কল্পনা-বিলাসের অবকাশ খুবই সামান্য। অপর পক্ষে বিবেকানন্দ-শিষ্য নিবেদিতার কর্মজীবন-রচনায় এমন বহু চরিত্রকেই আনতে হয়েছে, যাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রচুর জানা আছে। কাজেই এ হেন জীবনীচিত্রের সুষ্ঠু চিত্রায়ণ রীতিমত দুষ্কর কর্ম এবং তারই মধ্যে দশক-

যাতে আমরা মনে করতে বাধ্য হয়েছি একটি মহৎ জীবনীচিত্রে অভিনয়ের গুরুদায়িত্বের কথা প্রত্যেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করেছেন, তাতেই আমরা এই চিত্রনির্মাণে তাঁর নিজের অসাধারণ আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়েছি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, তাঁর এই আপ্রাণ প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছে।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই ছবির নাম-ভূমিকার অভিনয়; অভিনয় বললে ভুল-

রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র !



Fit to rank among the best of good biographical— correct, balanced, unexaggerated and reverential..... —Screen

It is a type of moving, emotional and highly dramatic motion picture which silences criticism and evokes spontaneous admiration and unprejudiced praise..... —Sport & Pastime

কাহিনী রচনা, চিত্রনাট্য, সংগীতগোষ্ঠী, অভিনয়, সকল ক্ষেত্রেই ছবিটি এক অসামান্য কৃতিত্বের অনবদ্য স্বাক্ষর..... —দৈনিক বহুমতী (সম্পাদকীয়)

"Bhagini Nivedita" in many respect is a picture, in which the Bengali film industry may legitimately take pride. Editorial-A. B. Patrika

অভিনয় সংলাপ ও ঘটনা সমাবেশে ভগিনী নিবেদিতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাচ্ছে..... —লোকসেবক (সম্পাদকীয়)

Neatness has been maintained in the film's mounting & technical qualities..... —Amrita Bazar Patrika

inspiring document of Faith..... —Cine Advance

"ভগিনী নিবেদিতা" প্রশংসনীয় স্মৃতি... —সামান্যতা

অমল বাগচী ছবির আবেদন রচনার রসবোধের পরিচয় দিচ্ছেন। করেকটি স্তোত্রগানের হারাতিপ, হৃদয় এবং অন্তর্লিঙ্গীত..... —দেব

This is one of those rarely produced pictures that enlighten the mind without surmizing and give a new stature to film entertainment —Hindusthan Standard

ত্রিবিজয় বহুর পরিচালনায়, ত্রিদেশীয় চিত্রোপাখ্যায়ের চিত্রনাট্যে এবং অসামান্য (অসামান্য) অভিনয় গুণে নিবেদিতার উত্তীর্ণ। এই জীবনচিত্র "বাংলাদেশের মেয়েদের নতুন প্রেরণা দেবে".... —সুদান্তর (সম্পাদকীয়)

ত্রিদেশীয় উপোপাখ্যায় চরিত্রটিতে শুধু একটা রূপই দেখনি, তিনি যেন এতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন..... —জানমহাভারত পত্রিকা

চলচ্চিত্র বিচারে নিঃসন্দেহে "ভগিনী নিবেদিতা" ভারতের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য সংযোজন —জনসেবক (সম্পাদকীয়)

অরোবার শঙ্কাঞ্জলি ভগিনী নিবেদিতা

২১, ৫৬ রাধা তাপ পূর্ণ ২১, ৫৬
৯ নিয়ন্ত্রিত ৮-৫৫

ও রূপছায়া - রূপছায়া - সিংহানিয়া - চিত্রমন্দির - বিচিত্রা - অরোরা - পরী
(আগরতলা) (বালিচক) (শিলং) (কৃষ্ণনগর) (বোলপুর) (খালপুর) (মেটিয়াবুরুজ)



এ সম্বন্ধে মুক্তিপ্রাপ্ত তারাশঙ্করের 'কাহ্না' চিত্রে একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুলতা চৌধুরী।

হবে; তিনি জীবন্ত নিবেদিতারূপে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়েছেন। এবং অমরেশ দাস প্রমুখ প্রতিটি শিল্পী নিজের নিজের গৃহীত ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন। এ কথা 'ভগিনী' নিবেদিতার সমালোচনা কালে আগেই বলেছি।

'ভগিনী' নিবেদিতার রাষ্ট্রীয় সম্মান-লাভের যে গৌরব, সে গৌরব চিত্রনাট্যকার

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ পরিচালক বিজয় বসু, সংগীত-পরিচালক অনিল বাগচী, চিত্রশিল্পী বিজয় ঘোষ, শব্দ-বাহী সমর বসু, শিল্প-নির্দেশক সত্যেন রায়চৌধুরী, সম্পাদক বিশ্বনাথ মিত্র প্রভৃতি সকল কলাকুশলী, অরুণতী মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, সাধনা রায়-চৌধুরী, বাণী গাঙ্গুলী, ছন্দা, মঞ্জুশ্রী, অমরেশ দাস, অসিতবরণ, দিলীপ রায়, রবীন মজুমদার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী সরকার, শিশির মিত্র, ঠাকুরদাস মিত্র, শিবজু ভাওয়াল, মমতাজ আহমেদ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমশঙ্কর বসু প্রভৃতি শিল্পী এবং ছবিখানির নির্মাণ যাদের অক্লান্ত সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভব ছিল না, আরো ফিল্ম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠানের সেই যুগ্মসম্মত—অজিত বসু এবং অরুণ বসু এবং তাঁদের সংগে এই চিত্র-সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীরই সমবেতভাবে প্রাপ্য।

আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকলে যে প্রচেষ্টা ফলবতী হয়, 'ভগিনী' নিবেদিতা রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করে সেই সত্যকেই উল্লেখিত এবং প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিবিধ সংবাদ

১৯৬১ সালের রাষ্ট্রীয় সম্মান:

ভারতে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলিকে সর্বাঙ্গীয় এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে পুরস্কার-প্রদানের যে ব্যবস্থা ভারত সরকার গেল ১৯৫৪ সাল থেকে করে আসছেন, এ বছর সেই ব্যবস্থামত ১৯৬১ সালে নির্মিত ছবিগুলির মধ্যে

যে সব ছবি পুরস্কৃত হয়েছে তা নাম:

সর্বাঙ্গীয় ভিত্তিতে

কাহিনীচিত্র : (১) ভগিনী নিবেদিতা (বাংলা)—রাষ্ট্রপতির সুবর্ণ পদক

(২) পাবা মণিঙ্গু (তামিল)

(৩) প্রপঞ্চ (মারাঠি)

শিশুচিত্র : (১) হট্টগোল বিজয় (হি প্রধানমন্ত্রীর সুবর্ণ পদক

(২) সাবিত্রী (হিন্দী)

(৩) নানহে মনহে সিতারে (হিন্দী)

তথ্যচিত্র : (১) রবীন্দ্রনাথ (ইংরাজ রাষ্ট্রপতির সুবর্ণ পদক

(২) আওয়ার ফেথার্ড ফ্রেন্ডস (ইংরাজী)

(৩) রোমান্স অব দি ইন্ডিয়ান কয়ে (ইংরাজী)

শিক্ষামূলক চিত্র : (১) সাইটাস ক্যাডেশন (ইংরাজী)—রাষ্ট্রপতির সুবর্ণ পদক

(২) কয়ল ওয়াকার (ইংরাজী)

(৩) আহদান (হিন্দী)

আঞ্চলিক ভিত্তিতে

হিন্দী : (১) ধরমপুত্র

(২) গঙ্গা-বহুনা

(৩) প্যার-কি-পিয়াস

বাংলা : (১) সমাপ্ত

(২) সন্তপদী

(৩) পুনশ্চ

মারাঠি : (১) মানিনী

(২) বজ্রস্বত

(৩) মানসাল পাং অস্তাত

তামিল : (১) কাম্পালোট্রি টামিঝা

(২) পাসা মলর

(৩) কুমুদম

মালয়লম : (১) মুড়িয়ানরা পট্রেন

(২) কান্তম বেচা কোট্ট

(৩) সার্বারামালা শ্রীআইয়্য

অসমীয়া : (১) শকুন্তলা

তেলেগু : (১) ভার্ঘা ভারতলু

গুজরাটী : (২) মাণ্ডনবন

ওড়িয়া : (২) নুয়া বৌ

কানাড়া : (২) কিতুর চেনাম্মা

আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রথম স্থান কান্নী ছবিগুলি রাষ্ট্রপতির রোপা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানীয়ক সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করবে

থিয়েটার লাইবারের নির্মিত আর্জন কলকাতার অন্যতম নাট্য-থিয়েটার লাইবার ২৭-এ মার্চ থেকে

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা দক্ষিণ বঙ্গ থিয়েটার সেন্টার-এ তাঁদের নতুন

ধূলিমাটির সুর-এর অভিনয় কর

স্টার থিয়েটার

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত | ফোন : ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক

শেষাঙ্গি

কাহিনী : শক্তিধর রাজগুরু

নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত

দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু

গান : শৈলেন রায় • সুর : দুল্লি সেন

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬৯ টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬টা টায়

৯ রূপায়ণে ৯

কমল মিত্র - অজিত বন্দ্যো - আশীষ
কুমার - অর্ণা দেবী - ললি চক্রবর্তী
বাসবী নন্দী - অনুপকুমার - চন্দ্রশেখর
বীরেশ্বর সেন - গীতা দে - সাধনা
রায়চৌধুরী - আশা দেবী - শ্যাম লাহা

প্রেমাংকুর বোস - ডান, বন্দ্যো

শুভ ১লা বৈশাখ স্মরণীয় শুভমুষ্টি !

একটি মহান সাহিত্য-সৃষ্টি

.....এখন একটি স্মরণীয় ছায়াছবি !

নববর্ষের অনবদ্য উপহার---

ইন্ডেলী বাকের উপকথা

কাহিনী
ভার্যাক্ষর
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
তপন সিংহ
সঙ্গীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
ভূমিকা
কালী ব্যানার্জি
দিলীপ ব্রায়
রঞ্জনা ব্যানার্জি
অনুভা গুপ্তা
লিলি চক্রবর্তী
নিভানলী
ববি ঘোষ
বীবেকর জেন
প্রভৃতি

প্রযোজনা
শ্যামলাল জালাল

জালাল
প্রোডাকশন্সের
নিবেদন

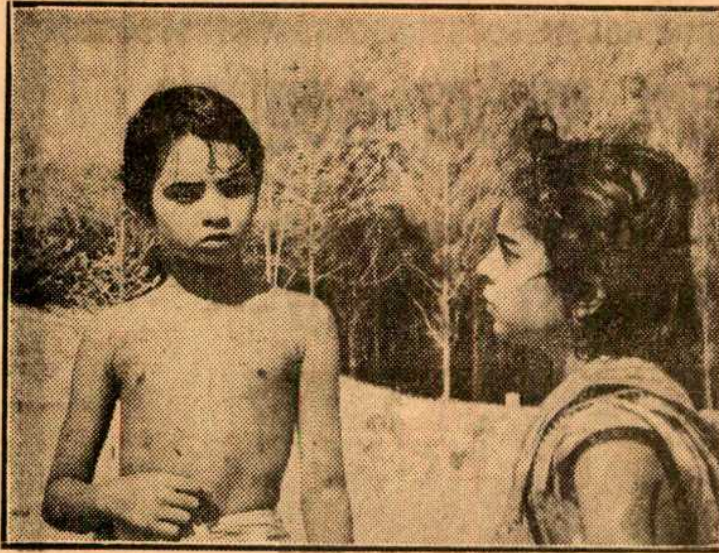


প্রভা—৩, ৬ ও ৯টার

মিনার : বিজলী : ছবিঘর

: জালাল ডিস্ট্রিবিউটার্স রিলীজ :

এবং শহরতলীর
অন্যান্য চিত্রগৃহে



‘টেউ-এর পর টেউ’ ছবিতে কিশোর শিল্পী শান্তনু ও গোপা

সমরেশ বসুর ছোটগল্প ‘মদনের স্বপ্ন’ অবলম্বনে অশ্রমিত্রম কর্তৃক রচিত এই নাটকখানি ১৯৬১-৬২ সালে থিয়েটার সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। নাট্যকার স্বয়ং নাটকটির পরিচালক ও অজয় দাস হচ্ছেন সংগীত-পরিচালক।

এস টি প্রোডাকশন্সের ‘রতনলাল বাংলালী’ :

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এস টি প্রোডাকশন্স-এর ‘রতনলাল বাংলালী’ ছবির চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে বর্তমানে কমল গাঙ্গুলীর সম্পাদনাকর্মে রয়েছে। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন চন্দ্রাবতী, সন্ধ্যা রায়,

তন্দ্রা বর্মণ, কমলা মুখোপাধ্যায়, গীতা সিং, আশিসকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, ধীরাজ দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এতে সুরারোপ করেছেন—অভিজিৎ।

বংগীয় নাট্য সংসদের “পান্থশালা” :

গেল রবিবার, ৮ই এপ্রিল সকালে বংগীয় নাট্য সংসদ রমেন লাহিড়ী রচিত “পান্থশালা” কৌতুক-নাটকটি নিউ এম্পায়ার রংগমঞ্চে মণ্ডস্থ করলেন। পাড়াগেয়ে জমিদার রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ছেলে লাটু তারই শহুরে হবু-ভাগিনীপতি প্রকাশ এবং তার বন্ধু অজয়ের কাছে নিজেই যে শহুরে আত্মগোপন করে, তাই নয়, তারা যখন ঐ পল্লীগামে কোনো হোটেল আছে কিনা জানতে চায়, তখন তাদের উৎকট শহুরে-পনার উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে নিজেদের বাড়ীটাকেই তাদের চাহিদামত হোটেল বলে সেইখানে পাঠিয়ে দেয় এক বন্ধুকে সংগে দিয়ে। এবং বলে দিল—হোটেলওয়ালা বড়ো পুরোনো জমিদার-বাড়ীর নীচের তলায় হোটেল খুলেছে বলে নিজেকেই জমিদার বলে জাহির করে আনন্দ পায়। অতএব প্রকাশ এবং অজয় জমিদার রমণীমোহনকে মনে করে হোটেলওয়ালা এবং নিজেদের পরস্পরের নাম পালটিয়ে পরিচয় দিয়ে তাঁর সংগে করে দুর্বাবহার। জমিদার-গাহিণী বিরজা দেবী অজয়কে প্রকাশ মনে করে তার সংগে আত্মীয়তা বাড়বার চেষ্টা করেন এবং বিপাক্তি চরমে ওঠে, যখন তাদের কন্যা মীরা তার হবু-স্বামীর কাছে নিজের পরিচয় দেয়, তারই

মাস্তুতো বোন মীরা বলে এবং প্রকাশ তার কথা বিশ্বাস করে মীরাকেই মীরা ভেবে নিয়ে তার সাহায্যে লেগে নিজে বন্য করবার চেষ্টা করে।—এই ভুল বোকামি এবং ভুল জ্ঞানাজানিকে আশঙ্কায় ঘেঁষে-সব কৌতুককর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তার জন্যে প্রেক্ষাগৃহে হাসি হুজুড় পড়ে যায়।

“পান্থশালা” নাটকটির গোড়ারদিক কিছুটা অংশ এবং শেষের দৃশ্য সম্পূর্ণ অবান্তর এবং অপয়োজনীয় এটুকু বাদ দিলে নাটকটি আরও রসযুক্ত হতে পারত। নাটকটি মোটের উপর অত্যন্ত সুঅভিনীত ও সুপ্রযুক্ত হয়েছে। অজয়ের ভূমিকায় সোমেন নন্দ নিঃসন্দেহে এই নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন চলন, অঙ্গভঙ্গী এবং ভাবপ্রকাশ দৃষ্টি কৌতুকনাট্যটিকে উপভোগ্যতা চরমে নিয়ে যেতে বহুলাংশে সহায় করেছে। লাটুর ছোট ভূমিকটি

হাওড়ায় নিয়মিত অভিনয়

(স্বাধিক ও নট-নাট্য সংগঠিত)

প্রথম পর্যায়ের অভিনয় :

শুভ ১লা ও ২রা বৈশাখ, ১৩৬৯

- সংসার সীমান্তে
- করুণা কোরো না
- ওরা কাজ করে
- ব্যান্ড মাস্টার

স্থান : হাওড়া টাউন হল।

২৫শে এপ্রিল
বুধবার
সন্ধ্যা ৬টায়
নিউ এম্পায়ারে
॥ নির্দেশক ॥
• শম্ভু মিত্র •

• বহুরূপীর অভিনয় •

॥ প্রস্তাংশে ॥

শম্ভু মিত্র • ভূপ্ত মিত্র
অমর গাঙ্গুলী • কুমার
রায় • শোভেন মজুমদার
শান্ত দাস • রমলা রায়
ও দেবভোষ ঘোষ।

• টিকিট পাওয়া যাচ্ছে •



বাসুদেবের মেখে

সত্যজিৎ রায়

ইউনিট থিয়েটার

নির্দেশক

অমর চট্টোপাধ্যায়

রঙমহল

১৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার ৭ টায়

টিকিটের হার-৫.৩.২.১.১



কৃষ্ণাণ পাণ্ডু পরিচালিত 'শাদী' চিত্রে সায়রাবানু ও মনোজ

বস্ত করে তুলেছেন দিলীপ রত্ন তাঁর
স্বাম্য নাট্যনিপুণতা স্বরা। অদিত
তঁর বাস্তবধর্মী অভিনয়ে নিজেকে
স্বয়ংসেই জমিদার রমণীমে হনে
পান্তরিত করতে পেরেছিলেন।
স্বাশের ভূমিকায় নাট্যকার রমেন
হিড়ীর সাবলীল অভিনয় আরো কিছু
স হ'লে আরো ভাল হ'ত। মীরা
ং সায়র ভূমিকায় উমা দশগুণত ও
রা নিয়োগীর অভিনয় চরিত্রোপযোগী।
মলি লাহিড়ীর বিরজা কিছু আড়ন্ত।
পর্যাপ্ত ভূমিকা যথাযথ।

শুভ দৃশ্যের সাহায্যে দৃশ্য পরি-
পন্য এবং আলোকসম্পাত-উভয়
ভাগেই অমর ঘোষ যথেষ্ট কৃতিত্বের
রচয় দিয়েছেন।

ভাসচে ৩০এ এপ্রিল বঙ্গীয় নাট্য
সদ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করবে। এরই
অন্ততঃ দৃশ্যনি পূর্ণাঙ্গ নাটক
ং বাইশটি একাধিকককে মণ্ডস্থ করা
কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শ্লাঘার
যা। বঙ্গীয় নাট্য সংসদের পথ
মোস্তার্প হোক!

স্টিকা ফিল্মস-এর "পলাশের রঙ" :

একটি গ্রাম্য কবিরালের ছেলের
ত-প্রতিঘাতপূর্ণ জীবনকে কেন্দ্র করে
চত বাণী বিষারী কাহিনী অবলম্বনে
রিচালক সুশীল ঘোষ যে চিত্রনট্য
না করেছেন, তারই চিত্ররূপ হবে
স্টিকা ফিল্মস-এর "পলাশের রঙ"।
বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন :
সমিকুমার, বিকশ রায়, বঙ্কিম ঘোষ,
মথ মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুলা সরকার,

মঞ্জু দে, অঞ্জনা নাগ, চিত্রিতা মন্ডল এবং
নবাগতা সুতপা মজুমদার। ছবিটির
আলোকচিত্র, শিল্প-নির্দেশনা, সম্পাদনা
এবং সংগীত-পরিচালনার ভার নিয়েছেন :
যথাক্রমে গণেশ বসু, গৌর পোন্দার, শিব
ভট্টাচার্য ও ভি বালসারা। বি এন
বাহেড়ী ছবিখানির প্রযোজক।

চেনা-অচেনার "ভীমপল্লী" :

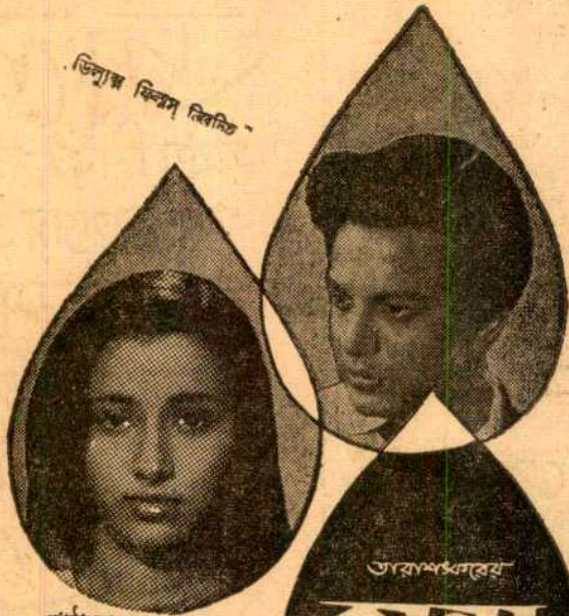
আজ শুক্রবার, ১৩ই এপ্রিল, সন্ধ্যা
৬টাটায় রঙমহল "চেনা-অচেনা"র সভারা
বনফুলের সুখ্যাত কাহিনী "ভীম-
পল্লী"র সুশীল ঘোষ প্রদত্ত নট্য-
রূপটিকে মণ্ডস্থ করবেন। নির্দেশনার
আছেন জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যোগেশ দত্তের ম্কেভিনয় :

বঙলা নববর্ষের প্রথম দিন, ১৪ই
এপ্রিল সকাল ১০টাটায় নিউ এম্পায়ার
রঙ্গমঞ্চে সুখ্যাত ম্কেভিনেতা যোগেশ
দত্ত একক অভিনয় ঘটাব্যাপী ম্কেভিনয়

॥ শুভমুক্তি বৃহস্পতিবার ১২ই এপ্রিল ॥

ডিল্লি ফিল্মস নিবন্ধিত



শ্রেষ্ঠাংশে :

উত্তম কুমার

রাধামোহন ভট্টাচার্য

স্বলতা চৌধুরী ও

নবাগতা নন্দিতা বসু

সঙ্গীত : সুধীন দাসগুপ্ত

তারাশংকর

কামা

প্রযোজনা ও পরিচালনা

অগ্রগামী

উত্তরা : পূরবা : উজ্জ্বলা : আলোছায়া

শ্যামাঙ্গী - অলকা - উদয়ন - নেত্র - জয়ঙ্গী
মীনা - কল্যাণী ও পুষ্পঙ্গী (বেহালা)

প্রদর্শন করবেন। বিখ্যাত ফরাসী মুকা-
ভিনেত্রী মার্সেল মার্শোর পর ভাবতে
এই প্রথম পেশাদারী পূর্ণাঙ্গ মুকা-
ভিনয় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন
বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী।

“নাট্যম” সম্প্রদায়ের পথের ডাক”:

গেল ২৮এ মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারে
শোখীন নাট্য সম্প্রদায় “নাট্যম” ভাবা-
শব্দকরের “পথের ডাক” অভিনয় করেন।
অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনার এবং
রথীন চন্দ, রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কুন্-
লাল রায়চৌধুরী, অতীশ রায়চৌধুরী,
মণি গাঙ্গুলী, গণেশ বরাট, তারা
ভদ্রা, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা দে,
গীতা বন্দ, নমিতা সমাজদার প্রভৃতির
অভিনয়গুণে নাটকটি সর্বাঙ্গসুন্দর
হয়েছিল।

অগ্রগামী “কাল্পনা”:

গেল বৃহস্পতিবার, ১২ই এপ্রিল
থেকে উত্তরা, পূর্ববী ও উজ্জ্বলায় মূর্তি
পেয়েছে অগ্রগামী পরিচালিত এবং ডি-
ল্লু নিবেদিত নতুন ছবি “কাল্পনা”। ছবির
প্রধান ভূমিকাগুলিতে আছেন : উত্তম-
কুমার, রাধামোহন, শ্যামল, সুলভা
চৌধুরী, শোভা সেন ও নবাগতা নবিতা
বসু। ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন
সুধীন দাসগুপ্ত।

জালন প্রোডাক সন্স-এর “হাসিনী
বাকের উপকথা”:

তপন সিংহ পরিচালিত এবং জালন
প্রোডাকসন্স প্রযোজিত নবতম চিত্র
হাসিনী বাকের উপকথা” নতুন
প্রতিষ্ঠান নিয়ে নতুন বছরের প্রথম দিনে
মিনার, বিজলী, ছবিঘর ও অন্যান্য চিত্র-
গৃহে মুক্তি পাচ্ছে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
দিলীপ রায়, রজন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা
গুপ্তা প্রভৃতি অভিনীত ছবিখানিতে
সুন্দর-যোজনা করেছেন হেমন্ত মুখো-
পাধ্যায়।

তিন দেশী ছবি

মাইকেলেঞ্জেলো আন্তোনিয়োর নতুন
ছবি

আন্তোনিয়োর “L' Avventura
(লা আভেনতুরা) চিত্রজগতে একটি
সৌরগোল তুলেছিল। সৌরগোল ওঠার
কারণ চিত্রটির প্রতীকী দৃষ্টোদ্যাত।
অভেনতুরা ছবিটির আঙ্গিক একেবারে
খাঁটি তথ্যচিত্রের। সমগ্র ছবিটিই তোলা
হয়েছে লোকেশনে এবং ডিটেলের কাজ
ছবির কোথাও এতটুকু খুঁত নেই।
কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে আন্তোনিয়োর
ভাবশ্রুতিপন্থী। কাহিনী গ্রন্থনে
তিনি বাইবেলের গতিবিধির ওপর
নির্ভর না করে আন্তর্লোকের মানবকে

খুঁজেছেন। ফলে ছবির গল্পে নাটক
থেকেও নেই সমস্ত কিছুই যেন কেমন
ছাড়া ছাড়া। আভেনতুরা ছবির বিরুদ্ধে
অসংলগ্নতার অভিযোগ ওঠার পর পরি-
চালক উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি ইচ্ছে
করেই কাহিনীর ফাঁকগুলো রেখেছেন
যাতে দর্শকরা নিজেদের কল্পনায় ফাঁকা
ভরে নেয়।

কিন্তু আন্তোনিয়োর নতুন
ইটালীয় ছবি “La Notte” (দি নাইট)
নাট্যগতিসম্পন্ন সহজতর ছবি। এই
ছবির গল্পটি নিতান্তই আটপোরে এবং
চরিত্রদের জীবনসমস্যাও আমাদের অতি-
চেনা। দি নাইট ইটালীর অসুস্থ
জীবনের মানচিত্র। মিলানবাসী জনৈক
প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক এবং তাঁর স্ত্রীর
একটি অবক্ষয়ী অপরাহ্ন এবং সম্ভার
“লানি বর্তমান চিত্রের উপাদান। একটি
গ্রীষ্মের অপরাহ্নে, হাসপাতালে এক
পারিবারিক বন্ধুকে দেখে বাড়ি ফেরার
পথে স্ত্রী হঠাৎ বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে
পড়লেন। স্বামীকে ছেড়ে একা একা

মিলানের পথে পথে ঘুরতে লাগলেন
এক অসুস্থ একাকীহৃদবোধের তাদৃশ।
স্বামী গেলেন তাঁর নতুন উপন্যাস প্রকাশ
উপলক্ষে প্রদত্ত একটি ককটেল পার্টিতে।
পরে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে
স্বামী একটি সামান্যভোজে গেলেন,
সেখান থেকে আবার আরেক জামানায়
সারারাত্রির বনভোজন উৎসবে। চারদিকের
হৈ চৈ, হাসি-হুম্রোড়ের মধ্যে নিজের
নিঃসঙ্গতাকে শ্বিগুণ করে ফিরে পেলেন
স্ত্রী। ক্রমশঃ যেন স্বামীর মুখ তাঁর
কাছে অচেনা হয়ে এল এবং ভোরের
ধূসরতায় তাঁর মনে হল পৃথিবীতে
তিনিই বাকি একমাত্র নিঃসঙ্গ জীবিত
সত্তা। মোটামুটি এই হচ্ছে দি নাইট
চিত্রের কাহিনী। কাহিনীর মন্তব্যতা
আধিকাংশ দর্শকের অসহনীয় মনে হতে
পারে কিন্তু এই চিত্রে আন্তোনিয়োর
অবক্ষয়ী যুগের হতাশাকে কঠোর নিষ্ঠায়
রূপায়িত করেছেন। জিন মর, অভিনয়
করেছেন স্ত্রীর ভূমিকায় এবং স্বামীর
ভূমিকায় আছেন মারসেলো মাস্ট্রিয়ানি।

এখিল মাসের
ডালেসা
প্রকাশিত হয়েছে।
এই সংখ্যায় উপন্যাস লিখেছেন
সুশীল রায়
রত্নাকর গিরিশচন্দ্র
অচিন্ত্যকুমার গোস্বামী
এখানে সেখানে
সমরেশ বসু
বঙ্গের খবর। প্রমুখান
শচীন ভৌমিক

দায় এক টকা চার আনা।

এখিল মাসের
ডালেসা
প্রকাশিত হয়েছে।
এই সংখ্যায় উপন্যাস লিখেছেন
সুশীল রায়
রত্নাকর গিরিশচন্দ্র
অচিন্ত্যকুমার গোস্বামী
এখানে সেখানে
সমরেশ বসু
বঙ্গের খবর। প্রমুখান
শচীন ভৌমিক

খেলাধুলা

দশক

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ চতুর্থ টেস্ট

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৪৪৪ রান (রোহন কানহাই ১৩৯, ফ্র্যাংক ওরেল ৭৩ নট আউট, ম্যাকমরিস ৫০, রডরিগস ৫০, হল ৫০ নট-আউট। উমরিগড় ১০৭ রানে ৫, নাদকানী ৬৯ রানে ২, জয়সীমা ৬১ রানে ১ এবং দুরানী ৫৪ রানে ১ উইকেট)।

ও ১৭৬ রান (৩ উইকেটে)। হাট ৩০, ম্যাকমরিস ৫৬, কানহাই ২০, নার্স ৪৬ নট-আউট এবং সোবার্স ১৬ নট-আউট। দুরানী ৬৪ রানে ৩টে উইকেট)

ভারতবর্ষ : ১১৭ রান (উমরিগড় ৫৬, পতোদির নবাব ৪৭ এবং বোরদে ৪২। হল ২০ রানে ৫, রডরিগস ৫৩ রানে ৩ এবং সোবার্স ৪৮ রানে ২ উইকেট)।

ও ৪২২ রান (উমরিগড় ১৭২ নট-আউট, দুরানী ১০৪, মেহেরা ৬২ এবং নাদকানী ২০। গিবস ১১২ রানে ৪, সোবার্স ১১৬ রানে ৩, হল ৭৪ রানে ১ এবং স্টেয়ার্স ৫০ রানে ১ উইকেট)

প্রথম দিন (৪ঠা এপ্রিল) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস—২৬৮ (৬ উইকেটে)। রডরিগস (২৫) এবং গিবস (০) নট আউট থাকেন। লাগের স্কোর—১০১ রান (১ উইকেটে) এবং চা-পানের স্কোর ২০৪ রান (৩ উইকেটে)।

দ্বিতীয় দিন (৫ই এপ্রিল) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ওরেল দলের ৪৪৪ রানের (১ উইকেটে) মাধ্যমে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস—৬১ রান (৫ উইকেটে); ৬ষ্ঠ উইকেটের জুড়ি উমরিগড় এবং পতোদির নবাব নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিন (৬ই এপ্রিল) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১১৭ রানে সমাপ্ত। ভারতবর্ষ ২৪৭ রান পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস—১৮৬ রান (২ উইকেটে)। দুরানী ৯১ এবং মজরেকার ৯ রান করে এই দিন নট-আউট থাকেন।

চতুর্থ দিন (৭ই এপ্রিল) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৪২২ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস—২৩ রান (কোন উইকেট না পড়ে)। হাট এবং ম্যাকমরিস যথাক্রমে ১১ ও ১০ রান করে নট-আউট থাকেন।

বিজ্ঞানের দিন (৮ই এপ্রিল)

পঞ্চম দিন (৯ই এপ্রিল) : ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস—১৭৬ রান (৩ উইকেটে)।

খেলার ফলাফল : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭ উই-কেটে জয়লাভ করে।

ট্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট-অব-স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭ উইকেটে জয়লাভ করেছে—আলোচ্য টেস্ট সিরিজে এই নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের উপর্যুপরি চতুর্থ জয়। এখন পঞ্চম টেস্ট খেলা বাকি। এই শেষ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়লাভ করলে টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলায় জয়লাভের দলভেদে সম্মান লাভ করবে।

ক্রিকেট খেলার রীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে বার্বাদোসের তৃতীয় টেস্ট খেলাটি 'ল্যান্স গিবসের খেলা' নামে অভিহিত করে-ছিল। চতুর্থ টেস্ট খেলায় সেই সম্মান পলি উমরিগড়ের প্রাপ্য। প্রধানতঃ গিবসের বোলিং সাফল্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় টেস্ট খেলায় জয়লাভ করেছিল। পলি উমরিগড়ের বোলিং এবং ব্যাটিং সাফল্যে ভারতীয় দল পরাজয় থেকে আশ্বর্য্য করতে পারেনি সত্য, কিন্তু প্রবীণ টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরিগড় ভারতবর্ষের দারুণ সঙ্কটের সময়ে দক্ষ সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে একজনের পক্ষে যতখানি সম্ভব ভারতবর্ষের মুখ রক্ষা করেছিলেন। তিনি এই ভূমিকা গ্রহণ না করলে ভারতবর্ষের অবস্থা আরও শোচনীয় হ'ত। চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পরাজয়ের ফলান অনেক পরিমাণ হ্রাস করেছেন পলি উমরিগড়। তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসে ১০৭ রান ৫টা উইকেট পান এবং প্রথম ও দ্বিতীয়

ইনিংসে যথাক্রমে ৫৬ এবং নট আউট ১৭২ রান করে বোলিং এবং ব্যাটিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। চতুর্থ দিনে লাগের সময় ৮টা উইকেট পড়ে দলের রাণ ছিল ২৮৫—ভারতবর্ষ মাত্র ৩৮ রাণে অগ্রগামী। উইকেটে তখন উমরিগড় ৬৩ রাণ এবং নাদকানী ২ রাণ করে নট আউট। দলের এই সংকট অবস্থা থেকে সুদক্ষ অধিনায়কের মতই তিনি দলকে ৪২২ রাণ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে নিজে অপরিজিত থাকেন। লাগের পর দলের ১৩৭ রাণ ওঠে। এই ১৩৭ রাণের মধ্যে উমরিগড়ের ১০৯ রাণ, নাদকানীর ২১ রাণ, সারদেশাইয়ের ০ এবং কুন্দরামের ৪ রাণ। এই থেকেই উমরিগড়ের খেলার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাংক ওরেল টেসে জয়লাভ করেন, বর্তমান টেস্ট সিরিজে পর পর দুটো টেস্ট খেলায় তাঁর টেসে জয় হ'ল। খেলায় জয় পর পর চারটে। এবার আর ওরেল ভারতবর্ষকে তৃতীয় টেস্ট খেলায় মত প্রথম ব্যাট করতে দান ছাড়লেন না। প্রথম উইকেট দলের ৫০ রানে এবং দ্বিতীয় উইকেট দলের ১৬৯ রানে পড়ে যায়। দ্বিতীয় উইকেটের জটিলতায় ম্যাকমরিস এবং কানহাই ১২২ মিনিটের খেলায় দলের ১১৯ রান তুলে দেন। লাগের সময় দলের রান ছিল ১০১ (১ উইকেটে)। ম্যাকমরিস ৩৫ এবং কানহাই ৩৮ রান করে নট-আউট ছিলেন। চা-পানের বিরতির সময় রান দাঁড়ায় ২০৪ (৩ উইকেটে)। তখন উই-কেটে খেলছিলেন কানহাই এবং সোবার্স। এর পর আরও তিনটে উইকেট পড়ে যায়। খেলা আঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৬৮ রান তুলে ৬টা উইকেট খুইয়ে। রডরিগস ২৫ রান করে নট-আউট থাকেন। তাঁর সপ্তম উই-কেটের জুড়ি গিবস তখনও কোন রান করেন নি। এই দিনের খেলা খুবই উপ-ভোগ্য হয়েছিলো—ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—খেলার সব বিভাগে। রোহন কানহাই ১৩৯ রান করে উমরিগড়ের বলে এল-বি-ডবলউ হয়ে খেলা থেকে বিদায় নেন। কিছু কম চার ঘণ্টা তিনি খেলেছিলেন। বাউন্ডারী মেরেছিলেন ১৫টা এবং ওভার-বাউন্ডারী ২টা। রোহন কানহাই এই নিয়ে সবশুদ্ধ ২৯টা টেস্ট ম্যাচ খেললেন; সেগুরী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭টা, ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৩টে এবং বর্তমান টেস্ট সিরিজে ২টা।

প্রথম দিনের খেলায় উমরীগড় ৩৯ রানে ৩টে উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে লাণ্ডের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের স্কোর দাঁড়ায় ৩৪৬, ৯ উইকেটে। অর্থাৎ সকালের দৃশ্যটার খেলায় পূর্ব দিনের ২৬৮ রানের (৬ উইকেটে) সঙ্গে ৭৮ রান যোগ হয়েছে আরও ৩টে উইকেটের বিনিময়ে। লাণ্ডের সময় উইকেটে নট-আউট ছিলেন ওরেল (২৬ রান)। লাণ্ডের পরের খেলায় ১০ম উইকেটের জুটি ওরেল এবং হল ব্যাট করতে নামেন। দলের ৪৪৪ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) অধিনায়ক ওরেল প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ১০ম উইকেটের জুটি ওরেল এবং হল ৮০ মিনিটের খেলায় ৯৮ রান তুলে দিয়ে যে কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে দশম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান প্রতিষ্ঠা করেন। দশম উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ড—৫৫ রান (ওরেল এবং রামাধীন), ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, নটিং-হাম, ১৯৫৭। ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার ফলে ওরেল এবং হল যথাক্রমে ৭৩ এবং ৫০ রান করে নট-আউট থেকে যান।

দ্বিতীয় দিনের খেলা হলেরই খেলা। এই দিন হল ৫০ রান করে নট-আউট থেকে ব্যাটিংয়ে যেমন কুতিষের পরিচয় দেন, তেমনি দেন বোলিংয়ে—মাত্র ১২ রানে ভারতবর্ষের ৫টা উইকেট নিয়ে। তবু একটাও বাম্পার বা বাউন্সার ছাড়ে ননি।

ভারতবর্ষের ৩০ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায় এবং এই পাঁচজন



ফ্র্যাংক ওরেল

খেলোয়াড়—সারদেশাই সূতি, মঞ্জরেকার, খেলোয়াড়—সারদেশাই, সূতি, মঞ্জরেকার, জয়সীমা এবং মেহেরা সকলেই হলের বলে আউট। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা হলের বল দিয়ে আরম্ভ। হল তাঁর প্রথম ওভারের পাঁচটা বলেই ভারতবর্ষের ২টা উইকেট পেলেন। ভারতবর্ষের রানের ঘর শূন্য। মেহেরা ৭০ মিনিট এক দিকের উইকেট বাঁচিয়ে খেলে দলের ৩০ রানের মাথায় বিদায় নেন। দলের এই সঙ্গীন অবস্থায় ৩০ রানের মাথায় উমরীগড়ের সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে খেলতে নামেন পতোদির নবাব। এই দিন আর কিছু অঘটন ঘটে ননি। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগেই আলোর অভাবে খেলা বন্ধ হয়। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে

উমরীগড় এবং পতোদির নবাব এই দিন দলের ৩১ রান যোগ করেন।

ভারতবর্ষ বিগত তিনটি টেস্ট খেলায় প্রথম দিনে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ লাভ করেছিল এবং প্রতি ক্ষেত্রে খুব অল্প রানের মধ্যেই দলের চরটে উইকেট পড়ে যায়। চতুর্থ টেস্ট খেলায় ব্যাট করার প্রথম সুযোগ লাভ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এবার দেখা গেল অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি বরং আরও খারাপ, ৩০ রানে ৫টা উইকেটের পতন।

তৃতীয় দিনে দলের ১২৪ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট (পতোদির নবাব) পড়ে যায়। পতোদির নবাব ৯৩ মিনিটের খেলায় নিজের ৪৭ রান করেন। বাউন্সারী মেরেছিলেন ৫টা। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে পতোদির নবাব এবং উমরীগড় দলের ৯৪ রান তুলে দেন। উমরীগড়ের সঙ্গে সপ্তম উইকেটে খেলতে নামেন বোরদে। এর পর উমরীগড় মোট ১৩০ মিনিট খেলে নিজস্ব ৫৬ রানে সোবাসের বলে মেন-ডেনকার হাতে স্টাম্পড আউট হ'ন। উমরীগড় ৬টা বাউন্সারী মেরেছিলেন এবং তাঁর ৫৬ রানই প্রথম ইনিংসের খেলায় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান হয়েছিল। পতোদির নবাব এবং উমরীগড়ের বিদায়ের পর দলের আবার ভাঙ্গন শুরুর হয়। বোরদে একদিকের উইকেট বাঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে ছিলেন। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা ১৯৭ রানে শেষ হয়। বোরদে ৮০ মিনিট খেলে ৪২ রান করেন। লাণ্ডের সময় স্কোর



ওয়েসলে হল



পলি উমরীগড়



সেলিম দুরাণী

ছিল ১৭৯, ১ উইকেটে। উইকেটে খেল-
ছিলেন বোরদে এবং কুন্দরাম। লাগের
পর ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২০ মিনিট
টিকে ছিল এবং এই সময়ে ১৮ রান
যোগ হয়েছিল। তৃতীয় দিনে ভারত-
বর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলায় ওয়েসলে
হল বল করেননি। এই দিন রডরিগস
৩টে এবং সোবার্স ২টে উইকেট পান।

ভারতবর্ষ ২৪৭ রানের পিছনে পড়ে
‘ফলো-অন’ করতে বাধ্য হয়। আলোচ্য
টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে
ভারতবর্ষের এই প্রথম ‘ফলো-অন’ করার
লাজনা। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় প্রথম
আঘাত দিলেন স্টেয়ার্স দলের ১৯ রানের
মাধ্যম; স্টেয়ার্সের বলে জয়সীমা ধরা
পড়লেন মেনডোনকার হাতে। বিজয়
মেহেরার সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে জুটি
বাঁধেন সেলিম দুরানী। এই জুটিই শেষ
পর্যন্ত ভারতের মুখ রাখলেন। ১৩৬
মিনিটের খেলায় দ্বিতীয় উইকেটের
জুটি মেহেরা এবং দুরানী ১৪৪ রান
তুলে দেন; মেহেরা ১৫৫ মিনিটে ৬২
রান করে খেলা থেকে বিদায় নেন।
বাউন্ডারীর মার দেন ৭টা। মেহেরার
খেলায় বিশেষ কোন চটক ছিল না, তিনি
সোজা ব্যাট দিয়ে খেলে যান। আলোচ্য
টেস্ট সিরিজে তাঁর এই ৬২ রানই
ওপেনিং ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ রানের
রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়েছে।

মেহেরা এবং দুরানীর দ্বিতীয় উই-
কেটের জুটি ভাঙতে ওরেল ৬ জন
বোলার লাগিয়েছিলেন এবং ১৩৬ মিনিট
খেলার পর তবে হলের বলে মেহেরা
বোল্ড-আউট হন। নির্দিষ্ট সময়ে
ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ১৮৬, ২ উই-
কেটে, দুরানী ৯১ রান এবং মঞ্জরেকার
৯ রান করে এই দিনে নট-আউট থেকে
যান। তৃতীয় দিনে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার
খেলায় ভারতবর্ষ ৩২২ রান করে—প্রথম
ইনিংসের খেলায় ৫ উইকেটে ১৩৬ রান
এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২ উই-
কেটে ১৮৬ রান। ‘ফলো-অন’ করা এবং
ইনিংস পরাজয়ের লজ্জা থেকে রেহাই
পাওয়ার চেষ্টায় ৫ই ঘণ্টার খেলায় এত
রান ওঠে।

চতুর্থ দিনের খেলার সূচনার আবার
ভারতীয় দলের ভাঙ্গান মাথা চাড়া দিয়ে
দেখা গয়। পূর্ব দিনের ১৮৬ রানের
(২ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ৬ রান যোগ
হল এদিকে উইকেট পড়লো ২টো—
মঞ্জরেকার (১৩ রান) এবং পরোদির
নবাব (৯ রান) খেলা থেকে বিদায়

নিলেন। পঞ্চম উইকেটে দুরানীর সঙ্গে
খেলেতে নামেন উমরীগড়। এই জুটি
ভেঙ্গে যায় দলের ২২১ রানের মাধ্যম—
সেলিম দুরানী ১০৪ রান করে
সোবার্সের বলে রডরিগসের হাতে আটকে
পড়েন। দুরানী ১১৫ মিনিট খেলে তাঁর
শতরাণ পূর্ণ করেন। টেস্ট খেলায় এই
তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী; ওয়েস্ট ইন্ডিজের
বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজে
ভারতবর্ষের পক্ষেও প্রথম সেঞ্চুরী।
দুরানী তাঁর ৯৯ রানের মাধ্যম সোবার্সের
বলে মিড-অনে ওরেলের হাতে একটা
‘ক্যাচ’ দিয়েছিলেন; ওরেল ‘ক্যাচটা’
হাতে রাখতে পারেন নি, ফেলে দেন।
উমরীগড়ের জুটি দুরানী, স্মিথ,
বোরদে এবং সারদেশাই একে একে
খেলা থেকে বিদায় নিলেন। দলের
২৭৮ রানের মাধ্যম ৮ম উইকেট
(সারদেশাই) পড়ে যায়। ৯ম উইকেটে
উমরীগড়ের সঙ্গে খেলতে নামেন
নাদকানী। লাগের সময়ের স্কের খুবই
মলিনমুখ—২৮৫ রান (৮ উইকেটে);
উইকেটে ছিলেন উমরীগড় (৬৩ রান)
এবং নাদকানী (২ রান)। চতুর্থ দিনের
প্রথম দু’ ঘণ্টার খেলায় দলের ৬টা
উইকেট পড়েছে, পূর্ব দিনের ১৮৬
রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ৯৯ রান
যোগ হয়েছে।

ডরল চৌকস খেলোয়াড় সেলিম
দুরানীর খেলা খুবই উপভোগ্য হয়ে-
ছিল। দলের ভাঙনের মুখে তিনি
দ্রুতর সঙ্গে খেলেছিলেন। তৃতীয়
দিনে দলের ১৯ রানের মাধ্যম তিনি
দ্বিতীয় উইকেটে মেহেরার সঙ্গে
খেলেতে নামেন এবং ১৩৬ মিনিটের
খেলায় দ্বিতীয় উইকেটে দলের মূল্যবান
১৪৪ রান তুলে দেন। চতুর্থ দিনে
দলের ২২১ রানের মাধ্যম তিনি
সোবার্সের বলে রডরিগসের হাতে বল
তুলে দিয়ে খুব আনাড়ীর মত আউট
হয়েছিলেন। তাঁর ১০৪ রান তুলতে
২০০ মিনিট সময় লাগে, বাউন্ডারী
করেন ১৫টা। এই সময় ভারতবর্ষ মাত্র
২৬ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল।

লাগের পরের খেলা উমরীগড়েরই
খেলা। যেমন তৃতীয় টেস্টে লস্‌ গিবস
মাত্র ৬ রানে ভারতবর্ষের ৮টা উইকেট
নিরে ভেঙ্কির খেলা দেখিয়েছিলেন,
তেমনি মারের খেলা দেখান পলি
উমরীগড় চতুর্থ দিনের লগের পরের
খেলায়। ভারতবর্ষের লাগের স্কের
(৮ উইকেটে ২৮৫ রান) দেখে ভারত-

বর্ষের অতি বড় গোড়া সমর্থকও বেশী
কিছু আশা করেননি। উমরীগড় যে
অন্য রকম আশা করেছিলেন, তা তাঁর
খেলাতেই প্রমাণ পাওয়া গেল। তিনি
তাঁর ১৭ এবং ২৬ রানের মাধ্যম ‘চাম্প’
দিয়ে খুব জোর বেঁচে যান। এই দু’টি
ঘটনা এবং দলের সংগীন অবস্থা শেষ
পর্যন্ত তাঁকে দুরবার করে তুলে। হল
এবং স্টেয়ার্সের ব্যাপার এবং বাউন্সার
বল তাঁকে বিপদমুখ বিচলিত করতে
পারেনি। হলের এক ওড়ার বলে
উমরীগড় ১৪ রান তুলে দেন—দুটো
বলে ‘হুক’ করেন। দলের ৯ম উইকেট
(নাদকানী) পড়ে যায় ৩৭১ রানের
মাধ্যম। ৯ম উইকেটের জুটিতে ৮৭
মিনিটের খেলায় নাদকানী এবং
উমরীগড় দলের অতি মূল্যবান ৯৩ রান
তুলে দেন। ভারতবর্ষ ১২৪ রানে
অগ্রগামী হয়। নাদকানী দেড় ঘণ্টা
খেলে ২৩ রান করে দুর্ভাগ্যক্রমে রান
আউট হন। শেষ উইকেটে খেলতে
নামেন কুন্দরাম। কুন্দরাম এক ঘণ্টা
খেলে মাত্র ৪ রান করেছিলেন, কিন্তু
তাঁর এই রানটাই বড় ছিল না—উইকেটে
টিকে থাকাই বড় ছিল। কুন্দরাম এবং
উমরীগড়ের ১০ম উইকেটের জুটিতে
দলের ৫১ রান ওঠে যায়। দলের
৪২২ রানের মাধ্যম কুন্দরাম গিবসের
বলে ড্রাইভ মেরে রডরিগসের হাতে ধরা
পড়ে আউট হন। চতুর্থ দিনের খেলায়
কোন ফাফ্ট বোলারই উইকেট পাননি।
এই দিনের ৮টা উইকেট পড়ে—গিবস
পান ৪টে এবং সোবার্স ৩টে। নাদকানী
রান আউট হন। পলি উমরীগড় ১৭২
রান করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন।
শেষদিকে উমরীগড় পরিশ্রান্ত হয়ে
পড়ার কয়েকটা ‘চাম্প’ দিয়েছিলেন।
কিন্তু এইগুলি দিয়ে তাঁর খেলা ফলান
করা যায় না। দলের যখন ৪ উইকেটে
পড়ে ১৯২ রান, তখন ৫ম উইকেটে
দুরানীর সঙ্গে উমরীগড় খেলতে
নামেন। তখনও ভারতবর্ষ ৫৫ রানের
ব্যবধানে পিছনে পড়েছিল। দলের ৪২২
রানের মাধ্যম ভারতবর্ষের দ্বিতীয়
ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ ১৭৫ রানে
অগ্রগামী হয়। কিন্তু উমরীগড় ১৭২
রান করে নট আউট থাকেন। ক্রিকেট
খেলায় যত রকমের দর্শনীর মার আছে
উমরীগড় তারই যেন প্রদর্শনী খুলে
দিয়েছিলেন চতুর্থ দিনের খেলায়। মাঠের
দর্শক-সাধারণ তাঁর খেলা দেখে পরম
ভূষিত পেয়েছিলেন—চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট
খেলায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একমাত্র তিনিই

আলোচ্য টেস্ট সিরিজে স্থাপন করেছেন। উমরীগড় তার এই ১৭২ রান তুলতে ২৪৮ মিনিট সময় নিয়োজিলেন, বাউন্ডারী মেরেছিলেন ২২টা। ২০৩ মিনিটে তার ১৫০ রান পূর্ণ হয় এবং শেষের ৫০ রান তুলে দেন ৪৭ মিনিটে। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে উমরীগড়ের এই প্রথম সেঞ্চুরী এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় সেঞ্চুরী। পূর্বের সেঞ্চুরী ১১৭ রান, কিংসটন ১৯৫২-৫৩ এবং ১০০ রান, দ্বিগিদাদ (৬ম টেস্ট), ১৯৫২-৫৩। উমরীগড়ের এই নট আউট ১৭২ রানই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব রেকর্ড : ১৬৩ নট আউট—এম এল আপ্তে, কিংসটন, ১৯৫২-৫৩। এই নিম্নে উমরীগড়ের টেস্ট সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২টা, ৫৮টা টেস্ট খেলায়। সদ্য সমাপ্ত চতুর্থ টেস্ট খেলা ধূবে উত্তর দেশের সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়াল—ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩২ (১৯৬২ সালের ৪টে সেঞ্চুরী) এবং ভারতবর্ষ ১৩ (১৯৬২ সালে ২টা সেঞ্চুরী)।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭৬ রান তুলতে এই দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং এক ঘণ্টার সময়ে কোন উইকেট নষ্ট না করে ২৩ রান তুলে দেয়।

পঞ্চম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলতে তিনটে উইকেট হারাতে হয়। চা-পানের বিরতির নির্দিষ্ট সময় থেকে



রোহন কানহাই

৮ মিনিট আগে জয়-পরাজয়ের নিশ্চিত হয়ে যায়। লাগ্নের সময় স্কোর ছিল ৯০, কোন উইকেট না পড়ে। ম্যাকমারিস ৫৪ এবং হাট ২৭ রান করে নট-আউট ছিলেন।

৥ প্রদর্শনী ক্রিকেট ॥

বোম্বাইয়ে কমনওয়েলথ একাদশ দল বনাম ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাবের সভাপতির একাদশ দলের চারদিনের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলাটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়া'র সভাপতির একাদশ দলের অধিনায়ক রামচাঁদ টেসে জয়লাভ করেও কমনওয়েলথ দলকে প্রথম ব্যাট করতে ছেড়ে দেন। প্রথম দিনের খেলায় ৫ উইকেট পড়ে তাদের ৪৩৫ রান ওঠে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান অস্ট্রেলিয়ার আয়ান ক্রেগ (১০১ রান) এবং বিবি সিম্পসন (১০৪ রান) সেঞ্চুরী করেন। এই দু'জন খেলোয়াড়ের প্রথম উইকেটের জুড়িতে দলের ২০৮ রান ওঠে। ইংল্যান্ডের টম প্রেভিনী ও রানের জন্যে সেঞ্চুরীর সম্মান থেকে বঞ্চিত হন।

দ্বিতীয় দিনে কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংস ৫১৮ রানে শেষ হলে সভাপতির একাদশ দল ব্যক্তিগত সময়ে ৩

উইকেট খাইয়ে ২২০ রান তুলে দেয়। সুধাকর অধিকারী ১২৩ রান করে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে সভাপতির একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ৪৭২ রানে শেষ হলে কমনওয়েলথ দল ৪৬ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। অধিকারী উত্তর দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৫০ রান করেন। এইদিনের খেলায় কমনওয়েলথ দলের চারটে উইকেট পড়ে গিয়ে ১১৯ রান দাঁড়ায়।

চতুর্থ দিনে কমনওয়েলথ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৩ রানে শেষ হয়। বাকি গুণ্ডে ৯৪ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পান। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায় সভাপতির একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২১৪ রান উঠেছে ৬টা উইকেট পড়ে। ফলে খেলাটি ড্র যায়।

কমনওয়েলথ দল : ৫১৮ রান (বিবি সিম্পসন ১০৪, আয়ান ক্রেগ ১০১, টম প্রেভিনী ৯৫, এডার্টন উইকস ৫৫, রমণ সুন্দরামাও ৫১, রিচি বেনো ৭৩। সিভালকর ১২৯ রানে ৫ এবং বালু গুণ্ডে ১৬১ রানে ৪ উইকেট)।

ও ২৫৩ রান (বেনো ৬৪, সুন্দা রাও ৪০। রাজেন্দর পাল ৪৪ রানে ২, বালু গুণ্ডে ৯৪ রানে ৪, সিভালকর ৪৪ রানে ২ এবং দিওয়াদকার ৪৫ রানে ২ উইকেট)।

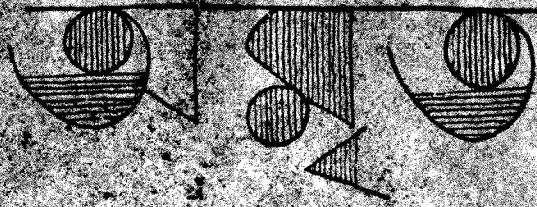
সি সি আই প্রেসিডেন্ট দল : ৪৭২ রান (সুধাকর অধিকারী ১৫০, আমরোলিওরলা ৯০, জি এস রামচাঁদ ৬১। সিম্পসন ১২৯ রানে ৩, রোডস ৬৩ রানে ২, রামাশ্রী ৯৪ রানে ২ উইকেট পান)।

ও ২১৪ রান : (৬ উইকেটে)।

ভৌসলে ৫২, আমরোলিওরলা ৪৭ এবং সুধাকর ৪২। বেনো ৫৭ রানে ৫ উইকেট)।

হাণিয়া কোম্বন্ধি ফাইলোরিয়া

বিনা অস্ত্র কেবল সেবনীয় ও বাহ্য প্রথম দ্বারা স্থায়ী আরোগ্য হয় ও আর পুনরাব্রমণ হয় না। রোগ বিবরণ লিখিয়া নিম্নোক্ত লিউন। হিম্ব বিসার্চ হোম, পোর্ট ব্লক নং ২৫, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৭৫৫।



১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৫০শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পাইসা
শুক্রবার, ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 20th April, 1962,
40 Naya Paise.

সম্প্রতি দিল্লিতে 'সাহিত্যসাধনার উদ্যোগে সন্তম বেতার-সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে ভারতের তেরটি আঞ্চলিক ভাষার প্রতিনিধি হিসাবে ১২৪ জন সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। তথ্য ও বেতার দপ্তরের নবনিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেষ্ট্রী সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন যে, সমগ্র দেশের মধ্যে জাতীয় এবং ভাষাগত সংহতির জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষার পরিচয় সত্ত্বেও এক নতুন ধরনের ঐক্যবোধ জাগ্রত করা উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যিকগণকে স্বকল্যাণ-কল্যাণ-পদ্ধতি 'মিনারে' বিচ্ছিন্ন না থেকে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতিকে প্রসবশালী করে জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অনুরোধ জানান।

এ ধরনের অসুযোগ আমরা আগেও শুনেছি: শ্রীরেষ্ট্রী তাঁর নতুন ভাষণে যে সেই পুরনো কথাই নতুন করে বলবেন এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। এবং বক্তৃতার মধ্যে তিনি সাহিত্যিকদের যে 'গজদন্ত মিনার' ছেড়ে আসার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন তার মধ্যেও নতুনই বিশেষ কিছু নেই।

কিন্তু 'গজদন্ত মিনার' কথাটির তাৎপৰ্য কী? শিল্পের জন্যেই শিল্প, কিংবা সমাজের জন্যে শিল্প, এ তর্ক বহুকালের। কিন্তু সাহিত্যিকরাও মানুষ এবং ভিত্তিভরে ডান হাতে হোক বা অনিচ্ছাসত্ত্বে বা হাতেই হোক তাঁরা সমাজের পায়ের পাতা দিয়ে দিচ্ছে থাকেন। তর্কটা নিতান্তই মানসিক প্রবণতার, এবং তর্ক কল্পনা কারো মনের স্বাধীন বদলানো যায় কিনা তা খুবই সন্দেহের বিষয়।

তবু শ্রীরেষ্ট্রী এবং তাঁর সমসাময়িক বক্তাদের অসুবিধেটাও আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। তাঁরা শিল্প সাহিত্যের মধ্যে একটা অলৌকিক নেতৃত্ব আশা করেন। একথা অবশ্যই ঠিক যে মানুষের চিন্তা-ভাবনার উপর শিল্পসাহিত্যের প্রভাব অপরিহার্য। কিন্তু শিল্পী কিংবা সাহিত্যিকগণ ইচ্ছা করলেই একটা সব পেয়েছিঁর দেশ তৈরি করতে পারেন এ ধারণা অমূলক। আর যদি তা পারেনও তবে সেটাও কি এক ধরনের 'গজদন্ত মিনারেরই ব্যাপার' হয়ে উঠবে না?

সাহিত্যিকদের যখন গজদন্ত মিনার ছাড়ার অনুরোধ জানানো হয় তখন নিশ্চয়ই বক্তাদের উদ্দেশ্য থাকে এই যে, সাহিত্যিকরা নিছক কল্পনাবিলাস ছেড়ে মাটির পৃথিবীর রূপ বাস্তবতার মধ্যে নেমে আসবেন। এ প্রস্তাব যে অত্যন্তই যুক্তিসঙ্গত, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই।

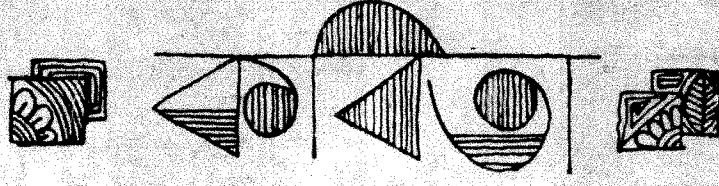
কিন্তু কথা হল এই যে, বাস্তবের মধ্যে যদি শ্রীরেষ্ট্রীর আকাঙ্ক্ষিত সদগুণগুলির বিকাশের পথ ভ্রান্তি না হয় তাহলে কেবল সাহিত্যের মধ্যে সেগুলির রূপায়ণ ঘটে থাকলেও ঐক সেটা কল্পনাবিলাসের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে না?

আসলে, বিখ্যাত ইংরাজ কবি-সমালোচক এলিয়ট যে বলেছেন, প্রত্যেক যুগই তার প্রাপ্য সাহিত্য পায়, সেই কথাই সত্য। অর্থাৎ সাহিত্য ভূইফোড় জিনিস নয়, বাস্তবে যে অবস্থা থাকে, সাহিত্যেও ঘটে মোটামুটি তারই প্রতিফলন।

কাজেই জাতীয় সংহতি ইত্যাদির জন্যে সাহিত্যিকগণের কাছে আবেদন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবেও যাতে সে সংহতির বাঁজ অঙ্কুরিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। নয়তো বাস্তবে যেমন চলছে তা চলতে দিয়ে সাহিত্যিকদের কাছে একটা স্বপ্নময় সংহতির ভাবমণ্ডল প্রত্যাশা করলে সেটা হবে দুর্ভাগ্যেরই নামান্তর।

শ্রীরেষ্ট্রী অবশ্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে হিন্দি সাহিত্যিকদের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় দক্ষতা অর্জনের কথা বলেছেন। এবং অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা যেন হিন্দি সাহিত্যকে ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় এবং আঞ্চলিক সাহিত্য-গুলিকে হিন্দি ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ দায়িত্ব হিন্দি সাহিত্যিকরা একেবারে গ্রহণ করেননি এমন বলা যায় না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে অন্যত্র। হিন্দি সাহিত্যিকগণ যেহেতু ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দিকে একচ্ছত্র প্রভাবের অধিকারী বলে মনে করেন, সেইহেতু তাঁদের আচার-আচরণের মধ্যে প্রকাশিত হয় এক ধরনের অধীরতা এবং অরজা। আঞ্চলিক ভাষাগুলির কাছে এই মনোভাব যে বিরক্তি ও আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে তা না বললেও চলে। এবং এইভাবেই তৈরি হয় পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষ, জাতীয় সংহতির পক্ষে যা সব থেকে বড় বাধা।

শ্রীরেষ্ট্রী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যদি এদিকে বিশেষ মনোযোগী হন, এবং হিন্দির উদগ্র আধিপত্যাকান্ধা প্রশমিত করতে পারেন, তাহলে জাতীয় সংহতির অনুকূল একটা বাস্তব অবস্থা দেখা দিতে পারে। তখন আশাকারী সাহিত্যিকগণকে আর 'গজদন্ত মিনারের' কথা শুনতে হবে না, এবং এমন সাহিত্যই সৌন্দর্য রচিত হবে যা আমাদের জাতীয় সংগীতে বর্ণিত ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের জনগণমনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।



শান্তিনিকেতন ১৯৬১

অসীম রায়

সন্ধ্যায় এমন এক ব্যাপ্তি আছে যা প্রায় সূর্যের
রূপকথা ফুটপাথে দোকানের নিওন আলোতে,
এখানে তা এত সত্য এত মৃদু ধীর আলিঙ্গনে
অবলুপ্ত করে দেয় জল, জলে ছায়া, গাছ, গরু,
দিনান্তের পাখী, ঘরে ফিরে চলা সাঁওতাল, মাঠ,
এত স্পর্শকাতর তুলিতে তোলে আলো শূন্য রেখে দিয়ে যায়
একটু আকাশ যেন একটি প্রার্থনা
তা কি ঈশ্বর বা আমাদেরই অন্তরের সাধ
যেমন ঘনায়মান আধারে হৃদয় শূন্য চায়
ক্ষণ যদি বাংলাদেশ বাংলাদেশ হয়।



একটি উজ্জ্বল মাছ

বিনয় মজুমদার

একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যতঃ সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেল—এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে আপক রক্তিম হল ফল।

বিপন্ন মরাল ওড়ে, অবিরাম পলায়ন করে,
যেহেতু সকলে জানে তার সাদা পালকের নীচে
রয়েছে উদগ্র উষ্ণ মাংস আর মেদ;
স্বপ্নায়, বিশ্রাম নেয় পরিশ্রান্ত পাহাড়ে পাহাড়ে।
সমস্ত জলীয় গান বাষ্পীভূত হয়ে যায়, তবু
এমন সময় তুমি, হে সমুদ্রমৎস্য, তুমি.....তুমি.....

কিম্বা দ্যাখ, ইতস্তত অসুস্থ বৃক্ষেরা
পৃথিবীর পল্লবিত ব্যাপ্ত বনস্থলী
দীর্ঘ দীর্ঘ ক্রান্তিবাসে আলোড়িত করে।
তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।

জানালা

অশোক চট্টোপাধ্যায়

সহসা দুচোখ তুলে জানালার পানে যদি চাই
স্তম্ভিত অরণ্যে বাজে অতিকায় পতনের ধ্বনি,
গিরিপথ সমাচ্ছন্ন, ঢেউ ওঠে প্রবল চুড়ায়,
শূন্যতা হারায় বর্ণ, তন্মূহূর্তে আমার নিধন।

এখনো অসংখ্য ভুল পড়ে আছে প্রহরীর মত
মৃত্যুর অমোঘ স্মৃতি দীর্ঘজীবী স্বপ্নে ও শরীরে,
পরিত্যক্ত প্রাসাদের অশ্বকার বিষয় গম্বুজে
দেখিনি কি কোনদিন ক্ষুদ্রতম পুষ্পের প্রয়াস।

প্রত্যাঘাতে রুড়তায় গড়েছি সহস্র প্রতিরোধ;
অভ্যাস দিয়েছে মূর্ত্তি, অপমানে দলিত কুসুম
অভিশাপে বিশ্ব করে—মনোরম চিহ্নিত জানালা
লাবণ্যের মূখোমুখি আমি মৃত, আমি পরাভূত।

দুর্দশ

জৈমিন

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প আছে, নাম 'হতাশ প্রেমিক'। এবারের 'পূর্বপক্ষে' আমি সেই গল্পের লিখন-পদ্ধতি অনুসরণ করলাম। ডায়েরির আঙ্গিকে লেখা ঐ গল্পের প্রথম কয়েকটি লাইন এইরকম :

৩১শে চৈত্র। রাত্রি ১০টা।

হে ১৩২৮ সাল! আজ কি সত্য সত্যই তুমি আমাদের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছ? আজ নিশা-শেষে, উষালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সত্যই কি অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইবে? তোমার পায়ে ধরি ২৮ সাল, এত শীঘ্র তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাইও না, আরও কিছুদিন অবস্থিতি কর—তোমায় যে আমি বুক ভরিয়া ভোগ করিতে পাইলাম না। ভাই ২৮ সাল, তোমায় আমি বড় ভালবাসি, তাই তোমার আসন্ন বিরহে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে।.....

প্রাণ জৈমিনেরও কেঁদে উঠেছিল। ২৮ নয়, ৬৮ সালের দৃষ্টে। তাই সে লিখেছে :

ভাই ১৩৬৮ সাল!

তুমি আমাদের কাছে চিরবিদায় নিয়ে গেলে। কেন গেলে ভাই? তুমি কি মনে কর, সময় শূন্য ঘাড়ির কাঁটা, ক্যালেন্ডারের পাতা, বয়স মাপার নিরিখ? না তা তো নয়। সে যে শত-সহস্র মানব-মানবীর স্মরণের অঙ্গান কুসুম, তা কি তুমি জানো না?

কী জানি কেন ফুলের সঙ্গে সময়ের তুলনা দিলাম। হয়তো ফুলের মধ্যে মধু থাকে, সেই ছিল আমার আকর্ষণ। কিন্তু মধুর সঙ্গে মোমাছি, এবং মোমাছির সঙ্গে তার হুল যে অগাঙ্গীভাবে বৃদ্ধ তা কি আমি ভুলে গেলাম?

না, ভুলিনি। ভাই ১৩৬৮ সাল। তোমার মধু আর হল, দুই-ই আমার অন্তরে চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেল।

আহা, কি সুন্দর ছিল এক বছর আগেকার সেই নতুন বছরের আরম্ভটি। সৌদিনও এমনই নিদাঘ-তাপে আইচাই করছিলাম বটে, কিন্তু সৌদিন যে আমার এক বছর বয়স কম ছিল। এই কম থাকাটা যে কত বেশী থাকা, তা আমার মতো

বাক - সাহিত্যের বই

গ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

রবীন্দ্রায়ণ

মজবুত কাপড়ে বাঁধাই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ
প্রতি খণ্ডের দাম দশ টাকা

সতীনাথ ভাদুড়ীর

জ ল ব্র মি

'জাগরী' উপন্যাস সতীনাথ ভাদুড়ীর চিরস্মরণীয় কীর্তি, কিন্তু উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের রচয়িতা হিসেবেও তিনি যে শ্রেষ্ঠ কথাসিঙ্গীদের অন্যতম 'জলদ্রমি' গল্পসংগ্রহের প্রতিটি গল্পই তার উজ্জ্বল উদাহরণ। 'মহিলা-ইন-চার্জ' গল্পের নাটোরাল, 'কুকলি'র রেখা, 'দাম্পত্য সীমাস্তের' অসীমা ইত্যাদি আশ্চর্য চরিত্র কাহিনীর পরিধি ছাড়িয়েও জীবন-সত্যের নানা অনুস্মারিত মহিমায় চিরঅঙ্গান।

দাম—০.০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নতুন বই

অযাত্রায় জয়যাত্রা

৪.৫০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
সাংস্কৃতিকী ৫.৫০

বিনয় ঘোষের

সুতানুটি সমাচার ১২.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ রস-রচনা

বিনোদী ডিরোজিও ৫.০০

হসন্তী ৪.৫০

বিকর্ণ-রচিত সুবৃহৎ উপন্যাস
নৌমহারণ্য ২.৫০

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস

জরাসন্ধের সার্থক উপন্যাস

নিশাপদ্ম

আশ্রয়

(২য় মুদ্রণ) ৪.০০

(দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৩.৫০

শংকর-এর জনপ্রিয়তম বই
এক দুই তিন ৪.০০

পাড়ি

(পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল)

(৫ম মুদ্রণ) ৩.৫০

বিমল মিত্রের

সৈয়দ মজতবা আলীর

স্ত্রী (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৪.০০

শ্রেষ্ঠ গল্প ৪.০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
অনির্মিতা ৫.০০

বনফুল-এর নতুন বই

দুরবীন ৪.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর

সুবোধ ঘোষের

রক্তের স্বাদ লোনা ৩.০০

চিত্তচকোর

কন্যা-কলঙ্ক-কথা ৩.০০

(২য় মুদ্রণ) ৩.০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

বিদেহী

(২য় মুদ্রণ) ২.৫০

নাট্যগৃহ ২.০০

বাক-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ২

বিগতযৌবন মানুষ মর্মে মর্মে অনুভব করে।

কিন্তু যৌবন নিয়ে শোচনা করিনে। কে না জানে, আয়ুর মতো যৌবনও পশ্চপত্রে নীর, যতোক্ষণ থাকে সেই-টুকুর জন্যেই আমরা কৃতজ্ঞ। আরো বেশী থাকে না কেন, এ নিয়ে ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই। অতএব যৌবনের কথা থাক। কিন্তু যৌবন যেতে শুরুর করলেই গায়ের চামড়া টিলে হয়, চুল পাকে, দাঁত পড়ে, এগুলো আমি ভুলে থাকতে পারিনে। কিংবা আমি ভুলতে চাইলেও লোকে ভুলতে দেয় না। আমার দুঃখ সেইখানেই। ভাই ৬৮ সাল, লোকের কাছে আমাকে হেয় করে তোমার কী লাভ হল?

জানি, আমার এই বিশেষ চেহারাটিরও কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধে তুমি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রেখেছ। আমি ইচ্ছে করলে এখন জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দিতে পারব, আরো বেশী করে সভা-সমিতির সভাপতি হতে পারব, এমন কি বিশেষজ্ঞ-রূপে দেশ-বিদেশেও আমন্ত্রণ পেতে পারি। তার-পর ধীরে ধীরে আসবে সেইদিন যেদিন আমি নানা উপলক্ষে কাগজে বিবৃতি দেব। লোকে হাততালি দেবে, কিন্তু পড়বে না। আমি হাওড়া ব্রিজ, এসপ্ল্যান্ড, কিংবা মেডিক্যাল কলেজের মতো একটা নিত্য-উচ্চারিত নামে পরিণত হব।.....কিন্তু আমার যে কামা পায়। ভাই ৬৮ সাল, তুমি আমাকে যাদুঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে গেলে।

কিন্তু তুমি চলে গেছ, এসব কথা বলে আর লাভ কি? বরং আমি সেইদিনের কথাই বলি যখন তুমি ছিলে। ভাই ৬৮ সাল, তুমি জানো না, তুমি কতো মহৎ। কালচক্রের অমোঘ নিয়মে যেদিন পঞ্জিকায় ১২৬৮ সালের আবির্ভাব ঘটে সেইদিনই স্থির হ'য়ে গেছে তুমি চিরস্মরণীয় হবে। কারণ ঐ বছরেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করে-

ছিলেন। ১২৬৮ সালের একশ' বছর পরে যে তোমাকে আসতেই হবে এ তো সোজা অঙ্ক। তাই রাজ্য ছেলে রাজা হওয়ার মতো রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেছে, ১২৬৮ সালের মতো তোমারও কপাড়ে পড়বে অক্ষয় কীর্তির চন্দন-তিলক।

সেই গোরব তুমি কড়া-গাডায় আদায় করে নিয়ে গেছ। বাঙালী যে এতো রসগ্রাহী জাত, এর আগে তা কে এমন মর্মে মর্মে টের পেয়েছে বল তো? আমরা দুর্বল, বিপর্যস্ত, অবহেলিত যাই হই না কেন, কলম ধরতে ভয় পাইনে। বরং কলম দেখলেই আমরা চঞ্চল হ'য়ে উঠি। ভাই ১৩৬৮ সাল, একবার চিন্তা করে দেখ, গত এক বছরে কতো প্রবন্ধ আমরা লিখেছি! সত্যি বলছি, একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, বাঙালীর ছেলে আর যাতেই ভয় পাক, প্রবন্ধ লিখতে ভয় পায় না। বিশেষ করে, বিষয়টা হয় যদি রবীন্দ্রনাথ। ভূমা, জীবনদেবতা, আপন মনের মাধুরী ইত্যাদি কথা এমন সহজে আমাদের কলমে আসে যে, নিজেরাই আমরা মুগ্ধ হ'য়ে যাই। বাস্তবিক, বীজগণিতের ফর্মুলার মতো একেও এক ধরনের রবীন্দ্র-বোধ ফর্মুলা বলা যেতে পারে। এই ফর্মুলা আমরা বাল্য-

॥ নববর্ষের সম্ভাষণ ॥

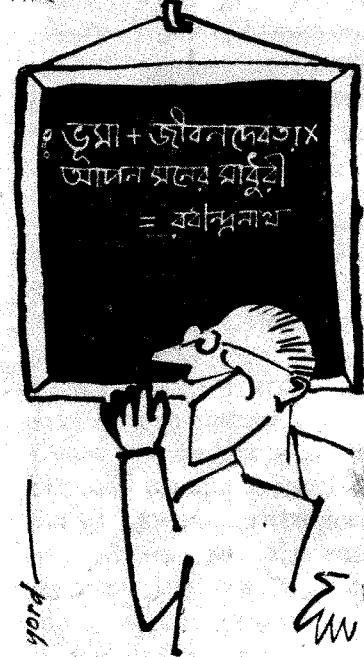
'অমৃতের' অগণিত পাঠক-পাঠিকা, পৃষ্ঠপোষক এবং শুভানুধ্যায়ী গণ নববর্ষ উপলক্ষে আমাদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আপনাদের অকৃত্রিম সহযোগিতায় অল্পকালের মধ্যেই 'অমৃত' যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তাতে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করি। ভবিষ্যতেও যাতে 'অমৃতের' প্রতি আপনাদের এই প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্যে আমরা সচেষ্ট থাকব।

ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩৬৯
সম্পাদক, অমৃত।

কাল থেকে এমনভাবে রস্তু করেছি যে অন্য কথা ভাববারই কোনো দরকার করে না। এবং ভাবিও না। তুমিই বল ৬৮ সাল, কষা অঙ্ক নতুন ফর্মুলার কষতে গিয়ে একটা গোলমাল করে ফেলা কি খুব গোরবের কথা হতো?

তাছাড়া, তুমি তো জানো, নতুন করে ভাবতে গেলে পড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে পড়া আমাদের অনেকেই হ'য়ে ওঠেনি। আর তার সময়ই বা কোথায়? আমরা কেউ সাহিত্যিক, কেউ অধ্যাপক, কেউ বা রাজ-

নীতিক। সারাদিনই আমাদের কাজ। এর মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথ পড়তে বসলেই হ'য়েছে আর কি! তাহলে আর বক্তৃতা দেব কখন? লিখব কখন? আমরা তাই কয়েকটা সরল রাস্তা বার করেছি। একটা তো আগেই বলেছি, ভূমা+জীবনদেবতা×আপন মনের মাধুরী=রবীন্দ্রনাথ। আরো কয়েকটা নিচে তুলে দিচ্ছি।



১। রামমোহন ÷ দেবেন্দ্রনাথ + উপনিষদ + বৈষ্ণব কবিতা × ইংরাজি রোমান্টিক কবিতা-আধুনিক যন্ত্রণা = রবীন্দ্রনাথ।

২। রবীন্দ্রসঙ্গীত = (ধ্রুপদ + বাউল) ÷ পাশ্চাত্য সঙ্গীত।

৩। রবীন্দ্রচিত্র = আধুনিক মন + কবিতার খসড়া কাটাকুটি × অবচেতন মনের অসুন্দর ÷ অবদমন।

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভাই ১৩৬৮, তুমি গেছ, কিন্তু যে সব অমূল্য শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছে সেজন্যে তুমি আমাদের ধন্যবাদ জেনো। একশ' বছর পর ১৩৬৮ সালে আবার লোকে তোমার কথা মনে করবে। এবং তোমার ৩৬৫ দিনের সামান্য আয়ুতে কী অলৌকিক প্রক্রিয়ার তিরিশ হাজারটি প্রবন্ধের জন্মদান সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে ভেবে কল্কিনারা পাবে না। সেই জন্যেই আমি উপরে কয়েকটি ফর্মুলা লিপিবদ্ধ করে রাখলাম। আশা করি, রবীন্দ্রজন্ম-দ্বিশত-বার্ষিকীর লোকেরা এ জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।

ভাই ১৩৬৮ সাল, আমার কামান নেই, তোমার সম্মানে আমি একশবার নমস্কার জানাচ্ছি। বিদায়, চিরবিদায়!

মৌচাক

ছেলেমেয়েদের নবপুস্তক মাসিক

বার্ষিক চাঁদা : পাঁচ টাকা

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিঃ-১২

তলস্টয় সান্নিধ্য

লিওনিড পাস্তেরনাক

দৃশ্যের মধ্য মুখোমুখি

লিওনিড পাস্তেরনাকের জন্ম-শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে বিগত ৪ঠা এপ্রিল। আজ তাঁর সম্যক পরিচয় জানবার সুযোগ এসেছে বলে পৃথিবীর অজস্র কলারসিক বিশেষ সূখী হয়েছেন। কারণ নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক বোরিস পাস্তেরনাকের পিতাই শূন্য নন, লিওনিড নিজেকে ছিলেন সার্থক স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী। শিল্পের সমস্ত মাধ্যমেই নিজের স্বকীয়তার পরিচয় এবং অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেলেও, প্রধানতঃ পোষ্টেট পেইন্টিং-এই সিম্বলিস্ট ছিলেন তিনি। তুলির আঁচড়ে তাঁর মডেলের দৈহিক প্রতিকৃতিই নয়, প্রকৃতি, চরিত্র আর ব্যক্তিত্বের আলোখ্যও ক্যানভাসের বৃকে তিনি তুলে ধরতে সক্ষম ছিলেন। বীটোভান্‌ থেকে শব্দ করে তলস্টয়, আইনস্টাইন প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বহু ব্যক্তিরই প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন লিওনিড। সমসাময়িক শিল্প-জগতের গুরু বলেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন লিওনিড পাস্তেরনাক।

শেষ-জীবনে, অক্সফোর্ডে বসে লিওনিড রচনা করে গিয়েছেন তাঁর স্মৃতিকথা, ১৯৪৫ সালে দেহত্যাগের আগে। এতদিন সেগুলো অপ্রকাশিতই ছিল। এই স্মৃতিকথায় তলস্টয়-পর্বটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের নতুন কয়েকটি দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন লিওনিড, তাঁর এই লেখনী-চিত্রে।

মাত্র দ্বিশ বছর যখন লিওনিডের বয়স, সেই সময় একদিন সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে বহু-পঠিত এক পত্রিকার প্রতিনিধি এসে তাঁকে জানানো যে, তলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' বইটা সচিত্র করার জন্যে কয়েকজন সক্ষম চিত্রশিল্পীর প্রয়োজন : রোপিন, কিভ্‌-শেকো এবং ভেরেশচাগিন সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন। চতুর্থ শিল্পীরূপে তাঁরা লিওনিডকে চান!

লিওনিড তো এই প্রস্তাব শুনে অবাক। কারণ উপরিউক্ত শিল্পী-তিনজন ইতিপূর্বেই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়েছেন

চিত্র-জগতে; আর লিওনিডের নাম সবে অল্প অল্প ছড়তে শুরু করেছে তখন! বরেন্য শিল্পীহরের সঙ্গে এইভাবে কাজে নামা উচিত কিনা ভেবে শেষপর্যন্ত তিনি সম্মত হয়ে গেলেন।

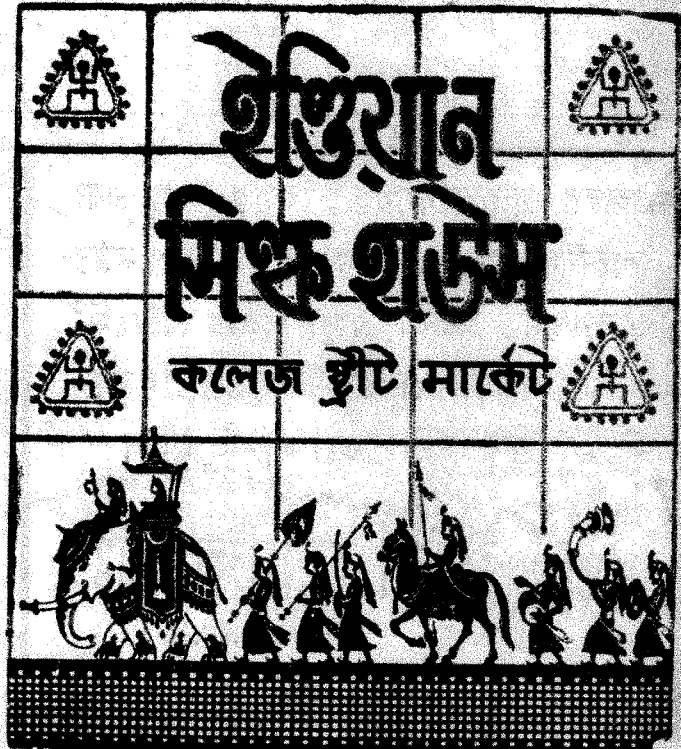
উপন্যাসটির বিভিন্ন দৃশ্য বেছে নিয়ে প্রত্যেক শিল্পী স্বতন্ত্রভাবে কাজে হাত দিলেন। যে-যুগের বর্ণনা দিয়েছেন উপন্যাসিক, সে-যুগের মস্কোর চিহ্নমাণ আর অবশিষ্ট ছিল না লিওনিডের যুগে। বহু বই-পত্র ঘেঁটে বহু গ্রন্থাগারে ধণা দিয়েও সে-যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা করে উঠতে পারলেন না। ভবু আন্দাজে আন্দাজে তিনি কয়েকটি ছবি শেষ করেই ফেললেন, যথাসম্ভব ইতিহাস-নিষ্ঠা এবং বাস্তবতা বজায় রেখে। মাঝে মাঝে লিওনিডের মনে হ'তে লাগল, খোদ উপন্যাসিক যখন মস্কোতেই আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে কিছ্‌ কিছ্‌ নির্দেশ নিয়ে এলে ক্ষতি কি? দ্যাকোভোয়া হেন মহারথী পর্যন্ত গোটের ফাউস্ট

সচিত্র করতে বসে প্রতিটি চিত্র মহাকাব্যের কাছে পাঠাতেন তাঁর অনুমোদনের জন্যে—আর লিওনিড তো সামান্য উদীয়মান শিল্পী তখন। কিন্তু কোনমতেই সাহস করে তিনি তলস্টয়ের মতো বিরাট মহান ব্যক্তিত্বের কাছে যেতে পারলেন না।

এদিকে, ১৮৯৩ সালে, মস্কো আর্টস স্কুলে বড় করে একটা চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন হ'ল। শোনা গেল উন্মোচনের আগেই তলস্টয় আসবেন প্রদর্শনী দেখতে। লিওনিড পাস্তেরনাকের আঁকা বড় একটা ছবিও ছিল প্রদর্শনীতে। ঘটনাক্রমে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতে থাকতেই একদিন চাম্‌ল্যা জাগল, তলস্টয় এসেছেন প্রদর্শনী দেখতে! তলস্টয় যে আসবেন, লিওনিড জানতেন না।

তলস্টয় এসে পড়লেন। “অমায়িক, সরল, আত্মমর্বাদা-সম্পন্ন প্রবীণ ভদ্রলোক যেন এত ভিড়ে একটু বিরতই বোধ করছেন। কী সহৃদয়, সৌজন্যভরা, আপন-করা ব্যবহারেই না তিনি অভিনন্দন জানানো সমবেত শিল্পীদের!..... পঁয়ষাট বছর বয়স হ'লেও প্রাণ-শক্তিভে ভরপুর, বলিষ্ঠ, মনে আর দেহে দায়ুশু সামর্থ্য রাখেন মনে হ'ল।”

ছবির পর ছবি দেখে চললেন তলস্টয়। পেছন পেছন চললেন প্রবীণ-



নবীন অগণিত শিল্পী। সবার পেছনে লিওনিড। হঠাৎ তাঁর কানে এল, প্রবীণ শিল্পী সান্ভিৎস্ক তলস্টয়কে বলছেন, “এই ছবিটি হচ্ছে প্রতিভাবান তরুণ শিল্পী পাস্তেরনাকের আঁকা।” সঙ্গে সঙ্গে তলস্টয় জবাব দিলেন, “বিলক্ষণ চিনি। পাস্তেরনাকের আঁকা ছবি গোড়া থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।” সান্ভিৎস্ক বললেন, “খদি অনুমতি করেন তো শিল্পীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।” “জারি সুখী হব”, তলস্টয় বলা-মাত্র ভিড় ফাঁক করে সবাই পাস্তেরনাককে টোলে দিল সামনে। অল্প দু-চার কথা বলবার পর পাস্তেরনাক জানালেন “ওয়ার অ্যান্ড পীস” সচিত্র করবার কথা। তাঁর উৎসাহিত হয়ে তলস্টয় বললেন, “দয়া করে, যে-কটা ছবি তৈরী আছে, নিয়ে আসুন না আমার ওখানে—আগামী শতাব্দীর আমার ওখানে আপনার চাবের নেমান্তর রইল।”

নির্দিষ্ট দিনে লিওনিড উপস্থিত হলেন তলস্টয়ের বাড়িতে। তাঁকে দেখা-ব্রাই উৎফুল্ল তলস্টয় বললেন, “কই, ছবি এনেছেন? দেখি, কী এনেছেন!” সন্ধ্যা হয় হয়। তলস্টয় বাড়িটার কাছে এগিয়ে গেলেন। লিওনিডের হাত থেকে প্রথম ছবিটা নিয়ে দেখতে লাগলেন। প্রথম বল-নাচের সময় নাতাশা-র সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রে-র পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন পিয়ের বেস্‌কভ; পশ্চাৎপটে সম্রাট প্রথম আলেক্সান্ডার সপার্বদ এসে ঘরে ঢুক-ছেন—এই দৃশ্যটি ছবিতে দেখেই

তলস্টয় আনন্দে চোঁচিয়ে ডাকলেন তাঁর মেরেকে : “তানিয়া, তানিয়া, দেখে যা, দেখে যা একবার কান্ডটা!” তারপর শিল্পীর দিকে ফিরে বললেন, “কী মজা! যখন এই দৃশ্যটির বর্ণনা আমি লিখছিলাম, ঠিক এমনি একটা ছবিই যে আমার মনের চোখে ভাসছিল।” থেকে থেকে এ-কথাটাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উনি বলতে লাগলেন।

তলস্টয়-কন্যা তাতিয়ানা লুভনার সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় করিয়ে দিলেন সাহিত্য-সম্রাট। তাতিয়ানা নিজেও শিল্পী। পিতা আর কন্যার অকৃত্রিম প্রশংসায় লিওনিড যেমন আনন্দিত তেমনি বিরত হয়ে পড়লেন। পরবর্তী আর তিনটি ছবি হল “নেপোলিয়ন ও লাভরুস্কা”, “আহত প্রিন্স আন্দ্রে ও নাতাশা”, এবং “মস্কাতে ফরাসীরা”। চিত্রাকুল গম্ভীর নেপোলিয়নের পাশে মাতাল ফুতিবাজ লাভরুস্কাকে দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন তলস্টয় ছোট্ট ছেলের মতো।

তলস্টয়ের উৎসাহ দেখে সাহস করে লিওনিড ধীরে ধীরে তাঁর প্রথমগুলি পাড়তে লাগলেন। কিন্তু লিওনিডের বিশ্বাসের অবধি রইল না, যখন দেখলেন যে স্বরচিত উইনাসের কোনও অংশই তলস্টয়ের মনে নেই, বোমালুয় সব ভুলে বসে আছেন। অত বড় উপন্যাস “ওয়ার অ্যান্ড পীস” যেন আর-কারো লেখা এই নকম ভাব ও’র।

একে একে তলস্টয় পারিবারের আর-সবাই, বন্ধু-বান্ধবও এসে উপস্থিত

হলেন। তাঁদের সঙ্গে লিওনিডের আলাপ হল। আলাপ হল তলস্টয়-পল্লী সোফিয়া আন্দ্রভনার সঙ্গে। রাশান সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের যাতায়াত এই ড্রায়ং রুমটার।

লিওনিডের স্ত্রী রোজা (কাউফমান, পরে পাস্তেরনাক) ছিলেন বিখ্যাত পিয়ানো-শিল্পী। তাঁর বাজনা শোনে তলস্টয়ের চোখে বইত আনন্দের অশ্রু। লিওনিডের বাড়িতে বসে তলস্টয় পিয়ানো শোনেছেন—লিওনিডের আঁকা এই ছবিটা মস্কার তলস্টয় মিউজিয়ামে আজো দেখা যায়। চাইকভস্কি-র বিশ্ববিদ্রুত Trio-টি তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে : রোজা পাস্তেরনাক পিয়ানো বাজাচ্ছেন, প্রফেসর গ্জিমালি বেহালা, আর প্রফেসর ব্রান্দুকভ বাজাচ্ছেন ডিওলসেল।

রুম্মান্সকভ-মিউজিয়ামে রাম্-রান্টের আঁকা একটি ছবির পাশেই আছে লিওনিড পাস্তেরনাকের আঁকা তলস্টয়ের একটি ছবি, “পান্ডুলিপি শোনানো”। ছবিটি প্রসঙ্গে লিওনিড বলছেন :

“প্রসিদ্ধ শিল্পী-বন্ধু N. N. Gue-কে তলস্টয় তাঁর একটি রচনার খসড়া পড়ে শোনাচ্ছেন—এই দৃশ্যটি আমি এঁকেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আদতে ওটি Gue-কে নয়, আমাকেই তলস্টয় লেখাটা পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তলস্টয়ের সঙ্গে নিজেকে এক-ক্যানভাসে অমর করে রাখা আমার অভিসম্পি ছিল না, অতটা স্বার্থপর হতে আমার বাধ্যত। তাই তলস্টয়ের প্রবীণ বন্ধুকে কল্পনার সাহায্যে প্রোভার আসনে বসিয়েছি। তৃতীয় আর-একজনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তলস্টয়ের জীবনীকার পল বিন্নকভ। কিন্তু মেজাজের গভীরতা, নিবিড় একাগ্রতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁকেও আমি বাদ দিয়েছিলাম।”

উক্ত ছবিটি আঁকার মূলে যে-ঘটনাটি, তার ইতিহাসও দিয়েছেন লিওনিড। ১৮৯৩ সালের জুন মাসে তলস্টয়ের আমন্ত্রণে লিওনিড যান তলস্টয়সের পল্লী-ভবনে। সেখানে, একদিন বিকেল বেলা, তলস্টয় তাঁর লেখবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাতে কাস্তে। রোজ, খানিকটা ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে, তলস্টয় যেতেন মাঠের কাজে। লিওনিড আর বিন্নকভকে ডেকে তিনি মাঠে গিয়ে চাবের কাজে সোঁদন ছিল আগাছা

সহৃদয় গ্রাহকদিগের সুবিধার জন্য এবং
তঁাহাদের অনুরোধে আজ ইহাতে ৭ নম্বর
এস্প্লানেড ইষ্ট-এ ‘এস্প্লানেড স্টোর্সে’
আমাদের আরও একটি নূতন বিক্রয়-
কেন্দ্রের উদ্বোধন হইল

গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল লিঃ

বেকানস্ — কনফেকশানার্স

কলিকাতা-১



লিওনিড পাস্তেরনাকের প্রথম যে চিত্রটিকে কেন্দ্র করে মস্কো আর্টস স্কুলে তলস্টয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়

তোলা) মন দিলেন। কী যেন ভাবছিলেন তিনি সারাফণ। কারো সঙ্গে একটাও কথা বললেন না। কাজ-শেষে ক্লান্ত তলস্টয় ঘরে ফেরবার সময় হঠাৎ লিওনিডকে বললেন, “হাতে সময় আছে?”—“নিশ্চয়”—“তবে আসুন আমার সঙ্গে!”

বিরুদ্ধ ফিসফিস করে লিওনিডকে বললেন, “নিশ্চয়ই উনি নতুন কোনও রচনা শোনাবেন। সচরাচর উনি কাউকেই পাণ্ডুলিপি শোনাতে চান না। যান!”—ঘরে ঢুকে, কাস্তোটা মেঝের এককোণে রেখে, ওভারকোট না খুলেই তলস্টয় সদা-রচিত এক বইয়ের একটা পরিচ্ছেদ পড়ে শোনালেন।

এর কিছুদিন বাদেই ‘রিসারেকশান’ বইটা চিত্রিত করবার ভার পেলেন লিওনিড। ‘রিসারেকশান’ তখনো একটা ছোটগল্পের আকারেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণতঃ তলস্টয় নিজের রচনা সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই করতে চাইতেন না। কিন্তু শিল্পীর হাতে ‘রিসারেকশান’-এর খসড়া ভুলে দেবার সময় তিনি বললেন, “এটিই আমার সেরা রচনা। মনে হয় আপনার ভালই লাগবে।”

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, তলস্টয় তাঁর গল্পটিকে ততই বিপুলতর করে তুলতে লাগলেনঃ দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলে দিলেন, কতক পরিচ্ছেদ বাদ

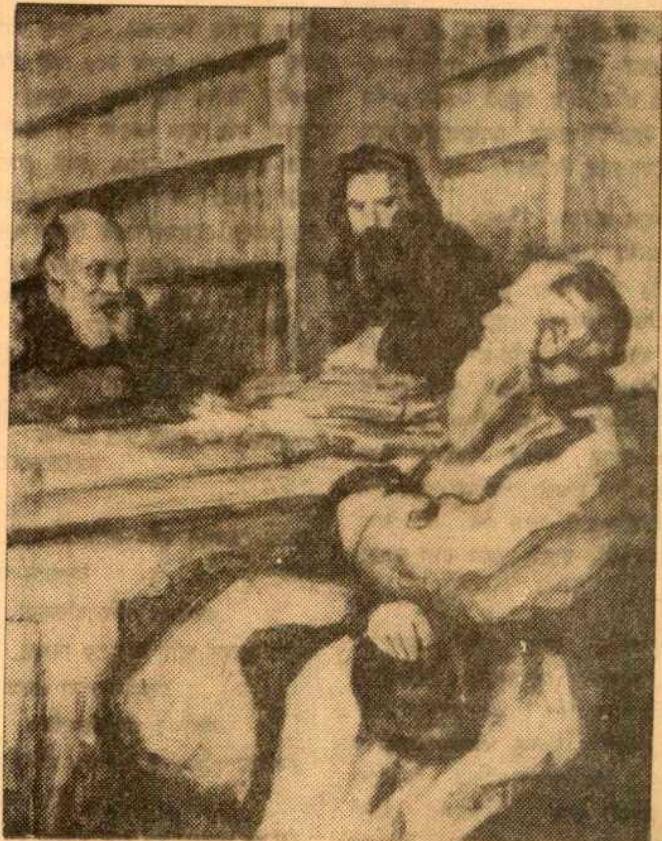
দিলেন, নতুন আরো-কত পরিচ্ছেদ লিখলেন! সে এক এলাহি কাণ্ড! ওদিকে প্রথম পর্বটি তিনি প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেনঃ একাদিক্রমে পিটার্স-বাগ, পারী, লন্ডন, ন্যা ইয়র্ক প্রভৃতি বহু জায়গা থেকেই বইটা ছেপে বের হচ্ছে। শিল্পীর আঁকা ছবিগুলো দেখে শিশুসুলভ আনন্দে আটখানা হয়ে উঠতে লাগলেন তলস্টয়; কোনটা দেখে তিনি হো-হো করে হেসে ওঠেন, কোনটা দেখে বলেন, “বাবাঃ, আপনি দেখাচ্ছে আমার চেয়েও বেশি শ্লেষ ঢেলেছেন!” আর শিল্পীর আঁকা ‘শাস্তির পরে’ ছবিটা দেখে ও’র চোখ ছিলছিল করে উঠল। বললেন, “খাসা! অতি সুন্দর! চমৎকার হয়েছে, ভায়া!” তারপর কপাল চাপড়ে বললেন, “ইস্! এত সুন্দর ছবিটা আমার বইয়ে যাবে না?” শিল্পী কিছ্ না বুঝতে পেরে ফ্যালফ্যাল করে তলস্টয়ের দিকে ভাবতেই তিনি বললেন, “ভায়া, আমি যে প্রকাশকের কাছে টেলিগ্রাম করেছি, এই পরিচ্ছেদটা বাদ দিতে!.....না, না, তা’ হয় না। এখনি যাচ্ছি। টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি যে ও-পরিচ্ছেদটা বাদ দেওয়া অসম্ভব।.....”

বইটা অবশেষে প্রকাশিত হ’ল। তার খ্যাতি সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সভ্য-জগতের সর্বত্র। সেইসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল লিওনিড পাস্তেরনাকেরও নাম।

লিওনিড পাস্তেরনাক তলস্টয়ের সুন্দর একটি উক্তি দিয়ে তাঁর তলস্টয় প্রসঙ্গে শেষ করলেন। লিওনিডের আঁকা ছবিগুলি প্রথম যখন ছেপে এল, ছাপার খুঁত আর মামুলি ধরণের প্রয়াস দেখে তিনি বিশেষ মর্মাহত হয়েছিলেন। অথচ প্রকাশকেরা এইটুকুতেই সন্তুষ্ট, এতেই তাঁরা শিল্পীর প্রশংসায় পণ্ডমাখ। শিল্পীর মনের বাধা বুঝে তলস্টয় তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন,

“এমন মর্মাহত হ’লে চলবে কেন? ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই প্রকাশ্য কোনও প্রদর্শনীতে আপনার মূল চিত্রগুলি আপনি দেখাবেন। তখনই তো লোকে বুঝতে পারবে তাদের সত্যকার মূল্য।”

তলস্টয় আরো বললেন, “মনে রাখবেন যে এই জগতের সর্বকিছ্ই লোপ পাবেঃ রাজ্য যাবে, সিংহাসন যাবে, ধন-রত্ন সবই লুপ্ত হ’য়ে যাবে, লোকে ভুলে যাবে আমাদের কথা, ভুলে যাবে আমাদের পুত্র-কলত্রের রক্তমাংসের চেহারার কথা। কিন্তু, আমাদের কীর্তির কোথাও যদি তিলমাত্র সত্যকার শিল্প প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে তা’ শাস্বত, অমর হয়ে থাকবে চিরটা কাল।” লিওনিড পাস্তেরনাকের আঁকা ছবিতে কি তলস্টয় দেখেছিলেন সেই সত্যকার শিল্পের প্রকাশ?



মস্কো লেনিন স্টেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত লিওনিড পাস্তেরনাক আঁকিত তলস্টয়ের ছবি

॥ বিশেষ দৃষ্টব্য ॥

সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়াটা আমাদের দৈনন্দিন রোজনামাচার খুব কমই ঘটে থাকে। ধর্মের বিভিন্নতার কথা না ভুললেও, নিজেদের নশ্বর জীবনের দার্শনিক চিন্তায় মন ভারী করতে রাজী নই আমরা। শ্মশানে গিয়ে আমরা যেমন শ্মশান-বৈরাগী হয়ে পড়ি, তেমনি সমাধিক্ষেত্রে গেলে তার চেয়েও স্বাভাবিক কারণেই বেশী অস্বস্তিবোধ করি। কতকগুলো মানুষের সুখ-দুঃখ-ভরা জীবন এই মাটির নীচে স্তব্ধ হয়ে আছে এই চিন্তাটা আমাদের মন ভারী করে তোলে। তাই কৌতূহলী ছাড়া এই নিষিদ্ধ এলাকায় পা বাড়াবার কথা ভাবতেই পারেন না কেউ।

হয়ত ইতিহাসের নামকরা কোন খ্যাত-অখ্যাত মানুষের শেষ সমাধি দেখার কৌতূহলটুকু আমরা বড় জোর দেখাতে পারি, কিন্তু যারা তাদের জীবনে চিরদিন লোকচক্রের অগোচরে রয়ে গেল, তাদের শেষ আখ্যায় প্রতি আমাদের কোন কৌতূহলই থাকে না।

তবু, কবি মধুসূদনের 'দাঁড়াও পৃথিবীর জন্ম যদি বঙ্গে তব, তিষ্ঠে কণকলা' তাঁরই সমাধিক্ষেত্রে এই অমর অনুরোধের মত কোন সমাধিক্ষেত্রে অকস্মাৎ যদি গিয়ে পড়েন, এমনি সারি সারি সমাধিক্ষেত্রে লেখাগুলো মনে হবে মুখের হয়ে উঠেছে।

মানুষ জীবনে চিহ্ন রাখার জন্য চিরপ্রয়াসী। মরণের পরেও তাই পৃথিবীর বকে চিহ্ন থেকে যায় পাষণ-ফলকে কটি কথায়: গদ্যে, পদ্যে বা বিচিত্র ভাষায়। সমাধি-প্রস্তরের ওপর কিছুর লিখে রাখার নিয়ম তাই অনেক যুগের প্রাচীন। যে প্রিয় মানুষেরা মাটির তলায় আশ্রয় নিয়েছে, তার সম্বন্ধে সত্যি কথাটা ক্ষোদিত করে দেয় তার আত্মীররা। আর এটী কটি কথা মৃত মানুষটির হয়েই যেন কথা বলতে চায়।

পৃথিবীর সেরা সেরা মানুষের সমাধি ফলকের লেখাগুলো পৃথিবীর মনিষের কাছে চিরকালের সমাগ্রী প্রদ্বার বাণী। কিন্তু সাধারণ মানুষের সাধারণ সমাধিপিণ্ডগুলির বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। মৃত মানুষের জন্যে জীবিত মানুষের মহানুভবত্বের পরিচয় এমনই কম, যে এই সর্বাঙ্গীত রচনা-

মৃত পাত

চন্দ্রশেখর মৃত্যুপাধ্যায়

গুলির কলেবর কোন দিন এমন হয় না, যে দশকের ধৈর্যের ওপর অভ্যাস চলতে পারে। তাই হয়ত বিশ্বের সেরা সেরা মানুষেরা নিজেদের সমাধি বেদীর ফলকে কি লেখা হবে তারই মূসাবিদা করে গেছেন। শোনা যায়, কোলারিজ তাঁর নিজের জন্যে এমনি তিনটী লেখা রচনা করে গিয়েছিলেন, অবশ্য তিনটির একটিও তাঁর সমাধিফলকে শেষ পর্যন্ত উৎকীর্ণ হয়নি।

কোলারিজের এমনি একটি সুপরিচিত রচনা—

আমাকে দেওয়া হল মৃত্যু

আর তোমাকে জীবন

কিন্তু হায় এমন একটা মৃত্যু এল যখন দুজনেই আমরা সমান হয়ে গেলাম, দেখ, বিশ্বের ইচ্ছার কোন পক্ষপাত নেই।

অবশ্য সমাধিফলকে মৃতের আত্মীররা মৃতের কপিপত-অকপিপত গণাবলীর ফিরিস্তি দিয়ে মৃতের প্রতি তাদের প্রীতি নিবেদন করতে পারেন, কিন্তু দশকদের মুখ করে সেই সমস্ত উৎকীর্ণ লিপি যার মধ্যে পাওয়া যায় রসবোধ, যার মধ্যে পাওয়া যায় দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা। যেমন একটী জারগার একটা রঙের দর্জীর স্মৃতি-ফলকে লেখা আছে (ইংরেজীতেই উল্লেখ করছি, বাংলা অনুবাদ সম্ভব নয় বলেই)।

HERE LIES JOHN HYDE
HE FIRST LIVED AND
THEN HE DIED;
HE DYED TO LIVE AND
LIVED TO DYE
AND HOPES TO LIVE
ETERNALLY

বা,

আজ যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ,

সেখানে আমি

একদিন দাঁড়িয়েছিলাম

আজ যেমন তুমি আমাকে দেখছ,

তেমনি অন্য একজনকে

আমিও দেখেছিলাম।

একদিন তুমিও আমার মত নীচে,

নেমে আসবে

তখন অনারা তোমার সামনে দাঁড়াবে,

আর দেখবে তোমাকে।

বা,

রবীন্দ্রনাথের মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম
সমানের মত—

কি সুন্দর এই মৃত্যু

পৃথিবী ত শব্দে দুঃখ আর

অহংরে ভরা।

পৃথিবীর সেই যন্ত্রণা কদিনের

তার পর ত এই সুখশয্যা।

ক্লান্ত পৃথিবী বল তবে কোনটা ভাল

ক্রান্তিকর পথযাত্রা, না পথশেষের

এই বিশ্রাম!

বাগের ক্ষুরধার চমকও কখনও
কখনও দেখা যায়, যেমন কোন রাজার
সমাধি-ফলকে লেখা থাকে—

এখানে আমাদের মহারাজাধিরাজ

বিশ্রাম করছেন

যাঁর কথা কেউ কোনদিন বিশ্বাস

করেনি,

যিনি কোনদিন বোকায় মত কথা

বলেননি

অথচ জ্ঞানীর মত একটাও কাজ

করেননি!

বা জনৈক অজ্ঞাত পরিচয়ের উদ্দেশ্যে—

ALIVE, HE LIED
IN ALL HE SAID
AND HAVING DIED
HE NOW LIES DEAD.

কখনও কখনও মৃত্যু-বিবরণীও
স্থান পায় এই সব লেখার মধ্যে যেমন—

In memory of Captain under-
wood who was drowned.

Here lies free from blood and
slaughter once underwood — now
under water.

কিন্তু এত সব কিছু, লেখার মধ্যে
হঠাৎ যদি আমাদের চোখে পড়ে একটি-
মাত্র কথা Silence তখন এক অন্তঃ-
প্লাবী মহা-মোন আমাদের নিম্নে
স্তব্ধ করে দেয়। মাথা কখন আপনা
দেকেই মাটির দিকে ঝুঁকে। মাটির
নীচে যে মানুষ তার কামনা-বাসনার অব-
সান করে দিয়ে শান্তির লবঙ্গ পেতে
রয়েছে, তাকে দেখা না গেলেও মনে হয়
আমার সামান্য চণ্ডলতা তার শান্তিকে
বিঘ্নিত করবে।

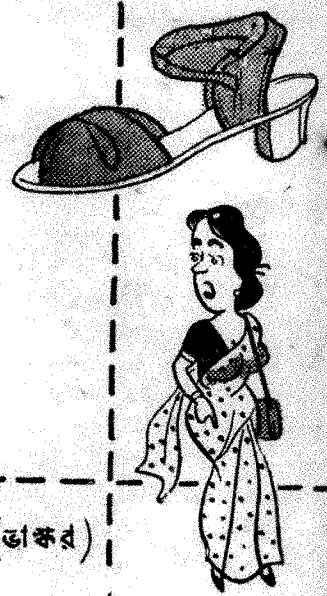
এই সমাধি-ফলকে কিছুর লিখে রাখা
কে প্রবর্তন করেছিল জানি না, কিন্তু
কঠিন পাথরের বকে এই লেখাগুলো
জীবন আর মৃত্যুর শাস্বত ফাটল
ঘোষণা করে চলেছে মানুষকে তার কষ্ট
বিশ্বির উদ্দেশ্যে ওঠবার জন্য আহ্বান
জনিয়ে চলেছে। শত কাজের মধ্যেও
তাঁর জীবনকে আরও সার্থক করে তুলতে
সমাধি-ক্ষেত্রে বা শ্মশানে যাওয়াটা
সময়ের অপব্যয় নয় নিশ্চয়ই। *

* উপকরণ বিদেশী পত্রিকা থেকে
সংগৃহীত।



প্রেম ও পাড়কা

জ্যোতির্ষ্ম ঘোষ (ভাষ্কর)



(১)

বিকাশ মনে মনে বিবাহের স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। সেকেলে রীতিতে পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের মনোনীত পাত্রী বিবাহ করবে, এটা তার পছন্দ নয়। একটু আধুনিকভাবে দেখিয়া-শুনিয়া মিলিয়া-মিশিয়া তারপর বাহা হয় করবে। সেকেলে দিন তো আর নেই। এখন ত পথে, ট্রামে, বাসে, পার্কে, মিটিং-এ, একজিবিশনে, সিনে-মায়, থিয়েটারে কত বয়সের, কত বর্ণের, কত সাজের কত মেয়ে কিলবিল করিতেছে। ইহাদের মধ্য হইতে একটি বেশ মনোমত মেয়ে পছন্দ করিয়া আলাপ করিয়া তারপর—সেই ত ভাল।

একদিন বাসে উঠিতেই প্রায় সম্মুখেই তাহার বহুবাহিত যুবতী যেন তাহারই জন্য বাসের একটি খালি সীটে আসিয়া বসিয়া পড়িল। আহা! যেমন রং, তেমনি মুখশ্রী, তেমনি গড়ন-পেটন। টিকিট কিনবার সময়ে কন্ডাক্টরের সঙ্গের কথা বলবার সময়ে তাহার দাঁতের পাটি বিকাশ দেখিয়া ফেলিল—ঠিক যেন মস্তুর পাঁতি। বিকাশ মনে করিয়াছিল, আলাপ-তালাপ হইয়া খাইবার পর বুঝিয়া-সুঝিয়া ভালবাসার কথা বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে। কিন্তু কেমন যেন সব উল্টা হইয়া গেল। আলাপের আগেই কেমন যেন একটা, কি যেন একটা তাহার মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বসবার সীট নিকটে খালি ছিল না। বিকাশ মাথার উপরের রড ধরিয়াই মেয়েটির দিকে একটু,

ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ডালহৌসি স্কয়ারের কোথায় সে নামিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইল, মেয়েটি তাহারই পাশের অফিসের দরজার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

পরদিন। ঠিক সেই বাস-স্টপ, সেই রাস্তার মোড়, সেই সময়ে বিকাশের সম্মুখে বাস আসিয়া থামিল। জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল, লেডিজ সীটের কোথাও সে নাই। পর পর কয়েকখানি বাস এমনি করিয়া চলিয়া গেল। তারপর একখানি বাসের জানালার ফাঁকে তাহার বাহিতার মুখখানি দেখিয়াই বাসে উঠিয়া পড়িল এবং যথাসম্ভব সেই মেয়েটির সীটের কাছেই গিয়া দাঁড়াইল। একটু লক্ষ্য করিয়া বিকাশ দেখিল, মেয়েটির হাতে একখানা চিঠির এন-ভেলপ, পোস্ট-অফিসের সীল-দেওয়া। নাম পড়িয়া বুঝিতে পারিল, মেয়েটির নাম সুরমা—কি সুন্দর নাম! এমন সুন্দর নাম পৃথিবীতে বোধ হয় মাত্র একটিই আছে। দেখিতে দেখিতে এবং ভাবিতে ভাবিতে বিকাশ যথাস্থানে পৌঁছায়, আর তেমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বিদায় নেয়।

আবার একদিন। ঠিক তেমনি করিয়া সুরমা ও বিকাশ ঠিক সেই স্টপে ওঠে। সুরমার সীটের পাশে একখানা পোস্ট-অফিসের সীল-দেওয়া পোস্টকার্ড পড়িয়া যায়, বোধ হয় বিকাশই ফেলিয়া দেয়। সুরমা চাহিয়া দেখে তাহাতে বিকাশের নাম। মনে ভাবে, তাহলে ও'রই নাম বিকাশ। মনে

মনে বলে, বিকাশ! কি মিষ্টি নাম। যাক গে, কোথাকার কে, ও-সব ভাবতে নেই। সুরমা ব্যাগ খুলিয়া ছোট আয়নার দিকে চাহিয়া মুখে একটু পাউডার বুলাইয়া নেয়। ও কি! আয়নার মধ্যে তাহার কাঁধের পিছনে কার মুখ! ওই তো বিকাশ—না, কে যেন, হ্যাঁ বিকাশই তো। যাক গে, কোথাকার কে, তার ঠিক নেই। সুরমা ব্যাগ বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিল। তারপর? তারপর আর কি। ডালহৌসি স্কয়ারের সেই পাশাপাশি দুই অফিসের দুই দরজায় তারা নামিয়া যায়।

আরো কয়েকদিন পরে। একদিন বৈকালে অফিসের ছুটি হইবার একটু আগেই বিকাশ তাহার উপরিতন কর্ম-চারীকে বলিয়া মাথা ধরার অজুহাতে অফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সুরমার অফিসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক জনস্রোত দেখিতে লাগিল। সুরমা তাহার অফিস হইতে বাহির হইয়া যখন বাসে উঠিল, ঠিক সেই সময়ে বিকাশও সেই বাসে উঠিল। কন্ডাক্টর টিকিট চাহিলে বিকাশ সেই বাস লাইনের শেষ স্টপের টিকিট কিনিয়া সাগ্রহে লক্ষ্য করিতে লাগিল, সুরমা কোথায় নামে। বিকাশের নিজের নামবার স্থানে আসিয়াও সে নামিল না দেখিয়া সুরমা একটু যেন চিন্তিত হইয়া পড়িল। ব্যাপার কি? উনিও কি আমারই সঙ্গের নামিয়া পড়িবেন না

কি! সুরমার মুখের ভাব ক্রমশই কঠিন হইতে লাগিল।

সতাই তো। সুরমা নামিতেই বিকাশও নামিয়া পড়িল এবং একটু দূরে থাকিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। সুরমা একবার পিছনের দিকে একটু চাহিয়াই ব্যাপারটা বেশ বুঝিয়া ভাবিতে লাগিল, কি করা যায়! কত বইতে, কত পত্র-পত্রিকায় কত প্রেমকাহিনী পড়িয়াছে, কিন্তু ঠিক এই সূচুয়েশনে কি করা যায়, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার সমস্ত বুদ্ধিটাই যেন ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে। একে সকাল বিকালের এই বাসের ধাক্কা আর ঝাঁকানি, তারপর সমস্ত দিন অফিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, তারপর আবার এসব উৎপাত কাঁহাতক সহ্য করা যায়! সুরমা যতই বাড়ীর নিকটে আসিতে লাগিল, ততই কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। যদি সত্যি বাড়ী পশ্চাত্ত এমনি করিয়া চলিতে থাকে, যদি তার মা—বাবা অবশ্য নেই—জানিতে পারেন। ছিঃ। আমি কি এমনই একটা অপদার্থ মেয়ে যে পথের একটা অচেনা লোক আমার পিছনে পিছনে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠবে। আচ্ছা, আলুন না আমার সঙ্গে, ঢুকুন না আমাদের বাড়ীতে, দেখিয়ে দেব না মজা। উঃ, কি আপদ! কি জ্বালা! অফিসের পরে বাস-ট্রাম ঠোঁড়য়ে বাড়ীতে এসে হাত-পা ছড়িয়ে একটু গড়িয়ে পড়ব, তা তো নয়, যত-সব কলা-কাঁবির পালা। উঃ, কি যে করি! সুরমার চোখে-মুখে আর মনে দুঃখের কামা আর রাগের জ্বালা একত্র মিলিয়া উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলিল।

সুরমা বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়িতেই সুরমার মাতাঠাকুরাণী দরজার ছিটকিনি খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সুরমা দরজা ফাঁক করিয়া স্যান্ডাল-

জোড়া খুলিয়া একটু ঝাড়িয়া লইয়া আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকিল। কি আশ্চর্য, দরজা বন্ধ করিতে যাইবে, এমন সময়ে সুরমা দেখিল, বিকাশ একেবারে দরজার চৌকাঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সুরমা একটু পিছাইয়া গেল। বিকাশ ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মাত্র মুহূর্তের জন্য। ক্রুদ্ধ এবং বিমূখ সুরমা তাহার পা হইতে একখানি স্যান্ডাল খুলিয়া লইয়া বিকাশের গালের উপর—ছিঃ ছিঃ ছিঃ। স্যান্ডালের তলায় একটা ছোট সরু পেরেক একটু বাহির হইয়াছিল, সেটা বিকাশের গালে ফুটিয়া রক্ত বাহির



বিকেশের গালের উপর—ছিঃ ছিঃ ছিঃ

হইয়া গেল। বিকাশ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কি যে করিবে ভাবিয়া পায় না। বিকাশের গালে রক্ত দেখিয়া সুরমা দৌড়িয়া ভিতরে গিয়া তাহার মাকে ডাকিয়া আনিয়া বিকাশের গালের দিকে চাহিয়া বলিল, শিগ্গির একটু ডেটল আর তুলো এনে দাও তো। সুরমার মাতাঠাকুরাণী—সুনয়নী-

দেবী—তাড়াতাড়ি একটু ডেটল-মাখা তুলো আনিয়া বিকাশের গালের রক্তটা মুছিয়া সেখানে আস্তে আস্তে লাগাইয়া দিলেন। তারপর সুরমার দিকে চাহিয়া সুনয়নী বলিলেন, ব্যাপার কি বল তো। ইনি কে? কগড়াই বা কিসের?

বিকেশ আর কোন কথা শুনাবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল। বাড়ীতে আসিয়া মুখ গোজ করিয়া চুপ করিয়া রহিল। বিকাশের বৌদি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুরপো, তোমার গালে কি হ'ল?

বিকেশ কোন মতে ঢোক গিলিয়া বলিল, মানে, বাসে যা ভিড়! একটা বেঁটে ছাতার শিকের ডগা খাঁচ করে—।

তা, ডেটল, তুলো কোথায় পেলে? —বউদি বলিলেন।

বিকেশ বলিল, একটা ডিসপেন্সারিতে ঢুকে—।

বউদি বলিলেন, আহা, তবু চোখটা যে বেঁচে গেছে।

বিকেশের 'লভ' করার ইচ্ছা শেষ হইয়া গিয়াছে। সে যে এত আনাড়ী, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক, এই শেষ।

বিকেশ বেশ শান্ত হইয়া গিয়াছে। নিয়মিত অফিস যায়—যখন সুরমা যায় সে সময়ের বাসে আর ওঠে না। বাড়ীতে কেহ কোন বিবাহের সম্বন্ধ আনিলে বা মেয়ে দেখার প্রস্তাব করিলে, বিকাশ ঠিক যে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করে, তা নয়, তবে বলে, যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। যা ইচ্ছে করগে তোমরা।

বৌদি বলেন, আজকাল সবাই তো দেখে-শুনে আলাপ-টীলাপ করে মেয়ে পছন্দ করে।

তা করুক। মেয়েছেলেগুলো সব সমান, সব সুমান।

তা কি হয়? কালো, ফর্সা, বেঁটে, লম্বা, শান্ত, চঞ্চল, কত রকম আছে! তোমার যাকে মনে ধরে—একটু দেখে-শুনে—

না, না। আমার দেখা শোনার কোন দরকার নেই। তোমরা যা খুশি করগে।

(২)

বিকেশের বৌদি এবং অপর সকলেই যা খুশি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া



স্টার ইসবগল

FLEA SEED HUSK
SUPERIOR QUALITY

আপনার কোষ্ঠবদ্ধতায় সকল
অসুবিধায় একটি নিরোপ, উত্তম
এক কার্যকরী প্রতিকার।

Jam Products
CALCUTTA-1

লাগিলেন। এক একটা খবর আসে আর বৌদি সাজিয়া গুঁজিয়া গোল ব্যাগ ঝুলাইয়া, কি কি দোঁখবেন, কি কি জিজ্ঞাসা করিবেন, খাবার খাইবেন কিংবা শয্যা চাখিবেন, প্রভৃতি মুখস্থ করিতে করিতে কনের বাড়ীতে যান, সঙ্গে হয়তো আরো দু'একজন পুরুষ মানুষ বা মহিলা আত্মীয়।

শেষ পর্যন্ত বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বৌদি বিকাশকে একান্তে লইয়া গিয়া বিশেষ করিয়া বলিলেন, একবার নিজের চোখে দেখলে পারতে থাকুরপো। শেষে আমাদের সবায়ের উপর চিরদিন চটে থাকবে।

বিকাশ জোর করিয়াই বলে, না, না, আমি কিছু করব না। লক্ষ্মী ছেলের মত গিয়ে বিয়ে করে আসব। একটা বউ হলেই হল। ওরা সব সমান, সব সমান।

বিকাশকে বাদ দিয়াই সব ঠিক হইয়া গেল। কনের বাড়ীতে যায়না নাকি অত্যন্ত কম। সেইজন্য বিবাহের ব্যবস্থা হইয়াছে কনের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে।

বিবাহের দিন সম্ভাষ্য বিকাশ সাজিয়া গুঁজিয়া অন্যান্য বরযাত্রীদের সঙ্গে যাত্রা করিল। মুখে বা মনে কোন ব্যগ্রতা নাই, কোন উৎসাহ নাই। যেমন মন লইয়া অফিসে যায়, প্রায় সেই মন লইয়াই জাঁতি হাতে করিয়া ফুল দিয়া সাজানো মোটর-গাড়ীতে উঠিল।

কনের বাড়ীতে পৌঁছবার পর কোন নতুন ব্যাপার কিছুই ঘটিল না। যেমন সব বিবাহেই হইয়া থাকে, তেমনই আদর আপ্যায়ন, ইত্যাদি চলিল।

পিঁড়িতে বসিয়া সাতপাক ঘুরিয়া যখন শূভদৃষ্টি হইল, তখন—এ কি! বর আর কনে দুজনেই কেমন বেন ভয়ে,

দৃষ্টিচলিত্যয় অস্বাভাবিকভাবে গম্ভীর হইয়া গেল। চারিপাশে ছেলে মেয়ের দল অবাচ্। সবাই বুদ্ধিল উহাদের পর-স্পরকে পছন্দ হয় নাই। বৌদি ছিলেন বরযাত্রীদের মধ্যে। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত বর-যাত্রী ও কন্যায়াত্রীদের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঁজন ছড়াইয়া পড়িল। ওদের নাকি পছন্দ হয়নি! বন্ধেরা বলিলেন, দু'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ছোকরারা বলিল, বাপদে, একবারে না দেখে শূনে মত দেওয়া কেন? আর একজন বলিয়া উঠিল, এমন মেয়ে অপছন্দ? ও যাক না চলে, ওর জায়গায় বাসরঘরে আমিই গিয়ে বসছি। এরপর অবশ্য, আর কোন কথা বা গোলমাল কিছুই হইল না। উৎসবের কোন অংশই বাকি রহিল না। বরকনে বাসরঘরে গিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। হাসি, ঠাট্টা, ইত্যাদির পালা শেষ হইলে প্রায় সকলেই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কয়েকটি ঠাট্টাস্থানীয়া তরুণী রহিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে কনে' সগিনীদিগকে বলিল, ভাই, ও'কে ভোরা আর জ্বালাস নে। শরীরটা ভাল নেই—আমাকে এক ফাঁকে একবার বোল্‌ছিলেন।

‘ও বাবা! দেখিস! এর মধ্যেই এত-খানি শেষ পর্যন্ত সইলে হয়, বলিয়া সগিনী মেয়েটি ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। সন্গের আর দুইটি মেয়েও উঠিয়া গেল।

কনে ভাবিতেছে, গালের সেই স্যাণ্ডেলের পেরেকের দাগটা এখনও রয়েছে। জানি না, কি আছে অদৃষ্টে।

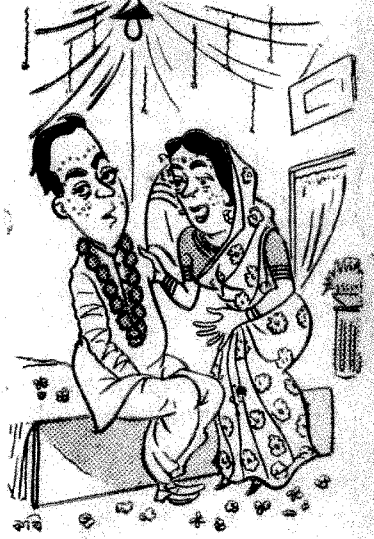
বর ভাবিতেছে, স্যাণ্ডেল-পেটা করে যে তাড়িয়ে দিল, শেষে কি না তারই সন্গে—। জানি না, কি আছে অদৃষ্টে।

কিছুক্ষণ পরে সুরমা ধীরে ধীরে বলিল, শুনছ?

কি বলছ, সুরমা?

আমার কিছুই বলবার নেই। তুমি আমাকে কমা করতে পারবে না?

আমি জানি, তুমি আমাকে ভাল-বাসো। কাজেই অন্য সব কথা অবান্তর।



‘আমার কিছুই বলবার নেই’

আর একটা কথা তুমি জানো না। কন্যাপক্ষের ঘটকী আমি নিজেই। আমাদের বাসার ঠিকানা শুনলে তুমি বেসে বসতে পার, তাই ভেবে আমি এই বাড়ীতেই সব ব্যবস্থা করছি।

বেশ করেছ। এখন আর একটু কাছে এসো।



সুন্দর থেকে সুন্দরতম...

দেও দত্ত

ঢালঙ্গার দীপ্তি ও অর্পণ প্রকাশনা

১৩/২, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২

ফোন: ৩৪-৪৭৬০



বর্তমানকালে বাঙলা দেশে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রভাব যেমন সর্বব্যাপী, পাশ্চাত্যে জ্যাজ সঙ্গীতের জনপ্রিয়তাও তেমনি অবিসংবাদী।

কিন্তু জ্যাজ সঙ্গীতের সংজ্ঞা কি?—বিখ্যাত আমেরিকান নিগ্রো জ্যাজ শিল্পী লুই আর্মস্ট্রং তার উত্তরে বলেছেন, 'এই প্রশ্ন করলে আপনি তার কোন সঠিক উত্তর পাবেন না।'

সত্যিই 'প্রচলিত সঙ্গীত' ও জ্যাজের সীমারেখা অস্পষ্ট। তবে জ্যাজের প্রাণ-স্পন্দন হচ্ছে ছন্দ, লয় ও তাল। তাল, লয় ও ছন্দের এই গুরুত্বই তার স্বাতন্ত্র্য।

সেই ছন্দ-লয় ও তালের দ্যোতনাই জ্যাজ গায়কদের মাতিয়ে তোলে, তাদের রক্তে নতোর দোলা জাগায়। সেই ছন্দিত নতোর তাল কখনো ধীর মল্লথরতায় এলিয়ে পড়ে, কখনো আচম্বিতে দ্রুত ও দ্রুততর হয়ে যেন মহারণ্যে ঝড়ের উন্মাদনায় তুফান জাগায়। জ্যাজের এই ছন্দ ও তাল-লয়কে তীরতর করাও জনো ব্যবহৃত হয় ডবল বেস, ড্রাম, গীটার ও পিয়ানো। ডবল বেসের তারে জাগে ক্রম-য়ত তাল ও মাত্রা, ড্রাম তাকে দেয় ঘনত্ব ও পারিপাট্য, গিটার কিম্বা ব্যাঞ্জো ও পিয়ানো আনে গভীরতা।

জ্যাজের অন্যান্য সঙ্গত হচ্ছে বহুধা ও বিচিত্র। তার মধ্যে আছে নানা আকৃতি ও প্রকৃতির সেক্সোফোন, ব্যাণ্ড পাইপ, ক্লারিওনেট, ফ্লুট, হার্প, জলতরঙ্গ, বগ, পশ্চিম আফ্রিকার ড্রাম প্রভৃতি। পশ্চিম চতুরলাল তো আমেরিকার জ্যাজ আসরে গিয়ে তবলাও বাজিয়ে এসেছেন।

জ্যাজের ইতিকথা

পশ্চিম আফ্রিকান ও ইউরোপীয়ান সঙ্গীত-ঐতিহ্যের এক মিশ্রিত বিবর্তনে

জ্যাজের উৎপত্তি। আফ্রিকার নিগ্রো ক্রীত-দাসেরা যুক্তরাষ্ট্রের দাক্ষিণাত্যে নিয়ে আসে তাদের পালা-পার্বণের ছন্দময় সঙ্গীত ও নৃত্য। তার সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হলো সামরিক ও সাধারণ ব্যাণ্ড, কেটল ড্রাম, খুঁটীয় উপাসনার হিমস, সামস্ এবং বিচিত্র সব গাথা, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য ও বাজনা।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিউ অর্লেতে সেই বিচিত্র, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বরলিপিহীন সঙ্কর সঙ্গীত প্রথম নাম পেল জ্যাস্ (Jass)। তারপর একটি যুগ তা রইলো নিম্ন শ্রেণীর পানশালার আড্ডায় ও গণিকাঙ্গণীর হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে।

১৯১৫ সালে টম ব্রাউনের 'ডিক্স-ল্যান্ড (স্বরলিপিহীন ও স্বতঃস্ফূর্ত)' জ্যাস দল যখন শিকাগোয় কয়েকটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্যে এলো তখন স্থানীয় সঙ্গীতশিল্পী সম্মুখ তাঁদের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুললেন। কারণ, 'জ্যাস্' কথাটার চলতি অর্থ তখনো যৌন সংযোগ। অতএব জ্যাসের নাম পাশেট করা হলো জ্যাজ (Jazz)।

১৯১৭ সালে সর্বপ্রথম পাঁচজন শ্বেতাঙ্গের একটি দল জ্যাজ রেকর্ড করান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যেই কিন্তু জ্যাজ নাইট ক্লাব, ক্যাফে ও ক্যাবারেতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। রচিত হতে লাগলো জ্যাজ-স্বরলিপি। এলো সর্বপলাবী জ্যাজের যুগ।

আজ জ্যাজের অন্তত নটি ধারা :

(১) ডিক্সল্যান্ড—আগেই বলা হয়েছে এ হচ্ছে স্বরলিপিহীন ও স্বতঃস্ফূর্ত। ১৯১৫ থেকে '২০ ও '৩০

দশকের গোড়ার দিকে এর ঝল-বহুল প্রচলন।

(২) সুইং—দ্বিশ দশকে এই মার্জিত ও অকেন্দ্রাকৃত জ্যাজের বিকাশ হয়।

বিবপ্ (বা বপ্)—'৪০ দশকের নিউইয়র্কের মিনটন ক্লাবে প্রগতিশীল ও শক্তিশালী জ্যাজ শিল্পীরা মিলিত হয়ে 'সুইং রীতির' পুরোনো অতিবিস্তৃত ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন।

জ্যাজের ইতিহাসে '৪০ দশকটা হচ্ছে পুরোনো ও নতুন রীতির মধ্যে সংঘাত ও বিবর্তনের কাল। সুইং রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নব্যপন্থীরা যে বিবপ্ রীতির প্রবর্তন করলেন তার বৈশিষ্ট্য হলো বহুস্পন্দন বা ছন্দের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ।

ফলে তীরতর সংঘাত সৃষ্টি করে তার দ্বারা সম-সাময়িক আবেগকে আরো মূর্ত করে জালা সহজতর হলো।

যান্ত্রিক আঙ্গিকে এর মোহা তফাৎ হলো,—বেস ড্রামে সুইং শিল্পীরা যেখানে চতুর্মাত্রিক ছন্দ ব্যবহার করতেন বিবপ্ পন্থীরা সেখানে সিম্বল যন্ত্রের প্রাধান্য আনলেন। পুরোনো শিল্পীরা সিম্বলের স্বরিত্র আওয়াজে একটা অংশের সমাপ্তি বোঝাতেন। বিবপ্ ড্রামবাদকেরা এই তালকে আরো ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করে ধ্বনিকে আরো দীর্ঘায়ত করার চেষ্টা করলেন।

ট্রাড—প্রথম দিককার বা জ্যাজ ঐতিহ্যের প্রায় সব বৈচিত্র্যকে বোঝানোর জন্যেই এই সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত হয়।

মের্ণাষ্ট্রম—এর দ্বারা বোঝায় যা পুরাতনও নয়, নতুনও নয়।

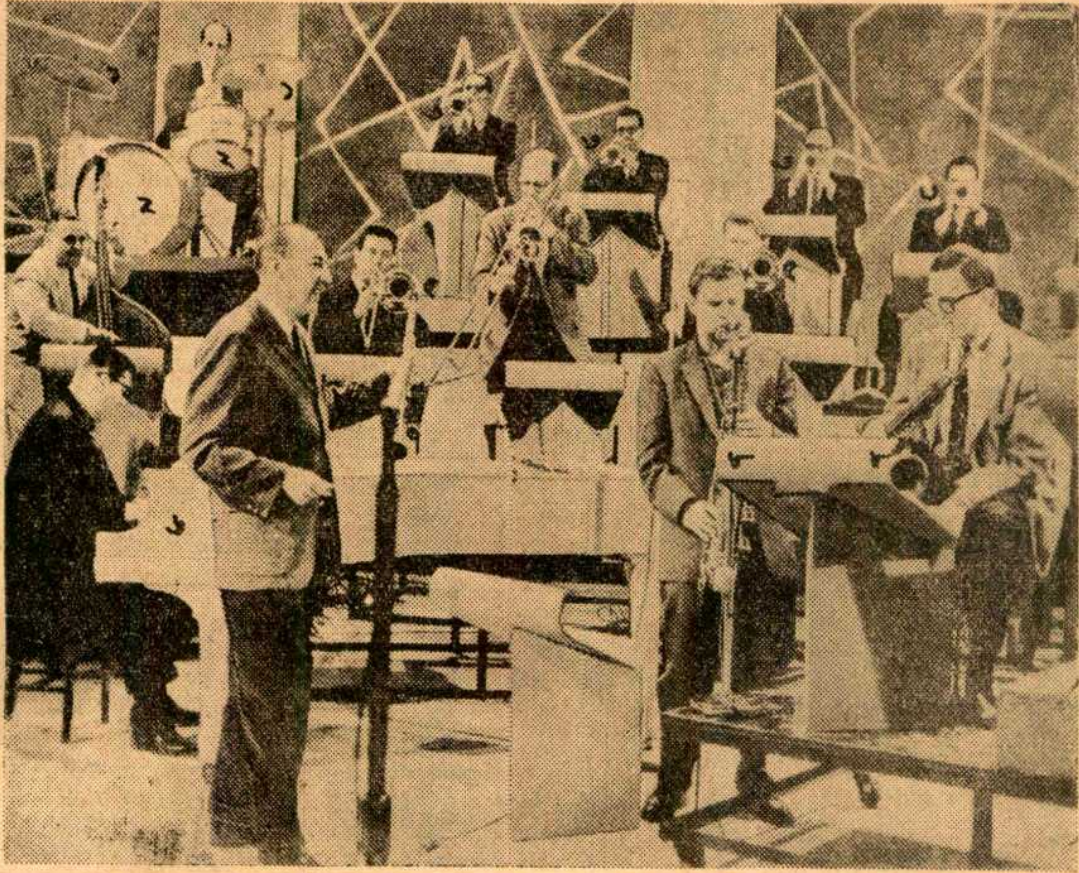
হার্ড বপ্—কয়েকটি ছোট ছোট আধুনিক দলের ছাঁটা আঙ্গিক।

প্রগতিশীল জ্যাজ—স্ট্যান কেনটন কর্তৃক ব্যবহৃত বড় বড় দলের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

হার্ড স্ট্রিম্—প্রগতিশীলদের চেয়ে ছোট ছোট দলে প্রায়-ধ্রুপদী সঙ্গীতের চর্চা।

বুগি-উগি—এ একটি বিশেষ পিয়ানো আঙ্গিক, সঙ্গে বাঁ হাতের টেউ-তোলা-তালকে ডান হাতের স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গীর দ্বারা কেটে-কেটে দেওয়া ও পারিপাট্য আনা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থাৎ জ্যাসের আবির্ভাবকালে সাধারণত



জ্যাজ আসরের সংগতঃ ১—সিম্বল ২—ড্রাম (Percussion-বা কাঠির আঘাতে বাজে) ৩। ট্রাম্পেট (ব্রাস বা ধাতব), ৪—বেস (তার বাদ্য), ৫—ট্রাম্বন (ব্রাস বা ধাতব) ৬—পিয়ানো, ৭—ক্লারিওনেট (কনডাক্টরের হস্তধৃত। কাস্টনিমিত্ত তাই আরেক নাম 'উড উইন্ড') ৮—স্যাক্সোফোন (বাদ্যটি ধাতব বা ব্রাস)।

স্বরলিপি অনুসরণ করে এক ধরণে পিয়ানো-প্রধান সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় তার নাম রাগটাইম। মতান্তরে তা হচ্ছে জ্যাজের আদি সংস্করণ।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, বর্তমানে প্রধানত যন্ত্রসঙ্গীত হলেও তার আরম্ভ হয় কণ্ঠসঙ্গীত হিসাবে। যদিও তারপর থেকে জ্যাজের এই বিভাগটির উন্নতি হয়েছে সামান্য এবং বিকৃতি হয়েছে বহুতর, তবুও কণ্ঠসঙ্গীতকে এখনো তার একটি প্রামাণিক উপাদান বলা চলে।

পরিশেষে সর্বকালের, সর্বরীতির সঙ্গীত সম্বন্ধে নিউ টেস্টমেন্টের 'ইউনিভার্সিটি সামনে' যে কথাটি আছে জ্যাজ সম্পর্কিত সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য, "স্বল্প-গ্রামে সত্যটি সূর আছে,—তাকে চৌদ্দটিতে পরিণত করো। তবু এক বিশাল আয়োজনে সে কতটুকু সরঞ্জাম? কী অর্কিষ্ট্রংকর উপাদান থেকেই না এই শিপের মহানায়কেরা এক অভিনব জগৎ সৃষ্টি করেন।....."

জ্যাজের জয়যাত্রা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হচ্ছে জ্যাজের জন্মভূমি ও পীঠস্থান। আজকের আমেরিকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর জ্যাজের প্রভাব আলোচনা করতে হলে একটি স্বতন্ত্র বই লেখা প্রয়োজন।

কিন্তু জ্যাজ আমেরিকাকে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বর্ধনে কতখানি সহায়তা করেছে এবং আমেরিকার জ্যাজ শিল্পীরা পৃথিবীর দেশে-দেশে কতখানি জনপ্রিয় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বোধহয় অপরিহার্য।

১৯৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর জন (ডিজি) গিলেস্পির নেতৃত্বে একটি জ্যাজ দলকে নিকট প্রাচ্য সফরে পাঠিয়ে এমনি সাড়া পায় যে তারপর থেকে হামেশাই বিভিন্ন জ্যাজ দলকে বারবার পুরো কিম্বা আংশিক অর্থ-সাহায্য দিয়ে নানা দেশে পাঠিয়েছে। ঐ বছরই গিলেস্পির দল লাতিন আমেরিকা সফর করেন।

'৫৬-'৫৭ সালে বেনি গুডম্যানের দল দূর প্রাচ্য সফর করে দিগ্বিজয়ী সেনানীর মত জয়ধ্বজা উড়িয়ে ফিরে আসেন। '৫৭ সালেই উইলবার দি প্যারিসের নেতৃত্বে একটি দল ঘানার স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করেন। তারপর তাঁরা নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, বেলজিয়ান কঙ্গো, নিরক্ষর ফরাসী আফ্রিকা, টাঙ্গানিকা, উগান্ডা, ইথিওপিয়া, লিবিয়া, টিউনিসিয়া, আলজেরিয়া এবং মরক্কো পরিভ্রমণ করেন। '৫৮ সালের শেষের দিকে উডি হার্মানের নেতৃত্বে একটি দল আড়াই মাসের জন্যে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি সফরে যান।

উপরোক্ত সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়া বেসরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেক আমেরিকান জ্যাজ শিল্পী বহির্বিশ্বে আনন্দ ও প্রীতির জোয়ার বইয়েছেন। কয়েক বছর আগে আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি যখন কারাকাস ও ভেনজুয়েলায় গিয়ে ব্রুন্স জনতা কল্লিক ইট-পাটকেন ও পচা ডিমের ম্বারা অভিযুক্ত হন তার

কয়েকদিন পরেই গ্রী ও গ্রীথের লাই আম'ল্ট্রিং কারাকাস ও লাতিন আমেরিকার অন্যান্য স্থানে তাঁদের জ্যাজ দল নিয়ে সফরে যান। সেখানে তাঁদের অভ্যর্থনা কেমন হয়? —এর উত্তরে লাই আম'ল্ট্রিং বলেন যে জনতা এমন উদ্দীপনার সঙ্গে তাঁদের সব'দাই ঘিরে থাকতো যে তাঁদের স্নেহাতিশয্যে তাঁদের ব্যবসার্টাই পল্ড হবার দাখিল হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের পরই শ্রেষ্ঠতম জ্যাজ দলের দর্শন পাওয়া যায় যুক্তরাজ্যে। বর্তমানে বটেই অতীত পাঁচ লক্ষ জ্যাজ অনুরাগীর ৫০০০ জ্যাজ ক্লাব আছে।

জ্যাজকে কেবল মাত্র একটি নতুন হুজুগ বলে মনে না করে তাকে একটি বিশিষ্ট শিল্পের মর্যাদা দেয় 'সর্বপ্রথম ফ্রান্স'। ১৯২৮ সালে জাঁ কাক্তোর নেতৃত্বে প্যারিসিয়ান বুদ্ধিজীবীরা সিনেমা ও আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে জ্যাজকেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মর্যাদার আসন দেবার দাবী করেন।

অবশ্য আমেরিকার বাইরে জ্যাজের সবচেয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা হচ্ছে সুইডেনে। এই ছোট দেশটিতে জ্যাজ সংগীতের রেকর্ড বিক্রীর সংখ্যা শুনলে ভাস্কর হয়ে যেতে হয়। সুইডেনে জ্যাজের প্রভাব লক্ষ্য করে আমেরিকান ভ্রমণকারীরা তার নাম দিয়েছে 'দোদুল্যমান দেশ'।

১৯৫৭-৫৮ সালে আমেরিকান জ্যাজ শিল্পী জন লাইস জার্মানী ভ্রমণ করে বলেন যে, 'জ্যাজ সত্যিই যা—একটি শিল্প, জার্মানরা তা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি করে অনুভব করে এবং সেইভাবে তাকে গ্রহণ করে।'

জার্মানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হলো সব কিছুকেই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা। তাই জার্মানীতে জ্যাজের রেকর্ড বিক্রী হয় ইউরোপের অন্যান্য দেশের গড়-পড়তা হারে, কিম্বা তার চেয়েও কম। কিন্তু জ্যাজের ওপর আলোচনার বই প্রকাশ ও বিক্রয় হয় সবচেয়ে বেশি।

শুধু পশ্চিম ইউরোপ কিম্বা আমেরিকাতেই নয়, রাশিয়া ও রুশ এস্তিয়ার তুস্ত পূর্ব ইউরোপেও জ্যাজের জনপ্রিয়তা বর্ধিত। তবে এ দেশগুলিতে জ্যাজকে সরকারীভাবে উৎসাহ দেওয়া হয় না।

পাশ্চাত্য রৌড ও টেলিভিশনে বর্তমানে জ্যাজের প্রাধান্য প্রায় অপ্রতিহত। কিন্তু চলচ্চিত্রে জ্যাজের আবির্ভাব

হতে কিছু দেরী হয়। কারণ হলিউড কিম্বা ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে নিগ্গোদের বাধা স্থান ছিল নস্কর-নফর কিম্বা ভাড়ের ভূমিকায়। তাই নিগ্গোপ্রধান জ্যাজের তাতে স্থান করে নিতে কিছুটা সময় লাগে। তবে আজ তার স্থান চলচ্চিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

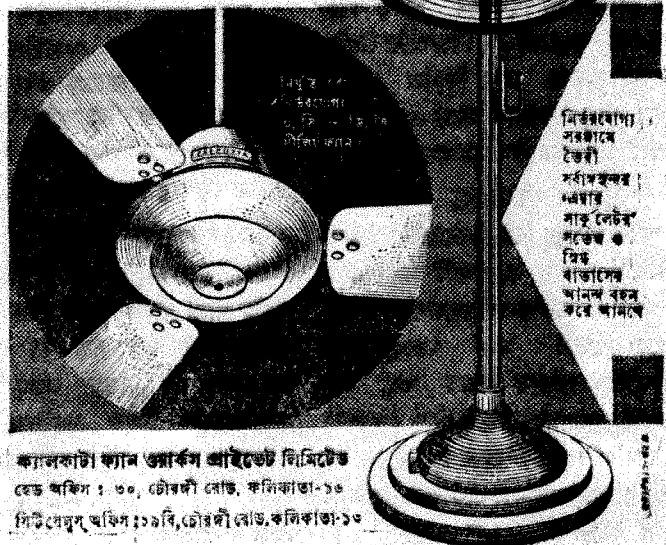
সাহিত্যে অর্থাৎ আধুনিক কাব্য-কবিতায় জ্যাজের প্রভাব নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা হয় '৬১ সালের সেপ্টেম্বরে বেলজিয়ামের কাকলো-জুতে (Knokke-le-Zoute) আন্ত-জাতিক কবি সম্মেলনে। আলোচনা-কারীরা আধুনিক পাশ্চাত্য কবিদের ওপর জ্যাজের তাল-লয়-ছন্দের প্রভাবের

বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে দেখান যে একটু রদবদল করে নিলেই তা জ্যাজ সংগীতে উপযোগী হয়ে যায়।

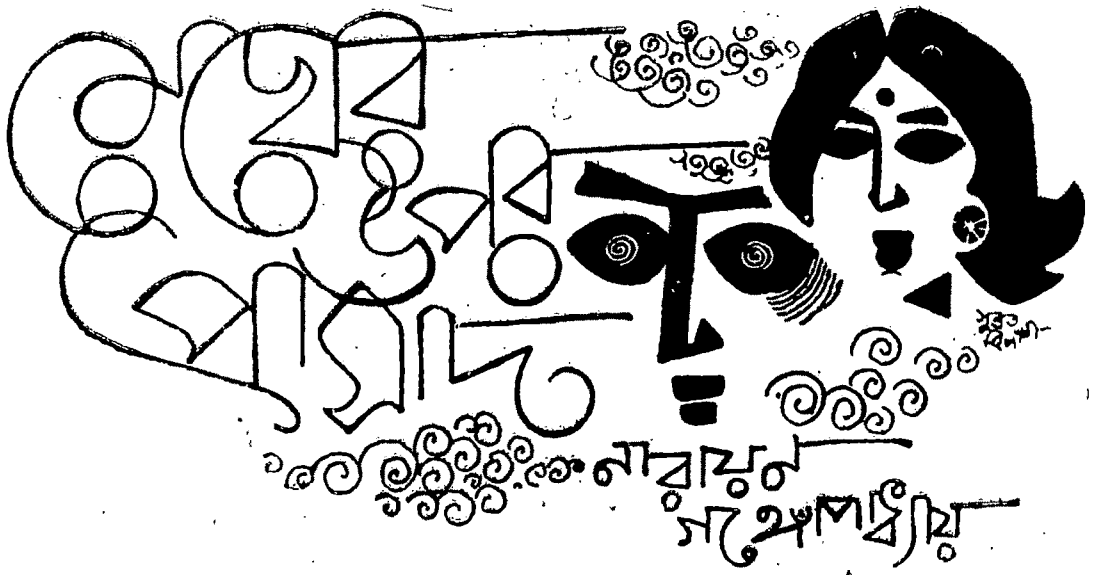
**ভয়েস
অব আমেরিকার
বাংলা অনুষ্ঠান শুভন**
প্রতাহ
সম্মুখ ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ
১৯-৪৬, ২৫-২৬ ও ৪২-১৯
মিটারে

ক্যালকাটা ফ্যান

আপনার
সারা
জীবনের
সহযোগী.



ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস : ৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬
সিউপেরস অফিস : ১৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬



[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ দুই ॥

সমস্ত গলিটা পচা আবর্জনার গন্ধে ভরাট হয়ে আছে। রবিবারে কপো-রেশনের খণ্ডেরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, তার ফলে সারা দিনের সঞ্চিত ময়লার স্তূপে এই চার হাত গলিটা এখন নরক। বৈশাখের বীভৎস গরমে সে ময়লা আরও বিকটভাবে ফেঁপে উঠেছে। সামান্য বাতাস হয়তো আছে, কিন্তু এই গলিতে আপা-তত তার আনাগোনা নেই। বিন-বিন করে মশা উড়ছে, গলির মোড়ে দু'জন হিন্দু-স্থানী অশ্লীলতম ভাষায় ঝগড়া করছে আর কোন একটা বাড়ী থেকে একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে চিংকার করে হার্মোনিয়ামের সঙ্গে গলা সাধছে।

আড়াই হাত বারান্দায় একটা জল-চৌকিতে বসে বসে খাচ্ছিলেন গৌরাঙ্গ-বাবু। শেষ টান দিয়ে বাড়টাকে ছুঁড়ে দিলেন সামনের আবর্জনার ওপরে। তার-পরে দাঁতে দাঁতে ঘষে বললেন, এর চাইতে রাস্তার কুকুর হওয়া ভালো ছিল।

বারো বছর আগে পাকিস্তান ছেড়ে যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখনো সব এমন করে বিষয়ে যায়নি। গায়ে জোর আছে, খেতে খাব; মনে শক্তি আছে—আবার উঠে দাঁড়াব। দেশের ভিটে-মাটি গেছে ঝাক—নতুন করে সব গড়ে নেব আবার।

তেরো আর ছ বছরের দুটি ছেলে, আট আর চার বছরের দুটি মেয়ে, স্ত্রী। এই পাঁচটি গোষাকে নিয়ে উন্মাদত্বের

দলে ডিড়ে গৌরাঙ্গবাবু কলকাতায় এসে পা দিয়েছিলেন। বয়েস তখন বেরাল্লিশ হলেও বাইশ বছরের, মতো খাটতে পারেন। ম্যাট্রিক ফেল গৌরাঙ্গবাবু, চাকরির মিথ্যে আশায় ঘুরলেন না। সীজন্ টাইমে শুরুর করলেন বইয়ের ক্যান্ডিডাইস—অন্য সময়ে দালালী। অভাবের মধ্যেও ছেলোমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করালেন, নারকেলডাঙার এই গলিতে ছোট বাসাটা ভাড়া করলেন দ্বিধা টাকায়। ভাবলেন, কয়েক বছর চালিয়ে যাই—তারপর ছেলেদুটো দাঁড়িয়ে গেলে আমার আর কিসের ভাবনা!

কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেল।

আজ চার বছর ধরে বাত। অল্পে অল্পে শরু হুয়েছিল, এখন সারা শরীরে যন্ত্রণার নাগপাশ জড়িয়েছে। ছ' মাস বিছানাতেই পড়ে থাকতে হয়—শরীরের প্রত্যেকটা সন্ধিতে যেন করাত চলে, হাত-পায়ের আঙুলগুলো বঁড়শীর মতো বেকে যেতে চায়। তখন পৃথিবীশুদ্ধ সকলকে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া আর কিছুর করার থাকে না। এক গ্লাস জলের জন্যে পর্যন্ত অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। যে গৌরাঙ্গ দে বেলা আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বাস থেকে ব্যারাক-পূর চষে বেড়িয়েছে, সে নারকেলডাঙার গলির অন্ধকার ঘরে যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে টেনে ছিঁড়তে চায় মাথার চুল।

যে ছ' মাস শরীর ভালো থাকে, তখনো সামান্য চলাফেরা ছাড়া আর কিছুর করার নেই। বায়ান বছর বয়সেই পৃথিবী-বীর কাছে গৌরাঙ্গবাবু সম্পূর্ণ বাতিল

হয়ে গেছেন। এখন তিল-তিল করে মৃত্যুর অপেক্ষা। কিন্তু সে মৃত্যু কবে আসবে গৌরাঙ্গবাবুর জানা নেই। এর চাইতে যক্ষ্মাও ছিল ভালো, বোঝা যেত মৃত্যুটা দিনের পর দিন কাছে আসছে। সে ভরসাও তাঁর নেই। এই অকাল-পশুদের বোঝা নিয়ে হয়তো আরো দশ—আরো কুড়ি বছর বেঁচে থাকবেন গৌরাঙ্গবাবু। এই দুর্গন্ধ গলির অন্ধ-কার ঘরে কানের কাছে মশার গুঞ্জন শুনতে শুনতে মনে হবে, নরক কি এর চাইতেও ভয়ঙ্কর?

তবু আজ তিন বছর ধরে সংসার চলছে। কী ভাবে চলছে?

এই কথাটাই ভাবতে চান না গৌরাঙ্গ-বাবু। এক-চক্ষু হরিণের মতো সৌন্দর্যের দৃষ্টি সম্পূর্ণ বন্ধ করে রেখেছেন।

বড়ো ছেলে অতর তিনবারে স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করতে পারেনি। এখন কোন একটা কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস্ খাটছে। সামান্য হাত-খরচা পায়—কোনো মাসে দশ, কোনো মাসে পনেরো টাকা এনে দেয় সংসারে। ছোট মেয়ে তৃপ্তি ক্লাস সেভেন পর্যন্ত উঠে পড়া ছেড়েছে—পড়-বার আর উপায় ছিল না। ছোট ছেলে অমিয় এইট পর্যন্ত উঠে স্কুলের মায়া কাটিয়েছে—এখন শিস দিয়ে সিনেমার গান গায়—পাড়ার রকবাজ ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা মারে—ফুটবল খেলার নাম করে তিন-চার দিনের জন্যে কোথায় উধাও হয়ে যায়।

সংসার চালায় বড়ো মেয়ে দীপ্তি।

খার্ড ডিভিশনে কেবল স্কুল-

ফাইন্যাল পাশ করেছিল। তারপর কৌথায় যেন একটা চাকরি জুটিয়েছে। কী চাকরি গোরাঙ্গাবাদু জানেন না। সকাল নটার বেরিয়ে, চারটেয় আসে; আবার বেরিয়ে রাত এগারোটা-বারোটা ফেরে। বলে, ওভার টাইম ডিউটি দিতে হয়।

কী চাকরি করে দীপ্তি?

কখনো একশো কখনো দুশো টাকা এনে দেয় বাপকে। শ্রদ্ধে তাই নয়। বিকেলে প্রত্যেকদিন শাড়ী বদলায়, প্রসাধন করে, চকচকে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায়। এইখানেই খটকা লাগে গোরাঙ্গাবাদুর। স্কুল-ফাইন্যাল পাশকরা দীপ্তি কী এমন চাকরি পেয়েছে যে সংসারে দুশো টাকা দিয়েও নতুন শাড়ী কেনবার পয়সা উল্লেখ্য থাকে তার হাতে? অনেকদিন বেশি রাত হলে সে ট্যাক্সি করে বাড়ী ফেরে—এত টাকা তাকে কে জোগায়?

গোরাঙ্গাবাদুর মনের ওপর ছায়া নড়ে বেড়ায়। দুর্বোধ্য আভ্যন্তরীণ একটা কালো হাত যেন নেমে আসতে চায় গলার ওপর। দীপ্তির প্রসাধন-করা মুখ, পেন-সিলটানা ভুরু, তার উজ্জ্বল চলার ভাঁজের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন গোরাঙ্গাবাদু। কিছুর একটা বৃত্তে চান, কী যেন দেখা যায় আবছা-আবছা, তারপরেই চোখ বন্ধ করে ফেলেন। যা হওয়ার হোক—তিনি কিছু জানতে চান না। সংসার চলছে—চলুক। শরীরের প্রত্যেকটি সন্ধিতে সন্ধিতে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে তিনি শ্রদ্ধে মৃত্যুর জন্যেই অপেক্ষা করবেন।

পাঁচ বছর—দশ বছর—পনেরো বছর। কতদিন, গোরাঙ্গাবাদু তা জানেন না।

আবজ্ঞার দুর্গন্ধভরা গলিতে অন্ধকার নামছে। গোরাঙ্গাবাদু ডান হাত ভুলে পারের ওপর মশা মারতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ওপর যন্ত্রণা টনটন করে উঠল।

—কুকুর! কুকুরেরও অধম আমি!—
আজ একবার অক্ষম ক্রোধে আত্মসমালোচনা করলেন গোরাঙ্গাবাদু। তারপর গলা চাড়িয়ে ডাকলেন :

ভূপ্তি!

—আমি ছি বাবা।

কিশোরী মেরেটি ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—কী করছিলি?

—মশলা বাটছিলুম।

—রাতের বেলায় আবার মশলা কেন?

—দিদি বিকেলে কোথেকে ভেড়ার মাংস নিয়ে এসেছে—তাই—

ভেড়ার মাংস—মার্টন! এই নারকেল-ডাঙার অসহ্য দুর্গন্ধ ভরা গলিতে—

ধরলেন। ছোট ছোট্টা কোন্ দোকানের বিড়ি এনেছে কে জানে! অসম্ভব তেতো।

সামনের বড়ো রাস্তায় আবার এক রাশ অশ্লীল গালাগালির ঢেউ উঠল।
ওগুনোর অর্থ বোধবার মতো



—দিদি বিকেলে কোথেকে ভেড়ার মাংস নিয়ে এসেছে—তাই—

এই লোনাধরা একতলা স্যাঁত-সেঁতে বাড়ীতে মার্টন। সব মিলিয়ে একটা বিকট প্রহসনের মতো মনে হল। গোরাঙ্গাবাদু মুখ বিকৃত করলেন। আবার সেই অস্পষ্ট ছায়াটা এগিয়ে আসছে সামনে—একটা ঠাণ্ডা হাতের ছায়া পড়ছে হৃৎপিণ্ডে।

—কৌথায় পেল মার্টন?

—বললে, মাকেট থেকে এনেছে।

—মাকেট! ও!

গোরাঙ্গাবাদু আর একটা বিড়ি

ভূপ্তির হয়েছে। গোরাঙ্গাবাদু মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারলেন না। শ্রদ্ধে বিড়ির গোড়াটা চিবিয়ে চললেন কিছুক্ষণ

তারপর :

—তোরা দিদি অনেক টাকা মাইনে পায়—না রে?

—জানি না বাবা

—হুঁ। একটা এম-এ পাশকেও যোগ

হয় এত টাকা দেয় না। সবই আমার বরাতের জোর।

ভাগ্যকে আশীর্বাদ করা নয়—শেষ কথাটায় সাপের ফণা হিস-হিস করে উঠল। কিন্তু ছোবলটা পড়ল নিজেরই বুকের ওপর। তৃপ্তি মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ গৌরাঙ্গবাবুর মনে হল, হয়তো অনেক কথাই তৃপ্তি জানে। কিন্তু সাহস করে দীপ্তিকে কখনো জিজ্ঞেস করতে পারেননি, তৃপ্তিকেও পারলেন না। চলুক—যেমন চলছে চলুক। তিনি অক্ষম, পঙ্গু। কিছু করবার শক্তি নেই—বাধা দেবার শক্তিও কি আছে?

—যাব বাবা?—তৃপ্তি আস্তে আস্তে জানতে চাইল।

—যা। পারিস তো আমাকে একটু চা—

—এনে দিচ্ছি।

তৃপ্তি চলে গেল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন গৌরাঙ্গবাবু। দীপ্তি দেখতে খারাপ নয়, কিন্তু তাঁর এই মেয়েটি সত্যিকারের সুন্দরী। যদি গরীবের ঘরে না জন্মাত, যদি আদর-স্নেহ থাকত, তা হলে সারা শরীরে রূপ ঝলমল করে উঠত। লেখাপড়াতেও মন ছিল মেয়েটার।

—কিন্তু পড়ানো গেল না।

একবার বলবেন দীপ্তিকে? বলবেন, তোর বোনটাকে আবার স্কুলে ভর্তি করে দে? গরীবের ঘরে মার্কেটের মাটন না হলেও কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু মেয়েটা যদি একটু লেখাপড়া শিখত—

কিন্তু দীপ্তিকে কোনো কথা তাঁর বলতে সাহস হয় না। মেয়ের দিকে তাকিয়ে গৌরাঙ্গবাবু বুঝতে পারেন, সে যেন অনেক দূরে সরে গেছে। তার চেহারায়, তার চলায়, তার কথার ভাঙতে মনে হয় সে একটা আলাদা জগতে বাস করছে এখন। সংসারের সঙ্গে যোগ তার আছে বটে, কিন্তু বৌটাটা আলাদা। যে-কোনো সময় তার সফনের শাড়ীর আঁচল দু'লিয়ে সে প্রজাপতির মতো উড়ে যেতে পারে। তখন বাড়ীর এতগুলো মানুষ চক্ষের পলকে শূন্যের ভেতর দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে সোজা পাতালে গিয়ে নামবে। সে দুঃস্বপ্ন কল্পনাও করা যায় না।

গৌরাঙ্গবাবু দীপ্তিকে ভয় করেন আজকাল। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস নেই তাঁর; তাই একচক্ষু

হারণের মতো কেবল একদিকে তাকিয়ে থাকে। রাঁচতে হবে। সেই বাঁচবার উপকরণ কোথা থেকে আসে, সে-কথা জানতে না চাওয়াই সব চাইতে নিরাপদ।

তৃপ্তিটাকে যদি একটু লেখাপড়া শেখানো যেত!

সামনের বাড়ীর ছাতে একটা সিগারেটের আগুন দেখা যাচ্ছে। পাড়ার মধ্যে এরাই একটু অবস্থাপন্ন—বাড়ীটা নিজের, বেলেঘাটার ভদ্রলোকের জামাকাপড়ের দোকান আছে। তাঁরই ছেলে। লেখাপড়া বিশেষ করেনি—বাপের দোকানে কখনো কখনো যাওয়া-আসা করে; বাকী সময়টা আশ্চর্য দিয়ে বেড়ায় আর প্রতিমা-বিসর্জনের সময় ব্যান্ড পার্টিতে তাকে দেখা যায় সকলের আগে, হাতে দস্তানা পরে নানা ভাঙতে ড্রাম বাজায়। তাঁর ছোট ছেলের সঙ্গে খাতির আছে—নাম অমল।

ছাতের রেলিঙে ঝুঁকুে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহ

চমকে উঠল মনে। তৃপ্তিকেই দেখাছিল বোধ হয় এতক্ষণ। বোধ হয় নয়—নিশ্চয়ই। গৌরাঙ্গবাবুর মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ ছুটল। ওই ছেলেটার চোখে দৃষ্টি, শিস টানার ভাঙ, বাড়ীর নামে একটা বিশেষ ধরনে চলাফেরা করাও তাঁর নজর এড়ায়নি।

ইচ্ছে করল, ছুটে গিয়ে ছেকরাসার্টের কলার টেনে ধরেন, ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় বসিয়ে দেন গালে। কিন্তু সারা শরীরে যন্ত্রণার নাগপাশ নিয়ে তিন পা-ও হাঁটবার উপায় নেই তাঁর—অনেক কষ্টে দেওয়াল ধরে ধরে এই বারান্দা এসে বসতে হয়েছে তাঁকে। আর জো করে কীই বা বলতে পারেন? কপৌরেশনের রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার অধিকার সকলেরই আছে, নিজে বাড়ীর ছাতে দাঁড়িয়ে যে কেউ ইচ্ছেমতে সিগারেট খেতে পারে। তিনি কে তাহে শাসন করবার?

শুধু তৃপ্তিকে ভালো করে বলে দিচ্ছে

নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হল

সপ্তর্ষি

অভিজাত সাহিত্য ত্রৈমাসিক

[মূল্যবান এণ্টিক কাগজে ছাপা তিনশতাধিক পৃষ্ঠা]

৥ দাম দু' টাকা ॥

এই সংখ্যার আকর্ষণ :

মিহির আচার্যের সুদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস দ্বিরাগমন গ্রাম-বাঙলার পটভূমিকায় লেখা। এমন ভাবে গ্রামীণ-জীবনের মর্মস্পর্শক ট্রাজেডি কেউ এতদিন তুলে ধরেন নি। গ্রাম বলতে আমাদের মনে যে চিরায়ত ভাবালু সংস্কার রয়েছে শক্তিশালী লেখক নিষ্করুণ নিরাসক্তিতে তাকে ভেঙেছেন। এই উপন্যাস সেই হিসেবে মার্কিন সাহিত্যিক আর্স্টিকন কল্ডওয়েলের সমগোত্র।

গল্প লিখেছেন : সুবোধ ঘোষ, ভবানী মৃধোপাধ্যায়, খগেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি।

কবিতা লিখেছেন : সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক, দিলেশ দাস, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র রক্ষিত, রাম বসু প্রভৃতি।

প্রবন্ধ লিখেছেন : বিনয় ঘোষ, সুকান্ত রায়চৌধুরী, হরপ্রসাদ মিত্র, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিশ্ব ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

সম্পাদনা : এন কিউ ১০।২, নিউল্যান্ড, বাটানগর, চাঁদপুর পরগণা।

হবে। যেন সহজে বাইরে না আসে—যেন ওই ছেলেটার সামনে না দাঁড়ায়। কিন্তু তা-ও কি বলা উচিত? এই নোনাধরা, দম-চাপা বাড়ীর বাইরের বারান্দাটুকুতেই যা কিছু খোলা হাওয়া—যা কিছু মৃদুতার আকাশ। কোন লজ্জায় মেয়েটার কাছ থেকে সেটুকুও কেড়ে নেবেন তিনি?

—বাবা, চা—

তৃপ্ত চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলে। চা-টা হাতে নিয়েই গৌরাঙ্গবাবু আবার সামনের ছাতের দিকে তাকালেন। সেই ছেলেটা রেলিঙের ওপর থেকে গলা বাড়িয়েছে উটের মতো। আবছা আলোতেও যেন এতদূর থেকে তিনি তার লব্ধ চোখ দুটোকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন!

কিন্তু কিছুই বলবার জো নেই।

নিরুপায় হয়ে একটা ধমক লাগালেন মেয়েকেই।

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন এখানে? ভেতরে যা।

তৃপ্ত ভর পেয়ে চলে গেল ভেতরে। হুৎকারটা সামনের বাড়ীর ছাদ পর্যন্তও পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই। উটের মতো গলাটা সরে গেল সঙ্গে সংগেই।

—নরক! নরকে বাস করছি!

চায়ে অনেকখানি একসঙ্গে চুমুক দিয়ে বসলেন গৌরাঙ্গবাবু—সমস্ত মূখ জ্বলে উঠল। ঠক করে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললেন, হারামজাদী! আমাকে পুড়িয়ে মারতে চায়!

এতক্ষণে একরাশ গরম হাওয়া ছুটল গিলির ভেতর, কতগুলো বিড়ির পাতা আর ছেঁড়া কাগজ আবর্জনার স্তূপ থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। খানিকটা পচা আঁশের গন্ধ যেন গৌরাঙ্গবাবুর মূখে এসে ঘা মারল।

এর চাইতে পাকিস্তানে পড়ে থাকলেও কি খারাপ হত? এর চেয়েও বেশি দুর্ভোগ হত সেখানে?

—ডম্ ডম্ ডিগা - ডিগা—

চলতি কোনো হিন্দি গানের সুর ভেসে এল। গৌরাঙ্গবাবু উৎকর্ষ হয়ে উঠলেন। গানের আকর্ষণে নয়; গলা শুনিয়ে বোঝা যাচ্ছিল তাঁর ছোট ছেলে অমিয় আসছে। পরশু সকালে কোথায় খেলতে গিয়েছিল, এখন বাড়ী ফিরছে।

—ডম্ ডম্ ডিগা-ডিগা—

সামনের গ্যাসের আলোয় দেখা দিল অমিয়। বেশ তন্ময় হয়ে গাইতে গাইতে আসছে। এক হাতে একটি কিট-ব্যাগ আর এক হাতে একজোড়া ফুটবল বৃত্ত বুলছে। বাড়ীর বারান্দায় বাপকে বসে থাকতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কঠোর চোখে গৌরাঙ্গবাবু একবার তাকালেন ছেলের দিকে।

পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল অমিয়, গৌরাঙ্গবাবু বললেন, এই শূয়ার!

অমিয়র সারা মূখে বিদ্রোহ দেখা দিলে।

—বাড়ী ঢুকতেই গালাগালি দিচ্ছ যে বড়ো?

—না —আনন্দে নাচতে থাকব। কোথায় গিয়েছিলে লক্ষ্মীছাড়া বয়্যাটে ছেলে?

—বাঃ, খেলতে গিয়েছিলুম না সিউড়ীতে? বলেই তো গেছি তোমাকে।

—উদ্ভার করছ—উজ্জ্বল কোথাকার।

—এতক্ষণের সমস্ত জ্বালা ফেটে পড়ল অমিয়র ওপর : আঠারো বছর বয়েস হল, এক পরসা রোজগারের নাম নেই—ফুটবল খেলেই কটবে সারা জীবন?

অমিয় ভেতর দিকে পা বাড়িয়েছে ততক্ষণে।

—জবাব দিলি না?

—কী আবার জবাব দেব? কাজ-কর্ম পেলেই করব এখন। আমিও কি বসে থাকতে চাই নাকি? —উদ্ভত উত্তর এল অমিয়র।

—কাজকর্ম কি গাছের ফল যে আকাশ থেকে তোমার মূখে টুপ করে এসে পড়বে? চেষ্টা করতে হবে না?

—চেষ্টা করছি না কে বললে তোমায়? মিথ্যে বকাবকি করো না। এই নেমে আসছি ট্রেন থেকে—মেজাজ খারাপ করে দিয়ে না এখন।

—মেজাজ খারাপ করে দিলে কী করবি? —আগুন করা গলায় জানতে চাইলেন গৌরাঙ্গবাবু : মারবি নাকি আমাকে?

—তোমার মাথায়ই গোলমাল হয়েছে। —সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে

মিটিয়ে দিলে অমিয়, কিটব্যাগ আর বৃত্তজোড়া দোলাতে দোলাতে ঢুকে গেল বাড়ীর মধ্যে। একটু পরেই তার খুশী গলার চিংকার শোনা গেল : মাংস হচ্ছে নাকি? বাঃ - বাঃ— চমৎকার! ঢুকতেই গন্ধ পেয়েছি।

চমৎকার! গৌরাঙ্গবাবুও স্বগতোক্তি করলেন। চারদিকে সব কিছুই চমৎকার চলছে। অভয় অ্যাপ্রেন্টিস খাটছে—কালি-ঝলি মেখে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে সেই যে লম্বা হয়ে শূয়েছে—আর উঠবে খাওয়ার সময়। মেজাজ তার সপ্তমে চড়া। —পনেরোটি টাকা মা-র হাতে দিয়ে সে যেন উদ্ভার করছে সবাইকে। অমিয় এই মাত্র ফুটবল খেলে ফিরল—সে সংসারের সব কিছুর উদ্বে। দাঁপ্ত তার 'ওভার টাইম' খেটে যখন খুশি বাড়ী আসবে, একশো-দুশো টাকা ছুড়ে দেবে, মার্টন আনবে—শাড়ী কিনবে—তাকে একটা কথা পর্যন্ত গৌরাঙ্গবাবু জিজ্ঞেস করতে পারেন না। আর সামনের বাড়ীর ওই ছোকরাটো নেকড়ের মতো দু চোখ দিয়ে তৃপ্তকে গিলে খেতে চাইছে—কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদ করা যাবে না, হয়তো যা-তা বলে বসবে মূখের ওপর।

চমৎকার!

সামনে দিয়ে কুঁজো চেহারার এক ভদ্রলোক চলেছেন। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে। দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—কেমন আছেন গৌরাঙ্গবাবু?

—আর থাকা! মানুষের বাইরে চলে গেছি বলতে গেলে। —গৌরাঙ্গবাবুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

—বাতের মতো পাজী জিনিস আর ভু-ভারতে নেই—ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন : আমিও তো ভুভোগী। তবে আপনার মতো—একটু থেমে বললেন, ডাক্তারী কবরেজীতে ওর কিছু করতে পারে না। মাদুলী নিয়ে দেখবেন নাকি?

—গোটা দশেক নিয়ে দেখছি—ভিক্ত জবাব দিলেন গৌরাঙ্গবাবু।

—জানবাজার থেকে একটা আনিবে দেখুন না। অনেকেই তো ফল পায় শুনছি।

—দেখব।

—দৈবের কথা তো কিছ্ বলা যায় না। কী থেকে যে কী হয় কেউ বলতে পারে না সে-কথা।

—হুঁ।

ভদ্রলোক লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে চললেন। পুরো নামটা গোঁরাগু-বাবু জানেন না—পাড়ায় মধুখণ্ডেশ্বরশাহী বলেই পরিচিত। আজ পনেরো বছর ধরে সরকারী পেনশন পাচ্ছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, এখন বড়ো বড়ীর নিশ্চিন্তে দিন কাটে। গলির মোড়েই যে হোমিওপ্যাথির দোকানটা আছে—সেখানে একটা বেঁধে গিয়ে বসবেন এখন। রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত কাটিয়ে আসবেন সেখানে। বেশ আছেন।

শুধু গোঁরাগুবাবুই—

রাত বাড়তে লাগল গলির ওপর। এক-একটা হাওয়ার গরম ঝলকে বিড়-পাতার টুকরো আর ময়লা কাগজ ছড়িয়ে যেতে লাগল চারদিকে। গোঁরাগুবাবুকে ঘিরে ঘিরে মশার গুঞ্জন উঠতে লাগল।

প্রায় এক ঘন্টা আগে চা দিয়ে গিয়েছিল তৃপ্ত, সে-কথা এতক্ষণে গোঁরাগুবাবুর মনে পড়ল। এক চুমুক গরম চা খেয়ে বিরক্তিভরে নামিয়ে রেখেছিলেন, তারপর ভুলেই গিয়েছিলেন সে-কথা। এক ঘন্টা পরে চা-টা নিশ্চয় ঠান্ডা হয়েছে, কিন্তু তা খাওয়া চলে না।

সামনে একটা দীর্ঘ ছায়া পড়ল। জুতোর শব্দ উঠল তার সঙ্গে। গোঁরাগু-বাবু চেয়ে দেখলেন সেদিকে, মনটায় এতক্ষণে একটু প্রসন্নতার আলা পড়ল। এই ছেলোটর ওপর তাঁর একটু মমতা আছে।

—প্রভাত এলে নাকি?

—হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।

—আজ যে এত তাড়াতাড়ি ছুটি পেলো?

—গাড়ীটায় একটু গোলমাল হয়েছে, সার্ভিসে গেছে।

—ভালোই হয়েছে। যাও—ভেতরে যাও।

প্রভাত সরকার তখনই ভেতরে গেল না। মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। যেন কী একটা তার বলবার আছে, কিন্তু বলাটা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছে না।

—জ্যাঠামশাই, দীপ্ত এখনো ফেরেনি—না?

এক মূহুর্তে গোঁরাগুবাবুর সমস্ত স্নায়ুগুলো সজাগ হয়ে উঠল। মনের সামনে সেই অস্পষ্ট ছায়াটা যেন কত-গুলো ধারালো দাঁত নখ নিয়ে উদ্যত হল তাঁর দিকে।

অবরুদ্ধ গলায় গোঁরাগুবাবু বললেন, কেন-কেন? কী হয়েছে দীপ্তর?—শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, সন্ধিতে সন্ধিতে যন্ত্রণার বিদ্যুৎ চমকে গেল তাঁর।

আর সেইদিকে তাকিয়ে প্রভাত সর-কার থমকে গেল। যে-কথাটা বলতে চেয়েছিল, বলতে পারল না।

—না, কিছ্ নয়। এমনিই জিজ্ঞেস করছিলুম।

দরজা ঠেলে বাড়ীর ভেতরে অদৃশ্য হল সে। আর গোঁরাগুবাবু শারীরিক যন্ত্রণা আর পচা দুর্গন্ধের সেই নরকের ভেতরে বসে বসে ভাবতে লাগলেন, কী বলতে চায় প্রভাত? কী বলতে চায় দীপ্তর সম্পর্কে?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার সাহস তাঁর নেই। যে-কালো পদাট্টা সামনে দুলছে—তার ওপারে কী আছে তা তিনি কম্পনাও করতে চান না।

প্রভাত সরকার আজ এক বছর ধরে এই দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ীতে পোঁয়ং গেস্ট।

(ক্রমশঃ)

মীরা স্নো

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

জনসাধারণের অনুরোধে যোগদানের শেষ তারিখ

১৫ই মে ১৯৬২ অবধি বর্ধিত করা হইল।

এ প্রতিযোগিতায় প্রবেশ মূল্য নাই।

মীরা স্নোর বাক্সটি ফেলিয়া দিবেন না। বাক্সের উপরের ঢাকনাটি (ইংরাজীতে মীরা লিখা আছে) কাটিয়া দোকান হইতে প্রাপ্ত প্রতিযোগিতা ফর্মে আপনার নাম ঠিকানা সহি এবং কোন্ দোকান হইতে মীরা স্নো কিনিয়াছেন লিখিয়া বাক্সের উপরের অংশটি সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় ১৫ই মে ১৯৬২ তারিখের মধ্যে পাঠাইয়া দিবেন।

সংক্ষিপ্ত পুরস্কার তালিকা

সেলাই কল • ট্রান্সিস্টার রেডিও • মেয়েদের হাত ঘড়ি • সোনার লকেট • গোল্ড ক্যাপ বরণা কলম • এবং ৯৫টি বিভিন্ন পদুরস্কার।

মীরা কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ

১১এ, প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোড,

টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

II 'প্রেক্ষাগৃহ' এবং ভারতীয়ত্ব প্রসঙ্গে II

সম্পাদক সমীপেষু,

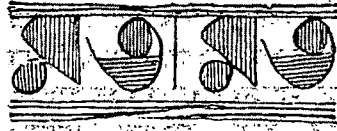
সবিনয় নিবেদন,

'অমৃতের' ৯ই মার্চের ৪৪শ সংখ্যায় 'প্রেক্ষাগৃহ' শীর্ষক নিয়মিত চলচ্চিত্র বভাগে 'রত্নমণির' চলচ্চিত্র সম্বন্ধে নান্দীকর মহাশয়ের আলোচনা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। উনি মন্তব্য করেছেন, সত্যিকারের 'ভারতীয়ত্ব' বলতে আজকের দিনে কোন বিশেষ জীবনধারাকে বোঝায়, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।" মরি ম্যাডামের মতন কুরুচিপূর্ণ বাংলা ছবির প্রশংসা করার পর তাঁর চিন্তাধারা কান স্রোতে বইছে তা বুঝতে মোটেই বৃথা পেতে হয় না। কিন্তু নিজের বিচার-বুদ্ধিকে আর দশজনের বিচারবুদ্ধি বলে লানোয় আমাদের আপত্তি আছে।

ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে সামাজিক কাঠামোর যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে তা কেউই অস্বীকার করবে না, এবং স্বাভাবিকভাবে এবং সহজভাবে মনে নতেও সন্দেহ করবে না, কারণ পরি-
র্তনই সুস্থ জীবনের লক্ষণ, সে সমাজ-
হীননেরই হোক বা ব্যক্তিগত জীবনেরই
হোক। আচারে ব্যবহারে, পোশাকে,
সংস্কৃতিতে যুগোপযোগী আইন প্রবর্ত-
নের মাধ্যমে ভারতবর্ষ বিংশ শতাব্দীতে
সংস্কৃত এগিয়ে এসেছে। আসাই

হাণিয়া কোষবুদ্ধি ফাইলেরিয়া

বনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ
বারা স্থায়ী আরোগ্য হয় ও আর পুনরাব্রমণ
হয় না। রোগ বিবরণ লিখিয়া নিয়মাবলী
লিখুন। 'হিন্দু রিসার্চ' হোম, পোস্ট বক্স
২৫, হাওড়া। ফোন : ৪ ৬৭-২৭৫৫।



স্বাভাবিক। কিন্তু পরিবর্তন মানেই
উৎকট আধুনিকতা নয়, প্রগতি মানেই
নয় পুরনো ধ্যানধারণার সমূল বিসর্জন।

কোনো দেশের চলচ্চিত্র সেই
দেশের জীবনধারাকে রূপায়িত ও প্রতি-
ফলিত করবে এটাই স্বাভাবিক, আর
স্বাভাবিক বলেই কাম্য। কিন্তু তাই বলে
শহরে পুজার নিরঞ্জন শোভাযাত্রায়
আমাদের যুবকেরা যে কুরুচিপূর্ণ
অশ্লীল রক-এন-রোল, রম্বা সম্বা নাচ
দেখায় সেটাকে বাংলা ছায়াছবিতে দেখতে
পেলে আমাদের কি খুব খুশী ও গর্বিত
হবার সঙ্গত কারণ আছে? 'অমৃতের'
মতন বিখ্যাত বাংলা পত্রিকার চলচ্চিত্র
সম্পাদকের কাছ থেকে আমরা আরও
সূচিন্তিত, যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য আশা
করেছিলাম, কারণ চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে,
চলচ্চিত্রে সংগীতে, সাহিত্যে, জীবনের সকল
ক্ষেত্রেই জনসাধারণের মত ও রুচিকে সত্য,
শিব ও সুন্দরের পথে চালিত করার
দায়িত্ব পত্র-পত্রিকার, তারাই জনসাধারণের
বিচার ও রুচির জাগ্রত প্রহরী। "একালের
বাঙালী দেহজীবনে ও মনোজীবনে
দুই-ই অতিশয় শক্তিশালী হইয়াছে, তাই
সুপথ্য যেমন অরুচিকর, কুপথ্যও তেমনি
রুচিকর হইয়াছে।" (মোহিতলাল মজুম-
দার—"বাংলা ও বাঙালী") কুপথ্য ও
সুপথ্যের মধ্যে যাতে সুপথ্য আমরা
চিনে নিতে পারি তার জন্য সাময়িক পত্র-
পত্রিকার দায় ও প্রভাব অনেক—সে
দায়িত্ববোধকে সংকীর্ণ, ব্যক্তিগত স্বার্থের
ওপরে রেখে যথার্থভাবে পালন করার
মধ্যেই পত্র-পত্রিকার সার্থকতা। আমাদের
প্রিয় 'অমৃত'কে সেই ভূমিকায় দেখতে
পেলে আমরা আনন্দিত হ'বো।

নান্দীকর মহাশয় তাঁর আলোচনার
উপসংহার টেনেছেন এই বলে; "আজ কি
সাহিত্যে, কি সংগীতে, কি চিত্রকলায়, কি
চলচ্চিত্রে—কোনটা ভারতীয় এবং কোনটা
ভারতীয় নয়, এ-কথা সঠিকভাবে বলা
শুধু যে অত্যন্ত দুঃস্থ, তাই নয়; এ-কথা
বলবার চেষ্টা করা মূঢ়তার নামান্তর
মাত্র।" বলা দুরের কথা, বলার চেষ্টা
করাই মূঢ়তার নামান্তর মাত্র?

'অমৃতের' ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যায়
তিনি মধ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন
বাংলা দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির অন্যতম
ধারক ও বাহক বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প-
টিকে যেন তিনি সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে
সাহায্য করেন। বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পকে
বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির অন্যতম ধারক
ও বাহক বলতে তিনি কি বুঝাতে
চেয়েছেন?

২রা ফেব্রুয়ারীর ৩৯শ সংখ্যায়
নান্দীকর মহাশয় স্টেট স্ম্যুনের লেখিকা
শ্রীমতী অমিতা মালিকের ভারতীয় চল-
চ্চিত্র সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধটির সমালোচনা
প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "ভারত
সম্বন্ধে আগ্রহ আজ পৃথিবীর সর্বত্রই।
সকল দেশের লোকই ভারতবাসীর চিন্তা-
ধারা, দৈনন্দিন রীতিনীতি, কাব্যকলাপ—
প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে চায়।.....
ভারত কেমন, সেখানকার লোকজনসমত
সমস্ত দেশটাকেই ঐসব দেশের লোকেরা
জানতে চায়। এবং এ-পরিচিতি ভারতীয়
চলচ্চিত্র যে-রকম প্রত্যক্ষভাবে দিতে
পারবে, সে-রকমটি আর কোনো কিছুর
মাধ্যমেই সম্ভব নয়।" অতি খাঁটি কথা।
২রা মার্চের ৪৩শ সংখ্যায় তিনি এই
কথারই পুনরুক্তি করে বলেছেন,
"আমাদের চিত্রপ্রযোজকদের যেমন উচিত
ছবির মধ্যে খাঁটি ভারতের আকৃতি-
প্রকৃতি ও মানসকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে
তোলা, তেমনি আমাদের সরকারের উচিত,
প্রকৃত ভারতীয় ছবিগুলিকে বিদেশে
বহুল প্রচার ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।"
—এতো কথা লেখবার পর নান্দীকর
মহাশয় নিজেই আবার সত্যিকারের
'ভারতীয়ত্ব' কি তা বুঝতে পারছেন না!

দেশাচার, লোকাচার, ধর্ম, ভৌগোলিক
পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক
কাঠামো, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতি
একটা দেশকে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেয়,
যা অপর কোন দেশের সঙ্গে হুবহু মিলে
যেতে পারে না। বাংলা তথা ভারতের
নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অবশ্যই
আছে, রকেট বা অ্যাটম বোমার যুগেও

অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের জন্য
আমাদের আর একটা নূতন কেন্দ্র

৭নং পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা—১

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এর্ভিনিউ, কলিকাতা-১২

আছে। কোনটা ভারতীয়, কোনটা ভারতীয় নয় সে-কথা বলা অত্যন্ত দুরূহ স্বীকার করেও নান্দীকর মহাশয় কি করে আবার বলেন সেটা বলার চেষ্টা করাই মৃত্যুর নামান্তর মাত্র? দেখা যাচ্ছে, তিনি নিজেই শৃঙ্খল চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হননি, বলেছেনও কিছদ!

বিদেশে ‘পথের পাঁচালী’ বা ‘অপূর সংসার’ প্রকৃত ভারতীয় চিত্র বলেই বিশেষ সমাদর ও পুরস্কার পেয়েছে; হলিউড-মার্কা হাল্কা ভারতীয় ছবি না এদেশে, না বিদেশে, প্রকৃত গুণগ্রাহী রসিকজনের অকুণ্ঠিত প্রশংসা লাভ করতে পারে। সাধারণ মেহনতী কর্মকর্তার অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মজদুর শ্রেণীর অবসর বিনোদনের ছবি আর বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত ও মার্জিতরুচিসম্পন্ন দর্শক-সমাজের ছবি এক নয়। মানুষের মনো-বৃত্তির বা হৃদয়বেগের কয়েকটি সাধারণ দিক আছে। দেশজাতীয়তামূলক-নির্বিশেষে যার আবেদন সার্বজনীন। কিন্তু তবুও কই ‘অভিমানের’ তো ঠিক ইংরাজী প্রতিশব্দ এক কথায় পাই না। সর্বদেশে সর্বযুগে মায়ের রূপ যদি একই হয় তবে মাইকেল মধুসূদন রিড্যাসাগরের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে একথা বলেন কি করে, “Vidyasagar—the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengalee mother.” The heart of a mother নয় Bengalee mother? তা এ বাঙালী মায়ের হৃদয় কি অন্যদেশের অন্যজাতের মায়ের হৃদয়ের থেকে ভিন্ন? রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও বাঙালী মায়ের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা বারবার স্বীকার করে গেছেন (‘সাধারণ মেয়ে’, ‘প্রীতান্ত’)! এই বাঙালী মায়ের জীবনকে উপজীব্য করে রচিত যে মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টি রূপালী পর্দায় আমরা দেখবো, তার ভেতর “ভারতীয়ত্ব” বলে কিছদ খুঁজে পাওয়া দুরূহ? ‘অপূর সংসারে’ নায়ক-নায়িকার যে সংঘাত, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন প্রেমের অভিব্যক্তি ঘটেছে, এমনটি আর কোথায় দেখা যায়! প্রত্যেক মহৎ ও সার্থক শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই একটা সমগ্র দেশ, একটা সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে তাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করে তোলে। যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয়, নিজের বৈশিষ্ট্য হারায়, সে মরুরপৃষ্ঠ-শোভিত দাঁড়াকার মতই নিন্দা, ঘৃণা ও কুপার-পাত্র।

আমাদের ‘ভারতীয়ত্ব’ আমাদের দেহে মনে, আকাশে-বাতাসে, মাটিতে, চিন্তায় ধ্যানে, আমাদের সাধনা-আরাধনা সংকল্পে, শোবে, বীর্ষে অশ্রুজলে, আমাদের সাহিত্য ও ধর্মে, এতো ওতঃপ্রত্যোভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে যে এর প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে টেস্ট-টিউবে ঢেলে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা যায় না, যেমন যায় না, ধ্বংস না করে, কুড়ি থেকে ফুলকে আলাদা করা, দেহ থেকে প্রাণকে। জলচর জীব জলে বাস করলেও জলের অস্তিত্ব অনুক্ষণ অনুভব করতে পারে না, যেমন মানুষ তার চারদিকেই সব সময়ে বাতাসের বিরট চাপ, থাকা সত্ত্বেও তা অনুভব করে না, কিন্তু তাই বলে জল বা বাতাস নেই একথা কেউ বলে না। Nation or Nationalism (Indian nation তে মটেই) একটা concept, একে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে এককথায় বলা যায় না। Dr. Johnson একবার Boswell'র কাছে কবিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,

“What is poetry? Why, Sir, we all know what light is, but it is not easy to say what it is.....It is much easier to say what it is not.” তাই ভারতীয়ত্ব কি কি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত তা, বলার চেয়ে কোন জিনিসে ভারতীয়ত্ব নেই তা, বলা মনে হয় সহজতর।

‘ভারতীয়ত্ব’ কি তা না বুঝতে পারি, কিন্তু ‘ভারতীয়ত্ব’র— একটা অস্তিত্ব যে আছে এটা বেশ বুঝতে পারি যখন শুনি, “It is God's will that we should be ourselves and not Europe.... Our business is to realise ourselves first and to mould everything to the law of India's eternal life and nature.” (Sri Aurobindo—“The Ideal of the Karmoyogin.”). “India could not have been what she undoubtedly was and could not have continued a cultural existence for thousands of years, if she had not possessed something very vital and enduring, something that was worth while.” (Nehru—“The Discovery of India.”)

—এ চিঠি খুবই দীর্ঘ হয়েছে, সম্পাদক মহাশয় ছাপাবেন কিনা জানি না, তবে নান্দীকর মহাশয় এমন কয়েকটা বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যার সব উত্তর এর চেয়ে দীর্ঘতর হলেও অনেক কথা না-বলা থেকে যেতো।

নান্দীকর মহাশয় ছায়াছবির আলো-চনা প্রসঙ্গে ‘ভারতীয়ত্ব’ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত ‘শেষ কথা’ বলা থেকে বিরত থাকলে প্রজ্ঞা ও পরিণামদর্শিতারই পরিচয় দিতেন এবং আমরাও তার জন্য আমাদের ‘ভারতীয়ত্ব’ সম্বন্ধে হঠাৎ সন্দেহান (?) না হয়ে তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকতাম।

নমস্কারান্তে,

বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র পালিত
কলিকাতা : ৬

বিনোদনী মাড়ীর মেলা

মোহিনী মোহন

কাঙ্ক্ষিতাল

এও মন্ড

কলেজ স্ট্রীট জংশন, কলিঃ-৯

ফোন : ৩৪-৪৫২০

বিজ্ঞানের কথা

অমরকান্ত

॥ কয়েকটি ঘরোয়া মন্তব্য ॥

ঘরোয়া মন্তব্য মানে ঘরে ব্যবহার করা হয় এমন মন্তব্য। যেমন, সেলাইয়ের কল বা ঘাড়ি ইত্যাদি। আমরা আজকাল অনেক সময়ে বড়ো বড়ো বিষয়ে খুঁটিয়ে খবর রাখি কিন্তু অনেক ছোট্ট বিষয়ে প্রায় কিছুই জানি না। যেমন, যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আইসোটোপ কাকে বলে, তাহলে একেবারে মূখ বুজে ঢোক গেলার মতো অবস্থা আমাদের হয়তো কারও হবে না, কারণ এই পারমাণবিক যুগে খবরের কাগজের পাঠককেও আইসোটোপ সম্পর্কে কিছু না কিছু জানতেই হয়। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ঘাড়ি চলবার সময়ে টিক-টিক শব্দ হয় কেন—তাহলে আমরা সবাই যে খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে জবাব দিতে পারব সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি আরো একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, পৃথিবী থেকে চন্দ্র বা মঙ্গলগ্রহে বা শূন্যগ্রহে পাড়ি দিতে হলে কী কী আয়োজন ও প্রস্তুতি চাই তাহলে আমি খুঁটিয়ে জবাব দিতে পারি। কিন্তু আমার ভাইঝি আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—জোয়ার-ভাটা হয় কেন? জবাব দিতে গিয়ে টের পেলাম বিষয়টি সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই ভাসা-ভাসা। প্রাক-

বিশ্ববিদ্যালয় ক্রাশের একজন ভূগোলের ছাত্রী বিষয়টি যতোটা খুঁটিয়ে জানতে চায় তা আমার অনায়াস। তারপরে আরো আশ্চর্য হয়ে আবিস্কার করলাম যে, ভূগোলের চর্চায় টেক্সট-বইগুলোতে এ-প্রশ্নের জবাব যে-ভাবে দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে এই সামান্য প্রশ্নের জবাব জানাবার জন্যে বড়ো একটি লাইব্রেরিতে গিয়ে বসতে হয়েছিল। এই দৃষ্টান্ত শুনে অনেকে হয়তো হাসছেন। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের সকলকেই এমনি ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো না কোনো সময়ে পড়তে হয়েছে। একবার একটি সাত-শ বছরের মেরে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—রাতিয়েলা মাঝে মাঝে ট্রামের তारे সবুজ আলো জ্বলে ওঠে কেন? আমরা বললাম, ও কিছু না, বৈদ্যুতিক স্পার্ক। হোয়েটি জিজ্ঞেস করলে, সব সময়ে হচ্ছে না কেন? জবাব দিতে গিয়ে আমাদের জুনিয়রকেই টের পেতে হবে যে, একটি

সামান্য প্রশ্নের জবাব সাত বছরের মেরেকে বুঝিয়ে বলার মতো জ্ঞান আমাদের নেই।

যাই হোক, আমাদের আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

॥ সেলাইয়ের কল ॥

বাইরে থেকে যেটুকু বোঝা যায়, একদিকে হাত বা পায়ে সাহায্যে একটি চাকা ঘোরানো হচ্ছে আর অন্যদিকে একটি সূঁচ অনবরত ওঠা-নামা করছে। আর যাঁরা ভেতরের দিকেও একটু নজর দিয়েছেন তাঁরা জানেন যে, এই সূঁচের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি মাকুঁও অনবরত সামনে-পেছনে ছুটোছুটি করে। সেলাইয়ের কলের যান্ত্রিক আয়োজন প্রধানত এই সূঁচ আর মাকুর যথাযথ সম্বলনের জন্যে।

হাতে-সেলাইয়ের সঙ্গে কলে-সেলাইয়ের একটি প্রকৃতিগত তফাৎ আছে। কলে-সেলাইয়ে দুটি সূঁচের প্রয়োজন—একটি সূঁচের সঙ্গে, অন্যটি মাকুর সঙ্গে। মাকুর সূঁচটি থাকে মাকুর ভেতরে একটি বিনের মধ্যে। মাকুর সূঁচ না থাকলে শুধু সূঁচের সূঁচের কলে সেলাই পড়ে না—এ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সকলের আছে।

আসলে ব্যাপারটা কী ঘটে? বাইরের সূঁচটি কাপড়কে একটা ফাঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসে। কিন্তু সূঁচের সঙ্গে সঙ্গে সূঁচটিও কিন্তু বোরিয়ে আসতে পারে না। তা আটকা পড়ে যায়। এখানেই মাকুর কৃতিত্ব।

বাইরের সূঁচটি যে-মুহূর্তে ফাঁড়ি দেওয়া শেষ করে ওপরে উঠে আসছে, তখন সূঁচের সঙ্গে সূঁচটিও হয়ে ওঠে একটি ফাঁসের মতো। আর সূঁচ সন্মত মাকুটি সেই ফাঁসের মধ্যে সূঁচুৎ করে ঢুক পড়ে। তারপরে বাইরের সূঁচ বাইরে বোরিয়ে গিয়ে সংগের সূঁচকে যতোই টানটান করে ততোই মাকুর সূঁচের সঙ্গে সূঁচের সূঁচের গিঁট শক্ত হয়। বাইরের সূঁচ আবার একটি ফাঁড়ি দেবার জন্যে নামতে শুরুর করে। ততোক্ষণে কাপড় খানিকটা সামনের দিকে সরে গিয়েছে। অর্থাৎ এই ফাঁড়িটি পড়ে নতুন জামগাম। তারপরে একই প্রক্রিয়ায় বাইরের সূঁচের সঙ্গে মাকুর সূঁচের

নতুন আরেকটি গিঁট। এমনিভাবে কাপড় সেলাই হয়ে চলে।

প্রক্রিয়ায় কোনো জটিলতা নেই। যান্ত্রিক আয়োজনেও নয়। কিন্তু মনে পড়ে, ছেলেবেলায় বাড়িতে যখন প্রথম সেলাইয়ের কল এসেছিল, আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। মা সেলাই করতেন আর মাঝে মাঝে যখন একটানা লম্বা সেলাই দেবার প্রয়োজন হত তখন শুধু চাকাটি ঘুরোবার সুযোগ পেলেই কী খুশী হতাম আমরা! আজকালকার মায়েরদের অবশ্য বাড়িতে সেলাই করার অবসর খুবই কম। তার ওপরে শোনা যাচ্ছে, আর কিছুদিন পরে নাকি জামা তৈরি হবে বিশেষ ধরনের আঠার সাহায্যে কাপড়ের সঙ্গে কাপড় জোড়া লাগিয়ে, সেলাই দেবার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তবুও এই পুরনো যুগের সেলাইয়ের কল যতোদিন টিকে আছে, ততোদিন বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা সেলাইয়ের কল দেখে অবাক হবেই, কখনো কখনো সেলাইয়ের কলের আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে, আর সেলাইয়ের কলের চাকাটি ঘুরোবার সুযোগ পেলে ধন্য মনে করবে নিজেদের।

॥ ঘাড়ির টিক-টিক ॥

ঘাড়ি বলেই চলেছে টিক-টিক, টিক-টিক। কান পেতে থাকলে এই শব্দের মধ্যেই অনেক কিছু ঘোষণা শোনা যেতে পারে। কবির শব্দেছেন এবং কবিতাও লিখেছেন। আমরা আলোচনা করব, ঘাড়ি কেন টিক-টিক করে।

প্রথমে পেন্ডুলাম-ঘাড়ির দিকে তাকানো যাক। এই ঘাড়িতে স্পষ্টতাই একবার দম্ব দিতে হয়। পুরো দম্ব খাওয়া স্প্রিংটি সাতদিন ধরে আস্তে আস্তে পাক খুলে দম্ব শেষ করে। তাহলে বৃদ্ধিতে হবে ঘাড়ির স্প্রিং-এর দম্ব ধরে রাখবার একটি ব্যবস্থা আছে। সেটি কি?

ঘাড়ির ভেতরে যাঁরা তাকিয়ে দেখেছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, ঘাড়ির ভেতরে রয়েছে অনেকগুলো ছোট-বড়ো দাঁতওয়া চাকা। দাঁতের সঙ্গে দাঁত এমনভাবে লাগানো থাকে যে, একটি চাকা ঘুরতে শুরুর করলেই সবকটি চাকাকে ঘুরতে হয়। বিশেষ যে চাকাটির সাহায্যে সবকটি চাকার ঘূর্ণগতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তার নাম এস্কেপ-হুইল। এই এস্কেপ-হুইলের সঙ্গেই মেইন স্প্রিং-এর কগ-হুইলের যোগ। এই এস্কেপ-হুইলের পাক-খাওয়াকে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ায় বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে।

ঘাড়ির পেন্ডুলামটি দোলে তা আমরা সকলেই লক্ষ্য করছি। এই পেন্ডুলামের দন্ডটির সঙ্গে ভেতরের দিকে এমন একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে যার ফলে

পেন্ডুলামের দোলন নোঙরের মতো দেখতে একটি ধাতুর পাতকে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঠেলা দিতে থাকে। নোঙরটি যখন ডানদিকে ঠেলা খায় তখন তার ডানবাহুটি ঢুকে পড়ে এস্কেপ-হুইলের দাঁতের মধ্যে আর এস্কেপ-হুইলের পাক-খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পর মূহুর্তেই নোঙরটি ঠেলা খায় বাঁদিকে। এস্কেপ-হুইলের দাঁত থেকে ডানবাহু বেরিয়ে আসে, এস্কেপ-হুইল পাক খেতে শুরু করে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নোঙরের বামবাহু গিয়ে ঢোকে এস্কেপ-হুইলের দাঁতে। এস্কেপ-হুইলের পাক-খাওয়া আবার বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে এস্কেপ-হুইলের পাক-খাওয়াটা চলে অনবরত থামতে থামতে। ফলে ঘড়ির স্প্রিংকেও বাধ্য হয়ে অতি ধীরে ধীরে পাক খুলতে হয়। আর তার পরে চাকার সঙ্গে চাকার যোগাযোগে এমন একটা মাপ বজায় রাখা হয় যার ফলে ঘড়ির ছোট কাঁটাটি চম্পিশ ঘণ্টায় পুরো একটা পাক খেতে পারে, বড়ো কাঁটাটি প্রতি ঘণ্টায় একবার।

নোঙরের ডানবাহু যখন এস্কেপ-হুইলের দাঁতে গিয়ে লাগে তখন একটি শব্দ হয়—টিক। পরক্ষণেই নোঙরের বামবাহু গিয়ে লাগে এস্কেপ-হুইলের দাঁতে। আবার শব্দ হয়—টিক। এমনভাবে ঘড়ি চলার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ওঠে—টিক-টিক, টিক-টিক।

রিস্ট-ওয়াচে বা টাইমপীসে পেন্ডুলাম থাকে না। তার বদলে থাকে একটি হেয়ার-স্প্রিং। এই হেয়ার-স্প্রিং একটি ব্যালান্স-হুইলকে একবার সামনে আর একবার পেছনে পাক খাওয়াতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নোঙরটি একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঠেলা খায়।

ঘড়ির যান্ত্রিক আয়োজনও খুব জটিল নয়। কিন্তু লিখে হয়তো ঠিক বোঝানো গেল না। একটি টাইমপীসের পেছনের ডালাটি খুলে একবার তাকিয়ে দেখবেন। সামান্য কয়েকটি চাকা—আর তাই দিই কি না প্রবহমান সময়কে একটা মাপের মধ্যে বন্দী করা হয়েছে! তবে একটি বিষয়ে সাবধান করার আছে। অনাড়ম্বর হাতে কখনো রিস্ট-ওয়াচ খুলতে চেষ্টা করবেন না।

II আবিষ্কারের ইতিহাস II

মতাদ্র জানা গিয়েছে, সত্যিকারের একটি সেলাইয়ের কল প্রথম তৈরি হয়েছিল ফ্রান্সে। আবিষ্কারক একজন

গরীব দরজী। তাঁর নাম বার্থেমিনি থিমোনিয়। ১৮৩০ সালে তিনি ফ্রান্সে এই সেলাইয়ের কলের পেটেন্ট নিয়েছিলেন। যন্ত্রটি অবশ্য ছিল খুবই জবজব ধরনের, প্রায় সবটাই কাঠে তৈরী—তবুও এই যন্ত্রটির সাহায্যে সত্যি সত্যিই সেলাই করা যেত। তবে যন্ত্রটি খুব যে জনপ্রিয় হয়েছিল তা বলা চলে না। প্রায় একশত বছর ১৮৪১ সালে এসে দেখা যাচ্ছে, সারা প্যারিসে মাত্র আশিটি সেলাইয়ের কল কাজ করছে। তাও শুল্ক সৈনিকদের পোশাক তৈরির জন্যে। ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সে রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁর আকার ধারণ করেছিল। এমন এক আন্দোলনের সময়ে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা সবকটি সেলাইয়ের কলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু থিমোনিয় তাতে দমেননি। ১৮৪৫ সালে তিনি আরো উন্নত ধরনের একটি সেলাইয়ের কল তৈরি করেন। তারপরে তিন বছর না যেতেই তিনি যে যন্ত্রটি তৈরি করেন তা খুবই উন্নত ও পুরোপুরি ধাতুতে তৈরি। কিন্তু রাজনৈতিক আলোড়নে বিক্ষুব্ধ প্যারিস এই আবিষ্কারকে কোনোই মূল্য দেয়নি। ১৮৫৭ সালে নির্বাসন ও নিঃসম্বল অবস্থায় থিমোনিয়ের মৃত্যু হয়।

তবে, সত্যিকারের অর্থে, আধুনিক সেলাইয়ে কল আবিষ্কার করেছেন নিউ-ইয়র্কের উইলিয়াম হাণ্ট নামে একজন ভদ্রলোক। ১৮৩২-৩৪ সালে তিনি যে যন্ত্রটি নির্মাণ করেন তার মধ্যে আধুনিক সেলাই-কলের সবকটি বৈশিষ্ট্যই ছিল। মাথার দিকে ফুটোওলা স্‌চ ও বিন-সমেত মাকুর সার্থক প্রয়োগ তাঁরই কৃতিত্ব।

ইংল্যান্ডে ১৮৪৩ সালের পর থেকে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা চলছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৫১ সালে আইজাক মেরিট সিগার (১৮১১-৭৫) নামে এক ভদ্রলোক সেলাইয়ের কল উৎপাদনের পেটেন্ট সংগ্রহ করেন এবং সেলাইয়ের কল ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

ঘড়ি আবিষ্কারের ইতিহাস অল্প দূর-এক কথায় বলার উপায় নেই। এই ইতিহাসের সঙ্গে মানব-সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা-

বিজ্ঞানের এই দুটি বিশেষ শাখার অবদান ঘড়ি-নির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই বেশি। এই আলোচনা ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল।

ইউরোপের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, ইউরোপে ঘড়ির ব্যবহার শুরুর হয়েছে চারোদশ শতকে। তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে জানা যায় যে ঘড়ির আবিষ্কার আরো কয়েক-শো বছর আগেই। খুব সম্ভবত দ্বিতীয় পোপ সিলভেস্টার ১১৬ খ্রিষ্টাব্দে যান্ত্রিক ঘড়ি আবিষ্কার করেছিলেন। তবে গোড়ার দিকে এই যান্ত্রিক ঘড়িকেও সূর্য-ঘড়ির সাহায্যে বারে বারে মিলিয়ে নিতে হত।

ইংল্যান্ডের ওয়েস্টমিনিস্টার টাওয়ারে প্রথম ঘড়ি বসানো হয় ১২৮৮ সালে। ক্যান্টারবারি গির্জায় ১২৯২ সালে।

* * *
কন্ডিশনড রিসেক্স সম্পর্কে বিজ্ঞানের কথায় অনেক আলোচনা হয়েছে। ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি কি-ভাবে এক ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে কন্ডিশনড স্টিমুলাস হয়ে উঠেছিল সেই গল্প বলে আজকের আলোচনা শেষ করছি।

এক জমিদার ভদ্রলোক দুপুরবেলা খেয়ে উঠতেন আর ঘড়িতে টং টং করে বারোটা বাজত। এক-দুই-তিন করে গুনতে শুনতে বারোটি ঘণ্টা তিনি শুনতেন আর তারপরে প্রচণ্ড শব্দ করে মস্ত এক ঢেকুর তুলতেন। ভদ্রলোক নিজেও জানতেন না যে ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি তাঁর ক্ষেত্রে কন্ডিশনড স্টিমুলাস হয়ে উঠেছে। একদিন কি কারণে যেন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক যথারীতি দুপুরের খাওয়া শেষ করে বিছানায় আগ্রয় নিলেন। কিন্তু সেই ঢেকুরটি আর কিছতেই ওঠে না। ভদ্রলোক হাঁসফাঁস করতে থাকেন আর শেষকালে দম বন্ধ হয়ে মারা যান আর কি। ভদ্রলোকের কপাল ভালো যে তাঁর দর-ওয়ান অনেক দিন থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে সে তাড়াতাড়ি ঘড়িটা চালিয়ে দেয়। টং টং করে বারোটা বাজে। আর বারোটি ঘণ্টা বেজে উঠতেই ভদ্রলোকের গলায় আটকে থাকা ঢেকুরটি সশব্দে বেরিয়ে আসে। ভদ্রলোক প্রাণে বেঁচে যান।

সতর্কভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনেও কোনো কোনো ক্রিমাকান্ডের সঙ্গে ঘড়ির এমন-ধারা সম্পর্ক খুঁজে পেতে পারি।

১১. লুপ্ত বাক্‌শক্তি পুনরুদ্ধার ১১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বহু সৈনিক গলার কাছে আঘাত পাওয়ার ফলে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে। অনেক সময়ে আবার কঠিন কোনো অস্ত্রোপচারের ফলে কিংবা স্বরযন্ত্রে আঘাত পেয়ে কিংবা অন্য কোনো গলদেশীয় রোগে আক্রান্ত হয়ে কেউ কেউ কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এরা যাতে স্বাভাবিক কথা বলতে পারে, তার জন্যে কাজাকস্তানের চিমকেন্ট শহরের 'ইলেকট্রো-আপারার' কারখানার গবেষকরা একরকম যন্ত্র তৈরি করেছেন।

বিদ্যুৎচালিত এই যন্ত্র লুপ্ত স্বর-দণ্ডের কাজ করে থাকে এবং এই যন্ত্রব্যবস্থায় স্বরকক্ষের (ভোক্যাল বক্স) কাজও স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। ঠোঁট, জিহ্বা ইত্যাদির স্বাভাবিক সন্ধিতার সহযোগে এই "বাচনযন্ত্র" যন্ত্রার মূল কণ্ঠস্বরকে হুবহু রূপ দেয় এবং তার প্রত্যেকটি কথাকে যথাযথ স্পষ্টতার সঙ্গে ব্যক্ত করে। যন্ত্রটির ওজন মাত্র পঞ্চাশ গ্রাম এবং আকার একটি সাধারণ সিগারেট ব্যাক্সের মতো। এই ব্যাক্সের মধ্যে রাখা একটি ক্ষুদ্র ট্রান্সিস্টার জেনারেটর-এর সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম তারের সাহায্যে সংযুক্ত বোতামের আকারের একটি ভাইব্রেটর যন্ত্রার মূখের ভেতরে আটকানো থাকে।

১১. স্বয়ংক্রিয় স্কুটার ১১

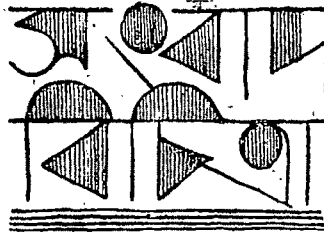
ব্রিটেনের ট্রান্সামফ ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিমিটেড সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা একটি স্বয়ংক্রিয় স্কুটার নির্মাণ করছেন।

এই ১০০ সি. সি. হার্পা যানটির নাম হল 'টিনা'। ক্লাচ ও গ্যায়র ব্যবহারের প্রয়োজন না থাকায় এর চালক রাস্তার অবস্থার প্রতি পুরাপুরি দৃষ্টি রাখতে পারবেন। গ্লটল এবং ব্রেক মাত্র এই দুটি কন্ট্রোল ব্যবস্থা এর রয়েছে। ইঞ্জিন চালু হয়ে গেলে অটোমেটিক ট্রান্সমিশন ব্যবস্থাধীন যানটি দ্রুতগতিতে চলতে থাকবে। ট্রান্সমিশন ইউনিট রাস্তার অবস্থা বুঝে আপনা-আপনি কাজ করবে।

দুইজন বয়স্ক ব্যক্তিকে বহন করে 'টিনা' ঘণ্টায় ৪০ মাইল পর্যন্ত বেগে চলতে পারবে। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ইন্ধন ব্যয় হবে প্রায় ১০০ মাইলে এক গ্যালন।

১১. অভিনব বৈদ্যুতিক বালব ১১

আমেরিকার নিউজার্সির নর্থবার্গেন ডুরোন্ট কর্পোরেশন নামে একটি



প্রতিষ্ঠান 'ফ্রেমসসেন্ট' নামে একপ্রকার অভিনব বৈদ্যুতিক বালব উদ্ভাবন করেছেন। এইটি বাজারে যে সকল বালব আছে তাদের তুলনায় অনেক বেশী আলো দেয়, তিনগুণ বেশী টিকে এবং শক্তি জমিতে পড়ে গেলেও ভাঙে না। ফাইবার গ্লাস তন্তু, গ্লাস বা কাঁচ এবং রবারযুক্ত সিলিকোন দ্বারা এই বালব নির্মিত হয়েছে।

১১. বৃহদায়তনের দাড়ি ১১

সম্প্রতি বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাড়ি-ওয়ালা লোক আমাদের ভারতেই পাওয়া গেছে। ফিরোজপুরের রোডা গ্রামের সর্দার ফারা সিংয়ের বর্তমান বয়স ৭০। তাঁর পাঁচ ফুট লম্বা দাড়িটি দাড়িয়ে থাকাকালে মাটি স্পর্শ করে। ১৬ বৎসর ধরে দাড়ির ওপর বিশেষ যত্ন নিয়েছেন ফারা সিং। সিং তাঁর দাড়ির জন্য কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সরিষার তেল ব্যবহার করেছেন। সম্ভবতঃ এইটিই বিশ্বের সর্ববৃহৎ আকৃতিসম্পন্ন দাড়ি।

১১. সাংশ্লেষিক রক্ত ১১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আহত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে দুর্বল সৈনিকদের বাঁচিয়ে তোলার জন্য তাদের দেহে রক্ত প্রবেশ করানোর দরকার পড়ত খুব ঘন ঘন। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে রক্ত পাওয়া যেত না বলেই নানা দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও জৈব-রসায়নবিদরা গবেষণাগারে সাংশ্লেষিক রক্ত বা সিনথেটিক রক্ত তৈরি করার দিকে তখন মনোযোগ দেন এবং একাজে সফলও হন।

তারপর থেকে এক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে। এই সাংশ্লেষিক রক্তের গুণ ও ব্যাপক হারে উৎপাদন-ব্যবস্থার বিপুল উন্নতি ইদানিং ঘটানো হয়েছে। সম্প্রতি লেনিনগ্রাদের হাই-মালিকিউলার কম্পাউন্ডস ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপিকা বোগোমোলোভা পরীক্ষা মূলকভাবে প্রমাণ করেছেন যে, জীবদেহের দুই-তৃতীয়াংশ স্বাভাবিক রক্তের অভাব এই সাংশ্লেষিক রক্ত দিয়ে অনায়াসেই পূরণ করা চলে। তার ফলে জীবদেহের প্রত্যেকটি ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই হবে। বোগোমোলোভা এক্ষেত্রে কুকুর নিয়ে এই পরীক্ষা চালান। এর ফলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাংশ্লেষিক পদ্ধতিতে তৈরি কৃত্রিম রক্তের কতোটা উন্নতিসাধন করা গেছে।

যে কুকুরগুলি নিয়ে তিনি পরীক্ষা চালান, তাদের প্রত্যেকের দেহ থেকে ক্রমে ক্রমে তিন ভাগের দুই ভাগ রক্ত বের করে নেওয়া হয়। এর ফলে তাদের ধমনী-চাপ (আর্টেরিয়াল প্রেসার) হঠাৎ অনেকখানি কমে যায় এবং হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তাদের দেহে সাংশ্লেষিক রক্ত ঢুকিয়ে দেওয়া হতে থাকে এবং খুব দ্রুত ধমনী ও হৃদপিণ্ডের কাজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

১১. কলের দিদিমা ১১

কিছুদিন হ'ল পশ্চিম জার্মানীর কলোন সহরে তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিশু-সামগ্রী প্রদর্শনী খোলা হয়। এই যুদ্ধের শিশুরা যেসব জিনিস পেলে খুশি হয় সেই সব জিনিসের মেলা সাজিয়ে বসে যুরোপের দশটি দেশের ৩০৫জন প্রদর্শক। এই মেলায় এসে জিনিসপত্র দেখে শিশুরা আনন্দে বিম্বয়ে কোতুলে উদ্দাম হয়ে ওঠে।

শিশুদের জন্মহারের সঙ্গে তাল রেখে বাজারে নতুন নতুন জিনিস বের হচ্ছে। সেসব যেমন রকমারি তেমন মজাদার। এসব দেখলে শিশু শিশু কেন, শিশুদের মা-বাবারা পর্যন্ত অবাক হয়ে যান। ছেলে-মেয়ে এবং তাদের মায়েদের জন্য যত কিছু আধুনিক সম্ভব অসম্ভব হতে পারে সবই এখানে তাদের জন্য জড় করা হয়েছে।

বাস্তব সুবিধা বিচার করে শিশুদের জিনিসপত্র তৈরী করা হয়েছে। বড় বড় চাকার ঠেলাগাড়ী, রং-বেরং-এর সুন্দর ফিনিশ করা নানারকমের আসবাব। এর কোনটা এসেছে ইংল্যান্ড থেকে, কোনটা বা স্ক্যান্ডিনেভিয়া দেশ থেকে। শিশুদের সাজ-পোষাকের বাহারে অবশ্য প্যারিস টেকা মেয়েছে। অবশ্য শিশুদের মস্কল হয়েছে এই-জন্য যে, এইসব জামা-কাপড় এত বেশী দামী ও বাহারী যে একটু নষ্ট হলেই মায়েদের চড়-চাপড় খেতে হবে।

অনেক প্রতিষ্ঠান মায়েদের কণ্ঠের বোবা লাঘব করার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। কেউ বা তৈরী করেছেন শিশুদের স্নানের জন্য নতুন ধরনের টব, কেউ বা তৈরী করেছেন প্ল্যাস্টিকের জুফার কাটা 'শিশু-সিন্দুক' যেখানে শিশুদের একলা কিছুক্ষণ রাখা যায়। এক জায়গায় রয়েছে "বৈদ্যুতিক দিদিমা"। এটি হচ্ছে শিশুদের ঘুম-পাড়ানি কলের দোলনা। প্রস্তুতকারীর মতে এই কলের দিদিমা শিশুগরই আসল দিদি-মার স্থান গ্রহণ করবে।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধ কুমার মান্যম

॥ একুশ ॥

আজ অধিবাস, গায়ে-হলুদ,—
আগামীকাল বিবাহ! এখানে সভ্যমণ্ডপ,
ওখানে বরযাত্রী ও নিমন্ত্রিতের আসর,
এবং চতুর্দিকে বিয়েবাড়ির সাজসজ্জা,
আনাগোনা আর আয়োজনের ধুম।
সানাইয়ের মিষ্ট সুরে পাওয়া যাচ্ছে,
দরবারী! 'সন্ধ্যার' নান্দীপাঠ!

আজ মস্কোর 'অধিবাস'। আগামী-
কাল ৭ই নভেম্বর, সোভিয়েট ইউনিয়নে
সর্বব্যাপী বিপ্লবপূজা। নান্দীপাঠ
করবেন প্রধান পুরোহিত মিঃ নিকিতা
সেগেইভিচ খ্রুশ্চেভ। তিনি আপন
দেশে তাঁর স্বভাবনয়িতা, সত্যতা, বিচক্ষণতা
এবং স্নেহশীলতার জন্য বিশেষ
জনপ্রিয়। তিনি যখন যেখানে খ্রীশি
আনাগোনা করেন। তাঁর জন্য কোথাও
সারসন্দী পাহারাওলা দাঁড়ায় না। যে
কোনও দোকানে তিনি ঢোকে। যে
কোনও ব্যক্তি বিনা ছাড়পত্রে তাঁর কাছে
গিয়ে পৌঁছতে পারেন। পরদেশীর সঙ্গে
মন খুলে তিনি কথা বলেন। স্টালিন
আমলের সমস্ত পুরাতন রীতিকে
ভাঙবার জন্য তিনি বন্দপরিষ্কার। তাঁর
ধারণা, লৌহবর্ষিকার অন্তরালে
সোভিয়েট ইউনিয়নে দৃষ্ট দুর্গন্ধ
জমেছিল অনেক। এবার বাইরে থেকে
আসুক স্বাস্থ্যকর বাতাস। তিনি
গোপনতার ঢাকা খুলেছেন অনেকটা।
'অগপু' এবং 'এন-কে-ভি-ডি'র উগ্রতা
কমিয়েছেন, মিথ্যা-অভিযোগে-আটক
রাজবন্দীদেরকে ফিরিয়ে এনে সম্মান
দিয়েছেন, দেশের উৎপাদনশক্তি বাড়িয়ে-
ছেন, বার বার বিদেশ ভ্রমণ করে রাষ্ট্র-
নেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন এবং
পৃথিবীর সকল দেশের পৃষ্ঠটেকে
আমন্ত্রণ জানিয়ে 'ইন্টারিফ' হোটেলের
ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয়,
আমেরিকা, ইংল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী,
ফ্রান্স, ভারত, জাপান প্রভৃতি দেশের
সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি
সম্পাদন করে সকলের সহিত সামাজিক
সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ব্যক্তিগত
জীবনে তিনি সাধারণ গৃহস্থ। তাঁর

স্ত্রীর নাম নিনা পেত্রভনা। তাঁর এখন
একটিমাত্র পুত্র, নাম সেগেই, একজন
ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর তিন কন্যা জুলিয়া,
রাদা এবং লেনা। তাঁর অপর পুত্র
লিওনিদ ছিলেন সামরিক বিমানচালক।
বিগত বিশ্বযুদ্ধে একবার সেই যুবক
গুরুতরভাবে আহত হন। সেরে উঠে
আবার যান রণাঙ্গনে। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে
লিওনিদ যখন যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন,
স্নেহময় পিতা তখন সেই রণাঙ্গনে
দাঁড়িয়ে। মিঃ খ্রুশ্চেভ ঘৃণা করেন
যুদ্ধকে। সেই ঘৃণা মৌখিক নয়। মিঃ
খ্রুশ্চেভের প্রিয় বস্তু হল সাহিত্য এবং
প্রিয় নেশা শিকার-অবেষণে যাওয়া।
তিনি স্টালিনগ্রাদ যুদ্ধের একজন অসম-
সাহসিক সেনানায়ক ছিলেন। তিনি
গরীব গৃহস্থঘরের ছেলে। 'ডনেৎস
বেসিন' ওরফে 'ডনবাস' কয়লাখনিতে
তিনি একজন মজুর ছিলেন। তাঁর ছেলে-
মেয়ে-স্ত্রী—সকলেই উপার্জন করেন।

প্রতি বছরে ৬ই নভেম্বর সন্ধ্যায়
মস্কোর নবনির্মিত স্পোর্টস-স্টেডিয়াম
ওরফে লেনিন স্টেডিয়ামে একটি রাষ্ট্রীয়
অধিবেশন আহ্বান করা হয়, এবং জন-
সাধারণের সম্মুখে যে কোনও একজন
মন্ত্রী এসে দাঁড়িয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের
সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা এবং তাঁদের
পররাষ্ট্রনীতির মূল বস্তুগুলি বঝিয়ে
বলেন। এবারে বলবেন ডেপুটি প্রধান-
মন্ত্রী মিঃ মিকোয়ান। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট
ভরিশলভ এবং মিঃ খ্রুশ্চেভ প্রমুখ
সকল মন্ত্রীরাই সেখানে উপস্থিত।
প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক একদল
সম্পন্ন দেহরক্ষী বদল হচ্ছিল, এটি
বিশেষ ওৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য
করাচ্ছিলুম।

স্পোর্টস স্টেডিয়ামটি গোলাকার।
দিল্লীর প্যারামেণ্ট ভবনের মতো।
আগাগোড়া ইন্দিরান্দি বন্দ। মাথার
দিকে ছাদ সম্পূর্ণ ঢাকা,—সেটি দেখে
বিস্ময় লাগে এই কারণে যে, ভিতরে
কোনও স্তম্ভের দ্বারা সেই অতি বহুৎ
ছাদকে ধরে রাখা হয়নি। এই বিরাট
স্টেডিয়ামে ১৫ হাজার দর্শকের আসন

আছে এবং বিদ্যুতের সাহায্যে ভিতরে
উত্তাপসৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে। লেনিন
পাহাড়ের উপরে দাঁড়ালে দূরের থেকে
এই স্টেডিয়ামটিকে মনে হয়, একটি
গোলাকার 'তাতার ক্যাপ' উপর দিকে
একটি মুণ্ডি বসানো। লেনিন জন্মগ্রহণ
করেছিলেন তাতার পরিবারে। এই
স্টেডিয়ামে সর্বপ্রকার খেলাধুলা হয়ে
থাকে। এটির নির্মাণ-কৌশল এবং
ভিতরের অলংকরণ লক্ষ্য করলে রাফস-
রাজ রাবণের স্বর্ণলংকার কল্পিত ছবিটি
মনে আসে।

পৃথিবীর বহুদেশের এবং ভারতের
রাষ্ট্রদূত সোদিন উপস্থিত ছিলেন। বহু
পরদেশীকে এই উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ করা
হয়েছে।

মিঃ মিকোয়ান তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ-
পাঠকালে ১৫ হাজার দর্শকের সঙ্গে
নিজেও হাততালি দিচ্ছিলেন। নিজের
রচনার দক্ষতার উপর! মিঃ খ্রুশ্চেভকে
দেখে সবাই যখন হাততালি দিচ্ছে, মিঃ
খ্রুশ্চেভও হাততালি দিচ্ছেন। দু'তিনটি
কথা বলেই বক্তা নিজের কথার উপর
নিজেই হাততালি দিতে থাকেন, এটি
আমার অভিনব অভিজ্ঞতা।

সমস্তটার দিকে যখন মূগ্ধ ও
অভিভূত চক্ষে চেয়ে রয়েছি সেই সময়
জেনেক ভারতীয় মহিলা পিছনের সীট
থেকে হঠাৎ সম্ভাষণ করলেন। এর নাম
উর্মিলা দেবী। পিতা পাটনার এড-
ভোকেট শ্রীবজরং সহায়, এবং স্বামী
শ্রীযুক্ত ওৎকারনাথ পাণ্ডালা। এঁরা
স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এখানে অনুবাদের
কাজ করেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর
মহিলাটি আমাকে একসেট চকোলেট
উপহার দিলেন, এবং আমি আমার
পার্শ্ববর্তিনী শ্রীমতী লিভিয়ার সঙ্গে
তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম।

অতঃপর সভ্যমণ্ডলের উপরে যখন
একটি মনোরম নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান
আরম্ভ হল, তখন রাষ্ট্রনায়কগণ মগ্ন
হুয়ে। গিয়ে অপরদিকে গ্যালারিতে
আসন নিলেন। নাচে, গানে এবং
অভিনয়ে মগ্ন মুখের হয়ে উঠল।

ফিরবার পথে সেদিন রাতে তুষার-পাত হচ্ছিল।

পরদিন এই নভেম্বর বিপ্লব দিবস। মেঘময় আকাশ ইস্পাতবর্ণ। তুষারপাত নেই, কিন্তু তুহিন হাওয়ায় মস্কা ঠকঠক করে কাঁপছে। নগরের সমস্ত দোকানপাট, কাজকারবার—আগাগোড়া বন্ধ। এ যেন কলকাতার সাধারণ ধর্মঘট। মস্কা নগরী যেন তুহিনের চাদর মর্দি দিয়ে ঘুমোচ্ছে!

শ্রীমতী নাট্যা বিশেষ কর্মতৎপরতার সঙ্গে আমাদের মোট ছয়জন ভারতীয়কে নিয়ে চললেন রেড স্কোয়ারের দিকে। তাঁরা হলেন জহীর, তাবান, শেখোন, রশপাল, বেদী এবং আমি। পথে পথে প্রতি অট্টালিকা সুন্দরভাবে সুসজ্জিত। দুই ব্যস্তের ছবিতে সমগ্র নগরী সজ্জিত। একজন কার্ল মাক্স, অন্যজন লেনিন। একজন থিয়োরী, অন্যজন প্রাকটিস। একজন মনোদাতা, অন্যজন মনোবিশ্লেষক। নগরের সর্বত্র বড় বড় অক্ষরে লেখা,— ‘মীরদুশবা’। শান্তি ও বন্ধুত্ব! কেবলমাত্র শান্তি প্রচার ও বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র কোটি কোটি টাকা খরচ করে। যুদ্ধের পক্ষে কোনও কথা উচ্চারণ—ওখানে অপরাধ বলে গণ্য, এবং তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে! লাল চীনের কঠোর যখন যুদ্ধের অবশ্যশাস্তিবার বস্তুতা করেন, সেগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও কাগজে ছাপা হয় না! সোভিয়েট ইউনিয়নে পাশ্চাত্য দেশগুলির কঠোর সমালোচনা আছে, আত্মরক্ষার কথা নিয়ে সতর্কীকরণ আছে, কিন্তু আক্রমণের হুমকি নেই, অকারণ আত্মরক্ষা নেই! সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বাপেক্ষা বেশি-সংখ্যক পয়টিক হল আমেরিকান। ওখানে রুবল যেমনই সস্তা, ডলার তেমনই দুষ্প্রাপ্য। এখন প্রতি ১৫ রুবলে ৫ ডলার হয়। এই হারে সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন অনায়াসে লক্ষ লক্ষ ডলার বাইরে থেকে উপার্জন করছেন। মজুত পরিমাণ স্বর্ণভান্ডারের মূল্যসমতুল ‘নোট’ ওদেশে বোধহয় ছাপা হয় না। ওরা উৎপাদনের হারে নোটের টাকা বাজারে ছাড়ে! সম্ভবত এই কারণে পাশ্চাত্য দেশের নিকট ওরা অবিস্বাসের পাত্র! কিন্তু আমি অর্থনীতির ছাত্র নই, —এগুলি খুঁটিয়ে বলতে পারব না। শুধু এটি দেখছি, আমেরিকান পয়টিক মাত্রই সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশেষ সমাদৃত।

‘বিপ্লব দিবসে’ রেড স্কোয়ারের পাথুরে ময়দানে প্রবেশ করতে গেলে পাস, আমন্ত্রণপত্র এবং পরদেশীর পক্ষে বাস্তবিকতায় আমন্ত্রণপত্রসহ ‘পাসপোর্ট’ দরকার হয়। জহীর এবং আমি পাসপোর্ট আনতে ভুলেছি। বলা বাহুল্য, নাট্যা কপালে করাঘাত করলেন! ফিরে গিয়ে আনবার তখন সময়ও হাতে নেই। পালিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রত্যেকের পাসপোর্ট সংলগ্ন ফটোটির সঙ্গে আমাদের পোড়ারমুখগুলি মিলিয়ে দেখে তবে একে একে ছাড়বেন! আমার অবারণ কৌতুহল আমাকে স্থির থাকতে দিল না। বন্ধুরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি নাট্যার পিছনে পিছনে ‘শ্বেত-ভঙ্গুকদলের’ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলাম!

আমি নিরীহ এবং অমায়িক ভারতবাসী। গরুর বন্ধুধর্মীদের মূর্তিটির মতো আমার মুখে-চোখে একটি নির্বিকার করুণা জড়িত। ওই প্রকার দৃষ্টি নিয়ে যাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালুম তারা সেই বলশেভিক রাশিয়ার ঐতিহ্যবাহী এক একজন দানবাকার ব্যক্তি। প্রত্যেকের পোষাক কৃষ্ণনীল। প্রত্যেকের পোষাকের ওপর ওভারকোট চাপানো। আমার ধারণা, সাধারণ রুশ উচ্চতায় ৫। ফুটের বেশি হয় না। এখানে ৬ ফুটের কম কেউ নেই! সবাই কর্মতৎপর। কিন্তু কঠিন ঠান্ডার জন্য কেউ খাচ্ছে ‘ভোদকা’, কেউবা এক-আধটা সিগারেট। এ বাড়িটি ‘এন-কে-ভি ডি’র একটি প্রধান কেন্দ্র।

মিনিট পাঁচেক পরে আবার বেরিয়ে এলাম। শুনলাম, আমরা ভারতীয়, এই আমাদের শ্রেষ্ঠ ছাড়পত্র! আমাদের পরিচয় ওইটাই যথেষ্ট।

রেড স্কোয়ারের চারিদিক জনারণ্যে ডরে গেছে। আমাদের জন্য ‘লেনিন-ট্যালিন মসলিয়মের’ পাশে সিঁড়ি বাঁধানো গ্যালারিতে স্থান নির্দিষ্ট ছিল। আমাদের পিছনে ক্রেমলিনের বৃহৎ প্রকার। সেখানে শোভা পাচ্ছে সুপ্রীম সোভিয়েটের কেন্দ্রীয় প্রাসাদে প্রকাশিত রক্ত-পতাকায় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতীক-চিহ্ন পাঁচকলাযুক্ত একটি-তারকা। তারকার ঠিক নীচে কাস্তে আর হাতুড়ির ছবি।

আজকের ‘বিপ্লব দিবস’ উপলক্ষ্যে আমার রচিত দুইটি প্রবন্ধের একটি আজ ‘মস্কা নিউজ’ নামক বাই-উইকলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং অন্যটি

বাংলায় টেপ-রেকর্ড করা, সেটি আজ সন্ধ্যায় মস্কা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হবে। দুইটি প্রবন্ধেরই মূল বক্তব্য এক। গান্ধীজির সমকালীন লেনিনের সম্পর্কে ভুলনামূলক রচনা। গান্ধীজির অহিংস বিপ্লববাদে সসাগরা ধীরদ্রব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষয়রোগ ধরেছিল। লেনিনের আগ্নেয় বিপ্লবে রুশ সাম্রাজ্য চূরমার হয়েছিল! গান্ধীজির সংগ্রাম সকল প্রকার রাজনীতিক বন্ধনের বিরুদ্ধে, লেনিনের সংগ্রাম মানবজাতির সর্বপ্রকার ঐহিক দুর্গতির বিরুদ্ধে। বিংশ শতাব্দীর এই দুই বিরাট পুরুষের একই বীজমন্ত্র গংগায় ও ভল্গায় প্রবাহিত হয়েছিল। বাংলা প্রবন্ধটি রুশ এবং ইংরেজিতে ছাপা হয়।

আমাদের পরণে প্রচুর পরিমাণ গরম পোষাক থাকা সত্ত্বেও ঠান্ডায় আমরা কষ্ট পাচ্ছিলাম। বেলা এখন দশটা। মেঘের ফাটলে সূর্য দেখা যাচ্ছে, কিন্তু জিরো ডিগ্রির নীচে ঠান্ডা। অদূরে খন্ডের টুপিপরা কৃষ্ণকায় এক ভারতীয় উদ্ভলোক এসেছেন। ওকে তাসকন্দে দেখেছিলাম। একদিন রাতে উনি আমার সঙ্গে আলাপ করেন। উনি হলেন জনৈক কেন্দ্রীয় উপ-মন্ত্রী শ্রীমতী ডায়লেট আলভার স্বামী শ্রীজোয়ানচিন আলভা। আমাদের আশেপাশে একটি মেয়ে ফুটবল ক্রীড়া করছিল এবং তার সঙ্গে মাংসের বড়। বলা বাহুল্য, বড় দুঃসময়ে কাজ দিল!

মসলিয়মের হাদের উপর একে একে এসে দাঁড়ালেন প্রান্তন প্রেসিডেন্ট ভরিশলভ, মিঃ খুন্সচভ, মিঃ মিকোয়ান এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা। তাঁদের সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যান্য কণ্ঠধারগণ। তাঁরা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর কুচকাওয়াজ আরম্ভ। তৎকালীন সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক মার্শাল জুকভ তাঁর বাহিনীসহ পেরিয়ে বাবার সময় অভিবাদন জানিয়ে গেলেন। প্যারেড করে চলছেন সেনাপতির দল। অগণিত সাজোয়া গাড়ি চলল সারবন্দী হয়ে। একে একে সোভিয়েট সামরিক শক্তির প্রবলতা প্রকাশ করা চলছে! বেলুন উড়ে চলেছে শূন্যে। বিরাট এক কৃত্রিম ‘স্পুটনিক’ দূর আকাশে উধাও হয়ে উড়ে গেল! এখানে বলে রাখা চলে, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে যে আণবিক ‘বোম্ব মুনটি’ উপরদিকে ৫৬৫ মাইল উর্ধ্ব শূন্যলোকে পাঠানো হয় সেটি ভারত, আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য

ইত্যাদি ভূভাগ প্রদীক্ষণ করে এবং “পিপ-পিপ”—এইরূপ সংকেত পাঠাতে থাকে! পরবর্তীকালে এই ‘বোব’ মুনটিকেই বলা হয় ‘স্পোর্টনিক’। বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সাফল্যে পৃথিবীবাসী চমৎকৃত হয়।

আমাদের সামনে দিয়ে ছোট ছোট খেলাঘরের বিমান উড়ে চলে যেতে থাকে। অন্যদিকে কামান গর্জন করে ওঠে। একের পর এক বিভিন্ন ‘বর্ণের’ সেনাদল কুচকাওয়াজসহ এগোতে থাকে। তারপর আবার সাজোয়া বাহিনী, তার পিছনে আসে কামানের গাড়ি, বিভিন্ন অস্ত্রাদির খেলা, ট্যাঙ্কের দল। স্থল, জল ও বিমান বাহিনীর সৈন্যদল। আসে নীল, পীত, গোলাপী, রক্তিম,—নানা বর্ণের বিচিত্র বাহিনী। তারপর আসে নারী সৈন্যদল। এই প্রথম দেখলুম তন্দ্রাবী সুন্দরী রূশ মেয়ে! মুখে-চোখে যেন কঠিন পরীক্ষার মূদু হাসি! সর্বাগ্রে তাদের মোলায়েম নীলাভ ঘাগরায় লাবণ্য ও তারুণ্য ফেটে পড়ছে। কোনও দলের বর্ণ রক্তিম পীত, কেউ গোলাপী, কেউ পেলব শূভ্র। তাদের এক হাতে অস্ত্র, অন্য হাতে পুষ্পগুচ্ছ। এতক্ষণ পরে রেড স্কোয়ারকে মনে হল, অসুরালোক!

আমাদের এদিকটা নিম্নস্তরের আসর। পৃথিবীর সকল জাতির প্রতিনিধি ও সাংবাদিকরা এখানে উপস্থিত। ক্যামেরায় ছবি তোলা হচ্ছে শত সহস্র। আজকাল ক্রেমলিনের ভিতরেও অবধি ছবি তোলা যায়। আমাদের আশে-পাশে অগণিত বিদেশীরা এসে দাঁড়িয়েছেন। পতাকা হাতে নিয়ে বাদ্যসহকারে চলেছে সবাই। চারিদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিরাটকার কার্ল মার্ক্স ও লেনিনের চিত্র। সামনে দিয়ে ছবি চলে যাচ্ছে ভরশিলভ ও ক্রুশ্চভ প্রমুখ নেতাগণের। হাততালি দিচ্ছে সবাই।

দেড় ঘণ্টা ধরে শোভাযাত্রা চলল। ভিড় যখন ভাঙলো এবং যখন আমরা জনতার সঙ্গে মিলিয়ে রেড স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, সেই সময় কয়েকজন লোক একটি দমর উপরে স্টালিনের একখানা ছবি সেঁটে নিয়ে কোথা থেকে যেন ভিড়ের মধ্যে ঢুকল। কিন্তু বিশেষ কেউ সোঁদিকে হুক্কেপ করল না। সে-ছবি এমন অনাদৃত, উপেক্ষিত এবং অসম্মানিত চেহারা নিল, যেটি অনেকের পক্ষেই বিশ্বাসের মতো ঠেকল। সোভিয়েট

ইউনিয়ন থেকে স্টালিন মুছে যেতে বসেছেন!

উল্লাইনা হোটেলের একটি ঘরে ‘বিশ্ব দিবস’ উপলক্ষে মধ্যাহ্নকালে একটি আনন্দ আসর বসেছে। কয়েকজন ভারতীয়সহ পাকিস্তানের কবি ফয়েদ আহমেদ ফয়েজ এবং ভারতীয় দূতাবাসের জনিতনেক বন্ধু সেখানে উপস্থিত। আমাকে নিয়ে জনিতনেক বাঙালীও সেখানে আছেন। শ্রীমতী নাট্যাশা হলেন মধ্যমণি। খবর পেয়ে শ্রীমতী লিডিয়াও এলেন। বলা বাহুল্য, এটি বন্ধনহীন এবং কতকটা শৃঙ্খলাবহীন আমাদের আসর—সাধারণত যেটি রাতের দিকেই জমে বেশি। শ্রীমতী নাট্যাশার নৃত্যভঙ্গীটি অতি সুঠাম এবং মদের পাত্র হাতে থাকলে সুন্দরী রমণীর সেই লাস্যভঙ্গী পুরুষের চোখে মোহমাদুর হয়ে ওঠে। শ্রীমতী

নাট্যাশা প্রাণোচ্ছল এবং রসোচ্ছল ও বটে! আজও তিনি আনন্দে, হাসো, উচ্ছ্বাসে এবং পরিহাসে মগ্নরা। সম্মিলিত কর-তালির সঙ্গে তিনি ঘরময় বিভিন্ন ভঙ্গীতে নাচছিলেন!

আমি বোধ করি ঈষৎ বেমানান বলে নিজেকে ঠাওরাচ্ছিলুম। কিন্তু সেটি যে শ্রীমতী লিডিয়া পর্যবেক্ষণ করে থাকবেন, সেটি ভাবিনি। আমার স্মৃতির প্রয়োজন ছিল। সেই কারণে এক সময় সকলের অলক্ষ্যে বিদায় নিয়ে চলে গেলুম নিজের ঘরে।

বোধ হয় আমার অবস্পর্কিত অচরণে কিছ্র হ্রুটি থেকে গিয়েছিল!—দিনতিনেক পরে সোঁদিন সকালের দিকে ঘরের দরজায় টকটক শব্দ শুনে দরজা খুলেই দেখি, শ্রীমতী নাট্যাশা! তিনি হাসিমুখে ঢুকলেন। বললেন, আপনার সঙ্গে নিরি-

গ্রীষ্মকালীন বর্ণ পরিচর্যা

শীতল ও সুগন্ধী
ল্যাভেন্ডার ওয়াটার দিয়ে
গ্রীষ্মের তাপদংশ
দিনগুলির
উন্মোচন করুন



খস সাবান,
আফগান স্নো এবং
আফগান ট্যালকাম পাউডার
সূর্যের প্রখরতা থেকে আপনার
চক্রে রক্ষা করবে—দুর্গন্ধ
দূর করে এবং সমস্ত
দিন স্থায়ী সজীবতাকে
সুনিশ্চিত করে



আফগান স্নো

সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক

বিলিতে একটু কথা বলব, তার সময়ই পাইনে। কী এমন লেখাপড়া করছেন সারাদিন বলুন ত? আপনি বড় গম্ভীর মানুষ!

আমি খুব হাসছিলাম। নাট্যাশা পুনরাপি বললেন, নাচগান কি আপনার ভাল লাগে না?

লাগে বৈকি।

তবে সৈদিন ইঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে এলেন কেন?

বললাম, সত্যি বলছি, লেখাপড়ার অনেক কাজ জমে গিয়েছিল।

নাট্যাশা হাসলেন। বললেন, না, সত্যি আপনি বলছেন না! আমি জানি, আমার নাচগান আপনার ভাল লাগে না! ঠিক বলুন ত?

এবার আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। বললাম, ম্যাদাম, আমি ভারতীয়। একটা স্বত্ব আছে আমার মনে।

কি বলুন? আমি শুনেতে এসেছি। অস্বস্তিতে বলুন।

অস্বস্তিতে বলা চলে না! কিন্তু ভারতীয় কোনও স্ত্রী এবং সন্তানের জন্মের স্বামীর চোখের আড়ালে দিনে বা রাতে পুরুষের মলপানের আসরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে নাচে গায়—এটি আমার দেখা অভ্যাস নেই!

শ্রীমতী নাট্যাশা বললেন, আপনি কি এটা অনিয়ম মনে করেন?

আমি বললাম, এ কথাই ওঠে না! আমি অনভ্যস্ত, তাই বলছি। আমাদের দেশে আমরা অতিশয় কঠোরতার মধ্যে মানুষ। আমাদের দেশের স্বামীর স্ত্রীর এই আচরণ বরদাস্ত করে না, সেটি স্বীকার করছি!

হাসিমুখে নাট্যাশা বললেন, তাঁরা হয়তো অসহিষ্ণু!

সম্ভব! তবে ভারতীয় মেয়েও অভ্যস্ত সংরক্ষণশীল,—কঠোর সংযম তাদের।

আপনি নিজে কি একজন নীতি-বিদ?

এবার আমিও হাসলাম। বললাম, আমি কি তাঁর আমিও জানিনে। আমি শুধু অনভ্যস্ত! এসব আমার দেখা অভ্যাস নেই বলেই আমি আড়ন্ত হই। ক্ষমা করবেন।

শ্রীমতী নাট্যাশা এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনাকে কষ্ট দিলুম, কিছুর মনে করবেন না। বেশ, খাবার টেবিলে আবার দেখা হবে। এখানে আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না ত?

বিলম্বমানও না!

নাট্যাশা বৌয়য়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ওই আমার শেষ আলাপ। কেননা এই দিনটির প্রায় ১ মাস পরে সৈদিন রাত ২টার সময় আবার এসে মিসেস বিমানঘাটিতে নামলাম সৈদিন শ্রীমতী মেরিয়ম, মালংজিভ এবং লিডিয়ার কাছে একে একে সকলের খবর নিতে গিয়ে ইঠাৎ সচকিত হয়ে শুনলাম, প্রায় মাস-চারেক আগে শ্রীমতী নাট্যাশা মারা গেছেন!

সংবাদটি আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল বলেই আমি ওটি সহজে ভুলতে পারিনি। কথায় কথার আরেকদিন নাট্যাশার উল্লেখ করতেই শ্রীমতী অকস্মাতঃ কাছে শুনলাম, নাট্যাশার স্বামী অত্যন্ত বিবেচপরায়ণ হয়ে নাট্যাশাকে বড় গলা টিপে হত্যা করেছেন!

সোভিয়েট ইউনিয়নে এইরূপ নির্দর ও নিষ্ঠুর হত্যার শাস্তি হল, আসামীকে পিছন থেকে গুলী করে মারা! সে যাই হোক, অত্যন্ত বিবাদ এবং বেদনার মধ্যে সৈদিন এই কথাই মনে হয়েছিল, নাট্যাশার এই অপমৃত্যুর জন্য পৃথিবীর সমস্ত পুরুষমাজ দায়ী!

ভারতীয়রা সকলে এবার বিদায় নিলেন। সাম্রাজ্য জহীরি যাচ্ছেন লন্ডনে। লন্ডন শহরে জহীরি একটি মসজিদ সম্পত্তির মালিক। শ্রীমান সূভাষ মুখোপাধ্যায় এতদিন ছিলেন তাঁর বাঙালী বন্ধুদের বাড়ি। এবার তিনিও বিদায় নিলেন। কিন্তু তাঁর যাবার দিন রাতে সামান্য যলবাহনের ব্যাপারে তাঁর বন্ধু-কর্মীউনিষ্ট কেরালার প্রফেসর দামোদরন যে ইতর আত্মপরতার পরিচর্যাটি দিলেন, সেটি লক্ষ্য করে উল্লাহুনা হোটেলের সোভিয়েট বন্ধুরা স্তম্ভিত হয়েছিলেন। সূভাষের মতো উদ্ভট ও মিস্ত্রিভাষী বন্ধু আমাদের মধ্যে কমই। দামোদরন তাঁকে মধ্যরাত্রে পাথে ভাসিয়ে একা বিমানঘাটির দিকে চলে যাবার চেষ্টা পেয়েছিলেন। এ নিয়ে একটি বিরুদ্ধপূর্ণ গুঞ্জনও আমার কানে উঠেছিল। ভারতীয় একজন কমিউনিষ্টের এক্ষণিক আচরণ সৈদিন

উক্ত হোটেলের যথেষ্ট গোরব রেখে আসেন! অতঃপর একই গাড়িতে দামোদরন সূভাষকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন!

এখন থেকে আমি রইলাম সম্পূর্ণ একা। আমার অদূর ভবিষ্যৎ আমি জানিনে। এখানে আর আমার কোনও পরিচয় নেই, আমি এখন আর ভারতের প্রতিনিধিত্বও নেই! আমার না আছে রাজনীতি, না দল, না বা উল্লেখ্য। আমি কবে ফিরব জানিনে, কেন পিছিয়ে রইলাম তাঁও অজ্ঞাত! আমি কে, কি এবং কেন,—আমার জাতি গণ গোত্র শ্রেণী গোষ্ঠী—সমস্তই অন্ধকারে। আমি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত এবং প্রক্ষিপ্তও বটে। আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ এবং নিরুদ্ভিষ্ট। এবার থেকে আমি রইলাম, আর আমার সামনে রইল এক অজানী, ‘অনামা’, অনাবিস্কৃত, আদিঅন্তচিহ্নহীন বিরাট ‘মহাদেশ’—বিগত ৪৫ বৎসর কালের মধ্যে যার কোনও নির্দিষ্ট নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি, অর্থাৎ ‘সোভিয়েট ইউনিয়ন’!

জগৎপ্রসিদ্ধ রুশ অভিনেতা ‘ক্যাকালভের’ নামাঙ্কিত যে রাস্তাটিতে ট্রলিবাস আনাগোনা করে, সেই প্রাথমিক পথটির ৬নং গেটটির সামনে ট্যান্ড থেকে নেমে যখন ঢুকলাম, তখনও বাঙালী ঘরের তুলসীমণ্ডে কোনও গৃহাঙ্গনা সম্মাপ্রদীপ জ্বালেনি! ফটক একটাই, কিন্তু ভিতরে এলেই চোখে পড়ে একাটি পল্লী, এবং আশেপাশে বহু গৃহস্থের বাস। চারদিক শান্ত,—কোথাও কোনও উচ্চকণ্ঠের সাড়া নেই। এটি শহরের মধ্যস্থল, কিন্তু সাবেক আমলের পাড়া-পল্লী।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমতী লিডিয়া ডানহাত একটি দরজায় ঢুকে পুনরায় একটি বড় দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পক্ষেও এ বাড়িতে এই প্রথম। তিনিও এখানে অপরিচিত। আমরা সামনে এসে দাঁড়াতেই যে স্বয়ং খবরকারী কৃন্দা শান্তমুখের হাস্য ওদিক থেকে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন, তিনি ভারতীয় হলে তাঁর পায়ের ধলো মাথায় নিকুম্ব এবং আমার আরেকটু কম বয়স হলে তাঁকে অনায়াসে বলতে পারতুম ‘দিদিমা’! কিন্তু আনন্দে ও রোমাঞ্চে পুনরুৎসাহ আমার সর্বশরীর একটু খরখর করছিল! কেননা ইনি জগৎ-প্রসিদ্ধ সাহিত্যপ্রীতি এবং রুশ-বিশ্ববৈর অন্যতম মন্ত্রগুরু ম্যাক্সিম গোর্কির সহধর্মিণী! আমি সন্নিবে

তার বই—কোনটা বাদ যাবনি। আমি ঘুরে ঘুরে আগাগোড়া সব দেখছিলাম। এ বাড়ি এবং এর সমস্ত আসবাবসম্পত্তি এখন সরকারের তত্ত্বাবধানে। আমি যেন তীর্থমন্দিরে প্রবেশ করেছিলাম!

বৃন্দা বললেন, এখনও কি তোমার সব 'তেতো' মনে হচ্ছে, বাবা?

আমরা সবাই উচ্চরোলে হেসে উঠলাম। এবার আমি বললাম, আমাদের দেশে ভেজনে বসে প্রথম 'তেতো' দিয়ে আরম্ভ করতে হয়। শরীর সুস্থ রাখে 'তেতো'।

আমাদেরও তাই, বাছা!—বৃন্দা বললেন, বল ত লিডিয়া? অ বোমা, ওই শোনো! আমরাও যে 'তেতোজাম' চিবাই খাবার আগে! তবে বাছা তোমরা-আমরা তফাৎ কিসের?

আমি হাসলাম। বললাম, আমারও তরুণ বয়সের প্রথম সাহিত্যের আশ্বাদ এই 'তেতো'! এটি আমার গুরুদ্বাড়ি! এখানে আমি প্রগাম রেখে যাব। গোর্কির 'মাদার' গড়ে প্রথম চোখ খুলেছিল। তাঁর গল্প, নাটক, রেখচিত্র, তাঁর বৈশ্বিক চিন্তা, তাঁর চরিত্রচারণ, তাঁর রচনাশৈলী,—আমার মতন অনেক লেখকের জীবনে কাজ করেছে! তাঁর নারীচরিত্র বর্ণনা পড়ে অবাক হতুম—

বলছ বটে—গোর্কির স্ত্রী আমাকে একটু ধমকিয়ে দিলেন। পরে নিজের মনেই বললেন, তাঁর সব কথা বোধ হয় নিভুল ছিল না! ভুল করেছেন অনেক-বার।

আমি ফিরে তাকালুম তাঁর দিকে। বৃন্দা একাটারিনা পেসকভা পুন্নার বললেন, মেয়েদের চরিত্র তিনি সঠিক জানতেন, আমার মনে হয় না!

কথাটা আমার কানে বেজেছিল বহু দিন ধরে। আমি জানতুম ম্যাক্সিম গোর্কির 'দুই' স্ত্রী বর্তমান। কিন্তু মস্কোর অপর একটি রাজপথে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় যেদিন সুবহু গোর্কি মিউজিয়মটি দেখতে যাই, এবং আগাগোড়া গোর্কির জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী ও সর্বপ্রকার তথ্যাদির দলিল-চিত্রগুলি দেখে অভিভূত হই, সেইদিন একটি ছবিতে প্রথম দেখলাম, গোর্কির বিবর্তী স্ত্রীকে! ইনি একজন আমেরিকান মহিলা। যতদূর বৃন্দাতে পারা যায়, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পুন্নারের চোখ এড়িয়ে বৃন্দারোগগ্রস্ত গোর্কি আমেরিকায়

পলায়ন করেন। কিন্তু আমেরিকার কোথাও তিনি স্থায়ী আশ্রয় পাননি। আশ্রয় পেয়েছিলেন একজন আমেরিকান মহিলার হৃদয়ে। সেই মহিলা গোর্কিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেন। অতঃপর গোর্কি ইতালীর এক স্বাস্থ্যাবাসে গিয়ে বোধ করি বছর দেড়েক বাস করেন। এই মহিলা সেই সময় গোর্কির সহিত বিশেষভাবে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। গোর্কি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসেন মস্কাতে, এবং সম্ভবত বৃন্দা টলন্টয়ের নির্দেশক্রমেই 'কনসার্ট' রূপে গোর্কির তত্ত্বাবধানে তিনি একটি পৃথক বাড়িতে বাস করতে থাকেন। এই মহিলাটি ছিলেন বিশেষ বিদুষী এবং সাহিত্যপ্রিয়। তিনি নিজেও একজন লেখিকা বটে। এই আমেরিকান মহিলার প্রতি গোর্কি নিজেও যেমন আন্তরিকভাবে অনুগত ছিলেন, তেমনি এই নারীর সহায়তায় তাঁর নানা গ্রন্থেরও অনুবাদ হয়। সে বাই হোক, দুইবার বিবাহ রুশদেশে আইন-বিরোধী বলেই উভয়ের মধ্যে সামাজিক বিবাহ ঘটেনি। বিগত ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে এই আমেরিকান মহিলা মস্কাতেই মারা যান। তাঁর কোনও সন্তানাদি হয়নি। তাঁর একখানি ছবি আমাকে উপহার দেবার আগে গোর্কি-মিউজিয়মের মহিলা-ডাইরেক্টর একটু কুণ্ঠিত হয়েছিলেন! তাঁদের ধারণা, চন্দ্রের এইটুকুই কলঙ্ক!

বৃন্দা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত নীচের তলাটার ঘুরাছিলেন দেখে এক-সময় আমি বললাম, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি,—আমি খুব দুঃখিত।

কষ্ট?—বৃন্দা হেসে বললেন, আমার বয়স কত ঠাণ্ডে বলো দেখি?

বললাম, পঁচাত্তর হয়েছে কি?

কপালখানা! তোমার চেয়ে বয়স আমার অনেক কম, তা জানো? তবে আমি আশি পেরিয়েছি!

ভূমল হাস্যরোলে সবাই ফেটে পড়ল। বৃন্দা পুন্নার বললেন, ও, বিশ্বাস হল না বুঝি? বেশ, তাহলে এখনই দেখাতে পারি কার গায়ের জের বেশি!

হাসতে হাসতে মহিলারা একশেষ। আমার নিজেরও সমস্ত আড়চোখ ঘুচে গিয়েছিল। বৃন্দা বললেন, আমার ফ্যাট এই কাছাকাছি। লিডিয়া, বল দেখি, ছেলেটাকে আমার ওখানে কবে আনছ? একসঙ্গে বসে খেতে হবে কিন্তু। আমি রান্না করব।

আচ্ছা বেশ, তারিখ ঠিক করে আমাকে ফোন করো। চলো বাবা, তোমাকে আমি থিয়েটারে পৌঁছে দিয়ে আসি। বোমাও যাবেন সঙ্গে। চলো, লিডিয়া—

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার আগে ম্যাডাম গোর্কি দুটি স্নেহোপহার আমার হাতে দিলেন। প্রথমটি একটি রঙীন পদ্মুল—এটি ঘাস-মাটির তৈরি। এগুলি তাঁদের 'গোর্কি' শহরের কুমোরেরা ঘরে তৈরি করে। অন্যটি ধাতব-নির্মিত একটি দেশলাই বাজের খোল। এটি বহুকাল ধরে ম্যাক্সিম গোর্কি ব্যবহার করেছিলেন।

তরুণ বয়সে একদা প্রথম গোর্কির রচনা পড়ে একটা আশ্চর্য বাস্তব জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলাম, সে অনেক-কাল হয়ে গেল। কিন্তু এমন অবাস্তব দিব্যস্বপ্ন সেদিন দেখিনি যে, ম্যাক্সিম গোর্কির বৃন্দা স্ত্রী আমার জীবনের কোনও এককালে তাঁর নিজের গাড়িতে করে তাঁরই স্বামীর নামাঙ্কিত থিয়েটারে আমাকে পৌঁছিয়ে দেবেন, এবং এক পাশে থাকবেন তিনি, অন্য পাশে গোর্কির পুত্রবধূ! কিন্তু বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি এখনও—এই গাড়ির মধ্যেই বসে—যখন আমার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে!

মস্কা আর্ট থিয়েটারের ওরফে গোর্কি থিয়েটারের সামনে আমাদের তিনজনকে নামিয়ে দিয়ে মাদাম গোর্কি বিদায় নিয়ে গেলেন। অভিনয় তখনও আরম্ভ হয়নি। ডাইরেক্টর মহাশয় বিশেষ যত্নে ভিতরে আমাদের জায়গা করে দিলেন।

সেদিন ছিল রুশভাষায় 'উইন্টার টেলস্'। আজ আমার সহদর্শিনী হলেন গোর্কির পুত্রবধূ মিষ্টভাষিনী ম্যাক্সিম পেসকভা! মোট চার ঘণ্টার অভিনয়। রাত সাড়ে এগারোটায় ভাঙবে। শ্রীমতী লিডিয়া বললেন এপাশে—

এইদিন আমি সোভিয়েট সংস্কৃতি-মন্ত্রী মিঃ মিখাইলভের সঙ্গে একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়েছিলাম। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আদর্শ এবং জনসাধারণের জন্য আনন্দ-অনুষ্ঠান-গুলিকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করার জন্য জেটট কিংকি নীতি অবলম্বন করেছেন, এই নিয়ে এই শান্ত ও মৃদু-ভাষী ভদ্রলোক দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। অতঃপর রাষ্ট্র বারোটায় গ্রীষ্মভা পেসকভাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আমরা বখন হোটেল ফিরে আহারাদ শেষ করলাম রাত তখন ১টা। ওভারকোটটি

গায়ে চিড়িয়ে শ্রীমতী লিডিয়া শূভরাগ্রি জানালেন।

এককালে গোঁড়া খৃষ্টধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি রাশিয়ায় ছিল প্রচুর। সনাতন খৃষ্টধর্ম দেশের রাজনীতিক, সামাজিক এবং নাগরিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। সেই সনাতন খৃষ্টধর্ম এবং ধর্মমন্দির অব্যাহতভাবে আজও আছে রাশিয়ায়, কিন্তু তারা দেশবাসীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার হারিয়েছে! কলকাতার কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর বা ভাটপাড়া যদি দুর্মতি-গ্রস্ত হয়ে এই সিদ্ধান্ত করত যে, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বাঙালী জাতির সামাজিক বা রাজনীতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে, তাহলে তাদের ঠাই হ'ত ওই আদি-গঙ্গা বা ভাগীরথীর জলে! বলা বাহুল্য, ৪৫ বছর আগেও বাঙালী বা ভারত-বাসী রাজনীতিক ও সামাজিক চিন্তায় রাশিয়া অপেক্ষা অনেক বেশি আগ্রসর ছিল! চিন্তাধারার দিক থেকে বাঙালী বা ভারতীয় রাশিয়ার থেকে আজও পিছিয়ে পড়েনি। কেননা রাশিয়া আজ যেমন 'গোঁড়া', তেমনই 'রক্ষণশীল'। বৈপ্লবিক চিন্তাধারা যে আগ্রসরবাদকে আশ্রয় করে থাকে সেটি তাঁরা ভুলতে বসেছেন! রাশিয়ায় বিপ্লববাদের পূজা নেই, আছে বিপ্লবের পূজা! আগ্রসরবাদ অপেক্ষা উন্নতিবাদ এখন তাঁদের কাছে বড়। এইটাই গোঁড়ামি! কিন্তু ভারতবর্ষ দেখেছে অনেক, প্রচুর তার অভিজ্ঞতা। কোনও গোঁড়ামিকে সে আঁকড়ে ধরেনি, কেননা প্রতি যুগে সে 'সীনথেসিস' খুঁজেছে! আজ কমিউনিজমের জগৎ-জোড়া বিতর্কের মধ্যে ব'সে ভারতবর্ষ নিঃশব্দে তার মূল শাস্ট্রটুকু কুরে-কুরে বা'র করে নিচ্ছে! ভারতবর্ষে আকাট কমিউনিজম কোনও কালে জায়গা পাবে না, কেননা গোঁড়ামি তার প্রকৃতি-বিরোধী। বলা বাহুল্য, কমিউনিজমের প্রখরতা বা উগ্রতা, নিরীশ্বরবাদ বা বিবেকসত্তার বল—এগুলি ভারতের দু'চোখের বিষ। হিউম্যানিজমকে জায়গা দিয়ে কমিউনিজমকে সে সরিয়ে রাখতে চায়!

মস্কোতে 'গোঁড়া' খৃষ্টধর্ম আজও সগৌরবে বিরাজমান। রাজধানীতে এবং তার চতুঃপার্শ্বস্থ অঞ্চলে অগণিত গির্জা এবং সেখানে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার নরনারীর উপাসনা ও মাথা ঠোকাঠুকি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে! বিস্ময়ের কথা এই, পাশ্চাত্য এগুলিকে সেই লেনিনের আমল

থেকেই রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। ফুল বেলপাতা, পুজো-আর্চা, পাণ্ডা-পুরুতের দক্ষিণা, প্রণামী, গুরুঠাকুরের উপার্জন, খৃষ্টধর্ম প্রচার,—সমস্ত রয়েছে অব্যাহত! নেই শৃঙ্খল-বাধকতা, নেই তার রক্তচক্ষু, এবং নেই তার শাসন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে স্টালিনের আমলে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম 'কনস্টিটিউশন' প্রবর্তিত হয়। সেটির ১২৪ ধারা হল এই :
In order to ensure to citizens freedom of conscience, the church in the U.S.S.R. is separated from the state, and the school from the church. Freedom of religious worship and freedom of anti-religious propaganda is recognised for all citizens".

এই ধারাটিরই পরিপূরক হিসাবে ১২৫নং ধারায় এটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

"In conformity with the interests of the working people, and in order to strengthen the socialist system, the citizens of the U.S.S.R. are guaranteed by law :

- a) freedom of speech;
- b) freedom of the press;
- c) freedom of assembly, including the holding of mass meetings;
- d) freedom of street processions and demonstrations.

These civil rights are ensured by placing at the disposal of the working people 'and their organizations printing presses, stocks of paper, public buildings, the streets, communications' facilities and other material requisites for the exercise of these rights".

সোভিয়েট শাসনতন্ত্রে নাগরিক-গণের বিশুদ্ধ মৌল অধিকাররক্ষার ধারাগুলি যুক্তিহীন নয়। কিন্তু এমন করেকটি ধারা রয়েছে যার ছিদ্রপথ দিয়ে নাগরিকদের মৌল অধিকার অতি অনায়াসেই অপহরণ করা যায়। এই ছিদ্রপথ-গুলির সাহায্যেই স্টালিনের স্বেরাচ'রী একনায়কত্ব সম্ভব হয়েছিল, এবং লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী সেই উৎপীড়নের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল।

বিগত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে 'সোভিয়েট কনস্টিটিউশন' গ্রন্থখানি নতুন করে প্রকাশ করা হয়,—কিন্তু এটি পাস হয়েছিল প্রথম ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দেই। এই শাসনতন্ত্রের ১০৪ ধারায় যে আইনটি সুস্পষ্টভাবে বলবৎ আছে সেটি

আমাদের দেশে অনেকেরই জানা নেই। সেটি হল :

"The personal property right of citizens in their incomes and savings from work, in their dwelling-houses and subsidiary husbandries, in articles of 'domestic economy and use and articles of personal use and convenience, as well as the right of citizens to inherit personal property, is protected by law."

এই ধারাটির মধ্যে 'property' এবং 'right'—এই শব্দগুলি একবচনে আছে, বহুবচনে নেই! অর্থাৎ একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবারের একখানি নিজস্ব বাড়ি থাকতে পারে, কিন্তু দুই-খানি নয়! সেই বাড়িখানি তাঁরা বংশ-পরম্পরায় ভোগ-দখল করতে পারেন, কিন্তু সেই বাড়িখানি যে-জমিটুকুর ওপর দাঁড়িয়ে, সেটুকু শাসনতন্ত্রের ওস্তাদ ধারানুযায়ী "belong(s) to the whole people." এখানে 'পীপল' মানে 'সেট'। বলা বাহুল্য এই সব ধারাগুলির মধ্যে একটি অলিখিত শাসন উহা থেকে গেছে! তুমি যদি এই সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রের বাধী, অনুগত এবং বশীভূত না থাকো, তাহলে তোমার জীবনযাত্রা ও ধনসম্পত্তি নিরাপদ নয়!

আমার ভ্রমণকালে একটিমাত্র সোভিয়েট নাগরিককেও আমি অব্যাহত হতে দেখিনি! কিন্তু আমার বিশ্বাস, আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে 'উদারতম' শাসনতন্ত্র একমাত্র ভারতেরই আছে! কেননা আমাদের ঘরের শত্রুরা এই শাসনতন্ত্রের গুণে অহেতুক প্রশ্রয় পায়, এবং বাইরের শত্রুরা অব্যাহত আশ্রয় পায়!

মস্কো ছাড়িয়ে অনেক দূর যাচ্ছিলাম—প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। আমাদের সঙ্গে একজন নতুন অতিথি ছিলেন। তিনি এসেছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে। ভদ্রলোকের বয়স বছর পঞ্চাশ, মাথায় বহু পরিমাণ টাক, এবং তিনি আপন দেশে একজন বিশিষ্ট ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর নাম মিঃ ক্রাক। তাঁরা চারজন অস্ট্রেলিয়ান মিলে একটি পুথক প্রতিনিধিমণ্ডলী। কিন্তু এই ভদ্রলোকের মিস্টারিস ও সৌজন্য আমি দূরের থেকে লক্ষ্য করতাম। এঁরা চারজন ছিলেন শ্রীমতী অকসানা নিকোলায়না। একদিন অকসানা আমাকে বললেন, মিঃ

ক্লার্ক আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

মিং ক্লার্কের সঙ্গে সেদিন থেকেই বন্ধুত্ব। তিনি যে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের আত্মীয এ সম্বন্ধে তিনি সচেতন এবং সতর্ক। তিনি মদ্য বৃজে হাসিমুখে এবং নিরীহ চেহারা নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন দেখে যেতে চান। প্রশ্ন, বিতর্ক, সমালোচনা বা বিশ্লেষণ,—এগুলি তাঁর মনে মনেই থেকে যায়। সম্ভবত আমি ভারতীয় বলেই তাঁর কিছু ঔৎসুক্য ছিল, এবং আমাদের গাড়িতে তিনি বেশ খুশী হয়েই চললেন। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ভারতের ‘শান্তি কমিটির’ নিরামিষভোজী ও নিরীহ ভারত পালি-মেটের সদস্য এবং বন্দু সদ্যর গুরুবাক সিং, শান্তশীলা ‘দিদি’ শ্রীযুক্তা আশা-দেবী আর্থনায়কম ও তাঁর স্বামী এবং অবশ্যম্ভাবিনী শ্রীমতী লিডিয়া! আমরা যাচ্ছিলুম সনাতন খৃষ্টধর্মের প্রধান কেন্দ্র তীর্থশ্রেষ্ঠ ‘জেগোরস্ক’-এ। এক কথায়, ‘কাশী’ যাচ্ছিলুম! চলো, তীর্থ কাশী!

দুধারে পাইন এবং বাচের অরণ্যশ্রী। মাঝখানে দিয়ে প্রশস্ত ও মসৃণ রাজপথ। মাঝে মাঝে দিগন্তপ্রসার প্রান্তর, শ্যামশ্রী পরিপূর্ণ সমতল। দেখতে দেখতে পথ পেরিয়ে এলুম অনেক দূর, এবং একটি পল্লীজনপদের ধারে এসে পথের পাশে একটি মন্দিরসদৃশ গির্জার কাছে গাড়ি থামল। আমরা গিয়ে ঢুকলুম সেই মন্দিরে। এটি বহু প্রাচীন, এবং ভিতরটি ছমছমে। স্থানীয় বহু প্রবীণ নরনারী পূজাপাঠে ব্যস্ত। অনেকে হাঁটু মূড়ে পাথরের মেঝের উপর বসে স্তবপাঠ করছে, কেউ বিচিত্র ভঙ্গীতে কান মলছে, কেউ বা ‘হৃদয়ে-স্বক্শে-ললাটে, অক্ষ ও কণ্ঠে’ করস্পর্শ করে ‘আচমন’ করছে। অনেকে মাথা ছুঁইয়ে খৃষ্টের ছবিতে প্রণাম জানাচ্ছে। এই মন্দিরের কর্মীদের ব্যয়ভার বহন করেন রাষ্ট্র; এবং প্রণামী বা পূজার দরুণ বা পাওয়া যায় তাতেই মন্দিরের খরচ চলে।

আমরা আবার এসে গাড়িতে উঠলুম।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এখন মোটা-মটু চারটি ধর্ম বর্তমান। সেগুলি হল খৃষ্ট, ইহুদী, ইসলাম এবং বৌদ্ধ। নিখিল সোভিয়েট বৌদ্ধ কাউন্সিলের যিনি সর্বপ্রধান লামা, তাঁর নাম ‘গাবাজ

ধর্মায়োড লবসাননিমা’, এবং যিনি ‘চিতা’ অঞ্চলস্থিত ‘আগা’ মন্ঠের প্রধান পুরোহিত, তাঁর নাম ‘গাবিৎ জিগাজিত্ত শম্ভু’। ইসলাম ধর্মগুরু ধারা তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ গাজি কুবানিত্ত, শামসুদ্দিন আবদুল্লায়েভ, আলীজাদা আবদুদ আগা, ইব্রাহিম আবদুল করিম, আলী আব্বাস কাজী,—প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ইহুদীদের মধ্যে দুইজন প্রধান ধর্মযাজক রয়েছেন। একজন হলেন ‘সলোমন শিফার’, অন্যজন ‘ইৎস্কা শেখৎমান’। বিগত ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে শান্তিপ্রচার কামনায় সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের এই চারটি ধর্মের প্রধান পুরোহিতগণের যে মস্ত সম্মেলন হয়, পূর্বোক্ত ধর্মচার্যগণ সেই সম্মেলনে যোগদান করেন। সেই বৃহৎ সম্মেলনের ক্ষেত্র ছিল ‘জেগোরস্ক’ (Zagorsk)।

সোভিয়েট ইউনিয়ন গোঁড়া বা সনাতন খৃষ্টধর্মের দেশ। এদেরই অধীনে আছে মোট ১৬টি তীর্থস্থান, সেগুলি পূণ্যক্ষেত্র। সেখানে স্নান দান পূজা দীক্ষা ত্রিরাতিবাস, ধর্মালোচনা, আরতি,—আগাগোড়া সমস্তই সনাতনী হিন্দুদের মতো! সেই ১৬টি পূণ্যক্ষেত্রের মধ্যে যেটি সর্বপ্রধান, সেই ‘জেগোরস্ক’-এ আমরা এসে পৌঁছলুম। আমি অতিশয় কৌতুক বোধ করছিলাম এইটি দেখে যে, আমি গয়া-কাশী-প্রয়াগ-বন্দাবন-হরিদ্বারের বিশেষ বিশেষ মন্দিরের পাড়ায় এসে পড়েছি!! সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা এই, যে ধরনের গির্জা আমাদের দেখা অভ্যাস, এখানে তার কোনও ডিজাইন নেই! রোমান ক্যাথলিকদের গির্জা, প্রটেস্ট্যান্টদের গির্জা, ইহুদী সিনাগগ, গোঁড়া খৃষ্টানদের গির্জা,—এগুলির নির্মাণ-কৌশল প্রত্যেকেরই পৃথক। কলকাতার সেন্ট পল্‌স্ বা দার্জিলিং, কালিপু, শিমলা, মুনসৌর, বোম্বাই বা দিল্লীতে যে বড় গির্জাগুলি আমরা দেখি,—তাদের অধিকাংশ ইংরেজ স্থাপত্যকলা অনুসারে নির্মিত। কিন্তু রাশিয়ার প্রত্যেকটি গির্জার ডিজাইন ভিন্ন। হঠাৎ দেখে মনে হতে পারে, এ যেন হিন্দু মন্দিরের সগোত্রী! তার খিলান, তার গম্বুজ, তার স্বর্ণালি মন্দির, এমন কি ভিতর ও বাহিরের নির্মাণকলার মধ্যে হিন্দু স্থাপত্যের ছায়াটি থেকে গেছে! ‘টেম্পল’ এবং ‘চার্চ’—এই দুটি শব্দের ব্যবহারে একটি জটিলতা আছে। খৃষ্টজন্মের পরেও গ্রীস, ইতালী, পূর্ব ইউরোপ, রুশ সাম্রাজ্য—সর্বত্রই উপাসনা

গৃহকে ‘টেম্পল’ বলা হত। শ্রেষ্ঠত্বের সকল কেন্দ্রই ‘টেম্পল’। আমরা ‘জেগোরস্ক’ এসে চারিদিকে দেখছি বৃহদাকার এক একটি মন্দির! ক্রেম-লিনের ভিতরে অত বড় যে ‘উম্পেনিস্ক ক্যাথড্রাল’, সেও ত টেম্পল!

উক্কাইনের রাজধানী কিয়তে থাকতে যে ‘পেচারস্ক লাবরা’ দেখে এসেছি, এটি ভারই সগোত্রীয়। তবে সেটি ‘তারকেশ্বর’, এটি ‘বারাগসী’। এখানে চারিদিকে মস্ত শহর, কিন্তু তীর্থ-কেন্দ্রিক। কালীঘাটে অত ভিড় শুধু কালীমন্দিরের জন্য। গদাধরের মন্দিরের জন্যই পুরনো গয়া! রাজস্থানে নাথজীর মন্দিরটি আছে বলেই নাথবার শহর। এখানে এই বৃহৎ ও ব্যাপক ‘ট্রিগ্গিস্ক-সেব’গয়েভা বিহার’ আছে বলেই ‘জেগোরস্ক’ শহর! এই শহরে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বপ্রধান খৃষ্টধর্মগুরু ‘হিজ হোলিনেস আলেক্সিস, পেট্রিক’ অফ মস্কোর’ স্থায়ী বাসস্থান। এখান থেকে তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থার সাহায্যে তিনি ১৫টি সোভিয়েট রিপাবলিকের গোঁড়া খৃষ্টান সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এই প্রশাসন ব্যবস্থার উচ্চতন অধিকারের নাম হল, ‘হোলি সাইনদ’। এককালে এখান থেকেই মহামতি টলষ্টয়কে ধর্মচ্যুত করা হয়েছিল! এখানকার অধ্যাপক বিদ্যালয়, রক্ষাচর্চা আশ্রম, মঠ, টোল ও গুরুদৃষ্টি, এখানকার পাঠ্যক্রম বসবাস ব্যবস্থা—সমস্তই ধর্মগুরুর নির্দেশে চলে! একজন ধর্মযাজক সগোরবে আমাদের বললেন, আমরা এখানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কোনও প্রকার অর্থসাহায্য (subsidy) গ্রহণ করিনে! আমাদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব।

ধর্মযাজকটি বয়সে কিছু তরুণ, চেহারাটি অতি সুদর্শন, মুখশ্রীটি দীপ্ত ও কমনীয়, গুরুশ্রমশ্রুত। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরের দুটুতা দেখে ঈষৎ বিস্ময় বোধ করেছিলাম। আজ বোধকারি কোনও এক পর্ব দিন। চারিদিকে সকল বয়সের হাজার হাজার নরনারীর জনতা। যে-বৃহৎ ‘মন্দিরের’ মধ্যে ঘণ্টা ও বাদ্য-সহকারে আরতি-অর্চনা চলছিল, আমরা সেইখানকার ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে চারিদিকের মণিমাণিক্যের শোভা-সম্পদের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিলাম এবং যে কোনও ‘হিন্দু’ মন্দিরের দেবদেবীর আরতির সঙ্গে এখানকার কিছুমাত্র প্রভেদ নেই, এইটি ভাবছিলাম! তেমনি ধূপ-ধূনা-প্রদীপ, তেমনি হাতজোড় এবং চোখ

বোজা, তের্মান দেওয়ালে মাথা ঠোকা। এক সময়ে আমাদের পাশ থেকে শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, এখানে বহু দেশ থেকে মেয়ে-পুরুষরা মানৎ করতে আসে!

সোভিয়েট ইউনিয়নে বর্তমানে ৬৯টি মঠ বা খৃষ্টাবহার আছে। এই বিহারগুলি স্থানীয় ধর্মগুরু বা মোহন্তর অধীনে। যারা শাস্ত্র-চর্চা করবে, বা অধ্যাপক জীবন বাপন করবে,—তারা এখানে আশ্রয় পাবে। এই সব মঠ থেকে ‘সন্ন্যাস’ দেওয়া হয়। এই মঠগুলির মধ্যে যোগদল অতি প্রসিদ্ধ, তাদের ভিতরে গ্নায়ংসে-সেগিয়েভা, কিয়েভো পেচারস্কায়া, পোচারেভস্কায়া, পেচারস্কালাবরা, পুখ-তিৎসা ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল মঠ বা খৃষ্টাবহার ছাড়া গিজার সংখ্যা শত সহস্র। একমাত্র মস্কো এবং তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে ৫০টিরও বেশি গিজা ধর্মোপাসকদের জন্য সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন খোলা থাকে।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান লেখক কেনেডি (হিনি প্রেসিডেন্ট কেনেডি কিনা জানিনে) এই খৃষ্টাবহারে এসে চারদিক দেখে শুনে এখানকার ‘ভিজিটাস বুক’ বে কয়েকটি কথা লিখে গেছেন, সেগুলি এখানে তুলে দিচ্ছি :

“Coming from the United States of America, where it is frequently asserted by the press that freedom of religion does not prevail in the Soviet Union, it has been most gratifying to see with my own eyes the free exercise of religious conception here today. At the same time, it has been inspiring to see the Church fulfilling the function of service to the people.” (August 8, 1954).

আমরা বিভিন্ন বহুং অট্টালিকার আশেপাশে শত শত নরনারীর ভিড়ের ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এই তীর্থস্থানের যিনি প্রথম পত্তন করেন তাঁর নাম ‘সন্ত সেরগিউস’। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর একজন খৃষ্টান সাধু। তাঁর দেহাবশেষ আজও এখানকার একটি রৌপ্যময় স্তম্ভের নীচে একটি রৌপ্য-ধারে সংরক্ষিত আছে। এখানে বর্তমানে ১০০ সাধু এবং ব্রহ্মচারীর বাস। তাঁরা জপ-তপ, পড়াশুনা এবং শাস্ত্রচর্চা নিয়ে থাকেন। এখানকার সর্বপ্রধান ধর্মগুরুর সহকারী হিসাবে যিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অধ্যক্ষ, তিনি হলেন মেট্রোপলিটান নিকোলাস রেভারেন্ড ফাদার ক্লুটিংজ। তাঁর বয়স প্রায় ৭৫। তিনি বছর দুই আগে দিল্লীর ধর্মসভার অধি-বেশনে যোগদান করেছিলেন।

মোট ৬টি বিভিন্ন বিভাগের সাহায্যে এই বিরাট খৃষ্টাবহার তার সকল কাজ সম্পন্ন করে। এখানকার আইন-কানুন, বিলি-ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন নির্দেশনামা

‘হোলি সাইনদ’ প্রচার করেন। এঁদের উপদেষ্টা কমিটির হাতে রয়েছে ধর্ম-শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থার মোট ১০টি শিক্ষায়তন এখানে বর্তমান। প্রচার ব্যবস্থার মধ্যে আছে মাসিকপত্রাদি, বাইবেল এবং ধর্মশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক, গুরুত্বপূর্ণ সমাচার এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থাদি। এখানে আছে পেন্সন ব্যবস্থা। অশক্ত, বৃদ্ধ বা অকর্মণ্য-প্রায় সাধুসন্ত, বার্ধক্যজীর্ণ ধর্মযাজক বা তাঁদের নিরুপায় পরিবার, শিক্ষক বা গিজার কর্মী,—এঁরা যে অর্থসাহায্য বা পেন্সন পান, সেই সকল অর্থসংগ্রহের জন্য নানা অঞ্চলের গ্রামীণ ধর্মকেন্দ্রাদির নিকট আবেদন জানানো হয়। অর্থিং চাঁদার টাকায় এই হেভজোড়া ধর্মপ্রতিষ্ঠান চলে। এ ছাড়া এঁদের অধীনে কয়েকটি উৎপাদন কেন্দ্রও আছে। গৃহাঙ্গী নির্মাণের মালমসলা, মোমবাতি, আসবাবসজ্জা, তৈজস, গিজার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী, কাঠের জিনিস, বাসনপত্রাদি, ছাপাখানা, কাগজ কল,—প্রভৃতি নানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত হয়। কিন্তু সেগুলি কেবলমাত্র এখানকার জন্য। এখানকার কোনও কর্ম-ব্যবস্থায় সোভিয়েট ইউনিয়নের নির্দেশ গ্রহণ করা হয় না।

আমরা একেবারে পবিত্র বেদীমূলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলাম। একেবারে কক্ষ আগা-গোড়া স্বর্ণখচিত। সম্পদ ও বৈভবে পরিপূর্ণ প্রত্যেকটি উপাসনাস্থল। খৃষ্টের ও মাতা মেরীর বর্ণাঢ্য চিত্রপট-গুলির যে অনৈসর্গিক আবেদন, সেগুলি শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণের প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে। জড়োয়া, জহরং, মণিমাণিক্য চারিদিকে দ্যুতিমান। তার অলঙ্করণ, ঐশ্বর্য, কারুকা, বৈচিত্র্য, শিল্পকর্মাদি আমাকে যেন তিব্বতের বৌদ্ধ গুরু-গুলির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

পূর্বোক্ত ৬৯টি খৃষ্টাবহার বা মঠের তত্ত্বাবধানে সমগ্র রাশিয়ায়, সাইবেরিয়ায়, ট্রান্স-ককেশিয়ায়, এসটিন্যা-লিথুয়ানিয়া-লার্টভিয়ায় এবং উক্ৰাইনে শত শত খৃষ্ট-মন্দির এবং অধ্যাপক সাধনার যে ছোট-বড় কেন্দ্রগুলি অদ্যাবধি সগৌরবে বর্তমান, তারা প্রধানতই ‘জোগোরস্কের’ নির্দেশানু-সারে চলে। তাদের পরে সোভিয়েট কত-পক্ষের একমাত্র শাসন হল এই, দেশবাসীর রাজনীতিক, সামাজিক এবং অর্থনীতিক জীবনের ওপর তারা প্রভুত্ব করবে না। পলিটবুরের মধ্যে ধর্ম বা সম্প্রদায়ের জিগির তোলা চলবে না। আগে মানুষ, পরে ধর্ম। ধর্মাবিশ্বাস ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রগত নয়। গিজা, গুরু, মন্দির, মুসজিদ, সিনাগগ—এদের চৌহদ্দির মধ্যে ধর্ম যদি থাকে, তার বাইরে সে ‘ধর্ম’ যেন দেশের বৃহত্তর জীবনকে শাসন না করে, চোখ না রাঙায়, জাত মারবার ভয় না দেখায়! এই সৌন্দর্য অর্বাধ ওদের আঁতুড়ঘরের

‘মেষ্টেরা পুজোয়’ ঢুকতো ‘বামুন’, ব্যাপটিজম বা খৃষ্টানত্ব কর্মে ‘বামুন’, বিবাহে ‘বামুন’, মৃত্যুকালে ‘বৈতরণী’র রেভারেন্ড বা ‘বামুন’! আজ সেই প্রথা বা শাসনের চিহ্ন কোথাও নেই। ‘হোলি সাইনদ’ আজ আর রাজনীতি নিয়ে বা ধর্মচ্যুতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। এখন প্রত্যেক ধর্মমন্দিরের পাঠ্যক্রম হল, সোভিয়েট কনস্টিটিউশন। আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন সেদিনকার গদ্যবর্ণনায় ‘বামুনাই’ ঘটিয়েছে বলেই পৃথিবীব্যাপী এত কোলাহল! আমাদের সংগী অস্ট্রেলিয়ান প্রফেসর মিঃ ক্লার্কের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। গত কয়েকদিন থেকেই তিনি বলছিলেন, সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে নতুন ঠেকছে। আমাদের সমস্ত চিন্তার ধারাটাই নিষাক্ত হয়ে রয়েছে ৪০।৫০ বছর ধরে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই, ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করি, লেখক হিসাবে আমার একটুআধটু খ্যাতিও আছে। কিন্তু এদের দেশে এসে নিজেকে যেন পদে পদে অজ্ঞ, অনাভিজ্ঞ এবং অনেকটা অশিক্ষিত মনে হচ্ছে!—“I feel myself ignorant, inexperienced and foolish in every step”.

আড়ালে দাঁড়িয়ে দু’জনে খুব হাসছিলাম। ক্লার্ক বললেন,—“bel-lieve me. I’ve to unlearn many things which I learned already in my country” অর্থাৎ যা শিখে এসেছি এতকাল, তার অনেক কিছু ভুলতে হবে!

মিঃ ক্লার্কের কিছু ভাবান্তর ঘটেছিল। এই সৌম্যদর্শন অধ্যাপক এক সময় গল্পপছন্দে আমাকে বলেছিলেন,—“I’ve been let down by our own people, and am going to expose them!”

আমাদের জন্য কিছু জলযোগের আয়োজন করা হয়েছিল এবং যিনি এখানকার পরম ভাগবত, সেই প্রভুপাদ ‘মেট্রোপলিটান নিকলাস রেভারেন্ড অফ ক্লুটিংজ এন্ড কলোমনা’ আমাদেরকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁর সামনে বসাসেন। বৃন্দের চেহারাটি অতি সৌম্য, পরিচ্ছন্ন এবং প্রসন্ন। শ্বেতশ্মশ্রুত এই দশাসই বৃন্দকে দেখলে মনে একটি শ্রদ্ধা এসে পৌঁছয়। ইনি সাধারণত ভিনদেশীয় অভ্যাগতগণকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীমতী লিডিয়া দোভারীর কাজ করছিলেন।

জলযোগের মধ্যে ছিল তিন চার রকমের মাংস, এবং সেগুলি হিন্দু-মুসলমান কারও পক্ষেই ভোজ্য নয়! আগুদুর-আপেল-পীয়ার-বোঁব প্রভৃতি ছিল। পানীয়ের মধ্যে জল ভিন্ন আর সব রকমের তরল বস্তুই প্রাচুর্য রয়েছে। আলু, টমাটো, মাছ, শাক, শসা, টোস্ট,—কোনটার অভাব নেই। পুরোহিত মহাশয় নিজেরও সকলের সঙ্গে আত্ম-বন্দ-গেলেন। ভোজ্যবস্তু সম্বন্ধে এখানকার

পরোহিত বা ছাত্রমহলে, কোনও নিষেধ নেই। এটি ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির উপর নির্ভর করে। একমাত্র ভারতবর্ষ—যেখানে হিন্দু জাতির অধ্যাত্ম জীবনের বিশুদ্ধতা ও শ্রদ্ধাচিন্তার সঙ্গে জীবজন্তুর প্রাণনাশ জড়িত নয়। ভগবৎ আরাধনার সঙ্গে জীবহত্যা ও হিংসা, শৈবভারতের মেলোনি।

খোঁজ-খবর নেবার মাঝখানে আমি অর্বাচীনের মতো একটি প্রশ্ন করে বসলাম যেটি শুনে আশা দেবী ও গুর্বাক সিং ঈষৎ ক্ষুব্ধ হলেন। প্রশ্নটি আশ্রয়, কিন্তু প্রয়োজনীয়। আমার প্রশ্ন ছিল—এই প্রকার : বলশেভিক বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হবার পর সম্রাট আমলের পরোহিত-সমাজ—যাঁরা সেন্নিন গভর্ণ-মেন্টের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তাঁদের পরিণাম কি দাঁড়াল, সেইটি আমি জানতে উৎসুক।

গুর্বাক সিং বললেন, but these are embarrassing questions!

বোধ হয়, মিঃ ব্রাক ই বললেন, not irrelevant. I suppose!

শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, এসব প্রশ্ন যদি কারও মনে আজ আসে, তার জবাব পাওয়া উচিত বৈকি।—এই বলে তিনি

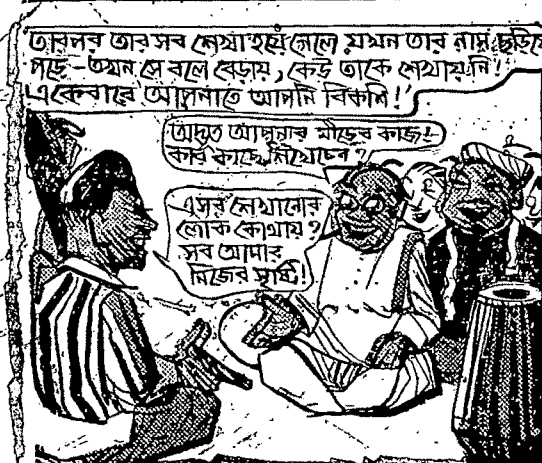
বৃদ্ধ রেভারেন্ডকে আমার প্রশ্নটি বুঝিয়ে বললেন।

মেট্রপলিটান নিকলাস ই ষ ৭ হাসলেন। বললেন, প্রশ্নটি পেরেনো, কিন্তু কোতুলটি আজও রয়ে গেছে পৃথিবীতে। আসল কথাটি না জেনে লোকে গুলামন্দ করেছে! শত শত বছরের অভ্যাস কি মানুষ সহজে ছাড়তে পারে? কেউ কি জানিত, জুর কোনও দিন সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন, না রুশ সাম্রাজ্য ভেঙে চুরুর হবো? আমি নিজেকে সাদিন দুঃখের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখিছি। পেরেনো : অভ্যাস রাতারাতি বদলায় না, কিন্তু রাজনীতি আমরা নই বা করব, নাই বা উজন-জীবনের ওপর আধিপত্য করবো! গভর্ণমেন্ট ডাল কি মন্দ, সেটা বঝুকগে গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণ—আমরা ধর্ম-মন্দিরের রাইরে গিয়ে ওদের মধ্যে মাথা নাই গলালাম! অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এক শ্রেণীর ধর্মযাজক, তাঁদের শিষ্য-মন্ডলী এবং অনাগতর দল এই অভিমতটি মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা দুঃখ বহন করেছেন, এবং বহু ব্যক্তির সম্মান পাওয়া যায়নি। বহু পরোহিত শাস্তি-লাভ করেছেন!

এই অবস্থাটা কতদিন ছিল?

ধরুন মোটামুটি পাঁচ বছর! ১৯১৭ থেকে ১৯২১!—আচার্য বলতে লাগলেন, উপাসনার ক্ষেত্রগুলি যে রাজনীতিক বড়বস্ত্রের ক্ষেত্র নয়, এটি সৌন্দর্য অনেকেই বুঝতে পারেননি। তাঁরা প্রাচীন ব্যবস্থাকে কারোম রাখতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীর নানা দেশে ধর্মো উঠেছিল, সোভিয়েট ইউনিয়নে খ্রিস্টানধর্ম বিপন্ন! প্রকৃতপক্ষে কোনও ধর্মই বিপন্ন হয়নি! কিন্তু যে সকল ধর্মযাজক জারের আমলকে নানা কৌশলে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, তাঁরা কেউ রক্ষা পাননি।

আহারাদির পর আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এই তীর্থ-নগরীর সর্বত্র স্থাপত্যকলার মনোরম সমাবেশ দেখলে মন অভিভূত হয়। বড় বড় গির্জা, স্মৃতিসৌধ, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, টোলা, নাট্যমন্দির, বাসগৃহ, পারিষদমণ্ডলের জন্য এক একটি পার্ক, প্রাচীন কলাশালা, প্রতি মন্দিরের ভিতরে প্রতি দেওয়ালের ফ্রেসকো চিত্রাদি—আগাগোড়া সমস্ত বহু শত বৎসরের সংগ্রহ। একজন 'ফাদার' আমাদের হাসিমুখে বললেন, পৃথিবীর সব দেশে যেমন, এখানেও তাই। আজ-কাল মানুষের ব্যক্তিগত সুখস্বচ্ছন্দ্য



বেড়ে গেছে, তাদের আকর্ষণ সেইদিকেই বেশি। ওরা ধর্মকথা বা তত্ত্বকথা এখন আর তেমন শুনতে চায় না। অল্প বয়সের মেয়ে-পুরুষরা ধর্মতত্ত্বে এখন রস (interest) পায় কম। বয়স্ক লোকরাই বেশি আনাগোনা করে, যাদের প্রবীণ মনে প্রশ্ন ওঠে নানাবিধ!

আপনাদের খরচপত্র কি রীতিতে চলে?

আচার্য মিষ্ট হাস্যে বললেন, উপার্জন আমাদের প্রচুর! দান এবং প্রণামীর হাত লোকের কর্মেই [People pay the church still lavishly]

মিঃ ক্লার্কের মুখে চোখে সৌন্দর্য বিস্ময় ও আনন্দ উচ্ছ্বাসিত হয়েছিল।

মস্কোর 'জিপসী থিয়েটারে' বসে 'সোহনী ও মহীওয়াল' নামক একটি অপেরা নাটকের মহড়া দেখেছিলুম। এটি কোনও এক পাঞ্জাবী লেখকের রচিত। এটি একটি দরিদ্র কুমোর-পরিবারের কাহিনী, এবং এর রস ও অভিনয়কলা অতিশয় অতীন্দ্রিয়। কেবলমাত্র গতি-ভঙ্গীতে এবং বাদ্যসঙ্গীতে এটিকে প্রকাশ করা হচ্ছে। এর সঙ্গীতের অংশটি যোজনা করেছেন মস্কোবাসী কৃত্তবীদা শ্রীযুক্ত বিনয় রায়, কিন্তু নাটক বা অভিনয়ংশটি যথেষ্ট মনোজ্ঞ হয়নি। আমি এর সুখ্যাতিপত্রে চক্ষুদুঃস্বপ্নের দায়ে সই করে দিলুম বটে, কিন্তু ডাইরেক্টর সাহেবের কাছে আমার প্রকৃত মনোভাবটি প্রকাশ করে বললুম। নাটকের প্রধানা পাত্রীটিকে জানিনে, কিন্তু পরম্পরায় শুনলুম শ্রীমতী ভ্যালেন্টিনা ভিসনিয়া-কোভা নামক একটি বিংশগতি অভিনেত্রী নাকি যোগ্যতর পাত্রী ছিল। রংগমণ্ডের স্ববিনিকার অন্তরালবতী যো-জগং, সেখানকার 'রাজনীতি' পরদেশীর নিকট দুর্বোধ। সেখানকার রহস্যময় পক্ষ-পাতিত্ব, সংগোপন কানাকানি, প্রচুর মান-অভিমান, অসন্তোষের বিষমবাস—এগুলির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। প্রকাশ্য মণ্ডের উপর এই পাঞ্জাবী অপেরা সৌন্দর্য যথেষ্ট আনন্দদায়ক হয়নি। ভারতে এই আজগুবী বস্তুর ঠাই হত না।

কিন্তু ভাল লেগেছিল 'মস্কোর 'প্যাপেট থিয়েটার'। আমাদের দেশে এক-কালে 'পতুলনাচ' ছিল অতি প্রসিদ্ধ। কলকাতার 'পতুলনাচ' সমগ্র ভারতের পক্ষে গৌরবের বস্তু ছিল। সৌন্দর্য তাঁরা 'কথা' বলত না বটে, কিন্তু 'কায়িক-ভঙ্গীর' দ্বারা বিষয়টিকে প্রকাশ করত। আজ সেই 'জেলেপাড়ার সঙের' মিছিল কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সে ঘাই হোক, আজকের 'প্যাপেট থিয়েটার' বিস্ময় আনে না, আনন্দ প্রদান করে না। মস্কোর এই 'প্যাপেট থিয়েটার' পতল-নাচটি হল বিজ্ঞানকলার একটি অনন্য সম্পদ। বিষয়টির মূল উদ্দেশ্য রাজ-নীতিক, কিন্তু হাস্যাত্মক রসে এটি

পরিপূর্ণ। একটি আমেরিকান ফিল্ম কোম্পানীর নূরতম পুণ্যস্মৃতিস্মৃতি, নিয়ে তামাশা ও পরিহাস চলছে। পুডউসার, ডাইরেক্টর, অভিনেতা ও অভিনেত্রী, কুকুর, ঘাঁড়, গরু, প্রত্যেকটি দৃশ্যপটের শূন্যটিং, আউট-ডোর নিয়ে হৈচৈ—সমস্তগুলি কলের পুতুলের দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। ওরই মধ্যে নৈরাশ্য, ব্যস্ততা, ব্যর্থতা, হাসি-অশ্রু, সঙ্গীত ও অভিনয়, আয়োজন এবং বিভ্রম! বাস্তবিক, পুতুলকে আর কোনদিন এমন জীবন্ত মনে হয়নি, এবং তাদের কন্ঠ এমন করে মানুষের কলকন্ঠ ও শব্দনি। সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টাব্যাপী এই অনর্গল হাস্যরস এবং 'অনাবিল' 'অনন্দ' পোয়ে-ছিলুম, তার জন্য শ্রীমতী লিডিয়াকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলুম।

মস্কোর অন্যতম আকর্ষণ হল 'চিল ড্রেন্স থিয়েটার'। ৬ বছর থেকে ১৭ বছর বয়স, অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা এখানে নাটকের অভিনয় দেখতে আসে। উপদেশ বা নৈতিক বক্তৃতা ছেলেমেয়েদের দৃষ্টোত্তর বিষ। তাদের 'ভাল' হতে বললেই তারা 'মন্দ' হয়ে দাঁড়ায়। নীতি-উপদেশ দিলেই তারা বিগড়াতে থাকে, এবং শাসন করলেই বেঁকে বসে। প্রবীণ বয়স্ক মা-বাপের কাছে ছেলেমেয়েরা আনন্দ পায় না, ভয় দেখালে তারা নড়ি হয়, সব সময় চোখে-চোখে রাখলে তারা চুরি করতে শেখে, ধর্মক শুনতে থাকলে তারা মিথ্যাবাদী হয়! ছোট ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা ও ভুলবাসা এবং আনন্দ পেলে তবে উপযুক্তভাবে মানুষ হয়। সোভিয়েট কৃৎপক্ষ এসম্বন্ধে খুবই সচেতন।

আমরা দুটি স্বচ্ছন্দচারী শিশু-বালকের একটি রূপককাহিনী নাট্যকারে দেখেছিলুম। আজ আমার পাশে ছিলেন শ্রীমতী অকসানা, একজন তরুণ বয়স্ক স্কচ নাট্যকার ও কবি মিঃ রীড এবং এই থিয়েটারের ডাইরেক্টর স্কেলার সুপার-বুথ শ্রীযুক্ত গোল্ডবর্ডস্কি। পরম স্নেহশীলা একটি জননী তার দুটি শিশুসন্তানকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে অতি আনন্দ জীবনযাত্রা নিবাহ করছিল। শিশু-বালক দুটি অতি মিষ্টপ্রকৃতির। কিন্তু শিশু-বলেই বোধ হয় একটু ভুল করল। তারা তাদের স্বাভাবিক কৌতুকলবশতঃ স্বাধীনতার সীমানার বাইরে গেল এবং এক ডাইরেক্টর দ্বারা অপহৃত হয়ে কোনও এক অরণ্যলোকে একটি আপেলগাছের কেটে লুপ্তায়িত থাকতে বাধ্য হল। অবশেষে একটি সন্দর নাটকীয় সংঘাতের ভিতর দিয়ে গাভীপাশের মিলন এবং পেঙ্গুয়িনের বাসক-বালিকা দর্শকদের সঙ্গে নানারক 'পাদ দর্শন' দ্রুত-প্রত্যাবর্তের কৌতুকজনক যোগা-যোগ। এই নাটকটি দেখে বড় আনন্দ পেয়েছিলুম।

মিঃ গোল্ডবর্ডস্কির বাড়িতে অর্থাৎ ফ্ল্যাটে আমাদের নৈশভোজের আমন্ত্রণ ছিল। তরুণ স্কচ কবি ও নাট্যকার শ্রীমান রীড মদ এবং আমোদ—এ দুটির বিশেষ অনুরাগী। তিনি বললেন, আমি স্কচ বলেই স্কচ হুইস্কিতে মানুষ! আমাদের দেশের স্বনামধন্য পাদরীদের জ্ঞানোন্মেষ হয় স্কচ হুইস্কির গণে। কথাটি হয়ত সত্য নয়, হয়ত বা ওর মধ্যে বক্তোক্তি আছে। কিন্তু রীড সন্দিগ্ন নৈশভোজের অসরটিকে রাত ১টা পর্যন্ত তাতিয়ে রেখেছিলেন।

ঘরে মিঃ গোল্ডবর্ডস্কির প্রাচীন জননী এবং বছর চৌদ্দ বয়সের একটি কন্যা বর্তমান। এরা বোধ হয় ইহুদী এবং এককালের বিশিষ্ট অভিজাত। বৃদ্ধার বয়স অন্তত ৬৫ বছর, কিন্তু এমন পরিচ্ছন্ন সুশ্বেতা ও সন্দরী বস্ত্রা এর আগে আমার চোখে পড়েনি। বালিকা মেয়েটিও যেমন সস্ত্রী, তেমন শান্ত ও নম্রভাষিনী। বৃদ্ধা আমাদের সকলকে সাদরে বসালেন। নতুন ফ্ল্যাটটি নতুন আসবাবপত্রের ঝলমল করছিল। অনেকগুলি আলমারি বই ঠাসা। সর্বত্র পরিচ্ছন্ন রুমির পরিচয় রয়েছে। গোল্ডবর্ডস্কির বয়স হয়ত চল্লিশের কিছু বেশি। কিন্তু এমন রূপবান পুরুষ এদেশে আমার কমই চোখে পড়েছে। ভোজের আসরে এসে পেঁয়াজের ভরি স্থায়ী এবং তিনি আমাকে দেখেই 'সিবিসময়ে' হেসে উঠলেন। গত বছর যমস্কোতে এর স্ত্রীকে আলাপ হয় এবং এই অতি সুশ্রী মহিলাটির স্ত্রীমাতা শ্রীমতী গীরা। ইনিও সুপট, দোস্তিগণী এবং বয়স আদ্যজ বছর পর্যন্ত। তিনি জ্ঞানতেন না, আমি পুনরায় মস্কোতে এসেছি এবং গোল্ডবর্ডস্কি যে-ইন্ডিয়ানকে আজ নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছেন সে-বাস্তি যে আমি, এটি গীরার কাছে চেপে রাখা হয়েছিল।

বৃদ্ধার চেহারাটির মধ্যে জার আগলের নোবল পরিবারের যে অর্জিজাত্যের কথা শুনে এসেছি, তার একটি সুস্পষ্ট ছাপ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছিলুম। সন্দেহ নেই। তিনি যখন কাছে বসে সমুদ্রে আমার পেল্টগিলি ভাবনা দিচ্ছিলেন, আমি তখন তাঁর নাগনীটির অভিজ্ঞতা ভাগিয়ে খাওয়াতে বাসেছিলুম। বহু পরিবারের মাধেই আমি—এতদিন ধরে যোরাফেরা কাঁবাছি, কিন্তু এমন একটি শোভন, সুশিক্ষিত, সুবচিসম্পন্ন পরিবার নতুন কণ্ঠে শুধু আমার যাকি ছিল। শ্রীমতী গীরার সৌন্দর্য গোল্ডবর্ডস্কির অসামান্য কণ্ঠস্বরের সীমানা লক্ষ্যমান, পরি-নামস্বর, শ্রীমান রীডের স্নেহস্বর। প্রমোদপ্রসাদ—এই রাগির ত্রিভুজ-কালব্যাপী নৈশভোজের অসরটিকে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছিল। সৌন্দর্য ফিরলুম তখন রাত দেড়টা। (ক্লেমঃ)

উপন্যাসোপম গল্প-সংগ্রহ প্রভাতকুমার দত্ত

বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক একনিষ্ঠ পাঠকই উপন্যাসোপম গল্প কথার সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত। সম্প্রতি 'বড়-গল্প' কথার বিকল্পে উপন্যাসোপম গল্প কথার ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় আজকাল প্রায়ই ঘোষণা লক্ষ্য করা যায় যে অমূলক অমূলক রচনার সঙ্গে একটি কি দুটি উপন্যাসোপম গল্প প্রকাশ করা হবে। ভাবখানা যেন এই যে সম্পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাই উপন্যাসোপম গল্প দিয়ে উপন্যাসের স্বাদ মেটানো। উপন্যাসোপম গল্প কথার আমাদের শ্রুত কৈমন যেন লাগে। উপন্যাস ও গল্প এ দুটো তো আলাদা জিনিস। এ দুয়ের ধর্ম তো সম্পূর্ণ পৃথক। এদের ধর্ম পৃথক না হলে সাহিত্যের এই দুই প্রকাশ-মাধ্যম সৃষ্টি হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য বলা হতে পারে উপন্যাসোপম গল্প সেই জিনিস যেখানে গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে উপন্যাসের খানিকটা স্বাদ দেওয়া হয়। ব্যাপারটা আমরা বুঝলাম, কিন্তু প্রশ্ন এই যে সৃষ্টিতে দুই সাহিত্যরসেরই সম্মান মেলে তার সার্থকতা কতটুকু? বাংলাদেশে যে উপন্যাসোপম গল্প সম্প্রতি রচিত হচ্ছে সেগুলির সাহিত্য-মূল্য কি ধরনের?

পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্যে 'নভেল' আর 'নভেলেট' উপন্যাসের এই দুটি রূপ প্রচলিত আছে। নভেলে কাহিনীর ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ বিস্তার আর নভেলেটে বস্তুর পরিমিত। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই মূল কাঠামো হচ্ছে নভেলের। এমন অনেক কাহিনী আছে যা উপন্যাসিক নভেলের স্বাভাবিক পরিসরে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। তখন তাকে 'নভেলেট' ফর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। বাংলাদেশে নভেল আর নভেলেট দুইই লেখা হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত দিয়ে জিনিসটা বোঝানো যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' আর 'মালাগু' দুখানি গ্রন্থ তুলনা করলেই আমরা নভেল আর নভেলেটের পার্থক্য বুঝতে পারব। প্রথম গ্রন্থটি হচ্ছে নভেল আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে

নভেলেট। 'গোরা'র কাহিনীর বিরাট ব্যাপ্তি ও মৌলিকতা এমনই যে তা নভেলের আঙ্গিকে প্রকাশ করা ছাড়া গতানুগতিক নেই। কিন্তু 'মালাগু'র কাহিনীর ধাঁচ এমন যে তা দিয়ে পূর্ণ অর্থে নভেল রচিত হতে পারে না। তাই এটিকে আমরা নভেলেট বলি। মালাগু গদ্যে রচিত হলেও তার আবেদন কাব্যময় কারুণ্যে ভরা। বস্তুবোরে সঙ্গে কাব্যভাব মিশ্রিত হলে তা দিয়ে তো আর নভেলের ঘটনা সংঘাতময় কাহিনীর মৌলিক বিস্তার সম্ভব নয়। তাই 'মালাগু' নভেল হতে পারেনি। কিন্তু নভেল না হলেও কাহিনীর কাঠামো নভেলের আঙ্গিকেই রচিত। এই হোলা 'নভেল' আর 'নভেলেটের' মধ্যে পার্থক্য। আমাদের এই ব্যাখ্যা থেকে সহজভাবেই বোঝা যায় যে সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে নভেলের উদ্ভব আগে তার থেকে এসেছে নভেলেট। একটার থেকে আর একটার উৎপত্তি বলে দুয়ের মধ্যে সম্পর্কও ওত-প্রোত। নভেল সৃষ্টির সুদীর্ঘ ট্র্যাডিশন থাকলেই নভেলেট সৃষ্টি হবার পরিবেশ রচিত হয়।

বাংলাদেশে 'উপন্যাসোপম গল্প' বলে যে জিনিসটা সম্প্রতি চলছে তাকে নভেলেট বললে বোধহয় ভুল হবে। কারণ আসলে যে জিনিসটা বড়গল্প তাকেই আমরা নামফের করে বলাছি 'উপন্যাসোপম গল্প'। কিন্তু নামেই তো একটা জিনিস পরিবর্তিত হয়ে যায় না! গল্পের বিস্তৃত সংজ্ঞা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যায় যে গল্পে আমরা পাই বিস্তৃতিতে সিম্ধুর স্বাদ। গল্পে সাধারণতঃ একটা 'মুদ্র'কে নিয়ে রস সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। চরিত্রের বিভিন্নমুখী রূপকে, তার গড়ে ওঠা এবং পরিণতিকে গল্পে ফুটিয়ে তোলা একেবারে সম্ভব নয়। কারণ সে পরিসর গল্পের আঙ্গিকে পাওয়া সম্ভব নয়। এক কথায় উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণের স্থান গল্পে নেই। অন্ধকারে দেশলাই কাঠি জ্বেলো এক পলকে মূখ দেখে নেওয়ার মত গল্পে আমরা চরিত্রকে এক পলকের পরিচয় পাই। গল্পের ধর্ম যদি বজায় রাখতে হয়

তাহলে তাতে কি করে উপন্যাসের ছাপ পড়তে পারে? সে কারণে উপন্যাসোপম গল্প কথার আশ্রয়ের কাছে খানিকটা বিসদৃশ মনে হয়।

আসলে উপন্যাসোপম গল্পের প্রসঙ্গ সঙ্গে জড়িত আছে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের একটা গভীর সংকটের দিক। বর্তমানে যে উপন্যাসোপম গল্প রচিত হচ্ছে তার কারণ অনেকটা এই সংকটকে জোড়াতালি দেওয়া। বাংলাদেশে ছোট-গল্প বিস্ময়কর উৎকর্ষতা অর্জন করেছে। বাঙালী প্রতিভা ছোটগল্প সৃষ্টিতে অনবদ্য ও অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যুগান্তকারী সাহিত্য কর্ম ও বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। ছোটগল্পে প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত উচ্চ মান সাম্প্রতিককালেও মোটামুটি বজায় আছে। এখনও বাংলাদেশে যে ছোটগল্প সৃষ্টি হচ্ছে তা নিয়ে খানিকটা অন্ততঃ গর্ব বোধ করা যায় বৈকি। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ছোটগল্পের ফর্মের ক্ষেত্রে আমাদের সৃষ্টিধর্মী মানস যে রকম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তা অন্যত্র তেমন নয়। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এলে আমরা ঠিক উল্টো অবস্থা লক্ষ্য করি। একথা খুবই ঠিক যে বিষ্ণুচন্দ্র এদেশে সর্বপ্রথম প্রকৃত উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সাহিত্য সৃষ্টির ফর্ম হিসাবে উপন্যাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর রচনায়, উপস্থিত। বিষ্ণুচন্দ্র প্রবর্তিত উপন্যাসের মান পর-বর্তীকালে কোন ঔপন্যাসিক বোধহয় ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। এরপর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস—তাঁর চোখের বাসি, গোরা ইত্যাদি বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু একেবারে সাম্প্রতিককালে এলে বর্তমান উপন্যাসলেখকদের মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত উপন্যাসের টেকনিকগত সেই উচ্চ মান আর লক্ষ্য করি না। অবশ্য এর মধ্যে আমরা তারাত্মক বনফুলের উপন্যাসকে বাদ দিচ্ছি কারণ সাহিত্যের ফর্ম হিসাবে উপন্যাসের মৌলিক গুণ তাঁদের সৃষ্টিতে বর্তমান। কিন্তু সাধারণ অর্থে বাংলা উপন্যাসের জগত আজ অত্যন্ত স্তিমমান। অভিনব প্রচ্ছদপটে পিচ-বোর্ড বাঁধাই করা আড়াই-শো তিন-শো পৃষ্ঠার উপন্যাস নামধেয় ভূরিভূরি রচনা আজকাল প্রকাশিত হচ্ছে। সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশে উপন্যাসের কোন দৈন্য

নেই। তবে মানুষ পেটে না খেয়ে যদি বাইরের পোশাকের চাকচিক্য বজায় রাখে তাহলে কি বলব তার ভাল অবস্থা? চরিত্রবিশ্লেষণ মৌলিকত্ব, জীবনদর্শনের গভীরতায়, আঙ্গিকগত সৌকর্যে বাংলা উপন্যাসের দুর্বলতা আজ অতিমাত্রায় প্রকট। আড়াই-তিনশো পৃষ্ঠার প্যারিসের যে কোন কাহিনী নিয়ে কথার পর কথা গেঁথে দিলেই হোল। কয়েক ঘণ্টা অবসর সময় কাটাবার মত মনোহরণকারী কাহিনী একটা চাই। তাতেই সাধারণ পাঠকের পরিচুপ্ত। আর বিষয়, আঙ্গিক এবং ভাষার চটকদারী মারপ্যাঁচে তেমন তেমন কাহিনী দিচ্ছে পারলে তো আর কথাই নেই। কিন্তু এ করলে তো আর উপন্যাসের প্রকৃত চরিত্র বজায় থাকে না।

অনেকে হয়ত বলবেন যে বিষয়-বৈচিত্র্য এবং ভাষায় বাংলা উপন্যাস বাঙালি-রবীন্দ্রনাথের যুগ থেকে বহুদূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। আজকাল বাংলা উপন্যাসের পটভূমি শুধু বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত নয়। আন্দামান, নাগা-গাহাড়, দক্ষিণ ভারতের উপকূল, লন্ডন শহর ইত্যাদি সবই এখন বাংলা নভেলের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি কি সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসকে এক নব-সার্থকতায় মণ্ডিত করেনি? এরপর ভাষার কথা। কাব্যের এলায়িত ও পল্লবিত ভাষা উপন্যাস সৃষ্টির মোটেই উপযোগী নয়। একথা বলা হতে পারে যে বাংলা ভাষা এখন যে স্বাভাবিক অর্জন করেছে তা কি মহৎস্বচ্ছ উপন্যাস সৃষ্টিতে সহায়তা করছে না। এখানে প্রশ্ন হোল বিষয়বৈচিত্র্য ও স্বচ্ছ ভাষা উপন্যাস রচনার দুটি অঙ্গমাত্র। কেবলমাত্র এ দুটি জিনিস দিয়েই মহৎ উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে না। আসল কথা হোল উপন্যাসিকের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বোধশক্তির গভীরতা এবং চরিত্র ও ঘটনা বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। উপন্যাসিকের যদি এই ক্ষমতাগুলি না থাকে তবে শুধু বিষয়ের বৈচিত্র্য আর ভাষা দিয়ে কি হবে? বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বর্তমানে সবচেয়ে বড় অভাব হচ্ছে এই বোধশক্তির গভীরতার আর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির। এরই জন্য মহৎ বাংলা উপন্যাস হচ্ছে না। উপন্যাসের নামে আড়াইশো-তিনশো পৃষ্ঠার মধ্যে যে কথার মালা গাঁথা হচ্ছে তা না উপন্যাস না গল্প। শুধু গল্প লিখলে আর্থিক সাফল্য অর্জন করা যায় না। কারণ নিছক গল্পগ্রন্থের চেয়ে তথাকথিত উপন্যাসের ক্রেতা ও পাঠক অনেক

বেশি। প্রকৃত উপন্যাসিকের সেই পরিপূর্ণ দক্ষতা নেই অথচ সামনের লক্ষ্য আর্থিক সাফল্য। এ অবস্থায় কি ধরণের উপন্যাস সৃষ্টি হবে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। প্রকৃত উপন্যাস না লিখতে পারলে উপন্যাসোপম গল্প লেখা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। এই হচ্ছে অধুনা উপন্যাসোপম গল্প রচনার মূল কারণ। প্রকৃত উপন্যাস লিখতে অক্ষম তাই উপন্যাসোপম গল্প দিয়ে উপন্যাসের স্বাদ মেটাবার অসম্ভাবিক চেষ্টা।

সম্প্রতি বাংলা পত্র-পত্রিকায় উপন্যাস প্রকাশের একটা নতুন রীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগে ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হতো। কিন্তু এখন রেওয়াজ হয়েছে মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিশেষ করে সিনেমা পত্রিকাগুলিতে প্রতি মাসে একটি করে এবং সম্ভব হলে দুটি কি তিনটি উপন্যাস প্রকাশের। তাই লেখকদের এখন পাণ্ডুলিপি তৈরীর তাড়া আগের চেয়ে অনেক বেশী। তাঁদের যদি রাজার রাখতে হয় তবে দ্রুত উপন্যাসের কপি তৈরী করতে হবে। এই অসম্ভব তাড়াহুড়োর মধ্যে মোটামুটি চলনসই একটা বিস্মৃত কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করা যেতে পারে কি? আজকাল শারদীয়া সংখ্যায় (সিনেমা পত্রিকার) পাঁচ-ছশো পৃষ্ঠার মধ্যে অন্যান্য স্বাভাবিক রচনার সঙ্গে তিনখানি করে উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ভাবন তো এই উপন্যাসগুলো কি জাতের হতে পারে? উপন্যাসের যথার্থ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই সমস্ত রচনায় কি রক্ষিত হওয়া সম্ভব মনে করেন। আমরা তো মনে হয় সম্ভব নয়। যে কাহিনী কেবলমাত্র গল্পেরই উপযোগী তাকেই খানিকটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উপন্যাসোপম গল্প বা উপন্যাস বলা হচ্ছে। একটা সংখ্যায় উপন্যাসের পুরোকাপি ছাপতে হলে এছাড়া আর উপায়ই বা কি?

পাশ্চাত্যের 'নভেলেট'কে যদি আমরা উপন্যাসোপম গল্পের সমগোত্রীয় মনে করি তবে বিশেষ ভুল করা হবে। কারণ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। নভেল থেকে নভেলেটের সৃষ্টি। পাশ্চাত্যে নভেলের স্বল্প কাঠিন বনিয়াদ ছিল বলেই নভেলেট রচিত হয়েছে। ছোট গল্পের প্রসিদ্ধি বাংলা দেশে। আমরা শব্দ করেছি উলটো দিক থেকে। গল্পকে আমরা উপন্যাসোপম করে তুলতে চাইছি। কিন্তু তা কি সম্ভব? গল্প গল্পই এবং উপন্যাস উপন্যাসই। সার্থক উপন্যাসোপম রচনার অক্ষমতাকে ঢাকার জন্য দুয়ের মাঝামাঝি কিছু সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। বাংলা দেশে শুধু গল্প হয়-উপন্যাস হয় না একথা আমরা বলছি না। বাংলা দেশে উপন্যাস হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু মহৎ ও সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি ও পরিশ্রম স্বীকারের প্রয়োজন তাতে কার্পণ্য করলে বাংলা সাহিত্যই ফাঁকিতে পড়বে। মহা-কাব্য ও উপন্যাসকে এক পর্ষয়ে ফেলা যায় কি না সেটা অন্য কথা। তবে মহা-কাব্য রচনার মত যথার্থ মহৎ উপন্যাস সৃষ্টিতেও অনন্যসাধারণ ক্ষমতার দরকার হয়। উপন্যাসের নামে গল্পকে কৃত্রিমভাবে ফেলানো ফাঁপানো বোধ হয় বাংলা সাহিত্য ও তার পাঠকের কারুরই কোন লাভ নেই। প্রকৃত অর্থে যাতে উপন্যাস সৃষ্টির উপযোগী প্রতিভার স্ফূরণ হয় সেদিকেই আগে নজর দেওয়া উচিত। নয় কি?

সুখে স্বিষ্টান্তা ভায়ে

বোল্যাস

ফেন্স পার্ডডার

ব্যারন, কল্লোয়টিক প্রোডাক্টস, কলিকাতা

সার্ভে ড্রইং সল্যাম ও
অফিস সংক্রান্ত স্টেশনারী
ক্যাগজ রিফ্রেতা ও প্রিন্টার্স

রহস্যময় ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

কুইন স্টেশনারী স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ

৬৩ ই. রাধাবাজার স্ট্রীট - কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৪২২৩



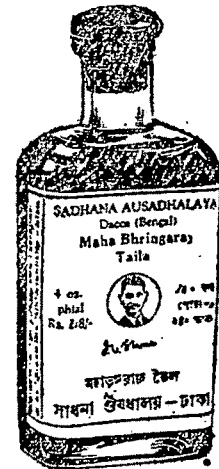
মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজনে !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভূঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই ম্লিষ্ককর ও আরামদায়ক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্বদা প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনার মহা ভূঙ্গরাজ তৈল



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদোচাৰ্য্য

অধ্যক্ষ ত্রিযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লন্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

বিদেশী গল্প

যে লোকটি নিয়ে আমি এই গল্প লিখছি তার অঢেল বিষয় সম্পত্তি। গ্রামের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। লোকটার নাম থোর্ড ওভারএস। বেশ বলিষ্ঠ তার চেহারা। একদিন গ্রামের পাদ্রীর ঘরে ঢুকে সে বললে, “আমার ছেলে হয়েছে। আপনি তাকে দয়া করে প্রথম দীক্ষা দিন।”

“কি নাম রাখবে ছেলের?”

“ফিন;—আমার বাপের নামে নাম রাখবো ছেলের।”

“কারা কারা ছেলের ধর্ম-বাবা ধর্ম-মা হবে? সে সব কিছ, ঠিক করেছো থোর্ড।”

থোর্ড কয়েকটা নাম করলে। পাদ্রী দেখল লোক হিসাবে তারা বেশ সম্ভ্রান্ত। থোর্ডের সঙ্গে সম্পর্কও আছে তাদের।

থোর্ডের দিকে তাকিয়ে পাদ্রী বললে, “আর কিছ, বলবে?”

কৃষকটি একটু সংকুচিত হল।

শেষকালে বললে, “আমি চাই.....”

“যে কোন দিন হতে পারে।” উত্তর দিল পাদ্রী।

“তাহলে আগামী শনিবারের দিন বেলা বারোটোর সময় হোক।”

“এ ছাড়া আর কিছ, বলবে?”

“না, আর কিছ, না”, এই বলে টুপি তুলে থোর্ড যাবার জন্য তৈরী হল।

পাদ্রী বললে, “আরো কিছ, আছে।” থোর্ডের কাছে গিয়ে তার দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে গভীর ভাবে তাকিয়ে পাদ্রী বললে, “ঈশ্বর করুন, এই সন্তান তোমার কল্যাণ আনুক।”

ষোলো বছর পরে থোর্ড আবার পাদ্রীর দরজার সামনে দাঁড়াল।

পাদ্রী বললে, “তোমার বয়স হয়েছে বলে বোঝাই যাচ্ছে না।” পাদ্রী থোর্ডের

চেহারার ভেতর কোন পরিবর্তন খুঁজে পেল না।

থোর্ড উত্তর দিল, “আমার দুর্ভাবনা নেই, তাই আমি বাড়িয়ে যাইনি।”

এ কথার কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে সে বললে, “এই ভর-সন্ধ্যায় কি মনে করে?”

“ভর-সন্ধ্যায় আসার কারণ আছে। আমার ছেলেকে কাল পূর্ণ দীক্ষা দিতে হবে।”

“ছেলের কল্যাণ হোক।”

“কিন্তু চার্চে কালকে যখন গিয়ে দাঁড়াবে তখন তার কত নম্বর হবে। এ কথা না জেনে আমি কিছ,তেই পুরাতন বিদায় দিতে পারবো না বলে দিলাম।”

“তার এক নম্বর হবে।”

“আমি তাই ভেবেছি। যাক দশ ডলার দেবো।”

“আর কিছ, বলবে?” পাদ্রী থোর্ডের দিকে স্থির ভাবে তাকাল।

“না, কিছ, না।”

থোর্ড চলে এল।

তার আট বছর পরে আবার পাদ্রীর ঘরের সামনে কলরব শোনা গেল। একদল

বাবা

ফিনিস্টার
ফিনিস্টার



লোক আসছে। থোড' সেই দলের নেতা। সে-ই প্রথমে ঘরে এল।

একবার দেখেই পাদ্রী থোড'কে চিনতে পারল।

“দলবল সঙ্গে নিয়ে এসেছ যে। কি ব্যাপার?”

“আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে এসেছি। আমার ছেলে গুডমন্ডের মেয়ে কারান স্টোরলিডেনকে বিয়ে করতে চায়। এই যে গুডমন্ড, আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। বিয়ে হচ্ছে এই বলে যদি দয়া করে চার্চ থেকে একটু ঘোষণা করে দেন।”

“এ ত খুব সুখবর হে! আত বড় লোকের মেয়ে!”

পিছনের দিকের চুলগুলো ঠিক করতে করতে থোড' বললে, “লোকে ত ওদের বড়লোক বলেই জানে।”

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করল পাদ্রী। তারপর কোন কথা না বলে খাতায় নামটা টুকে নিল। দলের লোকজন তারপর খাতায় সই করে দিল। থোড' টেবিলের ওপর তিন ডলার রাখল।

পাদ্রী বললে, “এক ডলার আমার প্রাপ্য।”

“তা আমি জানি। কিন্তু ওই আমার একমাত্র ছেলে। আমি তাই আপনার সেবায় কিছু না হয় দিলাম।”

পাদ্রী টাকাগুলো তুলে রাখল।

“এই নিয়ে তিনবার তুমি ছেলের জন্যে আমার কাছে এলে থোড'।”

“ওকে নিয়ে আমি জরলে পড়ে গেলাম।” কথাগুলো বলে থোড' পকেট-বইটা ঠিক করে পকেটে রেখে খাওয়ার জন্যে তৈরী হল।

দলবল থোড'ের পিছনে পিছনে হাটতে থাকলো।

দিন পনেরো পরে হুদে নৌকা করে বাপ আর ছেলে যাচ্ছিল স্টোরলিডেনের বাড়ী বিয়ের কথা পাকা করতে। হুদা তখন শান্ত নিথর।

ছেলেটা বললে, “দাঁড় বাওয়ার জায়গাটা কেমন টলমল করছে। ঠিক বসতে পারছি না।” ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে জায়গাটা ঠিকঠাক করতে লাগলো।

আর উঠতে না উঠতে পা পিছলে জলে পড়ে গেল ছেলেটা। হাত দুটো উঁচু করে একবার চিৎকার করে উঠল সে।

হাল বাড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল বাপ। চিৎকার করে বললে, “হালটা আঁকড়ে ধর।”

কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেল ছেলের।

বাপ চিৎকার করে বললে, “একটু জলের ওপর জেগে থাক রে! এই তুললাম বলে।” বাবা ছেলেটার দিকে নৌকোর মত ঘুরিয়ে নিল। ছেলে ততক্ষণে জলের তলার দিকে যাচ্ছে। বাবার দিকে দীর্ঘ দৃষ্টি রেখে টুপ করে ডুবে গেল ছেলেটি।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না থোড'। নৌকাটাকে দাঁড় করিয়ে ছেলে যেখানে ডুবে গেছে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। ও ভাবছিল ছেলেটা এখন যেন জল থেকে আবার উঠবে। ছেলে উঠল না। জলের ওপর কয়েকটা বড়বড় কাটছে। তারপর আরও কতকগুলি; তারপর বড় একটা বড়-বড় জলের ওপর উঠে শব্দ করে ফেটে গেল। তারপর হুদা স্থির হয়ে গেল। একটু পরে আয়নার মত ককঝকে হয়ে উঠল।

গ্রামের লোকেরা দেখল যে ছেলে যে জায়গায় ডুবে গেছে সেখানে বাবা তিনদিন তিন রাত্রি ধরে কেবল নৌকা বাইছে। তিনদিন রাত্রি বাবা দাঁত দিয়ে একটা দানাও কাটেনি, তিন দিন রাত্রি বাবা চোখের পলক ফেলেনি একটিবারও। শেষে বাবা ছেলের লাশ খুঁজে পেল। টেনে তুললো নৌকায়। ছেলেকে বৃকের ভিতরে নিয়ে বাবা চলে গেল পাহাড়ের ওপর তার খামারে।

সে দিনের পর আরও একটা বছর কেটে গেল। পাদ্রী তার ঘরে বসে আছে। সন্ধ্যা গাড়িয়ে রাত্রি হয়েছে। হঠাৎ খেয়াল হল পাদ্রীর কে যেন বাইরের দরজায় খিল খোলায় চেষ্টা করছে। উঠে নিজেই দরজা খুলে দিল পাদ্রী। লম্বা রোগাটে একটা লোক নমস্কার করে পাদ্রীর সামনে দাঁড়াল। তার চুলগুলো সব পেকে গেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর পাদ্রী তাকে চিনতে পারলে। এই-ই থোড'।

তার সামনে দাঁড়িয়ে পাদ্রী জিজ্ঞাসা করল, “এত রাতে কি মনে করে?”

চেয়ারে বসতে বসতে থোড' উত্তর দিল, “রাত্তির হয়ে গেছে? খেয়াল করিনি।”

বসে পড়ল পাদ্রী। থোড' কি বলে শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। দুজনের কেউ-ই কোন কথা বললো না। চুপচাপ থাকল বহুক্ষণ। শেষে থোড' বললে;

“গ্রামের গরীবদের দেবার জন্য আমি কিছু টাকাকাড়ি এনেছি। আমার ইচ্ছা আমার ছেলের নামে এই টাকার সদ্যবহার হোক।”

থোড' উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর টাকা রেখে আবার বসে পড়ল চেয়ারে। পাদ্রী টাকা গুনতে লাগলো।

“এ যে অনেক টাকা, পাদ্রী বললে।

“আজকেই আমি আমার জমিজমা বিক্রি করেছি। যা দাম পেরোছি তার অর্ধেকটা এনেছি।”

চুপ করে বসে থাকল পাদ্রী। শেষে খুব ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, “কেমন করে বায় করলে তুমি খুশী হও থোড'।”

“সে আর আমি কি বলব। আপনি যা ভাল বোঝেন তাই হবে।”

তারপর ওরা দুজন বহুক্ষণ বসে থাকল; থোড' চোখ নামিয়ে আর পাদ্রী থাকল থোড'ের দিকে চেয়ে। ধীরে ধীরে পাদ্রী বললে, “তোমার ছেলেই তোমার মৃত্তি আনল থোড'।”

“আমারও তাই মনে হয়”, উত্তর দিল থোড'। দুটোখ দিয়ে তার টপ টপ করে জল ঝরছে। অন্ত্রবাদক : রাম বসু

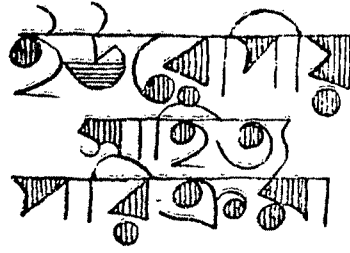
নরওয়ের সাহিত্যে ইবসেনের মত সন্মানের অধিকারী বিয়ান সেন। ১৮৩৯ সালে এঁর জন্ম হয়। কিছুদিন ক্রিস্টিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার পর ইনি নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করেন। ১৯০৩ সালে এঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এই গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। ১৯১০ সালে প্যারিসে এঁর মৃত্যু হয়।

॥ জার্মান চিন্তালোক ॥

॥ অহিংসা ও বিশ্বভোগ ॥

‘ভেল্ট’ (‘বিশ্ব’ ‘জীবন’) শব্দটি জার্মান ভাষায় যতগুণি সমস্ত পদের সৃষ্টি করেছে তাদের সংখ্যা ও চরিত্র লক্ষ্য করিলে অবাক হ’তে হয় এই ভেবে যে জার্মান চিন্তা-প্রকৃতি কতো ইরেক উপলক্ষ্যে স্বদেশের সীমানা পার হয়ে বিশ্ব-বাসে সম্মত হয়েছে। ‘বিশ্বজনীন’ বা ‘বিশ্বপ্রেম’ এর মতো কয়েকটিই যেখানে বিস্কৃতির এমতো দোড়ে বাঙালী ভাষাকে প্রায় সর্বস্বান্ত করে, (ইংরেজী ও অন্যান্য যুরোপীয় ভাষাতেও অনুরূপ অশক্তি) সেখানে জার্মান অভিধানে ঈতিমধ্যে-প্রতিষ্ট ‘বিশ্ব’-আকৃষ্ট শব্দের সংখ্যা কয়েক কুড়ি। আধুনিক ইংরেজী সমালোচনায় আকছার ব্যবহৃত জার্মান ‘ভেল্টজানশায়ণ্ড’ (ইংরেজীতে শব্দটির প্রচলন সম্ভবতঃ টি, ই, হিউমের প্রাথমিক উদ্যমের কাছে খণি), ‘বিশ্ব-বীক্ষা’-রূপে যার চলনসই বাঙালী প্রতিশব্দের সঞ্চে আমরা এখন পরিচিত, বা ‘ভেল্টগেশিখতে’ (বিশ্ব-ইতিহাস), কিম্বা ‘ভেল্টশেমেরংস’ (বিশ্ব-বিবাদ) থেকে জার্মান ভাষায় ‘বিশ্ব-চিন্ত’ (ভেল্টসসেলে), ‘বিশ্ব-লয়’ (ভেল্ট-উস্তেরগাণ্ড) এমনকি ‘বিশ্ব-ভীতি’ (অসভালত্ স্পেণ্ডলরের প্রয়োগে) পর্যন্ত সহজলভ্য শব্দ সত্য। ‘বিশ্ব-পত্রিকা’ (ভেল্টতলাত)-র কথা জার্মান সম্পাদনায়ই নশতাব্য! তার ‘বিশ্ব-শক্তি’র নামোচ্চারণ কেবল হিতলরীয় প্রগলভতারই স্মারক।

বিশ্ব-শক্তি—ভেল্টমাত্ত! রাইখস্‌তাগে মিল্টাবিষ্ট শ্রোতৃবর্গের সামনে মাইক্রো-ফোন-লীগোয়া, তীর, দুর্বিনীত একটি মূখ, আদলফ হিতলরের মূখ, ভেসে ওঠে। মূখ নয় মূখ-ব্যাদান। বস্তা মানদুষ নয়, অবতার; শ্রোতার সাধারণ সামাজিক জীব নয় এক দগল সাচা আর্থ, কুলীন শিউক জাতির সন্তান। নির্মম ভাষণে এক অঞ্জর পরন্তপের সকল রোমহর্ষের রূপরেখা ফুটে উঠছে : খোদ নর্ডিক জাতির সন্তান, মৌলিক জার্মানগণ! আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি পৃথিবীর সবটুকু তোমাদের ভেগার্থে পাবে—তোমাদের আশীর্বাদ জিজীবিষার পুরস্কার এই নব জার্মান অভুত্থান, যা কোনও একটি ভূখণ্ডের আধিপত্য নয়, আহরণ করবে সারা বিশ্ব দখলের ও ভোগের নিয়তি-সমর্পিত মহাশক্তি। বিশ্ব-শক্তি।



—সার্থবাহ—

সারা বিশ্ব একাধিপত্যের এই মন্ত্র ও তার সাধনে একটি সমগ্র জার্মান শরীরের যে-পাতন, তার জন্য কেবল একজন দুর্মেধা নায়কের ব্যক্তিগত অনাচারই দায়ী ছিল না। আর এই অনাচারের মূলসূত্রে উদ্ভিষ্ট হিসাবে যা ছিল, তাতেও আভাসিত চিন্তাপ্রণালীর কোনও জাতীয় বৈশিষ্ট্য। নিছক সাম্রাজ্য-বিস্তারের প্রায়-ন্যায় উৎকণ্ঠার সঞ্চে গুণিতক হিসাবে কোনও ভৌগোলিক স্বস্তিবোধের উপস্থিতি এই হিতলরীয় বিশ্বশক্তির মূর্তি গড়েনি। হিতলরের যে-অভিলাষ বাস-করা পৃথিবীর সমগ্র জার্মান শাসন (টেরনবীয় সংজ্ঞায় ‘পাক্স-একুমেনিকা’) পরিকল্পিত করেছিল, তার পশ্চাতে ছিল জার্মান চিন্তা-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সেই সর্বস্বাত্মক ক্ষেপ যাতে ভাবনার প্রসর ও তীক্ষ্ণতা সৃষ্ট জীবনের আদ্যন্ত কবলিত করত, প্রদেশ-মহাদেশ টপকে বিশ্বকে তার লালস আয়োজনের মধ্যে আটক করত। জার্মান চিন্তার এই প্রকৃতি নানাভাবে অনুভূত হয় আধুনিক জার্মানীর মনোরাজ্যের বেশ ক’জন প্রতিনিধির রচনায়।

অবশ্য হিতলরীয় রাজ্যদর্শ, যার পরিচিত নাম নাৎসীবাদ, এই চিন্তা-নায়কদের রচনা থেকে সরাসরি উদ্ভূত, এমতো ধারণা জন্মান কিম্বা এঁদের কার্যকে নাৎসীবাদের সমর্থক প্রতিপন্ন করা, বর্তমান প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য নয়। কারণ, সাহিত্য, দর্শন বা ইতিহাস রাষ্ট্র-চিন্তাকে যে-ভাবে প্রভাবিত করে তাকে প্রত্যক্ষ বললে রাজনীতির ভোগসত্ত্বেই প্রথমতঃ অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়। বিবর্তীয়তঃ, জার্মান চিন্তালোকের আলাটা প্রতিভূদের কাউকে সন্দেহাতীত নাৎসীরূপে আমরা এখনো জানিনি। দার্শনিক মার্তিন হাইদেগেরের মতো কাউকে নাৎসী-বাংলানোর স্বপক্ষে ব্যবহারিক যুক্তি স্বপই থাকে এখন তাঁর দর্শনে অস্তিত্ব ও সত্ত্বের দুরূহ মীমাংসায় তিনি এমনই জবরদস্তভাবে মগ্ন যে উপলব্ধির

একটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া, প্রচার কিম্বা ভোগের চক্রে নামমাত্র বিপথগমনের তোড়জোড়ও তাঁর পক্ষে অসম্ভব থেকেছে আগাগোড়া। কিম্বা, কবি স্তেফান গেরগে, যার চিন্ময় কল্পলোক হয়ত সত্যই রাজনীতির ছায়াপাতে কণ্ঠিত বিবর্ণ যেহেতু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তরুণ জার্মান কবি, হফ-মানস্‌তাল কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েও যুদ্ধ-বিরোধী ঘোষণায় স্বাক্ষর দিতে গর-রাজী হয়েছিলেন,—বলেই নাৎসী প্রমাণিত হ’ন না।

যে জার্মান চিন্তালোকে নাৎসী-বাদকে আমরা নেহাঁত আকস্মিক ও নিরাশ্রিত বলে ভাবতে অপারগ এবং উনিবংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে হিতলরীয় জার্মানীর সময় পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দীকালে যার ঐতিহাসিক পরিসর বিন্যস্ত, তার একটি প্রধান চরিত্র হাঁদ হয় সর্বস্বাত্মকতা, তবে, এও স্বীকার করতে হয় যে তার স্বভাব গঠিত হয়েছিল চিন্তময়তার উপাদানে। অন্তর্মুখী বোধ, মনসত্ত্বের খনিতে মানসিকতার চাইতে গভীর এক চিন্ত-জ্ঞান যার উৎস, এবং সেই বোধের এক আশ্চর্য সাহসিক উৎকলিত, জার্মান চিন্তাকে যেন এক নতুন ডাইমেনসন এনে দিয়েছিল। হয়ত এই অন্তর্মুখিতার আদিত সঞ্চার লক্ষ্য করতেই হয় অষ্টাদশশতকী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট-এ এনং তারই দুর্মর প্রোভের বিবিধ চলাফেরা পরখ করা সম্ভব পরবর্তী শতাব্দীতে শোপেন-হাউয়ের সসূয়ে নৈরাশ্যবাদে, বীলাসী ভাগনের সঞ্চেতে পলিফনের নান্দনিক জটিলতায় ও স্বাদেশিকতার স্বাদে, ঐতিহাসিক বৃকহাতের আত্মবিশেষী ইতিহাস-প্রজ্ঞায়, হাইনের যন্ত্রণাবোধে ও উৎপ্রাসে। এইভাবে জার্মান চিন্তার সংগঠনে ক্রমশঃ যে-একটি প্রকরণের ভাগ অব্যর্থভাবে বেশী হয়ে উঠেছিল তাঁর নাম এক-কথায় প্রকাশ্য শূন্য জার্মান ‘গাইস্ত’ শব্দটির দ্বারাই, এবং বোধহয় ফরাসী ‘এস্প্র’-তে ছাড়া এই ‘গাইস্ত’ অন্য কোনও আধুনিক ভাষার আয়ত্তাধীন শব্দ সম্পূর্ণ উপভূক্ত নয়। (বাঙালীর ‘চিন্তময়তা’, বলা বাহুল্য, ঐ ‘গাইস্ত’র এক দুর্বল অনুবাদ মাত্র।)

যে-অর্থে আধুনিক জার্মান চিন্তা-নায়কদের চরিত্র্য তাঁদের চিন্তময় বা ‘গাইস্তিক’ সপ্রমাণ করে সে অর্থে আধুনিক ইংরাজ বা এমনকি, ফরাসী চিন্তাশীলতা বহুদূরশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

আর চিন্তার আঙ্গিক হিসাবে এই জার্মান চিন্তাময়তা পশ্চিম যুরোপে এ যুগে খুব মানানসইও ঠেকেনি অনেকের কাছে। প্রসঙ্গতঃ, দার্শনিক অয়কেন-বিষয়ে টি. এস. এলিয়টের এই উনাসিক কথিকাটি : 'ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিনি এমন কেউ কম্পনা করতে পারত না অধ্যাপক অয়কেনের স্বরে সেই নিশ্চিত বখন তিনি টেবিলে থাপড়াতেন আর তাঁকতেন : ভাস্ ইস্ত্ গাইস্ত? গাইস্ত ইস্ত...!' এই রুদলফ খ্রিস্তফ অয়কেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত, হেগেলপন্থী দার্শনিক, যিনি প্রকৃতি ও বুদ্ধি এ দুয়ের কোনও একটিতে আস্থা না-রেখে দুয়ের মিলন-বিন্দুরূপে মানুষকে দেখেছিলেন, অবশ্যই সংগত উৎকণ্ঠা ভোগ করতেন তাঁর 'গাইস্ত' নিয়ে। কারণ যেনা বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে অয়কেন ছিলেন সেই বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে, যার ঐতিহ্যে বাখোফেন ও বর্কহাউজের নামের সঙ্গে স্মৃতি বা অধ্যাপক ফ্রীদরিখ নীতশের নামও। আর, চিন্তাময়তার প্রাবল্য এ যুগে নীতশের মতো আর কেউ সহ্য করেননি।

নীতশের নুষ্ঠক চিন্তার প্রভাব অয়কেনের গঠনমূলক ও মানবিক বিশ্ববীক্ষাকে অবশ্যই মন্দভাগ্য নৈতিবাদ শেখাতে পারেনি। হেগেলীয় প্রগেদনার বাহুল্য সত্ত্বেও অয়কেন গের্মানীয় চিন্তার সেই অপর স্বভাবও প্রতিফলিত করেন যার উপাদান পরিমার্জিতবোধ, সমন্বয়ঃ ও সৃষ্টিশীলতা এবং ব্যর্থ আশ্বাদ আমরা অনেক বিশশতকী জার্মান লেখকের—নামতঃ, এরিখ হেলের, কার্ল মানহাইম, এনস্ট রোবের্ত কুর্তিয়ুস ও এনস্ট কাসিররের রচনায় পাই। কিন্তু চিন্তাময় নীতশে তাঁর মানবিকতায় নিরঙ্কুশ এক অশান্তি আদৃত করে সমাধানের কাঠগড়ায় বিশৃঙ্খলভাবে হাজির করেছিলেন ঐতিহ্যপ্রিত সত্য ও মূল্যদের, যদিও বিচারকের নৈতিক ও মানবিক স্বধর্ম পর্যন্ত তাঁর মধ্যে আর টিকে ছিল না। কতকগুলি অশান্ত, অনুভবের আকাশে নিরালম্ব নীতশে, কবি ও দার্শনিক, সৃষ্ট, সভ্য জীবনের হিতাহিতে, ন্যায়ান্যয়ে, পতন-অভ্যুদয়ে উদ্ভব না হয়ে অস্তিত্বের অন্বয়ে ব্যস্তির,—প্রাঞ্জল-তম ব্যস্তির, 'অহম্'-এর স্বরূপ আঁকতে এমন কয়েকটি অপরিচিত, ঘোর রঙ ব্যবহার করলেন, যা' অন্ততঃ সাধারণ চোখে ধাঁধা লাগাল জোরালভাবে; পরিচিত স্খাস্থের বিশ্বকে—লোপাট

করল অন্যতর, জাঁকাল লাল-কালোর ঘূর্ণির মধ্যে। জীবনবোধের সর্বস্ব আক্রান্ত হ'ল নীতশীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি। একাধারে নিরীশ্বর ও অযান্ত্রিক, নীতশে এক প্রলাপী চৈতন্যের নির্দেশে যে-উদ্ভট, টিউটনিক সোহংবাদ উঁখিত করলেন, তা'তে উদ্ভাবনের চমক যেমন নিঃসন্দেহে থাকল, তেমনি থাকল না সমন্বয়ের শান্তি।

কোটি কোটি মানুষের এই বসুন্ধরা ছেড়ে চিন্তাময়তার অভ্যস্ত তপস্যা করতে তাই নীতশের স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি-আদর্শ, বসরাতুস্ট্রা, স্বার্থের কোনও ভয়ানক নৈমিষারণ্যে ঘুরে বেড়ায়। সেখানে আলাপ নেই। যুথচারিতায় নিষ্পহ, গাহ'স্থে বীতরাগী, প্রেম-নিবেদন-গ্রহণে অসমর্থ তথা নিরুৎসাহী, এক অতিআত্মসচেতন শ্রমণ যেন গোপন ঈর্ষার অজুহাতে বজ্রতায়, স্বগতোক্তি আর রূপক-বিলাসে জগৎ-সংসারের সব কিছুর নস্যং করে আপন বুদ্ধি ও হার্দ্যকে বার বার অভিনন্দিত করে। আলাপ নেই, কারণ এ এক অপর বিশ্ব। এখানে সবজালতা বস্তা সকল মানবিক শ্রোতাকে বিদায় দিয়েছে।—

‘আর বসরাতুস্ট্রা এইমতো বললেন লোকদের :

‘আমি তোমাদের উপর-মানুষ * সমন্বয় শিক্ষা দিচ্ছি। মানুষ হচ্ছে এমন কিছু যা উত্তীর্ণ হওয়া উচিত। কী করেছে তোমরা তা' উত্তীর্ণ হবার জন্য?

এতাবং সকল সত্তা সৃষ্টি করেছে এমন কিছু যা তাদের চাইতে বেশী, আর তোমরা চেয়েছ এই মহাতরঙ্গের ভাটা হ'তে এবং মানুষকে উত্তীর্ণ হবার চাইতে প্রেম মনে করেছে পশুদেহ প্রত্যাবর্তন।

* জার্মান Übermensch : প্রচলিত ইংরেজী ও বাংলা প্রাতিশব্দ যথাক্রমে 'Superman' ও 'অতিমানুষ'। কিন্তু নীতশীয় স্মারবেমেনশ'-এর অনুবাদে 'সুপারম্যান' বা 'অতিমানুষ' বোধহয় অযথার্থ। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, ওয়স্টার কাউফ-মান 'Overman' শব্দটি ব্যবহার করেন। জার্মান স্মারবেম, গ্রীক 'উপের' ও বাংলা (সংস্কৃত) 'উপরি' একই অর্থ এই অভিধায় উপর-মানুষকে নিকটতর মনে করা হয়েছে।

মানুষের কাছে বাঁদর কী? একটি উপহাসনীয় বস্তু, কিম্বা, এক স্করুণ লজ্জা। এই রকমটা হচ্ছে মানুষ উপর-মানুষের চোখে : একটি উপহাসনীয় বস্তু, কিম্বা, এক স্করুণ লজ্জা।.....উপর-মানুষ হ'ল ধরণীর চৈতন্য। তোমাদের এষণা বলে : হোক উপর-মানুষ ধরণীর চৈতন্য।” * *

সাধারণ মানুষ মক'টের মতোই তুচ্ছ! শূদ্ধ তুচ্ছ নয়, (এবং এখানেই নীতশের অমানবিক বিদ্রূপ-প্রবণতা সক্রিয়) উপহাস্যও। 'উপর-মানুষ'ের প্রস্তাবক নীতশে, যিনি আত্মপরিচয়ের উদার এক সংজ্ঞায় - 'সত্যের নওজোয়ান' ('আইন য়াঙেরদের ভাহরহাইত') বলে নিজেকে জাহির করেন, এইভাবে বিবেচনায় নৈরাজ্যে অধিষ্ঠানের ব্যবস্থা পাকা করেছিলেন। সংশয়ধর্মে প্রাথমিকভাবে দীক্ষিত নীতশে ভেবেছিলেন যে তথাকথিত সকল সত্য ও বিশ্বাস পুনর্বিচারে স্বাধীনতাই তাঁর শক্তি প্রতীতি এবং তদনুগ সার্বিক বোঁক নিয়েই জীবন-দর্শনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু এই সূরত পদ্যবীতির ব্যক্তি-চরিত্রে কোনও বিশেষ গলদ—সেক্সপীয়র-কথিত সেই 'ওয়ন ডিফেক্ট',—তাকে শূদ্ধ থেকেই শিখিয়েছিল বাহিরকে অবিশ্বাস করতে। বাহির অর্থে জীবন; নারী, পুরুষ ও কর্মের জীবন, সকলের এবং সে-সঙ্গে নীতশেরও জীবন। সেই জীবনের প্রতি অবিশ্বাস ও তৎপ্রসূত অসুখ্য নীতশেকে ক্রমশঃ ঠেলে দিয়েছিল এক মারাত্মক উন্মাদগে, সেখানে 'উপর-মানুষ'ের তামস যজ্ঞ আহুতি হ'তে হ'ল জীবন মনুষ্য-কুলের ধর্ম ও অস্তিত্বের সমগ্রক। বাস্তব থেকে সরে, একক চিন্তাকারীর শূন্য গম্বুজ থেকে নীতশে দেখলেন নীচের অমহান, উপহাস্য সাধারণকে এবং বিকৃত রূপকের সঙ্গে নিরুদ্দেশ চিন্তাময়তার যোগসাজশে গঠন করলেন নানান অসম্পূর্ণ জীবন-চিত্র। বসরাতুস্ট্রা যে-তিনটি রূপান্তরে মনুষ্যজীবন বৃত্তাবস্থ দেখেন তা'তে তাই বুদ্ধি নিরর্থক : উষর মরুভূমিতে চাপিয়ে-দেওয়া ভার বইতে সম্মত উট যেন মানবিক চিত্তের প্রথম পর্যায়; তারপর, মরুভূমির নির্জনতম অঞ্চলে ঘটে তা'র দ্বিতীয় রূপান্তর—'কর্তব্যের' ড্রাগনের সংগে লড়তে গিয়ে উৎপত্তি হয় 'ইচ্ছারূপী

** Also Sprach Zarathustra : Friedrich Nietzsche Wilhelm Goldmann Verlag. Ungekürzte Ausgabe. 1957. পৃ-১১।

সিংহের। চিরাচরিতের প্রতিরোধ ও বিরুদ্ধতা, ও নতনের অভিলাষ নিয়ে প্রলয়ংকর এই সিংহ 'নেতি-নেতি' বলে হুংকার দিলেও, তার পরিণতি তৃতীয় রূপান্তর 'শিশু'তে। কারণ 'শিশু', পরিণতি ও 'বিস্মরণ'—নীতশের এই 'শিশু' আশ্চর্যভাবে ও অসংখ্য—'হাঁ'-বলতে জানে, সে 'ইতি-জ্ঞানী' (রা-জাগেনস)। ('সরাস্বতী', পৃঃ ২১-২২)

"সৃষ্টির এই লীলাখেলায়", নীতশে বোঝেন বটে যে "প্রয়োজন আছে একটি পরিণতি 'হাঁ'-বলতে পারার", কিন্তু সেই সম্মতির জন্য নীতশেকে ভাবতে হয় অপরিণতি 'শিশু'র কথা। যেন পরিণতি-চিন্তা প্রমাণ মানুষ কেবল 'না'-ই বলতে জানে! অবশ্য এই 'না'-বলার পূর্বাঙ্গ, অভিসন্ধিই আমৃত্যু নীতশেকে চিন্তায় সজীব রেখেছিল। বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক নীতশের বুদ্ধিমান চিরন্তনতার কাব্য ও মানবিকতায় অস্বস্তি বোধ-করার চপল, উদ্দাম সেই নগ্নরূপে শূন্য নিঃশব্দে বৃষ্টিতে এক করাল অন্তিম পৌছেছিল। বীর্য, শূন্যতা, শান্তি ও সুন্দরের দ্যোতনা যে-আপজ্ঞানীয় বিশ্ব-চক্র, তার প্রতিপক্ষরূপে নীতশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সুদাস্ত, কাপুরুষ, বিলাল, দিওনাসসের অরাজক পানোৎসবকে। তার 'উপর-মানুষ' ত্যাগ ও যন্ত্রণাভোগের প্রতীক, যিশুখৃষ্টকে সহ্য করেন; নীতশে খাড়া করেছিলেন তার প্রতিযোগী খৃষ্ট-বিরোধী পুরুষ, 'দের' আন্তিখৃষ্টকে। আর, সমগ্র মানুষিক অস্তিত্বের একমাত্র ধ্রুব প্রার্থিত বলে নীতশেকে ধর্ম করতে হয়েছিল সেই দুঃশীল পরাক্রম-বাসনা—'দের' ভিলেৎসুর মাথ'কে।

এই পরাক্রম-বাসনা মূসোলিনির ফাশিবাদে সক্রমক হওয়ার দৃষ্টান্ত কেবল ফ্রান্সেই করেছিল হিটলরকে জার্মানীর অবসান ও 'তৃতীয় রাইখ'র সৃষ্টি। জনগণের প্রতিনিধিত্বে নয়, তাদের সমবায় বাসনার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজ্য-চালক, 'রাইখসফুহরর' হিতলর, একজন নিঃসংশয় 'উপর-মানুষ'। এই পরাক্রম-বাসনার ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল নাৎসী দার্শনিক আলফ্রেড রোসেনবর্কের '২০শ শতাব্দীর রূপকথা (মিথদুস)', যাতে এক গগনচুম্বী বিকার নিয়ে গ্রন্থকার 'জ্ঞান'কে বৈপত্ত্য করে বলেছিলেন 'ঘোষিত সত্য'ই (বেকেন্সটিনস) সব; আর

ইতিহাসের সামগ্রিক পুনর্নির্মাণ দাবী করেছিলেন সেই মহাপ্রমাদের আরাজ পেশ করে—যে আর্থ ও আর্থের জাতি-দের স্বন্দাই মানবোচিত্রের একমাত্র সত্ত্ব। সংগ্রাম ও ইতিহাসের এই ভাষ্য, উপর-মানুষ-জাতির চালক, নর্ডিকদের পরমপুরুষ, নব-বিধাতা, বীর হিতলরে জার্মান জীবনের সমস্ত ভার, রাজনৈতিক ও সে-সঙ্গে আত্মিকও, অর্পিত হয়েছিল।

জার্মান ভূমিতে উপর-মানুষের নির্মম মহত্ব পরিবর্ত ছিলেন বীর; আর, বীরপূজার সটিক মন্ত্র ও পুরোহিত সে-দেশে কখনই বিরল ছিল না। রিখার্ড ভাগনরের সংগীত-ধর্মের জাতীয়তাবাদ তার অপেরাগুলিতে জিগলিড, ট্রিস্তান, পারসিফাল-এর মতো বীরদের জন্ম দিয়েছিল। 'বীর' ছিল কবি স্তেফান গেয়র্গের অশান্ত আধ্যাত্ম বৈদ্যৎ অক্ষরে লিখিত এক শান্তির বিজ্ঞাপন। প্রায় জ্যোতির্গণনার স্বচ্ছতায় 'আকাশিক অভ্যুত্থান' ও 'জয়ের তোরণাভিমুখে যাত্রা'র সামরিক স্বপ্ন গেয়র্গেতে অনায়াসলব্ধ ছিল। যে- 'চিন্তাময় রাষ্ট্র' (দাস গাইসারিগে রাইখ)-এর প্রস্তাবনা গেয়র্গে করেছিলেন, তা' কোনও এক বাঙালী কবির আকাশিকত 'নির্বিকার স্বপ্নের নিভুতে' পাতা 'যৌব-রাজ্য' থেকে অনেক ভিন্নরূপ ছিল, তার জন্য গেয়র্গে সচেতনভাবে বীরদের—এবং মৌলিক জার্মান চণ্ডে 'বিশ্ব'-বিশেষিত সেই নৃসিংহদের,—নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপালনে! গেয়র্গের সেই 'বিশ্ব-প্রভুদের' (হেরন দেস ভেল্ড) একজনই ছিলেন কি-না আদলফ হিতলর এ প্রশ্নও নেহাত অবান্তর নয়।

জার্মান চিন্তায় সর্বস্বাত্মকতার দৌরাণ্য নীতি-ইতির উভয়েই দারুণ হয়ে ওঠে। শোপেনহাওয়ার-আদিষ্ট 'এষণা ও ধারণার' বিশ্ব যদি বা বাপসা, নীতশেতে তার পরিণতি 'পরাক্রম-বাসনায়' স্পষ্টতর। ভাগনরের বীর-গণ, কিম্বা, গেয়র্গের আধ্যাত্মিক-অধিরাজরা মানুষিক অস্তিত্বের এক সার্বিক সংজ্ঞার চক্রান্ত মেনে নেন, যেমন নের রোসেনবর্কের বিশশতকী 'মিথদুস'-এর প্রাণঘাতী রূপকথা। উপর-মানুষ, বীর, বর্লৈবণা, ঘোষিতসত্য ইত্যাদি মূল্যেরা যদি কোনও নৈরাজ্যের ভগ্নাবৃত 'ধারণা'ই হয়ে থাকে, তবে হিতলরের 'অটিকা-বাহিনী', আউশভিৎস ও বুখেনভান্ডের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-

গুলি, 'বিশ্ব-শক্তি' ও 'নর্ডিক জাতি' নিশ্চয়ই তাদের ইতিপ্রধান অনুবাদ। আর এমন কোনও তাজব সোনায় গঠিত হয়েছিল সেই 'ইতি' যাতে ন্যায়ান্যায়ের প্রশ্ন সামান্য কালিমাও মাখাত না। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নরক তার প্রবেশ-দ্বারে খোদাই করে রেখেছিল : 'ন্যায় অথবা অনায়া। আমার পিতৃভূমি' *

দর্শন ও বিশ্ববীক্ষার মধ্যে টি, ই, হিউম-নির্দেশিত তফাতিটির কথা মনে রেখে, আধুনিক জার্মান চিন্তানায়কদের প্রায় সকলেই অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ সেই 'বিশ্ববীক্ষা'রই রচয়িতা, যাতে জ্ঞানের সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। দর্শন-রচনার চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ও মারাত্মক এক বিশ্ববীক্ষা-প্রণয়নে ক্রিয়াশীল তাদের চিন্তের সার্বিক ক্ষুধাপিপাসা। সিস্টেমের স্বজন্মায় অসহিষ্ণু না হয়ে উপায় থাকে না এ-ধরণের সর্বস্বাত্মক

* Buchenwald: Docteur George Roos, Editions Medecis, Paris, 1945.

বিশুদ্ধ গাছনা
আপনারো: আধুনিকতার
আচরণ সুপারিও

ফোন: ৪০-৬৪৫৭
মিস্ট্র নিপুণ

কপায়ন ডুয়েল্যাস
২৬৪, ডায়মণ্ড হারবার রোড, বেহালা (খালার প্রস্থান)

ত্বকের পরিপূর্ণ
স্বাস্থ্যের জন্য
নিকো
আসল জীবাণুনাশক সাবান

THE ORIGINAL
Germicidal
Soap
Contains the most effective germicides
PARKE DAVIS
LONDON
SATA NALA BOMBEY 70

এটি পার্কে-ডেভিসের তৈরী
NAS-8D-55/62

বিশ্ববীক্ষা-প্রণেতাদের। যেন কোনও অপ্রত্যাশিত ও প্রলয়ঙ্কর সংবাদে পরিবেশক হয়েই এরা বোধের জগতকে নাড়া দিতে চান। মনে পড়ে জিগমুন্ড ফ্রয়দের একটি গ্রন্থে ব্যবহৃত সেই লাতিন শীর্ষ-ফলকের খবরদারী : 'যদি দেবতাদের ওপর প্রভাব খাটতে অশক্ত হই, তবে জাগাব পাতাল।' প্রসঙ্গতঃ ফ্রয়দের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তায়ও কি বিশ্ববীক্ষার চমক, প্রচণ্ডতা ও ব্যাপ্তি বিবৃত নয়? ফ্রয়দীয় চিন্তার কোনও রাজনৈতিক যোগসূত্র আবিষ্কার করা যদি বা পণ্ডিত্রম, তবু এটুকু মানতেই হয় যে প্রাণশক্তির উৎসরূপে অবচেতন 'ইদ'-এর প্রাথমিক স্বেচছারকে স্বীকার করে ফ্রয়দ তথাকথিত মনুষ্যত্বের পবিত্র দাত্যকে বেকসুর নস্য্য করেছিলেন। মানুষের স্বভাবে মৌলিক ও অব্যর্থ উপাদান হিসাবে নির্বিরোধ ষড় রিপদ-দেরই উপস্থিত দেখে ফ্রয়দ সৃষ্টিকার্যে ঐশ্বরিক সহৃদয়তাকেও প্রশ্নাধীন, ক্ষেত্রিকরী প্রকৃতির আচরণকেও অবি-শ্বস্ত বাৎশেছিলেন। 'মারমুখী ও আক্রমণশীল' মানুষ তার স্বাভাবিক প্রচণ্ডতায় হয়ে কি প্রেয়, সে-মীমাংসার সিদ্ধি ফ্রয়দে কতোখানি ছিল বা না-ছিল এ প্রশ্ন উপেক্ষণীয়, কারণ ঐ দুরা-চারী অবচেতনের সন্তোষঘটনের কতবোই ফ্রয়দীয় শাস্ত্রের মৌল প্রতিজ্ঞা নির্ণীত।

ফ্রয়দীয় মনোবিদ্যার 'ইদ'-ভাবনা জার্মান চিন্তার সর্বস্বাত্মক শক্তি অবশ্যই বহন করে। বসন, আভরণ, রং ও মাটির পরিণত ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে কাঠামোর তুচ্ছ তবু বিপজ্জনক খড়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রতিমা-দর্শনকারীর যে-অপকার করা হয়, ফ্রয়দ কতকটা সেই রকম করেছিলেন বিশশতকী জীবন-বোধের ক্ষেত্রে। অন্তরালে খড়ের গ্রীহীনতা, দহন, দাহন, ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত যেন দর্শককে কেবল নান্দনিক অর্থেই বঞ্চিত করে না, নন্দনের পর্বেই তাকে সন্ধি-বানিয়ে বাড়তি এক বিবিম্বায় ভোগায় পূজা-পার্বনের অঙ্গনে অঙ্গনে, তেমনি জীবনোপভোগের মহাক্ষেত্রে ফ্রয়দীয় 'ইদ'-এর প্রজ্ঞা অবশ্যই কিছু পরিমাণে অনিশ্চকারীও। কিন্তু ফ্রয়দীয় বিশ্ববীক্ষার পরোক্ষ লাভ-লোকসানের তত্ত্ব খতিয়ে-দেখার যথার্থ স্বল্পই মনে হয় যখন এ-যুগের আরেক জার্মান মনীষী, অসভালত স্পেণ্ডলরের মৌলিক বিশ্বসমীক্ষার উপসংহার প্রচ-লিত, ঐতিহাসিক জীবনোপভোগের স্রোতকে আটক করে তার কালান্তক উপপাদ্যগুলি শোনায় তীব্রতর, যদ্যপি ভিন্নমুখী, এক প্রত্যয় নিয়ে।

গের্মানীয় চিন্তনের সর্বস্বাত্মক প্রকৃতি স্পেণ্ডলর-বিবৃত যুরোপীয় অবক্ষয়ের বৃত্তান্তে ঐতিহাসিকতার বর্ণে নগ্ন ও জোরাল। যদিও স্পেণ্ডলর তার সুবিখ্যাত

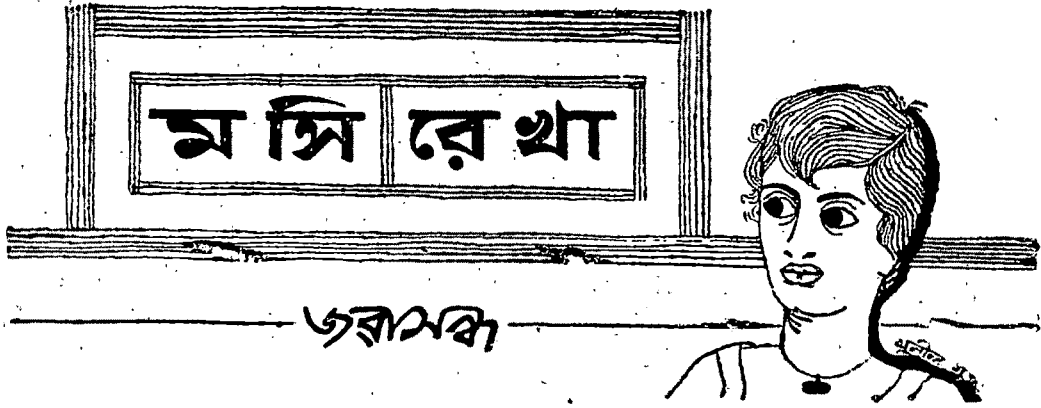
গ্রন্থ 'প্রতীচীর অধঃপতন' (দৈব উত্তের-গাও দেস আবেন্দলান্ডেস' : ইঃ 'দ ডিরাইন-অব দি ওয়েস্ট')-এ তার ঐতি-হাসিক দৌড়ের সীমা-রক্ষায় গোড়া থেকেই সজাগ (যুরোপ মহাদেশ পেরিয়ে বিশ্বগ্রাসী হবে না স্পেণ্ডলরের ইতিহাস-চেতনা), তবু স্পেণ্ডলরের অনুসন্ধান, পর্য্যালোচনায় ও সিদ্ধান্তে অন্তর্নিহিত এমন এক নিশ্চিতর প্রতিধ্বনি, যা অব-ধারণের পটভূমি হিসাবে নিয়েছে কোনও মানুষিক সর্বস্ব। বস্তু-সত্তা ('দিওলিখ-কাইত') স্পেণ্ডলরকে আকৃষ্ট করে যদি বা, তার ঐতিহাসিকতায় এক গুরুতর ভাব-বাদী একদেশদর্শিতা তাকে ঢালোয়া ধুংস ও রক্ষার ইতিতে উলসিত করে। অসাধারণ পাণ্ডিত্যে চমকপ্রদভাবে প্রাজ্ঞ, স্পেণ্ডলর গ্রীক ও রোমক ঐতি-হাসিকদের কৃপমণ্ডকতা ও সে-সঙ্গে ক্লাসিকল কৃষ্টির ফাঁকি, কিম্বা আধুনিক গণিতশাস্ত্রের কক্ষচ্যুত জটিলতা উপলব্ধ করেন। কিন্তু দৃষ্টিত ও আপাতসম্পন্ন এক বস্তুবাদের দিশান্ত তিনি ইতিহাস-অর্থেই পড়েন 'সংগ্রাম'। স্পেণ্ডলরের ভাষা চলন্ত ইতিহাস কেবলমাত্র যুদ্-ধানই, আর তার সেই সত্ত্বের বিনাশ, যা কোনও অপাপবিম্ব, স্তম্ভ 'অস্তিত্বের' জন্ম সম্ভব করে, ইতিহাসকেও নিঃশেষ করে দেয়। গঠিত রাষ্ট্রের শান্তি-ইতি-হাসের জীবনাবসান। স্পেণ্ডলর বলেন, কৃষ্টি তার আধ্যাত্মিক রসদের অভাবে সঞ্চিত হয়ে যখন হিমাক্ষ স্পর্শ করে, তখন প্রসারের তাগিদ; একমুহুরে প্রসারেই তখন তার প্রাণশক্তি দূর্গত হাদিশ। ইতিহাসের নামে স্পেণ্ডলর এই বিপন্ন বিস্তৃতিকে সংগত বিবেচনা করেন রাষ্ট্রের পক্ষে। ভৌগোলিক-রাজনৈতিক প্রসারে, অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহে, ইতিহাস তথা সভ্য-তার মানরক্ষা তখন মানুষের নৈতিক স্বাধিকার। ইতিহাস 'রোমক কাইজার-গণের জয়লিপ্সায় রক্তাক্ত, শান্তিহীন যেন সর্বকালেই। বিরল সেই শান্তির অধ্যায়-গুলি যখন ইতিহাস-সত্ত্ব নিঃশেষিত হয়েছে আহবান নির্বাচিত হওয়ার পরই; রাষ্ট্রের গঠনকার্যে নেই পরিবর্তন, পরিবর্তনের অবসর আর মানুষ 'নির্বর্তী' ধার্মিকতায়' বিশ্বশান্তির অনুশাসন মেনে নিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে কীর্তিমান সৈন্য রেজিমেন্টকে অভিনন্দিত করতে স্পেণ্ডলর পশ্চিম, কারণ আধুনিক যুরোপ তার মুমূর্ষু কৃষ্টির বিকীরণে দেশান্তর খুঁজবে, রাজ্যবিস্তার অনিবার্য কুরবে স্পেণ্ডলরীয় ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই। নাৎসীবাদ থেকে অনেক দূরে, এক বিপন্ন ঐতিহাসিকের সংগতি নিয়ে সত্যদ্রষ্টার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ছিলেন স্পেণ্ডলর, কিন্তু একথাও ভাবহয় অর্ধস্বীকার যে ঐ দূরস্থ রক্ষা-করার দায়িত্ব একদল অধোমান, রাজনৈতিক দৃষ্টকারীদের ছিল না।

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী লিখিত

অনুদ্য আধ্যাত্মিক গ্রন্থরাজী।

- ১। নীলকণ্ঠ—গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের 'জীবন সন্ধ্যা ও সিঁধের মৃতপ্রতীক ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর মহাজীবন। এই গ্রন্থে পারমাথিক বিষয়বস্তু আজিকার দুর্বল, বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট বাঙালীকে সংপথের নির্দেশ দিবে। ১ম ও ২য় খণ্ড। প্রতিটি ৬.০০
- ২। পারের কড়ি—প্রাবলীর মাধ্যমে সদগুরু বিজয়কৃষ্ণ-কুলদানন্দের অপূর্ব সাধন সূক্তত। ৩.৫০
- ৩। যোগিরাজ কুলদানন্দ—পরিব্রাতা বিজয়কৃষ্ণের মানস-দুলালের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী। ৩য় সংস্করণ ৪.০০
- ৪। সদগুরু মহিমা—শ্রীশ্রীসদগুরু সত্বের সারকথা ও ৫। Saint Bijoykrishna (ইংরাজী)—বিজয়কৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী— ১.০০
- ৬। Jogiraj Kuladananda (ইংরাজী)—অলৌকিক কার্যাবলী। ৩.৫০
- ৭। Gospel from Sadgurusanga—(ইংরাজী) শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গের সারকথা ২.০০
- ৮। ভগবান বিজয়কৃষ্ণ—অপূর্ব নাট্যজীবনী ৩.০০
- ৯। সৎগুর মুখপত্র বিবর্তন—বার্ষিক— ৪.০০

সদগুরু সাধন সঙ্ঘ—৬০, সিমলা স্ট্রীট, কলিঃ ৬। ফোন : ৫৫-২৮৮১



[উপন্যাস]

(গুরু প্রকাশিতের পর)

আশুদেবের উঠবার তাড়া ছিল না। এতক্ষণ এক কোণে বসে সব নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিলেন এবং গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন তাঁদের কথাবার্তা। এবার এগিয়ে এসে কুণ্ডার সঙ্গে বললেন, আমাকে কী কাজ দিচ্ছেন?

পরিচর্যা আগেই হয়েছিল। মৈত্র লঘু সুরে বললেন, 'আপনি যা করছেন মশাই তার চেয়ে শক্ত কাজ আর কী আছে? একপালি গেছো বাদর ধরে রেখেছে গবমেস্ট। আপনারা তাদের ন্যাজ খসিয়ে মানুষ বানাবার চেষ্টা করছেন।' বলে উচ্চ-রোলে হেসে উঠলেন। তারপর মিনিট-খানেক কী ভেবে নিয়ে একেবারে অন্য সুরে বললেন, কিন্তু মানুষ হচ্ছে কি?

—জানি না। আমরা শুধু চাকরি করে যাচ্ছি, এই পর্যন্ত।

—তা'ছাড়া আর কীই বা করতে পারেন আপনারা?' তার পরের ভাবনা বাদের, তারা ভাবেনা। সরকারী দপ্তরে ঐ জিনিসটার বড় অভাব। সব আছে, নেই শুধু 'ইমজিনেশন'। আমি নিজেই তার সাক্ষী।

বর্তালের নীতি, পদ্ধতি এবং দৈনন্দিন কর্মসূচী নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হল আশুদেবকে। তাঁর নিজের মনে যে-সব কথা বহুদিন থেকে আনাগোনা করছিল, সাহেবের সঙ্গে মাঝে মাঝে যে-সব আলোচনা হয়ে থাকে, তারও কিছু কিছু তিনি এই প্রসঙ্গে খুলে বললেন। শুনবার পর মৈত্র বললেন, ছেলেগুলোয় সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। সময় পলে মাঝে মাঝে আসবেন। আরো শুনবো।

সেই থেকে শুরুর। তারপর সুযোগ পেলেই একদিনের ছুটি নিয়ে এখানটা একবার ঘুরে যেতেন আশুদেব। মৈত্র-মশায়ের এই প্রাণখোলা লোকটিকে ভাল লেগেছিল। অন্য অনেকের মত আশুদেবও ও'কে মনে মনে 'গুরুদেব' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর ফরমাস মত দু-একটা ছোট-খাট কাজ করে দিয়ে তৃপ্ত পেতেন। কিন্তু বেশী বা ভারী কাজের ভার মৈত্র ও'কে দিতেন না। বলতেন, 'তোমার তো দশটা পাঁচটার কলমপেশা নয়, তুমি চরিত্র গল্টার চাকর। করবে কখন?' কিন্তু কিছু একটা না দিতে পারলে আশুদেবের মনে স্বেচ্ছা ছিল না। তাই কাজ বা 'সার্ভিস' এর বদলে দিতেন অর্থ। সামান্য উপার্জনের একটা মোটা অংশ চলে যেত গুরুদেবের আশ্রমে। প্রথম দিকে তিনি মাঝে মাঝে আপত্তি জানাতেন, কিন্তু আশুদেব দুঃখ পান বলে ইমানিং হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, তুমি এখন যা করছ, কর। সরকার বোদিন ছুটি দেবেন, ততদিন যদি বেঁচে থাকি, এসো। ভেবে দেখা যাবে, কী করা যায়। আর একটা কাজ করতে পারবে? তোমাদের ওখান থেকে যে ছেলেগুলো বেরিয়ে যায়, যতটা পার, তাদের সঙ্গে যোগ রাখবার চেষ্টা করো।

আশুদেব, আশ্রমে যতবার এসেছেন খালি হাতে। বেশ কিছুদিন থেকে আশুদেবের বাড়িতে ওঠা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সোজা এখানেই উঠতেন। সকালে এসে সন্ধ্যার দিকে চলে যেতেন, জিনিসপত্রের দরকার হত না। আজ তাঁর সঙ্গে একটা ছোট তোরঙ্গ আর সতরঞ্চি জড়ানো হালকা বিছানা দেখে মৈত্রমশায়

বলে উঠলেন, কী ব্যাপার? জেল থেকে খালস পেলো?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ, বলে আশুদেব গুরুদেবের পায়ের ধুলো নিলেন।

—বাঁচালে বাপু। এখানকার রান্না-ডিপার্টমেন্ট নিয়ে বড় বিরত হয়ে পড়েছি। মধু অবিশ্যি আছে, কিন্তু একজন পাকাপোষ ম্যানেজার দরকার। প্রায়ই লোকজন থাকে। তা তোমাকে পেয়ে বর্তে গেলাম। হাজার হলেও সমঝদার লোক!... বলে হেসে উঠলেন।

আশুদেবের ভোজনানুসঙ্গ এখানেও রান্না হয়ে গিয়েছিল। তারই প্রতি গুরুদেব এই সন্দেশ ইঙ্গিতে তিনি সলজ্জ মুখে বললেন, রান্নাঘরের আসল জিনিসের ওপর আমার আকর্ষণ আছে। কিন্তু তার খবরদারির বিদ্যোটা তো শিখিনি।

—এবার বাধ্য হয়ে শিখবে। তা না হলে নিজেরাই ঠকবে। আমারও কিঞ্চৎ স্বার্থ আছে। বড়ো বয়সে একটু ভাল-মন্দের সোভ কার না হয়?

আশুদেব জানেন, এটা গুরুদেব অতিভাষণ। আহার সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সংযমী এবং সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। এদিকে যে আয়োজনই হোক, অনেকদিনের পুরনো বন্ধ সনাতন ইকমিক-কুকারটি ছাড়া অন্য কারো রান্না তাঁর রোচে না। সে ব্যবস্টার্টকুও তিনি নিজের হাতে করে নেন, মধুকে বা অন্য কাউকে হাত লাগাতে দেন না। ছোঁয়া-মেলার বাধা কিছু নেই। এইটাই তাঁর নীতি ও অভ্যাস। অবশ্য এ নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে ছাড়েন না। ইকমিকের নামমাত্র উপকরণ দিয়ে নিজের সামান্য প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে মাঝে মাঝে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দেন। ছুটির দিনের দুপুর বেলা কজন শিশু মিলে

সেদিন হয়তো একটু বিশেষ আয়োজন করেছেন। গরুর ছদ্ম বিস্ময়ের সুরে বলে ওঠেন, ঈস, করেছ কি! এ যে রীতিমত 'ফিস্টি'। তা, আমাকে তো একবার ডাকলে না, বাপু।

ওঁদের ভিতর থেকে কেউ পাল্টা পরিহাস করেন, আপনাকে ডেকে কী লাভ হত? অরসিকের রসস্য নিবেদনম্।

মৈত্রমশাই মুখে যাই বলুন, তাঁর রন্ধন-ডিপার্টমেন্টের তার নৈবার জন্য আশুবাবুকে যে আসতে বলেননি, সেটা কদিন পরেই বোঝা গেল। সম্ভার পর বর্তাল সম্বন্ধে কথা পাড়লেন এবং সেই প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন, ওখান থেকে বেরোবার পর ছেলেগুলো সব যায় কোথায়?



“এ যে রীতিমত 'ফিস্টি'।”

—আহা! একবার পরখ করেও তো দেখতে পারতে সত্যিই অরসিক কিনা। থাক, তোমরা খাও, আমি আর নজর দিতে চাই না... বলে হাসতে হাসতে নিজের ঘরে চলে যান। কখনো বা দরজার সামনে বসে ওঁদের খাওয়া দেখেন এবং এর ওর সম্বন্ধে নানারকম সরস মন্তব্য করে ভোজনের আসন্ন জন্মেরে তোলেন।

আশুবাবু বললেন, কেউ কেউ বাড়ি ফিরে যান।

—সে আর কজন? বেশীর ভাগই তো বাপ-তাড়ানো মা-খেদানো। অনেকে বোধ হয় সে সব বালাই জন্মাবার পরেই চুকিয়ে ফেলেছে। তাদের নিয়ে তোমরা কী কর?

—তাদের জন্যে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। নামমাত্র একটা 'আফটার-

কেয়ার'এর আশ্তানা আছে। সেখানে কিছুদিন থাকতে পার।

—তারপর?

—তারপর আর কী? যেখানে খেঁশি চলে যায়। অবিশ্যি ওঁরা কিছুটা চেষ্টা করেন, যদি কোনো কাজ-কর্ম জুটিয়ে দেওয়া যায়।

—কাজ-কর্ম শেখবার বহর যা শূন্যমাত্র তোমার কাছে, বিশেষ কিছু জোটে বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া, ঐ বয়সের একটা ছেলে কি কাজই বা করতে পারে যদি না তাকে, আরো খানিকটা এগিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকে? সে রকম কিছু আছে কি? ইংরেজিতে বাকে বলে ফলো-আপ্ কৌস্।

—আজ্ঞে না, সে সব কোনো ব্যবস্থা নেই।

—তার মানে সোজা কথা—বাও বাবা, চরে খাওগে।

আশুবাবু জবাব দিলেন না, দেবার মত কিছু পেলেন না। এ দিকটা তিনিও ভেবেছেন। সরকারী ভাষা অনুসারে যারা কৈশোরেই অ্যান্টি-সোস্যাল-এর দলে চলে গেছে, কটা বছর আটকে রেখে একটু ড্রিল, দু-পাতা 'অজ-আম', আর তার সঙ্গে গোটা কয়েক পেরেক ঠোকা কিংবা বার দুই মাকু চালানোর মহড়া দিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিলেই কি তাদের সমাজ-বিরোধী প্রবৃত্তির পুরো চিকিৎসা হয়ে গেল? এখানেই সরকারের সব দায়িত্ব শেষ? বর্তাল স্কুলস্ অ্যাক্টে যাদের সাজা, অর্থাৎ কুড়ি একশ বছরে যারা বেরিয়ে যান, তাদের তবু ডান হাত বাঁ হাত জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু ঐ ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রুপের ছেলেগুলো? বোল বছর হতেই এক একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়, সে যেন বিশ্বাস করতেই চান না, আজ থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে থালা সাজিয়ে কেউ তাকে খেতে ডাকবে না, গানের জামা, পরনের প্যান্ট ছিঁড়ে গেলে ধমক দিয়ে বলবে না, গুদামে গিয়ে বদলে নিয়ে আয়। দোতলার হলঘরে তার ছোট্ট বিছানাটি, যার প্রতিটি দিক সে এত-গুলো বছর নিজের বলে জেনে এলো, কম্বল দুখানা কত যত্ন পাট করে, তার উপরে নিজের হাতে কাটা ধবধবে ওয়াড় পরানো বালিসটি সাজিয়ে রেখেছে, সব ঐ পড়ে রইল। 'আমাদের স্কুল', 'আমাদের গ্রীণ হাউস' বলে বাকে জানত, এই মুহূর্তে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ

হয়ে গেল! এবার কোথায় যাবে সে, কে দটো খেতে দেবে, রাশিয়র অশ্বকারে কোনখানে জুটবে একটু মাথা গুঁজবার ঠাই?

খালসের দিন ছ আনা পরস্যা মাত্র সম্বল করে সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে, বর্ডালের থাকী পোষাকে নয়, দীর্ঘ দিন আগে নিয়ে আসা নিজের সেই জীর্ণ মালিন জামাকাপড়টুকু কোনো রকমে জড়িয়ে এই সব ছেলে যখন ফ্যালা ফ্যালা চোখে তাকাতো তাকাতো গেট পেরিয়ে অজানা পথে পা দিয়েছে, তাদের মূখের উপর এই প্রশ্নগুলো স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন আশুবাবু। নিঃশব্দে সরে গেছেন সেখান থেকে। যদি কেউ মূখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে বসে, কী উত্তর দেবেন তিনি? এর কোনো সমাধান তাঁর জানা নেই।

আজ সেই বর্ডাল ছেড়ে দূরে চলে এসেও সেই মূখগুলো চোখের উপর ভেসে উঠছিল। একটু অনমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। গুরুদর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ চমক ভাঙল। মৈরমশাই বলছিলেন, তোমার কথায় যন্দুর বুদ্ধলাম, ওখানে যে-সব ট্রেড তোমরা শেখাতে, তার মধ্যে প্রেস্ আর বুক বাইন্ডিং—ভদ্রমহরের ছেলেদের পক্ষে এই দুটোই যাহোক একটু কাজে লাগবার মত। তাছাড়া এগুলো মোটামুটি শিখতে খুব বেশী সময় লাগে না। শিখতে পারলে মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থাও হয়। কী বল?

আশুবাবু সায় দিলেন এবং বললেন, বর্ডাল থেকে বেরিয়ে যাবার পর অনেক ছেলে আমাকে চিঠিপত্র লেখে। আপনি বলবার পর আমিও যতদূর পারি তাদের সঙ্গে যোগ রেখেছি। তার থেকে দেখছি, ঐ দুটো সেকশনে যারা ছিল, তাদের মধ্যে দু'একজন ছোটখাটো প্রেস-এ ঢুকতে পেরেছে। বাকী 'কামান'এর ছেলেগুলো কোথাও পান্ডা পাচ্ছে না।

—কেমন করে পাবে? সেখান থেকে যে বিদ্যে তারা নিয়ে গেছে, তা দিয়ে কিছুই হয় না। যাক, তুমি এক কাজ কর। কোলকাতার গিন্নে ছোটখাটো রাস্তার অর্ধ ভাড়ায় একটা বাড়ি ঠিক করে একটি ছোট প্রেস্ খুলে দাও। তার সঙ্গে বই বাঁধাই। দু'একজন ট্রেড লোক রাখা, আর তোমার পুরনো মক্কেল যতগুলো জোটতে পার, নিয়ে এসো। বাঁদরগুলোর একটা হিরো হোক।

আশুবাবু নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। বর্ডাল প্রসঙ্গে গুরুদর সঙ্গে কদিন থেকেই তার নানা আলোচনা চলছিল। কিন্তু এরকম একটা পরিকল্পনা তিনি মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন, অন্ত্যমান পর্যন্ত করতে পারেননি। শিষ্যের অভিভূত দৃষ্টির দিকে চেয়ে মৈর বললেন, কী ভাবছ? পারবে না?

—আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদ থাকলে কেন পারবো না? ভাবছিলাম—

—টাকা পরস্যা কোথেকে আসবে! সেজন্যে আটকাবে না। আজ পর্যন্ত তুমিও তো কম টাকা দাওনি।

আশুবাবু প্রতিবাদস্বরূপ সবিনয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় জেলেপাড়া থেকে কোঅপারেটিভ ব্যাংকের কজন মেম্বর সোরগোল করতে করতে এসে পড়ল। মৈর বললেন, এখন আর কথা হবে না। এ সম্বন্ধে যতখানি খোঁজ খবর নেওয়া দরকার, আগেই সেরে রেখেছি। খরচপত্রের খসড়াও মোটামুটি তৈরী। তোমার সঙ্গে বসে ফিনিশিং টাচটুকু দিতে শুধু বাকী। তার আগে বাড়িটা ঠিক করা দরকার। তুমি বরং কাল সকালেই চলে যাও। আমার কাছেও খান দুই বাড়ির খবর আছে। ঠিকানা দিয়ে দেবো।

বাড়ি পেতে দেরি হল না। শুধু বাড়ি নয়, তার সঙ্গে একটি ছোট প্রেস্। মালিক হঠাৎ দ্বারা যেতে তার ছেলেরা আর চালাতে চাইল না। একেবারে তৈরী জিনিস; সূর্যবধা দরেই পাওয়া গেল। নীচেটার মন্ত্রপারিত, আফিস, পেছন দিকে রান্না-খাওয়া স্নানাদির ব্যবস্থাও আছে। উপরে খান তিনেক ঘর। তার মধ্যে সব চেয়ে ছোট কামরাটি নিলেন আশুবাবু, বাকী দুটোতে তার পুরনো ছাত্রদের আস্তানা। একটি একটি করে সাত আট-জন এসে জুটল, কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে যারা বেরিয়ে গেছে বর্ডালের প্রেস্ এবং বুক বাইন্ডিং সেকশন থেকে। সবাই বেকার নয়, কেউ অন্য ছাপাখানার কাজ করছিল, কেউ ঢুকেছিল মাদ্রী দোকানে এবং পাইস হোটেলের 'বয়'এর কাজে। ছেড়ে দিয়ে চলে এল সেকেন্ড স্যারের প্রেস্-এ। কথটা কানে যেতেই আশুবাবু কষে বকুনি দিলেন, দূর হতভাগা, সেকেন্ড স্যারের প্রেস কি রে!

তোদের প্রেস; তোরাই এর মালিক, আমি তোদের ম্যানেজার। ওরা তো অবাক! 'বা-রে, আমরা আবার মালিক হলাম কেমন করে? মিছিমিছি মালিক বৃথা?'—বলে উঠল একজন। সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল।

—'মোটাই মিছিমিছি নয়,' মাথা নেড়ে বললেন আশুবাবু। 'সব টাকাটা তোদের ধার দিয়েছেন গুরুদেব। আস্তে আস্তে শোধ দিতে হবে।'

ছেলেদের মূখ শুকিয়ে গেল। এত টাকা তারা শোধ দেবে কেমন করে! আশুবাবু বললেন, 'গতর খেটে। মাইনে পাবি তো? তারই খানিকটা দিয়ে মাসে মাসে শেয়ার কেনা হবে প্রত্যেকের নামে নামে। লাভ যেটা হবে, তার থেকে ধারের কিস্তি মিটিয়ে বাকীটা তোদের নামে জমা হতে থাকবে। সমস্ত প্যাকাপার্কি বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন গুরুদেব।

ছেলেগুলো মূখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এসব শব্দ শব্দ কথ্য তারা জীবনে কোনোদিন শোনেনি। বুদ্ধিতেও পারল না একবন্দু। তার জন্যে কোনো দৃশ্চিন্তাও দেখা গেল না। 'সেকেন্ড স্যার' যখন আছেন এর মধ্যে, তখন এসব তাদের না বুদ্ধলেও চলাবে। কলরব করতে করতে বেরিয়ে গেল। একজন বলল, আপনার গুরুদেব কোথায় থাকেন স্যার?

—গংগার ওপারে তাঁর আশ্রম। একদিন তোদের নিয়ে যাবো। প্রণাম করে আসি।

(ক্রমশঃ)

৫৫৮৭২৬
বেঙ্গল ডেকারেটর
২২০, চিট্রবুডন এডিমিউ কলিকাতা ৬

খুশী উজ্জ্বল করে
বোল্যান্ড
ব্যানর কমিউনিক প্রোডাক্টস, কলিকাতা

এটিকেট

সম্বন্ধে কব

এটিকেট! দেখুন, এই শব্দটি বিদেশী হলেও আমাদের ভাষা থেকে শব্দ করে অঙ্গ-ভঙ্গীর বিভিন্ন সম্ভার এটি এত সুস্বাদুভাবে জড়িয়ে আছে যে, একে ব্যাখ্যা করার জন্য আর নতুন কোন ভাব্যের প্রয়োজন হয় না। আসলে এ খব্দ যে কি তা যেমন আমরা জানি, আবার সরল উপেক্ষা করে এক গাল হেসে একে এড়িয়ে যেতেও আমরা কম সচেতন নই। আমার এক বন্ধু, যিনি সম্প্রতি ইংলন্ড থেকে ফিরে এসেছেন, এই শব্দটির বর্তমান সভ্যজগতে প্রকট-রূপে আবির্ভাবের ব্যাপারে একটি মজার ‘থিসিস’ শোনালেন। তাঁর মতে ‘এটিকেট’ কথাটা তেমন উপেক্ষার বস্তু নয়। বরং সামাজিক স্বচ্ছতা ধরুন আর সভ্যতার বিকাশই বলুন, এটিই ন্যাক তার একচুয়াখা ম্যানোমিটার।

আমি বললাম, তাই এটা আবার কি রকম হোল? ওসব স্বচ্ছ-টচ্ছ আর বিকাশ—আমার কাছে চিরদিনই নিতান্ত ‘ভাগ’ (Vague) বলেই মনে হয়েছে। সৌন্দর্য আমাদের লোক-সভার কি কাণ্ড হয়ে গেছে! তোমার মনে নেই? লোক-সভার প্রবেশ করার পর তার স্পিকার মশায়কে মাথা নত করে সম্মান দেখানোই ন্যাক ‘এটিকেট’। কিন্তু জনৈক সভ্য তা মানতে রাজী নন। প্রথা অনুযায়ী একমাত্র ‘আম্মার’ কাছেই তিনি ঐভাবে তহলিম পেশ করতে পারেন। কারণ আম্মা হো আকবর।

বন্ধুটি আমার কথায় যেন ক্ষেপে উঠলেন। আমি জানি, চিরদিনই সে ধোপদোরস্ত। অবশ্য সরল বাংলা ভাষার যাকে বাবুগিরি বলে, তা অবশ্য তিনি করেন না। বেশভূষা সম্বন্ধে তিনি স্বারলম্বী এই বা। লজ্জী বা ধোপার অপেক্ষায় তিনি বসে থাকেন না। জুতোয় পালিশ চালানো থেকে শব্দ করে প্রতি রবিবারে ছোট্ট লনের মরুদুর্গ ফুলের তদারক করা মায় গাড়ী ধোয়া, সব তিনি করেন। আমরা মাঝে মাঝে মন্তব্য করছি। এর মধ্যে কিন্তু একটা অর্থনৈতিক ব্যাপারের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি এক গাল হেসে উত্তর দেন,

ব্যাপারটা তা নয়। আসলে আত্মনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হয় পরনিষ্ঠা, পরের প্রতি সৌজন্যবোধ। সোজা বাংলায় যাকে বলে ভদ্রতা। এটিকেট।

আমি বললাম, ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে।

বন্ধুটি এবারে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। হাতের অসম্পূর্ণ চার কাপটি টেবিলের ওপর রেখে ড্রয়ার খুলে একটি কাগজের প্যাকেট বের করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তা খুলে ফেলে আমার সম্মুখে মেলে ধরলেন। দেখলাম, একটি ট্রাউজার, একটি সার্ট এবং একটি টাই। বিচিত্র বর্ণে প্রত্যেকেই রঞ্জিত। তবে মোট কমবিনেশনটাকে যে কি বলব জানি না। তবে চিনি।

কিন্ময়ে বন্ধুর দিকে চাইলাম। রেগে উত্তর দিলেন, তোমাদের কলকাতা! বললাম, তা তোমার এগুম্বির এ দুঃবস্থা হোল কি করে? কিন্তু তার উত্তর যা হোল, তা একান্ত মামুলী। কলকাতায় ওসব ব্যাপার হামেশায় চলে। বিশেষ করে স্বর্বার কলকাতা। তাতে আবার এটিকেটের কি হোল?

ব্যাপারটা তাহলে খুলে বলি। সৌন্দর্য বন্ধুটি আমাদের কলকাতা সহরেরই কোন রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ আগে বেশ এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সকলেই জানেন, বৃষ্টির পর শহর কলকাতার রাজপথগুলির কি অবস্থা হয়। রাস্তার আনাচে-কানাচের ক্ষুদ্র-বহু হ্রদ, লেগুন থেকে শব্দ করে কোন চৌমাথা, তেমাথার উপ এবং মহাসাগর সৃষ্টি হয়। আবার দেখবেন, বড় বড় বাড়ীর কার্নিশ বা কোলানো বারান্দার ফাঁকে যে পাইপ ড্রেনগুলি থাকে তা সাময়িক অবিরাম প্রস্রবেণে রূপান্তরিত হয়েছে। আর মহানগরীর হতভাগ্য পাথকরা এদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে লিভিংস্টোন, তেনজিং প্রভৃতির মত চেঁচা করছে। আসল কথা, আফ্রিকার জঙ্গলের হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে বরং রক্ষা পাওয়া যায় এবং মাউন্ট এভারেস্ট

আরোহণ করাও হয়ত সোজা, কিন্তু এক একটি মোটর বাস বা কারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যে চেঁচা করবেন, অতটা সোজা নয়। বন্ধুটি বোধ হয় একটি লেগুনের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন। সবে লন্ডনের সভ্য সমাজ থেকে ফিরে এসেছেন, বোধ হয় সেখানকার ছবি-টবি ফিকে ফিকে তখনও মনে গাঁথা। কলকাতারই রাজপথকে হয়ত ভাবছেন পিকার্ডিলি সারকাস। কিন্তু ইটাং গণিতের ভাষায় যাকে বলে ‘ইনফাই-নাইটিসিমেল’ ব্যাপার। তিনি অনুভব করলেন তাঁর সাদা জামা, প্যান্ট, টাই থেকে শব্দ করে মায় কাপটি পর্বন্ত করপোরেশনের বিবর্ণ তেল-জলে অভিস্রবিত হয়েছে। আর এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটির জন্যে দায়ী অবশ্য কুক-মহাদেশের সিংহ নয়। একটি নিতান্ত পার্থিব, বাস্তব এবং একান্ত অনুগত সামগ্রী—একটি হিন্দুস্তান ল্যান্ড-মাস্টার।

দেখুন, আমাদের অবচেতন ইন্দ্রিয়ের এইটে একটা বড় বৈশিষ্ট্য যে, সচেতন ইন্দ্রিয়ের কোন স্পন্দন হওয়ার আগেই কোন গোপন বন্ধুর মত সে আগে থেকেই কাজটি সেরে ফেলে। তাই দেখবেন, চোখের পাতায় কয়লার টুকরো পড়ার মুহূর্তগত পূর্বেই আমাদের পাতা বড়জে আসে। একটি আঘাতের সন্তাবনা কত মুহূর্তগতভাবে আমরা সামালিয়ে নিই। আমার বন্ধুর মধ্যেও যে এমন একটি চেতনা কাজ চালিয়ে যায়নি, তা অবশ্য বলব না। ধাবমান ‘সম্ভাবনাটির’ আবির্ভাব এবং তার পরিণতি কি হতে পারে তা তিনি জেনেও ছিলেন। তাই কাছের কোন ফুটপাথ বরাবর একটি উঁচু সিঁড়িতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু আগেই বোলাই, এভারেস্টে ওঠা হয়ত সোজা, এ ব্যাপারটি অত সহজ নয়।

বন্ধুটির ততক্ষণে বাকরোধ হয়েছে। কারণ সহস্রপদের চরণামৃত তাঁর ওষ্ঠে শব্দ নয়, মৃদু-গহ্বরবেণু। ধাবমান গাড়ীর নম্বর টোকার চেঁচা করেও কোন্ ফল হয়নি। টোকা যায়ও না। তবে তিনি আশা করেছিলেন, অন্ততঃ চালক একটু

থেকে তাঁর এই দুষ্কর্মের জন্য ক্ষমা
করে নেবেন।

বন্ধুটি বললেন, উঃ! ল্যাক অব
এটিকেট!

আমি বললাম, ভাই, ব্যাপারটা
এতই গোলমেলে, আসলে ও জিনিসটির
অস্তিত্ব আমাদের দেশে নেই। কারণ
এটিকেট দেখাতে যাওয়াকে হয়ত তুমি
সামাজিক স্বচ্ছতা বা ভদ্রতা বলে মনে
করতে পার। কিন্তু তাতেও বিপদ
আছে। হয়ত এমন একটা কিছুর আশংকা
করেই লোকটি আর দাঁড়াতে সাহস
করেনি।

বন্ধু আমার ওপর অপ্রসন্ন হলেন।
বললেন, কি আনসিভলাইজডের মত
কথা বলছ।

আমি বললাম, তবে শোন। ব্যাপারটা
গম্ভীর মত শোনালেও, সত্যি! : সোঁদিন
বোধ হয় মাঘ মাস হবে। গ্যালিফ
স্ট্রীটের লাস্ট ট্রামে বাড়ী ফিরছি।
কয়েকদিন হোল খুবই শীত পড়েছিল।
প্রথম শ্রেণীর কক্ষে মাত্র জন-তিনেক
যাত্রী। দু'জন পুরুষ এবং একজন
মহিলা। মহিলার বয়েস বছর ত্রিশেক
হবে। সঙ্গে কয়েকটি কাসকেড, বই
এবং আরও কি যেন।

আমি সায়েন্স কলেজের সামনে
নেমে পড়লাম এবং বাড়ীর পথে পা
বাড়লাম। সহর কলকাতার প্রফুল্লচন্দ্র
রায় রোডে তখন নেমে এসেছে ঘন
কুমুশা এবং ধোঁয়া। তুমি নিশ্চয় জান,
বিকালটায় সমস্ত কলকাতা ধোঁয়ায়
আচ্ছন্ন হয়। শুনছি নাকি, তোমাদের
ইংলণ্ডে লিভারপুলে অমনটি হয়।
বাস্তবতার সমস্ত আলো নিভ-নিভ। এক
শীত এগোতেই মহিলা কণ্ঠে কে আমাকে
ডেকে উঠল।

আমি থামলাম এবং পেছনে চাইলাম।
দেখি সেই ভদ্রমহিলা। যাঁকে ট্রামে
দেখিছি।

একটু বিচলিত হওয়ারই কথা।
একে গভীর রাত, পথ জনশূন্য তায়
অশ্রুচিহ্নিত আত্মবিশ্বাস।

বললাম, মাফ করবেন, আমার
ডাকছেন?

আজ্ঞা হ্যাঁ। দেখুন এই পথটি বড়
খারাপ। সঙ্গে দামী জিনিসপত্র আছে।
জন্মদিনের উপহার। বললাম—

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপারে মেয়েরা
একটু বেশী কথাই বলে। হয়ত একদুটি

মন্ত এক লিস্ট মেলে ধরবেন, এই ভয়ে
মাঝ পথেই প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি,
বলুন। মেয়েটি বলল, মানে, অমৃত
গলিতে আমার বাসা। যদি দয়া করে
একটু এগিয়ে দিতেন—সর্বনাশ! সে যে
আমার পাশের বাড়ী। গিন্নী অবশ্যই
এখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।
রাত করে বাড়ী ফিরলে শত কৈফিয়ৎ
দিতে হয়। তাঁর মতে, কলকাতা সহরটা
নাকি উচ্ছন্ন যাওয়ার একমাত্র জায়গা।
চাকরীর দোহাই দিয়েও তিনি শুনতে
চান না। তাঁকে একথা বোঝাতে গিয়ে
বার-বার ব্যর্থ হয়েছি যে, বর্তমান
কালে পুরুষদের বাজার বড় মন্দা।
কিন্তু তিনি তা শুনতে রাজী নন।
তারপর যদি দেখেন, এই রাতে একজন
সুন্দরী মহিলা আমার পার্শ্বচর, তাহলে
তো কথাই নেই।

কিন্তু বিধি বাম। সঙ্গে নিতে
হোল। শব্দ তাই নয়। ঐ যে, যাকে
তুমি বলছিলে 'এটিকেট', শব্দ সেটিকে
পালন করার দায়ে, মায় তার ভারী ভারী
উপহারগুলিও বয়ে নিয়ে চলতে হোল।

এদিকে তার বাসায় এসে বাধল
গোলমাল। উপহারগুলি ফেরৎ দিতে
গিয়ে দেখা গেল 'স্ট্রেক্স' জুতো-
জোড়ার বাজুটি পাওয়া যাচ্ছে না।...আর
যায় কোথায়! খোঁজ খোঁজ!

আমি বললাম, বন্ধুর বাড়ীতে ভুল
হয়নি তো? অথবা ট্রাম থেকে নামার
সময়? মেয়েটি যেন ক্ষেপে উঠল, বলেন
কি মশায়? আমি ম্যাথমেটিক্সের
স্টুডেন্ট। আমার অত সহজে ভুল হয়
না। ওঠা আপনার হাতেই আমি ভুলে
দিয়েছি।

আমার বন্ধুটি মন্তব্য করলেন,
ব্রুট! তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম,
শোন একবার ব্যাপারটা। আমার অবস্থাটা
একবার অনুমান কর। ভদ্রমহিলার
কণ্ঠস্বর ক্রমেই মধুর ছাড়িয়ে ককশ
হতে লাগল। অঙ্কের ছাত্রী কিনা। একে-
বারে একটি এসোঁডিং অরডারের সিরিজ
তৈরী হতে লাগল। নেহাৎ রাতের
কলকাতা। কেউ কারুর খোঁজ রাখে না।
আর আমার তখন অত শীতেও পুরু
কোটের ভেতর থেকে বাত্প বের হতে
লাগল। মায় গেঞ্জীশুদ্ধ লিকুইড হয়ে
গেছে।

কিন্তু তবু বলব ভাগ্য সুপ্রসন্ন।
প্রথম কারণ, এর মধ্যে মেয়েটির একটি
ছোট ভাই বাড়ী থেকে বের হয়ে এল।
যেন লেট দেয়ার বি লাইট, এন্ড দেয়ার
ওয়াজ লাইটের মত। আমাকে দেখেই
একটু চমকে উঠল। বলল, প্রসন্নদা
আপনি? তারপরেই সে তার দাঁদির

ভারতের শক্তি-সাধনা

ও শান্ত সাহিত্য

১৯৬১ সালের একাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা। ডাঃ শশীভূষণ
দাশগুপ্ত প্রণীত উচ্চ বিদ্যালয়ের গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক আলোচনা ও
শক্তিসাধনার আধ্যাত্মিক রূপায়ণ। [১৫]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত দুই শতাধিক
পদকর্তা হইতে প্রায় চার হাজার পদের টীকা, ব্যাখ্যা, শব্দার্থ ও
বর্ণনাত্মক সূচী। [২৫]

রামায়ণ কৃতিবাস রচিত

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত বহু রঙীন সুন্দর
চিত্রাবলী সহ অনিন্দ্য প্রকাশন। ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [৯]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস মোট ছয়খানি একত্রে।
প্রিয়োগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক রমেশচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি
আলোচিত। [১৫]

SAMSAD ANGLO BENGALI DICTIONARY

উচ্চ মান-বিশিষ্ট ইংরেজী-বাংলা শব্দকোষ [১২১০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৯

আমাদের বই সর্বত্র পাইবেন

পায়ের দিকে চেয়ে বলল, আরে দিদি! মাঝেমাঝে যা মানিয়েছে তোর পা! চকিতে তার পদযুগলের দিকে চাইলাম। নতুন ফ্লেঞ্জ সতিই খুব শোভা বর্ধন করেছিল।

মেরোটর অবস্থা অবশ্য অনুমান করতে পারছি। কিন্তু আমার আর এক মনোভাব অপেক্ষা করার অবস্থা নেই। কারণ, গিন্নী হয়ত এখনও ব্যাপারটা অনুভব করতে পারেননি। তাঁকে সামলানো আমার প্রথম কাজ। তরুণ অধ্যাপকদের ওঁরা বিশ্বাস করেন না। ওঁর কাছে যে, অন্ততঃ আমার 'এটিকেট'কে পুরো-মাত্রায়, যাকে বলে সেন্ট-পারসেন্ট অটুট, তা প্রমাণ না করতে পারলে নিস্তার নেই। বন্ধুটি কিন্তু থামল না। বলল, তর্ক করাটা আজকাল শিক্ষিত সমাজের যেন একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, বলতে পার, জীবনের কোন জটিল সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত মানুষ তর্কের দ্বারা সংগ্রহ করতে পেরেছে? আসলে জীবনটা একটি অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে বদ্বতে পারবে, ব্যস্ত করতে পারবে না। তোমাকে আমার ভাল লাগছে, আর কেন ভাল লাগছে, তা বোঝানো শক্ত। মানুষের শিক্ষা বল, দীক্ষা বল সমস্ত কিছুর মধ্যেই আছে একটা মার্জিত রুচি, আচরণ এবং অভিব্যক্তি আহরণ করার ক্ষেত্র। ভবিষ্যতে জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়টি সার্টিফিকেট তুমি পেয়েছ, একথা তোমারও হয়ত মনে থাকবে না। কিন্তু যা মানুষকে মূগ্ধ করবে, দেবে সামাজিক খ্যাতি তা হোল তোমার ঐ শিক্ষাচার। আজ এর অভাবে মানুষ যে কত কি লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়, তা আমার তিনটি উদাহরণ থেকে বদ্বতে পারবে।

প্রথমটি ঘটে মাদ্রাজ মেলের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। স্লিপার কোচে ভ্রমণ করছিলেন জনৈক মিঃ রাও এবং মিস সুলতা। ওঁরা কেউ কারুরই পরিচিত ছিলেন না। মিঃ রাও বছর ত্রিশের যুবক এবং ইঞ্জিনিয়ার। মিস সুলতা বছর পঁচিশের তরুণী। অধ্যাপিকা। ওঁরা পরস্পর সামান্য সামান্য নীচের বার্থে শুয়েছিলেন। কখন রাতি গভীর হোল। বৃষ্টি নামল হঠাৎ। ঘুম ভেঙে গেল মিঃ রাও-এর। দেখলেন তাঁর বিছানা ভিজে গেছে। তাড়াতাড়ি জানলার কাঁচ নামিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর নজরে পড়ল, মিস সুলতার গায়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়াতেও তাঁর ঘুম ভাঙছে না। একটু ইতস্ততঃ করে তিনি মিস সুলতার জানলার কাঁচও নামিয়ে দিলেন।

ডোর সাতটায় কোন এক স্টেশনে ট্রেন থামলে মিঃ রাও-এর ঘুম ভাঙল। তিনি দেখলেন, মিস সুলতা অতিরিপ্ত এক কাপু কাফি নিয়ে তাঁর জন্যে

অপেক্ষা করছেন। এ ব্যাপারে মিঃ রাও প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে যান। কিন্তু পরে উভয়ের মধ্যে আলাপটা জমে ওঠে। কথা প্রসঙ্গে মিস সুলতা জানান, এই-টুকু আন্তরিকতাও জীবনে তিনি কারও কাছ থেকে পাননি। অর্থাৎ বর্ষায় তিনি ভিজে যাচ্ছেন দেখে, কেউ যেন তাঁর জানলা বন্ধ করতে পারে, এ তাঁর ধারণার বাইরে। ঘুমটা তাঁর গাঢ়। টের পাননি, গায়ে জল পড়াছিল।

একটু কৌতুকের সঙ্গে বললাম, তারপর?

বন্ধুটি আমাকে চমকে দিয়ে বলল, ওঁরা পরস্পর বিয়ে করেছেন। এ্যান্ড ইট ইজ ফর ইওর এটিকেট! এবং তারপর বন্ধুটি আরম্ভ করল আমেরিকার সান লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির জৈনক ডিরেক্টরের জীবনী। ভদ্রলোকের নাম মিঃ এডগার জোন্স। কুড়ি বৎসর বয়সে ইনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে বেকার অবস্থায় নিউ-ইয়র্কের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ছিল উচ্চাশা। তাই ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। অবশেষে বহু সাধাসাধনা করে ইনস্যুরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হওয়ার আবেদন করলেন একজন খানদ এবং অত্যন্ত রাশভারি ম্যানেজারের কাছে। অনুমতি মিলল। কিন্তু সময় মাত্র তিন মিনিট। দেখাও করলেন। ব্যর্থমনোরথ হতে হোল। কঠিন কাজ। অত ছেলে-মানুষ এবং একেবারে আনাড়ী দিয়ে হবে না।

মিঃ জোন্সের মুখে কিন্তু কোন ব্যর্থতার রেখা ফুটে উঠল না। তিনি মৃদু হেসে অভিবাদন করলেন এবং আশ্বস্ত করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার অসংলগ্ন পর্দাটি ঠিক করে দিয়ে মৃদু পদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে লাগলেন। কিন্তু চমকে উঠতে হোল। মাত্র এক মিনিট পর। সবে মিঃ জোন্স রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন। যেয়ারা এসে তাঁর হাতে একটি খায়-তুলে দিলে। একেবারে এ্যাপপেন্টমেন্ট লেটার। তাঁকে কোম্পানি জুনিয়ার এজেন্টের পদে বহাল করেছেন। পরে ইনি একজন ডিরেক্টরও হন।

প্রশ্ন করলাম, কারণ?

বন্ধুটি বলল, এটিকেট। মাত্র ঐ পর্দা সরানো, যা ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল ম্যানেজারকে। এপয়েন্টমেন্ট লেটার প্রস্তুতই ছিল। সেই করে পাঠানো মাত্র।

বন্ধুটিকে বললাম, এবার বন্ধু তোমার শেষেরটা!

বন্ধু বলতে লাগল : এটা ঘটে আমাদের ভারতেরই কোন অফিসে কতকগুলি উচ্চ-পর্ষায়ের কেরাণী বয়স্ক করার সময়। অফিসে লোক নেয়ার কথা ছিল পনের জন। দরখাস্তকারীদের মধ্যে থেকে ইন্টার-ভিউ-এ ডাকা হয়েছিল চতুর্দশ জনকে। যে ঘরে এদের বসার কথা ছিল সেখানে প্রতি প্রার্থীর নাম বসিয়ে একটি করে চেয়ার, একটি টেবিল এবং প্রতি টেবিলে এক প্যাকেট ক্যাপসটেন সিগারেট রাখা হয়েছিল। আর ছিল একটি করে এ্যাস-ট্রে এবং দুই-একটি করে ম্যাগাজিন প্রতি টেবিলেই। ঘরের কোণে একটি নোটিশ-বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা ছিল : আপনাদের ইন্টার-ভিউ নিতে হয়ত আমাদের একটু বিরক্ত হবে। অনুগ্রহ করে বিচলিত না হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

কিন্তু তা তো হোল। মিনিটের পর ঘন্টা। তারপর আর এক ঘন্টা। কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা চলে? ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। শব্দ হোল গুঞ্জন। পাক্সা আড়াই ঘন্টা যখন কাটল হঠাৎ একজন দাঁড়িয়ে উঠে হলঘরের এক কোণে গেলেন এবং বেশ সূর করে বলতে লাগলেন, মিঃ বোস, মিঃ কালেকার..... আপনারা অনুগ্রহ করে চলে যেতে পারেন। আমাদের প্রাথমিক ইন্টারভিউ পর্বে আপনারা নির্বাচিত হননি।

কি রকম? কে একজন বেশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করল।

যে ভদ্রলোকটি কথা বলছিলেন তিনি একজন অফিসার। চাকুরী-প্রার্থীর ছদ্মবেশে সকলকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বললেন, আপনারা নির্বাচিত হননি। কারণ আপনারা ডিসিপ্লিন ব্রেক করেছেন। আপনারা স্ব স্ব স্থানের যথাযথ ব্যবহার করেননি। এ্যাস-ট্রে থাকা সত্ত্বেও সিগারেটের টুকরো বা ছাই যত্রতত্র ছাড়িয়ে রেখেছেন। ম্যাগাজিনগুলি এলোপাথারি পড়ে। এবং একটি টেবিলেরটা অন্য টেবিলে যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমরা আপনাদের একটা গ্রুপ টেস্ট নিলাম।

বন্ধুটি বলল, একটু ভাবনা সামান্য শিষ্টাচারের অভাব, দেখ, কেমন নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকেও মানুষকে বাচিয়ে দেওয়া পারে।

এবার আমাকে চুপ করে থাকতে হোল।



অন্ধকার অপেক্ষা

রমানাথ রায়

চোখের সামনে মোমের ফোঁটার মত ঝরে ঝরে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে এল। দৃশ্যমান অগণন বাড়ি, মানুষ, কোলাহল সব একাকার হয়ে গেল। কোথাও কোথাও বেজে উঠে শাঁখের শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে গেল। একাকী অন্ধকার সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বরের মত ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। শরীরে কুয়াশার আন্তরঙ্গ। দূরে চাঁদ উঠলে রপোর টাকার মত চকচক করতে লাগলো।

অমল চেয়ারে চিবুক হাত দিয়ে এই দৃশ্য রচিত হতে দেখল। এবং প্রতিদিনের মত আজও মনে মনে শূন্যে প্রজাপতির মত এক সুখী চিত্র রচনা করল। পুরুরী সমুদ্রের ধারে একতলা বাড়ি তুলেছে। সেখানে থাকবে সে আর মীরা। প্রতিদিন সে কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরবে। মীরা দরজার পালা বন্ধ করে চেপে দাঁড়িয়ে থাকবে, অপেক্ষা করবে। আর গভীর রাতে যখন ঘরের মধ্যে হু হু করে বাতাস আসবে, জানালার পালা-গুলো দেওয়ালে ঠোকাঠকি করবে, তখন মীরাকে শরীরের নিকটতম প্রান্তে নিয়ে এসে বলবে, মীরা আমরা পুখুখী। মানুষ যা চিরকাল কামনা করে, আমরা তা পেয়ে গেছি। আমাদের মত ভাগ্যবান পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

মীরা হয়ত কিছুই বলবে না। তখন, অমল ভাবল, তার চিবুক আমার বক্ষদেশ স্পর্শ করবে।

ঠিক এই সময় তীক্ষ্ণ কাতর 'আঃ আঃ' শব্দপ্রবাহ ভেসে এল। অমল এই ধ্বনিতে মূম্বুর্ভবর আতি অনুভব করল। আর সেই সঙ্গে কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। কেননা, স্বরচিত সুখী চিত্র রচনার আমেজ ছিল হয়ে যায়।

পূনরায়, অমল পূর্বের চিত্র রচনার আশ্রমগ্ন হল। কেননা, কেবলমাত্র এই চিত্রের দিকে তাকিয়ে সে প্রতিদিনের ধূসর ইতিহাস অনায়াসে ভুলে যেতে পারে। বাবার মৃৎ তখন মনে পড়ে না। আর, বাবার মৃৎ মনে পড়লেই সে কেমন অসুস্থ হয়ে পড়ে। কতবার সে মনে মনে বাবার মূর্তি তৈরী করেই পরমুহূর্তে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছে। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই অতল অন্ধকার থেকে সেই মৃৎ জেগে উঠেছে। পিছন থেকে ঘাতকের মত উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে এমনভাবে তাকিয়ে থেকেছে, যেন ঘাড় ফেরালেই তাকে দেখতে পাবে। ভয়ে আঁৎকে উঠে করতলে মৃৎ ঢেকেছে। কিন্তু তাতেও সে মৃদ্ধি পায়নি। ঘাড়ের ওপর অনুভব করেছে হিম নিঃশ্বাসের স্পর্শ। তার

শরীর কেঁপে উঠেছে। কিন্তু, কোথাও ছুটে যেতে পারেনি। স্থির হয়ে বসে থেকেছে।

প্রতিদিন অন্ধকারে ক্লান্ত, ক্লান্ত হয়ে ভেবেছে, এই দুঃসহ বোঝা আর কতদিন সে বহন করবে? রোগ-যন্ত্রণার অসহ্যতার চেয়ে বরং বাবার মৃত্যু হোক, এ নিষ্ঠুর গোপন সত্য হয়ত সে কোথাও কোনদিন উচ্চারণ করেনি, কিন্তু জানে, মৃত্যু হলে সে অন্ততঃ মৃদ্ধির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। আবার সে ভাল করে বাইরের আকাশটাকে দেখতে পাবে। যেমন দেখতে পেত কৈশোরে, মাঠের মাঝে একা একা দাঁড়িয়ে।

এ সময় অমল গোপন তীর তৃষ্ণা অনুভব করল। এবং পরমুহূর্তে করতল দেখার মত নিজের প্রতিদিনের বৃত্তান্ত চোখের সামনে মেলে ধরতেই দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলল। কি ম্লান আর কি করুণ তার প্রতিদিনের ইতিহাস। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে। নিয়মিত খবরের কাগজ পাঠ করে। তারপর স্নান করে খেয়ে নেয়। অফিসে যায়। বিকেলে ফিরে আসে। বাবার জন্য কিনে আনে বেদানা, ন্যাসপাতি, কমলালেবু। মীরার হাতে সেগুলো তুলে দিয়ে চুপচাপ

এই চেয়ারে বসে থাকে। সন্ধ্যা হয়। স্বপ্ন দেখে। রাত্রি বাড়ে। তারপর খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর, মীরা প্রাতি-দিন রান্না করে। বাসন মাজে। এবং বাকি সময় বাবার মাথার পাশে বসে থাকে। ওষুধ খাওয়ায়। থার্মিটার দিয়ে শরীরের তাপ নেয়। চার্ট টুকে রাখে। আর আজকাল অসুখ একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় বাবার পাশেই সারা রাত শুয়ে থাকে। বাবাকে একলা রেখে কদাচিৎ এ ঘরে শূন্যে আসে।

অমল কপালে করাঘাত করে। তার শরীর ক্রমাগত ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে। চিবুক ঝুলে পড়ছে। আর মীরার চোখের কোলে কালি পড়ছে। মূত্থের চামড়া কুচকে যাচ্ছে। অথচ, মনে পড়ে অমলের, মীরাকে বিয়ে করার সময়ে অনেক উজ্জ্বল চিত্র রচনা করেছিল। বাবার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও মীরাকে বিয়ে করেছিল। তখন নিজেকে মনে হত সন্মতের মত। পৃথিবীর যাবতীয় উজ্জ্বল আহ্বাদ যেন তার জন্য অপেক্ষা করছে, এ রকম মনে হত। মীরাকে এখানে আনার পর বাবার সঙ্গে শূদ্ধ কথা নয়। প্রায় মূত্থদেহাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। এগুলো সে নিম্নমভাবে অগ্রাহ্য করেছে। কেননা, তখনো তার কাছে জীবনের অন্যতর মানে ছিল। কিন্তু তারপর বাবা যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, সেদিন সে অকারণে চমকে উঠেছিল। ভয় পেয়েছিল।

বাবা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রইলেন। দেখতে পেল, বাবার শরীর ক্রমাগত বিবর্ণ হয়ে আসছে। কিন্তু, আশ্চর্য! বাবা তাঁর অসুস্থতাকে টিকিয়ে রাখলেন মাসের পর মাস। ওঠা-বসার ক্ষমতা লোপ পেলেও ঘাতকের মত নিম্নম দৃষ্টি মেলে জেগে রইলেন। গোটা বাড়িটা নির্জন প্রাসাদের মত ভয়ংকর হয়ে উঠল। কোথাও দ্রুত পদ-পাত নেই। কোলাহল নেই। ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে বাবার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার ধ্বনি ও কাদের মৃদু ফিসফাস কথাবার্তায় পুরুরে ঢিল ফেলার মত ঘরের স্তব্ধ হাওয়ায় অদৃশ্য তরঙ্গ উঠেই মিলিয়ে যেত। এ রকম শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় তারা অশরীরী আত্মার মত বেঁচে রইল। আর মাঝে মাঝে সেই সব অস্থির স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা দেশলাইয়ের কাঠির মত অকারণে জ্বলে উঠত, এবং সে আলোয় ক্ষণিকের জন্য দেখতে পেত, বিশাল

শকুনের মত ডানা মেলে কি ভয়ংকর অন্ধকার এখানে নিপতিত। মূত্থের কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে যেত।

হঠাৎ এ সময় অমল হু হু করে ছুটে আসা উত্তরে হাওয়ার নিম্নম প্রহারে চমকে উঠল। চাদরটাকে আরো আপন করে জড়িয়ে নিল নিজের গায়। চেয়ে দেখলো, রাত্রি হয়েছে। অন্ধকার চাপ বেঁধে আসছে। চাঁদ দূরে অশ্বথ গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। আর সমস্ত আকাশ ভরে অন্তহীন নক্ষত্রপুঞ্জ।

অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে পদপাতের ক্ষীণ শব্দে অমল মূত্থ ফিরে তাকাল। মীরা। অন্ধকারে ওর গোটা শরীর পোড়া কাঠের মত মনে হল। মীরা দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, বাবা কিরকম হয়ে যাচ্ছে। অবস্থা বোধ হয় খুব খারাপ। তাড়াতাড়ি এস।

অমল সব শুনল। কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল। যেন এরকম অবস্থায় তার পক্ষে শূদ্ধমাত্র বসে থাকা ছাড়া আর কোনরকম কাজ সে করতে পারে না। মীরা, অমল আসছে, এই ভেবে এগিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর, অমল সেই রকম ভাবেই চেয়ারে বসে রয়েছে, উঠে আসছে না, এরকম মনে করে পুনরায় মূত্থ ফিরিয়ে বলল, কই ওঠ।

অমল তবুও বসে রইল।

মীরা এবার ফিরে এসে তার হাত ধরে টান দিল। বলল, ওঠ।

অমল বলল, আমি কি করতে পারি বল? মীরা তার কথা শুনলে অন্ধকারে তার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে বলল, ডাক্তার ডেকে আনতে হবে।

মীরা যেভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, তাতে সে অনারকম কথা আশা করেছিল। একটু অবাক হল। তাকিয়ে রইল মীরার বিবর্ণ চোখের দিকে। এবার মীরার কণ্ঠস্বর রুঢ় হয় উঠল, কই, ওঠ।

অমল এরকম কণ্ঠস্বর শুনলে চমকে উঠল। কেননা, এই প্রথম, এতদিন পর মীরার কণ্ঠস্বরে রুঢ়তা লক্ষ্য করল।

অমল বালকের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মীরাকে অনুসরণ করে পাশের ঘরে বাবার মৃতপ্রায় শরীরের পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর বাবার চোখ দুটো বোঁজান দেখে আশ্বস্ত হল।

কেননা, ঘাতকের মত নিম্নম দৃষ্টির প্রহার থেকে সে বেঁচে গেছে।

অমল এবার অনায়াসে বাবার শরীরের ওপর হাত রাখতে পারল। আশ্চর্য! একটুও জ্বর নেই। আর কেমন যেন ঠান্ডা। কিছু বন্ধে উঠতে পারল না।

মীরা এবার বলল, দেখেছ, শরীরটা কিরকম ঠান্ডা হয়ে আসছে।

অমল বলল, কি করা যায় বলত?

—শীগগির ডাক্তার ডেকে আন।

—কি বলব?

—যা দেখলে তাই বলবে। তুমি কি কিছুই বন্ধতে পারছ না? আশ্চর্য!

অমল মীরার মূত্থের দিকে একবার তাকাল। অকারণ আত্মঘাতী প্রহারে গোটা মূত্থ ভেঙে পড়েছে। বেশীক্ষণ তাকানো যায় না।

অমল চোখ দুটো ফিরিয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে এল। মীরা বাবাকে কোলে নিয়ে বসে রইল।

রাস্তায় নামতেই অমলের গোটা শরীর অস্থির মাতালের মত টলে উঠল। আর একটু হলেই পড়ে যেত। টাল খেয়ে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল। ধনুকের ছিলার মত নিজের শরীরটাকে টানটান করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করল। পারল না। পাতার মত থর থর করে কাঁপতে লাগল। আর সেই সময় তার মনে হল, সে বুঝি মারা যাবে। গোটা শরীর হিম হলে এল।

তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে আপ্রাণ টানল। খক খক করে কাশল। মাটিতে থু-থু ফেলল। চেয়ে দেখল একবার। এবং পুনরায় শূন্যে মূত্থ তুলে ধোঁয়া ছাড়ল। শরীরটাকে গরম করার চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সুস্থ মনে হলে দ্রুত পায় এগিয়ে গিয়ে সামনের এক রেষ্টরায় ঢুকে পড়ল। চেয়ারে বসে ভাবতে শূদ্ধ করল, আশ্চর্য! আমি এমন টলে পড়লাম কেন? শারীরিক অসুস্থতা? হয়ত তাই। শূন্যে নিজের প্রতিকৃতি রচনা করল। তাকিয়ে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর নীরবে উচ্চারণ করল, আমার বয়স বাড়ছে। প্রতিদিন তিল তিল করে আমার শরীরের অস্থি মেদ মজ্জা শিথিল হয়ে

আসছে। আমি আর বেশিদিন বাঁচব না।
আমি যাব, হয়ত আজ কিংবা কাল।

এসময় একজন বেয়ারা এসে
অমলের মূখের সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস
করল, কি দেব?

অমল কথাটা যেন শুনতে পেল না।
অপলক তাকিয়ে রইলো বেয়ারার টানটান
শরীরের দিকে। ও কি করে এভাবে
দাঁড়িয়ে রয়েছে ভেবে অবাক হল। যে
কোন মূহুর্তে তার মত ওর শরীর
ভেঙ্গে পড়ে যেতে পারে, অথচ কি
কুঠিন মেরুদণ্ডে ভর করে ও দাঁড়িয়ে
রয়েছে।

বেয়ারা জবাব না পেয়ে পুনরায়
প্রশ্ন করল, কি দেব? প্রশ্নটা এবার
কানে যেতেই চমকে উঠে দ্রুত জবাব
দিল, চা।

উত্তর শুনেই বেয়ারা গর্বিত শরীর
নিরে চলে গেল। পিছন থেকে বিস্ময়ে
অমল কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে
থেকে, ফিরে তাকাল প্রতিটি টেবিল
দ্বিগুণে বসা বিভিন্ন মানুষের দিকে।
বাঁদে মৃৎগর্ভালি রেস্টরায়ি ক্ষণিক
উজ্জ্বলতা পেয়ে শ্রীময় হয়ে উঠেছে।
কেউ কেউ মৃদুস্বরে গোপন আলাপ
করছে। কেউ বা তারস্বরে বোঝাচ্ছে
রাজনীতি, দর্শন কিংবা কবিতার গোপন
শরীর। আবার দু'একজন যাবতীয়
উপদ্রব থেকে নিজেকে মুক্ত করে, স্থির
হয়ে দ্বিধাহীনভাবে চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

অমল এদের দিকে তাকিয়ে ভাবল,
যেন স্রোতমুখে উন্মূলিত ভাসমান
ভূগল অকস্মাৎ স্থল খুঁজে পেয়ে স্থির
হয়ে নিজেদের ফিরে পাওয়া অস্তিত্ব
যাচাই করে নিচ্ছে। অথচ এরা জানে না
এই গোপনতম সংবাদ যে, হয়ত এই
মূহুর্তেই অদৃশ্য মৃত্যুর নিপদ প্রহারে
এদের সমগ্র অস্তিত্বের সমূহ বিনাশ
ঘটে যেতে পারে। আর হয়ত জানে না
বলেই এরা ক্ষণেকের জন্যেও উজ্জ্বল
হতে জানে।

এসময় বেয়ারাটি অমলের সামনে
চায়ের পেয়ালা রেখে দ্রুত চলে গেল।

অমল চায়ের পেয়ালা মূখের কাছে
টেনে নিয়ে কয়েকবার চুমুক দিল।
তারপর ভাবল, আমিও আসলে ওদের
মত ক্ষণিকের জন্যেও শ্রীময় হয়ে উঠতে
চাইছি। অনুভব করতে চাইছি নিজের
অস্তিত্বকে। যদিও জানি, আমার
অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মৃত্যু।
এবং মৃত্যু অদৃশ্য শরীর নিয়ে নেই



আঃ! লাইফবুয় মান করতে কি বলা! কত
তাজা আর স্বচ্ছ হয়ে লাগে! লাইফবুয় লাবণ্য রেখে
মান করলে খুলে ময়লার রোগবীজাণুও
খুয়ে যায়। পরিবারে সকলেই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে
রোজ লাইফবুয় বেখে মান করুন।

**লাইফবুয় যেখানে,
স্বাস্থ্যও সেখানে!**

বিশুদ্ধতার লিডারের তৈরী

L-29-M-1-80

অন্তিম মূহুর্তের জন্য অপেক্ষমাণ, যখন আমাকে অসহায় বালকের মত তার কাছে সমর্পিত হতে হবে। কিন্তু জানি না, জীবনে কখন আসবে সেই অন্তিম মূহুর্ত। এবং হয়ত একারণেই মানব স্বর্ণিক উজ্জ্বলতা ভালবাসে।

অমল চা শেষ করে পেয়ালাটা ঠেলে সরিয়ে রাখল। বেয়ারা এলে তার হাতে চায়ের দাম তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর রান্ধায় পা দিয়েই বিরত বোধ করল। মনে পড়ল, বাবার শরীর ক্রমশ শীতল হয়ে আসছে। মীরা তাকে ডাক্তার ডেকে আনতে বলেছে। অথচ সে এতক্ষণ রেস্টোরাঁর অনায়াস ভঙ্গিতে বসে রইল। সামান্য তাঁপের জন্য চায়ের চুমুক দিল। অমল বিস্মিত হল। বাবার কথা, কি করে এত সহজে সে ভুলে গেল, ভেবে গেল না।

আলোকিত রাস্তায় অমলের মুখ বিবর্ণ হয়ে এল। তারপর অস্থির ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে এক পারিচিত ডাক্তারখানার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল।

অমলকে দেখেই ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর?

অমল দাঁড়িয়ে রইল। কিভাবে খবরটা দেবে, তা ঠিক করে উঠতে পারল না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তার অমলকে নীরব দেখে কপাল কুণ্ঠিত করে প্রশ্ন করলেন, আপনার বাবার শরীর ভাল ত?

অমল এবার জবাব দিল, অবস্থা খুব খারাপ।

—কি হয়েছে?

—গা হাত পা কিরকম ঠান্ডা হয়ে আসছে। শীর্ণগির চলুন।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। ডাক্তারী ব্যাগের মধ্যে দরকারী ওষুধপত্র পুড়ে নিরে রাস্তায় নেমেই বললেন, চলুন।

অমল ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে জোরে হাঁটবার আপ্রাণ চেষ্টা করল।

তারপর বাড়ির কাছে এসেই অনুভব করল, বাবা হয়ত এতক্ষণে মারা গেছেন। আর সেই মূহুর্তে তার গোটা শরীর সংকুচিত হয়ে এলো। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল। সারাজীবনে সে এই ঘটনাটি কখনোই বিস্মৃত হবে না যে, বাবার শরীর যখন শীতল হয়ে আসছে, কিছুক্ষণ পরেই মারা যাবেন, সে তখন মীরার অনুয়োখে ডাক্তার ডাকতে গিয়ে অনায়াসে রেস্টোরাঁর ঢুকে চায়ের চুমুক দিতে দিতে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়েছে। মীরার কাছে না হলেও নিজের কাছে চিরকাল অপরাধী থেকে যাবে। অমল এই কারণে এই মূহুর্তেই কেবলমাত্র

একবারের জন্যও বাবার জীবন কামনা করল।

ঠিক পরমূহুর্তে যখন বাড়ির নীল দরজার মুখোমুখি হয়েছে, অমল কেঁপে উঠল। কাঁছেই, চেয়ে দেখল, একজন পুলিশ ঘোরাফেরা করছে। পরণে কালো কোট। মাথায় লাল চুপি। লাল এবং কালোর তীব্র বিরোধিতা অমলের মধ্যে গ্রাশ সঞ্চার করল।

কোনমতে বাড়ির ভিতরে ঢুকে কয়েকবার শ্বাস ফেলল জোরে জোরে। শান্ত হতে চাইল।

তারপর ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে চাইল খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে। ঠোট কামড়ে যাবতীয় ভয় ও উত্তেজনা থেকে নিজেকে সামলে নিতে চাইল। বাবা জীবিত আছেন, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পা ফেললো। আর ফেলেই সে আশ্চর্য হলো, কেননা বাবা তখনো জীবিত আছেন। এতে সে আনন্দিত না দুঃখিত তা বুঝে উঠতে পারল না।

ডাক্তার চেয়ারে ব্যাগ রেখে দিয়ে রুগীর হাত ধরে নাড়ী পরীক্ষা করলেন। তারপর হাত ছেড়ে দ্রুত ব্যাগ খুলে সিরিজে কোরামাইন টেলে বাবার উরুতে বড় সূচ গোঁথে দিলেন।

মীরা সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। অমলও তাই দেখাছিল, হয়ত অন্য কিছু এখন দেখা উচিত নয় বা দেখা সম্ভব নয় বলে। মীরাকে উত্তেজিত মনে হল। ডাক্তারবাবুকে কম উত্তেজিত দেখাল। যদিও যাবতীয় কাজগুলি তিনি উদ্বেগ নিয়ে করে গেলেন। কিন্তু ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরমূহুর্তে তাঁকে কেমন শান্ত দেখাল। নিরুদ্বেগ মনে হল। আর আশংকা নেই, এ রকম ভাব তার চোখে-মুখে দীপ্ত হয়ে উঠল।

ব্যাগ গোছাতে গোছাতে অমলকে সঙ্গে যেতে বললেন। ওষুধ দেবেন। তারপর দ্রুত রাস্তায় নেমে বললেন, আর পাঁচ মিনিট হলেই রুগী মারা যেত।

অমল চূপ করে শুনল। ডাক্তার-বাবুও আর কিছু বললেন না।

ডিসপেন্সারীতে এসে তিনি এক প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। এবং সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন বারবার, কখন কোনটা খাওয়াতে হবে।

কাছের এক দোকান থেকে দ্রুত ওষুধ কিনে অমল হন হন করে বাড়ি ফিরে এল। মীরার হাতে সেগুলো তুলে দিলো। বুকিয়ে দিলো ডাক্তারের নির্দেশ। তারপর চলতে চলতে নিজের ঘরে এসে চেয়ারে গোট্টা শরীর মেল

দিল। চতুর্দিকের নিরবয়ব অন্ধকারে চোখ দুটো বোঁজাল। তারপর ভাবল, আজ ঘটনাটা অন্য রকম ঘটল না কেন? আর, মাত্র পাঁচ মিনিট বেশী সে রেস্টোরাঁর বসে থাকতে পারল না? কেন তার বিস্মৃতি আর কিছুক্ষণ স্থায়ী হল না? হলে, ক্রমশ এভাবে নিজেকে নিভে যেতে দিত না। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম ঘটে গেল। অনায়াসে ঘটে যেতে দিল। আগামীকাল পুনরায় আজকেরই মিলন পুনরাবৃত্তি ঘটবে। নতুন কিছু আর ঘটবে না।

এ সময় অমল অনুভব করল, মীরার হাত তার শরীর স্পর্শ করেছে।

অমল চোখ মেলে মীরার দিকে তাকাল। অন্ধকারে মীরার শরীর ছায়ার মত মাংস-মেদ-মস্তাহীন বলে মনে হল। মীরা মৃদুস্বরে বলল, চলা, খাবে চল।

অমল চূপ করে বসে রইল। বেশ কথটা শুনতে পেল না।

মীরা পুনরায় বলল, কই চল।

অমল এবার ফিসফিস করে বলল, আমি আজ মারা যেতাম মীরা।

মীরা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছিল?

—তখন রাস্তায় বেরিয়েই শরীরটা কেমন নড়ে উঠল। আর একটু হলেই পড়ে যেতাম। খুব বোঁচে গেছি।

মীরা অমলের কপালে কিছুক্ষণ হাত রেখে বলল, শরীর খারাপ হয়েছে দেখছি।

অমল এ সময় চকিতে চেয়ার ছেড়ে মীরার শরীরের নিকটতম প্রান্তে এসে বলল, মীরা সময় হয়ে আসছে। খুব বেশী দিন আর বাঁচব না।

মীরা চমকে আহত গলায় বলল, কি যা তা বলছ?

অমল মীরার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। যেন স্বগতোক্তি করছে এ রকম স্বরে পুনরায় বলল, তবে, শুধু আগার নয়, তোমারও সময় হয়ে আসছে। তুমি দেখতে পাও না। আয়নার ভাল করে নিজের মুখ যদি কোন দিন দেখ, তাহলে বুঝতে পারবে।

অমলের কথা শুনল মীরা যেন এই প্রথম দেখতে পেল তার অভীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তার সমূল অস্বিন্ত কেঁপে উঠল। টলে উঠল তার শরীর। অমল মীরাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল।

তারপর তারা নিরবয়ব নির্মল অন্ধকারে প্রাচীন ভগ্ন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। যেন, অন্তিম ধ্বংসের অপেক্ষা করছে।

নিজের দিকে অস্বাভাবিকতা রাখুন

মানুষের মনের অস্বাভাবিকতা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়। মনোবিকলন এই গবেষণা নিয়ে গঠিত। তারা মানুষের মন, ব্যবহার, হাব-ভাব নিয়ে চুলচেরা বিচার করে। রায় দেয়—এই এই ব্যবহার স্বাভাবিক। আর তার থেকে এক পা এধার ওধার হলে রক্ষা নেই। বলবে, বিকৃতি এল। স্বাভাবিকতা আর রইল না। অস্বাভাবিকতা এল। মোসদা কথায় স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক মানুষের তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মোটা তফাৎটার দাইরে গেলে, খুব বিপদে পড়তে হয়। মনোবিকলন তাই বলে সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় সব মানুষের মধ্যেই অঙ্গ-বিস্তার অস্বাভাবিকতা লুকিয়ে আছে। যেমন ধরা যাক গর্ব বা দম্ভ প্রকাশ করা। আমরা হামেশাই করে থাকি। অনেক সময় সচেতন ভাবে, কখনও বা অচেতন ভাবে। কিন্তু আমরা কোনদিন তলিয়ে বিচার করে দেখি না যে, ক্রমাগত দম্ভ প্রকাশ চরিত্রের অস্বাভাবিক বৃত্তিকে জাহির করে। খেয়াল হয় বেশ কিছু পুরে। তখন বন্ধ-বান্ধব ক্রমাগত আশ্বস্তিরিতা সইতে না পেরে সরে যায়। আত্মীয়-স্বজন মুখ ফিঁরিয়ে নেয়। গর্বের জন্য খবর হই লোক-সমাজে। খেয়াল হয় তখন।

প্রত্যেক মানুষের বিকাশের বিশেষ ধারা আছে। সামাজিক মানসিক পোষণ পদার্থ তার দরকার। তা ভিন্ন বিকাশ অসম্ভব। যেমন প্রত্যেক মানুষ চায় নিজেকে প্রকাশ করতে। তার চিন্তা-ভাবনার যে বিশেষ মূল্য আছে এ কথা সে যেমন নিজে বুঝতে চায়, তেমনি বোঝাতে চায় অন্য লোককেও। সে চায় স্বীকৃতি। মানুষের বিকাশের জন্যে এই স্বীকৃতি বিশেষ প্রয়োজন। তা ভিন্ন নিজের প্রতি বিশ্বাস আসে না। যে মানুষ নিজেকে নিতান্ত মলোছন্ন বলে ভাবতে সুরু করলো সে জীবনের কষ্ট থেকে কি স্বীকৃতি আশা করতে পারে? কিছুই না। তাই গোটা জীবনটাই অর্থহীন হয়ে ওঠে।

এই স্বীকৃতি চায় এমন কি শিশুরা।

তারা চায় বাড়ীর অন্য সব লোক তাকে আদর যত্ন করুক, তার কদর বুঝুক। তাই তাকে বাহবা দিতেই হবে। এই স্বীকৃতি না পেলে তার বিকাশ রুদ্ধ হতে পারে। সে নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে বিমর্ষ হয়ে একা একা থাকতে পারে। পরবর্তী-কালে এই আঘাত তার সমস্ত ব্যক্তিকে জখম করতে পারে। হয় সে ইতালি বিফল মানুষ হিসাবে বড় হয়ে উঠবে অথবা তার মধ্যে জাগবে স্বীকৃতি, অশোভন ও উদগ্র কামনা। বলা বাহুল্য, বিকাশের এই দুই ধারা সমানভাবে অস্বাভাবিক।

গর্ব বা দম্ভ প্রকাশ কখন করি? যখন দেখি যে, জীবন বা সমাজের কাছে আমার ধারণা অনুযায়ী যতখানি প্রাপ্য ছিল, ঠিক ততখানি পাচ্ছি না, তখনই আমরা গর্বের আশ্রয় নেই। কেন না আমরা মনে করি যে নীরব অবস্থিলা আমরা সহ্য করছি তা ভেঙে যাবে যদি আমি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি। তাই গর্ব বা দম্ভ প্রকাশের মূলে লেই অহংকার কিম্বা আত্মসম্মান বোধ। বরং ঠিক তার উল্টোটাই আছে। তা হল কাঙালপনা এবং আত্ম-অবমাননা। ধাতাদের উদাহরণ দিয়ে বড়দের কথা ভাল বোঝানি যাবে। বাচ্চারা মায়ের আদর পাবার জন্য অকারণ কাঁদে। সে মনে করে মায়ের কাছ থেকে যতখানি স্নেহ ও যত্ন তার পাওয়া উচিত ছিল ঠিক ততখানি সে পাচ্ছে না। তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে। রাতদিন ঘ্যান ঘ্যান সহ্য না করতে পেরে চড়-চাপড়ের সংগে একটু বেশী স্নেহও পেয়ে থাকে। বড়দের অহংকার বা গর্ব প্রকাশ মনোগত অভিনাযের দিক

থেকে ঘান-ঘানে বাচ্চাদের সমতুল্য। আদতে তারা চায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। চায় লোকে তাকে দেখুক, প্রশংসা করুক।

অবশ্য আকাঙ্ক্ষা হিসাবে নিন্দার কিছু নেই। কারণ অজ্ঞাত হয়ে, অবহেলিত হয়ে থাকতে চায় না। জন সনাজে প্রতিষ্ঠা চায় সবাই। সবাই চায় আত্মপ্রকাশ করতে, বিকশিত হতে। এ নিতান্তই মানবিক প্রবৃত্তি। তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা চলবে না। সেজনা গর্ব বা অহংকার প্রকাশ করা যদি কারো কাছে আত্মপ্রকাশের গ্রহণীয় পথ হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে কিছু বলার মেই। অবশ্য যদি সেই গর্ব বা অহংকার প্রকাশ সভ্যতা-উন্নতির গন্ডী না ছাড়িয়ে যায়। ছাড়িয়ে গেলেই বিপদ।

আমাদের আশে পাশে এমন কত লোক আছে। আপনার অফিসেই দেখতে পাবেন এই ধরনের লোক। অফিসের কাজে খুব সুবিধা করতে পারছেন না। বড়-বাবুরা খুব পছন্দ করেন না। আপসি গিজেও দেখেছেন ভদ্রলোক খুব ঢল-সই নয়। কিন্তু তার মুখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য। নিজের ঢাক পেটাবার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। বাড়ীতে সেই ভদ্রলোকের হিম্ব-তম্বতে স্ত্রী পুত্র শক্তিত। কিন্তু এই অশোভন আত্মপ্রচারে তার কি কোন সুবিধে হয়? হয় না। ভদ্রলোক যদি একটু চিন্তা করেন তবে তিনি নিজেও বুঝবেন যে এতে হিতে বিপরীত হচ্ছে। সহকর্মীরা তাকে করুণা করতে সুরু করেছেন। অফিসারেরা নির্বিকার। পাড়া-পড়শী একত্রেই ঘ্যানঘ্যানানিতে বিরত। স্ত্রী পুত্র অস্থির। অন্তত অশোভনভাবে

বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর মাই
বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তথ্যের অভিধান
বিজ্ঞান ভারতী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি. কলি-১২



কেশুত

ডেমজ কেশ তৈল

নির্যাস কলিকাতা



অহংকার প্রকাশ করার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়।

বন্ধুবান্ধব বিবর্ত হলেও কিন্তু ভদ্রলোক এক ধরনের তৃপ্তি পান। সে তৃপ্তি কল্পনায়। তিনি মনে করেন যে, যে আবিচার তার ওপর করা হচ্ছে তিনি তার প্রতিবাদ করতে পেরেছেন। যেমন ভাবে তাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তিনি ভাল-ভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই কল্পনিক আনন্দে তার মানসিক শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু এও সত্য নয়। এ যে দিব্যাম্বন। এ ভেঙ্গে যেতে কতক্ষণ। সামান্য আঘাতেই ভাঙে। কারণ তিনি ত বাস্তব জীবনে তার মূল্য ও অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাই সাময়িক দিব্যাম্বনের আনন্দ পরবর্তীকালে গভীর ক্ষেভের কারণ হয়ে ওঠে। পৃথিবী তার প্রতিপক্ষ। প্রতি পদে নিজের অসহায়তা বোধ করতে থাকেন।

আর তাই অহংকার প্রকাশ করার ভগ্নী তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। তার থেকে আসে মানসিক ব্যাধি—যার নাম আত্মরতি, মানসিসজ্জম। নার্সিসাস নিজের প্রেমে পড়েছিল। জলার ধারে নিজের মূখ দেখতে দেখতে শূন্য হয়ে গেল সে। এ গ্রীক পুরাণের কথা। অতিরিক্ত অহংকারের অনিবার্য ফল নার্সিসজ্জম। বিশ্বভ্রমের দর্পণে নিজের মূখ ছাড়া

আর কিছু নজরে পড়ে না। এই আত্ম-মগ্নতায় কি পাওয়া যাবে? কবি সাহিত্যিকরা এই কথা শূনে মারমুখী হবেন। কারো কারো মতে একেবারে নিজের গভীরে যেতে না পারলে বিশুদ্ধ কবিতা নাকি লেখা যায় না। কিন্তু কবিতা সাহিত্যের কথা থাক। আমরা সাধারণ মানুষ। খাঁটি, খাই। সমাজ সংসারের সংগে আমাদের বিনিবনা করে থাকতে হয়। আত্মীয়-পরিজনের মন যুগিয়ে চলতে হয়। অফিসে বড়বাবুদের কটু কথা শূনেও হজম করতে হয়। মূখের ওপর ফাইল ছুঁড়ে ফেলার সাহস নেই।

সংক্ষেপে এই যাদের অবস্থা তাদের কাছে নার্সিসজ্জম কিন্তু ঘোড়া-রোগ। অসাধারণ লোকদের পক্ষে যা প্রতিভার অঙ্গ সাধারণ লোকদের কাছে তা বিষ।

অহংকার প্রকাশের রীতি ভিন্ন। এই প্রকাশ কখন সোচ্চার। এখন সোচ্চার প্রকাশকে সহজে বন্ধ করতে পারি। এই আত্ম-শ্লাঘা কখন গায়ে মাখি কখন মাখি না। কখন মানি কখন মানি না। কখন শূনি কখন শূনি না। কারণ এই প্রকাশের মধ্যে কোন গোপনীয়তা নেই, বৃদ্ধির বালাই নেই।

কিন্তু যারা নীরবে অহংকার প্রকাশ করে থাকেন তাঁরা আরও মারাত্মক। কারণ এ প্রকাশ শূন্যমাত্র রসনায় নয়, সর্বাত্মে। হাবোভাবে, চালাচলনে, কথায় বাতর্ন্য, আকারে ইংগিতে, এক কথায় লোকটির ব্যক্তিত্বের প্রতি পরতে পরতে এই নীরব অহংকার মূখর হয়ে বাজে। কারণ যদি খুঁজতে চান, তবে ঠিক একই জায়গায় আসবেন। দেখবেন ভদ্রলোকটি এ কথা বুঝেছেন যে সাধারণ সমাজ তার মূল্য বোধেনি তার প্রাপ্য তাকে দেয়নি। তাই তিনি নিজের ঢাক পিটিয়ে কাঙালপনা প্রকাশ করতে চান না। বরং তিনি সমাজকেই করুণা করে যাবেন।

অতি-বিনয় আর এক ধরনের অহংকার। বিনয় জিনিসটা ভাল। কিন্তু অতি-বিনয় হলে খারাপ। অতি-বিনয়ের মধ্যে থাকে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ। মানসিকতার দিক থেকে অতি-বিনয় আরো নিশ্চিন্ত। কারণ অহংকার করে সোচ্চার আত্ম-প্রকাশের মধ্যে যে অহং-বোধ কাজ করে তা বরং মানুষের ব্যক্তিত্বকে নাড়া দেয়, কিন্তু অতি-বিনয়ী ভদ্রলোকদের অহং-এর সেই জোরটুকু অবধি নেই। মেরুদণ্ডহীন এই অস্তিত্ব একান্ত করুণার।

গর্ব প্রকাশ করা মানুষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে যদি ঠিক পরিমিত গম্ভীর মধ্যে আটকে না রাখা যায় তবে তা চরিত্রকেই ধ্বংস করে। তাই সময়ে নিজের দিকে নজর রাখুন।



**লিলির
বার্লি বিস্কুট**
স্বাদেই জানা যায়

বিশুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

বাইরে থেকে ঐক্যে বিশ্ববাসী

জৈনিক আমেরিকান লেখক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—‘মাঝে মাঝে বাবা ঠিক করতেন, তাঁর অফিস আমাদের তিন ভাইয়ের স্কুল, মা-র ওপর বস্তু চাপ দেওয়া হচ্ছে। তিনি আমাদের শহরের বাইরে নিয়ে যেতেন। নদীর ধারে একটা পুরনো ধরনের বাংলা ভাড়া করা হতো।

সেখানে আমাদের শহরের বাড়ীর মতো আধুনিক বিলিব্যবস্থা ছিল না। বাবা বলতেন, এবার তোমায় মা একটু বিশ্রাম করতে পারবেন।

সকালে উঠে মা কেরোসিনের সেকলে স্টোভ জেলে আমাদের ব্রেকফাস্ট তৈরী করতেন। তারপর তিন মাইল দূরে বাজার করতে যেতেন। লাগু বানাতে, কাপড় কাচতে, ইন্দ্রী করতে তাঁর তিনটে বেজে যেত। চারটের সময় আমাদের নিয়ে বাবা নদীতে নৌকো চড়তেন। মা বারান্দায় টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসে সন্ধ্যা হবার আগে ছেঁড়া মেরামত মোজা সেলাই এবং রিপদ করতেন।

তাই দেখে বাবা বলতেন—‘আঃ, তোমার মা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আল-সেমি করতে পারছেন, দেখে আমার যা আনন্দ হচ্ছে!’

যাঁরা কেরিয়ার করেননি তাঁরা গল্পটি উপভোগ করবেন।

পঞ্চাশ বছর আগে, গৃহিণীরা গৃহ নিয়ে থাকতেন। তাঁদের কতব্যও ছিল মাপাজোকা। সেলাই ফোঁড়াই, ছেলেদের পড়ানো, স্বামীর কর্মচিন্তার ভার নেওয়া, দোকান-বাজার করা, এ তাঁরা ভাবতে পারতেন না। মধ্যবিত্ত সংসারের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হলেই বি-চাকর থাকত। রান্নার দিকটা দেখা ছাড়া গৃহিণীরা খুব বেশী কিছুর করেন না। যাঁরা বই পড়তেন, কাগজ পড়তেন, তাঁদের খুব নাম হ’তো। আজকাল গৃহিণীদের নাম হওয়া ভার।

অথচ কেরিয়ারটা বাইরে থেকে যাঁরা ঘরে এনেছেন, অর্থাৎ যাঁরা শূন্য ঘর-সংসার করছেন, তাঁদের দায়িত্ব আজকাল অনেক বেড়ে গিয়েছে।

যাঁরা বাইরে কাজ করেন, স্বামী-সন্তান ও সংসারের কাছে তাঁদের অনেক রেহাই মেলে। বাইরেই যার আট ঘণ্টা কাটে, সে কেমন করে এ সব করবে, এ কথা সকলেই বলেন।

যাঁরা কাজ করেন না, তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা, চিঠি লিখে তাঁর অবস্থা জানিয়েছেন।

তিনি বলছেন—‘আমি আই-এ পাশ। আমার স্বামীর আয় মাসে চারশো টাকা। আমার সন্তান দুটি। একটি মেয়ে, একটি ছেলে। দুটিই স্কুলে পড়ে। আমার বয়স আটশ। সাত বছর হলো বিয়ে হয়েছে।

দিনদিন, আমি অনুভব করছি, জীবনের গতিবেগ বেড়ে চলেছে অসম্ভব দ্রুত লয়ে। এবং হঠাৎ আমি আবিষ্কার করছি, আমাকে একলা একসঙ্গে অনেক-গুলো ভূমিকায় অভিনয় করতে হচ্ছে। তাই এই অশুভ অনুভূতিটা হচ্ছে। সময়টা যেন আমি হারিয়ে হারিয়ে ফেলছি। সকাল ছ-টায় উঠতে না উঠতে দেখি দশটা বেজেছে। আবার ভাত খেয়ে উঠতে না উঠতে দেখি বিকেল চারটে বাজল।

আমার কার্যসূচীটি শূন্য। তাহলেই আমার কথাটা বুঝবেন।

কাগজে মেয়েদের পাতা খুলে দেখেছি, যাঁরা ঘরে থাকেন, তাঁদের জন্যে হাজারটা নির্দেশ। আমাদের জন্যে যে কতগুলো ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার হিসেব নেই।

এতদিন আমি মা এবং স্ত্রী, এই বৈভব ভূমিকায় নামছিলাম। কিন্তু যুগটাই হচ্ছে স্পেশলাইজেশনের। তাই এই সব

ভূমিকার মধ্যে নানারকম নতুন ব্যাখ্যা আমদানী করা হয়েছে।

সংসারের তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে আমি কি কি কাজ করি দেখুন। আমি দুধের বাহক। কেননা ভোর ছটায় উঠে হরিণ-ঘাটার সেন্টারে গিয়ে দাঁড়াই। ফিরতি-পথে টাটকা ডিম-রুটি এবং দরজার গোড়া থেকে খবরের কাগজ আনা আমার কাজ।

স্টোভ ধরিয়ে দুধ বসাই। ডিম সেন্দধ করি। ওদিকে মেয়েকে ঘুম থেকে ওঠার জন্যে ডাকি। আমার স্বামী আমাকে শিশুদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে শিখিয়েছেন। তাই, মনে যা লাগবে বলে আমি জোরে ডাকি না। মিষ্টি করে ডেকে তুলি।

তাকে তৈরী করে স্কুলে পাঠাতে না পাঠাতে আমার বি আসে। তাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আমি স্বামী এবং ছেলেকে তুলি।

‘আপনার কাজের মধ্যে অনাবশ্যক ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়োর ভাবটি যেন না বোঝা যায়। আপনার স্বামীর সামনে সারাদিনের ব্যস্ততা। ট্রাম-বাস ধরবার তাড়া, অফিসে কাজের তাড়া—বাইরে যারা কাজ করে, অসুস্থ একটা দ্রুতগামীতা তাদের ব্যস্ত করে রাখে। মনে রাখবেন, আপনিই হচ্ছেন আপনার সংসারের প্রেরণার উৎস।’

সে কথা মনে রাখি। তাই, স্বামী এবং ছেলেকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট শুরুর করার সময়ে ঘড়ির দিকে না তাকাবার চেষ্টা করি। খবরের কাগজ থেকে স্বামী কি যেন খবর শোনান, আমার কানে অর্ধেক যায়, অর্ধেক যায় না। আমি কোনমতে চা-এর পেয়ালার নামিয়ে রেখে বাজারে ছুটি।

বাজারে জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। আমি তারই মধ্যে গুছিয়ে বাজার করে কোনমতে সামনের বাসটা ধরে ফেলি। স্বামী বলেন—এক স্টপ আসতে বাস দরকার হয়? বাঙালীর মেয়েরা—!

জবাব দিই না। কেননা তখন রান্নার ব্যবস্থা কুলিয়ে দেওয়া, স্বামীর দাড়ি কামাবার গরম জল, অফিসের জামা-কাপড়, শার্টটা একটু ইন্দ্রী করে দাওয়া লক্ষ্যীটি, মা আমার বাস আসবে এক্ষুণি, ছেলের জামাকাপড়, ভুগোল

আজ-কালকে গেছে, চিঠি ফিলে আজ-ও কমলালেবু? দাঁদিমাণি, মাহের কোল পড়ে গেল, আমার অফিসের ফাইলটা কোথায়?—সব একটার ওপর একটা হুড়-হুড় করে এসে পড়ে।

ন-টা বাজে। এখন বাড়ীতে শ্রুদ্দু আমি এবং আমার ঝি। ঘরদোর দেখলে কান্না পায়। ঘর-দোর পরিষ্কার করি। সাবান দিয়ে জামাকাপড় ভেজাই। কেননা, সিনেমাতে অতি সহজে জামাকাপড় কাচ-বার নিয়ম দেখে দেখে আমি এবং আমার স্বামী দুজনেই বিশ্বাস করতে শ্রুদ্দু করেছি ধোপার খরচটা নেহাত বাড়তি। আমিই এখন ধোপা। এই ভূমিকাটা আমাকে কম সময় আটকে রাখে না। তারপর রান্নার ব্যাক পর্ব সেরে আমি কোন-মতে বিকেলের খাবারটা গোছাই। স্নান করে উঠতে না উঠতে দেখি বাড়িতে সাড়ে বারোটা বাজল।

ছুটি মেয়ের ইন্ধুলে। সেখানে যে-সব মা-দের দেখি, তাঁদের কি সুখী, শান্ত, গোছালো ভাব। আমি বুদ্ধিতে পারি আমার মূখে পাউজরের ছোপ। আমার হাতে হলুদের দাগ।

বাড়ী ফিরে থেয়ে নিতে না নিতে ইন্দ্রী করতে শ্রুদ্দু করি।

তারপর আবার ঝি আসে। স্কুল থেকে ছেলে। মেয়ের সি-এল-টি। ছেলের ফুটবল ক্লাব। স্বামী আসবার আগে গা ধুয়ে সুখী সুখী চেহারা করে বসে থাকি। কেননা 'মনে রাখবেন, আপনার স্বামী সারাদিন পর আপনার গোমড়া মুখ দেখতে চান না।'

তারপর 'যখন স্বামীর সঙ্গে বেড়াবেন,

সঙ্গিনী বা বান্ধবীর মতো তাঁকে বন্ধুত্বের আনন্দ পেতে দেবেন'—তা-ও চেষ্টা করি।

'স্বামীকে নতুন নতুন কাজে প্রেরণা দেবেন। হয়তো আপনার স্বামী একটা নতুন কাজের বুদ্ধি নিতে চান। নতুন চাকরি, নতুন ব্যবসা, তাতে আপনি আমার কি হবে, এই বলে বাধা দেবেন না, বরং উৎসাহ দেবেন।'

তা-ও করি। স্বামী যখন রেডিও খুলে বসে কিমোন, আমি বলে দেখিছ—কেন এক কাজ নিয়ে পড়ে আছ? নতুন কিছু কর। পুরুষমানুষের সাহসী হতে হয়।—দেখিছ তিনি কিছুই বুদ্ধিতে পারেন না। বিরক্ত হন।

আমাকে সংসারের অফিস এ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করতে হয়। পোস্টাফিসে ছোট, চিঠিপত্র লেখা, ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেওয়া, জন্মদিন, বিয়ে, অন্ত্রাশন, গৃহপ্রবেশ, হাজারটা অনুষ্ঠানের খোঁজ-খবর রাখা সে-ও আমার-ই কাজ।

আজকাল কেউ গরম-জামা কিনে পরে না। তাই শীতকালে আমার হাতে উলকাটা, গরম কালে ছুঁচ-সুতো। কেননা বোতাম লাগানো, ছেঁড়া মেরামত করা, রিপদ করা এসব-ও আমার-ই কাজ।

আশ্চর্য কি, যে এর-ও পরে আমি ইলেকট্রিক বিল, হরিণঘাটার দ্রুতের টাকা, ছেলেমেয়ের ইন্ধুল, ক্লাব, সি-এল-টি'র টাকা সময়মতো দিতে ভুলে যাই?

আশ্চর্য কি, যে হঠাৎ যখন স্বামীর বন্ধুপত্নী বেড়াতে এসে কিউবার রাজ-নীতি, লুম্বা হত্যার অবিচার বা গাগারিংকে নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য

করতে থাকেন, তখন আমি বোকার মতো চেয়ে থাকি? সত্যি বলতে কি কাগজ পড়বার সময়ই পাই না। ছেলের কাছ থেকে টুকরো-টাকরা খবর জেনে নিই। সে শ্রুদ্দু খেলার খবর শোনায়। রাজ-নীতির চেয়ে খেলার খবরটা তবু আমি মনে রাখতে পারি।

কি কি পারি না—মহিলা সমিতির সংগঠনের কাজ করতে পারি না। কোন চ্যারিটির টিকিট বিক্রি করতে পারি না। পাড়ার লাইব্রেরীর জন্যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী করতে পারি না। এবং শ্রুদ্দুতে হয়—কি করেন? সারাদিন ত' ঘরেই থাকেন!

ঘরে যারা থাকার, তারা যে এক হাজার এক রকম ভূমিকায় কাজ করে চলবে এ ধারণা জন্মিয়েছেন বিলেত ও আমেরিকার মেয়েরা। বিলিভী ম্যাগাজিনের কল্যাণে তাঁদের কথা সবাই জানে, আর মনে মনে আশাও বাড়তে থাকে। আমাদের সম্পর্কে।

এদেশেও কেউ কেউ আছেন। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলারা যদি চারটি ছেলেমেয়ে সামলে টবের বাগান, দেয়ালে ফ্রেস্কা করবার সময় পান, স্বামীকে দরকারী ইনজেকশান দিতে শেখেন, তাতে-ও আমাদের অনিচ্ছ হয়।

ছেলেমেয়েদের কাছেও কথা শ্রুদ্দুতে হয়। দীপান্বিতার মা রেডিওতে গান করে। সত্যত-র মা ওয়েলফেয়ার অফিসার। বিশ্বপ্রিয়-র মা লেডি ডাক্তার, নিজে গাড়ী চালিয়ে আসেন।

ভাবছি এবার একটা চাকরি নেব। কোরিয়ার করিনি বলে এত কথা আর শোনা যায় না।



॥ জাতীয় অধ্যাপক ॥

রোডও-ফিজিক্সের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক-বিজ্ঞানী অধ্যাপক এস. কে. মিত্র পদার্থ-বিদ্যার জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রক এই জাতীয় অধ্যাপক পদের স্রষ্টা। ১৯৪৯ সালে ডঃ সি. ভি. রমণ সর্বপ্রথম জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার পর এ পর্যন্ত অধ্যাপক মিত্রকে নিয়ে মোট ছয়জন বিজ্ঞানীকে জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হল। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা যাতে তাঁদের সমস্ত সময়টুকু গবেষণার কাজে দিতে পারেন এবং প্রয়োজনমত ভারতের যে-কোন গবেষণাগারে গিয়ে গবেষণা করতে পারেন তারই জন্যে এই জাতীয় অধ্যাপক পদের সৃষ্টি করা হয়। জাতীয় অধ্যাপকরা ভারতের সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই অধ্যাপক, একারণে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্ররাও প্রয়োজনমত তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা-লাভের সুযোগ পাবেন।

অধ্যাপক মিত্রের এই স্বীকৃতি ও সম্মানে বাঙালী মাত্রেই গর্বিত।

॥ বিনা টিকিটের যাত্রী ॥

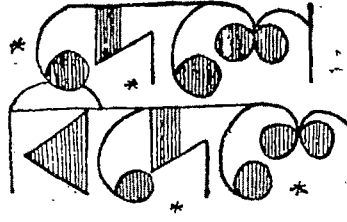
সংবাদে প্রকাশ, উত্তর রেলপথের কর্তৃপক্ষ বিনা টিকিটের যাত্রী ধরার উদ্দেশ্যে একদিন ট্রেনের বিভিন্ন শ্রেণীর কামরায় অতিক্রান্ত হামলা চালিয়ে যাদের গ্রেপ্তার করেন, দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে বিনা টিকিটে ভ্রমণরত একজন ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে শিক্ষক, ছাত্র, রেল কর্মচারী, পুলিশের লোক প্রভৃতি সব ধরনের লোকই আছেন।

লক্ষ্যের সাংবাদিকদের কাছে ঘটনাটি বর্ণনাকালে ডিভিশনাল কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেন, রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আজ এইটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা যে, সমাজের ওপরতলার লোকেরাই এখন বেশী করে বিনা টিকিটে ট্রেনে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন। তাঁদের তুলনায় গ্রামের লোকেরা এখন অনেক বেশী সৎ।

বিনা টিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া ও ফাইন আদায় করে উত্তর রেলপথের কর্তৃপক্ষ গত মাসে ৬৭ হাজার টাকা আদায় করেছেন।

॥ শ্রেষ্ঠ দান ॥

মধ্যপ্রদেশের দুর্গ জেলার মানিয়ার গ্রামের এক দরিদ্র অধিবাসী হিন্দ্রম



হাজার খানেক টাকা ব্যয়ে সদ্যানির্মিত তাঁর কুটিরখানি গ্রামের পাঠশালাকে দান করে দিয়েছেন। গ্রামের শিশুদের একমাত্র শিক্ষালয়টি এতদিন একটি আস্তাবলে ছিল, হিন্দ্রমের মহানুভবতায় এবার তার কুটিরে স্থানলাভ হল। কিন্তু নিরাশ্রয়ী হতে হল হিন্দ্রমকে।

॥ দণ্ডদান ॥

টেমস নদীর তীরে অবস্থিত বটেনের ঐতিহাসিক দুর্গ টাওয়ার অব লন্ডন। বিজয়ী উইলিয়াম দশম শতাব্দীতে নির্মাণ করেন এই বিশাল দুর্গ এবং সেই থেকে প্রথম জেমসের শাসনকাল পর্যন্ত টাওয়ার অফ লন্ডনই ছিল ইংলন্ডের রাজপ্রাসাদ। এখনও ইংলন্ডের রাজশাসনের সঙ্গে টাওয়ার অফ লন্ডনের আবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

শোনা যায়, টাওয়ার অফ লন্ডনের নির্মাণের দিন থেকেই সেখানে বংশ-পরম্পরায় বাস করছে কয়েকটি অশুভ-দর্শন বৃহদাকৃতি দাঁড়কাক। একদিন বিশেষ উদ্দেশ্যেই ওদের টাওয়ারে স্থান দেওয়া হয়েছিল। সে উদ্দেশ্যটি হ'ল খাদ্য পরীক্ষা। কোন ষড়যন্ত্রকারী রাজার খাদ্যের সঙ্গে কোন কৌশলে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে কিনা তা দেখার জন্য রাজাকে পরিবেশনের প্রাক-মুহুর্তে যাবতীয় খাদ্য ঐ দাঁড়কাকগুলিকে খাইয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হ'ত। একারণে এখনও ঐ দাঁড়কাকদের প্রধান খাদ্য মাংস। সহস্রাব্দব্যাপী দুর্গাশ্রয়ী ঐ দাঁড়কাকগুলিকে নিয়ে বহু কিংবদন্তী ও কুসংস্কার গড়ে উঠেছে ইংলন্ডে। তার মধ্যে একটি হল যে, ইংলন্ডের রাজ-মুকুটের অভিভাবক ওরা, ওরা উড়ে গেলে রাজমুকুটও ভুলদ্রুতিত হবে। একারণে সরকার থেকেই বিশেষ পরিচর্যা ব্যবস্থা আছে ঐ দাঁড়কাকদের। কিন্তু সম্প্রতি অসদাচরণের জন্য কর্তৃপক্ষ ওদের দণ্ড দিতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমানে টাওয়ারবাসী সাতটি দাঁড়কাককে চোন্দ দিন খাঁচাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা টাওয়ারের প্রাঙ্গণে

কিছুতেই নতুন ঘাস গজাতে দিচ্ছিল না। নতুন করে ঘাসের বীজ বপন করলেই ওরা মাটির তলা থেকে তুলে সেগুলি খেয়ে ফেলছিল। কর্তৃপক্ষের আশা, রাজ-মুকুটের অভিভাবকদের খাঁচার মধ্যে চোন্দ দিন আটকে রাখতে পারলে সেই অবসরে ঘাসগুলো বেড়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। তবে অভিভাবকদের পরিচর্যা কোন রুটি হবে না, বন্দী অবস্থাতেও তাদের মাংস সরবরাহ করা হবে।

॥ দণ্ডভোগ ॥

অগ্র-পশ্চাত্ত বিবেচনা না করে সবত্র নাক গলাতে যাওয়া যে নিরাপদ নয়, এবং আপাতদৃষ্টিতে উচিত কাজ বলে বিবেচিত হলেও তা করার আগে যে অন্ততঃ দু'বার ভাবা দরকার তা গাঁটের পয়সা গুলুনোয়ার দিয়ে বুঝতে পেরেছে লন্ডনের দুই পরোপকারী। রাস্তায় হঠাৎ একটি দুর্বল লোকের ওপর এক সবলকায় ব্যক্তিকে হামলা করতে দেখে তারা ছুটে গিয়ে তাদের ছাড়িয়ে দেয়, আর সেই ফাঁকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। কিন্তু তারপরে তারা জানতে পারে যে, সবল লোকটি একজন সাদা পোশাকের পুলিশ এবং আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ ঐ ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি একটি পাকা শয়তান।

পুলিশের কাছে বাধা দেওয়ার অপরাধে দু'জনকেই পাঁচ পাউন্ড করে জরিমানা করা হয়েছে।

॥ রাজা মহেন্দ্র ॥

অবশেষে নেপালরাজের দিল্লীতে আসা পাকাপাকিভাবে স্থির হয়েছে। ১৮ই এপ্রিল আসছেন তিনি ভারতের রাজধানীতে।

নেপালের গণতন্ত্রবিমুখ বর্তমান শাসকবর্গের এটা বোঝার সময় এসেছে যে, শূদ্র অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দেশের মানুষকে চিরদিন দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। দেশের মানুষকে বিক্ষুব্ধ রেখে কোন শাসনই স্থায়ী হতে পারে না, যতদিন থাকে ততদিনও প্রতি মুহুর্তে শাসকদের শঙ্কিত থাকতে হয় অত্যন্ত বিপর্যয়ের আশংকায়। ইতস্ততঃ অভ্যর্থনা লেগেই আছে নেপালে। সম্প্রতি খবর এসেছে, সিকিম-নেপাল সীমান্তে নেপালের বিস্তৃত অঞ্চল এখন দেশভক্ত বিদ্রোহীদের কবলে এবং গত দু'মাসের চেষ্টাতেও নেপালের রাজকীয় বাহিনীর

পক্ষে সে অঞ্চল পুনর্দখল করা সম্ভব হয়নি। নেপাল-রাজ ও তাঁর পারিষদদের অবশ্য এখনও ধারণা যে, বিদ্রোহীদের শক্তির মূল উৎস হ'ল ভারত এবং একারণে ভারতের বিরুদ্ধে বিযোগ্যারে তাদের বিরাম নেই। সম্প্রতি দুজন ভারতীয় সাংবাদিককে নেপাল থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছে “নেপাল-ভারত সম্পর্ক ক্ষুরকারী” সংবাদ প্রচারের অভিযোগে। এ অবস্থায় রাজা মহেন্দ্র যে দিল্লীতে আসছেন সেটা অবশ্যই আশার কথা। চীনের বর্তমান অর্থনৈতিক মনোভাব ও আচরণের ফলে ভারতের উত্তর সীমান্ত এখন যেভাবে বিপন্ন তাতে নেপালে শান্তি বজায় থাকা ভারতের স্বার্থেই বিশেষভাবে প্রয়োজন। নেপালে গণ-অসন্তোষের ফলে রাজ-শাসন যতই অপ্রিয় ও দুর্বল হবে ততই চীনের পক্ষে নেপালে অনুপ্রবেশ সহজতর হবে। ভারতের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে এ অবস্থা দেখা কোনমতেই সম্ভব নয়। একারণে নেপালে স্থায়ী ও জনপ্রিয় শাসন কায়েম হওয়ার ব্যাপারে ভারত বিশেষভাবে, এবং খুব সংগতভাবেই আগ্রহী। এ অবস্থায় রাজা মহেন্দ্র যদি নেপালের গণতান্ত্রিক শক্তিকে দমনের অসম্ভব চিন্তা ত্যাগ করে ভারত সরকারের ইচ্ছামত তাঁদের সঙ্গে আপোষে আসেন এবং আবার নেপালে গণ-শাসন কায়েম করেন তবে সেটা নেপাল ও ভারত উভয়ের পক্ষেই বিশেষ কল্যাণকর হবে।

১১ আট মাসের নোটিশ ১১

ইন্দোনেশিয়ার বিমানবাহিনীর এক কুচকাওয়াজে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ বলেছেন, আট মাসের মধ্যে যদি ওলন্দাজরা পশ্চিম ইরিয়ান ত্যাগ না করে, তবে ১৯৬৩ সালের জানুয়ারীতে জোর করে পশ্চিম ইরিয়ানকে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা ইতিমধ্যে যদি হল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়

তবে তা কার্যকরী করার জন্যে যতদিন দরকার ইন্দোনেশিয়া ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে। প্রসঙ্গক্রমে ডঃ সুকর্ণ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত “বাৎকার পরি-কল্পনা” গ্রহণে ইন্দোনেশিয়া সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ঐ পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, ওলন্দাজদের হাত থেকে পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে দু'বছর তাকে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে রাখা হবে, এবং ওরই মধ্যে তার প্রশাসনিক দায়িত্ব ইন্দোনেশিয়ার সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রস্তাব ওলন্দাজ সরকারের মনোমত হয়নি বলে জানা গেছে। এ সম্পর্কে তাদের প্রধান অভিযোগ নাকি এই যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার শূদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করেই এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন এবং তারপর তা জানিয়েছেন তাদের। কিন্তু ওলন্দাজ সরকারের মনোভাব যাই হোক না কেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাৎকার পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ যদি আন্তরিক হয়, তবে হল্যান্ডকে শেষ পর্যন্ত তা মেনে নিতেই হবে। এবং বিনা রক্তপাতেই সম্ভব হবে পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তি।

১২ সিরিয়া ১২

সিরিয়ার রাজনৈতিক নাটকের ওলট-পালট এখনও শেষ হয়নি। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, নাসেরপন্থী ও নাসের-বিরোধী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিরোধের মীমাংসা এখনও হয়নি এবং এই মীমাংসার আশাতেই উভয়পক্ষ নাকি সিরিয়ায় আবার অসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল আবদেল করিম জাহেরোদ্দিন গত ১০ই এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তিন দিনের মধ্যেই সিরিয়ায় অসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সরকার গঠিত হবে। সুতরাং, অমৃতের এই সংখ্যা যখন প্রকাশিত হবে তখন হয়ত দেখা যাবে, সিরিয়ার শাসন-দায়িত্ব আবার এক অসামরিক সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে সেই অসামরিক সরকারের সদস্য কারা হবেন তার মীমাংসা করা বোধ হয় খুব সহজে সম্ভব হবে না। কারণ, প্রধান সেনাপতি তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে পদচ্যুত প্রান্তন প্রেসিডেন্ট ডঃ নাজেম কুদসি সম্মুখে বিরূপ মন্তব্য করে বলেছেন, তাকে আটক রাখা হয়েছে। অথচ বেরুত থেকে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে, সিরিয়ার প্রস্তাবিত অসামরিক সরকারের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা ডঃ কুদসিরই সুবচেয়ে বেশী। তবে তিনি নাকি পাল-মোস্তাইবহীন মন্ত্রিসভার দায়িত্ব গ্রহণে রাজী নন। সুতরাং সিরিয়ার সৈন্য-

বাহিনীর বিবদমান দুই পক্ষ অসামরিক সরকারের হাতে আবার সিরিয়ার শাসন-দায়িত্ব তুলে দিতে সম্মত হলেও সরকারের সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে একমত হওয়া তাঁদের পক্ষে বোধহয় খুব সহজে সম্ভব হবে না।

১৩ ফ্রান্সে গণভোট ১৩

আলজিরিয়ার প্রশ্নে গণভোট হয়ে গেল ফ্রান্সে, এবং সেই সুযোগে মস্ত একটা অপবাদ থেকে মুক্তি পেল ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা মন্ত্রের উদ্গাতা ফ্রান্স, একদিন সারা পৃথিবীর নির্ধারিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে সে। কিন্তু মুক্তি-মেয় সাম্রাজ্যবাদের নিলজ্জ লোভের ফলে ফ্রান্স তার সন্মান হারাতে বসেছিল। গণভোটের ফলাফলে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের প্রকৃত মনোভাব আর একবার সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হ'ল। জানিয়ে দিল ফ্রান্সের শতকরা নব্বইজন মানুষ যে আলজিরিয়াকে তারা শৃঙ্খলিত রাখতে চায় না।

গণভোটের নির্দেশমত নয়জন মুসলিম ও তিনজন শেবতাগ্ন নিয়ে গঠিত আল-জিরিয়ার অস্থায়ী শাসন-পরিষদের হাতে গত ১০ই এপ্রিল আলজিরিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসনদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নে আলজিরিয়ায় গণভোট গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা থাকবে, তারপর গণভোটের সিদ্ধান্ত অনুকূল হলে স্বাধীন সার্বভৌম আলজিরিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে আর কোন বাধা থাকবে না।

আলজিরিয়া স্বাধীনতা অর্জন করার পর আফ্রিকায় ফ্রেঞ্চ সোমালিল্যান্ড ছাড়া আর কোন উপনিবেশই ফরাসীদের হাতে থাকবে না।

আফ্রিকার বাইরে ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে কয়েকটি দ্বীপ-উপদ্বীপ ও দ্বীপাংশের ওপর ফরাসী কর্তৃত্ব অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু তবুও ফ্রান্স বহু শক্তি বলেই বিবেচিত হবে, আর তা হবে তার পারমাণবিক শক্তির জোরে নয়। ১০৪ সদস্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের একুশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যখন ফরাসী কায়দায় দাঁড়িয়ে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে অকুতোভয়ে জানাবেন নিজেদের অভিযোগ ও আহ্বান, তখনই বার বার করে প্রমাণ হবে বিশ্বের ইতিহাস, রাজনীতি ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে মহান ফ্রান্সের অনন্য ভূমিকা।

ধবল বা শ্বেত

রোগ স্থায়ী নিশ্চিত করুন!

অসাড়, গলিত, শ্বেতিরোগ, একজিমা, সোরাইসিস ও দুর্বল ক্ষতাদি দ্রুত আরোগ্যের নব-আবিষ্কৃত ঔষধ ব্যবহার করুন। হাওড়া কুণ্ড কুটীর। প্রতিষ্ঠাতা—পার্লভ রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, -খরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২০৫৯। শাখা—৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হারিসন রোড), কলিকাতা—৯।

সত্যবাহু

॥ ঘরে ॥

৫ই এপ্রিল—২২শে চৈত্র : প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পরিকল্পনা পর্বৎ গঠনের প্রস্তাব—রাজ্য সরকারগুলির নিকট কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ।

রাষ্ট্রপতির নিকট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর পদত্যাগপত্র পেশ—পত্র প্রাপ্তির পরই শ্রীনেহরুকে প্রধানমন্ত্রী পদে পুনর্নিয়োগ।

৬ই এপ্রিল—২৩শে চৈত্র : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পশ্চিম-বঙ্গকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্যম—কর্মসূচী সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আবেদন।

কলিকাতার সমিহিত কয়েকটি গ্রামে ‘পকেট দুগ্ধ কলোনী’ স্থাপনের পরিকল্পনা—নগরীর বিপুল দুগ্ধ চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকারী প্রয়াস।

৭ই এপ্রিল—২৪শে চৈত্র : কলেজের অধ্যাপকদের নির্দিষ্ট বেতনের হার চালু রাখার অনুরোধ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পত্র।

‘ভারতীয় বাহিনীর কার্যকলাপ বিশ্ব ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছে’—রূপো প্রত্যাগত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সম্বর্ধনায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের মন্তব্য।

৮ই এপ্রিল—২৫শে চৈত্র : পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি—গত বৎসর অনাবৃষ্টিজনিত ব্যাপক শস্য-হানির জের—টেক্সটাইল ও সাহায্যের ব্যবস্থা। (সংবাদ)

নিরস্ত্রীকরণই আমাদের স্বপ্নের পৃথিবী রচনায় একমাত্র পথ—বোম্বাই-এর সভায় শ্রীমেননের (প্রতিরক্ষামন্ত্রী) ঘোষণা।

অবিলম্বে আন্তর্জাতিক অস্ত্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতা বন্ধের দাবী—জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত শান্তি সম্মেলনের (মহাদিগ্গী) প্রস্তাব।

৯ই এপ্রিল—২৬শে চৈত্র : সার্বভৌম পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী লইয়া শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে

নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মন্ত্রীদের নাম ও দপ্তর ঘোষণা।

‘গ্রামাঞ্চলের লোকদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণের প্রশ্ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ’—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের মন্তব্য।

১০ই এপ্রিল—২৭শে চৈত্র : রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুসমেত নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত পালী-মেটের প্রাক্তন সদস্য শ্রীকংসারি তাল-দারের মজিলাভ—কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক আপীলের আবেদন মঞ্জুর।

১১ই এপ্রিল—২৮শে চৈত্র : ‘মলো-হর ক’হানিয়া’ নামক হিন্দী পুস্তককে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় একদল মুসল-মানের উচ্ছৃঙ্খলতা—রাজপথে যথেষ্ট ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হামলা—১৫০ জন গ্রেপ্তার।

মালদহে হিন্দুদের গৃহে দুর্বৃত্ত-দলের অগ্নিসংযোগ—৫ ব্যক্তি নিহত—সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অনুবৃত্তি বলিয়া ধারণা।

॥ বাইরে ॥

৫ই এপ্রিল—২২শে চৈত্র : ‘ভারত পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ না করার প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত’—রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ. থান্টের সাক্ষাৎকারের উত্তরে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীসি এস্ কাশ্‌র লিপি।

‘পৃথিবীর এক কোটি অশ্বের মধ্যে অর্ধেকের দৃষ্টিশক্তি ফিবিয়া পাত্থা সম্ভব’—বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থার পত্র।

৬ই এপ্রিল—২৩শে চৈত্র : লন্ডন বৈঠকের পর কেনিয়ার শাসনাত্মিক ভাবিহাৎ সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরিত—স্বাধীন-শাসন কার্যক্রমের মধ্যে নতুন আফ্রিকান কোয়ালিশন সরকারের গঠনের প্রস্তাব।

মধ্য ভিয়েতনামে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান।

৭ই এপ্রিল—২৪শে চৈত্র : আল-জেরায় অস্থায়ী শাসন পরিষদের কার্য-ভার গ্রহণ—নয়জন মুসলমান ও তিনজন ইউরোপীয় লইয়া পরিষদ গঠিত।

‘স্বাস্থ্য পরিষদে কাম্বোজ প্রসঙ্গে রপশিয়া ভেটো প্রয়োগ করিলে প্রশ্নটি সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করা হইবে’—সাংবাদিকদের নিকট পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুবের উক্তি।

৮ই এপ্রিল—২৫শে চৈত্র : ‘নেপাল-সিকিম সীমান্তে দুইটি অঞ্চল (থিংগা-চপ ও মিমিং) নেপালী বিদ্রোহীদের দখলে—মধ্যে মধ্যে সামরিক ও পুলিশ ফাঁড়িসমূহে বিদ্রোহীদের হানা’—নেপাল সরকারের ইস্তাহার।

৯ই এপ্রিল—২৬শে চৈত্র : ‘শান্তির পথে না হইলে পশ্চিম ইরান উদ্ভারে ইন্দোনেশীয়া যুদ্ধে নামাবে’—ইন্দোনেশীয়া প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকার্নোর সতর্ক-বাণী—পঃ ইরান ত্যাগে ওলন্দাজদের আট মাসের মোরাদ দান।

প্রেসিডেন্ট দা গলের আলজিয়ার শান্তিচুক্তির পক্ষে বিপুল সমর্থন—ফ্রান্স গণভোটের ফলাফল ঘোষণা।

রাষ্ট্রসংঘে এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।

১০ই এপ্রিল—২৭শে চৈত্র : ক্রাশেভের (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) নিকট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি-র যুক্ত বক্তব্য—আণ-বিক অস্ত্র পরীক্ষার আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মনোভাব পরিবর্তনের অনুরোধ।

‘রুশ-ভারত মৈত্রীতে বিশ্বশান্তি আঁসিবে ও উপনিবেশবাদ অবলম্বিত নইবে’—নতুন মন্ত্রিসভা গঠন উপলক্ষে শ্রীনেহরুর নিকট ক্রাশেভের লিপি।

১১ই এপ্রিল—২৮শে চৈত্র : ‘ইংল-মার্কিন যৌথ নিরস্ত্রীকরণ পদক্ষেপ প্রচার-কৌশল গ্রহণ’—সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী ‘টাস’-এর মন্তব্য।

‘সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সন্ত-মিলন সম্পর্কে গণভোট গড়ানর পক্ষ বিবেচনা করা হইবে’—মিসরাস পদান সেনাপতি মেজর পেঃ করিমের বিবৃতি।

সমকালীন সাহিত্য

অভ্যুদয়

॥ শতাব্দীর স্বপ্ন ॥

ভারতের ইতিহাসে পাজাব চিরদিনই এক গৌরবের আসন লাভ করেছে, তার বিশিষ্ট ভূমিকা। বার বার অভিযান হয়েছে, শত্রুসৈন্যের অশ্ব, হস্তী ইত্যাদির পদধ্বনিতে অরণ্য-প্রান্তর মুখরিত হয়েছে, রাজা পালাটিয়েছে, রাজ্য পরিবর্তিত হয়েছে, ধর্মীয় মতবাদের রূপান্তর ঘটেছে সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ঘটেছে প্রচুর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাজাবের সঙ্গে সম্মানের সমান আসন দাবী করতে পারে বঙ্গদেশ। দুটি প্রদেশের কোন্ঠীও যেন একই রকমের। তাই শেষ পর্যন্ত দু'জনেরই অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে।

আর্য, গ্রীক, হুন, মোগল-পাঠান এবং সর্বশেষ শিখ সম্প্রদায়, সকলেই পাজাবে নায়কত্ব করেছেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক বছর আগে পাজাব রণঙ্গমে ইংরাজের পদধ্বনি শোনা গেল। পাজাবের অদৃষ্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজসূচী-কান-ঘেঁষে গেছে, যাই হোক ইংরাজ-আগমনের পর থেকে অন্ততঃ কিছুকাল শান্তি ও প্রগতির মধ্যে পাজাব কাটিয়েছে।

প্রথম কমিশনার লরেন্স অমায়িক বদমাশ। কয়েকটি সংস্কার তিনি করে-

ছেন, একটা প্রশাসনচক্র, নতুন আদালত, এবং পুলিশ বিভাগ স্থাপন করেছেন। ভূমিরাজস্ব এবং ভূমিসংক্রান্ত নথিপত্র সংগৃহীত রাখার ব্যবস্থা করেছেন, শিক্ষাবিস্তার, চাষবাসের উপযোগী খাল কাটানোর ফলে অনেক মরু-প্রান্তর শস্যশ্যামলা হয়ে উঠেছে। এই সব কারণে পাজাবের সমাজ-জীবনে এসেছে এক প্রচণ্ড পরিবর্তন। প্রাচীন রীতির রূপান্তর ঘটেছে-নিঃশব্দ বিপ্লবের মাধ্যমে।

পাজাবীর অদৃষ্টে কিন্তু শান্তি সয় না। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে এল দেশবিভাগ, যার ফলে এই পরিবর্তনশীল, শান্ত, সমৃদ্ধ অঞ্চলে নেমে এলো এক দুঃসহ দুঃখের অশ্রুভর মূহূর্ত। সামাজিক জীবনের অগ্রগতির পথে আকস্মিক সমাপ্তি ঘটল, শান্তি বিঘ্নিত হল।

প্রকাশ টানডনের আত্মজীবনীমূলক রচনা Punjabi Century নামক সদ্য প্রকাশিত, বহুল প্রশংসিত এবং আলোচিত গ্রন্থটিতে আছে পাজাবী সমাজ-জীবনের শতাব্দীব্যাপী ধারাবাহিক বিবর্তনের কথা, ব্রিটিশ পতাকার নীচে যে উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' সমাজ গড়ে উঠেছিল তার কাহিনী। লেখকের খুন্সী-পিতামহ ঠাকুরদাসের জীবন এবং সমসাময়িক কাল থেকে এই কাহিনীর সূচনা। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরদাসের জন্ম, কাহিনী শেষ হয়েছে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখকের পিতা রামদাসের মৃত্যুতে।

মরিস জিনাকিন এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

"nothing is more important to the illumination of history than good autobiography"—তবু এ কথা স্বীকার করা উচিত যে আত্মজীবনীর পরিধি সীমিত এবং শিল্পকর্ম হিসাবে তা দুর্বল। প্রকাশ টানডনের এই গ্রন্থটি কি সুন্দর আত্মজীবনীর এক উৎকৃষ্ট নমুনা, বিগত শতকের উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এক নিখুঁত চিত্ররূপ এই "Punjabi Century"। প্রথম দর্শনেই

পাজাবের সঙ্গে ইংরাজের প্রেম ঘটেছিল, কিন্তু অতিদ্রুত ইংরাজ আর পাজাবীর মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। লেখক বলেছেন—

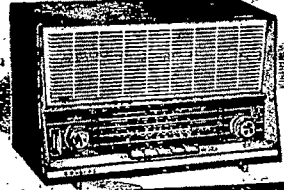
"Our society was extrovert and adaptable. It had while retaining its internal structure, adapted itself to each change until, like the exposed cross section of an archeological excavation, it showed layers of characteristics piled one upon the other from each external impact. And this the British impact, was comparatively so gentle and persuasive that the Punjabi for once enjoyed the process of change and adaptation".

টানডন পরিবারে লালা ঠাকুরদাস সবপ্রথম ম্যাদ্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করলেন, বছর-খানেক আইন শিক্ষা করার পর একেবারে পাকা উকিল হয়ে পসার জমালেন। তাঁর স্বগ্রাম গুজরাটে একটি বিরাট প্রাসাদ বানালেন। সম্মান, সমৃদ্ধি ইত্যাদি আহরণ করে, দীর্ঘ-জীবন সুখে ও স্বচ্ছন্দে ভোগ করলেন। উত্তম আহাৰ্য এবং মনোরম আলাপচার তাঁর প্রিয় ছিল। যা কিছু নতুন ও উদ্ভেজক, তাই তাঁর ভালো লাগত।

লেখকের পিতৃদেব রামদাস ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে জীবনযাত্রা শুরু করেন, এবং উত্তরকালে Imperial Engineering Service-এর অন্তর্ভুক্ত হন। পাজাবের বিভিন্ন অঞ্চলে খাল এবং বাঁধ রচনা করেছেন, এর ফলে পাজাবী কিশোরের দুঃখ, দুর্দশা দূরীভূত হয়েছে। যে যুগের মানদুঃখের জীবনের রত্ন ছিল শিক্ষা আর সেবা, তিনি সেই যুগের মানদুঃখ। কংকরকঠিন পথের বাধা অতিক্রম করে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। প্রাচীন পাজাবী চরিত্রে রামদাস কিছু নতুন মূল্য আরোপ করেছিলেন—
"There was no contradiction or ambivalence in his make up; he was all of a piece and lived up to what he preached".

দুই পুরুষের এই সমাজ অভ্যন্তর স্নেহময় এবং মমতাময়। যেখানে প্রচুর অবসর, অভাব ও অনটনহীন পরিবেশ, জীবন সেখানে মন্দাকান্ততা তালে প্রবাহিত হত। প্রতিবেশী, আত্মীয় প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। "শোকযাত্রা, পারিবারিক অসুখ-বিসুখ, বিবাহ-উৎসব, প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের কাছ থেকে সাহায্য-প্রার্থনা প্রভৃতির দাবী সর্বাগ্রে মানতে হবে, হাতের কাজ ফেলে রেখেও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করো। হাতের কাজ কর্ণদ্বয় নয় হয় ত্রয়ে

নভোজেনিক
ফিলিপস
রেডিও



উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য
জি.রোজার্স কো.
১২ ডালহাউসী স্ট্রিট, কলিকতা

থাক। এই হল কত'বাক্য', কোনো প্রশ্ন নয়, কোনো স্মৃতি নয়, সর্বগ্ৰে তাঁ পালন কর।—সকল শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই নীতি মেনে চলত। ব্রিটিশের চাকরিতে কিন্তু অন্য জাতের নিয়মানুবর্তিতা, তাই এই প্রাচীন রীতি ধ্বংস হয়ে গেল। জীবনের কাজকর্ম, ঘণ্টা, মিনিটের রুটিনে বাঁধা পড়ল।

লেখক পাজাবের মানুষের জীবন, সামাজিক আচার-ব্যবহার, খাদ্যরীতি, পোশাক, বিবাহবিধি, শোকযাত্রা, শোক-প্রকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে নিখুঁত ছবি এঁকেছেন। গ্রীষ্মকালে ছাতের ওপর খাটিয়া উঠে যায়, সেই উন্মুক্ত আকাশের নীচে জীবন এক বিচিত্র মায়াময় রূপ গ্রহণ করে—

"On moonlit nights the country became ethereal and unreal. Sometimes you would wake with a large bright white moon staring down in your face. The full moon will stare at couples sleeping on roof terraces. It would make the shy bride feel guilty in her husband's embrace as the intruder looked shamelessly on her body which she was just discovering for herself". চাঁদের এমন দুর্নাম আর শোনা যায়নি। এই গ্রন্থে এই জাতীয় অসংখ্য সুন্দর অংশ আছে। কারাধর্মী এই সমস্ত অংশাবলীতে লেখকের কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন পাজাবী সমাজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ছিল অবহেলিত। ব্রাহ্মণরা লেখাপড়া তেমন জানতেন না, তাই তাঁদের সম্মান ছিল না। নাপিতের কিছু প্রচণ্ড মর্যাদা ছিল। নাপিতের ভূমিকা ছিল ঘটকের, বিবাহাদি সেই ঠিক করত, সামাজিক অনেক কর্মে সে উপদেষ্টা। 'বিরাদার' ব্যবস্থা তখনও অক্ষুণ্ণ, তাকে সংরক্ষণ করতে পণ্ডারোচিত ব্যবস্থা। এঁদের সামাজিক শাস্তিদানের ক্ষমতা ছিল, একঘরে করে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া হত।

কয়েকটি বিচিত্র সামাজিক বিধিও ছিল, যেমন জননী কখনও কন্যাগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করবেন না, যদিও করেন তাহলে আহার ও বাসস্থানের জন্য মূল্য দিতে হবে। পেশাদারী শোকপ্রকাশ আর এক বিচিত্র সামাজিক রীতি, ভাড়াটে লোক ধরে এনে কাঁদানো। এর চেয়ে বীভৎস 'সিপয়া' বিধি। পঁচিশ বা ততোধিক স্ত্রীলোকের এক দল এসে "Would bare their breasts and

grid up their garments to bare their thighs, and at a word from their leader, begin to beat their breasts, their cheeks, their foreheads and thighs rhythmically in that order, keeping time with the mourning song, sung in a quick tempo".

নতুন শিক্ষাবিস্তারের ফলে এ সর্বের পরিবর্তন ঘটলেও, সব কিছুই হয়নি এবং প্রাচীন মূল্যবোধের অবসান ঘটনি। এই সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে পুরুষেরা যেমন দ্রুতগতিতে এগিয়েছেন, মেয়েরা তেমন সমান ভালে পা ফেলতে পারেননি। লেখক বলেছেন— "Our father changed rapidly and mother slowly and between them my generation managed to learn the new without entirely forgetting the old"

পশ্চিম পাজাবের এই শান্ত এবং টিম-তেভালার জীবন আর্য সমাজী আন্দোলন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডেও তেমন বিচলিত হয়নি। শিক্ষিত পাজাবীরা এ সব ঘটনার সাময়িক আলোচনা করেই আবার বিস্মৃত হয়েছেন। কয়েকটি হরতাল, পিকেটিং ইত্যাদি ছাড়া অসহযোগ আন্দোলন তেমন জমেনি। এমন কি দেশবিভাগের চরমতম মুহূর্তেও টানডন পরিবার এবং আরো অনেকেই ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাঁদের পৈতৃক ভূমিতেই থাকতে দেওয়া হবে। তাই যখন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে থেকে বিদায়-বাণী শুনতে হয়েছে এবং সে আবার চির-বিদায়ের-বাণী তখন তাঁরা অতিশয় আহত হয়েছেন।

লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে টানডন পরিবারকে তাঁদের স্বপ্নাম 'গুজরাট' ছাড়তে হয়েছে। লেখক বিষাদ-ভরে লিখেছেন— "আজ গুজরাটে আর কেউ নেই। আমাদের সব হিন্দু সম্প্রদায় সেখান থেকে চলে এসেছেন। রবি এবং চেনাবের মধ্যবর্তী সকল জমি, চেনাব থেকে বেলাম, বেলাম থেকে সিন্ধ, পাজাবের পর্বতশীর্ষে এবং সমতটে, যেখানে এই পশুন্দী অবশেষে এসে মিলেছে, সে অঞ্চল আমাদের 'বিরাদার'র সন্তপুরুষের বাসস্থান ইতিহাসের সূচনাকাল থেকে, সেই পিতৃভূমিতে আজ আর একটিও প্রাণী নেই।"

শ্রীপ্রকাশ টানডনের Punjabi Century—১৯৬১-তে প্রকাশিত— ভারতীয় লেখকের ইংরাজী গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে।

শ্রীপ্রকাশ টানডন শুনেনিছ ব্যক্তিগত জীবনে লিভার ব্রাদার্সের জনসংযোগ অধিকর্তা, লেখক হিসাবে তাঁর এই প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু এমন সুন্দর আত্ম-জীবনী ইদানীং কালে আর চোখে পড়েনি।

* PUNJABI CENTURY (1857-1947) — Prakash Tandon - Chatto & Windus — (London) 20 shillings.

নতুন বই

রূপং দেহি ধনং দেহি—(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মন্থোপাধ্যায় ॥ গ্রন্থ-প্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম : তিন টাকা পঁচিশ নং পঃ।

"কে এই নবাগত? মাটীর উপরকার শোভনশ্যামল আস্তরণ ছেড়ে একেবারে তার নিচে অন্ধকার গহবরে গিয়ে প্রবেশ করেছে? সেখান থেকে কয়লার বদলে তুলে আনছে হীরামণি?" এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর অচিন্ত্যকুমার পেয়েছিলেন "নবাগতের" নিজের মধ্যে থেকেই :

"আমার আসল নাম কি জানো? আসল নাম শ্যামলানন্দ। ডাক নাম শৈল। ইন্সকুলে সবাই ডাকত শৈল বলে। সেই থেকে কি করে যে শৈলজা হয়ে গেলাম—...বাবা ধরণীধর মন্থোপাধ্যায়। সাপ ধরেন। ম্যাজিক দেখান—" ডাকলো শৈলজার হাতের দিকে। তাহঁতেই তার হাতের এই ওস্তাদি। এই ইন্দ্রজাল।"

অচিন্ত্যকুমারের ঐন্দ্রজালিক উক্তিটি যে অতিকথন না, শৈলজানন্দ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করলেন তাঁর নবতম উপন্যাসটিতে। কয়লাকুঠির গুপের পর মহাযুদ্ধের ইতিহাস লিখে সাঁড়া ফেলেছিলেন শৈলজানন্দ এবং আজো তাঁর গ্রাম-গুপের আকর্ষণ এতটুকু কম না। আলোচ্য উপন্যাসটির পটভূমি যদিচ

মোড়াক

ছেলেমেয়েদের
সর্বপ্রথম মাগিক

বার্ষিক-চাঁদা : পাঁচ টাকা

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিঃ-১২

দ্বিতীয় মহাবাণ্ধকালীন একটি কল্পনাখনি অঞ্চলের গ্রাম। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে কয়েকটি গ্রামীণ চরিত্রকেই কেন্দ্র করে। দুলালী গ্রামের মেয়ে কাশুন। রূপের জোনাকি হয়ে সে ধরে বেড়ায় গ্রামে। বিয়ে হয় না পরসার অভাবে। পাড়ার লোকেরা নিষেধ রটায়, কুপ্ৰসূত্র করে। এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সে মহানন্দপুরে আসে দাদাকে নিয়ে। সেখানে আশ্রয় পায় জমিদার রামকানাই মুনোপাধ্যায়ের প্রতিধি ভবনে। লালসায়ন রামকানাই-এর আশ্রয়ে গভীরতরো এক অন্ধকারকে দেখতে পায় কাশুন। বিচিত্র মানুষ্য শিথিলতায় সেই অন্ধকারের একটি মাত্র প্রদীপ। শৈলজানন্দ এই আপনতোলা আসক্তিবান চরিত্রটিকে প্রথম উপস্থিতিতেই পাঠকমনের সিংহাসনে বসিয়ে দিতে পেরেছেন এবং এ কুশলতা তাঁর



স্বভাবজ। গ্রামের দারোগার চরিত্রটিকেও যেন কোথায় দেখেছি এমনি জীবন্ত মনে হয়।

তবে আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর নিরলংকার ভাবের প্রসাদ-গুণ। নির্ভর ভাবাপ্রয়োগে শৈলজানন্দের একমাত্র পূর্বসূরী সম্ভবতঃ শরৎচন্দ্রই। এবং হয়ত তাই পাঠককে কাহিনীমুগ্ধ করার শারদীয় ক্ষমতাটিও তাঁর একান্ত আয়ত্তে।

সেদিন ফুটলো কমল— (উপন্যাস)

বুদ্ধদেব বসু : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বস্কিন চ্যাটার্জ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম : চার টাকা।

উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। আজ ১৯৬২ সাল। মাঝখানে দীর্ঘ

২৯ বছরের ব্যবধান। সেদিন বুদ্ধদেব বসু ছিলেন বিদ্রোহী তরুণ। বাংলা সাহিত্যের নিস্তরঙ্গ ধারায় তুলতে চাইছিলেন প্রবল প্লাবন। আজ বুদ্ধদেব বসু স্থিতিধী প্রবীণ। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত আসনে সমাসীন। আর এই দীর্ঘ উনিশ বছরে পাঠক-সমাজের বোধ ও চৈতন্যের ক্ষেত্রে এসেছে বিপুল পরিবর্তন। পুরাতনকে দাঁড়াতে হয়েছে নতুন মূল্যায়নের কাঠগড়ায়। অতীতকে জবাবদিহি করতে হয়েছে বর্তমানের সঙ্গে। প্রত্যেক সং সাহিত্যিক এই বিচারকে বরণ করে নেয়। কারণ তাঁরা জবাবদিহি করেন সময়ের সঙ্গে।

আবার নতুন করে 'সে দিন ফুটলো কমল' পড়তে পড়তে বারবারই এই কথা আসে। মনে হয় এই উপন্যাসের পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। কারণ এটি একটি প্রেমের মিলিত উপন্যাস মাত্র নয়। ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে শূন্যমাত্র দুটি চরিত্রের কাছাকাছি আসার, ভালবাসার নিটোল কাহিনী মাত্র নয়। এই দৃষ্টিতে উপন্যাসকে বিচার করলে সমগ্র ভুল বোঝার আশঙ্কা থাকে। কারণ, শ্রীলতা আর পার্থপ্রতিম এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানের পর কলেজীর প্রেমের সীমাবদ্ধ গন্ডি পার হয়ে নতুন উজ্জ্বলতা পেয়েছে। বোঝাই যায় যে এ একজন প্রতিভাবান কবির উপন্যাস। তাই লোমহর্ষক ঘটনা, কিংবা আশা-নিরাশার রহস্য তৈরি করে নায়ক-নায়িকার প্রতি পাঠকের আভিনবিশ বজায় রাখতে হয় না। পাঠক মনঃমুগ্ধ হয়ে থাকে শব্দের জাদুতে, ভাবের প্রাণবান ঞ্জবর্ষে। পাঠক তখন রচয়িতার সঙ্গে পরম নিভয়ে যেতে পারে দুটি প্রায়-পরিণত যুবক-যুবতীর অন্তর্ভূতির সূক্ষ্ম ও নিবিড় স্বপ্নময় অদৃশ্য জগতে, যেখানে সামান্য অসতর্ক পদপাত, একটু অনামনস্ক শব্দ-প্রয়োগ বিকট আতনাদ তুলে উষ্ণ ও নরম নিসর্গকে কলুষিত করে দিতে পারে। যখন পড়ি, "অন্ধকারকে হতে দাও তোমার মধ্যে", তখন মনে হয় এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা কাহিনীর পরিধি পার হয়ে অন্য বস্ত্রে স্থিত। তাই তথাকথিত উপন্যাসের গঠন-রীতি স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করা হয়েছে। আবার সমগ্র উপন্যাস এমন একটি তীর ও কস্পিত আবেগে বিধৃত যা একমাত্র লিরিক কবিতায় সম্ভব এবং উপন্যাসটি পায় কবিতার মর্যাদা। এই বহু প্রশংসিত উপন্যাসের পরিমার্জিত সংস্করণ অভিনন্দনযোগ্য।

আমেরিকায় শিশিরকুমার— (রোজ-নামচা) ও মার্কিনী মার (নাটক) ॥
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। দাম পাঁচ টাকা।

আচার্য শিশিরকুমারের নটজীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা অভিনয় প্রদর্শনের জন্য নাট্য-সম্প্রদায় নিয়ে আমেরিকা যাত্রা। তাঁর আগে বা পরে কোনো বাঙালী নাট্যশিল্পী এইভাবে বিদেশ যাত্রা করেননি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিশিরকুমার আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ভ্যাডারবিক্ট-থিয়েটারে 'সীতা' নাটক প্রদর্শন করেন। প্রখ্যাত নাট্য ও 'সীতা' নাটকের রচয়িতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সেই যাত্রায় শিশিরকুমারের সহ-যাত্রী ছিলেন। "জাহাজে করিয়া কলিকাতা হইতে নিউইয়র্ক যাত্রা সহজ কথা নয়। কি করিয়া সময় কাটানো যায়? তাই সেই সময় কিছু দিনের জন্য ডায়েরী লিখিয়াছিলাম।" এই রোজনামচা ভাগ্যক্রমে একটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, এবং এতদিনে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। আমাদের দেশে উৎসাহী প্রকাশকের সংখ্যা কম, নতুবা এই গ্রন্থ অনেক আগেই প্রকাশিত হত। শিশিরকুমারের মত এক অসামান্য প্রতিভাধারী নটকে আমেরিকায় কি সঞ্চয়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল তার অপরূপ বিবরণ যোগেশচন্দ্র লিখে গেছেন। এই সঙ্গে সংযুক্ত 'মার্কিনী মার' নামক নাটকটিও মার্কিনী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত প্রহসন। 'ডকুমেন্টারী' গ্রন্থ হিসাবে 'আমেরিকায় শিশিরকুমার' শূন্য মাত্র ছাত্র, গবেষক প্রভৃতির কাছে যে মূল্যবান সম্পদ তা নয়, নাট্যরাসিক ব্যক্তি মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। শিশিরকুমারের পূর্ণাঙ্গ জীবনী একদিন রচিত হবে, সেদিন 'আমেরিকায় শিশিরকুমার' তার একটি বৃহৎ পরিচ্ছদ হবে। গ্রন্থটি উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। সন্মুদ্রিত এবং সন্মুদ্র প্রচ্ছদ শোভিত।

পদাবলী সাহিত্য— (সমালোচনা)—

কালিদাস রায়। প্রকাশক : এন্ড্রুজি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বস্কিন চ্যাটার্জ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম সাত টাকা।

গ্রন্থপরিচিতিতে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "কবি কালিদাস রায় জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত প্রধানতঃ কাব্যরসেই বিভোর ও কবি আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। পঞ্চাশোব্দে তাঁহার কবিত্ব কবিত্ব-বিশেষণের বানপ্রস্থ জ্বলন করিয়াছে। এ যেন কাব্যরচনার প্রত্যক্ষ রাজেশ্বরভোগ পরিত্যাগের পর তাহার পরোক্ষ রহস্য অনুধানের পূজা কবি-জীবনে আবিস্কৃত হইয়াছে।" কবি কালিদাস রায় বর্তমানে কবিত্ব বিশেষণের বানপ্রস্থ আত্মনির্গো

করেছেন। কবিতা অপেক্ষা গদ্যসাহিত্যেই ইদানীং তাঁর সমধিক আগ্রহ লক্ষিত হয়। “পদাবলী সাহিত্যে” তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্ববিচার ও রসবিশ্লেষণ করেছেন। কবি কালিদাস রায়ের কবিতা বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী, সেই কারণে পদাবলীর মূলোপস্থানে তাঁর অধিকার অনস্বীকার্য। তিনি এই আলোচনায় পদাবলী সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা অতি সংক্ষেপে সন্মিলিত ভঙ্গীতে বিবৃত করেছেন। সাধারণ পাঠক ও ছাত্রদের পক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর রসান্বাদনে গ্রন্থটি সাহায্য করবে সন্দেহ নেই।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

চতুরঙ্গ— হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈ-মাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্র-সংখ্যা, কার্তিক—পৌষ ১৩৬৮। দাম : ১-২০ নং, পঃ। ৫৪. গণেশচন্দ্র এর্ডিনউ, কলিকাতা-১৩।

শ্রী হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকা গত তেইশ বছর ধরে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন এক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে যার তুলনা বর্তমানকালে বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। সূনির্বাচিত প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা এবং সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র ও চিত্রকলার বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তির আলোচনার সমন্বয় হয়ে এই পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল পত্রিকাটি বাংলাদেশের শিক্ষাজগতে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

বর্তমান রবীন্দ্র-সংখ্যাটি সে গৌরব আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

আলোচ্য সংখ্যার লেখকসূচীতে আছেন—ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (এ’র স্মৃতিকথা অনুবাদ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র), সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, আইজায়া বার্লিন, লড হেলসাম, আদ্রে অস্টারলিং; এবং রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন ইংরাজি ও বাংলা সংকলন ও আলোচনা গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন—হিরণকুমার সান্যাল, অমলেন্দু বসু, নীহাররঞ্জন রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, হ্যালডর ল্যান্সনেস, হরপ্রসাদ মিত্র, ভবতোষ দত্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রনাথ রায়, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত এবং সুধাংশু ঘোষ।

এই সুদীর্ঘ তালিকা, বিশেষ করে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ লেখকের নাম থেকে স্পষ্টই বোঝায় সম্পাদক তাঁর দায়িত্বের বিষয়ে কত তীব্রভাবে সচেতন ছিলেন এবং পত্রিকাখানি পাঠ করে একথা অকুণ্ঠভাবেই বলা যায় যে তাঁর পরিগ্রহ আমাদের পক্ষে সুফলপ্রসূ হয়েছে।

উত্তরসূরী— সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য। ৯বি।৮, কালিচরণ ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৫০ থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

কবিতা, সংগীত, শিল্পচর্চা ও সমালোচনার ত্রৈমাসিক মূল্যপত্র হিসাবে

‘উত্তরসূরী’ ইতিমধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার মধ্যে। বর্তমান সংখ্যাটি নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। মূল্যবান প্রবন্ধ, বিবিধ আলোচনা, অনুবাদ কবিতা, এবং সুপাঠ্য কবিতাবলী নিয়ে প্রকাশিত এ সংখ্যাটি পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির উন্নত মানকে রক্ষা করেছে।

ধর্জিটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘একালের লেখা’ নামক মূল্যবান রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এ সংখ্যায়। অরুণ ভট্টাচার্য ও শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে অমিত চক্রবর্তী ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অমিত চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য তরুণতর কবিদের কবিতা আছে। শেক-স্পীরের পাঁচটি সনেটের মণীন্দ্র রায়-কৃত অনুবাদ নিপুণ এবং অনবদ্য। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সেরমন্তফ, তলস্তয় ও ব্রিউসবার কবিতা অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া আরও কয়েকটি কবিতার অনুবাদ আছে।

তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন—কমলকান্তি ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য, অমিত সেন, নন্দগোপাল সেন, গুপ্ত, বিমল কর, মিহিরকুমার গুপ্ত প্রভৃতি।

আগামী সপ্তাহে বাহির হইবে

অলৌকিক ও রহস্যময় গল্প-সাহিত্যের একমাত্র সংকলন

রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তীকালের ৩৮ জন প্রতিভাবান সাহিত্যিকের গল্প এবং অলৌকিক গল্প সাহিত্য সম্পর্কে অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন লিখিত সুবিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধপুস্তক

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

অণু ভুবন

পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠা
দাম—১০

কাপড়ে বাঁধাই, বিলাতী আর্ট পেপার জ্যাকেট এবং প্রতিটি রচনা চিত্র সম্বলিত

অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ :

প্রমথ চৌধুরী • রবীন্দ্রনাথ • ২-০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় • স্বপ্নসঞ্চার • ৩-৫০

বিমল কর • এই দেহ অন্য মূখ • ৩-০০

গ্রন্থভারত : ৪১বি রাসবিহারী এডেন

কথামূল্য : ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

আনন্দকিশোর মন্সী • পরম লগনে • ৪-৫০

রূপদর্শী • ব্রজবলি • ৩-৫০

বার্তিক

ফোন : ৪৬-৮৪৭৫

১/৩২এফ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলি-২৬

শ্রোতৃদায়ক

নাট্যদীপক

আভিজিৎ কথ্য

বাঙলা থিয়েটারের নব বিবরণ :

অ্যাডেল্‌ফি থিয়েটারের নাম শুনেনছেন? কলকাতার অ্যাডেল্‌ফি থিয়েটার? এই শহর কলকাতার অ্যাডেল্‌ফি থিয়েটার?—না, আপনাদের মত আমিও শুনিনি। তবে পড়েছি। ১৯৫৬ সালে টমাস নেলসন অ্যান্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত এবং ফব্রন বাওয়ার্স নামক জনৈক মার্কেণ্ড ডব্লিউক দ্বারা লিখিত “থিয়েটার ইন দি ইস্ট” (Theatre In The East) নামে একখানি ৩৭৪ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থে পড়লাম, “অহীন চৌদ্দ (?) সাধারণতঃ প্রাচীন এবং সুখ্যাত অ্যাডেল্‌ফি থিয়েটারে অবতীর্ণ হয়ে প্রচুর ভক্ত দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণ করেন।” শুধু তাই নয়, তিনি প্রধানতঃ যে-নাটকে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, সেখানির নাম হচ্ছে “মিশরকুমার” (কুমারী নয়?) বা “ডটর অব ইজিপ্ট”। যেখানে তিনি ক্রাইম্যান্স-দৃশ্যে আনন্দরূপে বর্ণনাম্বরে ওপর লম্বা বস্তুতা দেন, সেখানে মৃদু দর্শকরা যে প্রায়ই “আসেত”, “আসেত” বলে চীৎকার করে, এ-ও গ্রন্থকার স্বকর্ণে শুনেন। কিন্তু এই “আসেত” “আসেত” বলার যে অর্থ এবং কারণ তিনি নির্ণয় করেছেন, তা শোনালে আপনারা হাসি চাপতে পারবেন না। গ্রন্থকার “আসেত” কথাটির আভিধানিক অর্থ করেছেন “ধীরে” (slowly) এবং কারণ হিসেবে বলেছেন, সত্য বাস্তবতার আগে অভিনেতা যেন দর্শকমনের ঔৎসুক্যকে যতদূর সম্ভব টেনে বাড়ানোর জন্যে তাঁর বক্তব্যকে অনেকখানি সময় নিয়ে বলেন। গুণগ্রাহী দর্শক অহীন্দ্র-বাবুর অভিনয়ের মধ্যেই অনেক সময় তারিফসূচক মন্তব্য শ্রবণ করে দিত বলে কোনো কোনো দর্শক তাঁর উপভোগ্য বাচনকে স্পষ্টভাবে শোনার জন্যে অপর দর্শকদের গোলমাল করতে বাধা করে “আসেত” “আসেত”—এই কথা যে বলত, এটুকুও বুঝিয়ে দেবার মত লোককে তাঁর সংগী-দোভাষী হিসেবে পাননি বলে আমরা গ্রন্থকারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি। এবং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, গ্রন্থকার বর্ণিত অ্যাডেল্‌ফি থিয়েটার আমাদের মিনার্ভা থিয়েটার ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ইংরেজী প্রভাবেই বাঙলা রংগালয়ের জন্ম, এই কথা বলে গ্রন্থকারপ্রবর তাঁর

পাঠকদের জানিয়েছেন, বাঙালীরা তাদের সাধারণ রংগালয় চালাবার জন্যে ইংরেজী নাটক অনুবাদ করেছে, ইংরেজী কাহিনী বা প্লট ধার করেছে। সে-যুগে গিরিশচন্দ্র “ম্যাকবেথ”—এর অনুবাদ বাঙলা রংগালয়ে চালাবার চেষ্টা করে অকৃতকাব্য হয়েছিলেন এবং আধুনিককালের নাটকে কিছু কিছু বিদেশী প্লট আমদানী হলেও বাঙলা নাটক ‘পৌরাণিক’ ‘ঐতিহাসিক’ বা ‘সামাজিক’—প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে ভারতীয় কাহিনীকে আশ্রয় করেছে যে গড়ে উঠেছে, একথা অসম্বীকার্য।

গ্রন্থকার আরও যে-সব ‘ঐতিহাসিক’ সংবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হল, গিরিশচন্দ্র বিংশ

শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙলা রংগালয়ে আবির্ভূত হন। আমরা সকলেই জানি ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের কোঠা থেকে তিনি নিয়মিতভাবে সাধারণ নাট্যশালায় অভিনয় করে গেছেন। দ্বিতীয় সংবাদ, ভাদুড়ী মশাই ১৯৫৫ সালের কলকাতার কোনো একটি ছোট থিয়েটারে (?) প্রতি রবিবার বৈকালে অভিনয় করতেন। এবং স্টারের “শ্যামলী” নাটকের প্রধান ভূমিকায় যে-অভিনেত্রী অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর নাম সুচিত্রা চট্টোপাধ্যায়। আর একটি সংবাদ হচ্ছে, ঐ ১৯৫৫ সালেই, ‘ভক্ত রামপ্রসাদ’-এর জীবনী অবলম্বনে রচিত নাটক বাঙলা রংগালয়ে ৪০০ রাত্রি অভিনীত হয়েছিল। আমাদের মনে হয়, এম-জি-এন্টারপ্রাইজ-এর রামকৃষ্ণ মার্কেণ্ড লেখকের রূপায় রামপ্রসাদ-এ পরিণত হয়েছে, যেমন সার্বিক চট্টোপাধ্যায় পরিণত হয়েছেন সুচিত্রা চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের মনে হয়, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এমন কিছু নিয়ম কানুন বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে,



তপন সিংহ পরিচালিত ‘হাসিনী বাকের উপকথা’ চিত্রে রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

যা একটি দেশের সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে অপর দেশে এই ধরনের ভ্রমপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনকে বন্ধ করতে সাহায্য করবে। শূন্যে, থিয়েটার ইন দি ইস্ট বইখানি ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকাতে একটি প্রামাণ্য বই হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সেই বইয়েরই মাত্র তিনটি পৃষ্ঠার মধ্যে যদি এতগুলি চিত্রপূর্ণ বিবরণ পেশ করা হয়েছে থাকে, তাহলে সমস্ত বইখানিতে এ-রকম আরও কত ভ্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে, সে-কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

চিত্র সমালোচনা

হাসিনী বাকের উপকথা : জালান প্রোডাকশন্স-এর নিবেদন; ১১,০০০ ফুট দীর্ঘ ও ১১ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী ও গীতরচনা : তারাসংকর বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : উপেন সিংহ; সংগীত-পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ : বিমল মুখোপাধ্যায়; শব্দধারণ : অতুল চট্টোপাধ্যায় (অন্তর্দৃশ্য); দেবেশ ঘোষ, মৃণাল গৃহীকৃতা, শচীন চক্রবর্তী (বহির্দৃশ্য); সংগীতগ্রহণ ও শব্দ-পুনর্বীজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; নৃত্য-পরিচালনা : শান্তি নাগ; শিল্প-নির্দেশনা : সুনীতি মিত্র; সম্পাদনা : সুবোধ রায়; রূপায়ণ : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, প্রশান্ত-কুমার, দেবী নিয়োগী, চন্দন রায়, বীরেশ্বর সেন, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নুতন দাস, কেণ্ট দাস, নিভানন, অনভা রঞ্জন, লিলি প্রভৃতি। জালান ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় গেল ১লা বৈশাখ, ১৩৬১, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬২ থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অপারাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

“এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী—দুরোরণী, আর সুরোরণী—” কিংবা “এক ছিল বেগম, আর এক ছিল বেগমী—”, এই ছিল আগেকার কালের উপকথা বা রূপকথার আরম্ভ। উপকথার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে—আখ্যায়িকা-সদৃশ (যে-কথা), কল্পিত গল্প, উপাখ্যান বা পুরাবৃত্ত কথন। এখন যুগ বদলেছে; সঙ্গে সঙ্গে উপকথারও রূপ বদলেছে। তাই কোপাই নদীর মাঝ বরাবর হাসিনী বাকের বাঁশবাঁদী গ্রামের প্রতিরীশেক কাহারের আদিম, সরল জীবনযাত্রার কাহিনী—না, ঠিক সরল জীবনযাত্রার কাহিনী নয়, সেই সরল জীবনযাত্রার মধ্যে অকল্পিত বিপর্যয় ঘটে যাবার কাহিনীকে অবলম্বন করে বর্তমান বাঙলার শ্রেষ্ঠ কথাসিঙ্গাপী তারাসংকর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন “হাসিনী বাকের উপকথা”। এই যে কাহার বা বাউরীকুল—এরা রাঢ় বাঙলার

অন্যতম আদিবাসী। বেহারা-কাহারই হোক, আর আটপৌরে কাহারই হোক, যেমন বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এদের ছিল বাস, তেমন বিচিত্র ছিল এদের জীবনযাত্রা—এদের সংস্কার, এদের অন্ধ বিশ্বাস, রীতিনীতি, করণ-কারণ, ধরণ-ধারণ, বেশভূষা, আহার-উৎসব। আজ আর এদের হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরে স্বাধীন ভারতের দ্রুত শিল্পায়ন এদের বাসভূমির সঙ্গে এদেরও গ্রাস করেছে; আজ এরা ‘শ্রেণীহীন’ সমাজে ছিন্নছাড়া কলমজুর হয়ে নিজেদের হয়ত ভুলে গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির দুলাল, এই কাহারদের রূপকথা তারাসংকর চিরকালের জন্যে ধরে রেখে দিয়েছেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ

সাহিত্যকীর্তি “হাসিনী বাকের উপকথা”তে। বেহারা-কাহারদের মাতৃস্বর বনোয়ারী আর কালী সুচাঁদ বড়ী এই আদিম সমাজের জীবন্ত প্রতীক। ওদের সমাজে ছেলেমেয়েতে ভালোবাসা জন্মালে বলত—‘রঙ’-এর খেলা। বিবাহিতারও বারণ ছিল না এই রঙের খেলা করতে। স্বামীর কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে সে ‘সান্তা’ বসত মনের মানুষের সঙ্গে। তাই মাতৃস্বর বনোয়ারীরও মনে রঙ ধরায় আটপৌরে পাড়ার মাতৃস্বর পরমের স্ত্রী কালোশশী বা কালো-বৌ। কাহারদের সমাজে এটা তেমন কোনো দোষের জিনিস নয়। কিন্তু এই আদিম সমাজে প্রথম বিদ্রোহের সুর এনেছে করালী; সে কুলকর্ম না করে হয়েছে রেলের কুলীগ্যাংয়ের একজন। বৈষ্ণবান্ততালার ‘কর্তা’বাবার বাহন বিরাট

অন্য শুভ-উদ্বোধন



সায়রাবাণু

মনোজ

বলরাজ সাহনী

সুলোচনা

ইন্দ্রাণী

ওম প্রকাশ

অভিনীত শিল্পী
বাহার ফিল্মসেন

জাদী

পরিচালনা

সংগীত

কৃষ্ণন পাণ্ডা

চিত্রগ্রহণ

সংলাপ ও গীত : রাজেন্দ্রকৃষ্ণ

হিন্দ - কৃষ্ণা

খান্না - প্রিয়া ও অন্য

সাপকে পড়িয়ে মেরে সে বাহাদুরী
নেয়; হে পোরগী নয়ানের যুবতী-বৌ
পাখীকে নিয়ে সে কাহারপাড়া ছেড়ে
চন্দনপুরে রেলস্টেশনের কাছে বাসা
বাঁধে। বড়ো খড়ের চাল উড়ে গেলে সে
পাকা দিল্লী গাঁথতে শুরু করে সকলের
কপ্পা অগ্রাহ্য করে। মাতঙ্গর তো
মাতঙ্গর, তার মুনব ঘোষমশাইকেই সে
কেয়ার করে না; মাতঙ্গরের সঙ্গে সে তো
একদিন শক্তি-পরীক্ষা করে জিতেই
যায়। করালী যে-বিদ্রোহের সূচনা করে,
তাই অনুকূল বাতাস পেয়ে পল্লবিত
হয়ে ওঠে; যখন দ্বিতীয় মহাসমরানল
প্রজ্জ্বলিত হয়। করালীর পরণে তখন
স্যাগার্স অ্যান্ড মাইনাস'-এর পোশাক—
যুদ্ধের সাজ। কাহারেরা অবাক হয়ে
ভার দিকে চেয়ে দেখে আবার আকাশে
উডোজাহাজ দেখে হতভম্ব হয়ে যায়।
যুদ্ধশেষে কলকাতানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে
সঙ্গে কাহার-সম্প্রদায়ের ভাঙন সম্পূর্ণ
হয়। কেবল মাতঙ্গর বনোয়ারী তার
সনাতন আদর্শে অটুট থেকে শেষ-
নিশ্বাস ফেলে হাঁসুলী বাকের মধ্য-
সমীপ।

চলচ্চিত্রে এই আদিম সমাজ-
জীবনের ভাঙনের কাহিনীকে রূপা-
ন্তরিত করতে গিয়ে চিত্রনাট্যকার রূপে
তপন সিং প্রথমেই স্থির সিদ্ধান্তে
উপনীত হয়েছেন যে, তারাশঙ্কর-বর্ণিত
সমগ্র কাহার-সমাজ-জীবনকে পদ্য
উপস্থাপিত করা একবারেই দৃশ্যসাধ্য
এবং তার প্রয়োজনও নেই। তাই
হাঁসুলী বাকের প্রকৃতির সঙ্গে কাহার-

সমাজের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক এবং তাদের
স্বাভাবিক অস্থি বিশ্বাসপূর্ণ জীবনযাত্রার
একটি সামগ্রিক রূপ ও তারই সঙ্গে
নব-জীবনবোধের অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষকে
চিত্র, চরিত্র, সংলাপ ও সঙ্গীতের মাধ্যমে
সুপরিষ্কার করে তোলার মধ্যেই তার
কাজকে তিনি সীমিত রেখেছেন। এই
কারণেই বনওয়ারীর স্ত্রী গোপালীবালা
চিত্রে অনুপস্থিত; আটপোরে পাড়ার
রমণের শ্যালিকাপুত্রী বিধবা সুবাসীর
সঙ্গে বনওয়ারীর 'সাগু' বসার কাহিনী
উহা; কাহার-জীবনের একটি বড় উৎসব
—গাজন—চিত্রিত হবার অবকাশ পায়নি;
বনোয়ারীর পেশা—গুড়ু তৈরি করা এবং
তার কর্মস্থলে বর্ষার জল নিবারণের
জন্যে করালীর 'তেরপল' আনা; এমনকি
করালীর নিজের চন্দনপুরের জীবন—
সবই ছবিতে অনুক্ত থাকতে বাধ্য
হয়েছে। পুরুষ হয়েও মেয়েদের মত
আবভাব ও কাপড়-পর্যায় নসুবালার যে-
ছবি তারাশঙ্কর এঁকেছেন, ছবির
খাতরে সেই নসুবালা সত্যিই মেয়েতে
পরিণত হয়ে দর্শকদের হৃদয় জয়
করেছে। হাঁসুলী বাকের উপকথা'কে
দর্শকের মনোরঞ্জননের জন্যে চিত্রনাট্যকার
তপন সিং এর নাট্যাংশের সঙ্গে
সঙ্গীতাংশকেও যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন
এবং স্বীকার করতে বাধ্য নেই, তার
অভীষ্ট সর্বাংশে সিদ্ধ হয়েছে।
পদ্যতাকারে 'হাঁসুলী বাক' যেমন সাগা
(Saga)-ধর্মী, চলচ্চিত্রাকারেও এটি ঠিক
তেমনই সাগাধর্মী—প্রথম থেকে শেষ
পর্যন্ত, দৃশ্যের পর দৃশ্যে, চিত্রের পর
চিত্রে, চরিত্রের পর চরিত্রে, গানের পর
গানে, কথার পর কথায়, আলোকে-
অন্ধকারে, রেলের বাশীতে, খুশীর
হাসিতে, আবহসঙ্গীতের মূর্ছনায়—
আমাদের চোখে ছবিটি একটি বিরাট
'সাগা'রূপে প্রতিভাত হয়েছে। চিত্রনাট্য-
কার তপন সিং এবং পরিচালক তপন
সিংহ এক হয়ে মিশে গেছেন এই নব-
সৃষ্টির উদ্দানায়। বড় এবং বন্যার বিরাট
রূপকে যদি এই ছবির মধ্যে আরও
বহু করে ধরা সম্ভব হ'ত, তাহলে এই
'সাগা'-রূপটিও অসামান্য পরিপূর্ণতা
লাভ করত।

তপন সিংহের পরেই এই ছবিতে
যার কৃতিত্ব সমধিক প্রকাশিত, তিনি
হচ্ছেন সুরকার ও গায়ক হেমন্ত
মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর রচিত গান-
গুলিতেই তিনি যে সার্থক সুরবোজনা
করেছেন এবং সেগুলিকে সঙ্গীত
হওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন, শুধু তাই
নয়, ঘটনা ও দৃশ্য অনুযায়ী আবহ-
সঙ্গীত রচনায় তিনি অসামান্য দক্ষতা
প্রকাশ করেছেন বাদ্যযন্ত্রের নির্বাচন ও
উপযুক্ত সঙ্গীতসৃষ্টি করে। নয়ানের
মৃত্যু-দৃশ্যে 'ভাইরে, আলোর তরে
ভাবনা কেন হায়রে' যেমন একটি নিঃশব্দ
উদাস আবহ রচনা করে, ঠিক তেমনই

বর ও বধুবৈশী করালী ও পাখীর
দলের মিলন-সঙ্গীত 'বর আসিল বর
আসিল ও বউ তুমি অংগ তোলা' প্রচণ্ড
মাতনের সৃষ্টি করে। পাল্কীবাহার দৃশ্যে
'পেলাহী' 'পেলাহী' গানও অপূর্ব।

ছবিতে দিন অপেক্ষা রাতের দৃশ্য
যেমন অতিরিক্ত, আবার স্টুডিও
অভ্যন্তর অপেক্ষা বাহ্যিক দৃশ্যও ঠিক
সমভাবেই অসংখ্য। কাজেই চিত্রশিল্পী
বিমল মুখোপাধ্যায়কে গুরুতর অসু-
বিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এই
অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি তার কাজকে
একটি উচ্চপাঠ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন।
বিরাট পটভূমিকাকে বজায় রেখে এবং
এক-কেন্দ্রীক গল্পের অভাবকে স্বীকার
করেও—বনোয়ারী-করালীর আদর্শগত
বিরোধ, করালী-পাখীর সোচ্চার প্রেম
এবং বনোয়ারী-কালোশাখীর গোপন
প্রেম, এই তিনটি কাহিনী একস্থানে
কেন্দ্রীভূত হবার অবকাশ পায়নি—
সুবোধ রায়ের চিত্র-সম্পাদনা ছবিকে
স্থানে স্থানে কিছুটা মস্তুর করে
তুলেও ছবির 'সাগা'-রূপটি প্রকাশে
যথেষ্টই সাহায্য করেছে।

এ ধরনের ছবিতে স্বভাবতঃই
অভিনেতা-অভিনেত্রীর অংশ গৌণ।
তবুও ওরই মধ্যে পুরুষ-ভূমিকায় কালী
বন্দ্যোপাধ্যায় (বনোয়ারী), দিলীপ রায়
(করালী), রবি ঘোষ (পানু), দেবী
নিয়োগী (পরম), কেট দাস (নয়ান),
পাগল (প্রশান্তকুমার) এবং মেয়েদের
মধ্যে লিজ চক্রবর্তী (নসু), রাজমা
(পাখী), নিভাননী (সুচাঁদ বড়ী) ও
অনুভা (কালোশাখী) চরিত্রোপযোগী
অভিনয় করে আমাদের সম্প্রশংস দৃষ্টি
আকর্ষণ করেছেন।

তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাকের
উপকথা' যেমন একটি নতুন ধরনের
সাহিত্যকীর্তি, তপন সিং পরিচালিত
'হাঁসুলী বাকের উপকথা' চিত্রটিও তেমনই
বাঙলা চলচ্চিত্র জগতে একটি নবতম
শিল্পসৃষ্টিরূপে ঘোষিত হবে।

বিবিসি সংবাদ

'চেনা-অচেনা'র ভীমপল্লী:

ভীমপল্লী: কাহিনীটি একটি
বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত
হলেও 'বনফল'-এর সরস কৌতুহলো-
দ্দীপক ভঙ্গী বইখানিকে একটি বিশিষ্ট
মর্যাদা দান করে বাঙালী পাঠকের
অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছে। সেই 'ভীম-
পল্লী'র একটি সার্থক নাট্যরূপের
অভিনয় দেখলাম গেল ১৩ই এপ্রিল
রঙমহল রঙ্গমঞ্চে। প্রতি অঙ্ক পাঁচটি
করে দৃশ্য রেখে মাত্র দুটি অঙ্কের মধ্যে
সমগ্র কাহিনীকে যেভাবে নাট্য-কৌতুহল
(Suspense) বজায় রেখে তিনি শেষ
করেছেন, তার জন্যে নাট্যরূপাতা সুনীল

স্টার থিয়েটার

সীতাভূষণ নিয়ন্ত্রিত। ফোন : ৫৫-১১০৯

নতুন নাটক

শেষাঙ্গি

কাহিনী : শক্তিধর রাজগুরু,

নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত

দর্শক ও আলোক : অনিল বসু

গান : শৈলেন রায় • সুর : দুর্গা সেন

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬৥ টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬৥ টায়

৥ রূপায়ণে ৥

কমল সিন্ধু - অজিত বন্দ্যো - আশীষ
কুমার - অঙ্গীমা দেবী - লিজ চক্রবর্তী
বাসুদেবী নন্দী - অনুরূপকুমার - চন্দ্রশেখর
বীরেশ্বর সেন - গীতা দে - সাধনা
রায়চৌধুরী - আশাদেবী - শ্যাম লাহা
প্রেমাংশু বোস - ভানু বন্দ্যো

রূপান্তরীর ভাবাদর্শ ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে।

হাওড়ায় নিয়মিত অভিনয়

গেল ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল হাওড়া টাউন-হলে ঋষিক ও নট-নাট্যম নাট্য-গোষ্ঠীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় হাওড়ায় নিয়মিত অভিনয় করার প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে দু-খানি একাঙ্ক নাটক—ঋষিক প্রযোজিত পরিমল দত্তর 'ব্যান্ডমাষ্টার' ও প্রেমেন্দু মিত্রর 'সংসার সীমান্তের' নাট্যরূপ অভিনীত হয়েছিল। শেষেরটির রূপদাতা ও দুটি নাটকেরই পরিচালক শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়। নট-নাট্যম নাট্যসংস্থা অভিনয় করেছিলেন 'করুণা করো না' ও 'ওরা কার্জ করে'। এ দুটির রচনা ও প্রথমটির পরিচালনা করেছেন শ্রীজগমোহন মজুমদার ও শেষেরটির পরিচালনা করেছেন শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়মিত অভিনয়ের এই রজনীশ্বরকে স্মরণীয় করে তোলার জন্য শিল্পী শ্রীরবীন্দ্র মন্ডলের সম্পাদনায় একটি 'স্মরণী' প্রকাশিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন যিধানসভার সদস্য ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়।

৥ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ৥

মণিপুরী নৃত্যকলা মন্দিরের প্রমোজনায় গত পরশু বৈশাখ ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টার হলে মণিপুরী নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত বসন্ত সিংহের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "বসন্ত" নৃত্যানাটিকার এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি, উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ



হিন্দী ছবি 'হাফ টিকিট'এ একটি দৃশ্যে কিশোরকুমার ও মধুবাল

করেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত পি কে খান্না, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায় এবং শ্রীযুক্ত সুনীল-রঞ্জন সেনগুপ্ত। সংগীত পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত বাসন্তী বাগচী।

সংগীত ও যন্ত্রসংগীতে সূত্রধরের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে সর্বশ্রী কবি প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী গুরু, মিনীত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা নাহা, বাসন্তী বাগচী, গীতা বোস, ছায়া পাল, স্মৃতিরেখা দেব, মীরা দেব, জ্যোতি-প্রকাশ বসু, কিশোরকান্ত বাগচী, তপতী নন্দী, বাঁগা সেনগুপ্ত, খগেন্দ্র মৃধাজি, অজয় রায়চৌধুরী, সৌরেন নাগ, গৌর দে, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, অজিতকুমার নন্দী, চন্দন দাস প্রভৃতি।

নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী রুণা রাহা, মালা দে, শিপ্রা লাহিড়ী, বিশাখা দত্তরায়, অনিমা সিকদার, প্রতিমা দত্ত, অঞ্জলি সিকদার, নন্দনা রায়, ইন্দ্রাণী রায়, মধুছন্দা দাস, শীলা সেন, লিলি পাল, সুজাতা লাহিড়ী, প্রজ্ঞাপারমিতা রায় প্রভৃতি।

রাজার ভূমিকায় প্রমোদ মুখোপাধ্যায় এবং রাজকবি ভূমিকায় মৃণাল মুখোপাধ্যায়ের দরজা কণ্ঠে অভিনয় খুবই শ্রুতিমধুর। সংগীতাংশে সুমিত্রা নাহার কণ্ঠে একক সংগীত সত্যি উচ্চ-প্রশংসিত। নৃত্যাংশে ধৃতুরাজ ও মালতীর নৃত্যও সুন্দর। সবাদিক দিয়েই নৃত্যনাট্যটি সুন্দর প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। উপস্থিত দর্শকগণ্ডলী সকলেই চমকিত হন।

দক্ষিণী

'দক্ষিণী-ভবন'

১, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েন্ট, কলিকাতা-১৬ ॥ ফোন: ৪৬-২২২২

নূতন শিক্ষাবর্ষ

মে মাস থেকে দক্ষিণী নূতন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। 'এপ্রিল' মাস থেকে নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি আরম্ভ হয়। কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সংগীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা শিক্ষাদান করা হয়। সতেরোটি পর্যায়কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-সংগীতের যে শিক্ষাক্রম নির্ধারিত তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীত-রচনার সহিত পরিচয় হবে। রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে ঔপনিবেশিক বিষয়বস্তু, স্বরলিপি-পাঠ ও স্বরসাধনা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট। ভারত-নাট্যম, কথাকলি ও মণিপুরী নৃত্যপদ্ধতির সমন্বয়ে নৃত্যকলার শিক্ষাক্রম নির্ধারিত। বয়স্কদের পাঁচ বছরের ও শিশুদের তিন বছরের পাঠক্রম। শিক্ষা-পরিষদ : শ্রী গৃহঠাকুরতা, সুনীলকুমার রায়, বীরেশ্বর বসু, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, অশোকতর, বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল নাগ, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, হেনা সেন, স্নিগ্ধা বসু, মঞ্জরী লাল, দেবী চাকলাদার ও লীলা দত্তগুপ্ত এবং আদিত্য সেনা রাজকুমার, নিদিতা রায় ও স্থিতি গৃহঠাকুরতা। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তির সময় : মঙ্গল, বুধস্পতি ও শনিবার বিকাল ৪-৮১ এবং রবিবার সকাল ৮-১২ ও বিকাল ৪-৬১।

তিন দেশী ছবি।

বাইশ বছর পর আবার একজন বিদেশিনী হলিউডের পুরস্কার দাক্ষিণ্যে অভিষিক্ত হলেন। ১৯৩৯ সালে 'গন উইথ দি উইন্ড' ছবিতে অভিনয় করে এ্যাকাডেমি এ্যাডওয়ার্ড পান ইংরেজ অভিনেত্রী ভিভিয়ান লে, তারপর থেকে ঘরের পুরস্কার ঘরেই থেকে যাচ্ছিল। অবশেষে ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার হেমকান্তি জঙ্কার মতিটি ইটালির পথে যাত্রা করল, কারণ ১৯৬১ সালের জন্যে পুরস্কৃত হয়েছেন ইটালির সোফিয়া লোরেন, 'দি টু উইমেন্স' ছবির অভিনয়ের জন্যে।

শরীরিণী সোফিয়ার খ্যাতি কিন্তু রূপনির্ভর না। স্বনামধন্য অভিনেত্রী তানা ম্যাগনানির মতে সোফিয়া একটি "Neopolitan giraffe" মাত্র। বাস্তবিক ইউরোপীয় সমকালীন তারকার পাশে সোফিয়াকে রূপবতী বলা



‘অস্কার’-বিজয়িনী সোফিয়া লোরেন

পারি কঠিন। লম্বা নাক, দুর্বল চিবুক-
রেখা তাকে ক্যামেরা-সুন্দর করে না,
কিন্তু উদ্ভৃগ আঙ্গিকের নিরলস, নিরা-
বরণ ব্যবহারে লোরেন একটি বিরল
শক-চক্ষুয়ী প্রতিভা।

সোফিয়া লোরেনের সাতাশ বসন্তের
সমস্ত জীবনই অধিকার অর্জনের যুদ্ধ-
কাহিনী। এমনকি তাঁর বর্তমান পদবীটাও
আদালত মারফৎ অর্জিত। মিলানের
আদালতে সোফিয়ার বিমাতা এক অভি-
যোগ আনেন এই বলে যে, সোফিয়া এবং
তাঁর বোন মারিয়া “লোরেন” পদবীর
অধিকারিনী হতে পারে না কারণ তাদের
গর্ভধারণী তাদের পিতার বিবাহিতা
স্ত্রী নন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুই বোন
নামলাটি জিতেছিলেন এবং এই মিলান
আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দী থেকেই
সোফিয়ার দরিদ্র-পীড়িত জীবনের
অনেক কথা সাংবাদিকরা জেনেছেন।

নেপলস-এর উত্তরে পজুর্লি সোফিয়ার
জন্মস্থান। সোফিয়ার বালাকাল শূন্য

শ্রমিকদের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এই প্রসঙ্গে
তাঁর মন্তব্য :-

There was no meat to be had nor
fish—only maize. The only feel-
ing I had was hunger. I know
what it is to have nothing and to
be nothing. পজুর্লিতে মার সপ্তে
ঠাকুমার বাড়িতে থাকতেন সোফিয়া এবং
তাঁর বোন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁর
বয়স মাত্র ছয়। এই সময় একবার বিমান
আক্রমণে গ্রুথে আঘাত পান তিনি। মা
দুই মেরেকে নিয়ে চলে আসেন
নেপলসে বোনের বাড়িতে। বাড়িতে
মাঝিয়ারে রেখে মা আর মেয়ে কতদিন
যে রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে
খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁর
স্মৃতি আজো অম্লান সোফিয়ার কাছে।
মা সিসিলেন ছিলেন অসাধারণ পিয়োনো
বাজিয়ে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মত
মেয়েও সংগীতে সুনামজন্য হোক।
পিয়োনো শিখতে আরম্ভ করলেন
সোফিয়া। ইতিমধ্যে একটি সৌন্দর্য
প্রতিযোগিতায় নেমে দ্বিতীয়া হয়ে
কিঞ্চিত লক্ষ্যগোচর হলেন। নেপলস
থেকে আবার সিসিলেন তাঁর দুই
মেয়েকে নিয়ে রোমে এলেন। রোমে
কয়েকটি পত্রিকা-প্রজ্ঞে প্রকাশিত
সোফিয়ার ছবিতে আকৃষ্ট হয়ে কয়েকজন
প্রযোজক তাকে সিনেমার অভিনয়ের
জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। প্রথম দু বছরে
ছোটখাট ভূমিকায় প্রায় তেরোটা ছবিতে
অভিনয় করেছিলেন সোফিয়া। প্রথম
নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন
Aida নামক চিত্রে।

আমেরিকায় সোফিয়ার প্রথম ছবি
“ডিজারার আন্ডার দি এলমস”।
সোফিয়ার আন্তর্জাতিক খ্যাতি বর্ধিত
হয়েছে, কিন্তু “দি প্রাইড এন্ড দি
প্যাশন”, “দি বয় এন্ড দি ডলফিন”,
“হাউজ বেট” প্রভৃতি ছবিতে নায়িকা-
চরিত্রে অনন্য অভিনয়ের জন্যে।



১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে ‘অস্কার’ পুরস্কার প্রাপ্ত সংগীতমুখর “এস্ট্রেট
সাইড ফোরার”র একটি দৃশ্য

খেলাধুলা

দশক

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ পঞ্চম টেস্ট

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৫৩ রান
(গারফিল্ড সোবার্স ১০৪, রোহন কানহাই ৪৪, ইগন ম্যাকমরিস ৩৭।
রঞ্জে ৭২ রানে ৪, নাদকাণী ৫০ রানে
৩, দুরাণী ৫৬ রানে ২ এবং বোরদে
৩৩ রানে ১ উইকেট)

ও ২৮৩ রান (ওয়েল নট আউট ১৮,
সোবার্স ৫০, ম্যাকমরিস ৪২, কানহাই
৪১। সূতি ৫৬ রানে ৩, দুরাণী ৪৮
৩, রঞ্জে ৮১ রানে ২, নাদকাণী ১৩
রানে ১ এবং বোরদে ৬৫ রাগে ১ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ১৭৮ রান (বাপু
নাদকাণী ৬১, রুস সূতি ৪১ এবং
পলি উমরিগড় ৩২। লেস্টার কিং ৪৬
রানে ৫, লান্স গিবস ৩৮ রানে ৩, হুল
২৬ রানে ১ এবং আলফ ভ্যালেন্টাইন
৩২ রানে ১ উইকেট)।

ও ৩৭ রান (২ উইকেটে)—স্বিতীয়
ইনিংস অসমাপ্ত।

প্রথম দিন (১৩ই এপ্রিল) : ওয়েস্ট
ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ২৫৩ রানে
সমাপ্ত। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৩
রান (৫ উইকেটে)। পরোমির নবাব
৮ এবং নাদকাণী ০ রাগ করে নট
আউট থাকেন।

স্বিতীয় দিন (১৪ই এপ্রিল) :
ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৭৮ রানে

সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয়
ইনিংস—১৩৮ রান (৬ উইকেটে)।
ওয়েল ৩২ এবং কিং শূন্য রান করে
নট আউট থাকেন।

৩য় দিন (১৬ই এপ্রিল) : ওয়েস্ট
ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৮৩ রানে



ফ্র্যাংক ওয়েল

সমাপ্ত। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস—
৩৭ (২ উইকেটে)। মেহেরা (১৫) এবং
বোরদে (৮) নট আউট আছেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম দিনের খেলা এখনও
বাকি।

পোর্ট-অব-স্পেনের চতুর্থ টেস্ট
খেলার বিজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের
পক্ষে যারা খেলেছিলেন তাঁদের থেকে
পঞ্চম টেস্ট খেলায় এই চারজন বাদ
পড়েন—উইকেট কীপার মেনডোনকা,
ফাস্ট বোলার স্টেয়ার্স, লেগ-স্পিন
বোলার রডরিগস এবং ব্যাটসম্যান নার্স।
এই চারজনের শূন্যস্থানে দলভূক্ত হ'ন
মিডিয়াম ফাস্ট বোলার লেস্টার কিং,
লেফট-আর্ম-স্পিন বোলার আলফ্রেড
ভ্যালেন্টাইন, উইকেট-কীপার ডোভিড
এ্যালেন এবং ব্যাটসম্যান জো সলোমন।



গারফিল্ড সোবার্স

এই চারজনের মধ্যে লেস্টার কিং ওয়েস্ট
ইন্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট দলে নবাগত
খেলোয়াড়। এইভাবে খেলোয়াড় পরি-
বর্তন করে দল গঠনের উদ্দেশ্যে নতুন
খেলোয়াড়ের সম্মান করা বাতে করে
আগামী বছর ইংল্যান্ড সফরে শক্তিশালী
ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল গঠন করা যায়।
পঞ্চম টেস্টে ভারতীয় দলে বসন্ত রঞ্জে
বাদে সকলেই ছিলেন চতুর্থ টেস্টের
খেলোয়াড়। চতুর্থ টেস্টের খেলোয়াড়
সারদেশাইয়ের স্থানে রঞ্জনকে দলভূক্ত
করা হয়। সারদেশাই অসুস্থ ছিলেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে রঞ্জনের এই
প্রথম টেস্ট খেলা। লেস্টার কিং টেস্ট
ক্রিকেট খেলায় তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ
করেছেন খুব ভাল ভাবেই—প্রথম দিনে
ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলার
লেস্টার কিং ৬ ওভার কল করে ১টা
মেডেন পান এবং মাত্র ২০ রান দিয়ে
৫টা উইকেট পান।

পঞ্চম টেস্ট খেলাতেও ওয়েস্ট
ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাংক ওয়েল
টসে জয়লাভ করেন—উপর্যুক্ত পিরি ডিনারি
টেন্স্ট খেলায় ভাগ্যের খেলাতে ওয়েলের



সৌলম দুরাণী



নাদকাণী

জয়লাভ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা ভাল হয়নি, দলের মাত্র ২ রানের মাথায় হাট্ট এক রান করে নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় রঞ্জনের বলে উইকেট-কীপার কুন্দ-রামের হাতে ধরা পড়েন। দ্বিতীয় উই-কেটের জুটিতে ম্যাকমরিস এবং কানহাই ৫০ মিনিটের খেলায় ৬২ রান তুলে দেন। দলের ৬৪ রানের মাথায় দুরাণীর বলে ম্যাকমরিস (৩৭ রান) এবং সলোমন (০) আউট হন। লাগের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের রান দাঁড়ায় ১২৭, ৪ উইকেট পড়ে। উইকেটে নট আউট ছিলেন ওরেল (২৪ রান) এবং সোবার্স (১৭ রান)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ২৫৩ রান শেষ হয়। দলের সর্বোচ্চ ১০৪ রান করেন গারফিল্ড সোবার্স। সোবার্স চতুর্থ উইকেটে যখন কানহাইয়ের সঙ্গে খেলতে নামেন তখন দলের ৩ উইকেট পড়ে মাত্র ৬৪। সোবার্স দলের ২৫৩ রানের মাথায় নিজস্ব ১০৪ করে আউট হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলাও শেষ হয়ে যায়। সোবার্স পঞ্চম উইকেটে ওরেলের সহযোগিতায় ৪৭ রান, ষষ্ঠ উইকেটে হলের সহযোগিতায় ৩০ মিনিটে ৩৪ রান এবং দশম উই-কেটে ভ্যালেন্টাইনের সহযোগিতায় দলের ৩৫ রান তুলে দেন। সোবার্স এই ১০৪ রান তুলতে ২০০ মিনিট সময় নেন। বাউন্ডারী করেন ১২টা এবং ওভার-বাউন্ডারী ২টো। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সোবার্সের এই সেঞ্চুরী ১৩শ সেঞ্চুরী এবং আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের বিপক্ষে দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। ভারতবর্ষের ফিল্ডিং এবং বোলিং খুবই ভাল হয়। রঞ্জন প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন— ৭২ রানে ৪টে উইকেট পান। রঞ্জনের বলে হাট্ট, কানহাই, ওরেল এবং সোবার্স এই চারজন নামকরা ব্যাটসম্যান আউট হন। উমরিগড় পীঠের বেদনায় এবং সূর্তি আগলে আঘাত পেয়ে এইদিন মাত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ভারতবর্ষ এইদিন ৬৫ মিনিটের মত খেলার সময় পায় এবং এই সময়ে ৫টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩৩ রান তুলে দিয়ে ২২০ রানের পিছনে পড়ে থাকে। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি পর্তোদি (৮ রান) এবং নাদকাণী (০) এইদিনের মত নট আউট থাকেন। ভারতবর্ষের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব নবাগত খেলোয়াড় লেস্টার কিংয়ের। কিং মাত্র ২০ রান দিয়ে ভারতবর্ষের ৫টা উইকেট পান। এই খেলা থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় বিগত চারটি টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের বিপর্যয় কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় দলের ৪০ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট (পর্তোদির

নবাগত—৭ রাণ) পড়ে যায়। ৭ম উইকেটে নাদকাণীর সঙ্গে সূর্তি জুটি বেঁধে দলের ভাঙ্গন রোধ করেন—৭ম উই-কেটের জুটিতে ৭০ মিনিটের খেলায় ৭২ রান ওঠে। সূর্তি ৭০ মিনিট খেলে নিজস্ব ৪১ রান করে ১১২ রানের মাথায় আউট হ'ন। বাউন্ডারী ৩টি এবং ১টা ওভার-বাউন্ডারী মারেন। ৮ম উইকেটে নাদকাণীর সঙ্গে জুটি বাঁধেন অসুস্থ উমরিগড়। লাগের সময় ভারতবর্ষের স্কোর দাঁড়ায় ১৩৫, ৭ উইকেটে। উইকেটে তখন নাদকাণী ৪৫ রান এবং উমরিগড় ৭ রান করে নট আউট। দলের ১৭১ রানের মাথায় নাদকাণী ৬১ রান করে আউট হন। নাদকাণী ৫টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার বাউন্ডারী মেরেছিলেন। ৮ম উইকেটের জুটিতে ৬৩ মিনিটের খেলায় দলের ৫৯ রান ওঠে। দলের ১৭৮ রানের মাথায় ৯ম উইকেট (কুন্দরাম) এবং ১০ম উইকেট (উমরিগড়) পড়ে যায়। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৭৮ রানে শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭৫ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনাও প্রথম ইনিংসের মতোই শোচনীয় হয়। দলের মাত্র এক রানের মাথায় দুটো উইকেট (হাট্ট ০ এবং সলোমন ০) পড়ে যায়। সলোমনের ভাগ্যে উভয় ইনিংসেই শূন্য রান জুটে। ক্রিকেট খেলায় উভয় ইনিংসেই শূন্য রান ব্যাটসম্যানের পক্ষে খুবই ব্যর্থতার পরিচয়। রঙীন চশমা পরে লজ্জা ঢাকার মতই অবস্থা। শেষ পর্যন্ত ৩য় উইকেটের জুটি ম্যাকমরিস এবং সোবার্স দলের রান অনেকটা ভরস্ব্য করেন। সোবার্স তাঁর খেলায় প্রাণ-প্রাচুর্যের যথেষ্ট পরিচয় দেন। বিবিধ মারে তিনি ভারতীয় খেলোয়াড়দের মাঠে ছত্রভঙ্গ করে দেন। সোবার্স ৬৩ মিনিটে ৫০ রান করে আউট হন, দলের ৭৫ রানের মাথায়। ৩য় উইকেটে দলের ৭৪ রান উঠে যায়। ম্যাকমরিসের সঙ্গে ৪র্থ উইকেটে খেলতে নামেন দলপতি ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। দলের ১১৮ রানের মাথায় ম্যাকমরিস ৪২ রান করে আউট হ'ন। ম্যাকমরিস যেন বেরালের প্রাণ নিয়ে আজ খেলতে নামেন। কয়েকবার আউট হ'তে হ'তে বেঁচে যান। দলের রান যখন মাত্র ৭ এবং তাঁর রান ৫ তখন সূর্তির বলে নাদকাণী তাঁকে আউট করতে পারেননি। বল হাট-ছাড়া হয়ে যায়। উইকেট-কীপার কুন্দরাম তাঁকে দু'বার ছেড়ে দেন—দলের ২২ রানের মাথায় যখন তাঁর রান ১০ এবং দলের ৮২ রানের মাথায় যখন ম্যাকমরিসের রান ৩০। শেষ পর্যন্ত ম্যাকমরিস বোরদের বল মারতে গিয়ে নিজেই নিজের উই-কেট ভেঙে ফেলে খেলা থেকে বিদায় নেন। এইদিনের খেলা ভাঙতে যখন

মাত্র ২০ মিনিট বাকি এমন সময় অঘটন ঘটে গেল—বোরদের বলে ম্যাকমরিস, দলের ১৩৮ রানের মাথায় দুরাণীর বলে এ্যালান এবং গিবস খেলা থেকে বিদায় নিলেন। এ্যালান ২ রান এবং গিবস কোন রান না করেই খেলা থেকে বিদায় নেন। ৭ম উইকেটের জুটি ওরেল (৩২ রান) এবং কিং (০ রান) এইদিনের মত নট আউট থাকেন। এইদিনের খেলায় ভারতীয় দলের ফিল্ডিংয়ে যথেষ্ট গলতি ধরা পড়ে। ঠিকমত ফিল্ডিং হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের আরও বেশী উইকেট পড়তো এবং রানও কম হ'ত। প্রথম দু'দিনের খেলায় ২৬টা উইকেট পড়ে ৫৬৯ রান ওঠে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২১৩ রানে অগ্রগামী থাকে।

খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান দাঁড়ায় ১৩৮, ৬ উইকেট পড়ে।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় শেষ ওভারের শেষ দুটো বলে দুরাণী ২টো উইকেট নিয়েছিলেন। তৃতীয় দিনের খেলার সূচনায় দুরাণীর প্রথম বলে চার মারলেন লেস্টার কিং, দুরাণীর 'হ্যান্ডিক' সম্মান পাওয়া আর হ'ল না। দলের ১৫৪ রানের মাথায় কিং নিজস্ব ১৩ রান করে অবিশ্য দুরাণীর বলেই নাদকাণীর হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন। তাঁর শন্য উইকেটে খেলতে নামেন কানহাই। অসুস্থ থাকায় কানহাই শনিবারের খেলায় যথাসময়ে নামতে পারেননি। লাগের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খেলা গড়ানি। বৃষ্টি নামায় ২৩ মিনিট আগেই খেলা বন্ধ হয়। এই সময়ে দলের রান ছিল ২২১, ৭টা উইকেট পড়ে। উইকেটে নট আউট ছিলেন ওরেল (৬৪ রান) এবং কানহাই (৩৩ রান)। লাগের পরবর্তী খেলায় দলের ২৩২ রানের মাথায় কানহাই নিজস্ব ৪১ রান করে রঞ্জনের বলে বোল্ড আউট হ'ন। তাঁর ৪১ রানে ছিল ৭টা বাউন্ডারী। ৮ম উইকেটের জুটিতে কানহাই এবং ওরেল ৯০ মিনিটের খেলায় দলের মূল্যবান ৭৮ রান তুলে দেন। এরপর ৯ম উইকেটে ওরেলের সঙ্গে খেলতে নামেন ওয়েসলে হল। হল দলের ২৪৮ রানের মাথায় ১০ রান করে রঞ্জনের বলে এল-বি-ডবলিউ হয়ে আউট হ'ন। লাগের পর যখন পঞ্চাশ মিনিট খেলা হয়েছে তখন পুনরায় বৃষ্টি নামার জন্যে খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হয়। এই সময়ে ওরেল ৮৯ এবং ভ্যালেন্টাইন ৬ রানে নট-আউট ছিলেন। দলের ২৮৩ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ উইকেট (ভ্যালেন্টাইন) পড়ে যায়। ওরেল আর মাত্র ২ রানের জন্যে তাঁর শতরান পূর্ণ করতে পারলেন না জুটির অভাবে, ৯৮ রান করে নট-আউট রইলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম

ইনিংসের ২৫০ রানের থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০ রান বেশী করে। ভারতবর্ষ ৩৫৮ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় প্রথম ইনিংসের মতই ওয়েস্ট ইন্ডিজের নবাগত খেলোয়াড় লেস্টার কিং ভারতীয় দলের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ান। কিংয়ের বলে দলের ১৫ রানের মাথায় জয়সীমা ৬ রান করে এবং দলের ২৫ রানের মাথায় দু'রাণী মাত্র ৪ রান করে আউট হন। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৩৭, দুটো উইকেট পড়ে। মেহেরা (১৫) এবং বোরদে (৮ রান) নট আউট থাকেন। ভারতবর্ষ এখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজদের থেকে ৩২১ রানের পিছনে পড়ে আছে। হাতে এখনো পুরো দু'দিন খেলার সময় বাকি এবং উইকেট জমা আছে ৮টা। সময়ের দিক থেকে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩২২ রান তুলে দেওয়া মোটেই শক্ত কাজ নয়, তবে ভারতবর্ষের কথা আলাদা।

৥ টেস্ট ক্রিকেটে দুর্লভ সম্মান ৥

ক্রিকেট খেলায় যত রকমের দুর্লভ সম্মান আছে তার মধ্যে পাঁচটি টেস্ট খেলা সমান্বিত টেস্ট সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই জয়লাভ করার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে দুর্লভ সম্মানের পর্যায়ে পড়ে। এ পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে মাত্র দুটি দেশ অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড এই সম্মান লাভ করেছে। ১৯২০-২১ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংল্যান্ড দলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলায় জয়লাভ করে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে প্রথম এই সম্মান লাভের গৌরব লাভ করে। এই টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ছিলেন ওয়ারিক আর্মস্ট্রং এবং ইংল্যান্ড দলের জে, ডবলউ, এইচ. টি ডগলাস। এই টেস্ট সিরিজে সিডনির প্রথম টেস্টে ৩৭৭ রানে, মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস এবং ১১ রানে, এডেলডের তৃতীয় টেস্টে ১১৯ রানে, মেলবোর্নের চতুর্থ টেস্টে ৮ উইকেটে এবং সিডনির পঞ্চম টেস্টে ৯ উইকেটে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে 'রাবার' জয় করে। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে পাঁচটি টেস্ট খেলার টেস্ট সিরিজ প্রথম আরম্ভ হয় অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১৮৮৪-৮৫ সালে—এই দুই দেশের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট খেলা সূচনার অনেক বছর পরে। দুটো টেস্ট খেলার টেস্ট সিরিজ নিয়ে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হয় ১৮৭৬-৭৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে।

এরপর টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলাতেই অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভ—অস্ট্রেলিয়া সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ১৯৩১-৩২ সালে। এই 'রাবার' বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন বিল উডফুল। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অধিনায়ক ছিলেন এইচ বি ক্যামেরন।

সুদীর্ঘকালের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলাতেই একদল জয়লাভ করেছে এমন ঘটনা ঘটেনি। ১৯৫৯ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ড ৫-০ খেলায় ইংল্যান্ড সফরকারী ভারতীয় দলকে পরাজিত করে দ্বিতীয় দল হিসাবে প্রথম এই সম্মান লাভ করে। তবে ইংল্যান্ডের একজনের অধিনায়কত্বে এই সম্মান আসেনি—পিটার মে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্ট খেলায় অধিনায়ক ছিলেন এবং কলিন কাউড্রে ছিলেন শেষের দুটি টেস্টে—চতুর্থ এবং পঞ্চম।

সুদূর অধিনায়কের সাফল্যের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ারিক আর্মস্ট্রং এবং বিল উডফুলের মর্যাদা ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৫৯ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলায় বিজয়ী ইংল্যান্ড দলের যুগ্ম অধিনায়ক পিটার মে এবং কলিন কাউড্রে থেকে অনেক বেশী।

৥ ক্যালকাটা হকি লীগ ৥

১৯৬২ সালের ক্যালকাটা হকি লীগ প্রতিযোগিতার সকল বিভাগের খেলা শেষ হয়েছে। প্রথম বিভাগের 'এ' গ্রুপে মোহনবাগান ক্লাব ১৮টা খেলায় ৩৪ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছে। লীগের শেষ খেলায় এরিয়ান্স দলের কাছে ১-০ গোলে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতার অপরায়ে সম্মান লাভ থেকে মোহনবাগান বঞ্চিত হয়েছে। এই খেলাটির উপর মোহনবাগান দলের বিশেষ কিছু গুরুত্ব ছিল না—একমাত্র অপরায়ে রেকর্ড করা ভিন্ন। কারণ এই খেলার আগেই তারা নিজ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে যায়। মোহনবাগান দলের নামকরা খেলোয়াড়রা বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত গোল্ড কাপ হকি টুর্নামেন্টে দলের পক্ষে যোগদান করায় এরিয়ান্সের বিপক্ষে মোহনবাগান এক দুর্লভ দল গঠন করতে বাধ্য হয়। মোহনবাগানের বিপক্ষে এরিয়ান্স ২ পয়েন্ট পাওয়াতে দ্বিতীয় বিভাগে নামা থেকে এরিয়ান্সের ফাঁড়া কেটে গেল। 'এ' গ্রুপে রাগাস-আপ হয়েছে গত বছরের যুগ্ম লীগ চ্যাম্পিয়ান ক্যান্টমস, ১৮টা খেলায় তাদের ২৭ পয়েন্ট

উঠেছে। প্রথম বিভাগের 'বি' গ্রুপে প্রথম স্থান লাভ করেছে গত বছরের যুগ্ম-লীগ চ্যাম্পিয়ান ইন্টবেংগল এবং রাগাস-আপ হয়েছে মহম্মদান স্পোর্টিং। ইন্টবেংগল ক্লাব অপরায়ে অবস্থায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—১৮টা খেলায় ৩৫ পয়েন্ট—একটা খেলা ড্র।

দ্বিতীয় বিভাগে বি এন আর (১৫টা খেলায় ৩০ পয়েন্ট) এবং ক্যালকাটা এফ সি (১৫টা খেলায় ২৭ পয়েন্ট) যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ান এবং রাগাস-আপ খেতাব পেয়েছে।

৥ বাইটন কাপ ৥

ভারতীয় হকি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা বলতে বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা। বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। ক্যালকাটা ক্যান্টমস ১১ বার বাইটন কাপ পেয়ে সর্বাপেক্ষা বেশীবার বাইটন কাপ জয়লাভের রেকর্ড করেছে। তাছাড়া ক্যালকাটা ক্যান্টমস একই বছরে ৮ বার হকি লীগ এবং বাইটন কাপ পেয়ে রেকর্ড করেছে।

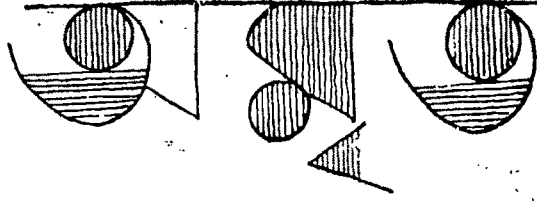
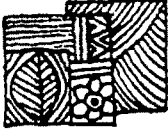
১৯৬২ সালের বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ৩০টি দল নাম দিয়েছে—বহিরাগত দল ৮টি এবং স্থানীয় দল ২২টি। সরাসরি তৃতীয় রাউন্ড থেকে খেলবার সুযোগ পেয়েছে এই ৬টি দল—মোহনবাগান, ইন্টবেংগল, ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী, টাটা স্পোর্টস, ইন্ডিয়ান নেভী এবং ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব।

চতুর্থ রাউন্ডে সরাসরি খেলবে ২টি দল—বোম্বাইয়ের সেন্ট্রাল রেল এবং মাদ্রাজের ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ।

ডেভিস কাপ পূর্বপ্ৰল

আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্বপ্ৰলের খেলায় ভারতবর্ষ প্রথম রাউন্ডে ৫-০ খেলায় পাকিস্তানকে পরাজিত করে এবং পরবর্তী সোমি-ফাইনালের খেলায় ৪-০ খেলায় ইরানকে পরাজিত করে পূর্বপ্ৰলের ফাইনালে উঠেছে। ইরান প্রথম রাউন্ডে ৩-২ খেলায় মালয়কে পরাজিত করে সোমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলোছিল।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্বপ্ৰলের অপরাদকের সোমি-ফাইনালে ফিলিপাইন ৩-২ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। ভারতবর্ষ বনাম ফিলিপাইনের পূর্বপ্ৰলের ফাইনাল খেলাটি আগামী ২৮শে এপ্রিল দিল্লীতে সুরু হবে।



১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৫১শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 27th April, 1962.
40 Naya Paise.

সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে নতুন কতকগুলি করবৃদ্ধির প্রস্তাব আছে। ভারতের জনসাধারণ দরিদ্র এবং পর্যায়ক্রমিক মূল্যবৃদ্ধির চাপে পর্যুদস্ত। কাজেই কর-ধারের কথা উঠলে যে এখানে বিবর্ততার আবহাওয়া নেমে আসবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। চারিদিকেই সেজন্যে সমালোচনার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু ভারতবর্ষ একটি গঠনশীল দেশ। তৃতীয় পরিকল্পনার জন্যে অর্থ সংস্থান করতে হলে করবৃদ্ধি না করে উপায়ই বা কি ছিল সেটাও বিবেচ্য।

এক নজরে যা অনুমান করা যায়, সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে করবৃদ্ধির আওতায় এসেছে—তামাক, সিগারেট ও মিহি কাপড়। তাছাড়া রপ্তানী-কর কমানোর জন্যে চায়ের রপ্তানী বেড়ে যাবে বলে চায়েরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু একমাত্র কাপড়ের দৃষ্টান্তটি বাদ দিলে এগুলির জন্যে কারোই ঠিক জীবনযাত্রা অচল হওয়ার কথা নয়। কাজেই এনিম্নে সোরগোল তোলা কতখানি যুক্তি-সঙ্গত তা চিন্তার বিষয়।

বরং অশান্তির মেঘ ঘনীভূত হয়ে আসছে অন্যদিক থেকে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বিগত এক বছরে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে গত শুক্রবারের 'যুগান্তর' পত্রিকায় যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাই থেকেই বোঝা যায় সাধারণ মানুষ এখন কী দুর্দশায় জীবনযাপন করছে। চাল, মাছ, শাকসব্জী ইত্যাদির প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন আশ্চর্যরকম মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে যে সকলেরই মনে যেন মনস্তত্ত্বের এক নতুন ব্যাধির মতো 'বাজারাতঙ্ক' দেখা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু এগুলির জন্যে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোনো রকম বাজেট-প্রস্তাব বা নতুন কর দায়ী তা বলা যায় না!

প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্যা এখন অনেক গভীর। অতিমুনাফার লোভ এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের মনে

এমন গভীরভাবে শিকড় বিস্তার করে আছে যে, সুযোগ পেলেই তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আসল বিপদ রয়েছে সেইখানে। কারণ, মূল্যবৃদ্ধি এবং বেতনবৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত দেশের অর্থনীতিকে মুদ্রাস্ফীতির দিকে নিয়ে যায়, এবং পরিণামে বৃহত্তর জটিলতার উদ্ভব ঘটে।

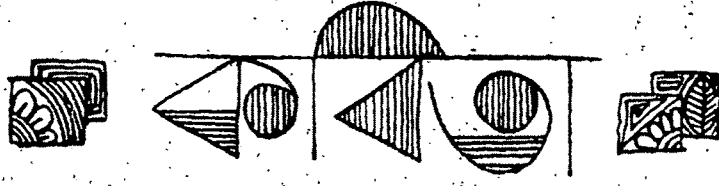
সেই জন্যে মূল্য বৃদ্ধির গতিরোধ করা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। এতে মানবিক প্রশ্ন তো আছেই, কিন্তু সেকথা বাদ দিলেও দেশের গঠনকর্মকে অব্যাহত রাখার জন্যেও এ ব্যবস্থা আশু-আচরণীয়।

এবং সেই সত্ত্বেই দরকার নতুন কর্মসংস্থানের উপায় আবিষ্কার করা। বেকার-সমস্যা ক্রমেই এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে যে, কিছুতেই একে আর ভবিষ্যতের জন্যে সিরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত এই উভয় শ্রেণীর বেকার যে কেবল উপার্জনশীল ব্যক্তিদের উপর বিরাট ভারস্বরূপ তাই নয়, অব্যবহৃত মনুষ্যশক্তি হিসাবেও তা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এক অপচয়ের ক্ষত-মুখ। দেশগঠনের জন্যে এই অপচিত মনুষ্য-সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার হওয়া উচিত। না হলে পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের অত্যন্ত দেরি হয়ে যাবে।

‘অমৃত’ের দ্বিতীয় জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ১১ই মে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে সুপরিচালিত আলোচনা এবং নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক—‘অমৃত’

বাস্তবিক, প্রত্যেক ভারতবাসীরই চোখের সম্মুখে আজ শব্দ একটি মাত্র আশার বর্তিকা—সে হল, পরিকল্পনা। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর বিদায়-ভাষণে লোকসভাতে যে সমাজতান্ত্রিক সুখী ভবিষ্যতের কথা বলেছেন সেই নতুন যুগের উদ্ভোধনের জন্যেই পরিকল্পনা। এই পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনাগুলিকে যদি সত্যিই আমরা ভবিষ্যৎ উন্নতির সিঁড়ি বলে গ্রহণ করি তাহলে আমাদের যাত্রা-পথের দৃংথ হয়তো এত অসহ্য মনে হবে না। বিশেষ করে, দেশগঠনের জন্যে আমরা যখন বিদেশের সাহায্য ও ঋণের মূখ্যোপেক্ষী, তখন অল্পস্বল্প বর্ধিত কর যে আমাদেরও দেওয়া উচিত এটা বোধহয় মনে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।



বসন্তে গোবিন্দ চক্রবর্তী

যেখানে আকাশ জ্বলে দাউদাউ পলাশে ও কৃষ্ণচূড়ায় :
হরিণ ও চিতা চরে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি পাহাড়ের গায়।
এলোমেলো তাঁবু বেন ফেলা,
দূরে-দূরে বসতির মেলা,
ঘাসের আঁচল পেতে এক পাশে আড়াআড়ি পৃথিবী ঘুমায়—
চল না বেড়াতে যাই সেখানে দুর্দিন

সুদূরে একান্ত নিরালায়।

তেমন একটি বাড়ী অবিকল টকটকে প্রবালের রঙ—
না মেলে—পেতে ত' পারি একটু বাগানঘেরা ডেরাই বরং।
ঘুঘুডাকা উদাসী দুপূর,
ঝর্ণার একটানা সুর,
ধবধবে শাদা দিন, তারার ফিনিকফোটা ঝিকিমিকি রাত—
যাই মেলে টুকটাকি পাখি কি, জোনাকি

—তাতেই সাজাব সওগাত।

আসবে ময়ূরগুণি পুরোপুরি পোষমানা পাখির মতন—
কখনো নাচবে ছাদে, কিছুর বা নাচেরি ছাঁদে ভরাবে উঠোন।
পেতে দুর্গিট বেতের চেয়ার
বস যদি মুখোমুখি—আর
একটি জংলী হাওয়া এক মূঠো ঝরাপাতা তখনি ওড়ায় :
ঝড় নয়—মনে হবে শ্বাস বেন কার

পাক দেয় বৃকের গোড়ায়।

কী খোঁজ যে দিশেহারা ইটপাথরের এই নিরেট নগরে :
ছায়া এরা, কায়্যা নয়—পুতুলের মত যারা ঘোরাফেরা করে।
তুমি ঘুরে যতদূর যাও
যার পানে যতই তাঁকাও
কেউ সুধাবে না নাম ভুল করে কোনোদিন ভুলেও বারেক।
একটু বেড়াতে চল তারচে' দুর্দিন,

একটুই কখনো অনেক।

নৌকো

আলোক সরকার

দুঃখ এই কোনোদিন দুঃখ পাওনি তুমি। ভালোবাসা,
একদিন খুব বড়ো দুঃখ জেনো।
দাঁড়িয়ে নির্মোহ একা অন্ধকারে, বাগানের সঘন কুয়াশা
তার মাঝে দুইটি ফুলের স্থির অনিকেত নিস্পৃহে বিষাদ—
নির্নিমেষ সেই ছবি চিনো।

সারাদিন বিকেলবেলার হাওয়া, পাতা ঝরে রিঙ্ক অবসাদ।।
আমাদের রৌদ্র দিনগুলি

এখন মাঠের শেষে সাদা আলো, শব্দহীন নির্জন বিশ্রামে
জেগে ওঠে সুদূর গ্রামের নদী, অনুচ্ছ্বাস প্রগত অগ্নিগুলি
ভাসায় ধূসর নৌকো নিরুদ্দেশে—তার খনি কোনোদিন শোনো?

ভালোবাসা, একদিন দুপূরবেলার গাড় জাগরণে দেখা

মাকড়শার জাল ফাটা দেয়ালের ক্ষুদ্রিত তমসা

জানালার পাশের নিভুতে—দুই হাতে নত মুখ ঢেকো :

নৌকো চলেছে দূর তেপান্তরে, জলধানি বিস্তীর্ণ বিরাম।

দু-হাতে দরজা খুলে বিদ্যুতি আকাশে দেখো আলুনিত শ্রাবণ সহসা।

দুর্দশা

জৈমিনি

স্বর্গরাজ্যে অশ্বিনীকুমারস্বয়ং যেমন অবিচ্ছেদ্য, আমাদের মর্ত্যভূমিতে, বিশেষ করে এই বাংলাদেশে, ইংকুলীশিষ্কার অনিবার্য সঙ্গী জৈমিনি প্রাইভেট টিউটার। ইংকুলগুলিতে পড়াশোনা কতদূর কি হয় সে বিষয়ে আমি আপাততঃ কোনো মন্তব্য করতে চাইনে, কিন্তু পাঠ্য বিষয়ের এমন ব্যাপ্তি ঘটেছে এবং হোমটাস্কের বহর এতোই বেশি যে, সরলমতি বালক-বালিকার পক্ষে সেগুলি সামলে ওঠা একরকম অসম্ভব। কাজেই, হয় অভিভাবক নিজে পড়াবেন অথবা একজন প্রাইভেট টিউটার রাখবেন, এছাড়া কোনো বিত্তীয় রাস্তা নেই। এবং যেহেতু আজ-কাল অভিভাবকদের প্রাণ রাখতেই প্রাপ্ত অতএব প্রাইভেট টিউটারই যে এক ও অমিথ্য ক্যাডারী, এটুকু বুঝতে ন্যায়-শাস্ত্রের শরণ নিতে হয় না।

কাজেই ইনি আছেন। কলকাতা শহরে উনুন ধরানো ধোয়ার মত ইনিও কিছুক্ষণ ব্যাডির আবহাওয়া বৃদ্ধিবাস করে রাখেন। এই নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষণিকের অতিথির জন্যে অভিভাবক বা ছাত্র কারোই খুব বেশি ভালোবাসা নেই। যে অসহায়তায় মানুষ দাঁতে দাঁত চেপে ইনজেকশন দেওয়ার সময়টুকু পার হ'য়ে যায়, সেইভাবেই সকলে পার হন মাস্টার আসা এবং - মাস্টার থাকার সময়টুকু। মাস্টার চলে গেলে সকলেই যেন হাঁপ ফেলে বাঁচেন।

অথচ না হলেও চলে না।

এবং কেবল আজ নয়, বোধকরি চিরকালই। সুন্দর অতীতে মহাভারতের কালেও দৌখি আচার্য কৃপ এবং দ্রোণ কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত হ'য়েছেন। আধুনিক যুগে আজ থেকে প্রায় নব্বুই বছর আগে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালেও দৌখি একই ইতিহাস। তাঁর সেজদাদার কড়া শাসনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাধিক গৃহশিক্ষকের পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বাবধানে কেটে যেত কবির সারাটা দিন। নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। এবং সব থেকে আশ্চর্য, যে ইংরাজ ভাষায় তিনি পরবর্তীকালে ইংরাজ সাহিত্যিকের মতোই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, ছেলেবেলায় সেই ইংরাজি শিক্ষার নামেই হত তাঁর সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক। 'জীবনস্মৃতিতে' দেখা যায়, তাঁর ইংরাজি ভাষার টিউটার ছিলেন মোড়িকেল কলেজের এক ছাত্র, অঘোর-বাবু। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“এই মোড়িকেল কলেজের ছাত্র মহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত আশ্চর্য-

নাভানা'র বই

পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

মাত্র ন' ঘণ্টার ঘটনা হ'লেও পলাশির যুদ্ধ একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণেই বাংলা দেশের মধ্যযুগের অবসান এবং বর্তমান যুগের অভ্যুদয়। কলকাতা শহরের গোড়াপত্তনের কথা, বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজের আত্মউদ্বোধনের ইতিহাস ক্রান্তদশী লেখকের সরস কথকতার বৈশিষ্ট্যে সার্থক উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক ॥ চার টাকা ॥

সমুদ্র-হৃদয় ॥ প্রতিভা বসু

দুটি বিরুদ্ধ হৃদয়ের আত্মসন্নিবিষ্ট থেকে 'সমুদ্র-হৃদয়'-এর অপ্রত্যাশিত কাহিনীর জন্ম। নবাব সুলতান আমানের ভালো লাগার আলো কি করে ভালোবাসার আগুনে পরিণত হ'লো আর নবাবের সবুজমহলে বাঁধনী সুলেখা তালুকদারের চিরসঞ্চিত অশ্রু আকোশ অবশেষে কোন অতলান্ত মমতায় আকুল উদ্বেল, 'সমুদ্র-হৃদয়'-এর নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তিতে তা সজল বিধুর রেখায় আঁকা পড়েছে ॥ চার টাকা ॥

গড় শ্রীখণ্ড ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার

'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসের আদ্যান্ত কাহিনীটি যেন যুগসন্ধির জীবন-জিজ্ঞাসার নিষ্ঠুর জবাব। বৃন্দসভা নয়, কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বও নয়, দেশের মাটির মজির উপরেই গণজীবনের শ্রী ও সমৃদ্ধি। বিশাল পটভূমিতে বিচিত্র প্রাণ-প্রবাহের গভীরতায় মহৎ উপন্যাস ॥ আট টাকা ॥

মীরার দুপুর ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

দেবদারুর মতো সক্ষম স্বামী এখন অসুস্থ। অচল সংসারকে চালু রাখার তাগিদে প্রসাধনের আড়ালে ক্রান্তি ও বিকৃতিকে ঢেকে নিয়ে মীরাকেই বেরুতে হচ্ছে টাকার ধান্দা। শহরের বিচিত্র সংসর্গে শূচিতার ছিটফোটা খোয়া গেলেও সভাসমাজ তো আর অসতী বলছে না তাকে। জীবিকার হিজিবিজি থেকেই হয়তো একদিন জীবনশিপের অমৃত উন্মার, নয়তো ঠাট্টমক বজায় রেখেও মীরা চক্রবর্তী'রা শেষ পর্যন্ত শূন্য কোনো শূন্য এসেসের শিশি।... 'মীরার দুপুর' সমস্যা-পীড়িত প্রেমের প্রসঙ্গে বলিষ্ঠ আধুনিক উপন্যাস ॥ তিন টাকা ॥

চার দেয়াল ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ

বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রক্ত উন্মেষ-আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্রী বিনতা মধ্যবিত্ত জীবনের মামুলি নামক নায়িকা হ'য়েই চরিতার্থ হবে? যৌবনচেতনার আকস্মিকতার সংস্কারজীর্ণ দেয়ালের উপর তাই অবরোধ-মন্ডির আতনাদ বেজে উঠে : না, না, না। নতুন মূল্যবোধের দৃঢ় প্রত্যয়ে কাহিনীপ্রধান উজ্জ্বল আধুনিক উপন্যাস ॥ তিন টাকা ॥

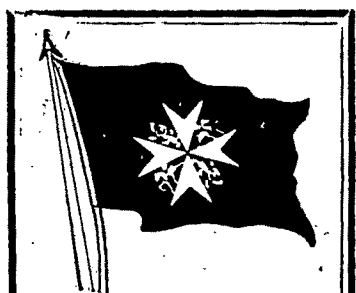
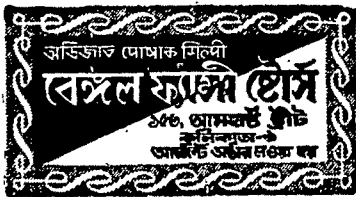
নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাডভিনউ, কলকাতা ১৩

রূপে ভালো ছিল যে, তাঁহার দিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনা সন্তোষ একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। কেবল একবার যখন মোড়িকেল কলেজের ফার্সি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল, সেই সময় শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে সময়টাতে মাস্টার মহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই এবং তাঁহার আরোগ্য লাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

তাছাড়া অঘোরবাবুর আসার সময়ও ছিল একেবারে অনিবার্য রকম নিষ্ঠুর। একদিন মৃষলধারে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় রাস্তায় একহাট জল জমে গেল। এমন দিনে মাস্টারমশায় কিছুতেই আসতে পারবেন না ভেবে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অন্য দু'জন সহপাঠীর মনের ভিতরটা 'কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত' হয়ে উঠল। এদিকে ঘড়ির কাঁটাও দু-চার মিনিট অতিক্রম করে গেল। মনে খুব ভরসা, অথচ 'এখনো বলা যায় না' ধরনের ভাব। অবস্থাটির বর্ণনা দিয়ে কবি লিখেছেন—

“.....রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গাঁলার মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। ‘পতীত পত্নী বিচলিত পত্নী শক্তিক ভবদুপখান’ যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা-হতোসি



৪ঠা মে—

সেন্ট জন এম্বুলেন্স

গতাকা দিবস

আতের সেবায়

মুক্ত হস্তে দান করুন।

করিয়া পড়িয়া গেল। দৈব-দুর্ঘটনাপে অপরাহৃত সেই কালো ছাত্রটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে অপর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মী বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টার মহাশয়ের সমানধর্মী দ্বিতীয় আর কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।

যাই হোক, এবার হাল আমলের কথায় আসি। প্রাইভেট টিউটার এখন যেহেতু ‘নেসেসারী ইভল’ সেইহেতু অনেক বাড়িতেই দেখা দিতে তাদের অভ্যর্থনা দায়সারী গোছের। শিক্ষকের চোখের সামনে না হলেও বেশ শ্রুতিগম্য ভাবেই অনেক গৃহিণীকে ব্যাজার কন্ঠে হাঁক দিতে শোনা যায়—‘ওরে, খোকনের মাস্টার এসেছে, এক কাপ চায়ের জল বসিয়ে দে!’ কিংবা মাস্টারমশাইকেই সম্বোধন করে বলতে শোনা যায়, ‘কাল খোকনের জন্মদিন। বিকেলে ও পড়তে পারবে না, আপনি বরং তিনটির সময় আসবেন!’ এছাড়া, ‘আপনি তো কলেজ স্ট্রীটে যান, দেখবেন তো এই বইখানা পাওয়া যায় কিনা,’ অথবা ‘খোকনের আজ জন্ম হ’য়েছে, আপনি বরং বাবলুকেই গোটাকত অঙ্ক কষিয়ে যান,’ এ ধরনের অনুরোধও একেবারে দুলভ নয়।

তবে মাস্টারমশাইরাও যে খুব নিরীহ জীব এমন বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। পরীক্ষার আগের কয়েক মাস কোনো কোনো কৃতবিদ্য শিক্ষক সম্ভবতী পুঙ্জোর পুরুতটাকুরের মতো তিন-চার বাড়িতেও বিদ্যাদান করে থাকেন। ইস্কুলের মাস্টার হলে এমনিতেই বাজারদর বেশি হ’য়ে যায়, তার উপর কারো কারো আবার ছাত্র পাশ করানোর ব্যাপারে এমন হাতযশ থাকে যে তাঁরা ‘সীজিন টাইমে’ নাওয়া-খাওয়ার সময় পান না। এই রকম একজন অঘটন-ঘটন-পটু শিক্ষকের কাছে জনৈক ফেল-করা ছাত্রের অভিভাবক পরীক্ষার ঠিক আগের মাসটাতে এমন নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছিলেন যে বাধ্য হয়ে তাঁকে এক অশ্রুতপূর্ব শর্তে রফা করতে হয়েছিল। স্থির হয়েছিল এই যে, সকালে বিকেলে বা সন্ধ্যায় মাস্টারমশাই পড়াতে পারবেন না, তিনি পড়াবেন দুপুরে তাঁর অফ পিরিয়ডের সময়ে। অবশ্য সে সময়ে ছাত্রকে হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সে থাকবে ইস্কুলে। তা না পাওয়া যাক, তার টাস্কের খাতাটা পেলেই চলবে। সেটা যেন সে তার বাড়িতে রেখে যায়। বাড়িতে মানে, বাড়ির জানলায়। মাস্টারমশাই অববেচক নন, দুপুরে এসে বাড়ির লোকের শান্তিভঙ্গ করবেন না। বাড়ির জানলায় সূতো দিয়ে বাঁধা খাতাখানি নিয়ে তিনি এখানেই দাঁড়িয়ে টাস্কগুলি সংশোধন করে নতুন

টাস্ক দিয়ে যাবেন। এবং গুরু-শিষ্যে সাক্ষাৎ না হলেও এইভাবে চলবে নিরুপদ্রব পঠন-পাঠন।



শুনছি, এভাবে পড়েও ছাত্রটি সেবার পরীক্ষার পাস হ’তে পেরেছিল।

আরেকজন কলেজের অধ্যাপক জনৈক দয়ে-মজা ছাত্রের অনুরোধে শব্দ এইটুকু সময় দিতে পেরেছিলেন যে, তিনি যখন ভোরবেলায় ফাঁকা ট্রামে বড়-বাজারের এক ধনী ছাত্রকে পড়াতে যান সেই সময়টুকু ছাত্রটি তাঁর সঙ্গে একই সীটে বসে জ্ঞানসঞ্চয় করে নিতে পারে। অবশ্য প্রণামীর অঙ্ক যে তাই বলে কিছু কম দাখ করা হয়েছিল তা নয়। এবং সবটাই ছিল আগাম।

ইনি অবশ্য পরবর্তীকালে এ’র এক নবীন সহকর্মীকে আগাম নেওয়ার কারণটা সবিস্তারেই বলেছিলেন। তাঁর ধারণা, আগাম না নিলে, (১) ছাত্রের দিক থেকে সীরিয়াসনেস আসে না, (২) পরীক্ষার মাসের মাইনে পাওয়ার নিরাপত্তা থাকে না, এবং (৩) ছাত্র যদি ফেল করে, কিংবা ইম্বর না করুন, মারা যায়, শিক্ষকের পরিশ্রমটাও সেই সঙ্গে মাঠে মারা যায়।

সুখের বিষয়, হাজারকরা একজন গৃহশিক্ষকও হয়তো এই ব্যস্তির মতো দুঃদর্শী নন। এবং সেইজন্যেই এখনো বনে না গিয়ে মানুস সংসারেই বাস করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে অবস্থা এখন চলছে তাকেও ঠিক মনুষ্যোচিত বলা যায় না। গৃহশিক্ষক এবং অভিভাবক এই দু’পক্ষই যদি একটু সংযত না হন তবে এই হৃদয়হীন পরিবেশের ভিতর দিয়ে যে সব ছাত্রেরা ‘মানুষ’ হ’য়ে উঠছে তারা হয়তো সংসারে বাস করেই হ’য়ে উঠবে এক-একটি বনমানুষ।

চল্লিশ বছরের জীবনটা অনিন্দ্য-
সুন্দরের কাছে এমন বিস্বাদ হয়ে উঠবে
তিনি নিজেও ভাবেননি। এই দীর্ঘ
বছরগুলি ব্যর্থ নয়—বহু কৰ্মকাণ্ডে
মহীরূহ হয়ে উঠেছে। খ্যাতি যশ অর্থ

দান
হল
মুণ্ডে



আমি কি! আমার নিজের বলে কি
আছে! আমি নিজেকে বুঝতে চাই,
নিজেকে চিনতে। আবার ভাবলেন
অনিন্দ্যসুন্দর। এক লোভনীর স্নোভের
টানে তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন,

দুর্ভাগ্যের অগণ্য মানুষ
বাহবা দিচ্ছে। আমি
ভেসে চলেছি, কখনো
ডুব-সাঁতারে, কখনো
চিত-সাঁতারে... আশ্চর্য!
তিনি এভাবে কতদিন
ভেসে চলে ছিলেন।
নিজেকে একবারও
ভাবেননি, নিজের জন্যে
কোনো সময়ও তাঁর ছিল
না। এবার তাঁকে তাঁরে
উঠতে হবে। না, আর

মিথি
আচার্য

তাঁর মুকুটে এসে শোভা বধন করেছে।
বিরূপ সমালোচকেরাও সবশেষে স্বীকার
করতে বাধ্য হয়েছেন অনিন্দ্যসুন্দর
আধুনিক যুগমানসের সার্থক ভাষ্যকার।
তাঁর লেখার বর্তমান আছে কিন্তু
ব্যক্তনায় তা কালোত্তীর্ণ ধ্রুপদের মহিমা
বিকীর্ণ করেছে। রচনার এই প্রৌঢ়-
গুণেই তিনি তরুণ চিত্তকে জয় করতে
পারেননি। তরুণেরা তাঁর লেখা বোঝে
না। তাই প্রবীণ বিদগ্ধদের দরবারে
তাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। এই কয়েক
বছরে ক্রান্তিহীন অজস্র ছোটগল্প
লিখেছেন অনিন্দ্যসুন্দর, সেগুলি সম্পদ
হয়ে আছে। আর মাত্র গুটিকয়েক উপ-
ন্যাস জীবনদর্শনের কীটনে সোচ্চার।
নামের পায়ে পায়ে সম্মান এসেছে, অর্থ।
পৈতৃক বাড়িটি সারিয়েছেন তিনি,
সংসারে কল্যাণী স্ত্রী, দুটি প্রজাপতির
মতো ছেলেমেয়ে। এই পরিবারের তিনি
কর্তা, দায়িত্বশীল পিতা, প্রেমময় পিতা।
সমস্ত সংসারে স্নিগ্ধ পবিত্রতার প্রলেপ।

মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে জন্মেও
খ্যাতি যশ অর্থ পারিবারিক মারা সমস্ত
কিন্তু হঠাৎ এক সকালে অনিন্দ্যসুন্দরের
কাছে এমন বিরক্তিকর ঠেকবে তিনি
নিজেও কল্পনা করেননি। নিত্যকার
মতো আয়নার সামনে দাঁড়ি কামাতে
বসেছিলেন, গরম জল রাখা ছিল
টোবলে, সরঞ্জামগুলি প্রস্তুত। হঠাৎ
আয়নার প্রতিফলিত নিজের চেহারার
দিকে চেয়ে কেমন স্তম্ভ হয়ে গেলেন
তিনি। অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়ার ফলে
চোখের মণি ঘোলাটে। অনিন্দ্যসুন্দর
দেখলেন। দেখলেন সকালের এলো-মেলো

বাসী চুলে বেরিয়ে-পড়া সাদা চুলগুলি,
পিনের মাথার মতো গলময় সাদা সাধা
দাগগুলি। কপাল কঁচকোলেন। কপলে
স্পষ্ট কয়েকটি ভাঁজ। অনেকগুলি নিস্তম্ভ
হয়ে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তারপর
অক্ষুণ্ণে বললেন : 'এগুলির কি অর্থ?'
তারপর চুপ করে গেলেন। কথা বলতে
চাইলেন, পারলেন না। অনেকগুলি গমে
হয়ে বসে রইলেন। পিছন ফিরে একবার
বুক-শেলফ-এ চোখ রাখলেন। তাঁর
নিজেরই বই, অজস্র পত্রিকা। লেখার
টোবলে গত রাতের অর্ধসম্পন্ন উপ-
ন্যাসের অংশ, পত্রিকার পাঠাতে হবে।

কেমন ধূসর চোখে অনিন্দ্যসুন্দর
তাকালেন তাঁর কীর্তিস্তম্ভের দিকে।
এই চারদেয়ালের ঘেরাটোপে আটকে-
থাকা তাঁর অস্তিত্বের কল্পনা করলেন
তিনি। এই ঘর আমার। এই কীর্তিও।
এখানে কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে পারবে
না, পারবে না কেউ স্পর্শ করতেও।
কিন্তু কী এর অর্থ? খ্যাতি যশ অর্থ।
নাকি এক বিরাট তামাশা। ঠান্ডা
নিরুদ্বেজ দৃষ্টিতে ঘরময় চোখ দিয়ে
আঁচড়ালেন তিনি। এক বিরাট তামাশা।
আবার ভাবলেন অনিন্দ্যসুন্দর। এগুলি
তাঁর কীর্তি নয়, জনসাধারণের তুমুল
হাততালিকে নির্ভর করে তিনি কসরত
দেখিয়ে চলেছেন। ছি ছি। একি লজ্জা,
এ কি গ্লানি। গড়পড়তা সাধারণ
মানুষের মতো তার চলাফেরা নয়, তিনি
কিন্তু কীমাকার এক ক্রাউনে পরিণত
হয়েছেন। নিছক তামাশা। এই যশ অর্থ
প্রতিপত্তি একটা ব্যঙ্গের নিশান ভুলে
তাঁর চোখের সামনে দুলছে।

ভেসে-চলা নয়। যশ প্রতিপত্তি অর্থ।
চিংকার করে উঠতে ইচ্ছে করল অনিন্দ্য-
সুন্দরের। ওগুলির তলায় তিনি তলিয়ে
গেছেন। তাঁর চল্লিশপূর্ণ জীবনটো,
চল্লিশ বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পদ
রক্ত-মাংস। আজ হঠাৎ মনে হল এই দীর্ঘ
বয়সে জীবনকে যথার্থরূপে তিনি
দেখেননি। তাঁর দৃষ্টি জীবন-দেখা
ভাগ্যে পরিণত হয়েছে। আয়নার প্রতি-
ফলিত শরীরের দিকে আবার তাকালেন
অনিন্দ্যসুন্দর। কাঁচা-পাকা চুল—এই
বয়সেই, দাঁড়ি বিস্মদ, বিস্মদ সাদায় ভরে
গেছে, কপালে বলী, চোখের তারা
ঘোলাটে। ওই সুন্দর মলাটে বাঁধানো
কেতাবগুলি, তাঁর শরীরে অত্যাচারের
নখ-দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। ওগুলি তাঁর
রক্ত, যৌবনকে হরণ করেছে। পরিবর্তে
আমি কি পেয়েছি। যশ প্রতিপত্তি অর্থ।
আমার রক্তের বদলে, যৌবন উৎসর্গ করে।
বুক ঠেলে কী-একটা উঠতে চাইল।
মাথাটা ঘুরল কি? চোখে বাপসা দেখছেন
বোধহয়। টোবলে মাথা রেখে কেমন ঘুম
এল অনিন্দ্যসুন্দরের। আর ঘুম-ঘুম
চোখের পরদায় একরশ টেউ এসে আছাড়
থেল। গানের মতো মুছল না। হঠাৎ,
হঠাৎই টোটদটো ভাঁজ খেল তাঁর :
কেমন এক আনন্দের, পিপাসার। স্বপ্ন
না সত্য। সুন্দর এক যৌবনের ছবি,
বিশ্বম সূত্রম সূচক, যেন তাঁর সারা-
জীবনের আদর্শ, প্রতীক। যশ প্রতিপত্তি
অর্থের ইমারত চোখের সামনে ভেঙে
যেতে দেখলেন তিনি, সেই ধূসর-
স্তুপের ওপর নতুন একটা জ্বর

নির্দেশ নিখুঁত এক যৌবনের প্রাণবন্ত প্রতীক।

‘একি। এখনো দাড়ি কামাওনি।’
চারের বাটি হাতে নন্দিতা ঘরে ঢুকল।

কে? নিম্নলিখিত চোখে ডাকলেন
অনিন্দ্যাসুন্দর। বহিঃ বহরের একটি
স্বাশ্রয়ী। তাঁর স্ত্রী, সন্তানের জননী।

‘অমন করে তাকিয়ে আছ কেন।
আমাকে চিনতে পারছ না।’ নন্দিতা
হাসিল।

নন্দিতা সুন্দরী। হাসলে এখনো
চোখের তারা অশ্রুত চকচক করে ওয়।
চন্দ্রবদন বহরের নৈরিকবদন নিয়ে
নন্দিতা এল গৃহিণী হয়ে। ওর
সৌন্দর্য অনেক শীত-বসন্ত-গ্রীষ্মের
স্বভাব জড়ানো। অনিন্দ্যাসুন্দরের প্রয়ো-
জনের আগুনে গলা সোনার মতো বিভিন্ন
অলংকারে রূপান্তরিত হয়েছে নন্দিতা।
প্রতিদিনের অভ্যাসে জড়ানো আটপোরে।

‘চা রাখো।’ অনিন্দ্যাসুন্দর বললেন।

প্রতিভাবান স্বামীর দিকে চোখ রেখে
কোনো ভরসা না পেয়ে কিছুক্ষণ কিছু
বলল না নন্দিতা। তারপর একটু চেষ্টা :
‘সকাল থেকেই এমন মেজাজ। কিছু
লিখতে পারেনি বুঝি?’

অনিন্দ্যাসুন্দর সে কথার উত্তর দিলেন
না।

গৃহিণীমানুষ, সকালে সময় থাকে
না। জলদপায়ে বেরিয়ে গেল নন্দিতা।

অনিন্দ্যাসুন্দর আগুনমানে হেসে
উঠলেন। চন্দ্রবদন বহরের জীবনটাকে যেন
বাংগ করলেন। আমি এই সংসারের প্রভু
—বললেন তিনি। আমার সংসার।
ঘোরতর সংসারী আমি। আমার স্ত্রী
আমার সন্তান আমার যশ প্রতিপত্তি
অর্থ।

চেয়ার ছেড়ে পদচারণা শুরু করলেন
অনিন্দ্যাসুন্দর। আয়নার পিছলে যাচ্ছে
তাঁর প্রতিবিম্ব। স্বপ্ন ঘনিয়ে এল
দেখতে : আছড়ে পড়ছে ঢেউ অশ্রুত
গর্জন। একটি নির্ভাজ অটুট যৌবন,
তাঁর স্বপ্ন, প্রতীক, আদর্শ। আশ্চর্য,
এতদিন কি হাস্যকর জীবন কাটিয়েছেন
তিনি। ভাঙচোরা পৃথিবীর সংগে তাঁর
দর্শনও বেকে-চরে গেছে। কদর্য
কুৎসিত প্লানির চিত্র এঁকেছেন তিনি।
একটি নিটুট যৌবনকে বৈজ্ঞানিকতার
মতো তুলে ধরতে পারেননি।

‘আমি মাস্তুলভাঙা হালচড়ে ডা। একটি
আছাড়—আবার বললেন তিনি। আমি

এ যুগের মতোই প্রত্যাহীন আদর্শহীন
প্রচণ্ড তামাশা। আমার স্বপ্ন নেই,
বিশ্বাস নেই, নেই কোনো প্রতীক। একটি
সুন্দর যৌবনের বিজয়-স্তম্ভ।

‘বাবা, আমরা ইশ্কুলে যাচ্ছি।’ কনক
আর বকল।

‘এস।’

তাঁর ছেলেমেয়ে, সুন্দর প্রজাপতির
মতো। তাঁর ভাবীকাল। অনিন্দ্যাসুন্দর
বাৎসল্য অনুভব করলেন। কিন্তু...এই
মুহূর্তে চিন্তিত হয়ে ভাবলেন তিনি :
এদের পৃথিবীতে আনবার জন্যে একটুও
সজাগ ছিলেন না তিনি, তাঁর হাজারো
কর্মব্যস্ততার পরে কোনো শ্রান্ত উত্তে-
জিত মুহূর্তে এরা এসে গেছে, অন্য-
মনস্কতার মাঝখানে। অনিন্দ্যাসুন্দর
বিমূঢ় হলেন। এই সংসারে তাঁর
অস্তিত্ব আলু-গা-আলু-গা, আনুষ্ঠানিক।
তাঁর সমগ্র চৈতন্যের সংগে এই
সংসারের সম্মিলন ঘটেনি। ঘটেনি—
বললেন অনিন্দ্যাসুন্দর।

একটা বিষয় বেদনার ছেয়ে গেল
অনিন্দ্যাসুন্দরের মন। খোলা মাঠে
দাঁড়িয়ে দূরের দিগন্তের দিকে চাইলে যে
বেদনা। যেন অকস্মাৎ হারিয়ে গেছেন
তিনি : একটা নাম-না-জানা হিমেল ভয়
তাঁকে পাকে-পাকে বেগুনি করে ধরছে।
আমার চন্দ্রবদন বহরের জীবনটা—কায়ার
মতো গলায় বললেন তিনি : আমার
স্বপ্ন, আমার আদর্শ.....এতদিন তিনি
ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে ছিলেন, তাঁর
অন্দরমহল কোনোটিনি জাগেনি, ঘুম
পানিদ্রা রাখা ছিলেন বসি। আজ চন্দ্র-
বদন তাঁর তীক্ষ্ণ মদিরায় রৌদ্র স্ফীত করে
তুলল তাঁর অন্তলোককে। সে-আলোকে
কেঁপে উঠলেন পাহাড়ের মতো ধরতর
করে। এবং দেখলেন নিজেকে।

সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিলেন
অনিন্দ্যাসুন্দর। সমস্ত সাহস জড়ো করে
ডাকলেন স্ত্রীকে। ‘আমি এখনি বেরোব।
সুটকেসে কিছু জামা-কাপড় পুরে দাও।’

নন্দিতা অবাক। ‘এখন কোথায়
বেরোবে।’

আলমারি খুলে টাকা বের করেছেন
অনিন্দ্যাসুন্দর। বললেন, ‘জানি না।’

নন্দিতা গজ-গজ করে বললে,
‘জানো না মানে। কি পাগলের মতো কথা
বলছ। দাড়ি কামালে না, খেলে না.....’

অনিন্দ্যাসুন্দর জামায় বোভাম
লাগিয়েছেন। টাকাগুলো পকেটে রাখ-

লেন। উসকো চুলগুলোয় আলতো
চিরুনি বুলোলেন। আয়নার মুখটা
পরীক্ষা করলেন একবার।

নন্দিতা আবার বললে, ‘এইভাবে কি
যাওয়া হয়। বলা নেই কওয়া নেই।’

দরজায় পা দিয়েছেন অনিন্দ্যাসুন্দর।
জুতোয় পা গুলিয়েছেন। এখনি নেমে
যাবেন বুঝি।

সুটকেস তাড়াতাড়ি গুছিয়ে দিল
নন্দিতা। মুখ অপ্রসন্ন বিহবল।

‘তোমার কাণ্ডকারখানা.....’

অনিন্দ্যাসুন্দর সুটকেস হাতে বেরিয়ে
গেলেন। একবারও পিছন ফিরে তাকা-
লেন না।

রাস্তায় নেমে সকালের একরাশ
আলোয় কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে রইলেন
অনিন্দ্যাসুন্দর। কিছু দেখতে পারলেন
না চোখে। মনে হল অন্ধ হয়ে গেছেন।
তারপর সম্ভবত ফিরে পেয়ে দ্রুত পায়ে
ট্যাঞ্জিতে উঠে বসলেন। কখন হাওড়া
স্টেশনে এসে পৌঁছলেন। টিকিটের
জানালায় দাঁড়িয়ে কি-একটা টিকিটও
সংগ্রহ করে এক্সপ্রেসে উঠে পড়লেন।
জানালায় ধারের সিটে বসে স্বপ্নিতর
নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। আর মুক্তি।
স্বগত বললেন অনিন্দ্যাসুন্দর।

গাড়ি ছাড়বে কয়েক মিনিট বাদে।
গাড়ির ভেতরে ইতস্তত দৃষ্টি ছুড়লেন
তিনি। বিষাদ গভীরতায় ডরে উঠল মন।
প্রত্যাহের দেখা অভ্যস্ত কতকগুলি মুখ।
নরনারী শিশু। ভাঙচোরা বিধ্বস্ত
পালিশ-করা মেরামত-করা কোথাও চড়া
রঙ উদগ্ন সুবাস। মনে হল বাসী
গম্বুটাকে ঢাকবার জন্যে তাঁর গম্বু
ছাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এই মানুষ—
মানুষের হাস্যকর অবশেষ। শব্দ
কাঠামো নিয়ে হাজির হয়েছে। অনিন্দ্য-
সুন্দরের চোখে। স্বপ্ন ঘনাল : একটি
নিটুট সুস্থ যৌবনের প্রতীক তাঁর
আদর্শ। নাঃ প্রাণধারণে শ্রান্ত মানুষের
মিছিল নয়। তাঁর স্বপ্নকে শরীর দিতে
মন অনিন্দ্যাসুন্দর। প্রয়োজন হলে
বিশ্বের থেকে ঊপকরণ এনে এই যৌবনকে
সম্মত করবেন তিনি। খুঁড়খুঁড় কতক-
গুলি ছবি ভেসে উঠছে তাঁর চোখে।
তারপরে শীর্ষে আলো কাঁপছে, এক-
জোড়া চোখ, দীর্ঘ নয় গভীর শীতের
দিনের রোদ্দুরের খুঁশি। টিকিলো নাকের
নীচে চোখের আলোকে সংগত জানাচ্ছে
গোলাপী পাতলা চোঁট, একটু ভিজ-

ভিজে, রক্তের আভাস। ক্ষীণ কটিকে ছাড়িয়ে উধেদাঁচলে-ঢাকা একজোড়া ডানাকোলানো পাখি, বাহুদুটো রাজ-হুসের গ্রীবার মতো বহিকম সূতান। কঠিন নিতম্ব ছাপিয়ে এক রাশ কাগো চুলের অরণ্য, ঠান্ডা, উন্মিদের গন্ধ জড়ানো। গাড়ির দোলায় দুলছে অনিন্দ্য-সুন্দরের মাথা, স্বপ্ন-পাওয়া অংশগুণি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমার স্বপ্ন, আমার প্রতীক—বললেন অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁর আবিষ্ট চোখের সামনে দিয়ে অনেক স্টেশন অনেক মানুষ এল গেল। তাদের দেখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। কারুর মুখ আছে, কারুর চোখ, কারুর কটিদেশ—কিন্তু সবগুলি লক্ষণ নিয়ে কেউ সম্পূর্ণ নয়। ক্লান্ততনুমন মানুষ। কোথাও যৌবন তার বৈজয়ন্তী মেলে ধরেনি। একটি আস্ত দিন সন্ধ্যার চিতায় জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেল। রাত্রির খনি খুঁড়ে কোথাও হীরকখণ্ড দৃঢ়ি নিয়ে উঠবে না—জানেন অনিন্দ্যসুন্দর।

শেষরাত্রির দিকে কোনো এক স্টেশনে গাড়ি থামতে স্বরিত উঠে দাঁড়ালেন অনিন্দ্যসুন্দর। ভাবলেন না কোন স্টেশন, দেখলেন না টিকিটের দৌড় ফুরিয়েছে কি না, সুটকেস হাতে করে নেমে গেলেন প্ল্যাটফরমে। ফিকে অন্ধকারে হাঁটু-মুড়ে কিমোছে স্টেশন, বাতিগুলি খোলাটে চোখে পিঁচুটিভরা দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মাথার ওপরে শূকতারাটা দপ্ দপ্ করছে। ট্রেনটা বিদায় নিতে ভালো করে স্টেশনটির দিকে চোখ রাখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। কী আশ্চর্য, স্টেশনটা তাঁর চেনা। চাবিশ বছর বয়সে একবার এসেছিলেন সেজকাকার সঙ্গে। ছোটো অরণ্য আছে একটা, কাঁকা ছিলেন তার চার্জ। স্টেশন ছাড়িয়ে মাইল দুয়েক, টাঙ্গায় যেতে হয়। কোয়ার্টার আছে। ডাক-বাঙলো আছে। আর আছে ছোটো ছোটো পাহাড় চড়াই-উৎরাই, ছোট্ট একটা নদী, বরনা। চারদিকে তাকিয়ে চাবিশ বছরের জীবনের নিবিড় টান বোধ করলেন অনিন্দ্যসুন্দর। খুশী হলেন। এখানে ফরসা হতে বাঁক, চারদিকটা জলো কালির মতো ঝাপসা। সুটকেস রেখে কিছুক্ষণ প্ল্যাটফরমে পায়চারী করলেন তিনি। ধূমপানের ইচ্ছে প্রবল হল। সিগারেট বার করলেন পকেট থেকে। আঃ, ধোঁয়া ছাড়লেন অনিন্দ্যসুন্দর। যশ খ্যাতি অর্থ—মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মনে মনে বললেন তিনি। এখানে কেউ তাঁকে চেনে না—যশ খ্যাতি

পিছনে তাড়া করবে না। নিজেকে হাল্কা বোধ করলেন তিনি। জীবনটা যে এত সহজ হতে পারে এবং এমন অনায়াসে তাকে বহন করতে পারা যায়, এর আগে টের পাননি। একবার শিস্ দিতে ইচ্ছে করল তাঁর। কিন্তু পারলেন না। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন স্টেশনে কেউ তাঁকে লক্ষ্য করেনি, ভাবতে ভালো লাগল তাঁর।

‘বাবুজি টাঙ্গা চাহিয়ে—’ সম্ভাব্য খন্দরের প্রত্যাশায় বৃন্দ দাঁড়ালো লোকটি এগিয়ে এল।

অকারণেই ভালো লাগল বৃন্দকে। আজকের প্রত্যাশার নবীন উষায় হৃৎপিণ্ড জুড়ে ভালো লাগার সর বাজছে। সামনের রেল লাইন ছাড়িয়ে নিচু দিগন্ত ডিমের মতো ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। এখনি ডিম ভেঙে লাল কুসুম ছড়িয়ে পড়বে দিগন্তে। অনিন্দ্যসুন্দর এই লগ্ন শব্দ মনে করলেন। টাঙ্গা ছুটে চলল। সর পিচালা রাস্তা, দুধারে ছেঁড়া ছেঁড়া বসতি, গাছপালার জটলা। চষা ক্ষেত। তারপর রাস্তা নিজের হয়ে এল। শাল-সেগুন ইউক্যালিপটাসের সারি দিয়ে গাড়ি ছুটে চলল। চাবিশ বছরের চোখ দিয়ে রাস্তাটা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন অনিন্দ্যসুন্দর। কাটা-ঝোপ, অনেক আগাছার স্মৃতির সড়ক

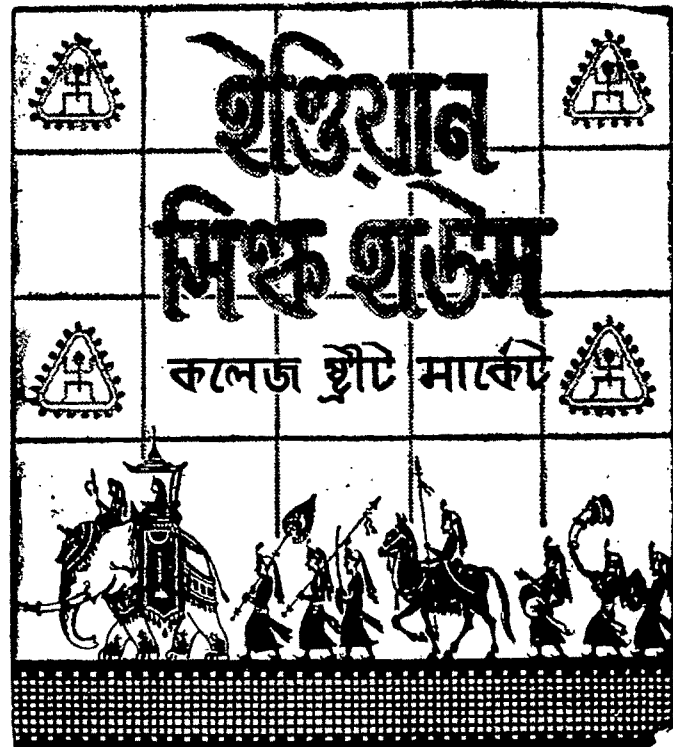
ডেকে গেছে। গাছপালার মাথা থেকে উঁচু, ওটা কি গির্জা, সৌদীনও কি ছিল! বাঁক ঘুরল টাঙ্গা। এবার জংগল পরিষ্কার। এপাশে ওপাশে মেটো ঘর। তারপর একটি কুয়োতলা। ঘোড়া কয়েক পা এগিয়ে গেল। টালির ছাদ-অলা ডাকবাঙলো পরিষ্কার চোখে পড়ল। ডাক-বাংলোর দক্ষিণ দিকে আরণ্যক সাহেবদের কোয়ার্টার। এখন আবছা মনে পড়ল। গাড়ি থেকে নেমে সর-জমিনে তদন্ত করতে লাগলেন অনিন্দ্যসুন্দর। যদি চাবিশ বছরের কোনো স্মৃতি হঠাৎ তুমুল গম্বে ঢেকে ফেলে সমগ্র চৈতন্যকে।

টাঙ্গাঅলাই খুঁজে নিয়ে এল বাংলোর ভূতাকে। ছোকরা। চালাক-চতুর বলে মনে হল। কিছুক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সাহেবের দিকে। না, কোনো সরকারী হুজুর নন। আবশ্যত হল সে।

সুটকেস হাতে নিয়ে স্টে-ই অভ্যর্থনা জানাল। ভাড়া নিয়ে সেলাম করে টাঙ্গাঅলা বিদায় হল।

বিরাত হল ঘর। তার দুধারে ছোটো ছোটো শয়নকক্ষ।

একটি ঘর অনিন্দ্যসুন্দরের জন্য নির্দিষ্ট হল। ভূতোর যাদুস্পর্শে স্বরিতে



ঘরটা কেড়েপড়ে বাসযোগ্য হয়ে উঠল। আরামকেন্দ্রার গা ঢেলে দিয়ে অনিন্দ্য-সুন্দর উচ্চারণ করলেন, আঃ। তারপর পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট ভুতোর হাতে ছুঁড়ে দিয়ে জানালেন তিনি এখানে কিছদিন থাকবেন। আহা! তার দাবতীয় ব্যবস্থা ওকেই করতে হবে।

ভূতা সেলাম করে বিদায় নিল।

সকালের রোদ কমলারাঙা হতেই অনিন্দ্যসুন্দর বাংলা ছেড়ে বের হলেন। ইতিমধ্যে দাঁড়ি কামানো হয়েছে, স্নানও করেছেন। দেহে মনে পরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধ লাগছে নিজেকে।

এই রাস্তা আমি চিনি—সকালের রোদে আর হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর। বুনো ঘাস আর উদ্ভিদের গন্ধ সুরার মতো উদগ্রীব করে তুলছে ইন্দ্রিয়গুলিকে। ডানদিকে একফালি পায়ের হাঁটা রাস্তা। অনেক চেনা মনে হল। যেন কোন কুমারীর সিঁথি দেখছেন তিনি। যৌবনের স্বপ্নটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে চোখের পাতায়। শব্দ সিঁথি নয়, দুপাশে উপছানো চুলের তরঙ্গ পানের মতো মুখ, ঘসা কাচের মতো গায়ের রঙ আর, অলোয় প্রপাত সূতিকর গভীর একজোড়া চোখ। অনিন্দ্যসুন্দর হাসলেন। আমি আসছি—আবার বললেন তিনি : অনেক পথ হেঁটে, অনেক বিফল সুযোগ-সুখের পর। হঠাৎ গাছপালা টেলে বেলোয়ারি ছুড়ির মিশ্রি আওয়াজ সত্য সমাহিত করে তুলল তাঁকে। অজস্র অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে তাকালেন তিনি : যেন কোন দামাল শিশু রাগ করে ভেঙে ফেলেছে ড্রেসিং টেবিলের বিরাট কাটা, আর ভাঙা টুকরোগুলির পর আছড়ে পড়েছে আকাশের আস্ত সূর্যটা, স্বলসে উঠল অনিন্দ্যসুন্দরের চোখ। মুখ হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। মস্ত একটা আলোর সাপ হয়ে কিলবিলা করছে বরনার জল। তিরতির করে পাথরের ওপর দিয়ে জলের ধারা বইছে। নীল জল, শেওলা আর ছোটো ছোটো কঁকড়া অদ্ভুত পারে হেঁটে চলেছে। জুতো খুলে কাপড় গুছিয়ে নেমে পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দর বরনার মধ্যে। ছড়ানো পাথরের ওপর দিয়ে টপকে টপকে চললেন। পায়ের পাতা ভিজছে, ভিজুক। সামনে পাহাড়টা গম্ভীর গোরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অজস্র রঙ-বেরঙের ফুল আর প্রজাপতি।

এতদিন বৃকের মধ্যে এই ঝরনা ওই পাহাড় কি করে ঘুমিয়ে ছিল। বৃক থেকে কী একটা ঠেলে উঠতে চাইল তাঁর। কেমন অদ্ভুত খারাপ-ভাগ্যার বিষাদে ভরে উঠল মন। মনে হল রক্তের ভেতরে একটা কাঁপনি অন্তর্ভব করছেন তিনি, মেরুদণ্ড বেয়ে কেমন এক শীতল ধারা। নিজেকে ভয়ংকর নিঃসঙ্গ নির্জন বোধ হল।

উঠে পড়লেন ঝরনা থেকে। ধীর পদক্ষেপে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললেন। ফুলগুলিকে স্পর্শ করলেন। ঘ্রাণ নিলেন নাসারন্ধ্র ভরে। স্পর্শ-গন্ধের বিপুল একটা জগৎ দুলে উঠল অনিন্দ্যসুন্দরের চোখে। পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আকাশকে আহবান জানালেন একবার, শব্দতরঙ্গ ডানা ছড়ানো পাখির মতো হা-হা করে ছাড়িয়ে পড়ল দিক-বিদিকে। ওখানে ঘন জঙ্গল, মাঝখানে পাহাড়টা ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেছে। ওই জঙ্গলে যাওয়া যায় না। নীচে ঝরনার দিকে তাকালেন তিনি। এখান থেকে লাফিয়ে পড়লে ঝরনা কী বৃকে টেনে নেবে। একটা পাথরের ওপর বসে নিশ্বাস নিলেন অনিন্দ্যসুন্দর। আঃ মুক্তি। তাঁর চাবিশ বছরের জীবনের জানালায় এই পাহাড়ও ছিল ঝরনাও ছিল। কিন্তু আজকের মতো তাঁর সন্তোকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরনি। এই পাহাড় আর ঝরনা কেই এতদিন বৃকের পাখিতে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন তিনি। তারা প্রতিশোধ নিয়েছে, কুরে কুরে খেয়েছে তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে।

সকালের রোদ এবার তাঁর হয়ে উঠেছে। ঘাম নয়, ভেতরে জ্বালা অন্তর্ভব করলেন। সিগারেট ধরিয়ে নিচে নেমে এলেন অনিন্দ্যসুন্দর। ফেরার পথে মন সুখে ভরে উঠল তাঁর। যেন বহু দিনের হারানো কোনো সম্পদকে ফিরে পেয়েছেন তিনি, যাকে উপভোগ করা যায়, যা প্রাণময় আলোয় অনন্ত যৌবনের জীবন্ত প্রতীক। সেই যৌবনের চেহারাটা আবার স্পর্শ-গন্ধের চেতনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারছেন তিনি। একটি নিটুট পরিপূর্ণ যৌবন। রঙ রস স্পন্দন উত্তেজনা। একটা বিশুদ্ধ বেদনায় টলমল করে উঠল অনিন্দ্যসুন্দরের হৃদয়। এবং সেই বেদনাবোধ যে এমন সুখকর হতে পারে, জানা ছিল না তাঁর।

বিকেলের আলো মুছে বাবার আগেই অনিন্দ্যসুন্দর বেরোজেন।

এলোমেলো হাওয়া বইছে। গাছের পাতার পাতায় খুশী। মুখে চোখে চুল উড়ে পড়ছে, ধূতির প্রান্ত উড়ছে। দূর থেকে পাহাড় দেখলেন অনিন্দ্যসুন্দর, গোখলি সূর্যের লাল ছাড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের চড়োয়। বরনার জল কাকচক্ষু। যেন আসন্ন সম্ম্যাকে হাতছানি দিচ্ছে।

হঠাৎ সবিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। স্বপ্ন না সত্য। অসহ্য উত্তেজনায় এখনি যেন মস্তিস্কে বিস্ফোরণ হবে। চোখ ঘসলেন তিনি। সত্যিই কি শব্দে-থাকা ঝরনা এই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়েছে। নাকি কোনো স্ট্যাচু। কাছে যেতে সাহস হয় না যদি এই দেখাটুকু মিথ্যে হয়। তবু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। এই দেখবার জন্যে যে এই দীর্ঘ জীবন অন্বেষণ করেছেন তিনি। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর প্রতীক। পরিপূর্ণ যৌবন।

ওই আলোভরা চোখ, ওই গ্রীবা, রক্ত-উচ্ছ্বাসিত পাতলা অধর, আঁচলে বন্দী একজোড়া পাখি, বাঁকম বাহঁজতা, গুরু নিতম্ব ছাপিয়ে একরাশ কালো চুলের অন্ধকার। আমার যৌবন, আমার প্রতীক, আদর্শ—মলোচ্চারগের ভগ্নিতে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর। এতদিন একেই আমি খুঁজিছিলাম, আমার রক্তে এরই আকর্ষণ।

নিঃশব্দ পায়ের এগিয়ে গেলেন তিনি।

‘আমি আপনাকে চিনি.....’ সে বললে।

অনিন্দ্যসুন্দরের মুখ কিশোর-বেলার লজ্জায় ছেয়ে গেল। আশ্চর্য। আমি তোমাকে চিনি। চিনতে পারিনি। স্বগত বললেন তিনি।

‘.....আজ সকালেই তো ডাক-বাঙালোয় এসেছেন।’ সে শেষ করল।

‘আশ্চর্য।’ অনিন্দ্যসুন্দর বললেন : ‘তুমি এখানে কি করে এলে?’

‘কেন পারে হেঁটে। আপনি যেমন করে এসেছেন।’

সেই মুখ, সেই চোখ। কী আশ্চর্য, স্বপ্ন যেন অবয়ব পেয়েছে।

‘কী নাম তোমার?’

‘সানু।’

‘সানু!’ তাই বৃষি তোমার সানু-দেশে অনেক আশ্রয়। অনেক গাছ, অনেক ফুল, প্রজাপতি।

‘রোজ আসো এখানে?’ অনিন্দ্যসুন্দর জিজ্ঞাস করলেন।

‘প্রায় আসি।’ সান্দ্র বললে।

‘কাল আসবে?’

‘কেন?’

‘আসবে?’

‘চেষ্টা করব।’

অনিন্দ্যাসুন্দর পরিপূর্ণ করে তাকালেন ওর দিকে। পাহাড়ের ছায়া পড়েছে নিচে। ঝরনার জল কালো শেলেটের মতো। পাহাড়ের মাথায় আকাশটা এখনো পিঙ্গল। মালার মতো একঝাঁক পাখি গান গাইতে গাইতে আকাশ-পরিভ্রমণ করে গেল।

সান্দ্র বললে, ‘আমি যাচ্ছি।’

অনিন্দ্যাসুন্দর জিগ্যেস করলেন, ‘কোথায় থাকো তুমি?’

সান্দ্র বললে, ‘বাবার কাছে। আমার বাবা ফরেস্ট আপসের কেরানী।’

‘মা?’

‘নেই।’ সান্দ্র মলিন হাসল।

ওর চোখের আলোর দিকে অনির্মমবে তাকিয়ে রইলেন অনিন্দ্যাসুন্দর। ওই চোখের আলো এখন সম্ভার ছায়ায় মেদুর। আর সম্ভাষাশে দুটি তারার মতো চকচক করছে। ইচ্ছে হল ওই শীতল অন্ধকারের ওপর হাত রাখেন। কিন্তু, পারলেন না। আকাশে একটি দুটি করে তারা ফুটেছে। পাহাড়টা অন্ধকারে এখন আরক্ত ধূসর। গাছগুলি কাল-লেপা। ঝরনা এখন শব্দ, শব্দের জলতরঙ্গ। এই সেই যৌবন। অফুরন্ত আলো ঢেলে তার হৃদয়ের গৃহকে ভাস্বর করে গেছে। সেই আলোতে কাঁপছেন অনিন্দ্যাসুন্দর, তারপর আলোটা যেন ফুলঝুরি হয়ে ঘিরে ধরল তাঁকে, সেই আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে একজোড়া চোখ, অধর, বাহু। ধপ করে বসে পড়লেন অনিন্দ্যাসুন্দর। সান্দ্র, সান্দ্র, সান্দ্র—সুন্দর গানের কলির মতো বারবার উচ্চারণ করলেন তিনি। চাবিশ বছরের মনের সুর লাগল কণ্ঠে। কেমন এক কাপুরুষতা ভয় দাসত্ব হতাশা শক্তিশীনতা পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল তাঁকে। তবু ভালো লাগল। যেন একটা অসহ্য শক্তির জোয়ার তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। থরথরিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। খোলা প্রান্তরের একক নিঃসঙ্গ পাখির গলায় চিৎকার করতে চাইলেন তিনি। আকাশটা কাঁপছে, সমস্ত প্রকৃতিতে নাচের মাতন। অনিন্দ্যাসুন্দর স্থির স্তম্ভ।

পরের দিন সান্দ্র এল না। পাহাড়টা একটা বিরাট আলোর ভালুক হয়ে গম্ভীর হয়ে রইল। আর, ওই ঝরনা যেন বোবা হয়ে গেছে। অনিন্দ্যাসুন্দর অকস্মাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। মনে হল এই নির্জন পরিবেশ থেকে উদ্যত অশরীরী ভয় তাঁকে গ্রাস করতে আসছে। আরো মনে হল তিনি হেরে গেছেন, ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছেন। কালকের পাওয়া শক্তিটা বোমালুম আজ এখন চুরি হয়ে গেছে। একি হল, একি হল আমার—বিড় বিড় করে বললেন তিনি। এই মুহূর্তে চোখের সামনে সমস্ত রঙ-গন্ধ মুছে গিয়ে কালোর বন্যায় একাকার হয়ে গেছে। অনুভূতিগুলি খরতর হয়ে ওঠে, প্রতীক্ষা কাঁটার মতো খচ খচ করতে থাকে। বারবার একটি লঘু পদশব্দের জন্যে কান পেতে থাকেন। তারপর অভূত বিমর্ষে চুমরে ওঠে ভেতরটা। সারা চোখমুখে প্রদাহ। জিভে কামার মতো লোনা স্বাদ। সে এল না। এল না। কথাগুলি যেন হাওয়ার ভাসা পাতার মতো চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইলেন অনিন্দ্যাসুন্দর। আধো অন্ধকারে হঠাৎ তাঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়ের জন্যে একটা দুঃখ অনুভব করলেন তিনি। তাঁর আসক্তি। কিন্তু—অনিন্দ্যাসুন্দর ভাবলেন : ওগুলি দুঃখ, দুঃখের অনুভূতি।

দুপুরের ঝামা রৌদ্রে সান্দ্র এল ডাক-বাঙলোয়। একটু হাঁপাচ্ছে, ঠোঁটের প্রান্তে ঘাম।

‘রাগ করেছেন?’

অনিন্দ্যাসুন্দর স্তম্ভ হয়ে রইলেন।

‘বলুন না রাগ করেছেন আমার ওপর?’ সান্দ্র জিগ্যেস করল ফের।

‘কাল আসোনি কেন?’

‘এম্মি। আসতে ইচ্ছে করেনি।’

সান্দ্র বললে : ‘আজ তো এসেছি।’

‘জানো আমি কষ্ট পাই...’ অনিন্দ্যাসুন্দর মৃদু গলায় বললেন।

সান্দ্র একদৃষ্টে তাকাল অনিন্দ্যাসুন্দরের দিকে। কি দেখল কি খুঁজল। তারপর মুখ নিচু করে বললে, ‘আমি জানতাম না।’

অনিন্দ্যাসুন্দর এবার স্পষ্ট করে তাকালেন ওর দিকে। সেই চোখ সেই মুখ। বললেন, ‘আমি তোমাকে স্পর্শ করব।’

‘করুন।’

সান্দ্র করতল ভিজ়ে, ঠান্ডা। অনেকক্ষণ নিজের মূর্ত্তায় ওর করতল নিয়ে বসে রইলেন অনিন্দ্যাসুন্দর। ‘এতদিন তোমাকেই খুঁজছিলাম...’

সান্দ্র হাসল। ‘আপনি এমনভাবে কথা বলেন যেন সত্য।’

ওর ভিজ়ে চুলে মুখ রেখে অনিন্দ্যাসুন্দর ঘ্রাণ নিতে নিতে বললেন, ‘এতদিন তোমারই আকর্ষণ আমি অনুভব করেছিলাম রঙে...’

সান্দ্র ছিটকে সরে গেল। মুখ কালো করে বললে, ‘এখানে ঝাঁর আসেন তাঁরাই আমার আকর্ষণ বোধ করেন। আমার সতেরো বছরের শরীরটা...’

আহত বেদনায় মুখ হয়ে গেলেন অনিন্দ্যাসুন্দর। কোনো দিকে তাকতে পারলেন না। শুধু কোনো রকমে বললেন : ‘তুমি যাও। আর এস না।’

সান্দ্র অবাক হয়ে চলে গেল।

অনিন্দ্যাসুন্দর পাথর হয়ে বসে রইলেন। কিছ্র ভাবতে চান, পারেন না।

এই বৈশাখে প্রকাশিত হল

মিহির আচার্যের গল্পের জগৎ অভিজ্ঞতার এক বিপুল উপচয়। এই কঠিন যুগের নিক্ষেপণ ভাস্কর্য। অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা অপ্রেম আর অপমানের কাহিনী।

মিহির আচার্যের
দীর্ঘপ্রত্যাহিত গল্পগ্রন্থ ॥

অগরাত্বের নদী

৩.০০

বুক সোসাইটি

২ বকিম চাটুজো স্ট্রীট, কলি-১২

তার মস্তিষ্ক কে যেন থেঁতলে দিয়েছে। এই সেই অটুট নির্ভাজ যৌবন, দীর্ঘকাল যাকে অন্বেষণ করেছেন, যার আকর্ষণ তাঁর রক্তে। না, তিনি লোভী নন। স্থলে রক্ত মাংসের কামনা তাঁর ভেতরে নেই। তাঁর আকর্ষণ কামনার নয়, ভালোবাসার রক্তে তিনি রাঙাতে চান। একটি অক্ষুরন্ত নির্দোষ যৌবন তার স্বাদে গন্ধে তাঁর সমস্ত চিত্তলোককে গম্ভীর করে তুলুক। তিনি পূর্ণ হতে চান, পরিপূর্ণ মানুষ। ভাঙাচোরা বিধবস্ত পৃথিবীতে যৌবন তার কেতন উড়িয়ে তুলুক। তাঁর আদর্শ, প্রতীক। ও কি করে ভাবল এমন কথা। আকর্ষণ মানে কামনা! আরো দশজনের সঙ্গে তাঁকে এক করে দিল। তবে কি তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা স্বপ্নই, একটা লালিত সাধ। কোনোদিন সেই যৌবন তার ঐশ্বর্য নিয়ে তাঁর সামনে উন্মোচিত হবে না! হবে না! তবে এই জীবন কেন, কেন জীবন ধারণ। কেন? হঠাৎ এই ক্রান্ত দুপুরে অনিন্দ্যসুন্দরের মার কথা মনে পড়ল। 'মা আমি তোমাকে ভালোবাসি' যেন মায়ের কোল আঁকড়ে ধরে শূন্যে আছেন তিনি। মার দীর্ঘ আঙুলগুলি তাঁর চুলে, কপালে।

তিনিটি দিন ডাকবাঙলোর সীমার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। ভাবলেন। মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করলেন। যতবার ভাবতে চান তাঁর স্বপ্নে পাওয়া যৌবনের কল্পনার সঙ্গে সানু চোরাটা মিলে যায়। ঐ পুঞ্জীভূত চুল, আলোপাগল চোখ, গ্রীবা, সব মিলিয়ে যৌবন তার আদল পায়। কোনোটিকে বাদ দেয়া যায় না। যেন কোন প্রতিমাকে নিরীক্ষণ করছেন তিনি। শিল্পীর হাতের স্পর্শে যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্ষম, সঠিক। যৌবন একটা নিশানা নয়। শরীর, আর শরীর তার অঙ্গশোভা করবে। এই যৌবনকে তিনি স্পর্শ করতে পারেন, ঘ্রাণ নিতে পারেন। কেমন স্নিগ্ধ পবিত্রতায় ভরে ওঠে তাঁর মনোলোক। তাঁর মন অবগাহম করে রূপের, গন্ধের।

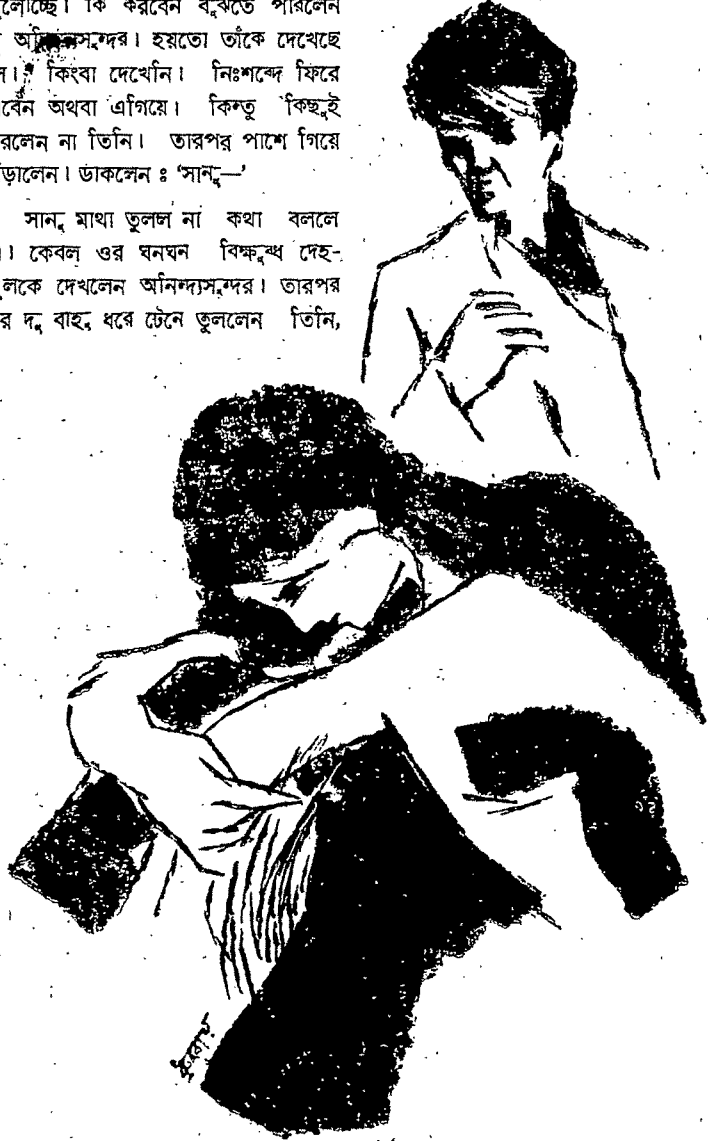
সেদিন আবার বেরোলেন অনিন্দ্যসুন্দর। ঝরনার ধারে গেলেন না, সোজা পাহাড়ের দিকে হাঁটতে লাগলেন। বুনো ফুলগুলি হাওয়ায় কাঁপছে, প্রজাপতিগুলি ঘুরে ঘুরে উড়ছে। অনিন্দ্যসুন্দর আজ যেন নিজেই পাহাড় হয়ে গেছেন। তেমন বিম্ব গম্ভীর উদাস। তার মনের ছন্দের সঙ্গে আর্জকের বিকেলের আকাশটাও যেন সম্মতি দিয়েছে। তেমন গুমোট বিষম। কোথাও

কোনো শব্দ নেই। অটুট নৈশব্দ ঘিরে ধরেছে পরিবেশকে।

বাঁক নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন অনিন্দ্যসুন্দর।

একটা পাথরের ওপর ঘাড় গুঁজে বসে সানু। আনমনে ঘাসের গায়ে হাত বুলোচ্ছে। কি করবেন বুঝতে পারলেন না অনিন্দ্যসুন্দর। হয়তো তাঁকে দেখেছে সে। কিংবা দেখেনি। নিঃশব্দে ফিরে যাবেন অথবা এগিয়ে। কিন্তু কিছুই করলেন না তিনি। তারপর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডাকলেন : 'সানু—'

সানু মাথা তুলল না কথা বললে না। কেবল ওর ঘনঘন বিক্ষুব্ধ দেহ-মূলকে দেখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তারপর ওর দু'বাহু ধরে টেনে তুললেন তিনি,



বাঁক নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন অনিন্দ্যসুন্দর

কানের পাশে চুলে হাত রেখে মুখ তুলে ধরলেন, দেখলেন ওর চোখ দুটো, প্রচণ্ড এক আলোকপ্রপাত উন্মোচিত হয়ে উঠেছে, কাঁপছে অধর। 'কেন, কেন আমাকে এত বড় শাস্তি আপনি দেবেন... অশ্রুতে জড়িয়ে গেল স্বর।

অনিন্দ্যসুন্দর কিছু বলতে পারলেন না। কেবল দেহ দিয়ে তাকে আচ্ছাদিত করে দিলেন। নিজের হৃদয়ে ঝরনার স্পন্দন অনুভব করলেন তিনি। সুখের

আলোয় ছেয়ে গেল চেতনার আকাশ। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বললেন। সানু হাসল। মাথা নাড়ল। 'আর কোনোদিন ভুল করব না।' বললে সে। অনিন্দ্যসুন্দর নিশ্চুপ। স্পর্শগন্ধের রাজ্যে তাঁর চেতনা মগ্ন হয়ে গেছে। এই সেই যৌবন যাকে আমি স্পর্শ

করছি, ঘ্রাণ নিয়েছি—বললেন তিনি। এর আশ্বাদ আলাদা, নতুন এক অবগাহন।

'সানু আমি তোমাকে ভালোবাসি... কেন আমাকে ভালোবাসলেন? আপনি কি জানেন আমার, আমি—'

'সারা জীবন আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম, আমার ভালোবাসাকে।'

কিন্তু আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়ে। ওদের আপনি ভালোবাসেন না?'

‘বাসি। ওরা আমার প্রতিদিনের সঙ্গে প্রয়োজনের হিসেবে জড়ানো। আর তুমি, তুমি আমার নিত্যকালের আমার অপ্রয়োজনের, আমার মনের যে অংশ নিজের নিঃসঙ্গ সেখানে তোমার আসন।’

‘কিন্তু সে কি সত্যিই আমি? না আপনার কল্পনা?’ সান্দ্র বললে, ‘আমার সবটাই হয়তো আপনার রানানো।’

অনিন্দ্যাসুন্দর বললেন, ‘কিন্তু তোমার স্পর্শ গন্ধ সেগুলো তো বানানো নয়। আমি যে তা উপভোগ করতে পারি।’

সান্দ্র চুপ করল। হাত ধরাধরি করে ওরা নিচে নেমে গেল।

‘কাল আসছ?’

‘জানি না।’

‘আসছ না?’

‘অমন করে ডাকলে আমি না এসে পারিনে।’ সান্দ্র হাসল।

অনিন্দ্যাসুন্দর বললেন, ‘ডাকি বলেই আসো। নিজের থেকে আসতে ইচ্ছে করে না?’

সান্দ্র বললে, ‘করে। আপনি আমার সব হিসেব গোলমাল করে দিয়েছেন।’

ঝরনার বৃষ্টি থেকে অনেক জল ঝরে গেল। পাহাড়ের বৃষ্টি অনেক সুখোঁদর-সুখান্ত। দীর্ঘদিন পর নিজের সন্তাকে ফিরে পেয়েছেন অনিন্দ্যাসুন্দর। জীবন-ধারণের আনন্দ। আমি এমন করে নিজেকে কোনোদিন পাইনি—বললেন তিনি : বেঁচে-থাকার সুমহান অর্থ। আমার যৌবন-প্রত্যয়, আমার আদর্শ, প্রতীক। স্থূল জীবনের প্লানি কদম্বের পক্ষ থেকে উদ্ভেদ এক পরিপূর্ণ শতদল। জীবন সহস্র পাগাড় মেলে ধরেছে, রূপে রসে গন্ধে। তোমার ওই চুলের উন্মিদ্ধ-গন্ধ, তোমার পাতলা রক্ত ছড়ানো ঠোঁট-নরম শীতল বাহু, কঠিন উষ্ণ বক্ষদেশ—আমার অস্তিত্বে ডুব দিয়েছে, তারা মন থেকে আলাদা নয়, তারা কথা বলে, কোলাহল করে, স্পন্দিত হয়। শূন্য শরীর-ধর্ম নয়, আগল ভেঙে দেহমনের সম্পূর্ণ সন্ধি হয়ে গেছে। মন্দির আর বিগ্রহ একাকার।

সান্দ্র বলে, ‘আমার ভয় করে। যদি মরে যাই—’

অনিন্দ্যাসুন্দর বলেন, ‘মৃত্যুরও মরণের ভয় আছে। জীবনকে সেও ভয় করে।’

সান্দ্র বলে, ‘আপনার কথা আমি বুঝতে পারিনে।’

‘বলছি মৃত্যু জীবনের শেষ কথা নয়। একদিন আমরা থাকব না। তুমিও না আমিও না। থাকবে ওই আলোর ঝরনা, গম্ভীর পাহাড়, আমাদের অনুভবের প্রত্যয়ের নিত্যকার হাওয়া বইবে এই ধূলিতে। আমাদেরই ছন্দে নরনারী যৌবনকে খুঁজে পাবে, তার স্বপ্ন আদর্শ প্রতীককে চিনে নেবে।’

সান্দ্র মৃদু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অনিন্দ্যাসুন্দর আবার বললেন, ‘সৈনিকের মানুষ আবিষ্কার করবে এক মস্ত বড় ধর্ম। যৌবনের ধর্ম। শরীর আর মনকে একসূত্রে গেঁথে যৌবনকে হৃদয়ে বসাবে। যৌবনকে সে ভয় করবে না, লোভ করবে না, কোনো কদম্বতা-কলুষতা নয়, তার উদ্ভাপ স্পর্শ গন্ধকে সে ফুলের রেণুর মতো গারে মেখে নেবে, নেবে তার আনন্দকে নিকিয়ে।’

সান্দ্র আজকাল কথা বলে না, চুপ করে শোনে। আর চিন্তা করে। অনিন্দ্যাসুন্দর নিজের চিন্তা দিয়ে তাকে সব সময় বুঝতে পারেন না। জিগ্যেস করলে তেমন উত্তর পান না। ও যেন কোথায় আটকে গেছে এবং চক্র দিয়ে ঘুরছে একটি আবর্তের মধ্যে। অনেক গোখুলি আলো ছিড়িয়ে বিষয় সন্ধ্যাকে ডেকে আনল। সন্ধ্যা অনেক রারিকে।

কদিন থেকে একটা চাপা গুমোট। হাওয়া নেই। থমথমে চারদিক। বোধ হয় বৃষ্টি নামবে কিছু দিনের মধ্যে। সৌন্দর্য বিকেলে ঝড় উঠল, আকাশ ঘোলাটে, গাছপালার মধ্যে দূরন্ত থেপামি। সান্দ্র সে-বিকলে আসেনি। অনিন্দ্যাসুন্দর ডাকবাঙলোর চুপ করে বসে ছিলেন। সন্ধ্যা নামতে রাতের খাওয়া চুকিয়ে ঘরে পা দিতেই মৃদলধারে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুৎ। অনিন্দ্যাসুন্দর শূন্যে শূন্যে সিগারেট খেতে লাগলেন। তারপর কখন গায়ের ওপর চাদর টেনে ঘুমিয়ে পড়েছেন, খোয়াল নেই।

অনেক রাত্রে একটা চিংকার নাকি কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল

অনিন্দ্যাসুন্দরের। বাইরে সমানে মেঘের গর্জন বিন্দুভের চোখ ঝলসানো আলো। পায়ের দিকে জানালাটা খুলে গেছে।

ঝড়ের গর্জন ঠেলে একটা আতর্জন। একটা শব্দপদ দুর্ঘণ্টের রাতে চিংকার জুড়েছে বৃষ্টি। জানালার কাছে উঠে এলেন তিনি। জানালা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়ালেন অনিন্দ্যাসুন্দর। ঠিক জানালার নিচে একটা বেড়াল নখ দিয়ে দেয়াল আঁচড়াচ্ছে, জ্বলছে ওর চোখ দুটো ফসফরাসের মতো। একটা আতঙ্কের দ্রোত নামল সারা গা বেয়ে। গলা শুকিয়ে এসে অনিন্দ্যাসুন্দরের। এমন ভয়ংকর বিভীষিকা তিনি জীবনে দেখেননি।

‘দরজা খুলুন—দরজা খুলুন—’

জানালার গরাদে মুখ রেখে স্তম্ভ হয়ে গেছেন অনিন্দ্যাসুন্দর। বিদ্যুতের প্রভায় ওর সিস্ত শরীর অদ্ভুত এক হিংস্র পার্শ্বিক দেখাচ্ছে। মূত্থের ওপর লেপটে-পরা চুল, শাড়ি কোমর থেকে লুটোচ্ছে মাটিতে, সিস্ত হৃদয় উদ্ভবাসে এক জোড়া নিষ্ঠুর হিংসা প্রতিবিস্তিত হয়ে উঠেছে।

‘দরজা খুলুন।’ সান্দ্র হাঁপাচ্ছে, দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে : ‘আমি ভুল বুঝেছিলাম, সব ভুল। আমার লোভ আছে, আমার কামনা আছে...’ হিঁহি করে কাঁপছে সান্দ্র, দূঢ় মৃষ্টিতে দেয়াল আঁকড়ে ধরেছে।

নিশ্চল নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলেন অনিন্দ্যাসুন্দর। আমার যৌবন, আমার স্বপ্ন, প্রতীক। ওই মুখ, গ্রীবা, বাহু, অধর প্রতিটি অংশ যেন ছিড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে তাঁর চোখের সামনে। ওগুলি সম্পূর্ণ হয়ে উঠে শরীর গড়ে তুলছে না কোনো প্রতিমার মতো, কেবল কতগুলি নিষ্ঠুর হিংসা লালসার চিহ্ন হয়ে ফুটে উঠছে চোখের সামনে। অনিন্দ্যাসুন্দর হিমশীতল হয়ে গেলেন। বাইরে অঝোর-ধারে বর্ষণ চলেছে। পাহাড় ডুবল ঝরনা ভেসে গেল, সমস্ত পৃথিবীটা বোধহয় নিঃস্ব হয়ে গেল তাঁর চোখের সামনে।

পরদিন অনেক সকালে অনিন্দ্যাসুন্দর কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন।

কেশ পরিচর্যা ও সৌন্দর্য অধিকারী

কেশোলান

১০০ স্বপ্না কেমিকেল ওয়ার্কস, কলিকাতা-২০



॥ প্রেক্ষাগৃহ ও ভারতীয়ত্ব ॥

(উত্তর)

গেল হস্তার “অমৃত”-এ মৃত্যুভাষ্য প্রকাশিত, শ্রীসুভাষচন্দ্র পালিত লিখিত “প্রেক্ষাগৃহ এবং ভারতীয়ত্ব” শীর্ষক দীর্ঘ পত্রখানির প্রতি আমার দার্ঢ়ি আকৃষ্ট হয়েছে।

প্রথমেই পত্রলেখককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিনি আমার লেখার সমালোচনা করেছেন বলে। এবং বিগত ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তিনি আমার লেখার, তথা ‘অমৃত’-র নিয়মিত পাঠক বলে।

কিন্তু আমার মনে হয়, চ্যুয়ালিশ সংখ্যক ‘অমৃত’-এ “বর্তমানের ভারতীয় চিন্তিত্ব” সম্পর্কে বলতে গিয়ে ‘ভারতীয়ত্ব’ নিয়ে আমি যে-কথা বলে-ছিলুম, সে-কথা, হয় আমারই লেখার দোষে, নয় পত্রলেখকের পড়ার দোষে; তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। আমি কোনো কিছুই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বলিনি; আজকের ভারতের বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে যে-সব আচার-আচরণ লক্ষ্য করেছি, তারই কয়েকটি উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করেছি, এদের মধ্যে কোন কোন জিনিসকে ভারতীয় বলা যেতে পারে বা পারে না। মনে রাখতে হবে, আজকের ভারত is a nation in the making

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ এখনও তার নিজের রূপকে খুঁজে পায়নি, আজ তার সাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—কোনোটাই স্থিতিশীল নয়, দ্রুত পরিবর্তনশীল। আজকের ভারতে নেহরুর ‘ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া’ও একটি অতীতের বস্তু। এবং যতই ভাব-প্রবণ হয়ে আমাদের দেহে-মনে আকাশে-বাতাসে, মাটিতে, চিন্তায়-ধ্যানে আমাদের সাধনা-আরাধনা-সংকল্পে, শৌর্ষে বীর্ষে, অশ্রুজলে, আমাদের সাহিত্য ও ধর্মে আমাদের ‘ভারতীয়ত্ব’ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি না কেন, বর্তমান ভারতের ‘ভারতীয়ত্ব’কে অন্বেষণ করবার জন্যে জাগ্রত মনোবিশিষ্ট কোনোও ব্যক্তিই ‘পর্যায়-তত্ত্বশালা’র স্মরণস্থ হবেন না। ভারতীয় ঐতিহ্যকে সসম্মানে স্বীকার করে নেবার পরেও এই হচ্ছে আমার সর্চিস্চিতে অভিমত। তাই দেখি, আজ পণ্ডিত নেহরু নব-ভারতের তীর্থক্ষেত্র বলতে বোঝেন, ভাখরা-নাগাল, ময়ুরাঙ্গী প্রভৃতি বিরাট প্রযোজনাগুলিকে। পরা-ইনিতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতে আজ ‘পেহারি রজনী’ জাগিছে জননী—‘ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়ে রূপান্তর চলেছে, কিন্তু রূপের পরিণতিতে আজও এসে পৌঁছায়নি।’

সব শেষে বলি, লেখক আমার প্রতি সমান্য একটু অবিচার করেছেন। আমি



সজ্ঞানে বলতে পারি, আমি কোনো দলের লোক নই এবং ‘সংকীর্ণ’, ব্যক্তিগত স্বার্থ’ কোনোদিনই আমার চিন্তাকে কলুষিত করেনি। আমি যখন লিখি, তখন আমার সীমিত জ্ঞানবৃত্তি বিদ্যার সাহায্যেই নিজের অভিমত ব্যক্ত করি এবং সে-অভিমত পৃথিবীর আর একটি লোকের অভিমতের সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে, এমন অনায়াস আশা আমি কখনই মনের মধ্যে পোষণ করি না।

ইতি—নান্দীকার।

২২-৪-৬২

॥ মাতৃভাষা বনাম ইংরাজি ॥

সম্পাদক সমীপেষু,

মাননীয় মহাশয়,

ইংরাজি অথবা বাংলা শিক্ষার মাধ্যম কী হবে এ বিষয়ে শ্রীবসুর পরামর্শ, শ্রীমতী পণ্ডিতের এবং উপাচার্য শ্রীলাহিড়ীর অভিমত এবং ‘অমৃতের’ সম্পাদকীয় আলোচনা অনেকের সঙ্গে আমিও মনোযোগ দিয়েই পড়ছি।

প্রতিবাদ যারা করেছেন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ক্ষেত্রে ‘কেউকেটা’ হলেও শিক্ষার বিষয়ে স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক এবং জ্ঞান-বৃদ্ধ শিক্ষাবিদ শ্রীবসুর অভিমত খণ্ডন করার যোগ্যতা তাঁদের আছে কি না তা প্রশ্নাতীত নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের কটোর্তিত্ত অধিকার লাভ করার পর যে বিষয় এবং দস্তরটির সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করা উচিত ছিল অথচ যার ভাণ্ডে জুটেছে সর্বাধিক অবহেলা এবং অমনোযোগ সেই হতভাগ্য বস্তুদের নাম ‘শিক্ষা’। ইংরাজ আমলে ইংরাজি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন মাত্র গুটিকয়েক (ভারতের লোকসংখ্যার অনুপাতে) সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র (তঁরাই আজ আমাদের দেশের এবং সমাজের কর্তা-ব্যক্তি। ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়ার সঙ্গে তাঁরা নাড়ীর যোগ অনুভব করেন, আমাদের ভারতের দৃষ্টান্ত তাঁদের কাছে দূর্বোধ্য অথবা বোধের অযোগ্য)। প্রকৃত দেশ বলতে যা বোঝায় তা সেদিনও ছিল ও আজও আছে এবং বর্তমান অবস্থাদুর্ভেদে মনে হয় আরও অনেকদিন থাকবে অজ্ঞানতা, কুশিক্ষা এবং মারাত্মক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। শিক্ষার দীর্ঘপাখা দেশের প্রত্যেকটি কোণে ছড়িয়ে দিতে না পারলে

ভারতবর্ষ তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে না। আর আত্মবিশ্বাস ফিরে না পেলে হাজার পঞ্চ-বর্ষীয় যোজনাও গড়ে তুলতে পারবে না আমাদের জাতীয় চরিত্র, নৈতিক দৃঢ়তা, টিকে থাকবে না, সফল হবে না গণতন্ত্র। মাতৃভাষাই সেই ‘Conductor’ যা বহন করে নিয়ে যাবে শিক্ষার আলোকশিখাকে প্রত্যেক দেশ-বাসীর অন্তরে, অন্তরে।

প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যেই যদি সেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে জাতীয় সংহতি হ্রতভঙ্গ হয়ে যাবে উপাচার্য শ্রীলাহিড়ী এই মত পোষণ করেন। কিন্তু, প্রকৃত শিক্ষার সর্বব্যাপী বিস্তার (যা মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যতীত সম্ভব নয়) ঘটলে ওরকম অবস্থা কখনোই সম্ভব নয়। জাতীয় সংহতি বিপর্যস্ত হবে তখনই যখন তার রক্ষার ভার থাকবে মাত্র গুটিকয়েক শীর্ষস্থানপ্রাপ্তদের হাতে আর দেশের অগণিত জনসাধারণ থাকবে এখনকারই মত অন্তর্দুঃস্থিত। আজ যখন পৃথিবীর এক দেশ সহস্র মাইল দূরবর্তী আরেক দেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে, বিনিময় করছে পরস্পরের সংস্কৃতি, তখন দেশের আভ্যন্তরীণ সংহতির বিপর্যয়ের আশঙ্কা কষ্ট-কল্পনা। আসল কথা ‘ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে সমাজের এক স্তরের মানুষ এমন একটি নতুন কোলিনোয় আত্মবাদ পেয়েছেন যা তাঁরা দেশের বহুস্তর মানবগোষ্ঠীর সংগে ভাগাভাগি করে নিতে প্রস্তুত নন। সম্ভবতঃ সেইজন্যেই এত গেল গেল রব।’ অমৃতের এই সম্পাদকীয় মন্তব্য ভারতবর্ষের প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির মনের কথা। সম্পাদক মহাশয়ের এই নির্ভীক মতপ্রকাশকে আমার অভিনন্দন জানাই। রাজনীতির মহিমায় অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়ে বিশেষ করে শিক্ষার কি অবস্থা কোন সচেতন ব্যক্তিকে তা বদ্বিষে বলার দরকার নাই। যোগ্যের সমালোচনায় অযোগ্য আজ মৃত্যুর, যোগ্যকে কোণঠাসা করার নিরন্তর প্রয়াসে অযোগ্য ক্লান্তিহীন। তাই অনুরোধ, এই জাতীয় প্রশ্নের বহুল আলোচনা আপনারা উৎসাহিত করুন যাতে দেশের প্রকৃত শিক্ষাবিদরা নির্ভয়ে তাঁদের সর্চিস্চিত্ত মতামত দিতে পারেন এবং দেশের সচেতন ব্যক্তি-মানস সেই পরামর্শ কার্যকরী করার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।

নমস্কারান্তে ইতি—

শ্রীতুলসীদাস বাগচী,

১৩-৪-৬২

লালপুর, রাঁচি।

নাটক এবং ছদ্মদেহ অভিনয় আঙ্গিক

বাংলা নাট্যজগতে আঙ্গিকের আধিপত্য নিয়ে হৈ চৈ শুরুর হয়েছে কিছুদিন যাবৎ। আঙ্গিকের বিরুদ্ধ-পন্থীদের অভিযোগ,— মঞ্চকোশলের বাড়াবাড়িতে নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে,— অভিনয়ের আবেদন ছাপিয়ে আঙ্গিকের কলাকোশল দর্শককে বিভ্রান্ত করছে। নব্যপন্থীরা থিয়েটারে অভিনয়কে প্রাধান্য দিতেই রাজী নন। তাঁদের মতে, নাটকের মধ্যে অভিনয়ের স্থান গৌণ। আঙ্গিক যথোচিত উৎকর্ষভালাভ করেনি বলেই অভিনেতারা এতদিন রঙ্গজগতে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পেয়েছেন এবং পরিচালকরাও উপায়বিহীন হয়ে তাঁদের স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন।

অভিনেতার পদচ্যুতির স্বপক্ষে তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন যে, নাটক হ'লো শিল্প, আর শিল্প হচ্ছে এক সৃষ্টি বা অচল, অনড়। অথচ এই শিল্পশ্রুতি অভিনেতা হলেন সচল, সজীব, আবেগাশ্রিত। সৃষ্টির মূহুর্তে আবেগের প্রয়োজন, সুতরাং প্রস্তুতি হিসাবে অভিনেতা আবেগাশ্রিত হ'লে অসুবিধা নেই। কিন্তু তিনিই আবার সৃষ্টির উপাদান। তাই সজীব হওয়ায় তিনি শিল্প-সৃষ্টির পরিপন্থী। কারণ প্রতিদিন একই জিনিস সৃষ্টি তিনি করতে পারেন না,— margin of human error থাকবেই। তাই তিনি শিল্পী নন এবং তাঁর আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়ও শিল্প নয়। যথার্থ শিল্পী হ'তে হ'লে অভিনেতাকে সাধামত প্রাণহীন, যান্ত্রিক হ'তে হবে। অন্যান্য আঙ্গিকের প্রয়োজনানুযায়ী যন্ত্রবৎ অভিনয়ের সেই শিক্ষা দেবেন নতুন যুগের পরিচালক। তাই আজকের যুগে নাটকের মূখ্য অঙ্গ অভিনেতা নয়, পরিচালক। এই প্রসঙ্গে নটগুরু স্তানিস্লাভস্কির the magic "If" theory ও তাঁরা নস্যৎ করতে চেয়েছেন এই বলে যে যদি টাঁদ হলো সত্যের ভাণ আর ভাণ কখনো শিল্প হতে পারে না।

অভিনেতার বিরুদ্ধে নব্যপন্থীদের এই বিদ্রোহী মনোভাবের মূলে রয়েছে শিল্প সম্বন্ধে দ্রুত ধারণা। শিল্পের

সংজ্ঞা কি? শিল্প বলতে আমরা কি বুঝি? যে প্রক্রিয়ায় অসম্পূর্ণ জিনিস সম্পূর্ণতা লাভ করে তাই শিল্প। এক টুকরো কাঠ শিল্প নয়, শিল্পের উপাদান মাত্র। সেই কাঠ থেকে তৈরী চেয়ারও শিল্প নয়, শিল্পজাত দ্রব্য। যে গতিশীল প্রক্রিয়ায় শিল্প উপাদান কাঠ শিল্পজাত দ্রব্য চেয়ার হিসাবে সম্পূর্ণতা লাভ করে পরিবর্তনশীল সেই প্রক্রিয়াই শিল্প। তাই শিল্পজাত দ্রব্য অচল, অনড় হ'তে পারে কিন্তু শিল্পী এবং শিল্প গতিশীল, সজীব না হ'লে চলে না।

অভিনেতা শিল্প নন, অভিনয়ই শিল্প। যে ক্রমিক অভিব্যক্তি অভিনেতাকে কোন এক বিশেষ চরিত্রের সূচনা থেকে নিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে নিয়ে যায় তাই শিল্প। সুতরাং নাটককে শিল্প বলে

স্বীকার করলে অভিনয়ই প্রাধান্য পেতে বাধ্য এবং অন্যান্য আঙ্গিক এই অভিনয়-শিল্পের পরিপূরক মাত্র।

এবার দেখা যাক আবেগের বিরুদ্ধে নব্যপন্থীদের যুক্তি কতদূর গ্রহণযোগ্য। The magic "If" theory-র বিরোধীতা করতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন যে যদি টাঁদ হলো সত্যের ভাণ এবং ভাণ কখনো শিল্প হতে পারে না। কিন্তু নাটক-ভিনয়ের সবটাই কি ভাণ নয়? বাস্তবে আমি যা নই, মঞ্চে তার ভাণ করাই ভো অভিনয়। দর্শকও জানে মঞ্চে 'সাজাহান' কিছু সত্যিকার সাজাহান নয়। তবু তারা অভিনয় দেখে আনন্দ পায়, তাদের রসাস্বাদনের ব্যাঘাত হয় না কারণ সাময়িকভাবে তারা এই 'ভাণ' সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। তাই এই 'ভাণ'টুকুকে যতদূর সম্ভব সত্যের মতো প্রতিভাত করতে পারলেই অভিনয় হয় সাফল্যমণ্ডিত। সুতরাং the magic "If" theory-র সাহায্যে অভিনেতা যদি এই ভাণটুকুকে সুন্দর করতে পারে তাহলে তার শিল্পসম্বন্ধে অস্বীকার করবো কেন?—আর তাছাড়া যন্ত্রবৎ অভিনয়ের স্বপক্ষে যারা ওকালতী করছেন তাঁরা একথা ভুললে চলবে কেন যে যান্ত্রিক হ'লেও সে অভিনয়, অর্থাৎ ভাণমাত্র—সজীব হয়েও প্রাণহীন ভাণ!

• জ্ঞানভীষের সদ্য প্রকাশিত ৩টি বৈশাখী অর্থ্য •

অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত ॥ দুই পাখী এক নীড়	[৪.০০]
সুধীর চৌধুরী ॥ মনের ময়ূরী	[২.০০]
চিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কাগা গিলির মানুষ	[২.৫০]

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

- * শহরের আর গ্রামের, জদালা আর শান্তির, ক্ষুধা আর তৃপ্তির কথা নিয়েই দুই পাখী এক নীড়।
- * মননশীল, সুখপাতি, আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্র উপন্যাস মনের ময়ূরী।
- * * * ন্যায় অন্যায়, পাপপুণ্যের পীঠস্থান ছলনাময়ী; রূপসী কলকাতার স্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ইতিহাস—কাগা গিলির মানুষ।

অন্যান্য বই	
এমিলি জেলা ॥ সত্যের নম্বর বাড়ী	৩.০০
ভবেশ দত্ত ॥ গান গেয়ে যাই	২.০০
সুদীন চট্টোপাধ্যায় ॥ শেষ অভিসারে	২.৫০

শীঘ্রই বেরচ্ছে

যেন ভুলে না রাই—শৈলজানন্দ
নহ মাতা নহ কন্যা—বিনয় চৌধুরী
ইরাণী কন্যা—নিগূঢ়ানন্দ

জ্ঞানভীষ—১নং কণ্ঠওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি—১২।

সুতরাং ভাগ যদি শিল্প না হয় তাহলে তাঁদের যান্ত্রিক অভিনয়ের যুক্তি দাঁড়ায় কোথায়?

আসল কথা নাটকের প্রাণ অভিনয়, আর অভিনয়ের মূলমন্ত্র আবেগ—এই প্রতিষ্ঠিত সত্যকে নস্যং করার দুর্বীর ইচ্ছায় নব্যপন্থীরা দিশাহারার মতো যুক্তিবিহীন পথে অগ্রসর হয়েছেন। নতুন কিছু করার প্রচেষ্টা প্রশংসার, কিন্তু পুরানোকে তার যথোচিত মূল্যদানের উদ্যম আমাদের থাকবে না কেন? সৃষ্টির মূহুর্তে আবেগের আবশ্যিকতা স্বীকার করলে অভিনয়ের সাফল্যের জন্য আবেগের প্রয়োজনকে অস্বীকার করবে কোন যুক্তিতে, কারণ আগেই বলেছি, অভিনয়ই শিল্প এবং অভিনয়ের প্রতিটি মূহুর্তই সৃষ্টির মূহুর্ত।—তাছাড়া নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য আর কাব্যের পক্ষে আবেগ অপরিহার্য। কারণ তার আবেদন হৃদয়ের কাছে। নাটকের সংলাপের সাহায্যে দর্শকহৃদয় সংবেদনশীল করে তুলতে হলে চাই প্রাণ, চাই আবেগ। এবং সংলাপকে এই কর্তব্য পালন করতেই হবে, কারণ দর্শকই নাটকের সাফল্যের মূল্যায়নকর্তা,—প্রত্যক্ষ না হ'লেও পরোক্ষ দর্শকও নাটককার অন্যতম অঙ্গ। অথচ অভিনয় দেখতে দর্শক শূন্য চোখ আর কান নিয়েই যায় না, অভিনয় বিচারে তার মন তার হৃদয়ও অংশ গ্রহণ করে। সংলাপের মাধ্যমে সেই দর্শক-হৃদয়ের কাছে নাটকের আবেদন পৌঁছে দেওয়াই আবেগের কাজ, অভিনেতার মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তিতে সাহায্য করাই তার দায়িত্ব। “কোথায় যাচ্ছ” এই একটিমাত্র সংলাপকে আশ্রয় করে অভিনেতা কখনো প্রকাশ করেন তাঁর নিস্পৃহতা, কখনো বা মিনতি, বিরক্তি, রাগ। অভিনেতার এই বিভিন্ন মূডকে প্রকাশ করতে deliveryর যে modulation তার সার্থকতার মূলে রয়েছে আবেগ। সুতরাং নাটকে যতদিন সংলাপ থাকবে ততদিন আবেগকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেরও পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে আবেগের চাহিদা দেখা যায় কখনো বেশী কখনো বা কম। আজকের মানুষ—মননশীল, তাই হৃদয়ের থেকে মনের প্রাধান্য বেশী। থিয়েটারে আবেগের আভিষেক দেখলে তার ‘যাত্রাগান’ বলে মনে হয়। সুতরাং আবেগের অনুপান কমতে হবে কিন্তু তাকে বিসর্জন দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, আগেই বলেছি,

সংলাপ আর দর্শকের হৃদয় যতদিন আছে আবেগের আসন ততদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

অভিনয় ছাড়া নাটককার অন্যান্য অঙ্গ হচ্ছে—নাট্যকার, নাটক, অভিনেতা, মঞ্চদৃশ্য ও রূপসজ্জা, আবহসংগীত, আলোকসম্পাত এবং পরিচালক। আঙ্গিকের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বহুল-বিস্তৃত এবং উপরোক্ত সব অঙ্গই তার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আঙ্গিক সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে প্রত্যেকেরই উল্লেখ প্রয়োজন।

নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকার সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ অল্পই আছে, কারণ বিগত যুগে “নাট্যকারের থিয়েটার” না “থিয়েটারের নাট্যকার” এই নিয়ে বহু বাগবিতণ্ডা হয়ে গেছে এবং জয়লক্ষ্মী “থিয়েটারের নাট্যকার”কেই বরণ করে নিয়েছেন। অর্থাৎ নাট্যকারের লেখনী অনুযায়ী থিয়েটার চলার যুগ শেষ হয়ে থিয়েটারের প্রয়োজনে নাট্যকারের লেখনী চালনার যুগ এসেছে। তবু আজকের ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আর আলোর কেরামতি নাট্য-প্রকরণে যে আমূল পরিবর্তন এনেছে তারই পটভূমিকায় একটা জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের অভিলাষে আজকের দিনের নাট্যকাররা এক একটি অঙ্কে দৃশ্য-সমাবেশ বাড়িয়ে দিয়েছেন অস্বাভাবিকভাবে। কিন্তু কালকাতার গুটিকয়েক মঞ্চ বাদ দিলে সারা বাংলা-দেশে আর কোন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আছে বলে আমার জানা নেই, আর থাকলেও অন্যান্য রংগমঞ্চের তুলনায় তারা অনু-ল্লভ্য। সেক্ষেত্রে বর্তমান নাট্যকাররা যদি ঘূর্ণায়মান রংগমঞ্চের আকর্ষণ উপেক্ষা করতে না পারেন তাহলে সামগ্রিকভাবে নাট্যজগতের অপকারই করা হবে, কারণ নাটক নিয়ে পরীক্ষা, নিরীক্ষা সখের মতোই চিরকাল হয়ে এসেছে, পেশাদার মতো নয়। আর একটি জিনিস লক্ষণীয়। নাট্যকীয় সংঘাতের তুংগ মূহুর্তগুলি আলোর সাহায্যে চমকপ্রদ এবং appealing করা যায় কিয়ৎপরিমাণে। নাট্যকারের দৃষ্টি আজ সেই দিকেই নিবদ্ধ। ফলে, সংলাপের দিকে সজাগ দৃষ্টি না থাকায়, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সংলাপের আবেদন কমে আসছে। অথচ নাটক হচ্ছে ভাষা-শিল্প। গতিশীল জীবনের প্রত্যক্ষ-কল্প রসরূপ সৃষ্টিতে ভাষাই নাটকের অন্যতম প্রধান সহায়। আধুনিক নাট্য-

কারদের এ বিষয়ে সচেতন হবার সময় এসেছে, কারণ কোন এক অঙ্গের উৎকর্ষ যদি অন্য অঙ্গের অপকর্ষের সহায়ক হয় তাহলে তাকে উন্নতির পথে পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করা চলে না কোনমতেই।

আবহসংগীত সম্পর্কে নব্যপন্থীদের বক্তব্য কথঞ্চিৎ যুক্তিযুক্ত। প্রাচীনকালে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। সাম্প্রতিক-কালেই এই আঙ্গিকের জন্ম এবং এখনো এর শৈশবাবস্থাই চলেছে। বর্তমানে হার্মোনিয়াম, গীটার, বেহালা, বাঁশী, সেতার ইত্যাদির সংমিশ্রিত একতান বা যে কোন একটির এককতানকেই আবহ-সংগীত সৃষ্টির কাজে লাগানো হয়। এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। সংগীত, আবহসংগীত এবং শব্দের মধ্যে সংযোগ নেই কোন। নাটকের নিজস্ব প্রয়োজনে সংগীতের স্থান তার অন্দর-মহলে। বিগতযুগে সংগীতবিহীন নাটক ছিল অকম্পনীয়। বর্তমান নাটকে সংগীতের স্থান গোণ, এমনাকি প্রয়োজন না থাকলে সংগীত অনুপস্থিত অনেক নাটকে। ঢাক বা বাজ ইত্যাদি সহযোগে যে শব্দ বা ধ্বনি সৃষ্টি তার ব্যবহারও প্রয়োজনানুযায়ী পরিমিত। কিন্তু যদিও প্রত্যক্ষ অঙ্গ নয়, তবু আবহ-সংগীত ছাড়া বর্তমান নাটক প্রায় অচল। নাট্যকীয় সংঘাত বা শব্দের মূহুর্তে অথবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় দর্শকের মনকে সংবেদনশীল করে তুলতে সাহায্য করে আবহসংগীত। কিন্তু সে একান্তভাবেই নাটকের অধীন, নাটকের নিজস্ব সৃষ্টি। সমস্ত নাটকের মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে বিলীন করে ঘটনার মূহুর্তকে রূপ দেওয়াতেই তার সার্থকতা। এর যথোচিত ব্যবহার শূন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে দর্শকহৃদয়কে সংবেদনশীল করেই তোলে না, অভিনেতাকেও আবেগ আনতে এবং এক নির্দিষ্ট পদ্যই ডোলভারী দিতে সাহায্য করে। কিন্তু বিশুদ্ধ রাগ বা মার্গ সংগীতের ব্যবহার আবহসংগীতে সম্ভব নয় একথা স্বীকার করা যায় না। একটা সম্পূর্ণ রাগ বা রাগিণীকে আবহসংগীত সৃষ্টির কাজে কখনই নিয়োগ করা হয় না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাগ-রাগিণীর ছোঁয়ায় আবহসংগীত মাঝে মাঝে ক্যান্টাসিক পর্যায় ওঠে। একথা অনস্বীকার্য যে, সব রংগমঞ্চেও এর সচ্ছন্দ ব্যবহার হয় না কিন্তু তাই বলে গীটার আর বাঁশী থেকে বেড়ালের ডাক শোনার দুঃসাহ্য প্রচেষ্টা নব্যপন্থীদের

উন্নাসিকতার নিদর্শন। বাংলার নাট্য-জগতে আবহসংগীতের এখনো শৈশবাবস্থা। এই কথাটি স্বীকার করে নিয়ে যথোচিত কালচার-এর দ্বারা এর উন্নতি-বিধানে সচেতন হওয়াই যুক্তিযুক্ত, অনর্থক বিষোদ্বিগ্ন লাভ নেই কোন।

এবার আলোক-সম্পাতের কথায় আসা যাক। এর বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীদের অভিযোগ হচ্ছে ‘তাপস-সেনী’ আলো বেশী সচেতন, সোচ্চার, স্থূল। নাটকের পরিবেশ অতিক্রম করে সে নাটককে লঙ্ঘন করে, তার বক্তব্য চেপে দেয়।

গানের আসরে যদি গানের ওপর দিয়ে তবলার চাঁটি শোনা যায় তাহলে সে তবলা গানের পরিপূরক না হয়ে প্রতি-বন্ধক হয়ে ওঠে একথা স্বীকার করতেই হবে। অভিনয়ে আলোক-সম্পাতের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। একথা ভুললে চলবে না যে, অভিনয়ের সহায়করূপে আলোর প্রয়োজন। আলোক-সম্পাতের সার্থকতা অভিনয়কে দর্শকের সামনে তুলে ধরায়, অভিনয়োপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে। তাপস-সেনী আলো সেই বিচারে কি সার্থক? এখানে ‘অঙ্গার’ দেখে আসা এক দর্শকের মন্তব্য তুলে ধরি—“পৃথিবীর ওপরকার মানুষের কাছে খনির নীচেকার মানুষের যে আর্ত এঁপিল তাকে ‘হল’ থেকে বাইরে আনার অবকাশ পেলাম না। এক ভেল্কির বন্যায় তার অপমৃত্যু ঘটল।”—অনেকেই ‘সেতু’ দেখতে যায় কারণ ‘তার রেলগাড়ীর দৃশ্যটা বড় চমৎকার হয়েছে। অর্থাৎ নাটকের আবেদন ছাপিয়ে উঠেছে রেল-গাড়ীর কৌশল, জল আর আগুনের কেরামতি।—কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণেই এ যুগের আলোক-সম্পাতকে সোচ্চার বলে অভিহিত করা সংগত নয়। রংগমঞ্চে আলোর এ জাতীয় খেলা দেখতে অভ্যস্ত নয় সাধারণ দর্শক। তাই, অদৃষ্টপূর্ব বলেই এর আকর্ষণ দর্শক-মনকে চণ্ডল করেছে। বিবেচক দর্শককে একথাও বলতে শুনিয়ে যে, রেলগাড়ীর দৃশ্যে নায়িকার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা যে করুণরস সৃষ্টি করেছিল আলোর খেলায় তার আবেদন বিশেষ ব্যাহত হয়নি। আসল কথা এই জাতীয় আলো দেখে দেখে দর্শকের চোখ যখন অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, নতুনদের চটকে যখন আর চমক জাগবে না, তখন দেখা যাবে নাটকের রসসৃষ্টির সহায়করূপেই এই আলো কাজ করছে। সুতরাং হঠাৎ আলোর লুকানি লাগা দর্শকের মোহমুগ্ধ চোখ

দেখেই এই আলো সোচ্চার বা বেশী সচেতন বলে রায় দেওয়া যুক্তিসংগত হবে না। পরন্তু এ কথা স্বীকার করাই সংগত যে, আঙ্গিকের সাহায্যে যে সমস্ত পরিবেশ সৃষ্টি এক সময় অসম্ভব বলে বিবেচিত হতো তাপস-সেনী আলো সেই সমস্ত পরিবেশের বাস্তব-রূপায়নের দ্বারা নাট্য-জগতে যুগান্তর এনেছে। এর আগে দেখেছি নাটকের প্রয়োজনে রংগমঞ্চে স্থান পেলেও বাত বা হারিকেন-লণ্টন অনাদর আর উপেক্ষার মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে ইলেক্ট্রিক আলোর উপহাস সহ্য করছে। এ দৃশ্য দৃষ্টিকটু ঠেকেছে, কিন্তু সহ্য করেছি উপায়বিহীন হয়ে। এই সমস্ত অভাব, অসম্পূর্ণতা দূর করেছে তাপস-সেনী আলো, পরিবেশকে করে তুলেছে স্বাভাবিক। সুতরাং, গোড়ামির বশবর্তী হয়ে তাকে দূরে সরিয়ে না রেখে সানন্দে বরণ করে নেওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

এবার রূপ, দৃশ্য আর মণ্ডসজ্জার প্রসঙ্গে আসা যাক। রূপসজ্জার সরঞ্জাম আবরণ আর আভরণ। অভিনেতার স্বাভাবিক রংকে মণ্ডোপযোগী করতে প্রয়োজন রংএর আবরণ এবং বয়স মেক-আপ করতে পরচূলা ও তুলির আঁচড়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সখের থিয়েটারে খড়ি গোলা রংএর আধিক্য চক্ষুপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য রংএর সূক্ষ্ম ব্যবহার যে স্থান-বিশেষে হয় না তা নয়, কিন্তু নাটকের সব আঙ্গিকই যখন স্বাভাবিক ও বাস্তব হয়ে উঠে তখন অভিনেতাদের রং মাথিয়ে সংস্কারের প্রয়োজন কি? নাটকের প্রয়োজনে ব্যক্তিবিশেষকে রং মাথাতে হলে সেই রংকে কি আরো স্বাভাবিক করে তোলা যায় না? তাহলে সামঞ্জস্য রাখার জন্য নাটকের সব পাত্র-পাত্রীকে রং মাথাতে হবে না, রূপসজ্জা আরো স্বাভাবিক হবে। আমার মনে হয় এই বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা দেবার জন্য রীতিমত শিক্ষালয় চালু করা উচিত। আভরণ সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, কারণ কয়েকটি শখের থিয়েটারে পরিচালকের অজ্ঞতায় পোষাক-পরিচ্ছদ হাঁসির খোরাক হওয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা নেই বর্তমানে।

দৃশ্য আর মণ্ডসজ্জা নাটকের গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, নাটকের গতির সঙ্গে আজ সে সমভাবে পা ফেলে চলতে পারছে না। পটে আঁকা মন্দির

যদি হাওয়ায় দুলতে থাকে তবে তা চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক। তাছাড়া যাবতীয় দৃশ্য একমাত্র পটভূমিকায় ভীড় করে সময় সময় অভ্যস্ত হাস্যকর হয়ে ওঠে। পটে আঁকা রাস্তা হয়তো পড়ে থাকে সুদূরবিস্তৃত হয়ে অথচ সেই রাস্তা দিয়ে যাবার কথা যে অভিনেতার ভিনি প্রচ্ছন্ন হন উইংসের পাশে। এই সমস্ত অসংগতি মেনে নিতে হয়েছে কারণ না মেনে উপায় নেই। নব্যপন্থীরা বর্তমানে এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলছেন যে, উইংস, বর্ডার, পট-ভূমিকা সব হটাও। হঠাতে পারলে তো ভালই হতো কারণ অভিনেতা যেখানে রিমার্কিক সেখানে শ্বি-মার্কিক আঙ্গিক সামঞ্জস্য আনতে পারে না। এর ওপর, অধ্যাপক সাধন ভট্টাচার্যের কথায়, নাটক যদি রবীন্দ্র-নাটকের ধারা বেয়ে চতু-মাত্রিক হতে শুরুর করে, তবে তো হালে পানি না পেয়ে হালই ছেড়ে দিতে হয়। এই উভয়বিধ সমস্যার কথা চিন্তা করেই কবিগুরু মণ্ড ও দৃশ্যসজ্জাকে প্রতীকী করে কাল-পদার পটভূমিকা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এবং শুরুর নির্দেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, বহু অভিনয়ের মাধ্যমে এর সূক্ষ্ম ও সংযত ব্যবহারের শিক্ষা দিয়ে গেছেন হাতে-কলমে। কিন্তু নব্যপন্থীদের এতেও আপত্তি। তাঁরা বলেন, একরঙা পদার সামনে অভিনয় করলে অভিনয় আর আবৃত্তিতে তফাৎ রইল কি?—কথাটা অতিরঞ্জিত। অভিনয়ের দক্ষতা থাকলে মণ্ড ও দৃশ্যসজ্জার আঙ্গিক যখন অভিনয়কে স্বাভাবিক করতে সাহায্য করতে পারে তখন তাকে বাদ দেবার চিন্তা করব কেন? তাছাড়া প্রতীকী মণ্ডসজ্জাও সর্বপ্রণীর নাটকের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এতে শ্বি-মার্কিকতার গুটি তো দূর হয়ই না, মনও মেনে ভরে ওঠে না। সুতরাং নাটকের ক্ষেত্রে প্রতীকী দৃশ্য ও মণ্ডসজ্জার কল্পনায় অভিনবত্ব থাকতে পারে, নতুনদের আশ্বাদ তাতে পাওয়া যায়, কিন্তু বহুল ব্যবহৃত শ্বি-মার্কিক মণ্ডসজ্জার Substitute হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। নব্যপন্থীরা এর বিকল্প হিসাবে কি দিতে চান, দেখা যাক—“থিয়েটার এবং দর্শক পেলেই আমি যবনিকা বাদ দেবো। তারপর বাদ দেবো উইংস, বর্ডার প্রভৃতি। তারপর হটাৎ সান জাতীয় যত জিনিস। মেঝেটাকে নানা আকারের বেদী দিয়ে ভরে দেবো। এলোমেলো এদিক-ওদিক সিঁড়ি সাজাবো। অভিনেতা চলতে গেলেই যাতে সিঁড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।.....ঝড় বোঝাতে ব্যবহার করবো ফ্রেগ-এর আঁকা রেখা-কাটা একটা কালো পর্দা বা ব্রেসার্ট বর্ণিত বিদ্যুৎ আঁকা ধূসর পর্দা। জল বোঝাতে নীল পোষাক-পরা জনকুড়ি নর্তকী। আগুন বোঝাতে হয়তো উদয়শংকর বর্ণিত লাল

রিবন নাড়বো। বৃষ্টি বোঝাতে গুটি-দশেক ছাড়া খুলে ধরব। যুদ্ধক্ষেত্র বোঝাতে পদা আর বেদীগলো নাড়বো ভীমবেগে। যাক্ করব আমি অনেক কিছুই। কিন্তু বা করব থিয়েটারী ঢং-এই করব। চিত্রপটের থোকাসুন্দ ভাস্তবতা আমদানী করব না।”

যবনিকা নাটকের টেম্পো নষ্ট করে অনেক ক্ষেত্রে। সুতরাং তার ব্যবহার কমানোর চেষ্টা যুক্তিযুক্ত কিন্তু তাকে পুরোপুরি বাদ দিলে কি ভাল হবে? নাটকের মাঝে এমন অনেক দৃশ্য থাকে যার শেষভাগে কোন নাটকীয় সংঘাত তুঙ্গে ওঠে। তারপরই আরম্ভ হয় নতুন দৃশ্যের স্বাভাবিক গতি। এর মাঝখানে যাবত প্রয়োজন। দর্শককে নতুন দৃশ্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার সুযোগ দেয় এই যতি। এই যতির কাজ করে যবনিকা। যবনিকা বিসর্জন দিলে এই যতির জন্য যবনিকার বিকল্পে অন্য কিছু ব্যবহার করতে হবে। তাতে লাভ কি? তাছাড়া এক অঙ্কের শেষে এবং অন্য অঙ্কের শুরুতে একই অভিনেতার প্রবেশ থাকলে পোষাক-পরিবর্তনের জন্যও বিরাম অপরিহার্য হয়ে ওঠে সময় সময়। সেক্ষেত্রেও যবনিকার প্রয়োজন। অন্যান্য ক্ষেত্রে যবনিকাকে বাদ দেওয়া যায় এবং বর্তমান যুগীয়মান রংগমণ্ড অপ্রয়োজনে যবনিকার ব্যবহার সীমিত করে এনেছে। বর্ডার, উইংস, সীন ইত্যাদি মাত্রা-বৈষম্যের জন্য অভিনয়ের সঙ্গে ভাল রাখতে পারছে না একথা আগেই বলেছি। কিন্তু তাদের কোন বিকল্প ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। নব্যপন্থীরা আরো কি কি করার ইচ্ছা পোষণ করেন জানি না, কিন্তু বতটুকু তাঁরা জানিয়েছেন তাতে হামবড়া ভাব এবং বাগাড়ম্বর ছাড়া ভরসা করার মতো কিছুই তো পেলাম না। সিঁড়ি আর বেদী তাঁরা কি কি শ্রেণীর দাশো ব্যবহার করবেন জানাননি, তবে কথার ধরন দেখে মনে হয় মণ্ডসজ্জাকে ত্রিমাত্রিক করতে ঐ দুটিই তাঁদের প্রধান অস্ত্র। তাহলে মণ্ডসজ্জাটা কেমন হবে একটু কল্পনা করার চেষ্টা করা যাক।

শয়নঘরে ড্রেসিং টেবল আর খাটের মাঝখানে অথবা বনের পথে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ইতঃতত বিক্ষিপ্ত সিঁড়ি আর বেদী।—ত্রিমাত্রিক মণ্ডসজ্জার এই যদি নমুনা হয় তাহলে তাকে নমস্কার জানিয়ে বলব ত্রিমাত্রিক নিয়ে ভব স্বস্তিতে আসি, ত্রিমাত্রিকের সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন নেই। আর প্রতীকী যে সমস্ত জিনিস তাঁরা আমদানী করতে চেয়েছেন মণ্ডে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক আগেই হয়ে গেছে। নাটকের পরিবেশ-সৃষ্টির মধ্যস্থ সহায়ক হলে মণ্ডে এদের ব্যবহার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকত না। অর তাছাড়া

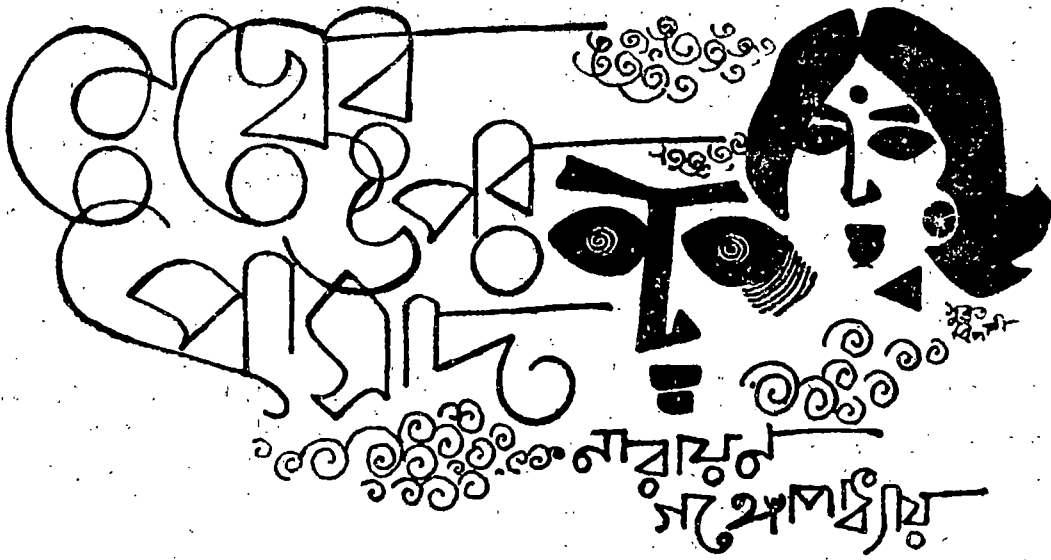
প্রতীকী মণ্ডসজ্জাকেই যদি গ্রহণ করবো তাহলে বেচারী রবীন্দ্রনাথ দোষ করলেন কি? অর্থাৎ এককথায় নব্যপন্থীদের ত্রিমাত্রিক মণ্ডসজ্জা বিসর্জনের প্রস্তাবে সায় দিলেও তাদের বিকল্প সজ্জার পরিকল্পনা গ্রহণীয় নয়। আমার তো মনে হয় এই ত্রিমাত্রিক এবং ত্রিমাত্রিকের বিরোধ অদূর ভবিষ্যতে ঘোচবার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করার সাধ সংকল্প থাকলেও বর্তমানে বর্ডার, উইংসকে সহ্য করে আর আঁকা সীন পেছনে ঝুলিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবে মণ্ডের সীন আঁকার কাজে যথার্থ শিল্পীরা যাতে হাত লাগান তারই জন্য সচেতন হতে হবে আমাদের। শিল্পীদের কাছে বর্তমানে একাজ হীন, ঠিক যেমন কিছুদিন আগে অভিনয়ও হীন ছিল সামাজিক মানদণ্ডের কাছে। সে যুগের পরিবর্তন হয়েছে, বর্তমান যুগেরও পরিবর্তন ঘটবে একদিন, তখন আর এই কাজকে হীন বলে মনে করবেন না যথার্থ শিল্পীরা। আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত সেই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা।

কিন্তু নব্যপন্থীরা অভিনেতার সমালোচনার সবচেয়ে নিম্নম। থিয়েটারে অভিনেতার মধ্য আসন তাঁরা কেড়ে নিতে চেয়েছেন, তাকে আবেগহীন, যান্ত্রিক করে পরিচালকের দাস করতে চেয়েছেন। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে অভিনেতাদের জন্য তাঁরা General qualification নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুগঠিত দেহ তো তাঁদের অবশ্য প্রয়োজনীয়, উপরন্তু, তাঁরা এ্যাক্রোব্যাট জানলে ভাল হয়। তাছাড়া ক্রিকেট থেকে দাবা পর্যন্ত বাবতীয় খেলা তাঁদের জানা প্রয়োজন। এ্যাকাডেমিক না হলেও যথেষ্ট পড়াশুনার চর্চা থাকা দরকার তাঁদের সর্বাধিকারে। রাজনীতিকও বাদ দিলে চলাবে না, মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে বিতর্ক করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান তাঁদের রাখতে হবে। তদুপরি কাবোর রসাস্বাদনে তাঁরা হবেন পারগম। সাহিত্যের সবচেয়ে জল খেতে হবে তাঁদের। চিত্র এবং কলার রসিকও হতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় তাঁদের হতে হবে এক একটি জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। মার কাছ থেকে আমরা শুধু চাই পরিচালকের নির্দেশ-মতো যান্ত্রিক অভিনয়, সেই আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজ রাখার প্রয়োজন কি বুঝতে পারলাম না। রাখতে পারলে অবশ্য ভাল, কিন্তু অভিনেতা মাদেরই এগুলি essential quali-

fication বলে নির্দিষ্ট করলে তলোয়ার দিয়ে দাড়ি কাটার ব্যবস্থা করা হয় না কি? আমাদের দেশে এমন চৌখশ লোক কটি আছে হাতে গোণা যায়, যে কটি আছে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরো সম্মানজনক কর্মক্ষেত্র। সুতরাং অভিনেতার পক্ষে এগুলি essential qualification বলে নির্দিষ্ট করলে রংগালয়ের দরজা আমাদের বন্ধ করে রাখতে হবে আরো বেশ কয়েক যুগ।

সবশেষে পরিচালক সম্বন্ধে দুচার-কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নব্যপন্থীরা অভিনেতাকে সিংহাসনচ্যুত করে পরিচালককে বসাতে চান সেখানে। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, একমাত্র পরিচালকই নাটককে একাবস্থা করে শিল্পরূপ দিতে পারেন।—নাট্যকাজিন্যে পরিচালকের role অভ্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ একথা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু অভিনেতার চেয়ে তাঁকে প্রাধান্য দেবার প্রস্তাব বাড়াবাড়ির পর্যায়ভূত। কারণ, আগেই বলেছি, অভিনয় হচ্ছে শিল্প এবং সেই শিল্পের স্রষ্টা অভিনেতা, শিল্পের উপাদান অভিনেতা, এমন কি সৃষ্টিও অভিনেতা। এই শিল্পকর্মকে সাধক করে তোলার জন্য পরিপূরক হিসাবে যে সমস্ত আঙ্গিক ব্যবহৃত তাদের সামঞ্জস্য-বিধান এবং সূক্ষ্ম প্রয়োগের দায়িত্বমাত্র পরিচালকের। নাট্যকলার অঙ্গ অভিনেতা; সুতরাং তাঁর ওপর ছাড়ি ঘোরাবার অধিকারও আছে পরিচালকের। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রাজাকে শাসন করার অধিকার আছে বলেই রাজগুরুকে সিংহাসনে বসাবার পরিকল্পনা সমর্থনযোগ্য নয়।

এক কথায়, এতক্ষণের আলোচনায় আমরা দেখলাম যে বিদ্রোহের মনোভাব নিয়েই নব্যপন্থীরা আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন,—ভাল-মন্দ বিচারের অপেক্ষা রাখেননি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এই আপদোলন যে সবতোভাবে অসাধক এমন কথা বলা যায় না—বরং দেখছি আলোকের ক্ষেত্রে তাঁরা অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে দুটি তাঁরা ধরতে পেরেছেন কিন্তু সংশোধনের পথ হয় দেখতে পাননি না হয় ভুল পথ দেখিয়েছেন। তবে, এই আপদোলনকে অভিনন্দন জানাতে হয় কারণ পুরানোর বিরুদ্ধে নতুনের বিদ্রোহই জন্ম দেয় নতুনতর জীবনের, উন্মুক্ত করে নব নব বৈচিত্র্যের নিত্য-নতুন দুয়ার, ত্বরান্বিত করে উজ্জ্বল নব-প্রভাত।



[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২ তিন ২

পাশের তন্তুপোশে অভয়ের নাক ডাকছে। গুমোট গরমে ছটফট করতে করতে ঘুমটা ফিকে হয়ে এসেছিল প্রভাতের। মশারির বাইরে অপ্রান্ত ব্রহ্ম গুঞ্জন। রাত শেষ হয়ে এল অথচ এখনো ভেতরে ঢোকবার পথ পাওয়া যাচ্ছে না দেখে মশারা সমস্বরে প্রতিবাদ তুলেছে। প্রভাত করুণা অনুভব করল। মশারির একটা কোনো একটুখানি তুলে ধরলে মন্দ হয় না—বুড়ুফু প্রাণীগুলো কিছুদ্ধ অন্তত খেয়ে বাঁচতে পারে।

বাইরের মশার কলরবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অভয়ের নাকের ডাক যেন ঐক্যমত সৃষ্টি করছিল। প্রভাত সন্ধ্যার মনে আবার একটা তড়িচ্চলিতা জেগে উঠল। নাক কখনো ডাকে না—ওটা নিতান্ত গুরুত্বমাত্র। আওয়াজটা যদি মুখ থেকেই আসে—তাহলে মিছিমিছি নাকের এই অপব্যবহার কেন? কিংবা এমনও হতে পারে যে, মুখ সব সময়ে মুখের বলে তার সবচাইতে নিকট প্রতিবেশী নাককে একেবারে বাণিত করতে ভালো লাগে না, ইচ্ছে করেই তাকে খানিকটা গৌরব দেওয়া হয়ে থাকে।

নিজের গবেষণাতে প্রভাত বেশ কৌতুক বোধ করল। ঘাড়ের নীচে তেল-চিটচিটে বালিশটা ঘামে ভিজ়ে গেছে, একটা বিদ্রী গন্ধ উঠছিল। কোন এক মশানে কবে দেখা একটা আবছা ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। বিবর্ণ

ময়লা একটা বালিশ পড়ে আছে কুশ-ঘনের ভেতর, শীর্ণ কালো মৃতদেহের মতো পোড়া বাঁশটা রয়েছে তার পাশেই আর ঝোড়ো দক্ষিণা হাওয়ার ফাটা বালিশটা থেকে রাশি রাশি তুলো উড়ে যাচ্ছে মজা নদীটার শ্যাওলাভরা কালো জলের দিকে। সামনের শিমুল গাছটার দূরটো শকুন শব্দ করে ডানা ঝাপটালো—মৃত্যু!

মৃত্যু! সেই রাত। বৃষ্টির ধারায় তিন-চার হাতের বেশি নজরে আসে না। অন্ধের মতো এগিয়ে চলেছে গাড়ীটা। তারপর—প্রভাতের চমক লাগল। মশার গুঞ্জরণ, অভয়ের নাকের ডাক—সব ছাপিয়ে কম্বু-কম্বু শব্দ উঠেছে বাইরে। বৃষ্টি নামল। প্রভাত চোখদুটোকে সম্পূর্ণ মেলে ধরল। ঘরটা অন্ধকার, তবু নিজের শরীরটাকে স্পষ্ট রেখায় দেখা যায়, শাদা মশারিটা তাকে খানিকটা মেঘের মতো ঘিরে আছে বলে মনে হয়। মৃত্যুর আগে যখন নিজের চেতনা এমনিভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আসবে, যন্ত্রণার শেষ গোষ্ঠীর পরে যখন শান্ত রাত্রির অবসান ধীরে ধীরে কালো থেকে আরো কালোর ভেতরে তলিয়ে নেবে তাকে, তখন নিজের দেহের রেখাটা একবার এমনি করেই ভেসে উঠবে তার আবছা চোখের সামনে। তারপরে আর কিছ নেই।

বৃষ্টি পড়ছে। সেই রাতটাকেই বার বার মনের কাছে জাগিয়ে তুলতে চায়। প্রভাত জোর করে অন্য কোনো বৃষ্টি—আরো অনেক বৃষ্টিতে ভাবতে চাইল।

মাঠের ওপরে ঘন কালো মেঘে বিদ্যুৎ হেনে বৃষ্টি আসছে—বজ্রের আতঙ্ক জৈমিনি মন্ড জপ করছে দীর্ঘ তাল-গাছের সারি। পাড়াগাঁয়ে কোথায় অজস্র বর্ষণে পড়ুর ভেসে গেছে—গেরস্ত-বাড়ীর উঠোন দিয়ে ঘোলা জলের সঙ্গে চলেছে মাছের ঝাঁক। কোথায় পথের ধারে মস্ত একটা গাছের নীচে কবে যেন বৃষ্টিতে আশ্রয় নিয়েছিল—দেখাছিল খানিক দূরে টোকা মাথায় লাঙল দিচ্ছে চাষীরা—লাঙলের ফলার মাটি আর কাদাজল বৃষ্টিতে যেন টগবগ করে ফুটছে আর গাছটা তুলসীর ঝারির মতো পাতায় পাতায় জলের বিন্দু উপহার দিচ্ছে ওদের : টপ-টপ-টপ—

—দূর শালা!

অভয়ের বিরক্ত গলার আওয়াজে গাছের পাতার বৃষ্টি মিলিয়ে গেল। প্রভাত মাথা ঘোরালো অভয়ের বিছানার দিকে। ঝাপসা অন্ধকারে দেখা গেল, অভয় নেমে পড়েছে বিছানা থেকে, হড়-হড় করে টানতে শব্দ করেছে তন্তুপোশ।

—কী হল অভয়?

—কী আর হবে? ছাত চুইয়ে জল পড়ছে। ব্যাটা বাড়ীওলা ভাড়া নেবার সময় ঠিক দোসরা তারিখে এসে হাজির, অথচ একটুখানি সারিয়ে দেবার বেলায় কোথাও নেই। বলে, অসুবিধে হল ছেড়ে দাও। জোচ্চোর!

ততক্ষণে টপ করে প্রভাতের মশারির চালেও একটা ফোটা পড়ল।

—আমার এখানেও পড়ছে।

—পড়বেই। কোথাও বাদ যাবে না।
যর তো নয়, যেন ঝাঁঝরি।

প্রভাতের মশারির ওপর পর পর
তিনটে ফোঁটা পড়ল এবারে। জলের
ছিটে লাগল মৃদু।

অভয় বললে, তন্তুপোশ সরাও
প্রভাতদা। এই কোনার দিকে নিয়ে
এসো। এদিকে একটু কম পড়ে।

অগত্যা নামতে হল প্রভাতকেও।
ঘড়ঘড়িয়ে খানিকটা সরাতে হল বিছানা।
মেজেটা ভিজে উঠেছে এর মধ্যেই।
টিপয়ের ওপর একটা কাচের গ্লাস ছিল,
টুং টুং করে জলতরঙ্গ বাজতে শুরুর
হয়েছে তার ভেতরে।

অভয় রাস্তার দিকের জানলাটা
খুলে দিলে। পশ্চিমমুখো জানলায়
দক্ষিণমুখো বৃষ্টির ছাট আসছে না।
বাইরে কালির শিশিধোয়া জলের মতো
ভোর। থেকে থেকে বৃষ্টি ঝিকিয়ে
উঠছে তার ভেতর।

—ওঃ, কী মশা! হুস-হুস! যা—
বাইরে যা—দু হাত দিয়ে এক ঝাঁক
মশাকে জানলার বাইরে চালান করবার
একটা অকারণ চেষ্টা করল অভয়।
মশারিটা তুলে ফেলে পা গুঁড়িয়ে বসল
বিছানার ওপর। কাচের গ্লাসটায় জল-
তরঙ্গ বাজতে লাগল, ঘরের এখানে-
ওখানে জল পড়বার নানা রকম ঐকতান
উঠতে লাগল, ভেজা আবজ্ঞার গন্ধ
আসতে লাগল খোলা জানলা দিয়ে।

—বিড়ি আছে প্রভাতদা?

প্রভাত আবার শূন্যে পড়োঁছিল,
অভয়ের ডাকে উঠে পড়তে হল।
বালিশের পাশ থেকে একটা বিড়ি
এগিয়ে দিলে অভয়কে।

—ম্যাচিস?

দেশলাইটাও দিতে হল।

অভয় দেশলাই জ্বালল। পনেরো-
কুড়ি সেকেন্ডের জন্যে খানিকটা লালচে
আলোয় ভরে উঠল ঘর। চোখে পড়ল,
মেজে দিয়ে দু-তিনটে জলের স্রোত
গাড়িয়ে চলেছে।

শৌ শৌ করে বিড়িতে গোটা দুই
টান দিলে অভয়। তারপর :

—আচ্ছা প্রভাতদা।

—হুঁ।

—এ-বাড়ী যা হয়েছে। কোনো
ভন্দরলোক থাকতে পারে না। তুমি
কোন দুঃখে পড়ে আছো এখানে?

প্রভাত হাসল : আমি ভন্দরলোক নই
বলে।

—ঠাট্টা নয়। আমারই খুন চেপে
যায় মধ্যে মধ্যে। বাবা রাতদিন খিটখিট
করছে। অমিয়টা বয়ে যাচ্ছে চোখের
সামনে দিয়ে—এর পরে ছোরা হাতে
নিয়ে মানুষ খুন করতে বেরবে। আর
বড়দি—হঠাৎ থেমে গেল অভয়।

ভোরের ফ্যাকাশে আলোর চোখের
দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে প্রভাত অভয়ের দিকে
তাকালো। বড়দি—অর্থাৎ দীপ্তি।

সন্দেহজনকভাবে যে চাকরি করে—
সংসারের এই মৃদু-খুবড়ে-পড়া বোঝাই
গাড়ীটাকে যে দীপ্তিই কোনোমতে
টেনে নিয়ে চলেছে। অভয় কী বলতে
যাচ্ছিল প্রভাত জানে না, কিন্তু কাল
নিজের চোখেই—

কথাটাকে অভয় ঘুরিয়ে নিলে।

—মাসে মাসে বাবাকে তুমি কত
দাও প্রভাতদা?

—পঞ্চাশ, ষাট।

—ভ্রমশ্রী ষাট। ওই টাকা দিয়ে
কোনো একটা মেসে রাজার হালে থাকতে
পারতে তুমি।

প্রভাত হাসল।

—এখানেও তো খুব খারাপ আছি
বলে মনে হচ্ছে না।

—কী ভালো আছো?—বিড়িতে
একটা কড়া টান দিয়ে মৃদু ঝাঁকালো
অভয় : এই তো ঘর—কুকুর থাকতে
পারে না এর ভেতরে। কোন দিন ছাতের
টালী ভেঙে পড়ে মাথা গুঁড়িয়ে দেবে
ঠিক নেই। ছাঁচড়া আর খেঁশারি ডাল
খেতে খেতে পেটে চড়া পড়ে যাচ্ছে।
পরস্য দিয়ে কেন এত কষ্ট পাও
প্রভাতদা?

—কষ্ট কোথায়? কাল রাতেও তো
চমৎকার মার্টন খাওয়া গেল।

—হুঁ, মার্টন—দিদির আনা মার্টন!

—অভয় বিড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে
বাইরে : গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতে
ইচ্ছে করে আমার। আমরা কুলি-
মজুরদের সঙ্গে খেটে মরি, একেবারে
ছোটলোক হয়ে গেছি। রুটি আর ডাল
খেতেও কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু
দিদির পরসার রাজভোগ খাওয়াও—

আবার থেমে গেল অভয়। দুই
কোথায় ঠং ঠং করে পাঁচটা বাজল।

—নাঃ, উঠতে হল। একটু আরাম
করবারও জো আছে নাকি কপালে!

মশারি তুলে ফেলোঁছিল, এবার
বিছানাটা গুঁড়িয়ে ফেলল অভয়। তার-
পর বোরিয়ে গেল বাইরে। আটটায় ওর
হাজিরা দিতে হয় মেটেবুরুজে।
বোরিয়ে যায় পোনে সাতটা সাতটার
ভেতরেই।

বাইরে বৃষ্টি থেমে এসেছে, ঘোলাটে
সকালের আলো উর্গাক দিয়েছে ঘরে।
কাচের গ্লাসটাকে দেখা যাচ্ছে, কানায়
কানায় ভরা। মেজে দিয়ে এখনো স্রোত
চলছে, বাইরের বর্ষা থেমে এলেও,
তেঁতুল পাতার বৃষ্টি চলছে ঘরে।

এইবার প্রভাত একটা বিড়ি ধরালো।
একটা গতের ভেতরে যেখানে অনেক-
খানি জল জমে রয়েছে, কাঠিটা ছুঁড়ে
দিলে তার ভেতর।

অভয় যে একেবারে মিথো কথা
বলেছে তা নয়। পঞ্চাশ-ষাট টাকার
বিনিময়ে এর চাইতে অনেক বেশি
আরামে থাকা যেত। মা আর বেঁচে নেই,
এখন সে একেবারেই একা। একটা
ধুকতে-থাকা লক্ষ্মীছাড়া সংসারের এক
কোনায় মৃদু বুজে পড়ে থাকার চাইতে
স্বাধীন নির্ভাবনায় দিন কাটানো অনেক
ভালো হত তার পক্ষে। কিন্তু কলকাতায়
আসবার পর সেই যে এই বাড়ীতে এসে
জুটল, তারপর থেকে সে রয়ে গেল
এইখানেই। নিজের কথা কোনোদিন
ভাবে না বলেই এখানকার সুবিধে-
অসুবিধেগুলোকেও কোনোদিন খতিয়ে
দেখনি প্রভাত। থাকতে থাকতে অভ্যাস
হয়ে গেছে। আত্মীয়তার একটা আল্গা
সম্পর্ক—অনেক খুঁজেপেতে সেটাকে
বার করে আনতে হয়। এই সংসারে তার
বাঁধন নেই বলেই এখানকার ভালোমন্দ
বিশেষ কিছু তাকে স্পর্শ করে না।
ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারে বলে
বাওয়ার কথাটাও মনে আসে না কোনো-
দিন।

জ্বাইভারের চাকরি। সাড়ে সাতটায়
তাকেও বেরতে হয়। দুপুরের খাওয়াটা
প্রায়ই মিনব-বাড়ীতে। কতী বড়ো একটা
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চাকুরে। অফিসের
টোঁবলে তাঁর যা কাজ, তার চাইতেও
ঢের বেশি ঘোরাঘুরি। কখনো চিৎপুরে
ইয়ার্ডে কখনো খিদিরপুরের ডকে,
কখনো বা ধুলো, ধোঁয়া আর পাটের
ফেসোতে বিষাক্ত দম-আটকানো
জগন্দলে। কতীর কাছ থেকে ছুঁটি মেলে
পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায়, তারপর গিন্নী
আর দিদিমাণি। মার্কেটে যাওয়া,
বেড়ানো, নিমন্ত্রণ রক্ষা, আরো দশটা

খুঁটিনাটি। নারকেলডাঙায় আসতে রাত এগারোটো। কিছু খেয়ে নিয়ে শূয়ে পড়তে না পড়তেই পৃথিবীর সমস্ত আলো-মানুষ-শব্দ একসঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়।

এই বাড়ীটাকে নিয়ে ভাববে কখন প্রভাত? সময় কই তার? এক অভয় ছাড়া—একঘরেই শোয় বলে—আর কারো সঙ্গে পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি তার দেখাই হয় কিনা সন্দেহ।

এই ভাবেই চলছিল। কিন্তু আজ দিন চারেক হল দীপ্ত তাকে ভাবিয়েছে।

কর্তা সপরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলেন গঙ্গার ধারে। প্রিন্সেস ঘাট থেকে দক্ষিণে একটু এগিয়ে যেখানে গম্বুজতোলা দোতলা বসবার জায়গাটি রয়েছে, সেইখানে গাড়ীটা রেখে বেড়াতে চলে গিয়েছিলেন ওরা। আর প্রভাত সরকার চূপ করে বসে দেখেছিল গঙ্গার কালো বৃকে দুটো বড়ো বড়ো জাহাজ স্তম্ভ হয়ে আছে, মিটমিটে লষ্ঠনের আলো জেরলে ছোট নৌকাগুলো আসা-যাওয়া করছে—সার্চ লাইটের আলো ফেলে লণ্ড আর স্টিমার চলেছে।

চোখে পড়ল সেই সময়।

সুটপরা একটি পুরুষ মানুষ—তাকে ভালো করে দেখা গেল না। কিন্তু দীপ্তিকে চিনতে ভুল হল না। পুরুষটির একখানা হাত দীপ্তির কোমরে জড়ানো। দুজনে রেললাইন পার হয়ে চলেছে।

দীপ্তির গলা পরিষ্কার কানে এলঃ এখন ছেড়ে দাও, বাড়ী ফিরব।

—আরে ধেঁ!

পুরুষটি আর কী বলল শোনা গেল না, কিন্তু দীপ্তিকে প্রায় জোর করে নিয়েই গম্বুজওলা ঘরটার ভেতরে সে অদৃশ্য হল। চোখের দৃষ্টি যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ করে চেয়ে রইল প্রভাত, কিন্তু দোতলার দুটো ছায়ার অস্পষ্ট খানিকটা সান্নিধ্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না।

আর প্রভাত সরকারের খরাপ লাগল। যতটুকু দেখা গেল, তাকে ঘিরে ঘিরে না দেখা অংশটা কুৎসিত কল্পনার জাল তৈরী করে চলল।

অথচ, বলতে গেলে সে এই পরিবারের কেউ নয়। আত্মীয়তার সূত্রটুকু প্রায় গবেষণা করে আবিষ্কার করতে হয়। সোজাসুজি এখানে সে পেরিয়ে গেলো। দীপ্তির সে অভিভাবক

নয়, আর বাইশ বছরের দীপ্তি নিজের ভালোমন্দ নিজেই বুঝতে পারে। তার মাথা ঘামানোর কিছু নেই। যার যা খুশি করুক, যা হওয়ার তাই হোক।

সহজ করেই নিতে চেয়েছিল প্রভাত, কিন্তু কিছুতেই সহজ হওয়া যাচ্ছে না। দীপ্তির টাকা-পয়সা, কখনো কখনো মাকেট থেকে মাটনের দাক্ষিণ্য—সব কিছুর সঙ্গে প্রিন্সেস ঘাটের ওই

আশাহীন, ভবিষ্যৎহীন কতগুলো মানুষ সেই পার্কের ভেতর বৃক্ষদ তুলছে। দীপ্তির মতো অসংখ্য মেয়ে আজ—

কী করতে পারে প্রভাত? কিছুই করতে পারে না। সেই দুঃখিনীর রাতটার স্মৃতি বয়ে সেও তো একটা প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। তারও কোনো আশা নেই, স্বপ্ন নেই, ভবিষ্যৎ নেই। বৃকের



এখন ছেড়ে দাও, বাড়ী ফিরব।

ছবিটা জড়িয়ে যাচ্ছে। আর শব্দ সে একাই নয়। একটু আগেই অভয় কী যেন বলতে গিয়েও থমকে গেছে। কিন্তু যেটুকু বলেছে—তারপর আর বলবার দরকার ছিল না।

প্রভাত জানে—প্রভাত দেখেছে। বৃক্ষ আর পার্টিশনের পর এই বীভৎস কলকাতা। বৃক্ষ শেষ হয়ে গেছে, আলাদা করে তৈরী হয়েছে দুই দেশের ভূগোল। সেই সব দুঃস্বপ্নের দিনগুলো এখন বিবর্ণ স্মৃতি হয়ে আসছে। কিন্তু এই কলকাতায় নয়। যেন বৃক্ষ আর দাওয়ার রক্ত-ধোয়া যত পার্কে এসে জমেছে এই শহরের কুন্ডের ভেতর, যত পাচা শব যেন স্তব্ধ করে ফেলে দেওয়া হয়েছে এখানে।

পাঁজরায় ফিক ব্যথা ওঠবার মতো রাণীর কথা কখনো কখনো মনে পড়ে—তারপরেই কলকাতার ট্রাফিক সিগন্যালের মধ্যে মৃদুত্ব মৃদু হয়ে যায় সেটা। নিজের ভার বয়েই সে ক্লান্ত, অন্যের কথা ভাববার মতো সময় তার নেই।

তা হলে দীপ্তির কথা সে কেন ভাবে? কেন জোর করে স্মরণে দিতে পারছে না মন থেকে? কেন একটা অস্বস্তির কাঁটা হয়ে বিধছে বার বার?

—প্রভাতদা, চা।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢুকল তৃপ্তি। ছোটখাটো এই মিষ্টি মেয়েটিকে দেখলে মন খুশি হয়ে ওঠে। সংসারের

অধেক দায়িত্ব এই মেয়েটির কাঁধের ওপর—ভোর থেকে একটানা খেটেই চলেছে। নিরাসক্ত প্রভাতেরও কখনো কখনো মনে হয়েছে, এই বাড়ীতে মেয়েটি যেন প্রস্ফুট—এখানে ওকে কোনোমতেই ধানায় না। একটা সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে জায়গা পেলে তৃপ্ত ফুলে ফলে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারত।

—ইস, একেবারে ভেসে গেছে ঘরটা! —চারের পেয়লা রাখবার জন্যে টিপয়টা টেনে আনতে গিয়ে স্বগতোক্তি করল তৃপ্ত। তারপর শ্বাশুরের ময়লা জলটা ঢেলে দিলে মেজের ওপর : বাড়ীওলাকে বাবা এত করে বলেন, তবু সারিয়ে দেয় না? চাটা সামনে রেখে বললে, তোমার এখানে খুব কষ্ট হয়, না প্রভাতদা?

ঠিক এই কথাই অভয় বলছিল। কিন্তু তৃপ্তির সূরটা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রভাতের মনে হল, তৃপ্তির মুখ থেকে এই কথাটুকু শোনবার জন্যে এর চাইতে অনেক বেশি কষ্ট করা যেতে পারে।

প্রভাত হাসল : সব ঘরেই তো জল গড়ে।

—তা পড়ে। মার-র বাস্ত-টাস্ত সব ভিজে গেছে কালকে। আমরা তো বসেই কাঁটিয়েছি শেষ রাতটুকু। এই সব শব্দ। এর পরে বর্ষা এলে কী যে হবে!

—একটুখানি সারিয়ে নিতে হবে নিজেদেরই, কী আর করা।

—বাবা বলছিলেন প্রায় একশো টাকা লাগবে।



—দেখা যাক!

তৃপ্তি বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তখন মনে পড়ল প্রভাতের। আর সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাতেই প্রশ্নটা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে : শোনো, দীপ্তি : কাল কখন ফিরেছিল?

তৃপ্তি থমকে দাঁড়ালো। প্রভাতের এই আচমকা কোতাহলে যেমন আশ্চর্য হল, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে চোখে-মুখে ঘনিয়ে এল ভয়ের ছায়া। ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল একবার।

তৃপ্তি কাছে এগিয়ে এল। শব্দনো ফিসফিসে গলায় বলল, তুমি জানো তা হলে? আমি তো ভেবেছিলাম, আমি একাই বুঝি জেগেছিলাম বাড়ীতে।

—না, আমিও ঘুমুছিলাম। এমনিই কথাটা জিজ্ঞেস করছিলাম তোমাকে।

—ওঃ, এমনিই!—একবারের জন্যে তৃপ্তির মুখ থেকে ভয়ের ছায়াটা সরে গিয়েই শ্বিগদুণ বেগে ঘনিয়ে এল আবার।

জলে-ভেজা মেজের দিকে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—কী একটা যেন বলতে গিয়েও বলতে পারছে না।

প্রভাত চায়ের পেয়লাটা হাতে নিয়ে একটা নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় স্তম্ভ হয়ে রইল।

তারপর তৃপ্তি মুখ তুলল। আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেছে।—

—কাউকে বলবে না প্রভাতদা? বাবা-মা-দাদা কাউকে নয়?

—না।

ফিস ফিস করে তৃপ্তি বললে, দিদি ফিরেছে প্রায় দুটোয়। একটা ট্যান্ডি থেকে টলতে টলতে নামল। জানো প্রভাতদা, দিদি মদ খেয়ে এসেছিল। কী বিস্তীর্ণ গম্ভীর সমস্ত মুখে!

প্রভাতের পেয়লা থেকে খানিকটা চা ছলকে পড়ল। অসম্ভব নয়—তার সমস্ত মন এমনি কিছু একটা শোনবার জন্যেই যেন তৈরী হচ্ছিল। তবু সহ্য করা গেল না। বৃকের মধ্যে যেটা কাঁটা হয়ে বিধাচ্ছিল, সেটা ছুরির ফলা হয়ে আঘাত করল।

বর বর করে কেঁদে ফেলল তৃপ্তি।

—কী হবে প্রভাতদা? দিদির যে সর্বনাশ হয়ে গেল। কী হবে আমাদের?

কী হবে দীপ্তির? প্রভাত সরকার তার উত্তর জানে না। বাঁচবার পথ খুঁজতে গিয়ে দীপ্তির মতো অনেক মেয়েই আজ সোজা পা বাড়িয়েছে পাতালের পিছল সিঁড়িতে। কী হবে প্রভাত তা জানে না। কেউই কি জানে?

—তৃপ্তি—তৃপ্তি—

গোরাগুণাব্দ ডাকছেন। চোখের জল সেলাইকরা শাড়ীর আঁচলে মুছে নিয়ে তৃপ্তি প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। প্রভাত হাতের পেয়লাটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। চা খাওয়ার প্রবৃত্তি আর নেই, এই মদহুত জীবনের সব স্বাদ তার মুখে সম্পূর্ণ বিস্বাদ হয়ে গেল।

দীপ্তি এই সংসারটাকে চালায়। কিন্তু কী অর্থ—কিসের অর্থ সে তুলে দিচ্ছে সংসারের মধ্যে? আর সেই অর্থের বিনিময়ে কী ভয়ঙ্কর দাম তাকে দিতে হচ্ছে দিনের পর দিন!

অভয়ই ঠিক বলিছিল। এই বাড়ী থেকে তার ছুটে পালিয়ে যাওয়া উচিত। এখন—এই মদহুতই। কিন্তু এখন থেকেই বা সে পালাবে কোথায়? কোন্ কলকাতায়? বৃন্দ-দাঙ্গা-পার্টিশনের যত রক্ত, যত রেদ, যত পাপ সব এসে জমেছে এই কলকাতার পঙ্ক কুণ্ডে। কোথায় বাবে সে—কোথায় তার নিস্তার মিলবে? এই কলকাতার অক্ষম, নিরুপায় মনুষ্যের প্রতীক গোরাগুণাব্দ—বাতের যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ যার পঙ্গু। সব দেখতে পাচ্ছি—সব বুঝতে পারছি, ক্রীষ যন্ত্রণায় তিলে তিলে রক্ত হয়ে যাচ্ছি—অথচ প্রতীকার নেই। আকর্ষিত রক্তপঙ্কের মধ্যে ডুবিয়ে অপেক্ষা করে আছি অনিবার্য একটা ভয়ঙ্কর পরিণামের জন্যে।

আর তখন প্রভাত সরকারের মনে হল, এখন থেকে পালিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই তার। তৃপ্তির সঙ্গে কোথায় যেন রাণীর মুখের আদল আছে একটা। ঝড়ের কালো মেঘ হয়ে কী যেন ঘনিয়ে আসছে সামনেই, আর চরম একটা দুর্ঘটনার রাতে বাড়ীটাকে ভাঙা মোটরের মতো চালিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষ দৃশ্যটানা না। খটানো পর্যন্ত কিছুতেই তার ছুটি মিলবে না!

(ক্রমশঃ)

অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের জন্য
আমাদের আর একটি নতুন কেন্দ্র
৭নং পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা—১

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

॥ বৈশাখী সাহিত্য সম্মেলন ॥

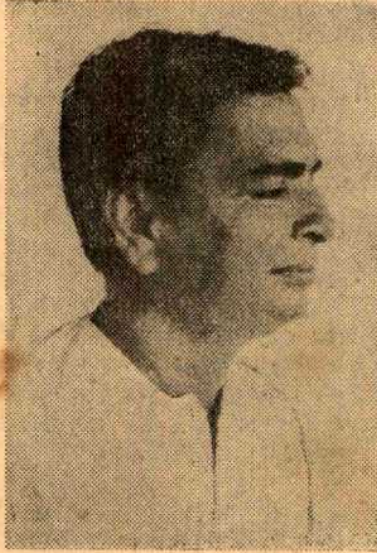
সাহিত্যের সঙ্গে আড্ডা বা মজলিসের বোগ চিরকালের। নানারকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈঠকের ভিতর থেকেই শ্রেষ্ঠ শিল্পী-কলাকুশলীর উদ্ভব ঘটেছে এককালে। একালে কর্মব্যস্ততার মাঝখানে ওধরনের বৈঠকই আবহাওয়া সৃষ্টির সুযোগ কম। কিন্তু প্রতি বছরে অনুষ্ঠিত বৈশাখী সাহিত্য সম্মেলনের আসরে গিয়ে পুরনো দিনের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে আমাদের পূর্বসূরীদের আর তাঁদের ঐতিহ্যপূর্ণ সেই সমস্ত আসরকে।

এবারের সম্মেলনে সাহিত্যালোচনা ও আলাপ-পরিচয়ের জন্যে আহ্বান এসেছিল শ্রীতৃষারকান্ত ঘোষ ও শ্রীসুধীর-চন্দ্র সরকারের যুগ্ম-স্বাক্ষরে। এই আসরেই উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদির ১৯৬১ সালের সাহিত্য পুরস্কার বিতরণ করা হয় সাতজন সাহিত্য-সেবীর মধ্যে।

সভাপতির ভাষণে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সাহিত্য-পুরস্কারগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেকালের রাজাও নেই—রাজ-কবিও নেই ঠিকই। কিন্তু রাষ্ট্র এখন রাজার স্থান নিয়ে যোগ্য শিল্পীদের পুরস্কৃত করছেন। এ ব্যাপারে নানাপ্রকার মত প্রকাশের অবকাশ থাকলেও এই পুরস্কারগুলির উদ্দেশ্য খুবই মহৎ বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, সংবাদপত্রে জনগণের অভি-মতই প্রতিধ্বনিত হয়। সংবাদপত্র জনগণের প্রতিনিধি। সুতরাং এই পুরস্কার-গুলিকে জনসাধারণের পুরস্কার বলে মনে করা যেতে পারে। সাহিত্যিকদের সমাবেশ বা মজলিসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন যে, এই ধরনের

সাহিত্য সম্মেলন

না। সে সময়ে রাজপক্ষ থেকে যেমন তেমন অন্য কোন পক্ষ থেকে কোন পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা ছিল না। এই বৈঠকই-আড্ডাই আমাদের সামাজিক



বলাইচাঁদ মথোপাধ্যায়

ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল নিঃসন্দেহে। আজ সে আড্ডা, সে মজলিস স্মৃতি। 'সাহিত্যের হাটে' ও ধরনের আড্ডার প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই—এই ধরনের আসরের মধ্য দিয়ে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি সেই অতীতের আড্ডাধারী মেজাজকে।



নরেন্দ্র মিত্র



বিমল মিত্র



হরপ্রসাদ মিত্র



কুমুদরঞ্জন মজুমদার

- পারম্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ মেলামেশা সত্যিই প্রয়োজনীয় এবং অনুকরণীয়।

আমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক তাঁদের মধ্যে অনেকেই একদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণের বারান্দার হস্টার পর হস্টা কাটিয়েছিলেন। সেই 'হংগলছানি' আড্ডার কোন বিরাম ছিল

এ কথাগুলি অত্যন্ত দরদ ও জোর দিয়ে বলেন শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সরকারী পুরস্কারসমূহ বিতরণের মাধ্যমে রাজ-নৈতিক মতকে কোন কোন সময়ে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে তিনি দৃষ্ট প্রকাশ করেন।

এই আসরে পূর্ব ঘোষিত অজুত-

বাজার, যুগান্তর, আনন্দবাজার, দেশ, মৌচাক, উল্টোরাথ প্রভৃতি পত্রিকা-গুলির পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পুরস্কার বিতরণ করা হয়। 'শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এবং 'মতিলাল স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন ঔপন্যাসিক শ্রীবিমল মিত্র। 'প্রফুল্ল স্মৃতি পুরস্কার' এবং 'সুদর্শন স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন যথাক্রমে শ্রীকুমুদরঞ্জন মজুমদার ও শ্রীনরেন্দ্র মিত্র। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত 'সরলা স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। 'মৌচাক' পত্রিকা প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেছেন শিশু-সাহিত্যিক শ্রীসুখ-লতা রাও। 'উল্টোরাথ' পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র।

সভার সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসুমিত্রা সেন। বহু সাহিত্যিক-বৃন্দ-জীবী-অধ্যাপক আসরে উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

॥ রবীন্দ্র পুরস্কার ॥

সাহিত্য জগতে ডঃ বলাইচাঁদ মথোপাধ্যায় 'বনফুল' নামে পরিচিত। বহুদিন ধরে এই নিষ্ঠাবান কথালিপী বাংলা সাহিত্যের সেবা করে আসছেন। এই প্রবীণ সাহিত্যিক রচিত 'হাটে-বাজারে' গ্রন্থখানি মৌলিক সাহিত্য-কর্মের জন্য ১৩৬৮ সালের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেছে। প্রশ্নের এই সাহিত্যিকের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করার জন্য আমরা তাঁকে অকৃত্রিম অভিনন্দন জানাই ও তাঁর দীর্ঘ সৃষ্টিশীল জীবন কামনা করি।

তাছাড়া শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কল্যাণ-পাধ্যায়ও তাঁর মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ পঞ্চোপাসনা রচনার জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন।



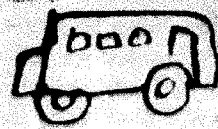
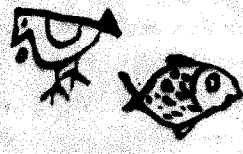
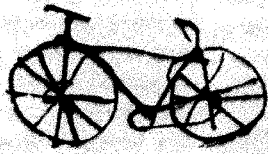
পুলিনবিহারী
সেন



বিমানবিহারী
মজুমদার

বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দান করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এরা প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে পুরস্কার বাবদ পাবেন।

বেঙ্গলীর খাতা



অঙ্গস্কান্ত

॥ কেকা ও কুহু ॥

কেকার সঙ্গে কুহুর চিরকালের বিবাদ। কেকা মুখের হলে কুহুকে নীরব হতে হয়। একটি পরিচিত গানের লাইনেও এই কথাটি বলা হয়েছে। এই গানে পাওয়া যায় একদিকে কেকার জন্যে আনন্দ, অন্যদিকে কুহুর জন্যে আক্ষেপ। কিন্তু কবি যদি কোনোদিন ঘরমুখো ডেলি-প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে বাইগামী কোনো একটি ট্রেনে চেপে বসতেন তাহলে তার এই আক্ষেপের কোনো কারণ থাকত না।

না, সারাদিনের আপিসের পরে প্রান্তরস্থিত মানবগুলো কলকাতার অনিশ্চিত পরিবহন-ব্যবস্থার ওপরে নির্ভর করা সত্ত্বেও আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে ট্রেন ছাড়বার এক-মিনিট কি দু-মিনিট আগে স্টেশনে পৌঁছে যখন কোনো রকমে কোনো একটি কামরায় একটখানি জায়গা করে নিয়ে বসতে বা দাঁড়াতে পারে তখন কুহু বা কেকার চিন্তা তাদের মনে ঠাই পায় না। বিশেষ কোনো চিন্তাই নয়। তাদের ফাঁকা মনের ওপরে বাইরের পৃথিবীটা কচুপাতার ওপরে বৃষ্টির জলের ফোটার মতো গাড়িয়ে গাড়িয়ে পড়তে থাকে। মনে হয় জীবনের সমস্ত চাওয়াও এক পিচ্ছিল লিফটারের ওপর থেকে খসে খসে পড়ছে। আর ঠিক এমনি সময়ে শোনা যায় সেই কুহু আর কেকা। প্রায় একই সময়ে। একটির সুর মিলিয়ে বেতে না বেতেই আরেকটি। ভিড়ে-ঠাসা কামরার বাতাসে দুই প্রান্তের দুই স্বতন্ত্র ছোঁয়া আনন্দের কাণিন জাগিয়ে তোলে।

আর তারপরে একটু কান পাড়লেই শোনা যায়, শব্দ কুহু আর কেকা নয়, জীবজগতের সমস্ত পরিচিত ডাক যেন ঐক্যবাদের মতো বেজে উঠছে। করও অন্যদর নেই। যে-সব জীব সব স্বত্বতেই মুখের তারাও অনুপস্থিত নয়।

তখন ঘরমুখো ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা নড়েচড়ে বসে, মুখ ফিরিয়ে তাকায়, আর নিস্তেজ মন থেকে ভাবনাগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তুলে নেয়। কী যে সেই ভাবনা তা তারা নিজেরাও ভালো করে জানে না। হয়তো বৌ-ছেলে-

মেয়ের ভাবনা। হয়তো ফাইল-লেজার-বড়োবাণু-বড়োসাহেবের ভাবনা। হয়তো সভাসমিতি - ইউনিয়ন - আন্দোলনের ভাবনা। হয়তো বাজারের মাছ, ঘরের কোণের ছোট বাগানের মরশুমী ফুল আর তারে শূকরতে দেওয়া ফ্যাকাশে একটি শাড়ির ভাবনা। কিংবা হয়তো কিছুই নয়। কোনো ভাবনাকেই ঠিক যেন ঘূঁঠোর মধ্যে ধরতে পারা যায় না। আর তখন শোনা যায় দশ বছরের একটি কিশোরের স্বরযন্ত্রকে আশ্রয় করে আশ্চর্য সেই ডাক : কু-উ-উ-উ! কু-উ-উ-উ!



নানা সুরের আর নানা ভাংগতে এই একই ডাক কামরার বাতাসে অনেকগুলো ডেউ জাগিয়ে তোলে যেন। আপিস-ফেরত ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা এই ডেউয়ের ধাক্কা চমকে ওঠে, দু-হাত দিয়ে তেলে ভাবনাগুলোকে সামনে থেকে সরিয়ে দেয় আর ভ্রমায় হয়ে শোনে।

আগেই বলেছি, বসন্তের ঘোষণা দশ বছরের একটি কিশোরের স্বরযন্ত্রকে আশ্রয় করেছিল। বাইরে থেকে তাকিয়ে দেখলে অসাধারণ কিছু নয়। কিংবা হয়তো এইটুকুই অসাধারণ যে রাস্তায়-ঘাটে দেখতে পওয়া আর দশটা কিশোরের মতো রোগা ও ফ্যাকাশে নয়।

উজ্জ্বল স্বাস্থ্য আর কালো রঙে পাথরে কুঁদে তোলা মূর্তির মতো। ছিটের হাকপ্যাট ও হাকশাট এখনো জীর্ণ হয়নি আর অপরিষ্কার কিনা বোঝা যায় না। কাজেই সব মিলিয়ে এই কিশোর-মূর্তিটি মনের ভেতর থেকে ঠক করে যেন ভালো-লাগাটাকেই সবচেয়ে আগে জাগিয়ে তোলে।

ট্রেন চলতে শুরু করার পরে দশ বছরের এই ছেলোটিকে অনায়াসে পটু-ত্ব চলন্ত ট্রেনের কামরার লাফিয়ে উঠে পড়ে। ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা এ-দৃশ্য দেখে দেখে অভ্যস্ত। কেউ আঁতকে ওঠে না বা আশ্চর্য উল্বেগে ধমক দেবারও চেষ্টা করে না। সকলেরই দেখা ও জানা ঘটনা।

প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে যাওয়া পৰ্যন্ত অপেক্ষা করে, সুবিধেনতো একটি জায়গা বেছে নেয়, একবার কি দুবার ছোট্ট করে কাশে। এই হচ্ছে প্রস্তুতি-পর্ব।

তবে সব সময়েই এত অনায়াসে নয়। কে নো কোনো দিন কামরার ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতেই হয়তো কেউ একজন খেঁকিয়ে ওঠে, এখানে কেন, আরেকটু এগিয়ে যাও না বাবা!

দশ বছরের কিশোর তার চেয়ে তিন-চারগুণে বয়সে বড়ো গুরুজনভূষা মানবটিকে অনায়াসে ক্ষমা করতে পারে। একটু হাসে, হয়তো একটু এগিয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত প্রায় সেই একই জায়গার দাঁড়িয়ে থাকে।

প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দরজা বড়ো একটা বন্ধ হয় না। আর ঠিক দরজার সামনেটিতে হাতজ ধরে বা না-ধরে শরীরের উদ্ভাংশ বাইরের দিকে হেলিলে বিপজ্জনক ভাংগতে দাঁড়িয়ে থাকার মতো বাস্তবিক অভাব হয় না কখনো। এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তারা বিড়ি বা সিগারেট টানে, আর এমনি উদাস দৃষ্টিতে বাইরের মাঠ, গাছপালা, ডোবাপুকুর আর ঘরবাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে যে দেখে মনে হতে পারে দুনিয়ার সমস্ত দার্শনিক চিন্তা তাদের মাথার ভর করেছে। আসলে তারা কিছুই ভাবছে না। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার নিত্যতাই একটা অভ্যাস। ভেতরে বসবাস

জয়গা থাকলেও, এরা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু এই জোক-গলোকেও ফিরে তাকাতে হয়। সিগারেটে একটা টান দিয়ে একজন মন্তব্য করে, বাঃ, বেশ শিখেছে তো ছোকরা!

ছোকরা মানে আমাদের সেই দশ বছরের কিশোরটি। ততক্ষণে সে মুখের মধ্যে আঙুল পুরে রাখা এক-পাশে হেলিয়ে চোখ বুজে গলার স্বরবল্লভে কাঁপিয়ে তুলেছে। কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে : কুহু, কুহু, কু-উ-উ-উ!

বেশ শিখেছে তো ছোকরা।

একটু আগে যে ধমক দিয়ে উঠছিল সেও ফিরে তাকিয়েছে। চোখের দৃষ্টি দিয়ে সেও যেন একই কথা বলতে চাইছে।

প্ল্যাটফর্মের উলটোদিকের দরজার কাছে একটি নিষ্কল্লট কোণে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে যে ভয়লোকটি এতক্ষণ নিবল্ট হয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন তিনিও একবার মুখ তুলে তাকান। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিল ও দুরূহ আবর্ত সামান্য একটা কোকিলের ডাকেই মূহুর্তের জন্যে খবরের কাগজের পৃষ্ঠার ওপরে অর্ধহীন কালো আঁচড়ে পর্বসিত হয়ে যায়। চোখ থেকে চশমাটা খুলে তিনি আরো একবার তাকিয়ে দেখেন। এতক্ষণে হয়তো বুঝতে পারেন যে চশমার কাঁচদুটো ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। তখন পকেট থেকে রুমাল বার করে কাঁচদুটো মুছেও শূন্য করেন।

কামরার ঠিক মাঝমাঝি জায়গায় দু-জোড়া মানুষ মূখোমুখি বসে কোলের ওপরে খবরের কাগজ বিছিয়ে তাস নিয়ে মেতে উঠেছিল। তাদের মধ্যে থেকে হঠাৎ একজন মন্তব্য করে ওঠে, বা ভাই! মন্তব্যটি ভালো তাস পাওয়ার জন্যে কিনা তা অবশ্য ঠিক বোঝা যায় না।

আর চারদিকে ছড়ানো ছিটানো এমন আরো অজস্র মানুষ ছিল বরা এইটুকু সময়ের মধ্যেই আশেপাশের সকল বাতায় সেইদিনকার সওয়া সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া শেষ করেছে। জিনিস-পত্রের দুমূল্যতা সম্পর্কে পরম বিজ্ঞ-জনোচিত মন্তব্য ও ভবিষ্যৎবাণী প্রচার করার গুরুদায়িত্ব পালন করতে পেরেছে এবং পকেট থেকে ছোট একটা খাতা বের করে তারই ফাঁকে ফাঁকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের হিসেব মেলাবার অসম্ভব প্রচেষ্টার নিজদের ব্যাপৃত রাখতে পেরেছে। এরা সাধারণত নিজস্ব ধারণা ও মতামত দিয়ে গড়া এমন একটি জগতে বাস করে যা বাইরের শব্দ ও আলোড়নে বিচলিত হয় না। সত্যিকারের কোকিলের ডাক হয়তো এদের কানে নিতান্তই একটা ঘামাঘাসি কোলাহল হয়ে বাজত। কিন্তু ছুটন্ত যেনের কামরার এই কুঠির

কোকিলের ডাক এদের অভ্যস্ত জগতটাকে একটু যেন নাড়া দিয়ে গেল।

ফলে, দশ বা পনেরো বা কুড়ি বছরের ডেলি-প্যাসেঞ্জারকেও হিসেবের খাতা থেকে মুখ তুলে সহস্রাব্দকে জিজ্ঞেস করতে হয়, কোন্ স্টেশন গেল এটা?

ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের ট্রেনের কামরা এক আশ্চর্য জগত। কান পাড়লে এখনে দুনিয়ার ভাব-বিষয়ের আলোচনা শোনা যাবে। চোখ মেলালে দেখা যাবে অতি অদ্ভুত এক মুখের মেলা। আর যদি কান ও চোখ বন্ধ করে শুধু হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা করা যায় তাহলে অনুভব করা যাবে মানবিক বিকাশের অনিবার্য ধারায় রূপায়িত এক মহত্তম জীবনবৃত্ত। দশ বছরের একটি কিশোর কোকিলের ডাক ডাকতে ডাকতে অনায়াসেই নিজেকে এই আশ্চর্য জগতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছে। কেকার সমারোহের মধ্যে থেকে যে-কবি কুহুর জন্যে আক্কেপ করতে পেরেছিলেন তিনি এই কিশোরটিকে দেখলে নিশ্চয়ই নতুন একটি গান রচনা করে যেতেন।

সেই গানটি আমরা পাইনি। আর কিছুদিন পরে এই কিশোরটিকেও হয়তো আমাদের হারাতে হবে। তাই সময় থাকতে আরো খুঁটিয়ে ওর দিকে একবার তাকানো যাক।

—নাম কি?
—বিশু।
—পুরো নাম কি?
—শ্রীবিষ্মনাথ ঘোষ।
—বাবা আছে?
—হ্যাঁ
—বাবা কী করেন?
—কেতন গান।
—কী?
—কেতনের দল আছে না! সেই দলের গাইয়ে।
—মা আছে?
—হ্যাঁ
—আর কে আছে?
—দুটি ছোট ভাই আর একটি ছোট বোন।

এমনি প্রশ্ন আর জবাবের মধ্যে দিয়ে পুরো ছবিটি বেরিয়ে আসে। সমর্থ বাপ আর কিছু করার না পেয়ে কীতন গেয়ে বেড়াচ্ছেন। আর দশ বছরের কিশোর জ্যেষ্ঠ সন্তানের দায়িত্ববোধে পুরো সংসারের যে-কটি তুলে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বাপের কাছ থেকে ছেলে সত্যিকারের কীতনগান শিখতে পেরেছে কিনা তা জানার উপায় আপাতত নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় অন্য এক ধরনের কীতন গাইতে শিখেছে বইকি।

লেখাপড়া? না, সে পাট এখনো চুকে বারানি। ক্লাশ ফোর্ডে পড়ে। এখনো

পৰ্বন্ত দুপুরবেলাটা কাটার শুলের চৌহদ্দিতে সমবয়সী পড়ুয়াদের সঙ্গে। কিন্তু বিকেলবেলার খেলার মাঠ অনেকদিন আগেই স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গিয়েছে। বিকেল গাড়িয়ে সম্ভো হয়, সম্ভো গাড়িয়ে রাত—আর এই ঘণ্টা-চারেক সময় একটা স্বপ্নের মতো আবর্ত তোলে।

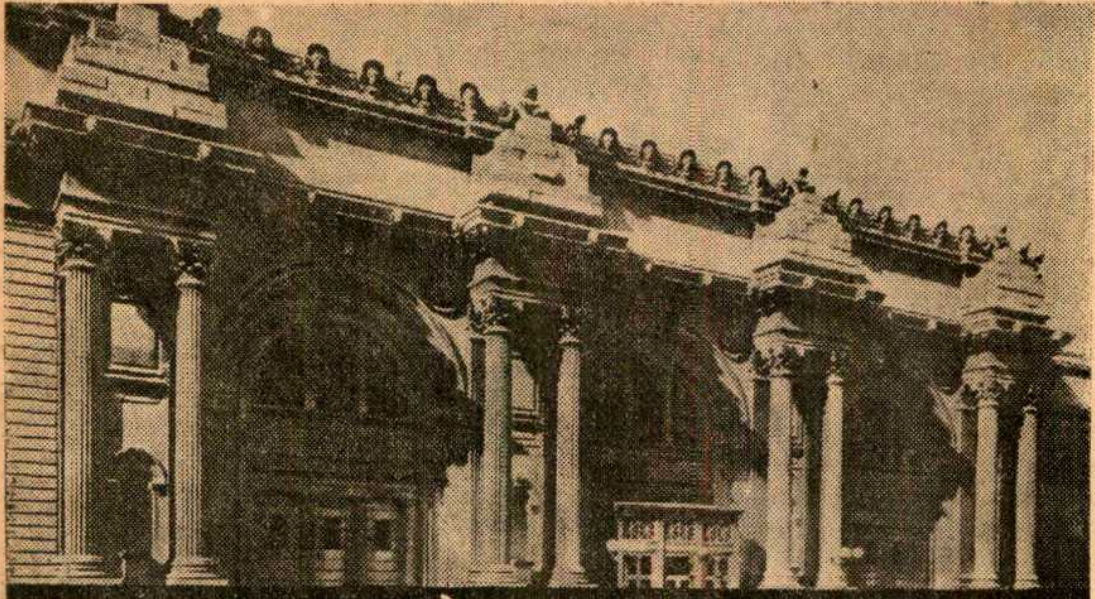
কবে কি-ভাবে এই আবর্তের শুরুর তা এখন আর স্পষ্ট মনে করতে পারে না। হয়তো নেহাতই একটা ঘটনার যোগাযোগ, হয়তো কোনো হৃদয়বন ব্যক্তির অমীচিৎ দাখিয়া, হয়তো কোনো একটি প্রলোভনের দুনিয়ার দৃষ্টান্ত—বাঁকটা সম্পূর্ণ করেছে নিদারুণ দারিদ্র্য-জনিত অবস্থার চাপ। হয়তো বা আক্ষর বাপের শাসানি, হয়তো বা মায়ের চোখের জল, হয়তো বা নির্বোধ ও নিরবলম্ব একটি উচ্চাশা।

শুরু হয়েছিল কোকিলের ডাক দিয়ে। তারপরে আস্তে আস্তে দৈনন্দিন জীবনের শব্দময় পরিবেশটি দশ বছরের একটি কিশোরের স্বরবল্লভে অবিকৃত স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে। এখন আর শুধু কোকিলের ডাক নয়, কুকুর-মোড়াল, হাতি-মোড়া, শালিক-চড়ুই, পরিচিত জীবজগতের প্রত্যেকটি শব্দকে পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে।

হ্যাঁ, কিছু মূল্যও পাচ্ছে বইকি। ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের জগত এখনো এতটা নিম্নম হরনি যে এই আশ্চর্য অনাশ্রীজনের দৃষ্টান্ত দেখেও কিছুমাত্র বিচলিত হবে না। জিজ্ঞেস করলে পরম পরিতৃপ্তির জবাব শোনা যাবে যে চারঘণ্টার অবিশ্রান্ত স্বরবিক্ষেপের পুরস্কার হিসেবে দু-টাক থেকে তিন টাকা পর্যন্ত কাণ্ডমূল্য পাওয়া যাচ্ছে। একটি পরিবারের বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে নিতান্তই সামান্য নয়।

জিজ্ঞেস করলে হয়তো আরো অনেক কিছু জানা যাবে। কিন্তু এই কিশোরটির কাছে বিকেল ও সন্ধ্যার প্রত্যেকটি মূহুর্ত এতই মূল্যবান যে কিছু ব্যক্তিগত খবর সংগ্রহ করার জন্য ওকে আটকানো চলে না। তবে কিছু জিজ্ঞেস না করেও শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যক্তিগত খবরটির রেখাপাত লক্ষ্য করা যেতে পারে। পাথর কুঁদে গড়ে তোলা কিশোর-মূর্তিটির ওপরে ইতিমধ্যেই ক্রান্তির ছাপ পড়েছে। এই ক্রান্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ের রূপ নেবে। ভবিষ্যতের ইতিহাস হয়তো একটি রোগজীর্ণ স্নান শরীরের সাক্ষ্য বহন করবে মাত্র।

আর তারপরেও যদি কিছু থাকে তা হলে একজন ডেলি-প্যাসেঞ্জারের অধিকার চোখে কুহু ও কেকার নিষ্কল একটি স্বপ্ন-সেদিনও ঠিক এমনিভাবেই বাইরের জগতটা পিছল একটি বিস্তারের ওপর দিয়ে কচু-পাতার ওপরে ব্যস্তির জলের ফোঁটার মতো গাড়িয়ে গাড়িয়ে পড়বে।



যুগব্যঞ্চে আর্ট মিউজিয়াম

কৃষ্ণা
বসু

একজন সাধারণ মিউজিয়াম প্রেমিকের চোখে যুক্তরাষ্ট্রের আর্ট মিউজিয়াম কেমন লাগল দু-চার কথা লিখব বলে বসে-ছিলাম। এমন সময় আমার এক কলা-সম্বন্ধকার বন্ধু এসে সব গোলমাল করে দিলেন। তাঁর মতে বর্তমান কলা-জগতের হালচাল সম্পর্কে আমি নাকি মোটেই ওয়াকিবহাল নই। আর্ট মিউজিয়ামের সমগ্র আইডিয়াটাই বদ্বি এখন ব্যাকডেটেড বলে গণ্য হচ্ছে। নির্দিষ্ট স্থান, কাল, পরিবেশ থেকে চ্যুত করে শিল্পসামগ্রী মিউজিয়ামে এনে সাজিয়ে রাখার সার্থকতা কোথায়? এতে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য অনেকটাই ব্যাহত হয় না কি? প্রশ্নটা উঠেছে আদ্রে মাল্যের কোন এক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে।

শ্রুত্রে ভাবনায় পড়তে হল। সীতাই তো, যে ম্যাডোনার মূর্তি হয়ত কোন গির্জার একটি নির্দিষ্ট জায়গা অলংকরণের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল যেখান থেকে সরিয়ে তাকে হঠাৎ মিউজিয়ামের পরিবেশে দেখলে খাপছাড়া মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। শিল্পী তো মিউজিয়ামের এই বিশেষ বসতিস্থল কথা ভেবে শিল্প-রচনা করেননি।

পোর্ট্রেট বা প্রতিকৃতির কথাই ধরা যাক। পোর্ট্রেট-আঁকিরের দক্ষতার মূল প্রধানতঃ বিচার করা হয় একজনের চেহারার সাদৃশ্য ও ব্যক্তিত্ব কতখানি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তাই দিয়ে। আর বেশীর ভাগ ব্যক্তিগত পোর্ট্রেট আঁকা হয় ব্যক্তি বিশেষের আপনজনের জন্য। কিন্তু মিউজিয়ামের দেওয়ালে সার বেঁধে টাঙিয়ে রাখা সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি দেখে দেখে আমরা যখন তার ভাল-মন্দ নিরীক্ষ করতে বাস তখন শিল্পীর প্রতি আঁকার হবার আশংকা অমূলক নয়।

কিন্তু তাই বলে আর্ট মিউজিয়ামের কার্যকারিতার দিকটাই কি উপেক্ষা করা যাবে? মিউজিয়ামে বিভিন্ন দেশকাল থেকে আহরণ করে আনা কলাসামগ্রী একসঙ্গে দেখার সুযোগ হয়। পরস্পরের তুলনা করা চলে। শিল্পকলার ইতিহাস, বিভিন্ন আঁগিকের আবির্ভাব ও প্রম-বিকাশ এক জায়গায় বসে গবেষণা করারও সুবিধে হয়। আধুনিক কলা-সম্বন্ধকারদের মনে বত সংশয়ই দেখা দিক না কেন চারুকলার ইতিহাসে আর্ট মিউজিয়ামের স্থান নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

যুক্তরাষ্ট্রের আর্ট মিউজিয়ামগুলোর অপর ঐশ্বর্য্য দেখে দেখে মৃদু হতে

হয়। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান আর্ট মিউজিয়াম, বস্টনের মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস, ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল গ্যালারি অফ আর্টস—এক-একটা বেন কুঁবেরের ভান্ডার বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে দেখে তৃপ্তি হয় না, ভুল্প আরো বেড়ে যায়।

আর্ট সংগ্রহের সমৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছাড়াও অন্য আর একটি জিনিস বিশেষভাবে চোখে পড়ত। তা হল মিউজিয়ামগুলো জনপ্রিয় করে তোলার আশ্রয় চেষ্টা। শ্রুত্রে এক-বাড়ী ছবি নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। চাই জনসাধারণকে মিউজিয়াম-সচেতন করে তোলা, চাই সাধারণ দর্শকের সুখ-স্বচ্ছন্দ্য, সুবিধা-অসুবিধার দিকে প্রথম দৃষ্টি। এ সবদিকে আমেরিকান মিউজিয়ামের কতৃপক্ষ সদাতৎপর।

সেবার এপ্রিল মাসে চেরী ফুলের উৎসবের সময় ওয়াশিংটন গিয়েছিলাম। চেরীফুলের রঙীন সৌন্দর্য ও ইতিহাস-ময় ওয়াশিংটনের নানান ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য দেখা হয়ে বাবার পরও সব কিছু

ছাপিয়ে মনে ভাসছে ন্যাশনেল আর্ট গ্যালারির স্মৃতি।

কনস্টিটিউশন, এভেনিউ-এ ন্যাশনেল গ্যালারির দরজায় আমাদের মহিলা ট্যাক্সি ড্রাইভার যখন গাড়ী থামাল হঠাৎ একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। ক্রমে দেখি আমার ভ্রমণ-সঙ্গী শিশু-পুত্র গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছে। স্নিগ্ধাভাস্ত হয়ে কি করব ভাবছি এমন সময় চোখে পড়ল ন্যাশনেল গ্যালারির এক গার্ড ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এগিয়ে আসছে, আর ঠেলে জানচ্ছে ছোট একটা স্ট্রোলার বা বেবী-কারের। চকিতে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ধন্যবাদের উত্তরে হেসে আমেরিকান প্রথামত 'ইয়ু আর ওয়েলকাম' বলে চলে গেল গার্ড।

প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গেলেও পরে জেনেছিলাম আমেরিকান মাসেরের জন্য মিউজিয়ামে এ ব্যবস্থা প্রাকটা খুবই স্বাভাবিক। কাউন্টারে ওভার কেট আর প্লাভল রাখতে রাখতে নজরে এল এক-পাশে সারি সারি বেশ কয়েকটা স্ট্রোলার সাজানো রয়েছে।

স্ট্রোলার ঠেলে নিয়ে এলিভেটরের দরজায় কাছে দাঁড়লাম। মিউজিয়ামের সোতলাতেই বেশির ভাগ এগিজিভিশন গ্যালারি। বোতাম টিপতে বেশ বড়সড় এলিভেটর ধীরে ধীরে নেমে এল। দরজা খুলতেই দেখি ঢাকাওয়ালা চেয়ার ঠেলে এক নার্স বেরিয়ে আসছে। চেয়ারে ছেলান দিয়ে বসে আছে এক শীর্ণ চেহারা রোগিশী। কোলের উপর খোলা আছে ন্যাশনেল গ্যালারির গাইড বুক। শূন্য শিশুর জন্য কারেক্স নয়, অশক্তের জন্য হুইলড চেয়ারের ব্যবস্থাও রয়েছে। এই বিচিত্র চিত্রশালারের আরোজন থেকে কেউ বেন বঞ্চিত না হয়।

সোতলায় একশটি ঘর জুড়ে ছবি সাজানো। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম বা বস্টনের ফাইন আর্টস মিউজিয়ামে গেলে বিশাল কলাসংগ্রহের মধ্যে নিজেকে বেন হারিয়ে ফেলোঁছ মনে হয়। কিন্তু ন্যাশনেল গ্যালারিতে মোটের উপর শিল্পকলার ইতিহাসের এক-একটা অধ্যায় ধরে কমানুসারে সাজানো ভাই এক থেকে একল নম্বর ঘর পর্যন্ত ঘুরে এলে শিল্পকলার ইতিহাসে বেশ একটা সিস্টেমার কোর্স নেওয়া হয়ে যায়।

প্রথম কয়েকটি ঘরে রেনোদল থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীর চিত্রকলা। সবই বেশির ভাগ ছবির উপজীব্য। চক-

চকে সোনালী পশ্চাৎপটের ওপর উজ্জ্বল রঙে আঁকা আড়ল্ট মূর্তি শিশুকোলে ঝাডোনা। তারপর ধীরে ধীরে বাইজেন-টাইন আড়ল্টতা কেটে গিয়ে চিত্রকলা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। প্রতিকৃতি, দৃশ্য চিত্র, 'জেনর' চিত্র ইত্যাদি কিছু কিছু ধর্ম সম্পর্কহীন ছবিও দেখা দিতে শুরুর করেছে। আঙ্গিকের দিকেও কাঠের প্যানেলের ওপর টেম্পারার কাজ ছাড়াও ক্যানভাসের ওপর তেল রঙের কাজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ফ্রেমিশ ও জার্মান চিত্রকরদের মধ্যে ইয়ান ভ্যান আইক, রুবেনস, ভ্যান ডাইক, গ্রুনেওয়াল্ড হলবাইন, ডুরার, বশ্ সকলেই রয়েছে। পাঁচটি ঘর জুড়ে আছেন ডাচ চিত্রকরেরা। দুখানা ঘর তো সম্পূর্ণ রেনেসাঁসেরই দখলে। দৈনন্দিন জীবনের ছবিতে ডেরমিসার, প্রতিকৃতিতে ফ্রান্স হলস, 'জেনর' চিত্রে ইয়ান স্টিন—ন্যাশনেল গ্যালারির ডাচ পেইন্টিং-এর দিকটা ভালই বলতে হবে।

গোটা পঞ্চদশ ঘর দেখার পর বিশ্রাম না নিলে ভাসন্তব্য। বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থার অভাব নেই কোন। দেতলার দুটি গার্ডেন কোর্ট ফোয়ারায়, ফুলে পাতায় স্নিগ্ধ পরিবেশ। আরো সুন্দর গাঢ় সবুজ মাবেলের থামে সুশোভিত মাঝের গোল হল বা রোটান্ডা।

আমরা অবশ্য মিউজিয়ামের একতলায় রেনেসাঁসের নিয়ে এলাম। রেনেসাঁসের সমানে কারিগর-এ লম্বা কিউ। কিছু ধরে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত কাউন্টারে পৌঁছানো গেল। সেলফ সার্ভিস রেনেসাঁস। ঠোঁটে স্টেক তুলে নিয়ে ঠোঁ হাতে এসে টেবিলে বসে পড়লাম।

জাপের পর ব্রিটিশ চিত্রকলার বিভাগটি দেখছিলাম। কনস্টেবল, টার্নার, রেনোন্ডস—। গ্যান্সবারার একটি ছবির সামনে দেখি জনৈক দর্শক অনেকটা ধ্যানমগ্নের মত দাঁড়িয়ে আছেন। ভাল করে চেয়ে দেখি তাঁর কানে ইয়ার ফোন, হাতে ছোট একটি রিসিডিং সেট। ন্যাশনেল গ্যালারির বিভিন্ন ঘরে সাজিয়ে রাখা শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা টেপ রেকর্ড করা আছে। আর্টের ইতিহাসে উৎসাহী অনেক দর্শক এই রেডিও লেকচারের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

উদ্যোগে শতাব্দীর ফরাসী চিত্র-কলার ঘরে দেখলাম নবীন চিত্রশিল্পীদের অনেকে ইজেকলে ক্যানভাস চড়িয়ে বসে গেছেন, মন দিয়ে কপি করে চলেছেন কিশোর কোন মাস্টারপিস।

হোমার, ইয়াকিনস, রাইডার প্রমুখ আমেরিকান চিত্রকলার দিকপালদের ঘিরে সৈনিকের মত মিউজিয়াম পাগলম্য শেষ করে বেরিয়ে পড়ছিলাম। বার হবার মধ্যে ইনফরমেশন বুকে আটকে পড়তে হল। মিউজিয়ামের ভাল ভাল ছবির নিখুঁত রিপ্রোডাকশন, চমৎকার রঙীন স্লাইড সেলস ডেস্ক সাজানো রয়েছে। কিছু ডলার দণ্ড না দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি সাধ্য কি। গিলবোর্ট স্ট্রোয়ার্টের আঁকা 'দি ভগ্যান পোট্রেট' নামে পরিচিত জর্জ ওয়াশিংটনের একটি পোট্রেট সংগ্রহ করলাম। ন্যাশনেল আর্ট গ্যালারির একটি সামান্য স্মৃতিচিহ্ন রইল আমার মধ্যে।

থ্যাংকস গিভিং-এর দিনকতক আগে নভেম্বর মাসে কাব্যোপলক্ষে নিউইয়র্ক এলাম। একদিন ইউনাইটেড নেশনস-এ গিরেছি, একজন ভারতীয় সাংবাদিক বন্ধু ও'দের ডেলিগেটস ডাইনিং রুমে লাগু খেতে নেমন্ত্রণ করলেন। খাবার টেবিলে নানারকম আলোচনা হাঙ্কল—আমাদের পররাষ্ট্র নীতি, কুন্সমেন, আমেরিকান এইড...এমন সময় আমাদের টেবিল-সঙ্গী ইউ এন এর জর্নৈক কর্মচারী হঠাৎ বললেন, আর বাই করুন গুগেনহাইম মিউজিয়াম না দেখে নিউইয়র্ক থেকে চলে যাবেন না যেন।

দেখতে দেখতে গুগেনহাইম মিউজিয়াম নিয়ে টেবিলে বেশ তকের খড় উঠে পড়ল। সে সময় মাত্র অল্পদিন হল এপ্রিল মাসে মারা গিয়েছেন শ্বশ্রামবন্য স্থপতি নব্বই বছরের বৃদ্ধ ফ্র্যাংক লয়েড রাইট। গুগেনহাইম মিউজিয়ামের অটালিকা এর শেষ কীর্তি। অক্টোবর মাসে পুরোন বাড়ী ছেড়ে গুগেনহাইম মিউজিয়াম ফিফথ এভেনিউর ওপর এই নব-নির্মিত ভবনে উঠে এসেছে। এই নতুন ভবনের স্থাপত্যকলা নিয়ে তর্ক চলেছে নিউইয়র্কের সর্বত্র। আমার ইউ এন এর বন্ধুটি নিউইয়র্কের কোন এক কলাসমালোচকের দস্তকা উদ্ধৃত করে বললেন,—বাড়ীটা দেখতে হয়েছে তিক যেন একটা ক্লজের (closet) টার্পড আপসাইড ডাউন।

কৌতুহল জেলে উঠল, পরদিনই চলে গেলাম। ফ্র্যাংক লয়েড রাইট তার শেষের দিকের কাজে 'রেকটাংগল' সম্বন্ধে পরিহার করে চলতেন। তাঁর তৈরী প্রাসাদ, ভবন, গির্জা হয়ে পড়ত গোলা-কার নয়ত চিকোণ, নয়ত এখন কি ছবিটি দেওয়ালবৃত্ত। গুগেনহাইম মিউজিয়াম

প্রধানতঃ গোল। কিন্তু এর ভিতরে না ঢুকলে এর অশ্রুত আকৃতির তাৎপর্য বঝতে পারা যায় না।

ভেতরে বিরাট গোল হল-এ দেয়ালের পাশ দিয়ে চওড়া পথ ঘুরে আঁত ধীরে ওপরে উঠে গেছে। ঘোরানো সিঁড়ি নর, ঘোরানো ঢাল পথ—আর তার ঢাল এত ধীর উঠতে গিয়ে কোন পরিশ্রমই হয় না। পাশের দেয়ালে একটু দূরে দূরে ছবি সাজানো। একদিকে ছবি তাই এদিক-ওদিক চাইতে হয় না, চোখের পরিশ্রম কম। ঘুরে ঘুরে একেবারে উপরে উঠে যাওয়ার পর নীচে চেয়ে থাকে থাকে সাজানো ছবি অপূর্ব মনে হল। প্রত্যেকটি ছবি সামনে থেকে, ওপর থেকে নীচ থেকে বিভিন্ন কোণ থেকে স্টাডি করা যায়। অনেকক্ষণ ধরে সেদিন ছবি দেখে-ছিলাম। এত আবক্ষাকট আর্ট একসঙ্গে দেখেও চোখের বা মনের ক্লান্তি হয়নি। কোন নতুন ভবনের রূপ কল্পনা করার সময় ফ্র্যাংক লয়েড রাইট সৌন্দর্যের চাইতেও কার্যকারিতার দিকে বেশী নজর দিতেন। সৌন্দর্য থেকে গুগেনহাইম মিউজিয়াম অফ নন-অবজেকটিভ পেইন্টিং-এর এই নব-নির্মিত বাড়ী চিত্রসংগ্রহশালা

হিসেবে লয়েড রাইটের এক সার্থক সৃষ্টি বলা যেতে পারে।

একাধিকবার ওপর নীচ করেও গুগেনহাইম-এ এতটুকু ক্লান্তি বোধ করিনি। কিন্তু এর বিপরীত অভিজ্ঞতা হয়েছিল নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টস-এ। ছোট ছোট ঘরে দেওয়াল-ঠাসা ছবি। একে তো মডার্ন আর্ট সাধারণ দর্শকের সহজবোধ্যগম্য নয় তার উপর যেন এতখানি মডার্ন আর্ট একসঙ্গে গ্রহণ করতে বলা চোখ এবং মন উভয়ের উপর জুলুম। একদিন সারাদিন মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টস-এ কাটিয়ে বিকেলে এমন বিধ্বস্ত চেহারায় বাড়ী ফিরলাম যে, আমার গৃহ-স্বামিণী তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে এক পেয়লা চা ও দুটি অ্যাপারিনের ট্যাবলেট সামনে বসিয়ে দিলেন।

অবশ্য চোখের ক্লান্তি বতই হোক না কেন এ কথা মানতেই হবে যে আমেরিকার জনচিন্তে আধুনিক আর্টের ভাবধারার প্রচারে মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টস-এর ভূমিকা নিতান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মিউজিয়ামের বিরাট ও বিচিত্র সংগ্রহ-

শালায় অনেক ভাল ছবি মন্দ ছবি গা যে-ষােঘর্ষ করে রয়েছে। তেমনই হয়ত রয়েছে অনেক দর্শককে হতবুদ্ধি করে দেওয়া অতি আধুনিকতার উৎকট নিদর্শন। কিন্তু এখানকার চিত্রশালাতেই আমেরিকার জনসাধারণ পৃথিবীর অনেক খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা আধুনিক শিল্পীর সংগে প্রথম পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছেন। ১৯২৯ সালে এই মিউজিয়াম স্থাপিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই পর পর কতকগুলো প্রদর্শনী এখানে আয়োজিত হয়। সেজন্য, ভ্যানগগ গ্যাগার চিত্রকলা, প্যারিসের ফরাসী চিত্রকলা, আধুনিক জার্মান চিত্রকলা ও ভাস্কর্য এবং তারপর ১৯৩২-এ আমেরিকান লোকশিল্প প্রদর্শনী—আমেরিকার চিত্র-জগতে এই প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

সেন্ট্রাল পার্ক মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম। মেট্রোপলিটান সমুদ্রবিশেষ—তার বর্ণনা দেবার চেষ্টা বৃথা। ঘরের পর ঘর পার হয়ে চলেছি তো চলেছিই—ইজিপশিয়ান, যুরোপীয়, আমেরিকান চিত্রকলা ও ভাস্কর্য। কোথায়ও রয়েছে ঘর জুড়ে পারস্যের গালিচা, নরত হলঘর ভরতি অশ্রুশ্রদ্ধ বর্ম বকবক করছে, নয়ত আছে বহুকালের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র।

রোস্টারী ও সেলস ডেসক ছাড়া কোন আমেরিকান আর্ট মিউজিয়ামই যেন সম্পূর্ণ হয় না। মেট্রোপলিটানের রোস্টারীটি খুব জমকালো। মন্দ হলের মাঝখানে আভ্যন্তরিক সরোবরের চারধারে সাজানো চেয়ার-টেবিল। সরোবরের জলে ব্রোঞ্জের মূর্তিশোভিত ফোয়ারা। সেলস ডেসকে ভিড় লেগেই আছে। এখানকার ছবির রিপ্ৰোডাকশন দেওয়া কার্ড পাঠানো খুব ফ্রাসান। থ্যাংকস গিভিং আসতে না আসতে ক্লিসমাসের কার্ড নিঃশেষ।

আমেরিকান শিল্পকলায় বাদেই অগ্রহ আছে তাদের পক্ষে নিউইয়র্কের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে হুইটনি মিউজিয়াম অফ আমেরিকান আর্ট। মিসেস গার্টুড হুইটনির নেতৃত্বে পরিচালিত হুইটনি স্টুডিও গ্রুপ আমেরিকান চিত্রজগতে সুপরিচিত। অনেক তরুণ আমেরিকান চিত্রকরের আনাগোনা ছিল এই আড্ডায়। ১৯৩১ সালে এই ক্লাব পরিণত হয় হুইটনি মিউজিয়াম অফ আমেরিকান আর্ট। অনেকে নিউইয়র্কে এসে মেট্রোপলিটান দেখেন, মডার্ন আর্ট মিউজিয়ামও দেখেন কিন্তু আমেরিকান আর্টের এই সুন্দর সংগ্রহশালাটি তাদের তালিকা



ফ্র্যাংক লয়েড রাইটের সার্থক সৃষ্টি গুগেনহাইম মিউজিয়াম

থেকে বাদ পড়ে যায়। মডার্ন আর্ট মিউজিয়ামের গায়ে-লাগাও এই মিউজিয়ামটি কিন্তু নিঃসন্দেহে নিউইয়র্কের অন্যতম "মাস্ট"।

বস্টনের ফেনওয়ে অঞ্চলে দু'চারদিন হাটাচাঁটি করলে একটি সুউচ্চ ভিনি-

শিয়ান প্রাসাদ নজরে পড়বে। সকলেরই পড়ে। গার্ডনার মিউজিয়াম বস্টনের একটি অতি পরিচিত ল্যান্ডমার্ক। ইসাবেলা স্টুয়ার্ট গার্ডনার নামে বস্টন সোসাইটির এক ধনী, অভিজাত মহিলা এর প্রতিষ্ঠাত্রী। ১৯০২ সালে ফেনওয়ে

কোর্টের এই বিরাট প্রাসাদটি প্রাচীন ভেনিসের স্থাপত্যকলার অনুকরণে তৈরি করেন। মৃত্যু পর্যন্ত এই বাড়ীতেই তাঁর জীবন কেটেছে।

একমাত্র সন্তান শিশুকালে মারা যাবার পর শিল্পকলা সংগ্রহ হয়ে দাঁড়ায়

সাধনার সৌন্দর্যের গোপন কথা...

লাক্স আমায় সুন্দর রাখে



সুন্দরী চিত্রতারকাদের রূপ লাভগের
পোশাক কথা হোল লাক্স! সাধনাকে দেখুন!
লাবলভরা রূপ লাগ্নের পরশে আরও কত
সুন্দর, আর কমবীয়! - আশনিও লাক্স
ব্যবহার করেনতো? লাক্স মাথুন - লাক্সের
কুৎস কোমল ফেনার পরশে চেহারায়
নতুন লাগবা আনবে! লাক্স মাথুন -
হৃৎসহিতরা লাক্সের মধুর গন্ধ আপনায়
চমৎকার লাগবে! লাক্স মাথুন -
লাগ্নের রামধুন রঙের বিচিত্র মেলা থেকে
মনের মতো রঙ বেছে নিতে পারবেন।
আপনার প্রিয় সাদাটিও পাবেন।
লাবণ্যবীর জনা লাক্স টয়লেট সাবান
ব্যবহার করুন!

চিত্রতারকাদের
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য-সাবান



সুন্দরী সাধনা বলেন, লাক্স সাবানটি আমি ভালবাসি আর এর রঙ শুভোও আমার সুরী ভাল লাগে!

এই মহিলার জীবনের সাধনা। বহুবার যুরোপে আনাগোনা করার সময় বহু বিখ্যাত শিল্পনন্দননে তাঁর সংগ্রহশালা ভরে ওঠে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উইল অনুসারে এই প্রাসাদ মিউজিয়ামরূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। এ জন্য যে প্রভূত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাঁর ব্যবস্থাও তিনিই রেখে যান।

ইসাবেলা গার্ডনারের ব্যক্তি ছিল অসাধারণ এবং খানিকটা চমকপ্রদও বটে। বস্টনের পিউরিটান সমাজ থেকে থেকে তাঁর কর্মকলাপে শকড় হয়ে যেত—তা সে প্রকাশ্যে বিয়ার ড্রিংক করাই হোক কি মাথার পিছনে ম্যাডোনার মত 'হ্যালো' (halo) দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠিত আকানোই হোক। মিসেস গার্ডনারের ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে এই মিউজিয়ামে। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল শিল্পকলা উপভোগ করতে হলে তার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা চাই।

মাঝখানে ঢাকা দেওয়া আঙ্গিনা ঘিরে এই বিরাট চারতলা অট্টালিকা উঠে গেছে। আঙ্গিনার এই ঢাকা দেওয়া বাগানে বছরের সব ঋতুতেই ফুলের সমারোহ। পিছন দিককার খোলা বাগানেও রকমারি ফুলের বাহার। মিউজিয়ামের নিজস্ব বাগানবাড়ী থেকে সব ফুলের চায়া আসে। আর আছে সঙ্গীতের ব্যবস্থা। মিউজিয়ামের ট্যাপেণ্ট রুমে প্রতি রবিবার হয় কনসার্টের আয়োজন। অন্য দিনেও আছে আধ ঘণ্টা করে সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা।

মিউজিয়ামের ইতালীয় চিত্রকলা সংগ্রহটি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অবশ্য ডাচ, জার্মান, ফরাসী সব রকমই কিছু কিছু মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ হিসেবে এর বিরাট অশ্চর্য, তেমন ব্যক্তিগত সংগ্রহ বলেই হয়ত সংগৃহীত শিল্পকলার মান সর্বত্র সমান নয়। গার্ডনার মিউজিয়ামের বৈশিষ্ট্য হল এর সবকিছু মিলিয়ে—ভিনিশিয়ান প্রাসাদ, ফুলের বাগান, সঙ্গীতময় পরিবেশ, বিচিত্র কলা-সংগ্রহ।

গার্ডনার মিউজিয়াম থেকে পূর্বদিকে মিনিট দশক হেটে গেলেই জোখে পড়বে বস্টন মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস। বস্টন মিউজিয়ামকে আমি দেখেছি নানা রূপে নানা ঋতুতে। যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা দেবার অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম একদিন বস্টন মিউজিয়ামে বাই। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটি ঘরে ঢুকে চারদিকের দেওয়ালে মূষল ও রাজপুত পেইন্টিং-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে “হোম সিক” বোধ

করেছিলাম। কাঁচের শো-কেসে সাজানো আছে নানা রকম ভারতীয় অলংকার।

বস্টনের মিউজিয়ামে ‘এশিয়াটিক আর্ট সংগ্রহের দিকটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমেরিকান আর্ট মিউজিয়ামের নানা গুণের মধ্যে একটি হল প্রাচ্য আর্ট সম্পর্কে চেতনা। সচরাচর পাশ্চাত্য আর্ট গ্যালারিতে এমনটি নজরে পড়ে না। বস্টন মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস-এ প্রাচ্য শিল্পকলার যথাযোগ্য স্থান পাবার অবশ্য একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। বিশিষ্ট ভারতীয় কলা সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামী এই মিউজিয়ামের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত ছিলেন।

বস্টন মিউজিয়ামও বিরাট সমৃদ্ধ-বিশেষ। দু’একজন আমেরিকান চিত্রকের কথা শুধু উল্লেখ করব। অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা চিত্রকর কোপলে (Copley) ছিলেন বস্টনেরই বাসিন্দা। তাঁর “মেরী এ্যান্ড এলিজাবেথ রয়েল” এখানে রয়েছে। সার্জেন্ট (Sargent) যদিও যুরোপে প্রবাসজীবন কাটিয়েছেন বস্টনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল গভীর। বহুবার আসা-যাওয়া করেছেন তিনি বস্টনে। বস্টনের পাবলিক লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম দুটির ডেকোরেশনেই তাঁর হাত ছিল। “এডওয়ার্ড ডারলি বোম্বার্টের চরকন্যা” সার্জেন্টের তুলিতে চারটি ছোট ছোট মেয়ের একটি কম্পোজিশন। আর একজন প্রবাসী আমেরিকান শিল্পী হুইসলার চিত্রজগতে সুবিখ্যাত। তাঁর “দি লাস্ট অফ ওয়েস্টমিনস্টার” এখানে রয়েছে। আর একটি ছবির সামনে বেশ খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়াতে হয়। গিলবার্ট স্টুয়ার্টের “ওয়াশিংটন এ্যাট ডরচেস্টার হাইটস”-মোড়ার পাশে দাঁড়ানো জর্জ ওয়াশিংটনের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। দৃষ্ট, বীরত্বপূর্ণ চেহারা।

মিউজিয়ামের করিডর, বারান্দায় এদিক ওদিক দেখা যাবে হয়ত “মেম্বারশিপ ড্রাইভ” লেখা আবেদনপত্র। “দিস ইজ ইয়োর মিউজিয়াম”—এ মিউজিয়াম আপনায়ই। এর সভ্য হয়ে একে বড় করে তুলতে সাহায্য করুন। আমেরিকাতে দেখেছি মিউজিয়ামে-মিউজিয়ামে তাঁর প্রতিযোগিতা, সকলেই তাই যার যার মিউজিয়াম উন্নত করে তুলতে সচেষ্ট। বস্টন মিউজিয়ামের স্থান নাকি স্বতীয়। হঠাৎ কিছুদিন একটা সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কি ব্যাপার! না ওয়াশিংটন ও ফিলাডেলফিয়ার মিউজিয়াম দুটি বস্টনকে প্রায় ধরব-ধরব করছে। আমেরিকার অনেক বড় বড় মিউজিয়ামই জনসাধারণের নিজস্ব চেণ্ডায় গড়ে উঠেছে। বড় বড় কতক-গুলো দান, এনডোমেন্ট ও সভ্যদের দেয় চাঁদার ওপর এগুলোর নির্ভর। এ

ধরনের বেসরকারী প্রচেষ্টার বিরাট সাফল্য দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

আর্ট মিউজিয়ামের পেছনে আমেরিকানদের অকাতর অর্থব্যয় অন্যান্য দেশের মিউজিয়াম-কর্মীদের ইশ্বার বস্তু। কিন্তু অর্থই সব নয়। আমেরিকান আর্ট মিউজিয়ামের সাফল্যের পিছনে রয়েছে মানুষের জীবনে আর্টের মূল্য যে অনেক তারই উপলব্ধি। আবার এই উপলব্ধি আসবে শব্দ তখনই যখন জনসাধারণের মন হয়ে উঠবে শুদ্ধ কলাসচেতন।

ভারতবর্ষে আমরা এখন সব আর্ট মিউজিয়াম গড়ে তোলার হাত দিয়েছি। গুটিকতক ছোট ছোট আর্ট গ্যালারি ও একটি দুটি বড় মিউজিয়ামে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা এখনো সীমাবদ্ধ। তাই মনে হয় আমেরিকান আর্ট মিউজিয়ামগুলোর সাফল্য থেকে আমাদের অনেক শেখবার আছে। আগেই বলেছি মিউজিয়াম-গুলোকে আকর্ষণীয় করে তুলতে কি আশ্রয় প্রয়াস আমেরিকানদের। প্রতি সপ্তাহে হয়ত টেলিভিশনে থাকবে মিউজিয়ামের একটি বিশেষ ঘর নিয়ে আলোচনা। মিউজিয়ামেও বক্তৃতামালার ব্যবস্থা থাকে। হয়ত তার নাম “দিস উইকস পিকচার”, এক একটি বিশেষ চিত্র নিয়ে আলোচনা প্রতি সপ্তাহে। কর্মব্যস্ত মানুষের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করে কোন কোন মিউজিয়াম সপ্তাহে একদিন রাতি দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে। জনসাধারণকে মিউজিয়ামে উৎসাহী করে তুলতে এরা বন্দ্যপরিচর।

আমাদের দেশে কোথায় সেই মিউজিয়াম-সচেতন জনসাধারণ? অথচ সার্থক আর্ট মিউজিয়ামের ভিত্তি রচনা করবে তো ভারাই। দিল্লীর ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্টের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট একটি বন্ধু সৈদন গল্প করছিলেন কত মজার অভিজ্ঞতা হয় তাদের। দিল্লীর চারপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে রাজধানী দেখতে আসে সরল, কোতুলী গ্রামবাসী। এসে ঢুকে পড়ে মিউজিয়ামে। বিস্ফারিত নেত্র এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হঠাৎ একদল একসঙ্গে সান্টাঙ্গ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ এই অকস্মাৎ পতনের কারণ অনুসন্ধানে। হয়নি কিছু। সামনে রয়েছে এক জেলে রমণীর প্রতিকৃতি। এ কোন দেবী হ্যায়, বলছে তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের আর্ট মিউজিয়াম দেখতে দেখতে তাই মনে হত সফল আর্ট মিউজিয়াম সৃষ্টির পথে এখনো অনেক দূর যেতে হবে আমাদের।

রাসিয়ার ডায়েরী

দ্রবোধী কুমার মান্যম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥বাইশ ॥

মস্কোর যে কোনও একটি জনবহুল বাজার আমার পক্ষে আকর্ষণের বস্তু। সেদিন যেখানে গেলুম সেটি পূর্বনো অঞ্চল। আমাদের দেশের মতো ভোজ্য বৈচিত্র্য ওদের বাজারে নেই। সর্ষ ও আনাজ-ভরকারির মধ্যে ওরা বোঝে আলু ও বাঁধাকপি। পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো প্রচুর। ভিনিগরে পচানো শশা ওদের প্রিয়। ফলের মধ্যে আপেল প্রধান। আগরুর একটু বড়মানুষ। ওদিকে মাছ সহজলভ্য নয়। মাংস নানাবিধ। মুরগী, হাঁস অন্যান্য পাখী,—এরা বাজারে ঝোলে সিদ্ধ অবস্থায়! শূকরের মাংস প্রচুর। শূকরের বড়গাউলি মোড়কের মধ্যে পাওয়া যায় যেখানে-সেখানে। সেগুন্দির নাম 'সোসিসক'। মধ্য-এশিয়ার মুসল-মান-জগতে শূকরের সমাদর নেই। সেই-জন্য সেখানকার বাজার-ছাওয়া হল, 'সাসলিকু'—অর্থাৎ মাটন শিক-কাবা!

বাজার করে অধিকাংশ মেয়েছেলে আর নয়ত পেন্সনভোগী বৃন্দ। প্রায় প্রত্যেকের হাতে একটি করে জালি-থলে। প্রধানতঃ কেনে আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, মাংস আর আপেল। ওর সঙ্গে এক শিশি জেলি, হয়ত বা আর এক শিশি 'ভাদকা' মদ। ওটা হজমের ওষুধ মাত্র। বাজারের মধ্যে ওজনে ঠকাবার উপায় নেই, কেননা মাসিনে ওজন! দরদস্তুর কেউ করে না। দাগী বা পচাজিনিস কেউ বেচে না। প্রতি বাজারে একটি করে ইনসপেক্টরের আপিস। প্রতি বিক্রেতার পোষাক ঔষধ-শোধিত। অধিকাংশ বস্তু কাঁচের বাজের মধ্যে—পাছে মাছি বসে! কিন্তু মাছির দেশ হল মধ্য-এশিয়া, মস্কো নয়। বাজারে তিন দলের লোক মাল বেচে। গ্রেট ফার্ম, কলেক্টিভ ফার্ম এবং ব্যক্তিগত। ফড়েরা যখন তখন এসে নিজেদের গহজাত সামগ্রী বেচে কিছু রোজগার করে চলে যায়। তারা আনে শশা, পেঁয়াজ, হয়ত বা চারটি আলু, অথবা নিজের গাছের আপেল কিংবা

বেরি। ফলের মধ্যে আগরুর এবং মাংসের মধ্যে মুরগী,—এদের দাম বেশি। ছাগল অথবা তার মাংস আমার চোখে পড়েনি!

তরুণী দোভাষিণী শ্রীমতী মেরিয়ম আমার সঙ্গে ছিলেন। বাজার থেকে বেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ একটি জীর্ণ-সজ্জাগ্রস্ত বৃন্দ আমার কাছে ছটকিয়ে এসে দাঁড়াল। লোকটা হাত পেতে ভিক্ষা চাইল! যে দেশে টাকা-পয়সার অতি-প্রাচুর্য দেখে কতবার বিস্মিত হয়েছি, সে দেশে ভিখারী যদি সেলাম ঠেকে অতি বিনীতভাবে ভিক্ষা চায়, তখন একটু চমক লাগে বইকি। সামনে 'চৌরগার' মতো রাজপথ, চারিদিকে জনতা, সকলের চোখের উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি এক বিদেশী, এবং এ-দেশে ভিক্ষা বে-আইনী,—এসব সত্ত্বেও পরদেশীর কাছে নির্ভয়ে যখন ভিক্ষা চায়,—অভাব তখন কোথাও আছে বইকি! একে একে অনেকগুনি ভিখারী দেখলুম।

ভিক্ষা দেবার অভ্যাস আমার কম। কিন্তু তখনই পকেট থেকে একটি রুবল বার করে দিলুম। শ্রীমতী মেরিয়ম যে মন্তব্যটি করলেন, আমাদের দেশেও সেটি সর্বত্র শুনি : "কাজ দিলে করবে না, ভিক্ষে গেলে খুব খুশী!"

লোকটা ভিড়ের মধ্যে তখনই মিলিয়ে গেল! আমার সোভিয়েট ভ্রমণকালে এই নিয়ে বোধ করি প্রায় কুড়িজন মেয়ে-পুরুষ ভিখারীর মুখোমুখি এলুম। মস্কোর ঘুরে বেড়ালে প্রায়ই ভিখারীর দেখা মেলে!

শ্রীমতী মেরিয়মের স্বামী জর্জ ভলংচেক আমার পূর্বনো বন্ধু। একদিন এই জর্জ আমাদের নিয়ে গিয়েছিল জর্জিয়ায়। সে একজন শিক্ষক। যেমন শান্ত, তেমনি নিরীহ। তার চোখে এক-জোড়া মোটা চশমা। কাজকর্মের ফাঁকে সময় পেলে মাঝে মাঝে সে স্ট্রীর ফাই-ফরমাসটা খেটে দেয়। জর্জ সেদিন আমাকে নিয়ে চলল 'সকল্‌নিক' পार्কে। ওখানে আমেরিকান একজিবিশন চলছে আজ বৃষ্টি মাস দেড়েক।

মস্কোর যেটা শহরতলী, তার চতুর্দিকেই বড় বড় পার্ক। এক একটি পার্ক এত বড় যে, একদিনে তার আগাগোড়া দেখা যায় না। পার্ক মানেই তার এক-একটি স্থলে একজিবিশন, রেস্‌ট'রা, খেলাধুলো, কিছুর একটা ক্লাব, এবং নানা-বিধ আকর্ষণ। যেমন গোর্কি পার্ক, 'নেসকুচিন' পার্ক, 'গ্রাইগবেল্ট', 'স্টালিন' পার্ক, 'দিজেরজিনস্কি' পার্ক, 'সোভিয়েট আর্মি' পার্ক, 'অষ্টানকিনো গার্ডেনস' ইত্যাদি। এদের মধ্যে 'সকল্‌নিক পার্ক' হল অনেক দিনের পূর্বনো। আগে যেগুনি ছিল জমিদারী এন্টেষ্টের অনধ্যুষিত এলাকা বা ময়দান, আজ সেগুনি পার্ক নামে পরিচিত হচ্ছে। কলকাতার দক্ষিণে বছর ত্রিশেক আগে রেলপথের ধারে যে অঞ্চল ছিল জলাবিল এবং ম্যালেরিয়ার ডিপো, এখন তার একটা অংশের নাম হয়েছে 'টাকুরিয়া লেক' বা 'রবীন্দ্র সরোবর'। এই ধরনেরই একটা বনময় জলাবিলযুক্ত ময়দান, যেটি এককালে অপরিচিত ছিল, একালে সেই-টিই একজন দেশপ্রেমিকের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'সকল্‌নিক পার্ক' নামে পরিচিত হয়েছে। মধ্য কলকাতায় যেমন এক-কালের 'হৈদুয়া', অন্যকালের 'আজাদ হিন্দ-বাগ'। এই পার্কের রোপ-জংগল একদা বিপ্লববাদীদের গোপন পরামর্শ-সভার কাজে লাগত। এটির আয়তন প্রায় পাঁচ হাজার বর্গবিঘা, এবং এখানে প্রায় এক লক্ষ বড় বড় গাছ বর্তমান। প্রতি বছরে এই পার্কে কমবেশি দশ লক্ষ ফুলগাছ বসানো হয়!

এই পার্কেরই সামনের অংশটুকু বসেছে আমেরিকান একজিবিশন। মিঃ খুশ্‌চভ স্বয়ং আমেরিকানদের সঙ্গে মিলে এর প্রতিষ্ঠার আয়োজন করে দিয়েছেন। দূরের থেকে যে সবুহা গোলাকার আলুমিনিয়ামের গম্বুজটি দেখা যায়, সেটি বৃষ্টির পর রৌদ্রালোকে ঝলমল করছিল। জর্জ আমাকে সঙ্গে করে ভিতরে ঢুকল।

প্রদর্শনীর যে খ্যাতিটি বাইরে থেকে শুনেছিলুম, ভিতরে তার জৌলস কম।

এটিকে ফটো-প্রদর্শনী বললে মানিয়ে যেত। যাদের সঙ্গে প্রতিলিপিতার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাদের সামনে আপন দেশের বৈজ্ঞানিক কীর্তিকলাপ এবং কল-কস্জার বিভিন্ন কারিগরি প্রকাশ করতে আমেরিকার কতৃপক্ষ যেন কিছু কুষ্ঠাবোধ করেছেন! ফলে, এই সর্বখ্যাত প্রদর্শনীটি কোথাও হয়ে উঠেছে জুতোর দোকান, কোথাও বা মনোহারী বিপণিবেসাতি। একটি সাধারণ আমেরিকান শোবার ঘরের আসবাবপত্র এবং রান্নাঘরের ও বাথরুমের সাজ-সজ্জা দেখানো হয়েছে। কিছু মেয়েদের পোষাকপত্র, কিছু বা বিলাসী জীবনের উপকরণ। সর্বসমেত ঘণ্টাখানেক কাটানো যায় এই প্রদর্শনীতে, এবং তারপরেই মনে হতে থাকে, দিল্লী-কলকাতার ভারতীয় একজি-বিশন এর চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয়। আমি ঈষৎ নৈরাশ্য নিয়েই ফিরেছিলাম।

বরং সেদিন আনন্দ পেয়েছিলাম 'অষ্টান্টিকিনো' বাগানের প্রান্তবর্তী একটি মস্ত রাজবাড়িতে গিয়ে। 'অষ্টান্টিকিনো' নামটি একটি জনপদের সঙ্গে মেলানো। প্রাসাদটি পুরনো কালের। স্তম্বনের অংশে রাজপথ, পথের ওপারে মস্ত এক জলাশয়। এটি প্রাচীনকালের এক এস্টেট। এই এস্টেটের সীমানা কত-

দূর জানিনে, কিন্তু এর বন-বাগানের সামনে সুদীর্ঘলম্বিত একটি প্রশস্ত দীঘি, এবং চারিদিকে নিঃস্বল্প নিকুঞ্জ কাননলোক। যেন পূর্ববঙ্গের কোনও এক বিজনবাহিনী নদীতট! রাজপথের ধারেই মস্ত এক গির্জা।

'অষ্টান্টিকিনো' রাজপ্রাসাদের মধ্যে যে একটি কৌতুকজনক কাহিনী লুকিয়ে রয়েছে সেটি শ্রীমতী লিডিয়া ভিতরে প্রবেশ করার পর থেকে সবিস্তারে বলতে লাগলেন। বস্তুতঃ, রাজকুমার 'ব্রোতস্ট্রাক' প্রতিষ্ঠিত আর্ট গ্যালারির পর এই প্রথম অপর এক রাজকুমারের বাসস্থানের মধ্যে প্রবেশ করেছি! এখানে বিধিনিষেধ কিছু আছে। পায়ের জুতোর ঘর্ষণ মেঝের উপর না লাগে এজন্য ক্যাম্বিসের একজোড়া কৃত্রিম জুতো পায়ের তলায় পরে নিতে হয়। এককালে যিনি এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন তাঁর নাম 'প্রিন্স শেরেমতিয়েভ'। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্ত এবং উনিশ শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক। বলা বাহুল্য, রাজবংশের এক শাখায় তাঁর জন্ম, জার গোল্ডস্টার্টই এক সন্তান এবং তিনি বিপুল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী। এই বিশাল প্রাসাদের প্রতি কক্ষটি যে বিলাস এবং বৈভব-সজ্জায় পরিপূর্ণ, সেটি পর্যবেক্ষণ করলে চমৎকৃত হতে হয়। তৎকালীন

সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা অগণিত তৈলচিত্রের সঙ্গে প্রতি দেওয়ালে ও শিলিংয়ে বে চিত্রাঙ্কন, সেগদিল দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করে। কোনটা শিবমহল—চারিদিকের স্ফটিকসম্ভার থেকে বিদ্যুৎ-বলক বিচ্ছুরিত হচ্ছে; কোনটা মোতিমহল,—বিবিধ কোমল বর্ণাঢ্য প্রস্তরমণি সেখানে যেন ইন্দুলোকের দ্বার খুলে দিয়েছে; কোনটা জহরৎমহল,—সেখানে চক্ষুভারকা নানা জায়গায় ঘা খেয়ে যেন ঠিকরে আসে! কারুকার্য ও বিবিধবর্ণ মখমলের কাজ প্রতিটি আসনকে যেন সিংহাসনে পরিণত করেছে! কোনটা প্রমোদ-কক্ষ, কোনটা শয়নকক্ষ, কোনটা বিশ্রমভালাপের, কোনটা পানাহারের। গ্রীক এবং ইতালিয় ভাস্কর্য এক একটি মর্মর মূর্তিকে পরম রমণীয় করে তুলেছে। কোথাও সোনালি সাজা জরির রাজ-পোষাক, কোথাও স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজসপত্রাদি, কোথাও বলমলে পার্লিশের মেহগনি ও আখরোটের আসবাবপত্র,—কোথাও বা রক্তনীল মখমলের সঙ্গে স্বর্ণালির সংমিশ্রণ। আমার খেই-হারানো মৃদু দৃষ্টি একটার থেকে অন্যটার ঘুরে বেড়াতে লাগল কিছুক্ষণ।

রাজকুমার শেরেমতিয়েভের একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তদানীন্তন রাশিয়ার সম্রাট জার। সেন্ট পিটার্সবার্গ



উৎকৃষ্ট
বার্লি
বলিতেই
লিলি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, টাটকা
ও স্বাস্থ্যপ্রদ



সকল বয়সে
ও প্রত্যুতে সমান উপযোগী

লিলি বার্লি মিলস্, প্রাইভেট লি:
কলিকাতা-৪

থেকে সম্রাট যখন আসতেন মস্কোতে, তখন তাঁর আমোদ-প্রমোদের অন্যতম কেন্দ্র হত এই প্রাসাদ। সম্রাটকে অভ্যর্থনা করার জন্য যে সমস্ত রাজকীয় বা রাজসিক উপকরণের প্রয়োজন, সেগুলি এখানে বোড়শ উপচারে বর্তমান! কনসার্ট হলটি বৃহৎ, তার দারুময় মেঝের উপর মনোরম চিত্রাঙ্কন, আনন্দ সৃষ্টির রমণীগণের নৃত্যগীতের আসর, তাদের যৌবনশ্রীকে বর্ণাঢ্য করার জন্য বিশেষ কক্ষে স্ফটিকচ্ছুরিত আলোক-ব্যবস্থা, এই বৃহৎ প্রাসাদকে তুষারপাতকালে উত্তপ্ত রাখার জন্য সুকোশল উত্তাপ-সৃষ্টির আয়োজন, শিলিংয়ে স্বর্ণময় ঝাড়লণ্ঠনের শিল্পশোভা, এবং সম্রাটের অভ্যর্থনা জন্য বিশেষ বিশেষ কক্ষ,—এগুলি যে কোনও দর্শককে সম্মোহিত করবে! শুনলুম, সম্রাট যখন এই প্রাসাদে আসবার জন্য সংবাদ পাঠাতেন, তখন এই জনপদের সমস্ত অঞ্চলগুলি থেকে জনসাধারণকে অপসারিত করা হত।

রাজকুমার শেরেমিতিয়েভ তাঁর বিলাসপ্রিয়তা এবং অতিশয় বায়-বাহুল্যের জন্য সমগ্র রাশিয়ায় সুবিদিত ছিলেন। আরেকটি কারণে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। দেশের ভূমিদাস সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী, কর্মী, কারুকলাবিদ, ডাস্কর, গায়ক, নর্তক ও নর্তকী, সংগীতবিদ, কবি ও চিত্রকর—ইত্যাদি প্রতিভাবান ব্যক্তিকে নির্বাচন করে আনতেন এবং তাদেরকে প্রতিপালন করতেন। তাঁর নিজস্ব ভূমিদাস বা দাসান্দ্রদাসের (Serf) মোট সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১০ হাজার ৪৪৭ জন। তাঁর এই বিশাল প্রাসাদ এবং এর যা কিছু বৈভবসজ্জা—সমস্তই সেই ভূমিদাস দলের সৃষ্টি। সুতরাং তিন ঘণ্টাকাল ধরে এতক্ষণ যা কিছু চমৎকে অবলোকন করলুম, তার আনন্দপূর্বক কাহিনী দাসান্দ্রদাসদের সঙ্গে জড়িয়ে! কিন্তু শেষকালের কাহিনীটি ছিল কিছু মনোজ্ঞ।

এদেরই একজন নির্মাণশিল্পীর একটি কন্যার নাম ছিল 'শ্রীমতী প্রাসকোভিয়া কোভালেভা'। উক্ত ভূমিদাস দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যে সম্প্রদায়টি ছিল, এ মেয়েটি তাদেরই একজনের কন্যা। মেয়েটি ছিল অসামান্য সুন্দরী এবং তার তনুলতার যৌবনশ্রী ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর পক্ষে দিব্যবর্ণের মতো! কিন্তু রাজকুমার শেরেমিতিয়েভ কেবলমাত্র নারীদেহ-

কেন্দ্রিক রিরংসার বিলম্ব পতঙ্গ ছিলেন না, বরং ছিলেন কিছু বিপরীত। তাঁর সমস্ত ভোগবিলাসের অন্তরালে একটি সুক্ষ্ম ঔদাসীন্যের 'সন্ন্যাস' তাঁকে অনেক সময় পেয়ে থাকত। সেই অবকাশের মুহূর্তগুলির মধ্যে অনেক সময় তিনি লক্ষ্য করতেন, তাঁর নাচের দরবারে একটি সুন্দরী নর্তকীর নিলোভ এবং নিরাসক্ত সংযম! মাঝে মাঝে আবিষ্কার করতেন, এ নর্তকী ছবি আঁকে, এবং কবিতা লেখে! সে কবিতা বিরহগুণ গানের মধুর লিরিক নয়,—সে যেন অধ্যাত্মবাদী এক বিদগ্ধ আত্মার অবিনশ্বর পিপাসা!

রাজকুমার আপন জীবনের দিকে তাকিয়ে থমকিয়ে, গেলেন! তিনি অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ভাবান্তর নানাদেশে ও নানাস্থানে প্রচারিত হতে লাগল। একদিন তিনি প্রাসাদকাননের নিভৃত নিকুঞ্জ পদ্পমালা হাতে নিয়ে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে রইলেন। মেয়েটি এই পথ ধরেই তার ঘরের দিকে যায়!

'প্রাসকোভিয়া' সামনে এসে থমকিয়ে দাঁড়াল। শেরেমিতিয়েভ তাঁর প্রস্তাব জানিয়ে বললেন, আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই, প্রাসকোভিয়া!

আমাকে?—মেয়েটি বলল, সে যে আপনার মন্ত অপমান! তাছাড়া আমরা সবাই আপনার হুকুমের দাসী! ফুলের মালা হাতে নিয়ে মন জানাজানির অবসর কোথায় আপনার? একবার হুকুম হলেই ত আপনার পায়ের তলায় পড়ে আমরা যে কেউ দেহদান করতে বাধ্য! মালা

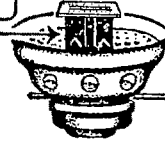
ফেলে দিন! রাজকুমার, দাসীকে হুকুম করুন! আমরা শুধু ভোগের উপকরণই থাকতে চাই, মালা চাইনে!

রাজকুমার অপমানিত মুখে ফিরে গেলেন! কিন্তু গোপনে যে-ঘটনাটি ঘটেছিল, গোপনেই সেটি রয়ে গেল। তবুও প্রাসকোভিয়া এবং তার পিতার সম্বন্ধে শেরেমিতিয়েভের পক্ষপাতের কথা দেখতে দেখতে এখানে ওখানে কানাকানি হতে লাগল। জনশ্রুতি, নিন্দা, বিদ্বেষ, কানাকানি,—এরা ফণা উঁচিয়ে চারিদিকে দাঁড়িয়ে উঠল। রাজকুমার শান্ত, সংযত, ও সহাস্যভাবে একদিকে অবিবাহিত রয়ে গেলেন, এবং অন্যদিকে সেই সভানর্তকী বাহিরের সর্বপ্রকার বিলাস আড়ম্বরের অন্তরালে চারিদিকের 'সুপদংশনে' ক্ষতবিক্ষত ও বিষজর হতে লাগল। বছরের পর বছর কাটল!

অবশেষে যৌবনের প্রান্তে এসে রাজকুমার একদা তাঁর সংযমের কঠোর বাঁধন বিদীর্ণ করে এই 'ভূমিদাসীর' পদতলে নতজানু হয়ে সাম্রাজ্যে ভিক্ষা চাইলেন! প্রাসকোভিয়াও রাজকুমারের ললাটের উপর মাথা রেখে অশ্রু বিসর্জন করলেন। অতঃপর সর্বপ্রকার অখ্যাতি, নিন্দা, বিদ্বেষ এবং দেশজোড়া অপমানের বোঝা মাথায় তুলে প্রিন্স শেরেমিতিয়েভ সৌদিদকার সেই ভূমিদাসী প্রাসকোভিয়া কোভালেভাকে সগৌরব সমারোহের সঙ্গে বিবাহ করেন, এবং সম্রাট জারের পরিবার কর্তৃক সমাজচ্যুত হন। কিন্তু এই বিদগ্ধ নারীর সৌভাগ্য বৈশিষ্ট্য স্থায়ী হয়নি! যে-আগুনে বছরের পর

আরও মজবুত... আরও ভাল

পিতলের তৈরী
বার্ণার টিউব



সম্পূর্ণ লক্কন মোটা চাদরে
তৈরী ও লক্কনে লুং কেবোজিত
তৈলে নষ্ট হয় না

কিমান
লক্কন
সর্বোৎকৃষ্ট

কিমান লক্কনে
'স্পেশাল কোয়ালিটি'
রাপ দেখিয়া লইবেন।





গোহরমোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৬, ৩২৬ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৫৮০

বছর সে দগ্ধ হয়েছিল, সেই আগুনই তার চিত্তের জ্বলে উঠল বিবাহের দুই বছর পরে! প্রাসকোভিয়া যক্ষ্মারোগে মারা যায় ৩৫ বছর বয়সে!

সেদিনকার সেই রাজকুমারের শয়ন-কক্ষের দ্বারপ্রান্তে সালংকারা সুন্দরী প্রাসকোভিয়ার একখানি মনোরম তৈলচিত্রপট স্বর্ণমণ্ডিত ফ্রেমের মধ্যে আজও শোভা পাচ্ছে!

ওই ছবিখানার তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম। ‘অণ্টানুকিনোর’ বাগানের ধারে রাজকুমার শেরে-মোতিয়েভের প্রতিষ্ঠিত প্রকাণ্ড গির্জায় সুন্দর মধুর ঘণ্টা ডিং-ডং ডিং-ডং শব্দটা জানিয়ে দিল, এটি রবিবারের অপরাহ্ন, এখনই উপাসনা আরম্ভ হবে! শ্রীমতী লিডিয়া ডাক দিয়ে বললেন, আসুন, এবার বাগান দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে চলে যাই—

বাগানে এসে পৌঁছতেই সুসপিণ্ডে বৃষ্টি নামল। সুবিধা ছিল এই, প্রতি বাগানের ধারেই দু'একটি খাবার হোটেল খোলা। এসব হোটেলে কফি, চা, মদ, আপেল, মাংসের খাবার ইত্যাদি পাওয়া যায়। দেখতে দেখতে বনবাগানে সন্ধ্যা নেমে এল।

‘ফরেন’ লিটারেচার পাবলিশিং হাউস’ বা বিদেশী সাহিত্য প্রকাশনের মস্ত আপিসটি মস্কোর সাবেক শহরের এক স্থলে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর হলেন ঈশ্বর খর্বকায় ‘বিলিষ্ট ও সৌজন্যশীল ব্যক্তি মিঃ পাভেল চুভিকভ। এঁর কাছে আমাকে কয়েকবারই আসতে যেতে হয়েছে। এঁদের বর্তমান আপিসটি মস্ত বড় এক অট্টালিকা। এটি সাবেক-কালের, এবং জার আমলে এটি ধর্মযাজক এবং সাধুসন্তের বাসস্থান ছিল। রুশ-বিলুপ্তের পর বিশেষ এক সরকারি ডিক্রির বলে যখন হাজার-হাজার অট্টালিকা অধিকার করা হয়, তখন এটিও তাদের সংগে গভর্নমেন্টের হাতে আসে। তারপর যে যেমন পারে, দখল করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু সেই সব ‘সাধুসন্ত বাবাজিরা’ কোথায় গেলেন কেউ জানে না! তাঁদের জন্য অবশ্য জুমারাকীর্ণ ‘কেমি’ উপত্যকা, সাইবেরিয়া, কাজাখস্তান, শাখালিন, অথবা ‘লেবার ক্যাম্প’ খোলা ছিল। তাঁদের একটা দল নাম ও পোষাক বদলে এবং জপতপের মালা ছিঁড়ে গাছপালায় ফিরে গেছে! কেউ কেউ

এদেশ ছেড়ে ডিন দেশে পালিয়ে গাল-মন্দ করেছে অনেককাল। কেউ না খেয়ে মরেছে, কেউ ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, কেউ বা বশম্বদ হয়ে আত্মরক্ষা করেছে।

মিঃ চুভিকভের আপিসে একটি যন্ত্রচালিত বৎ অভ্যর্থনা জুটে গেল। কিন্তু এঁরা ঠিক আমাদের দেশের মতো প্রকাশক নন যে, বেড়াতে বেরিয়ে দু'ঘণ্টা গল্পগাউজের লোভে তাঁদের দোকানে ঢুকে জমিয়ে বসলুম। ওঁদের দেশে প্রকাশকের কাছে যাওয়া আর আমাদের দেশের কোনও মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢোকা প্রায় একই কথা! আগে থেকে ইচ্ছা প্রকাশ করা, ইচ্ছার কারণ বলা, আসল উদ্দেশ্য জানানো, এবং ঘণ্টা ও মিনিট ধরে পৌঁছনো! যথাযথানে গিয়ে নাম বললে একজন বৌরয়ে এসে অভ্যর্থনা করবেন এবং এমন একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাবেন যেখানে টেবল-চেয়ার সবই শূন্য,—দ্রুত বা বস্তু সে ঘরে কোথাও কিছু নেই। শূন্য ঝুলছে লেনিনের ছবি!

শ্রীমতী লিডিয়া বোধকরি বুদ্ধে-ছিলেন আমার গলা শুকোচ্ছে! তাই এক সময় বললেন, মনে রাখবেন, এঁরা আপনার প্রতি বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন!

কুষ্ঠার সংগে বললুম, কিন্তু না এলেই হত!

মানে?—লিডিয়া চোখ পাকিয়ে বললেন, ah, poor ‘second brahmin’!

আমি চুপ করে গেলুম। কিন্তু ওই ‘second brahmin’ কথাটার কিছু তাৎপর্য ছিল! গল্পটি তিনি আমার কাছে একদিন শুনেছিলেন।—একদা চৈত্রের রৌদ্রে মনের দুঃখে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর ব্রাহ্মণীর দ্বারা লাঞ্চিত হয়ে কিছু সাহায্যলাভের আশায় মাঠ-ময়দান পেরিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর এক যজমানের বাড়ি। এমন সময় আকাশপথ অতিক্রম করছিলেন হরপার্বতী। দয়াবতী পার্বতী বললেন, হে দেবাদিদেব, সংসারে এত দুঃখ কেন? এই উপবাসী ব্রাহ্মণের দুর্ভাগ্যের কি কোনও প্রতিকার নেই? দয়াদেবী দেবাদিদেব স্নেহের হাসি হেসে একটি লাল কাপড়ের টুকরোয় একরাশি মোহরের পট্টলি বেঁধে সেই ব্রাহ্মণের যাবার পথের উপর বৃষ্ণ করে ফেলে দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই পথ পেরোবার সময় হঠাৎ সেই পট্টলিটা দেখে নাকে কাপড় দিয়ে মুখ ঝিঁচিয়ে উঠলেন,

কোন আবাগী সর্বনাশীর কাণ্ড র্যা? উচ্ছ্বসে যা,—নরকে যা—!

ব্রাহ্মণ ঘৃণাভরে পাশ কাটিয়ে হন হন করে চলে গেলেন। বুদ্ধিহীন দৃষ্টি-হীন মানুষের এই অজ্ঞান দেখে আকাশপথে হরপার্বতী আবার স্নেহের হাসি হাসলেন!

লিডিয়ার ধারণা, আমি ঈশ্বরতীর ব্রাহ্মণ!

মিঃ পাভেল চুভিকভ এলেন এঘরে তাঁর দলবলসহ। সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি একা কারো সংগে দেখা করেন না, অথবা তাঁর নিজের আপিসঘরের মধ্যে কখনও কারোকে ডাকেন না! আপিস মানেই গোপনীয়! সাক্ষী না রেখে কখনও কারো সংগে তিনি আলাপ করেন না! সেই কারণে তাঁর সংগে পাঁচ ছয় জন ভদ্রলোক এসে পাশাপাশি বসে গেলেন, এবং আমার নানাবিধ প্রশ্ন এবং ওৎসুক্যের জবাব দিতে লাগলেন। এই প্রতিষ্ঠানে পৃথিবীর বহু ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ ছাপা হয়। সেই সব গ্রন্থ নির্বাচন করেন বিভিন্ন কমিটি। এঁদের অধীনে যে সকল উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা আছেন, তাঁরা প্রত্যেকে এক একটি ভাষায় পারদর্শী। সংখ্যাভীত অনুবাদক এঁদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। প্রথম সংস্করণের দরূণ ৫০ হাজারের কম কোনও বই ছাপা হয় না! এর মধ্যে ৫ হাজার বই গভর্নমেন্টকে দিতে হয় বিভিন্ন পাঠাগারের জন্য। ১৫০ থেকে ২০০ পৃষ্ঠার একখানি অনুবাদ-গ্রন্থের জন্য এঁরা প্রথম কমবেশি ১৫ হাজার রুবল রয়েলটি দেন, যেটি ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হারে এখন দাঁড়ায় ১৮ হাজার টাকা! কিন্তু এই রয়েলটির ‘টাকা’ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া তাঁরা সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে যেতে দেন না। শূন্য তাই নয়, পৃথিবীর যে কোনও ভাষায় লিখিত যে কোনও গ্রন্থ তাঁরা গ্রন্থকারের অনুমতির অপেক্ষা না রেখে এবং তাঁদেরকে ‘কলা’ দেখিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে কোনও ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। কেননা, ‘World Copyright’ আলোচনায় জেনেভা কন্ভেনশনে তাঁরা স্বাক্ষরকারী ছিলেন না। অবশ্য এর বিনিময়ে পৃথিবীর যে কোনও দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের যে কোনও গ্রন্থই ছাপতে পারেন। কিন্তু আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য তাঁদের দেশের বাইরে যে যেখান সমাদৃত নয়,—

এটি বোধ করি তাঁদের কতকটা জানাও আছে।

রুশবিপ্লবের ফলে পৃথিবীর সব দেশের নিরীহ লেখকরা তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন—এ কেমন কথা? যে-দেশে 'exploitation' ব্যবস্থা চিরকালের জন্য নির্মূল হয়ে গেছে, সেই দেশ আজ পৃথিবীর সব লেখককে ভাগিয়ে থাকে—এ কেমন যুক্তি?

আপনারাও আমাদেরকে 'exploit' করুন?

আমরা বারোজন মিলে একজনের খাদ্য খাবো, আর বারোজনের খাদ্য আপনারা একজনে খাবেন,—পেটটা কার ভরছে বেশি?

একথা নিয়ে হাসি পরিহাস চলে! কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে এর জবাব নেই! ফিরবার পথে সেদিন শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিলেন, ah, once again a poor 'second brahmin' incorrigible!

এইদিনটির দেড় বছর পরে "বিদেশী সাহিত্য প্রকাশন" আমার একখানি বই প্রকাশ করেন। কিন্তু আমার প্রাপ্য থেকে আমি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইনি।

পথে পথে ঘুরে বেড়ানো আমার দরকার ছিল। প্রয়োজন ছিল জনতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া, হোটেলে বা রেস্টুরায় শিগাড়া ওরফে 'শাম্সা' এবং আমেরিনয় হোটেলে 'পেরোটা' খেয়ে বেড়ানো! বোধ হয় আমেরিনয় হোটেলের রান্না এবং ভোজ্য দিল্লী-পাঞ্জাবের অতি কাছাকাছি! রান্না বলতে যা বুঝি তা রাশিয়ান নেই! রাশিয়ানরা রাঁধে না, খাদ্য-সম্ভার 'প্রস্তুত' করে মাত্র! সিদ্ধ করাটা রান্না করা নয়! ওরা বাঁধাকপি'র বে 'ঘটি' রান্না করে, সেটিতে তেল বা ঘি, নুন, স্বাদ—কোনটাই নেই! সেটি 'গোবরের' সমতুল্য! ভাল রান্না খেতে গেলে দক্ষিণে নেমে আসতে হবে আড়াই হাজার মাইল! অর্থাৎ মধ্য-এশিয়ায়! কেবলমাত্র মুসলমান মধ্য-এশিয়াই এটি জানে, "বাসনার সেরা বাসা রসনায়!" আমার আমেরিনয় দৌভাষণী শ্রীমতী অকসানাকে একদা টাউ টাউ করে 'তাসকন্দের' 'পিজাও' গিলতে দেখেছিলুম।

একটি গোল-গোম্বাজের মধ্যে 'সিনেরামা'র ঘরজোড়া বৃহৎ ছবি'র মধ্যে সমগ্র লেনিনগ্রাড ও মস্কো অঞ্চল এমনভাবে দেখানো হল, যেন আমরা ওই দুটি

শহরের রাজপথে এবং বিভিন্ন 'লোকেশনে' দাঁড়িয়ে একইকালে দেখছি নগরের নানাবিধ দৃশ্য। চোখের সামনে একটি বিস্ময়কর মায়াজাল রচনা করে এই সিনেরামা! এর আগে 'সকলানিক' পার্কে দেখে এসেছিলুম আমেরিকান 'সার্কো-রামা'! সোভিয়েট ইউনিয়নে সিনেরামা, থার্ড-ডাইমেন্সনের ছবি এবং টেলিভিশন—এই তিনটি খুবই জনপ্রিয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র উজবেকিস্তানের জনসাধারণ ৬০ হাজারেরও বেশি টেলিভিশন সেট কিনেছে!

মস্কো থেকে একটি পথ চলে গেছে দেশগাঁয়ের দিকে। আমরা যাচ্ছিলুম 'লেনিননিক-গোর্কি' নামক একটি গ্রামে। শ্রীমতী অকসানা এনেছিলেন লেখক সম্ভের একখানা গাড়ি এবং সেই গাড়িতে আমরা উঠলুম মোট ছয়জন। সম্প্রীক মিঃ মালভেজভ, একজন শিল্পী, শ্রীমতী অকসানা ও লিডিয়া। শহরতলী ছাড়িয়ে মাঠময়দান, ক্ষেতখামার, চাষীগ্রাম এবং পাইনের জঙ্গল পেরিয়ে বোধ হয় যেন মাইল তিরিশেক পথ। পথ ছিল মসৃণ এবং আকাশ ছিল রৌদ্র-বলম্বল। একদিকে দূরে দেখা যাচ্ছিল এক একটি গির্জা। ক্রেমলিন ছাড়া মস্কো অঞ্চলের প্রত্যেক গির্জায় নিয়মিত উপাসনা চলে! বিস্ময়ের কথা, স্টালিন আমলেও এর ব্যতিক্রম হয়নি!

আমরা যে এন্টেটে এসে পেঁছলুম এইটিতেই লেনিন তাঁর জীবনের শেষ দু'বছর অতিবাহিত করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে এই বৃহৎ অট্টালিকায় সম্প্রীক তিনি এসে জায়গা নেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। শেষ-জীবনে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি এবং পক্ষাঘাতে একপ্রকার অকর্মণ্য হয়েছিলেন, সেজন্য তাঁকে একটি তিন-চাকার গাড়িতে বসিয়ে এই এন্টেটেরই বনবাগানে বা এঘর থেকে ওঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ত। এবাড়িতে বসেই তিনি রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন, এবং মৃত্যুকাল অবধি তিনিই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ব্যবহৃত প্রাচীন মডেলের একখানা মোটরগাড়ি প্রদর্শনী হিসাবে রাখা হয়েছে। এই অট্টালিকার প্রত্যেক সুপ্রশস্ত কক্ষে মূল্যবান আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সম্পদ-সামগ্রী অবিকল অবস্থায় রয়েছে। এই এন্টেটের যিনি মালিক তিনি ছিলেন মস্ত জমিদার। রুশবিপ্লবের ঠিক পরে তিনি সপরিবারে প্রাণভরে রাতারাতি

কোথায় যে পালিয়ে যান! আজও তার সন্ধান মেলেনি! সে যাই হোক, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট গভর্নমেন্ট এই অট্টালিকা এবং এন্টেট অধিকার করেন এবং এটি লেনিনকে দান করা হয়। এই বৃহৎ এন্টেটের সীমানা কোথায় এবং কতদূর সেটি ঠাহর করা যায় না। হঠাৎ মনে হয় এটি পার্বত্য উপত্যকা। আশে-পাশে ও নীচের দিকে সুবিস্তৃত বন-বাগান, এবং অদূরে একটি মস্ত জলাশয়। এরই মালিক ছিলেন সেই 'নোবল'! লেনিনের ব্যবহৃত প্রত্যেকটি সামগ্রী, এমন কি যে বেগুখানিতে মাঝে মাঝে তিনি বসতেন সেখানিও, সম্বল্লবিত।

বাগানের পথে সর্বাপেক্ষা বড়ি দর্শককে আকর্ষণ করে সেটি হল, একটি প্রস্তরমূর্তি। এটি লেনিনের 'শবযাত্রা'! লেনিনের মৃত্যুর পর যারা তাঁর শবদেহ কাঁধে তুলে সেই জানুয়ারী মাসের কঠিন তবারাকীর্ণ পথ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন রেলস্টেশনের দিকে, সেই শবদেহযুক্ত শোকার্ত বাহকদলের সম্মিলিত মূর্তি! পৃথিবীর কোনও দেশে এই প্রকার দলবদ্ধ শব্দমর্মর মূর্তি আছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু আমাদের দেশে বিহারে এমনি একটি 'সম্মিলিত' প্রস্তরমূর্তি আছে—যেটিতে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের শহীদদের আত্মত্যাগের মহিমাকে প্রকাশ করা হয়েছে। যাই হোক, ভাস্কর্যের এত বড় সাফল্যও বোধ হয় দুর্লভ। এগুলি ঠিক পুতুল নয়, সর্বহারা, শোকসন্তপ্ত, বেদনাদীর্ণ এবং অশ্রুকরণ কয়েকটি শববাহক! এই বাহকদল আমাদের কাছে অপরিচিত নন। কেননা এঁদের মধ্যে ছিলেন কালিনিন, ট্রটস্কী, স্টালিন, ভরশিলভ, মলোভ, কামেনেভ, জিনোভিভ, বুখারিন, কাগানভিচ, বুলগানিন এবং আরও দু' কজন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তারিখে লেনিন এইখানে মারা যান, এবং ২৩শে জানুয়ারী তাঁর শবদেহ ট্রেনযোগে মস্কো নগরীতে পেঁছয়। কঠিন ঝরফের নীচে সেদিন মস্কো নগরী নিমজ্জিত ছিল, এবং প্রচণ্ড তুষারঝটিকার সোঁদন রাজধানী ক্ষণে ক্ষণে বেগাহতবৎ কেঁপে উঠছিল! সেদিনকার সেই ভয়াবহ দুর্যোগ সত্ত্বেও লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আড়াই লক্ষ নরনারী রেলস্টেশনের দিকে ছুটে এসেছিল! স্টেশন থেকে লেনিনের দেহ কাঁধে করে এনে মস্কোর একটি প্রসিদ্ধ অট্টালিকায় রাখা

হয়। সেটির নাম 'হল্ অফ কলম্বুস'। অতঃপর কি প্রকার কৌশল এবং প্রকল্পের সাহায্যে লেনিনের শব্দদেহকে অবশ্যম্ভাবী ক্ষয় ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করা হয় এবং কোন বিশেষ ঔষধি প্রয়োগের দ্বারা তাঁকে 'সজীব বা জীবন্তসদৃশ' করে রাখা হয়,—আজও পৃথিবীর পদার্থ ও রসারন শাস্ত্র থেকে সে-রহস্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি!

এই অট্টালিকার বিবিধ সম্পদের সঙ্গে লেনিনের যোগ ছিল কম। কেননা তাঁর বসবাসের অংশটি শাদামাটা স্বল্প-বিস্তারিত পরিবারের মতো নিতান্ত সাধারণ। তাঁর ঘরকন্নার ছিলেন তাঁরা মাত্র তিনজন,—তাঁর স্ত্রী রুপস্কায়া, তাঁর ভগ্নি মেরিয়া ও তিনি নিজে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শয়নকক্ষে নানাবিধ কাগজপত্রের মধ্যে একটি দলিল পাওয়া যায়; সেটিতে চীন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর স্বহস্ত-লিখিত বাণী ছিল। এই বাণীতে তিনি বলেছিলেন, সমগ্র প্রাচ্যে উৎপীড়িত জাতিগণের মধ্যে ধর্ম্মায়িত অসন্তোষ একটি বৈশ্বিক পরিণতি লাভ করতে চলেছে। চীন এবং ভারতে বিরাট এক মূর্ত্তিসংগ্রাম আসন্ন! এই দুই জাতি সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে, সোদিনের বিলম্ব নেই!

কিন্তু বিলম্ব কিছ্ হয়েছিল, কারণ গান্ধীজি রক্তপাত, হিংসা, অরাজকতা এবং বলশেভিকবাদের পথ ধরেননি!

মিঃ থড্ডচভ প্রমুখ সুপ্রীম সোভিয়েটের মন্ত্রীরা কে কোথায় থাকেন, এটি জানা সম্ভব নয়, এবং আমার প্রয়োজনও নেই! একবার শুনেছিলুম মিঃ থড্ডচভ ক্রেমলিনের বাইরে সাধারণ নাগরিকের মতো থাকেন, এবং কাজকর্মের জন্য ক্রেমলিনে যান। এটি শুনে আমার ভাল লেগেছিল।

অত্যন্ত প্রয়োজন এবং জরুরী কাজ-কর্ম ছাড়া কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা সহজসাধ্য নয়। আমি কেবলমাত্র সংস্কৃতি মন্ত্রী মিঃ মিখাইলভের সঙ্গে একদিন আর্ট থিয়েটারে ব'সে কিছুক্ষণ আলাপ করেছিলুম। সোদিন শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চললেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দপ্তরে। তাঁর ইচ্ছা, আমি সকল শ্রেণীর লোকজনদের সঙ্গে অঙ্গবিস্তারিত আলাপ করে যাই। বস্তুতঃ, তাঁরই অক্লান্ত অধ্যয়নসাধনের গুণে আমি এই বিরাট

দেশের বৃহত্তর জনতার মধ্যে অনেকবার মিলিয়ে যেতে পেরেছিলুম। অনেক সময় তিনি পাঁচ, সাত বা দশ মাইল দূরে কোনও এক রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করতেন। এবং আমি বিশেষ নির্দেশক্রমে বার দুই মোটরবাস বদল করে কিংবা ট্যাক্সি নিয়ে তাঁর কাছে পথ চিনে যেতে পারতুম! এমনি করে পথঘাট চিনে-ছিলুম অনেকগুলি, এবং একা ঘুরে বেড়াতে আর ভয় পেতুম না! সর্বাপেক্ষা ভয় পথ হারাবার,—কেননা লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে ইংরেজি জানা কেউ আছে কিনা, এই সন্দেহের জন্যই সবসময় আড়ষ্ট বোধ করতুম।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সুবৃহৎ অট্টালিকা বহু সরকারি দপ্তরে পরিপূর্ণ। এটি ১০নং কুইবিশেভা স্ট্রীটে অবস্থিত। প্রবেশপথে ডবল দরজা। বাইরে শীত, ভিতরে উষ্ণ। প্রত্যেক দপ্তরের মতো এখানেও কড়াকাড়ি। সশস্ত্র পাহারা প্রথমে পরীক্ষা করবে অনুমতিপত্র! অতঃপর অপর একজন টেলিফোন করবে। তৃতীয় ব্যক্তি দোতলার পথনির্দেশ করবে, এবং দোতলার চতুর্থ ব্যক্তি সঙ্গে করে নিয়ে কোনও একটি অভ্যর্থনাকক্ষে বসাবে! আমার মনে পড়ছিল ইংরেজ আমলের কলকাতার 'রাইটার্স বিল্ডিং'। আমার ধারণা, ১৯৩০-এর আমলে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ প্রেনটিস এবং ১৯৪০-এর আমলে মিঃ পোর্টারের সঙ্গে দেখা করা বরং সহজ ছিল! আমার বিশ্বাস, অতিশয় কড়া-কড়ির মধ্যে জনগণ সম্বন্ধে ভয় ও শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ পায়!

অথচ যে দুজন ব্যক্তি এক-সময় বোরিয়ে এলেন তাঁরা অতিশয় অমায়িক এবং সৌজন্যশীল। এঁদের একজন হলেন ভাইস-মিনিষ্টার অফ কালচার, মিঃ পাখোমভ, এবং অন্যজন সম্ভবত এঁর সহকারী,—ইংরেজি জানা! ভাইস মিনিষ্টার আমার সঙ্গে যে আলোচনা করবেন, নিবর্তীয় ব্যক্তি সেগুলি টুকে নেবেন! সম্প্রতি নবপ্রতিষ্ঠিত জিপসি থিয়েটারে 'সোহনী এবং মহিওয়াল' নামক যে পাজারী নাটকটি হচ্ছে সেটির অপ্রাকৃত মিসটিক্ চেহারাটা যে অর্থহীন, এটি আমাকে বলতে হল! ভারতবর্ষের জীবন অবাস্তব অতীন্দ্রিয়তায় ভরা নয়! আজগুর্বাী কোনও 'ইলুশন্স' সৃষ্টি করে ভারতকে চেনাবার চেষ্টা হাস্যকর। সুতরাং মূলরস যেখানে বিকৃত, সেখানে নাটকের সাফল্য

এবং দর্শকের হাততালি দুটোই অর্থহীন! ভারতবর্ষকে সোভিয়েট ইউনিয়নে পরিচিত করতে হলে সর্বাপ্রণে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নেওয়া উচিত! তাসকন্দে. 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটি "Daughter of the Ganges" নামক নাট্যাকারে অভিনীত হচ্ছে, এবং এটিতে প্রকৃত ভারতীয় সমাজের একটি অংশকে ব্যস্ত করা হয়েছে।—মিঃ পাখোমভের সহকারী আমার কথাগুলি টুকে নিচ্ছিলেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নে ভারতবর্ষ অতিশয় অপরিচিত, কিন্তু অতিশয় প্রিয়। 'ভিলাই ইম্পাত কারখানার' কথা জানে বহুলোক, কিন্তু 'ভাকড়া-নাগোল' জানে কম! 'দুর্গাপুর' শোনি, 'সুরাটগড়' অনেকে জানে! ভারতবর্ষের উন্নতি হচ্ছে কিনা, এটি শোনবার জন্য বহুলোক ব্যগ্র, কিন্তু ভারতবর্ষ বহু বিষয়ে যে কতখানি উন্নত—এটি তাদের জানতে বাকি আছে! ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন অর্থনীতিক অগ্রগতি আজ একান্ত প্রয়োজন এবং বহু শতাব্দীর অসাড়তার উপর দিয়ে ভারতের জনজীবনে প্রাণ-প্রবাহের তরঙ্গ উঠেছে! কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবাদ যদি ভারতের চিরকালীন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করায় চেষ্টা পায়, তবে ভারত সেটি সহিবে না! কেননা আপন স্বভাবধর্ম এবং মানবতাবাদের প্রতি এতবড় আত্মপ্রত্যয় ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে ইদানীং আর দেখা যাচ্ছে না! মারগান্ধের ঝগৎকার, সৌরবিশ্বের দিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, সম্পদসম্পন্ন বিরাট আয়োজন, ধর্ম্মবর্ষের বাহবাফেস্ট,—এগুলি কিছ্-কালের জন্য ভারতকে সচকিত করে বটে, কিন্তু এনিয় সে ঈর্ষাকাতর হয় না, বা প্রতিযোগিতার পাজা পাঠিয়ে কোথাও সে আশ্ফালন করে না,—সে কেবল শান্তভাবে শক্তিশালীকে স্বীকার করে নেয় মাত্র! কিন্তু পৃথিবীর কোনও দেশে কোথাও যদি নতুন মানবতার পুণ্যধ্বনি বেজে ওঠে, কেউ যদি কোথাও নিপীড়িত মানবাত্মার বেদনায় কেঁদে ওঠে, কেউ যদি কোথাও মানুষের ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা আনে, জীবনের কোনও নতুন ভাষাক্ষর কোথাও যদি জন্মগ্রহণ করে, সাধু এবং মহতের প্রতি যদি কোথাও অবিচার ঘটে, যদি কোথাও অন্যায়ের দম্ভ মাথা তোলে,—ভারতবর্ষ তখনই চঞ্চল হয়ে ওঠে!

মিঃ বের্সিল পাখোমভ রবীন্দ্রনাথের কথা তুললেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ প্রিয়। তিনি কেবল ভারতের নয়, তিনি সকল দেশের এবং মহাপ্রাচ্যের ভাবনায়ক। তাঁর কাব্য, সংগীত, নাটক, উপন্যাস, তাঁর বিবিধ চিন্তাসামঞ্জস্য সাহিত্য,—এগুলি সৌভি-য়েট ইউনিয়নে পরিচিত হচ্ছে। আগামী রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রত্যেক রিপাবলিকে তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হবে। তাঁর রচনাবলী সৌভিয়েট নাগ-রিকের ঘরে ঘরে পৌঁছাবে। মিঃ পাথো-মভ জানতে চাইলেন, কবির কোন কোন নাটক এবং নৃত্যানাট্য বা গীতিনাট্য,—সৌভিয়েট রপ্তানিতে অভিনীত হওয়া উচিত। আমি এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলি নাম ক’রে গেলুম এবং বিশেষ করে ‘তপতী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, তালের দেশ, শ্যামা’ প্রভৃতি কয়েকটির উপর জোর দিলুম। সহকারী সেগুলি টুকে নিলেন। মিঃ পাথোমভ আমাকে

আমন্ত্রণ করলেন, আমি যেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের জন্য একখানি ‘আধুনিক’ নাটক অবিলম্বে লিখে দিই। তাঁকে আমি জানাব্দম্, চলিত অর্থে আমি ঠিক নাট্যকার নই! তবে মনে রইল।

এই দিনটির প্রায় মাস পাঁচেক পরে
মিঃ পাথোমভ কলকাতায় আমার নিকট
বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে একখানি পত্র
লিখে আমার রচিত একখানি নাটক চেয়ে
পাঠান। কিন্তু সে-নাটক আজও লেখা
হয়নি! তাঁর দ্বিতীয় অনুরোধ ছিল,
রবীন্দ্রনাথের গীতি ও নৃত্যনাট্যের
প্রযোজনা সম্পর্কে। এই সময়ে ভারতের
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী প্রফেসর হুমায়ূন
কবির যাদ্ধলেন মস্কো। আমি পাথো-
মভকে লিখি, কবির সাহেবের সঙ্গে
যোগাযোগ করার জন্য, এবং মিঃ কবিরের
কাছে তার নকল পাঠিয়ে দিই!

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউ-
নিয়নে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে
মহাকাবির 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য সর্ব-
ব্যাপী সমাদর লাভ করেছিল!

সাতটি অসমতল উপত্যকা মিলিয়ে
মস্কা শহর। তার মধ্যে যে উপত্যকা-
পথটি 'লেনিন পাহাড়' নামে খ্যাত, সেটি
কলকাতার 'রাইটাস' বিল্ডিং অপেক্ষা
উচ্চস্তরের কিনা, সেটি চিন্তার বিষয়।
কিন্তু এই লেনিন পাহাড়ের উপর প্রতি-
ষ্ঠিত মস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতা,
গঠনকৌশল, এবং বিশালতা দেখে
১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে
ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান
বিস্ময়ে-বিমূঢ় ও হতবুদ্ধি হন। এই
বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়টির ঠিক এই
স্থলটিতে স্থাপন করার মূলে কর্তৃপক্ষের
কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিনা



আমি জানিনে। কিন্তু পৃথিবীর যে-কোনও দেশের লোক যদি মস্কা বিমান-বন্দরে এসে অবতীর্ণ হন, তবে মস্কা নগরীর প্রবেশপথে পৃথিবীর প্রথম সোস্যালিস্ট দেশের এই বিরাট কীর্তি তাঁর পক্ষে না দেখে উপায় নেই! মস্কা থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে যে কোনও অঞ্চলে গেলেও এই গগনস্পর্শী বিশাল অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হয়।

বিগত বিশ্বসংগ্রামের পর ডিস্ট্রিক্টর স্টালিন আপন দেশে অতিশয় অপ্রিয় হন। তার প্রথম কারণ, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে হিটলারের সঙ্গে তাঁর কুখ্যাত ‘অনাক্রমণ চুক্তি’, এবং স্বিত্তীয় কারণ, হিটলারকে বিশ্বাস করে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নিরুদ্যম করে রাখা! এর ফলে দেশব্যাপী যে সর্বনাশ ঘটে, তার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে গভীর অসন্তোষ ধুমায়িত হতে থাকে। সম্ভবতঃ সেই কারণে, এবং আপন লুপ্ত ‘গোরব’ ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে স্টালিনশাসিত তদানীন্তন পার্টির কমরী এই ‘মস্কা স্টেট ইউনিভার-সিটির’ নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন, এবং স্টালিনের মৃত্যু বৎসর ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে সেই কাজ শেষ হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্টালিন আমলের সর্বশেষ কীর্তি!

সোভিয়েট ইউনিয়ন সংখ্যাগণনার উপর জোর দেন সর্বাপেক্ষা বেশি। সেই কারণে বিদেশী পর্যটকমাত্রই অঙ্কের উপরে ভেসে বেড়াতে বাধ্য হন। ওদেশে মানুষের জীবন মস্ত এক অঙ্কের ফিরিস্তি। কমিউনিজম হল বিরাট এক অঙ্কের প্রকাশ। ‘মস্কা স্টেট ইউনিভার-সিটি’ দাঁড়িয়ে উঠেছে সেই একই অঙ্কের উপর। শুনলুম এইটি নির্মাণ করার জন্য দেশের ৫০০ বিভিন্ন শিল্পসংস্থা এক-যোগে কাজ করেছিলেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর অবধি এখানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪০০০, এবং বিদেশী ছাত্রসংখ্যা হয় ১৬০০। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২০০০ ক্লাসরুম ও গবেষণাগার চালু করা হয়েছে। ছাত্রদের থাকার ঘর, লাউঞ্জ, কমনরুম, ক্যানাটিন, ব্যায়ামাগার, সন্তরণাগার, লাইব্রেরী, অধ্যাপকদের ঘর, রান্নাভাড়া, ঝি চাকর, রাঁধনি, বাড়িদার, মেথর, মর্চি, দর্জি, ধোপা, নাপিত, মালী, থানা-পুলিশ, কাছারি, ইত্যাদি সব মিলিয়ে মোট ৪৫,০০০ ঘর ও কক্ষাদি। এই অট্টালিকা হল ৩২ তলা, এবং মোট ১৮টি শাখায়

বিভক্ত। কতখানি পরিমাণ অঞ্চল জুড়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত, তার হিসাব আমি করিনি, তবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার-দের ভাষায় যেটিকে বলা হয় ‘ফ্লোর-স্পেস’ সেটি প্রায় ১২৫ একর পরিমাণ জমি! এই ‘দানবীয়’ অট্টালিকার ভিতরে সর্বত্র যদি কেউ দেখেদুনে বেড়াতে চায় তবে তাকে মোট, ১৪৫ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ৯০ মাইল পথ হাঁটতে হবে! এ ছাড়া এই অট্টালিকার সংলগ্ন যে বটানিকাল্ গার্ডেনটি রয়েছে, তার ভূ-পরিমাণ হল প্রায় ৩৫০ বিঘার একটি কুঞ্জকানন। সেখানকার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাড়িগুলি পৃথকভাবে নির্মিত।

শ্রীমতী লিডিয়া যখন আমাকে সেই লেনিন পাড়াবতী যক্ষপুত্রীর দ্বার-প্রান্তে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন, বেলা তখন দুটো। জর্জেনক তরুণ রুশ অধ্যাপক আমাদের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভিতরে ঢুকলুম।

সোভিয়েট ইউনিয়নে শিক্ষা হ’ল আবশ্যিক, এবং সর্বপ্রকার শিক্ষা বিনামূল্যে। কিন্তু পৃথিবীর কোনও দেশে যে-ব্যবস্থাটি আজও নেই, এখানে সেটি বিদ্যমান! এখানে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্র ও ছাত্রী মাসিক বেতন বা ‘স্টাইপেন্ড’ পায়। এখানে যে ছাত্র প্রথম প্রবেশ করে, তার প্রথম মাইনে হয় ৯০০ রুবল অর্থাৎ ১০৮০ টাকা! আমার কবি-বন্ধু ও সাংবাদিক শ্রীমান সমর সেন বাস করেন মস্কাতে। তাঁর ফ্ল্যাটে একদিন মস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এই যুবকের নাম শ্রীমান আদিত্য-প্রসাদ সিংহ, এবং এর বাড়ি হ’ল দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুরে। শ্রীমান আদিত্য ১৫০০ রুবল মাইনে পায় এবং সে যদি ‘বডমান্‌সি চালে’ থাকে তবে তার খাই খরচ এবং সর্বপ্রকার হাত খরচসমেত—সিনেমা, থিয়েটার, যানবাহন মিলিয়ে—মাসিক ১০০০ রুবলের বেশি খরচ হয় না! বাকি টাকা সে ব্যাঙ্কে জমায়। বছরে একবার রিটার্ন টিকিট কেটে যদি বিমানযোগে কলকাতায় যাতায়াত করতে হয় তবে ৪ থেকে ৫ হাজার রুবলের মতো খরচ পড়ে! আদিত্য আমাকে বলেছিল, এখানে প্রত্যেক ছাত্রের অবস্থাই সচ্ছল!

তরুণ অধ্যাপক আমাদের দুজনকে নিয়ে লিফ্টের সাহায্যে উপরে গেলেন। এটি এই অট্টালিকার একাংশ মাত্র। কিন্তু

কতগুলি মহল কতদিকে বিভক্ত হয়ে চলে গেছে সেটি ঠাহর করে বেশিদূর এগোবার চেষ্টা করিনি। খুঁটিয়ে কিছু দেখার সময় নেই এবং আমি এঁদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শন করতেও আসিনি। এখানে দেখতে পাওয়া যায় একটি ভৌগোলিক যাদুঘর, সেখানে বিচিত্র প্রাকৃতিক সামগ্রী সংরক্ষিত। অতঃপর এদিক ওদিক ঘুরে আবাসিক ছাত্রদের ঘরে ঢুকলুম। প্রায় প্রতি ঘরেই রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, গরম ও ঠান্ডা জলের কল, সুন্দর বিছানা, টেবল চেয়ারের সঙ্গে প্রতি ছাত্রের জন্য টেবল ল্যাম্প, কাপড়চোপড় রাখার ব্যবস্থা, একটি আলমারি, জুতা রাখার জায়গা ইত্যাদি। প্রতি ঘরে দুটি করে ছাত্র। এই প্রকার বহু শত সংখ্যক ঘর এক একটি তলায় রয়েছে। যারা বিদেশ-গত ছাত্র তাদের পক্ষে আবশ্যিক নিরম হল, প্রথম বছরে এখানকার ব্যবস্থানুযায়ী রুশ ভাষা শিক্ষা করা। এখানে সমস্ত প্রকার শিক্ষার মাধ্যম হল রুশ ভাষা। এরপর ঘুরতে ঘুরতে আমরা এলুম, ছাত্র এবং ছাত্রীরা যেখানে জলাশয়ে সাঁতার শিখছে! বুঝতে পারা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সমস্ত দেশে যখন তুষারপাত হচ্ছে, ভিতর দিক তখন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে উষ্ণ রাখা হয়েছে! সাঁতার দেবার জল, পারিপার্শ্বিক বাতাস—সমস্তই মধুর উষ্ণতায় ভরা,—যেন চৈত্র সংক্রান্তির দিনে দশাশ্বমেধ ঘাটে ডুব দিচ্ছি!

বয়স্ক তরুণ তরুণীরা একই সঙ্গে সাঁতার শিখছে এটি সর্বত্রই দেখেছি। ঠান্ডা দেশে কুমারী মেয়ের মনে লজ্জা এসে পেঁছতে কিছু সময় লাগে! ওদের ‘শীতল’ তারুণ্য শিথিল হ’তে কিছু দৌর হয়। কারণ শীতপ্রধান দেশে যৌন-চেতনা খুব সহজে আতপ্ত হয় না! বাঙ্গলাদেশে গোলাপ যেদিন ফোটে, পরদিন তার পাপাড়ি ঝরে। ওদেশের গোলাপ দশ বারো দিন ধরে কঠিন বোঁটায় নিজেকে ধরে রাখে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি কারণ এই, রুশ-মেয়েরা অধিকাংশই কুড়ি বছর বয়সের আগে থেকেই চর্বিপ্রধান হতে থাকে, এবং তারই তলায় তাদের যৌবনশ্রী চাপা পড়ে।

ঘুরে বেড়ালুম নানা দিকে। এটি যেন মস্ত এক শহর, এবং সমস্তই এই অট্টালিকার অভ্যন্তরে। এখানে-ওখানে-সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা এক একটি জনতা

যেন একটা তরঙ্গ তুলে আবার যে-যার পথে চলে যাচ্ছে! এটি বিচিত্র শহর!

বিদায় নেবার আগে রেষ্টার সাহেবের কাছে গিয়ে বসলুম। এঁর নাম আইভান পেট্রভস্কি। সামনে লেনিনের মস্ত ছবি। বস্তুত, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্রই লেনিনের বিভিন্ন প্রস্তরমূর্তি ও তৈলচিত্র বর্তমান। তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুর নেই! মিঃ পেট্রভস্কি আলাপ করছিলেন মাতৃভাষায় এবং আমি তাঁর বক্তব্য শুনছিলাম লিডিয়ায় অনুবাদে। ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, এবং তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা। এখানকার ফ্যাকাল্টিটির সংখ্যা এবং বিভিন্ন 'চেয়ারের' আলোচনা চলছিল। ছোট ছেলে-মেয়েরাও এখানে আসে এবং তাদেরকে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সকল প্রকার ব্যবস্থা এখানে আছে। ভারতীয় ছাত্র এখানে অনেক আছে। সম্প্রতি আফ্রিকার 'ঘানা' থেকে আসছে অনেক ছাত্র। ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, যুগোস্লাভ, হাঙ্গেরিয়ান, পোল,—সব দেশেরই ছাত্র এখানে। প্রতি বছরেই সংখ্যা বাড়ছে। চীন, মঙ্গোলিয়ান, কোরিয়ান, জাপানী, ইন্দোনেশিয়ান, বর্মী,—এদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এখানে সিংহলী এবং আফগান-ইরান ছাত্রও অনেকগুলি। প্রথম সর্ব এই প্রত্যেককে রাশিয়ান শিখতেই হবে! ছাত্ররা এখানে চার বার পেট ভরে খায়, এবং একবার জলখাবার অর্থাৎ টিফিন। সকালবেলা রুটি, মাখন, ভিমা, চীজ, ক্রীপ, দই, কড়াইশুটি, সালাড, চপ, বিস্কুট এবং ফল। অনেকে দুধও খায়। আহা! উপরে শাসন নেই। যার যেমন এবং যত ইচ্ছে! দুপুরবেলা এগুলাের সঙ্গে যোগ হয় মাংস এবং সুপ। অপরাহ্নে ফলের পরিমাণ কিছু বাড়ি, হয়ত বা কিছু ভাজাভুজি। এবার আমি বললুম, দেখুন, শীতপ্রধান দেশে নৈশভোজনের চেহারা আমি দেখেছি। ওটা আর না শুনলেও চলবে।

মিঃ পেট্রভস্কি খুব হাসলেন। তারপর বললেন, আপনার ছেলে দুটিকে দিন না পাঠিয়ে এখানে, বেশ ভালই থাকবে। আপনারা তাদের বিষয় আর কিছু ভাবতেই হবে না!

বললুম, তারা আপনাদের দেশের জল-হাওয়ায় বেশ সুস্থ থাকবে মনে করেন?

ভদ্রলোক অতি ভদ্র এবং সরল প্রকৃতির। কিন্তু আমার মূখের ওই

'সুস্থ' শব্দটির উচ্চারণ শুনে শ্রীমতী লিডিয়া একবার বক্র ও সন্দেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তিনি জানতেন, প্রশ্নটি কোন দিক ঘেঁষা! তিনি তাড়াতাড়ি হাসিমুখে বললেন, আপনার এই আশংকা নিরর্থক! মস্কোর জলহাওয়া কি অস্বাস্থ্যকর মনে হচ্ছে? যদি তাদের স্বাস্থ্য না টেকে এখানে, তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন!

ঘণ্টাখানেক আলাপের পর মিঃ পেট্রভস্কির কাছে বিদায় নিয়ে এবং সেই অধ্যাপকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলুম।

পথে নেমে এসে শ্রীমতী লিডিয়া ফেটে উঠলেন, You're a very dangerous person, sir! I know what was your drive!

আমি বললুম, বাঃ, যদি তাদের জল-হাওয়া সহ্য না হয়? যদি কোনও স্থায়ী অসুখ নিয়ে তারা ফেরে?

স্থায়ী অসুখ? মানে? আমি কি জানিনে আপনার মনোভাব? This is the psychology of a man belonging to capitalist country! Don't you think so?

আমি বললুম, তার চেয়ে আপনার ছেলোটিকেই আমি সঙ্গে নিয়ে যাই! সে ছাত্র হয়ে চলুক, ক্যাপিটালিস্ট হয়ে ফিরবে!

এবার শ্রীমতী লিডিয়া উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন,—now I find the cat is out of the bag! ইস, কি ভাগ্য ওই সরল ভদ্রলোকটি আপনার বক্তোক্তি ধরতে পারেননি! আশ্চর্য, আজও আপনার সংশয় ঘুচল না!

লেখক সঙ্ঘের অন্যতম কবী শ্রীমতী হেলেন রমানভা আমার জন্য একটি নতুন ভ্রমণ ব্যবস্থা করতে পারেন এটি শুনছিলাম। কিন্তু দেশ থেকে চিঠি আসতে দেরি হাচ্ছিল বলে মনে কিছু উদ্বেগ ছিল। ওঁরা আমার এই নতুন ভ্রমণের জন্য অপর একটি দোভাষী নিযুক্ত করতে চান। মেয়েটির বয়স কিছু অল্প, নাম শ্রীমতী মায়্যা। ইনি ইতিহাসের ছাত্রী ছিলেন। বর্তমানে লেখক সঙ্ঘে কাজ করেন। আমার সঙ্গে শ্রীমতী মায়্যার পরিচয় ছিল না। কিন্তু কথায়-কথায় দোভাষী বদলানো কিছু ক্লান্তিকর এবং কিছুটা বিরক্তিকরও বটে। নতুন মেয়ে মানেই আবার নতুন করে আমার মোজাজ-মর্জির সঙ্গে তাকে মিলিয়ে গুড়োঁপটে নেওয়া! সেখানে

ধৈর্যের প্রশ্ন আসে। আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি চারজনের মধ্যে। প্রথম, শ্রীমতী অকসানা, তিনি অতিশয় ভদ্র, বিচক্ষণ এবং বিদূষী। শ্রীমতী নাটাশা, বর্ণাঢ্য এবং বুদ্ধিমতী। শ্রীমতী মেরিয়ম কতবানিস্ট, পরিশ্রমী এবং অতি সংপ্রকৃতি। শ্রীমতী লিডিয়া তেজস্বিনী, উদ্যমশীলা এবং জাতকমিউনিষ্ট। তাঁর অন্ধ দেশানুরাগ আমার পক্ষে কোঁড়কের বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি লেখক সঙ্ঘের কর্মী নন।

সৈদিন উক্কাইন হোটেলের নীচের তলাকার লবিতে যিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁর নাম মিঃ কনস্টান্টিন চুগোনভ। ইনি লেখক সঙ্ঘের সহকারী সেক্রেটারী, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। এঁর কাজ হল বিদেশাগত অতিথিগণের আদরঅভ্যর্থনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। ইনি মিষ্টভাষী, শান্ত এবং অতি ভদ্র। এঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ তাসকন্দে। এই সৌম্যদর্শন ব্যক্তির বড় বড় চোখের অতি অমায়িক ও নিরীহ চাহনি লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে তাসকন্দে কেন জানিনে আমার গা ছমছম করত! দু'মাস পরে আমাকে বিদায় দেবার দিনে এই ব্যক্তি যখন হাসিমুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সকলের কথাই বললেন, কিন্তু আমাকে কেমন লাগল, কই বললেন না ত?—আমি সৈদিন বলেছিলাম, আপনার সৌজন্য, শালীনতা, সংযম ও মিষ্টতা দেখে বার বার আমার মনে হয়েছে আপনি বোধ হয় পদূলিশের লোক!—মিঃ চুগোনভ তৎক্ষণাৎ বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন! আমার ডিস্ট্রিক্টের পদূলিশ-ইউনিয়ন থেকে আমরা মিলিচ-মেন্ সাপ্লাই করি!

পরের বছরে সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়ন বোর্ডের তরফ থেকে মিঃ চুগোনভই আমার নিকট টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানান। ইনি আমার বিশেষ প্রিয় ছিলেন এই কারণে যে, ইনি কোথাও নিজেকে অস্পষ্ট রাখেননি।

নাটাশা আমার ঘরে বসে সেই সময় আলাপ করছিলেন। মিঃ চুগোনভের টেলিফোন পেয়ে নাটাশাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নীচে নেমে এলুম।—চুগোনভ বললেন, বাঃ এ কেমন কথা! ১৪ই তারিখে কেমন করে যাবেন? আপনার জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়েছে যে?

কোথায়?

টান্স-ককেশিয়ান 'শোচি' শহরে।

আপনি বললে সীট বুক করি! পরশু যাবেন। লিডিয়া যাবেন আপনার সঙ্গে!

আমার তৃতীয়বার দিল্লী যাওয়া স্থগিত হল! মিঃ চুগোনভকে এবং তাঁর মারফৎ ম্যাডাম রমানভকে ধন্যবাদ জানালুম। রাতে শ্রীমতী লিডিয়া ফোনে জানালেন, বেলা ৯টায় প্লেন,—আপনাকে সকাল সাড়ে ৭টায় বেরোতে হবে!

ট্রান্স-ককেশিয়ায় যেতে গেলে মস্কো থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে নেমে আসতে হয়। রেলগাড়িতে চড়ে একটু দেখে-শুনে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ করতে গেলে দশ বছরের বেশি আর কতদিন সময় লাগে সেটি হিসেব করতে হয়। তাছাড়া তিন-চতুর্থাংশ রাষ্ট্রে রেলপথই নেই। মোটরপথ বহু আছে, কিন্তু পথের অনধিগম্যতা অনেক বেশি। সোভিয়েট ইউনিয়নের দূ-তৃতীয়াংশ এখনও দূস্তর বলেই বিমান চলাচল ওখানে 'ডেল প্যাসেজারের' মতো! ওদের দেশে জেট বিমানই 'ডেল প্যাসেজার'। তার ভাড়া প্রথম শ্রেণীর ট্রেনভাড়া অপেক্ষা অনেক কম। আমরা দুজন একটি জেট বিমানে যাচ্ছিলাম। যাত্রীসংখ্যা মাত্র ৬ জন, তার মধ্যে ৪ জন যুগ্মোচ্ছে!

বিমানপথে আমরা যে-অঞ্চলটি অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলাম, সেটি হল রাশিয়ার সুপরিচিত 'কালি-মাটি'র দেশ, যাকে বলা হয় "Black Earth Region"। এই মস্তু ভূভাগ—যেটি সম্মিলিতভাবে আমাদের উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যভারতের সমান,—এটি চিরকাল একটি সমস্যার মতো দাঁড়িয়ে ছিল। এটি নাবালভুমি, কৃষ্ণবর্ণ, জলা-জংগল-বিল ও কতকটা অস্বাস্থ্যকর, ন্যাতিশীতোষ্ণ, এবং স্যাঁত-সেঁতে। দক্ষিণের এই পথ দিয়ে বিভিন্ন শাখাবর সম্প্রদায়, তাতার আক্রমণকারী, কসাক দস্যু, কালমুক, ইত্যাদি বর্বর ও অসভ্য জাতিরা মস্কো জয় করতে যেত, এবং পথে পথে রক্তপাত, আগুন, ও লুটতরাজের কাহিনী লেখা হত! পূর্বের ইতিহাসে এই 'কালামাটি' ছিল জন-বিরল। তারপর ধীরে ধীরে মস্কো শক্তি সংগ্রহ করে, এবং এই ভূভাগে তারা এক শ্রেণীর "সামরিক গোষ্ঠী" এবং তাঁদের সঙ্গে সংখ্যাভীত 'ভূমিদাস বা Serf' সম্প্রদায়কে এনে বসায়। কিন্তু এর দ্বারা রাশিয়ার অপর একটি কলঙ্কের ইতিহাস নতুন করে আরম্ভ হল। কেননা সামরিক গোষ্ঠী হয়ে উঠল মধ্য-বর্গীয় সশস্ত্র জমিদার গোষ্ঠী,—ছোট ছোট একেকটি রাজা,—এবং তাদের উপাধিভূমির সামগ্রী হল লক্ষ লক্ষ ভূমিদাস, যাদেরকে এর আগে আমি দাসানুদাস আখ্যা দিয়ে এসেছি! অথচ অন্যদিকে এই 'কালামাটি' ভূভাগ হল রুশ জাতির অসংস্থানের ক্ষেত্র। অপরিসীম এর উর্বরতা এবং ফসলাৎ-প্রাদুর্ভাব। মারামারি ও বিরোধ

সেইখানে। বিপ্লবের বীজ ওখানেই অঙ্কুরিত হয়। কেননা অর্থনীতিই জীবননীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে! যারা মনে করে, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের "ডিসেম্বরিস্ট" বিপ্লব, এবং ১৯০৫ ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব,—এইমাত্র তিনটি বিপ্লবই সংঘটিত হয়েছে, তারা ভ্রান্ত! রুশ সাম্রাজ্যে ২৫০ বছরের মধ্যে কম-বেশি ৫৭০টি 'জনবিপ্লব' সংঘটিত হয়েছে। এই সাম্রাজ্যের প্রাতিটি রক্তবিন্দুর মধ্যে ছিল হিংসা, ঘৃণা, বর্বরতা, নীচতা, ক্রুরতা, শয়তানি এবং সবব্যাপী অসত্যতা। এই বিরাট ভূভাগের ঐতিহ্যে পাওয়া যায় নৈরাজ্যবাদ, ঈশ্বরবিরোধ, নির্দয়তা, ধর্মান্ধতা, নীতিজ্ঞানহীনতা,—এবং মানবতাবিরোধী সর্বপ্রকার আত্ম-অপমান! দাঙ্গা, অরাজকতা, দারিদ্র্য, শোষণ, প্রবঞ্চনা, চুরি, ডাকাতি, এগুলা ছিল নীত্যকর্ম। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরেও সুদীর্ঘকাল ধরে জনঅভ্যুত্থান ঘটেছে, কেননা লেনিনের 'মাক্সার প্ল্যান' হজম করতে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর লেগেছিল অনেক! বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে হিটলারের সৈন্যবাহিনী যখন উক্কাইনের ভিতর দিয়ে দৃঢ়পদক্ষেপে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন বহু অঞ্চলে সোভিয়েটবিরোধী জনঅভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু এর ইতিহাস বাইরে প্রকাশ করা হয়নি।

এই সুবিশাল 'কালামাটি' অঞ্চল এখন ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, 'ওরেল, কারস্ক, বেলগোরদ, ভরনেজ, লিপেটস্ক, তামবড এবং বাল্লাশভ' অঞ্চল। 'কালামাটির' ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে ওকা, সীম ও ডন প্রভৃতি নদ-নদী। এই ভূভাগে এখন খাদ্য, জুতা, তুলাজাত সামগ্রী, ষাঁড়পাথর, রাসায়নিক পদার্থ এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। 'বেলগোরদ' নামটির শব্দার্থ হল, 'শেবতবর্ণ শহর'। ভরনেজ শহরটি প্রতি-ষ্ঠিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে, তখন তাতার তুর্কি ও শাখাবর দস্যুর হাত থেকে দেশরক্ষার জন্য এখানে একটি বৃহৎ দুর্গ নির্মাণ করা হয়। এই শহর এখন মস্তু সংস্কৃতির কেন্দ্র। এটি 'ভর-নেজ' নামক নদীর উপরে দাঁড়িয়ে। সম্রাট পীটার-দ-গ্রেট এখান থেকে দক্ষিণাপথে শত্রু প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতেন!

আমাদের বিমানটির গতি যথেষ্ট দ্রুত নয় এবং উচুতেও ওঠেনি। কিন্তু যত দক্ষিণ, ততই উষ্ণতার স্পর্শ! রৌদ্র এবার কিছু উজ্জ্বল, মেঘের সঞ্চার কিছু কম! এদিকে তন্দ্রা এসেছিল শ্রীমতী লিডিয়ার চোখে। কিন্তু 'কমিউনিষ্ট' কর্তব্যনিষ্ঠার প্রখর উদাহরণ তিনি! হোস্টেস চা ইত্যাদি আনতেই তাঁর তন্দ্রা ছুটল, এবং তিনি তাঁর তহবিল থেকে ৫।০টি আপেল, আগুর এবং মাংসের খাবার বার করলেন।

এই দুঃস্বপ্নাক্রমণ জাত-রুশ নারীর

মুখে চোখে আনন্দশ্রী দেখে একসময় ভারতীয় কৌতুহল জাগল। প্রশ্ন করলুম; আপনার চোখে অমন নীলাভা কেন?

আমি উত্তরের মেয়ে! ঠান্ডার দিকে আমাদের চোখ থাকে—তাই!

একটু সাহস-পেয়ে আবার প্রশ্ন করলুম, এ যাত্রা কেমন লাগছে আপনার? শ্রীমতীর মনে বোধ করি ঈষৎ উচ্ছ্বাস ছিল। তিনি হাসি-মুখে একটু কাব্য করে বললেন, "as happy as a swan floating in the unknown blues"!

ঈষৎ বিস্ময়ে বললুম, কিন্তু এভাষা ত' কমিউনিষ্টের নয়!

লিডিয়া বললেন, but 'am a human being'!

জলযোগাদির পর ওঁর চোখ আবার তন্দ্রায় জড়িয়ে এল। ভোর বেলার উনি বোধহলে, আপনার যাবার আয়োজন করতে গিয়ে দু'রাত আমি চোখ বুজিনি! উনি নাকি প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টার বেশি ঘুমান না!

আমরা ভল্গা এবং ওকা—এই দুই নদের অববাহিকার উপর দিয়ে ভাস-ছিলাম। এ অঞ্চলে রুশরা আসে গ্রন্থাদশ শতাব্দীতে! অতঃপর ষোড়শ শতাব্দীতে 'আইভান গ্ৰজনির' আমলে যখন কাজান ও অস্ট্রাখান অঞ্চল অধিকার করা হয়, তখন রুশরা এই ভূভাগে আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একদা এই ভল্গা নদ ছিল দুই বিরোধী পক্ষের মাঝখান-কার বাবধান সীমানা। এপারে অস্ট্রসবজায় সজ্জিত রুশ ওপারে সশস্ত্র তাতার এবং বিভিন্ন উপজাতির দল। এই বিশাল ভল্গা নদীর অপর নাম, "গ্রেট রাশিয়ান রিভার", এবং এর দুই পারে দাঁড়িয়ে রাশিয়ার অনেক ইতিহাস এবং অনেক-কালের ভাগ্য বারবার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে! একশ বছর আগে ভল্গার পূর্বপারে থেকে সাইবেরিয়া আরম্ভ হত। ওপারে তখনও জমিদার গোষ্ঠীর রাজত্ব ভেমন প্রতিষ্ঠালাভ করেনি, সেই কারণে এপার থেকে ভূমিদাসের দল ওপারে পালিয়ে বাঁচত! এই ভূমিদাসপ্রথার অবসান ঘটে ১৮৬১ সালে। আমাদের পদতলবতী ভল্গা নদ হল রাশিয়ার অর্থনীতিক প্রাণসূত্র। এই নদ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে কাশ্যপ সাগরে মিলেছে। এর দুই পারে যে বৃহৎ কয়েকটি নগর গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে কাস্ট্রোমা, গোর্কি, কাজান, উলিয়ানভস্ক, কুইব-শেভ,সারাটভ, কমিশিন, গ্টোজিনগ্রাড, ও অস্ট্রাখান অতি প্রসিদ্ধ। কৃষসাগরের অডেসা ও কাশ্যপ সাগরের অস্ট্রাখান—এই দুই বৃহৎ বন্দর-শহর সোভিয়েট অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের মস্তু ঘাঁটি। ভল্গার জলের সরবরাহ হয় প্রধানত উত্তরের তুষারলোকের বিগলন এবং শরৎকালের বর্ষাধারা থেকে। এ নদের দৈর্ঘ্য হাজার মাইলের মতো। এই

নদের দুই পারে এখন শতকরা ৯০ জন রাশিয়ান, কিন্তু আরও যে সব জাতি বাস করে তাদের মধ্যে 'মারি' হ'ল প্রধান,— তাদের নিজ রাষ্ট্র হল, মারি অটোনমাস রিপাবলিক। এরা ছাড়াও আছে তাতার, চুভাষ, উদমর্ত, মর্দোভিয়ান ইত্যাদি। ভল্গার বহু অঞ্চল পার্বত্য, অরণ্যময় এবং অনধুষিত। এই ভল্গারই মধ্য অঞ্চলে 'সিম্‌বারস্ক' নামক নগরীতে 'ভ্যাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ' অর্থাৎ লেনিন একটি তাতার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন! এখন সেই নগরীর নাম, 'উলিয়ানভস্ক'।

রাশিয়ায় এককালে 'জার্মানদের' সমার এবং আধিপত্য ছিল প্রচুর। দুশো বছর আগে সম্রাজ্ঞী স্ভিতীয় ক্যাথারিনের রাজত্বকালে 'ফর্মালজার' দ্বারা আমন্ত্রণ জানিয়ে বলা হয় বিদেশীরা এসে যদি রাশিয়ায় তাদের এক একটি উপনিবেশ গড়ে তোলে, তাহলে সম্রাজ্ঞী সুখী হ'ন। তাঁর এই আহবানে অনেকেই সাড়া দেয়, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসে। কিন্তু জার্মানরা আসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায়। তারা নিজেদের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে দক্ষিণ ভল্গায় এক বিরাট উপনিবেশ গড়ে তোলে, এবং অনেকগুলি অঞ্চল তাদের হাতে সম্মুখ হয়ে ওঠে। শিল্পে, বাণিজ্যে, বিদ্যায়, নির্মাণকলায় তারা সর্বত্র উন্নতি করে। কালক্রমে এরাই 'ভল্গা জার্মান' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অতঃপর রাশিয়ার সর্বত্রই এই 'ভল্গা জার্মানরা' ছড়িয়ে পড়ে। এদের এক একটি বৃহৎ ভূভাগ দান করা হয়েছিল। এরা অর্থসাহায্য পেত। রাজস্ব দেবার হাত থেকে এরা অব্যাহতি লাভ করত, এবং সামরিক কাজের বাধ্যবাধকতা থেকে এরা মুক্ত ছিল। এদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতাও স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছিল। এইভাবে 'ভল্গা জার্মানরা' একটি উন্নতিশীল, পরিশ্রমী এবং ধনবান জাতিতে পরিণত হয়ে ওঠে এবং বংশ পরম্পরায় এরা একটি জাতীয়তাবাদী 'জার্মান সম্প্রদায়' হিসাবেই রাশিয়ার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এরা কেবল ভল্গায় নয়, বেসারাবিয়া, ককেশাস, উক্রাইন, অডেসা প্রভৃতি বহু অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে। এদের নিয়ে লেনিনের আমলে একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, এবং তার নাম দেওয়া হয়, 'ভল্গা জার্মান অটোনমাস রিপাবলিক'। অবশ্য প্রথম মহা-যুদ্ধের কালে এই প্রথম জাতীয়তাবাদী জার্মান সম্প্রদায়কে সাইবেরিয়ায় পাঠবার কথা উঠেছিল, কিন্তু সোট আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে নাৎসীবাহিনী সোভিয়েট ইউনিয়নকে যখন আক্রমণ করে, তখন রাতারাতি এই "জার্মান রিপাবলিকটি" ভেঙ্গে দেওয়া হয়, এবং ৪ লক্ষ জার্মানকে নির্বাসনে পাঠানো হয়! মোট কত লক্ষ জার্মান

সোভিয়েট ইউনিয়নে ছিল জানিনে, কিন্তু চারিদিকের লক্ষ লক্ষ জার্মান যারা সোভিয়েট নাগরিক এবং যারা বংশ পরম্পরায় স্ত্রী পুত্র পরিবারসহ সোভিয়েট ইউনিয়নকেই আপন মাতৃভূমি মনে করে, তারা কেউ দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি। আজও সোভিয়েট নাগরিক হিসাবে প্রচুর সংখ্যক জার্মান আছে মস্কো, লেনিনগ্রাড, আর্কটিক, সাইবেরিয়া এবং মধ্য এশিয়ার বহু অঞ্চলে।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে জানা যায়, উক্রাইন ও অন্যান্য স্থলের 'জার্মানরা' নাৎসী সৈন্যদলের নানাকাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল এবং আরও যে কয়টি খণ্ডজাতি বা ককেশিয় উপজাতি স্টালিন-বিরোধী ছিল তাদেরকেও একপ্রকার সাংঘাতিক নির্দয়তার সঙ্গে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে নির্বাসিত করা হয়। এইসব খণ্ডজাতির কারও নাম "কালমুখ", কারও নাম "ক্রাইমিয়ান তাতার", কারও নাম "চেচেন-ইনগুশ", কারও নাম বা "কারাচে"। এরা ছিল চিরকালের দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতি, এবং অধিকাংশই গোঁড়া ও ধর্মাত্মক মুসলমান। কোনওকালে এরা বশ্যতা স্বীকার করেনি এবং এরা অতিশয় গর্বিত এবং স্বাধীনচেতা ছিল। এদের নিজেদের রাজা ও রাজপাট ছিল, এবং এরা এককালে রাণী ক্যাথারিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। এরা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধেও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ করে এবং তুড়ি মেরে 'কলেকটিভ ফার্মের' ব্যবস্থা উড়িয়ে দেয়! এদের নিজস্ব রাষ্ট্রের নাম ছিল, "চেচেন-ইনগুশ অটোনমাস রিপাবলিক"। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে স্টালিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই রিপাবলিক এবং এর ৫ লক্ষ অধিবাসীকে একটি 'ফুৎকারে' উড়িয়ে দেন। শোনা যায়, "চেচেনরা" জার্মান আক্রমণকালে ১৯৪১-৪২ সালে জনৈক নব্য কবি—হাসান ইসরাইলের, নেতৃত্বে সর্বশেষবারের মতো স্টালিনের অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সম্প্রতি প্রধান-মন্ত্রী মিঃ খ্রুশ্চভ সেইসব বিস্মৃতপ্রায় এবং বিক্ষিপ্ত উপজাতির নিরপরাধ নরনারীকে চারিদিক থেকে ডাক দিয়ে তাদের যথাস্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন!

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারীর রাতে মিঃ খ্রুশ্চভ কমিউনিষ্ট পার্টির বিশ্লেষণী অধিবেশন উপলক্ষ্যে বে-গোপন ভাষণটি দেন, সেইটির একস্থলে তিনি বলেন, "(Stalin) practised brutal violence not only towards everything which opposed him, but also towards that which seemed, to his capricious and despotic character, contrary to his concepts. Stalin acted not through persuasion, explanation and patient co-operation with people.... Who ever opposed was doomed to

removal and subsequent moral and physical annihilation...."

"কালমুখ" নামক একটি খণ্ডজাতি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দক্ষিণ ভল্গা ও কাশ্যাপ সাগরের মাঝামাঝি অঞ্চলে যাবাবরদের মতো বাস করত। তারা জাতিতে ছিল বৌদ্ধ এবং মঙ্গোল বংশসম্ভূত। লেনিন তাদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। 'কালমুখ অটোনমাস রিপাবলিক' নামক একটি রাষ্ট্র তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং তাদের রাজধানী ছিল, 'এলিস্তা'। এদের একটি দল যোগদান করেছিল লাল ফৌজে, কিন্তু আরেকটি দল নাৎসীবাহিনীর সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন ছেড়ে পালিয়ে যায়! সম্ভবতঃ এই কারণেই স্টালিন উক্ত 'কালমুখ রিপাবলিক' এবং 'কালমুখ' সম্প্রদায়কে সোভিয়েট মানচিত্র এবং সোভিয়েট অভিধান থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেন! "ক্রাইমিয়ান তাতার" বলে যারা পরিচিত ছিল, তারা নাৎসীবাহিনীর চর বলে সিদ্ধান্ত হওয়ায় তাদেরকেও সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'রে 'ক্রাইমিয়ান রিপাবলিক' নষ্ট করা হয়। ক্রাইমিয়া এখন উক্রাইনে।

আমাদের বিমান এবার ধীরে ধীরে নেমে এল 'স্টালিনো' নামক একটি কল্যাণকেন্দ্রিক নগরে। এখানে আধঘন্টার জন্য আমাদের ছুটি। শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, চলুন, একটু বাইরে ঘুরে আসি।

বাইরে রৌদ্রতপ্ত মাঠে এসে আমরা নামলুম। বাতাস তপ্ত এবং রুদ্ধ। দূরে দূরে বন্য ঝাউ, চারিদিকের বর্ণ যেন ধূসর স্বপ্ন। আমি আবার সেই উক্রাইনে প্রবেশ করেছি! এই শূন্য গরম বাতাস ও রোদে দাক্ষিণ্য বড় কম।

এই অঞ্চল খনিজসম্পদ প্রধান, এবং এটি 'ডনেৎস বেসিন'-এর অন্তর্গত। 'ডনেৎস বেসিন'কেই ছোট ক'রে বলা হয়, 'কুজুবাস'। স্টালিনো শহরের কিছু দক্ষিণে মৎস্যপ্রধান সমুদ্র 'আজব' সাগর। এই সাগর অতিক্রম ক'রে আমাদের বিমান প্রবেশ করবে উত্তর ককেশাস অঞ্চলে। এখানে অপর প্রধান নগরটির নাম হল, 'ভরশিলভগ্রাড'। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান অংশ হল কসাক জাতি। এই জাতির প্রধান কর্মকেন্দ্র 'রস্টভ-অন্ডন' নামক বৃহৎ নগর।

উত্তর ককেশাসের একদিকে 'ডনবাস' খনি অঞ্চল, অন্যদিকে লেনিন ভল্গা-ডন ক্যানাল। এই দুই বৃহৎ নদীর জল একত্র ক'রে বে 'ড্যাম' বা কৃত্রিম জলাশয় প্রস্তুত করা হয়েছে, তার আয়তন হল ৬০০০ বর্গমাইল। এই ভল্গা-ডন ক্যানালের পূর্বপ্রান্তে 'বীরনগর' স্টালিনগ্রাড বা 'ভলোগোরদ' নগরী দৃশ্যমান!

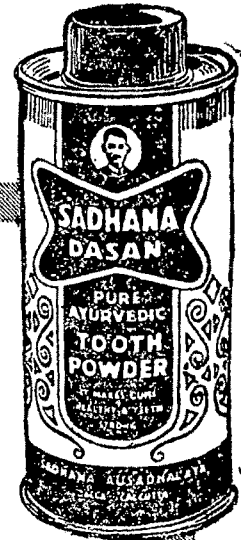
বিমান এবার ছাড়ল এবং আমরা পুটলি খুলে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসে গেলুম। (ক্লমঃ)

মুখের দুর্গন্ধ অতি অস্বীতিকর



মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে সমাজে
অবাধ মেলামেশা করা যায় না।
কাজেই ইহা অনেকের জীবন
দুঃখময় করে। প্রতিদিন সাধনা
দশন ব্যবহার করিলে মুখের
দুর্গন্ধ দূর হয়, মুখ জীবাণুমুক্ত
হয় ও দন্তরাজি সুস্থ, সবল
ও সুন্দর হয়।

সাধনা দশন



সাধনা ঔষধালয় - ঢাকা

২০৬নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর

কলিকাতা-৪৮



অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেন্দ্র বোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী,
এফ. সি. এস. লেওন এম. সি. এস. (বাসেয়িকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেন্দ্র বোষ,
এম. বি. সি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদশাস্ত্রী।

সাহিত্য দেবত্ব চক্রবর্তী

সত্যকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়—জ্ঞানের সত্য ও ভাবের সত্য। রিচার্ডস্‌ ভাষার আবেগময় প্রয়োগ ও জ্ঞানময় প্রয়োগের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করেছেন। তিনি কবিতার ক্ষেত্রে জ্ঞানের সত্যকে নিশ্চিতভাবে অনুসরণ করেন নি। তাঁর মতে, শিল্পকৃতিতে প্রযুক্ত সত্যের একমাত্র অর্থ হচ্ছে শিল্পকৃতির অন্তর্নিবন্ধ বা যথার্থ্য, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্য যেখানে বাস্তবতার প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলিত, সেখানে শৈল্পিক সত্য আন্তর-সংস্কৃতির বিষয়। আলেকজান্ডার সেলস্‌কার্‌ জীবনের প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে 'রবিনসন ক্রুসো'র বর্ণিত বিবরণের একসম্প্রদায়ের মাঝে নয়, তার ঘটনাবলীর প্রতি আমাদের মনের উদগ্র কোতাহলের মাঝে বিচিত্র বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতাই এই রোমাঞ্চময় কাহিনীর সত্য। প্রাগ্‌দুপসংহার পর্যন্ত 'ডন কুইকস্মো' অথবা 'কিং লায়র' বাদের মনে গভীরভাবে সাড়া জাগিয়েছে ঐ রচনা দুটির পরিসমাপ্তির অপ্রকৃত তাদের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ দিক থেকে সত্য অন্তর্নিবন্ধ বা যথার্থ্যের সমমূল্য এবং তা অভিজ্ঞতার অনুরূপ অথবা তার পূর্ণতাসাধনে তৎপর।

'রবিনসন ক্রুসো' বা 'কিং লায়র'র সত্য বস্তুধর্মী সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বর্ণিত বিবরণের গ্রহণযোগ্যতার নির্ধারণকারী কাহিনীর সকল ক্রিয়া হচ্ছে মনোবৈজ্ঞানিক ক্রিয়া। 'কিং লায়র'র পারিপার্শ্বিক প্রাপ্তি, কারণ তা নাটকের অবশিষ্ট অংশের বিরোধী। প্রকৃত মনো-বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার উন্নয়নের জন্যে অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন মানসাবস্থার মধ্যে এবং সেই মানসাবস্থা ও বিশ্বজগতের মধ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্যে সমগ্রভাবে নাটকটি অকৃত্রিম। তাই রিচার্ডস্‌ বলেছেন, 'কিং লায়র' পড়বার সময় আমাদের কোনো প্রত্যয়ের প্রয়োজন নেই, কারণ প্রত্যয় বস্তুধর্মী সত্যের দাবীতে আত্ম-

ধৃত সংস্কৃতি ও অন্তর্নিবন্ধকে বাধা দেয় যাকে তিনি নাটকের ক্ষেত্রে একমাত্র সত্য বলে অনুমোদন করেছেন। এভাবে তিনি বিজ্ঞান ও কবিতার সংঘাতের মীমাংসা করেছেন, এটি যেমন তাঁর তেমন নিপুণ। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, বিজ্ঞান ও কবিতার মিলনের কোনো সাধারণ ক্ষেত্র নেই, ফলে সংঘাত হতেই পারে না। এরা ভাষার মৌলিক বিভিন্ন কলাকে ব্যবহারোপযোগী করে।

'রবিনসন ক্রুসো'তে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা সে করতে পারে না, কারণ কাহিনীর গোড়ার দিকে তার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা গড়ে উঠেছে তা এদের দ্বারা লঙ্ঘিত হয়। 'কিং লায়র'র পরিসমাপ্তিও নাটকের পূর্ব-তন অংশের সঙ্গে সদৃশমুখ্য নয়। তবু একটি বিশেষ উপন্যাস বা নাটকের পূর্ব-গামী অধ্যায়ে বা দৃশ্যে বিধৃত বিষয়ের তুলনায় অধিকতর বিষয় আমাদের প্রত্যাখ্যানের মনোভাব গঠনে কার্যকর বলে মনে হয়; আমাদের প্রবণতা মানবজীবনের সঙ্গে সমগ্র পূর্ব-পরিচয়ের অভিমুখে এবং এর দ্বারাই আমরা প্রভাবিত হই। যখন আমরা এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ক্রুসো এ কাজ করতে পারে না তখন একান্তভাবে নির্ভর করি মানবিক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ধারণার ওপর। এ সব ধারণা সম্ভবত খুবই সাধারণ, তবে তারা নির্দেশ করে শিল্পকৃতির ব্যবহারিক সীমার বহির্ভূত জগতের প্রতি। এমন কি শিল্পের উপকথা, বা কাল্পনিক রূপকথা কিংবা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের জগৎ আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে সকল সংযোগ ছিন্ন করে না।

রিচার্ডস্‌ জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে সৃজনী সাহিত্যকে পৃথক করেছেন। এখন, এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যদি বলা যায় যে, 'ম্যাকবেথ' স্কটল্যান্ডের অপদার্থ ইতিহাস সম্বন্ধে শেক্সপীয়রের

পাঠকের উদ্দেশ্য হবার কোনো প্রয়োজন নেই অথবা চাঁদের অধোপ্রান্তে তারার স্থাপনের মতো বিজ্ঞানের দিক থেকে অসম্ভব বিবরণ দ্বারা কোলরিজের পাঠকের বিশৃঙ্খলিত হবার কোনো কারণ নেই, তবে সামান্য তর্কের অবকাশ থাকে। এই পর্যায়ে সাহিত্য ও ইতিহাস এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রভেদ নির্ণীত হয়েছিল গ্রীক ও রোমানদের দ্বারা। রিচার্ডস্‌ তাঁর মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত যুক্তির দ্বারা অধিকতর প্রগতিপূর্ণভাবে বলেছেন, কবিতা হচ্ছে সাহিত্যগত প্রলাপ, তবে তা বিশেষ মূল্যবান ও গৌরবময়। অ্যালেন টেট্‌ ও জন র্যানসম্‌ কিন্তু শিল্পের সত্যকে পরম বলে স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে, জ্ঞানের সত্যই যথার্থ সত্যের মর্যাদায় ভূষিত। তাই রিচার্ডস্‌ যখন শিল্পের ক্ষেত্র থেকে জ্ঞানের সত্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন তখন টেট্‌ ও র্যানসমের মতো সমালোচকের পক্ষে এর প্রকৃত কারণ নির্দেশ করা দুঃসাধ্য।

শিক্ষাদানের রীতি যে প্রকাশমান কবিতার অন্তরঙ্গ অর্থাৎ কবিতা যে এক ধরনের বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত—এই ধারণাকে এলিয়টের চেয়ে অধিকতর পূর্ণভাবে ব্যক্ত করেছেন অ্যালেন টেট্‌। কোনো কিছুর বিবরণই হচ্ছে কবিতা—উইন্টারের এই মতকে প্রত্যাখ্যান করে টেট্‌ কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন, কবিতা হচ্ছে আপন সমগ্রতায় সম্পন্ন একটি ক্রিয়া। এই ক্রিয়া বিজ্ঞানের মতো পদ্ধতির কিংবা ধর্মের মতো পরিণামের চিরব্যবহারসিদ্ধ নয়। কারণ এখানে পাঠকের নিজস্ব সিদ্ধান্তের গুরুত্বও স্বীকৃত। তাহলে একথা মানতেই হয়, নীতিবাদী কবি, আলংকারিক কবি প্রভৃতির ক্ষেত্রে সত্যের বিভিন্নতা রয়েছে। আপন বস্তুকে যথার্থভাবে উপস্থাপিত করাই সত্য। কিন্তু যদিও কবিতা একটি প্রমাণাত্মক বিবরণী তবু টেট্‌ তাকে কল্পনাপ্রসূত মনোধর্মী উদ্ভাবন বলে স্বীকার করেন নি। তিনি বস্তুর ওপর আরোপিত রূপক-উপমা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, কারণ তারা বস্তু থেকেই উৎসৃষ্ট। কবি কোনো পূর্বনির্ধারিত রীতিতে তাঁর কথাকে সজ্জিত করেন না। তিনি তাঁর রীতিকে অভিজ্ঞতার ওপর স্থাপন না করে অভিজ্ঞতায় অন্তর্নিহিত প্রকরণকে উদ্ঘাটিত করেন। 'বস্তু থেকে উৎসৃষ্ট' এবং 'সমগ্র অভিজ্ঞতায় স্বয়ং-সিদ্ধ' এই অলংকারসমৃদ্ধ বাক্যাংশ

দৃষ্টির প্রকৃত অর্থ নিরূপণে সচেতন হওয়া উচিত। তবে প্রকল্পনা যে শুধু খেয়ালের সামগ্রী এই দৃষ্টিকে তারা নিশ্চিন্তভাবে অগ্রাহ্য করে; তাদের নিগূঢ় অর্থ হচ্ছে, প্রকল্পনা মানবিক মনে জটিল বিধির অনুসারী এবং সকল মানবিক অভিজ্ঞতাই চূড়ান্তভাবে একক।

টেটু এ সব ধারণাকে এত বিস্তৃতভাবে বলেন নি। অনেকের মতে, মানবিক মনের চরম একত্ব যে বিশেষ বিশেষ কবিতার ভালো-মন্দের নির্ণায়ক বিধির মাঝে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতে পারে, এই দৃষ্টিকে তিনি প্রতিহত করেছেন। কিন্তু অবস্থাস্বামী মানবের মৌলিক একত্ব অতিক্রম করে চলে অসংখ্য প্রভেদকে যা প্রাতিস্বিক মানবের মধ্যে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় ও সংস্কৃতিগত মানবের মধ্যে অনৈক্যের সীমারেখাটি অঙ্কিত করে। এরকম একটি প্রতিষ্ঠিত বর্তমানে জটিলতা বান্ধি করেছে। সম্ভবত একে উজ্জ্বল বোধের আলোকে বিশ্লেষণ করা উচিত। কারণ যদি আমরা মোটের ওপর কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলতে প্রবৃত্ত হই তবে এটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যদি আমরা একে গ্রহণ না করি তবে নানা প্রকারের সামাজিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সরণী-করণের নামে আমরা অবশ্যম্ভাব্যরূপে পরিত্যাগ করি কবিতার নন্দনতত্ত্বের প্রত্যয়েকে।

এই নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে অথবা সজীব শিল্পকৃতির দিক থেকে বলা যায়, বিষয় ও ভাষা পরস্পর পৃথক ও বিশ্লেষণীয়। শিল্পদৃষ্টি নিঃশেষে এত বোঁশ ঐন্দ্রিয়িক যে, নৈব্যক্তিক শিল্পরূপে সূচিত হয়; অর্থাৎ রচনা তার আপন আন্তর-তত্ত্বের অনুসারে মূর্তি লাভ করে এবং তা লেখকের অহং-এর সূচক পদার্থমাত্র নয়, তাঁর অনুভূতির দ্যোতনা অথবা তাঁর মতের নিশ্চিত প্রকাশ। লেখক সকলের জীবনকে স্বকীয় সৃষ্টির মাঝে বিধৃত করতে চান; কিন্তু তাঁর শিল্পী-বিশেষকে তাঁকে প্রতিহত করে এবং তখন সামান্যের মাঝে যা অলোকসামান্য তাকে তিনি উজ্জ্বল করে তোলেন নিগূঢ় নিরীক্ষায়। লেখক এই ভিত্তি অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে, তিনি মানুষের আশা নৈরাশ্য ভাঙি পরিসমাপ্তি দ্বারা আন্দোলিত হবার চেতনা নন; তিনি এমন একটি সংবেদনশীল যন্ত্র যা আন্তর-লোকের পরিসরে লিপিবদ্ধ করে সত্যকে।

যেহেতু অনুভূতির জীবন মানস-বস্থা ও এষণার প্রবাহ এবং যেহেতু জীবনসম্বন্ধীয় সকল মানসাবস্থার প্রকরণ হচ্ছে ঐন্দ্রিয়িক প্রকরণ, সেজন্যে যে কোনো শিল্পকৃতিই মূলত ঐন্দ্রিয়িক। এই অনুভূতিময় জীবনের অধ্যায়কে যেন আমরা অনুভূতির প্রত্যক্ষ অনুকরণের মতো একটি স্থূল রুচির সঙ্গে মিলিয়ে না ফেলি সৌন্দর্যে সচেতন থাকতে হবে। যেহেতু শিল্পী কোনো প্রত্যক্ষ অনুকরণকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেন না তাই তাঁর রচনায় যে-সব অনুভূতি দ্যোতিত হয় তাঁর বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞতা দ্বারা তাদের লাভ করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি রচনার পর্বে পর্বে অনুভূতির নোতুন সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতে পারেন। কারণ শিল্পকৃতি যদিও মনোধর্মিতার বৈশিষ্ট্যকে প্রকটিত করে তবু তা আত্মগতভাবে বস্তুধর্মী, এবং অনুভূতির জীবনকে প্রত্যক্ষিত করাই এর উদ্দেশ্য। কবিতা তখনই যথার্থ মূল্যবান যখন তা সম্পূর্ণরূপে দ্যোতক। কবিতার দ্যোতনার বিষয় হচ্ছে একটি মহৎ ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতা, ভাবের উদ্দীপনা, কবির স্বকীয় অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা ও ব্যাপকতা। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, মহত্ব কি আসে যায়, পাঠকের কাছে ভাবটি যদি তুচ্ছ বলে প্রতিভাত হয়, তবে কি একটা প্রকৃত প্রভেদের সূচনা হবে না? এর উত্তরে বলা যায়, ভাবের মহত্বের জন্যে দুটি ক্রিয়ার প্রয়োজন; প্রথমত, ভাবটি কবির কাছে মহৎরূপে আবির্ভূত হবে; দ্বিতীয়ত, কবি তাকে আমাদের কাছে মহৎরূপে প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ কোনো ভাবকে যথার্থভাবে দ্যোতিত করতে না পারাই কবির অসফলতা। তবে পাঠকের কাছে ভাবকে মহৎ বলে প্রতীত করতে গেলে তাকে প্রকাশ করতে হবে জ্ঞানের প্রাসঙ্গিক আদর্শে।

এলিয়ট যাকে খাঁটি কবিতা বলেছেন তাতে ব্যবহৃত সাহিত্যগত রীতিকে, বিশেষ করে সাহিত্যগত অধ্যাসকে নির্বিক্রিয় মনে নেওয়া যায় না। তাঁর কবিতার ভাব সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না উঠলেও তাঁর সাহিত্যগত আপ্যায়ক কবিতা চেতনার কাছে হয়তো সত্য, কিন্তু পাঠকের কাছে তা সত্য বলে প্রতিভাত নাও হতে পারে। তাছাড়া তাঁর কবিতা স্থানে স্থানে এত স্পষ্ট যে, দ্যোতনার কোনো পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না। কবিতার উপাদানের কোনো ভালো-মন্দ নেই, প্রাণময়তা বা নিষ্প্রাণতা নেই,

বিষয়ের দিক থেকে উৎকর্ষ-অপকর্ষের প্রভেদ করা যায় না। কবি তাকে উদ্দীপনাপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন। কবির সত্যদৃষ্টির এখানে প্রাধান্য। এ কথা ঠিক, কোনো মহৎ শিল্পকৃতিই স্পষ্ট নয়, তাকে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত করা যায় না, এবং তা কখনোই পরম ও চিরকালীন সত্যকে নিশ্চয়তার সঙ্গে নির্দেশ করতে পারে না। একই রচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সত্যকে আবিষ্কার করা সম্ভব। যা শিল্পকৃতির মনোবৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা থেকে আমাদের স্থানান্তরিত করে কবির স্বকীয় মানসিক প্রবণতার সম্মুখে উপস্থাপিত করে তাকেই বলতে পারি সত্য।

দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে শিল্পকৃতির ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। এ কথা নিশ্চিত যে, সত্য বা অসত্য নির্ধারিত হতে পারে একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ের দ্বারা, জ্ঞানময় বিবরণের দ্বারা। শিল্পকৃতি প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপস্থাপনের সঙ্গে সংস্কৃত নয়, জ্ঞান ছাড়া ভার্য অন্য ক্রিয়া রয়েছে। শিল্পকৃতি আবেগ অথবা মানসাবস্থাকে উদ্দীপিত করে। এদের সত্য নেই, তবে মূল্য আছে। তাছাড়া যখন বস্তু নান্দনিকভাবে বিধৃত হয় তখন তার সত্য বা অসত্যের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। রচনার সকল দিক আপন অন্তর-মাধুরীতে আমাদের অনুরাগকে কেন্দ্রায়িত করবার জন্যে মিলিত হয়। যদি রচনার শিল্পকলাগত সামঞ্জস্যের দিক থেকে আমাদের উপভোগ-নৈপুণ্যের পরিবর্তে প্রজ্ঞা অনুশীলিত হয় তবে দুটি যথার্থ প্রান্ত হচ্ছে গুরুত্ব ও তুচ্ছতা; সত্য এবং অসত্যের প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ পরিবেশানুচিত। এই প্রভেদ নান্দনিকভাবে সঙ্গত। এর আলোকে প্রতিটি ব্যক্তি অকিঞ্চিৎকর হাসির কবিতা থেকে শূন্য করে সফোক্লিস ও শেক্সপীয়ার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রচনাধারা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব একটি মান গড়ে তোলেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, একটি রচনার গুরুত্বের অবস্থান কোথায়। মূল্যবোধের সমস্যা সত্যের সমস্যার মতোই জটিল। তবু আকৃতিগত, শিল্পকলাগত ও গঠনগত মূল্যে একটি লঘু ভাবের রচনাও একটি গভীর ভাববিষয়ক রচনার মতো সমৃদ্ধ হতে পারে। প্রকৃত তুচ্ছ রচনা প্রায়ই মহৎ সৃজন-নৈপুণ্য প্রকাশ করে। রচনার মূল্য তার উপস্থাপিত জীবনের সঙ্গে সংস্কৃত মূল্যের মাঝে নিহিত। যখন কয়েকজন লেখক সচেতনভাবে একই পথ অনুসন্ধান করেন তখন তা নান্দনিক

॥ তিনটি চিত্র প্রদর্শনী ॥

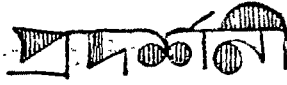
মাচ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রায় একসঙ্গে কলকাতায় তিনটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি একক এবং একটি সম্মিলিত প্রদর্শনী। দুটি প্রদর্শনী চলছে ক্যাথোড্রাজ রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে, অন্যটি চলছে পাক ম্যানসনের, আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে।

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে প্রখ্যাত শিল্পী গোপাল ঘোষ দীর্ঘদিন পরে তাঁর সৃষ্টি-কর্মের চমৎকার নিদর্শন উপস্থাপন করেছেন, এটাই এই তিনটি প্রদর্শনীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অ্যাকাডেমী ভবনের অন্য অংশে চলছে স্টুডিও সভাদের 'স্কেচ ক্লাবের' পঞ্চম বার্ষিকী সম্মিলিত প্রদর্শনী। আর আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারী আয়োজিত প্রদর্শনীর শিল্পী হলেন শ্রীসীল ভট্টাচার্য।

॥ শিল্পী গোপাল ঘোষের প্রদর্শনী ॥

কলকাতার মানুষ যখন প্রায় এক-ঘেয়ে ক্রান্তিকর, ইউরোপীয় চিত্র-রীতির ভঙ্গী-সর্বস্ব প্রদর্শনী দেখতে দেখতে কিঞ্চিৎ বিরক্তিবোধ করছিলেন, তখন উল্লেখযোগ্য দু'একটি ব্যতিক্রমের সঙ্গে প্রখ্যাত শিল্পী গোপাল ঘোষ এসে তাঁদের সেই ক্রান্তি আর বিরক্তির হাত থেকে মুক্ত করলেন। শিল্পী গোপাল ঘোষের প্রদর্শনীর এই হলো ফলশ্রুতি।

প্রকৃতপক্ষে, শিল্পী গোপাল ঘোষ যে পণ্ডাশখানি প্যাস্টেলে আঁকিত চিত্র এবং চোন্দখানি স্কেচ এই প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করেছেন তার প্রত্যেকখানির সম্মুখে দাঁড়ালে একটি জিনিস সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সে জিনিস, শিল্পীর স্বধর্মনিষ্ঠা আর স্বদেশের জল-মাটি,



কলারসিক

আলো-হাওয়ার বর্ধিত এক অনন্য শিল্পীমনের সজাগ উপস্থিতি।

গোপালবাবু এই প্রদর্শনীতে জলরঙ কিংবা তেল-রঙের মাধ্যমে আঁকিত কোনো চিত্র এবার উপস্থাপন করেননি। প্যাস্টেল, অয়েল প্যাস্টেলই ছিল এবার তাঁর চিত্রাংকনের একমাত্র মাধ্যম। এটা খুব লক্ষণীয় ঘটনা। আর একটি লক্ষণীয় ঘটনা : তাঁর প্রতিটি চিত্রে বাঙলা দেশের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ যেমন করে খুঁজে পাওয়া গেল, এ-বছর কলকাতার অন্য কোনো প্রদর্শনীতেই তার সম্ভাবন আমরা পাইনি। তাহলে গোপালবাবু কি আধুনিক নন, সেকলে শিল্পী? আমার কিন্তু এ-প্রশ্ন একবারও মনে হয়নি। বরং তাঁর ছবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে বারবার মনে হচ্ছিল, তথাকথিত আধুনিক শিল্পীরা একবার যেন দেখে যান গোপালবাবুর সৃষ্টিকর্ম। দেখলে বুঝতে পারবেন, ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভুলানো যায়, মন রাঙানো যায় না কোনদিন। অথচ, গোপালবাবু আমাদের চোখ ভুলিয়েছেন, মনও রাঙিয়েছেন। এই 'কম্মিউনিকেশন'-এর অভাবই তো আধুনিক প্রতিটি শিল্পকর্মের সঙ্গে আমাদের মানসলোকের সেতুপথ রচনার সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গোপালবাবু বেগুনে সাফল্য অর্জন করেছেন সেই গুণগুলির প্রতি যদি অভ্যস্তর আধুনিক বাঙালী শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তাহলে আমরাই খুশি হবো সকলের আগে।

আলোচ্য প্রদর্শনীর পণ্ডাশখানি

চিত্রের মধ্যে তেঁতিশখানি ছিল নিঃসঙ্গ চিত্র। এর কোনখানিতে বাংলার গাছ-গাছালি, খেত-খামার, নীল আর ধূসর আকাশ আবার কোনখানিতে পঞ্জীর শান্ত-শ্রী, নদীর তীর, জলাশয়, ঘন জঙ্গল আর জীর্ণ বাড়ি আশ্চর্য বর্ণ-সুসময় রূপায়িত হয়েছে। প্রত্যেকটি চিত্রের সংস্থাপন এবং রঙ প্রয়োগ এত নিখুঁত যে মনকে অভিভূত করে। বাংলা দেশকে যেন এই চিত্রমালার মধ্য দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন শ্রীযুক্ত ঘোষ। আর কী আশ্চর্য, কোনো চিত্রেই তথাকথিত 'অ্যাকাডেমিক' গন্ধ নেই একেবারে।

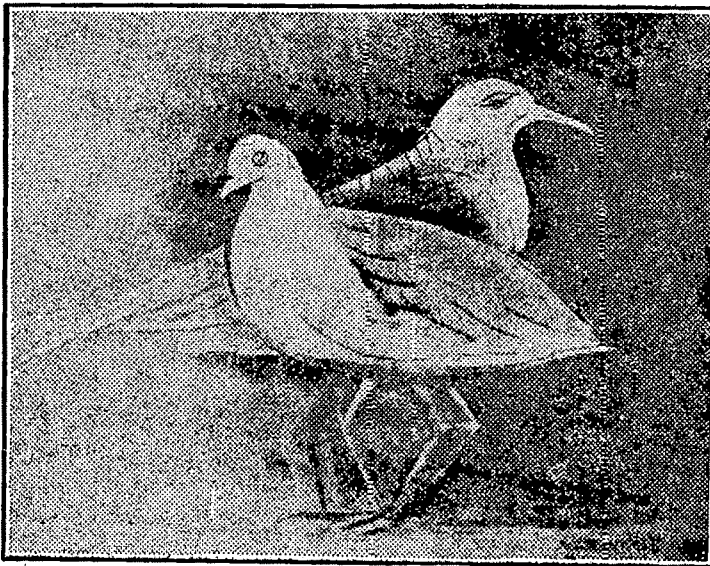
অন্য কতকগুলি চিত্র ছিল ফুল আর পাখি নিয়ে। কয়েকখানি ছিল নারীর বিভিন্ন ভঙ্গীর সুন্দর চিত্র। শ্রীঘোষের এই নারীরাও আধুনিক নন। কোনটায় গ্রাম্য আবার কোনটায় অন্তর্জ নারীর অন্তরঙ্গ রূপ ফুটে উঠেছে। কালি-কলমে আঁকা স্কেচগুলির মধ্যেও দক্ষ শিল্পীর নিপুণতার চিহ্ন বিদ্যমান। সব মিলে শিল্পী গোপাল ঘোষের এই প্রদর্শনী আমাদের মন যেমন জয় করেছে, তেমনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দানে এবং মৌলিকতায় তাঁকে বাংলার শিল্প-জগতেও দিয়েছে স্থায়ী আসন। প্রদর্শনীটির আয়োজন করার আমরা ইয়ং আর্টিস্ট সোসাইটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

॥ স্কেচ ক্লাবের প্রদর্শনী ॥

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর স্টুডিও গ্রুপের সদস্যরা মিলে যে 'স্কেচ ক্লাব' গঠন করেছেন তার পঞ্চম বার্ষিক প্রদর্শনীতে ২০ জন শিল্পীর ৬৫টি শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। তেল-রঙ, জল-রঙ, প্যাস্টেল আর কালি-কলমের মাধ্যমে আঁকিত হয়েছে চিত্র-গুলি। অধিকাংশই স্কেচধর্মী চিত্র। স্কেচগুলির মধ্যে শিল্পী যোগেন চৌধুরী, মিলু বানার্জি, প্রিয়গোপাল ভট্টাচার্য, অরুণ মুখার্জি, সৌম্য মন্সসী, সজল রায়, সুচন্দা রায়-ভাদুড়ানী নিঃসন্দেহে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তেল-রঙে আঁকিত চিত্রগুলির মধ্যে গোপাল বসাকের 'হেডস্টাড' (৩), তারাদাস চ্যাটার্জির স্কেচ (১০), টুটু লাহিড়ীর প্রতিকৃতি-চিত্র 'বলুদ' (৩০), সজল রায়চৌধুরীর 'ফুট-স্লেয়ার' (৬৬) ও সুবীর সেনের 'স্টাড' (৬১, ৬৪) মোটামুটি মন্দ নয়।

জল-রঙের কাজ এই প্রদর্শনীতে বিশেষ কিছু নেই। একমাত্র সজল রায় ও কুমকুম মন্সসীর কয়েকখানি চিত্র দর্শক-মনকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। আমরা আশা করবো, 'স্কেচ ক্লাবের' সদস্যরা তাঁদের শিল্প-চর্চার বাংলার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবেন।



শিল্পী-গোপাল ঘোষ



[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(নয়)

জ্যোতি' বা 'মিডল ক্লাস' বলতে ধানের বোঝায়, (বিভিন্ন দিক দিয়ে আজ বার 'মধ্য' থেকে 'নিম্ন'পানে দ্রুত গাব্ধান), চাকরি নামক পরম বস্তুটি তাদের কাছে চিরদিনই দুলভ। সে-বাজারে বিদ্যাবৃষ্টির জোর যতই থাক বা না থাক, আসল মূলধন 'মামার জোর'। বিশেষ করে ইংরেজ আমলে সুওদাগরী অফিসে সেটা ছিল অপরি-হার্য। বিজন ব্যানার্জির এই সম্বলটি গোড়া থেকেই মজুত ছিল। বাপ ঢুকেছিলেন রেল কোম্পানীর ক্রেমস অফিসে এবং মরুদ্বীপ খুঁটা ধরে বেশ খানেকটা উঁচুতেও উঠেছিলেন। তিরিশ বছর পরে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর হাতে প্রভিডেন্স ফান্ডের মোটা টাকার চেয়েও বড় সঞ্চয় কয়েকটি শাসালো উপরওয়ালার নেকনজর। সেই জেরে বড় মেজো দুটি ছেলের পাকা ব্যবস্থা নিজের জীবদ্দশাতেই করে ফেলেছিলেন এবং তৃতীয় অর্থাৎ বিজনের বাথটিও রিজার্ভ করে রেখে গেলেন। অপেক্ষা শুধু তার বি-এ ডিগ্রির। যথাসময়ে সেটি লাভ করবার পর মা এবং দাদাদের তরফ থেকে যখন তাগিদ এল, বিজন বলে বসল, 'এম-এ পড়বো'। দাদারা বোঝালেন, তাতে লাভ কিছন্ন নেই। শুধু দুটি বছর এবং সেই সঙ্গে দুটি ইনক্রিমেন্ট নষ্ট করা। কেননা, রেলের সাহেবরা 'ব্যাচেলর' এবং 'মাস্টার'-এর তফাটটা ঠিক বুঝতে পারেন না। তা সত্ত্বেও বিজন নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইল।

এম-এ পাশ-এর ফল বেরোতেই আবার যখন ডাকে সেই পুরনো কথা

স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, বিজন তখন 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন দেখে দেখে চোস্ত ইংরেজিতে দরখাস্তের মসাবিদা করতে ব্যস্ত। মাথা না তুলেই সোজা জানিয়ে দিল, 'রেল চাকরি করবো না।' সমস্ত পরিবারের মধ্যে শুধু বিস্ময় নয়, সেই সঙ্গে খানিকটা শোকের ছায়া নেমে এল। সবাই একবারো রায় দিলেন, এ ছেলের কপালে দঃখ আছে। তানৈলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কেউ আলোর পেছনে ছোট্টে? এ বাজারে এম-এ পাশের দাম কী? একটা পঞ্চাশ টাকার মাস্টারিও জেটে না। কথটা মিথ্যা নয়। তবু বিজন পাশটা প্রশ্ন তুলল, 'রেলের কেরানীর মাইনেও তো তিরিশ টাকা।

—আহা, মাইনেটাই তো সব নয়, বলে একটি সুস্পষ্ট ইংগিত করলেন বড়দাদা। প্রকাশ্যে বললেন, তাছাড়া ফিউচার প্রস্পেক্ট দেখতে হবে না?

—ও চাকরি আমার ভালো লাগে না। তর্কের পথে আর বেশী না এগিয়ে এখানেই দড় হাতে ছেদ টেনে দিল বিজন।

বছর খানেক ধরে দিস্তা কয়েক দরখাস্ত ছাড়বার পর সাড়া পাওয়া গেল সি পি অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের এক অখ্যাত শহর থেকে। নতুন কলেজ খোলা হচ্ছে; একজন লজিকের অধ্যাপক চাই। ফিলজফিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম নাম ছিল বিজন ব্যানার্জির। একশ টাকা তলবে ওকেই তাঁরা নির্বাচিত করেছেন। বাড়ি থেকে এল সমবেত বন্ধা। মা বললেন, রেলের চাকরি না করতে চাস, না করালি। তাই বলে, অত দূরে যেতে হবে কেন?

—কাছাকাছি তো কিছু জুটেছে না।

—আজ না জেটে কাল জুটবে। জলে তো আর পড়নি।

বিজন সে অনিশ্চয়ের অপেক্ষায় বসে থাকা সমীচীন বলে মনে করল না। নাই বা থাকল সচ্ছলতার অভাব। তবু বেকার জীবনের মধ্যে কেমন একটা অমরবাদা আছে, যার সঙ্কর ধারণালো উঠতে বসতে লাগে, বিশেষ করে যে পরিবারে আর দুজন কর্মক্ষম পুরুষ বসে নেই। তার চেয়েও একটা বড় কারণ ছিল, বা কাউকে বলা যায় না।

নির্মলা তার জীবনে বিগত হয়েও শেষ হয়ে গেল কই! চোখ বুজলেই দেখা যায় আজও সে বিকৃত অন্তরের গভীর স্তর জুড়ে আছে। আনন্দের রঙে রঙীন, বেদনার রঙে রঞ্জিত। সে স্বপ্নের মায়ামধুরী নিয়ে সে এসেছিল, যে বাস্তবের রুঢ় আঘাত দিয়ে সে চলে গেছে, কোনোটাই মুছে যায়নি। একদিকে দুটি প্রশ্ন নয়নের সিন্ধু আলো, আরেকদিকে রুঢ় চক্ষুর বিষাক্ত বাঁহ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তার চোখের উপর। কোনোটাকেই ভোলা যায় না; ভুলতে ইচ্ছা করে না। তবু ভুলতে তো হবেই। যে দ্বার চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে গেছে, বার বার তার উপরে করাঘাত করে কী লাভ? যে তার ছিঁড়ে গেছে, কোনোদিন জোড়া লাগবে না, তাঁর একটা ক্ষীণ সূত্রকে জইয়ে রাখা শুধু খিড়ম্বনা। কিন্তু লোভী অন্তরটার উপরে তার বিশ্বাস নেই। নিজেকে তাই অনেক দূরে এমন জায়গায় নিয়ে ফেলতে হবে যেখান থেকে ইচ্ছা করলেই ছোট্ট আসা যায় না। সামান্যে যে উজ্জ্বল, অমলিন, দূরত্বের দিগন্ত রেখায় সে



২০০৮
৬৪ ৬৪৬৮

আবিসিক জিমে জোয়ার আমকার (বৈচিত্র্য)

আর.জি.দে.এম.এস

জুয়েলার্স

১১১-মহাভারত স্ট্রীট • কলিকাতা

না। যত শীগগির হোক শুভ কাজ মিটিয়ে ফেলা দরকার।

বিজন এতক্ষণে কথা বলল, জৈষ্ঠ্য মাসে হবে না।

—কেন? মায়ের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

—ও সম্বন্ধে আমি এখনো মনস্থির করিনি।

—কেন, সম্বন্ধটা ফেলনা হল কৌনদিক দিয়ে? অমল চমৎকার মেয়ে, অত ভাল ঘর, দেবে থোবেও ভাল। সব দিক ভেবেচিন্তে কত্তা নিজে মূখে কথা দিয়ে গেছেন।

—জানি। সম্বন্ধ ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে আমি কিছু বলছি না। আমার আপত্তি বিষয়ে নিয়ে। বিষয়ে আমাকে করতে বলো না। আমি পারবো না।

মায়ের মূখে সহসা কোনো কথা যোগাল না। 'কেন'—এ প্রশ্নটাও জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না। বিস্ময়ে, ক্রোধে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মিনিটখানেক পরে স্ট্রটক্রেস হাতে করে বিমলা ঘরে ঢুকতেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, শুনলে বোঁমা? শুনলে কি বললে বিজ্ঞ? আমার মূখের ওপর শূন্যে দিল, বিষয়ে করবো না।

বিমলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ডান হাতে শব্দ্রকে জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে আকর্ষণ করে বলল, আপনি ওঘরে চলুন মা। অত উতলা হবেন না। ছেলেরা ঐ রকম বলে থাকে। আমি শুনছি কী বলতে চায় ও।

মায়ের দুচোখের কোল বেয়ে তখন অশ্রুধারা নেমে এসেছে। বললেন, আর কী শুনবে ভূমি। ও আমাদের কিছুই চায় না, অত করে কাজ ঠিক করে গেলেন, নিলে না; মায়ের বাপকে কথা দিয়ে গেলেন, তাও মানবে না! এই-জনাই কি এত কষ্ট করে, এত লেখাপড়া শিখিয়ে এতবড়টা করলাম!.....বলতে বলতে দুচোখে আঁচল চাপা দিয়ে বোরিয়ে গেলেন।

সৌদীন ঐ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা হয়নি। কিন্তু যাত্রার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সকলের মূখে যে গম্ভীর, থমথমে ভাবটা দেখা দিয়েছিল, সেটা শূন্য বিচ্ছেদের বেদনা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষেপ ও হতাশা। আনুগত্য হলেও বিজ্ঞের কাছে তা অস্পষ্ট ছিল না। গাউনাবহ

গাড়ি ছাড়বার বাঁশী রাজ্যতেই জানালায় রুদ্ধ বাড়িয়ে বিমলা ফিস্ ফিস্ করে বলোছিল, চিঠিতে সব জানাবো। মাস-খানেক থাক, একটু গুছিয়ে রস। তার-পর।

পর পর কয়েকখানা দীর্ঘ চিঠিতে অনেক কিছু জানিয়েছিল বিমলা। তার

জানি না। তোমরা যা ভাল বোঝ, কর—এই জাতীয় বিস্তৃত বর্ণনা। শূন্য বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হবে, বৌদি তেমন পাত্র নয়। এই সব কিছুর মূল্যধার যে সে-ই, এবং প্রতিকারের চাবিটিও তার হাতে, বিমলা তার নিজস্ব ভঙ্গিতে এই সুস্পষ্ট সত্য কথাটাও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করত। বিজ্ঞের অস্বীকার করবার উপায় ছিল



.....ভেবেচিন্তে কত্তা নিজে মূখে কথা দিয়ে গেছেন।

মধ্যে সবচেয়ে বেশী জায়গা জুড়ে থাকতেন মা। দিনদিন তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছে, যে সংসার ছিল তাঁর প্রাণ, তার থেকে একেবারে সরে দাঁড়িয়েছেন। সারা-দিন নিজের ঘরটিতে চুপ করে বসে থাকেন, লোকজন দেখলে বিরক্ত হন, কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে নিলিঙ্গিত কণ্ঠে বলেন, আমি কিছু

না। মাকে সে জানত। বিজ্ঞ তাঁর শেষ বয়সের সন্তান। স্বামী তাঁকে মানুষ করে যেতে পারেননি, কিন্তু তাঁর ধাপ-গুলো তৈরী করে রেখে গেছেন। ছেলেকে তারই উপর পা দিয়ে দিয়ে ছক-কাটা রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে হবে, এই-টুকুই তিনি জানেন। সেখানে এতটুকু হেরফের বরদাশিত করতে পারেন না। তবু

হেলের মুখে চেঁচিয়ে ছকের বাইরে তার অনেকগুলো পদক্ষেপ তিনি মেনে নিরে-ছিলেন। তাকে এম-এ পাশ করতে দিয়ে-ছেন, রেলের রাস্তা না ধরে কলেজের চাকরিতে ঢুকতে দিয়েছেন, বাড়ি-ঘর ফেলে, নিতান্ত বিনাকারসে একা একা দূর দেশে পাড়ি দেবার যে দুর্বদা, তাতেও শেষ পর্যন্ত বাধা দেননি। কিন্তু স্বর্গত স্বামীর শেষ ইচ্ছা ও আদেশ এবং তার নিজের একান্ত মনের শেষ কামনাটুকু জেনে-শুনেও যখন সে পায়ে ঠেলে চলে গেল, পুরলোকগত পিতার প্রতিশ্রুতির মর্বাদা পর্যন্ত রাখতে চাইল না, তখন সেই চরম আঘাত বৃষ্টিপাতে নেওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হল না। এতদিন কোনরকমে দাঁড়িয়ে থেকে এবারে তিনি ভেঙে পড়লেন। তাঁর এই পরিণতি বিজ্ঞানের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। শিশু বয়স থেকে সে অতিমাত্রায় মাতৃ-নিষ্ঠর। সুতরাং দূরে থেকেও উদাসীন থাকতে পারল না, মায়ের কথা ভেবে ভেবে প্রবাসের দিনগুলো দুঃসহ হয়ে উঠল।

বৌদি জানিয়েছে, প্রতিকার তার হাতের মধ্যে। সেও জানে। শব্দ একটা মুখের কথা—“আমি রাজী আছি।” বাপ-মায়ের মনোনীত এবং সমস্ত পরিবারের মনোমত পার্শ্বটিকে গ্রহণ করলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু গ্রহণ কি শব্দ, পাণিগ্রহণ? বহু আড়ম্বর-মুখ্যায়িত উৎসব সন্ধ্যায় বরাসনে বসে দেবভাষায় ‘গৃহ্যামি’ ‘গৃহ্যামি’ বলে পুরোহিতের প্রতিধ্বনি করলেই কি বলা হল—তোমাকে নিলাম? নিজের অন্তর সে জানে। সেখানে তো কোন আয়োজন নেই, উৎসব নেই, ঐ কথাটি মনে-প্রাণে বলবার জন্যে কেউ বসে নেই। একটি নির্দোষ, সরল, নিঃসন্দেহ মেয়ের সঙ্গে প্রতারণা করবার কী অধিকার আছে তার?

এই কথাটাই সে বিমলাকে লিখে জানিয়েছিল। উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গে। লিখল,—“ঠাকুরপো, তুমি অনেক লেখা-পড়া শিখেছ। তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। আমার বিদ্যার দোড়

তো জান। পাড়ার লাইব্রেরীর খানিকরেক বাংলা নাটক-নভেল পর্যন্ত। মনে পড়ে, তারই কোনো একটাতে পড়েছিলাম—মানুষের মন যেন নদীস্রোত। জীবনের ছোট-বড় সুখ-দুঃখ নৌকোর মত তার উপর দিয়ে ভেসে চলে যায়। কোনোটা দ্রুতগতি কোনোটা মন্ডর। তারই মধ্যে দু’একখানা হয়তো কদিনের জন্যে নৌগুর ফেলে। কিন্তু থাকে না কেউ। পুরনো যায়, নতুন আসে। স্রোত কাউকে ধরে রাখে না। তোমার মনের যে নৌগুর ফেলে বসে আছে, মনে হচ্ছে আর উঠবে না, সেও দু’দিন পরে ভেসে চলে যাবে। যে আসছে, তাকে জায়গা দিতে হবে তো। এই নিয়ম। আমি তোমার চেয়ে অনেক বিষয়ে ছোট হলেও, বয়সে বড়, অভিজ্ঞ-তায় বড়। এটা আমার শব্দ নভেল-পড়া-বিদ্যা নয়, নিজের চোখে দেখেছি। আমার এই কথাটা, তুমি মেনে নিও, ভাই।”

“সুদূরমার জন্যেও তোমার কোনো ভাবনা নেই। সে এসে তার পাওনা ঠিক বুঝে নেবে। তার জন্যে যদি দু’দিন অপেক্ষা করতে হয়, করবে। মেয়েরা সব কিছুর জন্যেই তৈরী হয়ে আসে। তোমার মন এখনো ‘বিমুখ’ বলে তুমি ভয় পাচ্ছ। বিমুখকে উদ্মুখ করবার চেষ্টাই তো মেয়েদের সাধনা। উদাসীনকে উৎসুক করে তোলাই তাদের স্বভাব। আমার কথা পড়নি? দেবাদিদেবের মত শ্মশান-চারী বৈরাগীও তার কাছে হার মেনে-ছিলেন। তুমি কি শিবের চেয়েও অসাধ্য? মনে রেখো, সব মেয়ের মধ্যেই উমা আছে। সুদূরমাও একদিন জন্মী হবে।”

সকলের শেষে ছিল সব চেয়ে বেটা দরকারী কথা। “মার অবস্থা দিন-দিন খারাপের দিকে চলেছে। আর দেরি করলে হয়তো তাকে আমাদের হারাতে হবে। সে দুঃখ কি সহিতে পারবে? মাথের গোড়াতেই দিন আছে, তোমার চিঠির অপেক্ষায় আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে দিন গুনবো।”

এর পর সেই সমবেত উৎকণ্ঠার নির-সন ছাড়া বিজ্ঞানের সামনে আর কোনো পথ ছিল না। মাথের প্রথমেই বে দিন ছিল, তারই এক শব্দভঙ্গী সকলের ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে সুদূরমাকে সে গ্রহণ করেছিল। মা যেন আবার নতুন জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। বহু ঘটনা করে, সকলের সব সাধ মিটিয়ে প্রায় নিঃসম্বল হয়ে ছোট ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। সবাইকে একে একে ডেকে বলেছিলেন।

মাথা ধরা, সর্বপ্রকার ব্যথা ও বেদনা,
সর্দি-অর, ইনফ্লুয়েন্স প্রভৃতিতে

**নিরাপদ
নিশ্চিত ও
দ্রুত
আরামের জন্য**

এলজিড



৫ টি কার্যকরী
উপাধানে
প্রস্তুত

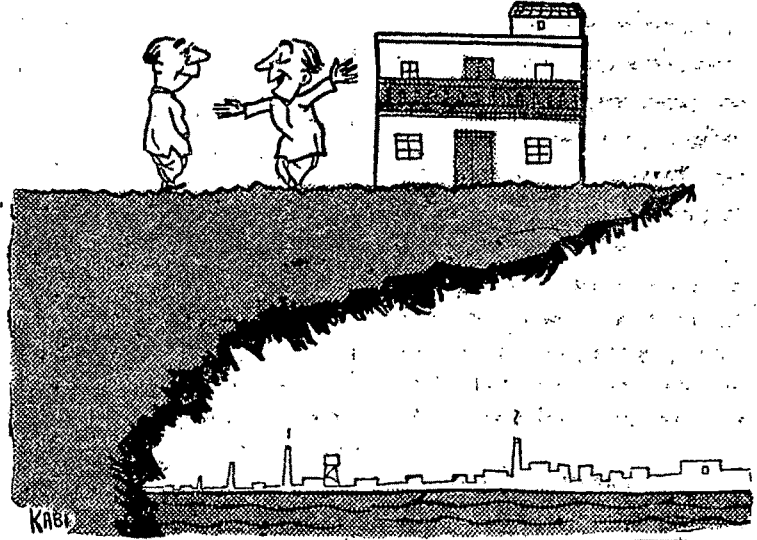
বেঙ্গল ইমিউনিটির ভৈরী

‘এই আমার শেষ কাজ; বল তোমাদের কার কী হচ্ছে।’ কেউ চেয়েছিল গড়ের বাদা, কেউ জমকালো প্রসেশন, কারো ফরমাস ছিল বাঈজী নাচ। কোনোটাই তিনি অপূর্ণ রাখেননি।

লগ্ন শ্রুত হলেই কি তার ফল শ্রুত হয়? সব সময়ে হয় না। মঙ্গলানুষ্ঠানের সমাপ্তি-পর্বে মঙ্গলের আবির্ভাব ঘটবেই—একথাও জোর করে বলা যায় না। বিজনের জীবনে ঘটেনি। বাসর-সজ্জার মঙ্গল-দীপ নিবতে না নিবতেই তার লক্ষণ দেখা দিল।

ফুলশয্যার দুদিন পরে। এ পর্যন্ত সুরমার সঙ্গে তার একটি কথাও হয়নি। শ্রুতরাগির নিভৃত শয্যায় সুযোগ আসেনি তা নয়, কিন্তু কেমন একটা সংকোচ এসে যেন তার মুখ চেপে ধরেছিল। হয়তো শ্রুত সংকোচ নয়, তার সঙ্গে কিছুটা অপরাধবোধ—‘জায়গা নেই জেনেও কেন একে ডেকে নিয়ে এলাম।’ তার পরের রাতিতে আবার স্বপ্ন দেখা হল, তখনো ঐ একই চিন্তার রেশ তার মন জুড়ে আছে—এই ফুলের মত মেয়ে; অন্য কারো হাতে পড়লে শ্রুতী হতে পারত। আমি কেন সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়িলাম? নিজেকে বড় ছোট বলে হল, বড় স্বার্থপর। প্রাণপণে চেষ্টা করল, সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সহজভাবে দুটো কথা বলতে। প্রতিবারেই ব্যর্থ হল। প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল। বিস্তীর্ণ শয্যার আরেক প্রান্তে জড়সড় হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইল তার সুন্দরী শোভন-সাজ্জতা নবোঢ়া স্ত্রী। একটিবার তার ডীর কোমল হাতখানি স্পর্শ করা হল না, কাছে ডেকে বলা হল না, শোনা। তারপর কখন গভীর অবসাদে জুড়ে এল চোখের পাতা। সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথম চোখ মেলে দেখল, শ্রুতী শয্যা খাঁ খাঁ করছে। কোথায় গেল সুরমা! ঘরের ও পাশটায় কার্পেটের ওপর কম্বল ঢাকা দিয়ে পড়ে আছে একটি কাপড়-চোপড়ের কুন্ডলী। বিজন বিছানার উপর উঠে বসতেই, সেও ধড়মড় করে উঠে পড়ল এবং কোনো দিকে না তাকিয়ে শশবাস্তে বেরিয়ে চলে গেল।

সে স্বস্তি ছিল শ্রুতবাবুড়িতে জোড়ে আসবার পর বিত্তীয় দিন। বিজন স্থির করে রেখেছিল, আজ যেমন করে হোক সব দৌর্বল্যকে কাটিয়ে উঠতে হবে। যা ঘটে গেছে, স্মেচ্ছয় হোক, বাধা হলে হোক—সত্যকে মেনে নিতে হয়েছে, তার মধোমুখী দাঁড়বার মত সংসাইস



‘নদীর ধারে এমন খোলামেলা জায়গায় এত কম টাকায় এত সুন্দর বাড়ী আর পাবেন না স্যার।’

তাকে অর্জন করতেই হবে। স্ত্রী বলে যাকে গ্রহণ করেছি, তার যোগ্য আসন যদি তাকে না দিতে পারি, সে অপরাধও কম নয়। বৌদি বলেছিল, মেয়েরা সব কিছুই জন্যে তৈরী হয়েই আসে। হয়তো তাই। তবু, পুরুষকেই অগ্রণী হয়ে আহ্বান জানাতে হয়।—এই সংকল্প নিয়েই সে শয়নঘরে এসে ঢুকেছিল। কিছুক্ষণ পরেই সুরমা এল এবং স্বামী কিছু বলবার আগেই নিঃসংকোচ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে নিজের মাথার বাঁশিটা টেনে নিয়ে সহজ ভাবে বলল, আপনি শ্রুতে পড়ুন। আমি নীচে শুচ্ছি।

বিজন বিস্ময়ে মুখ তুলল, কেন?

সুরমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। কয়েক মূহুর্ত মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল, আপনার অসুবিধা হবে, তাই।

—অসুবিধা হবে। কে বললে?

—আমি জানি। এ বিয়েতে আপনার মত ছিল না। আপনার বাবা আমার বাবাকে যে কথা দিয়েছিলেন, সেইটে রাখবার জন্যেই বাধ্য হয়ে রাজী হয়েছেন।

বিজন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবু বিয়ের উৎসব শেষ না হতেই সদ্য-পরিণীতা স্ত্রীর মুখ থেকে একথা শ্রুতে হবে, এটা তার কল্পনার বাইরে। সুরমা এক পলক ওর দিকে তাকিয়ে আবার বলল, আপনার মা এবং দাদা-বৌদিরা

অনেক করে আপনাকে রাজী করিয়েছেন, তা-ও আমি জানি।

কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কী নির্মম বিরোধ! ‘কী প্রত্যাশা নিয়ে সে আজ ঘরে এসেছিল, আর কী তাকে শ্রুতে হল! এই নিদারুণ আশাভঙ্গের আঘাতেই বিজনের মনটা বিঘাট হয়ে উঠল। সুরমার দিকটা ভেবে দেখল না। তিস্তকণ্ঠে বলল, তাই যদি জানতে, তুমি কেন রাজী হলে? বললেই! পারিতে এ বিয়ে আমি করবো না?’

—‘আমি!’ দুটি বিস্ময়িত দীপ্ত চক্ষু স্বামীর চোখের উপর তুলে ধরল সুরমা, ‘আপনি পুরুষমানুষ, হয়ে-যা পারলেন না, আমি মেয়ে হয়ে তাই বলবো! কে শ্রুত আমার কথা?’

ঠিকই বলেছিল সুরমা। কেউ শ্রুত না। তাকেই বরং শ্রুতে হত অনেক কথা। সবাই ছিঃ ছিঃ করত, নিলজ্জ বেহারা বলে তিরস্কার করতেন অভিভাবকেরা। ‘এসব নাটক নভেল পড়বার ফল’—বলে, ব্যগোষ্ঠি করতেন প্রতিবেশিনী-প্রবীণরা দল। তবু স্ত্রীরা মুখ টিপে হাসত। যে পরিবারে তার জন্ম, যে সমাজে, যে সব আত্মীয়স্বজনের বেষ্টনীর মধ্যে সে বড় হয়েছে। সেখানে একটি অনুচর মেয়ের মুখ থেকে এত বড় সম্পদীর কথা শ্রুতবার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। মেয়ে আবার বিয়ে করবে কি! তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। সে শ্রুত দত্তা, তৃতীয় পক্ষ-মাত্র।

(জমশং)

সেকালের কাঁসারীপাড়ার

বীকেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

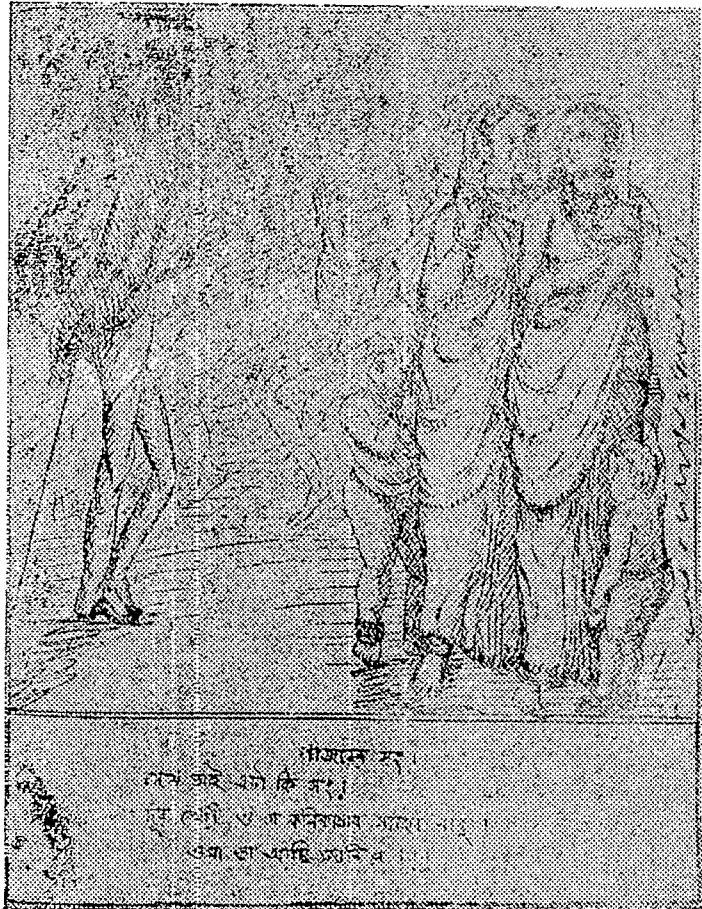
বর্তমান কলকাতা আর সেকালের কলকাতায় অনেক প্রভেদ। কলকাতা শহর নানাভাবে বদলে গেছে। চারিদিকে প্রাসাদের পর প্রাসাদ নির্মিত হয়ে এক মহান প্রাসাদ-নগরী গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের পিছনে আছে অনেক ইতিহাস। পরিবর্তন খুব দ্রুতই হয়েছে, অবশ্য সে পরিবর্তন অনেক রূপ নিয়ে বদলে গেছে পথ-ঘাট। বদলে গেছে মানুষের রুচি। বদলে গেছে আমোদ-প্রমোদের বিষয়বস্তু। বদলে গেছে অনেক কিছু। সেকালে সিনেমা ছিল না। বর্তমানের মত এত রংগশালা ছিল না। তা'ছাড়া সেকালে মাঠে মাচা বেঁধে মঞ্চ করে অভিনয়াদি এত হতো না। সেকালের মানুষ যাত্রা, পাঁচালী, কবির লড়াই, পতুল নাচ আর সংয়ের মিছিল দেখে আমোদ-আহ্লাদ করতো। কলকাতার বিভিন্ন পল্লী থেকে সং-এর মিছিল বার হতো। উত্তর কলকাতার বারাগসী ঘোষ স্ট্রীট থেকে যে সং বার হ'তো তাকে বলা হতো “কাঁসারীপাড়ার সং”। কাঁসারীপাড়ার পল্লীবাসীর উদ্যোগে ও বহু ব্যয়ে প্রতি বছর সং বার হতো। সেই সাথে পরিহাসাত্মক ও নানা রসোদ্দীপক ছোট ছোট নাটিকা অভিনয় করা হতো। তা' ছাড়া থাকতো গান ও ছড়া। উক্ত পল্লীর ১০ বছর আগেকার সংয়ের মিছিলের সংবাদ যা ১৫ই এপ্রিল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের “হিন্দু প্যাট্রিয়ট” (The Hindoo Patriot) সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে তাই থেকে কতকাংশ মর্মনিব্বাদ লিপিবদ্ধ হলো।

“বারাগসী ঘোষ স্ট্রীটের কাঁসারীগণ প্রতি বছর চড়ক পুজায় উৎসব করেন এবং শহরের জনবহুল দেশীয় মহল্লাগুলি দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে যান। শোভাযাত্রায় গায়ক, বাদক, ভাড়ি ও সং থাকতো। প্রায় দশ ঘণ্টা ধরে এই শোভাযাত্রা দুই মাইল পথ প্রদক্ষিণ করতো। এবং এই তামাশা দেখতে বহু জনসমাগত হতো। এই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য ছাদে ও বারান্দায় লোকেরা ভীড় করতো। এই দৃশ্য দেখতে কোন মূল্য লাগতো না। এবং আমরা আনন্দিত যে, চড়ক উৎসব সংক্রান্ত বর্ষের প্রথাগুলির বিলোপসাধন করা হয়েছে। কিন্তু লোকরঞ্জক অনুষ্ঠানগুলি অব্যাহত আছে। এই বছরের আয়োজনটি সর্বোত্তম হয়েছিল।”

উক্ত সংবাদে আরও উল্লেখ ছিল যে— “কৌতুক ও শ্লেষ অবশ্য সর্বিশেষ ছিল কিন্তু তাতে অশ্লীলতা কিছু ছিল না। অভূতপূর্ব রকমারি সংয়ের সমাবেশ ছিল। যথা—একদল যন্ত্রপাতি সমেত কুপখনকারী, জাঁকজমক পোষাকপরিহিত পারস্য দেশের আতর বিক্রেতা, একদল বস্তা সেলাই-ওয়ালা, একদল বিলাতী গোরাপল্টনদের

ও গানগুলি নীতিগর্ভ ছিল। পৌরাণিক ঘটনাগুলিও বাদ যায়নি। যথা গোপিনীদের সাথে ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণ, গন্ডার পিন্ডদান, কার্তিকের অর্চনা। কিন্তু প্রতি দৃশ্যই কৌতুকাবিশেষ ছিল। আমাদের সমাজ-জীবনের কয়েকটি দিকও ব্যঙ্গের সাথে পরিষ্ফুট করা হয়েছিল।

কুলীনের বিবাহদৃশ্যটি যথার্থ অপূর্ব হয়েছিল। স্ট্রিফেন সাহেবের আইন অনুযায়ী বিবাহেরও একটি চমৎকার ব্যঙ্গচিত্ররূপের সং বার হয়েছিল। তাতে বর পাতলদুন ও চাপকান পরিহিত। কনে পায়ে বুট জুতো ও নতকীর পোষাক পরিহিতা এবং বিবাহের পুরোহিত তিনি নিজেকে জগৎগুরু অথবা গুরুর গুরু আখ্যায় অভিহিত করেন। তিনি খড়ের শিরস্ত্রাণ



১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দের ‘বসন্তক’ পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যঙ্গ চিত্র।

ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রসহ বাদকের দল, দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের একটি দল, কাপড় কাচতে কাচতে চললো একটি ধোপা, তেল নিক্ষেপণে ব্যাপৃত কল, প্রেমিকার সাথে আলাপের একটি ধীবর, মস্করারত জেলে-জেলেণী, মোসাহেব পরিবৃত জনৈক লম্পটবাবু। সকলেরই মুখে যথোপযুক্ত গান ও ছড়া। এবং ঐ ছড়া

(হেলমেট) পরিহিত ছিলেন। আমরা এই হেতু তাতে “কুশপুতুল” (The man of straw) আখ্যায় অভিহিত করি। বিবাহ অনুষ্ঠানটি খুব সাধা-সিধা ও কালোপযোগী ছিল। বর উচ্চ-স্বরে ঘোষণা করলেন যে তিনি হিন্দু নন, মুসলমান নন, খৃষ্টান নন, জৈন নন, বৌদ্ধ নন। এবং কনেও উক্ত প্রকার

ঘোষণা লাজসহকারে করেন। তারপরে তাঁরা পুরোহিতকে বলেন যে পরম্পরের পাণিগ্রহণ করতে প্রস্তুত। পুরোহিত যখন বলেন ‘আমিন’ (Amin) তখন বর-কনে করমর্দন করলেন।”.....

কাঁসারীপাড়ার সং বার হতো উক্ত পল্লীর মহান পুরুষ তারকনাথ প্রামাণিকের উৎসাহে। আর একজনের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি হলেন তৎকালীন হিন্দু সমাজের মুখপত্র হিন্দু পোষ্ট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল। তিনিও কাঁসারীপাড়ার সং বার হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে কৃষ্ণদাস পাল লাট কাউন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত থেকে স্বদেশবাসীর যথেষ্ট হিতসাধন করে গিয়েছেন। তাঁহার এক শ্বেত-প্রস্তরময় মূর্তি এখন মহাত্মা গান্ধী রোড (হারিসন রোড) ও কলেজ স্ট্রীটের সংগম স্থলে প্রতিষ্ঠিত আছে।

কাঁসারীপাড়ার সং প্রসঙ্গে শ্রীপদ্মানন রায় কাব্যতীর্থ লিখিত “প্রাতঃ-স্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

“সং যাত্রা দেখিবার নিমিত্ত সাধা-রণের এরূপ আগ্রহ ছিল যে, সং বাহির হইবার বহু পূর্বে হইতেই রাজপথের সম্মুখস্থ বারান্দাগুলি দর্শনার্থি জন-সংঘ কর্তৃক অধিকৃত হইয়া যাইত; ঐ সকল ভাড়া দিয়া গৃহের মালিকগণ প্রচুর অর্থ লাভ করিতেন। জনসমুদ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থান করিত।”

উক্ত গ্রন্থে সং প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করেছেন যে,—“প্রাচীন বঙ্গীয় প্রথার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক হিসাবেই তারকনাথ এই অনুষ্ঠানের পরিচালক-পদ গ্রহণ করেন এবং ইহাকে লোকপ্রিয় করিবার নিমিত্ত আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন।”

কাঁসারীপাড়ার সংয়ের সাথে সেকালে বিশেষভাবে নির্মিত ঘোড়ার গাড়ী করে সংয়ের দল ও অভিনেতারা বিভিন্ন পথে ঘুরতো। সেকালে এই গাড়ীকে বলা হতো “কাটরা গাড়ী”। অর্থাৎ অশ্ববাহিত সুসজ্জিত কাটরা করে সং ঘুরতো। উত্তম বসন-ভূষণে বিভূষিত অভিনেতারা যে সব অভিনয় দেখাতেন ও গান গাইতেন তা’ রসাত্মক ও শিক্ষাপ্রদ সুন্দর দৃশ্য বলে গৃহীত হতো। ছোট ছোট নাটিকা ঘোড়ার গাড়ীতে অভিনয় হতো। যেমন শকুন্তলার নাটিকাবলম্বনে রচিত একটি পালা সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। উক্ত নাটিকার

দৃশ্যমন্ডলের প্রতি শাঙ্গরবের উক্তি কিয়দংশ উল্লেখ করলাম—

“জয় জয় মহারাজ দৃশ্যমন্ড ভূপতি!
যশঃকীর্তি, আরবুদ্বিকি,

ধর্ম থাক মতি।

ধর্মারণ্য-বাসী, পুণ্যরাশি, তপোধন—
মহর্ষি কণ্ঠের শিবা, আমরা দৃজন॥

অবধান, মহারাজ! তাঁহার আরতি—
শকুন্তলা কন্যা ধন্যা—রূপগুণবতী—
তারে না জানিয়ে তোমা করেছে বরণ।
তথাপি হয়েছে তাঁর প্রীতির কারণ॥

—ইত্যাদি

উক্ত পালায় শকুন্তলার উক্তিঃ—

“হা বিধাতঃ! এই ছিল ললাট লিখন!

বিখ্যাত ছড়া হ’লো কৃষ্ণ-কালী বিষয়ে
ছড়াঃ—

“শুনিয়ে মুরালি-ধ্বনি,
গৃহে হ’য়ে উদাসিনী,

বনে এলেন কমলিনী রাই।

কুটীলা তো দেখতে পেয়ে

কুটিল ভাবে অগ্নি ধেরে,

জানায় গিয়ে আয়ান ঘোষের ঠাই—

শুন বলি ওগো দাদা!—

তোমায় তো বানিয়েছে গাধা—

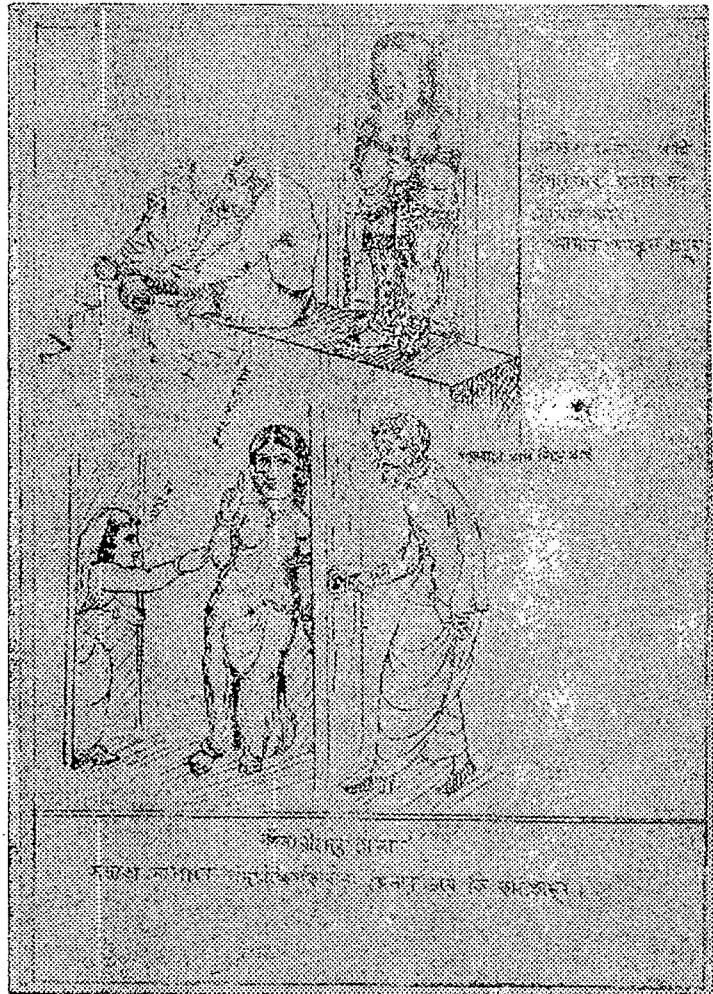
হারামজাদা বৌ এমন দোখিনে,

তোমার মাথায় ঘোল ঢাল,

বনে নিয়ে বনমালী,

রসের খেলা খেলেছে সে নিজনে!”

—ইত্যাদি



১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ‘বসন্তক’ পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যঙ্গ চিত্র।

সরলা সরল মন, ভাবিয়া সরল জন,

সংপল্লব প্রাণ-মন,

কে জানে যে সুধার্মণ্যে বিবের সঞ্জন!

অরণ্যের পূর্বরাগ, অনুরাগ এত!

ভাঙ্গিল স্বপন-ভুর, সব আশা হ’লো দূর,

আপন অদৃষ্ট ক্রুর,

সাধিয়া কাঁদিয়া হব মিছা মানহত!”

—ইত্যাদি

কাঁসারীপাড়ার সংয়ের আর একটি

উক্ত পালায় কৃষ্ণের প্রতি রাধার
উক্তিঃ—

“চেয়ে দেখ, বনমালি, হ’লো বিষম দায়—
আয়ান ঘোষের হাতে আজ

প্রাণটা বুদ্ধি যায়—

কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিবাদী ননদী মোর বাঘিনী,

ভাইকে নিয়ে আসছে ধেরে,

উপায় কি শ্যাম গুণমণি?”

—ইত্যাদি

তদন্তে কৃষ্ণের উক্তিঃ—
 “শুন রাধে বিনোদিনী,
 চিন্তা কেন কর ধনি,
 উপায় করব আমি, হ'য়ে না উতলা।
 ব্রজে তুমি রাহীকেশরী,
 ছলেতে আয়ানের নারী,
 গোলোকে গোলোকেস্বরী, আপনি কমলা।
 তুমি প্রিয়ে আদ্যশক্তি,
 ভব-ভয়ে কর মুক্তি,
 আয়ানের কি আছে শক্তি,
 তোমায় ভয় দেখাতে?
 ত্যেজে রূপ-বনমালী,
 আমি হই কৃষ্ণকালী,
 তুমি দিয়ে পদ্পাঞ্জলি, বৈসহ পূজিতে।”
 —ইত্যাদি

সেকালে কাঁসারীপাড়ার সংয়ের মুখ
 থেকে মুখে হয়ে পল্লীবাসিনী শুনতেন—
 দুজর মানে কৃষ্ণের সন্ন্যাস গ্রহণ ভাবের
 ছড়া—দুতীর উক্তিঃ—
 “দেখ দেখ কমলিনি! কৃষ্ণবারে আসি,
 দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নবীন সন্ন্যাসী:—
 ত্রিশূল-উষ্মর-ধরা; পরা বাঘ-ছাল,
 ববম্ ববম্ ঘন বাজাইছে গাল;
 ভাং ধুতুরায় ঘোরে আঁখি ঢুল ঢুল;
 সবাংগে বিভূতি, কর্ণে ধুতুরার ফুল।
 “ভিক্ষাং দোহি, ভিক্ষাং দোহি”
 ধীরে ধীরে বলে—
 আহা! কথাগুলির ছলে যেন
 সুধারাশি গলে।”
 —ইত্যাদি

কাঁসারীপাড়ার সংয়ের প্রায় নব্বই
 বছর পূর্বের একটি গানের কিয়দংশ
 উল্লেখ করলামঃ—

“আজর সহর কলকেতা।
 হেতা ঘটে পোড়ে গোবর হাসে,
 বলিহারি সভাতা।।

পেটের পীড়ায়

“এন্টারন” একটি বিশ্বকর শ্রেষ্ঠ
 ঔষধ। ইহা ব্যবহারে পাক্ষণিক দোষ,
 ক্ষয়, অজীর্ণ, পুরাতন আমাশয়, তরল
 দাশ, পেট বেদনা, শিশুদের রিকটন প্রভৃতি
 দ্রুত দূরিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩
 টাকা। মাগুর পুথক।

হাণিয়া (অন্তরু রক্তি)

বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা
 অন্তরু রক্তি ও কোষরক্তি স্থায়ী আরোগ্য হয়
 ও আর পুনরুত্থান হয় না। রোগের বিবরণ
 সহ পত্র লিখিয়া নিম্নলিখিত লিউন।

হিন্দু রিসার্চ হোম

৩৩, নীলরতন মুখার্জী রোড, শিবপুর
 হাওড়া। ফোন: ৬৭-২৭৫৫

এইর এক নতুন হৃদয়
 উঠেছে রে ভাই,
 অশ্লীলতা শব্দ মেরা
 আগে শুনি নাই;
 এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা,
 বঙ্গদর্শন এর নেতা।”
 —ইত্যাদি

উক্ত গানের মধ্যে আরও উল্লেখ
 আছে—
 “বৎসরান্তে একটি দিন
 কাঁসারীয়া যত,
 নেচে কুঁদে বেড়ায় সূত্রে
 দেখে লোক কত,
 এতে গরীব লোকের আমোদ বড়,
 সভ্যতার মাথা ব্যথা।।”
 —ইত্যাদি

সং প্রসঙ্গে সেকালের পত্রিকা—
 “নব্যভারত” ১৩১০ সালের মাঘ
 মাসের সংখ্যায় উল্লেখ আছে যে—“প্রায়
 ত্রিশ বৎসর পূর্বে যদিও তখন বাণ-
 ফোঁড়া প্রচলিত ছিল না, তবুও কাঁসারী-
 পাড়ার বাবু তারকনাথ প্রামাণিকের
 উৎসাহে কাঁসারীয়া মহা উৎসাহে সঙের
 মিছিল বাহির করিত। সেই সময়
 মহাত্মা বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যশে
 কলিকাতার অনেকগুলি কৃতিবিদ্য লোক
 ও খুঁচান পাদরী একটি অশ্লীলতা
 নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন; এই
 সভার অনুরোধে গভর্ণমেন্ট প্রকাশ্য
 পথে অশ্লীল সঙ্গীতাদি নিবারণোদ্দেশ্যে
 দণ্ডবিধির প্রচার করায় ঐ মিছিল বন্ধ
 হইয়া যায়।”

উক্ত “নব্যভারত” পত্রিকায় আরও
 উল্লেখ আছে যে—“অমৃতবাজার পত্রিকার
 ন্যায় সংবাদপত্র এই সভাকে বিদ্রূপ
 করিতে ছাড়েন নাই।”

সেকালে সং-এর গানে অশ্লীলতা
 দোষ দেখিয়ে সং-এর মিছিল বন্ধ করার
 যে চেষ্টা হয়েছিল তার উল্লেখ আমরা
 পাই ১৩১০ সালের “নব্যভারত”
 পত্রিকায়। একদল যেমন অশ্লীলতা
 খুঁজে বেড়াতে ঠিক তেমনি আর এক-
 দল সং-এর মিছিলে কোনরূপ
 অশ্লীলতা নেই তা দেখানোর চেষ্টা
 করতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে
 পারে সেকালের মাসিক “বসন্তক”
 পত্রিকায় (১৮৭২—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের
 সংখ্যায়) যা লেখা হয়েছিল। কিয়দংশ
 উল্লেখ করলামঃ—

“এক্ষণে সামান্য লোকের আমোদ-
 আহ্লাদ ও উৎসব তো সকল একে একে
 শেষ হইতেছে। এক্ষণে যাত্রা নাই,
 পাঁচালী নাই, কবিগণ তো কথাই নাই।
 সামান্য লোকেরা কি লইয়া থাকিবেন।
 কেবল ধান্যস্বরী। আর ছোবড়া টেনে
 ক দিনপাত হয়?”

সামান্য লোকের মাথায় কাঁঠাল
 ভেঙ্গে এ সভ্যতা দেখান কেন?”

উক্ত পত্রিকায় আরও উল্লেখ আছে—

“কাঁসারীপাড়া দিয়া তো কাঁসারীদের
 সং বাহির হয়, সেখানে তো বাবু কৃষ্ণ-
 দাস পাল থাকেন, তিনি কি সভ্য আর
 অশ্লীল?”

সেকালের কাঁসারীপাড়ার সং বারা-
 গসী ঘোষের গুটীট থেকে বার হয়ে
 বিভিন্ন পথে ঘুরতো। রাস্তা লোকে
 লোকারণ্য হতো বিশেষ করে চিংপুর
 রোড ও কর্ণওয়ালিস গুটীট।

কাঁসারীপাড়ার সং প্রসঙ্গে যা
 সংগ্রহ করা হয়েছে তা এখানে লিপিবদ্ধ
 হলো। এবার কাঁসারীপাড়ার পথ প্রসঙ্গে
 দু-চারটি কথা—

বারাগসী ঘোষের গুটীট ইহা জোড়া-
 সাঁকো হতে আরম্ভ হয়েছে। এই পথের
 উপর এক প্রাসাদতুল্য ভবনে মহাত্মা
 কালীপ্রসন্ন সিংহ বাস করতেন। মহা-
 ভারতের অনুবাদ করে সিংহ মহোদয়
 অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। তাঁহার
 প্রসিদ্ধ পুস্তক “হুতোম পেঁচার নজ্জা”।
 নীলদপণের ইংরাজী অনুবাদ করে
 লং সাহেবের যখন জেল ও জরিমানা
 হয়, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ই
 তাঁহার জরিমানার টাকা প্রদান করেন।
 বারাগসী ঘোষ দেওয়ান শান্তিরাম
 সিংহের জামাতা। দেওয়ান শান্তিরাম
 সিংহ কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ।
 বারাগসী ঘোষ—কলকাতার তদানীন্তন
 কালেক্টর, আইন-ই-আকবরির অনু-
 বাদক গ্লাডউইন সাহেবের অধীনে
 দেওয়ানী করতেন। বারাগসী ঘোষের নাম
 হতেই পথটির নামকরণ হয়।

সেকালের কলকাতার ম্যাপে দেখা
 যায় যে, বারাগসী ঘোষ গুটীট বৈরেন্দ্রে
 চিংপুর রোড থেকে। উক্ত পথটি একে
 বৈরেন্দ্রে হ্যালিডে গুটীট যা এখন সেন্ট্রাল
 (পরে, চিত্তরঞ্জন) অ্যান্ডারউই অংশে
 পরিণত হয়েছে। উক্ত পথ পার হয়ে এসে
 পড়েছে কর্ণওয়ালিস গুটীটে। বর্তমানে
 কর্ণওয়ালিস গুটীটের দিকের অংশটি
 অর্থাৎ গ্রীমাণি বাজারের পাশ দিয়ে যে
 পথটি গিয়েছে সেই পথটির বর্তমান
 নাম তারক প্রামাণিক রোড। অর্থাৎ
 সেকালের কাঁসারীপাড়ার রাস্তা। এই
 রাস্তার প্রায় পূর্বপ্রান্তে তারকনাথ
 প্রামাণিকের ভবনটি অবস্থিত। কল-
 কাতার একটি ঐতিহাসিক ভবন। দরজা
 দিয়ে ঢেকে সামনে চোখে পড়ে প্রকাশ
 উঠান আর ঠাকুরদালান। অতীতের
 বহু উৎসব ও পল্লীবাসীর বহু আনন্দ-
 উজ্জ্বল দিনগুলির স্মৃতি-চিহ্ন নিয়ে
 দাঁড়িয়ে আছে।

না—সে মাকে আজ কি করে রেখে গেলি তুই? কী সান্নিধ্য সাপ্তিত রেখে গেছিস?”

কাঁদাছিলাম—মাসিমাই হাত ধরে আমাকে ঘরে নিয়ে এলেন। তপতীর একখানা নিজস্ব ঘর ছিল সেই ঘরই কিন্তু তপতীর কোনো চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে নেই। বিছানার চাদর থেকে শূন্য করে টেবিলের বই কোথাও তার চিহ্ন নেই, দেওয়ালে তার যে ছবিখানা ঝুলতো—একটা সুন্দর ফুলের গোছার ক্যালেন্ডার ঝুলছে সেখানে।

আমার মূখের দিকে তাকিয়ে আমার মনের কথাগুলো কেমন সহজে বুঝে নিলেন মাসিমা—, “ভাবিছিস, তপ্তকে এমন করে নিশ্চিহ্ন করেছি কেন—না রে?”

আমার চোখ দিয়ে আবার জল গড়াতে লাগলো কিন্তু মাসিমা কাঁদলেন না। আমার মূখের দিকে ফ্যাকাসে ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে তাকিয়ে রইলেন একটু তারপর প্রায় ফিস্ ফিস্ করে কললেন, “তপ্তর কোনো স্মৃতিকেই আমি সহিতে পারি না রে জয়ন্তী। ভয় হয় ওই স্মৃতি ধরে ও যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়—যদি আমার দিন-রাতের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আসে—যদি.....।”

মাসিমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে না ভা? কেমন ভয় করতে লাগলো আমার—ভয়ে আর কণ্টে কান্না লিঙ্গদণ হয়ে উঠলো।

মাসিমা আবার মূখের দিকে তাকালেন, কথা বললেন, মনে হ’ল কত কালের ক্লান্তি জড়ানো সে স্বরে। আর

সে কথায়—সে জিজ্ঞাসায় আমার চোখের জল বন্ধ হ’য়ে বিপ্লব ফুটে উঠলো দু’চোখে।

“জয়ন্তী—বলতে পারিস তপতী মেয়েটা আসলে কেমন ছিল।” এ কি প্রশ্ন? আমার আর কোনো সন্দেহই রইল না যে মাসিমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ বাড়িতে কেউ তা লক্ষ্য করে না। জানি মৃতকে সবাই ভুলে যেতে চায়—ভুলে যায়, পারে না কেবল সেই একটা মানুষ—মা। তপতী যে মৃত তাই বা কে বলেছে—কিন্তু এখনি তাকে এমনি করে ভুলে যেতে হবে! কেউ কি মাসিমাকে কাছে বসে একটু সান্নিধ্যর কথাও শোনায় না নাকি মাসিমারই শোক প্রকাশের অবসর নেই তাই নিজের মধ্যে গমরে গমরে মাসিমা পাগল হ’য়ে যাচ্ছেন। দু’হাতে আমি মাসিমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম, বললাম, ‘মাসিমা, তপ্তর কথা বলে আপনি একটু কাঁদুন—আমার সঙ্গে কাঁদুন—বুকটা হাল্কা হবে আপনার। এমন করে চেপে থাকলে আপনার যে ক্ষতি হবে মাসিমা।’

তবু কাঁদলেন না, তেমনি জেদী গলায় বললেন, “আগে বল তুই, তপতী কেমন মেয়ে ছিল?”

“আপনার চেয়ে আমি তাকে বেশি চিনি? সে যে আপনার নিজের জিনিস।”

—“না রে, নিজের জিনিস হলেই বা? বাবা-মাই বোধহয় ছেলেমেয়েদের চেনে সবচেয়ে কম—নইলে.....।”

—“তপ্ত আপনাকে যে কত ভালো-বাসতো সে বোধহয় আপনিও জানেন না—আপনাকে ও দেবীর মত ভক্তি করত।”

—‘কেন রে’?—মাসিমা কেমন অবাক হ’য়ে গেলেন যেন।

“তাতো জানিনে, কেবলই বজাতো আমার মা আমার জীবনের পথ দেখিয়ে—ছেন এমন মা কারো হয় না।”

মাসিমা যেন অন্যমনস্ক হ’য়ে কোন এক জগতে চলে গেলেন—আপন মনে বলতে লাগলেন, “বলেছে? বলতো বুঝি এ-সব কথা তাদের কাছে? জয়ন্তী, তপ্ত এ্যাডভেঞ্চার খুব ভালোবাসতো নাকি রে?”

“এ্যাডভেঞ্চার! তপ্তর মত শান্ত আর সহিষ্ণু মেয়ে—মাসিমা! এত তো আমার বন্ধু-বান্ধব আছে, এমন করে সহ্য করতে, এমন করে যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে মরেও সাহসের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে আর কাউকে দেখিনি।”

হঠাৎ এতক্ষণ পরে কে’দে-ভেঙ্গে পড়লেন মাসিমা, ‘শান্ত, সহিষ্ণু! মিথ্যে কথা রে—মিথ্যে কথা। ওর মতো নিষ্ঠুর, ওর মতো অত্যাচার আর কোনো মেয়ে মায়ের ওপর করেছে কিনা জানি না। জানিস, ও কি করেছে? তোর বন্ধু তপ্ত সমস্ত টাকা-পয়সা আমাকে উইল করে দিয়ে গিয়েছে। জানিস গ্রিশ-বছরের নিজের জীবনের সবখানি জালা আমায় ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সে চলে গেছে—নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাকে যে আমি শেষবারের মতও একবার দেখতে পাইনি।’

তপতীর পুরানো সব স্মৃতি আমার মনে ভিড় করে আসছিল, বললাম, “মাসিমা, মহীতোষ ওর জীবনটা যদি এমন করে নষ্ট না করে দিত—ও জীবনের মানে হয়তো এমন করে হারিয়ে ফেলতো না।”

কানে হাত চাপা দিয়ে মাসিমা বললেন “বলিস্‌নে, বলিস্‌নে,—ও নাম উচ্চারণ করিসনে। উঃ আমি যে মা—না হ’লে.....।” হঠাৎ স্থির হ’য়ে চোখের জল মুছে ফেলে মাসিমা বললেন, “জয়ন্তী, তোকে একটা জিনিস দেখাই—তুই পড়ে বল আমাকে, বুঝিয়ে দে। আমি খুলে পড়তে পারিনি—ভয় হ’য়েছে আমার—কি ভয়ঙ্কর কথা ওখানে লিখে রেখে গেছে ও কে জানে—আমি সহিতে পারবো না হয়তো। আজই দু’পুড়ে খুঁজে পেলাম ওখানে.....।”

বড় বড় ফুলস্কপ কাগজের কয়েকটা পাতা ভাঁজ করা একটা খামের মধ্যে—কার্বণ কপি করা। মনে হয় আসল কপিটাকে কোনো কাজে লাগিয়ে কার্বণ কপিটাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল—তপতীরই হাতের সেই বাঁকা বাঁকা লেখা—

মহীতোষ,

যেদিন তুমি বিদেশ যাবার ছাড়পত্র পেলি আমি তোমার বৃক্ক মূখ রেখে কাঁদছিলাম—কাঁদছিলাম সুখে, গর্বে।

আমার একেবারে ঠিক হয়ে যাওয়া বিয়েটা কেমন জঘন্য করে দিয়েছিলে

ফোন: ৫৫-৪০১২

বিবিসি ডেকরেটর

২২৩ চিত্ররঞ্জন এভিনিউ: কলিকাতা-৬

সার্ভে ড্রইং সরঞ্জাম ও
অফিস সংক্রান্ত ষ্টেশনারী
কাগজ বিক্রয় ও প্রিন্টার্স

রহস্যময় ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

কুইন ষ্টেশনারী স্টোর্স প্রাইভেট লি.

৬৩ ই. রাধাবাজার স্ট্রীট: কলিকাতা-১

ফোন: ২২-৪২২৩

তুমি সেকথা সোঁদন আমার আবার মনে পড়েছিল। অথচ তুমি আমাকে চাও একথা আগে নাকি কখনই তোমার মনে হয়নি। দুজনে পাশাপাশি কাজ করলাম, চলাফেরা করলাম, হৈ চৈ করলাম, জলসা করলাম। অফিসের উৎসবে দিনের পর দিন নাটকের মহড়া দিলাম, দুজনে প্রধান নায়ক-নায়িকা হ'লাম তখনও তোমার কিছু হ'ল না—আমার যদিও কিছু হয়েছিল কিন্তু তোমার কাছ থেকে সায় না পেয়ে তাকে আমিও আমল দিলাম না। কারণ তোমার যদি কখনও একথা মনে না হয় যে এ মেয়েটা ছাড়া আমার চলবে না, আমারই বা কেন একথা মনে হবে যে তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না—আর তাই নিয়ে ইগিয়ে বিনিয়ে কামা ভাও আমার ধাতে নেই। তাই বাবা যখন তাঁর পিতৃধ্বের অধিকারে আমাকে সংপাশস্থ করতে গেলেন আর ছেলটাকে দেখে যখন আমার খরাপ লাগলো না আমি কেনই বা বিয়েতে অমত করবো? আমি খুশী হয়ে বৈঠকে এসে বিয়ের খবর দিলাম, মেয়েরা আমাকে ঘিরে ধরলো নানা প্রশ্নে, ছেলেরা অভিনন্দন জানালো—তুমি উঠলে সবায়ের ওপরে, চে'চামিচ করে এক হুলস্থূল কান্ড বাধালে। আমার টাকায় সন্দেশ এলো, চা এলো। হঠাৎ কি হ'ল একটা সন্দেশ আধখানামাত্র খেয়ে তুমি ফ্লট সিরিয়ে দিলে—আমি দেখলাম কেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মূখের দিকে তাকাতে লাগলে বারে বারে।

বৈঠক হ'য়ে গেলে রাস্তায় নেমে আমার সঙ্গে সঙ্গে এলে, বললে 'তপতী, শুনুন।

আমি বললাম, কি বলুন?

"চলুন, ঐ চায়ের দোকানটায় গিয়ে বসি।"

"চা যে খেলেন এইমাত্র।"

"চলুন না—কথা আছে।"

কেবনের পদ টেনে দিয়ে প্রথম কথা তুমি কললে, "আপনার যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সে বেশ ভালো ছেলে না?"

"হ্যাঁ, মোটা মাইনে পায়, গুন গাইতে পারে মনেছি।"

"দেখতে বেশ সুন্দর না?"

"মন্দ না—আপনার কিম্বা আমার চেয়ে সুন্দর।"

"আপনার এ বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে কেন?"

"বারে! ইচ্ছে না হবারই বা কি আছে? বিয়ে তো একদিন করতেই হবে—তাছাড়া বাবা-মা সবাই এতে খুশী হবেন। বিয়ে করবো না এমন প্রতিজ্ঞা তো আমার নেই।"

"না, শুনুন," হঠাৎ আমার হাতের ওপর হাত রেখেই আবার সিরিয়ে নিলে সে হাত, "এমন করে সাধারণের মত কেন হবেন আপনি? এ বিয়েটা ভেঙে দিতে পারেন না?"—কাঁপা কাঁপা হাতে তুমি একটা সিগারেট ধরালে—তোমার গলার স্বরও কাঁপছিল, তবু আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ভেঙে দিয়ে তারপর?"

"তারপর"—তোমার মত ছেলেও আর চোখ তুলে তাকালে না আমার দিকে "তারপর লড়াই—বাড়ির সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে। সেখানেই তো জীবন—আমি আছি আপনার পাশে।"

আমি অবাক চোখে তাকলাম—বুঝতে চেষ্টা করছিলাম তোমাকে, তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে—"বুঝতে পেরেছেন? নতুন করে কাছে যাবেন? কে আপনাকে বুঝবে? তাছাড়া আমি—আমি পারবো না—আগে বুঝিনি—এখন বুঝতে পারছি"—বলে অপরাধীর মত ম্লান হাসি হাসলে।

সে হাসিতে কী ছিল জানি না—আমার সব অন্যরকম হ'য়ে গেল। তারপর কত কথা হয়তো আমরা বলছিলাম কিম্বা কিছুই বলিনি, কিন্তু একটা জিনিস মনের মধ্যে গাঁথা হ'য়ে গেল—তোমার হাসিটা! আমার আগেকার যত প্রস্তুতি আর মনে নেওয়াকে আমি অপরাধীর মত যেন বিসর্জন না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি পেলাম না। একটা এ্যাড-ভেঞ্চারের লোভ যেন আমাকেও পেয়ে বসলো। আমি বাড়ি এসে বিয়ে ভেঙে দিতে বললাম। যত সহজে কথাটা বলতে পারছি ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজে হয়নি। একটা প্রচন্ড চীৎকারের মত, একটা উৎপাতের মত আমার সমস্ত কথাগুলো যেন সংসারের ওপর ভেঙে পড়লো। সোঁদন আমার মায়ের চোখের জল পড়োঁছিল, বাবার রাডপ্রেসার কতটা বেড়েছিল তার খোঁজ আমি রাখিনি। কারণ আমি চাকুরে মেয়ে। বাবা-মার মধ্যে হয়তো একটা গোপন সন্ধি হয়েছিল—আমাকে এজন্যে একটা কড়া কথাও তাঁরা বলেননি। কখন একসময় নিঃশব্দে

বিয়েটা তাঁরা ভেঙে দিয়েছিলাম—কখন একসময় নিঃশব্দে সমস্ত ব্যাপারটার ওপর যেন যবনিকা পড়ে গিয়েছিল তার খোঁজও আমি রাখিনি। এ বাড়িতে বিয়ের সম্বন্ধে আর কোন কথাই উঠলো না—বাবা আমাকে ডেকে একটা কথাও বললেন না কিন্তু তাঁর ব্যবহারে একটা জিনিস তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন—তোমাকে তিনি পছন্দ করেন না। পদুর্ভবের ইনটাইশান দিয়ে হয়তো কিছু বুঝিয়েছিলেন তিনি—কে জানে! বাবা না করুন কিন্তু মা তো আছেন। তোমার কথা আমিই তাঁকে বলে বলে তাঁর মনের মাটিটাকে ভিজিয়ে তুলেছিলাম। তুমি দেখতে সুন্দর নও কিন্তু তোমার অন্তরের রূপের তুলনা নেই—তোমার আত্মীয়-স্বজন চাল-চুলো নেই, কিন্তু তুমি অমিত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছো—এসব কথা বলে বলে আমি মায়ের মনের জমিটিতে বীজ বুনিয়েছিলাম আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নিজেরই কম্পনার জালে নিজেকে জড়াচ্ছিলাম, তোমার সব কিছুকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। রুমে মায়ের সেই মনের ভিজে জমিতে তোমার পদক্ষেপ সহজ হয়ে উঠতে লাগলো—তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আর আমার বোঝানোর অপেক্ষায় রইল না। এমনকি বাবা পর্যন্ত সহজ হয়ে উঠলেন যখন, এমনি একদিনে তুমি আমাকে একটা কথা বলোঁছিলে—বলে খুব হেসেছিলো। মজা লেগেছিল আমারও, আমিও হেসেছিলাম, তারপর

সাধারণ পাঠাগারের উপযোগী
গল্প ও উপন্যাসের সমস্ত বই
কলিকাতার কমিশনে সংগ্রহ করেন।

দামোদর প্রকাশনী

বর্ধমান শহরের সর্বাধুনিক
পুস্তক বিপণি
॥ বিজয় তোরণ ॥ বর্ধমান ॥



দু'জনেই হৈ হৈ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে সব কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

তুমি বলছিলেন, “আসলে কি জানো? একটা মজা করা গেল আর কি। তুমি যদি সেদিন অমন হঠাৎ বুক ফুলিয়ে, খুশী হয়ে বিয়ে করার কথাটা না বলতে তাইলে হয়তো আমার কিছই হ'ত না। কিন্তু যেই দেখলাম এ নিয়তে তোমার বেশ মত আছে—তুমি খুশী, ছেলেটা বেশ ভালো, ওমনি আমার মাথায় ভূত চাপলো। তোমাকে অন্যলোকে পাবে এ আমার সহ্য হ'ল না—করে ফেললাম একটা এ্যাডভেঞ্চার।”

“এ্যাডভেঞ্চার। যদি আমি রাজী না হ'তাম তোমার কথায়?”

“আরে এ্যাডভেঞ্চারের তো তাই নিয়ম—মোটামুটি একটা পথ ভেবে নিয়ে তো বাঁপিয়ে পড়তে হয়—সফল না হলেই বা। ওটাই তো মজা।”

তোমার এ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ আমাকেও পেয়ে বসেছিল। কিন্তু সেই এ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে যখন মাঝে মাঝে মদ খাওয়াটাকেও তুমি যোগ করে বসতে আমার বাঙালী মেয়ের মন একেবারে বেক বসতো; আর তুমি কেবলই বলতে, “খোং, তোমাদের দিয়ে কিছই হবে না। এই সামান্য ব্যাপারে এত কান্ডও করতে পারো তোমরা। কতটুকু খেতে পাই আমরা বল—কি মাইনে পাই—কতটুকু আমাদের প্রাণ? ভয়ে ভয়ে বারে ঢুকবো—মেপে এতটুকু খাবো, ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে আসবো তাও বাধা দেবে?”

আমি ভারী বিরক্ত হ'য়ে বলতাম, “তোমাদেরই বা কি সুখ হয় বল? ওটা তো আমাদের না হ'লে চলে না এমন নয়—। শীতের দেশের লোকেরা খায়—সে আলাদা কথা। সেখানে গিয়ে খাও প্রয়োজনে—কিছই বলবে না কেউ।”

“আঃ,” তুমি চমকে উঠতে, “আঃ, কোনোদিন যদি যেতে পারতাম সেখানে—আমার জীবনের সব আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণ করে নিতাম। জানো কি করতাম?”

আমি মাথা নেড়ে বলতাম, “না, শুনতে চাই না—যে ভাবনায় আমি নেই সে ভাবনা আমি শুনবো না।”

তুমি ভোর করে আমার হাত চেপে ধরে সামনে বসিয়ে বলতে, “শোনো, শুনতেই হবে তোমাকে। আচ্ছা তপতী? তুমি একটুও এ্যাডভেনচারিস্ট নও কেন? ভাবো তো—বাইরে বরফ পড়ছে—আমি

গ্রেট কোর্টে সর্বাঙ্গ ঢেকে মোটা জুতোয় বরফ মাড়িয়ে মাড়িয়ে রাস্তা চলেছি। বাইরেটা অসহ্য ঠান্ডা, বাসায় ফিরে কোট থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে বরফ ফেলছি—টুপি থেকে ফেলছি, তারপর মদ খেয়ে সমস্ত শরীরটাকে চাঙ্গা করে.....আঃ, ভাবতে বা ভালো লাগে।”

খুব রেগে গিয়ে আমি বলতাম, “শুধু মদ—আনন্দস্বাদ আর কিছই নয়? সন্টার সঙ্গে নারী? লাগবে না তোমার?”

তুমি যেন আরও উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে, “আঃ, মেয়ে যদি হয় তো ইরানী

তো ঘর বাঁধে না—লাল আগুনের মত চুলের বিন্দুনি, কালো চোখ আর থাপ থোলা তলোয়ারের মত দেহ—মেয়ে যদি হয় সে রকম তবে জীবনের একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়—একটা এ্যাডভেঞ্চার হয়।”

সেদিন আমার খুব রাগ হ'য়েছিল, দুঃখে আমার দু'চোখ ভরে জল এসেছিল—আমি রাগ করে উঠে যাচ্ছিলাম। তুমি সেটা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলে, “ওমনি রাগ হ'ল তো? আচ্ছা তুমি এত সাধারণ কেন বলতো? আমার কোনো



“ওমনি রাগ হ'ল তো?”

মেয়ে। শুনছি ওসব দেশে কিছই পাওয়া যায়। শুনছি এমন ঈর্ষা ওদের তার নাকি কোনো হিসেব-পত্তর নেই, যাকে ভালোবাসলো তাকে ভীষণ ভালোবাসলো আর রাগ হ'ল তো দিল খুন করে। ওরা

কল্পনাকেই তুমি সহ্য করতে পারো না। জানো না আমার মধ্যে একটা বর্বর পুরুষমানুষ বাস করে—সে তো এসব ভাববেই। তাই কি সত্যি হচ্ছে নাকি? আসল সত্যটা তো তুমি—এই আমার

বাঙলা দেশের মাটির প্রদীপ—নাই বা হ'ল আমার এ্যাডভেঞ্চার—তুমি তো আছো।”

তুমি যে ভালো ছবি আঁকতে পারো এটা আমি কখনও জানতাম না। হঠাৎ আমাকে বসিয়ে বসিয়ে আমার একটা ছবি তুমি আঁকতে শুরুর করে দিলে। শেষ হ'লে তোমার ঘরে রেখে তোমার বন্ধুবান্ধবদের দেখালে—সবাই খুব প্রশংসা কোরলো ছবিটার। আমি যে খুশীতে কি করবো ভেবে পেলাম না। একটা মানুষ যাকে আমি অনবরত পাশা-পাশি দেখে দেখে সাধারণের দলে ফেলে দিয়েছিলাম সে যেন আমার চোখে নতুন নতুন মর্দতিতে আবিষ্কৃত হ'তে লাগলো। তোমার একটা ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় তুমি কৃতিত্বের সঙ্গে লিফট পেয়ে গেলে আর তারই সঙ্গে গুরুজব উঠলো আমাদের অফিস থেকে নাকি জনকয়েককে ইউরোপে ট্রেনিং পাঠানো হবে—তার মধ্যে তোমার নামটাও আছে।

জয়ন্তী দৌড়ে এলো সেদিন আমার কাছে, বললে, “কি করছিছরে তুই? মহীতোষ চললো সে খবর রাখিস। বিয়ে না করে ঝোলাচ্ছে কেন তোকে? বিয়ে করে কৈল তাড়াতাড়ি।”

“কেন রে?”

“কেন রে!”—জয়ন্তী আমাকে যেন বাজা করে উঠলো: “তিন বছরের ট্রেনিং তা জানিস? কোনো ছুটি থাকবে না—বদি অন্য রকম হয়ে যায় সব কিছ? যা এ্যাডভেনচারিষ্ট ছিলে মহীতোষ। আর আমাদের ছেলেদের বিদেশে গিয়ে পাখা গজায় জানিসনে—সাদা চামড়ার মেয়েদের দেখে তারা মূর্ছা যায়।”

আমি জানি তোমার পছন্দ—আমি তোমার ইচ্ছেগুলো জানতাম। আমারও কেমন ভয় করতে লাগলো। গেলাম তোমার কাছে, বিয়ের কথা বলেছিলাম তোমাকে—বলিনি কেবল আশঙ্কার কথাটা, কেমন লজ্জা করেছিল।

তুমি বললে, “দাঁড়াও, যাওয়াটা সত্যি কিনা আমি এখনও জানি না—যদি সত্যি হয়, তাহলে তিন বছরের ব্যাপার তো, মাঝখানে একবার এসে তোমাকে নিয়ে ছুটি লাগাবো।”

“বিয়ে করে তো?”

“পারলে বিয়ে না করে—সেটাই তো মজা। পারবে না থাকতে?”

তোমার মধ্যে অম্ভুত একটা শক্তি ছিল মহীতোষ—আমাকে তুমি যা বলতে

আমি তাই করতাম। ঠিক করেছিলাম নিজেকে কখনও ছোটো কোরবো না তোমার কাছে। আঁকড়ে রেখে—জোড় করে কাউকে পাওয়া যায় না—আমি সাবধান ছিলাম আমার ভায়ে যেন তুমি ডারাক্তান্ট না হও।

তাছাড়া এই বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারটার তুমি আমাদের বাড়িতে কেমন শ্রম্ভার আসন পেয়েছো, একটা ছোটো-খাটো মধ্যবিত্ত সংসারের গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবনের ছককাটা গম্ভী থেকে কেমন করে তুমি নিজেকে অসাধারণের

‘রূপার বই’

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা, রূপকলার আলোচনা ক্ষেত্রে যুগান্তরকারী গ্রন্থ, এবং এ যুগে আমাদের মধ্যে রসবোধের উৎসাহ-সাধনে অতুলনীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গ সাহিত্যের এটি এক অমূল্য সম্পদ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ বহুদিন হল নিঃশেষিত; এটির পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে জেনে রূপরাসিক সহৃদয় ব্যক্তি মাগ্রেই যারপরনাই আনন্দিত হবেন। আমিও এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি এবং এই প্রকাশ বিষয়ে উদযোগী হওয়ায় ‘রূপা কোম্পানী’কে অভিনন্দন জানাই।

—নন্দলাল বসু

দাম ব্যারো টাকা



রূপা অ্যান্ড কোম্পানী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

দলে নিয়ে গেলে, তোমারই অনেক সহ-কর্মীর দ্বারা দৃষ্টি তোমাকে কেমন বিধে, আমার অনেক সহকর্মীর দ্বারা আমাকে কেমন দিনরাত পোড়াচ্ছে আর এ সবের মূলেই যে আছে তোমার সেই এ্যাডভেনচারিষ্ট মনটা—যার জোরে তোমার এ অস্বভাব উত্তরণ সে কথা ভেবে তোমার পাশে আমার এ সাধারণ মনটাকে নিয়ে নিজেকে ভারী দীন লাগতো।

মহাশূরে অফিসের হেডকোয়ার্টারে তোমার শেষ ইনটারভিউ দিয়ে ফিরে এলে তুমি। ওরা তোমাকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করেছে। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার স্মার্টনেস ওদের খুশী করেছে, যার দ্বীপ্তিতে আমি এতদিন অভিভূত ছিলাম তা যে সবাইকেই আকর্ষণ করে এ কথাটা তুমি বাবার আগে প্রমাণ করে দিলে।

তুমি খুশী—একটা অসম্ভব প্রত্যাশা পূর্ণ হ'লে যেমন খুশী হয় মানুষ! সেই খুশী মাথানো মূখেই তুমি বললে, “দেখছো, ভাগ্যি কিয়েটা করে ফেলিনি। ইনটারভিউতে যে তিনজন চান্স পেলে—তিনজনই আনম্যারেড। কী ওদের লাভ বাবা ওয়াই জানে.....।”

আমার চোখে জল ভরে আসছিল,—তুমি হঠাৎ আমার মূখের দিকে তাকিয়ে বললে, “কি ভাবছো তপতী?”

চোখের জল মুছে ফেলে বললাম, “কই, কিছ না তো।” তুমি সেদিন দু'হাতে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, “মায় ভো তিনটে বছর। এর মধ্যে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো—যাবোই। তাছাড়া কি ভাবছি জানো—?”

আমি তোমার মূখের দিকে জিজ্ঞাসা দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলাম, বললে, “অফিস আমাকে কতগুলো সতর্ক দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল—সে সতর্কগুলো মেনে নিলে আর্থিক দিক দিয়ে লাভ হোত আমারই কিন্তু আমি তা নিইনি। সেজন্যে আমাকে খানিকটা কষ্ট পেতে হবে—ঠিকই কিন্তু লাভ হবে আমার। পারলে আমি অন্য কিছু শিখবো, ইউরোপের জীবনটা দেখবো একবার ভালো করে, আমার সারা জীবনের স্বপ্ন। তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখবে তো—আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে তো?”

কে'দে ফেলছিলাম আমি, “আমি আর নতুন করে কি করবো তোমার

প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া। আমি তো এ্যাডভেনচারিষ্ট নই।”

তুমি শূনে হো হো করে হেসেছিলে, “বাবা! কী অভিমান মেয়ের। সত্যি তপতী, তুমি নিজেকে ভেবে দ্যাখো তো আমাদের জীবনগুলো কী জোলো, জীবনে কোথাও বৈচিত্র্য নেই। ইউরোপে দেখ ওদের জীবনের ওপর দিয়ে যুদ্ধ, খুনোখুনি—ওদের ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকের জীবন যেন পাগুলা ঘোড়ার সওয়ার—আর আমাদের! দাঁড়াও—সেই জীবনের স্বাদ তোমাকে আমি এনে দেবো...তখন।”

তারপর তুমি চলে গিয়েছিলে খুশী মুখে। পরের দিনগুলো সব আমার একার। আমার সমস্ত সন্তা তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হ'য়ে থাকতো—কী সুন্দর চিঠিই যে তুমি লিখতে পারতে। কয়েকটা মাস তুমি সুন্দর চিঠি লিখেছো আমাকে—সাহিত্যের মত। তারপর ক্রমে ক্রমে গেল চিঠির সংখ্যা—ক্রমে বিরল হ'য়ে এলো। অনুযোগ জানালে তুমি জানাতে বড় ব্যস্ত তুমি। যে এ্যাডভেনচারের নেশা এখানে তোমাকে উন্মনা করে দিত ওখানে গিয়ে তুমি তা কতখানি পাচ্ছে জানতে চাইলে কোনো উত্তর পেতাম না। মাঝে মাঝে অফিসে নানা গুজব শুনতাম, শুনতাম হেড অফিস থেকে নাকি কড়া চিঠি গেছে তোমার নামে—কখনও শুনতাম তুমি নাকি এ অফিসের সঙ্গে সংযুক্ত নও আর—তোমাকে নাকি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। লোকেরা এ সব জানতো এবং বিশ্বাস করতো—আমি শুনতাম কিন্তু বিশ্বাস করতাম না কারণ তোমাকে বিশ্বাস করবো এ প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম।

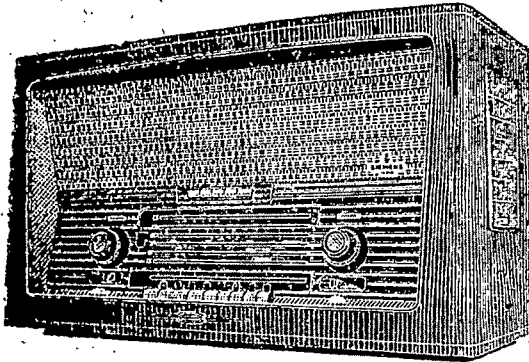
এমনি করে বোধহয় বছর দু'য়েক কেটে গিয়েছিল—ঠিক জানি না। একটা সময় আসে যখন সময়টা তার কাজ করে যায় কিন্তু তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না—আমার হয়েছিল তাই। শেষের দিকে কদাচিৎ একটা চিঠি পেতাম তোমার—কেবল মামুলি কুশল প্রশ্ন তাতে—তারপর সেই শীর্ণ পরিচয়ের সূতোটাও কবে যেন ছিঁড়ে গেল।

যারা আমাকে প্রথমে হিংসে করেছিল তারা এখন আমার দিকে অনু-কম্পার দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। এরমধ্যে গোটাকয়েক বিয়ে ঘটে গেল অফিসের ছেলে-মেয়েদের মধ্য। আমার বন্ধু জয়ন্তী বিয়ে করলো সদ্য বিদেশ-ফেরতা ভালো একটি চাকুরে ছেলেকে। আর জয়ন্তীই একদিন বাড়ি বয়ে এসে বলে গেল অনেক কথা, “জ্যানিস! তুই, মহাতোষ, গোলাম গেছে? জানিস ওর কাণ্ডকারখানা?”

আমি গম্ভীর হইনি—হাসিমুখে বললাম, “মদ খাচ্ছে তো? তা থাক্ না,

SIEMENS
INDIA

সিমনস্ — এর
গ্যাণ্ড সুপার ৭১০ ডব্লু



৫টি লাউড স্পিকার যুক্ত!

প্যানারামিক শব্দ ব্যবস্থা!

পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং আন্দামানের পরিবেশকঃ

নান অ্যান্ড কোম্পানী

১৭, ডালহৌসি স্কোয়ার ইন্ট, কলিকাতা-১

সিমনস্ গ্যাণ্ড সুপার ৭১০—ডব্লু, এ ধরনের এক অদ্বিতীয় সেট। ভারতেই তৈরী। সুন্দর ডিজাইন ও সুদৃশ্য কারিগরী। পৃথিবীর যেকোনো কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বেতার এ সেট গ্রহণ করতে পারে। নিখুঁত স্পষ্ট শব্দ শুনতে পাওয়ার আনন্দ আপনি এই সেটে পাবেন।

সিমনস্ গ্যাণ্ড সুপার ৭১০ - ডব্লুঃ ৯৭২ টাকা ও স্থানীয় কর। অপর তিনখানি বিশিষ্ট নতুন মডেলও অসীলবে আসছে।

স্পেস শাল সুপার ৬৯২-ডব্লু-এ ৫৪০ টাকা এবং শব্দ ও স্থানীয় কর।

স্ট্যাণ্ডার্ড সুপার ৬৯১-ডব্লু-এ ৪৮২ টাকা ও শব্দ এবং স্থানীয় কর।

সুপার রা ১০১-৩২৪ টাকা এবং শব্দ ও স্থানীয় কর।

মদ খাবার এ্যাডভেঞ্চারটা পূর্ণ করে আসুক ওখান থেকে।”

“শুধু মদ!”—মুখ বাঁকালো জয়ন্তী।

“কি? মেয়েদের সঙ্গে মিশছে তো? ইরানী মেয়ে নিশ্চয়ই? জানিসনে তো ওরা কি ধাতের—ঘর বাঁধে না ওরা—মানুষ খুন করতে পারে।”

এবার ক্ষেপে উঠলো জয়ন্তী, “ছাই জানিস তুই। এক আমেরী মেয়ে নিয়ে দিবা ঘর বেঁধেছে দুজনে—শুনলাম সে মেয়ের প্রণয়ীর সঙ্গে মারামারি করে মহাতোষ কিছুদিন হাসপাতালে পর্যন্ত ছিল! হি হি—মারিসমা-মেশোমশাই-এর মূখের দিকে তুই তাকাস কেমন করে? ওরা তোর জন্যে কেমন সুন্দর পাঠ পেরোইছিলেন—ওই মহাতোষটা তোকে কি বোঝালো কে জানে! আমরা তো কেউ ওকে দেখতে পারতাম না।”

আমার মধ্যে কামার সমুদ্র উথলে উঠছিল, তবু ব্যঙ্গের হাসিতে মুখ ভরিয়ে আমি উত্তর দিয়েছিলাম, “আঙুর ফল বড় টক না রে? মহাতোষকে ভালো লাগবার মত ক্ষমতা তাদের কারো ছিল—ওকে পেতে হলে মূল্য দিতে হয় জানিস?”

জয়ন্তী আমার ছোটবেলার বন্ধু—কথাগুলো ওকে বিধলো, কেঁদে উঠে গেল, বললো, “ভারী তো মূল্য—তুই একটা বোকা তাই। অফিস থেকে যে ওর চাকরি গেছে তাও জানিস কি?”

জানলাম সব—যা জানতাম না তাও, যা বুঝেছিলাম সব। এতদিন পরে দীর্ঘদিনের এই স্বাবলম্বী মেয়ের অহঙ্কারে যেন একটু ঘা পড়লো—অনেকদিন পরে হঠাৎ আমার মায়ের কথা মনে পড়লো।

মা শান্ত চোখ তুলে তোমার সব কথা শুনলেন, একটুও কাঁদলেন না, কাঁপলেন না, পুরানো কথা তুলে আমাকে মৃদু তিরস্কার পর্যন্ত করলেন না, কেবল বললেন, “তুমি নিজেকে তাকে চিঠি লিখে জানো তপ—লোকের কথায় কান দিয়ে না। অথবা ভুল বোঝাবুঝির জন্যে ভাবিয়ে তেনে অনুতপ্ত হতে না হয়।” আঃ এই আমাদের মা, আমরা তাঁদের চিনি না, বুঝি না।

তোমাকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম—দীর্ঘ চিঠি। তার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমার জীবনেও এ্যাডভেঞ্চার এসে গেল। আমাদের অফিসে এলো একটি নতুন ছেলে—নির্মল তার নাম। তার সঙ্গে কেমন করে কি সূত্রে আমার যেন আলাপ হয়ে গেল—আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। বয়সে সে হয়তো আমার ছোটই হবে কিন্তু অভিজ্ঞতা তার কারো চেয়ে কম নয়। অনেক দেখেছে সে ছেলে, জীবনের অনেক পথ, অনেক মোহানা পেরিয়ে সে হঠাৎ এই অফিসে

এসে উঠেছিল। সাধারণ চেহারা কিন্তু ভারি শান্ত তার চোখ দুটো। মেয়েরা তাকে টানছে নানা দিকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি মিশতাম নিঃসঙ্কেচে। তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি বসে বসে, কখন এক সময় নিজের সব কথাও বলেছি তাকে, আমার সমস্যার কথা, প্রতীক্ষার কথা—বলেছি তোমার এ্যাডভেঞ্চারের কথা।

নির্মল প্রথম প্রথম হাসতো সব শূনে, বলতো, “দেখুন, ইউরোপ না গেলেও কাম্বোজ-কাসিয়াঙ এ সমস্ত জায়গায় আমি দীর্ঘদিন বন্ধনহীন জীবন যাপন করেছি। যাকে মহাতোষবাবু এ্যাডভেঞ্চার বলে মনে করেন ওরকম এ্যাডভেঞ্চার আমার জীবনেও হয়নি যে তা নয়, কিন্তু ওগুলো আসলে কি জানেন? জীবনের পাঁকে একটু ঘুলিয়ে তুলে দেখতে চাওয়া। ওতে আনন্দ নেই, তৃপ্তি নেই।”

আমি বলছিলাম, “তৃপ্তি তবে আছে কোথায়? এই জেলো জীবনে?”

আবার হাসলো নির্মল, “না, তৃপ্তি হয়তো সেখানেও নেই, কিন্তু উনি দেখছি আপনাদের মাথায় জেলো জীবন-চীবন এ সব কথাগুলো বেশ করে ঢুকিয়ে গেছেন।”

আমি উত্তেজিত হয়ে বলতে চাইলাম, “কেন নয়? দেখুন—ইউরোপের জীবন—ওদের চলা-ফেরা, প্রেম-ভালোবাসা সব কিছু ওদের রক্তে, রুদ্ধে, ঘামে, মৃত্যুতে আর বাঁচার নেশায় এমন করে মেশামেশি যে সাংসারিক সাহিত্য ওরাই সৃষ্টি করতে পেরেছে। আর আমাদের? একটা রক্তাক্ত যুদ্ধ পর্যন্ত আমাদের ওপর দিয়ে যায়নি—বড় জোর একটা দাওয়া না হয় জমির লড়াই। কোনোমতে বেঁচে আছি—কোনোমতে ধুঁকে ধুঁকে প্রাণশক্তিটাকে টিকিয়ে রেখেছি। ওদের সাহিত্যের মধ্যে, জীবনের মধ্যে প্রাণ আর আমাদের সেই বসতা পচা মামূল কাঁদুন।”

নির্মল তবু শান্ত মুখে হেসেছিল, “এভাবে ভাবতে ভালো লাগে বৈকি কিন্তু যাদের জীবন যেমন! কেবল যুদ্ধের বনবনাতেই জীবনের স্বরূপ—স্বামী-স্ত্রীর সুখী সংসারটা চুছে—এ কথা কে বললো? অবাধে মিশতে পারা যায় বলে সে দেশের মেয়েদের কেবল লালসার চোখ দিয়ে দেখা এগুলাের জন্যে বর্বরতাই যথেষ্ট। কিন্তু ওদেরও দেশে ঘরে ঘরে কত পবিত্র প্রেম, সুকুমার চিন্তা আর সৌন্দর্য লুকোনো আছে তাকে প্রস্ফা করাটাই তো আসল কথা। এ্যাডভেঞ্চার কি কেবল সৃষ্টিছাড়া অসামাজিক কাজের মধ্যেই? দুঃখের মধ্যেও অপেক্ষা করে থাকা, যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করা—নিজের মনটাকে শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও অন্যের জন্যে উন্মুখ করে রাখা এগুলোও কি কম বড় শক্তি?”

বাড়ি এসে নির্মলের কথাগুলো সোঁদন অনেক রাত পর্যন্ত ভেবেছিলাম আমি। দেখলাম তিন বছরের মধ্যে তোমার কাছ থেকে পাওয়া মোট চিঠির সংখ্যা হচ্ছে আমার সাত-আটখানা আর তোমার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলে দেখি কিছুতেই ঠিক ঠিক মেলাতে পারছিলাম। এতদিন তুমি আমাকে যা বলতে, যা যা বোঝাতে, যতবার তা ভাবতে যাই ততবার নির্মলের বলা কথাগুলো এসে কান আর মন জুড়ে বসে। তোমার চেহারা ভাবতে গেলে নির্মলের চেহারাটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

অফিসের রমলা নির্মলের পাশের চেয়ারে কাজ করে। শুনলাম বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে সে তার সঙ্গে নির্মলের ঘনিষ্ঠতার কথা নিয়ে। কিছু তার বানানো, কিছু সত্য। একদিন-দুইদিন-তিনদিন—অনেকদিন আমার কানে এলো সে কথা। নিজেকে কেমন নির্বোধ মনে হ’ল হঠাৎ। আমার বন্ধু জয়ন্তী চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, এখন যারা আছে তারা অনেকে নতুন। পুরানো যারা আছে তারা সবাই সংসারী—অন্য আর এক ধরনের জীবনযুদ্ধে তারা বাস্তু, তারা কেউ আমার মত নয়। যারা এখন আছে তারা নবীন—বয়সে—আচরণেও। আমার থেকে তারা স্বতন্ত্র। তাদের দেখে প্রতি মুহূর্তে আমার মনে পড়ে আমাকে সাতাশ বছরে তুমি রেখে গিয়েছিলে—আজ আমি একদিশ পেরিয়ে যাচ্ছি। ওদের যৌবনের অহঙ্কারকে তাই আমি ভয় করতে শুরু করেছিলাম আর নির্মলের সঙ্গে মেশামেশিটাও একেবারে ক্রিয়ে দিয়েছিলাম—সেও একটা আভ্যন্তরীণ। শুনলাম ওরা আমার আর নির্মলের মেলামেশা আর বয়স নিয়ে হাসতে শুরু করেছে—অনুকম্পার হাসি। বিদ্রূপের স্পষ্ট ঝিলিক দেখতে পেলাম ওদের বাইশ-তেরিশ আর পঁচিশের ঠোঁটে। আমি তাই নিজেকে সারিয়ে নিচ্ছিলাম ওদের বিদ্রূপের আওতা থেকে। কিন্তু নির্মল তা হ’তে দিল না। সে আমাকে টেনে আনলো সবায়ের মাঝখানে। আমাকে সে নতুন করে ভাবতে শেখালো, বয়সটাকে সে হেসেই উড়িয়ে দিল, বললো, “বয়স মানুষের শরীরে নয়—মনে।” এ্যাডভেঞ্চারে জিতে গেলাম, আমিও—বাইশ, তেরিশ, পঁচিশের হারিয়ে দিয়ে।

অনেকদিন আগে সব জানতে চেয়ে চোখের জলে ভেজা যে চিঠি দিয়েছিলাম—তুমি তার কোনো উত্তর দাওনি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলে গিয়েছিলে, আমি বিশ্বাস করেছিলাম। তুমি অপেক্ষা করতে বলেছিলে—অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু সে বিশ্বাসের মূল্য দিয়েছো তুমি বিশ্বাসহীনতা দিয়ে, অপেক্ষার মূল্য দিয়েছো নিশ্চিন্ততা দিয়ে—আমাকে

অনেক বিকিষ্ট রাতের চোখের জলে ডাসিয়ে, লজ্জা-দুঃখ-অপমানের তুঘের আগুনে পুড়িয়ে মেরে।

তবু আমার নিষ্ঠা আমাকে ছেড়ে যায়নি। আবার চিঠি দিয়েছিলাম আর একখানা—তাতে ছিল নির্মলের কথা—তাতে তোমার কাছে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি থেকে মৃদু চেনেছিলাম আমি। ভাবিনি যে সে চিঠিও ভেসে যাবে তোমার নীরবতার হাওয়ায়। কারণ তুমি তো সেই লোক, যারা নিজ প্রথমে মূল্য দিতে পারে না কিন্তু যখন দেখে যে যে ধন সে ফেলে দিয়েছে তাকে অন্য কেউ কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখনই লোভীর মত হাত বাড়ায়।

তাই নির্মলের কথা শুনেও তুমি যখন সাড়া দিলে না, বুঝলাম তুমি একটা উল্কার মত জরলে নিভে গেছো—কোথায় তোমার এ্যাডভেঞ্চার!

তোমার চেহারাটা আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম চোখের সামনে একটা চাঁদ্রশ বছরের প্রৌঢ় চেহারা ভেসে ওঠে—। আমি নিজে নিজে কল্পনা করে দেখছি ইউরোপের সেই প্রাণচঞ্চল জীবনকে দেখার নেশায় তুমি কেবল নিজেকে ক্রান্ত আর বিধ্বস্ত করেছে—তোমার আমেরিকা নিয়ে তোমাকে ছেড়ে গেছে, ইরানী মেয়ের খোঁজ আজও মেলেনি—আর যে সব মেয়ের খোঁজ মিলেছে তারাও বাঙলা দেশের তপতী মেয়েটারই মত সাধারণ—তারাও ঘর চায়, সংসার চায়—সেই একই জ্বালো জীবন ইউরোপেও।

তোমাকে আর আমি পুরানো আসনে বসাতে পারলাম না মনের মধ্যে, উল্টে নির্মলের সেই দীর্ঘ ঋজু চেহারা, তার সেই বয়সের তুলনায় একটু গম্ভীর মুখ, তার থেমে থেমে বলা কথাগুলো এখন আমার দিনরাতের সহচর হয়ে উঠেছে। দেখলাম আমি কেমন লোভীর মত হ'য়ে উঠছি। একদিকে বয়সের একটা ব্যবধান আমাকে পিছন টানছে—মন বলেছে, তোমার-যে যৌবন-যেতে বসেছে। আর কেন? মনের মুখে হাত চাপা দিয়ে আমি বাল-চূপ করো, চূপ করো—শুনতে চাইনে।

ভেতর থেকে কে যেন বলে মহীতোষ যদি কোনোদিন ফেরে? মন বলে, যে মহীতোষকে আমি চিনতাম তাকে ভ্রো আমি কোনোদিন ফিরে পাবো না। ভাঙা যন্ত্রে নতুন সুর বাজবে না—বাজতে হয়তো নতুন যন্ত্রেই বাজাবো।

তোমার আর নির্মলের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে একটা ক্ষয়িত যৌবন আর একটা যৌবনের সমারোহ। আমি কাকে গ্রহণ করি, যে তুমি আমার যৌবনকে প্রতীক্ষা আর চোখের জলে ক্ষইয়ে ক্ষইয়ে আজ প্রৌঢ়ের দরজায় পৌঁছে দিয়েছে তাকে? না যে আমার ক্ষয়িত যৌবনকে নিজের যৌবনের দীপ্তিতে ভরে দেবার আশ্বাস দিয়েছে—তাকে? যে বলেছে, “এ্যাডভেঞ্চার তো কতরকমের আছে। সারা ভারতবর্ষটা একবার ঘুরে দেখতে পারি আমরা। ছোটো খাটো সুখ-দুঃখ বিবর্তিত আর শূন্যতার মধ্যও বাঁচবার চেষ্টা করবো। সৌন্দর্য কি শুধু লুকানো আছে পপলার আর পাইনের বনে, শুধু বরফের স্তূপে?”—জানি এরপর ও রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করবে, জানি হয়তো তার অনেকখানি উচ্ছ্বাস, তবু আমি তাতে ভুলছি। এ আমার প্রায় শেষ হ'য়ে আসা যৌবনের শেষ লেভে কিনা জানি না—জানি না কি আছে আমার ভাগ্যে কিন্তু আমি তো তোমারই মন্ত্রশিষ্য—নেমে পড়লাম এ্যাডভেঞ্চারে।

মাত্র গতকালের একটা ঘটনা বাল। সকালের রেডিওতে কার যেন বাজানো সারেগাঙ্গীর সুর বাজছিলো—কী অশ্রুত করুণ সুর! তার মছ'নায়-ছড়ের টানে আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ মচড়ে মচড়ে, গুমরে গুমরে কান্নার তুফান তুলে ফেটে যেতে চাইলো। মনে হোল জগত-সংসারে আমার মত নিঃস্ব, নির্জন, একা কেউ কি কোথাও আছে? মনে হ'ল সমস্ত বিশ্বসংসারের প্রাণের মধ্যে একটিই সুর বাঁধা—তা বিষাদ। তোমার কথা মনে পড়লো—তোমার প্রথম দিকের পাঠানো ইউরোপের বরফ ঢাকা ল্যান্ড-স্কেপ একখানা যন্ত্র করে বাঁধানো ছিল দেওয়ালে, হঠাৎ বহুদিন পরে সেখানার দিকে চোখ পড়লো—সাদা গম্ভীর বরফের ওপর পাতাছাড়া ন্যাড়া ন্যাড়া করেকটা গাছ। হঠাৎ মনে হ'ল তোমাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—সেই বরফের স্তূপের ওপর দিয়ে, বাঙলা দেশের ছেলে তুমি—বিলিতি বৃষ্টি প'রে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে—হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে নারী, সুরা, মেদ-মাংস আর রক্তের মধ্যে মাথা-মাখি হবার জন্যে। যাকে তোমরা বল প্যাসান—সেই প্যাসানের লেভে সেই পা ডোবা বরফের মধ্যে ভুতের মত এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর মনে হ'ল না তুমি নও—কেউ নয়—এ ন্যাড়াগাছগুলোই বুঝি এগুচ্ছে।

সারেগাঙ্গীর সুর হঠাৎ আমাকে যেন চমকে দিল। জানলার ফাঁকে একটুকরো রোদ এসে লালচে করে তুলেছিল ল্যান্ড-স্কেপটাকে—হঠাৎ মনে হ'ল ছবির মধ্যের ঐ সাদা বরফের স্তূপ লাল হ'লে উঠেছে আমার বুকের রক্তে!—তোমার বৃষ্টির তলায় ছিল সে রক্ত! কেমন বিবমিষা হ'ল আমার—হঠাৎ মনে হ'ল কে তুমি। তোমাকে তো আমি চিনি না—অনেক দূরের একটা বিশাল বীভৎস কালো ছায়ার মত একটা মূর্তি যেন তুমি—তার বেশি কিছু নও।

তাই নির্মলকে আমি ভাবতে চাইলাম। ওর মধ্যে আমি বাঙলা দেশের ছিলছিল চোখ দুটিকে দেখতে পেয়েছি—ওর সংগে কোলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কাম্বীর থেকে কাশ্মীরে কিম্বা সিকিম-ভূটানের কোনো একটা জায়গায় ও নতুন একটা কাজ নিয়ে চলে গেছে কয়েকদিন আগে। ওর কাছ থেকে চিঠি পেয়ে আমিও যাবো আগামী সপ্তাহে। না কাউকে নয়—এমনকি যে মাকে এত ভালোবাসতাম সেই মাকেও আমি জানাতে পারলাম না—একটা অশ্রুতভাবে উধাও হওয়ার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে।

তুমি যদি কোনোদিন ফেরো কি করবে তুমিই জানো। হয়তো কোনো আমেজনী কিম্বা ইরানী মেয়েকে নিয়ে ফিরবে। তারপর ভারতের জলমাটি যদি তাদের সহ্য না হয় তারা ফিরে গেলে, বাঙলা দেশের সেই সুবোধ শান্তি ছেলের মত—বাঙলা দেশেরই কোনো কালো মেয়েকে বিয়ে করবে হয়তো। তারপর কোনোদিন বাজার থেকে ব্যাগে করে পুঁই ডাটা কিনে নিয়ে যাবে কিম্বা কালো ছেলের হাত ধরে কালো স্ত্রীকে পাশে নিয়ে সামাজিকতা রাখতে বেরোবে....। হয়তো জীবনের নির্মম হাতের ধাক্কায় আমিই আবার কোথায় পৌঁছাবো জানি না—তবু আপাতত এই পর্যন্ত।

জীবনের ঘাটে ঘাটে নোঙর করা প্রাণ-গুলো—তোমার মত, আমার মত, একদিন কবে যেন পাশাপাশি এসে মিশেছিল—আবার এমন করেই আলাদা হ'য়ে গেল। এও এক অশ্রুত এ্যাডভেঞ্চার! জীবন-বিধাতার এ্যাডভেঞ্চার! দেখি আমার জনে তাঁর ভান্ডারে আর কি সঞ্চিত আছে!

চিঠি শেষ করে আমি মাসিমাকে দ'হাতে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে

উঠলাম, “মাসিমা, তপদ্ যে বেঁচে আছে। এ চিঠি এতদিন পড়েননি কেন?”

মাসিমা পাংশামুখে একবারমাত্র আমার মুখের দিকে তাকালেন তারপর হঠাৎ স্তম্ভ হারালেন। আমার চীৎকারে তপতীর বাবা উঠে এসেছিলেন।

আমি হাসি-কান্না মেশানো অশ্রুত মুখে সে খবর দিলাম তাঁকে, দেখলাম মেশোমশাই-এর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। মাসিমার মুখের ওপর কাঁদে পড়ে বলতে লাগলেন, “কণা ওঠো-উঠে বোসো। তপতী যে আমাদের রক্তের জিনিস-ঠিকই করেছে। নিজের জীবনে যা হ’তে পারে মেয়ের জীবনে হ’লে কষ্ট পেলে চলবে কেন?” তারপর হেসে আমার মুখের দিকে তাকালেন-“তা এমন করে ভাবিয়ে-কাঁদিয়ে। অবশ্য আমার যেন কেমন একটা মন্দেই ছিল-গাড়ির খালি কামরায় তার ব্যাগ পাওয়া গেলে আর ডেড বন্ড নেই? পুলিশ বলছে যখন একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে পাস করছিল গাড়িটা তখন নাকি নিচের খরস্রোত নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে রান্ধুরে-আমি তবু বিশ্বাস করিনি।”

মাসিমা দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে আমাদের ডর করে উঠে বসলেন, তারপর কেমন খুশীতে আর আনন্দে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তপতীর বাবা আমার সামনেই তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, “কে’দো না কণা, ও বৈদিন বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল সেন্নিনই বুঝেছিল। আমার রক্তের ডাক ওতে আছে। তুমি কি নিজের জীবনকে আড়াল করে সন্তানকে ভাবতে চাও? তা হয় না-জয়ন্তী, তোমাকে একটা কথা বলি,” মেশোমশাই আমার মুখের দিকে করুণা-প্রার্থীর মত তাকালেন, “তোমার কাছে বলা দরকার নইলে আমার কথার অর্থ তুমি বুঝবে না। আজ থেকে পরিত্রা বহর আগে তোমার এই মাসিমাকে বিয়ের চেষ্টা পরা অবস্থায় নিয়ে পালিয়ে এসে-হিসাম অন্য লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে হাঁছিল বলে। তারপর জীবনের অনেক বাড়-বন্ধা পার হ’য়ে কেবল যখন একটু পা রেখেছিলাম মাটিতে তখনই এসেছিল তপতী-ওর রক্তও তাই এ্যাডভেঞ্চারের নেশা আছে।”

মাসিমার দিকে তাকিয়ে পরিত্রা বহর আগেকার সেই মেয়েটাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম আমি। দেখি মাসিমা সজ্জিত হ’য়ে থামাতে চেষ্টা করছেন মেশোমশাইকে, “আঃ থামো না, ও না তোমার মেয়ের মত।”

“স্না, জানা ওর দরকার। জানা দরকার যে একালের ছেলে-মেয়েরা নতুন কিছু

করবার নামে মাঝখান থেকে খানিকটা সময়ের অপচয় করে ফেলছে কেবল-এর বেশি কিছু নয়।”

মাসিমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো, “বেথানেই থাক, ও যেন সুখী হয়। তপদ্-আমার তপদ্। কি যে হ’য়ে গেল মেয়েটার জীবনটা। নিম্নলিও যদি ওকে অসুখী করে?—” অসহায়ের মত নিজের মনের কাছেই যেন প্রশ্ন করলেন মাসিমা। এ প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না-উত্তর হয় না।

একটা মৃত্যুকরণ সূর থেমে গিয়ে হঠাৎ জীবনের সূর বেজে উঠেছিল সারা সংসারটার-আমি প্রাণভরে তাই উপভোগ করছিলাম-আর তপতীর অশ্রুত খেয়াল, ওর খাপছাড়া জীবন-এমানি করে উধাও হ’য়ে যাওয়া সব মিলিয়ে যত মেলাতে যাই, আমার বাঁধা সরের সঙ্গে কিছুতেই সে সূর মেলে না-তবু কিন্তু আমার একটুও দৃষ্টি হ’ল না।

কখন যেন বেলা শেষ হ’য়ে গিয়েছিল। তপতীর লেখা কাগজগুলো তখনও আমার হাতের মুঠোয় ধরা ছিল। মাসিমা, মেশোমশাই তখন বসে বসে হয়তো পড়ানো কথা ভাবছিলেন।

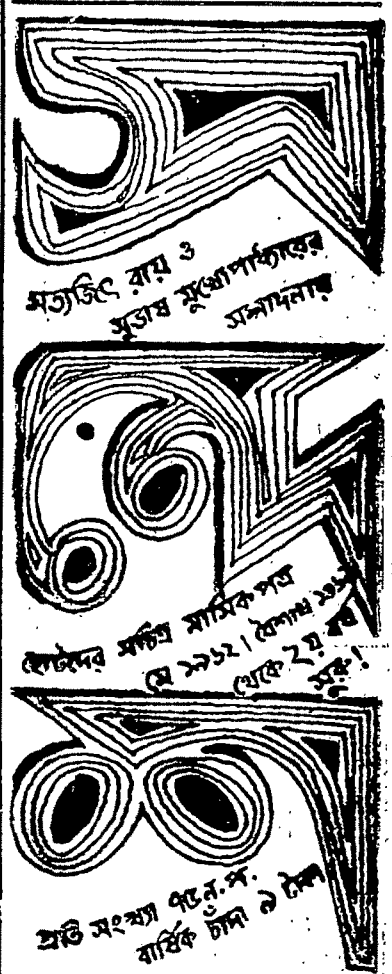
তপতীর বোন ফিরলো অফিস থেকে, ভাই ফিরলো কলেজ থেকে। ওদের চোখে-মুখে একটা রুদ্ধতার আর ক্রিস্টতার ছাপ পড়েছিল। তপতীর আকস্মিক অন্তর্ধানকে মৃত্যু বলে স্পষ্ট না বুঝে অথচ মৃত্যু আশঙ্কায় ফ্যাকাসে আর শ্লান হ’য়ে গিয়েছিল। মাসিমা ওদের দুজনকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে বসলেন তপতীর খবর। শূন্যে বোন ভারতী ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত মার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো, ওর মুখে বিরক্তির একটা স্পষ্ট ছায়া পড়লো, বোললো, “বুড়ো বয়সেও দিনির এ্যাডভেঞ্চার। এত কান্ড-বান্ড-অফিসে আমি মুখ দেখাতে পারিনে, সবাই আমাকে সহানুভূতি দেখাতে আসে। সমস্ত পরিবারের মুখ এমন করে না হাসালেই কি চলতো না? একবার মহীতোষবাবু, একবার নিম্নলি-তাও আবার বয়সে ছোট। এ্যাডভেঞ্চারের কী মোহ মানুষের!”

আমি জানি ভারতী খুব হিসেবী মেয়ে। ও যে ছেলেটাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে রেখেছে সে ওকে কোন উন্নতির পর, কতদিনের মাথায়-ক’ট ঘরওয়ালা ভ্যাটে বিয়ে করে নিচ্ছে যাবে, কেমন করে ঘর সাজাবে-সব কিছু ঠিক করা আছে। খুব হিসেবী মেয়ে ভারতী, তাই ওর কথায় আমি রাগ করতে পারলাম না; কারণ আমি স্পষ্ট দেখলাম ওর চোখে ঈর্ষা ছায়া।

আমার ওঠবার সময় হ’য়েছিল-উঠে আসছিলাম। দরজার কাছে দেখি ভারতীর ভাবী স্বামী সমরেশ। ঠিক হিসেব ক’রে এসেছে। এখন ওরা দুজনে বেড়াতে যাবে-কোনো এক বিশেষ দিনে কেমন করে ওদের বিয়ে হবে-কেমন করে ওরা ঘর সাজাবে সেই হিসাব ক’রে ওরা। তপতী আর ভারতী! এক রক্তের দুই প্রতিবিম্ব।

কেবল শূন্যে তপলাম সূর্যাসনের চেঁচামেচি-সমরেশদা, জানেন দিদি বেঁচে আছে-চলে গেছে নিম্নলিদার সঙ্গে। খবর একটা দেবেই-হয় কাম্মীর না হয় গ্যাণ্ডটক কোথাও না কোথাও থেকে। তারপর ব্যাস-দেখুন না, এবার আমিও পালাবো শিপিং। একবার বেরিয়ে পড়তে পারলেই ব্যাস।”

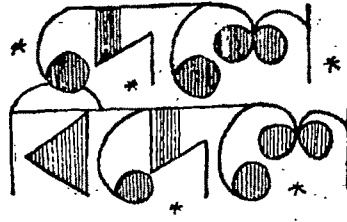
আমার রিক্সাটা অনেক দূরে চলে এসেছিল। এতক্ষণে আমি মহীতোষের কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম। তপতীর লেখা চিঠিখানা শেষ পর্যন্ত পেয়েছে তো মহীতোষ!



১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১০
(নিউ সিনেমার পাশে)

॥ কর্মযোগীর লোকান্তর ॥

মহান কর্মযোগী ডঃ এম বিশেষ-
রায়ার শতবর্ষব্যাপী কর্মময় জীবনের
অবসান হ'ল। একটিমাত্র মানুষের কর্ম-
সাধনায় একটি জাতির বৈষয়িক ও
সাংস্কৃতিক জীবনে যে কি বৈপ্লবিক
রূপান্তর সম্ভব হতে পারে ডঃ বিশেষ-
রায়ার তা প্রমাণ করেছেন তাঁর সমগ্র
কর্মজীবনের সাধনা ও সিদ্ধি দিয়ে।
শতাব্দীকাল পূর্বে মহাশুরের এক
অজ্ঞাত গ্রামের অখ্যাত পরিবারে তাঁর
জন্ম এবং কঠিন দারিদ্রের মধ্যে অতি-
ক্রান্ত হয় তাঁর শৈশব। কিন্তু অনন্য
প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের জোরে তিনি
শুধু নিজের জীবনকেই দারিদ্রের
অভিশাপমুক্ত করেননি, তাঁর অগণ্য
স্বদেশবাসীর জীবনেও বহন করে
এনেছেন আধুনিক সভ্যতার বিবিধ
আশীর্বাদ। এই হতভাগ্য দেশের সকল
মানুষকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অনগ্রসরতার
অভিশাপ থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর
দীর্ঘ জীবনের একমাত্র সাধনা। এবং
ভাগ্যবান তিনি বে, জীবদ্দশাতেই
দেখে যেতে পেরেছেন, তাঁর সে সাধনা
কাথ হ'য়নি। তাঁর প্রতিভা ও মহত্ব
শুধু এদেশেই দলমতনির্বিশেষে সকল
মানুষের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেনি,
ইংলন্ড আমেরিকার মত দেশগুলিতেও
শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন তিনি
বিশ্বজনের মাঝে। পঞ্চাশ বছর আগে
মহাশুর কুম্বরাজসাগরে তিনি যে বাঁধ
বেঁধেছিলেন শুধু ইট ও মাটি দিয়ে
পরবর্তীকালে তাই আমেরিকাবাসীদের
বান্ধি যুগিয়েছে টেনেসি পরি-
কল্পনায়। কুম্বরাজসাগরে বাঁধ সম্বন্ধে
মন্তব্য প্রসঙ্গে মহাত্মাজী একবার
বলোছিলেন, শুধুমাত্র ঐ বাঁধটির
জন্যই বিশ্বব্ধরায় চিরজীবী হয়ে
থাকবেন। পরবর্তীকালে মহাশুর-
রাজের উদ্যোগে সারা রাজ্যজুড়ে যে
উন্নয়ন-যজ্ঞ শুরু হয় তাঁর প্রধান হোতাই
ছিলেন মহাশুর রাজ্যের দেওয়ান
বিশেষ্বরায়। রেলপথ প্রসার, রাস্তাঘাট
তৈরী, শিক্ষাবিস্তার, কৃষিব্যবস্থার
উন্নতি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পপ্রসার



প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েই তিনি দৃষ্টি
দেন এবং সেই মহান কর্মসাধকের
সুনিপুণ পরিচালনা ও অনুপ্রেরণাতেই
গড়ে উঠেছে আজকের মহাশুর। সমগ্র
ভারতের বৈষয়িক উন্নতিতেও ছিল তাঁর
সীমাহীন আগ্রহ এবং এই উদ্দেশ্যে
১৯১৯ সালে তিনি রচনা করেন
“ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরি-
কল্পনা” নামে অতি মূল্যবান ও চিন্তা-
সমৃদ্ধ এক গ্রন্থ। সারা ভারতের
সর্বাঙ্গীন উন্নতির আদর্শে নিবেদিত
এমনই একটি প্রাণ শতাব্দীকাল পরে
স্পন্দনহীন হ'ল। দেশের এ-কতি
অপূরণীয়।

॥ রাজা মহেন্দ্র ॥

নেপালরাজ মহেন্দ্র এসেছেন ভারতে,
রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে। এদেশে এই তাঁর
প্রথম আসা নয়, কিন্তু তবুও এ আগমন
বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্ব-
পূর্ণ এবং একারণে বিশেষভাবে
উল্লেখ্য। নেপালের সঙ্গে ভারতের
বর্তমান সম্পর্ক নানা কারণে ভাল নয়।
নেপালের জনসাধারণের দীর্ঘ সংগ্রাম ও
পরলোকগত নেপালরাজ ত্রিভুবনের সক্রিয়
সহযোগিতায় নেপালে যে গণতান্ত্রিক
শাসন কায়েম হয়েছিল, রাজা মহেন্দ্র
তাঁর অবসান ঘটিয়েছেন। ফলে সারা
নেপাল জুড়ে এখন বৈরতম্ভী রাজ-
শাসনের বিরুদ্ধে চলেছে প্রজাসাধারণের
প্রবল বিক্ষোভ। নেপালের জননেতাদের
বৈশীরাভাগকেই মহেন্দ্র কারাগারে বন্দী
করে রেখেছেন, কয়েকজন গ্রেপ্তারী
এড়িয়ে পালিয়ে এসেছেন ভারতে।
ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী নেপালী জন-
নেতাদেরও গ্রেপ্তার করতে চান রাজা
মহেন্দ্র, এবং একারণে নেপাল সরকারের
পক্ষ হতে বহুবার ভারত সরকারের কাছে
দাবী জানানো হয়েছে তাঁদের গ্রেপ্তার
করে নেপাল সরকারের হাতে সমর্পণ
করার জন্যে। কিন্তু সে অনায়াস ও
অযৌক্তিক দাবীতে ভারত সরকার কণ-
পাত করেননি বলে নেপাল সরকারের
বিভিন্ন মুখপাত্র বারবার ভারতের
বিরুদ্ধে তীব্র বিবোপ্যার করেছেন এবং
নেপালের বর্তমান গণবিক্ষোভকে
প্ররোচিত করার অভিযোগও এনেছেন
ভারতের বিরুদ্ধে। ওঁদিকে নেপালের
সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান সখ্য ও ভারতের
পক্ষে বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে
দাঁড়িয়েছিল। এ অবস্থায় রাজা মহেন্দ্রের

ভারতে আসার সিদ্ধান্ত অবশ্যই আশার
কথা। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে
যদি নেপালের বর্তমান আভ্যন্তরীণ
সংকটের একটা সমাধান হয় এবং আবার
যদি ভারত ও নেপাল পরস্পরের বিরুদ্ধে
বন্ধুত্ব পরিণত হয় তবে সেটা ভারত ও
নেপাল উভয়ের পক্ষেই বিশেষ কল্যাণকর
হবে।

কিন্তু মহেন্দ্রের দিল্লী আগমনের
প্রাক-মুহূর্তে নেপালের জাতীয় পরি-
চালনা দপ্তরের প্রচার ও বেতার বিভাগ
৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দলিল প্রকাশ
করে ভারতের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে
শ্রীনেহরুর বিরুদ্ধে যেভাবে বিবোপ্যার
করেছেন তাতে রাজা মহেন্দ্রের ভারত
আগমনের যে সফল আশা করা
গিয়েছিল তা প্রায় সম্পূর্ণই নিমূল
হওয়ার উপক্রম হয়েছে। শ্রীনেহরু যে
নেপালকে ভারতের অনুরূপ গণতন্ত্র
গ্রহণের সুপারিশ করেছেন এটা নাকি
কোন বিবেকসম্পন্ন নেপালীর পক্ষেই
বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া
নেপালের বিদ্রোহীদের প্রশ্রয় দিয়ে
ভারত সরকার পরেও নেপালের
সার্বভৌমত্বের উপরেই আঘাত হানতে
উদ্যোগী হয়েছেন এমন অভি-
যোগও ভারতের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে।
এ অবস্থায় নেপালরাজের ভারত সফর
সম্পূর্ণ অর্থহীন বলেই মনে হয়, যদি না
অন্যকোন কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের
মতলবে তিনি ভারতে এসে থাকেন।

॥ পূর্ব পাকিস্তান ॥

ভয় বা প্রলোভন কোন কিছুতেই
পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজকে দমন
করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা পাকিস্তানের
জগ্গী শাসকদের কাছে স্মারকলিপি পেশ
করে দাবী জানিয়েছিলেন, অনতিবিলম্বে
পাকিস্তানের সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি
দিতে হবে, সারা দেশজুড়ে পূর্ণ গণ-
তান্ত্রিক শাসন কায়েম করতে হবে ও
পূর্ণ বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকার
করতে হবে; অন্যথায় ১৮ই এপ্রিল থেকে
আবার তাঁরা অনিদিষ্টকালের জন্যে
ধর্মঘট শুরু করবেন। কর্তৃপক্ষ তাঁদের
সে দাবীর কোন উত্তর দেননি, পরন্তু
এই বলে ভয় দোখিয়েছিলেন যে, ধর্মঘটে
যেসব ছেলে যোগ দেবে তাদের বৃত্তি
সম্পর্কিত যাবতীয় সুযোগ কেড়ে নেওয়া
হবে। কিন্তু সে ধমকে কোন কাজ
হয়নি। ঢাকার ছাত্ররা সব বাধা-নিষেধ
উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট দিনেই ধর্মঘট
আরম্ভ করেছিলেন। ফলে ক্রুদ্ধ কর্তৃপক্ষ
৩১শে মে পর্যন্ত যাবতীয় স্কুল কলেজ
বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

**ভয়েস অব
আমেরিকার
বাংলা অনুষ্ঠান শুভুন**
প্রত্যহ
সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মি:
১৯৪৬, ২৫-২৬ ও
৪২-১৯ মিটারে

সত্য

৥ ঘরে ৥

১২ই এপ্রিল—২৯শে চৈত্র : তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপ্রচেষ্টা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার আশংকা—রাজ্য সরকারের উচ্চ মহলে বিশেষ উদ্বেগ সঞ্চার।

১৩ই এপ্রিল—৩০শে চৈত্র : হরিশ্বরে কুম্ভমেলা উপলক্ষে ২০ লক্ষাধিক নর-নারীর পদাশ্রয়।

'সমাজ-জীবনের উৎকর্ষ' সাধনে যুব সমাজের গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে—পশ্চিম-বঙ্গ যুব কংগ্রেসের বার্ষিক যুব-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল ঘোষের বক্তৃতা।

১৪ই এপ্রিল—১লা বৈশাখ, ১৩৬৯ : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আরও চারজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও এগারজন উপমন্ত্রী নিযুক্ত—রাষ্ট্রপতি ভবন হইতে ঘোষণা : এ পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় মোট সদস্য-সংখ্যা ৩৮।

বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও দেশসেবক 'ভারতরত্ন' ডাঃ এম বিষ্ণুস্বাম্যয়ার (১০১) বাঙ্গালারে জীবন-দীপ নির্বাণ।

সাধারণ নির্বাচনে বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে শংখলাভঙ্গের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত ব্যবস্থা—দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে একটি কমিটি নিয়োগ।

১৫ই এপ্রিল—২রা বৈশাখ : এলাহাবাদে অশান্ত জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—প্রহারের ফলে নিহত বলিয়া কথিত ব্যক্তির মৃতদেহের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জের—উপদ্রুত অণ্ডলে ১৪৪ ধারা ও কার্য জারী।

শ্রীএ কে গোপালন লোকসভায় (তৃতীয়) কমুনিষ্ট দলের নেতা নির্বাচিত।

১৬ই এপ্রিল—৩রা বৈশাখ : মন্ত্রিবর্গসহ লোকসভায় নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন।

কলিকাতার সমিহিত দক্ষিণদাড়িতে মধ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কতৃক লবণ হুদ সংস্কার পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক উদ্‌ঘোষন।

'এলাহাবাদে পুলিশের গুলী বর্ষণের ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাই—পার্লামেন্টের বিরোধীপক্ষীয় ৮ জন সদস্যের সম্মিলিত দাবী।

১৭ই এপ্রিল—৪ঠা বৈশাখ : সর্দার হুসুম সিং সর্বসম্মতিক্রমে লোকসভার স্পীকার নির্বাচিত।

ইতস্ততঃ দাংগা-হাংগামার পরিণতিতে মালদহ শহরে সাম্য আইন ও ১৪৪ ধারা জারী।

১৮ই এপ্রিল—৫ই বৈশাখ : গণ-তান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ভারতের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ—পার্লামেন্টের যুগ্ম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতিরূপে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের শেষ ভাষণ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার (কংগ্রেস) পুনরায় কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত।

নেপালের রাজা মহেন্দ্রের দিল্লী উপস্থিতি ও যথোচিত সম্বর্ধনা।

৥ বাইরে ৥

১২ই এপ্রিল—২৯শে চৈত্র : পশ্চিমী শক্তিবর্গ প্রতিশ্রুতি দিলে রাশিয়া জেনেভা আলোচনাকালে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করিতে প্রস্তুত—সাতদশ রাষ্ট্র সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ জোরিনের ঘোষণা।

১৩ই এপ্রিল—৩০শে চৈত্র : পূর্ব পাকিস্থান সরকার কতৃক ছাত্রদের সতর্কীকরণ—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বে-আইনী ক্রিয়াকলাপের ঘাঁটি করা চলিবে না।

ভারত সরকারের নিকট চীনের নতুন লিপি প্রেরণ—সীমানা বিরোধ প্রসঙ্গে ভারতের মনোভাব মীমাংসার অনুকূল নয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ।

আলজিরিয়ার গুরুত্ব সামরিক সংস্থার (ও-এ-এস) নেতা ভূতপূর্ব জেনারেল এডমন্ড উহাউগ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত—প্রতিমাসে আলজিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইউরোপীয়দের ধর্মঘট।

আলোচনাকালে আণবিক পরীক্ষা বন্ধ রাখার জন্য ভারতের উত্থাপিত প্রস্তাব গ্রহণে সোভিয়েট সরকারের সম্মতি।

১৪ই এপ্রিল—১লা বৈশাখ, ১৩৬৯ : আন্তর্জাতিক পরিদর্শনাধীনে পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব ক্রুশেভ (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) কতৃক পুনরায় প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় পশ্চিমী মহলে নৈরাশ্য।

১৫ই এপ্রিল—২রা বৈশাখ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক কতৃক অবিলম্বে শংখলাভঙ্গকারী ছাত্রদের শাসনস্তা

কারিবার জন্য সরকার নির্দেশিত ব্যবস্থা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত।

১৬ই এপ্রিল—৩রা বৈশাখ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পুনরায় ধর্মঘট—গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য তিনদিবসব্যাপী প্রতীক ধর্মঘটের সূচনা।

জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের নতুন উদ্যম—নিরপেক্ষ দেশগুলির বৈজ্ঞানিকদের লইয়া আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের প্রস্তাব।

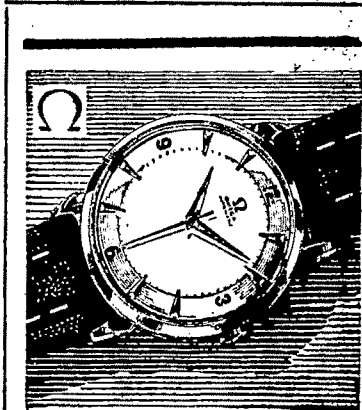
১৭ই এপ্রিল—৪ঠা বৈশাখ : সাধারণ ও সর্বাঙ্গিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির খসড়া মধ্যবন্ধ অনুমোদিত—জেনেভা সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ দলিল সম্পর্কে মতৈক্য।

ভারতের বিরুদ্ধে নেপালের আবার বিবোধাগার।—রাজা মহেন্দ্রের দিল্লী সফরের প্রাক্কালে ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল প্রকাশ।

৩১শে মে পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাশ বন্ধ—শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের জের।

১৮ই এপ্রিল—৫ই বৈশাখ : জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে আমেরিকার তিনটা অধ্যায় সমন্বিত প্রস্তাব পেশ—প্রস্তাবে নতুন কিছু নাই বলিয়া সোভিয়েট জোটের মন্তব্য।

'রাশিয়া চুক্তি (নিরস্ত্রীকরণ) সম্পাদনে রাজী না হইলে বায়ুমণ্ডলে আণবিক পরীক্ষা চালানো হইবে—মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির ঘোষণা।



OMEGA
SEAMASTER
Steel Automatic—Rs. 520/-

ROY COUSIN & CO.
4, Dalhousie Sq. Calcutta-1.

সমকালীন সাহিত্য

অভ্যুত্থান

নতুন বই

ব্যক্তি— (সংকলন-গ্রন্থ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুবাদ—সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। দাম : আড়াই টাকা।

নাম জানিনে, অথচ লেখকের জায়গার মূদ্রিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এমন বই এখন চোখে পড়লে বিস্মিত হতে হয়। এই সঙ্গে ছাপা কভারটি দেখে সেই বিস্ময়ই জেগেছিল আমাদের মনে। পরে বোকা গেল ঘটনা অন্যরকম।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন শ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রে যান তখন বিভিন্ন স্থানে যে সব বক্তৃতা দেন সেগুলি ১৯১৭ সালে Personality নামে একটি বইয়ে সংকলিত হয়। দীর্ঘকাল বইটির বাংলায় অনুবাদ হয়নি, এতদিন পরে রবীন্দ্রশতবর্ষ উপলক্ষে এর বাংলা

অনুবাদ বিশ্বভারতী থেকে ছাপা হল। বইটিতে সর্বসমেত ছটি প্রবন্ধ আছে : 'আর্ট কি?', 'ব্যক্তির জগৎ', 'শ্বিতীয় জন্ম', 'আমার বিদ্যালয়', 'ধ্যান' এবং 'নারী' প্রত্যেকটিই মানুষের ব্যক্তিস্বার বিভিন্ন ঠিকানা সম্বন্ধে। প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর্ট সম্বন্ধে প্রায় ছে-চল্লিশ বছর আগে যে সব ধারণার অবতারণা করেছেন সেগুলি আজকের বাংলা দেশের শিল্প-সমালোচকদের পড়ে দেখতে অনু-রোধ করি। তখন পাশ্চাত্য জগতে শিল্পবিচার আধুনিক যুগের ধাক্কায় পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে। শিল্পের উপলব্ধি এবং শিল্পকর্মের সমালোচনার জন্য যে বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রয়োজন তার হৃদয় এই প্রবন্ধে মিলবে। 'ব্যক্তির জগৎ' প্রবন্ধে তিনি মানুষের অস্তিত্বের এক রহস্যের মর্মকে আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। 'শ্বিতীয় জন্ম' মানুষের ব্যক্তির বিকাশ নিয়ে লেখা। মানুষ কেমন করে প্রকৃতির

কোলে জন্ম নিয়ে প্রকৃতির জগতের বাইরে নিজস্ব এক জগৎ সৃষ্টি করে তাই এর বক্তব্য। 'আমার বিদ্যালয়' প্রবন্ধে তিনি জাতির শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত বরাবরই অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এই প্রবন্ধেও তার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। 'ধ্যান' প্রবন্ধ তাঁর সত্যোপলব্ধি সম্বন্ধে।

ব্যক্তিত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এতে বহির্জগৎ থেকে আহরিত উপকরণ অন্তরে সঞ্চার করার সঙ্গে সত্যকে উপলব্ধি করার পার্থক্য বোঝান হয়েছে। 'নারী' প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন নারীর মূর্ত্তি নিয়ে। পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র সীমানা থেকে তিনি নারীর মূর্ত্তি চেয়েছেন, যাতে তারা তাদের সহজাত এবং স্বভাবাসিদ্ধ ভাল-বাসা দিয়ে মানব জগৎকে গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য নারীচিন্তে পুরুষের অনুকরণে যে নৈর্ব্যক্তিক সংগঠনসর্বস্ব সামাজিক আদর্শের প্রতি আকর্ষণ দেখা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন। অনু-বাদক তাঁর দূর-হৃদয় কর্ম অতি সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করেছেন। ইদানীং এত সুন্দর অনুবাদ চোখে পড়েনি। রবীন্দ্রশতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে বইটি উপস্থিত করার জন্যে প্রকাশক ধন্যবাদার্থ।

ভবিষ্যৎ— (অনুবাদ গল্প-সংগ্রহ) উইলা ক্যাথার। অনুবাদ—রাখাল ভট্টাচার্য। প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪নং বাল্লভ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—আড়াই টাকা।

১৮৭৫-এর ডিসেম্বর মাসে এক এ্যাংলো-আইরিশ পরিবারে উনচেস্টার

মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের আধুনিক
ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্র

মানব মন

এপ্রিল সংখ্যা প্রকাশিত হল।

এ সংখ্যার বিশিষ্ট রচনা :-

শেরিংটন প্রসঙ্গে	—	আই পি. পাভলভ
মানসিক ক্রমবিকাশ	—	ডক্টর হিউজেন গ্যাঙ্গোপাধ্যায় [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]
পাভলভ পরিচিতি	—	ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গ্যাঙ্গোপাধ্যায়
আমেরিকার স্কুল শিক্ষায়		
প্রয়োগবাদের ফলাফল—		প্রমোদ সেনগুপ্ত
মানসিক রূপায়ণে		
ইতিহাসের ভূমিকা—		মোঃ আব্দুল করিম... ইত্যাদি

প্রতি সংখ্যা—১

সডাক বার্ষিক মূল্য ৪

পাভলভ ইনস্টিটিউট —১০২।১এ, কণ্ঠওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিঃ-৪

গল্পীর কাছে শ্রীমতী উইলা সিবার্ট ক্যাথারের জন্ম হয়। সংগীতের প্রতি অতিশয় আগ্রহ থাকায় পিটসবার্গে আসেন ১৮৯৫-এ স্নাতক হওয়ার পর। এইখানে সাংবাদিকতায় হাতে-খড়ি। কিন্তু তেমন ভালো না লাগায় শেষ পর্যন্ত এলেক্সান্দ্র হাই-স্কুলের শিক্ষিকার কর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই প্রথমে কাব্য রচনার সূত্রপাত, তারপর প্রকাশিত হয় ১৯০৫-এ প্রথম গল্প-সংগ্রহ। যুরোপ ও আমেরিকায় প্রচুর পর্যটন করেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে April Twilights, O Pioneers, The song of the Lark প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, Youth and the bright Medusa, One of Ours, A lost Lady, My Mortal Enemy, Obscure Destinies, এবং উপন্যাস Death comes to Archbi-

shop-সম্বন্ধে খ্যাতিসম্পন্ন। One of Ours গ্রন্থটি ১৯২২-এ পুলিটজার পুরস্কার লাভ করেছে। শ্রীমতী ক্যাথারের গ্রন্থাবলী আমেরিকার সাহিত্যে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর রচিত গল্পাবলীর এক চমৎকার নমুনা। হ্যারিস বর্ডি, দুই

বন্ধু ও প্রতিবেশী এই তিনটি গল্প এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। হ্যারিস বর্ডি গল্পে কলরাডো অঞ্চলের এক বালিয়াড়ি শহরের বৃন্দা মিসেস হ্যারিস। বয়সের শেষ সীমায়, পেঁছে অবাহিত, যারা যৌবনের উদ্দামতায় উন্মত্ত তারা ভাবে না যে তাদের একদিন ঐ অবস্থায় পেঁছাতে হবে। সকল দেশের এক চিরন্তন সমস্যা old age problem—সহানুভূতি ও সমবেদনায় মন ভরে ওঠে। দুই বন্ধু গল্পে আছে রাজনৈতিক বাতুলতার অন্ধ আবেগ, যে তাঁর নেশায় মানুষ বন্ধুকেও শত্রু করে তোলে। প্রতিবেশী রোসের গল্পে এক দেশ-বিবাগী দ্রাম্যমাণের জীবনী, লন্ডন ও নিউইয়র্কে দিন কাটিয়ে, তবু ভরিল না চিন্ত। তাই সে অবশেষে প্রেইরী অঞ্চলে এসে তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার বলে আসে, জীবনকে সে নিবিড়ভাবে দেখেছে, তাই সে সংবেদনশীল মন নিয়ে সব বন্ধুতে পারে অতি সহজেই। উইলা ক্যাথারের রচনার সঙ্গে বাঙলার সমাজ-জীবনের অনেক মিল। এ তাবৎ তাঁর সাহিত্য এদেশে অচেনা ছিল। এখন কিছু কিছু অনুবাদ হচ্ছে। রাখাল ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে দু' একখান

গ্রন্থ অনুবাদে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'ভবিষ্যৎ'র সাবলীল অনুবাদে তাঁর পূর্বগৌরব অস্মান রইল। ঝরঝরে সরল ভাষায় তিনি গল্পগদ্যলি বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে ভাষান্তর করেছেন। ছাপা ও বাঁধাই মনোহর। প্রচ্ছদটি সুন্দর।

যে কমনওয়েলথে আমরা বাস করি—(প্রবন্ধ) ভারতীয় ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত।

এই ৭২ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটির চাকচিক্য আপাতদৃষ্টিতেই চমক লাগায়। তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে সুদৃশ্য চিত্রাবলীর মাধ্যমে কমনওয়েলথের জন্ম, তার ক্রমবিকাশ, কার্যাবলী, আদর্শ, বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি বর্তমান বিশ্বের কমনওয়েলথভুক্ত দেশ-গুলির জটিল সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে এর ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ প্রচেষ্টা নিখুঁত ও সহজবোধ্য হয়েছে। ক্রমবিবর্তনের পদক্ষেপে আজকের কমনওয়েলথ বিশ্বশান্তির অগ্রদূত। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত এই

প্রকাশিত হলঃ বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রহস্য গল্পের সংকলন

রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র দত্ত, পরশুরাম, জগদীশ গুপ্ত, মণিলাল গাঙ্গুলী, প্রেমাস্কুর আতখী, ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, মণীন্দ্রলাল বসু, শরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মনোজ বসু, শৈলজ্ঞানন্দ, প্রমথনাথ বিশী, সরোজকুমার রায়-চৌধুরী, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিমল মিত্র, সুশীল রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল কল ও সমরেশ বসু গল্প।

অলৌকিক গল্পসাহিত্য সম্পর্কে অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন লিখিত সুবিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সরস রম্যরচনা সহ ৩৮ জন প্রতিভাবান সাহিত্যিকের রচনাসমৃদ্ধ অলৌকিক ও রহস্যময় বাংলা গল্পের একমাত্র সংকলন।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

অন্য ভুবন

পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠা
মূল্য ১০

প্রাপ্তিস্থান :

গ্রন্থভারত : ৪১বি, রাসবিহারী এডিনা,

কথাসিল্প : ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

১/৩২এফ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড,



বিত্তিক

কাপড়ে বাঁধাই, বিলাতী আর্ট
পেপার জ্যাকেট এবং প্রতিটি
রচনা চিত্রসম্বলিত।

কলিঃ-২৬। ফোন : ৪৬-৮৪৭৫, ৭৫২৯

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সার্থক করার কাজে যুব-সম্প্রদায়ের অসীম ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা স্মরণ করা হয়েছে এই পুস্তকে। জাগতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিশেষত শিক্ষাপ্রসার, ক্রীড়ানুষ্ঠান, শিল্পকলার বহুমুখীন বিকাশের সঙ্গে

সঙ্গেই বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে মৈত্রী-বন্ধন হবে সুদৃঢ়; এবং সেই সঙ্গে হবে দ্রান্ত ধারণার অবসান। আজকের ১ কোটি ৪৫ লক্ষ বর্গমাইল এলাকার প্রায় ৬৭ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ কমন-ওয়েলথ সীমানায় সীমিত। এই কমন-ওয়েলথের লক্ষ্যে ত্রিমুখী—শান্তিরক্ষা, সম্পদবৃদ্ধি এবং নিজস্ব সভ্যতার

বিকাশ। তবে মহাকালের দরবাবে বিচার হবে এই মহাশক্তিমান সত্ত্বা সর্বপেক্ষা শক্তিশালী, সমৃদ্ধিশালী প্রেত কিনা। রঙীন প্রচ্ছদপট এ মূল্যবান আর্ট পেপারে পরিচ্ছন্ন মুদ্রা প্রকাশনীয়। এর “গাম-পেপার” বীধাই নতুনত্বের দাবী রাখে।

নীল সাগরের নাবিক— ভিত্তি

হুগো, অনুবাদ : স্বপনকুমার
পরিচয় পাবলিশার্স, ২১, হা
খাঁ লেন, কলিকাতা-৯। দাম
এক টাকা।

ভিত্তি হুগোর “টয়লাস্ অফ
সী” বিশ্বসাহিত্যের একটি অনন্য গ্রন্থ
রোমাঞ্চকর নাবিক-জীবনের কাহিনী
অতি সহজেই পাঠক-মনকে আকর্ষণ করে
—হুগোর গ্রন্থটিও তার ব্যতিক্রম নয়।
‘নীল সাগরের নাবিক’ হুগোর ‘টয়লাস্
অফ দি সী’র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। সুল
মূল্যে বিশ্বসাহিত্য পরিচয়ের এক
প্রচেষ্টার জন্যে প্রকাশক ধন্যবাদ দা
করতে পারেন। আঙ্গিক কিন্তু মনোরঞ্জ
না। অনুবাদ মোটামুটি। ভূমিকায় অনু
বাদকের গ্রন্থকারের ভূমিকা গ্রহণ অতী
দৃষ্টিকটু। আশা করি আগাম
সংস্করণে এ ত্রুটি সংশোধিত হবে।

বৈদিকী—(কাব্যগ্রন্থ) অনুবাদক
অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক
বাণীতীর্থ, ২৬-২বি, বেনিয়াটেকি
লেন। কলিকাতা-৯। মূল্য : দু
টাকা।

কবি অরীন্দ্রজিতের এইটিই চতুর্থ
কাব্যগ্রন্থ। বর্তমান গ্রন্থে অরীন্দ্রজিৎবাব
ঋগ-বেদের ৩৪টি সূক্তের অনুবাদ
করেছেন। প্রাচীন আর্য-সংস্কৃতির বাহ্য
হিসাবে ঋগবেদের মূল্য অনস্বীকার্য
সে-যুগের মানুষের ধর্ম, কর্ম আ
চিন্তার প্রতিফলন এই সূক্তে। সেই জন
ঋগবেদের ওপর আমাদের কৌতূহল
সহজাত। অরীন্দ্রজিৎবাব আমাদের সেই
কৌতূহল কিছুটা মিটিয়েছেন।

কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকা হিসাবে ড
সুকুমার সেনের ঋগবেদ সংহিতার ওপর
সাধারণ আলোচনাটি মনোজ্ঞ; কবির
নিজস্ব কথা কয়টিও উল্লেখযোগ্য।
প্রচ্ছদপটটি রুচিসম্মত।

এশিয়া • রবীন্দ্র বীক্ষা • এশিয়া • রবীন্দ্র বীক্ষা • এশিয়া •

॥ প্রকাশিত হ'ল ॥

॥ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ও মেঘনাদবধ কাব্যের শতবর্ষ পুঁতি জন্ম ॥



রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ বিষয়ক যাবতীয় রচনা
ও মন্তব্যাদি এবং ধর্ম বিষয়ক বাঙ্গালচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং
রবীন্দ্রনাথের বিতর্কমূলক দৃষ্টান্ত রচনাবলীর সংকলন।

চিত্র পরিচয় সহ রবীন্দ্রনাথের দুটি দৃষ্টান্ত
(অপ্রকাশিত) চিত্র।

রবীন্দ্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন :
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট, ইন্দিরাদেবী
চৌধুরাণী ॥ রবীন্দ্র, সংগীত, মোহিতলাল মজুমদার ॥
রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ॥ ছন্দোমুদ্রি
ও রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্দ্র সেন ॥ রবীন্দ্র দৃষ্টিতে অশোক,
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রবীন্দ্রনাথের তিন সংগী, প্রভাত-
কুমার মুখোপাধ্যায় ॥ প্রকৃতির প্রতিশোধ, অমিয় চক্রবর্তী ॥
রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা, শশিভূষণ দাশগুপ্ত ॥
রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধ, প্রমথনাথ বিহারী ॥ রবীন্দ্রনাথের
তত্ত্বনাট্য, অম্বদাশংকর রায় ॥ জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ,
অশোকবিজয় রাহা ॥ রবীন্দ্র কাব্যে শিল্পের গিঁধারা, ডঃ
অজিত ঘোষ ॥ রবীন্দ্রনাথের মণ্ড ও শিল্প চেতনা, ডঃ নীলিমা
ইরাসিম ॥ রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ, ডঃ রথীন্দ্রনাথ
রায় ॥ রবীন্দ্রনাথের বাঁশরী, বৃন্দদেব বসু ॥ রবীন্দ্রনাথের
প্রেমের কবিতা, দেবীপদ ভট্টাচার্য ॥ রবীন্দ্র, জননী সারদা
দেবী, ভবানী সেন ॥ একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী ॥

সম্পাদনা ॥ নীলরতন সেন

দাম ॥ বারো টাকা

॥ ছোটদের জন্য ॥ **রবীন্দ্র প্রণাম** তিন টাকা

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-বারো
ডায়াল ॥ ৩৪-২০৮৬

১৯৬৮ • ১৯৬৮ • ১৯৬৮ • ১৯৬৮ • ১৯৬৮ •

শ্রেষ্ঠা মহা

নান্দীকর

সম্মানোচনা

কায় : ডিলাক্স-এর নিবেদন; ৫৩১ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে
র্ণ; কাহিনী : তারাক্ষর
াপাধ্যায়; প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও
চর্চনা : অগ্রগামী; সংগীত-পরি-
না : সুধীন দাশগুপ্ত; চিত্রগ্রহণ :
নন্দ সেনগুপ্ত; শব্দধারণ : দেবেশ
ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; গীত-
: শৈলেন রায় ও গোপীনাথ
: সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা :
সুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশ : সুধীর
সম্পাদনা : কালী রাহা; রূপায়ণ :
মার, রাধামোহন ভট্টাচার্য, শ্যামল
সুনীলেশ ভট্টাচার্য, প্রীতি
ার, সলিল দত্ত, ধীরেশ বন্দ্যো-
া, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল
নন্দিতা বসু, সুলতা চৌধুরী,
সেন, রেণুকা লাহিড়ী, জয়ন্তী
াধ্যায়, সবিতা সিন্হা, উষা
। ডিলাক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স
টবের পরিবেশনায় গেল ১২ই
ন থেকে উত্তরা, পূর্ববী, উজ্জ্বলা
অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

ভারতীয় খ্যাতিমান ন্যাথানিয়েল
বিশ্বাস আসলে মানবধর্মে দীক্ষিত
। তাই তিনি কন্যাকুমারীকা থেকে
এনেছিলেন এক পংগু নাম-না-
শব্দকন্যাকে এবং সাকুলার রোডের
ানের কাছ থেকে সাংঘাতিকভাবে
বছর এগারো-বারো বয়েসের,
র ছেলে বাচ্চিকে। পিতার সমস্ত
তুলে দিয়ে এই দুই ছেলেমেয়েকে
এমনভাবে মানুষ করতে চেয়ে-
ন, যাতে তারা পবিত্রভাবে জীবন-
করতে পারে। সারাক্ষণ সদুপদেশ,
ক শিক্ষা এবং ধর্মীয় সংগীতের
তিনি এদের মনকে প্রভাবান্বিত
চেয়েছিলেন। অবশেষে তাদের
ধর্মে দীক্ষিত করে তিনি এদের
দিয়েছিলেন লনা ও জন। লনা তার
সংযত আচার-ব্যবহারে একটি
মল পরিহৃতার প্রতিমূর্তি হয়ে তাঁর
টকে সিদ্ধ করেছিল; কিন্তু জন?—
দার বিশ্বাসের কাছ থেকে দশ
ধরে নীতিশিক্ষালাভের পরও তার
কে ভুলতে পারেন—শত চেষ্টা
। সেই যে বাস্তবজীবনে সে একদিন
ধলে একটি নৃত্যগীতপটীয়সী
র মাদকতাময় যৌন আহ্বানে
দিয়েছিল, দীর্ঘ দশ বারো বছরেও
সদুপথকে সে ভুলতে পারেন এবং

লাস্যময়ী নারীর আহ্বান তার কাছে
অমোঘ। সে জানে, লনা তাকে
ভালোবাসে; কিন্তু সে ভালোবাসায়
কোনো মাদকতা নেই—‘কামগন্ধ নাহি
তায়’। লনার মধ্যে কোনো উত্তেজনা নেই
সে হিমশীতল। কাজেই ফাদারের শিক্ষা

সাহিত্যের কাহিনীকে চলচ্চিত্রে
রূপান্তরিত করতে গেলে স্বভাবতঃই
বহু পরিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্তনের
প্রয়োজন হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও তার
ব্যতিক্রম হয়নি। মূল কাহিনীর ন্যাথান-
নিয়েল রমেশ বিশ্বাস ছবিতে হয়েছেন
সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। জনের বন্ধু
ডেভিড হয়েছে স্টীফেন। কাহিনীকে
সরল এবং নাটকীয় করবার জন্যে থিয়ে-
টারের সুমি সেন ও পুতুলকে সরিয়ে
দিয়ে আনা হয়েছে বস্তীর রোশনাকে
নর্তকীরূপে। এর ওপর কাহিনীতে



‘হাফটিকটে’ মধুবালা

বার্ধ ক’রে জন নেমে গেল পার্কের মধ্যে;
দীর্ঘদিনের পর নর্তকী রোশনাকে নতুন
করে পেয়ে সে ডুবে গেল যৌনউপভোগের
অতল তলে—ফাদারের পবিত্র আহ্বান
এবং লনার পবিত্র প্রেম তাকে ফেরাতে
পারল না। সে মাত্র তখনই আত্মস্থ হ’ল,
যখন তাকে রক্ষা করবার জন্যে ফাদার
হারালেন তাঁর প্রাণ এবং সে নিজে হারাল
তার চোখের আলো।

ফাদার এবং বাচ্চি—দু’জনেই কণ্ঠসঙ্গীতে
অসামান্য; তার ওপর তারা বহু বাদ্য-
যন্ত্রবিশারদ। কিন্তু ছবিতে দেখি, বাচ্চি
বস্তী-জীবনে বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে এবং
জন-রূপে সে ফাদারের কাছ থেকে
শিখেছে বেহালা। ফাদার নিজে বসেছেন
বটে, তিনি জনকে পাকা বেহালাবাজিয়ে
করে তুলবেন; কিন্তু নিজে বেহালা না
ছ’য়ে বাজিয়েছেন গিয়ানো। এসব পরি-

বর্তনের হয়ত প্রয়োজন ছিল কিংবা হয়ত, সবগুলির ছিলও না। কিন্তু ব্যক্তি বা জনের জীবনের যে ম্বন্দ্র নিয়ে নাটক, তা সম্যক পরিষ্ফুট করার জন্যে আহত অবস্থায় ব্যক্তিকে তুলে আনবার পর যখন সে ফাদারের সেবায় স্বেচ্ছায় হয়ে উঠল, তখন তার পবিত্র স্বেচ্ছা জীবনের চেয়ে বস্ত্রী-জীবনে ফিরে যাবার আগ্রহকে বিস্তারিতভাবে দেখাবার প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া তার যে সঙ্গীতের প্রতি একটি সহজাত অনুরাগ আছে, তারও কিছু নিদর্শন দেওয়ার দরকার ছিল, যার ফলে পরবর্তী জীবনে ফাদার বলতে পারেন, “জনের জীবনেও আসবে সত্যের নতুন আলো—কারণ সে সুর ভালোবাসে, সঙ্গীত তারই কাজ—তারই প্রার্থনা।”

পবিত্র ভাবে দিনযাপনের শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলে জন যখন থিয়েটারে বেহালা বাজানোর চাকরী নিল এবং রোশানী ম্বারা ধীরে ধীরে প্রলুপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত কামের কুটীল আবেতে গা ভাসিয়ে দিল, তখন আবহ সৃষ্টির তাগিদে যে কুস্ত্রীতার অবতারণা করা হয়েছে, তার খুব বেশী প্রয়োজন ছিল বলে বোধ হয় না। এ ক্ষেত্রে সেন্সরের কাঁচ আরো নির্মমভাবে ব্যবহৃত হওয়ার অবকাশ ছিল। এ ছাড়া চিত্রনাট্য মোটের উপর সুন্দরভাবে গ্রথিত হয়েছে। ফাদারের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, লনার নিরুচ্চার প্রেম দৃশ্যের পর দৃশ্যে যে চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং ছবির শেষভাগে অনুভূতাপ-দগ্ধ অন্ধ ‘জন’কে যেভাবে চিত্তশুদ্ধির তপস্যার ম্বারা সার্থকতার পথে নিয়ে বাওয়া হয়েছে, তা সমূহ প্রশংসা পাবার হোগা।

পরিচালনায় অগ্রগামী গোষ্ঠী অত্যন্ত নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন ‘কামা’ ছবি-খানিতে। বহু রকমের চরিত্রের ভাঁড়ও ছবিখানির ছন্দপতন ঘটেনি কোথাও। আলো-ছায়ার সংমিশ্রণে ‘মুন্ড’-অনুযায়ী চিত্রগ্রহণে রামানন্দ সেনগুপ্ত অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির গোড়ার দিকে সম্ভবতঃ শব্দ-পুনর্যোজনার চুটির জন্যেই পাঠ-পাঠীর সংলাপ শুনতে

অসুবিধা বোধ করেছি। সুরকার হিসেবে সুধীন দাসগুপ্তের কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়; বিশেষ করে আবহ-সঙ্গীত কয়েক জায়গায় এমন বিচিত্রভাবে দৃশ্য-সংস্থাপনায় সাহায্য করেছে, যাকে অভূতপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হবে না।

অভিনয়ে নবাগতা নন্দিতা বসু সংযত, ধীর, শান্ত অভিনয়ে লনার পবিত্র চরিত্রকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। রূপ-বিলাসিনী রেশনীর ভূমিকায় সুলতা চৌধুরী ছিলনাময়ী। রূপে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখালেও কোনো মাদকতাময়ী অভিনেত্রীকে এই ভূমিকায় দেখব বলে আশা করেছিলাম। রাধামোহন ভট্টাচার্যের ফাদার সত্যাপ্রিয় বন্দোপাধ্যায় একটি শূচিচরিত, মানবধর্মী, ভারতীয় খৃষ্টানকে আমাদের চোখের সামনে মূর্ত করে তুলেছিল। তার রূপসজ্জাও চরিত্রের অনুরূপ। নায়ক ‘জন’-এর ভূমিকায় উত্তমকুমার গৃহীত চরিত্রের অন্তর্ম্বন্দ্রটিকে অবলীলাক্রমে ফুটিয়ে তুলেছেন তার বলিষ্ঠ অভিনয় ম্বারা। ছোট ব্যক্তি ও রোশানীর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্যামল ভট্টাচার্য ও জয়ন্তী বন্দোপাধ্যায় নৃত্যে, বংশীবাদনে ও অভিনয়ে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পল্টনের ভূমিকার অভিনেতাটিকে জীবন্ত শয়তান বললেও অত্যুক্তি হবে না, এমনই স্বাভাবিক হয়েছে তার রূপসজ্জা ও অভিনয়। ‘জন’-এর গুণগ্রাহী বন্ধু স্ট্রীফনের ভূমিকায় শ্যামল ঘোষাল স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন শোভা সেন (চাচি), রেণুকা লাহিড়ী (মাদার সুপিরিয়র), উষা (নানি) এবং অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় (থিয়েটার মালিক)।

“অগ্রগামী”-গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য অধুনা পরলোকগত পাবর্তীচরণ দে’র নামে উৎসর্গীকৃত “কামা” ছবিখানি মানুষের জীবনপরীকার একটি মর্মস্পর্ষু চিত্র।

বিবিধ সংবাদ

।। বাঙালী সুরকারের সম্মান ।।

সম্প্রতি নিখিল সোভিয়েট সুরকার সংঘের আমন্ত্রণে দিল্লী-প্রবাসী বাঙালী সুরকার গ্রীজোতিরন্দ্র মৈত্র ভারতবর্ষের গন্ধ থেকে উক্ত সংঘের তৃতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়েছিলেন, এ সংবাদে সকলেই আনন্দিত হবেন। জ্যোতিরন্দ্র বাবু গত কয়েক বৎসর ধরে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর অধীনস্থ



সুরকার জ্যোতিরন্দ্র মৈত্র

একটি প্রতিষ্ঠানে সুরকার এবং অধ্যাপক হিসাবে কাজ করছেন। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং স্বরবিন্যাসের কাঠামোকে মোটামুটি অক্ষত রেখে তিনি আধুনিক মন ও কানের পক্ষে তৃপ্তিকর সৃজনধর্মী আবহসঙ্গীত রচনায় সন্মুখ।

এইসব গুণাবলীর জন্যেই তিনি বিদেশে আমন্ত্রিত হ’য়েছিলেন এবং এবার মস্কোতে গিয়ে তিনি সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সুরকারদের একযোগে কাজ করার জন্যে আহ্বান জানান। তার এই প্রস্তাব সেখানে সাদরে গৃহীত হ’য়েছে। দেশে ফিরে জ্যোতিরন্দ্র-বাবু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সুরকারদের নিয়ে অদ্রভবিষ্যতেই একটি আলোচনা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার বিষয়ে চিন্তা করছেন।

বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্য সম্মেলন :

গেল বৃহস্পতিবার, ১৯-এ এপ্রিল থেকে চারদিন ধরে বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিদপ্তর পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল। সম্মেলনের উন্মোচন করেন বিখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসু। মূল সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং যুগ্মসভাপতি পদে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

কাটা, পোড়া, ঘা, রণ ও
যাবতীয় চর্মরোগ—

সাল্ফা-ডার্মিন

কুমারেশ হাউস, মালকিয়া, হাওড়া।



আর ডি বনসালের নবতম চিত্র 'এক টুকরো আগুন'-এর একটি বিশিষ্ট চরিত্রে নবাগতা সুরচিত্রা দাশগুপ্ত

উন্মোচন বহুতা প্রসঙ্গে মনোজ বসু বলেন, "আমাদের জাতীয় সরকার আজ-কাল দুরন্ত সাহিত্যিকদের মাসিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছেন। যারা একদিন রঙ্গমঞ্চ থেকে জনসাধারণের সানন্দবিধান করেছিলেন, তারা অক্ষম হয়ে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লে তাঁদেরও জন্য সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত।" প্রধান অতিথিরূপে বিবেকানন্দ মূখোপাধ্যায় যে-ভাষণ দেন, তার এক স্থানে তিনি বলেন, "আমরা নতুন জীবন ও যুগের সিংহাসন এবং ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছোছি। এই জীবন তাঁর ও তাঁক্ষ-এর সংঘাত অত্যন্ত গভীর। আজ দেশের নতুন পট-ভূমিকায় জনসাধারণের জীবনযাত্রা, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক মন্দ, চিন্তায় ও চেতনায় নতুন ভাব ও আদর্শের জাগরণ—এই সকলকে কেন্দ্র করে সাহিত্য, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, শিল্পকলা—এক

কথায় সমগ্র সংস্কৃতিকে নতুন বাস্তববাদে গড়ে তুলতে হবে।" এর পর ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য গেল বছরকে 'রবীন্দ্র'-নাটকের বছর ব'লে অভিহিত ক'রে বলেন, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প এবং উপন্যাসগুলিতে এত যে নাট্যবস্তু ছিল, তা রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব না হলে আমাদের কাছে ধরা পড়ত না। এ-ছাড়া তাঁর কাহিনীগুলির নাট্যরূপ কিন্তু বিভিন্ন সাধারণগ্রাহ্য প্রয়োগ-রীতি মারফতই জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়েছে, প্রয়োজনা ব্যাপারে তাঁর অনুসৃত মঞ্চরীতি ক্রটিং অনুসৃত হয়েছে। সুবীপ্রধান "সাধারণ নাট্যশালায় এক বছর" সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করবার পর বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরি-কল্পনা সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। সবশেষে মূল সভাপতি শৈলজা-নন্দ মূখোপাধ্যায় তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন, "আজকাল নট্যরচনায় হৃদয়কে

অস্বীকার ক'রে মস্তিষ্ককে প্রধান্য দেওয়া হচ্ছে। মস্তিষ্কধর্মী নাট্যকারেরা তাঁদের রচিত নাট্যবস্তু থেকে হৃদয়ধর্মকে সমলে বিদায় করার পক্ষপাতী। কিন্তু নাট্য-সাহিত্যে শুধু 'হৃদয়হীন মস্তিষ্ক' বিরাজ করলে সমস্ত দেশ একটা নীরস জড়পদার্থে পরিণত হতে দেরী হবে না।"

কলকাতা মেট্রো সিনেমার কর্মধ্যক্ষ :

কলকাতা মেট্রো সিনেমার সুদক্ষ কর্মধ্যক্ষ জনাব আই. এ. হাফেসজী চিকিৎসার জন্যে সুইজারল্যান্ড যাত্রা করেছেন গেল ১৭ই এপ্রিল। কলকাতা ত্যাগের আগে ঐ দিন সকালে তিনি স্থানীয় চিত্র-সমালোচকদের একটি ঘরোয়া চা-পানে আপ্যায়িত করেছিলেন। আমরা কামনা করি তিনি যেন চিকিৎসা-সান্তে যত শিগ্গির সম্ভব নিরাময় হয়ে এবং হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ক'রে দেশে ফিরে আসেন।

এস, সি, প্রোডাকশন্স-এর "শুভদৃষ্টি" :

ফাল্গুনী মূখোপাধ্যায়ের বহুপঠিত উপন্যাস 'কাঁটা ও কেয়া' অবলম্বনে এস, সি, প্রোডাকশন্স চিত্র বসুর পরিচালনায় যে-ছবিখানি তুলছেন, তার নব-নামকরণ হয়েছে 'শুভদৃষ্টি'। স্টুডিওর আভ্যন্ত-রীণ দৃশ্য শেষ ক'রে শ্রীবসু এবার বন্যা-দৃশ্য তোলার জন্যে খুব শিগ্গিরই মসেজোর যাত্রা করবেন। ছবিখানির নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন

স্টার থিয়েটার

শীতাতপ নিরন্তরিত] ফোন : ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক

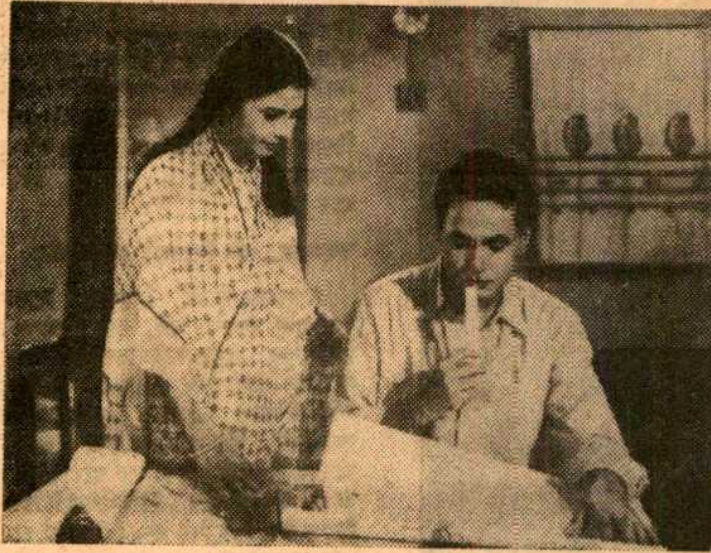
শেষাশ্বি

কাহিনী : শক্তিপদ রাজগুরু
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
গান : শৈলেন রায় • সুর : হৃদ্য সেন

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬। টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬। টায়

৥ রূপায়ণে ৥

কমল মিত্র - অজিত বন্দ্যো - আশীষ
কুমার - অর্ণবা দেবী - লিলি চক্রবর্তী
নাসরী নন্দী - অনুপকুমার - চন্দ্রশেখর
বীরেশ্বর সেন - গীতা দে - সাধনা
মায়চৌধুরী আশাদেবী শ্যাম লাহা
প্রেমাংশু বোস - ডান, বন্দ্যো



ডি এ পি প্রোডাকসনের 'কাজল' চিত্রে 'কাণ্ডনজঙ্ঘার' শিল্পী অরুণ মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় এবং অপরাপর ভূমিকায় আছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গুলী, অনুপকুমার, গীতা দে, নিভাননী প্রভৃতি। ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন মণি বর্মণ এবং এতে সুরারোপ করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জনতা পিকচার্স অ্যান্ড থিয়েটার্স লিমিটেডের পরিবেশনায় ছবিখানি জুলাই মাসের গোড়ার দিকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সূর্যশিখা :

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠান তাঁদের প্রথম ছবি 'সূর্যশিখা'র শুভ মহরৎ সূর্যম্পন্ন করেছেন গেল ১লা বৈশাখ টেকনি-সিয়ান্স স্টুডিও-তে। ছবিখানি পরিচালনা করবেন 'অগ্রদূত'-গোষ্ঠীর সহকারী সলিল দত্ত। বিনয় চট্টোপাধ্যায় এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণে আছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সুলতা চৌধুরী, রেণুকা রায়, শোভা সেন, শিখা বাণ প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ ছবিখানির পরিবেশনা করবেন।

সাক্ষী :

একখানি অভিনব অপরাধমূলক চিত্র হবে এম্-কে-জি প্রোডাকসন্স-এর আগামী চিত্রনিবেদন 'সাক্ষী'। ছবিখানির চিত্রনাট্যরচনা, পরিচালনা এবং সুরযোজনায় যথাক্রমে আছেন প্রণব রায়, পিনাকী মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত, দীপক মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, বীরেশ্বর সেন, জীবন বসু, সন্ধ্যারাণী, ছায়া দেবী, রেণুকা রায় এবং

সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অসীমকুমার

ন'বছর বয়সের শিশু-অভিনেতা বাসুদেব। কালিকা ফিল্মস্ ছবিখানির পরিবেশক।

মায়ার সংসার :

শিবানী ফিল্মসের সংগীতবহুল চিত্র 'মায়ার সংসার'-এর কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে টেকনি-সিয়ান্স স্টুডিও-তে কনক মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। ছবিখানির গীত রচনা করেছেন প্রণব রায় এবং সুরকার হচ্ছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। এর বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন বিশ্বজিৎ, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, সুলতা চৌধুরী, দীপ্তি রায় প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ চিত্রখানির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির :

১২ই মে, সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদনে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের

বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী নীরেশ্বরনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'শ্রীমতী' নৃত্যনাট্য (গ্রীক ও রাধিকার জীবনালেখ্য) নৃত্য-বিচিত্রা প্রদর্শিত হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র মহাশয়। সংগীত ও সহকারী নৃত্যে যথাক্রমে অংশ গ্রহণ করবেন সমর মিত্র, অরবিন্দ মিত্র, স্বপ্না সেনগুপ্তা, অরুণকুমার ও অনুপশঙ্কর।

'পূর্বাপর' অভিনয়

গত ১১ই এপ্রিল '৬২ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় 'রূপদর্শী' সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শ্রীহরিপদ বসু রচিত 'পূর্বাপর' নাটকখানি রঙমহলে অভিনয় করলেন। পরিচালনা করলেন শ্রীরমেশ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচ্য নাটকখানিতে নাট্যকার সামাজিক অব্যবস্থা ও দেশের বর্তমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছেন এবং সৌন্দর্য দিকে নাটকখানি রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

অভিনয়্যাংশে সেদিন যারা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন তাঁদের মধ্যে সুপ্রিয়, বাবুলাল, মিঃ লাহিড়ী, মৃত্যুঞ্জয়, গোসাই, বিমান, প্রজাপতি, অবিনাস, পিয়াসা, পুতুল ও বিরজা চরিত্রে যথাক্রমে : প্রভাত বসু, বিশ্বনাথ গরাই, গোপাল দত্ত, ভাস্কর চ্যাটার্জি, নির্মলেন্দু বিশ্বাস, রথীন সিকদার, বিকাশ দত্ত, বাদল মুখার্জি, সিপ্রা সাহা, দত্তা মুখার্জি ও মেনকা দেবীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাট্য পরিচালনা এক কথায় সুন্দর।

হাওড়ায় নিয়মিত অভিনয় :

ঋষিক ও নট-নাট্যম্-এর যুগ্ম প্রযোজনায় হাওড়ায় নিয়মিত অভিনয়ের প্রথম পর্বায়ের অভিনয় গেল ১৪ই ও



'উত্তরায়ণ' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তমকুমার

১৫ এপ্রিল হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনে চারটি একাঙ্ককার অভিনয় হয়। পরিমল দত্তের 'ব্যান্ড-মাস্টার', প্রেমেন্দু মিত্রের গল্প অবলম্বনে অরুণ মুখোপাধ্যায় কৃত নাট্যরূপ 'সংসার সীমান্ত', জগমোহন মজুমদারের

'করুণা কোরো না' এবং জো কুরীর 'হিউয়ার্স অব কোল' অবলম্বনে জগমোহন মজুমদার কৃত নাট্যরূপ 'ওরা কাজ করে'।

প্রথম দুটির পরিচালনা করেন অরুণ মুখোপাধ্যায় এবং শেষের দুটির

পরিচালনার দায়িত্ব নেন যথাক্রমে জগমোহন মজুমদার ও শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম পর্যায়ের অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ঋষিক ও নট-নাট্যম্ আগামী মে মাসে দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিনয় শুরু করবেন।



শিলাখত ইতিহাস

প্রাচীন স্মৃতিসৌধগুলি আজ ইতিহাসের পর্যায়ে উন্নীত।
খণ্ড খণ্ড শিলার গ্রন্থনায় রচিত এদের প্রত্যেকটি অতীত
ভারতের উদ্যমশীলতা আর কল্পনাশক্তির অমর নিদর্শন
হয়ে আছে। প্রতিদিন ভারতের নানা অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ
যাত্রীকে পৌঁছে দিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারাকে পারস্পরিক
সুভেচ্ছার দৃঢ়তম বন্ধনে গ্রথিত করে চলেছে রেলপথ।



দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

খেলাঘর

৮ম

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ পঞ্চম টেস্ট

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৫০ রান
(গারিফিল্ড সোবার্স ১০৪, রোহান কানহাই ৪৪, ইন্সটন ম্যাকমারিস ৩৭, রঞ্জনে ৭২ রানে ৪, নাদকার্ণী ৫০ রানে ৩, দুয়াণী ৫৬ রানে ২ এবং বোরদে ৩৩ রানে ১ উইকেট)।

ও ২৪৩ রান (ওরেল নট আউট ৯৮, সোবার্স ৫০, ম্যাকমারিস ৪২, কানহাই ৪১। সূতি ৫৬ রানে ৩, দুয়াণী ৪৮ রানে ৩, রঞ্জনে ৮১ রানে ২, নাদকার্ণী ১৩ রানে ১ এবং বোরদে ৬৫ রানে ১ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ১৭৮ রান (বাপে নাদকার্ণী ৬১, রুসি সূতি ৪১ এবং পলি উমরিগড় ৩২। লেস্টার কিং ৪৬ রানে ৫, লাস্টি গিবস ৩৮ রানে ৩, হল ২৬ রানে ১ এবং আলফ ভ্যালেন্টাইন ৩২ রানে ১ উইকেট)।

ও ২৩৫ রান (উমরিগড় ৬০, সূতি ৪২, মঞ্জরেকার ৪০, মেহেরা ৩৯। সোবার্স ৬৩ রানে ৫, হল ৪৭ রানে ৩, কিং ১৮ রানে ২ উইকেট)।

প্রথম দিন (১৩ই এপ্রিল) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ২৫০ রানে সমাপ্ত। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৩ রান (৫ উইকেটে)। পতৌদির নবাব ৮ এবং নাদকার্ণী ০ রান করে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (১৪ই এপ্রিল) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৭৮ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস—১৩৮ রান (৬ উইকেটে)। ওরেল ৩২ এবং কিং শূন্য রান করে নট আউট থাকেন।

৩য় দিন (১৬ই এপ্রিল) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৪৩ রানে সমাপ্ত। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস—৩৭ (২ উইকেটে)।

মেহেরা (১৫) এবং বোরদে (৮) নট আউট থাকেন।

৪র্থ দিন (১৭ই এপ্রিল) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩১ রান (৫ উইকেটে)। মঞ্জরেকার ৩৬ রান এবং উমরিগড় ১১ রান করে নট আউট থাকেন।

লাগের পর ২০ মিনিট খেলা হয়ে ব্যাটের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। এই দিন আর খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।

৫ম দিন (১৮ই এপ্রিল) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২৩৫ রানে সমাপ্ত।

খেলার ফলাফল : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১২৩ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

কিংস্টনের পঞ্চম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১২৩ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করায় পাঁচটি খেলা সমন্বিত টেস্ট সিরিজের প্রত্যেকটি খেলায় জয়লাভের সফল রক্ষা করতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল সক্ষম হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের টেস্ট ক্রিকেট জীবনে এই ধরনের সাফল্য প্রথম; এবং আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় দল হিসাবে এই সম্মান লাভ করলো। টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে যোগদানকারী সাতটি দেশের মধ্যে, মাত্র তিনটি দেশ—অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই দুর্লভ সম্মান পেয়েছে। ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়া ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে সফররত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবং ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়া সফররত দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এবং ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ড সফরকারী ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যান্ড দল টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই জয়লাভের কৃতি লাভ করে। অস্ট্রেলিয়ার কৃতিত্বই বেশী, তারা দু'বার এই সাফল্য লাভ করেছে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করার আছে, কোন দেশই ভিন্ন দেশের মাটিতে এই সাফল্য লাভ করতে সক্ষম

হয়নি। ভারতবর্ষ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই পরাজয় স্বীকার করলো—কোন দেশেরই টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ ধরনের অকৃতকার্যতার দৃষ্টান্ত নেই। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য 'রাবার' বিজয়ী ভারতবর্ষের এই চরম ব্যর্থতার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে ভারতবর্ষের সুনাম অনেকটা নষ্ট হয়েছে এবং ক্রিকেট অনুরাগী মাগ্রেই বিস্মিত হয়েছেন ভারতবর্ষের এই ধরনের দুটিপূর্ণ খেলাতে।

গত সংখ্যায় (৫০শ সংখ্যা, শুক্লাবার ৭ই বৈশাখ) পঞ্চম টেস্টের তৃতীয় দিন পর্যন্ত খেলার বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৪৩ রানে শেষ হলে ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভ করতে ৩৫৯ রানের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষ ৭৪৫ মিনিট খেলার সময় পায়। ভারতবর্ষ মাত্র ১৫ মিনিটের খেলায় ১৫ রান করে জয়সীমার উইকেট হারায়। দলের ২১ রানের মাথায় দুয়াণী ৪ রান করে কিংয়ের বলে আউট হন। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনায় কিংয়ের এই সাফল্য ভারতীয় দলের সমর্থকদের মহা-দুঃশ্চিন্তার ফেলে। যাই হোক এইদিন আর কোন অঘটন ঘটেনি—নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগে খেলার উপযুক্ত আলোর অভাবে খেলা ভেঙে যায়। রান দাঁড়ায় ৩৭, ২ উইকেটে। উইকেটে অপরায়ে ছিলেন মেহেরা (১৫) এবং বোরদে (৮)।

এই দিন ব্যাটের জন্যে ১০৮ মিনিটের মত খেলার সময় নষ্ট হয়।

চতুর্থ দিনের খেলায় ভারতবর্ষ তৃতীয় দিনের ৩৭ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে ৯৪ রান যোগ করে আরও ৩ উইকেট খুইয়ে। চতুর্থ দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি, ১৪০ মিনিট খেলা হয়। লাগের পর ২০ মিনিট পর্যন্ত খেলা চলে এবং ব্যাটের দরুণ সেই যে খেলা বন্ধ হয় এইদিনে আর খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। চতুর্থ দিনে লাগের আগেই ভারতবর্ষের ৩ জন খেলোয়াড়—মেহেরা, বোরদে এবং অধিনায়ক পতৌদির নবাব আউট হয়ে যান, এদিকে পূর্ব দিনের ৩৭ রানের সঙ্গে ৮১ রান যোগ হয়ে মোট রান দাঁড়ায় ১১৮, ৫টা উইকেট পড়ে। চতুর্থ দিনে প্রথম ৭৭ মিনিটের খেলায় দলের রান পাঁচের কোঠায় পৌঁছায়। এবং ৮১ মিনিটের খেলায় তৃতীয় উইকেটের

জুটিতে ৫০ রান পূর্ণ হয়। দলের ৭৭ রানের মাথায় সোবাসের বলে খোঁচা দিয়ে মেহেরা উইকেট-কীপার এ্যালানের হাতে ধরা পড়েন। এর ৬ মিনিট পর দলের ৮০ রানের মাথায় সোবাসের বলেই বোরদে বোল্ড আউট হয়ে খেলা থেকে বিদায় নেন। ১৫ মিনিট পর সোবাস দলের ৮৫ রানের মাথায় ভারতবর্ষের অধিনায়ক পতোদিকে বোল্ড আউট করেন। ৬ষ্ঠ উইকেটে মঞ্জুরেকারের সঙ্গে খেলতে নামেন উমরিগড়। লাণ্ডের সময়ে স্কার ছিল ১১৮, ৫ উইকেট পড়ে। চতুর্থ দিনে বর্ষের দরুন লাণ্ডের পর যখন মাত্র ২০ মিনিট খেলা হয়েছে তখন বর্ষের জন্যে খেলা বন্ধ রাখতে হয়। ভারতবর্ষের তখন রান ১৩১ (৫ উইকেট)। উইকেটে আছেন মঞ্জুরেকার (৩৬) এবং উমরিগড় (১১ রান)। এই দিনের মত এইখানেই খেলা শেষ। খেলার এই অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভে ২২৮ রানের প্রয়োজন হয়। হাতে খেলার সময় ৩৩০ মিনিট এবং হাতে জমা আছেন মঞ্জুরেকার, উমরিগড়, সূতি, নাদকাণী, কুন্দরাম এবং রঞ্জে—৫টা উইকেট পড়তে বাকি।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে যখন ভারতবর্ষ খেলা আরম্ভ করে তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের থেকে ভারতবর্ষ ২২৭ রানের পিছনে আছে। এই দিনের খেলার সূচনায় মঞ্জুরেকার সোবাসের বলে বার বার পরাস্ত হন। তিনি যে আর বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারবেন না তা এই থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। কলকাতায় খেলা হলে বার বার ঠাকুরের কাছে তাঁর জন্যে মানত করা হত। এই দিনের বার মিনিটের খেলার সময়ে এবং দলের ১৩৫ রানের মাথায় মঞ্জুরেকার নিজস্ব ৪০ রান করে সোবাসের বলে এল-বি-ডবলিউ হয়ে বিদায় নেন। ৬ষ্ঠ উইকেটে মঞ্জুরেকার এবং উমরিগড় দলের ৪৯ রান যোগ করেন। চতুর্থ দিনে মঞ্জুরেকার তাঁর ১৩ রানের মাথায় হলের বলে একটা খুব সোজা ক্যাচ তুলে দেন। সলোমন এই বলটা ফেলে দিলে মঞ্জুরেকার অপরা ১৩ রানের মাথায় খুব জোর আউট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যান। ৭ম উইকেটে উমরিগড়ের সঙ্গে খেলতে নামেন সূতি। এই জুটি খুব তাড়াতাড়ি দলের রান তুলে দেন। দলের ২১৮ রানের মাথায় সূতি ৪২ রান করে আউট হন। তখন লাণ্ডের জন্যে

খেলা ভাঙতে ২০ মিনিট বাকি—সোবাসের বল মারতে সূতি লাফ দিয়ে এগিয়ে যান, কিন্তু ব্যাটে বলে এক করতে পারলেন না; উইকেট-কীপার এ্যালান তাঁকে স্টাপড আউট করেন। সূতি এবং উমরিগড়ের ৭ম উইকেটের জুটিতে দলের ৮৩ রান উঠে যায় ৮০ মিনিটের খেলায়। সূতি ধীর-স্থিরভাবে খেলেন। গোড়া থেকেই তাঁর খেলায় অস্থিরতা প্রকাশ পায়। তাঁর এই দুর্বলতার প্রতি সোবাস লক্ষ্য রেখেছিলেন এবং ঝোপ বুঝে কোপ মারেন। সূতি একটু ধীর-স্থিরভাবে খেললে এইভাবে আউট হতেন না। এবং ওয়েলকে এই পঞ্চম টেস্ট খেলায় জয়লাভের জন্যে যথেষ্ট মাত্রা ঘামাতে হত। সূতি যখন আউট হ'ন তখনও ভারতবর্ষ ১৪০ রানের পিছনে পড়ে ধুকেছে। এর পর নাদকাণী খেলতে নামেন; কিন্তু বেশীক্ষণ উইকেটে ছিলেন না। দলের মাত্র এক রান যোগ হয়ে ২১৯ রান দাঁড়াল এবং নাদকাণী কেন রান না করেই হলের বলে বিদায় নেন। তাঁর শূন্যস্থানে খেলতে নামেন কুন্দরাম। কুন্দরাম হলের বল খেলতে খুবই অসুবিধায় পড়েন। হলের পর পর পাঁচটা বল খেলতে গিয়ে তিনি কোন রকম আউট থেকে বেঁচে যান। লাণ্ডের জন্যে খেলা ভাঙলে কুন্দরাম হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন আর কি! লাণ্ডের সময় স্কার ছিল ২২৪ রান ৮ উইকেটে; উইকেটে তখন আছেন উমরিগড় (৫৪ রান) এবং কুন্দরাম। কুন্দরাম তখনও রানের মুখ দেখেননি। লাণ্ডের পরের বার মিনিটের খেলার সময়ে কুন্দরাম বোল্ড আউট হলেন হলের বলে। কুন্দরাম ১ রান করে পিঙ্কিরক্ষা করেন। দলের রান তখন ২৩০ অর্থাৎ লাণ্ডের পর দলের মাত্র ৬ রান যোগ হয়েছে। রঞ্জে শেষ উইকেটে খেলতে নামেন উমরিগড়ের সঙ্গে। উমরিগড় সোবাসের বলে বাউন্ডারী এবং হলের বলে ১ রান মোট ৫ রান করেন। দলের রান দাঁড়ায় ২৩৫। এই

২৩৫ রানের মাথায় হলের শেষ বলে উমরিগড় বোল্ড আউট হন। ফলে ভারত বর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২৩৫ রানে শেষ হয় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১২৩ রানে জয়লাভ করে। উমরিগড় ২১০ মিনিট খেলে নিজস্ব ৬০ রান করেন এবং বাউন্ডারী করেন ২টো।

পাঁচের ব্যাথার জন্যে উমরিগড় পঞ্চম টেস্ট খেলায় বল করেননি। সোবাস ৬৩ রানে ৫টা উইকেট পান। শেষ দিনে ওস্তাদের মার দেন কিন্তু হল। ১৩ ওভার বল করেও হলের খেলা শূন্য—এমন অবস্থায় হল পুরনো বল নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের শেষের দিকে বল করতে নামেন এবং ৭.৫ ওভার বলে ৩টে উইকেট পান; তাঁর খলে পূর্ণ করেন নাদকাণী, কুন্দরাম এবং উমরিগড়। এই ৩টে উইকেটের বিনিময়ে হল মাত্র ৭ রান দেন। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, উইকেট পাওয়ার উপযুক্ত পাঁচ পেয়েও গিবস ২৫ ওভার বল করে একটা উইকেটও পাননি, অথচ রান দিয়েছিলেন ৬৬টা। আর এই গিবসই কিনা ভোল্টের খেলা দেখিয়েছিলেন তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৬ রানে ভারতবর্ষের ৮টা উইকেট নিয়ে; এবং তাঁর সেই খেলার জন্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়।

॥ ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট ॥

(বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলা এবং টেস্ট সিরিজের সংক্ষিপ্ত ফলাফল)

মোট জয় হার ড্র				
টেস্ট খেলা	৯৪	৩১	৩২	৩১*
টেস্ট সিরিজ	২২	১০	১০	২
*টেস্ট খেলার ইতিহাসে প্রথম টাই ম্যাচ (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট) নিয়ে ৩১টি				

॥ ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট ॥

মোট জয় হার ড্র				
টেস্ট খেলা	৮২	৮	৩৪	৪০
টেস্ট সিরিজ	১৯	৩	১৩	৩

॥ ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ॥

প্রথম টেস্ট ১৯৪৮-৪৯ এবং শেষ টেস্ট ১৯৬২ এপ্রিল, ১৯৬২

স্থান	সাল	ভারতবর্ষের		ওয়েস্ট ইন্ডিজের		মোট
		জয়	হার	জয়	হার	
ভারতবর্ষ	১৯৪৮-৪৯	০	১	৪	৫	
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৯৫৩	০	১	৪	৫	
ভারতবর্ষ	১৯৫৮-৫৯	০	৩	২	৫	
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৯৬২	০	৫	০	৫	
মোট		০	১০	১০	২০	

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে পাঁচটা টেস্ট খেলার ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রবীণ খেলোয়াড় পলি উমরীগড় ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথম স্থান লাভ করেছেন। ব্যাটিংয়ে তাঁর খেলার হিসাব দাঁড়িয়েছে : খেলা ৫, ইনিংস ১০, নট-আউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭২ নট-আউট, মোট রান ৪৪৫ এবং গড়পড়তা ৪৯.৪৪। বোলিংয়ের হিসাব : ওভার ১৫৬, মেডেন ৬৭, ২৪৯ রানে ৯ উইকেট এবং গড়পড়তা ২৭.৬৬। মোট টেস্ট খেলায় তিনিই উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান (১৭২ নট-আউট) এবং নিজ দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান (৪৪৫) করেছেন। চতুর্থ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসে উমরীগড়ের ১০৭ রানে ৫ উইকেট, প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৫৬ ও ১৭২ নট-আউট রান করার কৃতিত্ব-টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই রকমের সাফল্য খুব কমই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পক্ষে এবার উমরীগড়ই এক ইনিংসের খেলায় ৫টা উইকেট পেয়েছেন। টেস্ট খেলা ছাড়াও এইবারে সফরের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর খেলার ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন উমরীগড়ই। সফরের খেলায় আহত এবং পীঠের পুরনো ব্যথায় অসুস্থ না হলে তিনি আরও উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারতেন। বর্তমানে উমরীগড়ের টেস্ট ক্রিকেট খেলার হিসাব দাঁড়িয়েছে : মোট খেলা ৫৯, মোট রান ৩৬৩১, সেন্সুরী সংখ্যা ১২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২৩ (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৫-৫৬); অর্ধ-সেন্সুরী ১৪ এবং ২৪৭৫ রানে ৩৫ উইকেট। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র উমরীগড়ই তিন হাজার রান করেছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ১৯৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় উমরীগড়ের পর যথাক্রমে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান পেয়েছেন-নাদকারী ২৩৬ রান (৩৩.৭১), দুরানী ২৫৯ (২৮.৭৭), সুদী ২৪৬ রান (২৪.৬০) এবং বোরদে ২৪৪ (২৪.৪০)। বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন নাদকারী, ৩১৬ রানে ৯ উইকেট (৩৫.১১)। দুরানী ৬০০ রানে ১৭টা উইকেট নিয়ে তৃতীয় স্থান (গড়পড়তা ৩৫.২৯) পেলেও দলের পক্ষে তিনিই সর্বাধিক ১৭টা উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান

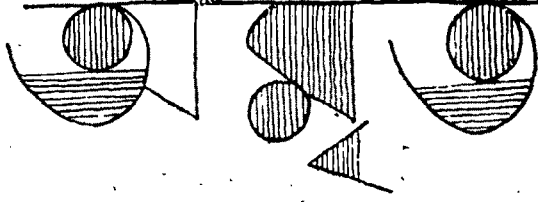
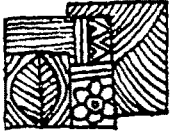
পেয়েছেন দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল-খেলা ৫, ইনিংস ৬, নট আউট ২ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৯৬ নট আউট, মোট রান ৩৩২ (৮০.০০)। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান (৪৯৫) পেয়েছেন রোহন কানহাই; তালিকায় তাঁর স্থান দ্বিতীয়-খেলা ৫, ইনিংস ৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩৯, মোট রান ৪৯৫ (৭০.১৭)। ৩য় স্থানে সোবাস-খেলা ৫, ইনিংস ৭, নট আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৫৩, মোট রান ৪২৪ (৭০.৬৬), ৪র্থ স্থানে ম্যাকমরিস-খেলা ৪, ইনিংস ৬, নট আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২৫, মোট রান ৩৪৯ (৮৫.১৬)। উভয় দলের খেলোয়াড় নিয়ে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকা তৈরী করলে উমরীগড় পানেন পঞ্চম স্থান। প্রথম চারটে স্থানই পাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। উভয় দলের পক্ষে বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন ওয়েসলে হল-ওভার ১৬৭.৪, মেডেন ৩৭, ৪২৫ রানে ২৭ উইকেট (গড়পড়তা ১৫.৭৪)। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেটও (২৭) পেয়েছেন ওয়েসলে হল। গিবস পেয়েছেন ৪৯০ রানে ২৪টা (২০.৪১), সোবাস ৪৭৩ রানে ২৩টা (২০.৫৬), স্টেয়ার্স ৩৬৪ রানে ৯টা (৪০.৪৪) এবং কিং ৬৪ রানে ৭টা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ৫টা করে উইকেট পেয়েছেন চারজন বোলার : ওয়েসলে হল ৪৯ রাণে ৬ (২য় টেস্ট ২য় ইনিংস) এবং ২০ রাণে ৫ (৪র্থ টেস্ট ১ম ইনিংস), লান্স গিবস ৩৮ রাণে ৮ (৩য় টেস্ট ২য় ইনিংস), লেস্টার কিং ৪৬ রাণে ৫ (৫ম টেস্ট ১ম ইনিংস) এবং গারফিল্ড সোবাস ৬৩ রাণে ৫ (৫ম টেস্ট ২য় ইনিংস)।

পাঁচটা টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ মোট রান করেছে ২৩৯১ (১০০ উইকেটে) এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৫৬৬ (৬০ উইকেটে)। ভারতবর্ষের ২৩৯১ রানের মধ্যে অতিরিজ্ঞ রান ১৩০ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৫৬৬ রানের মধ্যে অতিরিজ্ঞ ৮৫ রান। টেস্ট সিরিজে মোট ৭টা সেন্সুরী হয়েছে-ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ৫ এবং ভারতবর্ষের পক্ষে ২। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে সেন্সুরী করেছেন কিংস্টনের দ্বিতীয় টেস্টে সোবাস ১৫৩, কানহাই ১৩৮ এবং ম্যাকমরিস ১২৫; পোর্ট অব স্পেনের চতুর্থ টেস্টে কানহাই ১৩৯ এবং কিংস্টনের পঞ্চম টেস্টে সোবাস ১০৪। ভারতবর্ষের পক্ষে টেস্ট সেন্সুরী করেছেন পোর্ট অব স্পেনের চতুর্থ টেস্টে দুরানী ১০৪ এবং উমরীগড় নট আউট ১৭২।

ভারতবর্ষের ব্যর্থতার কারণ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষ শূন্য টেস্ট খেলায় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়নি; এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের ফলাফল ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই লজ্জার কারণ। এই ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বলা যায়, বিদেশের অনভ্যস্ত জলবায়ুতে কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড়ের অসুস্থতা, খেলায় কয়েকজনের শারীরিক আঘাত, টেস্ট খেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্পন্নতার ভুল সিদ্ধান্তে দলের ক্ষতি, দল পরিচালনার যোগ্যতার একান্ত অভাব, ব্যাটিং বিপর্যয়, দ্রুতিপূর্ণ ফিল্ডিং, খেলোয়াড়দের মানসিক দুর্বলতা এবং ওয়েসলে হলের ফাস্ট বল সম্পর্কে খেলোয়াড়দের নিদারুণ আশঙ্কা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল পাঁচটা টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের শোচনীয় পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে হলের বলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের দারুণ ভয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। ওরেলের মতে: ভারতীয় দল দুর্বল নয়, মূলতঃ ভালই। তিনি বলেছেন, যে সময়ে হল সম্পর্কে ভারতীয় দলের ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা কেটে যায়, তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিনটে টেস্ট খেলা জিতে নিয়েছে। দল পরিচালনায় দ্রুতি সম্পর্কে তিনি খোলাখুলিভাবে অভিমত প্রকাশ করেননি; ভ্রুতার খাতিরে রেখে-দেকে ইঙ্গিত করেছেন মাত্র। একথা ঠিকই যোগ্য অধিনায়কের হাতে পড়লে ভারতীয় দলের এরকম 'হাড়ির হাল' হ'ত না। ভারতীয় দলের কন্ট্রোল্টর এবং পাঠোদীর নবাব কি খেলায় এবং কি দল পরিচালনায় মোটেই যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে যেখানে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল অধিনায়ক সেখানে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার কার উপর দিলে শোভন এবং কাজের হ'ত প্রবীণ টেস্ট খেলোয়াড় পলি উমরীগড় এই সফরের খেলায় চোখে আঁঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। খবরে প্রকাশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের চারজন ফাস্ট বোলারকে ভারতবর্ষের খেলোয়াড়দের মন থেকে ফাস্ট বলের 'জুজুর ভয়' দূর করার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিগত টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের ১০০টা উইকেটের মধ্যে ফাস্ট বোলাররা পেয়েছেন ৪৩টা উইকেট; বাকি বেশীর ভাগ উইকেট পেয়েছেন স্লো বোলাররা। ভারতীয় ক্রিকেট দলের আজ প্রধান সমস্যা যোগ্য অধিনায়কের। ঝকঝকে দামি গাড়ি অক্ষম চালকের হাতে পড়লে গাড়ির যে দুর্গতি হয় ভারতবর্ষেরও তাই হয়েছে।



VIVEK

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৫২শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২১শে বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 4th May 1962.
40 Naya Paise.

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সম্প্রতি কংগ্রেসের সংসদীয় দলের এক সভায় গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে, পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানবের পক্ষে অত্যন্তই ক্ষতিকর, এবং সেইজন্যই যারা শান্তিপূর্ণ পৃথিবী চান; তাঁদের এই পরীক্ষা বন্ধের জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

সকলেরই একথা জানা আছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে খ্রীষ্টমাস দ্বীপে নব-পর্যায়ে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা শুরু হওয়ার ফলে জেনেভায় অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন প্রায় ব্যর্থ হয়ে উঠেছে। এবং উক্ত সম্মেলন শুরু হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ঘনঘটার মধ্যে সামান্য যে একটু আশার আলো দেখা দিয়েছিল, তাও এখন বিলীনমান।

কিন্তু আরম্ভেরও একটা আরম্ভ আছে। সেই হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাম্প্রতিক পারমাণবিক বিস্ফোরণের কারণ হিসাবে দেখাতে পারে গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত রুশ পারমাণবিক বিস্ফোরণের নজির। প্রকৃত প্রস্তাবে সে সময়ে রাশিয়ার পঞ্চাশ মেগাটন বোমার বিস্ফোরণ যে-পরিমাণ প্রতিবাদের ধূলিঝড় উৎপাদিত করে তুলেছিল তাও প্রায় অভূতপূর্ব। তবে প্রতিবাদের ফলে রাশিয়া যেমন তখন তার বিপজ্জনক পরীক্ষা বন্ধ করেনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তেমনি বর্তমানে অবচলিতভাবেই তার পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এবং এইভাবে পূরাদস্তুর একটা মহা-যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার আগেই নিছক পারমাণবিক বিস্ফোরণ-জাত তেজস্ক্রিয় ভস্মপতনের ফলেই সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষ 'সবংশে নিধন' হওয়ার বিভীষিকায় নিমজ্জিত হচ্ছে।

প্রত্যক্ষ মৃত্যুর চেয়ে এই সর্বগ্রাসী আতঙ্কই যেন এ যুগের উৎকটতম অভিশাপ।

এ আতঙ্কের বজ্রমর্দিতে কেবল আমরা অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরাই যে প্রাণান্তকর দৃঃস্বপ্নের মধ্যে কালাতিপাত করছি তা নয়, বর্তমান পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীরও সেই একই দুরবস্থা। বাস্তবিক শ্রীনেহরু তাঁর পূর্বোক্তিত বক্তৃতায় ঠিকই বলেছেন যে, দুই বৃহৎ শক্তির পারস্পরিক অবিশ্বাসই নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির পথে সবথেকে বড় বাধা। এবং এই অবিশ্বাসের ফলেই উভয় দেশে পর্যায়ক্রমে পারমাণবিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

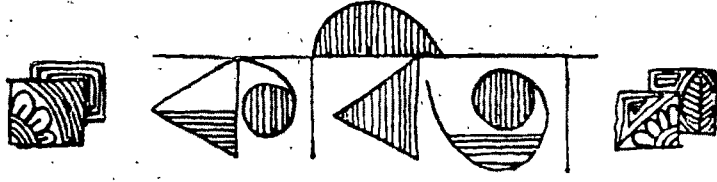
অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আমরা এক সর্ব-ব্যাপী যুদ্ধের মূখোদুখী বাস করছি তবে পরীক্ষা-মূলক পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের জন্যে কোনো পক্ষকেই হয়ত দোষী করা যায় না। কারণ পারমাণবিক অস্ত্রই যখন সম্ভাবিত সে যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের নিয়ন্তা তখন যে-পক্ষ ভীষণতম অস্ত্রের অধিকারী হবে, জয়লক্ষ্মী তাদেরই কণ্ঠে বরমালা দান করবে এ বিষয়ে

নিঃসন্দেহ। কাজেই রাশিয়া পঞ্চাশ মেগাটন বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষাকার্য চালালে মার্কিন রাষ্ট্রকেও উন্নত-তর বোমা ফাটাতে অগ্রণী হ'তে হয়। এবং মার্কিন দেশের পর রাশিয়া যদি নতুন পর্যায়ে আবার পারমাণবিক বিস্ফোরণ আবশ্যক মনে করে তাতেও বিশ্বময়ের অবকাশ থাকবে না। এই দৃষ্টান্ত যেন কালচক্রের মতোই অমোঘ; ন্যায়শাস্ত্রের বিধান মতো এ থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ অত্যন্তই ক্ষীণ।

কিন্তু ন্যায়ের বিধান বা নিয়তি মনে ক'রে মানুষ কোনো বিপদকেই নির্বিচারে মেনে নেয় না। মানুষের মনুষ্যত্ব এবং পুরুষকার অজস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মানবিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে তৎপর। সভ্যতার বিস্তৃত ইতিহাস আসলে এই ধরনের অভাবনীয় বাধা এবং তাকে সাহস ও বুদ্ধির দ্বারা অতিক্রম করারই ইতিহাস। কাজেই বর্তমান বিপদকেও সর্বশক্তিমান মনে করলে সে হবে মানুষের যুগ-যুগ-অর্জিত মনুষ্যত্বের প্রতিই নিদারুণ অবিশ্বাস।

প্রকৃত প্রস্তাবে, ইতিমধ্যেই অন্য একটি সম্ভাবনার পথরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মার্কিন দেশের পক্ষ থেকে বর্তমানে খ্রীষ্টমাস দ্বীপে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে এ যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও অত্যন্ত সত্য যে ইস্টার দিবসের পূর্ব রাতে নিউইয়র্ক শহরের টাইম স্কোয়ারে প্রায় সাড়ে তিন হাজার নরনারীর প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে। এবং এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, ২৩শে এপ্রিল নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি থেকে ১২৫ জন অধ্যাপক ও গবেষক একটি প্রতিবাদ পত্র ছেপে জানিয়েছেন, যারা এই প্রতিবাদের পক্ষে একমত তাঁরা যেন তার নিচে তাঁদের নাম স্বাক্ষর করে সেটি প্রেসিডেন্ট শ্রীকেনেডির কাছে পাঠিয়ে দেন। এ ছাড়া এই দিন গ্রেট ব্রুটনে ১৫ হাজার, পশ্চিম জার্মানিতে ১০ হাজার এবং কোপেনহেগেনে ৩০ হাজার প্রতিবাদকারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন, এ সংবাদও নিউইয়র্ক টাইমস থেকেই জানা যায়। ইতিপূর্বে রাশিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষার সময়েও এইভাবে দেশে দেশে প্রতিবাদ-ধ্বনি উঠিত হয়েছিল। আমাদের মনে হয়, বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীদের এই সংঘবদ্ধ প্রতিবাদই পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়।

অত্যন্ত সুখের বিষয়, কেবল আমাদের প্রধানমন্ত্রীই নয়, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষও এই শান্তিপূর্ণ নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্যে বারবারেই তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে; এবং আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, যতোদিন প্রয়োজন ঘটে ততোদিনই তাদের এই মূক্তকণ্ঠ প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।



স্বগত

মৃগাঙ্ক রায়

ট্রাম টর্ক ট্রেন, সংসার শহর,
প্রাচীন প্রত্যাহের পরিচর্যা,
মাছি মাংস বাজার, অবিমিশ্র রৌদ্রের
রক্তহীনতা, তিন ডাইনির কড়ায়ের নিচে
আগুন আগুন আগুন।

তবু লেখো, প্রতিদিন কবিতা লেখো
যদিও সাধারণ, অতীব সাধারণই থাকে
শ্রুতকীর্তি সন্মুখ হবে না, যদিও তুমি
দু'সারি দাঁতের অন্তরালের অন্ধকারে
জীবনের নিত্যকার ক্ষুধার আহাৰ্য।

তবু লেখো, অর্পিত হও কবিতায়
কেননা, জীবন যথেষ্ট যন্ত্রণা নয়॥

রৌদ্রে খুঁজি সেই মৃদু

কৃষ্ণ ধর

আমি খুঁজি এই রৌদ্রে তোমার সে ঝলসানো মৃদু
দম্পদীর্ণ এ প্রান্তরে, তোমাকেই খুঁজে দেখি আমি
লাল পাহাড়ের নিচে, উজ্জ্বল নদীর জলে নামি
খুঁজে দেখি সেই মৃদু, অশ্বেষণে অপরিমেয় স্নেহ।

তৃপ্ত দেবে বলেছিলে, গভীর যন্ত্রণা দেবে মৃদু
জীবনের পাত্র থেকে, কিছু আর রাখিনি যে নিজে
সবই তোমাকে দিয়ে শুচিস্তান নায়কের সাজে,
শিশুর খেলনার মতো রৌদ্র নাচে মহুয়ার নিচে।

আমাকে ডাকবে বলে পৃথিবী এমন রৌদ্রমতী
জ্যোৎস্নার মতো শাদা বৃকের ভিতর ভালবাসা
পুষে রাখে অবিরত, পূর্ণতার প্রেমিকের আশা
রেখেছি তোমার জন্য, হে নায়িকা তোমার সম্মতি

কখন মিলবে বলে, রৌদ্রে খুঁজি ঝলসানো মৃদু
লাল পাহাড়ের নিচে, অশ্বেষণে অপরিমেয় স্নেহ॥



বাসা বাড়ী

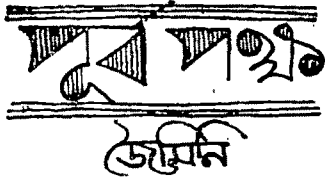
নারায়ণ মৃদুথোপাধ্যায়

কাল রায়ে ওরা সব চলে গেছে বাসাটাকে ছেড়ে।
এই বাসাবাড়ী থেকে অন্য কোন নতুন বাসায়।
দুয়ার জানালা খোলা, এদিকে সেদিকে ইতস্ততঃ
ছেঁড়া কাগজের টুকরো, ভাঙা কলসী মাটির গেলাস।

কী নির্মম শূন্যতায় ভরে আছে, দেখ চতুর্দিক।
দেওয়ালে কালির দাগ, কে একটা ছবি এঁকে গেছে।
ছেঁড়া পাতা ক্যালেন্ডার হাওয়ায় আপন মনে ওড়ে।
শূন্য ঘর একা সাক্ষী শূন্য এ নীরব শূন্যতার।

কয়েকটা পুরানো চিঠি, খালি টিন, শিশি ও বোতল।
এ ঘরের কুলুঙ্গিতে প্রদীপের কালোভূসো দাগ।
খোলা দরজা রান্নাঘর, ভাত ফেলা এখানে সেখানে,
অত্যন্ত স্বাধীন কটা কাক সে রাজছে সমাসীন।

কজন মানুষ এসে এখানে কদিন বাস করে,
অভিনয় করে গেছে চিরন্তন হাসি ও কান্নার,
সুখদুঃখ ভালবাসা, জন্মমৃত্যু, বিরহ প্রণয়।
মুক মৌন বাসাবাড়ী, সে শূন্য নীরব সাক্ষী তার॥



একটি প্রতিষ্ঠান আছে এই শহরেরই পূর্বাংশে, তার নাম লুন্স্বিনী হাসপাতাল। মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা হয় সেখানে। শোনা যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটি নাকি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছি আমি এ সংবাদে।

কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করার আগে পাগল, আধা-পাগল এবং হব্দ-পাগলদের আশ্বাস দিয়ে জানাচ্ছি, সরকারী যে আইনের পর্যায়ে পড়ে লুন্স্বিনী হাসপাতালের দুর্দশা ঘটেছে, অচিরেই হয়তো তার সংশোধন ঘটবে এবং প্রতিষ্ঠানটি যেমন আছে তেমনটি টিকে যাবে। যাঁরা আরো বেশি নিশ্চয়তা দাবী করেন তাঁরা খবরের কাগজের পাতার দিকে নজর রাখতে পারেন।

একটা ব্যাপার ভাবতে ভাবি আশ্চর্য লাগে, পাগলের বিষয়ে আমাদের এত কৌতূহল কেন! আমাদের বলতে আমি শুদ্ধ বয়স্কদেরই বোঝাচ্ছি নে, শিশুদেরও পড়ে সেই দলে। এবং সত্যি বলতে কি, শিশুদের কৌতূহল এ ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরতারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়!

কারণটা অনেক সময়েই হয়তো মজা দেখা, কিন্তু পাগলকে বিরক্ত করে মজা লাগারই বা কারণ কি?

আমার মনে হয়, পূর্ণকায় পরিণত মানুষের সব কিছু দৈহিক লক্ষণই অটুট আছে অথচ আচার-আচরণের মধ্যে কোনো ঘৃষ্ণি-শৃঙ্খলা নেই, পাগলদের মধ্যে এই ঘাটতিটাই বালক-বালিকাদের কাছে আশ্চর্য লাগে। এবং হয়তো তারা এই ভেবে কিছুটা আত্মপ্রসাদও লাভ করে যে, অতো বড় একজন সাবালক মানুষের চেয়ে তাদের বৃদ্ধিসমৃদ্ধিও বেশি! কিংবা, এসব কিছুই নয়, ছোটোদের আমোদ লাগে প্রেফ আছাড়-খাওয়া দেখলে যেমন হাসি পায় সেই-রকম। জীবনের পথে চলতে চলতে পাগল মানুষটি যে পিছলে পড়ল, সেই গতনটাই হ'ল মজার ব্যাপার।

কিন্তু বয়স্ক মানুষদের কাছে তা নয়। তাঁরাও মাঝে মাঝে খুঁশি হন পাগল দেখলে, কারণ তাঁদেরও মনের মধ্যে শিশু বাস করে। তবে বেশির ভাগ সময়েই তাঁদের মনে জাগে করুণা এবং তারই সঙ্গে মিশে থাকে একটি আতঙ্ক। না, পাগল এসে তাঁদের আক্রমণ করবে সে আশঙ্কা নয়, বরং সময়ের ধাক্কা

বাক-সাহিত্যের নতুন বই

দিলীপকুমার রায়-এর উপন্যাস

দো টা না

দোটা না উপন্যাসের দুই প্রধান পুরুষ বিভূতি ও প্রদীপ অভিন্নহৃদয় দুই বন্ধু। বিলেতে অবাধ মেলামেশার সুযোগে প্রদীপ বিভূতির রূপবতী বাকদত্তা শ্রীলা-র মোহিনীশক্তিতে আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি, কিন্তু তাকে নিয়ে নীড় বাঁধার প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। শ্রীলা স্বভাবে ঘিচারিণী কিনা এ-আশঙ্কা ভিত্তিহীন, কিন্তু দুটি পুরুষের জীবনে অনেক আবর্ত অনেক তরঙ্গ সৃষ্টি করেও তার যৌবনোচ্ছল প্রাণশক্তি এতটুকু স্তিমিত হবার নয়। আর এই রসোজ্জ্বল রোমান্টিক কাহিনী সুর-সুধাকর দিলীপকুমারের মধুর লেখনী থেকেই সম্ভব।

মাম-৩.০০

হিমানীশ গোস্বামীর

বিলিতি বিচিত্রা

বিলেতে দেশটা বিচিত্র। কিন্তু সে-বৈচিত্র্যের ব্যাপকতা ও সৌন্দর্য কি যথার্থ পরিচয়ে ধরা পড়ে সব ভ্রমণার্থীর চোখে? 'বিলিতি বিচিত্রা'র লেখক দীর্ঘদিনের তীক্ষ্ণ ও তন্ময় দৃষ্টিতে দেখেছেন বিলেতে দেশটাকে আর সেখানকার প্রকৃতি ও পরিবেশ, সমাজ ও মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে যে-সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার নিপুণ ও অন্তরঙ্গ আলোচনা রচিত হয়েছে এই বইটিতে।

দাম-৪.০০

বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের

আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও গন্ধতি

আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ লেখকের সূচিস্থিত ও মূল্যবান আলোচনা। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং বিশেষ করে শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের পক্ষে অপরিহার্য বই।

দাম-৯.০০

তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নিশিপদ্ম (২য় মূদ্রণ) ৪.০০	অযাত্রায় জয়যাত্রা ৪.০০
জরাসন্ধের নতুন উপন্যাস	শরাদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আশ্রয় (২য় মূদ্রণ) ৩.৫০	হসন্তী ৪.৫০
পাড়ি (৫ম মূদ্রণ) ৩.৫০	বিকর্ণ-রচিত সুবৃহৎ উপন্যাস
সত্যনাথ ভাদুড়ীর নতুন বই	নৈমিষারণ্য ৯.৫০
জলভ্রমি ৩.০০	শংকর-এর জনপ্রিয়তম বই
প্রেমেন্দ্র মিত্রের	এক দুই তিন (৫ম মূঃ) ৪.০০
কুয়াশা ৩.০০	বনফুল-এর নতুন বই
বিমল মিত্রের	দূরবীন ৪.০০
স্বদী (২য় মূদ্রণ) ৪.০০	সৈয়দ মুজতবা আলীর
সুবোধ ঘোষের	শ্রেষ্ঠ গল্প ৪.০০
চিন্তাকোর (২য় মূঃ) ৩.০০	ধনঞ্জয় বৈরাগীর উপন্যাস
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের	বিদেহী (২য় মূদ্রণ) ২.৫০
অগ্নিমিতা (উপন্যাস) ৫.০০	প্রাণতোষ ঘটকের উপন্যাস
সমরেশ বসু	রোজালিন্ডের প্রেম ৩.০০
জোয়ার ভাটা ৩.০০	সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের	আরও আলো (উপন্যাস) ৫.০০
আজ রাজা কাল ফকির ৩.০০	নীলকণ্ঠের নতুন বই
	ফ্যাপা খুঁজে ফেরে ৩.০০

বাক-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

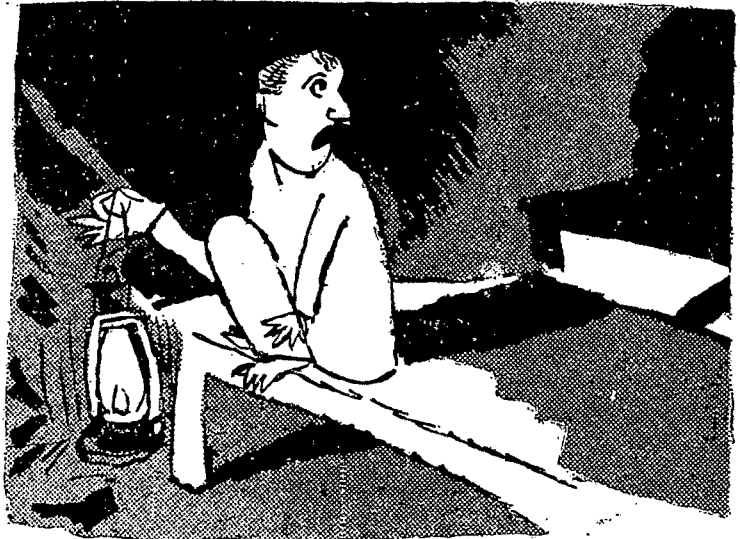
নিজেরাই পাছে তাঁরা পিছলে চলে যান
পাগলের দলে, সেই আতঙ্ক।

বাস্তবিক, আমরা যারা 'ভারতীয়
উন্মাদ আইন ১৯১২'র চাহিদা মতো
পাগল হিসেবে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের
সার্টিফিকেট পাইনি এবং পাইনি বলে
কোনো মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে
রোগী হিসেবে ঢুকতে পারব না, তারাও
যে খুব একটা সুস্থ মনে বাস করছি
এমন কথা তামা-তুলসী হাতে নিয়ে
বলা যায় না। তাছাড়া অল্পস্বল্প
পাগলামি না থাকলে সমাজেও তো
তৈমন পাত্তা পাওয়া যায় না। ভাবুক-
প্রকৃতির শিল্পী-সাহিত্যিক কিংবা
'কাজের মানুস' ব্যবসায়ী কি চাকুরে
যাই হন আপনি, আপনার নিজের
পেশার চুড়োয় যদি উঠে থাকেন তো
দেখবেন বেশ খানিকটা 'পাগলামি'ও
আপনার মজাগত হয়ে গেছে। অবশ্য
কোনো কোনো মনোবীর জীবনে আপাত-
দৃষ্টিতে কোনো অস্বাভাবিকতা খুঁজে
পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে বুদ্ধিতে হবে,
পাগলামিকে ঠেকিয়ে রাখাই তাঁদের
পাগলামি। কিংবা বলা যায়, তাঁরা হলেন
অস্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক। ঠিক যেমন
হ'য়েছিল বার্গার্ড শ'র দৃষ্টিশক্তির
বেলায়। তাঁর চক্ষু-চিকিৎসক বন্ধু ডাঃ
ওয়াইল্ড শ'য়ের চোখ দেখে বলেন তাঁর
দৃষ্টিশক্তি নর্ম্যাল। তখন শ' জানতে
চান, চোখে দেখতে পাওয়ার বেলায়
নর্ম্যাল কথাটার মানে কি? ডাঃ ওয়াইল্ড
এতে স্বীকার করতে বাধ্য হন, বেশির
ভাগ মানুসেরই দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক
নয়, কিন্তু শ'য়ের চোখ সত্যিই
স্বাভাবিক—কাজেই বেশির ভাগ মানুসের
জুলনায় তাঁর চোখের দৃষ্টিকে বলা যায়,
অ্যাবনর্ম্যাল নর্ম্যাল।

কিন্তু বেশির ভাগ মানুসের

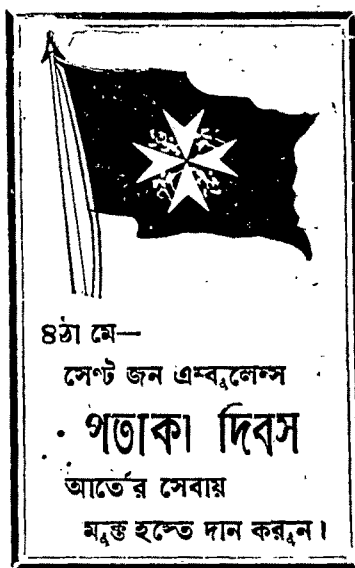
অবস্থাই এর বিপরীত। অর্থাৎ নর্ম্যালি
অ্যাবনর্ম্যাল!

এবং এই 'স্বভাবতই অস্বাভাবিক'
মানুসের দলেই আমরাও। অবশ্য এসব
অস্বাভাবিকতাকে আমরা ঠিক পাগলামি
বলে সনাক্ত করিনে, বাতক বলে একটা
ডকনাম বার করেছি, সেই নামে ডাকি।
এমন আটপোরে পোষা বাতক আমাদের
অজ্ঞান। খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ,
চলা-ফেরা থেকে শূরু করে মানব
জীবনের গোপনতম অন্তর্ভূতি পর্যন্ত
অনেকের বাতকের শিকড় ছড়ানো।
প্রত্যেকটি খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন খোঁজা
কিংবা ভর গ্রীষ্মেও আকাশের কোণে
মেঘ দেখা দিলে গায়ে সোয়েটার চাপানো,
অথবা যে-কোন মিটিংয়ের ডাক এলেই
খবরের কাগজে নাম উঠবে মনে করে
বাঁচি-মারি করে সেখানে গিয়ে বস্তুত
দেওয়া, এগুলো বাতকের পর্যায়েই
পড়ে।



খুব বেশি কিছু থাকে এমন নয়। কিন্তু
চোরের ভয় তাঁর এমনই মজাগত যে
রাতে ঠিক ঘরের মাঝ-বরাবর খাট টেনে
এনে শোন তিনি; এবং হঠাৎ যদি উঠতে
হয় তো পাশে রাখা হারিকেন লম্বনটি
আগে খাটের এপাশে দুলিয়ে খাটের
তলায় লুকাইয়ত কোনো ব্যস্তির ছায়া
খাটের ওপাশের দেয়ালে পড়ে কিনা
দেখে নিয়ে তারপর তিনি মাটিতে পা
নামান।

আরেকজনকে জানি, রাতে শোবার
আগে দরজাটা ভালো করে বন্ধ হয়েছে
কিনা সেটা টেনেটেনে দেখা ছিল তাঁর
পাগলামো। এভাবেই এক আত্মীয়ের
বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তাঁদের অনভ্যন্ত
দরজায় একটা বেশি জোরে টান দিয়ে
ইনি কাঠের খিলের ইস্ক্রুপ উপড়ে
ফেলোছিলেন। শোনা যায়, তারপর তাঁকে
সমস্ত রাতই দরজায় পিঠ লাগিয়ে বসে
থাকতে হয়েছিল।



এছাড়া ভূতের ভয় তো লোকে
হাসিমুখেই ব্যস্ত করেন। যারা শোনে
তাঁরাও হাসিমুখে শোনে—যেন এ
ব্যাপারে কারোই কিছু করার নেই।

আর চোরের ভয়, তা যার নেই তিনি
জীবমুস্ত মহাপুরুষ। বাস্তব-প্যাটার
কা কথা, ঘরের দেয়ালও তাঁর কাছে
বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা
বেশির ভাগ মানুসই ঘরের ভিতরে
থাকতে ভালোবাসি, এবং বাস্তব-তোরগও
আমাদের বিলক্ষণ আছে। আর সেগুণের
লোভে পাছে চোর এসে ঘরে ঢেকে এ
ভয়ও আমাদের যৎপরনাস্তি।

কিন্তু কারো কারো আবার এই
চোরের ভয়টা প্রায় বাতকের পর্যায়ে
চলে যায়। যেমন ধরুন আমাদের ব-বাবুর
ব্যাপার।— কার্যব্যপদেশে তাঁকে প্রায়ই
গায়ে গায়ে ঘুরতে হয়, আশ্রয় তখন
ডাক-বাংলো। সংগে জিনিসপত্রও যে

যাই হোক, দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ
নেই। মানসিক হাসপাতালের দরজা যখন
নিঃশর্তভাবে খোলা ছিল, আমরা তখন
আমাদের আত্মীয়-বন্ধদের অল্পস্বল্প
পাগলামির মজাটা মুখ বুজে উপভোগ
করলেও বেকায়দা দেখলে তাদের নিয়ে
গিয়ে বিশেষজ্ঞের হেপাজতে রাখাই
নিরাপদ মনে করতাম। কিন্তু এখন
ম্যাজিস্ট্রেটের সার্টিফিকেট ছাড়া পাগল
বলে কাউকে ভর্তি করা বেআইনী কাজ
হওয়ার ফলে হাসপাতালে রোগী
কমলেও গোটা সংসারটাই হয়ে উঠবে
বোধ হয় বিরাট একটি 'পাগলা-গারদ'।
হায়, শিক্ষা-প্রসারের নামে সরকারী
শিক্ষা-সংকোচনের নীতির মতো এই
পাগলাস্বক নীতিও যে অচিরে কী
মারাত্মক বুমেরাঙের মতো ফিরে আসবে
আমাদের উপর, তা ভেবে শিহরিত
হচ্ছি।

রবীন্দ্র চিত্র সোমেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

। এক ।

‘আমার মধ্যে সৃষ্টিমুখী যতগুলো উদ্যম আছে, তার প্রত্যেকটাকেই স্বীকার করতে আমি বাধ্য।’

প্রবীণ, প্রতিষ্ঠিত কবি জীবনের শেষ অধ্যায়ে হঠাৎ ছবির রাজ্যে প্রবেশ করতে এলেন কেন, এই কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর কবির উপরিউদ্ধৃত উক্তিটির মধ্যে নিঃশেষে পাওয়া যাবে।

ছবিকে কবি বলেছেন তাঁর ‘শেষ জীবনের প্রিয়া’, যে তাকে ‘নেশার মতো পেয়ে রসেছে’। কাব্য বা সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি তিনি জীবন-দেবতার নির্দেশকেই মূখ্য ভূমিকা দিয়ে আপন ইচ্ছার গোণতার উল্লেখ করেছেন। প্রতিমা দেবীকে লেখা একটি পত্রে পাই—

‘ছবি কোনোদিন আঁকি নি। আঁকব বলে, স্বপ্নেও বিশ্বাস করি নি..... জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল, তখন অভূতপূর্ব উপায়ে আমার জীবন-দেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুড়িয়ে দিলেন।’

কিন্তু এই পরিশিষ্টটি যে একেবারেই ভূমিকাবিহীন, এমন নয়। শৈশবের কোনো পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন চিত্রবিদ্যার বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ প্রকাশ করেছেন কিনা তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে জীবন-স্মৃতির ‘নানা বিদ্যার আয়োজনে’ এ বিদ্যাটির উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থেই বোঁরনের চিত্রচর্চার একটি সুন্দর বর্ণনা পাই।—

‘মনে পড়ে দূরপুরবেলা জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি।’

কিন্তু কবির ভাষাতেই ‘সে চিত্রকরের কঠোর সাধনা নয়’। সে কেবল ছবি আঁকার ‘ইচ্ছাটাকে’ নিয়ে ‘আপন মনে খেলা করা’।

তারপর দীর্ঘদিনের ব্যবধানে প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভেই চিত্রলক্ষ্মী তাঁর ঘন

টেনেছেন। কিন্তু সে শেষবয়সের ব্যাপক চিত্রসৃষ্টির বহু আগে। সকলেই জানেন, লেখার কাটাকুটি দিয়ে পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠাগুলি বিচিত্ররূপে ভরিয়ে তোলা কবির খেলালে এবং ক্রমশ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আর এই প্রবণতা তাঁর পরবর্তী চিত্র-সাধনার প্রেরণা ও পাথর হয়েছিল। ‘পূরবী’ রচনাকাল থেকে অর্থাৎ ১৯২৪ থেকে এ অভ্যাসের শুরুর। কিন্তু এই সময়ের বহু পূর্বে পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠায় নয়, একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবি আঁকার চেষ্টা কবি করেন শান্তিনিকেতন-পর্বেরও আগে, শিলাইদহে বাসকালে। বহু জগদীশচন্দ্র বসুকে একটি পত্রে লিখেছেন—

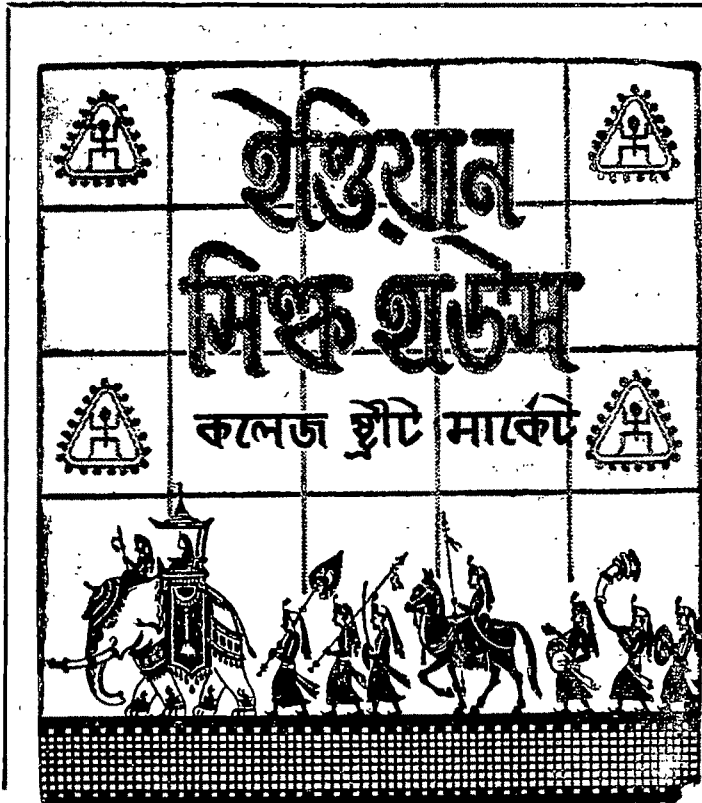
‘শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা স্কেচ-বুক নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকছি।.....

কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে, তেমনি যে বিদ্যাটা ভালো আসে না, সেইটার উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করলাম, এবারে ষোল আনা কুঁড়িমেতে মন দেবো, তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে।’ (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০; চিঠিপত্র ৬, পৃঃ ৫)

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চল্লিশের এপার। এর পরের অধ্যায় শান্তিনিকেতনে।

আশ্রমে প্রথম যে ছবি আঁকার চেষ্টা কবি করেন, সে ছবি মানুষের মূখের অনুরূপ; কিন্তু মূখ নয়, মূখোশ। পেন্সিল-ড্রইং, কলাভবনে অথবা রবীন্দ্র-সদনে তা হয়তো রক্ষিত আছে। এরকম মূখোশ আঁকেন তিনখানা। শান্তিনিকেতনের কলাভবন তখন অজাত।

এরপর সম্ভবত ১৯১৯ সালে ‘আনন্দ-মেলার’ জন্যে একটি ছবি আঁকা হয়। ছবিটি কাঁটা গাছ বা ক্যাকটাসের সৈখানি কলাভবনে থাকতে পারে। ১৯২০ কিংবা ২১ সালে শান্তিনিকেতনে কোনো পত্রিকার প্রচ্ছদের এক কৌতুক-কর চিত্র প্রতিযোগিতায় কবি স্বয়ং ছিলেন অন্যতম প্রতিযোগী। অন্যেরা ছিলেন মাণ্টারমশাই (নন্দলাল বসু), শ্রীসুধেরন কর এবং সি এফ এণ্ড্রুজ।



বিষয় ছিল মুখ্যতঃ দিগে আলপনার ডিজাইন।

এই হ'ল রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক চিত্র-সৃষ্টির প্রাক-ইতিহাস। কালের দিক থেকে এগুলি বিচ্ছিন্ন চেষ্টা। কবির অন্তরের কথা জানি না, কিন্তু বাইরে পরবর্তী শিল্প-সাধনার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতার যোগ নেই। এর পরের সব চেষ্টাই পূর্ববর্তী-পরবর্তী।

শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান অঙ্গরূপে 'কলাভবন' ক্রমে গড়ে উঠল আচার্য নন্দলালের অধ্যক্ষতায়। সেখানে বহু শিল্পীর শিল্প-সাধনা চলাছিল দিনের পর দিন। রবীন্দ্রনাথও তারই পাশে, অথচ স্বতন্ত্রভাবে আপন একক শিল্প-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর রং ও রেখাভাষিগণ ইতিহাসবিহীন, নিজস্ব। কিন্তু একবার তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল, তিনি ড্রইং শেখেন, বস্তুর রীতিমতো এনার্টিম শিখে হাতটাকে পাকিয়ে তোলেন। নন্দলালকে তিনি সে ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু শিল্পাচার্য সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলেন, 'দরকার নেই'। এতে কবি নিরস্ত হন। বস্তুর শিল্পাচার্য ভিন্নমত প্রকাশ করলেও কবি তাঁর ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা হয়তো করতেন না। দীর্ঘদিন ধরে ড্রইং শেখার ধৈর্য তাঁর ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। ড্রইং-শিক্ষা দূরের কথা, রঙ-বসে ছবি আঁকার ধৈর্যও তাঁর স্বল্প ছিল, একথা অনেকেই জানেন, যে কারণে, পাতলা রং যা শূন্যেতে সময় লাগে, তা তিনি অপছন্দ করতেন, ব্যবহার করতেন মোটা রং যা সহজে শুকোয়।^১ কবির প্রায় সব ছবির মধ্যেই ধৈর্যবিহীন অতিদ্রুততার ছাপ স্পষ্টতঃ।

'পূর্ববর্তী' রচনাকাল থেকে কলমের খোঁচায় পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠদেশ কলঙ্কিত করে তোলা নেশার মতো কবিকে পেয়ে বসল। চোখে দেখলে বোঝা যায়, কী বিপদুল সময় এর জন্য ব্যয়িত হয়েছে। আসলে কিন্তু সময়টা খরচ হয়েছে নিছক আঁচড় কাটতে নয়। এর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবেই সাহিত্যচিন্তার স্রোত চলেছে। কাজেই আনন্দের কবির আঁচড়ের রেখাগুলি অনেক ক্ষেত্রে নিরুদ্দেশ। শূন্য সেই হিজিবিজ রেখাজালের মধ্যে

১. "একটু মোটা রং গুলে দাও। আমার কি ভয় ধৈর্য আছে যে একবার রং দিয়ে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকব যে কতক্ষণে শুকোবে।" —মংপুতে রবীন্দ্রনাথ : মেহেরী দেবী।

অতীর্কিতে এক একটা অপ্রত্যাশিত রূপ ধরা পড়ে কবিকে মুগ্ধ করেছে। কোনো স্পষ্ট উদ্দেশ্য কলমকে ঠেলে নিয়ে যায়নি, তাকে টেনেছে 'অকস্মাতের আশা'। বারে বারেই অভিঘাতের দর্শন মিলেছে এই পথেই। তারপর অবশ্য এই রীতির পালাবদল হয়েছে। কিংবা বলা যায়, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ শিল্পচর্চায় নিজের একটা পথ পেয়ে গেছেন। তখন রেখাগুলি শূন্যের পাণ্ডুলিপির উপজাত অংশ না হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'স্বৈ মাহিমি'। অতীর্কিত রূপ-সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়েছে শ্বিরাট শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে।

। দুই।

রবীন্দ্রনাথের ছবি এ দেশের শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগহীন, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দেশীয় শিল্প-সাধনার রীতিভঙ্গের প্রথম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ নন। ঠাকুরবাড়ীতে এ চেষ্টা আগেই হয়েছে। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় রীতিকেই অর্থাৎ অজন্তা, রাজগুহা, রাজপুত, মোগল-ধারাকেই বিশুদ্ধভাবে মেনেছেন, এমন নয়। বরং বলা যায়, তাঁর রং ও রেখার প্রথম প্রয়োগ আদৌ ভারতীয় নয়। ক্রমে দেশীয় ধারার সঙ্গে যুরোপের মতো, চৈনিক, জাপানী শিল্প-কৌশলের সংমিশ্রণ ঘটেছে অতি সূক্ষ্মভাবে। এক কথায় অবনীন্দ্রনাথ কোনো ট্র্যাডিশন-বিশেষকে অনুসরণ করেননি। নানা ধারার মিশ্রণে এক অভিনব শিল্প-রীতির উদ্ভব ঘটিয়েছেন, যার মধ্যে তাঁর আপন স্রষ্টারূপের ছাপটি স্পষ্টতঃ।

সব মেনে নিয়েও অনেকে বলবেন, তবু অবনীন্দ্র-প্রতিভা মূলত ভারতীয় ধারার অনুবর্তন করেছে। বিমিশ্র ও নূতন হলেও প্রাক-আধুনিক ধারার সঙ্গে তার যোগটা দুর্বল নয়। একথা মানি।

কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ? জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর এই প্রতিভাধর স্রষ্টা এ দেশের শিল্পী ও রসিক সমাজে সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কিন্তু এ'র রচনায় বিশুদ্ধ ভারতীয় রীতির অনুবর্তন নেই। বরং স্পষ্টতঃ বিচ্যুতি আছে। গগনবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ স্বতন্ত্র। ইয়োরোপে কিউবিজম-এর আন্দোলন তখন শেষ পর্যায়ের এসে অবসিতপ্রায়। নতুন জয়যাত্রা শব্দ চাষাচ জ্যারট্টকে জার্মানে। সেই সময়ে গগনেন্দ্রনাথ ভারতে প্রথম কিউবিষ্ট আর্টের সাধনা শুরুর

করলেন। বলা বাহুল্য তাঁর শিল্পসৃষ্টি ইউরোপীয় শিল্পের অন্ধ অনুকরণ নয়। তেমন হলে রূপের রাজ্যে তার দাম সস্তা হ'ত এবং সে-শিল্প স্থায়ী সৃষ্টির আসন লাভের অযোগ্য হয়ে উঠত। পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করলেও গগনেন্দ্রনাথ তাকে নিজস্ব করেছেন এবং সেই স্বীকরণের মধ্যে দিয়েই ভারতীয় সম্পদ করে তুলেছেন। এই কারণে তাঁর শিল্প ভারতীয় ধারানুসারী শিল্প না হলেও ভারতীয় শিল্পজগতে এক নূতন সংযোজন।

রবীন্দ্রনাথও ছবি-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য না-মানার দলে। এবং এই হিসাবে তিনি গগনেন্দ্রনাথের সম-ধর্মী। কিন্তু এক জায়গায় তিনি একান্ত পৃথক। গগনেন্দ্রনাথ পুরোদস্তুর শিল্পী, অর্থাৎ শিল্পসাধনার নির্দিষ্ট ক্রমের পথে তিনি এগিয়েছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষা ও অধ্যবসায়ের পথে প্রাঙ্গসর নন। সাহিত্যের ভাষায় যেমন, চিত্রের ভাষায় কিন্তু তেমন দীর্ঘদিন-অর্জিত সাধনার সঞ্চার তাঁর ছিল না। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

"আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তবে একথা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে, তার প্রতি আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি; কিন্তু পাবার আশা নেই। সাধনা করার বয়স চলে গেছে।"

সাধনার বয়স চলে গেলেও সজ্ঞের সাধ দুর্নিবার। শিল্পরাজ্যে তাঁর পক্ষপে হঠাৎ খুশির ফল। এ ক্ষেত্রে তাই তিনি একেবারে সহজপন্থী। বাউল-ভাষায় 'আপনা-পথের পথিক'। তাঁর রেখা ও বর্ণিকাভঙ্গ স্ব-আবিষ্কৃত, ভাষান্তরে তিনি একে বলেছেন 'অশিক্ষিত পটু'।^২

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেননি, তার কারণ এ নয় যে, ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্য তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণে অসমর্থ। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের প্রতি যেমন, সম-কালীন অবনীন্দ্র-নন্দলাল প্রভৃতির শিল্প-সাধনার প্রতিও তেমন তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকদের আবিদিত নয়। রবীন্দ্র-রচনা ও বিশ্ব-ভারতীয় জীবনযাত্রায় সে অনুরাগের অজস্র পরিচয় আছে। বস্তুতঃ পরবর্তীক্ষা

২. "আমার হ'ল অশিক্ষিত পটু" — মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মেহেরী দেবী।

বা প্রস্তুতিবিহীন দুর্বীর আত্মপ্রকাশ-
বাসনার বেগ তাঁকে আদর্শ অনুসরণের
প্রয়োজনীয়তা অনুভবের বা বিবেচনার
তিলমাত্র অবকাশ না দিয়ে নিজের পথ
নিজেই খনন করার স্বীকৃত সিদ্ধান্তে উপ-
নীত করেছে এবং বিকল্পহীন সেই
খাতেই সৃষ্টিধারাকে প্রবাহিত করে
দিয়েছে।

অনেকে অনুমান করেন, পাশ্চাত্য
শিল্পাদর্শ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে
প্রভাবিত করেছে এবং ইয়োহান্সের
শিল্পপরীতির আশ্রয়েই তিনি নিজের
সৃষ্টি-ইচ্ছাকে বিকশিত করতে চেয়েছেন।
এই অনুমানের পশ্চাতে যুক্তি কি আছে,
আমাদের জানা নেই। প্রথমতঃ ইয়ো-
হান্সের চিত্রকলার প্রধান মাধ্যম তেল-রং
এবং তার বিশিষ্ট রীতি রবীন্দ্রনাথ আগা-
গোড়া পরিহার করে এসেছেন। অয়েল
কালারে তিনি কখনও ছবি আঁকেননি।
উপকরণ হিসাবে তিনি ব্যবহার
করেছেন পোলিক্যানের রং, দ্রুত শুকিয়ে
যাবার গুণ যার আছে। এই নির্বাচন
ব্যবহারিক সুবিধার্থে। যখন জল-রং
রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। কিন্তু যেমন রেখায়,
তেমনি রঙে প্রয়োগ-ভঙ্গিটা তাঁর
নিজস্ব। প্রয়োগের বাহ্যিক কৌশলটাও
তাঁর। তুলির বিপরীত প্রান্ত দিয়ে,
আঙুল দিয়ে, প্রয়োজন হলে কণ্ঠ বা
তালু দিয়ে বর্ণপ্রলেপন তাঁর স্ব-আবি-
ষ্কৃত বিচিত্র পদ্ধতি।

বস্তুত ইয়োহান্সের শিল্পকে শ্রদ্ধা
করলেও ভারতীয় শিল্পীর ইয়োহান্সের
চিত্ররীতির অনুকরণ করাটা রবীন্দ্রনাথের
চোখে কখনও ভালো ঠেকেনি। আমাদের
দেশের কলাবিদ্যালয়ের অব্যাহত ব্যবস্থা
তাঁকে দীর্ঘদিন পীড়াই দিয়েছে। এই
প্রসঙ্গে এক জায়গায় যে মন্তব্য করেছেন,
এখানে তা স্মরণ করা যেতে পারে। কবি
লিখেছেন—

‘কিন্তু শিল্পবিদ্যালয়ে আমাদেরকে
অগত্যা ইয়োহান্সের চিত্রাদির অনুকরণ
করিয়া আঁকিতে শিখিতে হয়। তাহাতে
হাত এবং মন বিলিতি ছবির ছাঁচে
প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহার আর কোনো
উপায় থাকে না। সেই অভ্যস্ত পথ হইতে
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেশী চন্দ্র দিয়া দেশী
চিত্র-বিষয়কে দেখা আমাদের পক্ষে
কঠিন।’ (প্রাচীন সাহিত্য, র, ব, ৫)

এখানে রবীন্দ্রমনের অনুকরণ-
বিরূপতা কত ভীষণ ও দৃঢ়মূল তা
সহজেই অনুভব করা যায়। বস্তুত

রবীন্দ্রনাথের ছবির দৃষ্টি এবং সৃষ্টি-
কৌশল তাঁর একান্ত নিজস্ব।

।তিন।

সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ যত ছবি
এঁকেছেন, সেগুলি গভীর অভিনিবেশ
নিয়ে দেখলে তার মধ্যে দুটি প্রণী
দেখতে পাওয়া যায়। এদের মৌলিক
ভাবগত প্রভেদটা বাইরের রূপগত
ভিন্নতার সৃষ্টি করেছে। যেন দুই
মানসিকতা থেকে উদ্ভূত সম্পূর্ণ ভিন্ন
দুই জাত। এ দুয়ের মাঝে তবু যদি
কোনো মিল থাকে, শিল্পপীমনের দুজের
অন্ধকারের মধ্যে তার রহস্যের সম্মান
করতে হয়। অর্থাৎ দুই ধারার সমান্ত-
রাল রেখাগুলো স্রষ্টামনের অসীমে
মিলতে পারে।

প্রথম দল কালের দিক থেকে প্রথম
দেখা দিয়েছে। এগুলির আকৃতি ও
প্রকৃতির বিশেষত্বকে একটি নাম দিয়ে
প্রকাশ করা যেতে পারে। এগুলি ছবি-
রাজ্যের ‘ছড়া’। বাণীশিল্পে যেমন ‘ছড়ার
ছবি’, চিত্রশিল্পে তেমনি ‘ছবির ছড়া’।
কলমের আঁচড়ে বা তুলির রেখায় বিচিত্র-
দর্শন মৃদু, অতিকার জীবজন্তু, অদ্ভুত
চেহারার পাখী, গাছ, ফুল এই গোত্রের
অন্তর্গত। ছবিগুলিতে প্রকৃতিকে অনু-

করণের চেষ্টা এমন কি ইচ্ছাও নেই।
বাহ্য সাদৃশ্য রাখার উদ্যম নেই। এগুলো
স্বাধীন সৃষ্টির আনন্দের আঁকা, যদিও
ফর্ম-এর মধ্যে মানুষ, পশু, গাছ-
পালার মৌলিক চেহারার নিগূঢ়ভাবে
পাওয়া যায়। এগুলি দর্শকচক্ষে
কৌতুকের সৃষ্টি করে। আসলে স্রষ্টা-
চিন্তে যে কৌতুকবোধ সৃষ্টিকালে কাজ
করেছে, দর্শকচক্ষে তাই সঞ্চারিত হয়ে
যায়। এই ছবির রস আলংকারিক অন্য
কোনো রস নয়, বিশুদ্ধ কৌতুকরস।
সৃষ্টিগুলি চিন্তা বা ভাবনার ফল নয়।
এমন কি কোনো গভীর ভাবের বা
ইমোশানের প্রকাশ নয়। এগুলি ভাবনা
ও ভাবের ভারমুক্ত হালকা মনের নিছক
খুঁশির খেলায় রচিত অদ্ভুত, উদ্ভটের
জগৎ। তাই এর মধ্যে অর্থের সম্মান করা
আলোক্ষেতে বেগুন খোঁজার মতো।
অর্থলোভী সমালোচকের একথা স্মরণ
রাখা ভালো। কবির কথাই তুলে দিই—

‘যখন আর কিছুর ভালো লাগে না,
তখন ছবি আঁকি। কিন্তু আমার ছবি
রেখার ছবি, রঙের ছবি; ভাবের ছবি
নয়। ভাবের ছবির জন্য কথা, সে-ছবি
অনেক এঁকেছি। সম্প্রতি কথার চেয়ে
রেখার পরে মনের টান হয়েছে বেশি।
রেখা চোখের ভিতর দিয়ে মরমে পশে,
কানের ভিতর দিয়ে নয়। কথাকে অর্থ

বসিষ্ঠনাথ

নৈবেদ্য

সুন্দর সংস্করণ। মূল্য ০.৭৫

রবীন্দ্র-শতবর্ষ-উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ
সংস্করণ। কবি-প্রতিভা ও পাণ্ডুলিপি চিত্রে অলঙ্কৃত।

ভাবভক্তি কবিত্বের যে পরম সুসম্মান গীতাজলি কাব্যে ব্যক্ত,
নৈবেদ্যে তাহারই ভূমিকা।

ইতিপূর্বে পরিপাটী মৃদুগে ও সুন্দর মূল্যে যে ভাবে
গীতাজলি প্রচারিত হইয়াছে, নৈবেদ্য কাব্যও সেই ভাবেই
প্রকাশ করা হইল।

ভগবদ্ভক্ত, কাব্যরসিক এবং ভারতভারতীয় শাস্বত
বার্তার সম্বানী, সকলেরই বিশেষ আদরণীয় হইবে
সন্দেহ নাই।

বিশ্বভারতী

দিতে হয়, রেখাকে দিতে হয় রূপ। রূপ বিনা-অর্থে ভোলায়। দৃশ্যমান হয়ে ওঠা ছাড়া ওর আর কোনো দায়িত্ব নেই। (রাণী মহলানবীশকে লিখিত পত্র)।

এই ছবিগুলির উপাদান বিশ্লেষণ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যায়। এক, প্রাকৃতিক বস্তু-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র রূপ-ময়তা, দুই, সেই রূপসৃষ্টির পিছনে কৌতূকের দৃষ্টি। কিম্বা হয়তো বলা উচিত, কৌতুকী দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক বস্তুরূপের আভ্যন্তরীণ। অর্থাৎ মানুষ বা মনুষ্যের জীবের আকৃতিগত গঠন-ভাঙ্গাময় প্রত্যাশিত রেখাভাগিকে বিপর্যস্ত করে, অপ্রত্যাশিতের ধাক্কা দর্শক-মনে কৌতূকের উচ্ছ্বাসকে উদ্ভূত করা। মানুষের মুখে নাকটাকে বা কান-দুটোকে দীর্ঘ করে, পশুর গলাকে অথবা লম্বা করে দিয়ে, পাখীর ঠোঁটটাকে বিচিত্র ভাঙ্গতে বাড়িয়ে তুলে এই রসসৃষ্টির চেষ্টা আছে। ছবিতে জীব-জন্তুর ছড়াছড়ি এই কারণে। নিছক নিসর্গচিত্রে কৌতূকের অবকাশ কম। কেননা, পূর্বেই বলেছি, প্রত্যাশাকে আঘাতের দ্বারা চমক সৃষ্টি শিল্পীর উদ্দেশ্য। গাছপালা, লাভাপাতা, নদী-পর্বতের রেখার বিকৃতিতে সে চমক সৃষ্টি অসম্ভব, কারণ সেখানে আমাদের কোনো বিশেষ প্রত্যাশাই থাকে না। কিন্তু প্রাণীজগতে আকারের রেখা-ভাঙ্গা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা প্রত্যাশা থাকে। তাই বিকার সেখানে মনকে ধাক্কা না দিয়ে পারে না।

এ কৌতুকরস ব্যাংগরস নয়, নিছক অসংগতির লব্ধ ও নির্দোষ আনন্দ। ইংরেজিতে বলা যায় 'ইউমারাস'। ভাবনার ভারে ভারাক্রান্ত নয়, ভাবের ঘন বাপে আচ্ছন্ন নয়, এ যেন সহজ মনের একটা মৃদু জগৎ। ভাব-ভাবনার ভারাক্ষণটা এখানে লুপ্ত হয়ে গিয়ে, এর পরিমণ্ডলকে এমন লব্ধ করে দিয়েছে যে, দুঃখ দায়হীন, হাল্কা জীবন যাপন করা যায়। মন অর্থহীন জগতে এসে দুলভ ছবি উপভোগ করে।

মজা এই যে, বাইরে কাজের ভাবনার দাবী যখন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, কবি তখনই এই সব ছবি এঁকেছেন সবচেয়ে বেশি। চিন্তার শাসন যখন জ্বরদস্ত, চিন্তাশাসনমুক্ত এই ছড়া রাজ্যে তখন তিনি প্রবেশ করেছেন বার বার। বস্তুতঃ প্রকৃত বিশ্বাসের কিছু নেই। ভাবনাময় এই ছবিগুলিতে কবি অত্যধিক ব্যস্ততার দিনে সাময়িকভাবে মনকে মৃদু

দিতে চেয়েছেন। এক একটি ছবি-সৃষ্টির পূর্বে কবির কাছে অতিসংহত মৃদুপূর্ব। কাজের 'ঠাস দাসের' দিনে স্বরচিত 'নিবিড় ছবি'।

যৌবনে অবশ্য মনের আনন্দে প্রথম ছবি আঁকার বে প্রয়াস, তা দেখা দিয়েছিল অশ্রুত অবকাশের মধ্যেই, 'জিজিম বিছানো কোণের ঘরে শরৎকালের দুপুরবেলায়।' সে শরৎ কবির ভাষায় 'আমার গান-পাকানো শরৎ, আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা বোঝাই করা শরৎ, আমার বন্ধন-হীন মনের মধ্যে অকারণ পূর্নকে ছবি-আঁকানো, গম্প-বানানো শরৎ' (জীবন-স্মৃতি)।

অর্থাৎ যৌবনে ছবি এসেছিল ছবির সহচর হয়ে। কিন্তু বার্ধক্যে যে-ছবি এল, ছবি হল তার সহচর। এবার ছবি ছবি নিয়ে আসেন, ছবি নিয়ে এল ছবিকে বৃকের মধ্যে বহন করে।

। চার ।

কবি ছবিরাজ্যের না হলেও সাহিত্যরাজ্যের ছড়াগুলিকে মৃদু জগৎ বলে অভিহিত করেছেন।—

'লব্ধকায়, বন্ধনহীন মেঘ ছড়াগুলি তারবিহীন, অর্থবন্ধন্য।' (লোক-সাহিত্য, ছেলেভুলানো ছড়া, র র ৬)।

ছড়াগুলিকে তুলনা করেছেন ভার-মুক্ত শরৎ মেঘের সঙ্গে।—

'কতগুলি অসংলগ্ন ছবি সামান্য প্রসঙ্গসূত্র অবলম্বন করিয়া উপস্থিত। কোনো বাহ্যবিচার নাই, বালকের কল্পনা ঐতিহাসিক ঐক্যরচনার জন্য উৎসুক নই, তাহার নিকট সমস্তই বর্তমান এবং বর্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে, সেই ছবিকে ভাবের অশ্রুবাণে ঝাপসা করিতে চাহে না।' (লোকসাহিত্য, ছেলেভুলানো ছড়ার ৬)

রবীন্দ্র-চিত্র রচনার সঙ্গে বাংলা-দেশের এই ছড়া-রাজ্যের বে শৃঙ্খল সাদৃশ্যই আছে, তা নয়। এর দানও আছে। কবি ছবি সৃষ্টিকালে এই ছড়া-জগৎকে স্মরণে রেখেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু সৃষ্টি-নিরত মনের অবচেতনায় এগুলি যে অবশ্যই কাজ করেছে, একথা জোর করেই বলতে পারি। এই জন্য যে, একদা তিনি ভাষা-রাজ্যের এই আশ্চর্য জগৎটাকে চিত্রের রূপরাজ্যে রূপান্তর-দানের ইচ্ছা অনুভব করেছিলেন, সে কথা নিজেই বলেছেন। সে

উজ্জ্বল রবীন্দ্র-চিত্রের রসোপভোগ এবং রসবিচার-কালে বিশেষভাবে স্মরণ ও প্রাণধানযোগ্য। কবি বলেছেন—

'এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘ-রাজ্যের লীলা। সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার নির্ণয় নাই। ছড়ার অশ্রু-রচিত চিত্রগুলির অনেক স্থানে রেখার এমন সুস্পষ্টতা আছে যে, তাহারা আমাদের সংশয়ী চক্ষুও অতিসংক্ষেপ বর্ণনার দ্বারা রচিত চিত্র আনিয়া উপস্থিত করে। ছবি যদি কিছু অদ্ভুত গোছের হয়, তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, বরঞ্চ ভালোই। কারণ নতুনসে চিত্রে আরও অধিক আঘাত করে।...ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছুই নাই। এক মৃদুওয়াল মানুষের মতো দুই মৃদুওয়াল, এমন কি স্কন্ধকাটাও সম্ভব।

যেমন মিশ্র হৃদয় শুনিলে তাহাকে গানে বাঁধিয়া গাহিতে ইচ্ছা করে, তেমনি এই সকল ভাষার চিত্র দেখিলেই ইহা-দিগকে রেখার চিত্রে অনুবাদ করিয়া আঁকিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে।'

শব্দ ইচ্ছা প্রকাশ করেই কবি ক্ষান্ত হননি। তার ঠিক পরেই আরও একটু মন্তব্য আছে। এবং সেটুকু আমাদের মতে বিশেষ মূল্যবান।—

'কিন্তু হায়, এ সকল চিত্রের রস নষ্ট না করিয়া, ইহাদের বালাসরলতা, উজ্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভাব্যতা রক্ষা করিয়া আঁকিতে পারে, এমন চিত্রকর আমাদের দেশে কোথায়? এবং বোধ করি 'সর্বত্র দুলভ। এই সমস্ত চিত্র সূনিপুণ, সহৃদয় চিত্রকরের প্রত্যাশায় বহুকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।' (ছেলে-ভুলানো ছড়া—লোকসাহিত্য; প্রথম প্রকাশ ১৩০১ বা ১৮৯৪)।

প্রতীক্ষা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে কিনা কে জানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। সূনিপুণ না হলেও তিনি সহৃদয় চিত্রকর। ছড়া-রাজ্যের অন্তরমহলে তাঁর মতো সংবেদন-শীল মন নিয়ে এমন করে পৌঁছতে পেরেছে কে? আর এখানে নৈপুণ্য তো প্রচলিত রূপদক্ষতা নয়। ছড়ার রূপের যে-কটি মৌলিক গুণের তালিকা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন,—'বালাসরলতা, উজ্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভাব্যতা', যদি তার প্রত্যেকটির নিঃসংশয় উপস্থিতি রবীন্দ্রচিত্রে দেখা যায়, তবে একথা বললে বাড়াবাড়ি হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ 'ছড়ার ছবিকে' 'ছবি

ছড়ায়' অনুবাদের কাজে সম্পূর্ণ অধিকারী। আর সেইজন্যও শিল্পজগতে তাঁর তুলি অজন্তা, বাগ, রাজপুত, যোগল, অবনীন্দ্র, নন্দলালের পথে চলেনি, সে 'আপনা পথের পথিক'। বাংলার শিল্পজগৎ তাকে পথ দেখায়নি, বাংলার গ্রাম্য সাহিত্য তাকে পথের ইংগিত দিয়েছে।

এবার এই ছড়াগুলির সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রের ভাব ও রূপগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য-গুলি লক্ষ্য করে আমাদের বস্তুর সীমা টানব। ছড়ার জগৎকে এক হিসাবে বলা যায়, 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'। কথার ক্ষেত্রে বাঁধলেও তার অনেকখানি কথার বাইরে। কতকগুলি প্রত্যক্ষ ছবি থাকলেও অনেকটা ব্যাপসা। আসলে যা অমৃত, তাকে মূর্তি দানের চেষ্টায় খানিকটা বাষ্পীয়। কঠিন জমাট বেঁধে কিছু অংশ স্পষ্ট দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও বাকিটা নীহারিকার জগৎ। রবীন্দ্রচিত্রেও তাই। রেখাভিগ্ন কোথাও প্রত্যক্ষ বস্তুর আকৃতির আভাস দিয়ে আবার অনির্দিষ্টতার মধ্যে বিলীন।

ছড়ার একটা প্রধান বিশেষত্ব তার রূপের চলমানতা, বিবর্তনময়তা। সে স্থির নয়, মেঘের মতো অস্থির, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। ছড়ার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'সহজ অবস্থায় আমাদের মানস আকাশে স্বপ্নের মতো যে সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন অলক্ষ্য বায়ু-প্রভাবে দৈব-চালিত হইয়া কখনও সংলগ্ন, কখনও বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র বর্ণ ও আকার পরিবর্তনপূর্বক ক্রমাগত মেঘ রচনা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা যদি কোনো অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিচ্ছবি চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত, তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়া মাত্র, তরল, স্বচ্ছ সরোবরের উপর নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো।...কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া সেখানে থোকাকে অনায়াসে পক্ষী জাতের সামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোনো প্রাণীবিজ্ঞান-বিদ তাহাতে আপত্তি করিতে আসেন না।'

রবীন্দ্রচিত্রেও তাই। আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চল রেখায় স্থির মনে হলেও এ ছবির মধ্যে রূপের পরিবর্তনশীলতা দৃশ্যমান নয়। ছড়াকারের মতো চিত্রী রবীন্দ্রনাথও পাখীকে মানুষের মূখে,

গাছকে জন্তুর আকারে পরিণত করেছেন অনায়াসে। এ ছবিগুলি স্থির নয়। আন্দোলিত সরল ও বক্ররেখার বাঁকে বাঁকে ছন্দের স্বভাষাচাঞ্চল্য তো আছেই, আর আছে রূপান্তর লাভের চাঞ্চল্য, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, এক আকার থেকে অন্য আকারে।

রবীন্দ্রনাথের মতে ছড়ার মূখ্য বা একমাত্র রস হ'ল কৌতুকরস। লিখেছেন—

'শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।'

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রনাথের ছড়াগুলিতেও ঐ রসই মূখ্য। যে রসের আকর্ষণ তাকে ছড়া-সংগ্রহে প্রবৃত্ত করেছে, সেই রসের প্রেরণায় তাঁর তুলিতে বিচিত্র রূপের জন্ম।

বাংলা লোকসাহিত্যের এই শাখাটির সঙ্গে রবীন্দ্রচিত্রের যোগটা যে নিছক আনুমানিক নয়, তার আর একটি প্রমাণ কবি শেষবয়সে এই ছবি-রচনাকালেই ছড়ার অনুসরণে ভাষা-সাহিত্যেও অজস্র ছড়া-রচনায় হাত দেন। 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'ছড়া' প্রভৃতি গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত। এগুলি ছবির মতোই ভাষারাজের অর্থহীন সৃষ্টি। একটু নমন্বা তুলে দিই—

ঝিনেদার জ্ঞানদার ছেলেটার জন্যে।
ত্রিচিনাপল্লী গিয়ে খুঁজে পেল কন্যে॥
কিংবা

দাড়ীশ্বরকে মানত ক'রে
গোঁপগাঁ গেল হাবল।
স্বপ্নে শেয়ালকাটা পাখি
গালে মারল খাবল॥
অথবা

নাম তার ভেলুরাম ধুনিচাঁদ শিরখ।
ফাটা এক তন্দুরা কিনেছে সে নিরর্থ॥

কলম আর তুলির ভাষার বাইরের তফাৎটাকে বাদ দিলে আসলে এরা জাতে এক। এই ঐক্য নিঃসংশয়রূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে সেখানে, যেখানে ছড়া-গুলিকে কবি সচিব রূপ দিয়েছেন। ঐ ধুনিচাঁদ শিরখকে খাপছাড়ার পাতায় মূর্ত হতে দেখি কলমের আঁচড়ে। ছড়া আর ছবির যমজ রূপটা আমাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। আর সমর্থন করেন স্রষ্টা স্বয়ং। লিখেছেন—

'যেমন তেমন বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে, কিছু তুলি দিয়ে আঁকা
দিলেম উজাড় ক'রে ঝুলি।'

(উৎসগপত্র : 'সে')

ভাষায় ও তুলিতে এই যেমন তেমন ছবি অর্থহীন, কিন্তু রূপবান। তাই দৃষ্টিমান এর প্রেমে না পড়ে পারে না।

অর্থগন্ধলুপ্ত অরসিকের কটাক্ষ ও কটাক্ষির বিরুদ্ধে তার যে একটিমাত্র বক্তব্য, তার ভাবখানা হ'ল—
শিমল রাঙা রঙে চোখে দিল ভরে
নাকটা হেসে বলে হায় রে যাই মরে।
নাকের মতে গুণ কেবলি আছে ঘ্রাণে
রূপ যে রঙ খোঁজে নাকটা তা কি জানে।

(খাপছাড়া)

তবুও নিরস্ত না হয়ে অরসিক যদি প্রশ্ন করে,—রবীন্দ্রনাথের মতো ধর্ম-কবি জীবন ও শিল্পসাধনার অন্তিম-পর্বে অর্থগৌরবযুক্ত মহত্তম সৃষ্টির মাঝখানে হঠাৎ এই অর্থহীন অনা-সৃষ্টির জন্ম দিলেন, এ বড় আশ্চর্য নয় কি? তবে এ প্রশ্নের আগাম উত্তর কবির মূখেই শুনতে পাব। তিনি বলবেন—

যদি দেখ খোলশটা খসিয়াছে বৃন্দের
যদি দেখ চপলতা, প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলিমিতে সিন্ধের
যদি ধরা পড়ে সে যে নয় ঐকান্তিক

ঘোর বেদান্তিক,

দেখ গম্ভীরতায় নয় অতলান্তিক
যদি দেখ কথা তার কোনো মানে মোদ্দার
হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্ভ্রান্তিক,
মনখানা পেঁপেয় খ্যাপামির প্রান্তিক,
তবে তার শিক্ষার দাও যদি ধিক্কার
সুধাবিধির মূখ চারিটা কী কারণে।

একটাতে দর্শন করে বাণী বর্ণ
একটা ধর্মানিত হয় বেদ উচ্চারণে
একটাতে কবিতা রসে হয় দ্রবিতা,
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে।
নিশ্চিত জেনো তবে

একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে ওঠে উচ্ছ্বাসিয়া।
তাই তারি ধাক্কায় বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।
চতুর্মূখের চেলা কবিটিরে বলিলে
তোমরা যতই হাস, রবে সেটা দিলিলে।

দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা
অনাসৃষ্টিতে তবু বোঁকটাও অল্প না॥

(খাপছাড়া)

পাগলামির এই অনাসৃষ্টিগুলি হ'ল রবীন্দ্রচিত্রের একটি রূপ। আর একটি রূপ আছে, যা ভাবে ও অভিব্যক্তিতে ভিন্ন জগতের বস্তু। তার ধাতুটা সম্পূর্ণ পৃথক। মনে হবে তুলিটাই যে আলাদা, তা নয়, মানুষটিও যেন এক নয়।

ইতিমধ্যে যদি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে থাকি, তবে বারান্তরে সে প্রসঙ্গে আসার ইচ্ছা রইল।

॥ উপন্যাসোপম গল্প প্রসঙ্গে ॥

সবিনয় নিবেদন,

৭ই বৈশাখের 'অমৃত' পত্রিকায় 'উপন্যাসোপম গল্প প্রসঙ্গে' রসিক পাঠকের মনের কথাটি ব্যক্ত করার জন্য শ্রীপ্রভাতকুমার দত্তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আধুনিক বাংলাদেশে মহৎ উপন্যাস সৃষ্টির উপাদানের অভাব নেই। অভাব বস্তুগত গভীরতা ও রূপগত নিষ্ঠার। মহৎ ভাব থাকলেই উপন্যাস মহৎ হয়ে ওঠে না—এই কথাটি প্রবীণ লেখকদের স্মরণ রাখা উচিত।

উপন্যাসোপম গল্প নামক নিবন্ধের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত মহাশয় শারদীয় সংখ্যা ও সিনেমা-পত্রিকাগুলিকে দায়ী করলেও পাঠকেরা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। শিল্পের ক্ষেত্রে আজকাল quality-র চেয়ে quantity-রই চাহিদা বেশী দেখা যায়। সাধারণের রুচিগঠনের দায়িত্ব শিল্পীরই। কিন্তু কখনও কখনও সাধারণের রুচিবিকৃতি শিল্পীকে বিভ্রান্ত করে। এইজন্যই প্রয়োজন পাঠক-গোষ্ঠীর (Readers' Society) যাদের কাজ হবে পাঠকদের সং-সাহিত্যের রসাস্বাদন করানো তথা মহৎ সৃষ্টিতে শিল্পীকে উৎসাহিত করা। ইতি—

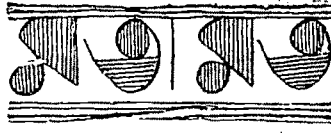
বাণী দত্ত,
আসানসোল

॥ ইংরাজের মত ইংরাজী ॥

'অভয়স্কর' লিখিত 'বাঙালী ভদ্রলোক ও ইংরাজের মত ইংরাজী' আলোচনাটি পড়লাম। আলোচনাটি পড়ে আমার মনে যে দুটি চিন্তার উদয় হয়েছে, তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম।

প্রথম, শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত খুসাবলত সিং-এর মন্তব্যটি খুব নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। বিশেষ করে তাঁর মন্তব্যের শেষাংশটি, যথা—

As a matter of fact there are few English writers who have the same mastery over their mother-tongue shown by the "Bengali Bhadralog" in the two books he has written"—যেন অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। বেশ কয় শতাব্দীর ঐতিহ্য-পুষ্ট ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে একাসনে বসাবার অভিপ্রায় ইংরেজী সাহিত্যিক-সমাজ মেনে নেবেন বলে মনে হয় না। দল্লভাজের কোন ইংরেজী রচনা কল্যাণী ইংরেজের মত ইংরেজী হতে পারল, সে বিচার



কোন এক অ-ইংরেজের পক্ষে সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে। তা যদি সম্ভব হোত, তাহলে কোন ইংরেজী বা ইয়োরোপীয় রচনা ইয়োরোপে 'সর্বজনস্বীকৃতিজনক সমাদর পাওয়ার পূর্বে' এদেশে কিছুটা অন্তত পরিচিত হতে পারত। দেখা গেছে, যখন কোন ইয়োরোপীয় সাহিত্য নোবেল পুরস্কার বা এরূপ কোন স্বীকৃতি লাভ করেছে, তখন ঐ সাহিত্য এদেশে পরিচিত হতে পেরেছে। তার পূর্বে আমরা ঐ সাহিত্য সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবরই রাখিনি। হয়ত ঐ সাহিত্য আমরা পড়েছি, কিন্তু তা যে অত উচ্চাঙ্গের হতে পারে, পাশ্চাত্য বিদগ্ধ সমাজ সে সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করার পূর্বে স্বাধীনভাবে আমরা আমাদের অভিমত প্রকাশ করতে পারিনি। উদাহরণস্বরূপ প্যান্টারনাকের কথা বলা যেতে পারে। নোবেল পুরস্কার না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই ছিলেন।

দ্বিতীয়, ইংরেজের মত ইংরেজী লিখবার পক্ষে শ্রীযুক্ত চৌধুরী যে ব্যবস্থা-পত্র দিয়েছেন, যথা 'roast beef ও Yorkshire pudding ভক্ষণ' সব সময় তা যে ঈপ্সিত ফললাভে সহায়তা করে না এবং চৌধুরীমশায়ের অপর উক্তি, বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় রেখেও ইংরেজের মত ইংরেজী লেখা সম্ভব, এটিও যে সর্বজনগ্রাহ্য নয়, তা জনৈক হিন্দু বাঙালীর ইংরেজী রচনা সম্বন্ধে প্রখ্যাত ইংরেজ সমালোচক জন মিডলটন মারীর উক্তি থেকে বুঝা যায়। উক্তিটি একটু দীর্ঘ। আশা করি পাঠক ধৈর্য হারাবেন না। শ্রীযুক্ত মারী বলেছেন—

"I lately read a volume of English poems by a Hindu, who was sent to this country at the age of seven, and educated at St. Paul's and Christ Church. Not till he was twenty-five did he return to his own country, and then it was to serve as a Professor of English literature in an Indian university. At such a task he died."

The poems perplexed me. Their author's command of the English language was notable, his emotional sincerity obvious: yet never for one moment could I be lulled into the—belief that they were good poems. Something was lacking. What was it? Though I thought over the question for long I could find no pat and positive answer, but I came to certain conclusions about the poems.

What troubled me, I concluded, was a constant hiatus that I felt

between the language and the thought, between the expression and the experience. The poet was using English words to convey what English words never could convey. It was not that other English words than those he used would have done the work better: on the contrary, his diction was surprisingly felicitous. The truth was that no English words could possibly convey what he wanted them to convey, and no doubt supposed that they did convey.

It might be asked: How did I know what he wanted to convey, seeing that I had only his words to inform me? A fair logical objection, but fortunately (for otherwise literature would be unnecessary) logic is not sovereign in literature. It is true, that if I took an isolated verse, or an isolated sequence of verses, I could not pronounce positively that he meant something other than he said: I could merely register an indefinable dissatisfaction. But the cumulative effect of many pages was not to be mistaken. A thousand approximate expressions of a thought will make a thought distinct even though no individual expression be exact. So with the Indian poet: though no once of his poems really expressed his thought or his feeling, and therefore no one of them was a true poem yet all together conveyed to me a fairly distinct impression of his habit of thought and feeling. And I am confident that such a habit of thought and feeling can not be expressed in the English language'. (J. M. Murry: Things to Come).

সাত বছর বয়সে বিলেতে গিয়ে দীর্ঘ আঠার বৎসর সেখানে থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ 'roast beef এবং Yorkshire pudding' গলাধঃকরণ করেও একটা 'good poem' লেখা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে এদেশে বাস করে এদেশের জীর্ণ-শীর্ণ গোদেহের 'roast beef এবং Yorkshire pudding' বেশী কাজ দেবে কী? প্রচুর পরিমাণে 'roast beef এবং Yorkshire pudding'-ভক্ষণও যে বাঞ্ছিত ফললাভ করতে সাহায্য করল না, তার কারণ মারী সাহেবের মতে সাত বছর বয়সে বিলেতে গিয়ে এবং সেখানে দীর্ঘ আঠার বৎসর থেকেও ভদ্রলোকের 'habit of thought and feeling' এতটা ভারতীয় হয়ে গিয়েছে যে, তাকে আর ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হোল না। তাই যদি হয়, তাহলে চৌধুরী-মশায় যে উপদেশ দিয়েছেন, ভারতীয় লেখকরা তাঁদের বিষয়বস্তুটা যেন খাঁটি ভারতীয় রেখে ইংরেজীর চর্চা করেন, তাঁর এই উপদেশ প্রার্থিত ফললাভে সাহায্য করবে বলে কি করে আশা করি?

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর ঘোষ

হাওড়া

দ্বিপদী



(১)

কুড়িয়ে পেয়েছে বলে আমার নাম হল কুড়োরাম। সবাই ডাকে কুড়ো। আর ওই ছেলোটিকে সবাই বলে খোকাবাবু। খোকাবাবু আমার মালিক, আমি ওর বন্ধু। আমার ওজর-আপত্তি, মনের সুখ-দুঃখ আনন্দ আহলাদ সবই বুঝতে পারে খোকাদা। এ বাড়ীতে দিদিমাও একটা সুন্দর দেবেন আমাকে। বলেন, আহা, অবোলা জীব, এমন সারাক্ষণ বেঁধে রাখিসনে, বাগানে ছেড়ে দে খোকা। আহা, ওর খিদে পেয়েছে রে। কিন্তু রাগাঠাকুর এসব কথা দূর থেকেই। কাছে গেলে ছুঁল ছুঁল গেল গেল চেঁচানি। ওইরে, ঘরের মধ্যে গেল বন্ধি। ওই আমার শূন্য বস্তুরথানা দিল একাকার করে। সত্যি বলতে ওর এই ব্যবহার আমার সহ্য হয় না। কিন্তু তা বললে শুনছে কে? যার যা স্বভাব। উনিও চেঁচাবেন। আমিও ছুঁয়ে দেব।

খিদিরপুরের বাড়ীতে আমার আসবার মাস কয়েক পরেই কর্তাবাবু মারা যান। কর্তাবাবু মানে খোকাবাবুর মামা। কর্তাবাবুকে আমি মাত্র একদিনই দেখেছি। সকালবেলা ছাড়া পেয়ে ঘর ঘর করছি দোতলায়। একটা খোলা ঘর পেয়ে ঢুকে গেলুম। পূর্বদিকের জানালার কাছে ইঁজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন

কর্তাবাবু। আমার ঘরে আসা টের পাননি। এমন সময় খোকাবাবু আমার খোঁজে এসে হাজির। ভাণের সাড়া পেয়ে মুখ ফিরিয়েই দেখতে পেলেন আমাকে। আরে এটাকে কোথেকে পেলি খোকা? এষে দেখছি খাঁটি পিকনিজ, আমার বকুলশের সঙ্গে শেকল জুড়ে দিয়ে কর্তাবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল খোকাদা। আমি করবার মত কিছু না পেয়ে বার-দুই ওর পা চটে দিলুম। ভীষণ চটে গেল খোকাদা। বলল, তোর এই স্বভাবটা আর গেল না-কুড়ো।

কর্তাবাবু হেসে উঠলেন। ভারি অন্তর খরনের সেই হাসি। কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, এখন থেকে ওকে সেই কথাটাই শিখিয়ে দে খোকা, ভালবাসলেই পা চাটতে নেই। কথাটা শেষ করেও কেমন টেনে টেনে বিদ্রীভাবে হাসতেই থাকলেন। কর্তাবাবু দেখতে সুন্দর কিন্তু ওর এই হাসিটা আমার ভাল লাগেনি।

এর মাসখানেক পরেই একদিন রাতে হঠাৎ শুনতে পেলুম, কর্তাবাবু মারা গেছেন। কর্তাবাবুর বালিশে মুখ চেপে খোকাবাবু খুব কাঁদছিল। তখন অনেক রাত। বাইরের বাগানে ধবধবে জ্যোৎস্না। সবাই মিলে ধরাধরি করে কর্তাবাবুকে নীচে নামাল। চাকর রসিকলালের পায়ের ধাক্কায় একটা কাঠের তেপায়া গড়িয়ে পড়ল নীচে।

সে রাতের কথা আর কিছুই মনে নেই আমার।

(২)

এ বাড়ীটা গোল ধরনের। আগা-গোড়া শ্বেতপাথরে মোড়া। বাড়ীর চারদিক ঘিরে বাগান। বাগানের উত্তরদিকে একটানা লম্বা ব্যারাকের মত একসারি ঘর। ওটা রান্নাবাড়ী। ওর বাকী ঘর-গুলোয় ভাগাভাগি করে ঠাকুর, চাকর, ড্রাইভার, মালি, দরওয়ান সব থাকে। ওদিকটা আমার বেশ লাগে। হৈ-টৈ গোলমাল হাসি কথায় সরগরম। ওখানে মানুষের ছাট। আর এই মার্বেল পাথরে মোড়া গোলবাড়ীটা দিনের-বেলায়ও এমন নিশ্চুপ নিব্বন্ধম যে চলতে-ফিরতে গা হুম্‌হুম করে।

একতলায় দু-তিনটে ঘর নিরে থাকেন দিদিমা, দোতলার দক্ষিণ-দিকের সবটাই বোরানীর মহল। বোরানীকে দেখলে আমার ভয় ভয় লাগে। খুবই সুন্দর। কিন্তু যেন পাথরে গড়া একটি মূর্তি। ওর হাসি, কথা, হাঁটা, চলা সবই কেমন নিঃশব্দ, চাপা। তবু সেই কথার মধ্যে, হাসির মধ্যে কি লুপন আছে, কাছে যেতে সাহস হয় না। এবাড়ীতে সবাই বোরানীকে ভয় করে। দিদিমাও। কর্তাবাবু মারা গেলে সকলেই কাঁদছিল। বোরানীর চেঁখে কিন্তু একবিন্দু জল দেখিনি। ঝি,

চাকররা এ নিম্নে কি সব বলাবলি করছিল আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

গোলবাড়ীর তিনতলার মস্ত বড় ছাত। ছাতের লাগোয়া দুখানি ঘর নিয়ে থাকে থোকাদা। একটায় পড়াশোলা করে। অন্যটাতে শোয়। মস্ত বাথটব্‌ ভর্তি করে থোকাদাবাবু আমায় যত্ন করে নাওয়ায়। তারপর মোড়া পেতে বসে আমার খাওয়ার তদারক করে। আমার সব ব্যবস্থা আলাদা। রান্নাবাড়ী থেকে আমার খাবার তৈরী করিয়ে নিয়ে আসে রসিক।

কিন্তু দুপুরবেলা হয় মনস্কিল। থোকাদা সিঁড়ির দরজায় তালা দিয়ে কলেজে চলে যায় তখন।

এদিক থেকে কটকটাস্‌ চাবী বন্ধ করার আওয়াজ পাই আমি। তার মানে থোকাদা এখন সমস্ত দিন বন্দী হয়ে। চেঁচাও, কাঁদো, কেউ শুনবে না। আমি আর কি করব? পড়ে পড়ে ঘুমোই। ঘুম ভাঙলে দেখতে পাই চক্‌চকে নীল আকাশে সাদা মেঘের বল নিয়ে কারা ঘেন খেলা করে। ওই বলগুলো যখন গাড়িয়ে গাড়িয়ে আকাশের একটেরে চলে যায় আর তাদের মাথায় সোনারং লাগে তখন বুঝতে পারি থোকাদার আসবার সময় হল। ঘরে ঢুকেই ও আমার শেকল খুলে দেবে আর আমি ছুটব নীচে। তিনতলা থেকে দোতলা, তারপর একতলায়। ছুটে ছুটে পৌঁছব রান্নাবাড়ীতে। রসিক আমায় কলাই করা বাটিতে চা দেবে, মেঝেয় ছড়িয়ে দেবে বিস্কুট। চা খেতে আমার ভারি ভালো লাগে। খেয়ে-দেয়ে চাওয়া হয়ে ঘর ঘুরে করব রান্নাবাড়ীর উঠানে। চেয়ে চেয়ে দেখব ঘি নিয়ে, ময়দা নিয়ে, বাজারের হিসেব নিয়ে কি চাকর ঠাকুর আর সরকার মশাইএর বক্তৃতা। মতি কি যখন চেঁচায় মনে হবে রাস্তার খেঁকী কুকুরটা মার খেয়ে একটানা চীৎকার করছে।

আমি বরাবর দেখেছি খাবার জিনিস নিয়ে বেশীর ভাগ মানুষের লড়াই, চেঁচামেচি। শব্দ বোরানী, রাঙা-ঠাকমাদের মত লোকদের খিদের চাড় নেই। ওদের ঘরে খাবার নষ্ট হয়। ওরা বেড়াল কুকুরকে বিলিয়ে দেয় নয়ত ফেলে দেয় জঞ্জালের মত। আমি এসবের মানে বুঝিনে। একদিকে ফেলে ছড়িয়ে অপচয়, অন্যদিকে এক দানা খাবারের জন্য খেয়োখেয়ি। আমার মনে হয় মানুষ বড় বোকা।

শনিবার বিকেলটা আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। আড়াইটের আগেই এসে পড়ে থোকাদাবাবু। বিকেলের সোনালী রোদের মধ্যে বেরিয়ে পড়ি আমরা। ময়দানের সবুজ ঘাসে মুখে বল নিয়ে ছুটতে থাকি আমি। থোকাদাও এক এক সময় আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোট্ট, হাততালি দেয়। অতল হাওয়ায় ছোট্টাছুটি করে শরীরটা তাজা হয়ে ওঠে। সম্মুখ ঘোর হয়ে এলে তখন বাড়ীর দিকে ফিরি। রবিবার বিকেলেও বেড়াতে যায় থোকাদা। কিন্তু আমাকে রেখে যায় বাড়ীতে। সেদিন ওর সঙ্গে থাকে নীরা দিদিমণি, পাশের বাড়ীর কর্ণেল চ্যাটার্জির মেয়ে।

থোকাদাবাবু মুখে বলে এ দুনিয়ায় আমিই ওর একমাত্র বন্ধু। কিন্তু এ আমি অনেকবার দেখেছি, নীরাদিকে কাছে পেলে আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। সেদিন বাগানের ঘাসে গড়াগড়ি দিতে গিয়ে বিষ পিপড়ের ঝাঁকের মধ্যে পড়ে আমার যা লাঞ্ছনা হল বলবার নয়। লোমের ভেতরে ঢুকে পিপড়গুলোর যা কামড়! মনে হল আগুন জ্বলছে আমার সারা গায়ে। আমি চোঁচিয়ে কেঁদে একশা, দেখি থোকাদা নীরাদির সঙ্গে গল্পে মত্ত, একবার ফিরেও তাকাল না। হুঁ, এই নাকি বন্ধুত্ব। একজনকে পেলেই আর একজনকে দিবা ভুলে যায়।

দিদিমা শিউলি ফুল কুড়িয়ে রাধামাধবের জন্য মালা গাঁথেন আর আপনমনে অনেক কথা বলে যান। বলেন, কুড়োকে তোমরা কেউ কিছু বল না। কুড়ো এসে থোকাদার মুখে হাসি ফুটেছে। মামা গিয়ে অবশি ছেলেটা যেন অনাথ হয়ে গেছে।

আমি বুঝিনে কতাবাবু মারা যেতে অনাথ হবে কেন থোকাদা? বোরানী তো আছেন। মামী থাকলে আর ভাবনা কি। বরং থোকাদারই দোষ। বোরানীকে ও একেবারে সহ্য করতে পারে না। মূখো-মুখি হলেই থোকাদার শরীরটা কেমন শক্ত কঠিন হয়ে ওঠে। কথা বলতে মুখ লাল হয়ে যায়। উদ্বেজনার রাগে ভেতরে ভেতরে যেন কাঁপতে থাকে ও। কথার মাঝখানে বোরানীকে ধামিয়ে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। কতদিন দেখেছি থোকাদা ঘর থেকে চলে গেলে বোরানী নিজের কান্নাভাসা মুখটা নীচু করে মেঝের গালচের নঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে। যত দিন

যাচ্ছে সম্পর্ক বিষয়ে যাচ্ছে ততই। এর কারণ বুঝতে আমার সময় লেগেছে। মানুষদের এসব মন কষাকষি বাজে ব্যাপার আমার আদৌ ভাল লাগে না। তার চেয়ে কাবুলি বেড়ালটাকে তাড়া করে গাছে তুলে দিতে ভালবাসি আমি। ওটা বোরানীর বেড়াল। গলায় লাল রেশমী ফিতে বাঁধা। চালচলনে খুব দেমাক। ভারী জন্ম হয়েছে এখন। আমার দেখে সেই যে মোটা শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে গাছে তুলে বসে আছে তো আছেই। নামবে কি করে? আমি যে গাছের তলায়?

বোরানীর কি দ্রোপদী বেড়ালটার জন্য একবারি দুঃখ নিয়ে ডাকছে ওকে। দ্রোপদী বড় ভাল। ওকে আমার খুব ভাল লাগে। ছিপছিপে একহারা গড়ন। টিকলো নাক, টানা দুটি চোখ, ফুরফুরে পাতলা ঠোঁট। গায়ের রং কিন্তু কুচকুচে কালো। খুব সুন্দর ছবি একে যদি কেউ তার ওপর এক দোয়াত কালি ঢেলে দেয় দেখতে ঠিক দ্রোপদীর মত হবে।

এ বাড়ীতে থোকাদার বন্ধু আমি, বোরানীর বন্ধু দ্রোপদী। দিদিমা মুখে বলেন, কারুর সাথে পাঁচ নেই, কিন্তু থোকাদার ওপরেই ওর টান, বোরানীকে দেখেন বিবনজরে। এত বড় বাড়ীতে মোটে তিনজন মানুষ কিন্তু কি বিস্তী আবহাওয়া করে রেখেছে এরা? ছি-ছি-ছি। আমরা জানোয়ার। ঝগড়া লড়াই খেয়োখেয়ি করি বটে তাবলে মানুষের মত এমন সারাক্ষণ মুখ বুজে মনের ছুরিতে শান দিইনে।

থোকাদাবাবুর রাগের কারণটাও আর আমার অজানা নেই। রাত আটটার সময় দরওয়ান রামভকত টেনে গেটটা সম্পূর্ণ খুলে দেয়। রূপালি রং-এর একখানা মোটরগাড়ী নিঃশব্দে চলে আসে ভেতরে। চাপা বাঁশীর সুরে হর্ণ বেজে ওঠে। ঠিক সেই মুহূর্তে দোতলার দক্ষিণ দিকের বোরানীর একটা ঘরের জানালা খুলে যায়। যতক্ষণ গাড়ীটা এবাড়ীতে থাকে ততক্ষণ থোকাদা ছটফট করে অস্বস্তিতে। জিনিসপত্র টেনে ছুড়ে ফেলে, মাথার চুল ধরে টানে নয়ত ছাতময় পায়চারী করে বেড়ায়। আমি এসবের মানে বুঝিনে। বাইরে কনকনে শীত, ঘরের মধ্যে গোল হয়ে আরামে চোখ বুজে থাকি। একটু পরেই রসিক আমার জন্য গরম গরম মাংস আর ভাত আনবে।

(৩)

আগে ছোট ছিলুম, রাতদিনের পার্থক্য তত বুঝতুম না। এখন দেখছি

দিনের মানুষ আর রাতের মানুষে আকাশ পাতাল তফাত। দিনের বেলা যে যার খুশিমত এক একটা মন্থখোশ পরে নিয়ে হাঁটে, চলে, কথা বলে। রাতের বেলা সেই মন্থখোশটা খুলে যায় আমার বকলশে বাঁধা শেকলটার মত। তখন মানুষগুলো আসল চেহারা নিয়ে ইচ্ছেমত চলে। তখন সব নানা রকম মজার মজার ব্যাপার ঘটে। এই রাত্ণাঠাকমা যিনি লাল টুকটুকে লোমবস্ত্র পরে পুজোর মন্ত্র বলেন তাঁকেই দেখি দুপুরের রাতে আঙুল মট্টকে বৌরাণীকে শাপশাপান্ত করেন। বলেন, অলক্ষ্যরী মরণ হয় না, মলে হাড় জুড়ায়, আপদ মরেও না।

রাত বারোটায় যখন চারদিক নিষ্পীড়িত, গোলবাড়ীর সব ঘরের আলো নেভানো, আকাশটার হাঁড়ি মূখ কালো অন্ধকার, তখন দেখতে পাই ঘোমটার মূখ ঢেকে কে যেন ছায়ার মত রসিকলালের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। ঠুক ঠুক ঠুক তিনটে ঘা দেয় কুবাটে আর সঙ্গে সঙ্গেই হাঁ হয়ে খুলে যায় দরজাটা। ঘরের আঁধার যেন গিলে ফেলে ছায়াটাকে। তারপর আবার সব সন্ধান নিশূপ।

আজ রাতে গোলবাড়ীর আলো নিভে যাবার পর রাত্ণাঠাকমার রকে কি চাকরদের জটলা বসেছে। রসিক বলছে, রতন সিং ড্রাইভারের নাকি চাকরী থাকবে না।

বলে গাড়ীই বেচে দিচ্ছে তার আবার ড্রাইভার। মূখ ঘুরিয়ে ফোড়ন কাটল মতি কি।

ওই চাকলাদারসাহেব ইচ্ছে করলে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে পথে বসাতে পারে। বিড়িতে একটা সন্ধান দিয়ে বলল রসিক।

কথাটা শুনে আমি চমকে গেলাম। অসাবধানে আমার মূখ থেকে যেউ করে একটা আওয়াজ বেরোতেই ওরা শিউরে উঠল সবাই। পেছন ফিরে আমাকে উঠানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হলে বোধ হয়। মতি কি বলল, দুপুর হ মূখপোড়া, তুই কোথেকে এসে জুটলি।

এই যে লাটসাহেবের মত চারসম্মুখ ভাল মন্দ খাওয়া, গাড়ী চড়ে হাওয়া খাওয়া সব শিকয়ে উঠবে। বাছাধন টের পাবে কত ধানে কত চাল। রসিক হেসে হেসে বলল আমার দিকে তাকিয়ে।

আমি জানি থোকাদা আমার ভাল-বাসে, এত আদর-যত্নে রেখেছে বলে ওরা আমার দুচোখে দেখতে পারে না। হিংসের জ্বলে মরে।

চাকলাদারসাহেব কস্তাবাবুর বন্ধু। হুটু করে পথে বসাবেন না এদের, বলল রতন সিং।

কস্তাবাবুর বন্ধু এখন বন্ধু হয়েছেন গো। মতি কি কথাটা বলে হেসে গাড়িয়ে পড়ে আর কি। অন্য সকলেও হাসছিল। হঠাৎ দ্রোপদীকে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখে চূপ হয়ে গেল সবাই। একখানা চিরকুট রসিকের হাতে ধরে দিয়ে দ্রোপদী বলল, এই ওখুটা এখুখুনি এনে দিতে হবে। কথাটা বলে যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল। আমি জানি বৌরাণীর ঘুমের ওষুধ ওটা। ওষুধ না খেলে বৌরাণীর ঘুম হয় না রাতে।

দ্রোপদীর পেছনে আমিও নেমে এলাম রাত্ণাঠাকমার রক ছেড়ে। বাগানে নামতেই কনকনে হাওয়া শীত ধরিয়ে দিল। টুপটাপ শিউল ফুল ঝরিছিল ঘাসে। আমার খাবার নীচে ফুলগুলো পিষে যাচ্ছিল।

(৪)

কদিন থেকেই গোলবাড়ীর আব-হাওয়া থমথমে, মেঘলা দিনের মত। রাত্ণাঠাকমার মূখ গম্ভীর। থোকাদা যই গুলে গুলে হয়ে বসে থাকে। বৌরাণীর অবস্থা কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। কুরুশ-কাটি দিয়ে লেস বুনছেন সোফায় বসে। পায়ের কাছে কাবলী বেড়ালটা লোজে-মুখে এক হয়ে ঘুমোচ্ছে। রসিক এসে খবর দিল চাকলাদারসাহেব আসছেন। বৌরাণী লেসটা চোখের সামনে ধরে পরখ করছিলেন, বললেন, ওপরে আসতে বল।

নীচের হলঘর সুন্দর করে সাজানো। অতিথি-অভ্যাগত এলে ওখানেই বসানো হয়। কিন্তু চাকলাদারের বেলায় দেখি অন্যরকম। সোজাই দোতলায় বৌরাণীর বসবার ঘরে চলে আসেন। দাঁদিমা চাকলাদারের এই ওপরে আসা-বসা একেবারে সহ্য করতে পারেন না। থোকাদাবাবুও না। অথচ মূখ ফুটে সেকথা ওরা কেউই বলবে না।

‘রূপার বই’

বাতাসী বিবি

অজিতকৃষ্ণ বসু

[অ. কৃ. ব.]

অ্যাটর্নী নিমাই মিশ্রের পাঁচাল-ঘেরা অনেকখানি জায়গা-জোড়া মস্ত বাড়ির মস্ত গেট। তার দুই পাশে দুটি গোল থাম দাঁড়িয়ে আছে অনেক দিনের অনেক স্মৃতি বহন করে। অনেক দিন আগে—যখন এ বাড়ির নাম ছিল ‘বাতাসী মজিল’—এই পথেই বেরিয়ে আসত বাতাসী বিবির জমকালো জুড়ি গাড়ি, প্রাণশক্তিতে চপ্পল দুটি বিরাট শাদা ঘোড়ার টানা। ‘বাতাসী মজিল’-এর চার দেয়াল ঘিরে ছিল কৌতূহল আর কিংবদন্তীর জোয়ার, আর চার-দেয়াল-ঘেরা রহস্যের মহারাজ্যে মহারাণী ছিল বাতাসী বিবি। সারা দেশ জোড়া গোপন কারবারের বিরাট দল হরেক রকমের মাল আমদানী রপ্তানীর। সিন্ধে রাস্তায় নয়, বাঁকা রাস্তায়; খোলাখুলি নয়, আড়ালে আড়ালে চুপি চুপি, এক মূলুক থেকে আর এক মূলুকে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় চালান—প্রকাশ্য আলোয় নয়, নেপথ্যের অন্ধকারে। আলো এদের রাস্তা দেবে না বলেই এরা বেছে নিয়েছিল অন্ধকারের পথ। এই বিরাট দলের সর্বাধিনায়িকা ছিল অপূর্ণ রূপময়ী মোহময়ী রহস্যময়ী বাতাসী বিবি। এ উপন্যাস তারই কাহিনী।

দাম চার টাকা

রূপা অ্যান্ড কোম্পানী

১৫ বস্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলকাতা-১২

মানুষদের হালচালই আলাদা। আমি যাকে পছন্দ করি না তাকে পিছুত্যাড়া করে একেবারে গেট-এর বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে তেবে ছাড়ি।

টিয়ে পাখীর মত নাকটা উঁচু করে চাকলাদারসাহেব লম্বা লম্বা পা ফেলে ওপরে উঠে আসছেন। পরণে চোস্ত সাহেবী পোশাক, মুখে পাইপ, ডান হাতটা প্যাণ্টের পকেটে, বাঁহাতে আলতো করে পাইপটা ধরা। আমি পেছনে লাফাচ্ছি, যেউ যেউ করছি, ড্রুক্ষেপাই নেই ও'র। রসিক দরজার ভারী পর্দাটা উঁচু করে তুলে ধরতে ভেতরে ঢুকলেন উনি। সোফার মাঝখানে পায়ের ওপর পা তুলে বসলেন চাকলাদার, যেন আগন্তুক কেউ নন, এ বাড়ীরই মালিক। খুটে করে আওয়াজ হল একটা। ওপাশের দরজাটা খুলে গেছে, বোরানী দাঁড়িয়ে। চাকলাদার বোরানীর দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলেন। সাদা রেশমের থান কি এক অশুভ কায়দায় পরেছেন বোরানী। দিদিমা বলেন বাইজীদের মত। সে যাই হোক, বোরানী সুন্দর। এই হাতায় লেস দেওয়া গরদের জামা আর যুইরং রেশমের থানে ও'কে দেখাচ্ছে সকালের ফোটা সাদা পশ্মফুলটির মতন। একটু হাসির ছোঁয়াচ লেগে আছে ঠোঁটে, চোখে। চাকলাদার চেয়ে আছেন তো চেয়েই আছেন। চোখের পলক পড়ছে না। বোরানী এগিয়ে এসে সোফার বসতে যেন সম্ভিত ফিরে পেলেন। সুপ্রভাত।

মিষ্টি আওয়াজ তুলে হেসে উঠলেন বোরানী। আমি ভাবলুম কাঁচের ঠুনকো একটা ডিশ্‌ কার হাত থেকে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল বা। অনেক কথা হল দুজনের। তা থেকে বুঝলুম ঝি চাকরদের কোন কথাই ঠিক নয়। এ বাড়ী-ঘর, মোটরগাড়ী, ড্রাইভার সব যেমন আছে তেমনই থাকবে। চাকলাদার বেঁচে থাকতে বোরানীর গায়ে আঁচড়ও লাগতে দেবেন না।

আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না। কথাটা বলতে বোরানীর ঠোঁট দুটো কে'পে উঠল, চোখে জল আসবার মত হল। আর চাকলাদারের গনটা চিরে গেল তাতেই।

ছি, ছি, এ কী কথা? আপনি কি করে ভাবলেন আমি আপনার ক্ষতি করব।

আমার মনে হল যেন বোরানী নয় চাকলাদারই কেনা হয়ে আছেন এ'দের

কাছে। বিচিত্র ব্যংকার তুলে দেওয়ালা ঘাড়িতে দশটা বাজলো। বাইরে খর রোদ, দরের মধ্যে না রাত না দিনের আবছা অন্ধকার। গোলাপ ফুল, চন্দন ধূপের মিষ্টি সুবাস।

চিরকাল মন্দিরের চাতালেই দাঁড়িয়ে রইলুম। দরজায় আঘাত করব কি করব না ভেবেই সময় বয়ে গেল। ভেতরে খাবার অনুমতি পেলুম না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন চাকলাদার।

বোরানী একথার জবাব দিলেন না, নিরন্তর হাসলেন একটু। তারপর অনেকটা স্বগতোক্তি মতই শোনা হল ও'র কথাটা। থোকাটা এত ছেলেমানুষ, শূদ্ধ বয়সে নয় বৃদ্ধিতেও। ও মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ালেই আমার ছুটি।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে শেষ করলেন কথাটা। তখন আর আমার পিছু ফিরে তাকাবার মত কিছুই রইল না এ বাড়ীতে।

যেন আশার অধিক অনেক কিছু পেয়ে গেছেন এমনভাবে জ্বলো উঠল চাকলাদারের মুখ। পাইপটা পকেটে পুরে দুহাতের চেটোয় মুখখানা রগড়ে নিলেন। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। ওর বয়স কত হল? এইবার বি, এস-সি ফাইনাল না?

হ্যাঁ, এই মাঘে আঠারো পূর্ণ হবে।

উঠে পড়লেন চাকলাদার। হাত বাড়িয়ে টুপিটা নিতে গিয়ে অসাবধানেই বোরানীকে ছুঁয়ে গেলেন একটু। অতঃপর আমার ভাই মনে হল। তারপর



হাত বাড়িয়ে টুপি নিতে গিয়ে অসাবধানেই বোরানীকে ছুঁয়ে গেলেন একটু।

যেন জোর করে নিজেকে নিজেরই ধাক্কা দিয়ে বার করলেন ঘরের থেকে।

দোতলায় এই ব্যাপার। তিনতলায় এসে দেখি খোকাদা দু'হাত মুঠি করে মাথার চুল টানছে। রূপালি রং-এর গাড়ীটা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ গেট খোলা। এ বাড়ীতে চাকলাদারের আসা যাওয়া কতাবাবুর মতই। কতাবাবু মায়া যেতে এদের এমন কি অসুবিধে হয়েছে ভেবে পাইনে।

(৫)

দেখতে দেখতে কতাবাবুর বাৎসরিক প্রাঙ্গণের দিন এসে গেল। কুটুম্ব-স্বজন, গুরু-পুত্রোহিত লোকজনে গোলবাড়ী থৈ থৈ করছে। এ সময়টা চাকলাদারসাহেব আড়ালেই থেকে গেলেন। শব্দ অনেক টাকার চেক সই করে পাঠাতে লাগলেন বোরানীর নামে। আমি দেখতুম খাম ছিঁড়ে চেক বার করবার সময়ে বোরানীর সাদা পশমকলির মত আগুনগলো কাঁপছে, মুখে খুশীভরা উত্তেজনার হাসি। এ কয়দিন খোকাদাবাবুর রাগটাও যেন পড়ে আসছে। নানা দয়াকারে বোরানীর ঘরে আসছে, ডেকে কথা বলছে। ওর মুখে মামী ডাক শুনে বোরানীর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে বার বার।

বাৎসরিক উপলক্ষে যে সব কুটুম্ব-স্বজন এসেছে তাদের চুপিচুপি কথা-বাতা আলাচনা থেকে এ পরিবারের অনেক কিছুই জানতে পেরেছি আমি। কতাবাবুর পৈত্রিক জমিদারী ছিল। সেই আয়ের টাকা থেকে উনি অন্ন আর করলার খনি কিনেছিলেন। এ ব্যবসায়ের অন্য অংশীদার ছিলেন চাকলাদারসাহেব। বন্ধুকে খুবই বিশ্বাস করতেন কতাবাবু। শেষের দিকে চাকলাদারের হাতে সবই ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিজে ঘুরে বেড়াতে দেশ বিদেশে। ও'র নাকি ইচ্ছে ছিল সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে বই লিখবেন। এই ঘুরে বেড়ানো আর বই-এর নেশা যখন কাটল তখন প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন। ওদিকে চাকলাদার ফুলে-ফেঁপে চতুর্গুণ।

মুখের গাস কেড়ে নিতে হলে বন্ধুর দিকে হাত বাড়ানোই তো সুবিধের। খোকাদার পিসেমশাই বললেন।

যাই বল বাপু, এককালে যা থিয়েছে এখন শুনে আসলে তাই তো উগড়ে

দিচ্ছে। হেসে হেসে একজন রোগাটে বৃদ্ধমানুষ বলছিলেন।

ছাতময় পাতা পড়লো। কত মানুষ খেল, কত খাবার যে খেলাছড়া গেল তার হিসেব নেই। রাত তখন এগারটা। আমি গেটের পাশে দাঁড়িয়ে। একদল লোক যেতে যেতে বলছিল, নটীর টাকায় নারায়ণের পূজো।

(৬)

বাৎসরিকের হটগোল থামল একদিন। ছাতের ওপরকার ম্যারাপ খুলে নিয়ে গেছে। দাঁড় দড়া বাঁশ তারের চিহ্নমাও নেই। একটা এলোমেলো হাওয়া বইছে কদিন থেকে। হঠাৎ আসছে, ঘরের কাগজপত্র, গাছের শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে আবার। পিছনের বাগানে ভারী অম্লভূত এক ব্যাপার দেখছি। একটা নেড়া গাছ চারপাশে ডালপালা ছড়িয়ে হাহুতাশ করছে। একাটও পাতা নেই গাছে। অথচ অভয় কালচে রং-এর কুণ্ড ধরেছে গাছটায়। দুদিন বাদে আগুন ধরে যাবে ডালে ডালে, বলছিল খোকাদা। পলাশ ফুলের বড় বাহার, সরকার-মশাইও মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন।

সেদিন বিকেলে গোলবাড়ীটা ফাঁকা। দিদিমা গেছেন বনহুগলী। খোকাদা বইখাতা হাতে কোথায় বেরিয়ে গেল পায়ে হেঁটেই। আজকাল গাড়ী চড়া ছেড়ে দিয়েছে ও। একা একা কি আর করি। ঘর ঘর করছি দোতলায়। বোরানীর হলঘরের দরজায় দেখি এক জোড়া হরিণ চামড়ার চটি। ঢুকে গেলুম

ঘরের মধ্যে। বোরানী ঘর আলো করে বসে আছেন। কানের গহনা থেকে গলার হারের লকেট থেকে নীলচে আলো ঠিকরে পড়ছে। বোরানীর পায়ের দিকটায় একটা মোড়া পেতে বসেছেন চাকলাদার।

চাকলাদার যেন কি সব বলতেই খিঁচ-খিল করে হেসে উঠে বোরানী ডাকলেন, দ্রোপদী। সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে সরে এসে অন্য একটা সোফায় বসে পড়লেন চাকলাদার। দ্রোপদী তো সামান্য ঝি। তাকে এত ভয়, সমীহ করেন কেন চাকলাদার! ভয় যদি করতাই হয় তো আমাকে। আমি খ্যাক করে কামড়ে দিতে পারি। চাকলাদারের মোজার মধ্যে দিয়ে একেবারে হাড় পর্যন্ত দাঁত ফুটিয়ে দিতে পারি। দ্রোপদী রসিক রতন সিং ওদের সে মুরোদ আছে? চাকলাদার লোকটা দেখছি বেজায় বোকা।

নরম থাবা-পেতে কৌচের পেছনে বসে পড়লুম, ওরা বোধহয় জানতেই পেল না।

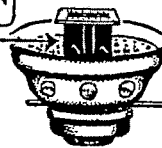
না না না, তা হয় না। আমায় ভাবতে দিন, সময় দিন। বোরানী যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠেছেন। গলার স্বর কাঁপছে, কালো চোখের তারা ঝকঝক করছে।

সুরমা, তুমি কি আমায় মেরে ফেলতে চাও? মরীয়া ঘোড়ার মত হাঁফাচ্ছেন চাকলাদার। আমার সব চাওয়া এমনি করে পায়ে পিষে—।

চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল দ্রোপদী। ও'রা দু'জনেই চুপ। ঘাড়টা টিক্ টিক্

আরও মজবুত... আরও ভাল

পিতলের তৈরী
বার্ণার টিউব



কিমান লন্টনে
'স্পেশাল কোয়ালিটি'
গ্যাস দোঁষেরা লইবেন।



সম্পূর্ণ লন্টন মোটা চাদরে
তৈরী ও লন্টনের ব্লং কেব্রোসিত
তৈলে নষ্ট হয় না

কিমান

লন্টন
সম্বোধকৃত



সেইসময়ই দাম এও কো

২৩৩, ৩নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন-২২-৬৫৮০

করে যাচ্ছে একমনে। ওটা যেন রাগাঠাকুরমার মতো। কেউ গ্রাহ্য করুক আর নাই করুক, বকে যাবে একটানা।

চাকলাদার বোরানীর কাছে কি চায়? কি নিয়ে দিনের পর দিন এই কথা কাটাকাটি? আমি বুদ্ধি বলে বোরানীই বা ওঁকে এত ঘোরাচ্ছেন কেন? যা দেবার দিয়ে ফেললেই তো চুকে যায়। তা নয়, রোজ এক কথা নিয়ে বাজে ঝামেলা।

নীচে গাড়ীবারান্দায় মোটরের হর্ণ খবজে উঠলো। ওঃ, গাড়ী এসে গেছে। চায়ের কাপ নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন চাকলাদার। সুরুমা, তুমি আমার প্রাণে মেরে ফেলবে। হাসতে হাসতে পাইপটা ঠোঁটে চেপে ধরে বোরিয়ে যাবেন, বোরানী ঠোঁট বাকিয়ে হাসতে লাগলেন। শব্দই প্রাণে? ধনে নয়?

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছো। ধনে-প্রাণেই গেলুম। বাই দা বাই, বুদ্ধীটা গেল কোথায়, দেখাচ্ছেন আজ।

আমি বুদ্ধিই দিদিমার কথা বলছে চাকলাদার। দিদিমাকে একে-বারেই পছন্দ করেন না উনি। এক বোরানী ছাড়া আর কাকেই বা ভাল চোখে দেখেন! আমাদের মধ্যেও এ রকম আছে। চাকলাদার চান শব্দ বোরানীকে আগলে থাকতে।

সে বাই হোক, ঘর থেকে বোরিয়ে যাবেন কি করে? ওঁর সেই হরিণ চামড়ার এক পাটি চটি খুঁজে পাচ্ছেন না যে! কি করে পাবেন? চটিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে সোজা নিয়ে এসেছি তেতলায়। খুব খোঁজাখুঁজি করে শেষটার নাকি কতাবাবুর এক জোড়া পাম্পশ, পরে যেতে হয়েছে চাকলাদারকে। রাগে দেখলুম বোরানীর মুখটা লাল, থমথমে। চাকলাদারের চটির কথা নিয়ে রান্নাবাড়ীতে ভারী হাসির ধুম পড়ে গেল।

(৭)

লজের ডগায় ছোট্ট একটু ঘা হয়েছে। একটা মাছি কখন থেকে উৎপাত শুরু করেছে। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজবো আর অর্মানি কুটুস করে এক কামড়। এই এক যন্ত্রণা। কতদিন হল আমার সাবান আনে না রসিক। কিন্তু কে আর দেখছে সে সব। খোকাদা! আজকাল আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। বলতে গেলে বাড়ীই থাকে না। এই আসে তো এই বোরিয়ে যায়। কোথায়

যায় কি করে তা ও-ই জানে। যখন বাড়ী থাকে মুখ গোঁজ করে গুম হয়ে বসে থাকে পড়ার টেবিলে। খোলা বই-এর পাতাটা উল্টায় না পর্যন্ত। রাতেও ভাল করে ঘুমোয় না। ছাতময় পায়চারী করে বেড়ায়।

বোরানী এখানে নেই। উনি তীর্থ করতে বোরিয়েছেন প্রায় মাসখানেক হল। উনি চলে গিয়ে মগের রাজত্ব শুরু হয়েছে এ বাড়ীতে। নিয়ম কানুন বলতে কিছু নেই। আমার জন্য সরকার মশাই-এর কাছ থেকে সাবানের পয়সা চেয়ে নেয় রসিক আর সেই পয়সা দিয়ে বিড়ি দেশলাই কেনে। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করে এসব। আমাকে সংকোচ নেই ওর। থাকলে আমারই সাবানের পয়সা দিয়ে বিড়ি কিনে ফুঁকতে লজ্জা হত ওর।

দিদিমার ইচ্ছে ছিল বোরানীর সঙ্গে তীর্থ করতে যান। কিন্তু জত টাকা কোথায়! শব্দ দ্রোপদীকে নিয়ে গেছেন সঙ্গে। রাধামাধবের জন্য চন্দন ঘষতে বসে চোখের জল ফেলাছিলেন দিদিমা। খোকাদা হাসছিল। ডিয়ার ওল্ড লোডি কান্না কেন? খোকাদা দিদিমার পিটে হাত বুলিয়ে হেসে হেসে বলছিলেন। ডিয়ার ওল্ড লোডি, পকেটে পয়সা না থাকলে তুমি আমিও যা, ওই কুড়োরামও তাই। কোনো তফাত নেই। কথাটা বলেই হাসতে হাসতে বোরিয়ে গেল খোকাদা। দিদিমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে বলে উনিও উঠে গেলেন কাপড় ছাড়তে, গঙ্গাপর্শ করতে। কিন্তু আমার ভারি রাগ হল খোকাদার কথায়।

পকেটে পয়সা না থাকলে কি মানুষ-দের আরও দুটো করে ঠাং গজাবে আমাদের মত? নাকি পয়সা রোজগারের ফিকিরে আমি কুড়োরাম মোড়ের ভিথিরটার পাশে বসব গিয়ে। মানুষদের সঙ্গে জন্তু জানোয়ারের তুলনা হয় নাকি? খোকাদার যত সব আজগুর্বা কথা!

আমার কানকাড়িও নেই একথা মানি। কিন্তু নই কেন? সারারাত জেগে আমি বাড়ী পাহারা দিই আর ওই ভুঁড়ো দরওয়ান রামভকত দিবা ঘুমোয় নাক ডাকিয়ে। ও পায় মাসে চল্লিশ টাকা আর আমার বেলা একটা আখলাও না। আসলে ওরা মানুষরা ঠিক এই রকম। বিনে পয়সায় যেখান থেকে যতটুকু সুবিধে আদায় করতে পারে করে নেয়। সে বেলায় ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দ কোন কথাই ওঠে না। আমার চানের সাবান নেই, বিস্কুট মিরানো, মাংস আসে না প্রায়

এক হপ্তা। অথচ রসিক এসবেরই হিসেব দেখিয়ে পরসা নিচ্ছে রোজ। সেদিন সরকারমশাইকে চোঁচিয়ে বলতে গেলুম সেই কথাটা, উলটে আমাকেই তেড়ে এলেন। বললেন, বেরো বেরো হতছাড়া। রাস্তার কুকুরকে এনে রাজপাটে বসিয়েছে। এবাড়ীর ধরনই এই। যেমন মা তেমন ছা।

(৮)

হাম তি দেখা। ড্রাইভার রতন সিং চওড়া বৃকে হাত চাপড়ে বলল।

রসিকও নাকি দেখেছে। বোরানী যে ট্রেণে হাওড়া থেকে রওনা হয়ে গেছেন, সেই ট্রেণেরই অন্য কামরায় চাকলাদার-সাহেবকে উঠতে দেখেছে ওরা। যদিও হাওড়া স্টেশনের পিষে যাওয়া ভীড়, যদিও প্ল্যাটফর্মের জমজমাট আলোয় চোখ ধাঁথিয়ে যায় তবু রসিক, রতন সিং সেই ভীড়ের মধ্যে আবিষ্কার করেছে চাকলাদারসাহেবকে। চাকলাদার চোখে কাল চশমা ছিল। পরণে ঢোলা পায়জামা আর চুড়িদার পাঞ্জাবী। একেবারে ভোল পালটানো বেশবাস। তবু রতন সিংয়ের আঁখিকে ধোঁকা দিতে পারেননি।

আরে ভাই মদ বন্দ করকে তামাশা তো দেখো। বলেই রতন সিংএর সে কি হাসি। রান্নাবাড়ীর রকে সবাই অটুহাসি জুড়ে দিয়েছে। উড়ে ঠাকুরটা শব্দ পানিঠাসা তোবড়ানো গালে মৌরীমার্কা হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সকলের পেছনে। ভাল মওকা পাওয়া গেছে। আমি নিঃশব্দে পা টিপে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লুম। ভাঙ্গা মাছগুলোর অর্ধেকের বেশী যখন সাবাড় করে এনেছি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে রসিক দেখে ফেলল আমাকে। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল সবাই। আমি ঠোঁট চাটতে চাটতে বোরিয়ে পড়েই টেনে দৌড় লাগলুম বাগানে। একজনের লাভ মানেই আর একজনের লোকমান। লোকমানটা বোধহয় রসিকেরই বেশী প্রাণে বেজেছিল। তা ছাড়া আমার ওপর রাগ আছে ওর। আমি বাগানের ঘাসের ওপর দিয়ে প্রাণপণ ছুটছি, একখানা চেলোকট এসে লাগল গায়ে। তারম্বরে চোঁচাতে লাগলুম খোকাদার নাম ধরে। ছাত থেকে ব্যাপারটা দেখতে পেরেছিল খোকাদা।

সম্মানবেলা শব্দলুম রসিকের জবাব হয়ে গেছে। খোকাদাই ওকে বরখাস্ত করত বলেছে। রান্নাবাড়ীর রকে বসে

চোখের জল পুঁছতে পুঁছতে পোটলাটা বাঁধাছিল রসিক।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওকে আর যেতে হয়নি। সরকারমশাই মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। রসিককে সবার সামনে নাক কান মলে বলতে হল আর কখন আমার গায়ে হাত তুলবে না।

খুব জন্ম হয়েছে রসিক। ইদানীং বোরাণী আর চাকলাদারকে নিয়ে বড় বেশী রংতামাশা জুড়েছিল ও।

(৯)

সকালবেলা। এরই মধ্যে রোদের আঁচ গগণগে হয়ে উঠেছে আকাশে। থোকাদা চা খেয়ে সব কাপটা নামিয়ে রেখেছে, কর্ণেল সাহেবের বোয়ারা সেলাম জানিয়ে একটা খামে আঁটা চিঠি দিয়ে গেল ওর হাতে। থোকাদা রসিককে ইসারা করল কাপ-ডিসগুলো সরিয়ে নিতে। নিয়ে চলে গেল রসিক। ডান হাত দিয়ে চিঠিটা তুলে নিল থোকাদা।

এ কী? থোকাদা আচমকা চেঁচিয়ে উঠল। আমি চেয়ে দেখি চিঠি ধরা ওর হাতটা থরথর করে কাঁপছে। ও বিড়-বিড় করে ক্রমাগত আউড়ে চলেছে, অশোক চাকলাদার অশোক চাকলাদার—চাকলাদার। মনে হল শেষের কথাটা দাঁতে পিষে ফেলতে চাইছে ও।

আমি হতভম্ব হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। ও চিঠি তো নীরাদির। সেলাম বোয়ারা এরকম চিঠি অনেক এনেছে এর আগে, জবাবও নিয়ে গেছে থোকাদার কাছ থেকে। আজ অবশ্য জবাবের জন্য দাঁড়ানি। কিন্তু নীরাদির এ কি কাণ্ড। থোকাদার নামের সঙ্গে উলটো পদবী জুড়ে দিয়েছে কেন? থোকাদার নাম অশোক। কিন্তু চাকলাদার কেন? এ বাড়ীর সবাই তো রায়চৌধুরী। এমনকি বৃন্দাবন কাশী থেকে রাঙ্গাঠাকুর নামে পাণ্ডাদের যে সব চিঠি আসে তাতেও লেখা থাকে রায়চৌধুরাণী। থোকাদারা কেন চাকলাদার হবে? নীরাদির হঠাৎ এরকম লিখবার কি মানে? গদম হয়ে বসে আছে থোকাদা। ওর মূখটা কাগজের মত সাদা। যেন হঠাৎ একটা বিষাক্ত সাপ ছুঁলে দিয়েছে ওকে। এ ভাল নয়। আমার মন বলছে এ কিছতেই ভাল নয়।

আমি পিকিনিজ, নীরাদিদের বাড়ীতে আছে এ্যালসেশিয়ান জেন্স সাহেবের

আধ ডজন ডালকুন্ডা আছে। জোর করে পিকিনিজকে আলসেশিয়ান বলা যায়? রায়চৌধুরী কখনো চাকলাদার হয়?

দুপুরের ডাকে হরিমবার থেকে বোরাণীর চিঠি এল। উনি এখন কিছ— দিন ওখানেই থাকবেন। জামগাটা ভাল লেগেছে ওঁর। রতন সিং-এর পাওনা-গন্ডা চুকিয়ে জবাব দিতে লিখেছেন বোরাণী। উনি ফিরে এসে মোটর-গাড়ীরটা বেচে দেবেন। গাড়ী বেচার কথাবার্তা প্রায় ঠিকই হয়ে আছে।

তলপাী গুটিয়ে চলে গেল রতন সিং। এলোমেলো হাওয়ায় এখন কেবলই ধুলো ওড়ে। প্রায় একশ কাকের জটলা বসেছে পেছনের শিমুল গাছে। কোথেকে দুটো শকুন এসে বসেছে তাল গাছের মাথায়। সরকারমশাই বলছেন, এ ভিটেয় এখন শোয়াল শকুন চরবে।

কি হবে না-হবে কিছই জানিনে। শূন্য থোকাদার রকম সকম দেখে আমি স্তম্ভিত। নাওয়া খাওয়া ছেড়েছে। দিনরাত ইঁজিচেয়ারে গা এঁলিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে। কাল দাঁদমা কোমর বোঁকিয়ে অতি কষ্টে ওপরে উঠে এলেন ওকে বোঝাতে।

ও দাঁদমাকে বলল, মাই ডিয়ার ওল্ড লেডী, ডোন্ট ডিস্টার্ব আম। রাঙ্গাঠাকুর হার মেনে বোরিয়ে যেতে দরজাটা বন্ধ করে দিল। প্রায় চাবিশ ঘণ্টা হতে চলল দরজা খোলেন ও।

হরিষাঘরের চাতালের নীচে গুটি-জোড়া রেখে সরকারমশাই উঠে এসেন সিঁড়ি বেয়ে। আমায় ডেকেছেন কতামা?

“যন্ত্রজীবনের মহাকাব্যরূপে” অভিনন্দিত সূবহু গ্রন্থ
বাংলা সাহিত্যে এত বড় উপন্যাস এই প্রথম

গুণময় মান্না প্রণীত

জুনাপুর ষ্টীল

পূর্ব খণ্ড : ১০.০০

উত্তর খণ্ড : ৯.০০

বহু অভিনন্দনের মধ্যে মাত্র তিনটি

“গ্রন্থটি আয়তনে বিরাট ও আধুনিক শ্রমশিল্পজীবনের একটি সর্বাঙ্গীন মহাকাব্যোচিত কাহিনী।...আমি আশা করি যে এই বিরাট উপন্যাসটি...যন্ত্র-জীবনের মহাকাব্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করবে।”

—ডঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

“বইটি পড়ে প্রথমেই বলি, আমার অবাক অবাক লেগেছে; এই রকম চরিত্র-চিত্রণ আমি বাংলায় কই পড়েছি বলে মনে হয় না।”—বিষ্ণু দে
“গ্রন্থের পাতায় পাতায় লেখক শ্রীমান্না শ্রমিকদের বিবিধ সমস্যার কথা সূচনপূর্ণ হস্তে অংকিত করেছেন।...শ্রমিকদের জীবনের এমন নিখুঁত ছবি বাংলা সাহিত্যে খুব কম পড়েছি। —রেজাউল করিম

ন তু ন প্র কা শি ত

যজ্ঞেশ্বর রায় প্রণীত

আর একখানি সর্বপ্রশংসিত মূল্যবান গ্রন্থ

ভালবাসা ও বিবাহ

৩.০০

রেক্সন বাঁধাই ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদ

প্রতিভাবান তরুণ লেখকদের অগ্রণী

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের

সর্বপ্রথম সাহিত্য কর্মীত

ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী

২.৫০

আধুনিকতম যুগের স্মরণীয় একখানি গ্রন্থ

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স এ।এ. কলেজ স্ট্রীট, মার্কেট।

হ্যাঁ, বোসো ওখানে।

হবিষ্যঘরের সামনের বাতাবী-
সেবুর গাছ বেয়ে একটা কাঠবেড়ালী
ওঠানামা করছে। আমি ওটাকে তাক
করে ওং পেতে বসে আছি। দিদিমা
বললেন, কাশীর বাড়ীটা মেরামত
করিয়ে একতলায় ভাড়াটে বসিয়ে দাও।
দোতলায় আমি থাকব।

সরকারমশাই-এর মুখ গম্ভীর হয়ে
গেল। বললেন, আপনিও আমাদের ছেড়ে
চলে যাবেন।

কতামা হাসলেন। আমি তো গিরেই
আছি বিনোদ। গোনা কটা দিন। সরকার-
মশাই চুপ করে রইলেন। কাঠবেড়ালীটা
সন্তপণে একটু একটু করে নেমে
আসছে গাছের গা বেয়ে। শুনলুম
সরকারমশাই মাথা নেড়ে নেড়ে বলছেন,
সবই বুঝি কতামা। সকল গেল মরে,
কতামা হল হয়ে।

একদিন বিকেলের দিকে একটা
ট্যাক্সি এসে থামল গাড়ীবারান্দার
সামনে। ঠাকুর চাকর কিরা সবাই ছুটল

ওইদিকে, সেই সঙ্গে আমিও। লম্বা
ঘোমটা টেনে প্রথমেই নামল দ্রোপদী।
তাহলে বোরণী এসে গেছেন? গলা
বাড়িয়ে দেখতে লাগলুম ব্যাপারটা। এক-
খানা ইজিচেয়ারে শাইয়ে ধরাধরি করে
সবাই নামাচ্ছে বোরণীকে। চোখ বজ্জে
মড়ার মত মাথা হেলিয়ে দিয়েছেন। এ যেন
সেই বোরণীই নয়।

একটু পরেই চাকলাদার এলেন গাড়ী
করে। তাঁর গাড়ীর পেছনে আরও দু-
তিনখানা মোটরকার। ডাক্তার নার্স-এর
ব্যস্ত চলাফেরায় বাড়ীটা যেন হাস-
পাতাল হয়ে উঠল।

আজ রাতে রসিক আমার জন্য স্নেহ
ডাল ভাত দিয়ে গেছে। চারদিকের ব্যাপার
সুবিধের নয়। সোনামুখ করে ঐ ডাল-
ভাতই খেয়ে নিলুম।

পরদিন সকালে উঠে দেখি রাতারাতি
বাড়ীর আবহাওয়া পালটে গেছে। খোকাদা
কাকভোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে।
রান্নাবাড়ীতে হুলস্থূল। এই জল গরম
চাই, নার্সদের জলখাবার, সাতরকম ফর-
মাস নিয়ে দ্রোপদী ক্রমাগত গোলবাড়ী
থেকে আসছে। সরকারমশাই-এর মূহূর্ত
ফুরসত নাই। রসিক এই নিয়ে বোধহয়
দশবার ছুটল ওষুধ আনতে। ওঁদিকে
মতি বিকে দিয়ে দিদিমা বারবার
ডেকে পাঠাচ্ছেন সরকারমশাইকে।

একটু ফুরসত পেতেই লাল থেরো
বাঁধানো খাতাটা বগলে চেপে সরকার-
মশাই হবিষ্যঘরের দরজায় এসে
দাঁড়ালেন। টুকটুকে লাল ফ্রোমবস্কে
চমৎকার দেখাচ্ছে দিদিমাকে। কিন্তু
ঠাহর করে দেখি। ওঁর তোবড়ানো গাল
কেমন শুকনো অথচ শুকনো আঙ্গুরের
মত চোখ দুটি ছল্‌ছলে। গুণগুণ

অস্পষ্ট গলায় উনি কি বললেন বোঝা
গেল না। মতি ঝি জোরগলায় ওঁর কথা-
গুলো শুনিয়ে দিল সরকারমশাইকে।

কাল থেকে জলটুকুও ছোঁনি
কতামা। আজই কাশী চলে যেতে চান।
চম্কে উঠলেন সরকারমশাই। আজই?
কিন্তু বাড়ী মেরামত হয়নি, কোন
ব্যবস্থাই নেই, ওখানে গিয়ে—

ওখানে ওঁর ভাইপো আছেন!
এখন ভাইপোর বাসায় উঠবেন গিয়ে
তারপর—

কিন্তু গাড়ী ভাড়ার টাকাও
তো—। সরকারমশাই থেমে গেলেন।
দোরের আড়াল থেকে রূপোর একটা
কোটো কনাং করে এসে পড়ল
বারান্দায়। কোটোর মুখ খোলা। তার
মধ্যে কলমলে সোনার সাতনরী হার।
মতি ঝির গলা খন্‌খন্‌ করে উঠল। এইটে
বিক্‌করী করে যাহোক একটা ব্যবস্থা
করে দিন। নইলে কি উপদ্রুসী থেকে বড়ো
মানুষ আপ্তঘাতী হবেন

রসিক ছুটতে ছুটতে এল। সরকার-
মশাই শীর্ণগীর আসলুন। তেনারা সব
দাঁড়িয়ে আছেন আপনার জন্য। পড়ি কি
মরি ছুটলেন সরকারমশাই, পেছনে
রসিক।

সরকারমশাই চলে যেতে দিদিমা
উঠে গেলেন। সুযোগ বুঝে আমিও
এগিয়ে এসে উঁকি দিলুম হবিষ্যঘরের
দরজায়। ঘরের মেঝের চাল ডাল মশলা
ছড়ানো ছিটোনা, কিছ, পেতলের,
তামার বাসন। একটা শালিখ জানালায়
বসে ঘাড় নেড়ে দেখছে এদিক ওঁদিক।
হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় কাগজের ঠোঙা-
গুলো সরসর থরথর এলোমেলো ছড়িয়ে
গেল আর ভর পেয়ে শালিখটাও উড়ে
গেল কুড়ুপ একটা আওয়াজ তুলে।

(১০)

ওই শালিখ পাখীটার সঙ্গে সগেই
যেন এ বাড়ীর এতদিনকার নিয়মকানুন
আদব কায়দা আবর, পরদা সবই উড়ে
উধাও হয়ে গেল। চাকলাদারসাহেবের
গাড়ীটা প্রায় সারাক্ষণই এ বাড়ীতে। উনি
কখন যান কখন আসেন এ নিয়ে কেউ
আর মাথা ঘামায় না। একটা মুসলমান
বেয়ারা বহাল হয়েছে। চাকলাদার
সাহেবের ফরমাস খাটে আর তিন ওকত
নমাজ পড়ে।

দিদিমা সেইদিনই চলে গেছেন।
যাবার সময় কতাবাবুর একটা অঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পঞ্চাঙ্ক নাটক
— আড়ৎদার —
দাম দেড় টাকা
চক্রবর্তী ব্রাদার্স
৩৮, সুদিকিয়া স্ট্রীট : কলিকাতা-৯
এ, সি, আর-৩৪



বিবাহে ও উপহারে
এস, সি, সরকারের
গহনা
অতুলনীয়
ফোন-৩৪-২৪৫৩
এস.সি.সরকারওকোং
জুয়েলার্স
১২৫-বি, বংবাডয়ার স্ট্রীট-কলি-১২
১২৭-১৩৭-বি, বংবাডয়ার স্ট্রীট-কলি-১২

বয়সের ছবি দিলেন খোকাদাকে। এইটে তার শোবার ঘরে টাংগিয়ে রাখিস খোকা। আর ভাল না লাগলে কাশী চলে যাস।

খোকাদা ইজিচেয়ারে শুয়ে পা দোলাচ্ছিল হেসে হেসে। বলল, কোথায় যাব এই স্বগুণে ছেড়ে? স্বগুণে, ইডেন, গার্ডেন অব ইডেন।

দিদিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলে কপালে হাত ঠেকিয়ে নেমে এলেন। আমি আসছিলাম গুঁর পেছনে। দেখতে পেয়ে বললেন, খোকা রইল, ওকে দেখিস্ কুড়ো। কত গালমন্দ দিইছি তোকে, মনে করিস্ কিনে। ভাল থাকিস সব। দিদিমার তোবড়ানো গাল বেয়ে হুহু করে জল পড়ছিল।

(১১)

নিশ্চুতি রাত। অন্ধকারের হাত-ছাড়ানো এককোণ খাওয়া চাঁদ উঠেছে, নারকেল গাছের ফাঁকে। হাওয়ার দোলায় বারবার গাছের আড়ালে চলে যাচ্ছে চাঁদটা মনে হচ্ছে এক খাব্‌লা মাংস তুলে নেওয়া একটা মড়ার মাথা থেকে থেকে উর্কি দিয়ে দেখছে এ বাড়ীটা।

বারবার তিনবার ডেকে উঠলাম আমি। সেই ডাকটা শুনে চমকে জেগে বিছানায় উঠে বসল খোকাদা। ও হাত বাড়িয়ে জানালাটা খুলে দিতেই চোখো-চোখি হল ঐ চাঁদটার সঙ্গে। আরছা আলোয় দেখলাম কেমন কেঁপে উঠল ওর শরীরটা, আর তখনই কি ভেবে যে ও খাট ছেড়ে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল আমি জানিনে।

ও পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, পেছনে আমি। একবার আমার একটা পা মাড়িয়ে দিল, খেয়ালই নেই ওর।

দোতলায় নেমে এলাম আমরা। বোরানগীর ঘরে নীলচে মৃদু আলো। মেঝেয় শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে দ্রোপদী। জানালার কাঁচে নাক মুখ চেপে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে আছে খোকাদা। আমিও দেখলাম। ধবধবে সাদা বিছানায় কুঁকড়ে যাওয়া শীর্ণ শরীর মেলে দিয়ে চোখ বজ্জে পড়ে আছেন বোরানগীর। হয়তো বেঁচেই নেই, নয়তো ঘুমিয়ে আছেন কে জানে। মাথার কাছে সাজানো নানারকম কাঁচের শিশির ওপর আলো পড়ে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। খোকাদার নজর সারা ঘর এসে দ্রোপদীর ওপরে

গেল। দ্রোপদীর গায়ে জামা নেই। বুদ্ধের আধখানা খোলা। আমি স্পষ্ট দেখলাম সোঁদিকে চেয়ে চেয়ে খোকাদার চোখ দুটো হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল। টং করে একটা আওয়াজ হল দেওয়াল ঘড়িতে। ভীষণ চমকে গিয়ে খোকাদা পিছন ফিরে মরায়ার মত উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। বারকয়েক হুঁচোট খেল বোধ হয়। ওর দ্রুত্বেপও নেই।

ওকে আর মানুষ বলে মনে হয় না। সারাক্ষণ ক্ষাপা কুকুরের মত হন্যে হয়ে ঘুরছে। সত্যিই ক্ষেপে গেছে ও। নইলে এই আবছায়া শেষ রাতের অন্ধকারে আধখাওয়া চাঁদটার দিকে আগুল তুলে দেখিয়ে অমন অদ্ভুত বিন্দীভাবে হেসে উঠত কি? হো হো হো, হি হি হি সে কি হাসি খোকাদার! যেন চাঁদটার সঙ্গে ইয়ারকী জুড়ে দিয়েছে ও!

বেশ খানিকক্ষণ এমনি হেসে হেসে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। পরক্ষণেই দুহাতে মুখ চেপে ডাকল, মামা, মামাগো! যেন ডাক নয়, কান্না। আমার ভারী কণ্ঠ হতে লাগল শুনে। কর্তাবাবু না মরে গেলে এমন দশা হত না ওর।

ঘরে চল শোবে, ঘরে চল। ভেউ ভেউ করে আমার এই কান্নাটাও খোকাদা

শুনতে পেল না, যেমন কর্তাবাবু পেলেন না ওরটা।

(১২)

না আর নয়। কাশীই চলে যাব আমরা। সরকারমশাই তারই উদ্যোগে উঠে-পড়ে লেগেছেন। খোকাদার ভাব-গতিক দেখে ভয় পেয়েছেন উনি। চোখ দুটো পাকা করমচার মত লাল। কালিলেপা গর্তের মধ্যে ওর চোখের চাহনি দেখে আঁতকে উঠেছিলেন সরকারমশাই।

দাদাবাবু, কাশী চলে যান আপনি। সেই ভাল। কাশীতে কস্তামা আছেন, ভালই হবে। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।

কাশী? ফাদার বিশ্বনাথ? খোকাদা হো হো করে হাসতে লাগল। সরকারমশাই-এর দিকে তর্জনীটা বাড়িয়ে দিয়ে টেনে টেনে বলতে লাগল, ইওর ফাদার; মাই ফাদার, মাই ফাদারস ফাদার, ও হো হো হি হি হি। সরকারমশাই আর দাঁড়ালেন না, সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন, খোকাদার হাঁক শুনে থমকে দাঁড়ালেন। হ্যালো জেস্টলম্যান, কুড়ো যাবে না আমার সঙ্গে? কুড়ো মাই ওয়ান এ্যান্ড ওনালি ফ্রেন্ড?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কুড়োও যাবে। ও আর এখানে থেকে কোন খোড়ার ঘাস

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আঙ্গিকের যে কতো বিচিত্র বিন্যাস হয়েছে তার সাক্ষী সংকর্ষণ রায়ের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

—সঙ্ঘামিত্রা— (মূল্য ২.৫০ নং পঃ)

অভিনয়-সাফল্যমণ্ডিত নতুন একাংক নাটিকা :-

* অনুরাধা দেবীর :-

দুঃস্বপ্ন ও অভিনব নাটক মূল্য ১,-

* অশোক গুহের চিরায়ত উপন্যাস—

গোরা কালোর হাট মূল্য ৮.৫০ নং পঃ

* শিশির দাসের মননশীল উপন্যাস—

সৌম্যন্ত মূল্য ৩.০০

* বিশ্বনাথ রায়ের মিষ্টিমধুর উপন্যাস—

চৌধুরী বাড়ি মূল্য ৪.০০

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

১১এ, বঙ্কিম চার্জার্স স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কাটবে! ও-ও যাক। নীচে চলে গেলেন সরকারমশাই।

আর আমাকে পায় কে? লার্কিয়ে ছুটে চলে গেলুম নীচের বাগানে। কাশী। কাশী যাব আমরা। রেলগাড়ী চড়ে, থোকাদার সঙ্গে। কোথায় বা বোরাণী, আর কোথায়ই বা চাকলাদার-সাহেব।

বাতাবী লেবু গাছটার ঝরে-পড়া শুকনো পাতার ওপর আমার পায়ের আওয়াজ হচ্ছে খচমচ্ খচমচ্। খু-ব মজা লাগছে আমার।

থাকবি এই উনানের পাঁশ-গাদায় আর এণ্টোকাটা কুড়োবি। ছোঃ।

ওপর থেকে রসিকের গলার আওয়াজ পাচ্ছি। আয় আয় কুড়ো, চা খেয়ে যা। আয় আয় কুড়ো।

বোরাণীর বেড়ালটা করুণ সুরে আর একবার ডাকল। মিয়াও। আমি ফিরেও তাকাইনি। বয়েই গেছে আমার ওর কথা শুনতে।

(১০)

পরশু দুপুরে আমাদের ট্রেন। মাঝে আর একটা দিন। আনন্দে উত্তেজনায়

চোখ চেয়ে দেখি থোকাদা একটা ছোট টর্চ এক বাণ্ডিল দাঁড় নিয়ে পকেটে পুরছে। চেয়ারের পিট থেকে একটা তোয়ালে তুলে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিল আবার।

ওকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে আমিও পেছা নিলুম। কি ব্যাপার? এসব দড়াদড় নিয়ে কোথায় যচ্ছ? অস্পষ্ট গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলতেই চাপা শিষ দিয়ে থামিয়ে দিল ও। খু-ব নীচু-গলায় বলল, কুড়ো, একদম চুপ।

থোকাদা অন্ধকারে হাতড়ে নেমে এল দোতলায়। গোলবাড়ীর বারান্দা সম্পূর্ণ ঘুরে পেছনের দিকে চলে এলুম আমরা। এদিকটায় বোরাণীর গোসল-খানা। গোসল-ঘরের বাইরের দিকের দরজাটা বন্ধই থাকে। কিন্তু আজ দেখলুম থোকাদা একটু তৈলতেই ভেজানো দরজাটা খুলে গেল। থোকাদা ঢুকেই ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। টর্চ জেলে বাথটব ধরে ধরে এগিয়ে চলল ও। দরজা পর্যন্ত পৌঁছেই আলো নিভিয়ে দিল আবার। আমি হোঁচট খেলুম একটা বালতির গায়ে।

গোসল-খানার পরেই আর একটা ছোট ঘর। সবাই বলে বঙ্গ রুম। এ ঘর ভর্তি তোরঙ্গ, স্যুটকেস আর আলমারী। বোরাণীর শোবার ঘর থেকে তেরছাভাবে আলো এসে পড়েছে এ ঘরে। সেই আলোয় দেখলুম মেবের ওপর কাত হয়ে পড়ে রয়েছে একটা ফুলদানী। খানিকটা জল আর একগুচ্ছ লাল গোলাপ গাঁড়িয়ে পড়েছে মেবের। ওরা দুজনেই ফুল ভালবাসেন। বোরাণী আর চাকলাদার। থোকাদা বঙ্গরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখছিল বোরাণীর ঘরটা। দ্রোপদী ঘরের এক কোণে স্পিরিট স্টোভ জেলে কি যেন করছে। চট করে সরে এল থোকাদা। খু-ব সন্তর্পণে টিপে টিপে আবার বেরিয়ে এলুম আমরা। তেতলার ঘরে ফিরে এসে ইজিচেয়ারটায় গুম হয়ে বসে রইল থোকাদা। আমি হতভম্ব হয়ে ওর পায়ের কাছে গুঁড়িসসিঁড়ি মেরে বসে আছি। নানা দর্ভাবনায় ক্লান্ত হয়ে শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পোড়া গন্ধে ঘুম ভাঙল ভোরাবলা। পূর্বের আকাশটা টকটকে লাল। কিন্তু ওরকম আগুন-রাগা আকাশ তো প্রায় কোথাই দেখি। তা থেকে পোড়া গন্ধ পাইনে তো কখনো। তাড়াতাড়ি ঘব থেকে বেরিয়ে এলুম।

দুখি ছাতের মাঝখানে বই-খাতা,



থোকাদার নজর সারা ঘর ঘুরে এসে দ্রোপদীর ওপরে আটকে গেল।

মিয়াও! চমকে তাকিয়ে দেখি ব্রহ্মাচারীর উনানের মধ্যে থেকে ছাই-লি মেখে বেরিয়ে এল বোরাণীর বেড়ালটা। এটাটাই তাহলে অজ্ঞকাল ওর সন্তান হযেছে। ওপরে কে আব ওক স্ত্রী দিচ্ছে এখন? ওর ছাইমাখা হাঁড়ী-কো চেকারটা দেখে আগার কেবলই সি পান্ছিল। কণ্ঠে হাস চেপে বলমে, আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে। মি আর থোকাদা। কাশী যাব। সে কি খনে? অনেক অনেক দূর। তুই পড়ে

ঘুম আসছে না আমার। বাইরে ঘুরঘুরি অন্ধকার। ঘরের মধ্যে দম আটকানো গরম। থোকাদাও আজকাল হয়েছে তেমনি জুলো। পাখাটা খুলতেও মনে নেই ওর। বন্ধ ঘরের মধ্যে সোম্ব হচ্ছ গরমে। কাশীতেও কি এমনি গরম? সেখানে দিদিমা সব ঘরে ঢুকতে দেবে ত? এমনি সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। খটে করে ঘরের আলোটা জ্বলে উঠতে ঘুমের চট্কা ভেঙে গেল আমার।

কাগজপত্র ডাঁই করে তাতে আগুন জেঁদলে দিয়েছে খোকাদা। একবার ঘরে ছুটে এসে আলমারী থেকে কি যেন বার করে নিয়ে গিয়ে সেই দাউ দাউ আগুনে ফেলে দিল। চেয়ে দেখি এক বাঁশ্জল চিঠি আর নীরাদির ছবি।

আমার আর কিছুই বলবার নেই। প্রথম প্রথম ওর এই সব ক্ষাপাটে কাণ্ড-কারখানা দেখে চোঁচিয়ে কেঁদে বকে, একসা করেছি। এখন কিছুই বলিনে। শূন্য চূপ করে দেখি আর শূন্যে শূন্যে লেজ নাড়ি।

বেলা আটটার সময় খোকাদা হস্তদন্ত হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। বোশেখ মাসের চড়া রোদ গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। আর এই রোদেও কতাবাবুর পুরোনো শাল দিবা করে গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

(১৪)

খোকাদার কাশী যাবার কথায় বোঁরাণী চিঁ-চিঁ করে কি যে বললেন সরকারমহাশয়কে বোঁরা গেল না, চেহারার সঙ্গে গলার আওরাজটা শূন্য পালটে গেছে ও'র। আজকাল এক-আধটু উঠে বসেন বিছানায়, পরক্ষণেই শূন্যে পড়ে হাঁফাতে থাকেন। চুলোয় যাক বোঁরাণীর কথা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। এখনও খোকাদার পাশ নেই। কাল আমরা রওনা হব, জিনিসপত্র গোছানো সব পড়ে আছে। কখন কি হবে?

রাত নটা নাগাদ ফিরে এল খোকাদা। এসেই ধপ করে শূন্যে পড়ল বিছানায়। নিশ্চিন্ত হয়ে আমিও চোখ বন্ধলুম। যাক ফিরেছে তাহলে। কাল দুপুরেই মানে মানে বিদেয় হব এ বাড়ী থেকে। কাশী গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। খোকাদা আগের মত হবে, তোফা মজায় থাকবে দু'জনে।

মাঝ রাত্রে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে ঠাहर করে দেখি খাটের বিছানায় খোকাদা নেই। পালান নাকি? তড়াক করে লাফ দিয়ে বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। গম্ব শূন্যে বৃষ্টি ও গোসলখানার দিকেই গিয়েছে। হাঁফাতে হাঁফাতে চলে এলুম ওদিকে। মাথা দিয়ে ঠেলতেই বৃষ্টিলাল দরজা বন্ধ। মানে ওদিক থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দিয়েছে খোকাদা। তাজ আর আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না ও।

আমি আর দাঁড়ালুম না। বাগানের দিকে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি আছে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলে বোঁরাণীর শোবার ঘরের একটা জানালা চোখে পড়ে। ওদিক থেকে যদি দেখতে পাই এই ভেবে তর-তর করে নীচে নেমে ছুটলুম বাগানে।

লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ছোট চাতালটার দাঁড়াতেই থ হয়ে গেলুম আমি। জানালা খোলা। পরিষ্কার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘরের ভেতরটা।

মেঝেয় তাকিয়েই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। গালচের ওপরে চিং হয়ে পড়ে দ্রোপদী। তোয়ালে দিয়ে শক্ত করে মুখ বাঁধা। হাত-পাগুলোও পাকিয়ে পাকিয়ে রশি দিয়ে বেঁধেছে। দ্রোপদীর চোখ দুটো ঠিকরে বোরিয়ে আসতে চাইছে যেন।

বোঁরাণী কিন্তু কিছুই জানছে না এ সবে। অকাতরে ঘুমোচ্ছেন খাটে শূন্যে।

দ্রোপদীকে বাঁধা শেষ করে এগিয়ে এল খোকাদা। হাতের টর্চটা দিয়ে বোঁরাণীর গায়ে একটা ঠেলা দিল ও। চমকে জেগে গেলেন বোঁরাণী। পরক্ষণেই ও খোকা। বলে পাশ ফিরে শূন্যে যাবেন আবার একটা টর্চের গুতো।

দেখবে না? দ্যাখো। বিদ্রী একট হাসি শিউরে উঠল খোকাদার ঠাটে। কি কি দেখব? কি বলছিছ তুই? ধড়ফড় করে উঠে বসতে চাইলেন বোঁরাণী আর ওইটুকু পরিশ্রমেই হাঁফাতে হাঁফাতে শূন্যে পড়লেন আবার।

উঃ! শূন্যে পড়লে চলবে না। ওঠো দ্যাখো। এক হেঁচকা টানে বোঁরাণীকে তুলে বসিয়ে দিল খোকাদা। নিজের হাতটার দিকে চেয়ে নাক কোঁচকাল। যেন বোঁরাণী নয়, বিদ্রী নোংরা একটা জিনিস ছ'য়েছে ও।

এতক্ষণে বোঁরাণীর ঘুম পুরোপুরি ছুটে গেছে। মেঝের ওপর আঁস্টে-পাঁস্টে বাঁধা দ্রোপদীকে দেখতে পেয়েছেন উনি থর-থর করে সমস্ত শরীর কাঁপছে ও'র।

সর্বনাশ খোকাদা দ্রোপদীর গল টিপে ধরেছে, এ কি কাণ্ড? দ্রোপদী তে খুন হয়ে যাবে এখনই! আমি লাফিয়ে ঝপিয়ে নীংকার করে ডাকতে লাগলুম রামভকত! রসিক!

অনেক রাতে বাগানের একটা ছুঁজে কি ইন্দুর দেখেও ওরকম চোঁচিয়েছি আমি। তাই ভেবেই বোধ হয় ওরা কেউ এল না। না রামভকত, না রসিক।

চোঁচানি বন্ধ করে তাকিয়ে দেখি বোঁরাণী ঢলে পড়েছেন বিছানার ওপর। একেবারেই ঘুমিয়ে গেছেন উনি।

(১৫)

সে রাতের কথা, খোকাদার কথা কাউকেই কিন্তু বলেনি দ্রোপদী। খোলা দরজা দিয়ে সকালবেলা যখন রসিক বাড়িপোঁছ করতে এল শূন্যে আঙুল তুলে রসিককে দেখিয়ে দিয়েছিল বোঁরাণীর দিকে।

সারা বাড়ীতে তোলপাড় চেটে উঠলো। ডাক্তার এল একটু পরেই। দুর্বল শরীরে হার্টফেল করে মারা গেছেন বোঁরাণী।



মত্যজিৎ রায় ও
মুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
সম্মাদনায়

ফোটোদেব মন্দির মাসিক পত্র
মে ১৯১২। তৈরী ১৯১২
থেকে ২য় বর্ষ
মুক!

প্রতি মংস্যা ৭৫০.প.
বার্ষিক চাঁদ ৯ টকা

১৭২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলকাতা-৬৫
(নিউ সিনেমার পাশে)

ডাক্তার কাগজে সেই কথা লিখে দিয়ে চলে গেলেন। আর বোরানীকে নিয়ে ধমশানে ওরা রওনা হয়ে যাবার পর দ্রোণদীকে কেউ খুঁজে পায়নি এ বাড়ীতে। ওর সেই গোলাপ ফুল আঁকা টিনের স্যুটকেস নিয়ে ও যে কোন অচেনা অজানা রাজ্য হারিয়ে গেল সে খবর আমরা কেউই জানতে পাইনি।

বোরানীকে যখন সবাই ধরাধরি করে খুঁটে তুলছে, সরকারমশাই থোকাদাকে ডাকতে এলেন। থোকাদা তখন তেতলার ঘরে বসে গৌফি-দাড়ি কামাতে লেগেছে।

মারা গেছে? পাগল হয়েছেন? থোকাদা সরকারমশাইকে যেন ধমকাতে লাগল। ওসব স্রেফ ন্যাকামো! ছোঃ। একরাশ খুঁটু ছিটিয়ে দিল সরকার-মশাই-এর মুখে। বড়ো সরকার কোঁচার খুঁটে চোখের জল আর খুঁটু পুঁছতে পুঁছতে নেমে গেলেন নীচে।

আমি বসে বসে থোকাদার মুখটা দেখতে লাগলুম। অনেকদিন পর ওকে বেশ খুঁশী খুঁশী দেখাচ্ছে আজ।

(১৬)

চাকলাদারসাহেব সরকারমশাইকে ডেকে বললেন, আমার তো একটা কর্তব্য আছে। সরকারমশাই মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, সে ভো ঠিকই।

গাড়ীতে উঠে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিলেন চাকলাদার। একটু চোঁচিয়ে বললেন, আপনি সব রেডী করে রেখে দেবেন, আমি সকাল আটটার সময় আসব।

পরদিন ভোর থেকেই সে কী ব্যিষ্টি! জলে জলে সমস্ত পথ-ঘাট থৈ থৈ। দোকান-পাট সব বন্ধ। একটা কুকুর বেড়াও বেররনি রাস্তায়। চাকলাদারের রূপালী রং গাড়ীটা যেন জলে ভেসেই এসে দাঁড়াল গাড়ী-বারান্দায়।

শব্দ পেয়ে ভিজতে ভিজতে সরকার-মশাইও এলেন রাস্তাবাড়ীর দিক থেকে। বর্ষাতি গায়ে থোকাদা উঠে বসল গাড়ীতে। স্যুটকেস, হোবডঅল টিফিন ক্যারিয়ার একে একে তুলে দিল বসিক। আমিও উঠে বসল পাখানীয়ে দাঁ পা তুলে দিয়েছি, চাকলাদারসাহেব রসিকের বালেন, ওটাকে সরিয়ে নাও। এতক্ষণ চম্পস নাকাল থোকাদা। বলল কতদা যাবে না? কি রকম একটা হাসি খেলে

গেল চাকলাদারের ঠোঁটে। ও নো, নো, নো।

থোকাদা দাঁত দিয়ে নীচেকার ঠোঁট কামড়ে ধরল। রসিক আমাকে সরিয়ে নিতেই, চাকলাদার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন।

থোকাদা চলে যাচ্ছে। চকলাদার ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আমি চোঁচিয়ে লাফিয়ে পড়লুম গাড়ীর জানালায়, পর-ক্ষণেই ছিটকে পড়লুম নীচে। তাকিয়ে দেখি থোকাদাকে নিয়ে গাড়ীটা তীরের মত বেরিয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে। আমি গাড়ীর পেছনে ছুটেতে যাব অমনই মুখ খুঁবড়ে পড়ে গেলুম।

ততক্ষণে সরকারমশাই হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছেন, গেছে গেছে একেবারে গেছে।

সামনের দুটো পাই চাকার তলায় পিষে গেছে। রসিক, রামভক্ত, মতি ঝি গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাকে।

বাথায়, যন্তনায় আর থোকাদার জন্য কণ্ঠে প্রাণপণ চেঁচাছি আমি।

ঝি-চাকরদের কথা থেকে বুঝলুম থোকাদাকে রাঁচী পাঠানো হল। রাঁচী কেন? আমরা যে কাশী যাব। কাশীতে দাঁদমার কাছে—।

কিন্তু আমার কান্নাকাটির জবাব পাবার আগেই সরকারমশাই-এর টেলি-ফোন পেয়ে পশু হাসপাতালের গাড়ী এসে গেল। আমাকে সেই গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে গেল কয়েকজন লোক। আমি তাদের কাউকেই চিনি।

(১৭)

আমি কুড়োরাম। সবাই ডাকত কুড়ো। কিন্তু ও নামে এখন আর আমাকে কেউই ডাকে না। আমার চারটে পাও নেই আর। সামনের পা দুটো হাসপাতালে কেটে রেখে দিয়েছে, আর ফেরত পাইনি। সেদিক থেকে আমি মানুষ হয়ে গিঁছি বহা যায়। দু পায়ে হাঁটলেই মানুষ হয় কিনা জানিনে, তবে মানুষের মতই আমার খিদে তেঁচটা অসহ্য কণ্ঠে সুখ-দুঃখের বোধ আছে। মানুষের কি মনে রক্ত জার কোন কথা জ্বলে যায় কোনই সম্ভব নয়। আমি কিন্তু অসহ্য কণ্ঠে ডাকিনি। সব সঁদি তুলেও যাই থোকাদাকে কোনদিন তুলব না।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেলুম একদিন। খোঁজা পা ছেঁচড়ে টেনে কোন-মতে এক সকালবেলা গোলবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালুম। গেট বন্ধ। তালা দেওয়া। কেউ নেই কোথাও।

গেটের লোহার শিকণুলোর মাধ্যমে দিয়ে মাথা গিলে ডাকলুম, সরকারমশাই, রসিক। শন-শন করে গাছপালার মাধ্যমে দিয়ে হাওয়া বয়ে গেল। দোতলার একটা জানালার কপাট বন্ধ হয়ে খুলে গেল আবার। ওটা বোরানীর ঘর। আমার মনে হল চাকলাদারের অপেক্ষায় নয়, থোকাদার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বোরানী। আর তাই আমাকে দেখতে পেয়ে খুঁশী হয়ে ডাকছেন।

আমি কুঁই কুঁই করে লেজ নাড়লুম, জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিলুম কবার। ভেতরে যাবার পথ নেই, কি করব।

রোদ বাড়ল, হাওয়ায় শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে এল। যখন চনুচনে খিদে পেটে জ্বালা ধরিয়ে দিল আস্তে আস্তে হাঁটা দিলুম বাজারের দিকে।

পেছনের দুটো পায়ে ভর দিয়ে কোন-মতে ছেঁচড়ে পথ চলি। গাছতলায়, মিঠাই-এর দোকানের উনানের ছাই-গাদায়, নয়ত কারুর বাড়ীর রকে ঘূঁমিরে থাকি।

একদিন কতগুলো ভিখারী ছোঁড়া এসে আমার গলার বকলশটা খুলে নিয়ে গেল। ছোঁড়াগুলো আমাকে ভারী জ্বালায়। কখনও ঢিল ছুঁড়ে মারে, কখনো রাস্তার গঙ্গাজলের ফোয়ারার পা চেপে আমার সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দেয়। এই শীতে, অবলায় নেয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকি।

আমি এখন বুঝতে পারি যাকে ভালবাসার কেউ নেই তার কণ্ঠ ঠিক আমার মতই।

থোকাদা এখন কোথায় কার কাছে আছে কে জানে? রাঁচী কতদূর? যাবার সময় ও যদি বৃষ্টি করে রুটি কি বিস্কুটের টুকরো রাস্তায় ফেল ফেলে যেত তাহলে আমি ঠিক পেঁপেলে সন্তান ওর কাছে। কিন্তু কোন নিশানই রেখে যায়নি ও।

কদিন থেকে একটা অশ্বখাগারের তলায় থাকি। কাল রাত্রে জীবন মরণ সন্তান পেয়ে গেছে গাছটা। আজ আবার কোথায় থাকব কে জানে!

বার্ষিক সংখ্যা

অমৃত

১৩৬৯

সম্পাদক: শ্রীতুঙ্গর কান্তি ঘোষ

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর ঐতিহাসিক বৎসরে যাত্রা শুরুর করে 'অমৃত' তার দ্বিতীয় জন্মদিন পালন করবে আগামী ১১ই মে প্রকাশিতব্য বিশেষ সংখ্যাটিতে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের উপর সর্বজনমান্য লেখক-লেখিকাদের সন্নিবিষ্ট রচনা এই বিশেষ সংখ্যাটির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

অন্যান্য রচনা সহ এই বর্ধিত কলেবর সংখ্যাটিতে থাকবে :

প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	...	গল্প ছোট
লীলা মজুমদার	...	...	শিশুসাহিত্যের সমালোচনা
পারিমাণ গোস্বামী	...	...	বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য
মম্বথ রায়	...	...	বাংলা একাংক নাটক প্রসঙ্গ
হরপ্রসাদ মিত্র	...	...	বাংলা কাবিতার সাম্প্রতিক আসর
ভবানী মদ্যোপাধ্যায়	...	...	সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	বইয়ের যুগ
সুধীরচন্দ্র সরকার	...	...	সাহিত্যে পুরুষকার
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	...	...	ছোটদের বই : সেকাল ও একাল
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	সাম্প্রতিক বাংলা ছোট গল্প
কশাদ চৌধুরী	...	...	এশিয়ার চারটি দেশের
			পুস্তক প্রকাশনা
সন্তোষকুমার দে	...	...	বিজ্ঞাপন কি পড়ে থাকেন ?
গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়	...	...	১৩৬৮ সালের বাংলা ছবি
ফকিরনাথ রায়	...	...	খেলাধুলা

॥ গল্প ॥

বিমল মিত্র

...

মা জননী

তাছাড়া :- গল্প, ধারাবাহিক রচনা এবং বহু বিচিত্র তথ্য ও ঘটনাপঞ্জী।

• দাম যথারীতি ৪০ নয়া পয়সা •

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

সাহিত্য সম্মান

সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার আগে টমাস মানকে সর্বপ্রথম কক্ষক্ষেত্রে 'সিমালজিসিমান' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। ১৯০১ সালে প্রকাশিত 'বাডেনবুর্কস' উপন্যাসে একটি পতনশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের কল্পণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'হিজ রয়েল হাইনেস'-এ অর্থাৎ, মহাশয়, মান-মর্যাদা স্বাঙ্গ ও বিদ্রূপের সাহায্যে সুন্দরভাবে অঙ্কিত। মানের 'দি ম্যাজিক রাউন্টেন' বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর নিন্দা ও প্রশংসার ঝড় বয়ে যায়। তবু ১৯২৯ সালে মান নোবেল পুরস্কার পান উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির জন্য। মান সম্পর্কে ধূজটিপ্রসাদ মোক্ষম কথা বলেছেন, '...তিনটি ছোট গল্প পড়লাম। অপূর্ব। অর্থাৎ ও-দেশেও অপূর্ব।' মান পড়তে আমার কণ্ট হয়, বিশেষত শেষ বয়সের নভেলগুলি। অত্যন্ত ক্রান্তিকর। চিন্তার জটিলতা এত বেশি যে, গল্পের গতি সময় সময় থেমে যায়। আর সবচেয়ে খারাপ লাগে রোগ আর পাপবোধের ব্যাখ্যান। 'টিপিকাল' জার্মান সভ্যতার প্রতীক। জার্মানীতে থাকতে পারলেন না, আমেরিকা গেলেন, সেখানেও থাকতে পারলেন না, পালিয়ে এলেন

সুইজারল্যান্ডে। এই ধরনের পলাতক প্রবাসী জীবন সতাই ভয়াবহ। ভদ্রলোকের কোনো রচনার রসিকতার চিহ্ন মাত্র নেই। তবু মহান ভিন্ন জগতেরই প্রস্টা; অথচ এই জগতেরই আভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রতীক।



আনুমানিক ১৯০০ সাল সময়কার মানের চিত্র।

সম্প্রতি ড্রামসডাটে মানের জীবন ও রচনাবলীর ওপর এক আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেছে। এমন কতকগুলি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল যা একেবারেই নবাবিস্কৃত। নানান ব্যস্তির ব্যস্তিগত সংগ্রহ ছাড়া জুরিখের একটি বিদ্যালয়

থেকে অনেক কিছু পাওয়া গেছে। যা প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ নিবন্ধের এই বিচিত্র সমাবেশ থেকে টমাস মানের প্রতিভার বহু-মুখীনতার সমাবেশ ও সমন্বয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়, যা উপস্থিত বিদ্যামণ্ডলীকে মান সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিদেশে বিস্তীর্ণভাবে বাঁধনো হলদে কাগজের ওপর ছোট ছোট হরফে ছাপা বই এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বই-এর রূপ দ্রুত পাশ্চাত্যে। সুন্দর ছাপা, বাঁধাই, রঙচঙে মলাটের বইগুলি দেখলেই কিনতে ইচ্ছা করে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও আধুনিক উপন্যাস ও কবিতার বইগুলি জাতির বৈদগ্ধ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের বহু-মুখীনতার নিদর্শন।

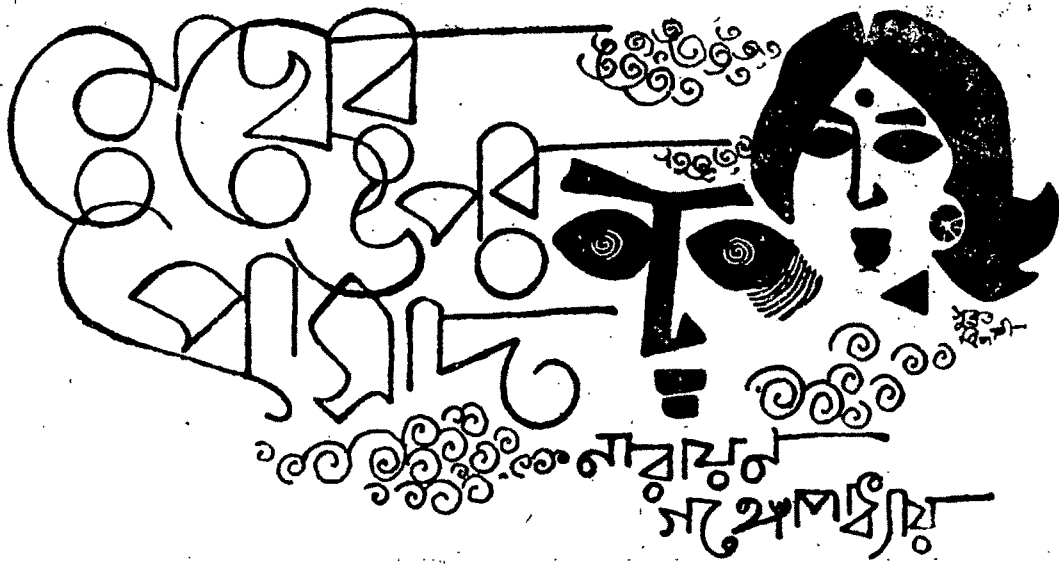
জার্মান প্রকাশনালয় মরিৎস ডিস্টের-ভেক 'আমাদের যুগ সম্বন্ধে জ্ঞান' নামে একটি নতুন রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই রচনাবলী ১৯টি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা। আধুনিক গদ্য ও পদ্যের ধারা ছাড়াও শিল্পবিজ্ঞানের উপর সেকাল ও একালের প্রভাব সম্বন্ধে লিখিত আঁদ্রে জিদের 'ইডিপাস ইন্টার-প্রিটেশান' কিংবা অ্যালবার্ট কামুর 'সিসিফাস প্যারাবল' এতে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত বই প্রকাশিত হয়েছে তাদের মূল্য অপরিসীম।

অন্যান্য প্রকাশকরা শিশু মনের উপযোগী অসংখ্য বই প্রকাশ করেছে। পুরনোদিনের বড় বড় লেখকের গল্প ছাড়াও আধুনিক লেখকদের সঙ্গেও শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমন সব গল্পও লেখা হচ্ছে যা নিয়ে তারা স্কুলে সাহিত্য সম্বন্ধে বিতর্কে যোগ দিতে পারে। আমাদের দেশের সাহিত্যের বাজারে শূন্য নয়-শিক্ষা-জগতে ঘটনাটি একান্তই বিস্ময়কর।

শিশু ও ছাত্ররাও যে সাহিত্যের সমঝদার এই কথাটা প্রকাশকরা আজকাল ভাল করে বুঝেছেন। অন্তত পকেট বৃকের ক্ষেত্রে তো বটেই। পশ্চিম জার্মানীতে এখন কম করে ৪১টি প্রকাশনালয় এই বাবসায়ে রত রয়েছে। রোভলট নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৫০ সালে প্রথম পকেট বৃক প্রকাশ করেন। বর্তমানে প্রকাশিত হয় ৫২টি সিরিজ। পশ্চিম জার্মানীর সব বৃহৎ পকেট বৃক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান রোভলট ও ফিশার ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ৭০ মিলিয়ন কপি পকেট বৃক ছেপেছেন। এবং এটি সম্ভব হয়েছে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে এই যুগের তরুণদের বিপুল জ্ঞান পিপাসার জন্য।



টমাস মান অল্প বয়সে, জুর্লিয়া, কালা ও হাইরিখের (দুই বোন ও ভাই) সঙ্গে মান।



[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১১ চার ১১

থেকে গোলমাল ছিল। অথচ কর্তার গাড়ীর ভাড়া। নটা থেকে সার্ভিস স্টেশনে বসে থেকে প্রায় বারোটার গাড়ীর ডেলিভারী পাওয়া গেল। প্রভাত গাড়ীটা নিয়ে তখনি বোরিং পড়ল ড্যালহৌসি স্কয়ারের দিকে।

জ্বলন্ত কলকাতায় পথে পাঁচ গলছে। 'মেঘবিহীন খর বৈশাখ'—কোথায় যেন এমনি একটা গান শুনছিল। কিন্তু ভুল হল—সম্পূর্ণ মেঘবিহীন নয়। কাল রাতেও বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু আপাতত সে বৃষ্টির চিহ্নমাত্র কোথাও নেই, একটা মৃদু, মৃদু, মৃদু প্রসারিত শব্দকণা কালো জিনের মতো ছড়িয়ে আছে পথটা—একটু, একটু, কাঁপছে যেন। দক্ষিণ থেকে ঝোড়ো হাওয়ার ঝলক আসছে, কিন্তু তাতে সমুদ্রের ছোঁয়া নেই। কোথায় একটা আকাশ-ছোঁয়া, অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে—বাতাসে ভারি হলুদ আসছে থেকে থেকে।

ট্রাফিকের লাল আলো রৌদ্রে আগুনের গোলক হয়ে জ্বলছে। ডান-দিকের স্ক্রীনটা তুলে নিল প্রভাত।

এই রোদে পূর্ব বাংলার বর্ষাকে মনে পড়ে। কালোয় কালো মেঘে বিদ্যুৎ জ্বলছে। ঠান্ডা হাওয়া এল নারকেল-সুপারীর বন কাঁপিয়ে। তার-পর মেঘনার কালো জলের ওপর বৃষ্টির

সে কী মাতামাতি। পৃথিবী-আকাশ—সব জুড়িয়ে গেল, উঠতে লাগল জল, ডিজে মাটি, বৃষ্টি আর কদমের গন্ধ।

কিন্তু না! বৃষ্টিতে ভয় করে প্রভাত। সেই রাতিটা বৃষ্টির ভেতর থেকে বিভীষিকা হয়ে দেখা দেয়। আরো মনে পড়ে, বৃষ্টি নামলেই গৌরাঙ্গ-বাবুর ফাটা ছাতের ভেতর দিয়ে বসুধারা নেমে আসে।

বৃষ্টি নেই—বৃষ্টি আসবে না কলকাতায়। ফুটপাথ জুড়ে উদ্ভাস্ত-হকারদের স্টল। খরসদার নেই, টিনের ছাউনির ভাঙা কড়কগুলো কাতর ঘর্ম্ম মানুষ, রং-বেরঙের সস্তার পোষাক আর ছিট কাপড়গুলো ঝোড়ো হাওয়ার পতাকার মতো দুলছে। টিনের কোঁটো আর কলাইকরা ভাঙা থালা হাতে, তিন-চারটি কালো কালো কঙ্কালসার শিশু নিয়ে অর্ধ-উলঙ্গ রুম্মকেশ মায়ের দল দরজায় দরজায় ফিরছে ভাতের ভিক্ষের। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা উদ্ভাস্ত চেহারার একটি মানুষ, বাস-স্টপের সামনে দাঁড়ানো কয়েকটি বিরক্ত মানুষের কাছে কি যেন বলছে হাতজোড় করে—মাথা নেড়ে নেড়ে সরে যাচ্ছে সবাই। ওদিকে এই প্রখর রোদের ভেতরেও কে যেন উবুড় হয়ে পড়ে আছে ফুটপাথে, দুটো কালো কালো জম্বা পা পথের অনেকখানি পর্যন্ত নেমে এসেছে। একটি শীর্ণদেহ অল্প বয়সী মেয়ে ছেঁড়া জুতো টানতে টানতে এগিয়ে চলেছে—নিশ্চয় চাকরির খোঁজে বোরিংয়েছে, নিশ্চয় গ্রামে ওঠবার পরস্যা

নেই। আর দীপ্তির মতো মেয়েদের সবে হয়তো নেশার ঘোর কেটেছে, হয়তো গ্লানিতে, লজ্জায় কেঁদে উঠেছে একবার, হয়তো একবারের জন্যে ভেবেছে, এভাবে বেঁচে থাকার চাইতে আত্মহত্যা করাও অনেক ভালো।

বৃষ্টি নেই কলকাতায়। অন্তরে-বাইরে সে জ্বলছে। যে বৃষ্টিতে গোড়া মাটি জুড়িয়ে যায়, নতুন অক্ষুর মাথা তোলে, ঘন সবুজ কাঁচ পাতা খুঁশিতে দোল খেয়ে ওঠে—সে বৃষ্টি এখানে কখনো নামবে না। শুধু নরকের যন্ত্রণাকে সম্পূর্ণ করে একটা পচা ডোবার পাক এই অগ্নিবৃষ্টিতে টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

একটা লরী এসে মাঝরাস্তায় বিকল হয়ে পড়েছিল, সেটাকে ঠেলে সরিয়ে পথটাকে পরিষ্কার করতে প্রায় সাত-আট মিনিট সময় লাগল। আবার গাড়ী নিয়ে এগিয়ে চলল প্রভাত। সেই মেয়েটি জ্বলন্ত রোদের ভেতর দিয়ে তেমনি করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে, ট্রাম-বাসের ভাড়া যার জোটে না, ছাতা তার থাকবার কথাও নয়। একবারের জন্যে মনে হল, এই মেয়েটিকে একটা লিফট দিয়ে তার যাবার জায়গায় পৌঁছে দিলে কেমন হয়?

কিন্তু প্রভাত জানে, মেয়েটি তাকে বিশ্বাস করবে না। একটা বিদ্রী় সন্দেহে ভরে উঠবে তার মন, হয়তো চিৎকার করে লোক ডাকবে, বলবে, এই লোকটা আমাকে কিডন্যাপ করতে চাইছিল। এই কলকাতায় কেউ কাউকে

—५५।

যাক, অমিয়র জন্যে তবে ভাবনা
 নেই—প্রভাতের মনে হল। বড়ো গাছে
 নোকো বেঁধেছে। গৌরাঙ্গবাবুর
 সংসারের দর্জন অন্তত সত্যিকারের

নির্ভরযোগ্য
সরকারে
ভেদী
সর্বাবস্থায়
এয়ার
সাইলেন্ট
সুতেজ ও
ব্রিড
বাতাসের
আনন্দ বহন
করে আনবে

লিমিটেড
কাডা-১০
লিকাকা-১৩

ক্যালকাটা ক্যান্সার ওয়ার্কস আইডেট লিমিটেড
হেড অফিস : ৩৩, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
লিটিলেন্দু অফিস : ১১ বি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

কলকাতাকে চিনে নিয়েছে, খুঁজে পেয়েছে উন্নতির পথ। একজন দীপ্তি আর একজন অমিয়! কিন্তু—

অমিয় গদন গদন করে সদর ভাঁজ-ছিল। অ্যাম্প্লিফায়ারের কল্যাণে গানটা প্রভাতের চেনা। ‘ছলিয়া মেরা নাম’। ছলিয়া কথার মানে কী? অমিয়কে জিজ্ঞাসা করলে হয়।

কিন্তু নামটার অর্থ জিজ্ঞাসা করল না প্রভাত। জানতে চাইল : এই দুপুর রোদে কোথায় বেরিয়েছিল অমিয়?

—টালীগঞ্জ। একটা ক্রাবের হয়ে বসিরহাটে খেলতে যেতে হবে, তারাই ডেকে পাঠিয়েছিল।

—তা বেশ। কিন্তু মোহনবাগান কিংবা ইণ্টবেগলে চান্স পাচ্ছ কবে?

অমিয় জবাব দিল না। তার বদলে বলে উঠল : একটু—একটু রাখো প্রভাতদা। এইখানেই আমি নামব।

গাড়ীটা ভালো করে দাঁড়ানোরও তর সইল না। তার আগেই টক করে নেমে পড়ল অমিয়। একটা লরী প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছিল। সেটাকে বাঁচিয়ে দূর লাফে উঠে গেল ফুটপাথে। একবার ঘাড় ফিরিয়ে প্রভাত দেখতে পেলো, রাস্তার ধারের পান-বিড়ির দোকানের দড়ি থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিচ্ছে অমিয়।

গোরাঙ্গাবাবুর সংসারে দুজন সন্তু আছে। একজন অমিয়, আর একজন দীপ্তি।

কর্তার নাম কাজীলাল-সাহেব। আধা-বিলাতী আধা-মাড়োয়ারী কোম্পানির একজন বড় কর্তা। বয়েস ষাটের দিকে, কিন্তু এখনো চম্পশ-পঁপঁতাশের মতো শক্ত-সমর্থ চেহারা। পোশাকে এবং চাল-চলনে অসম্ভব স্মার্ট। তিন-চারতলা পর্যন্ত লিফট ব্যবহার করেন না, দুটো সিঁড়ি লাফিয়ে ওঠেন এখনো। মধ্যে মধ্যে টেনিস খেলেন। গর্ব করে বলেন, আমার ব্রাড-প্রেশার নেই, সুগার নেই, রিউ-ম্যাটিজম্ নেই, অম্বল নেই। অ্যাভেরেজ বাবু-মাকী বাঙালী ইয়ংম্যানের চাইতে থ্রি-টাইম্স্ বেশি আমি খাটতে পারি।

অতিশয়োক্তি হয়তো একটু আছে, কিন্তু সত্যি সত্যি কাজের লোক কাজীলাল-সাহেব। কোনো কোনো দিন ট্রিশ-চল্লিশ মাইল পর্যন্ত গাড়ী নিয়ে

ঘোরাঘুরি করেন। সম্ভ্রম ফেরবার পথে পার্ক স্ট্রীটের একটা বারের সামনে ঘণ্টাখানেক দাঁড়াতে হয়, তারপর থেকেই হেল্ অ্যান্ড হার্ট—একেবারে রাত এগারোটা পর্যন্ত।

এ সব প্রভাতের আপত্তি নেই। কিন্তু বার থেকে বেরিয়ে কোনো কোনো-দিন যখন এক-আধটু মদু আসে, তখন গাড়ীটাকে আস্তে আস্তে চালাবার অনুমতি দেয় কাজীলাল-সাহেব। এসে বসেন প্রভাতের পাশে।

—আমরা কোয়েকাররা কী চাই? পীস অ্যান্ড প্রোগ্রেস। সত্য আর শান্তির জন্যে প্রাণ দিতে পারি। তাই অল্ড ওভার দ্য ওয়াল্ড—আমরা এক-সূত্রে গাঁথা—এ হ্যাপি ফ্যামিলি। একবার ল্যান্ডানে এক বাঙালী ডাক্তার বন্ধু আমায় নিমন্ত্রণ করলে, বললে ইন্ডিয়ান ডিস খাওয়াব। চার বছর ধরে একটানা সেম্ব খাচ্ছি—ন্যাচারালি ভারী লোভ হ়ল। গেলুম ব্র্যাডফোর্ডে তাঁর বাসায়। গলদা চিড়ির কারী খাওয়ালে—যেমন



এই দুপুর রোদে কোথায় বেরিয়েছিল অমিয়?

তখন দেশের কথা, বিশ্বমানবতার কথা ভেবে তাঁর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে যায়। প্রভাতের সঙ্গেই তিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আলাপ শুরু করে দেন। ‘বস’ হয়েও যে তাঁর কোনো ভ্যানিটি নেই, তিনি যে সত্যি সত্যি মেন্টাল ডি-ক্লাসড—এইটেই প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

—ডু য়া নো—আমি একজন কোয়েকার?

কোয়েকার কথার অর্থ প্রভাত সরকার জানে না। শুনতে থাকে কান পেতে।

স্পাইসেস, তেমনি পেপার—সেই টিপি-ক্যাল আন্-হাইজেনিক বেগলী কুকিং! বাড়ী ফিরে পেটে ঘন্থা—এক্সক্লু-শিয়েটিং! ডক্টর নিকলসকে কল দিলুম। আলাপ হতে হতে যেই শুনল, আই অ্যাম এ কোয়েকার—আমনি দু হাতে জড়িয়ে ধরলে আমায়। বললে, য়া আর মাই ব্রাদার। ব্যাস—নিয়ে গেল পার্সো-ন্যাল নার্সিং হোমে। কী অ্যাটেডান্স! ল্যান্ডান ছেড়ে আসবার সময় হি অ্যাক-চুয়ালি ওয়েপট!

রূপকথার গল্পের মতো শুনতে থাকে প্রভাত সরকার, একবার আড়

চোখে তাকিয়ে দেখে কর্তার দিকে। ফিকে নীল লেনসের নীচে কাজিলাল-সাহেবের চোখেও ভাবের অশ্রু দেখা দিয়েছে বলে সন্দেহ হয় তার।

—ট্রাই টু লাভ ম্যান—মানুষকে ভালোবাসতে শেখো। কেন পলিটিস্ক—কেন লেবার আনরেস্ট—কেন এ সব বাম্ভা প্রোসেশন? স্ট্রাগল—বিটারনেস—আনরেস্ট। কোথাও শান্তি আছে পৃথিবীতে? ক্যাপিটালিস্ট দেশে, কম্যুনিষ্ট কান্ট্রিতে? পীসফুল কো-এক্জিস্টেন্স? অল রাইট—খুব ভালো কথা। কিন্তু নিউক্লিয়ার ব্যানিং নিয়ে একটার পর একটা সানিট টক শেষ পর্যন্ত ফিস্যাস্কা—ডেমোক্রসের সোর্ডের মতো খাড়া ওয়াল্ড ওয়ার পৃথিবীর মাথার ওপর বড়লছে। কী করছ তোমরা সবাই মিলে—সায়েন্টিস্টস—পোলিটি-শ্যানস—থিংকারস? আই ডিম্যান্ড অ্যান আনসার!

‘আনসারটা সারা পৃথিবীর কাছেই দাবী করেন, কিন্তু নীলচে চশমার মধ্য দিয়ে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে থাকেন প্রভাতের দিকেই। বলা বাহুল্য, প্রভাত জবাব দিতে পারে না; নিজেকেই অপরাধী ঠিক করে নিয়ে নীরবে গাড়ী চালাতে থাকে।

—আসল কথা কী জানো? লোভ—মাকে বলে গ্রীড। ক্যাপিটালিস্ট ভাবে লেবারকে কত ঠকাতে পারি, লেবার ভাবে—কত কম সার্ভিস দিয়ে কত আদায় করে নিতে পারি। ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি চায় কলোনিয়াল মার্কেটে বেপারেরা লাটুতরাজ, কম্যুনিষ্ট জারেন্টরা চায় সোস্যালিস্ট ইম্পিরিয়া-লিজম—লুক অ্যাট চায়না!

চাঁনের দিকে কাজিলাল-সাহেব প্রভাতকে তাকাতে বলেন। প্রভাত সেটাকে চোখের সামনে দেখতে পায় না—গাড়ী থামিয়ে ট্রাফিকের সংকেত লক্ষ্য করে।

চোখটা বোধ হয় ভিজ়েই গেছে, চশমা খুলে কাজিলাল-সাহেব চোখ মোছেন। একবার খাঁকারি দিয়ে গলাটাকে পরিষ্কার করে নেন একটুখানি। তারপর সোজাসুজি প্রশ্ন করেন প্রভাতকে।

—এ সম্পর্কে কী আইডীয়া তোমার?

প্রভাত বিব্রত হয়। নীল আলোর নিশানায় গাড়ীটাকে এগিয়ে দিয়ে বলে, আজ্ঞে কিছু ভেবে দেখিনি।

—ভাবো—ভাবো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমাকে একটা কংক্রীট উদাহরণ দিই।—কাজিলাল-সাহেব চুরট ধরান : কলকাতায় ভিড় কি রকম দেখেছ? রাস্তা দিয়ে চলা পর্যন্ত যায় না—বাতাস আনরেদেবল। ফ্যাক্ট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পার্টিশনের ফলে অনেক লোক এসে পড়েছে, তাই—

—দেয়ার—দেয়ার—

কাজিলাল-সাহেব প্রভাতকে থামিয়ে দেন : সেই কথাই বলছি। পার্টিশনের ফলে অনেক লোক এসে পড়েছে কলকাতায়। কিন্তু কলকাতায় কেন? ধুলো-ধোঁয়া-ভিড়। একটু খোলা জায়গা নেই—এতটুকু আকাশ নেই—নট এ প্যাচ অফ গ্রীন। এর মধ্যে পিগারির শয়োর-দের মতো গুঁতোগুঁতি করে মরা কেন? অথচ কলকাতার আশে-পাশে খোলা জায়গা রয়েছে—সুবার্বে না হোক—আর একটু দূরে গিয়ে সেটল করো। ফ্রেশ এয়ার, ফ্রেশ ভেজিটেবল। তা নয়—কলকাতায় এসেই ভিড় করা চাই। কেন? সেই গ্রীড! কলকাতায় কুকুরের মতো মাটি কামড়ে থাকলেও পয়সা আসবে—এই স্বপ্ন!

—থাকে অনেকেই তো কলোনীতে—

—ইয়েস—ইয়েস, আই নো। কিন্তু কলোনী করলেই তো হয় না। দৃষ্টি-ভিঙটাই বদলাতে হবে আগাগোড়া। চাষবাস করো, বন্যা মাটিতে ফসল ফলাও—সোনার বাংলা তৈরী করো। যাই হোক—উদ্ভাস্তুদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, অনেক প্রবলেম আছে তাদের। কিন্তু হোয়াট অ্যাভাউট ইয়োর সিডল ক্লাস? কলকাতার গলির একতলাতে দুটো ডাম্প ঘর ভাড়া নিয়ে পলেরো-জন লোক এক সংগে থাক—ডাউট অ্যান্ড ডিজিজ। অথচ একটু দূরে গিয়ে—ন্যাচারাল সারাইন্ডংয়ে বাস করলে—

এর মধ্যে গাড়ীটা বাড়ীর সামনে এসে পেঁজোর, বাধ্য হয়ে সারগভ আলোচনাটা বন্ধ করতে হয় কাজিলাল-সাহেবকে। কিন্তু প্রভাত বুঝতে পেরেছে, আপাতদৃষ্টিতে কড়া এফি-শিয়েন্ট, চাকরীগত প্রাণ কাজিলাল-সাহেব আসলে দেশপ্রেমিক এবং বিশ্ব-প্রেমিক। মানুষের হিতের জন্যে সময় পেলেই তিনি চিন্তা করেন। ‘কিন্তু য়া নো’—এক সময় নিজেই দ্বিধা করে বলেছেন, ‘লীডার্স যদি য়ুময়ে থাকেন—য়াম এ মাল ম্যান—আমি কী করতে পারি।’ প্রভাত মধ্যে মধ্যে ভাবে, চাকরী-

বাকরী ছেড়ে দিয়ে কেন ইলেকশনে দাঁড়ান না কাজিলাল-সাহেব?

আজও তিনি কম্যুনিটি প্রোজেক্ট-এর ব্যর্থতা সম্পর্কে কী সব মৌলিক আলোচনা করছিলেন, কিন্তু একটা কথাও কানে যাচ্ছিল না প্রভাতের। চিন্তাটা ঘুরছিল দীপ্ত আর অমিয়কে ঘিরে ঘিরে। দীপ্ত ওভার-টাইম খেটে সংসারে অল্প-বিস্তর স্বাচ্ছন্দ্য আনে—অমিয় চন্দন সিংয়ের ট্যাক্সির ব্যবসায় ঢুকে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু আলো আর আলোয়া পাশাপাশি জ্বলছে এই কলকাতায়। একবার ভুল করলে কী নিদারুণভাবে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়—প্রাইভেট ড্রাইভার প্রভাত সরকার তা যে একবারেই জানে না, তা নয়।

কাজিলাল-সাহেব ভেতরে উঠে যাবার পর, স্ট্রিয়ারিঙে মাথা রেখে প্রভাত চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। বাড়ীর সামনে খানিকটা অংশ সদা পাথরের কাঁকর ছড়ানো, তারপর দুধার দিয়ে বাগান। কতগুলো ফুলের ঝাড়, ক্রোটন, পাম আর ঝাউ গাছ। দুটো গাছে ম্যাগনোলিয়া ফটে রয়েছে কিছুর কিছু—দক্ষিণের হাওয়ায় তার গন্ধ আনছে। ভোর রাতের সেই বৃষ্টিটার পর আজকের বাতাস যেন একটু ঠান্ডা—অন্তত গুরুদয় রোডের এই বাড়ীতে বৈশাখী সন্ধ্যা বসন্তের ছোঁয়া মেখেছে।

প্রভাতের কিম্বদীনি আসিচ্ছিল। এমনি ঝাড়য়ের শব্দ, এমনি ছায়া—এই রকম য়মে জড়ানো ঠান্ডা হাওয়ায় ম্যাগ-নোলিয়ার গন্ধ। কত শান্তি, কত বিশ্রাম, কী স্নিগ্ধতা! কিন্তু নারকেলডাঙ্গার গলিতে এ ছায়া কোথাও নেই—এ বিশ্রাম সেখানে কোনোদিন পাওয়া যাবে না। এখানে বসে বিশ্বপ্রেমের কথা ভাবতে ভালো লাগে, বসন্তের বাতাসে গা এলিয়ে দিয়ে দেশের জন্যে চোখের জল ফেলা যায়, কিন্তু—

খোয়ার ওপর দিয়ে জুতোর আওয়াজ। প্রভাত চোখ মেলল। কাজিলালের মেয়ে রিনি—যার ভালো নাম অরুণা। মনে পড়ল, কোথায় কোন বান্ধবীর জন্মদিনে যাওয়ার কথা আছে ওর।

প্রভাত বেরিয়ে এসে গাড়ীর দরজা খুলে ধরল। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিরক্তিভরে গাড়ীতে ঢুকল রিনি। ভুরু কুঁচকে বললে, ইস, সাড়ে সাতটা বেজে গেল।

—আজ্ঞে পার্ক স্ট্রীটে ঘন্টাখানেক দেরী হল বলেই—

বিরক্তিতে সুন্দর মুখখানা বিকৃত

করল রিনি : বাপির ওই এক রোগ! মালহোত্রার 'বারের' সামনে এলে আর মাথা ঠিক থাকে না। অথচ, আমি বলে দিয়েছি, পজিটিভাল সাতটার মধ্যে গাড়ীটা আমার চাই। হোপলেস!

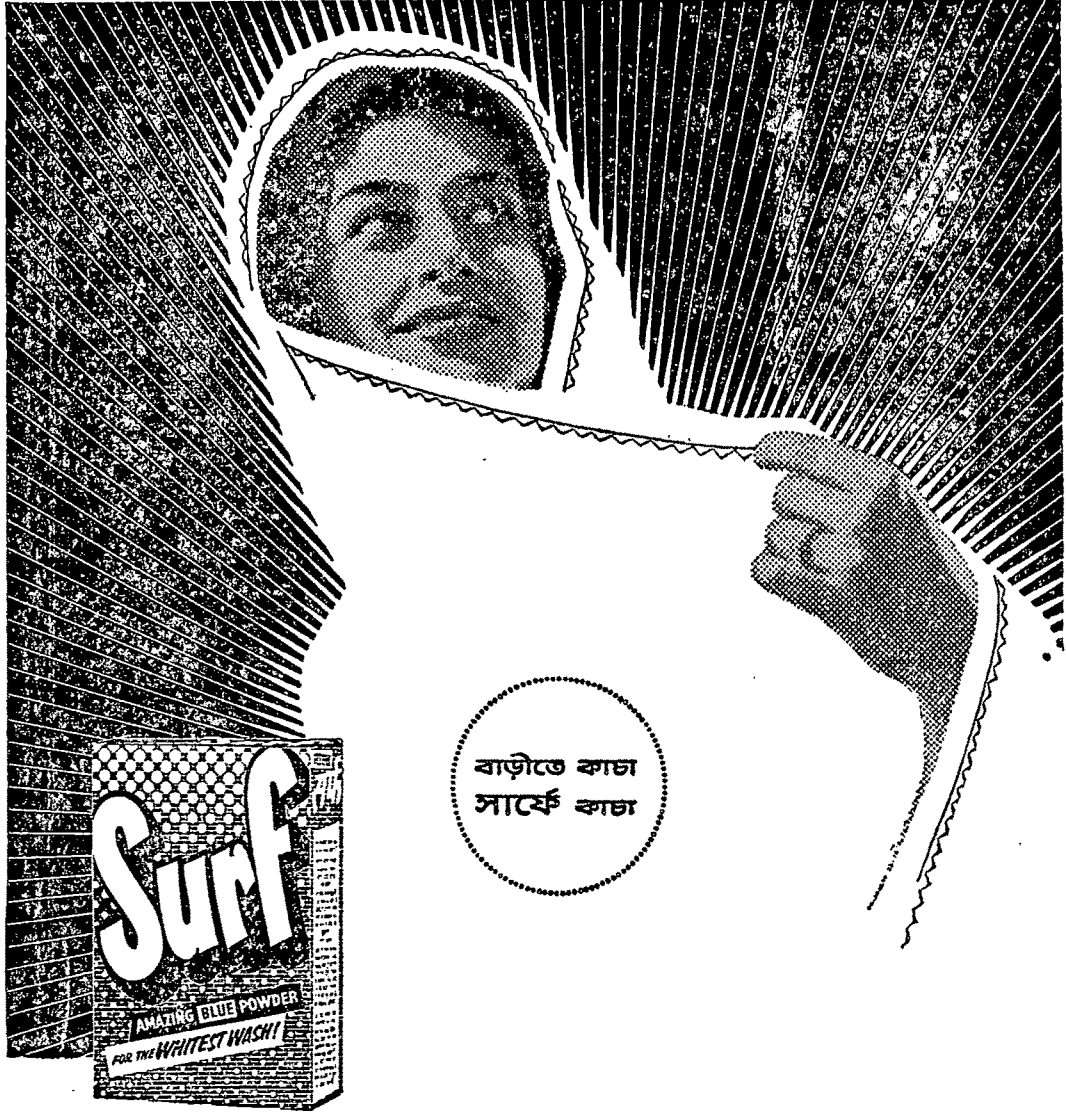
প্রভাত জবাব দিল না। এ-সব

পারিবারিক আলোচনায় তার কোনো ভূমিকা নেই।

গাড়ীটাকে ব্যাক করিয়ে রাস্তায় এনে নামালো সে। জিজ্ঞেস করল, কোথায় যেতে হবে?

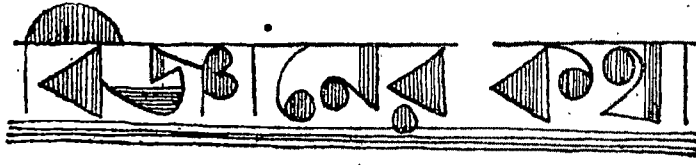
—নিউ আলিপদুর।

এতক্ষণে প্রভাত অনুমান করল কোথায় যেতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল একটা। আজকে বাড়ী ফিরতে রাত এগারোটোর আগে নয়। (ক্রমশঃ)



সব জামাকাপড়ই রোজ বাড়ীতে সার্ফে কাচুন—শাড়ী, ব্লাউজ, ধুতি, পাঞ্জাবী, সার্ট, প্যান্ট, ফ্রক, তোয়ালে। দেখবেন, কি পরিষ্কার কি ধবধবে ফরসা হবে! সার্ফে কাপড় কাচার অতুলনীয় শক্তি আছে, তাই সহজেই ফরসা করে কাচা হয়। বাড়ীতে কাপড় সবচেয়ে ধবধবে ফরসা করে কাচায় সার্ফের জুড়ী নেই! আজই সার্ফে কিছুন!

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়!



অল্পকাল

॥ প্লাস্টিকের যুগ ॥

এক প্রাচীন ভদ্রমহিলাকে প্লাস্টিকের একটি গয়না উপহার দেওয়া হয়েছিল। সোনার গহনায় অভ্যস্ত ভদ্রমহিলাটি প্লাস্টিকের গয়নাটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'এই প্লাস্টিক জিনিসটা তৈরি না হলেই ভালো হত। প্লাস্টিকের জিনিস আমার ছুঁতেও ঘেন্সা করে।'

ভদ্রমহিলা অবশ্য বলেই খালাস। সোনার গয়নার বদলে প্লাস্টিকের গয়না উপহার পেলে যে-কোনো ভদ্রমহিলাই হয়তো এমনি ধরণের মন্তব্য করবেন। কিন্তু এই ভদ্রমহিলাদের মনোবাসনা পূর্ণ করে আচমকা যদি সমস্ত প্লাস্টিক উধাও হয়ে যেত তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াতে দেখা যাক।

প্রথমেই সবচেয়ে ভয়াবহ যে ব্যাপারটি ঘটত তা হচ্ছে এই যে নাইলন-পরিহিতা তাঁর দুই আধুনিক কন্যাকে তিনি সর্বসমক্ষে বিবস্ত্রা হতে দেখতেন। এমন কি পায়ের শৌখিন চটিজোড়া পর্যন্ত অদৃশ্য হত। প্লাস্টিকের কাঁটার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে খোঁপার বাহার মিলিয়ে যেত নিম্নের মধ্যে। অন্য দিকে তিনি শূন্যে পেতেন অনেকগুলো কাঁচের গ্লাস বান বান শব্দে ভেঙে পড়ছে। তাঁরই নির্দেশে বাড়ির পরিচারিকা প্লাস্টিকের ট্রে-তে বসিয়ে কাঁচের গ্লাসে সরবৎ নিয়ে আসছিল। প্লাস্টিকের ট্রে অদৃশ্য হবার ফলে যা হবার তাই হয়েছে। তারপরে রেডিওর দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠতেন তিনি। রেডিওর অমন সুন্দর প্লাস্টিকের ক্যাবিনেটটি আর নেই—তিনি শূন্য দেখতে পাচ্ছেন চেনসে আঁটা কয়েকটি ভালু। টেলিফোনেরও একই দশা। ঘরের জানলা থেকে নাইলনের পর্দা উঠে গিয়েছে। ইলেকট্রিক সুইচের জায়গায় খাড়া হয়ে রয়েছে কয়েকটি ধাতুর পাত। আর গেমটা বাড়িটা অন্ধকার, কারণ ইলেকট্রিক তারের প্লাস্টিক ইন্সুলেশন আর নেই, তারে তারে ছোঁরা লেগে শর্ট-

সার্কিট হয়েছে। ইলেকট্রিক বাল্ব ও ফ্লুরোসেন্ট টিউবের চিহ্নমাত্র নেই; প্লাস্টিকের হোল্ডার অদৃশ্য হতেই সেগুলোর গতি হয়েছে কাঁচের গ্লাসের মতোই। ওদিকে বাড়ির বাচ্চারা তারস্বরে কান্না জুড়ে দিয়েছে কারণ তাদের খেলনা-গুলিকে (প্রায় সবই প্লাস্টিকে তৈরি) তারা আর খুঁজে পাচ্ছে না। আর খুব সম্ভবত ইলেকট্রিক ওয়্যারিং-এ শর্ট-সার্কিট হবার ফলে সারা বাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছে। প্রাচীন ভদ্রমহিলাটি নিজেও জানতেন না যে, তাঁর অনুমতি না নিয়েই তাঁর সাজানো-গোছানো সংসারে এমনভাবে প্লাস্টিকের আধিপত্য শূন্য হয়েছিল।

একটু ভেবে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব যে, আমাদের আধুনিক জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, আমরা অনেক সময়ে সে বিষয়ে সচেতন হবার অবসরটুকু পর্যন্ত পাই না। আমরা ধরেই নিই যে, এমনটিই হওয়া উচিত।

প্লাস্টিক অবশ্য নিতান্তই হালের আবিষ্কার। কিন্তু প্লাস্টিকের আগের যুগও সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি অবহিত ছিলাম না, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে সত্ত্বেও।

রবার—একটি অপরিহার্য উপকরণ

যেমন ধরা যাক, আজকের দিনে আমাদের কাছে আঁত মামুলী একটি জিনিস—রবার। আমি যদি বলি, রবার না থাকলে এমন কি এই প্লাস্টিকের যুগের পৃথিবীও অচল হয়ে যাবে—তাহলে কথটা মিথ্যে হবে না। কিন্তু আমরা যখন সাইকেলে চাপি বা মোটরে-ট্রেনে-জাহাজে-এরোপেনে দূরদেশে যাত্রা করি বা কোমরের যন্ত্রণায় হট-ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে বিছানায় শুই তখন একবারো ভাবি না যে এ ধরনের প্রত্যেকটি কাজে রবার আমাদের কতখানি সাহায্য করছে। পেন-

সিলের দাগ ওঠানো থেকে শুরু করে সুইচ টিপে ইলেকট্রিক বাতি জ্বালানো পর্যন্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক কর্মকাণ্ডেরই অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে রবার। আধুনিক যুগ রবারের চাকায় ভর দিয়ে চলছে—এমন কথা বললে অত্যাঙ্গ হয় না।

রবারের আবিষ্কার ও একটি আশ্চর্য জীবন

রবারের আবিষ্কার আসলে ঠিক আবিষ্কার নয় (যে-অর্থে প্লাস্টিকের আবিষ্কার একটি আবিষ্কার)—একটি সম্ভান-লাভ। ইউরোপের মানুষ প্রথম রবারের সম্ভান পায় ১৭৩৬ সালে। শার্ল মারি দ্য লা কোঁদামিন নামে একজন ফরাসী ভৌগোলিক হাজির হয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে। তিনিই প্রথম জানতে পারলেন যে, ব্রেজিলের আদিবাসীরা একধরনের গাছের নাম দিয়েছে 'কাঁদুনে গাছ'। এই গাছের কাণ্ডে কুড়ুলের ঘা মারলে সাদা দ্রবের মতো রস বেরিয়ে আসে। এই রস অল্প অঁচে জমিয়ে নিতে পারলেই তৈরি হয় এ'টেল' মাটির মতো জমাট একটা পদার্থ। এই পদার্থ দিয়ে মূর্তি তৈরি হতে পারে, বা নানা ধরনের পাত্র, বা এমন কি পায়ের জুতো।

ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কানে এই খবর পৌঁছবার পরে অনেকেই এই বিশেষ পদার্থটি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই যে ফললাভ হল তা নয়। শূন্য জানা গেল, কাগজের ওপর থেকে কালো লেড-পেনসিলের দাগ মুছে ফেলতে হলে এই পদার্থটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সেই থেকে পদার্থটির নামও হল 'রাবার'। ইংরেজি 'রাব' শব্দের অর্থ ঘষা আর ঘর্ষণকারী অর্থে 'রাবার'। এই ইংরেজি শব্দটিকেই বাঙালী ধাঁচে আমরা অকারান্ত করে নিয়েছি।

যাই হোক, এই প্রথম সোরগোল কেটে যাবার অনেক বছর পরে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রবারের জগতে একজন উদ্যোগী পুরুষের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেল। তিনি হচ্ছেন চার্লস ম্যাকিনটোশ—গ্লাসগোর একজন তরুণ রসায়নবিদ। তাঁর ছিল রঙ-তৈরির কারখানা। এই রঙ তৈরি করার সময়ে আনুষঙ্গিক একটি তেলও পাওয়া যেত, যাকে বলা হত 'ম্যাপথা'। ম্যাকিনটোশ

করলেন কি এই নাপথ্যের সঙ্গে কাঁচা রবার মিশিয়ে তাকে শূন্যে শূন্যে ঘন করে তুললেন। তারপরে তাঁর কি খেয়াল হল, দু'টুকরো কাপড়ে এই ঘন পদার্থটি লেপটে মাথিয়ে মুখে মুখে জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এভাবে নিতান্তই ঘটনাচক্রে তৈরি হয়ে গেল এমন একখণ্ড বস্ত্র যা জলপ্রবেশরোধক বা ওয়াটার-প্রুফ। ১৮২৩ সালে তিনি এই প্রক্রিয়াটির পেটেন্ট নিলেন এবং ম্যাকিনটোশ কোট তৈরি করার কারবার খুলে বসলেন। ইংরেজি ভাষায় নতুন একটি শব্দ চালু হয়ে গেল। ম্যাকিনটোশ বা জলপ্রবেশরোধক উপরের জামা।

ইতিমধ্যে আমেরিকাতেও রবারের প্রচলন শুরুর হয়েছিল। প্রথমে একটি এবং তার দেখাদেখি আরো কয়েকটি কারখানার পত্তন হল রবারের জিনিসপত্র তৈরি করার জন্যে। গোড়ার দিকে অবস্থা দেখে মনে হতে লাগল, রবারের কারবার ভালোই মনোফা তৈরি করবে।

কিন্তু বিপর্যয় দেখা দিল কয়েক বছরের মধ্যেই। আচমকা একটি উষ্ণ-প্রবাহ আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলল আর দেখা গেল যে রবারের তৈরি জিনিসগুলো কাদার মতো চটচটে হয়ে গিয়েছে। আবার আবহাওয়া যদি খুব বেশি ঠান্ডা হয় তাহলে রবারের তৈরি জিনিসগুলো খুব বেশি শক্ত হয়ে যায় আর অনায়াসেই তাতে ফাটল ধরে। রবার-শিল্প একটা ভরাডুবি মরুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

রবার-শিল্পের এই প্রাথমিক বিপর্যয়ের পটভূমিতে একজন আশ্চর্য মানুষের জীবন-কাহিনীও কান্নার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে।

মানুষটির নাম চার্লস গুডইয়ার। একটি সুপরিচিত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দৌলতে এই নামটি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু এই মানুষটি কোনো সময়েই ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তাঁর জীবন কেটেছিল চরম দারিদ্র্য এবং অবহেলা ও উপেক্ষার মধ্যে। কিন্তু অন্যদিকে অপরাঞ্জের অধ্যবসায় ও তিমিত্ত সাধনায় তিনি একটি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত।

১৮০০ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবার ছিল হরেক রকম টুকটাকি জিনিস তৈরির ছোট একটি কারখানা। ১৮১৬ থেকে ১৮২৬ পর্যন্ত তিনি বাবার এই কারখানাতেই কাজ করে-

ছিলেন। তাঁর জীবনের এই পর্বে উল্লেখ করার মতো ঘটনা কিছু নেই। তারপরে তিনি বাবার কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেই একটি লোহালক্কড়ের দোকান খুলে বসলেন। শুরুর হল স্বাধীন জীবিকাজনের প্রচেষ্টা এবং প্রায় একই সঙ্গে ব্যর্থতার পরে ব্যর্থতা।

স্বাধীন ব্যবসা চার বছরও টিকিয়ে রাখা গেল না। ধারে-দেনায় এমনভাবে ডুবলেন যে, বৌ ও পাঁচটি ছেলেমেয়েকে ভাগ্যের হাতে সঁপে কয়েক সপ্তাহের জন্যে কারাবাসে যেতে হল। পরের চার বছরেও এই একই ইতিহাস। নানা শহরে

উৎসাহিত হয়ে তিনি এই রবারের জিনিস নিয়েই মেতে উঠলেন।

কিন্তু এই সাফল্য খুবই ক্ষণস্থায়ী। ১৮৩৪ সালের যে উষ্ণপ্রবাহের কথা বলেছি, সেই উষ্ণপ্রবাহ এবারে তাঁর জীবনে দুর্ভাগ্যের রূপ নিয়ে দেখা দিল। ফলে আরো একবার (এবার নিয়ে ছ' বার) কারাবাস।

কিন্তু এবারকার কারাবাসের সময়ে তিনি অশ্রুত একটি কান্ড করে বসলেন। কারা-কক্ষে একটি গবেষণাগার স্থাপনের অনুমতি চেয়ে বসলেন কারা-



চার্লস গুডইয়ার

নানাভাবে ব্যবসা করার চেষ্টা ও শেষ পর্যন্ত কারাবাস। এমনি এক কারাবাসের পরে বোস্টনের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ নজরে পড়ল একটি দোকানের জানলায় রবারের প্রলেপ দেওয়া ক্যানভাসের জ্যাকেট সাজানো রয়েছে। জিনিসটিকে দেখে তাঁর মনে হল, চেষ্টা করলে তিনি আরো ভালো জিনিস তৈরি করতে পারেন। হলও তাই। সেই কোম্পানীর কাছেই তিনি আরো ভালো জিনিসের নমুনা হাজির করলেন। তারপরে নিজের সাফল্যে

কর্তৃপক্ষের কাছে। আবেদন মঞ্জুর হল এবং তিনি তাঁর গবেষণাগারটি সাজিয়ে বসলেন। আর গবেষণাগারটিও দেখবার মতো। একটা মাৰ্বেলের পাটাতন, একটা রোলিং-পিন, খানিকটা রবার ও কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ—এই ছিল তাঁর গবেষণাগারের মোট উপকরণ। এবং এই অপরূপ গবেষণাগারেই একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল। সেটি এই যে রবারের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়াম মেশালে রবারের উপরিভাগের চটচটে ভাবটা দূর করা যায়। তারপরে জেল থেকে ছাড়া

পাবার পরেই তিনি নিজস্ব 'কারখানা' খুলে বসলেন। অবশ্য কারখানাটি বসল বাড়ির রান্নাঘরেই আর বোঁ-ছেলে-মেয়েরাই হল কারখানার কর্মী। মহা উৎসাহে এই কারখানায় ম্যাগনেসিয়াম মেশানো রবারের জুতো তৈরি হতে লাগল। কিন্তু এবারেও তিনি দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। এবারকার দুর্ভাগ্য এল প্রতিবেশীদের প্রতিবাদের রূপ নিয়ে। রবার জবাল দেবার শব্দে প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু এই মানুষটি এত সহজে হিমবার পাত্র নন। বোঁ-ছেলেমেয়েদের একটি বোড়িং-হাউসে রেখে তিনি গিয়ে হাজির হলেন নিউইয়র্কে। আর সেখানে লোকালয় থেকে অনেক দূরে আবার খুলে বসলেন তাঁর কারখানা। এখানেই

তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি দেখলেন, রবারের সঙ্গে যদি নাইট্রিক অ্যাসিড মেশানো যায় তাহলে অনেকখানি উত্তাপেও রবার চটচটে হয় না। তখন এই নতুন প্রক্রিয়ায় তৈরি হতে লাগল রবারের জুতো ও আরো নানা জিনিস। নিজের সাফল্য সম্পর্কে তিনি এতই নিশ্চিত হলেন যে, বোঁ-ছেলেমেয়েদের চিঠি লিখলেন চলে আসবার জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হাজির হল আর্থিক মন্দার রূপ নিয়ে। আরেকবার তিনি একেবারে নিঃসম্বল হলেন।

পরের জীবন বোস্টনে। এখানেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। সাময়িক সাফল্য, তারপরেই বিপর্যয়। এই সময়ে তিনি নতুন আরেকটি পেশার সন্ধান পেলেন। রবারের সঙ্গে গন্ধক বা সালফার মিশিয়ে রোদে শুকিয়ে নিলে রবারের উত্তাপ সহ্য করার ক্ষমতা খুবই বেড়ে যায়। গুডইয়ার জানতেন না যে, রবারের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে তিনি যে সফল পেয়েছিলেন তাও একই কারণে। বাজারের নাইট্রিক অ্যাসিডে কিছু পরিমাণে সালফার থাকেই। আর এই সালফার থাকার জন্যেই তাঁর আগেরবারের সাফল্য।

ইতিমধ্যে পারিবারিক অশান্তি চরমে উঠেছে। স্ত্রী ক্লারিসা স্বামীর এই সমস্ত পাগলামি আর কিছুতেই সহ্য করতে রাজি নন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনবরত এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি। এমনি পরিস্থিতিতে একদিন গুডইয়ার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে রবারের সঙ্গে সালফার মিশিয়ে পরখ করে দেখছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ স্ত্রীর ফিরে আসার পায়ে শব্দ পাওয়া গেল। গুডইয়ার করলেন কি, আর কোনো জায়গা না পেয়ে রবার ও সালফারের পিণ্ডটিকে

গুঁজে দিলেন উনুনের মধ্যে। স্ত্রী হয়তো ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন কিন্তু মূখে কিছু বলেননি। তারপরে স্ত্রী আবার বেরিয়ে যেতেই গুডইয়ার উনুনের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকে নাড়া দিয়ে প্রচণ্ড একটি উল্লাসের ধ্বনি বেরিয়ে এল। উনুনের জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে রয়েছে বলসে যাওয়া এক টুকরো রবার—শক্ত, নীরেট। যে উষ্ণপ্রবাহ রবারের এত বড়ো শত্রু সেই শত্রুই কিনা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল আরো বেশি উত্তাপের কাছে। অবশ্যই শত্রু উত্তাপ নয়, সালফার বা গন্ধকের উপস্থিতি টুকুও চাই।

এতদিনে পথের শেষ চোখের সামনে ভেসে উঠল যেন। শত্রু হল উন্মত্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অন্য কোনো দিকে আর তাঁর হৃদয় রইল না। সবাই মনে করতে লাগল যে তিনি পুরোপুরি পাগল হয়েছেন।

এদিকে পরিবারের অবস্থা প্রায় রাস্তার ভিখারির মতো। বিক্রি করার মতো আসবাবও আর কিছু নেই।

কিন্তু গুডইয়ার তাঁর লক্ষ্যে আবিচল। নিজের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে তিনি আবারও এলেন বোস্টনে ভাগ্যপরীক্ষা করতে। কিন্তু হোটেলের বিল শোধ করতে না পারার জন্যে আবার তাঁকে জেলে যেতে হল। ছাড়া পেয়ে তিনি পায়ে হেঁটে বাড়িতে ফিরে এলেন। দুর্ভাগ্য এল তাঁর পেছনে পেছনে। বাড়িতে পৌঁছে তিনি দেখলেন তাঁর ছোট ছেলেটি মারা গেছে।

তারপরেও এই আশ্চর্য মানুষটি ভেঙে পড়েনি। লন্ডনে ও ফ্রান্সে গিয়েছিলেন পেটেন্ট সংগ্রহ করতে। ফ্রান্সে প্রদর্শনী করতে গিয়ে প্রদর্শনীর জায়গার ভাড়া দিতে না পারার জন্যে আরো একবার তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভেঙে পড়েননি।

১৮৬০ সালের ৩০শে জুন তারিখে তিনি ছিলেন নিউইয়র্কে। খবর এল তাঁর মেয়েটি মারা গেছে। এই খবরটি পাবার পরে তিনি আর মাত্র একদিন বেঁচে ছিলেন। অবজ্ঞা ও উপেক্ষার মধ্যে তাঁর অখ্যাত মৃত্যু।

তাঁর মৃত্যুর আঠাশ বছর পরে একটি টায়ার ও রবার কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—যার নামের সঙ্গে তাঁরই নাম যুক্ত।



সালসা ভিটল

স্ত্রী ও পুরুষের শারিরীক দুর্বলতা, অকাল বার্ধক্য, শক্তিহীনতা প্রভৃতি হইতে মুক্তি দিয়া দুর্বল স্নায়ু-মণ্ডলীকে সর্বল সতত্ত্ব করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করে। মূল্য ৫, সকল প্রকার স্ত্রীরোগ চিকিৎসা কেন্দ্র

ইউনানী ড্রাগ হাউস

১৮, সূর্য সেন স্ট্রীট,
কলিকতা-১২

কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখে দোতলা

আসল গ্রহরত্ন

রাবির জন্যে—পদ্মরাগমণি (হুনি), চন্দের জন্যে—শ্বেতমুদ্রা বা চন্দ্রকান্তমণি, মংগলের জন্যে—প্রবালরত্ন বা অনুরাগমণি, বুধের জন্যে—মরকতমণি (পাম্মা), বৃহস্পতির জন্যে—পীতপদ্মরাগমণি, শুক্রের জন্যে—হীরক বা বরুণমণি, শনির জন্যে—নীলকান্তমণি বা সন্ধ্যামণি, রাহুর জন্যে—গোমেদকমণি, কেতুর জন্যে—বৈদূর্যমণি বা রাজপট।

আমাদের গ্রহরত্ন জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া অফিসের পরীক্ষার অধীনে প্রমাণিত হইলে ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।

আসল গ্রহরত্ন ব্যবসায়ী

এম, গি, জুয়েলার্স

১, বিবেকানন্দ রোড (চিংপুর জং), কলিঃ-৭, ফোনঃ ৩০-৩৭৬৬

দীঘা শঙ্কর নারায়ণ জেন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীঘা সমুদ্র-সৈকতের উন্নয়ন ও বসতি লইয়া বহু জল্পনা-কল্পনা কিছুকাল ধরিয়৷ করিতেছেন। যাতায়াতের অসুবিধাই হইল প্রধান অন্তরায়, অন্ততঃ সাধারণ লোক তাহাই বন্ধিতেছে। ট্রেনে খড়গপুর পর্যন্ত গিয়া তারপর বাস ধরিতে হয়। সুতরাং যাহারা শিশুদের লইয়া যাইবার কথা চিন্তা করেন তাহাদের হৃদয় সম্পূর্ণ হওয়া শব্দ আশ্চর্য নয়, স্বাভাবিক। মালপত্র লইয়া বাসে যাওয়া এবং আরামে বসিয়া যাওয়া এদেশে বর্তমানে চিন্তাও করা যায় না। আমিও মানা করিব। কিন্তু মোটরে যাওয়ার কোনও বাধা নেই এবং রাস্তা মোটামুটি ভালই। অবস্থা-সম্পন্ন ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ ছটিতে সমুদ্রস্নান ও আনন্দ করিতে সমুদ্র-সৈকতে গিয়া থাকেন এবং তাহাদের পিছন পিছন ধীরে ধীরে সাধারণ ব্যক্তিরাও যাইতে শুরু করেন। এইরূপ করিয়াই সমুদ্রসৈকতে শহর গড়িয়া উঠে। সুতরাং মোটরে যাইতে বাধা কি?

গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়৷ দুর্গাপুর বারাজ পার হইয়া বাঁকুড়া যাওয়া অতি সহজ। দুর্গত ১৪১ মাইল এবং চারি ঘণ্টার বেশী লাগে না। দুর্গাপুরের পর হইতে রাস্তা দীঘা পর্যন্ত বেশ ফাঁকা থাকে এবং জোরে চলাইতে অসুবিধা কিছু নাই। ট্রাকের উপাং নাই বিশেষ। বাঁকুড়া হইতে খড়গপুর ৫ মাইল, মেদিনীপুরকে দক্ষিণে রাখিয়া বাহিরের রাস্তা ধরিয়৷ চলিয়া যাওয়া যায়। খড়গপুর হইতে বেলেদা ২০ মাইল এবং চমৎকার রাস্তা। সেখান হইতে কাঁথি পার হইয়া দীঘা ৫৫ মাইল এবং রাস্তা ভালই। এ রাস্তা আগে খারাপ হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানে সম্পূর্ণ মেরামত হইয়া গিয়াছে। মোট হইল ২৮১ মাইল।

এই ২৮১ মাইল যাইতে বিশেষ দেরী হয় না। কারণ দুর্গাপুরের পর হইতে, আগেই বলিয়াছি, রাস্তায় বিশেষ ভিড় নাই। সকাল ৭টায় ছাড়িলে, পথে গাছতলায় খাওয়া-দাওয়া করিয়া, পরমা-নন্দে সন্ধ্যা ৫।৬টায় দীঘা পৌঁছানো চলে, কলিকাতা হইতে। পথে পশ্চিম-বঙ্গের ছোট ছোট প্রাচীন শহরগুলি পড়ে যেমন, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, গড়বেতা,

শালবনী, দাঁতন, জলেশ্বর, কাঁথী ইত্যাদি। অনেকের ইহাও ভাল লাগবে। রাস্তার বহু জায়গা ও দৃশ্য অতিশয় মনোরম।

দীঘায় বাড়ীঘর বিশেষ নাই। কয়েকজন মাত্র লোকের নিজস্ব বাড়ী আছে তাহা তাহারা নিজেরাই ভোগ করেন। সুতরাং বাড়ী ভাড়া করিয়া দীঘায় থাকার কোনও প্রশ্নই উঠে না। সরকারের সড়ক বিভাগ এক উগ্র আধুনিক বাংলা করিয়াছেন এবং যাহা খরচ করিয়াছেন তাহাতে অন্ততঃ কার্যো-পযোগী ছয়খানা বাড়ী ঐ খরচে করা যাইত। যাহারা সরকারের পদস্থ কর্মচারী নহেন এবং যাহারা পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েটের মাতঙ্গবদিগকে ধরাধরি করার কৌশল জানেন না, তাহাদের পক্ষে ঐ বাংলার থাকিবার চেষ্টা করা বা বাসনা রাখা বাতুলতা মাত্র। সর্বদাই কোনও পদস্থ অফিসার বা মাতঙ্গবর ব্যক্তি মাথা ঠান্ডা করিবার জন্য একলাই সমগ্র বাংলা লইয়া ওখানে থাকেন। আর একটি সেচ্-বিভাগের বাংলা আছে। তাহার চমক নাই কিন্তু তাহাও দুঃপ্রাপ্য।

সাধারণ লোকদের থাকিবার জন্য মেসের মত একটি হোটেল আছে তাহার নাম “কাফেটারিয়া”। এইখানে তত্তাপোশ ও দু’একখানা ভাঙা চেয়ার দেওয়া হয়, মেসের ভাত, ডাল ইত্যাদি অতিসাধারণ ভোজ্য বিক্রয় করা হয়। রান্না অতিশয় কদর্য ও নোংরা, লাললঙ্কা ভিন্ন কোনও আর আস্বাদ থাকে না। ১৫০ হইতে ২০০ টাকার মাসিক রোজগার যাহাদের তাহারা এখানে থাকিতে পারেন। আর একটি নামমাত্র হোটেল আছে এক টিনের ঢালায়। উহাও সমশ্রেণীর। “কাফে-

টারিয়া” মেইন বাড়ীর দোতলায় পশ্চিম-বঙ্গ কোঅপারেটিভের দুইখান ঘর আছে, তাহা ভাড়া পাওয়া যায়। প্রতি ঘরের ভাড়া দৈনিক বারো টাকা। অতিশয় জরাজীর্ণ অবস্থা। কিছু নড়বড়ে ভাঙা-চোরা আসবাব আছে। একমাত্র আধুনিকতা আছে সংলগ্ন বাথরুমে। খাদ্য নীচের কাফেটারিয়া পাঠাইয়া দেয়। উপরোক্ত এই জায়গাগুলির কোথাও যাহারা মোটর লইয়া যাইবেন তাহারা একদিনের বেশী থাকিতে পারিবেন না। আমি প্রত্যেককে মানা করিব যেন তাহারা সে চেষ্টা না করেন এবং যদি একান্তই যান সঙ্গে শিশুদের যেন কখনও না লইয়া যান। এ অখাদ্য তাহাদের এক-বেলাও সহ্য হইবে না।

ইহা ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকার “টেনেমেন্ট” নাম দিয়া এককামরা-বিশিষ্ট চারখান ও দু’কামরাবিশিষ্ট পাঁচখান দেশলাইয়ের বাজর মত একতলা বাড়ী করিয়াছেন। এগুলি নতুন, আবাবাপত্র আছে, রান্না করিবার বাসন-পত্র আছে, খাইবার পাত্রও সব আছে। পাঁচ ছয় টাকা দৈনিক ভাড়া হিসাবে

জীবনন্দ ভট্টাচার্যের
মধু-গোস্বামী ২৫০

শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাসগুলির অন্যতম
গোপালকৃষ্ণ ভাস্করের
ছদ্মনাম (চিন্তাশীল
উপন্যাস) ৪৫০

একটি অনবদ্য জীবন-কথা
সুপারন্যাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
“শরৎচন্দ্রের জীবনের
একাদক” ৩৫০

দি বুক হাউস
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

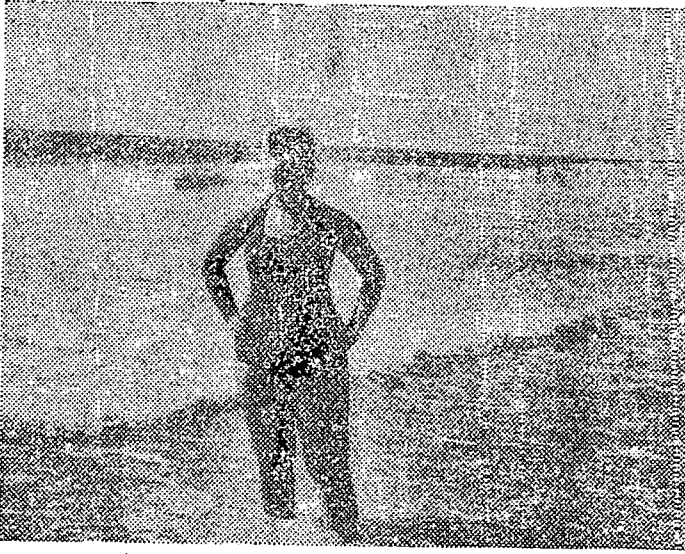


কেশু

ডেমজ কেশ তৈল

নিখার ট্রা কলিকাতা





পূরীর সমুদ্র

এগুলি সুন্দর স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু কয়টাই বা লোক সেখানে থাকিতে পারিবে? গরমের সময় সর্বদাই ভর্তি থাকে এইসব বাড়ী এবং এক একজন বহুদিন থাকেন। এখানে রান্নাবাড়ী নিজেরদের করিতে হয়। ইহা ভিন্ন দীঘায় থাকিবার কোনও জায়গা নাই। খানচারেক দৃষ্টিকটু একতলা দোকান ঘরের মত ঘর করা হইয়াছে তাহাতে নাকি অসুস্থ প্রাণিকও কেমনায়া থাকিবে না। যে স্থানে করা হইয়াছে, তাহা দীঘার শ্রেষ্ঠাংশের লাইনে। ইহা সমীচীন হয় নাই।

দীঘার কথা বলিতে গেলে খুবই স্বাভাবিক পূরীর কথা মনে পড়িবে। সাধারণ ব্যক্তিরা যাঁহারা দীঘা যান নাই তাঁহারা প্রশ্ন করিবেন কোনটি ভাল? তুলনামূলক প্রশ্ন পূরীর সহিত দীঘার হইতে পারে না। পূরী বিশাল শহর—দীঘা একটি গণ্ডগাম। হাতে গুণিতে পারা যায় দীঘার কয়খানি বাড়ী আছে। হঠাৎ অসুখ বিসুখ হইলে দীঘায়

ভগবান ভরসা ভিন্ন কিছুই করিবার নাই। দীঘায় একখানি রিক্সা পর্যন্ত নাই। সমুদ্রের তুলনা করিলে বলিব পূরীর সমুদ্র দুর্দান্ত ও উজ্জল, দীঘার সমুদ্রও চক্ৰবালে মিলিয়া যায় কিন্তু শান্ত ও দুর্বল। পূরীতে জলে নামিলেই চেউয়ের সঙ্গে লড়াই করিতে হয়। দীঘায় আধ মাইল ভিতরে হাঁটিয়া গেলে বুক পর্যন্ত জল পাওয়া যায়। চেউ আতিশয় সামান্য এবং টান বিশেষ কিছু নাই। সামান্যিক জীব দীঘাতে পাড়ের কাছে পূরী হইতে অনেক বেশী। বিশেষ করিয়া সংকর মৎস্য। ইহাতে একটু নজর রাখিয়া স্নান করা কত বা। দীঘার জল কিণ্ডং ক্রেদাঙ্ক, পূরীর মত নীল নয়

কিন্তু দীঘায় একটি জিনিস আছে তাহা ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। ইহা দীঘার সমুদ্রসৈকত বা তট, অর্থাৎ “বীচ”। এই অপূর্ণ বীচ ভোগ করিবার লোক নাই, ইহা পরম দুঃখের কথা। সমুদ্রসৈকতের জল গড়াইয়া

আসিয়া মোটরের চাকায় লাগিতে থাকে আর গাড়ী ৬০ মাইল ঘণ্টায় মহানন্দে চালানো যায়। এমনি দশ হাত জলের ভিতর গিয়াও গাড়ী কিনারা ধরিয়া চালানো যায়। চাকা কখনও বসিয়া যায় না। এইরূপ কঠিন বালুকাময় অথচ মসৃণ “বীচ” আমি যুরোপ ও আমেরিকায়ও কখনও দেখি নাই। শূন্যিয়াছি দক্ষিণ আমেরিকায় আছে। ইহার কারণ দীঘার বালুকাতে মাটির মিশ্রণ আছে যথেষ্ট। এই সমুদ্রতটে ফুটবল হকি ইত্যাদি মহোৎসবে খেলা যায়। পরম আনন্দে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া বেড়ানো যায়। পূরীর মত দুঃসাধ্য বালুকার ভিতর হাঁটা নয় এবং খালিপায়ে হাঁটিতে হয় না। যাঁহারা পায়েহাঁটার ভক্ত দীঘাতে প্রাতঃ ও সাধ্য-ভ্রমণ তাঁহাদের অতি আনন্দদায়ক হইবে।

একটি কথা না বলিয়া পারির্ভেছি না। দীঘার সৈকত অশ্বারোহণ আনন্দের জন্যই যেন ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন। “রাইডিং” সভা সমাজের এক বিশিষ্ট ক্রীড়া ও ব্যায়াম এবং কলিকাতায় ইহা প্রায় অসম্ভব। মুন্সিমেয় কয়েকজন রেনকোর্সে ও ময়দানে বন্দোবস্ত করিয়া এ আনন্দ প্রাতঃকালে উপভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাহা যৎসামান্য আনন্দ। দীঘায় এ আনন্দের উন্মুক্ত প্রাপ্তি পড়িয়া আছে। মাইলের পর মাইল ভেলভেটের ন্যায় মসৃণ ও নরম বালুরতটে মনের আনন্দে “রাইডিং” করা চলে। শিক্ষার্থীরা পড়িয়া গেলে হাত পা ভাঙিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তট ঘোড়ার পা বসিয়া যাইবার মত নরম নয় অথচ হাত পা ভাঙিবার মত কঠিনও নয়। এ এক আশ্চর্য সমুদ্রসৈকত। আমি আশা করি অদূর ভবিষ্যতে দীঘায় “রাইডিং ক্লাব” অথবা “স্কুল” কোনও চিন্তাশীল উদ্যোগী ব্যক্তি বা সরকার খুলিতে শ্রমসাধ্য করিবেন না। বড় হোটেল যদি কেহ করেন, তিনি যেন “রাইডিং”কে বাদ না দেন।

কলিকাতার “টাক্স ক্লাব”, যাঁহারা রেস পরিচালনা করেন তাঁহাদের গ্রীষ্ম-বকাশ বাপনের জন্য ঘোড়ার আস্তাবল রাঁচীর পাহাড়ে আছে। এ স্থান গরমে এমন কিছু ঠান্ডাও নহে এবং ঘোড়ার ব্যায়ামের জন্য জায়গাও বিশেষ নাই। কুলে দামী এবং ভাল ঘোড়ারা যান

অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা ক্রেতাদের জন্য
আমাদের আর একটি নতুন কেন্দ্র

৭নং পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা-১

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

বাংলালোরে গ্রীষ্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য। তাহার খরচ নিতান্ত সামান্য নহে এবং দুরূহ যথেষ্ট। এই গ্রীষ্মাবকাশের আস্তাবল যদি দীঘায় করা যায়, তাহা হইলে বহু কারণে ইহা জনপ্রিয় হইবে। ঘোর গরমেও দীঘা ৯০° ডিগ্রি ফাঃ হাঃ'র বেশী হয় না এবং আস্তাবল যদি ঝাড়ুয়ের শান্তশীতল ছায়ায় করা যায়, যেখানে রৌদ্র পর্যন্ত ঢোকে না, আস্তাবলের উষ্ণতা ৭৫।৮০ ফাঃ হাঃ'র বেশী কখনও হইবে না। কারণ, রৌদ্র নাই অথচ শীতল সমুদ্রের হাওয়া সর্বক্ষণ থাকিবে। ঘোড়ার ব্যায়ামের জন্য ট্রাকের দরকার নাই, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ট্রাক অল্পে পড়িয়া আছে। যে সব বেতো ঘোড়া পায়ের ব্যায়ামে অকেজো হইয়া যায় ও তাহাদের গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হয়, তাহারা দীঘার শান্ত সমুদ্রের জলে ছোট্টাছুটি করিয়া নবযৌবন লাভ করিবে। আমি অনেক ঘোড়ার ট্রেনারের মধ্যে দুঃখের সহিত শুনিয়াছি যে “যদি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের নোনা জলে এক সাতাই ছোটাইতে পারিতাম, তাহা হইলে উহকে আজ গুলী করিয়া মারিতে হইত না।” আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও রয়াল ক্যালকাটা টার্ম ক্লাবের কতৃপক্ষদের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঘোড়া দৃষ্টান্তে খড়্গপদুর পৌছাইবে ট্রেণে সেখান হইতে “হর্সমোটর ভ্যানে” তিন ঘণ্টার ভিতর দীঘায় পৌছাইয়া যাইবে। চারিখান “হর্সমোটর ভ্যান” সময়কালে



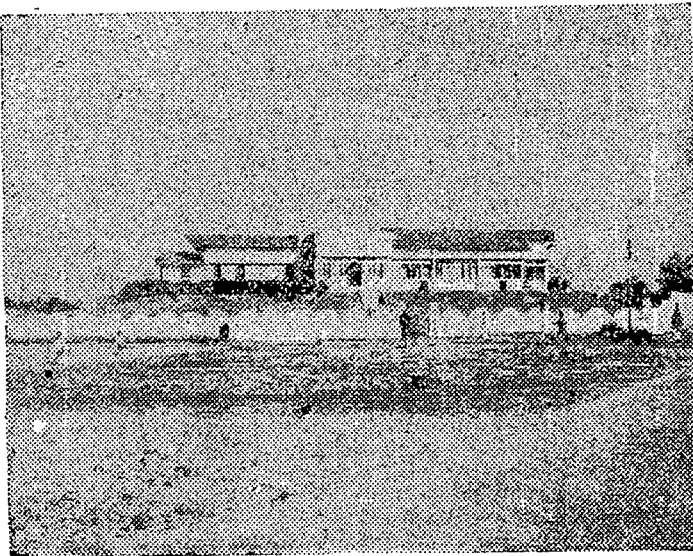
দীঘার সমুদ্র

খড়্গপদুরে মোতায়েন রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

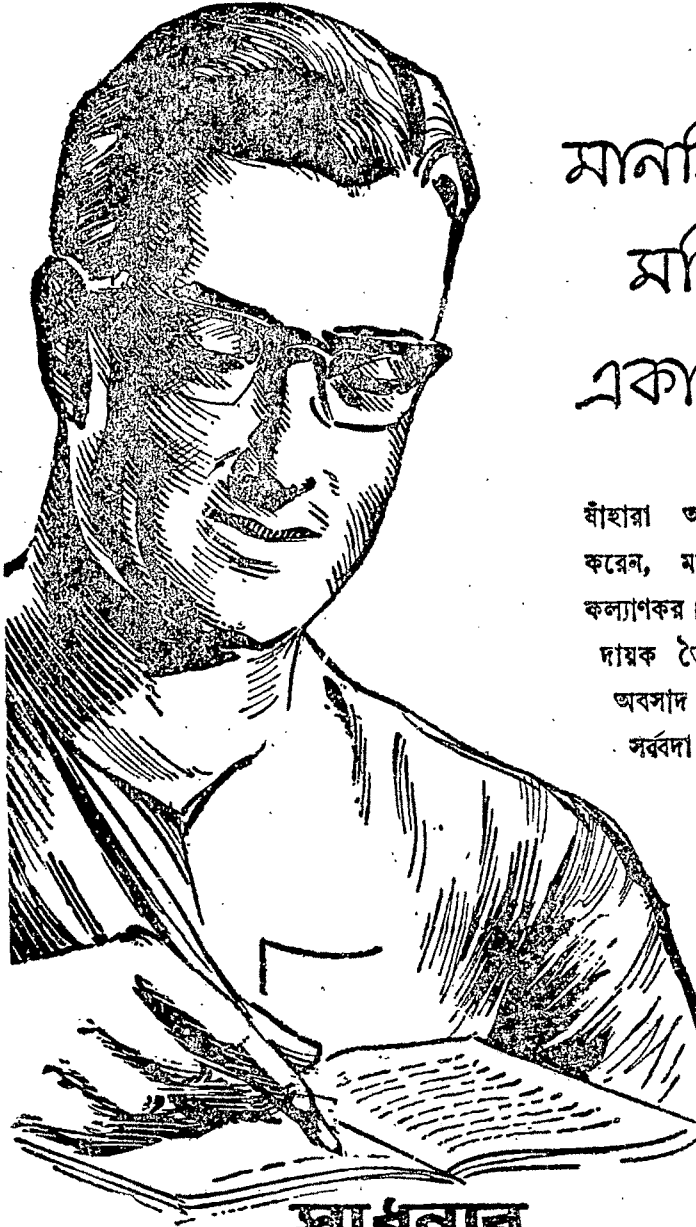
দীঘাকে যদি সতাই শহর বানাইতে হয় সম্পদ ও অর্থশালী বণিকদের আগে আনাইতে হইবে। তাহারাই হইবেন শহর গড়িবার পথপ্রদর্শক। দীঘার নিকটবর্তী বড় শহর খড়্গপদুর ও মেদিনীপুর। সেখান হইতে মালমশলা, ঠিকাদার, মিস্ত্রি ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া ও আনাইয়া দীঘায় বাড়ী করিবার সময়, উৎসাহ ও বন্দোবস্ত খুব কম লোকেরই থাকিবে। অথচ যদি দশ পনেরো কুড়ি হাজারের ভিতর তৈয়ারী বাড়ী পাওয়া যায়, আমার বিশ্বাস, কয়েক হাজার

বাড়ী এখনই বিক্রয় হইয়া যাইবে। “কল্যাণীর” মত পরিকল্পনা করিয়া জমি বিক্রয় ও বাড়ী বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত সরকারের অবিলম্বে করা উচিত। ইহা করিলে পাঁচ বৎসরের ভিতর দীঘা স্বাস্থ্যাবেষীদেব ও সমুদ্রস্নানার্থীদের কাশীবাস হইয়া উঠিবে। বাড়ী করা দূরে থাকুক, কি করিয়া জমি কেনা যায়, তাহাও দীঘাতে কেহ বুঝিতে পারেন না।

সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে, একেবারে সমুদ্র-সৈকতে যেখানে একটি বিশাল হোটেল করা উচিত ছিল, সেখানে সরকার করিয়াছেন এক বাজার। ইহা যে কি দুঃখের বিষয় তাহা আর বলা যায় না। তবে এখনও সময় আছে। এ বাজারের উপর দূতলা, তিনতলা তুলিয়া অন্ততঃ দুইশত মধ্যবিত্ত লোকদের থাকিবার জন্য হোটেল করা যায়। ভাল হোটেল থাকিলে দীঘায় যাত্রীর অভাব কখনও হইবে না। দীঘাকে প্ল্যান করিয়া আধুনিক মনোরম সমুদ্রোপকূল স্বাস্থ্যাবাস করা দরকার এবং ইহা করিতে গেলে সমাজের বিদগ্ধ ও প্রথম শ্রেণীর লোকরাই আগে আসিবেন। দার্জিলিং চিন্তা করিয়া দীঘার প্ল্যান করিতে হইবে এবং ঠিক প সমুদ্রকূলে আর একটি শহর হইলে পশ্চিমবঙ্গের বহু দিনের এক বড় অভাষ ঘটিবে।



আধুনিক বাংলো .



মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

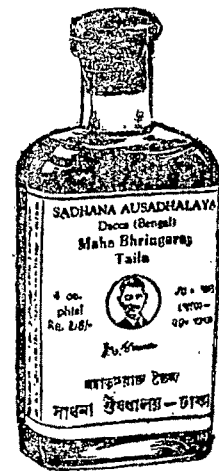
বীহারী অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভূঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্বদা প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনার
মহা ভূঙ্গরাজ
তৈল



সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮



কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ নরেশচন্দ্র বোষ,

এম. বি. দি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

অধ্যাপক ত্রীযোগেশচন্দ্র বোষ, এম. এ.,

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী, এম. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা)

ভাটপুত্র কলমেয় রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

রাশিয়ার ডায়েরী

এবোষি কুমার মান্যল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১১ তেইশ ১১

ট্রান্সককেশিয়ার উপর দিয়ে আমাদের বিমানটি ধীরে ধীরে যাচ্ছিল পূর্ব-দক্ষিণে। কসাক নগরী 'রসটভ-অন-ডন' পেরিয়ে গেলুম। দক্ষিণ-পশ্চিমে পড়ে রইল 'আজব' সমুদ্র। ককেশাস পর্বত-মালা দূরের থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। রসটভের ধারে দিয়ে যাচ্ছি 'অনপা' উপত্যকার দিকে। 'কিউবান' নদী ও তার উপত্যকা চোখে পড়ছে। পাশেই মস্তু শহর 'কাসনোদর'। এই শহর থেকে রেলপথ চলে গিয়েছে পাহাড়তলীর জটিল পথ ধরে। ভিতরে ভিতরে অগণিত চা-বাগান, বিশাল অরণ্যানী, এবং শত শত বর্গমাইলব্যাপী আগ্নেয়র ক্ষেত। এই ককেশাসের আশেপাশে ফেডারেটেড রাশিয়ার অধীনে কয়েকটি অটোনমাস বা স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল আছে। যেমন রসটভ, কাসনোদর, স্টাভরোপল, গ্রজনি, দাঘেষ্তান প্রভৃতি। এই বৃহৎ পার্বত্যভাগে সংখ্যাগত আরণ্যক নদী, উপনদী ও শাখানদী পূর্বে অথবা পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে গেছে।

আমাদের বিমান এবার ধীরে ধীরে ভেসে চলল কৃষ্ণসাগরের পূর্বসীমানা ঘেঁষে। দূর তীরভূমিতে এক একটি শহর গড়ে উঠেছে। কোনটি স্বাস্থ্য-শহর, কোনটি বা খনিজসামগ্রীপ্রধান শহর। যেমন 'অনপা', নভরিস্ক, গেলেন-দিজিক, তুয়াপ্স, শোচি, আদলার প্রভৃতি। আমরা দেখতে দেখতে পৌঁছলুম ফেডারেটেড রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমপ্রান্তে। আমাদের বিমান নেমে এল 'শোচি' নামক একটি পার্বত্য শহরের বিমানঘাঁটিতে। প্লেন থেকে নেমে এসে দেখলুম, চারিদিকে পর্বতের দেওয়াল, মাঝখানে একটি নাতিবৃহৎ প্রান্তর।

জনৈক খর্বকায় ব্যক্তি আমাদের দিকে এগিয়ে এল। হাতে তার এক মস্তু ফুলের তোড়া। বলা বাহুল্য, এটি লৌকিক সৌজন্য-ইংরেজিতে যাকে বলে, মেকানিকাল। কিন্তু বেঁটে

লোকটির একগাল হাসিতে আমি আকৃষ্ট হলুম। উনি এসেছেন স্থানীয় 'লেখক সংঘের' প্রতিনিধিস্বরূপ, ও'র সঙ্গে রয়েছে একখানা কালো রংয়ের মস্তু মোটরগাড়ি। ভদ্রলোকটি নিরীহ এবং অকিঞ্চন, কিছু লাজুক এবং অনেকটাই স্বল্পভাষী। নাম মিঃ আইভান জাইৎ-জেভ। উনি একজন লেখক। পরে উনি ও'র একখানি সচিত্র চিঠি বই আমাকে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক শিল্পীও বটে। গাছের ডাল ভেঙ্গে তার খোসা ছাড়িয়ে উনি ছুরির সাহায্যে অতি সুন্দর ডালের পুতুল 'কুদে' বার করেন। পরবর্তীকালে এই ব্যক্তি আমার অতিশয় প্রিয় হয়ে ওঠেন।

পাহাড়ের ধার দিয়ে একটি ঘন বনময় পথ ছায়াবীথির ভিতর দিয়ে চলে গেছে শহরের দিকে। কম-বোশি কুড়ি মাইল অরণ্যপথ। কিন্তু এই পথ সুন্দর হয়েছে কয়েকটি কারণে। ককেশাসের পার্বত্য অঞ্চলে পৃথিবীর প্রাচীনতম বৃক্ষ ও বনস্পতি দেখতে পাওয়া যায় কেন, তার ভূতাত্ত্বিক কারণ আমার জানা নেই! যে-পথটি দিয়ে আমি চলছি, তার পাশে পাশে চলে গেছে রেলপথ, এবং রেলপথের পাড়ের ঠিক নিচে কৃষ্ণ-সাগরের ঢেউ এসে আঘাত করছে! বনের ধারে সমুদ্র আমাদের দেশের বহু স্থলেই আছে। কিন্তু যে-অঞ্চলটির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, সেখানকার পশ্চিমে সমুদ্র এবং পূর্বাঁদিকে 'এলব্রুজ' পর্বতচূড়া তুষারাবৃত,—এটি আমাদের দেশে কোথাও নেই। পূর্ববঙ্গের পার্বত্য চট্টগ্রামে, মাদ্রাজের দিকে 'পূর্বঘাটে', বোম্বাইয়ের 'পশ্চিমঘাটের' কোন কোনও স্থলে,—সমুদ্র ও পাহাড় মেশানো আছে। কিন্তু সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে পর্বতের তুষারচূড়া দেখতে পাওয়াটা নতুন। সে যাই হোক, এই রেলপথটি তুরস্কের সীমানা-শহর 'বাতুমী' থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের তীরে তীরে সোজা উত্তরে চলে গেছে বোধ করি 'আজব' সাগরের প্রান্ত পর্যন্ত। এই রেলপথ যেমন প্রত্যেকটি জনপদে রসদ • সরবরাহের কাজে লাগে, তেমনি এটি সোভিয়েট-তুরস্ক সীমানাও

রক্ষা করে। দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর সীমানা-বর্তী 'বাতুমী' নগরটি হ'ল সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি মস্তু ঘাঁটি।

আঁকাবাঁকা বনময় পথ ধরে আমরা 'শোচি' শহরে এসে প্রবেশ করলুম, তখন কৃষ্ণসাগরের দিগন্তে সূর্য নেমে যাচ্ছে। এটি ককেশাসের অধিত্যকা শহর,—সমুদ্রের উপরেই। আমরা যে বৃহৎ নব-নির্মিত অট্টালিকায় এসে উঠলুম, সেটি 'ইনটারিক্টেরই' পরিচালিত হোটেল 'প্রিমিস্ক'। এটি এই পার্বত্য 'পুত্প-নগরীর' সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হোটেল। এখানে উল্লেখযোগ্য এই, প্রধানমন্ত্রী মিঃ খুশ্চভ তাঁর অবকাশ্যাপনের জন্য 'শোচি' শহরটি বিশেষভাবে পছন্দ করেন। মিঃ জাইৎজেভ কথায় কথায় আমাকে বললেন, 'শোচি' শহরে আপনাই প্রথম ভারতীয় এলেন!

সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত এক রাজপথের চৌমাথায় এই হোটেলটির তিনদিকে ডালিয়া, সূর্যমুখী, গোলাপ, এবং কাম্বীর ফুলের অজস্র সমারোহ। বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই, এ-নগরের জনবিরলতা। একটি শহর তার সমস্ত সৌধশ্রেণী, পথঘাট, যানবাহন,—আগা-গোড়া সব নিয়ে নবনির্মিত, এটি একটু অভিনব। জারের আমলে 'শোচি'র এক প্রান্তে বৃষ্টি ছিল সৈন্যদলের উপনিবেশ। কিন্তু সোভিয়েট আমলে এটিকে স্বাস্থ্যাবাসে পরিণত করা হয়। বিগত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই নগরটিকে নির্মাণ করার জন্য ১৪০ কোটি রুবল অর্থাৎ ভারতীয় টাকার পরিমাণ ১৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর ফলে এই শহরের সর্বত্র 'টালিন' বিরাজ করছেন! সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথ, স্বাস্থ্যাবাস, বিদ্যা-মন্দির, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বন্দর, হাসপাতাল,—সবই তাঁর কর্তৃত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর বিরাট মর্মরমূর্তি সর্বত্র, তাঁর বৃহদাকার তৈলচিত্র প্রতি প্রতি-ষ্ঠানের দেওয়ালে,—তাঁকে বাদ দিয়ে 'শোচি' শহরের কোনও অস্তিত্বই নেই। আজ তাঁর মৃত্যুর পর নানাঞ্জে উচ্চকণ্ঠে নানান প্রতিবাদধ্বনি তুলছে বটে, কিন্তু

একজন মাত্র ব্যক্তি আপন শক্তিবলে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল ধরে কুড়ি কোটি লোককে স্তম্ভ করে রেখেছিল,— এ কৌতুক কোনও কালের ইতিহাসেও নেই! ইউরোপের সর্বশেষ দানব হিটলারের বিরুদ্ধে নাৎসী জার্মানিতে প্রকাশ্য বিরোধিতা ছিল, কিন্তু হিটলারের বিরুদ্ধে টু শব্দও কোথাও শোনা যায়নি! প্রসঙ্গত বলা চলে, সোভিয়েট ইউনিয়নের তিনজন প্রধান ব্যক্তির নামই তিনটি ছদ্মনাম! উলিয়ানভ হয়েছেন ‘লেনিন’, ব্রুসাইটিন হয়েছেন ‘ট্রটস্কী’, এবং ‘দিয়োগানভিল’ হয়েছেন ‘স্টালিন’।

‘প্রিমস্কি’ হোটেলের দোতলায় একটি ‘ডবল-ঘর’ আমাকে দেওয়া হল। তার একাটতে শয়ন, অন্যটি বৈঠকখানা। গরম জলের সুব্যবস্থার অভাবে এই ঘরের সংলগ্ন স্নানাগারটি অনেক সময় আমার পক্ষে অস্বস্তির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে এমনটি সচরাচর ঘটে! ওদের ‘প্রাচ্য-দেশীয়’ প্রকৃতির ভিতরে একটি ‘তাল-কানা’ ভাব অতি প্রকট। এতগুলি শহর ও গ্রাম এবং জনপদ ভ্রমণ করলুম, কিন্তু নিখুঁত স্নানাগার সচরাচর চোখে পড়ে না। চারিদিকে বিলাস এবং সুখের এত আয়োজন, মানুষের সুযোগসুবিধা-সৃষ্টির এমন সর্বব্যাপী অধ্যবসায়, কিন্তু ছোট ছোট স্বাচ্ছন্দ্যদানের বিবেচনা অনেক ক্ষেত্রে এত কুপণ যে, বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে! লেনিনগ্রাদ বা মস্কো থেকে তাসকন্দ, এবং সাইবেরিয়া থেকে ক্রাইমিয়া, ককেশিয়া বা জর্জিয়া— এই বৃহৎ ভূভাগে স্নানাগার বা শৌচাগার সৃষ্টির ব্যাপারে যে অক্ষমতা, অববিবেচনা ও মূঢ়তার চেহারা, চোখে পড়ে, সেটি ওদের পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের নয়! এসব ব্যাপারে সোভিয়েট কতৃপক্ষ আরেকটু সর্বাঙ্গীণত্ব হলে ভাল হত!

শহর মাত্রই অট্টালিকাবহুল, সেখানে বিস্ময় নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি বাড়ি যদি বাগানবাড়ি হয়, তবেই সেগুলি নগরের সম্পদ। নিউদিল্লীর বড় বড় রাজকর্মচারী বা লোকসভার সভ্যদের বাংলোগুলি যে কারণে সুখী, শোচি শহরেও তেমনি। এটি পার্বত্য শহর, প্রত্যেকটি গৃহস্থই সংস্থানসম্পন্ন, কিন্তু এর জনবিরলতা ও প্রসন্ন শান্তি যে কোনও ব্যক্তিকে মূগ্ধ করে। কৃষ্ণসাগরের উত্তর এবং পূর্বপারে হল সোভিয়েট ইউনিয়নের অধীনে। পশ্চিমে বুলগারিয়া এবং রুম্যানিয়া, দক্ষিণে তুরস্ক। পূর্বপারে যেখানে শোচি শহর, পশ্চিম পারে ঠিক সেইখানে

হয়েছে একটি বন্দর। বন্দরটির নাম হল ‘স্টালিন’, কিন্তু সেটি বুলগারিয়ার মধ্যে পড়ে!

সন্ধ্যার পরে শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে নিয়ে এলেন শোচি থিয়েটারের প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। বাস্তবিক আধুনিক সোভিয়েট থিয়েটারে ঢোকবার আগে ভাবতে হয় রাজবাড়িতে ঢুকাছি কিনা। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে একমাত্র মস্কো আর্ট থিয়েটার বা গোর্কি থিয়েটার—যার বাড়িটি হল সাবেক কালের, যেটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং যেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলি অভিনীত হয়! কিন্তু মস্কোর ‘মালি’ থিয়েটার হল রাশিয়ার প্রাচীনতম থিয়েটার। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা ছিলেন। তাঁর নাম মচালভ। তিনি তৎকালীন বিশ্বজন সমাজে অতি প্রশংস্য ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আজও ‘মালি’ থিয়েটার আপন আভিজাত্যের গৌরবে গর্বিত। বলা বাহুল্য, রূপ জাতির অভিনয় ও মঞ্চপ্রতিভা চিরদিন গৌরবোজ্জ্বল!

শোচি থিয়েটারের ভিতর দিকটি খটখটে নতুন এবং প্রচুর সম্পদশালী। বর্দিও এটি নির্মাণ করা হয় ১৯৩৭ সালে, তবুও এটিকে নতনের মতো করে রাখা। ওরা পুরনো চায় না, শুধু চায় নতুন! বাপের নাম জানতে চায় না, ছেলের কথা শুনতে চায়! শোচি থিয়েটারটির কোল ঘেঁষে যে প্রাঙ্গণপথ, তার নিচেই সমুদ্র! ফলে, বন-বাগান লতাপাতার সঙ্গে মিলিয়ে শান্ত গম্ভীর সমুদ্র কেমন যেন মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আমি মূগ্ধ-চক্ষে চেয়েছিলাম।

সোভিয়েট ইউনিয়নে নগর নির্মাণ-বিধি একটু কৌতুকজনক। বহু দূস্তর ভূভাগে ওরা যখন রাতারাতি নগর বসাতে থাকে, তখন বসবাস ব্যবস্থা বা অম-জলের উপযুক্ত আয়োজন করার আগেই ওরা বানিয়ে তোলে রংগমণ্ড! নগরের প্রথম দিনের নির্মাণকর্মের তালিকায় আগে বসবে একটি থিয়েটার, তারপর আসবে সিনেমা! অভিনেতা এবং অভিনেত্রী ওদের দেশে পরম সম্মানিত এবং যন্ত্রের সামগ্রী। ওরা বার্ষিকের কালে শুধু যে পেনসন পায় তাই নয়, ওদের অবশিষ্ট জীবনে যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছন্দ্য এবং শান্তি থাকে, সেদিকে

কতৃপক্ষ প্রথর দৃষ্টি রাখেন। অবসর-প্রাপ্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিলাস-পূর্ণ বসবাসের জন্য লেনিনগ্রাদে যে বৃহৎ ও মনোরম অট্টালিকাটি দেখে-ছিলাম সেটি ভুলিনি!

শোচি থিয়েটারের মঞ্চের উপরে জনৈক উজ্জ্বল গায়িকা আপন কণ্ঠের কসরৎ দেখাচ্ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ গায়িকা, শুনলুম। তাঁর কণ্ঠস্বরের কেরামতির ভিতরে বিভিন্ন পক্ষীর উচ্চগ্রামের কাকলী শুনছিলাম। এই সূত্রে জনৈক রূপশেখক ভিক্টর ভিটকোভিচ তাঁর একখানি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করেছেন :

“When Rabindranath Tagore, the famous Indian author, heard European singing for the first time, it sounded to him like a strange imitation of the singing of birds.” এই গায়িকার কণ্ঠস্বরে আমিও সেই ‘strange imitation’ শুনতে অবাক হচ্ছিলাম! কিন্তু মানুষের কণ্ঠে পাখির কাকলীর অবিকল অনুকরণ হল এক-প্রকার ম্যাজিকের কসরৎ,—এটা ‘মিমিক্রি’! আমি এসেছিলাম গান শুনতে!

শ্রীমতী লিডিয়া আড়ষ্ট হয়ে পাশ থেকে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। এক সময় বললেন, চলুন, আর আপনার শুনতে কাজ নেই!

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে পালিয়ে বাঁচলাম!

সন্ধ্যার পরে এই পুষ্পনগরীর উপরে যেন স্বপ্নাচ্ছন্নতার ছায়া নেমে আসে। আমাদের ‘প্রিমস্কি’ হোটেলের ব্যবস্থা খাস ইউরোপীয়। এ হোটেলের ম্যানেজার একজন দীর্ঘকায় প্রসন্নমুখ ব্যক্তি। সুবিধা ছিল এই, তিনি ইংরেজি জানেন এবং করিৎকর্মা ব্যক্তি। তাঁর আপ্যায়নের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। আমার ঘরটিতে আসবাবসজ্জা এবং আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে বৈকি। ঘরের সামনের দিকে ছোট ছোট দুটি বারান্দা, সেখানে দাঁড়ালে এপাশে ওপাশে পুষ্পোদ্যান এবং সামনে সমুদ্র! কিন্তু এই হোটেলের বাইরের চেহারাটা যেমন প্রোজ্জ্বল, এবং প্রবেশপথটি তার সমস্ত বৈভবসজ্জাসহ যেমন চাকচিক্যময়,—ভিতর মহলে ঠিক ততখানি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য আছে কিনা এটি বার বার ভাবতে হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণকালে এটি প্রায়ই চোখে পড়ত, অভ্যাগত বা নির্মমিত ব্যক্তিগণের জন্য যে পরিমাণ আতিথেয়তার আয়োজন,

তাদের 'ঘরের' লোকদের জন্য সে-পরিমাণ নেই! শ্রীমতী অকসানা আমার সঙ্গে তাদের দেশে ভ্রমণ করেছেন প্রচুর, কিন্তু তাঁর জন্য প্রায় প্রতি হোটেলের যে-প্রকার অস্বাস্থ্যকর বসবাসের ব্যবস্থা হত,—সেটিতে আমি নিজেই পীড়া বোধ করেছি! সভ্যতার ইতিহাসে যে-দেশে সাধারণ মানুষের 'ডিগনিটি' প্রথম প্রধান স্থান পেয়ে বাঁচল, সে-দেশে 'ঘরের লোকের' প্রতি এই অসংগত তাক্কল্য এবং তারতম্য আমার ভাল লাগেনি। ভোজননের আসরে পাশাপাশি বসে একজনের পাতে চারখানা দাগা মাছ এবং অন্যজনের পাতে মাছের টুকরো পড়াটা যেমন দৃষ্টিকটু, এও অনেকটা তাই! শ্রীমতী অকসানা যে-সকল ব্যবহারিক অসুবিধাগুলি মিস্ট্র হাউস-মুখে সহ্য করে নিতেন, এই হোটেলের কোনও একটি দরিদ্র ঘরে জারগা পেয়ে শ্রীমতী লিডিয়াও সেই অসুবিধাগুলির মুখোমুখি হয়েছেন, এটি আমার দৃষ্টি এড়ায়নি! কিন্তু 'সোভিয়েট নাগরিকের' শিক্ষা বড় কঠিন। তারা বরং ভাগে, কিন্তু মচকায় না! দোভাষীগণের পক্ষে যে স্নানের সুব্যবস্থার প্রয়োজন, এটির সম্বন্ধে 'ইনট্যুরিস্টের' ওদাসীনা লক্ষ্য করে বিরক্তিবোধ করতুম।

আমাদের বারানসী শহর উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি ক্ষুদ্র নদীর দ্বারা সীমায়িত। তার উত্তরে হল বরুণা নদী, এবং দক্ষিণে অসি। এখানে পার্বত্য অধিত্যকা নগরী শোচিও তাই—দুটি নদীর দ্বারা এর সীমানা নির্দিষ্ট। একটির নাম 'মামেকা', অন্যটি 'কুদে-পস্তা'। এ দুটি ককেসাসের বরফগলা জলের নালীপথ মাত্র। কিন্তু এ দুটির চারিপাশে অরণ্যশ্রীর চেহারা মনোরম। শোচির অরণ্যক বনভূমির ইতিহাস সত্যই মনোজ্ঞ। এ অরণ্য নাকি প্রাগৈতিহাসিক যুগের। এখানকার শীতাতপের ভিতরে নাকি এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যেটি প্রকৃতির সম্পদকে বহুকাল অবধি অক্ষুণ্ণ ও অজর করে রাখে। এখানে এমন হাজার হাজার গাছ এবং বনস্পতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল যাদের আয়ু ৫০০ বছর থেকে প্রায় ২৫০০ পর্যন্ত, এবং প্রতি গাছে তার এক একটি ইতিহাস খোদিত!

এখানে আমার আরও দুজন নিত্য-সঙ্গী জুটোঁছিল। পূর্বোক্ত আইভান জাইৎজেভ এবং এখানকার প্রসিদ্ধ নাট্যকার মিঃ নিকলাই ভিনিকভ। প্রথম ব্যক্তি অতি নিরীহ এবং মিষ্টভাবী,

দ্বিতীয় ব্যক্তি আমোদপ্রিয় ও প্রাণচঞ্চল। এঁরা দুজনেই রাইটাস ইউনিয়নের লোক। কিন্তু এর মধ্যে জাইৎজেভ হলেন দারুণশিল্পী এবং ছুতোরা। কাঠের উপরে তাঁর খোদাইশিল্পের কাজগুলি বড় সুদৃশ্য। এমন গাছের ডালের ভিতর থেকে তিনি এমন সব অদ্ভুত ধরণের অঙ্কটাবক পুতুল কুঁদে বার করেন, যেগুলি বিস্ময় ও প্রশংসার উদ্বেক করে। এদিকে কৃষ্ণসাগরকে কেন্দ্র করে তিনি দুখানি বইও লিখেছেন। ঘরে-তাঁর স্ত্রী আছেন,—অতি ভদ্রা এবং সরলা। তাঁর বিশ্বাস, আমি একজন ভারতীয় ভবিষ্যদ্বক্তা এবং গণকর! তিনি একদিন 'হাত দেখাতে' এসে যখন শুনলেন; তাঁর স্বামী শীঘ্রই সম্রাস নিয়ে গৃহত্যাগ করবেন, তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মস্ত বিতর্ক বেধে গেল, এবং স্ত্রী শাসন করে বললেন, আমারও তাই সন্দেহ! বেশ, আজ থেকে তোমাকে ঘরে তালাচাবি দিয়ে রাখব! দেখ কেমন তোমার স্বাধীনতা—!

স্ত্রী বোধ হয় স্বামী অপেক্ষা দু'-এক বছরের বড়ই হবেন। শ্রীমতী লিডিয়া রাগ করে বললেন, আপনি বৃদ্ধি ওদের ঘর ভাগতে চান? দেখতে পাচ্ছেন না, মেয়েটি এসব বিশ্বাস করে?

মস্কো থেকে আসবার সময় একটি কাগজ এনোঁছিলুম সঙ্গে। প্রাচ্য-ভাষা প্রকাশন বিভাগ থেকে "Palace and Prison" নামক একখানি বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করা হচ্ছিল। সেটি আমি একটু 'দেখেশুনে' দিচ্ছিলুম। সুতরাং এখানকার অনাহত বিপ্লবের ফাঁকে ফাঁকে ওই কাজটি আমার হাতে ছিল।

স্থানীয় রাইটাস ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য একখানি বড় গাড়ি বরাদ্দ করেছিলেন। নাট্যকার ভিনিকভ সেই গাড়িতে আমাদের নিয়ে চললেন ককেসাস পাহাড়ের দিকে। পথ মাত্র ১১ মাইল, কিন্তু সেই সুন্দর চিত্রণ পথ আমাদের আনন্দ-কলরবে মুখর ছিল। ভিনিকভের বয়স এখনও পঞ্চাশ হয়নি।

ইংরেজি তিনি জানেন না, কিন্তু বিদেশী বন্ধকে কেমন উল্লাস সহকারে কথা-কথায় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করতে হয়, এটি তিনি জানেন। তাঁর সাবলীল প্রাণোচ্ছলতা অনেক সময় আমারও প্রাচীন বৈপর্য্য প্রকৃতিতে খুঁচিয়ে বার করত! ভিনিকভের বাড়িতে আমার 'দাবা খেলার' আড্ডা জমতো। মাঝে মাঝে তাঁর মুখে ভারতীয় কি একখানা ছবিবর নোংরা সুদর্ভাজা শুনতুম! সেটি তাঁর বাড়ির গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া ইতর একটি সুর। তার দু'-চারটি শব্দ এই প্রকার,—"ইচেক দানা ইচেক দানা..... জুতি মেরা জাপানী.....মেরা পাংলুন হিন্দুস্তানী—"

এই গান এবং এর সংলগ্ন ছবিটি সোভিয়েট ইউনিয়নে তৎকালে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে, এবং এর থেকে আমি সেদিন সোভিয়েট নাগরিকদের রুচিবিকারের পরিচয় পাই!

জলে, স্থলে, অনিলে, আকাশে অন্ধকারে যেমন শ্রীরাধা একদা শ্রীকৃষ্ণেরই ছায়া দেখতে পেতেন, আমিও তেমনি প্রতি দেশের প্রতি পর্বতের কোলে হিমালয়কেই আবিষ্কার করি! কিন্তু ককেসাস গিরিমালার মধ্যে এমন একটি রহস্যজনক প্রেতচ্ছায়া চোখে পড়ে যেটি হিমালয়ে নেই! সেখানে নগাধিরাজের স্তবকে স্তবকে দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শন মেলে, কিন্তু ককেসাসের গুহা-গহবরে যাদেরকে দেখি, তারা মহাদেবেরই

কিংকো'র *
আগিকা
হেয়ার অয়েল
প্রতি বরক-কিংকো'র



ঔষধি বৈদ্য ব্যবহারে

নিম্নলিখিত ঔষধি

১১০ রাসবিহারী এজেন্ট

কলিকাতা

বায়দ্যান

সঙ্গী, ভূত-প্রেত-পিশাচ-নন্দী-ভৃগু! এর কারণ আছে। পাহাড়ের ভিতর যত গহনলোকে যাচ্ছ ততই দেখতে পাওয়া যায় ঘনকালো কৃষ্ণছায়া! বড় বড় বন-স্পতি এবং বড় বড় গগনচুম্বী বৃক্ষ কালো বর্ণ! শুধু তাই নয়, চারিদিকে কেমন যেন ভৌতিক মানবাকৃতি, সংখ্যাতীত অর্ণবক্রের দল! ঠাহর করে দেখলে ওদের চোখ-কান-নাক-হাত-পা,— সমস্ত একে নেওয়া যায়! চারিদিকে বৃক্ষ-বনস্পতির জটিলার মধ্যে ছায়ারা দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন ক্রোধোন্মত্ত, বিকলাঙ্গ, পাগল, রক্তক্ষ, রক্ষমতি, জগীর্ভাসা,— একদল শূঙ্কপ্রকৃতি ও ভয়ভীষণ কাল-প্রহরীর দল! এই আদিম এবং প্রাগৈতিহাসিক বনভূমির মধ্যে একা অগ্রসর হতে গেলে গা ছমছম করে।

সেই অরণ্যালোকের গহন জটিল কন্দরে গিয়ে নাট্যকার নিকলাই ডিনিকভ প্রত্যেকটি গাছের ইতিহাস বলছিলেন এবং হাজার দুঃহাজার তিনহাজার বছরের সেই অরণ্যকাহিনী শুনছিলেন। এই পাহাড়গুলির নামা নিভৃত স্থলে অনেকে বাগানবাড়ি বানিয়েছে, কোথাও বা কোন কোন বিষয়ের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেগদুলি একে একে অতিক্রম করে অবশেষে আমরা তিনজন পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এবং ছাঁবি তুলতে তুলতে গভীর বনভূমির মধ্যে যেন তলিয়ে গেলুম!

ককেশাসের একটি চুড়ার নাম, “আখুন বা আহুন”। কিন্তু সেখানকার প্রাকৃতিক শোভাসম্পদ দেখার জন্য একটি চতুষ্কোণ পাথরের টাওয়ার নির্মাণ করে তার নাম দেওয়া হয়েছে, “আখুন টাওয়ার”। এটি ১০০ ফুট উঁচু, এবং সিঁড়ি দিয়ে এর চুড়ার বারান্দায় উঠে দাঁড়ালে অদূরে পশ্চিমে দিকচিহ্নহীন কৃষ্ণসাগর এবং পূর্বদিকে নয়নাভিরাম ও তুষারকিরীট ‘এলব্রুজ পর্বতের’ চুড়া দেখা যায়। এই পর্বতরাজ্যের আশে-পাশে এখনও নানা বন্যজাতি ও সম্প্রদায় বাস করে—যারা এখনও আপন স্বাভাবিক রক্ষা করে চলেছে।

শোচি শহরের অন্যতম আকর্ষণ হল কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ। এই জলধারাগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যশোধনী ধাতব পদার্থ থাকার জন্য প্রতি বছরে প্রায় ৩ লক্ষ নরনারী এখানে ‘স্নান’ করতে আসে। একটি সুবৃহৎ অর্ধচন্দ্রাকার এবং পুষ্পোদ্যান সম্বলিত অট্টালিকার নাম দেওয়া হয়েছে ‘মার্গেসেস্তা’। এটিকে ওঁরা বলেন, ‘বাত গ্যাভিলিয়ন,’ অর্থাৎ স্নানচয়ন। ধাতব

পদার্থমিশ্রিত উষ্ণজলের দ্বারা বহু-প্রকার ব্যাধি এখানে নিরাময় করা হয়। এখানকার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে রোগীর স্বাস্থ্যকে নতুন করে নির্মাণের যে আয়োজন আছে সেগদুলি দেখে আমি বিশেষভাবে তারিফ করেছিলাম। কিন্তু এগদুলি আমার কাছে নতুন নয়। যারা বিহারের অন্তর্গত রাজগৃহে, পাজ্রাবের অন্তর্গত কাংড়ায়, কুমায়ূনের অন্তর্গত গৌরীকুন্ডে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত তারাপীঠে বা বক্রেশ্বরে গেছেন, তাদের কাছে এগদুলি অপরিচিত নয়! যারা খবর রাখেন তারা জানেন, এবম্প্রকার ‘স্নান-চয়ন’ ভারতে আছে শত শত, তবে সেসব স্থলে অবশ্য এমন সুন্দর প্রাসাদ বা স্বাস্থ্যগবেষণার বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নেই। আমাদের অভিজ্ঞত করেছিল এখানকার মানববৈজ্ঞানিক মন্ত্র, এবং জন-কল্যাণকর্মের অপারিসমীম অধ্যবসায়। একটি সাধারণ কয়লাখনির মজদুর, রেল আপিসের কনিষ্ঠ কেরানী, মৃদির দোকানের একটি চাকর, সামান্য একজন ঝাড়ুদার—এরা এখানে এসে যে রাজবেশ পরে, সেটি দ্রুতব্য। এর জন্য তাম্বির-তদারক, লেখালেখি, উমেদারি—এসবের গন্ধমাত্র নেই, কারণ এগুলি তাদের পাওনা। এককালে এখানকার জনপদে বহু অর্থশালী লোকের বাগানবাড়ি এবং ব্যবসায়ীদের বোর্ডিং হাউস ছিল। সোভিয়েট আমলে সেগদুলিকে ‘লিকুইডেট’ করা হয়েছে এবং ২৫।১০০ বছরের মধ্যে একমাত্র ‘শোচি-মার্গেসেস্তা’ অঞ্চলে ৫০টিরও বেশি অতি বৃহৎ ‘সানাতোরিয়াম’ অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন এবং পুরনো মিলিয়ে বা পুনর্নির্মাণ একত্র করে এই পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ৯০টি স্বাস্থ্যাবাস গড়ে উঠেছে। সমগ্র কৃষ্ণসাগরের উত্তর ও পূর্ব তীর ধরলে শোচির মতো অন্তত কুড়িটি শহর আঙ্গুলে গোণা যায়, এবং প্রতি শহরে এই প্রকার সংখ্যাতীত স্বাস্থ্যাবাস সৃষ্টি করা হয়েছে!

এখানে গন্ধকজল সহ ‘অসলজান’ স্নানের ব্যবস্থা দেখলাম। স্বাস-প্রস্রাব শোধনের জন্য ‘মেন্থল’ গ্যাসের চিকিৎসা আছে। চর্মরোগ, হৃদরোগ, পক্ষাঘাত, রক্তদৃষ্টি, শিরঃপীড়া, অগ্নিব্যাধি, কেশ-বিরলতা প্রভৃতি ব্যাধির বিবিধ নিরাময়-ব্যবস্থা এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। কোন কোনও নিরাময় কক্ষে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, বিভিন্ন ও বিচিত্র ধাতব জলের সাহায্যে আনন্দ পূরুষ এবং নারীকে

নানাবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎসা করা হচ্ছে!

‘মার্গেসেস্তা’ থেকে বেরিয়ে আমরা যে প্রাসাদোপম একটি অট্টালিকায় এসে প্রবেশ করলাম, সেটি মস্ত এক হাসপাতাল। এখানে আগাগোড়া সব বিনামূল্যে। হাসপাতাল বলতে বোঝি, আহা, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং ঔষধপত্র! এখানে একটু অন্যরকম। এখানে সর্ব-প্রকার আমোদ-আহ্লাদ, থিয়েটার-সিনেমা, খেলাধুলা, লাইব্রেরী, সন্তরণ ক্ষেত্র, ব্যায়ামাগার, এবং বিস্তৃত লাউঞ্জ ও কমন্-রুম। প্রতিদিন পাঁচটি পরিপূর্ণ ভোজের আয়োজন। সোভিয়েট ইউনিয়নের হাসপাতাল কেবল চিকিৎসা-কেন্দ্র নয়, স্বাস্থ্যসম্প্রদায়ের কেন্দ্রও বটে। একজন মহিলা ডাক্তার সর্বত্র ঘুরে ঘুরে যখন আমাদের দেখাতে লাগলেন, তখন এইটিই শুধু ভাবিলাম, দীর্ঘকাল অসুস্থ অবস্থায় সোভিয়েট ইউনিয়নের হাসপাতালে থাকার মতো সৌভাগ্য আর কিছু নেই! মাঝে মাঝে এক-আধজন ভারতীয় কমিউনিষ্ট কর্মী ‘স্বাস্থ্য-লাভের’ কামনায় ছিটকে চলে যান সোভিয়েট ইউনিয়নে, এটি সংবাদে দেখতে পাই। বলা বাহুল্য, তাদের সেবা-যত্নাদি ভালই হয়! কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের একজন কমিউনিষ্ট তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে নিরাময় হতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ব্যাধি তাঁর সারেনি, এবং স্নানমুখ নিয়েই তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল! আমার বিশ্বাস, এখানকার অসুস্থ এখানে গেলে সারে না, এবং ওখানকার চিকিৎসা এখানে মেলে না!

সোভিয়েট ইউনিয়নে মেয়েদের প্রত্যেক কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে একেকটি ছোট বা বড় হাসপাতাল এবং প্রসূতি-সদন সংযুক্ত থাকে। অন্তঃস্বভা নারীর স্বাস্থ্য-রক্ষা, জীবনরক্ষা এবং ভ্রূণ বা সন্তান-রক্ষার সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব তার স্বশরীরবাড়ি বা বাপের বাড়ির মাথাব্যথা নয়, সে-দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সন্তানসম্ভবা মেয়ের ‘চতুর্থ’ মাস থেকে তাকে অতিশয় হালকা কাজ দেওয়া হয়। সে থাকবে ‘পয়-বেক্ষণে’, এবং সতত তত্ত্বাবধানের মধ্যে। তার আহা, বাসস্থান, চলাফেরা, ঔষধ-পত্রাদি, নিয়মিত স্বাস্থ্য ও দৈহপরিষ্কার, —এগুলি বিশেষ যত্নের সঙ্গে করা হবে। এখানে রাষ্ট্রের স্বার্থ অনেক বেশি বলেই নারীর প্রতি এত যত্ন! রাষ্ট্র কেবলই চাইছে সুস্থ সন্তান! লোকসংখ্যার অভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন কাঁদতে

বসেছে! বিগত বিশ্বযুদ্ধে সে হারিয়েছে দেড় কোটি পুরুষ! এখন সে প্রতি মেয়ের কাছে চাইছে ৪।৫টি সন্তান—ছেলে বা মেয়ে যাই হোক। সেইজন্য সর্বাপেক্ষা সমাদৃত জাতি হল, শিশু-জাতি!

জারের আমল পর্যন্ত রাশিয়ায় ছিল সন্তান প্রসব করানোর জন্য বর্ডাউ-দাই! আঁতুড়ঘরের জন্য কোপড়া বানিয়ে ভিতরে ঘাস বিছিয়ে দেওয়া হত! ঘুঁটে বা কাঠ-কুটোর আগুনে সেক; ভোঁতা বা মরচে-ধরা ছুরিতে নাড়ি কাটা; শিশুকে স্নান করাবার ব্যবস্থা হত না; অশিক্ষিত দাইরা, তুকতাকের ব্যবস্থা করত। এর ওপর ছিল ভূত, প্রেত, ডাইনী বা 'পেঁচোয়' পাবার ভয়! এর ফলে রুশসাম্রাজ্যে প্রসূতি ও শিশুর যে-পরিণাম ঘটত, সেই সম্বন্ধে এক ইংরেজ চিকিৎসক সম্পাদিত এক রুশীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে :

"Two million martyred mothers shed bitter tears every year on Russian soil, burying in early graves with their work-worn hands the needlessly lost innocent victims of a monstrous state system." ("Health Protection in the Soviet Union").

আমাদের খাবার টেবলের সামনে এসে বসতেন স্থানীয় জনৈক প্রসিদ্ধ মহিলা-ডাক্তার 'মিসেস ব্রাকো'। আমি তাঁকে বলছিলাম, আমার আহালাদী পর্যবেক্ষণ করে আমাকে বলে দিন আমার শরীরে কোনও রোগ আছে কিনা!

বলা বাহুল্য, আমি সর্বপ্রকার সামগ্রীই খেতুম। মিসেস-ব্রাকো প্রতিদিন তিনবার এসে আমার খাবার সামনে বসে গল্পগুজব করার অবসরে আমার আহালাদী তালিকা ও ভোজনভঙ্গী লক্ষ্য করতেন! চতুর্থ দিনে বিদায় নেবার কালে তিনি বললেন, দু'তিনটি সামগ্রীর প্রতি আপনাদের অনেককালের বোঁক মনে হচ্ছে! ডিম এবং কার্বো-হাইড্রেট আপনি কমিয়ে দিন। চিল্লেশের পর কোন কোনও খাদ্যের প্রতি বোঁক কমানো ভাল!

তাঁর উপদেশটি গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছিলাম। শ্রীমতী লিডিয়া সৌদিন থেকে আমার প্রতিবাদসত্ত্বেও পাতের ধার থেকে দৃঢ়কথারি স্লেট সরিয়ে নিতেন!

ঔর্মান সময় একদিন আইডান জাইৎজেভ আমাদেরকে নিয়ে এলেন মাইল তিনেক দূরবর্তী একটি পাহাড়তলীর ধারের ফল-ফুলের বাগানে। এই বাগানের পরিচালক হলেন 'মিঃ ফিয়েডোর জোরিন'। তাঁর বয়স প্রায় ৫৫। তিনি

ভারতের কথা বহু শুনছেন, কিন্তু একজন ভারতীয়কে দেখলেন এই প্রথম! এখানে করমর্দনের সাধারণ সৌজন্যের অবকাশ না দিয়ে তিনি সোজা এসে আমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন! এই সুবৃহৎ পুষ্পকাননের সঙ্গে তাঁর জীবন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এবং লক্ষ্য করে দেখলাম, তিনি যে কেবল প্রত্যেকটি ফুলফলের গাছের আনন্দ-পূর্বক ইতিহাস জানেন তাই নয়, তিনি নিজের মনে এদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন! তাঁর চারিদিকে সমস্ত বাগান-ভরা বড় বড় গোলাপ, ডালিয়া, সূর্য-মুখী, চন্দ্রমালিকা প্রভৃতির বিপুল সমারোহ এবং চতুর্দিকব্যাপী আপেল ও রোজবেরির অজস্র ফলন। একটি অতি বিচিত্র লেবুগাছের কাছে তিনি নিয়ে গেলেন। গাছটির বয়স তখন ১৮ বছর, মোট ১৮ রকমের কমলালেবু ও অন্যান্য লেবু এতে ফলে, এবং মাত্র ১৮ দিন আগে আমেরিকার প্রসিদ্ধ নিগ্রো গায়ক 'পল রবসন' এই বাগানটি দেখে গিয়েছেন! এই গাছটির নাম রাখা হয়েছে, 'আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব বৃক্ষ'। এই গাছটি প্রকৃতির খেলায় অনুসারে চলে, এবং এর উচ্চতা আন্দাজ ২০ ফুট। উপর থেকে নিচে পর্যন্ত কয়েকটি ছোট বড় নানা ধরনের রঙিন লেবু ঝুলছে! সমস্ত গাছটির প্রায় প্রত্যেক ডালে ছোট ছোট প্লাস্টিকের টিকিটে জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যক্তির নাম লটকানো, — ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ, চীন, জাপান—কেউ বাদ নেই। তাঁরা প্রত্যেকে এসে এই গাছের একেকটি ডালে অপর একটি গাছের কচি ডাল দিয়ে 'সুত্রবন্ধ' করে গেছেন। আমিও সেই প্রকার একটি 'গ্রাফটিং' করে দিলাম! একটির নিখাস অন্যটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কালক্রমে ফল ধরবে! ধরেও ছিল তাই। বছর দেড়েক পরে মিঃ জোরিন আমাকে পত্র লিখে জানান, আপনার 'গ্রাফটিংয়ের' ডালে একটি বৃন্তাশাখা এসেছে, যথাসময়ে ফল আসবে! কিছুকাল পরে এই স্বভাবসরল ব্যক্তি আমার নামাঙ্কিত 'গ্রাফটিং'-এর ডালের ফলসহ একটি ফটো আমার নিকট পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি উক্ত ডালের চারটি লেবু একটি কাঠের বাস্কে পাঠিয়ে করে কলকাতায় আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন! যাঁর মারফৎ পাঠানো হয় তিনি তাঁর পত্রে আমাকে লেখেন, "We have great pleasure to send you the oranges from the branch grafted by you on the 'Friendship Tree' in the garden

of Sochi experimental station of subtropical and southern fruits during your stay in our town. Let Friendship between the peoples of the Soviet Union and India grow and flourish just as the 'Friendship Tree' is developing. Yours sincerely, Efremov."

"অগনিয়োক" নামক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে আমার 'গ্রাফটিং' করার ছবিটি ছাপা হয়েছিল।

মিঃ জোরিনের এইটিই পেশা। ফুল ফোটানো, বাগান সৃষ্টিকরা, উদ্ভিদের নানাবিধ পর্যালোচনা—এই নিয়েই তিনি থাকেন। লুসিয়া নামক একটি মেয়ে তাঁর এই সকল কাজে সহায়তা করে। তাঁর নতুন ফ্ল্যাট, আর্থিক সাচ্ছল্য এবং তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে আমি সচকিত হয়েছিলাম। তাঁর বাগানে কয়েকটি ভারতীয় 'কলাগাছ' তিনি সযত্নে লালন করেন। সে-গাছে 'কাঁদা' আসে না কোনদিন!

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণকালে যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছিলাম, তাঁদের প্রায় সকলেরই পারিবারিক ও ব্যক্তিগত

এই সকল পরম্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

লিবে কালি শুকায় না;
কিছু কাগজ হুত শুকায়।

রাঙার যশেট গভীরতা; তবু
অবাধে লেখা এন্নিয় ঢলে।

লেখা গুয়ে-মুছে যায় না;
অক্ষয় কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

কোন কারণে না হলেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে।



সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

কলিকাতা • দিল্লী • বেঙ্গল • মাদ্রাস

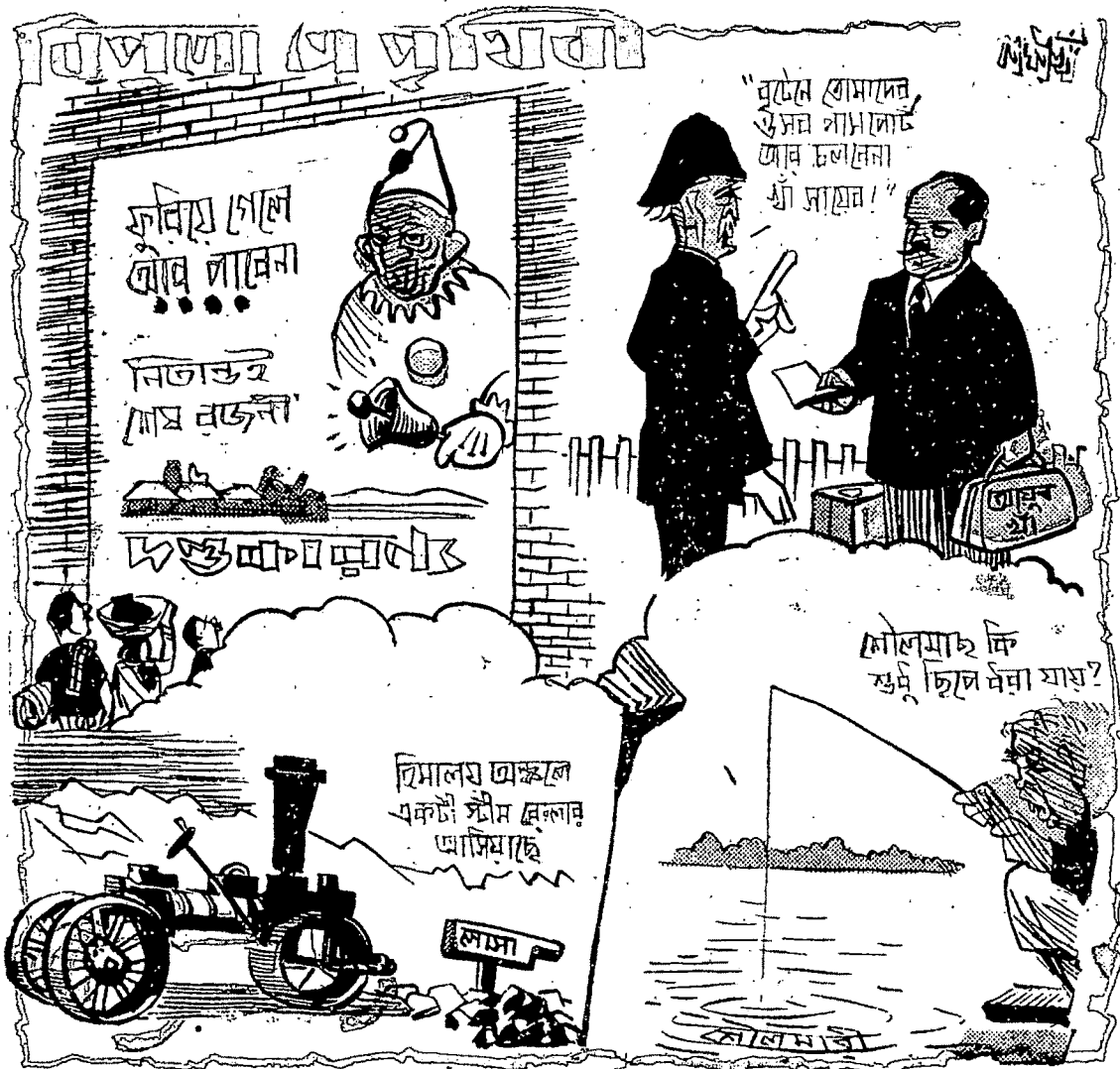
জীবনের খেঁজ-খবর নেওয়া আমার পক্ষে একটি প্রধান কাজ ছিল। আমার এই কৌতূহল অনেকটা অসামাজিক এবং এই অহেতুক ঔৎসুক্যের জন্য অনেক সময় লজ্জা পেতুম। রূশভাষা না জানার জন্য আমার বহু কৌতূহল অতৃপ্ত থেকে গেছে, এবং সেই কারণে বহু জীবনের মধ্যে প্রবেশলাভ ঘটেনি। তবু এটি দেখতে পেরেছি, আমার পথ ছিল অব্যবহৃত, এবং যে সকল পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়—তারা অকুপণভাবে আমাকে তাঁদের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন।

যাঁর সঙ্গে শোচি শহরে এসেছি তিনি খুব নরম মেয়ে নন। কিন্তু আমার রাশিয়া ভ্রমণকালে বোধ করি তাঁর সহায়তা পেয়েছি সর্বাপেক্ষা বেশি। আমার রুচি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কৌতূহল, প্রয়োজন—এগুলি ছিল তাঁর নখ-দর্পণে। তাঁর বিশেষ আগ্রহের জন্যই

আমি সকল স্তরের নরনারীর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম। মাদাম চেকভ, মাদাম গোর্কি, গোর্কি পরিবারের অন্যান্যরা,—এঁদের সঙ্গে তিনিই আমার সংযোগ ঘটান। এ ছাড়া শিল্পী, কবি, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক, প্রকাশক, মন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর, থিয়েটার ও সিনেমার ডাইরেক্টর, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও প্রদর্শনী, খৃষ্টানতীর্থ জেগোস্ক ও তার ধর্মযাজক, মস্কোর বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাইটার্স ইউনিয়নের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ,—এ সমস্তই শ্রীমতী লিডিয়ায় সহায়তায় ঘটে। কিন্তু অন্যান্য দোভাষী এবং দোভাষিণীরা যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক জীবনের দ্বারোন্মোচন করতেন, ইনি তাঁদের বিপরীত! এঁকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভাবান্বিত হয়ে চোখের জল মূহুর্তে দেখেছি কয়েকবার। কিন্তু

নিজের চারিদিকে ইনি এমন একটি দৃষ্টান্ত দৃঢ় রচনা করে রাখতেন, যার জানালা বা দরজার সম্ভান আমি কেন-মতেই পেতুম না! শুধু এইটুকু জানতুম, ওঁর বছর আঠারো বয়সের একটি ছেলে আছে, এবং সে ছাত্র।

সেদিন মেঘলা ও বৃষ্টির দিন। কৃষ্ণসাগরের উপর ঘন কালো মেঘ দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টি ও বাতাসে বাইরে বেরোবার জো ছিল না। সমুদ্রের ধারের বেঞ্চগুলি শূন্য। আমি সকালের দিকে প্রাতরাশ শেষ করে ঘরে এসে বসে 'Palace and Prison' বইটির বাংলা পান্ডুলিপিটি পরীক্ষা করছিলাম। এমন সময় শ্রীমতী লিডিয়া একখানি চিঠি হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। চেয়ে দেখলাম, তাঁর মূখ্যখানা গম্ভীর। চোখে তাঁর 'শর্ট-সাইটের' চশমা, মাথার চুলগুলি তান্ত্র-স্বর্ণাভ, এবং তাঁর মূখখানি সুস্থি।



মুখের দুটি দাঁত সোনা-বাঁধানো—যেমন এদেশে বহু মেয়েপুরুষের হয়। অনেকের মুখে 'ফেইনলেস' ঘট্টালের দাঁতও দেখতে পাওয়া যায়। চিঠিখানা আমার সামনে রেখে তিনি পিছন দিকের কুশনে চুপ করে বসে রইলেন। চেয়ে দেখছিলাম, সন্দীর্ঘ চিঠি।

গতরাতে একটি অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। সেটি এখনো বালি। এই হোটেলেরই কোন একটি ঘরে জনৈক সিকাগোবাসী আমেরিকান আইনজীবী এসে উঠেছেন, এবং হোটেলের বাসিন্দাদের তালিকায় একজন ভারতীয়ের নাম দেখে তিনি আমাকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করেন, আমার ঘরে তিনি এখনই একবার আসতে পারেন কিনা। আমি তখনই তাঁকে আমন্ত্রণ করি, এবং লিডিয়াকেও ডেকে পাঠাই। মিঃ লিউইস বোধ করি 'একাই' আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে যেতে চেয়েছিলেন! কিন্তু আমি সেটি গছন্দ করিনি। সুতরাং তাঁকে বললাম, আমি যে দেশের অতিথি এবং যার হোপ-জতে আছি, তাঁকে বাদ দিয়ে অপর একজন বিদেশীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা একটু যেন অসুবিধাজনক বোধ করি। ইতিমধ্যে শ্রীমতী লিডিয়া এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

লিডিয়াকে হঠাৎ দেখে ভদ্রলোক একটু যেন থাতিয়ে যান, এবং অপ্রস্তুত ভাবে বলেন, দিল্লী থেকে আগ্রা ঠিক কতটা দূর, এইটি জানতে এসেছিলাম!

আমি তাঁর অবস্থা দেখে হাসি চাপতে পারলাম না। বললাম, আসুন, বসুন। বেশ ত, দিল্লী-আগ্রা নিয়েই তিনজনে মিলে গল্প করা যাক।

ভদ্রলোকটি খর্বকায়, ধারালো এবং তাঁর বয়স আন্দাজ ষাট। তিনি হাসিমুখে আমার ইংগিতটা গ্রহণ করলে আমি সন্দীর্ঘ হতুম! কিন্তু তিনি একটু ভুল করে বসলেন। বললেন, ভেবেছিলাম ঘরে আপনি একাই থাকবেন।

হঠাৎ রুষ্ট হয়ে উঠলেন লিডিয়া। বললেন, ক্ষমা করবেন। উনি একা থাকলে আপনার পক্ষে কি প্রকার সন্নিবিধ হত?

ভদ্রলোক কৌতুক করে বললেন, সন্নিবিধ ছিল এই, আমরা দুজনে একই ভাষায় গল্প করতে পারতুম, দোভাষীর দরকার হত না।

ফস্ করে শ্রীমতী বললেন, Do you mean my presence here is unwanted and undesirable?

না, না—মিঃ লিউইস বললেন, এ কি কথা! আপনিও থাকুন! আমি একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কাছে কিছু কিছু গল্প শুনোঁছি, সেইগুলি ওঁকে বলবার জন্য এসেছিলাম!

আর যায় কোথা! দুঃখরস্কিম সুন্দর মুখখানিতে প্রাচীন বলশেভিক বিপ্লবের আগুন ধকধক করে উঠল,— Do you ask me to believe that you tried to bribe a Soviet driver?

এবার লিউইসের পালা! তিনি হাসিমুখে বললেন,—

no, he was very eager to get inside my flat in Moscow and narrate your miserable plights!

ব্রহ্ম হাসি হাসলেন শ্রীমতী লিডিয়া। বললেন, And are you going to give out the story in your democratic Press?

It is not a story, dear madam!

এবার আমাকে মাঝখানে দাঁড়াতেই হল। হাসিমুখে বললাম, এই ঘরটির থেকে যদি রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে ব্রহ্ম ঘোষণা হয় তবে ইতিহাসে আমার নামটি থেকে যেতে পারে।

বচসাটা আরম্ভ হয়েছিল মাত্র। কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে জানিনে।—

অতঃপর দুই পক্ষে একটি রফা হল এবং হাসি-তামাশার মধ্যে দুইজনই যখন বিদায় গ্রহণ করলেন, তখন আন্দাজ করে নিলাম, উভয়পক্ষই 'জয়লাভ' করেছেন! কিন্তু লিডিয়ার বিশ্বাস বন্ধমূল হয়ে রইল, এই আইনজীবী ব্যক্তিটি যথেষ্ট সরল নয়।

আজ সকালে বৃষ্টি-বাদলার দিনে যিনি এসে ঘরে ঢুকলেন তিনি গতরাত্রির 'ঝড়ঝঞ্ঝা' নন, তিনি অন্য মেয়ে! চিঠি-

খানা নাড়াচাড়া করে বললাম, এ ত রূশ ভাষা, আমি নিয়ে কি করব? কার চিঠি?

শান্ত এবং কোমলকণ্ঠে লিডিয়া বললেন, এ চিঠি এল একটু আগে মস্কোর ঠিকানা কেটে! যাঁদের কখনো দেখিনি এ চিঠি তাঁরা লিখেছেন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বললেন, একঘণ্টা আগেও জানতুম না আমার মা ছাড়া আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আর কেউ বেঁচে আছে! আজ প্রথম জানলাম, আমি আর একা নই। আমার কাকার ছেলেমেয়েরা জীবিত রয়েছে! জীবনে এমন সুন্দর চিঠি আর কোনদিন পাইনি! সমস্ত চিঠিতে আমার দাদার কণ্ঠস্বর যেন কান্নায় কাঁপছে!

শ্রীমতী লিডিয়ার চোখে জল এল। আমি সাগ্রহে তাঁর পারিবারিক পরিচয় শুনতে চাইলাম।

মস্কো থেকে বহু দূর উত্তর-পশ্চিমে বালটিক্ ইউনিয়ন রাষ্ট্রের সীমানায় বিরাত একটি নগরের নাম 'পেশকভ'।

বিন্দু গ্রন্থনা
জন্মদায়ক জাগরণ
জন্মদায়ক জাগরণ
জন্মদায়ক জাগরণ

ফোন: ৪০-৬৪০৭
মিঃ মৈত্র

কপালান জন্মদায়ক

Coventry Ladies'



Rolled gold steel back case,
17 jewel movement Rs. 140/-

Roy Cousin & Co.

4, Dalhousie Square, CALCUTTA-1

এই নগরীর নিকটবর্তী ‘পেচাটস্ক’ অঞ্চলের অন্তর্গত ‘বগামলোভো’ নামক গ্রামে এক দরিদ্র চাষী পরিবারের কতী ছিলেন ‘পাভেল লুকিন’। লুকিনের পাঁচটি ছেলেমেয়ে ছিল, এবং সকলের ভরণপোষণের জন্য সেই লোকটাকে নানা মঠে গিয়ে ক্ষেত-মজুরি করতে হত। পাঁচটি সন্তানের মধ্যে চারটি ছিল ছেলে, মেয়ে একটি। লুকিনের যে ছেলেরি বড়, তার নাম নিকলাই। সে ১২ বছর বয়স থেকেই ভিক্ষে করে বেড়ায়। সুবিধা পেলে জুতো পালিশ করে দেয়—তার থেকে পরিসা জমিয়ে নদীর ধারে মাছ কিনে বাজারে বেচে আসে। ১৪ বছর বয়সে কারখানায় কিংবা এখানে ওখানে মজুরি করে পরিসা আনে। কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে সে লেখাপড়া শেখে। মাথাটা তার পরিষ্কার, এবং লেখাপড়াটা সে ভালই শিখল। অতঃপর সে একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে হিসেবনবীশের কাজ পেল। এইখানে একটি মেয়ের সঙ্গে তার ভাব হয়। মেয়েটি ওইখানেই কাজ করত, নাম ‘আলেকজান্দ্রা’। নিকলাইয়ের সঙ্গে যখন বিয়ে হল, আলেকজান্দ্রার বয়স তখন ১৬। সেই বিবাহ দ্বিতীয় প্রথম মহাযুদ্ধের কালে। কিন্তু সেই যুদ্ধের দশ বছর আগে অত্যন্ত বালক বয়সে অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নিকলাই ‘গুরুপ্ত বিপ্লবী দলে’ যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধের সময় আলেকজান্দ্রা কাজ নিল ফ্রন্টে, এবং নিকলাই ‘সাব-লেফটেন্যান্ট’ পদে বহাল হল। কিন্তু সেই যুদ্ধ থামবার আগেই রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল, এবং বিপ্লবী নিকলাই আপন মেধা ও যোগ্যতার বলে হয়ে উঠল পেশকভ অঞ্চলের ‘পার্টিজান কমান্ডার’। নিকলাই তার অধীনে ক্রমশ একটি সশস্ত্র বিশাল বাহিনী গড়ে তোলে এবং তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭,০০০। এই যুবক অসীম বীরত্বের সঙ্গে একদিকে জমিদার-গোষ্ঠীর বিপক্ষে এবং অন্যদিকে, দেশব্যাপী শত্রুদল ‘হোয়াইট গার্ডসদের’ বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তিনি ‘পেনেভস্কভস্কি’ অঞ্চলের বিপ্লবী সংস্থার সভাপতি ছিলেন, এবং পরে তাঁকে ‘পীপলস কমিসার’ অর্থাৎ মন্ত্রীর পদে উন্নীত করা হয়। ওঁদিকে জারতন্ত্রী ‘হোয়াইট গার্ডস’-এর কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, যদি কোনও ব্যক্তি নিকলাইকে হত্যা করে অথবা তার মৃত্যুটি কেটে আনতে পারে তবে তাকে ৫,০০০ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পেশকভ শত্রুর দাঁড়িয়ে একদা জারসম্রাট শ্বিতসী নিকলাস ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেরেনস্কিপ্রেসিত এক দলিলে সঠিকরূপে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

রাশিয়ার ঘরোয়া সংগ্রাম চলছিল অনেকদিন। কিন্তু লেনিনের প্রিয়পাত্র এই ব্যক্তি মন্ত্রীপদে আসীন থাকাকালেও সেই ঘরোয়া-যুদ্ধ অনেকদিন অব্যাহত

থামেনি। এই সময় নিকলাইয়ের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সেই সুদীর্ঘকালব্যাপী অরাজকতার কালে বছর দুইয়েকের মধ্যে আলেকজান্দ্রা পুনরায় যখন আসন্নপ্রসবা হয়—সেই সময় নিকলাই স্থির করে, আলেকজান্দ্রাকে পেশকভের বাড়িতে রেখে আসা দরকার! কিন্তু নিকলাই তখন চারিদিক থেকে সশস্ত্র শত্রুবোঁচক। অতএব সে স্থির করল, রাশির ঘন অশ্বকারের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে সে একটি ঘোড়াটানা ঘাসপাতার গাড়িতে তার অন্তঃস্বভা স্ত্রীকে কোনমতে বসিয়ে নিয়ে গা-ঢাকা দেবে। সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যাবে ওই দুই বছরের ফুট-ফুটে মেয়েটা—যার নাম রাখা হয়েছে ‘লিডিয়া নিকলায়েভনা’। সে কতক যাবে হেঁটে, কতক যাবে বাপের কাঁধে। তবে হ্যাঁ, গুলীভরা রাইফেলটাও কাঁধে নিতে হবে বৈকি!

নিঃসাড় রাতে ছোট্ট একটি খোলা ঘোড়াটানা গাড়িতে অসুস্থ আলেকজান্দ্রাকে শুলিয়ে মেয়েটাকে চুপি চুপি কাঁধে নিয়ে নিকলাই মাঠের ধার দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেইদিকে, বৌদিকটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। জনচারেক সশস্ত্র দেহরক্ষী বহুদূর পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে নিকলাইকে সেই তল্লাটের বাইরে পার করে দিয়ে এল। ঘোড়ার মতের রাশিটি ধরে নিকলাই হাঁটতে হাঁটতে চলল। মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে!

উষার প্রাক্কালে একটি নালা ও খাদের কাছে এসে যখন গাড়ির পথ আটকে গেল, সেই সময় মেয়েটাকে কোল থেকে নামিয়ে নিকলাই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিল, এমন সময় সেই অত্যন্ত মূহুর্তে নিকটবর্তী ঝোপজঙ্গলের ভিতর থেকে সহসা শত্রুপক্ষের রাইফেলের গুলী ছুঁতে এসে নিকলাইয়ের শরীরে বিদ্ধ হয়, এবং সেই গুলিগোলের মধ্যে দুই বছরের মেয়েটা খাদের মধ্যে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায়। এর পর আসন্ন-প্রসবা আলেকজান্দ্রা, জ্ঞানহারা শিশুকন্যা লিডিয়া, এবং নিকলাইয়ের রক্তাক্ত শব্দেই শত্রুদের হাতে পড়ে। বলা বাহুল্য, শব্দরবাড়ির আর কোনও খবর আলেকজান্দ্রা পাননি।

এর পর ‘হোয়াইট গার্ডসের’ সৈন্যরা নিকলাইয়ের দুই সহোদর ইভান এবং মিখাইলকে বহুবিধ শারীরিক উৎপীড়ন করার পর গুলী করে মারে। অন্য দুটি ভাই—তার মধ্যে একটি বৈমান্য—তার বিচ্ছিন্ন হয়ে এস্টনিয়াতে আশ্রয় নেয়। তাদের আর কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায় না।

আলেকজান্দ্রার আর একটি কন্যা জন্মায়। কিন্তু দশবছর বয়সে সে মারা যায়। জননীর কাছে ‘লিডিয়া’ লেখাপড়া শেখেন, এবং টীচার ইন্সটিটিউট থেকে তিনি গাজেট হন। এখন তিনি

শিক্ষকতা করেন। তাঁর দুই কাকা নাৎসী বাহিনীর অবরোধ কালে এস্টনিয়া থেকে প্রেপ্তার হয়ে ‘গ্যাস চেম্বারে’ প্রেরিত হন, এবং সেখানেই তাঁদেরকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়। কিন্তু তাঁদের ছেলে-মেয়েরা পেশকভের বাড়িতে কোনওমতে বেঁচে যায়! এতকাল পরে কোনও এক সূত্রে আলেকজান্দ্রা তাঁর শ্বশুর পরিবারের খবর পান, এবং সেই সূত্রে ধরেই যে ভাইটি লিডিয়াকে চিঠি দিয়েছেন তিনি লিডিয়ার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। লিডিয়াকে সকল সংবাদ জানিয়ে আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়ে অবিলম্বে তিনি পেশকভে যেতে লিখেছেন! চিঠির মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হৃদয়বেগ ও ভালবাসার মাধুর্যটি উপলব্ধি করে শ্রীমতী লিডিয়া বরকারিয়ে কাঁদছিলেন!

এই দিনটির প্রায় আট মাস পরে বালটিক প্রান্তবর্তী ‘পেচাটস্ক’ নামক একটি গ্রাম থেকে শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে কয়েকখানি পত্র লেখেন। তার মধ্যে একখানিতে এইরকম একটি ছত্র ছিল :

“In the ‘Pskov Pravda’ of the city of Pskov on 31.12.58 an article dedicated to my father was published. I quote here a few lines from the article for you. (Forgive my poor English). My family members visited the graveside of my father along with me and they all wept.” At the very fence of the cemetery which is situated a kilometre away from a village of the Latvian Republic, there is seen a small hill under a curly thick birch tree. It is the grave of the “Military Commissar of Panikovsky District, Nikolay Pavlovich Lookin, who stubbornly fought for the strengthening of the Soviet power, was killed in the fight against White Guards”.

আরেকখানি পত্রে তিনি লেখেন, তাঁর পিতার নামে এখানে একটি মিউজিয়ম ও স্মৃতিসৌধ রয়েছে এবং এখানকার গ্রামে প্রতি বছর তাঁর স্মৃতি উপলক্ষে একটি মেলা হয়,—এগুলি এতকাল ধরে তিনি জানতেন না। “I became all of a sudden a ‘hero’ when I reached my village, as I am the only living child of my father.”

নিকলাই লুকিনের ঘটনাবহুল জীবনী পূর্বোক্ত মিউজিয়মে সুরক্ষিত আছে।

‘পেচাটস্ক’ গ্রাম থেকে শ্রীমতী লিডিয়া যে প্রথম পত্র আমাকে লেখেন, সেখানি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এখানে তার অনুবাদটি তুলে দিই :

‘শিশু অবস্থার পরে জীবনে এই প্রথম পিতৃভক্তি পদার্পণ করলাম। মনে করুন, সেই আমরা যাঁহঁদের মস্তকা থেকে লেনিনগণ্ডের দিকে। মাঝপথে সেই স্টেশন নামলাম যেখানে ‘আম্মা কেরেনিনা’ প্রথম দেখাছিল ‘দনস্কিক’। তারপর উত্তর পশ্চিমে গাড়ি চলল বালটিক রিপাবলিকের দিকে। রাত

১২টার নামলুম 'পেচারি' স্টেশনে। দাদা, বৌদি এবং তাঁদের বড় মেয়ে স্টেশনে এসেছিলেন। এই স্টেশনের কাছেই রয়েছে বোডশ শতাব্দীতে নির্মিত খৃষ্টানদের প্রাচীন মঠ (Church monastery), আমি তখনই সেটি দর্শন করতে গেলুম। সেটি দেখে আনন্দ পেলাম। সেখানে এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা, তিনি আমার বাবাকে চিনতেন। পরদিন গেলুম এস্টার্নরায় মাইল আশেট দূরে। সেই গ্রামে একটি 'গানের জলসা' ছিল—সেটি বহু সম্প্রদায়ের আসর। আমাদের গ্রাম পেশকভ প্রদেশের অন্তর্গত। এই গ্রাম এককালে সবচেয়ে দরিদ্র ছিল। এই অঞ্চল একদা ঘরোয়া যুদ্ধে সামাজিক অন্যাচারে, বর্জ্যায়াজের উৎপীড়নে এবং পরি-শেষে ফাসিস্তাদের সর্বনাশা অধিকারে গিয়ে এর দুর্গতির অন্ত থাকে না। সেই সব সাংঘাতিক কাহিনী আমাকে শুনতে হল।

"শুনে অবাক হবেন যদি বলি, আজ একটিও দরিদ্র পরিবার এখানে নেই। কাল সেই 'জলসা' গিয়ে দেখি, আমি ছাড়া আর সকলের পরণে রেশমী পোষাক! কী সুন্দর সকলের স্বাস্থ্য!... আমার বাবা এক বাড়িকে দুবছর ধরে 'ট্রুবেরি' বৃগিয়ে তবে একটি সুতী-শার্ট পেতেন তাঁর ছোটবেলায়। সেই বাড়ির বাড়ি দেখলুম। একজোড়া জুতার জন্য এককালে একটি গরু দিয়ে দিতে হত। একখানি বাইসাইকেল কিনতে গেলে ৪টি গরু বেচতে হ'ত! এখন একটি গরু বেচলে ৪ খানারও বেশি সাইকেল কেনা যায়! বিপ্লবের আগে এ অঞ্চলের লোক চাউলের দানা বা চারের পাতা কেমন, চোখেও দেখিনি! 'চিনিও' দেখেছিল কিনা সন্দেহ! এখন এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না!

"আমি যে বাড়িতে জন্মেছিলাম, সেই বাড়ি ফাসিস্তরা ভস্মীভূত করে। বৃদ্ধের পর গভর্ণমেন্ট নতুন বাড়ি পরিচ্ছন্নভাবে বানিয়ে দেন। আমার কাকাদেবকে হত্যা করার পর আমার খুড়ততো ভাই-বোনরা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেন, এবং উৎপীড়নের ভয়ে তাদেরকে পিতৃ-পরিচয় গোপন করে বাঁচতে হয়েছিল। সুদীর্ঘকাল। তাদের জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে চোখের জল সামালানো যায় না.....

"এখানে নদী নেই, আছে একটি শীর্ণ স্রোতস্বিনী। সেখানে স্নান করা যায় সাতার কাটা যায় না। প্রাকৃতিক শোভা সুন্দর, কিন্তু বড় বোপাঞ্জগল ভাঙা ভাঙা ভয়ানক সাপের ভয়... জাম কাডতে যেতে সাহস হয় না... চেষ্টা করবও এগোতে পারবো না। কাল গিয়েছিলুম 'জলসা' নিজেই যোড়বা গাড়ি চালায়ে। গাড়ি আমি ভালই চালাতে পারি। এখানে এখন হতে অন্ধকার নেই। রাত ১১টার পরে আলো না

জ্বলেও বেশ লেখাপড়া করা চলে। এটি আমার কাছে একটু আশ্চর্য লাগে। মস্কায় এখন রাত আটটার আলো জ্বালতে হয়। এখানে এখন সম্পূর্ণ 'অন্ধকার' নেই, এবং আর হাস্যকর একই রকম থাকবে। তারপর ধীরে ধীরে আসবে রাত্রি, সেই রাত্রি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকবে.....

"আজ আমার ভাইবির সঙ্গে গরু ও ভেড়া চরাতে গিয়েছিলাম। এ কাজও ভাল পারি। কিন্তু মাঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভাইবির কাছে আমার 'চাকরিটা' গেল।... আজ আপনার জন্মদিন। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আশা করি আমার টেলিগ্রামটি পেয়েছেন। এই চিঠি আসছে কাল ডাকে দেবো। ইতি—"

চিঠিখানা হৃদয়বেগের সঙ্গে জড়িত ছিল। সুতরাং পড়ে শেষ করতে কিছু সময় লাগল। অতঃপর শ্রীমতী লিডিয়া মুখ-চোখ মুছে বখন একটু সুস্থির হয়ে বসলেন আমি তাঁর দিকে তাকালুম। প্রথম দিন থেকে লক্ষ্য করেছি, এই মহিলায় সর্বপ্রকার মিস্টমথুর আচরণ এবং অপারিসমী সেবা-স্বস্তির অন্তরালে একটি পুথক ব্যক্তি লুকিয়ে থাকে। তাঁর সুন্দর মুখশ্রী, পোষাক-পরিচ্ছদের শোভনতা, ব্যবহারিক সঞ্চয় এবং স্বভাব কোমলতার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে ঈশ্বর উগ্রমতি একজন নিজস্বা কমিউনিষ্ট। সেখানে তিনি অনমনীয় এবং আপোষবিহীন। অকস্মাৎ, নাট্যশা, মেরিয়ম, নীনা, এদের সকলকে যে কোনও দেশের সমাজে মানিয়ে যাবে। শ্রীমতী অলেন্সিয়া বা সোয়েৎলানা—সব দেশেই প্রিয় হবে। কিন্তু শ্রীমতী লিডিয়া কেবলমাত্র রাশিয়াতেই সম্ভব। তাঁর বিশ্বাস, মানব জাতির 'ভূ-স্বর্গ' একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

আজ দেখি অন্য মেয়ে। এ মেয়ে 'মানবী'। দুঃখে-বেদনায় এবং মমতায় এই মহিলার চেহারাটি আমার সম্মুখে যেভাবে প্রতিভাত হচ্ছে, সেটির সঙ্গে গতরাত্রির 'রুশ-আমেরিকান' সংগ্রাম যোষণার কোথাও মিল নেই। সেটি খোলস এমন কথা বলিলে, কিন্তু আজ বোটি অশ্রুর আবেগের ভিতর দিয়ে দেখছি, সেটি খোলস নয়। আজ মনে হচ্ছে, জীবনের যে অনন্ত বৈচিত্র্য, সেটি সর্বত্রই এক। সেখানে ভায়তবর্ষের কোনও দুর্গম গ্রামের অশিক্ষিত মেয়ে নিউ-ইয়র্ক-লন্ডন-প্যারিস-রোমের লিপ-ভটক ঘষা মেয়ে অথবা রাশিয়ার প্রসাধন-বিনাসবিহীন মেয়ে, এদের মধ্যে তফাৎ কম।

আমি চুপ করে গিয়েছিলাম। এবার মুখ খুললুম। বললুম, আপনার পারিবারিক জীবন খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ, কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত জীবন আমি

জানিনে। আপনার একটি ছেলে আছে, এ ছাড়া কিছু শূন্যনি!

আপনি শুনতে চান?

শুনতে চাওয়াটা শোভন নয়।

লিডিয়া নিজেই বললেন আমার ছেলের বয়স ১৮। সে একজন ছাত্র—থাকে তার দিদিমার কাছে। ছেলের বাবা ছেলেকে খুব ভালবাসেন। দরকার হলে ছেলের খরচপত্র দেন। তিনি বিশেষ নৈহশীল এবং হৃদয়বান। তিনি থাকেন অন্যত্র। তাঁর অবস্থা বেশ ভাল।

বললুম, কিন্তু আরেকটা কথা যে উহা থেকে যাচ্ছে, ম্যাডাম?

শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, ছেলের বাবার সঙ্গে ছেলের মায়ের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। টাকাকড়ি বা অন্যান্য সাহায্যের দরকার হলে ছেলের মা যান ছেলের বাবার কাছে! তিনি বিশেষ বিবেচক মানুষ অতিশয় ভদ্র।

কিন্তু পৃথিবীসুস্থ সবাই জানে, ছেলেদের মায়েরা আর বাপেরা একতর-বাস করে। অভিধানে বলে, তাঁরা নাকি স্বামী এবং স্ত্রী।

সোভিয়েট ইউনিয়নেও তাই বলে!—তবে এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে উভয়ে একত্র বসবাস করেন না। সোভিয়েট আদালতের রেকর্ডে এটি পাওয়া যাবে তাঁদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে গেছে বছর দশেক আগে।

এবার সাহস করে বললুম, এই বিচ্ছেদের পর উভয় পক্ষের কে কবার পুনরায় বিবাহ করেছেন, জানতে পারি কি?

কেউ একবারও করেননি।—শ্রীমতী বললেন, ছেলের বাবা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এসব ব্যাপারে তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই। পড়াশোনা নিয়ে তিনি একা থাকেন। বিচ্ছেদ ঘটলেও তিনি তাঁর স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে চান।

আমি পুনরায় তাঁর দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, আক্ষেপ হ্যাঁ, আমাদের দেশে এটি ঘটে,—বোধ হয় অনেক দেশেই ঘটে। বার বার স্বামী অথবা স্ত্রী বদল করার পর অনেকেই ফিরে আসে প্রথম বিবাহের সম্পর্কে! জানিনে তাঁরা কেমন!

একটু অবাক হয়েছিলাম সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব ব্যক্তিগত আলোচনা বেশি দূর চলে আমার ইচ্ছা নয়। মানুষের জীবনে অভ্যন্তর সাধারণ পৃষ্ঠভূমিতে অনেক সময় জটিল হয়ে থাকে। প্রশংসী এবং প্রণয়নীর সম্পর্ক চিরদিনই সহজবোধ্য। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার প্রকৃত সম্পর্ক চিরকাল জটিল, দুর্য্যোগ, অপ্রকাশ্য এবং বিশ্লেষণের অতীত! এ ব্যাপারটি নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে কারও মাথা ঘামাবার সময় নেই, এ

নিয়ে মামলাও চলে না কোথাও দীর্ঘকাল। সেই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা শেষ হয় মাত্র দশ মিনিটে!

শ্রীমতী লিডিয়া এবার উঠে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার স্বামী অত্যন্ত ভদ্র এবং সূচীশীল। তিনি আমার দূর-সম্পর্কের কুটম্বও বটে। তাঁর ছাত্রাবস্থায় আমি উপার্জন করে তাঁকে সাহায্য করতুম। আমাদের বিবাহ ছিল বিশেষ আনন্দের। উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও বিতর্ক ছিল না। তবু আট বছরের মধ্যে সেই বিবাহ-বন্ধন ঘুচে গেল!

এ নিয়ে আর কোনদিন কথা ওঠেনি।—

পরদিন আমরা গিয়েছিলুম একটি সানটোরিয়ামের কর্ণসার্ট হল-এ। সেখানে সংগীতানুষ্ঠানের পরে একটি কনসার্ট-নাটক 'স্বামী-স্ত্রী' অভিনীত হল। এটি যেন অনেকটা কৌতুকনাট্য। স্ত্রীর জন্ম-দিনে স্বামী একটি উপহার দিচ্ছেন, সেটি স্ত্রীর পছন্দ নয়! এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে মস্ত বচসা এবং বিতর্ক। উভয় পক্ষেরই বক্তৃতা ছিল বেশ চড়া সুরে। নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, যা পেয়েছ তাই নিয়ে যদি সুখী না হও, তাহলে মনে মনেই দঃখ পাবে,—কিন্তু অবস্থার প্রতিকার হবে না! শেষ পর্যন্ত এইটি দাঁড়াল, স্বামীর অকৃত্রিম এবং আন্তরিক ভালবাসাই হল নারীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপহার! এই মিলনান্তক এবং কৌতুক-নাট্যটি যন্ত্রসংগীতের দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছিল। এটি সকলেই উপভোগ করেছিলেন। এই নাটকটি দেখার পর অভিনেতা এবং অভিনেত্রীটির সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ ঘটল, তখন জানলুম, বাস্তব জীবনেও তাঁরা স্বামী-স্ত্রী!

মিস নিকলাই ডিনিকভ আমাদের নিয়ে গেলেন ক্লকসাগরের উপরে 'মোটর-বোট বিহারে'। আমি সাঁতার জানিনে। অজানা কালো সমুদ্র,—এবং তাঁর বিদেশী কালো জলের করাল রূপ আমার মনে নিয়ে এল হাস! তরঙ্গের উপর দিয়ে মোটরবোটের দুরন্ত দ্রুতগতির চেহারাটা খুব উৎসাহজনক মনে হচ্ছে না। আমার কাছাকাছি বসে লিডিয়া যখন বললেন, ভয় পাবেন না, আমি ভালই সাঁতার জানি!—তখন আমাকে বলতেই হল, ডুবে মরার আগে লোকে খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে ভাববে! সত্যতঃ আমাদের দাঁতি 'স্বতন্ত্র' যখন একই সঙ্গে তোলা হবে,—সেটি এদেশে-ওদেশে কোথাও আনন্দ-দায়ক হবে না!—আমার কথা শুনে ওঁরা দু'জন হেসেই লুটোপুটি!

সেদিন অপরাহ্নে ডিনিকভের ওখানে 'ব্যবহৃতভোজের' আমন্ত্রণ ছিল। সেই মধ্যাহ্নভোজ রুশীয় সামাজিকতা অনু-

সারে মধ্যরাত্রির কাছাকাছি অবধি চলল। কিন্তু সেদিন বিদেশী অতিথি প্রথম থেকেই এই নাট্যকার পরিবারের রান্না-ভাণ্ডার, শোবার ঘর, বারান্দা, বৈঠকখানায় এগনিই আবহাওয়ায় পেয়েছিল যেটি উল্লেখযোগ্য। ডিনিকভের অতি ভদ্র স্ত্রীর সকল প্রকার পরিচর্যা ওই ৭।৮ ঘণ্টা কালের মধ্যে একবারও মনে হয়নি, আমি আমার সাধারণ বাঙালী সমাজের বাইরে এসেছি। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কথাই যদি ধরি, তাহলে আমার বিশ্বাস, সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের সঙ্গে ভারত-প্রকৃতির এত নৈকট্য নেই। সেদিনকার আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে রুশ ভাষা কোথাও অবরোধ সৃষ্টি করেনি!

নিকলাই অষ্ট্রভাষিক নামক একজন নব্যকালের প্রসিদ্ধ লেখকের স্মৃতি-মন্দির ও যাদুঘর 'শোচি' শহরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ'র একখানি উপন্যাস "How The Steel Was Tempered" সোভিয়েট ইউনিয়নে ১ কোটি ২০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। এই লেখক ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে একটি গ্রামীণ চর্যা-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-লাভের পর তিনি লেনিনের আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে বলশেভিক বিপ্লবে ব্যাপিয়ে পড়েন। তিনি যখন লালফোজে যোগদান করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫। ঘরোয়া যুদ্ধের কালে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়। অতঃপর নানাবিধ ব্যাধির আক্রমণে তাঁর স্বাস্থ্যও ভাঙতে থাকে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি চিরদিনের মতো শয্যাগত হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ এবং তাঁর দু'খানা হাত ছাড়া সমগ্র দেহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। এই সময় তিনি তাঁর স্ত্রী, ভগ্নী এবং বন্ধুদের কাষিক সাহায্যে পূর্বোক্ত রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই বইখানি তাঁকে যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে সেটি যে কোনও লেখকের পক্ষেই দুর্লভ সৌভাগ্য। এই তরুণ লেখকের তেজস্বিতা, আদর্শ-নিষ্ঠা, জীবন-পর্যালোচনা এবং অপার-সীম দরদ তাঁকে সোভিয়েট ইউনিয়নে বহুজনপ্রিয় করে রেখেছে। বিগত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মস্কো নগরভে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে এই অন্নসাধারণ লেখকের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর আগে বহু বছর তিনি 'শোচিতে' বাস করেছিলেন।

অষ্ট্রভাষিকর প্রবীণা ভগ্নী শ্রীমতী অগ্ভভস্কারা এবং এই যাদুঘরেরই অপর একজন প্রবীণা কর্মী শ্রীমতী লাজারেভা সমস্ত বাড়িটিতে অষ্ট্রভাষিকর সকল চিহ্নগণ্ডি আমাকে সমস্ত ঘর-ঘিষে দেখালেন। ভিজিটাস বুক-এ আমি লেখকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানালুম।

এখানকার বটানিক্যাল গার্ডেন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ থেকে মোট ৮০০ রকমের গাছ এনে বসানো হয়েছে। তাঁর মধ্যে ভারতীয়, আম, নিম, কলা ও

নারকেলকে চিনতে দেই হয় না। এখানকার সাব-ট্রপিক্যাল আবহাওয়া সত্ত্বেও ওদের না আছে বৃষ্টি, না আছে ফল-ফল, না বা মৃত্যু! ওরা তামাশার মতো শুধু দাঁড়িয়েই রয়েছে।

কিন্তু শোচির মস্ত বাজার এবং হাটতলা ছাড়িয়ে পাহাড়ি অলিগলি পেরিয়ে একটি সিনেমাহলে গিয়ে যেদিন মিখাইল সলোকভের, "Quiet flows the dawn" বইটির সুদীর্ঘ ছবিটি দেখলুম, সেদিন সোভিয়েট ইউনিয়নের সিনেমা-শিল্পটি আমার নিকট অতিশয় শ্রদ্ধের হয়ে উঠেছিল। এ ছাঁব এত জীবন্ত এবং এমন বাস্তব চেহারা নিতে পারে, এটি অবিশ্বাস্য। "আউট-ডোরের" সঙ্গে "ইন্ডোরের" যে মনোস্তম্ভ সংমিশ্রণ লক্ষ্য করেছিলাম, সেটি আমার পক্ষে স্মরণীয়। এমন চিত্রনাট্য রচনা, প্রয়োগশিল্প এবং প্রাপবন্ত অভিনয় আমি অল্পই দেখেছি।

শোচি শহরে আমি হঠাৎ খ্যাতিমান হয়ে উঠলুম, যেদিন ট্রান্স-ককেশিয় ভাষার একখানি দ্বি-সাপ্তাহিক 'রেড ব্যানার' নামক কাগজে আমার একটি ছোটখাটো জীবনী ও একটি ছোট প্রবন্ধের অনুবাদ ছাপা হল। হঠাৎ খ্যাতি বোধহয় রামধনুর মতো এক সময় মিলিয়ে যাবার ভয় থাকে! সেইজন্য স্থানীয় লেখকসম্প্রদায়ের কতারা সেদিন নিয়ে গেলেন তাঁদের আয়োজিত একটি সভায়। সভাটি খুব ছোট নয়। সেখানে চেনবার জো নেই, কারা কোন সম্প্রদায়ের লোক। বস্তুত, মধ্য-এশিয়ায় অথবা মঙ্গোলয়েড রক্তের কাছাকাছি না এলে জাতি-বৈশিষ্ট্য আর কোথাও চেনা যায় না। বাই হোক, সভাস্থ নরনারীরা এর আগে অবশ্য লেখক বস্তু কেমন, অবশ্যই দেখেছেন,—কিন্তু একজন ভারতীয়কে তাঁরা দেখলেন এই প্রথম! যেখানে শোনার আগ্রহ অপেক্ষা দেখার আগ্রহ বেশি,—সেখানে একটু ভিড় হয় রৈকি। শ্রদ্ধা অথবা বিরক্তি আসে পরে। কৌতুহল আসে সকলের আগে! ওদের কাছে আমি প্রধান নয়, 'ভারত' প্রধান! অভ্যর্থনা জানাচ্ছে ভারতকে আমাকে সামনে রেখে। আমি নমস্কার জানালুম হাতযোড় করে,—কিন্তু সে-নমস্কার 'ভারতের' ভারত প্রসন্ন কিনা, সেটি প্রকাশিত আমার অভিব্যক্তিতে! আমি কথা বলছি ভারতের মতো! অহমিকা, আত্মশ্লাঘা, মাংসর্ষ, আত্ম-ভিমান, অনমনীয় কঠোর মতবাদ—এরা ভারতের নয়! আমরা পরস্পর অপরি-চিত! কেউ কারো ভাষা জানিনে, উভয়ের সমাজব্যবস্থায় মিল নেই, জীবনাদর্শ পৃথক, কেউ কারও কুটম্ব নয়, বিরাট এক অপরিচয়ের ব্যবধান দুইয়ের মাঝখানে! কিন্তু ভালবাসা ও বন্ধুত্বের ভাষা হল তার নিজস্ব। সেখানে সামান্য সুন্দর হাসি, ঈর্ষ

একটি মধুর স্পর্শ—তারই মধ্যে আশ্বাদ পাওয়া যায় অমৃতের। মানুষের পরমার্শ সত্তা তারই স্পর্শে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেখানে কৃষ্ণসাগরের নাবিকের সঙ্গে গঙ্গাসাগরের নৌকার মাঝির চিরকালীন সম্পর্কটি অচ্ছেদ্য প্রাণসূত্রে বাঁধা! এই ককেসাস অঞ্চলের প্রতি ব্যক্তির মস্তিষ্কে অবোধে পৌঁছতে পারি সামান্য একটি ছাড়পত্র নিয়ে, যদি হাসিমুখে তার হাত ধরতে পারি! ভারতবর্ষ এমনি করে হাত ধরতে চেষ্টাচ্ছে চিরদিন। স্বাধীনসিদ্ধি, মতবাদ-প্রচার, রাষ্ট্রসীমানা, শক্তি ও শৌর্যের আশ্বাসন—এর জন্য ভারত ছোট্টোনি কখনও দীর্ঘনিদ্রাকে। কিন্তু সে ভীরু একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে ভিক্টর বোশে গিয়েছে দেশ-দেশান্তর। সে-প্রদীপ জ্ঞান-পিপাসার বিদ্যাজ্বলের অধ্যাত্ম আনন্দের! ভারতে সেই প্রদীপ আজও জ্বলছে!

ভারতীয় সাহিত্য সেই কারণে কেবলমাত্র বুদ্ধপ্রতীক জড়বাদী হয়ে ওঠেনি। সাহিত্যে সে সুখসম্প্রদায় কথা ভাবেনি, সে আনন্দের অনুসন্ধান করেছে! তার সাহিত্যচিন্তার গঠন হয়েছে জ্ঞানপ্রতীক। দেশাসুত্রে সংগ্রামে সে সমুদ্র-পরিমাণ গরল পান করেছে অমৃতের সন্ধান। ভারতের চিরায়ত সাহিত্য সেই অন্তহীন জ্ঞান-সাধনার একটি মহৎ আসন। সেই জ্ঞান-সাধনার ধারা চলে এসেছে কাল থেকে কালান্তরে,—তার ইতিহাস বাম্পীক-বেদব্যাস-কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছেও শেষ হয়নি। ভারতের সাহিত্যে চিরকালের পরমায়ু লুকানো আছে বলেই চিরকাল সে নতুন।

আধুনিক সোভিয়েট লেখকের তুলনায় ভারতের লেখকরা বড় দরিদ্র! কিন্তু সেটি তাদের অঙ্গের ভূষণ। রাষ্ট্রের সহায়তা তাদের কাম্য নয়, সেইটি তাদের গৌরব। সেখানে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম আছে, আছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা, আছে নিদয় প্রতি-স্বপ্নভা, আছে সামাজিক জীবনের নানাবিধ জ্ঞান। কিন্তু সেই কঠোর পরীক্ষার মধ্যেই ত' শক্তিমানের পরিচয়। সমস্ত দুর্ভোগ, বিরোধ, দুর্ভাগ্য এবং বিরূপতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে যে সাহিত্য-সাধক,—তাকেই ত' বলি প্রতিভা! সে অপরাঙ্কের বলেই ত' ব্যবণা! ভারতের প্রত্যেকটি লেখক হ'ল সোম্বা—জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে পাণপূর্ণ সংগ্রাম করে বলেই সে স্বাধীনচিত্র! অমায়িকসজ্জা সোভাগ্য তার চোখে সম্মানজনক নয় বলেই সে ওঠে পৃথিবী বরণ। ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিশেষণ চিরকালীন গ্রামীণী—এটা অস্বাভাবিক বর্ণিত সমগ্রতা—এটা স্বাভাবিক সত্যের জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ সত্য-সংস্পর্শেই ওঠে প্রাণের মিলন, আভির্ভূত, আভিমত,—সমস্তই নিজস্ব।

এ'রা মন্ত্র দান করেন আপন প্রতিভার শক্তিতে, কিন্তু মন্ত্র গ্রহণ করেন না! পৃথিবীর আর কোনও আকাশে এমন স্বচ্ছন্দবিহারী বিহংগের দল আছে কিনা আমার জ্ঞান নেই!

নমস্ते!

এটি পুরী কিংবা স্মারকার সমুদ্র নয় যে, ক্রমনিম্নমান ঢালু ধীরে ধীরে গভীরে চলে যাচ্ছে। কৃষ্ণসাগর হল একটা বিরাট গহবর, যার ধারে পা পিছলে পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ৬৫৬ ফুট নীচে তলিয়ে যেতে হয়। এ যেন এক অতিকায় জলপাত্র, এবং এর গভীরতা লম্বায় ৭১৬ মাইল এবং চওড়ায় ৩৭৮ মাইল। এই গহবরের গভীরতা ৭৩৫৭ ফুট। এর আশেপাশে আনেনরিগিরির নানাবিধ উৎপাত আছে। এর জল অতি বিকৃত-স্বাদ, একপ্রকার ক্ষার ও গন্ধকমিশ্রিত পোড়া গন্ধ—যেন ঢালুই-লোহার কড়াইয়ে সিদ্ধ করা জল। এই সাগরের পূর্বদিকে ককেসাস পর্বতমালার ফাটল থেকে অবি-প্রান্ত উদ্ভূত ধাতুর জলধারা যেমন নামছে, যেমন নামছে তুবারবিগলিত 'রাইওনি, ইগুনি' প্রভৃতি উপরিভাগের নদী,—তেমনি কৃষ্ণসাগরের উত্তর দিকে থেকে নেমে এসেছে ইউরোপের চারটি বহু নদী,—দানিউব, নীলদার, বাগ ও নীপার'। এই সমস্ত জল পশ্চিমে এশিয়া মাইনর বা তুরস্কের গা বেয়ে 'বসফোরাস' প্রণালীর ভিতর দিয়ে 'ইজিয়ন' মর্মর ও ভূমধ্যসাগরের' দিকে চলেছে! ভূতত্ত্ব-বিদরা বলেন,

"In remote geological times what are now the Black, Azov and Caspian seas was a gulf of the ancient Mediterranean, which extended from the Atlantic far to the East—to the Arctic and Indian oceans—and covered the territory of Southern Europe, North Africa and Central Asia. In the tertiary period when the great tectonic upheavals gave rise to the Himalayas, Alps and Caucasian mountain ranges and the deep valleys intersecting them, the ancient sea retreated and formed separate basins."

খৃষ্টপূর্ব বহু শতাব্দীর আগে ফিনিসিয়ানরা (Phoenicians) এবং গ্রীকরা এসে কৃষ্ণসাগরের তীরে-তীরে উপনিবেশ গড়ে। পরবর্তীকালে বাস-বরের দল এসে গ্রীক উপনিবেশ ধ্বংস করে। তারপর আসে রোমানরা। তারাও পাবে পামায় বাসাবাসদান ভাঙে। অবশেষে এসে পৌঁছয় রোমকামনিয়ানরা। তারা কাসাস গ্রীক উপনিবেশ গড়ে তোলে। এজন্য রোম বহু শতাব্দী চলে যায়। তারপর দশম শতাব্দিতে স্লাভরা আসে।

তাতার ও মঙ্গোলরা এসে দাঁড়ায় ১৩শ শতাব্দীতে। তারা মারধর করে সবাইকে এবং রাশিয়ানরা পালায়। অতঃপর তুর্কীরা মাথা তোলে, এবং তারা ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই সাগরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। কিন্তু কালের গতি স্তব্ধ হয়ে থাকে না। ১৮শ শতাব্দী থেকে রাশিয়ানরা তুর্কীদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে আবার ফিরে আসে কৃষ্ণসাগরে। তারা সমগ্র উত্তর ভাগ দখল করে। অতঃপর বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯২০ সালে এই সাগরের সমগ্র পূর্বসীমানা বহুবিশেষ সংঘর্ষ এবং অরাজকতার পর সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পূর্ণ দখলে আসে। আজ কৃষ্ণসাগরের সর্বত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রচণ্ড শাস্তিশালী নৌবাহিনীর সর্বময় প্রভুত্ব। এদেরই একটি মনোরম 'নেভি কনসার্ট' সেদিন বসে বসে দেখাছিলুম।

আমাদের সুন্দরবনের নিভৃত নদীর চড়ায় শীতের দিনে যেমন বড় বড় মোটাসোটা কুমীরগুলি রৌদ্রের মধ্যে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে; তেমনি কৃষ্ণসাগরের ধারে ধারে প্রায়শঃ নরনারীরা ছড়িয়ে থাকে গা ঢেলে দিয়ে। ওদের মধ্যে স্থলীলোকের সংখ্যা বেশি, কেননা সাধারণতঃ জনতার মধ্যে ওরা বিবস্ত্র হবার সুবিধা পায় না। যাদের বয়স কিছু বেশি, তারা বেশি স্থলে, এবং ঈষৎ চক্ষুলাজ্জা থাকার জন্য কেউ কেউ রঙীন ছাতার সাহায্যে সূর্যালোক এবং নিরীহ পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে 'মুখরক্ষা' করে। ভারতে এরূপ দৃশ্য দেখার অভ্যাস নেই বলেই নিজের চক্ষুকে অকে সম্মত বিশ্বাস করতে পারিনি! কিন্তু কুমীরের প্রয়োজন আছে সূর্যসম্ভোগের, আমি তার রিসীমানায় নাই বা এলুম!

শোচনীয়ভাবে পূর্বরাষ্ট্রে ফিরোডোর জোরিন একটি ভূরিভোজের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী রান্না করেছেন নিজে। তাঁর বালকপুত্র অতি উৎসাহী। এই ভোজে উপস্থিত ছিলেন জনৈক তরুণ ফটোগ্রাফার, 'অগনিয়োক' কাগজের একজন প্রতিনিধি এবং পররাষ্ট্র বিভাগের একজন কর্মচারী। এই সুন্দর চন্দ্রহাসিত পুষ্পনগরী পর্যটন করে প্রথম একজন ভারতীয় আগামী কাল বিদায় নিচ্ছে, এজন্য সকলের ভাবাবেগ ছিল! পরম স্নেহশীল জোরিন আপন স্বভাবগুণে চোখ মুছেছিলেন কয়েকবার। এখানেও জর্জিয়ার রীতি অনুযায়ী অতিথির সঙ্গে চন্দন-বিনিময়ের ব্যাপার ছিল। সন্ধ্যা, আমার মতের দিকে চেয়ে শ্রীমতী লিডিয়া ঈষৎ বিরত বোধ করেছিলেন! অতঃপর হঠাৎ ফিরে। বিদায় নেবার কালে তিনি বসে গেলেন, সাবান দিয়ে মুখখানা ধুয়ে তবে বিছানায় উঠলেন! (ক্রমশঃ)।

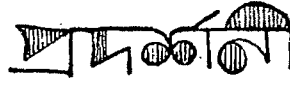
এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতার বিভিন্ন প্রদর্শনী ভবনে অনেকগুলি চিত্র ও কারুশিল্প প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে পার্ক ম্যানসনের আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে শিল্পী নিখিল বিশ্বাস ও ক্যাথেরিন রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে শিল্পী সান্দ্রনা গোস্বামীর চিত্র-প্রদর্শনী আমরা দেখে এসেছি। কারুশিল্পের প্রদর্শনীটি চলছে পার্ক স্ট্রীটের আর্টসি স্ট্রিট হাউসে এবং বাঙলার লোকশিল্পের প্রদর্শনীটি শুরুর হয়েছে ৪, এলগিন রোডের 'রচনা' নামক প্রদর্শনী কক্ষে।

॥ শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের প্রদর্শনী ॥

শিল্পী নিখিল বিশ্বাস তরুণ শিল্পী। দু'একটি প্রদর্শনীতে ইতিপূর্বে তাঁর ছবি দেখেছি কিন্তু তাঁর কোনো একক প্রদর্শনী শেখার সুযোগ এতকাল পাইনি। আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীর কতৃপক্ষ সেই সুযোগ করে দেওয়ার আমরা আনন্দিত।

এই প্রদর্শনীতে শ্রীবিম্বাস চৌদ্দখানি চিত্র-কর্মের নিদর্শন উপস্থিত করেছিলেন। এর মধ্যে আটখানা চিত্রের মাধ্যম ছিল টেম্পেরা ও চারখানা তেল-স্কেচের মাধ্যমে অঙ্কিত। এই সঙ্গে চীনা কালিতে অঙ্কিত দু'খানি স্কেচও স্থান পেয়েছিল।

শ্রীবিম্বাসের এই সব চিত্র-কর্মের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটি কথা আমার বারংবার মনে পড়েছে। শিল্পীর যদি কোনো জীবন-দর্শন না থাকে এবং সেই জীবন-দর্শন রূপায়ণের আঙ্গিক সম্পর্কে



কলারসিক

মনে যদি থাকে বিশ্বাস ভাব, তবে সেই শিল্পীর নিকট থেকে কোনো ভাল শিল্প-কর্ম বোধহয় প্রত্যাশা করা যায় না। এবং 'কম্পোজিশন' এই চিত্র-নামের আড়ালে লুকিয়েও সেই দুর্বলতা ঢাকা যায় না। শ্রীবিম্বাসও পারেননি। এবং ফলে, তাঁর চিত্র-কর্ম-দর্শনের পর কোনো ফলশ্রুতি, কোনো প্রাপ্তির আনন্দ নিজেও আমরা ফিরতে পারিনি।

এমনটা কেন হয়? আসলে, বোধহয়, সমস্ত তরুণ শিল্পীরাই এক বিশ্বাসের সংকটে ভুগছেন। তাঁদের চিত্র-কর্মে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এত কম থাকে যে, তার মধ্য দিয়ে প্রাতিভাদীপ্ত কোনে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আমরা স্বাগত জানাতেও পারি না। নিখিলবাবুর মনেও দৃঢ় কোনো শিল্প-বিশ্বাস বাসা বাঁধতে পারিনি। প্রতিটি চিত্রেই এর সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। তিনি বাস্তব ও বিমূর্ত শিল্পকে মিলাতে গিয়েছেন, কোথাও শব্দমাত্র ব্যঙ্গনার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সীমিত কল্পনা-প্রতিভার জন্য কোনো শিল্প-বক্তব্য তেমন করে অন্ততঃ আমার মনকে নাড়া দিতে পারেনি।

অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে। এবং নিখিলবাবুর ড্রয়িং সম্বন্ধে চেতনাও অনেক তরুণ শিল্পীর চেয়ে প্রখর। বিশেষ করে যেখানে জন্তুর কোনো চিত্ররূপ তিনি অঙ্কন করতে চেয়েছেন সেখানে তিনি অশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর টেম্পেরায় অঙ্কিত ঘোড়া (৪),

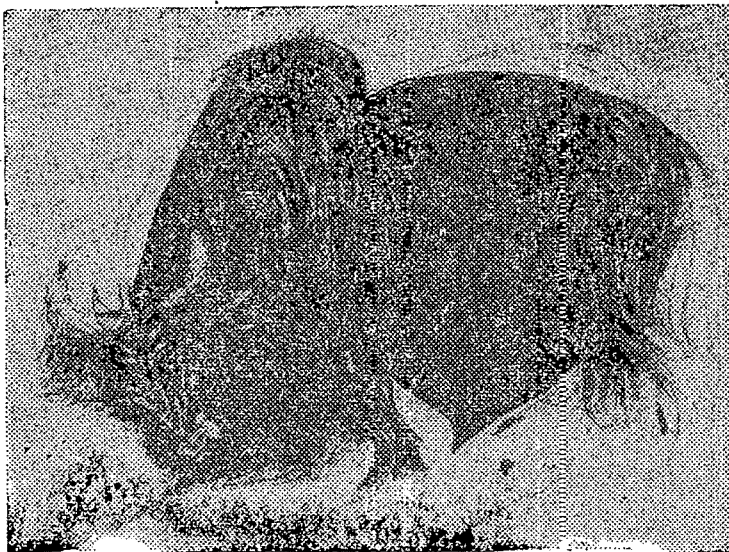
কিংবা 'পশুবৃদ্ধ' (৫) এই গতিশীল জন্তুর হাল্দিত রেখা ও বর্ণে বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর 'চন্দ্রালোক' (৯), গিজা (১০) কিংবা 'কম্পোজিশন' নামধারী চিত্রগুলি মনে বিশেষ কোনো দাগই কাটেনি।

নিখিলবাবুকে এ-সব সত্ত্বেও আমি অভিনন্দন জানাই। তাঁর 'বাইসন' (৮) নামক স্কেচখানিতে তিনি যে অপূর্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা এই প্রদর্শনীর সম্পদ। পশুর এত ভাল জ্ঞানতব রূপ শব্দ রেখায় তুলে ধরতে পারেন যে শিল্পী তাঁর ভবিষ্যৎ চিত্র-কর্ম দেখার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করবো। এই অবকাশে নিখিলবাবু, তাঁর দুটি-বিচ্যুতি-মুক্ত হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

॥ শিল্পী সান্দ্রনা গোস্বামীর প্রদর্শনী ॥

ছাত্র-শিল্পী সান্দ্রনা গোস্বামীর প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছেন 'মহেঞ্জোদারো' নামক একটি পত্রিকার পরিচালকমন্ডলী। ক্যাথেরিন রোডের প্রদর্শনী কক্ষে ১৭ খানি চিত্রকলা ও ১৪ খানি খোদাই কর্মের প্রতিলিপি স্থান পেয়েছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক থেকে শিল্পী বেছে নিয়েছেন পশু ও পক্ষীর নানা ভঙ্গী। তাঁর এই স্টাডির মধ্যে শিক্ষানবিশীর চিত্র থাকলেও রচনা-গুলির মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষরও আছে। ঘাটির সঙ্গে গাছের পাতা ও ফলের নির্যাস মিশিয়ে ইনি অনেকগুলি চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই খাঁটি দেশী পদ্ধতি বন্দ এফেক্ট সৃষ্টি করেনি। কয়েকখানি চিত্রে বিমূর্ত শিল্প-চেতনা প্রত্যক্ষ করা গেল। শিল্পী গোস্বামীর টান বোধহয় এই বিমূর্ত শিল্পকলার দিকে। অন্ততঃ তাঁর ভাস্কর্যশিল্পের প্রতিলিপিতে এই রূপ সুস্পষ্ট। শিক্ষানবিশী থাকাকালে এই মানসিক চেতনা বোধহয় খুব ভাল ফল প্রসব করে না। বরং ভবিষ্যৎ শিল্পী-জীবন এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ, যার ফর্মের চেতনা দৃঢ়-ভিত্তির উপর গড়ে ওঠার অবকাশ পেল না, সে যদি ফর্ম-ভাঙ্গার নেশায় মেতে ওঠে তবে কি বাস্তব, কি বিমূর্ত কোনো শিল্পধারাতেই তার শিল্পকর্ম স্থায়ী পাবে না। আশা করি শ্রীগোস্বামী এদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।

এই প্রদর্শনীর 'রোদ পোরানো' (২৫), 'ঝোপের উপর পাখি' (৬), 'মাতঙ্গ' (২৩) ও 'মোহাবেশ' প্রভৃতি চিত্রগুলি আমাদের মন লাগেনি। আমরা এই ছাত্র-শিল্পীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।



বাইসন

নিখিল বিশ্বাস

অ দ্বি রে খা

৬৪২৮৮

[উপন্যাস]



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিজনও সেই সমাজে সেই পরিবেশে মানুষ। সুতরাং তার প্রশ্নটা যে নিতান্তই অর্থহীন, সহজেই বুঝতে পেরেছিল, এবং উত্তরের মধ্যে যে বিস্ময় ছিল, তাতেও কিছুমাত্র বিস্মিত হয়নি। শব্দ, বিস্ময় নয়, তার সঙ্গে জড়ানো একটা প্রচ্ছন্ন তিরস্কার তীক্ষ্ণ। শরের মত তার বুকে এসে লাগল। বলবার মত আর কোনো কথা খুঁজে পেল না। সুরমা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। হাতের বালিশটার দিকে চেয়ে, যেন অন্য কারো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে, যার সঙ্গে সে জড়িত নয়, এমন নির্লিপ্ত সুরের বলল, যে কারণে আপনি বিয়ে করতে চাননি, তাও আমি জানি। সবই শুনেছি।

—কী জানো? কী শুনেছ তুমি?

তাড়িৎ স্পর্শে মানুষ যেমন চমকে চম্পচে ওঠে, তেমনি একটা দ্রুত শ্বর বেরিয়ে এল বিজনের গলা থেকে।

—থাক; সে কথা আপনার ভালো লাগবে না। শান্তকণ্ঠে এই দুটি কথা বলেই সুরমা বালিশ আর কম্বলটা টেনে নিয়ে ওঁদিকের দেয়ালের পাশে মেঝের উপর গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। হয়তো এক সময়ে ঘুমিয়েও পড়েছিল। কিন্তু বিজন একটিবারও দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। অনেকবার মনে চেষ্টা এখনি নেমে গিয়ে ওকে ডেকে তুলবে, হাত ধরে নিজের পাশটিতে বসিয়ে বলবে, তোমার সব অভিযোগ আমি অকপটে মেনে নিচ্ছি সুরমা। কিন্তু তোমার আমাব গাধা যে বাধা দাঁড়িয়ে আছে সেটা অলঙ্ঘ্য নয়। তাকে আমি জয় করবো। তার জন্যে শব্দ কটাদিন সঙ্গস চেষ্টা তোমার কাছে। এই কথাগুলো যদি সৌন্দর্য মন্থকটে বলতে পারত, সুরমা হয়তো মৃদু

ফিরিয়ে থাকত না। কৈশোরে পা দিয়েই সে শুনে আসছে, বিজনের কাছে সে বাগদত্তা। দূর থেকে তাকে দেখেওছে অনেকবার। এই প্রিয়দর্শন, স্বাস্থ্য-জ্জ্বল কৃতী ছেলোটর পাশে নিজেকে বসিয়ে বছরের পর বছর মনে মনে কত মধুর স্বপ্ন রচনা করেছে। সর্বাত্মক দিয়ে উপভোগ করেছে সেই কল্পিত স্পর্শের শিহরণ। তারপর নানা কানায়াম্বার মধ্য দিয়ে কোথেকে একখানা কালো মেঘ ভেসে এসে সেই নিতাপ্রতীক্ষিত মিলনাকাশের একটা কোণ জুড়ে বসল। মা থেকে আরম্ভ করে বহু-কালের পুরনো ঝি সারদার মৃদুও তার ছায়া। শঙ্কায়, বেদনায় তার সঙ্গে কী এক অর্থহীন অভিমানে সুরমার ভীরা হৃদয় ভরে উঠল। বিজন যে তাকে চায় না, অন্য কারো কাছে তার মন বাঁধা পড়ে আছে—এই কথাগুলো নানাসূত্রে পঙ্কজিত হয়ে তার কানে আসতে লাগলো। তার মধ্যে একদিকে ব্যর্থতার বেদনা, আরেকদিকে প্রত্যাখ্যানের লজ্জা। সকলের চোখের আড়ালে নিজের ঘরের নিরালোচনাটি ছাড়া তার আর কোনো আশ্রয় রইল না।

তারপর একদিন তাদের ঝিমিয়েপড়া বাড়িটা হঠাৎ যেন কোন যাদুমন্ত্রে জেগে উঠল। বোন ভাজি এবং সখীরা মিলে তাকে সেই কোণ থেকে টেনে এনে হাসি-পরিহাস ঠাট্টা তামাশায় অতিষ্ঠ করে তুলল। সকলরবে শব্দ হল আসন্ন উৎসবের আয়োজন। মেঘ কেটে গেছে। সকলের সঙ্গে সুরমার মনেও সেই আশ্বাসের আনন্দ। শোভাযাত্রা করে ব্যান্ড-বাজিয়ে বরের গাড়ি যখন তাদের বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছিল, সুরমার সাজানো পর্ব তখনো মাঝপথে। চিরদিন, চন্দন মালা কাজল ফেলে এক ঝকি উড়ন্ত পায়রার মত মেয়েরা চোখের

নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল। সুরমারও কি ইচ্ছা হয়নি তাদের মত একটা কোন জানালার আড়াল থেকে কতবার দেখা চেনা মৃদুখানা আজ আবার নতুন চোখ দিয়ে দেখে আসে। কিন্তু লজ্জা এসে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিল। মেয়েরা ফিরে এসে বলাবলি করেছিল—কেমন যেন গোমড়ামুখো বর! চমকে উঠেছিল সুরমা। সে কি! সে যাকে দেখেছে তার মৃদুখানা যে সদাহাস্যোজ্জ্বল। তারপর নিজেকেই আবার বুঝিয়েছিল, মেয়েগুলো যেন কী! বিয়ে করতে এসে কেউ হাসতে হাসতে নামে নাকি বরের গাড়ি থেকে? চারদিকে সব গুরুজন রয়েছে না? কিন্তু যেখানে গুরুজন নেই কেউ নেই, শব্দ দুজনে একা, সেখানে যখন দেখা হল, দামী বেনারসীর আধঘোমটার অন্তরাল থেকে ভীরা চোখ দুটি যখন অলঙ্ঘ্য তুলে ধরল স্বামী মৃদুখের পানে, তখন আর কোনো কৈফিয়ৎ বা সান্ত্বনা দিয়ে নিজেকে বোঝাতে পারেনি। তারপরও রাতের পর রাত ব্যর্থ অপেক্ষায় কাটিয়ে নিঃসন্দেহে বুঝেছিল সুরমা, না, মেঘ কাটেনি। শব্দ কাটেনি নয়, তার নবারম্ভ ঘটাপাতের যতখানি চোখে পড়ে সবটাই বোধহয় মেঘেঢাকা।

পরের ইতিহাস দীর্ঘ হলেও ঘটনা-বহুল নয়। ছুটি ফুরিয়ে যাবার ওজু-হাত দাঁখিয়ে বিজন হয়তো তখনকার মত একটা আশ্রয় সঙ্কটের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছিল। ভেবেছিল, আপাতত পালিয়ে গিয়ে ভারাক্রান্ত মনটাকে একটু হালকা হবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সুরমার সেই হীন নিরুদ্ভাপ চোখ দুটো সে যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। তার চেয়ে সে যদি তাঁর ভাষায় নালিশ জানাত, রসনায় কিংবা

চোখের তারায় বিষের জ্বালা ছড়িয়ে আক্রমণ করত তাকে, বিজনের পক্ষে সেটাই ছিল অনেক বেশী সহজ ও সুস্থ। সেই প্রত্যাশাই সে করেছিল। কিন্তু সুরমা সে পথে যায়নি। বোধহয় ভেবেছিল, পাওনা যেখানে শূন্য, সেখানে পেলাম না বলে অভিমান জানাতে যাওয়া হাস্যকর। না-পাওয়ার মধ্যে বেদনা আছে; সেটা সয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের মধ্যে আছে অপমান। সাধ করে হাত বাড়িয়ে সেটা মাথার তুলতে কে চায়?

বিমলা হয়তো ঠিকই বলেছিল। মেয়েরা যখন স্বামীর সংসারে আসে, অনেক কিছুর জন্যে তৈরী হয়ে আসে। তেমনি একথাও সত্য, প্রথম পাওনা দিয়েই তারা আগামী দিনের পাওয়া ও না-পাওয়ার হিসাব করে। ঐদিনের রূপটি ওদের জীবনে অক্ষয়। পুরুষ থাকে পেল, তাকে সে সারাজীবন ধরে একটু একটু করে চেনে, কিন্তু নারী যার হাতে প্রথম হাত রাখল, তাকে সে চেনে ঐ একটি মাত্র স্পর্শ দিয়ে। শূভ-দৃষ্টির আড়ালে কিংবা বাসরের কোলাহলে একটি মাত্র দৃষ্টি দিয়ে। ভুল যে করে না, ভা নয়। কিন্তু সে ভুল সহজে ভাঙে না। অনেক সময় তার মাশুল গুনতে হয় সারাজীবন।

সুরমা তার স্বামীর সম্পর্কে ভুল করেনি। সব জেনেই, অন্তরে না হোক, বাইরের দিক থেকে ঘটনাপ্রবাহকে স্বীকার করে নিল। নিজেকে বোঝাল, মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে সবই কি তার মনোমত? বেশীর ভাগই নয়। অনেক ঘটনাই দূর্ঘটনা। তবু সে সত্য। 'মানি না' বলেই মিথ্যা হয়ে যায় না। অস্বীকার করলেও তার হাত থেকে মুক্তি নেই। সুতরাং যা ঘটেছে তারই স্রোতে নিজেকে ছেড়ে দাও। যে পরিবারে যে পরিবেশে সে মানব, যেখানে এসে সে দাঁড়াল সেখানে একটি সামান্য লেখাপড়া-জানা সাধারণ মেয়ের সামনে তা ছাড়া আর পথ কী? মন? তার দিকে কেউ তাকায় না। সংসার বড় নির্মম। সে নিজের মনে নিজের পথে এগিয়ে যায়। কারো মন-রাখা তার কাজ নয়। ঐ অলক্ষ্য বস্তুটি কোথায় কোন চাকর তলায় খেঁতলে, গর্দিয়ে গেল, সেসব দেখলে তার চলে না।

বিয়ের মাস দুইয়ক পরেই শাশুড়ী একদিন বললেন, বোমা, আসছে রবিবারে বিমান তোমাকে বিজুর কাছে রেখে

আসবে। ওকেই আসতে লিখেছিলাম। বলছে, ছুটি পাবে না।

সুরমা চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, যেমন থাকতে হয়, নব-বিবাহিতা বধু শ্বশুরের মুখে এ জাতীয় প্রস্তাব শুনে যেমন থাকে। শাশুড়ী ভাবতে লাগলেন তাঁদের কালে তারা কী করতেন। লজ্জায় জড়সড় হয়ে মাটিতে মিশে যেতেন নয়তো ছুটে পালিয়ে যেতেন। কিন্তু যুগ বদলে গেছে। এরা এতে লজ্জা পায় না। যাবার জন্যেই দুপা বাড়িয়ে আছে। তাছাড়া, বয়স্থা মেয়ে; বিয়ের রাত থেকেই বরটিকে চিনতে শেখে। তাঁর কালের কনে-বোঁ ত নয়। তবু বলা কর্তব্য বলেই বললেন, এই সব এলে। মনে করেছিলাম, দুটোদিন তোমাকে নিয়ে আমোদ-আলাহাদ করবো। সকলেরই তাই ইচ্ছে। সব্বার ছোট তুমি। কিন্তু ওদিকে বিজু একলা। খোট্টার দেশে একটা পছন্দমত রান্নার লোক পর্যন্ত পাওয়া যায় না। পেলো কে তাকে চালায়? তুমি না গেলে ওর কষ্ট হবে।

একটু থেমে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, নিজের ঘরসংসার বুঝে নাও। তোমরা সুখী হও, এই আমার সবচেয়ে বড় সাধ।

শাশুড়ীর এবং সেই সঙ্গে শ্বশুর ও পিতৃকুলের সমবেত সাধ মেটাবার জন্যেই যেন সুরমা শূভদিনে যাত্রা করে মেজো ভাসুরের সঙ্গে স্বামীর কর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছল। নিজের মনের দিকে তাকাল না। সেখানে কোনো সাড়া জাগল কিনা, কোনো উৎসাহের জোয়ার কিংবা আগ্রহের জাগরণ, সে প্রশ্ন একান্ত অব্যবহৃত বলে এক কোণে ঠেলে রেখে দিল। যেতে হবে, তাই যাওয়া, ঘটনার গতির সঙ্গে পা ফেলে চলা। এর বেশী আর কিছু ভাবনার নেই, করবার নেই।

শুরমা হল দুজনের সংসার। বিজনের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই বয়সে বড়। সব বাড়িতেই দুটি-চারটি ছেলেমেয়ে এবং আনুষঙ্গিক ব্যক্তি ও বিশৃঙ্খলা। তাঁরা রেড়িতে আসেন, কখনো একা, কখনো জোড়ে। সুরমা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, খাতু ও স্ময় ভেদে চা, ফল, সরবৎ, নিজের হাতে তৈরী দুটি-একটি মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করে অতিথিদের, হাসি-পরিহাসে যোগ দেয়। ছোট বাসার-কর প্রতিটি কোণে তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। কোথাও কোনো দ্রুটি নেই। সব পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি। প্রতিটি জিনিসে

সজ্জানো-গোছানোর বিশেষ ভিজ্ঞতে গৃহকর্তার সযত্ন নিপুণ হাতের স্পর্শ। সকলের মুখেই উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা। "ঠিক যেন দুটি কপোত-কপোতী" "What a loving pair!" "আপনাদের দেখলে হিংসে হয়" ইত্যাদি। ওরাও বেড়াতে যায় এবাড়ি ওবাড়ি। একটা সাধারণ শাড়ি পরেই হয়তো তৈরী হয়েছিল সুরমা। বিজনের চোখে পড়তে বলল, ওটা কেন, আর একটু ভালো কিছুর পরে নাওনা? সুরমা স্বিরস্তু না করে তখনই কাপড় পালটে আসে। 'এই তো বেশ' বলে ওদাসীনের ভাবও নেই, স্বামীর ইচ্ছার নতুন সাজে সেজে আসবার আগ্রহও নেই।

দিনগুলো কেটে যায় কাজকর্মের ভিড়ে এবং লোকজন বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্যে। রাত আসছে ভাবতেই এক অবর্ণনীয় শঙ্কায় বিজনের বুক ভরে ওঠে। সেখানে দুজনের মাঝখানে কোনো অন্তরাল নেই। সুরমার সেই নিষ্পৃহ, নির্বিকার রূপটি সেখানে বড় বেশী প্রকাশিত। অতন্ত কাছে থেকেও সে যে কত দূরে রাত্রির নির্জনতায় এই কঠোর সত্যটাই নির্মমভাবে ধরা পড়ে। তারা এক টেবিলে, একসঙ্গে বসে খায় (এবিষয়ে নিজের মত যা-ই থাক, স্বামীর ইচ্ছাকেই মেনে নিয়েছে সুরমা), খাবার পর বারান্দায় পাশাপাশি বসে গল্প করে, সাধারণ সাংসারিক গল্প, যার মধ্যে সুরমার স্থান প্রধানতঃ শ্রোতার, তারপর রাত বাড়লে উঠে গিয়ে একই শয্যায় পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তবু বিজনের মনে হয়, তার একান্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে যে মেয়েটি শুয়ে আছে, তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়, তার উপরে স্বামীজের সব ইচ্ছা ও অধিকার অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু তার নাগাল পাওয়া যায় না। মাঝখানের এই ব্যবধানটুকু সামান্য হলেও অনতিক্রম্য।

অথচ অভিযোগ করবার মত কোথাও কিছু নেই। সুরমা আদর্শ গৃহিণী। প্রতিটি দিকে তার প্রখর দৃষ্টি। রান্না-বান্না, গৃহসজ্জা, যত্ন-পরিচর্যা, সব দ্রুটিহীন। যেটি যখন দরকার, হাতের কাছে উপস্থিত। ওটা নিয়ে এস, সেটা কোথায় গেল—বলবার অবকাশ নেই। সব প্রয়োজন নিরলসভাবে যুগিয়ে চলেছে প্রতিদিন। ক্রান্তি নেই বিরক্তি নেই, মাথাধরা বলেও দুর্ভাগ্যবিশ্রাম নেই। বিজন যদি কখনো বলে, 'এত খাটবার কী দরকার?' কি রয়েছে, চাকর রয়েছে,' সুরমা হয় কোনো জবাব দেয় না,

যা করছিল করে যায়, নয়তো সংক্ষেপে জামিয়ে দেয়। তারা অন্য কাজ করছে। সংসারের এই যান্ত্রিক শৃঙ্খলা, গৃহ-কর্তার এই হুঁটিহীন নৈপুণ্য উঠতে বসতে বিজ্ঞকে পীড়া দেয়। সুরমার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সে যেন একটি সচল পুতুল, ভিতরে কোনো প্রাণ নেই, আছে একটা দম-দেওয়া স্প্রিং। তারই জোরে চলছে ফিরছে। আর মনে হয়, সত্যত স্বাচ্ছন্দ্য, পরম আরামে যেখানে তার দিন কাটছে, সেটা তার গৃহ নয়, একটি সুস্বাদু-পরিচালিত হোটেল, আর ঐ মহিলাটি, যাকে সে তার স্ত্রী বলে জানে সেখানকার সদা-বশব্দ সদৃশ ম্যানেজার। তার বেশী আর কিছু নয়।

তার বেশী আর কিছু যে সে আশা করতে পারে না, সেখা বিজ্ঞের চেয়ে কে বেশী জানে? জানে, কিন্তু কোথায় তার প্রতিকার তা জানে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এভাবে আর চলে না, একটা খোলাখুলি বোঝাপড়া দরকার। তার ফলে যদি আলাদা হয়ে বাস করতে হয়, সেই পথই বেছে নিতে হবে। সুরমাকে বঝিয়ে বলবে, তোমাকে আমি সুখী করতে পারিনি, সেটা আমার পরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু তোমার সব ইচ্ছা আমি প্রাণপণে মেনে চলবো। তোমার যেখানে থাকতে গুন যায়, আমার মায়ের কাছে, কিংবা তোমার মায়ের কাছে, সেখানে গিয়ে থাকো। কারো উপরে নির্ভর করতে হবে না। তোমার সব ভার, সব দায়িত্ব আমারই রইল।

মনে মনে এই সংকল্প নিয়ে কতদিন কলেজ থেকে ফিরেছে, কিন্তু সুরমার সেই নিস্তরঙ্গ চোখদুটোর সামনে দাঁড়িয়ে কিছুই বলতে পারেনি। বাড়ি আসা মাত্র ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সুরমা। তারপর যন্ত্রের মত একটির পর একটি করে গেছে তার নিত্য-নির্ধারিত কাজ-গুলো। কেমন একটা মায়ী হয়েছে বিজ্ঞের। যেখা বলবে বলে ভাবতে ভাবতে এসেছিল, তার বদলে বলেছে, বেড়াতে যাবে সুরমা?

—‘আমার যে এখনো কাজ সারা হয়নি,’ হুঁপিতহীন ক্লান্ত চোখদুটি স্বামীর মুখের উপর তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছে সুরমা।

—কাজ পরে হবে। চল একটু ঘুরে আসি।

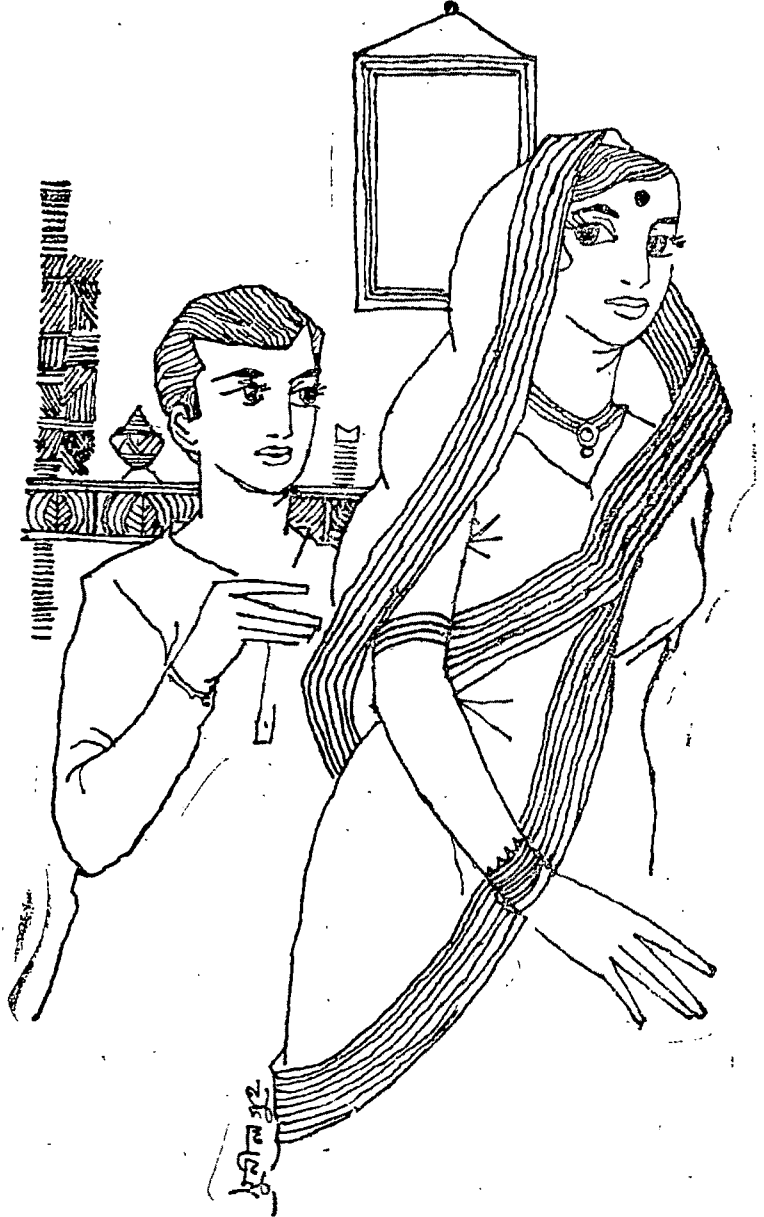
সুরমা আর কিছু বলেনি। নিঃশব্দ ধীর পায়ে ঘরে গিয়ে পরনের কাপড়খানা বদলে যাহোক একটা কিছু পরে তখনই

ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে সেইখানে। রাস্তায় বেরিয়ে বিজ্ঞ জানতে চেয়েছে, কোন দিকে যেতে চাও?

সেই নিস্পৃহ উত্তর—যেদিকে হোক, চল।

—আচ্ছা, চল ঐ পাহাড়টায় চড়া যাক। পারবে তো?

তের্মনি বিনাবাক্যে অনুসরণ করেছে সুরমা। বলেনি, এখনো অনেক বেলা আছে, পাহাড় থেকে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসা যাবে। কিংবা যে জামাকাপড় পরে বেরিয়েছে, সেটা যে বন্ধুদের বাড়ি যাবার যোগ্য নয়, তার জন্যে তৈরী হয়েও আসেনি, একথাও তোলেনি।



বেড়াতে যাবে সুরমা?

সুরমা মাথা নুইয়ে জানিয়েছে, পারবে।

খানিকক্ষণ নীরবে পথ চলবার পর মত বদলেছে বিজ্ঞ, ‘নাঃ, পাহাড়ে উঠতে গেলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। তার চেয়ে চল, প্রফেসর স্কুলের বাড়ি যাওয়া যাক। ওরা দু’দিন এসে গেছে, আমাদের একবারও যাওয়া হয়নি।’

কিছুক্ষণ পরে বিজ্ঞের নিজেরই খেয়াল হয়েছে, ‘এভাবে সেখানে যাওয়া যায় না। চল ফিরি। কী বল?’

সুরমা এবারেও ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে মাত্র।

একদিন কী কারণে সকাল সকাল কলেজ ছুটি হয়ে গেল। বিজ্ঞ স্থির করে ফেলল, এতদিন অনেকবার যা

বলতে গিয়েও পারেনি, আজই তার সুবোধ। এখন সুদর্মার অবসর। হয় শূন্যে আছে, নয়তো বই কিংবা সেলাই নিয়ে বসেছে। কী ভাবে পাড়বে কথা-গুলো; কেমন করে বললে রত্ন শোনাবে না, সুদর্মার মনে হবে না, এ শব্দ তাকে সরিয়ে দেবার ছিল; উত্তরে কী বলবে সে, যদি বলে 'আমি কোথাও যাবো না', তারপর তার কী করবার আছে—ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে সমস্ত ব্যাপারটাকে মানা ভাবে ওজন করে, বস্তব্য কথাগুলো মনে মনে সাজিয়ে নিয়ে বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল। সদর দরজা খোলা রেখে চাকরটা কী করছিল। কড়া নাড়া বা ডাকাডাকির প্রয়োজন হল না। বসবার ঘর পার হয়ে দক্ষিণের বারান্দায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল বিজন। ঠিক সামনে কয়েক ফুট মাত্র দূরে সুদর্মা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে দূরে ঐ শালবনের দিকে। এ ধার থেকে তার সমস্ত মন্থনানা দেখা যায় না, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবার বিশেষ ভঙ্গিটি চোখে পড়ে। সেদিকে একটি বার তাকিয়েই বিজনের মনে হল 'বিষাদ প্রতিমা' বলে যে কথাটি সে কাব্য-উপন্যাসে পড়েছে, কখনো উপলব্ধি করেনি, এই হচ্ছে তার জীবন্ত রূপ। বেদনার অবয়ব আছে, একটি নারীদেহের প্রাতি অঙ্গে সে সমূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে—এই পরম সত্যটি সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল।

কতক্ষণ স্থাণুর মত সেই একই জায়গায় নিঃশব্দক দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ছিল, বিজনের মনে নেই। হয়তো ঐ ধ্যান-মোহন মূর্তির দিকে চেয়ে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করে থাকত। হঠাৎ কী কারণে এদিকে ফিরে তাকাল সুদর্মা। শ্রান্ত, বিষণ্ণ,

জ্যোতিহীন দুটি চোখ। কোলে যেন কালি ঢেকে দিয়েছে। তার উপর দিয়ে গাড়িয়ে পড়ছে জলধারা। স্বামীকে দেখেই যেন ব্যাধভীতা রুস্তা হরিণীর মত ছুটে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। বিজন ফিরে এসে গা এলিয়ে দিল বসবার ঘরে সোফার উপর। সেই মূহুর্তে একটি কথাই শব্দ মনে হল—নিজের শয়নকক্ষেও তার প্রবেশের অধিকার নেই। সেখানকার নিভৃত শয্যায় বসে পড়ছে যে গোপন সঞ্চিত অশ্রুধারা, তার অমর্যাদা হবে।

সুদর্মারও মনে হল, স্বামীর কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। অন্তরের যে গুপ্ত কক্ষটি সে সময়ে বন্ধ করে রেখেছিল, একটা অসত্যক দূর্বল মূহুর্তে সহসা তার দ্বার খুলে গেছে, বৌরিয়ে পড়েছে বেদনা-মলিন দীনরূপ। 'হিঃ হিঃ', এর পর সে মন্থ দেখাবে কেমন করে? এরপর একে অন্যের সান্নিধ্যটুকু যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা ছাড়া দুজনের আর পথ রইল না। তাই বা কেমন করে সম্ভব? তিনখানা ঘরের এই ছোট্ট বাসায় সর্বক্ষণ একই সংগে থাকা; মাঝখানে একটু অন্তরাল সৃষ্টি করার মত আর কোনো পরিজন নেই! এই সমস্যা যখন দুজনের কাছেই দূরূহ হয়ে উঠেছে, একদিন আকস্মিকভাবে তার অনেকখানি সমাধান হয়ে গেল। কোনো খবর বাতী না দিয়ে সকালের গাড়িতে সুদর্মার ছোট ভাই মোহন এসে উপস্থিত। বিজন ছিল বইরের ঘরে। বিস্ময়ে আনন্দে কলরব করে উঠল—তুমি! কী আশ্চর্য! একটা খবর দিয়ে এলে তো স্টেশনে যেতে পারতাম।

ফাস্ট ইয়ারের ছেলের পৌরুষে আঘাত লাগল। বেশ গর্বের সংগে বলল, কেন, আমি বড়ি আর চিনে আসতে পারি না?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই; তার প্রমাণ তো হাতে-হাতেই পাওয়া গেল। কিন্তু গাড়ি আসে ভোর পাঁচটায়, এখন বেজেছে সাড়ে ছটা। মাইল দুয়েক পথ, রিক্সাতে বড় জোর আধ ঘণ্টা লাগবার কথা। কী ব্যাপার বল দিকিন?

—তা কী করবো? যে-দেশে আছেন, রিক্সাওয়ালাগুলো একটা কথাও বোঝে

না, খালি হাঁ করে মূখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—'তাই বলো!' বলে বিজন হো হো করে হেসে উঠল, আচ্ছা এবার সোজা ভিতরে চলে যাও। জামা-কাপড় ছেড়ে মূখ-হাত ধোও।

দিদির সংগে দেখা হতেই মোহন চমকে উঠল, এ কি! তাকে যে চেনা যায় না। কী হয়েছিল?

—কী আবার হবে? নে, ঐ ঘাম-জব-জবে জামাটা ছেড়ে হাওয়ার মূখে এসে বস। ছেলে একেবারে লায়ক হয়ে উঠেছেন। কেন, একটা খবর দিয়ে এলে কী দোষ হত?..... না বলে কয়েক পালিয়ে আসিসনি তো?

মোহনের কানে বোধহয় এর কোনো কথাই ঢুকল না। দিদির কাছে এগিয়ে গিয়ে অনেকখানি উঁচু হয়ে-ওঠা কণ্ঠার হাড়ে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলল, সত্যি দিদি, তুই বড় রোগা হয়ে গেছিস। নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করছিল। কই আমাদের তো একবারও জানাসনি?

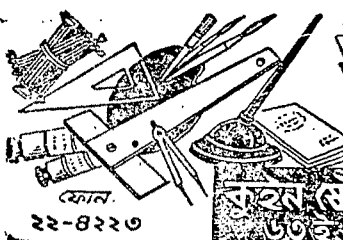
—কী মূস্কিল! অসুখ করলে তো জানাবো?

—করলেই বা জানাবি কেন? এখন তো আমরা কেউ নেই। সবচেয়ে যিনি আপন, তিনি—

কথাটা শেষ করবার আগেই সুদর্মা সম্মুখে ভাইয়ের গালটা টেনে ধরে বলল, খুব ফাজলামো শিখিছিস, দেখছি। কলেজে ঢুকে বড়ি এই উন্নতি হয়েছে?

ঐ দিনই বিকলের দিকে জানা গেল, মোহনের এতখানি পথ ঠেলে মধ্যপ্রদেশে আসবার আসল উদ্দেশ্য বেড়ানো নয়, দাদার বিষেতে দিদি ও জামাইবাবুকে নিয়ে যাওয়া। বিয়ের এখনো মাসখানেক দেরি। মাঝখানে কয়েকটা দিন একটু ঘুরে-ফিরে দেশ দেখবে। তাই কলেজ বন্ধ হতে অনেক বলে-কয়ে মা ও দাদাদের মত করিয়ে চলে এসেছে। কবে কোন গাড়িতে রওনা হচ্ছে, কখন পৌঁছবে, ইত্যাদি বিবরণ দিয়ে বড়দা বিজনকে যে-চিঠিটা লিখেছিলেন, সেটা জাকে দেবার ভার ছিল ওরই উপর। সে কাজটি ইচ্ছা করেই সে করেনি। মনে মনে মতলব ছিল—হঠাৎ এসে দিদি ও ভগ্নদীপতিকে চমকে দেওয়া। ওখান থেকে ওরা ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেন, মাঝখানে গাড়ি-বদলের হাঙ্গামা নেই। এখানকার স্টেশন থেকে রিকশ করে বাসায় আসা। সে আর এমন কি কঠিন! তখন কে ভেবেছিল তার এত কণ্ঠের শব্দ হিন্দী এই লোকগুলোর মাথায় ঢুকবে না। আর এদের দেহাতী বুলিও তার কাছে 'বিশুদ্ধ গ্রীক' হয়ে দাঁড়াবে?

(ক্রমশঃ)



সার্ভে ড্রইং সরঞ্জাম ও
তফিস সংক্রান্ত কেসনারী
কাগজ বিক্রয় ও প্রিন্টার্স
২২-৪২২৩

সুরের সুরধ্বনি

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

॥ পাঁচ ॥

কোলকাতার বাল্যশিক্ষাকালে যখন স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ শান্তপ্রায় তখন আমাদের সূর্যকীয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে সাংস্কৃতিক ও গঠনমূলক নানা ব্যাপারের পরিচয় আমরা সবদাই পেতাম। বাবা স্বয়ং ব্রাহ্মণপন্ডিভের ঘর হ'তেই গৌরীপুর জমিদারবাড়ীতে দত্তকপুত্র-রূপে এসেছিলেন, তাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি এই কারণেই তাঁর অনুরাগ বর্ধিত হয়। যদিও ঠাকুর-পরিবার ও চৌধুরীপরিবারের সংস্কৃতির উদারনৈতিক রূপ বিশেষ ভাবেই পরি-স্ফুট ছিল, তথাপি শাস্ত্রীয় সংগীত-বিদ্যায় বাবার সহিত চৌধুরীপরিবার ও ঠাকুরপরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ সহ-বোণিতা ছিল। স্বগীয় জ্যটিস আশুতোষ চৌধুরী সম্পর্কে আমার মনে হ'তেন এবং দেশের কাজে বাবা সবদাই তাঁর বহুমূল্য উপদেশ গ্রহণ করতেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু-স্থান কো-অপারেটিভ ইন্সটিটিউট সোসাইটি ও অবশেষে সংগীত সংঘে স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরীর সহিত বাবার পূর্ণ সহযোগিতার নিদর্শন আমরা দেখেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতার কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে যখন রাঁচীতে শান্তিপূর্ণ সাধন-জীবন অবলম্বন করলেন, তখন “সংগীত প্রকাশিকা” পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত সমাজেরও অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে গেল। ১৯১১ সালে জ্যটিস আশুতোষ চৌধুরীর সুযোগ্য সহধর্মিণী প্রতিভা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহেই “সংগীত সংঘ” নামক একটি উন্নত সংগীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ রাঁচী থেকেও এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বহুমূল্য নির্দেশ-উপদেশ সবদাই দিতেন। রাজা সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন সংগীত সংঘের প্রথম সভাপতি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সহ-সভাপতি। বর্ধমানের মহারাজা,

নাটোরাদিধর্ষিত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ও কলিকাতার অন্যান্য গণ্যমান্য অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিগণ ইহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য বাবার সহিতও সংগীত সংঘের বিশেষ যোগাযোগ ছিল এবং তিনি সংগীত সংঘের নানা অনুষ্ঠানে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। সংগীত সংঘের প্রতিষ্ঠার দুই বৎসরের মধ্যেই লেডী প্রতিভা চৌধুরী ও তাঁর কনিষ্ঠা ও বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক জগতে তাঁরই পরবর্তী নেতৃস্থানীয় স্বর্গীয় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সহ-সম্পাদকতায় “আনন্দ সংগীত পত্রিকা” নামে একটি অতি উন্নত শ্রেণীর সংগীত মাসিক প্রকাশ করতে থাকেন। আনন্দ সংগীত পত্রিকা সংগীত সংঘেরই মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় লেডী চৌধুরী সম্পাদকীয় যে নিবন্ধ লেখেন, তা পাঠ করলেই আমরা “সংগীত সংঘ” ও আনন্দ সংগীত পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো। তিনি লিখেছেনঃ—

(আনন্দ সংগীত পত্রিকা : প্রথম বর্ষ
প্রথম সংখ্যা—প্রাণ ১৩২০ সন)

“আমাদের দেশ হইতে বিশুদ্ধ আর্থ-সংগীতের চর্চা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বাসিয়াছে। যদিও সংগীতের উন্নতিকল্পে দুই-একটি সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু সেগুলির দ্বারা সংগীতের শিক্ষার জন্য বিশেষ-

ভাবে কোনও উদ্যোগ হয় নাই। আমরা দেশ হইতে সেই অভাব মোচন করিবার জন্য “সংগীত সংঘ” নামে একটি সংগীত শিক্ষাগার স্থাপন করিয়াছি। বাহাতে সংগীতে ও যন্ত্রাদি বাদনে বালক-বালিকাগণকে যথারীতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুণী সংগীতজ্ঞদিগের একত্র সমাবেশ করিয়া আর্থ-সংগীতের শিক্ষা-প্রণালী বাহাতে যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সংগীতের অনেক তত্ত্ব ও অনেক যন্ত্রাদি লোপ পাইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। এমন সময়-কাল পাঁড়িতেছে যে মনে হয় বুদ্ধি বা অধঃশতাব্দী মধ্যে আর্থ-সংগীত ও আর্থ-যন্ত্রাদি লোপ পাইবে ও তাহার আসন বিদেশী সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রাদি অধিকার করিয়া বাসবে। বালক-বালিকাগণই আমাদের ভবিষ্যতে আশার স্থল। বাহাতে সংগীতবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া দেশ-বিদেশে উহার পথ প্রসারিত করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই সংঘ স্থাপিত হইয়াছে।

বিনা চশমায় দেখুন

পুনর্জ্যোতি

অত্যশ্চর্য বনোঁষি পুনর্জ্যোতি ও উজ্জ্বল জ্যোতি হইতে প্রস্তুত আইজ্যুপ। সকল বয়সে অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির জন্য ব্যবহার করুন। মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ও ডি পি—১০.৫০ নং পঃ।

নিও হারবল প্রোডাক্টস

২০/৩২, গাড়িয়াহাট রোড,
কলিকাতা-১৯

স্টকিস্ট : দেজ মোডকেল স্টোর
৬/২বি, লিডসে স্ট্রীট, কলিকাতা।



সকল সম্ভ্রদায়ের ব্যবহার
উপযোগী প্লেট ও চক
ডিজাইনের

গগনমুকলা
লুঙ্গি

সহ পাকা ও টেকসই
সকল লুঙ্গির দোকানেই পাইবেন

এই কার্যে সকল গুণী, গায়ক ও বন্দ্যবাদকগণের একযোগে আবশ্যিক। বাঁহারা গান-বাজনার সমাদর করেন বা বাঁহাদের গান-বাজনার রুচি বা আসক্তি আছে, তাঁহারাও সকলেই ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। সময়ে সময়ে ইহার অধিবেশনে সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী ভাল ভাল গুণী গায়ক ও বন্দ্যবাদকগণের সমাগম হয়। সেই শ্রুত অবসরে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক-বালিকাদিগের concert (একবাদন) ও গীতিবাদ্যের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়। যখন সুশিক্ষিত শত শত বালক-বালিকাগণের কন্ঠে ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি সুমিষ্ট সংগীত কিংবা যখন বালক-বালিকাগণের কোমল অঙ্গুলীস্পর্শে সরসবতীর বীণার ন্যায় বীণা-তন্ত্রীতে নানা স্বরসংযোগে মধুর স্বংকার শুনিতে পাওয়া যাইবে তখন আমাদের উদ্যোগের ফল বৃদ্ধিতে পারিবা। ভগবান আমাদের এই শ্রুত সংকল্প পূর্ণ করুন এই প্রার্থনা। সহজে গান শিক্ষা হইবার অভিপ্রায়ে একটি সংগীত পত্রিকা বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। ইহার নাম “আনন্দ সংগীত পত্রিকা” রাখা হইল। এই পত্রিকা বাহির করিবার মূখ্য উদ্দেশ্য এই স্বরলিপি শিক্ষা করিয়া গান-গুলিকে সহজে নিজের আয়ত্তে আনা। এখন অনেকে নানা প্রণালীতে নিজের সুবিধামতো স্বরলিপি বাহির করিয়া গানগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছেন। আমাদের দেশের গানগুলি কতরকমে লোপ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, তাহার রক্ষার নিমিত্ত এবং বাহাতে এগুলি স্থায়ী হয় তন্ম্বশ্বরে সকলে চেষ্টা করিতেছেন ইহা খুব সুখের বিষয়। খালি ভো গানের শব্দ-প্রয়োগে গান গাইতে পারা যায় না। সুর-তাল-লগ্নে শব্দগুলি যুক্ত হইয়া কন্ঠস্বরে বাহির হওয়া চাই। একটি কথা আমি বলিতে চাই। নানা প্রণালীতে সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার উপায় বাহির না করিয়া সহজ সাত্ত্বিক চিত্তের দ্বারা সহজে লোকের বাহাতে বোধগম্য হয়, এমন উপায় এবং যেটি বহু বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতি আমাদের মতে অবলম্বন করা উচিত। “সংগীত-প্রকাশিকা” নামে একটি সংগীত পত্রিকা অনেক বৎসর হইতে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহাতে নানা দেশের গান, পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্ভাবিত আকার-মাট্রিক স্বরলিপি



KABI

“আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—আমি একটু বেশী সিগারেট খাই কিনা তাই.....”

পদ্ধতি অনুসারে এতদিন লিপিবদ্ধ হইয়া চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাঁচী বাস করায় এবং আরও অন্যান্য কারণে ইহা বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। বড় দুঃখের বিষয় যে, এতবড় কাজের জন্য কেহ সহানুভূতি দেখান নাই, কত উদার স্বভাবাপন্ন মহানুভব কত ঐশ্বর্যশালী মহাত্মারা আছেন তাঁহারা অনায়াসে অর্থের সাহায্য করিয়া এটি রক্ষা করিতে পারিতেন। তাহাদের কত সময়ে কত কাজে বৃথা অর্থব্যয় হয়। এইরূপ একটি কাগজের আজকাল যে কত দরকার হইয়াছে ইহা অবশ্য সকলের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। এইজন্য ইহা স্বস্বাধারণের নিকট এত আদরের বস্তু হয় নাই। বাঁহারা সংগীতপ্রিয়, তাহাদের কাছে আমার এই নিবেদন, নিজেরা অনুগ্রহ-পূর্বক গ্রাহক হইয়া এবং অনেক গ্রাহক করাইয়া ইহার সাহায্য করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহা লিখিয়াই যেন ইহার শেষ না হয় এবং বৃথা বাক্যব্যয় না হয় এই আমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এবং সকলের কাছে আমাদের অনুরণ। আমি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এই পত্রিকার সম্পাদিকার ভার লইয়া যদি কিছু করিতে পারি সে চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছি। সকলে অনুগ্রহ করিয়া ইহা চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করিয়া দেখিবেন কত সহজ উপায়ে এই স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে গান শিক্ষা করা যায়। সংগীত সংঘে বসত গান হিন্দুস্থানী এবং ব্রজ-সংগীত ইত্যাদি ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে

শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে এবং অন্যান্য সংগীতও প্রকাশিত হইবে। শুনিয়া সকলে সুখী হইবেন যে অনেক শিক্ষক এবং জনসাধারণ হইতে গান প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে এই পত্রিকা পরিপূর্ণ হইবার অনেক উপায় হইবে আশা হয়।”

আনন্দ সংগীত পত্রিকার প্রথম প্রকাশকালে লেডী চৌধুরী মহোদয়ার এই বিবৃতিটি পাঠ করলে “সংগীত সংঘ” প্রতিষ্ঠানের মহৎ উদ্দেশ্য আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো। বর্তমানে স্বাধীন ভারত সরকার উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রতিষ্ঠানের সহায়ে সংগীত প্রচারে অগ্রসর হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যারা এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের আদর্শ বর্তমান সময়ে আমরা যদি জীবন্ত করে তুলতে পারি, তবেই স্বাধীন ভারতের সংগীত-প্রগতি সার্থক হয়ে উঠবে। সংগীত সংঘের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সংঘের ১৯১৪ সালের বার্ষিক বিবরণীতে যে বর্ণনা আছে, তা পাঠে আমরা জানতে পাই যে, জ্যষ্টিস চৌধুরী পার্ক স্ট্রীটে হিন্দু সংগীতের যে সংস্থার প্রতিষ্ঠা বহুপূর্বেই করেছিলেন, সেখানেই সংগীত সংঘের প্রথম উদ্বেগধন ঘটে। পরে পার্ক স্ট্রীট হাটে ল্যান্সডাউন রোডে সংগীত সংঘ স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময় থেকেই দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিভূগণ সংগীত সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রতী হন।



একটি মৃত্যু দিয়ে একটি জীবনকে ঘিরে রাখা যায় না। সুখেন ভাবল, মানুষের মৃত্যুকে কেন অনুসরণ করা যায় না! মৃত্যুকে অনুসরণ করে কোথায় গিয়ে পৌঁছান যায়। যাকে ভালবাসা যায় তার শরীরের অনুপস্থিতি কেন এমন নাড়া দিয়ে যায়! ভালবাসার মৃত্যু নেই। কিন্তু একটি শরীরের মৃত্যুতে সব কিছুর শেষ হয়ে যায়! মনে হয়, আর কোন আর কারো স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই। একটি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, নিঃশেষ হয়, মছে যায়। ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট ছায়ার মত। স্মৃতি-সাগর মগ্নন করেও ঠিক তার অনুরূপ প্রতিচ্ছবি, মূখের' দেহের শরীরের প্রতিটি খাঁজের রেখা মিলিয়ে আগেকার মানুষটিকে চোখের সামনে তুলে ধরা যায় না। এই মৃত্যুতে সুলতার সম্পূর্ণ মানস-চিত্রটি স্মরণ করতে, ঠিক তার হৃদয় চেহারাটা মনে করতে পারল না সুখেন। অথচ চম্পক ঘণ্টাও হয়নি সুলতার অস্তিত্ব এ-ঘর থেকে মছে গেছে। অস্তিত্ব মছে গেছে কি? সুখেন ভাবল। ঘরের চারদিকে আঁতপাতি করে খুঁজতে লাগল। টেবিলের কাছে এসে তার দৃষ্টি ঠিকরে পড়ল। আটকে গেল। ঝুলে রইল দাঁড় করানো একটা ফটোর গায়। বিয়ের পর ওরা এক সঙ্গে ফটো তুলেছিল। একটা স্টুডিওয় গিয়ে অনেক কসরৎ করে ফটোগ্রাফার ওদের যুগল ছবি তুলেছিল।

ছবিটা কোনদিনই ভাল লাগেনি সুখেনের। তার নিজের চেহারার অবিকল প্রতিচ্ছবি। সুলতার জন্যই নিয়ে আসতে হয়েছিল। ফটোগ্রাফার ছোকরা মুখ টিপে বলেছিল, হবে ভাল হয়েছে আপনাদের ফটোটা। দুটো স্নাপ নিয়েছিলাম। দরকার ছিল না। প্রথমবারেই ভাল উঠেছিল। সুলতা বলেছিল, বাঃ বেশ উঠেছে তো। তোমার ছবি এত সুন্দর ওঠে। সুখেন ভেবেছিল, সুলতা তার নিজের ছবিটার জন্যই বলেছে। আসলে ওর নিজের চেহারাটারই প্রেমে পড়েছিল। বাঁধিয়ে এনে টেবিলের উপর রেখেছিল। অনেক দিন ঝাড়পোঁছ করা হয়নি। অনেক ধুলো জমে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বোঝা যায়, ওটা সুলতারই ফটো। সুলতার কি? না সুলতা কখনো এমন ছিল না। ফটোগ্রাফার ছোকরার কারসাজি। ওর মনের মত করে সুলতাকে এঁকেছিল, ফটোর গায় ভুলি বুলিয়ে ওর অসুন্দর চেহারাটিকে মনোরম করে তুলেছিল; যাতে সুলতা বাহবা দেয়। সুখেন জানতো, ফটোগ্রাফাররা অনেক কারসাজি করতে পাবে মানুষের চেহারাকে ফটোতে সুন্দর করে তুলতে। খরিন্দারের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার কায়দা ও রপ্ত করে নিয়েছে। আসলে ওটা সুলতার ছবি নয়। প্রতিচ্ছবি মাত্র। প্রতিচ্ছবি কি আসল ছবি হয়? না—ওর চেহারার সঙ্গে কোন মিল নেই। সুখেন বাঁধানো ফটোর ছবি থেকে আসল

সুলতার কোন আঁচ করতে পারল না। বরং তার মনের ছবিটাই কেমন হিজিবিজি হয়ে গেল। অস্পষ্ট কতগুলো আঁচড়-কাটা। আশ্চর্য, তার অস্তিত্ব এখনো অনুভব করতে পারে সুখেন। না, সুলতা মরে যায়নি। পাশের ঘরে তার চুড়ির শব্দ শোনা যায়—হাত নাড়াচাড়ার, ছোটখাট গহস্থালি কাজে ব্যাপৃত থাকার শব্দ। সুলতার অস্তিত্ব ভোলা যায় না।

দেয়ালের কোণের খাটটাতে সুলতা শুতো। সে খাটটা কাত করে একদিকে ঠেলে রাখা হয়েছে। বেশ খানিকটা জায়গা বেড়েছে ঘরখানার। উঃ, কতটা জায়গা দখল করে থাকত খাটখানা। আকারে এমন কিছুর বড় নয়, অথচ ঘরের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকত। এখন বেশ পায়চারি করা যায়। ওই খাটখানার মত সুলতাও তার জীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিল। খুশিমত এমন অনায়াসে পায়চারি করা চলত না। না বলে ফিরতে দৌঁর হলে, কাজে বা যান-বাহন বিভ্রান্তে বা বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে দৌঁর হয়ে গেলে, কত কৈফিয়তই না দিতে হতো। আজ সে সব থেকে একেবারে মুক্তি দিয়ে গেছে সুলতা। এমন মুক্তি জীবনে অনেকদিন পায়নি সুখেন। কারো কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। কেউ কোন খোঁজ নেবে না। আশ্চর্য, মুক্তি পেয়েও, অনায়াস জীবনের স্বাধীনতা লাভ করেও, বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না তাঁর। এই অশুকার

যরের দমবন্ধ ভেপঁসা নিজীব পরিবেশ ছেড়ে কোথাও যেতে তার মন চান্নল না। যেন মৃত্তির স্বাদ ভুলে গেছে সুখেন। মৃত্তির ইচ্ছাটাও মরে গিয়েছে। এতদিনের অভ্যস্ত জীবনে মৃত্তি ছিল না বলে বন্ধন-মৃত্তির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। পোষা পাখি খাঁচা খুলে দিলেও যায় না। খাঁচার জীবনে অভ্যস্ত পাখি বাইরের মৃত্তি উপেক্ষা করে। সুখেনও কি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল? সুলতার উপস্থিতি, তার সাহচর্য, দেহের একান্ত শারীরী আসঞ্জে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সুখেন? সুলতা কি অভ্যস্ত হয়নি? শরীরের একটা দাবির কাছে শব্দ কি অসহায় হয়ে পড়ত সুলতা, নিরুপায়ের মত নীত স্বীকার করতো? সুখেনের অস্তিত্ব কি প্রাতিবিকভাবে মনে নিতে পারতো না সে? সামুদ্রিক জীবের মতো জড়িয়ে জড়িয়ে নিজের অস্তিত্বই ভুলে থাকতে চাইত সুলতা, সঙ্গে সঙ্গে অন্যের অস্তিত্বও। উপেক্ষা আর অভ্যস্ততার হাত থেকে মৃত্তি দিতে চেয়েছিল সুলতা। সে নিজেকে কি মৃত্তি পারানি? মৃত্তি দেবার আর মৃত্তি পাবার আর কোন সহজ পথ কি খুঁজে পারানি সে? সুখেন ভো অনায়াসেই তাকে, মৃত্তি দিতে পারতো। বললেই সুখেন রাজি হয়ে যেতো। আমাদের মন যখন চাইছে না তখন দেহের অধীনতাকে নাই বা স্বীকার করলে। তার জন্য আত্ম-নাশের কী প্রয়োজন হল। আত্মহত্যা করার কোন দরকারই ছিল না।

সুলতার বিকৃত শরীরটার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। নীলাভ ফ্যাকাশে রক্তহীন বীভৎস একটা মানুষের অবয়ব। হাঁ, মানুষের। সুলতার। এক টুকরো কাগজে স্পষ্ট করে লিখে রেখেছিল : ‘আমি তোমাকে মৃত্তি দিয়ে গেলাম।...’ লিখতে গিয়ে ওর হাত কেঁপেছিল। কাঁপা কাঁপা ছাড়া ছাড়া অক্ষরের কতগুলো কথা। কখনোনাও সে কথার মানে ধরতে পারেননি। অবশ্য এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাননি। তাঁরা। কেন না, এমন ঘটনা ওঁদের কাছে অনেক আসে। একটা সিদ্ধান্তকে যেন আগে থেকেই খসড়া করে রেখে দেয়। জুরিদের মত নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা রায়ও লিখে ফেলে। যেন অনিবার্যভাবে করে ফেলতে হবে, নিয়ম মারফক। অবশ্য সে সব মূহূর্তগুলো সুখেনকে একা থাকতে হয়নি। খবর পেয়ে অনেকেই এসেছিলেন। বিশেষ সুলতার আত্মীয়েরা। অনেক সাহায্য করেছিলেন তাঁরা। সুখেন যন্ত্রের

মত একটার পর একটা প্রতিটি কর্তব্য-কর্ম করে গেছে, মন্ত্রের মত অনুসরণ করেছে, অনুগমন করেছে। সব কাজ শেষ হয়ে গেলে ফিরে এসেছে। আর কিছু করার নেই। আর কোন কর্তব্যবোধ ঘোড়ার পিঠে সাঁহসের চাবুকের মত ভাড়া করে আনেনি। সব কাজ সব দায়িত্ব যেন শেষ হয়ে গেছে।

সুখেন ভেবেছিল এবার তার মৃত্তি। আর কোন বন্ধন নেই। সুলতা নিজেই বন্ধন ছিন্ন করেছে, তাকে মৃত্তি দিয়ে গেছে। তবে কেন সে এখানে একা নিঃসঙ্গ কাটিয়ে দিল। একটানা চাবিশ ঘণ্টার প্রতিটি মূহূর্ত, সময়ের প্রতিটি স্পন্দন ঘাড়ের পেঁচুলামের প্রতি সেকেন্ডের গতিতে নিজের মধ্যে স্তব্ধ করে রেখেছে। ভূমিকম্পে ঘাড় বন্ধ হয়ে যায়। সুখেনের প্রতিদিনের চলার, প্রতিটি পদক্ষেপের গতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওর মনের সিসু-মোগ্রাফে একম্পন অনুভব করা যায়। দারুণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে ওর মনে—যেন ওর অনুভূতিগুলো সব ভেঁতা হয়ে গেছে। কঠিন কিছুতে আঘাত করলে ধারাল কাটারির ধার ফলে যায়, ভেঁতা হয়ে যায়। জীবনের কঠিন পাথরে আঘাত করেছে সুলতা, তাই এমন ভেঁতা হয়ে গেছে সুখেনের অস্তিত্ব, ওর বেঁচে থাকা। মৃত্যুকে অনুসরণ করার দারুণ কৌতূহল পেয়ে বসেছে যেন। নিঃসঙ্গ হাঁপিয়ে উঠেছে, জীবনের একাকীত্ব কেঁপে কেঁপে উঠছে। তবে কেন সে একা থাকতে চাইল?

আমাকে একা থাকতে দাও।

একা আপনি ওই বাসায় ফিরে যাবেন। লালিতা বলেছিল, ওখানে গেলে দিদির কথা মনে করে মন খারাপ করবেন।

মারা যাবার পরও কি আমি তার কথা মনে করবো না? তোমার দিদির তো ধারণা ছিল তার কথা আমার কখনো মনে হয় না। মারা যাবার পর সে জানুক আমি তাকে ভালবাসতাম।

তা জানি। দিদি না জানুক। আমি তা জানতাম।

তুমি জানতে!

হাঁ। লালিতা মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুখেন ওর মুখ দেখতে পেলে দেখতে পেত দিদির জন্য গভীর মমতা ঝর পড়ছে লালিতার। চোখ ছিলছিল হয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুখেন। শেষে লালিতাই এগিয়ে দিতে এল। সুখেনের একতলার ফ্ল্যাটের কাছে এসে দু’জনের চোখাচোখি হল। ট্যান্স অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। সারাদিনে অনেক ধকল গেছে। একটানা অনেক কর্মবাস্ততা—একটি জীবনের সম্প্রতিতর ব্যবস্থায় সকলকেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। সব চুকে গেলে ট্যান্সর নরম গদির সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়েছে। ফুটবল খেলার বিরতির সময় যেমন খেলোয়াড়রা বুক ভরে বাতাস নেয়, শুষে বসে নিঃশ্বাস টানে। সুখেনের মনে হয়েছিল তার দম আটকে এসেছে। অনেক ছোটোছোটো করে হাঁপিয়ে পড়েছে। গড়ের মাঠের শির শির হিমের স্পর্শে স্তিমিত হয়ে এসেছিল তার উত্তেজনা, বুঝি নিজের মধ্যে গতির ছন্দ অনুভব করছিল, অজানা একটা খুশীর অনুভূতি তাকে কেমন আনমনা করে ফেলেছিল। গলির মুখে ট্যান্সটা দাঁড়িয়ে গেল। তন্দ্রায় ঝুলে পড়েছিল সুখেন। লালিতা তাকে ডেকে তুলে ভাড়া মিটিয়ে পাশাপাশি হেঁটে এসেছে। সুখেন বলেছিল, ট্যান্সটা ছেড়ে দিলে? লালিতা বলেছিল, আরেকটা ডেকে নেবো’খন। আপনাকে পেঁছে দিই।

কোন দরকার ছিল না। সুখেন বলেছিল।

তা জানি। আপনার কিছুতেই দরকার নেই। সারাদিন কিছু মুখে দেবারও প্রয়োজন হল না। দিদির জন্য এমনি উপোস করে থাকবেন নাকি? লালিতা বলেছিল।

একরাশ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়েছিল সুখেন। সারাদিনের পরিশ্রমে, রোদে ছোটোছোটো লালিতাকে শুকনো দেখাচ্ছিল। বিশেষ, কোন প্রসাধনের, সাজসজ্জার বালাই ছিল না। এমন সাধারণ কোনদিন দেখেনি লালিতাকে। সুলতা এই নিয়ে কত কথা বলতো। সুখেনের সাক্ষাতেই কত ইঙ্গিত করতো আর সে সময় সুলতার চোখদুটো জ্বলে উঠতো। একটা ঈর্ষার যেন জ্বলত সুলতা। সেই সুলতার মৃত্যুর দিন কেমন সাধারণ আটপোরে হয়ে গেছে লালিতা। দিদি বেঁচে থাকতে যদি দেখতো লালিতাকে, তাহলে এমন ঈর্ষার জ্বলত না সে। হয়তো মরতে ইচ্ছে হতো না তার। সুখেন চোখ ভরে নতুন করে দেখল লালিতাকে। অনেকক্ষণ ওর চোখের ভাষা বুঝে নিয়ে বলেছিল, দাঁখি

উপোস করে থেকে যদি প্রার্থীশীত করা যায়। তোমার দাঁদির আত্মা হয়তো তাহলে তৃপ্ত পাবে।

দাঁদিকে তৃপ্ত দিতেই আপনি উপোস করে থাকবেন! তাহলে দাঁদির কাছে পৌঁছতে আর দাঁদির নেই। লালিতা বলেছিল।

আমাকে তোমার দাঁদির কাছে পৌঁছে দিতে পারো লালিতা? তোমার দাঁদি যেখানে আছে।

সুখেনের গলার স্বরে চমকে উঠেছিল লালিতা। পরিহাসের স্বর এ নয়। লালিতা জানে। তবে কি সত্যি পাগল হয়ে গেল। দাঁদির জন্য পাগল হয়ে গেল দাদাবাবু? আরো কাছে সরে এসে তার হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে লালিতা বলেছিল, কী বলছেন! দাঁদির কাছে আপনি যেতে চাইবেন কেন? আপনার কি মাথা খারাপ হল?

সুখেনের তো মাথা খারাপ ছিল না লালিতা।

না, দাঁদির মাথা ঠিকই ছিল।

তবে কেন সে আত্মহত্যা করল?

আমি কেমন করে জানবো? অসহায়ের মত সুখেনের হাতটা আরো জোরে আরো গভীরভাবে চেপে ধরেছিল লালিতা। —আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

আমিও পাচ্ছি না লালিতা। করো-নারের কথা আমি বিশ্বাস করি না। হাট দু'বল ছিল। এনিময়য় ভুগছিল সুখেন—একথা সত্যি। কিন্তু আত্মহত্যার কথা কেমন করে ওরা মনে নিল। আসলে রোগের লক্ষণ ছিল ওর মনে। আমার মনে হতো এমন একটা কান্ড ও করবেই। কথাগুলো বলে উত্তেজনায হাঁপাচ্ছিল সুখেন। শারীরিক অস্থিরতা ওকে আরো বেশি উত্তেজিত করে তুলেছিল।

ও কথা যাক। আপনি আর বেশি ভাববেন না।

কিন্তু মন থেকে সরিয়ে দিতে পারি না লালিতা। আমি একে ক্ষমা করতে পারি না। সুখেনের মৃত্যুকে আমি মেনে নিতে পারি না। আমি পাগল হয়ে যাবো লালিতা।

না-না! কী বলছেন! দু'দিনেই আপনি দাঁদির কথা ভুলে যাবেন। আপনাকে ভুলতে হবে। বেঁচে থাকবার জন্য আপনাকে ভুলতে হবে।

বেঁচে থাকবার জন্য! সুখেন হেসে বলেছিল, বেঁচেই তো আছি। হাঁ বেঁচে থাকবো লালিতা। আমি অনেকদিন বেঁচে থাকবো। আমি বাঁচতে চাই। মৃত্যুকে আমি ভয় করি। আমি কোনদিন মৃত মানুস দেখিনি। মানুস মরে গেলে কেমন দেখায় এ-অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। আমি বড় ভীরু। ছেলেবেলায়

হাঙ্গিধনি শুনলে কান চেপে রাখতাম, মাকে জড়িয়ে ধরতাম ভয়ে। কেউ মারা গেলে আমি পালিয়ে যেতাম, পাছে সেই মৃতের মৃত্যুমুখি হতে হয়। বড় হয়েও আমার ভয় যায়নি। সুখেন তাই আমাকে সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে গেল। আমি মৃত্যুকে দেখলাম। চোখের সামনে দেখলাম মানুসের দেহকে নিস্পন্দ ঝুলে থাকতে; বিকৃত হয়ে যেতে, আগুনে পুড়ে ছাই হতে। মানুসের মৃত্যুর চেহারা এমন বীভৎস করুণ—কল্পনাও করতে পারিনি। কেমন নিরুদ্ভাপ গলায় সুখেন কথাগুলো বলেছিল। না, ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না তার। স্বাভাবিক মনকেও হারিয়ে ফেলেছিল। একটা মানুসের মৃত্যু কেমন আঁকবট করে ফেলেছিল—তার চিন্তা বৃদ্ধি বিবেক সব-কিছুর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আবেগের আকুলতা রুদ্ধ কান্নার ভাষায় আকুলি বিকুলি করেছিল। রুদ্ধ আবেগ ভাষা পেতে চেয়েছিল তার মনে।

স্মরণ করতে পারে সুখেন কালকের প্রতিটি ঘটনার খুঁটিনাটি, প্রতিটি কথার ধ্বনি। কালকের ঘটনা কি? সুখেনের মনে হল অনেক অনেকদিন আগেকার। আদৌ এমন কিছু ঘটছিল কিনা, তাও বলতে পারে না। না, আজ তার অফিসে যাওয়া উচিত ছিল। অফিসে একটা খবর দেওয়া, নয়তো সীক্ লীভের দরখাস্ত। অফিসের নিয়মে তার অনু-পস্থিতি কেউ ক্ষমা করবে না। অবশ্য সে যদি বলেই ফেলে। সবাই তাকে সম-বেদনা জানাবে। তার অসহ্য লাগবে। আড়ালে সহকর্মীরা মুখ টেপার্টোপ করবে, তাও সে সহ্য করতে পারবে। আড়মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল সুখেন। ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। অনেকটা জায়গা বেড়েছে ঘরখানার। পায়চারি করা যায়। জানলা গলিয়ে কিছুটা

আলো ঘরের মধ্যে অগুড়ে পড়েছে। পথের লাইটপোস্টের আলো চুরি করে ঘরে ঢুকেছে। অন্ধকারকে আরো ঘন উজ্জ্বল করে তুলেছে। সুখেন তাই থাকলে এই আলোটুকু নিয়ে কত কবিতা করতো। উপভোগ করতো আলোর এই অভিসার, চূপসারে ঘরে ঢোকা। জোরে সুইচ টিপে আলো জেলে দিল সুখেন। অন্ধকার অসহ্য হয়ে উঠেছে। অন্ধকার সে সহ্য করতে পারতো না। তাকে ঘিরে ধরতো, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতো। সেজন্য সে বেশি পাওয়ারের আলো জ্বালতো ঘরে, সারা রাত একটা সবুজ আলো জেলে রাখতো। এই নিয়ে সুখেনের সঙ্গে কত কথা কাটাকাটি হয়েছে, কত বাদানুবাদ। সুখেন আলো সহ্য করতে পারতো না। অন্ধকারকে সে ভাল-বাসতো। বলতো, আমি যা পছন্দ করি না তাই তুমি করবে। আমার যা অসহ্য তাই তোমার কাছে ভাল। আশ্চর্য মানুষ তুমি। সুখেন বলেছে, তোমার পছন্দের কথা আর বলো না। কিসে যে তোমার অসহ্য নয় বৃদ্ধি না। সুখেন বলতো, বৃদ্ধিবে। আমি মরে গেলে তুমি বৃদ্ধিবে। তখন সব বৃদ্ধিবে। সুখেন বৃদ্ধিতে পারে না আলো মানুসের অসহ্য হয় কেন? কিন্তু চড়া রঙ তো ওর অসহ্য ছিল না। ডিপ্ রঙের শাড়ি পরতো সুখেন। লাল কিংবা বেগুনি। বলতো, চড়া রঙেই নাকি ভালো দেখায়। সুখেনকে ইলকা রঙ পরলেই মানাতো। কেননা, ওর রঙটা উজ্জ্বল ছিল না। লালিতার মত ছিল না ওর গায়ের রঙ। সুখেন বলেই ফেলেছিল, ওই রঙের শাড়ি তোমার বোনকে পরলে মানায়। সুখেন বলেছিল, আমার বোনকে কী পরলে মানায় তাই তো তোমার দেখার। তাকে কেমন করে হাটলে ভাল দেখায়, কেমন সাজ পোশাক

বনাবমী মাড়ীর মেলা

মোহিনী মোহন

কাঙ্ক্ষিত

এও মন

কলেজ স্ট্রীট জংশন কলিকাতা-১

ফোন ৩৪-৪৫২০

করলে, রাতদিন তুমি তারই ধ্যান কর—
তা কি আমি বৃদ্ধিতে পারি না ভাবো?

কী বলছো সুলতা! ভাগ্যস ললিতা
এখানে নেই।

আপসোস থাকে কেন। আনিরে
দিচ্ছি তাকে। কথার সংগে সংগে
সুলতার চোখ জ্বলে উঠতো। কী কথা
থেকে কী কথা এসে পড়তো। সুখেন
প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইতো। আলো
নিভিয়ে সুলতার তীর দৃষ্টি থেকে যেন
আড়াল করতে চাইতো নিজেকে।

আজ আর আড়াল করতে চাইল না।
আলনায় ঝোলান এলোমেলো শাড়ি
রাউজ সায়্য বড়জ। চুলের ফিতে কাঁটা
প্রসাধন সামগ্রী আয়নার সামনে জড়ো
করা। যেন এইমাত্র সুলতা খুলে
রেখেছে। এখনো মাথার তেলের দাগ,
রান্নার হলুদ মশলার ছোপ কাপড়ে।
কাপড়গুলো লীঙ্গুতে পাঠাতে হবে। সেই
সঙ্গে পাঞ্জাবিটাও। মনে করে কেমন
আশ্বস্ত হল সুখেন। ধীরে ধীরে তার
দৃষ্টিটা দেয়াল বেয়ে জানলার বাতা
ছাড়িয়ে লোহার জাফরি ভেঁস্টলেটের
ডিঙিয়ে শির শির করে উপরে উঠতে
লাগল। ছাদের কোণে মাকড়সার জাল
অন্ধকার করে রেখেছে, ধুলো জমে ঝুলে
রয়েছে। দৃষ্টি বদলিয়ে ছাদের কাঁড়
বরগা লেপে লেপে এক জায়গায় স্থির
হয়ে গেল। নিশ্চল, নিষ্পলক। ফ্যানের
একটা হুক ঝুলে আছে। একটা ফ্যান
পয়েন্ট। অসহ্য গরমে ওই সিলিং-এর
সঙ্গে একটা ফ্যান ঝোলাতে কতদিন
বলেছে সুলতা।—পয়েন্ট যখন আছে
ইনস্টলমেন্টে একটা ফ্যানও তো কিনতে
পারো, নয়তো ভাড়াও করা যায়। সারা-
দিন আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। সারাটা
দুপুর কেমন করে কাটে তা তুমি কি করে
বুঝবে। সুখেন বলেছে, তা নয় সুলতা।
ফ্যান কেনার কথা আমিও ভেবেছি।
কিন্তু একসঙ্গে যে অনেকগুলো টাকার
দরকার। দেখি যদি পারা যায়। সুলতা
বলেছে, আর দেখেছো। তোমাকে তো
বাড়িতে থাকতে হয় না। অফিসে ফ্যানের
নিচে বসে থাকো—। সুখেন হেসে
বলেছে, তাই তোমার ঈর্ষা হয়। তুমিও
তো ইচ্ছে হলে অফিসে ফ্যানের নিচে
বসতে পারো।

না, আমি চাকরি করতে ছুটতে
পারবো না। একটু ফ্যানের হাওয়ার জন্য
আমাকে দিয়ে গোলার্মি করিয়ে না।

চাকরি করলেই গোলার্মি হয় না।
তাছাড়া গোলার্মি কে না করছে। আজ-
কাল মেয়েরা তো চাকরি করছে।

করুকগে। তাবলে আমাকেও
করতে হবে। তোমার মত লোকের হাতে
পড়েছি বলেই না আমার এমন হাল
হয়েছে। রাগে সুলতা স্বামীর বিরুদ্ধে
বিশোধগার করতে সন্ধা করতো না।

সুখেনকেই বলতে হতো শেষে,
আচ্ছা। আচ্ছা। তোমাকে আর চাকরি
করতে হবে না। ফ্যানও দেখি আনিতে
পারি কিনা। সুলতা গম হয়ে বসে
থাকতো। অনেকক্ষণ অপ্রিয় কথা বলে
ও যখন হাঁপিয়ে উঠতো তখন হঠাৎ কথা
বন্ধ করে গম হয়ে থাকতো। ডাকলেও
সাদা দিতো না। মেজাজটা ওর কিছ-
দিন হল এমন হয়ে উঠেছিল। সামান্য
কিছুতেই রেগে উঠতো, কথার সূত্র
পেলেই কথা শোনাতো।

সেই ফ্যান আর এবারের মে-
জুনে কেনা হয়নি। আগামী
বছরের জন্য মুলতুবি রয়েছে। অথচ
ফ্যানটা কেনা হলে এমন হতো না। জংখরা
লোহার ওই নিঃসঙ্গ হুকটাই কাল
হয়েছে। সিলিং-এর গায় আটকানো
লোহার হুকটা একটা আকর্ষণের মত
টানতে লাগল। মাধ্যাকর্ষণের চেয়েও এর
শক্তি বেশি, এর আকর্ষণ কাটানো যায়
না। স্থির একটা বিন্দুতে নিজেকে
সংহত করে রাখে, দৃষ্টির বিভ্রম ঘটায়
না। নিজের খাটটা অনেকখানি দূরত্ব
ঘুচিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে সিলিংটা
এগিয়ে আসতে লাগল, আরো কাছে,
হাতের নাগালের মধ্যে। যেম হাত দিয়ে
ছোঁয়া যায়, স্পর্শ করা যায়। কি ঠান্ডা,
মৃত্যুর মত শীতল বরফের মত
নিরুদ্ভাপ। নিশ্চিত একটা সিন্ধান্তে
পৌঁছতে পারা যায়। একটা পরিণতির
দিকে টানতে লাগল, হাতছানি দিল, কাছে
টানল, জড়িয়ে ধরল। আলিঙ্গনের মধ্যে
নিজেকে সপে দিতে ইচ্ছে হল। হাঁ
সুলতাই তো! ওর লাল শাড়ির একটা
তীর আকর্ষণ। হাতছানি, ইশারা। তাকে
ডাকছে, কাছে ডাকছে। ওই সিলিংটার
সঙ্গে ঝোলান ওর শরীরটা তো নিষ্পল
নয়। এই তো ছুঁয়ে দেখল সুখেন।
কেমন জীবন্ত, স্পন্দিত, উত্তপ্ত ওর
শরীরের স্পর্শ।

আমাকে ডাকছো সুলতা?
হাঁ, কাছে এসো। ভয় পাচ্ছো কেন?
এগিয়ে এসো। আমাকে ছুঁয়ে দেখ আমি
বেঁচে আছি। তুমি না ছেলেবেলার ভয়
পেতে।

ও তো ছেলেবেলার কথা। এখন
অনেক বড় হয়ে গেছি। ভয়-টয় আমার
নেই।

খিল-খিল করে হেসে উঠল সুলতা।
তাই বলে! তোমাকে দেখে আমি কী
ভয় পেয়েছিলাম। যাক বাঁচা গেল। তুমি
ভয় পাওনি! এবার শোন আমার কথা।
কোনদিন তো আমার কথা শোননি।

এবার শুনবো। তোমার সব কথা
শুনবো আমি।

অনেক অন্ধকার সাতেরে অতলে
ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠে চোখ মেলে

তাকাল সুখেন। স্বপ্নের মত সব
জড়িয়ে গেছে। হিজিবিজি কাটাফটি।
অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া একটা স্মৃতি
ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। ললিতাকে সামনে
দেখে উঠে বসার চেষ্টা করল সুখেন।—
কখন এলে? একি আমার চুলগুলো সব
ভিজে গেছে।

ললিতা তখনো বিশ্বাস করতে
পারছে না। এতক্ষণের সব্ব শব্দশ্রু-
বিকারের ঘোর থেকে জাগিয়ে তুলবে
সুখেনকে। মাথায় জল ঢেলে, ব্লটিং
পেপার পড়িয়ে নাকের কাছে ধরে অনেক
চেষ্টা করেছে। তার জানা বা কিছু
বিদ্যা ছিল সবই পরীক্ষা করে দেখেছে।
শেষে ডাক্তার ডাকবে ঠিক করতেই
সুখেনের জ্ঞান ফিরে এল। খাটের এক-
পাশে তার শরীরটা ঝুলে ছিল—কেমন
অপ্রকৃতিস্থ, অসম্বত, বিকারগ্রস্ত।

কেমন লাগছে এখন?

কেন? আমার কি হয়েছিল? তারপর
চোখ বুজে স্মরণ করার চেষ্টা করল
সুখেন। কী একটা মনে করে বলল,
জানো ললিতা, আমি ভীষণ ভয় পেয়ে-
ছিলাম।

ভাগ্যস আমি এসে পড়েছিলাম। না
হলে আর এক কান্ড বাড়িয়ে বসতেন।
এবার চলুন দেখি। উঠুন।

সুখেন স্নান হাসল। বলল, আমাকে
নিরে যেতে এসেছো? কোথায় নিয়ে
যাবে? আমি তোমার দ্বিধাকে ছেড়ে
কোথাও যেতে পারি না ললিতা। সুলতা
আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল। কেমন
অপ্রকৃতিস্থের মত ললিতার দিকে
অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল সুখেন।

ললিতা ওর কথায় চমকে উঠল। যেন
সেও আর নিজেকে সামলাতে পারছে না।
ললিতা বলল, আমি নিয়ে যেতে দেবো
না।

সত্যি তুমি আমাকে আটকে রাখতে
পারবে? সত্যি পারবে? আমার কেমন
ভয় হচ্ছে। তুমি আমাকে ফেলে যেও না
ললিতা। তুমি এখানে থাকো। দ্বিধার
পাশে। দ্বিধাকে আড়াল করে থাকবে
তুমি।

আলোটা নিভিয়ে দেবো? তোমার
আলো অসহ্য লাগে না?

না। আলোটা জ্বালা থাক।

আমি অন্ধকার সহিতে পারি না।
আমার মনে হয় অন্ধকার মানে মৃত্যু।
আর এক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আর এক
জীবনকে পেতে চাই। তুমি দিতে পারবে
ললিতা?

॥ শের-ই-বাংগাল ॥

বঙ্গ রাজনীতির প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক, শত সংঘর্ষের বীর যোদ্ধা, শের-ই-বাংগাল ফজলুল হক পরিণত বয়সে ঢাকার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের যারা প্রথম দিনের সংগী সেই রাষ্ট্রগুরু, সুরেন্দ্রনাথ, ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী প্রভৃতি সকলেরই স্থান আজ ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের যুগের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা জনাব হক প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও ছিলেন বাঙলাদেশের মানুষের অবিংস-বাদিত নেতা। ওপরতলার রাজনীতির কটুবৃদ্ধির খেলায় বহুবার পরাজিত হয়েছেন তিনি, কিন্তু সে পরাজয় তাঁকে গ্রাম-বাঙলার কোটি কোটি মানুষের



অন্তরের আসন থেকে কখনও অপসারিত করেনি। তাই মুকবিলার সুযোগ এলেই 'শের-ই-বাংগাল' বাকিয়ে দিয়েছেন, ড্রয়িং রুমের কটুবৃদ্ধি রাজনৈতিকদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ কোথায়।

বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সাহসে, কর্ম-ক্ষমতায় হক সাহেব ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ১৮৯৪ সালে যুগপৎ গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর সম্মানসহ তিনি বি-এ পাশ করেন, এবং পরে গণিতে এম-এ ও ল' পাশ করে ১৮৯৮ সালে স্যার আশুতোষের জুনিয়ররূপে কলিকাতা হাইকোর্টে শুরুর করেন আইন ব্যবসায়। অনতিবিলম্বেই আইন ব্যবসায় তিনি সপাতিত্যা অর্জন করেন কিন্তু কিছুকাল অলস পড়েন না তাঁর দেশের কোটি কোটি মানুষকে যাদের দুর্দশা শিশুরা অতি কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। ১৯১৪ সালে তিনি যোগ দেন জাতীয় কংগ্রেস, ১৯১৫ সালে শুরুর করেন প্রজা-



আন্দোলন। ১৯১৮ সালে তিনি হন জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের সমর্থনে হন কলিকাতা পৌরসভার মেয়র। ১৯৩৭ সালে জনাব হক শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন বাঙলা মুসলিম লীগের নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে বিধানসভার নির্বাচনে। কিন্তু তারপর কংগ্রেসের অহেলাতেই ফজলুল হককে সাময়িকভাবে হারায় বাঙলার জাতীয়তাবাদী শক্তি, যার ফলে এদেশে গড়ে ওঠার সুযোগ পায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা।

দেশ বিভাগের পর হক সাহেব ঢাকায় যান এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। সে সুযোগ আসে ১৯৫৪ সালে, পূর্ব-বঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সংযুক্ত ফ্রন্টের নেতৃত্ব পেয়ে তিনি নির্বাচনে নামেন এবং সে নির্বাচনে অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের। কিন্তু হক সাহেবের পক্ষে সে গণনেতৃত্ব বেশীদিন অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়নি। অনতিবিলম্বে সারা পাকিস্থানে কায়ম হয় আয়ুব খাঁর সৈন্যশাসন আর সে শাসনের পীড়নে কয়েক কোটি পাকিস্থানবাসীর সঙ্গে ফজলুল হকের কণ্ঠও চিরকালের জন্য নৃশূন্য হয়। কিন্তু তবুও এই সাধারণ মানুষটির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্থানের প্রাণের সংযোগ যে কখনও ছিন্ন হয়নি তা প্রমাণিত হয়েছে তাঁর শবানুগমনে লক্ষ মানুষের সমাগমে। রণক্লান্ত যোদ্ধা পরলোকে চিরশান্তি লাভ করুন, সারা বাঙলার সকল মানুষের সঙ্গে আজ এই আমাদের কামনা।

॥ তুচ্ছের বিড়ম্বনা ॥

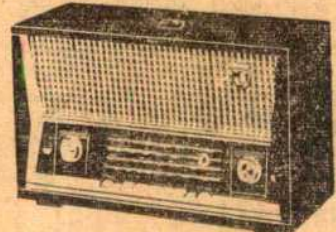
অতি তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র এক নয়া পয়সা সরকারী টাকশালে নাকি এক আভাবনীর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বিদেশ থেকে তাম্রা আমদানির খরচ সম্বন্ধে তার বর্তমান যা উৎপাদন সাহেব জানতে তার মাদা-মালোব অধিকও নাকি উশাল করা সম্ভব হচ্ছে না। দ'নয়া পয়সারও বেশী খরচ করে সবকিছুকে প্রতিটি নয়া পয়সা ভাঙতে হচ্ছে বাজারে। কিন্তু তার চোখেও দৃশ্টিমন্তার কারণ হল এই সম্রাণা মুদ্রাটির অসামান্য বাজার চাহিদা। কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি টাকশালের

এক-তৃতীয়াংশ সময় ব্যয় হয়ে যায় শব্দে এক নয়া পয়সার উৎপাদনে। তবুও তাতে ক্রমক্ষমতায়না ঐ ক্ষুদ্র মুদ্রাটির বাজার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। মুদ্রাটি বর্তমানে ধাতব প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে, সরকারের মনে এমন আশঙ্কাও নাকি দেখা দিয়েছে। তাই রেলভাড়া, বাসভাড়া, রাজস্ব, শুল্ক, খাম পোষ্ট-কার্ডের দাম প্রভৃতি ব্যবসায়ী সরকারী হিসাববাবস্থায় বেজোড় সংখ্যার বদলে শূন্য বা পাঁচ-বিভাজ্য সংখ্যায় মূল্যমান স্থিরীকরণের কথা চিন্তা করছেন সরকার। তাতে নয়া পয়সার চাহিদা হয়ত কমবে, কিন্তু এই অজহাতে ব্যবসায়ী বস্তুত আরও একবার দাম বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ মিলবে সব সরকারী ও বেসরকারী মুনাকা-শিকারীদের।

॥ সরকারের ভেল্ক ॥

'আচ্ছা ভেল্ক দেখাল বাটে সরকার' কথাটা বলছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক কর্মচারী। দশ টাকা মাঙ্গীজানা বাড়ার কথাটা শোনামাত্রই তাঁর নাকি সন্দেহ হয়েছিল, ওটা আর এক হাত দিয়ে পনের টাকা বার করে নেওয়ার প্রারম্ভিক প্রস্তুতি। বাজেরটে দন্ডাঘাত মাথায় পড়ার পর তাঁর সে সন্দেহের নিরসন হল। তিনি হিসেব করে দেখিয়ে দিলেন, শুল্ক বাড়ানোর জন্যে কাপড়, সুতো, তামাক, দেশলাই, চা প্রভৃতির যে হারে দাম বাড়লো, বাড়তি দশ টাকা মাঙ্গী ভাতা দিয়ে তার বাবো আনা মত পূরণ হবে মাত্র। তবুও তিনি ভাগাবন যে, এই বাজারে অন্তত দশটা টাকা মাইনে বেড়েছে তাঁর। যারা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী নয়, সেই কোটি কোটি মানুষের মাথায় যে বিরাট বোকা ইতিমধ্যেই চেপে আছে, তাদের ক্ষেত্রে

বগদ ও কিস্তিতে



রোডিও সেট, রোডিওগ্রাম, ট্রানজিস্টর রোডিও, টেপ-রেকর্ডার, রেকর্ড প্লেয়ার ইত্যাদি আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি।

রোডিও অ্যান্ড ফটো স্টোরস্।

৬৫নং গণেশচন্দ্র এডিনউ,

ফোনঃ ২৪-৪৭৯৫, কলিঃ-১৩

সরকারী কৃপায় সাম্প্রতিক বারবান্ধিটি সম্পূর্ণই নতুন সংযোজন। এর ওপরেও আছে রেলের যাত্রীভাড়া ও মালভাড়া বান্ধি।

একচেটিয়া কারবারেও কতকগুলি বিধানবোধ মেনে চলতে হয়। সুটিংছাড়া যে কোন দাম চেয়ে বসা যায় না যে কোন পণ্য বা কাজের জন্যে, তা সে পণ্য বা সে কাজ যতই মানুষের প্রয়োজনে লাগুক না কেন। একচেটিয়া কারবারের জবরদস্তির সবচেয়ে বড় প্রতিবেদক হল বিকল্প পণ্য বা সেবা, যা অর্থনীতির প্রাথমিক পর্ষায়ের ছাত্রদেরও জানা আছে। সুতরাং ভারত সরকারের ওকথা অজানা থাকার কথা নয়। তবুও তাঁরা কোন বিবেচনায় যে রেলের যাত্রীভাড়া ও মালভাড়া বাড়িয়ে দিলেন, তা বোধহয় শূন্যে তাঁরাই জানেন। রেলের উভয় পর্ষায়ে এইভাবে ভাড়া বান্ধিকে সবচেয়ে বেশী সাদর অভিনন্দন জানাবে বাস ও ট্রাকের মালিকরা যারা আজ ভারতের সর্বত্র রেলের বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থা হিসাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এমনিতেই সাধারণ মানুষের কাছে আজ মালবহনের ব্যাপারে ট্রেনের চাইতে ট্রাক অনেক নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, এরপর যখন ট্রেনের মালবহনের মামূল্য বৃদ্ধিগত হবে, তখন ট্রাকের চাহিদাও বৃদ্ধিগত হবে। যাত্রী-বাহী বাসের উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধিও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ অবস্থায় সরকারের রেলের ভাড়া বান্ধির প্রস্তাবকে সুবিবেচনাপ্রসূত বলে ভাবা খুবই কষ্টসাধ্য। তৃতীয় শ্রেণী নামক চলমান অন্ধকূপগুলি মূলতঃ যাত্রী-গুলির সামান্যতম নিম্নস্বাস ফেলার সুযোগটুকুও না করে দিয়ে তাদের কাছ থেকে আরও বেশী ভাড়া চাওয়ার নৈতিক অধিকারের প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে না হয় না-ই তোলা গেল।

॥ কর্ণফুলি ॥

পাক প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল খান গত ৩১শে মার্চ কর্ণফুলি বাঁধের

ধবল বা শ্বেত

রোগ স্থায়ী নিশ্চিত করুন।

অসাড়, গলিত, শ্বেতিরোগ, একজিমা, সোরাইসিস ও দাঁষত ক্ষতাদি দ্রুত আরোগ্যের নব-আবিষ্কৃত ঔষধ ব্যবহার করুন। হাওড়া কল্লি কুঠার। প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাদব ঘোষ লেন, খরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৩৫৯। শাখা—৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হারিসন রোড), কলিকাতা-৯।

উল্লেখ্য করেছেন। ঐ বাঁধ নির্মিত হলে চট্টগ্রাম বিভাগের কি কি মহান উপকার সাধিত হবে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন জনাব আব্দুল শূন্য বলেননি, ঐ বাঁধের ফলে কি সমূহ ক্ষতি হবে ভারতের অন্তর্গত আসামের লুসাই পাহাড় এলাকার। বাঁধ বাঁধার যখন প্রস্তাব ওঠে ১৯৫০ সালে তখনই ভারত পাকিস্থানের সিস্থান্তের বিরুদ্ধে প্রতীবাদ জানিয়ে বলেছিল ঐ বাঁধের ফলে লুসাই পাহাড়ের বহু ভূমি নির্মজ্জিত হবে। কিন্তু ভারতের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে পাকিস্থান কর্ণফুলিতে বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনার কাজ শেষ করেছে এবং তার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ আসামের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। ভারত সরকারের সচমন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম লোকসভায় বলেছেন, পাকিস্থানের এই অন্যায় ও আন্তর্জাতিক আইন-বিরোধী কার্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার অবিলম্বে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন তবে সে ব্যবস্থা কি ধরনের হবে, জনস্বার্থের খাতিরে সচমন্ত্রী এখনই তা প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করেননি।

॥ সোনার খাট ॥

সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা রাখত রূপকথার রাজকন্যারা। তাতে এ মর্ত্যজগতের অধিবাসীদের কোন আপত্তি ছিল না, কারণ তাদের পয়সায় ঐ রাজকন্যাদের বিলাসবাসন চলত না, মন্ত্রেই হত ওসব। কিন্তু লোকের রক্ত জল করা টাকায় রূপকথার রাজকন্যা হওয়ার সখ হয়েছিল ঘানার শিল্পমন্ত্রীর শ্বেতাঙ্গিনী সহধর্মিণী। সুতরাং গোড়াতেই সাংঘাতিক ভুল হয়েছিল তাঁর, আর আজ সে ভুলের মামূল্য দিতে তিনি স্বামী-পুত্রে সর্বহারা।

আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন দেশ ঘানা এগিয়ে চলেছে সমাজতন্ত্রের পথে, ডঃ এনকুমা পরিচালিত ঘানার শাসকদলের অন্তত তাই দাবী। কিন্তু কদিন আগে হঠাৎ লন্ডনের এক সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়, ঘানার শিল্পমন্ত্রী ক্রোবো এডুসেইর সহধর্মিণী মেরী লন্ডনের এক সৌখিন আসবাবের দোকান থেকে কিনেছেন, সোনার পাতে মোড়া এক পালংক, যার দাম চল্লিশ হাজার টাকা! সংগে সংগে দাবানলের মত সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে ঘানায়, এবং এনকুমার সহকর্মীদের পক্ষ থেকেই দাবী ওঠে শিল্পমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের। নিরপায় শিল্পমন্ত্রী লন্ডনে প্রতিকারের আশায়। কিন্তু প্রতিকার কিছু হল না, পরন্তু ফিরে এসে দেখলেন, ঘানার রাজধানী

আফ্রার উপকণ্ঠে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে স্বপ্নপ্রাসাদ তিনি নির্মাণ করেছিলেন তাও গেছে হাতছাড়া হয়ে। ঘানার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ডঃ এনকুমার অন্যতম বিশ্বস্ত সহকর্মী ক্রোবো এডুসেই বোধহয় সংগ্রামের পদস্কার মনে করেই যে প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন তার মধ্যে আছে সাতারের পুকুর, বিরাট মর্মরনির্মিত অতিথি অভ্যর্থনা ভবন, চোখ বলসানো আলোকস্তম্ভ। সরকারী নির্দেশে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ক্রোবোর স্বপ্নপদুরী।

॥ আবার পরীক্ষা ॥

সকলের সব অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্র আবার শুরু করল বায়ুমণ্ডল পারমাণবিক পরীক্ষা। এই ভয়ংকর পরীক্ষার পরিণতি কি ভয়াবহ যুক্তরাষ্ট্রের তা অজানা নেই, তবুও তাকে বিশ্বের শান্তিকামী কোটি কোটি মানুষের সাক্ষর অনুরোধ নিবৃত্ত করতে পারল না। এমন কি নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা চলাকালে পরীক্ষা বন্ধ রাখার জন্য যে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাও যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য হল যে, পর্যবেক্ষণাধীন নিরস্ত্রীকরণ ছাড়া নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে আর কোন প্রস্তাবেই তার পক্ষে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়। আর সে প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পরীক্ষা বন্ধ রাখাও সম্ভব নয়। পারমাণবিক শক্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অগ্রগতি যুক্তরাষ্ট্র নীরব নিশ্চেষ্ট হয়ে দেখে যেতে পারে না।

এক পক্ষের এই যুক্তি ও মনোভাবের অনিবার্য পরিণতি সকলেরই জানা আছে। এর পর সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হতেও অনুরূপভাবে পারমাণবিক পরীক্ষা শুরু হবে, আর তা সে শুরু করলে তার প্রতি কোন রকম দোষারোপই করা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সোভিয়েট ইউনিয়ন এ পর্যন্ত ত অনেক কম পরীক্ষা করেছেই, সমগ্র পশ্চিমী শক্তিজোটের পরীক্ষার সামগ্রিক হিসাবের সঙ্গে তুলনা করলে সোভিয়েট ইউনিয়নের পরীক্ষার স্বল্পতা আরও স্পষ্ট হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হতে এ পর্যন্ত পারমাণবিক পরীক্ষা হয়েছে ১০৫টি, সে জায়গায় যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষা করেছে ১৮১টি, বৃটেন ২২টি ও ফ্রান্স চারটি। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়নও অবশ্যই আর চুপ করে থাকবে না। আর তার ফলে সারা পৃথিবীর আকাশ আবার সর্বনাশা বিষব্রশ্মের আশুভ আশংকার মেঘে কালো হা উঠবে।

সত্যবাহু

১১ মার্চ

১৯শে এপ্রিল—৬ই বৈশাখ: ১লা জুলাই (১৯৬২) হইতে রেলের মাসুল ও যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব—রেলওয়ে মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং কর্তৃক লোকসভায় নতুন রেল বাজেট পেশ।

লাদাক অঞ্চলে চীনের আর এক দফা অনুপ্রবেশ ও ঘাঁটি স্থাপন—চীন সরকারের নিকট ভারতের তীর প্রতিবাদ—লোকসভায় পররাষ্ট্র বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননের বিবৃতি।

ভারত-নেপাল সম্পর্ক বিষয়ে দিল্লীতে নেপালের রাজা মহেন্দ্র ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মধ্যে পুনরায় গোপন বৈঠক।

২০শে এপ্রিল—৭ই বৈশাখ: ভারতীয় মার্কিং রাষ্ট্রদূত মিঃ গলব্রেথ কর্তৃক ব্যাঙেলে দেশের বহুস্তম তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন—অর্থ সাহায্যের জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (মুখ্যমন্ত্রী) কর্তৃক অনুষ্ঠানে মার্কিং সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

কলিকাতা ও উৎকলে বঙ্গবন্ধুর প্রথম কাল-বৈশাখীর তাড়ব-প্রচণ্ড ঝড় ও জলে রেল, বিমান, ট্রাম, বাস চলাচল ব্যাহত।

পূর্বলিয়ার নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সনাতন ও ৭৭তম বার্ষিক সম্মেলন সূর্য: সভাপতি অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী।

২১শে এপ্রিল—৮ই বৈশাখ: এক তরফা কণ্ঠস্বী বর্ষ নিমাণ সম্পর্কে ভারতের আর এক দফা প্রতিবাদ—প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া পাকিস্থানকে সতর্কীকরণ।

নয়াদিল্লীতে রাজা মহেন্দ্র (নেপাল-ধীশ) ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মধ্যে দুই দফা আলোচনা।

পূর্বলিয়ার সম্মেলনে দীর্ঘ আলোচনার পর মাধ্যমিক শিক্ষকদের (পশ্চিম-বঙ্গ) প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত।

২২শে এপ্রিল—৯ই বৈশাখ: দিল্লী আলোচনা ফলপ্রসূ হইয়াছে রাজা মহেন্দ্রের (নেপাল) মন্তব্য।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র চাউল ও অন্যান্য জাত্যাবশ্যক দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি—সাধারণ মানুষের চরম দুর্দশা।

২০শে এপ্রিল—১০ই বৈশাখ: কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৬২—৬৩ সালের

বাজেটে ১৫০ কোটি টাকা ঘাটতি—পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোহরজী দেশাই কর্তৃক নতুন বাজেট পেশ—কাপড়, সুতা, তামাক, দিয়ারলাই, চা, চট ও বস্তার উপর শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব।

ভারত-নেপাল সম্পর্কের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা—রাজা মহেন্দ্র-নেহরু যৌথ ইস্তাহার প্রকাশ—বিভিন্ন বিষয়ে উভয় মতের ঐক্যমত।

পূর্ব পাকিস্থান হইতে এখনও শত শত উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গে আগমন।

চীনের সাহিত্য বাণিজ্য আলোচনায় ভারত অসম্মত—অধিকৃত এলাকা না ছাড়িলে কিছুই করা হইবে না বলিয়া সাফ জবাব।

২৪শে এপ্রিল—১১ই বৈশাখ: পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ রাখার জন্য আণবিক শক্তিগুলির নিকট শ্রীনেহরুর আবেদন।

‘প্রয়োজনবোধে পূর্ব পাক সীমান্তে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হইবে’—লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) আশ্বাস।

২৫শে এপ্রিল—১২ই বৈশাখ: ‘কাশ্মীরে পাকিস্থানই রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ অমান্য করিয়াছে’—পাক অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের নতুন পদক্ষেপ প্রকাশ।

শোলমারী আগ্রহের সাধু নেতাজী সুভাষচন্দ্র নহেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আগ্রহ সম্পাদক শ্রীরমণীর্জন দাসের পত্র।

১১ মার্চ

১৯শে এপ্রিল—৬ই বৈশাখ: বুটেনে প্রবেশ সম্পর্কিত কমান্ডার্স বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ আইন—১লা জুলাই (১৯৬২) হইতে বলবৎ হইবে বলিয়া বৃটিশ সরকারের প্রেস নোটে ঘোষণা।

দক্ষিণ নেপালে সশস্ত্র ও সুসংগঠিত বিদ্রোহী দলের অভিযান—নেপালী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি।

২০শে এপ্রিল—৭ই বৈশাখ: পাক সরকারের নিকট বিনা বিচারে আটক সকল ছাত্র, সাংবাদিক ও জননেতার মুক্তি দাবী—ময়মনসিংহ ও রাজসাহী বার এসোসিয়েশনের সভায় প্রস্তাব গৃহীত।

আমেরিকা আণবিক পরীক্ষা চালাইলে রাশিয়া গ্রিগিট পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ কমিটি বর্জন করিবে—জেনেভায়

সাংবাদিক বৈঠকে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ জোরিনের হুমকী।

২১শে এপ্রিল—৮ই বৈশাখ: প্যারিসের জেলে দাওয়া ও অগ্নি-সংযোগ—১৫ জন বন্দী ও পাঁচজন পুলিশ আহত।

প্রশান্ত মহাসাগরে ঋতুসময় স্বীপে আমেরিকার প্রস্তাবিত পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার বাধা প্রদানের আহ্বান—নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির (ভারত সমেত) নিকট দার্শনিক রাসেলের (৮৯) আবেদন।

মার্কিং সরকারের বারমুন্ডলে আণবিক পরীক্ষা পুনরায়ম্ভের বিরুদ্ধে আমেরিকার সর্বত্র বিক্ষোভকারীদের মিছিল।

২২শে এপ্রিল—৯ই বৈশাখ: ‘সমগ্র বিশ্ব কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সদস্য সংখ্যা প্রায় চার কোটি, তন্মধ্যে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রসমূহেই প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ সদস্য’—মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বিশ্লেষণে তথ্য প্রকাশ।

২৩শে এপ্রিল—১০ই বৈশাখ: মার্কিং প্রেসিডেন্ট কেনেডি কর্তৃক পারমাণবিক অস্ত্র-সম্বন্ধে পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা প্রস্তাব অনুমোদন।

আমেরিকার পারমাণবিক পরীক্ষা পুনরায়ম্ভের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লন্ডনে ১০ হাজার বিক্ষোভকারীর নীরব প্রতিবাদ।

২৪শে এপ্রিল—১১ই বৈশাখ: নিকিতা ক্রুশ্চেভ ও লিওনিদ ব্রেজনেভ পুনরায় রাশিয়ার মধ্যপ্রাচ্যে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।

আর্জেন্টিনায় সমস্ত নির্বাচনের (মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত) ফলাফল বাতিল—প্রেসিডেন্ট পোসে গৃহীত কর্তৃক সকল প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ। রাশিয়া কর্তৃক ‘কসমস-৩’ নামক কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন।

২৫শে এপ্রিল—১২ই বৈশাখ: আমেরিকা কর্তৃক গৃহীত প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা আরম্ভ—প্রেসিডেন্ট কেনেডির চূড়ান্ত নির্দেশ।

রাশিয়ার নতুন সরকার মোটামুটি অপরিবর্তিত—ক্রুশ্চেভের (প্রধানমন্ত্রী) অন্তরঙ্গগণ স্ব স্ব পদে বহাল—স্টালিনী শাসনতন্ত্র পাল্টাইবার উদ্যোগ।

হাণিয়া কোষবন্দী ফাইলোরা

বিনা আস্ত্রে কেবল সেবনীর ও বাহা ঔষধ শ্রমীয়া শ্রমীর আয়োগ হয় ও আর পুনরায়ম্ভ হয় না। রোগ বিবরণ লিখিয়া নির্যাতন লউন। হিন্দু রিসার্চ, হোম, পোস্ট বক্স নং ২৫, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৭৫৫।

সমকালীন সাহিত্য

অভ্যুত্থান

॥ আরো বই পড়ুন ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একজন ফরাসী রসিক সমসাময়িক গ্রন্থ সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ মন্তব্য করেছিলেন: তাঁর মতে সমকালীন গ্রন্থাদি যেন একদিনেই লিখিত, পড়ে মনে হয় পূর্বদিনে পঠিত গ্রন্থপাঠের প্রত্যক্ষ ফসল নতুন বই। ভারতবর্ষের যে স্বল্পসংখ্যক পাঠক আছেন, যারা আজো বই কিনে পাঠ করে থাকেন, তাঁদের অনুভূতি কতকটা এই জাতীয়। ভারত সরকারের বিদায়ী তথ্য ও বেতারমন্ত্রী কেশকার আগস্ট ১৯৬১-তে প্রকাশকদের এক সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থাদি যে বিক্রী হয় না, বেশী লোকে কেনে না, কিনে পড়ার আগ্রহ নেই, তার কারণ সে সব বই কেনবার উপযুক্ত নয়। তিনি আরো বলেছিলেন যে প্রকাশকদের সমস্যাটা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে বই বিক্রী হবে তা নয়, কাকে বিক্রী করা হবে এই হল আসল সমস্যা। প্রকাশকরা স্বচ্ছন্দে তাঁদের ক্রোড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন, যদি তাঁরা বৈদেশিকোত্তর পাঠকমণ্ডল লাভ করতে পারেন।

মন্ত্রী মহোদয়ের এই উপদেশ নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে শক্তিমান বস্ত্র আছে, জন-সংযোগ রক্ষা করা এবং জনসমাজে পৌঁছে দেওয়ার যে পদ্ধতি আছে তার সাহায্যে প্রকাশকদের কি সাহায্য হতে পারে সে কথা তিনি সৌদীন বলেননি। কিভাবে প্রকাশকরা গ্রীষ্মক কেশকারের এই উপদেশ পালন করতে পারেন, তার নির্দেশ তিনি দেননি।

বেতারবস্ত্রের দ্বারা প্রচারিত সঙ্গীত, তথ্য, সাহিত্য, সংবাদ-সমীক্ষা ইত্যাদিতে কি জনসাধারণের যথেষ্ট কৌতুহল জাগানো গেছে? সরকারী নির্দেশে এবং তত্ত্বাবধানে প্রবাহিত নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণকে কতদূর শিক্ত করা গেছে, কতটা সমাজসচেতন করা সম্ভব হয়েছে। সরকারী দৃশ্য-শ্রাব্য (audio-visual) প্রচারপ্রচেষ্টা কতদূর সাফল্য লাভ করেছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর কোথায় পাওয়া যাবে?

প্রকাশকরা তাঁদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যথাসম্ভব কৌতুহলোদ্দীপক, চিন্তা-কর্ষক, মনোহর, সুলিখিত গ্রন্থ প্রচ্ছদ-ভরণে সজ্জিত করে প্রকাশ করছেন, নতুন বইটির প্রকাশ-সংবাদ যথোচিত কৌশলসহকারে বিজ্ঞাপিত করছেন। গ্রন্থাদির ভালো মন্দ কিংবা উদাসীন জাতীয় সমালোচনাও বহুল এবং স্বল্প প্রচারিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু যে বিপুলসংখ্যক পাঠক বই কিনবে না, দেখবে না এবং পড়বে না পণ করছেন, তাঁদের আগ্রহ কিভাবে বাড়ান যাবে?

দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত কোনও প্রকারের সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা দ্বারা পঠিতব্য বিষয়াদির (গ্রন্থ, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতি) কি কারণে পাঠকমহলে তেমন চাহিদা নেই, আগ্রহ নেই এই গবেষণা করানো হয়নি। অথচ বিগত দুই দশকে দেশে শিক্ষার হার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়েছে, শুল্ক পশ্চিমবঙ্গের সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের পরিচালিত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের সংখ্যা ন্যাক ১-৪ মিলিয়নের মত। ৫০০০ হাজার পরীক্ষক এই ১-৪ মিলিয়ন খাতা দেখতে দেখতে এই গরমে হিমসিম খাচ্ছেন। অনেকে সব-কন্ট্রোল দিয়ে আত্মীয়কুটুম্বমহলে খাতা বিতরণ করছেন। এই বাংলাদেশে আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও গ্রন্থপাঠের আগ্রহ ছিল, যারা তেমন লেখাপড়া জানতেন না তাঁরা অপরের মুখ থেকে শুনতেন প্রতি সম্ভাষণ ইনস্টলমেন্ট পদ্ধতিতে। রাজশেখর অগ্রজ রসিকপ্রবর শশিশেখর বসু মহাশয়ের 'যা দেখছি যা শুনছি' নামক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি একবার প্রমাণস্বরূপ—

“তারপর? মামী জিজ্ঞাসা করলেন। ভাগনে উপেন্দ্র প্রদীপের গলিতে উসকে দিয়ে ‘তটিনী তরঙ্গ’ উপন্যাসের খোলা পাতার আবার চোখ বুলতে লাগল। বলতে লাগল ব্যাখ্যা করেঃ—

—হ্যাঁ, তারপর তটিনী একটু রাগ দেখিয়ে ওঘরে চলে গেল। যাবার সময়

ওপনকে বলে গেল, সকলের সামনে তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকো কেন? ইত্যাদি।

এ-বাড়ির ও-বাড়ির বি, রাধুনিও গল্প শুনছিল, গ্রাম সম্পর্কে এক মাসীমাও ছিলেন; সেকালে নিরক্ষরার দল প্রেমের গল্প শুনতো এই রকম করে।” —(যা দেখছি যা শুনছি : পৃ. ৩১)।

এই জিনিষ বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের ঘরে ঘরে একদা প্রচলিত ছিল। যা একদা অশিক্ষিত, অধীক্ষিত এবং শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত বর্তমান সভ্যতার স্পর্শ লাভ করে তা কি বে-মালুম স্কুল বাতাসে মিলিয়ে গেল? এ অবস্থা শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতেই নাকি আজ উপর এবং মাঝে তলার সমাজে এই অবস্থা। অথচ ট্যাটিসটিক্স দেখে গড়পড়তা শিক্ষার হার কিভাবে কয়েক বছরে বেড়েছে তা জানা যায়, অথচ সাময়িক বা সংবাদপত্রের কিংবা মদ্রিত পুস্তকের প্রচারসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেলেও আশানুরূপ বাড়েনি। গ্রন্থ-প্রকাশের সংখ্যা বা তার প্রচার-সংখ্যার কোনও গ্রহণযোগ্য সর্বভারতীয় ট্যাটিসটিক্স পাওয়া যায় না, অথচ বই-এর বাজারে দুর্ভিক্ষ ঘটেছে, প্রতি সপ্তাহেই হাজার হাজার বই সারা ভারতে প্রকাশিত হচ্ছে, তার মধ্যে সরকারী, আধা-সরকারী, বিদেশী রাষ্ট্রের আনুকূল্যে প্রকাশিত গ্রন্থাদির সংখ্যা কম নয়।

বাংলাদেশে ‘বেট সেন্সার’ মানে তিন মাসে এক হাজার খণ্ড গ্রন্থাবলয়। যে হিন্দী ভাষা ভারতের ভাষা, যার প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা খরচাত করছেন তার সর্বাধিক চাহিদাসম্পন্ন গ্রন্থ বড়জোর ৫০০০ কপি বিক্রী হয়, অথচ হিন্দী-ভাষাভাষী অগ্নল এবং হিন্দী পাঠকের সংখ্যা কম নয়, একটি প্রদেশেই সীমাবদ্ধ নয়।

দেখা গেছে ধর্মীয়গ্রন্থ বা ধর্ম-গুরুর জীবনীরা একটা চাহিদা আছে বছরের সব সময়ে, কিন্তু উপন্যাস, গল্প, বিজ্ঞানালোচনা, বা সাময়িক প্রসঙ্গ খুব বেশী বিক্রী হলে বড়জোর তিন-চার হাজারের বেশী নয়, অর্থাৎ তিন কিংবা চার সংস্করণেই তার বাজার পড়ে যায়। এর কারণ কি? আমাদের পাঠকরা কি সত্যি উদাসীন? না আমাদের লেখকরা পাঠকদের রুচিমারফিক গ্রন্থ লিখতে পারছেন না, বা যে সমস্যার সাধারণের

আগ্রহ সর্বাধিক সেই সময়ের নাগাল পাচ্ছেন না? সংস্করক, গৌড়া মতাবলম্বী একদল মানুষ চিরদিন সজাগ হয়ে বসে আছেন গ্রন্থকে নিষিদ্ধ করানোর তালে, আরেক দল আছেন প্রকাশিত গ্রন্থে মাত্রেই অপাত্য এই কথা চড়া গলায় জ্বীহর করতে, নবীন লেখককে আবিষ্কার করা, বা প্রতিষ্ঠিত করার দিকে না পাঠক না সমালোচক, না প্রকাশক কারো আগ্রহ নেই। গ্রন্থকে সর্বসাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টাই নেই, গ্রন্থপাঠের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য কোনও প্রচেষ্টাই নেই, ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে যে-কটি পাঠক মাধ্যমের আমলে ছিল আজো সেই নির্দিষ্টসংখ্যক পাঠকই রয়েছেন। বেতার, সিনেমা প্রভৃতির প্রতিযোগিতাও উপেক্ষণীয় নয়। অনেক পাঠকই গ্রন্থ-বিমুগ্ধ হয়ে বসে আছেন। মোটা অংকের সরকারী পুরস্কার প্রভৃতির উৎসাহ সাহিত্যিককে সাময়িক সান্নিধ্য দিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিকদের গ্রন্থাদির প্রচুর প্রচারের জন্য সরকারের কি কোনও দায়িত্ব নেই। ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা-সমূহের শ্রেষ্ঠ ও পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থাবলী সরকারী খরচে সুসম্প্রদিত করে সুলভে বাজারে ছাড়া উচিত। চতুর্দিকে প্রচার করা উচিত এমন কি বেতার মাধ্যমেও—আরো বই পড়ুন। শূদ্ধ লেখক, প্রকাশক ও পাঠককে নিম্না করলে এতটুকু লাভ হবে না, পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধি করানোটাই আজ সর্বসাধারণের এবং জাতীয় সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। জাতীয় গ্রন্থাগারগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, পাঠক-সাধারণের আগ্রহের অভাব নেই। অনুকূল পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য অধ্যবসায়ী পাঠক, জাতীয় গ্রন্থাগারে নিয়ম করে যেতে পারেন।

বর্তমান কালে অতিরিক্ত পরিমাণে সাংস্কৃতিক আসরের অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেখানে সংস্কৃতি মানে শুধু নাচ, গান আর হল্লা। ফলে গুরু বিষয়ে মন দেওয়ার মত ইচ্ছা বা শক্তি কোনোটাই সাধারণ মানুষের নেই। যা চটল, সহজ-সুবিধা এবং সরস তার প্রতি মানুষ সহজে আকৃষ্ট হয়। আরো বেশী দেরী হওয়ার পূর্বেই সেই বিপুলসংখ্যক পাঠকের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে তাদের বজাতে হবে আরো বই কিনুন। আর আরো বই পড়ুন।

নতুন বই

সাংস্কৃতিকী—(প্রথম খণ্ড) সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : বাক-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য ৫-৫০ নং পঃ।

বাংলাদেশে এখন স্বল্প-সংখ্যক যে কয়জন বিশ্ববিদ্রুত মনীষী বর্তমান আছেন আচার্য সুনীতিকুমার তাঁদেরই অগ্রগণ্য একজন। ভাষাতত্ত্বের মৌলিক গবেষণার জন্যে যে সম্মান তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে অর্জন করেন,



নিরন্তর অনুশীলনের দ্বারা তাঁর সেই পূর্বগৌরবকে অতিক্রম করে আজ তিনি বিশ্ব-সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়, তেমনি তাঁর মানব-হিতৈষণাও অপারিসমী। এই দুটি বিরল গুণের অধিকারী হওয়ার ফলে তাঁর মুখে নানা পরিচিত উক্তিও নতুন চারিত্র্য পায়। যেমন—

‘আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্ব-সংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে বহুরূপ হয়ে যা বিরাজ করবে আর পৃথিবীর তাবৎ মানব-জাতির বা মানব-সমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠার সম্মিলিত করে এক করে তুলবে।’

এই সিদ্ধান্ত জনার আগে যখন আমরা দেখি যে প্রাক্ত লেখক ‘সংস্কৃতি’ কথাটির সঠিক সংজ্ঞা এবং ‘সভ্যতা’ শব্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও পার্থক্যের বিষয়ে আলোচনা করে ভারতীয় সংস্কৃতির আদি যুগের তত্ত্বানুসন্ধিৎসা-শাস্ত্রকে গাঙ্গুলী মন্ত্র, মামসারসের আধ্যাত্মিক অনুভূতি-সম্পন্ন সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ, এবং

আধুনিক যুগের ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবধারার অভিসংঘাতের উপরে আলোকপাত করেছেন, তখন তাঁর বক্তব্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতে হয় বৈকি!

তাছাড়া, আচার্য সুনীতিকুমার এই গ্রন্থে কেবল ভারতে বিকশিত ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয়েই আলোচনা করেন নি, ঐ সংস্কৃতির যে নতুন রূপ স্বাধীন ভারতে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে বিষয়ে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচীন যুগের চীন ও মধ্য-যুগের নিকট-প্রাচ্যের দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়েও তুলনামূলক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে সমগ্র আলোচনাই এমন একটি বহু-ব্যাপ্ত পরিপ্রেক্ষিত পেয়েছে যে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পাঠকেরও মানস-সঙ্গীভূত প্রসারিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে।

এই পুস্তকের সূচীপত্রে আছে : সংস্কৃতি, যবনীরূপের মহাভারত, রামায়ণ, হুরল, কোল-জাতির সংস্কৃতি, তাও, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দর্শন, অল-বীরনী ও সংস্কৃত, দরূপ খাঁ গাজী, মণিপুর-পুরাণ, শিল্প-কলা, এবং রবীন্দ্রনাথের ‘জীবন-দেবতা’। ভূমিকায় জানা গেল, ‘বিভিন্ন সময়ে রচিত’ ও নানা পত্র-পত্রিকায় কিংবা পুস্তকের ভূমিকারূপে প্রকাশিত’ প্রবন্ধের সংকলন এই ‘সাংস্কৃতিকী’। এবং এর দ্বিতীয় খণ্ডও হয়তো অচিরেই প্রকাশিত হবে। প্রকাশকবর্গ এ জনো সংস্কৃতি-অনুগামী পাঠক-সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

বইখানির প্রচ্ছদ ও ছাপা-বাঁধাই খুবই সুসুচিসম্পন্ন।

নয়নী ও রাজনীতি—জলাধা বীর-চিত। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দাম পাঁচ টাকা।

ছদ্মনামের আড়ালে যিনি এই বইটি লিখেছেন তাঁর কলমটি খুবই জোরালো। এবং তিনি মনেপ্রাণে বাঙালি। আধুনিক কালটিকে তিনি একজন স্বাভাবিকজনীন বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মহাভারতের উপাখ্যান বিবৃত করার ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন। লেখকের দৃষ্টি বিশেষ করে দেশভাগজনিত রক্তক্ষরণের দিকে, যার মূল্য আজকেব দিনেব কমতার অধিষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতাদের কাছে অনেকখানি অস্বীকৃত। আর এই রক্তক্ষরণের যে নিম্নম চিত্র লেখক উপস্থাপন করেছেন তা ফেলের তীর, সমালোচনার কামের ও উদ্ভাসতু জীবনের পতি মমতার অকৃত্রিম।

বইয়ের শেষে প্রকাশক জানিয়েছেন, এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি তিনি পোষাকের বস্ত্রবাজিকে শেষ দেখা দেখে মিসরার পথে শাক্তীসহ জেগারেল এসে সন্নিহিত মাদো। ‘স্বাধীনতা গান’ এটি পঠি সম্বন্ধে ও বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণের পটের নিচে

লেখা 'ডাইনাস' আর বিবেকানন্দের পটের নিচে লেখা 'বালব' চতুর্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পত্র-পত্রিকা। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক। এ থেকে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বাঙালিয়ানা যতোখানি, হিন্দু তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

লেখকের মতামতের সঙ্গে হয়তো সব পাঠক সর্বত্র সায় জানাতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর নিজস্ব ভাষাতে সাত-চালিশ-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের ঘটনাবলীর যে সামগ্রিক বিশ্লেষণ এই বইয়ে পাওয়া যায় তা যে-কোনো বাঙালী পাঠককে উন্মেষিত করবে। পূর্ব বাংলার উন্মেষিতদের নিয়ে আমাদের দেশের রাজনীতি যে কি-পরিমাণ মোলাটে হয়েছে তার ইতিবৃত্ত হয়তো টুকরো-টুকরো ভাবে আমরা জানি, ইতিমধ্যে হয়তো অনেকখানি ভুলতেও বসেছি, কিন্তু এই টুকরো-টুকরো ইতিবৃত্তের বিচ্ছিন্ন রেখাগুলোকে দেশ ও কালের সামগ্রিক পটভূমিতে ঠিকভাবে বিন্যস্ত করলে যে-ভরস্কর ছবিটি ফুটে ওঠে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুবই কম। এই ছবিটি আমাদের জানা দরকার—নইলে আমাদের জীবন-প্রয়াস খণ্ডিত থাকবার সম্ভাবনা। তাছাড়া, অন্য একদিক থেকেও এই বইটি অভিনন্দনীয়। এই বইয়ে এমন কিছু কিছু বিবরণ আছে যা খবরের কাগজ পুরনো হবার সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসেই আমাদের বিস্মৃতির মধ্যে লোপ পেতে। জালা খাঁর এই বইটি এই বিবরণগুলোকে আরো কিছুকালের জন্যে আমাদের স্মৃতির জগতে উদ্যত করে রাখল।

পঞ্চদশ ভট্টাচার্য

মরা বদী

বহু নারী দেহকে পণ্য করিয়া সমাজের অঙ্গে পচনশীল ফলের মত বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এই অবস্থার কারণ জানবার কোন নিখপূর্ণ নাই অথচ সংস্কারের প্রয়োজন। এই উপন্যাসে বাঙালি মত ও অভিজ্ঞতাই বর্ণিত হইয়াছে—অপ্রিয় সত্য বলিবার শালীনতা না থাকিতে পারে কিন্তু পৌরুষ আছে।

দেবপ্রী সাহিত্য সমিতি

৫৭শ, কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মহাশূন্যের রহস্য—মণোজ দত্ত

প্রকাশক : এস ব্যানার্জী অ্যান্ড কোং, ১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বইয়ের নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে বইটি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত। ছোটদের জন্যে লেখা এই বইটি সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র বসু লিখেছেন, "গল্পকারের এই বই জনপ্রিয় হবে আশা করাছি।"

অধ্যাপক সত্যেন্দ্র বসুর অভিমত সংযোজিত এই বইটিকে মূল্যবোধে প্রশংসা করতে পারলে আমরা খুশি হতাম। অধ্যাপক বসু বলেছেন, "আজকের দিনে তাই সকলকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল-কথাগুলো জানতে হয়।" কিন্তু বইটি পড়ার পরে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ হয়েছে, বিশেষ করে এই বইটি পাঠককে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনো মূলকথা শেখাতে পারবে কি না! একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

"শব্দ বাতাস কেন, শব্দগ্রহে পাহাড় আছে। আছে বরফের স্তূপ। আর আছে সমুদ্র। সেই সমুদ্রের জল সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে মেঘ তৈরী করে। নিশ্চয়ই সেই মেঘ থেকে আবার বৃষ্টি হয়। নইলে সাগর শুকিয়ে যেতো কোনদিন। বৃষ্টি হওয়ার কথা যদি সত্যি হয়, তবে নদী-নালাই-বা থাকবে না কেন? আর যদি নদী-নালাই থাকে তবে জীবই বা বাস করবে না কেন? জীব বেঁচে থাকার জন্য জল এবং বাতাস দুই-ই আছে সেখানে।" (পৃঃ ১০)

এমান ধরনের মনগড়া তথ্য পরিবেশনের দৃষ্টান্ত একাধিক। তাছাড়া, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় কনফিউজড থিংকিং, এই বইটি তারও একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বইটি পড়ার পরে বহু সরল বিষয়কে জটিল বলে মনে হবে। স্থানাভাবে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল না।

শিশু মণ্ডল—আবুল হাসানাব

প্রকাশক : স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

'মোনবিজ্ঞান'-এর লেখক আবুল হাসানাব নিজস্ব ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। এটি তাঁর সর্বশেষ বই। বইটি পিতামাতা ও অভিভাবকদের জন্যে। এই বইয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে জন্ম থেকে বয়সের প্রারম্ভিকাল পর্যন্ত সন্তানকে কি-ভাবে মানুষ করতে হবে। বইটি সচিত্র এবং জ্ঞাতব্য তত্ত্বে ও তথ্য সমৃদ্ধ। বিশেষ করে প্রসূতি ও জননীরা এই বইটি পড়লে অবশ্যই উপকৃত হবেন। মানবিশিশুর জন্ম-প্রকরণ ও সন্তান-পরিরক্ষণ সম্পর্কে দুটি সুসজ্জিত

অধ্যায় বইটিকে মূল্যবান করে তুলেছে। আমরা এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

চাঁদের দেশ—দেবদাস দাশগুপ্ত

প্রকাশক : কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম এক টাকা।

এই বইতে গল্প-বলার মতো ভাষায় চন্দ্র-অভিযানের বিবরণ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু খুবই দুঃখের কথা, বইয়ে এমন কিছু কিছু বিবরণ আছে যা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে যথার্থ নয় বা ভ্রান্ত। বিজ্ঞানের বইয়ের লেখকের কাছ থেকে আমরা আরো বেশি দায়বদ্ধতা আশা করি।

৯ সংকলন ও পত্রপত্রিকা ৯

মানবমন—সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ গগোপাধ্যায়, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৬২। ১০২২১এ, কণ্ঠওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

১৯৬২। ১০২২১এ, কণ্ঠওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

মানবমন নামক এই সুসম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইতিপূর্বে বিশেষ পাতলাত সংখ্যা এবং একটি সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যাটিও পূর্ববর্তী সংখ্যা দুটির ন্যায় মূল্যবান রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যায় আছে পাতলাত-পরিচিতি (ধীরেন্দ্রনাথ গগোপাধ্যায়), শেরিংটনের ভাববাদী চিন্তা সম্পর্কে (আই পি পাতলাত), জীবনদর্শন ও চিকিৎসাবিজ্ঞান (ইউ আর্থসেরভ), জাতির মানসিকতার রূপ-রূপে ইতিহাসের ভূমিকা (মোহাম্মদ আবদুল করিম), মানসিক ক্রমবিকাশ (স্বিজেন্দ্রলাল গগোপাধ্যায়), পাতলাত বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। তাছাড়া আরও অনেকগুলি মূল্যবান রচনা আছে। মনোবিজ্ঞান - জীববিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞানের এই পত্রিকাটির উপযুক্ত সমাদৃত ও বহুলপ্রচার কামনা করি। কিছু মূদ্রণ-প্রমাদ চোখে পড়ল।

মহেঞ্জোদাড়ো—সম্পাদক : সমীর রায়।

৫৫।৪, নটবর পাল রোড, হাওড়া থেকে প্রকাশিত। প্রথম বর্ষ প্রথম সংকলন। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পত্রিকাটি মাসিক, ত্রৈমাসিক কি বাৎসরিক তার কোন উল্লেখ পেলাম না। এমন কি পত্রিকার উদ্দেশ্য কোথাও হয়নি। মোটামুটিভাবে বলা যায় সাহিত্য ও শিক্ষাসংক্রান্ত পত্রিকা। নন্দলাল বসু ও দেবপ্রী মনোপাধ্যায়ের স্কেচ আছে। প্রবন্ধ লিখেছেন উমাশঙ্কর ঘোষ (উপলব্ধি প্রসঙ্গ) ও শঙ্কর মিত্র (যামিনী রায় ও তাঁর শিক্ষণীয়) বিশেষ দাস

রেকর্ডের কাঁচা আছে। মূদ্রণ-
ই বেশী।

— অজিতমোহন গুপ্ত। ৭২।১,
শ্রীট কলকাতা-১২ হতে
শত। দাম—এক টাকা।

দর পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত চিত্র-
চলচিত্র-বিষয়ক এই পত্রিকাটি
পরে যথেষ্ট আনন্দিত হবার
হবে। অধিকাংশ রচনাকারের নাম
কানে নতুন শোনালেও রচনা-
মণিটই কাঁচা হাতের লেখা বলে
না। দিলীপ দাশগুপ্ত, গোরা
রেন্দ্রকুমার ঘোষের আলোচনা
যা। তাছাড়া আরও অনেকগুলি
রচনা স্থান পেয়েছে। ঈশিতা
রায়ের “খ্যাপা খুঁজে খুঁজে”
উপন্যাসটি অনেকেরই ভাল

সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য ।।

প্রতি রেগেশাস ক্লাব হলে
কপত্র ও বাংলা সাহিত্য’ বিষয়ে
নাজ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে
‘র্যাডিক্যাল হিউম্যানিট’ নামক
এক পত্রিকার রজত জয়ন্তী উৎসব
ক্যা আয়োজিত এই আলোচনা-
প্রথম দিনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে
রুর জন্ম-শতবার্ষিকী বৎসরে,
ভাবে আলোচনা করেন ডাঃ
দ, বসু। বর্তমান পৃথিবীতে
বর্জিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক
মকায় ও আপাতমূল্যহীনতার
রবীন্দ্রনাথের শাস্বত বাণী কতটা
রী এ সম্পর্কে তিনি কয়েকটি
প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সাময়িক-
আদিযুগ ও আধুনিক যুগ
ক আলোচনা করেন যথাক্রমে বিনয়
ও নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। নানাবিধ
উদ্ঘাটিত আলোচনা দুটি খুবই
বান ছিল এবং সাময়িকপত্র যে
শীল সাহিত্যকে কতখানি অগ্রসর
দিতে পারে তারই উদাহরণস্বরূপ
কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকার উল্লেখ
অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত ‘বিক্রম-
বঙ্গদর্শন’ বিষয়ে চিন্তাপূর্ণ
দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। নারায়ণ
রায়ের আলোচ্য বিষয় ছিল
ক রবীন্দ্রনাথ। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য-
মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর
নাকারে একটি স্থির আদর্শ ও
পরিচয় সর্বদাই পাওয়া যেত বলে
গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন।
গঙ্গোপাধ্যায় ও ডাঃ রবীন্দ্রনাথ
মথ চৌধুরী ও সবুজপত্র পর্ষায়
চনা করেন। প্রমথ চৌধুরীই সর্ব-
সবুজপত্রের মধ্য দিয়ে বাংলা
আধুনিকতার সূত্রপাত করেন
কয় বক্তাই উল্লেখ করেন। রবীন্দ্র-
সম্পাদিত ‘পরিচয়’ পত্রিকার
সম্পর্কে আলোচনা করেন সঞ্জয়

ভট্টাচার্য ও অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
‘পরিচয়’ এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে
মননশীলতা দেখা দেয় ও পাশ্চাত্য
সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

সভায় ঘোষণা করা হয় যে বর্তমান
বৎসর থেকে ‘এম-এন-রায়-এলেন রায়

বক্তৃতামালা’র ব্যবস্থা হবে ও কোন
বিশিষ্ট চিন্তাশীল মনীষীকে আমন্ত্রণ
জানান হবে। এবং ‘সাময়িকপত্র ও বাংলা
সাহিত্য’ বিষয়ক বক্তৃতাদুলি পরে গ্রথিত
হয়ে “উত্তরসূরী” পত্রিকার একটি বিশেষ
সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

রবীন্দ্র-উৎসব

এই উৎসবের মধ্যে এক পক্ষকাল

৫ই মে থেকে ১৯শে মে

সুলভ মূল্যে — শতকরা ১২৥ টাকা বাদ দিয়ে — রবীন্দ্র-
নাথের সমুদয় গ্রন্থ ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্বভারতী
প্রকাশিত ও প্রচারিত অন্যান্য গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা
হয়েছে। যে-কোনো পুস্তককালয়ে সর্বসাধারণ এই সুবিধা
পাবেন।

এই উপলক্ষে কবি কে নতুন করে পাওয়ার ও
নতুন করে জানার আগ্রহ হওয়া সকলের পক্ষেই
স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-
সান্নিধ্যলাভের সহায়তা করার জন্যে বিশ্বভারতীর এই
উদ্যোগ।

স্বল্পমূল্যে প্রচারিত বিচিত্রা, গীতাঞ্জলি ও নৈবেদ্য

এই বিশেষ সুবিধার অন্তর্গত নয়।

॥ পুস্তকবিক্রেতাদের প্রতি নিবেদন ॥

নির্দিষ্ট সময়ে পুস্তকবিক্রেতাগণ যাতে ক্রেতাসাধারণকে পুস্তক
সরবরাহ করতে পারেন সেজন্যে নির্ধারিত অতিরিক্ত কমিশনে ৩ মে
থেকে এই করাটি কেন্দ্রে তারা বাংলা পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন—

- | | |
|---|--|
| ১। দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি
৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকতা-১২ | ৫। দামোদর পুস্তকালয়
বর্ধমান |
| ২। জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো, কলিকতা-৯ | ৬। বিশ্বভারতী শিল্পসদন
শান্তিনিকেতন, বীরভূম |
| ৩। জিজ্ঞাসা
১৩৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ,
কলিকতা-২৯ | ৭। পত্রিকা সিডিং প্রাইভেট
লিমিটেড
গোল মার্কেট, নিউ দিল্লী |
| ৪। বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ
৫ হারকানাথ ঠাকুর লেন,
কলিকতা-৭ | ৮। হাইলার ডিস্ট্রিবিউটার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১৫ এলগিন রোড,
এলাহাবাদ। |

॥ পুস্তক বিক্রেতাদের পৃথক পত্র দেওয়া হল না ॥

বিশ্বভারতী

শ্রেষ্ঠা যুগ

নান্দীকর

আজকের কথা

বর্তমানের বাংলা নাটক :

বিশ্ববরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিষদপনা পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "বাংলা নাট্যসাহিত্য সম্মেলন"-এর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন দিবসে পরিষদের সম্পাদকীয় বিবরণী থেকে জানা গেল যে, গেল চার বছরের মধ্যে একাংক এবং পূর্ণাংগ নাটকের অন্ততঃ এক হাজারটি পাণ্ডুলিপি তাঁদের হস্তগত হয়েছে। অনুমান করা কঠিন নয় যে, ঐ সময়ের মধ্যে আরও অন্ততঃ এক হাজারটি পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছে, যা তাঁদের হস্তগত হয়নি। অর্থাৎ এই বাঙলাদেশে বাঙলা ভাষায় বছরে গড়ে পাঁচশোটি করে গেল চার বছরে প্রায় দু'হাজারখানি পূর্ণাংগ ও একাংক নাটক রচিত হয়েছে। উক্ত উন্নয়ন পরিষদের আর একজন সদস্য অবশ্য জানানেন যে, ঐ এক হাজারটি নাটকের মধ্যে বেশীরভাগই অপাঠ্য এবং নাটক নামের অনুপযুক্ত। তাঁর কথা অনুযায়ী যদি ধরে নেওয়া যায় যে, শতকরা নব্বইখানিই নাট্যপদবাচ্য নয়, তবুও ঐ দু'হাজারের মধ্যে যদি দু'শোখানিও যথাযথ নাটকের মর্যাদা পাবার যোগ্য হয়, তাহলেও বছরে পঞ্চাশখানি অর্থাৎ প্রতি হস্তার গড়ে একখানি করেও সার্থক নাটক রচিত

হওয়া নিশ্চয়ই একটি অসাধারণ এবং অভূতপূর্ব ঘটনা।

নাট্যরসিক মাত্রই ইচ্ছা করবেন, সার্থক নাটকগুলির সংগে পরিচিত হতে। নাটকগুলি পড়তে পারলে জানতে পেরতুম, ওদের বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী,

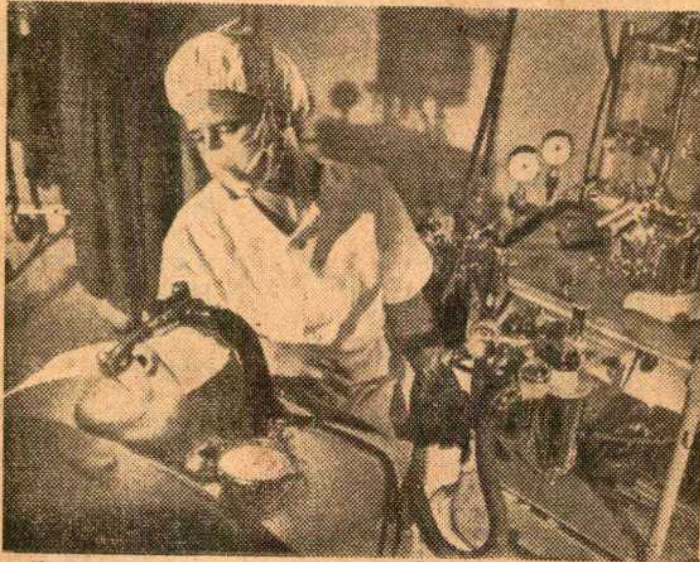


হিন্দী "মায়াজাল" চিত্রে চিত্রা ও মমতাজ বেগম

বক্তব্য প্রদান কি। এবং ওগুলির অভিনয় প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেলে আরও বেশী করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতুম ওদের রসমূর্তি। বহু বিদগ্ধজনের মত আমারও আক্ষেপ আছে, এদেশে নাটক-পাঠকের আজও সৃষ্টি হয়নি। যে আগ্রহ নিয়ে জনসাধারণ উপন্যাস ভক্ষণ করেন,

তার অর্ধেক আগ্রহও বিন্দু করতেন ভালো নাটক পাঠ্যে তাহলে অনভিনীত বহু মূদ্রিতরূপে লোকচক্ষুর উপস্থিত হতে পারত। দৃশ্যকাব্য এবং নাটকে অভিনয়ে; তবুও মূদ্রিত নাট্য কি আমরা অনিবচনীয় জানি না? কার্লদাস এবং ভবভূতি সেক্সপীয়র, ইবসেন, সেক্সপিয়র রচনাধীন পাঠ করে তা চক্ষে তাদের অভিনয়

সাধারণতঃ, সাধারণ রংগম নাটকের অভিনয় হয়ে থাকে মূদ্রিত রূপ পাঠকের চাহিদা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সাধারণ মূখ্যপেক্ষী না হয়েও কি বাঙলা নাটক ছাপা যে হয়নি, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, নাথের নাটকগুলি। অবশ্য ঐ অধিকাংশ নাটকই শানি অভিনয় করিয়ে বা অতি সাপেক্ষে প্রকাশ করেছিলেন।



'ও ফর অক্সিজেন' চিত্রের একটি দৃশ্য

বর্তমানে নাটক নিয়ে বিনিরীক্ষা চলছে। তবুও আজ নাটক বলতে আমরা যা দেখতে বেশীর ভাগই হচ্ছে সমস্যাযুক্ত চিত্র। আজ আর পে ঐতিহাসিক নাটকের সাক্ষাৎ না আদপেই। এমনকি, গায় প্রতীহংসা কিংবা বাদ-বিস নিয়ে লেখা নাটকও খুব পড়ে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা গাহস্থ হিঁসেবে শ্রে করে ট্রাজিডি, কমেডি, মিউজিক্যাল, ফ্যান্টাসি, মি গোছের শ্রেণীবিভাগ ক

দিনে মাত্র একটি টাইপেরই
পরিচিত হবার সুযোগ পাই
কিছুটা হচ্ছে ট্রাজিডি। মানুষের
জীবনসমস্যা যতই জটিল
আমাদের নাটকও ততই সমস্যা-
মূলক পড়ছে। বাংলাদেশ একসময়ে
আন্দোলনে মেতে উঠেছিল।
রাজস্ব-সম্প্রদায়ের হাত থেকে
কে ভারতভূমিকে উদ্ধারের জন্যে
বেগেছিল। আমাদের নাট্যশালাগুলি
অমূল্যকে সার্থক করে তোলবার
যোগ্য দেশের সঙ্গে সোৎসাহে যোগ
হোঁচকারে। সেযুগে পৌরাণিক বা
পাশ্চাত্য নাটকের মধ্যে দর্শকদের
স্বাধীনতার বাসনা জাগিয়ে
দেয়। জনো তাঁদের অকুণ্ঠ প্রয়াস
সেই পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ

সমাজ জাতির সম্মুখে নতুন জীবন-
সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। কিসে জাতির
জীবন হবে, কোন পথে চললে দেশ
সুখসম্পদের আকর হবে,
কোন জনগণ দেশকে সার্থকতার পথে
নিরন্তর পারবে, এই সব প্রশ্ন আজ
সামনে এসে ভীড় করে
আজকের নাটক এই প্রশ্নের
দেয়, এই আশাই আমরা করব।
এই আশা করব, আমাদের চোখের
লব্ধ ব্যর্থ জীবনের ছবি উপস্থিত
করে ভবিষ্যতের সৃষ্টিমূলক
কতার চিত্র থাকবে তাদের মধ্যে।
এই আশা করব, মাত্র সমাজ-সমস্যা-
মূলক নাটক রচিত না হয়ে হাস্যরসপ্রধান,
কল্পনামূলক এবং কল্পনামূলক নাটকও
রাখতে পারব।

শেষাংশ :

"শেষাংশ" :

জগতের একমাত্র শীতাতপনিয়ন্ত্রিত
শক্তি-স্রোত"-এ শক্তিপদ রাজগুরুর
মামল উপন্যাস অবলম্বনে দেব-
দত্ত রচিত "শেষাংশ" নাটকটি
প্রকাশ্যে অভিনীত হচ্ছে।

নাটকের ঘটনাকাল বাংলাদেশে
কম্প্রথার বিপ্লবের কিছু আগে
আমাদের ভ্যালী কর্পোরেশনের
জৈত্রী কাজের শেষ পর্যন্ত।
স্থান আসানসোলার নিকটবর্তী
উত্তর নন্দলাবিত অঞ্চলের কার্পাসিক
কর্মচারীদের এবং ভূবনপুর। নাটকের
কর্মপনায়ণ পিতা ভূবন-
পুর অঞ্চলের জন্যে অল্পবয়সেই



"শেষাংশ" নাটকে আশীষকুমার ও বাসবী নন্দী

জমিদারীর পরিচালনাভার পাওয়ায় হয়ে
দাঁড়িয়েছেন রুর, নৃশংস, দুর্ধর্ষ। লুট-
তরাজ, খুন, জখম—কিছুই তাঁর বাধে
না। শব্দরবংশের সঙ্গে চরের জমির
দখল নিয়ে তাঁর নিত্য বিরোধ। অন্ধ
পিতা বৃথাই তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত হতে
অনুরোধ করেন। কিন্তু কর্মপের একমাত্র
পুত্র মানব কলকাতায় বড়মামার
বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করে বি, ই
পরীক্ষা দিয়েছে। সে গ্রামে ফিরে পিতার
নৃশংস কাণ্ডকারখানা দেখে মর্মহত হয়;
প্রতিবাদও করতে চায়—কিন্তু উদ্ধত
পিতার মাটি বাপের নয়, দাপের—এই
সদৃশ উত্তির কাছে তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ
হয়ে আসে। রেল-ওয়াগন লুণ্ঠের অপরাধ
চাপা দিতে তার পিতা যে-অন্যায় মিথ্যার
আশ্রয় নেন, তা দেখে সে বিরক্ত হয়ে
পিতাকে না জানিয়ে পারে না যে, আসল

অপরাধী কে, তা সে জানে; কিন্তু মৃত
ও পথ পৃথক হওয়া সত্ত্বেও পিতার প্রতি
স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্যে সে একমাত্র
সন্তান হয়ে পিতার বিরুদ্ধে জেহাদ
ঘোষণা করতে পারে না, তাঁর অনিশ্চি-
শঙ্কায়। মায়ের মর্মপীড়া, পিতামহের
অসহায়তা তাকে বিচলিত করে। এরই
মধ্যে তার বাগদত্তা দীপা তার মর্মমলে
কঠিন আঘাত করে, প্রত্যক্ষভাবে তার
পিতার রুর প্রকৃতি লক্ষ্য করবার পর
তাকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু তার প্রকৃত
শিক্ষিত মন এত আঘাতেও ভেঙে পড়ে
না। নিজের ভবিষ্যতকে সে নিজেই
গড়বে, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে কর্মজীবনে
কাঁপিয়ে পড়ে—নিজের গ্রামের সন্নিকটে
যে-কালীপুর ব্যারের জৈত্রী হবে, তারই
অন্যতম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সরকারী
চাকরী নিয়ে সে তার গ্রামেরই কাছের

কর্মক্ষেত্রে এসে পৌঁছায় এবং নিতান্ত শৈববশে ডিনামাইটের সাহায্যে শূন্য যে নিজেদের বাসভূমি 'আচার্য'-প্যালেস'কেই ধূলিসাৎ করে, তাই নয়; সপ্তে সপ্তে জমিদারীর শেষ অগ্নিশিখা 'কন্দর্প'-নারায়ণ'-এরও মৃত্যুর কারণ হয়ে পড়ে।

আদর্শের সংঘাতকে অবলম্বন করে একখানি সাবলীল নাটক গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল কিনা, সে-প্রশ্নকে স্থগিত রেখে বলতে পারি যে, "শেষাঙ্গি" নাটকের chief protagonist দুর্বীর কন্দর্পনারায়ণের ম্বল্ব আসলে অমোঘ নিয়তির সপ্তে। দুরন্ত কন্দর্প ওয়াগন লুটে, নীলুর খুন হওয়া প্রভৃতি বহু জিনিসের নিমিত্ত হয়েও ধরা পড়ে গেলেন মুরুন্দ সাঁপাইয়ের হত্যার ব্যাপারে; কালের অমোঘ চক্রে ঠিক যেদিন তিনি তাঁর আহারের জন্যে কালীপুরের কাছারীবাড়ীতে না গিয়ে ভুবনপুরের 'আচার্য'-প্যালেসে' রইলেন, সেই দিনই তাঁর অবস্থানের কথা না জেনে তাঁরই একমাত্র সন্তান ডিনামাইটের সাহায্যে নিজেদের বাড়ীকে ভূমিসাৎ করতে গিয়ে তাঁর জীবনান্ত ঘটাল।

প্রমাণিত হ'ল, মানুষ যতই দুরন্ত, দুর্দম হোক না কেন, নিয়তি তার থেকেও কঠোর, কঠিন ও দুর্বীর।

স্টার থিয়েটার

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ফোন : ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক

শেষাঙ্গি

কাহিনী : শক্তিপদ রাজগুরু
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
গান : শৈলেন রায় • সুর : দর্পা সেন

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬৥ টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬৥ টায়

॥ রূপায়ণে ॥

কমল মিত্র - অজিত বন্দ্যো - আশীষ
কুমার - অর্পণা দেবী - লিলি চক্রবর্তী
দাসবীন্দ্র - অনুপকুমার - চন্দ্রশেখর
বীরেশ্বর সেন - গীতা দে - সাধনা
রায়চৌধুরী - আশাদেবী - শ্যাম লাহা
প্রেমাংশু বোস - ডানু বন্দ্যো



হিন্দী চিত্র "জিন্দগী ওর ধোয়াব"এ মণীনা কুমারী ও রাজেন্দ্রকুমার

তিনটি অঙ্কে এবং একুশটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ "শেষাঙ্গি" নাটকের মূল কাহিনীর সপ্তে টগর ডুমুরী সামান্য অবস্থা থেকে হোটেল-পরিচালিকা হওয়ার কাহিনীটি অগাধভাবে জড়িত না হ'লেও দর্শকমনে কিছু কৌতুকের সঞ্চার করে বৈচিত্র্যের ম্বাদ আনতে সাহায্য করে। যারা চিরদিন ধরে বাণ্ডিত জীবন যাপন করে, সামান্য সুখের লোভে তারা নিজেদের ইজ্জত বিক্রি করে দিতেও কসুর করে না, এই মর্মাত্মক সত্যটি টগরের জীবনে প্রকট হয়ে উঠেছে। আবার বিপরীত দিকে মানবের বড়মামার পত্নবধূ টুন্দু-বৌদিদির চরিত্রে স্বামীসোহাগে বাণ্ডিত্য নারীর যে-আদর্শ উদ্ঘাটিত করা হয়েছে, তার সুখমা হৃদয়কে দ্রবীভূত করে। "শেষাঙ্গি" নাটকে অল্প পরিসরে অঙ্কিত এমন বহু চরিত্র আছে, যারা জীবনেরই প্রতীক।

অভিনয়ে অম্ব ভুবননারায়ণের ভূমিকায় কমল মিত্র অনায়াসেই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন; তাঁর রূপসজ্জা এবং অম্বহের অভিনয় অতুলনীয় হয়েছে বললেও অত্যাধিক হয় না। শক্তিমদে মাতাল, বিচিত্র জীবন-দর্শের অনুগামী, সমাজবিরোধী কর্মে উৎসাহী, কঠোর হৃদয় জমিদার কন্দর্প-নারায়ণের কঠিন ভূমিকায় আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় করেছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে'—এই সত্যকে অনুধাবন করবার পরে, খুনের মামলার জামীনমুক্ত কন্দর্প-বংশে তাঁর অভিনয় অবশ্যই স্মরণীয়। শিক্ষিত যুবক মানব রূপে আশীষকুমার অত্যন্ত দরদ দিয়ে অভিনয় করেছেন। মুরুন্দ সাঁপাইয়ের বিচিত্র ভূমিকায় ডানু

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিকে হাস্যরসে নিব্বার এবং শেষের দিকে অসহায়ভা করুণার পাত্র। অনুপকুমার চিত্রিত পর-ডোমের টগর-প্রীতি অত্যন্ত উপভোগ্য চোরাকারবারী কৃপাল সিং-এর ভূমিকায় চন্দ্রশেখরের অনবদ্য অভিনয় ভূমিকাটি জীবন্ত করে তোলে। অপরাপর পুরুষ চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছে বীরেশ্বর সেন (বসন্ত), শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় (নিবারণ), প্রীতি মজুমদার (রোহিনী), পণ্ডান ভট্টাচার্য (অভ. ডোম), প্রেমাংশু বসু (পাঁচু), শ্যাম লাহা (তরফদার), সুধেন দাস (শান্তনু) ও শৈলেন মুখোপাধ্যায় (মিঃ রয়)।

স্ট্রী-চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কন্দর্পগৃহিণী বাসন্তীর ভূমিকায় অর্পণা দেবীর। কোমলহৃদয়া, স্বামীর অন্যায়ের জন্য ম্লিন্নমাণা, কতব্য-পরায়ণা রূপটিকেও তিনি যেমন অনায়াসে ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনই নাটকের শেষের দিকে ভাবী অমণ্ডলাশঙ্কায় সদাই উদ্বেগ্নভাব এবং সহ্যসীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় বাধাতুর হৃদয়ের প্রকাশে তিনি সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সাধনা রায়চৌধুরীর টুন্দু-বৌদি একটি মিলিট চরিত্রচরণ। দীপার চরিত্রের আধুনিক উন্মাসিক ভাব এবং শেষের দৃশ্যে সত্যসচেতনতা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন দাসবীন্দ্র। কিন্তু তাঁর প্রথম গানখানি সুর এবং গাওয়া উভয় দিক থেকেই ব্যর্থ। প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি, সাম্প্রতিককালে আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে গাইয়ে অভিনেত্রীর একান্তই অভাব অনুভব করছি। লিলি চক্রবর্তীর মাধুরী সত্যিই মাধুরী-মন্ডিত; শেষের দিকে তার অন্তর্বেদনার



বীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে অগ্রগামীর
নশ নাটকের জন্যেই কিছুটা
কল্পিত বলে মনে হয়। যৌবন-
ভিত্তি, অর্থলোভী টগরের লাস্যময়ী
পক্ষে কিছুটা উগ্রভাবে ক্ষুটিয়ে
লেছেন গীতা দে। কামনা-বাসনা থাকে
ত মূহুর্তেই ধাক্কা দেয়, সে বোধ করি
মনেই উগ্রই হয়। আশা দেবী চিত্রিত
লালের মা একটি জীবন্ত চরিত্র। মিসেস
নাজি ও মীরার ভূমিকায় যথার্থমে
প্রয়া চট্টোপাধ্যায় ও শীলা গাল
চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন।

ডোম-ডুমনারদের 'দামোদর পূজার'
ভাষ্যাত উপভোগ্য।

'শেষাঙ্গিনী'র প্রযোজনায় স্টারের
কৃতপক্ষ অনুমোদিত ও চুটি থাকতে দেখনি।
প্রযোজী দৃশ্যপট, সাজসজ্জা এবং সূত্রে
লোক নিয়ন্ত্রণে নাট্যোপস্থাপনার
লগ্নিক অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের। স্টেশন-
টারের কোয়ার্টার থেকে নৈশট্রেন চলে
ওয়ার দৃশ্য অভিনব কৌতূহলের
কর্ত করে।

সুপ্রযোজিত 'শেষাঙ্গিনী' নাট্যরসিক
কি মনোরঞ্জে সক্ষম হবে বলেই
শ্যাকরি।

বীন্দ্রনাথ

গল্প ফিল্ম জার্নালিস্ট

• অ্যানোলিটেশন :

আস্চে ১৩ই মে, বুধবার সকালে
মাদেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে
গল্প ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যানো-
লিশনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী

'নিশীথে' চিত্রে উত্তমকুমার ও নন্দিতা বসু
সভা অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৬১ সালের
শ্রেষ্ঠ বাঙলা ও হিন্দী চিত্রের প্রযোজক,
শ্রেষ্ঠ পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার,
সুরকার, চিত্রশিল্পী, শব্দমন্ত্রী, অভি-
নেতা, অভিনেত্রী প্রভৃতি এই সভায়
যথাযোগ্য প্রশংসাপত্র দ্বারা ভূষিত হবেন।
সভায় সভাপতিত্ব করবেন অ্যাসো-
সিয়েশনের সভাপতি তুষারকান্তি ঘোষ
এবং প্রশংসাপত্র বিতরণ করবেন লেডী
রাণু মৃধোপাধ্যায়।

রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পারিতোষিক বিতরণ :

গেল শনিবার, ২১-এ এপ্রিল, নতুন
দিবসীর বিজ্ঞান-ভবনে ১৯৬১ সালের

জনা সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে
শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচিত ছবিগুলিকে এক
তাদের পরিচালক ও অভিনেতা-
অভিনেত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। এই
উৎসবে পুরস্কার বিতরণের পরে
ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন
চলচ্চিত্রনির্মাতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন,
তারা যেন তাদের কাজকে একটি পবিত্র
মিশনরূপে গ্রহণ করেন। বর্তমানে
জাতীয় জীবনে উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের
যে অভাব নিতা অনুভূত হচ্ছে, ছবির
মাধ্যমে সেই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যে
তিনি চিত্রনির্মাতাদের আহ্বান জানান।
প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, চিত্রজগতের
লোকেরা দেশের মন্ত্রীদের চেয়েও
জ্ঞানপ্রিয়। কাজেই সাধারণের সঙ্গে
তাদের একটা সহানুভূতির বন্ধন অতি
সহজেই গড়ে ওঠা সম্ভব। নবনির্বাচিত
বেতার ও তথ্যমন্ত্রী গোপাল বোর্ড
বলেন, "চলচ্চিত্র মাত্র মানুষের আনন্দের
উপাদান নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষার
বাহনও বটে।"

ব্রিটিশ অক্সিজেন কোম্পানীর

প্রামাণিক চিত্র :

৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ব্রিটিশ
অক্সিজেন কোম্পানী "ও ফর অক্সিজেন"
নামে যে-প্রামাণিক চিত্রখানি তৈরী
করিয়াছেন, তারই একটি প্রদর্শনী হয়ে
গেল সেদিন লাইটহাউস মিনিয়চার
থিয়েটারে। ইন্ডিয়ান অক্সিজেন কোম্পা-
নীর চেয়ারম্যান স্যার জন ব্রাউন তাঁর

দক্ষিণী

'দক্ষিণী-ভবন'

১, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট, কলিকাতা-১৬ ৥ ফোনঃ ৪৬-২২২২

নূতন শিক্ষাবর্ষ

'মে' মাস থেকে দক্ষিণী'র নূতন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। 'এপ্রিল' মাস থেকে
নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি আরম্ভ হয়। কেবলমাত্র স্বাধীন-সঙ্গীত ও শাস্ত্রীয়
নৃত্যকলা শিক্ষাদান করা হয়। সাতেরোটি পর্যায়কে কেন্দ্র করে স্বাধীন-
সঙ্গীতের যে শিক্ষাক্রম নির্ধারিত তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাধীননাথের
সমগ্র সঙ্গীত-রচনার সহিত পরিচয় হবে। স্বাধীন-সঙ্গীতের সঙ্গে
ঔপন্যাসিক বিষয়বস্তু, স্বরলিপি-পাঠ ও স্বরসাধনা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়
হিসাবে নির্দিষ্ট। ভারত-নাট্যম, কথাকলি ও মনিপুুরী নৃত্যপদ্ধতির
সমন্বয়ে নৃত্যকলার শিক্ষাক্রম নির্ধারিত। বয়স্কদের পাঁচ বছরের ও
শিশুদের তিন বছরের পাঠক্রম। শিক্ষা-পরিষদ : শ্রুত গৃহকৃত্যতা,
সুনীলকুমার রায়, বীরেশ্বর বসু, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, অশোকভট্ট,
বন্দোপাধ্যায়, অমল নাথ, প্রবুল মৃধোপাধ্যায়, হেনা সেন, নিম্মা বসু,
মঞ্জরী লাল, দেবী চাকলাদেয় ও লীলা দত্তাদিত এবং আদিতা সেনা
রাজকুমার, নন্দিতা রায় ও স্থিতি গৃহকৃত্যতা। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তির
সময় : মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার বিকাল ৪-৮ ৥ এবং বুধবার সকাল
৮-১২ ও বিকাল ৪-৬ ৥



অরবিন্দ মুখার্জী পরিচালিত 'কাণ্ডি' চিত্রে জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, অজিত চ্যাটার্জী, অনিল চ্যাটার্জী ও আশাদেবী

উন্মোধানী ভাষণে জানান, এই ছবিখানি টিউরিন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ১৮টি দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। তার পর কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এ. কে. সেন বলেন যে, ছবিখানির ভারতীয় অংশের কৃতিত্ব বুলু দাস-গুপ্তের, যিনি রঘুনাথ গোস্বামীর সহযোগিতায় “হটগোল বিজয়” নামে প্যাপেট ফিল্ম পরিচালনা করে শিশুচিত্র হিসেবে ছবিখানিকে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক লাভ করিয়েছেন। এরপর ছবিখানি দেখানো হয়। এই কুড়ি মিনিট স্থায়ী, প্রায় দু’বীল দীর্ঘ ছবিখানিতে ১৭৭৪ সালে বৈজ্ঞানিক প্রিসলে ম্বারা অস্টিজেন আবিষ্কার থেকে শুরু করে বর্তমান জগতে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে অস্টিজেনের প্রয়োগকে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখানো হয়েছে। সাধারণ বাস্তব বিভিন্ন উপাদানকে বৈজ্ঞানিক

পরস্পর থেকে পৃথক করে নিয়ে কি কি কাজে লাগাচ্ছেন, তাও প্রসংগক্রমে ছবিখানিতে দেখানো হয়েছে। ছবিটির পরিচালক ও প্রযোজক হচ্ছেন যথাক্রমে জন আমস্ট্রং এবং যুগ্মভাবে জেমস্ কার ও রেমন্ড স্পিটিশউড।

লোকতীর্থের “দীপা-কেবিন” ও সুমেদ-কুমেদ

গেল ২৭এ এপ্রিল, শ্রুতবার থিয়েটার সেন্টারে লোকতীর্থ-সম্প্রদায় তাদের দুটি মৌলিক প্রয়াস—“দীপা-কেবিন” ও “সুমেদ-কুমেদ” নামে দু’খানি নাটক মঞ্চস্থ করেন। পুরুষ বা মেয়ে, কারুরই পক্ষে সংভাবে উপাচার্যের চেষ্ঠা নিন্দনীয় নয় এবং কোনো কাজকে ছোট জ্ঞান না করে শ্রমের মর্যাদা দেওয়া উচিত—এই কথাটিকে প্রতিপাদ্য করে “দীপা-কেবিন”—এর সৃষ্টি। কোনো ভদ্র মেয়ে চায়ের কেবিনে কাজ করার জন্যে কেন সমাজে হয়ে প্রতিপন্ন হবে, এই প্রশ্ন নাট্যকার তুলে ধরেছেন বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে। আর “সুমেদ-কুমেদ” হচ্ছে একটি সাস-পেন্সনধর্মী নাটক, যে-সাসপেন্সের অবসান হয় মাত্র তখনই, যখন জানতে পারা যায়, নাটকের মধ্যে যাদের অ্যাবনর্মাল চরিত্র বলে মনে করা হচ্ছে, বা যাদের সন্দেহভাজন চরিত্র বলে মনে করা হচ্ছে, তারা আসলে একটি চলচ্চিত্রের স্টাটিং পার্টির অন্তর্ভুক্ত। দু’টি নাটকের অভিনয়ই সাধারণ শ্রেণীর।

শিশু রংমহল (সি-এল-টি) :

শিশু রংমহলের একাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আস্তে ৬ই ও ১৩ই

মে নিউ এম্পায়ারে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থাপিত করবেন ‘ছন্দগাথা’—সাতটি বিভিন্ন ছন্দের সমবেত প্রদর্শনী। প্রকাশ, এই দৃশ্যের স্কেচগুলি এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ নৃত্যের প্রাথমিক ছন্দের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। এই বিশেষ যন্ত্রসঙ্গীতটি যদি রেকর্ড করে নেওয়া হয়, তাহলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই সঙ্গীত তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে ব্যবহার করতে পারবেন—এই কথা স্মরণ রেখে শিশু রংমহলের কর্তৃপক্ষ কলকাতা ও মফস্বলের দু’শো জন প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাকে আমন্ত্রণ জানাবেন। এই আমন্ত্রণ-পত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকেন্দ্র ২নং তিলক রোড থেকে পাওয়া যাবে।

৬ই মে ‘ছন্দগাথা’র সঙ্গে কৃষ্ণলীলা ‘সাধু’ মঞ্চস্থ করা হবে। এবং ১৩ই মে থাকবে ‘ঋগ্‌ভাটি পড়ুয়া’ ও ‘সাত ভাই চম্পা’।

সি-এল-টির নতুন নাটিকা ‘লালচে বড়ো’র কাজ পুরোদমে এগুচ্ছে। এতে সুরযোজনা ও নৃত্য-পরিচালনা করছেন যথাক্রমে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও ভানু দে।

একাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনে পর শিশু রংমহলের শিল্পীরা শিল্পা-যাচ্ছেন তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করার জন্যে।

দক্ষিণীর রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব :

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও দক্ষিণী চতুর্দশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠান-সূচী নির্ধারিত হয়েছে :—

(ক) ৮ই মে, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭টায় দক্ষিণী-ভবনে শিক্ষার্থী, সদস্য ও অভিভাবকদের প্রীতি সম্মেলন ও বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠান।

(খ) ১৩ই মে, রবিবার, সন্ধ্যা ৭টায় আশুতোষ কলেজ হলে শ্রুত গৃহস্থাকুরতার পরিচালনা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষ অনুষ্ঠান।

জঃ কোম্পঃ
আর্নিকা
কেশ তৈল

- মস্তিষ্ক শীতল রাখে।
- চুল ওঠা বন্ধ করে।
- অব্যবহৃত পুষ্টি নিবারণ করে।
- চুলের গোড়া শক্ত করে।

পরিবেশক : হার্নিম্যান হোমিও ফার্মেসী
১০৬এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা - ১৬

পাভলভ ইনস্টিটিউটের অভিনয় :

আসচে ৯ই মে, বুধবার সন্ধ্যা ৬টার মিনাভা থিয়েটারে পাভলভ ইনস্টিটিউটের নাট্যবিভাগ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গণ্ডোপাধ্যায় রচিত 'সম্রাট' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। প্রযোজনা, পরিচালনা ও আলোক-সম্পাতে উপদেশ দিয়েছেন যথাক্রমে সূর্য্য প্রসাদ, জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় ও তাপস সেন। অভিনয়ের উদ্বোধন করবেন গোপাল হালদার।

তিন দেশী ছবি

বঙ্গ আফিসের সম্বন্ধে হলিউড

বঙ্গ আফিসের সম্বন্ধে হলিউডের যাত্রার গতি ক্রমশঃই বৃদ্ধির দিকে। জন-তত্ত্বগত হলিউড আজকে তার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করেছে, ফলে 'কোরালিটি' চিত্রের নির্মাণ সংখ্যা বছরে বছরে কমে যাচ্ছে আমেরিকায়। এমন কি যারা 'হীতপর্বে' বাণিজ্যিক মলোবৃত্ত ছবি নির্মাণে তেমন আগ্রহী ছিলেন না তাঁরাও আজকে বঙ্গ আফিসের জালে জড়িয়ে পড়ছেন।

চিত্রের জন্যে কাহিনী নির্বাচন-পর্ব থেকেই হলিউডের প্রযোজকবৃন্দ গণভক্তনার আত্মনিয়োগ করেন। মৌলিক গল্পের দিকে তাঁদের কোনো ঝোঁক নেই। রডওয়ে-সার্থক নাটক অথবা সম্প্রদর্শন উপন্যাসের জন্যে কাড়া কাড়ি পড়ে গেছে প্রযোজকদের মধ্যে। ফলে কাহিনীর জন্যে মূল্যও দিতে হচ্ছে অস্বাভাবিক অঙ্কের। ওয়ারনার ব্রাদারসকে "মাই ফেরার লেডি" মঞ্চস্থ নাটকটির গল্প স্বত্ত্বের জন্যে দিতে হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার (প্রায় তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা!)। এবং এছাড়াও লভ্যাংশের অংশও দিতে হবে কাহিনী-মূল্য বাবদ। প্রযোজকরা মঞ্চস্থল নাটক অথবা 'বেস্ট সেলার'-এর দিকে আরো একটি কারণে আগ্রহী। যদি দৈবাৎ লোকচিত্রায়িত হবার পর ছবিটি সফল না হয় তিন অশ্লার খাড়ে দোষ ফেলে নিজে দায়মুক্ত হতে পারবেন। সেক্ষেত্রে পরিচালক বেচারীর কপাল পোড়ে। কাহিনী নির্বাচনের পরের অধ্যায় হল তারকা নির্বাচন। 'স্টার সিস্টেম'-এর

ব্যবস্থিতে হলিউড অনেকদিন ধরেই ভুগছে, ইদানীং কাহিনীর পেছনে প্রচুর টাকা লাগানো হওয়াতে কোনো ব্যক্তি স্বভাবতঃই তাঁরা নিতে চান না। ফলে তারকা নির্বাচনও হয় বিপুল অঙ্কের। শ্রেষ্ঠ তারকারা অচেনা কাহিনী (তা সে যতই উৎকৃষ্ট হোক) অপেক্ষা 'হীতপর্বে' বহু বিজ্ঞত কাহিনীতে অভিনয় করতে পছন্দ করেন। অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যে নেই তা না। খিলি ওয়াইল্ডার অথবা আই, এ, এল ডারমন্ডের মৌলিক কাহিনীর জন্যে শ্রেষ্ঠ তারকার অভাব হয় না কখনো। কিন্তু ব্যতিক্রমটি নিয়মকেই বার-বার সত্য প্রমাণিত করে। তারকা নির্বাচনের পর আসে স্টুডিওর খরচ। যেখানে কাহিনীতে, তারকার ইতিমধ্যে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে সেখানে উৎপাদন মলোর দিকে তাকানোর ইচ্ছে থাকে না প্রযোজক পক্ষে। ফলে জটিলতাকে উচ্চকিত চিত্র নির্মিত হয়। কিন্তু বঙ্গ আফিস আরাধনার এই প্রাণান্ত চেষ্টা যে সব সময়ে সফল হয় তা নয়, কিন্তু তথাপি খরচের গোলকবাধা থেকে হলিউডের প্রযোজকদের নিস্তার নেই সম্ভবতঃ আজকে।

শুধুমাত্র জটিলতাকের ওপরেই হলিউডে কম চিত্র নির্মিত হচ্ছে না। 'বেন-হার' ছবিটিই এর উজ্জ্বল নিদর্শন। তবু বেন-হারে তৎকালীন বিপুল অঙ্কের কোনো তারকা ছিলেন না। বেন-হারের অসামান্য সাফল্যের পরে প্রযোজকরা ভাবলেন শ্রেষ্ঠ তারকাহীন হয়েই বেন-হার যদি স্বর্ণপ্রসবিনী হয়, শ্রেষ্ঠ তারকাসমূহ হলে হয়ত এল ডোরেরডোর সমস্ত গুণতত্ত্ব ভাঙারই ব্যাপক এসে দণ্ডিত হবে। ফলে শ্রেষ্ঠ তারকাজ্যোতিতে উজ্জ্বল করে তোলা হল 'পার্টা কাস'। 'পার্টা কাস'ের পরে আসছে 'মিউজি' অন দি বাউশি'র নবসংস্করণ এবং 'ক্লিয়োপেট্রা'। দুটি ছবিতে আছেন যথাক্রমে মার্লেইন ব্রান্ডো এবং এলিজাবেথ টেইলার। উপরোক্ত তিনটি ছবির একটা বিশেষ সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতিটি চিত্রই নির্মাণের প্রাথমিক হিসেবকে অতিক্রম করে গেছে। 'পার্টা কাস'

নির্মাণের ব্যয় হয়েছে এক কোটি 'কুড়ি' লক্ষ ডলার। 'মিউজি' অন দি বাউশি'—এক কোটি সত্তর লক্ষ ডলার, এবং 'ক্লিয়োপেট্রা'—দু কোটি ডলার ব্যয় করা হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু ছবি এখনো শেষ হয়নি। ইতিমধ্যেই উপরোক্ত অঙ্ক খরচ হয়ে গেছে। অথচ একটি সাধারণ ভালো ছবি 'কুড়ি' থেকে 'ত্রিশ' লক্ষ ডলারের মধ্যেই নির্মিত হতে পারে হলিউডে। কিন্তু সেদিকে যাওয়ার সব সাহস হলিউডের নেই। কারণ 'কোরালিটি' চিত্র বাড়ি বদল করে আমেরিকা থেকে ইয়োরোপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাই বিচিত্র চিত্র-উৎসব ক্রাস, ইটালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশের ছবিগুলিরই জরখানি শোনা যায়।

—চিত্রকট

দর্শক মনোলোভা সায়রাবান্, অভিনীত এক মিলন-মধুর পারিবারিক কাহিনী

বাহার বিশ্বাসের

শাদী

সেইখানে

সায়রা বানু
বলরূপে সায়রা
মনোজ্ঞা-মলোচনা
ওম প্রকাশনা
পরিচালনা
কুস্তান পাঞ্জু
সম্পাদিত
চিত্রগুপ্ত

প্রতাপ, ১৩, ৬ ও ৯টার

হিন্দ - কৃষ্ণা - খান্না
প্রিয়া - গার্কশো

ফুটবল খেলা

দশক

১। প্রথম বিভাগের হকি লীগ ৥

১৯৬২ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দল চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এই চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্ধারণের জন্যে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, কাস্টমস এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের মধ্যে শেষ পর্যায়ের খেলা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের এ গ্রুপে মোহনবাগান প্রথম স্থান এবং কাস্টমস দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। বি গ্রুপে প্রথম স্থান পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল এবং দ্বিতীয় স্থান মহমেডান স্পোর্টিং দল। চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্ধারণের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় মোহনবাগান মোট ৩টি খেলার মধ্যে জয়লাভ করে ২টি খেলা এবং ড্র করে একটা। মোহনবাগান ৪-০ গোলে কাস্টমসকে এবং ২-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে। ইস্টবেঙ্গল দলের বিপক্ষে তৃতীয় খেলাটি তারা ড্র করে। প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়েছে ইস্টবেঙ্গল দল, ৩টে খেলার ৪ পয়েন্ট, মোহনবাগানের থেকে ১ পয়েন্ট কম। ইস্টবেঙ্গলের জয় ১, মহমেডান দলের বিপক্ষে ১-০

গোলে। তারা কাস্টমস এবং মোহনবাগান দলের সঙ্গে খেলা ড্র করে মূল্যবান ২টো পয়েন্ট নষ্ট করে।

এই নিয়ে মোহনবাগান দল আটবার প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। তারা লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৩৫, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৫-৫৮ (উপস্ফূর্তি ৪ বার) এবং ১৯৬২।

লীগ খেলার চূড়ান্ত তালিকা

খেঃ	জঃ	হাঃ	ড্র	পঃ	বিঃ	পয়েন্ট
মোহনবাগান	৩	২	০	১	৬	০
ইস্টবেঙ্গল	৩	১	০	২	১	০
মহঃ স্পোর্টিং	৩	১	২	০	০	৩
কাস্টমস	৩	০	২	১	০	৪

কাস্টমস অনুপস্থিত থাকায় মহমেডান স্পোর্টিং বনাম কাস্টমস দলের খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে মহমেডান স্পোর্টিং দল দু'পয়েন্ট লাভ করে।

লীগ জয়ের পথে মোহনবাগান পোর্ট কমিশনারের বিপক্ষে ৮-০ ও ৩-০; জ্যাম্বেরিয়ান্সের বিপক্ষে ৭-০

ও ৮-০; আমেনিয়ান্সের ১০-০ ও ওয়াকওভার; স্পোর্টসের বিপক্ষে ৪-০ ও রেজার্সের বিপক্ষে ৪-০ ও ইন্টার্ন রেলের বিপক্ষে ১-০ ও এরিয়ান্সের বিপক্ষে ২-০ ও পলিশের বিপক্ষে ৪-০ ও কাস্টমসের বিপক্ষে ৩-১, ৪-০; মহমেডানের বিপক্ষে ২-০ ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে ০-০।

পূর্ব বিজয়ী দল

এ পর্যন্ত ১৪টি দল প্রথম হকি লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। সব থেকে বেশি চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ক্যালকাটা ১৭ বার। তারপরই রেজার্স এবং বাগান দলের স্থান। প্রত্যেকে ৮ বার করে।

পাঁচবার অথবা তার বেশী

ক্যালকাটা কাস্টমস (১৭)
১৯০৯-১০, ১৯১২-১৩, ১৯১৬-১৭, ১৯৩১-৩৩, ১৯৩৬-৩৭, ১৯৪০ ও ১৯৬১ (যুদ্ধ বিজয়)
রেজার্স (৮ বার) : ১৯১১-১২, ১৯৩৪ ও ১৯৪৩
মোহনবাগান (৮ বার) : ১৯৫১-৫২, ১৯৫৫-৫৮ ও ১৯৬২
বি ই কলেজ (৫ বার) : ১৯০৮, ১৯১১ ও ১৯২০
পোর্ট কমিশনার্স (৫ বার) : ১৯৪৪, ১৯৪৬, ১৯৪৮-৪৯



প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের চূড়ান্ত পর্যায়ের মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলে গোলরক্ষক কাপ্তানের মোহনবাগান দলের গুরুত্বপূর্ণ গোল দেওয়ার চেষ্টা বাতিল করেছেন।

দু' বার জয়

১৯১১ ও ১৯২৩;
১৯২৪-২৫: ভবানীপুরে
৩: মহম্মদান স্পোর্টিং ১৯৪৫
৯: ইস্টবেঙ্গল ১৯৬০ ও

একবার জয়

১৯০৭: মিলিটারী মেডি-
৮: বি জি প্রেস ১৯৪০;
৪১

খাঁ হাকি প্রতিযোগিতা ॥

ইয়ের বিখ্যাত আগা খাঁ হাকি
তার ফাইনালে মারহাটা লাইট
দল (বেলগাঁও) ১-০ গোলে
র শক্তিশালী টাটা স্পোর্টস
রাজিত করে প্রতিযোগিতার
প্রথম বছরেই আগা খাঁ কাপ
জিতেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে
শেলোয়াড় শান্তারাম খেলার
পেনাল্টি করণ কিক থেকে
গোলটি করেন। প্রতিযোগিতার
৩৬ বছরের ইতিহাসে মাত্র এই
ল উপযুক্তি তিনবার স্বর্ণ-
পদম্য আগা খাঁ কাপ পেয়েছে
মারহাটা রোজমেন্ট, (২) বোম্বাই
(১৯৩৪-৩৬) এবং (৩) টাটা
ক্লাব (১৯৫০-৫২)। এই নিয়ে
টাটা ক্লাব তিনবার রানার্স-আপ
১৯৫৫ সালের ফাইনালে পাজাব
এবং ১৯৫৭ সালের ফাইনালে
র মাত্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ
ছে টাটা স্পোর্টস ক্লাব পরাজিত

১৯৬০ সালে একদিকের সেমি-
ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে টাটা
ক্লাব ২-০ গোলে ওয়েস্টার্ন
দলকে পরাজিত করে ফাইনালে
থায় দিন খেলাটি গোলশূন্যভাবে
সমাপ্ত থেকে যায়। অপর দিকের
ফাইনালে খেলার জয়-পরাজয়ের
হাতে দু'দিন লাগে। দ্বিতীয়
দিন মারহাটা লাইট ইনফ্যান্ট্রি
গোলে বাঙ্গালোরের মেকানিক্যাল
ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপকে পরাজিত
করে যায়। প্রথম দিনের খেলা
সমাপ্তি হয়।

৩য় দিনে আগা খাঁ হাকি প্রতি-
যোগিতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য
ঘটনা চতুর্থ রাউন্ডের খেলায়
টাটা ক্লাবের কাছে এ বছরের
কাপ বিজয়ী সেন্ট্রাল রেল-
০-২ গোলে এবং মারহাটা

লাইট ইনফ্যান্ট্রি দলের কাছে এ বছরেরই
গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতার রানার্স-আপ
পাজাব পুলিশ দলের ০-১ গোলে
পরাজয়।

এবারের ফাইনাল খেলার ধারা
দর্শকদের মনে উত্তেজনা আমতে পারেনি
—খেলা দেখে দর্শকেরা হতাশ হয়েছেন।

ফাইনালে দুই দলের রক্ষণভাগের
খেলাই প্রাধান্য লাভ করে: কিন্তু সেই
খেলায় মধ্যে দর্শনীয় কিছু ছিল না,
যে কোন রকমে গোল বন্ধার চেষ্টা। টাটা
স্পোর্টস ক্লাব একাধিক গোলের সুযোগ
নষ্ট করে—তাদের দুর্বলতা ছিল রক্ষা-
ভাগের খেলায়। মারহাটা লাইট ইনফ্যান্ট্রি
দলের পক্ষে এবারের আগা খাঁ কাপ জয়-
লাভ বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া
হয়নি। বোম্বাইয়ের লুইসটোনয়ান্স এ
বছরের জাতীয় হাকি চ্যাম্পিয়ন পাজাব
পুলিস, বাঙ্গালোরের মেকানিক্যাল
ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ এবং ফাইনালে টাটা
স্পোর্টস ক্লাব—এতগুলি শক্তিশালী
দলকে পরাজিত করে তবে এই কাপ
পেতে হয়েছে।

॥ গোল্ড কাপ হাকি ॥

বোম্বাইয়ের গোল্ড কাপ হাকি টুর্না-
মেন্টের ফাইনালে সেন্ট্রাল রেলওয়ে
৩-১ গোলে পাজাব পুলিশকে পরা-
জিত করে। সেন্ট্রাল রেলওয়ে ১৯৬১
সালের বটন কাপ ফাইনালেও পাজাব
পুলিশকে পরাজিত করেছিল। সুতরাং
শক্তিশালী পুলিশ দলের বিপক্ষে রেল-
ওয়ে দলের উপযুক্তি দ্বিতীয় সাফল্য
বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এশিয়ান ব্যাডমিন্টন
প্রতিযোগিতা

এশিয়ান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার
ফাইনালে মালয় ৫-০ খেলায় বিশ্ব
ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় 'টমাস কাপ'
বিজয়ী ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে।
সেমি-ফাইনাল খেলাতেও মালয় ৫-০
খেলায় পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়লাভ

করেছিল। ইন্দোনেশিয়া অপর দিকের
সেমি-ফাইনালে থাইল্যান্ডকে পরাজিত
করে ফাইনালে উঠেছিল ৩-২ খেলার।

এশিয়ান যুব ফুটবল
প্রতিযোগিতা

যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান যুব
ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে থাই-
ল্যান্ড ২-১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে
পরাজিত করেছে। প্রতিযোগিতায় এই
দশটি দল যোগদান করে: 'এ' গ্রুপে—
মালয়, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, জাপান এবং
ব্রহ্মদেশ; 'বি' গ্রুপে—কোরিয়া, ইন্দো-
নেশিয়া, পাকিস্তান, হংকং এবং সিঙ্গা-
পুর। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী
দশটি দেশকে সমান দুটি বিভাগে ফেলে
লীগ প্রথম খেলানো হয়। এবং প্রতি
বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধি-
কারী দেশগুলি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত
পর্যায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।
ভারতবর্ষ প্রতিযোগিতায় যোগদান থেকে
বিরত থাকায় ভারতীয় যুব সমাজ
নিজদের কুড়িয়ে নেওয়া প্রকাশের সুযোগ
থেকে বঞ্চিত হয়।

ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সফর

ভারতবর্ষ: ২১৮ রান (ইঞ্জিনিয়ার ৬২
এবং সূরিত ৪১ (আহত হয়ে খেলা
থেকে অবসর); মাসন ৩২ রানে ৫
এবং গ্রানাম ৪৭ রানে ৩ উইকেট)
ও ২০২ রান (৭ উইকেটে ডিক্লে-
য়ার্ড); জয়সীমা ৮৪ এবং সূরিত
৩৫; মাসন ৩৩ রানে ৩ এবং গ্রানাম
৩২ রানে ২ উইকেট)

উই-ডওয়ার্ড—লীওয়ার্ড আইল্যান্ড একা-
দশ: ১৩২ রান (গ্রোসাম ৪২; প্রসন্ন
৫৩ রানে ৫, রঞ্জন ৩০ রানে ৩
এবং দুরাণী ১৬ রানে ২ উইকেট)
ও ১৫১ রান (এডওয়ার্ডস ৫২ ও
গ্রোসাম ৫০; প্রসন্ন ৫০ রানে ৪,
দুরাণী ৩ রানে ২ এবং সূরিত ২৬
রানে ২ উইকেট)



কাটা, গোড়া, ঘা, রণ ও
যাবতীয় চর্মরোগে—

সালফা-ডার্মিন

কুমারেশ হাউস, মালিকিয়া হাওড়া

ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দফরে শেষ খেলায় উইন্ডওয়ার্ড এ্যাণ্ড লীওয়ার্ড আইল্যান্ড একাদশ দলের বিপক্ষে ১৩৭ রানে জয়লাভ করে। এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রথম শ্রেণীর খেলায় ভারতীয় দলের এই প্রথম জয়। মোট ৯টি প্রথম শ্রেণীর খেলায়

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে
এক ইনিংসে ৬০০ রান

ও
তিনটি ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

টেস্ট সিরিজ : ১৯৪৮-৪৯

৬৩১ ১ম টেস্ট, নিউ দিল্লী (ওয়ারলকট ১৫২, গোমেজ ১০১, উইকস ১২৮ ও ক্রিস্চিয়ানী ১০৭)।

৬২৯ (৬ উইকেটে ডিক্রেঃ) ২য় টেস্ট, বোম্বাই

টেস্ট সিরিজ : ১৯৫৮-৫৯

৬১৪ (৫ উইঃ ডিক্রেঃ), ৩য় টেস্ট, কলকাতা (কানহাই ২৫৬, বুচার ১০৩ ও সোবার্স নট আউট ১০৬)।

৬৪৪ (৮ উইঃ ডিক্রেঃ), ৫ম টেস্ট, নিউ দিল্লী (হোল্ট ১২৩, স্মিথ ১০০, সলোমন নট-আউট ১০০)।

টেস্ট সিরিজ : ১৯৬২

৬৩১ (৮ উইঃ ডিক্রেঃ), ২য় টেস্ট, কিংস্টন (কানহাই ১৩৮, ম্যাক-মরিস ১২৫ ও সোবার্স ১৫৩)। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের খেলায় ৬০০ রান করেছে।

টেস্ট সিরিজ : ১৯৫২-৫৩

৫৭৬ ৫ম টেস্ট, কিংস্টন (ওয়েল ২০৭, উইকস ১০৯ ও ওয়ালকট ১১৮) *

* ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত তিনটি সেঞ্চুরীর প্রথম টেস্ট রেকর্ড।

মধ্যে ভারতবর্ষের জয় ১, ড্র ২ এবং হার ৬ (পাঁচটি টেস্ট খেলা সহ)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের তালিকায় উইন্ডওয়ার্ড এ্যাণ্ড লীওয়ার্ড আইল্যান্ড একাদশ দল ছিল সব থেকে দুর্বল—যদিও সাতটি দ্বীপের খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী।

ভারতীয় দল টেসে জয়লাভ করে প্রথমই ব্যাট করার সুযোগ নেয়। কিন্তু প্রথম ইনিংসের গোড়াপত্তন মোটেই সুবিধার হয়নি। দলের ৩১ রানের মধ্যে ৩টি উইকেট পড়ে যায়—জয়সীমা, দুঃখী এবং মোহরা। ৩র্থ উইকেট সারদেশাইয়ের গাঙ্গে খেলতে নামেন অধিনায়ক পতোদীর নবাব। দলের পতন রোধ করার সমস্ত আশা ভেঙে গেল যখন পতোদীর নবাব

কোন রান না করেই দলের ৩৭ রানের মাথার বিদায় নিলেন। লাঞ্চার সময় উইকেটে অপরাজেয় ছিলেন সারদেশাই (১৮) এবং কুন্দরাম (১১); এই দুজনের ২৫ মিনিটের খেলায় ৩১ রান উঠে। চাপানের বিরাতির সময় দলের রান দাঁড়ায় ১৯৭, ৭ উইকেট, পড়ে। উইকেটে তখন খেলছিলেন সুতি (৪১ রান) এবং ইজিনীয়ার (৬২ রান)। সুতি এবং ইজিনীয়ারের ৮ম উইকেটের জুটি দলের ৭৩ রান তুলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুখ রাখেন। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ২১৮ রানে শেষ হয়। সুতি তার ৪১ রানের মাথায় ফাস্ট বোলার ম্যাসনের বাউন্সার বল খেলতে গিয়ে চিবকে আঘাত পান এবং খেলা থেকে শেষ পর্যন্ত অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। হাসপাতাল পর্যন্ত তাকে দৌড়তে হয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দলের বিপক্ষে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন ফাস্ট বোলার ম্যাসন এবং গ্রানাম। ওয়ার্লার পাকের ঘাসের পিচে বল বোলারদের সহায়ক ছিল। এই দিনের বাকি খেলায় উইন্ডওয়ার্ড-লীওয়ার্ড আইল্যান্ড দল ২টো উইকেট নষ্ট করে ৭০ রান করে।

খেলার দ্বিতীয় দিনে উইন্ডওয়ার্ড-লীওয়ার্ড আইল্যান্ড দলের প্রথম ইনিংস ১৩২ রানে শেষ হলে ভারতীয় দল ৮৬ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দ্বিতীয় দিনে আইল্যান্ড একাদশ দল বাকি ৮টা উইকেটে মাত্র ৬২ রান করে। লাঞ্চার পরই তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ভারতীয় দলের পক্ষে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন প্রসন্ন, ৫৩ রানে ৫টা উইকেট। ভারতীয় দল দ্বিতীয় দিনের খেলায় ২০২ রান করে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। আইল্যান্ড একাদশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে কিন্তু দলের কোন রান হওয়ার আগেই আলোর অভাব ঘটায় খেলা বন্ধ রাখা হয়। ভারতবর্ষ ২৮৮ রানে অগ্রগামী থাকে। ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যাটিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন জয়সীমা ৮৪ রান করে। তার এই রানে ছিল ১৪টা বাউন্সারী; এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তার সর্বোচ্চ রান।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চার পর ৮০ মিনিট পর্যন্ত খেলা হয়। আইল্যান্ড একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫১ রানে শেষ হলে ভারতীয় দল ১৩৭ রানে জয়লাভ করে। আইল্যান্ড দলের পক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন এডওয়ার্ডস। দ্বিতীয় ইনিংসেও বোলিংয়ে

সাফল্য লাভ করেন প্রসন্ন ৪টো উইকেট। দুটো ইনিংসে পান ১টা উইকেট ১০০

বছরের লেগা ক্রিকেট

ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সম্মান ক্রিকেট খেলার বিবর্ষপঞ্জীতে প্রকাশিত খেলোয়াড় (five crick year) এই বিশেষ অর্জনের নামের তালিকায় এই সম্মান লাভের জন্যে খেলোয়াড়রা কি গভীর অপেক্ষা করে থাকেন। বছরের নির্বাচিত পাঁচ এই সম্মান লাভের জন্যে সার্টিফিকেট বা আর্থিক করেন না। ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের পরম সম্মান লাভ। উইসডেন ১৮ বছর আগে ক্রিকেট মাত্র প্রামাণ্য বর্ষপঞ্জী নয়, সম্পর্কে প্রবাদ দাঁড়িয়ে খেলোয়াড়দের 'বাইবেল'।

উইসডেন বর্ষপঞ্জীর সংস্করণে বছরের সেরা ক্রিকেট হিসাবে যে পাঁচজনকে হয়েছে তারা সকলেই খেলোয়াড়। এই তালিকায় পেয়েছেন ১৯৬১ সালে সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দল অধিনায়ক রিচি বেনো, এল্যান ডেভিডসন, বিল ইংল্যান্ডের সামারসেট অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬১ সিরিজে দল পরিচালনার বোলিং এবং ব্যাটিং ডেভিডসন, ব্যাটিংয়ে ন এবং বিল লরী কৃতিত্ব। বিল এ্যাঙ্গেল ইংল্যান্ডের মরশুমে ৩,০১৯ রান করে উইকেট পেয়ে চৌকস পরিচয় দেন।

এপর্যন্ত ৬ জন খেলোয়াড় বিভিন্ন সময়ে খেলোয়াড় এই অধ্যায়ে তাদের নাম কে (১৮৯৭), কে এস (১৯৩০) পতোদীর (১৯৩৩), (১৯৩৭) এবং তিন দ্বীপের রঞ্জী সিংহী, দ্বীপ পতোদীর নবাব ইংল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের কাউন্টি সম্মান লাভ করেন।

অমৃত পাবলিশার প্রাইভেট লিমিটেড গ্রন্থ প্রকাশিত পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জী কলিকাতা-৩ হইতে মাদ্রাস ও তৎকর্তৃক ১১টি, আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্র